পূর্ব্ব ও পশ্চিম

পূর্ব্বে কি পশ্চিমে সকল স্থানে লোক কেবল চা-ই চায়। পাশ্চাত্য দেশকে এই "আনন্দময় পাত্রের" রহস্যের সন্ধান দিয়েছিল প্রাচীই। তাই পূর্ব্ব পশ্চিমের ভেতর স্থানের ব্যবধানটা ঘুচে গেছে; আজ সারা জগৎ এসে চায়ের পাত্রে মিলিত হচ্ছে। যে দেশেই চা পানের রীতি আছে সেই দেশেই লোকে একবাক্যে একে সভ্যতার প্রতীক বলে স্বীকার করে নিয়েছে। জগতের বিভিন্ন জাতিকে চা-ই বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করেছে

চা-প্রস্তুত-প্রণালী

টাট্কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।
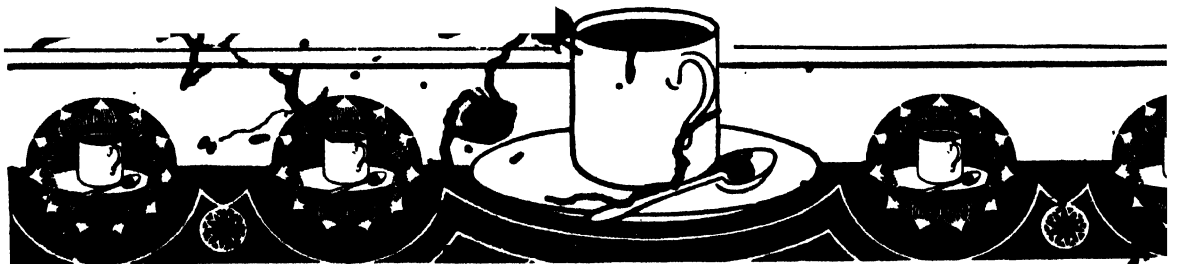
ছায়া দেবী

লালিত্য ও মাধুর্য্যের সামঞ্জস্যে আধুনিকা এই মেয়েটি কে? মেট্রোপলিটান পিকচার্সের "হাল-বাঙলা"-র নায়িকা।
পরিচালক—ধীরেন গাঙ্গুলী।

নতুন ধরণের ভূমিকায় নামছে রেণু। কালী প্রসাদ ঘোষ পরিচালিত রাধার "পুরুষোত্তম" চিত্রের জাম্ববতী ইনি।

প্রফুল্ল পিকচার্সের "স্বপের শ্রমিকে" কমলা ও দেববালা। ছবিখানি শীগ্রই আসছে।

আশীর্ব্বাদ

শ্রীযুক্ত "খেয়ালী"-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

আজ হইতে সাত বৎসর পূর্ব্বে এমনই এক পৌষের সন্ধ্যায় পরম-খেয়ালীর অচিন্ত্য খেয়ালের বশে যে "খেয়ালী" পত্রিকাটি ধরার আলোক প্রথম দেখিবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইয়াছিল, এতদিনে তাহা কোমল শিশুত্বের বয়ঃসীমা অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে বাল্যের চপলভূমিতে পদার্পণ করিতেছেন যে দুর্ভাগ্য দেশের ধুলিমলিন দরিদ্রকুটীরে শোচনীয় শিশুমৃত্যুর তালিকা দেখিয়া সুসভ্য সুধীসমাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন, সেই নিরন্ন কণ্ঠাগতপ্রাণ দেশের পক্ষে ইহা সবিশেষ আনন্দ-সংবাদ সন্দেহ নাই!

নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও "খেয়ালী" বড় ক্ষীণপ্রাণ হে[illegible]। এ দীর্ঘ সাত বৎসর "খেয়ালী" কেবল অসহায় [illegible]মতই 'কোনরূপে পরাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছে'—[illegible]বাদ তাহার অতি বড় শত্রুতেও দিতে কুণ্ঠাবোধ [illegible]রিবে। আশৈশব আপনার সগৌরব অস্তিত্ব সুপ্র-[illegible]ণিত করিতে "খেয়ালী" চিরদিনই পরমুখাপেক্ষণে [illegible]মুখতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। পরানুগ্রহপুষ্ট-[illegible]ংবাদিক জগতে তাই "খেয়ালী" নিয়ত চক্ষুঃশূল—[illegible]রতিশয় ঈর্ষ্যার পাত্র

আজন্ম সুদীর্ঘ সপ্তবর্ষ কাল "খেয়ালী" সত্যাশ্রয়ে—ধর্ম্মাবলম্বনে— ন্যায়ের পক্ষে—উন্নতশিরে অচল-অটল-পদে একাকী দাঁড়াইয়া কত শত অসত্য-অধর্ম্ম-অন্যায়ের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন কঠিন সংগ্রাম চালাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কতবার কত সুরক্ষিত বিপক্ষ-পক্ষ লৌহকঠোর নিষ্পীড়নে তাহার স্বল্পপ্রসর শ্বাস রুদ্ধ করিবার প্রবল প্রয়াস পাইয়াছে—কতবার কত না শিশুঘাতি নৃশংস কংস প্রাণান্তকরী বধ্যশিলায় সবেগে নিক্ষেপ করিয়া এই ক্ষীণ শিশুশরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রতিবারই এই ক্ষুদ্রকায়া পত্রিকাখানি করুণাময়ের কৃপাকণা-লাভে—[illegible]-সঞ্চিত সুকৃতবলে বিনা [illegible] আপনাকে বিপক্ষ-কবল-মুক্ত করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে! "খেয়ালীর" বাঁচিবার যোগ্যতা ও শক্তির পরিচয় এইখানেই। আর এই জন্যই 'খেয়ালী' তাহার পরাক্রান্ত পরপক্ষের নিকট চিরদিনই একটা বিরাট হেঁয়ালী—বিপুল বিস্ময়ের নিদান!

খেয়ালী তুয়লেশ-পরিশূন্য জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক। জাতীয়তার মহনীয় আদর্শ চির উন্নত

ও অবিকৃত রাখিবার সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে, উঁহাকে একাধিকবার ভিন্নমতাবলম্বী অথচ হিতৈষিবর্গেরও অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে "খেয়ালী" বরং বন্ধুবর্জ্জন করিতেও স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি কোনদিন বন্ধুত্বের খাতিরে জাতীয়তার আদর্শ বিসর্জ্জন দেয় নাই। এজন্য "খেয়ালী" চিরদিনই আদর্শবাদিগণের অভিনন্দনীয়!

"খেয়ালী" অজাতশত্রু নহে। এক নিষ্কাম মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় ব্রতী বলিয়াই উগ্র স্বার্থান্ধ আদর্শচ্যুত ব্যক্তিগণের স্বার্থে আঘাত দিয়া শত্রু সৃষ্টি করে। দুর্গতের আকুল ক্রন্দন শ্রবণে "খেয়ালীর" অন্তরতল চিরদিনই ব্যথাতুর—আর্ত্তের চিত্তে সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদানে "খেয়ালী" চিরদিনই অকৃপণ —পথভ্রান্ত বান্ধব-গোষ্ঠীকে রূঢ় সত্যভাষণের শাসন-সহায়ে সুপথে পরিচালিত করিতে "খেয়ালী" চিরদিনই ক্লান্তিহীন অগ্রণী—আদর্শ-পরিভ্রষ্টের বিরুদ্ধে উত্তোলিত তাহার মর্ম্মভেদী বেত্রদণ্ড চিরদিনই অতি অকরুণ—অত্যাচারী প্রবলের প্রতিপক্ষে অভিযানে "খেয়ালী" চিরদিনই বদ্ধপরিকর—আবার কদাচিৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইলেও হীনতার কলঙ্ক-কালিমা ক্ষেপনে "খেয়ালী" চিরদিনই পরাঙ্মুখ। "খেয়ালী"র এ আদর্শ সাংবাদিক-সমাজের অনুকরণীয়।

সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষোত্তমের শ্রীচরণারবিন্দের উদ্দেশে সভক্তি নতি নিবেদনান্তে প্রার্থনা করি—সাত বৎসর পূর্ব্বে "খেয়ালীর" যে নবীন জীবনযাত্রার সূচনা হইয়াছিল তাহা অচিরভাবিনী জয়যাত্রায় পর্য্যবসিত হউক! —সকল বাধা-বিঘ্ন চরণে দলিয়া—শত ঝঞ্ঝা বজ্রপাত অকাতরে শিরে বহিয়া—অকম্পিতপদে—অচঞ্চলচিত্তে আমাদের চির-আদরের "খেয়ালী" তাহার চিরস্থির লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকুক! —সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর রিপুভয়বারিণী প্রহরণ-প্রভা তাহার গন্তব্য পথ উদ্ভাসিত করিয়া তুলুক! —মহাশক্তির দিগন্ত-প্রসারিত বরাভয়-কর তাহার সরল শিশু-চিত্তে নিরন্তর অকুণ্ঠিত শক্তিসঞ্চার করুক!

॥"শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"॥

॥শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি—

নিত্যশুভার্থী

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

১৭ই পৌষ, ১৩৪৪

——:০(×)০:——

'খেয়ালী'র প্রতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

সৌন্দর্য্য ও সত্যের লাগি যুগে যুগে তব অভিযান
ধ্বনিছে গভীর কণ্ঠে, নিপীড়িত মুখে তব জয়গান
দিক হতে দিগন্তরে তোমার সান্ত্বনা বাণী
নিরাশার দিক আশা
মূকে দিক নব-ভাষা
জীবনের উন্মাদনা দেই যেন আনি।

অজ্ঞতার অন্ধকারে ব্যাধিগ্রস্ত দেহে
জীবনে কালিমা আনে হীন-অপমান গেহে
দুঃখের রজনী আজো যাহাদের হয়নিক ম্লান
যারা মরে অনাহারে
অবিচারে অত্যাচারে
তাহাদের দিতে হবে-নব আলো অমৃত সন্ধান!

জীবনের আলো দাও শেষ হোক অপমান গ্লানি
ফুকারিয়া পাঞ্চজন্য জীবনের জয়গান তুমি দাও আনি॥

———

আমাদের কথা

উপনিষদে আছে—"স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বম্ সৃজত যদিদম্ কিঞ্চ।" বিশ্ববিধাতা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু তপস্যার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। তপঃশক্তিই সৃজনীশক্তি। এবং যেহেতু man was made in the image of good সেই হেতু মানুষকেও কিছু সৃষ্টি করিতে হইলে তপস্যা করিতে হয়—জ্ঞানের তপস্যা, প্রেমের তপস্যা, কর্ম্মের তপস্যা এবং এই তিনের মধ্যেই ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত আছে ত্যাগের তপস্যা, দুঃখের তপস্যা। বাঙ্গলাদেশে সাময়িক পত্রিকার গতিপথ নিতান্ত সুগম নয়—বহু দুঃখবাধায় কণ্টকাকীর্ণ। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, অকুণ্ঠসত্য ভাষণের নির্ভিক প্রয়াস, দেশের নানা দুঃখদ্বন্দ্বের সমস্যা সমাধানের একমাত্র প্রচেষ্টা দ্বারা 'খেয়ালী' আপনার জীবনের সূত্রে একে একে সাতটী বৎসরের অক্ষমালা সংগ্রহ করিয়াছে। কোনও ধনিকের বা বনিকের আর্থিক বা মানসিক কণ্ডুয়ণ চরিতার্থ করিবার জন্য 'খেয়ালী'র জন্ম হয় নাই। সেইজন্য কাহারও অনুগ্রহের লালনের দিকেও সে লোলুপদৃষ্টিতে চাহে নাই, কাহারও নিগ্রহের তাড়নাকেও সে ভয় করে নাই। এই নিরপেক্ষ নির্ভীকতার ফলে হয়তো :—

"কত বান্ধব হ'য়েছে বিমুখ" ম্লান হ'য়ে গেছে কত উৎসুক উন্মুখ ভালবাসা"।

নিতান্ত দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু 'খেয়ালী' এই সত্যের তপস্যা, এই দুঃখের তপস্যা করিতে কোনও দিন পশ্চাৎপদ হয় নাই। তাই সমসাময়িক পত্রিকার জগতে "খেয়ালী"র দান ও স্থান আজ সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে স্বীকৃত, বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার অন্তরে তাহার জন্য প্রীতির আসন আজ অব্যাহত।

বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা কি দেখিতেছি? পশ্চিম দিগন্তে লীয়মান অস্তরাগচ্ছটা কি পূর্ব্বদিগন্তে নবারুণরূপে দেখা দিতেছে? পাঠক-পাঠিকাদের এই কথা বলিতে পারিলে হয়তো আনন্দিত হইতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়—তাহা পারিতেছি কই? 'খেয়ালী'র খেয়ালে "মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" নীতি বদলাইয়া হইয়াছে "মা ব্রূয়াৎ অসত্যম্প্রিয়ম্।" অর্থাৎ অপ্রিয় সত্য বলিতে 'খেয়ালী' পশ্চাৎপদ নয়, কিন্তু যতই প্রিয় ও মুখরোচক হউক অসত্য বলিতে সে সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ। তাই দেশের রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থী ধুরন্ধরেরা নূতন শাসনতন্ত্রের প্রশংসায় গদ গদ হউন না কেন 'খেয়ালী' তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য যে, শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না। দুই একজন এই নূতন শাসনতন্ত্রের কৃপায় আবুহোসেনী লাভ করিয়া আনন্দে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত শক্তির জয়ঢাক এমন প্রাণপণে বাজাইতেছেন যে, দেশবাসীর কর্ণপটহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সকল বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, যে যুগে ইম্পিরিয়ালিজমের সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত শক্তি মানুষের মনে নির্ভীক স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তিকে দমাইয়া রাখিতে পারে নাই, সে-যুগে কয়েকজন পাগলের দাঁতখিচুনী, তর্জ্জন গর্জ্জন ও হুমকীতে ভীত হইবার মত শৈশব বাঙ্গালী বহুদিন অতিক্রম করিয়াছে।

বাস্তবিক বাঙ্গলার ভাগ্য এইরূপ দুঃখমেঘ-সমাচ্ছন্ন আর কতদিন থাকিবে, তাহাই ভাবি। নূতন শাসনতন্ত্র কোঁ।সিলের আমলন্ত্র বা উহার মধ্যে সত্যই আমের কোনো সত্ত্ব আছে, ভারতের আর ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার বুকের উপর এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলী চাপিয়া বসিয়া আছে। তাই এখনও বহু বন্দী ও রাজবন্দীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাঙ্গলার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত, তাই শিক্ষাসংস্কারের নামে শিক্ষা সংহারের জন্য আমলাতন্ত্রের কামারশালে শাণিত হইতেছে, তাই এযুগেও দেশের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য সংবাদপত্র দলনের লজ্জাকর হুমকী মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধের জন্য চাই দেশের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি। আমরা সাম্প্রদায়িকতার ঘোর বিরোধী। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, এইরূপ প্রতিক্রিয়াপন্থী ব্যক্তিমাত্রেই দেশের স্বাধীনতার প্রগতি-বিরোধী। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই প্রগতি-বিরোধীদের বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান।

ইউরোপের আকাশও আজ দুর্য্যোগের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। শক্তি মদমত্ত ফ্যাসিজমের হুঙ্কারে ইউরোপের রাজনৈতিক শান্তি আজ ব্যাহত। এদিকে সাম্রাজ্যলোভী জাপানের অভিযানে চীন বিধ্বস্ত। এযুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে সারাবিশ্ব একসূত্রে গ্রথিত। তাই এই প্রমত্ত তাণ্ডবের ঢেউ আমাদের দেশেও লাগিয়াছে বা লাগিবে। এই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আমাদের পথ চিনিয়া চলিতে হইবে। ইহার জন্য চাই, অদম্য আশা, অবিচলিত বিচার বুদ্ধি, একাগ্র আদর্শনিষ্ঠা ও সংহত কর্ম্মশক্তি। সেই বিশ্বদেবতা—"যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ"—অমৃতও যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া—আমাদের অন্তরে সেই শক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণা দান করুন—আজিকার দিনে ইহাই প্রার্থনা।

আশ্রয়

(গল্প)

শ্রীকপিল প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শিয়ালদহ ষ্টেশনখানা গমগম্ করে কাঁপিয়ে দার্জ্জিলিং মেল এসে দাঁড়াল, প্লাটফরম্ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। গাড়ী থেকে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে মনে হ'লো যেন হারিয়ে গেলাম, জলস্রোতে যেমন জলবিন্দু হারিয়ে যায়। মুহূর্ত্তেকের জন্যে মনটা পুলকিত হয়ে' উঠল।

সার্কাসের তাঁবুর মত উঁচু ষ্টেশনের ছাদ, করগেট টিনে ছাওয়া—প্রকাণ্ড, উঃ কি প্রকাণ্ডই! ওই ছাদের করগেট টিনের খানচার যদি জলপাইগুড়িতে কেউ আমায় দিত, বসতবাড়ীর ঘরখানার ছাউনিটা মেরামত করিয়ে দিয়ে আসতে পারতাম। বুড়ী মা আমার, সারারাত ধরে' এই জলপাইগুড়ীর বর্ষায় তাঁর কি নাকালই না এ বছর হচ্ছে।

যাক্ জলপাইগুড়ি—তাকে অনেকদূর পিছনে ফেলে এসেছি। মহাজনের তাগাদার হাত থেকে ত অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই কলকাতা শহরে ইতিপূর্ব্বেও বহুবার এসেছি, এবারে কিন্তু কলকাতা যেন স্নেহশীলা মায়ের মত আমায় বুকে তুলে' নিল। মাথায় হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিয়ে যেন বলতে লাগল, "বাছারে! পয়সার অভাবে কত কষ্টই পেয়েছিস্; এখানে, আমার কোলে যখন এসে পড়েছিস্; ছিল্লে একটা হবেই।"

কলকাতায় কত লোক কত উপায়ে করে' খায়, আমারই কি একটা ব্যবস্থা হবে না?

সাহসে বুক বেঁধে প্লাটফরমের জনস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আমিও টিকিট-কালেক্টারের গণ্ডী পার হয়ে বাইরে এলাম, পিছনে তাকিয়ে দেখি, দার্জ্জিলিং মেলের ইঞ্জিনটা এই দূরপথ এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে হাঁফ ছাড়ছে।

কোথায় যাব, তা' তখনও ভাবিনি, হাতে একটি গামছাবাঁধা পরণের ধুতিখানির পোঁটলা। সটান্ হ্যারিসন রোডের মোড়ের দিকে চললাম।

রেল-চৌহদ্দির ফটকের বাইরে আসতেই, সামনে দেখি, একদল কাবুলীওয়ালা, গোস্ত-রোটীর দোকানের সম্মুখে বেঞ্চিতে বসে' প্রাতরাশ সমাপন করছে।

ত্রাসে আঁৎকে উঠলাম।

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আমি ত কলকাতায় পৌঁছেছি, জলপাইগুড়ির করিম এখানে নেই। বিভীষিকা দমন করে' বুক ফুলিয়ে সার্কুলার রোড পার হয়ে গেলাম, এখানে বুড়ী মায়ের চোখের সাম্‌নে কাবুলীওয়ালা করিম সুদের তাগাদায় এসে আর আমার হাত ধরে' টানাটানি করতে পারছে না।

আমার বাবা ছিলেন রংপুর আদালতে মোক্তার, সামান্য আয়ে কোনরূপে সংসার চলে যেত। একমাত্র ছেলেটীকে উকিল করাই ছিল তাঁর জীবনের উচ্চাকাঙ্খা। আমি জলপাইগুড়ি থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে' যখন রংপুর কলেজে আই-এ পড়তে এলাম, তিনি সাফল্যের পথে যেন অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেলেন। সামান্য য' পুঁজি জমাতে পেরেছিলেন, আর কিছু ঋণ করে' বয়স্থা কন্যাটীর বিবাহ দিয়ে ফেললেন।

তারপরেই এল অসহযোগ আন্দোলন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে সমস্ত উত্তর বঙ্গ আর আসাম বিচলিত হয়ে উঠল, বিশেষতঃ চা-বাগান অঞ্চল।

কলেজের পড়া ছেড়ে জলপাইগুড়ির চা-বাগানে দেশের কাজে যোগ দিলাম। এদিকে আইন-আদালতের কাজের চাকা যেন সহসা থেমে গেল।

বাবার পঞ্চাশ বছর বয়স হ'য়েছিল, এসব ধাক্কায় তিনি বিমূঢ় হ'য়ে পড়লেন। কলেজ যখন ছাড়ি, একটীবার মাত্র তিনি আমায় মুখফুটে নিষেধ করেছিলেন, আমি কর্ণপাত করিনি। একমাত্র পুত্র আমি, স্নেহের দুর্ব্বলতায় আমায় আবাল্য প্রশ্রয় দিয়েছিলেন ঢের। তাঁর জীবনের একটী মাত্র বাসনা ছিল আমি উকিল হই, আইন-জীবির সমাজে মোক্তারের উপরে তাদের মর্য্যাদা। দেশের কাজের ডাকে তাঁর সে আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।

সে বছর তাঁকে কালাজ্বরে ধরল, কয়েক মাস ভুগে আরও কিছু ঋণ বাড়িয়ে তিনি মারা গেলেন। মরবার পূর্ব্বে তাঁর মুখের শেষ বাণী, স্নেহমুগ্ধ চক্ষে আমার পানে তাকিয়ে, "চল্লাম বাবা রমেন"—

দেশের কাজ ছেড়ে আমায় ঘরের কাজে মন দিতে হ'ল। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কিছু উপার্জ্জন করা।

পাওনাদারেরা মানে না। মাড়োয়ারী শেঠজী স্বয়ং খাতাবগলে দুয়ারে হাজির; পিতৃঋণ, তার সুদ ত, অন্ততঃ যথা সময়ে আমার দেওয়া কর্ত্তব্য!

শেঠজীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনিও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন, মাথায় রঙিন্ পাগড়ী ছেড়ে খদ্দরের টুপি পরেছিলেন, আর বিলাতী সিগারেটের ব্যবসায় ছেড়ে লক্ষ লক্ষ বাণ্ডিল গান্ধী-মার্কা বিড়ি আমদানি করে' তাঁর আড়ৎ ভরে ফেলেছিলেন।

তিনি আমায় ডেকে বললেন, "রমেণবাবু তুমি আমার সতই মহাত্মাজীর চেলা

আছ—পিতার ঋণ কি উসুল না ক'রে' বিলম্ব করতে আছে? কুচ্ছু না হোয় ত' দেড় শও রূপেয়া সুদ এখন দিয়ে দাও!"

শেষ পুর্য্যন্ত কাবুলীওয়ালা করিমের কাছ থেকে দেড়-শ' টাকা নিয়ে গান্ধীজীর চেলা শেঠজীকে দিয়ে পুত্রের কর্ত্তব্য সম্পাদন করলাম।

উঠে পড়ে একটা চাকরী সংগ্রহে মন দিলাম। চা-এর বাগান সব বন্ধ হয়ে' আসছে, তামাকের বাজার, পাটের বাজার সবই মন্দা, জলপাইগুড়িতে চাকরি মিলবে কোথা থেকে?

কয়েকটা টাকা সংগ্রহ করে' রং-পুরে গেলাম, পিতৃবন্ধু প্রবীন মোক্তার বাবুদের ধরলাম। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বললেন, "আচ্ছা দেখছি, হাকিমদের সঙ্গে কয়ে' যদি তোমার কিছু করতে পারি!"

আশ্বস্ত হ'লাম। তারপর আজ এর বাড়ী কাল তাঁর বাড়ী আহার করে' দিন কাটাতে লাগলাম। দিনের পর দিন কাটল, সপ্তাহ কাটল, মাস কাটল। ক্রমে আমার পিতৃবন্ধুরা বিরক্ত হয়ে' উঠলেন—এ দুর্দ্দিনে পুরানো বন্ধুতার খাতিরে, বেকারকে বাড়ী বসিয়ে খাওয়াতে কেউ রাজি নন।

রংপুরে অপেক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কোথায় থাকি? এদিকে মা লিখলেন, করিম তার সুদের তাগাদা করছে, শেঠজীও ঘোরাঘুরি করছেন? শেঠজী বলেছেন, তিনি মোক্তার বাবুকে সাধুলোক বলেই জানতেন, তাঁর ছেলে কংগ্রেসে কাজ করেও যে এরূপ জুয়াচোর, রংপুরে পালিয়ে লুকিয়ে থাকবে, একথা তিনি কখনও ভাবতে পারেন নি।

জলপাইগুড়ি ফিরে বসত বাড়ীর লাগাও সামান্য যে কয়কাঠা জমি ছিল, তা, শেঠজীকে বিক্রয় কোবালা করিয়ে দিলাম—সে কিস্তির সুদ তার শোধ হ'ল।

করিমের জন্যে কিছু উপায় করতে পারলাম না। দিন কতক সে আমাদের বাড়ী এসে ফিরে গেল, তার সঙ্গে দেখা করলাম না। শেষে একদিন সে আমায় ধরে ফেলল। বাড়ীর দরজার সুমুখে আমার হাত ধরে টানাটানি করল, মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। পাড়ার লোকজন জড়ো হ'ল, কোনরূপে সেদিন তার হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম।

দু'দিন পরেই মায়ের সাদরে রক্ষিত পৈতৃক পিতল কাঁসার তৈজস কয়েকখানি বিক্রয় করে' কয়েক টাকা সংগ্রহ করলাম। সেই টাকা হ'ল কলকাতা আসবার পাথেয়। এখানে যা'-হোক্ একটা কিছু উপার্জ্জনের উপায় হবেই।

আত্মাকে 'মুক্ত করে' ছিল। মদ-গাঁজা-আফিংএর দোকানে পিকেটিং, প্রাপ্রোপ-গেশন অভ্যাস ক'রে যে চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জ্জন করেছে, তার আবার চিন্তা কি?

মোড়ে মোড়ে হকারেরা খবরের কাগজ বিক্রী করছে, ঝাঁকা মুটের দল বাসের আরোহীদের মোট বয়ে' নিতে প্রস্তুত হয়ে' বসে আছে, রিক্‌শ ওয়ালা গাড়ী টানছে, কল্‌কাতায় অর্থোপার্জ্জনের কত উপায়ই না রয়েছে।

মনে পড়ে গেল, জানবাজারে আমার দূর সম্পর্কীয় এক পিতৃব্য আছেন। লেখাপড়া তিনি বেশী শেখেন নি, তাই জাতিতে কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও এখানে একখানি মিষ্টান্নের দোকান খুলেছেন। ইতিপূর্ব্বে বাবার সাথে কল্‌কাতা বেড়াতে এসে তাঁর সঙ্গে দু' একবার দেখা করে গিয়েছি। বড়দিনের সময় জলপাইগুড়ি থেকে বড় এক ঝাঁকা কমলালেবু নিয়ে বাবা তাঁর ওখানে শেষবার উঠেছিলেন —কাকা মহাশয় আমাদের খুবই যত্ন করেছিলেন।

আমি সটান তাঁর দোকানে গিয়ে হাজির হ'লাম।

দোকানের সম্মুখ অংশেই একটা প্রকাণ্ড উনানে কাকা স্বয়ং 'ভিয়ান্' চড়িয়েছিলেন, ভাদ্রমাসের গুমোটে আর অগ্নিতাপে তাঁর বিশাল ভুঁড়ি বেয়ে ঘাম ঝরছিল। গ্লাস কেসের মধ্যে নানা জাতীয় মিষ্টান্ন স্তবকে স্তবকে সাজানো রয়েছে। আহার্য্যের প্রাচুর্য্যের দিকে নিরীক্ষণ করে' থাকলে মন মাধুর্য্যে ভরে যায়।

ভক্তি ভরে পিতৃব্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করলাম, তিনি একগাল হেসে বললেন; "কিরে রমেশ এসেছিস্? বেশ, বেশ।"

এমন স্বাগত পেয়ে মনে বড় আনন্দ হ'ল, জলপাইগুড়ির সকল লাঞ্ছনা ভুলে গেলাম।

কাকা মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর?"

পিতৃবিয়োগের পর আমাদের দুর্দ্দশার কথা তাঁকে কথঞ্চিত নিবেদন করলাম, তিনি ধৈর্য্য সহকারে শুনলেন। আমি বললাম "তাই ভাবলাম যা' হোক কিছু একটা করব মনে করে' কল্‌কাতা চলে এলাম।"

তাঁর দোকানটী থেকে কয়েকজন হিন্দুস্থানী ফেরীওয়ালা, খাবার নিয়ে কল্‌কাতার ও আশে পাশের পল্লীতে ফেরী করে' বেড়ায়। তখন বেলা নয়টা, তারা সব দোকানে জড়ো হয়েছিল, কাকা মহাশয় তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমি একমনে তাই দেখতে লাগলাম।

বর্ত্তমানে তাঁর আমার সঙ্গে অধিক বাক্যালাপ করবার অবসর নেই বুঝে, দোকানের অভ্যন্তরে আমার গামছা-কাপড়ের পুঁটুলিটী রেখে আমি একটু পথে পথে ঘুরে আসতে বেরিয়ে পড়লাম।

কল্‌কাতার ব্যস্ত-সমস্ত ভাব কোন্ উচ্চাকাঙ্খাশীল যুবকের প্রাণ আলোড়ন করে' তাকে উদ্যোগী না করে দেবে?

প্রায় ঘণ্টা দুই' এদিকে ওদিকে ঘুরে আবার কাকার দোকানে ফিরলাম, ততক্ষণে মন আমার কর্ত্তব্য স্থির করে' ফেলেছে।

কাকার অন্য মনস্ক ভাব কিন্তু তখনও কাটেনি, তিনি আমায় ফিরে আসতে দেখেও কিছু বললেন না।

দোকান ছাড়া তাঁর পৃথক বাসা ছিল না, "পিছনের মিষ্টান্নের গুদাম ঘরটীতেই তিনি বিশ্রাম-শয়নাদি করতেন। রাস্তার কলে স্নান সেরে আমি কাকার সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হ'লাম।

ভোজনের সময় তাঁকে একান্তে পেয়ে বললাম, "কাকা, আমিও ওই হিন্দুস্থানীদের মত এক ঝাঁকা খাবার নিয়ে পল্লিতে বিক্রী করে আসব। তাতে দু' পয়সা যা' উপার্জ্জন করতে পারি।"—

তিনি শুধু বললেন, "হু"—

ম্যাট্রিক পাশ করেছি, কলেজেও পড়েছি, অথচ আমার এই ফেরীওয়ালা বৃত্তি গ্রহণ করবার সৎসাহসের পরিচয় পেয়েও, কাকা মহাশয়ের কোন উৎসাহ হ'লনা দেখে মনটা আমার বিমর্ষ হয়ে' আসছিল। তবে কি, আমি তাঁর কাছে অকস্মাৎ এসে পড়াতে পিতৃব্য মহাশয় আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন? কিন্তু জলপাইগুড়িতে যে লাঞ্ছনা পেয়েছি; তার তুলনায় এ সামান্য অনাদর অতি তুচ্ছ—কংগ্রেসের কাজ করে' মন আমার ক্ষমাশীলতা শিক্ষা করেছে, এ অনাদর আমি গ্রাহ্য করব না।

শেষ পর্য্যন্ত ফেরীওয়ালার কাজই আরম্ভ করলাম।

মাকে পত্রে অবিলম্বে জানালাম, উত্তরে মা লিখলেন, 'বাড়ীর টীনের চালটী মেরামত না করলে আর চলে না। ভাদ্রমাসের শেষেও এবার জলপাইগুড়িতে বর্ষা ক্ষান্ত হবার নাম নেই।

বিধবা মানুষ তিনি, একবেলা দু'টী হবিষ্যান্ন আহার করেন, যা' চাল আমি কিনে রেখে এসেছিলাম, তা' ফুরিয়ে এসেছে।

কল্‌কাতায় আমি কাজকর্ম্ম করছি শুনে শেঠজী আহ্লাদিত হয়েছেন;—করিম রোজই গালাগালি করে যাচ্ছে।

আমি প্রত্যুত্তরে মাকে লিখ্‌লাম' "নিশ্চিন্ত থাকুন' সব ঠিক হয়ে'-যাবে।"

পরম উৎসাহে আমি ফেরিওয়ালার কাজে লেগে গেলাম। যেসব সর্ত্তে হিন্দুস্থানী ফেরী-ওয়ালারা খাবার বিক্রী করে, আমি তার চেয়ে কোন বিশেষ সুবিধার অপেক্ষা রাখ্‌লাম না।

সারাদিন ছয়সাত ক্রোশ পদব্রজে ঘুরে আস্‌তাম, মাথায় খাবারের ডালা। দিনান্তে প্রায় একটাকা পাঁচ-সিকা লাভ হতে লাগ্‌ল, কাকা মহাশয়ের হাতে এনে জমা দিয়ে দিতাম। তিনি আহ্লাদে তা' গ্রহণ করতেন। আমার ইচ্ছা ছিল, কিছু টাকা জমিয়ে পুঁজি করে' স্বতন্ত্র কোন একটা ব্যবসায় আরম্ভ করি।

দিনান্তে হিন্দুস্থানী ফেরীওয়ালাদের চেয়ে বেশী একটী পয়সাও ব্যয় করতাম না। দিনে তাদের মত সামান্য কিছু জলপান খেয়ে কাটাতাম, রাত্রে একটী হোটেলে চারআনা ব্যয় করে উদর পূর্ণ করে' অন্নাহার করতাম! কাকামহাশয় অনুগ্রহ করে' তাঁর দোকান ঘরেই আমায় শয়ন করতে দিয়েছিলেন।

এম্‌নি করে' কাকা মহাশয়ের কাছে আমার সতরো টাকা জমে গেল, মাঝে শুধু মাকে পাঁচটী টাকা পাঠিয়েছিলাম।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর কাকা মহাশয়ের হাতে টাকা তুলে দিলেই তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, "আহা, বড় মেহনৎ হচ্ছে তোর রে রমেশ!"

আনন্দে আমার মন গলে' যেত। কল্পনার রঙিণ্‌ ফানুস উড়িয়ে আকাশ-কুসুম কত কি যে ভাব্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। এমনি ধারা ময়রার দোকানই যদি একখানা খোলা যায়। কাছেই ত' একটা দোকান ঘর খালি পড়েছে। আচ্ছা এতে কত টাকা পুঁজি লাগে? লাভ ত এতে টাকায় আটআনা। কাকামহাশয় আমার উন্নতি বিধানে কি একটু সাহায্য করতে পারেন না, এক-টাকা পাঁচসিকা করে' জমিয়ে ত' বহুদিন লাগ্‌বে? দু' একদিন তাঁকে মনের কথা খুলে বলেও ফেল্‌লাম। শুনে তিনি শুধু মুচকি-হেসেছিলেন, "হবে রে হবে, সব হবে, রোস্‌না!"

ব্যবসায় ফাঁদ্‌তে কাকামহাশয়ের কাছে কোনরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যে একেবারে অসম্ভব, তা' বুঝে ফেল্‌তে বেশী বিলম্ব হ'ল না। অর্থব্যয় সম্বন্ধে তাঁর হস্ত বেশ শক্ত ছিল, এমন কি আহারাদির খরচেও।

খরচ না কমাতে পার্‌লে কি পয়সা করা যায়? ব্যবসায়ের এ মূলসূত্র আমিও কিছু দিনেই ধরে' ফেল্‌লাম। আমার রাত্রের আহারে রোজ চার আনা খরচ কর্‌বার প্রয়ো-

জন কি এই খবরেও ত কিছু কিছু পৌঁছানো যায়—তাতে আমার ব্যবসায় ফাঁদবার পুঁজি আরও শিগগির জমে যাবে।

একদিন রাত্রে উপোস করে' হোটেলের পয়সাটা কাকার হাতে তুলে দিলাম।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে বড় পরিশ্রান্ত থাক্‌তাম, বন্ধ দোকান ঘরে রাত্রে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে' যেতাম,—সেদিন রাত্রে কিন্তু কাচের আলমারির ভিতর থেকে মিষ্টান্নের সৌরভ এসে অনেকক্ষণ আমায় আকুল করেছিল।

তারপর দিন দুপুর বেলাই হোটেলে চার আনা ব্যয় করতে বাধ্য হলাম—রাত্রে উপবাসের পর শুধু মুড়ি জলপান খেয়ে দিন কাটাই কি করে? সে রাত্রে অবশ্য আর হোটেলে গেলাম না।

গভীর রাত্রেও ঘুম আস্‌ছিল না। রাস্তার গ্যাসপোষ্টের আলো দোকান ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প প্রবেশ করে' ভিতরটা আলোকিত কর্‌ছিল। পাশের গুদাম ঘরটায় কাকার একটানা নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

বড় গামলায় রসের মধ্যে রসগোল্লা ডোবানো ছিল, আর প্রকাণ্ড একটা কটাহে পানতুয়াগুলো রসে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

অত্যন্ত ক্ষুধায় উদ্রেক হয়ে' গেল। যদি দু'চারটে রসগোল্লা পানতুয়া এখন খাই, ত' দোষ কি? কাল না হয় কাকাকে বলে' আমার হিসাব থেকে বাদ দেব।

চিন্তাটা মাথা থেকে নামতে পারল না, বরং ক্ষুধার তাড়না দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হ'ল। সন্তর্পণে শয্যাত্যাগ করলাম, কাকার ঘুম ভাঙিয়ে কি হবে? একটা সরায় খান কয়েক রসগোল্লা আর কয়েকটা পানতুয়া তুলে নিয়ে জলের টবটার নিকটে বসলাম।

একটী মিষ্টান্ন মুখে দিতেই প্রাণে পুরম পরিতৃপ্তি বোধ করলাম। মনের আনন্দে রসগোল্লা পানতুয়া গালে পুর্‌তে লাগলাম।

বোধহয় আমার নড়াচড়ার শব্দেই কাকা মহাশয়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু কখন উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, আমি কিছুই জান্‌তে পারিনি! মুখ তখনও আমার রসগোল্লায় ভরা।

তাঁকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে' গেলাম। রসগোল্লায় তখনও আমার বদনবিবর ভরা, বাক্য নিঃসরণ অসম্ভব। এদিকে সে রসগোল্লা ঢোক দিয়ে গলাধঃকরণ করতেও পারছিনা।

কাকা মহাশয় অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে' বল্‌লেন "ও:, তাই।"

আমার মুখ দিয়ে শুধু একটী শব্দ নির্গত হ'ল, "হুম্"।

তিনি কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "চোর কোথাকার।" তারপরে একহাতের দুই অঙ্গুলিতে আমার কানটী ধরে' দরজা খুলে আমায় রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। আমার কোন কথায় কর্ণপাত করতে চাইলেন না।

গ্যাসের আলোয় কল্‌কাতার পথ উদ্ভাসিত কিন্তু আমার চোখের সাম্‌নে জগত যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে পথ বেয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম, পরণে ছিন্ন কাপড়খানি। আস্ত ধুতি আর গাম্‌ছা খানা দোকানে পড়ে' রইল, আর পড়ে রইল কাকা মহাশয়ের কাছে জমানো টাকা কয়টী।

জলপাইগুড়ি থেকে মা সেদিন আবার পত্র দিয়েছেন, শেঠজী তা'র করিম বড়ই জ্বালাতন করছে।

রাত্রি শেষ হ'য়ে আস্‌ছিল। অনেকখানি পথ চলার পর মুক্ত বাতাসে মাথাটা ঠাণ্ডা হ'ল। দু'একটা বাদুড় শ্রান্ত পক্ষ-সঞ্চালনে কল্‌কাতার আকাশ বেয়ে তাদের আস্তানায় ফির্‌ছিল। ক্রমশঃ মনের গ্লানি আমার অনেকখানি কমে এল।

ভাবনা কি? আবার আর একটা ময়রার দোকান থেকে খাবার নিয়ে ফেরী কর্‌লেই হবে। জানবাজারে না হয়, ত, শ্যামবাজার আছে।

আশা আর আশ্বাসে বুকখানা আবার বেঁধে ফেললাম।

রজনীগন্ধা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

কাননে যে ফুল ফুটেছিল একা নিশীথ রাতে,
ওগো নিশানাথ তোমার করুণ কিরণ পাতে
জ্যোছনায় মেশা শীতল শিশিরে
মন্থির করিয়া বিরহ নিশিরে
প্রভাতে সে ফুল ঝরে গেল তুমি দেখিলে নাকো,
নিশিগন্ধারে কেমনে নিঠুর ভুলিয়া থাকো।

দীনতায় সে যে দুহিতা হারালো সুখের রাতি
পুবালী হাওয়ায় নিভে গেল ক্ষীণ মোমের বাতি,
প্রভাতী ধূসর আলো লেগে তার
ছন্দ পতন হ'লো কবিতার,
হে চাঁদ তোমার রজনীগন্ধা মরিল একা,
রক্তের শুভ্র মরণ তোরণে দিলেনা দেখা?
রাতের শুভ্র মরণ তোরণ পূর্ব্বাচলে,
শুভাশিষ কেহ করিলনা ধান দূর্ব্বাদলে,
কে তা'র ভাবিবে মরণ বাঁচন?
নির্দ্দয় শাপ স্বস্তি-বাচন?
কালো রজনীর বিধবা কন্যা সরমে একা
আত্মঘাতিনী হ'ল সে যে তবু দিলেনা দেখা?
একদা যে ফুল ফুটেছিল বন বীথিকা তলে,
রজনীতে তাই রজনীগন্ধা কবিরা বলে,
দিবসের আলো সে কেমনে সয়?
ওগো চাঁদ তা'র অপরাধ নয়,
সে তো নয় রবি-সোহাগিনী রাঙা সূর্য্যমুখী,
তা'র ব্যথা বুকে হরিয়া মরণ হয়েছে সুখী।

——:(•):——

রসিক মাষ্টারের রসিকতা

(ব্যঙ্গ-রচনা)

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

(১)

রসিকলাল শিক্ষক এবং শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

রসিক বাবু মফঃস্বল সহরে শিক্ষকতা করেন। বিবাহ হইয়াছে। ছোট্ট একটু বাসাও আছে সুতরাং বিরাট বহির্জগতের খবর রাখা তিনি বড় একটা দরকার মনে করেন না।

কলিকাতা হইতে রসিকলালের শ্বশুর মহাশয় পত্র দিলেন, তাঁহার কন্যা—অর্থাৎ রসিকের শ্যালিকা শ্রীমতী বিদ্যুৎলতাকে একটি পাত্র নিজে দেখিতে আসিবে। তিনি অবগত হইয়াছেন পাত্রটি রসিকের কোনও সহপাঠী বন্ধুর ভাই এবং রসিকের বিশেষ পরিচিত। অতএব আলাপ পরিচয়ের সুবিধার জন্য তাহার সেদিন সেখানে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তিনি 'পুনশ্চ' দিয়া আরও লিখিয়াছেন কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সর-পুরীয়া খুব বিখ্যাত সুতরাং রসিকলাল যাইবার সময় যদি কিছু সরভাজা ও সর-পুরীয়া লইয়া যায় তাহা হইলে ভালই হয়।

ভালই হয় তাহা রসিকলালও জানিতেন। এজন্য তিনি স্ত্রী নিরুপমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'একথা আর লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? না লিখিলেও আমি লইতাম।'

নিরুপমা একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'সত্যি!'

বলা বাহুল্য বিবাহের পর বৎসর হইতে রসিকলাল জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ পত্র খানিও পান না। বহুদিন শিক্ষকতা করিয়া রসিকলাল অনেক সত্য ও তথ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্বশুর বাড়ীর ব্যয়-কুণ্ঠা বোধ তিনি তাহার ব্যয়-নিষ্ঠা দ্বারা প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিলেন।

কিন্তু এদিকে একদিনের বেশী রসিকলালের কলিকাতায় থাকিবারও উপায় ছিল না।

রসিকলাল যথা সময়ে এক হাড়ি সরভাজা ও সর-পুরিয়ার কথা বক্কেশ্বর ময়রার দোকানে বলিয়া আসিলেন। তাহার কলিকাতা যাইবার সংবাদ বিদ্যালয়ের ছেলেরা শুনিল, সহকর্ম্মীরা শুনিলেন, ডাইং-ক্লিনিং এর সতীশ দাস শুনিল, পাড়া প্রতিবাসীরা শুনিল এবং ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানেরা প্রায় সকলেই শুনিল।

কিন্তু মূর্খ ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের কথায় রেলের টাইম বিশ্বাস করা যায় না। এইজন্য রসিককে তাহার উকিল বন্ধু রণেন মিত্রের বৈঠকখানায় যাইতে হইল।

'কি মাষ্টার খবর কি?'

'আর ভাই ব'লো না। আজকের রাত্তিরের গাড়ীতে আবার ক'লকাতায় ছুটতে হ'চ্ছে।'

রসিককে বাসা ছাড়া হইতে কেহ কোনদিন বড় একটা দেখেন নাই; সুতরাং উকিল বাবু নিশ্চয় কিছু বিপদ আপদ কল্পনা করিয়াছিলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন 'গুড নিউজ। তা' চ'লে যাও।'

কিন্তু শেষ রাত্রের গাড়ীর টাইমটা রণেন্দ্র কুমার টেবিলের উপরে টাইম টেবলটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তিনটে বিয়াল্লিশ বোধহয়'। তারপর তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

রসিক কাগজ পেন্সিল লইয়া কলিকাতায় যাইবার এবং কলিকাতা হইতে ফিরিবার গাড়ীর সময়গুলি যথারীতি টুকিয়া লইলেন।

ফিরিবার পথে গাড়োয়ান ইদ্রেইসকে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিয়া আসিলেন, —'বেশ খানিক সময় হাতে রেখে যাবি—দেখিস যেন ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়িস নে।'

(২)

সমস্ত ঠিক ঠাক। উদ্বেগের জন্য রসিকলালের ঘুম আসিতেছিল না। তাঁর উপর পার্শ্ববর্ত্তিনীর উদ্বেগ ততোধিক বেশী হওয়ায় আরও অসুবিধা হইতেছিল।

'ওগো, শুনছ?'

'কি?' পাত্রটি কি করে?'

'স্যানিটারী ইনস্পেক্টর,

কি ব'ল্লে?—ইনস্পেক্টর?'

'হুঁ'

'তোমাদের ইস্কুল যদি দেখতে আসে তা'হ'লে ইস্কুল ছুটি হবে একদিন।'

কোনও ইতিহাসের ছাত্র পরীক্ষার খাতায় এইরূপ লিখিলে রসিক মাষ্টার তাহাকে কত নম্বর দিতেন বলা যায় না। কিন্তু গৃহিনী ইস্কুলের ছাত্র নয় সুতরাং তাহাকে হু বলিয়াই চুপ করিতে হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও নিস্তার নাই। রসিকের চেয়ে ছোট হইয়াও যে রসিকের স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিবে—তাহার উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহা নিরুপমার অসহ্য!

'ঘুমুলে?'

'হুঁ'

'তোমার কি দায় যে তাদের জন্যে সরভাজা সর-পুরীয়া নিয়ে ছুটবে?—চিঠি লিখে দাও যে তুমি যেতে পারবে না।'

পাড়ায় রাস্তা রসিক মাষ্টার স্ত্রীকে বুঝাইতেছিলেন, স্কুল ইনসপেক্টার এবং স্যানিটারী ইনসপেক্টার এক নহে। এমন সময় গাড়োয়ান আসিয়া ডাকিল, 'বাবু'। রাত্রি তখন দুইটা হইবে। রসিক স্কুলের ছেলেদের 'লেট লতিফের' গল্প পড়াইতেন। একটু সকাল সকাল ষ্টেশনে পৌছাইয়া থাকা মন্দ কি?

(৩)

গাড়োয়ান যখন রসিক লালকে ষ্টেশনে নামাইয়া দিল তখন সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই। গাড়োয়ান তাহাকে শুইয়া থাকিতে পরামর্শ দিল, আরও বলিল, সে আর একটা ভাড়া লইয়া আসিবে ইতিমধ্যে রসিক যদি ঘুমাইয়া পড়ে তবে সে তাহাকে ডাকিয়া দিবে।

রসিক দেখিলেন, প্লাটফরমের বাহিরে একটা কেরোসিনের আলো টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে, একধারে কতকগুলি কুলী নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছে, তাহাদের পাশেই কতকগুলি ছাগল ও গরু নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটিতেছে। রসিকলাল সেই নিরীহ জীবগুলিকে তাড়াইয়া কুলীদের পাশেই কম্বল বিছাইয়া লইলেন।

কিন্তু ঘুমাইবার উপায় নাই! অসম্ভব মশা। তার উপর নানাদিক হইতে নানাবিধ গন্ধ আসিয়া স্থানটিকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। রসিকলাল নেহাৎ মাষ্টার মানুষ হইয়াও নাসারন্ধ্রে সেই তীব্র গন্ধ প্রবেশ করায় ঘুমাইতে পারিলেন না। এ ছাড়া হাঁড়িটির উপরও তাহার দৃষ্টি রাখিতে হইতেছিল।

ট্রেণ আসিল। টিকিট কাটিয়া তন্দ্রালসচক্ষে রসিক গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে রসিক চাহিয়া দেখিলেন, গাড়ী শিয়ালদহ আসিয়া পৌছিয়াছে।

রসিক রিক্সা করিয়া অনেক ঘুরাঘুরির পর শ্বশুরের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এক ডজন ছেলে মেয়ে আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল।

শ্যালিকা হাঁড়ি খুলিয়া দেখিল, এক হাঁড়ি বাতাসা! শাশুড়ী ভাল করিয়া কথা বলিলেন না—তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য বোধ হয় গোপনে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

ইহাকেই বলে নিয়তি। রসিকলাল রাত্রের অন্ধকারে হাড়িটিকে নিজের বলিয়া ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে পারেন নাই। এখন বুঝিলেন, টিকিটের নম্বরটি নোট বুকে টুকিয়া রাখিবার সময় বুদ্ধি করিয়া হাড়ির গায়ে তাহার নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিলে ভাল হইত।

অগত্যা সরিকের দোকান হইতেই গোপনে এক হাঁড়ী সরভাজা ও সরপুরীয়া আনিতে হইল। সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। শাশুড়ী বলিলেন, 'জামাই আমার বড় জামাই। এমনটি আর হয় না। শ্যালিকে নিয়ে কি ঠাট্টাই না ক'রলেন!'

পাত্র পক্ষের মেয়ে দেখিতে সেদিন আসা হয়নি। শ্যালকপত্নী একখানি সরপুরীয়া মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন, 'খেতে হয়ত কেষ্টনগরের সরপুরীয়া। হা, যা' ব'লব। কলকাতার সাধ্যি আছে এমনটি তৈরী করে?'

রসিকের কলিকাতা যাইবার কথা শুনিয়া পাড়ার দুর্গামণীর পিস-শাশুড়ী (এবং রসিকের স্ত্রীর সখী) বারবার করিয়া তাহাকে সখী মারফৎ একসের পাথুরে চুণ আনিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানা রোড হইতে উহা কিনিয়া রসিকলাল কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া ফিরিতেছেন এমন সময় পশ্চাৎ হইতে মৃদু স্বরে কে বলিল, 'এ বাবু, ফ্রেঞ্চ পিকচার লিজিয়ে'।

'ফ্রেঞ্চ পিকচার' রসিকলাল কোনদিন উহা দেখেন নাই। শুনিয়াছিলেন উহা অশ্লীল ফরাসী ছবি। রসিকলাল চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার কোনও ছাত্র নাই, কোনও পরিচিত মাষ্টার মহাশয় নাই—সেখানে কেহই তাহাকে চিনে না। সেই বিরাট জন-সমুদ্রের মধ্যে তিনি একা এবং স্বাধীন! রসিকলালের মনের মধ্যে একটা বন্ধন হীন স্বেচ্ছাচারিতা জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হস্তে এক টাকা দিয়া খামে আটা সেই 'ফ্রেঞ্চ পিকচার' কিনিয়া ফেলিলেন।

এদিকে গাড়ীর সময় ঠিক না থাকায় অর্থাৎ নূতন টাইম টেবল না দেখিয়া পুরাতন টাইম টেবলের সময় টুকিয়া আনায় পর পর দুইখানি গাড়ী ফেল করিয়া অবশেষে রাত্রি দশটার গাড়ীতে রসিক কলিকাতা হইতে ফিরিলেন।

টিকিট!

রসিকলাল গম্ভীর হইয়া পকেট হইতে টিকিটখানি বাহির করিয়া ক্রুম্যানের হাতে দিলেন। ঘণ্টায় তিনবার করিয়া রসিকলাল স্বীয় পকেটে হাত দিয়া টিকিটের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিলেন; সুতরাং টিকিট যে তাহার আছে, হারায় নাই সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না।

কিন্তু একটু গোলযোগ ঘটিল। কলিকাতায় যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে রসিক লাল তাহার রিটার্ণ টিকিটের কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর অংশ গেটম্যানকে দিয়া অপর অংশ লইয়া গিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়াই হউক অথবা অজ্ঞাত সারেই হউক গেটম্যান তাহাতে আপত্তি করে নাই।

কিন্তু ক্রুম্যান আপত্তি করিল।

'মহাশয়কে ত' বেশ রসিক লোক ব'লে মনে হ'চ্ছে!' গেটম্যানের এই ভুলের জন্য রসিকের খুব রাগ হইতেছিল। 'আপনি বরং এই অংশটা গেটম্যানকে দিয়ে তার কাছ থেকে অপর অংশটা চেয়ে নেবেন

দু'বেলাই ত' তার সঙ্গে আপনার দেখা হচ্ছে!'

রসিকলালের এই উক্তি পরিহাস মনে করিয়া গাড়ীর অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন। ক্রুম্যানও হাসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রসিদ লিখিয়া রসিকলালের নিকট হইতে কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরের পুরা ভাড়া এবং কিছু অতিরিক্ত আক্কেল সেলামী আদায় করিয়া তবে ছাড়িলেন।

গাড়ীটা প্যাসেঞ্জার গাড়ী; সুতরাং ছোট বড় সকল ষ্টেশনেই থামিতেছিল। শিমুরালী ষ্টেশনে আসিলে দেখা গেল গাড়ীতে আর একটি লোকও নাই! কি ভয়ানক! এই ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একা একা পথ চলিতে হইবে নাকি? যদি ডাকাত পড়ে? পায়খানার মধ্যে কেহ লুকাইয়া নাই ত! সাবধান থাকা ভাল। রসিকলাল উঠিয়া পায়খানার দরজার বাহিরের সিটকিনি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই দুর্গা বলিয়া অন্য গাড়ীতে গিয়া উঠিবেন এই ইচ্ছা। পায়রা ডাঙ্গা গাড়ী থামিলে নামিয়া দেখিলেন সব গাড়ীই ফাঁকা! কেবল সম্মুখের একখানি গাড়ীতে জামাজুতা পরা একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। সম্মুখের গাড়ীতে উঠিবেন! যদি এ্যাকসিডেণ্ট হয়! কিন্তু অতশত আর ভাবিবার সময় তখন ছিল না। তাড়াতাড়ি তিনি সেই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল এই ভদ্রলোকই যদি ডাকাত হয়? ভদ্রবেশী ডাকাতের আজকাল অভাব নাই। রেলওয়ের 'নোটিশের' দিকে রসিকের দৃষ্টি পড়িল—'চোর, জুয়াচোর এবং গাঁটকাটা তোমার নিকটেই আছে'। সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে নিকটের এই লোকটি যে গাঁটকাটা তাহাতে আর সন্দেহ নাই! লোকটির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া রসিকলাল পেছনের বেঞ্চিতে এ্যালার্মিং চেনের নিকট গিয়া বসিলেন। বিপদের কথা কিছু বলা যায় না।

গাড়ী রাণাঘাট আসিলে রসিক তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন; কিন্তু তখন কৃষ্ণনগর যাইবার গাড়ী নাই—রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে!

উকিল রণেন্দ্র মিত্রের উপর রসিকের ভয়ানক রাগ হইল। 'নাঃ' এই বাঙ্গালী জাতিটা'র এত ড্রব্যাক্ রয়ে গেছে যে এর উঠতে এখনও কমছে কম আট হাজার বৎসর সময় লাগবে! নূতন টাইম টেবল কিনে পুরাতনটাকে এরা সরাবে না, নূতন পঞ্জিকা কিনে পুরাতনটাকে এরা বিদায় কর্ব্বে না—এমন কনজারভেটিভ জাতির কখনও উন্নতি হয়?' 'মরুকগে'! রসিক ভাবিলেন এই সময়ে নিরিবিলি এক জায়গায় বসিয়া ফ্রেঞ্চ পিকচারগুলি দেখিয়া লইলে হয়। কিন্তু পুলিশটা বড্ড পায়চারি করিতেছে। যদি ধরিয়া ফেলে!—থাক্, বাড়ী গিয়া লুকাইয়া খুলিলেই হইবে।

ষ্টেশনের বাহিরে খাবারের দোকানে তখনও কাজ চলিতেছে। ক্ষুধার্ত্ত রসিকলাল কিছু জলযোগ করিবার জন্য সেই দোকানে গিয়া বসিলেন। নিকটে ড্রেনের মধ্যে উচ্ছিষ্ট শালপাতার স্তূপের ভিতর একটি ক্ষীণকায় ছোট কুকুর শাবক। আহা, বেচারা ক্ষুধার জ্বালায় শালপাতা চাটিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুধার জ্বালা যে কি রসিকলাল তখনও তাহা উপলব্ধি করিতেছিলেন। তাহার 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে' কবিতাটি মনে পড়িল। রসিকলাল কুকুর শাবকটিকেও খাইতে দিলেন।

গাড়ী আসিতে তখনও ঢের দেরী। একজন কুলী তাহাকে শুইয়া পড়িতে পরামর্শ দিল গাড়ী আসিলে সে রসিকলালকে ডাকিয়া দিবে।

ডাকিয়া সে দিয়াছিল; তবে গাড়ী আসিলে নয়, গাড়ী ছাড়িবার এক মিনিট পূর্ব্বে। রসিক তাড়াতাড়ি কম্বল ও বিছানা জড়াইয়া ছুটিতে ছুটিতে একখানি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এখানেও ক্রুম্যান! এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িয়া ক্রুম্যানটি রসিকলালের নিকট কুকুর ছানার টিকিট দাবী করিলেন। রসিকলাল আকাশ হইতে পড়িলেন! 'আমার সঙ্গে কোন কুকুরছানা ত' নেই!' ক্রুম্যান রসিকলালের কম্বলটি একপাশে সরাইয়া দেখাইয়া দিলেন যে কুকুরছানা আছে এবং বে-আইনীভাবে রসিকলাল উহা লুকাইয়া লইয়া যাইতেছেন। রসিকলাল কুকুরছানা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন। ছানাটি ততক্ষণ হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল এবং রসিকলালকে দেখিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। রসিকলাল বুঝিলেন, করুণা বিগলিত হইয়া রাত্রে খাবারের দোকানে তিনি যাহাকে লুচি, সন্দেশ খাওয়াইয়াছিলেন, ইনি সেই। তাহার বড় রাগ হইল। এই জন্য বলে 'কুকুরকে নাই দিতে নাই' রসিকলাল কুকুর ছানাটিকে বেঞ্চির নীচে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, এ কুকুর আমার নয়।

ক্রুম্যানটি তাহার জুতা দিয়া কুকুর শাবকটিকে একটা আঘাত করিতেই সে করুণ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রসিকলালের পায়ের নীচে আসিয়া আশ্রয় লইল।

ক্রুম্যান বলিলেন, 'এ কুকুর যদি আপনার না হবে তা' হ'লে এত প্যাসেঞ্জার থাকতে ওটা আপনার কাছে গিয়ে লুকাবে কেন?'

তার এ যুক্তি যাত্রীরাও সমর্থন করিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে কুকুরটি সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিলেন ওটা পকেট ডগ, কেহ বলিলেন, ওটা নিশ্চয় হলাণ্ড দেশীয় বুল ডগ—এখন দেখতে অমনি, কিন্তু যখন বড় হবে আর গায়ে লোম উঠবে তখন কার সাধ্যি ওর ত্রি[sic] সীমানায় ঘেঁষে'।

রসিকলাল আর একবার কুকুরটির দিকে তাকাইলেন। সেই কুকুরটিই কি? তা

কি এমন ধারা কান ভাঙা ছিল?—না কোন সাহেব লোক ভুল ক'রে রেখে গেল?

একটি ছোট ছেলে ছাতি দিয়া কুকুর শাবকটিকে খোঁচা মারিতেই শাবকটি মরিয়া হইয়া ছাতির বাট কামড়াইয়া ধরিল।

'দেখচেন মশাই, এ বুলডগ না হ'য়ে যায় না'—তারপর রসিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কোত্থেকে কিনলেন 'বলুন ত'! এসপ্লানেডের মোড়? না হগ সাহেবের মার্কেট?'

রসিকলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন 'হুঁ'। তিনি তখন ভাবিতেছিলেন, নিরুপমা বড্ড কুকুর ছানা ভালবাসে। দৈবযোগে যদি জুটিয়াই গেল লইয়া যাওয়া মন্দ কি—বিশেষ যখন ভাঙা তখন 'বিলাতী' কুকুর না হইয়াই পারে না।

এদিকে গাড়ী প্রায় কৃষ্ণনগর আসিয়া পৌঁছিল! ক্রুম্যান বলিলেন, 'যা হয় ব্যবস্থা করুন!'

রসিক মাষ্টারী করিলেও এ ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিলেন। তিনি ক্রুম্যানটির হাতে একটি টাকা দিয়া কম্বলের সহিত কুকুর ছানাটিকে জড়াইয়া লইলেন।

গাড়ী কৃষ্ণনগর থামিলে রসিক দেখিলেন, চায়ের দোকানের হাবুল এক কোণের বেঞ্চির তলা হইতে উঠিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িতেছে। রসিককে দেখিয়া সে একগাল হাসিয়া বলিল, 'বাবু কোত্থেকে' তারপর মাথায় গামছা জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'জিনিষ পত্তর কৈ?'

তাই ত! তাহার পাথুরে চুণ? যা! চুণটা সেই রাণাঘাটে 'গাঁট কাটার' গাড়ীতেই পড়িয়া আছে। রসিকলাল স্থির করিলেন, রেলের লাইন হইতে কতকগুলি পাথরের নুড়ি কুড়াইয়া লইয়া যাইবেন। ঝিনুক ও শামুক পোড়াইলে ঝিনুকে চুণ হয় তিনি জানিতেন। রসিকলাল মনে করিলেন, পাথরের নুড়ি পোড়াইয়া লইলেও পাথরে চুণ হইবে!

গাড়ী থামিতেই রসিক দেখিলেন, হাবুল আর এক বাবুর জিনিষ পত্র নামাইতে ভয়ানক ব্যস্ত! ভাবটা, যেন সে বাবুর বাড়ীর চাকর তাঁহাকে নামাইয়া লইতে এইমাত্র ষ্টেশনে আসিয়াছে।

কুকুর শাবক দেখিয়া নিরুপমার মন উঠিতেছিল না। রসিক তাহাকে বুঝাইলেন, 'দেখছ না কাণ ভাঙা! এ খাটি হলাণ্ডের বুল ডগ। একটু বড় হ'লেই বুঝতে পারবে।'

রাত্রি প্রভাত হইলে নিরুপমা দেখিলেন, —একটা অখেন্ত 'লুচিভাজা' কুকুরের ছা। গায়ের শীর্ণ হাড় কখানির উপর ঢাকা চামড়া চিলচিল করিতেছে—দুটি কাণ এটুলীতে বোঝাই! কুকুর দেখিয়া পাড়ার লোক হাসিয়াই খুন। নির্ম্মলার মামী বলিলেন,' এ নিশ্চয় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা কুকুর—এত রঙও জানেন ভাই তোদের উনি'!

নিরুপমা তখনই কুকুরটিকে বিদায় দিয়া গঙ্গাজল দিয়া ঘর ধুইয়া ফেলিল।

রুমাল দিয়া জড়ান পাথরের নুড়িগুলি দেখিয়া দুর্গামনীর 'পিস্' শাশুড়ী গালে হাত দিয়া বলিলেন, 'ওমা! শুনলে কথা! পাথর পোড়া'লে আবার পাথুরে চুণ হয় নাকি?'

অগত্যা রসিকলাল সমস্ত সকালটা টো টো করিয়া ঘুরিয়া চতুর্গুণ মূল্যে খানিকটা পাথুরে চুণ আনিয়া হাজির করিলেন।

তাই বল 'বাবা!'—তারপর দন্তহীন মুখে একগাল হাসিয়া দুর্গামনীর পিস-শাশুড়ী তাহার সখীর নিকট মন্তব্য করিলেন, 'আচ্ছা রসিক কিন্তু ভাই তোর বর'

ইতিমধ্যে রসিকলাল 'ফ্রেঞ্চ পিকচারের প্যাকেটটি খুলিবার জন্ত অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সুযোগ করিতে পারেন নাই।

এই—খুলোনা, খুলোনা, ওটা একটা ইয়ে—

কি? বল, এটা কিসের চিঠি? অমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে রাখছ কেন?'

রসিকলাল ঢোক গিলিয়া বলিলেন, না, এমন কিছুই না তবে কিনা—ওটা কুড়িয়ে পেয়েছি কিনা—

ততক্ষণে চিঠি খোলা হইয়া গিয়াছে। "সর্ব্বনাশ' গৃহস্থ ঘরের কুল বধূ, তার উপর নিজের স্ত্রী! রসিকলাল দেখিলেন জাতি ধর্ম্ম নষ্ট হইতে বসিল। রসিকলাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, দেখো না, দেখো না, ওটা একটা অতি অশ্লীল, জঘন্য, অকথ্য—

কতকগুলি খরগোস, ইঁদুর এবং কাঠ-বিড়ালীর জাপানী জল ছবি!—স্ত্রী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন, 'মাইরি তুমি এতও জান!

ইস্কুলের মাষ্টার হইয়াও বাপ পিতামহের দেওয়া আদরের রসিক নাম রসিকলালের এতদিনে সার্থক হইয়াছে।

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

আমাদের সমুদ্র তীরবর্ত্তী সহরের মধ্যে টামানের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। একবার সেখানে আমি অনাহারে মরতে বসেছিলুম, আর ডুবে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলুম।

অনেক রাতে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ীতে সেখানে পৌছোলুম। সহরে ঢোকবার মুখে ফাঁকা জায়গায় মাত্র যে পাথরের বাড়ীখানা ছিল, তার সামনে গাড়োয়ান ক্লান্ত ঘোড়া ছটোকে দাঁড় করালে। কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসী যে কস্যাকটা পাহারায় ছিল, গাড়ীর ঘণ্টার শব্দ শুনে, হঠাৎ জেগে ওঠা লোকের মত ধারালো গলায় বল্লে "কে যায়?"

সার্জ্জেণ্ট আর কর্পোর্যাল বেরিয়ে এলো। তাদের বল্লুম যে, আমি একজন সরকারী কর্ম্মচারী, রাজার কাজে এখানে এসেছি আর কোন বাড়ীতে থাকবার জায়গা চাই। কর্পোর্যাল আমাদের সহরের ভেতর নিয়ে গেল। যেখানে যেখানে খোঁজ করলুম সে সব বাড়ীই ভর্ত্তি ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, তার ওপর তিন রাত ঘুমোতে পাইনি। আমি একেই ক্লান্ত ছিলুম, তার ওপর নিষ্ফল চেষ্টায় মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল।

কর্পোর্যালকে বল্লুম "বন্ধু, যেখানে হোক্, অন্ততঃ ঘুমোতে পাই এমন একটু জায়গা দেখে ঠিক করে দাও।"

কর্পোর্যাল বল্লে "কাছাকাছি মাথা গোঁজবার মত একটা কুড়ে আছে; কিন্তু ভয় হচ্ছে, সেখানে থাকা আপনার পোষাবে কি?"

তার মন্তব্যে কান না দিয়ে বল্লুম "চলো সেখানেই।" অনেকগুলো নোংরা অলি-গলি পার হয়ে শেষে সমুদ্রের ধারে একখানা কুড়ের কাছে এলুম। আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট বাসার খড়ো চালে আর চুনকাম করা দেওয়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়েছিল। কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা উঠোনের মাঝখানে বড় কুড়ে খানার চেয়ে পুরাণো আর ভাঙ্গা একখানা ঘর দেখলুম। ঘর থেকে খুব ঢালু উঠোনের জমি জলের দিকে নেমে গেছে আর আমি পায়ের তলায় চঞ্চল সাগরের ঢেউয়ের ফেনা দেখতে পেলাম। যে অশান্ত সাগরের চাঞ্চল্যে শুভ্র রজনীর শান্তিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল, চাঁদ যেন চিন্তিত দৃষ্টিতে তারই পানে চেয়েছিল। আকাশের রাতের রাণীর আলোয় আমি তীর থেকে অনেকটা তফাতে যে দুখানা জাহাজ দেখতে পেলুম তাদের কালো পাল, মাস্তুল আবছা আকাশের গায়ে মাকড়সার জালের মত দেখাচ্ছিল। মনে মনে বল্লুম "রাতটা কোন রকমে এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে ঘেলেনদিকের দিকে চলে যাবো।"

সৈন্যদলের একজন কস্যাক আমার চাকরের কাজ করছিল। কাপড়ের প্যাটরাটা নামিয়ে নিয়ে তাকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বল্লুম। তারপর বাড়ীর কর্ত্তাকে ডাক দিলুম। কিন্তু কারো সাড়া পেলুম না। দরজায় ধাক্কা দিলুম তবু কারো সাড়া শব্দ পেলুম না। এর মানে কি? আবার দরজায় ধাক্কা দিলুম; এবার বছর চোদ্দ'র একটা ছেলে উঁকি মারলে।

"বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়?"

রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে চলিত ভাষায় ছেলেটা জবাব দিলে "কর্ত্তা কেউ নেই।"

"কর্ত্তা নেই! তা হলে বাড়ীর গিন্নি কোথায়?"

"গাঁয়ে গেছে।"

দরজায় লাথি মেরে চেঁচিয়ে বল্লুম, "তাহলে দরজা খুলে দেবে কে?"

দরজা আপনি খুলে গেল আর সঙ্গে এলো এক ঝলক স্যাৎসেঁতে ধোয়া। দেশলাই জ্বেলে দেখলুম আমার সামনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাণা ছেলে। আগেই বলে রাখছি, কাণা, কালা, খোঁড়া, কুঁজো, তার মানে এক কথায়, বিকৃতাঙ্গদের সম্বন্ধে আমার খুব খারাপ একটা ধারণা আছে। আমার মতে মানুষের দৈহিক আকৃতির সঙ্গে মনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যেন অঙ্গহানির সঙ্গে মানুষ মনের কতকগুলো শক্তি হারিয়ে ফেলে।

ছেলেটার মুখখানা বেশ করে দেখলুম; কিন্তু চক্ষুবিহীন দৈহিক আকৃতি থেকে কিই বা বোঝা সম্ভব? ছেলেটাকে দেখে মনে দয়া হোল। হঠাৎ তার ঠোঁটে দুর্ব্বোধ্য হাসি দেখে ছেলেটার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা হয়ে গেল। মনে মনে বল্লুম "ছেলেটা কি তাহলে সত্যিই কাণা নয়?" তারপর মনকে বোঝালুম যে হয়তো ছেলেটার চোখে ছানি পড়েছে আর ভাণ করে তো আর কেউ ছানি পড়াতে পারে না। তাছাড়া কেনই বা কাণা হওয়ার ভাণ করবে? মনকে এসব বোঝানো সত্ত্বেও মনে সন্দেহের কতকটা ধোয়া রয়েই গেল।

ছেলেটাকে বল্লুম "তাহলে বাড়ীর গিন্নী কি তোমার মা?"

"না।"

"তাহলে তুমি কে?"

সে জবাব দিলে "মা বাপ মরা গরীব ছেলে।"

"গিন্নীর ছেলেপিলে আছে?"

"এক মেয়ে আছে ; সে একটা ও তারের সঙ্গে সমুদ্রে গেছে।"

"কি রকম তাতার ?"

"তা কি করে জানবো ? ক্রিমিয়ার তাতার, লোকটা কার্চের (Kertch) মাঝি।"

আমি কুড়ের ভেতর গেলুম। খান দুয়েক বেঞ্চি, একটা টেবিল, আর উনোনের কাছে বড় একটা পোষাক রাখা আলমারী, এই ছিল ঘরের আসবাব। দেওয়ালে যিশুর কোন মূর্ত্তি ছিল না—খারাপ চিহ্ন!

ভাঙা সার্শি দিয়ে ঝড়ো বাতাস আসছিল। চামড়ার প্যাঁটরা থেকে একটা চর্ব্বি বাতি বের করে জ্বালিয়ে বসবার ব্যবস্থা করলুম। ছোট বন্দুকটা আর তলোয়ারখানা একধারে রেখে টেবিলে পিস্তল রাখলুম ; তারপর কোট গায়ে ঢাকা দিয়ে একখানা বেঞ্চিতে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

আমার কসাক অনুচরটা অন্য বেঞ্চিখানা অধিকার করলে আর মিনিট দশেকের ভেতর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি জেগে পড়ে রইলুম ; ছেলেটার কালো তারাবিহীন সাদা চোখ দুটো আমার মনে যে ছাপ দিয়েছিল তার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলুম না।

ঘণ্টা খানেক কেটে গেল। জানলা দিয়ে স্বপ্নের জড়িমামাখা চাঁদের আলো মেঝের ওপর এসে পড়েছিল। যেখানে চাঁদের উজ্জ্বল আলো পড়েছিল হঠাৎ সেখানে কার ছায়া পড়লো। আমি লাফিয়ে উঠে জানলার ধারে গেলুম। একটা মানুষের আকৃতি একবার মাত্র জানলার সামনে দিয়ে গেল, তারপর—ভগবান জানেন কোথায়—মিলিয়ে গেল। সে যে ঢালু জমি দিয়ে জলে নেমে গেল, একথা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তবু, তাছাড়া আর কোথাও যাবার জায়গাই ছিল না।

ওভার কোটটা চাপিয়ে, তলোয়ারখানা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে নামনেই দেখলুম কাণা ছেলেটাকে। তাড়াতাড়ি দেওয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দেখলুম, ছেলেটা সাবধানে অথচ ঠিক ঠিক পা ফেলে চলে গেল। তার বগলে কি একটা ছিল আর সে ঢালু জমি বেয়ে জলের ধারে গেল। মনে মনে বল্লুম 'এই তো সেই সময় যখন বোবার বাক ফোটে, কাণার চোখ খোলে।'

পাছে ছেলেটা চোখের আড় হয়ে যায় তাই একটু তফাতে থেকে ছেলেটার পেছু নিলুম। ঠিক এই সময়ে চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়লো আর জলের ওপর কালো কুয়াসা ভাসতে লাগলো। যে জাহাজ দুখানা নোঙর করা ছিল, অন্ধকারে তার একখানার মাস্তুলে একটা লণ্ঠন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। সাগরের ঢেউ বালির বুকে আছড়ে পড়ছিল আর ভয় হোল আর একটু এগোলেই আমাদের কাণাবীর সাগরের গ্রাসে যাবেন। তখন সে জলের এত কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আর এক পা এগোলেই তার চিহ্নমাত্র পাওয়া যেতো না। কিন্তু এই তার প্রথম রাতে বের হওয়া নয়, কারণ যদিও তার পায়ের তলায় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল তবু তার পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে যাওয়ার তৎপরতা দেখে আমি অন্ততঃ এই আন্দাজ করলাম। হঠাৎ যেন কোন শব্দ শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর একখানা পাথরে বসে হাতের বোঝাটা নিজের পাশে রাখলে। জলের ধার দিয়ে দিয়ে সাদা একটা আকৃতি এসে ছেলেটার পাশে দাঁড়ালো। একখানা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আমি তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগলুম :

মেয়ে গলায় কে বল্লে "বাতাস বড় জোর বইছে ; জ্যাঙ্কো আর আসছে না।"

কানা ছেলেটা জবাব দিলে "জ্যাঙ্কো ? জ্যাঙ্কো ঝড়কে ডরায় না।"

"কিন্তু মেঘ যে ঘনিয়ে আসতে লাগলো।"

"অন্ধকারে জল-পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়াই তো সোজা।"

"কিন্তু যদি সে ডুবে মরে ?"

"তাহলে রবিবারে তোমার রেশমী ফিতে পরা বন্ধ হয়ে যাবে।"

কথাবার্ত্তা থেকে বুঝলুম, যে কাণা ছেলেটা দক্ষিণ অঞ্চলের ভাষায় কথা বলেছিল, সে খাঁটি রাশিয়ার ভাষায় কথা বলতে পারে। হাত তালি দিয়ে ছেলেটা বলতে লাগলো "দেখো ঠিক বলেছিলুম কি না। জ্যাঙ্কো সমুদ্র, ঝড়, কুয়াসা কি জল-পুলিশকে ডরায় না। শোন ! যা শুনতে পাচ্ছি তা নিশ্চয়ই ঢেউয়ের শব্দ নয়। না, এ নিশ্চয়ই তার দাঁড়ের শব্দ।"

মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে অন্ধকার ভেদ করবার চেষ্টা করলে। একটু পরে বল্লে "তোমার ভুল হয়েছে, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি নে।" আমিও কোন ডিঙি দেখবার জন্যে তাকালুম, কিন্তু দেখতে পেলুম না। একটু পরে, ঢেউয়ের মাঝখানে দেখা গেল, কালো বিন্দুর মত কি একটা ঢেউয়ের তালে উঠছে, পড়ছে। শেষে দেখতে পেলুম, একখানা ডিঙি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নাচতে নাচতে তীর বেগে কিনারার দিকে আসছে। যে মাঝি এমন রাতে চোদ্দ মাইল চওড়া উপসাগর পাড়ি দেয় সে নিশ্চয়ই সাহসী নাবিক আর তার এমন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বার নিশ্চয়ই লাভজনক কারণ আছে। আমি দেখতে পেলুম, হালকা ছোট ডিঙিখানা হাঁসের মত একবার সেন জলে ডুব মেরে আবার তখনই ভেসে উঠছিল। মনে হোল, এইবার ডিঙিখানা ডাঙার পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে খান্‌খান্ হয়ে যাবে। কিন্তু পাকা মাঝি, দাঁড়ের এক ঝাকুনিতে ডিঙি ঘুরিয়ে একটু তফাতে ফাঁকা জায়গায় নিরাপদে ভেড়ালে।

লোকটা দেখতে মাঝামাঝি লম্বা আর তার মাথায় ছিল ভেড়ার চামড়ার কালো টুপী। সে হাতের কি একটা ইসারা করলে, আর যে দুজন রহস্যময় লোক কথা বলছিল, তারা তার কাছে গেল। তারপর তিনজনে হাতাহাতি করে ডিঙি থেকে এমন ভারী একটা বোঝা নামালে যে, এত হাল্‌কা ডিঙি কি করে এত ভারী বোঝা আনতে পারলে, ভেবে আমি অবাক হয়ে গেলুম। তারপর মাল কাঁধে তুলে নিয়ে তিনজনে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন কুড়েতে ফিরে যাওয়াই ভাল বোধ করলুম। কিন্তু যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলুম, তা আমার মনে এমন ছাপ দিয়েছিল যে ভোরের প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে রাতটা জেগে কাটিয়ে দিলুম।

সকালে চোখ চেয়ে, আমাকে পোষাক পরা অবস্থায় দেখে, কস্যাক অনুচরটা অবাক হয়ে গেল। রাতের ব্যাপারটা তাকে আর কিছু জানালুম না। সকালে জানলা দিয়ে নীল আকাশ পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বসে খানিকক্ষণ কাটালুম; আকাশে মেঘের ফালিগুলো ভাসছিল আর দূরে তীর ভূমি' ক্রিমিয়া, দিগন্তে বেগুনী রেখা টেনে পাহাড়ের বুকে গিয়ে মিশেছিল; তার মাথায় দেখা যাচ্ছিল আলোকমঞ্চের চূড়ো কখন গেলেন্‌শিকে যেতে পারি জানবার জন্যে, বেরিয়ে পড়ে চানাগোর দুর্গের অধ্যক্ষের কাছে চলে গেলুম। দুর্ভাগ্যবশতঃ অধ্যক্ষ আমাকে সঠিক কোন খবর দিতে পারলেন না। শুনলুম, যে জাহাজ দুখানা বন্দরে দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলো মালবহা জাহাজ, আর তাতে তখনও মাল বোঝাই হয়নি। তবে বল্লেন যে, দিন-চারেকের মধ্যে একখানা ডাকের জাহাজ এসে পড়তে পারে আর তখন একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খারাপ মেজাজ নিয়ে কুড়েতে ফিরলুম। দরজায় কস্যাক অনুচরটা দাঁড়িয়েছিল; আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে এক রকম ভীত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে "সুবিধে হোল না?"

জবাব দিলুম "না। ভগবান জানেন, কবে এখান থেকে যেতে পারবো।" আমার জবাবে সৈনিকটার উৎকণ্ঠা যেন বেড়ে গেল। খুব কাছে এসে চাপা গলায় বিড়-বিড় করে বল্লে "পথের মাঝে নামবার মত জায়গা এটা নয়। একটু আগে চেনা একজন কস্যাকবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—গত বছর আমরা একদলে ছিলুম। জায়গাটা কেমন শুধতে বলে গেল 'খারাপ জায়গা লোক-গুলোও সুবিধের নয়।' কাণা ছেলেটাকে আপনার কেমন ঠেকে? কানাকে কেউ কোনদিন এখান থেকে ওখানে ছুটে যেতে দেখেছে? বাজার করছে, রুটি কিনতে, জল আনতে কি কাণারা যায়? এখানে কিন্তু কেউ ওসব ভ্রূক্ষেপ করে না।"

"গিন্নী ফিরেছে?"

"সকালে যখন আপনি বেরিয়েছিলেন তখন একটা বুড়ী একটা মেয়েকে নিয়ে ফিরলো।"

"মেয়ে কিরকম? মেয়ে না কোথায় গেছে?"

"তাহলে কে, তা বলতে পারিনে। কিন্তু দেখুন না, ওই তো বুড়ী ঘরে বসে রয়েছে।" আমি ভেতরে গেলুম। উনোনে আগুন গন্‌গন্ করছিল আর যে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা হচ্ছিল তা এদের মত লোকের পক্ষে রীতিমত বিলাসিতা। বুড়ীকে কথা বলতেই বুড়ী বল্লে যে সে কালা। তারপর তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র। তখন আমি কাণা ছেলেটার দিকে ফিরে কান ধরে বল্লুম "এই ক্ষুদে ভেল্‌কিবাজ, কাল রাতে বগলে কি মোড়ক নিয়ে যাচ্ছিল কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো; তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লে

ভুলে যাও যত অপরাধ-মোর

শ্রীমধুসূদন সুর

ভুলে যাও যত অপরাধ মোর
ক্ষমা কর' প্রিয় মোরে।
রাখ' এ মিনতি; এস' কাছে এস'
যেও নাক' দূরে স'রে।
অভিমান ভুলে কও আজি কথা,
দিও নাক' মোর পরাণেতে ব্যথা,
নয়নের জলে ভাসায়োনা আর
আমারে এমন ক'রে!
তুমিত জাননা,—কত যে তোমায়
ভালবাসি আমি রাশি,
তব প্রেম' লাগি উন্মুখ সদা
মোর এ হৃদয়খানি;
ফিরায়োনা মুখ; আজি কাছে এসে,—
পুনঃ কও কথা মৃদু হাসি হেসে,
সুকোমল তব বাহুর পরশে
সারা হিয়া দাও ভ'রে।

——:(•):——

"কাল রাতে যাচ্ছিলুম কোথায়? কোথাও তো যাই নি। বগলে কি মোড়ক নিয়ে? কিসের মোড়ক?"

বুড়ী প্রমাণ দিলে যে দরকার হলে সে কাণে ভালই শুনতে পায়। চেঁচিয়ে বল্লে "ওসব মিছে কথা। কেন গরীব বেচারীকে জ্বালাচ্ছো? ওকে তুমি ঠাওরাও কি? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?"

চেঁচামেচি আমার অসহ্য মনে হোল। যেমন করে হোক এ হেঁয়ালীর মানে বুঝতেই হবে ঠিক করে বেরিয়ে পড়লুম।

দরজার সামনে একখানা বেঞ্চে ওভার কোটটা পরে বসেছিলুম। রাতের ঝড়ে উত্তাল সাগরের ঢেউগুলো তখনো আমার সামনে বালির বুকে আছড়ে পড়ছিল। তাদের একঘেয়ে শব্দ, দূর থেকে শোনা,

শহরের কোলাহলের মত শোনাচ্ছিল। যে দিনগুলো আমাদের পরিষ্কার, সুন্দর, আলোকোজ্জ্বল রাজধানীতে কাটিয়েছি ঢেউয়ের শব্দে তার সবটুকুই মনে পড়তে লাগলো আর দেখতে দেখতে তার চিন্তায় ডুবে গেলুম।

ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশী সময় কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ গানের সুরে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। আমি শুনতে লাগলুম, অদ্ভুত সুর কখনো ধীর, কখনো করুণ, কখনো দ্রুত, কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগলো। মনে হোল, সুরের ধারা যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। মুখ তুলে চাইতেই দেখলুম কুড়ের ছাদে আঁটসাঁট পোষাক পরা আর অপ্সরার মত চুলের রাশি বাতাসে এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী। এক হাতে সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণ থেকে চোখ ঢেকে দূরে দিগন্তের পানে চেয়ে সে তখনো গান গেয়ে চলেছিল।

মনে হলো কাল রাতে সমুদ্রের কিনারায় এরই গলা শুনেছি। আবার গায়িকার দিকে চাইলুম কিন্তু সে তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে হাতের তালের সঙ্গে নতুন একটা গান গাইতে গাইতে সে আমার সামনে দিয়ে তীরের মত ছুটে গেল। বুড়ীর কাছে গিয়ে সে তাকে কি বললে। মনে হলো যেন বুড়ী বিরক্ত হোলো। তরুণী খুব হেসে উঠল, তারপর লাফিয়ে আমার সামনে এসে থমকে দাড়িয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলো, তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মুখ ঘুরিয়ে সে আস্তে আস্তে সাগরের দিকে চলে গেল। কিন্তু তার রঙ্গলীলার তখনো শেষ হয়নি। সেদিন সমস্তক্ষণ দেখলুম, সে থেকে থেকে নেচে গেয়ে ঘুরে ফিরে যাচ্ছে। অদ্ভুত মেয়ে!

কিন্তু তার ভাব ভঙ্গিতে পাগলের মত কিছু ছিলনা। বরং তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বুদ্ধি মত্তার পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছিল। সে দৃষ্টি আমার উপর কতটা আকর্ষণীপ্রভাব বিস্তার করেছিল আর যেন আমার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন প্রত্যাশা করছিল। কিন্তু যখনই আমি মুখ খুলতে উদ্যত হচ্ছিলুম তখনই সে দুষ্টুমীর হাসি হেসে ছুটে পালাচ্ছিল।

এমন মেয়ে আগে আমি কখনো দেখিনি। তাকে ঠিক সুন্দরী বলা যেতো না, কিন্তু সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মতামত ছিল: তাকে দেখে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল আর ঘোড়ার মত মেয়েদেরও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মের চেয়ে বড় কিছু নেই। চলার ভঙ্গিতে, হাত পায়ের গড়নে এটা বেশ বোঝা যায়। নাকও লক্ষ্য করবার মত জিনিষ। রাশিয়ায় ছোট পায়ের চেয়ে নিখুৎ নাক আরো দুষ্প্রাপ্য। যাদুকরী বয়েসে প্রায় অষ্টাদশী।

কিন্তু যা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম সেটা ছিল তার দেহের নমনীয়ত, মাথা দোলানোর বিশিষ্ট ভঙ্গি, সুগঠিত কাধের উপর গড়িয়ে পড়া সোনালী, কোকড়া, লম্বা চুলের রাশি আর তার নাকের নিখুৎ গড়ন।

তার কটাক্ষে দুষ্ট, বন্য একটা ভাব লুকিয়েছিল আর নাকের গড়নের রেখায় ছিল মনভোলানো ভঙ্গি। আপনভোলা গায়িকা আমাকে জার্মাণ কবি গোটের রহস্যময় সৃষ্টি মিগননের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। এই দুজনের ভেতর একটা বিশিষ্ট মিল ছিল। সেই চাঞ্চল্য থেকে হঠাৎ শান্তি, সেই দুর্ব্বোধ্য কথাবার্ত্তা, আর সেই গানের তরঙ্গ তোলা।

বৈকালের দিকে আমার বনবালাকে কুড়ের দরজায় দাড় করিয়ে বল্লুম "সুন্দরী! বলো সকালে ছাদে তুমি করছিলে কি?"

"দেখছিলুম বাতাস কোন দিক থেকে বইছিল।"

"তাতে তোমার প্রয়োজন কি?"

"যে দিক থেকে বাতাস আসে, সে দিক থেকে আসে সুখ।"

"আর গান গেয়ে কি সৌভাগ্যকে ডাকছিলে?"

"যেখানে গানের সুর সেখানেই আনন্দ।"

"কিন্তু যদি বলি তোমার সুর দুঃখই এনেছে?"

"সে এলে তাকে সহা ছাড়া উপায় নেই। আর দুঃখ থেকে আনন্দের ব্যবধান বেশী নয়।"

"এসব গান তোমাকে কে শিখিয়েছিল?"

"কেউ নয়। আমি স্বপ্নের জাল বুনি, আমি সুরের তরঙ্গ তুলি। আমার গান যাদের কানে পশে তাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে, যারা শোনে না তারা বোঝেও না।'

"তোমার নাম কি?"

"যারা আমাকে দীক্ষিত করেছিল তারা জানে।"

"কে তোমাকে দীক্ষিত করেছিল?"

"তা জানি না।"

"আঃ—সত্যিই তুমি রহস্যময়ী! কিন্তু আমি তোমার সম্বন্ধে কিছু জানি।"

তার মুখে ভাবাবেগের চাঞ্চল্য ফুটলো না, তার ঠোঁট কেঁপে উঠলো না।

আমি বল্লুম "কাল রাতে তুমি সাগরের তীরে গিয়েছিলে।" তারপর যা দেখেছিলুম সব বল্লুম। ভেবেছিলুম, এইবার তার মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন ফুটবে; কিন্তু তার কিছুই দেখতে পেলুম না।

সে হেসে আমাকে বল্লে "আমাদের গোপন সভার কিছু আপনি দেখেছেন। তবে তার কথা বেশী কিছু জানেন না, আর যে টুকু জানেন সে টুকু মূল্যবান সম্পদের মত মনের মণি কোঠায় লুকিয়ে রাখাই ছিল ভাল।"

কতকটা ভয়-দেখানোর ভঙ্গীতে গম্ভীর ভাবে বল্লুম "কিন্তু আমি যা দেখেছি তা যদি দুর্গের অধ্যক্ষকে জানাই?"

একথা কানে যেতেই সে গান গেয়ে উঠে তীরের মত সরে গেল, তারপর ভয়-পাওয়া

পাখীর মত মিলিয়ে গেল। কিন্তু তাকে ভয়-দেখানো ঠিক হয়নি। তখন কিন্তু আমি নিজের ভুলের গভীরতা বুঝতে পারিনি।

রাত নেমে এলো। কস্তাক অনুচরকে চায়ের জল চড়াতে বলে একটা বাতি জাল্লুম; তারপর টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে লম্বা পাইপটা টানতে লাগলুম। চায়ে চুমুক দিচ্ছি, দরজা খুলে গেল আর পোষাকের খশ খশ শব্দ কানে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই আমার যাদুকরীকে দেখতে পেলুম। সে নিঃশব্দে আমার সামনে এসে বসলো আর এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে লাগলো যে আমি ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলুম।... এমনি যাদুভরা এক দৃষ্টি আমার বিগত জীবনের অনেকগুলি দিনকে অস্বস্তিকর করে তুলেছিল।...মনে হলো সে যেন আমার কোন কথা শোনবার প্রত্যাশা করছিল; কিন্তু অব্যক্ত কি এক আবেগে আমি বাকশক্তিরহিত হয়ে গেলুম। তার মুখখানা মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। ভাবলুম, এই বিবর্ণতার মধ্যে আমি তার মনের চাঞ্চল্য দেখতে পেলুম। তার আঙ্গুলগুলো যন্ত্রের মত টেবিলে ঘা দিচ্ছিল, তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তার বুক বার কতক দুলে পর মুহূর্তেই সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

তার এই কৌতুকাভিনয়ে আমি বিরক্ত হয়ে উঠলুম আর আমার সুন্দরী অতিথিকে এক পাত্র চা নিবেদন করে, অত্যন্ত নিরসভাবে এই অভিনয়ের যবনিকা পাত করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দুহাতে আমার মাথাটা তুলে ধরে কামনাময় কোমল দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলো।

যেন আমার চোখে মেঘ নেমে এলো, আমার ইচ্ছে হোল, তার এই আদরের বদলে তার মুখ চুম্বন করি। কিন্তু সে সাপের মত আমার উদ্যত বাহু এড়িয়ে চলে গেল আর যাবার সময় জড়িতস্বরে বলে গেল "আজ নিশুত রাতে সাগর তীরে আমার দেখা পাবে।" তার ধাক্কায় চায়ের জলপাত্র আর একটা মাত্র বাতি উল্টে পড়লো।

কস্তাক অনুচরটা তার চায়ের অংশ নিতে এসে বলে উঠলো "মেয়েটা বেজায় পাজী?" তারপর সে বেঞ্চে শুয়ে পড়লো আর আস্তে আস্তে আমার মনও শান্ত হয়ে এলো। অনুচরটাকে বল্লুম "দেখ, যদি পিস্তলের শব্দ শোন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেও সমুদ্রের ধারে।"

চোখ রগড়ে সে বল্লে "যে আজ্ঞে।"

পিস্তলটা কোমর বন্ধে গুজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। যে পথটা জলের দিকে নেমে গিয়েছিল, তার ঢালুর মুখে যাদুকরী আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তার পরণে আলগাভাবে ছিল হালকা পোষাক, যেটা তার কোমরে বাঁধা রুমালের মত দেখাচ্ছিল।

আমার হাত ধরে সে বল্লে "আমার সঙ্গে এসো।"

পাথুরে পথে সে এমন করে আমাকে নিয়ে চললো যে, আমি কেমন করে পড়ে যে ঘাড় ভাঙলুম না, তা বুঝতে পারলুম না। আগের দিন রাতে কাণা ছেলেটা যেখান থেকে মোড় নিয়েছিল সেখানে পৌঁছে, হঠাৎ মোর ফিরে, আমরাও সে রাস্তা ধরলুম। তখনো চাঁদ ওঠেনি। দুটি নক্ষত্র আলোকময়ীর আলোর মত অন্ধকারের বুক একটু ফিকে করেছিল। মাতাল ঢেউয়ের মাথায় তালে তালে উঠতে উঠতে পড়তে পড়তে একখানা মাত্র ডিঙ্গি তীরে এসে লাগলো।

তরুণী বল্লে "উঠে পড়ো।" খেয়ালের বশে রাতে সাগর অভিযানে বেরোবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তাই ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। কিন্তু এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা আমর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে লাফ দিয়ে ডিঙ্গিতে উঠে পড়লো, তার পেছু পেছু আমিও উঠলুম আর সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গি সাগরের বুকে ভেসে পড়লো।

আমি রেগে উঠে বল্লুম "এ সবের মানে কি?"

আমাকে একখানা বেঞ্চে বসিয়ে, কোমরটি জড়িয়ে ধরে সে জবাব দিলে "এর মানে—এর মানে যে আমি তোমাকে ভালবাসি।" তার নরম গাল প্রায় আমার গালে ঠেকছিল, তার গরম নিঃশ্বাস আমার মুখে পড়ছিল। হঠাৎ জলে কি একটা পড়ার শব্দ পেলুম। যন্ত্র-চালিতের মত হাত গিয়ে পড়লো কোমরবন্ধে। কোমরবন্ধে পিস্তল

পেলুম—না ! এ এক ভয়াবহ সন্দেহে বুক কেঁপে উঠলো। রক্ত মাথায় উঠে গেল। আমি তার পানে তাকালুম। আমরা তীর থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছিলুম আর আমি সাঁতার জানতুম না। তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে বিড়ালীর মত আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল আর হঠাৎ একটা ঝাকুনি দিয়ে, কাত হয়ে পড়া ডিঙি থেকে আমাকে জলে ফেলে দেবার জোগাড় করলে। যাই হোক কোন রকমে টাল সামলাদুম ; তার পরই আমায় বিশ্বাসঘাতিনী সঙ্গিনীর সঙ্গে মরণ বাঁচনের ধস্তাধস্তি সুরু হোল। সেই ঘৃণ্য নারী তৎপরতার বলে আমাকে পরাজিত করছে বুঝতে পেরে আমিও দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলুম। তার ছোট হাত দুখানা এমনভাবে মুচড়ে ধরেছিলুম যে তার আঙুলগুলো মড়মড় করে উঠলো। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলুম "তোমার মতলবটা কি ?" কিন্তু এত যাতনায়ও সে একটি কথা বল্লে না। বুঝলুম, সর্পিনীকে এভাবে জব্দ করা যাবে না।

শেষকালে সে বল্লে "তুমি আমাদের দেখতে পেয়েছিলে। তুমি আমাদের ধরিয়ে দেবার মতলব করেছিলে। তারপর হঠাৎ খুব জোরের সঙ্গে বিদ্যুতের মত একটা কৌশল প্রয়োগ করে সে আমাকে কাবু করলে। দুজনের দেহের আধখানা ছিল ডিঙিতে, আর আধখানা জলের ওপর ঝুলে পড়েছিল, তার চুল জলে ভাসছিল। সঙ্কট সঙ্কুল মুহূর্ত ! আমি হাটু গেড়ে বসে এক হাতে তার চুলের মুঠি আর একহাতে তার গলা টিপে ধরলুম। শেষে তার মুঠো থেকে নিজের পোষাক ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে তাকে জলে ফেলে দিলুম।

ফেনায় সাদা ঢেউয়ের ওপর বার কয়েক তার মাথাটা ভেসে উঠলো। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

ডিঙিতে একখানা দাঁড় পেলুম। সেখানা চালিয়ে অনেক কষ্টে শেষকালে তীরে ডিঙি ভেড়ালুম। ঢালু পথ বেয়ে কুড়েতে ফেরবার সময়, আগের রাতে কাণা ছেলেটা যেখানে মাঝির অপেক্ষা করছিল, সেদিকে চাইলুম। এই সময় আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছিল। মনে হোল যেন, চাঁদের আলোয় জলের ধারে কার সাদা মূর্ত্তি দেখলুম। কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে একখানা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আমার সামনে কি হচ্ছিল, দেখতে লাগলুম। যখন দেখলুম সেই সাদা মূর্ত্তি আমার অপ্সরার তখন বিস্ময় আর আনন্দে আমার বুক ভরে গেল। সে তার লম্বা, সুন্দর চুলের রাশি নিঙড়ে জল ঝরাচ্ছিল আর ভিজে পোষাক তার দেহের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। দূরে একখানা ডিঙি দেখতে পেলুম। সেখানা আমাদের দিকেই আসছিল। আগের রাতে তুর্কী টুপী-আঁটা যে মাঝিটাকে দেখেছিলুম, ডিঙি থেকে সে নামলো। আজ দেখতে পেলুম, তার চুল কষ্টাক-ধাচে ছাঁটা আর কোমরবন্ধ থেকে লম্বা একখানা ছুরি ঝুলছিল।

মেয়েটা চেঁচিয়ে বলে উঠলো "জ্যাঙ্কো ! সব ফেঁসে গেছে !"

তারপর তারা কি বলাবলি করতে লাগলো, কিন্তু এত আস্তে যে আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। শেষে জ্যাঙ্কো একটু চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "কাণা ছেলেটা গেল কোথায় ?"

কে জবাব দিলে "সে এখনই আসবে এখানে।" বলতে বলতে পিঠে একটা বোঝা নিয়ে ছেলেটা সেখানে এসে পড়লো আর বোঝাটা ডিঙিতে নামালে। জ্যাঙ্কো বল্লে "শোন্। এখানে পাহারায় থাক্। তুই যা জানিস্ তা দামী খবর। (জ্যাঙ্কো কি একটা নাম করলে)—কে বলবি যে আমি আর তার চাকরী করবো না। চারদিকে মুস্কিল বেধে গেছে। সে আর আমার দেখা পাবে না। অবস্থা এমন খারাপ দাঁড়িয়েছে যে আমাকে অন্য কোথাও কিছু করতে হবে। তবে সে এত সহজে কিছু জোটাতে পারবে না। তবে তুই তাকে বলতে পারিস্—তার যে শক্ত কাজ করে দিয়েছি, তার জন্যে যদি আরো ভাল মজুরী দিতো, তাহলে তাকে এমন দশায় ফেলে যেতুম না। সে যদি জানতে চায় কোথায় আমার দেখা পাবে, তাহলে বলিস্—যেখানে ঝড় গর্জ্জায়, ঢেউ যেখানে ফেনা তোলে—সেখানে আমার দেখা পাবে।"

একটু চুপ করে থেকে জ্যাঙ্কো বলতে লাগলো "বলিস তাকে, ও চললো আমার সঙ্গে। ওর এখানে থাকা চলবে না। বুড়ীকে বলিস্ তার সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে না।"

কাণা ছেলেটা বিড় বিড় করে বল্লে "আর আমি ?"

"তোর হাঙ্গামা আমি পোহাতে পারবো না।"

মেয়েটা লাফ দিয়ে ডিঙিতে উঠে পড়ে তার সঙ্গীকে কি ইসারা করলে।

লোকটা কানা ছেলেটাকে বল্লে "এই নে, মিষ্টি পিঠে কিনে খাস্।"

ছেলেটা বল্লে আর কিছু নয় ?"

"হাঁ, এই নে।" বলে বালির ওপর আর একটা মুদ্রা ফেলে দিলে।

ছেলেটা কুড়িয়ে নিলে না। জ্যাঙ্কো ডিঙিতে উঠে নিজের জায়গায় বসলো। ছেলেটা কিনারায় বসে রইলো, মনে হোল যেন সে কাঁদছিল। আহা বেচারা! তার দুঃখে আমারও দুঃখ হোল। যারা নির্ব্বাটে বে-আইনী মাল চালানের ব্যবসা করছিল, ভগবান কেন আমাকে তাদের মাঝখানে এনে ফেল্লেন ? একটা পাথর যেমন জলের বুকে ঢেউ তোলে আমিও তেমনি এদের

মাঝখানে ঢেউ তুলেছি আর সেই পাথর খণ্ডের মতই ডুবে মরছিলুম।

যখন আমি কুড়েতে ফিরলুম তখন কস্যাক অনুচরটা এমন ঘুমিয়ে পড়েছিল যে, ভাবলুম ওকে জাগালে ওর ওপর নিষ্ঠুরতা করা হবে। বাতি জালিয়ে দেখলুম, যে ছোট্ট বাক্সোটায় দামী জিনিষ পত্র ছিল সেটা, রূপোর হাতলওয়ালা তলোয়ার খানা, এক বন্ধু যে সারকেশিয়ান ছোরা উপহার দিয়েছিল সেখানা চুরি গেছে। এতক্ষণে বুঝলুম, যে বোঝাটা কাণা ছেলেটা ডিঙিতে নামিয়েছিল, তাতেকি ছিল। এক ঘুসি মেরে কস্যাকটাকে জাগিয়ে তার গাফিলির জন্যে খুব ধমকালুম। রাগে তখন আমি প্রায় জ্ঞানহারা হয়েছিলুম। কিন্তু যা গেছে, রাগলে তো আর সে সব ফিরবে না।

কিন্তু কি করে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করি? একটা কানা ছেলে আমার চোখে ধূলো দিয়ে চুরি করেছে আর একটা মেয়ে আমাকে ডুবিয়ে মারবার জোগাড় করেছিল শুনলে তারা কি হেসে উঠবে না? *

* Michael Y. Lermoutoff থেকে।

—:•:—

বন্ধু

শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়

জীবনের চলতি পথে অকস্মাৎ হয় তাদের প্রথম সাক্ষাৎ। গভীর রাত্রে কোন পথে ধনী যখন গুণ্ডাকর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন দরিদ্র নিজে বিপন্ন হলেও তার জীবন রক্ষা করে। ধনী দরিদ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"ভাই, আজ হ'তে আমরা বন্ধু! অন্য কোন পরিচয়ে কাজ নাই। যদি কখনও পারি, তাহ'লে এ ঋণ শোধ ক'র্‌বার চেষ্টা করব।" তাদের এই বন্ধুত্ব দেখে অনেকেই দরিদ্রকে বলেছিল যে,—এ হয় না। তেল ও জলে কখনও মিশ খায় না। এর জন্য তাকে একদিন অনুতাপ ক'র্‌তেই হবে! কিন্তু সে কোন কথা কানে তোলে নাই।

কৃতজ্ঞ ধনী নিজেই বন্ধুকে এক চাকুরী যোগাড় করে দেয় এবং তাকে নিজের আশ্রয়ে রাখে। দিনে দিনে তাদের বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে গাঢ় হতে গাঢ়তর। তারা আর নিজেদের পর ভাবে না। ধনীর সংসারে আপন বল্‌তে ছিল না কেউ। তাই সে মেতে উঠল একজন দরদী বন্ধু পেয়ে। ধনী বন্ধুর এত ভালবাসা সত্বেও দরিদ্রের মুখে সব সময় লেগে থাকে এক করুণ বিষাদের ছায়া। মাঝে মাঝে ধনীবন্ধু তা লক্ষ্য করে মনে ব্যথা পায়। শেষে একদিন বন্ধু বন্ধুকে অনেক অনুরোধ করে জানিতে পারে তার মনের কথা। দূর পল্লীগ্রামের এক জীর্ণ কুটীরে পড়ে আছেন তার চির দুঃখিনী বিধবা মাতা ও তরুণী বধূ। পূর্ণ এক বৎসর আগে সে তাঁদের ছেড়ে চলে আসে আসবার সময় তাঁদের হাতে তাঁর শেষ সম্বল মাত্র পঞ্চাশটী টাকা দিয়ে বলেছিল "আবার যদি কখনও তোমাদের দুঃখ ঘোচাতে পারি, তবেই ফিরব।" তারপর এই এক বৎসর, সে আর তাঁদের কোন খবর পায় নি। জানে না সে তাঁরা বেঁচে আছেন কিনা। তাই, যখন এই সুখের সময় তাঁদের কথা তার মনে হয়, তখনই তার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।

দরিদ্র-বন্ধুর মাতা এবং বধূকে দূর পল্লীগ্রাম হতে আনিয়ে ধনী তাদের নিজের গৃহে আশ্রয় দেয়। বন্ধুর মাতাকে সে ডাকে 'মা' বলে আর বন্ধুপত্নী ডালিকে বলে—'বৌঠান।' ডালি,—অপরূপ তার রূপ! সত্যই বিধাতা যেন জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে সাজিয়েছেন এই ডালি। তার সে রূপ তীব্র নয় অথচ কোমলও নয়। কবি পারে না তা'র বর্ণনা করতে। এত সুন্দর সে। ধনী-বন্ধু দিবসের কাজের মধ্যে খোঁজে কেবলই অবসর। কখন সে ছুটে যাবে তার মার কাছে তার বৌঠানের

কাছে চাইও খোঁজেন তাই। দরিদ্র-বন্ধু এই সময় তার কর্ম্মের জন্ম ঘুরে বেড়াত দেশ দেশান্তরে। তার পরিবারবর্গের ভার ধনী বন্ধুর উপর চাপিয়েই সে নিশ্চিন্ত ছিল। তাকে সে বিশ্বাস কর্ত্ত অগাধ। কিন্তু এ সংসারে একের সুখ অন্যের ঈর্ষার উপাদান। তাই অনেকে ব'লত;—"এত মাখামাখি ভাল নয়। কে জানে কার মনে কি আছে?" সব কথাই সে শুনতে পেত কিন্তু তখনি আবার আপন মনেই হেসে বলত,—"যত সব পাগল! এও কি সম্ভব? তার বৌঠানকে—না, না, না।" সে শিউরে উঠত।

* * *

পাঁচ দিনের মিথ্যাও একদিন সত্য হয়। 'বৌঠান সম্বন্ধে কথাটা যতই সে মনে মনে ভাবে ততই সে হয়ে যায় কি যেন এক রকম। সময় সময় সে ভাবে—"সত্যই তো! কেনই বা লোকে একথা বলে? সে কি সত্যই তার বৌঠানকে ভালবাসে? কে জানে? হয়ত সত্য!" এই রকম সাত পাঁচ চিন্তাই ক্রমে ক্রমে তাকে আকৃষ্ট করে তোলে তার বৌঠানের প্রতি। শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, কেবলই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অপরূপ রূপ। কোন কাজেই আর বসে না মন। অবশেষে একদিন সে বুঝতে পারে যে সত্যই ডালির সৌন্দর্য্য জুড়ে রয়েছে তার সমস্ত হৃদয়, মন এবং সেই সঙ্গে সে স্থির করে যে, যেমন কোরেই ডালিকে তার চাই-ই! ভুলে যায় সে তার কর্ত্তব্য! ভুলে যায় কৃতজ্ঞতা, মানে না সে বিবেকের নিষেধ বাণী, তুচ্ছ করে সে সমাজ বন্ধন! ডালির অসামান্য সৌন্দর্য্যের পসরা তাকে করে তোলে—ক্ষিপ্ত—উন্মাদ!

* * *

সহসা একদিন দরিদ্র-বন্ধু বিদেশে পায় এক চিঠি—"যথা শীঘ্র সম্ভব চলে এস। তোমার বন্ধু নিরুদ্দেশ!" সেই মুহূর্ত্তেই সে বিদেশ ত্যাগ করে বাহির হয়। সমস্ত পথ সে দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটায়। মনে মনে আলোচনা করে,—কেন এমন হ'ল? কোথায় গেল তার অসময়ের বন্ধু? আর কি সে পাবে না তার দেখা?—এই রকম কত কি! নানা চিন্তায় তার মন হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত। গৃহে উপস্থিত হয়ে সে চারিদিকে চেয়ে দেখে বাড়ীর সে শ্রী আর নেই। সমস্ত বাড়ীটা যেন প্রাণহীন দেহ। যতবার সে ফিরে এসেছে বিদেশ হ'তে, ততবার সে সামনের ঐ জানালায় তারই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখেছে তার বড় আদরের ডালিকে। আর ঐ বারান্দায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকৃত তার ধনী বন্ধু! আজ সব কোথায়? অস্থির পদে গৃহে প্রবেশ করে সে দেখতে পায় সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার অশ্রুমুখী মাতা।

মাতার পদধূলি গ্রহণ করেই অধীর আগ্রহে সে প্রশ্ন করে—"একি মা! তুমি কাঁদছ কেন? এরা সব গেল কোথায়?"

তার হাতে একখানি চিঠি তুলে অশ্রু-রুদ্ধকণ্ঠে মাতা বলেন,—"ওতেই সব বুঝতে পাবে।" পত্রে তার বন্ধুর হস্তাক্ষর। অত্যধিক ঔৎসুক্যে সে মুহূর্ত্ত মধ্যে পড়ে ফেলে সেই চিঠি। চিঠি পড়েই তার মাথা ঘুরে ওঠে। চিঠির কথা সে পারে না বিশ্বাস কর্ত্তে। তাই সে আবার পড়ে। সেই এক কথা! 'একি স্বপ্ন না' সত্য? চিঠিতে লেখা আছে—

হে বন্ধু!

বাগানে ফুল ফোটে পূজার জন্য কিম্বা যে তার ব্যবহার জানে তার জন্য। যে তার ব্যবহার জানে না তার জন্য নয়। একথা অতি সত্য। রূপসী নারীর সৃষ্টি হয় ধনীর গৃহ আলোকিত করবার জন্য। দরিদ্রের গৃহে অযত্নে ধূলায় পড়ে থাকবার জন্য নয়। যদি পড়ে থাকে, তাহ'লে সেই ধূলা হতে তাকে উদ্ধার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই তোমার গৃহে ডালিকে অযত্নে পড়ে থাকতে দেখে আমি স্থির থাকতে পারি নি। ডালির অপরূপ রূপ তোমার গৃহে শোভা পায় না। তুমি বোধহয় স্বীকার করবে যে, তোমার স্কন্ধ হতে এ বোঝা নামিয়ে দিয়ে আমি যথার্থ বন্ধুরই কাজ করেছি। ডালির বিনিময়ে তোমায় দিয়ে গেলাম আমার প্রাসাদতুল্য আবাসগৃহ।

বিদায়!

তোমারই—

ধনীবন্ধু।

অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দুহাতে বুক চেপে সে বসে পড়ে। একটা মর্ম্মভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদে তার মুখ হতে বার হয়ে আসে—"উঃ!" বন্ধু!!

সনেট

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি যাহা ভালবাস—তাই দিয়া সাখি।
সাধিব তোমার তুষ্টি। না করি' বিচার—
না শুনি' শ্রবণে কভু অথবা নিরখি';
ছুটে যাব আহরিতে সে দ্রব্য-সম্ভার।
ইন্দ্রাণীর কণ্ঠ হ'তে পারিজাত-মালা
খসায়ে আনিতে যদি কভু বল মোরে,—
কিম্বা সিন্ধু-তল হ'তে তব স্বর্ণ্যডালা,
আনিবারে বল যদি মণিরত্নে ভ'রে—
তাও পারি অবহেলে। শুধু পারিবনা—
আমারে দিয়েছ তুমি যে প্রেম গভীর,
অসঙ্কোচে নিজ হ'তে। তারি এককণা,
প্রতিদানে ফিরাইয়া দিতে। শুধু শান্ত স্থির—
হ'য়ে থাক্ বক্ষে মোর সে প্রেম-মুরতি;
অঙ্কিব যে যুগে যুগে তারি মধু-ছবি

নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় ছবি "অভিজ্ঞানে"র একটি দৃশ্যে মলিনা ও দেববালা। পরিচালনা কোরছেন প্রফুল্ল রায়।
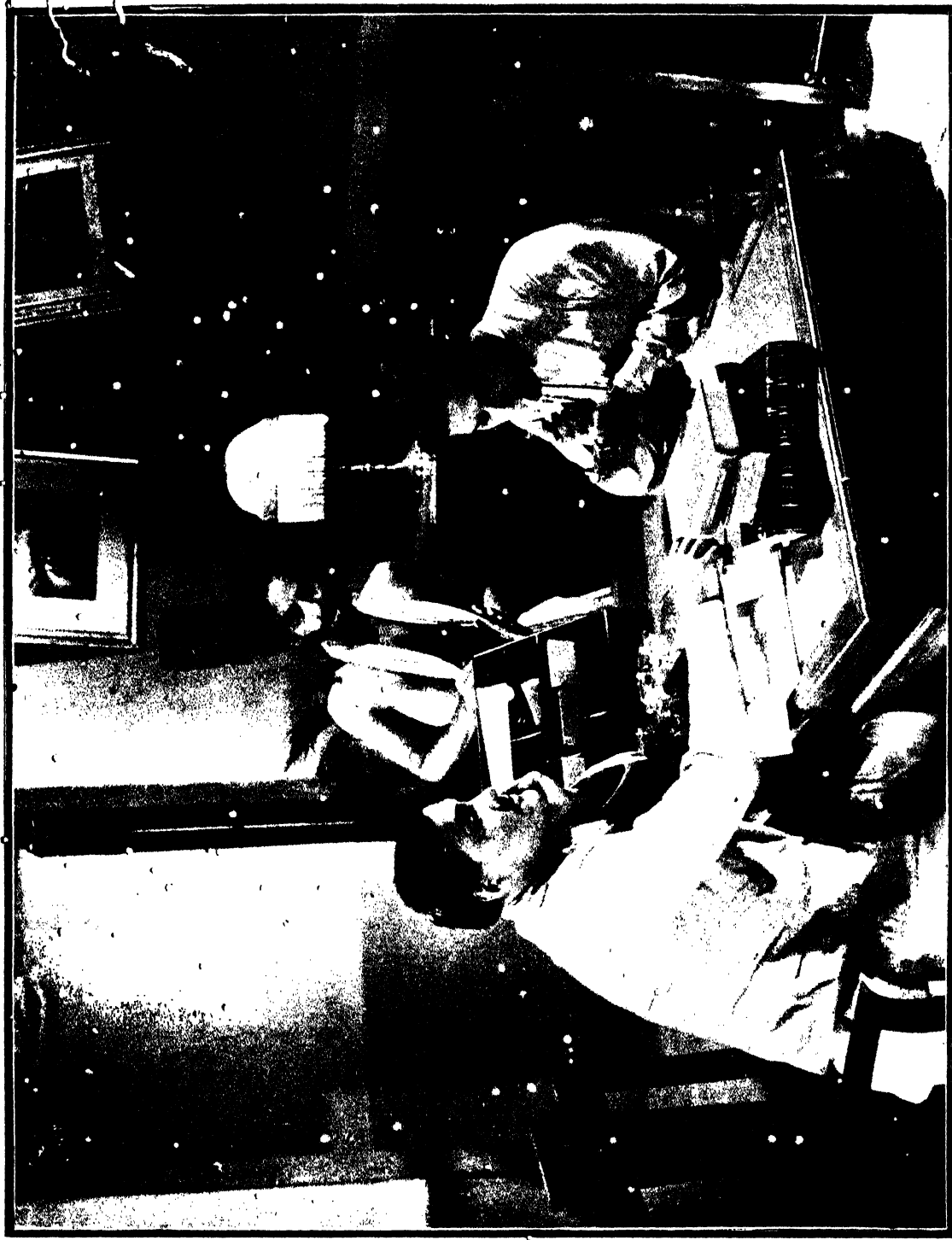
ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের "রূপোর ঝুমকো"র আরেকটি দৃশ্যে ধীরাজ, [illegible] প্রভাষ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য সিগারেট ধরাচ্ছেন।

ছায়াচিত্রের ব্যবসায়ে বাংলার প্রডিউসার

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

[illegible] প্রডিউসারের সংখ্যা [illegible] বাঙালায়দেশে ছায়া চিত্রের ব্যবসায়ে, পারসী বণিকের একাধিপত্য ভঙ্গ করিয়া যিনি নিজস্ব শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায়, সারা ভারতে বাঙলা ও বাঙালীর মান রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আজ জাতীয় নমস্য ও শ্রদ্ধার পাত্র।

নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার ছায়া-চিত্রের ব্যবসায়ে আজ যে ভারত-জোড়া সুনাম ও সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার মূলে আছে তাঁহার ঐকান্তিকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং পরিচালনা শক্তি। যে কয়টি কর্ম্মীর সহযোগীতায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, কর্ম্মজীবনে তাঁহারাও সকলেই সুনাম ও সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের সৌভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করে এমন বাঙালী আমি দেখিয়াছি, কিন্তু গৌরব বোধ করে না এমন বাঙালী নাই।

ব্যক্তিগত ভাবে যখন আমি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলাম না তখনও দিনের পর দিন নিউ থিয়েটার্সের বিজয়-বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া, সাফল্যের পরিচয় দিয়া, তাঁহাদের ছবি ও শিল্পীর গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া গৌরব বোধ করিয়াছি। আজ নিউ থিয়েটার্সের পতাকা-তলে দাঁড়াইয়া সেই গৌরবই বোধ করি। পূর্ব্বে অবাঙালী প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও যে জাতীয়তার মোহ আমার অন্তর আশ্রয় করিয়াছিল, আজও তেমনি করে। বাঙালী বলিয়া নিউ থিয়েটার্সকে ভাল বাসিতাম, বড়ো বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। আজ তাহারই সংশ্রয়ে আসিয়াছি বলিয়া, একাধারে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সমন্বয় ঘটিল।

আর একটি প্রতিষ্ঠান বাঙালীকে বড়ো করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম—কালী ফিল্মস্। বাঙলার মৃত্তিকায় চিত্র-শিল্পের বীজ রোপন করিয়া যে পারসী বনিক এই শিল্পের প্রতি বাঙালী ধনিকের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—সেই ৺রুস্তমজী ধোতিওয়ালার শিক্ষাধীনে, পরবর্ত্তী জীবনে যিনি চিত্র পরিচালক হিসাবে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন, তিনিও আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র—শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ম্যাডান কোম্পানীতে থাকা কালীন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত আমার সংযোগ ঘটিয়াছিল। পরবর্ত্তী জীবনে চেষ্টা, অধ্যবসায় ও আন্তরিকতার জোরে তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

কুটির শিল্পের আদর্শের সহিত কালী ফিল্মস-এর আমি তুলনা করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে, বাঙলার জল-বাতাসে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে—তাই হঠাৎ ঝড় ঝাপ্টায় পতনের সম্ভাবনা নাই। ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া যিনি ইহার ভিত পত্তন করিয়াছেন তাহার সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির তারিফ করিতে আমরা বাধ্য।

হিন্দুস্থানী ছবির বাজারে কালী ফিল্মস্-এর নাম নাই। এই দিকে আমরা গাঙ্গুলী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রাধা ফিল্মস্ মূলতঃ মাড়োয়ারীর টাকায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইলেও ভাগ্যচক্রে আজ বাঙালীর হাতে পড়িয়া, বাঙালী বনিয়াছে। সুজনে 'মাষ্টারজী' বর্ণ-পরিচয় করাইয়াছিলেন। শিষ্যের গুরু দক্ষিণায়, গুরু তাঁহার স্বজাতীয় মান রক্ষা করিয়াছেন।

তাই বাঙালী হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি নমস্কার করি। এরূপ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আচার পরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল ভদ্রলোক এ রাজ্যে বিরল। কর্ম্মজীবনে প্রায় দুই বৎসর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ব্যবসা পরিচালনায় বহুদিন লিপ্ত থাকিয়া ইনি অভিজ্ঞ হইয়াছেন। ইহাদের পৌরাণিক চিত্রগুলি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগী শ্রীযুক্ত চিত্ত রঞ্জন ঘোষ মহাশয় "Friend, Counsellor and Guide" হিসেবে রাধা ফিল্মস-এর উন্নতি সাধনে সর্ব্বদাই যত্নবান। তাঁহাদের যুগল প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হোক, এই প্রার্থনাই করি।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে বজরংলাল খেমকা (Mr. B. L. Khemka) শিক্ষিত এবং পরিপক্ক ব্যবসায়ী। তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া কর্ম্মজীবনে বিশেষ শান্তি পাইয়াছি। খেমকা বাবুর 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস' কোম্পানীর নাম নিউ থিয়েটার্সের পরেই উল্লেখ যোগ্য। বহু উচ্চ শ্রেণীর ছবি তুলিয়া এই প্রতিষ্ঠান সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন।

অন্তর বিপ্লবে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া খেমকা বাবু আবার নব উদ্যমে চিত্র-গঠনে উদ্যোগী

হইয়াছেন। তাঁহার আন্তরিকতা ও প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তির তারিফ করিতে আমরা বাধ্য। বাঙালী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সৎপরামর্শে খেমকাবাবু কর্ম্মজীবনে উপকৃত হইয়াছেন। আশাকরি ভবিষ্যতেও তিনি জয়যুক্ত হইবেন।

অপর মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান—"শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্স"। পরিচালক বাবুলাল্ চোখানী। সম্প্রতি মধুবোস এখানে ছবি তুলিতেছেন। প্রথম শ্রেণীর চিত্র অদ্যাবধি তুলিতে না পারিলেও ইহাঁরা অনেক ছবিতে ব্যবসাগত সাফল্যলাভ করিয়াছেন। অল্প টাকায় ভাড়া পাওয়া যায় বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে।

ম্যাডান কোম্পানীর ষ্টুডিও শোনা যায়, রায় বাহাদুর শুকলাল কারনানীর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে চলে। ইহাদের সম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভবপর নহে কারণ সংবাদ-পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগ নাই। ছায়া-চিত্রে Mortgagee হিসাবে ছাড়া প্রডিউসার হিসাবে কারনানীর কোন দাবী নাই।

দেবদত্ত ফিল্মস্এর শ্রীযুক্ত দেবদত্ত শীল বয়সে তরুণ ও এ-ব্যবসায়ে নবাগত। কয়েকখানি ছবি তুলিলেও কোনখানি প্রথম শ্রেণীর হয় নাই। শীল মহাশয়ের ছবির ব্যবসায়ে হাত পাকিতে এখনও বিলম্ব আছে। আশাকরি ভবিষ্যতে তাঁহার পরবর্ত্তী প্রচেষ্টাগুলি অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

বালিগঞ্জের "বড়ুয়া পিকচার্স" অনাদি বাবুর পরিচালনাধীনে, বেশীর ভাগ ভাড়া খাটাইয়া চলিতেছিল—সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। চিত্র নির্ম্মাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রবর্ত্তক (pioneer) হিসাবে অনাদি বাবুর নাম আছে।

ষ্টুডিও বিহীন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান, মাঝে মাঝে ভাড়া করা ষ্টুডিওতে ছবি তুলিয়া থাকেন। স্থায়ী প্রডিউসার-এর তালিকায় তাহাদের নাম উল্লেখ করা সমীচিন নহে। প্রসঙ্গতঃ কমলা টকীজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম করা চলে। ইনি ছায়া-চিত্রের ডিষ্ট্রিবিউশন্ ব্যবসায়ে নিজ দক্ষতা ও ব্যবসা বুদ্ধির জোরে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রথম ছবি সম্প্রতি মুক্তি লাভ করিয়াছে।

প্রডিউসারের কোন এসোসিয়েশন্ বাঙলাদেশে নাই। তাঁহাদের ভিতর সহযোগীতা এবং নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের সুবিধার জন্য এদেশে Producer's association হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। বাঙলায় অধিকাংশ প্রডিউসারের মধ্যে মতের মিল নাই। একটি organization নির্দ্দোষ ভাবে চালাইবার মত বিচার বুদ্ধিও সকলের নাই। অনেক ক্ষেত্রে, চিত্র-নির্ম্মাতার

ক্রস্ ট্র্যাজিডি

শ্রীভূধর নাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র—পুরুষ।

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেক্টিভ।

অবিনাশ—ঐ বন্ধু—শক্তিশালী সহকারী।

রামদহিন—ঐ বিশ্বস্ত বেয়ারা।

অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

চরিত্র—স্ত্রী।

মনীষা—হরেন বাবুর পত্নী।

বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝী।

অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(১)

জুন মাস। দারুণ গরম। সমস্তদিন আকাশ থেকে আগুন ঠিক্‌রে পড়েছে। প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি ছট্‌ফট্ করার পর আন্দাজ বারোটার সময় এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। হঠাৎ ফোনটা ঝন্‌ঝন্ করে' বেজে উঠলো।

উঠে আলো জেলে ফোন ধরলুম—"হ্যালো'—কে?"

ফোনে—"হরেনবাবু।"

আমি—"কে আপনি? কোথা থেকে কথা বলছেন?"

ফোনে—"আমি বড় বিপন্ন। আপনাকে এখনি দরকার। আপনাকে আসতে বলতে পারি না। যদি বলেন তো, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি।"

আমি—"কে আপনি?"

ফোনে—"আমার পরিচয় দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন। কিন্তু যা বলা দরকার তা আপনার সামনেই বলতে চাই। যদি অনুমতি করেন—?"

আমি—"কাল সকালে হ'লে চলে না?"

ফোনে—"না—না—না। আমি আপনার পায়ে পড়ছি। একটু কষ্ট করে আমার কথাটা শুনুন। আপনার ঠিকানা আমি 'ফোন-ডিরেক্টরী' থেকে পেয়েছি।"

একটু চিন্তা করে বল্লুম—"আচ্ছা—আসুন। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

ফোনের ঝন্‌ঝনানিতে শুধু আমি জাগি নি, মনীষারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে বল্লে—"এই অসময়ে আবার কোন্ উৎপাত এসে হাজির হ'লো?"

আমি বল্লুম—"একটী স্ত্রীলোকের গলা শুনলুম। সে বড় বিপন্ন বলছে।"

মনীষা বল্লে—"তা বলে' এই শেষ রাত্রিতে? ঘড়িটা দেখছো? রাত্রি প্রায় তিনটে বাজে।"

আমি হেসে বল্লুম—"বিপদ কি সময় বুঝে আসে, মনীষা? আমার মনে পড়ে, আর একবার এই রকম ফোনের ডাক পেয়েছিলুম—আর, সেও এমনি অসময়ে, এমনি আর্ত্ত রমণীকণ্ঠে।"*

মনীষা একটু চুপ করে থেকে বল্লে—"ঠিক্ বলেছ। সে সময়ে তুমি ছুটে না এলে আমার কি হ'তো? কি ভীষণ অবস্থায় পড়ে, আকুল ভাবে আমি তোমাকে সেদিন ডেকেছিলুম তা' আমি জানি আর জানেন অন্তর্যামী। তুমি যাও—যিনি তোমাকে ডেকেছেন তিনি নিশ্চয়ই এতক্ষণ পথে!"

তাড়াতাড়ি চটি জোড়াটা পায়ে দিয়ে নীচের বৈঠকখানায় নেমে এলুম। অবিনাশ আজ-কাল এইখানেই শোয়। তার নাক ডাকায় বাধা দিয়ে তাকে জাগিয়ে সব কথা বল্লুম। রামদহিনকে ডেকে বাইরের গেটের আলোটা জেলে দিতে বল্লুম।

অবিনাশ বিরক্তভরে বল্লে—"একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোবারও উপায় নেই। যাহোক দেখা যাক্। যা' এসে পড়েছে তা'তো আসবেই। তা'—আমি থাকবো না থাকবো?"

আমি হেসে বল্লুম—"যাবার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যখন, তখন থাকলে ক্ষতি কি?"

অবিনাশ কোন কথা না বলে একটা ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। আর সে যে জেগে আছে তা' জানাবার জন্যে গুন্‌গুন্ করে তাল-লয়-বর্জ্জিত এক অদ্ভুত সুর ভাঁজতে লাগলো।

প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। আমি চুপ-চাপ বসে সিগারেট টানচি, আর অবিনাশ গুন্‌গুন্ করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে, আবার যেন চম্‌কে উঠে নূতন উদ্যমে গুঞ্জনের খেই ধরচে। হঠাৎ 'কলিং বেল (calling bell) বেজে উঠ্‌লো।

অবিনাশ চোখ চেয়ে উঠে বস্‌লো।

আত্মীয় বলিয়া অনেক অযোগ্য ব্যক্তিকেও ষ্টুডিওর বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। অনেক প্রডিউসারের আবার 'সবজান্তা' 'complex' আছে। এই দোষ গুলির উচ্ছেদ সাধন প্রয়োজন।

———

* কি ভীষণ অবস্থায় পড়ে' মনীষা হরেনবাবুকে ডেকেছিলেন তা জানতে হ'লে ৭ম বর্ষের 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত 'নিশীথের ডাক' পড়ুন।

আমি উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতে লাগলুম। একটু পরেই দরজায় ঘা পড়লো। অবিনাশ উঠে দরজা খুলে দিলে। একটী স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকলেন—সঙ্গে একটী বারো-তেরো বছরের ছেলে।

মহিলাটীর বয়স আন্দাজ ২৭।২৮ বছর হ'বে—অত্যন্ত সুন্দরী।

আমি একখানি চেয়ার এগিয়ে দিলুম। তিনি বসে বল্লেন—"আপনি হরেনবাবু?"

আমি বল্লুম—"আজ্ঞে হাঁ। বলুন আপনার কি দরকার?"

মহিলাটী কেঁদে ফেল্লেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বল্লেন—"আমার বড় বিপদ। আমার সঙ্গে এটী আমার ছেলে। আমরা মায়ে-পোয়ে আপনার পায়ে ধরতে এসেছি। আমাদের রক্ষা করুন।"

আমি—"বলুন—ব্যাপারটা খুলে। আমার যা সাধ্য তা' আমি করবো।"

মহিলাটী বল্লেন—"আপনার দয়ার কথা আমি অনেক শুনেছি। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।"

কান্নার উচ্ছ্বাস ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে ঘটনাটীর বিবৃতি যা তিনি দিলেন তা' এই :—

সুদর্শন জনপ্রিয় অভিনেতা মানবেন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্বামী। হেলেনা থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেন এবং যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জ্জন করেছেন। আজ ঐ থিয়েটারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' নাটকের অভিনয় চলছিল। মানবেন্দ্রবাবু নায়ক মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, আর মহিমের রক্ষিতা 'শান্তা'র ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন সুন্দরী নটী সতী দেবী। অভিনয় অত্যন্ত উচ্চাঙ্গেরই হচ্ছিল। ক্রমে সেই দৃশ্য এলো, যেখানে শান্তা বেশ্যা ও মহিমের সাধ্বী স্ত্রী সরযূর প্রথম পরিচয় হ'লো। মাতাল অবস্থায় মহিম এসে উপস্থিত হ'লো এবং টাকার জন্য সরযুকে উৎপীড়ন করতে লাগলো। শান্তা মহিমকে বাধা দিলে। উভয়ের মধ্যে বচসা হ'লো। তারপর মহিম একটা ড্রয়ার থেকে পিস্তল বার করে শান্তাকে গুলি করবার ভয় দেখালে। শান্তা বুক পেতে দিলে—বেশ্যার আশা কোথায়, আকাঙ্খাই বা কি? 'বেশ্যা আজীবন বেশ্যা'। মহিম বল্লে তবে মর। 'গুড়ুম' করে' পিস্তল ছুটলো—শান্তা লুটিয়ে পড়লো মাটীর উপর—মহিম ছুটে পালিয়ে গেল—প্রতিবেশীরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো—সরযূ তখন মূর্চ্ছা গিয়েছে। সামনে পর্দ্দা ফেলে দেওয়া হ'লো। বাইরে প্রেক্ষাঘরে করতালির শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিতে লাগলো। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে থিয়েটারের সকলের মুখ সাদা হয়ে গেল। দেখা গেল একটি গুলি সত্য সত্যই শান্তার মাথা ভেদ করে গিয়েছে! ক্রমশঃ কানাকানি হ'তে কথাটা শ্রোতাদের মধ্যে পৌঁছিল। কখন কি রকমে যে প্রেক্ষাগার খালি হয়ে গেল তা বোঝা গেল না। পুলিশ এলো এবং মানবেন্দ্র বাবুকে হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার করলে। এখনও তদন্ত চলছে।

সমস্ত শুনে একটু চিন্তা করে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনার স্বামীর সঙ্গে এই অভিনেত্রীর খুব ঘনিষ্ট আলাপ ছিল কি?"

তিনি বল্লেন—"অভিনেতাদের বেশীর ভাগই কি রকম চরিত্রের তা' আপনাকে বলে দিতে হবে না বোধ হয়। তবে এই স্ত্রীলোটীর সঙ্গে আমার স্বামীর ঘনিষ্টতা ছিল বলে আমি জানি না। দেখুন, এই নাবালক ছেলেটীকে নিয়ে আমি যে কি বিপদে পড়িয়াছি তা' আপনি বুঝতেই পারছেন। তাই আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি। অবস্থা আমাদের বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু যে রকম অবস্থায় স্বামী আমার গ্রেপ্তার হ'য়েছেন, বিশেষ রকম তদ্বির না হ'লে তাঁকে বাঁচান শক্ত হ'বে। একবার দয়া করে তদন্তের সময় হাজির থেকে যাতে আমার স্বামী মুক্তি পান তাই আপনাকে করতে হ'বে। মনে করুন আমি আপনার বোন। আমায় রক্ষা করুন—আমার স্বামীকে রক্ষা করে। আমার স্বামী যে হত্যাকারী নন, সে কথা আমি খুব জোর করেই বলতে পারি।"

মনীষাকে সব কথা বলে' অবিনাশকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই গাড়ীতে থিয়েটারে এসে উপস্থিত হ'লুম। আসবার সময় তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বহুবাজার ষ্ট্রীটে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে এলুম।

থিয়েটারের ম্যানেজার আমার খুব পরিচিত। আমাকে দেখেই তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে তাঁকে এক-পাশে নিয়ে এসে বল্লুম—আমার পরিচয় এখন কাউকে দেবেন না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, বলবেন আমি আপনার একজন বন্ধু থিয়েটার দেখতে এসেছিলুম।"

তিনি বল্লেন—"আপনাকে দেখে সাহস পাচ্ছি। কি বিপদ দেখুন তো! আপনি হঠাৎ এদিকে এলেন কি করে?"

আমি বল্লুম—মানবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী এই রাত্রিতে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে আমার টেনে এনেছেন। মোটামুটী ব্যাপারটা শুনেছি। এইবার গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি। খুব সংক্ষেপে জবাব দিন।"

তিনি বল্লেন—বলুন। ওদিকে আবার ইন্‌স্পেক্টরের তদন্ত চলছে। তিনিত কাউকে বাদ দিচ্ছেন না যেন সকলেই অপরাধী।"

আমি বল্লুম—"হাঁ। নিয়ম তাই বটে। তদন্ত করতে হ'লে কাউকে জেরার বাদ দিতে নেই। যাক্ সে কথা। বলুন তো এই মানবেন্দ্র বাবু লোকটী কেমন।"

তিনি বল্লেন—"অসাধারণ শক্তিমান অভিনেতা। খুব উঁচু প্রাণ—নেশা ভাং করেন না। তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না। তবে, জানেন তো, আমাদের দেশে অকারণ নিন্দুকের অভাব নেই।"

আমি—"এই অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর কতদূর আলাপ ছিল ?"

ম্যানেজার—"এই অভিনেত্রীটী অল্পদিন হ'লো ষ্টেজে এসেছে। কিন্তু এর মধ্যেই এর বেশ পসার হ'য়ে উঠেছে। মানবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে এঁর বিশেষ আলাপ ছিল না। বরং নাট্যশিক্ষক যশোদাদুলাল বাজপেয়ীর সঙ্গে এর খুব পাকাপাকি আলাপ লোকে লক্ষ্য করেছে।"

আমি—"যশোদা বাবুর সঙ্গে মানবেন্দ্র বাবুর ব্যবহার কি রকম ?"

ম্যানেজার—"না। সেদিক দিয়ে কোন সন্দেহের কারণ নেই বলেই আমার মনে হয়। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব যথেষ্টই আছে।"

আমি—"এই রিভলভারের লাইসেন্স আছে অবশ্য ? কিন্তু এটা রাখবার ভার কার উপরে ?"

ম্যানেজার—"এটা আমার নিজের কাছেই থাকে। এর ছটা চেম্বারে টোটা ভরা ছিল। একটা ছোড়া হ'য়েছে—বাকী আছে পাঁচটা। সে পাচটাই খালি টোটা (Blank cartridge)। চলুন না। টোটার বাক্স পুলিসের হেপাজতে আছে, আর সজ্জাকর (Property man) এখন ইন্‌স্পেক্টরের জেরার জবাব দিচ্ছে।"

ম্যানেজারের সঙ্গে সাজঘরে গেলুম। সেখানে ইন্‌স্পেক্টরের জেরা ও সজ্জাকরের উত্তর থেকে বুঝলুম যে, খালি টোটা ছাড়া অন্য কোন টোটা তার কাছে ছিল না; এবং সে জানেও না কেমন করে একটা মাত্র গুলি ভরা টোটা রিভলভারে গেল।

সকাল পর্য্যন্ত তদন্ত চল্লো। কিন্তু কোন দিক থেকেও এমন সূত্র পাওয়া গেলনা যাতে এই হত্যারহস্যের অনুসন্ধান চালানো যায়। রঙ্গমঞ্চের সমস্তলোক মায় গেটকীপার পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত ছিল—কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কেউ এই রহস্যের উপর একটুও আলোকপাত করতে পারলে না।

ষ্টেজের উপরেই লাস পড়েছিল। ইন্‌স্পেক্টর যখন রিপোর্ট লিখছিলেন, সেই অবকাশে আমি লাসটা একটু পরীক্ষা করলুম। কপালের ঠিক মাঝখানে গুলি লেগেছে। মানবেন্দ্রবাবু কোন জায়গায় দাড়িয়ে রিভলভার ছুড়েছিলেন তা জিজ্ঞাসা করায় ম্যানেজার বল্লেন যে তিনি ঠিক বলতে পারেন না। তবে যেখানে ড্রয়ারটা ছিল তার পাশ থেকেই গুলি করেছেন বলে মনে হয়। মানবেন্দ্র বাবুও সেই কথাই বল্লেন; তবে মাতালের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে একটু আধটু টলে গিয়েও থাকতে পারেন।

অন্য কোন লোককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা সময়ের অপব্যয় করা হ'বে মনে হ'লো। একবার লাসটা নেড়ে দেখলে ভাল হ'তো। তাড়াতাড়ি সেটাও সেরে নিলুম। কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করতে পারলুম না। এই সময় ইন্‌স্পেক্টর এসে লাস মর্গে চালান দিলেন। তারপর মানবেন্দ্র বাবু ও সজ্জাকরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে থানায় চলে গেলেন।

ক্রমশঃ ভিড় কমে গেল—ম্যানেজার তখনও দু'হাতের উপর মাথা রেখে বসে আছেন। একটু পরে তিনি মাথা তুলে বল্লেন—"আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, হরেন বাবু! কি করি এখন ? আচমকা এ কি বিপদে পড়া গেল ?"

আমি বল্লুম—"বিপদ এই রকম আচমকাই আসে—forewarning দিয়ে আসে না। আচ্ছা, আপনার ষ্টাফের (staff) মধ্যে সকলেই কি আজ উপস্থিত ছিল ?"

ম্যানেজার—"হেড শিফ্টার (shifter) হরিদাস ছাড়া আর সকলেই ছিল। হরিদাস আজ ক'দিন আসছে না। তার জ্বর হ'য়েছে। চলুন—এ জায়গাটায় যেন দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। পাশের বাগানে একটু বসা যাক্।"

থিয়েটারের মঞ্চের ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটী ছোট্ট ফুলের বাগান সেটী রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেইখানে গিয়ে আমরা বসলুম। এদিক ওদিক চাইতে আমার নজর পড়লো মাটীর উপর। খানিকটা মাটী খোড়া হ'য়েছে—এখনও বীজ পোতা হয় নি, নিশ্চয়। মাটীটা খুব নরম। সেই মাটীর উপর গোটাকিতক পায়ের দাগ।

ম্যানেজারকে দেখাতেই, তিনি অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে মালীকে ডাকেন আর কি! বল্লুম—"থামুন। এই পায়ের দাগ ষ্টেজের দিকে গিয়েছে। ঘটনাটা হ'য়েছে বৃষ্টিটা হ'য়ে যাবার পর—কেমন ?"

ম্যানেজার—"হ্যাঁ।"

আমি—"তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে, ঘটনার আগে কোন লোক এই দিক দিয়ে ষ্টেজের দিকে গিয়েছে। তার পায়ে জুতো ছিল না; কারণ, দাগগুলো খালি পায়ের। এখন দেখতে হ'বে এই লোকটা ষ্টেজের মধ্যে কোথায় গিয়েছিল—আর লোকটাই বা কে।"

পায়ের দাগ অনুসরণ করে' দেখা গেল, সে লোকটী প্রধানা অভিনেত্রী সতীদেবীর ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। সেখানে সতীদেবীর সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল কি না তা' বোঝা গেল না। লোকটা নিশ্চয়ই সকলের পরিচিত হ'বে; নইলে এত লোকের মধ্যে একটা অপরিচিত লোকের আসা-যাওয়া করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। ম্যানেজার বল্লেন—"ঐ দিককার দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকে। নিতান্ত দরকার না হ'লে খোলা হয় না। সেদিনও, তাঁর যতদূর মনে আছে, দরজাটা বন্ধই ছিল। পরচুলওয়ালা মীর আলীকে জিজ্ঞাসা করা দরকার। কারণ সে-ই ওদিকটায় থাকে।"

মীর আলীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে—"ও দরজা বন্ধই ছিল। আমি জোর গলায় বল্তে পারি—কেউ ও দরজা খোলে নি।"

যা হোক দরজা আপাততঃ খোলাই ছিল। আমরা আবার বাগানে এলুম। একটু নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে নজরে পড়লো আবার সেই পায়ের দাগ। এবার সেগুলো রেলিংএর দিকে গিয়েছে, এক একটা ধাপের মধ্যে তফাৎ এবং দাগের গভীরতা দেখে বুঝলুম লোকটা ফেরবার সময় খুব তাড়াতাড়ি চলেছিল—খুব সম্ভব ছুটেছিল। দাগ লক্ষ্য করে রেলিং পর্য্যন্ত এলুম।

হঠাৎ অবিনাশ বলে উঠলো—"হরেন, একখানা খাম।" ঠিক রেলিংএর তলায় একখানা খামে মোড়া চিঠি। খামখানা খোলা হয় নি। উপরে শিরোনামা লেখা—"সতী দেবী"। এক পাশে লেখা আছে—"জরুরী"। তা' হ'লে লোকটা এই চিঠিখানা দেবার জন্যেই এসেছিল। খুব সম্ভব গোলযোগ দেখে সরে পড়েছে। খামখানা আর যথাস্থানে পৌঁছবার অবকাশ পায় নি। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম ঘটনাটা ঘটেছে একটা আন্দাজ রাত্রিতে। তা'হ'লে, একটা আন্দাজ সময়ে একটা লোক একখানা চিঠি নিয়ে লুকিয়ে রেলিং টপকে সতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। খামখানা খুলে ফেল্লুম তাতে লেখা আছে—"গজানীনকে পাঠাচ্ছি। কথামত আমার সঙ্গে দেখা করো। যদি কথার খেলাপ হয় তা' হ'লে যা' ঘটবে তা' জান্। 'তোমার যশোদা আর তুমি' দু'জনেই জাহান্নমে যা'বে, তার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি যদি না পাই, তো কাহাকেও দেব না—ভেঙ্গে ফেলবো—এ নিশ্চয় জানবে। তোমাকে সব দিতে রাজী আছি। কিন্তু তেমনি বুঝলে, কিছু দেব না, সব নেব—এও জেনে রেখো। ইতি—কালীমোহন।

ম্যানেজার সাগ্রহে আমার চিঠিপড়া দেখছিলেন। আমার পড়া শেষ হ'লে বল্লেন—"কি—কি—ও কার চিঠি?—দেখি।"

আমি বল্লুম—"দেখতে আপনার হ'বে না; আমি দেখলেই চলবে। আচ্ছা, একটা খবর আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।"

ম্যানেজার—"বলুন।"

আমি—"কালীমোহন বাবু বলে' কোন লোককে আপনি জানেন?"

ম্যানেজার—"কালীমোহন পোদ্দার? ৪৮নং নীলমণি সেন ষ্ট্রীটে থাকেন? খুব চিনি তাঁকে। তিনি খুব বড়লোক। কেন বলুন দেখি?"

আমি—"সতী দেবীর সঙ্গে এই ভদ্রলোকের পরিচয় ছিল?"

ম্যানেজার—"পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল বলে মনে হয় না! নানারকম দামী জিনিষ পত্র নিয়ে তিনি সতী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন! কখনো দেখা হ'তো কখনো হ'তো না। শেষ দিকে একটু ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল বলে' শুনেছি। থিয়েটারের স্ত্রী বসন্ত সতী দেবীর বাড়ীতে থাকে। তার মুখে শুনেছি, ইদানীং সতী দেবী মাঝে মাঝে কালীবাবুর গাড়ীতে চড়ে ইডেন গার্ডেনে যেত। এ নিয়ে যশোদা বাবুর সঙ্গে তার অনেকবার বচসাও হ'য়ে গেছে। যশোদা বাবু তাকে অনেকবার অনেক রকমে শাসিয়েছেন। এমন কি শেষকালে একখানা মটর গাড়ীও কিনে দিয়েছেন।"

আমি—"যশোদাবাবু কি বলে শাসাতেন তার একটা উদাহরণ দিতে পারেন?"

ম্যানেজার—"একবার বলতে শুনেছি—'আমি তোমার সব জানি। সব ফাঁস করে দেব। আর একবার বলেছিলেন—'আমি যদি তীর ছুড়ি, তোমার কালীমোহনের বাবাও তোমায় রক্ষা করতে পারবে না। প্রাণের চেয়ে প্রেমের দাম বেশী নয়। বাঁচলে প্রেম করবার অবকাশ ঢের পাওয়া যাবে। কেমন—নয় কি?"

আমি—"সতীদেবী কি জবাব দিয়েছিল?"

ম্যানেজার হেসে বল্লেন—"জবাব খুব মিষ্টি। এত মিষ্টি যে যশোদাদুলাল জল—আর কি?"

আমি—"পরস্পরে ঝগড়া হ'তো—নয়?"

ম্যানেজার—"একবার হ'য়েছিল—কিছুদিন আগে। তারপর সব মিটে গিয়েছিল আবার।"

আমি—"কতদিন আগে?"

ম্যানেজার—"দিন পনেরো হ'বে।"

আমি—"কাল রাত্রিতে যশোদাবাবু কোথায় ছিলেন?"

ম্যানেজার—"একটা বক্সে বসে' অভিনয় লক্ষ্য করছিলেন। ঘটনার পর আমি তাঁকে ডেকে পাঠাই। তিনি অত্যন্ত shock (হৃদয়ে আঘাত) পেয়েছেন। ইন্‌স্পেক্টরের কাছে প্রথমে এজেহার দিয়েই তিনি চলে যান। আপনি তাই তাঁকে দেখতে পাননি।"

আমি—"পুলিশ যাবার আগে একবার সতীদেবীর বাড়ীখানা দেখা দরকার। আপনি আমায় সাহায্য করতে পারেন?"

ম্যানেজার—"বসন্ত এখনো বোধহয় আছে। যদি না থাকে তো আমি 'চিড়িতন'কে পাঠাচ্ছি আপনার সঙ্গে। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে'খন।"

অবিনাশ বলে উঠলো—"দেখবেন—'ইস্কাবন' পাঠাবেন না যেন। ইস্কাবনের নাম শুনলে ভয় হয়।" *

* ভীষণ "ইস্কাবনের টেক্কা" দলের কার্য্য কলাপ জানতে হ'লে 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত 'বাবা কোথায়?' উপন্যাস পড়ুন।

ম্যানেজার হেসে বল্লেন—"শুধু 'চিড়িতন'ই যাবে। 'চিড়িতন' আমার বেয়ারা।"

আমি সেখানে আর সময় নষ্ট করা ঠিক মনে করলুম না। বসন্তর খোঁজ করা হ'লো। শোনা গেল সে চলে গিয়েছে। তখন 'চিড়িতন' বেয়ারাকে সঙ্গে করে সতী দেবীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলুম। বেয়ারা আমার পরিচয় দিলে বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে আমি সতী দেবীর ঘরে গেলুম। সেখানে সব অনুসন্ধান করে দু'খানা চিঠি ছাড়া দরকারী কিছু পেলুম না।

একখানা চিঠিতে লেখা—"গত ১২ই তারিখে মিসেস্ ঘোষের পার্টী ছিল। ঐ দিনে আপনি কৃতকার্য্য হ'য়েছেন, আমরা জানি। আজ ১৪ই জুন। আজ পর্য্যন্ত সেটা আমাদের কাছে পৌঁছয় নি। কাল ১৫ তারিখ। কাল পর্য্যন্ত সময় দেওয়া গেল। যদি কাল না পাওয়া যায়, তাহ'লে এ্যাসোসিয়েশনের আইনের চরম দণ্ড আপনাকে দেওয়া হ'বে জানবেন। আই, পি, সি, এ।"

অন্য চিঠিখানি ঐ বাড়ীর ঠিকানাতেই 'স্বর্ণলতা দেবী' নামে কোন স্ত্রীলোককে লেখা হ'য়েছে। চিঠিখানি এই রকম—"তোমায় কি বলিয়া সম্বোধন করিব স্থির করিতে না পারিয়া কোন রকম সম্বোধনই করিলাম না। ইতোপূর্ব্বে আমি তোমাকে জানাইয়াছি যে আজিও তোমার জন্য আমার হৃদয়ের আসন শূন্য রহিয়াছে। সিনেমা অথবা থিয়েটারে যোগ দেওয়া তোমার মতন সম্ভ্রান্ত বনীয়াদী ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা ও কুলবধূর সাজে না, একথা বারবার লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই। অর্থলোভী পিতার পরামর্শে তুমি নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছ। এখন সেই পিতাও তোমাকে আর সামলাইতে পারিল না। শিকল তুমি সব দিক হইতেই কাটিয়া ফেলিয়াছ। সথের বাজারের রামজীবন বসুর ঠিকানায় তোমার যে শেষ পত্র পাইয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে তোমার আশা ত্যাগ করিতে লিখিয়াছ। তোমার আশা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু, আজই হউক বা দুই মাস পরেই হউক, আমার পবিত্র বংশে তুমি যে কালীর দাগ লাগাইয়া দিয়াছ তাহা আমি নিশ্চয়ই মুছিয়া ফেলিব জানিবে।" পত্রে কোন স্বাক্ষর নেই।

'স্বর্ণলতা দেবী' নামে কোন অভিনেত্রীকে চেনে কি না জিজ্ঞাসা করায় বসন্ত বল্লে—"না মশাই। তবে সতী দেবী জানতেন কি না জানি না। আমি তো ঐ নামের কোন মেয়েমানুষ কোন থিয়েটারে আছে বা ছিল বলে শুনি নি।"

থিয়েটারে আসবার আগে সতী দেবীর কি পরিচয় ছিল বসন্ত তাও জানে না। এর আগে বায়োস্কোপে দু'একটা ছবিতে সে বেশ নাম করেছিল। তবে সে শুনেছে যে 'সতী দেবী' তার আসল নাম। সে ক'ল্‌কাতার খুব বনেদী ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে আর তার স্বামী খুব লেখাপড়া জানা বড়লোক।

আমি—"তবে এ লাইনে তার আসবার কারণ কি?"

বসন্ত—"স্বভাব-চরিত্তিরে ভাঙন না ধরলে কি আর এদিকে কেউ আসে, বাবু? ওকথা জিজ্ঞাসা করাই তো আপনার ভুল। এই তো সতী দেবী—নামের কত্তই না জাঁক! কিন্তু মানুষ তো কম আসতো না। আমরা গরীব-গুরবো লোক, কাজেই নামটা বেজে যায়। হুঃ! বেশ্যের আবার সতী আর অসতী!"

আমি—"কে কে আসতো বলতে পার?"

বসন্ত—"যশোদাবাবু, কালী পোদ্দার, জগাই শা, মনোরঞ্জন ভড়—এই কজন খুব আস্‌তো।"

আমি—"মানবেন্দ্রবাবু?"

বসন্ত—"রামঃ! কখনো না! তিনি কি সেই রীতের মানুষ?"

আমি—"জগাই সা আর মনোরঞ্জন ভড়ের ঠিকানা আমায় দিতে পার?"

বসন্ত—"হ্যাঁ। জগাই সা থাকে নেবু-বাগান, আর মনোরঞ্জনবাবু থাকে আলম-বাজার।"

অবিনাশকে দিয়ে কার্ব্বন কাগজ আনিয়ে আমি চিঠি দুখানার হুবহু নকল তুলে নিলুম। তারপর যে জিনিষটা যেখানে ছিল সেটা ঠিক সেইখানে রেখে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম। পুলিসের অনুসন্ধানে নূতন কিছু তথ্য আবিষ্কার করা হয় কি না জানবার জন্য অবিনাশকে সেখানে রেখে এলুম।

(২)

বেলা আন্দাজ বারোটার সময় অবিনাশ ফিরে এলো। খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে, বেলা আন্দাজ তিনটের সময় আমরা বসলুম হত্যারহস্যটার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য।

পুলিসের অনুসন্ধানে কোন নূতন সূত্র আবিষ্কৃত হয় নি। পুলিস সমস্ত চিঠিপত্র এবং কাপড় চোপড় নিয়ে গিয়েছে শুনলুম। আমার যতদূর মনে হয়, কাপড়চোপড়ের মধ্যে সূত্র খুঁজে পাবার মত কোন চিহ্ন আমার নজরে পড়ে নি। সুতরাং সে সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। অবিনাশের সঙ্গে পরামর্শ করা আর ঘরের যে কোন একটা দেওয়ালের সঙ্গে পরামর্শ করায় সমান ফল পাওয়া যাবে জেনেও অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি বুঝছো, অবিনাশ?"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে অবিনাশ বল্লে—"তুমি কি বুঝছো?"

তার গাম্ভীর্য্য দেখে একটু হেসে আমি বল্লুম—"এখনও ঠিক কিছু বোঝা যায় নি। এস, কেসটা একটু analyse (বিশ্লেষণ)

করা যাক্। খুন একটা হ'য়েছে, অবশ্য। খুন হ'য়েছে একজন অভিনেত্রী—ওজনক্ষের উপরে। Propertyman (সজ্জাকর) গুলিভরা টোটার সন্ধান রাখে না। পুলিশের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, যে থিয়েটারের তরফ থেকে ফাঁকা টোটা ছাড়া অন্য কোন টোটা কেনা হয় নি। যে রিভলভার দিয়ে খুন হ'য়েছে বলে ধরে' নেওয়া হ'চ্ছে, তাতে বাকী টোটাগুলো ফাঁকা টোটাই বটে। একটা মাত্র গুলিভরা টোটা সেখানে এলো কি করে? আর, প্রথম আওয়াজ করবার সময়েই সেই টোটাটা ছুটে গেল—এও খুব বিস্ময়কর ব্যাপার। যাকে খুনী বলে ধরে' নেওয়া হ'চ্ছে, তার খুন করবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি ঘটনাটা, যেমন আপাততঃ বোঝা যাচ্ছে তাই হয়, তো এটা নিছক আকস্মিক দুর্ঘটনা। এই গেল এক দফা। তারপর আমরা অনুসন্ধানক্রমে যা জানতে পেরেছি, তা' থেকে মনে হয় আরও কয়েক জনের এই সতী দেবীকে খুন করবার সম্ভাবনা আছে। ১নং—যশোদা দুলাল, ২নং কালী পোদ্দার, ৩নং আই, পি, সি, এ। জগাই শা ও মনোরঞ্জন ভড়ের বিরুদ্ধে কোন সন্দেহ আপাততঃ নেই।"

হঠাৎ অবিনাশ বলে' উঠলো—"কিন্তু খুনটা যে ষ্টেজের উপরে হাজার লোকের চক্ষুর সামনে হ'য়েছে: এদের মধ্যে কেউ এসে কি করে খুন করবে?"

আমি একটু অবাক্ হ'য়ে গেলুম সত্যি সত্যি। অবিনাশের মুখে এ রকমের প্রশ্ন আমি এ পর্য্যন্ত শুনি নি। বল্লুম—"প্রথমেই তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, যে এই প্রথমবার তুমি আমাকে কোন কেস সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে। এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই। আগেই বলেছি, যে সবকটা ফাঁকা টোটার মধ্যে একটা মাত্র ভরা-টোটার অস্তিত্ব কেমন সন্দেহজনক। আর, ঘোড়া টানবামাত্র সেই টোটাটিই ছুটে গেল—এও যেন কেমন কেমন লাগে। তার উপর, যে খুনী তার খুন করবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে এমনও ধরা যেতে পারে, যে প্রকৃত খুনী যে সে পাশেই কোন জায়গায় লুকিয়েছিল। যখন মানবেন্দ্র বাবু "তবে মর" বলে ঘোড়া টানলেন, ঠিক সেই সঙ্গে আর একটা রিভলবার থেকেও গুলি ছুটলো; সাইলেন্সার দেওয়া থাকায় শব্দ হ'লো না। তারপর সাধারণ উত্তেজনা ও গোলমালের সহায়তায় সে সরে পড়লো। তবে সে থিয়েটারের লোকদের সকলের পরিচিত—এটাও ধরে নিতে হ'বে। এখন বুঝতে পারছ, যে, খুনটা অন্য কারো দ্বারাও ঘটে থাকতে পারে?"

অবিনাশ বল্লে—"তা'হ'লে কি তুমি বলতে চাও—"

বাধা দিয়ে আমি বল্লুম—"বলতে আমি এখন কিছুই চাই না। তবে, খুনটা যে অন্য কারও দ্বারা হয় নি এ কথাও বলা যায় না। সুতরাং দেখতে হ'বে আর কারো সতী দেবীকে খুন করবার সম্ভাবনা আছে কি না। তা' হ'লেই আসছে—যশোদা দুলাল, কালী পোদ্দার, আই, পি-সি-এ। যশোদাদুলাল বম্বে ছিলেন—তাঁকে বাদ দেওয়া গেল। গঙ্গাদীনের মারফৎ কালী পোদ্দার যে চিঠি পাঠিয়েছে তাতে সন্দেহটা তার উপর পড়ে। কিন্তু সে যদি উপস্থিত থাকবে, তো চিঠিখানা পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? আরও চিঠিখানা থিয়েটারে যখন পাঠান হ'য়েছে, তখন অভিনয় শেষ না হ'লে যে সতী দেবী 'কথামত' তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না এ কথা তার অবশ্য জানা ছিল। সুতরাং অভিনয় শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করতো নিশ্চয়। কাজেই কালী পোদ্দারকে বাদ দিলেও চলে। তারপর আসছে 'আই-পি-সি-এ'। এটা একটা 'এ্যাসোসিয়েশন্' নিশ্চয়—চিঠি থেকেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সতীদেবী এই এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যা। মিসেস্ ঘোষের পার্টি ছিল ১২ই জুন। ঐ পার্টিতে কোন কাজের ভার সতীদেবীর উপর ছিল, এবং সে কাজে সে কৃতকার্য্য হ'য়েছে। চিঠিতে আছে—'সেটা আমাদের কাছে পৌঁছয় নি।' তা'হলে কোন জিনিস নিয়ে যাওয়াই সতীদেবীর কাজ ছিল। হ'য়েছে, অবিনাশ, হ'য়েছে!"

অবিনাশ বল্লে—"কি?"

আমি—"১২ই জুন থিয়েটার রোডে মিসেস্ ঘোষের পার্টী ছিল বটে। আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় ঐ দিন সেখানে যেতে পারি নি। কিন্তু খবর পেয়েছি মিস্ ঘোষের ১২০০৲ টাকা দামের হীরের নেকলেস চুরি হ'য়েছে। চিঠিখানার উল্লিখিত 'জিনিস' সেইটাই হ'তে পারে। সতীদেবী এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে চুরি করেছে; আর এ্যাসোসিয়েশনটী একটী চোরের এ্যাসোসিয়েশন্। 'আই-পি-সি-এ'—পুরো নামটা কি হ'তে পারে? যাই হোক্ না কেন, এ্যাসোসিয়েশনের তহবিলে সেটা জমা পড়েনি বলে কাল পর্য্যন্ত সতীদেবীর সময় দেওয়া হ'য়েছিল—অর্থাৎ ইংরাজী মতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সময় ছিল—তার পরেই চরম দণ্ড দেওয়া হ'য়েছে। কেমন?—কি বল অবিনাশ?"

অবিনাশ গম্ভীর ভাবে বল্লে—"হ'তে পারে—খুব। কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনটার পুরো নামটা কি হ'লো? "ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড এ্যাসোসিয়েশন্ কি?"

আমি—"অর্থাৎ?"

অবিনাশ করুণার হাসি হেসে বল্লে—"এও বুঝলে না? যদি বলা যায় "লোকটা ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড," তা'হলে বুঝায় কি? বোঝায় এই যে, লোকটা ইণ্ডিয়ান পেনাল

কোডের আমলে আসে এমন সব কটা অপ-রাধে অপরাধী। সুতরাং এই 'এসোসিয়েশন্‌টা ভীষণ অপরাধীদের 'এসোসিয়েশন্' হওয়ায় নামকরণ হ'য়েছে—'ইণ্ডিয়ান্ পেনাল কোড্ এসোসিয়েশন্।"

আমি বল্লুম—"সম্ভব বটে, কিন্তু সঙ্গত নয়। আচ্ছা নামটা যদি হয় 'ইণ্টার-প্রভিন্সিয়াল্ ক্রুক্‌স্ এ্যাসোসিয়েশন্', (Inter Provincial Crooks' Association—আন্তঃপ্রাদেশিক তস্কর-সভা) তা' হ'লে কেমন হয়?"

অবিনাশ খানিকটা হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর লাফিয়ে উঠে আমার হাতে একটা বিরাট ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলো—"Thank you for the interpretation. Oh, it fits too nicely!" (মানে করার জন্যে ধন্যবাদ। ওঃ! চমৎকার খাপ খায়।)

আমি বল্লুম—"তা' যেন হ'ল। কিন্তু, এই এ্যাসোসিয়েশন্ কোথায় তা আমরা জানি না। তবে এটা ঠিক্ যে হারগাছা এখনও তাদের কবলে আসেনি। পুলিশেও সে হারের কোন সন্ধান সতী দেবীর ঘরে পায় নি। সুতরাং ঐ হার যে এখনও এই ঘরে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তুমি কি বল্‌তে চাও ঐ হার নেবার জন্যে এ্যাসো-সিয়েসন্ চেষ্টা করবে না?—নিশ্চয় করবে; আর, সে আজ রাত্তিরেই খুব সম্ভব। কেননা দেরী হ'লে সেটা স্থানান্তরিত হ'তে পারে।"

অবিনাশ—"হ'লো। তারপর?"

আমি—"আজ সমস্ত দিনের মধ্যে যশোদা বাবু, কালী পোদ্দার প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা করে তদন্ত কর্‌তে হ'বে। আর একজন লোকের সঙ্গেও আমাদের দেখা করা উচিত। সে হ'চ্ছে শিফ্‌টার হরিদাস। সে কোন নূতন খবর আমাদের দিলেও দিতে পারে হয়ত। তারপর রাত্রিতে একবার সতী দেবীর বাড়ীতে গিয়ে এ্যাসোসিয়েসনের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাক্‌তে হ'বে। সব শেষে আসছেন 'স্বর্ণলতা'। স্বর্ণলতার নামের চিঠি সতী দেবীর কাছে এলো কোথা থেকে? এই 'স্বর্ণলতা' কে? আর স্বর্ণলতার চিঠি সতী দেবী যত্ন করে তুলে রেখেছিলই বা কেন? কাজেই আমাদের একবার বঁড়িশা সখের বাজারে রামজীবন বাবুর সন্ধানে যেতে হ'বে। সখের বাজারের রামজীবন বসুর মারফৎ কোন লোকের সঙ্গে এই স্বর্ণলতার চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া চলতো। স্বর্ণলতাকে যে চিঠিখানি লেখা হ'য়েছে, সেখানি এই বাড়ীর ঠিকানায়। অথচ বসন্ত বল্‌ছে 'স্বর্ণলতা' নামের কোন স্ত্রীলোক এ বাড়ীতে কখনো ছিল না। আমাদের এই স্বর্ণলতাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে হ'বে। চিঠি থেকে বোঝা যায় যে সেও অভিনেত্রী এবং ভদ্রবংশে তার জন্ম। কাজেই সে সতী দেবীর সম্বন্ধে এমন অনেক কিছু জানিতে পারে, যাতে আমাদের তদন্তের সুবিধা হ'বে। এমনও হ'তে পারে যে এই সতী দেবীরই আসল নাম 'স্বর্ণলতা'। আর তা' যদি হয়, তো চিঠিখানা খুব দরকারী হ'য়ে উঠবে আমাদের পক্ষে।"

অবিনাশ—"কেন?"

আমি—"চিঠিখানা স্বর্ণলতার স্বামীর লেখা; এটা বুঝেছ বোধ হয়? এমন কি হ'তে পারে না, যে তাঁর পবিত্র বংশে যে কালীর দাগ লেগেছে তা তিনি এতদিন পরে কাল রাত্তিরে মুছে ফেলেছেন?"

অবিনাশ—"হ'লে, এখন আদেশ হ'চ্ছে কি?"

আমি—"এক কাজ আমাদের কর্‌তে হ'বে। চল, আপাততঃ কালী পোদ্দার, জগাই শা ও মনোরঞ্জন ভড়ের চেহারাগুলো দেখে আসা যাক্। পারিতো বড়িশা-বেহালাও হ'য়ে আসা যাবে। তারপর রাত্রিতে এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারের অপেক্ষায় সতী দেবীর বাড়ীর মধ্যে কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকলেই চলবে। কোন না কোন মেম্বার যে আজ-কালের মধ্যে সেখানে শুভাগমন করবে সেটা নিশ্চিত।"

খানিক পরে প্রস্তুত হ'য়ে আমরা কালী-পোদ্দার প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করতে বেরুলুম। কালী পোদ্দার দাম্ভিক দুশ্চরিত্র বড়লোক। প্রথমে আমাদের সে আমল দিতেই চায় না। শেষকালে অনেক কৌশলে প্রশ্ন করে' তার কাছ থেকে যেটুকু জানলুম, তাতে আমার বিশেষ কোন সুবিধা হ'বে বলে মনে হ'লো না। সে বল্লে, সতী দেবীর খুন হওয়ার কথা সে জানে। কাল রাত্তিরে তার চাকর গঙ্গাদীনকে দিয়ে সে সতী দেবীকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিল। গঙ্গাদীন সতী দেবীর ঘরে অপেক্ষা করছিল, এমন সময় "সতীদেবী খুন হ'য়েছে"—শুনে সে ভয়ে পালিয়ে আসে। বাগানের রেলিং টপকে সে ভিতরে ঢুকেছিল কেন জিজ্ঞাসা করায় কালীপোদ্দার বল্লে যে, তার উপর হুকুম ছিল যাতে এই চিঠির কথা কেউ না জানতে পারে।

জগাই শা কোমরে বাত হ'য়ে শয্যাগত। আমাদের সঙ্গে দেখা করবার মতন তার অবস্থা নয়। তাকে যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর কাছ থেকেও এ কথাটার সমর্থন পাওয়া গেল।

মনোরঞ্জন ভড় তিন দিন যাবৎ বাড়ীতে নেই। ঝরিয়ায় তার একটা কয়লার খনি আছে। সেইটা দেখবার জন্যে সে সেখানে গিয়েছে শুনলুম পাড়ায় সন্ধান নিয়েও তাই জানতে পারলুম যা হোক এই মনোরঞ্জন বাবুর সম্বন্ধে খোঁজ নেবার ইচ্ছা রইলো। কারণ, ঝরিয়ায় যাওয়ার অজুহাতে এই দেশেই লুকিয়ে থেকে ইচ্ছা করলে অনেক কুকাজই তিনি করতে পারেন।

তারপর আমরা এলুম শিফ্‌টার হরিদাসের সন্ধানে। তার বাসার ঠিকানা আমি আগেই

ম্যানেজারের কাছে নিয়ে রেখেছিলুম। কাজেই বাসা খুঁজে বার করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না। দেখলুম, ঐ শ্রেণীর লোকেরা যেভাবে থাকে, হরিদাস ঠিক সে ভাবে থাকে না। বেশ একটা দোতলা বাড়ীতে সে থাকে। বাড়ীখানায় অনেকগুলি ভাড়াটে আছে। একজনের কাছ থেকে তার ঘর কোনখানে খোঁজ নিয়ে, দরজায় গিয়ে ঘা দিলুম। বার দুই ঘা দেবার পর আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। একটা মধ্যবয়স্ক লোক দরজার ফাঁকে মাথা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা কা'কে চান?"

আমি বল্লুম—"আমরা চাই হরিদাস শিকদারকে।"

লোকটা বল্লে—"আসুন ভিতরে।"

আমরা ভিতরে ঢুকলুম। লোকটা তক্তপোষের উপর বসে একখানা বেঞ্চি দেখিয়ে বল্লে—"বসুন আপনারা। আমিই হরিদাস শিকদার। আপনাদের আমার সঙ্গে কি দরকার?"

কোন কথা বলবার আগে আমি ঘরের চারিদিক ও লোকটাকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম। ঘরটা বেশ রুচিসঙ্গতভাবে সাজান। আসবাবগুলি খুব দামী না হ'লেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মেঝেটা চমৎকার-রূপে ঘষামাজা তকতকে। এক পাশে একটা বুক কেস, তাতে অনেকগুলি বই। বুক-কেসের পাশে একটা ছোট টেবিল ও একখানি চেয়ার। টেবিলের উপর একটা আয়না, দোয়াত কলম ও প্যাড—সুন্দরভাবে গুছিয়ে সাজান। তক্তাপোষের উপর একখানা মস্ত মোটা বই খোলা রয়েছে—যেন সেখানা পড়া হচ্ছিল। হরিদাস লোকটা বেশ লম্বা দোহারা গড়নের। মাথার চুল প্রায় সব পাকা—কাঁচার ভাগ খুব কম, রং খুব ফরসা না হ'লেও 'ফরসা' বলাই চলে, গায়ের চামড়া ঢিলে না হওয়ায় রংটা বেশ উজ্জ্বল মনে হ'চ্ছিল, জোড়া ভ্রূ ও চক্ষু দু'টী বেশ কুচকুচে কালো, দাঁত একটাও পড়েনি উপরন্তু বেশ সাজান—যেন বাঁধানো দাঁত। উপর থেকে দেখলে তার বয়স যতটা মনে হয়, খুটিয়ে দেখলে চেহারার সঙ্গে বিশেষতঃ তার দৃষ্টির সঙ্গে—সেটা কেমন খাপ খায় না যেন। মুখখানা দাড়ীগোঁফে ঢাকা।

তার প্রশ্নের উত্তরে বল্লুম—"আমাদের একটা সখের থিয়েটারের দল আছে। তোমাদের থিয়েটারের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে; তাই ওখানকার সিনগুলো ভাড়া নেব মনে কচ্চি। তিনি বল্লেন তোমার সঙ্গে দেখা করে' শিফটার জোগাড় করতে। আমাদের বেশ ভাল শিফটার দিতে হ'বে।"

একটু হেসে হরিদাস বল্লে—"ও! এই জন্যে এসেছেন? তা' বেশ। শিফটার জোগাড় করে দেওয়া যাবে। তবে আমি একটু অসুস্থ। ক'দিন থিয়েটারেই যেতে পারিনি। আপনাদের প্লে (অভিনয়) কবে?"

আমি—"আসছে সপ্তাহে।"

হরিদাস—"ও! তা'হলে হতে পারে। আমি সেরে উঠেছি—একটু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা গোছের হ'য়েছিল, তা' সেরে গেছে। দুর্ব্বলতা কাটলেই কাজে বেরুব।"

আমি এদিক-ওদিক চেয়ে মোটা বইখানা বিছানার উপর থেকে তুলে নিয়ে তার পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে বল্লুম—"হরিদাসের পড়াশুনোর অভ্যাস আছে দেখছি।"

হরিদাস হেসে বল্লে—"না, বাবু। ওসব ইংরেজী বই কি আমরা পড়তে পারি? শুধু থিয়েটারের চাকরীতে কি চলে, বাবু? দেখছেন তো, আমি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই। ভদ্রলোকের ছেলে, লেখা পড়া শিখিনি, তাই এই ছোট কাজ কচ্চি। ছোট লোকের মতন থাকা তো কখনো অভ্যাস ছিল না। তাই পুরণো বইয়ের কারবার করি। এতেও কিছু আসে।"

আমি ইতিমধ্যে বইখানার পাতা ওল্‌টাচ্ছিলুম। বইখানা শেক্সপীয়রের (Shakespeare) একটা বেশ দামী সংস্করণ। গোড়াতেই একটা নাম লেখা দেখলুম—"এম, ব্যানার্জ্জী—সিনিয়র প্রফেসর অব ইংলিশ লিটারেচার,—লক্ষ্ণৌ।" বল্লুম—"আমারও বই কেনার খুব সখ আছে। তোমার বইগুলো একবার দেখবো, হরিদাস?"

হরিদাস ব্যগ্রভাবে বল্লে—নিশ্চয়-নিশ্চয়। দেখবেন বই কি। আপনাদের দেখাবার জন্যেই তো কিনে রেখেছি।"

সে বুক কেসের চাবি খুলে দিলে। আমি বইগুলি দেখতে লাগলুম। শেক্সপীয়র, মিলটন্, বাইরণ, শেলী, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন্ প্রভৃতি কবির কাব্য, হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে প্রভৃতির কয়েকটা অনুবাদের সংস্করণ—ওয়াল্‌টার স্কট্, ডিকেন্স থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বুথবী, গার্ভিস, ওপেনহাম্, ওয়ালেস, ওয়েলস প্রভৃতির নভেল—সার্ভাণ্টিস, হিউগো, মপাসা প্রভৃতির অনুবাদ এই সব দিয়ে বুককেসটা ভরা। কাব্য, নাটক ও উপন্যাস ছাড়া ইতিহাস দর্শন প্রভৃতির সংখ্যাও তাতে বড় কম ছিল না। কিন্তু একটা লক্ষ্য করবার বিষয় তাতে এই ছিল, যে প্রায় সমস্ত বইতে "এম, ব্যানার্জ্জী" নাম লেখা।

বইগুলো দেখতে দেখতে বল্লুম—কত দাম দিয়ে এই বইগুলো কিনেছ হরিদাস? এতো বেশ দামী collection দেখতে পাচ্চি।"

হরিদাস বল্লে—"খুব সুবিধা দরে কিনেছি বাবু। বছরখানেক আগে লক্ষ্ণৌতে আমার এক ভগিনীপতির বাড়ীতে যাই। তাঁর বাড়ীর পাশেই একজন প্রফেসর থাকতেন। তিনি হঠাৎ একদিন রেলেরেলে ঠোকাঠুকি হ'য়ে মারা যান। তাঁর ওয়ারিশ কেউ না থাকায় তাঁর জিনিষ পত্র বিক্রী হ'য়ে যায়। সেই সময় আমি বুককেস শুদ্ধ সমস্ত

বইগুলো একেবারে মাটীর দরে কিনে নিয়েছিলুম। কিন্তু এগুলো কাটাতে পারিনি আজও। যে সব বই পড়তে বিদ্যের দরকার হয়, সে সব বই তো আজকাল বাজারে বিকোয় না বাবু।"

আমি বল্লুম—"এর দর কি?"

হরিদাস একটুখানি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো; তারপর বল্লে—"আপনি কিনবেন?"

আমি—"ইচ্ছে হ'চ্চে তো। দরটা শুনি।"

হরিদাস আবার খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে—"দাম, এক হাজার টাকা।"

অবিনাশ বলে' উঠলো—"লোকটা দেখছি কালই একখানা বাড়ী কিনবে!"

হরিদাস তার দিকে চেয়ে একটু হাস্‌লে মাত্র; কোন জবাব দিলে না। আমি চোখের ইঙ্গিতে অবিনাশকে চুপ করে' থাক্‌তে বলে উত্তর করলুম—"বল কি! দামটা একটু বেশী হ'লো না? একটু বিবেচনা কর।"

হরিদাস বল্লে—"বিবেচনা করবার কিছু নেই বাবু। এর দাম হাজার টাকা, আপনিই বরং বিবেচনা করুন—আমি বেশী বলিনি কিছু। এই শেক্সপীয়র খানার এই একটা ভলিউম্ (Volume) ১০৲ দশ টাকা। দেখুন দশটা ভলিউম্ আছে—সব মরক্কো বাঁধাই। বইগুলো কি দেখছেন তো!"

আমি হেসে বল্লুম—"হরিদাস, তুমি তো দেখছি বেশ পাকা 'জহুরী'। তা' ঐ ক্যাণ্টের (Cant.) ফিলজফিখানার দাম কত?"

হরিদাস আবার খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বল্লে—"কোনটা কান্তর ফিলজফি তা' জানি না বাবু, এইটুকু জানি যে অতবড় বিদ্বান লোক বাজে বই দিয়ে তো আর বুককেস ভরিয়ে রাখেন নি। সেই হিসাবে দর বলেছি।"

আমি বল্লুম—"না—এই খানার দাম জান দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। যাক্; আমি ভেবে দেখে পরে খবর দেব। আপাততঃ উঠি। ভাল কথা—তোমাদের ষ্টেজে একটা খুন হ'য়েছে শুনেছ বোধ হয়?"

হরিদাস সহজ স্বরে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ। আহা, মেয়েটী বেশ ছিল। আমার উপর তার খুব অনুগ্রহ ছিল। সে যাওয়ায় আমার একটা মুরুব্বী চলে গেল।"

আমি—"সে তো শুনলুম এ থিয়েটারে নতুন এসেছিল।"

হরিদাস—"এ থিয়েটারে কেন—সে এর আগে কোন থিয়েটারেই ছিল না। সে বায়োস্কোপে ছিল, আর সেখানেই নাম করেছিল। ভদ্রঘরের মেয়ের ওখানে বেশ দর আছে তা' সে কাণাই হোক্ আর খোঁড়াই হোক্। এতো সুন্দরী ছিল—কাজেই বেশ মোটা মাইনেই পাচ্ছিল। সেখানে যশোদাদুলাল বাবুর সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর তাঁর টানে এখানে এসে পড়েছিল।"

আমি—"কি রকম?"

হরিদাস—"এ তখন শ্যামচাঁদ ফিল্‌ম্ কোম্পানী'তে কাজ করছিল। সেই সময় একদিন এ যশোদাবাবুকে ফোনে বলে—'আপনার সতী রইলো কি মলো সে খবরও আপনি আর রাখেন না, অথচ সে আপনার জন্যে মরে, এ আপনি জানেন।' যশোদাবাবু কি উত্তর দিলেন জানি না। কিন্তু ঠিক পরের দিনেই তিনি আসেন, আর ১৫ দিনের মধ্যে এইখানে এর কাজ হয়।"

আমি—"তুমিও সেখানে কাজ করতে নাকি?"

হরিদাস—"হাঁ। খাবার-দাবার দেওয়া, দেখাশুনো করা—এই আমার কাজ ছিল। বুড়ো মানুষ আমি—কাজটা ছিল মন্দ নয়। কিন্তু এ চলে আসতেই আমার মুরুব্বীর অভাব হ'লো। যশোদাবাবুকে ধরে' এখানে এলুম। সেই থেকে এখানেই কাজ করছি।"

আমি—"এই সতী দেবীর অতীত জীবনের কিছু তোমার জানা আছে? এ কি সত্যি ভদ্রঘরের মেয়ে?"

হরিদাস খুব অল্পক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো। তারপর বল্লে—"ভদ্রঘরের মেয়ে শুনেছি। তার বেশী আমি কিছু জানি না।"

আমি—"এর বাপের নাম কি—কোথায় এদের বাড়ী ছিল, তা' শুনেছ?"

হরিদাস মাথা নীচু করে' বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বল্লে—"আজ্ঞে না।"

"রাত হ'য়ে আসছে—আচ্ছা, তা হলে আজ উঠি। কাল-পরশু আবার দেখা-করে' এ সম্বন্ধে সব ঠিক করবো।" এই বলে' উঠে পড়লুম।

বাইরে এসে গাড়ীতে উঠে গাড়ী ছেড়ে দিলুম। অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে—"এইবার কোথায়?"

আমি—"এইবার সোজা বাড়ীর দিকে। তারপর একটু পরে সতী দেবীর বাড়ীর দিকে রওনা হ'তে হ'বে। তুমি হরিদাসকে কি রকম বুঝলে?"

অবিনাশ—"তুমি কি বুঝ্‌লে?"

আমি—"এই হরিদাস সতী দেবী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে। সে ইচ্ছা করলে আরও অনেক খবর দিতে পারে। আর একটা কথা,—সে লেখাপড়া বেশ জানে বলে মনে হ'চ্ছে; কিন্তু সে, সে কথা চেপে গেল। খুব বিদ্বান না হ'লেও, সে মোটামুটী লেখাপড়া জানে। 'ফিলজফি'কে 'ফিলজফি' বলবার মতন কম বিদ্যা তার নয়। আরও, 'ফিলজফি' বলে' একটা বিষয় আছে—অন্ততঃ এটা না জানা থাকলে ঐ কথাটা অমন সহজ ভাবে

ওর মুখ দিয়ে বেরুলো না। যাই হোক—সতী দেবীর অতীত জীবন সম্বন্ধেও খবর নেওয়াটা খুব দরকার! অথচ আর সে দিকে কিছু করা যাবে বলে' মনে হ'চ্ছে না। কাল দেখা যা'বে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা কালীঘাট এসে উপস্থিত হলুম। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে, একটু বিশ্রাম করে রাত্রি আন্দাজ সাড়ে ন' টার সময় সতী দেবীর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হ'লুম। সেখানে পৌছে দেখলুম, বাড়ীর সামনে দু'জন পাহারাওয়ালা খাড়া হ'য়ে রয়েছে। রাত্রিকালে বাড়ীতে ঢুকতে গেলে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দিতে হ'বে; আবার কৈফিয়ৎ দেওয়া সত্ত্বেও বাড়ীতে যে ঢুকতে পারা যাবে, সে বিষয়েও কোন স্থিরতা নেই। সুতরাং স্থির করলুম, তাদের অজ্ঞাতসারেই বাড়ীতে ঢুকতে হ'বে।

বাড়ীর পিছন দিয়ে একটা ছোট গলি গিয়েছে। গলির দিকে নীচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা একটা ছোট ফুলের বাগান। আমরা পাঁচিল টপ্‌কে সেই বাগানে পড়লুম। বাগানে ঢুকেই প্রথমে মনে হ'লো বসন্তের কথা। এই খালি বাড়ীতে পুলিস পাহারার মধ্যে বসন্ত নিশ্চয় বাস করছে না। সুতরাং সে সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত হ'য়েই আমরা খিড়কীর দরজার দিকে চললুম।

দরজা খোলা পড়ে আছে। পুলিসের চোখের উপর থেকে চুরি করবার জন্যে যে কেউ এ বাড়ীতে ঢুকবে সে সম্ভাবনা বলেই বোধ হয়, দরজা-জানালা গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। যা হোক, আমাদের ঢোকবার সুবিধা হ'লো; আরও 'আই, পি, সি, এ'র এজেন্টের সুবিধার জন্যে সেটা বন্ধ করেও দিলুম না। সোজা উপরে গিয়ে আমরা সতীদেবীর ঘরে উপস্থিত হ'লোম। তারপর জানালার খড়খড়ি গুলো বেশ করে' বন্ধ করে দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করলুম। দু'টো ইলেকট্রীক টর্চের আলোতে ঘরটা বেশ আলো হ'য়ে উঠলো।

ঘরের জিনিষ পত্রগুলো বেগোছ হ'য়ে গিয়েছে। বিছানা-বালিসগুলো খাটের উপর থেকে মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয়েছে দেখলুম। তা' হ'লে বিছানার তলা পর্য্যন্ত খানা তল্লাস করা হ'য়েছে দেখা যাচ্ছে।

অবিনাশ বল্লে—"এমন তন্ন তন্ন করে' তল্লাস করার পরেও হারটা এখানে আছে মনে কর?"

আমি—"খুব তন্ন তন্ন করে' সন্ধান করা হ'য়েছে বটে, বন্ধু; কিন্তু তা বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে করা হয় নি। অত দামের একটা হার বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখবে—এমন বোকা কে আছে? দেরাজ আলমারী প্রভৃতি আমি নিজেই দেখে গিয়েছি। সেখানে কিছুই নেই—এবং থাকবারও সম্ভবনা নেই। তবে একটা স্থান আছে, যেখানে লুকিয়ে রাখা চলে; সেটা হচ্ছে বালিসের মধ্যে। এখন সেইটা দেখা যাক্।"

বালিসগুলো একে একে ছিঁড়ে ফেলা গেল। কিন্তু হারের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

অবিনাশ বল্লে—"বাড়ীর অন্য জায়গাগুলো একবার দেখলে হ'তো।

আমি বল্লুম—"হার যদি এ বাড়ীতে থাকে, তো এই ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তা নেই। অত দামী-জিনিস যে-কোন লোকের খুঁজে পাবার সম্ভাবনা উপেক্ষা করে' বাইরে রেখে দেবার পাত্রী সতী দেবী ছিল না। এতগুলো লোককে নিয়ে মানিয়ে চলে যে, তাকে তুমি সহজ-স্ত্রীলোক ঠাওরাও? ভদ্র-ঘরের কুলত্যাগিনী কুলবধূ সাধারণ পতিতার চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর জানবে।"

অবিনাশ—"কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে আর?"

এইসময় আমার চক্ষু ঘরে টাঙানো দেয়াল ঘড়ীটার দিকে পড়্‌লো। ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে রয়েছে। দিন বা রাত্রি যখনই হো'ক এগারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় সেটা বন্ধ হ'য়েছে। একটু ভেবে অবিনাশকে বল্লুম ঘড়ীটাকে চালিয়ে দিতে। অবিনাশ পেণ্ডুলামটা (Pendulum) নেড়ে দিলে বটে, কিন্তু সেটা বেশীক্ষণ দুললো না। খানিক পরেই বন্ধ হয়ে গেল। বার বার তিনবার চেষ্টা করে দেখা গেল, কিন্তু প্রত্যেকবারই অল্পক্ষণ দুলেই পেণ্ডুলামটা বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো। ঘড়ীটাকে নামিয়ে আনতে বলায় অবিনাশ সেটাকে নামিয়ে নিয়ে এলো। তারপর তার সামনের দিকটা খুলে ফেলতে বেশী দেরী হ'লো না। তার ভিতরে কলের সঙ্গে জড়ানো একছড়া হীরার হার—মিস্ ঘোষের হীরার হার!

অবিনাশ অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আমি বল্লুম—"এর ভিতরে হার আছে ঠিক করলুম কি করে তা বোধ হয় বুঝতে পারছ না?"

অবিনাশ—"কি করে পারবো?"

আমি—"তবে শোন। ঘড়ীটা দেখলুম এগারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় বন্ধ হ'য়েছে। সাতদিনের দম দেওয়া ঘড়ী। এ সপ্তাহে যে দম দেওয়া হয় নি তা হ'তে পারে না। কারণ, ঘড়ীর গায়ে বেশ স্পষ্ট করে' লেখা রয়েছে 'রবিবার'। আজ বৃহস্পতিবার—সুতরাং দমের অভাবে ঘড়ী বন্ধ হয় নি। কল খারাপ হ'য়ে গিয়ে যে ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে তাও নয়। কারণ, অব্যবহৃত অবস্থায় ঘড়ী পড়ে' থাকলে এমন পরিষ্কার থাকে না। আরও, এমন দামী 'Ansonia' মেকারের ঘড়ী বেমেরামতী অবস্থায় ফেলে রাখবার কোন সঙ্গত কারণও নেই। সতীদেবীর টাকার অভাব ছিল না। তৃতীয়তঃ মিসেস ঘোষের

*

হাজরা পিকচার্সের প্রথম অবদান "ফুল্লরা" চিত্রে নাম ভূমিকায় শ্রীমতী শিশুবালা। ছবিখানার পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

নীতীন বসু পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের "দেশের মাটি" চিত্রের একটি দৃশ্য।

পার্টী শেষ হ'য়েছে সাড়ে দশটা আন্দাজ। ধর এগারোটার সময় সতীদেবী ফিরে এলো। প্রথমেই হারটা কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌বে তাই ভাবতে লাগলো। আরও দশ মিনিট কেটে গেল। ঘড়ির মধ্যে লুকিয়ে রাখবার সঙ্কল্প করে' ঘড়ীটা নামানো হ'ল—ধর—ঐ টুলটার উপর উঠে। ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে গেল। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ডায়াল (dial) খুলে ফেলে কলের সঙ্গে হারটাকে জড়িয়ে রাখা হ'লো। ডায়ালটা বসানো হ'লো বটে, কিন্তু আনাড়ীর হাতে কাঁটাদু'টো ঠিক বসলো না—একটু লক্ষ্য কম্‌লেই তা' বুঝতে পারতে। সুতরাং—এই সমস্ত ৃবেচনা করে' আমার স্থির করতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না যে, হারটা ঐ ঘড়ীটার মধ্যেই আছে। ১২ই তারিখে কি বার গিয়েছে মনে আছে? রবিবার। মিসেস্ ঘোষের পার্টি ছিল ঐ দিন রাত্তিরে। তা' হ'লে পার্টিতে যাবার আগে ঘড়ীতে দম দেওয়া হ'য়েছিল নিশ্চয় বুঝেছ ?"

অবিনাশ—"এইবার ?"

আমি—"এইবার আমাদের অপেক্ষা করতে হ'বে "আই-পি-সি-এর" এজেন্টের জন্য। এই ঘরে সব আগে আসবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমাদের এ ঘর ছেড়ে অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকতে হ'বে !"

এই সময়ে সিড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আমরা টর্চ্চ নিবিয়ে বাইরে যাব, এমন সময়ে দালানের আলো জ্বলে উঠলো। পায়ের শব্দ দালানে—সুতরাং বাইরে বেরুলেই আগন্তুকের নজরে পড়্‌বো। তাড়াতাড়ি একটা বড় দেরাজওয়ালা সিন্দুকের পিছনে গিয়ে আমরা লুকিয়ে পড়লুম। এত সপ্রতিভভাবে আলো জ্বেলে এদিকে আসে কে !

ঘরের মধ্যে ভারী জুতোর শব্দ হ'ল। মোটা আওয়াজে হিন্দুস্থান ভাষায় কে বল্লে—"কোন হ্যায় হিঁয়া ?"

আরে, এ যে পাহারাওয়ালা দু'টো ! বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেলুম। হঠাৎ এখানে এদের আবির্ভাব হ'লো কি করে ?

ফের প্রশ্ন হ'ল—"কোন্ হ্যায় হিঁয়া ?"

পরক্ষণেই আলো জ্বলে' উঠলো। কে একজন বল্লে—"ইধার আয়া—দো আদ্‌মী—এ হি ঘরমে ঘুসা হোগা।"

শব্দে বুঝলুম Search (তল্লাস) আরম্ভ হ'য়েছে। অবিনাশ আমার কানে কানে বল্লে—"বাইরে বেরিয়ে দেব নাকি ফটিয়ে ? তিনটে লোক বইতো নয় !

আমি তার গা টিপে তাকে চুপ করতে বল্লুম—পাহারাওয়ালাটা সিন্দুকটার দিকে আসছে—পিছন দিকে উঁকি মারলেই আমাদের দেখতে পাবে ! সব গোলমাল হ'য়ে গেল ! কিন্তু তৃতীয় লোকটা কে ? তার কথা শুনে মনে হ'লো, সে যেন সন্ধান দিয়ে পাহারাওয়ালা দুটোকে ডেকে এনেছে। তবে কি আমরা এখানে ঢোকবার সময় কারো নজরে পড়ে গেছি ?

"জুঁহুয়ায়! ইধর্ হায় হো আদ্মী! এই! নিকাল আও!"—পাহারাওয়ালা সাহেব উঁকি মেরেছেন!

আস্তে আস্তে বাইরে এলুম। অবিনাশও বিদ্যাসাগর, মহাশয়ের 'সুবোধ ও সুশীল' বালকের মতন আমার পিছন পিছন বেরিয়ে এলো।

দ্বিতীয় পাহারাওয়ালাটী একটু দূরে ছিল। আমাদের দেখে বলে' উঠলো—"আরে! এতো বাবুলোগ হ্যায়! আপলোগ এৎনা রাতমে হিঁয়া ক্যা করতে হো, জী?"

দরজার কাছে কোট্-প্যান্টালুন পরা একটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুঝলুম তিনিই informant (সংবাদদাতা)। তিনি বলে' উঠলেন—"এমন 'বাবুলোগ' আমার ঢের দেখা আছে। রাত্তির বেলা—খালি বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে কেন এসেছেন এরা—এ আবার জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে হ'বে না কি? থানায় নিয়ে চল, সেখানে জবাব দেবেন এরা।"

দেখলুম অবিনাশের বুকখানা ফুলে উঠছে। চোখ টিপে দিলুম। বল্লুম—"সেই ভাল। চলো থানামে—হুয়া যা'কে যো বাল্না ও বোলেগা।"

কোট-প্যান্ট-পরা ভদ্রলোকটী বলে' উঠলেন—"আরে পাহারাওয়ালা সাহেব, আগে দেখ—বন্দুক-ছোরা-ছুরি, কি আছে কাছে।"

পাহারাওয়ালারা তল্লাস করতেই আমাদের কাছ থেকে দুটো রিভলভার পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল হারছড়াটা। মাল শুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার করে' পাহারাওয়ালারা মহাখুসী। অবিনাশ বল্লে—দেখো দেখ। এ যে নির্ঘাত প্যাচ।"

আমি কোন জবাব না দিয়ে বল্লুম—

আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হ'তে লাগলো। একজন পাহারাওয়ালা বাড়ীতে পাহারায় রইলো। আর একজন আমাদের নিয়ে চল্লো। ভদ্রলোকটীকেও সঙ্গে নিয়ে চল্লো। তিনি প্রথমে রাজী হ'ন্ নি। পাহারাওয়ালার পীড়াপীড়িতে তাঁকে রাজী হ'তে হ'ল। কারণ, তাঁকে 'গাওয়া' দিতে হ'বে। আমি পাহারাওয়ালাটীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ইনি কে?"

পাহারাওয়ালা গম্ভীরভাবে বল্লে—"নগীজমে রহেনেওয়ালা হ্যায়। আওর কোন্? কুছ জরুরৎ হ্যায় জী মহারাজ?"

চার জনে বাড়ীর বাইরে এলুম। রাস্তা দিয়ে একখানা ট্যাক্সী যাচ্ছিল। পাহারাওয়ালা ট্যাক্সীটাকে দাঁড় করিয়ে উঠে বস্‌লো, আমরাও উঠলুম। পাহারাওয়ালার নির্দ্দেশমত ট্যাক্সী থানার দিকে চল্লো। খানিকপরে বাঁদিকে এক গলির মধ্যে গাড়ীখানা ঢুকলো; এই গলির মোড়েই থানা। কিছুদূর গিয়েই আমাদের গাড়ী থামাকে থামতে হ'লো—সামনে আর একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ড্রাইভার সামনের গাড়ার ড্রাইভারকে গাড়ী সরাতে বল্লে। সে কানই দেয় না কোন কথায়। পাহারাওয়ালা হেঁকে বল্লে—"এই! সড়ক্ ছোড়কে!" কে কার কথা শোনে! তখন পাহারাওয়ালা গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। ড্রাইভারকে ডেকে বল্লে—"গাড়ী রাখকে হিঁয়া নিদ্ যাতে হো। চালাও—পিছুমে পুলিশকা গাড়ী হ্যায়।"

ড্রাইভার বলে উঠলো—"ও! কসুর হো গিয়া। হমারা ফেয়ার্ (Fare) নগীজমে গিয়া, উস্‌লিয়ে মন্ থাড়ে হু।" সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে।

কোটপ্যান্টপরা ভদ্রলোকটী বলে' উঠলেন—"হু হু! পাহারাওয়ালার একটী হুম্‌কীতে কাজ হ'য়ে গেল। মনে করছিলুম এখন আর যাবো না; দরকার হয় পরে যাব। তা', আমার আর যাবার দরকার হ'বে না। কাজ তো হ'য়ে গেল। ড্রাইভার—এই ড্রাইভার, গাড়ী চালাও। হু হু—পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ী, বাবা! ঐ পাগড়ী বড় দামী!"

এই সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। সামনের গাড়ার ড্রাইভার হঠাৎ পাহারাওয়ালার মাথা থেকে পাগড়ীটা ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমাদের

হাল-বাংলা

বিকৃতি ও অসঙ্গতি আধুনিক প্রত্যেক সমাজেই আছে—প্রতিদিনের অভ্যাস ও পরিচয়ের দরুণ সেগুলি আমাদের চোখে পড়ে না। হাল-বাংলায় আধুনিক বাঙ্গালা সমাজের সেই বিকৃত ও অসঙ্গত রূপ অজস্র হাসির উপাদানের সঙ্গে পরিবেশন করা হইয়াছে। ছবি দেখিতে দেখিতে আপনি হাসিবেন, কিন্তু নির্জ্জন অবসরে সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনাকে চিন্তা করিতে হইবে।

এই হিসাবে হাল-বাংলা উগ্র ব্যঙ্গ নয়, সমাজের অতি করুণ আলেখ্য মাত্র।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত—

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের

প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র

কোট্‌প্যাণ্টপরা ভদ্রলোকটী তড়াক্ করে' গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে'—"চোর—চোর—ডাকাত—ডাকাত—খুন করলে—মেরে ফেল্লে" বলে' চীৎকার করতে করতে ছুটলেন। চারিদিক থেকে লোক ছুটে এসে আমাদের গাড়ীর চারিদিকে মস্ত বড় একটা ভীড় গড়ে তুললে। ভীড় হটিয়ে আমাদের গাড়ীর পথ খোলসা করতে বেশ কিছু সময় লাগলো। তখন সামনের গাড়ী অদৃশ্য হ'য়ে গেছে—ভদ্রলোকটীরও কোন সন্ধান নেই।

অবিনাশ নামতে যাচ্ছিল; বাধা দিয়ে বল্লুম—"নিষ্প্রয়োজন, বন্ধু, সে সরেছে।"

পাহারাওয়ালা ভদ্রলোকটীর উদ্দেশ্যে উৎকট গালি দিতে দিতে চল্লো। থানায় পৌঁছে পাহারাওয়ালা ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে সব কথা বল্লে, আমার হার পাওয়ার কথা পর্য্যন্ত! ইন্‌স্পেক্টর বল্লেন—"ব্যাপার কিছুই তো বুঝলুম না। আপনারা এত রাত্রিতে ও বাড়ীতে কি করছিলেন? কে আপনারা?"

আমি আমার কার্ড একখানা তাঁর হাতে দিলুম। ইন্‌স্পেক্টর আমার করমর্দ্দন করে' বলে উঠলেন—"ও! আপনিই হরেন বাবু—প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্? আপার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকলেও, আপনার নাম আমরা শুনেছি। আপনি কি এই কেসের তদন্ত করবেন নাকি?"

আমি বল্লুম—"বড় interesting (কৌতুহলোদ্দীপক) কেস্। তাই একটু দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'লো। আপনাদের বিরক্ত না করে' লুকিয়ে দেখতে গিয়ে এই গোলযোগ। ভাগ্যে গাড়ী নিয়ে আসিনি। তা হ'লে গোলমাল আরও ঘোরালো হ'য়ে উঠতো।"

ইন্‌স্পেক্টর—"মাফ করবেন—কিছু মনে না করেন, তো, আপনার কোন identification"—

আমি—"ও! নিশ্চয়! কিন্তু—তাইতো! —বাড়ী না গেলে তো—"

অবিনাশ বাধা দিয়ে বলে উঠলো—"তা' কেন? তোমার লাইসেন্স্ খানা তো আমার কাছে রয়েছে!"

তবে নাকি অবিনাশ শুধু ঘুষীবাজ! বলে উঠ্‌লুম—"Thank you! তাওতো বটে!"

আমার identification হ'লো। ইন্‌স্পেক্টর বল্লেন—"তাইতো! বড় কষ্ট পেতে হ'য়েছে আপনাদের।" তারপর পাহারাওয়ালাকে বল্লেন—"রিভল্‌ভার তো মিলা। ও হার কাঁহা।"

তখন পাহারাওয়ালা রাস্তায় তার পাগড়ী রাহাজানীর কথা বল্লে। পাগড়ীর মধ্যে সে হার ছড়াটা রেখেছিল; পাগড়ীর সঙ্গে হারও গিয়েছে! ইন্‌স্পেক্টর শুনে তো তেলে বেগুনে জ্বলে' উঠলেন! পাহারাওয়ালাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে আমাদের লক্ষ্য করে' বল্লেন—

"যাক্। আপনাদের কষ্ট দিয়ে কোন লাভ নেই। তবে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। হারছড়াটা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?"

আমি—"ঘড়ীর মধ্যে।"

ইন্‌স্পেক্টর একটু চিন্তা করে' বল্লেন—"সেটা পাওয়া গেলে অনেক সুবিধা হ'তো এই কেসের পক্ষে। আচ্ছা, দেখা যাক্! তা'—আপনাদের আর কষ্ট দেব না। আমাকে একটু চিন্তা করতে হ'বে এই হার-চুরীর ব্যপারে। আপনারা যেতে পারেন।"

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একখানা ট্যাক্সী ডাকলুম। ট্যাক্সীতে উঠ্‌তে যাচ্ছি, এমনি সময়ে একজন পাহারাওয়ালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"আপ হরেন-বাবু হ্যায়?"

আমি বল্লুম—"হ্যা জরুর!"

পাহারাওয়ালা—"কোই বাঙ্গালী সাব একঠো চিট্‌ঠি দেকে বোলা—নিস্পেক্টর

গোধূলি

শ্রীসুনীলকুমার দাশগুপ্ত

পাহাড়ের ধারে ধূ ধূ করে মাঠ—
আছে মেঘ তারি কোলে,
(যেন) সারা দেহখানি জড়ায়ে র'য়েছে
ঘন-কুন্তল দলে।
মেঘের বুকেতে এলায়ে প'ড়েছে
রক্ত-রঙীন্-রবি,
স্বপন-লোকের স্বপন-শিল্পী
আঁকিছে গোধূলি ছবি।
পল্লীর নারী চলে সারি সারি
স-লাজ চরণ ফেলি',
বক্ষে বহিছে যৌবনের ঢেউ—
চাহিছে নয়ন মেলি'।
জলভরা-ঘড়া লইয়া মাথায়
আপন আলয়ে চলে,
মৃদু মৃদু বাজে চরণ-নূপুর—
রুণু ঝুনু বোল্ বলে।
ফিরিছে রাখাল আপনার গেহে—
পাখীরা ফিরিছে নীড়ে,
সাঁঝের চাঁদিমা দাঁড়ায়ে দুয়ারে
কহিছে সবারে ধীরে—
"—হ'য়েছে যে শেষ দিবসের খেলা
রবি যাবে তাই স'রে,
সারানিশি আমি রহিব জাগিয়া
আপনার খেলা ঘরে।
আকাশের তারা হবে মোর সাথী
'জোনাকীও রবে জাগি'
গাহিবে ঝিল্লি এ-দিকে ও-দিকে
'তোঁদেরি সুখের লাগি'।—"
ধীরে ধীরে রবি ঘুমায়ে পড়িল
মেঘ-বঁধুয়ার বুকে,
গোধূলি লগনে বন্ধুর কোলে
মিশাইয়ে গেল সুখে

——:•:——

সাব্‌কো সাথ বাৎচিৎ কর্‌কে আপ্‌কে লট্‌টু-নেকো বহৎ এইঠো আপ্‌কো দেনা।"

আমি—"ও চিঠঠি কাঁহা?"

পাহারাওয়ালা আমাকে একখানা চিঠি দিলে। তখনই সেটা খুলে ফেলে পড়লুম—
"হরেন বাবু, নমস্কার। আমরাও ঘরটা তল্লাস করেছিলুম—হারটার সন্ধান করতে পারি নি। আপনি খুঁজে বার করে দেওয়ার দরুণ আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হ'লো—মাফ্ করবেন। আপনি শত্রু হ'লেও আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করে' থাকি। তাই বলছি, সতীদেবীর মৃত্যুর জন্য আমরা মোটে দায়ী নই। তবে, হারছড়াটা আমরা নিয়েছি। এটা আমরা ছ'মাস আমাদের কাছে রাখবো—আপনাকে কথা দিচ্ছি। তারপর সুইডেন (Sweden) চালান করবো। পারেন তো উদ্ধার করবেন *। ইতি—প্রেসিডেন্ট—আই-পি-সি এ।"

অবিনাশও আমার কাঁধের পাশ দিয়ে উকি মেরে চিঠিখানা পড়েছিল। বলে উঠলে—"বাহবা! Three cheers for—"

বাধা দিয়ে বল্লুম—"থাক্।"

(৩)

সেদিন রাত্রিতে অবিনাশ নিজেও ঘুমোল না, আমাকেও ঘুমোতে দিলে না।

অনেক বাদ বিতর্কের পর স্থির হ'লো, পরের দিন সকালে আমরা যাব বঁড়িশা-বেহালার সখের বাজারে। সতীদেবীর পূর্ব্ব-জীবনের সন্ধান নেওয়া সকলের আগে দরকার। বিশ্রামের জন্যে উঠবো মনে করছি এমন সময় অবিনাশ বল্লে—"আচ্ছা হরেন, পাহারাওয়ালার পাগড়ীর মধ্যে হার আছে, একথা ড্রাইভারটা জানলে কি করে?"

* কি রকমে হারছড়াটা উদ্ধার হ'য়েছিল জানতে হ'লে "হীরের হার" গল্প পড়তে অনুরোধ করি

আমি—"কেন? কোট-প্যান্ট পরা মহাপ্রভু তো তাকে hint (ইঙ্গিত) দিয়ে-ছিলেন। খুব ধড়ীবাজ এই 'আই-পি-সি এ'র প্রেসিডেন্ট। তোমার মনে পড়ে?—সে বলেছিল 'এখন আর যাব না; দরকার হয় পড়ে যাব।...ঐ পাগড়ী বড় দামী।' আর যায় কোথা?—পাগড়ীর উপর আক্রমণ। আর, আমাদের বিপদে ফেলে কাজ সারবার মতলব খুব অল্পসময়ের মধ্যে স্থির হ'লেও কেমন সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল, তা' আমরা বেশ বুঝেছি—কেমন? এখন বল দেখি কত বড় ধড়ীবাজ এই প্রেসিডেন্ট? তবে সে যে বলেছে, যে সতীদেবীর হত্যা সম্বন্ধে তার কোন হাত নেই—একথা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই। আপাততঃ এদিকে অনুসন্ধান চলুক; তারপর 'আই-পি সি-এ'র দিকটা উল্‌টে দেখবার চেষ্টা করবো। সতীদেবীর পূর্ব্বজীবনের সন্ধান না পেলে তদন্তের সুবিধা হ'বে বলে মনে হয় না।"

পরের দিন সকাল বেলা বঁড়িশা-বেহালায় সখের বাজারে গিয়ে রামজীবন বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। তার কাছ থেকে বিশেষ কিছু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলুম না। তিনি সতীদেবীকেও জানেন না অথবা যে চিঠি-লেখে তাকেও চেনেন না। একটা লোক্ তাঁর সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে, যে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে যত চিঠি তাঁর কাছে আসবে, তিনি সেগুলি তাঁকে অর্থাৎ সেই লোকটীকে দেবেন। আর সেজন্য মাসিক পাঁচ টাকা করে' তিনি পাবেন। লোকটীকে তিনি চেনেন না, অথবা সে কোথায় থাকে তাও তিনি জানেন না।

অবিনাশ বড়ই দমে' গেল। বল্লে—"তাইতো, হরেন, এখানে তো কোন সুবিধাই হ'লো না।"

আমি বল্লুম—"সুবিধা কিছু হ'য়েছে বই কি, বন্ধু। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রামজীবনের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যায় যখন, তখন এই ভদ্রলোকই সতীদেবীর স্বামী। রামজীবনের মারফৎ চিঠির উল্লেখ সতীদেবীর ঘরে যে চিঠি পেয়েছিলুম তা'তে আছে। কাজেই 'মনোরঞ্জন' নামে কোন লোকের অস্তিত্ব আছে নিশ্চয়—এবং সে এই দেশেই আছে। আর, এখন বোধ হয় বেশ বুঝছো, যে সতীদেবীর আসল নাম 'স্বর্ণলতা'?"

রামজীবনকে জিজ্ঞাসা করে যে ভদ্রলোক চিঠি নিয়ে যায়, তাঁর মোটামুটি একটা চেহারার বর্ণনা পেলুম। লোকটী দোহারা উজ্জল শ্যামবর্ণ, লম্বা; মাথার চুল কুচকুচে কালো ও কোঁকড়া, চোখ দু'টী খুব কালো, বড় এবং উজ্জল। ভদ্রলোকটী পানের কিছু বেশী ভক্ত; সুতরাং দাঁতগুলি তাঁর বেশ সমানভাবে সাজান হ'লেও একটু লালচে ধরণের। আরও জানতে পারলুম, যে রামজীবনের সঙ্গে মনোরঞ্জনের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। পুলিন দত্ত চৌধুরী নামক কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। রামজীবন মনোরঞ্জনের হ'য়ে যে কাজ করে' থাকে পুলিন তা' জানে না বটে, কিন্তু মনোরঞ্জন যে সেখানে আসে তা' তার জানা আছে। পুলিনের ঠিকানা নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম।

পুলিন লোকটি খুব ভদ্র। সে বল্লে মনোরঞ্জন তার ছেলেবেলার বন্ধু। এম, এ, পাশ করে সে চাকরী নিয়ে লক্ষ্ণৌ যায়; সঙ্গে নিয়ে যায় তার স্ত্রী'কে। সেখানে তার সঙ্গে কি নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায়, তার অনুমতি না নিয়েই তার স্ত্রী' এখানে চলে আসে। তারপর ছদ্মনাম নিয়ে থিয়েটার, বায়স্কোপ করতে থাকে। কিছুদিন আগে হঠাৎ মনোরঞ্জন আমার সঙ্গে এসে দেখা করে। সেই থেকে সে মাঝে মাঝে এখনও এসে থাকে। তার নিবাস কোথায়

হ'য়েছিল জিজ্ঞাসা করায়, পুলিন বল্লে কল্‌কাতা বাগবাজারের নবগোপাল ঘোষালের মেয়েকে মনোরঞ্জন বিয়ে করেছিল। ঘোষালেরা ওখানকার পুরানো বাসিন্দা—কাজেই তাদের নাম করলেই সকলে চেনে। আমরা উঠবো উঠবো মনে কচ্ছি, এমন সময় পুলিন জিজ্ঞাসা করলে—"আপনারা মনোরঞ্জনের সম্বন্ধে এত খোঁজ নিচ্ছেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

আমি হেসে বল্লুম—"খুব পারেন। আমার এক বন্ধুর একটী মেয়ে আছে। শুনলুম, মনোরঞ্জনবাবু আবার বিয়ে করবেন। তাই জন্যেই এত খোঁজ নেওয়া। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এখন, ভদ্রলোকটী দেখতে কি রকম জানতে পারলে বড় সুবিধা হ'তো। তা' যাক্, তার বাড়ীর ঠিকানাটা ঘটকের কাছে আছে—সুবিধা মত দেখলেই হ'বে।"

পুলিন বলে' উঠলো—"আপনাকে এখনই দেখাতে পারি। দাঁড়ান।" এই বলে সে একখানা ফটো নিয়ে এলো। ফটোখানা কিছুদিন আগেকার। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, লক্ষ্ণৌ সহরে চাকরী নিয়ে যাবার ঠিক একমাস পরে এই ফটোখানা সে পুলিনকে পাঠিয়ে দেয়। ফটোর এককোণে লেখা আছে দেখলুম—"Ever yours M. Banerji", 'এম্, ব্যানার্জ্জী'—তখনই হরিদাসের বইয়ের কথা মনে পড়ে' গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দেখলুম—সই দুটো বেশ চমৎকার মিলে যায়। অবিনাশ হঠাৎ এই সময়ে বলে উঠলো—"ঠিক্ হ'য়েছে।" কি যে তার 'ঠিক হ'য়েছে' তা' বুঝতে আমার একটুও দেরী হ'ল না। বুঝলুম, সেও সইদুটোর সামঞ্জস্য ধরতে পেরেছে। কাজেই বাধা দিয়ে বল্লুম—"হাঁ। খুব সুবিধা হ'লো ফটোখানা পেয়ে। ঠিকই হ'য়েছে বটে। তা' হ'লে, অবিনাশ, আপাততঃ ওঠা যাক্ চল। ফটোখানা আমার সেই বন্ধুটীকে দেখাতে পারলে বড় ভাল হ'তো। তা'—এখানি নিয়ে যাওয়া তো সম্ভব হ'বে না।"

পুলিন বল্লে—"কেন হ'বে না ? আমার ও রকম ফটো আরও দু'খানা আছে। দেখছেন না—ওটা এতদিন বাধান হ'য় নি ? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন। তা'—মেয়ের বাপ কোথায় থাকেন ?"

মেয়ের বাপ—অর্থাৎ মনোরঞ্জনের ভাবী শ্বশুরের যথা-সম্ভব মনগড়া পরিচয়াদি দিয়ে আমরা পুলিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলুম। পথে অবিনাশ বল্লে—"এইবার কি করতে চাও ?"

আমি বল্লুম—"এম্ ব্যানার্জ্জি একজন প্রফেসার—এবং বড় প্রফেসার। কাজেই একবার লক্ষ্ণৌএ খোঁজ নিতে হ'বে, এই 'এম্, ব্যানার্জ্জীর' খবর কি। আমাদের প্রাণকুমার দত্ত এখন ওখানকার অফিসার। আজই একটা তার করতে হ'বে তা'কে।"

কথামত তার করা হ'লো। যথাসময়ে তারের উত্তর এলো। প্রাণকুমার বলছে—"এম্, ব্যানার্জ্জী গত বৎসরে ট্রেণ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। লাস আবিষ্কৃত হয় নি। তার জিনিষ পত্র নিলামে বিক্রয় হ'য়ে যায়। সে জিনিষপত্রের মধ্যে কোন সুটকেস্ ছিল না।"

অবিনাশ বল্লে—সুটকেসটা তো হরিদাস কিনেছে—এ জেনেও সুটকেসের খবর নিতে গেলে কেন ?"

হেসে বল্লুম—"যে জিনিষগুলো বিক্রয় হয়েছে তার মধ্যে সুটকেস্ ছিল না দেখছ। তবে হরিদাস বইশুদ্ধ সুটকেস্টা পেলে কোথা থেকে ?"

অবিনাশ অবাক্ হ'য়ে বল্লে—"তবে কি তুমি বলতে চাও, যে হরিদাস চোর ?"

আমি ড্রয়ার থেকে মনোরঞ্জনের ছবিখানা বার করলুম। তারপর মাথায় চুলের উপর শাদা রং লাগিয়ে দিয়ে এবং মুখে দাড়ি-গোঁফ এঁকে দিয়ে বল্লুম—"বল দেখি এ কে ?"

অবিনাশ খানিকটা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো। তারপর বলে উঠলো—"আশ্চর্য্য ! এতো হরিদাস !"

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ। এই 'হরিদাস', আবার এই 'মনোরঞ্জন'। সেদিন তার কথাবার্ত্তায় বুঝেছিলুম যে সে নিরক্ষর শিকটার মাত্র নয়। শেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী সেদিন ঝাড়বার জন্যে বার করা হয়নি, পড়বার জন্যেই বার করা হয়েছিল। এইবার আমাদের একবার হরিদাসের সঙ্গে দেখা করতে হ'বে। আর স্থির করতে হ'বে, যে হরিদাস ওরফে মনোরঞ্জন, তার পবিত্র বংশে যে কালী লেগেছে তা এতদিন পরে মুছে ফেলেছে কি না।"

সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিলো। খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা সাড়ে বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা আমার গাড়ীতে হরিদাসের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম। সেখানে পৌঁছে খবর নিয়ে জানলুম, হরিদাস উপরে তার ঘরে আছে। সে বাইরে গিয়েছিল—ঘণ্টাখানেক আগে সে ফিরে এসেছে। আর, সেই যে সে উপরে উঠেছে, আর নীচে নেমে আসে নি।

আস্তে আস্তে উপরে উঠে দরজায় ঘা দিলুম। কোন সাড়া পেলুম না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' আবার ঘা দিলুম। তখনও কোন সাড়া নেই। দরজা ঠেলতে খুলে গেল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম। দেখি—হরিদাস তক্তাপোষের উপরে শুয়ে আছে। একটা হাত নীচে ঝুলে পড়েছে, আর ঠিক তার তলায় পড়ে রয়েছে একটা খালি শিশি। নাড়ী অনুভব করে' বুঝলুম হরিদাস ইহজগতের সুখ-দুঃখ, সম্মান-অসম্মান, লজ্জা, ভয় এসবের বাইরে চলে গেছে ! তার বুকের উপরে একখানা মোড়া খাম রয়েছে,

বড়দিনের
বড় আসরে
নগরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ
দেবদত্ত ফিল্মসের
অতুলনীয় চিত্রকথা
গ্রহেরফের
মনে রাখবার
মুগ্ধ হবার
মুখ বদলাবার
মত ছবি
গ্রহের ফের
গল্পের নূতনত্বে
অভিনয়ের উৎকর্ষে
পরিচালনার বৈশিষ্ট্যে
বর্ত্তমানের
পরম উপভোগ্য
চিত্রসৃষ্টি
রূপবাণী
চিত্রগৃহে..
সগৌরবে চলিতেছে
—ঃ একমাত্র চিত্র-পরিবেশক ঃ—
প্রাইমা ফিলমস. লিঃ

তার উপরে শিরোণাম লেখা—"ডাঃ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

চিঠিখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে তার মুখ পর্য্যন্ত একখানা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলুম। লোকটী যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাচ্ছে। এবং আগে এই ঘরে বসে' এর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছি। আজ এ এখানে স্থূল শরীরে উপস্থিত নেই—কিন্তু এর সূক্ষ্ম শরীরের সত্তা বেশ অনুভব কচ্ছিলুম।

পুলিসে খবর পাঠিয়ে দিলুম। আর, পুলিস আসবার আগে 'হরিদাস' ওরফে মনোরঞ্জন বাবু'র চিঠিখানা পড়ে নিলুম। মনোরঞ্জন লিখেছে—

"প্রিয় হরেনবাবু,

'আমার নমস্কার জানবেন। যখন এই চিঠিখানা আপনার নজরে পড়বে, তখন আমি হয়তো অনেক দূরে চলে যা'ব। তবে আমি জানি, আপনি আসবেন—আজই আসবেন। সেদিন আমার সঙ্গে কথা কয়ে' আপনার যে সন্দেহের উদয় হ'য়েছিল, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম। আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার বাড়ীর উপরে একটু নজর রাখলুম। দেখলুম, আপনি পুলিস দত্ত চৌধুরীর সন্ধান পর্য্যন্ত করেছেন। আপনারা সখের বাজার থেকে চলে' আসবার পর আমি পুলিসের সঙ্গে দেখা করলুম। তার ফলে বুঝলুম, যে আপনারা অনুগ্রহ করে' নিশ্চয় এদিকে আসবেন। কাজেই, আপনাদের সঙ্গে দেখা হ'বার অপেক্ষায় না থেকে প্রিক্রিক এ্যাসিডের সাহায্যে সরে পড়লুম। জীবিত সরে যেতে পারতুম, কিন্তু সব হারিয়ে বেঁচে থাকবার কোন দরকারই মনে করলুম না। আর, আজ এই যে আমার মৃত্যু—এতো আমি তৃতীয়বার মরলুম। আমার মৃত্যু হ'য়েছে অনেকদিন আগে রেল-দুর্ঘটনায়—সেই আমার লোকতঃ মৃত্যু। আর ধর্ম্মতঃ মৃত্যু হ'য়েছে আমার তারও আগে সেইদিন, যেদিন আমার ধর্ম্মপত্নী 'স্বর্ণলতা' আমাকে ত্যাগ করে' এসে পাপের পথ বেছে নিলে। তারপর জীবন্ত-মরা অবস্থায় এতকাল ছিলুম শুধু একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়েছে,—আমি নিজের অস্তিত্ব একেবারে মুছে ফেল্লুম।

স্বর্ণলতা অর্থাৎ সতী দেবীকে আমিই খুন করেছি। কেন করেছি শুনবেন? আমার মতে তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই। কেন সে আমার সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল তা স্পষ্ট করে' এখন বলে' কোন লাভ নেই। তারপর সে যে পথে ছুটে গিয়েছিল, তাও আপনারা জানেন। আমি বার বার তাকে নিষেধ করেছিলুম, সে শুন্‌লো না। সমুদ্র ফেলে রেখে সে গোষ্পদের সন্ধানে যে কেন গিয়েছিল, তা সে নিজেই জানতো। আমার মৃত্যুর খবর যখন এখানে পৌঁছুলো, তখন এরা আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। আমি কিন্তু রেল-দুর্ঘটনায় মরিনি, তা' বোধ হয় আপনাকে বলে দিতে হ'বে না। কিন্তু দারুণ আঘাতে মরার মত হ'য়ে পড়ায়, আমাকে আরও অনেক মৃতদেহের সঙ্গে একটা খানার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। জ্ঞান ফিরে পাবার প'র সেই মড়ার গাদা থেকে কোন রকমে বেরিয়ে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় নিই। সেখান থেকে আরোগ্যলাভ করে' যখন আমি বাইরের জগতে এলুম, তখন আমার নিজের চেহারা দেখে নিজেই চিন্‌তে পারলুম না। আমার চুলগুলো সাদা ধবধব কচ্ছে। লক্ষ্ণৌএ আমার বাসায় রামভজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। আর যারা দেখলে তারা চিন্‌লে না, কিন্তু রামভজনের চোখে ধূলো দিতে পারলুম না। সে চিনে ফেল্লে। আমার বেঁচে উঠবার সখ আর ছিল না। 'মরা' অবস্থায় দেখতে ইচ্ছে হ'লো স্বর্ণলতা কেমন আরামে আছে। রাম ভজনকে কিছু টাকাকড়ি দিয়ে, তাকে চুপ করে থাকতে বলে, শুধু আমার বড় আদরের বুককেসটী নিয়ে আমি এখানে চলে এলুম। তারপর কেমন করে' পদে পদে আমি স্বর্ণলতার অনুসরণ করেছি, কেমন করে আমার অস্তিত্বের পরিচয় দিয়েছি, সে বোধ হয় আপনারা বেশ বুঝতে পেরেছেন। আমি সেদিন কতকটা আপনাকে বলেছিলুম। আমার অস্তিত্বের পরিচয় পেয়ে স্বর্ণলতা একটু ভয় পেয়েছিল। আমি নিজকানে তার প্রণয়াস্পদের সঙ্গে প্রেমালাপ শুনেছি। রামজীবন বসুর সঙ্গে যে ব্যবস্থা করেছিলুম তাও আপনি জানেন। রামজীবনের কাছে সাহস করে' সে সন্ধান নিতে যায় নি। তার ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখতো মাত্র। শেষকালে তার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হ'য়ে উঠলো। অসংখ্য লোকের সঙ্গে তার আলাপ হ'তে লাগলো।

আমি প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ অনুসন্ধান করতে লাগলুম। শেষে 'পরপারে' নাটকের অভিনয়ে আমি সুযোগ দেখতে পেলুম। হত্যার দায়িত্বটা মানবেন্দ্রের উপরে সহজে চাপাতে পারা যাবে কিসে তা ঠিক করতে আমার দেরী হ'লো না। ঘটনার কয়েক দিন আগে থেকে আমি অসুস্থতার অজুহাতে ছুটী নিলুম। তারপর ঘটনার দিন থিয়েটারে গিয়ে আস্তে আস্তে অন্যের অলক্ষিতে একগাদা সিনের মধ্যে লুকিয়ে রইলুম। 'মহিম' ড্রয়ার থেকে পিস্তল বার করলে, আমার সাইলেন্সারে দেওয়া রিভলভারটীও আমি উঁচু করলুম। তারপর যা ঘটলো তা' আর আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হ'বে না। গোলমালের মধ্যে সরে পড়লুম—অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বাসায় বসে রইলুম আমার বুককেসের মধ্যে রিভলভারটী পাবেন। মানবেন্দ্র বাবুকে দোষী সাব্যস্ত করবার প্রয়াসটা অতি হীন ও কাপুরুষোচিত বলে আমার অনেক আগেই মনে হ'য়েছিল। আপনি এর তদন্ত না

নিমলাবাণা চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরে ইনি সুনাম অর্জন কোরেছেন। ইনি সকল রকম নৃত্য বিশেষ পারদর্শিনী ও সুগায়িকা হিসাবেও এর যথেষ্ট নাম আছে।

নিউ থিয়েটার্সের "দেশের মাটী"র একটি চমৎকার দৃশ্য। পরিচালক নীতীন বসু

চাতক

শ্রীভক্তি চট্টোপাধ্যায়

মরুভূমি বুকে জাগে তৃষার বাণী
শুনিয়া আকুলি কাঁদে সাগর রাণী,
দল বেধে চলে মেঘ-পরিরা সাথে
সাহারার বুকচিরা তৃষা মিটাতে।
আমি কবি বসে আছি বুকে সাহারা
এ পথ বাহিয়া আসে বুঝি কাহারা।
চোখে হাসে কালমেঘ বাসে নীলাকাশ
হাঁ করি ক্ষণিক থাকি হইনু নিরাশ।
শুধিল না কেহ মোর প্রাণের কথা
মরমে লুকাল ধীরে মরম ব্যথা।

নামলেও আমি মানবেন্দ্র বাবুর খালাস পাবার ব্যবস্থা করে দিতুম। আমার জীবনের কোন দাম নেই; বেচে থেকেও আমি চিরকাল মরেই থাকতুম। তার জন্যে একটা সংসারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া আমার মতন লোকের উপযুক্ত কাজ নয়। এই চিঠি ও রিভলভার মানবেন্দ্রবাবুর নির্দ্দোষিতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট হ'বে নিশ্চয়। বইগুলি আপনি কিনতে চেয়েছিলেন, সে গুলি আপনিই নেবেন। যোগ্যতর লোকের হাতে সেগুলিকে আমি দিতে পারতুম না। আমার নিজের বংশের মুখে কালীর ছাপ লেগেছিল, নিজ-হাতে যদি তা মুছে ফেলে থাকি, তার জন্য নিজেকে আমি গৌরবান্বিত বলেই মনে করছি। হরেন বাবু, আমি কি হত্যাকারী? স্বামীর ঘর স্বর্ণলতা যেদিন ত্যাগ করেছিল, সেইদিন সে আত্মহত্যা করেছে। এতদিন যে স্বর্ণলতা, সতীদেবী নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে কায়া নয়, সে ছায়ামূর্ত্তি। ছায়ামূর্ত্তিকে অপসারিত করা হত্যা হ'তে পারে না।

আবার নমস্কার।

ইতি—শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।"

খেয়ালীর নববর্ষে

শ্রীইন্দিরা দেবী

বছর ঘুরিয়া আসিল, নগরীর এত আনন্দ কোলাহলে মন সাড়া দেয় না, মন গুমরিয়া মরে, এত দীপালোকের ভিতর, এত আলোর উজ্জ্বলতার ভিতর আমাদের গৃহ আলোহীন নিরন্ধ্র আঁধারে ভরা, আনন্দ কোলাহলের পরিবর্ত্তে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা চারিদিকে—মনে শান্তি নাই, দেহে শক্তি নাই, চক্ষে উৎসাহ ও প্রেরণার প্রভাত সূর্য্যের কিরণ ঝলসিয়া উঠে না—তবে কি আমরা মৃত! এ সমস্তই তো মৃতের লক্ষণ, সজীব আনন্দ আমাদের মনকে ব্যপ্ত করে নাই, দেহকে কর্ম্মের পথে চলিতে উৎসাহিত করে না—এ যে নির্জীবতার চিহ্ন!

অত্যাচার, অনাচার, অভাব, দুর্নাটন, দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা বেদনা, আশাভঙ্গ দারিদ্র্যতা ও নিরন্নতা আমাদের জীবনের পরম ভূষণ! উৎপীড়িতের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলের কাতর আহ্বান, অভাবের, অত্যাচারের, অনাচারের, নিরন্ধ্র আঁধারে আমাদের মণ প্রাণ দেহকে ক্লীব করিয়াছে, কাপুরুষ করিয়াছে, সমাজ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়াছে, জাতীয় জীবনকে হীন করিয়াছে।

এই তো' আমাদের পরিচয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত অবিচারের ও কুবিচারের ভিতরও আমরা তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে হাসিমুখে নগণ্য জীবন যাপন করিয়া চলিয়াছি, প্রত্যুত্তর দিবার জন্য কণ্ঠের জড়তাকে দূর করিবার চেষ্টা করি নাই, প্রতিবাদের জন্য একটিও অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে উঠে না—এমনি আমরা আমাদের মরণের পথে আপন ইচ্ছায় চলিয়াছি, যাহাদের, আমাদের পিছনে আসিবার সময় হইয়াছে তাহাদেরও এই ক্লীবত্বের ভিতর, এই জড়তার এই প্রাণহীনতার ভিতর এবং সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কুনীতির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছি।

আমরা মরিয়াছি, যাহারা আছে তাহারাও মরিবে, সমাজ মরিবে, দেশ মরিবে। আমাদের রক্ষা করিবে কে?

জীবন আমাদের দুর্ব্বহ, প্রাণ আমাদের দরিদ্র ও অভাবক্লিষ্ট। মেধা নাই, শক্তি নাই সাহস নাই উৎসাহ ও প্রেরণা নাই, প্রাণের ও জীবনের স্পন্দন নাই, তাই সমাজে এত অবিচার, অনাচার, কুবিচার, তাই এত বন্ধন—এত আশাভঙ্গের করুণ কাহিনী—তাই নারীর করুণ আর্ত্তনাদে পুরুষের কাল ঘুম ভাঙ্গেনা, অবিচারের অত্যাচারের অবিরাম স্রোত বহিয়া যায়, আমাদের পরিত্রাণ দিবার জন্য কেহ পাশে আসিয়া দাঁড়ায় না—নারী মরে অত্যাচারে ও সমাজের কুবিচারে, দুঃখী মরে দুঃখে, শিশু মরে অন্নহীনতায় ও অশিক্ষা ও কুশিক্ষায়—পুরুষ মরে ক্লীবতায় ও জড়তায়! দেশ ও জাতি এভাবে দ্রুতগতিতে মরণের পথে চলিয়াছে—এ মরণ-তরঙ্গ রোধিবে কে?

এ মরণ বাস্তবতার ভিতর, এই আশা-আনন্দহীন অবিচার, কুবিচারের ভিতর মরণের তাণ্ডব নৃত্যের ভিতর যুগগত কুসংস্কারের ও অন্ধ অবিচারের ভিতর পুঞ্জীভূত 'ব্যর্থতার ও কাতর ক্রন্দনের ভিতর 'এসো এসো হে মুরারী, কৃষ্ণ সুদর্শন ধারী'—

আশ্বাসের পাঞ্চজন্য বাজাইয়া এসো, এসো শান্তির তৃপ্তির ও আশার উত্তরীয় দিকে দিকে বিস্তার করিয়া এসো—এসো মুক্তির মিলনের ও জীবনের বাণী বহিয়া—এসো তুমি!

সমস্ত দেশ, সমগ্র জাতি তাহাদের নিষ্প্রভ আঁখি তোমার আসার পথে বিছাইয়া সাগ্রহে তোমার পথ চাহিয়া আছে।

মরণের অন্ধকারের ভিতর, জ্যোতিহীন জীবনের ভিতর, ছন্দহীন প্রাণের ভিতর তুমি এসো জীবনের অমৃত, আলো ও হাসিরূপে। তোমার মধুপরশে আমাদের যুগগত জড়তা, ক্লীবতা, প্রাণহীনতা দূর হোক, মোহ দূরে যাক। মুক্তি দাও! মুক্তি দাও—সমাজের কুবিচার ও অনাচার হতে, দেশের কুসংস্কার ও পরাধীনতা থেকে, ব্যক্তিগত জীবনের জড়তা থেকে।

অন্ধকার হইতে আলোকে তুমি লইয়া চল, মরণ পথ হইতে লইয়া যাও পরম জীবনের দিকে—পরাধীনতা হইতে লইয়া যাও চির মুক্তির দিকে, জড়তা, ক্লীবতা ও প্রাণহীনতা হইতে লইয়া যাও আনন্দের ও শৌর্য্যের দিকে।

সমস্ত জাতি করুণ কণ্ঠে আর্ত্তস্বরে পরিত্রাণের জন্য তোমায় ডাকে—ডাকে—কাণ পাতিয়া তাহাদের কাতর ক্রন্দন শোন, এসো, এসো। রথচক্রের নিষ্পেষণে যত আধি, ব্যধি, অপমান; অত্যাচার, জড়তা, প্রাণহীনতা ও পরাধীনতা ধূলি হয়ে যাক—এসো বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা তোমার রথচূড়ায় উড়াইয়া—এসো আনন্দের ও তৃপ্তির ও পরিত্রাণের দিব্য চক্ষু লইয়া—সজীবতার আনন্দের ও জীবণের বাণী বহিয়া তুমি এসো—তোমার সুদর্শন চক্রে সব বিদূরীত হোক, ক্লীবতা দূরে যাক, কাল নিদ্রা হইতে দেশ ও জাতিকে জাগাও—প্রাণ দাও, জীবন দাও, শক্তি দাও, উৎসাহ দাও, পরিত্রাণের চেষ্টা দাও।

এই অধঃপতিত, অবহেলিত জাতির জীবনে তেমনি করিয়া এসো—রুদ্ররূপে ধ্বংসরূপে মরণের মাঝে এসো জীবণের বেণু বাজাইয়া।

'তুমি এসো হে শিবসুন্দর!' তুমি এসো! সমগ্র জাতি তোমার আশাপথে চাহিয়া আছে।

বন্দেমাতরম্॥

—:(•):—

মনটি

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পাশের বাড়ীর ছোট্ট মেয়ে নাম রেখেছি মনটি
পাগল করে পাগল-করা স্নিগ্ধ নয়ন কোনটি
ছোট্ট পায়ের স্পর্শে
হৃদয় কাঁপে হর্ষে,
দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপে যেন নদীর পারের বনটি।

সাগর বুকের তরঙ্গ সে পাগলা হাওয়ায় চমকে
দোল দিয়ে যায় সবার প্রাণে—ক্ষণিক সে রয় থমকে।
আবার নাচন চললো
কেশের বাঁধন টললো
হাওয়ার বুকে নাচন লাগে—প্রাণ ডেকে কয় ঝমকে।

বয়সটা তার ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশের মধ্যে
রঙ ধরেছে আধফোটা কাপনলাগা পদ্মে
তার নয়নের সন্ধি
পরাণ করে বন্দী
মন ময়ূরী সে যেন রে—মোর এ হৃদয় সদ্মে।

হাসলে পরে টোল খেয়ে ছোট্ট মধুর গণ্ডে
ক্ষনিক চোখে পড়লে পরেই অনেক ব্যথাই খণ্ডে।
ধন্যা তুমি ধন্যা
কোন স্বরগের কন্যা
ঐ বাহুরই বাধন তলে প্রাণ ছোটে এক দণ্ডে।

অভিবাদন

মহিলা মহলের পক্ষ থেকে আমি সমস্ত মা, বোনেদের—'খেয়ালী'র নব বর্ষের শুভ-অভিবাদন জানাচ্ছি। খেয়ালী যেন অধিকতর ভাবে জাতির পথ প্রদর্শকের কাজ করতে পারে এবং বিশেষ করে নারী সমাজের উপকারে আসে এ প্রার্থনাও আমার রইল।

ইন্দিরা দেবী।

কালী ফিল্মসের
কালী ফিল্মস
আগামী চিত্রাবলী
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
আনন্দোজ্জ্বল কাহিনী
সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব
পরিচালক: সতু সেন
আলোক-চিত্রী: সুরেশ দাস
শব্দ-যন্ত্রী: জগদীশ বসু
সুর-শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
ভূমিকায়: জীবন, মনোরঞ্জন, ধীরাজ, ডাঃ হরেণ, জহর, মণি, সত্য, ললিত নবদ্বীপ, রাণীবালা, কুমারী রেখা, গীতা, রেবা, পদ্মা।
অবিলম্বে আসিতেছে
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিত্রের প্রতীক
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সামাজিক কাহিনী
চোখের বালি
পরিচালক: সতু সেন
আলোক-চিত্রী: ননী সান্যাল
শব্দ-যন্ত্রী: মধু শীল
ভূমিকায়: সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়, ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস।
চোখের বালি
আশা ও নিরাশার এক অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি!
বাঙলার নর-নারীর চির-আদরের ভক্তি-রসাত্মক আলেখ্য
শ্রীকৃষ্ণ
বাঙলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীর একত্র সমাবেশে।
চিত্রগুলি চিত্র-গৃহের সম্পদ বাড়াইবে।
'রীতেনের' নিকট হইতে ছবিগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করুন।
বড়দিনের ও নব-বর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!
*
কমলা টকিজের সামাজিক চিত্র-নিবেদন
রাজগী
শ্রেষ্ঠাংশে: মেনকা, ধীরাজ, শৈলেন, সত্য।
সকলের প্রশংসাধ্বনিতে সমগ্র নগরী মন্ত্রমুগ্ধ!
শ্রী
*
চলিতেছে
একমাত্র পরিবেশক
রীতেন এণ্ড কোং
৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন: ক্যাল ১০৯২-৯৩
গ্রাম: ফ্লিমসাইট

ও-বছর ও এ-বছর

(বিলাসী)

বাঙলার ফিল্ম-শিল্প আজ অগ্রগতির পথে। প্রত্যেক বছরের শেষে বিচার ক'রে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, ফিল্ম-শিল্প আমাদের দেশে প্রত্যেক বছরেই উন্নতির ধাপে ধাপে উঠছে। নিউ থিয়েটার্সের কথা বাদ দিলে অন্য ষ্টুডিও-গুলোর মধ্যে কালী ফিল্মস, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ও শ্রীভারতলক্ষ্মীর নাম যথাক্রমে উল্লেখ-যোগ্য। 'কোয়ালিটী'র দিক দিয়ে ছবির প্রভূত উন্নতি দেখা গেলেও 'কোয়ান্টিটি'-র দিকে কারুরই ভ্রূক্ষেপ নেই দেখা যাচ্ছে। গেল বছরে সবচেয়ে ভাল ছবি হ'য়েছে

বিমল রায়

নীতীন বসু

—নিউ থিয়েটার্সের "দিদি" (বাঙলা) ও "প্রেসিডেন্ট" (হিন্দি)। এরপরেই উল্লেখযোগ্য এন্‌-টির "মুক্তি" কালী ফিল্মসের "দস্তুরমত টকী", কমলা টকীজের "রাজগী", কালী ফিল্মসের "মুক্তিস্নান"। সবচেয়ে ভাল পরিচালক হিসাবে সম্মান পেতে পারেন নীতীন বসু (এন্‌-টি)। শব্দযন্ত্রী হিসাবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তিনজন মধু শীল (কালী), মুকুল বসু ও অতুল চ্যাটার্জ্জি (এন্‌-টি)। এরপরেই উল্লেখযোগ্য জগদীশ বসু (কালী) আলোকচিত্রী হিসাবে নীতীন বসু ও বিমল রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এরপরেই উল্লেখযোগ্য যতীন দাস ও প্রবোধ দাস (রাধা) ও ননী সান্যাল (কালী)। এ বছরে অভিনয়ে প্রথম সম্মান পেয়েছেন পুরুষদের মধ্যে শিশির ভাদুড়ী (দস্তুরমত টকী)
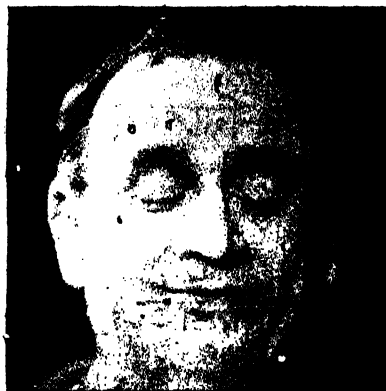
শিশির ভাদুড়ী

মেয়েদের মধ্যে কমলেশ কুমারী (প্রেসিডেন্ট) ও চন্দ্রাবতী (দিদি)। বহু বিজ্ঞাপিত ছবি হিসাবে "ইন্সপেক্টার" সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। এবং পরেই নাম করা যায় "শশিনাথে"র ও "রাজগীর"-র। নতুনত্বের জন্য কালী ফিল্মসের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কারণ, নিউজরীলের

চন্দ্রাবতী

এদেশে প্রবর্ত্তক এরাই ; ছবির শেষে বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের পরিকল্পনা এদেরই ; এদেশে পূর্ণ-দৈর্ঘ্য হাসির ছবি এরাই প্রথম তুলেছেন। এই ত' গেল এই বছরের মোটামুটি হিসাব নিকাশ। এখন আমরা আসছে বছরে কোন ষ্টুডিও থেকে শীগগিরই কী কী

কমলেশ কুমারী

ছবি মুক্তিলাভ কোরবে তারই একটা ফিরিস্তি দিচ্ছি।

নিউ থিয়েটার্স থেকে প্রথমেই মুক্তি পাবে দেবকী বসু পরিচালিত **বিদ্যাপতি**।

দেবকী বোস

এই ছবির হিন্দি সংস্করণ বোম্বাইয়ে মুক্তিলাভ কোরেছে। ছবিখানার ক্যামেরার কাজ ও শব্দযন্ত্রের কাজ কোরেছেন যথাক্রমে ইসুফ মুলজী ও লোকেন বসু। প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন—কাননবালা, ছায়া, পাহাড়ী, দুর্গাদাস, অমর মল্লিক, দেববালা প্রভৃতি।

কানন

এরপরেই মুক্তি পাবে উপেন গাঙ্গুলীর সমাজ-সমস্যা মূলক চিত্র **অভিজ্ঞান**।

পাহাড়ী সান্যাল

ছবিখানা পরিচালনা কোরছেন প্রফুল্ল রায়। আলোক-চিত্রী হ'চ্ছেন, বিমল রায়। শব্দযন্ত্রের কাজে আছেন বাণী দত্ত।

মলিনা

জীবন গাঙ্গুলী

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরছেন, বাঙলা সংস্করণে মলিনা, মেনকা, দেববালা,

সাইগল

জীবন গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক প্রভৃতি। এরপরেই বোধহয় আমরা দেখতে

উষা

প্রমথেশ বড়ুয়া

পাব নীতীন বসুর **দেশের মাটী**। এই ছবির আলোকচিত্রী পরিচালক স্বয়ং। শব্দযন্ত্রের কাজ কোর্‌ছেন মুকুল বসু। ভূমিকায় আছেন—সাইগাল, দুর্গাদাস, ভানু ব্যানার্জ্জি, উমা, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি। এ ছাড়া দু'নম্বর ষ্টুডিওতে ছোটাইবাবুর তত্ত্বাবধানে প্রমথেশ বড়ুয়া অনতিবিলম্বে

হেমচন্দ্র

একখানা সামাজিক ছবি হিন্দি ও বাঙলাতে তোলা আরম্ভ কোর্‌বেন। এ ছাড়া হেম চন্দ্রও একখানা ছবি তোলার আনুষঙ্গিক কাজে আপাততঃ ব্যস্ত।

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিও থেকে প্রথমেই আমরা দেখতে পাব শচীন সেনগুপ্তের আনন্দোজ্জ্বল কাহিনী "**সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব**। এই ছবির পরিচালক আলোক-চিত্র-শিল্পী, ও শব্দধরের কাজ কোর্‌ছেন যথাক্রমে সতু সেন, সুরেশ দাস, জগদীশ বসু। ভূমিকায় আছেন, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মণি সেন,

জহর গাঙ্গুলী

ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, সত্য মুখার্জ্জি, জহর গাঙ্গুলী, রাণীবালা, কুমারী রেখা, গীতা, রেবা প্রভৃতি। এরপরই আসছে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের **চোখের বালি**। ছবিখানাতে ভদ্রঘরের মহিলারা অভিনয়
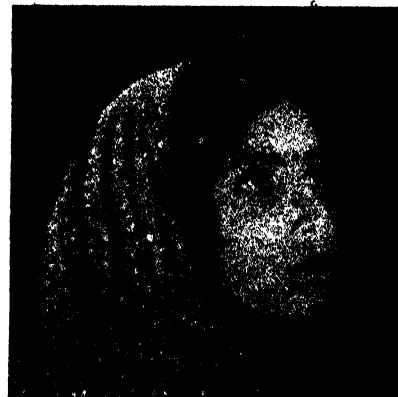
রাণীবালা

কোর্‌ছেন। মুল-ভূমিকা এই—সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়, ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি। পরিচালনা কোর্‌ছেন সতু সেন, আলোক-চিত্রী ও শব্দযন্ত্রী যথাক্রমে ননী সান্ন্যাল ও মধু শীল। এ ছাড়া "শ্রীকৃষ্ণ" নামে একখানা পৌরাণিক চিত্রেরও কাজ প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর নিজ তত্ত্বাবধানে আরম্ভ হ'য়েছে। ছবিখানায়

দেববালা

শব্দযন্ত্রী ও আলোকচিত্রের কাজ কোর্‌ছেন জগদীশ বসু ও সুরেশ দাস। মূল ভূমিকায় আছেন—রাণীবালা, দেববালা, শিশুবালা, সাবিত্রী, চিত্রা, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। এদিকে ননী সান্ন্যাল **মহামায়া** নামে একখানি সামাজিক চিত্র পরিচালনা কোর্‌বেন বলে জানা গেছে।

শিশুবালা

সান্যাল মশাই এখন এই ছবির আনুষঙ্গিক কাজে ব্যস্ত।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে মেট্রোপলিটান্ পিক্‌চার্স নাম দিয়ে মিঃ বি, এল খেম্‌কার প্রযোজনায় **হাল বাঙলা** নামে এক-

ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি, জি)

খানা ছবি উঠছে। ধীরেন গাঙ্গুলী এই ছবির পরিচালক। ভূমিকায় আছেন—মহাদেব পাল, ছায়া দেবী, প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতি। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কাহিনী **চন্দ্রশেখর** শীঘ্রই তোলা সুরু হবে। নরেশ মিত্র গল্পটির চিত্রনাট্য রচনায় আপাততঃ ব্যস্ত।

রাধা ফিল্মসে কালীপ্রসাদ ঘোষ **বাসুদেব** নামে একখানা পৌরাণিক ছবি শীঘ্রই তোলা আরম্ভ কোরবেন। যতীন দাস আলোক-চিত্র এবং ভূপেন ঘোষ ও নৃপেন পাল শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ কোরবেন। এ ছাড়া শোনা যাচ্ছে, অহীন্দ্র চৌধুরী নাকি এখানে **অভয়ের বিয়ে** পরিচালনা কোরবেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে মধু বোসের পরিচালনায় **অভিনয়** তোলা হ'চ্ছে।

অহীন্দ্র চৌধুরী

সাধনা বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরছেন।

দেবদত্ত ষ্টুডিওর পরবর্ত্তী আকর্ষণ হ'চ্ছে, রবীন্দ্রনাথের **গোরা**। ছবিখানা পরিচালনা

সাধনা বোস

কোরবেন নরেশ মিত্র। ভূমিকা-লিপি এখনও সঠিক জানা যায় নি।

প্রফুল্ল পিক্‌চার্সের নূতন ষ্টুডিওর নূতন অবদান হ'চ্ছে, কেশব গুপ্তের হাসির গল্প "নথের প্রমিস"। মূল ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন—সমর ঘোষ, অরুণা, দেববালা ভাস্কর দেব, ভানু রায় প্রভৃতি। এরপর এই ষ্টুডিওতে উঠবে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর **দানের মর্য্যাদা** (বাঙলায়) ও শচীন

অরুণা

চ্যাটার্জ্জির ঐতিহাসিক কাহিনী **মেঘমালা** (বাঙলা ও হিন্দি)।

ফিল্ম্ কর্পোরেশনের প্রথম ছবি **হোপে**র কাজ আরম্ভ হবে আসছে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে। কর্ত্তৃপক্ষ এখন ষ্টুডিও গঠনে ব্যস্ত।

এছাড়া ১৯৩৮ সালে আমরা অনেকগুলো ছবি পাব স্বাধীন প্রযোজকদের কাছ থেকে।

মতিমহল থিয়েটার্স জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তুলবেন **সার্ভিস সিকিওরিং এজেন্সী** নামে একখানা পূর্ণ দৈর্ঘ্য ব্যঙ্গ-চিত্র।

হাজরা পিক্‌চার্সের প্রথম অবদান **কুলশ্রী** কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত হ'চ্ছে। ছবিখানা পরিচালনা কোরছেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। আলোক-চিত্র ও শব্দানুলেখন কোরছেন বিভূতি লাহা ও যতীন দত্ত। ভূমিকায় আছেন—অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শিশুবালা।

ও-কে-এর প্রথম ছবি **রূপোর ঝুমকো** জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এতে অভিনয় কোরছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সত্য মুখার্জ্জি, কমলা প্রভৃতি।

নিউ পপুলার পিক্‌চার্সের আগামী আকর্ষণ হবে একখানা সামাজিক ছবি।

চলচ্চিত্র এবং ভারতে তাহার প্রগতি

ডাঃ শ্রীহরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

বহুদিন হয় ভারতীয় জন সমাজ শিল্প বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে; দেশে শিল্প-উন্নতির বিষয়ে একটা সাড়া পড়িয়াছে। আধুনিক কলকব্জা ও সরঞ্জাম সহযোগে ফ্যাক্টরী বা শিল্পকেন্দ্র গঠিত হইয়াছে এবং সেখানে আধুনিক প্রথায় শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে।

এই শিল্প-উন্নতির বিরাট জাগরণে ভারতে চলচ্চিত্রও যে তাহার বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইতি পূর্ব্বেই উহা প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে অতীতে এবং বর্ত্তমানেও ভারত কতকটা চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষক এবং ইহাতে উহার (ভারতের) আদর্শের মানদণ্ডের নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহার উন্নতি বা পূর্ণতার জন্য ভারত অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং উহার চিত্র-সম্পদগুলিও সেই আদর্শের অনুকরণেই সম্ভূত।

চিত্র-সম্পদগুলির অবাধ প্রণয়নের অভাবের কারণও উহার (ভারতের) আদর্শের সৌহ বেষ্টনী। সাধারণ শ্রোতৃবর্গ যাহারা প্রণীত চিত্রগুলির বিষয়বস্তু উপভোগ করেন তাহাদের স্বার্থাস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য প্রয়োজন। বস্তুতঃ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতীয় চিত্রশিল্পের এই প্রথমাবস্থাতেই বা শৈশবাবস্থাতেই আমাদের মন মোহন করিতে পারে না এরূপ কুৎসিৎ চিত্র অতি বিরল বা পরিদৃষ্ট হয় না।

এখন আমরা দাবী করিতে পারি যে যত মনে করা হয়, চিত্র প্রণয়নের গতি তত মন্থর নহে। একদিকে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও বম্বেতে বহু সংখ্যক ছবিঘর গড়িয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিক সংখ্যক ছবিঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় প্রগতির দৌড় অভিলষিত দিকে ধাবিত হইয়াছে।

ভারতে চলচ্চিত্রের উদ্বোধনের প্রেরণা উহার অন্তর নিহিত বৈশিষ্ট্য হইতেই যে আসিয়াছে একথা স্বীকার করিতেই হইবে। চলচ্চিত্র নিজেই বা স্বভাবতঃই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান এবং উহার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তাঁহার তুলনায় যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর আনন্দ দান করিয়া থাকে, বস্তুতঃ এতই চেতনা আনিয়া দেয় যে, উহা অতি সহজেই সদা সর্ব্বদা অনুভূত হইয়া থাকে এবং উহার সুবর্ণ সুযোগ চিত্রগৃহগুলি সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকে। যেথায় চিত্রগুলি প্রদর্শিত হয় সেই দেশের নর নারীর জীবনী হইতে চিত্রের বিষয়বস্তুগুলি সংগৃহীত হইলে উহা আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। জনসাধারণের মনে ভারতীয় নর নারীর জীবন কাহিনী ও ভারতীয় বিষয়বস্তু বা চিন্তাধারাসম্ভূত চিত্র যেরূপ আনন্দ দান করিতে পারিবে বৈদেশিক চিত্র, বৈদেশিক বিষয় বস্তু বা চিন্তাধারা হইতে উদ্ভূত কদাচ সেরূপ পারিবে না। ইহা হইতেই অনুমান করা যায়, কেন বৈদেশিক চিত্রগুলি ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইয়া যাইতেছে এবং দেশী চিত্র অপ্রতিহতভাবে শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করিতেছে। তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অনিন্দনীয় আনন্দ উৎস সন্ধানে ছায়াচিত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এছাড়া আরও একভাবে ইহার অনেক উপকারিতা আমাদের নিকট আছে। ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার উৎকৃষ্ট বাহন। কারণ আর কোনও উপায়েই শিক্ষনীয় বিষয়কে এরূপ জীবন্ত বা প্রভাবশালী করা অসম্ভব। প্রধান প্রধান বিষয়, যাহা জগতে সর্ব্বত্র ঘটিতেছে তাহা বেতার বার্ত্তায় সাহায্যে প্রচার করাই ইহার শিক্ষার বাহন হিসাবে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করার একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত।

সাধারণতঃ চিত্রদৃশ্যের সাহায্যে প্রদর্শিত শিক্ষা—অভিনীত উপাখ্যানের সাহায্যে আমাদের নিকট আসে। এই জন্যই বোর্ড অফ ফিল্‌ম্ সেন্সার (Board of Film Censors) প্রত্যেক চিত্রের প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা করিবার জন্য রয়েছে। তাহারা দেখিবে যে উহাতে জাতি বা সমাজের কোনও অনিষ্ট করে কি না।

এর আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে এখন হারু চ্যাটার্জ্জি বিশেষ ব্যস্ত।

কমলা টকিজের পরবর্ত্তী চিত্র হবে সুকুমার দাসগুপ্তের লেখা **রাজকুমারের নির্ব্বাসন।**

এ ছাড়া আরও কতগুলো স্বাধীন প্রযোজকের ছবি ১৯৩৮ সালে উঠবে বলে আমরা শুনছি। কিন্তু তাদের কার্য্যকলাপ না দেখে তাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলা এখন থেকে যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

অতঃপর, ছায়াচিত্র শিল্প বেকার সমস্যারও গুরুত্ব কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে। ইহার প্রসার যে খুব সীমাবদ্ধ নহে সেই ধারণা লইয়া ইহা সহস্র সহস্র লোকের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারে। অন্যথায় হয়ত তাহারা হতাশ বেকার জীবন-যাপন করিত। ইহাতে পরস্পর সম্বন্ধ বহু বিষয় (operation) রহিয়াছে। চিত্র তোলা হইতে ছবিঘরের বাহিরের বহুধা রঞ্জিত চিত্র-প্রতিষ্ঠা (posters) পর্য্যন্ত ইহাতে পরস্পর সম্বন্ধ বহু কর্ম্ম কুশলতার (operations) অবকাশ রহিয়াছে। এই সমস্ত স্থানে (operations) নিয়োজিত লোক সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা করুণ—তাহা হইলে স্বভাবতই মত প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইবেন—যদিও আশ্চর্য্যের কিছুই নাই যে, ছায়াচিত্র জগতে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠান। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে আমেরিকা মহাদেশে ইহা দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম শিল্পপ্রতিষ্ঠান।

সুতরাং এটা দুঃখের বিষয় যে, ছায়াচিত্র শিল্প আমাদের দেশে দৃঢ়বদ্ধভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইহাকে সংস্কার ও উন্নত করিবার অনেক কিছু রহিয়াছে। যে সমস্ত লোক ইহার নায়ক বা পরিচালক—তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ যাহাতে তাহারা যে কোনও প্রকার উন্নত ধরণের সংস্কার করিতে পারেন। সম্ভবতঃ এরূপ স্থানে আমাদের দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতে প্রয়াস পাওয়া ভুল হইবে না।

প্রথমতঃ ছায়াচিত্র গৃহে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইহাকে উৎকট আনন্দ-উৎসের সম্মেলন মনে করিলে চলিবে না। চিত্রগৃহ হইল একটা কর্ম্মকেন্দ্র, এখানে বিভিন্ন প্রতিভাশালী লোক সম্মিলিত হইয়া কলাবিদ্যার যে এক একটী নিপুণ নিদর্শন জনসমুদ্রের নিকট ধরিয়া তোলে তাহাই হইল চিত্র। নিয়মানুবর্ত্তীতা বা ব্যবহার পদ্ধতি যদি ফ্যাক্টরী বা কর্ম্মকেন্দ্রে অবশ্য পালনীয় হয় তবে চিত্রগৃহেই বা তাহার অভাব দৃষ্ট হইবে কেন?

এতদ্ভিন্ন স্ত্রী-পুরুষ উভয় প্রকারের শিল্পীরাই তাহাদের উদাসীনতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইতে ইতস্ততঃ করিবে না। তখন তাহারা দেখিতে পাইবে যে, এই সমস্ত সমিতির গতানুগতিক সংস্কার হইতে এখন মুক্ত।

ভারতের নিজস্ব ভাবধারা অনুযায়ী তাহার নীতিজ্ঞনের মানদণ্ড রহিয়াছে। তাহার ছবিগুলির বিষয়বস্তু তাহার কেশাগ্র স্খলিত হইবে না। এখানে এই শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে, যখনই সমাজের কোন দোষ বা দুর্নীতিকে জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয় তখনই সেখানে যথাসম্ভব তাহা দূর করণের সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সময় সময় সমস্ত বিষয়টী উপস্থিত করা অপেক্ষা এইরূপ

বিষয় নির্ব্বাচনই অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যে সমস্ত দৃশ্য ইন্দ্রিয় শৈথিল্য বা অবনৈতিক কারণ সঙ্ঘটিত হইতে পারে সে সমস্ত দৃশ্য বিশেষ সতর্কতার সহিত জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, এবং কখনই ঐরূপ দৃশ্য অকুন্ঠিতচিত্তে উপস্থিত করা সঙ্গত হইবে না।

শ্রম বণ্টন তথা বৈশিষ্ট্য রক্ষণটাই হইল আধুনিক অর্থনীতির প্রগতি এবং ইহারই উপর আজকাল শিল্প বাণিজ্য নির্ভর করে। ইহা হইতে একজন সুনিপুণ কর্ম্মীর সমস্ত শক্তি বা যোগ্যতা একটা কর্ম্মেরই নির্দ্দিষ্ট অংশ টুকুতে কেন্দ্রীভূত হয়। নিম্নতম মূল্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী, প্রস্তুত হওয়ার ইহাই ছিল কারণ। কিন্তু ভারতে চলচ্চিত্রে অর্থনীতির এই নির্দ্দেশ তথা যোগ্যতানুসারে কর্ম্ম বণ্টনের নীতি বিশেষ অনুসরণ করা হয় নাই। বস্তুতঃ আমাদের দেশেও নায়ক, চিত্রকর, গায়ক, পরিচালক প্রভৃতি না রহিয়াছে এমন নহে কিন্তু তাহাদের কর্ম্মসীমা বহুধা বিভক্ত। নীতির দিক হইতে আমাদের যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ অনুসরণ করিলে প্রণেতারাই লাভবান হইবেন এবং আমাদের বিশ্বাস তাহারা তাহাদের কর্ম্মসত্ত্বে ইহার যথেষ্ট সম্প্রসারণ করিবেন।

যে সকল ব্যক্তিরা তাহাদের স্ব স্ব পন্থাতেই যশোপার্জ্জন করিয়াছেন কেবল মাত্র তাহাদেরই নিয়োগ করিবার রক্ষণশীল নীতির সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করিব। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাহাদের সন্ধান লইয়া উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হইতে পারে, তাহা না করিয়া বরং অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়োগ মনোনয়নটা অনেক সময় ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সহানুভূতি দ্বারা অথবা বাজারের বড় বড় অর্থহীন মূর্খ বিজ্ঞাপনের প্রহসনের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এই জনসমুদ্রের মধ্যে হয়ত এরূপ লোক আছেন যাহারা সুযোগ পাইলে Jackey Coogans বা Shirley Temple হইতে পারিতেন। আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যে ভাবে অভিনেতা অভিনেত্রী প্রভৃতির তত্ত্ব সংগ্রহ করা হয় আমাদের দেশে কি ঐ রূপ পন্থা অবলম্বন করিবার কোনও সুযোগ নাই? প্রণেতা বা পরিচালকগণ একবার ভাবিয়া দেখুন যদি তাহারা ঐ সমস্ত অজ্ঞাত প্রতিভার সন্ধান লইয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন তাহা হইলে তাহারা কত প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

পুনশ্চ বৈদেশিক বিষয় বস্তু ও ভাবধারাকে দেশীয় চিত্রে অনুকরণ করিবার মত মূর্খামিও সময় সময় পরিদৃষ্ট হয়। ইহা হইতে আমাদের অক্ষমতাই প্রমাণ হয়। ভারতীয়

কৃষ্টির ভাব ধারাতেই যথেষ্ট অভিনব বিষয় বস্তুর সমাবেশ রহিয়াছে এবং চলচ্চিত্রে তাঁহাদেরই যথেষ্ট আদর হইতে পারে। যাহাতে ভারতীয় জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া উঠান হয় এইরূপ কোন চিত্রে বৈদেশিক কোনও বিষয় বস্তুর স্থান দেওয়া বস্তুতঃই নিন্দনীয়।

এই সমস্ত আলোচনার মূল কথা এই যে, ভারতে চলচ্চিত্র তাহার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই ইহার বহুলাংশে উন্নতি হইয়াছে এবং যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উন্নতি, জনপ্রিয়তার কারণ শিল্পের বহির্ভাগ হইতে আসিয়াছে; সুতরাং ইহাকে এখনই যতদূর সম্ভব সংস্কার করা উচিত এবং তাহা হইলেই আমাদের অভিযান সার্থক হইবে।

শুনেছি এই চিরদিন

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন

শুনেছি এই চিরদিন
ঋষির কথায় প্রাচীন গাথায়
আকুল চির বিরহীর
প্রাণের ব্যথায় মিলবে তোমায়!
সকল দিনে সকল সাঝে
বেদন ভরা কাঁদন মাঝে
তোমার বীণা মোহন বাজে;
মহিমায়
পুলক হেসে খেলে যায়
সকল ছায়ায় সকল কথায়;
তখনি দূর ক'রে দাও
সকল বিষাদ সকল বাধায়;
শুনেছি এই চিরদিন
ঋষির কথায় প্রাচীন গাথায়!

এই যে প্রাণ চরণে লীন্
রইল ব'সে এত যে দিন
ব্যগ্র আকুল ব্যথিত ক্ষীণ
তবু হায়
নবীন পূর্ণ গরিমায়
কেন বা তোমায় আজিও না পায়!
বিচিত্র কত ভঙ্গিমায়
শুধুই খেলাও জীবন খেলায়!
বলনা আর কতদিন
ছলবে হেলায় বৃথায় আমায়!

ীবন গাঙ্গুলী ও মলিনা। নিউ থিয়েটার্সের বি "অভিজ্ঞানে" এর অভিনয় করছেন প্রমথ ও সন্ধ্যার ভূমিকায়। পরিচালক প্রফুল্ল রায়।

নিউ থিয়েটার্সের "বিদ্যাপতি" (বাংলা) চিত্রে অমর মল্লিক ও কাননবালা যথাক্রমে বিদূষক ও অনুরাধার ভূমিকায়।

মুক্তি প্রতীক্ষায় ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের সামাজিক ছবি "রূপোর ঝুমকো"র একটি দৃশ্যে পারুল ও কমলা।

সিনেমার নব-পর্য্যায়

শ্রীনির্ম্মল বসু

চিরকাল ধরিয়া যে ধরণের চিত্র দেখিয়া আসিতেছি, তাহাতে আর মন সাড়া দেয় না, আনন্দ পায় না। প্রায় সকল দর্শকই এই কথা বলিতেছেন। চিত্র-নির্ম্মাতা পড়িয়াছেন মহা বিপদে। কাঁচা পয়সা খরচ করিয়া তিনি বহু আশা মনে লইয়া

ক্যামেরার ঈগল চোখে "দেশের মাটী"-র কর্ম্মিবৃন্দ

যে ছবি দর্শকদের সামনে ধরিলেন, তাহার আয়ু শেষ হইল অতি অল্পকাল মধ্যে। এই মহা বিপদ হইতে ত্রাণ লাভের পথ কি—এবং কেইবা তাহার নির্দ্দেশ দিবে? বাহির হইতে নির্দ্দেশ যদি না আসে তাহা হইলে চিত্র-নির্ম্মেতাকে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের পথ নিজেকেই বাহির করিতে হইবে। মানুষের মন পরিবর্ত্তন ভালবাসে এবং পরিবর্ত্তন চায়। কাজেই আমাদের চিত্র-শিল্পেও পরিবর্ত্তন সকল দর্শকই আশা করে।

ছেলে বয়সে মানুষ গল্প-উপন্যাস—নিছক বাজে উপন্যাস পাঠে, আনন্দ লাভ করে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রুচির পরিবর্ত্তন হয়। পরিণত বয়সে মানুষ যে-সব উপন্যাস পাঠ করে—কিন্তু বিচার করিয়া পাঠ করে। উপন্যাসের মধ্যেও সে সমাজের, দেশের, জাতির, সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণকর বস্তুর সন্ধান করে, এবং যে উপন্যাসে মানুষ ঐ সকল না পায় তাহাকে বাজে বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। চিত্রেরও প্রায় ঐ অবস্থা হইয়াছে। দর্শকমন যখন শিশু ছিল, তখন যে কোন চিত্রেই

"দেশের মাটী"-র লোকেশনে মিঃ পি, এন্ রায় ও মিঃ বি, এন্ সরকার।

দর্শক প্রচুর আনন্দ লাভ করিত। কিন্তু এখন দর্শকচিত্ত তাহার শৈশবকাল কাটাইয়াছে, কাজেই বাজে বা অকেজো জিনিষে তাহার মন উঠে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে—কেবল নিছক কাজের, কঠোর সত্য বস্তুতেও মানুষ সকল সময় আনন্দ লাভ করে না। অথচ কঠোর সত্যকে যদি যথাযথ রসপূর্ণ করিয়া পরিবেশন করা যায়, তাহা হইলে মনও তাহা সানন্দে গ্রহণ করে।

বর্ত্তমানে বাংলার একজন প্রডিউসার এই সত্যকে বোধ হয় মানিয়া লইয়াছেন। তাই তিনি আজ চিত্রশিল্পকে কেবল বাজে আনন্দের বা খেলার বস্তু বলিয়া মনে করেন না। পৃথিবীতে সকল বিষয়ের যেমন একটি আদর্শ থাকে—সিনেমারও সেই প্রকার আদর্শ থাকা উচিত এবং আছেও। অন্যান্য দেশে

"দেশের মাটী"র সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক ও ন্যাশন্যাল নিউজপেপার্সের ম্যাঃ ডিরেক্টর অক্ষয় সরকার "দেশের মাটী"-র শুটিং দেখছেন।

যেমন কল্যাণময় সিনেমার কথা আমরা শুনিতে পাই, সেই প্রকার কল্যাণময় সিনেমার রূপ বোধহয় এতদিন পরে ভারতবর্ষেও সার্থকভাবে দেখিতে পাইব।

"দেশের মাটি" চিত্রখানি যে কাহিনী, যেরূপ সৌন্দর্য্য, যে আনন্দ-রস এবং আদর্শ লইয়া গঠিত হইতেছে, তাহা এতদিন আমাদের মানস লোকেই ছিল। এই চিত্রের কাহিনীর মধ্যে দুইজন যুবক দুইটি বিভিন্ন আদর্শ সামনে লইয়া জীবন যাত্রা

"দেশের মাটী"-র একটি বিশিষ্ট দৃশ্য

আরম্ভ করিল। দুইজন অভিন্নপ্রাণ বন্ধু—মনে প্রাণে তাহারা এক। কিন্তু তাহাদের আদর্শ লইয়া বাধিল জীবনব্যাপী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে আমরা আমাদের দেশের বর্ত্তমান বহু অভাব-অভিযোগ; দৈন্যের পরিচয় পাইব। যা দেখিতে পাইব, তাহা হয়ত প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনেই ঘটিতেছে, কিন্তু তাহা চোখে পড়িলেও মনের দুয়ারে কোন ঘা বা আঘাত তাহারা দেয় না।

'দেশের মাটি' চিত্রখানি চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে। এই পথে বাধা প্রচুর, বিঘ্নও বহুতর, কিন্তু কর্মীদের মনে আছে দুর্জ্জয় পণ, প্রাণে অফুরন্ত আশা। কাজের নেশায় তাহারা সকল প্রকার আলস্য বিলাস ত্যাগ করিয়াছে। যাত্রার সার্থক সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের না আছে বিশ্রাম, না আছে শান্তি।

প্রকৃতির সহিত মানুষের যোগসূত্র কোথায়, 'দেশের মাটি' দেশের সন্তানের সকল দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে পারে কিনা, তাহাও এই চিত্রে দেখিতে পাইব।

যে চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ কামনা সকল দেশবাসী প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছেন সেই ভারত গৌরব চিত্রপ্রতিষ্ঠান নিউ-থিয়েটার্সের কল্যাণ কামনা আবার এই নব-বৎসরের প্রথম দিনে আমরা নূতন করিয়া করিলাম। লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ব্যক্তি এই মহান চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সকল দুঃখ-বেদনা নিজ অন্তরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভারতে নিষ্কামভাবে "চিত্র-সাধনা"য় মগ্ন রহিয়াছেন —সেই ব্যক্তিকেও আমরা নব বৎসরের নব-প্রভাতে আমাদের সকল শুভকামনা জানাইতেছি।

=গান=

শ্রীদেবাশীষ সেনগুপ্ত

স্বপন আমার সফল হলো গো
আসিলে কি প্রিয় পথ ভুলি
তোমার চরণ পরশ লভি
ধন্য পথের মলিন ধূলি।

মোহন সাঁঝেতে গোধূলি লগনে
বুঝি বা কুসুম ফুটিল গগনে
কাননে কাননে বুঝি আনমনে
গাহি ওঠে বুলবুলি

স্বরগের ধারা হলো দিশেহারা
ঝরি পরে তব মাথে
চাঁদ মৃদু হেসে বধূ ভালবেসে
পীরিতি বাঁধিল সাথে।

সোনার স্বপন সফল করিতে
এলে কি গো প্রিয় আমারে বরিতে
ফুলকৌটা সনে মধুর লগনে
কনকদোলায় দুলি॥

এন্-টির "দেশের মাটী"-তে শ্যাম লাহা ও ভানু ব্যানার্জ্জি

পরলোকে পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পরিচালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় গত সোমবার কয়েক ঘণ্টা রোগভোগের পর মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শৈশব হইতে কলাচর্চ্চা লইয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাধা করিয়া তিনি 'ম্যাডান কোম্পানী'-তে ফিল্মশিল্প শিক্ষাকল্পে প্রবেশ করেন—এবং বাঙলা ফিল্মশিল্পের প্রবীনতম শিক্ষাগুরু প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর অধিনে কাজ করিয়া চিত্ররাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তারপর কালী ফিল্মস্ আজ যে গৌরবের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, তাহার কিছু সম্মানের দাবী জ্যোতিষবাবুর ছিল। কালী ফিল্মসের হইয়া বহু ছবি এবং উত্তরায় চলিতেছে, "মালাবদল" ও "রুচি-সংসদ্" তিনিই পরিচালনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়াতে' তিনি "পথের শেষে" ও "পায়ের ধূলো" পরিচালনা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে মেট্রোপলিটন পিক্‌চার্সের একখানা এবং মতি মহলের একখানা ছবি পরিচালনা করিবার চুক্তি হয়। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্পাদক হিসাবেও জ্যোতিষবাবুর যথেষ্ট সুনাম ছিল। আমরা তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

নীরব দান

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

তুমি ডাকনিক, এসেছিনু তবু
সবার আগে
হে দাতা, তোমার গৃহ-উৎসবে,
দানের যাগে।
ছিল জনময় আঙিনা তব
মধ্যরাতে;
আকাশের মায়া ছিল ক্রীড়ারত
চন্দ্রিকাতে।

বিদায় করিলে একে একে সব,
মুখপানে চেয়ে রহিনু নীরব;
মনের কথাটি কহিতে পারিনি
তোমার সনে।

তুমিতো তখন ছিলে মাতোয়ারা,
আপন-আবেশে আপনাতে হারা,
কতই না কথা কহিলে হে প্রিয়,
আপন মনে।
শুধু দিঠি মোর বলেছিল, "হেরি
অকিঞ্চনে।"

কি ভাবি' আবার আসিয়া না জানি
সঙ্গোপনে
ডাকিলে আমায় মিনতি-কাতর
সম্বোধনে।
তাইতো তখন কিছুই না নিয়ে
ফিরিনু ঘরে
শুধুই তোমার নয়নে যা' ছিল
হরণ ক'রে।

সে-চাহনি ভ'রে কী যে দিলে ভাই,
তাহার হিসাব আজো মেলে নাই;
তবুও কেন যে সে-পাওয়া আমার
বক্ষে রাজে।

হৃদয় আজিকে কাণায় কাণায়
ভরিয়া উঠেছে জানা-অজানায়,
তোমার সে ভাষা বাজিছে আমার
সকল কাজে।
চেয়ে দেখ, তাই শোভিছে এ-শির
জয়ের তাজে।

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেকের পক্ষে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার! নীহারের এই কথাটিই এই বর্ষণমুখর সন্ধ্যার মাঝে বিশেষ করে মনে পড়ে গেল! ঘোলাটে আকাশের বুক থেকে অবিশ্রান্তধারায় বৃষ্টি ঝরছে—বিরামহীন বিশ্রামহীন গতিতে। সেই যে বৃষ্টি আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এখনও পর্য্যন্ত তার একটু ধরণ হোল না। সারা দেহ তার সিক্ত, ভাঙ্গা ছাতাটায় কোন বাধাই মানে না, তবুও মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে এই ভাঙ্গা ছাতাটিকেই সম্বল করতে হয়েছে আজকের বৃষ্টির আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্যে।

মাঝে মাঝে কড় কড় শব্দে বজ্রধ্বনি হচ্ছে, হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে কাঁপিয়ে দিয়ে। নীহার চলেছে।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মন তার ক্লান্ত-শ্রান্ত! অফিসের গুরু কর্ম্মভার, তারপর আবার স্ত্রীর অসুখ, উদ্বেগ ভাবনা অর্থহীনতা মনকে তার বিষিয়ে তুলেছে। 'সত্যি এরকম জীবনের কোনও মানে হয় না।' সামান্য উদরান্নের সংস্থানে এই অমানুষিক অক্লান্ত পরিশ্রম! সকাল না হতেই চা না খেয়ে দুই মাইল রাস্তা ঠেলে ছাত্র পড়াতে যাওয়া মাসের শেষে কয়েকখণ্ড রজত মুদ্রার প্রলোভনে এবং প্রয়োজনে। তারপর ফেরবার পথে বাজার করে আনা, কয়েক বালতি জল মাথায় ঢেলে কোন রকমে দুইটি নাকেমুখে গুজে অফিসে ছোটা। ফিরে এসে আবার সংসারের দাবী মেটানো, ধোপা'র খরচ থেকে আরম্ভ করে মুদির বিল, গোয়ালার হিসাব, কয়লার খরচ মাসে কমাবার ব্যবস্থা করা, সন্ধ্যায় আবার টিউশানি করা—এরপরও আবার আজ ছেলের সর্দ্দি জ্বর, মেয়েটার প্যানপেনানি কান্না, অসহ্য! তেমনি হয়েছে স্ত্রীর স্বাস্থ্য! বিয়ের বছর চারেক পর থেকেই সেই যে অসুখ লেগেছে, আজ পর্য্যন্ত আর তাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দিচ্ছে না। আজ দু'বছর স্ত্রীর অসুখে তার চিকিৎসার ব্যয় ভার বহনে নীহার সর্ব্বস্বান্ত হয়ে উঠেছে। অফিসের মাইনের কটি টাকা দিয়ে কোনরকমে দিনের অন্ন সংগ্রহ করা হোত, এখন আর ডাক্তার ফিতে এবং ঔষধ পথ্যের ব্যয়ে আর তা সম্ভবপর হয় না। সকালে সন্ধ্যায় তাই টিউশানি জোগাড় করে নিতে হয়েছে। কিন্তু তবুও নিষ্ঠুর সংসারের প্রয়োজনের দাবী মেটে না! এরই নাম বেঁচে থাকা, এরই নাম সংসার!

নীহারের সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠে। রাস্তায় মোটরগুলি চলেছে—সুসজ্জিত তাদের অধীশ্বর আরোহী আরোহিনীদের নিয়ে সান্ধ্য বিলাস ভ্রমনে—রাস্তার পথচারীদের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে। ওই রিক্সাওয়ালাটা ছুটে চলেছে টিং টিং আওয়াজ করতে করতে তার ওপর অধিরূঢ় ভদ্রলোকটি ওয়াটার প্রুপ গায়ে তিনিও চলেছেন বৃষ্টিকে উপেক্ষা জানিয়ে, লোকভর্ত্তি বাসগুলিও সদম্ভে ছুটে চলেছে তার মতন পথচারীর গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিয়ে, কী আশ্চর্য্য পৃথিবীতে সেই কী সবচেয়ে হীন সবচেয়ে হতভাগা! কটা পয়সা খরচ করে বাসে করে বাড়ী ফিরবারও সামর্থ্য তার নেই। সকাল বেলা অফিসের দেরী হয়ে যাবার ভয়ে যেতে হয় বাসে চেপে, ফেরবার সময় বাস খরচাও আর জোটে না। এইতেই সংসার অচল। দিনের অন্ন সংগ্রহের জন্যে এমনি অমানুষিক জীবন যাত্রা তাকে নির্ব্বাহ করতে হয়। অথচ সে ভদ্রলোক, সে শিক্ষিত, তার আছে সমাজ-সংসার-স্ত্রীপুত্র পরিজন। আদর্শ তাকে স্থাপন করে যেতে হবে, লোক লৌকিকতা তাকে করতে হবে, নিজেকে এমনি করে নিষ্ঠুর যান্ত্রিক জীবন যাপন করে, নিজের আত্মার বিলাসকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে তিলে তিলে হত্যা করে। তবুও কবি গাইবেন সুখ-স্বপ্ন-আশা আনন্দের গান!

নীহারের অসহ্য বোধ হয়। সমস্ত অন্তরটা তার বিদ্রোহের অগ্নিতে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে—সে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায় বিসুবিয়সের মত!

মহানগরীর রাজপথের দোকান গুলিতে জ্বলে উঠেছে সুশুভ্র বিজলীবাতী। কাপড়ের দোকানের সো কেশগুলিতে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে মূল্যবান সুদৃশ্য রঙ বেরঙ এর শাড়ী। ক্রেতার দলেরও অভাব নেই। এমনি বৃষ্টির মাঝেও এসে দাঁড়াচ্ছে মোটর, নামছে তা থেকে সৌখীন স্ত্রী-পুরুষ ক্রেতার দল। সো কেশের কাছে খানিকটে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নীহার। একখানি সুন্দর

ময়ূর আঁকা সিল্কের শাড়ী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—কত্য মধুর চমৎকার তার আবার একটা নামও দেওয়া হয়েছে। নীহারের মনের ভাবে খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটলো। নীহার ভাবলে শুভা! শুভাকে হয়ত চমৎকার মানায় এই কাপড় খানি পরলে। দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে তার সুন্দরী দেহতনু ম্লান হয়ে এসেছে, ছিপছিপে পাতলা গড়নটা ভেঙ্গে পড়েছে অম্লরোগের নিদারুণ আক্রমণে—লম্বা সুশ্রী মুখখানি নীল শিরায় রেখাম্বিত—হাড়গুলি দেখা যায়। টানা টানা চোখ দুটির কোলে নেমেছে ক্লান্তি গ্লানি অবসাদ এবং অসহায়তার মসীবর্ণ রেখা—কিন্তু তবুও আজ তাকে একেবারে অসুন্দরী বলা যায় না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আঁধারে গভীর রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকারে কিংবা ভোরের পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তার নিদ্রালু নয়নপল্লবে জেগে থাকে সৌন্দর্য্যের ঝিকিমিকি। না! শুভা এখনও তাকে আনন্দ দিতে পারে! সাজ সজ্জা করলে শুভাকে আজিও দেখায় সুন্দরী! শাড়ীখানি শুভাকে কিনে দিলে বেশ হয়। কিন্তু তার সঙ্গে সংযুক্ত সাদা একখানি কার্ড—কাপড়খানির মূল্য তালিকা দেখেই এবং নিজের পকেটের শূন্যতার কথা অনুভব করেই মনটি তার হু হু করে উঠলো। আটাশ টাকা—ওঃ! তাকে মাসের প্রায় কুড়িদিন খাটতে হয় এই টাকা উপার্জ্জন করতে। অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব তার পক্ষে এ বিলাসের স্বপ্ন দেখা। বিবেক তার পুনর্ব্বার গর্জ্জন করে উঠলো তার এই মূঢ়তার জন্যে। দোকানের ঘড়িটা নির্ম্মম ভাবে জানিয়ে দিলে তার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত্তের মূল্য—এখন তাকে ফিরতে হবে বাড়ী, তারপর আবার যেতে হবে টিউশনি বজায় রাখতে।

নীহার দ্রুততর গতিতে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।

ভাঙ্গা ছাতাটি দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পরে নীহারের দেহকে সিক্ত করে দিচ্ছে—বৃষ্টির আক্রমণকে আর কিছুতেই প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। নীহার নিরুপায়—নীহার আকাশের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখে নিলে। ঘোলাটে আকাশ—গা বেয়ে তার অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণধারা গড়িয়ে পড়ছে—নিবৃত্তি তার অনতিবর্ত্তীক্ষণের মধ্যে নেই বলেই অনুভূত হচ্ছে—বাড়ীর পথও বিশেষ নিকটবর্ত্তী নয়। চোখের সামনে দিয়ে একখানা রিক্সা চলেছে, রিক্সাওয়ালাকে কী সে ডাকবে? রিক্সা চড়ে বাড়ী যাবে? এখানথেকে কমসে কম হরিঘোষ ষ্ট্রীটের জগদীশ রায়ের গলি যেতে রিক্সা ভাড়া নেবে তিন চার আনা—বৃষ্টির দিনে চাইকি বেশীও হাকতে পারে!

টিং টিং শব্দে শ্যামবাজারের নতুন ট্রাম-গুলি চলেছে। কাঁচের আবরণ ভেদ করে অভ্যন্তরস্থ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে—গদি আঁটা সিট্ গুলিতে পরম আরামে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে চলেছে, বহু যাত্রী—মুখে সিগরেট কিংবা চুরোট—নীহার ভাবে, ওঠা যাক্ ট্রামে, তিনটে তো পয়সা! কিন্তু এতখানি পথ হেঁটে এসে আবার পয়সা খরচ—না অসম্ভব। তিনটে পয়সার মূল্য তার কাছে অকিঞ্চিৎকর নয়। নীহারের বিবেক গর্জ্জন করে উঠলো।

মাণিকতলার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে নীহার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একখানি সুন্দর বাড়ীর দ্বিতলের কক্ষ হতে ভেসে আসছে সুললিত নারীকণ্ঠের করুণ গানের রেশ। রবীন্দ্রনাথের গানের সে অন্ধ-ভক্ত ছিল এককালে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গান খানি শুনতে লাগলো।

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥
বনের ছায়ায় জল ছল ছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে।

বৃষ্টির একটানা রেশের মাঝে প্রকৃতির সুরে সুর মিলিয়ে গায়িকার কণ্ঠস্বর এক অপরূপ করুণ রসের সঞ্চার করেছে। গানখানি নীহারের অতি প্রিয়। সেও সঙ্গে সঙ্গে গুণ-গুণ-করে গেয়ে উঠলো:—

কোন্ দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দুলে তার বিরহ-ব্যথার মালা,
গোপন মিলন অমৃত-গন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

গান থেমে গেল। আরম্ভ হোল আবার আর একখানি। এবারেও সেই বর্ষার করুণ সুর। নীহার আত্মহারা হয়ে শুনে চলেছে গান—রবি ঠাকুরের গান মানুষকে দিতে পারে দুঃখের সান্ত্বনা।

নীহার ভুলে গেল তার গৃহের কথা—বৃষ্টির কথা, প্রাইভেট্ টিউশানির কথা। সে এক স্বপ্নময় মুহূর্ত্তের মাঝে এসে পড়েছে, বাস্তবের মালিন্যের প্রবেশাধিকার যেখানে নেই। কিন্তু চমক্ ভাঙতেও তার দেরী হোল না।

যেই ঘড়ি ঢং করে বেজে উঠে নীহারকে জাগ্রত করে দিয়ে গেল। নীহার চমকে উঠলো। তাইত এরই মধ্যে বেজে গেল সাড়ে সাতটা।

ভয়ানক দেরী হয়ে গেছে—সর্ব্বনাশ। বাড়ী গিয়ে এরপর আর টিউশানি করতে যাওয়া চলবে না। বাড়ী আজ আর যাওয়া হবে না। পড়িয়ে আবার যেতে হবে ডাক্তারের কাছে শুভার ঔষধের জন্যে।

নীহার আর পারে না—একা কোনদিক সামলাবে সে! নিজের নির্বুদ্ধিতায় করুণ সে অনেকক্ষণ সময় বাজে অপব্যবহার করেছে—নিজের উপর দারুণ রাগ হোল তার।

সিল্কের সুদৃশ্য শাড়ী—তরুণী কণ্ঠে রবিঠাকুরের গান—এবিলাস তার জীবনের জন্য নয়। তার জীবনে শুধু সংগ্রাম—বেঁচে থাকার জন্য কঠোর আপ্রাণ পরিশ্রম—বাস্তব—শুধু অর্থ শুধু সামর্থ—এখানে কাব্য নয়—গান নয়—বিলাস নয়—স্বপ্ন নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে তাকে সংসারের সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হবে।

নীহার চলার গতিকে আরও বাড়ায়ে দিলে। পৌনে আটটার মধ্যে তাকে ছাত্রের বাড়ী পৌঁছাতেই হবে!

শুভা—শুভা হয়ত তার প্রতীক্ষায় সময় গুনছে—কেন তার এত দেরী হচ্ছে? জামা কাপড় সর্ব্বাঙ্গ তার বৃষ্টির জলে ভিজে গেছে।

এসব চিন্তার সময় এখন আর নীহারের চিত্তে নেই, একটি মুহূর্ত্তকেও সে আর অপব্যবহার করতে পারে না।

আকাশের বর্ষণ ধারা সমান তালে তখনও বর্ষিত হয়ে চলেছে।

কুমারী রেণুকা সাহা

ভারতের শ্রেষ্ঠ সেতারী-প্রফেসার এনায়েৎ খাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা কুমারী রেণুকা সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতে সেতারের যে অপূর্ব্ব কলা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙ্গালী মেয়ের আসন অন্যান্য গুণিজন মণ্ডলীতে খুব উচ্চ স্থান পাইয়াছে। তাহার সুর প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া নেপালের সিনিয়ার কমাণ্ডিং জেনারল স্যার মোহন

সামসের জং বাহাদুর রাণা জি, বি, ই; কে, সি, আই, ই; গোয়ালিয়র স্কুল অব মিউজিকের অধ্যক্ষ, এলাহাবাদ হাই কোর্টের মহামান্য বিচারপতি ইউ, এস, বাজপাই; মহোদয় মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ তাহাকে নানারূপ স্বর্ণপদক দানে উৎসাহিত করিয়া প্রতিভার যথার্থ সম্মান দেখাইয়াছেন।

মুক্তধারা সম্মিলনী

গত ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তধারা সম্মিলনীর সভ্যগণ "ষ্টার রঙ্গমঞ্চে" "পথের সাথী" ও "অল ইণ্ডিয়া সাপ্লাই এজেন্সী" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন।

"অল ইণ্ডিয়া সাপ্লাই এজেন্সি" এই কৌতুক নাটকটি সম্মিলনীর সভ্য শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত। নাটকটির গল্প চমৎকার কিন্তু বাঁধন আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

গল্পটি আজকালকার ফিল্ম কোম্পানীদের উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত। এদের সভ্যেরা অভিনয় করেছিলেন ভালই। সবচেয়ে ভাল অভিনয় করেছিলেন ফুলবাতাসী ভৌমিকের ভূমিকায় পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের চিরঞ্জীব কোলে shooting. time direction দেওয়াটা সত্যই স্বাভাবিক। ত্রিশূল পাইনের মডার্ণ কৃষ্ণ চমৎকার! নৃত্য-শিক্ষক বাঁশবিহারী চাকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিমল ঘোষ তাঁর ১-২-৩-৩া ও আলিবাবার তাণ্ডব নৃত্যের নাচের pose বাস্তবিক দেখবার জিনিষ হয়েছিল।

তৎপরে এরা যোগেশ চন্দ্রের "পথের সাথী" অভিনয় করেন। এই নাটকে শশাঙ্ক সেন ও বসন্ত সেনের ভূমিকায় বিমল ঘোষ ও সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছিলেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের অমর মাষ্টার সুন্দর। রমেশ মিত্রের শরদিন্দু, সুধীর বন্দ্যোর নরেন্দ্র নারায়ণ, শোভার ভূমিকায় গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় অতি চমৎকার। চরণ বাবুর রুবি সুন্দর। সুমতির ভূমিকায় প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন এই প্রথম অভিনয় করছেন। যাই হউক তাঁর অভিনয় মন্দ হয় নি।

শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়

সঙ্গীত জগতের ... হরিপদ রায়ের নাম কারও অজানা নেই। হিন্দুস্থান রেকর্ডের মধ্য দিয়ে তাঁর গান আজ বাঙ্গলার প্রতি ঘরে ঘরে অনুকরণীয় বলে হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ইনি নিউ থিয়েটার্স ও হিন্দুস্থান রেকর্ডের অন্যতম ট্রেনার হিসাবে কর্ম্মক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করে রয়েছেন। আমরা বন্ধুবরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

ও যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন
মিলনের অগ্রদূত
সুভাষচন্দ্র ও লর্ড লোথিয়ান?

আমাদের লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে জননায়ক সুভাষচন্দ্র যখন বিলাতে আসিবেন তখন লর্ড জেটল্যাণ্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজনীতিকগণ তাঁহার সহিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা (Federation) ও কংগ্রেসের সহযোগিতার বিষয় আলোচনা করিবেন। এ বিষয়ে নাকি মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্রকে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়াছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্ত্তনের সময় সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিবেন সুতরাং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বা একটা বোঝাপড়া ইংরাজ রাজনীতিকদের পক্ষে সমীচিন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লর্ড লোথিয়ান বর্ত্তমানে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত আলোচনা মধ্যে আসন্ন যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিরোধিতা দূর করিবার মানসে এক ফরমুলা উদ্ভাবনে রত। অর্থাৎ আমাদের সংবাদদাতার মতে সুভাষচন্দ্র ও লর্ড লোথিয়ানকে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মিলন-দূত বলা যাইতে পারে।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিও হইতে

"রূপোর ঝুমকো"

পরিচালক : জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি
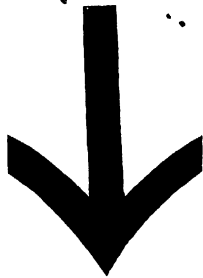
আলোক চিত্র-শিল্পী : বীরেন দে

প্রধান শব্দ যন্ত্রী : নৃপেন পাল

ভূপেন ঘোষ

শব্দ যন্ত্রী : অবনী চ্যাটার্জ্জী

গোবিন্দ ব্যানার্জ্জী

বিশিষ্ট ভূমিকায় :

ধীরাজ

নালু রায় (এঃ)

সত্য মুখার্জ্জি

কার্ত্তিক দে

ফনি মুখো

পারুলবালা

কমলা

কমলকুমারী

রাজলক্ষ্মী

বেলা প্রভৃতি

— ও কে এ প্রোডাকসন —

Regd. No. C. 1928
শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১১ চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ ভ্যারাইটীজ প্রেসে মুদ্রিত ও ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের পক্ষে ৯, রামময় রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

খেয়ালী চিত্রপট *

মেয়েটির নাম অরুণা। প্রফুল্ল পিকচার্সের "সখের-প্রমিক"-এ আমরা একে দেখতে পাব।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৯শে পৌষ ১৩৪৪, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৩৮ ২য় সংখ্যা

ঐক্যের আহ্বান ও পরিণতি

ভারতের রাষ্ট্রীয় আকাশে সদাসর্ব্বদাই যে কাল বৈশাখীর ঝড় উত্থিত হয় তাহার সর্ব্ব প্রধান কারণই হইতেছে সাম্প্রদায়িক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে ঐক্যের আহ্বান করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রকাশ করিলে সকলেই আশা করিয়াছিল রাষ্ট্রীয় আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ হয়ত এতদিনে অপসারিত হইতে চলিল। পণ্ডিতজীর এই তথ্যপূর্ণ বিবৃতি, যাহারা এতাবৎ কাল হীন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের মোহে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাদিগকে জাতীয় জীবনের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথকে সহজ করিয়া মিলনের পথকে সুগম করিয়া দিবে,—ইহাই সকলে ভাবিয়াছিল। তাই ছত্রীর নবাব এই বিবৃতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিতে এ পর্য্যন্ত যে বাধা বিঘ্ন অনুভূত হইতেছিল এক্ষণে তাহা অপসারিত হইবে। এমন কি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎফুল্ল হইয়া জমিয়ৎ উলেমা-হিন্দএর সেক্রেটারী ও মুস্লিম লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মৌলানা আমেদ স্বয়ং মিঃ জিন্নার নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া পণ্ডিতজীর এই বিবৃতি সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু পণ্ডিতজীর এই বিবৃতির প্রত্যুত্তরে মুস্লিম-লীগ সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না যে জবাব দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় পণ্ডিতজীর এই মিলন চেষ্টা হীন সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীগণ কর্ত্তৃক আরও বিঘ্ন সঙ্কুলই করিয়া তুলিবে। মিঃ জিন্নার মতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার উপর মুসলমানগণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না, অধিকন্তু তিনি যে যে প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল রহিয়াছে তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, "সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষভাবে মুস্লিমলীগের" বিরুদ্ধে ঐ সকল প্রদেশে অবিচারই চলিতেছে।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি যখন সাম্প্রদায়িক মিলনের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং যখন আশা

করিতেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবাদীগণের হয়ত এতদিনের ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করিবার সুমতি আসিয়াছে তখন এই সাম্প্রদায়িক দংশন চেষ্টা ও মিঃ জিন্নার কংগ্রেস প্রীতি এই অবজ্ঞাপূর্ণ বিবৃতি তাহাদিগকে ব্যথিতই করিবে।

গণতন্ত্রের আদর্শে পৃথক কোন রাজনীতিক অধিকারের দাবী থাকিতে পারে না। কারণ তাহাতে রাষ্ট্রের উন্নতিতে যথেষ্ট বাধা জন্মে ইতিপূর্ব্বেও আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি যে যাহারা সর্ব্বদাই সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধূয়া ধরিয়া থাকে তাহাদের সহিত আপোষ চেষ্টা কখনও কার্য্যকরী হয় না। রাষ্ট্রিক কল্যাণে তাহারা কখনও অগ্রসর হইবে না। তাহাদের অন্যায় ও যুক্তিহীন দাবী ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে। এবং এই সকল দাবী পূরণ করিয়া চলিতে হইলে রাষ্ট্রের উন্নতি ত দূরের কথা, বরঞ্চ রাষ্ট্রের অযথা শক্তিক্ষয়ই হইবে। সুতরাং এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার প্রতি কোন প্রকার মনযোগ প্রদর্শন না করিয়াই কংগ্রেসের কাজ করিয়া যাওয়া উচিত।

সম্প্রতি জিন্নার জবাব সম্পর্কে এক নূতন অবস্থার উদ্ভব হইতে চলিয়াছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পুনরায় এই মিলন চেষ্টাকে ফলপ্রসূ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি এতদ্ সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সহিত বহু আলাপ করিয়া মহাত্মাজী সকাশে উপস্থিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই ব্যাপারে মহাত্মাজী কি পন্থা অবলম্বন করেন সমগ্র দেশবাসী আজ তাহারই পরিণতি দেখিতে উন্মুখ।

শ্রীমল্লিনাথ

বরোদা হও বর-দা

বরোদার বর্ত্তমান গুইকোয়াড় স্যার সয়াজী রাও নিজে স্থবিরপ্রায় হোলে কি হয়, তাঁর পদার্পণে বাঙলার রাজধানী যৌবনের পুলকচঞ্চল হিল্লোলে টলটলায়মান হোয়ে উঠেছে। আনন্দের সে স্পন্দন মিয়াপুরী শ্রীগৌড়ীয় মঠ থেকে আরম্ভ কোরে দীঘির পাড়ের সংস্কৃত কলেজকে পর্য্যন্ত উতলা, আকুল কোরে তুলতে কসুর করে নি।—যা'র ফলে সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বজ্ঞ অধ্যক্ষপ্রবর অভিনব উপাধির মালা গলায় পরিয়ে বৃদ্ধ বরদাকে বরণ কোরে ঘরে তুলেছেন। আর গৌড়ীয়মঠের সভাপতি, বারাণসী-প্রবাসী মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ ছিলেন এই অভিনন্দন মহোৎসবের প্রধান পুরোধা।

অভিনন্দন পণ্ডিতেরা করুন, তা'তে কারুর কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু সেদিন এই গোপনন্দন-বন্দনার মাত্রাটা বেজায় বিকট রকমের দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। দ্বাপরের গোপান্ন-প্রতিপালিত যদুনন্দনকে একদিন এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দল দেবতা ব'লে স্বীকার করতেই রাজী হন নি—এখনো হয়ত অনেকে একটু ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যে যষ্টীধারী, মদনমোহন-প্রেমাভিখারী অনুকূল বায়ুবশে মতপরিবর্ত্তনকারী প্রমথনাথ যে যজ্ঞের হোতা, সেখানে শুধু নন্দনন্দন কেন নন্দের স্বজাতি যে কোন গোপের নন্দনই পূজার অর্ঘ্য লাভের অধিকারী হইবে—ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

সেদিন যে দৃশ্য দেখলাম, তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে শুধু বলতে ইচ্ছা করে—'আহা! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না!' সু-উচ্চ কুসুমগুচ্ছ পরিশোভিত সিংহাসনে পাদুকা-সনাথ বরোদা বরদারূপে সমাসীন—এক পার্শ্বে দুইখানি অপেক্ষাকৃত নিম্নাসনে দুইজন শ্বেতবরণ পুরুষপুঙ্গব (তন্মধ্যে একজন ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ)—পদতলে কেন্দ্রস্থলে সর্ব্বজ্ঞ অধ্যক্ষপ্রবর স্বয়ং—তাঁর চারিধারে কলিকাতার অগণিত গণ্য-মান্য পণ্ডিতমণ্ডলী। কেবল কয়েকজন ইংরাজিনবীশ অধ্যাপক বোধহয় আত্মসম্মান নষ্ট হ'বার ভয়ে এই অপমান-জনক আসন গ্রহণ করেন নি—বাহিরে বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন। আমরা এই সব দৃঢ়চেতা অধ্যাপকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘৃণ্য অপমানকর বসিবার ব্যবস্থায় প্রতিবাদ জানাবার সাহস হয়নি—একটিও তথাকথিত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের। যা'রা সংস্কৃত কলেজের বেতনভুক্ অধ্যাপক, তাঁদের কথা না হয় আমরা ছেড়েই দিলুম। কি করবেন তা'রা!—

'অন্ত্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিমনাটি ন নাটকম্!'

কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত রাজকীয় বেতনভোগী ন'ন, তাঁরা কোন্ স্বার্থসিদ্ধির আশায় এই হীনতা স্বীকার কোরেছিলেন—জানাবেন কি? সয়াজী রাওকে অভিনন্দন পত্রে "মহারাষ্ট্রপতি" বোলে সম্বোধন করা হোয়েছিল। এর চেয়ে শব্দের গ্লানি আর কি হোতে পারে, তা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীই জানেন। প্রকৃত মহারাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি—যিনি নিজ বাহু বলে দেশ জয় কোরেও ক্ষত্রবলের দর্পে দর্পিত হ'ন নি—সঞ্চিত রাজকোষের উষ্মায় ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলীর নম্রশিরোপরি আপনার সপাদুকা চরণ যুগল সাহঙ্কারে স্থাপন কোরে তাঁদের অবোধ্য বিজাতীয় ভাষায় বাণী শুনিয়ে কৃতার্থ কোরছেন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন নি—বরং এক সর্ব্বত্যাগী সংসার বিরাগীর ছিন্ন কন্থা বহন কোরে আপনাকেই ধন্য বোধ কোরেছিলেন। কিন্তু সিংহাসন ত' চিরদিনই সিংহের আসন থাকে না—সিংহের অবর্ত্তমানে শৃগালই তা'র উত্তরাধিকারী হোয়ে থাকে। অতএব সেজন্য অনুশোচনা করা বৃথা। কিন্তু আমরা অবাক্ হচ্ছি শুধু এই কথা ভেবে যে, কলিকাতার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ কি এতটা অপদার্থ হোয়ে উঠেছেন যে—আত্মসর্বস্ব অধ্যক্ষ মহাপ্রভুর এই অপমানজনক ব্যবহারেও কোনো একজন পণ্ডিত মহাশয়েরও সুপ্ত ব্রাহ্মণ্য জাগ্রত হোয়ে উঠল না!!

সয়াজী রাওএর পদতলে বসায় দাশগুপ্ত সাহেবের যথেষ্টই স্বার্থ ছিল—তা'র কতকটার সিদ্ধিও হোয়েছে বোলে শুনেছি। জানা গিয়েছে যে বরোদা তাঁর এই আনুগত্যে প্রীতিলাভ কোরে একটি সুবৃহৎ বৃত্তির ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হোয়েছেন। আরও কতদূর কি রফা হোয়েছে জানি না। তবে বরোদার কিউরেটর ও শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার, ডক্টর দাশগুপ্তের গুরুপুত্র (মমঃ ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র) ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটু সাবধান হোয়ে এসব বিষয়ে একটু চোক্-

কাণ খোলা রাখতে অনুরোধ করি, কারণ এসব প্রভুর শনির দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চ গদীতে আগুন লাগতে হয়ত বেশী দেরী হবে না—অন্ততঃ এরূপ একটা ইঙ্গিতের আভাস আমরা পেয়েছি। যদি তা' সত্যি হয়, তবে অধ্যক্ষপ্রবরের গুরু দক্ষিণার বহর একলব্যকেও ছাপিয়ে উঠবে!

সেদিন সর্ব্বজ্ঞ অধ্যক্ষবরের উচ্ছ্বাস ও উল্লাস একটা দর্শনীয় জিনিষ ছিল বটে! বাণভট্টের ভাষায় শ্লেষ-অনুপ্রাস-যমক-চমক দিয়ে একটি বক্তৃতা ক'দিন রিহার্স্যাল দিয়ে তৈরী কোরে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু মেধা-ত তাঁর কোন দিনই তেমন প্রবল নয়! তা'র ওপর আবার উদয়াস্ত রিসার্চ্চ আছে! অতএব, মাঝে মাঝে যে খেই হারিয়ে যাবে—তা'র আর বিচিত্র কি! কাজেই এই সব মালগাড়ী-প্রতিম লম্বা হইতে সুলম্বা বাক্যাবলীর মুখপাত তিনি কেঁদেই চলেছিলেন—অথচ কোনটা ঠিকমত শেষ হচ্ছিল না। পণ্ডিতমণ্ডলীও আপাত-দৃষ্টিতে বেশ নির্ব্বিকারভাবে এই পুরুষোত্তমের বিকট প্রলাপ গলাধঃকরণ করছিলেন। আচ্ছা; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সয়াজী রাওকে হঠাৎ তিনি কিরাতার্জ্জুনীয়ের শ্লোক বোলে দুর্য্যোধনের বিশেষণগুলিদ্বারা বিশেষিত কর্‌লেন কেন? তা'হোলে কি তাঁর মতে সার্ সয়াজী ও দুর্য্যোধন—একই পর্য্যায়ের লোক? বলিহারি অভিনন্দন বটে!

শুনা গেল—তিনি সয়াজী রাওকে তাঁর রিসার্চ্চ ছাত্রীবৃন্দের সহিত পরিচিত কোরে দিয়েছিলেন! 'ছাত্রীবৃন্দের'—কথাটা বোধ হয় গৌরবে বহুবচনের মত! কারণ ছাত্রী-হিসাবে একজনই মাত্র উপস্থিত ছিলেন—অজামেকাম্। অপর তিনজন মহিলার মধ্যে একজন মিসেস্ দাসগুপ্তা, অপর দুইজন তাঁহারই দুইটি দুহিতা।

বরোদাকে সেদিন এক উপাধিও দেওয়া হোয়েছিল! অধ্যক্ষবর যখন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে "কবি সার্ব্বভৌম" উপাধি দিয়েছিলেন, সেদিন একটু আনন্দিত হোয়েছিলাম এই ভেবে যে,—রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবিদ্বেষী—আজ তিনিও সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দেওয়া উপাধি নিতে বাধ্য হোলেন—দাশগুপ্ত সাহেবের বাহাদুরি বটে! তা'র পর সারফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যাণ্ডকে যখন "ক্রমকেশরী" উপাধি দেওয়া হোলো, তখন একটু অবাক্ হোলুম—যে কথাটার মানেই বা কি!—আর ব্যাপারটার পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্যই বা কি আছে! কিন্তু এবার আমাদের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন—গুইকোয়াড়কে উপাধি দিয়া। আর সে কি যে-সে উপাধি—একেবারে—"ভূপতি চক্রবর্ত্তী"! অধ্যক্ষবর ইংরাজীতে আবার ব্যাখ্যাও কোরে দিয়েছেন "King of Kings"!!! এ রকম উপাধি দিলে রাজদ্রোহ বা সম্রাটদ্রোহ হয় কি না—তা' সহযোগী "আজাদ" হয়ত' ভাল বল্‌তে পারবেন! কিন্তু দাশগুপ্ত শ্রীভগবানের নিজস্ব এই উপাধিটি কেড়ে নিলেন কি

(সি, বি)

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ:—গত ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম ভারতবর্ষে এসে হাজির হয়েছেন। ভারতে এরা যে কয়টি ম্যাচ খেলেছেন বা খেলবেন তার মধ্যে সব চেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে 'টেষ্ট' ম্যাচগুলি। যদিও এই 'টেষ্ট' ম্যাচগুলি আন্অফিসিয়াল্ বলে ঘোষিত হয়েছে তাহলেও এই খেলাগুলির গুরুত্ব ও আকর্ষণ 'অফিসিয়াল্' টেষ্ট ম্যাচগুলির চেয়ে বিশেষ কম নয় বলেই মনে হয়। এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে যদি ভবিষ্যতে কখনও ইংলণ্ড কিংবা অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ার 'অফিসিয়াল টেষ্ট' ম্যাচ খেলার সুযোগ ঘটে। 'অল ইণ্ডিয়া' দল এই বিলাতী ক্রিকেট টীমটির কাছে 'লাহোর' এবং 'বম্বের' দুটি টেষ্ট ম্যাচে যথাক্রমে ৯ উইকেট ও ৬ উইকেটে পরাজিত হবার পর বাকী কলিকাতা এবং মাদ্রাজের টেষ্ট ম্যাচ দুটির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

কোরে—কোন্ সাহসে? আমাদের কোন রসিকবন্ধু বলছিলেন—দাশগুপ্ত সাহেবের উপাধি দেবার অধিকার খুবই আছে—কারণ, ছেলে-বেলায় তাঁর ডাক নাম ছিল "খোকা ভগবান্" !!!

এবার মহামান্য মন্ত্রীবর ফজলুল হক্ ও নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়দ্বয়ের উপাধিদান সভায় নিমন্ত্রিত হবার আশায় ধৈর্য্য ধোরে রইলাম্ !!!

—:—

শৃঙ্খলা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করবার জন্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই 'প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েশন' আছে। আবার এই সকল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট কন্‌ট্রোল্ বোর্ড' গঠিত হয়েছে। এই কনট্রোল্ বোর্ড প্রাদেশিক

মস্তাক আলি

এসোসিয়েশনগুলি এবং 'নিখিল ভারতীয়' খেলাগুলি পরিচালনা করেন। কনট্রোল্ বোর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীমের সঙ্গে এবারকার এই টেষ্ট ম্যাচগুলি খেলবার জন্য বোম্বাইয়ের বিজয় মার্চেন্টকে 'অল্ ইণ্ডিয়া' দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচন করেছেন এবং মিঃ মার্চেন্ট ও কলোনেল্ মিস্ত্রীকে টীম্ নির্ব্বাচন করার ভার দিয়েছেন। বোর্ড এই সঙ্গে এদের দুজনকে যথাসম্ভব তরুণ এবং উদীয়মান্ খেলোয়াড়দের নিয়ে অল ইণ্ডিয়া টীম গঠন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

বিজয় মার্চেন্ট

সেই কারণে এখন অবধি যে তিনটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে সেগুলিতে তাঁরা সেই উপদেশ অনুসারেই টীম্ নির্ব্বাচন করেছেন। লাহোর এবং বোম্বাইয়ের দুটি খেলায় তাঁদের এই নীতি অনুযায়ী টীম নির্ব্বাচন মোটেই কার্য্যকরী হয় নি তার প্রমাণ এই রকমের প্রতিনিধিমূলক খেলায় 'অল্ ইণ্ডিয়া' দলের শোচনীয় পরাজয়। তাঁদের এই নীতি যে খুবই প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তবে এই নীতি পালন করার সঙ্গে টীমের শক্তি সম্বন্ধেও তাঁদের সজাগ থাকা উচিৎ। টীমের শক্তির সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে লাহোর 'অল্ ইণ্ডিয়া' দলের নিন্দনীয় পরাজয়ের পর দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের টীম্ মনোনয়ন করার আগে তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে দুচারজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ও যে টীমকে শক্তিশালী করবার জন্য থাকা দরকার তা নির্ব্বাচন্ কমিটী বুঝেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য বিখ্যাত এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় মেজর সি, কে, নাইডুকে তাঁরা আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বাচকদ্বয় ব্যক্তিগত কারণে মেজর নাইডুকে বোম্বায়ে উপস্থিত করিয়েও নিজেদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এবং এইরকম একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় 'অল্ রাউণ্ডার ক্রিকেট

অমর সিংহ

খেলোয়াড়ের দ্বিতীয় টেষ্ট টীমে স্থান পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝেও তাঁকে নির্ব্বাচন্ করতে পারেন নি। এই ব্যাপারে যে কোন মহৎ ব্যক্তির মহৎ উদ্দেশ্য সফল হক্, সাধারণের অতে কিছু স্বার্থ নেই কিন্তু মিঃ মার্চ্চেন্ট এবং কলোনেল্ মিস্ত্রী এই বিষয়টির সমর্থন করে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে পরাজয়ের অসম্মান সামান্য একটু কমেছিল কিন্তু মেজর নাইডুর মত একজন খেলোয়াড় টীমে থাকলে যে এই অসম্মানের একেবারে অবসান হত না তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। যাক্ ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি মনযোগী হয়ে 'নিখিল ভারতীয়' স্বার্থের প্রতি অবহেলা করে হয়ত তাঁরা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। তবে এই সমস্ত গূঢ় ব্যাপারগুলি বিবেচনা করার পরই আমন্ত্রন লিপিখানি 'ইন্দোরে' পাঠালে এই ব্যাপারগুলির গূঢ়ত্বও অনেকটা বজায় থাকত এবং মেজর নাইডুকেও এই অনিচ্ছাকৃত অসম্মান্ করার জন্য সাধারণের কাছে তাঁদের দায়ী হতে হত না।

কলিকাতায় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ্টি খেলা আরম্ভ হবার দুএকদিন আগেই অল ইণ্ডিয়া টীমের অধিনায়ক মিঃ মার্চ্চেন্ট এবং কলোনেল্ মিস্ত্রী এখানে এসে পৌছেছিলেন্। খেলার আগের দিনই মহম্মদ্ সৈয়দ ও পাতিয়ালার যুবরাজ ব্যতীত সমস্ত আমন্ত্রিত খেলোয়াড়গণ কলিকাতায় আসেন এবং 'ইডেন গার্ডেনে' নেট্ প্র্যাক্টিস্ করেন। বিকালে খেলোয়াড়দের নেট্প্র্যাক্টিস্ দেখার পর সন্ধ্যার সময় 'অল ইণ্ডিয়া টীমে', কে কে খেলবেন্ সঠিকভাবে ঘোষিত হবে বলে ক্রীড়ামোদীরা উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ খেলা আরম্ভ হবার আধঘন্টা আগে সঠিক্ টীম্ মনোনয়ন শেষ হয়। কারণ কলিকাতার এই তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ্টিতে "বেঙ্গল ও আসাম্ ক্রিকেট এসোসিয়েশন" বাংলার দুইজন খেলোয়াড় কমল ভট্টাচার্য্য ও কার্ত্তিক বসুকে তৃতীয় টেষ্ট টীমে স্থান দেবার

মহম্মদ নিসার

জন্য নির্ব্বাচন কমিটীকে অনুরোধ করেন, এবং তাঁরা সৈয়দ ও পাতিয়ালার যুবরাজের পরিবর্ত্তে এদের দলভুক্ত করেন। সম্ভবতঃ কমল ভট্টাচার্য্যের নেট্ প্র্যাক্টিসে সন্তুষ্ট না হতে পেরে তাঁরা কেবল কার্ত্তিক বসুকে নির্ব্বাচন্ করেন। কিন্তু কার্ত্তিক বসু খেলার দিন সকালে কলিকাতায় পৌচান্ এবং তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই খেলায় যোগদান করতে অসম্মতি জানানর পর সঠিকভাবে খেলোয়াড়দের নাম প্রচার করা হয়। কার্ত্তিক বসুর অসম্মতি জানানর পর কমল ভট্টাচার্য্যকে টীমে স্থান না দেওয়ার জন্য বাংলার ক্রীড়ামোদীরা অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিঃ ভট্টাচার্য্য টেষ্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বাংলা দেশে অবশ্য ভাল বোলার এবং ব্যাটসম্যান্ হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছেন কিন্তু বিলাতী নামকরা খেলোয়াড়দের এই শক্তিশালী দলের সঙ্গে সমকক্ষতা করার উপযুক্ত খেলোয়াড় তিনি এখনও হ'ননি বলেই মনে হয়। কারণ এই দলের বিরুদ্ধে কুচবিহারের মহারাজার একাদশের পক্ষে খেলে, তিনি তাঁর সমর্থকদের একেবারে হতাশ করেছেন। ভবিষ্যতে তিনি তাঁর খেলার উন্নতি করে যদি 'টেষ্ট টীমে' নিজ স্থান নিজে করে নিতে পারেন তাহলে বাংলাদেশ তার জন্য গৌরব বোধ করবে। আমাদের মনে হয় এবিষয়ে ক্রীড়ামোদীদের অভিযোগ করা খুব যুক্তিসঙ্গত হবে না।

গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৭, ইডেন্ গার্ডেনে বেলা ১১টার সময় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচটি খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ দুটিতে পরাজিত হবার পর "অল্ ইণ্ডিয়া টীমের" খেলোয়াড়েরা একটু নিরুৎসাহ হয়ে খেলা আরম্ভ করলেও ক্রমে ক্রমে তাঁরা নিজেদের শক্তির পরিচয় দেন। অল্ ইণ্ডিয়া দল প্রথমে ব্যাট করিতে আরম্ভ করেন।

এল্, অমরনাথ

জনসমাগম্ অন্ততঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় দিন 'টেষ্ট' ম্যাচের উপযুক্তই হয়েছিল। কিছুদিন আগে কলিকাতায় বিলাতী ফুটবল্ টীমের খেলা হওয়ার দরুণ অনেকে আথিক দিক্ দিয়ে ক্রিকেট ম্যাচগুলি সাফল্য লাভ করবে না বলে আশঙ্কা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সে মত পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে। তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে 'অল্ ইণ্ডিয়া' দল ৯৩ রাণে জয়লাভ করেছে। এই জয়ের জন্য মস্তাক আলি, অমর নাথ, এবং ভিনু মান্কদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। এরা প্রথম ইনিংসে যথাক্রমে ১০১, ১২৩ এবং ৫৫ রাণ করেন। মস্তাক এবং অমরনাথ প্রথম দিনের খেলাতেই একটি করে 'সেঞ্চুরী' করেন। এর আগে ভারতবর্ষে একদিনে দুটি সেঞ্চুরী কোন খেলায় হয় নি। এবং তাহা ছাড়া কোন বিলাতী দল ভারতীয় দলের কাছে পরাজিত হননি। এই দুই কারণে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচটি বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেছে। বর্ত্তমানে জামনগরের খেলোয়াড় এস ব্যানার্জ্জি বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। নিশার, অমরসিং ও আমীর ইলাহি বোলিংয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন। মার্চ্চেণ্ট উপযুক্ত অধিনায়কত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু ব্যাটিংয়ে সুবিধা করতে পারেন নি। লর্ড টেনিসনের দলে হার্ডষ্টাফ্ ও ইয়ার্ডলে ব্যতীত আর কেউ ব্যাটিং সাফল্য দেখাতে পারেন নি। গোডার, পোপ, ওয়েলার্ড ও ল্যাংরিজ উল্লেখযোগ্য বোলিং করেছিলেন। প্রথম দিনে একটু খারাপ হলেও বিজিত দলের ফিল্ডিং প্রশংসনীয় হয়েছিল। এই চারদিন-ব্যাপী খেলাটি গত ৩রা জানুয়ারী শেষ হয়। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এই খেলাটি একটি নূতন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলো।

অল্ ইণ্ডিয়া দল্

প্রথম ইনিংস্

মস্তাক্ আলি ক এডরিচ্ ব গোডার ১০১

ডি হিন্দেল্কার ক এডরিচ ব গোডার ১০

ভি মান্কদ্ ক ওয়েলার্ড ব গোডার ৫৫

অমরনাথ এল বি ডবলু ব পোপ ১২৩

ভি মার্চ্চেণ্ট এল বি ডবলু ব ওয়ার্দ্দিংটন্ ১৯

কুমারুদ্দীন এল বি ডবলু ব গোডার ৪

আব্বাস খাঁ ক এডরিচ ব পোপ ২

অমর সিং নট আউট ৯

এস ব্যানার্জ্জি ব পোপ ২

আমীর এলাহি ক ম্যাকরকেল্ ব পোপ ০

মহম্মদ নিশার এল বি ডবলু ব পোপ ০

অতিরিক্ত ২৫ মোট ৩৫০

বোলিং—গোডার ৯৩ রাণে ৪, ওয়েলার্ড ১০৯ রাণে ০, পোপ ৭০ রাণে ৫, ল্যাংরিজ ২৫ রাণে ০ ও ওয়ার্দ্দিংটন ২৮ রাণে ১ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংস

মস্তাক্ আলি ক ম্যাকরকেল্ ব ল্যাংরিজ ৫৫

ডি হিন্দেল্কার ক ওয়েলার্ড ব ল্যাংরিজ ৬০

ভি মানকদ্ ব ল্যাংরিজ ২৫

অমরনাথ ক ওয়ার্দ্দিংটন্ ব ল্যাংরিজ ০

ভি মার্চ্চেণ্ট এল বি ডবলু ব ওয়েলার্ড ৯

কুমারুদ্দীন এল বি ডবলু ব ওয়েলার্ড ২

আব্বাস খাঁ ব ল্যাংরিজ ১৩

অমর সিং ব ওয়েলার্ড ২

এস ব্যানার্জ্জি ক ম্যাকরকেল ব ওয়েলার্ড ০

আমীর এলাহি নট আউট ১৫

মহম্মদ নিশার ব ল্যাংরিজ ১

অতিরিক্ত ১৬ মোট ১৯২

বোলিং—গোডার ৯ রাণে ০, ওয়েলার্ড ৬৭ রাণে ৪, পোপ ৫৫ রাণে ০, ল্যাংরিজ ৪১ রাণে ৬ এবং ওয়ার্দ্দিংটন্ ১০ রাণে ০ উইকেট।

লর্ড টেনিসনের দল

প্রথম ইনিংস

এডরিচ ক নিশার ব অমর সিং ১৯

ম্যাকরকেল্ ক নিশার ব আমীর ইলাহি ২৮

হার্ডষ্টাফ ক হিন্দেলকার ব নিশার ৫৯

ইয়ার্ডলে " " " ৩৮

ল্যাংরিজ " এস ব্যানার্জ্জি " " ০

ওয়ার্দ্দিংটন্ এল বি ডবলু " " ১

গিব " " [illegible]

ওয়েলার্ড ব আমীর ইলাহি ২২

লর্ড টেনিসন ব অমর সিং ২৮

পোপ নট আউট ৪১

গোডার ক হিন্দেলকার ব অমর সিং ৩

অতিরিক্ত ১২ মোট ২৫৭

বোলিং—নিশার ৭৯ রাণে ৫, অমর সিং ৬৫ রাণে ৩, এস ব্যানার্জ্জি ৪০ রাণে ০, অমরনাথ ৮ রাণে ০, আমীর ইলাহী ৫১ রাণে ২ এবং মান্কদ্ ২ রাণে ০ উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংস

এড্রিচ ক মানকদ্ ব অমর সিং ৩

ম্যাকরকেল্ ব অমর সিং ৩

হার্ডষ্টাফ " " " ৪৯

ইয়ার্ডলে ক মস্তাক আলি ব অমর সিং ১৫

ল্যাংরিজ ক এবং ব মান্কদ্ ৩০

ওয়ার্দ্দিংটন্ ক আমীর ইলাহী ব মানকদ ১১

গিব্ নট আউট্ ২৯

ওয়েলার্ড ক এস ব্যানার্জ্জি ব আমীর ইলাহী ১৫

লর্ড টেনিসন্ ক মানকদ্ ব " ৮

পোপ ক হিন্দেলকার ব মান্কদ্ ২

গোডার ক নিশার " " ১৩

অতিরিক্ত ১৪ মোট ১৯২

বোলিং—নিশার ২২ রাণে ০, অমর সিং ৭৬ রাণে ৪, অমরনাথ ৮ রাণে ০, আমীর ইলাহী ২৫ রাণে ২ এবং মানকদ্ ৪৭ রাণে ৪ উইকেট।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ

অল ইণ্ডিয়া দল প্রথম ইনিংসে ১২১ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৯ রাণ করেন।

লর্ড টেনিসনের দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ২০৭ এবং ১ উইকেটে ১৪৪ রাণ করেন।

লর্ড টেনিসনের দল উইকেটে জয়ী হন

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ

অল্ ইণ্ডিয়া দল প্রথম ইনিংসে ১৫৩ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৮ রাণ করেন।

লর্ড টেনিসনের দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১৯১ এবং ৪ উইকেটে ১৭১ রাণ করেন।

লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে

নাট্য-তরঙ্গ

(শ্রীনটশেখর)

লিলি—রাণীবালা

রঙমহলে “স্বামী-স্ত্রী”

রঙমহলে শচীন্দ্রনাথের “স্বামী-স্ত্রী” দেখলাম। চমৎকার নাটক, চমৎকার অভিনয়, নিখুঁত পরিচালনা, রুচি-মার্জ্জিত দৃশ্যপট। এমন সামাজিক নাটকের অভিনয় আমরা বহুদিন দেখিনি। নাটক দেখে ও ভীড় দেখে মনে হ'ল—বাঙলার মরণোন্মুখ রঙ্গমঞ্চে এ যেন মৃতসঞ্জীবনীর প্রলেপ !

নতুন ধরণের গল্প “স্বামী-স্ত্রী,” নতুন টেকনিক্, জোরালো ভাষা—এক কথায় শচীন্দ্রনাথ এতদিনকার সাধনা সবই যেন নিঃশেষিত কোরে রচনা কোরেছেন এই নাটক। , চারিটি অঙ্কে, চারিটি দৃশ্যে নাটকের পরিণতি। প্রথম অঙ্ক ‘কমল কলি’, দ্বিতীয় ‘কলির কম্পন’, তৃতীয় ‘কুঁড়ি ফোটায় স্পন্দন’ ও চতুর্থ অঙ্ক ‘কলির শতদলে প্রকাশ’। গল্পটির চুম্বক হ'চ্ছে ললিত ও লিলি স্বামী-স্ত্রী হ'লেও তাদের মধ্যে বনিবনা ছিল না। ললিত লিলিকে স্ত্রীর মত পাবার জন্যে ছিল সদাই ব্যাকুল—কিন্তু তার এ অতৃপ্ত আকাঙ্খা যখন কিছুতেই ফলপ্রসূ হ'ল না, তখন সে লিলির মাসতুতো বোন বুদ্ধিমতী মিনতির চাইল সাহায্য। মিনতি ভালবাসতো ললিতকে—ঘটনাচক্রে লিলির সঙ্গে বিয়ের পূর্ব্বে ললিত ও মিনতি জানতো তারাই হবে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু ছোট বোনের সুখের জন্য মিনতি বিসর্জ্জন দিল আত্মসুখ এবং লিলি ও ললিত যাতে সুখী হয় সেই চেষ্টাই ছিল তার। এমন কী একদিন যখন গহন অরণ্যে লিলি ধনী ও সুশ্রী যুবা মোহনের কাছে দেহ বিলিয়ে দিতে চাইল—তখন মিনতিই মোহনকে শিক্ষা দিল মানুষ হ'তে।

তারপর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ‘স্বামী-স্ত্রী’-র ভেতর প্রেমের জোয়ার বইল—কিন্তু সেই স্রোতের মুখে পড়ে ‘মিনতি’ দিল আত্মাহুতি। আর মোহন—যে তাকে মানুষ হবার মন্ত্র শিখিয়েছিল তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিরুদ্দেশের পথের যাত্রী হ'ল।

নাটকখানির পরিচালনা বেশ ঝরঝরে, তকতকে এবং পরিচালক দুর্গাদাস যে একজন গুণী ব্যক্তি তা' প্রকাশ পেয়েছে এই নাটক পরিচালনায়। শুধু নট হিসাবে নয়, নাট্য-পরিচালক হিসাবেও তাঁর স্থান আজ বহু উর্দ্ধে তার সপ্রমাণ হ'য়েছে “স্বামী-স্ত্রী”-তে।

মোহন—জহর গাঙ্গুলী

ললিত—দুর্গাদাস

দৃশ্যপট খুব জমকালো নয়; অথচ বেশ রুচি-মার্জ্জিত ও স্বাভাবিক। বনের দৃশ্য ও কয়লার খনিতে আগুন লাগার দৃশ্যে মনীন্দ্রনাথ দাসের (নানু বাবু) প্রশংসা করা যায়।

গানের সুরগুলি বেশ শ্রুতিসুখকর। আবাহ-সঙ্গীত ও সুর সংযোজনায় সিনেমার ‘টাচ’ বিশেষ কার্য্যকরী হ'য়েছে।

ললিতের ভূমিকায় দুর্গাদাস চমৎকার অভিনয় কোরেছেন। তাঁর অভিনেতা জীবনের এ একটি অপরূপ দান। লিলির অংশে রাণীবালার অভিনয়ও সুন্দর—কিন্তু সামাজিক নাটকে তার ‘মেলোড্রামাটিক্’ আবৃত্তি বিশেষ শ্রুতিকটু লাগল। তার গান বেশ লাগল। মিনতির ভূমিকায় উষা দেবীর অভিনয় এক কথায় ‘চমৎকার’। তাঁর সংযত অভিনয় সকলকে মুগ্ধ কোরেছে। মোহনের একটি সুন্দর ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী নিখুঁৎ অভিনয় কোরেছেন। মিঃ দাস রূপে সন্তোষ সিংহ চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত কোরে তুলেছেন। লিলির মা'র ভূমিকায় পদ্মাবতীর অভিনয় ভাল লাগল—কিন্তু মেক্-আপের দিকে তাঁর একটু দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত হ'য়েছে।

(বিলাসী)

"রাজগী"

কমলা টকীজের প্রথম নিবেদন

কাহিনী : ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত

চিত্র নাট্য ও পরিচালনা : } সুকুমার দাশগুপ্ত

চিত্র-শিল্পী : ননী সান্যাল

শব্দানুলেখ : মধু শীল

সঙ্গীত-পরিচালক : ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি

সুর-শিল্পী : কুমার শচীন দেববর্ম্মন

শিল্প-নির্দ্দেশনা : পরেশ বসু

ভূমিকায় : বিধু—মেনকা, দ্বিজেশ—ধীরাজ ভট্টা, সাবিত্রী—অরুণা, দেওয়ানজি—শৈলেন চৌধুরী, নরেন—মণি বর্ম্মা, রাণীমা—দেববালা, বিপিন—সত্য মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

প্রথম মুক্তি : "শ্রী", শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর '৩৭

চিত্র-পরিবেশক : রীডেন এণ্ড কোং।

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের বহু বিখ্যাত উপন্যাস "রাজগী"। উপন্যাস হিসাবে "রাজগী" যতই বিখ্যাত হ'ক, চলচ্চিত্রে যে এর গল্পের বিশেষ মূল্য নেই—এই ধারণাই আমাদের ছিল এতদিন। সেই যেদিন প্রথম চিত্র হিসাবে কমলা টকিজ "রাজগী" তুলবে বলে খবর পেলাম সেইদিন থেকে মুক্তির দিবস অবধি আমাদের বেশ ভয় ছিল! কিন্তু ছবি দেখে বুঝলাম, পরিচালকও যে আমাদের মত সন্দেহ না কোরেছেন, তা' নয়! তাই তিনি বুদ্ধিমানের মত গল্পের কাঠামোটি খাড়া রেখে সুকৌশলে গল্পটি অদল-বদল কোরে লোকের পছন্দ অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন। এবং চিত্রনাট্য রচনার সুকৌশলের জন্যই গল্পটি মনে লেগেছে সবারেরই।

ছবিখানা সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগেই আমরা বলে রাখতে চাই—ছবিখানা আমাদের ভাল লেগেছে খুব। এবং এবছরের তিনখানা ছবি বাদ দিলে তারই পরে স্থান দেওয়া যায় "রাজগী"-র। ছবিখানার পরিচালনা নিখুঁৎ না হ'লেও পরিচালকের মগজে যে যথেষ্ট কলাজ্ঞান আছে, একথা বেশ নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। আরও ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, যদি সুযোগ ও সুবিধা তিনি পান, তা' হলে অবিলম্বে তিনি প্রথম শ্রেণীর পরিচালক হিসাবে পরিগণিত হবেন। "রাজগী"-র আলোকচিত্রের কাজে ননী সান্যাল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির টোন, কম্পোজিশান্ প্রভৃতি দেখে তিনি যে সত্যই একজন গুণী ব্যক্তি, একথা বলতে আমাদের মোটেই দ্বিধা নেই! শব্দযন্ত্রের কাজ হ'য়েছে নিখুঁৎ। মধু শীল যে এরকম কাজ কোরবেন এ আর আশ্চর্য্য কী! ছবিখানার আর একটি অমূল্য সম্পদ এর সঙ্গীতাংশ। আবহ-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত এত চমৎকার আমরা খুব কম ছবিতেই শুনেছি। সম্পাদনার কাজে সন্তোষ গাঙ্গুলী ও পরিস্ফুটনাগারের কাজে কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি খুব বেশী কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও তাঁদের কাজ মোটের ওপর মন্দ নয়। ছবিখানার সেট ও আসবাব পত্রের প্রশংসা করা যায়।

অভিনয়ে সকলেই বেশ উৎরে গেছেন। এদের মধ্যে আবার মেনকা, ধীরাজ ও সত্য-মুখার্জ্জির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাবিত্রীর ভূমিকায় অরুণার প্রাণহীন অভিনয় আমাদের খুশী কোরতে পারে নি। এত বড় একটি কঠিন অংশে অরুণাকে নামানো আমরা সমর্থন কোরতে পারি না। দেববালা চরিত্রোপযোগী গাম্ভীর্য্য রেখে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন। শৈলেন চৌধুরী মোটের ওপর মন্দ নয়—মণি বর্ম্মাও তাই। কানু বন্দ্যোঃ ও হেম সেনের ক্ষুদ্র ভূমিকা দু'টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ, ভবানী দাস ও গিরীণ চক্রবর্ত্তীর গানগুলো এককথায় চমৎকার! কিন্তু দেনকার গান অচল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মোটের ওপর ছবিখানা দেখে আমরা খুব খুশী হ'য়েছি এবং এই ছবির সমস্ত কর্ম্মীবৃন্দের সাফল্যের আন্তরিক চেষ্টার জন্য আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(হিন্দী)

নিউ থিয়েটার্সের চিত্র

পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া

আলোক-চিত্রী : বিমল রায়

শব্দধর : অতুল চ্যাটার্জ্জি

সুর-শিল্পী : পঙ্কজ মল্লিক

প্রথম মুক্তি : 'নিউ সিনেমা' ২৫ শে ডিসেম্বর '৩৭

ছবিখানার পরিচালনা, আলোক-চিত্র, শব্দ-সংযোজনা, সঙ্গীত পরিচালনা প্রভৃতি সব বিভাগই বাঙলা "মুক্তি"-র ন্যায় প্রশংসনীয় হ'য়েছে।

অভিনয়ে বড়ুয়ার প্রশান্ত পূর্ব্ববৎই চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে, তবে হিন্দি উচ্চারণ ঠিক হয় নি নবাবের পাহাড়ী, প্রফুল্লরায়ের

কুলি সর্দার, জগদীশের মিঃ মল্লিক, কাপুরের বিপুল প্রশংসনীয়। কাননের চিত্রা ও মেনকার ঝর্ণা বাঙলার মত অনবদ্য রূপ পেয়েছে। পঙ্কজ মল্লিকের গান এক কথায় চমৎকার; কাননের ও কল্যাণীর গান শ্রুতি-সুখকর। মেনকার গান চলনসই।

মোট কথা, হিন্দি "মুক্তি" একখানা দেখবার মত ছবি—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

দুনিয়া-না-মানে

প্রভাতের এই সামাজিক ছবিখানি 'প্যারাডাইজ' সিনেমায় বেশ ভালভাবেই চলছে। প্রসিদ্ধ ডাইরেক্টর শান্তারামএর অপূর্ব্ব পরিচালনা এবং শ্রীমতী শাণ্ডা আপ্তের অভিনয় ও সঙ্গীত লহরী যে এই বই খানিতে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তা আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি।

নিউ থিয়েটার্স

নীতিন বসু পরিচালিত ছবি 'দেশের-মাটী'র কাজ এখন ষ্টুডিওর সেটের মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। পল্লীগ্রামের কুঁড়ে ঘরে থাকে গৌরি (উমা)—সহরের ধার ধারেনা। হঠাৎ সেই গৌরির সঙ্গে দেখা হ'ল অরুণার (চন্দ্রা)—সহরের ধনী শিক্ষিতা মেয়ে। সে পল্লীর সৌন্দর্য্য দেখবার জন্যে এখানে বেড়াতে এসেছে। এই সিনগুলো এখন তোলা হচ্ছে চমৎকার সেটের মধ্যে।

* * *

এদের 'অভিজ্ঞান' চিত্রও খুব দ্রুত-গতিতে তোলা হচ্ছে। ফণী মজুমদারের সাহায্যে পরিচালক প্রফুল্ল বাবুর নব উদ্যমে, বিমল রায়ের আলোছায়ার ব্যবস্থা এবং জলু বড়ালের অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি যে এ ছবির সাফল্য আনবে, তাতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

* * *

দেবকী বাবু তাঁর 'বিদ্যাপতির' কাজ শেষ করে 'নিমাই সন্ন্যাস'এর পেপার ওয়ার্ক আরম্ভ করেছেন। দেবকী বাবুকে সাহায্য করবার জন্যে দীপালী সম্পাদক 'চন্দ্রশেখর' সহকারী পরিচালক হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন।

* * *

এদের দু'নম্বর বাড়ীতে পরিচালক বড়ুয়ার গল্প লেখার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম থেকেই শুটিং আরম্ভ হ'বে এও একরকম ঠিক্। বড়ুয়া সাহেবের গল্প নাকি আজকালকার আধুনিক City life এর ওপর base করেই তৈরি। এই ছবিতে নামবেন পাহাড়ী, শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখুজ্যে, পঙ্কজ মল্লিক, যমুনা, মেনকা, পূর্ণিমা, ইন্দরাত ও বড়ুয়া সাহেব নিজে।

* * *

মল্লিক মহাশয় তাঁর 'বড়দি'র পেপার ওয়ার্ক প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। 'অভিজ্ঞান' শেষ হলেই মল্লিক মশাই তার কাজ সুরু করে দেবেন।

কালী ফিল্মস

হাসিরাশির অফুরন্ত উৎসের ভিতর দিয়ে কালী ফিল্মসের প্রাণমাতানো হাসির ছবি "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে-"র শুটিং চলেছে। চার জোড়া নর-নারী কিভাবে মদনের ফুলশরে বিদ্ধ হ'য়ে তাদের মনের মানুষের কাঁছে আত্ম নিবেদন কোরল সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হাস্যরসের ভিতর দিয়ে সেই কাহিনীকেই কোরে তুলেছেন মনোহর। সম্প্রতি একটি আধুনিক ভাবে সজ্জিত কক্ষে বনলতা, শেফালি ও মিঃ চৌধুরীর প্রেমের প্রথম আখর টানা হচ্ছে। কিন্তু মিঃ চৌধুরীর যে কী উদ্দেশ্য, জীবন সঙ্গিনীরূপে কাকে পাবার ইচ্ছা তা' এখনও বোঝা যায় নি। ছবিখানাকে সবদিক থেকে সুন্দর কোরে তুলবার জন্য প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, পরিচালক সতু সেন, চিত্র-শিল্পী সুরেশ দাস, শব্দধর জগদীশ বসু, শিল্প-নির্দ্দেশক পরেশ বসু, ব্যবস্থাপক সতীশ সরকার—সবাই চেষ্টার কসুর কোরছেন না। এদিকে আবার রিহার্শেল ঘরে সুর-শিল্পী কমল দাশগুপ্ত সঙ্গীতের মহলা নিয়ে ষ্টুডিও দস্তুরমত সরগরম কোরে তুলেছেন। ছবির কাজ সেভাবে দিনরাত চলছে, তা'তে মনে হয় এই মাসের শেষেই ছবিখানার 'উত্তরা'-য় মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

* * *

এদিকে আবার দু' নম্বর ষ্টুডিওতে অবসর সময় রবীন্দ্রনাথের সেই প্রেম-বিরহের অপরূপ কাহিনী "চোখের বালি"-র চিত্র গ্রহণ সতু সেনের পরিচালনায় এবং মিঃ বি, পি, মেহরার তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলেছে। আপাততঃ মহেন্দ্রের বাড়ীর একটি বৃহৎ 'সেট' কাজ চলছে।

রবীন্দ্রনাথের যে কোনও বইতে অভিনয় কোরতে গেলে চাই শিক্ষা ও রুচি। সেই জন্যই প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী এই চিত্রে অভিনয় করবার জন্য যাঁদের মনোনীত কোরেছেন—এই দু'টি গুণে তাঁরা সমুজ্জ্বল। এঁদের মধ্যে শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জ্জি, শ্রীমতী ইন্দিরা রায়, ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি ও ছবি

বিশ্বাসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আমরা প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর এই দূরদর্শিতার জন্য তাঁকে প্রশংসা করি।

টকী অফ টকীজ

এই শনিবার থেকে 'উত্তরা'-য় কালী ফিল্মসের সর্বজন অভিনন্দিত "টকী অফ টকীজ" সাধারণের বিশেষ অনুরোধে দেখানো হবে। যাঁরা ছবিখানা এখনও দেখেন নি তাঁরা এ সুযেগে হারাবেন না।

হাজরা পিক্‌চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র-নিবেদন "দেবী ফুল্লরা"-র শুটিং বেশ জোরভাবেই চলেছে। প্রধান পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর অধীনে গিরিডির পর্ব্বত-সঙ্কুল অরণ্য, ঝরণা-নদীর প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভেতর বাইরের দৃশ্যগুলো এর মধ্যেই তোলা শেষ হ'য়েছে। তারপর আর কয়েকটি বিশিষ্ট দৃশ্য তোলার কাজ শেষ কোরেই তিনকড়িবাবু আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের কাজ সুরু কোরবেন এবং এইজন্য ইতিমধ্যেই পরেশ বসুর নির্দ্দেশনায় কালী ফিল্মসে সেট্ তৈরি হ'চ্ছে। এই ছবির আলোকচিত্রের কাজ ও শব্দযন্ত্রের কাজ কোরছেন যথাক্রমে দু'জন উৎসাহী তরুণ শিল্পী বিভূতি সাহা ও যতীন দত্ত। সুর-সংযোজনা কোরবেন গোকুল মুখার্জ্জি। আমরা এদের সমবেত চেষ্টা জয়যুক্ত হ'তে দেখলে বিশেষ খুশী হব।

মেট্রোপলিটান্ পিক্‌চার্স

'ডি-জি'র পরিচালনায় এদের "হাল বাঙলা"'র শুটিং বেশ খানিকটা এগিয়েছে। "হাল বাঙলার" গল্পটি আমরা যতদূর শুনেছি, তা'তে মনে হয় কাহিনী বেশ জমাটে। আর রস-পরিবেশনে ডি-জি সিদ্ধহস্ত সেইজন্য রসঘন-কাহিনী পর্দ্দায় বেশ জমবে বলে মনে হয়।

ও, কে, এ

আধুনিক যুগের রোমান্স বহুল হাস্যরস-পূর্ণ চিত্রকথা 'রূপোর ঝুমকো' এদের প্রথম ছবি। এর শুটিংএর কাজ সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। গত সপ্তাহে লেক অঞ্চলে কয়েকটি টাইপ চরিত্রের চিত্র অভিনয় দৃশ্যের শুটিং গ্রহণ করা হয়েছে। রাজপথে 'বাঙালে'র সঙ্গে ক্যালকেশিয়ান তরুণ যুবক সুতনুর বচসা, হাতাহাতির দৃশ্যে বেশ হাসির খোরাক যোগাবে। উপরোক্ত দুটি ভূমিকায় সত্য মুখার্জ্জী এবং নীলু রায় (এমেচার) খুবই নাকি স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন।

রাজবন্দী সাহায্য ভাণ্ডার

গত বুধবার পূর্ণ থিয়েটারে উক্ত ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে একটী চ্যারিটী শো-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং আগামী ১৭ই জানুয়ারী 'চিত্রা'য় আর একটী চ্যারিটী শো এর ব্যবস্থাও হয়েছে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে নিউ থিয়েটার্স ও পূর্ণ থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের বদান্যতা প্রশংসনীয়। আমরা আশাকরি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য সকল চিত্র-প্রতিষ্ঠানই নিজেদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিবেন।

চিত্রা

এখানে এখনও 'মুক্তির' জনসমাগম যে ভাবে হ'চ্ছে তাতে মনে হয় আরও কয়েক সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই চলবে। 'বিদ্যাপতি' দেখাবার জন্যে হয়ত' 'মুক্তি'কে ফেব্রুয়ারী মাসেই মুক্তি দিতে হ'বে।

নিউ সিনেমা

এখানে হিন্দি 'মুক্তি' এখনও বেশ ভাল ভাবেই চলছে।

পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটার্স এর শ্রেষ্ঠ ছবি 'দিদি' এই সপ্তাহেই শেষ। আসছে শনিবার থেকে এখানে নিউ পপুলার পিক্‌চার্স এর 'ইন্সপেক্টার' বা 'ধূমকেতু' দেখান হবে।

বিবিধ

ঊনপঞ্চাশী-দাদার ভবিষ্যত

আমাদের কেরামত "ঊনপঞ্চাশী" দাদা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্ট রেজিষ্ট্রেশন অফিসারের কার্য্যকাল গত ৫ই জানুয়ারী সমাপ্ত হইবার কথা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দাদা মধ্য পথে ঝুলিতেছেন। কাউন্সিলার যোগেশ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার কার্য্যকাল এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধির নোটিশ দিয়া এক বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। অপরপক্ষে কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় নোটিশ দিয়াছেন যে এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এম্, এন্, রায়কে উপেন বাবুর পদে বাহাল করা হউক। ওয়াকিবা-হাল ব্যক্তিবিশেষ মনে করেন যে, স্বর্গীয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র মোহন সেনগুপ্তকে এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করা হইবে কারণ এবার এ্যাসেসারের পদের মেয়াদ ফুরাইলে তিনি বেকারত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন মহাশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করার ফলে ব্যাপারটা বর্ত্তমানে ধামাচাপা পড়িয়া আছে এবং উপেনদা যথারীতি রূড়েয়ার মোড়ে নির্ব্বিকারচিত্তে কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় উপেনদার কার্য্যকাল এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি পাইলেও তিনি ১৯৩৮ সালের মধ্যেই অবসর গ্রহণ করিবেন বা পদত্যাগ করিবেন, কারণ ১৯৩৯ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি সিথির কেন্দ্র হইতে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন। তবে প্রশ্ন

হইতেছে অবসর গ্রহণান্তে যাহা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলে 'বন্ধুবর বিশ্বনাথ ও শঙ্কর-ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ নিতাই চরণ পালের মধ্যে কে বাদ প'ড়বেন তাহাই' বিবেচ্য।

ভারতীয় নৃত্য

বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির দিকে সুধী সমাজের দৃষ্টি পড়েছে। রবীন্দ্র নাথ সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় নৃত্যকলার প্রাচীন আদর্শকে উজ্জীবিত কর্ত্তে চেষ্টা করলেন। তারপর এলেন উদয়শঙ্কর। বিখ্যাত রাশীয়ান নর্ত্তকী আনা পাভলোভার সাহচর্য্যে তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতীয় নৃত্যকে সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলার সাধনা ও উজ্জিবনের উদ্দেশ্যে গত বৎসর বালীগঞ্জ ৩২নং হিন্দুস্থান পার্কে দেশের কয়েকটি শিক্ষিত ও উদ্যোগী কলাবিদের আগ্রহে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম Tne Institute of Indian Dances. অনেকদিনের প্রচেষ্টা ও সাধনার পর তারা শীঘ্রই কলকাতায় একটী প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য কলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নৃত্যকলাবিদ ও গবেষক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ইঁহাদের প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। তারই পরিকল্পনায় এই নৃত্য-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিতা মহিলাও ইহাতে যোগদান করেছেন। তার ভেতর কুমারী মঞ্জুলিকা ভাদুড়ী, কুমারী লতিকা রায়, কুমারী কণিকা রায়, কুমারী শেরিফা বেগম আমেদ, কুমারী নুরজাহান বেগম আমেদ ও কুমারী অসীমা সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রায় সকলেই ভারতীয় নৃত্য জগতে বহু পূর্ব্বেই যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

এই নৃত্য উৎসবের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হবে—এর সুরসংযোজনা বিখ্যাত সুরশিল্পী পণ্ডিত মুনেশ্বর দয়াল প্রাচীন ভারতীয় অবিমিশ্র রাগরাগিনীতে সকল নৃত্যের সুর দিয়েছেন। এবং বিখ্যাত ভারতীয় যন্ত্রীদের সাহায্যে এই নৃত্যের যন্ত্রী সংসদ গঠিত হয়েছে।

বিখ্যাত সুরশিল্পীদের সমন্বয়ে ও বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীদের সাহায্যে রূপে, ভঙ্গিমায়, সুরে এই প্রদর্শন ভারতীয় প্রাচীন গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আন্বে বলে আশা করা যায়।

কোন্নগর পাঠ-চক্রের বার্ষিক সম্মেলন

সম্প্রতি ডাঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে কোন্নগর স্কুল প্রাঙ্গণে ৺শিবচন্দ্র দেবের স্মৃতি উৎসব এবং 'পাঠচক্রে'র নবম বার্ষিক সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় প্রায় দেড় সহস্র নরনারীর সমাগম হইয়াছিল এবং 'মাইক্রোফোন' সাহায্যে সকলেরই শ্রুতিগম্য করার ব্যবস্থা থাকায় অতি সুচারুরূপে সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল বসুর ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক 'বন্দেমাতরম' গানের সহিত সভা আরম্ভ হয়। কোন্নগরের কয়েকটী বিশিষ্ট অনুষ্ঠান কর্ত্তৃক ৺শিবচন্দ্র দেবের স্মৃতি তর্পণের পর পাঠচক্রের সম্পাদক শ্রীশিতেন্দ্র নাথ মিত্র সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। বিমল ঘোষ একটী কবিতা এবং শ্রীশিশির ঘোষ "ভবিষ্যত ভারতে শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করার পর শ্রীপ্রবোধ সান্যাল রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা আবৃত্তি করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে, জাতি মরিয়াছে বা মরিতে বসিয়াছে এরূপ বলিবার বা ভাবিবার কোন কারণ নাই। মরণ, সে ত আছেই। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সাথে সংগ্রাম করিয়া জীবন স্রোতের দুর্ণিবার গতিকে অব্যাহত রাখিয়া জীবনকে পরাভূত হইতে দিব না। বর্ত্তমানের তরুণেরা ভবিষ্যতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া এই কথাই ত আমাদের শুনাইতেছে।

পরিশেষে শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের পাহাড়ী সান্যাল, প্রভাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও বিভিন্ন বরণের 'অর্কেষ্ট্রা' এবং স্থানীয় কুমারী মীরা সরকার ও গীতা সেনের সুমধুর সঙ্গীতে সকলে পরিতুষ্ট হন। সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শ্রীযুত অক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীযুত দেব প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুধীর বসু, শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুত ললিত মোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত জ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দি জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

দি জেনুইন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ জীবন বীমার কাজ মাত্র আড়াই বৎসর হইল আরম্ভ করিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা যেরূপ জীবন বীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। জীবন বীমা তহবিল বিশেষ আশাপ্রদ। মিতব্যয়িতা ও সুষ্ঠুভাবে কোম্পানীর পরিচালনাই এই কোম্পানীর উন্নতির মূল।

১৯৩৬ পর্য্যন্ত কোম্পানীর প্রথম ভ্যালুয়েশান একচুয়ারী মিঃ জে, সি, সেন দ্বারা করা হইয়াছে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, প্রথম ভ্যালুয়েশনেই কোম্পানী আজীবন বীমায় ও মেয়াদী বীমায় যথাক্রমে প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসর ১৫৲ এবং ১২৲ টাকা বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা বাস্তবিক কৃতিত্বের পরিচয়।

চারণ বিজয়লাল

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?"

প্রত্যেক চারণের কণ্ঠেই এই সঙ্গীতের ঝঙ্কার! যুগে যুগে চারণের দল এই সঙ্গীতের প্রেরণায় পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে জাতিকে মুক্ত করেছে। চারণ-আন্দোলনকে উপেক্ষা করা চলে না মোটেই কারণ, সাহিত্য আর সঙ্গীতের প্রভাব জাতীয় জীবনে চিরদিনই প্রচুর। শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে অপরিমিত শক্তি, অফুরন্ত প্রেরণা, অদম্য উত্তেজনা। "সাহিত্য জাতিকে দেয় নবজীবনের মন্ত্র, সঙ্গীত দেয় নবজীবনের উন্মাদনা।" রাজপুতানার উপত্যকায় আর প্রান্তরে চারণের দল মুক্তকণ্ঠে মুক্তির গান গেয়ে বেড়াত আর সহস্র সহস্র রাজপুত-তরবারি সূর্য্যকিরণে ঝক্‌ঝক্ ক'রে সেই গানে সাড়া দিত। "Marseillaise এর সুরের আগুন ফরাসী-বিপ্লবের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল একটা নূতনশক্তি। "বন্দে-মাতরম্" সঙ্গীত বাঙ্গালী জাতীর বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করেছে।

বিজয় বাবুকে চারণ নামে অভিহিত না ক'রে পারি না যখন তাঁর "চারণ-সিরিজের" পুস্তিকাগুলি পাঠ করি। "ত্রয়ী" এবং "অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ"এর প্রবন্ধগুলি মুক্ত, স্বাধীন, সত্য। তাদের ছত্রে ছত্রে পরাধীনতার ব্যথা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। স্বাধীনতা লাভের জন্ত তাদের প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমাদের মনের দরজায় উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা বহন ক'রে আনছে। স্বাধীনতার প্রতি হৃদয়ের তীব্র অনুরাগে "ত্রয়ী" ও "অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ"-এর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা কি এবং জীবনে তাঁর প্রয়োজন কতখানি স্বীয় বিশেষ ভাষা ও সুযুক্তির সাহায্যে বিজয়বাবু তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ শুধু সাহিত্য হিসাবে নয়, জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত-সঙ্গীত হিসাবে অমূল্য। তাঁর কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই "স্বাধীনতার মধ্যেই মনুষ্যত্বের গরিমা এবং দারিদ্র্যের অবসান। স্বাধীনতার মধ্যেই জীবনের প্রাচুর্য্য এবং আত্মপ্রকাশের আনন্দ। সতীত্ব হারিয়ে কোন নারীর বেঁচে থাকার যেমন মানে হয় না, মুক্তিকে হারিয়ে কোন জাতিরও তেমনি বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না।" স্বাধীনতা হারিয়ে আমাদের যে অগৌরব তা অসতী নারীর অগৌরবের চেয়ে কম তিক্ত নয়! সত্যই পরাধীন জাতীর পক্ষে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ সুকঠিন কারণ তাদের জীবনে অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, আশ্রয়ের অভাব! মুক্তির আনন্দ নেই যে জীবনে সে ত জড়! "ভারতবর্ষ শিল্পকলায় জাপানের সমকক্ষ হ'বে কি করে? জাপানীদের জীবনে যে মুক্ত প্রবাহ বহে যাচ্ছে ভারত-বাসীর জীবনে তার যে একান্ত অভাব! সেই প্রবাহের অভাবেই দুনিয়ার যত জঞ্জাল এসে জমা হচ্ছে ভারতীয় চরিত্রে। বিজয় বাবুর ভাষায় বলি, "যে জাতি স্বাধীনতা হারিয়েছে তার মনের সবখানি জুড়ে আছে দাসত্বের বেদনা। আর্ট বল, বিজ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল, সাহিত্য বল, বিশ্বপ্রেম বল—পরাধীন জাতির চিত্তে এ:দের কারও আসন নেই।" স্বাধীনতা আসুক—তারপর ভারতজননী ত বন্ধ্যা নন, ভারতের মৃত্তিকা ত' অনুর্ব্বর নয়—এ সব আপনিই জন্ম নেবে, বর্দ্ধিত হবে। যে দেশে কোটি কোটী নরনারী অনাহারে মরে, যে দেশের অসংখ্য শিশু-নারায়ণ বস্ত্রাভাবে শীতের দিনে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে, যে দেশের অগণিত মানবের অন্তর্দেবতা প্রতি মুহূর্ত্তে লাঞ্ছিত হয়, সে দেশে "সৃষ্টিতত্ত্ব আর প্রপঞ্চ, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ নিয়ে আলোচনা করবার…কি কোন সার্থকতা আছে?" সে দেশে চাই স্বাধীনতা, চাই মুক্তি;—মহাজন ও জমি-দারের রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি, শাস্ত্রের কারাগার থেকে মুক্তি, সমাজের নানাবিধ নিষ্ঠুর অনুশাসন থেকে মুক্তি, মন্ত্রের আধিপত্য থেকে মুক্তি, অতীতের কুসংস্কার থেকে মুক্তি।" এই মুক্তির আনন্দ আনতে হবে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি নর ও প্রত্যেকটি নারীর জীবনে। মুক্তি আমরা চাইব'ই তাতে যত বিপদ আসে আসুক—"ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে"; স্বাধীনতা আমরা চাইব'ই কারণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের কোটী কোটী মানুষের "ক্ষুধার্ত্ত মুখে দেবে অন্ন, তাদের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মনে দেবে জ্ঞান, তাদের নিরানন্দ হৃদয়ে দেবে আত্মপ্রকাশের আনন্দ, তাদের লাঞ্ছিত জীবনে দেবে মনুষ্যত্বের গরিমা। চারণ বিজয়লাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্বাধীনতাকে আবাহন করেছেন তাঁর প্রত্যেকটি প্রবন্ধে।

স্বাধীনতার পথে জাতীয় পতাকা বহন করে চলবে—যৌবন। যৌবনের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা, প্রতিভা আর উদারতাই

বহু বৎসরের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনার পাহাড়টাকে ধ্বংস করবে, এই কার্য্যে যাঁরা হ'বেন অগ্রণী তাঁদের মধ্যে অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক, তাঁরা হবেন "প্রথম শ্রেণীর" লোক—যেমন গান্ধী, তিলক, নাইডু, জহরলাল। স্বাধীনতার অভিযানে যাঁরা নেতৃত্বের গুরুভার নেবেন মাথায় তুলে তাঁদের সংগ্রাম কর্ত্তে হবে দুঃখের সঙ্গে, তাঁদের দলিত কর্ত্তে হবে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত কুসংস্কারকে, তাঁদের অঙ্গ ঢেকে যাবে পথের ধূলি আর কাদায়। "অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটিতে এই সত্য কথাটাই জোর করে বলা হয়েছে, যে স্বাধীনতা যখন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্ তখন স্বাধীনতা-আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ কর্ব্বে যারা তাদের থাকা চাই অসাধারণ প্রতিভা, অদম্য উত্তেজনা এবং অনমনীয় সাহস, সেই আন্দোলনের মুক্তাধারায় যারা প্রতিটি গ্রাম ও নগর, প্রতিটি ক্ষুদ্র কুটীর এবং প্রতিটি প্রাণ প্লাবিত করে দেবে তারা হ'ল যুবকের দল—যাদের মধ্যে ভয় ব'লে কিছু নেই, তুচ্ছ স্বার্থ ব'লে কিছু নেই, ব্যক্তিগত আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু নেই।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই এখন আমাদের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। চারণ বিজয়লাল দৃপ্তকণ্ঠে এই সঙ্গীতই আমাদের শোনাচ্ছেন। চারণ কবি হেমচন্দ্রের ছত্র ক'টি উদ্ধৃত ক'রে প্রবন্ধ শেষ কর্লাম;—

"একবার শুধু জাতি-ভেদ ভুলে,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ়পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।"

কুটিরখানি বাঁধব সেথায়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কুটির খানি বাঁধবো সেথায়
মনের মত ক'রে,
পাহাড় যেথায় দাঁড়িয়ে আছে
তুষার-মালা প'রে।

নদী যেথায় চ'লছে ব'য়ে
মধুর কলস্বনে—
দুই তীরে তার ফুটছে কুসুম
নিতুই নিরজনে।

সেথায় আমি বাঁধব বাসা
বিজন নদী তীরে,
পাহাড়, নদী, দখিন্ বাতাস
রইবে মোরে ঘিরে।

ব'সবে সেথায় নদীর চরে
চখা, চখির মেলা,
দল বেঁধে সব মরালগুলি
ক'রবে জলে খেলা।

ফাগুন রাতে ডাক্‌বে কোকিল
নীপের ডালে ব'সে,
বকুল ফুলে ভ'রবে কানন
প্রতি শীতের শেষে।

এক ফালি সে র'ইবে উঠান
যুঁই'র ঝাড়ে ভরা,
প'ড়বে সেথায় শুক্লারাতের
স্নিগ্ধ কিরণ ধারা।

শ্রাবণ রাতে ঝ'রবে বাদল
মেঘের গুরু ডাকে,
হাস্নুহানার আস্‌বে সুবাস
বাতায়নের ফাঁকে।

নদীর জলে ক'রব সিনান
নিত্য সকাল সাঁঝে,
প্রাণ খুলে গান গাইব সুখে
কণ্ঠে যে সুর রাজে।

ঝড়ের রাতে

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

শ্রীভূধর নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

চরিত্র—পুরুষ।

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ, বাড়ী কালীঘাটে।

অবিনাশ—ঐ অমিত শক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।

সমর মিত্র—ভবানীপুর থানার কর্ম্মচারী ও হরেনবাবুর সহপাঠী।

রামদহিন—হরেন বাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।

অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

চরিত্র—স্ত্রী।

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।

বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।

অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবিনাশ আমার কানে কানে ফিস্‌-ফিস্ করে' বল্লে—"ঐ এ-বি-সি-ডি।"

আমি—"কে?"

অবিনাশ—"ঐ ফরসা, চোখ জল-জলে, লম্বা জোয়ানটা।"

আমি—"চুপ্!"

এই সময় গম্ভীর স্বরে লোকটী বলতে আরম্ভ করলেন—"রাণী জ্যোতির্ম্ময়ি!—"

বাধা দিয়ে সিংহাসনারূঢ়া যুবতী বলে' উঠলেন—"আমি উষা—শুধু উষা! মা-বাপের দেওয়া নাম ছাড়া আমি অন্য নামে পরিচিত হ'তে চাইনি!"

মাথা নিচু করে গম্ভীরভাবে অভিবাদন জানিয়ে সম্পূর্ণ আবেগহীন নিষ্কম্পস্বরে লোকটী বলতে লাগলেন—"রাণী জ্যোতির্ম্ময়ি! রাজা চন্দ্রকেতুর বংশে যে আপনার জন্ম তা' নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে যাবার পর থেকেই নাগ-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের নেত্রীত্ব আপনার হাতেই দেওয়া হ'য়েছে। মহারাজ চন্দ্রকেতুর মহামন্ত্রী শশাঙ্কের বংশধর আমি রাজবংশীয়ের অনুপস্থিতিতে যতদূর সম্ভব যত্ন সহকারে সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করে' এসেছি। আমরা আদৌ আশা করিনা, যে আপনার হাতে সে মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'বে। আপনি যাঁকে বিবাহ করেছিলেন, তিনি রাজবংশীয় ছিলেন না। সুতরাং আমাদের নিয়ম মতে সে বিবাহ অসিদ্ধ হ'লেও, ঐ বিবাহের ফলস্বরূপ আপনার পুত্র উৎপন্ন হওয়ায় আমরা সে বিবাহ সিদ্ধ বলে' স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু আপনার গর্ভজাত সন্তান হ'লেও আপনার পুত্র রাজ-ঔরস-জাত নন। অথচ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ উত্তরাধিকারী হিসাবে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব আপনার পুত্রের উপর এসেছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক হ'লেও রাজপদে তাঁরই অভিষিক্ত হওয়া উচিত; আপনি শুধু তাঁর অভিভাবিকারূপে মুকুট-ধারণে অধিকারিণী। তিনি যখন রাজ-ঔরস-জাত ন'ন্' তখন তাঁর সিংহাসনে আরোহণ ও এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ নাগরাজের অভিপ্রেত কি না তা' জানা দরকার। তা' জানতে হ'লে নাগরাজের সম্মুখে আপনার পুত্রকে সমর্পন করতে হ'বে। যদি দেখা যায়, যে নাগরাজ তাঁর মস্তকে ছত্রধারণ কল্লেন, আমরা বুঝ্‌বো যে তিনি আপনার পুত্রের নেতৃত্ব অনুমোদন কচ্চেন। আর যদি আপনার পুত্রের নেতৃত্ব তাঁর অনভিপ্রেত হয়, তো তাঁকে তিনি ভক্ষণ করে ফেলবেন। অনেক দিন আগেই এই পরীক্ষা হ'তে পারিতো। কিন্তু আপনার হতভাগ্য মূর্খ স্বামীর পরামর্শে আপনি আপনার পুত্রকে দূরদেশে পাঠিয়ে দেন। তার ফলে সেই মূর্খ অকালে মৃত্যুকে বরণ করেছে, আর যার রক্ষণাবেক্ষণে আপনার পুত্রকে সে রেখেছিল, সে ভদ্রলোকও নানা প্রকারের উৎপীড়ন ভোগ করে, শেষে আমাদের সন্ধানে এই দ্বীপ পর্য্যন্ত এসে খুব সম্ভব কোন হিংস্র বন্যজন্তুর কবলে জীবন দিয়েছেন। আপনার পুত্র ও 'ঝল্‌মল' হীরা দুটোই এখন আমাদের হাতে। 'ঝল্‌মল্' হীরার উত্তরাধিকারী অবশ্য আপনার পুত্র, কিন্তু তা' পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আজ অমাবস্যা—পরীক্ষার দিন—আপনি পরীক্ষায় অনু-মোদন্ করুন। একটু ভেবে দেখুন, এই পবিত্র সম্পদ ও সম্মানের প্রকৃত—অধিকারী হ'য়েও যদি আপনার পুত্র তা' থেকে বঞ্চিত হ'য়ে থাকেন, তবে তাঁর জীবন অপেক্ষা মৃত্যুই কি বাঞ্ছনীয় নয়?"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে যুবতী বলতে লাগলেন—"আপনারা আমাকে রাণী করেছেন। একটা সিংহাসনে বসে, একটা মুকুট মাথায় দিয়ে আমি রাণী সেজে আছি। আপনি বলছেন, আপনি আমার মহামন্ত্রী। সিংহাসন, রাজছত্র, রাজমুকুট— এবং একদল লোক যদি রাজ্য হয়, তবে যে কোন রঙ্গমঞ্চও তো একটা রাজ্য। যে মণিমুক্তা একটা জঙ্গলে ভরা দ্বীপে মাটীর নীচে লুকানো রইলো, তাতে আর কাচ ও বোম্বাই-মুক্তায় তফাৎ কি? যে সোনার সিংহাসন এই গুহার মধ্যেই চিরকাল থাকবে, সে সিংহাসনে বসাতে আর রঙ্গমঞ্চের রাংতামোড়া সিংহা-সনে বসায় কি তফাৎ? "রঙ্গমঞ্চের" রাজার মাথায় সোনার মুকুটের মতই উজ্জল মুকুট থাকে, সেখানেও দু'দশজন লোক 'জয় মহারাজ অমুকের জয়' বলে গলাবাজী করে। কই—রঙ্গমঞ্চে রাজা হ'য়ে বস্‌তে পেলুম না' বলে গ্লানিতে কাউকে তো প্রাণ-বিসর্জ্জন করতে শোনা যায় নি?—সেই আফশোষে কারও কখনও জীবনে তো ধিক্কার জন্মায়

নি ? • তবে আমার পুত্রের এই সং সাজতে না পেলেই বা জীবন ও মরণে সমান হ'বে কেন ? রূপে, বিদ্যায়, বংশমর্য্যাদায় গৌরবান্বিত স্বামীর সহবাসে সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলুম। আপনারা, বিশেষতঃ আপনি, মূর্ত্তিমান আগুনের মত কেন আমার সে সুখের নীড় পুড়িয়ে দিলেন ? ছলে আমাকে ও আমার স্বামীকে কেন এখানে নিয়ে এসে বন্দী করলেন ? কি দরকার ছিল, আমার এখানে এসে এক বিস্মৃত যুগের নাটকীয় অংশের অর্থহীন মূক অভিনয়ে ? আপনাদেরই বা এতে স্বার্থ কি, তাও তো আমি বুঝ্‌তে পারি না। যতই আপনাদের কার্য্যাবলি আমি দেখছি, ততই আমার মনে হ'চ্ছে—আপনারা একটা পাগলের দল। একবার একটা লুপ্ত সম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ভুলে গিয়ে, আমার মাতৃত্বের চোখ দিয়ে আপনাদের কাজের সমালোচনা করুন দেখি। দেখতে পাবেন, আপনারা কতবড় নিষ্ঠুর—আপনারা কতবড় অধার্ম্মিক। স্ত্রীর সর্ব্বস্ব স্বামী—সেই স্বামীকে আপনারা হত্যা করেছেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ, মায়ের নয়নের মণি, সারা জীবনের সম্বল সন্তান—আমার সেই সন্তানকে আপনারা আপনাদের একটা উন্মত্ত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে চান। আরও চান, যে 'মা' তার সন্তানকে একটা অজগরের সামনে ফেলে দিতে সম্মতি দেবে। আপনারা কি! তবে শুনুন। আমি আপনাদের 'রাণী'—আপনারাই বলছেন। যদি আপনাদের রাণীর সম্মান আপনারা না করতে চান, তবে তার আদেশ শুনুন। ঐ 'মায়ের বাছা'কে মায়ের কোলে তুলে দেওয়া হোক্। যে পরীক্ষা আপনারা করতে চা'ন্, তা' হ'বে না। আমি কখনও তা'তে মত দেবো না।"

যাকে উদ্দেশ করে' যুবতী কথা বলেছিলেন, সেই লোকটি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বলতে লাগলেন—"আমার রাণীর ইচ্ছার সামনে আমি মাথা নত করছি। কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করা আমার সাধ্যাতীত। আমার কিম্বা আর কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার হ'লে আমাদের কিছুই বলবার থাকতো না। সবনতশিরে আমি আপনার আদেশ পালন করতুম। কিন্তু এই ব্যাপার সম্প্রদায়গত। এই নাগগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নেতা রাজপুত্র অথবা রাজকন্যা হওয়া চাই। আপনার পিতা রাজবংশীয়; সেইজন্য আপনাকে ঐ সিংহাসনে বসতে দেওয়া হ'য়েছে। আমি এতকাল এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করে' আসছি বটে। কিন্তু ঐ সিংহাসন এ পর্য্যন্ত শূন্যই পড়েছিল। কাজেই আপনার পুত্রের ঐ সিংহাসনে বসা নাগরাজের অনুমতি সাপেক্ষ। ব্যক্তিত্বের কথা ভুলে যান, রাণী! 'মাতৃত্ব' অতি মহৎ—সেই 'মাতৃত্ব' ও আপনাকে বিচার করে নিতে হ'বে। আপনি ধারণা করতে পারছেন না, যে সব রকম প্রবৃত্তির কত উঁচুতে এই বংশ-গৌরবের সোনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আপনি বলতে পারেন, যে আপনার পুত্রের সিংহাসনে প্রয়োজন নেই, কাজেই পরীক্ষাও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আপনার পুত্রের সিংহাসনে প্রয়োজন না থাকলেও, ন্যায্য নেতা থাকতে আমরা তাঁর নেতৃত্ব হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে থাকতে অস্বীকৃত। সুতরাং পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। এই সিংহাসন ও বিভবের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের সিংহাসন ও মূল্যহীন হীরামুক্তার আপনি তুলনা করেছেন। সে শুধু জানা এই সিংহাসনের ও এই বিভবের পবিত্র গৌরবের সম্বন্ধে আপনার অজ্ঞতা। মনে করে' দেখুন, কোন অতীতযুগের এক মহীয়সী মহিলা আপনি যে মুকুট ধারণ করে' আছেন, ঐ মুকুট মাথায় দিয়ে শোভা পেতেন। শত শত দাসদাসী, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যবল,—সেই গৌরবান্বিতার না ছিল কি ? বীরপত্নী, বীরমাতা সেই বীরনারীর অঙ্গুলী চালনে একটা রাজা—একটা রাজ্য চল্‌তো না কি ? আবার তাঁরই করুণাধারায় পুষ্ট হ'য়ে হাজার হাজার বুভুক্ষু নরনারী কৃতজ্ঞস্বরে 'জয় মহারাণীর জয়' বলে' তাঁর জয় ঘোষণা করতো না কি ? সে হৃদয়েও কি মাতৃত্বের স্থান ছিল না ? ছিল বই কি। তবে সে মাতৃত্ব কোমলা রমণীর তরল স্নেহধারায় পুষ্ট ছিল না—সে ছিল বীরত্বের রসে পুষ্ট। মা! আঁচল দিয়ে ঘিরে রাখলেই কি মায়ের কর্ত্তব্যের শেষ হ'লো ? জগন্মাতা কি দশহাতে দশটী প্রহরণ দিয়ে কার্ত্তিককে দৈত্যবধে পাঠিয়ে দেন নি ? কি জন্য তিনি তা' করেছিলেন ? দেবকুলের গৌরবরক্ষার জন্যই নয় কি ? জগন্মাতার মাতৃত্ব কি জগতের সমস্ত মায়ের অনুকরণীয় নয় ? মা শুধু চোখের জলে সন্তানের অভিষেক করেন না। সন্তানের জীবন যেমন তার কাছে কাম্য, সন্তানের গৌরবও তেমনি তাঁর কাছে বরণীয়। কোমলতার সঙ্গে কঠোরতাকে বরণ করে' নি'ন, মা! আজ রাজা চন্দ্রকেতুর স্মৃতিছাড়া কিছু আর নেই। কিন্তু সে স্মৃতি অতি পবিত্র। নাগগোষ্ঠী সম্প্রদায় সেই স্মৃতি আজও বজায় করে' রেখেছে, তাই এ সম্প্রদায় গৌরবান্বিত। যে পবিত্র বীররক্ত আপনার শরীরে প্রবাহিত হ'চ্ছে, তারই গৌরবরক্ষার জন্য আপনার সন্তানকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিয়ে, আমাদের নিজস্ব নেতাকে লাভ করবার সুযোগ করে' দিন মা!"

যুবতী স্থির স্বরে বল্লেন—"আপনি বংশ গৌরবের দোহাই দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, যে অনির্দ্দিষ্ট যার ফল, এমন বিপদের সামনে আমার সন্তানকে ফেলে দিলে আমার মাতৃত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ হ'বে না। বেশ কথা। কিন্তু কোন্ অজুহাতে আমাকে

বুঝিয়ে দিতে পারবেন, যে আমার স্বামীর হত্যাও ন্যায়-সঙ্গত ?"

লোকটী উত্তর দিলেন—"আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। আপনার পুত্র তাঁর কাছে ছিলেন না। কিন্তু, তবু তিনি এমনভাবে ছুটছিলেন, যাতে আমাদের ভ্রম হ'য়েছিল, যে বোধ হয় শিশুরাজা তাঁর কাছেই আছেন। কিছুদূর যেতে না যেতে আমরা তাঁকে ধরে' ফেলি। তখন দেখলুম শিশু তাঁর কাছে নেই। শিশুকে কোথায় রেখে এসেছেন তিনি'—এ কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কোন প্রকার সন্ধান দিতে অস্বীকৃত হ'ন। আমরা তাঁকে আমাদের সঙ্গে আসতে বলি। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে, আমরা বাধা দেবার পূর্ব্বেই, আত্মহত্যা করেন। তার কাছে যে রিভলভার ছিল, তা' আমরা জানতুম না। যদি জানতুম, তা' হ'লে কখনই তাঁকে আমরা আত্মহত্যা করবার অবকাশ দিতুম না। রিভলভারটা আমাদের কাজে লাগতে পারে স্থির করে' আমরা সেটা নিয়ে আসি। মৃতদেহ যেখানে পড়ে'ছিল, সেই খানেই পড়ে' থাকে। পরে আমরা জানতে পারি, যে 'ঝলমল্' হীরার এক অংশ তাঁর কাছে ছিল। অনেক কৌশলে সেই পবিত্র হীরা আমরা উদ্ধার করেছি। এখন শুনলেন আপনার স্বামীর মৃত্যুর ইতিহাস? তবে এ কথাও নিশ্চিত, যে রাজা চন্দ্রকেতুর বংশসম্ভূত না হ'য়ে যদি কেউ—ঐ হীরা ধারণ করেন, তবে তাঁর মৃত্যু অবধারিত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর গৌণ কারণ এই 'ঝলমল্' হীরা ধারণ করা।"

যুবতী ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

'মহামন্ত্রী' বলে যিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি—বলতে লাগলেন—"কান্নায় কোন ফল হ'বে না, মা। কান্নায় কখনও কোন ফল হয় নি। 'কাল' অতি নিষ্ঠুর। কান্নায় কালের মন গলে না। তা' হ'লে, আমাদের প্রতি কি আদেশ হয়?" পরীক্ষার অনুমতি দিচ্ছেন কি ?

যুবতী যেমন কাঁদছিলেন, তেমনি কাঁদতে লাগলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

'মহামন্ত্রী', বল্লেন—"সময় ক্রমশঃ অতিক্রান্ত হ'চ্ছে, রাত্রি শেষ হ'য়ে এলো। পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শিশুটিকে এখানে আনা হোক্।"

উপস্থিত লোকগুলোর মধ্যে দু'জন চলে গেল। যুবতী আকুলকণ্ঠে চিৎকার করে বলে' উঠলেন—"না—না।"

অবিনাশ চুপি চুপি বল্লে—"আমার অসহ্য হ'চ্ছে। লাফিয়ে পড়বো না কি ?"

আমি তার গা টিপে ইঙ্গিতে চুপ্ করতে বলে', তার কানে কানে বল্লুম—"দাঁড়াও, আগে ছেলেটীকে ওরা এখানে নিয়ে আসুক। ভুললে চলবে না, যে ছেলেটীকে উদ্ধার করবার জন্তই আমাদের এত বিপদের মধ্য দিয়ে এখানে আসা। এখন আত্মপ্রকাশ করলে তাকে আমরা আর নাও পেতে পারি।"

যুবতীটী এক-দৃষ্টে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দিকে চেয়ে আছেন। এই সময় এঁদের লোক একরাশি ফুল ও চন্দনাদি নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো। মহামন্ত্রী নিজে পূজা আরম্ভ করলেন। নানারকমের ফল, অন্নভোগ, দুধ প্রভৃতি যথারীতি নিবেদন করে দেওয়ার পরে, আরতি সারা হ'লো। এই সময়ে 'রাণী' হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে, দু'হাত প্রসারিত করে বলে উঠলেন—"আমার অমরনাথ! আমার অমর! ফিরিয়ে দাও, আমার জীবনের একমাত্র সম্বলকে ফিরিয়ে দাও! তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার ক্ষীণ আশার আলো নিবিয়ে দিও না!"

'মহামন্ত্রী'র ইঙ্গিতে দুজন লোক তাঁর সম্মুখে যেন তাঁর অগ্রগতি রোধ করে' দাঁড়ালো। বুঝলুম, ছেলেটীকে আনা হ'য়েছে। 'রাণী, সিংহাসনের উপর বসে পড়লেন।" তাঁর মাথা একটু একটু করে নীচু হ'য়ে এলো।

'মহামন্ত্রী', আবার 'রাণী'কে, আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"কোন ভয় নেই, মা! আমাদের শিশু-রাজার জীবন অকারণ বিপন্ন করবার অভিলাষ আমাদের কারো নেই। পাছে ক্ষুধার তাড়নায়, প্রকৃতি-পরিচালিত হ'য়ে 'নাগরাজ' শিশু রাজকে আক্রমণ করেন, সে জন্ত আমার পোষা বনমানুষের ছানাটীকে কাল তাঁকে উপহার দিয়েছি। সুতরাং আমাদের সমস্তার মীমাংসা খুব নিরপেক্ষ হ'বে। একান্ত যদি শিশু রাজপদে অভিষিক্ত হ'বার অনুপযুক্ত হ'ন, তা' হ'লেই 'নাগরাজ' তাঁকে ভক্ষণ করবেন, নতুবা নয়। আপনি আশ্বস্ত হোন্।"

'রাণী' কোন উত্তর দিলেন না। চুপ্ করে মাথা নীচু করে' বসে রইলেন।

অবিনাশ চুপি চুপি বল্লে—"'রাণী' ওরকম চুপ্ করে' আছেন কেন? একটু অস্বাভাবিক ঠেক্‌ছে যেন। উনি মূর্চ্ছিতা হ'ন নি তো?"

আমি—"খুব সম্ভব।' প্রস্তুত হয়ে থাক। যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের কাজ আরম্ভ হ'তে পারে।"

অবিনাশ বল্লে—"আমি সব সময়েই

এই সময়ে 'মহামন্ত্রী' বল্লেন—"ছেলেটীকে এখানে নিয়ে এস।"

আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমাদের ঠিক সামনে একজন ছেলেটীকে নিয়ে এসে উপস্থিত করলে। 'মহামন্ত্রী' ছেলেটীর মাথায় একটু মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিয়ে, তার হাতে একটী ফুল দিলেন। ছেলেটী—তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলো।

বেশ অনুভব করলুম, আমার পাশে অবিনাশ একটু একটু করে' যেন ফুলে উঠছে। খুব বেশীক্ষণ তাকে সংযত করে রাখা যাবে না।

দেখলুম উপস্থিত লোকগুলো একে একে গিয়ে সিংহাসনের পাশে দাঁড়ালো। 'মহামন্ত্রী' ও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মূর্ত্তির সামনে রইলো শুধু সেই শিশু—হাসিমাখা পবিত্রতার প্রতিকৃতি! 'মহামন্ত্রী' চিৎকার করে' বলে' উঠলেন—"১২ নং নামাও—১১ নং তোল।"

পরক্ষণেই একটা 'ঘর্ ঘর্' করে শব্দ হ'তে লাগলো। দেখলুম উপর থেকে একটা লোহার গরাদ দেওয়া ঘরজোড়া দরজা নেমে আসছে।

হঠাৎ 'রাণী' সুপ্তোত্থিতের মত সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। বিস্ফারিত চক্ষে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন—"অমর—আমার অমর!" তারপর বেদীর উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে এসে ছেলেকে তিনি বুকে তুলে নিলেন। কিন্তু মানসিক উত্তেজনার আধিক্যে তিনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে গেলেন, ছেলেটী কেঁদে উঠলো।

লোকগুলো ছুটে রাণীর পিছনে পিছনে আসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারি লোহার গরাদ-দেওয়া দরজা নেমে এসে তাদের পথরোধ করলে। লোহার গরাদের উপরে সজোরে পদাঘাত করতে করতে 'মহামন্ত্রী' চিৎকার করে বলে উঠলেন—"১১নম্বর—১১নম্বর—১১নম্বর—"

ঠিক আমাদের পায়ের তলায় 'ঘর্ঘর' শব্দ হ'তে লাগলো—। নাগরাজের গর্ত্তের আবরণ তোলা হ'চ্ছে নিশ্চয়! আর মুহূর্ত্ত নষ্ট হ'লে সর্ব্বনাশ হ'বে! কিন্তু এ কি! হঠাৎ সব দুলছে বলে মনে হ'চ্ছে কেন?—ভূমিকম্প!

আমাদের পায়ের তলায় যে 'ঘর্ঘর' শব্দ হ'চ্ছিল তাও থেমে গেছে। বাইরের দিক

থেকে একটা শব্দ মন্দিরের মধ্যে এসে পৌঁছুলো। সেটা জ্যাকের গম্ভীর ডাক!

"সঙ্গে এসো"—বলেই লাফিয়ে পড়লুম। অবিনাশেরও আমার অনুসরণ করতে দেরী হ'লো না। টলতে টলতে ছুটে গিয়ে অবিনাশ 'রাণীকে' তুলে নিলে, আমিও ছেলেটীকে তুলে নিলুম। পাশে একটা থাম ভেঙে পড়লো। খাঁচার মধ্যে বন্দী 'মহামন্ত্রী' ও তাঁর দল চিৎকার করে' খাঁচার দরজা তুলে নিতে বলছে—কিন্তু কেউ তা' শুনছে বলে' মনে হ'চ্ছে না। শেষে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি আরম্ভ হ'লো। আমরা বাইরে আসবার জন্য সুড়ঙ্গের দিকে ছুটলুম। বেশ স্পষ্ট শুনলুম 'মহামন্ত্রী'র কণ্ঠস্বর—"হরেনবাবু, আপনারই জয়! good night!

উত্তর দেবার অবকাশ নেই—দরকারও নেই। সুতরাং সুড়ঙ্গ পার হ'য়ে আমরা বাইরে ২নং হ'লঘরে এসে উপস্থিত হ'লুম। তখনও পৃথিবী দুলছে। টর্চ্চ বার করে' জ্বেলে দেখলুম, দু'টো বড় বড় থাম ভেঙ্গে পড়েছে। একটা থামের পাশে একটা লোক পড়ে র'য়েছে জীবন্ত কি মরা তা' দেখবার সময় নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের জীবন্ত সমাধি হ'তে পারে। সুতরাং টলতে টলতে প্রাণপণে বড় সুড়ঙ্গের দিকে ছুটলুম।

সুড়ঙ্গপথে খানিকটা এগিয়ে যাবার পরেই সামনে একটা ভীষণ শব্দ শুনে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। বল্লুম—"অবিনাশ ফিরে চল—ফিরে চল। সামনে সুড়ঙ্গের ছাদ ভেঙে পড়েছে। আমাদের বাইরে যাবার পথ বন্ধ।"

অবিনাশ বল্লে—"উপায়?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

অনেকবারই বলা হয়েছে যে ডাকের পর বিপক্ষদের' পক্ষ থেকে প্রথম যে তাসখানি খেলা হয় সেখানি ডাকদারকে ক্রীড়কের হাতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিয়ে দেয় এবং তাতে ডাকদার তার ডাক অনুযায়ী খেলা করবার বেশ সুবিধা পেয়ে যান। এইজন্যই প্রথম তাসখানি ফেলবার আগে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন হয়। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৎসরের গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার একটি খেলায় প্রতিযোগীদের হাত দেখুন। উভয়পক্ষ ভালনারেবল।

ইস্কাবন—নয়, ×, ×, ×, ×
হরতন—সাহেব, গোলাম, ×।
রুহিতন—×, ×, ×।
চিড়িতন—×, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, দশ।
হরতন—×, ×।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, নয়।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, ×, ×।

ডাক হয়েছিল,—

'দ'	'প'
একটি চিড়িতন।	পাশ।
দুইটী কোয়াই।	পাশ।

'দ'	'প'
পাঁচটি হরতন!	পাশ।
পাশ।	ডবল।
'উ'	'পূ'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
তিনটি ইস্কাবন।	পাশ।
পাঁচটি ইস্কাবন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।
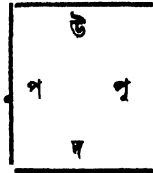
এখন ডাকের সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে একটি চিড়িতন ডাকের পর এক ইস্কাবন ডাক যুক্তিযুক্ত কি না। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যদি একটি চিড়িতন ডাক, ডাকগঠনকারী ডাক (Preparedness bid) হয়, তাহলে একটি ইস্কাবন ডাক অন্যায় নয়; আবার যদি চিড়িতন ডাক বৃত্তের ডাক হয় তাহলে এক্ষেত্রে একটি ইস্কাবন ডাকা অন্যায় হতে পারে। কিন্তু এই অন্যায় কার্য্যটি পরবর্ত্তী ডাকগুলির দ্বারা 'উ' অনেকবার প্রতিকার করবার চেষ্টা করেছেন। কাজে কাজেই তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে কিছু অন্যায় হয় নাই। যাই হোক প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁর হাত যদি ভাল আসে তাহলেই যে তাঁর খেঁড়ীর হাতও ভাল হবে এমন কোন নিয়ম নাই। অতঃপর ঐরূপ তাস নিয়ে কি ভাবে ডাকদার খেলা করে নিলেন দেখুন।

১ম পিট—'প' হরতনের টেক্কা খেলা সকলেই হরতন দিয়ে গেলেন।

"এসোগো মোর হৃদয় রাণী"

শ্রীসুনীলা মিত্র

আমায় শুধু বেঁধে রেখো তোমার মৃণাল বাহুর পরে—
মাধবী যেমন আঁকড়ে রাখে, তরুকে তার বক্ষোপরে।
তখন দেখো পাশে তোমার
আসবে যবে আঁধার ঘিরে—
স্নিগ্ধ প্রেমের কিরণ প্রাভায়
ঘুচিয়ে দিও তিমির ধীরে।

দেখব সদা মুখের হাসি
শুনব তব মধুর বাণী,
বিনিময়ে একটি চুমু অধরে মোর দিও
আমার প্রাণের আবেগ যত তুমি যেচে নিও।
ওগো! আমার মানস রাণি, কোথা আজি তুমি,
আঁকব কত রঙিন ছবি, স্মৃতি খানি চুমি।
কত নিশি গেল কেটে, কত মধুমাস,
মনের কোণে রয়ে গেল শুধু তব আশ।

পিয়াসা নাহি মিটল আমা
কল্পনারি ছবি এঁকে;
শুধায় না কেউ একটি কথা—
মৌন নিবিড় বর্ষা দেখে।
ভাসিয়েছি জীর্ণ তরী তোমার সাথে মিলন আশে—
কোন সেদিনে নিবে প্রিয়া মুছাতে নীর তোমার পাশে।
ভ্রমিতেছি আশায় যে গো পাব তব দেখা,
কোন সুদূরের সাগর তীরে আছ প্রিয়া একা।
ওগো, আমার জীবন সাথী এমনি তাবে আর
কত যুগ আর রইবে মানে মুখটি করে ভার।
ছড়িয়ে তোমার অভিমানের কালো মেঘের আচল খানি
জুড়িয়ে দাও হৃদয় মরু, শান্তি বারির বন্যা আনি।

২য় পিট—'প' ছোট একখানি চিড়িতন খেল্‌লেন, ডাক্তার খেঁড়ীর হাতের টেক্কা দিয়ে পিট ধরে ভাবতে লাগলেন। ডাক্তার ভাবলেন যেহেতু 'প' পাঁচখানি ইস্কাবনে ডবল দিয়েছেন সাহেব বিবি সমেত চারখানি বা পাঁচখানি ইস্কাবন তাঁর হাতে আছেই। যদি পাঁচখানি ইস্কাবন হয় তাহলে খেঁসারৎ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু চারখানি হলে খেলা করা বোধহয় সম্ভব হতে পারে। তবে এখানে আরও ভাববার আছে যদি 'হরতনের টেক্কাখানি একক তাস হয় তাহলেও খেঁসারৎ দিয়ে যেতে হবে। আবার যদি হরতনে দ্বৈত তাস থাকে 'তাহলে খেলা করা সহজসাধ্য। পাঠকবর্গ এইবার বুঝতে পারবেন যে, এই হরতনের টেক্কা খেলায় ডাক্তার স্পষ্ট বুঝে নিলেন যে তাঁর হাতে বিবি নাই। এটি জানবার পর কি ভাবে 'উ' খেলা করে নিলেন দেখুন।

৩য় পিট—ডাক্তার এবার ছোট হরতন খানি খেলে নিজের হাতের গোলাম দিয়ে পিট নিলেন, আর সকলে হরতন দিয়ে গেলেন।

৪র্থ পিট—ডাক্তার নিজের হাতের ছোট একখানি ইস্কাবন খেল্‌লেন, 'প' দেখলেন যে যদি তিনি এখানে বিবি বা সাহেব না মারেন তাহলে ডাক্তার দশ দিয়ে পিট নিচ্ছেন, সুতরাং তিনি সাহেব ফেল্‌লেন, আর 'ডামি' টেক্কা দিয়ে পিট ধরলেন। এই সাহেবখানি ফেলার দরুণ ডাক্তারের খেলা সুনিশ্চিত হয়ে গেল।

৫ম পিট—ডামি ইস্কাবনের গোলাম খেলায় 'প' বাধ্য হয়ে বিবি দিয়ে পিট ধরলেন, 'পু' পাশ দিয়ে গেলেন।

এইবার 'প' যে কোন তাস খেলুন না কেন ডাক্তার তাঁর খেলা করে নেবেন। কারণ যদি তিনি চিড়িতন খেলেন তো ডাক্তার সাহেব দিয়ে পিট ধরে নিয়ে ইস্কাবনের দশের পিট নিয়ে চিড়িতন খেলবেন। এ পিট ডাক্তারের নিজের হাতে তুরূপ করে নিয়ে বাকি ইস্কাবনখানি ধরে নেবেন। হরতনের সাহেব খেলে ছোট রুহিতনখানি পাশ দিয়ে দেবার পর বাকি সব পিটই ডাক্তার অনায়াসে নিতে সমর্থ হবেন।

—:(•):—

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা এযাবৎকাল বহুতর আলোচনা করেছি, এর সমস্ত বিভাগটির প্রতি লক্ষ্য রেখে অনেক suggestive hintও দিয়েছি। আমাদের আলোচনার ফলে কিছু কিছু সংস্কার মাঝে মাঝে হয়েছে এ কথা অবিশ্যি আমরা অস্বীকার করিনে—কিন্তু বেতারের কর্ম্মকর্ত্তাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আজ অবধি আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করতে পারলুম না। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা, যখন যে সম্বন্ধে তীব্রতর আলোচনা করা গেছে—কখনও কখনও হয়ত তার সাময়িক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেছে কিন্তু পরে আবার 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই'। বেতার কর্ম্ম কর্ত্তাদের বন্ধুভাবে আমরা যে সকল suggestion দিই এবং যে সকল কার্য্যের প্রতিবাদ করি তার ভেতর যথেষ্ট যুক্তি থাকে। আমরা প্রতি বিরুদ্ধ মন্তব্যেই আমাদের যুক্তিগুলি প্রকাশ করে থাকি—আমাদের যুক্তির যখন কোন প্রতিবাদ আসে না তখন আমরা অবশ্যই এ ধারণা পোষণ করতে পারি যে আমাদের মন্তব্য স্যায়যুক্ত।

* * *

আমাদের অভিযোগ, মন্তব্য সকল স্যায়-যুক্ত হলে বেতার কর্ম্মকর্ত্তাদের সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আমাদের মন্তব্য, অভিযোগ—তার ভিত্তি শ্রোতাদের মতের 'পরই প্রতিষ্ঠিত, আমরা যা বলি তা হচ্ছে জনমত। বেতার প্রতিষ্ঠান যখন Public institution তখন জনমতকে কখনই তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

বেতার জনশিক্ষাগার, এই প্রতিষ্ঠান হতে বহুবিধ জনশিক্ষা প্রচার করাই বেতারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। লোককে দিতে হবে আনন্দ-শিক্ষা, বিস্ময়ের কণ্ঠকে ভরিয়ে তুলতে হবে মাধুর্য্য দিয়ে। যে দেশের জনশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হতাশ-জনক সেখানে বেতারের কর্ত্তব্য গভীরতম—বিরাট। এই মহান উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এর অনুষ্ঠান লিপি প্রস্তুত করতে হবে। সকলকে জানিয়ে দিতে হবে এ প্রতিষ্ঠান সর্ব্বসাধারণের—তবেই শ্রোতাদের ভেতর সর্ব্বসাধারণের জাগবে বেতার প্রীতি।

* * *

আমরা বেতারকে এইভাবে দেখতে চাই। আমরা বেতারের হিতকামী বন্ধু তাই চাই এর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—এর সংস্কার। দিনের পর দিন আমরা আমাদের লেখনী চালনা করে চলেছি এর পথকে বাধাহীন সংকীর্ণতাহীন করে গড়ে তোলবার মহান পরিকল্পনায়।

* * *

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা জানাচ্ছি সকল বেতার কর্ম্মী, শিল্পী ও শ্রোতাদের হৃদয়ের শুভেচ্ছা। আমরা আমাদের সাংবাদিক কর্ত্তব্যকর্ম্মে চাই সকলেরই সহযোগীতা স্বার্থহীন দ্বেষহীন বন্ধুদের সহানুভূতি এবং আশীর্ব্বাদ।

* * *

বেঙ্গল রেডিও সার্কেলের জনৈকা সদস্যা—আমাদের পাঠিকা একখানি কবিতাপত্র প্রকাশের অনুরোধ করেছিলেন। আমরা তাঁর অবগতির জন্যে জানাচ্ছি 'চিঠি' খানি আমরা প্রকাশে অক্ষম। চিঠিখানিতে বেতার সম্বন্ধীয় বিশেষ কিছুই নেই এবং অত্যন্ত Personal. বেতার সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা, মন্তব্য, অভিমতপূর্ণ চিঠি পেলে এবং তা প্রকাশ করবার জন্যে অনুরোধ জানালে আমরা সাগ্রহে পত্রস্থ করবো। চিঠিখানির লেখিকার অনুরোধ রাখতে পারলুম না বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

* * *

২৭শে ডিসেম্বর দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে দেবাশীষ সেনগুপ্তের ব্যবস্থাপনায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল। কুমারী মনিকা গাঙ্গুলী শক্তি মুখার্জ্জির গান ভালো হয়েছিল। কালোবরণ দাস, শুভা ব্যানার্জ্জীর গান চলন সই। লক্ষ্মী মুখার্জ্জীর ভাটিয়ালী গান সমালোচনার অযোগ্য। ধীরেন ভট্টাচার্য্য তথৈবচ। সেতার বাজনা হোল চলন সই।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কৌতুকনাট্য 'হার হাইনেস' সাধারণ শ্রেণীর। কনকলতা ঘোষের কীর্ত্তন সুন্দর। বেতার অর্কেষ্ট্রার বাজনা এবারে উচ্চাঙ্গের নয়।

ঐদিন সাহিত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য 'বাংলার লোক সঙ্গীত' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। একাদশ শতাব্দী থেকে সুরু করে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত লৌকিক সাহিত্যের যে ক্রম-বিকাশ ঘটেছে তার সুন্দর বর্ণনা মাত্র ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে সকলের বোধগম্য করা বিশেষ প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বক্তৃতাটি আমরা উপভোগ করেছি।

* * *

২৮শে ডিসেম্বর দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে বীরেন উকীল গান গাইলেন—অনুল্লেখযোগ্য। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ধর্ম্ম বক্তৃতা দিলেন—মাঝে মাঝে গানের সুরে আবৃত্তি অত্যন্ত কর্ণপীড়াদায়ক এবং এর বক্তব্য বিষয়ও শ্রোতাদের পক্ষে অনুধাবন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

সরল ভাষায় সরল কণ্ঠে কর্ম্মতত্ত্ব আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী অনুষ্ঠান হোল।

৩০শে ডিসেম্বর বিদ্যার্থী মণ্ডলে সুসাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চণ্ডীদাস পর্য্যন্ত নিয়ে আলোচনা করলেন। সজনীবাবুর বক্তব্যে ভাষাতত্ত্বের দিকটা সত্যিই শিক্ষনীয়। বেতারে সাহিত্যের আসরের দুর্ভিক্ষ লক্ষিত হয়। এই ধরণের বক্তৃতার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে প্রফুল্লবালার গান দুখানি উপভোগ্য হয়েছিল। এ, আই, আর প্লেয়ারস্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রান্নাঘর রচনার দিক থেকে লঘু। মহিলা আসরে নারী প্রসঙ্গের যথেষ্ঠ প্রয়োজন আছে সেদিক থেকে বেতারের প্রোগ্রাম যথেষ্ঠ স্বল্প এবং অপ্রশংসনীয়।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বাসন্তী বিদ্যাবীথির "শেষ আরতির শিখা" অনুষ্ঠানটি কাব্যভাব সম্পন্ন। গানগুলি মন্দ গীত হয় নি।

* * *

৩১শে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এ, আই, আর প্লেয়ারস্ কর্ত্তৃক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় শচীন সেনগুপ্তের "কালের দাবী" অভিনীত হলো। নাটক নির্ব্বাচন ভালো। অভিনয় প্রসঙ্গ বীরেনবাবু ছাড়া আর কেউই প্রশংসার দাবী করতে পারেন না। পরিচালক মশাই এদিকে দৃষ্টি দিন।

* * *

রবিবার ২রা জানুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে কমলাবালা দু'খানি বাংলা গান গাইলেন। খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। পরে পঙ্কজবাবু শিক্ষাদান করলেন।

* * *

মঙ্গলবার ৪ঠা জানুয়ারী—সান্ধ্য অনুষ্ঠান—ছোটদের বৈঠক বসল। গানগুলি নিতান্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। অনুষ্ঠানের একটি গান বাজনা বা আবৃত্তি শোনবার উপযুক্ত হয়নি। এবং আমরা দেখছি দিন দিন এই ছোটদের আসর সঙ্গীত অনুষ্ঠানের দিক থেকে অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেদিনকার আসরে অমিয়া দাস গান গাইলেন বিশ্রী। রেডিওতে গান গাইবার অনুপযুক্ত। অপর্ণা ব্যানার্জ্জি সেতার বাজালেন—সমালোচনার বাইরে। আমরা সেদিনকার আসর-পরিচালক মহাশয়কে নজর দিতে অনুরোধ করছি যে 'এহেন বাজনা বেতারে সরবরাহ করে যেন হাস্যাস্পদ না হন। জ্যোতিষ দেব বর্ম্মন বাউল গান গাইলেন কোন রকম চলন সই। গলার বৈশিষ্ট্য তাতে মোটেই নেই। ফ্লুট ও পিয়ানো বাজনা হোল কোন রকম। বিমলেন্দুবাবু আবৃত্তি করলেন যেন রিডিং পড়া—জঘন্য। পরে ছেলেদের মাসীমা চিঠি পড়লেন। কণ্ঠস্বর বুঝতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল।

সেইদিন পরে অনাদিবাবু এক রবীন্দ্র গীতি বাসর করলেন। শক্তিন্দ্র ভট্টাচার্য্য "কান্না হাসির দোল দোলানি" গান গাইলেন চলন সই। পরের গান মন্দ নয়।

মান্দরা গুপ্তার "মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে" গানখানি শ্রুতিমধুর বলতে পারি না। উচ্চারণ ভাল নয়। যমুনা দাঁসের "এলো যে শীতের বেলা" গান ভাল।

সাগর ঘোষের "আমার নয়ন তব নয়নে" চলন সই।

* * *

৫ই জানুয়ারী বুধবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পুলিন পাল সেতার বাজালেন। মোটেই ভাল নয়। হাত কড়া। পরে "বিস্মৃত বৈশালী" অনুষ্ঠান হ'ল। আমরা উপভোগ করেছি। এ ধরণের প্রোগ্রামকে আমরা খুব প্রশংসা করি। পরিকল্পনাকায় নতুনত্ব ছিল।

৬ই জানুয়ারী। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বিদ্যার্থী মণ্ডল আসরে "কৃপণের মহারাজ" অভিনয় হ'ল। চলন সই। হরিদাস ব্যানার্জ্জি হাসির গান গাইলেন। নিতান্ত মামুলে ধরণের। পরে আশালতা কর দু'খানি দেহতত্ত্ব গান গাইলেন। ভালই। ধীরেন দাসের গান ভাল বলতে পারি না।

পরে পঞ্চাননবাবুর ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান হ'ল।

ধীরেন ঘোষের গান চলন সই। বিমান ঘোষের গান ভাল। শিশিরবাবু চলনসই গান গাইলেন। আলি খাঁ সাহেবের সেতার ভালই হয়েছে। জীবন উপাধ্যায়ের খেয়াল চলন সই।

প্রেমের সমাধি

মসি আমেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাগানের নানা রকম ফুলের গন্ধে ছায়াদেবীর কামরাটা ভরে উঠেছে—চাঁদের রূপালি আলোর খানিকটা জানলার ভেতোর থেকে এসে ছায়াদেবীর চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাঁকে আরও সুন্দর কোরে তুলেছে। তিনি আরম্ভ কোরলেন —"শোন বেবী! আমাদের সংসারটা ছিলো, খুব বড়ো, মোটমাট বারোজন লোক কিন্তু আমরা ছিলুম বড্ডো গরীব। আমার বাপের সামান্য একটা দরজীর দোকান ছিলো। সে অঞ্চলে আর কোনো দোকান তখনও হয়নি তাই সেলায়ের কাজটাজ টুক্‌টাক্ কোরে পাওয়া যেতো, কিন্তু তা থেকেও আমাদের সংসার চোলতো না। আমার দিদি মায়া আর আমি বাবাকে কাজে যথেষ্ট সাহায্য কোরতুম, আর মা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সামলে রাখতেন। মা কিন্তু একাও সামলে উঠতে পারতেন না কাজেই আমিও যতটা পারতুম মাকে সাহায্য কোরতুম। মায়া কিন্তু আমাদের সংসারের কথা খুব বেশী ভাবতো না। সে যতোটা পারতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। আমার বয়স তখন মাত্র পনেরো। আমরা থাকতুম তখন হাটখোলায়। কিছুদিন পরে মায়া এক বাড়ীতে একটা মেয়েকে সেলাই শেখাবার কাজ যোগাড় কোরলে, কিন্তু একমাস পরেই সেই মেয়েটার দাদার সঙ্গে কোথায় যে উধাও হোয়ে গেলো, আজও তার কোন খবর পাইনি। মায়া চোলে যাবার পর থেকে দোকানের কাজ নিয়ে আমায় বড্ডো বেশী খাটতে হোতো। এইভাবে কষ্টে সিষ্টে মাস তিনেক কাটবার পর তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হোয়ে গেলো। তোমার বাবারা ছিলেন খুব বড়লোক মটর ঘোড়া সবই ছিলো—আমার মা কিন্তু এই বিয়েতে সহজে মত দিতে রাজী হোলেন না, তিনি বোললেন যে বড়লোকের ঘরে মেয়ে দেবেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাবার মতেই মাকে মত দিতে হোলো। আমার বাবা ছিলেন খুব কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর কথার ওপোর কথা বোলতে কারুরই ভরসা হোত না। তোমার বাবার বয়স তখন সাতচল্লিশ বছর—আমার বয়স হোচ্ছে পনেরো মাত্র। যাক্, উনি আমাকে বিয়ে করবার জন্য বাবাকে জেদাজেদী আরম্ভ কোরেছিলেন। তার কারণ আমি নাকি খুব সুন্দরী, আমার মতো সুন্দরী মেয়ে তিনি নাকি জীবনে দেখেন নি। তিনি আরও একটা বিয়ে কোরেছিলেন বটে, কিন্তু মেয়েটা নাকি আমার মতো অত সুন্দরী ছিলো না। কিন্তু, সে মেয়েটা মারা যাওয়ার পর তিনি পুনরায় আর একটা বিয়ে কোরতে চান। যাক্ আমাদের বিয়ে হোয়ে গেলো। তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যা যা দেবার কথা তা সবই তিনি আমার বাবা মাকে দিয়েছিলেন। আমাকে যা যা দেবার কথা ছিলো তাও তিনি দিয়েছিলেন, বুঝলে বেবী! কেবল একটা জিনিষ বাদে. সেটা হোচ্ছে প্রেম—ভালোবাসা। তিনি চেষ্টা কোরেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত আমি যেনো তাঁকে ভালোবাসি, কিন্তু বেবী! তাকে সন্তুষ্ট কোরতে পারলুম না।—কি কোরেই বা পারি বলো? বয়সের পার্থক্যটাও তো দেখা দরকার? তিনি তাঁর সাতচল্লিশ বছর বয়সে আবার যৌবনে ফিরে যেতে চান—জীবনে রোমান্স করবার জন্যে! মানুষের কি ভ্রান্ত ধারণা দেখে বেবী? তিনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন না—তিনি আমার মধ্যে কেবল যৌবনটাই দেখতে পেতেন—আমার মনের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত কোরে দিতেন কাম শিখা! কিন্তু যখন তাঁর মন থেকে সে ভাবটা চোলে গেলো তখন তাঁর রোমান্সও নিভে গেলো। সত্যি কথা বোলতে কি বেবী, আমি যে তাঁকে ভালবাসতুম না, তা নয়—আমি তাঁকে ঠিক আমার বুড়ো বাবার মতোই ভালোবাসতুম, স্নেহ কোরতুম। ছায়াদেবী থেমে গেলেন। লতিকার দিকে তাকিয়ে তার হাবভাবটা লক্ষ্য কোরে বোললেন—"বেবী আজ থাক্ মা—আর একদিন শুনো—অনেক রাত হোয়ে গেছে, শুতে যাও।"

লতিকা তার মাকে আরও ভালো কোরে জড়িয়ে ধরে বোললে—

"না মা আজই সব বোলতে হবে বলো তারপর কি হোলো?" জিজ্ঞাসুনেত্রে সে তাঁর মার দিকে তাকিয়ে রইলো।

অগত্যা ছায়াদেবীকে আবার আরম্ভ কোরতে হোলো।

"এখন তুমি বুঝতে পারছো বেবী যে কেনো আমি যুবক ছেলেদের সঙ্গে তোমাদের মিশতে এতো অধিকার দিই। তোমাদের জীবনে ভালোবাসা জিনিষটা দরকার যেহেতু তোমাদের যৌবন রোয়েছে। আমরা কিছুদিন হাটখোলাতেই একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস কোরতে লাগলুম। তারপর একদিন তোমার বাবা বোললেন, যে তিনি এখান থেকে অন্য

কোথাও উঠে যেতে চান। কোলকাতায় তাঁর নিজের কোন বাড়ীই ছিলো না। বংশের মধ্যে তিনিই একা। সুতরাং এখানে ওখানে বাড়ী ভাড়া নিয়েই দিন কাটাতেন। যাক্! শেষ পর্য্যন্ত ছাতাখালা থেকে বাবা মা ভাইবোন সবাইকে ছেড়ে আমরা বালীগঞ্জ গিয়ে উঠলুম। সেখানে থেকেও যখন তোমার বাবাকে আমি কিছুতেই ভালোবাসতে পারলুম না—তখন তিনি বেজায় খিটখিটে হোয়ে উঠলেন। তারপরই ধরলেন মদ আর বেশ্যা, বড়ো লোকদের সাধারণত যা ঘটে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে মদ আর বেশ্যা থেকে আলাদা কোরতে পারলুম না। বালিগঞ্জে থাকবার বছর দেড়েক পরেই আমি বুঝতে পারলুম যে তুমি আমার কাছে আসছো। ও, সেকি আমার আনন্দ বেবী! ভাবলুম আমাকে একটু শান্তি দেবার জন্যই ভগবান ঠিক সময় পাঠাচ্ছেন। আমার তখন মনে হোতো আমার এমন একজনকে চাই; যাকে আমি সারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারবো। তারপর তুমি যখন সত্যি সত্যিই এলে বেবী, তখন তোমাকে প্রায় একলাই ফেলে রাখতুম। তার ওপোর তুমি ছেলে না হোয়ে মেয়ে হোয়েছ বোলে তোমার বাবা ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তোমার দিকে নজর দেওয়া তিনি মোটেই দরকার মনে কোরলেন না। যাক্! তুমি হবার পরে আমার একটু বায়ু পরিবর্ত্তনের দরকার হোয়ে পড়লো—যেহেতু আমার শরীরটা সে সময় দুর্ব্বল। তোমার বাবা আমাকে ঝি চাকর সঙ্গে দিয়ে দেওঘরে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে রইলেন বালিগঞ্জে একা। আমার পক্ষে সেই দেওঘরই একদিন স্বর্গ হোয়ে উঠলো। কিন্তু সে স্বর্গ সুখও তুমি আমায় বেশী দিন ভোগ করতে দিলেনা বেবী! ছায়াদেবী একটু থামলেন।

"আমি! আমি কি করেছি মা! কিছুইতো বুঝতে পারছিনা! বলো মা আমায় সব ভেঙ্গে বলো?" সতিকা বোললে।

"বোলছি" ছায়াদেবী আরম্ভ কোরলেন "তখন তুমি খুব ছোট ছিলে কিন্তু, তোমার তখনকার ওই ছোট ছোট হাত দুটো দিয়েই তুমি আমাকে আমার প্রিয় পাত্রের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে। আমরা যে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলুম দেওঘরে, ঠিক সেই বাড়ীর পাশের বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে থাকতো একজন যুবক। বয়স তার গোটা তিরিশ হবে, খুব ফরসা দেখতে, লম্বা ছিপছিপে, চুলগুলো কোঁকড়ানো, দেখতে অবিকল···"ছায়াদেবী" থেমে গেলেন।

সতিকা হঠাৎ বলে উঠলো—"দিলীপের মতো বোধ হয়—" কারণ দিলীপের সঙ্গে ছায়াদেবীর বর্ণণা একেবারে ঠিক মিলে যাচ্ছে।

"হ্যাঁ—ঠিক তাই, সেই চোখ, সেই মুখ, সেই রকম ব্যবহার আর সেই রকম কথা বলার ভঙ্গি। ওঃ বেবী—আমি কাল মনে করেছিলুম সেই বুঝি আবার ফিরে এলো। "ছায়াদেবী একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন।

"প্রথমে প্রদীপ ভেবেছিল যে আমি বোধ হয় তোমার নার্স কিন্তু পরে সে জানতে পেরেছিলো যে তুমি আমার মেয়ে। সত্যি কথা বলতে কি বেবী! আমি প্রদীপকে প্রাণ দিয়ে ভালো বেসেছিলুম। আমার সাথে একটা বুড়ো গোছের ঝি ছিলো, সে কিন্তু তোমাকে বড্ডো 'ভালো-বাসতো—আদর করতো তার সাথেই দিনের বেশীর ভাগ সময় তুমি কাটাতে। কাজেই —আমি আর প্রদীপ এক সঙ্গে গল্প করবার অনেকটা সুযোগ পেতুম! সে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা প্রায় ওই গানটা গাইতো—

"দূরের বন্ধু গেছে বোলে
চোখে যে নিদ্ নাই।"

কিন্তু গানটা গাইতে গাইতে যখন সে আমার চোখে জল দেখতে পেতো তখনই সে গান থামিয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোলতো, যে এইরকম কাঁচা বয়সে আমার নাকি কাঁদা সাজেনা। হঠাৎ একদিন তোমার বাবা গিয়ে বোললেন যে এবারে ফেরা যাক্—নিজের একটা বাড়ী তৈরী কোরিয়েছেন জয়নগরে—ভাড়া বাড়ীতে থাকতে তাঁর আর ইচ্ছা নেই। কাজে কাজেই আমার রাজী হোতে হোলো।" ছায়াদেবী একটু থামলেন।

"তারপর"? সতিকা জিজ্ঞাসা কোরলে।

"তারপর আমার যাবার খবরটা প্রদীপকে দিলুম—শুনে প্রদীপ বোললে—"ছায়া চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।" জানো বেবী! তাকে আমি এতো ভালো বেসেছিলুম যে শেষ পর্য্যন্ত তাকে হারাবার ভয়ে তার সঙ্গে যেতে রাজী হোলুম। আমরা যেদিন চোলে যাবো সেদিন তোমাকে বেশ ভালো কোরে জামা কাপড় পড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলুম। কিন্তু বেবী! শেষ পর্য্যন্ত তুমিই সমস্ত গণ্ডগোল কোরে দিলে। যাবার সময় যখন তোমার ঘুমন্ত মুখে চুম্বন একে দিচ্ছি, এমন সময় তুমি জেগে কেঁদে উঠে তোমার ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে। ভেবেছিলুম তোমাকে ঝির কাছেই রেখে চোলে যাবো কিন্তু যাওয়া আমার হোল না! চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রদীপকে বিদায় দিলুম। প্রদীপও শেষ পর্য্যন্ত চোখের জল সামলাতে পারেনি। তবে আমার এইটুকু সান্ত্বনা ছিলো যে সে আমাকে চিঠি লিখবে! কিন্তু বেবী এতোদিন হোয়ে গেলো, মাত্র তার একখানা চিঠি আমি পেয়েছিলুম সে আমায় জানিয়েছিলো যে, সে বিয়ে কোরেছে বটে কিন্তু সুখী হোতে পারেনি।

সেই একটা চিঠি ছাড়া আর কোন চিঠিই পাইনি। আমি কতো চিঠি লিখেছি তাকে, কিন্তু কোনো উত্তরই আজ পর্যন্ত পাইনি।

আমার মনে হয় আমি তার সঙ্গে যেতে পারিনি বোলেই সে একটা. বিয়ে কোরে এর প্রতিশোধ নিলে, কিন্তু নিরু, তবু তাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি, মনে মনে শ্রদ্ধা করি।

এমন সময় বারান্দায় জুতোর শব্দ পেয়ে ছায়াদেবী থেমে গেলেন। তিনি ধড়ফড় কোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন—দেখবার জন্যে বারান্দা থেকে কে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে দিলীপও কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো।

"আরে আপনারা এখনও জেগে রোয়েছেন! কি রকম?" হাসতে হাসতে দিলীপ কামরার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

"আমার না হয় ঘুম আসছে না নতুন জায়গায় এসেছি বোলে, কিন্তু আপনাদের ত ঘুম আসা উচিত ছিলো।"

ছায়াদেবী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন "আমাদেরও ঘুম আসছিলো না বোলে দুজনে মিলে গল্প কোরছিলুম।"

"কি গল্প একটু শুনি"

"এই তোমাদেরই সম্বন্ধে"

"আমাদের সম্বন্ধে!" দিলীপ লাফিয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তোমাদের—যাক্। আচ্ছা দিলীপ! এখন তোমরা দার্জ্জিলিংই আছো ত?

"দার্জ্জিলিং! না তো—থাকি খুলনা!"

"ওঃ দার্জ্জিলিং থেকে উঠে গেছো বুঝি?" ছায়াদেবী জিজ্ঞাসা কোরলেন।

"না না উঠবো কেনো! আমাদের ত বাড়ীই খুলনায়।"

"আচ্ছা যাক্ এখন তোমার বাবা কি করেন?"

"বাবা! কেনো আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?" দিলীপ যেনো আকাশ থেকে পড়লো। ছায়াদেবী হাসতে হাসতে মাথাটা নাড়লেন।

"বাঃ তবে তো আপনারা আমার পরমাত্মীয়। বাবার কথা জিজ্ঞাসা কোরছিলেন না? তিনি এখনও খুলনা কোর্টে ডিষ্ট্রিক্ট জজ্'ই আছেন এখনো তাঁর পেন্সন হয়নি। এইবার হবে।"

ছায়াদেবীর মুখটা কিন্তু ততোক্ষণে ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। তিনি দুরুদুরু বুকে কম্পিত স্বরে ভয়ে ভয়ে দিলীপকে জিজ্ঞাসা কোরলেন—

"তুমি প্রদীপবাবুর ছেলে তো? তোমার বাবার নাম প্রদীপবাবু তো?"

দিলীপ কথাটা শুনে যেনো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। "আজ্ঞে না। আপনি বোধহয় ভুল কোরছেন আমার বাবার নাম "দীপক লাহিড়ী।"

ছায়াদেবীর মুখ থেকে অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এলো—"দীপক লাহিড়ী!"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অজ্ঞান দেহটা লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

লতিকা কেঁদে উঠলো "মা—মা!" বাড়ীর সবাই জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ীর ডাক্তার রায়ও এসে পড়লেন। ছায়াদেবীর পালস্ ধ'রে তিনি বিষণ্ণ মুখে বোলে উঠলেন—"মেণ্টাল শক্, হার্ট ফেলিওর।"
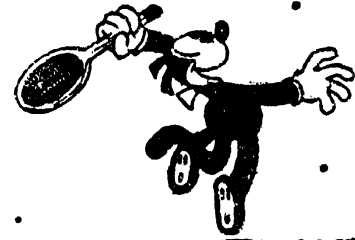
[খেয়ালীর নববর্ষে যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে ও শ্রীভগবানের চরণে প্রণাম জানিয়ে—মহিলা মহলের দ্বারোদ্ঘাটন করছি। খেয়ালীর বিশেষ সংখ্যার জন্য গতবার মহিলা মহলের লেখা বন্ধ ছিল—এবং সেইজন্য শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের প্রবন্ধ গত সংখ্যায় স্থান পায়নি। এবার আমরা তাঁর সেই প্রবন্ধটী আরম্ভ করলাম। আমরা আশাকরি এটী অনেক মা বোনেদের উপকারে আসবে। সম্পাদিকা মহিলা মহল]

ছেলেমেয়েদের মানুষ করা

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিদ্রূপ করা অনেক বয়স্কদের ভিতর দেখা যায়—এ বড় রকমের দোষ এবং এ দোষে দোষী আমাদের ভিতর অনেকেই। ছেলেমেয়েরা যখন কোন বিষয়ে গম্ভীর হয়ে এবং মনের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে কোন কথা বলে তখন আমরা তাদের কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিই—কিম্বা সে কথা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে থাকি। তারা ভেবে উঠতে পারে না, এভাবে তাদের নিগৃহীত হবার কারণ কি? তারা ক্রমে আত্ম মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলে এবং বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হ'য়ে পড়ে এবং অধিকতর নিজেদের হাস্যাস্পদ করে না তোলবার জন্য আপনাদের সম্পূর্ণভাবে লুকিয়ে ফেলে। ছোটদের প্রতি বয়স্কদের এই অপরূপ ব্যবহার প্রতি-নিয়ত সংঘটিত হওয়ার ফলে ছেলেমেয়েরা সতর্ক হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রকাশ পথে বাধা দেয়। তারা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ভয় পায় পাছে তাদের বোকা অথবা অজ্ঞ একথা অপরে ভাবে—এই ভয় এবং আমাদের অজ্ঞতা এবং অপরূপ ব্যবহার তাদের জীবনের একটা বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে—নিজেদের অন্তরের রূপকে বাইরে আনতে তারা ভয় পায়, লজ্জা বোধ করে—নিজেদের প্রকাশ করবার ক্ষমতা তারা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। যাঁরা আপন সন্তান সন্ততিদের ভাল দেখতে চান, ছোটদের চরিত্রে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করতে চান—এ ছেলেদের কোন বিষয় নিয়ে কোন প্রশ্ন নিয়ে, কোন জিজ্ঞাসা নিয়ে বিদ্রূপ করার পথ থেকে দূরে থাকাই তাঁদের উচিৎ। এতে করে পিতামাতার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধ আরো মধুর ও সুখের হয়ে উঠবে। ছেলেমেয়েরা দোষনীয় কাজ করে ফেললে অথবা যা আমরা চাইনা এমন কাজ যদি তারা ক'রে—তাহলে তাদের সব সময় দোষীর চোখে না দেখাই ভালো—এ রকম কাজ থেকে যখন তারা আপনা থেকে দূরে থাকবে—প্রশংসার বাণী যেন তারা পায়। দোষনীয় কাজ থেকে তাদের দূরে রাখতে গেলে শুধু রক্তচক্ষু, বেত অথবা ভর্ৎসনা বিশেষ কিছু কাজে আসবে না, বরং সহানুভূতি দিয়ে মিষ্টি কথা দিয়ে অনেক বেশী উপকার পাওয়া যায়!

শাস্তি দেওয়ার কথা এখানে কিছু বলা দরকার। শারিরীক শাস্তি প্রদান করা অতীত যুগের নিদর্শন। শারিরীক শাস্তি ছেলেমেয়েদের ভীতি প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু তাদের চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে না। স্নায়ু যাদের দুর্ব্বল—এমন ছেলেমেয়েদের শারিরীক শাস্তিই তাদের মনে ভয় জাগাতে পারে কিন্তু নির্ভীক ছেলেমেয়েদের একগুয়ে ও জেদী ক'রে তোলে। পুরাণ রীতি নীতি অবলম্বন করে ছেলেমেয়েদের শাসন করার রীতি আমাদের ঘরে ঘরে চলে আসছে।

Spare the rod and spoil the child অতীত যুগের অতি পরিচিত নীতি এ যুগে বর্ত্তমানে অচল হয়ে পড়েছে। মিষ্টিকথা, সহানুভূতি ভালবাসা প্রভৃতি অপরূপ মোহময় কার্য্যকরী মন্ত্রের কথা আমরা জানি—তখন শারিরীক বা অন্য কোনও রকম শাস্তির কথা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না. এর চেয়ে দোষনীয় আর কিছু নেই। আমার স্বল্প জ্ঞানের ভিতর এমন কোন ছেলেমেয়ে আমার চোখে পড়লো না যে কেবলমাত্র শাস্তির দ্বারা তার চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছে। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় অসহ্য হয়ে পড়ে। শাস্তি দিয়ে উপকার পাওয়া গিয়েছে এমন ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অতি অল্প—নগণ্য! কোন অবস্থাতেই ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো উচিৎ নয়। অতি সাহসী বা নির্ভীক ছেলেমেয়েদের স্নায়ুকে এই ভয় দুর্ব্বল করে ফেলে এবং তাদের উত্তর জীবন ধরে অবচেতন অবস্থার ভিতর দিয়ে মনের শক্তিকে নষ্ট করে ফেলে।

ছেলেমেয়েদের "অবলোকন" করার শক্তিকে বর্দ্ধিত করা উচিত এবং সব বিষয়ে যাতে ছেলেমেয়েদের জানবার বা দেখবার বা বোঝবার চেষ্টাকে সাহায্য করা উচিৎ। জানবার ইচ্ছাই মানুষের জীবনের সাফল্যের পথে অনেক কাজে লাগে তার পাথেয় হ'য়ে থাকে। জগতের সমস্ত কিছু জানবার দেখবার বা বোঝবার স্পৃহার ওপরেই মানুষের

ব্যবহারিক জগতে সাফল্য নির্ভর করে থাকে। নানাবিধ বিষয়বস্তুর রাজত্বে বাস করেও এমন লোক দেখা যায় যারা কোন কিছুতেই বিশেষ একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। তাঁরা চোখ থাকতে দেখেন না, কান থাকতে শোনেন না, মন থাকতে বোঝেন না। দেখার মত চোখ তাঁদের নেই, প্রশংসা করবার মত শক্তি তাঁদের নেই। সব বিষয়ে কেমন একটা উদাস ভাব, নির্ব্বিকার ভাব, এ হোল পরিণত বয়স্কের কথা। তাঁদের এই নির্ব্বিকার ও উদাস মনোবৃত্তির পট-ভূমিতে আত্মগোপন করে আছে ছোট বেলাকার শিক্ষা—বোঝবার, দেখবার, জানবার একটা বিশেষ ইচ্ছার অধিকারী তাঁরা হতে পারেন নি। ছোটবেলায় এ শিক্ষা তাঁরা পাননি। ছোটদের মন থাকে নমনীয়, মন থাকে সদা ব্যগ্র, উৎসুক এ বিষয়ে 'অবলোকন' করার শক্তিটাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা খুব সহজ—পিতামাতাদের এদিকে একটু সাহায্যের ও দৃষ্টির প্রয়োজন। এ বিশেষ গুণটি মানুষের অনেক উপকারে আসে। আমাদের বৈচিত্র্যহীন সীমাবদ্ধ জীবনে এটা অনেক সময় সান্ত্বনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, অন্তত: এক ঘেয়েমীর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য নিস্কৃতি পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে এই আমার মনে হয়। বর্ত্তমানে যুবক যুবতীদের ভিতর যেভাবে বৈচিত্র্যহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা বলবার নয়। এর কারণ, আমার মনে হয় সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ছাড়িয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে দৃষ্টি শক্তি নিয়োজিত করবার মতো শিক্ষা তাঁরা পাননি। এই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির পরপারে যে কত জিনিষ তাদের নিত্য নব সৌন্দর্য্য নিয়ে অবস্থান করছে সেকথা তাঁরা ভাববার সময় পান না। দৃষ্টিকোণ তাঁদের ছোট হয়ে আসার দরুণ জীবন যাত্রা তাঁদের বৈচিত্র্যহীন নিরস হয়ে পড়ে। পিতামাতার এ দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের বৃহত্তর জীবনের ও বৃহত্তর জগতের সন্ধান দিতে হবে—গৃহের অস্পষ্ট আলো থেকে তাদের আলোকের উৎসের সন্ধান দিতে হবে।

'ছেলেমেয়েদের মানুষ করা' এই প্রবন্ধটি অসমাপ্ত থাকবে যদি এখানে Sex education সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করা না হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রাথমিক চিকিৎসা

(পুড়ে গেলে)

রান্না করতে করতে হঠাৎ যদি পুড়ে যায়, (অল্প পুড়িলে) তখনি একটু মসিনার তৈল সেই পোড়া স্থানে লাগিয়ে দিলে তখনি জ্বালা কমে যায় এবং ফোস্কার আসঙ্কা থাকে না। যদি অনেকখানি পুড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই জায়গায় স্পৃট ঢেলে দিয়ে তার উপর খুব ঘনকরে সোডা বাইকার্ব্ব ঢেলে দিতে হয়, তাহলে ফোস্কা হয় না। পরে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া ভাল।

(কেটে গেলে)

হঠাৎ কোথাও কেটে গিয়ে যদি রক্ত বন্ধ না হয় তাহলে ট্যানিক এসিড লাগিয়ে দিলে তখনই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং ব্যথা কম হবে। মুখের ঘায়েতে ট্যানিক এসিড দিলে খুব শিগগির সারে।

(হাজা হলে)

বর্ষাকালে অনেকের পায়ে হাজা হয়, এবং খুবই কষ্ট দেয়। ওই হাজার উপর মসিনার তেল লাগাইলে দু একদিনেই ব্যথা মরে যায়। একজিমা কিউর, নামে একটী ওষুধ পাওয়া যায়, সে ওষুধ একদিন লাগাইলে উপকার হয়। পাছে কেহ বিজ্ঞাপন মনে করেন বলে ও ওষুধের সবিশেষ কিছু লিখিলাম না।

শ্রীমতী যুথিকারাণী মিত্র।

শ্রীসমীরেন সেন

মার্লিনকে মানবো না।

ক্লদেৎ কলবার্ট বলেছে, মার্লিন ডিয়েট্রিশের কথা মোটেই মানবার মত নয়; যা বলেছে তা নেহাৎ বাজে। সুন্দরী মীনাক্ষী কলবার্টের নাম হলিউডে আজ কোন তারকার চেয়ে কম নয়। ক্লদেতের কথা আজ তাই মার্লিনের কথার মত বড় বড় করে সবাইকে শেখানো হয়েছে।

মার্লিন বলেছে পুরুষ মানুষেরা স্ত্রীলোকের চেয়ে বুদ্ধিমান।'

মার্লিনের একথায় প্যারামাউন্ট ষ্টুডিওতে রীতিমত আলোচনা সুরু হয়েছে। ক্লদেৎ বলেছে: কেন?—লজ্জা করেনা মার্লিনের একথা বলতে! খবরের কাগজ মার্লিন কি পড়ে না?—তাতে কি দেখতে পায় না মেয়েরা দিনের পর দিন কি উন্নতি করছে? অভিনয় করতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে—বিজ্ঞানে, ডাক্তারিতে, ওকালতিতে মেয়েরা কিসে কার চেয়ে কম শুনি? দিনের পর দিন মেয়েরা এগিয়ে চলছে! আর খেয়াল রাখা উচিত আমরা অনেক পরে ষ্টার্ট করেছি। মেয়েদের যে ভাবে পেছিয়ে রাখা হয়েছিল আজ তারা তেমনি জোরেই অগ্রসর হচ্ছে।

লম্বার্ড বলেছে

ক্যারল লম্বার্ড ক্লদেৎ কলবার্টের কথা মানেনি, সে বলে, মার্লিন বোধ হয় ঠিকই বলেছে। পুরুষেরা সত্যি কথাই বলে, আমার তা ভাল লাগে। কারণ তারা যে আমাদের চেয়ে দৈহিক শক্তি এবং ধী শক্তিতে অনেক বড় এ কথা না মানবার মত কোন কারণ নেই। সময় সময় তাদের ব্যবহার অসভ্য এবং অভদ্রের মত হয় বটে তবু তারা আমাদের চেয়ে অনেক বড়। ক্ষমতা থাকলে মানুষ তার খানিকটা দেখাবেই।

আইরিণের মতে

আইরিণ ডান ঠিক ক্যারল লম্বার্ডের মত না বললেও সে বলেছে; মেয়েরা পুরুষদের মতই ধী শক্তিতে সমান, কিন্তু তাদের পুরুষদের মত দেখাবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় না। আমার মনে হয় পুরুষমানুষের সূক্ষ্ম গুণাবলী যা আছে স্ত্রীলোকের ঠিক তাই আছে; কেবল মেয়েদের ছোট বয়স থেকে ঠিক ভাবে শিক্ষা না দেওয়ার দরুণই তা বাড়তে পায় না। বিয়ে, মা হওয়া আর ঘরকন্না করা এ ছোট বয়স হতেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাই আমরা ছোট। পুরুষ মানুষেরা তাই আমাদের দাবিয়ে রেখেছে এই কথাই আমার মনে হয়।

গ্যারীর কথা

গ্যারীকুপারের কথার সহিত আইরিণের কথার সঙ্গে মিল আছে। দুজনেই মেয়েদের সম্বন্ধে একই মত দিয়েছে।

গ্যারী বলে, মেয়েরা ছেলেদের মত মূলতঃ স্মার্ট, কিন্তু তাদের কতকগুলি অসুবিধা আছে যার জন্য খুব সম্ভব পুরুষমানুষের মত অগ্রগামী ও উন্নতশীল হয়ে উঠতে পারে না। পুরুষমানুষের সহিত সমান তালে চলার পথে অন্তরায় অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে, মেয়েদের সন্তান বহন করতে হয়। বহন যদি না করে, তাহলেও সন্তান সম্ভাবনার আশঙ্কা সব সময়েই পোষণ করে রেখে দিতে হয়। আর এইটেই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কারণ যা মেয়েদের আমাদের সমান হতে অনেক দূর পেছিয়ে রেখেছে।

র‍্যাপ্ট ও মার্শাল

জর্জ্জ র‍্যাপ্ট ও হার্ব্বার্ট মার্শাল দুজনেই প্রকাশ করেছে মার্লিনের কথা ন্যায়সঙ্গত বলে তারা মানে না।

হার্ব্বার্ট মার্শাল সেদিন তার গলার টাইয়ের বাঁধন সুদৃঢ় করতে করতে বিশ্বের নারী পক্ষ হতেই পরিষ্কারভাবে কয়েকটি কথা বলেছে—মার্লিনের সৌন্দর্য্যই তাকে পুরুষ জনোচিত অভিমত প্রকাশ করতে বাধ্য করেছে। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বাহিরটাই দেখে, স্ত্রীলোকের বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখেই তারা আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্য্যের কাছে সবই হার মানে। কাজেই মার্লিনের কথা প্রায় সব পুরুষই মানবে।

অপরদিকে মেয়েরা সমালোচক। তারা সব জিনিষই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করবার চেষ্টা—করে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকই অপর স্ত্রীলোককে বিচারকের চোখে দেখে। বিশেষতঃ সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রতি। মার্লিনের কথা কোন স্ত্রীলোকই মানবে না। আমিও মার্লিনের কথা মানি না। স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান আছে ও তারা বড় রসবেত্তা—একথা আমিও মানি না। আমার মনে হয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের চেয়েও বুদ্ধিমতী।

—:(•):—

খেয়ালী চিত্রপট

প্যারামাউণ্ট-এর 'ওয়েল্‌স্ ফারগো' চিত্রে জোয়েল ম্যাক্রীয়া ও ক্রাসেস্ ডী—ছবিখানা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছে।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপ...

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৬ই মাঘ ১৩৪৪, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৮ } ৩য় সংখ্যা

বৈদেশিক রাজদত্ত সম্মানের মিথ্যা মরীচিকা
তুচ্ছ করি লভিয়াছ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজটীকা

সুভাষচন্দ্র

যে মহতী কল্পনায় হে বরেণ্য, অন্তরে তোমার
একদা আগ্নেয় বীজ করেছিলে গোপনে রোপন,
গভীর দেশাত্মবোধে মুক্তি লাগি যুবক বাংলার
বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে করেছিলে সর্ব্বসমর্পণ—
দেশ মাতৃকার পদে একনিষ্ঠ সাধকের মত
তুচ্ছ করি' বৈদেশিক রাজদত্ত বিপুল সম্মান,
পরাধীনতার দুঃখে ক্ষুব্ধ মনে হয়ে মর্ম্মাহত
নির্য্যাতন বক্ষে পাতি করিতেছ দৃপ্ত অভিযান।

তোমার তরুণ মনে দেশপ্রেমে তীব্র উন্মাদনা
জাগে নিতি দুর্নিবার যৌবনের জয়যাত্রা পথে,
নবীন সাধনা সে যে ঘুচাইতে জাতির লাঞ্ছনা
কণ্টক মুকুট পরি চলিয়াছ গৌরবের রথে।
যুবকের কত স্বপ্ন ? কী বিলাস ? কিন্তু হে যুবক—
বিলাসীরা দেখে যদি কী স্বপন তোমার অন্তরে—
পাগল করেছে জ্বালি' কর্ম্ম যজ্ঞে জ্বলন্ত পাবক,
মোহারিয়া লক্ষ কোটি মানবাত্মা অপমানে মরে।

সুভাষচন্দ্র

হে বিজয়ী বীর তব মর্ম্মাকাশে নব অরুণিমা,
রাঙ্গায়েছে পূর্ব্বাচল উদয়ের অপূর্ব্ব আলোকে,
হে সুভাষচন্দ্র তব জয়ন্তীর প্রদীপ্ত গরিমা
সারা দেশ গাহে তাই বিজয়ের আনন্দ পুলকে
বৈদেশিক রাজদত্ত সম্মানের মিথ্যা মরীচিকা
তুচ্ছ করি লভিয়াছ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজটীকা। *

* [হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর রচিত]

স্বাগত সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্র স্বাগত !

ত্যাগই অমৃতত্বের নিদান। কেবল আধ্যাত্মিক জগতেই যে এ অভ্রান্ত সত্যটির পরিপূর্ণ স্বরূপ আমাদিগের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তাহা নহে; জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমরা ইহার যথার্থতা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারি। তাই দেখি যে, নবীন বাঙ্‌লার দুই ত্যাগবীর জননায়ক আজ যাঁরা ভারতের রাজনীতির পক্ষদ্বয়ের কর্ণধাররূপে সমগ্র জগতের রাষ্ট্রনৈতিক মনীষিবৃন্দের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সগৌরবে অবস্থিত।

ইঁহাদিগের একজন—আশৈশব পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি ভাবধারার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও আজ প্রাচ্যভূমে দেশপ্রেমের মূর্ত্ত আদর্শরূপে দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত। ইহার মূলে বর্ত্তমান এক অতি মহৎ আত্মবিসর্জ্জনের প্রবৃত্তি। এই দেশপ্রাণ জনপ্রিয় তরুণ নেতৃবর কৈশোরে বিদ্যার্থিজীবনেই তাঁহার সকল উচ্চাশা স্বেচ্ছায় অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্যযোগ অভ্যাসে রত হইয়াছেন,—যৌবনের প্রারম্ভে অপরিমেয় শাসন-শক্তির নিদান রাজকীয় কর্ম্মযোগের প্রলোভন দাসত্বের সুবর্ণশৃঙ্খল-জ্ঞানে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়াছেন,—তার পর দীর্ঘ দিন শত লাঞ্ছনা সহস্র উৎপীড়ন হাঁসিমুখে বুক পাতিয়া লইয়াছেন,—সুদূর প্রবাসে নির্জ্জন কারাবাসে অগণিত তনুতাপেও দৈহিক ক্লেশ-সহনে শরীর বারবার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিদারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটিলেও আত্মত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত বীরহৃদয়ে দেশপ্রেমের সহস্রধারা কোনদিন উৎসারিত হইতে ক্ষান্ত হয় নাই। তাঁহার স্বার্থগন্ধহীন অচল-অটল-সুদৃঢ় অন্তর চিরদিনই কুসুমকোমল শরীরের সহিত আপনাকে সংস্পর্শমুক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই তরুণ জননায়কের নিষ্কাম সেবা-সাধনায় প্রীতিলাভ করিয়া দেশমাতৃকা আজ তাঁহার সুচিররক্ষিত আশীর্ব্বাদ-পরিপূত সুশুভ্র যশোমাল্য ইঁহার বরেণ্য বরাঙ্গে স্বহস্তে সযত্নে পরাইয়া দিয়াছেন। মুকুটহীন জননায়কের শিরঃস্থিত এ কীর্ত্তি-কুসুমমালিকা বহু স্বাধীন রাষ্ট্রপতির রত্নখচিত কিরীট অপেক্ষাও মহামূল্য—কামনীয়।

আর একজন—জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের সকল সুখ সকল শান্তি চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখ-দৈন্য-বিপদ রাশিকেই মাথার মণিরূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন,—গৃহসুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধাতা যাঁহার অদৃষ্টে কোনদিন লিখেন নাই, অথচ সে কারণে তিনি ক্ষণেকের তরেও ব্যাকুল নহেন,—এমন দিন গিয়াছে যখন নিজ জন্মভূমি হইতে তিনি নির্ব্বাসিত,—পাশ্চাত্যভূমে দেশ হইতে দেশান্তরে নিতান্ত অকরুণভাবে বিতাড়িত,—এ বিশাল পৃথিবীতে এক মুহূর্ত্তের তরেও শান্তিতে বিশ্রামের অবসর মিলে নাই,—বিদেশে একাকী অসহায় অবস্থায় কতবার জীবন সংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার অদম্য হৃদয় ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয় নাই—আত্মপ্রাণের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র মমতার উদ্রেক হয় নাই—বিপন্মুক্ত হইবার বাসনায় তিনি কখনও নিজ আদর্শ খর্ব্ব করিয়া চির-উন্নত শির শক্তিমান্ শাসকের পাদমূলে অবনম্র করেন নাই। আবাল্য দেহ-প্রাণ তুচ্ছ করিয়া এই কঠিন অবিরাম সংগ্রাম এ পুরুষকেশরীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে কেবল ত্যাগদীপ্ত মনের বলে। এই আত্ম-বিলোপ-স্পৃহা—সর্ব্বৈষণা সন্ন্যাস তাঁহার অন্তরকে পূত করিয়াছে বলিয়াই নরেন্দ্র আজ মানবেন্দ্র !

বিস্ময়ের বিষয়—দক্ষিণ বাঙ্‌লায় চব্বিশ পরগণার একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম এই দুই পুরুষপ্রবরেরই মাতৃভূমি। সুভাষচন্দ্র ও মানবেন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের অতি প্রিয় নিবাস এই কোদালিয়া গ্রামকে বাঙ্‌লার

আগামী সপ্তাহে বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে হরিপুরা কংগ্রেসের সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র ও বরেণ্য বামপন্থী নেতা মানবেন্দ্রনাথের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য সমগ্র বাঙলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। ইঁহাদিগের সম্মিলিত সুবিবেচিত নেতৃত্বে বাঙলায় আবার এক অভিনব কর্ম্মপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আমরা বিশেষ ভরসা করি।

রাষ্ট্রনীতিক মানচিত্রে আর গণ্ডগ্রামরূপে চিত্রিত করা উচিত হইবে না। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক-ভাবজাহ্নবীধারার গোমুখী-উৎসরূপে কোদালিয়ার নাম ভবিষ্যৎ ভূগোলের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। বাঙলার এই দুই রাষ্ট্রনায়ক সুদীর্ঘকাল পরে আবার নবউদ্যমে কর্ম্মযোগে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা ইঁহাদিগকে আমাদিগের সশ্রদ্ধ আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি—স্বাগত সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্র স্বাগত!

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে

সুবোধ রায়

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—'The king is dead—Long live the king. আজ শোকখিন্ন অন্তরে শরৎচন্দ্রের মহা-প্রয়াণের কথা ভাবিতেছি, আর বার বার এই কথারই প্রতিধ্বনি মনে জাগিতেছে। মন বলিতেছে—"শরৎবাবুর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু শরৎচন্দ্র অমর।" নির্ম্মমবিধাতৃবিধানে শৃঙ্খলিত মানব মনের নিরুপায় সান্ত্বনা নহে,—"শরৎচন্দ্র অমর" একথা সত্য, ধ্রুব সত্য। পূর্ণিমা রজনীতে আদিগঙ্গার তীরে তাঁহার ইহলৌকিক দেহ ভস্মসাৎ করিবার জন্য যে চিতাগ্নিশিখা জ্বলিয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেইরূপ শরৎচন্দ্র মানুষটি—যিনি সাধারণ আর পাঁচ জন বাঙ্গালীর মতই চলিতেন, ফিরিতেন, শোকে বিমর্ষ ও আনন্দে উল্লসিত হইতেন, তাঁহার কথা কয়েক বৎসর পরে বাঙ্গালী হয়তো ভুলিয়া যাইবে কিন্তু যে শরৎচন্দ্র অনন্যসাধারণ, যে দরদী শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনালব্ধ প্রতিভার অমোঘ শরসন্ধানে তৃষার্ত্ত শরশয্যাগ্রস্ত বাঙ্গালীর সামাজিক মনকে জাহ্নবীধারায় অভিষিঞ্চিত করিয়াছিলেন, যিনি অতিসাধারণ, চিরপরিচিত এবং সেইজন্যই চিরঅবহেলিত লোক সমাজের সুখদুঃখের কাহিনী লইয়া লোকোত্তর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই সাহিত্যস্রষ্টা প্রতিভাবান শরৎচন্দ্রের স্মৃতি বাঙ্গলার শিক্ষিত নরনারীর মন পূর্ণচন্দ্রের অমলিন জ্যোৎস্নায় চিরপ্লাবিত করিয়া রাখিবে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দান সম্বন্ধে বহু মনীষী ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। এই সামান্য প্রবন্ধে সেই অপরিমেয় দানের পরিমাপের ব্যর্থ প্রয়াস করিব না। আজ শুধু তাঁহার সাহিত্য সাধনায় ও ব্যক্তিত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে স্মরণ করিব মাত্র।

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র ছিলেন সত্যকার সাহিত্য-সাধক; সাহিত্য-সাধক না বলিয়া সাহিত্য-তপস্বী বলিলেই যেন তাঁহাকে যোগ্যতরভাবে অভিহিত করা হয়। আর কোন দুর্ব্বলতা না থাক—অন্ততঃ নামযশ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা নাই এমন সাহিত্যিক তো চোখে পড়ে না। কিন্তু এই একটি লোক দেখিয়াছি যিনি সে সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। নিদারুণ দুঃখকষ্টের মধ্যে সম্পূর্ণ লোক-লোচনের অন্তরালে আত্মবিশ্বাসী এই সাধক সুদীর্ঘদিন ধরিয়া সাহিত্যসাধনা ও সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন, সাহিত্যকে হাটের পণ্য করিয়া অর্থ ও সম্মানের প্রত্যাশায় দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া বেড়াইবার হীন লোভ তাঁহাকে কোনোদিন স্পর্শও করে নাই। তাঁহার প্রতিভার অবিস্মরণীয় অবদান—বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস—বোধ হয় তাঁহার ২০।২২ বৎসর বয়সে রচিত হয় কিন্তু এগুলি প্রকাশিত হয় অন্ততঃ ১২ বৎসর পরে। তপস্বী ভিন্ন এই নীরব অবিচলিত অপেক্ষা কি সাধারণ মানুষে সম্ভব? তাহার পর যখন তিনি তাঁহার পূর্ণ দীপ্তিতে বাঙ্গলা সাহিত্য সমাজে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন সে কি উল্লাস, সে কি কোলাহল! এক সঙ্গে স্তুতি ও নিন্দার, অভিনন্দন ও নিন্দা-বাদের প্রবল প্রবাহের এমন ধাক্কা আর কোনো সাহিত্যিককেই বোধ করি সহিতে হয় নাই। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবিচলিত। ভক্তগণের অজস্র স্তুতিবাদে তাঁহাকে কখনও অযথা উল্লসিত হইতে দেখি নাই, আবার অকারণ নিন্দাবাদ, এমন-কি হীন ব্যক্তিগত আক্রমণে ব্যথিত ও অধীর হইয়া কখনও তাঁহাকে আত্মসমর্থনে লেখনী ধারণ করিতে দেখি নাই। তাই বলিতে-ছিলাম যে, তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী, মোহমুক্ত সাহিত্য-তপস্বী। তাঁহার যাহা দিবার ছিল, তিনি অকৃপণহস্তেই দিয়া গিয়াছেন, সেই দানকে স্বীকার বা অস্বীকার করিবার ভার তিনি তাঁহার আরাধ্যা জননী বঙ্গভারতী এবং বঙ্গভারতীর অগণিত সন্তানদের উপর দিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই তিনি চিরদিন ভিড়ের কোলাহল এড়াইয়া চলিতেন। তাই যখন তিনি যশের সুউচ্চ শিখরে

প্রতিষ্ঠিত তখনও সভাসমিতিতে যোগদানে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করার মধ্যে যে আত্মপ্রচারের ভাব আছে তাহাই বোধ করি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে পীড়িত করিত। আত্মপ্রচার নহে, আত্মপ্রকাশেই ছিল তাঁর আনন্দ। তাই আপনার গৃহের নিভৃত কোণে বা অপরের গৃহে কয়েকজন পরিচিত বন্ধু বান্ধব বা অনুরাগীদের মধ্যেই ছিল তাহার প্রাণখোলা আত্মপ্রকাশ। তিনি যে বঙ্গভারতীর নিকট হইতে কথাশিল্পীর জন্মগত পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছিলেন, এই সকল বৈঠকে শরৎচন্দ্রকে জানিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল, তাহারাই তাহা স্বীকার করিবেন। কাহিনীর পর কাহিনী ছবির পর ছবি, শ্রোতাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে—সময় যে কোথা দিয়া কাটিয়া যাইত কেহ বুঝিতেই পারিত না। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আত্মগোপণে সুচতুর। নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ কাহিনীই হয়তো বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু বর্ণনার ভঙ্গীটি ছিল নিরপেক্ষ তৃতীয়-পক্ষের। তাঁহার সাহিত্যে ও জীবনে—নিজেকে অন্তরালে রাখিবার শিল্পী জনোচিত শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ।

বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া একবার তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছিলেন—"সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি করতে হ'লে নিজেকে হ'তে হ'বে একেবারে নিরপেক্ষ, নির্ম্মম। অপরের লেখা পড়বার সময় আমাদের সমালোচক মন তার দোষ ত্রুটী ধরবার জন্যে যেমন সদাজাগ্রত থাকে, নিজের লেখাও সেই মন নিয়ে পড়তে হবে। এই নিরপেক্ষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে তবে সে লেখা ছাপবে—নয়তো নষ্ট করে ফেলবে। নিজের লেখা যাচাই করবার এর চেয়ে ভাল কষ্টিপাথর আমার অন্ততঃ জানা নেই। আর এই নিয়ম অনুসারে আমি আমার যত লেখা ছাপিয়েছি, তার চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশী লেখাই নিজে ছিড়ে ফেলেছি বা পুড়িয়ে ফেলেছি।"

শরৎচন্দ্রের অমর প্রতিভার স্মৃতিতর্পণ হিসাবে তাঁহার এই পূর্ব্বোক্ত উপদেশটি যদি বাঙ্গলার আধুনিক সাহিত্যিকগণ মনে রাখেন ও অনুসরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঙ্গভারতীর পূজাঙ্গন অনেক অবাঞ্ছিত আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শুচিসুন্দর হইতে পারে।

'বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠার হাত ধরিল।' সেই শক্তিমান্ পুরুষ শক্তির পূর্ণতার মাঝেই আত্মসংহরণ করিলেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াও অস্ত্রোপচার ব্যাপারে যে নির্ভীকতা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন— সাহিত্যে ও জীবনে সেই অকুতোভয়তাই ছিল তাঁহার আদর্শ। অতএব তাঁহার তিরোধানে ললাটে করাঘাত করিয়া বালকোচিত ক্রন্দন শোভা পায়না। সবই বুঝি, কিন্তু তবু অশ্রুজল বারণ মানে না। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তো আমাদের হৃদয় সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠ রহিলেন—কিন্তু সেই মানুষ শরৎচন্দ্র, সেই পরিহাসরসিক সদাপ্রফুল্ল স্নেহভাজন দরদী শরৎচন্দ্র, সেই জাতি ধর্ম্ম বয়স নির্ব্বিশেষে অকৃত্রিম প্রীতিদানে অকৃপণ শরৎচন্দ্র, সেই আমাদের চিরপরিচিত অতিথিবৎসল, আভিজাত্যগর্ব্বলেশহীন বাঙ্গালী—আমাদের আত্মীয় শরৎচন্দ্র—তাঁহাকে আর কোথায় পাইব। এই অপরূপ মনের মানুষ শরৎচন্দ্রের তিরোধানে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অন্তরঙ্গ-গণের মনের যে স্থান শূন্য হইল, তাঁহার সাহিত্যের অমরত্ব বা অপর কোনও দার্শনিকতার দ্বারা আজ তাহা পূর্ণ করা সম্ভব নহে এবং কোনদিন তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।
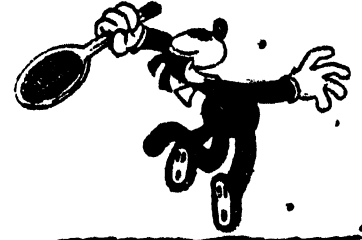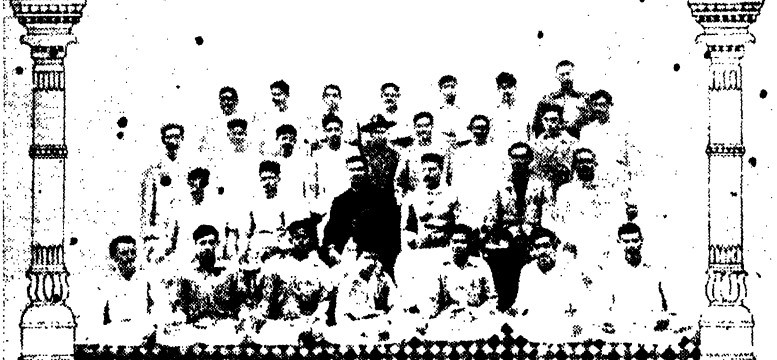
দরদী সাহিত্যিকের মহাপ্রয়াণে

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

বাংলার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মরমীলেখক শরৎচন্দ্র এবং আমাদের চিরপ্রিয় শরৎদার মহাপ্রয়াণের সংবাদে ব্যথিত, অগণিত নরনারী, অশ্রুসিক্ত নয়নে আসিয়া তাঁহার শবদেহকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। চন্দন চর্চ্চিত ললাটে পুষ্প সুশোভিত হইয়া দুঃখকাতর অসংখ্য ভক্তদের অশ্রুনৈবেদ্য লইয়া বাংলার শরৎচন্দ্র চলিয়া গেলেন চিরশান্তি ধামে।

তাঁহার শব শোভাযাত্রার অনুগমনে বেদনার যে ঘনবাষ্প চক্ষে ঘনাইয়া আসিয়াছিল—বাংলার আকাশ বাতাস যে দুঃখের কালো ছায়ায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—তাহা এখনও মিলায় নাই—কোনদিন মিলাইবে কিনা তাহাও জানি না। শোকাভিভূত চিত্তে শুধু স্মরণ করিতেছি তাঁহার অবদান গুলির কথা—তাঁহার চির প্রশান্ত সহাস্য মুখচ্ছবি।

লেখণী আজ স্তব্ধ—কণ্ঠ আজ রুদ্ধ—শুধু 'মনে' হইতেছে মরমী লেখকের নশ্বর দেহ আজ আর ইহজগতে নাই। আর আমরা কখনও তাঁহার সাহচর্য্যে আসিতে পারিব না। অভিশপ্ত জাতির ভাগ্যে নিষ্ঠুর বিধাতা নির্ম্মম হস্তে একি নিদারুণ মসী-রেখা টানিয়া দিলেন!

শরৎচন্দ্র কে ছিলেন—তাঁহার সাহিত্য অবদানগুলির সত্যকার পরিচয় কি—কোথায় তাঁহার স্থান?—এ কাহিনী বলিবার কোন প্রয়োজনই আজ আর নাই—আমরা শুধু ক্ষুব্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছি আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্যের কথা—একে একে নিভিছে দেউটি!

ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ ভাবে সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ আমার হয় নাই। কৈশরের স্বপ্নে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে ভালোবাসিয়া-ছিলাম—রাতের পর রাত জাগিয়া পড়িয়া-ছিলাম—'দত্তা' 'বিন্দুর ছেলে' 'শ্রীকান্ত' 'পণ্ডিত মশাই' 'বড়দি' 'অরক্ষণীয়া' 'মেজদি' প্রভৃতি তাঁহার অক্ষয় সৃষ্টি সমূহ। 'সাবিত্রী' 'রমা' 'অচলা' 'অভাগিনী অন্নদার' দুঃখে একান্ত নির্জ্জনে যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম—যৌবনেও সে অনুভূতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আজিও কর্ম্মাবসানে একান্ত সঙ্গোপণে, সন্ধ্যার ধূসর আলোকে পাঠ করি বাঙ্গালীর মর্ম্মের চির-জাগ্রত কাহিনীগুলি আর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাই। সাহিত্যিক সম্বন্ধে যে স্বপ্ন-মধুর একটি মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, আমার পাঠক কৈশর চিত্তপটে যৌবনে মাত্র কয়েকদিনের এবং কয়েক বারের পরিচয়ের মধ্যে সে স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া যায় নাই। ব্যক্তিগত পরিচয় সূত্রেও বাস্তব শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছি খাঁটি লেখক-শিল্পী শরৎচন্দ্র রূপে! শিশুর সরসতা—পল্লীর স্নিগ্ধতা উপলব্ধি করিয়াছি দক্ষিণ কলিকাতার বৈজ্ঞানিক সভ্য আলোক প্রভাবে অবস্থিত শরৎচন্দ্রের মধ্যে। সভা, সমিতিতে—উচ্ছাসে বন্দনায় ভরাইয়া তুলিতে গিয়া শুনিয়াছি মুখনিঃসৃত শিল্পীর বাণী—"আমাকে জনতার মধ্যে তোমরা টেনে নিয়ে যেওনা।"

আর একবার রেডিওতে তাঁহার গত জন্মতিথিতে সম্বর্দ্ধনা দান কালে আমরা তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছিলাম—প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "মানুষ শরৎচন্দ্র অপেক্ষা লেখক শরৎচন্দ্রের দীর্ঘায়ু তোমরা কামনা কর—মানুষ শরৎচন্দ্র থাক্‌লো কি না থাক্‌লো তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।" আমরা সে কথায় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম—কারণ আমরা যে উভয় শরৎ-চন্দ্রকেই ভালোবাসিতাম—কিন্তু আজ বুঝিতেছি কেন তিনি একথা বলিয়াছিলেন।

সেই শিল্পীপ্রাণ দরদী সাহিত্যিক আজ আর মানুষ শরৎচন্দ্র রূপে নাই—কিন্তু লেখক শরৎচন্দ্র আজিও রহিয়াছেন আমাদের মধ্যে এবং যুগে যুগে থাকিবেন বাঙালী হৃদয়ের অন্তরের চিরস্মরণের মণিকোঠায়।

সাহিত্য ক্ষেত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, থিয়েটার, সিনেমা সর্ব্বদিকেই ছিল তাঁহার অবিস্মরণীয় দান।

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল

জগতের কর্ম্মকেন্দ্রে বাজে যেথা কুর্ম্মের বিষাণ
সপ্তকোটি কণ্ঠে যা'রা তোমারে করিছে আহ্বান,
হে শিল্পী, দিবে না সাড়া ? জীবনের আলো-ছায়া মাঝে
আজও ত' আসেনি কবি, ক্লান্ত সন্ধ্যা স্তব্ধতম সাজে !
জলদ্ গম্ভীর স্বরে, নেপথ্যের ভৈরব হুঙ্কারে—
অন্যায় সমাজধ্বংসী, কাল-ধনু, বীভৎস্য টঙ্কারে
আজও ত' দেয়নি সাড়া, স্তম্ভিত করিয়া দশদিক্
সহসা দেখিনু চেয়ে, সে প্রাসাদে নাহি বৈতালিক !

একদা উচ্ছসি' উঠি জড়তাবিহীন শঙ্খ-রবে—
দিয়াছিলে আত্মবোধ বাঙালীরে অখণ্ড গৌরবে !
বাঙালী শরৎচন্দ্র, আজি তুমি বাঙালী সন্তানে
আসিবেনা জাগাইতে, বাণীমন্ত্রে, নব কলতানে' !
আর্ত্ত ধরনী তাঁই বেদনায়, কাঁদিয়া-লুটায়
চিরতরে মহাশূন্যে, শরতের চাঁদ ডুবে যায় !
তবু আজো, মনো-রাজ্যে জেগে রয় তোমার বারত
নব-জীবনের মাঝে মৃত্যু যেথা লাভে অমরতা !

ব্যথিত আর্ত্ত-অনাদৃত চিরদুঃখী-জনগণের লাঞ্ছিত জীবনযাত্রার লেখনী তাঁহার অশ্রু সমুদ্র-মন্থন করিয়াছে, পাপীকে দিয়াছেন তিনি স্নেহ কোল—লোক চক্ষে অশুচিকে তিনি দিয়াছেন শুচিতার রত্ন সিংহাসন—সর্ব্বোর্দ্ধে 'তিনি গাহিয়াছেন মানবতার জয়। তাই বৈষ্ণব লেখকের রচনায় শুনি বৈষ্ণব কবির সুর—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

বাংলার নারীহৃদয়কে তিনি যে ভাবে রূপ দিয়াছেন—স্নেহ, মমতা, প্রেম প্রীতি—করুণায় আর্দ্র-বিগলিত বাঙালীর নারীর কোমল অনুভূতি—রন্ধন সেবা পরায়ণা বাংলীর গোপন অন্তঃপুরচারিণী 'মহিয়সী মহিমাময়ী মহিলা'—তাহার আর তুলনা নাই। বাংলার মৃত পল্লীকে তিনি দিয়া গিয়াছেন নব-জীবনের চেতনা !

শরৎচন্দ্রের পরলোক গমনে তাই আজ নগরের জনারণ্য হইতে পল্লীর গৃহাঙ্গন এবং রন্ধনশালা অবধি শোকে মুহ্যমান !

দিনের শেষ রশ্মিতে সূর্য্যাস্তের করুণ রক্তিম আভা—শীর্ণ জাহ্নবীকূলে চিতাগ্নির শেষ শিখাটির করুণ ছবি আমাদের মন-লোকে বিষাদ স্মৃতির রেখা টানিয়া দিল।

অসংখ্য ভক্ত সমাগমের একপার্শ্বে অতি সঙ্গোপনে আমি আমার ভক্তি-অশ্রু-অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

(খিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

সারাভারতব্যাপী, হিন্দি বিদ্যাপতি-র অভাবনীয় সাফল্যে, আমাদের মত শিল্পানুরাগী বাঙালী মাত্রেই গর্ব্ববোধ কোরবে। নিউ-থিয়েটার্সের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়েচে; তাঁদের পরিচালক, শিল্পী, টেকনি-শিয়ানদের কলা-নৈপুণ্য ও কৃতিত্ব, বাঙলার বাইরের, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেচে ও অবিমিশ্র প্রশংসা অর্জ্জন কোরতে পেয়েচে—ছায়া-চিত্র শিল্পের ইতিহাসে, বাঙলার এ দান অমর হোয়ে থাকবে।

এখনও 'চিত্রা'য় 'মুক্তি' যেভাবে আসর জুড়ে বসে আছে এবং দর্শক আকর্ষণ কোরছে, তাতে আগামী মার্চ্চের পূর্ব্বে 'বিদ্যাপতি'-র বাঙলা সংস্করণ সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করবার ছাড়-পত্র পাবে বোলে মনে হয় না।

* * *

নিউথিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিওতে, পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের বাঙলা ও হিন্দি সামাজিক ছবির ইতিমধ্যেই মহলা সুরু হোয়েছে। ছবিখানির নামকরণ এখনও হয় নি। এই মৌলিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে পরিচালক বড়ুয়া, একটি সমস্যার অবতারণা কোরেছেন, যা'র নাটকীয় পরিণতির মধ্যে সেই সমস্যাটি সুমীমাংসীকৃত হ'বে। আধুনিক সমাজ এবং বস্তী জীবনের মধ্য দিয়ে, পরস্পর বিরোধী দুটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র কোরে, মূলতঃ এই বিচিত্র ঘটনাবহুল কাহিনীটির নাট্যাংশ গঠিত হোয়েচে। সমাজে পরস্পরের অধিকার বোধ সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে, জীবন যুদ্ধে এই দুটি নারী, যে রোমান্সের সন্ধান পেয়েছিল, তারই বিচিত্র পরিণতির কাহিনী এই ছবির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হ'বে।

সামাজিক চিত্র-গঠনের কৃতিত্বে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার সমকক্ষতা কোরতে পারেন—সারা ভারতে এমন পরিচালক দু'টি একটির বেশী নেই। নিউথিয়েটার্সের দুই নম্বর ষ্টুডিওর কর্ম্ম-সচীব ছোটাইবাবুর সঙ্গে সহযোগ ঘটায়, এই ছবিখানি যে সকল দিক দিয়েই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হোয়ে উঠবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। ফেব্রুয়ারী মাসের সুরু থেকে চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হবে।

* * *

সম্ভবতঃ আগামী মার্চ্চ মাসে 'রূপবাণী'তে নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" মুক্তিলাভ কোরবে। সর্ব্বসাধারণের চিত্তজয় করবার উপযোগী বহু মালমশলা আছে এই চিত্রের গল্পাংশে। যে সমস্যা আজ সমাজকে চঞ্চল কোরে তুলেচে অথচ সমাজ রক্ষকদের মধ্যে মনের মিল বা সহযোগীতার অভাবে যা'র সুমীমাংসা আজ হয়নি—একটি অপহৃতা নারীর মর্ম্মব্যথা ও জীবনের অশ্রুসজল কাহিনীকে কেন্দ্র কোরে, নিউথিয়েটার্সের বাছাই করা শিল্পী-সঙ্ঘ, তাঁদের অভিনীত অংশের মধ্য দিয়ে, সেই মীমাংসার পথ-নির্দ্দেশ কোরবেন। রাই বড়ালের সুর-সংযোজনায়, প্রফুল্লবাবুর পরিচালনায় এবং বিমল রায়ের ক্যামেরা-নৈপুণ্যে "অভিজ্ঞান" যে এবছরের একখানি পরম উপভোগ্য ও উল্লেখযোগ্য ছবি বোলে ছাড়পত্র পাবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

কালী ফিল্মস

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব" নামটার ভেতরই যেন কেমন একটা আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। নামটা যেমন এর চুম্বক—গল্পটিও তেমন রসঘন মালমশলায় অভিনব। বাঙলা দেশের বিয়ের বাজার কেমন জমাবার, শক্তিশালী লেখক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত হাসির ভেতর দিয়ে তাই নবরসে স্ফূর্ত্ত কোরেছেন। বিয়ে হবে পাঁচ জোড়া মেয়ে পুরুষে। তাদের বর্ণনা হ'চ্ছে—প্রথম জোড়া একটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দ্বিতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী তৃতীয় ব্যারিষ্টার—বিদুষী, চতুর্থ ডাক্তার—প্রেমিকা, পঞ্চম অভিনেতা—আলোক—প্রাপ্তা। এই বিয়ের ব্যাপারে এই পাঁচ জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার কত অভিনয়, কত রঙ্গরস, কত হা-হুতাশ কত 'রেকমেণ্ডাশন্' প্রভৃতি বিচিত্র সম্ভারে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ছবিখানার গল্প ও অভিনেতৃ সম্মেলন বিশেষ আকর্ষণীয়। এছাড়া প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ছবিখানা সবদিক থেকে লোকের মনে রেখাপাত কোরতে পারে সেইজন্য নাকি বিশেষ পরিশ্রম কোরছেন।

এই হপ্তায় এই ছবির বনলতার বাড়ীর দৃশ্য শেষ হ'য়ে গেছে এবং সম্প্রতি শ্রীমতীর ড্রয়িংরুমের কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। প্রথম সেট্‌টিতে মিঃ চৌধুরী (ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি) ফ্যালারাম (মণি সেন) মিস বনলতা সেন (বীণা) ও মিস শেফালি (ঊষা দেবী) শোনা যাচ্ছে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন। আর শ্রীমতীর ড্রয়িংরুমের দৃশ্যটি যেটি এখন তোলা হ'চ্ছে, এই দৃশ্যে শ্রীমতী (সাবিত্রী), মথুর (ধীরাজ ভট্টাচার্য্য) বনলতা প্রভৃতির মধ্যে চলেছে প্রেমের উঁকিঝুঁকি।

মোট কথা যেভাবে কাজ চলছে তা'তে মনে হয়, আসছে ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"র সানাইয়ের সুর উত্তরা'-র পর্দায় ভেসে উঠবে।

* * *

এদিকে 'এ' ইউনিটে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"-র মহেন্দ্রের গৃহের অপরাংশ তোলা হ'চ্ছে। প্রেম-বিরহ, আশা-নৈরাশ্যের সেই বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী "চোখের বালি"-র এই দৃশ্যটিই হ'চ্ছে একটি বিশিষ্ট দৃশ্য। সেইজন্য দৃশ্যটীর সাফল্যের জন্য পরিচালক সতু সেন, আলোক-চিত্র-শিল্পী ননী সান্যাল ও শব্দধর মধু শীল বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ কোরছেন। এ ছাড়া যারা অভিনয় কোরছেন—মহেন্দ্র (ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি), বেহারী (ছবি বিশ্বাস), বিনোদিনী (সুপ্রভা মুখার্জ্জি) ও তার মা (মিসেস ঘোষ) নিজ নিজ ভূমিকাগুলো ফুটিয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন।

হাজরা পিক্‌চার্স

এদের প্রথম ছবি "দেবী ফুল্লরা"-র আর একটি বহির্দৃশ্যের কাজ বেহালার সমীপবর্ত্তী এক জায়গায় তোলা শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্যটি খুব চিত্ত-চাঞ্চল্যকর। কারণ, বিশ্বঘাতক ভাড়ুদত্তকে (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) এখানে একটা গাছে বেঁধে সাওতালেরা পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা কোরছিল। সাওতাল মেয়েপুরুষদের নাচগান উৎসবাদির পর, যখন কাষ্ঠখণ্ডে অগ্নিসংযোগ করা হবে, এমন সময় "দেবী ফুল্লরা" আবির্ভূতা হ'লেন সেখানে। তাঁকে দেখেই ভাড়ু সজলনেত্রে বলে উঠল—"মা, আমায় রক্ষা কর—আমি এরূপ কাজ আর কোরবো না।" দেবী মুস্কিলে পড়লেন—তিনি সর্দারের দিকে চাইলেন। সর্দার তার মনোভাব বুঝতে পেরে দিল ভাড়ুকে ছেড়ে। প্রবীন পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এই দৃশ্যটি যা'তে লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কোরতে পারে স্বাভাবিকতার ভেতর দিয়ে তিনি তাই চেষ্টা কোরেছেন।—আর তাকে সাহায্য কোরেছেন নবীন চিত্র-শিল্পী বিভূতি লাহা ও শব্দধর যতীন দত্ত। হাজরা পিক্‌চার্সের নব উদ্যম সাফল্য মণ্ডিত হ'ক এই আমাদের একমাত্র কামনা।

মেট্রোপলিটান্ পিক্‌চার্স

'ডি-জি'র পরিচালনায় এদের "হাল বাঙলা"র শূটিং বেশ খানিকটা এগিয়েছে। "হাল বাংলার" গল্পটি আমরা যতদূর শুনেছি, তা'তে মনে হয় কাহিনী বেশ জমাটে। আর রস-পরিবেশনে 'ডি-জি' সিদ্ধহস্ত সেইজন্য রসঘন-কাহিনী পর্দায় বেশ জমবে বলে মনে হয়।

রাধা ফিল্মস

কালী প্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় "পুরুষোত্তম" তোলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়ে এল। আমরা যতদূর শুনেছি নাম ভূমিকায় নামবেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য আর নায়িকা সত্যভামা হ'চ্ছেন লীলা হালদার। এ ছাড়া মায়া, রেণুকা, সুশীল রায় প্রভৃতিও বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন। ভাল কথা, কিন্তু "পুরুষোত্তম" নামটা কিন্তু আমাদের মনে লাগে না—এ যেন মিনার্ভা থিয়েটারের নাটকের নামের মত হ'য়েছে। এরচেয়ে "বাসুদেব" নামটা মন্দ ছিল না।

মতিমহল থিয়েটার্স

জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের পরিচালনায় এদের ব্যঙ্গ-চিত্র "বেকার নাশন কোম্পানী লিমিটেডে"র আনুষঙ্গিক কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ছবিখানা তোলা হবে রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে।

এছাড়া হরি ভঞ্জের পরিচালনায় এদের আর একখানা সামাজিক ছবি উঠবে হেমেন রায়ের "যখের ধন।"

দেবদত্ত ষ্টুডিও

নরেশ মিত্তিরের পরিচালনাধীনে গোরার শূটিং শীঘ্রই সুরু হবে। চরিত্র নির্ব্বাচন প্রায় শেষ হয়েছে। যে কয়টি চরিত্র ঠিক হ'য়েছে তা' এই—গোরা—জীবন গাঙ্গুলী, বিনয়—মোহন ঘোষাল, গোরার দাদা—রবি রায়, পানুবাবু—নরেশ মিত্র, ললিতা — রমলা, গোরার মা — দেববালা সুচারিতার মা — রাজলক্ষ্মী। সুচিতার ভূমিকার জন্য এরা একটি সুদর্শনা অভিনেত্রী খুঁজছেন। না পেলে হয় ত, চারুবালাই এই ভূমিকায় নামবেন। তা, যদি হয়, তা, হলেই মুস্কিলের কথা। নিবেদনপক্ষে শান্তিও ত, ছিল।

এরপরই এরা আরও দু'একখানা ছবি তুলবেন—"অন্তরালে," "অভিনেত্রী"।

প্রফুল্ল পিক্‌চার্স

গেল হপ্তায় বটব্যালের বৈঠকখানায় দৃশ্য তোলা শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্য স্বাভাবিকতায় মণ্ডিত করবার জন্য প্রফুল্ল ঘোষ চেষ্টার কসুর করেন নি।

এই হপ্তায় 'নিউ মার্কেটে'র দৃশ্যটি বিশেষ সাফল্যের সহিত চিত্রায়িত করা হয় এবং এই দৃশ্যে সন্ধ্যা', তার পিতা ও 'গ্রাজুয়েট্ কুলি'রূপে যথাক্রমে অরুণা, ভাস্কর দেব (এঃ) ও সমর ঘোষ নাকি সবাইকে হাসিয়েছেন খুব।

পূর্ণ থিয়েটার

আস্‌ছে শনিবার থেকে এই চিত্রগৃহে নিউ পপুলার পিক্‌চার্সে'র বাঙলা সমর-চিত্র "ইন্সপেক্টর" বা "ধূমকেতু" দ্বিতীয় হপ্তায় পদার্পণ কোরবে। দক্ষিণ কলিকাতাবাসী যে ছবিখানা সাদরে গ্রহণ কোরেছে, তার প্রমাণ অসম্ভব জনসমাগম।

রূপবাণী

দেবদত্ত ফিল্মসের "গ্রহের ফের" অষ্টম ও শেষ সপ্তাহে প'ড়ল। বাঙলা দেশে রোমাঞ্চকর হত্যারহস্য বিজড়িত চিত্রকাহিনী হিসাবে "গ্রহের ফের" বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছে।

আগামী সপ্তাহে রূপবাণীতে বহুদিন পরে ইংরাজী ছবি প্রদর্শিত হ'বে নিউ ইউনিভারস্যালের হাস্যরসপূর্ণ কথাচিত্র "মাই ম্যান গড্‌ফ্রে" শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরেছেন উইলিয়াম পাওয়েল এবং ক্যারল লম্বার্ড।
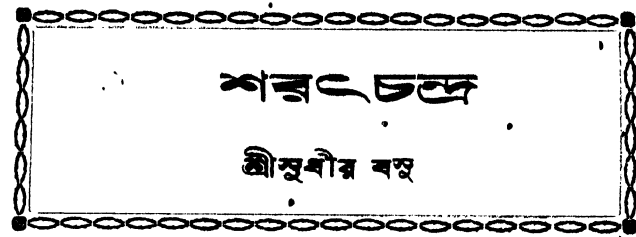
শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নশ্বর দেহের অবসান ঘটুক, তাই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে আমার মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জেগেছে যে, এত শীঘ্র কী শরৎচন্দ্রের বাঙলা সাহিত্যকে দান করার ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ হয়ে গেল? শরৎচন্দ্রের লেখনী, তাঁর ভাষা ও ষ্টাইল আমাদের মনে চিরদিনই যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করেছে। কিন্তু তবু এখানী আমারা তাঁর কাছে নিয়মিত অভিযোগ করেছি তাঁকে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে—তাঁর সৃজন প্রতিভার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে। যেদিন বাঙলা উপন্যাসে তিনি চিরাচরিত প্রথা বর্জ্জন ক'রে নায়ক নায়িকারূপে হাজির করলেন তাদেরই, যাদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়, লজ্জা ও কৌতূহল আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারে মজ্জাগত হয়েছিল, বাঙালী পাঠক পাঠিকা শরৎচন্দ্রকে রূপকথার পসারী বলে ভালবাসলে। শরৎচন্দ্রের এই যে বিদ্রোহ সকলে মাথা পেতে গ্রহণ করেছিল তা সত্য নয়। কিন্তু শরৎ সাহিত্যে তারা অপর কোন বিদ্রোহের সুর শুনতে পেল না—শুধু শুনল সেই মহাকালের বিভিন্ন বয়োসন্ধিতে যে সুর বেজে উঠেছিল তাঁরই প্রতিধ্বনি, প্রেমের জয়গান। বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, সহজিয়ার সাধন-রূপ, বিয়াত্রিচের পরিকল্পনা সবই একাকার হয়ে ফুটে উঠল কাল ও দূরত্বের ব্যবধান ভেঙে শরৎসাহিত্যে-প্রেমের পীঠস্থানে। প্রেম তিনি স্বীকার করলেন, প্রেমের মর্য্যাদা তিনি বাড়ালেন কবির কল্পনায়—বাস্তব পৃথিবীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে। তাঁর প্রেমের কড়া অনুশাসনে চাপা পড়ল নরনারীর অবচেতন কামনা, মানুষ হ'ল দেবতা, মানবী হ'ল দেবী। প্রেমের অমর্য্যাদা শরৎচন্দ্র ক্ষমা করেন নি, তাঁর নবসংহিতায় পাপ-পুণ্য এই ভাবে প্রকাশ পেল। শরৎচন্দ্র চরিত্রের সন্ধানে বস্তুতান্ত্রিক, কিন্তু প্রেমের পরিকল্পনায় হ'য়ে উঠলেন ঘোর আদর্শবাদী—তাই তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বেড়ে গেল। কিন্তু মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট প্রেম—উপদেবতা তারই উপর ভর করেছে, তাই 'গৃহদাহে' নরনারীর জীবনে নতুন কিছু অনুসন্ধান করলেন কিন্তু প্রেমের যূপকাষ্ঠে সুরেশচন্দ্রকে আত্মদান করাতে বাধ্য হ'লেন। হিন্দু সমাজপতির সহমরণের মধ্য দিয়ে বৈধব্যক্লেশ নিবারণের জন্য বিধানের মত। 'শ্রীকান্তে'র বিভিন্ন চরিত্রের শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে তাঁর মোহ-মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবশেষে আমরা পাই 'শেষপ্রশ্নের' কমলকে। 'শেষপ্রশ্ন' শরৎচন্দ্রের ব্যর্থ কি সার্থক প্রয়াস সে বিষয়ের

বিবিধ

ভবানীপুর এথ্‌লেটিক ক্লাব

ভবানীপুর এথলেটিক ক্লাবের-ঊনবিংশ বাৎসরিক ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনী ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশন প্রাঙ্গণে হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার ইউ,সি,-মহাতব এম্‌, এল্‌, এ—মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত ফনিন্দ্র নাথ বসুর 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটী হবার পর কার্য্যবিবরণী পাঠ হয়। পরে প্রোঃ জ্যোতিষ চন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম ক্রীড়া আরম্ভ হয়। ক্রীড়াগুলি সবই ভাল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মাষ্টার দুলাল, অধির, ও অনিলের বার্, সুধীরের রোলার ব্যালেন্স, শিশির ও শচীনের ব্লাঙ্ক ল্যাডার, নরেশ ও সুধীরের জাগলিং, আশুবাবুর, দুলাল ও পূর্ণের রোম্যান রিঙ, সত্য ও কানাইয়ের ফিট্‌স অন ফিট, ট্রংম্যান সুধীরের নেলবেডের উপর শায়িত অবস্থায় বুকের উপর লৌহপাত্র কর্ত্তণ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন, ইহাছাড়াও মাঃ প্রতুলের সোর্ড, কিশোরী. নিতিশ, সুনীল ও নিতাইয়ের লাঠি যু-যুৎসু—সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল।

অবতারণা না করে শুধু বলতে চাই যে শেষপ্রশ্নে শরৎচন্দ্র তাঁর সংহিতায় বিভিন্ন অনুশাসনে অনুপ্রাণিত হননি। তাঁর অসমাপ্ত "শেষের পরিচয়ে" একটী নারীর রূপপরিকল্পনায়ও তাই। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা 'কোন বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে' স্বতঃই উৎসারিত হোক্—মানবের জীবনের দুর্ব্বোধ্য ও দুজ্ঞের্য় রূপ, নর-নারীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিকল্পনা শরৎচন্দ্রের লিপিকুশলতায় অমর হোক্ এই কামনা যাঁরা করতেন তাঁরা শরৎচন্দ্রের শেষ রচনাগুলিতে যতই সামান্য হোক্ তারই কিছু সন্ধান পেয়েছিলেন—তাই শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তাঁদের কাছে একান্ত ক্ষোভের ও অসময়ের।

বালীগঞ্জ সংসদে শোক সভা—

গত ১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বালীগঞ্জ সংসদে বাংলার মরমী লেখক অজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবীন অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয়র পরলোক গমনে একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রায় খগেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়া ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, সুসাহিত্যিক ননী মাধব চৌধুরী এম-এ, সাহিত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তৃতাদি প্রদান করেন।

অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্রের চরিত্র মাধুর্য্য সম্বন্ধে অধ্যাপক তারক চন্দ্র দাশ এম্‌-এ, শ্রীযুত সত্যরঞ্জন সিংহ বি-এল্‌, বিস্তৃততর আলোচনা করেন।

সভাপতি রায়বাহাদুর খগেন্দ্র মিত্র মহাশয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রতিভা এবং হেরম্ব চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করিয়া বাংলার মনীষীদ্বয়ের পরলোক গমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

সভায় বহুজন সমাগম হইয়াছিল। অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী. এম্‌-এ বি-এল্‌, এ, ডি, জোয়াদ্দার ; আর, এল্‌, মুখার্জ্জী ; জে, সি, দত্ত ; ডাঃ আর, কে, মুখার্জ্জী ; এন্‌, পাকড়াশী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন

তরুণ সম্প্রদায়

গত রবিবার তরুণ সম্প্রদায়ের প্রাঙ্গনে (ভবানীপুর) সভ্যগণের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সদাশিব মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সম্পাদক মহাশয় কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। গ্রন্থাগার স্থাপন আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ বসু বলেন যে বস্তা পচা পুস্তক ভর্ত্তি হইলেই গ্রন্থাগার হয় না। এরূপ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। সমিতির ভাল খেলোয়াড়-দের যথাক্রমে তিনটি রৌপ্য পদক প্রদান করা হয়। সময়োচিত উপভোগ্য কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার পর ১৯৩৮সালের নিম্ন লিখিত কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হয়।

সভাপতি

১। শ্রীযুক্ত বাবু সদাশিব মিত্র।

সহঃ সভাপতি—

১। শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ।
২। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার সরকার।
৩। শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ ঘোষ।
৪। মিঃ, ডি, কে, বসু।
৫। শ্রীযুক্ত বাবু রবি ছবি মিত্র।

সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত কাশী নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক

১। শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষন বসু—
২। শ্রীযুক্ত মণিন্দ্র নাথ সাহা—

অডিটার

১। শ্রীযুক্ত বাবু পান্না লাল দে।

কোষাধ্যক্ষ

১। শ্রীকমল ব্যানার্জ্জি।

সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত সম্ভুনাথ বসু।
২। শ্রীযুক্ত জয়দেব চাটুর্য্যে।
৩। শ্রীযুক্ত কনক বরণ মিত্র।
৪। শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার বসু।
৫। শ্রীযুক্ত পঙ্কোজ নন্দন।

চরিত্র—পুরুষ।

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্‌, বাড়ী কালীঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিত শক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
সমর মিত্র—ভবানীপুর থানার কর্ম্মচারী ও হরেনবাবুর সহপাঠী।
রামদহিন—হরেন বাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

ঝড়ের রাতে

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

শ্রীভূধর নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

চরিত্র—স্ত্রী।

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বল্লুম—"জানিনা। আপাততঃ তো ফিরে চল। অন্য কোন পথ নিশ্চয় আছে। নইলে 'মহামন্ত্রীর' দল এখানে এলো কোন্ পথে ?"

পুনরায় ২নং হলঘরে ফিরে এলুম। দেখলুম, আরও একটা বড় থাম ভেঙ্গে পড়েছে। কোন দিকে যা'ব ভাবছি, পায়ের তলায় মাটী দুলছে, মাতালের মত টলছি—সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণী-হাওয়ার বেগে মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলছে। অন্য কোন একটা পথে মহামন্ত্রীর দল এখানে এসেছে—কিন্তু সে পথ কোথায়—কোন্ দিকে ?

পৃথিবীর দোলন যেন একটু বেড়ে উঠলো। উপর থেকে বড় বড় দুখানা পাথর ও খানিকটা মাটি ঝরে' পড়লো, একটা থামও চুরমার হ'য়ে গেল।

হঠাৎ লাফাতে লাফাতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এলো জ্যাক্! ডাকলুম—"জ্যাকি!"

জ্যাক 'ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠলো। তারপরেই ছুটে চলে গেল। খানিক দূর গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে, সে পিছন ফিরে আবার ডেকে উঠলো।

বল্লুম—"অবিনাশ, চল—চল। জ্যাকি আমাদের অনুসরণ করতে বলছে।"

দুজনে জ্যাকির অনুসরণ করলাম। হুড়মুড় করে' আরও খানিকটা ছাদ ভেঙ্গে পড়লো। প্রাণপণে ছুটে আমরা একপ্রস্থ সিঁড়ির সামনে এসে উপস্থিত হ'লুম। জ্যাক সিঁড়ির দিকে চেয়ে যেন ইঙ্গিতে আমাদের সিঁড়িতে উঠতে বলতে লাগলো। টর্চ্চের আলোটাও যেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে আসছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠতে লাগলাম। খানিকটা ওঠে গভীর নৈরাশ্যে বলে উঠলুম—"অবিনাশ,—hofeless (কোন আশা নেই)!"

অবিনাশ উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"কি ব্যাপার ?"

আমি বল্লুম—"মাথার উপর সিঁড়ির মুখ বন্ধ!"

অবিনাশ বল্লে—"মুখ যখন আছে, তখন বন্ধ থাকবেনা কিছুতেই। দাঁড়াও দেখি। তুমি একটু নীচে এসে 'রাণীর' ভারটা নিতে পারবে ?"

তাই করলুম। দু'ধাপ নীচে নেমে এসে রাণীর ভার নিলুম। অবিনাশ 'রাণীকে' একটা সিঁড়ির উপর নামিয়ে রেখে উপরে উঠে গেল। হঠাৎ আবার একটা উৎকট শব্দ কানে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সিঁড়িটা কেঁপে উঠলো। বল্লুম—"অবিনাশ, শীগগীর—শীগগীর—যা করতে চাও এখনি কর। উপরের খুব বড় একটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। যে কোন মুহূর্ত্তে—সিঁড়িটাও চূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে।"

অবিনাশ কোন উত্তর দিলে না। উপরের দিকে টর্চ্চের আলো ফেলে দেখলুম, সর্ব্বোচ্চ ধাপের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অবিনাশ সিঁড়ির মুখের আবরণটাকে পিঠ দিয়ে ঠেলছে। আমি অবাক্ হ'য়ে দেখতে লাগলুম। আমার মনে পড়লো, দৈত্য এ্যাট্‌লাসের, পৃথিবী পিঠে করে দাঁড়িয়ে থাকার ছবির কথা!

পৃথিবী দুলছে, মস্তিষ্কের মধ্যেও যেন একটা বিরাট আলোড়ন চলছে, আশে-পাশে—নিকটে দূরে—উপরের ছাদ সশব্দে ভেঙ্গে পড়ছে, আমি রুদ্ধনিশ্বাসে দেখছি, শরীর ও মনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে অবিনাশ উপরের বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে এই ভূগর্ভের অন্ধকারা থেকে বাইরের মুক্ত হাওয়ায় বেরোবার পথ করবার চেষ্টা করছে।

নিজের অজ্ঞাতসারে মনে মনে সময় গুণতে লাগলুম—এক—দুই—তিন—চার···। দেখলুম—একটু একটু করে অবিনাশের দেহ সোজা হ'চ্ছে। বাইরের খোলা ঠাণ্ডা হাওয়াও কতকটা যেন ভিতরে আসছে বলে মনে হ'লো। ক্রমশঃ অবিনাশ সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে একটা বড় পাথর সিঁড়ির মুখ থেকে সরে গিয়ে বাইরে ঠিকরে পড়লো।

হাঁফাতে হাঁফাতে অবিনাশ বল্লে—"হরেন, খোকাকে নিয়ে উপরে যাও। আমি 'রাণীকে' নিয়ে যাচ্ছি।"

আমিও জ্যাক উপরে উঠে এলুম। একটু পরেই অবিনাশ রাণীকে নিয়ে উপরে উঠে এলো। তখনও পৃথিবীর দোলন থামেনি!

অবিনাশ বল্লে—"তারপর ?"

আমি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। ঘন বনের মাঝে মাঝে খড়ের চালা—সংখ্যায় প্রায় ৫০ খানা হ'বে। বল্লুম—"অবিনাশ, এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এটা নাগ-গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের একটা ঘাটি। এখানে আরও অনেক লোক আছে। নীচে এদের কর্তা কাজে ব্যস্ত আছেন জেনে এরা নিশ্চিন্ত আছে। যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে, যে তাদের কাজে বাধা পড়েছে, তা' হ'লে আমাদের বিপদের সীমা থাকবে না। তা' ছাড়া, যে কোন মুহূর্ত্তে উপরের আবরণ তলায় ভেঙ্গে পড়তে পারে। তা' হ'লে আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হ'ব নিশ্চয়।"

কোন কথা না বলে আমরা দ্রুত বনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলুম। পৃথিবীর দোলন তখন বন্ধ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মনে হ'চ্ছে যেন এখনও সমান জোরেই ভূমিকম্প চলছে। হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দে আমরা চমকে উঠলুম। ফিরে চেয়ে দেখি আমাদের পিছনে অনেকদূর পর্য্যন্ত বনের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। যেখানে বড় বড় গাছ ছিল, ভূগর্ভস্থ প্রাসাদের উপরের আবরণ ভেঙ্গে পড়ায় সে স্থানটা একটা বিরাট খাদে পরিণত হ'য়েছে।

তখন একটু একটু করে' চারিদিক ফরসা হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। গত রাত্রিতেই বনের অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট হ'য়েছিল। সুতরাং আর এগিয়ে না গিয়ে' আমরা সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার টর্চ্চটা একটু একটু করে নিবে গেল। অবিনাশের টর্চ্চটা জাললুম। শুষ্ক ঘাসের আবরণের উপরে অবিনাশ 'রাণী'কে শুইয়ে দিলে। অদূর সমুদ্রের জলসিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস ফুরফুর করে বয়ে' যাচ্ছিল—দূরে ও নিকটে দু'একটা পাখীর ডাকও শোনা যাচ্ছিল—সে যেন প্রভাতের আগমনী!

ছেলেটীও আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমি তা'কে কোলে করে নিয়ে বসলুম। অবিনাশও আমার পাশে বসলো। জ্যাক একটু দূরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো—যেন সে এক মিনিটের জন্যও আমার সঙ্গছাড়া হয়নি, অথবা লজ্জিত বা অপ্রতিভ হ'বার মত কাজ সে কিছুই করেনি।

অবিনাশ বল্লে—"হরেন, এই ব্যাপারটা যদি কেউ আমাকে আগাগোড়া বলতে বলে, তো আমি নিশ্চয়ই খেই হারিয়ে ফেলবো। রাজা চন্দ্রকেতুর বংশীয়া 'রাণী' জ্যোতির্ম্ময়ী ওরফে উষাবতী ও তাঁর ছেলে অমরনাথ ওরফে দেবদত্তের উদ্ধার সাধন হ'লো, 'এ-বি-সি-ডি' ওরফে "মহামন্ত্রীর" এবং নাগ-গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের জীবন্ত কবর হ'লো, আমাদের জঙ্গলের অভিজ্ঞতা বাড়লো, আর বিশ্বাস ঘাতক কুকুর ফিরে এসে প্রভুর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুলো—যেন কিছুই ঘটে নি। কেমন, এই কি মোটামুটি গল্পটার চুম্বক নয়?"

হেসে বল্লুম—"কুকুর বিশ্বাসঘাতক তোমায় কে বল্লে? এই জ্যাকের শিক্ষা কোথায় তা' জান তো? ওর মাথায় মানুষের মত বুদ্ধি আছে। ও বেশ বুঝেছিল, যে যেখানে বলপ্রয়োগ নিষ্ফল, সেখানে চতুরতার আশ্রয় নেওয়াই বিধেয়। কাজেই আমাকে ছেড়ে ও শত্রুর ঘরে এসেছিল, আমাদেরই সুবিধার জন্য। যদি আমরা এদের সন্ধান করতে না পারতুম, তা' হ'লে নিশ্চয় জেনো, অবিনাশ, এই জ্যাকই আমাদের সে সন্ধান দিতো। আরও, অস্বীকার করতে পারো না, যে জ্যাকের সাহায্যেই আমরা নিষ্কৃতি পেয়েছি। নতুবা, ঐ খাদের মধ্যে নাগ-গোষ্ঠি সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদেরও থেকে যেতে হ'তো। 'মহামন্ত্রীর' জীবন্ত কবরের কথায় আমার একটা খুব বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। কেন জান? একটা অতীত গৌরবের নষ্টপ্রায় ধারাকে সঞ্জীবিত করে রাখবার এই যে প্রচেষ্টা—এ অতুলনীয়। যতদূর জানতে পারা গিয়েছে, এই 'মহামন্ত্রীর' পূর্ব্বপুরুষ সত্য সত্যই রাজা চন্দ্রকেতুর 'মহামন্ত্রী' ছিলেন। মনে করে দেখ দেখি, অবিনাশ, কি নিস্পৃহ 'এই মহামন্ত্রী'! যে ঐশ্বর্য্য রাজা চন্দ্রকেতুর প্রকৃত বংশধরের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ইনি আগলে বসেছিলেন, ইচ্ছা করলে তা' দিয়ে তিনি একটা রাজ্য কিনতে পারতেন। কিন্তু, সে ঐশ্বর্য্যের অতি ক্ষুদ্র অংশও তিনি আত্মসাৎ করেন নি। 'মহামন্ত্রী' একজন প্রকৃত বীর—অশেষ শক্তিমান নিস্পৃহ মহাপুরুষ। অবিনাশ, আমি তাঁর মুক্ত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি। যদি বল, শিশুকে সাপের মুখে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করবার কথা। সে ক্ষেত্রেও 'মহামন্ত্রীর' দিক থেকে দেখলে, তাঁকে দোষী করতে পারবেনা। তিনি একটা সম্পত্তির রক্ষক। সে সম্পত্তির অধিকারী সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারিত্বে সন্দেহ আছে। সুতরাং যদি নাগগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের নিয়মানুগত পরীক্ষা করতে তিনি প্রস্তুত হ'য়ে থাকেন, তো সেজন্য আমরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি কি? না অবিনাশ, 'মহামন্ত্রী' নমস্য—আমি আবার তাঁর আত্মাকে প্রণাম করি।"

অবিনাশ বল্লে—"ও! কতগুলো লোক আজ ঐ খাতের মধ্যে লুকিয়ে গেল!"

আমি বল্লুম—"শুধু লোক? না, অবিনাশ। আরও চিরকালের জন্যে লুকিয়ে গেল, বাংলার শিল্প গৌরবের একটা অমূল্য নিদর্শন। সেটা হচ্ছে স্ফটিক নির্ম্মিত সেই নাগরাজ-মূর্ত্তি। ঐ খাত হ'য়ে রইলো একটা মণির খনি—তার সেরা মণি সেই নাগরাজ মূর্ত্তি! আরও একটা জিনিষ লুকিয়ে গেল। সেটা—ঐতিহাসিক হীরা 'ঝলমল্'।"

এই সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'রাণী' ক্ষীণস্বরে বল্লেন—"আমি কোথায়? আমার অমর!"

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম—"আপনি ও আপনার সন্তান নিরাপদ, মা! ভাববেন না—নিশ্চিন্ত হ'ন্!"

আস্তে আস্তে উঠে বসে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনারা কে?"

আমি—"আমার নাম ডাক্তার হরেন মুখুজ্জে। আর, ইনি আমার বন্ধু অবিনাশবাবু।"

একটু চুপ করে থেকে 'রাণী' বল্লেন—"আপনাকে ধন্যবাদ।"

আমি বল্লুম—"আপনি আমার হাতে যে ভার দিয়েছিলেন—"

বাধা দিয়ে 'রাণী' বল্লেন—"না, না। আমি ঠিক আপনার হাতে ভার দিইনি। আমার স্বামীর কাছে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনে আপনার উপর আমার একটা বিশ্বাস জন্মেছিল। আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও আমার স্বামী আপনার অনেক খবর রাখতেন। আমি ও আমার স্বামী এখানে একরকম বন্দী হ'য়েই ছিলুম। যখন আমাদের সন্তানের জীবন বিপন্ন হ'ল, তখন আর কোন উপায় না পেয়ে স্বামীর হাতে ছেলেকে অন্যত্র পাঠাবার সঙ্কল্প করলুম। কিন্তু আমাদের শত্রু কতখানি শক্তিমান তা' আমাদের জানা ছিল। সুতরাং এরকম শক্তিমান শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে এমন লোক আপনি ছাড়া আর কাউকে না দেখে, স্বামীর পরামর্শে আপনার কাছেই তাকে পাঠাতে মনস্থ করলুম। তাঁরই হাতে ছেলেকে আপনার কাছে পাঠালুম। কিন্তু মায়ের মন তাতেও সন্তুষ্ট হ'ল না। তাই আপনাকে আমি একখানা পত্র লিখেছিলুম। পত্রখানা শেষ করবারও অবকাশ পাইনি। তাড়াতাড়ি সেখানাকে পদকের মধ্যে রেখে ছেলেকে স্বামীর হাতে দিলুম। তিনিও এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, যে জুতাজোড়াও পরবার অবকাশ পাননি। পরামর্শ যখন তাঁর, ইচ্ছা যখন তাঁর, তিনি নিজে যখন আপনার হাতে ছেলেকে তুলে দিয়েছেন, তখন তাঁর দেওয়া ভারই আপনি বয়েছেন, আমার দেওয়া ভার ঠিক নয়। যাই হোক, আপনি আমার যা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ ছাড়া আমার আর কিছু দেবার নেই। শুধু—যদি তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন—তাঁকে যদি ফিরে পেতুম! কি নিদারুণ অত্যাচারই না তার উপরে হ'য়েছিল! যেদিন আপনার সন্ধানে যান, তার একদিন আগে একটা থামের গায়ে বেঁধে তাঁকে চোরের মত চাবুক মারা হ'য়েছিল—অকারণ! যদি তাকে—" চাপা কান্নার আবেগে তাঁর স্বর বন্ধ হ'য়ে গেল।

আমি কোন উত্তর করতে পারলুম না। কি উত্তর দেব ভেবেও পেলুম না। শুধু বল্লুম—"কি করবো, মা। আপনার স্বামীকে আমার বাড়ীতে থাকতে অনুরোধ করবারও অবকাশ পেলুম না। খুব সম্ভব সন্তানের গুপ্ত আশ্রয় পাছে শত্রুরা জানতে পারে, সেই জন্য তিনি স্বেচ্ছায় প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছেন।"

'রাণী' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁর সন্তানকে তাঁর কোলে তুলে দিলুম। তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কান্নার বেগ আরও বেড়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বল্লুম না। খানিক পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"মা, আপনাকে কোথায় রেখে আসতে হ'বে?"

'রাণী' বল্লেন—"আমার বাবার নাম বোধ হয় শুনে থাকবেন। আমার বাবা, রায়বাহাদুর লক্ষ্মীকান্ত রায়।"

সসম্ভ্রমে বল্লুম—"বৈজ্ঞানিক লক্ষ্মীকান্ত বাবু?—রাজা সূর্য্যকান্তের বংশধর?"

'রাণী'—"হাঁ তাঁকে জানেন বোধহয়।"

আমি—"শুধু 'জানি' বল্লে তাঁর অপমান করা হয়। তিনি আমার গুরু। আমি বিজ্ঞানের যা কিছু আয়ত্ত করেছি তা' শুধু তাঁরই কৃপায়। তা' হলে, আপনার সাহায্য করে আমি ভাইয়ের কর্ত্তব্য পালন করেছি মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল। কই, তাঁকে তো মোটেই উদ্বিগ্ন দেখি নি।"
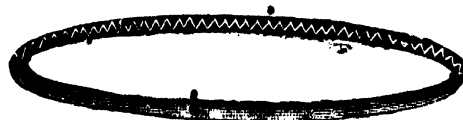
'রাণী'—"কেমন করে দেখবেন? তিনি এখনও জানেননা, যে আমার মাথার উপর দিয়ে এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল। আমি মধুপুরে স্বামীর কাছেই আছি, এই তিনি জানেন। তবে, প্রায় মাসখানেক কোন খবর না পেয়ে এতদিনে বোধ হয় তিনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমাকে বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেই হ'বে। কিন্তু কোন মুখ নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাবো জানিনা। রূপেগুণে অতুলনীয় সেই জামাই তার কিরকম ভাবে জীবন দিয়েছে, তা' যখন তিনি শুনবেন, তার একমাত্র মেয়ের কপাল কিরকম ভাবে পুড়েছে তা' যখন তিনি জানবেন, তখন তার বুক একেবারে ভেঙ্গে যাবে।"

আবার তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

পাশে শয্যায় নিশ্চিন্ত অবিনাশের নাকের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। উষার রক্তিম আলো গাছের পাতা রাঙ্গিয়ে পৃথিবীর বুকের উপর এসে পড়ছিল। অবিনাশকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুল্লুম। ধড়মড় করে উঠে বসে' অবিনাশ বলে উঠলো—"খবরদার! আছরে মেরে ফেলবো—"

পরক্ষণেই 'রাণীকে' দেখে অপ্রতিভ হ'য়ে বল্লে—"গুণ্ডোর দলের মধ্যে পড়েছি স্বপ্ন দেখেছিলুম। তুমি বড় 'ইয়ে', হরেন। এরকমভাবে আমাকে 'ইয়ে' করে দিলে! ছি!"

আমি বল্লুম—"এখন, এই বনের ভিতর থাকবে, না এখান থেকে যাবার মতলব আছে?"

অবিনাশ কাঠের পুতুলের মতন সোজা সামনের দিকে চেয়ে বল্লে—"নাঃ—যেতে হ'বে বই কি। উঠে পড়া যাক্ চল।" এই বলে' সে উঠে দাঁড়ালো।

সেখান থেকে সুড়ঙ্গের মুখে সন্ধান করে করে আমরা জঙ্গলের বাইরে জম্বিরা তীরে পৌঁছবার অভিপ্রায়ে চল্লুম। আসবার পথে 'পিউ-কিং'এর ঘর পড়লো। অবিনাশ পিউ-কিং'কে খোলসা করে দিলে। সে তিন লাফ দিয়ে বানরের মতন গাছের উপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিকটা দূর এসে আমি পথের খেই হারিয়ে ফেল্লুম। কারণ সেখানে কোন চিহ্ন দেওয়া ছিল না।

অবিনাশ বল্লে—"উপায়?"

আমি বল্লুম—"উপায়—জ্যাকি। জ্যাকি নিশ্চয় নদীরতীরে গিয়ে পৌঁছুবে। সুতরাং জ্যাকি যে পথে যাবে, চল আমরাও সেই পথে যাই।"

অবিনাশ জ্যাকিকে সম্বোধন করে বল্লে—"জ্যাকি, চল্। আমাদের তীরে পৌঁছে দে।"

জ্যাকি একবার অবিনাশের মুখের দিকে চাইলে, তারপর আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপর খানিকটা মাটি শুঁকে ও বাতাসে নাক উঁচু করে কিসের যেন আঘ্রাণ নিয়ে, সে চলতে আরম্ভ করলে।

বনের ভিতর দিয়ে যেতে 'রাণীর' খুবই কষ্ট হ'চ্ছিল। আমি তাঁর কোল থেকে দেবদত্ত ওরফে অমরনাথকে নিতে চাইলুম তিনি দিলেন না। বল্লেন—"সরু লতায় কত বড় ফল ঝোলে। লোকের মনে হয় এই বুঝি ছিঁড়ে পড়লো। কিন্তু লতার তাতে কোন কষ্ট হয় কি? ফল পেকে উঠা পর্য্যন্ত ঠিক সমান ভাবেই সেখানে সে ঝোলে।"

নীরবে কিছুক্ষণ চলবার পর আমরা তীরে এসে উপস্থিত হ'লুম। বিশাল জম্বিরা নদীর বুকের উপর তরঙ্গগুলি নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে। প্রকাঁন্তের পবনহিল্লোল যেন আবেগভরে ছুটে যাচ্ছে নদীর শীতল বক্ষ স্পর্শ করে' ধন্য হ'বার জন্য। চারিধারে শুধু পাখীর গান, হাওয়ার 'সোঁ-সোঁ' শব্দ আর তীরের গায়ে আহত তরঙ্গ মালার ঘুমপাড়ানী গানের মত মৃদু 'ছলছল্' গুঞ্জন!

তীরে এসে দেখলুম একখানা নৌকো বাঁধা রয়েছে। এই নৌকখানাতেই আমরা এপারে এসেছিলুম। কারণ, যে স্থানটায় আমরা নেমে ছিলুম, একটু ভাল করে' দেখতেই বুঝলুম, এটা সেই স্থানই বটে।

আমরা নৌকতে উঠে বসলুম। তারপর 'দুর্গা বলে' নৌকো ছেড়ে দিলুম। তখন সমস্ত নদীটার উপর আবীর ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের একপ্রান্তে সুবিরাট রক্তগোলকের মত সূর্য্য উঠছে।

(পরিশিষ্ট)

মাসখানেক পরে—আমার বাড়ীর ছাদ। কাল—সন্ধ্যা।

মনীষা—ছেলে কার? মা'য়ের না মাসীর?

উষা—মায়ের হলেও, সে চিরকালই মাসীর।

[২৪ পরগণার অন্তর্গত দেগঙ্গা নামক স্থানের একটা অতীত ইতিহাস আছে। শুনিতে পাওয়া যায় বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের এক পুত্র পুরন্দর সেন দেগঙ্গা নামক স্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন। রাজা চন্দ্রকেতু ঐ পুরন্দরের বংশের শেষ রাজা। গল্পের সংমিশ্রণে তাঁহার ইতিহাস বিকৃত হইয়া আছে। চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে রাজা চন্দ্রকেতুর বংশের এক শাখা আজিও বর্ত্তমান আছেন। তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তা এখনও, 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় ভবানীপুর চক্রবেড়ে রোড্ নিবাসী সেন-গোষ্ঠীও রাজা চন্দ্রকেতুর বংশীয়। ঘটনাটাকে রহস্তবহুল করিবার জন্ত দেগঙ্গার পরিবর্ত্তে কল্পিত 'চন্দ্রদ্বীপে'র অবতারণা করিয়াছি। ইতি—লেখক]

(সমাপ্ত)

অতীত ভবিষ্য নাই আছে শুধু দীপ্ত বর্ত্তমান

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

দেবত্বের গর্ব্ব কর, গর্ব্ব কর শাস্ত্রের ধর্ম্মের?
পাঠ করেছ কি কভু ইতিহাস মানব মর্ত্ত্যের,
শাশ্বত সাহিত্য খানি,
শুনেছ কি দৈববাণী?
যে ঋষি জীবাত্মা রূপে নিত্য করে মন্ত্র উচ্চারণ,
বহির্মুখী চিত্ত বৃত্তি ধ্যান মাঝে করি সংহরণ।
পৃথিবীর জরাজীর্ণ শাস্ত্র আর ধর্ম্মের শাসনে,
ব্যক্তিত্ব মরেছে আজ ধ্যানচ্যুত চিত্তের আসনে
অতীতের ভগবানে
আজো তাই বর্ত্তমানে—
অপ্রাপ্য অর্ঘ্যের ডালি দিয়ে যাও রে মূর্খ অজ্ঞান,
যে মণি ঢেকেছ পঙ্কে রাখিলে না তাহার সন্ধান!
জন্ম আর মৃত্যু হেরি জাগেনাকি অশেষ জিজ্ঞাসা?
কবে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মিটায়েছে অতৃপ্ত পিপাসা?
কবে কোন ব্রহ্মলোক
হরিয়াছে মৃত্যু শোক—
কোন ঋষি দার্শনিক করে গেছে তত্ত্ব আবিষ্কার?
স্পর্দ্ধাশালী কে সে জ্ঞানী লঙ্ঘিয়াছে দুঃখ পারাবার?
দেশ ও কালের গণ্ডী মনের বিচার কক্ষ মাঝে
স্বাপ্নিক মননযন্ত্রে দর্শনের সূক্ষ্মসুর বাজে,
জীবের জীবন্ত দৃষ্টি—
আব্রহ্ম তৃণের সৃষ্টি—
মুহূর্ত্তে সাধন করে বুদ্ধিজীবী মানব সমাজে,
মায়াবীর ভোজবাজী কল্পলোক ব্যাপিয়া বিরাজে।

বিজ্ঞানের প্রেক্ষাগারে কাল-পরিমাপকের কাঁটা,
ভূতাবিষ্ট বৈজ্ঞানিক গতিস্রোতে জোয়ার ও ভাটা
নিয়ত নির্ণয় করে
বুদ্ধি মার্গে দম্ভভরে
সাগর মন্থন লাগি' তুচ্ছ করে মহাপঙ্ক ঘাঁটা,
আয়ুর বিলাস ছাড়া জীবনের নাই পুঁজি পাটা।
মানব মনের সৃষ্টি জৈব আর অজৈব জগত,
অদৃশ্য বিদ্যুৎ গতি সৃজন ও প্রলয়ের রথ
গভীর রহস্য তলে
কল্পনায় নিত্য চলে
মনোময় বিশ্বলোকে জন্মে আর মরে বহু 'মত',
অজ্ঞেয় ভীতির রাজ্যে তৃপ্তিশূন্য করে মনোরথ।
সূক্ষের কম্পনে জাত বস্তুপিণ্ড সচল এ দেহ,
আবার সূক্ষ্মেতে লীন হায় মূর্খ আছে কি সন্দেহ?
মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া
দার্শনিক বুদ্ধি নিয়া
কোন্ স্বর্গে যা'বি তুই, বিচারক নাই সেরে কেহ,
'মানস-বিধাতা' গড়ি পুণ চাস্ তারি অনুলেহ?
মানব রচিত ধর্ম্ম নাহি মানি পুঁথি ও পঞ্জিকা,
অতীত সমাজ তন্ত্রে জ্বলে নিতি স্বার্থ-বহ্নি-শিখা?
গতকাল যা'ক মরে,
সত্য জ্যোতি এ অন্তরে,
জ্বলুক চিতার মত প্রেতভূমি করি দীপ্যমান,
অতীত ভবিষ্য নাই আছে শুধু দীপ্ত বর্ত্তমান।

জাগো দীপ্ত বর্ত্তমানে মানুষের অভিশপ্ত হিয়া
ভয়ঙ্করী বহ্নি শিখা মর্ম্মতলে উঠুক জ্বলিয়া,
জাগো ব্যক্তি-স্বাধীনতা
অতীতের অধীনতা,
অসহ্য লাগিছে বড় শাস্ত্রের ধর্ম্মের অত্যাচারে,
পৌরহিত্য গুরুগিরি, বর্ব্বরের বমন উদ্গারে।
ক্রূর অভিসন্ধি ময় দুর্নীতির নৈতিক জঞ্জালে—
শ্বাসরুদ্ধ স্বদেশাত্মা রক্তশূন্য নিষ্প্রাণ কঙ্কালে,—
সমাজ শাসন মানি,
মৃত্যুরে এনেছে টানি
অজ্ঞতার যূপ-কণ্ঠে ধর্ম্মভয়ে ভীত মেষপাল
বুভুক্ষাজর্জ্জর তবু অন্ধকারে রহে চিরকাল।
হে সমাপ্তি গ্রাস কর হতভাগ্য কবির জীবন,
এ বড় দুঃসহ লাগে শূন্যতায় কাঁদিবে কি মন?
মানি না ঈশ্বর কভু
কেহ মোর নাই প্রভু
জন্মেছি মানুষ—দেহে সত্য জানি মানুষের জ্ঞান,
অসহ্য লাগিছে বড় পদে পদে আত্ম অসম্মান।
হয়তো বিচার মম নহে ঋষি গৌতমের মত
সাংখ্যকার কপিল ও ব্যাস সম মন্ত্র শত শত

রচিনাই কোনো দিন,
বুদ্ধি মোর নহে ক্ষীণ,
তবুও মানুষ আমি আমারও তো স্বাধীন বিচার,
কারো চেয়ে ছোট নয় এ আমার নহে অহঙ্কার।
আমারে করিয়া কেন্দ্র ঘূর্ণ্যমান কালচক্র ঘোরে—
বস্তুময় বিশ্বলোক বাঁধিয়া রেখেছি চিত্ত ডোরে—
আমি আছি তাই তুমি
তাই জাগে বিশ্বভূমি,
কল্পনার কাব্য রচি নিশ্বাসের উত্থান পতনে,
অশাশ্বত প্রেমে-আতি ভাবময়, স্বপ্ন—নিকেতনে।
হায়রে মানবমন ব্যক্তিগত কাব্য সে যে মায়া?
উন্মাদ দর্শন বেত্তা নিত্য-লেখা ফেলে আত্ম ছায়া,
কত কবি অহংকারে,—
রূপক ও অলঙ্কারে—
যুগে যুগে সভ্যতারে করে গেছে কূট প্রবঞ্চনা,
সে কাব্য শাশ্বত ভাবি কোটি আত্মা সহিছে লাঞ্ছনা।
কল্পিত দেবতা সৃজি' মৃত্তিকায় যতো কুম্ভকার—
দেবত্বের ধর্মধ্বজা উড়াইয়া করিছে চিৎকার
মন্দির—গীর্জ্জায় মঠে—
উদ্ভট চিত্রের পটে,
পাঁজীতে—পুথীতে আর—পুরাণ ও পাঁচালীর স্তূপে।
মানবপশুর আত্মা নিমজ্জিত করে—অন্ধকূপে।
বাইবেলাদি ধর্মগ্রন্থ গীতা জেন্দাবেস্তা বেদ ত্রিপিটকে,
যেথায় মুক্তির পথ, না মানিলে পচিবে নরকে,
সমস্ত মানব যতো—
প্রচারিল ধর্ম্ম কতো!
দুঃখের শাসন হতে তবু জীব পেলনা নিস্তার,
অনিবার্য্য মৃত্যু আজো ক্রূর মূর্ত্তি ছুটিছে দুর্ব্বার॥

যতোক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ সত্য এ জগত
আমার মৃত্যুর পরে কোথায় চলিবে বিশ্বরথ?
চাহিনা সে তত্ত্ব কথা,
তৃপ্তিহীন ব্যাকুলতা
কি লাভ জাগায়ে মর্ম্মে অবহেলা করি বর্ত্তমান?
পর জন্মে কিছু নাই দেহ ভস্ম শেষ পরিণাম।
দেখেছ কি কোনোদিন আকাশের লক্ষ কোটি তারা?
অসংখ্য জগত যেথা অসীম রহস্যে আত্মহারা,
সৌর জন্ম বিভীষিকা,
কাঁপে লক্ষ নীহারিকা,
সেথায় কি ধর্ম্ম আছে, আছে শাস্ত্র, আছে কি ঈশ্বর?
ব্যর্থ অনুমান রাশি লেখা কভু—পাবেনা উত্তর।
মানুষ মর্ত্ত্যের পশু, মানুষ তো মর্ত্ত্যের বীজাণু,
শূণ্যের স্পন্দন মাঝে স্থান তার ক্ষুদ্র পরমাণু,
সীমাবদ্ধ জ্ঞান তা'র
তবু করেম হুংকার—
তবু করে মূর্খ সম ধর্ম্ম আর ঈশ্বর সৃজন,
মনের স্বাধীন শক্তি পর বাক্যে করিয়া নিধন।
কে পারে অমৃত তত্ত্ব বুঝাইতে মৃত্যুধর্ম্মী হ'য়ে?
মর্ত্ত্যের—বীজাণু তুই স্পর্দ্ধাভরে ধর্ম্মশাস্ত্র লয়ে,—
মানুষের সত্যনাশি,
অর্থহীন মন্ত্র রাশি—
পারিবি কি দিয়ে যেতে কাল্পনিক অমর্ত্ত্য নিবাসে?
যখন সকল সত্তা লুপ্ত হবে শাশ্বত বিনাশে?

দেখেছ কি অন্তর্ভেদী দৈব চক্ষু মন-মানবের?
ভুলে যাও ধর্ম্মবেত্তা রচিত যা' স্বার্থ দানবের,
অন্তর্মুখী মর্ম্ম হ'তে—
বহে যা'ক খর স্রোতে—
জাগতিক অনুভূতি সত্য যাহা মানব মনের—
সেথায় ছলনা নাই তত্ত্ব কথা অনিত্য ক্ষণের।
আজিকার সত্য যাহা মিথ্যা হয় আগামী প্রভাতে—
ধূলায় লুটায়ে কাঁদে বসন্ত কালের অস্ত্রাঘাতে—
সর্প-শিশু প্রেম কূলে,
জন্মলয় নানা ভুলে—
পরম আত্মীয় বক্ষে জেগে উঠে তীব্র হলাহল,
হিংসার কলুষ রক্তে ধর্ম্মনীতি করিয়া বিকল।
বিশ্বাস ও অবিশ্বাস একই সাথে পাশাপাশি চলে,
সুনীতি দুর্নীতি আর পাপ পুণ্য এই ধরাতলে,
প্রয়োজন সিদ্ধি তরে—
মানুষ সৃজন করে—
ধর্ম্মের দোহাই পাড়ি ভণ্ডামীতে করে স্বেচ্ছাচার
শাস্ত্রের শাসনে' খোলে নরক ও স্বর্গের দুয়ার।
এইরূপে চলে শ্রাদ্ধ সমগ্র জাতির পিণ্ডদান,
সত্যের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ি পাষণ্ডেরা করে রক্তপান।
নারীরে বঞ্চনা করি
পৈশাচিক মূর্ত্তি ধরি—
নিত্য করে—ভিখারী ও নপুংসক পুত্র উৎপাদন;
সমাজের দুষ্টব্রণ লক্ষকোটি—নির্জ্জীব জীবন।

দেখেছ কি অভাগিনী রমণীর বৈধব্য যন্ত্রণা,
দেখেছ কি নিরক্ষর—শ্রমিকের অশেষ লাঞ্ছনা ?
ভিখারীর—দুঃখরাশি
ধনিকের—ব্যঙ্গ হাসি

নেহারিয়া রে পাষাণ জাগেনা কি অন্তরে উন্মাদ ?
মুমূর্ষ জননী তোর চেয়ে দেখ্ করে আর্ত্তনাদ।

কি হ'বে সমাজ নীতি—স্বার্থপর রঘুনন্দনের ?—
যুক্তি হীন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা পদে পদে শত বন্ধনের,—
শাস্ত্রমেধ যজ্ঞানলে—
ভস্ম কর সে সকলে,

দূর করে ফেলে দাও মানুষের সৃষ্ট ভগবান,
অজ্ঞতায় নির্য্যাতীত উৎপীড়িতে কর পরিত্রাণ।

যৌথ ভাবে কোনো দিন করেছ কি কোনো শুভকাজ ?
কৌলিন্যের শিরে তোর পড়ুক অনল ভরা বাজ,
চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মাশ্রয়ে—
পাঠায়েছ যমালয়ে—

দরিদ্র দুর্ব্বল যতো দীন হীন মানুষের প্রাণ,
ধর্ম্মের বাণিজ্য ধজো মনুষ্যত্বে দিয়া বলিদান।

যে পিতা মনের মত শিক্ষা দেয় আপন সন্তানে
ভ্রূণ হত্যাকারী সে যে স্বার্থপর আত্ম অভিমানে
স্বেচ্ছাচারে মত্ত হয়ে,
মানব জীবন লয়ে,

প্রতিষ্ঠা করিতে চায় শিশুমনে ভ্রান্ত মতবাদ,
সন্তানে শাসিতে চায় নিষ্পেষিয়া ক্ষীণ আর্ত্তনাদ।

পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্মে মানুষের উত্তরাধিকার—
ধ্বংস করে শৈশবের স্বতস্ফূর্ত্তি স্বাধীন বিচার—
রাহুগ্রস্ত স্বচ্ছ মনে
পর ধর্ম্ম আক্রমণে—

অতীত আদর্শ আসি জীবাত্মার করে সর্ব্বনাশ ;
কুশিক্ষায় জর্জ্জরিত মূর্খ জীব হারায় বিশ্বাস।

অনন্ত বিপ্লবময়ী প্রকৃতির বিরাট জঠরে
শিক্ষার নির্দ্দেশ নাই আদর্শ জন্মায় আর মরে,—
কালচক্র তলে তাই—
সভ্যতার রক্ষা নাই—

পুরাতনে চূর্ণ করে অনাগত যাত্রা পথে ধায়,—
ঈশ্বর করিবে রক্ষা ? হায় মূর্খ ঈশ্বর কোথায় ?

ঈশ্বর যদি বা থাকে দেশকালাতীত সত্তা তাঁর—
ধর্ম্ম শাস্ত্রাধীন নহে, নাই তার সঙ্কোচ প্রসার,—
মৃত্যুহীন মহাসিন্ধু—
সংখ্যাহীন জীববিন্দু—

সে বিরাট ব্যাপ্তি বুকে অনর্থক করে কোলাহল,
অনিবার্য্য মৃত্যু স্মরি অসহায় ফেলে অশ্রুজল।

সৃষ্টির প্রথম রাত্রি আসে নাই কভু কোনদিন,
চিরকাল সবই আছে চিরকাল সবই হয় লীন
অনন্ত একের বুকে
সাময়িক দুঃখে সুখে

চঞ্চল মানব চিত্ত ক্ষণস্থায়ী ফেলে দীর্ঘশ্বাস ;
মূল্যহীন সান্ত্বনাতে ঊর্দ্ধ কাণে জানায় উচ্ছ্বাস

মানুষ যে মরে গেল নির্ম্মম ধর্ম্মের অত্যাচারে—
শাস্ত্রান্ধ কলুষআত্মা দাঁড়ায়েছে মৃত্যুর দুয়ারে—
স্বার্থপূর্ণ অর্থনীতি—
সৃজিয়াছে লক্ষ ভীতি—

জীবাত্মারে পুষ্ট কর নিত্য কর চিত্তের ব্যায়াম,
বাস্তব জীবনে নাই, স্বপ্ন আর সুখের আরাম।

একটি মানব বক্ষে জাগে যদি শ্রম বিমুখতা,
ধনোন্মত্ত চিত্তে তার জাগিবেই স্বার্থ কলুষতা
রচিবে নূতন শাস্ত্র
অত্যাচারে দিবারাত্র

বঞ্চিত ও প্রবঞ্চকে লাগিবেই বিপুল সংঘাত—
বাঁধিবে ভয়াল যুদ্ধ দিকে দিকে হ'বে রক্তপাত।

যুদ্ধ যুদ্ধ এস যুদ্ধ, অগ্নিময় অনন্ত বিপ্লব,
বীভৎস দুর্গন্ধময় দগ্ধ কর সভ্যতার শব,
দেবত্বের রক্ত স্রোতে
এস রুদ্র জিহ্বা হ'তে

শোণিত পিপাসু মূর্ত্তি জিঘাংসায় ছাড়িয়া হুঙ্কার
সে রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখি কর আজ ধর্ম্মের সৎকার।

শাস্ত্র ধর্ম্ম রাজনীতি বুভুক্ষার প্রচণ্ড সংগ্রামে
নিমেষে ভাঙ্গিয়া পড়ে ব্যক্তিত্বের দক্ষিণে ও বামে
জাগে ধর্ম্ম দুঃশাসন,
বিপ্লবের রক্তানন

ভয়াল ভ্রুকুটী করে মৃত্যু ধর্ম্মী জীর্ণতার পানে
বৃথা দেবত্বের গর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র লুটায় শ্মশানে।

কোন্নগর পাঠচক্রের নবম বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত॥

রেডিও প্রসঙ্গ

সভ্যভাষী

বেতারে অভিনয় প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথাই বলেছি, এ বিভাগটির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে কমে। এবারের প্রোগ্রামে বেতার জগতে দুখানি যাত্রার বই নির্ব্বাচিত হয়েছে দেখলুম। আমাদের একাধিক আলোচনার ফলে নাটক নির্ব্বাচনে একটু রসজ্ঞানের পরিচয় আমরা এবিভাগের পরিচালকের কাছ হতে পেয়েছিলাম কিন্তু অভিনয় অংশ এমন নীরস প্রাণহীন হোল যে, নাটকগুলির আসলরূপই শ্রোতাদের কাছে প্রকাশ পেল না। এ, আই, আর প্লেয়ার্সদের অভিনয়ের ষ্ট্যাণ্ডার্ড দিনে দিনে অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কোন intellectual partএর কোন সুষ্ঠ অভিনয় রূপ আমরা পাইনে। সেই গতানুগতিকা—পূর্ব্ব একঘেয়ে পথের অন্ধ অনুসরণ! সাধারণ রঙ্গালয়ের পাদপীঠে যা আজ যুগধর্ম্ম প্রবাহে অচল হয়ে এসেছে—বেতারে তারই সমারোহ।

* * *

এ বিভাগের পরিচালক মিঃ ভদ্র কোনরূপ নতুনত্বের পরিচয় দিতে পারছেন না। যুগধর্ম্মের প্রবাহে মানুষের রসবোধ রুচির যে পরিবর্ত্তন ঘটছে, সাহিত্যের দিক থেকে, artএর দিক থেকে, রসের দিক থেকে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করেই আমরা তা অনুভব করতে পারি। মিঃ ভদ্রকে আমরা রসজ্ঞ বলেই জানি অথচ তিনি কেন যে এদিক থেকে উদাসীন তা আমরা ভেবে পাইনে।

* * *

সাহিত্য প্রসঙ্গের তেমন বিশদ আলোচনা বেতারে আর পূর্ব্বের মত পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত আলোচনা বেতারে বাঞ্ছনীয়। জাতির জীবনে, সমাজে জাতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ কত যে ঘনিষ্ঠতর তা আজ আর কারুরই অবিদিত নয়। জাতির উন্নতির মূলে—জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টির মূলে জাতীয় সাহিত্য। 'বিদ্যার্থী মণ্ডল' এদিক্ উপলব্ধি করেছেন তাই সেখানে সাহিত্য প্রসঙ্গ আজ দেখছি সুপ্রতিষ্ঠিত। পরিচালক সাহিত্যিক নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এর জন্যে আমরা প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি। বেতারে অপরদিকে মহিলা মজলিস, জেনারেল প্রোগ্রামে এ প্রসঙ্গ তেমন বিস্তৃততর গতি বিস্তার করতে পারছে না—এ বড় পরিতাপের বিষয়। বেতারে প্রকৃত সাহিত্য, রসমূলক আলোচনার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বক্তৃতা বিভাগের কর্ত্তার এদিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

* * *

বেতারে ছোটদের আসরে আমরা দেখলুম "মাসীমার" আবির্ভাব। শিশুশিক্ষা মাতৃশিক্ষায় অধিক পরিপুষ্ট হয় আমরা তা বিশ্বাস করি। আমরা এবিভাগটির মন্তব্য পরে প্রকাশ করবো।

* * *

শুক্রবার ৭ই জানুয়ারী সান্ধ্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের "গোরা" বেতারে অভিনীত হোল। বিশ্বকবির এই অপূর্ব্ব অবদান রঙ্গালয়ের পাঠপীঠে ছিল বেঁচে—রঙ্গালয়ে এই সর্ব্বজন প্রশংসিত নাটকখানি কতখানি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে বেতার নাটকে দল তারই একটুকরা পরিচয় দিলেন। মাঝে মাঝে বেতার অর্কেষ্ট্রাও সেই অনুযায়ী যাত্রা প্যাটার্ণের ঐক্যতান ধ্বনি সরবরাহ করে জানিয়ে দিচ্ছিলেন যে এটা যাত্রা—থিয়েটার নয়। আমাদের সবিশেষ দুঃখ এটা রবীন্দ্রনাথের নাটক বলে।

* * *

রবিবার ৯ই প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে আলি হোসেন এবং তাঁর সম্প্রদায় সানাই বাজালেন। শীতের সকালের বাতাসে হোসেন সাহেবের বাজনার মূর্চ্ছনা খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভবতোষ ভট্টাচার্য্যের "বাস কোষে অসি" এবং "আর কত না করবি হেলা" দুখানি গান হোল। গায়ক রামপ্রসাদী সুরের সুন্দর রূপ দিলেন। পারুল চৌধুরীর দুখানি গান হোল—খুবই উপভোগ করেছি। আমরা এই শিল্পীটির ক্রমোন্নতি কামনা করি। পরে ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জী খেয়াল আশাবরী গাইলেন। তানপুরার শব্দে কণ্ঠস্বর চাপা পরে গিয়েছিল। আমরা ভীষ্মদেব বাবুর কাছ হতে আরও উচ্চাঙ্গের কিছু আশা করেছিলাম।

ঐদিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—লতিকা মুখার্জ্জীর গান ভালো হয়নি। গলা কেঁপে অনভ্যস্থতার পরিচয় দিচ্ছিল। হিন্দি গানখানিও তদ্রূপ। কুমারী অনিমা দাস সেতার বাজালেন—চলনসই। মাধুরী দেবীর "নিতি এসে কে ডাকে আমায়" এবং "এসে তুমি মন চেয়ে" গান দুখানি বিশেষ ভালো নয়।

* * *

সোমবার ১০ই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর গান চলন সই। ডাঃ বিনয় সেন পি-এইচ ডি মহাশয়ের বক্তৃতা "বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা" আমাদের মনে কোন impression আনে নি। ভাষাটি মোটেই মিষ্ট নয়।

* * *

মঙ্গলবার ১১ই ছোটদের আসরে ইন্দিরা দেবী লিখিত "কলুর খেলাঘর" অনুষ্ঠিত হোল। ছেলেদের খেলাঘরে চাই সরসতা—অভিনয়

-প্রসঙ্গে সে রূপ প্রকাশ পায় নি—actingও থার্ড ক্লাশ। পারিপার্শ্বিক সঙ্গীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। 'মালীমা' চিঠি পড়লেন দুর্বোধ্য—অত্যন্ত উচ্চারণদুষ্ট। বাসন্তী দেবী হিন্দী গান গাইলেন বিশ্রি। সত্যেন বাগচীর আবৃত্তি সমালোচনার বাইরে।

মিসেস কানিংহাম সরকার "সাওতালি ও মান্টো" জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি পরিচয় দিলেন। অত্যন্ত দুর্বোধ্য বাংলা এবং গানগুলিও সাওতালি গানের কোন রূপ দিতে পারে নি। মিসেস সরকারের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ করুণ রসাত্মক না হয়ে হাস্য রসের উদ্রেক করেছিল। Subject matterটি ছিল ভালো। অপর কাউকে দিয়ে বলালে উপভোগ্য হোত।

শিউলি সরকারের "মঞ্জুল মাধবী বনে" গানখানি চলনসই।

* * *

১২ই বুধবার পল্লীমঙ্গল আসরে সব্যসাচী সেতার বাজালেন—চলনসই। প্রফুল্ল মিত্রের গান মন্দ নয়। পঞ্চাননবাবুর গান "যদি মরমে লুকায়ে রবে"-ভালো না।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে লীলা দেবী "ভারতের মহীয়সী নারী সীতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। রামায়ণ কাব্যের সীতা—আদর্শ হিন্দু রমণী সীতার সুন্দর পরিচয়—ভাষা বেশ ঝরঝরে, বলবার কায়দাও ভালো। মহিলা মজলিশে লেখিকার স্থান হওয়া উচিত।

* * *

বিদ্যার্থী মণ্ডলে সুসাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস চণ্ডীদাস হইতে চৈতন্য যুগ পর্য্যন্ত একটি সুন্দর মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিলেন। সাহিত্য রসের দিক থেকে বক্তৃতাটি খুবই তথ্যপূর্ণ ছিল।

১৩ই জানুয়ারী সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কতকগুলি রেকর্ড বাজানো হোল। সব পুরানো এবং বাজে। বেতার অর্কেষ্ট্রা concert partyর bandএর মত বাজালেন। ইংলিশ গদের ব্যর্থ অনুকরণ! পশুপতি চ্যাটার্জ্জী "সুন্দর বন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন—আমাদের মোটেই ভালো লাগে নি। শিশুদের আসরে উপযুক্ত—বলবার কায়দাও ভালো নয়।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

বড়দিনের ছুটীতে পাটনায় "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের" পঞ্চদশ অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলার বাহিরে যে সকল সহরে বাঙ্গালী প্রভাব প্রতিপত্তি সহকারে বহুদিন বসবাস করিয়া আসিয়াছে এবং আজও আসিতেছে তন্মধ্যে পাটনাই সর্ব্বপ্রধান। আজও পাটনার হাইকোর্টে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, বাঙ্গালী হাকিম; শিক্ষায়তনে বাঙ্গালী অধ্যক্ষ, বাঙ্গালী অধ্যাপক তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই প্রভাব প্রতিপত্তি আছে বলিয়াই এই সম্মেলনের অধিবেশন পাটনার 'সেনেট হলে' এবং প্রতিনিধিগণের বাসস্থান 'ক্যাভেণ্ডিস হষ্টেলে' হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

প্রায় আড়াই শতের অধিক প্রতিনিধি এবং সহস্রাধিক পাটনাবাসী বাঙ্গালীর এই সম্মেলন সর্ব্বদিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে ভিজিগাপট্টম, রাওয়ালপিণ্ডি, ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি সুদূর প্রবাস হইতে বাঙ্গালীর সমাগম হইয়াছিল। চারদিন ব্যাপী নানা সভা সমিতিতে ও আদর আপ্যায়নে বিভিন্ন মনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

অবশ্যি বাঙ্গালী জাতির যে সমস্ত ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে, পাটনার বাঙ্গালী কিম্বা অন্যান্য প্রবাসী বাঙ্গালী তাহা হইতে মুক্ত নহেন। ব্যক্তিগত মতানৈক্য হেতু অনেক সময়ে দক্ষ যজ্ঞের সৃষ্টি হয়, পাটনা অধিবেশনে সেরূপ কিছু অনুষ্ঠিত না হইলেও পাটনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতি অনেকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় অল্প কয়েকদিন হইল পাটনায় আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তথায় নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাহার প্রমাণ, যে এই সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছেন। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা সহজেই অনুমিত হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদা কুমার ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের অক্লান্ত পরিশ্রম ইহারি সাফল্যের মূলীভূত কারণ। সম্মেলনের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা এই কাজে তাহাদের দিবস ও যামিনী অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্মেলনের মূল ও শাখা সভাগুলির ব্যবস্থা ও পরিচালনায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন অধ্যাপক ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদার। বিভিন্ন কার্য্যের দায়িত্ব লইয়া যাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা ও আন্তরিকতায় প্রতিনিধি মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশগুপ্ত (গৃহসজ্জা ও আমোদ প্রমোদ), শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ চন্দ্র মিত্র (নিদু বাবু) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত কুমার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (আহার

বাসস্থানের ব্যবস্থায়) শ্রীযুত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অবনী চট্টোপাধ্যায়। স্বেচ্ছা সেবক ও স্বেচ্ছা সেবিকাগণ তাহাদের কর্ত্তব্য সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন।

সহজ ও চিরন্তন ব্যাকুলতা কোথায়ও পরিলক্ষিত হইল না। গত কয়েক বৎসর ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশগুলিতে যে সমস্ত কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে তাহার বহু

প্রতিনিধি আবাসে পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ

গত বৎসর রাঁচিতে স্নেহ-অভাবটুকু খুবই পরিলক্ষিত হইয়াছিল, এবারের সম্মেলনীতেও তাহাই দেখিলাম। উভয় সম্মেলনেই বহু মহিলা দর্শকের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু একমাত্র প্রদর্শনী ও সঙ্গীত পরিচালনা ছাড়া কোথায়ও মহিলাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা দেখিতে পাইলাম না। প্রতিনিধিদের আহারাদির ব্যবস্থায় বাঙ্গালী মহিলাদের কোন সাহায্য ছিল বলিয়া মনে হইল না। প্রবাসের ও দেশের বাঙ্গালী ভাইবোনদের আহারাদিতে আদর আপ্যায়ন করিবার গুরু দায়িত্ব মহিলা সেবিকাগণই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী সর্ব্ব প্রকার আন্দোলনের স্রষ্টা হইয়া আজ এই সব ক্ষেত্রে কেন পশ্চাতপদ হইতেছেন তাহা খুবই ভাবিবার বিষয়।

২৭শে বেলা ১টায় সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। বিহারের তথা সমগ্র ভারতের নেতা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মেলনীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি বাঙ্গালী ও বিহার বাসীর কৃষ্টিগত সাধনা ও শিক্ষা দীক্ষার কথা উল্লেখ করেন। বিহারে কিছুদিন হইল বাঙ্গালী বহিষ্কারের একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে। সরকারী কার্য্যে বাঙ্গালীদের নিয়োগ এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীদের গ্রহণ এক রকম বন্ধ হইয়াছে। এইরূপ নীতির ফলেও পাটনার বাঙ্গালী সমাজের নিকট বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁদের শ্রদ্ধা হারাণ নাই। রাজেন্দ্র বাবুর আগমনে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাহার জয় ঘোষণা করেন। স্যার পি, সি, রায়ের অভিভাষণে তাহার সেই পুরাতন সুর ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বিকেলে সঙ্গীত শাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। ধৈর্য্যসহকারে সকলেই তাহার অভিভাষণ শ্রবণ করেন, কিন্তু দীর্ঘতার জন্য অনেকেই অভিযোগ করিয়াছিলেন। রাত্রি আটটায় তাহার কীর্ত্তন হয়। তাহার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য লোক সমাগম খুবই হইয়াছিল কিন্তু সকলেই আশানুরূপ খুসী হইতে পারিয়াছিলেন কিনা বলা বড়ই মুস্কিল। দীর্ঘ অভিভাষণের পর তাঁহারও স্বভাবজাত ক্লান্তি আসিয়াছিল এবং শ্রোতাদের সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসবে মন ও দেহ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই কীর্ত্তন বেশীক্ষণ হয় নাই। পশ্চিমে বাঙ্গালী মহলে এই কীর্ত্তনের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে, জীবনে এই দুর্লভ গান শ্রবণ সম্ভব হইবে কিনা—এইরূপ খেদোক্তি অনেককেই করিতে শুনিয়াছি। অনেক সময় মনে এই কীর্ত্তন সঙ্গীতে সেইরূপ আশানুরূপ কিছু না পাইয়া অনেকেই নিরাশ হন।

পরদিন সাহিত্য শাখার অধিবেশন। সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি শ্রীযুক্ত মোহিত লাল মজুমদার। বহু উচ্চদরের সাহিত্যিক বাঙ্গলায় বাঁচিয়া থাকা সত্ত্বে এই সমালোচক সাহিত্যিকের কেন ডাক পড়িল তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহার

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তোরণ ও পাটনা সেনেট হল

অভিভাষণ আমাদের আনন্দ দান করিতে পারে নাই। তিনি এত বড় সভায় সভাপতিত্ব করিবার সৌভাগ্য বোধহয় ইহার পূর্ব্বে কোথাও পান নাই। তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণটী 'শনিবারের চিঠির' পাতায় ছাপা হইলে হয়ত কাহারও কোন আপত্তির কারণ হইত না কিন্তু ছোট বড়, সাহিত্যিক অসাহিত্যিকের মিলন কেন্দ্রে এইরূপ ঘরোয়া কোঁদলের অবতারণা বড়ই অশোভন হইয়াছে। সাহিত্য স্রষ্টির পূজারী হিসাবে তিনি যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বাঙ্গালী সাহিত্যের অনেক লেখকের নামোল্লেখ করেন নাই তাহা স্পষ্টই মনে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটীর নিয়োগ ব্যাপারে তিনি যে সমস্ত সমালোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার অমর্য্যাদা বলিয়া মনে হইল। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথনাথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, দীনেশ সেন, জলধর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকদের দান স্বীকার করিবার মত মনোবৃত্তি তিনি লাভ করেন নাই। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক' গতবারের সাহিত্য সভায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তরুণ সাহিত্যিকদের কটাক্ষ করায় সাহিত্য অধিবেশনেই যেরূপ আন্দোলন হইয়াছিল পাটনায় তাহা হয় নাই। হয়ত তাহা হইতও, কিন্তু ব্যাপার বুঝিয়া মোহিতবাবু শারীরিক অসুস্থতা ঘোষণা করিয়া সজনীবাবু প্রমুখ পার্ষদের সঙ্গে সভা ত্যাগ করেন এবং তাহার পর আর সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল কিন্তু ঘটনার বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। তবে শান্তিনিকেতনের শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট লিখিত অভিভাষণ পাঠ না করিয়া সহজ সরল ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যান। তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই বরং মনে হইতেছিল মঞ্চের উপর বসিয়া সেকালের ঋষি পুরুষ যেন তাঁহার আত্মদর্শনের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন।

সম্মেলন ও আলোচনা ছাড়াও সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ পরস্পরের মেলামেশা করিবার বহু প্রকারের সুযোগ দান করিয়াছেন। পাটনার বাঙ্গালী সম্প্রদায় প্রতিনিধিবর্গকে তাঁহাদের নাট্য-প্রতিভা দর্শন করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন—পৌরাণিক নাটক 'খনার' অভিনয় করিয়া। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের খুব কমই হইয়াছে।

শ্রীসমীরেন সেন

গার্ব্বোর প্রেমাস্পদ

গ্রেটাগার্ব্বো প্রেমে পড়েছে একথা আমরা শুনিছি বহুদিন ধরে বহুবার, অথচ সত্য সত্যই সে যে আজ পর্য্যন্ত কারোর প্রেমে পড়েছে একথা মনেই হয় না। কাজেই সত্যাসত্য সম্বন্ধে—পাঠকদের ওপর ভার দিলাম। তাঁরা বিচার করুণ। আমার বলার কথা, আমি বলছি।

গার্ব্বো গর্ব্বিতা কিনা বলতে পারি না—তবে সে যে অপরের সঙ্গে মিশতে চায় না এটাও সত্যি কথা। লোকের না মিশতে পারাটা শুধু গর্ব্বোর কারণ নয়, লজ্জারও তো বটে।

গ্রেটাগার্ব্বো পর্দ্দায় অভিনয় করা ছেড়ে দেবে এটাও নতুন আমরা শুনছি না। অভিনয় ছাড়তে সে ইচ্ছুক কি-অনিচ্ছুক একথা সেই বেশী জানে। সে নামতে চায় ও পাঁচ জনে তাকে অভিনয় করতে বাধ্য করে কিনা একথা ষ্টুডিও বলতে পারে। আমরা বুঝি, পাবলিসিটির জন্য ষ্টুডিওকে এমন কথা ঘোষণা করতে হয়। এতে ছবিখানার নাম ও আর্টিষ্টের নাম বাজারে গরম থাকে।

গ্রেটাগার্ব্বোর নতুন যে কোন ছবির কোন খবর যখন সাধারণকে জানান হয় তখনই তার মধ্যে বড় করে একটি খবর লোককে জানান হয়, 'গার্ব্বো', প্রেমে পড়েছে। গার্ব্বোর প্রেমাস্পদের নাম তাই দু তিন জন নয়। বড় ছোট অনেক লোক।

গ্রেটাগার্ব্বোর নাম জন গিলবার্টের নামের সঙ্গে জড়িয়ে বলার পূর্ব্বেও আমরা অন্য লোকের নামের সঙ্গে বলেছি। তারপর সেদিনও 'কুইন ক্রিশ্চিনা' তোলার সময়ে আমরা শুনেছি তার নামের সঙ্গে রুবেন ম্যামুলিয়েনের নাম। সে ছবি তোলা শেষ হোল। পরের ছবি উঠল 'দি পেণ্টেড্ ভেল'। গুজবের কথা বিশ্বাস করে কে না ভেবেছিল জর্জ্জ ব্রেণ্টের নাম গ্রেটার সঙ্গে কিছুতেই মিথ্যে হবে না। তাও তো হোলো। তারপর এলো 'ক্যামিলি' ছবি। কতদিনের আগের ছবি। 'ক্যামিলি'র কথা আজো লোকের চোখে জল জল করে ভাসছে। তখন সবাই তো ভেবেছিল রবার্ট টেলরের নাম আমাদের ঠকাতে পারবে না। জন গিলবার্টকে ভুলতে পারে, রুবেন ম্যামুলিয়ানকে ঠকাতে পারে, জর্জ্জ ব্রেণ্টকে উত্তর না দিতে পারে। সুন্দরতম পুরুষ ম্যাটিনি আইডল রবার্ট টেলরকে কিছুতেই গ্রেটা নারীর সাধনার ধন না ভেবে থাকতে পারবে না। ছবি শেষ হয়ে গেছে। যারা সত্যিকার দেখবার, তারা প্রায় সবাই দেখে ফেলেছে। কই আজ গ্রেটার সঙ্গে টেলরের নাম কেউ তো শুনতে পায় না। কোন প্রচার কর্ত্তাই তো গল্পচ্ছলে কাগজে লেখে না।

গ্রেটার পরের ছবি 'মেরী ওয়ালিউস্কা'। গত সপ্তাহে যা কলকাতার 'মেট্রো' সিনেমায় হয়ে গেল। এই গার্ব্বোর প্রথম ছবি—যে ছবি দেখে লোকে গালে হাত দিয়ে ভাবছে বসে হিরো ভাল অভিনয় করল, না, হিরোয়িন অভিনয় ভাল করল—নেপোলিয়ন ভাল হয়েছে না মেরী ওয়ালিউস্কা ভাল হয়েছে—চার্লস বয়ারের পার্ট ভাল না গ্রেটা গার্ব্বোর পার্ট ভাল। চার্লস বয়ার এই একটি মাত্র অভিনেতা—যে গ্রেটার ছবিতে নায়ক সেজে গ্রেটার প্রেমাস্পদ বলে নাম কিনতে পারল না। প্রচারকর্ত্তা চার্লস বয়ারকে বোধ হয় রেহাই দিয়েছে।

গ্রেটার সঙ্গে চার্লস বয়ারের নাম যোগ করে প্রচার করলে সাধারণের কাছে খবরটা খুব ভাল লাগত না। বয়ার বিবাহিত লোক। হলিউডে বিবাহিত লোক হওয়া না হওয়ায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ বিয়েটা তাদের কিছু নয় এবং যে কোন মুহূর্ত্তেই চুকিয়ে ফেলা বা বন্ধন ছিন্ন করা যেতে পারে। তাতে কোন দিক থেকেই কিছু আসে যায় না। হলিউডে এমনও দেখা যায় যে, কোন স্বামী বা কোন স্ত্রী বিবাহিত অবস্থাতেই অপরের সঙ্গে প্রেমে পড়ছে ও বিবাহে অঙ্গীকৃত হচ্ছে এবং

ক্লান্ত-তটিনীর তটে নিভে গেল উৎসাহ-আলোক

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

শীর্ণ আদিগঙ্গা কূলে দেখিলাম সন্ধ্যার ছায়ায়
সাহিত্যের ভাবী আশা চিতাভস্মে নির্ব্বাপিত প্রায়!
প্রতিপদ চন্দ্র হাসে দেশবন্ধুস্মৃতিসৌধ পাশে;
শরৎচন্দ্রের চিহ্ন অবলুপ্ত দক্ষিণ বাতাসে।

তাহারে দেখেনি কেহ নবীন কবির পরিচয়ে,
কৈশোরের যৌবনের ধীর পদক্ষেপের বিনয়ে।
গোপন সাধনা শেষে, অকস্মাৎ বিজয় মালিকা
গ্রহণ করেছে কণ্ঠে, ললাটে নিয়েছে জয়টিকা।

মানের আসন লভি রাখিয়াছে তেজস্বিতাসনে
দৃঢ়করতলগত। কৃতাঞ্জলিপুট-নিবেদনে
দারিদ্র্যের—সাহিত্যের মর্য্যাদা সে করেনি কুণ্ঠিত,
বাণীর অঞ্চলখানি দেয় নি সে হ'তে ভূলুণ্ঠিত!

বঞ্চিত লেখকদলই তারে চাহি চলিয়াছে পথ।
দীন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি—সাহিত্যের নব-ভবিষ্যৎ!
ছিলনা দুরতিগম্য, অনায়াসে আত্মীয় পরম
হয়েছে সে বাক্যজালে। মিলালো সে হাসি মনোরম

আমরা, যাহারা লিখি, অতিবড় তাহাদেরি শোক।
ক্লান্ত তটিনীর তটে নিভে' গেল উৎসাহ আলোক।
হৃদয়ের কাছাকাছি, অন্তরের এতটা নিকট,—
এত বড় প্রতিভার তুলনা পায়নি স্মৃতিপট।

যে পেয়েছে যতটুকু, সেই তাই রেখেছে সঞ্চিত!
যে দেখেছে যতটুকু তাই নিয়ে থাক্ বিমোহিত।
তবু যতদূর চাই,—রবি-অস্তরাগ করি পার,
বিস্মৃত সাহিত্যভূমি,—অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।

কোর্ট থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরকে স্ত্রী বা স্বামী বলে গ্রহণ করছে। এতে কেহই কিছু দোষের ধরে না। চার্লস বয়ারের ক্ষেত্রে এরূপ হবার উপায় নেই। ওর স্ত্রীর নাম প্যাট প্যাটারসন। ওদের মধ্যে প্রেম প্রগাঢ়।

গ্রেটার নতুন খবর আমি দিচ্ছি। আমার পাঠকেরা যাদের ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুণ। কেউ কেউ বলছে গার্বোর মধ্যে প্রেমের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কে সেই ভাগ্যবান পুরুষটি, এই নিয়েই ছিল হলিউড জগতের বড় আলোচনা। সেদিন জানা গেল গ্রেটার হৃদয়জয়ী ভদ্র মহোদয়ের নাম হচ্ছে লিওপোল্ড ষ্টকোস্কি। মিউজিক কণ্ডাক্টর— যার একটি তর্জ্জনী সঞ্চালনে একশখানা বাজনা ঝনঝনিয়ে ঝঙ্কার তোলে তাকেই বিজয়িনী বোধহয় বরমাল্য দিলে।

তবে কি গ্রেটা হার মানল?

এলেন ব্যারীর ছবি

এলেন ব্যারী যে ছবিতে নেমেছে তার নাম 'হাউ টু আনড্রেস ইন ফ্রণ্ট অব ইয়োর হাসবেণ্ড।' ইংল্যাণ্ডে ছবিখানি দেখান হয়নি হয়ত এদেশেও হবে না। ছবিখানির নাম শুনে অনেক নীতি-বাগীশ নাসিকা কুঞ্চিত করবে এও আমরা বলতে পারি।

মার্লিণ ডিয়েট্রিশ নামছে 'ফ্রেঞ্চ উইদাউট টিয়ার্স'এ। এলেন ব্যারী ও জন ব্যারীমুরও নামছে এই ছবিতেই।

কিছুকাল পূর্ব্বে গুজব রটেছিল এলেন ব্যারী ও জন ব্যারীমুর 'দি টেম্পেষ্ট' ছবিতে নামতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। খবর নিয়ে জানা গেল কোন ষ্টুডিওই ওদের দুজনকে নিয়ে 'দি টেম্পেষ্ট' ছবি তোলা ঠিক করেন নি। তবে কিছু কাল পূর্ব্বে তাঁরা দুজনে রেডিওতে 'দি টেম্পেষ্ট' নাটকে নেমেছিলেন। ক্যালিবান ও এরিয়েল ওরাই দুজনে সেজেছিল।

টারজনের ছবি

যেদিন চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হোল যে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন গ্লেন মরিস ও 'বেল বয়' খেলোয়াড় লু গেহরিগ 'টারজনস রিভেঞ্জ' নামে ছবিতে অভিনয় করতে অবতীর্ণ হচ্ছে সেদিন হতেই রাশি রাশি দরখাস্ত ষ্টুডিও অফিসে উপস্থিত হচ্ছে।

প্রডিউসার সল লিসার বলেছেন তাঁর চিঠির বাক্স রোজ বোঝাই হয়ে যাচ্ছে, যত সব নাম করা অ্যাথলেটদের আবেদনে। জেসি ওয়েন্স, নিগ্রো ষ্টার—সেও নাকি ওখানে দরখাস্ত পাঠিয়েছে।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীইন্দিরা দেবী
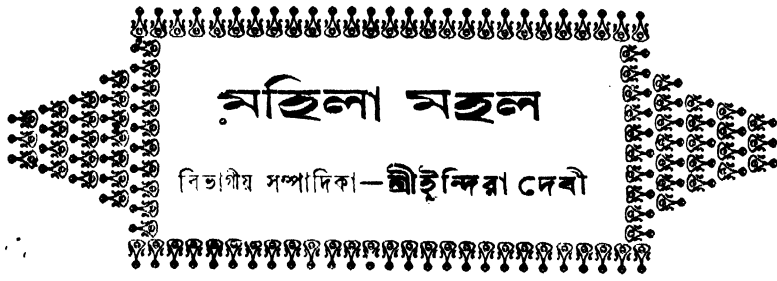
পরলোকে স্বরূপরাণী নেহেরু—

[১০ই জানুয়ারী প্রাতে আনন্দ ভবনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মাতা স্বরূপরাণী নেহেরু পরলোক গমন করিয়াছেন। ৯ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় পক্ষাঘাত রোগে তিনি একেবারে অসাড় হইয়া পড়েন এবং ১০ই জানুয়ারী সকাল ৫টায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সুস্থই ছিলেন এবং ডাঃ আনসারের পরিবারবর্গের সহিত চা পান ও কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত শয়নের পূর্ব্বে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন যে, মাতার সংজ্ঞা নাই—পক্ষাঘাতের আক্রমণে অসাড় হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরুর আর জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই—ভোরে ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আগামী মার্চ্চ মাসে তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইত।

৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় চীনা সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য তিনি ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়াকে ১০টাকা দিয়াছিলেন। ইহাই তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য।

পরলোকগতা স্বরূপারাণী নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান জন্য অতি প্রত্যুষ হইতেই সর্ব্বশ্রেণীর লোক দলে দলে আসিতে থাকেন। সহরের ব্যবসায় কেন্দ্র সমূহে হরতাল পালিত হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর দুই ভগিনী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীযুক্তা কৃষ্ণা হাতী সিং মাতার অন্তিমকালে মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টার সময় মৃতদেহ শোভা যাত্রা সহকারে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী তথায় শেষ কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও মাতৃভক্ত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সহরবাসীরাও জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই এই মহিয়সী মহিলার স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কোনরূপ কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বশ্রেণীর প্রায় ৫০ হাজার লোক তাঁহার শবের অনুগমন করে। বেলা ১১টার সময় শোকযাত্রা আনন্দ ভবন হইতে যাত্রা করে ও বেলা দুই ঘটিকার সময় উহা গঙ্গার ঘাটে পৌছে।]

স্বর্গীয় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহধর্ম্মিণী স্বরূপরাণী নেহেরু কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন। সমস্ত দেশ ও জাতি নেহেরু পরিবারের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। দেশের জন্যে যে সব তেজস্বিনী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধেয়া লোকান্তরিতা স্বরূপরাণী নেহেরু তাঁদের ভিতর অগ্রগণ্যা। তিনি বীরজায়া ও বীরমাতা। অমর মতিলাল নেহেরুকে অম্লানবদনে তিনি অগ্রগতির পথ দেখিয়েছিলেন এবং সংগ্রামের সময় স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে নেতৃত্ব করে যোগ্যা সহধর্ম্মিণী বলে নিজেকে দেশের কাছে সারা জগতের কাছে পরিচিতা করেছিলেন। স্বামীর পরলোক গমনের পর সাধারণ মানুষের মতো বানপ্রস্থ অবলম্বন করে দেশের ও দশের কাজে নিজেকে অনুপস্থিত না রেখে পরিপূর্ণভাবে স্বামীর আদর্শে ও আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—এবং হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মাননীয়া শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, পিতা মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জন সাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা জগতের কাছে এ সংবাদ অজানা নয়।

স্বরূপরাণী যে সৌভাগ্য ও যশ নিয়ে গেলেন তা অনেক যোগ্য ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে না। বীরমাতা ও বীরজায়ার স্মরণে আমরা বাংলার নারী সমাজের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে বলি বাংলার ঘরে ঘরে স্বরূপরাণীর আবির্ভাব ঘটুক।

ছেলেমেয়েদের মানুষ করা—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গত কয়েক সংখ্যায়—শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের উক্তির সারাংশ প্রদান করেছি, এবং শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের প্রবন্ধ এখানেই শেষ হ'য়ে গেল।

ছেলেমেয়েদের কিভাবে প্রকৃত মানুষ করা যায়—এ নিয়ে তিনি আমাদের পিতামাতাদের ও ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিকোন হতে সুবিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন আমাদের অজ্ঞতা কি ভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন নষ্ট করে দেয়, পিতামাতার অজ্ঞতা ও ছেলেমেয়েদের প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর তাদের কি করে পঙ্গু করে ফেলে। উপযুক্ত সহানুভূতির অভাবে, সাহায্যের অভাবে উৎসাহের অভাবে তারা দাসসুলভ

বাউল গান

শ্রীনিত্যানন্দ দাস

যা কিছু তোর বিলিয়ে দিয়ে হ'লি আপনহারা।
পথের ধূলার সঙ্গে আজি একলা কেঁদে সারা॥
আপন ভেবে ছিলি যাকে,
পড়্‌লি তারই ঘোর বিপাকে,
শূন্য ঘরে রইলো পুঁজি কেবল অশ্রু-ধারা॥
ভুল করে ফুল তুলতে গিয়ে ফুট্‌ল কাঁটা হাতে;
ভেবেছিলি উঠবে শশী গভীর আঁধার রাতে।
আশার-স্বপন- মায়ার ছলে
ডুবলি রে তুই অতল জলে
চায়না ফিরে তোর পানে কেউ আপন ছিল যারা।

—•—

মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। পিতা মাতার ব্যবহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের জীবনকে গঠিত ক'রে—এ কথা সবটুকু জানি না যেটুকু জানি তাও পরিণত করবার মত সুযোগ আমাদের আসে না আর এলেও তার সুব্যবহার আমরা করি না—এভাবে নিজেদের অবজ্ঞায়, অজ্ঞতায়, অলসতায় ও পারিপার্শিক উপযুক্ত আবহাওয়া না পাওয়ার ফলে আমরা আমাদের জীবনকে নানাবিধ দীনতায় ভরিয়ে তুলেছি এবং যারা আমাদের চার পাশে তাদের কলহাস্যে আনন্দ উৎসবের সূচনা করে তাদেরও অতি শৈশব থেকে আমাদের দীনতায় ভরিয়া তুলি দাস করে তুলি—ভীরু কাপুরুষ করি—এ দোষ এ পাপ আমাদের। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত খুব সহানুভূতি দিয়ে "ছেলেমেয়েদের মানুষ করা" নানা দিক থেকে আলোচনা করেছেন—আশাকরি বাংলার মায়েরা ও মেয়েরা এ থেকে উপকৃত হ'তে পারবেন। আমরা সুবিস্তৃত ভাবে এ সমস্যার আলোচনা করবো বারান্তরে—আপনাদের মতামতের আশা রাখি॥ —সম্পাদক, মহিলা মহল]

(স্নি, স্বি)

লর্ড টেনিসনের দলের কলিকাতায় দ্বিতীয় খেলা

কলিকাতায় লর্ড টেনিসনের দলের তৃতীয় আন্‌অফিসিয়াল টেষ্ট ম্যাচটি ছাড়াও আরও একটি খেলার বন্দোবস্ত আগে থেকেই হয়েছিল। এই খেলাটি হয় কুচবিহারের মহারাজার একাদশের সঙ্গে। কুচবিহারের মহারাজার এই দলটি বাংলার বাছাই করা বাঙ্গালী ও ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সুতরাং এই খেলাটিতে প্রকৃতপক্ষে বাংলা প্রদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের শক্তি পরীক্ষা হয়েছে বলা চলে। মহারাজার দলে যে সকল খেলোয়াড়েরা খেলার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুঁটে ব্যানার্জ্জি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যোগদান করতে পারেন নি এবং তাঁর পরিবর্ত্তে কলিকাতা টাউন ক্লাবের আলেকজেণ্ডারকে মনোনীত করা হয়। কিন্তু শেষ অবধি খেলার দিনে তিনি যোগদান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের স্কটকে দলভুক্ত করা হয়। সুঁটে ব্যানার্জ্জির এই দলের পক্ষে না খেলার কারণ তাঁকে তাঁর মনিব নওয়ানগরের জাম্‌সাহেবের আদেশ অনুযায়ী নওয়ানগর দলের পক্ষে 'রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়' খেলার জন্য এই খেলাটি আরম্ভ হবার আগেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাছাড়া বাংলার শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ বাঙ্গালী ব্যাটস্‌ম্যান্ কার্ত্তিক বসু অসুস্থতা বশতঃ খেলার প্রথমদিন সামান্য কয়েক ঘণ্টা ফিল্ডিং করার পর মাঠ পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। তিনি এই খেলাটিতে আর যোগদান্ করতে পারেন নি। ক্রিকেট্ খেলার আইন অনুযায়ী মহারাজার দলের বাকী দশজন্‌কে ব্যাট করতে হয়। তবে কার্ত্তিক বসুর বদলে দ্বাদশ ব্যক্তি খাম্বাটা ফিল্ডিং করেছিলেন। এই খেলোয়াড়টি কলিকাতা পার্শী দলের সভ্য।

যদিও টেষ্ট ম্যাচটি খেলা হবার দু'দিন পরে এই তিনদিনব্যাপী খেলাটি আরম্ভ হয়েছিল তা হলেও লর্ড টেনিসনের দলের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে দুচারজন শারীরিক আঘাত ও অসুস্থতার জন্য এই খেলাটিতে যোগদান করতে পারেন নি। অনুপস্থিত এই খেলোয়াড়গুলির মধ্যে বিখ্যাত, শক্তিশালী দুইজন বোলার গোভার এবং ওয়েলার্ডের জন্য এই দলের অধিনায়ক লর্ড টেনিসনকে প্রথমে একটু চিন্তিত হতে হয়েছিল। তবে খেলার শেষে অনেকে মন্তব্য করেছিলেন যে কুচবিহার দলের নিতান্ত ভাগ্য বলতে হবে যে গোভার ও ওয়েলার্ড এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি। কারণ তাঁরা দুজনে থাকলে কুচবিহার দলের পরাজয়ের গ্লানি হয়ত আরও অনেকখানি বেড়ে যেত। গোভার টেষ্ট ম্যাচটি খেলার সময়েই হাঁটুতে আঘাত পান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে রান্ করবার জন্য 'সাবষ্টিটিউট্' নিতে বাধ্য হন। খেলোয়াড়দের এই খেলাটিতে অংশ গ্রহণে অক্ষমতার জন্য লর্ড টেনিসনকে নিয়মিত খেলোয়াড়ের সংখ্যা

পূরণ করার জন্য বাংলা ও আসাম দলের অধিনায়ক ও নায়করা খেলোয়াড় এ এল হোসির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল। টেষ্টে যে এগারজন লর্ড টেনিসনের দলের পক্ষে খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে এডরিচ, গোভার ওয়েলার্ড এবং ইয়ার্ডলে দ্বিতীয় খেলাটিতে যোগদান করতে না পারায় তাঁদের স্থলে এ এল হোসী, পির্বলস্, জিম্ পার্কস্ ও ক্যাপ্টেন্ জেমিসন্ খেলেছিলেন। যদিও এদের মধ্যেও সকলেরই ক্রিকেট খেলায় বেশ সুনাম আছে তাহলেও লর্ড টেনিসন্ টেষ্ট ম্যাচটিতে পরাজিত হবার দরুণ এই খেলাটি শেষ হওয়ার আগে অবধি তাঁর নিজ দলের জয় সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

বৃহস্পতিবার ইডেন্ গার্ডেনে এই তিন দিন ব্যাপী খেলাটি আরম্ভ হয়। এই খেলাটিতে জন সমাগম বিশেষ হয় নি, তার কারণ গুরুত্বপূর্ণ টেষ্ট ম্যাচটি হয়ে যাবার পর এই খেলাটির ফলাফলের জন্য ক্রীড়ামোদীদের আগ্রহ অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল। বিলাতী দল টসে জয়লাভ করে, প্রথমে ব্যাট করতে আরম্ভ করেন এবং সারাদিন ব্যাট্ করে সাত উইকেটে মোট ২৪৮ রাণ করেন, দ্বিতীয় দিনে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত খেলে সকলে আউট্ হয়ে যান্ এবং মোট্ ৩১৬ রাণ হয়। এই ইনিংসে পার্কস্, ল্যাংরিজ ও পোপ্ খুব ভালভাবে ব্যাট্ করে যথাক্রমে ৮৯, ৮৩ এবং ৪৪ রাণ করেন। জে, এন্ ব্যানার্জ্জি ৮৩ রাণে তিনটি উইকেট পান। তারপর কুচবিহার দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন এবং বিকাল ৪-১৫ মিঃ অবধি খেলে সকলে আউট্ হয়ে যান এবং মোট ১৬৭ রাণ করেন। মাত্র এক রাণ বেশী করার জন্য মহারাজার দল 'ফলো অন্' করবার অসম্মান্ থেকে অব্যাহতি পান। ঐ দিনেই ৪-৩৫ মিনিটের সময় লর্ড টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করেন এবং খেলা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হার্ডষ্টাফ্ ও ওয়ার্দ্দিংটন নট্ আউট্ থেকে যথাক্রমে ৩১ ও ১৭ রাণ করেন। তৃতীয় দিনে আধঘন্টা খেলবার পর ওয়ার্দ্দিংটন ৪৩ রাণ করে আউট হয়ে যান্। তারপর পোপ্ ব্যাট করতে আসেন্ এবং বেলা পৌনে বারোটা অবধি খেলে হার্ডষ্টাফ ৬৪ ও পোপ্ ১৩ রাণ করে নট আউট থাকেন। মোট এক উইকেটে ১২১ রাণ হবার পর লর্ড টেনিসন ডিক্লেয়ার করেন এবং কুচবিহার দল দ্বিতীয় ইনিংস খেলা আরম্ভ করেন। মহারাজার দল বেলা বারোটার সময় খেলা আরম্ভ করে বেলা আড়াইটার সময়ে সকলে আউট হয়ে মোট ৮৩ রাণ করেন। এই ইনিংসে কুচবিহার দলের খেলোয়াড়েরা খুব নিন্দনীয়ভাবে খেলেন এবং লংফিল্ড ২২ রাণ করে সকলের চেয়ে বেশী রাণ করেন। পোপ ও ল্যাংরিজের বোলিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তাঁরা যথাক্রমে ৩৫ রাণে ৫টি এবং ২২ রাণে ৪টি উইকেট পান। কুচবিহারের দল ১৮৭ রাণে পরাজয় স্বীকার করেন।

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচঃ—

আগামী ১২ই ও ১৩ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী লর্ড টেনিসনের দলের সঙ্গে 'সিংহল দল' এবং 'আপ কানট্রি একাদশের' সঙ্গে কলম্বোতে দুটি ম্যাচ খেলার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু সিংহলের ক্রিকেট কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য করতে অক্ষমতা জানানর জন্য এই খেলা দুটি লর্ড টেনিসনের ভ্রাম্যমান খেলার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং ঐ কটা দিন লর্ড টেনিসনকে সদলবলে অকেজো হয়ে দিন কাটাতে হয় বলে ভারতের ক্রিকেট কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ কদিন পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করেছেন। এই চারদিনব্যাপী টেষ্ট ম্যাচটি আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই সহরে খেলা আরম্ভ হবে। সম্ভবতঃ এই খেলাটি শেষ করেই পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই বন্দর থেকে 'ঘরের ছেলেরা ঘরে ফেরার জন্য' সমুদ্রযাত্রা করবেন। কলিকাতায় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচটি হারবার পর লর্ড টেনিসনের আর একটি বেশী অর্থাৎ পঞ্চম্ টেষ্ট ম্যাচ খেলার জন্য খুব আগ্রহ হয়েছিল এবং ঘটনাচক্রে তা সম্ভবও হয়েছে। মাদ্রাজের চতুর্থ টেষ্টে যদি নিখিল ভারতীয় দল তৃতীয় টেষ্টের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাহলে বোম্বাইয়ের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচটির গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যাবে। কারণ এই খেলাটির জয় পরাজয়ের উপর 'রাবার' জয়লাভ নির্ভর করবে। তবে যদি চতুর্থ টেষ্টে নিখিল ভারতীয় দল পরাজিত হয় তাহলে বোম্বায়ের খেলাটির তত আকর্ষণ থাকবে না। যাক্ বোম্বাই সহরই শেষ পর্য্যন্ত শেষ রক্ষা করল। বোম্বাইয়ের অধিবাসীরাই লর্ড টেনিসনের দলকে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে আসাতে অভ্যর্থনা করে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনেন আবার তাঁরাই বিদেশ ছেড়ে স্বদেশে যাবার সময় বিদায় অভিনন্দন জানাবেন।

———

প্যারামাউন্টের রঙীন ছবি "এব্ টাইড"-এর একটি দৃশ্য। ছবিখানা রিগ্যালে দেখান হচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ টেলিফোন

'ভ্যারিটি' সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই মাঘ ১৩৪৪, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৮

বাংলার কংগ্রেসী মিশ্র মন্ত্রী-মণ্ডল

সুভাষচন্দ্রের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিতে বাঙ্গালী মাত্রেই তৎপর—ইহা স্বভাবিক। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিপুল জনতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সুভাষচন্দ্র আবেগময়ী বক্তৃতায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করেন।

চব্বিশ বৎসর বাংলার বাহিরে উদ্দীপক জীবন যাপন করিয়া ভূতপূর্ব্ব অখ্যাত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য অধুনা প্রখ্যাত মানবেন্দ্র-নাথ রায় রূপে কলিকাতায় আগমন করিয়া বামপন্থীনেতৃবর্গের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় বিরোধিতা করিয়া যে শোচনীয় মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অশেষ নিন্দনীয়। শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রজনী মুখোপাধ্যায় সোৎসাহে রায়-পন্থী বনিয়া গিয়াছেন। অভয় আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক কর্ম্মীবৃন্দ কোনরূপ স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করিতেছেন না। সুতরাং মানবেন্দ্র-নাথের আবির্ভাবে বাংলার শ্রমিকনেতৃ ও কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে যে আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে তাহার পরিণতি কী হইবে তাহা প্রণিধানযোগ্য। মানবেন্দ্র নাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের চাপে সহজ-প্রস্ফুটিত শ্রমিকনেতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও কাহারও বিলোপ সাধনে বিস্মিত হইবার কারণ নাই

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নিখিল ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে অপসারিত হওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদে কে আসীন হইবেন তাহা লইয়া এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। নবগঠিত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কোন দল প্রাধান্য লাভ করিবে তাহা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। শ্রমিকদল, খাদি-দল ও মজুমদার দলের মধ্যে কে কোন পক্ষে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন তাহা এখনও অনিশ্চিত।

অপর পক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে এক কুহেলী সন্ধ্যায় বিরলা পার্কে গুপ্ত-মন্ত্রণার বৈঠক বসে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই মাননীয় অর্থসচিব সরকার মহাশয়, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ও বিরলা মহাশয়কে সাথী করিয়া শ্রীপাঠ ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মাজীর সকাশে বাংলায় "ঘরোয়া রাজনীতি" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যান। নাগপুরের "হিতবাদ" সংবাদপত্রে প্রকাশ যে হরিপুরা কংগ্রেসের পর মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিবেন এবং কংগ্রেস-পন্থীয় একদল লোক বিশ্বাস করেন যে বাংলায়

কংগ্রেসী মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে তাঁহারা মহাত্মাজীর সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবেন। বিস্ময়ের বিষয় যে "বাংলার ঘরোয়া রাজনীতি" সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে ওয়াকিবহাল করিবার যোগ্যতর ব্যক্তি হইতেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এরূপভাবে উপেক্ষিত হইবার কারণ কি? কংগ্রেসী মিশ্র মন্ত্রী মণ্ডল গঠিত হইলে তিনি কি পরিষদের সভ্যপদরূপে বিরাজ করিবেন? যদি এ আশঙ্কা সত্য হয় তবে তাঁহার স্থলে নেতা হইবেন কে? ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ত' পরিষদেরও সভ্য নহেন তবুও দেখিতেছি তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিখিল ভারতীয় দরবারে অটুট্। ডাঃ রায় মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান মন্ত্রী হইবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইবেন সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধতা আছে। মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল হইলে মন্ত্রীবর্গের বেতন কোন হারে নির্দ্ধারিত হইবে? এ সব প্রশ্ন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইলেও এখন অমিমাংসিত—তবে মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হইতেছে যে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মাননীয় অর্থসচিব মহাশয়ের বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ বাহাল আছে তাহা বাতিল করিতে হইবে এবং তাঁহাকে পবিত্র গঙ্গাজল সিঞ্চনে পূত করিয়া শুদ্ধি করিয়া লইলে তাঁহার ও বিরলা মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী চূর্ণ করিয়া মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন দুরূহ হইবে না। সহযোগী "আনন্দ-বাজার পত্রিকা" মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন সম্ভাবনায় "বিষময় পরিণামে"র কথা ভাবিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নেতা শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই "বিষময় পরিণামের" বিরোধিতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আমরা শুধু শরৎচন্দ্রের ন্যায় শক্তিধর পুরুষের এই শোচনীয় ক্লৈব্য ও নিরপেক্ষতায় ব্যথিত।

শ্রীমল্লিনাথ

মঠ বলিতে এখন বাঙ্গালা দেশে একটি মাত্র স্থানকেই বুঝায়—তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মানব স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র বেলুড় মঠ। স্বামীজি একদল ত্যাগী সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়া যে সেবা ও ত্যাগ ধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার গতি আজ ভিন্নমুখী হইলেও তাহার তেজ এখনও একটুও ম্লান হয় নাই। সম্প্রতি এই মঠে দুইটি সুবৃহৎ মহোৎসব হইয়া গিয়াছে—একটি গত পৌষ সংক্রান্তির দিন—সেদিন মঠের কেন্দ্রস্থলে এক বিরাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে—সেই মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি শ্বেত পাথরের মূর্ত্তিও স্থাপিত হইয়া তদবধি পূজিত হইতেছে। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল, তাঁহার গুরুদেবের চিতাভস্ম রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মঠের বর্ত্তমান সভাপতি, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একজন এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, স্বামীজি বিজ্ঞানানন্দের দ্বারা তখন মন্দিরের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনা অনুসারে এই নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইল। এতদিন অর্থাভাবে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্ভব হয় নাই; সম্প্রতি স্বামীজির দুইজন মার্কিন মহিলা-শিষ্যা প্রায় ৭ লক্ষ টাকা দান করায় সেই অর্থে মন্দির হইয়াছে। মন্দিরটি আগাগোড়া চুনারের পাথরে ঢাকা। মার্টিন কোম্পানী মন্দির নির্ম্মাণের ভার লইয়াছিলেন। নাট মন্দির নির্ম্মাণ এখনও শেষ হয় নাই। বাহিরের অংশ সম্পূর্ণ হইলেও ভিতরের কাজ বাকী আছে। মূল মন্দিরের ভিতরটি মর্ম্মর প্রস্তর মণ্ডিত। তথায় শ্রীযুত নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বসান হইয়াছে। মূর্ত্তিটি সাধারণ মানব দেহ অপেক্ষাও বৃহৎ। বেলুড়ে যে সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল, সেরূপ বড় মন্দির বাঙ্গলা দেশে বোধহয় আর কোথাও নাই।

বেলুড় বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলার অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। তথায় ইতিপূর্ব্বে রাখাল মহারাজের, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ও স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে এতগুলি মন্দির দূর হইতে দর্শনের যোগ্য বটে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের দিন মঠে প্রায় ৫০ হাজার লোকসমাগম হইয়াছিল। সেদিন তথায় প্রায় ৩০ হাজার ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। কাশী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া হোম, যজ্ঞ প্রভৃতির আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু সেদিনকার একটি দৃশ্য সকলের সমালোচনার বিষয় ছিল। তীর্থক্ষেত্রে সকল যাত্রীই সমান আদরের পাত্র—কিন্তু মঠের কর্ম্মীরা সেদিন মঠের দক্ষিণাংশে একটি ফাঁকা মাঠে চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া তাহার তলায় টেবিল চেয়ারে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, শুধু ধনী ব্যক্তিদিগকেই ঐ সকল চেয়ারে বসাইয়া টেবিলে খাবার দেওয়া হইতেছিল। সে সময়ে মন্দির সংলগ্ন প্রসাদ বিতরণের স্থান হইতে দলে দলে ভক্তগণ প্রসাদাভাবে ফিরিয়া যাইতেছিল (তাহাদিগকে সাধারণভাবে খেচুরান্নই দেওয়া হইতেছিল), সেই সময়েই অপর পার্শ্বে একদল কোট প্যান্টধারী বাঙ্গালীকে চেয়ারে বসাইয়া খাওয়ান সত্যই দৃষ্টিকটু নহে কি? স্বামীজি সাম্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—সেই স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত মঠেই যদি এইরূপ ব্যবহার বৈষম্য দেখা যায়, তবে তাহা দুঃখের বিষয় নহে কি? যাহা হউক, সেদিন মঠের কর্ম্মীরা সমাগত ভক্তগণের সুখ সুবিধা বিধানের সকল ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উৎসব হইয়াছে—৮ই মাঘ। সে দিন স্বামীজির (বিবেকানন্দ) ৭৬তম জন্মতিথি। সে দিনও মঠে বহু সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন মাত্র ৪০ মণ চাল ডাল সিদ্ধ করায় পরে প্রসাদের অভাব পড়িয়াছিল—দ্বিতীয় দিন কিন্তু সেরূপ হয় নাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্তই সমাগত ভক্তদিগকে খেঁচুরান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। প্রথম

দিনে কবিরাজ শ্রীযুত কিশোরীমোহন গুপ্তের কীর্ত্তন শ্রুত হইয়াছিল—দ্বিতীয় দিনে কিশোরী বাবুর কীর্ত্তন ছাড়াও দুই দল লোক কালীকীর্ত্তন গান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মঠের পুরাতন গৃহের পূর্ব্বদিকস্থ গঙ্গাতীরের মাঠে স্বামীজির এক স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি-সি (বিজয়চন্দ্র) চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রথমে আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী অখিলানন্দ ও বোম্বাইস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী বিশ্বানন্দ ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উভয়েই বাঙ্গালী, কাজেই বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতাই শোভন হইত। উভয়েই বেশ ভাল ইংরাজি বলিতে পারেন। স্বামী বিশ্বানন্দের বক্তৃতার তীক্ষ্ণ ধার ছিল—তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মনে হইতেছিল, তাঁহার মত লোক রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিলে একদিন হয় ত কংগ্রেসের সভাপতি হইতে পারিতেন। যাহা হউক, তৃতীয় বক্তা অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমারসরকার বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সময় মনে হইতেছিল, তিনি বক্তৃতা না করিলেই ভাল করিতেন। এরূপ মাত্রাজ্ঞানহীন লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার ভাষার ত মাথামুণ্ড নাই—তাহার উপর তিনি এক এক সময়ে এরূপ অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন যে, তাহা সকলের কর্ণেই বিষবৎ শ্রুত হইতেছিল। বিনয়বাবু মঠের শিষ্য কি না জানি না—কিন্তু তাঁহার অশিষ্ট উক্তি গুলি বোধ হয় মঠের কর্ম্মী সন্ন্যাসীরাও বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। কারণ সভার পর তাঁহাদের মধ্যেও এ বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। সভা সম্পর্কে আর একটি কথা আছে। সভাপতি মহাশয় চেয়ারে বসিয়া সভা পরিচালনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি একটি মাত্র কথা না বলিয়াই বিনয়বাবুর বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। আমরা যুবক বিজয়চন্দ্রকে দেখিয়াছি, তিনি তখন কংগ্রেসের সেবক ছিলেন, বহু সভায় তাঁহার ইংরাজি ও বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিয়াছি, বহু কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীরূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তখন অবশ্য তিনি এত বড় ব্যারিষ্টার হন নাই। সে দিন সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াও তিনি বক্তৃতা না করায় আমরা হতাশ হইয়াছি। ব্যারিষ্টারী ব্যপদেশে তাঁহাকে এখন অনেক বক্তৃতা করিতে হয় বলিয়াই কি তিনি আর সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতে চাহেন না। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, মঠের একজন শুভার্থী বন্ধু। সেই জন্যই সেদিন ঐ সভায় মঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সভাপতি করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহার পক্ষে বক্তৃতা না করা সেদিন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

মঠকে আমরা তীর্থক্ষেত্ররূপেই দেখি—সেজন্য ব্যথিত হৃদয়ে মঠ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। দ্বিতীয় উৎসবের দিনেও মঠের কর্ত্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়নের অভাব ছিল না। নব নির্ম্মিত মন্দির দর্শনের জন্য শুনিলাম, প্রত্যহ ৩৪ হাজার ভক্ত তথায় গমন করিতেছেন। মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য এখন ও শেষ হয় নাই। শেষ হইলে উহা যে আরও কত বিরাট ও সুন্দর হইবে তাহা বলা যায় না। আমরা বাঙ্গালী মাত্রকেই বাঙ্গলার এই গৌরব—নূতন মন্দির দেখিতে অনুরোধ করি। স্বামীজির এক ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া মন্দিরে রূপধারণ করিয়াছে তাঁহার অপর ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া কবে বাঙ্গালী জাতি আত্ম-নির্ভরশীল হইবে—তাহার প্রতীক্ষায় আমরা দিন গণনা করিব।

গান

(আধুনিক)

শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণের সুর যবে বেজে যায়
অবিরল ধারে
বাতায়ন পাশে বসি খুঁজি মোর
হারানো প্রিয়ারে।
বাদল রিমি ঝিমি—
ঝিমি ঝিমি রিমি ঝিমি
খুঁজিয়া পাইনু ওগো তারে
বাতাস কাঁদিয়া ফেরে
অবিরল আঁখি লোরে
হারায়ে ফেলিনু তারে—
বাদল বিরহ সুর কহিল সে—
গেছে বহু দূরে।

—*—

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

বাঙলার বাহিরের প্রতি প্রদেশে হিন্দি 'বিদ্যাপতি'-র অভাবিত সাফল্যের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছি। ছবিখানির জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সর্ব্বত্রই সমানভাবে দর্শক আকর্ষণ কোরছে জেনে আমরা গৌরব বোধ করছি।

সম্প্রতি দেবকীবাবু তাঁর পরবর্ত্তী চিত্র 'নিমাই সন্ন্যাস'-এর চিত্র-নাট্য রচনায় তাঁর সহকর্ম্মীদের নিয়ে মশগুল্ হোয়ে আছেন। সহকারী পরিচালক হিসেবে দেবকীবাবুর সঙ্গে এবার কাজ কোরছেন শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র-নাথ ভঞ্জ (চন্দ্রশেখর), শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মিত্র এবং শ্রীমান্ অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র।

বাঙলা বিদ্যাপতি সম্ভবতঃ মার্চ্চমাসে 'চিত্রায়' মুক্তিলাভ কোরবে।

* * *

নায়িকা সন্ধ্যা তার শেষ আশ্রয় হারিয়ে একদিন পথের বার হতে বাধ্য হোল। হায়রে জীবন! কোথায় স্বামী, কোথায় তার ভগ্নির আশ্রয়! দুর্জ্জয় সাহসে ভর কোরে, জমশেদপুর বাঙলো ছেড়ে, এক দুর্য্যোগের রাত্রে সন্ধ্যা একাকিনী পথের বার হোল। সেই যাত্রা পথে, অতর্কিতে যার সঙ্গে দেখা সে সন্ধ্যার নব পরিচিত প্রমথ। তারপর কেমন কোরে প্রমথ তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেল—কী তার পরিনাম, অভি-জ্ঞান এর পরবর্ত্তী অংশে তাই সূচিত হ'বে।

সম্প্রতি একনম্বর ষ্টুডিওর নব নির্ম্মিত 'সাউণ্ড-স্ক্রীন'-এ, যে দৃশ্যটি তোলা হচ্ছে, তা'তে দেখতে পাই—নায়িকা সন্ধ্যা প্রমথের সঙ্গে তার কাশীর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বিতা সন্ধ্যার জীবনে যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সুরো হোল, তার উৎস এখানেই।

শ্রীমতী মলিনা ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায়—সন্ধ্যা ও প্রমথের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

* * *

আপাততঃ পরিচালক বড়ুয়া তাঁর আগামী চিত্রের নামকরণ কোরেছেন—'সাথী'। হয় ত' শেষ পর্য্যন্ত এ নামটিও পরিবর্ত্তিত হতে পারে। কিন্তু যে নামেই ছবিখানি সাধারণের কাছে মুক্তিলাভ করুক না কেন। ছবির কাহিনীটিই আমাদের আলোচনার বস্তু।

ধনী ও নির্ধন—সমাজের বুকে পাশাপাশি বাস করে। একদিকে বিলাস এবং একদিকে তার দৈন্য। এরই অন্তরালে, সমাজের বিভিন্নস্তরের দুটি নারীর জীবনে সে সংঘাতের সূচনা হোল—ছবির শেষে তারই পরিণাম আমাদের ভাবিয়ে তুলবে।

যে সমস্যাকে অবলম্বন কোরে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ শিল্পী, এই কাহিনীটিকে নিপুণ ভাবে গল্পাকারে সাজিয়ে তুলেছেন, তার মীমাংসায় ইঙ্গিত ছবির মধ্যেই পরিস্ফুট হবে। আখ্যায়িকার অন্তর্নিহিত রোমান্সটুকু যাতে আধুনিক নরনারীর অন্তর স্পর্শ করে, ছবির মধ্যে সে শ্রেণীর মাল মশলারও অভাব হবেনা। মুক্তি চিত্রে যে সঙ্গীতের মাধুর্য্য সর্ব্বসাধারণের মন আকর্ষণ কোরেচে—বর্ত্তমান চিত্রেও সে মাধুর্য্য যে পুরোমাত্রায় অক্ষুন্ন থাকবে, পরিচালক বড়ুয়ার কাছে এটা আমরা অবশ্য আশা কোরতে পারি।

* * *

নীতিন বসু পরিচালিত 'দেশের মাটি'র কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ষ্টুডিওর ভেতর যে ভাবে একটা সেট তৈরী হয়েছে তা বাস্তবিকই সুন্দর। শিল্পী অর্জ্জুন রায়ের পরিকল্পনায় এই চমৎকার সেটটী তৈরি হয়েছে। গেল মঙ্গলবার এই অতি আধুনিক সেটে অর্থাৎ অরুণার বাড়ীর মধ্যকার কয়েকটী সট নেওয়া হয়েছে। একটি দৃশ্যে অরুণা (চন্দ্রা ও কমলেশকুমারী) তার ভাইএর কাছ থেকে অশোক (সাইগাল) আর গৌরি (উমা)র বিয়ের কথা প্রথম শুনতে পেল। ব্যথাটা পাছে ভাইএর কাছে ধরা পড়ে যায় এই যে ভয়—স অবস্থাটাকে ফুটিয়ে তুলতে একমাত্র চন্দ্রার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

কালী ফিল্মস

এদের রঙ্গমহলের অবদান শচীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব'এর বনলতা ও শ্রীমতীর ড্রয়িংরুমের সেট্ গেল হপ্তায় তোলা শেষ হয়ে গেছে। এই দু'টি সেট্ আধুনিক ভাবে সজ্জিত করা হয়। এখানে তরুণ-তরুণীদের হাস্যরসে এবং প্রেমের নানারকম আদান প্রদানে এই দৃশ্য দু'টি

মুখর হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, বীনা, উষাদেবী, সাবিত্রী প্রভৃতি—শোনা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন রূপসজ্জায় ও কথা-বার্ত্তায় তাঁরা এই দৃশ্য বিশেষ চমকপ্রদ কোরে তুলেছেন।

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব আধুনিক সমাজের হালচালের এক অভিনব কাহিনী। সুপ্রসিদ্ধ লেখক সেই তথ্যগুলি একত্রীভূত কোরে রূপও রসের ভেতর দিয়ে সঞ্জীবিত কোরে তুলেছেন। শুধু নিছক হাল্কা হাসিই এই ছবির উপাদান নয়—হাসির ভেতরই লেখক প্রচ্ছন্নভাবে সমাজের প্রগতিকে যে কটাক্ষ পাত কোরেছেন—তাও ভাববার ও শিখবার। গল্পের মত ছবিখানাও যাতে প্রথম শ্রেণীর হয় তার জন্য প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, পরিচালক সতু সেন, চিত্রশিল্পী সুরেশ দাস, শব্দ-শিল্পী জগদীশ বসু, কারু শিল্পী পরেশ বসু, সুর-শিল্পী কমল দাশগুপ্ত এবং ব্যবস্থাপক সতীশ সরকার প্রভৃতি চেষ্টার কসুর কোরছেন না। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়াতেই আগ্রহান্বিত দর্শকবৃন্দকে নব রস পরিবেশন কোরবে "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব"।

* * *

'এ' ইউনিটে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সামাজিক গল্প "চোখের বালি"র চিত্রগ্রহণ কার্য্য ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলেছে। গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক—এর প্রতিটি কথার ভেতরই অন্তর্নিহিত মানে আছে। সেই জন্য পরিচালক সতু সেন ছবিখানা যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার না করে তার জন্য চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে কাজ কোরছেন এবং সেইজন্যই যাতে অভিনয়ের দিকেও চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব অভিনেতৃবৃন্দ সম্যক উপলব্ধি কোরতে পারেন—তার জন্য এই ছবির শিল্পী মনোনয় করা হ'য়েছে শিক্ষিত ও আভিজাত্য সম্প্রদায় থেকে। মিঃ বি, পি, মেহ্‌রা এই ছবির তত্ত্বাবধানা কোরছেন।

ভারত লক্ষ্মী পিক্‌চার্স

দন্দু-সাধনার অভিনয়ের পালা এতদিন চল্‌ছিল মন্থরগতিতে। এখন শুনছি "অভিনয়" চলছে দ্রুতগতিতে। জীবন-নাট্যের এ "অভিনয়ের" পরিণতি কোথায়? কে বলতে পারে।

দেবদত্ত ফিল্মস্

রবীন্দ্র নাথের "গোরা"র শূটিং এ হপ্তা থেকে আরম্ভ হ'ল। "গোরা"র ভূমিকালিপি আমরা পূর্ব্বেই জানিয়েছি। কেবল সু-

"দেশের মাটী"-র একটি দৃশ্য

রিতার ভূমিকায় ঠিক কে নামবেন তা' জানা যায়নি এ হপ্তায়েও জানাতে পারব না—কারণ উক্ত চরিত্রোপযোগী অভিনেত্রী এরা এখনও মনোনয়ন কোরতে পায়েন'নি'। তবে শোনা যাচ্ছে, এরা এই ভূমিকায় উপযুক্ত অভিনেত্রী খুঁজছেন। কর্তৃপক্ষের এই সৎ সঙ্কল্প বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

মেট্রোপলিটান্ পিক্‌চার্স

ডি-জি "হাল বাঙলা"র শূটিং নিয়ে এখন মশগুল। নতুন ধরণের 'কমেডি' হিসেবে "হাল বাঙলা" ডি-জিকে চিত্ররাজ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত কোরতে পারে তা' হলেই আমরা সুখী হব।

রাধা ফিল্মস

কালী প্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় পৌরাণিক চিত্র "পুরুষোত্তমে"-আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়েছে। এর বেশী কোন খবর আমাদের পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়।—কারণ, এখানকার কোন খবরই এদের প্রচার বিভাগ থেকে অধুনা আমরা পাই না।

হাজরা পিক্‌চার্স

বাঙলা নরনারীর চির আদরের পুণ্যোজ্জ্বল কাহিনী "দেবী ফুল্লরা"র চিত্রগ্রহণ কার্য্য প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হয়ে এল। "দেবী ফুল্লরা"-র যে কাহিনী যুগ যুগান্তর ধরে ভারতবাসীর মনোমন্দিরে জাগরূক রয়েছে। চিত্রপটে সেই বিচিত্র কাহিনী যে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে এক নূতন আন্দোলন তুলবে, একথা বলই বাহুল্য। ছবির পরিচালক হচ্ছেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী—এই ছবিখানা তাঁর মত প্রবীনের হাতে বিশেষভাবে রূপায়িত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা শুনলাম অভিনয় থেকে আরম্ভ কোরে দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, আসবাব পত্র, কোন বিষয়ে যাতে লোকে নিন্দা কোরতে না পারে, চক্রবর্ত্তী মশাই সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রেখে কাজ কোরছেন। অন্যদিকে বিভূতি লাহা, যতীন দত্ত ও পরেশ বসু যথাক্রমে আলোকচিত্র, শব্দযন্ত্র ও শিল্প নির্দ্দেশনায় যাতে তাঁদের সুনাম আরও বর্দ্ধিত হয় সেই চেষ্টাই কোরছেন। আমরা এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"
জহর গাঙ্গুলী

ও, কে, এ,

একটি তরুণীর জীবন পথে দুটি তরুণের আবির্ভাব। একজন এলো তার অর্থ, যশ সমৃদ্ধি নিয়ে আর একজন শ্রমিক কাব্যভরা উদাস দৃষ্টিতে কবিতায় সুললিত ছন্দ অর্ঘ্য নিয়ে—জয়ী হল কে?

তারই পরিচিতি বিচিত্র রঙমাধুর্য্যের মধ্যে সুসমৃদ্ধ এদের "রূপোর ঝুমকো।"

ছবিখানির কাজ অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। অবশিষ্ট কয়েকটি সেটের কাজ কেবল বাকি।

নিউ পপুলার পিক্‌চার্স

মার্চ্চের গোড়া থেকেই কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে এদের একখানা নতুন ছবির শূটিং আরম্ভ হবে। ছবিখানির গল্পটি আমরা শুনেছি, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত গল্পটির নামাকরণ না হওয়ায় আমরা পাঠকবর্গকে জানাতে পারলুম না। ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন সিনেমার সঙ্গে বহুদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সুধীর দাস ও হারু চ্যাটার্জ্জি। ছবিখানার তত্ত্বাবধায়করূপে ব্রতী হ'য়েছেন মুকুন্দ রায় ও বসন্ত মিত্র। আমরা এদের নূতন প্রয়াসকে অভিনন্দিত কোরছি।

চিত্রা

মুক্তি এখানে ২০শ সপ্তাহে পড়ল। জনসমাগম যেভাবে চলচে তাতে শেষ অবধি অনেকেই হতাশ হ'তে হ'বে। শোনা যাচ্ছে যে আর চার পাঁচ সপ্তাহ পরেই 'মুক্তি'কে মুক্তি দিয়ে—বিদ্যাপতির পুথি চিত্রায় পড়া সুরু হ'য়ে যাবে।

নিউ সিনেমা

মিলাপ ২য় সপ্তাহে পড়ল। এর পরই এখানে ভারতের প্রথম রঙিন ছবি 'কিষাণ কন্যা' দেখান হ'বে। এর প্রধান অংশ অভিনয় করেছে একটী বাঙলার মেয়ে—শ্রীমতী পদ্মাবতী।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে 'ইন্সপেক্টার' এখানে ৩য় সপ্তাহে পড়বে। ইন্সপেক্টারের পরই এখানে রাধা ফিল্মের 'প্রভাত মিলন' দেখান হ'বে।

বিবিধ

শ্রাদ্ধ বাসরে

গত ২রা মাঘ রবিবার ৺পরমবৈষ্ণব অন্নদাকুমার গুহ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ভবানীপুরে ৬২নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোডস্থিত ভবনে তাঁহার পুত্রগণ দ্বারা বিহিত শাস্ত্রীয় মতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধ বাসরে নিমন্ত্রিত বহু আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবগণ

অন্নদাকুমার গুহ

উপস্থিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনানন্দ ব্রজেন্দ্র লাল গাঙ্গুলি মহাশয়ের সুমধুর বিরহ মাথুর কীর্ত্তনে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলি সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

* * *

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের পিতৃদেব শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত বুধবার প্রাতে আদ্যশ্রাদ্ধ ও সভারোহণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করেন। আমরা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

দি পিয়ারলেস ইন্সিওরেন্স

পিয়ারলেস একটি নির্ভরযোগ্য এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ বীমা প্রতিষ্ঠান। কোম্পানী মোট ২৮০০০০৲ টাকার উপর দাবী মিটাইয়াছেন। সেয়ার ক্রেতাদিগকেও বার্ষিক শতকরা ২৫৲ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছেন। এর বৈশিষ্ট হচ্ছে জুবিলী বস্ত স্কীম।

দক্ষিণ কলিকাতায় মানবেন্দ্র নাথ

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গত রবিবার অপরাহ্নে ৯৮নং বেলতলা রোডে সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায় চা-চক্রে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী যোগদান করেন।

মানবেন্দ্র নাথ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অমর কৃষ্ণ ঘোষের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

সঙ্গীত আসর

গত শনিবার ২২শে জানুয়ারী '৩৮ রাত্রে "সঙ্গীত আসরের" ৮ম মাসিক অধিবেশন উক্ত সভ্য শ্রীঅমিয়কুমার সিংহ মহাশয়ের ১৫নং কালিদাস সিংহ লেনস্থ বাটীতে অনুষ্ঠিত হয়। অন্ধগায়ক শ্রীদীননাথ ধর খেয়াল ও ঠুংরী গান করেন। পরে শ্রীসুশীল চন্দ্র দাস সুমধুর হারমোনিয়াম (সোলো) বাদনে সকলকে মুগ্ধ করেন। ইঁহাদের সহিত শ্রীরাধাশ্যাম দত্ত অতি সুন্দর তবলা সঙ্গত করেন।

বনকুসুম

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সহযোগে প্রস্তুত বনকুসুম তৈল নিত্য ব্যবহারে কেশ ও মস্তিষ্কের যাবতীয় দুর্ব্বলতা সত্ত্ব নিবারিত হয়। তৈলের মধ্যে বনকুসুম যে একটী উৎকৃষ্ট তৈল তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

শরৎচন্দ্রের গৃহে সাংবাদিক সম্মেলন

গত শনিবার অপরাহ্নে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিল ও 'পদ্ম শ্রী' সম্পর্কীয় প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ডিকেটের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্থানীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ভবনে কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বসুর আমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি বসু ও শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী (অমৃত বাজার পত্রিকা) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীযুক্ত মাখম লাল সেন (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দ বাজার পত্রিকা) শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ (বসুমতী) শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত (এডভান্স) ও সম্প্রতি কর্পোরেশনের গাঁটছড়া হইতে মুক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

এই আমন্ত্রণ সভায় আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের মতামত ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব।

উপেনদার নব সঙ্কল্প

কর্পোরেশনের সার্ভিস কমিটির গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্য্যকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব নাকচ করায় গত শুক্রবার হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশনের চাকরী হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবনে পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রথম যৌবন আন্দামানে অতিবাহিত করিয়া, কৈশোর বন্দীশিবিরে যাপন করিয়া প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে কর্পোরেশনের গো—বিভাগ চালনা করিয়া বর্ত্তমানে অবসর যাপনের অন্তরালে লিপি কেন্দ্রের করদাতাবৃন্দের সেবা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ১৯৩৯ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি লিথির কেন্দ্র হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইবেন। তাহার এ সঙ্কল্প অটল রহিলে তিনি যে সহজেই কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিৎ।

(সিঃ বি)

লর্ড টেনিসনের দল

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম কলিকাতার খেলা শেষ করে পাতিয়ালা অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন। গত ১০ই জানুয়ারী পাতিয়ালায় পৌঁছিবার পর, ১১ই জানুয়ারী থেকে পাতিয়ালার মহারাজার একাদশের সহিত একটি তিনদিন ব্যাপী ম্যাচ খেলেন। পাতিয়ালা দল প্রথমে ব্যাট করে ১৪২ রাণ করবার পর তাঁদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। একমাত্র আমীর ইলাহী ছাড়া আর কেউ ব্যাটিং-এ সাফল্য দেখাতে পারেন নি। ইলাহী ৪৩ রাণ করে নট আউট থাকেন। ঐ দিনেই শেষের দিকে লর্ড টেনিসনের দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এক উইকেটে ৮৪ রাণ করেন। প্রথম ইনিংসে ওয়েলার্ড এবং এড্রিচ্ বোলিংয়ে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে ৪৬ রাণে ৬টি, এবং ১৯ রাণে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনে সমস্তক্ষণ ব্যাট করে লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে ৪৪৫ রাণ করে ডিক্লেয়ার করেন। এই রাণসংখ্যার মধ্যে ওয়েলার্ড ল্যাংগ্রিজ ও পার্কস্ যথাক্রমে ৭৮, ৭৭ এবং ৬৪ রাণ করেন। ওয়েলার্ড পাঁচটি ওভার বাউণ্ডারী এবং সাতটি বাউণ্ডারী হিট করেছিলেন। পাতিয়ালা দলের সাহাবুদ্দিন ও অমরনাথের বোলিং কার্য্যকরী হয়েছিল। তৃতীয় দিনে পাতিয়ালা দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করেন এবং সারাদিন ব্যাট করে ৫ উইকেটে ২৬৪ রাণ করবার পর খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই ইনিংসে অমরনাথ ১০৯ করে নট আউট থাকেন এবং হাভেওয়ালা ১০৩ রাণ করেন। পাতিয়ালা দলে নিম্ন লিখিত খেলোয়াড়েরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন

যোগীন্দ্র সিং, ওয়ার্ণে, অমরনাথ, হাভেওয়ালা, পাতিয়ালার যুবরাজ, মহম্মদ সৈয়দ, পাতিয়ালার মহারাজা, মুরায়ৎ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার, আমীর ইলাহী এবং সাহাবুদ্দিন।

পাতিয়ালা ত্যাগ করে লর্ড টেনিসন সদলবলে দিল্লী রওনা হন এবং গত ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী স্থানীয় প্রতিনিধিমূলক দলের সঙ্গে একটি দুইদিনব্যাপী ম্যাচ খেলেন। লর্ড টেনিসনের দল প্রথম দিনে ছয় উইকেটে ৩৫৩ রাণ করে ডিক্লেয়ার করেন। দ্বিতীয় দিনে খেলার শেষ অবধি ব্যাট করে দিল্লী দল আট উইকেটে ৩০৫ রাণ করেন। এই খেলাটিতেও কোন দল পরাজয় স্বীকার করেন নি। লর্ড টেনিসনের দলের গিব ১১৭, ল্যাংগ্রিজ ৮০ এবং ওয়ার্দিংটন নট আউট থেকে ৬২ রাণ করেন। দিল্লী দলের ফ্রিল্যাণ্ড, তাজমহল এবং ক্যালেলস্ যথাক্রমে ৭৪, ৭৩ এবং ৫০ রাণ করেন।

দিল্লী দল

সুরজ নারায়ণ, মামুদ, দীন, ফ্রিল্যাণ্ড, তাজমহল, ক্যালেলস, মকসুদ, রবার্টস, কে বাহাদুর, এড্রিস্, বেগ্ এবং লছমন্।

দিল্লীর খেলা শেষ হবার পর লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম গত ১৯শে ও ২০শে জানুয়ারী মধ্যপ্রদেশ দলের সঙ্গে একটি দুইদিন ব্যাপী ম্যাচ খেলার জন্য নাগপুরে উপস্থিত হন। মধ্যপ্রদেশ দল প্রথমে খেলেন এবং খুব নৈরাশ্যজনকভাবে ব্যাটিং করে মাত্র ৭৬ রাণ করে সকলে আউট হয়ে যান। পি আর নাইডুর ৩২ রাণ ছাড়া আর কোন খেলোয়াড়ই বেশী রাণ করতে পারেন নি। পোপের দুর্দ্ধর্ষ বোলিংই স্থানীয় দলের ব্যাটিয়ের শোচনীয় পরিণামের জন্য দায়ী। পোপ মাত্র ২১ রাণে পাঁচটি উইকেট লাভ করেন। তাছাড়া এডরিচের ৮ রাণে ২টি উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। প্রথম দিনেই লর্ড টেনিসনের দল ব্যাট করতে আরম্ভ করেন এবং দিনের শেষে ৯ উইকেটে ১৫১ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হবার আগেই লর্ড টেনিসন দলের অধিনায়ক আগের দিনের রাণ সংখ্যায় ডিক্লেয়ার করে দেন এবং মধ্য প্রদেশ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। এই ইনিংসের খেলাটিতেও মধ্যপ্রদেশ দল বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে ১১২ রাণ করবার পর সকলে আউট হয়ে যান। বিলাতী দলের পোপ, স্মিথ ও ওয়ার্দিংটনের বোলিং উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এরা যথাক্রমে ৪৩ রাণে ৪টি, ৩২ রাণে ৩টি এবং ২১ রাণে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। লাঞ্চের পর লর্ড টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন এবং খেলার সময় উত্তীর্ণ হবার দুঘণ্টা আগেই দুই উইকেটে ৩৯ করেন। লর্ড টেনিসনের দল আট উইকেটে জয়লাভ করেন।

এই খেলাটিতে মধ্যপ্রদেশ দলকে এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হত না যদি মেজর সি কে নাইডুকে এই খেলায় যোগদান করতে দেওয়া হত। তিনি মধ্যপ্রদেশ দলের পক্ষে খেলার জন্য মধ্য-

প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হলেও 'ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড তাঁর নির্ব্বাচন খারিজ করে দিয়েছেন। 'কনট্রোল বোর্ড' এই সম্পর্কে কারণ দেখিয়েছেন যে মেজর নাইডু ইতিপুর্ব্বে মধ্যভারত দলের পক্ষে খেলেছিলেন সুতরাং আবার তাঁকে মধ্যপ্রদেশ দলের পক্ষে খেলতে দেওয়া চলে না। 'কণ্ট্রোলবোর্ডের' এইরূপ আচরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না তা নিয়ে সমালোচনা না করাই ভাল। তবে এর থেকে কনট্রোল্ বোর্ডের স্বেচ্ছাচারিতা এবং মেজর নাইডুর ক্রিকেট প্রতিভাকে খর্ব্ব করবার যে একটা গুপ্ত চেষ্টা চলছে তা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে। তবে 'ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল্ বোর্ডের' দোহাই দিয়ে দু একজন রাজা মহারাজা মেজর নাইডুকে যতই দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করুন না কেন ভারতের ক্রীড়ামোদীরা তাঁর উপযুক্ত সম্মান দিতে কার্পণ্য করবে না। বৃথা হীন চেষ্টা করে মেজর নাইডুর জনপ্রিয়তা দূর করতে কিছুদিন সময় লাগবে। তার উপর লর্ড টেনিসনের দলের বিপক্ষে মেজর নাইডু যত বেশী না খেলেন ততই বেশী বিলাতী মর্য্যাদা রক্ষা পাবার সম্ভাবনা থাকবে। এই খেলাটিতে স্থানীয় দলে মেজর নাইডুকে যোগদান করতে না দেওয়ার জন্য ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব দেখা গিয়েছিল। এবং এইরূপ আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ এই খেলাটিতে খুব অল্পসংখ্যক দর্শকগণ মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মধ্যপ্রদেশ দল

পি আর নাইডু, ডিলোরভাত, ইরাণী, জয়ন্ত, টি এস নাইডু, জহুর আমেদ, রেজ্জাক, লেন, পাশা এবং বাটলিওয়ালা।

ইংলণ্ড অভিমুখে ভারতীয় দল

আগামী এপ্রিল মাসে একটি আন্‌অফিসিয়াল্ ভারতীয় ক্রিকেট টীম ইংলণ্ডে যাত্রা করবে। রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাব এই টীমটি নিয়ে যাবার উদ্যোগী হয়েছেন। সিন্ধুপ্রদেশের কয়েকজন খেলোয়াড় এবং অন্যান্য প্রদেশের তরুণ, উদীয়মান খেলোয়াড়দের নিয়ে এই টীম গঠন করা হয়েছে। ভুজারপুরের মহারাজা এই দলের ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ আগামী ১০ই এপ্রিল এই ভারতীয় দলটি জাহাজে চড়বেন। এখন অবধি নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ভুজারপুরের মহারাজা (ক্যাপ্টেন), এস এ গোপালদাস, আব্বাস খাঁ, বি ডি শঙ্কর, ও দীপচাঁদ (সিন্ধুপ্রদেশ), হাজারী ও নরসিংহ রাও কেশরী (পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যদল), কপুরিয়া, বাটলিওয়ালা ও নাথোদা (বোম্বাই), কার্ত্তিক বসু (বেঙ্গল), হাবিবুল্লা ও রোসানলাল (পাঞ্জাব) এবং এস ব্যানার্জ্জি (জামনগর)

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

'রহিনটন্ বারিয়া' আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের খেলাটি গত সপ্তাহে টালা পার্কে হয়ে গেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই খেলাটিতে প্রতিযোগিতা করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক ইনিংস এবং ১৩৮ রাণে পরাজিত করেছে। ঢাকা দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৯৯ ও ১২৬ রাণ করেন। বিজয়ী দল প্রথম ইনিংসেই ছয় উইকেটে ৩৬৩ রাণ করে ডিক্লেয়ার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি একাই নিজস্ব ২১৬ রাণ করে এই প্রতিযোগিতার আগের ব্যক্তিগত রাণের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন।

গত সোমবার থেকে টালাপার্কে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে।
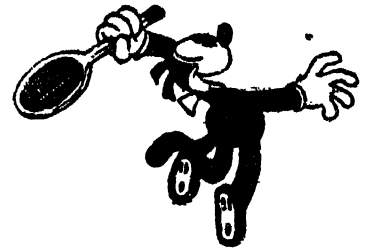
রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শ্রোতাদের কাছ থেকে আমরা অত্যন্ত নিরাশার কথা শুনে থাকি। কোন এক বিশিষ্ট শ্রোতা সেদিন আমাদের অভিযোগ জানালেন—"আপনারা এত আলোচনা করছেন খুব ভালো—কিন্তু এতে কি কিছু কাজ হবে? আমরা তো আজ কাল আর এ নিয়ে আলোচনাই করি না, প্রোগ্রামও কোন মন দিয়ে শুনি না।" ভদ্রলোককে আমরা অরসিকের কোঠায় ফেলেছিলাম। তাঁর যুক্তিগুলির কোন বিশেষ ন্যায্য অর্থ নেই, কিন্তু কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই রকম জনমতে আমরা দুঃখ অনুভব করি। তিনি বললেন "রেডিও একটা রাখতে হয় রেখেছি সন্ধ্যে বেলা দিল্লীর প্রোগ্রাম শুনি—তা ভিন্ন হয়ত রেডিও বেজেই যাচ্ছে—লক্ষ্য নেই বড্ড বিরক্তি বোধ হলে সেটটা বন্ধ করে রাখি।" আমরা প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম "কর্তৃপক্ষের কাছে আপনাদের অভিযোগ জানান না কেন?"

প্রত্যুত্তর এলো "কোন কাজ হয়না—করেছি, কোন প্রতিকার না পেয়ে ছেড়ে দিয়েছি ওই দিল্লীর প্রোগ্রামই ভালো।"

আমরা বললুম—"আমাদের জাতীয় অবদানকে সবসময়েই আমরা তুলনামূলক চক্ষে ছোট করে দেখি, এ আমাদের জাতীয় মনোবৃত্তি।

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—"জীবনের সকল দিকেই দেখুন বাঙ্গালীর আদর অবাঙলায়, রেডিওতেও তার ব্যতিক্রম হবেনা, দিল্লী বেতার প্রতিষ্ঠানে বাঙালী শিল্পী সম্মান পাচ্ছে।"

বেতার গ্রাহক ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমরা অনেক আলোচনা তর্ক করলুম বটে, কিন্তু শ্রোতাদের এই ধরণের impression—কলিকাতা বেতার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে উদাসীন ভাব সত্যিই আজ জাগ্রত হয়ে উঠছে।

* * * *

এক সময়ে কলিকাতা বেতারের অতি দুর্দ্দিনে আমরা কর্ম্মশক্তি দেখেছিলুম প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর মিঃ মজুমদারের। আজ তিনি কি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি কি বোধ করছেন না বেতারে রাশি রাশি অযোগ্য নভিসদের আমদানিতে গুণী শিল্পীর স্থান অপরিসর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্রোতাদের বিরক্তি কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, অভিযোগের প্রতিকার নেই।

* * *

আর্টিষ্টরা বলে—বেতারে তাদের আদর নেই, অভ্যর্থনা নেই। কাগজে কাগজে এই নিয়ে প্রতিবাদ—কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার—বেতার কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে উদাসীন। বেতার জগতের পৃষ্ঠায় কেবল দেখছি বেতার জন-প্রতিষ্ঠান এবং তার জয়গান। আমরা সমালোচনার পর সমালোচনা করে যাচ্ছি, অপ্রিয় হবার আশঙ্কা না রেখেই, কোন স্বার্থ-সঙ্কল্প না নিয়ে, কিন্তু মর্ম্মের কথা শুনচে কে?

* * *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর মিঃ মজুমদারকে আমরা তাঁর পূর্ব্বশক্তির আবার পরিচয় দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি। বেতারের বিরাট কর্ম্মপথে এখন চাই একজন শক্তিমান পুরুষের সুন্দর কর্ম্মহস্ত।

* * * *

এবার একজন শ্রোতার নিকট হতে একখানি অত্যন্ত অভিযোগপূর্ণ পত্র পেয়েছি। নিম্নে সেখানি আমরা প্রকাশিত করলুম। এবিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্থানাভাবে এবারে আর কোন প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা আলোচনা করলুম না।

১৬ই জানুয়ারী। কলিকাতা।

মাননীয় খেয়ালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রখানিকে আপনার পত্রিকায় স্থান দিলে বাধিত হইব। গত ১৩ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেতার অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় একটী সঙ্গীতানুষ্ঠান হইবার কথা ছিল। শ্রীযুক্তা অমিতা সেনের গানের পর কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন "যে বেদনার কোলে" শীর্ষক একটী মিলিত সঙ্গীত হইবে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে হঠাৎ গ্রামোফোন রেকর্ড যে কেন বাজান হইতে লাগিল তাহা জানা গেলনা। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানটী অসমাপ্ত থাকার ফলে ঐ দিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানটী একেবারেই নীরস হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানবাবু যে হঠাৎ তাঁহার অনুষ্ঠান বন্ধ করিলেন কেন, আশা করি তিনি এবং বেতার কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণে তাহার কারণ প্রকাশ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন। কোন একটী জন প্রতিষ্ঠানে এরূপ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয় সে সম্বন্ধে অবহিত হইবেন।

ইতি—

জনৈক শ্রোতা—
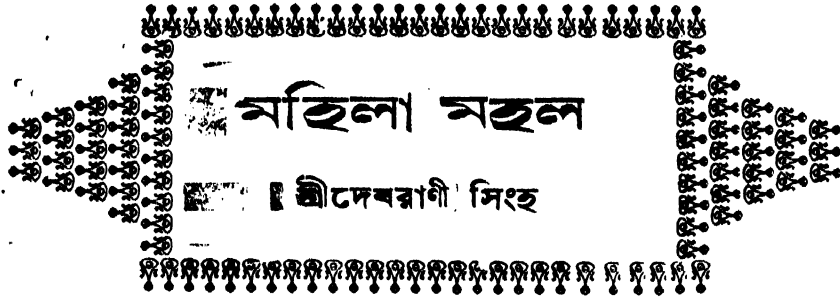
বাংলায় নারীর স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই সকল সম্পদের মূল 'Health is Wealth' এ নীতিবাক্য সকলেরই জানা আছে। ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকে এরকম অনেক নীতিবাণীই আমরা পড়ে থাকি। স্বাস্থ্য না থাকলে কোন কিছুতেই কোন অবস্থাতেই যে মানুষ সুখী হতে পারেনা একথা যে আমরা বুঝি না বা বিশ্বাস করি না এমন নয়—কিন্তু এর গুরুত্ব আমরা মনেপ্রাণে অনুভব করিনা। তোতা পাখীর মত জীবনে আমরা অনেক নীতি, আদর্শবাণী কণ্ঠস্থ করে রাখি—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! ব্যবহারিক জীবনে আমরা সেগুলি কোনদিনই কাজে লাগাই না।

আমাদের অস্বাস্থ্যের জন্যে আমরা যে বহু পরিমাণে দায়ী একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার নারী সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাদের শীর্ণ অসহায় মুখ এবং দৃষ্টি তাদের অকাল বার্দ্ধক্য সত্যিই আমাদের জাতির অশিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ঔদাসিন্যের চরম প্রমাণই দেয়।

বাংলার আধুনিক মেয়েদের কণ্ঠে আজ প্রগতিবাদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বাংলার আধুনিক মেয়ের দল সমাজের সকল রকম আচার, বিচার এবং কুপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছে—কিন্তু ভারী দুঃখের বিষয় শক্তি এবং স্বাস্থ্যের চিন্তা কারুর মস্তিষ্কে নেই। অস্বাস্থ্যে অনিয়মানুবর্ত্তীতায় বাংলার নারী সমাজ আজ কোন আলোকের পথে ছুটে চলেছে? রুচির দিক থেকে আমরা বহু অগ্রসর হয়েছি। শিক্ষায় আজ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব উচ্চ ধাপে সমাসীন, সভা-সমিতিতে আমাদের আর ঘরের কোণের কণ্ঠ নেই—আজ পুরুষদের আমরা চোখ রাঙিয়ে বলছি আমরা চাই সাম্যবাদ। নারী সমাজের অন্ধকারার বদ্ধ হাওয়ায় আমরা আনতে চাই স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোকরশ্মি, দক্ষিণ সমীরণের প্রাচুর্য্য, কিন্তু জীবনের ভিত্তি আমাদের আল্‌গা শিথিল। শীর্ণ খর্ব্বদেহবল্লরী মসীলিপ্ত কোঠরাগত চক্ষু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি পাণ্ডুর আনন, শক্তিহীন রুগ্ন স্বাস্থ্য। তবে কোথায় আমাদের প্রগতিবাদ? কোথায় আমাদের গর্ব্ব—অহঙ্কার?

নারী হচ্ছে মাতৃজাতি। আমাদের 'পরই নির্ভর করছে দেশের আশা-ভরসা দেশের ভবিষ্যত দেশের যা কিছু মঙ্গল! আমাদের সন্তানরাই হবে ভবিষ্যত বাংলার মেরুদণ্ড! রুগ্ন মাতার শীর্ণ-সন্তান কোন্ আলোকের সন্ধান দেবে ভবিষ্যত বাংলার নিরন্ধ্র অন্ধকারে?

বাংলার নারী সমাজের স্বাস্থ্য দিনে দিনে পড়ছে ভেঙে অম্ল-অজীর্ণতায় শতকোটি রোগের করালগ্রাসে বাংলার নারীসমাজ আজ ক্লিষ্ট। সমাজে নারী যদি স্বাস্থ্যহীনা হয় তবে সেখানে কোন সুখই নেই। প্রায় প্রত্যেকটি আধুনিক মেয়েকে দেখা যায় অস্বাস্থ্যের ভারে অবনত। এর প্রতিকার কী?

বাংলার প্রত্যেক মেয়েরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এর প্রতিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা। পাঠ্য পুস্তকের স্বাস্থ্য-নীতি বাণীগুলি শুধু তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ না করে বাস্তব জীবনে তাদের কাজে লাগানো।

বাংলার নারী যদি স্বাস্থ্যবতী মায়ের চির গৌরবোজ্জ্বল আসন গ্রহণ করতে না পারলে দেশকে যদি না দিতে পারলে স্বাস্থ্যবান সুসন্তান, সংসারকে যদি না দিতে পারলে সুখশান্তি তৃপ্তির প্রাচুর্য্য, গৃহশিক্ষায় না আনতে পারলে স্বাস্থ্যনীতি অস্বাস্থ্যকে দূর করে যদি সংসারে না আনবে স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি তবে কিসের প্রগতিবাদ? কিসের সাম্যবাদ? কিসের স্ত্রী-শিক্ষা? স্ত্রী-স্বাধীনতা?

বাংলার বর্ত্তমান নারীসমাজকে—আমার শ্রদ্ধেয়া মা বোনদের আমার এই ছোট আলোচনায় এইদিকে গভীর দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। আমি আবার বলি—স্বাস্থ্যহীনা বাংলার নারী সমাজের প্রথমে চাই সুস্বাস্থ্য—গৃহশান্তি মায়ের সুউচ্চ গৌরব আসন—দেশকে স্বাস্থ্যবান সন্তান দান করা। জাতির সৌভাগ্য নির্ভর করে তার স্বাস্থ্যে।

স্বপন

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

সারাটা শরীর অসহ্য ব্যাথায় আড়ষ্ট। ঝিম্ ঝিম্ করছে মাথাটা, চোখের পাতাদুটো ভারী হয়ে আসছে। পাশের ঘরের নবাগত ভদ্রলোকটি কপাল ছুঁয়ে বলে গেলেন—'জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ', হবে। সুদর্শন অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে পাশ ফিরে শু'ল। হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের ওপরকার ছোট খাম খানির দিকে। সার্ব্বজনীন বেয়ারা সুগ্রীব কোনসময়ে রেখে গেছে। আশ্চর্য্য! এতোক্ষণ সে দেখতে পায়নি।

দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে সুদর্শন তাকিয়াটা ঠেস দিয়ে বসল। হাত বাড়িয়ে খামখানি টেনে নিয়ে ঠিকানার হরফগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মাথার বালিশের তলায় গুজে রাখল সেটা। সে জানে প্রেরকের নাম এবং ধাম। লেখার ছাঁচ দেখে সে বুঝে নিয়েছে।

চিঠি লিখেছে মাধুরী—একটি মেয়ে—যাকে সে ভালবাসত একদিন। বহুদিন পর তার এই প্রবৃত্তি। থাক্, পড়বে সে নিশীত রাতে নীরবে মনে মনে নিঃশব্দে—একবার-দুবার-দু'-শবার। এখন তার অনেক কাজ। নতুন ধরা উপন্যাস খানার উপসংহারটা লিখে ফেলতে হবে। প্রকাশকের হাতে তুলে দিতে হবে শীগগির। মাসিক পত্রিকার কয়েক পাতা তার লেখাংশের জন্য খালি আছে। এই সংখ্যাতেই সমাপ্ত করবেন সম্পাদক।

সুদর্শন সাহিত্যিক এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। সাধারণে ওর লেখায় তুষ্ট। সুতরাং ভক্ত—সংখ্যা পুষ্ট হয়েও উঠেছে। বাজারে ওর বইয়ের চাহিদা আছে। অতি বড়ো কঠোর সমালোচকও ওর সৃষ্টির সুখ্যাতি করেন। প্রকাশক তাকে সুচক্ষে দেখে। অধুনা উপন্যাসখানি হবে তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

কোন্ অসতর্কতার ফাঁকে হাতে ধরা কলমটা মুখ থুবড়ে পড়ল খাতার পাতার ওপর। সুদর্শনের দুটী চোখ ভাবাবেশ, আনত মস্তক। চোখের সামনে ভেসে উঠল উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়, ওর নিজের জীবনের জ্বলন্ত পরিচ্ছেদ।—সতীর্থ কিরণের সঙ্গে তাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া। মাধুরীর সঙ্গে তার পরিচয়—আলগোছা কথাবার্ত্তা। অতঃপর ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠল পরিচয়। পরিচয় রূপান্তরিত হ'ল প্রেমে। দু-দিকে দু-কুল নদী বয়েগেল মাঝখান দিয়ে। একের বন্ধন অপরের হাতে। একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ—গ্রহের সঙ্গে যেমন তারকার। ক্ষণিকের অদর্শনে ব্যাকুল করে তুলত, স্নায়ুতে উঠত অশ্রান্ত কোলাহল আর শিরা উপশিরায় আসত অসহ্য চাঞ্চল্য।

আর মাধুরী! আশ্চর্য্য মেয়ে কিন্তু সে। অমন শান্ত, নির্জীব মেয়ে সুদর্শন কক্ষনো দেখেনি। আস্তে আস্তে চাপা গলায় নীচুস্বরে কথা কয়। প্রতিবাদ বোধ হয় জীবনে কোনোদিন কারো বিরুদ্ধে করেনি। স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সে ছিল একেবারে উদাসীন। উদাসীন মানে অজ্ঞান নয়। সে বুঝত সবই। তবু, ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবার স্পৃহা তার আদৌ ছিল না। ব্যাথায় সে ব্যাকুল হ'ত না, দুঃখেও কাতর নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওলট পালট এতোটুকু হয় না, শুধু আয়ত চোখদুটী ছলছল করত, পুরন্ত দুটী ঠোঁট থর থর করে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত।

মাধুরী যেন দূরাগত বাঁশীর সুরের মূর্চ্ছনা। তেমনি নম্র উদাস, তেমনি আবেগে অধীর।

মাধুরী রূপসী। হ্যা, সে রূপবতী। সে-রূপ আগুন ধরায় না, আলো করে। মাধুরীকে দেখে মুগ্ধ হবে—যে কেউ। কিন্তু স্নেহের সঞ্চার হবেনা মনে। সূর্য্যাস্তে পশ্চিমকাশের গৈরিক আভা ওর চোখে-মুখে—সর্ব্বাঙ্গে।

তারপর? তারপর একদা মাধুরীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এক অজানা পুরুষ। তার সঙ্গে মাধুরীর পরিচয়ের বন্ধন ছিল না কোনকালে। সম্পূর্ণ অপরিচিত। উল্কার মত ছুটে এল সে। মাধুরী বেনারসী বেষ্টনী। ম্লান আনত দৃষ্টি। দস্যু নিয়েছে তাকে বিজয় রথে তুলে। ঠোঁটের ওপর জয়ের চাঁপা উল্লাসের সুস্পষ্ট রেখা। পৌরষ উজ্জল দৃপ্তি তার দু-নয়নে।

সে পারলনা গতিরোধ করতে। রথের কঠিন চাকা ঘসড়ে চলে গেল তার বুকের ওপর দিয়ে। সারটা বুক হ'ল ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত। পরাজয়ের অবরুদ্ধ বেদনা গলে পড়ল তার দু-চোখের কোল ছাপিয়ে।

আহত মনে খাতা কলম নিয়ে সে সুরু করল বেদনার বেদরচনা। দুর্ব্বল দেহ-মনের সুলভ সঙ্গতি। তার সাহিত্য প্রতিভার চরম পরিস্ফুরন ঘটবে নবরচিত উপন্যাসে। মাসিক পত্রিকার পাতায় তুলে সে বুঝতে পেরেছে যে, তার ধারনা এতোটুকু অমূলক নয়।

আজো ভোলেনি মাধুরী তার মত একটা হীন কাপুরুষকে। চিঠি লিখে খবর নেয়। তার স্বাস্থ্য, সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামায়। প্রশ্ন করে নতুন কোনো উপন্যাস লিখলে কি—

না, কোথায় পত্রস্থ হবে এবং বেরুবে কোন্ সংখ্যায় ? সর্ব্বশেষে ছোট্ট করে লেখে—

'ভালোবাসা নিও'। ওর নিজের ঘর-সংসারের ইতিবৃত্ত দিয়ে ইতি টানে। পরে পুনশ্চ জানায়—তার নিজের স্বাস্থ্য ভালো নয় মোটে। প্রায়ই হয় জ্বর, তার সঙ্গে আছে বিবিধ উপসর্গ।'

সুদর্শন ফেনিয়ে লিখছে অতীতের ইতিহাস। প্রতি দিনকার ত্রুটী বিচ্যুতি, মান অভিমান খুঁটীনাটী সে কিছুই বাদ দেয় না। ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল, প্রয়োগ কৌশল তার প্রশংসনীয় আর চরিত্র চিত্রনের দক্ষতা অসামান্য—সাধারণে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে এই কথা।

উপন্যাসের পরিণতি পরিকল্পনায় সে মেতে উঠল। ভেবে কুল পায়না লেখার গতি কোন্ মুখো করবে। মিলনান্তক না বিয়োগান্ত ? হাসি কিংবা অশ্রু ? বিয়োগান্ত—অশ্রু ? শিউরে উঠল সান্তরিক। থর থর করে কেঁপে কলমটা শুয়ে পড়ল—সে নিজেও। চোখের দু কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বালিশের ওপর। চেতনা অতীত মন।

মাধুরী এসে ঘরে ঢুকল। তেমনি সংযত চলন, সেই আগেকার মত ঠোঁটের ওপর অস্পষ্ট হাসির রেখা। অনেকখানি রোগা হয়ে গেছে যেন। চোখের কোলে কালি পড়েছে, দৃষ্টি অধিকতরো উজ্জ্বল। ঢিলে করে বাধা খোঁপাটী ভেঙ্গে পড়েছে, কাঁধের ওপর। মুখখানি শুকনো, একটু যেন ফ্যাকাশে। কিন্তু ম্লান নয়। আধো বাকা ভুরু দুটীর মাঝখানে ওর সযত্নে আঁকা কুঙ্কুমের টিপটী বিশেষ করে তুলেছে মুখখানি। কী মিষ্টি চেহারা মাধুরীর !

অতি সন্তর্পনে পা টিপে টিপে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—'কেমন আছো সু ?'

সুদর্শন ফিকে হেসে জবাব দিল —'জ্বর ছেড়ে গেছে। বোস।'

মাধুরী বিছানায় ওপর তার মাথার কাছে বসল। নীরবে কপালে হাত রেখে হেসে বলল—'কোন্ ডাক্তারে বোলেচে যে জ্বর নেই ? তুমি নিশ্চয় !'

'হ্যাঁ'—সুদর্শন উল্টো দিকে পাশ ফিরল।

মাধুরীর পাতলা ঠোঁটের ওপর নিঃশব্দ হাসির রেখা ফুটে উঠল। সুদর্শনের গায়ে হাত রেখে নীচুগলায় ডাকল—'এই শুনচো সু !'

'কী বলো !'—তেমনি ভাবে থেকেই উত্তর দিলে সুদর্শন।

'অমন করে মুখ ফিরিয়ে শুলে কেন ? তোমার সঙ্গে দুটো কথা বোলতেও পাবনা। বাব্বাঃ— কী কঠিন লোক তুমি !'

সুদর্শন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—'আমি ভাবচি একটা কথা !'

'কী কথা ? কেন তোমার আজো বিয়ে হোলে না, এইত ?'

'না—না ওসব নয়।' আচ্ছা—মাধুরী তোমার স্বামী কিছু মনে কোরবেন না তো ? মানে আমি বোলছিলুম —'

'মানেত আমি জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু কারণ ?'

'এই এতো রাতে এখানে রয়েচো !'

মাধুরী সেকথায় কোনো উত্তর দিলো না। সুদর্শনের চুলের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বলল—'আঃ কী নরম তোমার চুল! মাথায় কী মাখো ?'

'কই কিছু না তো !'

"সেণ্টেড্ তেলের গন্ধ তোমার চুলে।'

সুদর্শন নিরুত্তর নিরুদ্বেগ ! মাধুরী সেইভাবে নীরবে চুলে হাত বুলোতে লাগল। হঠাৎ ও উঠে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওপরকার বই খাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। ঘরের ভিতরকার টেবিল ল্যাম্পটা টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। আবছা আলোতে মাধুরীর মুখখানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। সুদর্শন মাথা উঁচু করে হেসে জিজ্ঞাসা করল—'ওসব ধরে টানাটানি কোরচো কেন ?'

'ঘরটার কী হাল হোয়েচে। টেবিলের ওপর বই খাতার ছড়া ছড়ি। একমাসের পোড়া সিগারেট জমা করে রেখেচো, ফেলে দেবার সময় পাওনা। কী করে যে থাকো এমন ভাবে ? শরীরেরদিকে কোনোদিন একটুও নজর দেবে না। আমি শুধু মিছে বকে মরি। কোনোদিন আমার কোনো

অনুরোধ কানে তুললে না!'—কথায় আড়ালে একটা প্রচ্ছন্ন কান্না যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

সুদর্শন আবার মুখ ঘুরিয়ে শুল। সারাটা ঘর থম থম করছে। খানিক পরে মাধুরী এসে পাশে বসল। গা-নাড়া দিয়ে বলল—আমার দিকে মুখ ফেরাও। বাঃ—মুখ না দেখতে পেলে কী করে কথা কইবো, তোমার সঙ্গে।

সুদর্শন নীরবে পাশ ফিরল। মাধুরীর একখানি হাত মুঠোর ভেতর নিয়ে ডাকল—'মাধুরী!'

'উ'—মাধুরী নিশ্চল।

'তুমি কী সুন্দর। কী শান্ত তুমি! কী মিষ্টি করে তুমি কথা বলো! কী—,

মাধুরী হাত চাপা দিল ওর মুখে। রাগত সুরে বলল—'থাক্ ক্ষান্ত দাও! সেকেলে উচ্ছ্বাসের মায়া কাটাতে পারলেনা আজো! তুমিনা আধুনিক সাহিত্যিক? উচ্ছ্বাস না তোমাদের কাছে দোষনীয়!'

'তবে কী বোলবো মাধুরী?'

'কিছুনা! দোহাই তোমার, রূপ-গুণের ব্যাখ্যা তুমি কোরোনা। ওকাজ করবার লোক আমার আছে।'

একটু থেকে পরিষ্কার গলায় বলল—'একটি মেয়ে আছে।'

'তুটী নেই, মাধুরী?'—মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল সুদর্শন।

যাও—সব কথা হাল্কা কোরে নিওনা। শোন, মেয়েটী আমার বিশেষ জানাশোনা। বেশ দেখতে। চলচলে মুখখানি দেখলে কী জানি কেন, তাকে যেচে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার পর্য্যন্ত পড়েছে। ভারী বুদ্ধিমতী! সংসার চালাতে যে যে গুণের দরকার তার মধ্যে সব আছে।'

সুদর্শন গম্ভীর ভাবে বলল—'আরো আছে, তুমি জানো না। সে একজন বিখ্যাত সাতারু, ইংলিশ চ্যানেল্ পাড়ি দেবে শীগ্‌গির। নৃত্যে বাহবা পেয়েচে উদয়শঙ্করের কাছ থেকে।'

মাধুরী ধমক দিয়ে ওঠে—'আবার সেই! সত্যি বোল্‌চি আমি একটী মেয়ে ঠিক কোরে রেখেচি। তোমার সঙ্গে তার নিশ্চয় খুব মিল হবে। দুজনে সুখী হবে—আমিও।'

'তুমিও?'

হ্যাঁ আমিও। তোমাকে সুখী দেখলে আমি সুখী হবো! এমন ছন্নছাড়া হয়ে আর কতোকাল থাকবে! অসুখ হোলে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেবে; এমন দ্বিতীয় একটী লোক নেই। আগামী জষ্টিতে শ্রীমতীর আগমনের দিন ঠিক করি, কী বলো?'

—'যা খুশী তোমার!' সুদর্শন উত্তর দিল।

—'দূর! অষ্টিতে হয় না! তুমি যে আবার মা বাপের ব'ড়ো ছেলে। তাহোলে আষাঢ়েই হবে।'

উভয়েই নীরব। সারাটা ঘরে নেমে এলো একটা অসহনীয় স্তব্ধতা। আবহাওয়া হয়ে উঠল ভারী!

কয়েকমুহূর্ত্তপর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাধুরী বলল—'তোমার নতুন উপন্যাসখানা মাসিকের পাতায় পড়লুম। সুন্দর হয়েচে, তোমার সেরা সৃষ্টি হবে এখানা—আমি বোললুম দেখে নিও। কিন্তু শেষটা যে কী হবে ভেবে পাচ্চিনে। কী গতি কোরবে মেয়েটার?'

সুদর্শন স্পষ্ট বুঝতে পারল উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে মাধুরীর মনে কোনো সন্দেহের রেখাপাত করেনি। ম্লান হেসে বলল—'এখনো ভেবে উঠতে পারিনি। তোমার অভিমতটা শুনি।'

'আমার আবার অভিমত!' সলজ্জস্বরে বললে মাধুরী।

—'তবু—'

'আমি বোলি মেয়েটির—আচ্ছা—ধরো, মেয়েটার যদি মৃত্যু হয়!'

আপাদমস্তক শিউরে উঠল সুদর্শনের। মাধুরীর একখানা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরল।

ওকি! অমন কোরে কেঁপে উঠলে যে? গল্প তো!'

'গল্প! হ্যাঁ, গল্প বই কি! কিন্তু, তবু মেয়েটা বেঁচে থাকুক—বেঁচে থাকুক সে নীরোগ হোয়ে,—সুখে-শান্তিতে।

'কিন্তু ট্রেজিডীতেই মাধুর্য্য বেশী, কমেডির চেয়ে একথা তুমিই তো বলো! পড়ুয়ার মন টপ কোরে আটকে পড়বে।'

—'দরকার নেই। ছেলেটা বরং বিবাহ কোরুক। হ'ক সেকেলে কাণ্ড, তবু মেয়েটা যেন বেঁচে থাকে, সুখে থাকে। বিচ্ছেদের বেদনা যেন ওর সুন্দর জীবনকে বিষিয়ে না তোলে। শুনচো মাধুরী! কথা কইচো না যে? মাধুরী—মাধুরী!'—

সুদর্শন চমকে ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানার ওপর। টেবল ল্যাম্পটা দপ্ দপ্ জ্বলছে মশালের মত। বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগল। কই মাধুরী? এক্ষুনি বসেছিল যে তারি পাশে—গায়ে গা ঠেকিয়ে। স্বপ্ন! মাধুরী কী স্বপন সঞ্চারিনী? নাঃ—মাধুরী নিশ্চয় বাইরে—সামনের বারাণ্ডায় দেহ ঝুকিয়ে আছে! চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বন্ধ দরজার গায়ে মাথাটা গেল ঠুকে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা ঠেকছে তো-ভো করছে—মাধুরী এসেছিল এখানে—মেসে — পুরুষ পল্লীতে?

আবার খাটের কাছে ফিরে গেল সে। বালিশের তলা থেকে বা'র করল মাধুরীর লেখা চিঠিখানি। একটানে খামখানা ছিঁড়ে ফেলতেই বেরিয়ে এলো এক টুকরো চিরকুট। এই কী মাধুরীর হস্তাক্ষর! একনিঃশ্বাসে পড়ল—

বন্ধুবরেষু

ভাই সুদর্শন, কাল ভোরে মাধুরী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। শেষ সময়ে তোমায় দেখবার জন্য বড়ো অধীর—হয়েছিল। খামখানা তারি। তোমাকে চিঠি দেবে বলে ঠিকানা লিখে রেখেছিল।—

ইতি—'কিরণ'

মাধুরী নেই! উঃ এ কী মর্ম্মদাহী উপসংহার। মাধুরী মরে গেল? টেবল্-ল্যাম্পটা যেন বারকতোক দপ দপ করে জ্বলে উঠে অন্ধকারে ছেয়ে ফেলল সারাটা ঘর! পায়ের তলায় দুলে উঠল পৃথিবীটা। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সুদর্শন লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। কাগজের টুকরোটা সজোরে মুঠো করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বালিশে মুখ গুঁজে।

"স্মৃতি-লেখা"

শ্রীতড়িৎ কুমার ঘোষ

গাঁয়ের পথে সন্ধ্যে বেলায়—
চলতে ছিলেম···একা···!—
একটী বাঁকে তারসনে মোর
হঠাৎ..."চপল-দেখা"...!!—
লজ্জা-রঙীন্ মুখখানী তার
দুলিয়ে গেলো হৃদয় আমার—
সেই দুলোনের সবুজে পাতায়—
পড়লো বাধন-রেখা!—
—চলছিল সে একা!!—
বিদায় যখন ঘনিয়ে এলো
আকাশে মেঘ ছড়িয়ে গেলো
ঝড় বাদলের পাগল ধারায়
উদাসী মোর গানযে হারায়;—
এই বিরহীর বক্ষে কাঁদে—
—তার সে স্মৃতি লেখা!—
—চল্ছিল সে একা!!—

কবিওয়ালা হরুঠাকুর

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীতে এক জাতীয় স্বভাব কবির আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যে ইঁহাদের অবদান তুচ্ছ নয়। ইঁহাদের স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একদিককে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। এই স্বভাব কবির দলকে কবিওয়ালা বলা হইত। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেশের রাজা-মহারাজাগণ। কবিওয়ালারা বহু রাজসভা আলোকিত করিতেন। মজলিশে, বৈঠকে এই স্বভাব কবিদের ছিল স্থান—ইহারা বিরামক্ষণকে আনন্দ মুখরিত করিয়া রাখিতেন। শতাব্দী বর্ষ পূর্ব্বেও এই কবিওয়ালাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এখন যেমন গ্রামে, গ্রামে, সহরে সহরে, সখের এবং পেশাদারী যাত্রা, থিয়েটারের দল দেখা যায় তখন ছিল এমনি কবিওয়ালার দল। তবে এই কবিওয়ালাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইঁহাদের মধ্যে ছিল কাব্য প্রতিভা যাহা সাহিত্য দৃষ্টিতে উপেক্ষণীয় নহে। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসে তাই এই কবিওয়ালার দল সসম্ভ্রমে স্থান পাইয়াছেন।

এই জাতীয় কবিগণ প্রথমে "দাড় কবি" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আসরে দাঁড়াইয়া ইঁহারা মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন—সেই জন্যই বোধহয় তাঁহারা 'কবিওয়ালা' আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাদের রচনায় অশ্লীলতার স্পর্শ ছিল বলিয়া অনেকে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন এবং ইহাদের আক্ষরিক প্রতিভা বিশেষ না থাকায় অশিক্ষিত বলিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদের গীতিকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা এবং কাব্য প্রতিভার বিশেষ পরিচিতি লাভ করা যায়। অধিকাংশ গীতিকাব্য ইহাদের ধর্ম্মতত্ত্বমূলক।

কবিওয়ালাদের এক একটি সম্প্রদায় ছিল। সভা সমিতি, আসরে উৎসবে ইহাদের ডাক পড়িত এবং তখন 'কবিগান' হইত। এক এক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগীতা চলিত, এবং সেইখানেই কাব্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। দর্শকগণ বাদ্যযন্ত্র সমেত কবিওয়ালাদের গান শুনিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন। কবিওয়ালাদের মধ্যে রঘু, মতে, নন্দ এই তিনজনই—প্রথম কবিওয়ালা। ইহাদের পর প্রতিভাসম্পন্ন কবিওয়ালা রাম বসু। রাম বসুর কাব্য প্রতিভার সহিত আধুনিক বহু পাঠক পাঠিকা সুপরিচিত।

রাম বসুর সমসাময়িক কবিওয়ালা, হরু ঠাকুর। হরুঠাকুরের আসল নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ইনি বাংলা ১১৪৫ সালে কলিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কাব্য প্রতিভার পরিচয় লাভ করা যায়। ইঁহার পিতার নাম ছিল কালী চন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী।

হরুঠাকুর শীঘ্রই কবিওয়ালা রূপে জনসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন দেশের রাজা মহারাজারা কবিদের সম্মান করিতেন—ভরণ পোষণের ব্যয় ভার বহণ করিয়া কাব্য প্রতিভার পরিস্ফুরণের সহায়তা করিতেন—তাই হরুঠাকুরের ডাক আসিতে লাগিল বহু রাজসভা হইতে। বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি রাজসভায় হরুঠাকুর বিশেষ রূপে আদৃত এবং পুরস্কৃত হন। প্রথমে তিনি সখের কবির দল গড়েন, পরে তিনি সে দলটিকে পেশাদারী দলে পরিণত করেন। পরিশেষে দল ছাড়িয়া তিনি মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

হরুঠাকুরের স্বাভাবিক কবি প্রতিভা সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ গল্প আছে।

"একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় নানা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ হয়। মহারাজ সভাস্থ পণ্ডিতগণকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে দেন। সে সমস্যার শেষ চরণে থাকিবে, "বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে।" কিন্তু কোন পণ্ডিতেরই সমস্যা-পূরণ মহারাজের মনোমত হইলনা; তিনি হরুঠাকুরকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। হরুঠাকুর তখন গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করিয়া

আসিতে ছিলেন। সেই বেশেই মহারাজের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সমস্যাটি পূরণ করিতে বলিলেন। হরুঠাকুর তৎক্ষণাৎ কবিতায় সে সমস্যার পূরণ করিলেন ;—

"একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধুলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।

রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শী গিলেছেন যেন চাঁদে।"

শুনিয়া সভায় সকলেই সন্তুষ্ট হন ; এবং মহারাজ একহাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। ১২১৫ সালে হরুঠাকুর পরলোক গমন করেন।

হরুঠাকুরের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলিই প্রশংসনীয়। স্নিগ্ধ ও মধুর কথা রচনায় তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানুষের মনের যে একটি অতি সূক্ষ্ম harmony আছে তাহার সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নলিখিত কয়েকটি উদ্ধৃত ছত্রে। যমুনার জলে কৃষ্ণের ছায়া—রাধার মনে কৃষ্ণের ছবি প্রকৃতির সহিত মনের অতি সুন্দর সৌসাদৃশ্য :

"আচম্বিতে আলো কেন যমুনার জল।
দেখ সখি কূলে থাকি কে করে কি ছল॥
তীরের ছায়া নীরে লেগে হ'লো বা এমন।
স্থগিতে দেখিতে আমার জুড়ালো দুটী আঁখি॥
নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।
না দেখি এমন রূপো বারি মাঝেতে॥"

আর একস্থানে :—

"আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম হায়।
নীর মাঝে যেন স্থির সৌদামিনী প্রায়॥
ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী।
দরশনে বাধা দিলে হইবে সখি পাতকী॥"

হৃদয়ের একাগ্রতা—বঙ্গপল্লী-রমণীর হৃদয়ের এক করুণ অভিব্যক্তি কাব্যের সুরে রূপায়িত!

ছন্দ যেখানে গম্ভীর ভাব ও সেখানে গম্ভীরতর—প্রাচীন বাংলা কাব্যে sound এবং sense কেমন এক মাত্রায় চলিয়াছে!

"হায়, কি হবে সজনি, যায় যে রজনী
কেন চক্রপাণি এখনো।
না এলো একুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে
রহিল না জানি কারণো॥
বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,
হোতেছে স্থির মানে না।
যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,
না এলো মুরারি, পাই যাতনা॥
সই, রবি কিরণের প্রায় হিমকর,
এ তনু আমারো দহিছে।
শিখিপিক-রব অঙ্গে মোর সব
বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥"

বঙ্গ প্রকৃতির শ্যাম শোভায় সুশোভিত স্নিগ্ধ শ্যামরূপ বর্ণনায় কবির কি সূক্ষ্ম রূপ দৃষ্টি :—

"অঙ্গে অগোর চন্দন চর্চ্চিত, বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥"

কিন্তু বিরহ বর্ণনায়ই হরুঠাকুর সমাধিক প্রসিদ্ধ। করুণ কাব্যের সুরে তাঁহার বর্ণিত রাধার বিরহ নিপীড়িত, দুঃখ, বেদনা অতি সুনিপুন।

"সুধীর ধীর বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণ সখীরে কোথায় গুণমণি,
ঘন গরজে ঘন শুনি॥
ঐ ময়ুর ময়ূরী হরষিত, হেরি চাতক চাতকিনী,
এ বকম কেতকী চম্পক জাতি সেউতি
সেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে
গৃহে না দেখে,
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবাজ্যোতি মত প্রকাশে
দিনমণি,
প্রিয় মুখে মুখ দিয়ে শারীশুক থাকে
দিবস রজনী॥"

এইরূপ বহু পদই হরুঠাকুরের কাব্যে বিদ্যমান। বৈষ্ণব কবিগণের বাঁশীর মরমী সুর সহরে কাব্যধারায় খাঁটি বাংলা সুরে কবিওয়ালার গানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আধ্যাত্মিক কাব্যরসে, করুণ সুরের মাধুর্য্যে।

কবিওয়ালাদের সাক্ষাৎ আজিকার দিনে আর পাওয়া যায় না—কিন্তু সন্ধান করিলে আজিও হয়ত আবিষ্কার করা যায়—উৎসাহ দিলে আজিও হয়ত কবিওয়ালার কবিগান সৃষ্টি হইয়া বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্ব গৌরবের একটি অধ্যায়কে বাচাইয়া রাখিতে পারে।

নৃত্যকলা ও বাঙ্গালা দেশ

শ্রীসমরেন্দ্র লাহিড়ী

যে কটি কলার দ্বারা জীবনের চির-সুন্দর রূপকে মানুষ প্রকাশ করতে পারে, নৃত্যকলা তারমধ্যে অন্যতম।

রূপান্বিত দেহ-ভঙ্গিমার মাঝে জীবনের যে সত্য-সুন্দর রূপের প্রকাশ—তারই নাম নৃত্যকলা!

সাধনার পথে পরম সত্যের উপলব্ধিই ভারতের চিরকাম্য। তাই তার নৃত্যকলার সাধনার দ্বারা সে চেয়েছিল সত্য-সুন্দরের স্বরূপ প্রকাশ ক'রতে—হয়ত বা পেরেওছিল।

নৃত্য চর্চা ভারতে কোনদিনও উপেক্ষিত হয়নি, হারানো দিনের ইতিহাস তার সাক্ষ্য। রাজ্যের আনন্দ সভামহল থেকে মন্দিরের অন্দরমহল পর্য্যন্ত তার গতি ছিল অপ্রতিহত—রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, গুনী একই সাথে পেয়েছিল তার বন্দনা গান।

তারপর এলো সেইদিন, যেদিন ভারতের সৌভাগ্য-গগন সমাচ্ছন্ন ক'রে দেখা দিলে রাজনৈতিক ধূমকেতু। ভাঙ্গা গড়ার খেলা সুরু হোল। একে একে ভারত হারালো অনেককিছু, পেলেও বা অনেককিছু—আরম্ভ হোল নূতনত্বের অভিযান।

এরপর ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাস ছিল অজ্ঞাত, অখ্যাত। কিন্তু এখানেই তার সমাপ্তি হোল না, আবার নৃত্যজগতে সুরু হোল তার নব-অভিযান। নৃত্য-জগতে ভারতের এই অভিযান যদিও অতি অল্পদিন মাত্র আরম্ভ হোয়েছে, তবু ইতিমধ্যেই সে রাজ্যে তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হোয়েছে। এরজন্য অবশ্য সম্পূর্ণ সম্মানই সেই সমস্ত কৃতি শিল্পীদের প্রাপ্য—যাঁদের অপূর্ব্ব সাধনার গতি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সফলতার পথে ভারতের নৃত্যকলাকে তার হৃত যশ-মুকুটে পুনরায় সাজিয়ে তুলেছেন। এবার শুধু ভারতের অন্দর মহলে নয়—সমগ্র জগতের সভাগৃহে হোয়েছে ভারতীয় নৃত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

নৃত্যকলার এই নব-অভিযানে বাঙ্গলা দেশকে বলা যেতে পারে কর্ণধার। এক্ষেত্রে তার দান—অফুরন্ত, অপরিমেয়, অপরূপ। তার শিল্পী শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ঠ সাধকের অপূর্ব্ব সাধনার সামনে, স্তম্ভীত বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় সারা জগত মাথা নত ক'রেছে!...কিন্তু এর পরিচয় দেওয়া আজ আমার উদ্দেশ্য নয়, আর সে পরিচয় কে-ই বা না জানে।

গুণীর সমাদরে বাঙ্গলা কোনদিনই বিমুখ নয়—কি আপন, কি পর। ভারতের নানাস্থানের, আর শুধু ভারতেরই বা কেন—সমগ্র জগতের নৃত্য শিল্পীরা (অবশ্য যাঁদের সাথে বাঙ্গলা পরিচিত হোয়েছে) বাঙ্গলার কাছে সমাদৃত হোয়েছেন। বাঙ্গলার এই পরিচয়ই সকল গুণীর কাছে তার চির—নিমন্ত্রণ। কাজেই তার সভাগৃহ কোনদিনই শূণ্য নয়, আমন্ত্রিতের শুভাগমনে নিত্য পরিপূর্ণ। আপন সঞ্চয় সে পরের কাছে বিলিয়ে দিতেও সে কুণ্ঠিত নয়, আবার অপরের সঞ্চয়ে আপন রিক্ততা ভরিয়ে তুলতে সে অসমর্থ নয়।

এই দেওয়া-নেওয়ার ব্যপারে যেমন আপন গুণের কিছুমাত্র অপচয় ঘটে না, তেমনি নব নব সংগ্রহে সঞ্চয়ের পাত্রটা ওঠে পুরে। মানুষের মনের গতি চির প্রবহমান, সে চায় নিত্য-নূতন; আর এই নিত্য-নূতনের আহরণে, অপরের সাথে মিলনের প্রয়োজন হোয়ে দাঁড়ায় আমাদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। পরস্পর মিলনের সহায়তায়ই এক দিন অপরিপূর্ণতার পথ পার হোয়ে এসে, আমরা সম্পূর্ণতার দ্বারে পৌঁছতে পারি।

কাজেই দেখা যায় অপরের সাথে মিলনের দ্বারা বাঙ্গলা কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরঞ্চ তার উন্নতির, তার বৈশিষ্ঠতার গোড়ার কথাই—তার মিলনের কথা। এ কথাই আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, শুধু আপনার ভালটা আঁকড়ে ধরে চরম ভালটা পাওয়া যায় না।

অপরের ভালটার সাথে নিজের ভালটাকে মিশিয়ে নিতে পারলে—তবে পাওয়া যায় পরম ভালটা, সম্পূর্ণ ভালটা। শিল্পী শ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্করের পানে চাইলে, অতি সহজেই একথার মর্ম্ম উপলব্ধি করা যায়।

এই মিলনের পুণ্যে বাঙলা আজ দ্রুত অগ্রগামী, বহু গুণীর সমাবেশে সে আজ সৌভাগ্যান্বিত। বাঙলাকে আজ একান্ত আন্তরিকতায়, এই গুণীসমন্বয়কে আপনার কোরে নিতে হবে। এদের সহায়তায় আর আপন শিল্পীর নৈপুণ্যে, সম্পূর্ণতার পথে বাঙলার গতি হোয়ে উঠবে সহজ, সরল, সুন্দর—আর সেই পথেই সত্য-সুন্দরের স্বরূপ পাবে প্রকাশ।

বাঙলা দেশে আজ যে সমস্ত অবাঙালী নৃত্য-শিল্পীর সমাবেশ হোয়েছে, তাঁদের সকলের সম্বন্ধে বল্‌বার আজ অবসর নেই—এক জনের সম্বন্ধে কিছু বলে এবারের মত শেষ ক'রবো।

* * *

আমাদের দেশে মণিপুরী নৃত্য অখ্যাত নয়, শিল্প নৈপুণ্যে ও বিষয় বৈশিষ্টে মণিপুরী নৃত্য অনুপম। কিছুদিন হোল মণিপুরী নৃত্যের ঢেউ বাঙলাদেশে পৌচেছে, যদিও যোগ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে এদের শিল্পীরা আজও তাঁদের কলা কুশলতার যথাযথ পরিচয় দিতে পারেন নি। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে, তাঁদের কাছ থেকে বাঙলা দেশ অনেককিছু পেতে পারে—অন্ততঃ নূতন কিছু পেতে পারে।

এই মণিপুরী নৃত্যের গুণী শিল্পী শ্রীমান ব্রজবাসী আজ এখানে। কিন্তু বহুদিন যাবত এখানে থাকলেও, আজ পর্য্যন্ত ইনি আপন শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দেবার কোন সুযোগ বা সুবিধা পান নি। এমন কি অতি অল্প সংখ্যক লোকেই এই যুবকটির পরিচয় জানে।

অথচ, বাঙলার কৃতিশিল্পী এই যুবকটির নৃত্য-কুশলতার কতই না প্রশংসা করেছিলেন। এমন কি বিদেশ ভ্রমনেও এই যুবকটিকে সঙ্গে নেওয়ার স্থির ক'রেছিলেন! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বম্বে পর্য্যন্ত গিয়ে অসুস্থ হোয়ে পড়ায়, যুবকটিকে সে যাত্রা বিফল মনোরথ হোতে হয়। শ্রীমান তিমিরবরণও এই যুবকের বিশেষ গুণানুরাগী। শ্রীমান তাঁর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।

শ্রীযুত উদয়শঙ্কর বা তিমিরবরণ যে শিল্পীর গুনানুরাগী, বাঙলা দেশ যে কেন আজ সে গুণীসম্মানে বিমুখ বুঝতে পারি না? এতে যে শুধু সেই যুবকেরই অসম্মান সুচিত হয় তা নয়, বাঙলা দেশেরও দুর্ভাগ্য-সুচিত হয়। কারণ, আজ যে অপরের গুণের সমাদর ক'রতে পারে না, কাল যে সে আপন গুণের সমাদর ক'রতে পারবে এমন তো মনে হয় না।......

তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, বাঙলা আজ যেন এই শিল্পীটিকে চিন্‌তে আরম্ভ ক'রেছে। বাঙলার গৌরব নিউ থিয়েটার্স-এ, আজ এর ডাক প'ড়েছে। বাঙলার একটী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত-সম্মিলনী, একে নৃত্য শিক্ষকের পদে সমাদৃত ক'রেছেন। শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় নৃত্য-পটীয়সী শ্রীমতী সাধনা বসুর নৃত্য-গীতাভিনয়ে, এবার দেখলাম শ্রীমান ব্রজবাসীর স্থান হোয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রলাম যে, কোথাওই এই গুনী যুবকের নাম বা পরিচয় দেওয়া হয়নি। কারণ বুঝতে পারলাম না, এই শিল্পীটির পরিচয় কি শ্রীমতী সম্প্রদায়ের কাছে লজ্জার বিষয়? এছাড়া শ্রীমানের কাছে আজ শিক্ষার্থী সমাবেশ ও হোয়েছে, এদের মধ্যে শ্রীমতী লীলা দেশাইয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে বাঙলা দেশ, এই গুণী শিল্পীটিকে যথাযোগ্য সমাদরে সম্মানিত ক'রতে পারবে। শ্রীমানের একান্ত উন্নতি কামনা করি,—জয়যুক্ত হোক শ্রীমানের আন্তরিক সাধনা, কুসুমাস্তীর্ণ হোক যাত্রা পথ।

আমার একান্ত বিশ্বাস এদের সফলতার সাথে বাঙলার সফলতাও অবিচ্ছিন্ন নয়, একই সাথে একই তালে উভয়ের গতি। নিত্য নব নব সংগ্রহে সমৃদ্ধি উঠুক বেড়ে—সঞ্চয়ের পাত্রটা পুরে উঠতে সময় লাগবে না—আপনিই এসে সম্পূর্ণতা দেখা দেবে।

আশা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর রায়চৌধুরী

সেদিন রাতে তারার চাঁদে জ্বালায় দীপালি।
হঠাৎ জেগে বল্‌লে ডেকে ভোরের শেফালি—
"মনের যত আগল বাঁধন
অন্তরেরি রুদ্ধ কাঁদন
এসব দিয়ে মনের সাজি মিথ্যা ভরালি
দোর খুলেছে প্রভাত পাখীর জাগুক কাকলী

* * *

অন্ধকারের বুকের মাঝে বাঁধলি কেন বাসা
মন পাওয়া কী সহজ কথা মিথ্যা ভালবাসা
পাওনা দেনা সবি বাকি
লাভের ঘরে কেবল ফাঁকি
লোক দেখিয়ে সবার মাঝে মিথ্যা থালি হাসা
আজকে হ'তে দূর ক'রে দে চিরন্তনী আশা।"

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে

দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দানে বাংলা সাহিত্য তার আসন সুপ্রতিষ্ঠ করেছে, বাংলা সাহিত্যের খ্যাতির মূলেই ছিলেন এই দুজন, কথা উঠলেই এই দুজনকে লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। কিন্তু তাঁদের একজনও আজ নাই। অগনিত ভক্তের আশা অপূর্ণ রেখে অসময়ে তিনি চলে গেছেন। ভাবতে কষ্ট হয়, চক্ষু আর্দ্র হয়ে আসে। শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বাংলার সাহিত্যাকাশে আজ চন্দ্রদেব অস্তমিত। নক্ষত্র অনেক আছে। জ্বলছেও সকলে মিট মিট করে। কিন্তু তাদের ক্ষীণ আলোকে অন্ধকার দূর হয় না। লোকে চলার পথ খুঁজে পায়না। সাহিত্যের পথ নির্দ্দেশ এমন করে আর কেউ করে নি। তার অর্থ ও উদ্দেশ্য এমন করে আর কেউ বুঝায় নি। পঙ্গু, আড়ষ্ট সমাজের অসংখ্য গলদ চোখে আঙ্গুল দিয়ে এমন করে আর কেউ দেখায় নি। কোন রকমে টিকে থাকাটাই চরম সার্থকতা নয়, একথা এমন তীক্ষ্ণ, এমন তীব্র ভাবে আর কেউ কোন দিন বলেনি। "এমন অনেক জাতিই ত টিকে আছে। কুকিরা আছে, কোল ভিল সাওতালেরা আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক ছোট খাট দ্বীপের অনেক ছোট খাট জাতি মানুষ সৃষ্টির সুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায়ও আছে। তাদের এমন সব কড়া সামাজিক আইন কানুন আছে যে শুনলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র

বয়সের হিসাবে তারা ইউরোপের অনেক জাতির অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন। কিন্তু তাই বলিয়া যে এরা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ এমন সংশয় বোধ করি কারো মনে উঠে না।" সমাজের এই দুর্দ্দশায়, এই হৃদয়হীন ব্যবস্থায় তিনি যে বেদনা অনুভব করতেন তাথেকেই তাঁর ভাষা যেন অগ্নিময়ী জ্বালা উদ্গীরণ করতো। তাঁর "পথ নির্দ্দেশ"—"পল্লী সমাজ" তাঁর "শেষ প্রশ্ন" এই জ্বালাময় বেদনারই অভিব্যক্তি। দরদী কবি অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে বাংলার সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার ছবি নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করেছেন। যে অগণিত নরনারীর অন্তরে পুঞ্জিভূত বেদনা অহরহঃ গুমরে গুমরে উঠছে, নিষ্ঠুর অবজ্ঞার হাসি ছাড়া যারা সমাজের নিকট আর কিছুই পেলে না, শরৎচন্দ্র তাদেরই বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। তাদের দুঃখ বেদনাকে দিয়েছেন

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে

শ্রীমোহজিৎ মুখোপাধ্যায়

যে মায়াবিণীর সোণার কাটি ছোঁয়ালোকে এক জ্বলন্ত প্রতিভার স্মৃতি জগত হোতে বিলুপ্ত হোলো, তার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনবার সাধ্য মানব লোকের নেই। তাই যখনই এক একটি কথা হৃদয়ের মণিকোঠায় গিয়ে ধাক্কা লাগায় তখনই বেরিয়ে আসে আমাদের দুঃখ-রূপ অনুভূতির টুক্‌রো। এই যে মরণ—এরই চরণে নিবেদন কোরেছেন জগতের শ্রেষ্ঠ মনিষীরা তাঁদের ভাবের খেলা দিয়ে;—তাঁদের প্রতিটী তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হোয়েছে এক একটা বিভিন্ন সুর,—Keats গেয়েছেন, মরণ আঁচল বিছুলে তাঁর অনুভূতি শ্রেষ্ঠ ছন্দে প্রকাশিত হোতে পারবে না। Shakespeare বোলেছেন 'Come away, Come away death,' রবীন্দ্রনাথ সুর তুলেছেন 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান;—' কিন্তু এই যে মৃত্যুর দর্শন (Deaths Philosophy) আমরা প্রতি জনের ভেতর দিয়ে পেলাম, তার মাঝেও স্বাতন্ত্র আছে শরৎচন্দ্রের উক্তিতে। শরৎচন্দ্র মরণকে দেখেছেন আরেক স্বপ্নে,—এর ভেতর আছে মাদকতা। আছে 'রূপহীন মরণ'কে 'অপরূপ সাজে' সজ্জিত কোরবার অপূর্ব্ব কৌশল। মরণ যেন তাঁর কাছে জীবনের একটা অবলম্বন;—একে যেন ছাড়তে পারেনা কেউ; তাই শরৎচন্দ্রের বইতে নেই বেশী কিছু মৃত্যুর ছাপ, আছে শুধু সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর নিষ্কাম সেবা। 'দেবদাস' মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য

হোয়েছিলো এবং তাই-ই সে জগত হোতে নিয়েছিলো চিরবিদায়: কিন্তু অন্যদিকে Thomas Hardy-র নায়িকার (A Pair of blue eyes) মৃত্যুর কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তবুও সে 'মরলো, কারণ Hardy ভালবাসেন Pessimism এর প্রশ্রয়।

" যাহোক, আজ এই দুঃখের দিনে যে গভীর সমবেদনার ভেতর দিয়ে আমরা অগ্রসর হোচ্ছি, তাতে কোরে মনে হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের জ্বলন্ত প্রদীপগুলির মধ্যে এক একটি নিঃশব্দে নির্ব্বাপিত হোয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে বিদায় নিয়েছেন জগদীশচন্দ্র আর এখন গেলেন শরচন্দ্র—এই দুই শোক এতদূর ওতপ্রোতভাবে জড়িত রইল যে তা' এ জীবনের স্মৃতির পট থেকে আর মুছে যাবেনা। জীবনের পাখী মানবহৃদয়ে বদ্ধ ছিলো এতদিন, কিন্তু মরণকে সাথী কোরে চল্‌লো সে অজানার সুরে, দূর হোতে দূরে—আর রেখে গেলো আমাদের জন্যে একফোঁটা অশ্রু, ছন্দে গাঁথা।

"So past the strong heroic soul away"

দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভাষা। "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম?" এরাই দিল তাঁর মুখ খুলে। এরাই পাঠালো তাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। এদের সহানুভূতিতেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহই তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

তাঁর অনাবিষ্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধি শক্তি নারীচিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করেছিলেন। তাদের আনন্দ বেদনা, সুখ দুঃখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে তিনি সাহিত্যে বাস্তবরূপে সভ্য করে তুলেছিলেন। তাদের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যগুলি যে ভাবে তিনি ফুটিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। বোধহয় এমনটি আর কখনও হবে না।

রসসৃষ্টির দোহাই দিয়ে রুগ্ন বিকৃত মনের পরিচয় তিনি দেন নি। তাঁর অন্নদা দিদি, বিরাজ বৌ, বিন্দু, নরেন, মহিম প্রভৃতির তুলনা নেই। আর ছোট ছোট চরিত্রগুলি তাঁর সমগ্র সাহিত্যের পাতায় পাতায় যেন মনিমুক্তার ন্যায় ছড়িয়ে আছে। পরেশ, রতন নাপিত, "পোড়া কাঠ" কাকে রেখে কার নাম করবো? চরিত্রাঙ্কনে এতখানি দক্ষতা বাংলা সাহিত্যে আর দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। বাঙ্গালীর চরিত্রাঙ্কনে অবাঙ্গালীর রং মিশিয়ে তিনি continental সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন নি। তাঁর মানস পুত্রকন্যাগণ বাংলা দেশের ধুলোয় কাদায় মানুষ, বাংলা দেশের জল হাওয়ায় পরিপুষ্ট, বাঙ্গালীর দোষগুণ স্বভাব সৌন্দর্য্য দিয়ে তৈরি।

প্রাচীনবঙ্গ কীর্ত্তিমণ্ডিত, শিক্ষা, শিল্প, ধর্ম্ম, সংস্কৃতির গৌরবে উজ্জ্বল। কিন্তু আজিকার এই বর্ত্তমান যখন অতীতের কোলে আশ্রয় নেবে, যখন এর ইতিহাস রচিত হবে তখন আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের কোন কীর্ত্তি ইতিহাস ঘোষণা করবে? তার ভাষা ও সাহিত্য। এযুগের বাঙ্গালী জাতি এই জিনিষটাই কেবল গড়ে তুলেছে। অতি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের অকিঞ্চিৎকর উপকরণ নিয়ে শরৎচন্দ্র যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন স্বকীয় মৌলি-কতার জোরে অনাগত কালের সেই ইতি-হাসের পাতায় তার প্রতিভার মহিমা গগনের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়ই চির সমুজ্জ্বল থাকবে।

চলার পথ

শ্রীভক্তি চট্টোপাধ্যায়

দু'টি চোখে ব্যক্ত করা অন্তরের সস্তর্পিত প্রেম
কামনার সুখ শান্তি উৎসাহের তীব্রময়ী জ্বালা
হতভাগ্য নিরাশার স্বকল্পিত ব্যর্থ উপদেশ—
সঙ্কোচ সন্দেহে ঘেরা বিস্মৃতির আশায় মলিন
আমার চলার পথ ঘিরে রবে বিরাট আঁধার
দীর্ঘদিন রজনীর উচ্ছ্বসিত মৌন হাহাকার।
অশান্ত চরণক্ষেপে উপেক্ষিয়া ক্ষুদ্র ধূলিকণা
মানুষের রক্তে রাঙা কণ্টকের তীক্ষ্ণ পরিহাস
নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া বালুভূমি তটে
মরিচীকা মায়া বুকে স্পর্শমণি খানি—
প্রলয় প্রভাতে জাগা রুদ্রাণী সম
অতীতের স্বপ্নে ক্ষীণ আলোর নিঃশ্বাস
দুই হাতে ছিন্ন করি উচ্ছৃঙ্খল হাজার বাঁধন
আমার চলার পথ পড়ে র'বে গর্ব্বে অনুক্ষণ।

শরৎ সাহিত্যে দরদ *

শ্রীঅনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গৃহ ও সমাজ জীবনে স্নেহ ও ভালবাসা স্বাভাবিক আধার হইতে বঞ্চিত অথবা বিক্ষিপ্ত বা সমাজের বিধি নিষেধের জন্য অবিন্যস্ত হইয়া অহরহঃ যে কত গভীর বেদনার, কত দুঃখ গ্লানির সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে শরৎচন্দ্র সেই ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও ব্যর্থপ্রেমের বেদনার পুরোহিত। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী লেখার ছত্রে ছত্রে এই গভীর বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। Pathos স্ফুরণে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

হেতু যত বড়ই হোক, মানুষকে তিনি কখন ঘৃণা করেন নাই। ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়, মাঝখানে তার যে বস্তু আসল, সেই মনটাকে তিনি দেখিয়াছেন তার সকল অভাব অপরাধের চেয়েও বড় করিয়া। মানুষের দৌর্ব্বল্যের প্রতি তাঁর দরদের সীমা নেই। অথচ অনেকে এইটাই তাঁর অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, এবং যে অপরাধে তাঁকে সবচেয়ে বেশী লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছে, সে তাঁর এই অপরাধ। পাপীর চিত্র তাঁর তুলিতে হইয়া উঠিয়াছে মনোহর, তাঁর বিরুদ্ধে এই তাঁদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

বাংলা সাহিত্যে মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখাইয়াছেন কাবুলীওয়ালা অর্থের জন্য মানুষ খুন করিয়া থাকিতে পারে তবুও তার অন্তরে তার মেয়েটীর জন্য যে স্নেহ লুক্কিত ছিল তাহা জগতের কোনও স্নেহশীল পিতার অপেক্ষা কম নহে। শরৎ বাবুও দেখাইয়াছেন, দুর্দান্ত ছেলের চরিত্রেও একটী রমণীয় দিক আছে, উচ্ছৃঙ্খল মাতালের হৃদয়ের কোণেও হয়ত এমন ভালবাসা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে যাহাকে তুচ্ছ করা যায় না, যাহা তপোবনের হোমানলের মতই পবিত্র। হেয় ও অজ্ঞাত জীবনেরও একটী উজ্জ্বল দিক্ আছে। মনুষ্য-জীবন কখনই অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ নহে। প্রত্যেক জীবনই ভাল ও মন্দের সমষ্টি। আমাদের ঘরের ছোট খাট তুচ্ছ বিষয়গুলিও তিনি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন। কিরণময়ীর গৃহত্যাগ, দেবদাসের নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক দৃষ্টিতে মোটেই সহানুভূতির উদ্রেক করে না। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন কি দারুণ তৃষ্ণায় হতভাগা হতভাগিনীরা নর্দ্দামার দুর্গন্ধ জল অঞ্জলি পুরিয়া পান করে।

মানুষের ভ্রান্তি দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহার অপূর্ব্ব মমতা, অফুরন্ত দরদ। তাই দেবদাসের মৃত্যুর পর তিনি পাঠককে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন—"তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত, এমন হতভাগ্য অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও আর যাহাই হউক, যেন তাহার মত এমন করিয়া মৃত্যু কাহারও না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটী স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে, যেন একটীও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময়ে যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।"

তিনি দেখাইয়াছেন, যখন মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রা উদ্দামভাবে বিভিন্ন দিকে ছুটিয়া সমাজ-বিদ্রোহ, এমন কি হয়ত আত্মবিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তাহাদের মূলে থাকে প্রেমের বা স্নেহের সরল ও স্বাধীন প্রকাশে বাধা। এইজন্য শ্রীকান্ত ভবঘুরে, দেবদাস উচ্ছৃঙ্খল। এই জন্যই পিয়ারী চরিত্রে নারীত্ব ও মাতৃত্বের সংঘর্ষ। এই জন্যই অভয়া বঙ্গনারীর স্বাভাবিক সহিষ্ণুতাকে ছাপাইয়া সুতীক্ষ্ণ ও সত্যদৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইয়া চলিয়াছে। এইজন্য সতীলক্ষ্মী অন্নদাদিদি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাপুড়িয়ার গৌরব হীন জীবন যাপন করিয়া কলঙ্কিনী নাম কিনিয়াছেন। এই জন্যই কিরণময়ী মানুষের সহজ ভালবাসাকে এত করিয়া তুলিয়াছে।

ভালবাসা অপরাধ নয়। সে সমস্ত অন্তর-নিংড়ান অভিমান, বেদনা ও মাধুর্য্যের সমন্বয়। মানুষের অন্তরতম অন্তস্থলে যে আকাঙ্ক্ষা নীড় বাঁধিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা মূঢ়তা। মানুষের মন "এজিকের" নীতিতে বাঁধা নয়—তার মধ্যে সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের প্রভাবই বেশী। "Love is an anarchic force which will not remain within any bounds set by law or custom," যাহা মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি, তাহার আবৃত্তিতে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। ইহা পার্থিব জিনিষ। ইহাতে স্বর্গের সুষমা নাই, নরকের পূতিগন্ধও নাই। প্রেম

* "কোন্নগর পাঠচক্রে" ৫৭তম অধিবেশনে

প্রেমই। তাহাকে ঘৃণিত, অবৈধ ও কুৎসিৎ বলিলেও তাহার দাবী অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মন্ত্র পড়িলেই যে ইহা পবিত্র হইবে তাহা নয়। আবার মন্ত্র না পড়িলেও ইহা গর্হিত না হইতেও পারে। "পৃথিবীতে অনেক বর বধূ অনেক মালা বদল করেছে তাদের প্রেমে জগত পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের কিশোর বরটিকে বঁইচির মালা দিয়ে একমনে যত ভাল বেসেছে, এ সংসারে তত ভাল কেউ কোনদিন কাউকে বাসে নি।"

সমাজ যাহাদের পতিতা বলিয়া গালি দিয়াছে, চরিত্রহীন বলিয়া দূরে ঠেলিয়াছে, তাহাদের হৃদয় এমন মধুর, যে সমাজের তথাকথিত নেতারা তাহাদের কাছে নতশির হইতে পারেন। বেণী ঘোষাল রমাকে কলঙ্কিনী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল; কিন্তু কাহার চরিত্র মহত্তর—বেণীর না রমার?

শরৎচন্দ্র বুদ্ধি দিয়া কাহাকেও বিচার না করিয়া, সহানুভূতি দিয়া সবাইকে বিচার করিবার চেষ্টা করেন। মানব-জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, আঘাত-সংঘাতের বেদনাকে তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুরেশ ও কিরণময়ীর জীবনে সত্যিকার মাধুর্য্য খুব কম। কিন্তু তাহাদের জীবনও তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সহজ সমবেদনা দিয়া। তিনি দেখাইয়াছেন তাহাদের অপরাধ শুধু বুঝিবার ভুল—পাপ নহে। তিনি তাহাদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করেন নাই—ভ্রান্ত বলিয়া করুণা করিয়াছেন।

কিরণময়ী ধর্ম্ম মানে না, শাস্ত্র মানেনা, ভগবান পর্য্যন্ত মানে না। আচার বা সংস্কারে তাহার আস্থা নাই। পরকালের মূল্য তাহার কাছে কিছু নয়। তাই সে বুঝিত কেবল ইহকালের সুখ। উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল হীন প্রতিহিংসাবৃত্তি। আর যে উপায়ে সে প্রতিহিংসা লইল, তাহা যেমন নীচ, তেমনি বিভৎস। পুত্র-স্থানীয় বালকের হৃদয়ে বিরংসাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া সে লইল প্রতিহিংসা। দিবাকর কিরণময়ীর চুম্বনে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। অচলারও ঠোঁট দুটী বিদ্যুৎ ন্যায় জ্বলিয়া উঠিত। সে নিজের দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অদৃষ্টের পরিহাসে সামাজিক শিষ্টাচার রক্ষা করিতে গিয়াই সে কলঙ্কের কূপে অবগাহন করিয়াছিল। কিন্তু সেই যে একটা কুৎসিৎ ঘটনা, তাহাই কি শুধু সত্য? আর সে নিষ্ঠার সহিত এতকাল যে তাহার রুগ্ন স্বামীর ধ্যান করিয়া আসিয়াছে, তাহার ভালবাসাকেই সর্ব্বজয়ী করিতে সমস্ত বিরোধ, সমস্ত প্রলোভন পায়ে দলিয়া একদিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা কি সত্য? ভুল বেশী করিয়াছিল কে, সুরেশ না মহিম? কিসে বেশী গোল বাধাইয়াছে? সুরেশের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি না মহিমের নিশ্চল নীরবতা? তা'ছাড়া তিনি আরও দেখিয়াছেন—বাহিরে যা ঘটে, তা সব নয়। একদিন দারুণ অভিমানে, সাময়িক উত্তেজনায় হিতাহিত—জ্ঞান—বিবর্জ্জিত হইয়া বিরাজ-বৌ রজনীর অন্ধকারে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গোঁড়া সমাজপতিরা এই কাজটুকু দেখিয়াই তাহার দণ্ডাদেশ করিবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন যে, এইযে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এইটুকু কি সমগ্র সত্য? ঘরের বাহিরে দাঁড়াইলেই কি দেহের ও অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট হয়? বিরাজ-বৌ-এর অন্তরেত মুহূর্ত্তের জন্য স্বামী প্রেম ম্লান হয় নাই—তবে কেন তাহার প্রতি এই শাস্তি? বিধবা সাবিত্রী ঘটনাবশে পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সমাজের বিচারে তাহার কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও এইযে অসহায়া নারী এমন করিয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গীন পবিত্রতা রক্ষা করিল, ইহার কি কোনই পুরস্কার নাই?

কেবল অভয়াতে হিন্দুনারীর সতী-ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ বিদ্রোহের বাণী মূর্ত্তিমতী হইয়াছে। শ্রীকান্তকে অভয়া বলিয়াছিল, "আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এলেও উপায় ছিল না, আর এলেও উপায় হোল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আর আমার নিজের নয়। তবু তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফলেফুলে ফুঠে উঠে সার্থক হত, শ্রীকান্ত বাবু? আর সেই নিস্ফলতার দুঃখটাই সারাজীবন বয়ে বেড়ানই কি আমার নারী জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিনী বাবুকেও আপনি দেখে গেছেন, তাঁর ভালবাসাও আপনার অগোচর নেই। এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী-নাম কিনতে চাইনে, শ্রীকান্তবাবু!"

কিন্তু অভয়ার চরিত্রেও সুদীর্ঘ দিনের সংস্কার সঞ্জাত সঙ্কোচ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অভয়া সর্ব্বান্তঃকরণে রোহিণীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল স্বামীর সংসার করিবার জন্য এবং যদি সেই স্বামী তাহাকে অনুমাত্র দয়া বা প্রীতি দেখাইত, তাহা হইলে রোহিণী বাবুর প্রেমের মর্য্যাদা থাকিত কোথায়? কাজেই রোহিনী বাবুর সঙ্গে তাহার যে মিলন—ইহার মূলে রহিয়াছে 'ব্যর্থতা'।

পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিনীকে বেশ দু'কথা শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া, শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা দেখিয়া তিনি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন 'সমস্ত সমাজ,' সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম, সমস্ত পাপপুণ্যের অতীত একটা

উৎকট 'বেদনাবদ্ধ রোদন।' সব ক্রোধ তাঁহার ভাসিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, "এতবড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতিশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশী পড়ি নাই।"

বাস্তবিক, পুথির লেখার উপরেই তিনি কাহাকেও বিচার করেন নাই। তাই সমাজ-দ্রোহী অভয়াকেও বিচার করিবার সময়ে তিনি বলিয়াছেন—"কি ভাল, কি মন্দ, এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া, তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব। না পারিত, শুধু পুথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই; তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই।"

অভয়ার কাছে কিছুই কঠিন নয়, মৃত্যু—সেও তার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা, এই সব প্রাচীন মামুলী বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবল মাত্র বাহিরের ঘটনা পাশা-পাশি সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।

অথচ অন্নদা দিদি, যাহার সম্বন্ধে শ্রীকান্ত সবচেয়ে শ্রদ্ধা দিয়া লিখিয়াছেন, তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ত করেন নাই; বরং সমাজ তাঁহাকে যে স্বামী দিয়াছিল, সেই বর্ব্বর পশুকে অম্লান বদনে গ্রহণ করিয়া আজন্ম সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন সমাজের আদর্শকে অটুট রাখিবার জন্য-তাঁহার নামটাই ছিল শুধু কলঙ্কিনী—প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন হিন্দু রমনীর শিরোমণি। এক্ষেত্রে তিনি প্রশ্ন তুলেন নাই—শাহজীর মত বর্ব্বরকে বরণ করায় সত্যিকার কি মহত্ব আছে! তিনি দেখিয়াছেন অন্নদা দিদির সেবার মহত্ব, ত্যাগের গৌরব। তাই তিনি বলেন, "সমস্ত বিধি নিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধিতে পারে না। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে' দেয়, সেই অপরাধই হয়ত আর একজন স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ৩০ বছরের লোককে মারতে না পারে ত দোষ দেব কাকে? যাদের ভেতর আগুণ জ্বলেছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে,—তাদের কর্ম্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।"

মৃণালের সতী-ধর্ম্মের চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছেন। ব্রাহ্ম কেদার বাবুও মুগ্ধ হইয়াছেন, পরস্ত্রীলুব্ধ সুরেশ পর্য্যন্ত তাহার কাছে নতশির হইয়াছে। কিন্তু এই সতী-ধর্ম্ম ইহা কি শুধু দেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে নাই? অচলাকে সতীন বলিয়া সে যে লঘু পরিহাস করিয়াছে, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে একটা গভীর ব্যথার করুণ সুর। সামান্য সামাজিক কারণে তাহার প্রেমাস্পদ মহিম তাহাকে বিবাহ করে নাই এবং বৃদ্ধ স্বামীও ততোধিক বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করিয়াই তাহার জীবন কাটাইতে হইয়াছে—এই সেবার মধ্যে রহিয়াছে চরম ব্যর্থতা এবং তাহার সমস্ত আচরণ ও কথার মধ্যে এই ব্যর্থতার বেদনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পার্ব্বতী বড় বাড়ীর গিন্নী হইয়া সবারই মন পাইয়াছিল, কিন্তু তাহার নিজের মন বাঁধা রহিল দেবদাসের কাছে। সে ধর্ম্ম করিত, সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিত, অন্ধ খঞ্জের পরিচর্য্যা করিয়া তাহার দিন কাটিত—কিন্তু ইহার মধ্যে ছিল একটা চরম ফাঁকি। তাহাকে অসতী বলা যায় না। কিন্তু তাহার সতীত্বের বা মূল্য কতটুকু? যে ভালবাসার উৎস দেবদাসকে প্লাবিত করিয়া দিতে পারিত, ভুবন চৌধুরী মহাশয় তাহার কতটুকু পাইয়াছিলেন? কমল একজায়গায় বলিয়াছে,—"অসংযমে সত্য নেই বলে অতি সংযমকেও সত্য বলে ভুল করবেন না। সেও এত বড়ই মিথ্যে।"

মানব-জীবনে প্রেমের স্থান সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Bertrand Russell ও তাঁর "Marriage & Morals" পুস্তকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"It would be foolish, though in some cases it might be tragically heroic, to sacrifice career completely for love but it is equally foolish and in no degree heroic to sacrifice love completely for career. Nevertheless this happens, and happens inevitably, in society organized on the basis of a universal scramble for money" বাস্তবিক আমাদের জীবন-যাত্রার পথে দুইয়েরই সামঞ্জস্য দরকার।

পাপ চিরকাল সমাজে আছে এবং থাকিবেও। ইহাকে দূর করা যদি সমাজের অসাধ্য হয় ত পাপকে সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার। যদি অন্যায়, ভুল, ভ্রান্তি আসে, তাকে ক্ষমা করিতে হইবে। নতুবা সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় নিরপরাধ ব্যক্তিকে—তাহা আরও দুঃখকর। কমলিলতার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিল যতীন আত্মহত্যা করিয়া।

নর ও নারী যদি আপনাদের জীবনের ত্যাগ ও দুঃখের ভিতর দিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সার্থক করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে কোন বিধি-নিষেধের দাবী খাটে না। অবশ্য এরূপ ত্যাগ ও দুঃখ বরণ যে সকলে করিতে পারে তাহা নহে,—ইহা অসাধারণ। কিন্তু যে স্থানে ইহার প্রভাব দেখা যায়, সেইখানে সমাজের বিধিকে তাহার নিকট হার মানিতে হইবে। গৃহধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, ও ন্যায়ধর্ম্ম—এই ত্যাগের কাছে নিতান্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। যাহার ভিতর সত্যই ত্যাগের শিখা জ্বলিয়াছে, তাহাকে সাধারণ বিধি নিষেধের মাপ কাঠিতে বিচার করা উচিত নয়।

শ্রীদুর্ব্বাসা
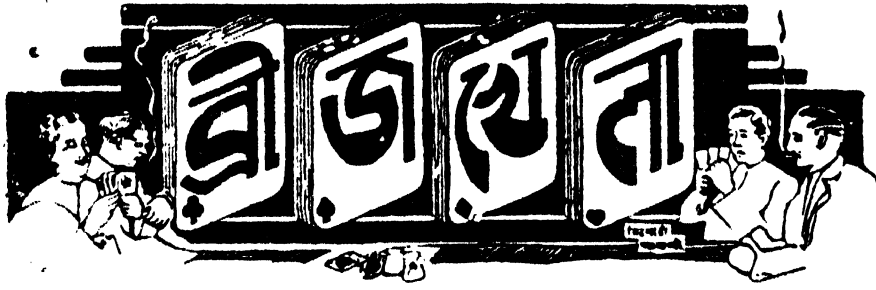
খেলায় নানাবিধ সমস্যা:—ব্রীজ খেলায় ডাক দিতে হলে যেমন সমস্যার উদ্ভব হয় খেলার সময়ও তদ্রূপ নানাবিধ সমস্যার আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে যদি কোন সময় ভাবতে হয় যে; এ ক্ষেত্রে 'ফিনাস' নেওয়া বিধেয় কি না, বেশীর ভাগ ক্রীড়কই তখনকার একটা ধারণা নিয়ে যা হয় করে বসেন। অনেক সময় দেখা যায় বেশ স্পষ্ট ক্ষেত্রেও 'ফিনাস' নিয়ে ক্রীড়কেরা খুব মুস্কিলে পড়েন। বিশেষতঃ একজন ক্রীড়কের চালবদ্ধ করতে হলে, নিম্নলিখিতরূপ বিবেচনার পর 'ফিনাস' নেওয়া আবশ্যক।

ইস্কাবন—আটা, ছক্কা, তিরি।
হরতন—সাত্তা, পঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ
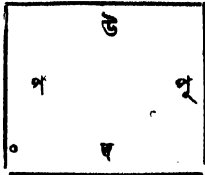
ইস্কাবন—সাহেব, পঞ্জা।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, চৌকা, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, নয়, আটা, চৌকা।
চিড়িতন—সাহেব, সাত্তা, তিরি।

ডাক হয়েছিল,

'দ'	'প'
একটি হরতন।	পাশ।
দুইটি কেরাই।	পাশ।
তিনটি কেরাই।	পাশ।

'উ'	'পূ'
দুইটি রুহিতন।	পাশ।
তিনটি চিড়িতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

রঙকর্ত্তা হরতনে ডাক দেওয়া সত্বেও 'প' হরতনের বিবি খেলে প্রাথমিক চাল দিলেন। 'দ' সাহেব দিয়ে পিটখানি ধরে বড় পিটগুলি গুণে দেখলেন, হরতনে, দুইখানি, রুহিতনে দুইখানি ও চিড়িতনে চারখানি,—মোট সাতখানি পিট পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাঁর নবম পিটখানি নির্ভর করছে রুহিতনে 'ফিনাস' নেওয়ার সাফল্যের উপর। এমন কি দশম পিট-খানিও নির্ভর করছে তার উপর। অনেকে ভাবতে পারেন বটে যে এই সমাধান সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখন রঙকর্ত্তার প্রথম চাল হবে নিজের হাত থেকে টেক্কার দিকে এক তাস ছোট রুহিতন খেলা এবং তৎপরে গোলাম খেলা। কেননা 'ফিনাস' যদি সফল নাও হয় তখন ৯ খানি পিট পাওয়া যাবে। কিন্তু 'ফিনাস' যদি অন্যদিক হ'তে নেওয়া হত, 'পূ' নিশ্চয়ই ইস্কাবনে চাল দিতেন আর সুবিধাজনক অবস্থায় টেক্কাটি না থাকলে সেই রঙে চারখানি পিট বিপক্ষ দলকে দিয়ে যেতে হত। ফলে অনায়াস-সাধ্য খেলাটিতে এক পিটের খেসারৎ দিতে হত। সম্পূর্ণ হাতখানি—[নিয়ে দেখুন]

প্রকৃত খেলায় ডাকদার উল্লিখিতরূপ খেলেছিলেন। দশম পিটখানি নেবার পর 'দ' হরতনের গোলামে 'প'কে পিট ধরালেন। তাতে তাঁর দিকে ইস্কাবনে চাল পাওয়ায় সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে পাঁচখানি কেরাই-এর খেলা করলেন। টেক্কায় দ হরতনের গোলামখানি পাশ দিয়ে যেতেন তাহলে অবশ্য 'প' ইস্কাবন পেড়ে খেলার হাত থেকে রক্ষা পেতেন।

'ডামির' হাত তৈয়ারী করা নিয়েও বহু ক্রীড়কের ধারণা প্রমাদ সঙ্কুল। সাধারণ খেলোয়াড়ের মনে ইহা বদ্ধমূল যে, তার নিজের হাত সব সময়ে আসল এবং "ডামির" হাত মাত্র সাহায্যকারী। কিন্তু

ইস্কাবন—আটা, ছক্কা, তিরি।
হরতন—সাত্তা, পঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দশ, চৌকা।
হরতন—বিবি, গোলাম, তিরি।
রুহিতন—সাত্তা, তিরি, দুরি।
চিড়িতন—আটা, ছক্কা, পঞ্জা।

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, সাত্তা, দুরি।
হরতন—দশ, নয়, আটা, ছক্কা।
রুহিতন—বিবি, পঞ্জা।
চিড়িতন—নয়, চৌকা, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, পঞ্জা।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, চৌকা, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, নয়, আটা চৌকা।
চিড়িতন—সাহেব, সাত্তা, তিরি।

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য

—প্রথম পরিচ্ছেদ—

ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিয়া, ললিতা ফাল্গুণ মাসের স্নিগ্ধ হাওয়াটুকু মাথায় লইতে-ছিল। এমন সময়ে নীরদরঞ্জন ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ কেমন আছ ?

—ভাল আছি।

—ভাল আছি মানে ? আজ আর জ্বর হয়নি ?

—না।

থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখেচো ?

—থার্ম্মোমিটার দিয়ে দেখতে হবে না। আমি নিজে বুঝচি, জ্বর হয়নি।

—নিজেই বুঝেছ ?

ললিতা একথার কোনও উত্তর করিল না। সে খাট হইতে উঠিল : উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নীরদ ভারিক্কে সুরে জিজ্ঞাসা করিল : "তুমি যে বড় বিছানা থেকে উঠলে ?"

ললিতা এ কথারও কোন উত্তর করিল না ; দ্বারের কাছে আসিয়া অপেক্ষাকৃত উঁচু গলায় ঝিকে ডাকিল।

—আচ্ছা, ডাক্তার তোমায় বারণ করে গেছে, বিছানা ছাড়তে। তুমি যে দিব্যি বিছানা থেকে উঠে দরজা পর্য্যন্ত গেলে ?

কাজটা যে বিশেষ অন্যায় হইয়াছে, ললিতার ভাবভঙ্গিতে তেমন কোনও স্বীকার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। সে স্বামীর মৃদু তিরস্কারটুকু গায়ে না মাখিয়াই—ঝি আসিলে বলিল : 'বাবুর জল খাবারের যায়গা ঠিক করে দে।'

—'আচ্ছা, সেজন্যে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি নিজের পরিচর্য্যাটা নিজে নিজে করো দেখি।'

ললিতা দরজা হইতে টলিতে টলিতে আসিয়া আবার খাটে বসিল। নীরদ তাঁহাকে ধরিয়া বলিল বিছানায় শুয়ে পড় দেখি।

—আর সমুস্তদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে পারিনে। বিছানায় শুয়ে থাকাটাই, এখন আমার সকলের চেয়ে বড় রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

—তা হোক্ রোগ ! তুমি শুয়ে পড়ো। ডাক্তারের কথাগুলো একটু শুনে দেখো। সে তোমার ভালো'র জন্যেই বলেছে, মন্দের জন্য বলেনি। শুয়ে থাকলে, ঘুষঘুষে জ্বরটা চলে যেতে পারে ! এটা বুঝতে পারো না ?

—আমার জ্বর ছেড়ে গেছে, আজ আর হয়নি।

—থার্ম্মোমিটারটা দেখি।

—কি অনবরত থার্ম্মোমিটার লাগানো, ভাল লাগেনা। আমার নিজের অনুভবের চেয়ে থার্ম্মোমিটার ? বিলেতে শীতপ্রধান দেশে থার্ম্মোমিটার তৈরি হয়,—আমাদের গরম দেশে, বগলে দিলেই জ্বর ওঠে। আমাদের দেশে ও যন্ত্রে ঠিক জ্বর ওঠে না। ওসব দরকার নেই,—আমার আজ জ্বর হয়নি।

নীরদ দার্শনিকের মত বেশ গম্ভীর বলিল : দেখো ললিতা ! মানুষের রোগ জিনিষটা যদি অতো তাচ্ছীল্যের ওপর সেরে যেতো,—তাহ'লে আজ ডাক্তার কবিরাজ দেশে ছেয়ে যেতো না, মানুষও রোজ রোজ এতো পট্ পট্ ক'রে মারা পড়তো না !

—'না ! মানুষ তা'হলে আজ অমর হয়ে থাকতো ! ডাক্তারখানার ঐ তেতো ওষুধ রীতিমত খেলে, আর সমস্তদিনে চুষণ্টা অন্তর থার্ম্মোমিটার লাগালে; মানুষ এতদিন মার্কণ্ডেয়র আয়ু পেয়ে যেতো !··· নাও ! তুমি ওঠো দেখি ! ইজেরটা ছাড়ো দেখি ! ঐ কোঁচান কাপড় রয়েছে, পরো !······ ও রামদীন ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস্ ? বাবুর আদালতের পোষাকগুলো ছাড়িয়ে নে না ! ঐ কালাপেড়ে কাপড়খানা কাছে এনে দে !'

ঝি আসিয়া ললিতার দিকে চাহিয়া বলিল : "মা ! বাবুর খাবার যায়গা হয়েছে !"

ললিতা বলিল: 'আচ্ছা চল্ ; আমি যাচ্চি ! বলিয়াই ললিতা খাট হইতে নামিয়া গেল।

নীরদ শেষে হাল ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল : "আচ্ছা, "শোনো শোনো ! একবার এদিকে আমার কাছে এসো ! তোমায় একটা কথা বলি, তারপর যেয়ো !"

ললিতা মুখ ফিরাইয়া বলিল : জলখাবারটা আগে ঠিক ক'রে সাজিয়ে আসি, তারপর শুনচি !"

"না, না, তার আগেই শুনে যাও ! বিশেষ জরুরি কথা !"

"জরুরি কথা তোমার সবই ! কেবল ডাক্তার আর রোগের কথা !"

বলিতে বলিতে ললিতা ঘরের বাহির হইয়া গেল। নীরদ নিরাশার একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সংসারের ভবিষ্যত

প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় "ডাক্তার" হাতই হয় আসল, তখন সে ক্ষেত্রে রঙকর্ত্তার উচিত নিজের হাতের তেরোখানি তাদের সাহায্যকারী হিসাবে পরিগণিত করা। আগামীবারে এ বিষয়ে বলবার ইচ্ছা রহিল।

অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ললিতা যে ইচ্ছা করিয়া এইরূপে তাহার নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিয়া নীরদ মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

বৈকালিক খাইয়া আসিয়া নীরদ পুনরায় ললিতার কাছে বসিল। ললিতার বাম হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল: 'আচ্ছা ললিতা! তুমি আমাকে এঘরে জলখাবার খেতে দাওনা কেন?'

ললিতা বলিল: সে তুমি বুঝবে না! ডাক্তার বাবু এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো! আমার বিশ্বাস তিনি এটা অনুমোদন কর্বেন!'

'বুঝেছি! কিন্তু তোমার এত সাবধানতা যত কি পরের ওপর চালাতে হয়! নিজের ওপর কি তার ছিটে ফোঁটাও চলে না! নিজে একটু সাবধান হ'লে যে অতি অল্পে সেরে যাও! দিন কতক,—দিন পনেরো,—পূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে দেখো দেখি!'

'পূর্ণ বিশ্রাম!' বলিয়াই—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ললিতা ত্যাগ করিল।

—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—

সেদিন রবিবার। আদালত বন্ধ। নীরদবাবু ঘরে বসিয়াই মামলার রায় লিখিতেছিল, তিনি স্থানীয় আদালতের মুন্সেফ্।

ললিতার শুইবার ঘরখানি বেশ প্রশস্ত। তাহারই একধারে একখানি চেয়ার ও একখানি টেবিল দখল করিয়া নীরদ।

চৈত্রমাসের দুপুর বেলা। গরম যে পড়ে নাই, এমন কথা বলা যায় না। তবে বাড়াবাড়ি কিছুই নাই। মাঝে মাঝে একটা আগুনের ঝলকা খোলা জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া ললিতার কুন্তল জাল গুলিকে নাড়া দিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেজন্য ললিতা জানালা বন্ধ করে নাই। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে, সমস্ত দিনরাত জানালা খুলিয়া রাখিতে। হাওয়া ও রৌদ্র নাকি তাহার রোগের একমাত্র ঔষধ।

ললিতা কাল একখানি চিঠি পাইয়াছিল, তাহার মায়ের নিকট হইতে। তিনি লিখিয়াছেন, আজ তিনি আসিবেন। তিনি থাকেন কাশীতে। বিধবা মানুষ, সংসারের প্রায় সব বাঁধনগুলিই আলগা করিয়া দিয়াছেন। বড়ছেলে কাছে রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিল, পারে নাই। স্বামী বিয়োগের পর তিনি যেন কেমন একরকম হইয়া গিয়াছেন।

ললিতা অনেকদিন ধরে লিখিতেছে তাঁহাকে আসিবার জন্য। নীরদও ললিতার অসুখের খবর অনেকবার লিখিয়া পাঠাইয়াছে। কিন্তু তিনি কেবলই ওজর করেন সংসারের মায়ায় আর জড়াইবেন না বলিয়া! শেষে দুইমাসের পর তিনি লিখিয়াছেন রবিবারে আসিবেন ললিতাকে দেখিতে।

ললিতা বারবার খবর লইতেছে, বাহিরের দরজায় কোনও গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল কিনা। আজ সকাল হইতেই মনটা তাহার প্রফুল্ল। অনেক দিনের পর মা'কে দেখিবে, কাজেই আনন্দ সে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

নীরদ তাহার এই অসম্ভব চঞ্চলতা ও উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে একটু প্রতিবাদ করিয়াছিল, তারপর কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার নিজের মা কাছে থাকিতেন না, থাকিতেন তাঁদের জন্মভূমিতে,—সেই বর্দ্ধমানের কোন এক নিভৃত পল্লীগ্রামে। মা কাছে না থাকিলেও, মায়ের স্নেহ তাহার স্মৃতির পুঁজি পাটায় গজ গজ করিত। তাহারও একটু একটু লোভ ছিল এই দুষ্প্রাপ্য মিঠে জিনিষটার ওপর। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পড়িয়া সে সুখটুকু বড় উপভোগ করিতে পায় না। ললিতা আজ অনেক দিন পরে সেই লোভনীয় জিনিষটুকু অন্ততঃ দিনকতকের জন্যও পাইতে বসিয়াছে এই ভাবিয়া নীরদ সহানুভূতিতে চুপ করিয়া গেল!

ললিতা অনবরত ঘড়ির দিকে তাকাইতে লাগিল। ঘড়ি কিন্তু তাহার নিজের নিয়মেই চলিতে লাগিল; ললিতার আগ্রহের জন্য এতটুকুও বেশী তাড়াতাড়ি আগাইল না। কিছুক্ষণ পরে, উপরকার বেয়ারা হঠাৎ ঘরে আসিয়া বলিল: মা! দিদিমায়া এসেছেন!

ললিতা ছিল বিছানায় শুইয়া একেবারে উঠিয়া বসিল! বেয়ারাকে বলিল:

'দিদিমা'র বাক্স পেঁটরাগুলো ব'য়ে ওপরে নিয়ে আয়!' বেয়ারা চলিয়া গেল।

নীরদের চঞ্চল কলম হঠাৎ বন্ধ হইল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, ললিতার দিকে ফিরিয়া বলিল: বেশী নড়া-চড়া করো না ললিতা! মা এসেছেন ব'লে বেশী ওঠা-নামা করলে আজ তোমার জ্বরটা বোধহয় বেড়ে যাবে!'

ললিতা সে কথায় কাণ দিল না; দরজার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন তাহার মাতা, প্রৌঢ়বয়সের শুভ্রতা লইয়া! থান কাপড়ের অবগুণ্ঠন মাথার সীমন্ত আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষের স্নিগ্ধ চাঞ্চল্যহীন দৃষ্টি করুণা বিতরণ করিতেছে।

শুধু তিনি একা ন'ন; আর একজন রমণী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে ঢুকিল! সেটি অল্পবয়সী! পরিধানে একখানি লালপাড় শাড়ি! গায়ে অলঙ্কার আছে, তবে খুব সামান্য! সীমন্তে সিন্দুর জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। চক্ষু দুইটি চঞ্চল, কিন্তু তখন মাটির দিকে অবনত!

(ক্রমশঃ)

খেয়ালী চিত্রপট

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"-র একটি দৃশ্যে ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী ও উষা দেবী—ছবিখানা শীঘ্রই উত্তরায় মুক্তি পাবে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'শ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০শে মাঘ ১৩৪৪, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

বাঙ্গলার কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্র

গত সপ্তাহে বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে যে কয়টী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে. তন্মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেসে এবং কর্পোরেশনে কলহ ও দলাদলি দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে সর্ব্বময় ক্ষমতা প্রদান করিয়া যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা বাঙ্গলার আভ্যন্তরীন রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রাদেশিক কংগ্রেস ও কর্পোরেশন পরিচালনায় গত কয় বৎসর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বশালী নেতৃত্বের অভাবে কংগ্রেসী কর্ত্তমহলে যে শৈথিল্য দেখা গিয়াছিল তাহার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই বর্ত্তমানে বহু আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অপসারণ আশু প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অন্তরীণ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর উপরোক্ত দুই ক্ষেত্র হইতে আবর্জ্জনা অপসারণ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আংশিক সাফল্যও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল ধূর্ত্ত ও শঠ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের বিরোধিতায় তিনি পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্রের পক্ষে, পূর্ণ সাফল্যলাভ না করিবার কারণ তিনি দলাদলি মিটাইতে যাইয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সকল দলের মতামত লইয়া তিনি সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তব জগতে, বিশেষ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে সকল সময় সকলকে যে সন্তুষ্ট করিয়া চলা যায় না তাহা তিনি একটু বিলম্বে বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় কংগ্রেসে দলাদলি যে বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে তাহার যথোপযুক্ত প্রতীকার করিতে হইলে দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসের শাসন-রজ্জু ধরিবার একান্ত প্রয়োজন। যে সকল উৎকট গ্রন্থি কংগ্রেস শাসনযন্ত্রকে বিকল করিয়া রাখিয়াছে সে গুলিকে নির্ম্মম হস্তে বিদুরিত করা প্রয়োজন—এবং সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে সর্ব্বজনমান্য এবং সকল দলের ও সকল মতের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ব্যতীত বাঙ্গলায় এমন কেহ নাই যিনি সকলের আস্থা দাবী করিতে পারেন। তাঁহার আদর্শবাদ ও কর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহাকে বাঙ্গলার রাজনীতি অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনে যে সকল চতুর সুবিধাবাদী আত্মস্বার্থ সাধন করিতে কংগ্রেসের ভেক ধারণ করিয়া অহরহ ঘুরিয়া ফিরিতেছে সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদিগের আবরণ উন্মোচন করা প্রয়োজন। কর্পোরেশন প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কর্পোরেশনে কংগ্রেসী কাউন্সিলারদিগের আন্তরিকতা পরীক্ষা করিতে সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। পৌরসভা পরিচালনায় এই সকল সুবিধাবাদীর দল কংগ্রেসের নামে যে কালিমালেপন করিয়াছে তাহাতে সহরের করদাতাবৃন্দ বাঙ্গলার কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণের উপর যে কিছু পরিমাণে আস্থা হারাইয়াছেন তাহা সম্প্রতি কর্পোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ডের উপ-নির্ব্বাচনে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বাঙ্গলার কংগ্রেসকে তাহার পূর্ব্ব-গৌরবে ফিরাইয়া লইতে যে যথেষ্ট বেগ ও বাধা পাইতে হইবে তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। তিনি যে তাঁহার এই মহান ব্রতে সকল আদর্শবাদী কর্ম্মীর সাহায্য ও সম্মতি পাইবেন—ইহা বলা বাহুল্য।

বারেন্দ্র পাড়ায় যজ্ঞানুষ্ঠান

গত ১৩ই মাঘ রবিবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত সরসীমোহন রায় মহাশয়ের উদ্যোগে এক যজ্ঞানুষ্ঠান ও মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বৈদিক বিধানে বর্ত্তমান ধর্ম্ম-পরিস্থিতির সমাধান জন্য উপস্থিত অনেকেই বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক ডাঃ কালীদাস নাগ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী যজ্ঞীয় উদ্বোধন কার্য্য ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হরিৎকৃষ্ণ দেব স্বস্তিক্ মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কবিতীর্থে বাণী-বন্দনা

উক্ত সমিতির সভ্যগণ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বাগ্দেবীর অর্চ্চনা করিবেন। ঐদিন বেলা ৪ ঘটিকায় হেমচন্দ্র পাঠাগার ভবনে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত সজনী কান্ত দাস মহাশয়ের 'সভাপতিত্বে খিদিরপুরবাসী অমর কবিত্রয়—মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হইবে। বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক এই উৎসবে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক, শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়, বীরেন বল, কুমারী সুনীলা দাশগুপ্ত, যূথিকা দাশগুপ্তা, কুমারী শিউলী সরকার, কুমারী রেখা কুমার, প্রভৃতি কলাবিদ্গণ তাঁহাদের সঙ্গীতের দ্বারা অতিথিবৃন্দকে আপ্যায়িত করিবেন। শ্রীযুক্ত ননী দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অজিত চট্টোপাধ্যায় হাস্য কৌতুকের দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন।

টসের চা

ক্লান্তি দূর করিতে অল্প খরচে উপকারী একমাত্র টনিক চা কেই বলা চলে, কিন্তু চাটী হওয়া চাই স্বাদে বর্ণে ও গন্ধে বিশুদ্ধ। টসের চাতে এ সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে। সারাদিন খাটুনির পর এক পেয়ালা টসের চা নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

আগামী ২৯এ মাঘ, ১লা ও ২রা ফাল্গুন (১২ই, ১৩ই ১৪ই ফেব্রুয়ারী) শনিবার হইতে সোমবার দিবসত্রয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) হইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালার সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র। বঙ্গভাষা-ভাষী মাত্রেরই জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে মিলিত হইবার প্রধান সুযোগ সমুপস্থিত। এই সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত ইহাতে যোগদান করা সকলের উচিত।

লীলা মাধুরী সঙ্গীত

শ্রীশ্রীবিষ্ণু প্রিয়ার জন্ম উৎসব উপলক্ষে গত রবিবার ৩০শে জানুয়ারী মুক্তারাম বসু ষ্ট্রীটে এক বিরাট কীর্ত্তন আসর হয়। বিখ্যাত সুগায়ক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখার্জ্জির পরিচালনায় তাঁহার ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃক এই অনুষ্ঠানটী হইয়াছিল, শ্রীমতী অনিমা দাস গুপ্তা মূল গায়িকা ছিলেন। শ্রীমতী মনিভা গাঙ্গুলী, শ্রীমতী যূথিকা চট্টোপাধ্যায় (বেণু) শ্রীমতী লাবণ্য বিশ্বাস, শ্রীমতী উষা মুখার্জ্জি, শ্রীমতী গীতা চক্রবর্ত্তী সহ গায়িকা ছিলেন। আসরে বিরাট জনসমাগম হয়। শ্রীমতী অনিমার এবং শ্রীমতী যূথিকার সুরের তানের মাধুর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল—সঙ্গে খোলদ্বারা সঙ্গত করিয়াছিলেন, আমাদের শ্রীযুক্ত বিজয় সেন, তাঁহার হাতের সুমধুর বোলে গানগুলি যেন মূর্ত্ত হইয়াছিল।

* * *

জাষ্টিস্ বিজন কুমারের মুখোপাধ্যায়ের ছেলে অমিয়কুমারের পরিচালনায় সেন্টপলস্ কলেজের ছাত্রেরা রবিবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গিন কোরেছিলেন। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গানটি মন্দ হয়নি। বিজন দে'র রবীন্দ্র সঙ্গীত বেশ ভালো-ই; অমিয় মুখোপাধ্যায়ের গজলটি অতি উচ্চাঙ্গের হোয়েছিল—সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। দুর্গা দাসের হাস্যরস আর একেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রগীতি চলনসই। সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্যের "অভিসার" আবৃত্তি পুরস্কার প্রত্যাশী।

—
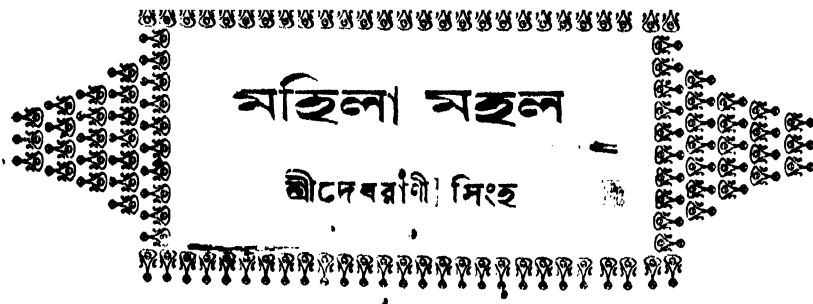
বাংলায় নারীর স্বাস্থ্য

গত সংখ্যায় আমরা আধুনিক নারীর স্বাস্থ্য-উপেক্ষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এবারের আলোচনায় আরও কয়েকটি কথা এ সম্বন্ধে উল্লেখ করছি। যাঁদের উপর জাতির ভাগ্য নির্ভর করে সেই আধুনিক মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ভাব দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়।

কলকাতার জনপথে ও জনতার ভীড়ে আধুনিক যে মেয়েদের রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে স্বাস্থ্যের দীপ্তি নেই, আছে শুধু শাড়ীর ঔজ্জ্বল্য, বেশ ভূষার চাকচিক্য! স্কুল কলেজের মেয়েদের দিকে তাকালে দেখা যায় কেবল অস্বাস্থ্যের শীর্ণ কঙ্কাল মূর্ত্তি, কষ্ট হয় ভাবতে যে এরাই হবে ভবিষ্যতে বাংলার মাতৃজাতি—এদেরই রুগ্ন সন্তানদের কণ্ঠে গীত হবে, 'ছত্রিশ কোটি' মোরা নহি কভু ক্ষীন—এরাই বলবে—'আমরা আনিব নব জগত!'

যুগ ধর্ম্মের প্রবাহকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, একথা স্বীকার করি। কিন্তু তা বলে শুধু আবিলতার মধ্যে পর্য্যবসিত হয়ে বাস করার অধিকারও আমাদের নেই। আজ আমাদের নারী-সমাজ বিলাসিতার স্রোতে অনুক্ষণ অবগাহন করার দরুণ স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় নেই। পুস্তকভারে অবনত বঙ্কিম দেহভার কষ্টে সৃষ্টে টেনে নিয়ে যখন আমাদের সম্মুখ দিয়ে আজকালকার মেয়েরা চলে যায়, তখন ভবিষ্যতের প্রগাঢ় অন্ধকারময় দিনগুলার নিদারুণ ছবি আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আজকের মেয়েরা মন দিয়েছে লেখা পড়ায়। মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্যে শারীরিক পরিশ্রমের অবকাশ কোথায়? যেটুকু সময় তাদের স্বাস্থ্য উন্নতিকল্পে দেওয়া দরকার সে সময়টুকু হয়ত তারা প্রসাধনে জর্জ্জরিত হয়ে কৃত্রিমতায় দেহ-স্বাস্থ্যকে পরিপূর্ণ করে ট্রামে, বাসে খানিকটা ভ্রমণ করে অথবা আলোবাতাসহীন বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকাকেই অধিক উপভোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। স্বাস্থ্য বিলাসিতায় সুরক্ষিত হয় না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবার অবকাশ তাদের থাকে না।

পূর্ব্বে বাংলা দেশের মেয়েরা—আমাদের দিদিমা, ঠাকুমার দল নিজেদের সাংসারিক কাজ নিজেরাই করতেন—গৃহকর্ম্মে তাঁদের কোন লজ্জা ছিল না। স্বহস্তের রন্ধন সন্তান-সন্ততি-নাতি-নাতনীদের না খাওয়ালে তাঁদের তৃপ্তি হোত না। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সংসারে, তাঁরা নিজেদের হাতে জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি শারীরিক শ্রমজনক কাজ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। তখনকার দিনে সুডোল কর্ম্মক্ষম দেহবল্লরী, উদ্ভাসিত প্রাণ খোলা হাসি-সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা প্রকৃতই জানিয়ে দিত তাঁরা স্বাস্থ্যবতী। আজ আমাদের অন্দর-মহলে উড়ে আর খোট্টা ঠাকুর চাকরের ভীড় সে স্থলে। লঙ্কা গোলা পাঁচনসিদ্ধে জীবনের প্রভাতেই আসছে অম্ল-অজীর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ।

আজ আমরা চাই চাকর, বেয়ারা, বয়! জলের কলসী থেকে জল গড়িয়ে নিতেও সাহায্য নিতে হয় চাকর-বেয়ারার। আজকের নারীর জীবনে শারীরিক পরিশ্রম মোটেই নেই। আজকের নারীর ধারণা intellectual geniusই হচ্ছে তাদের জীবনের প্রধান কাম্য। কিন্তু এ কথা জানা একান্ত দরকার যে intellectual faculty কখনই সম্ভব নয় যদি স্বাস্থ্য অটুট না থাকে। বংশানুক্রমে ভবিষ্যতে দেখা যাবে তাদের বুদ্ধিবেত্তা দিনে দিনে ধীরে ধীরে আসছে কমে।

পাহাড়ীদের কথা বলি—সেখানে আজও যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক এবং নাগরীক বিলাসিতা আসে নি। সারাদিন মেয়েরা অক্লান্ত পরিশ্রমে জীবন অতিবাহিত করে—রাত্রে শান্তি, সুখ-নিদ্রার কোলে গা এলিয়ে দেয়। তাই তাদের জীবনের যৌবন আমাদের সহরে মেয়েদের থেকে অধিক দিন স্থায়ী। নিটোল দেহ সত্যিই সুখের উপাদান যোগায়, আমাদের দেশে মেয়েরা চায়ের কাপে, পিয়ানোর টুলে, ড্রয়িং রুমের সোফায়, পড়ার টেবিলে সিনেমার বদ্ধঘরে সেই জায়গায় নিয়ে আসে অকাল-বার্দ্ধক্য। জীবন তাদের বেশীদিন আর চলে না। আমি অবশ্য এ দু'টি তুলনা করে বলছি না পাহাড়ী জীবনই আমাদের কাম্য।

আমাদের শিক্ষা চাই, কৃষ্টি চাই, সভ্যতা চাই, স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে কৃত্রিমতা, বিলাসপ্রাচুর্য্য এবং সর্ব্বোপরি অস্বাস্থ্য—আমাদের কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। পল্লীগ্রামে এখনও স্বাস্থ্যের দীপ্তি কিছু কিছু দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও আধুনিক নাগরীক নারীর জীবন

যাত্রার অস্বাস্থ্যের কলুষিত হাওয়া প্রবেশ লাভ করছে।

আধুনিক নারীর জীবন যাত্রায় মানসিক পরিশ্রমের প্রাচুর্য্যের অবকাশে স্বাস্থ্য কেমন ভাবে বজায় রাখতে হবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

Mr. Muller এর "My System for ladies" বইখানি পড়লে মেয়েরা স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবেন।

ব্যায়াম করলে আজকালকার মেয়েদের ধারণা তাদের শরীরের কমনীয়তা কমে যায়, তারা হয়ে পড়ে পুরুষ ভাবাপন্ন, এ ধারণা ভুল। মেয়েদের ব্যায়াম করতে বল্লই মানে মুগুর ভাজা বা ডাম্বেল করা নয় এটা বোঝা উচিত।

Free hand exercise করাই হচ্ছে মেয়েদের পক্ষে প্রশস্ত। skating করা (অল্প বয়সী মেয়েদের) এবং Muller এর "My System"-এ যে সমস্ত exercise এর কথা উল্লেখ করা আছে সেগুলো অনুধাবন করলে আজকাল মেয়েরা ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং শারীরিক পরিশ্রমহীনতা থেকে উদ্ধার পাবেন।

পাশ্চাত্যদেশের মেয়েরা বিলাসিতা যতই করুক না কেন দেহ গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে তাদের দৃষ্টি খুবই প্রবল।

পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে আমাদের দেশের মেয়েরা বিলাসিতা শিখে, কিন্তু তাঁদের কার্য্যক্ষমতা, তাদের সুস্বাস্থ্য—তাদের শক্তি—সেদিকে লক্ষ্য দিতে ভুলে যায়।

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

লাহোর, বোম্বাই, দিল্লী, করাচি এবং ভারতের অপরাপর বহু শহরে হিন্দি "বিদ্যাপতি" সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন কোরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলচে। ইংরাজী, হিন্দি, উর্দ্দু, গুজরাটি, মারাটি, ইত্যাদি প্রায় শতাধিক সাময়িক-পত্রে "বিদ্যাপতি"র বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হ'য়েচে। সংবাদপত্রের তরফ থেকে এরকম সার্ব্বজনীন অভিনন্দন লাভ খুব কম ছবির অদৃষ্টেই ঘটেচে। বাঙলার চিত্র প্রতিষ্ঠান-গুলিকে যাঁরা বিষদৃষ্টিতে দেখেন 'এমন সব সমালোচকও উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় নিউ-থিয়েটার্সের কৃতিত্ব স্বীকার কোরতে বাধ্য হোয়েছেন। কাব্য সম্পদে, সঙ্গীতের মাধুর্য্যে এবং টেকনিকের উৎকর্ষে ছবিখানি যে সত্যই উপাদেয় হোয়েচে—শত্রু-মিত্র নির্ব্বিশেষে সকলেই যে এই সহজ সত্যটুকু আজ খোলা মনে স্বীকার কোরতে হয়েছেন—এটা জেনে আমরা বিশেষ আনন্দবোধ করচি।

চিত্রায় "বিদ্যাপতি"র বাঙলা-সংস্করণ মুক্তি লাভের আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

ভাগ্য বিড়ম্বিতা, আশ্রয়হারা সন্ধ্যা—প্রকাশের জমশেদপুরের আবাস ছেড়ে পথের বার হোয়েছিল। সমাজে তা'র স্থান নেই, তাই সমাজের বিরুদ্ধে তা'র নালিশও নেই। কিন্তু সে অনির্দ্দেশ যাত্রা-পথে প্রমথ তার জীবনে কেন এসে অতর্কিতে জুড়ে বসলো? প্রমথকে সে প্রত্যাখ্যান করবার প্রাণপণ চেষ্টা কোরেছিল। কিন্তু অদৃষ্টের কাছে তাকে আবার পরাজয় স্বীকার কোরতে বাধ্য হোল।

এলো বেনারসে—প্রমথের প্রবাস-ভবনে। সবাই জানলে, সন্ধ্যা প্রমথের নব-বিবাহিতা পত্নী। কারণ অন্য কোন পরিচয়ে, একজন পরপুরুষের কাছে কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে বসবাস করার সম্ভাবনা ছিল না।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, সন্ধ্যার জীবনে আজ একী মর্ম্মান্তিক প্রহসনের অভিনয় সুরু হোল!

সম্প্রতি ১নং ষ্টুডিওতে, বেনারসের সেট, যে দৃশ্যগুলি তোলা হচ্ছে, তারমধ্যে উপরে বর্ণিত অংশটি প্রতিফলিত হবে।

২নং ষ্টুডিও

প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর নবতম চিত্রের সুটিং আরম্ভ করবেন আর কয়েকদিন পরেই। সেট্টার কাজ সব শেষ হয়ে গেছে। মহলা চলেছে পুরোদমে, বাংলার ছায়াচিত্রে এই একটি মাত্র ছবি যাতে নামছে শ্রীমতী যমুনা ও শ্রীমতী মেনকা। সুন্দরী যমুনা—তাঁর রহস্যময় চোখ দুটীর মধুর মায়া-দীপ্তিতে—দুটী রঞ্জিত ক্ষীণ ওষ্ঠে, কমনীয় চারু কণ্ঠে, সুঠাম দেহের দীপ্ত ভঙ্গীতে—অচঞ্চল রূপ গরিমায় যে মহলা দিচ্ছেন তাতে বাংলার চলচ্চিত্র রস পিপাসুরা হয়ত কালে একখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের

রস গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন, আর শ্রীমতী মেনকা যাঁর হাসি, যাঁর চোখের দৃষ্টি, যার অভিনয় সবায়ের মনোহরণ করেছে তিনি বলছেন: "আমি এই রকম একটা পার্ট বহুদিন হ'তেই খুঁজছিলাম।"

অতএব 'মায়া' ও 'মুক্তি'র পর দু অক্ষরের আর একটি নামের ছবি দেখবার আশায় পরিচালক প্রমথেশের পানে আমরা তাকিয়ে রইলাম।

* * *

জীবনে চলার পথে মানুষ চায় অর্থ— তাই অশোক আর তার বন্ধুরা চলল গ্রামের পথে দেশের মাটীর উৎকর্ষ সাধনে। তারা বুঝেছিল দেশের পয়সা "দেশের মাটী"র বুকেই রয়েছে লুকিয়ে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজে চাই অর্থ ও সহানুভূতি—অশোককে এ দু'টো জিনিষের জন্যই পড়তে হ'ল পিছিয়ে। কিন্তু ভাগাবানের বোঝা বয় ভগবানে—তাই সহানুভূতি ও অর্থ দুইই পেল যে নারীর কাছ থেকে। এই দৃশ্যটি শোনা যাচ্ছে সুকৌশলী পরিচালক নীতীন বসু খুব দক্ষতার সঙ্গে তুলেছেন এবং এই দৃশ্যে হিন্দিতে কমলেশ-কুমারী ও নেমো, বাঙলায় চন্দ্রা ও ইন্দু এবং উভয় সংস্করণে সাইগাল চমৎকার অভিনয় কোরেছেন।

কালী ফিল্মস্

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নতুন ধরণের 'কমেডি' সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"-র শুটি আর দু' এক দিনের মধ্যেই শেষ হবে। গেল হপ্তায় এই ছবির একটি মজার দৃশ্য তোলা হয়। এই দৃশ্যটিতে প্রাণধন ডাক্তারকে (জীবন গাঙ্গুলী) স্ত্রীলোকের রূপসজ্জায় দেখা যায়। ব্যাপারটি হ'চ্ছে এই—পুলিশের তাড়া খেয়ে প্রাণধন ও মথুর (ধীরাজ ভট্টাচার্য্য) গত্যন্তর না দেখে পাঁচিল টপকিয়ে একটি বাড়ীর ভেতর লাফিয়ে পড়ে; সেখানে দেখে দুইটি তরুণী বনলতা (বীণাপাণি) ও শেফালি (উষা দেবী) আর একটি ইঙ্গ-বেশধারী নব্য-যুবক—তাদের মধ্যে চলেছে প্রেম-যুদ্ধ। প্রাণধন এই দেখে খুব ঘাবড়ে গেল কিন্তু মথুর খানিকটা সাম্‌লে নিয়ে প্রাণধনকে ঠাণ্ডা কোরল এবং আড়ালে থেকে দু'জনে তাদের প্রেমাভিনয় দেখতে লাগল এবং অনেক কিছু তথ্য অবগত হ'ল। তারপর তারা চলে গেল। মথুর ও প্রাণধন দেখল তারা যেখানে এসে পড়েছে—এই বাড়ীটি কুমারী ডাক্তার বনলতা সেনের। তারা এইবার বাড়ী থেকে, মানে, মানে পালাবার চেষ্টা কোরল—কিন্তু রাস্তায় দেখল বামাপদ পুলিশের দলবল নিয়ে আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপার বেগতিক! মথুর ও প্রাণধন ভাবে এখন আত্মরক্ষার উপায় কী? এমন সময় একখানা গাড়ী এসে থাম্‌ল বনলতাকে রুগী দেখতে নিয়ে যাবার জন্যে। মথুরের মাথায় বুদ্ধি গজিয়ে উঠল। সে প্রাণধনকে বল্লে, "শীগ্‌গির তুমি বনলতা সাজ— ঐ আলমারিতে কাপড়, গহনা সব রয়েছে— দেরী কোর্‌লে একেবারে শ্রীঘরে বাস।" প্রাণধন কী আর করে—প্রাণের ভয়ে—অগত্যা কোট প্যান্টলুন ছেড়ে দিব্যি বনলতা সেজে গাড়ী কোরে রুগী দেখতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে রোগ যার হ'য়েছে সে তরুণী সুন্দরী। সে তার কাছে বুক খুলে দেয়—মন খুলে প্রাণের কথা কয়— দু'জনে দু'জনের পরশ পেয়ে যেন শিউরে শিউরে ওঠে! এমন সময় সেখানে পর্দ্দা সরিয়ে প্রবেশ কোরল আসল বনলতা। তারপর কী হ'ল তা' এ হপ্তায় তোলা হ'চ্ছে। আসছে হপ্তায় আপনারা জানতে পারবেন।

* * *

মিঃ বি, পি, মেহেরার তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহের অমর অবদান "চোখের বালি"-র 'বিনোদিনী'র ঘরের সমস্ত সেটের কাজ গেল হপ্তায় শেষ হয়ে গেছে। এই দৃশ্যে সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস বিভিন্ন চরিত্রে আশানুরূপ সুঅভিনয় কোরেছেন শোনা যাচ্ছে।

দৃশ্যের গঠন সৌন্দর্য্য ও শিল্প-কলায় রূপায়িত করবার জন্য কারুশিল্পী পরেশ বসু বিশেষ যত্ন নিয়ে কাজ কোরছেন। "চোখের বালি"র

প্রগতি-পঞ্চমী

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

অঞ্জলি ভরি' আনিয়াছে যা'রা মন্দির-দ্বারে কুসুম-রাশি
নাহি তাহাদের পূজা অধিকার, জানেন জননী সে ফুল বাসী!
সত্য-শিবের পূজারীর দল, একে একে সব মরিয়া ফতুর
সুযোগ বুঝিয়া আসর জমায় সেই অবসরে যত না চতুর।
গলিত শবের গন্ধে যেথায় প্রাণবায়ু ঘুরে যায়—
মায়ের বোধন হয় না সেখানে; প্রাণ সেথা খাবি খায়!

* * *

শুনি বস্তী-তীর্থে উৎসব আজি, সেই পথে দলে দলে
তৃষিত আত্মা চলিয়াছে কত, হেসে-খেলে কুতুহলে!
নারী ও সুরার পূজা-পার্ব্বনে, চেনা মুখগুলি দেখি
নরক যেথায় গুলজার সেথা সকল দেবতা মেকী!
দেবীরা আজিকে খুলিয়াছে বেনী; দলবল সাথে এলো কী সজনী
মোক্ষ লাভের আর কত বাকী—আমি শুধু দিন গণি!
অ-সুরের হাতে সুরের নাকাল, রাগিনীতে নাল ঝরে—
খোল-কর্ত্তালে ধরেছে গজল—বল দেখি কা'র বরে?

খাল বিল থেকে যত চুনো-পুটি জমা হয় হেতা রাতে
নিশা শেষে নারী—পাদুকা-প্রহারে বর দেয় হাতে হাতে!
ইহারা ভাষার জুয়াড়ী বন্ধু! লেখনী-যুদ্ধে সব্যসাচী
এদের আসরে নাই স্থান যা'র—অতি নীচ তা'রা মূর্খ পাজী!
রিয়ালিজিমের এই ত' উৎস, এই ত' জীবের গতি
এইখান হ'তে সুরু হয় নাকী ভাষার অগ্রগতি!
প্রগতিবাদীর নৃত্য-বাসরে, বীণা নয়—ভায়োলীন্
মৌন রহেনা যৌন-বেদনা—ছড়ায় সে প্রতিদিন!
নটীর-পূজায় তাই রিণি-ঝিণি, বোতলে গেলাসে তাল
মহা-সঙ্গীত রচনার লাগি, স্রষ্টারা বেসামাল্!

* * *

প্রগতি-পঞ্জী দিয়াছে বিধান, গাহ বস্তীর গান—
মিছে দেবী পূজা, মিছে আয়োজন, কেন শুধু হয়রান্!

* * *

বিদায় নিয়াছে সাধকের দল—আসিয়াছে নাকী নূতন দিবা
তাই আজ শুনি দেবীর বোধনে—মহা উল্লাসে ডাকিছে শিবা!

মত একটি কাহিনী যাতে রূপ, রস, গন্ধে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে তার জন্য পরিচালক সতু সেন, শব্দযন্ত্রী মধু শীল ও আলোক-চিত্রী ননী সান্যাল ও অন্যান্য কর্ম্মিবৃন্দ চেষ্টার কসুর কোরছেন না। আমাদের মনে হয়, এই সর্ব্বজনপ্রিয় কাহিনীটি এই সকল বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে বাংলার চিত্রানুরাগীদের নূতন আনন্দে অভিভূত কোর্বে।

প্রফুল্ল পিক্চার্স

এদের "সথের প্রশ্নিকে"র শূটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এল। 'শ্রী' চিত্রগৃহে ছবিখানা শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোর্বে।

মেট্রোপলিটান পিক্চার্স

ডি-জির "হাল বাঙলা"র শূটিং চলেছে দ্রুতগতিতে। মিঃ খেম্কা ছবিখানা শীঘ্রই শেষ কোরে "চন্দ্রশেখরে"র কাজ আরম্ভ করবার মতলব কোরেছেন।

ফিল্ম কর্পোরেশন

এদের ষ্টুডিও এখনও তৈরি হ'চ্ছে। "আশা" নামে একখানা ছবি আরম্ভ হবে, এই কথাই জানি এবং তার তোড়জোড়ও চলেছে। কিন্তু শুনলাম বাজারে ভাল শিল্পী পাওয়া যাচ্ছেনা বলে এদের প্রস্তাবিত কর্ম্মসূচীও পিছিয়ে চলেছে।

হাজরা পিক্চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রেম-ভক্তি-শৌর্য্য বিমণ্ডিত অভিনব পৌরাণিক কাহিনী "দেবী ফুল্লরা"-র শূটিং কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যে কাহিনী যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতের নর-নারীর মনে চির-নূতনরূপে বিরাজ কোরছে, তারই চিত্ররূপ পর্দ্দায় রূপায়িত করবার ব্যবস্থা কোরে পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্র-নির্ব্বাচনও "দেবী ফুল্লরা"-র হ'য়েছে আশানুরূপ। কালকেতু ও ভাঁড়ুদত্তের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মঞ্চে এই দু'টি ভূমিকায় বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। সর্দ্দারের চরিত্রে নামছেন পরিচালক মশাই স্বয়ং—তাঁর নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। যুবরাজের ভূমিকায় নামছেন "দ্বীপান্তরের" নায়ক সুদর্শন মোহন রায়। চেহারার দিক থেকে তিনি হবেন অনিন্দ্যনীয়—আর বিশ্বাস তিনকড়ি বাবুর শিক্ষায় তার অভিনয়ও হবে আশাপ্রদ। নাম ভূমিকায় শিশুবালা নামছেন। এই ধরণের ভূমিকায় শ্রীমতীকে মানাবে বেশ।

তিনকড়ি বাবু তাঁকে এই ভূমিকায় নির্ব্বাচিত কোরে ভালই কোরেছেন। ছবিখানির টেক্‌নিশিয়ানরা সবাই প্রায় নবীন। প্রবীনদের চেয়ে নবীনদের ওপর আমাদের আস্থা আছে বেশী। এদের মধ্যে আলোকচিত্রী বিভূতি লাহা ও শব্দধর যতীন দত্ত স্বাধীনভাবে কাজ কোরে সবাইয়ের কাছ থেকেই, পেয়েছেন অভিনন্দন। এই সব বিচার কোরে আমাদের মনে হ'চ্ছে, "দেবী ফুল্লরা" হাজরা পিক্‌চার্সকে কোরবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

সম্প্রতি অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ঠিক করেছে যে এখন থেকে এরা "নিউজ রীল" ছবি বিভিন্ন হাউসে যাতে রীতিমত দেখান হয় সে বন্দোবস্ত কর্বেন। এ সম্বন্ধে তোড়-জোড় খুবই চল্‌ছে—এবং এরা মফঃস্বলে ও অন্যান্য হাউসের মালিকগণের নিকটও চিঠি ও মত চেয়ে পাঠিয়েছেন। "নিউজ রীল" ছবি বিভিন্ন ভাষায় তোলা হবে। অরোরা ফিল্মের এ প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় এবং এর সাফল্যে ফিল্মজগতের একটা বহুদিনের অভাব দূরীভূত হবে।

রূপবাণী

প্যারামাউন্ট পিক্‌চার্সের 'প্লেনস্‌ম্যান্' ছবিতে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারী কুপার এবং সুঅভিনেত্রী জিন্ আর্থার একটি চমৎকার প্রণয়োপাখ্যানের গভীরতা, আবেগ এবং রহস্যের সুন্দরতম রূপ দিয়েছেন! উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাজগতের পশ্চাৎপটে এই গভীর প্রণয়ের অপূর্ব্ব কাহিনীটি সিসিল, বি, ডি, মিলের প্রযোজনায় অবিস্মরনীয় ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ থিয়েটার

এ সপ্তাহে পূর্ণ থিয়েটারের আকর্ষণ কম নয়। প্রথম তিন দিন "মন্ত্রশক্তি" তারপর দুদিন "পণ্ডিত মশাই" এবং শেষের দুদিন "আবর্ত্তন"—দেখানো হবে। "এরকম চেঞ্জ প্রোগ্রাম খুবই উপভোগ্য—আরও উপভোগ্য হবে আমরা এই প্রথম সতু সেন সপ্তাহ দেখতে পাব বলে।

বিচার শেষ

শ্রীসমীর কুমার ঘোষ

শিলং থেকে ফিরে এসে দেবেশ দেখলে, তার টেবিলের উপর একতাড়া চিঠি জমা হয়ে উঠেছে। এক মাসের জন্যে সে বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়েছিল আর সেই ফাঁকে চিঠির পর চিঠি এসে টেবিলটাকে করেছে চিঠিমণ্ডিত; তাও দেবেশকে শিলংএ যদি চিঠি সই করার হাত থেকে সেক্রেটারী অব্যাহতি প্রদান করতো, তাহলে না হয় সে এই চিঠির রাশকে ক্ষমা করতে পারতো। দেবেশের মেজাজ এই চিঠির তাড়ার দিকে চেয়ে চেয়ে অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে শিথিল হস্তে একখানি চিঠি পড়ে হয় ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো, না হয় সেক্রেটারীর জন্যে পাশে সরিয়ে রাখলো। হঠাৎ একখানা খামের উপরকার হস্তাক্ষর তার অলসতাকে নাড়া দিল। যে খামখানা তুলে নিয়ে মেয়েলী হস্তাক্ষরের দিকে চেয়ে অস্পষ্টভাবে বলে উঠলো, "আমি এ লেখা চিনি!"

খামখানা ছিঁড়ে সে চিঠির উপরে দ্রুতচোখ বুলিয়ে গেল। পড়া শেষ হয়ে গেলে চিঠিখানা সে পেপার ওয়েটের তলায় রেখে, দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরলো। কিছুক্ষণ পরে সে আস্তে আস্তে চা'য়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়ালো: তার সুন্দর গৌরবর্ণের মুখমণ্ডল বিদ্রুপের চাপা হাসিতে চক্ চক্ করছে। দেয়াল আলমারী খুলে দেবেশ মরোক্কোবাঁধানো একখানা ডায়েরী বের করে তার বিবর্ণ পাতা উল্টাতে লাগলে:

"আমার ছাত্রের এক দিদির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। শিখা সরকার' সরল সহজ সুন্দরী এই মেয়েটি সর্ব্বদাই হাস্যময়ী!…

"শিখার সঙ্গে আমি শেষ পর্য্যন্ত ভালবাসায় পড়ে গেছি। আর শিখা আমাকে ভালবাসে।

"শিখা আমার হবে না। আমি হ'তে পারি বিদ্বান, হ'তে পারি চরিত্রবান, থাকতে পারে আমার উচ্চবংশ পরিচয় তবুও আমি অগাধ অর্থের মালিক নই যার দ্বারা আমি নিজেকে শিখার উপযুক্ত ভাবতে পারি, সেই কথা শিখার মা আমাকে স্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

"শিখার বিয়ে হ'বে সুরেশ দত্তর সঙ্গে। সুরেশ দত্তর আছে যথেষ্ট অর্থ—আর তার উপর সে বার-এ্যাট-ল—হোক না সে কিছু বিলাসী'!

"নিয়তির পরিহাস সত্যই কঠোর নির্ম্মম, জীবনঘাতী। আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচি মানুষ কিসের জ্বালায়, কোন নিষ্ঠুর বেদনার তাড়নায়, কোন আগুনের নীরব অথচ বিশ্বত-দহনে করে আত্মহত্যা—মুছে ফেলতে চায় নিজের অস্তিত্ব বসুধার বুক হতে—মানুষের চোখ থেকে আলোর অনিসন্ধিৎসুকপ্রসারতার কবল থেকে।

"টেবিলের উপর পড়ে আছে আমার প্রোফেসরির দরখাস্তর উত্তর—আমি কবে কাজে যোগদান করছি?

"আমার কী যোগদানের কোন প্রয়োজন আছে? না! আমার অর্থ উপার্জ্জনের আজ কোন প্রয়োজন নাই; শিখার অনুরোধে আমারও দরখাস্ত গিয়েছিল চাকরি পাবার আশায়; সেই শিখাই যখন আমার কাছ থেকে বহুদূরে, তখন দূরেই থাক্ ও সম্বন্ধে যা কিছু আছে।

"কাল রাত্রিতে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী বিশেশ্বর বোস পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। তিনি পেছনে ফেলে রেখে গেছেন বিস্তীর্ণ জমিদারী, আর নগদ কয় কোটী টাকা ব্যাঙ্কে। সেই সবের উত্তরাধিকারী আমি!

"আমি নাকি তার নিজের ভাগ্নে! আমাকে একথা তিনি জানতে দেন নি পাছে আমি স্বাবলম্বী হতে পারি না—পাছে আমি শিখি না কেমন করে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। তাই তিনি আমাকে দূর আত্মীয় হিসেবে টাকা দিয়ে বোর্ডিং এ রেখে প্রতিপালন করে গেছেন। তার ধনী জীবনের কোনখানে আমাকে ঘেসতে দেন নি।

"আজ তাঁর মৃত্যু আমাকে করেছে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী—আর কাল হয়ে গেছে শিখার সঙ্গে সুরেশের সম্মিলন। সুন্দরী পৃথিবী আর

আরও সুন্দর এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, মানুষের জীবন যাত্রার পথ—আর সেই পথের পথিক আমি আজ করবো আত্মহত্যা—না হয়ে যাবো উন্মাদ?—কিছুই ভেবে পাইনা। চারিপাশ ফাঁকা!

ডায়েরী খানা দেবেশ সজোরে ছুড়ে দিলে শিলং-এর দিকে। সেটা সেখানে ব্যাহত হয়ে ফিরে এসে পড়লো একটা চায়না ফুলদানীর উপর—ফুলদানীটা ঝন্ ঝন্ শব্দে টুকরো বিটুকরো হয়ে পড়লো। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে দেবেশ চিঠিখানা ভারি গলায় পড়ে যেতে লাগলো:

বরানগর
২৭শে জুলাই।

"দেবেশ,

তোমাকে আর কী বলে সম্বোধন করবো ভেবে পেলুম না। তাই দেবেশ বলেই আরম্ভ করলুম। তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয় ছিল, সেই পরিচয়েরই জোরে আমি তোমাকে আমার বন্ধু হিসেবে ধরে নিয়েছি—আর সেই বন্ধুরই কাছে একটি জিনিষ দাবী করছি। আশা করি তুমি আমার অনুরোধ রাখবে।

আজ মাস দুই হলো আমার স্বামী মৃত। তুমি ভাল রকমই জানো, তিনি মাতাল আর চরিত্রহীন দুইই ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাকে তাই পথের ভিখারিনী করে গেছে। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে আমি পেয়েছি বালিগঞ্জের বাড়ী খানা—তাও বসাক এণ্ড সন্স কোম্পানীর কাছেবাধা আছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম তুমি ও ফার্মের প্রেসিডেণ্ট। আমার টাকা শোধের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বোধ হয় আর দিন পনেরোর মধ্যে ও বাড়ী ছাড়বার নোটীশ আসবে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি একটু চেষ্টা করে আমাকে মাস ছয়েকের সময় পাইয়ে দাও। এই সময় পেলে আমি আমার শেষ আশ্রয় ও বাড়ীখানা বোধ হয় বাঁচাতে পারবো। তোমার এই সাহায্য না পেলে আমিযে কী করবো তা নিজেই জানি না। হয়তো আমাকে এমন পথে চল্‌তে হবে যা আমার আত্মহত্যার সামিল। আমার ভায়ের কাছে কোন সাহায্য পাওয়া অসম্ভব সে বোধ কিছু দিনের মধ্যেই ইনসল্‌ভেন্সি নেবে।

আশাকরি দেবেশ তুমি আমাকে এই সাহায্যটুকু করবে। আজ তোমার এই সাহায্য ছাড়া আমার আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। তিন দিনের মধ্যে আমার চিঠির উত্তর না পেলে বুঝবো তুমি আমার প্রার্থনা বা দাবী রাখলেনা। তোমার কাছে আমার এ মুখ দেখাতে ইচ্ছে করে না বলেই এ চিঠি লিখলুম।

ইতি—
শিখা।

ক্যালেণ্ডার হিসেব করে দেবেশ দেখলে যেদিন সে শিলং গেছে, তার পরেরদিন রাত্রে এ চিঠি পোষ্ট করা হয়েছে। শিখা এ চিঠির উত্তর না পেয়ে ধরে নিয়েছে দেবেশ তাকে সাহায্য করলো না। আচ্ছা দেবেশ ঠিক সময়ে চিঠি পেলেও শিখাকে কি সাহায্য করতো?

না দেবেশ তাকে সাহায্য করতো না। হ্যাঁ করতো না। কেন করতো না? শিখা সুরেশের বদলে তাকে, দেবেশকে বিয়ে করে নি বলে? হ্যাঁ ঠিক সেই কারণে দেবেশ তাকে, শিখাকে সাহায্য করতো না। যাকে শিখা একদিন 'ভালবাসি' বলেছিল কি জন্যে সে সেই ভালবাসার দাবী নিয়ে বাড়ীর নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি, কেন সে একটা অশিক্ষিতা উনবিংশ শতাব্দীর পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত নিজের আত্মহত্যার পথে নিজেকে বিনা বাধায় এগিয়ে দিয়েছিল?

দেবেশের মুখ কঠিন হয়ে উঠলো—শিখা না নিজেকে শিক্ষিতা, আধুনিক, স্বাধীন মেয়ে বলে গর্ব্ব করতো? সে আজ দেবেশের কাছে সাহায্য পেতে পারে না। কারণ সে সেদিন যে হাতপানি দেবেশের হাতে তার গর্ব্ববজায় রেখে সমর্থন করতে পারেনি, সেই হাত আজ দেবেশের লাঞ্ছিত হাতের কাছ থেকে কি করে সাহায্য নেবে? সাহায্য নিলে যে তার সমস্ত গর্ব্ব ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। না, না দেবেশ শিখাকে এই গর্ব্ব অটুট রাখতে সাহায্য করবে—হ্যাঁ শিখা এই সাহায্য দেবেশের কাছ থেকে আশা করতে পারে—দেবেশ হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুলে "হ্যালো···ইয়েস pk. 4721···অময় বাবু আপনি···দেখুন ব্রাউন রোডের 47/5 বাড়ীখানা আমাদের কোম্পানীর দখলে এসেছে?···এসেছে ভাড়া পর্য্যন্ত বলে গেছে···থ্যাঙ্ক ইউ···

দেবেশ রিসিভার রেখে দিলে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তার সমস্ত মনটা এক অতি জ্বালাময়ী আনন্দে ভরে গেল।

নিজের অজান্তে দেবেশের বুক চিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। এমন সময় ভারীক্রীণ ঠেলে খবরের কাগজ হাতে লাবণ্য ঘরে ঢুকলো, "ওগো শুনছো—শিখা সরকার বি-এ, ফিল্ম-এ নামলো—কী মেয়ে গো! এই দু মাস হয়নি যার স্বামী মারা গেছে সে কি এরি মধ্যে নাচ গান করতে ফিল্মে···লাবণ্য আরও কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ অস্ফুট অথচ বেদনাব্যঞ্জক শব্দে সে দেবেশের মুখের দিকে তাকিয়ে, "তোমার কী হয়েছে?—বলে" তাড়াতাড়ি তার পতনোন্মুখ দেহটাকে জাপটে ধরলে। ততক্ষণে দেবেশের মুখ হয়ে গেছে বিবর্ণ নিশ্বাস হয়ে এসেছে অতি ক্ষীণ।

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের
প্রথম বাঙলা বাণী-চিত্র

'হাল-বাঙলা'

শীঘ্রই
উত্তর কলিকাতার
শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহে
মুক্তিলাভ
করিবে

ইহার নায়িকা
ছায়া দেবী

নিত্য পরিচয়ের ফলে সমাজের যে সকল বিকৃতি ও অসঙ্গতি আমাদের আর চোখে পড়েনা---সেইগুলিকে উপলক্ষ করিয়া যে হাসির প্রবল বন্যা সৃষ্টি করা যায়, আবার তাহাতে ভাসাইয়া কিরূপে আপনাকে চিন্তাসমুদ্রের উপকূলে আনিয়া ফেলা যায়—

"হাল-বাঙলা"

সেই রস ও রহস্যের অপরূপ
চিত্র-কথা

বিশিষ্ট একটি ভূমিকায়
অবতীর্ণ হইয়াছেন
অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্ব্বজন
পরিচিত
হাস্যরসাভিনেতা
ধীরেন গাঙ্গুলী

চিত্রটিকে গীতমুখর
করিয়া তুলিয়াছেন
সুকণ্ঠ-গায়ক
মৃণাল ঘোষ

*

অন্ধ-গায়ক
গোপাল সেন
ভাটিয়ালী গানের মঞ্চ-শিল্পী
গিরীন চক্রবর্ত্তী

*

সুগায়িকা : বীণা বোস
সুগায়ক : মহাদেব পাল

আর আছেন
চিত্র-জগতে নবাগতা
চন্দ্রিকা দেবী
এবং তুলসী লাহিড়ী, প্রফুল্ল মুখো, সত্য মুখো, প্রভাত সিংহ, সন্তোষ সিংহ, হরিদাস চট্টো, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি

(সি, বি)

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—

বেঙ্গল ও আসাম দল বিহার দলকে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউণ্ডে মধ্যভারত দলের সঙ্গে খেলার যোগ্যতা লাভ করে। গত শনিবার থেকে ইডেন্ উদ্যানে বেঙ্গল ও আসাম দলের সঙ্গে মধ্যভারত দলের এই প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব অঞ্চলের তিনদিন ব্যাপী ফাইন্যাল খেলাটি ইডেন উদ্যানে আরম্ভ হয়। বেঙ্গল দল প্রথম ইনিংসে খুব নিন্দনীয় খেল্‌লেও দ্বিতীয় ইনিংসে জি, এফ, কার্টার এবং এই দলের ক্যাপ্টেন ভ্যাণ্ডারগুচের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ে মধ্যভারত দলকে ২৮ রাণে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। বেঙ্গল ও আসাম দলটি নির্ব্বাচিত হবার আগে এবং পরে অনেকেই বেশীর ভাগ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত করা হয়নি বলে দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের যে প্রকৃতপক্ষে দুঃখিত হওয়াটা যুক্তিযুক্ত হয় নি তা এই খেলাটিতে তাঁরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। খুবই আক্ষেপের বিষয় যে বাঙ্গালী খেলোয়াড়েরা দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র মোট ১৫ রাণ করেন। তার উপর বেঙ্গল দলের ফিল্ডিং খুবই নৈরাশ্য জনক হয়েছিল। তরুণ এবং উদীয়মান খেলোয়াড় নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি নির্ব্বাচকদের এবং তাঁর সমর্থকদের নিরাশ করেছেন। তিনি যে একজন ভাল ব্যাটস্‌ম্যান তা দেং কোন ইনিংসের খেলায়ং প্রকাশ পায় নেবে তিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ রাণ করে আউট হন: এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র

সাহায্যটু·

১ রাণ করে বোল্ড আউট হন। তিনি যে এখন এইপ্রকারের প্রতিনিধি মূলক খেলায় যোগদান করবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন নি তা এই খেলা থেকে প্রমাণ হয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি যদি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে এই রকমের দায়িত্বমূলক খেলায় যোগদান করেন তাহলে সুবিবেচনার কাজ করবেন—তাঁহার পরেই কমল ভট্টাচার্য্যের বিষয় আলোচনা করা চলে। তৃতীয় টেষ্টম্যাচে ভারতীয় দলের চৌদ্দটি নামের মধ্যে তাঁহার নাম প্রথমে প্রচারিত হয়েছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর টেষ্টম্যাচ খেলার দু একদিন আগে দ্বাদশ ব্যক্তিতে এসে পৌছায়। এই ব্যাপারে অনেকেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁকে হয়ত তৃতীয় ভারতীয় টেষ্ট টীমে নির্ব্বাচিত করে তাঁর উপযুক্ত দাবী স্বীকার করা হবে। কিন্তু তৃতীয় টেষ্টম্যাচের পর তাঁর যোগ্যতা ক্রীড়ামোদিগণ কুচবিহার দলের খেলার পর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন। তবুও অনেকের মনে আশা ছিল যে উক্ত খেলাটিতে তিনি তাঁর ক্রীকেট নৈপুণ্যের উপযুক্ত পরিচয় না দিতে পারলেও বেঙ্গলের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু রঞ্জি প্রতিযোগিতার গত সপ্তাহের এই খেলাটির পর তাঁর বিষয়ে এ ধারণা পোষণ করতেও ইতঃস্তত করতে হচ্ছে। পূর্ব্ব এক বছরের তুলনায় এবছরে তাঁর ব্যাটিংয়ের ক্ষমতা অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। তিনি মধ্য ভারত দলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১ রাণ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে কোন রাণ করে নিজদলকে সাহায্য করতে পারেন না। তবে তাঁর বোলিং নিজখ্যাতি অনুযায়ী হয়েছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৩৮ রানে তিনটি এবং ২৩ রাণে একটি উইকেট লাভ করেছিলেন। একমাত্র তিনিই বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলেছিলেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ ও ৮ রাণ করে দলের অধিনায়ককে একেবারে হতাশ করেন নি। কার্ত্তিক বসু নির্ব্বাচিত হয়েও অসুস্থতাবশতঃ এই খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। তাঁর জায়গায় সন্তোষ গাঙ্গুলী খেলেছিলেন। তিনি প্রথম ইনিংসে ১১ রাণ করে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ০ রাণ করে অন্যান্য বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছিলেন তবে তাঁর খেলার আরও উন্নতি না হলে হয়ত এইরকমের দায়িত্বপূর্ণ খেলায় স্থান পাওয়া শক্ত হতো। আলেকজেণ্ডার বেঙ্গল প্রাদেশিক দলে নির্ব্বাচিত হয়ে বোলার হিসাবে তাঁর নিজ সুনাম অক্ষুন্ন রেখে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বেঙ্গল ও আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েসন এতদিন তাঁর উপর অবিচার করে এসেছেন। তাঁর পূর্ণ বোলিং বেঙ্গলদলের জয়লাভের অনেকখানি সাহায্য করেছিল। তিনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩৯ রাণে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২ রাণে ৪টি উইকেট গ্রহণ করেছিলেন। তাঁহার পরেই বোলারদের মধ্যে সি ই ইণ্ডারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রথম ইনিংসে ৩৬ রাণে একটি মাত্র উইকেট পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫ রাণে তিনটি উইকেট লাভ করতে সমর্থ হন। বেঙ্গল দলের এই জয়লাভে গৌরব করা চলে। কারণ প্রধানতঃ এই দলে অভিজ্ঞ অধিনায়ক এ, এল, হোসী, বোলার এবং ব্যাটস্‌ম্যান্ টি, সি, লংফিল্ড ও বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান কার্ত্তিক

বসু এই খেলাটিতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। তার উপর বেঙ্গল দলের বিপক্ষে মেজর সি, কে, নাইডু, মুস্তাক আলি, জে, এন, ভায়া এবং হাজারীর মত চারজন নাম করা নিখিল-ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড়গণ, খেলেছিলেন। বেঙ্গল দল এই খেলাটিতে জয়ী হয়ে এই প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বছর মধ্যভারত দলকে পরাজিত করলেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর মধ্যভারত দল অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ছিল। বিজিত দলে মেজর নাইডুর প্রথম ইনিংসে ১৪৩ মিনিট খেলে ৭৬ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ভাণ্ডারকার ও ভায়ার যথাক্রমে ৫০ ও ৩৯ রাণ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। মুস্তাক আলি একমাস আগে ইডেন উদ্যানে একটি সেঞ্চুরীর চেয়ে বেশী রাণ করে গেলেও এই খেলাটিতে বেঙ্গল দলের সৌভাগ্যের জোরে প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬ ও ৪ রাণ করেন। তিনি ওপেনিং ব্যাটসম্যান্ হিসাবে খেলার সুবিধা না পাওয়ায় সম্ভবতঃ নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। মেজর নাইডুর পায়ে আঘাত লাগার জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত ব্যাটিং ও বোলিং করতে পারেন নি। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র তিন মিনিট খেলে মাত্র ১ রাণ করে তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই শারীরিক অসুবিধা সত্বেও তাঁর বোলিং খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৫০ রাণে ৩টি ও ২৬ রাণে ৩টি উইকেট পান। মুস্তাক আলি প্রথম ইনিংসে ২৫ রাণে ৩টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬ রাণে ৫টি উইকেট পেয়েছেন। বেঙ্গল ও আসাম দল প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১১০ ২১৭ রাণ করেন। মধ্যভারত দল প্রথম ইনিংসে ১৫৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৫ রাণ করে ২৮ রাণে পরাজয় স্বীকার করেন। বিজয়ী দল এই মাসের মাঝামাঝি নওয়া-নগর দলের সঙ্গে বোম্বেতে সেমিফাইন্যাল খেলবেন।

বেঙ্গল ও আসাম দল

পি আই ভ্যাণ্ডারগুচ (ক্যাপ্টেন), জি এস কার্টার, সি ই ইণ্ডার, ডবলিউ স্কট, পি এন মিলার, নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জি, কমল ভট্টাচার্য্য, জে ই আলেকজেণ্ডার, জে এন ব্যানার্জ্জি, সন্তোষ গাঙ্গুলী এবং এ কামাল দ্বাদশ ব্যক্তি কে থাম্বাট।

মধ্যভারত দল

মেজর সি কে নাইডু (ক্যাপ্টেন) মুস্তাক আলি, জে এন ভায়া ভি হাজারী, ইস্তাক আলি, সম্নিরুদ্দীন, ভাণ্ডারকার, টাটারাও, ইউসুফ খাঁ, সর্দ্দার মহম্মদ খাঁ এবং শম্ভু সিং আম্পায়ারদ্বয়—সেমার্স বেচু দত্ত রায় এবং পাটু মুখার্জ্জি।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

'রহিনটন বারিয়া' আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলাটি মঙ্গলবার শেষ হয়ে গেছে। এই খেলাটিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগীতা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক ইনিংস এবং ২৫ রাণে জয়লাভ করেছে। অন্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ৪৬ ও ১১২ রাণ করে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথম ইনিংসে ১৮৩ রাণ করে। বিজয়ী দলের এইচ্ সাধুর অনিষ্টকারী বোলিংয়ের জন্য আগন্তুক দলের এইরূপ শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। বিজিত দলের পট্টনায়ক এবং ভেঙ্কটাচালমের বোলিং অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বেতে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ফাইন্যাল খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

———

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

রেডিওতে শ্রীযুত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীত আসরের অনুষ্ঠানটি অকস্মাৎ বন্ধ করে দেওয়া সম্বন্ধে একখানি অভিযোগ পত্র গত সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করেছি। পত্র লেখক এর কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। "আনন্দবাজার পত্রিকায়" এ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ঘোষক কমল বসু এবং মিঃ মুখার্জ্জীর অসঙ্গত ব্যবহারের ভিত্তি যদি সত্য হয়, তবে এ সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত এবং রেডিও কর্ত্তৃপক্ষেরও এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

* * *

এ ব্যাপারে মিঃ ভদ্র এবং এ্যাসিষ্টেণ্ট ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেন আর্টিষ্টদের প্রতি দুর্ব্যবহারে দুঃখ প্রকাশ করে এবং এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করে নিজেদের সৌজন্য প্রকাশ করেছেন সন্দেহ নেই— আমরা তার জন্যে তাঁদের প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি কিন্তু আমাদের বক্তব্য, মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করেই যেন ব্যাপারটা ধামা চাপা না পড়ে। সাধারণের প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বিশেষের চোখ রাঙানি ভবিষ্যতে যেন প্রকাশ না পায় তার জন্যে কঠোর নীতি অবলম্বন করা উচিত।

* * *

সবচেয়ে দুঃখের বিষয় ষ্টেশন ডাইরেক্টর, মিঃ ষ্টেপলটন এবিষয়ে মৌখিক অন্ততঃ কোন সহানুভূতি দেখান নি। আর্টিষ্টদের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা প্রায়ই আমরা শুনে থাকি। আদর অভ্যর্থনা দূরে থাক মৌখিক ভদ্রতা—সুব্যবহার পর্য্যন্ত অনেকের ভাগ্যে জোটে না'—কেন?

* * *

এ প্রশ্ন আমরা বহুবার করেছি। শিল্পীদের অনাদর, অবজ্ঞা বাংলা দেশেই শুধু সম্ভব! আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে ভেবে-দেখতে অনুরোধ করি এবং এ বিষয়ে প্রতিকার কামনা করি।

* * *

প্রোগ্রাম নির্ব্বাচনে অক্ষমতার পরিচয় বার বার পাওয়া যাচ্ছে। বেতার নাটুকে দল যাত্রার আসর—বিচিত্র অনুষ্ঠান রস গুনে বিচিত্রই (?) বটে! পল্লীমঙ্গল আসরে কেবলই জোড়াতাড়া লাগানো হচ্ছে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কোন standard নেই—রাম শ্যামার ভীড়। বক্তৃতা বিভাগে আজকাল সাহিত্য রসের একান্ত অভাব। মধ্যে খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল এখন অবার 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই!' দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে মিসেস হালদারের অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাহিত্য প্রসঙ্গগুলি উপেক্ষিত! ঘরসংসারের খুটিনাটি মহিলা প্রসঙ্গ অনেক পরিমাণে ব্যহৃত। তবে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত আসরে অধুনা খানিকটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় আদর্শ নারী সম্বন্ধেও দুয়েকটি আলোচনা শোনা যাচ্ছে—আমাদের বক্তব্য কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। নারী-শিক্ষা, কৃষ্টি, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম এ নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা চাই এ আসরে। তবে একথা স্বীকার্য্য রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে খানিকটা লক্ষ্য দিচ্ছেন ইদানিং।

* * *

ছোটদের বৈঠকে মাসিমা কিছু কিছু কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। এ আসরে বয়সের গাম্ভীর্য্য সরিয়ে ফেলে শিশুমন নিয়ে মাতৃ শিক্ষায় সন্তান পালনের আদর্শ আনতে হবে। ছোটদের আসরে সবচেয়ে প্রয়োজন সরলতা। মাসিমা সেই পথ অবলম্বন করলে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করবেন। শিশু সাহিত্যের সরস আলোচনা ও যোগ্য ব্যক্তিদ্বারা বাঞ্ছনীয়। মাসিমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ইংরাজী মিশ্রিত উচ্চারণ ভঙ্গী কিন্তু সহজ বোধগম্য নয়।

* * *

প্রোগ্রাম সমালোচনা কালে কোন কোন স্থলে শিল্পীদের নামে ভুল হয়ে থাকে। ঘোষকের কণ্ঠ উচ্চারণ অনেক সময়ে আমাদের অনুধাবণ করতে কষ্ট হয়। গত ৬ই জানুয়ারীর খেয়ালীতে বিমানবাবু গান গেয়ে ছিলেন পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের আসরে বলে প্রকাশিত হয়েছিল। সে স্থলে হবে বিমল বাবু।

* * *

২৩শে জানুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে কমলা ঝরিয়া দুখানি বাংলা গান গাইলেন ভাল। দক্ষিণা মোহন ঠাকুরের এসরাজ বাজনা মোটা মুটি ভালই। আর্টিষ্টের অনুপস্থিতির দরুণ রেকর্ড বাজনা হ'ল।

শোভা কুণ্ডু সেতার বাজালেন চলন সই। ইন্দুবালা গান গাইলেন উপভোগ্য হয়েছিল। পরে পঙ্কজ বাবু সঙ্গীত শিক্ষাদান দান করলেন।

ঐদিন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ক্ষিতি মোহন সেন মহাশয়ের বক্তৃতা (সঙ্গীত সহযোগে) খুব ভালই লাগল। এধরণের programme এর জন্য আমরা বেতার কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরে সুশীল দাস হারমোনিয়ম solo বাজালেন। আমাদের খুব ভাল লেগেছে। সুশীল বাবুর হাত মিষ্টি এবং বাজনাও বেশ উচ্চাঙ্গের।

হরেন নন্দীর দুখানি গান চলনসই।

* * *

মঙ্গলবার, ২৩শে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—

'বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদের Membersদের দ্বারা একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হ'ল। এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোগ্রাম সরবরাহ কি করে যে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ সমর্থন করলেন বুঝতে পারলাম না। আশাকরি ভবিষ্যতে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ এরূপ programme নির্ব্বাচনে সংযত হবেন। দেবীরাণী সিংহ "আলো ঝলমল পুর্ণিমারি" গান গাইলেন অত্যন্ত বাজে এবং নিকৃষ্ট reproduction। কার্ত্তিক দাস চলন সই রকমের গান গাইলেন। পরে রাধিকা বাবু স্বরোদ বাজালেন ভালই।

* * *

২৫শে বুধবার সান্ধ্য অনুষ্ঠান

যন্ত্রী সঙ্ঘ বাজনা বাজালেন ভালই। পরে বেতার বিচিত্রা অনুষ্ঠিত হল। "চিত্রস্মৃতি" কোন নূতন আবহওয়া পেলাম না। পরে এইচ কে সান্ন্যাল বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান কে? সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। বাংলার কৃষ্ণ সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করলেন। এ ধরণের বক্তৃতা জনসাধারণের লাভজনক।

* * *

বৃহস্পতিবার সান্ধ্য অনুষ্ঠান—

রঞ্জিত বাবু হাসির গান গাইলেন। রঞ্জিত বাবু এধরণের গানের উপযুক্ত শিল্পী। গানখানিও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। বীরেশ উকীল "দুয়ার খুলিয়া রাখি" গাইলেন—গানের উচ্চারণ ভাল নয়। আর্টিষ্টের অনুপস্থিতি পুরণ করবার জন্য রেকর্ড বাজন হ'ল। পরে বাসন্তী বিদ্যাবিথী কর্ত্তৃক "দেবীস্তুতি" অনুষ্ঠিত হ'ল। নজরুল ইস্‌লাম ব্যাখ্যা করলেন। ব্যাখ্যাকারের বলবার কায়দা মোটেই ভাল নয়। Nonstop performance ঠিক্ করে উঠতে পারেন নি মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিল। গানও ভাল নয়। programme এককথায় বলা উচিত অত্যন্ত বাজে এবং নিকৃষ্ট।

রুদ্ধধারা
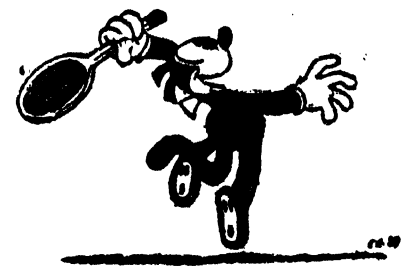
[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ললিতা উঠিয়া আসিয়া মায়ের পায়ের ধুলা লইল। নীরদও আসিয়া ঠক্ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

ললিতার মা ললিতার চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া বলিলেন:

"এ্যাঃ! চোখে যে কালি পড়ে গেছে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস্!"

ললিতা মুখ ছাড়াইয়া লইয়া বলিল: "কোথায় রোগা? তোমরা পাঁচজনেই তো রোগা রোগা ক'রে আমাকে সত্যি সত্যি শুকিয়ে দিচ্ছ! রোগা টোগা আমি হইনি বাপু!'

বলিয়া সে দিব্যি গিয়া খাটের বিছানায় উপবেশন করিল! যেন তাহার কোনই রোগ নাই!

নীরদ বসিবার চেয়ারখানার মুখ ফিরাইয়া বলিল: না! ও রোগা টোগা হয় নি! আমাদের চোখ সব খারাপ হয়ে গেছে! আর ডাক্তারেরা ও ভুল ক'রে ওর শরীরে অসুখ খুঁজে পেয়েছে! সকলেরই ভুল, ঠিক কেবল ও নিজে! বুঝলেন মা! আপনি কাশী ফিরে যান পাল্‌টা গাড়িতে,... আপনার কন্যা ললিতা'র কোনও অসুখ করে নি!

বলিতে বলিতে নীরদ তাহার বলিবার বিষয়ের সূত্র হঠাৎ হারাইয়া ফেলিল; সে গম্ভীর হইয়া গেল। সঙ্গে নবাগত মেয়েটিও মুখ নত করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

ললিতার মাতা বলিয়া উঠিলেন! দাঁড়িয়ে রইলি কেন লবঙ্গ! যা, কাপড় চোপড় কেচে আয়! আর এই অবেলায় চান টান করিস্ তো তাও করে আয়! এবাড়ীতে তোর লজ্জা কর্বার কেউ নেই! এখানে শুধু জামাই থাকে, আর মেয়ে থাকে! আর বাহিরের লোক কেউ নেই! সব চাকর চাকরাণী... তাদেরই সংসার! তুই যা মা,... সকাল সকাল কাপড় চোপড় কেচে আয়! আমি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিই!

ললিতা বলিয়া উঠিল: তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা? এই বিছানাতেই বসোনা! তোমার ত এখন কাচা কাপড় নয়।

হাঁ, তা বস্‌চি! আগে লবঙ্গকে বলে দিই, কোথায় আমার গঙ্গাজল, কোশাকুশি, কুশাসন এসব আছে! ঐ পোঁটলাটার ভেতরই আছে! 'বুঝলি লবঙ্গ! পোঁটলাটার ভেতরে খুজে দেখ! সেটা বুঝি এখনওআসে নি!

লবঙ্গ এতক্ষণে একটু ঘোমটা টানিয়া দিল। ঘোমটার ভেতর থেকেই সে ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটস্বরে বলিল: না, পোঁটলাটা আসে নি!

বলিতে বলিতেই বেয়ারা বাক্স, পেঁটরা, পোঁটলা লইয়া আসিল! ঘরের মেঝয় সে গুলি নামাইয়া দিয়া সে বলিল: গাড়োয়ান ভাড়া চাচ্চে!

—ও! ভাড়া বুঝি এখনও দেওয়া হয় নি! ও লবঙ্গ! এখনও ভাড়া দিস্‌নি?

—এই দিই! বলিয়া লবঙ্গ তাহার আঁচলের খুঁট হইতে একটি টাকা আর কিছু পয়সা বাহির করিয়া সে বেয়ারার হাতে দিল।

বেয়ারা ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। লবঙ্গ পোঁটলাটি টানিয়া আনিয়া, নীরদের দিকে পেছন করিয়া খুলিতে বসিল।

—এ মেয়েটি কে মা? ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার মাকে।

—ওমা, ওকে চিনিস্‌নি? কি করেই বা তুই চিনবি! তোর বিয়ের পর ও এসেছে আমাদের বাড়ীতে! ও আমাদেরই স্বঘর। আমাদের বাড়ীর পাশে যে রাম দত্তরা ছিল না? সেই তাদেরই বাড়ীর দৌহিত্রী। আহা, মেয়েটার বড় কষ্ট! স্বামীর ঘরে মেয়েটাকে মোটে থেকে দেয়না! তাই আমি আনিয়ে রেখেছি, আমার কাছে!"

ইত্যবসরে লবঙ্গ কোশাকুশি দুখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল।

নীরদ চেয়ারখানি বাঁকাইয়া লইয়া তখন রায় লিখিতে ছিলেন।

—তৃতীয় পরিচ্ছেদ।—

অপরাহ্ণে ডাক্তার বাবু আসিলেন, ললিতাকে দেখিতে।

নীরদ তাহাকে সঙ্গে করিয়া ললিতার ঘরে লইয়া আসিল।

ললিতার ঘর তখন বেশ গুলজার। তাঁহার মা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বসিয়াছেন, তাহার সহিত গল্প করিতে। পাশে আছে লবঙ্গ, ললিতার মার সঙ্গে যে এখানে আসিয়াছে। ললিতা খাটের উপর বসিয়া তাঁহাদের সহিত গল্প করিতেছিল।

ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন শুনিয়া ললিতার মাও লবঙ্গ সরিয়া গেল। ললিতা যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

ডাক্তার বাবু ঘরে ঢুকিয়া, ললিতাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন: কই, আমার কথাতো আপনি শুনছেন না! আপনাকে শুয়ে থাকতে বলে গেলাম,—'

ললিতা এ পুরাতন তিরস্কারের কোনও উত্তর করিল না। সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার বাবু একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া খাটের পাশে বসিলেন।

—আজ কত জ্বর হয়েছে?

ললিতা তাহারও কোন উত্তর করিল না। এই শীতল অভ্যর্থনা ডাক্তার বাবুর কাছে যেন কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল।

নীরদ দাঁড়াইয়াছিল; বলিল: আজ একবার ওকে ভাল ক'রে একজামিন করে দেখুন।

—হাঁ, দেখি।

বলিয়া ডাক্তার বাবু পকেট হইতে বুক দেখিবার যন্ত্র বাহির করিলেন। ললিতা কিন্তু বলিল: আজ থাক। রোজই তো ভাল ক'রে একজামিন করে দেখছেন। খারাপ একজামিন উনি কবে করেন?

নীরদ উচ্চকণ্ঠে আপত্তি তুলিয়া বলিল: না, না। আজ তোমার মা এসেছেন; আজ একবার ডাক্তার বাবু ভাল ক'রে একজামিন করে দেখুন। যদি অসুখ কমে থাকে, ভালই। আর যদি বেড়ে থাকে, তা'হ'লে না হয় মা'র সঙ্গে তোমাকে পাঠিয়ে দেই।

—'কোথায়?' ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

—'মা থাকেন কাশীতে! এ রোগের পক্ষে কাশী কি সুবিধাকর জায়গা হবে না, ডাক্তার বাবু?'

—কাশী! লোকজনের বড়ো ভিড়। খুব সুবিধাকর হবে বলে মনে হয় না।

—তবে কোথায় পাঠিয়ে দেবো?

—এমন জায়গায় পাঠাতে হবে, যেখানে লোকজনের ভিড় মোটে নেই, কাজেই হাওয়া একেবারেই বিশুদ্ধ, এই ধরুণ, শিমুলতলা কি রাঁচি কি হাজারিবাগ!

ললিতার দিকে তাকাইয়া নীরদ বলিল: মা বলছিলেন কি শুনেছো?'

—কি?

—বলছিলেন, উনি তোমাকে কাশী নিয়ে গিয়ে বেনারস সিটির বাহিরে একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখবেন, সে দিকটা নাকি খুব ফাঁকা আছে।

স্বামীর এ প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া, ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইয়া ললিতা বলিল: 'ডাক্তার বাবু! আপনার যা ওষুধ পত্র লেখবার তা লিখে দিয়ে যান! আজই তো আর আমি হাওয়া খেতে বাইরে যাচ্ছি না! যখন যাবো, তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেই যাবো।

ডাক্তার বাবু কথাটায় সায় দিয়া বলিলেন: হাঁ, তাতো বটেই! আগে দেখি, যদি এইখান থেকেই জ্বর সেরে যায়, তবে আর বাহিরে পাঠানো কেন? আর সে যখন আপনারা যাবেন, তখন সে সব কথা হবে! আজতো দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে যাই! আপনার সে খুকখুকে কাশীটা কেমন?

—ঐ একটু আধটু আছে, খুব কম পড়ে গেছে!

নীরদ মাঝ থেকে বলিল: "কিছু কম পড়ে নি ডাক্তার বাবু! কাল রাত্রে ভয়ানক কেশেছে!"

ললিতার মাতা পাশের ঘর হইতে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা সবই শুনিতেছেন,—ললিতা চায়, তাহার মাতাকে বুঝাইতে, যে তাহার অসুখ বিসুখ বিশেষ কিছুই নাই; যেটুকু ছিল, তাহা সারিয়া গিয়াছে।

তাই ললিতা তাড়াতাড়ি বলিল, ডাক্তার বাবু যা হয় করুন! ওষুধ পত্র লিখে আমায় পরিত্রাণ দেন! আর ভাল লাগচেনা আমি শুয়ে পড়ি।

—হাঁ, হাঁ, শুয়ে পড়ুন না। বসে থাকলে তো কষ্ট হবেই! আমিতো বলেছি,—

লবঙ্গ এই নূতন বাড়ীতে আসিয়া বড় বিপত্তিতে পড়িয়াছে। বাড়ীর যিনি প্রকৃত গৃহিণী, তিনিতো রুগ্ন শয্যায় শায়িতা। তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা যে নাই, তাহা নহে! অথচ তাঁহাকে ডাক্তারে ও বাড়ীর লোকে উঠিতে দেয় না। কাজেই ভাঁড়ার ঘর ও রসুইঘর এক রকম মগের মুল্লুক বলিলেই হয়। সেখানে একটা উড়ে পুরুষমানুষ কোমরে গামছা বাঁধিয়া গৃহিণীর কাজ করে।

বাড়ীতে মানুষ বলিতেতো তিনটি! বাড়ীর বাবু তাঁহার গৃহিণী আর একটি ছোট ছেলে। ছেলেটির বয়স হইবে তিন কি চার। কিন্তু তাহার জননীর সহিত তাহার ততো ভালবাসা নাই, যতটা আছে তার ধাইয়ের

সঙ্গে। আবার ধাই যখন তাহার ঘরের মেঝেয় পড়িয়া নাক ডাকে, তখন ছেলেটি বাড়ীর বাহিরের ঘরে গিয়া দরওয়ানের সহিত বন্ধুত্ব পাতায়! তাহার পিতার সাজানো বইগুলি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া পড়িতে বসে, এবং পড়ার সাক্ষী স্বরূপ রাখিয়া যায় দোয়াত কলমের কতকগুলি অবার্থ কলাবিদ্যা! শেষে আপনার মুখমণ্ডল বর্ণ বিপর্য্যয়ে চিত্রিত করিয়া হাজির হয় মা'এর কাছে—যেখানে তিরস্কারের পরিবর্ত্তে পুরস্কারের মাত্রাটাই কিছু বেশী!

কিন্তু পুরস্কার ছেলেটি তত পছন্দ করে না, যতো পছন্দ করে দরওয়ানজীর সুর করিয়া তুলসী দাসের রামায়ণ পড়া! কাজেই বাড়ীর ভিতর সে তত থকিতে চায় না, যত থাকিতে চায় বাড়ীর দেউরিতে।

বাপ ছেলেটিকে আদর করিবার তত সময় পান না, কেননা আদালতের কাজে তাঁহাকে ডুবিয়া থাকিতে হয়। সমস্ত দুপুর বেলা এবং বৈকালের প্রথমাংশটা তো আদালতের ঘরের মধ্যেই কাটিয়া যায়; আবার বাকি সময়েরও কিয়দাংশ দিতে হয় ঐ আদালতেরই লেখাপড়ার কাজে। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবান্ধব আসিয়া হাজির হয়, তাহাদের সঙ্গেও খেলাধূলা ও গল্প গুজব করিতে রাত্রি অনেক হইয়া যায়।

যাহা হউক, লবঙ্গ আসিয়া দেখে, এ বাড়ীটি ঝি চাকরেরই বাড়ী। ঝি আছে একজন, কিন্তু চাকর অনেকগুলি। একজন বাহিরের কাজ করে, আর বাকি সব অন্দরের জন্য। একজন বাবুর ঘরের জন্য; একজন রসুই ঘরের জন্য; একজন ভাড়ারের জন্য; একজন খোকার জন্য। এতদ্ভিন্ন একজন ধাই ও একজন রাধুনী বামুন বর্ত্তমান।

লবঙ্গ ইহার আগে কখনও রাধুনী বামুন দেখে নাই, এই প্রথম দেখিল। তাহার বাপের বাড়ী পল্লীগ্রামে, শ্বশুর বাড়ীও তাহাই। এই দুই স্থানে সে কখনও দেখে নাই, পুরুষ মানুষ কাঁছাকোঁচা আঁটিয়া রান্না করে, আর বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বসিয়া বসিয়া খায়। —কিন্তু নিত্য দুই বেলা পুরুষ মানুষ হেসেল ঠেলে, লবঙ্গ এই প্রথম দেখিল।

লবঙ্গ প্রথম দিন রাধুনী বামুনের সম্মুখে ঘোমটা দিল, কেননা সে পুরুষ মানুষ। পুরুষমানুষ দেখিলেই ঘোমটা দিতে হয়, ইহাই সে বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছে। ললিতার মাতা সন্ধ্যাবেলা বলিলেন:

"কাকে দেখে ঘোমটা দিচ্ছিস্ লবঙ্গ'? লবঙ্গ হাসিয়া একটু অনুচ্চস্বরে বলিল: অত বড় মিন্‌সেকে দেখে কি ঘোমটা নাদিয়ে থাকা যায়?

—কে? ঐ ঠাকুরকে দেখে? আঃ! আমার পোড়াকপাল ওযে রাধুনী বামুন, উড়ে। ওকে দেখে ঘোমটা দিবি কিরে! ওতো সমস্ত দিনই থাকবে রান্নাঘরে, রান্না কর্ত্তে! তোমাকেও হয়তো সমস্ত দিন রান্না ঘরে আসতে হবে, এটা ওটা সেটা কর্ত্তে! তাহলে, কথা না কইলে কি চলে? আরও রাধুনী বামুন, ভিন্নদেশী লোক,—ওর সঙ্গে কথা কইতে দোষই বা কি?

—তা, পুরুষ মানুষ রাধে কেন? মেয়ে মানুষ তো রাধতে পারে না!

—তা কি হবে বলো! ললিতা তো আর হাড়ি ঠেলতে পারে না। ও বিয়ের পর থেকেই কখনও হাড়ি ঠেলে নি। একবার বুঝি রাধতে গিয়েছিলো, তা, জামাই ব'কে ঝ'কে একেক্কার কাণ্ড করেছে!

—কেন মা? জামাই বাবু বকলেন কেন?

—আরে, ওর কি আর রান্না বান্না করলে চলে? কোলে ছেলে রয়েছে, তার 'ওপর জামাইবাবুর কাপড় চোপড় ঠিক করে দেওয়া আছে! তার ওপর নাকি, নীরদ এক মাষ্টার ঠিক করে দিয়ে ছিলো, পড়াশুনা করবে ব'লে'! ললিতা যে দুটো পাশ দিয়েছে, তা বুঝি জানিস্ না?

—পাশ দিয়েছেন? কি, ইংরিজি?

—হাঁ, ইংরিজি! ললিতার লেখিকেও খুব মাথা আছে।

লবঙ্গ শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িল। মেয়েমানুষ দুটো ইংরেজি পাশ করিয়াছে, একথা সে এই নূতন শুনিল।

লবঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল "আচ্ছা, পুরুষ মানুষ রাধুনি না রেখে মেয়ে মানুষ রাধুনি রাখলে তো হয়।

লবঙ্গ যতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়াছিল, ললিতার মা ততক্ষণে তাঁহার তুলসীর মালা বাহির করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সেই মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে একটা হাই তুলিয়া বলিলেন: মেয়ে মানুষ রাঁধুনি পাওয়া যাচ্চে কোথায় বলো?

—কেন মা? পুরুষমানুষ রাঁধুনি পাওয়া যায়, আর মেয়েমানুষ রাঁধুনি পাওয়া যায় না?

—কই আর পাওয়া যায়? মেয়েমানুষ জাত ত আর স্বাধীন নয়! তার স্বামী আছে, পুত্তুর আছে, ঘরের পাঁচটা বাঁধন আছে। সে সব বাঁধন কেটে, পরের বাড়ী চাকরি করতে আসা, মেয়েমানুষের ঘটে ওঠে কই? পুরুষমানুষ স্বাধীন জাত, এক কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে! তাদের চাকরি করা সাজে! কাজেই পুরুষমানুষ রাঁধুনিই বেশী পাওয়া যায়।

—তাহ'লে মেয়ে মানুষ ঝি এত বেশী পাওয়া যায় কেন?

—তারা ছোট ঘরের লোক! এককথায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বামুনের ঘরের মেয়েরা, কি ভাল কায়েতের ঘরের মেয়েরাত তা পারে না!

—না খেতে পেয়ে, ঘরের ভেতর পচে মরবে, সেও ভাল! তবু ঘর থেকে বাইরে এসে, পরের বাড়ীতে চাকরি করে আপনার পেট্‌টা চালাবে, সেটা ভাল নয়?

—সে কথাটা কটা লোক বুঝচে বলো! নিজের বংশের মর্য্যাদা সকলেই ঠিক রাখতে চায়!

—আমি সেটা ভাল বুঝিনে মা! এই ধরুন আমারই কথা! আমি যদি আমার স্বামীর ঘরের মর্য্যাদা রাখতে গিয়ে তাঁর উঠোনেই পড়ে থাকতুম, তাহলে এতদিন সেইখানেই হাড় ক'খানা রাখতে হতো! আপনার পায়ের তলায় একটু ঠাঁই পেলুম বলেইতো এখনও বেঁচে আছি!

—তোর স্বামী কি তোকে দুটি খেতেও দিতে পারতো না?

—'দিতে পারতেন নাও বটে, দিতেনও না বটে! বলিয়া মুখখানি নত করিয়া, লবঙ্গ পায়ের বুড়া আঙ্গুলের নখ খুঁটিতে লাগিল।

আমি যে তোমারে বেসেছি ভালো

শ্রীঅমিয় মোহন বসু

ভালোবাসো আর নাই ভালবাসো

আমি যে তোমারে বেসেছি ভালো

আস বা না আস মোর পাশে কভু

প্রতীক্ষাতে মোর যাবে যে কাল।

একদা যখন নিয়েছিলে টানি,

দিয়েছিলে মোরে নতুন আলো

আজি ভুলে যাবে—যাও, ক্ষতি নেই মোর—

আমি ভুলে যাবো কেমনে বলো?

আহরণ করি' মম প্রাণ মধু

(এখন) ভ্রমর সম যাও চঞ্চল

তবে হেসেছিলে কেন রঙিন অধর নাড়ি'

কেন বলেছিলে বাসিগো ভালো?

কেন মোহন সুরে গেয়েছিলে গান

করেছিলে কেন আঁখি সজল

কেন এসেছিলে শান্ত মূর্ত্তি নিয়ে

প্রেম যদি মোর হবে নিস্ফল?
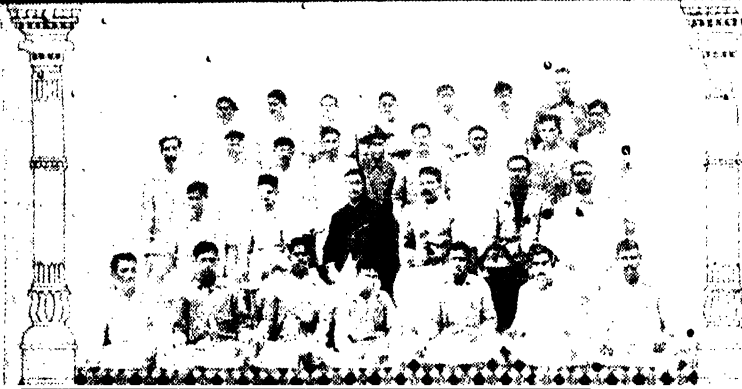
ললিতার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন: দিতেন না কথাটার মানে? ঘরে ভাত থাকতে, কে নিজের বউকে খেতে দেয় না?"

লবঙ্গ একথার কোনও উত্তর দিল না; শুধু আরক্তিম ঠোঁট দুইখানি উল্টাইল।

(ক্রমশঃ)

মরণ-আশিস

শ্রীদেবাশীষ সেনগুপ্ত

জনবিরল পথে কিছুকাল বিচরণ করিয়া আঁদ্রি সিন নদীর তীরে আসিয়া বসিল; দেখিল পাহাড়ের গায়ে প্রতিহত নদীর জল কিরূপ চিক্‌চিক্ করিতেছে—ঐখানে লুসি—তাহার প্রিয়া আশা আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করিত।

বহুদিন তাহাকে এরূপ শান্ত দেখা যায় নাই। ৮টার সময়ে সে স্নান করিয়াছে। তারপর আহারার্থ 'রয়েল প্যালেসে'র ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াছে, আর খাদ্য সামগ্রীর অপেক্ষাকালে সংবাদপত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছে। 'করবিয় দ্য লা ঈ গোসাইটী'তে ২৪শে ফ্লোরিয়েল এ সে 'প্রেস দ্য লা রিভলিউসন'এ বধ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পাঠ করিল।

বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়াছে। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পোষাক পরিচ্ছদে সৌষ্ঠব ও স্বচ্ছন্দের ছায়া আছে কিনা দেখিতে একটা আয়নায় দৃষ্টিপাত করিল। পরে সিন্ নদী ও মাজারাইন্ ষ্ট্রীটের কোণসংলগ্ন একখানি গৃহাভিমুখে মৃদুপায়ে প্রস্থান করিল। ওখানে বাস করেন নাগরিক সার্দ্দিলো—রাষ্ট্রবিপ্লবীয় বিচারসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধি অভিযোক্তা। আঁদ্রি তাকে জানে—অমায়িক ভদ্রলোক!—এ্যাজারসে খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী বিশেষ প্যারীতে সাধারণতন্ত্র অনুরাগী গোঁড়া নাগরিক।

ও ঘণ্টাধ্বনি করিল। কয়েকমিনিট নিস্তব্ধতার পর গর্ত্তের তক্তার পিছনে একখানি মুখ দেখা দিল;—নাগরিক সার্দ্দিলো তাঁর দর্শনপ্রার্থীর নাম ধাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া অবশেষে দরজা খুলিয়া দিলেন। মুখ তাঁর মাংসল, অত্যুজ্জ্বল বর্ণ, ঝকঝকে চক্ষু, স্বাস্থ্যে মুখ ও লাল লাল কাণ। তার আকৃতি স্ফূর্ত্তিবাজ লোকের মত—কিন্তু সময়-হিসাবী লোকটী। তিনি আঁদ্রিকে গৃহের প্রথম কক্ষে লইয়া গেলেন।

ছোট্ট একটী গোল টেবিলের উপর দুজনের আহার প্রস্তুত। আঁদ্রি লক্ষ্য করিল—একটা মোরগ, একখণ্ড ঝলসান মাংস, খানিকটা শূকরমাংস একপাত্র ফ'গ্রাস্ পনীর ও একডিস ঠাণ্ডা কচি গোমাংস।

কক্ষভূমে ছ'টা মদের বোতল একটী ঝুড়িতে ঠাণ্ডা হইতেছিল। একটী আনারস, পনীর ও সুরক্ষিত ফল ইত্যাদি ঢাকনায় আবৃত। অসংখ্য কাগজে জড়ান মদের ফ্লাস্ক ডেস্কের উপর স্থাপিত। পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের অর্দ্ধরুদ্ধ দরজা দিয়া একটী অনাবৃত বিছানা দেখা যাইতেছে।

"নাগরিক সার্দ্দিলো"—আঁদ্রি বলিল—"আমি আপনার কাছে একটী অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে এসেছি।

নাগরিক! যদি তার দ্বারা জনসাধারণের বিপদগ্রস্ত হবার আশঙ্কা না থাকে তবে আমি মঞ্জুর করতে প্রস্তুত!"

"যে অনুগ্রহ আমি আপনার নিকট প্রত্যাশী"—মৃদু হাস্যসহকারে আঁদ্রি বলিল—"সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের ও অপনার নিজের নিরূপত্তার সঙ্গে মিলে যাবে।"

সার্দ্দিলোর নিকট হইতে সঙ্কেত পাইয়া আঁদ্রি বলিল "নাগরিক প্রতিনিধি! আপনি জানেন ছ'বৎসর যাবৎ আমি আপনার বন্ধুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছি আর আমি—আমিই 'আতঙ্কের বেদী' নামক প্রবন্ধের প্রণেতা। আপনি আমায় গ্রেপ্তার করলে আমায় কোনও দয়া দেখানো হবে না। তাতে আপনি আপনার কর্ত্তব্যসম্পাদন করবেন মাত্র। সেরূপ অনুগ্রহ আমি প্রার্থনা করি না। কিন্তু শুনুন! আমি প্রেমোন্মত্ত! আর আমার প্রণয়িনী কারাগারে আবদ্ধ।"

সার্দ্দিলো শির নত করিয়া দেখাইলেন যে এরূপ মনোভাব তিনি অনুমোদন করেন।

"আমি জানি আপনি সহানুভূতিসম্পন্ন ভদ্রলোক, নাগরিক সার্দ্দিলো—আপনার কাছে আমার এই ভিক্ষা—আমি যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন—এখুনি আমাকে 'সাইরয়'এ পাঠিয়ে দিন!

"হাঃ! হাঃ! হাঃ!"—চতুর মৃদুহাস্যে অধর রঞ্জিত করিয়া সার্দ্দিলো বলিলেন—"জীবনের চেয়েও বেশী কিছু তুমি চাইছো নাগরিক! এযে সুখ!" তারপর শয়ন কক্ষের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে যেন কাহাকে আহ্বান করিলেন—"এপিক্যারিস! এপিক্যারিস!"

ঘনকৃষ্ণ কেশদাম—নগ্ন বাহু ও গ্রীবা মাথায় একগোছা কৃত্রিম ফুলসহ প্রবেশ করিল একটী মেয়ে।

"আমার প্রেয়সী!" জানুর 'পরে আকর্ষণ করিতে করিতে সার্দ্দিলো তাঁহাকে বলিলেন—এই নাগরিকের মুখপানে চেয়ে ছাখ!—কোনওদিন ভুলবে না। আমাদেরই মত এপিক্যারিস! ওর অন্তর সুমহান-ভাবপরিপূর্ণ! আমাদের মত ও'ও জানে বিরহ অন্য সকল দুঃখের চেয়েও বড়। ও ওর প্রণয়িনীর সঙ্গে কারাগারে—হ্যাঁ গিলোটিনেও যেতে চায়। এপিক্যারিস!—আমরা কি ওর এই প্রার্থনা না মঞ্জুর করে থাকতে পারি?

"না—" রাষ্ট্রবিপ্লবীয় নেতার গণ্ডে

কঠিন হস্তে আঘাত দিতে দিতে মেয়েটী বলিল।

"তুমি বলেছ আরাধ্যা দেবী আমার! এই দু'জন বিশ্বস্ত প্রেমিকপ্রেমিকাকে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করা উচিত। নাগরিক আত্রি! তোমার ঠিকানা দাও, আজ রাত্রেই তুমি সুখে নিদ্রা যাবে—কারাগারে!"

"তাই ঠিক রইলো"—আত্রি বলিল।

"তাই ঠিক রইলো" হস্তপ্রসারণ করিয়া সার্দিলো বলিলেন—"যাও, তোমার প্রিয়াকে আবার খুঁজে বের কর। আর তাকে বলো সার্দিলোর বাহুমধ্যে তুমি দেখেছো এপিক্যারিসকে! এই দৃশ্য তোমাদের অন্তরে যেন বহু বহু উজ্জ্বল ভাবধারার সৃষ্টি করে।"

আত্রি উত্তর দিলো সম্ভবতঃ তাদের ভাগ্যে আরও হৃদয়স্পর্শী মূর্ত্তির দর্শনলাভ ঘটিতে পারে...কিন্তু সে কৃতজ্ঞও কম নয়। প্রতিদানে সে কোনও কিছু করিতে পারিবে, এমন আশা নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল।

"মনুষ্যত্ব পুরস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে না" সার্দিলো বলিলেন। তিনি উঠিলেন এবং এপিক্যারিসকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আরও বলিলেন "কে জানে কখন আমাদের পালা আসবে? এখন—এস—পান করা যাক্! নাগরিক! এ ভোজের অংশ তুমি নেবে কি?"

"কি চমৎকার হবে!" বলিয়া এপিক্যারিস বাহুপাশে আবদ্ধ করিল আত্রিকে। কিন্তু আত্রি নিঃশব্দে সরিয়া গেল—শুধু বহন করিয়া লইয়া চলিল প্রতিনিধি অভিযোক্তার প্রতিজ্ঞাটী।*

* আনাতোল ফ্রান্স্।

———

শ্রীদুর্ব্বাসা
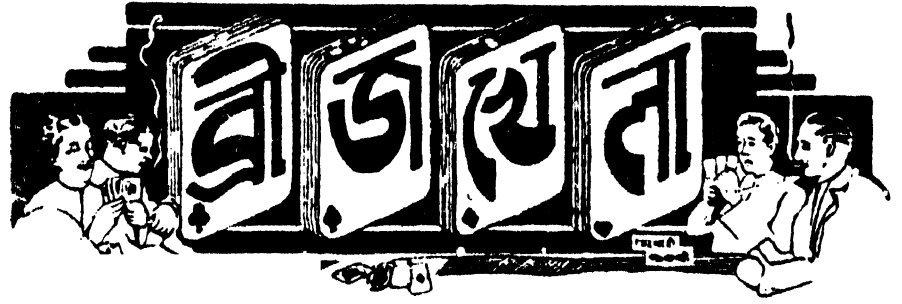
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রীজ খেলার নানাবিধ সমস্যা

নিম্নের হাতখানি ও তার ডাক দেখুন,—

ইস্কাবন—পঞ্জা।

হরতন—সাহেব, আটা, চৌকা।

রুহিতন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, ছুরি।

চিড়িতন—সাহেব, দশ, নয়, সাতা।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, ছক্কা, চৌকা, তিরি

হরতন—টেক্কা, বিবি, পঞ্জা।

রুহিতন—পঞ্জা।

চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, পঞ্জা, তিরি।

ডাক হয়েছিল,—

'দ'	'উ'
একটি ইস্কাবন।	দুইটি রুহিতন।
তিনটি চিড়িতন।	চারটি চিড়িতন।
চারটি ইস্কাবন।	পাঁচটি চিড়িতন।
পাশ।	

রুহিতনের সাহেব পেড়ে প্রাথমিক চাল দিয়ে পিট নিয়ে 'প' হরতনের দশ পেড়ে খেললেন। হরতনের টেক্কা দিয়ে পিটখানি ধরে রঙকর্ত্তা ইস্কাবনের টেক্কার পিট নিলেন। অতঃপর ইস্কাবন খেলে 'ডামি'কে দিয়ে তুরূপ করালেন। তৎপরে রুহিতন খেলে নিজের হাতে তুরূপ করলেন এবং ইস্কাবন খেলে 'ডামি'কে দিয়ে তুরূপ করালেন। এ স্থলে যদি ইস্কাবনের সাহেবখানি পড়ে যেত এবং ৩—২ হিসাবে যদি চিড়িতন বিভক্ত হত তাহলে ছয়খানি পিট অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে শেষবারে 'পূ' গোলাম দিয়ে ডামির তুরূপের উপর তুরূপ করলেন এবং একতাস রঙ খেলে দিলেন। এই খেলার পর ডাকদার একখানি ইস্কাবনের পিট প্রতিপক্ষকে দিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

তৃতীয়বার চাল দেবার পূর্ব্বে ডাকদার যদি এক মুহূর্ত্ত ভেবে দেখতেন, তাহলে তাঁকে এ অবস্থায় পড়তে হত না। এ হাতে ইস্কাবনে খেলা ঠিক নয়, রুহিতনে খেলাই যুক্তি সঙ্গত। তিনবার রঙ খেলে নিয়ে, 'ডামি'র হাতে সাহেব দিয়ে পিট ধরানোর পর 'প'কে রুহিতনে একখানি পিট দেওয়া ভাল তা'হলে এ খেলায়

কোনরূপ খেঁসারৎ দিতে হত না। এই ভাবের খেলা ব্যর্থ হত যদি প্রতিপক্ষের হাতে রঙের বিভাগ হত ৪-১ ধরণের; আর সে ক্ষেত্রে কোন উপায়ে খেলা করা সম্ভবপর কি না সন্দেহ। সম্পূর্ণ হাতখানি এইরূপ,—(নিয়ে দেখুন)

The Salikha Bandhab Samity ;—এই সমিতির পরিচালনায় একসঙ্গে দুইটী প্রতিযোগিতা বাহির হচ্ছে; সেগুলি যথাক্রমে, auction (single) এবং contract (Duplicate)। contract (Duplicato) প্রতিযোগিতা এদের সমিতির এই প্রথম। এই নূতন ধারায় ব্রীজ প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তনে অগ্রসর হয়েছেন বলে ব্রীজ প্রেমিকদের ধন্যবাদার্হ। তবে একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে মন গড়া আইন না করে এরা প্রচলিত নিয়মানুসারে contract Duplicate এর খেলাগুলি সম্পূর্ণ করেন।

ইস্কাবন—পঞ্জা।
হরতন—সাহেব, আটা, চৌকা।
রুহিতন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, ছুরি।
চিড়িতন—সাহেব, দশ, নয়, সাতা।

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, দশ, নয়, আটা।
হরতন—দশ, তিরি।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, আটা, ছক্কা।
চিড়িতন—আটা, চৌকা।

উ
প পূ
দ

ইস্কাবন—সাতা, ছুরি।
হরতন—গোলাম, নয়, সাতা, ছক্কা, ছুরি।
রুহিতন—সাতা, চৌকা, তিরি।
চিড়িতন—গোলাম, ছক্কা, ছুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, ছক্কা, চৌকা, তিরি।
হরতন—টেক্কা, বিবি, পঞ্জা।
রুহিতন—পঞ্জা।
চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, পঞ্জা, তিরি।

মিলন

শ্রীহিল্লোল কুমার মিশ্রী

সেই সেদিনের স্পর্শ তোমার
সেই সেদিনের বাণী—
সেই সেদিনের মধুর হাসি
আমায় যে নেয় টানি'—
আবেশ ভরা স্বপন মাঝে
মন—উদাস করে সকল কাজে
দিনের আলোয় খুজে ফিরি
রাতের অন্ধকারে—
তোমার সাথে মিলন যে মোর
হয়গো বারে বারে!
বাস্তবের ওই কঠিন পাতে
চোখের স্বপন কী ধারাতে
অঙ্কিত হয় বুঝতে নারি
মনের দিকে চেয়ে—

ছন্দহারা কল্পনাতেই
হৃদয় আছে ছেয়ে!
ওগো প্রিয়া ওগো সখী
পালিয়ে বেড়াও দূরে থাকি'
পাইনে পরশ আরেক দেখা
আধেক' জানাজানি—
আধেক তোমার স্পর্শ রাশি!
আধেক চক্ষু হানি!
সমুখেতে হঠাৎ এসে
পালিয়ে যাও মিষ্টি হেসে
সকল তাতেই পরশ রেখে
হরষ ভরে যাও—
অলক দোলে হাওয়া তরে
আবেশে গান গাও!
তব-করচ্যুত গোলাপগুলি
বায়ু ভরে বেনী খুলি'
ঝরে যে ফুল লইগো তুলি'
বুভুক্ষিত প্রায়—
কেশ গন্ধ বায়ু মাঝে
স্বপ্ন এঁকে যায়!
বকুল ঝরে গাছের তলে
বাঁধের জল ছল ছলে—
প্রতীক্ষাতে
রঙীন

শরৎচন্দ্র ও নারী

শ্রীযতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাঙলারে—যাহা তুমি করিয়াছ দান,
পৃথিবীতে—নাহি কিছু তাহার সমান।

রুশীয়ার টলষ্টয়, গর্কী যেমন ঘা মেরে—জাগিয়েছেন জাতিকে, চেতনা এনেছেন সর্ব্বহারা সম্প্রদায়ের অন্তরে; প্রেরণা দিয়েছেন প্রতিষ্ঠার। শরৎচন্দ্রও তেমনি দেখিয়েছেন আমাদের বাঙলার সত্যিকারের সমস্যাকে, সমাজের দুষ্টনীতির পঙ্কিলতাকে; নারীর প্রতি অমানুষিক অবিচারের দৃশ্যকে।

শুধু সমস্যার চিত্র এঁকে কিম্বা তার প্রতি দরদ দেখিয়ে তিনি চুপ ক'রে ব'সে থাকেন নি; সংগ্রাম ক'রেছেন অক্লান্ত ভাবে। এজন্য তাকে কত কটূক্তি, কত গঞ্জনাই না ক'রতে হ'য়েছে সহ্য।

তখনকার আবহাওয়া আর আজকের অবস্থা এক নয়; 'চরিত্রহীন' প্রকাশ ক'রতে কত বেগই না তাকে পেতে হয়েছে। স্বর্গীয় সুরেশ সমাজপতি ছিলেন সে দিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমাজদার। শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপী পড়ে বুঝলেন পৃথিবীতে দ্বিতীয় নুট হামসুনের উদ্ভব সুনিশ্চিত। তিনি সাগ্রহে উপেন্‌বাবুকে অনুরোধ জানালেন: শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎ চাই; যে ক'রেই হোক তাঁকে নিয়ে আসতে হবে আমার কাছে। কিন্তু লোভনীয় রচনা হ'লেও তাঁর 'সাহিত্য' প্রকাশ ক'রবার মত সাহস সংগ্রহ ক'রতে পারেন নি।

এর আগেই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হ'য়েছিল শরৎবাবুর 'বড় দিদি'। যে রচনাকে অনেকেই মনে এঁকে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব'লে, এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে সীলার এবং গ্যেটের কথা। অবশ্য গতির দিক দিয়ে সীলার ও শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শরৎচন্দ্র চাইতেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে; ছিলনা কোন প্রকার লোভ। সীলারের অভিপ্রায় অন্য প্রকার।

গ্যেটে তখন জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁর উচ্চতার নিচে সবাই অন্ধকার; যেমন এখন বাঙলার কবিকুলের অবস্থা, সীলারের আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচুর; তিনি গ্যেটের নামে লিখলেন এক গ্রন্থ। সবাই লুফে নিল তাকে। গ্যেটে ব'ললেন: 'এ বই আমার লেখা নয়; যাঁর ভাষার রেখায় এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে তিনি সামান্য নন। এই দিনই হ'য়েছিল সীলারের প্রতিষ্ঠা।

বড় দিদি ভারতীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'য়েছিল। প্রথম সংখ্যায় কারো নাম না থাকায়, প্রত্যেকের ধারণায় এরূপ একটা কল্পনা আসে,—রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কে এমন স্বচ্ছন্দ গল্প লিখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তখন বঙ্গদর্শন সম্পাদক; পরিচালক শ্রীযুত শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ ক'রলেন: 'এ আপনার বড় অন্যায়, নিজের কাগজে রচনা না ছাপিয়ে অপর স্থানে প্রকাশ করা।' রবীন্দ্রনাথ 'প্রথমে বুঝতে পারলেন না, পরে যখন জানলেন, ভারতীর বড় দিদির কথা হ'চ্ছে; তখন উত্তর দেন: 'ওই গল্পটী আমার লেখা নয়; আমি প'ড়ে দেখেছি, শক্তিশালী রচনা। খুব লোভ হয়, কিন্তু ও যখন আমার কল্পনা প্রসূত নয় এবং ভাষায় রূপ পায়নি, তাতে কি করে বলি উহা আমার?'

'ভারতবর্ষ' তখন শিশু। 'জি-ডি-চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্সের পক্ষ হ'তে শরৎ বাবুর কাছে প্রায়ই তাগিদ যেতো লেখার জন্য; দুঃখের বিষয় চরিত্রহীনের বেলায় তাঁরাও বুকে বল পাননি তখন। পরে উহা যমুনায় ক্রমে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

এ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে কিরূপ প্রতিকুল অবস্থার ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রতে হ'য়েছিল। এর পরে এলো সমালোচনা এবং স্নেহের ঝাপটা; কুলাঙ্গার' ব'লতেও তাকে কেউ কেউ কার্পণ্য করেন নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯২৮ সালে শরৎ বাবুর এক সেট বই ক্রয় করায় আমার একজন বন্ধুর পিতা তার ছেলেকে ব'লেছিলেন: হতভাগা শরৎচন্দ্রের মত কুলাঙ্গারের বই পড়ে তার সাথে তুমি মিশতে পারবে না।' শরৎ বাবুর প্রতি রক্ষণশীলদের মনোভাব এ সব ব্যাপার হ'তেই অনুমান করা চলে!

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সমুহতে রূপ পেয়েছে বাঙলার নারীর সত্যিকারের অবস্থা, তাদের গতি এবং অভাব অভিযোগ। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতী এবং নিস্কৃতিতে নারীর বাৎসল্যতার চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে, চরিত্রহীনের কিরণময়ীর চরিত্রে সন্ধান পাই আমরা নারী কেন পরপুরুষের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং এজন্য দায়ী কে। গৃহদাহ দেখিয়েছে পদস্খালনের কারণ; দেবদাস এবং বড়দিদি প্রেমের অমর চিত্র; শেষ প্রশ্নের কমল দীপ্ত উন্নত মস্তকে চায় অবিচারের প্রতিকার।

শরৎচন্দ্র 'Art for Art sake' বাদী ছিলেন না, তিনি চেয়েছেন রুষ সাহিত্যিকদের মত দেশের এবং জাতির সংস্কার।

'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামক তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় তিনি স্বীকার ক'রেছেন; 'আমি আর্টের জন্য আর্ট—বাদীদের দলে নই; যতদিন না আমাদের সাহিত্য রুশীয়ার ধারায় চলে ততদিন উন্নতির আশা নিষ্ফল।'

'নারীর মূল্য' অধ্যয়ন করলে দেখা যায় নির্য্যাচিতা এবং চির বঞ্চিতা নারী জাতির প্রতি তাঁর দরদ কত ছিল। উপন্যাসকে কল্পনার ফুল ব'লে সমাজ উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু নারীর মূল্যের ঐতিহাসিক সত্য কিরূপে অস্বীকার করা যায়; সত্যি-কারের এ চিত্রকে তো মিথ্যা বলা চলে না। প্রায় ঐতিহাসিক যুগ হ'তে এ পর্য্যন্ত নারী হ'য়ে এসেছে কেবলই উপেক্ষিত; তার কোন সত্তা নেই, অধিকার নেই—সুখের সামগ্রী মাত্র। সে যেন মানুষ নয়; তার যেন আত্মা নেই, বাসনা থাকা অন্যায়; ভোগ তার পক্ষে পাপ। পুরুষের আশ্রয়ে তাকে দিন কাটাতে হবে; পুরুষ কর্ত্তৃক যেকোন প্রকার নির্য্যাতন নীরবে সহ্য ক'রে চ'লতে হবে; প্রতিবাদ চলবে না। শরৎচন্দ্র চেয়েছেন এর প্রতিকার।

সোপেনহারের পৈশাচীক শাসন নীতি শরৎচন্দ্র বরদাস্ত করতে পারেন নি; জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত মানবতার দিক দিয়ে বিচার ক'রে তিনি চেয়েছেন নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার। পুরুষ যা ক'রতে পারবে নারীরও সে অধিকার থাকবে; তার জন্য নাক সেঁটকানো চ'লবে না। স্বদেশ ও সাহিত্যে তাই অনেক ব্যথায় ব'লেছেন: নারীর দোষ-গুণ বিচার করবার আগে আমাদের দেখা উচিৎ তাকে আমরা কি দিয়েছি।' যে সত্যিকারের অধিকারী হ'য়ে রিক্ত, তার বিচার করা নিতান্ত অসঙ্গত। আগে দিয়ে দেখ, তারপর বিচার কর সে সংযত না উশৃঙ্খল।

শ্রীমল্লিনাথ

কাঁথিতে বঙ্কিম শতবার্ষিকী জন্মোৎসব

বন্দেমাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের শত বার্ষিকী জন্মোৎসব কাঁথিতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। নব ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে কাঁথির একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। তাই ভারতের জাতীয় জীবন যজ্ঞের বিশিষ্ঠ পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব কাঁথিতেই সর্ব্বপ্রথমে অনুষ্ঠিত হোল—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিগত বৎসরের সভাপতি মনিষী হীরেন্দ্রনাথ বেদান্তরত্নকে প্রধান ঋত্বিক নির্বাচিত করে কাঁথিবাসীগণ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে এই সুপবিত্র যজ্ঞ সমাধা করেছেন। কাঁথির এই ষষ্ঠ দিন ব্যাপী মঙ্গল—উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হোল।—

বিগত ২০শে জানুয়ারী প্রভাতে কাঁথিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হয়। এই সভায় সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন।

ঐ দিন অপরাহ্নে নব নির্ম্মিত বঙ্কিম তোরণের দ্বার হীরেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত হয়। এতদুপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত কৃষি ও শিল্প মেলার ঐ সময়ে উদ্বোধন হয়। পরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কাঁথির প্রথিতযশা ঐতিহাসিক "মেদিনীপুরের ইতিহাস" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু বিদ্যাবিনোদ তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষনটি পাঠ করেন। তারপর মূল সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সহিত মেদিনীপুরের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সুন্দর, বক্তৃতা প্রদান করেন।

২১শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ডাক্তার কালীদাস নাগ এম, এ, ডি, লিট, "বঙ্কিমচন্দ্র" সম্বন্ধে কাঁথিবাসীকে অনেক নূতন কথা শোনান। এবং তৎপরে হীরেন্দ্রনাথ "দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র" নামে একটি অতি মূল্যবান সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সভায় দশ হাজারের বেশী লোক হওয়ায় লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

২২শে জানুয়ারী প্রভাতে কাঁথি হইতে দ্বাদশ মাইল দূরবর্ত্তী দারিয়াপুর গ্রাম পর্য্যন্ত (এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা পরিকল্পিত হ'য়েছিল) একটি বিরাট শোভা-যাত্রার বন্দোবস্ত করা হয়। বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের মত এমন অকৃপণ উদারতা, সত্যের জন্য কঠোর সংগ্রাম পৃথিবীতে খুব কম ব্যক্তিই ক'রেছেন। বাঙলার রামমোহন, কেশব চন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নারী জাতির উপর বিশেষ সহানুভূতি সম্পন্ন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত একান্ত পূজারী কিনা তা অপ্রকাশ্য। তিনি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে বাঙলার যে সংস্কার সাধন ক'রেছেন, সে অকল্পিত। একমাত্র রুষ সাহিত্য ব্যতীত শরৎ সাহিত্যের সাথে কোন সাহিত্যের তুলনা আনা চলে না; এ এক অভিনব।

ঐদিন শোভাযাত্রার অগ্রণী হ'য়ে দারিয়াপুরে গমন ক'রে সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বেদীমূলে সমবেত কাঁথিবাসীর ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেন।—

ঐদিন অপরাহ্নে কাঁথিতে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয়।

পরদিন ২৩শে জানুয়ারী কাঁথির বিবিধ থানায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা প্রচুর আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হয়। এগরা থানায় (এখানে রাজকার্য্য উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক দিন ছিলেন—তখন এর নাম ছিল নেগুয়া) বঙ্কিম পূজা অতি শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন হ'য়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত আনন্দ লাল মুখোপাধ্যায় এই সভায় পৌরহিত্য করেছিলেন। আমাদের ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়শেনের সহকারী সভাপতি সুকবি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু এতদুপলক্ষে এখানে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার অনিবার্য্য কারণে এই সভায় উপস্থিত হ'তে না পেরে দুঃখ প্রকাশ ক'রে পত্র লিখেছিলেন।

২৪শে জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে বঙ্কিম নগরে কাঁথি মহকুমার দশটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে একটি তর্ক প্রতিযোগিতা (Debating) ও পাঠ প্রতিযোগিতা (Reading) হয়। অপরাহ্নে হয় শিশু প্রদর্শনী (Baby Show)

২৫শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল প্রকার প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণকে ও শিল্পী কৃষিমেলার উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ম্মাতাগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী শ্রীযুক্তা অমিয়া রাও সকলকে পুরস্কার প্রদান করেন। একটি শীল্ড, ২টী কাপ, ৪০টী মেডেল এবং নানাবিধ সুচারু ক্রীড়া-দ্রব্য এই উপলক্ষে পুরস্কার প্রদত্ত হয়েছিল।—

মাষ্টার সাহেব—ইহা একখানি উপন্যাস—শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মাষ্টার সাহেব বাঙ্গালী। পশ্চিমবঙ্গের কোন এক গ্রাম্যস্কুলে হেড মাষ্টারী করিতে আসেন। স্ত্রী আধুনিকা। মেম সাহেব বলিয়া না ডাকিলে তিনি চটিয়া যান। কন্যা মিনতি অবিবাহিতা। তাহার বিবাহের ভবিতব্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই উপন্যাস। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী পাণিপ্রার্থী। একজন সব ডেপুটি, অপর জন উক্তগ্রামের প্রতিপত্তিশালী যুবক জমিদার। কন্যার মাতা জমিদারের পক্ষপাতী, পিতা ডেপুটির। পাত্রী মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। তবে হাবভাবে বোঝা যায় যে, সে ডেপুটিরই অনুরাগিনী। ডেপুটি কন্যার মাতাকে স্পষ্ট করিয়া একথা জানাইতে আসিয়া অপমানিত হইয়া ফিরে। পরে এক ভিখারীর মুখে জমিদারের গুণপণা কীর্ত্তিত হয়। চরিত্রহীন মাতাল জমিদারের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না—একথা মাষ্টার সাহেব গৃহিণীকে শেষবার জানাইয়া দেন। ইহা জমিদারেরও কর্ণগোচর হয়। গহিতকর্ম্মা জমিদার ছল-কৌশলে মাষ্টার সাহেবকে জেলে দেয় ও তাঁহার বাড়ীতে আগুন দিয়া মিনতিকে পোড়াইয়া মারে। ইহাই হইল গল্পের মোটামুটি বর্ণিত ঘটনা। ছোট হইলেও ভিখারীর কারুণ্যের প্রতীকটি ভালো ফুটিয়াছে। আদর্শ হইতে হইলে মানুষের কি কি গুণ থাকা উচিত—গ্রন্থকার গল্পের ভিতর দিয়া তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। আধুনিক চরিত্র সৃষ্ট হইলেও ভাষা ও তাহার প্রকাশ ভঙ্গী আধুনিক হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাই গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। ১৬০ পৃষ্ঠার বই—মূল্য দেড়টাকা।

কাঁথির জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, জি, রাও আই, সি, এস এবং তাঁহার বিদুষী সহধর্ম্মিণী মহোদয়ার চেষ্টায় ও যত্নে এবং কাঁথির অক্লান্তকর্ম্মী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন দুর্গাপদ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রাণপাত পরিশ্রমে এই উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজার জন্য এরা যে ভাবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা প্রশংসনীয়।

ছন্নছাড়া

শ্রীসুধাংশু কুমার মুখোপাধ্যায়

সেদিন দুপুর বেলা—একটা বই শেষ ক'রে, লক্ষ্মী আর কিছু করবার কাজ হাতে না পেয়ে, গান ধর্লে অর্গ্যানের সঙ্গে,—"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে—।" মাঝ পথে সে বাধা পেলে, সেই ঘরে অজয় সেনের আকস্মিক আবির্ভাবে। অর্গ্যানের চাবিগুলো এলোমেলো ভাবে টিপে, লক্ষ্মী অজয়ের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে বল্লে, 'এ সময় হঠাৎ কি মনে ক'রে অজয়বাবু?" অজয় একটি সোফার একধারে বসে পড়ে, আন্‌মনা ভাবে বল্লে, 'একে বিদেশ, তার ওপর হাতে কোন কাজ নেই ঘরের কোণে একা চুপ্‌চাপ বসে থেকে কি করবো বলুন? তাই—" বাহিরে থেকে এক ঝলক শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকলো। লক্ষ্মী উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'উঃ—কি ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে আজ—সার্সীটা বন্ধ করে দি, কি বলেন?" "দিন্—আপনাদেরও ঠাণ্ডা লাগে? দার্জ্জিলিং এর বাসিন্দা হয়েও? আমাদের ঠাণ্ডা লাগাটা স্বাভাবিক, আমরা আসি বৎসরে একবার, অন্য দেশের গরমটাকে ফাঁকি দেবার জন্য।" লক্ষ্মী সার্সীটা বন্ধ করে ফিরে এসে হেসে বল্লে, যখন শীত কম থাকে, সেই সময়েই আমরা ঠাণ্ডাটা একটু অনুভব করি।" অজয় হাসলে, "সেইটাই হওয়া সম্ভব,—দেখুন না, আপনার কাছে যা কম, সেই শীতে আমায় পরতে হয়েছে ওয়েষ্ট কোট, কোট,—অথচ আপনি দিব্যি প'রে আছেন, সিল্কের ব্লাউজ আর নীলাম্বরি। বেশী ঠাণ্ডা পড়লে, তখন আপনার এ পোষাক আর চলেনা নিশ্চয়?—তখন যা পরেন, তাতে একটুও ঠাণ্ডা গায়ে লাগতে পায় না আর কি—তাই খুব শীতে আপনাদের শীত করে না, অথচ অল্প ঠাণ্ডা অনুভব করেন।" লক্ষ্মী অর্গ্যানের সামনে টুলটার ওপর বসলো, "তা ঠিক বলেছেন—" তার কথায় বাধা দিয়ে অজয় বল্লে, "যাক্—যে গানটা গাইছিলেন, গান ত' শুনি পুরানো, তা হলেও আপনার গলায় গানটা যেন নূতন লাগছিল।" অজয়ের অনুরোধে লক্ষ্মী আবার গান ধর্লে। গান শেষ হওয়ার সঙ্গেই হঠাৎ অজয় বলে উঠলো, "দেখুন,—প্রথম দিন থেকেই যেদিন আপনাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল,—আমার আপনাকে মনে হচ্ছে, যেন কত কালের চেনা, কতবার আপনাকে দেখেছি। আচ্ছা, আপনারা দার্জ্জিলিংএ আসবার আগে কোথায় ছিলেন বলুন ত'? আশোকবাবুর সঙ্গে আপনার বিয়ে—মানে আপনি মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি হয়েছেন কতদিন?" অজয়ের কথা বলার ভঙ্গিমায় লক্ষ্মী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলো মাত্র, কিছু বল্লে না। অজয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো এই কথাগুলো বলে বিনীতভাবে সে লক্ষ্মীকে বল্লে, "রাগ কর্লেন নাকি? দয়া করে কিছু মনে করবেন না,—আমি একটু সরল ভাবে কথা বোলতে ভাল বাসি, কেন না দুনিয়ায় আমার আপনার কেউ নেই—যার সঙ্গে মিশি, তাকেই আপনার ভাবি, অতি সহজ, সরলভাবে তার সঙ্গে কথা বলি।" একটু থেমে অজয় আবার বল্লে, "আমার জীবনের ইতিহাস,—আচ্ছা, আপনাকে বলব, তাহ'লে আর কোনদিন আমার ওপর আপনি রাগ কর্ত্তে পারবেন না। লক্ষ্মী ভাবলে, মন্দ কি, বসে বসে কতকগুলো আজে বাজে কথা বলা বা শোনার চেয়ে, একজনের জীবন ইতিহাস শোনা ঢের ভাল। লক্ষ্মী একটি সোফায় গিয়ে বসলো, 'না আমিত' রাগ করিনি—বলুন আপনার জীবনের ইতিহাস আমি শুনি।" অদূরে পাহাড়ের গায়ে জড়ানো মেঘের স্তরের দিকে চেয়ে, অজয় বলতে সুরু কর্লে—"আজ আঠারো বৎসর আগে একটি মেয়েকে আমি ভাল বেসেছিলুম, সেও আমাকে ভালবাসত—প্রাণ দিয়ে। সে ছিল খ্রীষ্টান, তবে বাঙালী আর আমি হিন্দু। আমার বাবা, তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। আমার আর রুবির এই মেলামেশার কথা কোন এক কুক্ষণে বাবার কানে ওঠে, তিনি বহুবার আমায় নিষেধ করেছিলেন, রুবির সঙ্গে মিশতে, আমি তাঁর কথা অনুযায়ী চলতে পারলুম না, তার ফলে—চার বৎসরের একটি ছোট ফুটফুটে বোন তাকে আমি খুব ভালবাসতুম, সেই বোন, আর আর ভাই বোন ও বাপ, মা ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াতে হ'ল একা—বাবারই হুকুমে। এত তিনি রেগে ছিলেন আমার ওপর যে, সেদিন তিনি আমায় একথাও বলেছিলেন, আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও—এ বাড়ীর কেউ নও, কোন দিন যেন তোমার মুখ না দেখতে পাই—তোমার কোন চিহ্ন এখানে না থাকে। ভবিষ্যতে কারো কাছে আমার পরিচয় দিও না, তাতে আমার মাথা নীচু হবে। বাবার সেই কথাগুলো, আজও আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি,—বড় ব্যথায় বড় অভিমানে। যাক্—রুবি যখন শুনলে আমার এই অবস্থার কথা,—আমায় স্থান দিলে তাদের বাড়ীতে, অবশ্য তার বাপ মা'র মতে। পরে, তাদের ঐ চেষ্টায় মাস খানেকের মধ্যে আমি একটি চাকুরী পেলুম—রেঙ্গুনে। যখন আমি আর

রুবি রেঙ্গুন যাত্রা করলুম তখন আমরা বিবাহিত। আত্মীয় স্বজন, সমাজ, বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে সেই সুদূর রেঙ্গুনে—মনে কর্চ্চেন আমার খুব কষ্ট হত মোটেই নয়,—সবার স্নেহ নিয়ে আমায় ভালবাসত রুবি, খুব শান্তিতে ছিলুম, শুধু মাঝে মাঝে কষ্ট পেতুম, মার কথা মনে করে, আর সেই ছোট বোনটির কথা, যখন নির্জ্জনে বসে কিছু ভাবতুম, মনে হ'ত তার কচি হাত দুখানা, আমার মথার কোঁকড়া চুলগুলোকে সোজা করবার নিষ্ফল চেষ্টা পাচ্ছে, আমি চমকে পিছন ফিরে চাইতুম। রুবি আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেই বুঝতো, আমি ভাবছি আমার বড়ীর কথা; সে আমার মাথাটা তার বুকের ওপর চেপে ধরে বলতো, 'সত্যি আমার জন্যে সব ছেড়ে এসে তুমি খুব কষ্ট পাও না ডার্লিং? আমি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতুম, 'না সুইট! এ অশান্তিময় জগতে তুমি আমার একমাত্র শান্তি। কয়েক বৎসরের মধ্যে, আমি আমার বাড়ীর কথা প্রায় ভুলে গেলুম. সেই সময়টুকু ছিল আমার জীবনের পরম শান্তি। কিন্তু এ শান্তিটুকু সহ্য হ'ল না বিধাতার, একদিন রুবিও বিদায় নিলে, আমার কাছ থেকে, দুনিয়ার কাছথেকে। আমার জীবনের একমাত্র শান্তি একটি অবলম্বন, তাকেও হারালুম। তারপর একটি বৎসর যে কি ভাবে কেটে গেছে, তা' আমি জানিনা। সন্ধ্যার মৃদু হাওয়ায়, পাতার মর্ম্মরে শুনতে পেতুম রুবির কথা, সেই মৃদু কণ্ঠের ডাক, আর রাতের বাতাসে জেগে উঠতো কার দীর্ঘশ্বাস, হয়তো আমার বাবার। আমার মায়ের। একদিন মনে হ'ল ফিরে যাই আমার ঘরে। আমার বাবা, মায়ের কোলে। আজ ত' রুবি নেই, স্বর্গের দেবী সে, আমার সব কিছু পাপ সেত মুক্ত করে দিয়ে, মুক্তি নিয়েছে। শেষে সত্যি ফিরে এলুম; আমার বাবার দরজায়— কিন্তু যে আশা নিয়ে এসেছিলুম, তা বিফল হ'ল, শুনলুম তাঁরা এ বাড়ী ছেড়ে চলেগেছেন অন্য দেশে। আমার ছোটবেলা থেকে একটা বদ্ অভ্যাস যে, কাজের প্রথম ধকায় আমি নিষ্ফল হব, আর সে কাজে অগ্রসর হই না,—সুতরাং বাপ মা'র সঙ্গে আর দেখা করা হোল না। জানিনা কিসের খেয়ালে আমি আবার আমার নাম বদ্‌লালুম এই নিয়ে তিনবার, প্রথমে বাপ-মার দেওয়া নাম বদলিয়েছিলুম; খ্রীশ্চান হয়ে, আমি খ্রীশ্চান—নাম ছিল সবেন্স মুখার্জ্জি, এবারে শুধু নাম নয় উপাধিও—আমার নাম নিলুম, অজয় সেন। জীবনের গতি হ'ল ছন্নছাড়া। আজ এখানে, কাল সেখানে,—কোথাও এতটুকু শান্তি নেই মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি। আজ আমার কেউ নেই, এতবড় দুনিয়ায় আমি একা! জানিনা আমার এ ছন্নছাড়া জীবনের শেষ কোথায়? 'বুক উজার করে' অজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে, তার চোখের কোণে দু ফোটা জল আলোয় চিক্ চিক্ করে উঠলো। সে চেয়ে রৈল দূর শূন্যে। তখন লক্ষ্মী অজয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল, সে ভাবছিল তার দাদার কথা। যাকে সে তার জ্ঞানে কোন-দিন দেখেনি,—শোনা কথা। সেও কি একটা কারণে, বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগরা করে চলে যায়। আর ফিরে আসেনি, তবে সে শুনেছে তার সেই দাদা বেঁচে আছে। মানুষের জীবনের ঘটনা অনেক সময় এক হয়ে যায়। এতে কি আছে বিচিত্রতা কি আছে ভাবার, তবু লক্ষ্মী ভাবতে লাগলো। তার না-দেখা দাদার কথা; সেও নাকি ভারী ভালবাসত তাকে,—সে যেন আজ কত কালের কথা। লক্ষ্মীর চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে অজয় উঠে দাঁড়ালো, না: আমায় ফিরতেই হবে মিসস্ চাটার্জ্জি, যেমন করে হোক্।" লক্ষ্মী সবিস্ময়ে বল্লে, "কোথায়?" "আমার বাপ-মার কাছে, আমার ভাই বোনের কাছে,—আর আমি পারি না।" অজয় আবার বসে পড়লো সোফার ওপর—বুকটায় কি যন্ত্রণা, অথচ এতটুকু স্বান্তনা দেবার আমার কেউ নেই। কোথায়ই বা যাব? আমার বাপ-মা তাঁরা আছেন কি নেই। তাই বা কে জানে? ওঃ—সবাই আমায় একসঙ্গে ফাঁকি দিয়েছে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি! আমি আর ভাবতে পরি না—আমি আজই চলে যাব দার্জ্জিলিং ছেড়ে। জায়গা বদল না কর্লে আমার চিন্তার ধারা বদলায় না, শেষে কি পাগল হয়ে যাব, তাই আমি ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশে ছন্নছাড়ার মত। তবু আজ একবার বাবার খোঁজ নেব,—তাঁরা কোথায় আছেন? কেমন আছেন? তাঁর কথাগুলো আজও মেনে চলেছি। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আজও কেউ আমার দেখা পায়নি, দেখা দেবেও না, পরিচয়ত দূরের কথা। তবু আজ একবার বাবার খোঁজ নেব, অজয় উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীকে নমস্কার জানালে, চলি, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, নমস্কার। লক্ষ্মী তখন একমনে কি ভাবছিল,—সে অজয়কে প্রতি-নমস্কার দিতে পার্লে না, তার যখন খেয়াল হ'ল, অজয় তখন ঘরে নেই। সন্ধ্যাবেলা,—লক্ষ্মীর স্বামী অশোক ফিরে এসে দেখে, সে শুয়ে পড়ে আছে সোফার ওপর মুখটা গুঁজে, অশোক ভাবলে নভেল পড়ে তার ভাবের ঝোকটা এখনও বুঝি লক্ষ্মী সামলাতে পারে নি—পাশে বইখানা পড়ে আছে। অশোক হেসে জিজ্ঞাসা কর্লে; "কি হ'ল? শুয়ে পড়ে যে? লক্ষ্মী উঠে বললো, "না' কিছু না, এমনই।" অশোক কোটটা খুলতে খুলতে বল্লে, "ষ্টেশনে, অজয়বাবুর সঙ্গে এইমাত্র দেখা হ'ল, তাঁর পিছনে মালপত্তর সমেত একটা কুলী, তিনি আজ দার্জ্জিলিং ছেড়ে

চল্লেন। লোকটি ভয়ানক খেয়ালী একটুও মতিস্থির নেই।" কোটটা যথাস্থানে রেখে, অশোক ফিরে এলে, একটা চেয়ারে বসলো,—"অজয়বাবু হঠাৎ তোমার বাবার খোঁজ কর্লেন,—নাম জানলেন কি ক'রে কে জানে? লোকটার কিছু ত' বোঝবার যো নেই—" লক্ষ্মী চমকে উঠলো,—" আমার বাবার কথা! কি?—কি জিজ্ঞাসা করলেন?" অশোক একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে, "আমায় বল্লেন,—'আপনি ত' এখানকার 'পোষ্ট-মাষ্টার' বলতে পারেন, মিঃ অচিন্ত্য মুখার্জ্জি এখন কোথায় আছেন? তিনি ছিলেন জব্বলপুরে 'পোষ্টাল-সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট'—অবশ্য বহুদিন আগে? আমি বললুম, কেন বলুন ত'? অন্য কেউ হলে হয়ত' টপ করে বলতে পারত না, তবে আমি বলতে পারি'—তখন আমার হাত দুখানা চেপে ধরে অজয়বাবু বল্লেন, বলুন না দয়া করে আমি আপনার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব, তাঁর সঙ্গে বুঝি আপনার আলাপ আছে? জানেন তিনি কেমন আছেন? আমি বল্লুম, 'তিনি আমার শ্বশুর,—বেশ সুস্থ আছেন এখন তার ঠিকানা—আমার কথায় বাধা দিয়ে অজয়বাবু বললেন, 'তিনি আপনার কে?" আমি বল্লুম, 'আমার শ্বশুর।' লোকটা পাগল না কি জানি না—এই কথা শুনে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রৈলেন। সেই সময় একটা ট্রেন সবে ষ্টেশন ছাড়ছে, তিনি তাড়াতাড়ি সেইদিকে প্রায় ছুটে চল্লেন, আমাকে আর কোন কথা না বোলে—আর তাঁর পিছনে ছুটেছে কুলীটা ট্রেন ছেড়ে দিলে আর তাঁকে দেখতে পেলুম না।" লক্ষ্মী হঠাৎ সোফায় লুটিয়ে পড়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো, বুঝি তার বুকখানা ফেটে যাবে, এমনই ফুলে উঠছে পাঁজরগুলো,—অশোক তার পাশে বসে, তার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞাসা কর্লে,

"কি হ'ল তোমার? একি!" অশোকের কথার উত্তর দেবার শক্তি তখন লক্ষ্মীর ছিল না। তখন তার কোমল বুকটাকে ক্ষত বিক্ষত করে, ছুটে চলেছে হুড়মুড় শব্দে সেই ট্রেনের নির্ম্মম চাকা, আর একটা কেবিনে বসে আছে, তার অপরিচিত অনাদৃত, হতভাগ্য সহোদর,—সেই ছন্নছাড়া—পাহাড়ের আঁকা বাঁকা ভাঙা-চোরা পথের পানে শূন্য-দৃষ্টে চেয়ে তার জীবনের গতি মিলিয়ে নিচ্ছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দুই একটি কথা

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ যাহার নিকট হইতে যতটা সম্ভব পূর্ণরূপে কার্য্য আদায় করিবার উপায় সর্ব্বদা উদ্ভাবন করিতেছে। ফলে পরিত্যক্ত কাগজের টুকরা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতি দেবী পর্য্যন্ত কাহারও আজ মানুষের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। বিজ্ঞানের বলে, মানুষ সকল চেতন ও অচেতন পদার্থ এবং শক্তিকে সামান্য মাত্র অপচয়ের হাত হইতেও বাঁচাইয়া তাহাদের ব্যবহারের প্রয়োজনের বৃদ্ধি করিতেছে। গ্রন্থাগার গুলিও এই যুগধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে।

গ্রন্থাগার সভ্যতার নিদর্শন এবং সভ্য জগতের এক অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান। মানব সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় পৃথিবীর যেখানে যখন সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারেরও আবির্ভাব হইয়াছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগের অবস্থার বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রন্থাগারগুলির বাহ্যরূপ এবং পরিচালন ও ব্যবহারের প্রণালী ও প্রকৃতি সব সময়ে একরূপ হয় নাই। বর্ত্তমানকালে নানা কারণে গ্রন্থাগারের ব্যবহারে ও প্রয়োজনীয়তা বহুক্ষেত্রে ও বহু প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে বহু অর্থ, শক্তি ও সময় ব্যয়ে গ্রন্থাগারের নিকট হইতে অধিক কার্য্য আদায় করা যায় সভ্যদেশগুলিতে তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও আন্দোলন হইতেছে। এবং ইহার ফলেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে একটা বিচিত্র বিষয় বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত নীতি ও কর্ম্মপন্থার সংগ্রহের মধ্যেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সুচিন্তিত নীতি ও প্রণালীর সাহায্যে সুষ্ঠু ও দক্ষভাবে পরিচালন দ্বারা গ্রন্থাগারগুলির কার্য্যকারিতার কিরূপে বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুশীলনে তাহাই জানা যায়। গ্রন্থাগারের সংখ্যার হিসাবে একমাত্র বরোদা রাজ্য ব্যতীত বাংলা দেশের স্থান ভারতবর্ষের অন্যান্য যে কোন অংশের অনেক উচ্চে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যথোচিত অনুশীলনের অভাবে আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির

পরিচালন ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। কাজেই সংক্ষেপে হইলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে দুই একটি কথার অবতারণা করা একেবারে নিরর্থক হইবে না বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বকালে পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা ছিল না এবং মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবনের প্রথম অবস্থায় পুস্তক মুদ্রণ খুব সহজ সাধ্য অথবা স্বল্প ব্যয় সাধ্য ব্যাপার ছিল না। কাজেই সে সময়ে পুস্তকের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তিই অধিকতর প্রবল ছিল। বর্ত্তমানকালে এই ধারণা ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল সূত্রই হইতেছে ব্যবহারের জন্যই পুস্তকের অস্তিত্ব। ফলে এখন আর মাত্র পুস্তকের সংখ্যাধিক্যই গ্রন্থাগার জগতে গ্রন্থাগারের কৌলীন্য ঘোষণা করে না, সংখ্যার সহিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রসারতা ও গভীরতা ও বিবেচনা করা আবশ্যক হয়। গ্রন্থাগার ব্যবহারের হ্রাস বৃদ্ধি গ্রন্থাগারিকের কার্য্য দক্ষতার উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। সেজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা ও গ্রন্থাগারিক নির্ব্বাচন বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে।

অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারিকের কার্য্য খুবই সহজ এবং গ্রন্থাগারিক নির্ব্বাচনের সহিত গ্রন্থাগারের কার্য্যের সফলতা অথবা বিফলতার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইঁহাদের মতে যে কোন ব্যক্তিকেই গ্রন্থাগারিকের কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে অপর এক শ্রেণীর লোকের ধারণা যে গ্রন্থাগারিকের পাণ্ডিত্যের বহরই গ্রন্থাগারিক নির্ব্বাচনের একমাত্র মাপকাঠি—যেন নিজের বিদ্যানুশীলন করাই গ্রন্থাগারিকের একমাত্র ও প্রধান কার্য্য। বিদ্বান ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থাগারিক হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু কার্য্য পরিচালন বিষয়ে বিশেষ দক্ষ হওয়া তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। সুপণ্ডিত, চরিত্রবান, উদার মতাবলম্বী, জনসেবাভিলাষী, কার্য্যদক্ষ, কৌশলী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিই আদর্শ গ্রন্থাগারিক হইবার উপযুক্ত পাত্র। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ আদর্শ গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা কার্য্যতঃ। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের পক্ষেই সাধ্যাতীত ব্যাপার। কিন্তু বিদ্যায়তন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য বৃহৎ ও সঙ্গতিপন্ন গ্রন্থাগার-গুলির জন্য গ্রন্থাগারিক নির্ব্বাচন কালে যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করাই সঙ্গত। এতদ্ব্যতীত স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানগুলির স্ব স্ব সীমার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার গুলির উন্নতিকল্পে এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিলে ঐ সকল গ্রন্থাগার বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে।

গ্রন্থাগার গৃহের স্থান ও গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনার উপরেও গ্রন্থাগার ব্যবহারের হ্রাসবৃদ্ধি বহু পরিমাণে নির্ভর করে। স্থানীয় লোকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেখানে গমনাগমন করা সকলের পক্ষে সহজ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যেরূপ স্থলে সকলকেই কার্য্য গতিকে যাতায়াত করিতে হয় সেইরূপ সাধারণের গমনাগমনের সম্ভাবনা যুক্ত স্থলে—যেমন বাজার অথবা ডাকঘর ইত্যাদির সান্নিধ্যে—গ্রন্থাগার গৃহের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থলে স্থান নির্ব্বাচন করিলেও স্থানটি যতদূর সম্ভব কোলাহল বর্জ্জিত এবং সহজবুদ্ধিতে বোধগম্য অন্যান্য অসুবিধা হইতে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থাগার গৃহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার সময়ে উহা বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ মত করাই সঙ্গত। মোটের উপর গ্রন্থাগার গৃহের ভিতরে ও বাহিরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বাভাবিক আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন মত যাহাতে গৃহের বা কক্ষাদির আয়তন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে সে বিষয়েও লক্ষ রাখা দরকার এবং গৃহের বহির্ভাগের গঠন প্রণালী এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে সহজেই সকলের দৃষ্টি ইহার দিকে আকৃষ্ট হয়।

গ্রন্থাগারের ব্যবহার যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য সচেষ্ট হইতে হইলে ক্রয়ের পূর্ব্বে গ্রন্থাগারের জন্য যথেচ্ছ ভাবে পুস্তক নির্ব্বাচন না করিয়া এ বিষয়ে সুচিন্তিত নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থাগারের কোন্ বিভাগের পুস্তক কি হিসাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে প্রথম হইতেই একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়া লওয়া আবশ্যক। পুস্তক নির্ব্বাচনকালে পুস্তকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ ব্যতীত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে উহাদের চাহিদা এবং গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। সান্নিধ্যে অন্যান্য গ্রন্থাগার থাকিলে তজ্জন্য পুস্তক নির্ব্বাচন নীতির কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক কিনা তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। পুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে নির্ব্বাচকদের পক্ষপাত শূন্য হইয়া সকল বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে কোন স্তরের বা সম্প্রদায়ের লোকেরাই যেন পুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে তাহাদের রুচি বা দাবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের যুক্তিসঙ্গত কোন অভিযোগ করিবার অবকাশ না পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গ্রন্থাগারে সমাচার জ্ঞাপক (books of information),

প্রেরণামূলক (books of inspriation) এবং ক্লান্তিদূরকারক (books for recreation) সকল প্রকার পুস্তকই প্রয়োজন মত অল্প বিস্তর সংগ্রহ করা আবশ্যক। দৈনিক এবং সাময়িক পত্রিকাদিও গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ইতিহাস, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কীয় পুস্তক ও পত্রিকাদির সংগ্রহ থাকাও বাঞ্ছনীয়।

পুস্তক সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাগারে বিশৃঙ্খলভাবে অথবা স্তুপাকারে রাখিয়া দিলে মাত্র যে কার্য্যের অসুবিধা হয় তাহা নহে পুস্তকের ব্যবহারের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়। কোনও বিশেষ নিয়মে পুস্তকগুলি তাকে সাজাইয়া না রাখিলে প্রয়োজন মত তাহাদের ব্যবহার করিবার পক্ষে এবং গ্রন্থাগার পরিচালন কার্য্যে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রায় সকল গ্রন্থাগারেই কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থায় পুস্তক সাজাইবার ব্যবস্থা আছে। যে সকল পন্থায় পুস্তক সাজান হয় তাহার মধ্যে যে পন্থার দ্বারা সম বিষয়ের পুস্তকগুলির স্থান পরস্পরের সান্নিধ্যে হয় সেই পন্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিষয়বস্তুর ঐক্যদ্বারা পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করাকেই গ্রন্থাগারিকের ভাষায় সাধারণতঃ পুস্তকের শ্রেণী করণ বলে। শ্রেণীকরণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। পুস্তকের বিষয়বস্তুর ঐক্যদ্বারা শ্রেণী বিভাগ করিবার যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আমেরিকার ডক্টর মেলভিল ডিউই (Dr. Melvil Dewey) প্রবর্ত্তিত 'দশমিক শ্রেণী বিভাগ' পদ্ধতিই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

পুস্তকে যাহা লেখা থাকে তাহা কখন মানুষের জ্ঞানের সীমার বাহিরের বস্তু হইতে পারেনা। সেজন্য পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করিবার জন্য ডিউই পুস্তকের বিষয় বস্তুর সাহায্যের ভিত্তিতে সমস্ত জ্ঞান রাজ্যকে প্রথমে নয়টি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের চিহ্নস্বরূপ ১ হইতে ৯পর্য্যন্ত সংখ্যা কয়টি ব্যবহার করিয়াছেন; যথা (১) দর্শন শাস্ত্র, (২) ধর্ম্মশাস্ত্র, (৩) সমাজতত্ত্ব, (৪) ভাষাতত্ত্ব, (৫) বিজ্ঞান, (৬) ব্যবহারিক শিল্প, (৭) কলাশিল্প, (৮) সাহিত্য এবং (৯) ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনী। বিশ্বকোষ, সাধারণ সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদির বিষয় বস্তু এত ব্যাপক যে উপরোক্ত সকল বিষয় অথবা উহাদের অনেকগুলি ইহাদের

বিষয় বস্তু হইতে পারে। সেজন্য এইরূপ বিষয় বস্তুর জন্য (সাধারণ বিষয়) নাম দিয়া একটি দশম বিভাগের সৃষ্টি করিয়া ঐ বিভাগের নিদর্শনের জন্য (শূন্য) ব্যবহার করা হইয়াছে। শূন্য অর্থে কিছুই নহে এই প্রকার চিহ্ন বিশিষ্ট বিভাগের বিষয় বস্তুর নিজস্ব কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। সংখ্যা দ্বারা বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিবার জন্য ডিউই প্রথমে একটি মাত্র সংখ্যা ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক বিষয়ের ভিত্তি মূলক সংখ্যাকে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইলে এক্ষণে কোন সংখ্যা কোন বিষয়ের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয় দেখা যাউক:—

০০০ সাধারণ
১০০ দর্শন শাস্ত্র
২০০ ধর্ম্ম শাস্ত্র
৩০০ সমাজ তত্ত্ব
৪০০ ভাষাতত্ত্ব
৫০০ বিজ্ঞান
৬০০ ব্যবহারিক শিল্প
৭০০ কলা শিল্প
৮০০ সাহিত্য
৯০০ ইতিহাস, ভূগোল ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত, এবং জীবনী।

উপরোক্ত বিভাগগুলির প্রত্যেকটিকে পুনরায় তাহাদের বিষয় বস্তুর সাদৃশ্যের তারতম্য অনুসারে নয়টি উপবিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন ৫০০ বিজ্ঞান এই বিভাগের পরবর্ত্তী উপবিভাগ গুলি এইরূপ:—

৫০০ বিজ্ঞান
৫১০ গণিত শাস্ত্র
৫২০ জ্যোতিষ শাস্ত্র
৫৩০ পদার্থ বিজ্ঞান
৫৪০ রসায়ন শাস্ত্র
৫৫০ ভূতত্ত্ব
৫৬০ প্রত্নতত্ত্ব
৫৭০ জীবতত্ত্ব
৫৮০ উদ্ভিদ তত্ত্ব
৫৯০ প্রাণীবিজ্ঞান

প্রত্যেক উপবিভাগের আবার প্রয়োজন মত নয়টি করিয়া অধীন উপবিভাগ করা হইয়াছে। যেমন ৫১০ গণিত এই উপবিভাগের পরবর্ত্তী বিভাগগুলি ৫১১ পাটিগণিত, ৫১২ বীজগণিত, ৫১৩, জ্যামিতি ইত্যাদি। এই সকল অধীন উপবিভাগগুলিকে প্রয়োজন-

মত যতদূর ইচ্ছা অধিকতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারগুলি অনাবশ্যক বিবেচনা করিলে পুস্তকগুলিকে মাত্র প্রথম দশভাগে ভাগ করিয়া রাখিতে পারে। অন্যান্য গ্রন্থাগার উপবিভাগ অথবা অধীন উপবিভাগ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারে এবং অতি বৃহৎ গ্রন্থাগারগুলি যতদূর ইচ্ছা সূক্ষ্ম বিভাগ ব্যবহার করিতে পারে। ডিউই পুস্তকের বিষয়গুলি জ্ঞাপনের নিমিত্ত চারিটি অথবা ততোধিক সংখ্যা ব্যবহার করিবার আবশ্যক স্থলে তিনটি সংখ্যার পর এক দশমিক বিন্দু ব্যবহার করিয়াছেন (যেমন্ ৫২৩·১) এবং সমগ্র সংখ্যাটিকে দশমিক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। এই জন্যই এই পদ্ধতির নাম দশমিক পদ্ধতি।

পুস্তকের শ্রেণী বিভাগের জন্য এ পর্য্যন্ত নিঃখুত এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কোন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে সেরূপ পদ্ধতি কখনও আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে। তবে বর্ত্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ডিউইর দশমিক পদ্ধতি পৃথিবীর বহুস্থানে প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পদ্ধতি বলিয়া অতি সংক্ষেপে ইহার বর্ণনা করা হইল।

গ্রন্থগারের সহিত যাঁহাদের কোন সম্পর্ক আছে তাঁহারা জানেন যে, যে প্রথারই হউক প্রায় সকল গ্রন্থাগারেই সেই গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের 'গ্রন্থসূচী' বা 'ক্যাটালগ' রাখা হয়। গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার পক্ষে যথোচিতভাবে প্রণীত গ্রন্থসূচীর সহায়তার মূল্য অবর্ণনীয়। কোন পুস্তকের বিষয় সূচী হইতে ঐ পুস্তকে কোন কোন আলোচনা করা হইয়াছে এবং ঐ সকল বিষয়ের সন্ধান কোন স্থানে মিলিবে তাহা যেমন অনায়াসে জানা যায় গ্রন্থাগারের 'গ্রন্থসূচী বা 'ক্যাটালগ' হইতে ও সেইরূপ কোন গ্রন্থগারে কি কি পুস্তক আছে এবং গ্রন্থাগারের কোন স্থানে ঐ পুস্তক রাখা হয় তাহা সহজেই জানা যায়। অর্থাৎ 'গ্রন্থসূচী' গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক সমূহের চাবি কাঠি বিশেষ।

গ্রন্থসূচী এরূপভাবে প্রস্তুত করা উচিত যাহাতে যে কেহ অন্ততঃপক্ষে নিম্নলিখিত অনুসন্ধানগুলির উত্তর গ্রন্থসূচীর নিকট পাইতে পারে। (১) কোন গ্রন্থাগার লিখিত কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাগারে আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লিখিত কোন কোন পুস্তক আছে। (২) কোনও বিশেষ বিষয়ের কি কি পুস্তক ঐ গ্রন্থাগারে আছে। যথা বাংলাদেশের ইতিহাস, কৃষিবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কি কি পুস্তক আছে। এবং (৩) কোন কোন নামের পুস্তক (অন্ততঃপক্ষে উল্লেখ-যোগ্য নামের পুস্তকের মধ্যে কোনগুলি) গ্রন্থাগারে আছে। যেমন চলন্তিকা, দত্তা, পোকামাকড়, যোগাযোগ ইহাদের মধ্যে কোন কোন পুস্তক গ্রন্থাগারে আছে।

সকল গ্রন্থাগারের জন্যই গ্রন্থসূচী আবশ্যক ইহা সহজেই অনুমেয়। কারণ স্মরণশক্তি যত প্রখরই হউক না কেন ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু গ্রন্থাগারে কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষেই গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রত্যেক পুস্তকের কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা সম্ভব নহে। আবার একই গ্রন্থাগারিক চিরকাল যে একই গ্রন্থাগারে কার্য্য করিবেন অথবা পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদের জন্য সকল সময়েই যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায় বৃথা। কাজেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে, অবর্ত্তমানে অথবা পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদ দিবার সময়াভাবে গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক আছে তাহা পাঠক বা গ্রন্থাগারের অন্য কর্মীদের যাহাতে জানিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা না হয় সেজন্য গ্রন্থসূচীর প্রয়োজন।

কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে সকল গ্রন্থাগারে বিষয় হিসাবে পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করা আছে এবং যেখানে 'মুক্তদ্বার পদ্ধতি'* (Open access System) প্রবর্ত্তিত আছে সেখানে গ্রন্থাগারে কোন কোন বিষয়ে কি কি পুস্তক আছে গ্রন্থসূচীতে তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে গ্রন্থাগারের সকল পুস্তক সর্ব্বদাই গ্রন্থাগারে থাকে না। পাঠের জন্য অনেক পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। কাজেই তাকে কেবল রক্ষিত পুস্তক দিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই জন্যই গ্রন্থসূচীতে বিষয়মূলক সংবাদ প্রদান করাও আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করা এবং গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ এবং জ্ঞানার্জ্জন না করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে সন্তোষজনক ফল লাভ করা সম্ভব নহে। সেজন্য সাধারণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে অধিকতর জটিল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা যুক্তি যুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

---

* এই পদ্ধতিতে পাঠকগণকে বই-এর তাকে যাইয়া পাঠের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

প্যারামাউণ্টের হাস্যরসাত্মক ছবি "থ্রিল অব এ লাইফটাইম"-এর একটি দৃশ্য।
ছবিখানা [illegible] দেখান হচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে মাঘ ১৩৪৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

মধুচক্রে ক্রুদ্ধ-গুঞ্জন

কর্পোরেসন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরে গৃহীত প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রস্তাব এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি ও সর্ব্বোপরি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গোপন আলোচনা কর্পোরেসনের কংগ্রেসী কাউন্সিলার মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মধুচক্রের মধুলোভী মক্ষিকাবৃন্দ এতদিন ধরিয়া বিশেষ সুখে ও পরম শান্তিতে মধু আহরণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাহাতে বাদ সাধিতে যেভাবে মক্ষিকা বিতাড়নের আয়োজন হইতেছে তাহাতে যে চতুর্দ্দিক হইতে ক্রুদ্ধ-গুঞ্জন শুনা যাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু ব্যাধি যদি বিশেষ কটু হইয়া উঠে তাহার চিকিৎসাও ঠিক তদনুরূপ প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র অতি শীঘ্রই কর্পোরেসন সংস্কারে মনোনিবেশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহাকে ইত্যবসরে কয়েকটি ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন।

কর্পোরেসন পরিচালনায় কংগ্রেসী আদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে এমন একটী আইন থাকা প্রয়োজন যে যাঁহারা কর্পোরেসনে চাকুরী করিবেন তাঁহারা কংগ্রেসের সাধারণ সভ্য থাকিলেও কলিকাতার কোন জিলা বা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে কোন পদ অধিকার করিতে পারিবেন না। কর্পোরেশনের বহু কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কর্ম্মকর্ত্তার পদ অধিকার করিয়া আছেন। তাহার ফলে এই দেখা যায় যে যখন কর্পোরেসন নির্ব্বাচনে কাউন্সিলার পদপ্রার্থীদিগকে কংগ্রেসী মনোনয়ন দিবার সময় আসে তখন যাঁহারা কর্পোরেসনে কাউন্সিলারদিগের ভৃত্য হইয়া থাকিবেন তাঁহারাই কাউন্সিলারদিগের প্রভু হইয়া থাকেন। ভাবী কাউন্সিলারগণ, যাঁহারা কংগ্রেসী আদর্শে পূর্ণ আস্থার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'ন তাঁহারা তাঁহাদিগের জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ত্তা কিন্তু কর্পোরেশনে ভৃত্যসম ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের নিষ্পেষণে, কংগ্রেসী আদর্শে আস্থা হারাইয়া অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিতে বাধ্য হ'ন। এবং এই সকল কর্পোরেসন কর্ম্মচারী সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকেন এমন সকল ব্যক্তিকে কাউন্সিলার পদে অভিষিক্ত করিতে যাঁহাদিগকে তাঁহারা অতি সহজেই পরিচালিত করিতে পারিবেন। কর্পোরেসনে যখন কোন কর্ম্মচারী-নিয়োগ বা কন্‌ট্রাক্ট গ্রহণের ব্যাপার আলোচনা চলে তখন কর্ম্মচারী-পরিচালিত কাউন্সিলারগুলি কর্ম্মচারী বিশেষের অঙ্গুলী হেলনে তাঁহাদের মতামত দিয়া থাকেন।

উপরোক্ত মতে কলিকাতায় বিভিন্ন জিলা রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ত্তৃমহল হইতে কর্পোরেসন কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়ন করিলেই যে কর্পোরেসন

পরিচালনায় সকল গলদ দূরীভূত হইবে তাহা নহে। তবে আমাদের মনে হয় যে কর্পোরেসন ব্যাপারে কোন কর্ম্মচারীর প্রভুত্ব না থাকাই উচিৎ। যাঁহারা কর্ম্মচারীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইবেন তাঁহারাই যদি কর্ম্মচারীদিগের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হন তাহা হইলে কর্পোরেসন পরিচালনায় কোন আদর্শ পন্থাই অনুসরণ করা চলিতে পারে না।

এই সকল কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সিলারবৃন্দ যে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিতে এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় বিশেষ বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া পড়িবেন তাহা ঠিকই। কিন্তু সুভাষচন্দ্র মধু আহরণকারী মক্ষিকাবৃন্দকে কর্পোরেসন হইতে বিতাড়িত করিতে যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতার করদাতাবৃন্দ ভরসা করিতে পারেন যে সুভাষচন্দ্র কর্পোরেসনের পরগাছাগুলি উৎপাটন করিতে সমর্থ হইবেন।

অত্র্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে কে বা কাহারা কর্পোরেসনে চাকরী করেন সম্পাদক মহাশয় তাহা জানাইবেন কি? শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত নামধেয় যে ব্যক্তিকে ১৯নং ওয়ার্ডের উপনির্ব্বাচনে দাঁড় করান হইয়াছিল তাঁহার বর্ত্তমানে উপজীবিকা ও অতীতের কার্য্যাবলী ও শিক্ষা-দীক্ষার একটা ফিরিস্তি পাইলে দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন কেন বিগত উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটিল। সুভাষচন্দ্র ও প্রাদেশিক কর্ম্মকর্ত্তা-বৃন্দকে আমরা বিগত পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছি যে কলিকাতা কর্পোরেসন বা কোন স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান যেন উপজীবিকাবিহীন ও অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি-বর্গের কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত না হয়।

---*---
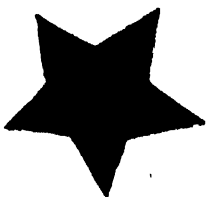
মাইকেল মধুসূদন

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

'পয়ার', 'লাচাড়ী' ছন্দ মুখরিত বাংলার অঙ্গনে—
হে পুরুষসিংহ কবি হে ভৈরব হে রুদ্রচারণ,
আদি রসে আর্দ্র হিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় স্পন্দনে
উদাত্ত গম্ভীর সুরে মহাচ্ছন্দ করি উচ্চারণ—
পৌরুষ জাগায়ে দিলে। প্রগতির ওগো দীক্ষা গুরু;
প্রাণময় ছন্দ তব বন্ধনের নাশি মায়াজাল,
অবারিত মুক্ত গতি অব্যাহত যেন মহাকাল
দেখাল তাণ্ডব নৃত্য; সচেতন যাত্রা হ'ল সুরু
তব কাব্য সমুদ্রের উত্তাল গর্জ্জন শুনি বক্ষ তাই করে দুরু দুরু।

আদিম স্পন্দনে জাত অনাহত নাদমন্ত্র যথা
অনাদি কালের বুকে সৃজনের চির উৎস হ'তে—
বিচিত্র লীলার ছন্দে মোহধর্ম্মী মৃত্তিকার পথে
দেখায় মুক্তির পথ; সেইমত তব কাব্য কথা
বিপুল বন্যার বেগে ভাসাইয়া কূপ মণ্ডুকতা
দীর্ণ করি চন্দ্রচূড় গঙ্গেশের রুদ্ধ জটাজাল
প্রবাহিল ভাবময়ী জাহ্নবীর মত; মহাকাল,
তব প্রিয় কবিভক্ত দেখাল যে বিশ্ব ভাবুকতা
অমর করিল তা'রে অমিত্র ছন্দের বুকে বহাইয়া স্নিগ্ধ মধুরতা।

লক্ষ তারা বিমণ্ডিত আকাশের নীল চন্দ্রাতপে,
ছন্দের বন্ধন নাই আছে সুর গতি অব্যাহত,
উধাও চলার বেগে কাল সেথা কী যে মন্ত্র জপে
শুনে নাই সে উদ্গীত বন্দীপ্রাণ মোহ-ঝঞ্ঝাহত
কে বলে অমিত্র তারে? মৈত্রী তার নিখিল ভুবনে
বহায় ভাবের বন্যা রসিকের চিত্ত গুহা হ'তে,
অরূপেরে রূপ দেয়, জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত ছায়াপথে
জ্বালায় প্রাণের শিখা রসামৃত দেয় বিশ্ব মনে
হে মধুসূদন তুমি সে বিরাট ভাব বন্যা প্রবাহিলে চিত্ত বৃন্দাবনে।

অভিশপ্ত যে বীরেন্দ্র একদিন স্বর্ণ লঙ্কাপুরে,—
বিসর্জ্জিল তনু তা'র নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সভাতলে
বাসব-বিজয়ী বীর দুর্ম্মদ রাবণি; অশ্রুজলে
সিক্ত করি আত্মা তা'র তুমি কবি সেই শ্রেষ্ঠ সুরে,
উদ্ধারিলে বাল্মিকীর অবজ্ঞার কারাকক্ষ হ'তে।
হেরিল রসিক চিত্ত ধীরে করি আঁখি উন্মীলন
মাতৃভক্ত বৈনতেয় করে বুঝি অমৃত হরণ,
স্বর্ণ পক্ষ আন্দোলিয়া উর্দ্ধগতি দূর স্বর্গপথে
তুমি সেই বৈনতেয় সুধাভাণ্ড হরেছিলে রামায়ণ রস স্বর্গ হতে।

রচিল লেখনী তব সংশোধিত মহারামায়ণ
শিখাইলে বীরপূজা মেঘনাদ গর্জ্জিল আকাশে
দেহজ প্রেমের ক্ষুধা পরিপূর্ণ নহে—রামায়ণ,
জন্মেছিল দৈত্যভাবী বীর্য্যবান তোমার নিঃশ্বাসে;
বৈপ্লবিক কাব্য হেরি মূর্খ যতো বালখিল্য দল
সেদিন তোমারে ধরি অর্ব্বাচীন বালকের মত
প্রশ্ন বাণে জর্জ্জরিয়া চেয়েছিল করিতে বিব্রত,
গর্ব্বিত গরুড় সম তুমি শুধু হাসি অচঞ্চল,
সফরী-লীলায় মত্ত বিলাসীর অঙ্গরাখা জ্বালাইলে স্বপ্নের অঞ্চল।

বজ্রাগ্নি জ্বালায় পূর্ণ তুমি মেঘ বঙ্গের আকাশে—
প্রতিভার আভিজাত্যে করে গেলে যে গুরু হুঙ্কার,
জীর্ণ পত্র পুঞ্জসম উড়ে গেল উন্মাদ বাতাসে
পুরাণ ও পাঁচালির ক্ষীণ কণ্ঠে রাগিনী ঝঙ্কার,
বঙ্গবাণী প্রবাহের কল্লোলিত কপোতাক্ষী জল
সাগর দাঁড়ির ছন্দ শুনি' যেন অপূর্ব্ব অদ্ভুত,
শুধু নহে বীর রস, নব রস নব মেঘদূত—
কী বিরাট অনুভূতি জেগেছিল তব চিত্ত তলে!
লোক লোকান্তরে তাই মৃত্যুহীন তব স্মৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সমজ্বলে।

বিরচিয়া মধুচক্র তৃষাতুর গৌড় জন চিতে—
রসমন্দাকিনী ধারা দিলে ঢালি' হে মধুসূদন,
সুরস্বপ্নলীন তব মধুচ্ছন্দা কাব্যের সঙ্গীতে—
অমৃত ভাষিণী দেবী ভারতীর করিল পূজন;
যাঁর বরে সিদ্ধি লভি' নরহন্তা দস্যু রত্নাকর

কবিগুরু আখ্যা পেল রচি' মহাকাব্য রামায়ণ;
সৃজিল মানস পুত্র রাঘবেন্দ্র নর নারায়ণ,
তুমি সেই বাগ্দেবীর যোগ্য পুত্র হে কবি ভাস্কর,
সাহিত্যের ইতিবৃত্তে অমর রচনা তব স্বর্ণাক্ষরে রহিবে ভাস্বর।

উন্মাদ যৌবনে তব দারিদ্রের ক্রুর নিষ্পেষণ,
স্বদেশে বিদেশে কবি করিয়াছে ঘোর অত্যাচার,—
তবু সেই ভস্ম স্তূপে জেলেছিলে দীপ্ত হুতাশন
সতীহারা রুদ্র রোষ সম। বীরেন্দ্র কেশরী তুমি—
দারিদ্র্য বিতংস দিয়ে কা'র সাধ্য বাঁধিবে তোমারে—?
গঙ্গোত্রীর ভীম স্রোতে ঐরাবত কী করিতে পারে?
লজ্জায় দারিদ্র্য তব লুটাইল পদতল চুমি,
প্রতিভার বরপুত্র উন্মাদ লীলায় তব বিস্ময়ে নির্ব্বাক জন্মভূমি!

জনারণ্য রাজপথে আনমনে চলিতে চলিতে—
"দাঁড়াও পথিকবর বঙ্গভূমে জন্ম যদি তব—"
নহে ক্ষীণ অনুরোধ, এ আদেশ কে পারে করিতে?
থমকি দাঁড়ানু মুগ্ধ, রুদ্রাদেশ শুনি অভিনব;
শোকান্ধ রাবণ তুমি অনির্ব্বাণ চিতাবহ্নি হ'তে—
হা পুত্র, হা পুত্র, বলি ঝঞ্ঝা-স্বরে ডাকিছ সবায়,—
মূঢ়মতি আমি কবি, তব পূজা জানা'ব কোথায়?
স্বর্গের উদ্দেশে? কিম্বা গোরস্থান মলিন মরতে?
নেহারিনু কাব্যলোকে রাঘবারি-আত্মা ওগো সেথা দিলে স্বর্ণ হংসরথে

* কবিতীর্থে বাণী বন্দনা উপলক্ষে খিদিরপুর হেমচন্দ্র পাঠাগারে পঠিত।

মালবিকার হার

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

মালবিকা তর্কের শেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই যুক্তি হারাইয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ সুরু করিল,—যাই বলো, লোকটা অভদ্র, কাল্‌চার বলে কোনো জিনিষ ওর মধ্যে নেই।

দিতেন বলিল—তা তুমি বল্‌তে পারো না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি, নির্ম্মল সেনের ট্রাডিশন আছে, এবং কৃষ্টির মধ্যেই সে মানুষ। বরঞ্চ যে তোমার প্রবন্ধ সমর্থন করেছে—নিত্যানন্দ দাস, জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করবার মতন শিক্ষাদীক্ষা পায়নি। যেহেতু তুমি নারী, এইজন্যেই হয়ত সে তোমার পক্ষ নিয়েছে! তা নইলে লেখা প্রকাশ হবার পরেই সম্পাদকের কাছে তোমার ঠিকানার খোঁজ করতনা, আর আলাপ করবার জন্যে ঝুকতওনা।

মালবিকা বলিল—আলাপ করতে চেয়েছিল, তাত' তুমি জানাওনি? তার সঙ্গে আলোচনা করে আমার লাভই হত, কারণ নারীকে সে বলে দেবী, আর নির্ম্মল সেন বলে, মানুষ বল্‌লেও বেশী বলা হয়। দুজনের ক'ত তফাৎ। নির্ম্মলের সঙ্গেও আমার দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছিল। হয়ত তাকে শিক্ষাও দেওয়া যেত কিছু! যেরকম সঙ্কীর্ণ মন তার! মেয়েদের দেখলেই যার অপমান করবার প্রবৃত্তি জাগে, তাকে সায়েস্তা করা নিশ্চয়ই দরকার।

দিতেন আর তর্ক বাড়াইলনা। নির্ম্মলকেও সে দেখিয়াছে, নিত্যানন্দের সঙ্গেও আলাপ করিয়াছে, তার নিজের ধারণার সঙ্গে মালবিকার অনুমান মেলেনা।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনে স্ত্রীকে লইয়া দিতেন ট্রামে উঠিল। লেডীজ সীট্ দুটোই ভর্ত্তি, মালবিকা কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অন্য পুরুষগুলি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল—ভাবটা যেন, তোমাদের সীটে ত বসিনাই? কেন উঠিব?

একটি যুবক হঠাৎ দেখিয়াই সমব্যস্তে উঠিয়া পড়িল, মালবিকার দিকে চাহিয়া কহিল—বসুন।

মালবিকা তবুও বসিল না। তখনোও পাশের লোকটি ওঠে নাই, তার গা ঘেসিয়া বসে কি করিয়া!

যুবকটি সঙ্কোচের কারণ বুঝিল, উপবিষ্ট লোকটিকে বলিল—মশায় উঠুন, একে বস্‌তে দিন্।

সে অম্লানবদনে জবাব দিল—ইচ্ছে হয়, এইখানেই বস্‌তে পারেন, একজনের বসবার মতন জায়গা রয়েছে!

—আপনার গায়ের ওপর বসবেন?

—না বস্‌তে পারেন, আমি কি করব? মেমেদের নকল করতে যান, তারা এরকম বস্‌তে লজ্জাবোধ করে না।

—বাঙালী মেয়েরা তা কখনো পারেন?

—না পারেন, ত' ভিড় দেখে ওঠেন কেন? খালি গাড়ী দেখে উঠলেই পারেন।

—আপনি উঠবেন কিনা? যুবকটি রাগের সঙ্গে প্রশ্ন করিল।

—না। কিছুতেই না—বলিয়া লোকটি আরো চাপিয়া বসিল।

যুবকটি তার গায়ে হাত দিতেই একটা গোলমালের সৃষ্টি হইল, অন্য অনেকেই তখন উঠিয়া পড়িয়া 'বসুন এখানে বসুন, ওর সঙ্গে বচসা ক'রে কি হবে' ইত্যাদি রবে হৈ হৈ করিতে লাগিল।

SHYAMA in
TARZAN
BETI
Directed by
ROOP K. SHOREY
নূতন আরণ্য চিত্র!
নূতন আরণ্য চিত্র!!
নূতন পরিকল্পনায়, নূতন ঘটনার বৈচিত্রে ও নূতন ভাবের দ্যোতনায় সম্পূর্ণ অতুলনীয় ও অভাবনীয় সরল হিন্দী ভাষার সংলাপে—বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না।
নিউ সিনেমায়
দেখান হইতেছে!

আমার অভিনেত্রী জীবনের কয়েকটী কথা

শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

চন্দ্রাবতী

লেখবার তাগিদ এসেছে। কিন্তু আমার মত সামান্য নারীর পক্ষে কিছু লেখা যে কত কষ্টকর কাজ—তা আমার মত অবস্থায় যাঁরা না পড়েছেন—তাঁরা বুঝতে পারবেন না। বর্ত্তমান সিনেমা সম্বন্ধে আমরা কি ভাবি—কি চাই, তার বিষয় কিছু বলতে চেষ্টা ক'রব।

সিনেমা সম্বন্ধে আমার এমন কোন জ্ঞান নেই যা পাঁচজনকে শোনাতে পারি। কিন্তু তবুও আমার মত একজন সামান্য অভিনেত্রী সিনেমা সম্বন্ধে কি ভাবে বা কি ক'রে তাই সংক্ষেপে জানাব। অনেকদিন থেকে সিনেমায় অভিনয় আমি ক'রছি, ফলাফল হয়ত আশানুরূপ হয়নি, কিন্তু লোকের দেখবার অযোগ্য অভিনয়ও হয়ত আজ পর্য্যন্ত করিনি। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। মীরাবাঈ চিত্রে নাম ভূমিকায় ও দেবদাস চিত্রে চন্দ্রমুখার ভূমিকায় অভিনয় করে যে সম্মান আমি পেয়েছিলুম তাতে আমি গৌরবান্বিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না আর তার চেয়ে সন্দেহ নেই যে, নিউ থিয়েটার্স ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আমাকে এ সম্মান এনে দিতে পারত না।

এই প্রসঙ্গে একথাও ব'লতে হ'বে যে মীরাবাঈ চিত্রে অভিনয় ক'রবার সময় আমি নিজের প্রাণে এক অপূর্ব্ব প্রেরণা অনুভব ক'রতাম। মীরাবাঈ এর পুণ্য চরিত্র শুধু আমার কেন জগতের সকল নর নারীর মনকেই ভক্তিরসে প্লাবিত ক'রেছে।

দেবদাসের পর আমি 'দিদি' ছবিতে অভিনয় করি। 'দিদি' ছবি যখন প্রথম তোলবার কথা স্থির হ'ল, তখন আমার শরীর ও মন নানা কারণে বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিচালক নীতিন বাবুর কথায় প্রেরণা নিয়ে অভিনয় করতে লেগে গেলাম। 'দিদি' চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলুম কিনা তা পরিচালক মশাই নিজেই জানেন। তবে এ ছবির জন্যে যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে আমাকে হ'য়েছিল তা বোধহয় একেবারে ব্যর্থ হয়নি এই আমার ধারনা। দিদি চরিত্রে দিদির অপরূপ স্নেহধারা, অপূর্ব্ব প্রেমও অসাধারণ মনের বল, আমি নিজের জীবন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে তা থেকে বিশেষ ভাবেই উপকৃত হয়েছি।

নিজের হাতে যদি নিজের ভূমিকা নির্ব্বাচন করবার ক্ষমতা থাকত তা হ'লে সব সময়েই মহীয়সী নারীর ভূমিকাই নির্ব্বাচন ক'রতাম। নারীর যে কল্যাণময় মূর্ত্তির ছবি মনে আসে তাই পর্দ্দার বুকে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করতাম। এতে ক্ষনিকের জন্যেও নিজের সত্যিকার জীবনের কথা হয়ত' ভুলতে পারতাম। জীবনে যা পেলাম না—পাবার কোন পথই নেই—অভিনয়ের দ্বারা কিছু সান্ত্বনা লাভ করা কম পুণ্যের কথা নয়।

আমরা কপালদোষে যাহাই হইনা কেন, আমাদের মনের মধ্যে চিরন্তন এমন একটি নারী বাস করে যার ভেতর কোন পাপ নেই—তা পবিত্র ও সুন্দর। মনে মনে সেই নারীকে পূজা না করে এমন প্রাণী বোধহয় জগতে খুবই বিরল।

সম্প্রতি 'দেশের মাটী' চিত্রে যে ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি তা একটি শিক্ষিতা আধুনিকা ভদ্রনারীর চরিত্র। পরিচালক মশাই 'অরুণা' রূপে আমাকে যাহা বর্ণনা করেছেন তা বাস্তব জীবনে সচরাচর চোখে পড়েনা। পুরুষের মনে যে আদর্শ নারীর কথা জাগে—অরুণাও হয়ত তাই। এই নারী জীবনের সকল কিছু দিয়ে একজনকে ভালবাসলো, কিন্তু সেই পুরুষ যখন তার প্রেম অন্যকে দান ক'রে নিজের সুখ নিজেই বেছে নিল তখন এই 'অরুণা' নিজের সকল দুঃখ

ছিতেন ও মালবিকা আরাম করিয়া বসিল। সেই গোলমেলে লোকটা পরের ষ্টপেজেই মেডিকেল কলেজের সামনে নামিয়া গেল। যে পথটুকুর জন্য সে এতটা কলহ করিল, ট্রামে সেটা পার হইতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। যুবকটি তখনো বসিবার জায়গার অভাবে বেঞ্চি ধরিয়া ওপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ছিতেন প্রথম কথা কহিল—যে লোকটি উঠছিল না, ঐ নিত্যানন্দ দাস যানে যে তোমাকে সমর্থন করেছিল, আর যে অন্য দিকে মুখ ক'রে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ কুখ্যাত নির্ম্মল সেন।

মালবিকার কিছু বলিবার ছিল না। এমন নিঃশব্দে সে তর্কে হারিয়া যাইবে কখনো ধারণা করিতে পারে নাই।

—*—

নিজের মনের মধ্যেই গোপন রেখে প্রেমাস্পদের কল্যাণ কামনাই ক'রল। যে স্বার্থ গন্ধহীন প্রেমের কথা আমরা বইয়ে পড়ে থাকি, তাকে ফুটিয়ে তুলবার যে সাধনা ও শিক্ষার প্রয়োজন, তা হয়ত আমার নেই। কিন্তু আমার প্রবল চেষ্টা হয়ত 'অরুণা' চরিত্রকে অবিচার এর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।

সিনেমা ছবি বলতে আমি এমন একটা জিনিষ এর কল্পনা করি, বাস্তব জীবনে হয়ত খুব কমই পাওয়া যায়। সিনেমার কাজ যেমন আনন্দ দান করা তেমনই মানুষের জীবন যাত্রার নূতন পথ তৈরি করে দেওয়া।

'দেশের মাটী' ছবিখানার মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। বিদেশী ছবির বিষয় আমরা যে সকল কথা কাগজে পড়ে থাকি আমার মনে হয় আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা হয়ত এছবিকে তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবে।

আমেরিকার ছবি প্রায়ই দেখে থাকি। নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে কষ্টই পাই বেশী। কিন্তু ভেবে দেখলে এ কষ্টের কোন মানেই থাকেনা—কেননা যাদের অর্থবল ও লোকবলের কোন সীমাই নেই তাদের পক্ষে ভাল ছবি না করাই অস্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সবকিছুই সীমাবদ্ধ। তবু আমার মনে হয় আমরা বিদেশী ছবির গল্পের দিক্ থেকে অনেক উন্নত। জানিনা সকলে একথা মানবেন কিনা?

বিদেশে অভিনেত্রীদের শিক্ষা দেবার শিক্ষালয় আছে। আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা জানিনা? যদি না থাকে ত' এইরকম শিক্ষালয় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এইপ্রকার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যেমন বহু ভাল ভাল অভিনেত্রী পাওয়া সহজ হ'বে তেমনই অনেক অভাগিনীর জীবন যাত্রার পথও বদলে যাবে।
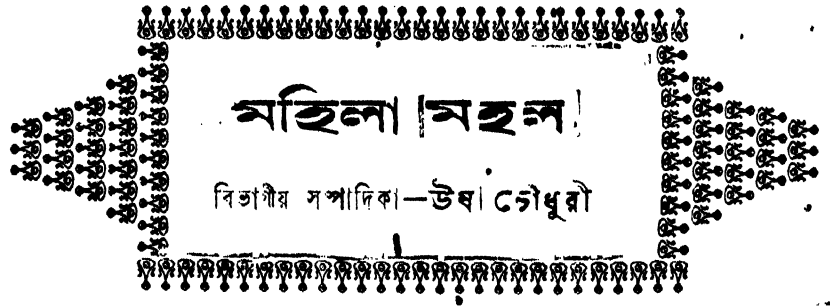
বাঙলা দেশ জুড়ে আজ অশান্তির ঢেউ এসেছে, ঢেউ এসেছে বাইরে, জনসমাজে, ঢেউ এসেছে গৃহকোণে। আমাদেরও গায়ে এসে লাগছে ঝড় ঝাপ্টা। চুপ ক'রে ব'সে থাকবার দিন আজ নয়। কিছু না করতে পারি, অন্ততঃ পথ কোন্ দিকে সে সম্বন্ধে আলোচনাও চলতে পারে। তাই খেয়ালীর মহিলামহলের দায়ীত্বগ্রহণের অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারলুম না। আমি এগিয়ে এলাম আরো আরো বোনেদের ডাক দিতে। নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে আজ সকলে মুখর হ'য়ে উঠুন, প্রকাশ ক'রে বলুন যিনি যা ভেবেছেন, নিঃশব্দ থেকে আমরা যেন আমাদের দায়ীত্ব এড়িয়ে না যাই।

চায়ের দোকানে, বন্ধুদের আসরে, ট্রেনে, ট্রামে, পথে ঘাটে, অফিসে, আদালতে মেয়েদের সম্বন্ধে হাজারো অভিযোগ উঠছে, কেউ আমাদের পক্ষে, কেউ বা বিপক্ষে। পুরুষমহল আমাদের বক্তব্য শোনবার জন্যে উদ্গ্রীব, কিন্তু এখনো আমরা পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারিনি। বোঝাতে পারলে সমস্ত কলগুঞ্জন এতদিনে শুদ্ধ হ'য়ে যেত।

এদিকে আমাদের সমাজেরও দুঃখের অবধি নেই। অনেকগুলি নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট থেকে বহু পরিবারের বহুবিধ অভাব অভিযোগ ও সুবিধা অসুবিধার সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা হয়েছে। সে সব অভিজ্ঞতার কথা ক্রমশ আমি প্রকাশ করব।

সংক্ষেপে বলতে গেলে,—সেই পরিবারই সুখী, যেখানে পুরুষরা কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও উপার্জ্জনশীল এবং নারীরা কিছু পর্দ্দায় কিছু স্বাধীনতায় আধুনিক আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হাস্যলাস্যময়ী ও সেবারতা এবং অবসর সময়ের পরিশ্রমে প্রস্তুত শিল্পবিক্রয়লব্ধ অর্থে সংসারে সচ্ছলতাবিধায়িনী। ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে এই ধরণের পারিবারিক জীবনেরই প্রয়োজন আছে।

এই প্যারাটির সমস্ত অন্তর্নিহিত অর্থ এককথায় সকলের বোধগম্য করা সহজ নয়। বিশ্লেষণের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যেখানে পুরুষরা মানুষ হলনা সেখানে নারীর মনমেজাজ ঠিক রেখে কাজ করে যাওয়া শক্ত। নারী সাহায্য করতে পারে মাত্র, সংসারের সমস্ত দায়ীত্ব নিতে গেলে তার নারীত্ব আহত হয়, সে নিজেও বঞ্চিত হয়। কাজেই যে পরিবারে পুরুষ অমানুষ, সেখানে নারীর পূর্ণবিকাশ কি ক'রে সম্ভব হয়? যেখানে পুরুষ সবদিক থেকে সাফল্য অর্জ্জন করেছে, সেইখানেই নারীর কর্মক্ষেত্র

অভিনেত্রী জীবন সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই বলবার ছিল কিন্তু পাছে পাঠকবর্গের বিরক্তি ভাজন হই এই ভয়ে এই খানেই সমাপ্তির লাইন্ টেনে দিলুম। ভবিষ্যতে আরও লেখবার ইচ্ছা রইল যদি অবশ্য সময় ও সামর্থে কুলায়। আমার এই লেখাতে অনেক ভুলচুক্ রইল আশাকরি সহৃদয় পাঠকগণ আমার সামান্য শিক্ষার কথা ভেবে তা মার্জ্জনা করে নিতে পারবেন।

———

সুবিস্তৃত। সেখানে তার গৃহধর্ম্ম সে শেষ করবে কড়া আব্রুর অন্তরালে, কারণ রান্নাঘর, খাবার ঘর, স্নানের ঘর এবং প্রসাধনের স্থান—মানে যেটুকু অন্দর—যেখানে সহজভাবে চলা ফেরা করবে, সেটুকুকে লোকচক্ষুর আড়ালেই সব জাতি সকল দেশেই রাখে। অন্তঃপুরের শালীনতার প্রতি খরদৃষ্টি রাখা দরকার। কিন্তু সেখানে চিরদিন বন্দী থাকলে বহির্জ্জগতের অভিজ্ঞতা থেকে জন্মের মতন বঞ্চিত হ'তে হয়। কাজেই বাইরেও বেরোতে হবে, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে লজ্জাশীলতাকে অচঞ্চল রেখে, আপন মহিমাকে অব্যাহত রেখে,—কর্ম্মব্যস্ত বিপুল পৃথিবীর শতকোটি অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্যে। তারপর, স্বামী ও প্রিয়জনের আনন্দ বিধানে মিষ্টহাসি, লঘু পরিহাস, মধুর বচনের যে প্রয়োজন আছে সে কথা বলারও কি দরকার আছে? সেবা,—যার মধ্যে শুশ্রূষা ও অতিথিপরায়ণতা পড়ে—তা না হলেও গৃহধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তারপর, অবসর সময়ে আরামে বিলাসে যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হবে, তা থেকে যে উপার্জ্জন হবে, তাই নারীকে মহিমময়ী ও আত্মনির্ভরশীলা ক'রে তোলে। পরগাছা শুধু শোভামাত্র, তার নিজের কোনো দাম নেই। স্বর্ণলতিকা না হয়ে রজনীগন্ধার মতন নিজের পায়ে ভর দিয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠা ভালো নয় কি? এবং এতগুলি গুণ না থাকলে নারী ও যে সম্পূর্ণ নয়। আমার আজকের বক্তব্য শেষ হ'ল। এবার আপনাদের কার কি বলবার আছে জানান। আলোচনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হোক্—দেখা যাক্ আলোর আভাষ পাওয়া যায় কিনা।

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবৃতি থেকে জানা যায়, "বিদ্যাপতি"র বাঙলা সংস্করণ অতি শীঘ্রই চিত্রায় আত্মপ্রকাশ কোরবে। বাঙলা "বিদ্যাপতি"-তে কাননবালার অনুরাধা—তাঁর অভিনয়, ভাবাভিব্যক্তি এবং সঙ্গীতের দিক দিয়ে সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। সুতরাং চিত্রায় "বিদ্যাপতি" মুক্তিলাভ কোরলে যে বাঙলা দেশেও একটি নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি কোরতে পারবে—এরূপ ধারণা করা যায়।

* * *

সভ্য-সমাজের আবর্জ্জনার মত যে একদিন দূরে সরেছিল—বস্তীর ঘৃণিত আবহাওয়ার মধ্যে পিতৃ-পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তি-ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মোহ তাকে একদিন পাগল কোরে তুললো। কিন্তু সে জানে আইনের চোখে তার কোন দাবী নেই। যে বিবাহ অবৈধ—তারই পরিনামে, বাপ-মার নিষেধের ভুলে সে পৃথিবীতে এসেচে। কিন্তু ধর্ম্ম, ভগবানের বিচারেও কী সে দণ্ডনীয়?

একটি অতি করুণ ও হৃদয়গ্রাহী সামাজিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এই জটিল প্রশ্নটির মীমাংসা কোরেছেন।

এই চিত্রের বাঙলা সংস্করণের ভূমিকালিপির পরিচয় দিলাম:

ইন্দিরা—যমুনা, রাধা—মেনকা, রেবা—চিত্রলেখা, নিখিলেশ—বড়ুয়া, রতন—পাহাড়ী, অম্বিকাপ্রসাদ—শৈলেন চৌধুরী, গণেশ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, বিহারী—পঙ্কজ মল্লিক, ঐ বন্ধু—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, হীরা—পূর্ণিমা।

হিন্দিতে অভিনয় কোরছেন; যমুনা, মেনকা, বড়ুয়া, পাহাড়ী, ইস্রাৎ, আনসারী, নেমো, পঙ্কজ, প্রতাপ এবং পূর্ণিমা।

ডাইরেক্টর সাহেব যে সব অভিনেতা বা অভিনেত্রী এই বইএর জন্য মনোনয়ন করেছেন তা ভালই বলা চলে। তবে একমাত্র 'ইন্দিরা'র ভূমিকায় যমুনার পরিবর্ত্তে অন্য কোন অভিনেত্রীকে নেওয়া উচিৎ ছিল। ইন্দিরা চরিত্রটী আমরা যতদূর জানিতে পেরেছি তাতে যমুনা একেবারে অচল হ'বে বলেই মনে হয়। কর্তৃপক্ষ যদি এ বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর করতে চান্ তবে ঐ রোলটী নিশ্চয়ই বদলাবার চেষ্টা করবেন।

ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কোরে গঠন করবার জন্য ২নং ষ্টুডিওর কর্ম্মসচীব ছোটাই

বাবু অক্লান্ত পরিশ্রম কোরেছেন। আমরা তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

* * *

প্রমথর আশ্রয়ে এসেও সন্ধ্যার জীবনে শান্তি কোথায়? অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ পরিহাস! স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়েও সে স্বামীর সমস্ত অন্তঃ-আত্ম তার দায়িত্বের চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হোয়ে আছে—তা'র জীবনে এ মর্ম্মান্তিক প্রহসন কেন? প্রিয়লাল তার স্বামী, অথচ সমাজের চোখে, তার সম্মান বাঁচাতে জাহির কোরতে হ'চ্ছে—সে প্রমথ নাথের গৃহিনী!

এই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যায় জীবনে যে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হোল—গত সপ্তাহে এক নম্বর ষ্টুডিওতে পরিচালক প্রফুল্ল রায় তারই অংশগুলি নিপুণভাবে গ্রহণ কোরেছেন। এই দৃশ্যে প্রমথর প্রভুভক্ত বৃদ্ধ ভৃত্য সাধুচরণের ভূমিকায় জনপ্রিয় শিল্পী অহি সান্ন্যালের রূপ-সজ্জা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কোরবে।

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

গেল হপ্তায় সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে-"র যে মজার দৃশ্য তোলা হ'য়েছিল, সে খবর আমরা পাঠকবর্গকে যথাসময়ে জানিয়েছি। এ হপ্তায় তার পরের ঘটনা যা' সেলুলয়েডের ভেতর তোলা হ'য়েছে সেটি আরও কৌতুক-প্রদ। বনলতা (বীণা) শ্রীমতীর (সাবিত্রী) ঘরে ঢুকেই দেখল তারই কাপড়-চোপড় গহণা ইত্যাদি পরে একটি পুরুষ দিব্য মেয়ে সেজে তারই রুগিণী শ্রীমতীর বুক দেখছে; আর শ্রীমতী তাকে বনলতা ভেবে তার গলা জড়িয়ে ধরছে; আর বেচারী প্রাণধন নারীর পরশ পেয়ে উঠছে শিউরে শিউরে। এমন সময় সেখানে বনলতাকে দেখে প্রাণধনের প্রাণ খাঁচা ছাড়া হ'ল। সে অমনি বনলতাকে বল্লে "চলুন আপনার বাড়ী যাই, মিঃ চৌধুরী (হরেন মুখার্জ্জি) সম্বন্ধে একটা খবর আছে। মিঃ চৌধুরী ও মিস্ সেফির (উষা দেবী) নাম শুনেই বনলতা একটু ঔৎসুক্য প্রকাশ কোরে বলল—"আচ্ছা চলুন"। যাবার সময় কেবল শ্রীমতীকে বনলতা বলে গেল—"কারবলিক্ এসিডে ঠোঁট জোড়া ওয়াস্ কোরে নিও—ও মেয়ে নয় পুরুষ!" শ্রীমতী তাই শুনে রাগল না হাসল, তা' বলা শক্ত! শুধু সে বলল—"আহা, সুন্দর পুরুষের সুঠাম দেহের পরশ এখনও যে আমাকে মাতাল কোরে রেখেছে। বনলতা বল্লে—"চোরের পরশেই তুই হ'লি পাগল। শ্রীমতী গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বল্লে "সখি, শ্রীকৃষ্ণ যে চোরচূড়ামণি ছিলেন, তাই ত' তিনি পুরুষোত্তম—আর তাই ত' বৃন্দাবনের মেয়েরা তারই পরশ পেয়ে হ'ত চঞ্চল।

এদিকে বনলতা প্রাণধনের কাছে আদ্যপান্ত সব কথা শুনে বল্লে—"তোমার জন্য আমাকে মিঃ চৌধুরীকে হারাতে হ'য়েছে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকেই তোমার জীবনের সঙ্গিনী কোরতে হবে।" প্রাণধন ত' মাথায় হাত দিয়ে বসল—এ আবার কী মুস্কিল! শেষে প্রাণধন অনেক

কষ্টে বনলতাকে রাজী করাল যে, শেফির কাছ থেকে চৌধুরীকে কেড়ে এনে তার সঙ্গেই মিলন ঘটাবে। এমন সময় সেখানে শ্রীমতী এল। তাকে দেখেই বনলতা গেল চটে। সে ভাবলে, শেফি মিঃ চৌধুরীকে কেড়ে নিয়েছে, আবার শ্রীমতীও হয় ত' প্রাণধনকে কাড়তে এসেছে। এদিকে মথুর শ্রীমতীকে দেখে মজল। শ্রীমতীকে তার চাই-ই। এরপর

বিমল+চামেলি, মিঃ চৌধুরী+বনলতা, মথুর+শ্রীমতী, ডাঃ প্রাণধন+কমলা, ক্যালারাম+আন্নাকালি।

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে" পাত্র-পাত্রীরা মদনের ফুলশরে কিরূপে বিদ্ধ হ'ল তাই 'উত্তরা'র পর্দ্দায় দেখবেন শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চারস

"মধু সাধনার "অভিনয়" শেষ করবার জন্যে কর্তৃপক্ষ হ'য়ে উঠেছেন ব্যস্ত। কিন্তু পাদপ্রদীপের রঙীন আলোর মায়া মাঝে মাঝে তাদের মনকে কোরে তোলে উতলা—তাই কর্তৃপক্ষের ব্যস্ততা নীরবে উঁকি মারে তাদের রঙীন অভিনয়ের মাঝখানে। মধু-সাধনার "অভিনয়" কবে শেষ হবে—তা' হয়ত' সঠিক কেউ বলতে পারে না। কিন্তু "অভিনয়"-র যবনিকাপাতের জন্য যে তাঁরাও মনে মনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন, এ ধারণা করা অসমীচীন নয়।

রাধা ফিল্মস

কালী প্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় "পুরুষোত্তমে"-র শূটিং আরম্ভ হ'য়েছে। কালী প্রসাদের ওপর আমাদের আস্থা আছে। বহুদিন পরে তিনি বাঙলাদেশে ছবি পরিচালনা কোরছেন—সেইজন্য তাকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—বাঙলা ও বোম্বাই সম্পূর্ণ বিপরীতগামী, এ কথা যেন তিনি ভুলে না যান। আর একটা বিষয়, তার আমরা প্রশংসা কোরতে পারছি না—সেটি হ'চ্ছে, নায়িকা নির্ব্বাচন। কালী বাবুকে বন্ধুভাবেই এই অযাচিত উপদেশ দিলুম। কারণ, তিনি গুণী—সে গুণের তার যেন অমর্য্যাদা না হয়।

প্রফুল্ল পিক্‌চারস

নিজের ষ্টুডিওতে প্রফুল্ল ঘোষের প্রথম বাঙলা ছবি "পথের প্রেমিক" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। প্রফুল্ল ঘোষ নিজের স্বোপার্জ্জিত অর্থে আজ যে ষ্টুডিও গড়ে তুলেছেন—সে ষ্টুডিও সকলের শুভেচ্ছা মাথায় নিয়ে উন্নতিপথে অগ্রসর হ'য়ে বাঙলাদেশে বাঙালীর অস্তিত্বকে সপ্রমাণ করুক এই আমাদের একান্ত কামনা।

মেট্রোপলিটান্ পিক্‌চারস

ডি-জির পরিচালনায় "হাল বাঙলা"র কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। হাসির ছবি পরিচালনায় ধীরেনবাবুর বেশ সুনাম আছে—সেইজন্যই মনে হয় এই ছবিখানা মিঃ বেমকার নব উদ্যমকে জয়যুক্ত কোরবে। আমরা যতদূর শুনেছি নিছক হাসিই ছবিখানার মূল প্রতিপাদ্য নয়। হাসির ভেতর দিয়ে শিক্ষার অনেক কিছুই লেখক এই গল্পের ভেতর সন্নিবেশিত কোরেছেন। এই ধরণের গল্পই অধুনা চিত্রের জন্য মনোনীত করায় এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করি।

"টারজন-কি-বেটি" চিত্রের একটি দৃশ্য

টারজন-কি-বেটি

ভারতের জঙ্গল চিত্রের মধ্যে এই ছবির স্থান শীর্ষে। ছবিখানা দেখতে দেখতে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শরীরের ভেতর

"টারজন-কি-বেটি" চিত্রের একটি দৃশ্য

শির'-উপশিরাগুলো দস্তরমত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। গল্পটি হ'চ্ছে সংক্ষেপে এই— জঙ্গলের ভেতর মণি-মাণিক্যের সংগ্রহের জন্য দু'টি বীর যুবক বেগ ও মজনু ও দু'টি বদমায়েস্ দীননাথ ও শান্তিলালের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। ইতিমধ্যে সেই জঙ্গলে পালিতা টারজনের মেয়ের সঙ্গে বেগ পড়ে প্রেমে আর মণিকার রূপে মজে মজনু। বহু চিত্ত-চাঞ্চল্যকর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শান্তিলাল ও দিননাথ হয় নিহত এবং বেগ ও মজনু সেই মহামূল্য রত্নের হয় অধিকারী। মজনু মণিকাকে পায় ও বেগ টারজনের কন্যাকে লাভ করে। মজনু দেশে ফেরে কিন্তু বেগ সেই জঙ্গলেই তার প্রিয়তমার সঙ্গে রয়ে যায়।

অভিনয়ে বেগের বেগ ও শ্যামার টারজনের মেয়ে হ'য়েছে চমকপ্রদ। এ ছাড়া জি, এন্, ভট্ট, মণ্ট ও মেনকার যথাক্রমে দীননাথ, শান্তিলাল ও মণিকা প্রশংসনীয়। হেরল্ড লুইদের পেশী সঞ্চালন ক্রীড়া প্রণিধানযোগ্য। পরিচালনা ভালই বলা যায়। শব্দগ্রহণীকরণ ও আলোকচিত্র প্রশংসনীয়। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই ছবির 'লোকেশন সট্'।

পরিশেষে অরোরা ফিল্ম ও কমলা মুভিটোনের কর্মকর্তাদের এই ছবির জন্য যে অমানুষিক শ্রম স্বীকার কোরে সাফল্য-মণ্ডিত কোরে তুলেছেন—তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কোরছি।

হাজরা পিকচার্স

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় "দেবী ফুল্লরার শুটিং অর্দ্ধেকের উপর শেষ হয়েছে। বহির্দৃশ্য সমস্তই শেষ হয়েছে। সম্প্রতি রাজপ্রাসাদের দৃশ্যের সেট্ কারুশিল্পী পরেশ বসুর কল্পনানুযায়ী তৈয়ারী হইতেছে। ছবি খানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য এই নবজাত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অর্থ ও সামর্থ ব্যয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য করিতেছেন না, আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

পূর্ণ থিয়েটার

এদের কর্ত্তৃপক্ষরা এই রবিবার থেকে স্থায়ীভাবে সকাল ১১টার সময় এক একখানা কোরে ইংরেজি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা কোরেছেন। এই রবিবারে এখানে হবে "ক্যাপটেন ব্লাড।" এই ব্যবস্থা কোরে কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিশেষ ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন—একথা বলাই বাহুল্য।
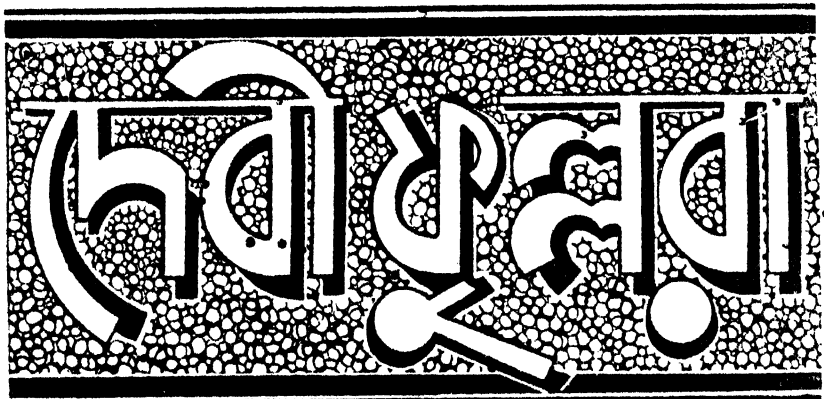
বিবিধ

শ্রীপঞ্চমী উৎসব

আমরা নিম্নলিখিত স্থান সমূহ হইতে এবৎসর শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি।

তরুণ সম্প্রদায়—২১ রূপ নারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর বালিকা শক্তি সঙ্ঘ—৪৪নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট, ভবানীপুর এথলেটিক ক্লাব ২০।১০বলরাম বসু ঘাট রোড—বিবেকানন্দ ক্লাব—২ বি, কার্ত্তিক বসু লেন, হাতিবাগান সার্ব্বজনীন—৬৯ গ্রে ষ্ট্রীট, সুবোধ স্মৃতি সঙ্ঘ—১০২ এ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কালীঘাট রোড শিল্পী সঙ্ঘ ভবন—১৩৩ কালীঘাট রোড, বাণীমন্দির বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—২ উইলিয়ামস্ লেন, প্রবাসী বাঙ্গালী সঙ্ঘ—কুপার বিল্ডিং (বোম্বাই), প্যারাডাইস ক্লাব—১৬ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ভবানীপুর সমাজ—ভবানীপুর, রূপ বিকাশ ক্লাব ও কোহিনুর ক্লাব—২৭।১ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, চক্রবেড়িয়া ক্লাব—৩৭।১, চক্রবেড়িয়া রোড (নর্থ), কিশোর সঙ্ঘ—৭নং জনক রোড, বালক সঙ্ঘ—সর্দ্দান পার্ক, ভবানীপুর, খিদিরপুর উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মেমোরিয়াল স্পোর্টিং এসোসিয়েশন সাখারীপাড়া রোড ভবানীপুর, আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব—৩নং মোহনচাঁদ রোড খিদিরপুর, বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব—ভবানীপুর। কবিতীর্থে বাণী-বন্দনা সমিতি. খিদিরপুর।

ন্যাশনাল টেলারিং

সম্প্রতি সিল্ক ও পশমের জামা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিষ্কার করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যেই উত্তর কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

"স" কলেজ

আগামী রবিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ৫ ঘটিকার সময় সেনেট হলে "স" কলেজের ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের "গোরা" অভিনয় করিবেন। শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ইহার পরিচালনা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

নৈহাটী সাহিত্য সভা

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী নৈহাটী মহাকালীতলা বঙ্কিম-মণ্ডপে মহাসমারোহে এক সাহিত্য-সভার অধিবেশন হয়। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ মহাশয়, পণ্ডিত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত সভাপতি-পদ-প্রস্তাবের সমর্থন কালে শ্রীপঞ্চমীর দিনে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করায় উদ্যোক্তাগণের কার্য্যের প্রশংসা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে তাঁহার অভিভাষণটী পাঠ করিলে পর সভার সভাপতি প্রতিষ্ঠ-যশা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণটী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ, শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ এম, এ শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। এতদুপলক্ষে এক আবৃত্তি ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। কুমারী তারা দেবী, শ্রীমান মুরারী বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত অমল কুমার সান্যালের প্রবন্ধটী উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তাঁহাকে 'সুমতি পদক' প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত অতুল্য চরণ দে, শ্রীযুক্ত অজয় কুমার দে ও শ্রীযুক্ত অজিত কুমার পাল প্রভৃতি মহাকালীতলা ভ্রাতৃ-সমাজের সভ্যবৃন্দের প্রাণপাত পরিশ্রমে এই অনুষ্ঠানটী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়।
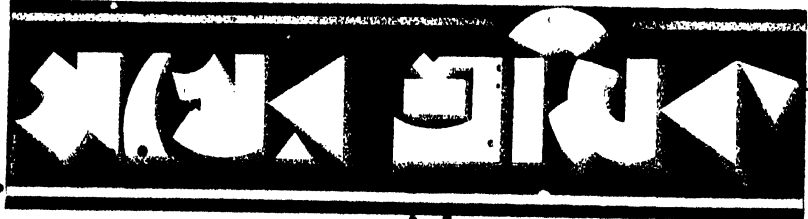
টেলিফোনে আধঘণ্টা

শ্রীমতী সরলা দেবী

তিনদিন ধরে অনবরত বৃষ্টির বিরাম নেই। সমস্ত আকাশটা আষাঢ়ে মেঘের মত মুখ ভার করে রয়েছে। কথায় কথায় কান্না ছাড়া সে যেন আর কিছুই জানে না। সামনের খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার বিপরীত দিকে যে লালরঙের তিনতলা বাড়ী, তার দোতলার ঘরের প্রায় সবটাই দেখা যায়। ছোটখাটো জিনিষ পত্তর দিয়ে ঘরখানি আধুনিক রুচিসম্পন্নভাবে বেশ সাজানো। জানলার কাছে যে টেবিলটা দেখা যাচ্ছে, সেটা আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় কাগজ পত্তরে বোঝাই; এবং তার ভেতর থেকে যে মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, আজ দুপুর থেকে তাকে আর চেয়ার ছাড়তে দেখা যায়নি। অনবরত সে লিখেই চলেছে। কি লিখছে কে জানে। সমরের মনটা আজ মোটেই ভাল না। বাদলার দিন। কোথাও বেরোতেও ভাল লাগে না; আর ঘরে বসে বসেই বা কি করা যায়। না:—আজ সে বেরোবেই। কিন্তু, যাবেই বা কোথায়। চিত্রাতে কি একখানা যেন বই দিয়েছে। আজ আবার opening day, টিকিট পাবে তো?—তা বোধ হয় পাবে—যদি না পায়! না:—একটা ফোন করা যাক।

হ্যালো—Burrabazar 1133—একি—এ আবার কে কথা বলছে—আরে বা:—Exchange আবার cross connection দিয়ে বসে আছে। না:—রিসিভারটা রাখতে হোল। তাইত— এরা এত হাসে কেন। টেলিফোনেই বা এত হাসির ধুম কিসের— কি?—অনেক রাত্রে বাড়ী এসেছে— না:—এরা কি বলছে শুনতে হোল। বাইরে তখন জলটা বেশ জোরে এসেছে। সামনের বাড়ীর মেয়েটি table lampটি জ্বালিয়ে দিল। সমরের আর রিসিভার রাখা হোল না। মেয়েদুটি তখন টেলিফোনে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছে।

"সত্যি নেলি, আজকে এই বাদলার দিনে কি ভাললাগে বলত—কি—ঘুমোতে?—মোটেই না—তার চেয়ে কাউকে কাছে এনে—কি—ঠাট্টা; যা:—কি সব বাজে বকিস। এই শোন—পরশুদিন prize distribution এর সময় যে গানটি গেয়েছিলি, সেটা গানা ভাই। বর্ষার দিনে বর্ষার গান বেশ লাগবে—কি?—ভাল লাগছে না?—কি যে তোর ভাল লাগে!—লক্ষীটি গা ভাই।"

অপরদিক থেকে গেয়ে উঠলো: "বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায়রে।" পরিষ্কার ঝরঝরে সুর। সমরের মনে দোলা লাগলো। সামনে বাড়ীর মেয়েটি টেবিলের ওপর থেকে মাথাটা তুলে বাইরের দিকে একবার চেয়ে দেখল। মুখের ওপর যেসব চূর্ণকুন্তল এসে পড়েছে, সেগুলি ফরসা ফরসা আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল। দু'আঙুলের মাঝে ফাউন্টেন পেন গোঁজা। ওকে দেখতে ভারী ভাল লাগে। বেশ মিষ্টি। লাইনের ওপারে যে মেয়েটি গান করছে, সেও হয়ত ঐরকমেরই হবে। বা:—কি চমৎকার গাইবার ভঙ্গী। দেখতে বোধ হয় ওর চেয়েও ভাল—টেলিফোনে গানটি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সমরের মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি গজিয়ে উঠলো। সুগায়ক বলে খ্যাতি তার একটা আছে। সে সুযোগ সে ছাড়বে কেন।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমর গেয়ে উঠলো: "কণ্ঠে তোমার কি সুর বাজে কবি—" দু'লাইন গেয়ে সে চুপ করল। ওধার থেকে একজন বলে উঠলো:

এই উনি আমার গানকে ভেঙ্গানো হল। লক্ষ্মীটি বল ভাই, তোর পাশ থেকে যে ভদ্রলোক গাইলেন, তিনি কে—বলবি না? বেশ, কোনদিন যদি—"

"আমাকে বাপ্পা চিনিনি নেলি। সত্যি করে বল, তুই গাইবার পর কাকে দিয়ে গান গাইয়েছিস। আমি না হয় তোর মত গাইতেই পারি না; বলে—"

"তুই পাগল হলি নাকি? সত্যি বলছি আমার কাছে কেউ নেই এবং কেউ গায়নি।"

"তবে?—"

সমরের তখন বেজায় হাসি পেয়েছে। ও একচোট খুব হেসে নিল। ওধারে তখন কথা চলেছে:

"সত্যি ভাই, কি মিষ্টি গলা বলত! যাই বল, তোর গানের চেয়েও ভাল।"

অপরিচিতার মুখ থেকে নিজের প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে! সমর গেয়ে উঠলো: "বাদল রাণী, কওগো কথা, কওগো আমার সনে—" সমর চুপ করল।

ওধারে তখন পূর্ণ উদ্যম বাকযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। দুজনে তখনও ভেবে পাচ্ছে না কে গান গেয়েছে।

হঠাৎ নেলি বলে উঠলো:

"ভাই, নিশ্চয় কেউ লাইনে আছে এবং আমাদের বোকা পেয়ে মজা করছে। হাঁরে, তাহলে আমাদের সেই কথাগুলিও বোধ হয় শুনেছে! ছি—ছি—যাই হোক, ভদ্রলোক কথা বলছেন না কেন? Hallo—Hallo—সত্যি, আপনি যেই হন

কথা বলুন; আমরা মোটেই রাগ করব না। বলবেন না ত? আমরা দুজনে আপনাকে request করছি—please—"

তাইত, কি করা যায়। সমর একটু nervous হয়ে পড়ল। এর জন্যে সে মোটেই prepared ছিল না। উত্তর দেবে নাকি! দিলেই বা; অন্যায়টাই বা এমন সে কি করেছে। ওধারে তখন request এর হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। সমর উত্তর দিল:

"হ্যাঁ, আপনারা যা ভেবেছেন, ঠিক। সত্যি,—পরের কথা শোনা অত্যন্ত অন্যায়; আমি তা জানি, কিন্তু—

"এর মধ্যে কিন্তু নেই। যখন আপনি জানেন যে এটা অন্যায়, তখন সে অন্যায়—"

"কেন করেছিলাম; এই ত বলবেন? আমি ত সেই কথাই বলছিলাম। কতবার চেষ্টা করলাম রিসিভারটি রেখে দেবার। কিছুতেই পারলাম না। সত্যি, কি সুন্দর আপনি গান। এই বর্ষার দিনে সম্রাট কবির গান সুরসম্রাজ্ঞির কণ্ঠে—"

"শুনুন শুনুন—আপনার বাক্যোচ্ছাস পরে শুনবো। তার আগে দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন কি?"

"বলুন।"

"প্রথমতঃ জেনে রাখুন আমরা দুজনে খুব বুড়ী। আর—"

"দেখুন, আমার ত মনে হয় না যে আমি আপনাদের বয়স নিয়ে কোন আলোচনা করেছি। আপনারা বৃদ্ধাই হোন আর বালিকাই হোন, তার সঙ্গে আমার ত কোন পরিচয়ও হয়নি এবং সে বিষয়ে কোন সমালোচনাও আমি করিনি। আমার পরিচয় হয়েছে আপনাদের সহজ এবং সাবলীল কথা কওয়ার সঙ্গে; আপনাদের ছোট ছোট হাসির সঙ্গে, আপনাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের যে সুর প্রাণলাভ করে কথা কয়ে উঠেচে তার সঙ্গে—"থামুন থামুন—যথেষ্ট হয়েছে। আপনি যে খুব কথার জাল বুনতে পারেন তা আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন আমি যা জিগেস করব, দয়া করে তার উত্তর দেবেন কি?"

অপর মেয়েটি বলে উঠলো:

"ডলি! তুই যেন কি; কলেজে প্রফেসারদের লেকচার শুনে শুনে তোর কথা বলবার ভঙ্গীও প্রফেসারি টাইপ হয়ে গেছে। তুই লাইন কাট। আমি ওঁর সব information নিয়ে পরে তোকে জানাব।"

"তা বলে—"

"আর 'তা বলেতে' কাজ নেই। তোকে যা বলছি শোন, লাইন কেটে দে—লক্ষ্মীটি।"

ঘটাং—বোঝা গেল ডলি নাম্নি মেয়েটি রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন।

"এখন আমরা একা—Hallo—চলে গেলেন নাকি?"

"বাবার সাধ্য কি, লোভ মানুষের পরম শত্রু। আপনি যা লোভ দেখিয়েছেন আর একখানা গান না শুনে কিছুতেই—"

"আমি যদি না গাই!"

"তাহলে জানবো আমার কপাল মন্দ, এবং শুধু তাই নয়; করযোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলব—দেবী, আমি মূর্খ। তথাকথিত এটিকেট বলে যে জিনিষটি আজকাল অন্দরে বাহিরে প্রাধান্য লাভ করেছে, সেটি এখনও আমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত লাভ করতে পারিনি। অতএব, এবারকার মত আমাকে ক্ষমা করে বিদায় দিন।"

কথার সুরে একটু লাইন ছেড়ে দেবার মত ভাবছিল। "Hallo—Hallo—চলে যাচ্ছেন?—শুনুন, বাজে কথা ছেড়ে দিন। বলুন ত আপনার নামটি কি। আপনার গান এবং কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে

গান

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

তোমার দুয়ার যদি বন্ধ রবে
আজ মিলনের রাতে,
কাঁদবে না কি ওগো প্রিয়
নিখিল বেদনাতে!
মোর পরাণের বেতস্‌লতা
কইতে যদি না পায় কথা,
মনের বীণা বাজবে তবে
কিসের মূর্চ্ছনাতে!
তোমার পূজায় লাগবো কাজে
আপন মনে ভাবি,
প্রেম-দেউলে যাবার তরে
করেছিলেম দাবি;
ভুল যদি তায় করে থাকি
তোমার ক্ষমা মিলবে নাকি?—
জ্বালবে না কি তোমার আলো
অন্ধ আঁখির পাতে!!

—

আপনি একজন অভিনেতা। রঙ্গমঞ্চেরও হতে পারে কিম্বা ছায়াচিত্রেরও হতে পারে। এখন সত্যি করে বলুনত আমি যা বললাম তা ঠিক কি না।"

"কতক ঠিকও বটে এবং নাও বটে। ছায়াচিত্রের বাতিক বা রঙ্গমঞ্চের নেশা আমার কম বেশী আছে সত্য, কিন্তু এস্থলে সে কথা আপনার মনে হয় কেন? আমার কথায় কি সেই রকম কোন ভাব ফুটে উঠেচে?"

"একেবারে না-ই বা কি করে বলি। আপনার সাধারণ কথা বলবার ভঙ্গী যদি এইটি হয় তাহলে সত্যি আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আপনি একজন সুবক্তা। যাক্—পরস্পর প্রশংসা আদান প্রদানের ফাঁকে আমাদের আসল কথা হারিয়ে যাচ্ছে।

"আপনার কি নাম এবং কোথা থেকে কথা বলছেন আমাকে আগে বলুন।"

"দেখুন, আমার নাম এবং ধাম বলতে একটু nervousness আসছে। কারণ, ধরুণ আপনি যদি এই ব্যাপারটি আপনার দাদা কিম্বা বাবার কাণে তোলেন, তাহলে ভাবুন ত আমার অবস্থাটা কি হবে।"

"আপনি অত্যন্ত বোকা—sorry—কথাটা মুখ থেকে হঠাৎ slip করেছে—please—হাঁা, যা বলছিলাম—দেখুন, আমার কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে বাবাকে এই সব কথা বলতে যাব! আর যদিই বা বলি, তাহলে আপনি কি ভাবেন, বাবা লাঠি নিয়ে আপনার বাড়ী ছুটবেন!

খিল খিল করে হেসে উঠল। কি মিষ্টি হাসি; লোকে এমন সুন্দর হাসতে পারে! সমরের বুকটা রিণরিণিয়ে উঠল। উত্তর দিল:

"না না—তা নয়—তা অবশ্য না হতে পারে। তবে এটা ত সম্ভব হতে পারে যে আপনার বাবা বা দাদা আমার একজন বন্ধু। যদি তাঁরা শোনেন এই সব কথা তাহলে তাঁরা আমাকে কি ভাববেন বলুন ত! তার চেয়ে আপনি কেন আপনার নাম আর ফোন নম্বরটি আমায় বলুন না। আমি তা হলে—"

"না না, সেটা হতে পারে-না। কারণ, হাজার হোক আমি একজন মেয়েমানুষ। যদি আপনি কোন দিন আমাকে ring করেন এবং অন্য কেউ ধরে, তাহলে ভাবুন ত আমার অবস্থাটা কি দাঁড়াবে। আমাকে আপনি বিশ্বাস করুণ, আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, একথা কারও কাছে বলব না। আমি নাহয় পরে আপনাকে ring করে—"

"না না ভুল করছেন। আমি ring করে যদি আপনার গলা না পাই, আপনি কি ভাবেন আমি আপনার বাবাকে ডেকে বলব যে আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সত্যি, আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন—"

"না—আপনি নেহাত কথা কাটাবার চেষ্টা করছেন। আচ্ছা, আপনি ত আমার নামটি জেনেছেন। এখন, আমার কি উচিত নয় আপনার নাম জানা? ঠিকানার কথা না হয় পরে আলোচনা করা যাবে।"

"তা অবশ্য আপনি বলতে পারেন। তবে দেখুন, আমার নাম বললেই আমার address খুঁজে বার করতে মোটেই কষ্ট হবে না। সেইজন্য—"

"কেন আমাকে এইরকম ভাবাচ্ছেন বলুন ত? সত্যি, বলুন না আপনার নামটি কি? বলুন—"

"শুনুন—"

"না, না, না। আমি কিছুতেই শুনবো না। আপনার নাম না বললে আমি কোন কথাই শুনব না।"

"আচ্ছা, নাম আমি বলছি, একমিনিট সময় দিন।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলতে আরম্ভ করল:

"দেখুন, নাম আমি বলব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমাদের দুজনের পরিচয় হল শুধু কথা এবং নামের মধ্য দিয়ে। আর কোন পরিচয়ই থাকচে না। টেলিফোনের রিসিভারটি হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন আমাদের জীবন মরণ—কাঠি। হাত থেকে, নামাবার সঙ্গে সঙ্গেই হবে আমাদের পরিচয়ের মৃত্যু। জীবনে হয়ত আর কোনদিনই আপনার সঙ্গে কথা বলবার বা আপনার গান শোনবার সুযোগ পাব না। শুধু এই কথাই মনে হবে যদি জানতে পারতাম আপনার ঠিকানা যদি সুযোগ পেতাম আবার আপনার গান শোনবার! কতদিন বাঁচবো জানি না। হয়ত কোনদিন আপনার দেখাও পাব না। যদিও বা পাই কোনদিন কোনখানে, বুঝতেও পারব না যে ইনিই আমার টেলিফোনের পরিচিতা, এরই কণ্ঠের সুর আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভেবে দেখুন ত' এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আছে? গান হয়ত গাইতে আমি ভাল পারিনা, কিন্তু গান আমি ভালবাসি। পৃথিবীর মধ্যে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল গান। দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনাই হয়ত হৃদয়ে রেখাপাত করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে; কিন্তু কোন করুণ সুর যখন মানুষের হৃদয়ে আঘাত করে, তখন মানুষ নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলবার মত হয়। যাক্, আর কোন পরিচয়ই যখন আপনি দেবেন না, তখন আর কি হবে। জীবনে মানুষ অনেক কিছুই চায়; সবই কি সে পায়? আজ এই আধঘণ্টার বন্ধুত্বকেই আমি আমার জীবনের একটি চরম পওয়া বলে মনে করব; আর—"

"থামুন থামুন—please—উঃ—আপনি কি ভীষণভাবে কথা বলতে পারেন! আমাকে আপনি — যাক্ — হ্যাঁ—আমি আপনাকে বলব—বলব আমার নাম' ঠিকানা, পরিচয়, যা কিছু। সত্যি আমি বলব। আমায় বিশ্বাস করুন, আমি বলব; তার আগে, দিন আপনার পরিচয়—দয়া করে—please"—

বেশ বুঝতে পারা গেল, একনিশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেলে সে হাঁপাচ্ছে। সমর তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

"দেখুন, আমায় ভুল বুঝবেন না—নাম আমি বলছি; আমার নাম—"

"হ্যাঁ আপনার নাম'?—বলুন—আঃ—দয়া করে থামবেন না বলুন—"

"আমার নাম—"

হঠাৎ টেলিফোনে খটাং করে একটা শব্দ হল।

সমর চেঁচিয়ে উঠল:

Hallo—Hallo—শুনুন—শুনুন আমার নাম—আমার নাম সমর রায়—বলরাম দের ষ্ট্রীটে থাকি — Hallo— শুনছেন—উত্তর দিচ্ছেন না কেন—আমায় ভুল বুঝবেন না—Hallo—।"

কোন উত্তর নেই। বোধহয় exchange লাইন কেটে দিয়েছে; কিম্বা—নাঃ—তা সম্ভব নয়। সমরের চোখদুটো ভিজে উঠল। কেন—কে জানে!

বাইরের আকাশ তখন আরও কালো হয়ে উঠেচে। বৃষ্টি আর ঝড়ের মাতামাতি যেন বেড়ে গেল। সামনে বাড়ীর মেয়েটির হাত লেগে হঠাৎ table lampটি টেবিলের ধার থেকে মাটিতে পড়ে উল্টে গেল। ঘর অন্ধকারে ভরে উঠল।

মেয়েটির মুখ আর এখন দেখা যাচ্ছে না।

—

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ধীরে ধীরে তাহার নাক দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। তাহার ইতিহাসের পশ্চাতে যে একটা গভীর রহস্য বর্ত্তমান আছে তাহা বুঝিতে ললিতার মাতার বিলম্ব হইল না।

ললিতার মাতা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: "কি, তোকে কি তোর স্বামী দেখতে পারতো না!—

লবঙ্গ হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিয়া বলিল:—আজ ভরা সন্ধ্যাবেলায় ওসব কথা থাক্ মা! আচ্ছা মা, তোমার মেয়ের বাড়ীতে কি ক'রে থাকা যায় বলতো? একটা শাঁখ নেই যে সন্ধ্যাবেলায় বাজাই! একটু গোবর তা পাবার যো নেই! হিঁন্দুর বাড়ী এসব না হ'লে যে অকল্যাণ হয়!"

ললিতার মাতা হাঁসিয়া বলিলেন: কি জানিস্ লবঙ্গ? ওরা অনেকদিন বিদেশে কাটিয়ে কাটিয়ে, হিঁন্দুর নিষ্ঠে ফিষ্ঠে সব ভুলে যেতে বসেছে! দেশেতো যেতে পায়না, আর পাঁচটা পাঁচরকম দেখতেও পায়না। জামাই চাকরি করে, দেশবিদেশেই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একটা স্থিতি স্থাপক তো আর নেই!

—কিন্তু আমি এসব দেখতে পারিনা মা, যাই বলো! সন্ধ্যেবেলায় শাঁখ বাজাবো না, এই বা কি কথা? ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবে কি করে মা?

—তাতো ঠিক কথা! ঝিচাকরের ঘর কেউতো দেখেনা! যে যার আপন, আপন! তুই মা যে ক'দিন আছিস্ একটু গুছিয়ে গাছিয়ে দে!

—কি যে কোথায় আছে, তাওতো বুঝতে পারিনে! ঘর কর্ন্নে যে সব জিনিষ দরকার, তার কোথায় কিযে আছে, না পারে বল্‌তে চাকর, না পারে ঝি! ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে সে এমন একটা উত্তর দেয় যে বুঝতে পারে কার সাধ্যি! এমন ক'রে কি করে কি হয়, বলতো মা!

—ওই দেখে শুনে নাও বাছা! আর কি বলবো! আমার মেয়েতো সুস্থ নয়! অসুখে অসুখেই তাকে খেলে! এবার আবার যে অসুখ ধরেছে, তাতে যে ও রেহাই পায় তাতো বলে মনে হয় না। কাল ডাক্তার কি বল্‌লে, সব শুনলে না!

—দিদি ভাল থাকলে কি আর সংসার এমন অগোছালো হয়! ঐখানেই তো গলদ মা! আহা! দিদি ভাল হন, তা'হলেই আবার সংসারের ছিরি ফিরে আসবে!

—তবু আমার মেয়ে এই অসুখের ওপরই জামাইএর খাওয়া দাওয়া, জলখাবার তৈরি সব তদারক করে! দুপুরবেলা নিজে উঠে ঠাকুরকে দিয়ে লুচি, হক্কা, মোহনভোগ সব তৈরি করায়! ঐ জন্যেই তো ও সেরে উঠতে পাচ্ছে না!

—আচ্ছা, ওগুলো আমার ওপর ভার দেওনা মা! আমার তো এখানে কোনও বাঁধাধরা কাজকর্ম্ম নেই! দিদির কাজটাই না হয় কিছু কিছু করি!

—সে তো ভাল কথা! আচ্ছা আমি ললিকে বল্‌চি! দুপুরবেলা তুমিই না হয় জলখাবার তৈরির তদারক করো!

—আমার তো আপত্তি নেই! তবু দিদির মত হলে হয়!

—পঞ্চম পরিচ্ছেদ—

সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টির উৎপাতে ললিতার শরীরটা ভাল ঠেকিতেছিল না। নীরদ বাবুও বৈঠকখানায় বসিয়া বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তাস খেলায় মাতিয়াছেন। কাজেই ললিতাকে সঙ্গী খুজিতে হইতেছিল।

ঝিকে দিয়া ডাকাইয়া লবঙ্গের সহিত সে গল্প জুড়িয়া দিল।

—চুঁচুড়া সহরটা তোমার কেমন লাগচে?

—ও! এ সহরটার নাম বুঝি চুঁচড়ো?

—হাঁ! কোথায় এসেছো, তার নামও তুমি জানো না?

—জানবার দরকার হয় নি! মা'র সঙ্গে এসেছি! মা যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আসবো!

—তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয়! কিন্তু মাতৃভক্তির শ্রীচরণে কি মানুষের সাধারণ জ্ঞানেচ্ছাটাও অঞ্জলি দিয়েছ?

—এক রকম তাই বই কি! সেখানে জ্ঞান কোনও উপকারে আসে না, সেখানে জ্ঞানটাকে বাড়িয়ে মনের বোঝা বাড়ানো কেন?

—"জ্ঞান কখনও মনের বোঝা হ'তে পারে?"

—তা জানিনে ভাই! তবে যাদের পৃথিবী—স্বামী পুত্র কন্যা নিয়েই সীমাবদ্ধ, তাদের কাছে বেশী জ্ঞান একটা ঝঞ্ঝাট!

—স্বামী আছেন?

—সিঁথের সিঁদুর দেখেই বুঝতে পারছো!

তা বটে! আমার ওটা ভুল হয়েছে! কিছু মনে করো না ভাই। একলা একলা থেকে থেকে, কার কি থাকা উচিত তাও ভুলে যেতে বসেছি। ছেলে পুলে কিছু হয়েছে?

—হ'লে সঙ্গেই থাকতো!

তা বটে! এটাও আমার আর একটা ভুল!

—এ রকম ছোটখাটো ভুলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। মানুষ তো আর সব সময় সব বিষয় দেখে শুনে কথা কইতে পারে না!

—কিন্তু তাই উচিত। নইলে অনেক সময় লোকের কাছে অপ্রস্তুত হ'তে হয়।

—আচ্ছা আমার কাছে তোমায় অপ্রস্তুত হতে হবে না। আমি সেটুকু অভয় তোমায় দিচ্ছি।

—তোমার স্বামী কি করেন, ভাই?

—আমার স্বামী খান দান বেড়িয়ে বেড়ান।

—কিছু কাজ কর্ম্ম করেন না?

—করেন বৈ কি! পাড়ায় সখের যাত্রার দল আছে তাইতে রাজা সাজেন, আর বাড়ীতে এসে অন্নধ্বংস করেন।

—জমিদারী আছে বুঝি?

—আছে বৈ কি! তবে সজীব জমিদারী!

—তার মানে?

লবঙ্গ ওষ্ঠাধরের কোণে অল্প একটু হাসিল। বলিল: "লোকের জমিদারী থাকে বড় বড় পরগণা। যার খুব ছোট জমিদারী, তারও থাকে দু'পাঁচ বিঘে জমি। কিন্তু আমার স্বামীর জমিদারী,—বড়ই বলো আর ছোটই বলো,—মাত্র সাড়ে তিন হাত লম্বা আর জোর এক হাত চওড়া। লোকের জমিদারী কথা কয় না, আমার স্বামীর জমিদারী কথা কয়। লোকের জমিজমা নড়ে চড়ে বেড়ায় না। আমার স্বামীর জমিদারী পায়ে হেঁটে বেড়ায়।

—এ যে বেশ একটা হেঁয়ালি দেখছি!

লবঙ্গ বেশ গম্ভীর হইয়াই বলিল: হাঁ, হেয়ালি বই কি? তুমি ত দিদি দুটো ইংরিজি পাশ দিয়েচো, অনেক লেখা পড়া শিখেচো, একজন হাকিম তোমার স্বামী...আচ্ছা আমার এই হেয়ালিটার উত্তর দাও দিকিন।

ললিতা লবঙ্গর কথা শুনিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। চুপ করিয়া খানিকটা সময় ভাবিল; একটু পরে বলিল:

—"হয়েছে! তোমার হেয়ালির মানে হচ্ছে এই যে তোমার স্বামীর জমিজমা কিছুই নেই! আছে কেবল একটি সাড়ে তিন হাত লম্বা ও একহাত চওড়া টাকার থলে।

লবঙ্গ বলিল: টাকার থলে কি কথা কয় দিদি?

—কিন্তু নড়ে চড়ে ত বেড়ায়!

—সবগুলো ত মিললো না। তবে কি ক'রে হেঁয়ালি ভাঙা হলো?

ললিতা বলিল: আচ্ছা, আর একটু ভেবে দেখি! হেঁয়ালিটা বেশ রকমারি বটে!

দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ। শেষ নীরবতা ভঙ্গ করিল ললিতাই। বলিল: ঠিক ধরতে পারলুম না ভাই?

লবঙ্গ বলিল "এটা আর ধরতে পারলে না! আমার শ্বশুর মশাই. মরবার সময় ছোট ছেলেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ জমিও দিয়ে যেতে পারেন নি। তার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁর নিজের কিছুই ছিল না। তার পরিবর্ত্তে দিয়ে যান এক সাড়ে তিন হাত লম্বা আর একহাত চওড়া মানুষ তাঁর বড় ছেলে। এই বড় ছেলেটিই আমার স্বামীর জমিদারী। অর্থাৎ আমার ভাসুর কোদাল পেড়ে রোজগার করেন, আর আমার স্বামী বসে বসে তাঁর অন্নের ভাগ বসান।

—ও হরি! তাই বলেছিলে সজীব জমিদারী?

—হাঁ! শুধু সজীব নয়, সবাক্ এবং সচল।

ললিতা একটু হাসিয়া বলিল: জমিদারীই বটে! আমার একটি দেওর আছে, সেটিও এই রকম জমিদারী ভোগ করে! তাকে দেখতে পাবে দুচারদিন পরেই! গেছেন বুঝি কোথায়,—বলেও যান নি। তা, সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে! এরা যদি কোনও কাজকর্ম্ম করে যেন, সেদিকে মোটে ঘেসবেন না।

লবঙ্গ বলিল: আমার স্বামীরও স্বাধীনতা যথেষ্ট! যেখানে নিজের পেটের ভাত নিজে রোজগার কর্ত্তে হয় না, সেখানে স্বাধীনতাও চারটে ঠ্যাং তুলে লাফিয়ে বেড়ায়।

—তুমি শ্বশুর বাড়ী যাও না?

—দিদি! তুমি আমায় এমন একটা প্রশ্ন করে বসলে, যার উত্তর দিতে গেলে, বুকের রক্ত পর্য্যন্ত শুকিয়ে যাবে! বলছিলাম না, আমার স্বামীর স্বাধীনতাটা খুব বেশী! সেই স্বাধীনতার যতখানি উপচে পড়ে, ততখানি দিয়ে দিয়েছেন আমাকে...জন্মের মতো!

শরচ্চন্দ্র-প্রয়াণে

শ্রীরথীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হে বাণী'র বরপুত্র! হে বঙ্গ-সন্তান!
হাসিমুখে আজি তুমি বাছি নিলে স্থান
স্বর্গ-লোকে, হে মরমী! হে শিল্পি দরদি!
হে বঙ্গ জননীর অঞ্চলের নিধি—
চ'লে গেলে নিত্যধামে কাঁদায়ে সবারে,
যাহা যায় হায়!! তারে কে ফিরাতে পারে।
নশ্বর দেহ সে তব হ'য়ে গেল লীন,
হে শিল্পি! কখনও যা' হয়না বিলীন
অমর করিয়া রাখে; সে যশঃসৌরভ
ছড়ায়ে পড়িবে দিকে দিকে, সে গৌরব
হ'বেনাক ম্লান, তোমার অমর দান
রহিবে অক্ষয় হ'য়ে, নারী সে যে তুচ্ছ নয়;
বিশ্বসাথে তাহারে করালে পরিচয়
অকুণ্ঠ দরদে, স্বার্থান্ধ মানব-চিতে
শিখাইলে অবহেলে স্বার্থ বলি দিতে,
অন্ধ সমাজের বুকে জ্বেলে দিলে আলো
সত্য তুমি স্বদেশেরে বেসেছিলে ভাল'
অন্তরে বাহিরে, সমাজের পক্ষপাত—
নির্য্যাতিতা রমণী'র তীব্র আর্ত্তনাদ,
তুমিই শুনিয়াছিলে অন্তর ভরিয়া,
তা'ই তুমি বেদনায় লেখনী তুলিয়া
আঘাত করিলে ভীরু বাঙ্গালী'র চিতে।
নারীদের অপমান পার'নি সহিতে
চুপে চুপে, সবলের তীব্র অত্যাচার,
সমাজের বুকে বুকে শত ব্যভিচার,
প্রকাশ্যে দেখা'লে আঁকি লেখনী'র মুখে
হে বীর! নির্ভীকচিতে বিশ্বের সম্মুখে।
সত্যের গাহিতে জয় শিখা'লে সবারে;
তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি র'বে চিরতরে

*

চির হাস্যময় তব সৌম্য মূর্ত্তিখানি,
চিরদিন অমলিন র'বে তাহা জানি;
অকাল-প্রয়াণে তবু, হে রুদ্র-তাপস!
হৃদি উদ্বেলিয়া উঠে নাহি মানে বশ।
ক্ষুদ্র অর্ঘ্য নিবেদিয়া ধন্য চিত্ত মম,
হে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রথী হে অন্তর-তম!!

—তা সেতো ভাল। পাড়াগাঁয়ের লোক হয়ে স্ত্রীকে সেখানে যতদিন ইচ্ছে থাকতে দিয়েছেন।

—হাঁ, একরকম খুবই ভালো! বিয়ে করা পরিবারকে ভাত কাপড় দিয়ে পুষতে হয় না, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? স্ত্রী পরের দরজায় ভিক্ষে করে খায়, এর চেয়ে সম্মানের সুবিধে স্বামীরই বা কি হতে পারে, আর স্ত্রীরই বা কি হতে পারে? যাকে নিজের উদর পূর্ত্তির জন্য নির্ভর কর্ত্তে হয় দাদার উপর, সে যে স্ত্রীকে কতো খেতে দেবে, বুঝতেই পারছো!

—তাহ'লে তোমার কি ক'রে চলে?

—দিদি? এ পৃথিবীতে কারুর চলে না, এমন কোনও জীব দেখেছো? যে অতি ক্ষুদ্র জীব, সে কোন দিন উপবাসে থাকে?

—তোমার ইতিহাস বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক!

ললিতার রুগ্ন মুখখানির উপর সহানুভূতির ছায়া সুপ্রকাশ হইয়া উঠিল।

ললিতা খানিক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল: তাই বুঝি তুমি মায়ের কাছে এসে পড়লে?

লবঙ্গ বলিল: আর কি করি? স্বামী যখন তাড়িয়ে দিলেন···ভাসুরও যখন উচ্য-বাচ্য করলেন না···তখন বাপের বাড়ী এলাম। কিন্তু অনাথিনী যেখানে যায়, সেখানেই দুরদৃষ্ট তার পিছন পিছন গিয়ে হাজির হয়। বাপের বাড়ীতে আসার পরই বাবাও গেলেন মারা। মা আগেই

মেয়ের দুর্দ্দশা দেখবার সৌভাগ্য এড়িয়েছেন। কাজেই আমি হয়ে পড়লাম ভাইএর গলগ্রহ। ভাইএর কোনও দোষ নাই, সে তার অন্নমুষ্টির অর্দ্ধেকটা আমায় দিতে রাজি ছিল। কিন্তু আমার ঘৃণা এলো এই চিরভিক্ষুক জীবনধারার ওপর। পাড়ার এক সমবয়সীর কাছে শুনলাম, তোমার মা কাশীতে একজন রাঁধুনি বামনী খুঁজচেন। এসে লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পায়।"

—তা সেই ভাল। মায়ের কাছেই থাকো। মা কাউকেই অযত্ন করেন না।

—আমার পূর্ব্ব জন্মের বোধহয় এইটুকু পুণ্যের জোর ছিল, তাই সবসুখে বঞ্চিত হয়েও মায়ের সুখ আবার কুড়িয়ে পেলাম। আমার নিজের মা নেই; কিন্তু নিজের মাও বোধহয় এতো অভাবহীনতার মধ্যে আমায় রাখতে পারতেন না।

—মা'র কাছে তোমার কি কি কাজ কর্ত্তে হয়?

—কিছুই নয়। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ের, মায়ের কাছে থেকে যতটা কাজ কর্ত্তে হয়, ততটাই। তার একটুও বেশী নয়।

—রান্নাবান্না কর্ত্তে হয় বুঝি?

—তাও সবটা নয়। মা'ই প্রায় সব করেন। উনি নিজে রাঁধতে বড় ভালবাসেন। আমি ওই তত্ত্বধারকের কাজ করি আর কি।

—পূজার যোগাড়টাও করে দিতে হয়, বোধহয়?

—কিসেরই বা পুজোর যোগাড়! মা গঙ্গাস্নান কর্ত্তে গিয়ে নিজেই ফুল বিল্বপত্র সব যোগাড় করে আনেন। উনি বড় স্বাধীনচিত্ত লোক, পরের ওপর মোটেই নির্ভর কর্ত্তে চান না।

—কতদিন মায়ের কাছে আছো।

—অনেকদিন। প্রায় তিন বছর।

—এত দিনের ভেতর স্বামী কিছু নামটাম করেন নি?

—না; এতটা আত্ম-অবমাননা যোগ্য লোক তিনি নন। বিয়ে করা পরিবারের খবর নেওয়া, সেটা তিনি ঘৃণার কাজ ব'লে মনে করেন।

—তুমি সত্যিই অভাগাবতী, সরজ! আমার যদি এমন হতো, তাহলে,—"

—"গঙ্গার জলে ডুবে মরতে! এইতো! না, আমি সেটা পারিনি! ভগবান্ অনেক সহ্যশক্তি দিয়েছেন, তাই ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সংসার যাত্রা চালিয়ে যাচ্ছি। অন্যায় কর্চ্ছি? তা হয়তো কর্চ্ছি! কিন্তু তবু লোভ হয়, এই দুরবস্থার দৌড় কতদূর পর্য্যন্ত চলতে পারে, তাই দেখতে।

—এ দেখায় কি সুখ আছে?

—না নেই। কিন্তু কৌতূহল আছে! কৌতূহলও নূতন একরকম অনুভূতির সৃষ্টি করে।

—তোমার মনের জোর আছে, তাই পারছো। কিন্তু সকলেতো তা পারে না।

—পারে না; কিন্তু আমি পারছি।

বারান্দা সংলগ্ন গৃহ হইতে কাহার পদশব্দ আসিল।

ললিতা চিনিতে পারিল কাহার পদশব্দ। বাহিরের ঘরের তাশখেলা শেষ হইয়াছে, বন্ধুবান্ধব উঠিয়া গিয়াছে, নীরদ বাবু উপরে আসিয়াছেন খাওয়া দাওয়া করিতে। অলক্ষ্যে এত রাত্রি হইয়া গিয়াছে, ললিতা কি সরজ কেহই জানিতে পারে নাই।

—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই ললিতার মাতা ললিতাকে আসিয়া বলিলেন: ও ললি! আমাদেরতো বাছা এইবার যেতে হয়! আর কতদিন থাকবো বলো! তোমাদের এই নৈরেকার সংসারে কায়েতের ঘরে বিধবার কি বেশীদিন থাকা চলে? আমার পূজা আচ্চা আছে, মহাদেবের মাথায় দুটো বিল্বপত্র দেওয়া আছে,—সে সব এখানে ভাল শুদ্ধভাবে হয় না! তুমি বাছা বলো, আমি না হয় জগুদাদাকে সঙ্গে করে আপনার ডেরায় গিয়ে উঠি!

—কোথায় যাবে মা? কাশী?

—তা আর পাপমুখে বলি কেমন করে? বাবা বিশ্বনাথ কি আবার দয়া কর্বেন?

মাতার কথা শুনিয়া ললিতা আকাশ হইতে পড়িল। বলিল: ওমা, সে কি কথা!

—আর বাছা! তোমার অসুখে সেবা শুশ্রূষা করি, সেটা কি আমার অনিচ্ছে? কিন্তু কি কর্বো? সংসারে আর জড়াতে চাইনে ললি! যে কটা দিন বেঁচে থাকি, বিশ্বনাথের পায়েই থাকতে চাই।

—তারপর আমরা? আমরা কার কাছে থাকবো মা?

ললিতার মাতা জগত্তারিণী একটু হাসিলেন। বলিলেন "তুমি কি ভেবেছো বুড়োমা চিরকাল তোমাদের আগলে আগলে রাখবে? অমন গোস্বামী রয়েছেন, উনিই দেখবেন। আমি বুড়ো হয়েছি, আমি আর কতকাল কর্বো।"

ললিতা বলিল: "মা! তুমিত আমাদের ছেড়েই দিয়েছো! বাবা মারা যাওয়া অবধি তুমিতো একরকম সন্ন্যাসিনী বললেই হয়! দাদা এত ডাকাডাকি করেন, তুমি তা কাণ পেতেই শোনোনা! আমার ওপর তবু তোমার একটু মায়াদয়া বেশী ব'লে দুদিনের জন্যে এখানে আমাকে দেখতে এসেছো। এর ভেতরই 'যাই যাই' করে চলবে কেন মা?"

ঠিক এম্নি সময় নীরদ ঘরে ঢুকিল। সে জিজ্ঞাসা করিল "কার যাওয়ার কথা হচ্ছে।

ইহার উত্তর ললিতা দিলনা। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। মনটা যেন ভারি ভারি।

(ক্রমশঃ)

ভিতরের কথা

মানুষের চোখে জল আসে কখন ?

দুঃখের আবেগে কিম্বা বিষম সুখের সময়। অভিনয় কালে চোখের জল দেখাইতে হইলে সাধারণতঃ কৃত্রিম চোখের জলই দেখান হইয়া থাকে। কিন্তু যে অভিনেত্রী অভিনয় করিবার সময় সত্যকার চোখের জল দেখাইতে পারেন—তাঁহার ক্ষমতা আছে, ইহা স্বীকার না করিয়া পথ নাই।

* * *

"দেশের মাটি"র একটি চিত্র গ্রহণ দেখিতেছিলাম। সেটে ছিল চন্দ্রাবতী। তাহার মুখ গম্ভীর—চিন্তামগ্নী। পরিচালক দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। এইভাবে প্রায় ১৫ মিনিট কাল থাকিবার পর—হঠাৎ অবাক হইয়া দেখিলাম চন্দ্রাবতীর চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে! যে ঘটনাটি চিত্রে তোলা হইতেছিল—তাহা অরুণার জীবনে হয়ত এক মহা পরিবর্ত্তন আনিবে। যে সুখের কল্পনা সে আজীবন করিয়াছে, তাহা হয়ত প্রদীপের আলোর মত দমকা হাওয়ায় নিভিয়া যাইবে! চিত্রের ভূমিকায় সকল দুঃখ নিজের সত্যকার জীবনের জিনিষ বলিয়া, অন্তত সাময়িক ভাবে, গ্রহণ করিতে পারিলে—অভিনয় আর অভিনয় থাকে না। তাহা জীবন্ত হইয়া ওঠে।

* * *

চন্দ্রাবতীর অভিনয়ে এই জীবন্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। যে (অরুণার) ভূমিকায় সে অভিনয় করিতেছে, সেই অরুণার সকল দুঃখ সকল ব্যর্থতা, সকল নিস্ফলতা চন্দ্রাবতী নিজের বলিয়া একান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাই তাহার অভিনয়ে আজ সকল কৃত্রিমতা দূর হইয়া তাহা অতী সহজ, সরল এবং সত্য হইয়া উঠিয়াছে। তাই চন্দ্রাবতীর চোখ দিয়া যখন অশ্রু ঝরিয়া পড়ে তখন আর তাহাকে অভিনয় বলিয়া মনে করা যায় না। সত্যই মনে হয় যেন চন্দ্রাবতীর জীবনের কোন এক গোপন ব্যথা আজ অশ্রুর রূপে বিগলিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িতেছে।

বিদেশী যুবক সায়গল—আজ কায়মনোবাক্যে বাঙ্গালী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সকল আশা, সকল বাসনা, সকল ত্যাগ অশোকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যে অশোকের ভূমিকায় সায়গল অভিনয় করিতেছে, দেশের মাটি চিত্রের সেই অশোক আমাদের কল্পলোকের বাঙ্গালী যুবকের রূপ। পীড়িতের সেবায়, দুঃস্থের সাহায্যে, শোকার্ত্তের সান্ত্বনায় আমরা আমাদের দেশের, যাহাদের সম্মুখে দেখিতে পাই অশোক তাহাদেরই একজন। তাহার শিক্ষা আছে, কিন্তু শিক্ষার অভিমান নাই, তাহার কৃষ্টি আছে, কিন্তু কৃষ্টি গর্ব্ব নাই, তাহার অন্তরে মহান্ সম্পদ আছে—কিন্তু সেই সম্পদের গৌরবে সে জনগন হইতে দূরে থাকে না, জনগণের একজন হইয়াই সে বাস করিতে চায়। এই অপূর্ব্ব মহান ভূমিকায় অভিনয় করিতে করিতে সায়গলের নিজের জীবনেও বহু স্থায়ী পরিবর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

* * *

দুর্গাদাসকে আমরা দেখিতে পাইতেছি ধনী যুবকের, শিক্ষিত যুবকের, কলকারখানায় বিশ্বাসী এক যুবকের ভূমিকায়। তাহার অন্য পরিচয়, সে অরুণার দাদা। বিলাত ফেরত। অজয় দেশকে ভালবাসে। দেশের সকল অন্নাভাব সেও দূর করিতে চায়। কিন্তু তাহার পথ ভিন্নতর। সে বিলাতী আবহাওয়ায় বিশ্বাস করে—এবং সেই মতে দেশ সেবা করিতে চায়। অজয় অশোকের বন্ধু। অকৃত্রিম প্রাণ প্রিয় বন্ধু। কিন্তু আদর্শের সংগ্রামে তাহারা দেশের মাটি চিত্রে সামনা সামনি দাঁড়াইয়াছে। এক চায় অন্যকে পরাজিত করিয়া নিজের হাতে আনিতে, নিজের কর্ম্মপন্থায় নিয়োজিত করিতে। দেখা যাক্—শেষ পর্য্যন্ত কাহার জয় হয়—অশোকের না অজয়ের॥

* * *

উমাকে আজ আর সহজে চিনিবার উপায় নাই। আজ সে আর চণ্ডীদাসের রামী নয়, ভাগ্যচক্রের মীরা নয়—সে আজ দুঃখীর, অন্ধের কন্যা। সকল গ্রামবাসীর নির্য্যাতীত এক অতি গরীবের একমাত্র কন্যা।

এ মোর প্রার্থনা

শ্রীধারানন্দ ঠাকুর

হে প্রাণেশ! জীবনেতে এ মোর প্রার্থনা—
নিষ্পেষিত দুঃখের কাতর আর্ত্তনা—
উজ্জ্বল আলোক দিয়ে ক'রো শুভময়,
সত্যের স্বরূপ সাথে হৃদয়ের হোক পরিচয়।
যেটুকু আনন্দ-আলো দিবে হে সান্ত্বনা,
তোমার স্মৃতির মোহে কভু যেন না কর বঞ্চনা।
উৎসবের আত্মগত মদে,
বিলাসের অলস সম্পদে,
সঙ্কীর্ণ সীমানার অন্ধতম আবেগ-বিরামে
হে দয়াল! জীবনের চঞ্চলতা নাহি যেন থামে!

তার চেয়ে প্রিয়
স্মৃতি-সিক্ত দুঃখের তপ বরণীয়।
আনন্দের অথর্ব্ব পরাণ
অমরতা করে নাকো দান
আনে শুধু মৃত্যু হলাহল
বাধি' সীমাহীন চলাচল।
তাই প্রভু, এ আকাঙ্ক্ষা মোর—
দুঃখে আনন্দ দিও—উৎসবে দুঃখ বিভোর।

ভাবে, বেশে, কথাবার্ত্তায়, উমা আজ এক সরল গ্রামের মেয়ে। কিন্তু গ্রামের একান্ত আপন হইলেও তাহার মধ্যে যে তেজ, যে ত্যাগের, প্রেমের অপূর্ব্ব এক মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহা সকলজনের মনের চোখে—অন্ধকার গৃহের শান্ত প্রদীপের আলোর মত উদ্ভাসিত হইবে।

* * *

কৃষ্ণচন্দ্রের "সুরদাসের" অভিনয় কোন দিন ভুলিবার নয়। এই ভারত বিখ্যাত গায়ককে ভগবান এক 'অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছেন। আমরা যাহা চোখে দেখিতে পাই না, কৃষ্ণচন্দ্র তাহাই তাহার অন্তরের চোখ' দিয়া দেখিতে পায়। কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধ গ্রামবাসী কুঞ্জর ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন। সেটে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পরিচালক মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সমস্ত ব্যাপারটি কথার ভিতর দিয়া বুঝাইয়া দেন। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্রের চোখে মুখে যে একাগ্রতা ফুটে ওঠে—তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র অন্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে—সেটের কোথায় কি আছে—কোন খানে চলিবার স্থান, কোথায় বা আসিবার, বসিবার—যেন তাহার কাছে সহজ স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্রকে অন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা শক্ত হইয়া ওঠে।

* * *

প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী যুবক পঙ্কজ মল্লিক। কিন্নর-কণ্ঠ পঙ্কজ মল্লিক। যাহার মধু-কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণ করিতে এখনও চিত্রায় বিপুল জনস্রোত চলিতেছে, সেই সকল জনপ্রিয় পঙ্কজ "দেশের মাটি" চিত্রের সুর শিল্পী। ইহা ছাড়া একটি বিশিষ্ট ভূমিকাতেও পঙ্কজ আছে। দেশের মাটির গান হইবে এমন যাহা মানুষের মনের সহিত কথা বলে, মানুষের মনে যে সঙ্গীত এক অদৃশ্য মনোহর জগতের দৃশ্যপট খুলিয়া দেয়। চিত্রের কাহিনীর সহিত মিল রাখিয়া সঙ্গীতের ভাষা এবং সুর সৃষ্টি হইতেছে। যাঁহাদের এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতরস ধারার কণামাত্র উপভোগ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারাই আমার কথার সত্যতা অনুভব করিবেন।

* * *

দেশের মাটির কাহিনীর কথা?

এমন কাহিনী লইয়া চিত্র রচিত হইতেছে, যাহা সকল মানব হৃদয় স্পর্শ করিতে বাধ্য। এমন এক প্রেম এই চিত্রে দেখিবেন—যাহা মানুষকে ব্যর্থতার দিকে লইয়া না গিয়া চরম সার্থকতার পথ-নির্দ্দেশ করে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সকল মলিনতার মধ্যেও পবিত্র-মহান প্রেমের চিত্র মনের পটে ভাসিয়া ওঠে—সেই প্রেমের ছবিই "দেশের মাটিতে" পাইবেন॥
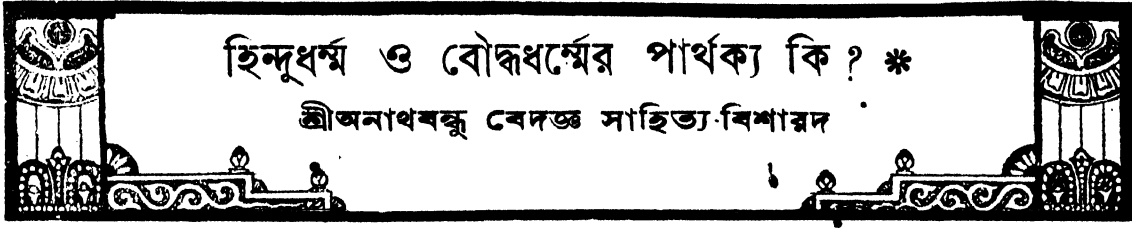
হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য কি? *

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ সাহিত্য-বিশারদ

হিন্দুর সাংখ্য, বেদান্ত, উপনিষৎ যখন মানব উপলব্ধির চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, আর্য্যঋষির ভগবদনুভূতি যখন জগতের সমস্ত সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টিতে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল, ভারতবর্ষ তখন সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক গুরুর স্থান অধিকার করিতে সক্ষম। এমনি জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত যুগে সুদূর বাংলার উত্তরপ্রান্ত মানবের চিরন্তন দুঃখ ও বেদনার নিবৃত্তির জন্য তথাগত সম্বুদ্ধ হইয়া যে ধর্ম্ম চক্র প্রচার করিলেন, তাহা যে হিন্দুধর্ম্মের কোন শাখা বিশেষ করিয়া সাংখ্যমত হইতে উদ্ভূত, এরকম ধারণা থাকা অসঙ্গত না। বিশেষতঃ যখন কতকগুলি বিষয়ে পরস্পরের ঐক্য দেখা যায়। আমি আজ শুধু আপনাদের দেখাইতে চেষ্টা করিব যে হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অনৈক্য কি কি।

ঈশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ তা সে দ্বৈতই হউক অদ্বৈতই হউক দ্বৈতাদ্বৈতই আর বিশিষ্টাদ্বৈতই হউক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ধর্ম। বৌদ্ধদর্শন বলেন "আমি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জগতের মূলকারণ ঈশ্বরও মিথ্যা। বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধশাস্ত্র উভয়েরই মতে দুঃখের মূলকারণ অবিদ্যা। কিন্তু উভয়ের অবিদ্যার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। বেদান্ত বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিদ্যাই ব্যবধান। এবং ইহা দূরীভূত হইলেই জীবের সোঽহং জ্ঞান হয়, জীব ব্রহ্মে একীকরণ সংঘটিত হয়। অবিদ্যা আচ্ছাদিত জীব; অবিদ্যা আবরণমুক্ত জীব—ব্রহ্ম। বুদ্ধের অবিদ্যা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট প্রচ্ছন্ন রাখে এবং এই অবিদ্যার অপগমে আমরা দুঃখোৎপত্তির প্রকৃত কারণ জানিতে পারি। সেই কারণ কিনা বিষয় তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে জন্ম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই রোগ, শোক, জরা।

অনেকের ধারণা কাপিল সাংখ্যদর্শন হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। কারণ উভয়ের মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়' এবং সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভই এই উভয় মতের মূলসূত্র। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবাস্তু। বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে কপিল ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশানুযায়ী স্থানে শাক্যবংশীয় নৃপতিরা একটি নগর নির্মাণ করিয়া তাঁর নামানুসারে উহার নাম কপিলাবাস্তু রাখেন। কিন্তু উপাখ্যান যাহাই থাকুক এই দুই মতের পার্থক্য যথেষ্ট। কপিলমুনির দুইটী মূলতত্ত্ব—প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি সত্ত্ব রজস্তমগুণাত্মিকা এবং পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়ার খেলা খেলিতেছেন যার প্রতিবিম্ব পুরুষ নিজ দর্পণে দেখিতেছেন। প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন তখন মায়ার খেলা থামিয়া যায় এবং তিনি দুঃখ, ক্লেশ, জরা ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। বুদ্ধের রাজ্যে পুরুষের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেন সকলি ক্ষয়শীল, সকলি অনিত্য, সকলি দুঃখময়। এদের মূলে কোন সত্যবস্তু নাই। বুদ্ধের গম্যস্থান নির্বান, বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান ও নহে। সাংখ্যের আত্মতত্ত্ব ও নহে—কিন্তু নির্বান জীবাত্মার অস্তিত্ব লোপ। সে যে কি অবস্থা, সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র তাহা সমূলে উৎপাটিত করিয়া শূন্যে মিশিয়া যাওয়া—শুধু অন্ধকার। নিস্তব্ধতা, শূন্যতা, বিনাশ অথবা আর কি তাহা জানি না!

আর একটি বিষয়ে মর্মান্তিক প্রভেদ দেখিতেছি। উপনিষদের আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা আমি শরীর হইতে ভিন্ন। আমি চক্ষুও নহি, কর্ণও নহি, মনোবৃত্তিও নহি, তাদের কর্ত্তা। আমার বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই, আরো কত কি! কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম দেহ মনের আড়ালে আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করে না। কোন কোন বৌদ্ধমত বলেন দেহ ও আত্মা এক। বৌদ্ধ মতে যে সব উপকরণে জীবের জীবন গঠিত, তাদের নাম স্কন্ধ। এই স্কন্ধ পাঁচটী এবং ইহারা ন্যূনাধিক মাত্রায় সব জীবে বিদ্যমান। ইহাদের সংযোগে জীবের জন্ম এবং বিয়োগে মৃত্যু। এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধ পুঞ্জের বিয়োগ হইবা মাত্র অন্যত্র তাহাদের সংযোগ ঘটে, এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্ট হয়।

তারপর আর একটি পার্থক্য দেখিতে পাই অবতারবাদে। হিন্দু ধর্মে ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে মানব দেহ ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পালনের জন্যই তাদের অবতরণ। কিন্তু বৌদ্ধমতে মনুষ্যগণ সাধনা গুণে অর্থাৎ,

বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ এইরূপ উত্তরোত্তর দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

হিন্দুধর্মে কর্মফলের বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই কর্মফল ও পরকালের উপরই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। যখনই দেখি পাপীর শাস্তি হইতেছে না। আজীবন কুক্রিয়ারত ব্যক্তি শান্তিতে মৃত্যুকে বরণ করিতেছে। যখনই দেখি জগতের নিদারুণ নির্দয় বৈষম্য রাজায় প্রজায়, ধনিকে শ্রমিকে, পণ্ডিতে মুর্খে, পার্থক্য, তখনই তার মীমাংসার জন্য পরকালকে উপস্থিত না করিলে আমাদের উপায় নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের কর্মফল ও পরকাল একটু অন্যরকমের। বৌদ্ধদের দেহ ও আত্মার একত্বহেতু দেহের বিনাশে যখন আত্মার ও বিনাশ হইয়া যায় তখন স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্ন উঠে যে ফল ভোগ করিবে কে? দেহের ধ্বংশে যখন আত্মার ধ্বংশ তখন ফলভোগ অন্যকেই করিতে হয়। কিন্তু একের পাপে অন্যের শাস্তি, তাহাই বা কিরূপ ব্যবস্থা! বৌদ্ধশাস্ত্রে এর কোন সদুত্তর নাই।

বিশ্বসংসার অকাট্য নিয়মে বদ্ধ অথচ তার কোন নিয়ন্তা নাই। ধর্মরাজ্যের কোন রাজা নাই, ফলাফলের ব্যবস্থা আছে কিন্তু কোন ব্যবস্থাপক নাই, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা নাই, পাপের শাস্তিদাতা নাই, এইরূপ ধারণা আমাদের সহ্য হয় না। বিশেষতঃ মনুষ্য আপনা অপেক্ষা উচ্চতর দৈবশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া ধর্মপথে চলিতে অক্ষম। আমরা এখন একজন মঙ্গলময় জ্ঞানময় পুরুষ চাই, যিনি আমাদিগকে সংসারের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। আধ্যাত্মিক জগতে আত্মপ্রভাব অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দেবপ্রসাদ ব্যতীত ধর্ম্মের মূল শুষ্ক হইয়া যায়। তাই আমার মনে হয় মনুষ্য সমাজের এবং মনুষ্য মনের সঙ্গে সহযোগীতা রাখিতে পারে নাই বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিল। এবং বুদ্ধদেবের তিরোধানের দুই শতাব্দীর মধ্যেই নানা ব্যভিচার ও পাপ এর অনাবিলধারাকে কলুষিত করিয়া দিয়াছিল।

সামাজিক আচার ব্যবহার, জাতিভেদ, যাগযজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠান, পূজায় বলিদান, প্রভৃতি প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে ভগবান বুদ্ধদেব তার মত প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে আকৃষ্ট করার প্রধান কারণ হইয়াছিল বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই নীতিবাদ। কিন্তু ধর্ম্মজগতে সাধন সর্ব্বপ্রধান সহায়ক হইলেও ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বলিয়া ভজনের কোনরূপ ব্যবস্থা বৌদ্ধদের ছিলনা, অথচ হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন শাখায় এটাই একমাত্র অবলম্বন। তাই বৌদ্ধধর্ম্মে নীতিবাদ খুব উৎকৃষ্ট হইলেও সেনাপতিহীন অগণিত সৈন্যের ন্যায় ঈশ্বরবিহীন এই ধর্ম্ম বেশীদিন আমাদের দেশে তিষ্ঠিতে পারে নাই।

* শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তোমার মনের গানখানি

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার মনের গান খানি লই
আমার বীণার তারে,
আজকে সদাই কেঁদে বেড়ায়
বেদন—ঝঙ্কারে।
চোখের জলে যেদিন রাতে
বিদায় দিলে আপন হাতে
সেই ব্যথারি কাঁটা শুধু
হানে হৃদয়-দ্বারে।
তবু নিবিড় অনুরাগে—
মোর বিরহী পরাণ মাগে
তোমার হিয়ার সঙ্গ খানি
কেবল বারে বারে।

রাতের কুতব

(চিত্র)

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লীর হিন্দু কলেজের বাঙালী ছেলে-গুলো হঠাৎ সেদিন আমায় ধরে বসল তাদের সঙ্গে জ্যোৎস্নালোকে কুতব যেতে হ'বে। বলা বাহুল্য, প্রথমটা অস্বীকার করলাম। কাজের দোহাই দিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভূতের মত তারা আমার ঘাড়ে ভর করে বসল, 'না ভাই তোমাকে যেতেই হ'বে, আমাদের কলেজের "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সঙ্ঘে"র সভ্যদের একান্ত ইচ্ছা তুমিও চল।'

তারা না বললেও ধরে নিলাম যে, যেহেতু আমি সাহিত্যিক এবং উক্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, উপরন্তু আমার রসকসের ভাণ্ডটি নাকি তাদের কাছে বরাবরই অতি উপাদেয় ও উপভোগ্য। তার আস্বাদন ইতিপূর্ব্বে তারা অনেকবারই পেয়েছে। সুতরাং এস্থলে আমায় হাত ছাড়া করতে তারা রাজী হ'ল না। স্থির হ'ল—ওদের ওপর ভার রইল আমার ভুরি ভোজনের আপ্যায়িতটা, পরিবর্ত্তে আমায় করতে হ'বে হাস্যরস পরিবেশন। যুক্তিটা মন্দ নয়, হাসিমুখে মেনে নিলাম। ওরা হুল্লোড় করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাতটার সময় কলেজে গেলাম। গিয়ে দেখি প্রবেশ মুখের দু'পাশে দু'খানি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিতরের কলেজ কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই ছেলেগুলো সব সমস্বরে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিল, 'এস, এস !'

ইতিহাস অধ্যাপক মিত্র মশায়কে এতক্ষণ দেখতে পায় নি। তিনিও দেখি কখন ছেলেদের সঙ্গে সর্ব্বরকমে যোগ দিয়েছেন। ছাত্র-মিত্র অমন অমায়িক অধ্যাপক খুব কমই নজরে পড়ে। গুরু গম্ভীর ব্যক্তিত্বকে ছেলেদের মধ্যে অমন করে হারিয়ে দিয়ে এতটা আমুদে হ'তে কোন অধ্যাপককে আজও দেখি নি। মনটা আশ্বস্ত হ'ল, যাই হ'ক কুতবেরই তলায় বসে নিশ্চয় কুতব সম্বন্ধে কিছু একটা তথ্যপূর্ণ শুনতে পাব। মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাল যাত্রা আমাদের শুভ না হ'য়ে যায় না।

সন্ধ্যা হতেই গাড়ী ছাড়ল। হুসহুস্ ক'রে সোজা পিচ রাস্তা ধরে চললাম। রাস্তার ধারে ধারে বৈদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। চারিদিক বেশ স্পষ্ট। বাঁ দিকে 'কেল্লা' আর ডান দিকে 'জুম্মা মসজিদ' ফেলে আমরা 'দিল্লী দরওয়াজা' অতিক্রম ক'রে শহরের বাইরে এসে পড়তেই ঠাণ্ডা হাওয়ার তীব্রতা অনুভব করলাম। গাড়ীর ভেতর ছেলেদের গোলমাল, চেঁচামেচি, গান ও গল্পে মাতোয়ারা হ'য়ে হঠাৎ চক্ষু মেলে বাইরের পানে তাকাতেই দেখি বাঁ দিকে 'ফিরোজ শা কোটলাকে ছেড়ে কখন আমরা পুরাণ পাণ্ডব কেল্লার' পথ ধরেছি। যতই এগিয়ে চলি ততই দুরন্ত হাওয়া ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। কানের পাশ দিয়ে হাওয়ার সুর বাসের ধাক্কা খেয়ে হুসহুস্ শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলের আমুদে স্বরখানা কেঁপে উঠল, 'ওই দেখা যাচ্ছে কর্ণের বৈমাত্রেয় ভায়েদের কেল্লা যেখানে আকবর-পিতা হুমায়ুন গ্রন্থাগারের সিঁড়িতে পা পিছলে অকস্মাৎ অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল।'

কথা শুনে সকলেই হল্লা ক'রে হেসে উঠল। শিশুরা যেমন সাধারণ অঙ্গভঙ্গি দেখে হেসে উঠে এরাও দেখলাম তাই; সামান্য কথায় সময়ে অসময়ে তারা হেসে গড়িয়ে পড়ে। কলেজে এসেও বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুর ধাক্কা এখনও যায় নি; নির্ভাবনার চিত্তে তাদের হাস্যরসের উৎসধারা সদাই মজুত থাকে, একটুতেই ফুরফুর করে ওপর পানে উথলে উঠে। এত আমোদ প্রিয় তারা।

আমার বড় ভাল লাগছিল তাদের বাঁধন হারা কথার স্রোতে ভেসে যেতে। নীতি অনীতির কোনই গণ্ডী নেই তাদের ঘিরে। তারা মুক্ত ও স্বচ্ছ, দিলদরিয়া হ'য়ে তারা অনর্গল বকে চলেছে, গেয়ে চলেছে ও হেসে চলেছে। সময় সময় আমিও যোগ না দিয়ে থাকতে পারিনি।

যাই হ'ক রাস্তার বাঁ' পাশে পুরাণ পাণ্ডব কেল্লা ফেলে রেখে আরও খানিকদূর এগিয়ে যেতেই পেলাম হুমায়ুনের মনোরম সমাধি ভবন। এতক্ষণ বাস দু'খানা আমাদের সামনেরই দিকেই ছুটে যাচ্ছিল, এবার তার গতিপথে কিছু বাধা পড়ল। 'হুমায়ুন কবর পিছনে ফেলে মোড় ঘুরেই গাড়ী দু'খানা সোজা 'সবেদারজঙ্গ' অভিমুখে রাস্তা খালি পেয়ে তীরবেগে ছুটে চলল।

পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নি, এবার দেখি সামনের পথটা আমাদের নিরন্ধ্র অন্ধকারে সমাহিত। রাস্তার পাশে এক ফোঁটা বিজলী আলো ছিল না। হেড লাইটের আলো অন্ধকারের বুকে অতি ক্ষীণ রশ্মি নিয়েই আমাদের যাত্রাপথ নির্দ্দেশ করছিল। ড্রাইভার ছিল সুদক্ষ। কিছ মাত্র তার ভয় ডর নেই। তীর বেগে

সে গাড়ী ছুটিয়ে চলেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তার ছায়াপাতে পৃথিবীও কালো। চারিদিকে কালোর কালোর একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছিল। অতীতের কত রাজার রাজধানীর ওপর দিয়ে চলছিলাম তার ঠিক নেই। সীমাহীন নীরবতার মাঝে বাসের ঘড়ঘড়ানি অন্ধকারের ষড়যন্ত্র চুরমার করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঝড়ের আগে উড়ে যাচ্ছিল।

আকাশের এইরূপ অবস্থা দেখে সকলেরই মন দমে গেল। কত আশা তাদের যে, আজকের মত মনোহারী একটি রাত পাবে। আগের দিন পুর্ণিমা গেছে, সুতরাং প্রতিপদের ওপরে সকলের খুবই ভরসা ছিল। কিন্তু এখন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুতবের সৌন্দর্য্য মহিমা মাঠে মারা গেল বলে অনেকেই কবিপ্রিয়া চন্দ্রমার ওপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে গালাগালি করতে সুরু করলে। বেরিয়ে যখন পড়েছি তখন উপায় নেই। বাধ্য হ'য়ে কালো রূপের মহিমা ও গরিমা কীর্ত্তন করে ওদের ভারাক্রান্ত মনে কিঞ্চিৎ আমোদের ঢেউ তুলে দিলাম: এই বলে যে, কাক কালো, কোকিল কালো, কয়লা কালো, ওপাড়ার পিসী কালো, সেই ছেলের চেয়ে কালো ছেলে ভাল, সুতরাং চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকারে ভুবনমোহিনীর ঠাণ্ডা রূপই ভাল। শাস্ত্র ঘেঁটে বার করলাম যেহেতু 'মা কালি কালো'; প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলাম চুলের কদর হ'ল কালো, চোখের তারা কালো—ভাল। সবার ওপরে সত্য হ'ল, আমরা কালো।

লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ এইসব কথাবার্ত্তায়। গাড়ীর বেগ কমে আসতেই দেখি 'নিজামুদ্দিনকে' পিছনে ফেলে 'সাফদার-জঙের' মুখোমুখি হ'য়ে চলেছি। ড্রাইভার ছিল ওস্তাদ আর বরাত ছিল আমাদের ভাল তাই 'সাফদারজঙের' দরজায় ঢু না মেরে বাঁ দিকে মোড় ঘুরিয়ে কুতবের দিকে অগ্রসর হ'লাম।

ডান দিকে বায়ুপোতের আড্ডাটিকে ফাঁকা মাঠের অন্ধকারে টিমটিমে আলোর মধ্যে ফেলে সোজা কুতবমিনারের পদতলে গিয়ে যখন পৌঁছলাম রাত্রি তখন ন'টা। হুড়মুড় ক'রে সব নেমে পড়লাম হুল্লোড় করে।

অন্ধকার, অন্ধকার···বিশ্বব্যাপী অন্ধকার নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চললাম অতি মনোরম একটি আড্ডা খুঁজতে। এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে ও নানা মন্তব্য ও টীকা টিপ্পনীর অবসান করে ঠিক কুতবমিনারের নীচেই ছোট একখণ্ড বাগানের ওপর আমাদের আড্ডাটি গাড়া হ'ল। করিৎকর্ম্মা যারা তারা ধরাধরি করে জিনিষপত্তরগুলো বাস থেকে বাগানের মধ্যে নিয়ে এল। বাকী অকেজো ছেলেরা কোঁচা দুলিয়ে কাচা ঝুলিয়ে এদিক সেদিক চরতে লাগল। ছাত্র বিশেষের দরকার পড়লে এক উচ্চকণ্ঠে ডাকা ভিন্ন খুঁজে বার করা ভার। কারুরই মুখ চেনা যায় না। পরণের ময়লা কাপড় জামাগুলো পর্য্যন্ত ধোপ দুরস্তের মত অন্ধকারে ধবধব করছে। কিন্তু চামড়ায় মুখগুলো যে তিমিরে সেই তিমিরে।

রান্নাবান্নার কোনই হাঙ্গামা ছিল না। সুতরাং খুব খানিকক্ষণ বৃত্তাকারে বসে গান বাজনা চলল। তারপরেই আইসক্রীম, ডিমটো, লেমনেড, আম, লিচু, এদেশীয় ফল আডু, আলুচা, মিষ্টান্নের মধ্যে রসগোল্লা, দিলবাহার ও সিঙ্গাড়া প্রভৃতির আদ্যশ্রাদ্ধ করে পরিতুষ্ট মনে যখন বিশ্রাম ভ্রমণের জন্য সব দল পাকিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার মতলব করছে, এমন সময় বড় বড় ফোঁটা নিয়ে কড় কড় রবে মেঘ ডাকিয়ে চড়বড় করে বৃষ্টি নেমে এল। সামনেই কুতবের লাগোয়া ভাঙাচোরা কামরা গুলোর অলি গলিতে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

খানিক পরেই বৃষ্টি গেল থেমে।

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল গ্রামোফোনে 'মানময়ী গার্ল স্কুল'। সবে মাত্র সাত নম্বর রেকর্ডখানা চাপিয়ে দিয়ে হাতল খুরিয়ে দম দেওয়া হচ্ছে এমন সময় এল এক নিদারুণ দুঃসংবাদ। প্রভাত নাকি

কোন এক কবরের তলে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে মুখ গুজার আর্ত্তস্বরে গোঁ গোঁ করছে। ভয়ে সকলের আত্মারাম খাঁচা। অতীতের বিজন ধ্বংস পুরীতে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই। ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের দুর্ঘটনা এখানে দু'বার হয়েছিল শুনেছি। ভেবে দেখবার সময় ছিল না। সকলেই সেই কবর অভিমুখে ছুটে চললাম। গিয়ে যা দেখলাম তা না বলাই ভাল। B. Sc পাশ করা আমাদের উৎসাহী প্রভাতের মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে ফেনা পড়ছে। মুখে তাই কোন কথা নেই। কবরের দিকে হাত বাড়িয়ে অদ্ভুত গোঙানীতে সে কি তার কাকুতি মিনতি! উন্মাদের মত কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। কোন কিছুতেই হুঁস নেই। অবিন্যস্ত চুলগুলো মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। চক্ষু দুটি বোজা। কখনও উঠে বসে দমাদম বুক চাপড়াচ্ছে…কখনও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ছটফট করছে…যেন বুকখানা তার জলে যাচ্ছে……!

আমাদের মুখে কারুর রা' নেই। নিশ্চল হয়ে বেচারা প্রভাতের পানে চেয়ে আছি। করতেই কিছুই পারছি না। সকলেরই চক্ষুস্থির! বেচু সাহসে কোমর বেধে ওকে টেনে তুলতে গেল। কিন্তু পারলে না, কবরের ভূত যার ঘাড়ে চেপেছে তাকে টেনে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। বারে বারে প্রভাত যেন গর্জ্জে ওঠে। বেচু ভয় পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে ফের চেষ্টা করলে কিন্তু এবারেও বিফল মনোরথ হ'য়ে থ' হ'য়ে গেল। তুলতে গেলেই স্কন্ধালীনা উপদেবতা গর্জ্জে ওঠে, নয়' গোঁ গোঁ রবে হাত ছাড়িয়া মাটির বুকে ঢলে পড়তে চেষ্টা করে নতুবা কামড়ে দেয়। অন্ধকার কবরের চারিপাশে আমরা যখন নির্ব্বোধ অসহায়ের মত নিষ্পলকে চেয়ে আছি এমন সময় সংবাদ পেয়ে মিত্র মশায় এলেন। মাত্র ক'বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন প্রথা ছেড়ে এখন তিনি অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হয়েছেন। সুতরাং ছাত্র সমাজের উপদ্রব ও দৌরাত্ম্যের অভিজ্ঞতা তখনও তাঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ভীড় ঠেলে তিনি কবরের দিকে এগিয়ে আসতেই একটি ফাষ্ট ইয়ারের ছেলে ভীত কাতরস্বরে বললে, 'স্যার প্রভাতদা কি রকম হ'য়ে গেছে!'

—'কিচ্ছু হয়নি, সব ঠিক হয়ে যাবে—' বলে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে টর্চ্চের আলো ফেললেন প্রভাতের মুখে। কিছুক্ষণ নীরিক্ষণ করার পর ডাকলেন, 'প্রভাত!'
বিস্ময়ের হেঁচকা টানে প্রভাত যখন দায়ে পড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাসতে লাগল তখন আর কারুর সন্দেহ রইল না। দুর্ভাবনার মেঘ কেটে গিয়ে তখন সকলের চোখে মুখে খুসীর আলো উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। সকলে নমস্কার মেনে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ অভিনয় বটে, ধন্য প্রভাত! থ্রি চিয়ার্স ফর ইউ, হিপ্ হিপ্ হুররে!'

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ওর মধ্যে কেউই স্বীকার করলে না যে সে ভয় পেয়েছিল। প্রত্যেকেই বলে—এ আমি জানতাম, তবে মজা দেখছিলাম।

ওর মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমানে যারা ভীতু বলে সাব্যস্ত হ'ল তারাও বলে—ভাই বিশ্বাস নেই। অনেকবার এরকম হয়েছে। প্রভাতের চালাকি আগেই অনুমান করেছিলাম, তবে দেখছিলাম ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

প্রভাতকে এই অভিনয় দুর্ঘটনার গূঢ় রহস্যের মূল কথা জিজ্ঞাসা করতেই সব জানা গেল। প্রকৃতপক্ষে 'মানময়ী গার্লস স্কুল'ই নাকি এই কৃত্রিম দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। কানন বালা আর মেঘ নগরে…ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে আর মেরী মাতার নন্দনের প্যানপ্যানানি শুনে ওর কাণ নাকি পচে গেছে। তাই এই পচা রেকর্ডের ঘ্যানঘ্যানানি ও সহ্য করতে না পেরেই অধ্যাপক মিত্র মশায় ও সাহিত্য সঙ্ঘের সেক্রেটারি কল্যাণের সঙ্গে যুক্তি এঁটে কবর মূলে আত্মাহুতি দিতে চেষ্টা করেছিল। আত্মাহুতিতে সফলকাম না হলেও মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় সে অতি আন্তরিকতার সহিত এই কবরকে তার ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

সমাধি

কুমারী বাণী নস্কর

কোন্ সে মাঝি আসবে খেয়াপারে
জীবন প্রদীপ নিভ্‌বে যখন—
বিদায় অন্ধকারে।
সন্ধ্যা বেলায় পারের ভেলায়
অশ্রু সমারোহের—মেলায়
পথ ভুলে সে কোন্ অতিথি
আসবে মরণ-দ্বারে'।
এই জীবনের খেলার শেষে
মরণ-ঢেউয়ে চল্‌বো ভেসে
আসল্ল লেখা কোন্ সে মাঝি
সোনার তরী বেয়ে—
বিস্মরণীর আঁধার বুকে
প্রেমের গীতি গেয়ে।
সেই সমাধির পরম রাতে
সে কোন্ প্রিয় বাহার সাথে
হ'বে আমার মধুর-মিলন
নীরব অশ্রুধারে—
জীবন প্রদীপ নিভ্‌বে যখন
বিদায় অন্ধকারে।

—

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

রেডিও প্রোগ্রাম দিনে দিনে অবনতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। রেডিও কর্তৃপক্ষের তরফ হতে এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। প্রতিটি বিভাগের সমালোচনা করে দেখা যাচ্ছে অধিক স্থলে অকর্মণ্যের ভীড়। বিভাগীয় কর্মকর্তারা তবে কী যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছেন? শ্রোতাদের অভিযোগ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু তবুও কোন উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাশি রাশি অযোগ্য আর্টিষ্টের ভীড়ে রেডিও প্রোগ্রাম কণ্টকিত!

* * *

আর্টিষ্ট অনুপস্থিতির প্রতিকার আজও হোল না। সেই আর্টিষ্ট অনুপস্থিতিতে বাজে পুরানো গ্রামোফন রেকর্ড বাজিয়ে অন্ধ নাচারের অবস্থা।' কোনদিন যদি দেখা গেল ভালো আর্টিষ্টের নাম প্রোগ্রাম তালিকায়। অধিকাংশ স্থলেই শোনা যায় অমনি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানকালীন ঘোষকের নিরাশা বাণী 'অনিবার্য্য' কারণ বশতঃ অনুপস্থিত—তার পরই সুরু হয় ত্রেতা যুগের রেকর্ড বাজনা।

* * *

রেডিওতে যদি রিজার্ভ আর্টিষ্টের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শ্রোতারা অন্ততঃ কর্ণ পীড়াদায়ক রেকর্ডের হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। রেডিও কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

* * *

বেতার নাটকে দল সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হয়ে গেছি। সেদিন আমাদের জনৈকা বিশিষ্টা পাঠিকা রেডিও গ্রাহিকা বলছিলেন-'ও হচ্ছে ঢাকের বাদ্য থাম্‌লে মিষ্টি! থাম্‌লে মিষ্টি সে কথা আমরা জানি না এবং উপমাটা ঠিক হয়েছে বলেও আমাদের মনে হয় না! কিন্তু চিত্ত বিরক্তিকর নাটকের যাত্রা প্যাটানের চীৎকারের আশু প্রতিকার হওয়া উচিত।

* * *

গত ৩০শে জানুয়ারী রবিবার প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে বেতার অর্কেষ্ট্রা বাজনা বাজালেন মন্দ নয়। সত্যবাবু বাংলা গান গাইলেন—ভালো নয়। হরিমতীর গান আমরা খুব উপভোগ করেছি। আলিহোসেনের সানাই বাজনা হোল—সুন্দর। পরে পঙ্কোজবাবু সঙ্গীত শিক্ষাদান করলেন।

* * *

৩১শে জানুয়ারী সোমবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে "kedari koyam" অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হোল। যন্ত্রীসঙ্ঘ আবাহ সঙ্গীত বাজালেন এবং কণ্ঠসঙ্গীতে তা রূপ পেল। অনুষ্ঠানটি মন্দ হয়নি। ডাঃ সুকুমার সেন Books of the month এর সমালোচনা করলেন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা তাতে বইগুলি সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচিতি দান অসম্ভব অবিশ্যি বক্তার সময় মাত্র ১৫ মিনিট নির্দ্দিষ্ট এবং বইও থাকে অনেকগুলি। সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গের সময় বর্দ্ধিত হওয়া উচিত।

* * *

১লা ফেব্রুয়ারী সান্ধ্য অনুষ্ঠানে 'প্রথমে ছোটদের বৈঠক হলো। 'মণিমা' এবং 'দাদুমণি' চিঠি পড়লেন। পরে দাদুমণি মহাভারতের গল্প বললেন। সমরেশ চৌধুরী গান গাইলেন অতি বাজে। রত্নেশ্বর বাবুর কীর্ত্তন গান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। সমরেশ বাবুর আর একখানি গান হোল—ফোর্থ ক্লাশ। বেতার অর্কেষ্ট্রা বাজনা—ভালো। বেতার অর্কেষ্ট্রা সংশোধনের পথ ধরেছেন আমরা প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি। প্রফেসর নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন আজকালকার দিনে বক্তৃতাটির মূল্য যথেষ্ট। ভাষাটি আর একটু সহজ করলে আরও ভালো হোত।

* * *

২রা ফেব্রুয়ারী সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সুধীর ব্যানার্জ্জীর গান ভালো নয়। অগুদের রস-কথায় রসের খোরাক ছিল। প্রতাপ ব্রহ্মচারীর বেহালা চলনসই। ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জীর গান গাইবার কথা ছিল—"অনিবার্য্য কারণ" হেতু অনুপস্থিতি পুরণের জন্যে রেকর্ড বাজানো হোল। এম্-এন্-রায় 'পূজা এবং ভক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন অতি সাধারণ বাজে রচনা কণ্ঠস্বরও দুষ্ট।

* * *

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বেতার নাটকে দল "জয়দেব" অভিনয় করলেন এককথায় যাত্রাগান তাও অমার্জ্জিত। Sublime sentimentকে এরকম ভাবে বিরক্তিকর করে তোলা বেতার নাটকে দলের পক্ষেই সম্ভব।

ফটো : প্যারামাউন্ট

ওপরের ছবিখানাতে মার্লিন ডিয়েট্রিচ, হারবার্ট মার্সাল, মেলভিন ডগলাসকে দেখা যাচ্ছে। ছবিখানার নাম "এঞ্জেল" এক্ষণে রিগ্যালে দেখান হচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই ফাল্গুন ১৩৪৪, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র

রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তিপ্রসঙ্গে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বহুঢক্কানিনাদিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ যাঁহারা না বুঝিয়া বা বুঝিয়াও বুঝিতে না পারিয়া শাসনতন্ত্রে নবলব্ধ কল্পিত ক্ষমতার মোহে কংগ্রেসী আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের আজিকার শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইবে কিনা সঠিক বলিতে না পারিলেও, ইংরেজ রাজনীতিকের কূটনীতি-প্রসূত শাসন-সংস্কারের মাকাল ফলকে যে সকলেই এখন চিনিতে পারিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। উপরোক্ত প্রদেশদ্বয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলে যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে সারা ভারতব্যাপী অন্ততঃ যে কয়টী প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেই প্রদেশগুলিতে অতি শীঘ্রই বিশেষ সঙ্কটাপন্ন শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতি উপস্থিত হইবে। ইহা ব্যতীত সর্ব্বজন উপেক্ষিত ফেডারেসনের কাঠামো ভারতবর্ষের উপর দেশবাসীর একান্ত অনিচ্ছা ও ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও চালাইবার প্রয়াস হইতেছে। জাতীয় জীবনের এই মহা সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে হরিপুরের রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশন সকল দিক হইতেই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

হরিপুরে কংগ্রেসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে একজন বাঙ্গালী সভাপতিত্ব করায় বাঙ্গালী নিজেকে স্বভাবতঃই গৌরবান্বিত মনে করিতে পারে। ভারতের জনসাধারণ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে এই সন্ধিক্ষণে কর্ণধাররূপে বরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের অসীম কর্ম্মোন্মাদনা ও অটুট দেশপ্রেম জাতিকে এই সঙ্কটে যে যথোপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে পারিবে এ বিশ্বাস সকলেরই আছে। আমরা আশা করি যে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় মহাজাতিকে লক্ষ্যপথে পরিচালিত করিতে দৃঢ় হস্তেই জাতীয় তরণীর হাল ধরিয়া থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র গভর্ণর-কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বিবাদের পর শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটকালে যে সৎসাহসের সহিত কংগ্রেসী কার্য্যক্রম পরিচালনা করিবেন তাহা আমরা জানি। ঘটনাবলীর চমৎকার আলোড়নে ভারতের রাজনীতি যে সংঘর্ষের সম্মুখে সমুপস্থিত তাহাতে সুভাষচন্দ্রের ন্যায় শক্তিমান ও তেজস্বী নেতার রাষ্ট্রপতি পদে বরণ সময়োপযোগী হইয়াছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উৎকলের রাজধানী কটকে অজাতশত্রু বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব জানকী নাথ বসু মহাশয়ের ষষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে বিলাস ও বৈদেশিক আবহাওয়ার আবেষ্টনে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্র যে অপূর্ব্ব চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। একা সুভাষচন্দ্র বসু পরিবারের ভাবধারার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহারই আদর্শের পীড়নে ও অনন্যসাধারণ ভ্রাতৃ-প্রেমের আকর্ষণে তদীয় মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী রাজনীতি বরণ করিয়া কারাবাসের অগ্নিশুদ্ধির মধ্য দিয়া আজ বাঙ্গলায় কংগ্রেসী নেতৃত্বের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত। জাতীয় মহাসভার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সভাপতির গৌরব লাভে আমরা সুভাষচন্দ্রকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার কার্য্যকাল সাফল্যে ও ঘটনা বৈচিত্রে গৌরবময় হউক ইহা আমরা কামনা করি।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মিলনে

শ্রীসুধীর বসু

এবারে সাহিত্য সম্মিলনে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়ায় দেখলাম অবসর ও সুযোগ জুটে গেল। বন্ধু অক্ষয় সরকার কর্ম্মিকর্ম্মা—সবে বিষ্ণুপুর ফেরতা ও হরিপুরের ভাবী যাত্রী। পাছে বন্ধু শুধু বিষ্ণু ও হরিভক্ত বলে পরিচিত হ'ন এই ভয়ে কৃষ্ণ ভক্তি জানাতে তৎপর হ'লেন। গত শনিবার তিনি ভোর রাত্রে যে উৎসাহে আমাকে ও বন্ধু নির্ম্মল বসুকে শয্যাত্যাগ করিয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশন অভিমুখে দৌড় করালেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ হুইপ বলে স্বীকার করতে ইচ্ছা হয়। ট্রেণের যাত্রাও সুখকর ও বৈচিত্র্যময়। বন্ধু নির্ম্মল বসু কইয়ে বলিয়ে রসিক সহযাত্রী। ট্রেণে আরও অনেক সাহিত্যরথী—মনে হ'ল যেন কলকাতা উজাড় করে লোক চলেছে কৃষ্ণনগর অভিমুখে। যদিও পরে জানা গেল কলকাতার অধিকাংশ সাহিত্যিক ভোরের নিরবিচ্ছিন্ন শয়নসুখ ত্যাগ না করে বেলার ট্রেণে গিয়াছেন। আমরা মার্কামারা সাহিত্যিক নই তাই এবং বিশেষ করে বন্ধু নির্ম্মলের প্ররোচনায় সাহিত্যের রস-ভাণ্ড ছাড়া অপর সরস ভাণ্ডের উপর লোলুপ দৃষ্টি রেখেছিলাম।

কৃষ্ণনগরে শুধু নয়, সাহিত্য সম্মিলনেও প্রথম যাচ্ছি। কিন্তু কৃষ্ণনগরের সরভাজা, ডি, এল, রায় মাটির খেলনা সব মগজের প্রকোষ্ঠে একাকার হয়ে গিয়ে কৃষ্ণনগরকে বড় পরিচিত মনে হ'চ্ছিল, অবচেতন মনের পরিচয় না পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার? ডাঃ গিরিন্দ্রশেখর বা দাদাবাবু মৃণালকান্তি জবাব দিতে পারেন।

মনে মনে ঠাউরে নিলাম এবারে অধিকাংশ সভাপতি বা সভানেত্রী সংবাদ পত্র বা মাসিক পত্রের সংশ্লিষ্ট লোক। ভাগ করলে এই দাঁড়ায়।

মূল সভাপতি ও সাহিত্যশাখা সভাপতি—অধুনালুপ্ত "সবুজপত্রের" গোষ্টিভুক্ত।

কথা-সাহিত্য সভানেত্রী—"বঙ্গলক্ষ্মী" পত্রের সম্পাদিকা।

কাব্যসাহিত্য সভাপতি—"শনিবারের চিঠির" ও বর্ত্তমানে "আনন্দবাজারের" গোষ্টিভুক্ত।

সংবাদপত্র সাহিত্য সভাপতি—আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক।

প্রধান এই কটী শাখা ছেড়ে দিলে বাকী শাখাগুলির সভাপতি বা সভানেত্রী—অসাংবাদিক। আর তা ছাড়া সভাপতিদের মধ্যে অধিকাংশ নিজেরা স্রষ্টা নন, তাঁরা প্রধানতঃ—সৃষ্ট বস্তুর সুপরিচিত সমালোচক—যেমন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, শ্রীঅতুল গুপ্ত, শ্রীসজনী কান্ত দাস। বাজারে যে চিরদিন Creative Genius এর একচেটিয়া আদর থাকবে আমি তা নিজে চাই না। তাই appreciative genius এর কদর হওয়ায় আমি আনন্দিত। এবং আমার মনে হয় শ্রীঅতুল গুপ্ত ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতি হিসাবে যেরূপ তথ্যপূর্ণ ও সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেছেন তাতে সমালোচক সাহিত্যিকের পদমর্য্যাদা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাহিত্য সম্মিলনের অনেক বিভাগ—অধিকাংশই কোন মূলনীতি অনুসরণ না করে ভাগ করা—যেমন সাহিত্যশাখা, কাব্যশাখা, কথাসাহিত্যশাখা, পদাবলী, সাহিত্যশাখা, সাংবাদিক সাহিত্যশাখা। এ ছাড়া চারুকলা শাখা ও সঙ্গীত শাখা। আমার মনে হয় উদ্যোক্তারা আরো বেশীদুর চালালে সাহিত্যকে ভাগ করতে পারতেন মহিলা সাহিত্যশাখা ও শিশু সাহিত্য শাখায় এবং যুগোপযোগী সাম্প্রদায়িকতার দিনে হিন্দু সাহিত্যশাখা ও মুসলমান সাহিত্যশাখায়! গত চন্দননগর অধিবেশনে সদ্যজাত শিশুশাখা বাঙলাদেশে শিশু মৃত্যুর হারের সঙ্গে সমতা রেখে আঁতুড়ঘরে পরলোক গমন করেছেন (বন্ধু সোশ্যালিষ্টদের ভাষানুযায়ী পটল তুলেছেন) এবং চিকিৎসা শাখা লজ্জায় ও মর্ম্মবেদনায় আত্মঘাতী হয়েছেন। তাই এদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে কীর্ত্তন পদাবলীর বিরাট আয়োজন যাক্ আমাদের বলার আর বেশী কিছু থাকতে পারে না কারণ পত্রান্তরে প্রকাশ এবারে সম্মিলনে স্থিরীকৃত হয়েছে যে ভবিষ্যতে চারিটী শাখা যথা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস ছাড়া অপর

কোন শাখার অধিবেশন হ'বে না। আমার মনে হয় এইটি সুযুক্তির পরিচয়। নইলে অনেক সময়ে এই অনুপরমানুতে বিভাগের ফলে মূল সভাপতির বক্তব্য বিষয় অস্পষ্ট থাকে যেমন এবারের মূলসভাপতি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী কোন ভাষা শাখার অস্তিত্ব নেই নিঃসংশয়ে জেনে অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে ভাষা শাখার সভাপতির বক্তব্য তাঁর নিজের অভিভাষণে নিবেদন করলেন। তারপর আরও বিপদ হ'ল যখন সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীঅতুল গুপ্ত কাব্য ও কথাসাহিত্য শাখার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে কাব্য ও কথা সাহিত্য সম্বন্ধে ছোট করে অনেক নতুন তথ্য শোনালেন। তবে আমি স্বীকার করব কাব্য সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীসজনী কান্ত দাস কাব্য-সাহিত্যের সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের রূপ, তার রূপান্তর সম্বন্ধে যে নির্ভীক আলোচনা করেছেন তাতে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁর অভিভাষণে বাঙলার গৌরব পদাবলী সাহিত্যের রূপ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ পাই, দুঃখের সহিত স্বীকার করছি পদাবলী সাহিত্য শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী অর্পণা দেবীর অভিভাষণে পদাবলী সাহিত্যের রূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সেই সামান্য বিশ্লেষণেরও অভাব চোখে পড়ে। কিন্তু সাংবাদিক সাহিত্যসভার সভাপতি-রূপে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর অভিভাষণে সাংবাদিক সাহিত্যের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন। তাঁর সব মতের সহিত আমরা একমত না হয়েও তাঁর চিন্তার মৌলিকত্বের প্রশংসা করি। আমাদের মনে হয় সাংবাদিক সাহিত্যের এর চেয়ে ব্যাপক রূপ সত্যেন্দ্রনাথের চোখে পড়া উচিত ছিল। তর্জ্জমার মধ্যে যে সাহিত্য গড়ে উঠে তা বিশেষজ্ঞের চেষ্টা প্রসূত নয় বলে লোকের সাহিত্যিক হবার দাবী কি নেই। শাখা সভাপতিদের অভিভাষণের সমালোচনা করার জন্ম এই প্রবন্ধের অবতারণা করিনি তবে যেগুলি স্থূল দৃষ্টিতে চোখে পড়েছে তার উল্লেখ করলাম মাত্র।

যাক্ এখন আমার বিবরণের অসমাপ্ত দু'একটী কথা বলে এই প্রবন্ধ শেষ করব। অভ্যর্থনা সমিতি অনেক আদর আপ্যায়ন করেছেন—যদিও সরভাজা বা সরপুরিয়ার দাবী আমরা রেখে এসেছি অনাগত ভবিষ্যত কালের জন্ম। জানিনা সেই সুযোগ আবার ঘটবে কি না। কলিকাতা ফেরবার পথে বন্ধুর সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক জুটিয়েছিলাম। উপরি পাওনা স্বরূপে পেয়েছিলাম এক অতি আনন্দ জামাই বাবাজী। ট্রেণের যাত্রা আবার সরস হয়ে উঠল রূপে, রসে ও গানে।

[পথে পাওয়া চৌদ্দ আনা হিস্যাবে বন্ধুবর সুধীর বসু মহাশয়ের জামাতা রত্ন লাভের সংবাদে আমরা উল্লসিত হইয়াছি। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি'—তাহা হইলেও সুধীরবাবু হতাশ হইবার পাত্র নহেন সুতরাং আমরা শোভনা ও চকিত-চঞ্চলা কন্যা-লাভের স্বীকারোক্তিতে আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীমতী কমলের রোষ-ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ আসিবে না ত?

সম্পাদক—"খেয়ালী"]

শ্রীদুর্ব্বাসা
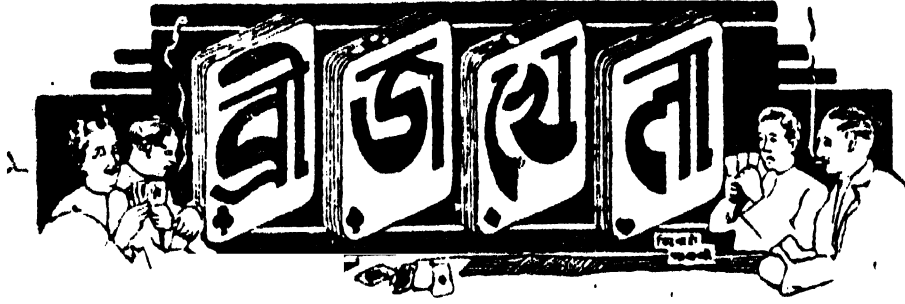
প্রতিযোগিতার একটি হাতঃ—

নিম্নলিখিত হাতখানি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে আপনারা অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, ডাকের কৌশলাদি জানলেই শুধু ভাল খেলোয়াড় হওয়া যায়না, বরং ডাকের পর খেলানোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৌশলগুলি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সুক্রীড়কের একান্ত আবশ্যক, অন্যথা এ খেলায় উন্নতিলাভের সম্ভাবনা একেবারে কম। যদিও প্রত্যেক ডাক ও তার জবাবগুলি খেলাবার অংশীভূত, তথাপি ভাল খেলতে হলে খেলানোর কতগুলি বিশেষ কৌশল জেনে রাখা বিশেষ করে দরকার। একটি ডুপ্লিকেট কণ্ট্রাক্ট প্রতিযোগিতায় নিম্নের হাতখানি খেলা হয়েছিল। একঘরে একপক্ষ ছয়খানি রুহিতন ডেকে খেলা করেছিলেন, অন্য ঘরে অপর পক্ষ পাঁচখানি রুহিতন ডেকে একটি পিঠের খেসারৎ দিয়ে সেই প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিলেন। হাতখানি,—

ইস্কাবন—x, x।
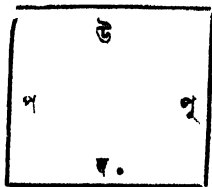
হরতন—সাহেব, বিবি, x, x, x, x।

রুহিতন—গোলাম, দশ, x, x।

চিড়িতন—x।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, x

হরতন—নাই।

রুহিতন—টেক্কা, বিবি, x, x, x।

চিড়িতন—টেক্কা, দশ, x, x।

ডাক হয়েছিল,—

'দ'	'প'
একটি রুহিতন।	দুইটি চিড়িতন
দুইটি ইস্কাবন।	পাশ।
'উ'	'পূ'
দুইটি হরতন।	পাশ।
তিনটি রুহিতন।	পাশ।
'দ'	'প'
চারিটি চিড়িতন।	পাশ।
পাঁচটি চিড়িতন।	পাশ।
ছয়টি রুহিতন।	ডবল।
'উ'	'পূ'
চারিটি রুহিতন।	পাশ।
পাচটি রুহিতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

অন্য ঘরে অপর পক্ষ চারখানি চিড়িতনের পর খেঁড়ীর উত্তরে চারখানি রুহিতন পাওয়ায় পাচখানি রুহিতনে ডাক দিয়েছিলেন। এইস্থলে ডাক সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গেলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ছয়খানি রুহিতনে ডাক দেওয়া বিশেষ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ খেঁড়ীর হাতে যদি রুহিতনের গোলাম ও ছোট ছোট তিনখানি তাস থাকত তাহলেও তিনি ঐরূপ জবাব দিতেন। তারপর খেলা চলল।

(১) 'প' চিড়িতনের সাহেব খেলায় ডাকদার টেক্কা দ্বারা পিঠ নিলেন।

(২) 'দ' ভেবে দেখলেন যে ডবলকারীর হাতে রুহিতনের সাহেব এবং হরতনের টেক্কা তো আছে,—এখন যদি তিনি চিড়িতনে ও হরতনে তুরূপ করে খেলতে চান, তাহলে তাঁকে দুইখানি রুহিতনের পিঠ দিতে হবে, যদি ডবলকারীর হাতে ঐ রঙের সাহেব ও নয় থাকে। সাধারণ ক্রীড়কেরা এইরূপ বিশদভাবে চিন্তা করেন না বলেই ভাল ডাক দেওয়া সত্ত্বেও খেলা করতে তাঁরা অসমর্থ হন। সুতরাং 'দ' ইস্কাবনের টেক্কা ও সাহেব খেলে দুইখানি পিঠ নিলেন।

(৪) পুনরায় 'দ' ইস্কাবনের বিবি খেলায় 'প' চিড়িতন পাশালেন।
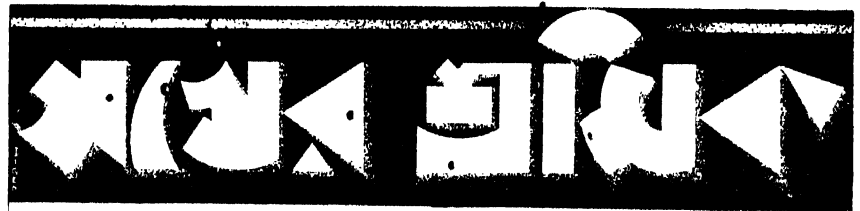
(৫) এক্ষণে চিড়িতন পাশানোর দরুণ 'দ' অনায়াসে বুঝতে পারলেন যে, "প'র হাতে, হরতন রঙ দুইখানই নয় আরও বেশী আছে, কারণ দুইখানি হরতন থাকলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহাই আগে ফেলে দিতেন। এবার দেখুন, খেলানোর সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষদের পাশানো দেখে খেলা কি ভাবে সোজা হয়ে যায়।" ইহা বিশেষরূপে ক্রীড়কবর্গের লক্ষ্য করা উচিত, তা নাহলে তিনি কখনই ভালো খেলোয়াড় হতে পারবেন না। ধরুন যদি তিনি হরতন পাশিয়ে যেতেন তাহলে 'দ' এড়োএড়ি তুরূপ না করে হরতন রঙ দাঁড় করিয়ে নিয়ে নিজের খেলা করে নিতেন। অপর ঘরে এরূপ না করার দরুণ দুজন খেলোয়াড় পাচটা রুহিতনের খেলায় একখানি খেঁসারৎ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

(৬) তারপর 'দ' হরতনে তুরূপ ও চিড়িতনে তুরূপ করে খেলে গেলেন। এই তুরূপ কার্য্য আগে থেকে আরম্ভ করলে কত অসুবিধা হয়, কিন্তু তাসগুলি নিজের মনোমত ভাবে সাজিয়ে নিয়ে খেলতে পারলে কত ভাল খেলা হয় দেখা গেল। বিশেষ চিন্তা করে খেললে বিপক্ষদের হাতের অনেক কিছুই জানতে পারা যায়। সম্পূর্ণ চার হাত ছিল নিম্নরূপ,—

ইস্কাবন— ×, × ।
হরতন—সাহেব, বিবি, ×, ×, ×, × ।
রুহিতন—গোলাম, দশ, ×, × ।
চিড়িতন— × ।

ইস্কাবন— ×, × ।
হরতন—টেক্কা, ×, × ।
রুহিতন—সাহেব, নয়, × ।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, ×, ×, × ।

ইস্কাবন—গোলাম, ×, ×, ×, ×
হরতন—গোলাম, ×, ×, × ।
রুহিতন— × ।
চিড়িতন—গোলাম, ×, × ।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, × ।
হরতন—নাই ।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, ×, ×, × ।
চিড়িতন—টেক্কা, দশ, ×, × ।

—o—

খেলার মাঠে

(সি, বি)
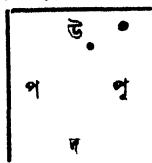
চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে মাদ্রাজে লর্ড টেনিশনের ক্রীকেট টীমের সঙ্গে নিখিল ভারত দলের চতুর্থ ক্রীকেট টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়েছিল খেলাটি চারদিনব্যাপী হবার বন্দোবস্ত থাকলেও তৃতীয় দিনে শেষ নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বিলাতী দলটি এই টেষ্ট ম্যাচটিতে খুবই শোচনীয় ভাবে পরাজয় স্বীকার করেছে। এই খেলাটির একটি বিশেষত্ব যে, লর্ড টেনিসনের দলকে ফলোঅন্ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এরা ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে এই অসম্মান এই প্রথম বরণ করলেন। নিখিল ভারত দল প্রথমে ব্যাটিং করে প্রথম ইনিংসে ২৩৬ রাণ করেন। তার মধ্যে ভিনু মানকাদের অবদানই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তিনি নিজ ব্যাটিং নৈপুন্য দেখিয়ে নিজস্ব ১১৩ রাণ করে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট ছিলেন। তিনি টেষ্ট ম্যাচে এই প্রথম শতাধিক রাণ করেণ। তাঁর পরেই হ্যাণ্ডেওয়ালার ৪৪ রাণ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। এস ব্যানর্জ্জি 'ওপেনিং' হিসাবে গিয়ে মাত্র ১১ রাণ করলেও দলের অধিনায়ককে হতাশ করেন নি। মুস্তাক এবং নিসার এই খেলাটিতে অনিবার্য্য কারণ বশতঃ যোগদান করতে পারেন নি। অমরনাথ মাত্র ছয় রাণ করেছিলেন। বিপক্ষদলের পোপ উল্লেখযোগ্য বোলিং করেছিলেন। তিনি ৫১ রাণে পাচটি উইকেট লাভ করেছিলেন। প্রথম ইনিংসে লর্ড টেনিশনের দল মাত্র ৯৪ রাণ করে সকলে আউট হয়ে যান। হার্ডষ্টাফ ২৯ রাণ করে ব্যক্তিগত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণ করেন। অমর সিং এবং মানকদ্ যথাক্রমে ৩৮ রাণে পাঁচটি এবং ১৮ রাণে তিনটি

উইকেট পাওয়ায় বিলাতী দলটিকে স্বল্পসংখ্যক রাণ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। লর্ড টেনিশনের দল ক্রিকেট খেলার আইনানুযায়ী 'ফলো অন্' করতে বাধ্য হন এবং প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করেই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। এই ইনিংসে অপেক্ষাকৃত ভাল খেলে তাঁরা তৃতীয় দিনেই মোট ১৬৩ রাণ করে এই খেলাটির পরিসমাপ্তি করেন। ওয়েলার্ড, ল্যাংগ্রিজ এবং ওয়ার্দিংটন্ যথাক্রমে ৪০,২৭ এবং ২৪ রাণ করেন। হার্ডষ্টাফ মাত্র ১৪ রাণ করেছিলেন। অমর সিং ৫৮ রাণের বিনিময়ে

অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট

ছয়টি উইকেট লাভ করেন। মানকদ্ ৫৫ রাণে তিনটি উইকেট পান। শেষ পর্য্যন্ত নিখিল ভারত দল এই প্রতিনিধিমূলক খেলাটিতে এক ইনিংস এবং ছয় রাণে কৃতিত্বের সহিত জয়লাভ করেন।

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ

যদিও পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী চারটি টেষ্ট ম্যাচ খেলার ঠিক ছিল তাহলেও লর্ড টেনিশন দলের 'কলম্বো' সহরের খেলাটি বাতিল হওয়ায় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে বোম্বাইয়ের নবনির্ম্মিত 'ব্র্যাবোর্ণ' ষ্টেডিয়ামে পঞ্চম এবং শেষ টেষ্ট ম্যাচটি খেলার ব্যবস্থা হয়। এই টেষ্টম্যাচটি খেলা না হলে লর্ড টেনিশনের দলটি নিখিল ভারত দল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হত না। এই খেলাটির ফলাফলের উপর 'রাবার' বিজয় নির্ভর করেছিল। সেই কারণে এই খেলাটির গুরুত্ব অন্য টেষ্টম্যাচগুলি অপেক্ষা অনেকখানি বেশী হয়েছিল। নিখিলভারত দল উপর্য্যুপরি তৃতীয় ও চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ দুটিতে কৃতিত্বের সহিত জয়লাভ করে জগৎবাসীর মনে ভারতীয় ক্রিকেট্ খেলার যে উৎকর্ষতা প্রমাণ করেছিলেন এই শেষ টেষ্ট ম্যাচটিতে নৈরাশ্যজনকভাবে খেলে তা পুনরায় নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক মার্চ্চেণ্ট গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যটি আশানুরূপ

অধিনায়ক লর্ড টেনিশন

পালন করলেও তিনি তাঁর পূর্ব্ব গৌরব অনুযায়ী ব্যাটিং সাফল্য দেখাতে পারেন নি। মুস্তাক আলি এবং অমরনাথ যারা পূর্ব্বে একাধিকবার নিজস্ব একশো রাণের চেয়ে বেশী রাণ করেছেন তারা যে কি প্রকারে এইরূপ একটি নিখিল ভারতীয় সম্মান এবং অসম্মানের দায়িত্বপূর্ণ খেলায় নৈরাশ্যজনকভাবে খেলে অতি নগণ্য রাণ সংখ্যা করে নিজেদের যশ ও খ্যাতিকে ম্রিয়মান করলেন তার কোন উপযুক্ত কারণ খুজে পাওয়া যায় না।

মানকড় প্রথম ইনিংসে অধিনায়ককে একেবারে হতাশ করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে স্বীয় ৫৭ রাণ করে নিজ সুনাম বজায় রেখেছেন। অমর সিং বোলিংয়ে তাঁর কৃতিত্বের এতটুকুও ম্লান করেন নি। তিনি প্রথম ইনিংসে ৪৭ রাণে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৫ রাণে চারটি উইকেট পেয়েছিলেন। এস ব্যানার্জ্জি মনোনীত হলেও হাতে আঘাত পাওয়ার জন্য এই খেলাটিতে যোগদান করতে পারেন নি। নিশার আশানুরূপ বোলিং সাফল্য না দেখালেও হতাশ করেন নি। রণবির সিংজী নামে একটি নূতন খেলোয়াড়কে এই টেষ্ট টীমে স্থান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু খেলার শেষে তাঁকে টীমে মনোনয়ন করবার কোন উপযুক্ত কারণ খুজে পাওয়া গেল না। তবে দর্শকগণ এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে তিনি হয়ত প্রতিপত্তিশালী কোন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মীয়। লর্ড টেনিশনের দলের বিখ্যাত এবং শক্তিশালী বোলার 'গোভার' অসুস্থতাবশতঃ এই খেলাটিতে যোগদান করতে পারেন নি। বিলাতী দলটি প্রথম ইনিংসে খুব নিন্দনীয় ভাবে খেলে মাত্র ১৩০ রাণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে খেলাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁরা তদনুযায়ী খেলতে আরম্ভ করেন এবং মোট ২৮৮ রাণ করেন। এই রাণসংখ্যার মধ্যে ওয়ার্দিংটন ৬৮, এডরিচ ৫৬ এবং পোপ ৪৯ রাণ করেন। নিখিল ভারত দল প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যেক ইনিংসে ১৩১ রাণ করেন। পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে মাত্র এই শেষ ম্যাচটিতে লর্ড টেনিশন টসে জয়লাভ করেন এবং প্রথমে ব্যাট করিতে নামেন। অমর সিংয়ের দুর্দ্ধর্ষ বোলিংয়ের জন্য মাত্র ৪৭ রাণে লর্ড টেনিশনের দলের পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। প্রথম দিনেই ৬-১০ মিনিটের সময় লর্ড টেনিসনের দল মোট ১৩০ রাণ করে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করেন। তার পর নিখিল ভারত দল খুব নৈরাশ্যজনকভাবে খেলা সুরু করেন এবং মাত্র ৩ রাণে দুইটি উইকেট পড়ে যায়। ৭৩ রাণে পাঁচটি উইকেট পড়ার পর ঐ দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে মাত্র একঘণ্টা খেলার পর নিখিল ভারত দল সকলে আউট হয়ে ১৩১ রাণ করেন এবং বিপক্ষদল ১ রাণে অগ্রগামী থাকেন। তারপর লর্ড টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন এবং সাত উইকেটে ২০৯ রাণ করে ঐদিনের খেলা শেষ করেন। তৃতীয় দিনে বেলা বারোটা অবধি খেলে মোট ২৮৮ রাণ করারপর তাঁদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ১২-২৫ মিনিটের সময় নিখিল ভারত দল দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং সুরু করেন এবং বিকাল ৩-৪০ মিনিট পর্য্যন্ত খেলে মোট ১৩১ রাণ করার পর এই খেলাটির শেষ মীমাংসা হয়ে যায়। লর্ড টেনিসনের দল ভারতবর্ষের এই শেষ খেলাটিতে ১৫৬ রাণে জয়ী হয়ে 'রাবার' জয়ের বিশেষ সম্মান অর্জ্জন করেন। ভারতীয় দলের এই পরাজয়ে পাতৌদির নবাবের ভবিষ্যদ্বাণী সফলতার কাণ ঘেঁষে বিফলতায় পরিণত হল। বোম্বাইয়ের হিন্দু জিমখানার সঙ্গে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার কর্ত্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হওয়ায় বোম্বাইয়ের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসী এই খেলাটির সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

লর্ড টেনিসনের দলের প্রথম ইনিংস

পার্কস্ ক মানকাদ ব অমরনাথ	৮
এডরিচ ক মার্চ্চেণ্ট ব অমর সিং	২
হার্ডষ্টাফ ক মার্চ্চেণ্ট ব অমর সিং	২০
ইয়ার্ডলে ব নিশার	৩১
ল্যাংগ্রিজ এল বি ডবলিউ ব অমর সিং	৫
ওয়ার্দিংটন ক মানকাদ্ ব নিশার	১০
গিব এলবি ডবলিউ ব অমর সিং	২১
পোপ ব হাজারী	১৫
ওয়েলার্ড ক অমরনাথ ব আমীর ইলাহী	৫
লর্ড টেনিশন ক মানকাদ্ ব অমর সিং	০
স্মিথ নট আউট	৪
অতিরিক্ত	৯
মোট	১৩০

দ্বিতীয় ইনিংস

পার্কস্ ক হিন্দলেকার ব নিশার	২০
এডরিচ রাণ আউট	৫৬
হার্ডষ্টাফ ক মার্চ্চেণ্ট ব অমর সিং	৫
ইয়ার্ডলে ব অমর সিং	০
ল্যাংগ্রিজ ব অমর সিং	৫
ওয়ার্দিংটন ক মানকাদ্ ব অমর সিং	৬৮
গিব ক রণবিরসিংজি ব মানকাদ্	১৬
পোপ্ এল বি ডবলিউ ব মানকাদ্	৪৯
ওয়েলার্ড ব মানকাদ	৩৩
লর্ড টেনিশন নট আউট	১২
স্মিথ রাণ আউট	২
অতিরিক্ত	২২
মোট	২৮৮

নিখিল ভারত দল

প্রথম ইনিংস

হিন্দেলকার ক পোপ ব ওয়েলার্ড	৯
মুস্তাক আলি ক ওয়েলার্ড ব পোপ	২
মানকাদ ব পোপ	০
অমরনাথ এল বি ডবলিউ ব পোপ	১৯
রণবীরসিংজী ক এডরিচ ব ওয়েলার্ড	৮
মার্চ্চেণ্ট ক ওয়ার্দিংটন ব পোপ	১৭
অমরসিং ক ওয়েলার্ড ব পোপ	১৬
হ্যাভেওয়ালা ক গিব ব ওয়েলার্ড	২
হাজারী ক ওয়েলার্ড ব এডরিচ	১২
আমীর ইলাহী নট আউট	৩৮
নিশার ব ওয়েলার্ড	১
অতিরিক্ত	৭
মোট	১৩১

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

প্রমথের আশ্রয়ে এল অভাগিনী সন্ধ্যা একটা বাহ্যিক অবলম্বন পেলো। কিন্তু অন্তরের বিরোধ তার দূর হোল না।

এই ভাবে সন্ধ্যার মনের অবস্থা যখন চরমে উঠেচে, তার মন প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা কোরল। সে প্রমথকে বলে—"আর এ লুকোচুরী নয়। আমার সত্য পরিচয় আজ সবাই জেনে যাক ; অসহ্য এ জীবন—অসহ্য এ মিথ্যা প্রহসনের অভিনয়!

প্রমথ বাধা দেয়নি, কোন দিনই সন্ধ্যার কোন কথায়। আজও সে নিশ্চুপ রইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঠিক যেন সন্ধ্যার ত্রাণকর্ত্তা রূপে নিতান্ত অতর্কিতে সেখানে প্রকাশের আবির্ভাব ঘটলো—এবং তার কিছু পরেই তার স্বামী প্রিয়লালকেও আসতে হোল।

এর পর নায়কের গতি কোন দিকে অগ্রসর হোল—কেমন তার পরিণতি—তাতে সন্ধ্যার জীবনে শুভ হোল কী অশুভ হোল—আপাততঃ সে কাহিনী আমরা গোপন রাখলুম। কারণ তাঁতে ছবির পর্দ্দায়, অভাগিনী সন্ধ্যার জীবনের সে অশ্রু-সজল কাহিনী আপনাদের সমবেদনা ও কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে পারবে।

*   *   *

আগামী বৃহস্পতিবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায়, তাঁর নতুন সামাজিক ছবির চিত্রগ্রহণ সুরু হবে। এই ছবির বিভিন্ন সেট ইত্যাদির পরিকল্পনা কোরেছেন সুবিখ্যাত শিল্পী অর্জ্জুন রায়। ছবির ভূমিকা লিপির পরিচয় আমরা গত সপ্তাহে দিয়েচি।

যে শ্রেণীর কাহিনী নিয়ে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া কাজ সুরু কোরলেন—সে শ্রেণীর গল্প ছায়াপটে ইতিপূর্ব্বে আর আত্মপ্রকাশ করেনি। ছবিখানি যে বাংলার তরুণ-তরুণীর অন্তরে নব-জাগরণের প্রেরণা আনতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সমাজের বনিয়াদ আলগা হয় কীসে—কোথায় তার গলদ এবং কোন পথে তার প্রতিকার—শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এই চিত্রে সেই পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমরা বারান্তরে ছবির বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা কোরবো।

ছবিখানির সঙ্গীতাংশের পরিচালনা কোরছেন—সুবিখ্যাত সুর শিল্পী তিমিরবরণ। ছবি তোলবেন—ইউসুফ মুলজী এবং শব্দগ্রহণ কোরবেন অতুল চট্টোপাধ্যায়।

*

কবি বিদ্যাপতির কথা চিন্তা কোরতে ভারতবাসী মাত্রেই গৌরব বোধ করে। বাণী-চিত্রাকারে তাঁর পুত-জীবনী ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদর লাভ কোরেচে।

শোনা যাচ্ছে, বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে কবি বিদ্যাপতির পুত-জীবনী ছায়া-চিত্রাকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরেচে। নাটকাকারে রূপান্তরের ফলে, চরিত্রগুলি প্রাণরসে মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত নানা ভাবের আলোড়নে ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে দর্শকের চিত্ত উদ্বেল হোয়ে ওঠে। পরিকল্পনার অভিনবত্বে, সঙ্গীতের মাধুর্য্যে, দৃশ্যপটাদির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যে, "নিউ-থিয়েটার্সের বিদ্যাপতি"—ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে যে নব-যুগের সূচনা কোরছে, একথা আজ অবিসম্বাদীরূপে সত্য।

বাঙালী দর্শকদের তৃপ্তি দিতে ছবিখানি শীঘ্রই চিত্রায় আসচে। ছবির প্রারম্ভে আমরা দেখতে পাব—মিথিলাধিপতির প্রমোদ উদ্যানে বসন্তোৎসব। এই উৎসব প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে অতর্কিতে রাজার সহিত কবির সাক্ষাৎ ঘটে। অনেকদিনের পর দুই বাল্য-সখার মিলন! তারপর রাজা পরিচয় করিয়ে দেন রাণীর সহিত বিদ্যাপতির।

সেই পরিচয় থেকে নাটকের সূচনা!

রাজা বলেন—"কবি, তুমি হ'বে আমার পুরোহিত এবং তোমার কাব্য হ'বে আমার মন্ত্র। সেই মন্ত্রে আজ আমার দেবী-পূজা হ'বে।"

তারপর রাণীকে দেখিয়ে বললেন—কবি, আমি মূর্ত্তি পেয়েছি, কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয় ইনিংস

মুস্তাক আলি ক টেনিশন ব ওয়েলার্ড	০
হিন্দেলকার ক ল্যাংগ্রিজ ব ওয়েলার্ড	৩
মানকাদ ক গিব ব স্মিথ	৫৭
অমরনাথ ক প্রতিনিধি ব পোপ	১৫
মার্চ্চেন্ট ক এডরিচ ব ওয়েলার্ড	৭
রণবীরসিংজী ব পোপ	২
অমরসিং ক প্রতিনিধি ব পোপ	০
হাতেওয়ালা (আঘাত প্রাপ্ত)	৮
হাজারী ক গিব ব ওয়েলার্ড	১৬
আমীর ইলাহী ব ওয়েলার্ড	১৪
নিশার নট আউট	১
অতিরিক্ত	৮
মোট	১৩১

—*—

কোরতে পারিনি—তুমি আমার সহায় হবে—তুমি হবে মিথিলার রাজ-কবি।

এমনি কোরে বিশপীর কবি, তার সঙ্গীনী অনুরাধাকে নিয়ে, রাজার অনুরোধ রাখতে আর একদিন মিথিলায় এলেন—

রাজসভায় কবি বরণ হোল।

তারপর ?......

রাণীর মৃত প্রাণে আবার চেতনার সঞ্চার হোল। ভক্ত যেমন কোরে তার অন্তরের সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে দেবতার চরণে প্রাণ বিকিয়ে দেয়—তেমনি কোরে রাণী লছমী তার সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিলেন—বিদ্যাপতির পায়ে।

রাণীর এই চিত্তবিকারে রাজ্যময় যে অশান্তি স্রোত বইতে সুরু হোল—ছবির সমাপ্তিতে তারই সর্ব্বান্তিক পরিনাম আপনাদের ভাবিয়ে তুলবে।

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"-র সানাইয়ের সুর আজ চারদিকে যেন এক আনন্দলহরী তুলেছে। সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"-র রহস্য যে কী তাই জানবার জন্যে আজ যেন সর্ব্বত্রই একটা সাড়া পড়ে গেছে। গেল সোমবার এই "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"-র বিয়ের দৃশ্য তোলা শেষ হ'য়েছে মহা-সমারোহে—বর-কনের হুড়োহুড়ির, লোক-জনের ছুটোছুটি, গাড়ী ঘোড়ার ঠেলাঠেলি, বামন পুরুতের হাতাহাতি ও বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর লুটোপুটির ভেতর দিয়ে। ছাদনা-তলায় পাঁচ জোড়া বর-কনে এসে সমবেত হ'ল। কন্যাকর্ত্তা হাঁকতে সুরু কোরলেন—"ওগো, বাড়ীর মধ্যেরা তোমরা শাঁখ বাজাও, উলু দাও আর কনেদের সব আসরে হাজির কর।" বরের দল একে একে আসরে ঢুকলে 'টেনার' (পঙ্কু দাস) এসে চেঁচালো দু' নম্বর বর ? পাশেই বামাপদ লিষ্ট নিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বললেন—দু'নম্বর মিঃ চৌধুরী (হরেন মুখার্জ্জি) ও বনলতা (বীণা)। মিঃ চৌধুরী সাহেবী-কেতা-দোরস্ত তাই তিনি চেলি না পরে একেবারে সাহেবী পোষাক পরে বিয়ে কোরতে হাজির। এক নম্বরের ডাক পড়লো—বামাপদ বিমল (জহর গাঙ্গুলী) ও চামেলীকে (রাণীবালা) দেখিয়ে দিলেন। চার নম্বরের ডাক পড়লে দাঁড়াল মধুর (ধীরাজ ভট্টাচার্য্য) ও শ্রীমতী (সাবিত্রী) পাঁচ নম্বরকে দেখে সভাশুদ্ধ লোক হেসেই লুটোপুটি। এরা হচ্ছে বনলতার বেয়ারা ফ্যালারাম (মণি সেন) ও তার রক্ষিতা আন্নাকালী (ব্লাকী)। সর্ব্বশেষে তিন নম্বর বর-কনের খোঁজ পড়ল। বামাপদ লিষ্ট দেখে বললেন—"কনের নাম ত' কমলা—কিন্তু বর কে ?" এমন সময় এক নম্বর বর বিমল চেঁচিয়ে উঠে বলল—"তিন নম্বর কনে কমলার সঙ্গে আমারই তো বিয়ে হবার কথা ছিল—হয় তাকে আমি বিয়ে কোরব নয়তো এই সভা ত্যাগ কোরে এখুনি চলে যাব।" এই কথা শুনে সভার একজন লোক (বিমল ঘোষ) হাতে লাঠি নিয়ে ভিড় ঠেলে এসে বললে—তুমি এ সভা ত্যাগ কোরে যেতে পার আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার প্রাণটি এখানে রেখে যেতে হবে।" বিমল বললে—"জুলুম নাকি ?" সেই ভদ্রলোক বললে—"হ্যাঁ জুলুম। দেশের ও দশের দাবীর মতে ঐ এক নম্বরের মেয়েকেই তোমার বিয়ে কোরতে হবে। এস ভাই সব এই এক নম্বরের বরকে আমরা এক নম্বর কনের পাশে বসিয়ে দিই।" বিমল অগত্যায় বললে—"তবে তাই হ'ক।" এমন সময় তিন নম্বর বর সেখানে উপস্থিত হলেন। পাঠকগণ বুঝতে পারছেন বোধ হয় তিন নম্বর পাত্র হ'চ্ছেন ডাঃ প্রাণধন আইচ (জীবন গাঙ্গুলী)। তারপর যথাসময়ে যথারীতি পাঁচ জোড়া বর-কনের সঙ্গে মহানন্দে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়ে গেল। বাসর জাগতে যারা এল তারা মনের আনন্দে গাইল—

প্রেমিকের আছে শর আর প্রেমিকারফুল মধুছিয়া
তাই দিয়ে রচে মিলন বাসর প্রিয়তম আর প্রিয়া।
—প্রাণধন+কমলা

হাতখানি নিয়ে বাঁধিয়া কুসুম রাখি
বলেছো দু'জনে সবটুকু দিনু কিছু নাই বাকী।
—মিঃ চৌধুরী+বনলতা

চাঁদ হয়ে এলে চকোরের চোখে সুন্দর মোহ নিয়া
প্রণয়ের হারে রচিলে বাঁধন প্রিয়তম আর প্রিয়া।

আজ তুমি এলে মাতাল ভ্রমর গোলাপের আঁখি চুমে
শত বসন্ত রাঙালো পরাণ অনুরাগে কুমকুমে
—বিমল+চামেলি

প্রেমের ঘানিতে ঘোরাবে সোহাগ লাগাম দিয়া
নথ নাড়া দিয়ে করিবে শাসন হাসিয়া কাঁদিয়া

রাধা ফিল্মস্

কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় পৌরাণিক ছবি "পুরুষোত্তমে"র শুটিং সুরু হ'য়েছে। অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এই ছবির সুর সংযোজনা কোরবেন।

মতিমহল থিয়েটার্স

জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের পরিচালনায় হাসির ছবি "বেকার নাশনের আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে আপাততঃ মনোনীত হয়েছেন—সুশীল রায়, হাঁদু বাবু ও দেববালা।

প্রফুল্ল পিক্চার্স

এদের "সখের প্রেমিকে"-র সম্পাদনা চলছে। আসছে মাসের মাঝামাঝি ছবিখানা 'শ্রী'তে মুক্তি পাবে।

বিবিধ

কবি হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী

আগামী ১৩৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার (১৯শে এপ্রিল) হইতে কবি হেমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে "হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি" কবির স্মৃতিকল্পে (১) রাজবলহাট গুলটিয়া গ্রামে কবির জন্মগৃহে হেমচন্দ্র-মণ্ডপ" নির্ম্মাণ (২) খিদিরপুরে কবির বাসভবনের সম্মুখে তাঁহার আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা (৩) কবির অপ্রকাশিত রচনাবলী সংগ্রহ ও প্রচার (৪) রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (৫) কবিলিখিত নাটক ও প্রহসনের অভিনয় এবং (৬) সঙ্গীতাদির জলসার অনুষ্ঠান প্রভৃতি করা আপাততঃ পরিকল্পনা করিয়াছেন।

কবির ভক্ত দেশবাসীকে অনুষ্ঠান সমিতির সদস্য হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। সদস্যদিগের চাঁদার হার প্রথম শ্রেণী ৫৲ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ২৲• টাকা মাত্র।

রচনা প্রতিযোগিতা (সুবর্ণপদক)

"বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের দান" শীর্ষক প্রবন্ধ ফুলস্কেপ সাইজ কাগজের একশত পৃষ্ঠার অনধিক আকারে লিখিতে হইবে। ইহা ৩০শে মার্চের পূর্ব্বে শতবার্ষিকীর সাহিত্য বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে অথবা তদীয় আবাস ৩-এ হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট খিদিরপুর ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতা (সুবর্ণ পদক)

আবৃত্তির বিষয় "ভারতসঙ্গীত"

বসুমতী কার্য্যালয়ে মুদ্রিত হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলীতে কবিতাটি যেরূপ আছে তাহাই কেবল মাত্র ৬, ৭, ৮, এবং ৯ এই কয়টি স্তবক (অর্থাৎ "এই কথা বলি মুখে শৃঙ্গ তুলি" হইতে "দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা" পর্য্যন্ত) বাদ যাইবে।

উপরি লিখিত সাহিত্য সম্পাদকের নিকট ২০শে মার্চ্চের মধ্যে আপনাপন নাম ঠিকানাদি দিয়া প্রতিযোগী তালিকাভুক্ত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

অভিনয় এবং জলসাদির নিমিত্ত শিল্পী নির্ব্বাচন—

যাঁহারা 'বৃত্রসংহার' নাটক ও 'নাকে খৎ' প্রহসনের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়াদির বা সভাসমূহের এবং জলসায় নৃত্যগীতবাদ্যাদি অনুষ্ঠানে ভূমিকাংশ গ্রহণ করিয়া শতবার্ষিকী উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সত্বর শতবার্ষিকীর নাট্য ও প্রমোদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হেমচন্দ্র লাইব্রেরী বা সকাল ৮টার মধ্যে কিংবা সন্ধ্যা ৬টার পর অথবা ছুটির দিবসে তদীয় আবাস "কবি রঙ্গলাল কুটীর" ২নং রামকল ষ্ট্রীট খিদিরপুর ঠিকানায় সাক্ষাৎ করিলে সবিশেষ অবগত হইয়া শতবার্ষিকীর নির্ব্বাচিত শিল্পীশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। আগামী মাস হইতে অভিনয় ও সঙ্গীতাদির মহলারম্ভ করা হইবে।

পূর্ণ থিয়েটার

এখানে এখনও রাধা ফিল্মের পৌরাণিক ভক্তিমূলক ছবি প্রভাস মিলন চল্‌ছে, পূর্ণর কর্ত্তৃপক্ষ নিত্য নূতন ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত করে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। আমরা আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের এ সুনাম ভবিষ্যতে বজায় রাখবেন।

শ্রীযুক্ত ননী দাশগুপ্ত

বাংলা দেশে যে কয়জন শিল্পী মাউথ অর্গ্যানের সাহায্যে সঙ্গীতজ্ঞ মহলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর শ্রীযুক্ত ননী দাশ গুপ্ত অন্যতম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইনি যেরূপ সুনাম অর্জ্জন

ননী দাশগুপ্ত

করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। বেতারে ইনি নিয়মিতভাবেই মাউথ অর্গ্যান বাজাইয়া থাকেন এবং তাঁর মাউথ অর্গ্যানের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হ'ন নাই এমন রস-পিপাসুর সংখ্যা খুবই বিরল। তিনি উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন— ইহাই আমাদের কামনা।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৬নং বিবেকানন্দ রোড হইতে ১৪।২ ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীটে (১২২নং রুম) স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

সারস্বত মঞ্জরী

গত শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিবস বেতারে কবি বাণীকুমার রচিত "সারস্বত মঞ্জরী" নামক একটি অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান হয়। রচনায় প্রয়োগে, সঙ্গীতে ও গীত গানে এই "সারস্বত মঞ্জরী" যেন শ্বেত পদ্মাসনা বীণাপাণির চরণ শতদলের মত, গন্ধ রসে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছিলো। এই অনুষ্ঠানের সকল শিল্পীই প্রশংসার পাত্র—কিন্তু সেদিন শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেছেন মধুকণ্ঠি শ্রীমতি আভাবতী। এই গীতি-শিল্পীর মধুর সুরে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রসিদ্ধ পেপার মার্চেণ্ট "বসু ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী" ১৪।২ ওল্ড চিনাবাজার—একটি সুবর্ণ পদক পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।

'ল' কলেজ

গত রবিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'ল' কলেজের ছাত্রগণ শ্রীনরেশ মিত্রের পরিচালনায় শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের "গোরা" অভিনয় করেন।

পুরুষ চরিত্রগুলোর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অমর ভট্টাচার্য্যের পানুবাবু (হারাণ)। জগদীন্দ্র বসুর মহিম ভাল—যদিও তিনি মধ্যে মধ্যে অভিনয়ের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। বালক চন্দ্রনাথের সতীশ আমাদের ভালই লাগে। গোরা চলন সই। হরেন বাবুর কৈলাস, অমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকুলেশ্বর ও শিশম বাবুর বিনয় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।—বিমান বাবু পথিকরূপে গান ভাল গেয়েছেন।

স্ত্রীচরিত্রগুলোর মধ্যে প্রভাত দে সরকারের সুচরিতা ও মিহির বাবুর ললিতা আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। হীরেন বসুর আনন্দময়ী ভাল হলেও তিনি আড়ষ্ট ভাব কাটাইতে পারেন নাই।—জয়ন্তগুপ্তের বরদাসুন্দরী, নিশীথ বাবুর লাবণ্য ও নির্ম্মল বাবুর হরিমোহিনী একাবারে অচল।

ভারতী মন্দিরে জলসা

আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ৩০নং এ্যালেনবি রোডস্থ বালিকা সঙ্গীত শিক্ষা মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে বিখ্যাত গায়কগণের সম্মিলনে একটি জলসা হইবে। প্রোফেসর কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, প্রোফেসর কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও প্রোফেসর শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ গান করিবেন। প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়ক শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী (নাকুবাবু) খেয়াল গাহিবেন। প্রোফেসর জীতেন্দ্র মোহন সেন,—সেতার; প্রোফেসর রাধিকা মোহন মৈত্র,—'সরদ' এবং প্রোফেসর মণিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হারমোনিয়াম বাজাইবেন। সভ্যগণ ও পৃষ্ঠপোষক গণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

চন্দ্রনাথ পরিষদে সারস্বত সম্মেলন

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী শনিবার, চন্দ্রনাথ পরিষদের সারস্বত সম্মেলনী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানে নগরীর বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভ্যগণ এই উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের 'রক্ত কমল' ও শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডিটেকটিভ' নাটকদ্বয়ের চিত্তাকর্ষক রূপ দান করেন। শ্রীযুক্ত পাইনের গান অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল।

পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ কুণ্ডু ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমুপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর অভ্যর্থনায় ও জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করেন।—

——

শ্রীমল্লিনাথ

জয় যাত্রার পথে সুভাষচন্দ্র

কংগ্রেসের পতাকা বহন করিয়া যে সমস্ত দেশকর্ম্মী স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন এবং কাজের প্রয়াস পাইতেছেন, গত ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারী বিষ্ণুপুর তাঁহাদেরই সম্মেলন হইয়াছে। অবশ্য নেতৃবৃন্দের দর্শন এবং তাঁহাদের অমৃতময় মুখ নিঃসৃত আশ্বাসবাণী শুনিবার আশায় বাঁকুড়া জেলার মুক ও দুস্থ পঞ্চদশ সহস্রাধিক নরনারী প্রতিনিধি বর্গের পশ্চাতে বসিয়া সম্মেলনের বাগবিতণ্ডার গূঢ় অর্থ গ্রহণের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিল। মোসলিজম, কমিউনিজম, ফেডারেশন, দেশীয়রাজ্য, জাঞ্জিবার, চীন ইত্যাদি যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা আমাদের দেশসেবকদের মাথায় ঢুকিয়া তাঁহাদের প্রতিনিয়ত উদ্‌ব্যস্ত করিতেছে—এই সম্মেলনে তাঁহারা তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের নিকট তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া অনেকেই আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং সময়াভাবে বা ভাগ্য-দোষে যাঁহাদের বক্তৃতা দিবার সুযোগ হয় নাই—তাঁহারা যে স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া জিলা সম্মেলন জাতীয় সভাসমিতি ডাকিয়া তাহা মিটাইয়া লইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রস্তাব প্রনয়ণে ও বক্তৃতা দানের প্রতি যে দারুণ দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা ও নিষ্ঠা একদল দেশসেবকদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম—প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের সে নিষ্ঠা সাধারণতঃ দেখা যায়না—শুধু মনে হইল এই নিষ্ঠা যদি কার্য্যে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে বাংলা এত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত না। এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে বাংলা দেশে কোন কাজ হইতেছে না—যা যাঁহারা প্রস্তাবাদি উপস্থিত করেন বা বক্তৃতাদি দিয়া থাকেন তাহারা কোন কাজ করেন না। তবে একদল তথাকথিত নেতা দেখা যায় যাহারা সব ব্যাপারেই নিজেদের পুরোভাগে দাঁড় করাইয়া এমন একটা ঢক্কা নিনাদ সুরু করিয়া দেন যে সেই হট্টগোলে আসল কর্ম্মীর কর্ম্মের সন্ধান মেলা ভার হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরে এই শ্রেণীর কয়েকজন মোড়লের আবির্ভাব হইয়াছিল।

সভাপতি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তাহাদের শুদ্ধ স্বদেশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু সভাপতি মহাশয় তাঁহার দুদিনের অভিভাষণে টমেটো বা কলার চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া ফেডারেশন পূর্ণ স্বাধীনতা প্রভৃতি এতগুলি গুরুতর সমস্যা আমাদের মাথায় একসঙ্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—যে সমস্তটা গ্রহণ করিবার মত সামর্থ আমাদের অনেকেরই ছিল না।

সম্মেলনে বহু শ্রমিক ও কৃষক কর্ম্মীর সমাগম হইয়াছিল এবং অধিবেশনে তাঁহাদের দলটি যে বেশ বড় তাহাও অনুভূত হইল। কিছুদিন হইল আমাদের দেশে কংগ্রেস হইতে পৃথকভাবে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কতকগুলি ব্যাপারে এই আন্দোলনের কর্ম্মপন্থা কংগ্রেসের মূলনীতির সহিত কোথায়ও খাপ্ খায়না। তাহার ফলে কোথায়ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইয়াছে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীদের এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে যথেষ্ঠ বিব্রত হইতে হইয়াছে। কাজেই মহাত্মাজী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বার বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসই ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্খা পুরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান গণ স্বার্থ্য রক্ষাই ইহার মুলগত উদ্দেশ্য—কাজেই শ্রমিক ও কৃষক অন্দোলন কংগ্রেসের পতাকাতল হইতেই করিতে হইবে—এবং এইরূপ বিভিন্ন কংগ্রেস বিদ্বেষী প্রতিষ্ঠান যাহাতে গড়িয়া উঠিতে না পারে তজ্জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গুলিকে সচেষ্ট থাকিতে বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র রায় স্পষ্টভাবে তাহাই ঘোষণা করিয়াছেন। বাংলাদেশে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ উপস্থিতি হইয়াছে—এই সমস্ত শ্রমিক ও কৃষক প্রতিষ্ঠানগুলি কংগ্রেসের পতাকা বহন না করিয়া 'লালঝাণ্ডা' বা লাঙ্গল-কাস্তে অঙ্কিত পতাকা বহন করেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে কংগ্রেসের একটা বড় সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে বিষ্ণুপুর সম্মেলনে তাহারই সূচনা পরিলক্ষিত হইল।

বাংলাদেশে এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্মও পুষ্টিলাভ, বাংলার রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দলগত আত্মকলহের সুযোগেই সম্ভব হইয়াছে। যখন বাংলার কংগ্রেস মহল কর্পোরেশন এবং বি, পি, সি, সির গদী দখল লইয়া কোমর বাঁধিয়া লাঠালাঠি করিতেছিলেন তখন ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া একদল দুঃখব্রতী ত্যাগী কর্ম্মী এই সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়েন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেন। গোড়াতেই হয়ত তাহাদের কর্ম্মপন্থার সঙ্গে কংগ্রেসের নীতির কিছু কিছু পার্থক্য ছিল কিন্তু তখন নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ইহাদের পরিচালনা করিবার প্রয়াস করেন নাই—বরং দলগত স্বার্থ্যের জন্য তাঁহাদের নিজ প্রয়োজনানুসারে উৎসাহিত করিয়াছেন—আজও তাহার অভিনয় চলিতেছে— ফলে আজ প্রাদেশিক

কংগ্রেস কমিটীর প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব রক্ষা করা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সুস্থ ও সবল মনে সুভাষচন্দ্রের আগমন প্রকৃত স্বদেশ সেবকদের মনে সাহসের সঞ্চার করিয়াছে। বাংলার এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সংহত করিয়া এক উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার সাধ্য একমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই আছে। জীবনের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ যিনি দেশ সেবায় নিয়োজিত করিয়া সমগ্র ভারতের এমন কি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজা লাভ করিয়াছেন—তাঁহার নিকট দলগত স্বার্থ স্থান পাইবেনা—ইহা তাঁহার বিষ্ণুপুরের কর্ম্মপন্থা ও দৃঢ়তার মধ্যে সহজেই অনুমিত হইল। তাঁহার সেই তেজস্বীতা ও দৃঢ়তার নিকট সকলেই মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিচালনার একক নায়কত্ব দান করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর সম্মেলন সুভাষচন্দ্রের জয়যাত্রার বিজয় মুকুট পরাইয়া দিয়াছে—৫ কোটী বাঙ্গালীর আন্তরিক শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া সমগ্র ভারতের নায়কত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

—

পঞ্চ কন্যা

শ্রীমন্মথ কুমার চৌধুরী

অলস বিকেলের দিকে তাকিয়ে পরমেশ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। উঞ্ছবৃত্তি করে আর কদিনই বা সংসার চলে। দেহে আলস্যের ঢেউ তুলে পরমেশ পাশ ফিরলে। বিছানায় যা ছিরি হয়েছে। এই কটা দিন খুবই অভাবে যাচ্ছে কি না! নইলে একটা নূতন চাদর কিনে আনতো—জীর্ণ ব্যাগেও মাত্র আনা কয়েক পয়সা আছে। জাল নোট দিয়ে ত যেখানে সেখানে কারবার করা চলেনা! ধরা পড়লে সাতটি বছরের জন্যে—অবিশ্যি পেটের চিন্তা করতে হয় না। আপাততঃ কিন্তু হেনা, শ্রীলতা, চামেলী এদের ছেড়ে জেলে যাবার ইচ্ছা নেই পরমেশের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বিড়িতে ও একটা আরাম-ঘন টান দিয়ে মনে মনে বললে—ভাবপ্রবণ মেয়েরা না থাকলে সে না খেতে পেয়ে মারা যেত। ঈশ্বর শুধু পরম কারুণিক নন্ তিনি পরম বুদ্ধিমানও। নইলে প্রেম বলে একটা কিছুর সত্ত—যদি মেয়েদের মনে আদপেই না থাকতো…।

বিড়িটা জানলা দিয়ে ছুড়ে ফেলে পরমেশ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলে" তাহলে সে কি হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকতো? ধার করে আর ক'দিনই বা সংসার চালানো যায়! সন্ধ্যার পর একবার সফরে বেরুতে হবে। পুরনো স্যুটকেসের ওপর একরাশ চিঠি জমেছে। হেন', শ্রীলতা এদের চিঠিগুলোর উত্তর দেবার খরচ সে কুলিয়ে উঠতে পারে না।" চিঠিগুলো অবিশ্যি বর্ত্তমানের গলির কোন বাসার ঠিকানায় আসেনি। ওরা সবাই জানে বালীগঞ্জে পরমেশের মস্ত দালান-বাড়ী …না খেতে পেয়ে মরলে কোন মেয়ের কাছে মাথা খুঁড়লেও একটা পাই পয়সা পর্য্যন্ত বের করা যাবেনা এর চাইতে পরমেশ অনেক ভদ্রভাবে জীবিকা সংস্থানের পন্থা বেছে নিয়েছে। নিজকে ভদ্রভাবে ঢেকে রাখাইত সভ্যতা। সুতরাং মুখোস পরাটা পরমেশের পক্ষে দোষের নয় মোটেই। ভালকথায় যারা টাকা দিতে চায়না—তাদের না ঠকিয়ে উপায় কি? এইত সেদিন প্রকাশ বাবু মুরব্বিয়ানা ভাবেই তার মুখের ওপর ছুড়ে মারলেন শব্দের তুবড়ী।

—একটা নতুন ইন্সিওরেন্স কেস্ করতে না বলে সোজা বুকে ছুরি বসিয়েই দিলেই পারেন। সব হাঙ্গামা একদিনে চুকে যায়। আপনাদেরত ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করতে হয় না! আছেন বেশ। মাসের শেষে পাওনাদারের মোটা বিল ত আপনাদের মেটাতে হবেনা? হাওয়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন, না?"

এর উত্তরে পরমেশের চুপ করে থাকা ভিন্ন উপায় নেই! প্রিমিয়ম্ যোগাবেন যখন ভদ্রলোক তখন এজেন্টের ওপর একহাত নেবার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে।…

দাড়িটা আজ কামাতে হবে। সাবান হয়তো শুকিয়ে আছে। ব্লেডে ধার আছে কি না তাও দেখতে হয়। পরমেশ উঠে বস্‌লো। এক কাপ চা খেতে পেলে মন্দ হয় না। দেশালাইতে দুটোমাত্র শলা রয়েছে। আজ রাত্তির চলে যাবে এতেই। চা কর্‌তে বস্‌লে আবার নূতন একটা দেশলাই কিনে রাখতে হয়। থাক্—হেনার ওখানে গিয়েই চা খাওয়া যাবে।

'সেফটি রেজার' নিয়ে পরমেশ দাড়ি কামাতে বসলো।—পড়ন্ত বেলার ম্লান আলোতে বড্ড অসুবিধা হচ্ছিল। পেতলের রঙচটা আয়নায় নিজের চেহারা দেখে পরমেশ বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করলে। ভগবান কাউকে সবদিক দিয়ে বঞ্চিত করেন না।… "মেয়েলোক বলে একটা জাতি না থাকলে," পরমেশ মনে মনে বল্লে, পুরুষদের খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই দায় হয়ে উঠতো।" আর প্রেম! স্বপ্নবিলাসী কবিরা প্রেমকে মানুষের অমূল্য সম্পদ বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। ও জিনিষটার যে একটা কমার্শিয়েল ভ্যালু থাকতে পারে, পরমেশই সর্ব্বপ্রথম তা, আবিষ্কার করেচে।…আচম্‌কা একটা কালো ইঁদুর পরমেশের কামাবার বাটিকে ওলটপালট করে পালিয়ে গেল। পরমেশ এই জীবটার আকস্মিক আক্রমণে চীৎকার করেই উঠেছিল আর কি! বেচারা ইঁদুর! এক জায়গায় ত ওদের থাকতে হবে এবং ঝুলেধরা, চামচিকা-ছড়ানো কোঠাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলতে হয়। তবে অসুবিধে এইযে পরমেশের এখানে বসে বসে খাবার পাওয়া যাবে না। "ওয়েলস্—" একটা বইয়ে লিখেছেন—our life is a fight for food. ইঁদুর বাবাজীও হাড়ে হাড়ে তা বুঝেন।

দাড়ি কামিয়ে পরমেশ সুটকেশের নীচে কাগজদিয়ে জড়ানো ধোপার ধোয়া কাপড় আর পাঞ্জাবী বের করলে। এই একসেট ভদ্রগোছের কাপড়েই তার কাজ চলে। হেনা শ্রীলতা ওদের বাড়ীতে যাবার বেলাই এগুলোর দরকার কি না! অন্যসময়ে খদ্দরের মোটা কাপড়, ও পাঞ্জাবীতেই কুলোয়। রোল্ড্ গোল্ডের বোতাম এটে পরমেশ পাঞ্জাবী পরলে। হেনা, শ্রীলতা, ওরা সবাই অবিশ্যি খাঁটি সোনার বোতাম সেট্ বলেই জানে।…

গলিটার মোড়ে এসে পরমেশ একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসলো! হেনাকে বাড়ীতে না পাওয়া গেলে আবার নতুন ফ্যাসাদ। তার চেয়ে ওর নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেই চলতো।…

গাড়ীটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালে। পরমেশ ড্রাইভারকে আটটার সময় আস্‌তে বলে ভিতরে ঢুকে পড়লো। সবুজ সেডের আলোতে হেনা কি একট বই পড়ছিল। দরজার কাছে এসে পরমেশ শুধালে—আস্‌তে পারি?

হেনা বই থেকে মুখ তুলে তাকালে।

—এই যে তুমি! অনুমতি নিয়ে কবে আবার ভিতরে এসেছ!" অর্দ্ধসমাপ্ত বইটাকে পেন্সিল দিয়ে বন্ধ করে হেনা দরজার দিকে পা বাড়ালে।

—"আমি ভেবেছিলুম" শরীরে খুশীর মূর্চ্ছনা জাগিয়ে বললে হেনা, নেক্‌লেসটার কথা নিয়ে তুমি বোধ হয় মন খারাপ করেচ। তোমার বাসায় টেলিফোন করেও হয়রাণ। কোচে দু'জন পাশপাশি বসলে।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে পরমেশ বললে" নেকলেসের কথা কি বলছিলেন?…

—থাক্, ও নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাস্কেল সুমন্তকে আমি দেখে নোব।"

—আহাঃ, সুমন্তের মুণ্ডপাত না হয় পরেই করবে। কথাটা খুলেই বল না।"

—এরই মধ্যে ভুলেগেলে বুঝি? ঠিক, সে কথা নিয়ে শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই!

—কথাটা যখন তুললে, তখন শেষ করেই ফেল না!

—আমার বার্থডে তে, ইতঃস্ততঃ করে বল্লে হেনা, "অনেকগুলো প্রেজেন্ট এসেছিল না! তার মধ্যে দুটো একরকমের নেকলেস ছিলত। তুমি আর সুমন্ত দুজনেরই দুটো প্রেজেন্ট আর কি! তোমাকে সেদিন বলছিলুম না, একটা নেকলেস…এখন সুমন্ত বলছে নেকলেসটা নাকি তোমার দেওয়া.. সে যাকগে। ও নিয়ে কিন্তু তুমি মন খারাপ করোনা। সুমন্তের জোচ্চুরি আমি ধরে ফেলেছি। ছুঁচ হয়ে ঢুকে কিনা হাতির ডাক ডাকতে এসেছেন। রাস্কেল কোথাকার!"

—গালাগালি দিচ্ছ কেন! বেচারার পয়সা নেই বলে কি ভালোবাসতে মানা আছে?

দুষ্টুমির হাসিতে পরমেশ বল্লে। হেনা আগুনের শিখার মতো লিক্‌লিক্ করে উঠলো!

—ভালোবাসা না হাতি! কে বলেছিল ওকে নেকলেস কিনে আনতে? জোচ্চর কোথাকার। প্রেম দেখাতে এসেছেন। টেবিলের উপর থেকে বাবার সোনার চেনটা ও নিয়েছে নিশ্চয়ই। 'বার্থ-ডে তে' সে দুটো নেক্‌লেস্ জেনে শুনে উপহার দিতে পারে সে পারে না কি? এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি! আদর দেখাবার জায়গা পান নি। দু'পয়সা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই…ভালোবাসা দেখাতে এসেছেন…।"

—তুমি চুপ কর হেনা। কোথাকার সুমন্ত একটা কাজ করে ফেলেছে, তাই বলে নিজের মন খারাপ করে লাভ আছে কিছু?

—নেই-ই ত। ওর কথা আমি ভাবতে যাব কেন? 'স্ট্রীট্ বেগারে'র কথা নিয়ে মন খারাপ করতে বয়ে যাচ্ছে কি না আমার। একটু বস, আমি চা নিয়ে আসি।

পরমেশের বুক থেকে যেন পাষাণ ভার নেমে গেল। খুব বেঁচেছে যা হোক্। সুমন্ত হাজার বছর বেচে থাক।···

হেনা চা'র সাথে খাবার নিয়ে এলো। কাপে চা ঢেলে হেনা বল্‌লে—টেলিফোন করে ত নাস্তানাবুদ···'

ছেদ দিয়ে পরমেশ বল্‌লে—বা:, আমি কোল্‌কাতায় ছিলুম বুঝি! তোমার এখান থেকে গিয়েই জামসেদপুরের কাকাবাবুর জরুরী 'তার' পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেতে হলো।···

চা'র কাপ এগিয়ে দিয়ে টানাসুরে বল্লে হেনা—বাড়ীর ওরা টেলিফোনে বল্‌লে যে তোমার নামে কোন লোক ওখানে নেই! গভীর উৎসুক দৃষ্টিতে পরমেশ জিজ্ঞেস করলে—কার নাম বলেছিলে শুনি? লঘু হাসিতে ঝল্‌সে উঠলো হেনা,—কার নাম আবার? তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আরেক জনের নাম বল্‌তে হয় বুঝি?···"

কথা শেষ করবার আগেই প্রচণ্ড হাসিতে পরমেশ উছলে পড়লো। হেনা অপ্রস্তুত হয়ে শুধালে—এতে দোষের কিছু আছে নাকি?

—দোষের মানে? খোকা নিশ্চয়ই টেলিফোন ধরেছিল। ও বুঝি আমার ভালো নাম জানে? তোমার ছোট বোনকে শ্রীমতী হেনা মিত্র বল্‌লে ভড়কে যাবে নিশ্চয়ই। বোকা মেয়ে!"

লজ্জায় হেনা রাঙা হয়ে উঠেছে।—বাড়ীর নাম আমার বলেছ কোনদিন? আকাশ থেকে ত তোমার নাম দৈববাণী হতে পারে না।

—সে ত পারেই না। তোমার চুনী নাম দৈববাণীতে আমি শুনিনি।

—ঘাট হয়েছে। এখন তোমার বাড়ীর নামটা বল্‌বে?

—এইবার মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখ্‌চি। আমার বাড়ীর নাম রেখেছিলেন ঠাকুর মা। বড্ড সেকেলে নাম। একটা নতুন নাম ঠিক করে তখন বল্‌বো না হয়।

তন্দ্রিল সুরে পিয়ানোর ঝঙ্কার তুলে হেনা বল্‌লে—সন্ধ্যের আগে আস্‌লে কি পৃথিবী তা'র আহ্নিক গতি হারিয়ে ফেল্‌তো? একটা ইংলিশ ছবি দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল—তা তোমার ত খোঁজ পাওয়া যায় না।" একটা সিগার জ্বেলে পরমেশ বল্‌লে—ইচ্ছে করেই কি দেরীতে আস্‌তে হয়! লেডি বোস্ আজ ডিনার দিচ্ছেন। তোমার এখানে আস্‌বো বলে ওদেরকে শুধু নমস্কার জানিয়ে সরে পড়লাম। এই—আটটার মধ্যে আমাকে ফিরতে হবে। 'ফ্র্যাঙ্ক কার কোম্পেনীর ম্যানেজারের সাথে দেখা হওয়ার কথা। পুরনো গাড়ীতে আর ক'দিন চলে!"

—এরই মধ্যে বাড়ী ফিরবে নাকি? আহত সুরে হেনা বল্‌লে।

—আমি ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না! মটর গাড়ীটা কিনে ফেল্লে আমাদের দুজনেরই লাভ। কী বোকা মেয়ে তুমি ··· হেনা খুব কাছে সরে এলো পরমেশের।···

···লাল হয়ে উঠেছে হেনা, আপেলের মতো লাল।

২

"পুরুষ মানুষের কথাতে", অনুযোগ করলে শ্রীলতা, "কোন দিনই বিশ্বেস করতে নেই। তোমরা সবই পার। পৃথিবীর বুক চিরে যে মেয়েকে দৃষ্টির আলোতে ঝল্‌সে তুলো", শ্রীলতা চোখের নীলিমায় পরমেশকে প্লাবিত করে বল্‌লে, "তাকেই নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে বিসর্জ্জন দিতে তোমাদের বাধে না।"

—একেবারে কবিতার ভাষায় বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলে যে! আচ্ছা, তুমি কবিতা লিখতে পার শ্রীলতা?"

অভিমানে শ্রীলতার কণ্ঠস্বর গাঢ়তর হয়ে এলো। বল্লে—জীবনের কোন দিকই তোমাদের স্পর্শ করে না। এমনি হাল্কা তোমাদের মন।"

অভিমানে শ্রীলতার জীবনে প্রথম প্রেমের সুর যেন আজ অকস্মাৎ বেসুরো বেজে উঠলো। তা'র লাল্‌চে মুখের মাঝে বুঝি ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।···শ্রীলতা আজ রাগ করেচে নিশ্চয়ই। নীল শিরাগুলো পর্য্যন্ত ওর গালে ফুটে উঠেছে। পরমেশের নিজের ওপর অনেক সময় ভীষণ রাগ হয়। অনেক স্থানেই তাকে বাধ্য হয়ে অভিনয় করতে হয়, অথচ এই সব ছোট খাটো বিষয়ে সে কী মারাত্মক ভুলই না করে বসে। বল্লেই পারতো—তুমি এত অল্পেতেই রাগ করো শ্রীলতা! এই বলে ওকে একটু আদর করলেইত সব ল্যাঠা চুকে যেত। মেয়েরা যা' চায়—না হয় এও ত বলতে পারতো "লাল শাড়ীটায় তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে লতা?" বা এই ধরণের একটা কিছু। কী স্পর্শ-কাতর মেয়ে এই শ্রীলতা। অল্পেতেই ভেঙে পড়ে, অল্পেতেই চুপসে যায়। তবে শাড়ীটা নিয়ে কিছু না বলাটা অশোভন হয়েছে। পুরুষের অজস্র প্রশংসার সমুদ্রে যে মেয়ে সাঁতার কাটতে পারলে না, জীবনটা তা'র বন্ধ্যা হয়ে গেল নিষ্প্রেমের নির্জ্জনতায়। পরমেশ এমন একজন মেয়ে দেখলে না, নিজের রূপসজ্জাকে যে পুরুষের সপ্রশংস দৃষ্টির সম্মুখ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইলে। আর সত্যিই ত, এতো টাকা খরচ করে নিত্য নতুন শাড়ী কেনবার কোন মানেই হয় না, যদি সেটা না দেখানোই চললো। অন্যের বিস্ময়ের মুকুরেই ত নিজের বিলাসের

একমাত্র সার্থকতা।...কিন্তু পরমেশের কি সব সময় সব কথা মনে থাকে? নেকলেসের ব্যাপারটায় সে যে ভাবে বেঁচে গেছে, ভগবানের দেখা পেলে সে পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাতো। হে ঈশ্বর, সুমন্ত আর হেনার মতো ছেলেমেয়েদের তুমি ঝাকে ঝাকে সৃষ্টি করো। কালিঘাটে সে একটা পুজো দিয়ে আসবে। জোচ্চুরি নয়। কোথাও না পেলে সে নিজের রোল্ডগোল্ডের বোতাম বিক্রী করে পুজোর জোগাড় করবে।

শ্রীলতার নরম, উষ্ণ হাতখানাকে আলগুছে টেনে তুলে পরমেশ বললে "কেন মিছিমিছি রাগ করছো লতা? ক'বে আবার তোমার কথামত এলুম না।"

আদরের উত্তাপে শ্রীলতা যেন বরফের মতো গলে গেল।

—কবে এলে শুনি? শব্দের ঝঙ্কার তুললে শ্রীলতা, গত সোমবারে আসবার কথা ছিল না বুঝি?" তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে শ্রীলতার মাখনের মতো কোমল হাতখানা স্পন্দিত হয়ে উঠলো।

—তুমি যদি রাগ করেই বসে থাকবে, পরমেশ অন্ধকারে ঢিল ছুড়লে, "তাহলে আমি এই উঠলুম বলে। কতদিন পর দেখা, তা, তোমার গোঁ নিয়েই ব্যস্ত।"

—কতদিন? শ্রীলতা যেন সমুদ্রের বুকে ঝাপ দিলে। "আমার মনে হচ্ছিল একটা যুগ, একটা অচল যুগ ধরে তোমার দেখা নেই।

শ্রীলতার ভীরু হাতে চাপ দিয়ে পরমেশ বললে "গত সোমবারেই আমি সোজা চলে আসতাম্। এরই মধ্যে বিকানীয়ের রাজার ছেলের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম।

—যাবার সময় একটা খবর দিয়ে গেলে কি আকাশ ভেঙে পড়তো। "ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে শ্রীলতা।"

—ইচ্ছে করে বুঝি না বলে পালিয়ে গেছলুম। একটা দুপুরই ঘুরতে হয়েছে প্রেজেন্ট কিনতে।" পরমেশ মিষ্টি কথায় শ্রীলতাকে স্নান করিয়ে দিলে। দু'দিকে উড়ে আসা অবিন্যস্ত চুলকে গুছিয়ে দিতে দিতে পরমেশ শুধালে—এইবার রাগ পড়েছে ত! জোরেই ঠুনকো দিলে পরমেশ।

—ওমা, আস্তুল না লোহা। এতো জোরে মারতে হয়! লাগে না বুঝি?

হাসিতে পরমেশ আবহাওয়াকে হাল্কা করে বললে—মেয়েদের কখন সব চাইতে সুন্দরী মনে হয় জানো লতা? ওরা যখন অল্পেতেই অভিমানের উত্তাপে লাল হয়ে উঠে"

শ্রীলতা প্রথম বারিবর্ষণের মতো স্পর্শের সুখানুভূতিতে পরমেশকে আচ্ছন্ন করে বললে—মটর কেনা হয়ে গেছে তোমার? বেড়াতে নিয়ে যাবে যে বলছিলে একদিন!"

পরমেশ উঠে দাঁড়ালো।

—ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিয়েছ। ন'টার সময় 'ফ্রান্স মটর' কোম্পানীর ম্যানেজারের সাথে দেখা করার কথা—আমি এবার যাই।

—তুমি রোজই কি ঘোড়ায় চড়ে আস না কি? যৌবন-মসৃণ দেহে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলে বললে শ্রীলতা।

"এখানে আসলেই তোমার সব 'এন্-গেজমেন্ট' ভিড় করে দাঁড়ায়।"

—মটর কিনলে যে দু'জনেরই লাভ। তোমার সব কিছুতেই অন্ধ আবদার।"

দরজার কাছে গিয়ে পরমেশ জোগান দিলে—সেদিনের পাঁচ টাকা বাকী ছিল না?" পকেট থেকে দশটাকার নোট বের করে পরমেশ বললে—মনে না করলে শেষকালে কিন্তু ঠকতে হবে। এসব ছোটখাটো কথা কি কেউ মুখস্ত করে রাখে নাকি!

অনুচ্চকণ্ঠে শ্রীলতা বললে—নোটের টাকা হবে না। পাঁচ টাকাই বা ফিরিয়ে দিতে কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে।"

সান্নিধ্যের ঘনতায় শ্রীলতার কথাগুলি পরমেশের দেহে মৃদু আঘাত করলে। রাত বাড়তির পথে। পরমেশের আর বসে থাকা চলে না।

৩

জানলার আলো ভেদ করে রঙিন্ আলো কার্পেট মোড়া সিড়িটার ওপর এসে পড়েছে। গোটা বাড়ীটা গভীর ঘুমে স্তব্ধ। আধো-অন্ধকারে বুক চিরে প্রকাণ্ড দালান মাঝে মাঝে বিরাট দৈত্যের বেশে পথিকের চমক লাগিয়ে দেয়।

পরমেশ চারিদিকে তাকিয়ে খুব সন্তর্পণে "গেট্" খুলে ভিতরে প্রবেশ করলে। সিড়ির কাছে একটা ছায়ামূর্ত্তি নড়ে উঠলো না?...নির্ভীক পদে পরমেশ এগিয়ে গেল।

চামেলী কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে বললে—ঠিক্ সময়েই এসে পড়েছ দেখছি! পা টিপে টিপে উপরে চলে এসো। বাবা কী পড়ছেন। জুতোর শব্দ কর না।

দু'জনেই নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল। গদিমোড়া চেয়ারটা দেখিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে চামেলী পরমেশকে বস্‌তে বল্লে।

—তোমার চিঠির মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিনি আমি। সমীরণ আবার···।"

ইঙ্গিতে পরমেশকে চুপ করতে বলে চামেলী কাছে এগিয়ে এলো।

—সুরটা নামিয়ে বল। বাবা যে এখনো ঘুমুতে যান নি।"

ফিস্‌ফিস্, করে পরমেশ বল্লে—সমীরণ বাবুর কথা চিঠিতে লিখেছিলে না!"

—সে কথা বল্‌বার জন্যেই ত তোমার কাছে জরুরী চিঠি পাঠিয়েছিলুম। সমীরণ বাবার এক বন্ধুর ছেলে। এবার এম, এ দেবে। বাবার ওকে খুবই মনে ধরেছে।

—আমাদের তা'তে কি?

—আমাদের তা'তে কি। ব্যঙ্গ কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করলে চামেলী।

—তোমার বোকামি আমি সইতে পারি না। সব সময়ে শুধু ফিলসফি।

—ওঃ বুঝছি। তোমাকে আর বল্‌তে হবে না। তবে এখন আমাকে কি করতে হবে?—বললে পরমেশ।

—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু আছে নাকি? এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না।

—তা'ত বুঝতেই পারছি। জোর করে কি কারো বিয়ে দিতে পারা যায় নাকি?

ওসব থিওরি রাখ। বাজে কথা বাদ দিয়ে প্র্যাক্‌টিকেল একটা কিছু বলো।

—প্র্যাক্‌টিকেল একটা কিছু করা ত দরকারই। উদাসীন ভাবে প্রতিধ্বনি করলে পরমেশ।

—সারা রাত শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবলে ত চল্‌বে না। জ্যামিতির একটা জটিল একস্‌ট্রা যেন এইমাত্র সমাধান করে এনেছে চামেলী। "আমি বলি কিনা মটর হাঁকিয়ে জব্বলপুরে চলে যাই। ওখানে তোমার কাকাবাবু থাকেন বলছিলে না। তারপর যা বরাতে আছে।

প্রশ্নময় দৃষ্টিতে তাকালে চামেলী। একটা পেন্সিল দিয়ে পরমেশ অর্থহীন দাগ কাটছিলো। মাথা তুলে বল্লে—তাই চলো। তবে শেষে যদি কোন ফ্যাসাদে পড়তে হয়।

—এর মধ্যে আবার ফ্যাসাদ হবে কেন? কারো সম্পত্তি লুট করে ত নিয়ে যাচ্ছি না। আর একটু আধটু হাঙ্গামা না পোহালে পুরুষ মানুষের চল্‌বে কেন। হেলেনের জন্যে 'ট্রোজান' যুদ্ধ হয়েছিল সে খবর রাখো! শব্দহীন হাসিতে প্রসারিত হয়ে উঠলো চামেলী। ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সে তোমার ইতিহাস ছিল না? লজিক নিয়েছিলে বুঝি?

—আমি ভাবছি জব্বলপুর না গিয়ে অন্য কোথাও গেলে চলে না? ওখানে আবার কাকাবাবু রয়েছেন।

—যেখানেই যেতে হয় চটপট ঠিক করে নাও। এইসব জরুরী কাজে লজিক মেশালে ঠক্‌তে হয়।

বেশ, আসছে বুধবারেই না হয় বেরিয়ে পড়া যাক্। শেষ কালে তোমাকে নিয়ে যে একটা য়্যাডভেঞ্চার করতে হবে, কে জান্‌তো!

—তুমি কবে সীরিয়াস হতে শিখবে? শাড়ী আর চেহারা নিয়ে যতো খুশী ঠাট্টা করো আপত্তি নেই কিন্তু··· চামেলীর সরব জমাট বেঁধে গেল।

—তোমার শাড়ী নিয়ে করেছি ঠাট্টা! আমার গা ছুঁয়ে বলতে পারো! তোমাকে আজ কি মনে হচ্ছে জানো? একটু থেমে বললে পরেশ, দাঁড়াও বলছি, তোমার ঐ লাল শাড়ীর দীপ্তিতে ভুবনে সূর্যের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। চেহারার সার্টিফিকেট নতুন করে দিতে হবে নাকি? তোমাকে দেখ্‌লে কি মনে হয় জানো চামেলী? ফ্রয়েড্ পড়েছ? ভয় পাবেনা ত! হ্যাবলক এলিসের মতে রাত্রে মেয়েরা······—ইয়ার্কি দিতে হবে না। একটা কিছুর ছুতো পেলেই আর রক্ষে নেই।

পাশের কোঠা থেকে বাবা হাঁকলেন—

রুবি এখনও ঘুমুতে যাওনি? কার সাথে এতো রাত পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়া হচ্ছে! মণ্টুর সাথে 'কেরম্' খেলছিল বুঝি! হতভাগা ছেলের শুধু একই বৃত্তি। তুই ওকে আসকারা দিয়ে মাথায় তুলেছিস্। পরীক্ষার আর ক'দিন বাকী হিসেব আছে? চামেলী জবাব দিলে—এই ঘুমুতে যাচ্ছি বাবা।

পরমেশ চাপা সুরে বল্লে—বুধবারই ঠিক রইলো কিন্তু!

দ্রুতপদে পরমেশ সিঁড়ি ভেঙে বাইরের রাস্তায় নেমে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বস্‌লো।

···গলিটার মোড়ে এসে ট্যাক্সি থাম্‌লো। পরমেশ জিজ্ঞেস করলে—কত উঠেছে মিটারে?

ড্রাইবার বল্লে—চার টাকা দশ আনা। পকেট থেকে নোট বের করে এগিয়ে দিলে।

—খুচরো টাকা হবে না বাবু। বিনীত কণ্ঠে ড্রাইভার জানালে।

—খুচরো টাকা সঙ্গে না নিয়ে ভাড়া খাটতে যাও কেন? ধমকে উঠলো পরমেশ।—এই রাত দুপুরে আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসবে নাকি? কালকেই ভাড়াটা নিয়ে যেও একবার সময় করে, বাড়ীটাত চিনে রাখলে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে পরমেশ নিমেষে গলির অন্ধকারে মিলে গেলো।

* * *

—গুডমর্ণিং

—গুডমর্ণিং। "ছিলে কোথায় ভায়া।" কলম রেখে বললে প্রবীর।

—আমি কোল্‌কাতায় ছিলুম না। কোন চিঠিপত্র এসেছে নাকি?

—চিঠি আসে নি। তবে সে দিন টেলিফোনে কে নাকি তোমাকে খুব ডাকাডাকি করছিল। আমি বাড়ীতে ছিলুম না। খোকা টেলিফোন ধরেছিল। সে সাফ বলে এসেছে, পরমেশবাবু বলে এ বাড়ীতে কেউ নেই।

—সত্যি নাকি? একদম জীবন্ত মানুষকে শূন্যে উড়িয়ে দিলে!

—ওরই বা দোষ কি। তোমার পোষাকী নাম ত ওকে ঘটা করে বলা হয় নি। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস না।

—বসো। টেলিফোনে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি।

...হ্যালো।

—কে, জ্যোতিকণা?

—দাঁড়ান, কণাকে ডেকে দিচ্ছি।

"...আজকে সন্ধ্যার পর আমরা এম্পায়ারে যাচ্ছি। (উৎফুল্ল স্বরে জ্যোতিকণা বল্লে)

—তোমাকে না গেলে চলে না?"

—চলবে না কেন? তবে মিঃ গাঙ্গুলীর অনুরোধ এড়ানো ভার।

—মিঃ গাঙ্গুলী! (বিস্ময়চকিত স্বর)

—মাভৈঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী ন'ন। ওর এক ছেলে বিলেতে পড়তে গেছে।

—ফোনে দাঁড়িয়ে ফাজ্‌লামী করতে হবে না।

(একপশলা হাসির শব্দ)

—খুব হাস্‌ছো যে। ফোনটা তোমার জমিদারীতে নাকি?

—আর একমিনিট সময়। শীগগির সেরে নাও।

—আস্‌ছে বুধবারে আমি জামসেদপুর যাচ্ছি। তোমার সাথে একটা জরুরী কাজ ছিল।

সেদিনের স্বপ্নখানি

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

সেদিনের স্বপ্নখানি আজো আমি বক্ষে লয়ে গেয়ে যাই গান,
সেদিনের স্মৃতিগুলি দোলাইয়া যায় মোর মর্ম্মের বিতান!
আমার মুহূর্ত্তগুলি রচে কোন্ কল্পনায় নব নব আশা,
জীবন স্বপন নীড়ে ঊর্দ্ধলীন মহাকাশে বাঁধে যেন বাসা।
তারমাঝে আছে রূপ—আছে গন্ধ—ঐশ্বর্য্যের বিচিত্র সম্ভার,
স্মরণের অনুরাগে-বিরহের ছন্দ-গান শব্দের ঝঙ্কার;
জীবনের অনুভূতি মরমের সুর আর কবিতার প্রাণ;
সে নহে বন্ধুর শুধু ক্লেদক্লিষ্ট চিত্তভারে ব্যর্থ অভিযান!

সেদিনের গানখানি সুরে সুরে আজো মোর কণ্ঠে ফুটে আছে।
সেদিনের স্মৃতি আজি রবি করে শুকাইয়া যায় যদি পাছে!
তাই তারে সযতনে দিবসের কোলাহল কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের শ্রান্ত ছায়ে গোধূলির ধূসরিত মর্ম্ম গানে গানে
রচে যাই; সুন্দরের রূপ দিই তারে—অসীম নীলিমা মাঝে।
তারকার ছন্দে ছন্দে সেথা মোর ঊর্দ্ধমুখী-চিত্তবীণা বাজে।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে নাকি? পেনাল কোডে "ইলোপমেণ্ট" বলে একটা ধারা আছে জানো?

—ইয়ার্কি নয়। বাজে বক্ বক্ করতে তুমি বড্ড ভালোবাস।

—তোমার চেয়েও বেশী?

—যা খুশী কর। আমি চল্লুম।

—আঃ চটো কেন। জরুরী কাজ থাক্‌লে চলে আসলেই হয় এখানে। কবে আবার অনুমতি নিয়ে এসেছ? অনুমতি করলে আমিও আস্‌তে পারি তোমার ওখানে।

—আমিই সন্ধ্যের পর যাব। বাড়ীতে থেকো কিন্তু।

—না থেকে উপায় কি।

—মনে থাকে যেন। যে আপন ভোলা মেয়ে তুমি।

—এই লিখে রাখছি।

—ধন্যবাদ।

—এই শোন, শোন। আমাদের ক্লাশের তারামনি তোমার সম্বন্ধে কি বলছিলো জানো?...

৫

ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করতে বলে কুন্তী দ্রুতপদে নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করলে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে অনেকগুলো টাকা এবং একছড়া নেক্‌লেস্ বের করলে। লোভে আর আনন্দে কুন্তীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হেনা, শ্রীলতা, চামেলী, জ্যোতিকণা এদের সাথে ঘণ্টা কয়েক অভিনয় করেই সে এতগুলো টাকা রোজগার করে ফেল্‌লে। এবার সে তার জঘন্য ব্যবসা ছেড়ে আপনাকে মনুষ্যত্বের আসনে

সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। নৈতিক স্খলন ত মানুষেরই হয়, তাই বলে শুধ্‌রাবার অধিকারটুকুও কি তার নেই ?···কুন্তী নিজের গলার হারছড়াটি বাক্সে তুলে রাখলে। মার্কেটে গিয়ে নিকেলের অনেকগুলো অলঙ্কার কিনতে হবে। নিজের হারছড়াটির অনুরূপ আর এক ছড়া কিনতে চাই। আর দেরি নয়। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।···

* * *

দরজায় মৃদু আঘাত।···

উদ্বেলিত চিত্তে পরমেশ বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। ত্রস্তে সে দরজা খুলে দিলো। ঘরে প্রবেশ করে কুন্তী নিঃশব্দে দরজায় ছিটকানি বন্ধ করে পরমেশের পাশের টুলে এসে বস্‌লে।

পরমেশের বুকটা আগ্রহে উচ্চকিত। বললে—কত পেয়েছ ?

—দাঁড়াও, বলছি। অনেক টাকা হবে। খুশীতে পরমেশ সূর্য্যের কিরণের মতো ছড়িয়ে পড়লো।

—হেনা, শ্রীলতা, ওরা বিশ্বেস করলে ত ?—জিজ্ঞেস করলে পরমেশ।

—"করবে না আবার! যা নরম ওদের মন। চামেলীত কেঁদেই ফেল্লে। হেনা জিজ্ঞেস করলে "জাম্‌সেদপুরে কলেরায় মারা গেছেন। কিন্তু কাগজে ত কিছু বেরোয় নি। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম—তিনি ত আর 'পাব্লিক ম্যান' ছিলেন না যে 'আনন্দবাজার' একপৃষ্ঠা জুড়ে শোক প্রকাশ করবে। এতে দেখলুম হেনার মন যেন আরও ভিজে গেল। বল্লে—দেশের লোক না করুক আমরা আছি কি করতে। নেক্‌লেস্‌টা হাতে তুলে দিয়ে বল্লে—দরকার পড়লে পরে জানাবেন। কি ভাবে ওঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি বললুম—এখনো চূড়ান্ত ভাবে কিছু ঠিক হয় নি। তবে মারা যাবার আগে তিনি শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন।" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে হেনা জিজ্ঞেস করলে—কি ইচ্ছা ছিল ওঁর!

—আপনাকে অবিশ্যি বলতে আপত্তি নেই। ইচ্ছে করেই মাথা নীচু করে বল্লুম—ওঁর স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থাই হোক্ না কেন, আপনার ছবিটাও তা'র পাশাপাশি থাক্‌বে।

কুন্তী কৌতুক হাসিতে পরমেশের দিকে তাকিয়ে বললে—একথা অবিশ্যি শ্রীলতা, চামেলী, জ্যোতিকণা সবাইকে বলেছি। এবং এর ফলটাও আশ্চর্য্য রকমের। এক চামেলী শুধু ভীরু গলায় বলেছিল—অনুগ্রহ করে আমার ছবিটা দেবেন না। দোহাই ভুল বুঝবেন না আমাকে। বাবাকে ত আপনারা জানেন না। দৈবাৎ যদি তাঁর চোখে পড়ে।" চামেলী মুক্তা বসানো ব্রোচটা এগিয়ে দিলে।

—জ্যোতিকণা কিছু বললে না ?"—পরমেশ প্রশ্ন করলে।

—বল্‌লে না আবার? ও-ই ত সব চাইতে ঝানু মেয়ে। জিজ্ঞেস করলে—আপনি বুঝি তার বোন্‌ হ'ন।

আমি বল্লুম—ঠিকই আন্দাজ করেছেন।

—আপন না সম্পর্কে ?

—আপন।

—কতটাকা উঠেছে ওঁর মেমোরিয়েল ফাণ্ডে ?

—সবার কাছে ত যাবার কথা নয়। যাঁরা খুবই নিকটতম শুধু তাদের কাছেই যাচ্ছি। এ পর্য্যন্ত হাজার পাঁচেক হাতে এসেছে।

—টাকার জন্যে আপনারা কাগজের মারফতে আবেদন করুন না কেন ?

—ওতে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এটা প্রাইভেট বিষয়।

একঘণ্টা বক্তৃতার পর কি না ও তিন খানা দশটাকার নোট তুলে দিলে। কী কৃপণ মেয়েটা। আবার বলে দিয়েছে—জানাবেন কিন্তু কি করলেন আপনারা।"

নেক্‌লেস, ব্রোচ, শ্রীলতার দেওয়া দুটো হেয়ারপিন্‌ আর আংটি গুলোকে কুন্তী ট্যাবিল ল্যাম্পের স্তিমিত আলোকে ঝলসে তুললে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরমেশ বললে—এগুলো বিক্রী করে কতো পাওয়া যাবে বলে মন করো।

—এই হাজার খানেক টাকা। দর কষাকষি করলে বেশিও পেতে পার।

—এলাহাবাদে গিয়েই বিক্রী করা যাবে না হয়। এখানে আবার ফ্যাসাদ বাঁধতে পারে।

কৃত্রিম আবেগে উচ্ছ্বসিত স্বরে পরমেশ জুড়ে দিলে—এ সবই তোমার রইলো কুন্তী। আজ থেকে আমি, হেনা, শ্রীলতা ওদের কাছে অশরীরী একটা ছায়া। ওদের প্রেমের সমাধির 'পরে অচিন দেশে আমরা গড়ে তুলবো নূতন স্বপ্নরাজ্য। শ্রীলতা, জ্যোতিকণাদের জীবন-মঞ্চে আসবে নোতুন অভিনেতা, ওদের আকাশে আবার জাগবে সাতরঙা রামধনু।······

All the world's a stage.

And all the men and women......

—চুপ করো। ফিরিঙ্গির ভাষা কপচাতে হবে না। ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে রাখ সুটকেসে। সাবধানের মার নেই।

—ষ্টোভে জল চড়িয়ে এক কাপ চা করে দাও না কুন্তী। আজকে আমার গলা ছেড়ে গান করতে ইচ্ছে করছেঃ I love thee, dear Kunti. পরমেশ সুর ধরলে।

—হয়েছে, হয়েছে, সোহাগ করে আর চেঁচাতে হবে না।

—আজকে আমার কী আনন্দের দিন সে তুমি বুঝবে না কুন্তী! আমেরিকা আবিষ্কার করে কলম্বস যতো খানি খুসী হয়েছিল। প্রেমের একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু...ঃ তুমি ত ইকনমিক পড় নি। ওসব বুঝতে পারবে না।

—ও সব ছাই ভস্ম আমি বুঝতে চাইনে। কাপড় চোপড় গুলো গুছিয়ে রাখো না। খুব ভোরেই ত ট্রেন ধরতে হবে।

চা করতে করতে কুন্তী প্রশ্ন করলে—সত্যিই কি তুমি হেনা, শ্রীলতা ওদের ভালোবাসতে না?

পরমেশ মুচকি হেসে বললে—বাবা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন কি না, বসে বসে প্রেম করবো।" বিদ্রূপের আঁচ পেয়ে কথাগুলো যেন জ্বলে উঠলো।

এবার গম্ভীরভাবে বললে পরমেশ—মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারে না কুন্তী। আমরা যাকে প্রেম বলি, সে একটা সস্তা কৌশল মাত্র যা দিয়ে মেয়েদের আমরা মাছের মতো গেঁথে তুলি। টাকা পয়সার মতো প্রেমও হচ্ছে একটা purchasing power ওঃ তুমি আবার ইংরেজী বুঝবে না।"

কুন্তী বললে—আমি বাপু অত শত বুঝিনে। আচ্ছা—ওদের ঠকাতে তোমার একটুও বাঁধলো না!

—ঠকানো?" সামনে সাপ দেখে পরমেশ যেন লাফিয়ে উঠলে। "একে ঠকানো বলে? জানো ঐ এ্যারিষ্টোক্রেট মেয়েদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে আমায় কাপড় ধোয়াতে কত নিয়েচে ধোপা। নগদ বারো আনা পয়সা খরচ করে এই রোল্ড গোল্ডের বোতাম কিনে আনতে হয়েচে—সে খবর রাখো! বাবার জমিদারী আছে কি না...

—তবু ত ওরা তোমায় সত্যিই ভালোবাসতো।

ঐ আবার গোলে হরিবোল দিচ্ছে। বলুম যে 'ভালোবাসা' বলে কিছু নেই। এ হচ্ছে অপরিণত মনের একটা আদিম সংস্কার। ফ্রয়েড না পড়ে তুমি প্রেম নিয়ে তর্ক করতে এসেছ। পাগল আর কি। মানুষ নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে পারে না কুন্তী! অসকার ওয়াইলড পড়েছো?...

সাহেব ঠাকুরের নাম করে ভড়কে দিতে চাও বুঝি?
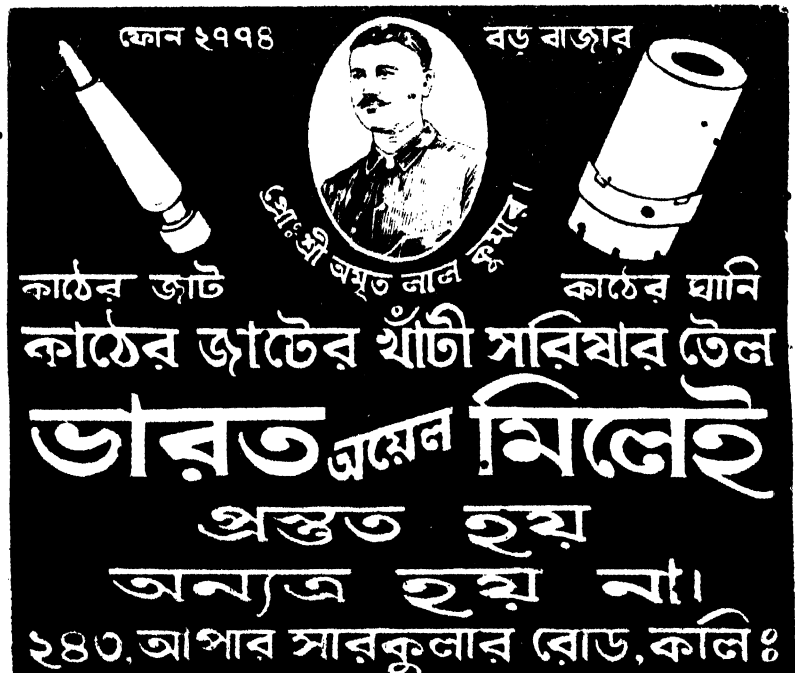
চা তৈরী করে এনেছে কুন্তী! উঃ, গোলাপী দু'কাপ চা!

পা টিপে টিপে খাটের পাশে এসে পরমেশ টর্চ জ্বাললে। রাত তখন দুটোর উপরে। টর্চ ফেলে পরমেশ দেখলে কুন্তী চরম নির্ভয়ে ঘুমুচ্ছে। যে মেয়ের চরিত্রের ভাবনা নেই—পরম নির্ভাবনায় সে ঘুমুতে পারে—নিঃসংশয়ে নিশ্চিন্তে সে আপনার দেহকে ছড়িয়ে দিতে পারে বিছানায়—শুভ্র মসৃণতায় পরমেশ দেখলে—ঠোটের কোণে যেন ওর ফুটে উঠেছে মৃদুচপল হাসি। সামান্য দেহ ব্যবসায়ীর স্তর থেকে কুন্তী উন্নীত হবে গৃহিনীর মর্য্যাদায়।

আর ঘণ্টা কয়েক মেয়েটা আরামে ঘুমিয়ে নিক।—পরমেশ ভাবলো। সন্তর্পণে সে কুন্তীর গলায় হার ছড়াটি খুলে নিলো। এইবার ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে পড়া যাক্। কুন্তী যদি আবার জেগে উঠে।

সুটকেসটা হাতে নিয়ে পরমেশ বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। একমাত্র স্থবির নির্ব্বাক দালানগুলি ছাড়া তার কাজের কেউ সাক্ষী রইলো না.... হঠাৎ ভিতরে গিয়ে কি

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বিদ্যার্থী মণ্ডলের প্রোগ্রামের উন্নতি ক্রমে ক্রমে দেখা যাচ্ছে। ছাত্রদের out knowledge-এর উপযোগী বক্তৃতা আমরা এই অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে পাচ্ছি। পাঠ্য পুস্তকের নীরস compulsory training-এর বাইরে বিপুল বিশ্বের সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়ের পরিচয় বিশেষ থাকে না। রেডিও যদি এই বিভাগের অনুষ্ঠান লিপির দ্বারা সে অভাব খানিকটা অন্ততঃ মেটাতে পারেন তবে তাতেও অনেক লাভ সন্দেহ নেই। শিল্প-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ-ধর্ম্ম বৃহত্তর জীবনের আদর্শ যদি সরল ভাষায় সহজ প্রণালীতে আলোচিত হয় তবে সেগুলি ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রকৃতই কল্যাণকর। আধুনিক প্রোগ্রামে এইগুলির কিছু কিছু আভাষ আমরা পাচ্ছি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেগুলি সহজ বোধগম্য হয় না। বক্তারা বিষয় বস্তুগুলিকে অত্যন্ত complex করে গড়ে তোলেন। শ্রোতা ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধিকে তাঁরা বড় একটা ভেবে দেখেন না। বিভাগীয় কর্ম্ম-কর্ত্তার এঁদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

* * *

আর একটা কথা : যে শ্রোতা সম্প্রদায়ের জন্যে এই অনুষ্ঠানের সৃষ্টি—তাদের মধ্যে সেই বিপুল ছাত্রছাত্রী বিদ্যার্থী সম্প্রদায়ের ভেতর ক'জন এই অনুষ্ঠান নিয়মিত শুনতে পায়? কটা স্কুলে সেটের ব্যবস্থা আছে? এবং যে সময় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ঠিক সেই সময়টি উপযুক্ত কিনা? প্রোগ্রাম করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি ভেবে দেখা দরকার।

* * *

আমরা কয়েক মাস পূর্ব্বে বেতার জগতের পৃষ্ঠায় দেখেছিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয়ের সঙ্গে রেডিও কর্ত্তৃপক্ষের এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ শ্রোতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন এর সুফল শ্রোতারা শীঘ্রই জানতে পারবেন। শ্রোতারা এর সুফল সত্যিই দেখতে চায়। আশা করি বেতার জগতের মারফৎ বিদ্যার্থী মণ্ডল সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃততর কিছু শুনতে পাবো।

* * *

পূর্ব্বে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে মিসেস হালদারের প্রোগ্রামে আমরা ভালো ভালো রস-রচনা ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্য প্রসঙ্গ শুনতে পেতাম। নারী সমাজের মঙ্গলজনক নারী প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা ঘর সংসারের খুঁটি নাটি প্রসঙ্গ আলোচিত হোত প্রায়ই—আজ অনেক পরিমাণে সেগুলি বেতার প্রোগ্রামে ব্যাহত। এ সম্বন্ধে জনৈকা বেতার গ্রাহিকার একখানি পত্র আমরা নিম্নে পত্রস্থ করলাম। বেতার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টরের দৃষ্টি আমরা এ বিষয়ে আকৃষ্ট করছি।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গীত—কণ্ঠ-সঙ্গীতের আদর অনেকখানি নেমে গেছে। বেতার কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। বক্তৃতার বিভাগেও সরস আলোচনা নেই—সাহিত্য প্রসঙ্গ যেমনি সামান্য তেমনি আড়ষ্ট। রসসাহিত্য নির্ব্বাসিত! জাতি এবং সমাজের বিভিন্ন দিকে জীবনের বিচিত্রতম অনুভূতি ইত্যাদির প্রকাশের চরম পথ রস-সাহিত্য মানুষের অবসর সময়কেও মধুরতায় ভরিয়ে তোলে বেতারে রসসাহিত্যের আসর একেবারে নেই বললেই চলে। বক্তৃতা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা এদিক থেকে একেবারেই পেছিয়ে রয়েছেন। বহুদিন পূর্ব্বে বেতারে সাহিত্যের আসর ছিল—সাহিত্যের আসর বসতো। এখন কি আর সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় না?

* * *

ছোটদের আসরের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে দেখছি। শিশু সাহিত্যের আলোচনা কোথায়? দাদুমনির কথা তবু মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের সাহিত্যের খোরাক কিছু দেয়। শিশুচিত্তের বিপুল অঙ্গনের বহু সুন্দর পুষ্প কোরককে ফুটিয়ে তুলতে হবে! "মাসীমা" "দাদুমণি" এ দিকের বিরাটত্বের দিকে দৃষ্টি দিন! অত্যন্ত বাজে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্তবিরক্তিকর আড়ষ্ট প্রোগ্রাম আমরা ইদানীং এ আসরে শুনছি।

* * *

মাননীয় 'খেয়ালী' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

আমি বহুদিন হইতে রেডিওর প্রোগ্রাম শুনিয়া আসিতেছি। রেডিও সম্বন্ধে আপনাদের সুবিস্তৃত আলোচনা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। রেডিও প্রোগ্রামের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। মহিলা আসর সম্পর্কে আমরা মহিলা সমাজ বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সংসারের কাজ কর্ম্মের

মনে করে পরমেশ কুন্তীর ঘুমোনো মুখে টর্চ্চের আলো ফেললে। ঠোঁটের কোণে কুন্তীর সেই চপল হাসি।...

দু'মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কী ভাবলে। তারপর সুটকেসটা হাতে নিয়ে পরমেশ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

কুন্তীর ঠোঁটের কোণে তখনো স্বপ্নিল হাসি জেগে ছিল কি না কে জানে? ঘন অন্ধকারে মানুষের দৃষ্টি চলে না।...

পর দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম সময়ের এই অনুষ্ঠানটি হইতে আমরা মহিলা শিক্ষাপ্রদ এবং নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক বহু অনুষ্ঠানের প্রত্যাশা করি। কিন্তু সে আশা আমাদের ফলবতী হয় না—ইহাই আমার বিশ্বাস। কিছুকাল পূর্ব্বেও মহিলা আসরে আমরা অনেক শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠান শুনিতে পাইতাম। রান্নাবান্না ঘর-সংসারের কাজকর্ম—সরস-গল্প ছোটগল্প গোলকধাম—মিসেস হালদারের বক্তৃতা প্রভৃতি সত্যই আমাদের আনন্দ দান করিত। আমরা ভাবিয়াছিলাম প্রকৃতই মহিলা আসরের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সেগুলি অধুনা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। দুপুর বেলায় শুইয়া বিশ্রাম কালে ভালো গল্প পাঠ শুনিতে ঘর সংসারের অলোচনা শুনিতে আমাদের ভালো লাগে। মধ্যে "সাহিত্যিকের পোর্টফোলিও" হইতে গল্প শুনিতাম কিন্তু অধিকাংশই অপটু রচনা। আজকাল আর কিছুই নাই। মাঝে মাঝে দেখি অভিনয় প্রণালীতে মহিলা সমাজের কিছু দিকের অবতারণা করা হয়—কিন্তু তাহা যেমন লঘু তেমনই বাজে রচনা—বাজে অভিনয়। আপনাদের পত্রিকা মারফৎ এইগুলি লইয়া যদি বিস্তৃত আলোচনা করেন তবে ইহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আপনাদের নির্ভীক মন্তব্যের আমরা সমর্থক। আশা করি আগামী সংখ্যায় আমার বক্তব্যগুলির প্রাধান্য দিয়া আমাকে বাধিতা করিবেন।

আমার শ্রদ্ধা-নমস্কার গ্রহণ করুন!

ইতি

বিনীতা

শ্রীনমিতা দেবী

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—উষা চৌধুরী
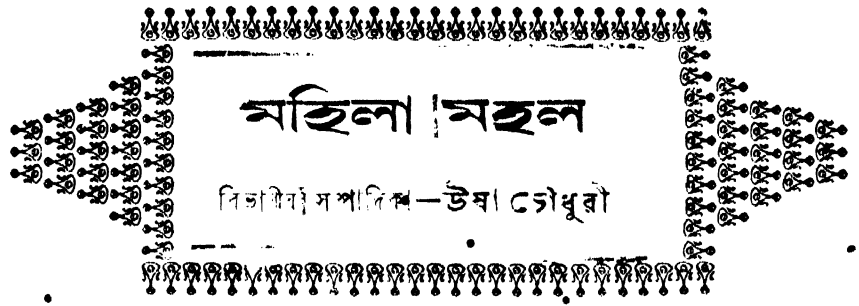
আপনারা হয়ত মনে করতে পারেন যে বৃহৎ কোনো সমস্যাই শুধু আমাদের আলোচনার বস্তু। কিন্তু তা নয়, সংসারের প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যাপার আমাদের ছোটোখাটো সুবিধা অসুবিধার কথা নিয়েও আমাদের আলোচনা করা উচিত। যেগুলোকে আমরা অতি তুচ্ছ ঘটনা মনে করি তাও বৃহৎ হ'য়ে বিস্তৃত হ'য়ে সারা দেশের উপকার বা অপকার করতে পারে।

যেমন ধরুন, কোনো মায়ের ছেলে সিনেমায় যায়, লেখাপড়ায় মন নেই, কথা বললে শোনেনা। মাথার ওপর আর কোনো অভিভাবক নেই, সেখানে যদি মার অনুশাসনই সে না মানে, তবে ভবিষ্যতে সেই ছেলে কুলপ্রদীপ না হয়ে যে কুলপাংশুল হ'য়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে ত' সন্দেহ নেই। তখন সমাজের পক্ষে সে হ'য়ে উঠবে এক আবর্জ্জনা, অন্য অনেক ছেলের সর্ব্বনাশ করবে, পাড়া-প্রতিবেশী ও ক্রমশঃ জনসাধারণের নানা অশান্তির উপলক্ষ্য হ'য়ে উঠবে। সুতরাং সেই ছেলের সমস্যা একা মায়ের নয়—সারাদেশের সমস্যা।

তেমনি জায়ে জায়ে, ননদ-ভাজে শাশুড়ী বৌ-এ যে মনান্তর তারও কুফল বিস্তৃত হ'য়ে সমাজ জীবনে এসে আঘাত করে।

আমাদের গৃহকে যদি আমরা সুন্দর, মধুর এবং শান্তিপূর্ণ ক'রে তুলতে পারি তবে তার আবহাওয়ার আদর্শ অনেকের কাছেই অনুসরণীয় হ'য়ে উঠবে এবং ক্রমশঃ আমাদের বাঙালী সমাজে তার প্রতিক্রিয়ার সুফল আমরা দেখতে পাব।

কাজে কাজেই কোনো মুখ এবং

রাতের কুতব

(চিত্র)

শ্রীগণেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লীলাময়ী মেঘমালার খেলা বোঝা ভার; ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে কখন দেখি চাঁদ উঠেছে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের কালো কালো মুখগুলো পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাধারায় পাউডার মাখা হ'য়ে উঠেছে।

রোহিণী ক্যামেরা এনেছিল। সারিবন্দী হ'য়ে সব পৌনে বারটার সময় উন্মুক্ত তৃণ-প্রাঙ্গণে ফোটো তুলব বলে গোছগাছ করে দাঁড়ালাম। কিন্তু ক্যামেরাম্যানের যে উপদেশ শুনলাম তাতে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! একাধিক্রমে পাচ মিনিট নিথর হ'য়ে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'বে। চেষ্টায় কারুর ত্রুটি নেই। প্রাণপণে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কোনপ্রকারে পাঁচ মিনিট কাল অতিক্রম করে যেতে। কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে বলে যদি কোন লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে নিঃশব্দে দাড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে তবে রাজ্যের চুলকানি আর মশা এসে ঘাড়ে পিঠে সুরসুরি কাটে।

হ'লও ঠিক তাই। বেচু মাথায় ফ্যাটা বেঁধে লাঠি হাতে বাংলা দেশের গুণ্ডাদের মত দাড়িয়েছিল। অবিচলিত চিত্তে তার দেখি গম্ভীর রুক্ষ এক পৌরষত্ব চকচকে চোখের ভেতর দিয়ে ঝকঝকে চাঁদের পানে ঠায় চেয়ে আছে।

কোনো দুঃখ আমাদের ব্যক্তিগত নয়, আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উন্নতির ওপরে সারা দেশের ও সমাজের উন্নতি নির্ভর করে।

মণি স্থির থাকতে পারেনা। অস্বস্তি অনুভব করে। চুপিচুপি বেচুকে বললে, "কি করি বলদিকি বেচু, বড্ড মশা কামড়াচ্ছে। এত হুলের জোর বাপ্‌রে বাপ! বোধ হয় বাদশাই মশা হবে।'

বেচু প্রাণপণে দাঁতে দাত চেপে অতি কষ্টে হাসিটা দমন করে নিয়ে গাল ফোলা গোবিন্দর মা হ'য়ে চাঁদের পানে তাকিয়ে থাকে। মণি তবু খুস্‌খস্‌ ক'রে, 'উফ্‌' এ দেখছি জ্বালাতন! বলে ফটাস করে গর্দ্দানের ওপর একটা চড় মারলে।

বেচু সুস্পষ্ট শুনতে পেলে বন্‌ করে মশাটা মণির গর্দ্দান থেকে লাফ মেরেই ওর কানের ডগায় একটা লাথি মেরে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

ফের মণি উস্‌খুস করে, 'বেচু, দেখত ঠিক আমার নাকের ডগায় একটা মশা বসেছে কি না—?'

কোনরকমে 'হাঁা' বলতে বলতে বেচু আর নিজেকে রক্ষা করতে পারলে না। দাতের প্রাচীর ভেদ ক'রে হাসির উচ্ছাস হড়হড় করে সশব্দে বেরিয়ে এল।

মিত্র মশায় ধমকে উঠেন, 'কি হচ্ছে বেচু!'

আবার চুপচাপ।

পাচ মিনিট বুঝি আর আজ রাতে শেষ হ'বে না। মণি অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। আপন মনেই বলে, 'ইস্‌, এখনও মশাটা বসে রয়েছে দেখছি। ভাল বিপদেই পড়েছি। সুরসুরি দিচ্ছে বটে, এত চুলকুচ্ছে যে তার ঠিক নেই। পাঁচ মিনিটে পাঁচ ছটাক রক্ত না খেয়ে ছাড়বেনা দেখছি। এত থাকতে গরীবকে কেন বাবা?'

বেচু বরাবরই হাসছিল কিন্তু এবার সেটা উদ্দাম হয়ে উঠল। রুখতে পারলে না শত চেষ্টা করেও; দুর্দ্দমনীয় বেগে শেষে খানিকটা বেরিয়েই এল। উপায়ন্তর না দেখে হাতের লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে বলে উঠল, 'দি ব্যাটাকে এক ঘা বসিয়ে?'

রীতিমত মণি বাধা দিলে, 'না খবরদার। এক্ষুনি উড়ে যাবে। আহা বেচারী অনেক্ষণ খেতে পায়নি। আচ্ছে থাক। হাজার হ'ক বাদশাই মশাত' মেজাজটা যাবে কোথায়।'

বেচুত হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়লই, উপরন্তু বাকী যারা শুনতে পেয়েছিল তারাও হো হো রবে হেসে উঠল। মিত্র মশায় চেষ্টা করেছিলেন গম্ভীর থাকতে কিন্তু নিষ্ঠুর হাস্য-দেবতা কাতুকুতু দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হাসিয়েই ছাড়লে।

ফোটো যা তোলা হ'ল তা মা ভগাই জানে। রোহিনী ক্যামেরা গুটিয়ে সুটিয়ে নিয়ে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সকলে বেচুর ওপর দোষ চাপালে। সে বেচারী অনন্যোপায়ে মণিকে দোষী সাব্যস্ত করে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করতে কিছুক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ও তর্কাতর্কি চালাল। মণির একটি মাত্র যুক্তি ছিল যেটা একেবারে অকাট্য যে সে মোটেই হাসে নি।

সব কাজ আমাদের ফুরিয়ে এসেছিল। মিনিট পনের তৃণতলে বসে গল্পগুজব করার পর অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দ্দেশে সব উঠে গিয়ে বাসে চেপে বসলাম।

কুতবের সীমানা পার হয়ে যখন আমরা গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়েছি তখন

দেখি সকলেরই মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত। অতীতের স্মৃতির বুকে আমোদ আহ্লাদের ঢেউ তুলে তারা আজ ফিরে চলেছে। দু'দিন পরে যখন আবার আসবে তখন দেখবে রাতের কুতব তাদের স্মৃতিরূপে জেগে রয়েছে। স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করা মানুষের জীবনে মস্ত বড় এক ভোগ। স্মৃতিই মানুষকে অভিজ্ঞতা দেয়, তাকে উন্নত করে। আবার সেই স্মৃতিই মানুষের গতি পথে পদে পদে বাধা জন্মায়, তাকে ভয় খাওয়ায়, কখনও আবার সাহসী করে তোলে।

সকলকেই দেখলাম বিচ্ছেদ বেদনায় রাতের কুতবের পানে চেয়ে রয়েছে। গাড়ী চলেছে বেশ জোরেই। খানিক পরেই যে যার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। অক্ষয় অতীত পড়ে রয়েছে।

চাঁদখানা মেঘে ঢাকা ছিল। ঈষৎ আলো মেঘের ফাঁকে ফাকে পথ হারিয়ে ফেলেছে; নীচে এসে পৌঁছতে পারে নি।

বাস যত এগিয়ে চলে ততই আমি পিছন ফিরে অধিক আগ্রহে চেয়ে থাকি; ঝোপ-ঝাপের অন্তরালে অতীত ভারতের একটুকরো কীর্ত্তি জীর্ণশীর্ণ প্রেতাত্মার মত অন্ধকারে আত্মগোপন করে রয়েছে; মনে হ'ল কুতবের চারিপাশে ধ্বংশ প্রায় প্রাসাদের আনাচে কানাচে সমাধি স্তূপ ভেদ ক'রে কারা যেন উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা চলে এসেছি, এইবার তারা সমস্ত রাত অতীতের সংসার সাজিয়ে কানাঘোষা করবে।

শূন্যের আঁধার ঠেলে মহিমাময়রূপে অতীতের কুতব আমাদের পিছনে আজও উদ্ধতরোষে আকাশের পানে উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে···কি যেন সে অনন্তকাল ধরে আকাশের কানে কানে বলতে চায়।

অনেকদূর এগিয়ে চলে এসেছি। তখনও দেখছি কুতবের চূড়ায় আকাশ যানের সতর্ক লাল আলো ক্ষণে জ্বলছে আর নিবছে।

ভাবলাম আমরা ত বর্ত্তমানের বুকের ওপর দিয়ে চাকা চালিয়ে ভবিষ্যতকে বর্ত্তমানরূপে বরণ করতে পলে পলে ছুটে চলেছি। কিন্তু অতীত? সেত চিরদিন আমাদের পিছনে অক্ষয় ভাণ্ডার নিয়ে উপেক্ষিত হ'য়েই পড়ে থাকবে। তার স্মৃতি নিয়ে খুব জোর এক টুকরো হাসব আর দু'ফোটা অশ্রু ফেলব; কিন্তু তার মূক ভাষা মুখর হ'য়ে কেমন করে আমাদের শিরায় শিরায় আদর্শের ঢেউ তুলে নবজীবন লাভ করতে পারে—তার বিষয় কোনদিন আমরা তলিয়ে দেখেছি কি?

আশা ও নিরাশা *

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

বন্ধু, তোমরা দেখোনাই চেয়ে
কখনো ফিরে
কাব্যলক্ষ্মী ধূলিতে লুটায়
আকুল নীরে!
বাংলা ভাষার মলিন আঙনে
শীতে, বসন্তে, শরতে, শাওনে
ক্রমে বিশীর্ণা দেহের ভাঙনে
কবিতারাণী,
তোমরা না জানো, সেবক আমরা
সেকথা জানি।

কাহারে ভাগা, কাব্য আকুল
কবির দেশে
ছন্দোময়ীরও হেন বিধিলিপি
ছিল কি শেষে!
দখিনা বাতাসে তাহারি স্বপ্ন,
পূর্ণিমা রাতে তাহারি লগ্ন,
তবু সঙ্গীত সকল তন্ত্র,
সজ্জ তারি!
তবু বিস্মৃত মূল্য তাহার
মর্য্যাদারি!

কথিকা, কাহিনী, উপন্যাসের
প্রবল স্রোতে
নির্ব্বাসিতা কি কবিতা তোমার
মর্ম্ম হ'তে?
এখন কি প্রিয় ডাকেনা প্রিয়ায়
অধীর কণ্ঠে আকুল হিয়ায়?
কেহ কি সুখের ভাব-মদিরায়
ভাসেনা আজি?
অলসশয়নে ফোটেনাকি মনে
ভাবনারাজি?

পিককলতান পশে নাকি কাণে
চৈত্ররাতে?
নব মুকুলের সৌরভে নাহি
হৃদয় মাতে?
অজানা মায়ায় ভরে নাকি মন?
শিশুর হাসি ও নারীর নয়ন
প্রিয়জন মুখে মধুর বচন
ভালো না লাগে?
প্রথম প্রেমের পরশে কিশোরী
হিয়া না জাগে?
ফুরায়ে কি গেছে সুখের কামনা?
আশার বাণী?
জমে নাকি আর ব্যথার রাগিণী?
কথার গ্লানি?
বিরাট বেদনা, বিপুল দুঃখ
মর্ম্ম কি কারো করেনা রুক্ষ?
যতনা রসিক, হ'ল কি মূর্খ
একথা কবে?
তাই কবিতার প্রয়োজন শেষ
মহোৎসবে।

তাই বহিছে সে পাদ পূরণের
অমর্য্যাদা!

তাই সহিছে সে প্রীতি উপহারে
গীতির বাধা।
বহু মানবের অবহেলা তার
সাকবিজনের যত অনাচার,
অনধিকারের বিপক্ষে আর
কি বলিবে সে?
অনাদৃতার দেহ বল্লরী
ধুলিতে মেশে!
ফিরে যায় ঘরে সেবকের দল
ক্ষুণ্ণমনে,
কণ্ঠ তাদের ওঠেনা উলসি
পুণ্যক্ষণে,
বরণীয় জনে করে না বরণ,
স্মৃতিকণা নাহি করে আহরণ,
মনোহরণের কোনো আয়োজন
করিবে না কো!
অকরুণ করে দিতেছ বিদায়,
জানিয়া রাখো।

পুরাতন যায় চলিয়া, নবীন
আসেনা পথে;
মনোরথ কেবা উড়াবে মন্ত্রে
মনের রথে?
জাগাবে কে আর নিদাঘ নিশীথে?
ভুলাবে কে আর মিলনের গীতে?
ত্যাগে দিতে সুখ বিরহে দহিতে
আসিবে কারা?
আশ্রয় ফেলে, লক্ষ্য ভুলেছ,
হে পথহারা!

শুনিবে যে গান, সে শুধু সাজানো
কথার মালা,
জাগিবেনা মোহ, ভরিবেনা প্রেমে
মনের ডালা,
ক্ষণিকের সুখ হবেনা অসীম,
শরতের ফুল, হেমন্ত হিম,
বাদলধারার রিম্ ঝিম্‌ঝিম্
হবে যে বৃথা!

বেদনার চিতা সহজে কি হবে
নির্ব্বাপিতা?
কিন্তু বন্ধু জলাঙ্গী জল
কলোচ্ছাসে
হয়ত' এখনো সন্ধ্যাবেলায়
স্বপন ভাসে!
হয়ত এখনো বিশ্রাম ক্ষণে
কামনা ঘনায় তোমারো নয়নে,
কবির ভাষায় দূর প্রিয়জনে
এখনো স্মরো,
হয়ত' এখনো পুরাণো কাব্য
লুকায়ে পড়ো!

এখনো সময় রয়েছে, বন্ধু
এখনো ফিরে,
তুলিতে প্রনাম করিতে কি চাও
গীত শ্রীরে?
বাংলাভাষার বিস্তৃত ভূমি
হরষে সরস করিবে কি তুমি?
ডাকিবে শোভন অঞ্চল চুমি
মধুর ভাষে?
কহিবে কি, দেবী কাব্যলক্ষ্মী
এসেছি পাশে?

এখনো শুনিছ পাপিয়াকণ্ঠে
মর্ম্মবাণী?
এখনো হেরিছ শ্যামল সুদূর
অরণ্যানী?
এখনো গোপন লিপির মালায়
রূপালী কবিতা দীপালী আলায়?
এখনো তরুণী কাঁপে নিরালায়
কাব্যগীতে?
সুরের মোহ যে মিলায়নি তবে
বিস্মৃতিতে!

আবার আসুক কাব্য লোকের
ফাল্গুন ফিরে!
আবার ভাসুক ব্যাকুল জনতা
আকুল নীরে!

সোনালী আলোর সূর্য্য উঠুক,
সোনালী দলের পদ্ম ফুটুক,
সোনালী পাখায় পাখীরা ছুটুক,
সোনার মেঘে,
কবিতারাণীর ললিত বাণীর
পরশে লেগে।
আবার মাতাল করিব আমরা
অযুত হিয়া,
সাদর করিব জীবন মধুর
ছন্দ দিয়া!
ঘরে ও বাহিরে, দূরে ও নিকটে,
প্রাসাদে কুটীরে, নদীতীর তটে,
আঁধারে আলোরে স্মরণের পটে
আঁকিব ছবি!
তোমার দুয়ারে দাঁড়াব নীরবে
তোমার কবি।

নূতন সুষমা হেরিব, তোমার
উপেক্ষাতে,
করুণা করুণ সঁপিব আমার
শুভেচ্ছাতে!
তোমার কর্ম্মে, তোমার খেলায়,
তোমার খুসিতে, তোমার মেলায়
হেলায় সন্ধ্যা প্রভাত বেলায়
কবিতা, মুখে—
স্মরিবে আমারে, এ কথা জানিয়া
মরিব সুখে।

কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত
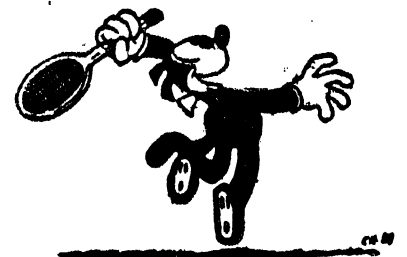
SHYAMA in
TARZAN Ki BETI
Directed by
ROOP K. SHOREY
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আরণ্য চিত্র!
তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখরে জীবন সংশয় যুদ্ধ
কুম্ভীরের সহিত রোমাঞ্চকর সংগ্রাম
দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন
সরল হিন্দি বুঝিতে মোটেই অসুবিধা হয় না
টা র জা ন - কী - বে টী
তৃতীয় সপ্তাহ
নিউ সিনেমায়
তৃতীয় সপ্তাহ

বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের বাঙ্গালাদেশে সঙ্গীতের উন্নতি সাধনকল্পে কয়েকজন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক সঙ্গীতের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁরা যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এর ব্যবস্থা করলেন শেষ পর্য্যন্ত সে আদর্শকে তাঁরা মেনে নিলেন না। বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীযুত কে এম নাহার বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম বাঙ্গলার তরুণ তরুণীরা যাঁরা সত্যই সঙ্গীত কলার চর্চ্চা করে থাকেন তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমাদের এ বিষয়ে নিরাশ হতে হয়েছে। বাঙ্গালার সঙ্গীতের যে এত অধঃপতন হয়েছে তা দেখে সত্যই আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি। এর কারণ কি? কেন ভাল ভাল গায়করা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি? আমাদের যতদূর মনে হয় এর জন্য প্রতিযোগিতার কর্ম্মকর্ত্তারা দায়ী। কারণ যে পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতাটী হয়েছে তাহা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। এত বড় একটা বিরাট প্রতিযোগিতায় যে সকল ব্যক্তিকে বিচারক করা হয়েছে তাঁরা কোন মতেই বিচারকের পদের উপযুক্ত নয়। তবে আমরা গোপেশ্বর বাবু কিম্বা ওস্তাদ মেহেদী হোসেন, ভীষ্মদেব অথবা কাল বাবু কিম্বা নগেন বাবুর কথা বলছি না। আমরা বলছি এমন কয়েকজনের কথা যাদের সঙ্গীত কলা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়। এদের সঙ্গীত বিচারকের পদ দিয়ে এই ফল হয় যে এদের ছাত্র ছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে, প্রতিযোগিতায় কোন না কোন স্থান তারা পাবেই। যে প্রতিযোগিতায় এরকম পক্ষপাতিত্ব অনায়াসে চলে আসে সে প্রতিযোগিতার ফলাফলের উপর সাধারণতঃই যে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই এবং এই কারণেই গত বৎসরের অনেক ভাল ভাল প্রতিযোগিগণ এ বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি।

শ্রীযুত নাহারের উচিৎ ছিল বাঙ্গালার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের অর্থ দিয়ে অথবা বাঙ্গালার বাহিরের যে সকল সঙ্গীতবিদ্ আছেন তাঁদের অর্থ দিয়ে বাঙ্গালায় আনিয়ে প্রতিযোগিতার বিচারক করা এবং তবেই প্রত্যেক প্রতিযোগীর অভিভাবক প্রতিযোগিতার উপর আস্থা রাখবেন এবং এই আস্থা সৃষ্টি না হ'লে প্রতিযোগিতার অথবা বাঙ্গলার সঙ্গীতের উন্নতি কোন দিনই হবে না।

এবারকার প্রতিযোগিতায় রণেন দাস ও কুমারী চিত্রলেখা গাঙ্গুলীর গানই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হয়েছিল। কুমারী চিত্রলেখা গাঙ্গুলীর খেয়াল ও ভজন গানে উচ্চাঙ্গের বিশুদ্ধ পশ্চিমা চালের ঠাঁঠ, রাগের শুদ্ধতা, সুরের বিস্তার ও রকমারী তানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠুংরী ও গজল গানে বাণীর শুদ্ধতা এবং সুরে দরদ, ইহাই ছিল গানের বৈশিষ্ট্য। কুমারী শিউলী সরকারের গলায় মিষ্টতা আছে কিন্তু মনের মধ্যে তার অহমিকা ভাব অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ভবিষ্যতে তার পক্ষে উন্নতি করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। মনিকা বসু রায়, মায়া পাল, গীতারাণী চাটার্জ্জি, আর মাধুরী সরকারকে যদি নিয়মিত শেখান যায় তবে ভবিষ্যতে তারা ভাল গায়িকা হতে পারে।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে যে সকল সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হবে তাতে সত্যকার প্রতিযোগিতা যেন হয়। সঙ্গীতের মহান আদর্শ নিয়ে প্রতিযোগিতা করলে বাঙ্গলার গায়ক গায়িকারা অচিরেই ভারতের অন্যান্য গায়ক গায়িকাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবেন আর বাঙ্গালার এই প্রতিযোগিতা অল্পকালের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্রই আদৃত হবে।
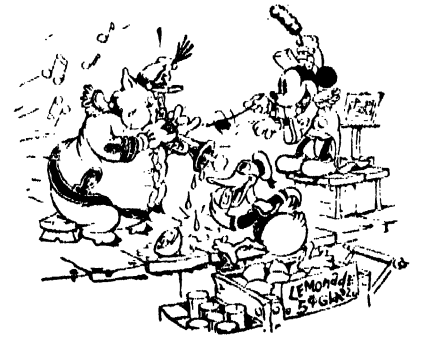
খেয়ালী চিত্রপট ঃ—

উপরে নিউ থিয়েটার্সের ছবি—"দেশের মাটি"-র একটি দৃশ্যে অভিনব ভঙ্গিমায় চন্দ্রাবতী। পরিচালক নীতিন বসু।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১২ই ফাল্গুন ১৩৪৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ } ৮ম সংখ্যা

হরিপুরের পর

"বঙ্গজননীর মানস পুত্র, এই তরুণ বীর তাঁহার ঐকান্তিকতা, অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা ও অপরিসীম কর্ম্মোন্মুখতা লইয়া দেশমাতৃকার পূজার পৌরহিত্য করিবেন—এই আমার অন্তরের বাসনা।" শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এই অননুকরণীয় উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের জাগ্রত জনমতের কর্ম্মক্ষেত্রের পথপ্রদর্শকরূপে সগৌরবে অভিনন্দিত করিতেছি। ভারতের জনগণমন "অধিনায়ক" রূপে সুভাষচন্দ্র আগামী সপ্তাহের প্রারম্ভেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অশান্ত ও উপদ্রুত দেশের সমগ্র দেশবাসী আজ সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মাদর্শের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। শতাব্দীর গৌরব, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীজীর আশীষ-ধন্য সুভাষচন্দ্রের নব কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি স্বীয় প্রদেশে রাষ্ট্রীয় সমিতির পুনর্গঠন ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েসনের সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন। বাংলার সুভাষচন্দ্র আজ সমগ্র ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হইলেও তিনি যে বাংলার সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হন নাই ইহা পরম আনন্দের বিষয়।

বিষ্ণুপুর রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে একা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল ব্যতীত সমবেত সকলেই একবাক্যে সুভাষচন্দ্রকে বাংলার কংগ্রেসী কর্ম্মপন্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে বরণ করিয়াছেন। 'হিন্দুস্থানের'-পক্ষচ্যুত অধুনা শরৎচন্দ্রের স্নেহপুষ্ট ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালকে বিষ্ণুপুর সম্মেলনে যে তীব্র ভৎর্সনা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা হইতে বাংলার কংগ্রেসী কর্ম্মীবৃন্দের মনোভাব প্রকট হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব যে খণ্ডদলের ঊর্দ্ধে তাহা বাংলার সকল উপদলের প্রধানগণ উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কর্ম্মক্ষম ও আদর্শবাদী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা সহজ হইবে। যে সমস্ত উপগ্রহ বাংলার কংগ্রেসী গগনের আশে পাশে বিভ্রান্তভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন তাঁহাদের কঠোর ও নির্ম্মম হস্তে নিষ্পেষণ করিবার সময় কি আজও হয় নাই? সুভাষচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তায় ও বিচক্ষণতায় সকলের আস্থা আছে।

কর্পোরেশনে মিউনিসিপ্যাল এ্যাসো-সিয়েশনের মধু-চক্র ভাঙ্গিয়া গড়িবার আশু প্রয়োজন। আদর্শ-বিহীন, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের স্বার্থসিদ্ধির কর্ম্মকেন্দ্ররূপে কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন কংগ্রেসী আদর্শের বেসাতী করিয়া কংগ্রেসী আদর্শকে কাঞ্চন-মূল্যে বাজারের পণ্যে পরিণত করিয়াছে। চৌরঙ্গীর 'ক্যাসানোভা' যাঁহাদের প্রমোদ-ক্ষেত্র, এটর্নি-পাড়ার অন্ধকূপ যাঁহাদের ষড়যন্ত্র কেন্দ্র, বাজারের বস্তীস্তূপে যাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ তাঁহাদের দৃষ্টি যে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে না তাহা সহজেই অনুমেয়।

যাঁহারা কংগ্রেসের অনুগ্রহে কর্পোরেশনে শ্রেষ্ঠতম পদগুলি অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহারাও আজ কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া পদ ও মর্য্যাদার আত্মসুখে নিমজ্জিত। বিরাট কর্ম্মোদ্দীপনার পর যে গভীর অবসাদ কলিকাতার কর্ম্ম-কেন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহাকে ছিন্ন করিতে হইবে। কলিকাতার কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কর্পো-রেশনের বেতনভুক কর্ম্মচারীবৃন্দের বদ্ধ-মুষ্টি হইতে মুক্ত করিতে হইবে—তাহা না হইলে শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশ গুপ্তের ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির মনোনয়ন লাভ ঘটিবে এবং সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার আবেদন সত্ত্বেও তাঁহাদের ন্যায় কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় ঘটিবে। কলিকাতার জনমত যে কংগ্রেসের নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিবে না ১৯নং ওয়ার্ডের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা নাইডু কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন: "একদিন যিনি সৈনিক বেশে স্বাধীনতার যুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিয়া-ছেন, আজ তিনি সমগ্র দেশের অধিনায়ক হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে নব গৌরবে অভিযান করিতে চলিলেন"—তাঁহার এই কর্ম্মোদ্দীপ্ত অভিযান সফল হউক ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

সারাভারতে বিদ্যাপতি যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কোরেছে, চিত্র-রসিক মহলে সে সংবাদ আজ আর কাহারও অজানা নেই। বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে বাছাই করা ছয়খানি গান এবং নব রচিত ছয়খানি— মোট বারোখানি গান এই চিত্রে সন্নিবেশিত হ'য়েচে। প্রতি নিরপেক্ষ সমালোচক এবং সঙ্গীত রসিক মাত্রেই স্বীকার কোরেছেন— ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে এত উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাংশের নমুনা আর শোনা যায় নি।

বিদ্যাপতির বাঙলা সংস্করণটি ঠিক কোন তারিখে যে চিত্রায় মুক্তিলাভ কোরবে, একথা এখন বলা শক্ত। কারণ "মুক্তি" এখনও অসম্ভব দর্শক আকর্ষণ কোরচে।

* * *

পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের অভিজ্ঞান ক্রমশঃ সমাপ্তি মুখে এগিয়ে আসচে।

যে গৃহ-বধূকে এক সমাজ বিনা অপরাধে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেয়, আর এক সমাজ সেই হতভাগিনীকেই গৃহের বধূ করবার জন্য প্রস্তাব করে! কেন? সন্ধ্যা নিরবশেষ দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার পথ দিয়ে ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় উপনীত হ'য়েছিল, যে অবস্থায় মানুষ জীবনের কোন আকর্ষণ অথবা সমাজের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না, যে অবস্থায় সে সুযোগ পেলে প্রাণত্যাগ কোরতে পারে, প্ররোচনা পেলে কুলত্যাগ পর্য্যন্ত কোরতে পারে।

নিউ থিয়েটার্সের "দেশের মাটি" চিত্রে—চন্দ্রাবতী
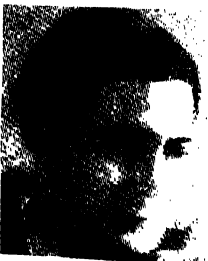
জীবন গাঙ্গুলী

মেনকা

শৈলেন চৌধুরী

শৈলেন পাল

দেববালা

মলিনা

কিন্তু সন্ধ্যা আত্মহত্যা করে নি—সে কোরেছিল আত্মার হত্যা। প্রমথ তাকে উদ্ধার কোরেছিল সত্যি! সমাজের কশাই খানা থেকে উদ্ধার কোরে তার মত একজন অসামাজিকের ঘরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্খায়।

* * *

গত বৃহস্পতিবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী, প্রিন্স আনওয়ারশা রোডস্থ নিউথিয়েটার্সের ৩'নম্বর ষ্টুডিওতে, শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তাঁর নতুন সামাজিক কথা-চিত্রের চিত্র-গ্রহণ আরম্ভ হ'য়েচে। এই চিত্রের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে নিউথিয়েটার্সের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার এবং এই প্রতিষ্ঠানের অপরাপর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন ৩'নম্বর ষ্টুডিওতে উপস্থিত থেকে পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের নূতন ছবির সাফল্য কামনা করেন।

সুন্দর একটি সেটে সেদিন ছবি তোলা হয়। সেটটিতে দেখানো হয় নায়ক নিখিলেশের শোবার ঘর। মার্জ্জিত রুচি, পুরোদস্তুর আধুনিক, সৌখীন একটি ধনী যুবকের শয়ন প্রকোষ্ঠ যেমন হওয়া উচিত—তেমনি আধুনিক কায়দায় সাজানো। এই সেটটির পরিকল্পনা কোরেছেন—শিল্পী অর্জ্জুন রায়।

নিখিলেশের ভূমিকায় হিন্দি ও বাঙলা উভয় সংস্করণে অভিনয় কোরছেন শ্রীযুক্ত বড়ুয়া স্বয়ং। এই দৃশ্যে বস্তিবাসিনী একটি মেয়ের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরছে—শ্রীমতী মেনকা। এই চরিত্রটার নাম—'রাধা'।

নায়ক নিখিলেশের বাগদত্তা ইন্দিরার জীবনে এই মেয়েটি যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, চিত্রিত নাটকে তারই পরিণতি আমরা দেখতে পাব। ইন্দিরা উচ্চশিক্ষিতা, অভিজাত সমাজের মেয়ে। এই চরিত্রে, উভয় সংস্করণে অভিনয় কোরছেন শ্রীমতী যমুনা।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার পরিচালনায় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যবস্থাপনায় এই ছবিখানি যে সকল দিক দিয়েই চিত্র রসিকদের হৃদয় হরণ কোরতে পারবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

এই শনিবার থেকে বাণী ফিল্মসের বহু প্রতীক্ষিত হাসির ছবি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব" 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। ছবির কাহিনীটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইতিপূর্ব্বে এইধরণের রসচিত্র পর্দ্দায় রূপান্তরিত হয়নি। পাঁচ জোড়া প্রেম-পাগল নর-নারী মদনের তাড়নে চঞ্চল হ'য়ে উঠে কিরূপে তাদের মনের-মানুষের সঙ্গে মিলিত হ'ল রঙ্গরসের ভিতর দিয়ে তাই রূপ পেয়েছে অভিনবরূপে। প্রথম জোড়া পাত্র-পাত্রী প্রেমের নাগপাশে বিয়ের ফাঁস কোরে অভিনেত্রী অভিনেতাকে চিরদিনের জন্য আপন জীবনে জড়িয়ে রাখতে চায়। দ্বিতীয় জোড়া পাত্রপাত্রীর পরিচয়—কুমারী ডাক্তার ও তরুণী মিস্ত্রেসে চলে প্রেমের টাগ-অফ্-ওয়ার। শেষে কুমারী ডাক্তারই হয় প্রেমযুদ্ধে জয়ী। তৃতীয় বর-কনে কস্তুরী মৃগের মত আপন আপন গন্ধেই হয়ে ওঠে মাতাল তাদের সেই প্রেম কল্পনার ভাগীদার জোটে আর একজন—কিন্তু শেষ অবধি সে হয় বঞ্চিত। চতুর্থ জোড়া কিশোর কিশোরী নিতান্ত অতর্কিতেই আত্মসমর্পণ করে পরস্পর পরস্পরের কাছে। পঞ্চজোড়া বিয়ের মন্ত্র পড়ে অবৈধ সম্বন্ধকে বৈধ ও শুদ্ধ কোরে নেবার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে জীবন সায়াহ্নে উপনীত প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। এই পাঁচ জোড়া প্রেম পাগল সারাদিন পথে ঘুরে সন্ধ্যায় সন্ধান পায় "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে-র" সেই উৎসবে তারা মেতে ওঠে জীবন তাদের, মিলন তাদের সুন্দর হয়, সার্থক হয়।

এই নতুন ধরণের 'কমেডি' চিত্রখানি পরিচালনা কোরেছেন সর্ব্বজনপরিচিত প্রিয়

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের প্রথম অবদান

অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর শান্ত হইয়াও ছোট ছেলেরা যেমন থাকিয়া থাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠে, তেমনি ছবি দেখিবার সময় হাসির প্রবল বন্যায় বিপর্য্যস্ত হইবার পরও আপনাদের ওষ্ঠাধারে থাকিয়া থাকিয়া হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবে।

হাল-বাঙলা

পরিচালক :
ভি, জি,

ভূমিকায় :
ছায়া দেবী
ধীরেন গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, সত্য মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রিকা দেবী, মহাদেব পাল, নবদ্বীপ হালদার, মৃণাল ঘোষ, প্রভাত সিংহ, সন্তোষ সিংহ, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ষ্টুডিওর
বি, এল, খেমকার
প্রযোজনায় গৃহীত

মানুষের
সহজ হইবার
অক্ষমতার মাঝে
যে প্রবল হাসির
উপাদান আছে,
সেই হাসির রূপে
যে প্রশ্ন গোপন থাকে
হাল-বাঙলা
কথা-চিত্রটী
তাহারই
সুস্পষ্ট উত্তর

রূপবাণীতে আগতপ্রায়

*

চিত্র পরিবেশক
এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রীবিউটার্স

*

পরিচালক সতু সেন। চিত্র-শিল্পী হিসেবে যিনি কাজ কোরেছেন তাঁর কাজের পরিচয় চিত্রামোদীরা সবাই পেয়েছেন। ছবির কথা ধরেছেন জনপ্রিয় তরুণ শব্দযন্ত্রী জগদীশ বসু। শিল্প নির্দ্দেশনা কোরেছেন পরেশ বসু। ছবিখানার তত্ত্বাবধায়করূপে সতীশ সরকার কাজ কোরেছেন। ছবিখানার চরিত্র নির্ব্বাচনও বিশেষ আকর্ষণীয়। আমরা ছবিখানার চরিত্র-লিপি সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে দিলাম—

প্রাণধন—জীবন গাঙ্গুলী, মথুর—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, মিঃ চৌধুরী—ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, ফেলারাম—মণি সেন, বিমল—জহর গাঙ্গুলী, বামাপদ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, হারু—লতা মুখার্জ্জি, মহেন্দ্র—সন্তোষ সিং, খগেন—নবদ্বীপ হালদার, প্রমথ—ললিত মিত্র, হাবুল—হরিধন মুখার্জ্জি, যতীন—গঙ্গেশ মজুমদার, কানাই—বেচু সিংহ, বারেন—সন্তোষ ঘোষাল, গোরা—দেবীতোষ রায়-চৌধুরী, জনার্দ্দন—উপেন ভট্টাচার্য্য, রামা—যতীন দাস, চামেলী—রাণীবালা, মিস্ শেফালি—উষা দেবী, মিস্ বনলতা—বীনাপাণি, শ্রীমতী—সাবিত্রী, কমলা—লক্ষ্মী, আন্নাকালী—হরিসুন্দরী (ব্লাকী) নৃত্যকালী—পদ্মাবতী, হেমাঙ্গিনী—সুহাসিনী।

প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড

বাঙলা দেশে চিত্র-পরিবেশকদের মধ্যে আজ প্রাইমা ফিল্মস্-এর খ্যাতি অতি অল্প দিনের মধ্যে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েচে। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে সহযোগ ঘটায়, চিত্র-প্রদর্শক মহলে প্রাইমা ফিল্মস্-এর চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েচে। এরা বাঙলা দেশে নিউ থিয়েটার্সের অনেকগুলি ছবির পরিবেশনার ভার পেয়েছেন এ ছাড়া রাধা ফিল্মস এবং দেবদত্ত ফিল্মস-এর অনেকগুলি বিখ্যাত ছবির ডিষ্ট্রিবিউশনের অধিকারও পেয়েছেন।

ছায়া-চিত্রের ডিষ্ট্রিবিউশনের ব্যবসায় এদের উদ্যম, আন্তরিকতা ও সততা বিশেষ প্রশংসনীয়। এত অল্পদিনে, বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিবেশক নামে পরিচিত হ'বার সৌভাগ্য লাভ কোরেছেন এরা এই সব গুণের জন্যেই। আমরা প্রাইমা ফিল্মস্-এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এই সাফল্যের জন্য আমরা এই বিভাগের কর্ম্মসচীব শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্ম দক্ষতার প্রশংসা করি।

হাল-বাঙলা

সুপরিচিত পরিচালক ডি, জি, পূর্ণোদ্যমে "হাল-বাংলা"র শুটিং চালাচ্ছেন। যেরূপ বিরাম-হীন প্রযত্নে ধীরেনবাবু "হাল-বাংলা" পরিচালনা করছেন তাতে মনে হয় মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি "হাল-বাংলা" রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। আধুনিক বাংলার আলেখ্য হাস্যে ও লাস্যে পরিস্ফুট করে যে রূপ ও রস পরিবেশন করতে ডি' জি যেরূপ উদ্যোগী হয়েচেন তাতে মনে হয় তাঁর নবতম উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হ'বে।

গত মঙ্গলবার বাংলার অর্থসচীব মাননীয় নলিনীরঞ্জন সরকারের "রঞ্জনী"তে 'হাল বাংলা'র এক বিরাট চা-চক্রের শুটিং হয়। শ্রীমান সুধীর সরকারকে কেন্দ্র করে ছায়া দেবী ও আশারাণী প্রভৃতি বহু মহিলা আর্টিষ্টদের সম্মেলনে চা-চক্রের আসর বসে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত হয়। শ্রীমান সুধীর মধুর আবেষ্টনীর মধ্যে মনোরম অভিনয় কোরেচেন বলে প্রকাশ। তৎপরে লেক রোডে মিঃ পি, সি, গাঙ্গুলীর বাটীতে ব্রাহ্ম-সমাজের একটী দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। পরিশ্রান্ত ডি, জি বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত শুটিং চালান।

'এক যুবতী এতেক পতি ভাব কেমনে রাখে'—এই শাস্ত্র বাক্য একটু বিকৃত করে বন্ধুবর শ্রীমান্ সুধীর সরকারের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পক্ক-কেশ ডি, জি থেকে আরম্ভ কোরে যৌবন-চঞ্চল বড়ুয়া ও স্থীর-বুদ্ধি ও বদ্ধ-মুষ্টি ছোটাই মিত্তির মশাইকে পর্য্যন্ত একই বন্ধুত্ব সূত্রে যিনি আবদ্ধ করতে সক্ষম সেই করিৎকর্ম্মা সুধীর সরকারের হাল-বাংলার অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষপ্রবর নলিনী-রঞ্জনের 'রঞ্জনী' গৃহে অভিনয় সঙ্গতই হয়েচে!

হাজরা পিকচার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভক্তি মূলক বাণী-চিত্র 'দেবী ফুল্লরা'র শুটিং প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়াছে। এই সপ্তাহ হইতে এই ছবির বাকি অংশের চিত্র গ্রহণ
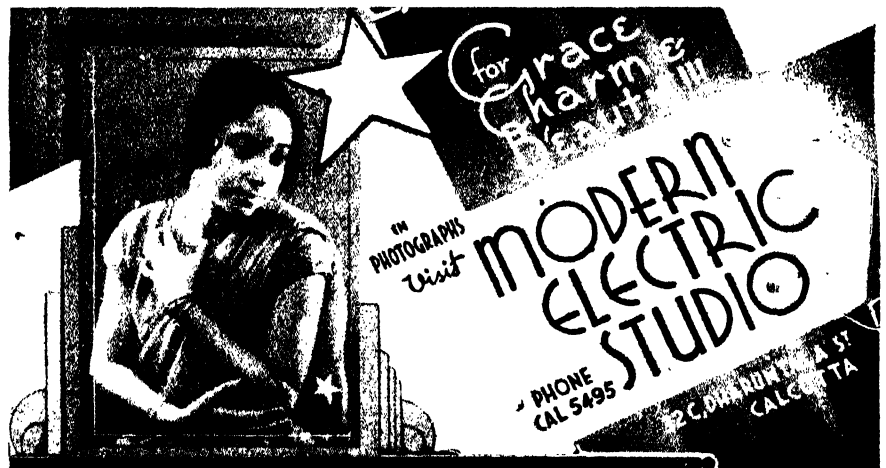
SHYAMA in
TARZAN
BETI
Directed by
ROOP K. SHOREY
সম্পূণ নূতন ধরণের আরণ্য চিত্র!
তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখরে জীবন সংশয় যুদ্ধ
কুম্ভীরের সহিত রোমাঞ্চকর সংগ্রাম
দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন
সরল হিন্দি বুঝিতে মোটেই অসুবিধা হয় না
টারজান-কী-বেটী
চতুর্থ সপ্তাহ
নিউ সিনেমায়
চতুর্থ সপ্তাহ

কার্য্য চলিয়াছে। এই দৃশ্যটি খুব চাঞ্চল্যকর করিবার জন্য প্রবীণ পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়েছেন।

মতিমহল থিয়েটার্স

এদের রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে "বেকার নাশনে-র" শুটিং শীঘ্রই সুরু হবে। এছাড়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এদের "খনা-র" কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

প্রফুল্ল পিক্‌চার্স

এদের প্রথম বাংলা ছবি "সখের শ্রমিকে-র" এখন সম্পাদনা চলছে। আগামী ১৯শে মার্চ্চ ছবিখানা 'শ্রীতে', মুক্তিলাভ কোরবে আশা করা যায়।

পূর্ণথিয়েটার

রাধার পৌরাণিক চিত্র "প্রভাস-মিলন" এখানে চলিতেছে। তাছাড়া, শিবরাত্রি উপলক্ষে যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে তাও খুবই উপভোগ্য হবে বলা যেতে পারে। নিউ-থিয়েটার্সের দিদি, দেবদাস, মীরাবাঈ ভাগ্যচক্র—ঐ দিন দেখান হবে।

নূতন কাগজ

আমরা শুনিয়া খুশি হইলাম যে সামনের বৈশাখে কবি প্রভাত কিরণ বসুর ছেলেমেয়েদের জন্য একটা নূতন মাসিক বাহির করিতেছেন। গদ্যে ও পদ্যে কর ও রঙ্গরসে আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জনের ক্ষমতা প্রভাতকিরণের লেখনীতে আছে, এই কারণেই আমরা যথেষ্ট আশান্বিত হইয়া ভাবিতেছি যে অতঃপর ৭নং রাজা-বাগান ষ্ট্রীটে ভাবী সম্পাদকের গৃহে শিশুদের ভিড় ঠেকাইবে কে?

শ্রীযুক্ত অবনী চট্টোপাধ্যায়

রাধা ফিল্মের ভূতপূর্ব্ব শব্দযন্ত্রী অবনী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পাওনিয়ার ষ্টুডিওতে প্রধান শব্দযন্ত্রীরূপে যোগদান করিয়াছেন।

বসু ব্রাদার্স এণ্ড কোং

সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠানটি তাহাদের অফিস গৃহ ১৪।২ ওল্ড চিনাবাজার ষ্ট্রীটে, (১২২নং রুম) স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

সঙ্গীত প্রতিযোগীতার প্রহসন

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

আপনার গত সপ্তাহের খেয়ালীতে "Bengal Music Association" সম্বন্ধে লিখিত বিষয়টি পড়িলাম! সত্য কথা—এ বছর উক্ত সমিতির সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় কলিকাতার বিশিষ্ট গায়ক গায়িকারা যোগদান করেন নাই। তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। গত বৎসর যে কয়টি প্রতিষ্ঠান উক্ত Association এর প্রতিযোগীতায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল "স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ ফাইন্ আর্টস্ সোসাইটি" তাহাদের অন্যতম। এখান হইতে যে কয়জন ছাত্রছাত্রী গত বৎসরের প্রতিযোগীতায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় উক্ত এসো-সিয়েশনের পুরস্কার বিতরণী সভায় ইহারা কেহই নিমন্ত্রিত হ'ন নাই। ইঁহাদের কৃতিত্বের পুরস্কারগুলি বহুদিন ধরিয়া এ্যাসোসিয়েশনের আলমারীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। এখনও কিছু কিছু করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াও সে-গুলি কলেজে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা যায় নাই। অথচ কর্ত্তৃপক্ষের নিজেদেরই উচিৎ ছিল সেগুলি সময় মত prize winnersদের পাঠাইয়া দেওয়া। এই সব কারণে এ বছর এখানকার কাহারও

প্রতিযোগীতায় নাম দেওয়া হয় নাই। অথচ Mr. K. S. Nahar অনেকের নিকটই বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে ফাইন আর্টস্ সোসাইটি, বাসন্তী বিদ্যাবিথী ও আরও দুই একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের entry তাঁহারা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্য প্রতিষ্ঠান গুলির কথা জানি না তবে স্কটিশ চার্চ কলেজ ফাইন আর্টস্ সোসাইটির ছাত্রছাত্রীরা গত বৎসরের ঐরূপ ঘটনার পরে বেঙ্গল মিউজিক এ্যাসোসিয়েশনের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করেন না। এ বৎসর নৃত্য প্রতিযোগীতার প্রথম দিন যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার জন্য মূলতঃ দায়ী কে—তাহা Mr. K. S. Nahar নিজেই বোধহয় জানেন। সাধারণের ব্যাপারে যে, মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করা দরকার এবং এ্যাসোসিয়েশন কাহারও personal property নয় তাহা স্মরণ রাখা উচিত। ইতি—

নিশীথ ভট্টাচার্য্য বি, এ।

চেয়ারম্যান, স্কটিশ চার্চ কলেজ ফাইন্ আর্টস্ সোসাইটি।

ভারতী মন্দিরে জলসা

গত শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় ভারতী মন্দিরের (ভবানীপুর সঙ্গীত শিক্ষায়তনের) শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়। সভায় ওস্তাদ খাঁ সাহেব (বাল্লু খাঁ) প্রমুখ বহুগুণীগণের সমাবেশ হয়। প্রথমে ভারতী মন্দিরের সম্পাদক শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ উক্ত ভারতী মন্দিরের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সভাস্থ সকলকে ভবানীপুর অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে উক্ত শিক্ষায়তনের অন্যতম ছাত্রী কুমারী অন্নপূর্ণা দেবী একখানি ভজন, একখানি ভাটিয়ালী ও আর একখানি আধুনিক বাঙ্গলা গান গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন তাঁহার গান সুরুচি সম্পন্ন ও উপভোগ্য হইয়াছিল। ইহার পর প্রোফেসর শ্রীকুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী বাবু ধ্রুপদ গান করেন এবং তাঁহাদের সহিত সঙ্গত করেন প্রোঃ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিত বাবু। শৈলেন বাবুর পাখোয়াজ সঙ্গত প্রকৃত উল্লেখ যোগ্য। তৎপরে প্রফেসর শ্রীরাধিকা মোহন মৈত্র মহাশয়ের সরদ উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। এবং তাঁহার বাজনায় সুমিষ্ট রস সঞ্চারের কথা রসিক সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। সর্ব্বশেষে মণ্টু বাবুর হারমোনিয়াম বাজনা হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে উক্ত সভা ভঙ্গ হয় এবং সম্পাদক মহাশয় সভাস্থ সকলকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কবিতা ও ছোটগল্প প্রতিযোগীতার ফলাফল

বহিরগাছি পল্লী মঙ্গল পাঠাগার হইতে কবিতা ও ছোটগল্প প্রতিযোগিতা শীর্ষক যে সংবাদ গত বর্ষের ৪৭ সংখ্যা সাপ্তাহিক খেয়ালেতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাংলা ও বাংলার বাহির দিল্লী, নাগপুর, বেনারস, পাটনা, গৌহাটী, রেঙ্গুণ প্রভৃতি স্থান হইতে ১১৮টী কবিতা ও ৪৩টী ছোট গল্প প্রতিযোগীতার জন্য পাইয়াছিলাম। আমাদের নির্ব্বাচিত বিচারকের বিচারের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কবিতা—১মঃ—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী।
২য়ঃ—শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ।

ছোটগল্প—১মঃ—শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বসু এম-এ, বি-এল।
২য়ঃ—শ্রীমতী পুষ্প বসু।

যে সমস্ত প্রতিযোগী রচনার সহিত ডাক টিকিট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের রচনা মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেরিত হইবে।

শ্রীসারনাথ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

সবেরে তোর খেলা সুরু
কেন মিছে তুই কাঁদিস—
সুমুখে তোর বিজন মরু
সেটা কিরে তুই ভাবিস?—

ন

(সি, বি)

এ বৎসর হকি খেলার মরশুম খুবই উত্তেজনার মধ্যে সুরু হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখিতে খুবই তৎপর। তাছাড়া প্রত্যেক দলেই খেলোয়াড় নূতন নূতন আমদানী করা হইয়াছে, এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি খেলার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। কাষ্টমস, রেঞ্জার্স, মোহনবাগান এ কয়টি দলের মধ্যেই 'চ্যাম্পিয়নশীপ' হ'বার জন্য জোর প্রতিযোগিতা চলিবে আশা করা যায়।

ইষ্টবেঙ্গল বনাম ক্যালকাটা

গত মঙ্গলবার ক্যালকাটা মাঠে ইষ্টবেঙ্গল দল ও ক্যালকাটার সহিত যে খেলাটী সেটী অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে।

এই খেলায় উভয় দলের জয় পরাজয় নিষ্পত্তি হয় নাই। তাহার কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আক্রমণভাগে খেলোয়াড়দের দক্ষতার অভাব। গোল করিবার সহজ সুযোগ পাইয়াও তাহারা গোল করিতে পারে নাই।

এই দিনকার খেলায় উভয় দলের ব্যাকে যামিনী ব্যানার্জ্জি ও হজেস প্রায় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের তাহাদের অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রথমার্দ্ধে লাফিক ও রসিদ দুইবার গোল করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পের জন্য বল গোলের পাশ দিয়া চলিয়া যায়। ক্যালকাটা দলের স্কটের একটী গোল করিবার চেষ্টা যামিনী ব্যানার্জ্জি ব্যর্থ করেন। প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে বিটি একটী গোল করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম দশ মিনিট ইষ্টবেঙ্গল দল ভীষণ চাপিয়া ধরে। শেষের দিকে ক্যালকাটা ভাল খেলিলেও তাহাদের পক্ষে গোল করা সম্ভবপর হয় নাই।

ক্যালকাটা :—পেইন ; হজেস এবং পেণ্ডারগাষ্ট ; টব্রিকেন, লংফোর্ড এবং এনসন ; পেক, কনোলী, স্কট, বিটী এবং পিক।

ইষ্টবেঙ্গল :—এস বসু ; এইচ দে এবং যামিনী ব্যানার্জ্জি ; জ্যোতিষ মহলানবিশ, এস চক্রবর্ত্তী এবং এইচ সুর ; আর ঘোষ, লাফিক, সিদ্দিক, জোসেন, রসিদ এবং নিতাই।

আম্পায়ারদ্বয় :—এ ক্রেমস এবং এন দাস।

সেণ্ট জোসেফ বনাম পুলিশ

কাষ্টমস মাঠে গত মঙ্গলবার পুলিশ এথলেটিক ক্লাব এবং সেণ্ট জোসেফ দলের খেলা হয়। পুলিশ দল ১—০ গোলে জয়লাভ করে। খেলাটিকে কোন মতেই উচ্চাঙ্গের বলা যাইতে পারে না।

সেণ্ট জোসেফ দলের খেলায় তাহাদের পূর্ব্ব খ্যাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুলিশ দল প্রথমার্দ্ধে অধিকাংশ সময় আক্রমণ করিয়া খেলে এবং সেই কারণে ঐ সময়ে তাহাদের এক গোলে অগ্রগামী থাকা অসঙ্গত হয় নাই। কার্ভে ব্যতীত পুলিশ দলের আক্রমণ ভাগে কেহই ভাল খেলিতে পারেন নাই

মিলিটারী মেডিকেল বনাম মহমেডান

গত মঙ্গলবার মোহনবাগান মাঠে

মহমেডান স্পোর্টিং এবং মিলিটারী মেডিকেল দলের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। কোন দলই গোল করিতে পারে নাই। প্রথমার্দ্ধে খেলাটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হইতে থাকে। দুই দলই আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণ করিতে থাকে এবং উভয় পক্ষই গোল করিবার অনেকগুলি সুযোগ নষ্ট করে। দুই পক্ষের গোল রক্ষককে খুবই ব্যস্ত থাকিতে হয়, কারণ রক্ষণভাগ অপেক্ষা আক্রমণ ভাগই অধিকতর শক্তির এবং নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিল।

ড্যালহৌসী বনাম বি জি প্রেস

মঙ্গলবার ডালহৌসী দল নিজ মাঠে খেলিয়া বি জি প্রেসের নিকট ৪—০ গোলে পরাজিত হইয়াছে। বি জি প্রেস এই খেলায় জয়লাভ করিলেও খেলাটী মোটেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই। প্রেস দল প্রথমার্দ্ধে মোটেই একতাবদ্ধ হইয়া খেলিতে পারে নাই। তাঁহারা দ্বিতীয়ার্দ্ধে খেলার উন্নতি করে এবং ফলস্বরূপ তিনটি গোল করিতে সমর্থ হয়। ডালহৌসী কোন সময়ই ভাল খেলিতে পারে নাই।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতা

ব্র্যাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা হায়দ্রাবাদ দলের সহিত নবনগর দলের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। নবনগর দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ১৫২ রাণে ইনিংস শেষ করে। ভিনু মানকদ, কোলা ও রণবীর সিং ব্যাটিংয়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। হায়দরাবাদ দলের হায়দার আলী বোলিংএ সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

হায়দরাবাদ দল পরে ব্যাট করে ও ১১৩ রাণে সকলে আউট হইয়া যান। সুটে ব্যানার্জ্জি ৩৪রাণে ৪টি উইকেট পাইয়াছেন।

নিম্নে খেলার ফলাফল দেওয়া হইল।

নবনগর প্রথম ইনিংস

রণবীর সিং ব ভাজুবা	২৮
মানকদ ক মাচি ব হায়দার আলী	১
কোলা ক ও ব হায়দার আলী	১
যাদবেন্দ্র সিং ক মেটা ব হায়দার আলী	৭
ইন্দ্রবিজয় সিং ব মেটা	৫
ওয়েন্সা ক আসাদুল্লা ব মেটা	১৫
অমর সিং ব ইব্রাহিম খাঁ	২১
মার্শাল ব ইব্রাহিম খাঁ	৩৬
ব্যানার্জ্জী নট আউট	২১
আজ্জি ক আসাদুল্লা ব হায়দার আলি	৫
অতিরিক্ত	৮
মোট	১৫২

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংস

আসাদুল্লা ব ব্যানার্জ্জি	১
মেটা ব ব্যানার্জ্জি	০
টার্কী ব ব্যানার্জ্জি	৬
ইসাক আমেদ ব মুবারক আলী	৫
হোসেন ষ্ট্যাম্পড আজিজ ব ওয়েন্সা	৩৬
হায়দর আলী ব ওয়েন্সা	২৭
এস, হাদি এল, বি, ডবলিউ ব মানকদ	১
আইবরা ব ব্যানার্জ্জি	৫
ভজুবা ব মুবারক আলী	১৬
ইব্রাহিম খাঁ নট আউট	০
মাচি রাণ আউট	০
অতিরিক্ত	৬
মোট	১১৩

মিত্র ইনষ্টিটিউসন-এর বাৎসরিক স্পোর্টস

গত মঙ্গলবার সকালে ইবি আর ম্যানসন মাঠে মিত্র ইনিষ্টিটিউসনের বার্ষিক স্পোর্টস বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

এইদিনকার অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল শিক্ষক বনাম ছাত্রদের দড়ি টানা-টানি বিষয়টী। কিন্তু ছাত্রের দলকে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। ছাত্রের দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতি মহাশয় এবং শিক্ষকগণের পক্ষে নেতা ছিলেন উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।

এইদিনকার প্রতিযোগিতাটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রগণের সবেত চেষ্টায় এবং তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন স্কুলের ক্রীড়াশিক্ষক মিঃ এন কে ঘোষ।

প্রতিযোগিতার শেষে মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কৃতি প্রতিযোগিগণকে পুরস্কার প্রদান করেন।

———

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

উত্তর দিলেন জগত্তারিণীই। তিনি জামাইএর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "আমার যাবার কথা হচ্ছে, নীরদ।"

—আপনার যাবার কথা? কোথায়?

—বলি, এসেছি হ'ল আজ সোমে সোমে আট দিন। এর ভেতরে ললিতার তো অসুখ দেখতে পাই সেই একই রকমের। আমি থেকেও তো তার কিছু করতে পারছি নে। তাই ভাবচি, নাহয় এখনই যাই! এই বৃহস্পতিবার হলো শিবচতুর্দ্দশী। সে দিনটা কাশীতে থাকবো না?"

—মা? আপনার যে কোন্‌দিন শিবচতুর্দ্দশী নেই, তা বুঝতে পারিনে। আজ শিবচতুর্দ্দশী, কাল অন্নকূট···এই নিয়েই ত আপনি আছেন। কিন্তু আমরা যে যাই! আপনার অবর্ত্তমানে,—

—নীরদ? কারুর জন্যেই কারুর আটকায় না। ওটা তুমি ভুল বলছো সবই ঠিক সমানভাবে চলে যাবে·· মাঝ থেকে—"

নীরদ বাধা দিয়া বলিল: মা: সবই ঠিক সমান চলে যায় সত্যি···কিন্তু জীবনটা ত শুধু কোনও রকমে চলে যাবার জন্যে নয়! এই যে আপনার এত আদুরে মেয়ে ললিতা আজ ছ'মাস হ'ল ভুগচে,—তা'তে চলে আমাদের ঠিকই যাচ্ছে,—কিন্তু সেটা যে কিরকম চলা, এবং সে চলার যে কত মূল্য, এবং সে চলা যে আমাদের কোনখানে নিয়ে গিয়ে ফেলবে,—তা অঙ্ক কষে ঠিক করে বলা বড়ই কঠিন! আপনি আছেন ব'লে তবু ললিতা আজকাল ওষুধপত্তরগুলো খাচ্ছে, আপনি চলে গেলে তো সে একেবারে হাঁসপাতাল ফেরত্ত রুগী হয়ে দাঁড়াবে।

বলিয়াই নীরদ বক্রদৃষ্টিতে একবার ললিতার দিকে চাহিয়া লইল। ললিতা কিন্তু স্থির নেত্রে সমুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

জগত্তারিণী বলিলেন: তা তোমরা যা বলো!"

ললিতা বলিল: তুমি যখন গোঁ ধরেছো মা, তখন তো নিজে যাবেই! তুমি সংসারের সব মায়া কাটিয়েছো, আর জড়াতে চাও না! আমি হাজার চেষ্টা করলেও তুমি আর ধরা দেবে না। এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তাই সেদিকে আর বেশী উঠে পড়ে লাগবো না। তার চেয়ে বরং এসো আমরা একটা সন্ধি করে নি। তুমি কাশী যাও, আমরা আপত্তি করবো না। কিন্তু সবজকে তুমি আমাদের কাছে রেখে যাও।"

-সবজকে রেখে যেতে বলছো? আমার সেখানে সেবা শুশ্রূষা কে করবে?

—তুমি একটা সেবা করবার লোক সেখানে রেখে নিও। কাশীর মত জায়গায় কিছুরই অপ্রতুল নেই।

—তবে তাই করো! সবজ থাক্!

—খোকাটা সবজর এত ন্যাওটা হয়ে পড়েছে, তাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটা নিষ্ঠুরতার কাজ হবে। তার ওপর, আমাকেও তো ডাক্তার এখনও ছাড়পত্র দেন নি। রোগের চেয়ে ডাক্তারই এখন আমার বড় রোগ। তার ওপর যে সিভিল সার্জ্জন বাড়ীতে অনবরত আমার ওপর পাহারা দিচ্ছে,—

বলিয়াই ললিতা বক্রনেত্রে একবার নীরদের দিকে চাহিয়া, তাহাকে বাক্যবাণের শূল ফুটাইয়া দিল। নীরদ কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। সে দেখিতেছিল, ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়ায়।

ললিতা বলিয়া যাইতে লাগিল: এই সিভিল সার্জ্জন আর অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনদের ব্যবস্থার জোরে আমি সত্যি সত্যি এখন রুগী হয়ে দাঁড়িয়েছি—যদিও রোগের একবিন্দুও আর আমার শরীরে উপস্থিত নেই।

নীরদ আর থাকিতে পারিল না; তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল:—না! রোগ ওর একবিন্দুও নেই, শুধু থার্ম্মোমিটরটা শত্রুতা ক'রে রোজ নিরানব্বই একশো ক'রে জ্বর দেখায়! আর খুকখুকে কাশীটা যাবার আর জায়গা নেই বলে ওর গলায় বাসা বেঁধে আছে।

ললিতা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল: তা যাই হোক্! রোগ থাকুক আর না থাকুক, আমি এখন রুগী। বুঝলে মা! একথা অস্বীকার করলে আমার আর ধড়ে প্রাণ থাকবে না। এরা চটকে চটকে প্রাণটাকে বার করে নেবে। সমস্ত দিনরাত এই খাটটিতে শুয়ে থাকি, এই হয়েছে এখন এদের চিকিৎসা! কাজেই আমার সংসারটিকে আমার দেখবার আর কোনও উপায়ই নেই! চিকিৎসার জোরে আমাকে থাকতে হবে সেবা খাবার হলের ভেতর!

মা বলিলেন: তা বাপু অসুখ হ'লে সেবা খায়না তো কি আর কুস্তি ক'রে বেড়ায়?

নীরদ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল: বলুন তো মা বলুন তো, এই নিয়ে আমার সঙ্গে দিনরাত খুঁটিনাটি!"

ললিতা বলিল: বেশ তো, শুয়ে শুয়ে খেতে পেলে কে আর খাটতে চায়? বাঙালীর ঘরে জন্ম আমার,—এটুকু আর বুঝিনে! কিন্তু ছেলেটিকে দেখবারও একটি লোক চাই,—আর স্বামী নামক গৃহ দেবতাটিকেও দুইবেলা পূজার্চ্চনা করবার একজন বাঁধা পুরোহিত চাই!' এ দুটো কাজ করে কে বলো?

নীরদ ললিতার প্রচ্ছন্ন-শ্লেষাত্মক কথা শুনিয়া একটা উত্তর দিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিল। কাজেই হাসিয়া বলিল: তবু ভাল! তুমি যে স্বামীকে গৃহদেবতার সহিত তুলনা করলে এতে নিজেকেই তুমি সম্মানিত করলে! স্বামীকে গৃহপালিত পশুর সঙ্গে তুলনা ক'রে নিজেকে যে বাড়ীর গোয়ালিনী ব'লে জাহির করো নি, এতে তোমার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে!"

জগত্তারিণী এ সকল কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন: বেশ তো! সবজ না হয় থাক্। আমি কাশীতে একজন রাঁধুনি বামনি দেখে নোবো! তোমার অসুখের সময় এটুকু উপকার আর আমি করতে পার্ব্বো না?"

ললিতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল: "না মা! ঐটুকু ভুলে যাও! আমার অসুখের সময় তুমি উপকার কচ্ছ এ কথাটা তুমি মনে করো না। বরং মনে করো তোমার জামাইএর উন্মাদ লক্ষণের সময় এই চিকিৎসাটা তুমি করছো!"

জগত্তারিণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন: নে বাপু! তোর সঙ্গে আমি কথায় পেরে উঠবো না! তাহ'লে ঐ কথা ঠিক রইলো নলি, কাল সকালের গাড়ীতে আমি জগুদা'র সঙ্গে কাশী চলে যাবো!' আজ সব গুছিয়ে নি।"

—যা বোঝো করো! কিন্তু সবজকে রেখে যাওয়া চাই-ই! তা না হ'লে আমি

অমিত দেবের অপমৃত্যু

(গল্প)

শ্রীসুদর্শন দেবশর্ম্মা

রঙিন খামের ভিতর করে এল নিমন্ত্রণ পত্র। শুভ বিবাহ নয়, অন্নপ্রাশন ও নয়, সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশন।

আমি সাহিত্যিক নই, সাহিত্য-রসিক এবং নগণ্য। সাহিত্য-চর্চ্চা আমার পেশা নয়, নিছক নেশা। সেই সূত্র ধরে সর্ব্বসভা থেকে আসে উপস্থিতির অনুরোধ-পত্র। আজকের নিমন্ত্রণ পত্র যে দলের, বন্ধু-শ্রেষ্ঠ নিরাপদ সেখানকার প্রধান পাণ্ডা।

তাই, মামুলী প্রথা মত কার্ড ত এসেছেই, উপরন্তু এসেছে একখানা চিরকুট। বন্ধুবর জানিয়েছেন—সেইদিনের অন্যতম আকর্ষণ হবে 'সাহিত্যে সত্যের পরিমান' সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা। অতএব আমি যেন ওই-দিন যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়ে আসি। বন্ধুবর তার্কিক-তালিকায় আমাকে জুড়ে দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * *

যথাদিনে উৎসবে উপস্থিত হলুম। নিরাপদ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে নিচুগলায় জিজ্ঞাসা করলে— 'এনেছিস্?'

—কী?'—অপ্রতিভের মত বললুম।

—'যা লিখে জানিয়েছিলুম, মনে নেই?'

এতোক্ষণে বোধগম্য হল নিরাপদর কথার বিষয়বস্তু। বললুম—'কিছু লিখেতো আনিনি, একটু দেখে শুনে এসেছি। এখন, বাগদেবীর দয়ায় বাক্‌যন্ত্রটা যদি ঠিকমত চলে তবেই।

'মাভৈঃ'—নিরাপদ আমার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়ে বললে 'উৎরে যাবি। আয়, ভেতরে আসবি আয়'—বলে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

প্রকাণ্ড হল। দূরে কার্পেট পাতা প্লাট-ফর্ম্মের উপর সভাপতির নির্দ্দিষ্ট আসন। নীচে সভ্য ও আগন্তুকদের জন্য সারিভাবে চেয়ার সাজানো।

আমাকে কোণের দিকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিরাপদ চলে গেল। তখনো সভাপতি আসেন নি। সভ্যদেরও অনেকের আসতে বাকী আছে। চুপটী করে বসে আছি। ভাবছি, আসন্ন আলোচনা—ওরফে তর্কযুদ্ধের কথা—বক্তব্যের ভাষাটা যেন ভদ্রগত হয়।

এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে আমার পাশের চেয়ারে বসলেন—আমারি সমবয়সী। সুন্দর চেহারা—হাবভাবে কবি বলেই মনে হ'ল। আজানুলম্বিত ঢিলাহাতা পাঞ্জাবী, একমাথা কালো ও কোঁকড়ানো উস্কোখুস্কো চুল, রিমলেশ চশমা আর শান্ত-উদাস দৃষ্টি যেন

দিনরাত কিছুতেই শুয়ে থাকতে পার্ব্বো না। বাপরে! এই চৈত্র মাসের দুপুর বেলা! একা খাটে শুয়ে কখনও কাটানো যায়? ওর কি? উনি আদালতে গিয়ে কোম্পানির চেয়ারে ঠ্যাং মেলিয়ে বসে বেশ টানাপাখার হাওয়া খাবেন! আর মরতে মরবো আমি এইখানে, নীরব সমাধির মধ্যে!'

(ক্রমশঃ)

ওর কবিজীবনের পুরোদস্তুর লৌকিক নিদর্শন। হাতে একখানি বই। তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলুম, বইখানি রবিন্দ্রনাথের 'বাঁশরী।'

* * *

নিরাপদ এল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমাদের দুজনের সামনে বসল। আমাকে বললে—'একে চিনতে পেরেছিস ?'

বললুম—'না, কক্ষণো দেখিনিতো কোন সভায়!'

'ইনি-ই অমিত দেব—যশস্বী সাহিত্যিক ?'

—'ওঃ'—তাঁর দিকে ফিরে হাতজোড় করে—নমস্কারান্তে বললুম—'আপনিই—?'

—'আজ্ঞে, নমস্কার! আপনাকেতো—'

নিরাপদ আমার পরিচয় দিলে—'ইনি আমার পরম বন্ধুবর সুদর্শন দেবশর্ম্মা। সাহিত্যিক সমাজে সুরসিক বলে খ্যাতি আছে।'

'আপনার নাম ইতিপূর্ব্বে শুনেচি'—অমিত দেব স্মিতহাস্যে বললেন—'তবে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে ওঠেনি। সভা-সমিতিতে বড়ো একটা যোগ দিই না। অনেকে তার জন্য আত্মাভিমানী, অহঙ্কারী ইত্যাদি ভারী ভারী বিশেষণগুলো আমার ওপর প্রয়োগ করেন। কিন্তু আমি নাচার। ঘরের বাইরে আসতে আমার ভালো লাগেনা।—' হঠাৎ কী মনে করে চুপ করলেন।

নতুন কথা—ঘরের বাইরে আসতে ভালো লাগেনা! আশ্চর্য্য মানুষ! আমি চুপটী করে বসে আছি। নিরাপদ 'আসছি' বলে উঠে চলে গেল। ওধারে অন্যান্য সভ্যরা পরস্পর পরিচয়-পর্ব্বটা সেরে নিচ্ছে এই ফাকে। অমিত দেব নীরব। কী যেন ভাবছেন এবং গম্ভীরভাবে।

এমন সময় নিরাপদ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। সঙ্গে জন পাঁচেক যুবক। সোজা অমিত বাবুর কাছে গিয়ে তাঁর হাতদুটী ধরল বিনীত ভাবে বলল 'অমিত বাবু আসুন।'

আমরা দুজনে চমকে উঠলুম। অমিত বাবু নিরাপদর মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বললেন—'কোথায় যাবো ?'

নিরাপদ তাঁর হাতদুটো অধিকতরো জোরে চেপে ধরে বললে—সভাপতি আসবেন না, ফোনে জানিয়েছেন। তাঁর সাংসারিক সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তিনি আসতে পারবেন না। কী বিভ্রাট বলোনতো! একগলা জলে নামিয়ে দিয়ে পাশ কাটালেন। আপনাকেই আমরা উপযুক্ত ব্যক্তি মনে কোরি। এযাত্রা উদ্ধার করুণ।

অমিত দেব ম্লান হেসে বললেন—'আমি হবো সভাপতি ? কী সঙ্গতি আছে আমার! আর, আজকে কী একটা বিষয়ে তর্কযুদ্ধ হবে শুনছিলুম।

নিরাপদ তাড়াতাড়ি বললে—'সাহিত্যে সত্যের পরিধান—'

—'ওঃ—তা' আমিতো মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসিনি।'

আমি সহাস্যে বললুম—তাতে কা আসে যায়! আপনি বাণীর বড়পুত্র!'

একটু চুপ করে থেকে অমিত দেব বললেন—'বেশ, সকলের অনুরোধ' আদেশেরি রূপান্তর। এবং আমি তা' আদেশের মতোই শিরোধার্য্য কোরে নিলুম। শুধু এই মিনতি—ক্রটী হোলে গায়ে মেখে নেবেন না।'

পিছন থেকে তরুণের দল বলে উঠল—'আপনার ক্রটী হবেনা কক্ষণো—এই বিশ্বাস আমাদের আছে।'

অমিত দেব উঠে দাঁড়ালেন। যাবার সময় বইখানি আমার হাতে দিয়ে গেলেন—'বইখানি দয়াকোরে আপনার কাছে রাখুন, এসে নেবো।

* * *

প্রবল করতালির ভিতর সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সভার কাজ সুরু হ'ল। প্রথমে চিরচলিত প্রথামত সভানায়ককে মাল্যদান তারপর উদ্বোধন সঙ্গীত, মাঝখানে তর্কযুদ্ধ ও সর্ব্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ।

অমিত দেব উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেন। কী সুন্দর ভাষা, কী অভিনব প্রয়োগ-কৌশল, তেমনি কমনীয় কণ্ঠস্বর। সকলের সম্মিলিত প্রশংসার ভিতর সভাপতি নীরব হলেন। তাঁর কথার দু'এক টুক্‌রো আজো আমার মর্ম্মে লেগে আছে—'সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে অধুনিকতার উগ্রপন্থীরা এমন একটা বিভৎস কাণ্ড বাধিয়ে বসেন, যা সাহিত্যিক সমাজের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর। এই বিভৎসতার

অন্যতম কারণ অতিশয়োক্তি ও আন্তরিকতা শূন্য। অতিশয়োক্তি অশিষ্ঠতার পরিচায়ক। এই অশিষ্ঠতার ভেতর—সংযমকে অতিক্রম করবার ভেতর আছে এক অপূর্ব্ব মাদকতা। আমাদের ভেতর যেন এই মাদকতা না আসে, আমরা যেন রঙিণ নেশায় মশগুল হয়ে না পড়ি। কেননা, এই জিনিষটা সমানে বেড়ে চলবে দিনের পর দিন-মাতালের মদের মাত্রার মত। রচনাকে অচিরে করে তুলবে রুচি-বিগর্হিত। তাই, সত্যকে বিকাশ করতে যেমন প্রয়োজন আন্তরিকতা ও নির্ভীকতা, ঠিক সেই পরিমানে প্রয়োজন ধীশক্তি ও প্রকাশ-কৌশল।'—

সভা ভঙ্গ হ'লে অমিত দেব বাইরে এসে দাড়ালেন। পাশে ও পিছনে প্রশংসামুখর জনতা। সামনে, রাস্তার ধার ঘেসে দাড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মাষ্টার-বুইক—তাঁরি অপেক্ষায়। আমার কাছ থেকে বইখানি নিয়ে ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির রেখা টেনে বললেন—'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারি সুখী হোলেম। আজকের মত আমায় বিদায় দিন। পরে সুযোগ হোলে আবার দেখা হবে।'

আমি সৌজন্যের হাসি হেসে প্রতি নমস্কার করলুম। সমবেত জনতার প্রতি হাততুলে নমস্কারান্তে গাড়ীর ভিতরে গিয়ে বসলেন।

* * *

মহাকালের পাখায় ভর করে পাঁচটা বছর বয়ে গেল। চালসে ধরা স্মৃতির দৃষ্টিতে অমিত দেব ঝাপসা হয়ে এসেছে। কর্ম্মব্যাস্ত মনের কোণে যদিও বা কখনো তাঁর কথা উদয় হয়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব সেকেণ্ডের কোঠাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়, মিনিট পর্য্যন্ত এগোয় না।

একদা শেষ রাত্রে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল কে যেন আমাদের বাইরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বিরাট কৌতুহল বুকে নিয়ে তর তর করে সিড়ি বেয়ে নেমে এলুম নীচে। দরজা খুলতেই দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে নিরাপদ। মুখখানা শুকনো, চোখদুটো রাঙা টকটকে করমচার মত, মাথার চুলগুলো এলোমেলো। মাথার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলে মানুষের যেমন চেহারা হয়, ঠিক তেমনি। প্রথমেই বললে—'যা, জামাটা গায়ে দিয়ে আয়।'

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম—'কেন, কী হোলো তোর?'

নিরাপদ শুকনো মুখখানা বিশ্রী ভঙ্গি করে বললে—আমার নয়, অমিত দেবের—প্রখ্যাত সাহিত্যিকের স্ত্রী-বিয়োগ।

শিউরে উঠে বললুম—,এ্যা!' অমিত দেবের স্ত্রী'—

সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—'হাঁ স্ত্রী এবং তিনি বিয়োগ, তাই তোমাকে যোগদান কোরতে হবে। যা, চট্‌ করে যাহোক একটা গায়ে চড়িয়ে আয়। এখানে বোসলুম আমি।'—ব'লে সত্যিই সিড়ির ওপর বসে পড়ল।

আমি ছুটে ভিতরে চলে গেলুম। তখুনি একটা জামা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এসে বললুম—'হয়েছে চল!'

দুজনে রাস্তা দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চললুম। তখনো রাস্তার লাইটগুলো জ্বলন্ত রয়েছে। সাড়াটা সহর নিঃসাড়। মাঝে মাঝে কাণে আসছে দূরাগত রিক্সার ঠুং ঠাং শব্দ, আর মোটরের অস্পষ্ট হর্ণ। জামাটা পরতে পরতে জিজ্ঞাসা করলুম—'ওর স্ত্রীর কী হোয়েছিল।

'ঘুসঘুসে জ্বর, পরিণাম ফুসফুসের রোগ। মুখ ফুটে বলতে নেই লোকের কাছে। ফুস-ফুস গুজগুজের ভেতর দিয়ে বেড়ে চলে দিনকে দিন। অতঃপর সাদা সত্য কথা—ফুস্ কোরে একদিন প্রাণপাখিটী উড়ে যায় জীর্ণ দেহ-পিঞ্জরটী ফেলে রেখে, বুঝলি?'—নিরাপদর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাচ্ছে কেমন যেন একটা অসহ্য রুক্ষতা।

বললুম—'তোর মেজাজটা মিলিটারীর মত, ব্যাপার কী বল্‌তো?'

'ব্যাপার সুবিধে নয়, শীগগির ব্যাপার মুড়ি দিতে হবে।'

'বুঝলুম না তোর কথাটা।'

নিরাপদ শ্রান্তসুরে বললে—'আজ পনেরো দিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। রাতে এক মুহূর্ত্তের জন্য দু-চোখের পাতা এক করিনি।'

'কেন, তোর আবার কী কাজ পড়লো?'

'সাহিত্যিকের স্ত্রী-বিয়োগ আর আমার কর্ম্মের ভোগ। one of the best rascals he is! বুঝলি এমনি পাষণ্ড সেটা যে, রুগ্ন মরণাপন্ন বউটাকে ফেলে উধাও হোলেন। আমি ভেবে সারা। চারিদিকে খোজ কোরলুম, কোথাও পাত্তা মিলল না। বউটা কেঁদে মরে, ওঃ—সে কী কান্না! মানুষের চোখে যে এতো জল থাকতে পারে এর আগে জানতুম না।'

'কোথায় গিছলেন?'

—'চুলোয়! অর্থের সন্ধানে যাচ্চি' বোলে বেরিয়েছিলেন, পনেরো দিন বাদে আজ সকালে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেচেন। নেহাৎ সতী সাবিত্রীর দেশের মেয়ে, তাই মরবার আগে দেব-দর্শনটা ঘটে গেল। উঃ—কী কুক্ষণেই বন্ধুত্ব কোরেছিলুম! এরাই

আবার সভা সমিতিতে বড়ো বড়ো বুকনি কাটেন—ছোঃ।'

—'কেন, তিনিতো খুব বড়োলোক।'

—'তোমার মস্তক!—' দাঁত খিঁচিয়ে উঠল নিরাপদ।

'সেবার সাহিত্য সমিতিতে—যে বছর উনি সভাপতি হোয়েছিলেন, দেখলুম রাস্তার ওপর মাষ্টার-বুইক দাঁড়িয়ে!'

'ওঃ—আজো তোর মনে আছে দেখছি। সে সব জনৈক ভক্তের। তখন ভক্তের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বাদশাহী চালে থাকতেন। সে গুড়ে বালি পড়েচে। ভক্ত এখন শক্ত হয়েচেন। অযথা চাকি ছড়াতে তিনি আর রাজী নন। তাই একদিন সরকারী রাস্তায় দাড় করিয়ে দিয়ে মুখের সামনে দোর বন্ধ কোরে দিলেন। অতঃপর হাড়ির হাল।'

একটু থেমে জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে একটা শব্দ করে সক্ষোভে বললে—'উঃ কী ভুলই কোরেছিলুম ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরে। বুঝলি কক্ষণো সাহিত্যিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরিসনি। মেছো বাজারের গুণ্ডাদের সঙ্গে মিতে পাতাবি, কিন্তু ওদের সঙ্গে না। ওরা এক একটা নরকের কীট!'

সারাটা রাস্তা নিরাপদ আপন মনে বকতে বকতে চলল। মাঝে মাঝে থেমে যায় গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত। আমি উসকে দিই রেকর্ডের গায়ে পিন দেওয়ার মত, আবার চলে। দূরের গীর্জ্জার টং টং করে পাঁচটা শব্দ কানে এল।

আরো খানিকটা গিয়ে নিরাপদ ঢুকল একটা সরু এদো গলিতে। আমি তার অনুগামী। দুপাশের মাটীর নর্দ্দামা থেকে পচা পাঁকের দুর্গন্ধ নাকে আসছে, সাহিত্যিক আচ্ছা জায়গাতে আস্তানা বেঁধেছেন। একটু এগিয়ে গিয়ে সে ঢুকল একটা পড়ো একতলা বাড়ীর ভিতর। চারিদিকে আবছা অন্ধকার। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া দুঃস্থ এবং দুঃসহ। বাঁ পাশে দরমার বেড়ার ওপারে একখানা ঘর।

ঘরের বাইরে থেকে নিরাপদ ডাকল—'অমিত বাবু!'

ভিতর থেকে উত্তর এল—'এই যে দাদা, আসুন।'

নিরাপদ ঘরে গিয়ে ঢুকল—আমি তার পিছনে। ঘরের এককোণে একখানা দড়ির খাটিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। যাক্ নিরাপদ কাজ সেরে রেখেছে। অদূরে নড়বড়ে জীর্ণ তক্তপোষের ওপর অমিত দেবের স্ত্রী শায়িতা। মাথার গোড়ায় অমিতবাবু দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে আছেন। ভোরের ম্লান আলো এসে পড়েছে মেয়েটীর মৃত্যু ম্লান চোখে মুখে। সর্ব্বাঙ্গ একখানা আধময়লা সাড়ি দিয়ে ঢাকা। শুধু মুখখানি নিরাবরণ। পাংশু, বিবর্ণ মুখখানা! কোটর গত দুটী চোখ আধো খোলা। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত জমাট বেঁধেছে কানের পাশে ও মাথার বালিশে। একরাশ রুক্ষ, অগোছালো চুল মেঝে স্পর্শ করেছে। সিঁথির সিঁদুরের রেখা অস্পষ্ট। ইনি-ই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অমিত দেবের স্ত্রী—ভাষান্তরে প্রিয়া! মাত্র পাঁচ বছর আগে যাঁর স্বামীর আভিজাত্য আড়ম্বর সারাটা সহরে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, নিরাপদ সজোরে এক ঠেলা মেরে বললে—'হাঁ কোরে কী দেখচিস? হাঁটুর ওপর কাপড় তোল। অমিতবাবু গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন! শেষ কাজটা সারা হোলে তারপর পা ছড়িয়ে বোসে আশ মিটিয়ে কাঁদা যাবে। উঠুন উঠুন বিলম্বেন অলম্!'

অমিতবাবু মাথা তুললেন। আমাকে দেখে সকৃতজ্ঞসুরে বললেন—'বাচালেন! আপনারা সহায় না হোলে কী বিপদেই যে পড়তে হোতো!—ক'টা বেজেচে বোলতে পারেন?'

আমি জানালুম—'সাড়ে পাঁচটার বেশী হবে না।'

—'এ্যাঁ সাড়ে পাঁচটা!'—তিনি যেন শিউরে উঠলেন—'তা'লে আর দেরী নয়, চলুন চলুন। পাঠান-পুরুষ আসবার সময় হয়েচে।'

নিরাপদ ভ্রুকুটী করল—'পাঠান-পুরুষ! সে আবার—কে?'

—'সীমান্তের সুদখোর দাদা—চলতি ভাষায় যাকে বলে কাবুলিওয়ালা! চলুন দেখতে পেলে আবার একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি কোরবে।'—ঠোঁটের ওপর নিঃশব্দ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

* * *

শ্মশান কার্য্য শেষ হ'লে যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। অমিত দেব কথান্তরে জানালেন—তিনি আজই কলকাতার বাইরে চলে যাবেন। এখানে থাকলে ওর আত্মসম্মানের মূলোচ্ছেদ হবার ষোলো আনা সম্ভাবনা। মহানগরী ভর্ত্তি ওর মহাজন।

তারপর বহুদিন আর অমিত দেবের কোন খোঁজ খবর পাই নি, সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টে মনে হচ্ছে, সাহিত্য সাধনা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। নিরাপদ বলে—সাহিত্যিকের কোনো পরিচিত লোকের মুখে সে শুনেছে, তিনি নাকি এখন

ইনশিওরের দালালী কাজে দেশ বিদেশ প্রদক্ষিণ করেন। অসম্ভব নয়!

* * *

হঠাৎ সেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হ'ল তাঁর সঙ্গে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কী বিশ্রী হয়ে গেছে চেহারা। পানঠাসা তোবড়ান গাল, বির্ণকুঞ্চিত কপাল। পরণে আধময়লা কাপড়, গায়ে লম্বাহাতের হাফসার্ট আর পায়ে গোড়ালি ফাটা বুট জুতো। বুকের কাছে জামার কাপড়টা পানের রসে রঞ্জিত। চোখের উপর ভেসে উঠল—দশবছর আগেকার সাহিত্য সমিতির সভাপতির সৌম্যমূর্ত্তি! কী অভাবনীয় পরিনতি!

আমাকে নিশ্চয় আগেই দেখেছিলেন। সামনে এসে নমস্কারান্তে পানে ছোবানো দু-পাটী দাঁত বার করে হেসে বললেন—'ভালো আছেন?'

বললুম—'ভালো, আপনি এখানে?'

আমতা আমতা করে বললেন—'এই-ইয়ে মানে কলেজে wife—

বুঝতে পারা গেল তিন পুনঃ বিবাহ করেছেন। পদ পুরণ করে বললুম—'ওঃ—near her confinement? ডেলিভারি হোতে এসেছেন বুঝি?'

—'হেঃ হেঃ ঠিকই অনুমান কোরেছেন। কেস সিরিয়স শেষ পর্য্যন্ত টিকলে হয়। সে যাক্—নিরাপদবাবুর খবর ভালো?'

"একরকম মন্দ নয়। আজকাল কাগজে তো আপনার লেখা নজরে পড়ে না।'

—'ছেড়ে দিয়েছি তো বহুদিন। পেট ভরে না, পৈত্রিক পুঁজির দরকার। সাহিত্যিকরা যে সংসারী, তাদের বাড়ী-ওলাকে যে ভাড়া দিতে হয়, মুদী সাত সকালে এসে তাগাদা করে—একথাটা সাধারণে বুঝতে চায় না। সাহিত্যিক অমিত দেবের মৃত্যু হয়েচে দশবছর আগে। a news of ten years ago!— অকারণ জোর গলায় হেসে উঠলেন।'

—'এখন কী কোরছেন?'—

—'কেরানীগিরি! ফুর্ত্তিসে কলমপিষি টেন্ টু ফাইভ। আর দৌজ কোরে পান দোক্তার জাবর কাটি। মোটে মাথা ঘামাতে হয় না, খুব সোজা কাজ!'

ট্রাম এসে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, আসি, নমস্কার!'

অমিত দেব গাড়ীতে উঠে পড়লেন।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—উষা চৌধুরী
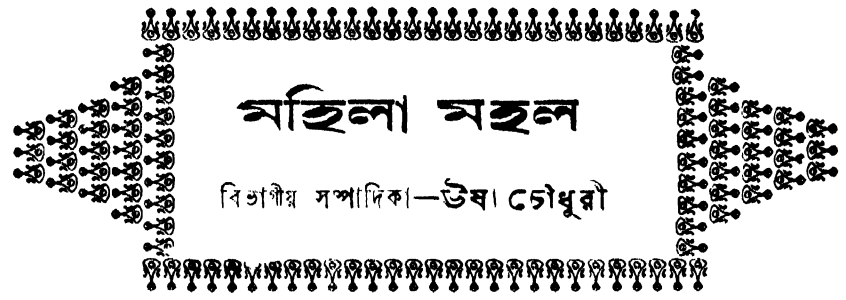
আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে বহু সমস্যার মধ্যে আজ প্রধান চিন্তার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে—অর্থসমস্যা অর্থাৎ জীবিকা নির্ব্বাহ!!

একটি পুরুষের উপার্জ্জনের উপর বহু নারী ও শিশু নির্ভর করে থাকে, অকস্মাৎ সেই পুরুষের মৃত্যু হলে ১০।১২টি পোষ্যর চিন্তা বা ভার কোন নিকটতম আত্মীয়বর্গই নিতে রাজী হন না। কারণ সহজভাবে ধরতে গেলে তাঁদেরও অর্থাভাব, স্থানাভাব। স্বামী হারিয়ে বাংলার নিরাশ্রয়া দুর্ভাগা মেয়েরা তবু উপা-য়ান্তর না পেয়ে তাঁদেরই আশ্রয়ে এসে শারীরিক মানসিক বহু লাঞ্ছনাকে বরণ করে গলগ্রহ জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়, বাংলার প্রতিঘরে এ দৃশ্যের বা সংখ্যার শেষ নেই। এভাবে জীবন কাটিয়েও তারা তাদের ছেলে মেয়ের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারেনা। দুবেলা ভাতের উপায় যাদের নেই তাদের লেখাপড়া বা শিল্প শিক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া শোভা পায় কি? নিতান্ত অত্যাচার বলেই অন্নদাতা মনে করে থাকেন।

আমার মনে হয় এই মহাসমস্যা আজ বাংলার সহরে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলার অসহায়া মধ্যবিত্ত নারীর জীবন ভয়াবহ হয়ে দাড়িয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ভীষণতর হয়ে দাড়াবে। এই সব অসহায়া নারীর দুঃখে অনেক মহিয়সী মহিলার অন্তর কেঁদে উঠে নানা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হলেও—অগণিত দুঃস্থা নারীর সংখ্যায় তাহা মুষ্টিমেয়। পুরুষের স্বাস্থ্যহীনতা এবং অকাল মৃত্যুই আজ বাংলার অসহায়া নিঃস্বা নারীর সংখ্যা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বহু প্রতিষ্ঠান বাংলার মেয়েদের জন্য অর্থকরি শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করে অভাব গ্রস্থা মেয়েদের যথেষ্ট ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন; কিন্তু দুর্ভাগা বাংলার অনেক ঘরে এখনও এইরূপ অর্থকরী শিল্প শিক্ষালয়ের কথা প্রবেশ করতে পারেনি। বাংলার অশিক্ষিতা মেয়েরাই এর জন্য দায়ী। এতদিন আমরা বলে এসেছি আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারে রাখার জন্য আমাদের পুরুষরাই দায়ী, আজ প্রগতির যুগে সেই কথা পুনরাবৃত্তি করতে আমি রাজী নই। কারণ, আমরা যদি জেগে ঘুমাই। তাহা হলে আমাদের ঠেলে কে জাগাবে? বিশ্বের, সমাজের, রাষ্ট্রের এত খবর দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে বেরোচ্ছে, অবসর সময়ে আমরা যদি যে সসব না পড়ি তার জন্য দায়ী কি আমাদের পুরুষ না আশ্রয়দাতা!!

নবীন যুগের রাসবেহারী

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

আইন প'ড়েই অধীরচন্দ্র ভাবলে, লাইন্ ক্লিয়ার তারি!—
হ'লেও রোগা, আঁটলে চোগা হবেই সে স্যর রাসবেহারী!
নামে অধীর, কাণে বধির, নিত্য হাজির দেয় সে কোর্টে;
মামলা 'দেখে' শাম্‌লা এঁটে, শুনতে কিছুই পায়না মোটে!
চাপ্‌কানেরে বিদায় দিয়ে, প্যাণ্টালুনে সাহেব সেজে
সিগার মুখে গাছতলাতে রৌদ্রে পোড়ে, জলেই ভেজে?
এক গাদা তার ফাইল্ হাতে, 'ব্রীফ' মোটে নয়, সব যে সাদা!
এর কাছে যায়, ওকে শুধায়, 'কেমন ভায়া?' 'এই যে দাদা!'
সবাই আছে ভুবন ভ'রে, মক্কেলেরি নেই ক' দেখা!
ভাবলে অধীর, রাসবেহারীর অন্যরকম ভাগ্যলেখা!

ওবিডিয়েণ্ট পেয়াদা সেজে ঘুরল কত প্রেজেণ্ট ব'য়ে!
রিসীভারী কোথায়? শেষে ইন্‌সিয়োরেন্স এজেণ্ট হ'য়ে
বধ্য খুঁজে বেড়ায় শহর। টিউশনীও জুটিয়ে নিলে;
ইংরেজী তার ভুল দেখে হায় ছাত্রী নিজেই তাগিয়ে দিলে।

শ্যামল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় কাটতে থাকে দুপুর তারি,
এম, এ, লয়ের ভূতের প্রতীক্—নবীন যুগের রাসবেহারী!
মাথা থেকে নখাগ্রভাগ পূর্ণ যারি মিথ্যাচারে,
সেও ভাবে, স্যর রাসবেহারী হ'লেও যেন হ'তেও পারে!

কেবল তাকে ধরাটাকে সরাই দেখে, যতই বাড়ীর
দুর্দ্দশা থাক;—অসহ্য চাল্ নিউ এডিশন রাসবেহারীর!
অবশেষে একটি ধোপা পড়ল তারি ফাঁদের মুখে,
কাপড় নাকি হারালো কার, সেই দিয়েছে নালিশ ঠুকে।
হারবে ধোপা, জানেই অধীর, তবুও এ কেস্ 'বৌনী' যে তার!—
সরল, এবং বললে তাকে, ''খালাস পাবেই বুঝলে কেদার!'
কেদার ভাবে, যাক্ না দেখা জল কোথাকার কোথায় দাঁড়ায়।
আট আনায় নগদ বিদায় নিতেই অধীর হস্ত বাড়ায়।

মামলাতে হায় হারল অধীর, রজক দিলে ফাইন গুণে!
উকীল বলে, 'করব আপীল, ব্যাপার বোঝ আইন শুনে!'
হাত সাফাইয়ে হাতিয়ে নিয়ে হায়রে সোণার মাদুলীটাই
পালায় কেদার! দেখলে অধীর অচল ছিল আধুলীটাই!!

তাইতে অধীর রাগছে যত, প্রচার ক'রে দিচ্ছে তত—
কেদার ও নয়, কেদার ও নয়,—নাম হ'ল ওর 'মিথ্যোপদ'!
স্মলকজ্‌এ ব্যাঙ্কশালে ঘুরে হাইকোর্টেতে আস্‌বে যখন,
দেখবে নতুন রাসবেহারীর কায়দা এবং এলেম তখন!
রাসবেহারী, রবীন্দ্রনাথ—একটা আসে, করি স্বীকার—
ক্ষুদে উকীল, ক্ষুদ্র কবি মায়ায় ভোলে মরীচিকার!

এইরূপ অভাবগ্রস্থা মেয়েদের জন্য প্রতি পাড়ায় সমিতি বা শিক্ষা সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্কুল বা শিল্প শিক্ষালয় যদি আরো হাজার হাজার তৈরী হয়; তবু সমিতি অর্থাৎ মহিলাসঙ্ঘের প্রয়োজন কোনদিন কমবে না। সমিতির উপকারিতা বলে এই সংখ্যাটা আমি শেষ করব। পরস্পরের মেলামেশার একটা সুবিধাজনক জায়গার নাম সমিতি দেওয়া হয়। এই সমিতিতে পরস্পর আলাপ আলোচনা শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া বিনা পয়সায় চলতে পারে। পরচর্চ্চা, পরকুৎসা বর্জ্জন করে সমিতিকে খুব ছোটভাবে সৎচিন্তার আদর্শে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে বৃহত্তরের সন্ধান সে আপনি দিতে পারবে। ঐকান্তিক নিয়ম নিষ্ঠায় সমিতির ভিত্তি স্থাপনা করলে প্রাসাদ তৈরী হতে দেরী লাগে না। এই সৎসমিতির দ্বারা বহু নারীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হতে পারে—এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। অভাব শিক্ষার, অভাব নিয়মানুগতার, অভাব সহযোগীতার।

পুরুষের সাহচর্য্য না নিয়েও এরূপ ছোটবড় সমিতির সন্ধান আমার জানা আছে। কত অসহায়া পথহারা শিল্পীনারী এই সব সমিতির সাহচর্য্যে—মনে সাহস, ঐকান্তিকতা, এবং সৎ আদর্শে শিল্প প্রসারের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করে ঘরে বসে সংসার প্রতিপালন করতে সমর্থ হচ্ছে।

আজ "মহিলা শিল্পী সঙ্ঘ" বহুল প্রচার খেয়ালীর মহিলামহলের ভেতর দিয়ে অভাবগ্রস্থা শিল্পী নারীকে সাদরে আহ্বান

করছি। যে কোন নারী তাঁহার শিল্প জ্ঞানের পরিচয় দিতে খেয়ালীর মহিলামহলে পত্রালাপ করতে পারেন। প্রত্যেক দুঃস্থা ভগিনীকে স্বাবলম্বিনী হবার জন্য আমি উদ্বুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিশ্বাস করি ভগবানের করুণায় বাংলার নারীর গলগ্রহ জীবন একদিন দূরে দূরান্তরে মিলিয়ে যাবে।

"মহিলা শিল্পী সঙ্ঘে" জ্যাম, জেলী, চাটনি, আচার, বড়ি, পাঁপর, কেয়াথয়ের, গোটা, ভাজা মশলা, টক মসলা, ইত্যাদি সংসারব্যবহার্য্য জিনিষ ছাড়াও; অর্ডারী জামা, সেমিজ, সুতার কাজ, সস্তায় ছোট ছোট খেলনা শিল্প দেওয়া ও নেওয়া চলে। বিবাহ বাড়ীর অর্ডারমত পান সাজা, ছানা মাখনের কারুকার্য্য "মহিলা শিল্পী সঙ্ঘের" অভাবগ্রস্থা মেয়েরা তৈরী করে তিন দিনের খরচ চালিয়ে দিতে পারছে।

আশাকরি পরবর্ত্তী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আমার ভগিনীদের আলাপ আলোচনা মহিলামহলে এসে পৌঁছবে। এই সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের রন্ধন প্রণালী সম্বন্ধে ওদিককার মেয়েদের কিছু খবর দিতে অনুরোধ করছি।

বাকা পথে তোকে যেতে হবে
অনেক বাধা অনেক দ্বায়ে,
অনেক কাঁটা ফুটবে পায়ে—
তবুও তোকে যেতে হবে।

স

ছাইত্ব ছন্মিলন

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনে এবার গিয়েছিলাম সাহিত্য-চর্চ্চা কি রকম হয় দেখতে। ইতিপূর্ব্বে কখনো কলকাতার বাইরে কোনো সাহিত্য সভায় যাই নি, ও সম্বন্ধে আমার বরাবরই একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে এবং আশঙ্কাও আছে সাহিত্য-সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা আমাদের না চিনতেও পারেন। বরাবরের মতন এবারেও অনেকে আমরা নিমন্ত্রণ পাইনি, অথচ যে কাগজে আমরা লিখি (যেমন c/o ভারতবর্ষ কিম্বা বিচিত্রা কিম্বা খেয়ালী) সেখানে লিখলে আমাদের কাছে চিঠি পৌঁছে যেত। কর্ত্তৃপক্ষের এসব খবর জানা উচিত।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন চাটগাঁ মেল ধরলাম, শিয়ালদা ষ্টেশনে কোনো সাহিত্যিক-কেই দেখতে পেলাম না। খানিকটা দ'মে গেলাম।

রাণাঘাটে দেখি আমাদের পুরাণো 'মাষ্টার মশায়' রায় বাহাদুর—খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়। ডাক দিলেন। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এসে পড়লেন। দুজনকে নিয়ে মাষ্টারমশায় সোরাবজীতে চললেন, ব্রেকফাষ্ট করিয়ে দিয়ে গল্পগুজোব করতে লাগলেন। অনেকটা সময় চমৎকার কেটে গেল।

কৃষ্ণনগরের ট্রেন এল, নবদ্বীপের মেলার যাত্রী বোঝাই নিয়ে। মন্দ লাগল-না ভক্তিমানদের সঙ্গ।

বেশীক্ষণ লাগল না। কৃষ্ণনগর ষ্টেশনের বাইরে দেখি বন্ধুবর বিজয়লাল কবিত্ব ছেড়ে' গেরুয়া টুপিধারী স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে ভীষণ ভাবে উদ্ধারক করছেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়া গাড়ী পেলাম যার ভাড়া দিতে হয়নি।

ক্যাম্পটি ৺মনোমোহন ঘোষের বাড়ী, বর্ত্তমানে স্কুল। চমৎকার বন্দোবস্ত, কোনো রকম অসুবিধাই নেই। আতিথ্যেরও তুলনা হয় না। ভলাণ্টিয়ারদের প্রশংসা একমুখে করবার ভাষা আমার নেই।

খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম, যার জন্যে কেউ পয়সা চাইলেও না, দিলামও না। ওখান থেকে বন্ধুবর সজনী দাস এবং আনন্দবাজারের সত্যেনদা প্রভৃতি যেখানে খুঁটি গেড়েছেন সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। যে ভাষায় রসালাপ চলছিল তা দারুণ উপভোগ্য কিন্তু সে উপভোগের ভাগ কাউকে দেওয়া যায় না যেহেতু ছাপার অক্ষরে সে সব বার করা অসম্ভব।

তারপর সম্মিলন মণ্ডপ। সেখানেও টিকিট কেউ চাইলে না। মোটকথা সবটাই আমার ফ্রী হ'য়ে গেছে, (ট্রেনভাড়া ছাড়া) আমি আপত্তিও করিনি কারণ বিনা নিমন্ত্রণে অনাহূত ও বরাহূত যাওয়ার অপরাধ আমার। তার জন্যেই আগাগোড়া লজ্জিত ছিলাম। এবং এই অপরাধে বহু সাহিত্যিকই দায়ী ছিলেন—ক্রমশ জানতে পারলাম।

সভা যা হ'ল, তাকে হাট বললেই হয়। দর্শকরা উঠছে বসছে চলছে ফিরছে—একবার এখানে উঁকি মারছে একবার ওধারটা দেখে আসছে চলমান্ শ্রোতা ও বস-মান বক্তা নিয়ে সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড! রাশি রাশি প্রেরিত রচনা 'পঠিত বলিয়া গৃহীত', অথচ 'মুদ্রিত'

অভিভাষণ বিতরিত হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারিত—এর সামঞ্জস্য পাওয়া গেল না।

মন্দ কবিযশোপ্রার্থী—রাম শ্যাম যদু মধুদের বালখিল্যবৎ আচরণ, উন্মাদনা—চীৎকার, লাইমলাইটে আসবার জন্যে ঠেলাঠেলি—অথচ যারা সাহিত্য সাধনায় ইহ-পরকাল নষ্ট করেছে—করেছে অসংখ্য লোকের মনোহরণ, তারা গেল ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে—দেখে 'বৈঠকখানা, বাজারে'র কথাই মনে পড়ে।

তালতলা কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে আমি এর চেয়ে disciplene দেখেছি, দেখেছি এর চেয়ে অনেক বেশী রসিক সমাগম ও রসবোধের পরিচয়।

আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম—আমাদের এদিককার লোকরাই শ্রোতা এবং বক্তা, কৃষ্ণনগর সহর সাহিত্যিক সমাগমে খুব বেশী চঞ্চল হয়েছে বলে মনে হলনা। স্বেচ্ছাসেবকও শুনলাম—স্থানীয় লোক কম।

"সাহিত্য সম্মিলন"গুলিতে বোধহয় এই-ই হয়। সামনের বারে কুমিল্লাতে ডাক পড়েছে, যাবার উৎসাহ বোধ করছিনা।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এক আলোচনা হ'ল। দ্বিজ, দীন ও বডু চণ্ডীদাসকে নিয়ে রথী মহারথী পদাতিকরা পড়লেন—গত এগারো বৎসর ধরে যে আলোচনা বহু বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে—তাই এবারেও অমীমাংসিত ও অসমাপ্ত র'য়ে গেল—কিন্তু যে চণ্ডীদাস

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—ব'লে গেছেন

সমস্ত বাঙালীর হৃদয়াসনে তিনি অটলই রইলেন।

এই সুদীর্ঘ সময় যদি সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হত, তবে হয়ত' দরিদ্র সাহিত্যিকদের অন্নসংস্থানের কোন উপায় আবিষ্কার করা যেত—ব্যাঙ্কব্যালান্সওয়ালা ধনীরা যখন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ঘরের পয়সা খরচ ক'রে কতকগুলো বাজে বটুকটি শুনতে যাবার মতন সময় ও অর্থ অধিকাংশ সত্যকার সাহিত্যিকের নেই, ছেঁদো কথা ও বাঁধাবুলির দিন গেছে, ছাপার অক্ষরে কাগজে নাম বেরোলেই আজ সাহিত্যিকেরা হাতে স্বর্গ পায়না—একথা কর্ত্তারা জেনেও কেন যে এড়িয়ে যান পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও কিছু কিছু যেন বোঝা যায়!

আজ সাহিত্য-সেবীরা আর্ত্তনাদ করছে সমস্বরে—বড় ভুল হয়ে গেছে এ পথে এসে। উকীল, অ্যাটর্নী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রোফেসর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কেরাণী, কুলী সবই তারা হতে পারত, কিন্তু কাজ হয়ত চালাতে পারতনা। এদের ধারা স্বতন্ত্র, এদের চিন্তা স্বতন্ত্র। এদের আত্মসম্মান-বোধ—এমনকি আলস্যও স্বতন্ত্র। সিনেমায়, পাবলিসিটিতে সাহিত্য অক্ষুন্ন থাকেনা, টাকা যতই কেননা আসুক। উকীল প্রভৃতির পেশাও তাদের চলতনা, ছাপাখানাও না, অসাধু লোকের সঙ্গে সংস্রব রাখা তাদের পোষাতনা। যারা আজো out and out সাহিত্যিক হ'য়ে আছে, তারা দুবেলা ঠকছে, দুটিবেলা বদনাম কিনছে, কিন্তু বাদশাহী নেশাত ছাড়তে পারছেনা! উপায় কি? তাদের উপায় কি? কোনো মিয়া, বলে দিতে পারে? গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে বড় জোর দৈনিকের সহকারী সম্পাদকতা করা চলে, কিন্তু চলেনা যে তাতেও। এই অচল অবস্থার মধ্যে আজ দেশের যে নাম করা লেখকরা—নাম ক'রে তাদের অপমান করতে পারবনা—তাঁদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো সাহিত্য সম্মিলন কখনো কি চিন্তিত হয়েছেন?

অনেকে মনে করতে পারেন আমি নিজের জন্যে খানিকটা ওকালতী করে নিলাম। ধন্যবাদ, বর্ত্তমানে আমার একখানি মোটর আছে এবং কোনগতিকে চলে যাবার মতন সামান্য কিছু সংস্থান আছে। সুতরাং আমি unbiased এবং সমর্থকহিসাবে bona-fide যদিও কোনরকম সাহায্য ও উৎসাহ পেলে হাত বাড়িয়ে নিতে দ্বিধা করবো না। অমৃতে নিশ্চয়ই অরুচি নেই এবং চিরদিন সমান যাবেনা, তাও জানি! কলিকাতা সাহিত্যসম্মেলনীতে যে কথা বলেছিলাম তারই পুনরোক্তি আজ করি:—

বৃথা সাহিত্য সম্মিলনের অযথা আড়ম্বর।
প্রদীপের নীচে অন্ধকারেই যদি কবিদল
কাঁদে!
বৃথা সমারোহ বসন ভূষায়, মোটরের ঘর্ঘর
কথাশিল্পীরা পড়ে যদি থাকে পাওনাদারের
ফাঁদে!
ঊর্জি চেয়ারে স্বপ্ন তোমার যাহারা রচনা করে,
দুঃখের দিনে সান্ত্বনা বাণী যারা দিয়ে যায়
কাণে,
তাদের জীবন কুসুম নিয়ত ফুটিতে ফুটিতে ঝরে,
ছুটিতে ছুটিতে গন্ধ তবুও বিলাইয়া যায় প্রাণে।
নার্ভাস্‌নেস্‌, ব্লাড্‌প্রেসারেও ডায়াবিটিশেতে
ভোগে,
মরিতে মরিতে তবু দিয়ে যায় শেষ স্মরণের
দান!
আর কতদিন চলিবে এমন অপূর্ব্ব
যোগাযোগে
অভুক্ত কবি চারণগণের বঞ্চিত অভিযান?

যদিও দেশটা এমনি callous হ'য়ে গেছে যে, ঐ আবেদনের উত্তর কোনো সাহিত্যিকই কোনোদিক থেকে পাননি।

বক্তৃতাটা লেগেছে ভালো
রয়েছে রেশ কাণে
কি যেন করা উচিত ছিল
কি করি তা কে জানে—
এই নীতিতেই কাজ হয়েছে!

চুলোয় যাক্ সাহিত্য সম্মিলন। পাণ্ডারা আমার চেয়ে কিছু কম বোঝেন না। ভবিষ্যতে না বোঝবার ভাণ না করলেই খুসি হব।

"সন্ধ্যার দিকে ভিড়ের ঠেলায় যন্ত্রচালিতবৎ রাজপ্রাসাদের একটা বিস্তৃত হল্-এ ঢুকতে হ'ল—সে ঠেলাঠেলি চার আনার বুকিং অফিসকেও হার মানায়, কাজে কাজেই ল'রে প'ড়ে সম্মান রাখবার উপায় ছিল না,' আমার কার্ডও ছিল না, কাজেই খাওয়ার ব্যাপারে কে খাওয়াচ্ছে, কাকে খাওয়াচ্ছে, কেন খাওয়াচ্ছে, বোঝা গেল না। সামনে দেখলাম খাওয়াচ্ছেন বিজয়লাল, খাচ্ছেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। আমিও অবশ্য সরভাজা সরপুরিয়ার রসাস্বাদন, যে করিনি তা নয়, কিন্তু সেদিকে খেয়াল ছিল না একটা মজা দেখতে গিয়ে—শাখা সভাপতিদের খোসামোদি করছিল যে-সে!

কিন্তু এই সম্মিলনে পরস্পরের আলাপ আলোচনাটা উপভোগ্য হয়েছিল। অখিল নিয়োগী, মনোজ বসু, অপূর্ব্ব ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মল ঘোষ, নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস রায়চৌধুরী, বিমান মজুমদার এবং আরো অনেকের ব্যবহার কবি-জনোচিত লেগেছিল।

সভা-মণ্ডপ থেকে বেরিয়েই ষ্টেশনের দিকে চল্লাম পায়ে চ'লেই, একটি বৃদ্ধের উত্তেজনায়—'ইয়ংম্যান্, হাঁটতে পারেন না? ঐত' ষ্টেশন!'

আব্ছা চাঁদের আলোয় পথ হারিয়ে এক পোড়ো বাড়ীর শূন্য বাগানে কি করে গিয়ে হাজির হলাম, সে ব্যাপার একটা গল্পের প্লট্। সকাল অবধি হয়ত আমাকে অপেক্ষা করতে হ'ত কৃষ্ণনগরের সেই পথ-চিহ্নহীন বসতিবিরল অজানা জায়গায় যদি না—থাক্।

জগতে তারাই শুধুরে সুখী
যারা সচেতন—সদা কর্ম্মে রয়,
যারা পরের দুখে দুখী—
তারাই পূজ্য—সুন্দর, মহাশয়।

ম

বিশেষ কিছু নয়

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দ্রুত পায়ে জয়শ্রী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

কিন্তু তার আগেই পিঠ দিয়ে পুরন্দর সমস্ত দরজাটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছে। একটা কী অজ্ঞাত আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে জয়শ্রী আর্ত্তনাদ করবার উদ্যোগ করতেই ডান হাত দিয়ে পুরন্দর তাকে মুখ চাপা দিয়ে ধরল। তারপর তাকে ছেড়ে দিল। জয়শ্রী তৎক্ষণে আবার পেছনে হটে গেছে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর ঝড়ো হাওয়ায় আক্রান্ত নরম লতার মতো থর থর ক'রে কাঁপছে।

'কোনরকম গোলমাল ক'রো না!' শান্ত গম্ভীর সুরে পুরন্দর কথাগুলি বললে।

গোলযোগ করবার শক্তি জয়শ্রীরও ছিল না অবশ্য। অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন। আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় দিক থেকেই পুরন্দরের যে এতোটা পরিবর্ত্তন এসেছে একথা আগে জানলে অতখানি উৎসাহ নিয়ে এরকম অসময়ে জয়শ্রী হয়তো আর এ-বাড়ীতে আসতে চাইতো না। কিন্তু যা হ'য়ে গেছে তার আর চাড়া নেই, জয়শ্রী ক্রমশঃ নিজেকে স্বাভাবিক ক'রে আনবার চেষ্টা ক'রল।

'তুমি অনেকখানি বদলে গেছো!' এই কথা বলে তাকে হাসবার চেষ্টা করতে হ'লো।

'মানুষ সব সময় ঠিক একই রকম থাকবে একথার কোন মানে হয় না।' পুরন্দর যেন তর্ক করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। সে অনায়াসে ব'লতে লাগলো: 'এক-একটা সময় এমন আসে যখন বাধ্য হ'য়ে মানুষকে অভ্যাসের বা স্বভাবের পুরাতন খোলসটা ঝেড়ে ফেলতে হয়। মানুষ তখন আরেকটা ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। অবস্থা বিশেষে এই পরিবর্ত্তন এতো বেশী আকস্মিক যে নিজের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে নিজেকেই অতি মাত্রায় অবাক্ হ'তে হয়। অন্যের তো কথাই নেই।'

'তুমিও কি বর্ত্তমানে সেই অবস্থায় এসে পৌঁছেছো?' জয়শ্রীর কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক।

'ঠিক বলতে পারিনে। কেননা এখন পর্য্যন্ত এমন কিছু করিনি যে-কাজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমার পরিবর্ত্তিত ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করা যেতে পারে।'

'একথা মেনে নেওয়া যায় না। এই একটু আগে তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলে সেটা কি অপ্রত্যাশিত নয়? তোমার কাছ থেকে কবে আমি এরকম আশা করেছি?'

পুরন্দর চুপ ক'রে রইলো।

'তোমার দুটো পায়ে পড়ি—' হঠাৎ অন্যরকম সুরে কাতরভাবে জয়শ্রী বলে উঠলো: 'সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এবার আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে দাও।'

পুরন্দর চাপা হাসি হেসে উঠলো।

'তুমি ভুলে যাচ্ছ এখন আর আমি কুমারী নই, গৃহস্থের কুলবধূ। এখন আমি সম্পূর্ণভাবে অন্য এক জনের অধীন। আমাকে যেতে দাও!'

পুরন্দর তাকিয়ে দেখলো, জয়শ্রীর সিঁথাতে সিঁদুর জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মনে হ'ল, সিঁদুর তো নয়, হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে ঝড়ে-পড়া রক্তের ফোঁটা! সে অস্বাভাবিক হেসে উঠলো। দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াবার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না তার।

তার হাসিকে দুরভি-সন্ধি-ধ্বনিত মনে ক'রে জয়শ্রী আরো ভয় পেয়ে গেলো। এই মুহূর্ত্তে কী যে সে করবে ভেবে পেলো না। জানলার ধারে সরে গিয়ে দেখলে বাইরে রাজপথে ইলেক্‌ট্রিক বাতিগুলো সারি-সারি জ্বলে উঠেছে। কেন যে মরতে সে এখানে এসেছিলো, জয়শ্রী মনে-মনে নিজের অন্ধ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলে। তারপর অস্থির চিত্তে আবার দরজার দিকে এগিয়ে এলো।

'আমার কথা শোন—' আস্তে আস্তে পুরন্দর বললে: 'অতটা উতলা হয়ো না। ফিরবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কৈ, বিয়ের আগেত তোমার এতোটা ব্যস্ত-সমস্ত ভাব লক্ষ্য করিনি কোন দিন! এদিক থেকে বিবেচনা করলে তোমর স্বামীটিকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবানই বলতে হবে—কী বলো?'

'কিন্তু আমাকে অনর্থক আটকিয়ে রাখছো কেন?' যদিও অন্তরে সাহসের লেশমাত্র ছিলনা, তবুও বাইরে খুব খানিকটা সাহস দেখিয়ে রাগ হবার ভান ক'রে জয়শ্রী বললে: 'কী চাও তুমি আমার কাছে?'

অত্যন্ত সোজা প্রশ্ন। কিন্তু সোজা জবাব ছিলনা সম্ভবত।

ঘরের চকচকে মসৃণ মেঝেয় তাকিয়ে পুরন্দর আনমনে কী ভাবছে এমনি সময়ে দরজায় কার করাঘাত শোনা গেলো। পরিণত বলিষ্ঠ হাতের খটাখট শব্দ। ছুটে এসে পুরন্দর জয়শ্রীর হাত ধরে বেগে বললে: 'তাড়াতাড়ি ঐ পর্দাটার পেছনে লুকোও। সিগগির!' কিছু না বুঝতে পেরে জয়শ্রী বললে: ওকে আমার দাদার আওয়াজ। তাঁকে দেখে লুকোবো কেন!'

তার দুটো হাতে প্রবল ঝাকুনি দিয়ে উত্তেজিত চাপা গলায় পুরন্দর বললে: 'পরে বলছি। লুকোও তো এখন। নইলে না জানি কী কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে! তুমিও ডুবে আমিও ডুববো। সিগগির কর!'

কথাগুলি এমন ভঙ্গীতে এমন সুরে বলা যে জয়শ্রী অবিলম্বে অভিভূত হ'ল। এবং বিশেষ কিছু না বুঝেই তাকে দাড়াতে হ'লো ঘরের এককোনে আলমারীর কাছে নীলবর্ণ পর্দ্দার আড়ালে। তখন পুরন্দর নিশ্চিন্ত মনে দরজা খুলে দিলে। জয়ন্ত কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রলো না। বাইরে দাঁড়িয়েই

পুরন্দরকে প্রশ্ন ক'র্‌লো: 'জয়শ্রী তোমার এখানে এসেছেনা? কোথায় সে?

'সেতো এখন এবাড়ীতে নেই, এই একটু আগে চলে গেছে—'পুরন্দর অনায়াসে এই কথাগুলি বলতে পারলে: 'রজনী গুপ্ত রোডতে তার সহপাঠিনী বান্ধবী আছে না? তার ওখানে গেছে। ফিরতে একটু রাত হ'তে পারে।'

'অথচ আমাদের কিছু বলে যায় নি!' জয়ন্ত বিস্ময়ের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ক'র্‌লো: 'তাকে দিয়েই বা এলো কে! তুমি?'

'অগত্যা। তোমরা কেউতো আর ধারে কাছে ছিলেনা।'

'কিন্তু আজকে যে আমাদের, সিনেমায় যাবার কথা ছিল।'

'সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এখন ছয়টা বেজে দের ঘণ্টা। সিনেমা না হয় আরেকদিন হবে। অবিনাশ বাবুকে বুঝিয়ে বলো সব কথা।'

অবিনাশ জয়শ্রীর বর। হতাশ হয়ে জয়ন্ত চলে গেলো।

জয়ন্ত চলে যাবার পর পুরন্দর দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলে। পর্দার আড়াল থেকে বার হ'য়ে জয়শ্রী ততক্ষণে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ফিরিয়ে মুখোমুখী হ'তেই ঝাঁঝালো সুরে বললে: 'আশৈশবের অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে এতগুলো নির্জ্জলা মিথ্যা বলতে তোমার এতোটুকু বাধ্‌লো না? তুমি কি মানুষ না আর কিছু?'

'তাইতো, মানুষ না আর কিছু! পুরন্দর প্রথমচোটে এর বেশী কিছু বলতে পারলে না।

'তোমার মতলবটা কী শুনি?' জয়শ্রী প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

'যাই বলি, তোমায় এখন যেতে দেবনা।

'ভণ্ড কাপুরুষ কোথাকার!' অপমান বোধ জয়শ্রীকে উত্তপ্ত ক'রে তুললো নিমেষে। এখন যেন লজ্জা সরম সম্মানের আর কোন বিশেষ ভয় নেই। জয়শ্রী একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, আক্রোশে, উত্তেজনায় রীতি মতো কাঁপছে। মুগ্ধনেত্রে আবিষ্টচিত্তে পুরন্দর তা লক্ষ্য করতে লাগলো। এরকম অপরূপ অবস্থায় এর আগে সে জয়শ্রীকে আর কোনদিন দেখেনি বোধ হয়। পুরন্দর অভিভূত হ'লো।

কারো মুখে কথা নেই কিছুক্ষণ। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পুরন্দর জয়শ্রীকে বললে: 'দেখ আমাদের এঘটনাটা কিন্তু মোটেই নতুন কিছু নয়। দু'জনে দু'জনাকে ভালোবাসে অথচ অদৃষ্টের অভিশাপ এই দুইজনের মিলন সম্ভব হ'ল না এই নিয়ে পৃথিবীতে রাশী-রাশী কাব্য নাটক আর উপন্যাস রচিত হয়েছে। এতো বেশী হয়েছে যে সন্দেহ হয়, এরকম ঘটনা বাস্তবিক ঘটতে পারে কিনা! কিন্তু কথা তো তা' নয়, কথা এই যে তুমি আমাকে বিয়ে করলে না কেন?'

একথায় জয়শ্রী একটু চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে: 'ইচ্ছে করলেই আকাঙ্ক্ষিত অতিথীকে বিয়ে করা যায় বাঙালী মেয়েদের এখনো সেদিন আসেনি। শতকরা সাতা-নব্বইজন আজও অভিভাবকের কথার ওপর নির্ভর ক'রেই নিজেদের বিলিয়ে দিতে সচরাচর বাধ্য হয়ে থাকে।'

'কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে অন্যত্র পালিয়ে গেলে না কেন?'

'তার ফল সম্ভবত আরো খারাপ হতো। সমাজের কথা নয় ছেড়েই দিলুম; তোমার অবস্থা এমন কিছু নয় যাতে আমাকে ভালোভাবে রাখতে পার। প্রথম কয়েকটা দিন বড়ো জোর স্বর্গসুখ আর রঙীন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কাটতো। তারপর হাতের টাকা ফুরিয়ে এলে নিত্য নতুন অভাব-অনাটনের মাঝে শেষ পর্য্যন্ত আমি তোমার একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াতুম। এবং সে বোঝাকে দুর্ব্বিসহ মনে করে তুমি অনায়াসে পলায়ন করতে পারতে। আমি হয়তো তখন মা হওয়ার পথে অনেকদূর এগিয়ে এসেছি। সেবাসদনে না উঠে বাধ্য হয়ে আমাকে গণিকালয়ে আশ্রয় খুঁজতে হ'তো।'

'তোমার কল্পনা শক্তি খুব প্রখর তো!' অত্যন্ত শ্লেষের সঙ্গে পুরন্দর উচ্চারণ করলে।

'কেন, ওরকম তো প্রায়ই হয়।' সাময়িক পত্রিকাদির প্রায় গল্পই তো এমনি ধারা। শুধু তাই নয়,—আমি যখন দেহের বেসাতি আরম্ভ করেছি এমনি সময়ে হয়তো খবর পেতুম তুমি সুবোধ শান্ত ছেলের মতো ঘরে ফিরে গিয়ে এক বিবাহ করে দিব্যি নতুন এক সংসার পেতোছো! আমি তখন কী করতুম বলতো?'

পুরন্দর হা করে তাকিয়ে রইলো জয়শ্রীর পানে।

'সেরকম একটা কিছু যে করিনি—' জয়শ্রীর যেন আর আসতে চায় না। দমকা কাঁপুনির প্রচণ্ড ধমকে ঝরণার মুখর উৎস-মুখ যেন আচমকা খুলে গেছে: 'বস্তুত বেঁচে গেছি বলতে হবে। এখন আমি যার অধীন বয়স, বিদ্যা এবং রূপের দিক থেকে তিনি হয়তো তোমার মতো লোভনীয় নন। কিন্তু এ তিনটি ছাড়া তার আর সবকিছুই আছে। এবং সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো মনে ক'রেই আমিও তাকে সহ্য করতে পেরেছি।'

পুরন্দর এরপর আর কিছু বলবার উৎসাহ খুঁজে পেলো না সহসা। জয়শ্রীর মতো অসামান্য মেয়েকে আর শয্যাসঙ্গিনী রূপে পাওয়া যাবে না একথা মনে হ'তেই সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ ক'রলো; ভারী দুর্বল মনে হ'ল নিজেকে। জয়শ্রীর দিকে তাকিয়ে তার আত্মা হাহাকার ক'রে উঠলো। নিজের অলক্ষে অনেকখানি থেমে উঠলো পুরন্দর।

'আমাকে এখন বাড়ী যেতে দাও—' জয়শ্রী বলতে লাগলো: 'এখানে আমাকে মিছিমিছি আটকিয়ে রেখে লাভ কি বলো। এককালে তোমাকে আমি খুবই ভালো বাসতুম; এখনো যে বাসিনে এমনও নয়—, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে আমাকে অপবিত্র ক'রবে না আশাকরি!'

অত্যন্ত নির্ভীক উক্তি। এবং পুরন্দরকে অভিভূত করার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট।

'আর অপর পক্ষ?' বিষণ্ণ সুরে পুরন্দর বললে: 'আমার দিক থেকেও তো কিছু ব'লবার আছে। তুমিও কি আমাকে খুসী করবার জন্য কিছুই ক'রতে পার না? আজকের রাতের স্থিতিটা যাতে চিরকাল পরস্পরের মনের মনিকোঠায় জাগরূপ থাকে তারজন্যে আমাদের কি কিছুই ক'রবার নেই?'

জয়শ্রী আবার ঘাবড়ে গেলো। ভালো ক'রে তাকালো পুরন্দরের পানে।

সাড়ীটা গায়ের ওপর চড়াতে-চড়াতে পুরন্দর বললে: 'চলো, তোমাকে তোমার বাড়ীতে রেখে আসি—'

———

শরৎচন্দ্র

শ্রীসমীর কুমার ঘোষ

(১)

আকাশে যখন চাঁদিনী কেবল
ছড়ায় জ্যোছনা হাসি,
চারণ পথিক তোমারে তখন
ডাকিল পারের বাঁশি।
ওপার হইতে ভেসে এলো গান:
এসো, এসো ফিরে হে মহান প্রাণ,
হয়েছে সকল তব অভিযান
ফুটেছে কুসুম রাশি।
চাঁদিনী কেবল আকাশে ধবল
ছড়ায় জ্যোছনা হাসি।

(২)

চলিলে চারণ শেষ করি গান
থামায়ে দীপ্ত বীণা।
চলিলে যাত্রী সুর-ঝঙ্কারে
করি এ ধরায় লীলা—
বক্ষের তলে তুলে গেলে নীতি:
মানুষ তোমার থাকে যদি প্রীতি,
দরদীর প্রাণে বুঝ শুধু নিতি
কেউ নয় হীন, হীনা।
বাজে নির্ভীক চারণ পথিক
দীপ্ত তোমার বীণা।

(৩)

হয়তো জীবনে জটিল পথেতে
হারায়েছে পথ নারী।
সমাজ বলেছে, বিষ দাও তারে
তুমি দিলে তায় বারি।
জীবনে যাহার জাগে হাহাকার,
ঘর ও বাহির হ'লো একাকার,
তাহারে দিয়েছ সম অধিকার
ধরিয়া অমৃত বারি।
বলেছ সমাজে, জীবনের মাঝে
মহীয়সী চির নারী।

(৪)

তুমি চলে গেলে থামাইয়া বীণা
রাখিয়া মোদের পিছে।
চলে গেলে কবি জানায়ে হিয়ায়
জগতে কেউ না মিছে!
শরতের চাঁদ ছড়াইয়া আলো
সকলেরে তুমি বাসিয়াছ ভালো।
দেখ নাই তুমি পাপে কেউ কালো,
কে গেছে নামিয়া নীচে।
উদার হিয়ায় নিয়েছ সবায়
কারেও রাখো নি পিছে।

———

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

"বেতার জগৎ" মারফৎ আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ষ্টেশন ডাইরেক্টরদের একটি ঘরোয়া মিটিং হচ্ছে। জনসাধারণের ভেতর বেতার প্রীতি জাগিয়ে তোলা কি ভাবে সম্ভব আমরা তার বহু ইঙ্গিত আমাদের একাধিক আলোচনায় প্রকাশ করেছি। প্রথমে জনসাধারণকে বুঝতে দিতে হবে বেতার প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের। শ্রোতাদের অভাব অভিযোগগুলিকে সহানুভূতিশীল অন্তর দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। সংবাদ পত্রের মন্তব্যগুলিকে প্রাধান্য দিতে হবে। জনশিক্ষাদায়ক এবং নির্দোষ আনন্দদায়ক প্রোগ্রাম প্রবর্ত্তিত করতে হবে। শিল্পীদের সঙ্গে সব সময়ে co-operation রাখতে হবে।

* * *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে সব সময়ে এগুলি কার্য্যকরী হয় না। গুণী শিল্পীরা এখানে অনাদৃত। ষ্টেশন ডাইরেক্টরদের মিটিং-এ এগুলি বিবেচিত হবে বলে আমরা আশাকরি। জনসাধারণ এবং শিল্পীদের মনে যদি এই ধারণা হয় যে বেতার প্রতিষ্ঠান তাদের তাহলে জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রোগ্রাম উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী।

* * *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের নাটক অভিনয় শুনে আমরা হতাশ হয়ে যাচ্ছি। 'বেতার-বিচিত্রা' অভিনয় প্রসঙ্গ না হলেও ছোট ছোট নাটিকার সঙ্গে সঙ্গীত সহগামী সঙ্গীত পরিচালনাগুণ আমাদের যতখানি আনন্দ দেয় বেতার নাটুকে দল সেখানে কোন আনন্দই দিতে পারে না। মনে হয় থাম্‌লে বাঁচি। এর কারণ কী? নাটক পরিচালক ভদ্রমহাশয় তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ রসজ্ঞানের তবে কী পরিচয় দিচ্ছেন? আমরা বহুভাবে এই বিভাগটি নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এর কোন প্রতিকার হোল না কেন?

* * *

গত শুক্রবারের অভিনয় "আলিবাবা" ব্যর্থ অনুকরণ। যে "আলিবাবা" ষ্টেজে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে হাস্য চটুল নৃত্য ছন্দে মাতিয়ে রেখেছিল তাকে টেনে নিয়ে এভাবে জবাই করার ভেতর কুচিজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই কোথায়? এতেও কী আমরা বল্‌বো না এ অভিনয়ের কোন সার্থকতাই নেই—শ্রোতাদের শুধু বিরক্ত করা মাত্র।

* * *

আগামীবারের অভিনয় প্রোগ্রামে দেখলুম রঙ্গ-মহলের অভিনীত "স্বামী-স্ত্রী!" "স্বামী-স্ত্রী মরা গাঙে জোয়ার এনেছে। বেতারে এর আমদানি দেখে সুখী হলাম। অভিনেতা অভিনেত্রী অধিকাংশই 'রঙ্গ-মহলের।' আমরা এ নাটকখানির সাফল্য বেতারে কামনা করি।

* * *

গত শুক্রবার ১১ই ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সন্তোষ সেনগুপ্তের ব্যবস্থাপনায় একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোলো। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর আর্টিষ্ট আমদানি। একখানা গানও শোনবার উপযুক্ত হয়নি। সত্য চৌধুরীর গান কোন রকমে চলনসই। কুমারী অনিমা দাসগুপ্ত গান গাইলেন বাজে। গানের মাঝখানে গলা আট্‌কে গেল। রঞ্জিৎ সেনের ভাটিয়ালী গান সমালোচনার অযোগ্য। পরিকুমারীর গান তথৈবচ! পরে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ছোটদের আসরে দাদুমণির চিঠি পড়ার পর নমিতা রায়চৌধুরী কাব্য সঙ্গীত গাইলেন "অচিন মাঝে"—সুন্দর। গায়িকার কণ্ঠস্বর বেশ মিষ্ট। বিমান ঘোষের গান দুখানি ভালো হয় নি।

* * *

রবিবার ১৩ই প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে নীলমণি সিংহের গান "দিবস নিশি আঁখির তারায়" বেশ ভালো হয়েছিল। সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। আঙ্গুর বালার দুখানি "পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল" এবং "ওই ঘর ভোলানো সুরে" আশানুরূপ হয় নি। আরও উচ্চাঙ্গের গান গায়িকার নিকট হতে আশা করেছিলাম। পরে পঙ্কোজ মল্লিক সঙ্গীত শিক্ষাদান করলেন।

* * *

সোমবার ১৪ই সান্ধ্য অনুষ্ঠানে গোপাল মিত্রের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "রাস লীলা" কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হলো। বাংলা দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই কীর্ত্তন গানের।

অনুরাগী শ্রোতা বহু এবং কীর্ত্তন গায়ক গায়িকার সংখ্যা যে নিতান্ত স্বল্প এরূপ আশা করি না। কিন্তু তবুও এই সব বাজে আর্টিষ্টদের কীর্ত্তনের আসরে রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ কি করে আমদানি করেন তা আমাদের ধারনায় আসে না। এই সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন গান একেবারেই অচল। অতঃপর আমরা আশাকরি বাংলা দেশে সত্যিই যাঁরা কীর্ত্তনে বিশেষ নাম করেছেন এবং যাঁদের সঙ্গীত রস ধারায় আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে বেতার কর্ত্তৃপক্ষ তাদেরই এ আসরে স্থান দেবেন। পরে বীণাপানি দেবী (of Madhupur) দুখানি গান গাইলেন অতি চমৎকার। গায়িকার কণ্ঠস্বরে দরদ আছে। আমরা এই শিল্পীর গান বেশী করে প্রোগ্রামে দেবার জন্যে বেতার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রন্ধন-বিদ্যা ও শিল্পকলা

শ্রীকমলা দেবী

গত ২০শে মাঘ সংখ্যার খেয়ালীর মহিলামহলে শ্রীদেবরাণী সিংহ বাংলায় নারীর স্বাস্থ্য আলোচনা প্রসঙ্গে নারী জীবনের সমস্যার কয়েকটি দিকের প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দিয়েছেন। আধুনিক কালের নারীর চলার পথে প্রতিপদক্ষেপে যে কণ্টকগুলি বিছানো রয়েছে—যাদের আঘাতে তার চলার পথ বিঘ্ন সঙ্কুল কণ্টকিত তাদের নির্ম্মূল করতে না পারলে ভাবীকালের সূর্য্যরশ্মি তমিস্রার গাঢ় অন্ধকারেই থাকবে ঢাকা।

বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য শিক্ষায়—কৃষ্টিতে সাবেক নারীর বহু অন্ধ সংস্কার সংস্কৃত হয়েছে সত্য, সভ্যতার নব আলোকে ঔদার্য্যে আজ আমরা অনেক উন্নত, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পশ্চিমের স্রোতের বন্যায় অনেক মলিনতা আমাদের সমাজতট হতে ধুয়ে গেছে বটে কিন্তু আমাদের ভারতীয় আদর্শের বহু ক্ষতি হয়েছে। সে ক্ষতিকে আমরা লাভের তুলাদণ্ডে ওজন করে, লাভবান বলে গর্ব্ব প্রকাশ করতে পারি না। পশ্চিমের সূর্য্য পূর্ব্বের সূর্য্যের খরদীপ্তিকে বহুদিক থেকে ম্লান করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকে হয়ত আমার একথায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলবেন আধুনিক জীবনে শুধু আদর্শ নিয়ে বাঁচা যায় না। আমাদের বাঁচতে হবে ঠিক মানুষের মতন—তার জন্যে যদি নীতি-আদর্শ বাদ ক্ষুন্ন হয় তাতে বেশী ক্ষতি নেই।

কিন্তু এই নীতিবাদ-আদর্শবাদের যে বড় রকমের একটা যুক্তি এবং মানে আছে তা ধীর মস্তিষ্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যায়। সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা শুধু শৃঙ্খলা নয় অর্থনীতির দিক্ থেকেও এই আদর্শবাদ নারীর জীবনে মস্তবড় সমস্যাকে পূরণ করে। আমি আজ শুধু একটি দিকের খানিকটা আভাষ দিচ্ছি—তাতেই জানা যাবে এক একটা দিক্ থেকে আমরা কত সম্পদ আজ হারিয়ে বসেছি। আমি রন্ধন বিদ্যার কথা বলছি।

'রন্ধন বিদ্যা একটা শিল্প কলা বা 'art'—বাংলার নারীর অন্দর মহলে রন্ধন কলা অতি গৌরবের সহিত স্থান পেয়ে এসেছে এতদিন। অত্যন্ত দুঃখের কথা আজ তা বঙ্গনারীর সুকোমল কর হতে সরে গেছে মলিন কঠোর 'খইনি টেপা' হিন্দুস্থানী এবং উৎকলবাসীর হাতে। মেয়েদের আজ রান্নাঘরে যেতে লজ্জা এবং অপমান বোধ হয়। শত অভাব-অনাটনের মাঝেও আজ সাধারণ গৃহস্থ পরিবারেও আজ পাচকের আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অন্নবস্ত্রের মতন পাচকও আজ গৃহস্থ পরিবারের অত্যাবশ্যকীয়। যে অর্থ এই পাচকের জন্য ব্যয়িত হয় তার দ্বারা সংসারের অন্য প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে।' সে অর্থ কিন্তু সহরে অন্ততঃ লঙ্কা গোলা পাঁচন সিদ্ধর জন্যে গৃহ স্বামীকে রাখতেই হবে—না হলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন থাকে না। সহরে আজ এ ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে—পল্লীর পথেও আজ তার অভিযান।

মেয়েরা আজ রান্না ভুলে গেছে। রন্ধন শালার সেবাপরায়ণা আদর্শ হিন্দু রমণী মূর্ত্তি আজ বিলাসের দাসী। জাপানী ছিটের ব্লাউসে, স্কার্ফ শাড়ীর আচ্ছাদনে চেয়ার টেবিলের মাঝে আজ তারা "কুক্"কে বিলাতিখানার ফরমাস দেয়।

স্বল্প পরিমিত অপরিতৃপ্তিকর আহারে শুধু স্বাস্থ্য হীনতা নয়, নিরানন্দ অনাহারকুচি নারী সমাজের প্রগতিবাদ জীবনকে কোন তৃপ্তি শিক্ষাভিমান এবং কৃষ্টির সন্ধান দেয় তা নারী হয়েও অন্ধ আভিজাত্য বোধে আলস্যের মোহে আমরা বুঝতে চাইনা!

কিছুদিন পূর্ব্বে আমার একজন ইংরাজ মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি ভারতীয় হিন্দুকে বিবাহ করে এখন ভারতীয় আদর্শকে অনেক দিক্ থেকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁকে সবিস্ময়ে দেখলুম আমি, রন্ধনশালায় চেয়ারে উপবিষ্টা অথচ হাতে খুন্তি। আমার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—হিন্দু নারীর এই রন্ধনশালা অতি পবিত্র অতি গৌরব, সম্মান এবং আদর্শের স্থান।

আমি অবাক বিস্ময়ে শ্বেতাঙ্গিনীর সেই রন্ধনমূর্ত্তি দেখলাম—গাউনের একপাশে মৃদু একটু হলুদের ছাপ!

আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রন্ধন শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। একটি কথা আমার কর্ণে এখনও বাজছে—"নিজে হাতে রেঁধে স্বামীকে খাওয়ান ঐর মতন তৃপ্তি আত্মপ্রসাদ জীবনে আমি ইতিপূর্ব্বে অনুভব করিনি।"

আর আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে অর্থ-নৈতিক অবস্থা তাতে করেও এ কোন-রকমে সমর্থন করা যেতে পারেনা যে আমরা বিলাসের দায়ে বৃথা অর্থ অপর প্রদেশবাসীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা আলস্যে অস্বাস্থ্যে false dignity বজায় রাখবো।

রন্ধন শিল্পের দিক্ থেকেও আমাদের বহু ক্ষতি হয়েছে।

বাঙালী হিন্দুর সুপরিতৃপ্তিকর আহারের বৈশিষ্ট আজ আর নেই। সাবেক কালের বিশ্ বৎসর পূর্ব্বেকার নিরামিষ্ আহার্য্যের সৌগন্ধী বাংলার বাতাস থেকে আজ মিশিয়ে গেছে। আজকালকার মেয়েরা 'সুক্তনি' 'মোচারঘন্ট' 'ইঁচরের ডালনা'র রন্ধন প্রণালী জানেনা কিন্তু চপ কাটলেট ওমলেট বলতে বোঝে।

স্কুলে আজকাল মেয়েদের রন্ধন বিদ্যা শিখানো হয়, কিন্তু তাও বেশীরভাগ বিলিতি খানার আবহাওয়ায়। আগের দিনের শাকান্নই লোকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে চেয়ে চিন্তে আহার করেছে—আজ আর 'ফ্রাইরোষ্ট এ' ও তাদের সে পরিতৃপ্তি নেই।

পূর্ব্বে বিবাহকালীন মেয়ে দেখার সময় বর পক্ষের অভিভাবকগণ কনেদের প্রশ্ন করতেন রন্ধনবিদ্যা সম্বন্ধে। আজ আর সে বালাই নেই।

রন্ধন-শিল্প বাঙালী নারীর হাত হতে বিতাড়িত হওয়ায় বহু বিড়ম্বনা দুর্ভাগ্য আমাদের সমাজে এসেছে, তার বিস্তৃততর বিবরণের খুব বেশী পরিচিত আজ আর নাই বা দিলাম।

যে কথাগুলির ইঙ্গিত সংক্ষেপে দিলুম তাই বোধ করি যথেষ্ট হবে।

——

বিরহ

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তবু মনে রেখ—
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা প'ড়ে যায়,
নব প্রেম জালে,
তবু মনে রেখ॥
যদি জল আসে আঁখি পাতে,
(একদিনও সে তোমারি ছিল ভেবে)
যদি জল আসে আঁখি পাতে
তবু চেয়ে থেক—ছবিখানি পানে
(ওগো) চেয়ে থেকো॥

—•—

1703·14

প্যারামাউন্টের "ওয়েলস্ ফারগো" চিত্রের একটি দৃশ্যে জোয়েল ম্যাক্রিয়া ও ফ্রান্সেস্ ডি। বর্ত্তমানে ছবিখানি রিগ্যালে চলিতেছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—**শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়**

অষ্টম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে ফাল্গুন ১৩৪৪, ৩রা মার্চ ১৯৩৮

প্রহসন না প্রহেলিকা ?

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের বামপন্থীদল কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বাধীনে প্রদেশ সমূহে দমননীতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে অনুসৃতনীতির প্রতি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইউ. পির প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ অবশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে মুক্তি দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তা সত্ত্বেও বামপন্থীদের অভিযোগ এইখানে পরিসমাপ্ত হ'ত না কারণ তাঁরা চেয়েছিলেন রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি সম্পর্কে শনৈঃপন্থার ও পৃথক আচরণের প্রতিবাদ করতে। কিন্তু সেদিনের সভায় সবচেয়ে চাঞ্চল্যের ও অসন্তোষের সঞ্চার করেছিল মান্দ্রাজে সোস্যালিষ্ট মিঃ বাটলীওয়ালার রাজদ্রোহ অপরাধে গ্রেপ্তার। তাই রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে ও একযোগে মুক্তির দাবীর সম্বন্ধে সবচেয়ে জোর না দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের অনুসৃত নীতি সমূহ ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল এবং কেমন করে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীকে এমন কি খুটিনাটী বিষয়ে পর্য্যন্ত কংগ্রেসী কার্য্যকরী সমিতির পরিচালনাধীনে আনা যায় তার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল আমলাতন্ত্রকে বুঝিয়ে অবশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে মুক্তি সম্পর্কে কিছুতেই সম্মত করাতে পারলেন না। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক বন্দীরা মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নিকট তাঁদের সন্ত্রাসবাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে বিবৃতি পাঠালেন। আর রাজনৈতিক বন্দীরা তাঁদের অভাব অভিযোগ দূর করার দাবী জানিয়ে জীবনপণ করে অনশনব্রত অবলম্বন করলেন।

এমনি আবহাওয়ার মধ্যে কংগ্রেসের হরিপুরার অধিবেশন আসন্ন হ'ল। যে অসন্তোষ ও বিরোধ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেন। এই দেশব্যাপী অসন্তোষকে শুধু বামপন্থীদের বিপক্ষতা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিহার ও ইউ. পির কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে মুক্তি দাবী করলেন। বড়লাট বাহাদুর তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে এই দাবী অনভিপ্রেত জানালেন। ফলে দুইটি প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন।

তারপরের ঘটনা ছোট ও নির্বিরোধের। দেশব্যাপী সন্তোষের মধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের জয়গান করে কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল। মহাত্মাজী তাঁর বিবৃতিতে বড়লাট বাহাদুরের এই ক্ষমতা প্রয়োগ অনুচিত জানিয়ে দিলেন, বিশেষ কংগ্রেসী-দলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণকালীন বড়লাট বাহাদুরের প্রতিশ্রুতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তবে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক লাটবাহাদুর ও মন্ত্রীমণ্ডলের মধ্যে কথাবার্ত্তা করার প্রস্তাব করলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে এই পদত্যাগ বিষয়ক ব্যাপক করে সারা ভারতবর্ষে কোন আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না বা অপর প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলকে পদত্যাগ করার আহ্বান করা হ'ল না।

উত্তরে বড়লাট বাহাদুর বিবৃতিতে জানান যে তাঁর ক্ষমতাপ্রয়োগ আইনসঙ্গত তবে তিনি কংগ্রেসের ও মহাত্মাজীর সঙ্কল্পে গররাজী নন। কিন্তু মহাত্মাজী প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সঙ্গত দাবী মেনে না লওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের নির্ব্বাচন ইস্তাহার অনুযায়ী কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে না দেওয়ার জন্য আমলাতন্ত্রকে নিন্দা করেন। কংগ্রেসের মূলনীতিগুলি মন্ত্রীমণ্ডলের কার্য্যকলাপে অনুসৃত হোক—মহাত্মাজী তাহাই কামনা করেন।

কিন্তু তবু দুইটী প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডলের সহিত প্রাদেশিক লাটবাহাদুরের মিটমাট সম্ভবপর হ'ল। অনুরূপ বিবৃতি থেকে জানা যায় যত শীঘ্র সম্ভব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান সম্পর্কে প্রাদেশিক লাটবাহাদুর সম্মত হয়েছেন তবে তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয়গুলি ব্যক্তিগত ও পৃথক ভাবে আলোচনা। ইতিমধ্যে ইউ, পি ও বিহারে কিছু সংখ্যক রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়েছে—আনন্দের সংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন উঠে সত্যই কী কংগ্রেসীমন্ত্রীমণ্ডল সম্মানজনক রফায় সম্মত হয়েছেন! সত্যই কী কংগ্রেসের নীতি জয়যুক্ত হয়েছে? অদূর ভবিষ্যতে শনৈঃপন্থা অবলম্বনের ফলে রাজনৈতিক বন্দীরা ক্রমশঃ মুক্ত হত। অকংগ্রেসী মন্ত্রীপরিচালিত বাঙ্‌লায়ও ত রাজবন্দীরা ক্রমশঃ মুক্তি পাচ্ছেন! কিন্তু কোথায় গেল সেই আদর্শবাদ যার বলে কংগ্রেসের প্রত্যেক সভামঞ্চ হ'তে গুরুগম্ভীরস্বরে উচ্চারিত হয়েছিল 'আমরা চাই রাজনৈতিক বন্দীদের অচিরে ও একযোগে মুক্তিলাভ' 'আমরা চাই সকল দমন-নীতির প্রতিরোধ?' আপাতদৃষ্টিতে ছলে ও কৌশলে কংগ্রেস অধিবেশনে বামপন্থীদের আক্রমণ থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল রক্ষা পেলেও দেশের মুক্তি সংগ্রামে তাঁরা যে কলঙ্ক কংগ্রেস সৈনিকের ললাটে লেপন করলেন তা কে মোছাবে?

———:০(X)০:———

যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

গভীর বেদনাময়ী ছায়াচ্ছন্ন অশ্রু অন্ধকারে—
একাকী পথিক চলে আর চলে অরণ্যের মায়া,
যুগান্তের অভিশপ্ত ধূলিশয্যা পরে
পথিকের পদস্পর্শে কণ্টকিত লতাগুল্মরাশি—
রহি রহি উঠে মর্ম্মরিয়া।
উৎপীড়িত মানবাত্মা, ছিন্নান্তরে মারীমন্বন্তর—
দিকে দিকে শৃগাল ও সারমেয় দল
শবগন্ধে উল্লসিত করিতেছে বিকট চিৎকার।
অবোধ ঝিল্লীর দল অবিশ্রান্ত গান গেয়ে যায়
অরণ্যের অন্ধকারে ঝিকিমিকি জোনাকীরা
নেভে আর জ্বলে।

*　*　*

একাকী পথিক চলে—
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি আত্মসমাহিত,
অজাগরী কল্পনায় মৌনমুখে প্রতিভা—বিদ্যুৎ
বিচ্ছুরিছে জ্যোতির্ম্ময় আলো,
কেবা এ পথিকবর? কেনমৌনী? কোথা লক্ষ্য তা'র?
কি উদ্দেশ্যে ভয়াবহ ভীমারণ্যে একা—
চলে ক্ষুব্ধ যজ্ঞানল বহি মর্ম্মতলে?

*　*　*

সহসা নিঃশ্বাস পড়ে,
উন্মথিয়া অরণ্যের মৌন গম্ভীরতা,
কণ্ঠ হ'তে শোনা যায় অগ্নিময় জ্বলন্ত হুঙ্কার—
'হায় মাগো জন্মভূমি একী তোর বেশ ?
শ্মশানে কেন মা তুই শবাসীনা কঙ্কালি মালিনী ?
সপ্ত কোটি কণ্ঠ আজ কেন মাগো মূক পক্ষাঘাতে
কেন মা গাহেনা তা'রা "বন্দেমাতরম্" ?
পথিকের দুনয়নে ঝর ঝর ঝর
বহে তপ্ত অশ্রুর প্লাবন।

*　*　*

যথার্থ ব্রাহ্মণ গাহে—
হে সন্তান বল বল বন্দেমাতরম্ ?
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে পৃথিবীর দ্রুত আবর্ত্তনে—
বল বল বন্দেমাতরম্ !
গ্রহে গ্রহে চেতনার স্পন্দনে স্পন্দনে—
বল বল বন্দেমাতরম !
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কাঁপে তরঙ্গিয়া—
মুক্তি মন্ত্র বন্দেমাতরম্ !
দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে হিমাদ্রীর কঠিন তুষারে—
উঠে ধ্বনি বন্দেমাতরম্ !

*　*　*

আবার পথিক চলে—
শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত শান্ত বন পথে ;
অদূরে মন্দিরে যথা দশভূজা সুবর্ণ প্রতিমা—
বিরাজেন মহামায়া সন্তানের ইষ্টদেবী রূপে—
দুর্গতিহারিণী দুর্গা দেশমাতৃকার মূর্ত্তি ধরি'।
পথিক চলিছে সেথা মাতৃপদে আত্মাহুতি দিতে—
হুঙ্কারিয়া বল বল বন্দেমাতরম্ !

*　*　*

পথিক এ ভারতের প্রথম সন্তান—
প্রথম যজ্ঞের হোতা প্রথম পূজারী ;
প্রথম গাহিয়া মাতৃবন্দনার গান,
প্রথম ঢালিয়াছিল অশ্রু অর্ঘ্য বারি।
পথিক বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সম্রাট
প্রথম স্বদেশ ভক্ত ; "বন্দেমাতরম্"
বৈশ্বানরী বীজমন্ত্রে করি নান্দীপাঠ—
জ্যোতির্ম্ময় শুভপন্থা দেখাল পরম ॥

*　*　*

হে ভারত হতভাগ্য, তবু কত সৌভাগ্য তোমার ?
বহু পুণ্যে তপস্যায় পেয়েছিলে এহেন সন্তানে ;
যে তোমার নির্য্যাতনে করেছিল প্রচণ্ড হুঙ্কার,
শুভঙ্কর দ্রষ্টা রূপে মাতি বন্দেমাতরম্ গানে।
আজো সে প্রবল আত্মা ব্যোমপথে করে বিচরণ,
জলদ গম্ভীর মন্দ্রে উচ্চারিয়া রাগিনী অদ্ভুত,—
'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ আজ বল বল **বন্দেমাতরম্**,
শুনি তা'র প্রতিধ্বনি গ্রহে গ্রহে চমকে বিদ্যুত ?

—*—

রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)

রাণীবালা

সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

চিত্র-নির্ম্মাতা : কালী ফিল্মস
প্রযোজক : প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী
কথা ও কাহিনী : শচীন সেনগুপ্ত
পরিচালনা : সতু সেন
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী : মধু শীল
চিত্র-শিল্পী : সুরেশ দাস
শব্দ-শিল্পী : জগদীশ বসু
কারু-শিল্পী : পরেশ বসু
সুর-শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত

চরিত্র-লিপি : ডাঃ প্রাণধন—জীবন গাঙ্গুলী, মথুর—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বিমল—জহর গাঙ্গুলী, মিঃ চৌধুরী—ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, ফালারাম—মণি সেন, বামাপদ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, হারু—সত্য মুখার্জ্জি, প্রমথ—ললিত মিত্র, মহেন্দ্র—সন্তোষ সিংহ, চামেলী—রাণীবালা, শেফালি—ঊষা দেবী, বনলতা—বীণাপাণি, শ্রীমতী—সাবিত্রী, আন্নাকালী—ব্র্যাকী প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা', ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৪৮

নূতনত্বের দিক থেকে কালী ফিল্মসের উৎসাহ চিরদিনই সবায়ের অনুকরণীয়। বাঙলার চিত্রামোদীদের নতুন রসে সিঞ্চিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর অদম্য চেষ্টা—চিত্ররাজ্যে তাঁকে রেখেছে বরণীয় কোরে। বহুপ্রকার নতুনত্বের আমদানির ভেতর বাঙলার চিত্ররাজ্যে পূর্ণ দৈর্ঘ্য হাসির ছবির প্রবর্ত্তনের জন্য গাঙ্গুলী মশাইয়ের নাম ছায়াছবির ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে এবং আজ যে ছবি 'উত্তরা' চিত্রগৃহে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত কোরেছেন তা' দেখে লোকে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ কোরছেন। নিরানন্দময় বাঙলার জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও দুঃখ থেকে বহুদূরে টেনে এনে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তিনি যে হাস্যরসের স্রোতে তাদের হাবুডুবু খাইয়েছেন—যাঁরা লোকের আনন্দ বিতরণের জন্য ব্রতী হ'য়েছেন, তাঁদের পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়!

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব" একখানি নতুন ধরণের 'কমেডি'। ফাগুনের আগুন হাওয়ায় শন্ শন্ কোরে ছোটে প্রেমের পঞ্চশর—বুক বেঁধে পাঁচ জোড়া নর-নারীর—মদন দহনে তারা হয় উতলা। পাঁচ জোড়া প্রেম-পাগল সারাদিন পথে পথে ঘুরে সন্ধ্যায় সন্ধান পায় "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসবে"-র—সেই উৎসবে তারা মেতে ওঠে—জীবন তাদের মিলন তাদের সুন্দর হয়, সার্থক হয়। এই ঘটনাটিকে শক্তিশালী লেখক শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অভিনব উপায়ে সংগ্রথিত কোরে বাঙলার চিত্র-গল্প লেখার লোক এখনও যে আছে

জহর গাঙ্গুলী

পদ্মাবতী

তা' সপ্রমাণ কোরেছেন। কাহিনীটি যেমনি সরস তেমনি আরও হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছে শচীন্দ্রনাথের সুমধুর সংলাপের গুণে। কাহিনীটি অনেক জায়গায় অনেকের হয় ত' সামান্য অশ্লীল বলে মনে হবে—কিন্তু শচীন্দ্রনাথ পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে এমন সব জায়গায় এই সব কথা প্রয়োগ কোরেছেন—যা'তে কারুর কিছু অভিযোগ করবার থাকতে পারে না। সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক যে অশিষ্টাচারের অভিনয় চলেছে হাল্কা-রসের ভেতর দিয়েই সেই দুষ্কৃতি লোকের চোখের সাম্‌নে লেখক উপস্থিত কোরেছেন।

ছবিখানার পরিচালনা হ'য়েছে বেশ ঝরঝরে তকতকে। পরিচালনার ভেতর অনাবশ্যক কেরামতি দেখিয়ে ছবিকে গতিহীন কোরে তাকে পঙ্গু কোরে দর্শকদের রসের ব্যাঘাত ঘটাবার চেষ্টা পরিচালক সতু সেন একেবারেই করেন নি। সেই জন্যই তাঁর পরিচালনা সবাইকে কোরেছে খুশী।

আলোকচিত্রী সুরেশ দাসের ছবি তোলার কাজ ভালই হ'য়েছে। ছবির ভেতর আগাগোড়া তিনি সাদা-কালোর সামঞ্জস্য রক্ষা কোরেছেন তা' সত্যই

প্রশংসনীয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ছবির রসায়নাগার-শিল্পীদের কাজ অতি জঘন্য হ'য়েছে—যারা এ সম্বন্ধে জানেন না তাঁরা হয়ত' বেচারী আলোকচিত্র-শিল্পীকেই দোষারোপ কোর্‌বেন।

ছবিখানির গানের সুর ভালই লাগল। কিন্তু আবহাওয়া সঙ্গীত বিশেষত্ব বর্জ্জিত। আলোক-নিয়ন্ত্রণে সুরেন চ্যাটার্জ্জি এবং সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জিকে অপ্রশংসা করবার কিছু নেই।

ছবিখানিতে ছোটবড় অন্যূনপক্ষে প্রায় চৌত্রিশটি চরিত্র আছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা যে, মাত্র দু'টি ভূমিকা ছাড়া ছোট বড় সব ভূমিকার অভিনেতৃই বিশদভাবে উৎরে গেছেন। যে দু'টি ভূমিকা সাধারণের মনস্তুষ্টি কোরতে পারে নি তার মধ্যে বিশেষভাবে আমাদের হতাশ কোরেছে মিস্ বনলতার ভূমিকা-ভিনেত্রী বীণাপাণি। তার চেহারা, তার হাবভাব, তার আধআধ কথাবার্ত্তা সব সময়েই দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন কোরছে। এই অভিনেত্রীটিকে ঐরূপ একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় মনোনয়ন করা আমরা কিছুতেই কর্ত্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির প্রশংসা কোরতে পারছি না। মণি সেনের 'ফ্যালারাম' অভিব্যক্তির দিক থেকে প্রশংসনীয়। কিন্তু বাচনের অস্পষ্টতার জন্য চরিত্রটিকে কেউ ভালভাবে গ্রহণ কোরতে পারে নি। এইবার আমরা যে সকল চরিত্র বিশেষভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছে তারই উল্লেখ কোরব। জীবন গাঙ্গুলীর 'প্রাণধন', ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের 'মথুর', ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জির 'মিঃ চৌধুরী', জহর গাঙ্গুলীর 'বিমল', রাণীবালার 'চামেলী', ঊষা দেবীর 'মিস্ শেফালী' ও সাবিত্রীর 'শ্রীমতী'। জীবন গাঙ্গুলীর পাদরীর রূপ

ঊষা দেবী

সজ্জায় ও মিস্ বনলতায় বেশ দর্শকগণকে চমৎকৃত কোরেছে। ধীরাজের মেমসাহেব বেয়ারা ও বৈরাগীর ছদ্মবেশ সবাইকে যেমনি হাসিয়েছে তেমনি মুগ্ধ কোরেছে। ওসমানরূপী জহর এক কথায় সুন্দর। কেতা-দোরস্ত মিঃ চৌধুরীরূপে ডাঃ হরেণের অভিনয় নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয় না। অভিনেত্রী চামেলীকে ফুটিয়ে তুলেছে রাণী চরিত্রোপযোগী কোরে। আধুনিক কুমারী শেফ প্রেমের-টাগ-অফ্-ওয়ারে জয়ী না হ'লেও এই চরিত্রটির মর্য্যাদা ঊষা পূর্ণভাবে রক্ষা কোরেছেন। সাবিত্রীর 'শ্রীমতী' লেখকের কথা চমকেই সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ললিত মিত্র, সন্তোষ সিংহ, সত্য মুখার্জ্জি, নবদ্বীপ হালদার, পদ্মাবতী, সুহাসিনী প্রভৃতি যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন ততটুকুই লোকরঞ্জনে সমর্থ হ'য়েছেন। আর একটি ভূমিকা সবাইকে খুব হাসিয়েছে—সেটি হ'চ্ছে ব্ল্যাকীর 'আন্নাকালী'।

মোট কথা, ছবিখানা দেখে আমরা বিশেষভাবে প্রীত হ'য়েছি। ছবিখানা দেখে আমরা প্রাণভরে হেসেছি—আর বাইরে এসে ভেবেছি লেখক তরুণ বাঙলার ছেলেমেয়েদের ও সমাজের ছদ্মবেশধারী মহাত্মাদের ওপর যে কষাঘাত কোরেছেন তা' সত্যই প্রণিধানযোগ্য। "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব" সাধারণে যেভাবে গ্রহণ কোরেছেন তা' দেখে মনে হয়, 'উত্তরা' চিত্র-গৃহ অন্ততঃ বেশ কিছুদিন এই উৎসবে মশগুল থাকবে।

জীবন প্রভাত

বোম্বে টকীজের নবতম অবদান "জীবন প্রভাত" গেল রবিবার সকালে প্যারাডাইস সিনেমায় একটী বিশেষ প্রদর্শনীতে সহরের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের দেখানো হয়েছে। আগামী ১২ই মার্চ্চ শনিবার দিন থেকে প্যারাডাইসে সর্ব্বসাধারণকে ছবিখানি দেখানো হবে।

সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছবির কাহিনী গাঁথা হয়েছে। ব্রাহ্মণের মেয়ে উমা ও সমাজের নিচু স্তরের ছেলে রামু ছোট বেলা থেকে পরস্পরের সান্নিধ্যে হেসে খেলে বড় হয়ে উঠেছে এবং সামাজিক ব্যবধান থাকা সত্বেও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রামু উমাকে ভাল বেসেছিলো। কিন্তু উমার একদিন বিয়ে হোল তাদের স্বঘরেরই এক ছেলে, নন্দলালের সঙ্গে এবং সে গেল হাসিমুখেই স্বামীর ঘরে। কিন্তু রামু তার পুরানো দিনের স্মৃতি কিছুতেই ভুলে যেতে পারলো না। নাটকের মোড় একটু ঘুরলো এইখানে।

দিন যায়—নন্দলালের বাপ শ্যামলাল নাতির মুখ দেখতে পেলেন না—তাঁর শেষ দিন বড় কষ্টেই কাটলো এবং ছেলেকে তিনি প্রকারান্তরে অনুরোধ জানিয়েই গেলেন আবার বিয়ে করতে। নন্দলাল অত্যন্ত ভাল বেসেছিলো উমাকে—তাই সে কিছুতেই আবার বিয়ে করতে রাজী হয় না। কিন্তু উমা তার শ্বশুরের শেষ দিনের কথাগুলো ভোলেনি। তাই সে নিজেই একরকম জোর করে আবার বিয়ে দিলে সে তার নিজের স্বামীর।

তার পরে! এইখানেই হোল নাটকের সুরু। নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে

চারটী নরনারীর চারটী কেন; পাঁচটী,—রামু, উমা, নন্দলাল, পদ্মা (নন্দলালের দ্বিতীয় স্ত্রী) এবং শোনিয়া জীবনের যে কি হোল তাই ছবিতে বেশ ফুটে উঠেছে। শোনিয়া ভাল বাসতো রামুকে।

ছবির টেকনিক্যাল গুনাগুন সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই শুধু এইটুকুই বললেই হবে যে তা অনিন্দানীয়। বিশেষ করে ছবিতে ক্যামেরার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা যেতে পারে।

নায়িকার ভূমিকায় দেবিকারাণীর অভিনয় হয়েছে অপূর্ব্ব। চিত্র জগতে নবাগত কিশোর সাহু প্রথমবারেই বেশ ভাল উতরে গেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মমতাজ আলী (রামু) ও মায়া দেবীর (শোনিয়া) নাচ ও অভিনয় সকলেরই তৃপ্তি সাধন করবে। রেণুকা দেবী—যিনি পদ্মার অংশে আত্মপ্রকাশ করেছেন—এখনো আড়ষ্ট মনে হোল। ছোটখাটো ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত।

ছবিতে এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। হোলির গান হোলির দৃশ্য আমাদের ভাল লেগেছে।

হোলীর ঠিক আগেই ছবিখানিকে মুক্ত করে প্যারাডাইসের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কাপুরচাঁদ লিঃ সহরের হোলী বিলাসী লোক সমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করার সহায়তা করেছেন।

ছবিখানি বাঙ্গালী দর্শকদেরও যে বিশেষ খুসী করবে—তা নিঃসন্দেহ।

নিউ থিয়েটার্স

চিত্রায় বিদ্যাপতি-র মুক্তি-প্রতিক্ষার অবসান হ'তে আর বিশেষ বিলম্ব নেই। খুব সম্ভব এই মাসের শেষ সপ্তাহে 'বিদ্যাপতি' সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

সারা ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত আজ শুধু শোনা যায় বিদ্যাপতির কথা, বিদ্যাপতির গান, বিদ্যাপতির পরিচালনায় উৎকর্ষ, বিদ্যাপতির গঠন প্রণালীর অভিনবত্ব; এমনভাবে ভারতের সকল প্রদেশে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর অভিনন্দন লাভ খুব কম ছবির অদৃষ্টেই ঘটেছে।

উৎকৃষ্ট অভিনয়, দৃশ্য পটাদির সমাবেশ এবং নৃত্য গীতের মাধুর্য্য—সকল গুণের সমন্বয়ে নিউ থিয়েটার্সের এই চিত্রখানি বাঙলার আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তর যে সহজে জয় কোরতে পারবে, একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবি এনেছিলেন বুক ভরা প্রেম। সে প্রেমে পঙ্কিলতা ছিল না। রাণী লছমী তা'তে আত্মসমর্পণ কোরলেন। রাজা চেয়েছিলেন প্রেমের মন্ত্র—রাণীর অবরুদ্ধ অন্তরে আলোকপাত কোরতে। রাজা ও রাণী যা' পাননি—তাই পেয়েছিল অনুরাধা। তার অখণ্ড বিশ্বাস! বৃদ্ধ মধুসূদন দাদা স্নেহ ও মমতার ঐশ্বর্য্যে অন্তরখানি তার কানায় কানায় ভরা—তা'র সঙ্গে মিশেছিল কৃষ্ণপ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা! মূর্খরাজ বিদূষক—অন্তরে তার শুধু অবিশ্বাস! তাই সে সারা-জীবন শুধু মরীচিকার পিছনে ছুটেই কাটালো! লবঙ্গলতা ও পিতাম্বর—যথাক্রমে প্রভু-পত্নী ও পেয়ারের ভৃত্য! ছেলে-খেলা কোরতে গিয়ে বিদূষকের অন্তরে দিল সন্দেহের বিষ ঢেলে।

এমনি সব কত ঘটনা, নাটকীয় গতি-বেগে বিদ্যাপতি কথা-চিত্রকে সুমোহন কোরে তুলেছে। দেবকী বসুর পরিচালনা ও রাই বড়ালের সুর-সংযোজনায়—ছবিখানি নিউ থিয়েটার্সের মর্য্যাদাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলেছে। বাঙলা বিদ্যাপতি দেখলে আপনারা

নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" চিত্রে মলিনা

বুঝতে পারবেন আমরা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করিনি।

* * *

হিন্দু ও মুস্লিম—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার এবং সংস্কারগত বহু অনৈক্য বর্ত্তমান থাকলেও, মানবতার আদর্শে, অন্তরের দিক দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সে একটি প্রীতি-মধুর সম্বন্ধ গোড়ে উঠতে পারে—অভিজ্ঞান চিত্রের গল্পাংশে আমরা তারই পরিচয় পা'ব।

হিন্দু নারী সন্ধ্যা, দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক অপহৃতা হোয়েছিল। একটি মুস্লিম তরুণী তা'কে উদ্ধার করে। এবং শুধু তাই নয়, ভগিনীর স্নেহ দিয়ে সন্ধ্যার বন্দিনী জীবনে সে আশার সঞ্চার কোরেছিল।

সুতরাং এই শ্রেণীর নারীর কাহিনী ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হলে সমাজের পক্ষেও যে বিশেষ কল্যাণকর হবে, একথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিখানি সমাপ্তির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

* * *

২ নম্বর ষ্টুডিওতে বড়ুয়ার পরিচালনায় নিয়মিতভাবে তাঁর সামাজিক ছবির চিত্রগ্রহণ চল্ছে। গত সপ্তাহ থেকে নায়িকা ইন্দিরার বাড়ীর ড্রইং রুমের একটি দৃশ্য তোলা হচ্ছে। এর পরেই অপর একটি সেটে এটর্নী অম্বিকা প্রসাদের লাইব্রেরী কক্ষের দৃশ্যাদি তোলা হবে। অম্বিকা প্রসাদের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী এবং তার পুত্রের ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

* * *

"দেশের মাটির কাজও খুব নিয়মিত-ভাবেই চল্ছে। গত সপ্তাহে কয়েকটি বাইরের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়। পরিচালক ও কর্ম্মীবৃন্দের উৎসাহের অন্ত নেই। সকলের মুখেই হাসি। তারই সঙ্গে হচ্ছে চিত্রগ্রহণ। নায়ক অশোকও তার স্বীম্কে পরিপূর্ণ হতে দেখে খুসী। গ্রামের লোকজন তার কথামত কাজ করে চলেছে, কিন্তু এমন সময়ে এলো কালবোশেখীর ঝড়, ভবিষ্যৎ ভেবে সকলেই আতঙ্কিত। অজয়ও পুনঃ তার বোনকে নিয়ে গ্রামে এল। সঙ্গে নিয়ে এল নূতন পরিকল্পনা। কী সেই পরিকল্পনা তা জানতে হলে আরও অপেক্ষা কর্ত্তেই হবে। নইলে তা পূরণের কোনই উপায় নেই।

* * *

তরুণ পরিচালক ফণি মজুমদার এতাবৎ বড়ুয়ার সহকারীরূপে কাজ করে এসেছেন। মিষ্টভাষী মজুমদার স্বীয় চরিত্র-মাধুর্য্যে ষ্টুডিও মহলে খুবই পরিচিত। এবং এ খবরে সকলেই আনন্দিত হবেন যে, শীঘ্রই তিনি স্বয়ং একখানা ছবি পরিচালনা কর্‌বেন। এ পর্য্যন্ত তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন তাতে তাঁর হাতে ছবির সাফল্য সম্বন্ধে আমরা খুবই আশা কর্ত্তে পারি। তাঁর প্রথম ছবি হবে হিন্দি।

কালী ফিল্মস

"চোখের বালি"-র নিয়মিত শুটিং যাতে এই হপ্তা থেকে শুরু হয় কর্ত্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থাই কোরছেন। ছবিখানার অর্দ্ধেক প্রায় শেষ হ'য়েছে। অবশিষ্টাংশ মার্চ্চের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। ছবিখানা যা'তে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" উপন্যাসের মতই সুনাম অর্জ্জন কোর্‌তে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সুবিজ্ঞ কর্ণধার প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। ছবিখানা সম্পূর্ণ ভদ্রঘরের নর-নারীর দ্বারা অভিনীত হচ্ছে—এ খবর আপনাদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি। সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া অভিনেত্রীদের মধ্যে যে তিনটি মেয়ে চিত্ররাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিতা হ'য়েছেন তাঁদের মধ্যে দুটি সুপভা মুখার্জ্জি ও ইন্দিরা রায় এই চিত্রে দু'টি বিশিষ্ট ভূমিকায় নাম্‌ছেন। ছবিখানার পরিচালনা কোরছেন কলাকুশলী পরিচালক সতু সেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী এই ছবির শব্দ-সংযোজনা কোরছেন। আলোকচিত্রের কাজে ব্রতী আছেন বাঙলার অভিজ্ঞ চিত্র-শিল্পী ননী সান্যাল। মিঃ বি পি মেহরা ছবিখানার তত্ত্বাবধান কোরছেন। এই সবের যোগাযোগে "চোখের বালি"-র সাফল্য সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত।

দীনু পিক্‌চার্স

কালী ফিল্মসের উদ্যোগে এই ইউনিটের দ্বিতীয় অবদান "মহামায়া"-র শুটিং শীঘ্রই আরম্ভ হবে। "মহামায়া" ভক্তিমূলক গীত-বহুল কাহিনী। সুসাহিত্যিক আশুতোষ সান্যাল এই কাহিনীটি সংগ্রথিত কোরেছেন। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ননী সান্যাল এই ছবিখানা পরিচালনা কোরবেন। সিনেমা-শিল্পের প্রারম্ভ থেকে সান্যাল মশাই এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন—তা'তে এই সময় তিনি পরি-চালকের দায়িত্বপূর্ণ পদে ব্রতী হবার যোগ্য বলেই আমাদের মনে হয়। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে তিনি উড়িয়া ছবি "সীতার বনবাস" পরি-চালনা কোরেছিলেন এবং তা'তে তার শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া গেছে। সান্যাল মশাই সম্প্রতি ছবিখানার মহলা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই ছবির চরিত্র নির্ব্বাচন এখনও সম্পূর্ণ না হলেও দু'টি বিশিষ্ট চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ কোরবেন তুলসী লাহিড়ী ও কমলা (ঝরিয়া)। ছবিখানার শব্দগ্রহণ কোরবেন মধু শীল এবং পরিচালক স্বয়ং আলোকচিত্রের কাজ কোরবেন। আমরা ননী সান্যালের এই নতুন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

মতিমহল থিয়েটার্স

এদের হাসির ছবি "বেকার নাশনের"-র

সুটিং জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জির পরিচালনায় আরম্ভ হ'য়েছে। ছবিখানিতে রাণীবালা, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায় প্রভৃতি প্রধান ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

দেবদত্ত ফিল্মস

'রবীন্দ্র নাথের "গোরা" নরেশ মিত্তিরের পরিচালনায় তোলা সুরু হ'য়েছে। ছবিখানার মূল ভূমিকায় কে কে নামছেন তা' আমরা বহুপূর্ব্বেই সকলকে জানিয়েছি। কেবল 'সুচরিতা' ভূমিকানেত্রীর নাম আমরা সঠিক এতদিন জানাতে পারেনি। এখন শুনছি এই ভূমিকার জন্য মনোনীতা হ'য়েছেন বীনাপাণি। এর চেয়ে 'ট্র্যাজেডি' আর কী হ'তে পারে! লোকে ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে। নরেশ বাবু শিখবেন কিসে?

প্রফুল্ল পিক্‌চার্স

আগামী ১২ই মার্চ 'শ্রী' চিত্রগৃহে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বাংলা বাণী-চিত্র "পথের শ্রমিক" মুক্তিলাভ কোরবে। প্রফুল্ল ঘোষ একজন গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, তাঁর ষ্টুডিওর তোলা এই হাসির ছবিখানি সকলেরই মনকে কোরে তুলবে খুশী।

মেট্রোপলিটন পিক্‌চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য কর্ণধার মিঃ বি, এল খেমকার তত্ত্বাবধানে এদের প্রথম হাসির ছবি "হাল বাঙলা" আগামী শনিবার ১২ই মার্চ 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। হাস্যরসাত্মক ছবি তুলতে যে ডি-জি ওস্তাদ একথা বোধ হয় তাঁর শত্রুও অস্বীকার কোরবেনা। এ ছাড়া ছায়া ও ডি-জি প্রভৃতি অভিনেত্রী সমাবেশও ছবিখানার অন্যতম আকর্ষণ।

চারু রায়ের পরবর্ত্তী

শোনা যাচ্ছে চারু রায় ম্যাডান ষ্টুডিওতে একখানা বাঙলা ছবি তুলবেন। এর বেশী কোন খবর আপাততঃ আমাদের জানা নেই।

'মুক্তি' চিত্রের রজত-জয়ন্তী

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

প্রতিযোগীতায় সমস্ত চিত্রকে পরাজিত করিয়া নিউ থিয়েটার্সের বহু-প্রশংসিত কথা-চিত্র "মুক্তি" আজ চিত্রায় পঞ্চবিংশ সপ্তাহে পদার্পণ করিল। একই চিত্রগৃহে একাধিক্রমে পঞ্চবিংশ সপ্তাহ চলিবার গৌরব লাভ করা, বাঙলার ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে বড়ো কম কথা নহে। সেই গৌরবের স্মৃতি অক্ষয় করিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য এই সপ্তাহ হইতে চিত্রায় মুক্তির "রজত-জয়ন্তী" উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এ দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে মুক্তি-র এই বিজয় অভিযানের কাহিনী অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে মাত্র আর চারখানি বাঙলা কথা-চিত্র, ২৫ সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। সে ক'খানির নাম:

নিউ থিয়েটার্সের চণ্ডীদাস

চিত্রা: ২৭শ সপ্তাহ

ভারত লক্ষ্মীর চাঁদসদাগর

ক্রাউন: ২৮শ সপ্তাহ

রাধা ফিল্মস্-এর দক্ষ-যজ্ঞ

বর্ণওয়ালীশ: ২৯ সপ্তাহ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস-এর সোনার সংসার

উত্তরা: ৩১ সপ্তাহ

১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি, প্রতিযোগীতায় নিউ থিয়েটার্সের "মুক্তি" বহুচিত্রের দীপ্তিকে ম্লান করিয়া নিজের একাধিপত্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে নানা কারণে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় "মুক্তি" চিত্রের এই অভাবিত সাফল্যের মূল কারণগুলি এই:—

১ চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের চিত্তহরণ করিবার উপযোগী 'মাল-

প্রযোজক—বীরেন্দ্র নাথ সরকার

মশলার' প্রাচুর্য্য (super abundance of Entertaining elements)

২। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অভিনবত্ব (আর্ট এবং টেকনিকের দিক দিয়া এই চিত্রখানি যে ছায়া-চিত্রের আদর্শ পুরা মাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে একথা অতি নিন্দুকেও স্বীকার করিবে)

৩। চিত্তহারী অভিনয় ও সঙ্গীতের মাদকতা (সুন্দর সংলাপ এবং সু-অভিনয় এবং অপর দিকে অপূর্ব্ব সুরের ইন্দ্রজালে 'মুক্তি'র সঙ্গীতাংশ সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের অন্তরে

কাননবালা

"মুক্তি" চিত্রের একটি দৃশ্য

ডিরেক্টর—প্রমথেশ বড়ুয়া

স্থায়ীভাবে রেখাপাত করিয়াছে। বেতারে, পারিবারিক বৈঠকে, গ্রামোফোনে এমন কি রাস্তাঘাটে চলিতে, পঙ্কজ মল্লিক এবং কাননবালার সুকণ্ঠের গানগুলি যেন রাতারাতি আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

৪। প্রচার কার্য্যের অভিনবত্ব (এই চিত্রের প্রচার কার্য্যে প্রচার-শিল্পী হেমন্ত বাবু সূক্ষ্ম রসবোধ ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মুক্তি চিত্রের সাফল্যের মূলে প্রচার-নৈপুণ্য অনেকখানি সহায় হইয়াছে)।

এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া সারা ভারতে সর্ব্বশ্রেণীর রসবেত্তার অভিনন্দন লাভ করিয়াছেন। নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন, যে যে গুণ থাকিলে একজন প্রথম শ্রেণীর ফিল্ম-অভিনেতা হওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বড়ুয়া সাহেবের মধ্যে বর্ত্তমান।

'মুক্তি'র নায়িকা—কানন দেবী। অভিনয়ে ও সঙ্গীতে তিনি যে আজ প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীনা—মুক্তিতে তাহার প্রমান পাওয়া গিয়াছে।

'মুক্তি' চিত্রের উপ-নায়িকা শ্রীমতী মেনকা এত উচ্চ স্তরের অভিনয় করিয়াছেন যাহার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—চিত্র-রাজ্যে তাঁহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।

মুক্তি-চিত্রের ছোট বড়ো সকল চরিত্রই সু-অভিনীত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

মিঃ মল্লিক ... ... শৈলেন চৌধুরী
বিপুল গুপ্ত ... ... ইন্দু মুখোপাধ্যায়
বিপুলের জননী ... দেববালা
সরাইখানার মালিক ... পঙ্কজ মল্লিক
সর্দ্দার ... ... অমর মল্লিক
কুলি ... ... অহি সান্যাল

মুক্তি-র প্রযোজক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার এই চিত্রের সাফল্যের জন্য আজ শিল্প রসিকমাত্রেরই অভিনন্দন লাভ কোরেছেন। নিউ থিয়েটার্সের ছবিগুলি আজ ভারতের ছায়া-চিত্রের দরবারে যে শ্রেষ্ঠ সম্মানের দাবী কোরতে পেরেচে, এর মূলে আছে তাঁর আন্তরিকতা, সুক্ষ্মরসবোধ এবং আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষমতা। তাই নিছক আনন্দ পরিবেশন ছাড়াও, নিউ থিয়েটার্সের ছবিগুলির মধ্যে আমরা পাই আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা সংস্কৃতি ও গভীর রসবোধের পরিচয়।

আজ মুক্তি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিনন্দন লাভ করিয়া "মুক্তি" আজ তাঁর জয়যাত্রাপথে 'জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিতে অগ্রসর, আশাকরি তাঁহারাও এই স্মরণীয় সপ্তাহে, সপরিবারে আবার "মুক্তি" দেখিতে আসিবেন। আর যাঁহারা এখনও "মুক্তি" দেখেন নাই, বা দেখিবার অবকাশ পান নাই—তাঁহাদের এই চিত্রখানি উপভোগ করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

বাঙলায় এই ছবিখানির পরিবেশনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন প্রাইমা ফিল্মস্

মেনকা

লিমিটেড এবং তাঁহাদের ব্যবসা পরিচালনার গুণে "মুক্তি" চিত্র বাঙলার প্রতি সহরে, প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সিনেমাতেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে ও অদ্যাবধিও মহাসমারোহে চলিতেছে। ছায়া-চিত্রের ডিষ্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমি তাঁহাদের এই উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির তারিফ করি।

"মুক্তির" গৌরবোজ্জল ইতিহাস

অবশেষে "মুক্তি" চিত্রায় পঞ্চবিংশ সপ্তাহে পদার্পণ করিল। যেহেতু 'মুক্তি' ২৪শ, সপ্তাহব্যাপী জনপ্রিয় 'চিত্রা'-প্রেক্ষাগৃহ দর্শককে পরিপূর্ণ আনন্দ দান করিয়াছে সেই হেতু আজ হয়তো অনেক বিরুদ্ধবাদী সমালোচক অনেক কিছু গুন গান বা প্রশংসার বন্যা ছুটাইবেন। কিন্তু এ'কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না যে ১৮ই সেপ্টেম্বর চিত্রার রূপালী পর্দ্দায় 'মুক্তি' যে দিন তার জয় যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ সুরু করেছিলো, সেদিন এই সব তথাকথিত সমালোচকের দল মুখে ক্রুর হাসি নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা দিয়ে তার জয়যাত্রার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু বিধির বিধানে সেই বিরুদ্ধ সমালোচনাই তার পথকে করলে কুসুমাকীর্ণ। বাংলার এবং তাহার বাহিরের বাঙালী দর্শক সমাজ, বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজ, তাঁদের মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন যে বাঙালী দর্শক সমাজ এইসব তথাকথিত সমালোচকের অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ছবির ভালমন্দ বিচার করেন না—প্রকৃত ভালকে ভাল বলে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও সৎসাহস তাঁহাদের আছে।

এইখানে আমি একটা ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া পারি না। কোনও এক বিখ্যাত দৈনিকের সুবিখ্যাত সমালোচকের সমালোচনার বিরুদ্ধে আমার এক বন্ধুবর একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবাদ কোনও সুপ্রচারিত প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিকে পাঠান। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য প্রতিবাদটি আত্মপ্রকাশের গৌরব থেকে বঞ্চিত

পাবলিসিটি অফিসার—হেমন্ত চ্যাটার্জ্জী

হয়। সেই প্রতিবাদের শেষাংশ এখা উদ্ধৃত করিলাম—"আর একটা ক বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব চলচ্চিত্র যে লোক শিক্ষার বাহন একা

খুবই সত্য—সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন মুক্তি চিত্রের মধ্যস্থতায় বাঙ্গালীরা যাহাতে পরিপূর্ণভাবে ফিরিঙ্গীয়ানা শিক্ষা করতে পারে নিউ থিয়েটার্স তাহারি চেষ্টা করিতেছেন। ইহার উত্তরে আমার অনেক কিছু বলিবার থাকিলেও, বলিব না, কিন্তু অতি আধুনিক সমাজের ভিতর গলদ কোথায়, প্রগতিবাদী মেয়েদের পরিণাম কি—বাংলার অর্থবান লোকেরা কি করিয়া সাহেবীয়ানার মোহে পড়িয়া একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর জীবে পরিণতি হইতেছেন—এই সব আজ কালের অতি সত্য ব্যাপারগুলি কি পরিপূর্ণভাবে মুক্তি চিত্রে দেখান হয় নাই? পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থ অনুকরণে আজ আমরা দিশেহারা হইয়া—পাগলের মত ছুটাছুটী করিয়া কি বেড়াইতেছি না? স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের কি বিষময় ফল—এই সব সত্যগুলিই মুক্তি চিত্রে দেখান হইয়াছে, ফিরিঙ্গীয়ানা শিক্ষার জন্য নহে। এইসব ব্যাপারগুলি ভাল করিয়া না বুঝিয়াই সমালোচক মহাশয় তাঁহার রায় দিয়াছেন।

"মুক্তি" চিত্রের একটি দৃশ্য

যাহা হউক প্রতিকূলতা এড়াইয়া 'মুক্তি' আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হয়

উইমেনস ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস

উইমেনস ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টস এসোসিয়েশনের তৃতীয় বাৎসরিক অনুষ্ঠান ১১ই মার্চ্চ অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিযোগীগণ স্ব স্ব নাম ৮৬ কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়াই, এম, সি, এ-তে মিস্ পুষ্প মুখার্জ্জির নিকট লিখুন।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

গত রবিবার অপরাহ্নে মাননীয় বিচারপতি চারু চন্দ্র বিশ্বাস ভবানীপুর ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টারদ্বয় স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক ও রায় নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন। বর্ত্তমান ডিরেক্টার বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী মল্লিক ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যকলাপ সংক্ষেপে আলোচনা করিলে পর সভাপতি বিচারপতি বিশ্বাস মহাশয় আবেগময়ী বক্তৃতায় তাঁহাদের অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, মিঃ পি. ব্যানার্জি, কাউন্সিলার ধরণী কান্ত বসু, কাউন্সিলার ফণীন্দ্র নাথ ব্রহ্ম, ডাঃ প্রবোধ ব্যানর্জ্জি প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষে অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু, সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভবেশ চন্দ্র সেন ও তদীয় সহকারী শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্যাগতবৃন্দের পরিতুষ্টির জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন।

নাই। নিউ থিয়েটার্সের গৌরবময় পতাকাকে অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছে। তাই 'মুক্তির' রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে —নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার মিঃ বি, এন, সরকারকে, পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়াকে এবং নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মীবৃন্দকে এই গৌরবময় সাফল্যের জন্য আমি আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীনরেশ চন্দ্র ঘোষ
(প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেড)

—:—

সালিখা সুরমঞ্জিল

গত ৮ই ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যায় সালিখা সুরমঞ্জিলের প্রথম বৈঠক শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাওড়া ৩নং দশানী বাগান লেনস্থ "গনেশ কুটীরে" বসিয়াছিল। প্রোফেসর সতীশ চন্দ্র অর্ণব (পাঁচুবাবু,) শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও পরিতোষ দে যথাক্রমে সুললিত কণ্ঠে উচ্চাঙ্গের রাগ রাগিনীর দ্বারা সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

ই, বি, রেলওয়ে

এবছরও ই, বি, রেলওয়ে ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে যাতায়াতী কন্সেসন টিকিটের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অপরাপর রেলওয়ে ও ষ্টীমার সমূহের সঙ্গেও যোগ রাখিয়া সকল শ্রেণীর টিকিটই পাওয়া যাবে। আবার অবাধ ভ্রমন টিকেটেরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই টিকেট ১৫ দিন পর্য্যন্ত যাতায়াত চলবে। ৮ই এপ্রিল হইতে ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এই টিকেট পাওয়া যাবে—কিন্তু ২রা মে মধ্যরাত্রির পর এই টিকেট আর চলবেনা।

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডা: শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'জগুদা' নামে যে লোকটির কথা জগত্তারিণী বলিতে ছিলেন, এ লোকটি এখানকার বাসিন্দা নহে। কাশী হইতে জগত্তারিণী মেয়েকে দেখিতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছেন শুনিয়া, তিনি দেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। জগুদা, অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর, জগত্তারিণীর শ্বশুর মহাশয়ের আমলের পুরাতন কর্ম্মচারী।

জগত্তারিণীর শ্বশুর মহাশয় ছিলেন বড়-পুরের এক বিখ্যাত জমিদার। যজ্ঞেশ্বর মিত্র যখন বালক কালে হাড়ের উপর একখানি কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্ম ঝুলাইয়া ও কাঁধের উপর শতচ্ছিন্ন মলিন উত্তরিয় ফেলিয়া, প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি জমিদার তাঁহার অন্তর্নিহিত বুদ্ধির দীপ্ত ধরিতে পারিয়া তাঁহাকে জমিদারী কার্য্যে বাহাল করিয়াছিলেন। সে আজ অনেকদিনের কথা।

তাহার পর এই জমিদার গৃহস্থ সংসারে কত গৃহস্থালী কার্য্য ঘটিয়া গিয়াছে, যজ্ঞেশ্বর প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এই সংসারের এত অন্তরঙ্গ একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যে জমিদার মহাশয়ের পুত্রবধূ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। জমিদারবংশের গৃহকর্ত্রী স্বয়ং তাঁহাকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সেই অবধি যজ্ঞেশ্বর—জগুদা। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু সম্মান হারান নাই। এখনও তিনি—জগুদা।

জগুদা জমিদারী খাতাপত্রও যেমন বুঝিতেন গোপাল ভাঁড়ের গল্পও তেমনি আওড়াইয়া যাইতে পারিতেন। হাস্যরস ছিল তাঁহার আটপৌরে অভ্যাস, গাম্ভীর্য্য ছিল পোষাকী।

জগুদা যেদিন নীরদ বাবুর বাড়ীতে আসিলেন প্রভুপত্নী জগত্তারিণীর সহিত দেখা করিতে, সেদিন আর ফিরিতে পারিলেন না। দূরের রাস্তা, কাজেই তাঁহাকে সেদিন থাকিতে হইল।

অপরাহ্নে লবঙ্গ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। জগুদা লবঙ্গকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, তাহার বিষয়ে এক ছড়া মুখে মুখে রচনা করিয়া, আওড়াইয়া ফেলিলেন। এ শক্তিটি জগুদার অনেক দিনের। মুখে মুখে পদ্য রচনাই তাঁহার রসিকতার বিশেষত্ব।

জগুদা আওড়াইলেন:

'লবঙ্গ বঙ্গছাড়া একি রঙ্গ হেরি আজ!

কুরঙ্গিনী বন ছেড়ে ফিরে কেন পুরমাঝ?'

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল: বঙ্গছাড়া আবার কোথায় দেখলেন? চুঁচুড়া কি বঙ্গের বাইরে?"

জগুদা বলিলেন: না, চুচুড়া বঙ্গের বাইরে নয়! কিন্তু তুমিত চুচুড়ায় ছিলেনা, ছিলে কাশীতে! কাশী বঙ্গের বাইরে!"

লবঙ্গ বলিল: কাশী বঙ্গের বাইরে হলেও ঠিক বাহিরে নয়। কাশীতে অনেক বাঙ্গালী আছে। আপনার মত অনেক রসিক বুড়ো বাঙ্গালী সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

—কেবল আমাকেই পাওয়া যায়না! সেজন্য নিশ্চয়ই তুমি বিরহ সন্তপ্তা!

লবঙ্গ পেছপাও নয়! সে উত্তর করিল: "বুড়ো বয়ের জন্যে তরুণীরা কি বিরহ সন্তপ্তা হয়? সে হতেন, আপনার যদি বুড়ো গৃহিনী বেঁচে থকতেন!"

জগুদা বলিলেন আহা সখিরে! কি কথাই শুনালে? বুড়ী গৃহিনী যে কি জিনিষ, তুমি নব্যা তার কি মহিমা বুঝবে?

"দুধের চেয়ে ক্ষীর ভাল, চালের চেয়ে ভাত!

ছুঁড়ীর চেয়ে বুড়ী ভাল দিতে কিস্তি মাত।

তোমাদের দ্বারা কিস্তি মাতটা আর হয় না। জোর কিস্তিটা অবধি চলে! কিন্তু তাও ভয়ে ভয়ে, পাছে দাবা খোওয়া যায়!"

—তোমার দাবা কি এখনও খোওয়া যায় নি, ঠাকুর্দ্দা?

—কেন আমিকি তোর মতন? খেলা আরম্ভ—কর্ত্তে না কর্ত্তেই দাবা হারাবো?

কি রসিকতাই চলিতেছিল: কিন্তু তবু এই রসিকতার মধ্য হইতে একটা নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য ঘটনা, জগুদার শেষ কথা কয়টিতে আত্মপ্রকাশ করিল। লবঙ্গ তাহাতে আপনাকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না। মুখখানা তার হইয়া গেল মলিন—তাহাকে দুইতিনবার ঢোক গিলিতে হইল।

জগুদা এই ক্ষতটুকু সারিয়া লইবার জন্য খানিকপরেই বলিয়া উঠিলেন: তা, বাবা তোর খোওয়া যাবার নয়! একদিন সে আবার তোরই হবে! তুই যে বুদ্ধিমতী মেয়ে, —তোকে সে কিছুতেই ত্যাগ করতে পার্বে না!

লবঙ্গ বলিল:—সে আশা আমার নেই! আর আমিও তা চাইনা। সে এখন আমাকে এসে খোষামোদ করলেও আমি আর ফিরে যাবোনা। এটুকু বুকের বল আমার আছে, ঠাকুর্দ্দা!

—হাঁা, সে যেরকম কাণ্ড করেছে, তাতে ফিরে না যাওয়াই উচিত বটে! কিন্তু তবু—কি জানিস্!—তুই মেয়ে মানুষ! মেয়ে মানুষের স্বামী ছেড়ে থাকা একটা লাঞ্ছনা!

—মেয়েমানুষ স্বামী ছেড়ে থাকলে একটা দোষের কথা হতে পারে বটে! কিন্তু স্বামী যদি বিনাদোষে আপনার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তাহ'লে স্ত্রীর পক্ষে সেটা অন্যায় কেমন ক'রে হতে পারে?

জগুদা লবঙ্গর কথা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইলেন। খানিকটা চুপ করিয়াও রহিলেন তিনি। পরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন: কি জানিস্ লবঙ্গ। আমাদের হিন্দু সমাজ বড় কঠিন সমাজ! তারা দুর্ব্বল নারীজাতির উপর তত সহানুভূতি প্রকাশ করে না, যত করে পুরুষের উপর!

লবঙ্গ একটু উত্তপ্ত হয়ে বলিয়া উঠিল: সমাজ কি করে না করে সে খবর আমার নেবার দরকার নেই! আমার প্রথম বোঝাপড়া আমার নিজের স্বামীর সঙ্গে! সেইটেই আগে ঠিক হয়ে যাক্, তারপর সমাজের খবর নেবো!

জগুদা হঠাৎ বলিয়া বসিলেন "তোর স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়াটাতো অনেক এগিয়ে এসেছে লবঙ্গ।"

লবঙ্গ উত্তর করিল: অনেক এগিয়ে এলেও একেবারে ত শেষ হয়নি।"

—শেষ কি হয়নি? মাঝে যে কাণ্ডটা তোর স্বামী করলে, সেটাতেতো স্পষ্টই মনে হয়, তোর সঙ্গে তার শেষ সম্পর্কই ঘটে গেল!

—কি কাণ্ড করলে ঠাকুর্দ্দা?

—তুই শুনিস্‌নি? সে কথাতো গ্রামের লোক সকলেই জানে!

—কি? কই আমিতো কোন কথা শুনিনি!

—শুনিস্‌নি? এতবড় ব্যপার আমরা সকলেই জানি, আর তোরই সকলের আগে জানা উচিত, তুইই শুনিস্‌নি? কুড়লগাছার দীনু মিত্তিরের মেয়েকে'—

বলিতে বলিতে জগুদা থামিয়া গেলেন। সমস্তটা বলিবার প্রয়োজন তিনি বিবেচনা করিলেন না। লবঙ্গ সোৎসুক নয়নে জগুদা'র মুখের দিকে চাহিল—শেষ টুকু শুনিবার জন্য!

—বিয়ের কথা তুই শুনিস্ নি?

—বিয়ে? বিয়ে? তুমি কি বলচো?

—হ্যারে বিয়ে! তোর স্বামী দীনু মিত্তিরের মেয়েকে যে বিয়ে কর্লে!

—বিয়ে কর্লে? তুমি সত্যি বলচো?

—তোকে মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ কি? এই বোশেখ মাসে সে বিয়ে হয়ে গেলো।

—'বিয়ে হয়ে গেলো, বিয়ে হয়ে গেলো!'

বলিতে বলিতে লবঙ্গ সেইখানে বসিয়া পড়িল। এত বড় অপমানের ধাক্কা সে সহসা সহ্য করিতে পারিতে ছিলনা। সে মনে করিতে ইচ্ছা করিতেছিল, হয়তো জগুদা তাহার সহিত এখনও রহস্য করিতেছেন।

—ঠাকুর্দ্দা! আমায় সত্যি করে বলো, একথা সত্যি কিনা! আমার এটা জানা দরকার।

—লবঙ্গ তুই এত কাতর হয়ে পড়বি জানলে আমি তোকে বলতুমনা—দেখচি তোকে বলা আমার অন্যায় হয়েছে।

লবঙ্গর চক্ষুদুটি স্থির হইল। চক্ষুর দুই কোণে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত টল টল করিতে লাগিল, কিন্তু ঝরিলনা। অসামান্য ধৈর্য্যে লবঙ্গ তাহা ধরিয়া রাখিল।

জগুদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর ভাইও তোকে খবর দেয়নি?

—না।

—খবর আরকি দেবে? সুখবর হোতো, দিত। এতো আর সুখবর নয়!

লবঙ্গ কোন কথা কহিলনা।

—জামাইটার বুদ্ধি শুদ্ধি তো কোন কালেই ভাল নয়! তার ওপর কুলীন কায়স্থর

ছেলে! বাপ পিতামহর ধারা যাবে কোথায়? যেমনি এক অরক্ষণীয়া কন্যার পিতা গিয়ে হাজির হয়েছে, অমনি 'কাঙাল ভাত খাবি,—না, আচাবো কোথা' করলে!

লবঙ্গ একথা শুনিয়াও কোনও কথা কহিলনা, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জগুদা আরও বলিয়া যাইতে লাগিলেন: শুনলুম না কি, কিছু টাকা পেয়েছে! কেউ বলে পাঁচশো,—কেউ ব'লে হাজার খানেক! তা—যাই পাক, তাব'লে কি ফের আবার বিয়ে করা উচিত হয়েছে!

লবঙ্গ তবু কথা কহেনা! নিথর পাষাণের মত স্থির সে!

জগুদা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আরে একটা বউ রয়েছে, সেটাকেই তুই খেতে দিতে পারিস্‌নে! দুমুটো ভাত দিতে হবে বলে সেটাকেই তুই বাড়ী থেকে দূর করে দিলি! নিজে একপয়সা রোজগার করিস্‌নে,—দাদার কাঁধের ওপর ঝুলে বেড়াচ্ছিস্‌! আজ যদি তোর দাদা তোকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, কাল তোকে দাঁড়াতে হবে পথের মাঝে তোর এমন আক্কেল নেই,—তুই দু'দুটো বিয়ে করলি। কি বলবো বল্‌ লবঙ্গ! সব কুষ্মাণ্ডের দল! ওরা কি মানুষ!

ওরা মানুষ কিনা, তাহা লইয়া লবঙ্গ তখন মাথা ঘামাইতে ছিল না। লবঙ্গ তখন ভাবিতেছিল, কি দোষে তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার একটা বিবাহ করিল? এর সদুত্তরটা সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির চারিধারে হাতড়াইয়া খুজিতে ছিল।

জগত্তারিণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন: জগুদা! আমার একটা উপকার তোমাকে কর্ত্তে হবে!

জগুদা শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন: কি উপকার দিদি?

—তোমার তো দেখ্লে আজকাল কোনও কাজকর্ম্ম নেই! খাজনা পত্তর আদায় উসুল তো আজকাল তোমার ছেলেই করে! তসিলের কাজও তো শুনতে পাই তার ওপরই চাপিয়েছো? তবেতো তোমার লম্বা ছুটি! তা চলনা আমার সঙ্গে,—আমাকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

—এ আর বেশী কথা কি দিদি? তুমি বল্‌লেই যাবো।

—হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম, কাকে আবার ধরি! যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো, সে এখন যেতে চাইচেনা। বলে, তার এখনও পাঁচ সাতদিন দেরি হবে। তা আমি কি অতদিন দেরি করতে পারি? কাল বাদে পরশু শিবচতুর্দ্দশী। এমন পুণ্যাহটা কলকাতায় বসে কাটাবো?

—না, না সেকি একটা কথা হলো? আর আমি যখন এসে পড়েছি, তখন আর তোমার ভাবনা কি?

তা চলো, তোমায় কাশী দিয়ে আসি। কবে যাবে?

—তাহ'লে আজই বিকালের গাড়ীতে চলো। নইলে পরশুর ভেতর পৌঁছতে পার্ব্বোনা।

—আজই? তা চলো।

যাবার সব ঠিক ঠাক আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই যাওয়া প্রায় ঠিক।

জগত্তারিণী ঘর হইতে যাইবার জন্য যেমনি পা বাড়াইয়াছেন, অমনি নজর পড়িল লবঙ্গর উপর। লবঙ্গ ঘরের একপাশে, জানালার গরাদ ধরিয়া, বা'হরের বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘরের পাশেই ফুলবাগান।

জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন: লবঙ্গ এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইছিস্ যে!

লবঙ্গ মুখ ঘুরাইলনা ফুলবাগানের দিকে চাহিয়া রহিল। জগত্তারিণী বুঝিলেন, কি একটা হইয়াছে। জগুদার দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিতেই জগুদা ব'লিলেন: লবঙ্গ যে অতবড়ো ঘটনার কথা কিছু জানেনা, তাতো আমি জানিনে। আমি ভেবেছি, ও সব শুনেছে। তাই একটু ছোট ঠাট্টা কর্ত্তে গিয়ে একটা বড় রকমের আঘাত ওকে আমি দিয়েছি। এর জন্য দায়ী আমি-ই।

—এমন কি ঘটনার কথা শুনিয়েছো জগুদা, যার জন্যে লবঙ্গর মত মেয়ে অমন মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?

—ঐ ওর অবুঝ স্বামী যে বে-আক্কেলি কাণ্ডটা করলে, সেই কথাটাই ওকে বলে ফেলেছি! ওযে সে কথা মোটে জানেনা তা আমি কি করে জানবো!

জগত্তারিণীও উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কেন, ওর স্বামী আবার কি নতুন কাণ্ড করেছে?

—ও হরি! তুমিও বুঝি তা জানোনা? এই গেলো বোশেখ মাসে তিনি যে আবার একটা—অনাথিনীর সংখ্যা বাড়িয়েছেন!

—অর্থাৎ?

অর্থাৎ আর কি? দীনু মিস্তিরের মেয়েকে উনি কুমারী অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছেন।

—বিয়ে করেছে?

—হাঁ গো হাঁ। সে কথা আর বলো কেন? গুণের ত' ঘাট নেই!

—সে কি কথা?—আবার বিয়ে করেছে? একটাকে খেতে দিতে পারেনা, আবার আর একটা?

—খেতে দিতে পারেনা ব'লে তাকে জেলেও যেতে হয়না, বা সন্ন্যাসীদের দলেও নাম লেখাতে হয়না। খেতে দিতে পারিনা বল্লে যদি একটা দায়িত্ব ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়া যায়, ত মন্দ কি?

—জামাইটা দেখছি তাহ'লে খুব ফন্দিবাজ!

জগুদা বলিলেন: না ঠিক ফন্দিবাজ নয়, দিদি! এরা বিবাহটাকে একটা দায়িত্বের চক্ষে দেখেনা! এরা বিবাহটাকে দেখে একটা রঙ্গ তামাসার আসবাব ব'লে!

—কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করবো কেন? ঐ কচি মেয়ে, ওকি এখন থেকে পৃথিবীর নির্য্যাতনগুলো ভোগ করতে থাকবে? একজন মজা মারবে, আর একজন তার যথেচ্ছাচারিতা মাথা নত করে মেনে নেবে? এ কোন্ দেশী বিচার?

জগুদা বলিলেন: সত্যিই তো! এ অরাজক ভাব ভগবানের রাজ্যে কেন চলবে?

দেশের লোক য নিয়েছে মাথা ঘামায় না! পোষাকের নালিশ করলে হয়না?"

"তা—তা—অমনি একটা কিছু করা দরকার বৈ কি! কিন্তু কথা হচ্ছে,—এত হাঙ্গাম হুজ্জুত করে কে?"

জগত্তারিণী হঠাৎ বলিয়া বলিলেন: প্রয়োজন হয়তো আমাকেই সব কর্ত্তে হবে!

জগুদা হাসিয়া বলিলেন: তুমিতো দিদি আজ বিকালেই কাশী চল্লে! সেখানে গিয়ে একবার বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢুকলে, সংসারের কোন কথাই তোমার মনে ছায়া ফেলতে পারে না।

—তুমি ভুল বুঝচো আমায়, জগুদা! সংসারের মায়া কাটিয়েছি বলে কি সংসারের অবিচার গুলোকে প্রশ্রয় দিতে হবে? তা হ'লে এরা যে সবাই মিলে আমায় অভিশাপ দেবে।

জগুদা বাধা দিয়া বলিলেন: কিন্তু আমিও যে তোমার সঙ্গে কাশী যাচ্ছি দিদি!

—তাহ'লে আমার কাশী যাওয়া হ'লনা। চলো, দেশে যাই। সেখানে গিয়ে নালিশ ফরিয়াদি জুড়ে দিই।

(ক্রমশঃ)

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

মার্চ্চ মাসের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে আমরা খানিকটা উন্নত ধরণের প্রোগ্রাম নির্ব্বাচনের আভাষ পেয়েছি। তবে অনুপস্থিত ভূত আবার নির্ব্বাচিত আর্টিষ্টদের ঘাড়ে না চাপে তবেই মঙ্গল! দীর্ঘদিনের সমালোচনার পর একটু তার ফল পর্য্যবেক্ষণ করা গেল।

* * *

আমরা বেতারের উন্নতিকামী বন্ধু! আমরা চাই বেতারের সফল প্রচার—বেতারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। অন্যায়—অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের লেখনী যেমন সুতীক্ষ্ণ তেমনি আবার 'ভালোকে' ভালোবাসতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। অন্যায়ের শত্রু এবং ন্যায়ের মিত্র আমরা।

* * *

দোষ ত্রুটি সকল জিনিষেরই আছে এবং কিছু না কিছু থাকবেও। নিরাঙ্কুশ কেউই হতে পারে না—একথা আমরা জানি এবং মানি। কিন্তু সংশোধনীয় ত্রুটি বিচ্যুতিকে আঁকড়ে ধরে না থেকে সংশোধন করে নিতে হবে। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের কল্যাণের জন্যেই আমাদের লেখনী-অস্ত্র ধারণ করা।

* * *

বেতার নাটকে দলের অভিনয় এবার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। বহুদিন পরে আমরা প্রকৃত একখানি ভালো নাটকের অভিনয় শুনে পরিতৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে হয়ত বা যাত্রার আসরের কর্ণপীড়াদায়ক চীৎকার বুঝি বা শীঘ্রই আমাদের কান ঝালাপালা করে তুলবে।

* * *

গত শনিবার ১৯শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে মনোমোহন ঘোষ "দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস" বললেন। মহিলা আসরে এ ধরণের বক্তৃতার কী সার্থকতা আমরা তা বুঝি না। বরঞ্চ "বিদ্যার্থী মণ্ডলে" কিংবা "ছোটদের বৈঠকে" এ বক্তৃতাটির ব্যবস্থা করলে তার অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। বক্তার বক্তৃতা-ভঙ্গিটি ভালো।

ডি, এন, ঘোষের ব্যবস্থাপনায় "দুপুর বেলার আসর" বললো। অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর গান সব—সমালোচনার বাইরে! শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র কমলা সরকারের গান তবু খানিকটা শ্রবণযোগ্য হয়েছিল।

* * *

রবিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে, বেহালা বাজালেন প্রতাপ ব্রহ্মচারী—ভালোই হয়েছিল। সন্তোষ সেন বাংলা গান গাইলেন—বিশ্রি! ধীরেন দাসের গান খুব ভালো হয় নি! সত্যবানের গানও তেমন জমে নি। ধীরেন মিত্র কীর্ত্তন গাইলেন 'সুন্দর। পঙ্কোজ বাবু সঙ্গীত শিক্ষা দান করলেন।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কুমারী গীতিকা সরকার গান গাইলেন "দেবালয়ের দ্বার খুলে"—সুন্দর। গায়িকার কণ্ঠ বেশ সুমিষ্ট। মীরা দেবীর গান চমৎকার! গায়িকাকে রেডিওতে নিয়মিত ভাবে স্থান দেওয়া উচিত। শোভা কুণ্ডুর সেতার এবারে চলন সই।

* * *

সোমবার ২১শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে লীলা দেবীর ব্যবস্থাপনায় বিচিত্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোল। জঘন্য প্রোগ্রাম। অম্বুজ মল্লিকের গান, বেতারে অচল। রবীন্দ্র নাথের "কর্ণকুন্তি সংবাদ" আবৃত্তি শুনলুম—কবিতাটিকে যেন জবাই করা হোল। দীর্ঘ সময়ব্যাপী এ কার্য্যের কী প্রয়োজন? একমাত্র সুপ্রভা মজুমদারের রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের খানিকটা আনন্দ দিয়েছিল।

* * *

মঙ্গলবার ২২শে ফেব্রুয়ারী সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—নবেন্দু সুন্দর মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল—এটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। বাসন্তী দাশ গুপ্তের গান—ভালো। শৈলেশ গাঙ্গুলীর গান, চলন সই। মমতা দাহার গান ভালোই কিন্তু একটু একঘেয়ে হয়ে পড়ছিল। অঞ্জলা দাসের গান মন্দ নয়। ইলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ভালো হয় নি। মঞ্জু দের কীর্ত্তন—সুন্দর। পরে তারাপদ চক্রবর্ত্তী খেয়াল গাইলেন খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। সাহিত্যিক 'সজনী কান্ত দাস জার্ম্মাণী'-র বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন।

* * *

বুধবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল—থার্ড ক্লাশ প্রোগ্রামের কোন গানই উল্লেখযোগ্য নয়। সুবোধ রায় চৌধুরী বক্তৃতা দিলেন—সভ্যতার ধারা। যান্ত্রিক সভ্যতার ধারা বিজ্ঞানের প্রকোপে কেমন রূপ আজ বিশ্বে ধারণ করেছে তারই খানিকটা পরিচিতি লাভ করা গেল বক্তার বক্তৃতার মধ্য হতে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে—রামচন্দ্র পাল গান গাইলেন—অতি সুন্দর। কণকলতা ঘোষ কীর্ত্তন গাইলেন জয়দেবের বিখ্যাত পদ "বদসি যদি কিঞ্চিদপি"—ভালো নয়। জয়দেবের পদ লালিত্যের কোন পরিচয় গায়িকার কণ্ঠে প্রকাশ পায় নি। বেতার অর্কেষ্ট্রা বাজনা মোটেই ভালো হয়নি।

* * *

বৃহস্পতিবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী বিদ্যার্থী-মণ্ডলে 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় "রচনা কৌশল" শেখালেন, সহজ ভাষায় সুন্দর প্রণালী। বিদ্যার্থী মণ্ডলের উপযুক্ত। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে যন্ত্রী সঙ্ঘ দ্বিপ্রাহরিক রাগের পরিচয় দিলেন—অতি সুন্দর বাজনা। পরে ফণী গুপ্তের প্রযোজনায়, বিনয় ঘোষ রচিত "ঝড়" নাটিকা অভিনীত হোল, সংসারের দুটি নারীকে কেন্দ্র করে, লেখক দুটি নারী চরিত্রের দুই আদর্শের দিক্ দেখাবার প্রচেষ্টা করেছেন—উদ্দেশ্য ভালো। অভিনয় প্রসঙ্গে কুমারী উমা বসু, অঞ্জলি রায় এবং বিমল গোস্বামী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সুশীল রায়ের অভিনয়ও মন্দ নয়। প্রথম গানখানি আমাদের ভালো লাগে নি। সঙ্গীত পরিচালনায় রবি রায় প্রশংসা পাবার যোগ্য—তাঁর গানখানিও বেশ শ্রুতিমধুর হয়েছিল।

* * *

২৫শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠানটি আমরা খুবই উপভোগ করেছি। কুমারী নমিতা রায় চৌধুরী, পঞ্চানন দত্ত, বিমল দত্ত, দেবাংশু মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ মৈত্রের প্রথম গানখানি আমাদের ভালো লেগেছে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃক "স্বামী-স্ত্রী" অভিনীত হোল। অভিনয়ে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় "স্বামী-স্ত্রী" এক কথায় অপূর্ব্ব।

বড়দি

[illegible]র দত্ত

নির্ম্মল তখন বর্দ্ধমানে দূর সম্পর্কের এক কাকার কাছে থাকিয়া রাজস্কুলে পড়িত। সে আসিত ৮মঙ্গলবাড়ীর দক্ষিণ দিক হইতে এবং তাহার সহপাঠী প্রেমেন্দ্র আসিত উত্তর দিক হইতে বাঁকার পুল পার হইয়া পরে কামানতলায় মিলিত হইয়া তাহারা স্কুলে যাইয়া প্রবেশ করিত। এবং খেলাধূলাতেও কেহ কাহারো সঙ্গ ছাড়িত না। ইহার অন্যথা যদি হইয়া থাকে ত তেমন দিনের সংখ্যা অত্যল্প, ধর্ত্তব্য নয়। তাই, তাহা দেখিয়া অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিত, কেহ বা মুখের উপরেই বলিয়া বসিত—'মাণিক-জোড়'—!

কিন্তু তাহারা রাগিত না, বরং হাসির কথা মনে করিয়া হাসিত এই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া, পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া প্রেমেন্দ্রের বৌদি পঙ্কজিনীর কানে গেলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখেন, কথাটা ভিত্তিহীন নয়। তদবধি তাহাদের দু'টিকে একত্র দেখিলেই তিনিও হাসিয়া বলিতেন, "মাণিকজোড়"?

অথচ এই দুই বলার মধ্যে কতই না প্রভেদ। কোথায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ—আর কোথায় অন্তঃস্পর্শী স্নেহ!

(২)

পঙ্কজিনীর পিসতুত বড় ভগ্নিপতির বাড়ী এই জেলাতেই সহর হইতে অনেক দূরে এক গ্রামে। তিনি মৈমনসিং অঞ্চলের এক নায়েবীতে ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা অঙ্কের কিছু জমাইবার পর, ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ছুটী চাহিয়াছিলেন। না পাইয়া চাকরিতে জবাব দিয়া বাড়ী ফেরেন। বৎসর না ঘুরিতেই তিনটী পুত্রসন্তান মরিয়া যাওয়ায় বুঝেন, পিতৃ-পুরুষের ভিটায় দোষ স্পর্শ করিয়াছে। তখন শেষ সম্বল সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান পাঁচ-ছ' বৎসরের কন্যা আশালতাকে বাঁচাইতে ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া সপরিবারে বাহির হইয়া পড়েন। এদেশ সেদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই সময় বর্দ্ধমানে আসিয়া হাজির হন। এবং পঙ্কজিনীর অনুরোধ সত্ত্বেও সম্বন্ধটা তেমন ঘনিষ্ঠতার নয় বুঝিয়া খোসবাগানে বাসা লইয়াছিলেন। তখন মাঝে মাঝে পঙ্কজিনী নিজে গিয়া এবং প্রায়ই এই "মাণিকজোড়" দু'টীকে পাঠাইয়া বড়দির খোঁজ-খবর লইতেন। এই তত্ত্ব তল্লাসের কারণ টাকা কিনা জানিনা, জানি সেই সূত্রে বড়দির সহিত নির্ম্মলের পরিচয় ঘটে এবং প্রেমেন্দ্র ও পঙ্কজিনীর দেখাদেখি সেও তাঁহাকে বড়দি বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছিল। ইহাই পূর্ব্বকথা অর্থাৎ নির্ম্মলের বড়দি বলিয়া ডাকার ইতিহাস। পরবর্ত্তীকালে, লেখাপড়া শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া নির্ম্মলের চাকরী গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহারা বর্দ্ধমান হইতে পশ্চিম মুলুকে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাই বলিয়া মা-বাপ-মরা নির্ম্মলের সহিত তাঁহাদের পত্র বিনিময় বন্ধ হয় নাই। তাহা বরং

পূর্ববেগেই চলিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাদের কলিকাতায় আগমন ও আনন্দাতিশয্যে নির্ম্মলের মহাকলরবপূর্ণ অভ্যর্থনার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত। যাহার বেগ ক্রমান্বয়ে কমিয়া আসিয়া ইদানীং একেবারেই থামিয়া গিয়াছিল তাহা সেই মাণিকজোড়ের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানটা।

সুতরাং কোন এক বন্ধুর বিবাহোপলক্ষে নির্ম্মল পাঁচ-সাত দিন বাহিরে কাটানোর পর রাত্রি প্রায় দশটার সময় মেসে ফিরিয়া আলো জ্বালিতেই বড়দির দুইখানা চিঠি দেখিয়া যত না বিস্মিত হইল তার অনেক বেশী হইল প্রেমেন্দ্রের একখানায়। প্রেমেন্দ্র তাহাকে এতদিন পরে আপন গরজে চিঠি দিয়েছে! ব্যাপার কি? খাম ছিঁড়িয়া দেখিল, গোড়ার দিকে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কুশল-প্রশ্নাদি সারিয়া স্বীকার করিয়াছে নিজের দোষেই তাহাদের মধ্যে পত্রের আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর লিখিয়াছে,—

হরিদ্বার হইতে আসিয়া বড়দিদিদের কলিকাতায় পৌঁছানোর সংবাদ পাওয়ার পর হইতে বৌদি আমাকে বড়দির নিকট পাঠাইবার জন্য কি যে না করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়। তিনি যে এতকাল চুপচাপ ছিলেন তার একমাত্র কারণ বোধ হয়, এখান হইতে হরিদ্বারের দূরত্বটা। সে কথা যাক্।

প্রথম প্রথম ভাবিয়া পাইতাম না, বৌদির এত তাড়া কেন। জিজ্ঞাসা করিলে পরিহাস-ছলে একদিন উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাহা আর কিছু নয়, আমার প্রতি বড়দির দৃষ্টি আকর্ষণের কৌশল। কি জানি যদি মনোমত হইয়া যাই, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কে জমানো লক্ষ্মী ও কন্যা স্বরস্বতী···এ দুই-ই লাভ করা নাকি আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। অমত করিবার মত কিছুই দেখিতে পাই নাই। একান্ত লজ্জাবশেই বৌদির আদেশ আরও ছ'মাস ঠেলিয়া কলেজের গ্রীষ্মাবকাশ পর্য্যন্ত আনিয়াছিলাম কিন্তু ছুটী হইলে আর পারা গেল না, যাইতে হইয়াছিল।

বড়দির মুখেই শুনা গেল, তুমি আমার বড়দিকে উঁচু হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে পিছন দিয়ে নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ কাঁধ ধরিয়া মেঝেতে বসাইয়া দাও। কখনো বা সেই টাল সামলাইতে না পারিয়া বড়দি চিৎপাত হইয়া সশব্দে পড়িয়া যান এবং হাসিমুখে উঠিয়া বলিয়া —বাঁদরমুখোর জ্বালায় আর পারি নে, মুখপোড়ার এখনো ছেলেমানুষী গেল না, ইত্যাদি প্রকারের স্নেহসিক্ত মিষ্টি-মধুর সম্ভাষণে মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। জামাইবাবুর মত গম্ভীর মানুষ, যাঁহার সহিত কথা বলিতে আমার ভয় হয়, ঝি-চাকর সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে, তিনি নাকি তাহা দেখিয়া হাসেন! আবার তাঁহারই সহিত তাঁহার দেওয়া বড়দির 'নয়নতারা' নাম লইয়া তুমি নাকি হাসাহাসি কর! দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহাদের এ সকল কথা যেমন সত্য তেমনি আনন্দের। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তুমি তাঁহাদের বুকের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছ। সুতরাং আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি, অদূর ভবিষ্যতে তুমিই আশালতার স্বামী।

নারীর দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে তিল পরিমাণ কথা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তাল হইয়া দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের জলে ভিজিয়া, ফুলিয়া ফাঁপিয়া ভীষণাকৃতির হইয়া দাঁড়ায়। তাই তাহার সহিত আমার ঘৃণিত ব্যবহারের কথা তোমাকেই খুলিয়া বলা দরকার। তাহা এইবার লিখিতেছি,—

পৌঁছিয়াছিলাম অনেক রাত্রে। পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিলে আশালতাকে দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। প্রায় ছ'-সাত বৎসর পূর্ব্বে যে, আশালতাকে এখানে খোসবাগানে দেখিয়াছিলাম সেই মেয়ে যে এমন সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হইতে পারে তাহা আমার ধারণার সম্পূর্ণ বাহিরে ছিল। তাই আশালতাকে পাড়ার অন্য কোন মেয়ে মনে করিয়া তাহার সহিত আমার প্রথম দর্শনটা পাপচক্ষে হইয়া গেল। সে
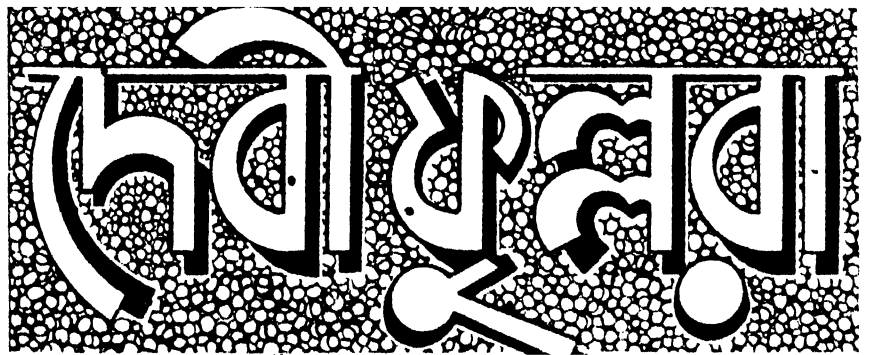
বারান্দার রেলিং ঝুঁকিয়া নীচের দিকে এবং মাঝে মাঝে ঘরের ভিতর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিতেই সেও হাসিল, হাসিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল এবং তাহার সেই হাসি দেখিয়া আমার চোখে পৃথিবীর রং হইয়া গেল অন্য একরকম।

অল্পক্ষণ পরে সে আবার বড়দির সহিত আসিল, দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলাম। আমার বাঁকা হাসির অর্থ বুঝিয়া বলিয়া দিল নাকি? বড়দি আমার সহিত আবার তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়া, কথা কহিতে বলিয়া, আমাকে শয্যাত্যাগের আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বুঝিলাম এ-ই আশালতা, পাড়ার অন্য কেহ নহে। বুঝিলাম বটে, কিন্তু মন মানিল না; মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঘামিয়া উঠিতে লাগিলাম।

আশালতা কিন্তু এতটুকু অপ্রতিভ হইল না। সে মুখ তুলিয়া হাসিমুখে বলিল, "তুমি মামা হও?" সম্বন্ধটা স্বীকার করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় সে চোখ পাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ইস্! মামা না আরো কিছু! দাদার বন্ধু—দাদা হয়৷"

একথার উদ্দেশ্য বুঝিলাম। পাছে আমি বলিয়া বসি, "হাঁ, আমি তোমার মামা হই," তাই আমার উত্তরের অপেক্ষা করিল না। আমার প্রথম দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া পথ পরিষ্কার রাখিতে চায়। নইলে মামা বলিয়া ডাকিয়া মায়ের আদেশ পালন করিয়া অন্য কোনো কথা কহিত। বলিয়া ফেলিলাম, "যা ব'লেই ডাক না কেন মনের কথাই সার। ইচ্ছেটা কি বল দিকি?"

আশা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "মনের কথা কি আবার।"

মনে পড়িয়া গেল, এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাহারা ভিতরে সুপক্ক হইয়া বাহিরে অপক্কের অভিনয় ক'রে অর্থাৎ ছেলেমানুষী দেখাইয়া উদ্দেশ্য সাধনের অধিক সময় এবং সুযোগ খুঁজে। কাব্যিক ভাষায় তাহারাই নাকি বর্ণচোরা আম। এই আশালতা সেই শ্রেণীর। আরো—

পড়িয়া নির্ম্মল বুঝিতে পারিল, এইখানেই প্রেমেন্দ্রর মস্ত বড় ভুল। আশালতা মুখ টিপিয়া ছাড়া অত্যধিক আনন্দেও—হা হা করিয়া বড় একটা হাসেনা। যে মুখভঙ্গী দেখিয়া প্রেমেন্দ্র নিজেকে হারাইয়া ফেলিল, তাহা তাহার প্রকৃতিগত একটা স্বভাব। বালিকা সুলভ গিন্নীপনা দেখাইতে আশা কারণে অকারণে ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকে। বুঝিয়া নির্ম্মল কোনরকমে হাসি চাপিয়া পড়িতে লাগিল।—

আরো মনে হইল, আশালতার কথা এবং কথা বলার এই মুখভঙ্গী ছাড়া নারীর প্রণয় নিবেদনের কি প্রনালী তার থাকতে পারে? ইহাই তো তাহার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ও প্রমাণ! আমার দেহ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল,—জগৎসংসার ভুলিয়া গেলাম। হারাইয়া ফেলিলাম নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান। মুগ্ধচোখে চাহিয়া তাহাকে ধরিতে যাইতেই সে দরজার দিকে ছুটিয়া গেল। সেই সময় বড়দি একহাতে জলভর্ত্তি গ্লাস ও অন্যহাতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া এই ঘরেই আসিতেছিলেন। আশালতা দরজা পার হইয়া বারান্দায় তাঁহার কোলের কাছে হুমড়ি খাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়দির যা কিছু সব ঝন্ ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল। তিনি তাহার পিঠে গুম্ গুম্ করিয়া দুইটা কীল কসাইয়া দিলেন, কহিলেন, দিনরাতই কি হুটোপাটী করতে হয়? দশ-বারো বছর বয়স হ'তে চলল এখনো যেন সেই কচি খুকী! বাঁদরের জ্বালায়, রাজ্যের জিনিষ আমার ভেঙ্গে নষ্ট হচ্ছে দিন-দিন।" বলিয়া তিনি ঝিকে ডাকিয়া সেগুলা পরিষ্কার করিতে বলিয়া, চাকরকে ডাকিয়া আঁচল হইতে পয়সা দিয়া আবার কি-কি আনিতে হইবে বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

দরজার ধার হইতে চক্ষের পলকে সরিয়া গিয়া ঘরের এককোণে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার দিক দিয়া কোন প্রকারের সন্দেহ আসিল না দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তখনো আমার মুখ ধোয়া হয় নাই মনে পড়িতেই ঘরের বাহিরে গিয়া বলিলাম, "কোথায় মুখ ধোব বড়দি।" বলিয়া নিজেকে সকল সন্দেহের বাহিরে আনিয়া ফেলিলাম।

(৩)

তারপর সমস্ত দিনটার মধ্যে আশাকে একবারও একা পাওয়া গেল না, রাত্রিটা গেল দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়া। পরদিন সকালেই বড়দি আমাকে জলযোগ করাইয়া তোমার মেসে পাঠাইলেন, তুমি বন্ধু বিবাহ দিয়া ফিরিয়াছ কিনা খবর লইতে। দর্জ্জিপাড়ায় এমন গলি থাকিতে পারে, আমার জানা ছিল না। অনেক খোঁজা-

খুজির পর তোমার আস্তানা বাহির করিলাম। তুমি নাই শুনিয়া খুশী হইতে আমায় বাধিল না। কেন, আশা করি তাহা তোমার কল্পনাতীত নয়। কিন্তু লিখিতে আমার লজ্জা করে। শ্রান্তদেহে ঠনঠনিয়ার বড়দির বাসায় ফিরিয়া ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বেলা দেড়টা! স্নানাহার শেষ করিতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। আমার আজিকার এই অনিয়মের জন্য বড়দি তার মত প্রকাশ করিলে, সানন্দে চাহিয়া দেখি আশা বিষন্ন! বুঝিলাম আমাকে একা না পাওয়াই হটার একমাত্র কারণ। বুঝিয়া কি যে সুখী হইলাম তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা আমার জানা নাই। আশাকে খুশী করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু মিলিল না। একবার সন্দেহ হইল, আমার মনের গোপন উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আমার ও আশার উপর ফৌজদারী চলে নাইত? কিন্তু আমার সেই আনন্দের কাছে এই সন্দেহটা সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হইয়া গেল বলিয়া একথা একটীবারের জন্যও মনে পড়িল না, সেসে তোমার অনুপস্থিতির কথা শুনিয়াও আশা বিষন্ন হইলেও হইতে পারে।

বৈকালে জামাইবাবুর সহিত আশা বেড়াইতে গেল। আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া একরকম নিজের মান বাঁচাইতেই বেড়ানোর ছলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ফিরিলাম সন্ধ্যার পর। ফিরিয়া শুনিলাম আশা এখনো ফিরে নাই, ফিরিল রাত্রি প্রায় সাড়ে নটায়। তখন আমি আহারাদি সারিয়া শয়নকক্ষের আলো নিভাইয়া সবেমাত্র শুইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বাস করুন বা নাই করুন

দেশের মাটি চিত্রে অজয়ের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের বয়স যেন ২০ বছর কমিয়া গিয়াছে। সদ্য বিলাত ফেরত বাঙ্গালী যুবক দেখিয়াছেন? দুর্গাদাসের সহিত তাহার কোনই তফাৎ নাই। কথায় বার্ত্তায় হাবভাবে সে খাঁটী যুবকের মতই ব্যবহার করিতেছে।

* * *

চন্দ্রাবতী অজয়ের বোন। মানাইয়াছেও চমৎকার। চন্দ্রাবতীর শিক্ষা আছে, সে শিক্ষিতা মেয়ের ভূমিকায় যে অভিনয় করিতেছে, তাহা অন্য কাহারো দ্বারা সম্ভব হইত না। ভূমিকার সহিত মনের পরিচয় না থাকিলে তাহা পর্দার গায়ে সম্যক প্রকাশ করা অসম্ভব। অরুণার ভূমিকা চন্দ্রাবতী যে ভাবে করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টভাবেই চন্দ্রাবতীর মনের শিক্ষা এবং রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

একমাস গ্রামে বাস করিয়া, চাষীদের সহিত মাঠে কাজ করিয়া আজ সায়গল হইয়া গিয়াছে একেবারে বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর মনের আশা, কল্পনা, সব কিছুই আজ সায়গলের মনে চিরকালের জন্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাই আজ আমরা অশোকের ভূমিকায় যাহাকে দেখিতে পাইবো, সে হইবে খাঁটী বাঙ্গালী। দেশ সেবাব্রতে নিযুক্ত বাঙ্গালী যুবকের প্রতীক।

* * *

উমা আজ যে ভূমিকায় আমাদের "দেশের মাটী" চিত্রে দেখা দিবে—তাহা কল্যাণময়ী গ্রামের বালিকার রূপ। বাংলার গ্রামে আমরা যে নারীকে দেখিতে পাই, যে নারী সেবায় আত্মপর ভেদ করে না, যে নারী প্রয়োজন হইলে সমাজের সকলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইতে পারে, উমা আজ সেই বাংলার মহীয়সী নারীর ভূমিকায় আসিতেছে। স্নেহ মমতায় পূর্ণ সেই বহুদিনকার ভুলিয়া যাওয়া বাঙ্গলার মেয়েকে আমরা আবার দেখিতে পাইব—অপরূপ এক মঙ্গলময়ী সেবাব্রতা নারীর রূপে।

* * *

অমর মল্লিককে চেনেন? নিশ্চয়ই চেনেন। তিনি আজ দেশের মাটি চিত্রে গ্রামের সমাজপতি যদু চক্রবর্ত্তীর রূপে দেখা দিবেন। গ্রামের সমাজপতিরা কি রকম লোক—তাঁহাদের স্বভাব কি প্রকার তাহা যাহারা গ্রামের দিকে একবার চোখ দিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। অমর মল্লিক সেই সমাজ পতির ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন মানুষের অন্তরে যথাস্থানে আঘাত করিতে পারিলে তাহার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়, তাহা এই যদুর জীবনেই দেখিতে পাইবেন। অমর মল্লিক ছাড়া অন্য কেহ এই আশ্চর্য্য অভিনয় এমন সত্যভাবে করিতে পারিতনা।

* * *

অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পরিচালক নীতীন বসু আজ এক নতুন জগতের রূপ উদঘাটিত করিয়াছেন। নীতীন বাবু এমন অদ্ভুতভাবে গ্রামের নির্য্যাতিত কুঞ্জের কথা কৃষ্ণচন্দ্রকে বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র নিজের জীবনে তাহা অতি অপরূপ ভাবে ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন। যখন যে সেটে কাজ হয়, কৃষ্ণচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না। অন্ধও যে তাহার মনের চোখ দিয়া জগতের বহু কিছু দেখিতে পায়—, কৃষ্ণচন্দ্রই তাহার নিদর্শন। অতি মনোহর নিদর্শন ॥

* * *

সঙ্গীতের মধ্যদিয়া কেমন করিয়া চিত্রের গতী বৃদ্ধি করা যায়, তাহা দেশের মাটি চিত্রের সঙ্গীতে প্রকাশ পাইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বহু চিত্রে দেখিয়াছি যে, সঙ্গীত আরম্ভ হইবা মাত্র চিত্রের কাহিনীর গতি হয় বন্ধ হয়, নয় ত' স্বাভাবিক পথ হারায়। কিন্তু দেশের মাটি চিত্রের সঙ্গীত সংস্থাপন এমন ভাবে হইতেছে, যাহাতে কাহিনী বিন্দুমাত্র থামবেনা, বরং ইহার স্বাভাবিক গতি আরো খরতর হবে। উমা, সায়গল এবং কৃষ্ণচন্দ্র এবার এমন কতকগুলি গান গাহিবেন, যাহা "মুক্তির" সঙ্গীতকেও বহু পরিমানে ছাড়াইয়া যাইবে।

* * *

আমাদের মধ্যে এমন বহুজন আছেন যাঁহারা গ্রামের নাম শুনিলে ভয় পান। তাঁহারা মনে করেন যে, গ্রামে মানুষ বাস করিতে পারে না। দেশের মটি চিত্রের বহু অংশ গ্রামের এবং গ্রামবাসীদের লইয়া। এই চিত্রে দেখা যাইবে যে গ্রামেও মানুষ বাস করিতে পারে, এবং শহরের অপেক্ষাও ভাল ভাবেই গ্রামে বাস করা যায়। কিন্তু বাস করিতে জানা চাই। গ্রামকে কি করিয়া সত্যকার প্রাণদান করা যায়,' তাহা দেশের মাটি চিত্রে অন্তত কিছু পরিমাণে বুঝা যাইবে। গ্রামের মধ্যে কি সৌন্দর্য্য, কি প্রাণ এবং দেশের কি পরিমাণ আশা ভরসা আছে, তাহার বহু আভাসও এই চিত্রে পাওয়া যাইবে।

* * *

শহরে লোককে দিয়া গ্রামবাসী চাষীর অভিনয় করাইতে কি পরিমাণ কষ্ট এবং পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পরিচয় দেশের মাটি চিত্রে পাইবেন। শহরের মাঝখানে ষ্টুডিওতে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করার কার্য্যও যে কত ভয়ানক কষ্টকর তাহাও দেশের মাটির কুটীর দৃশ্যগুলিতে দেখিতে পাইবেন। এই সকল সেটগুলিতে সহরের সকল চিহ্ন একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। সেটের মধ্যে যাহারা অভিনয় করিতেছে, তাহাদের কথায়-বার্ত্তায় পোষাকে পরিচ্ছদে তাহাদের শহরের লোক বলিয়া বুঝিবার কোন উপায়ই নাই। এমন কি উমাকেও বর্ত্তমানে আমাদের সেই বহু পরিচিতা উমা বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

———

(সি, দ্বি)

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম গত সাড়ে তিন মাস ধরে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ক্রিকেট খেলে সেগুলিকে তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন। তাঁরা এদেশে এসে হাজির হয়েছিলেন গত ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এবং গত মাসের ১৮ই তারিখে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য জাহাজে চড়েছেন। তাঁদের এই ভারত ভ্রমণে এদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যে কতখানি খেলার উন্নতি করলেন কিংবা তাঁদের কাছ থেকে কি শিক্ষা লাভ করলেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এখানকার ক্রিকেট প্লেয়ারদের যে উপকার হয়েছে তা আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে, কারণ ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলার কর্তারা তাঁদের সেই উদ্দেশ্যে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে এদেশে আনিয়েছেন। আর্থিক দিক দিয়ে কারা যে বেশী লাভবান হল তা বলা শক্ত তবে ভারতের ক্রীড়ামোদীগণ হুজুকে পড়ে যে বেশ কিছু খরচা করতে বাধ্য হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লর্ড টেনিসন ভারতের উপকুলে পা দিয়েই বলেছিলেন যে এর আগে তাঁর টীমের মত শক্তিশালী ক্রিকেট টীম ভারতে আর কখনও আসেনি এবং সেই কারণে ভারতের ক্রিকেট-প্রিয় ব্যক্তিগণ এই ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের অর্থের বিনিময়ে জনকতক নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন এবং ভারতীয় ক্রিকেট খেলার উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

ভারতবাসীদের এই সুযোগ দেবার জন্য বোম্বাইয়ের 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া' উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সকলের কাছ থেকে ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে 'রাবার' জয়লাভ করে লর্ড টেনিসনের পূর্ব্ব ঘোষণা কতকাংশে সাফল্যলাভ করেছে। তাঁরা ১৯৩৭-৩৮ সালের এই ভারত ভ্রমণে মোট চব্বিশটি ম্যাচ খেলেছেন। আর তাঁরা আটটি খেলায় জয়লাভ করেছেন, এগারটি খেলা অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে এবং পাঁচটি ম্যাচে পরাজিত হয়েছেন। এই খেলাগুলির মধ্যে একটি খেলায় তাঁদের এক ইনিংসে জয়লাভ এবং আর একটি

খেলায় এক ইনিংসে পরাজয়ও ঘটেছে। সমস্ত খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হোল।

১। লর্ড টেনিসনের দল ৩৯৯ এবং ১ উইকেটে রাণ—বরোদা দল ১৭৭ রাণ—অমীমাংসীত ভাবে খেলা শেষ।

২। লর্ড টেনিসনের দল ৩০৩ এবং ০ উইকেটে ৫৮ রাণ—সিন্ধুপ্রদেশ ৩৪৮ এবং ৫ উইকেটে ৮৩ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

৩। লর্ড টেনিসনের দল ২২৫ এবং ২ উইকেটে ২৩ রাণ—উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৮০ এবং ১৬৭ রাণ। আগন্তুক দল ৮ উইকেটে বিজয়ী।

৪। লর্ড টেনিসনের দল ৮ উইকেটে ৩৭৬ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) এবং ৩ উইকেটে ১০৮ রাণ—ভারতীয় ইউনিভার্সিটী দল ১৩৯ রাণ। অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ

৫। লর্ড টেনিসনের দল ২০৭ এবং ১ উইকেটে ১১৪ রাণ—নিখিল ভারত দল ১২১ ও ১৯৯ রাণ। আগন্তুক দল ৯ উইকেটে বিজয়ী।

৬। লর্ড টেনিসনের দল ২১২ এবং ১১২ রাণ—রাজপুতানা দল ২৩৭ এবং ৮ উইকেটে ৮৯ রাণ। রাজপুতানা দল দুই উইকেটে বিজয়ী।

৭। লর্ড টেনিসনের দল ৪২০ রাণ, গুজরাট দল ২১১ এবং ৯ উইকেটে ২২৮ রাণ। অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

৮। লর্ড টেনিসনের দল ১২৩ এবং ২৬৯ রাণ, নব নগর দল ২০৬ এবং ৭ উইকেটে ২২৩ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) নবগনর দল ৩৪ রাণে বিজয়ী।

৯। লর্ড টেনিসনের দল ৩১৯ এবং ২ উইকেটে ৪২ রাণ—মহারাষ্ট্র দল ২৭৩ রাণ। অমীমাংসীতভাবে শেষ।

১০। লর্ড টেনিসনের দল ৩৭৬ রাণ—ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া ১৮৯ এবং ৫ উইকেটে ২৯৭ রাণ অমীমাংসীতভাবে শেষ।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ

১১। লর্ড টেনিসনের দল ১৯১ এবং ৪ উইকেটে ১৭১ রাণ—নিখিল ভারতীয় দল ১৫৩ এবং ২০৮ রাণ। আগন্তুক দল ছয় উইকেটে বিজয়ী।

১২। লর্ড টেনিসনের দল ১৪৫ এবং ৭ উইকেটে ২০১ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড)—যুক্তপ্রদেশ দল ১৫৪ এবং ১ উইকেটে ৬৭ রাণ। অমীমাংসীতভাবে শেষ।

১৩। লর্ড টেনিসনের দল ১৯২ এবং ৪ উইকেটে ১২৬ রাণ—মধ্যভারত দল ১৯১ এবং ৯ উইকেটে ১৮২ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

১৪। লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে ২১১ রাণ—বিহার দল ৩৪ রাণ। আগন্তুক দল দশ উইকেটে বিজয়ী।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ

১৫। লর্ড টেনিসনের দল ২৫৭ এবং ১৯২ রাণ নিখিল ভারতীয় দল ৩৫০ এবং ১৯২ রাণ—নিখিল ভারতীয় দল ৯৩ রাণে বিজয়ী।

১৬। লর্ড টেনিসনের দল ৩১৬ এবং ১ উইকেটে ১২১ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড)—কুচবিহারের মহারাজার দল ১৬৭ এবং ৮৩ রাণ। আগন্তুক দল ১৮৭ রাণে বিজয়ী।

১৭। লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে ৪৪৫ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড)—পাতিয়ালার মহারাজার দল ১৪২ এবং ৫ উইকেটে ২৬৪ রাণ। অমীমাংসীত ভাবে শেষ।

১৮। লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে ৩৫৩ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড)—দিল্লী দল ৭ উইকেটে ৩০৭ রাণ। অমীমাংসীতভাবে শেষ।

১৯। লর্ড টেনিসনের দল ৯ উইকেটে ১৫১ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) এবং ২ উইকেটে ৩৯ রাণ—মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার দল ৭৬ এবং ১১২ রাণ। আগন্তুক দল আট উইকেটে বিজয়ী।

২০। লর্ড টেনিসনের দল ৮ উইকেটে ৪৪৮ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড) এবং ৫ উইকেটে ৩২৪ রাণ—মাদ্রাজ প্রদেশ ৩০৫ রাণ। অমীমাংসীতভাবে শেষ।

২১। লর্ড টেনিসনের দল ১৪৮ এবং ২৯৩ রাণ—নবাব মণিউদ্দৌলার দল ৩১৭ এবং ৪ উইকেটে ১২৭ রাণ। নবাব মণিউদ্দৌলার দল ছয় উইকেটে বিজয়ী।

২২। লর্ড টেনিসনের দল ৬ উইকেটে ৩০৫ রাণ (ডিক্লেয়ার্ড)—মাইশোর দল ৮৩ এবং ১৪১ রাণ। আগন্তুক দল এক ইনিংস এবং ৮১ রাণে বিজয়ী।

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ

২৩। লর্ড টেনিসনের দল ৯৪ এবং ১৬৩ রাণ—নিখিল ভারতীয় দল এক ইনিংস এবং ৬ রাণে বিজয়ী।

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ

২৪। লর্ড টেনিসনের দল—১৩০ এবং ২৮৮ রাণ—নিখিল ভারতীয় দল ১৩১ এবং ১৩১ রাণ। আগন্তুক দল ১৫৬ রাণে বিজয়ী।

ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

ভারতীয় খেলোয়াড়গণ

ডি, বি দেওধর—১১৮ রাণ (মহারাষ্ট্র)

মুস্তাক আলি—১০১ রাণ (নিখিল ভারতীয় দল)

এল, অমরনাথ—১২৩ রাণ (নিখিল ভারতীয় দল)

এল, অমরনাথ—১০৯ রাণ (নটআউট) (পাতিয়ালার মহারাজার দল)

এল, অমরনাথ—১২১ রাণ (নবাব মণিউদ্দৌলার দল)

ডি, আর হাভেওয়ালা—১০৬ রাণ (পাতিয়ালার মহারাজার দল)

ভিনু মানকাদ—১১৩ নটআউট (নিখিল ভারত দল)

লর্ড টেনিসনের দলের খেলোয়াড়গণ

পি, এ গিব—১০৫ রাণ বনাম বরোদা দল।

পি, এ গিব—১৩৬ রাণ (নটআউট) বনাম গুজরাট দল।

পি, এ গিব—১১৭ রাণ বনাম দিল্লী দল।

এডরিচ ১৪০ রাণ (নট আউট) বনাম সিন্ধু প্রদেশ এবং ১৩০ রাণ (নট আউট) বনাম মাদ্রাজ প্রদেশ।

হার্ডষ্টাফ ১০০ রাণ বনাম ভারতীয় ইউনিভার্সিটি দল।

হার্ডষ্টাফ ২১৩ রাণ বনাম মাদ্রাজ প্রদেশ।

লর্ড টেনিসন ১১৮ রাণ বনাম সিন্ধু-প্রদেশ।

ল্যাংগ্রিজ ১০৮ রাণ বনাম ভারতীয় ইউনিভার্সিটি দল।

ল্যাংগ্রিজ ১৪৪ রাণ বনাম ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়া।

লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট টীম ভারত ভ্রমণে আসার আগে আরও তিনবার বিদেশী ক্রিকেট টীম ভারতবর্ষে খেলতে আসেন। ১৯২৬-২৭ সালে আর্থার গিলিগানের নেতৃত্বে মেরিলিবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব এই আগমনের সূচনা করেন। তাঁরা মোট ৩৪টি ম্যাচ খেলেন। তার এগারটি ম্যাচে তাঁরা জয়লাভ করেন এবং তেইশটি খেলা অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়।

১৯৩৩-৩৪ সালে বিখ্যাত ক্রিকেটিয়ার ডি আর জার্ডিন্ একটি ক্রিকেট টীম ভারতবর্ষে আনেন। তাঁরাও মোট চৌত্রিশটি ম্যাচ খেলেন। তাঁরা ষোলটি খেলায় জয়ী হয়ে এবং সতেরোটি ম্যাচ অমীমাং-সীতভাবে শেষ করে একটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।

১৯৩৫-৩৬ সালে আর একটি বেসরকারী অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টীম্ ভারতে আসে। জে এস রাইডার এই টীমটির অধিনায়ক ছিলেন। তাঁরা মোট তেইশটি খেলার মধ্যে এগারটি খেলায় জয়ী হন এবং তিনটি ম্যাচে পরাজিত হন। বাকী নয়টি খেলায় কোন দলকেই অসম্মান স্বীকার করতে হয়নি।

১৯২৬—২৭ সালে নিখিল ভারতীয় দলের সঙ্গে এম সি সি দলের খেলাটি অমিমাংসীতভাবে শেষ হয়।

১৯৩৩—৩৪ সালের তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে বিলাতী দলটি দুইটি খেলায় জয়ী হন এবং একটি 'ড্র' হয়।

অষ্ট্রেলিয়ান দলটি ১৯৩৫—৩৬ সালে নিখিল ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে চারটি ম্যাচ খেলেন। নিখিল ভারতীয় দল দুইটিতে জয়লাভ করেন এবং জে, এস রাইডারের দলটি দুইটি খেলায় জয়ী হন।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—উষা চৌধুরী
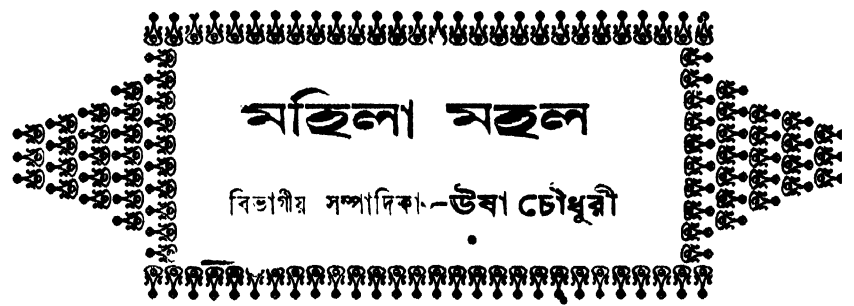
গত সংখ্যায় অর্থসমস্যার সঙ্গে সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলাম—যেটা কয়েকজন মহিলার কাছে বিপুল অন্ধকারের মাঝখানে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বলে মনে বিশ্বাস হয়ে থাকে। সেই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা শিল্পপ্রসার এবং সেই শিল্প বিক্রয়ের জন্য বিশেষ যত্নবান। টালা মহিলা সমবায় সমিতি তারমধ্যে অন্যতম।

দুঃখের বিষয় অর্থনৈতিক আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় মহিলা সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে। আজকাল ধনী নরনারীর সহৃদয়তা আশানুরূপ না থাকায় প্রতি সমিতির মধ্যে অভাবগ্রস্থা নারীর জীবন এত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। বেকার পুরুষের সংখ্যাধিক্য হওয়াতেও বহু নারীর সংসার-জীবন চরম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু আজ কত নারী কত রকম বিদ্যার দ্বারা স্বামী-পুত্র, সংসার প্রতিপালন করতে পারছে, কত বিধবা বেকার পিতা ও ভ্রাতার সংসারে সাহায্য করছে।

নারীর নারীত্বকে শীলতা ও শালিনতার আবরণে রেখে; কর্ম্মপ্রেরণায় নারী যদি বহির্জগতে বিশাল কর্ম্মসমুদ্রে ঝাপ দিতে পারে; অথৈ স্রোতধারা;—অসংখ্য ক্রীমি-কীট, অসীম জলরাশি—ঘনজাল জঞ্জালযুক্ত পিছিল-শৈবালরাশি; কোন কিছুই সেই উদ্দমে কর্ম্মমুখী নারীর গতিরোধ করতে সক্ষম হবেনা—হতে পারেনা। দ্বিধাহীন পদক্ষেপে নারীর সত্য পরিচয়ে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। অচঞ্চলচাহনী নারীর পথ নির্দ্দেশে সত্যের সন্ধান এনে দিতে পারে। অনাড়ম্বর বেশ-ভুষা নারীর পথ যাত্রার প্রধান সহচর হয়ে বন্ধুর পথ সুগম করতে সাহায্য করে।

ভগবানে বিশ্বাস না হারিয়ে; নারীত্ববোধ জাগ্রত রেখে নারী শিক্ষার সন্ধানে যতদূরই যাক্ না, সফলতা তার আসবেই।

বিলাস জীবন সুষ্ঠু এবং স্থায়ী যে নয়, প্রথমবারে সে আলোচনা করেছি। বৃহত্তর শিক্ষার প্রচলনে পুরাণ ভাবধারা একেবারে ছেঁটে কেটে বাদ দিলে গাছ যে উত্তম পরিপুষ্ট ফল দিতে পারে না, বা পারছে না তার উদাহরণ আমরা স্বীকার না করি—চোখে দেখতে পাচ্ছি।

উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিতা, উন্নততর "অন্তকরণ", সহজেই পিছনে ফেলা শুচীবাই-গ্রস্থ অশিক্ষিতা আবর্জ্জনাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও শোভনীয় সংস্কারে মার্জ্জিত করে

তুলতে পারে। গড্ডালিকা প্রগতির যুগে শিক্ষিতা বোনেদের কাছে এই আশা করার কি সময় আসেনি ?

এটা বোধহয় সকলেরই চোখে পড়ে থাকে, সংক্রামিত রোগে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়ে কত অশিক্ষিতা মা মৃত্যুর মুখে একটির পর একটি শিশুকে তুলে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার আশে পাশে ময়লা ইত্যাদি ফেলে সেখানকার বাতাসকেও দূষিত করবার পক্ষে সাহায্য করছে। চিলেগুপ্তের মৃত্যুহার প্রভৃতি হপ্তায় কি পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে কাগজ থেকেই সেটা আমরা নিত্য জানতে পারি। সংক্রামক ব্যাধিতে সহর আচ্ছন্ন—তার উপর নারীর অজ্ঞ-পরিচর্য্যা প্রতিবেশী বা আত্মীয় বন্ধুর জীবনে স্বাস্থ্যহীনতা ডেকে আনে।

এই অস্বাস্থ্যকর অজ্ঞতা দূর করতে প্রতি নারীকেই সজাগ এবং সচেষ্ট হতে হবে। সংক্রামিত ব্যাধির ধ্বংসলীলা হতে বাঙলার ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে হলে নারীর দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পথে পরিচ্ছন্ন-সেবাজ্ঞানই সকল কাজের আগে শেখা দরকার। এই সম্বন্ধে নারী বা সমিতির পরস্পর সহযোগীতা কত বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা পরে আলোচনা হবে।

সমিতির প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার আমি আমার বোনেদের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি—তাঁরা তাঁদের শিল্পজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করে আলাপটাকে দূর থেকে কাছে নিয়ে আসুন। সকলেরই কিছু না কিছু সমস্যা হালকা হয়ে উঠুক।

রন্ধনশিল্প বিষয়ে কিছু জানবার জন্য অনেকেই উদগ্রীব হয়ে আছেন। পূর্ব্ববঙ্গীয় রন্ধন কৌশল সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গীয় বোনেরা একেবারেই অজ্ঞ। সেজন্য পূর্ব্ববঙ্গীয় বোনেদের এবং মা পিসিমার কাছে এই কৌশল আমরা শিখতে চাই—আস্বাদ পেতে চাই। সহরের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট দেহ পূর্ব্ববঙ্গীয় রন্ধনশিল্প চাতুর্য্যে চিরবঞ্চিতা। কালিকলমের ভেতর দিয়া ১৬০।১৬৫ পদের মধ্যে কিছু নমুনা যদি ভেসে উঠে, তাহা হলে অনেক দিনের লোলুপ-আশা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হতে পারে—"দুধের বদলে ঘোলের স্বাদের মত"।

কিরে বেচু রামা, শ্যামা—কেন
হাসি মুখ
বলি-পেয়েছিস্ না পাবি কোন সুখ
নারে পচা, পতা, বামা ওটাই ত বিমুখ
তা না হ'লে পাই কিরে দুখ
ন

শ্রীদুর্ব্বাসা

অক্‌সন ডুপ্লিকেট প্রতি-যোগীতার একটি হাত :—

ইস্কাবন—দশ, চৌকা।
হরতন—গোলাম, আটা।
রুহিতন—টেক্কা, আটা, ছক্কা, তিরি।
চিড়িতন—বিবি, সাতা, পঞ্জা, চৌকা, তিরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, আটা।
হরতন—সাতা, ছক্কা, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, পঞ্জা।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, নয়।

ইস্কাবন—নয়, ছক্কা, তিরি।
হরতন—সাহেব, দশ, নয়, চৌকা।
রুহিতন—গোলাম, দশ, সাতা।
চিড়িতন—টেক্কা, ছক্কা, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, সাতা, পঞ্জা।
হরতন—টেক্কা, বিবি, পঞ্জা, তিরি।
রুহিতন—বিবি, নয়, চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—সাহেব, আটা।

উল্লিখিত হাতে 'দ' একটি ফেরাই ডাক দেওয়ায় সকলে পাশ দিলেন। অতঃপর এক ঘরে এক পক্ষ একটির খেলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, অন্য ঘরে অপর পক্ষ খেলা করতে না পেরে খেঁসারৎ দিয়েছিলেন। খেলা হয়েছিল নিম্নরূপ,

(১) 'প' ইস্কাবনের বিবি খেলায় 'উ' ইস্কাবনের চৌকা, 'পূ' ইস্কাবনের তিরি দিলে, 'দ' ইস্কাবনের সাহেব দিয়ে পিটখানি ধরলেন।

(২) এবার 'দ' রুহিতনের দুরি খেললেন; 'প' রুহিতনের পাঞ্জা, 'উ' রুহিতনের টেক্কা এবং 'পূ' রুহিনের সাতা দিলেন। এ স্থলে ডাকদার দেখ্‌লেন যে ডাকানুযায়ী তাঁর খেলা করা বিশেষ শক্ত, কারণ বিপক্ষদলের হাতে প্রবেশ করায় উপাযোগী তাস হাতে অনেক থাকায় ইস্কাবনে খেলা চলা প্রায় সুনিশ্চিত তবে তিনি নিজদলের চিড়িতন রঙটি দাঁড় করাবার চেষ্টা করতেন, যদি 'ডামি'র হাতে ঢোকার উপযুক্ত তাস তাঁর থাকৃত অন্যথায় তিনি রুহিতনে তিনটি পিট করাবার চেষ্টাই করতে লাগ্‌লেন।

(৩) 'উ' রুহিতনের তিরি খেল্‌লে 'পূ' দশ, 'দ' নয় ও 'প' সাহেব দিয়ে পিট ধরলেন। এবার ডাকদার দেখ্‌লেন যে যদি তিনি রুহিতনের দশের উপর বিবি খেলেন এবং বিবিখানি যদি মারা যায়, তা'হ'লে তাঁর পিট পাবার আশা সমূলে নির্ম্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু এইখানে যদি সাহেব পড়ে যায় তো তাঁর খেলা হলেও হতে পারে, এরূপ চিন্তা করে তিনি নয় দিয়ে পিটখানির আশা ছেড়ে দিয়ে খেঁড়ীর হাতে যাবার উপায় রেখে দিলেন।

(৪ ও ৫) 'প' ইস্কাবনের টেক্কা ও গোলাম খেললে 'উ'র চিড়িতনের তিরি ব্যতীত আর সকলে ইস্কাবন দিয়ে গেলেন।

০ (৬) এবার 'প' ইস্কাবনের আটা, 'উ' চিড়িতনের চৌকা, 'পু' চিড়িতনের ছুরি, আর 'দ' হরতনের তিরি দিয়ে গেলেন।

(৭) অতঃপর 'প' ইস্কাবনের ছুরি, 'উ' হরতনের আটা, 'পু' হরতনের চৌকা, এবং 'দ' হরতনের পাঞ্জা দিলেন।

(৮) তৎপরে 'প' চিড়িতনের গোলাম খেললেন, 'উ' চিড়িতনের পাঞ্জা, 'পু' চিড়িতনের ছয় আর 'দ' চিড়িতনের সাহেব দিয়ে পিট নিলেন।

(৯) 'দ' এবার রুহিতনের বিবি খেল্‌লে 'প' হরতনের সাত, 'উ' রুহিতনের ছয় ও 'পু' রুহিতনের গোলাম দিয়ে গেলেন।

(১০) 'দ' রুহিতনের চার খেল্‌লে 'প' হরতনের ছুরি, 'উ' রুহিতনের আটা আর 'পু' হরতনের নয় দিলেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন 'প' হরতনের সাতার পর হরতনের ছুরি দিয়ে 'দ'কে ভয় দেখালেন যে, যাতে তিনি হরতনে 'ফিনাস' না এমন, কিন্তু যাঁরা ভাল খেলানোর কৌশাদিতে অভিজ্ঞ তাঁদের ঠকানো সহজ নয়।

(১১) সুতরাং 'উ' হরতনের গোলাম খেল্‌লেন, 'দ' বিবি দিয়ে 'ফিনাস' করলেন।

(১২) অতঃপর তিনি টেক্কা খেলে নিলেন।

(১৩) এবং চিড়িতনের সাহেব বা বিবির পিট নিয়ে তিনি সাতখানি পিট মেরে নিলেন।

কিন্তু অপর ঘরে প্রথম থেকেই সুচিন্তার অভাবে হরতনের 'ফিনাস' নিতে গিয়ে ক্রীড়কদ্বয় সমস্ত খেলাটিকে একেবারে পণ্ড করে খেঁসারৎ দিয়ে গেলেন।

রজনীগন্ধা

শ্রীপ্রিয়ব্রত ঘোষ

দলগুলি নিরুপম ছন্দে
খুলে যায় নিখিলের স্পন্দে,
অনুদের মন্ত্রে,
ছেড়ে দেয় বিশ্বের লক্ষ্যে
সুরভি যে সঞ্চিত ছিল তা'র বক্ষে।
এ অসীম অখিলের কুঞ্জে
প্রতি ছোট পরমাণু গুঞ্জে
অবিরাম সমগীতিছন্দে,
অনুপম রূপরস গন্ধে;
কী মহা-আনন্দে
ওঠে সুর, অনাদি অনন্ত,
জীবন্ত বিশ্বের মন্ত্র।
সেই সুর লভিল যে পরাণে,
ভাষা দিল তা'র প্রতি চরণে,—
বিশ্বজনীন হো'ক্ মানবের ধর্ম্ম,—
সে বাণীর মর্ম্ম
যা'র, হোলো ব্রতকর্ম্ম
বিশ্বমনের সাথে মন তা'র মিলালো।
জীবনের দীপশিখা দেয় তা'র কী আলো!
প্রতিটি তারার গানে,
প্রতিটি তরুণ মনে
বিশ্ববাণীর বীণা যে বাজে
তা'র ভাষা যা'র মনে বিরাজে
মন তা'র হবে না'ক বৃদ্ধ,
তরুণ মন্ত্রে সে যে সিদ্ধ।

ফটো: প্যারামাউন্ট

উপরে৷ ক্যারল লম্বার্ড ও জন ব্যারিমুর "ট্রু কন্‌ফেসন" ছবির একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে।
-বিখানা বিগ্যালে দেখান হচ্ছে
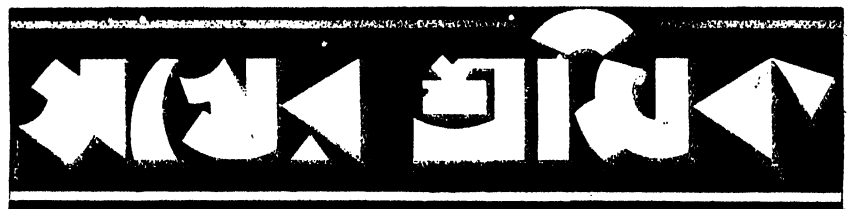
পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে ফাল্গুন ১৩৪৪, ১০ই মার্চ্চ ১৯৩৮ } ১০ম সংখ্যা

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করায় যে নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সু-সমাধান হওয়ায় কংগ্রেসীমহল ও লাটমহল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। কিন্তু তাহার উত্তাপ সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বেই কংগ্রেসী অনুশাসন ও লাটসাহেবী অনুশাসন মধ্যে পুনরায় এক সংঘর্ষ বাঁধিবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করিয়া পরাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে কায়েম করিবার জন্য যত আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১২৪ (ক), ১৪৪ ধারা ইত্যাদিই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খ্যাত। এবং ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আমরা সেই রাজদ্রোহ আইনেরই অন্তিম নিঃশ্বাস শুনিতেছি।

বিগত কংগ্রেস আন্দোলনে বহু প্রদেশই দমন-নীতিমূলক আইনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বহু ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী পত্রিকা সমূহকে ঐ সমস্ত আইনের বেড়াজালে ধরা পড়িতে হইয়াছে। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রেমিককেই ১২৪ক ধারা ও ১৪৪ ধারা ইত্যাদির প্যাঁচে আসিয়া শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে—তন্মধ্যে সীমান্তপ্রদেশের সহিত অন্যান্য প্রদেশের তুলনা খুবই কম। তাহার স্মৃতিই তথাকার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীকে দমন-নীতি দমনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছে। কংগ্রেস পক্ষীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেব তাঁহার প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ আপাততঃ তথাকার আইন সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা জরুরী প্রেস আইন, এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ও ১৪৪ ধারা সংশোধিত হইয়া উঠিয়া যাইবে।

কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণরের অনুমোদন ব্যতীত কোন গৃহীত আইনের প্রস্তাব কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যে নীতিতে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইতেছে তাহাতে এই সকল দমনমূলক আইন গবর্ণমেণ্টের খুবই প্রয়োজন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত হয়ত ডাঃ সাহেবের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতীকার রহিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশের আইন সভা সমূহও যদি অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ

করে এবং একযোগে যদি অনুরূপ দাবী করে তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার বিরোধিতা করা খুব সহজ হইবে না। সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত আরও ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও পাঞ্জাবে না হউক অন্ততঃ বাকী প্রদেশগুলির সীমান্ত প্রদেশের আদর্শ অনুসরণ করার পথে কোন অন্তরায়ই নাই।

যখন সীমান্ত প্রদেশে রাজদ্রোহ আইনের প্রতিবাদ হয়, বিহার ও যুক্ত প্রদেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অবরুদ্ধ রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইতেছে, মান্দ্রাজে রাজবন্দী বলিয়া আর কেহ নাই তখন পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার অবস্থা অন্যরূপ। বাঙ্গলায় এখনও প্রায় বহু শতাধিক রাজবন্দী কারা প্রাচীরের অন্তরালে তাহাদের দীর্ঘ বৈচিত্র্যহীন দিন কাটাইতেছে। প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্র খুলিলে দেখা যায় কোন না কোন রাজবন্দী হয় অনিদ্রায়, না হয় অন্য কোন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি নচেৎ যক্ষায় ভুগিতেছে। প্রাচীরের বাহিরে আত্মীয় স্বজনদের দুঃখের অশ্রু চোখের কোনেই শুখায়।

এই সকল রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে মন্ত্রী মণ্ডলীর চিন্তা করিবার কিছুই নাই এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে সামান্য মানবতার প্রদর্শনও করিবে কে? ঢাকা জেলে অনশনের ফলে হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যুতে জনসাধারণের মনে যে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয় সে সম্বন্ধে বাঙ্গলার স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্যার সার নাজিমুদ্দিন সোজা জবাব দিয়াছেন যে ঐ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করার ইচ্ছা সরকারের নাই। জনমত সম্বন্ধে সচেতন থাকার এখন কোনই প্রয়োজন নাই—নির্ব্বাচন-পর্ব্বের সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হইয়াছে। কিন্তু এই জনসাধারণের মনে এখন হইতেই যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সুরু হইয়াছে। হাওয়া ঘুরিয়া আসিতেছে। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ভবিষ্যতে দুঃখ ও ত্যাগের মূল্যেই নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে।

কর্পোরেশন ও কংগ্রেস

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ প্রসঙ্গে শরৎ বাবুর প্রস্তাব ২৮।১৩ ভোটে পরিত্যক্ত হওয়ায় বর্ত্তমান মেয়র শ্রীসনৎ কুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ সভাপতিসহ ১৩ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

পদত্যাগ পত্রের উপসংহারে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে "কংগ্রেস এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলীর গ্রহণযোগ্য" কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করা সম্ভবপর হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা করা না হইলে, তাঁহারা এসোসিয়েসনের সদস্য থাকিতে পারেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিবার মত সাহস যে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের ২৮ জন সভ্যের হইতে পারে তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির বেনামীতে যাহারা কংগ্রেসের ছাপ বক্ষে ধারণ করিয়া কর্পোরেশনে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের মুখোস নির্ম্মমহস্তে বিদীর্ণ করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, কর্পোরেশনে কংগ্রেস কাউন্সিলারবৃন্দের সম্বন্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন—বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানের বক্তৃতায় তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্পোরেশনে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় সুভাষচন্দ্র তাঁহার পুণার কার্য্যক্রম স্থগিত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সুভাষচন্দ্র কঠোর হস্তে এই সমস্ত চঞ্চলমতি ও আদর্শচ্যুত কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দকে সমুচিত শিক্ষা দিলে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিবে। আমরা এতৎসম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশঘোষণা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

চিত্রা

ফোন বি,বি, ১১৩৩

২৬ সপ্তাহ

মুক্তি

নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য স্ত্রী কতদিন অপেক্ষা করিতে পারে? মুক্তি চিত্রে দেখুন!

মুক্তি'র সহিত—
রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের
বোম্বাই-এ বিপুল সম্বর্দ্ধনার
টপিক্যাল চিত্র দেখান হইবে।

বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী সকলেই এই চিত্র দেখিয়া সুভাসচন্দ্রকে সম্মানদান করুন।

রূপবাণী

কৌতুক
রহস্য
বিদ্রূপ
প্রণয়

শুভ উদ্বোধন
শনিবার ১২ই মার্চ্চ

মেট্রোপলিটন পিক্‌চার্সের
বিদ্রূপাত্মক হাস্যরসচিত্র

হাল বাঙলা

ভূমিকায়:
ছায়া দেবী
ডি, জি, তুলসী লাহিড়ী
সত্য, নবদ্বীপ, রঞ্জিৎ
ললিত, মৃণাল মহাদেব

শনি ও রবিবার
৩, ৬-১৫ ও ৯-৩০টায়
অন্য দিন
৬-১৫ ও ৯-৩০টায়

নিউ সিনেমা

ধর্ম্মতলা * ফোন: কলি: ৫৮১৯

২য় সপ্তাহ!!

সরোজ মুভীটোনের

এ টেল অব্ ইয়েস্‌টারডে

(কাল—কা—বাত)

ভূমিকায়—দুর্গা খোটে, জেবউন্নিসা, সুরেন্দ্র, রোজ প্রভৃতি।

অত্যাচার, অবিচার পরিপূর্ণ হুনরাজ মিহিরগুলার জ্বলন্ত কাহিনী। প্রথম সপ্তাহে না দেখিয়া থাকিলে এই সপ্তাহে নিশ্চয়ই দেখিবেন। আপনার হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনয়ন করিবে।

এ টেল্ অব্ ইয়েস্‌টারডে

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড. ফোন: সাউথ ৩৪

শনিবার ১২ই মার্চ্চ হইতে
জনাকীর্ণ পঞ্চম সপ্তাহ!

প্রভাস-মিলন

ভূমিকায়—অহীন্দ্র, শান্তি, রেণুকা, ছায়া, সুশীল রায়, মৃণাল ঘোষ প্রভৃতি।

তৎসহ সতু সেনের অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা
কেমন জব্দ

বাগান লিজ

কলিকাতার উপকণ্ঠে পুষ্করিণীসহ একটী বাগান লিজ লইতে ইচ্ছুক। বিবরণাদিসহ বক্স নং অ C/o "খেয়ালী" ১১নং চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ) ভবানীপুর, কলিকাতা—লিখুন।

বিলাসী ১)

নিউ থিয়েটার্স

এই মাসের ২৬শে তারিখে "চিত্রায়" বিদ্যাপতির বাঙলা সংস্করণ মুক্তি লাভ কোরবে।

এই ছবিখানিকে সুন্দর ও শোভন কোরে ছায়া-পটে তুলে ধরেছেন—নিউ থিয়েটার্স। যতখানি যত্ন, আন্তরিকতা ও অর্থব্যয় প্রয়োজন—তা সর্ব্বাংশে প্রয়োগ করতে কর্ত্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। দেবকী বোসের পরিচালনায় এবং রাই বড়ালের সুর সংযোজনায় 'বিদ্যাপতি' যে তার নামের উপযুক্তই হ'য়েচে—একথা আজ সর্ব্ববাদী সম্মত। আমরা আশাকরি ভারতের অপরাপর প্রদেশের মত এর বাঙলা সংস্করণটি বাঙালী দর্শকের কাছে চির স্মরণীয় হোয়ে থাকবে।

* * *

পূর্ণ উদ্যমে ১নং ষ্টুডিওতে 'অভিজ্ঞান'-এর কাজ চলচে। ইতিমধ্যে কতকগুলি নৈশ দৃশ্য অতি নিপুণভাবে তোলা হ'য়েচে। সম্প্রতি কাজ চলচে যে সেটে—এই ছবির সেইটিই হ'বে শেষ সেট। এরপর পরিচালক প্রফুল্ল রায় বাকী লোকেশান-এর কাজ শেষ কোরতে যাবেন।

আশাকরি এই ঘটনাবহুল ও সমাজ সমস্যামূলক কাহিনীটি নিউথিয়েটার্সের সর্ব্বাংশে মর্য্যাদার উপযোগীই হ'বে।

* * *

বাঙলার অপরাজেয় কথা শিল্পী স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনী "বড়দি" চিত্র-গ্রহণের প্রাথমিক কাজগুলি অতি নিপুণ ভাবে সম্পন্ন হোয়েচে। হিন্দি ও বাঙলায় এই ছবিখানির পরিচালনা কোরবেন শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক। অভিনয় কার্য্য ছাড়াও মল্লিক মহাশয় প্রডাক্‌শান বিভাগে

নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, দেববালা, মনোরঞ্জন ও অহি সান্যাল

বহুকাল ধরে হাতে-কলমে কাজ কোরে গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছে। তাই পরিচালক হিসাবে মল্লিক মহাশয়কে নির্ব্বাচন আমরা উৎসাহিত হ'য়েচি এবং কর্ত্তৃপক্ষের নির্ব্বাচন শক্তির তারিফ করচি।

এই প্রডাকশানের আর একটি বিশেষত্ব—এর চিত্র-নাট্য রচনা কার্য্যের দায়িত্ব থেকে পরিচালককে অব্যাহতি দেওয়া হ'য়েচে। পরিচালনা সম্পর্কিত প্রাথমিক কাজগুলি যাতে আরও নিপুণভাবে সম্পন্ন করবার সুযোগ পান—এই উদ্দেশ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ এই পদ্ধতি অবলম্বন কোরেছেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচালক স্বয়ং চিত্র-নাট্য রচনার দায়িত্ব গ্রহণ কোরলেও সাধারণতঃ য়ুরোপে ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হয়।

বড়দি-র চিত্র-নাট্য রচনা কোরেছেন স্বনামধন্য পরিচালক দেবকী বসু। সুতরাং এই দিক দিয়ে মল্লিক মহাশয়ও যে বিশেষ লাভবান হোলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

আশা করি পরিচালনা কার্য্যে নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ হাত-যশের পরিচয় দিয়ে শ্রীযুক্ত মল্লিক এই চিত্রে পরিচালক হিসাবে নিজস্ব যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন। আমরা তাঁর নব উদ্যমের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

* * *

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার নিপুণ পরিচালনায় এদের সামাজিক ছবির চিত্রগ্রহণ কার্য্য নিয়মিত-ভাবে চলচে।

আধুনিক বাঙলার তরুণ-তরুণী মহলে এই ছবিখানি যে 'মুক্তি'র মতই সমাদর লাভ কোরবে, ছবির কাহিনীটি পড়ে আমরা সে কথা নিঃসন্দেহে বোলতে পারি।

ইন্দিরা ও রাধা—দুটি পরস্পর বিরোধী অপূর্ব্ব নারী চরিত্র। এদের দু'জনার সংঘাতের মাঝে অতর্কিতে এসে পড়লো নিখিলেশ। অপর দিকে বস্তীর কটি জীব—যা'কে আশ্রয় কোরে একটু সুখের নীড়

এই ভারতের

মহামানবের সাগরতীরে

মানবতার যে পরম সত্য

মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে

গোরা

তাহারই মূর্ত্তরূপ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

সেই অতুলনীয় সৃষ্টির

চিত্রানুবাদ

করিবার গৌরব

লাভ করিয়াছেন

দেবদত্ত ফিল্মস্

রচনা করবার কল্পনা কোরেছিল, একদিন সে নীড় ভেঙে দিয়ে ছুটে চললো, ঐশ্বর্য্য বিলাসের মোহে চঞ্চল হোয়ে—ধনীর আলয়ে একটু আশ্রয় পেতে।

কেমন কোরে সে আশ্রয় বিষিয়ে উঠলো, কেমন কোরে সে বিজয়িনীর সকল গর্ব্ব চূর্ণ হোল—এই ছবি খানিতে আমরা তারই পরিচয় পাই।

বিভিন্ন ভূমিকায় বড়ুয়া, যমুনা, মেনকা, চিত্রলেখা, পূর্ণিমা, পাহাড়ী, প্রতাপ, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখার্জ্জীর অভিনয়ে—চিত্রিত কাহিনী যে একটা অখণ্ড মাধুর্য্য নিয়ে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জন কোরতে পারবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই চিত্রের সঙ্গীতাংশের পরিচালনা কোরছেন স্বনামধন্য সুর-শিল্পী তিমির বরণ—এবং তাঁকে সর্ব্বতভাবে সাহায্য করছে সুগায়ক হরিপদ রায়।

*　　*　　*

গেল ৯ তারিখ থেকে ডাইরেক্টর ফণী মজুমদারের বইএর শুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। উপস্থিত এ বইখানির হিন্দী সংস্করণই হ'বে বলে স্থির হয়েছে। এর প্রধান ভূমিকায় দেখা যাবে কানন ও সাইগালকে। তাছাড়া জগদীশ, বিক্রম, কাপুর, রাসকুমারী প্রভৃতিকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে। এ ছবির আলোকচিত্রের ভার পেয়েছেন সুধীশ ঘটক ও দীলিপ গুপ্ত, শব্দ যন্ত্রের ভার নিয়েছেন লোকেন বাবু। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন মিঃ বড়াল। পরিচালক মজুমদারকে সাহায্য করবেন কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় ও মনী দত্ত। মজুমদারের হাতে এ ছবিখানি যে একখানি প্রথম শ্রেণীর ছবি হ'বে এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।

কালী ফিল্মস

এদের অভিনব হাস্যরসাত্মক বাণী চিত্র "সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব" আগামী শনিবার থেকে তৃতীয় হপ্তায় পড়বে। ছবিখানাতে রোজই অসম্ভব জন-সমাগম হ'চ্ছে এবং ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানা 'উত্তরা' চিত্রগৃহে বহুদিন চলবে।

হাজরা পিক্‌চার্স

এদের পৌরাণিক ভক্তি-মূলক চিত্র "দেবী ফুল্লরা"র শুটিং কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে বেশ জোরভাবে চলছে। পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এবং তাঁর সহকারী কালীপদ রায় ছবিখানাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। আমরা ছবিখানার সাফল্য কামনা করি।

প্রফুল্ল পিক্‌চার্স

প্রফুল্ল ঘোষের প্রযোজনায় এদের প্রথম বাঙলা হাসির ছবি "পথের প্রেমিক" আগামী ১৬ই মার্চ দোলপূর্ণিমা দিবসে 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। বাঙলার তরুণ তরুণীদের আধুনিক সমস্যার এই চিত্রখানি জলন্ত নিদর্শন। আমরা প্রফুল্ল ঘোষের "পথের প্রেমিকের"-র জনপ্রিয়তা কামনা করি।

ও, কে, এ,

"রূপোর ঝুমকোর" শুটিং শেষ হওয়ার পর কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। তাঁরা আর একখানি ছোট্ট বই তোলার প্রাথমিক তোড়জোড় কচ্ছেন। সম্ভবতঃ ঐ ছোট্ট বইখানি আর "রূপোর ঝুমকো" একসঙ্গে মুক্তি লাভ কর্ব্বে। ওদিকে রূপোর ঝুমকোর সম্পাদনা শেষ হতেও আর খুব বেশী বিলম্ব নেই। ছবিখানি শীঘই 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

পূর্ণ থিয়েটার

রাধাফিল্মের প্রভাস মিলন এ চিত্রগৃহে যে ভাবে চলছে তা বাস্তবিকই আনন্দের কথা। পূর্ণ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এর পরই অর্থাৎ শুক্রবার ২৫শে মার্চ্চ হইতে নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' দেখাবেন ঠিক্ করেছেন। চিত্রায় 'মুক্তি' চিত্র যে ভাবে এখনও লোক সমাগম করছে তাতে মনে হয় দক্ষিণ কলিকাতায় এই 'পপুলার' হাউসেও তদ্রূপ জনসমাগমের অভাব হ'বে না।

চিত্র-প্রচার না আত্ম-প্রচার ?

খেয়ালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
সবিনয় নিবেদন

খেয়ালীর গত সপ্তাহে "মুক্তি" সাফল্যো বিষয়ক প্রবন্ধে প্রচার সম্বন্ধে কিছু লেখা ছাপা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আপনারা, কিম্বা লেখক মহাশয়, দয়া করিয়া আমার একটি ব্লকও ছাপিয়াছেন। চিত্রের সাফল্যের প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু ঐ সঙ্গে প্রচার যিনি চালান তাঁহার প্রশংসা করার কোন অর্থই হয় না। ছবিতে যদি দর্শকের আনন্দ-দায়ক এবং উপভোগ্য বস্তু না থাকে, তাহা হইলে কোন প্রচারকার্য্য-কর্ত্তার এমন সাধ্য নাই যে চিত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারেন। কাজে কাজেই নিজের কর্ত্তব্য কাজ করার জন্য কেহ কোন প্রশংসার অধিকারী হইতে পারেন না।

তাহা ছাড়া, একই প্রতিষ্ঠানের একজন অন্যজনকে অনাবশ্যক প্রশংসা করিলে বাহিরের লোকে তাহার নানা অর্থ করিতে পারে—এই সুযোগ দান করাও কোন সার্থকতা নাই। চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা চিত্রের এবং কোম্পানির সুপ্রচার করিবার জন্য প্রচার-কর্ম্মী নিযুক্ত করেন। এই সকল প্রচার-কর্ম্মীর একমাত্র কাজ হওয়া উচিত কোম্পানির এবং কোম্পানির নির্ম্মিত চিত্রাদির সুপ্রচার করা। কিন্তু এই সুযোগ লইয়া নিজেদের প্রচার করা (বা কেহ কেহ যেমন বলেন—ঢাক পিটান) কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে প্রচারকর্ম্মীদের আত্মপ্রচার এই ভাবে না হওয়াই ভাল। অন্ততঃ আমার নিজের কোন প্রচার আমি ক্লেশ এবং লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করি। ইতি নিঃ—

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

('মুক্তির' রজত-জয়ন্তীকে উপলক্ষ করিয়া নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম প্রচার-সম্পাদক শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল স্বনামে এক প্রবন্ধ লিখিয়া গত সপ্তাহের খেয়ালীতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ও নিজের আত্মপ্রচার সকৌশলে করিয়াছেন। নিউ থিয়েটার্সের চিত্রগুলির প্রচার এই দুই কর্ম্মীর উপর অর্পিত হয়। তাঁহারা যদি সেই চিত্র-প্রচারের সুযোগে বা তাহার আবরণে নিজেদের প্রচার আরম্ভ করেন তাহা হইলে সম্পাদক-মণ্ডলীর প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। আমরা প্রীত হইলাম যে অন্যতম কর্ম্মী হেমন্তবাবু অনুরূপ প্রচার ক্লেশ ও লজ্জার কাজ বলিয়া মনে করেন। আশা করি সুধীরবাবু তাঁহার আত্মপ্রচার লিপ্সা দমন করিয়া আমাদিগকে অব্যাহতি দিবেন।

—সম্পাদক (খেয়ালী)

N. I. P 81

শনিবার, ১২ই মার্চ্চ

রূপবাণী

খেয়ালী
অতিরিক্ত
সংখ্যা

মৃণাল
SAILA

হাল
হাসির ছবি
দেবী, ছায়া
মনোরমা,
পাল প্রভৃতি
নূতন
ভূমিকায়

ছায়ালোকে শ্রীমতী ছায়া দেবী নবাগতা। বছর দেড়েক পূর্ব্বে কে-ইবা জানত তার নাম ?

বাংলার দর্শকের নিকট আজ তিনি পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, আজ তারা তার অভিনয়-নৈপুণ্যে মুগ্ধ, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। অল্পদিনের মধ্যে দর্শকের প্রিয় হওয়া অভিনেত্রীর পক্ষে যে কতবড় প্রশংসার কথা, আর কত বড় শক্তির পরিচায়কতা অভিনেত্রীরাই তা' জানেন ভাল! বাস্তবিক পক্ষে, এ সৌভাগ্য সকলের হয় না। হয় শুধু তাঁদেরই যাঁরা ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী—যাঁরা আসেন সৌন্দর্য্যশিল্পবোধ ও অভিনয় প্রতিভা নিয়ে। ছায়া দেবী প্রতিভাসম্পন্না শিল্পী—তাই যেদিন তিনি 'সোনার সংসার' চিত্রের মধ্য দিয়ে ছায়া-শিল্পের মন্দিরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন, সেদিন মন্দিরের দ্বার খুলে গেল। অভিনেত্রী জীবনের সত্যকার প্রাণঢালা পূজা তার ব্যর্থ হ'ল না।

'সোনার সংসার' চিত্রে ছায়া দেবীর অভিনয় দেখে দর্শকেরা বললেন—"চমৎকার"! ভক্তরা বল্লেন—"অভিনব"! সমালোচকেরা বল্লেন—"ওয়াণ্ডার-ফুল্"।

ছায়া দেবী উচ্চবংশজাত ভদ্রমহিলা। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ। অসীম রূপ লাবণ্যের অধিকারিণী না হ'লেও তাঁর রূপ ও লাবণ্যের অভাব নেই। তিনি সুশ্রী—সুন্দর তাঁর স্বাস্থ্য! তার পরে আছে তাঁর শিক্ষা, সুরুচি, কলাজ্ঞান এবং সংযম!

অভিনেত্রী জীবন গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তিনি ভাবতেও পারেন নি যে একদিন তাঁকে আসতে হবে চিত্ররাজ্যে, অভিনয় করতে হবে ক্যামেরার সামনে।

বয়স তখন তাঁর কতই বা আর—মোটে সাত কি আট! ভাগলপুরে থাকেন, খেলে খেলে দিন কাটান। দিনরাত হিঃ হিঃ, হো হো…মা বলেন, ওরে শুনছিস পাগলী! এমনি করেই কি তুই খেলে বেড়াবি ?

খেলবোনা ? বারে! বেশ লোক তো তুমি!

মা বলেন: একটু পড়াশুনা কর মা। মেয়ে-মানুষ, তাতে যদি আকার মুখ্যু হয়ে থাকিস…

দুত্তোর পড়াশুনো!…পাগলী মেয়ে মার সম্মুখ থেকে ছুটে চলে যায়। বাড়ীর সামনের রাস্তাটা একবার পাক দিয়ে ফিরে আসে। রান্নাঘরে মার পাশটিতে এসে বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—মা, মা, রাস্তায় ঐ খোঁড়া ভিকিরিটা কি রকম সুর ক'রে ভিক্ষে করছিল, দেখবে ? এই দেখ…

বালিকা খোঁড়া ভিখারীর কণ্ঠধ্বনির অবিকল অনুকরণ করে ভিখারীর ভিক্ষাভিনয় ক'রে যায়। মা মেয়ের পাগলামী দেখে বিস্মিত হয়ে যান, কিন্তু মুখে বলেন—ছিঃ মা, কাউকে ভেংচাতে নেই…ওতে পাপ হয়!

এমনি ক'রে ভাগলপুরে ছায়া দেবীর বাল্য-জীবন বেশ কাটছিল। হঠাৎ সেখানকার ক্ষুদ্র সংসারটি উঠিয়ে আনবার চেষ্টা চলতে লাগল!

মা তার সংসার নিয়ে এলেন দিল্লীতে। ছায়া দেবীর পিতা দিল্লীতে চাকরী করতেন। স্থির হ'ল দিল্লীতেই এখন থেকে কায়েমীভাবে সংসার পাতা হবে। হ'লও তাই।

এমনি করেই দিন যায়—বছর ঘোরে। ছায়া দেবীর পিতার প্রবাসের দিন বুঝি ফুরিয়ে এল। একদিন দিল্লীর সংসার গুটিয়ে তাঁরা সকলে বহুদিন পরে ফিরে এলেন—কোলকাতায়।…

কোলকাতায় এসে ছায়া দেবীর ভবিষ্যতের জন্য পিতা মাতা যেন অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে উঠলেন। নানা জল্পনা-কল্পনা চলল। মা বলেন: মেয়েটার জন্য একটা ব্যবস্থা কর! বাবা বলেন: ব্যবস্থা? কি ব্যবস্থা! মা ঠিক বলতেও পারেন না। সরোজনলিনীর স্কুল, ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষকতা…কত কি তাঁর মনে পড়ে!

হঠাৎ একদিন ছায়া দেবীর বাবা বল্লেন: শুনেছ, ছায়া বায়স্কোপে অভিনয় করতে চায়, কি বল ?

মা প্রায় শিউরে উঠলেন: এঁ্যা, অভিনয়? ও করবে অভিনয়? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কিন্তু পিতা শুধু হাসলেন? কেন, ভদ্রঘরের মেয়েরা কি অভিনয় করতে পারে না। ক্ষতি কি? তাছাড়া তিনি যখন মেয়ের সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রে থাকবেন।

মা প্রথমটা। তীব্রভাবেই আপত্তি জানালেন, তারপর চুপ করে গেলেন!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে এসে রাত্রে ছায়া দেবীর চোখের পাতা আর বোজে না! কি ক'রলে যে? ভাল হ'ল কি…কেন নয়! অন্যায় কোথায়? কেন, সে কী এমনই দুর্ব্বল! আচ্ছা ষ্টুডিওর লোকগুলি কেমন? …দূর হোকগে, আমি ত' ঠিক থাকব।

ছায়া দেবী চলচ্চিত্রে যোগদান করলেন, কাগজে চলচ্চিত্রে ভদ্রমহিলার যোগদানের বিবৃতি বের হল। ছায়া দেবীর অভিনয়ের হাতে-খড়ি হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়ার 'পথের শেষে' চিত্রে, ছোট একটী পার্ট—বৈষ্ণবীর ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হল—উপরন্তু পরিচালক তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীত যোজনাও করে দিলেন। প্রথম অভিনয় চলনসই পর্য্যায়েরই হ'ল—কিন্তু তাঁর কণ্ঠের সঙ্গীত অসম্ভব 'উৎরে' গেল!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে তখন সুবিখ্যাত পরিচালক শ্রীদেবকী বসু তাঁর অভিনব চিত্র 'সোনার সংসার' তোলার তোড়জোড় করছেন, সিনারিও লেখা হয়ে গেছে, ভূমিকা বণ্টনও কিছু কিছু করা হয়ে গেছে। কিন্তু আসল কাজটি তার তখনও করা হয় নি—মানে নায়িকা নির্ব্বাচন। এই ছবিখানির জন্য কোম্পানী লক্ষ টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত…অথচ মনের মত নায়িকা ঠিক পাওয়া যাচ্ছিল না। মেয়ে পাওয়া যায় কোথায়?

দেবকী বাবু সুঅভিজ্ঞ পরিচালক। বাংলার নাম-করা চিত্র নট-নটীর মধ্যে কার কতটুকু শক্তি আছে তা' তিনি চোখ বুজেই বলে যেতে পারেন।

একটিপ কড়াপাকের সন্থ নিয়ে পরিচালক মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করলেন—কিন্তু না, হোপলেস্ ...নতুন আর্টিষ্ট ক্রিয়েট করতে হবে,............ অবশেষে নির্ব্বাচন তালিকায় নাম উঠল—ছায়া দেবীর।

ছায়া দেবী পরিচালকের সামনে উপস্থিত হলেন। দু'চারটি প্রশ্ন করেই দেবকীবাবু বুঝতে পারলেন, তিনি ভুল করেন নি।

গত ৺পূজার সময় 'সোনার সংসার' আত্ম-প্রকাশ করেছিল। ছবি দেখে দর্শকের প্রাণে আর খুসী ধরে না...বাঃ কি সুন্দর ছবি...কি অপূর্ব্ব অভিনয় এই ছায়া দেবীর। আশ্চর্য্য এই মেয়েটি। কেমন সহজ, সরল, স্বাভাবিক অভিনয়। গলার স্বরটি তাঁর কি মিষ্ট।

'সোনার সংসারে' অভিনয় ক'রে ছায়া দেবী সুনাম অর্জ্জন করলেন।

এর পরেই এমন সময় হঠাৎ একদিন নব-নির্ম্মিত মতিমহল থিয়েটার্স থেকে আহ্বান এল—'রাজগী' চিত্রে নামভূমিকাভিনয় করবার জন্য। ছায়া দেবী আবার অভিনয়ে নামলেন।

এর পরেই ছায়ার ডাক পড়লো নিউ থিয়েটার্স থেকে 'বিদ্যাপতি' চিত্রে রাণী লছমীর ভূমিকা-ভিনয়ের জন্য। এই ভূমিকা শেষ করেই তিনি পুনরায় মিঃ বি, এল, খেমকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা হলেন এবং নব-নির্ম্মিত মেট্রোপলিটান পিক-চার্সের 'হাল বাংলা'-য় নায়িকার অংশে মনোনীতা হলেন। ছায়া দেবী এ যাবৎ যে ধরণের ভূমিকায় নেমে এসেছেন তা থেকে এই ভূমিকাটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। চটুল রঙ্গের ভেতর দিয়ে বিদ্রূপের কশাঘাতে এই চরিত্রটি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া শ্রীমতীকে আমরা গায়িকা হিসাবেও এই চিত্রে দেখতে পাব। অবশ্য এর পূর্ব্বেও 'পথের শেষে'-তে তিনি গান গেয়েছেন কিন্তু এবার তাঁর কণ্ঠ থেকে শুনতে পাব অনাবশ্যক সাতখানা গান। এই সব কারণেই শ্রীমতী ছায়াকে নূতনরূপে দেখতে পাবার জন্য চিত্রামোদীরা হয়ে উঠেছেন আগ্রহান্বিত।

অভিনেত্রীর জীবন তাঁর। কল্পনা আছে, খেয়ালও আছে। কিন্তু তিনি সংসারেরই মানুষ। সংসারের নিত্যকার জীবন স্রোতে গা এলিয়ে দেবার মত সুখ নেই। তাই সংসার তাঁকে প্রচুর আনন্দও দেয়।

মানুষ হিসাবে ছায়া দেবী ভারী চমৎকার। এমন ভদ্র, বিনয়ী এবং অতিথিপরায়ণা শিল্পী বাংলায় বড় কমই দেখা যায়।

সংসার একদিকে, আর একদিকে কর্ম্মক্ষেত্র। আজ এই দু'জগতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন ছায়া দেবী। মাঝে মাঝে মনে ক্লান্তি, অবসাদ আসে। কিন্তু ছায়া দেবী অসীম ধৈর্য্য, শক্তি ও অধ্যবসায়ের বলে সমান তালে আবার পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলেন—সাধনার পূর্ণ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। সিদ্ধি কবে আসবে কে জানে—কিন্তু সাধনার আনন্দ তাঁর সব চেয়ে বেশী। (বাণভট্ট)।

হাসির রাজা ডি-জি

বাংলার চিত্র-শিল্পের আদি যুগ থেকে ধীরেন গাঙ্গুলী এই শিল্পের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে আজ চিত্র-রসিকদের মধ্যে সিনেমা দেখবার যে অদম্য স্পৃহা বলবতী হ'য়ে উঠেছে, ডি-জি তার জন্য কিয়ৎপরিমাণে গৌরব অনুভব কোর্‌তে পারেন। ডি-জির ব্রিটিশ ডোমিনিয়ান আজ নেই সত্য—কিন্তু নিজের অটুট সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মশক্তির ওপর যে প্রতিষ্ঠানের ভিত গড়ে উঠেছিল—সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে আজ বাংলাদেশ অন্ততঃ একটি শিল্পেও মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ধীরেনবাবু সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ। শৈশব থেকে শিল্পকলা চর্চ্চার দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়। তার পিতামাতা তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তারী বা ওকালতি করবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন—কিন্তু ডি-জি তার মা-বাপকে সাফ্ বল্‌তেন, বই মুখস্ত করা আর খাতায় আঁচড় কাটা তার, দ্বারা সুবিধে হবে না। ছেলের এদিকে মন নেই দেখে তারা তাকে শিল্পবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। এ বিষয়ে অচিরে ধীরেনবাবুর মেধাও প্রকাশ পেল। এই থেকে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তিনি আজ অবধিও নিজেকে এই শিল্পকলার মধ্যে নিমজ্জিত রেখেছেন। এর জন্য জীবনে তার অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা গেছে কিন্তু তাতেও তিনি বুক খলিয়ে সেই ঝড়ো-হাওয়ার আক্রমণকে প্রতিরোধ কোরে নিজের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরেছেন।

ডি-জি আজ অবধি বহু ছবি পরিচালনা কোরেছেন এবং বহুচিত্রে অভিনয় কোরেছেন। কিন্তু হাস্যরসাত্মক চিত্র পরিচালনায় এবং হাসির চরিত্রে অভিনয়ে তার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই মেট্রোপলিটান পিক্‌চারসের বহুদর্শী কর্ণধার মিঃ বি, এল খেম্‌কা সেদিন বুঝলেন যে লোকে এখন গুরুগম্ভীর ছবি দেখতে চায় না—তারা চায়, বায়োস্কোপ দেখে হেসে বাড়ী ফির্‌তে, সেইদিনই তার মনে উদয় হ'ল, ডি-জির নাম। তিনি ডি-জেকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বল্‌লেন—"আমি এবার 'কমেডি' ছবি তুল্‌ব—আপনি গল্প ঠিক করুন।" গল্প ঠিক হ'ল। মিঃ খেম্‌কা ত' গল্প পড়ে হেসেই লুটোপাটি। শুটিং আরম্ভ হ'ল। বাংলাদেশের যেখানে যে কয়জন হাস্যরসিক ছিল সবাই পেল আমন্ত্রণ। আর পরিচালক স্বয়ং একটি নূতন ধরণের ভূমিকা নিলেন। বহুকাল পরে আবার হাসির রাজা ডি-জি হাসির ছবি 'হাল-বাংলা' নিয়ে দর্শক-সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ কোরছেন—তাই আজ 'হাল-বাংলা'র মুক্তির প্রতীক্ষায় দর্শকগণ উদ্‌গ্রীব।

ব্যক্তিগত জীবনে ধীরেনবাবু অতিশয় মিষ্টভাষী নম্র ও বিনয়ী। পর্দার ওপরে যেমন তিনি হাজার হাজার লোককে হাসির ঝরণাধারায় সিক্ত করেন—ব্যক্তিগত জীবনেও যিনি তার সঙ্গে মিশেছেন, তিনিই জানেন ধীরেনবাবু কত বড় রসিক পুরুষ।

নূতন মেয়ে চন্দ্রিকা দেবী

চন্দ্রিকা দেবী ছায়াচিত্রে নবাগতা। ইনি সুশিক্ষিতা, সিনেমার উপযোগী দেহ-সম্পদের অধিকারিণী। জাতিতে চন্দ্রিকা বাঙালী ক্রিশ্চান। শৈশব থেকেই শ্রীমতী পরদুঃখকাতরা। সেই-জন্য বাপ-মায়ের অনুমতি নিয়ে ইনি ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা কোরে জন-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বরাবরই সিনেমা দেখতে তিনি খুব ভাল বাসতেন—কোলকাতায় প্রদর্শিত খুবই কম ছবি আছে যা শ্রীমতী দেখেন নি। বায়োস্কোপ দেখে তার মনে মাঝে মাঝে অভিনেত্রী হবার আকাঙ্খাও যে জাগে নি, এমন নয়। তার এই আকাঙ্খাকে আরও বলবতী কোরে তুল্‌ল, যখন রোজই প্রায় নানা ষ্টুডিও থেকে লোক আসতে লাগল তার বাড়ীতে। কোলকাতার দু'একটি ষ্টুডিও তিনি ঘুর্‌লেন—কিন্তু কোন ষ্টুডিওই তার পছন্দ হ'ল না। অবশেষে একদিন মিঃ খেমকার নূতন প্রতিষ্ঠান থেকে তার আমন্ত্রণ এল। মিঃ খেমকার সঙ্গে আধ ঘণ্টা কথা বলেই তিনি বুঝলেন, তিনি যেখানে কাজ কোরে মর্যাদা পাবেন, এই সেই ষ্টুডিও—চুক্তি-পত্রে সই হ'য়ে গেল, কিন্তু বুক তার দুরু দুরু কোরতে লাগল। এমন সময় সেখানে ডি-জি এসে হাজির। তিনি বল্‌লেন—"শ্রীমতী চন্দ্রিকা আপনি 'নার্ভাস' হ'য়ে পড়লেন না কি? ভয় কি, আমি বল্‌ছি আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত। "হাল-বাংলা" ছবিতে আপনার মত যদি একটি মেয়ে আমি না পেতাম, তা' হ'লে আমাকে বেশ মুস্কিলেই পড়তে হ'ত।"

শ্রীমতী চন্দ্রিকা যদিও ছায়াচিত্রে যোগদান কোরেছেন তথাপি তিনি যে ব্রত নিয়ে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ কোরেছেন তা' এখনও ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন অভিনেত্রী হিসাবে যদি তার সুনাম হয়, তা' হলেও তিনি হয়ত' এই পরসেবাব্রত ত্যাগ কোরতে পারবেন না।

ব্যবহারিক জীবনে চন্দ্রিকা অতিথিপরায়ণা, স্বল্পভাষী ও কর্তব্যপরায়ণা। চন্দ্রিকা নিজে মটর চালাতে ভালবাসেন।

নূতন ধরনের হাসির গল্প

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ভগিনীপতির পয়সায় বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া মিঃ বোনার্জ্জি বনিয়া গিয়াছেন এবং ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে অনেকখানি সাহেবিয়ানাতে রপ্ত করাইয়াছেন। ফলে তাঁহারা উত্তর কলিকাতার বাসিন্দা হইলেও দক্ষি কলিকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজেও যথে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এ প্রতিপত্তির অন্য কারণও ছিল। ক্ষে মোহনের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সন্ধানে অবিশ্বা গুজব ও শেফালীর রূপ ও গুণ। শেফাল সরেটা ফেরতা, সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজে ডিপ্লোমা-প্রাপ্তা—ভাল নাচিতে ও গাহিত পারে। তাকে জীবন-সঙ্গিনী করা লোভে বহু মোটরবিহারী সপ্তাহে একবা করিয়াও অন্ততঃ চাটুয্যে বাড়ীতে হাজির দিয়া যাইত।

কিন্তু ইদানীং শেফালীর মনের পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। সাহেবিয়ানার উপর , চটিয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন ও আই, পাশ করিয়া সে স্কটিশচার্চ কলেজে বি, পড়িতেছে ও প্রসিদ্ধ রেকর্ড-গায়ক গোপা

ফলে শেষ পর্য্যন্ত নন্দলাল শেফালীর বাড়ীর সামানা-সামনি এক মেসে ডেরা বাঁধে।

সামীপ্যের দ্বারা প্রেমটা হাউ হাউ করিয়া বাড়িয়া উঠার কথা, কিন্তু বাধা হইল নন্দলালের দারিদ্র্যত', দরিদ্র থাকিলে শেফালীকে পাইবেনা এ কথা মনে মনে স্থির জানিয়া সে বড়লোক হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। কলিকাতায় বড়লোক হইবার সহজতম উপায় রেস খেলা। নন্দলাল কেরাণী

কাছে লাগায়। দরিদ্র নন্দলালের সহিত শেফালীকে মিশিতে দিতে মিঃ বোনার্জ্জির নিজেরই আপত্তি ছিল। তাঁহার নিজের Speculation এর ফাঁক দিয়া শেফালীর পিতার সঞ্চিত অর্থ অনেকখানি নিঃশেষ হইয়াছে। সরকার ভবতারণের সাবধানতা সত্বেও শেফালীকে বড়লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেই পাঁপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান। সুতরাং শেফালীদের বাড়ীর দারোয়ান একদিন পদাতিক নন্দলালকে জানাইয়া দিল—তাহার এ বাড়ীতে প্রবেশ নিষেধ। শেফালী ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিলনা। সুতরাং নন্দলালের অনুপস্থিতির অন্য কারণ কল্পনা

কলেজ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র ছাত্রীরা "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয়ে আয়োজন করে, এথেলেট ও আর্টের নন্দলা রায় জয়সিংহ ও শেফালী অর্পণা সাজিয়াছিল। অভিনয়ের রাত্রে নন্দলাল • শেফালী প্রেমে পড়িয়া যায়। কিছুদিন পং কলিকাতার এক রাজপথে নন্দলালে বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখি শেফালীও নন্দলালকে মনে মনে ভালবাসি

ভূপেনের উৎসাহে রেস খেলিতে সুরু করি এবং ধাপে ধীপে অধঃপাতের পথে নামি লাগিল।

গোপাল মাষ্টার মনে মনে ছাত্রী আত্মনিবেদন করিয়াছে। কিন্তু শেফালী নন্দলালকে ভালবাসে গোপাল এ ক জানিতে পারিয়াছে। সে নন্দলালের উপ হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল এবং শেফালী বাড়ীতে নন্দলালের যাতায়াত বন্ধ করিবার জ

করিয়া তাহার অভিমান হইল, নন্দলালের কল্পিত অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য সে নন্দলালকে বাদ দিয়াই তাহার দক্ষিণ কলিকাতার বন্ধু-বান্ধবীদের লইয়া বাড়ীতে নাচ গানের জলসা বসাইল।

বাধা পাইয়া ইতিমধ্যে নন্দলাল আরও ক্ষেপিয়া গিয়াছে—বড়লোক তাহাকে হইতেই হইবে এবং বড়লোক হইয়াই সে শেফালীকে দাবী করিবে। রেসে শুধু হার হয় সুতরাং অন্য উপায়ও দেখিতে হইবে—ভূপেন সে

উপায়ও বাৎলাইয়া দিল, যূথিকা নাম্নী এক-জন নবাগতা ধনী কন্যাকে বশ করিয়া তাহার টাকা বাগাইতে নন্দলাল একটু চেষ্টা করিলেই পারিবে। যূথিকার পূর্ব্ব-পরিচয় অন্ধকারাচ্ছন্ন কিন্তু কলিকাতায় তাহার স্তাবক ও ভক্তের অভাব নাই। সে রীতিমত রেস কোর্সে যায়, বাড়ীতেও স্বাধীনভাবে সকলের সহিত মেলামেশা করে। এক পত্রিকার সম্পাদক সেখানেও নন্দলালের ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছে। নন্দলাল মরিয়া হইয়া উঠিল। ওদিকে শেফালীর মামা ও মা তাহারা বিবাহের আয়োজন করিতেছেন, ঢাকার এক জমিদার তাঁহার পুত্রের জন্য শেফালীকে দেখিতে আসিতেছেন।

বাঙাল জমিদার শেফালীকে দেখিয়া তাহার সাহেবী চাল-চলন দেখিয়া চটিয়া ফিরিয়া গেলেন। এদিকে গোপাল মাষ্টারও একদিন শেফালীকে প্রেম-নিবেদন করিয়া অপমান করিল। শেফালী কাহাকেও কিছু না বলিয়া মাষ্টারকে দূর করিয়া দিল। এবং নিজের ভাগ্যকে জানিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

যূথিকাকে হাত করিতে গিয়া সম্পাদকের সহিত নন্দর ঘোরতর হাতিহাতি হইয়া গেল। নন্দলাল সম্পাদককে ধরাসায়ী করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পুলিসের ভয়ে পলাইয়া বাঁচিল ও মেসে ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। নন্দলালের এক তীর্থ-প্রবাসী দিদিমা ছিলেন, তিনি হঠাৎ মৃত্যু-

বাড়ীতে একমাত্র ভবতারণই শেফালীর মনের অবস্থা জানে, শেফালী জলসার রাত্রে দর্শনপ্রার্থী নন্দলালকে তাহার সাহায্যে উপরে নিজের ঘরে আনাইয়া তাহার সহিত বোঝা-পড়া করিতে যাইবে এমন সময় মামা ও মা হাজির হইলেন সেখানে। সেইজন্য নন্দলালের সহিত বোঝাপড়া হইল না।

মুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁহার স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নন্দলালকে উইল করিয়া দিলেন। সে দিন ঘুম ভাঙ্গাইয়া উকিল সেই খবর দিতেই নন্দলাল মেস হইতে উধাও হইল।

শেফালীর জন্য পাত্র খোঁজার বিরাম নাই, শেফালী কৌশলে সকলকেই তাগায়। সে নন্দলালের প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু নন্দলাল নিরুদ্দেশ। মামা ও মায়ের দুঃখের কথা ভাবিয়া সে বিবাহের জন্য রাজি হয় মনে মনে। কিন্তু কঠিন একটা কিছু করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এই সময় কলিকাতা সহরে হঠাৎ কুমার ইন্দ্রকুমারের হয় আবির্ভাব। মফঃস্বল হইতে তিনি জীবন-সঙ্গিনী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছেন সঙ্গে আছে সেক্রেটারী। বিবাহযোগ্যা কন্যাদের অভিভাবকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। যথাসময়ে মিঃ বোনার্জ্জিও এই পাত্রকে হাত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেক্রেটারী মারফৎ ফটো দেখিয়া কুমার শেফালীকে পছন্দ করিলেন এবং বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল। তাহার পর শেফালী এবং কুমার ইন্দ্রকুমার রায় ওরফে নন্দলালের কৌতুকপ্রদ দৃশ্যের এবং চকিত ঘটনার গতির যাহা মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা 'হাল বাঙলা' চিত্রে দেখিবার সময় হাসিতে হাসিতে আপনাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইবে।—

কৌতুকোজ্জ্বল গীত-লহরী

(১)

নন্দলাল (মহাদেব পাল)

তুমি আছ কিনা নাহি জানি
রহি সংশয় মাঝে একা
কাঁদে আঁধারে আলোর প্রাণী
দাও দাও দাও দেখা।
দেবী, তিমির মহিষাসুরে
তোমার খড়্গো হনন কর।
গলে মুণ্ড মালিকা পরি
মাগো, সাজো প্রলয়ঙ্কর।
মহাপাপের রুধির ধারে
সব তব অপহৃত হোক
হেথা নিবিড় অন্ধকারে
জ্বালো, জ্বালো শশাঙ্ক লেখা।

সজনী দাস

(২)

শেফালী (ছায়া দেবী)

আমি একলা চলেছি এ ভবে
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই, যাও আপন মনেই
যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে !!

রবীন্দ্রনাথ

(৩)

গোপাল (মৃণাল ঘোষ).

ফোটে যদি পথের কাঁটা তোমার পায়ে
তুমি সখি, বসবে এসে বনের ছায়ে।
বেণীখানি দুলবে তোমার পিঠের পরে
ধরবে আমার বাহুখানি শিথিল করে
আঁচল তোমার উড়বে মৃদু দখিনবায়ে
ফোটে যদি পথের কাঁটা তোমার পায়ে।

সজনী দাস

(৪)

তৈল বিক্রেতা

চাই তেল, তেল চাই, চাই তেল
তিল তিসি সর্ষে রেড়ি সরষে নারিকেল
এবাজারে সার তেল, সকলই তেলেরই খেল
একথা ভুলেছ যদি সংসার হবে জেল্।
মাত্রা যদি হয় ঠিক বশ হয় কাবুলে শিখ
বাবু বধে (আর) মোসাহেবের এই শক্তিশেল
চাই তেল. তেল চাই. চাই তেল
(তেল চাই Sir)

সজনী দাস

(৫)

গাড়োয়ান (রঞ্জিত রায়)

নাম ধরইয়া মোর সোনা বন্ধু কইরো তুমি রাও
তোর লাগিল পরাণ কান্দেরে
বিদেশী বন্ধু!
বন্ধুরে আশা দিয়া গাছেরে তুলে
রঙ্গ দেখ দূরে বইসেরে
আমারে কান্দালে বন্ধু
তোমার কান্দন পাছেরে
বিদেশী বন্ধু !!
বন্ধুরে পশ্চিমেতে আইলরে উইরা
দূরের পূবাল বাও
নাম ধরইয়া মোর সোনা বন্ধু
কইরো তুমি রাও
বিদেশী বন্ধুরে !!

গ্রাম্য কবি

(৬)

শেফালী (ছায়া দেবী)

কুসুম কাঁদে হায়
ভ্রমরা নাহি পায়
ফুল মালা শুকায়
ফুল না ঝরিতে।
মনের খেলা ঘর
সহেনা অতি ভর
নিখিল চরাচর
আঁধার ত্বরিতে !!

সজনী দাস

(৭)

শেফালী (ছায়া দেবী)

ওগো আমার হৃদয় বনের নীড় হারানো পাখী
উড়ে আমার বক্ষপুটে আয় চলে আয়
তোরে রাখি।
উদাস পরাণ কাঁপায়ে হায়
বইছে উতল পূবালী বায়
পুলক পাগল কদম শাখায় কাঁপছে থাকি
থাকি।

সজনী দাস

(৮)

সুকুমার

এস দরদিয়া, আও নিঠুর হিয়া
তুমি আও একেলা মেরা হৃদয়
গলিতে
বহুত লোক দেখো ওই হল্লা মচায়
বহে বাহার বাহার সব সহরতলীতে।

সজনী দাস

(৯)

শেফালী (ছায়া দেবী)

জ্বলে আলেয়ার আলো, ধরিয়া না যায় ধরা,
সময় নাইযে ঘুমে জাগরণে ত্বরা
স্বপন ভাঙিয়া যায়
মন করে হায় হায়
নিশীথ অন্ধকার—স্তিমিত তারায় ভরা
দেবতা তোমার লাগি
কুসুম রয়েছে জাগি
ফিরাবেনা মুখ জানি, তুমি ধূলায় ধরা।

সজনী দাস

(১০)

শান্তা

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু, সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছ পিরীত, কাহারে করিব রোষ
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া, আইনু আপন সুখে
কে জানে খাইলে, গরল হইবে পাইব এতেক দুখে।
যাহার লাগিয়া যেজন মরয়ে সেই যদি করে আনে
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি করয়ে সুজন সনে।

সজনী দাস

(১১)

শান্তা

মৌমাছি তার ডাক ভুলেছে, মৌচাকে কে বাঁধবে ঘর
পথ ভুলেছে রাজার ছেলে
রূপকথার এ তেপান্তর
ঘুমায় সুখে, রাজার মেয়ে
রূপার কাঠি পরশ পেয়ে
রাজার ছেলে সোণার কাঠি
পরশ তাহার স্বতন্তর।

সজনী দাস

(১২)

যুথিকা (চন্দ্রিকা দেবী)

বনের হরিণ আপনি এসে দেয় যে ধরা
শিকারী সামলে চল, শিকারী সামলে চলো
পথ যায়না দেখা, কালো কাজল রাত্রি
নীড়ে দিনের পাখী খোঁজে রাতের সাথী
দূরে জাগায় স্বপন কার বাজে কাঁকন
ঝরণা ঝরণা কলকল কলস্বরা।

সজনী দাস

(১৩)

শেফালী (ছায়া দেবী)

আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে,
দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন
কখন বেলা শেষের ছায়ায়
পাখীরা যায় আপন কুলায় মাঝে
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা যখন বাজে
তখন আপন শেষ শিখাটি
জ্বালবে এ জীবন
ব্যথার পূজা হবে সমাপন।

রবীন্দ্রনাথ

(১৪)

গোপাল (মৃণাল ঘোষ)

মিলবে জানি কূল,
ঝাঁপিয়ে পড়ি মরণ সরোবরে
সেথা ফুটবো হয়ে ফুল।
ভ্রমর হয়ে তোমরা এসো সখি
ফুটিওনাকো হুল।
আবার যেন টানতে না হয়
এই জনমের ভুল।

সজনী দাস

(১৫)

নন্দলাল (মহাদেব পাল)

মনের গোপন লোকে, এল, গেল চলে,
আঁধার ধরাতল ভরিল কোলাহলে,
চমকি দেখি জেগে
আঁচল ছোঁয়া লেগে
রক্তের মালাখানি কণ্ঠে মম দোলে

সজনী দাস

শ্রেষ্ঠ শিল্পী

তুলসী লাহিড়ীঃ বাঙলা দেশের শিল্পকলা বিভাগে যে কয়টি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন তুলসীবাবু তাঁদের অন্যতম।

বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ইনি ওকালতি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ কোর্বেন এই ছিল তাঁর বরাবরের ইচ্ছা। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সঙ্গীতচর্চা নিয়ে তুলসীবাবু বিশেষ গবেষণা করেন, যার ফলে পরবর্ত্তী জীবনে ঘটনাচক্রে ওকালতি ব্যবসায় মনোযোগ না দিয়ে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেই ক্রমশঃ জনগণের দৃষ্টিপথে আসেন।

অল্পদিনের মধ্যেই রেকর্ড-গায়করূপে তুলসীবাবু সুনাম অর্জ্জন করায় সিনেমা কোম্পানী থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আস্তে লাগল। "মণিকাঞ্চন", "বিরহ", "সোনার সংসার", "মায়া-কাজল" প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় কোরে তিনি বাঙ্লার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক অভিনেতা হিসাবে সম্বর্দ্ধিত হ'তে লাগলেন। বায়োস্কোপের ভেতর বাঙ্লা দেশের কথার ও হাবভাবের প্রবর্ত্তন করেন তুলসীবাবুই প্রথম। এ ছাড়া তুলসীবাবু কয়েকখানা হাসির ছবিও পরিচালনা করেন। মঞ্চ, পর্দ্দা ও রেকর্ডে সঙ্গীত পরিচালনা কোরে ইনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন।

"হাল বাঙলা"য় তুলসীবাবু একটি বিশিষ্ট চরিত্রে আত্মপ্রকাশ কোরেছেন। এই ভূমিকাটি তাঁকে যখন দেওয়া হয়, তিনি নাকি বলেছিলেন, তিনি এই ভূমিকায় নূতন কিছু দেখাতে পারবেন।

• তুলসীবাবু বাঙলায় যাকে বলে 'মাটীর মানুষ' তাই। এর সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন তাঁরা জীবনে একে কখনও রাগ্‌তে দেখেননি বা মিষ্টকথা ছাড়া কোনদিন চড়া কথা বলেন নি।।

মহাদেব পাল: চিত্ররাজ্যে ইনি নবাগত। "হাল বাঙলা"য় ইনি নায়ক নন্দলালের ভূমিকায় অভিনয়ার্থ মনোনীত হ'য়েছেন। যে সকল গুণ থাকলে সাধারণতঃ নায়কের ভূমিকায় নেমে সুনাম অর্জ্জন করা যায়

মহাদেববাবু সেই সেই গুণে অলঙ্কৃত। উপরন্তু ইনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ। অভিনয়-কলা নিয়ে মহাদেববাবু চর্চ্চা কোরছেন শৈশব থেকে। সৌখীন নাট্য-দলে অভিনয় কোরে ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মৃণাল ঘোষঃ সুরলোকের সুর সন্ধানী মৃণাল ঘোষের নাম বোধকরি কারও অজানা নেই। রেকর্ড-গায়ক হিসাবে ও সিনেমায় গীতীবহুল ভূমিকায় মৃণালের সমকক্ষ শিল্পী বাঙলা দেশে জোড়া মেলা ভার। বহু-চিত্রে

অভিনয় কোরে মৃণাল সুনামের সোপানি শিখরে আরোহণ কোরেছেন। সম্প্রতি ইনি ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে "বিদ্যাপতি"-তে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু সেখানকার আব-হাওয়া তার পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় তিনি মঞ্চের মায়া ত্যাগ করেন।

মানুষ হিসাবে মৃণাল নিরহঙ্কারী ও বন্ধুবৎসল। গানের উৎকর্ষতাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

প্রভাত সিংহঃ মঞ্চের একজন উদীয়মান অভিনেতা। কেতা-দোরস্ত সাহেবিয়ানা ধরণের ভূমিকায় প্রভাতবাবু বিশেষ পারদর্শী। "হাল বাঙলা" চিত্রে ব্যারিষ্টার মিঃ বোনার্জ্জির ভূমিকায় পরিচালক যখন সু-

যোগ্য অভিনেতা খুঁজছিলেন, সেই সময় হঠাৎ প্রভাতবাবুর নাম তাঁর মনে পড়ায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন।

ফনি রায়! ছায়াপটে আত্মপ্রকাশ কোরে যে দু' একটি অভিনেতা 'তারকা'-র সম্মানে ভূষিত হন ফণি রায় তাদের মধ্যে অন্যতম। "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র সেই বৃদ্ধকে আজও কেউ ভুলতে পারে নি। "হাল বাঙলা"য় ফণিবাবুকে একটি নূতন টাইপের চরিত্রে দেখা যাবে।

রঞ্জিৎ রায়: সুপ্রসিদ্ধ কৌতুক অভিনেতা হিসাবে ও হাসির গান গাওয়ায় রঞ্জিৎ বাবু সুনাম অর্জ্জন কোরেছেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় হুবহু কথাবার্ত্তা বলতে ইনি বিশেষ পারদর্শী এবং এই ধরণের ভূমিকায় ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মঞ্চ ও চিত্রজগৎ ভিন্ন রেকর্ড-গায়করূপে রঞ্জিৎবাবু অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন কোরেছেন। রেকর্ডে এবং সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালনা কোরেও রঞ্জিৎ বাবু নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

"হাল বাঙলা" চিত্রে রঞ্জিৎ রায় হাসির গান ও অভিনয়ে পর্দ্দার ওপর হাসির ঝরণা-ধারায় প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত কোরবেন।

সত্য মুখার্জ্জিঃ হাস্যরসিক অভিনেতা হিসাবে সত্যবাবুর সুনাম আজ স্বর্ণ-করোজ্জ্বলের দিকে দিকে উদ্ভাসিত। "সোণার-সংসারে"-র সেই বাঙাল বেকার যুবক এত অল্পদিনের মধ্যেই যে লক্ষ্মীর কৃপালাভে নিজের বেকারত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে পারবেন—একথা তখন কেউ ভাবতেই পারেনি। বাঙলাদেশে যে ষ্টুডিওয় যে ছবি হচ্ছে সত্যবাবুকে অভিনয় করবার জন্য সেখান থেকেই আমন্ত্রণ আসছে।

"হাল বাঙলা"-র সত্যবাবু একটি হাসির ভূমিকায় নেমেছেন সত্য; কিন্তু এতাবধি যে ধরণের ভূমিকা তিনি অভিনয় কোরে এসেছেন, এই ভূমিকাটি ঠিক সেই ধরণের নয়। নূতন-রূপে, নূতন রসে সত্যবাবু "হাল বাঙলা-"য় আত্মপ্রকাশ কোরবেন তাঁর অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীর সাম্‌নে।

ব্যক্তিগত জীবনে যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই জানেন, তিনি মিষ্টভাষী হাস্যরসিক এবং বন্ধুবৎসল।

নবদ্বীপ হালদারঃ সুপ্রসিদ্ধ কৌতুকাভিনেতারূপে সাধারণের দৃষ্টিপথে আসেন "সোনার-সংসার" চিত্রে অভিনয় করার পর থেকে। ইনি যে টাইপের হাস্যরসাত্মক চরিত্রে অভিনয় করেন তা' সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য

ধরণের। এ ছাড়া নবদ্বীপবাবু গলার ভেতর থেকে নানারকম আওয়াজ বের কোরতে বিশেষ পটু। ইনি মঞ্চাভিনেতারূপেও সুনাম অর্জ্জন করেন।

"হাল বাঙলা" চিত্রে নবদ্বীপবাবু যে চরিত্রে অভিনয় কোরেচেন তা' তাঁর পূর্ব্ব সুনামকে আরও উজ্জ্বল কোরবে বলে মনে হয়।

হরিদাস ব্যানার্জ্জি: 'হরবোলা' রূপে ইনি সাধারণের কাছে সুপরিচিত। রেকর্ডে এই 'হরবোলা' রূপেই ইনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন কোরেছেন। ছায়া-চিত্রে ইনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন "বাজানী" চিত্রে।

হাল-বাঙলা শুধু
মানুষের অক্ষমতা
ও অসঙ্গতি লইয়া
কৌতুক বা ব্যঙ্গ নয়

দুরন্ত প্রবহমান আধুনিক জীবনের অকারণ এবং অবান্তর গতি ভঙ্গিমার একটী সরস বিবরণ; আপনার, আমার এবং আরও অনেকের আতিশয্যের শুধু সমালোচনা নয়…

রহস্য-চটুল অভিব্যক্তি–

* * * *

হাল-বাঙলার এই অভিনব চরিত্র চিত্রণে যাহাদের সাহায্য লইতে হইয়াছে,

ছায়া দেবী, ধীরেন গাঙ্গুলী, চন্দ্রিকা, তুলসী লাহিড়ী, মহাদেব পাল, মৃণাল ঘোষ, প্রভাত সিংহ, ফণি রায়, সত্য মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, বীণা বসু, পদ্মাবতী, ধীরেন পাত্র, সন্তোষ সিংহ, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন চক্রবর্ত্তী, রঞ্জিত রায়, গোপাল সেন গুপ্ত (অন্ধ গায়ক) প্রভৃতি … … …

* * * *

বি, এল, খেমকার প্রযোজনায়…

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ষ্টুডিওএ গৃহীত…

রূপবাণীতে

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার, ১২ই মার্চ্চ

"হাল বাঙলা" ছবিতে "হরবোলা"কে দেখে সবাই যে খুব খুসী হবেন—একথা বলাই বাহুল্য।

গোপাল সেনগুপ্ত: অন্ধগায়ক গোপাল সেনগুপ্তের কণ্ঠ-সঙ্গীত রেকর্ড ও সিনেমার দর্শকগণকে এক অপূর্ব্ব পুলকে অভিভূত করে।

"হালবাঙলা"র গোপাল বাবু একটি গানের ভূমিকায় নেমে তার সুরজালে দর্শকগণকে বিমোহিত কোরেছেন।

গিরীণ চক্রবর্ত্তী: গায়ক হিসাবে গিরীণবাবু আজ বাংলার জনসমাজে সুপরিচিত। রেকর্ডে ও সিনেমায় তিনি যে সকল গানগুলি গেয়েছেন সেগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ কোরেছে।

প্রফুল্ল মুখার্জ্জি: অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রফুল্লবাবু চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছেন। "পায়ের ধূলো" ও "সোনার সংসারে" দু'টি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় কোরেই প্রফুল্লবাবু সকলের দৃষ্টিপথে আসেন।

"হাল বাঙলায় প্রফুল্ল বাবু কাগজের সম্পাদকরূপে আত্মপ্রকাশ কোরেছেন।

বীণা বসু: চিত্রজগতে ইনি নবাগতা। বীণা বসু গান গাইতে পারেন ভাল—চেহারাও ভাল। "হালবাঙলা"-র গানের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় শ্রীমতীকে দেখা যাবে।

পদ্মাবতী: মঞ্চ ও পর্দ্দায় ইনি জনপ্রিয়া অভিনেত্রী। নানা ধরণের ভূমিকায় অভিনয় কোরতে শ্রীমতী বিশেষ পটু। ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার হ'য়ে "পথের শেষে" চিত্রে ইনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় কোরে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

"হালবাঙলা"র শ্রীমতীর যে চরিত্রে আত্মপ্রকাশ সেটি ছোট হলেও এই ধরণের ভূমিকায় ইনি যে সুনাম অর্জ্জন কোরতে পারবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

১৯৩২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ছায়াচিত্রপ্রিয়দের একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন পৃথিবীর প্রাঙ্গণে যখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছিল—সেই শুভ-গোধূলি-লগ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেওয়া পরিচয় নিয়ে উত্তর-কলিকাতায় এই শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহটির জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। কবিগুরু নামদানের সর্ব্বশেষে সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন—

'দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে
যুগলমিলন হোলো
দেহমুক্ত বাণীর,
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে
দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে'

তাই তিনি দিলেন নাম 'রূপবাণী'।

'রূপবাণী' রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সেই নাম সার্থক করে তুলেছে। মিঃ বি, এল খেমকা প্রযোজিত "যমুনা পুলিনে" ছবি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই চিত্র-মন্দিরের জনপ্রিয়তা বহু-প্রসারিত হয়। এই চিত্রগৃহেই মিঃ খেমকার "বিদ্রোহী" ও "পায়ের ধূলো" সগৌরবে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া শ্রীভারতলক্ষ্মীর "আলিবাবা" রূপবাণী"তে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করে। "আলিবাবা" এই চিত্রগৃহে চৌদ্দ হপ্তা চলে এবং প্রায় ৭৫,০০০ হাজার টাকা মোট সংগৃহীত হয়। বিলেতি ছবিও এই চিত্রগৃহে দেখানো হ'লেই তিন ধারণের স্থান থাকে না—কিন্তু এখানে আর-কে-ও রেডিওর "কিঙ্ কঙ্" ছবি তিন হপ্তা চলে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে ইতিপূর্ব্বে এবং পরে কোন বিলেতি ছবিতে সেই পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়নি। "কিঙ কঙ" তিন হপ্তায় মোট ১২,৫০০ টাকা দেয়।

এই চিত্রগৃহের এত জনপ্রিয়তার কারণ, এই চিত্রগৃহটির বহিরাবরণ রমণীয়। প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী সকল দর্শকদেরই সুখ-সুবিধা এবং আরামের দিকে লক্ষ্য রেখে এরা আসন প্রভৃতির ব্যবস্থা কোরেছেন। বাইরের মত এই চিত্রগৃহটির ভেতরকার রূপও আকর্ষণীয়।

এ ছাড়া 'রূপবাণী'র শব্দ প্রেক্ষণ যন্ত্রটি অতুলনীয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহগুলিতে আজকাল যে 'আর, সি, এ' শব্দযন্ত্র ব্যবহৃত হ'চ্ছে এই যন্ত্রটি তাদের অন্যতম।

শুধু এই সব কারণেই নয়; এ ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, শ্রীপ্রকাশ নান, শ্রীসুধীর নান, শ্রীরবীন্দ্র নাথ দত্ত পরিচালক মণ্ডলীর ব্যবসা বুদ্ধি, অমায়িকতা ও সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার এই চিত্রগৃহটিকে সাধারণের কাছে আরও জনপ্রিয় কোরে তুলেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশীষে যে চিত্রগৃহের উদ্বোধন হ'য়েছিল, যে চিত্রগৃহ আজ ছয় বছর লোকের সেবা কোরে সুনামের উচ্চশিখরে আসীন; ধনী নির্ধনীর যে চিত্রগৃহে অবাধ-গতি সেই সর্ব্বজনপ্রিয় 'রূপবাণী'তে আজ মিঃ খেমকার নূতন প্রয়াস "হাল বাঙলা" দেখাবার ব্যবস্থা কোরে তিনি সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।

মিঃ খেমকার নূতন উদ্যম

মিঃ বি. এল্. খেম্কা

মিঃ বি, এল, খেম্কা জাতিতে মাড়োয়ারী হইলেও তিনি বাঙ্গালী ও নিজ সম্প্রদায়ের কাছে সমভাবেই সম্বর্দ্ধনা পান। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, তাঁর কর্ম্মশক্তি, তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি, তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রভৃতি আজ তাঁকে জনসাধারণের কাছে বিশেষ প্রিয় কোরে তুলেছে। ব্যবসায় তাঁর মাড়োয়ারী বুদ্ধি ও ব্যবহারে তাঁর বাঙ্গালীর প্রেরণা তাঁকে সাহায্য কোরেছে বড় হ'তে। বাঙলাদেশে আজ পর্য্যন্ত যে কয়জন অ-বাঙ্গালী এসে ব্যবসায় কোরেছেন, মিঃ খেমকার মত জনপ্রিয়তা লাভ কেউ কোরতে পারেন নি।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর কর্ণধাররূপে চিত্রজগতে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। তাঁরই প্রযোজনায় তোলা 'সীতা' 'পথের শেষে', 'বিদ্রোহী' 'পায়ের ধূলো', 'সোনার সংসার', 'লয়লা-মজনু', 'বাগে সিপাহী' প্রভৃতি চিত্রাবলী সারা ভারতে এক প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

সম্প্রতি মিঃ বি, এল, খেম্কা মেট্রোপলিটান্ পিকচার্স নামে যে চিত্র-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত কোরেছেন তা' এই অত্যল্পকালের মধ্যেই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিপথে এসেছে কেবলমাত্র মিঃ খেম্কার জনপ্রিয়তার জন্য। এদের প্রথম বাঙলা চিত্র 'হাল বাঙলা' এখনও মুক্তি পায়নি; তথাপি চারিদিকে এর মধ্যে যে সাড়া পড়ে গেছে তা' সত্যই প্রণিধানযোগ্য। 'হাল বাঙলা' নূতন ধরণের হাস্যরসাত্মক ছবি। এই সময়ে এই ধরণের ছবির বাজারে চাহিদা বুঝেই মিঃ খেম্কা হাসির রাজা ধীরেন গাঙ্গুলীকে দিয়ে 'হাল বাঙলা' তুলে কত বড় যে ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা যাঁরা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার কোর্‌বেন। আগামী শনিবার, ১২ই মার্চ উত্তর কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র-গৃহ 'রূপবাণী'-তে 'হাল বাঙলা' মুক্তি লাভ কোর্‌বে। তিনি বাঙলাদেশে হাস্যরসাত্মক

মিঃ এন্ গোস্বামী

অভিনেতা এবং বাঙ্লার জনপ্রিয় গায়ক-গায়িকাদের সমাবেশে চিত্রখানি সংগ্রথিত কোরেছেন। এ ছাড়া এই ছবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হ'চ্ছে বাঙ্লার অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ছায়া দেবীর নায়িকার ভূমিকাভিনয়। এই সব দেখে মনে হয়, মিঃ খেম্কার নূতন উদ্যম জয়যুক্ত হবে।

এরপরেও এই প্রতিষ্ঠানে যে সকল চিত্র গৃহীত হবে সেগুলিও সবদিক থেকে যে সাধারণের মনস্তুষ্টি কোর্‌বে একথা বলাই বাহুল্য। এদের পরবর্ত্তী চিত্রগুলি হ'চ্ছে—

খনা (বাঙ্লা)—ছবিখানা পরিচালনা কোর্‌বেন সুবিজ্ঞ পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি। মুখ্যাংশে অভিনয় কোর্‌বেন ছায়া দেবী ও অহীন্দ্র চৌধুরী।

চন্দ্রশেখর (হিন্দি ও বাঙ্লা)—বঙ্কিমচন্দ্রের সেই অমর কাহিনী। ছবিখানা মিঃ এলিস্ আর

ডান্‌কানকে দিয়ে পরিচালনা করবার জন্য তাঁকে ভারতবর্ষে আনা হ'য়েছে।

দিল-কি-আগ ঃ আগা হাসার 'কাশ্মিরীর শেষ দান। ছবিখানার মূল ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন ছায়া দেবী ও ধীরেন গাঙ্গুলী।

এই চিত্রগুলি মিঃ বি, এল, খেম্‌কার নিজ তত্ত্বাবধানে তোলা হবে। এবং এই ছবির সাফল্যের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের বিচক্ষণ কর্ণধার মিঃ খেম্‌কা অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে কিছুমাত্র কার্পণ্য কোরবেন না।

এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে আর দু'জন আছেন; তাঁরা হ'চ্ছেন, এই চিত্রের পরিবেশক এম্পায়ার টকী ডিস্‌ট্রিবিউটারসের সুযোগ্য ম্যানেজার মিঃ এস্‌, আর, হেমাদ ও এই প্রতিষ্ঠানের প্রবর্দ্ধক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এঁদের সকলের যোগাযোগে মিঃ খেম্‌কার এই নব-উদ্যম যে কুসুমাবৃত হবে একথা বলাই বাহুল্য।
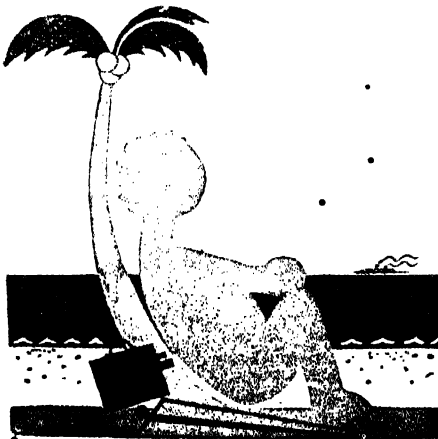
হাল বাঙলার টেক্‌নিসিয়ান্‌

"হাল বাঙলা" পরিচালনা কোরেছেন ধীরেন গাঙ্গুলী। হাসির ছবি পরিচালনায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত একথা কারও অজানা নেই। তা' ছাড়া ছবির গল্পটিও চমৎকার।

* * *

"হাল বাঙলা"র আলোকচিত্র-শিল্পীরূপে কাজ কোরেছেন দ্রোণাচার্য্য। নিউ থিয়েটার ও রাধা ফিল্মের বহুচিত্রে সহকারীরূপে তিনি কাজ কোরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন—স্বাধীনভাবে কাজ কোরে তার বিকাশ দেখতে পাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়!

* * *

শব্দযন্ত্রী হিসাবে ইরাণীর নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বহুচিত্রে শব্দযন্ত্রের কাজ কোরে ইরাণী সুনামের উচ্চশিখরে আসীন। "হাল বাঙলা"র শব্দযন্ত্রের কাজ প্রথম শ্রেণীর হবে বলেই ধারণা করা যায়।

* * *

"হাল বাঙলা"-র রূপসজ্জার কাজ কোরেছেন সুপ্রসিদ্ধ রূপ-সজ্জাকর ইঁদু। "সোণার সংসারে" যার কাজ দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কোরেছিলেন "হাল বাঙলা"-য় সেই রূপ-শিল্পীর রূপসজ্জা এবারও যে সবাইকে মুগ্ধ কোরবে—একথা বলাই বাহুল্য।

Compiled and Executed by B. Ray Chaudhury

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্বনাশ! কোথায় কাশী, আর কোথায় পাড়াগাঁয়ের আদালত ঘর! দুটো যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

জগত্তারিণী দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন: হোক তফাৎ! লবঙ্গর ওপর এই অত্যাচার ঘাড় পেতে সয়ে নিলে, আমার কাশীই হয়ে দাঁড়াবে পাড়াগাঁয়ের আদালত ঘর!

—নবম পরিচ্ছেদ—

যতক্ষণ জগত্তারিণী লবঙ্গর ওপর এই অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য জগুদাকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, ততক্ষণ লবঙ্গ নিজে জানালার গরাদ ধরিয়া বাগানের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সে ভালমন্দ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

জগত্তারিণী আরও কিছুক্ষণ যজ্ঞেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া সটান্ গিয়া হাজির হইলেন একেবারে জামাইবাবুর ঘরে। সেদিন কি একটা উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল। জামাইবাবু বৈঠকখানা ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া ললিতার খবরাখবর লইয়া সবে স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময়ে জগত্তারিণী আসিয়া বলিলেন: "হ্যাঁ বাবা নীরদ! আমার সঙ্গে ঐ যে মেয়েটা এসেছে, ওর যে সর্ব্বনাশ হ'ল!"

নীরদ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে মা?"

—আর বলো কেন বাবা, যত আমার ঘাড়ে! বাবা বিশ্বনাথ বুঝি এখনও আমায় ছুটি দেন নি। ঐ যে মেয়েটা এসেছেনা আমার সঙ্গে, ওকে নিয়ে গিয়েছিলুম কাশী! ওর স্বামী ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়! বলে 'আমি খেতে দিতে পারিনে, তাই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম'—কিন্তু তা নয়! আসল কথা কি জানো? ঐ ব'লে বউটাকে সরিয়ে দিয়ে সে ছোঁড়া আবার একটা বিয়ে করেছে! আমিতো তা জানিনে! জানলে কিআর আমি মেয়েটাকে কাশী নিয়ে যাই! পুলো পায়ে একটা লোক সঙ্গে দিয়ে ফের শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিতুম! ওরতো বাপ নেই,—মাও যা আছে···তা না থাকারই মধ্যে! সে নিজেই খেতে পায়না, তা মেয়েকে কি খেতে দেবে! এখন এই অনাথা,—

নীরদ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'মা? এরকম অনাথা আপনার কতগুলি আছে?'

—এরকম অনাথা আর একটিও নাই। আর যারা আছে তাদের তবু একটা পিসি, মাসী কি দূর সম্পর্কের দাদা খুড়ো এসব বেরোয়! কিন্তু তোমার বাড়ী যেটিকে এনেছি, এটার দুনিয়ায় আর কেউ নেই! স্বামী ছিল সেও ওকে পর ক'রে দিয়েছে!

নীরদ জিজ্ঞাসা করিল: এখন আপনি কি করতে চান?

—কি করা উচিত, তাইতো তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলুম।

নীরদ খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল: ওর স্বামী কি ওকে একেবারে বাড়ীতে ঢুকতে দেয়না?

—মোটেতো খোঁজখবর নেয়না! ও কি সাহসে সেখানে যাবে?

—সেটা আপনারা দেখুন! যদি বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়, তখন খোরাক পোষাকের জন্যে নালিশ করুন!

—তাহ'লে তুমি বলছো, একবার সেখানে ও যাক্। গিয়ে দেখুক ওর স্বামী ঘরবসত করতে দেয় কিনা!

নীরদ তৈল মাখিতে মাখিতে বলিল: সেইটেই ভাল হয়না কি মা?

জগত্তারিণী বলিলেন তা তুমি মন্দ বলনি। একবার দেখুকইনা কেন? কিন্তু আমার যতদূর মনে হয়, জামাইটা যে গোঁয়ার, সে যে ওকে বাড়ীতে পা পাত্‌তে দেবে এমন বাপের বেটাই সে নয়।

ঘরের মধ্যেই পালঙ্কে শুইয়াছিল ললিতা। সে সকল কথা শুনিতেছিল। সে বলিল: ধরো, জামাই না হয় ওকে পা পাততেই দিলে, তা হলেই কি ওর যাওয়া উচিত? ওর নিজেরই কি একটা আত্মমর্য্যাদার অভিমান হয়না?

জগত্তারিণী বলিলেন: হয়তো উচিত। কিন্তু এমন অবস্থায় ওকে টেনে এনে ফেলেছে জামাইটা, যে আত্মমর্য্যাদা ছেড়ে আত্মরক্ষাই এখন দায় হয়ে পড়েছে ওর।

ললিতা একথায় পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল: 'মা? তুমি ভুলে যাচ্ছ, স্বামীর কাছে আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করার চেয়েও, আত্মহত্যা শতগুণে শ্রেয়স্কর।'

জগত্তারিণী একথায় চুপ রহিলেন দেখিয়া ললিতা আরও বলিয়া যাইতে লাগিল: যে মেয়েমানুষকে স্বামী অপমান করে, তার আর রইল কি মা? তার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই ভালো। তার আর বেঁচে সুখ কতটুকু বাকি রইলো? মানুষ কি পৃথিবীতে এসেছে শুধু ভাত খেতে, আর সংসারের গাধা খাটুনি খাটতে?

জগত্তারিণী বাধা দিয়া বলিলেন: সে টুকুনও যে তার আটকে যাচ্ছে ননি।

—যাক্ আটকে! কিছু আসে যায় না। সংসারে আপনার লোক যদি দুটো হেসে কথা না কইলে, তাহ'লে সে সংসার থেকে তফাৎ থাকাই ভালো।......কি বলিস্ লবঙ্গ? দুটো ভাত চেয়ে খাবার জন্যে তোর স্বামীর লাথি খেতে শ্বশুরবাড়ী যাবি?

লবঙ্গ এই সময় সে ঘরে আসিয়াছিল, হাতে এক ডিবে পান লইয়া টেবিলের উপর রাখিবার জন্য। এ কয়দিন ধরিয়া এই গৃহস্থালীর কর্ম্মটি তাহার প্রত্যাহিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আগে ললিতাই পান আনিয়া নীরদ বাবুর টেবিলে রাখিত, কিন্তু ললিতাত এখন তাহার পালঙ্কের মধ্যে বন্দী! কাজেই, একাজটা কিছুদিন করিতেছিল ঝি, কিন্তু সেটা অসমীচীন বোধে ললিতা লবঙ্গকেই এই ভারটা দিয়াছে এই দিনকতক।

লবঙ্গ এই প্রশ্নে থতমত খাইয়া গেল। জগত্তারিণী ও নীরদ বাবু ঘরে না থাকিলে হয়তো সে এ প্রশ্নের যাহোক্ একটা উত্তর দিবার চেষ্টা করিতে পারিত! কিন্তু তাহাদের সম্মুখে কোনও অভিমত প্রকাশ করিবার নির্লজ্জতা সে একেবারেই পছন্দ করিলনা।

লবঙ্গ পানের ডিবা রাখিয়া, ঘরের অন্যান্য দুএকটি পোষাকী কাজে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। ললিতা যে প্রশ্ন তাহাকে করিয়াছিল, লবঙ্গ তাহার কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য নীরদবাবু কাণ পাতিয়াছিল, কিন্তু যখন কোনও উত্তর আসিলনা, তখন সে একবার আড়চোখে লবঙ্গর দিকে তাকাইল। দেখিল সে একখানি সাধারণ লালপেড়ে সাড়ি পরিয়া ঘুরিতেছে, তাহাতেই তাহার গায়ে যেন আগুন লাগিয়াছে। অল্প একটুকু ঘোমটার আড়ালে যে মুখখানি দেখা যাইতেছে, তাহাতে গাম্ভীর্য্য খুবই বেশী, কিন্তু সাময়িক লজ্জার উষারক্তিম আভাটুকুও অস্পষ্ট নহে! কাণে দুইটি দুল আছে, এবং নাকেও একটি নোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু তাহারা যেন অনাবশ্যক, মুখের যৌবনোৎফুল্ল গম্ভীর কান্তিটুকু সৌন্দর্য্যের কোনও ফাঁকই বাকি রাখে নাই।

লবঙ্গ কোনও উত্তর করিলনা দেখিয়া ললিতা আপনিই বলিয়া যাইতে লাগিল: না বাপু! স্বামীর কাছে অমন ভিক্ষুকের মতন গিয়ে দাঁড়ানো যায়না! যেখানে রাজত্ব করবো, সেখানে কি সামান্য দাসী বাঁদীর মত হ'য়ে অনুগ্রহ কুড়ানো যায়, স্বামী মেয়েমানুষের আপনার জিনিষ, সেটাই যদি অপরে কেড়ে নেয়, কি সেটাই যদি অজগর সাপ হয়ে দাঁড়ায়,—তাহ'লে জীবনটা হয়ে দাঁড়ায় বেদেদের মত! ঝুলি কাঁধেই তার একমাত্র সম্পদ্ হয়।

নীরদ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এবারে হাসিয়া বলিল: যে যেটা না চাইতেই অজস্রভাবে পেয়েছে, সে সেইটেরই গোমর করে! কিন্তু সেটার যে কত দাম, এবং কি মূল্য দিয়ে যে সেটা কিনতে হয়, তাতো আর তার জানা নেই! এবং সকলে যে সেটা সহজে নাও পেতে পারে, এটাও তার গণনার মধ্যে আসেনা!

ললিতা নীরদের মুখ হইতে কথা লইয়া বলিয়া উঠিল: ওগো হুজুর! আসে আসে! যারা কোন হিসেব নিকাশ করে, তারা সব গোণবার জিনিষই আঙুলের উপর গোণে।

নীরদ এ হুঙ্কারে রণে ভঙ্গদিল। বলিল: যাক্! অঙ্কশাস্ত্রটা আমার কোনদিনই আয়ত্তে আসেনা! সুতরাং ওটা নিয়ে আর তোমার সঙ্গে ঝগড়া কর্বোনা। বিশেষ যখন এর সঙ্গে নারী-ফিলজফি (philosophy) জড়ানো রয়েছে!"

জগত্তারিণী বলিলেন: "ননি! তুই একটু ক্ষান্ত দে বাপু! তোদের ও নতেদের

"কথা আমি বুঝে উঠতে পারিনে! তা, হা নীরদ! তাহলে আমি এখন কি কর্ব্বো, তাই আমায় বুঝিয়ে বলো!"

নীরদ বলিল, কি আর কর্ব্বেন মা! আপনি যেমন কাশী যাচ্ছিলেন তেমনি যান। আমি ওর স্বামীকে চিঠি লিখে দেখি, সে ওকে ঘরে ফিরিয়ে নেবে কিনা! যদি স্বীকার হয়, তাহ'লে কোনও লোক দিয়ে সেখানে মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। কি বলো ললিতা?"

ললিতা কোন উত্তর দিলনা। জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন: যদি স্বীকার না হয়?

—স্বীকার না হয়,—যাহোক একটা কর্ত্তে হবে বৈ কি!

জগত্তারিণী বলিলেন: "হ্যাঁ? ওর যা'হক একটা গতি কর্ত্তেই হবে! ও আমাকে মা বলে ডাকে! নিজের পেটের সন্তান না হ'লেও ওর ওপর কেমন একটা আমার মায়া পড়ে গেছে! ওযে বিনাপরাধে রাস্তায় ভেসে ভেসে বেড়াবে, সেটা আমি কিছুতেই দেখতে পার্ব্বোনা। আমি মরবার আগেই, এটার একটা হেস্তনেস্ত করে যেতে চাই!

নীরদ আর কোনও উত্তর দিলনা।

জগত্তারিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন: তাহ'লে কি থাকবো না কাশী চলে যাবো!

নীরদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল: আপনি আর থেকে কি কর্ব্বেন? সেই পাড়াগাঁয়ে ভূতটার সঙ্গে কি হাতাহাতি লড়াই কর্ত্তে থাকবেন?

—না! তার নামে নালিশ করে একটা বন্দোবস্ত করে যেতুম।

—কে এসব নালিশ ফরিয়াদি কর্ব্বে?

—জগুদা এসেছে,—তাকে স্বীকার করিয়ে নিয়েছি!'

—বুঝুন! আপনি যা ভালো বোঝেন! বলিয়া নীরদ স্নানে চলিয়া গেল।

—দুশম পরিচ্ছেদ—

জগত্তারিণী কাশীই চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে নীরদকে পই-পই করিয়া বলিয়া গেলেন লবঙ্গর স্বামী যাহাতে তাহাকে লইয়া সংসার করে,—তাহারই বিশেষ করিয়া চেষ্টা করিতে। লালিতাকেও তিনি অনেক করিয়া বলিয়া গেলেন, যাহাতে জামাইকে দিয়া লবঙ্গর একটা ব্যবস্থা করাইয়া লয়! ললিতা মাকে ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিল: "আমরা তোমার পেটে জন্মে যে আদর না পেয়েছি, লবঙ্গ দেখচি তার চেয়ে ঢের বেশী পেলে!"

জগত্তারিণী উত্তর দিয়াছিলেন: "তোদের

আদর কর্ত্রার ঢের লোক আছে, কিন্তু ও মেয়েটার যে আর কেউ নেই!"

লবঙ্গ সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল: মা? আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পার্ব্বো-না! তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চলো।

মা বলিলেন: "লবঙ্গ! অবুঝ হোস্-নে! এইখানে থেকে জামাইবাবুকে দিয়ে নিজের একটা দিল্লে কর্ত্রার চেষ্টা কর্! নইলে পরে ভারি কষ্ট পাবি। তারপর জামাইবাবু একটা হেজিপেঁজি লোকত নয়! তার এসব বিষয়ে খুব ক্ষমতা আছে! ও যদি মনে করে, তাহ'লে তোমার স্বামীর নাকে দড়ি দিয়ে, তোমাকে আবার ঘরে লওয়াতে পারে!"

লবঙ্গ বিষণ্ণভাবে বলিল: আমার মা, সেখানে যাবার মোটেই ইচ্ছে নেই!

—সেখানে যাবেনা তো, হিঁদুর ঘরের মেয়ে তুমি, তা না গিয়ে কি কর্ব্বে?

—কি আর কর্ব্বো? তোমরা যতদিন পায়ে রাখবে, থাকবো। তারপর, যে দিকে চোক যায়, চলে যাবো!

জগত্তারিণী বলিলেন: পরের বাড়ীতে থাকাটাও খুব সুখের বলে মনে করিস্নে। আর আমিই বা আর কদ্দিন? আমি চোখ বুজুলে তোমার কি উপায় হবে, তাই ভেবেই আমি অস্থির হচ্চি।

* * *

লবঙ্গ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তার কি করা উচিত। সহস্র অপমান সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া স্বামীর পদপ্রান্তে গিয়া লুটাইয়া পড়া উচিত, না, ললিতা যেমন তাহাকে বোঝায় তেমনই করা উচিত! ললিতা তাহাকে বোঝায় "পৃথিবীর অন্য সব জিনিষ নিয়ে মেয়েমানুষের ঝগড়া করা চলে, চলে না কেবল স্বামী নিয়ে! স্বামী যদি জলের মত গড়াইয়া কাছে আসিল, তাহ'লেই তাতে সুখ! তা না হয়ে যদি শক্ত পাথরের মত ভেঙে বাটোয়ারা কর্ত্তে হয়, তাহ'লে ওই পাথরের মতই স্বামী হয় শক্ত, কঠিন আর অমিল!"

ললিতা আরও বলে "স্বামী যদি নিজে হতে ধরা দেয়, তবে সেই স্বামীকে নিয়ে জীবনের যে কোনও সমারোহ সমাধান করা চলে: কিন্তু তিনি যদি নিজে বেঁকে দাড়ান, তাহ'লে পৃথিবীর কোনও বিচারালয়ই তাকে সোজা ক'রে আপনার ক'রে দিতে পারে না! কাজেই সে চেষ্টা না করাই লবঙ্গর উচিত!"

* * *

জগত্তারিণীর কাশী চলিয়া যাইবার দুইদিন পরেই নীরদ একখানি চিঠি লিখিল লবঙ্গর স্বামীকে! তাহার ঠিকানা সে জানিয়া লইল: লবঙ্গর কাছেই! লবঙ্গ এ চিঠিতে কোন আগ্রহও প্রকাশ করিল না, প্রকাশ্যে কোনও প্রতিবাদও করিলনা।

কিন্তু উত্তরের অনিশ্চয়তা তাকে মনে মনে একটু উৎকণ্ঠান্বিত করিয়া রাখিল।

চৈত্রের প্রারম্ভে যাহা কেহ কখনও আশা করেনা এবৎসর তাহাই ঘটিল। একদিন অপরাহ্নে আকাশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া বারিধারা বর্ষণ করিল। একটু শীতের আভাষও যেন দেখা দিল। ললিতা সেদিন জানালা খুলিয়া শুইয়াছিল; অতো বুঝিতে পারে নাই, একটু ঠাণ্ডা লাগিল।

তাহার পরদিন তাহার জ্বর বাড়িল। ডাক্তার আসিয়া বলিল 'খুব সাবধান! বুকে সর্দ্দি না বসে! কিন্তু সাবধান হইতে না হইতেই অসাবধানতার ফল আসিয়া দেখা দিল। জ্বর খুব কম্প দিয়া আসিল ও বুকের ব্যথায় ললিতা অস্থির হইয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া বলিল: নিউমোনিয়া!

বাটীতে অনেক ঝি চাকর সত্ত্বেও লবঙ্গ হইয়া দাড়াইল তাহার প্রধান শুশ্রূষাকারিণী!

লবঙ্গ ললিতার বুকে ডাক্তারি প্রলেপ লাগাইয়া ফ্লানেল দিয়া বাঁধিয়া দিতে লাগিল। রীতিমত তাপমান যন্ত্র দিয়া তাহার জ্বরের পরিমাণ দেখিতে লাগিল। একার্য্য সে আগে কখনও করে নাই, কিন্তু এখানে করিতে বাধ্য হইয়া সে অল্পেই শিখিয়া ফেলিল। সে পল্লী-গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে কিছুদূর পড়িয়াছিল, তাহাতে ইংরাজি অক্ষরগুলি শিখিয়াছিল, কাজেই তাপমান যন্ত্রের রেখাগুলি শিখিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইলনা। রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিবার যে সকল ধারা আছে, লবঙ্গ অনায়াসেই সেগুলি দখল করিয়া ফেলিল। নীরদ কিম্বা ডাক্তার বাবু তাহার কোনও খুঁত ধরিতে পারিলনা।

নীরদ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ললিতা পালঙ্কে শুইয়া আছে, এবং তাহার মাথা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী লবঙ্গর ক্রোড়-দেশে! তাহার ললাটে একখানি জলপটি লাগানো, তাহাতে ও-ডি কলোনের জল ভিজাইয়া দিতেছে ঐ শুশ্রূষাকারিণী! ললিতা চক্ষু বুজাইয়া শুইয়া আছে; নীরদের ঘরে আসার পদশব্দেও সে চক্ষু খুলিলনা! বোধ-হয় নিদ্রিত!

নীরদ আসিয়া লবঙ্গর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "জ্বর কতো?"

লবঙ্গ মুখে কিছু না বলিয়া, থার্ম্মোমিটারটি বাহির করিয়া বিছানার উপর রাখিল। নীরদ

তাহা কুড়াইয়া লইয়া জানালার কাছে লইয়া গিয়া আলোয় ধরিয়া দেখিল, একশো তিন !

নীরদ জ্বরের তাপ দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল। তখনই বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল 'ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন। বল্ জরুরি দরকার। পরে পালঙ্কের কাছে আসিয়া একখানা চেয়ার কাছে টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিল। হাত দিয়া একবার ললিতার কপাল অনুভব করিল। পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উচ্ছ্বাসের সুরে বলিয়া উঠিল : 'না, আর বাঁচানো যায়না !'

এই উচ্ছ্বাসের অসাবধান উচ্চকণ্ঠে ললিতা জাগিয়া উঠিল : চক্ষু মেলিয়া নীরদের দিকে চাহিল। নীরদ নিজের মাথাটিও ললিতার দিকে ঝুঁকাইয়া দিল। ললিতা প্রবল জ্বরেরউচ্চারণ কাতরস্বরে, নিদাঘশুষ্ক কিশলয়ের মত ওষ্ঠাধর দুইটি ঈষৎ কম্পিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : তুমি কখন ফিরলে ?

নীরদ তাহার মাথায় হাত দিয়া কেশ-গুলির মধ্যে তাহার আঙ্গুল দুইটি ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া উত্তর দিল : 'এই আসচি নলি'। তোমার কি কষ্ট হচ্চে ?"

—'না !' বলিয়া আবার সে চক্ষু বুজাইল।

নীরদ আর কিছু বলিল না, ললিতার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আদালতের কাপড় এখনও ছাড়া হয় নাই, মুখ হাত পাও ধোওয়া হয় নাই। সে বসিয়া রহিল একটা প্রবল বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া, যে আশঙ্কাটা বড় বড় ডানা মেলিয়া আজ যেন আলো ও বাতাস বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

লবঙ্গ নীরদকে তদবস্থ দেখিয়া, রোগী ছাড়িয়া উঠিল। নীরদ জিজ্ঞাসা করিল "উঠলে কেন ?"

লবঙ্গ কোনও কথা কহিল না, ধীরে ধীরে আপনার বসনাঞ্চল সামলাইয়া সরিয়া গেল। নীরদ কিছুক্ষণ পরেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিবার স্থান ছাড়িয়া উঠিল। কিন্তু উঠিতে না উঠিতেই দেখিল, লবঙ্গ একখানি রেকাবিতে খানকতক লুচি, দুইটি সন্দেশ ও কিছু তরকারি লইয়া, ডানহাতে একটি জলপরিপূর্ণ গেলাশ বহিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। নীরদ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল :

"এসবের জন্যে তুমি এত ব্যস্ত কেন ?"

লবঙ্গ টেবিলের উপরে খাবারের রেকাবি-খানি ও জলের গেলাস রাখিয়া, খুব মৃদুস্বরে অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল : আপনি আদালতের কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন। মুখে যা হয় একটু দিয়ে নেন! ভয় নেই, দিদি ভাল হয়ে যাবেন !

নীরদ একটা প্রবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল : হুঁ, ভাল যা হবেন, তা আজকের নমুনাতেই বুঝতে পারচি! না লবঙ্গ ! তুমি ওগুলো রাখো! ওসব নিয়ে বাজে সময় নষ্ট কোরো না ! ততক্ষণ বরং

রুগীর মাথায় একটু হাওয়া করো। রুগী জ্বরেতে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়েচে!"

লবঙ্গ উত্তর দিল: "সে আমি কচ্চি! এতক্ষণতো করছিলুমও। এখন আপনি একটু জলটল খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে নেন!"

—"মাথা ঠাণ্ডা কর্বো! হাঁ—মাথা আর ঠাণ্ডা হয়েছে?"

—অমন অধীর হবেন না! একদিন জ্বর হয়েছে ত কি হয়েছে?

—কি হয়েছে? শুনলে না কাল ডাক্তারের মুখে! বলে গেলেন, নিউমোনিয়া! তার ওপর আজ এই জ্বর বেড়েছে! ব্যাপারটা বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াল—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না!

এমন সময়ে ললিতা আবার একবার চোখ চাহিল! তাহার চক্ষু বেশ লাল হইয়া উঠিয়াছে—অস্তকালীন সূর্য্যের মতো! নীরদ তাহার কপালে হাত দিল! ললিতা ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল: তুমি এখনও—এখানে—বসে?

সে কথার উত্তর না দিয়া নীরদ জিজ্ঞাসা করিল: "বড় কষ্ট হচ্ছে কি ললি?"

ললিতা উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের স্বরে উত্তর দিল: না!

এমন সময়ে ডাক্তারবাবু আসিলেন: লবঙ্গ পাশের ঘরে সরিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

বড়দি

শ্রীসুশীল কুমার দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"দেখ প্রেমেনদা, কত বড় আর কেমন সুন্দর মোমের পুতুল বাবা কিনলেন!" বলিতে বলিতে আশালতা একেবারে আমার শয্যার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে আলো নাই দেখিয়া সে ইতস্ততঃ করিতেছিল কিনা অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই। আমাকে মামা বলিয়া স্বীকার না করার স্পষ্ট অর্থ বুঝিয়া ভাবিলাম, ইহাই অবা[illegible] সুযোগ। তাই তৎক্ষণাৎ তাহাকে চুম্বনেচ্ছায় সাপটিয়া ধরিতেই গোল বাধিল। সে অত্যন্ত ছটপট করিতে করিতে এক বিকট চিৎকারে বাড়ী কাঁপাইয়া ডাকিল "মা"!

পাশের ঘর হইতে সাড়া আসিল, "কিরে কি হল? ষাট।" বড়দির এঘরে আসার এবং দাস-দাসীদের 'কি হল—কি হল?' বলিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আমার পদশব্দ শুনিয়া আশাকে ছাড়িয়া, লজ্জায় ভয়ে সম্মুখের সমস্যার কথা মনে করিয়া একবার শিহরিয়া উঠিয়াই কি এক প্রকারের অচেতনায় আচ্ছন্ন হইয়া সশব্দে পড়িয়া গেলাম। সে আচ্ছন্নতা মাত্র মুহূর্ত্তেকের।

ছাড়া পাইয়াই আশা দরজা পার হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া মহাকলরবে পুতুল দেখাইতে আমার বিভ্রাট বলিতে লাগিল। বড়দি তাহার নিকট আসিলেন। ওধার হইতে জামাইবাবুর হুঙ্কার আসিল, "ঘর তো অন্ধকার। আলো নিয়ে দেখ, প্রেমেন্দ্র না আর কেউ?"

সভয়ে চাহিয়া দেখি, জানালা দিয়া আসা জ্যোৎস্নালোকে আমি মেঝের উপর বসিয়া রহিয়াছি। সেখান হইতে অন্ধকারের দিকে সরিব কিনা ভাবিতেছি, শুনিলাম, বড়দি আশাকে দরজার সম্মুখ হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে আগত ঝি-চাকরদের বলিলেন, "কিছু না, কিছু না। তোরা যা। একটু কিছু হ'লে তো তোদের অমনি হৈরম-মহরম সুরু হয়। কেন বল দিকি।"

আশালতা বলিয়া উঠিল, "কিছু হয়নি কি মা! এই দেখ না, এমন সাপ্টে ধরেছিল—আমার পুতুলটা একেবারে ভেঙে গেছে—"

"চুপ কর হারামজাদী, চুপ কর।" বলিতে বলিতে বড়দি খুব সত্বর আশার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। দাসদাসীরা আসিয়া আমার ঘরের সম্মুখে দু'চারবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া চলিয়া গেল। সেই ঘরেই আমার জামা-কাপড় ইত্যাদি যা কিছু ছিল লইয়া নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বৌদি আশা করিয়াছিলেন আমি পনের-কুড়ি দিন কলিকাতায় থাকিব বলিয়াই কলেজের ছুটী পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছুটী হইলে

লিখিয়াছিলাম। তাঁহার অসংখ্য প্রশ্নে বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়া বসিয়াছি, কলিকাতা আমার ভাল লাগে নাই। আমার উত্তরকে তিনি সন্দেহ করিয়াছেন। তাঁহার একখানা চিঠি খুব সম্ভব শীঘ্রই বড়দির নিকট যাইবে। জগতে আমার একমাত্র বন্ধু তুমিই; এখানে বন্ধুদের জ্বালায় তোমাকে পত্র দিতে সময় পাই না বলিয়া যে কৈফিয়ত তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বহুবার দিয়াছি তাহারা বন্ধু নয়, বন্ধুর বেশে এক-একটী শয়তান, লম্পট। অতএব তুমিই তার একটা ব্যবস্থা বড়দির নিকট গিয়া করিবে বলিয়া এপত্র লেখার জন্য আমার এত ব্যস্ততা। আশালতাঘটিত ঘটনা বৌদির কাণে গেলে, আমার আত্মহত্যা অনিবার্য্য। বৌদিকে মুখ দেখাইতে না পারিয়া আত্মহত্যা আমার প্রশংসার কিন্তু কি শয়তানী বুদ্ধি এই আশালতার! একটা শয়তানীর সংস্পর্শে আসিয়া আত্মহত্যা করিতে কোথায় যেন বাধে।

তুমি হয়তো মনে করিবে, আশালতার উপর তোমার ঘৃণা আনা আমার এ পত্রের উদ্দেশ্য। এমন যদি হয় তাহা হইলে তুমি আমার উপর অন্যায় অবিচার করিবে, যাহা তোমার নিকট আমি মোটেই আশা করি না। তবে হ্যাঁ, আমার মত শয়তানী মেয়ের উপর ঘৃণা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। তাই নয় কি? এর একটা স্পষ্ট উত্তর চাই। ইতি—

পড়া শেষ হইলে, নির্ম্মল দৃঢ়তার সহিত মনে মনে বলিল, সঙ্গদোষে সে প্রেমেন্দ্র আর নাই; তাহার মন অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। আশা মোটেই শয়তানী নয়। তাহাপেক্ষা দুই এক বৎসরের বড় হইলেও প্রেমেন্দ্রকে ছোটর মত দেখায়। ইহাই খুব সম্ভব প্রেমেন্দ্রকে আমার দাদা বলার একমাত্র কিংবা অন্যতম কারণ। ইহা ছাড়া, আশার স্বভাবসুলভ ব্যবহারের অস্বাভাবিকতা কোথাও নাই।
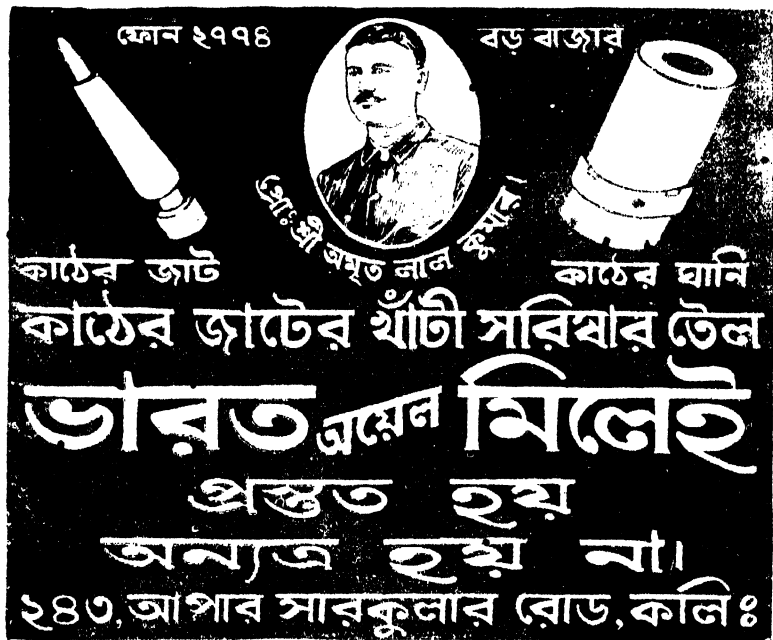
এ ব্যাপার কোন তারিখের? সময় ও তারিখ দেখিয়া নির্ম্মল বুঝিতে পারিল, গতকল্য এমন সময়ের কিছু পূর্ব্বের। ভোরে পৌঁছিয়া সকালের মেলে এ চিঠি পাইয়াছে এবং আজই সন্ধ্যায় এখানে বিলি হইয়াছে। আর একবার আগাগোড়া পড়িয়া নির্ম্মল ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, বারটা! এতরাতে বড়দির নিকট গিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলের বিব্রত করা—নাঃ।

(৪)

এ বাড়ী হইতে প্রেমেন্দ্রের অন্তর্ধানে ঘটনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়দি ও নায়েববাবুর মধ্যে এই সমস্যা অত্যন্ত জটীল হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, এ বিষয়ে কোন কথা নির্ম্মলকে বলা হইবে কি না। নির্ম্মল সে এ বাড়ীর কে এবং কতখানি, নির্ম্মলের নিকট এখন একথা গোপন করিলে পরে কখনো কোন সূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়ায় যে কতবেশী অপমান ও অন্তর্দাহ, তাহা এ বাটীর একজন হইয়া অনুভব না করিলে বুঝা কঠিন। তাই নায়েববাবু ও বড়দির মধ্যে এ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা রহিয়া রহিয়া যখন তখন চলিতেছিল। এবং গতরাত্রে মেসে নির্ম্মল যখন প্রেমেন্দ্রের পত্রে ঘটনাটা জানিয়া লইল তখন এখানে অনেক প্রশ্নোত্তরের পর নায়েববাবু অনেক চিন্তা করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ওপাশে শায়িতা বড়দিকে বলিয়াছিলেন, নির্ম্মলের সহিত আশার বিবাহ যদি দেওয়া হয়—এ ঘটনা নির্ম্মলকে বলিতেই হইবে; অন্যথায় প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। নতুবা না বলিলেও চলে। এই নতুবা তাঁহাদের সকল চিন্তার বাহিরে, সুতরাং তজ্জাকথা। সেই কারণে বলিয়াই আরো বলিয়াছিলেন, নির্ম্মলের সহিত প্রথম আলাপে একথা না বলিলে, বলিবার পথ আর উন্মুক্ত থাকিবে না, রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কেননা, পরে বলিতে গেলে আপনা হইতেই একটা কদর্থ হইয়া পড়ে এবং কদর্থ হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যদি

আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া যায় তাহা হইলে লজ্জায় নিজেদের ব্যবহারের কথা মনে করিয়া মুখ দেখাইবার আর উপায় থাকিবে না।

শুনিয়া বড়দি বলিয়াছেন, এই ঘটনা শুনিয়া কেহ কি কখনো নায়েবকে ভাল ভাবিতে পারে, না বিবাহ করিতে পারে? ইহার পূর্ব্বে যাহার সরল উদার মনের কাছে আশাকে গছানোর কথা বলিতে গিয়া মনে মনে দুই পা অগ্রসর হইয়া প্রত্যাখ্যানের ভয়ে তিন পা পিছাইয়া আসিয়াছি তাহার কাছে এ কথা বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করা যায়ই বা কিরূপে?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নায়েববাবুকে মৌন হইতে হইয়াছিল। তারপর তাঁহাদের মধ্যে আর বাদানুবাদ হয় নাই, ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে—বড়দি সে ঘরে নাই, থাকিবার কথাও নয়। সুতরাং অনতি-বিলম্বে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া বসিবার ঘরে ফিরিলে বড়দি চা-মিষ্টি লইয়া দেখা দিলেন, স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিতেই নীচে হইতে ডাক আসিল, "বড়দি!"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া এবাড়ীর যে যেখানে ছিল কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এডাক নির্ম্মলের। এ তাহার নিত্যকার ডাক—যেমন উচ্চ তেমনি সরল; সম্ভ্রমহীন কড়া গলা নয়।

ও ঘরে আশা সবেমাত্র পুতুলের ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছিল। সে নির্ম্মলের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই পুতুলের কাপড়জামা বিছানাপত্র তুলিয়া রাখিতে ব্যস্ত হইয়া মাকে জানাইতে ডাকিয়া কহিল, "মা; নির্ম্মলদা এসেছে।" তাহার এই নির্ম্মলদা বলিয়া ডাকারও একটা ইতিহাস আছে। বড়দি বর্দ্ধমান হইতে সরাসরি বৃন্দাবনে গিয়া এক বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের আবাসগৃহ সংলগ্ন তিন চারখানি ঘর লইয়া বৎসর দুই বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় মেলামেশা হইলে সেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৃদ্ধা গৃহিনী গল্প করিবার মানুষ পাইয়া প্রায়ই বড়দির কাছে আসিয়া বসিতেন এবং বড়দিকে প্রায়ই পত্র লিখিতে দেখিতেন। একদিন একথা সেকথার পর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামী তো এখানে, অত চিঠি লেখ কাকে?" বড়দি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। উপরন্তু আশা নিকটে কোথাও ছিল না। সুতরাং গোপন করিবার কারণ কিছু না থাকায় খোলাখুলিভাবে নির্ম্মল-সম্বন্ধে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন" ও! আশার মুখে যে নির্ম্মল মামার নাম শুনতে পাই সে-ই বুঝি?" বলিয়া-তিনি উপদেশ দিয়া আরো বলিয়াছিলেন, "এই মামা শব্দটা ঝেড়ে ফেলে এখন থেকে দাদা ব'লে ডাকতে শিখিও আশাকে। নইলে এরপর বিয়ে হ'লে আশা সহসা স্বামীকে স্বামী বলে মানতে পারবে না। এ আমার মুখের কথা নয়, নিজের জীবনে ঠিক এমনটাই

গান

শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

ঘুম্ যেন আজ ভাঙেনা মোর
তুমি এসো ধীর-চরণে,
গাঁথ্‌তে দিও স্বপন্‌মালা
পরাতে সুখ স্বপনে।
বন্ধু আমার আস্‌বে জানি—
আধেক রাতের মাঝে,
তার মিলনের মিলন্-বাঁশী—
বেহাগ সুরেই বাজে,
তাইতে পরাণ উঠ্‌ছে মেতে
তার আগমনী-গানে।
গাইতে দিও গান আমায়
সকল পরাণ ভ'রে,
উঠবে ভেসে গানখানি মোর
শুধুই নয়ন লোরে;
চোখের জলে ভিজিয়ে দেবো
বন্ধু আমার পথ,
শুকনো পথে চ'ল্‌তে গেলে
বাধা পাবে তার রথ,
(তাই) সকল ভাষা উঠছে ফুটে
আমার কাঁদন্ সনে॥

—

ঘটেছিল। আর, এর ফলে আমি লজ্জায় স্বামীকে স্বামী বলে স্বীকার করতে বহু চেষ্টার পর প্রায় ছ'মাস পরে পেরেছিলাম। ওঃ, সে যে কি লজ্জা তা' ব'লে বুঝানো যায় না।" বলিতে বলিতে তিনি সেই বৃদ্ধবয়সেও কৈশোরের কথা স্মরণ করিয়া সলজ্জে হাসিয়াছিলেন। বৃদ্ধার কথাটা বড়দির কাণে লাগিয়াছিল। তাই স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হ্যাগা এমন কখনো হয়? তোমার মতামত কি?" নায়েব বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কথাটা অমূলক নয় দেখিয়া অমত কিছু করেন নাই, মত দিয়া বলিয়াছিলেন, "আজকালকার নাটক-নভেলে ওই যে দাদা শব্দ যোগ করে ডাকে তা' একেবারে অযৌক্তিক নয়। অতঃপর বড়দি একদিন আশাকে বলিয়াছিলেন "হ্যাঁরে, তোর হাতের লেখা কেমন হ'ল তা তোর নির্ম্মলদাকে একবার দেখাবিনে? লিখিস তো যাহোক কিছু লিখে আমায় দে, আজই একখানা চিঠি আমার যাবে।" শুনিয়া সানন্দে আশা দোয়াত কলম আনিয়া বড়দির নির্দ্দেশানুসারে লিখিতে বসিয়া আপত্তি তুলিয়াছিল, "লেখবার সময় আমাকে দাদা লিখতে হয় নাকি?" বড়দি হাসি চাপিয়া বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ"। মায়ের পত্র লেখানোর আগ্রহ অল্প নয় দেখিয়া কন্যা আদরে আব্দারে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়াছিল "না, তাহ'লে আমি লিখিব না। নির্ম্মলদা ব'লে যদি লিখতে হয়, তাহ'লে এরপর কখনো দেখা হ'লে ওই ব'লেই আমি ডাকব।" এমন অভাবনীয়রূপে ইহার নিষ্পত্তি হইবে বড়দি তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন, "বেশ, তাই ব'লেই তুই ডাকিস্।" বলিয়া তিনি কন্যার অলক্ষে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া চাপাহাসি হাসিয়াছিলেন। পরে আশার সেই কাঁচা হাতের ছোটবড় অক্ষরের চিঠিখানা নিজের পত্রের সহিত তিনি নির্ম্মলকে পাঠাইয়া দেন। সে পত্র পাইয়া নির্ম্মল আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল, বিস্মিত হয় নাই। কেননা, দাদার বয়সী তৃতীয় ব্যক্তি যে তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকায় আশ্চর্য্যের কি আছে! তাই সেই কাঁচা সম্বোধনটা তাঁহাদের, কলিকাতায় আসার পর অসংখ্য ডাকাডাকির মধ্য দিয়া পাকা হইয়া গিয়াছিল।

"এসো ভাই, আমরা ওপরে—" বলিয়া নির্ম্মলকে সারা দিয়া বড়দি শুষ্কমুখে অনুচ্চস্বরে নায়েববাবুকে কহিলেন, "তুমি যেমন ক'রে পার ব'লো, আমি পারব না।"

শুনিয়া নায়েববাবু বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, পুরুষের পক্ষে তা কি সম্ভব?" বলিয়া নিতান্ত একটা শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিলেন, তা'ছাড়া তুমি মানুষ বশ করতে জান; আমি তো আর তা জানিনে?"

অন্যদিন হইলে একথা লইয়া বড়দি ভ্রূকুটি করিতেন, কিন্তু আজিকার আসন্ন মুহূর্ত্তের সহিত তাঁহার গতজীবনের যে কোন মুহূর্ত্তের তুলনা হয় না। তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন।

নির্ম্মল বারান্দা দিয়া এঘরে আসিতেছিল, আশাকে ওধারের ঘর হইতে এদিকে আসিতে দেখিয়াই সশব্দে হাসিয়া বলিল, "কই দেখি তোর কোন্ পুতুলটা প্রেমেন্দ্র ভুবড়ে দিয়ে গেছে।"

(ক্রমশঃ)

খেয়ালীর অষ্টম সংখ্যায় 'কমলা দেবী' লিখেছেন, "রন্ধন শিল্পকে বাংলার মেয়েরা আজ কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে"। আলোচনা ভাল উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, নিত্য যা চোখে দেখি তাতে সম্পূর্ণ অপরাধিনী বাংলার মেয়েরা নয়। প্রধান অপরাধ নৈতিক স্বাস্থ্যহীনতা, মেয়েরা যত বয়স্কা হোক স্বাস্থ্যসুন্দর কমনীয় লাবণ্যবতী কন্যার অভাব প্রতি ঘরে। ভীষণ চর্ব্বিযুক্তা কুমারী কন্যা কোন ঘরে বিদ্যমানা কোথাও ক্ষীণা—কোথাও নানা আধি-ব্যাধিতে পূর্ণ, কোথাও ধনীকের মোহে সমাচ্ছন্ন আলস্যবতী অবিবাহিতা কন্যা ঘরের শোভা বৃদ্ধি করছে। মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ ঘরে এখনও রূপ না হোক স্বাস্থ্যবতী মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। আলস্যহীন কর্ম্মময়ী মেয়ের অভাব—শুধু জননীর সুচিন্তিত সুপরিচালনার ঔদাস্যে। মায়ের শিক্ষিতা সতর্ক দৃষ্টি আজ ক্ষীণ অদূরদূর প্রসারী। তাই মেয়েরা সহজেই কাঁচকে গলায় পরতে চায় সগৌরবে। স্নেহময়ী জননীর দল সানন্দে সম্মতি দিয়ে সুখী হতে চেষ্টা করেন। পুঁথিগত বিদ্যায় ডিপ্লোমার অভিলাষ মেয়েদের মন যত না আকর্ষণ করুক; সিনেমার বৈচিত্র্যমোহ, সান্ধ্যভ্রমনে, আধুনিক চিত্রনাট্য ফ্যাসানে তরুণীদের অন্তর এতবেশী মোহগ্রস্ত করে রেখেছে যে, যার জন্য তারা ঘরে স্বাস্থ্যহীন ও বাহিরে অহেতুক অবহেলা লাভ করছে। নারীর সৌন্দর্য্য নমনীয় অটুট স্বাস্থ্য আধুনিক ফ্যাসানের আবর্ত্তে পড়ে বাংলার অন্তঃপুর হতে বুঝি নির্ব্বাসিত হতে চলল। প্রথম সন্তানের জননীরা সদ্যোজাত সন্তানকে পবিত্র

পুষ্টিকর মাতৃদুগ্ধ হতে বঞ্চিত করে ; অস্বাস্থ্যকে সন্তানের শরীরের অসংকোচে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে। ফলে সন্তানেরা ক্ষীণ দুর্ব্বল রিকেটগ্রস্থ ইত্যাদি নানা অসুখে জন্মাবধি ভুগিতেছে। মূল বিচার করলে দেখা যায়, স্কুল কলেজে পাঠ্য বই মুখস্থ করার দরুণ শ্রান্ত নারীর মন গৃহকর্ম্ম বিমুখ হওয়ায় অজ্ঞাতে ব্যায়াম জিনিষটা আয়ত্বের বাহিরে চলে যায়। যৌবনের মাঝপথে সংসার রঙ্গমঞ্চে বিপুল কর্ম্মরাশি দেখে ; শিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা মন বিদ্রোহী হয়ে উঠা অস্বাভাবিক মনে হয়না। জীবনের সুদীর্ঘ ২২।২৪ বছরের দায়িত্বহীন বিশুদ্ধ অন্তর যদি নিত্য নূতন অভ্যস্ত হয়ে থাকে ; তার হাতে হঠাৎ হাতা খুন্তি দিয়ে ঘর শোভার অনুসরণ করতে আদেশ দিলে নিতান্ত তার পক্ষে সেটা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

স্বাস্থ্য এবং সুমন দুইয়ের যখন অভাব, তখন উড়িয়া বা হিন্দুস্থানীর রান্নাঘর অধিকার করা ছাড়া গত্যন্তর কি? এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বাংলার শিক্ষিতা বা স্বাস্থ্যহীন মেয়েরা নয়।

অপরাধী বাংলার শিক্ষাভিমানী উচ্চ-শিক্ষিত বিবাহযোগ্য তরুণের দল। পাত্র সরমের কুণ্ঠা শিকায় তুলে অকুণ্ঠমনে অভি-ভাবককে জানিয়ে দেয়, বি এ, পাশ মেয়ে চাই, অন্ততপক্ষে মেট্রিক নইলে চলবেনা। কাজেই যুগের হাওয়া দেখে বাংলার হতভাগ্য মায়েরা রূপহীনা মেয়েদের নিজেরা না খেয়েও তাদের বিদ্যাশিক্ষার পথ প্রশস্ত করতে যত্ন নিয়ে আসছেন। নাচ, গান ও বাজনা উপরন্তু আছেই।

প্রগতির যুগ হাওয়া যে পথে চলেছে ; বাংলার তরলমতি ছেলে মেয়ে ছুটেছে সেই মোহের পিছনে ; উপায় কি? পিতামাতার অনুশাসন আজ ব্যর্থ—পরাজিত !! অনুযোগ অভিযোগ আজ মূল্যহীন অসার। গুণ্ঠনহীন লজ্জা বুদ্ধি অসীমের মাঝে মিলিয়ে যায়। অর্দ্ধনগ্ন ফ্যাসান বুদ্ধি মহিমান্বিতা নারীকে ঘৃণাস্তূপে আচ্ছন্ন করে আনল। কৃত্রিম স্বাস্থ্য তাই প্রতিচীর পরিহাসে ইন্ধন জোগাতে ব্যস্ত। বোধহয় এখনও তারা বোঝেনি এভাবে এগিয়ে গেলে ভবিষ্যৎ জগৎ শুধু অস্বাস্থ্যকর মরুভূমিতে পরিণত হবে। মায়ের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সন্তানের স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। পরবর্ত্তী ধারাও সেইভাবে গঠিত হয়। ব্যায়াম—নারীর ব্যায়াম নারীর স্বাস্থ্যের প্রতীক বই দেখে ব্যায়াম শেখা নারীর কাজ নয়। ঘর ঝাট—বিছানা পাড়াতোলা ; বাটনা বাটা ; বাসন মাজা ভাতের ফেন গালা, ময়দা মাখা ইত্যাদি প্রাত্যহিক উঠা বসা কাজের নাম বাংলার মেয়েদের ব্যায়াম। এই ব্যায়ামের অভাব ধরা পড়ে যায় সুতিকাগারে, চিকিৎ-সকের হাতে। ফল কষ্টকর Delivery ও অপরিপুষ্ট সন্তান।

স্বাস্থ্য অমূল্য রত্ন !! নীলাম্বুর রত্নগর্ভে এমন কোন মণি মাণিক্য নাই ;—খনির তিমির গহ্বরে এমন কোন রত্নরাজী নাই ; রাজাধিরাজের কোষাগারে এমন কোন ধনসম্পদ নাই ; যাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের তুলনা চলতে পারে। এই অমূল্য স্বাস্থ্যাভাব আজ বাংলার আকাশে বাতাসে হাহাকার এনেছে। তরুণী যদি সন্তানের পরিচর্য্যা নিজহাতে তুলে না নেয়, নারী যদি পুরুষের সেবা নিজ আয়ত্বে না রাখে ; মা যদি ছেলে মেয়ের দিকে প্রখর দৃষ্টি না দিতে পারে,—তাহা হলে দাসদাসীর হাতে শিশুর স্বাস্থ্য পাচকের হাতে গৃহকর্ত্তার জীবন ; এবং সিনেমা ও সাপ্তাহিক সিনেমাপত্রির মধ্যে কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য অকালে লুপ্ত হবে ; তার আর বিলম্ব নেই।

তাই বলি বাংলার বোনেদের ; ভুলনা তোমরা সন্তানের মা হবে ; ভুলনা তোমরা মহিয়সী নারী ; ভুলনা তোমরা বাঙ্গালী ছেলের বাঙ্গালী "মা" বাঙ্গালী পুরুষের বাঙ্গালী "স্ত্রী"। বাংলার তেলজল যে সুষমা যে লাবণ্য দিতে পারবে ; প্রতিচীর বিজ্ঞানিত প্রসাধন, বৈজ্ঞানিকী সাময়িক আরামপ্রদ ওষুধ সে শক্তি সে স্বাস্থ্য দিতে পারবে না।

অসবর্ণ মিলনের ফলে, প্রকৃতির অনুরূপ সন্তানের সুপ্রকৃতির অভাব প্রায়শঃই দেখা যায়। অবাধ মিলন স্বেচ্ছাচারিতার দুর্লক্ষণ, অস্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তী দারুণ দুর্ভোগ ও অশান্তির সৃষ্টি করে থাকে। স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজ্যসুখ কখনই বিঘ্নহীন হতে পারেনা। দেহে এবং মনে প্রকৃত শক্তি চাই ; যে শক্তি হতে স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে। যে শক্তি চেতন হারাকে জাগিয়ে তুলবে মহিমময়ী নারীর অমোঘ শক্তির বিনিময়ে ; যে শক্তি বৈদেশিক মোহকে উপদলিত করে কর্ম্মঠ, সহিষ্ণু ও যুদ্ধা করে সন্তানকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। আশাকরি তরুণী মায়ের সতর্ক দৃষ্টি নিজের এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সাধনের দিকে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা থাকবে। এই চেষ্টা সেদিন সফলতার জয়-গৌরবে গৌর-বান্বিত হবে ; যেদিন সুস্বাস্থ্যবতী নারী রন্ধনশালার ভার নিজের হাতে পূর্ব্বকালের মত তুলে নিতে পারবে ; সংসারের ব্যয় সংকোচের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য। বিনিময়ে গৃহকর্ত্তার অপরিসীম পুরস্কার সুগৃহিনীকে মহিমজ্জ্বোল করে তুলবে। সাহিত্যিকের তীব্র লেখনী সেদিন নির্ব্বাক হবে—বিস্ময়ে বিমুগ্ধে !!

—•—

বাংলার মেয়ে

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

গৃহলক্ষ্মী—বাংলার মেয়ে, বাংলার মেয়ে, এখনো কি তুমি
ঘুমিয়ে আছ?
এখনো কি তুমি দুঃখের কথা যাকে পাও তাকে
শুনিয়ে বাঁচো!
এখনো কি নেই শান্তি তোমার, এখনো কি
ঘরে অনেক জ্বালা?
বাংলার মেয়ে, বাংলার মেয়ে, সুরু কি
হয়নি সুখের পালা?

বাংলার মেয়ে—কেন কেন অত ডাক পাড়াপাড়ি!
কে তুমি গা, তুমি কাদের বাছা?
দুপুর বেলাও ঘুমোতে পাবো না?
গলাখানি যেন হাঁড়িটি চাঁচা!

গৃহলক্ষ্মী—আমি তোমাদের ঘরের লক্ষ্মী, ঘর করো তবু
জানো না মোরে!
ঘুম ভেঙেছে কি? শান্তি পেয়েছ—জানিতে
এসেছি আদর ক'রে।

বাংলার মেয়ে—কিসের নিদ্রা? নব জাগরণ সারা দেশ ভ'রে
জোয়ার আনে।
ঘুরিয়ে কাপড় পরতে শিখেছি, নাম করেছি
নাচে ও গানে।
কো-এডুকেশনে পড়া শেষ করি, ট্রামে বাসে
চলি বীরের মত;
গাড়ীর জান্‌লা তুলতে দিই না, কাঁচ পরি
ঠিক হীরের মত!
নিমন্ত্রণে ও সিনেমায় যাই নতুন গয়না
দেখাবো ব'লে,—
মেমের মতন ঘোরাফেরা করি সরু গলা
আর হাসির রোলে।
মোটরেই চলি, পায়ে হেঁটে যাই, ষ্টাইল কখনো
যাইনা ভুলে।
নতুন ফ্যাশন ব্লাউজের হাত কজিতে টেনে
কাঁধেতে তুলে।
হাজার রকম কানের গয়না, পায়ের
পাদুকা কাঁদিছে শোকে।
ক্লোকেট, জাপানী জর্জ্জেট চলে, যে বহর যেটা
লাগিবে চোখে।
নিত্য মোদের মহলার মত, পৃথিবী আপনি
ঘুরিয়া চলে·
পুরুষগুলোর চরম শাস্তি নাকের জলে
ও চোখের জলে।
আমরা এনেছি নব জাগরণ, জানিনা কোথায়
দুঃখ আছে।
প্রজাপতি মোরা, সারা দুনিয়াটা সরা হ'য়ে
প'ড়ে পায়ের কাছে।

গৃহলক্ষ্মী—এই কি তোমার সত্য স্বরূপ? বলিতে কি
চাও সকল সুখ,—
গয়না এবং শাড়ীতেই আছে?

বাংলার মেয়ে—তাই বলি, যেবা যাই বলুক।
রোগ আছে জানি, শোক আছে মানি—
সিনেমা সকলি ভুলিয়ে দেয়!
অভাব ত' আসে—ভাবতে গেলেই মাথা
যেন আরো গুলিয়ে দেয়।
তাই বলি অত ভেবে কিবা কাজ?
হৈ চৈ নিয়ে ভালোই থাকি।
টিউশনি ক'রে রোজগার করি—আর্ম্মরা
কি আছি তেমনি নাকি?
কেউ বিয়ে করি, কেউ বা করি না,
মোটর ওপর বাংলা দেশে—
বাঙালীর মেয়ে আগেকার চেয়ে পৌছল
ঢের উঁচুতে এসে।
উন্নতি দেখো চারিদিকে আজ, উন্নত আজ
সকল মেয়ে,
পুরুষের মোরা সমান হয়েছি—লজ্জা পালায়
লজ্জা পেয়ে।

গৃহলক্ষ্মী—একটা কথার জবাব কি দেবে? ছেলেরা তোমার
মানুষ হ'ল!
সুসন্তানের জননী কি তুমি? নতমুখী কেন,
মুখটি তোল!

বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রামকৃষ্ণ এসে,
ঘরখানি কারো আলো কি করেছে? এলো শুকতারা
নবীন বেশে?
নাম করবার মতন কি ছেলে, দিয়েছ জাতির
সেবার তরে?
মধুসূদনের প্রতিভা এনেছে, জ্ঞানে হারায়েছে
দীপঙ্করে?
বায়স্কোপে কি ভিড় ঠেলে তারা? নাম করা
বুঝি গুণ্ডামিতে?
পাশ ক'রে মাথা কিনে কি ফেলেছে? পোক্ত
হয়েছে ওস্তাদিতে!
মিথ্যা কথাও আটকায় নাকো, প্রতারণা করা
শিখেছে ভালো,
সেই ছেলে দিয়ে জন্মভূমির মুখখানি আরো
করেছ কালো।
ঘুমত' তোমার ভাঙেনি এখনো—তন্দ্রা যে আজো
রয়েছে চোখে

মানুষের মত মানুষ গড়ার, কাজ ভুলে গেছ
কিসের ঝোঁকে?
তোমাদের হাতে শান্তির ভার, কল্যাণ মালা সংসারেরি;
সব দায়ীত্ব এড়িয়ে চলেছ, ঘর ভাঙিবার
নাই ত' দেরী!
অন্দরে যদি স্বস্তি না থাকে, অন্তরে সুখ
কেমনে রবে?
সুসন্তানের জননী না হ'লে, নারী জন্ম যে ব্যর্থ হবে।

কুলাঙ্গারের বোঝা বাড়িয়ো না, নিজেরা হয়ো না
আবর্জ্জনা,
মেকী সভ্যতা হেরিয়া, আঁচলে কাঁচ তুলিয়ো না
ফেলিয়া সোনা।
বাংলার মেয়ে—জননী, আমারে লজ্জা দিয়ো না! পথ দেখায়েছ,
চলিব বুঝে।
গৃহলক্ষ্মী—আমি চলিলাম, গৃহলক্ষ্মীরে সাধনার শেষে
আনিয়ো খুঁজে॥

ফটো : প্যারামাউণ্ট

"মুক্তি চাই" "মুক্তি চাই"—তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রেডরিক মার্চ। "বুকানীর" চিত্রের একটি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। ছবিখানা মিনার্ভায় দেখান হচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩রা চৈত্র ১৩৪৪, ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩৮

শোধন

হরিশ পার্কের সম্বর্দ্ধনা সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পৌরসভায় অনাচার ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের উপদলীয় মনোভাব সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ বিশ্লেষণ যোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালীর চরিত্রে যে Inferiority Complex এর রোগ দেখা দিয়াছে তৎসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুগত্যের অভাবেই আজ সমগ্র ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী পশ্চাদপদ হইয়া পড়িতেছে। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বাঙ্গালীর অবদান অন্য কোন প্রদেশের অপেক্ষা কম না হইলেও বাঙ্গালী আজ উপেক্ষিত। সাড়ে ছয় বৎসরাধিক কাল বাংলার কর্ম্মকেন্দ্র হইতে সুভাষচন্দ্র বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি আগামী পাঁচ বৎসর বাংলার অবিসংবাদী নেতৃত্ব লাভ করিলে বাংলাকে পুনরায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারিবেন এ সঙ্কল্প তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ন্যায় সুবৃহৎ স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে বর্ণচোরা কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দের উপদ্রবে কংগ্রেসী আদর্শ আজ ধূলিক্ষিপ্ত। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এই সমস্ত বর্ণচোরা কাউন্সিলারবৃন্দকে সংযত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির স্থগিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সাহস সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যানের হয় কিরূপে? সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যান কি কর্পোরেশনের কংগ্রেসী দলের নেতা? মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন কি বলিতে পারেন যে চৌরঙ্গীর 'কাসানোভা' যাঁহার প্রমোদ-কেন্দ্র তাঁহাকে কংগ্রেসীদলের নেতৃত্বপদে আসীন রাখা সমীচিন কি না? হরিশ পার্কের সম্বর্দ্ধনা সভায় মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেন ও মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ দক্ষিণ কলিকাতা রাষ্ট্রীয় সমিতি ও দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির পক্ষে অভ্যর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করেন। যাঁহারা রাষ্ট্রপতির অনুজ্ঞা উপেক্ষা করিতে পারেন তাঁহারা কিরূপে অভ্যর্থনা-অভিভাষণ পাঠ করিতে আসেন তাহা আমাদের অবোধগম্য। বিরাট জনতা সুভাষচন্দ্রের বর্ণচোরা কংগ্রেসী কাউন্সিলারবৃন্দকে সংযত করিবার সঙ্কল্প যে বিপুল উৎসাহে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে কী মিঃ নিশিথ চন্দ্র সেনের ন্যায় বর্ণচোরা কাউন্সিলারবৃন্দের চৈতন্য উদয় হইবে না? আনন্দের বিষয় যে শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাশের ন্যায় সর্ববিদ্যাবিশারদ বাক্যবীরের বীররসের উচ্ছাস সত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু ডাঃ নলিনাক্ষ্য সান্যালের সংশোধনী প্রস্তাব কেহ সমর্থনই করেন নাই। আগামী শুক্রবার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েসনের স্থগিত সভার অধিবেশন রাষ্ট্রপতির এলগিন্ রোডের ভবনে হইবে এবং সেই সভায় প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত

হইলাম কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার বেতন সম্বন্ধে মহাত্মাজী ও জওহরলালজী যথাক্রমে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৫০০৲ ও ১০০০৲ টাকার অধিক হওয়া উচিত নহে।

পরিশেষে আমরা সুভাষচন্দ্রের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে পলিটিক্সে অভিমানের স্থান নাই। সুতরাং তিনি যেন কঠোর ও নির্ম্মম হস্তে বিরুদ্ধবাদী উপদলগুলিকে চূর্ণ করিয়া স্বীয়দল গঠন করিয়া বাংলায় কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী করিয়া তুলেন। বিশ্ব আজ শক্তির উপাসক—ভারতে তাহার অন্যথা হইতে পারে না। ডেমোক্রাসির নামে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রকে কলুষিত করিয়াছে তাহাকে শোধন করিতে হইলে যে শক্তিধর পুরুষের প্রয়োজন বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তজ্জন্য সুভাষচন্দ্র যে সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত তাহাতে দ্বিমত নাই।
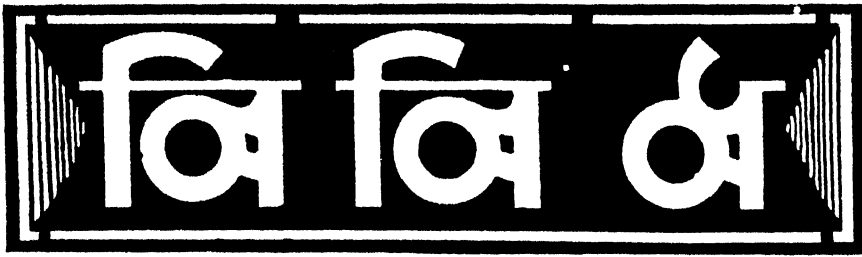
সঙ্গীত আসর

গত শনিবার ১৪ই ফাল্গুন ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী '৩৮ রাত্রে শ্রীশৈলেশ্বর মিত্র মহাশয়ের ২০নং কালীদাস সিংহ লেনস্থ ভবনে সঙ্গীত আসরের ৯ম মাসিক অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে কুমারী অন্নপূর্ণা বসু, কুমারী শান্তা বোস, কুমারী মহামায়া চক্রবর্ত্তী বাংলা গান করেন। পরে শ্রীমতী বুলীরাণী খেয়াল গান করেন। সর্ব্বশেষে কুমারী করুণা সেন অতি উচ্চাঙ্গের খেয়ালগানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে অভিভূত করেন। সঙ্গীত আসরের সভ্য শ্রীযতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের প্রতিশ্রুত রৌপ্য পদক কুমারী করুণা সেনকে দেওয়া হয়।

শোক সংবাদ

গত ৬ই মার্চ্চ রাত্রিতে ৪৯নং বালীগঞ্জ প্লেসস্থ ভবনে বড় বাজারের খ্যাত ব্যবসায়ী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল এবং বহুদিন যাবত তিনি অসুখে ভুগিতেছিলেন। তিনি স্ত্রী, চারিপুত্র, চারিকন্যা ও বিপুল আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য তাহার অন্যতম কনিষ্ঠ পুত্র। আমরা এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

গত সোমবার রাত্রিতে রাধাবাজারের প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী শ্রীপূর্ণচন্দ্র কর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বল্পকাল রোগভোগের পর আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। অগ্রজপ্রতিম কর মহাশয়ের এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই।

* * *

লিবারেল নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু, এম্, এল, এ মহাশয়ের পত্নী মঙ্গলবার রাত্রে আগড়পাড়ার ভবনে প্রায় বৎসরাধিককাল রোগ ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম জামাতা সুপরিচিত চিত্র-সমালোচক শ্রীচন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

বন-কুসুম তৈল

বাজারে কেশ তৈল বা প্রসাধন দ্রব্যাদির অভাব নাই। কিন্তু সচরাচর যে সব জিনিষ আমাদের নজরে পড়ে বা ব্যবহার করিবার সুযোগ লাভ করি—তাহার অধিকাংশই উল্লেখযোগ্য নহে।

"বন কুসুম" পারফিউমারী ওয়ার্কস্-এর "বন কুসুম" কেশ তৈলটি সম্বন্ধে কিন্তু এ অভিযোগ খাটে না। আমরা এই তৈলটি বিশেষরূপে ব্যবহার করিয়া দেখিলাম—ইহার গন্ধ চমৎকার এবং উহার স্থায়িত্বও আছে। তাহা ছাড়া কেশ বর্দ্ধন ও উহার স্বাভাবিক শ্রী ও স্নিগ্ধতা রক্ষার উপযোগী বহু উপাদান বর্ত্তমান থাকায়—ইহার ব্যবহারে স্থায়ী উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

বয়েজ ওন্ লাইব্রেরী

আগামী ১৩৪৫ বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে চুঁচড়া কনকশালীস্থ বয়েজ ওন্ লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন শ্রীযুক্ত কানাই লাল বসু মহাশয়ের ভবনে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত অধিবেশনে নিখিল বঙ্গ স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগী হিসাবে

আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিযোগীতার বিষয়—

১। প্রবন্ধ—গ্রন্থাগার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা (১২০০ শব্দের বেশী হইবে না)।

২। আবৃত্তি—অভিসার (চয়নিকা হইতে)—১৪ বৎসর কম বয়স্ক ছাত্রদের জন্য। নবীন (চয়নিকা হইতে)—১৪ বৎসর উর্দ্ধ। ৩। উপস্থিত মত বক্তৃতা—বক্তৃতার বিষয় ৫ মিনিট পূর্ব্বে জানান হইবে। বক্তৃতার সময়কাল ৫ মিনিট। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩৮ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ নাম ঠিকানা স্কুলের বা কলেজের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের স্বাক্ষর সহকারে পাঠাইতে হইবে। ১। শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্টাচার্য্য—চুচড়া কনকশালী, হুগলী। ২। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বসু—চুচড়া কনকশালী হুগলী। ৩। শ্রীসুধীর চন্দ্র বসু এম, এ (দেশবন্ধু স্কুল) ৪। শ্রীঅনিল বসু (রিপন কলেজ, আইনের প্রথম বর্ষ 'Y' বিভাগ) ৫। শ্রীপ্রশান্ত বসু (হুগলী কলেজ, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী)।

বাঙলা ভাষায় ভারতীয় নৃত্যের অভিনব গ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌ মহাশয় সম্প্রতি নন্দিকেশ্বরের "অভিনয়দর্পণে"র সরল বাঙ্‌লা ভাষান্তর করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন বিশ্ববিশ্রুত শিল্পাচার্য্য ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথঠাকুর মহোদয়। বইখানিতে শুদ্ধ"মুদ্রা"গুলির আলোকচিত্র দিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়টি সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। চিত্রসংখ্যা প্রায় ৭০। ছাপা, বাঁধাই অত্যুত্তম। ভারতীয় নৃত্য শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থিনী মাত্রেরই এই গ্রন্থ একখানি করিয়া সংগ্রহ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা গ্রন্থখানির বিস্তৃত পরিচয় ও সমালোচনা বারান্তরে পত্রস্থ করিব। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—উমা চৌধুরী

জীবনের পথ সহজ সরল কুসুমাকীর্ণ যে নয়; সংসার পথে চলতে গিয়ে প্রতি নিয়ত প্রতি পাদক্ষেপে সুখে ও দুঃখে প্রতি নরনারী অনুভব করছে। যেখানে স্বামী ও স্ত্রী স্বল্প আয়ের মধ্যে, নিজেদের মর্য্যাদা বজায় রেখে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা সমাধা করে চলেছে; যেখানে ধর্ম্মের ভাণ নয়, প্রকৃত ন্যায়কে ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ মনে ভেবে দম্পতীরা সাংসারিক অশেষ লাঞ্ছনা বরণ করে নিচ্ছে, সেখানেও অশান্তির ঢেউ আসে ধীরে ধীরে চুপে চুপে, জনক-জননীর নিভৃত অন্তরে, অরক্ষনীয়া কন্যার দেহে লীলাময়ী প্রকৃতির সহজাত অকৃপণ দান-সম্ভার দেখে। বাংলার শতকরা নিরানব্বই কুটিরে কুমারী কন্যার জন্য মধ্যবিত্ত পিতা-মাতার কোথাও বা দরিদ্র বিধবা মাতার এই অবর্ণনীয় চিন্তা প্রতি দিনের ক্ষুধার মত বেড়েই চলেছে।

মেয়েদের জন্য নানাবিধ শিক্ষার পথ বিস্তৃত করলেও সমাজ জীবনে যে ব্যাধি; সেটা দুষ্ট ক্ষতের মত আজও বাংলার বুকে দেদীপ্যমান। কোন ব্যক্তি বিশেষ এই দূষিত ক্ষতের জন্য দায়ী না হলেও; আংশিকভাবে প্রত্যেক নর-নারীই জড়িভূত। সমষ্টিগত ব্যাধি দূঢ় সমষ্টির প্রলেপ ভিন্ন নিরাময় হওয়া অসম্ভব। প্রতিকারার্থে কত মহা মহারথী বাঙপটুতায় বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন কত স্থলে, কত সুরে কত ছন্দে কত বর্ণ বিন্যাসে। কিন্তু আজও দুর্ভাগা বাংলার দুর্ভাগিনী মায়েদের শোচনীয় দুরবস্থা—"যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

একে বেকার সমস্যা প্রতি ঘরে হাহাকার এনেছে; তার ওপর কুমারী কন্যার সংখ্যাধীক্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, দিনের পরে দিন বিবাহ সমস্যা জটীল হয়ে উঠছে।

শিবপুর মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়

গত রবিবার ১৩ই মার্চ্চ সময় ৫ ঘটিকায় শিবপুর পাবলিক্‌ হলে উক্ত স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক ৺মণিলাল গাঙ্গুলীর "মুক্তার মুক্তি" নাটকের অভিনয় হয়। প্রযোজনা করিয়াছিলেন নগেন বোস। রাজার ভূমিকায় মিস্‌ প্রতিমা বোসের অভিনয় ও নাচন ভঙ্গি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। "অঞ্জনা"র ভূমিকায় মিস্‌ অনিমা মুখার্জ্জির অপূর্ব্ব নাট্য নৈপুণ্য, অভিব্যক্তি ও গানগুলি সমগ্র প্রেক্ষাগারকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকায় মিসেস্‌ ভারতী গাঙ্গুলী, আরতি গাঙ্গুলী, গীতা গাঙ্গুলী, শিবরাণী মিত্রের অভিনয়ও সুন্দর হইয়াছিল।

বাংলার ইতিহাসে পণপ্রথা আজও রেকর্ড রেখে চলেছে। ছেলের মা বাবার অপ্রতিহত ক্ষমতার উত্থান শুধু পণ গ্রহণের সময়, কর্ম্মশেষেই তার সমাপ্তী ঘটে থাকে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত পাত্রের দল মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করে পূণ্য সঞ্চয়ে আত্মশ্লাঘা লাভ করে থাকেন। দুর্ভাগা বাঙ্গালার ঘরে বিপত্নীকের পাত্রীর অভাব কোনদিন ঘটে না; দ্বিতীয় দফায় নারী ও রূপিয়া অনায়াসে কুক্ষিগত হয়। উপায় কি? সমাজ জীবনের এই উৎপীড়িত ব্যাধির প্রতিকারার্থ কোন দেশী ইঞ্জেকসান কি ফল দিতে পারে না? প্রৌঢ় পাত্র ও তরুণদলের কাছে অনধিকার চর্চ্চা হলেও এই প্রশ্ন করার' কি সময় আসেনি? এখনও প্রৌঢ়ের দল দ্বিতীয় সংসারে প্রবেশের সময় ৪০০৲ টাকা শুল্ক আদায় করতে উদ্যোগী হয়ে আসেন; ক্ষেত্রে কর্ম্মও সম্পন্ন হয়।

তরুণ পাত্রের বুকে এখনও কি দুর্ভাগিনী বিধবা জননীর আকুল আর্ত্তনাদ প্রবেশ করতে পায়না? মলিনমুখী জননীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার রূপ কি তাঁদের বিদ্যুৎ প্রবাহিত সুরম্য গৃহদ্বারে চোখে পড়েনা? দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে, জাতির এই মহাসঙ্কটের দিনে, পৃথিবীব্যাপী বেকারের চরম সমস্যার দুঃসময়ে, কর্ম্মঠ, সাহসী, মেধাবী, তরুণের সাহায্য একান্ত ও একমাত্র আশ্রয়। একনিষ্ঠ কর্ম্মচেতা, তরুণসঙ্ঘের কাছে ধনিকের অসামান্য অর্থদান নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কর্ত্তব্য এবং চারিত্রিক বল যদি তরুণসঙ্ঘের বুকে জাগ্রত প্রহরীর কাজ করে যায়, তাহা হলে জাতির সমষ্টিগত সকল বাধা নিশীথ অন্ধকারে মিশিয়ে যায়—অসীমের মাঝখানে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তরুণদলের কাছে আমরা বোনেরা ভিক্ষা চাই, "পণপ্রথার উচ্ছেদ"—"পথহারা প্রগতীর শৃঙ্খলাহীন চলার শেষ"—"নিয়মতান্ত্রিক সৃষ্টির আকাঙ্খা"। রহস্যময়ী প্রকৃতির পরিহাস প্রতিশোধ হয়ে ফিরে আসেই। তরুণ তরুণীর উদ্দেশ্যবিহীন পথে দায়িত্বজ্ঞানহীন যাত্রা একদিন শোচনীয় পরিণতি এনে যে ঝড়ের সৃষ্টি করে থাকে; তা থেকে বাংলার নবোন্মেষিত তরুণ তরুণীদের বাঁচতেই হবে। বাঁচার গৌরব যেন ভবিষ্যৎকে মহিমান্বিত করে রাখতে পারে। এখনও আভিজাত্যের গৌরব অন্তর্মুখী নয়। এখনও বাংলার বুকে বংশগরিমায়, আভিজাত্যে, শিক্ষায় দীক্ষায়, সাহসে, কর্ম্মে, কষ্টসহিষ্ণুতায়, দরদী মুকুটবিহীন তরুণ রাজা দেশকে, জাতিকে, শ্রদ্ধার দান হাত বাড়িয়ে দিয়ে যায়। ইতিপূর্ব্বে বাংলার ইতিহাসে এতবড় খ্যাতি কোন তরুণের ভাগ্যে ঘটেনি। ভবিষ্যতের গর্ভে দ্বিতীয় আসবে কিনা জানা নেই। বাংলার দুলাল, বাংলার ভাই, বাংলার আশা,—সুভাষচন্দ্র যে ত্যাগ, যে ব্রত, যে আদর্শ আমাদের দেখিয়েছেন; তরুণসঙ্ঘের কাছে সে ত্যাগ সে আদর্শ কি আশা করা যায়না? তারা কি পারেনা নিগৃহিতা নারীকে রক্ষা করতে? তারা কি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বেকারের সমাধান করতে পারেনা? তারা কি বিধবা নারীর চোখের জলে পণপ্রথা ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনা? তাই কি হয়? শিক্ষিত তরুণ যে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষিত তরুণ সে ভবিষ্যতে নব যুগের সৃষ্টি করবে—লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে শিক্ষিত তরুণের দল এগিয়ে আসবে অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার ও আশার দীপ্ত আলো নিয়ে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল তরুণ তরুণীকে মনে রাখতে হবে—আমরা দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের ভাই ও বোন। এই দেশের মায়ের কোলে সুভাষচন্দ্রের জন্ম—এই দেশের মাটির বুকে সুভাষচন্দ্রের প্রথম শিক্ষা। যে শিক্ষা দরিদ্রের ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছে, যে শিক্ষা পদমর্য্যাদাকে তুচ্ছ করে মাটির পথে ছোটবড় জাতির সঙ্গে অবাধ মিলনে সাহায্য করেছে। এই শিক্ষাই শিক্ষা; এই শিক্ষাই সার্থক ও ধন্য। অননুকরণীয় এই মহান ত্যাগ— বাংলার ছেলেমেয়েদের উদ্দাম গতির পথ রোধ করুক। দৃষ্টিকটু প্রগতির পথ থেকে তারা সার্ব্বজনীন আদর্শ প্রচার করুক, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কুটিরে কুটিরে। প্রতিচীর বিলাস-মোহ দূরে যাবে লজ্জা পেয়ে। ফ্যাসানের নগ্নরূপ দেশ থেকে বিতাড়িত হবে।

তরুণ তরুণীর আদর্শ কীর্ত্তি অনির্ব্বচনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে নব জাগরণের সৃষ্টি করুক এই প্রার্থনা।

পথ নির্দ্দেশ

মাননীয়া "মহিলা মহল সম্পাদিকা"

সমীপেষু—

কোন এক আত্মীয়ের টেবিলে একখানা খেয়ালী দেখে, তাতে দেখলুম; মহিলা সমিতি ও দুঃস্থা মহিলাদের অভাব এবং তার আংশিক প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। বিষয়টা পড়ে খুব আশান্বিতা হলুম; কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বোধগম্য হোলনা, বোধ হয় সমিতি বা শিল্প-বিক্রয় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোন ধারণা না থাকায়। আজীবন অন্তঃপুরের অন্ধকারে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতেই অভ্যস্ত, বাহিরে বিপুল কর্ম্মকোলা-

যদি আপনাদের মত সহৃদয়া মহিলা ধনীর বাড়ী হইতে এই মশলার বাগানের অর্ডার সংগ্রহ করিয়া দেন; তাহা হলে আমার অভাবগ্রস্থ সংসারে বিশেষ উপকার হয়। পরানুগ্রহ জীবন কি ভয়ানক কষ্টকর বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যদি প্রয়োজনীয় অর্থকরী শিল্পের দ্বারা গলগ্রহ জীবনের অবসান হতে পারে, অনুগ্রহ করে তার জন্য একটু চেষ্টা করে বাধিত করিবেন।

বাংলার অন্তঃপুরে খেয়ালী, দীপালী ইত্যাদি সাপ্তাহিক কোনদিন প্রবেশের সুবিধা হয়না বোধহয়; নহিলে আমার মত বহু মহিলা এই আলোচনা দেখে আশান্বিতা হতেন। সম্ভব কিশোর ও যুবকরা শনিবার পড়ে কোথায় ফেলে রাখে—মেয়ে মহলে আসবার সুবিধা হয়না। ইতিপূর্ব্বে কত প্রয়োজনীয় সংবাদ নাজানি প্রকাশ হয়ে থাকবে।

নমস্কার ইতি—

—প্রনতা, প্রতিভা ঘোষ—

অনেক রকম শিল্প আমার জানা আছে। তারমধ্যে প্রধান এবং প্রয়োজনীয় একটি শিল্প সম্বন্ধে জানাচ্ছি। যেটা মাঙ্গলিক বিবাহ-কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি কোন সহৃদয়বতী মহিলা দয়াপরবশ হয়ে বিবাহের সূচনায় অর্ডার দেন, তাহা হলে আমি ১০।১২ দিনের মধ্যে তৈয়ার করে দিতে পারি। জিনিষটা হচ্ছে একটা ডালার ওপর যাবতীয় পানের মশলা দিয়ে একটি সুন্দর বাগান বাড়ী রচনা— নারকেল গাছ ঝাউগাছ, ফোয়ারা ইত্যাদি সমস্তই পানের মশলা, দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে। বিবাহে পানের মশলা গায় হলুদ ও ফুলশয্যায় দিতেই হয়। সেই জিনিষগুলিকে শিল্পে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি ছোট সর্ব্বনিম্ন ডালা সাজাতে মজুরী সমেত পরে ১০।১২।১৫ ২০৲ টাকার মধ্যে। আকার অনুযায়ী মশলার তারতম্যে খরচ কম বেশী হয়ে থাকে।

হলে কোথায় কার অভাব অভিযোগ প্রতিকার কিছুই চিন্তা করে দেখবার অবসর আমার হয়নি। বংশগরিমা ও আভিজাত্য দারিদ্রকে উপেক্ষা করলেও, অভাবের তীব্র তাড়নায় ছোট ছোট নাবালক শিশুদের রক্ষার জন্য মায়ের জীবন যখন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠে; তখন কোন উপায় না এসে আসে শুধু বাহিরের নির্য্যাতীত উপহাস। পথহারা, অর্থহারা বাংলার কত নারী আমারই মত নীরবে মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা উপহাস সহ্য করে আসছে দিনের পর দিন।

আজ আপনার সুচিন্তিত ছোট্ট প্রবন্ধে পথ নির্দ্দেশের ইঙ্গিত পেয়ে আশা হোল, হয়ত একদিন আমার ছোট শিশুগুলিকে ক্ষুধায় আহার দিতে পারব; অমানুষিক অত্যাচার হতে একদিন তারা বাঁচতে পারবে। তাদের শিক্ষার পথ হয়ত একদিন মুক্ত করতে পারব।

বিলাসী)

সখের শ্রমিক

চিত্র-নির্ম্মতা : প্রফুল্ল পিক্‌চার্স
প্রযোজক : প্রফুল্ল ঘোষ
কথা ও কাহিনী : কেশব গুপ্ত
সঙ্গীত—কেশব গুপ্ত
ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতাংশ
পরিচালক : নির্ম্মল গোস্বামী
চিত্র-শিল্পী : ডব্লিউ মায়ার বার্গেণ্ট
শব্দযন্ত্রী : ডগ্‌লাস ওয়ালটার্স
নেপথ্য-সঙ্গীত—সুধামাধব সেনগুপ্ত
সুখেন্দু গোস্বামী
সম্পাদনা : অতুল নাগ
চরিত্র : মিঃ বটব্যাল—ভাস্কর দেব, মিসেস্ বটব্যাল—দেববালা, সন্ধ্যা—অরুণা, ভূপতি চৌধুরী—সত্যধন ঘোষাল, নন্দদুলাল—সমর ঘোষ।
প্রথম মুক্তি : 'শ্রী', বুধবার, ১৬ই মার্চ্চ

হাসির ছবি তোলা বাঙলাদেশে যেন একটা 'এপিডেমিক্' লেগেছে। সম্প্রতি উত্তর কোলকাতার তিনটি চিত্রগৃহে উপরি উপরি মুক্তি পেল তিনখানা হাসির ছবি। আমাদের আলোচ্য হাসির ছবিখানি "সখের শ্রমিক"। নতুন ষ্টুডিওর নতুন ছবি হিসেবে "সখের শ্রমিক"-কে যদি আমরা নিছক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি সেটি হবে সত্যের অপলাপ। তবে একথা স্বীকার্য্য, এদের প্রথম প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ এবং এই ছবি দেখে সহজেই অনুমেয় যে, প্রফুল্ল ঘোষের ভবিষ্যৎ পথ কুসুমাস্তীর্ণ।

"সখের শ্রমিকের" গল্পটি সত্যই বেশ উপভোগ্য। হলিউডে অধুনা প্রচলিত 'Crazy comedy'-র এটি পর্য্যায়ভুক্ত। বিবাহ বারণ সমিতির অন্যতম সভ্য নন্দদুলাল নিউ মার্কেটে গিয়ে বটব্যাল পরিবারের কৃপায় কিরূপে যে গ্রাজুয়েট কুলি বনে গেল এবং বটব্যাল-কন্যা সন্ধ্যার প্রেমে পড়ে হাসির ঘটনার মধ্য দিয়ে তাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে বরণ কোরল, চিত্রনাট্যকার অতি নিপুণভাবে এই কাহিনীটিই চিত্রান্তরিত কোরেছেন।

"সখের শ্রমিক"কে শুধু হাসির ছবি বললে মস্তবড় ভুল করা হবে। হাসির ভেতর দিয়ে আজকালকার সব চেয়ে বড় যে 'Bread Problem' তারই সম্বন্ধে লেখক যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কোরেছেন তা' সত্যই ভেবে দেখবার মত। এই গল্পটি, খুবই কম ছাত্র ছাত্রী আছেন যাঁরা পড়েন নি। প্রফুল্ল ঘোষ হুশিয়ার লোক তাই তিনি যথাসময়ে এই শ্রমিক সমস্যাকে পর্দায় রূপ দিয়ে বুদ্ধিমানেরই কাজ কোরেছেন।

ছবিখানির পরিচালক একেবারে নতুন। সে হিসেবে তাঁর কাজ আশাপ্রদ বলা যায়।

"সখের শ্রমিকের" আলোকচিত্রের কাজ সত্যই চমৎকার। কিন্তু সে হিসেবে শব্দযন্ত্রের কাজ হয়নি। আবহ সঙ্গীত প্রশংসনীয়। দৃশ্যসজ্জা হ'য়েছে যথোপযুক্ত। সম্পাদক খুব নির্দ্দয়ভাবে কাঁচি চালিয়েছেন—কিন্তু তবুও স্থানে স্থানে কাঁচি চালাতে তাঁর চোখ এড়িয়েছে।

অভিনয়ে ভাস্কর দেব, দেববালা, সমর ঘোষ প্রশংসনীয়। অরুণা ও ভানু রায় চলন সই। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় কোরেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ-ই আমাদের একেবারে নিরাশ করেন নি। গানগুলি সুগীত।

পরিশেষে আমরা এইটুকু বলতে চাই, "সখের শ্রমিক"কে সাধারণে সাদরে বরণ কোরে নিয়েছে দু'টি কারণে, একদিকে হাসি অন্যদিকে শিক্ষা। প্রেক্ষাগৃহে যতক্ষণ তাঁরা ছবি দেখেন ততক্ষণ তাঁরা প্রাণখুলে হাসেন, প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরুলেই তাঁদের মাথায় চিন্তাজাল করে বিস্তার। সেইজন্যই মনে হয় 'শ্রী' চিত্রগৃহে 'সখের শ্রমিক' চলবে ভালই।

নিউ থিয়েটার্স

ভারতবাসীর কাছে বিদ্যাপতি-র আকর্ষণ চিরন্তন। তাই তাঁ'র চিত্তহারী জীবনী-কথা এবং কোমলকান্ত পদাবলীর মাধুর্য্য বাণী চিত্রাকারে রূপবেত্তার অন্তর জয় কোরতে পেরেচে।

কল্পনা-প্রবণ বাঙালীর কাছে এই শ্রেণীর ভক্তিমূলক এবং গীতি প্রধান চিত্র যে কী বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়—নিউ থিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস', 'পূরণভকৎ', 'মীরাবাঈ' চিত্রাদিতে তা'র একাধিক প্রমাণ আছে।

কিন্তু সর্ব্বগুণ সমন্বয়ে—ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে চরমোৎকর্ষের পরিচয় দিতে পেরেচে—'বিদ্যাপতি।' দরদী প্রয়োগ শিল্পী তাঁর বুকের দরদ মিশিয়ে এই কাহিনীটি রচনা কোরেছেন ও রূপ দিয়েছেন। এই শ্রেণীর ছবির পরিচালনায়, ভারতীয় ছায়া-চিত্রের দরবারে দেবকী বাবু যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, এ কথাও আমরা অসঙ্কোচে স্বীকার কোরতে বাধ্য। বিদ্যাপতি-তে শিল্পী সমন্বয় ঘটেচে সত্যই অকল্পিত।

আগামী ২রা এপ্রিল শনিবার চিত্রায় আপনারা তা'র পরিচয় পাবেন।

* * *

এই চিত্রের কথা-বস্তু হ'চ্ছে তরুণী সন্ধ্যার অভিশপ্ত জীবন কাহিনী। লাঞ্ছনার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

চরম সীমায় উপনীত হোলে, শত সহস্র অভাগিনী যে পথে যায়—সন্ধ্যাও সেই পথে গিয়েছিল। এ অবস্থায় পড়লে অনেকে আত্মহত্যাও করে। কিন্তু সে কোরেছিল—আত্মার হত্যা! তবু সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে সে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। নারীর নিষ্ঠা, নারীর দম্ভ, নারীর সতীত্ব—সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে সে একজন অপরিচিতের সাথে পথের বার হোল। সমাজের কসাইখানা থেকে উদ্ধার কোরে আনলো তাকে এক যুবক। মূর্তিমতি উষার মত নব-জীবনের নতুন দীপ্তি নিয়ে সন্ধ্যা রাঙিয়ে তুললো তার অন্তর—নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

প্রমথর জীবনে এলো উষা। কিন্তু জীবন-জোড়া বেদনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে তরুণী সন্ধান পেলো সত্য পথের সন্ধান! কোন সে পথ? কেমন তার রূপ? কোথায় তার পরিণতি?

ছায়া চিত্রাকারে তারই পরিচয় পেয়ে আপনি বিস্মিত হবেন। জীবনে একটা বড় সমস্যার সমাধানের চূড়ান্ত ইঙ্গিত আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে। আপনাকে বোলতে হবে—সে পথ হারিয়েছিল কিন্তু লক্ষ্য হারায়নি! এই ত' বাঙলার নারীর রূপ—তার সত্য পরিচয়! মৃত সমাজকে যে জাগিয়ে তুলতে পারে, বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে সে নারী ঐ সন্ধ্যা—আমাদের নমস্যা! সন্ধ্যা ও প্রমথর ভূমিকায় শ্রীমতী মলিনা ও জীবন গঙ্গোপাধ্যায় অপূর্ব্ব অভিনয় কুশলতায় পরিচয় দিয়ে আপনাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কোরতে পারবেন। তা' ছাড়া অপরাপর ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মেনকা, দেববালা, পঙ্কজ মল্লিক, বিনয় গোস্বামী, অহি সান্যাল, যোকেন চট্টো ইত্যাদি যে নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন—এ বিশ্বাসও আমাদের আছে।

পরিচালক রায় মহাশয় সম্প্রতি শেষ সেটটি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এরপর লোকেশানের কাজে আত্মনিয়োগ কোরবেন।

* * *

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার নূতন ছবিতে অনেক কিছু মৌলিকত্বের পরিচয় আমরা পাব। নবীন বাঙলার প্রাণের কথা তিনি জানেন। তাই এমন একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মন স্পর্শ কোরতে চান—প্রাণ-ধর্ম্মে এবং মানবতার আদর্শে যা হবে সত্যই বরণীয়।

প্রেম যেখানে খাঁটি ও অচঞ্চল—সেখানে অবস্থা বিপর্য্যয়ে প্রেমের অমর্য্যাদা ঘটে না। নিখিলেশ ও ইন্দিরার জীবনে সেই সত্যটাই শেষ পর্য্যন্ত বড়ো হোয়ে উঠেছিল। সে বুদ্ধি বিপর্য্যয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়েও জীবনের চরম পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয় নি। কিন্তু রাধা?—বিনিময়ে সর্ব্বস্ব পেয়েও অন্তরের দিক থেকে তার বুভুক্ষা, হাহাকার মিটল কৈ?

জীবন-যুদ্ধে চরম পরীক্ষা সন্নিকট হোয়ে এলে—নারী কীসের জোরে তার পদমর্য্যাদা ঐশ্বর্য্য-বিলাস তুচ্ছ কোরেও বিজয়িনী, হয়—শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার নূতন ছবিতে তারই পরিচয় আমরা পাব।

আমরা আশা করি সকল শিল্পীই এই চিত্রে তাঁদের নিজস্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পারবেন।

শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় —আবার সেই মাণিক-জোড়! হাসির খোরাক দিয়ে এই যুগল-শিল্পী যে আমাদের অন্তর রাঙিয়ে তুলতে পারবেন—একথাও অবধারিত সত্য।

* * *

যিনি তাঁর অপূর্ব্ব লিপি-কুশলতার মধ্য দিয়ে সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয় স্পর্শ কোরতে পেরেছেন—সেই শরৎচন্দ্রের বড় আদরের 'বড়দিদি'। প্রথম প্রকাশের সময় লেখকের নাম গোপনের ফলে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ কোরেছিলেন—বড়দিদি রবীন্দ্রনাথের রচনা!

ছায়া-চিত্রের জন্য এই কাহিনীটিকে মনোনীত কোরে নিউ থিয়েটার্স তাঁদের রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ কোরে শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর এমন একটি কাহিনী ছায়া-পটে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবার অবকাশ পাবে, যা'র মধ্যে আমরা দেখতে পা'ব প্রেম ও সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের শেষ পরিণতিও কত মধুর হোতে পারে।

আমাদের দেশে এমন কোন শিক্ষিত বাঙালী নেই, যিনি এই কাহিনীটির সঙ্গে পরিচিত ন'ন। ছবিখানি যা'তে তার সত্যকারের রূপ ও মাধুর্য্য নিয়ে, রসবেত্তার চিত্তে স্থায়ী আনন্দ দান কোরতে পারে —পরিচালক মল্লিক মহাশয় তার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছেন। তার কর্ম্মশক্তি ও আন্তরিকতায় আমাদের বিশ্বাস আছে, তাই ছবিখানির সাফল্য সম্বন্ধে আমরা ভাল ধারণাই পোষণ করি। বারান্তরে আমরা বড়দিদির ভূমিকালিপি প্রকাশ করবার আশা রাখি।

* * *

গেল হপ্তায় "দেশের মাটি"-তে উমা, সাইগল ও পঙ্কজ মল্লিকের কয়েকখানি গানের 'প্লে ব্যাক্' করা হয়। সম্প্রতি এই ছবির একটি বৃহৎ দৃশ্যের মহলা দেওয়া হ'চ্ছে। এই দৃশ্যে গৌরীর ভূমিকায় উমা গ্রামবাসীদের একটি ভোজে পরিতৃপ্ত করেন কিন্তু সহুরে মেয়ে চন্দ্রাবতী আরও ভাল রাঁধতে পারেন তাই তিনি অশোক ও বন্ধুবান্ধবদের নিজের হাতে রেঁধে তৃপ্ত করেন। এই দৃশ্যের মহলা স্বভোজ্য একবার নয় চারবার হয়। কিন্তু পাঁচ-

বারের সময় যখন খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন সবাই বল্লেন ঠিক আছে—আমরা সব শুটিংয়ের জন্ত প্রস্তুত।

*　　*　　*

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার সুযোগ্য সহকারী ফণি মজুমদার স্বাধীনভাবে যে চিত্র গ্রহণ কোর্‌ছেন সেখানার নাম "ষ্ট্রীট সিঙ্গার"। গত ৯ই মার্চ্চ এই ছবির সুদৃশ্য একটি থিয়েটারের সেটে প্রথম চিত্রগ্রহণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ফণি মজুমদার শুটিংয়ের সময় যেভাবে এই দৃশ্যটি পরিচালনা কোর্‌লেন তা' দেখে সবাইয়ের মনে হ'ল যেন তিনি কত ছবি পরিচালনা কোরে অভিজ্ঞতা লাভ কোরেছেন। বড়ুয়া এইদিনে ফণির সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন—তিনি যেন কেমন ভড়্‌কে গিছলেন। সহকারী পরিচালকরূপে উন্নতি করার তাঁর কোনও আশা ভরসা নেই।

দেবদত্ত ফিল্মস

'গ্রামে এই পচা ডোবা ছাড়া আর একটা ভাল পুকুর নেই'—অনেক দুঃখে, অনেক বেদনায় বুঝি 'গোরা'র মুখ থেকে ভৎ'সনার সুরে এমন কথা বার হ'য়ে আসে।

ঘোষ পাড়ার দরিদ্র পল্লীতে অগ্নিদেবের কোপ দৃষ্টি পড়েছে, সে কোপ শান্ত করবার মত যথেষ্ট জলও নেই পচা ডোবায়।

শুধু কি জলই নেই। গ্রামে মানুষের স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই, উৎসাহ নেই, নেই সততা, নেই বিপদের দিনেও এক সঙ্গে কাজ করবার মত একতা, আছে শুধু এক দিকে ক্ষমতার লোভ, দম্ভ, অত্যাচার, আর একদিকে ক্ষুদ্রতা-সুলভ ঈর্ষা, দ্বেষ, নীচতা।

দেশ বলতে যে গ্রামকেই বোঝায়, এবং গ্রাম বলতে বোঝায়, এই দৈন্য, দরিদ্র, রোগ, অক্ষমতা, গ্লানি—এ কথা আজ হয়ত আমরা অনেকেই বুঝতে শিখেছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসপুত্র 'গোরা'র কাছে আমাদের শিক্ষা সুরু। 'গোরা' উপন্যাসেই গ্রামোন্নতি থেকে আরম্ভ করে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত আন্দোলনের সূত্রপাত। দেশব্যাপী অজ্ঞানতা, অক্ষমতা ও গ্লানির বিরুদ্ধে 'গোরা'ই প্রথম অভিযানের নায়ক।

শুধু দেশ জননীর সত্যকার রূপ, দেশ সেবার মহানতম আদর্শ সেখানে স্পষ্ট বলে নয়, সকল দিক দিয়েই 'গোরা' এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সেই কাহিনীকে চিত্রে জীবন্ত করবার দুরূহ ভার নিয়ে দেবদত্ত ফিল্মস্ সত্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

কালী ফিল্মস

এখানে "চোখের বালি"-র শুটিং নিয়মিত চল্‌ছে। মিঃ বি-পি-মেহরা নিজের তত্ত্বাবধানে ছবিখানা তুল্‌ছেন। সম্প্রতি মহেন্দ্রের বাড়ীর একটি সুদৃশ্য সেটে "চোখের বালি"-র শুটিং চল্‌ছে।

*　　*　　*

গেল হপ্তায় "শ্রীকৃষ্ণজন্মের" গোপগোপীগণ পরিবেষ্টিত শ্রীরাধার নৃত্যগাতের একটি দৃশ্য এবং হোলি উৎসবের দৃশ্য তোলা শেষ হ'য়েছে। এই ব্যাপারটির সঙ্গীত পরিচালনা করেন রঞ্জিত রায়।

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও

মধু-সাধনার "অভিনয়" এখনও চলছে। কবে যে যবনিকাপাত হবে, কে বলতে পারে?

*　　*　　*

জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের পরিচালনায় এদের আর একখানা বাঙলা ছবির প্রাথমিক শুটিং হ'য়ে গেছে। ছবিখানার নাম "কলেজ কন্যা"। এতে অভিনয় কোর্‌ছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ সিংহ, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, শান্তি গুপ্তা, অরুণা প্রভৃতি।

হাজরা পিক্‌চাস

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় এদের প্রথম ভক্তি-মূলক চিত্র "দেবী ফুল্লরা"-র রাজপ্রাসাদের কয়েকটি দৃশ্যের কাজ গেল হপ্তায় শেষ হ'য়ে গেছে। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ছবিখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম কোর্‌ছেন। আমাদের মনে হয়, "দেবী ফুল্লরা" সত্যই একখানি উপভোগ্য ছবি হবে।

ইউনাইটেড টকিজ

গুণময় বাঁড়ুয্যের পরিচালনায় শ্রীভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম সামাজিক ছবি তোলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়েছে।

বড়ুয়া ষ্টুডিও

বড়ুয়া ষ্টুডিওতে জি-ঘোষের পুত্রদ্বয় নতুন ছবি "যমুনা পুলিনে ভিখারিণী"র শুটিং যথারীতি চলেছে।

ম্যাডান থিয়েটার্স

এই প্রতিষ্ঠানে চারু রায় একখানা বাঙলা ছবি তুল্‌ছেন—এ খবর আমরা পূর্ব্বেই জানিয়েছিলাম। ছবিখানার নাম এখনও আমরা জানিনা—তবে এই ছবিতে নায়কের জন্য মনোনীত হ'য়েছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে ২৬শে তারিখ থেকে এখানে নিউথিয়েটার্সের চিত্র 'মুক্তি' দেখান হ'বে। মুক্তির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে বাঙলাদেশের কোন লোকের মনেই একটুও সন্দেহ নেই। দক্ষিণ কলিকাতায় যে এ চিত্রখানি বেশ সুন্দর ভাবে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবে তা জোর করেই বলা যায়।

চিত্রা

আসছে ২রা এপ্রিল থেকে এখানে 'বিদ্যাপতি' দেখান হ'বে। চিত্রায় 'মুক্তির' শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ থিয়েটারেও দেখান হ'বে।

বংশীর বিয়ে

শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য

বন্ধুবর বিজনবিহারীর লাইব্রেরীতে বসে আমরা কজন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে চালাচ্ছিলুম চলতি জগতের চমক লাগানো খবরগুলোর ওপর টিপ্পনী, এমন সময় ফুর্ত্তিবাজ ফটিক ঝড় থেমে যাওয়ার পর থমথমে আকাশের মত ভারী মুখে ঘরে ঢুকে ফ্যানের রেগুলেটারটা শেষ দাগে ঠেলে দিয়ে একটা সোফায় ধপ্ করে বসে পড়লো। চায়ের চাকর চণ্ডী চট করে তার সামনে গরম এক কাপ চা রেখে দিলে। ফটিক গম্ভীর মুখে চায়ের কাপে দু'একটা চুমুক দিয়ে একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত চেপে ধরে মাথাটা প্রায় বুকে ঠেকিয়ে চুপ করে বসে রইলো। যে ফটিক এলে সবাই দুনিয়ার আজব খবরের জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে তার ভাব-খানা দেখে সবাই ওর পানে চেয়ে রইলুম। চায়ের কাপ থেকে ধোয়া বেরোচ্ছিল—তার ফাঁক দিয়ে ফটিকের ভারী মুখের পানে চেয়ে, আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সোফাটার হাতায় বসে ফটিকের পিঠ চাপড়ে বিজন-বিহারী জিজ্ঞাসা করলে "ব্যাপার একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু কি রে ফটিক?"

দরদী বন্ধুর ঔৎসুক্যে ফটিকের ফুর্ত্তিবাজ স্বভাব যেন নাড়া পেয়ে খানিকটা জেগে উঠলো। মাথাটা তুলতে আমরা সবাই দেখলুম ওর মুখখানা যেন অনেকটা হাল্কা হয়েছে।

সে বল্লে দেখ ভাই, নিজের ঘরোয়া কথা তুলে তোদের মাথা ব্যস্ত করবার ইচ্ছে ছিল না। তবে যখন জানতে চাইছিস্ তখন বলিই কথাটা। ব্যাপারটা হয়েছে এই যে আমার মাসতুতো ভাই সুকুমারদা' বিয়ে করেছে এই মাস ছয়েক হবে। কিন্তু বৌদির সঙ্গে দাদার বনিবনা হচ্ছে না। সবে খবর পেলুম সুকুমারদা' বাড়ী ছেড়ে মেসে এসে উঠেছে। শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে।"

কতকটা ভুক্তভোগী হিসেবে আমি শুধোলুম "গোলমালের মূল কি বেকার সমস্যা, একজামিনে ফেল, না আর কিছু?"

ফটিক গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ফোঁস্ করে একটা নিঃশ্বেষ ছেড়ে বল্লে" নারে ভাই, ব্যাপারটা তা নয়। তবে দাদা আমার বৌদিকে যখনি কোন কথা বলে তখনই বৌদি চোখ বের করে দাদার পানে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে শেষে ঝঙ্কার তুলে বলে "কী?" দাদা বলে বিয়ের পর থেকেই এমনি চলছে। আর সইতে না পেরে শেষে বাড়ী ছেড়েছে। দাদার মতে তার মত সইতে কাউকে হয়নি আর উপস্থিত এর একটা উপায় না করলেও চলছে না।"
"ফটিক আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে থামলো। তারপর বল্লে "ব্যাপারটা হচ্ছে, আমরা ছেলের দল বিয়েটাকে সোজা বলে ঠাওরে নিয়ে, তাড়াতাড়ি মেয়ে বাছাই করে ফেলি। তারপর বিয়েটা হয়ে 'গেলেই দু'পক্ষের টান অনেকটা কমে যায়, নয় তো বেরোয় নানা ছুৎ। তখন বাধে যত গোল। কিন্তু আমার মতে বিয়েকরা জীবনে শান্তি, স্বস্তি পেতে হলে পূর্ব্বরাগের সময়টায় প্রাণ খুলে মেলামেশা করে মনের ভাব জানা দরকার। বিশেষ করে যদি এই সময়ে বাইরের কোন বাধা এসে মাঝখানে দাঁড়ায় তাহলে যাচাইটা ভাল রকমই হয়। সে পরীক্ষায় পাশ করে যে বিয়ে সেই হয় সত্যি সুখের বিয়ে। মানে, সোনা পুড়লেই ঠিক বোঝা যায় তার খাঁটিত্ব। এই যেমন আমাদের বংশীর হয়েছিল। তাইতো ওদের দুজনের মনের মিল এত বেশী। জানো তো কি কষ্ট করেই ওরা এসে ভিড়েছে দুজনে মনের মনের কূলে।" অমল বল্লে "তাহলে বৌকে নিজের ঠিক দাম বোঝাতে বংশীর সময় একটু বেশীই লেগেছিল ব'লো?" ফটিক টাটকা এক কাপ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে হাঁটু চাপড়ে বেশ জোর গলায় বল্লে "মোটেই নয়। ওখানেই তোরা ভুল বুঝছিস্। প্রেম তাদের প্রথম দর্শনেই হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের বাধা বিনোদিনীর—মানে বংশীর বৌয়ের—অনিচ্ছা কি অপছন্দের ভেতর ছিল না। সে বাধা ছিল অন্য ধরণের। যে ওদের জীবনে অগ্নী পরিক্ষা এনেছিল সে হচ্ছে শিকারী সহদেব শিকদার। আমাদের সরকারী খুড়ো। নামটা কি তোদের শোনা নেই?

তাপস বল্লে "কই, মনে হচ্ছে না তো।"

ফটিক বল্লে "কিন্তু নামটা শুনে কি মনে হয় যে লোকটা বেজায় দুদে?"

আমি বল্লুম "হোক্ না হোক্। সেইটাই তো আমরা শুনতে চাই।"

ফটিক বল্লে "কিন্তু খুড়ো ছিল সত্যি বেজায় দুদে আর ফিচেল। তার ওপর খুড়ো ছিল জবরদস্ত শিকারী। সুন্দর বনে নিজের জমিদারীতে খুড়ো বহু শীকার করেছে। এমন কি সেখানকার কেঁদো কেঁদো বাঘগুলো খুড়োর নামে খুড়োর জমিদারীর তল্লাট ছেড়ে পালাতো আর খুড়ো যখন বন্দুক কাঁধে নিয়ে খালের ধারের সরু পথ দিয়ে জুতো খস্ খসিয়ে যেতো

তখন ভীষণ কুমীরগুলো পর্য্যন্ত খুড়োর গন্ধ পেয়ে জলে ডুবে নিঃশ্বেষ বন্ধ করে থাকতো। খুড়ো সরলে তবে তারা জলের ওপর মাথা জাগিয়ে নিঃশ্বেষ নিয়ে বাঁচতো। এমন খুড়ো যখন এসে দাঁড়ালো বংশী বিনোদিনীর মাঝখানে তখন বংশী বাঘ, কুমীরগুলোর বুদ্ধিতে বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ খুজে পেলে।

"সহদেব খুড়োর আবির্ভাবের আগে ভাগ্যদেবী এক রকম মুষলধারে বংশীর ওপর কৃপাদৃষ্টি করছিলেন। বংশীর নামটা একটু সেকেলে হলেও চেহারা, কথাবার্ত্তায় সে ছিল একদম আধুনিক, তার ওপর স্বাস্থ্যও ছিল ভাল আর আমার সঙ্গে তার যে এত মাখামাখি সে তো তার আমার মত ফূর্ত্তিবাজ স্বভাবের জন্যেই। আর তার ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক যদি জানতে চাস্ তাহলে এই কথাটা বলতে পারি যে তার দেওয়া ইনকাম ট্যাক্স এই অফিসটার আর্দ্ধেক লোকের ছ'মাসের মাইনে অন্ততঃ দেওয়া চলতে পারে। তার ওপর সে পড়লো ডক্টর ডাটের মেয়ে বিনোদিনীর প্রেমে আর তার ভালবাসা সে পেয়ে গেল দরকারের অনেকটা কম চেষ্টাতেই।

"সপ্তা দুয়েক বেশ কাটলো। পরিচয় হওয়া থেকে গান, বাজনা, চায়ের আসর সিনেমা, পিকনিক এর মধ্য দিয়ে বংশীর প্রেম বেশ তরতর করে এগিয়ে চলছিল। এর মাঝে একদিন এসে পড়লো সহদেব—সমস্যা। খুড়ো আকাশ ফুড়ে পড়ার আগে কোনদিন বৈকালে চায়ের কাপে কোন তুফানই ওঠেনি। ডক্টর ডাটের বাড়ীর খানসামার তৈরী বিলিতি খানা, বিনোদিনীর তৈরী চায়ের পর ব্রীজ, বংশীর ব্যাঞ্জোর সঙ্গে বিনোদিনীর গানের সুরে তার মনের নদীতে প্রেমের তরী বেশ নাচতে নাচতে চলেছিল।

ডক্টর ডাটের ছিল ব্লাডপ্রেসার। ক'দিন তার সেবার পুরস্কার হিসেবে বিনোদিনী বংশীর সঙ্গে সিনেমায় যাবার হুকুম বাবার কাছ থেকে আদায় করে দুজনে গিয়েছিল মেট্রোতে। ছবি চলছে ঝড়ের মত, সবাইকার নজর তখন রূপোলী পর্দ্দার গায়ে। সেই সুযোগে বংশী বিনোদিনীর নরম হাতখানা হাতে নিয়ে বেশ একটু চাপ দিয়ে তাকে নিজের দিকে একটু টেনেছে। বিনোদিনীও জানতো ও বিয়েতে তার বাবা, মা, দাদাদের কারো কোন আপত্তি নেই। তাই সেও বংশীর গায়ে একটু হেলেছে এমন সময় পেছু দিক থেকে মাথায় কার কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে বংশীর প্রথম প্রেমের আবেগ ফুলে ওঠা বুকখানা ফুটো হয়ে যাওয়া ফুটবলের

মত চুপসে গেল। সোজা হয়ে বসে সে ভয়ে ভয়ে পেছু দিকে তাকাতে আবছা-আলোয় প্রথমেই তার নজরে পড়লো বাঘের মত জলজলে স্রেফ দুটি চোখ। বংশী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সেই জলন্ত ভাটার মত চোখ দুটোর পানে চেয়ে রইলো। তারপর পকেট থেকে সেন্টে জবজবে রুমালখানা বের করে চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলে। কিন্তু ভাল করে দেখবে কি, তার চোখ দুটো তখন সেন্টের ঝাজে জ্বালা করতে সুরু হয়েছে। তবু প্রাণের দায়ে তাকে পেছু দিকে চেয়ে থাকতে হোল। বিংশ শতাব্দীতে কোলকাতার চৌরঙ্গী হেন জায়গায় সহরের সেরা সিনেমায় বাঘ বেরোল নাকি? কিন্তু গোঁফ দাড়ীতে কণ্টকাকীর্ণ যে মুখখানা বংশীর চোখে পড়লো সেখানা বাঘের নয় বটে, তবে বাঘের যম শিকারী সহদেব শিকদারের। সহদেব খুড়ো বল্লে "কে হে, বংশীবদন নাকি?" সঙ্গে সঙ্গে ইণ্টার ভ্যালের আলো জলে উঠলো। বংশী চেয়ে দেখে তার বড়মামা বীরুবাবুর শালা সরকারী সহদেব খুড়ো। সে বল্লে "হ্যা; তারপর খুড়ো কি মনে করে? আমি তো জানতুম তুমি সোঁদরবনে।"

খুড়ো গাঁক গাঁক করে হেসে উঠে বল্লে "এলুম একবার তোদের কোলকাতা সহরে। তারপর সঙ্গে ইটি?"

বংশী কোঁৎ পেড়ে বল্লে "ইটি আমার—মানে ডক্টর ডাটের মেয়ে। মিস্ ডাট্, আমাদের সরকারী সহদেব খুড়ো। কিঙ অব সোঁদরবানস্।"

খুড়োর পরণে গলফ সুট। ওই হোল খুড়োর আটপৌরে আর শিকারের পোষাক। বিচিত্রবেশী খুড়োকে সম্ভাষণ করবে কি, বিনোদিনী হাঁ করে চেয়ে রইলো. তার মুখখানার পানে। খুড়ো বিনোদিনীর আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে, গোঁফ দাড়ীর জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে করাতের দাড়ার মত সারি সারি সাজানো সাদা দাঁতগুলো বের করে, গোঁফ চাটা হাসি হেসে বল্লে "আও:—দেখেছিলুম বটে ছেলেবেলায়। বেশ বড়সড় হয়েছে। তা তোমার সঙ্গে ডক্টর ডাট এত বড় আইবুড়ো মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছেন যে বড়ো?··· আও:—বুঝেছি। হুম্!"

তখন বংশীর সারা শরীরের ভেতর কেমন চুলবুল করতে সুরু করেছে। খুড়ো পাশের একখানা খালি চেয়ারে বসে পড়লো। ইজেরের পা দুটো টেনে আলগা করে নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, তোলা পায়ের মোটা বুটের থ্যাবড়া ডগাটা প্রায় বংশীর নাকের ডগায় নাচাতে নাচাতে বল্লে "বলতে তো বললিনে। গুরুজনের সঙ্গে সবোৎ একদম ভুলে মেরে দিয়েছিস। দেখা হোল আজ তোর মামার সঙ্গে। বাপ তো মারা গেছে। স্বাধীন হয়ে বেজায় ফুর্ত্তিতে আছিস শুনলুম।"

বংশী বল্লে "ভুল হয়ে গেছে খুড়ো। হ্যাঁ, বলো। তারপর আছ কেমন?"

হা হা করে হেসে হাতটা তুলে মাসলটা ফুলিয়ে খুড়ো বল্লে "শরীর? আমাদের এই লোহার শরীর আবার থাকবে কেমন? যেমন থাকবার তেমনিই আছে। একি তোদের আজকালকার ছেলেদের ফুঁয়ে উড়ে যাওয়া শরীর? হু—যতসব তালপাতার সেপাই!" বলে বংশীর পিঠে আস্তে একটা চাপড় মেরে খুড়ো হা হা করে হেসে উঠলো।

চড়টা খুড়োর হিসেবে আস্তে বটে, কিন্তু ওতেই বংশীর "কোঁক" করে ওঠবার মত অবস্থা, কিন্তু বিনোদিনীর সামনে, বিশেষ করে খুড়োর হাসির ধমক চমকে আশ পাশ থেকে শ্বেতাঙ্গিনীরা তাদের এপটার পানে আড় চোখে তাকাচ্ছে দেখে বংশী বল্লে "তা খুড়ো, তুমি যে বড়ো সিনেমায়? বরাবর ছবির শ্রাদ্ধই তো করে এসেছ?"

খুড়ো বল্লে "বলেছিস্ বটে কথাটা। এসব কি আর আমাদের ভাল লাগে? বাঘের দেশের আদমি আমরা। এসেছিলুম হগ সাহেবের বাজারে মোটা মত্তমান কলার খোঁজে। কলার নেশা। সোঁদর বনের লোক আমরা। কোলকাতায় হগের বাজার ছাড়া ও কলা আর মিলবে কোথায় বল? যাচ্ছিলুম হন্ হন্ করে বাজারের দিকে, দেখলুম তুই এই—হ্যাঁ, —একে নিয়ে ঢুকছিস্ বায়স্কোপে। আপনার জন রক্তের টান রে বংশী, রক্তের টান—ঢুকলুম একখানা টিকিট কেটে। কি যা অন্ধকার, তোকে কি খুঁজে পাই?"

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

দুখের তরী ভাসল এ'বার
চোখের জলের দরিয়ায়।
দোল্ দিতেছে, পাল তুলেছে
দীর্ঘশ্বাসের উদাস বায়॥
মায়ায় ঘেরা গহন আঁধারে
গগন গায় কোথা' সেই
ধ্রুব তারা যে!
নাই ঠিকানা, না পাই দিশা
বাইব কোথা, কোন্ কিনারায়!
ওগো কাণ্ডারী, কোথা কূল, কত দূরে!
মরি ঘুরে;
নিরাশ্বাসের ব্যথায় ভরা,
অবিশ্বাসের আঁধারে;
হায় দুরাশার পারে আসা
অতল তলে জীবন যায়॥

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রে রোগিনীর রোগ খুবই বৃদ্ধি পাইল। ললিতা জ্বরের প্রকোপে ভুল বকিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, নীরদ খুবই ভয় পাইল, তিন চার বার ডাক্তার ডাকাইল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রুগীর পাশে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে কখনও রোগীর মাথায় হাত দেয়, কখনও কপালে হাত দেয়, থার্ম্মোমিটারে জ্বর দেখে, আর কেবলই হতাশার উচ্ছ্বাসে ঘর পরিপূর্ণ করে।

লবঙ্গ সে রাত্রে রুগীর শিয়রে বসিয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সে স্থির, ধীর, গম্ভীর। এত বড় রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেলে, যে সকল অস্ত্রের প্রয়োজন, সে সকল সে সঞ্চয় করিয়া লইয়া বসিয়াছিল। মাথায় বরফ দিবার থলিটি, ওডিকলোনের শিশিটি, একটা পাথর বাটীতে খানিকটা জল, খানিকটা ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি সে তাহার পার্শ্বেই আনিয়া বসিয়াছিল। শয্যাসংলগ্ন পাশের টেবিলটিতে রাখিয়া দিয়াছিলেন ঔষধের শিশিটা, ঘড়ি দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহা হইতে ঔষধ ঢালিয়া রোগিনীকে কত সাবধানে, কত আদর করিয়া ডাকিয়া, তোয়ালে দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া,. ঔষধ খাওয়াইয়া দিতেছিল সে! শুশ্রূষার মধ্যে নারীজনোচিত যে লালিত্যটুকু চিরদিনই বর্ত্তমান থাকে, লবঙ্গর সেবায় তাহার কোনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল না।

ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিল, মাথার দিকের জানালাটি সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিয়া দিতে! বুকের রোগে নাকি আজকাল এই নিয়মই বাহাল হইয়াছে! যাহা হউক, যদিও তাহার বাল্যকাল হইতেই অন্য ধারণা বদ্ধমূল ছিল, তথাপি পল্লীগ্রামের ধারণাগুলিকে এইপাশে রাখিয়া সহরের এই নূতন চিকিৎসা প্রণালীকেই বরণ করিয়া লইয়া, সে যন্ত্রের মতই কার্য্য করিতে লাগিল, হুবহু ডাক্তারবাবুর কথিত উপদেশ মতই। অপরাহ্নে যখন ডাক্তারবাবু রুগী দেখিতে আসিয়াছিলেন, তখন সে পাশের ঘরে সরিয়া গিয়াছিল, একটা নারীজনোচিত সম্ভ্রমের বশে! কিন্তু যখন রোগীর রোগ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এবং ডাক্তারবাবু রাত্রির মধ্যেই আরও তিন চারবার আসিয়া দেখিতে বাধ্য হইলেন, তখন সম্ভ্রমের চাহিদা সরাইয়া দিয়া সে রোগীর ঘরেই বসিয়া রহিল।

কাকের বাসায় প্রতিপালিত হইলেও কোকিল যেমন বড় হইলেই কোকিল হইয়া দাঁড়ায়,—লবঙ্গও তেমনি পল্লীগ্রামে প্রতিপালিত হইলেও, আপনার ঔদার্য্যকে অক্ষত রাখিয়াছিল আপনার প্রকৃতির গুণেই! পল্লীগ্রামের পোকাগুলি সে কাঠখানিকে জর্জ্জরিত করিতে পারে নাই, তাহার নিজের বার্নিশের গুণে!

সে নিজে পাঠশালায় গিয়া লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছিল,—কিন্তু তাহার সেই বিদ্যাভ্যাসের খড়জড়ানো প্রতিমাখানি মাটি ও রংএ বাস্তবে পরিণত করিয়াছিল সে জগত্তারিণীর কুম্ভকার গৃহে! জগত্তারিণীর নিকট অনেক পুঁথি, অনেক আধুনিক বইও থাকিত! সেইগুলিকে চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিত, তাঁহার আশ্রিতা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না লবঙ্গ!

ললিতার আচ্ছন্নভাব দেখিয়া লবঙ্গ মনে মনে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু বাহিরে সে উদ্বেগের ছায়ামাত্রও প্রকাশ পেতে দিল না। এ কয়দিনেই সে বুঝিতে পারিয়াছে বাড়ীর কর্ত্তাটি অসুখ বিসুখে বড়ই উতলা হইয়া ওঠেন। কাজেই সে যদি নিজেও কোনও রকম চাঞ্চল্যের টানটুকুও প্রকাশ করেন, তাহা হইলে নীরদবাবু যে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এটুকু বেশ বুঝিতে পারিল। কাজেই মনকে বেশ দৃঢ় করিয়া সে রোগীর সেবা করিয়া যাইতে লাগিল।

নীরদবাবু একবার বলিলেন "ললিতা অমন চোখ বুজিয়ে রয়েছে কেন?"

লবঙ্গ নিজের চম্পককোরকসদৃশ অঙ্গুলি ওষ্ঠাধারে ঠেকাইয়া, খুব চাপাগলায় বলিল; চুপ করুন! জোরে কথা কইবেন না! দিদির ঘুম ভেঙ্গে যাবে!

—ও কি ঘুমুচ্ছে, মনে হয়?

—হাঁ, ঘুমুচ্ছে! মুখের ভাব দেখে বুঝতে পাচ্ছেন না?

—তুমি কি মনে করো, বিকেল থেকে ও ঘুমুচ্ছে!

—হাঁ, হাঁ, মনে করি! ডাক্তারবাবু বলে গেছেন, রোগী ঘুমুলে, কেউ যেন সে ঘরে গোলমাল না করে! আপনি দয়া ক'রে ডাক্তারের কথাটা মেনে চলবেন!

একথার উপরে নীরদ আর কি বলিবে? সে চুপ করিয়া গেল। লবঙ্গ যে তাহার চেয়েও এসকল বিষয় বেশ বুঝিতে সুঝিতে পারে, তাহা দেখিয়া তাহার বুকে যেন একটু বল আসিল। সে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশে একটু সরিয়া বসিল।

লবঙ্গ পাখা করিতে লাগিল রোগীর মাথার। নীরদ লক্ষ্য করিতেছে, সেই অপরাহ্ন হ'তে লবঙ্গ একটানে রোগীকে বাতাস করিতেছে; সুতরাং তাহার হাত ব্যথা হইয়াছে সম্ভব। নীরদ ইহা অনু-

ভব করিয়া বলিল "লবঙ্গ! তুমি ত বিকেল থেকেই একা পাখা টানছো? বোধহয়, হাত ব্যথা করছে! একজন ঝিকে ডেকে দেবো কি?"

লবঙ্গ ইসারায় তাহাকে বারণ করিল।

নীরদ আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ নারীটি তো দেখছি রোগসেবায় অদ্বিতীয়। কোথা হইতে এত শিখিল? মাতো রাধুনী বামনী করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু রাধুনী বামনীরা কি এত শেখে—ভদ্রঘরের মেয়ে, —কাজেই সবই জানে। মাহিনা-করা নার্স থাকিলেও কি এত পারিত? বোধ হয় না!

ঘড়িতে ঠুং করিয়া একটা বাজিল,—আর অমনিই লবঙ্গ উঠিল, ঔষধের শিশি হইতে ঔষধ ঢালিতে, কাচের গেলাসটি জল দিয়া ধুইয়া, তাহাতে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া রোগীর কাছে লইয়া আসিয়া সে রোগিণীকে কত মধুর, কোমল ও মৃদুস্বরেই ডাকিল! তাহাতে ডাক্তারের সাবধানতার উপদেশ, এমন করিয়া কি নার্সে ডাকিতে পারে? অসম্ভব!

ললিতা, লবঙ্গর ডাকে জাগিয়া, চক্ষু মেলিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ লবঙ্গ সেদিকে লক্ষ্য করিয়াও কিছু বলিল না। শুধু ঔষধের গেলাসটি মুখের কাছে আনিয়া খুব মৃদুস্বরে বলিল:

দিদি! ঔষধটা খাও দেখি!

ললিতাকে ধীরভাবে ঔষধ খাওয়াইয়া পরে লবঙ্গ তাহার আঁচলের প্রান্ত লইয়া ললিতার মুখ মুছাইয়া দিল।

নীরদবাবু একপাশে একখানি আরাম কেদারায় ছাদের দিকে মুখ তুলিয়া বসিয়াছিল, বক্র দৃষ্টিতে লবঙ্গকে থার্মোমিটার দিতে দেখিয়া বলিল: এখন জ্বর বোধ হয় খুব বেশী হবে!

লবঙ্গ সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিল। আপনি শুতে যান্না! সমস্ত দিন আদালতে ছিলেন শরীর ত ভেঙে পড়চে।

নীরদ বলিল: কাল আর আদালতে যাবোনা! বাড়ীতে এই অসুখ রেখে কেমন ক'রে হাত পা চলবে?

লবঙ্গ বলিল! আপনি অত ভাববেন না! অসুখ কি কারও হয়না? অসুখ হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে!

—যদি ভাল হয়, সে তোমারই সেবার গুণে হবে লবঙ্গ! নইলে নয়!

কথাটা শুনিয়া লবঙ্গর মুখ আত্মপ্রশংসার আঁচে লজ্জিত রক্তিমাভা ধারণ করিল। সেটুকু সে সামলাইয়া লইল অতি অল্প সময়েই।

নীরদ লবঙ্গর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল: কিন্তু এমন ক'রে?

—কি কচ্ছি যে আপনি এমন গুলো বাজে খরচ কচ্চেন?

—কি যে কর্চ্চ লবঙ্গ, তা এক এক ক'রে গুণে বলতে গেলে নামতায় কুলোবেনা! যা কর্চ্চ, তা নিজের সহোদরাও কেউ করেনা,—নিজের মাতাও অতটা পারে কিনা সন্দেহ!

লবঙ্গ একটু অভিমান করিয়া বলিল: আপনি যদি এমন করেন, তাহ'লে আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে! আপনি শুনগে যান!

—কোন্ ঘরে শোব? আজ আর ও ঘরে শুতে পার্ব্বোনা। আজ ভাবচি, এই ঘরেই একটা মাদুর পেতে,—

লবঙ্গ বাধা দিয়া বলিল: না, না, এমন কাজ কর্ব্বেন না! মেঝের শোওয়া আপনার সহ্য হবে না! শেষকালে আপনিও একটা রোগ ধরিয়ে ফেলবেন! একেতো দিদিকে নিয়েই—

—কিছু ভয় নেই লবঙ্গ! আমার এ শরীর অজর, অমর!

লবঙ্গ মাথা নাড়িয়া বলিল: "হ্যাঁ, তাই মাসের ভিতর পনেরো দিন সর্দ্দিতে হাসফাঁস করেন! আর গোমর কর্ব্বেন না!"

—সর্দ্দি একটু আমার প্রায়ই হয় বটে! কিন্তু এ সে সর্দ্দি নয়! এ নেহাত রাস্তার পথিকের মত এক আধবার দেখা দেয়, কিন্তু বাড়ীর ভেতর ঢোকেনা!

—ঢুকতে কতক্ষণ?

—ওঃ! অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ! এই মাংসপেশীগুলোর উপরের প্রত্যেক লোমকূপ যেন একএকটা রাজপুত-দুর্গের লৌহদ্বার—বড় শীঘ্র শত্রুকে প্রবেশ করতে দেবেনা!

—ভালইতো, সেটাতো আর খারাপ কথা নয়! কিন্তু তবু আমার কথাটা রাখুন; আপনি ওঘরের খাটে শুতে যান! আমি বিছানা পত্র পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছি!

—সেজন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি লবঙ্গ! কিন্তু ধন্যবাদ নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এটুকু আবদার তোমায় রাখতে হবে লবঙ্গ, আমি আজ ললিতার কাছ ছেড়ে কোথাও থাকবোনা! তার অসুখ আমার মনে হচ্ছে, আজ এত বেড়েছে, যে তাকে ছেড়ে থাকাটা আজ অত্যন্ত অনাত্মীয়ের কাজ হবে!—জ্বর কত উঠেছে থার্মোমিটারে?

লবঙ্গ এতক্ষণ ললিতার বগল হইতে তাপ যন্ত্রটি তুলিয়া লইয়া আলোয় ধরিয়া দেখিতেছিল! দেখিতে দেখিতে তাহার সদাপ্রসন্ন মুখ একখানা কালো মেঘে ঢাকা পড়িয়া গেল। সে নীরদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে তাপযন্ত্রটি খাপের মধ্যে রাখিয়া, দ্বারের নিকটে গেল। নীরদ আবার জিজ্ঞাসা করিল: কত—কত দেখলে?

লবঙ্গ বলিল: আস্‌চি,—এসে বল্‌চি!

বলিয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সত্য

শ্রীসুদর্শন দেবশর্ম্মা

সত্যকে প্রকাশ করবার অধিকার যেমন আছে বিজ্ঞানের, ঠিক তেমনি আছে সাহিত্যেরও।

কিন্তু সর্ব্বদেশেই একশ্রেণীর নীতিবাদী লেখক আছেন, যাঁরা সাহিত্য থেকে দেহকে যতদূর সম্ভব তফাতে রেখে পরম নির্ব্বিঘ্নে কলম চালান। অনেকের কাছ থেকে তাঁরা সস্তা বাহবা পান, একথা মিথ্যে নয়। তবে কোনো রসজ্ঞ পাঠকই তাঁকে সাহিত্যিক ব'লেবেন না। হ'তে পারে তাঁদের সৃষ্টি বিশুদ্ধ, হ'তে পারে নিষ্কলুষ কিন্তু প্রাকৃতিক নয়।

যে সাহিত্য সত্যকে বিকাশের সহায়তা করে না, তাকে আমরা সাহিত্য বলে মেনে নিতে রাজী নই। যে সাহিত্যিক নরকবাসের আশঙ্কায় অন্তর্নিহিত চরম সত্যকে স্বেচ্ছায় চাপা দিয়ে নিছক নীতিকথা প্রচার করেন, তাঁকে আর যা কিছুই বলা চলুক না কেন, 'সাহিত্যিক' নামে অভিহিত করা চলেনা। বললে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হয়। যাঁরা বলেন, তাঁরা জ্ঞান পাপী।

দেহ ও মন এই দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। এবং তা' অপরিহার্য্য যেমন কাণের সঙ্গে মাথা। সকল যুগে সকল লোকেই এই পারস্পারিক সম্বন্ধটা স্বীকার করে আসছেন।

'সকলের' সঙ্গে সাহিত্যিকের কথা একটু স্বতন্ত্র। সাহিত্যিককে শুধু ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেই চলবেনা। এই দিকে সুগভীর দৃষ্টি রাখতে হবে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হবে উদার মন দিয়ে।

অনেকের মতে তা হয়ত বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হবে। নীতিবাদী সমালোচক যারা, তাঁরা অশ্লীলতা অপরাধে অভিযুক্ত করতে দ্বিধাবোধ করবেনা।

কিন্তু এই অপযশ সত্যিকারের সাহিত্যিক যে, সে বুদ্ধিমানের মত গায়ে মেখে নেবে। তা-ই ব'লে কেউ যেন একথা ভাববেন না যে, আমরা সাহিত্যে নীতিকে স্থান দেওয়ার বিপক্ষে, দুর্নীতির পসরা টানতে বলছি। কিন্তু গোঁড়ামী অসহ্য। এযুগে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের মত নীতিপরায়ণ লেখক বিরল। তিনি মানব মনের সত্য কথাটাকে স্পষ্ট করে বলেছিলেন ব'লে একশ্রেণীর সমালোচক তাঁকে দুর্নীতির সহায়ক ব'লে ভুল করেন। পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন ইত্যাদি উপন্যাস রচনায় তাঁকে কম নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়নি! পল্লীসমাজের রমা যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, তারো বুকে যে মেয়েমনের আশা আকাঙ্খা বাসা বাঁধতে পারে—একথাটা নীতিবাদীরা মেনে নিতে রাজী নন—যেহেতু সে বিধবা। তাই, শরৎচন্দ্রের এই সৎসাহসিকতাকে অনেকে সমর্থন করতে পারেন না,

রূঢ় কথা শোনান। কিন্তু—তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষ। জনমুখোত্থিত সমস্ত গরল নীলকণ্ঠের মত নির্ব্বিবাদে পান করেছিলেন।

সত্যকে স্পষ্ট করে চোখের সামনে তুলে ধরলে পাঠক বিচার করতে পারবেন নিজেকে, সন্ধান পাবেন কোথায় নিজের গলদ—যা লোকসমক্ষে প্রকাশ করতে আসে কুণ্ঠা।

সত্যকে অনাবৃত দেখে যারা নাসিকা-কুঞ্চিত করেন, জানতে হবে তাঁদের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। তাঁদের যথাযথ শাস্তি হচ্ছে সত্যকে পুনঃ পুনঃ চোখের সামনে তুলে ধরে জর্জ্জরিত করে তোলা। সেই হবে উচিৎ দণ্ড আর তাতেই হবে নৈতিক সংস্কার সাধন। সত্য—মেঘমুক্ত আকাশে প্রথম ওঠা সূর্য্যের মত সমুজ্বল, নিস্কলঙ্ক ও সর্ব্বদৃষ্টমান।

কিন্তু এর ভেতর একটা কথা আছে। সেটা হচ্ছে—মানব-মনের নিহিত সত্যকে সাহিত্যে রূপ দেওয়ার সম্বন্ধে। আমাদের লেখকদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সৃষ্টিতে যেন কোনোমতে অসুন্দরের স্পর্শ না লাগে। সত্য সুন্দর এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হয়, যদি তা' গুণীলোকের হাত থেকে বেরোয়।

প্রকাশ ধরবার ভঙ্গিমার ওপর এর ষোলআনা ভালো মন্দ নির্ভর করছে। উপন্যাস অথবা ছোটগল্পে এমন অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় যে, একটা সর্ব্বজনীন সত্য, কাঁচা হাতে পড়ে বিকৃতরূপ ধারণ করেছে। আবার এও দেখি, সেই সত্যই একজন সুদক্ষ শিল্পী চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। কাজেই এজিনিষটা নির্ভর করছে সাহিত্যিকের হাতগুণের ওপর।

উগ্র আধুনিক পন্থি কয়েকটা সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টালে প্রায়ই দুএকটা এমন গল্প চোখে পড়ে যার প্রথমটা পড়লেই ধিক্কার আসে। যেমন নীচু ভাষা, তেমনি ইতর মনোভাব। এই ধরণের লেখা পড়ে মনে হয়, লেখক মোটেই আত্মসচেতন নয়। এরা যেন সাহিত্যকে একরকম চিত্তবিলাসের সামিল করে নিয়েছেন। এদের কাণ্ড-কারখানা দেখে সংশয় হয়, যেন সাহিত্য সাধনার অছিলায় কাগজ কলমের সাহায্যে এরা অধস্তন প্রবৃত্তির গায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। সত্যকে বিকাশ করবার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন একটা বিভৎস কাণ্ড বাধিয়া বসেন যা সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাস্কর।

এই বীভৎসতার বহুবিধ কারণের মধ্যে দুটীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটা হচ্ছে অতিশয়োক্তি, অপরটা আন্তরিকতাশূন্য। আতিশয্য যেখানে যতো বেশী আন্তরিকতার সেখানে ততো অভাব।

আতিশয্য ও আন্তরিকতাশূন্য অশিষ্টতার পরিচায়ক। আর্টের ক্ষেত্রে অশিষ্টতা অমার্জ্জনীয়। এই অশিষ্টতার ভেতর, সংযমকে অতিক্রম করবার মধ্যে আছে এক অপূর্ব্ব মাদকতা। এই মাদকতা যেন আমাদের ভেতর না আসে। আমরা যেন রঙিন নেশায় মশগুল হয়ে না পড়ি। কেননা এই কুঅভ্যাসটা সমানে দিনের পর দিন বেড়ে যাবে—মাতালের মদের মাত্রার মত। রচনাকে অচিরে করে তুলবে রুচি বিগর্হিত।

তাই, সত্যকে প্রকাশ করতে হ'লে যেমন প্রয়োজন আন্তরিকতা ও নির্ভীকতা, ঠিক সেই পরিমানে প্রয়োজন ধী-শক্তি ও প্রকাশ-কৌশল।
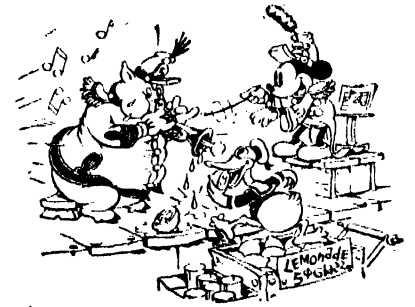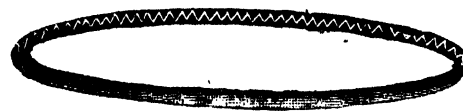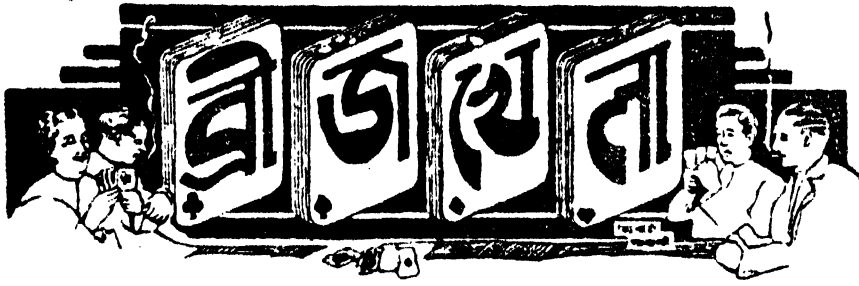
শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রতিযোগিতার একটি হাতঃ

ফেরাইয়ের খেলা হলেই প্রথমে 'ফিনাস' নেওয়া যেন অবশ্য কর্ত্তব্য সাধারণ খেলোয়াড়েরা এইরূপ মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের কোনও অকাট্য নিয়ম মেনে ব্রীজখেলা মোটেই চলে না, অথচ তাঁরা যদি একটু বিবেচনা করে খেলেন, তাহলে প্রত্যেক হাতের তাসগুলি ও তাদের বিভাগ সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেতে পারেন। কলিকাতার অনেক বড় বড় নামজাদা খেলোয়াড়দের দেখা গেছে তাঁরা ফেরাই-এর খেলা পেলেই তৎক্ষণাৎ হিসাব না করে 'ফিনাস' নিতে গিয়ে অনেক খেলাই পণ্ড করে ফেলেন। নিম্নের এই হাতখানি অনেককেই দেওয়া হয়েছিল, সকলেই 'ফিনাস' নিয়ে বা একটি রঙ দাঁড় করাতে গিয়ে গেম পর্য্যন্ত খেলা করতে অপারগ হয়েছেন। হাতখানি ছিল।

ইস্কাবন—সাতা, পঞ্জা, চৌকা।
হরতন—দশ, তিরি, দুরি।
রুহিতন—নয়, সাতা, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, দশ, ছক্কা, তিরি।
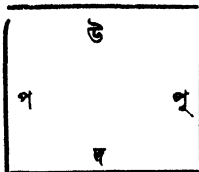
ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, আটা।
হরতন—সাহেব, পঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, পঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, গোলাম, ×, ×।

ডাক হয়েছিল তিনটি ফেরাইয়ের; 'প' হরতনের বিবি খেলে প্রাথমিক চাল দিয়েছেন। এখন দেখুন কত সহজেই খেলা করে নেওয়া যায়।

(১) সাহেব দিয়া প্রথম পিঠখানি নিয়ে ডাকদার ভাবতে লাগলেন কি ভাবে তিনি তাঁর খেলাটি করে নেবেন। প্রথমে দেখলেন যদি রুহিতনে ৩-৩ ভাগ হয়ে থাকে তবে তিনি এ রঙে চারখানি পিট পেতে পারেন, নতুবা একটি পিট দিয়ে যেতে হবে। তারপর ইস্কাবনে বা চিড়িতনে 'ফিনাস' করতে হবে বটে, কিন্তু যদি ফিনাসটি সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তাহলে তাঁর গেম করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং তিনি দেখলেন যে তাঁর হাতে দুইখানি ও তাঁর খেঁড়ীর হাতে তিনখানি হরতন আছে, যদি প্রথম হরতন চালকের হাতে পাঁচখানি বেশী হরতন না থাকে তাহলে তাঁর গেম করা বোধ হয় শক্ত হবে না। কারণ শেষ দুইখানি হরতনে তাঁর খেঁড়ী কি পাস দেন তা তিনি দেখতে পাবেন। এইরূপ ভাব্‌বার পর তিনি হরতনের ছোট তাসখানি খেলে দিলেন।

(২) ডাকদার হরতনের পঞ্জা খেলায় 'পূ' আটা, 'উ' তিরি, আর 'প' টেক্কা মেরে পিট ধরলেন।

(৩) 'প' হরতনের গোলাম খেল্‌লে সকলেই হরতন দিলেন, শুধু 'দ' ইস্কাবনের আটা দিলেন।

(৪) 'প' এবার হরতনের সাতা খেল্‌লে 'দ' চিড়িতনের দুরি; 'পূ' রুহিতনের দুরি ও 'উ' রুহিতনের ছক্কা দিলেন।

(৫) অতঃপর 'প' হরতনের চার খেলায় 'দ' ইস্কাবনের বিবি, 'পূ' রুহিতনের পঞ্জা ও 'উ' ইস্কাবনের চার দিয়ে গেলেন। এ স্থলে ডাকদার দেখলেন যে তাঁর রুহিতনের চারখানি পিট সুনিশ্চিত এবং চিড়িতনে 'ফিনাস' নিতে হবে সেটিও এক রকম নিশ্চিত হয়ে গেছে, সুতরাং ইস্কাবনের বিবি রাখার আর প্রয়োজন নাই।

(৬) 'প' ইস্কাবন খেলায় 'পূ' সাহেব মারলেন; 'দ' টেক্কা দিয়ে পিট নিলেন।

(৭ ও ৮) 'দ' এবার রুহিতনের টেক্কা ও সাহেব খেলায় সকলেই রুহিতন দিয়ে গেলেন।

(৯) তারপর 'দ' রুহিতনের বিবি খেললে 'প' ইস্কাবনের তিরি, 'উ' চিড়িতনের পঞ্জা ও 'পূ' চিড়িতনের চার দিয়ে গেলেন।

(১০) 'দ' রুহিতনের চার খেল্‌লেন। 'প' ইস্কাবনের নয়, 'উ' ইস্কাবনের সাতা ও 'পূ' ইস্কাবনের দশ দিলেন।

(১১) 'দ' চিড়িতনের তিরি খেলায় 'প' সাত্তা, 'উ' টেক্কা আর 'পূ' চিড়িতনের আটা দিলেন। এইখানে বিপক্ষদল যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের হাত গোপন রাখবার জন্ম কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁদের হাতগুলি আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে গেল। 'পূ'র পাশানোর ধারা দেখে 'দ' অনায়াসে বুঝে নিলেন যে তাঁর হাতে ইস্কাবন কম আছে, তা না হলে তিনি প্রথমেই হরতনের খেলার বেলায় ইস্কাবনে পাশ দিতেন। তারপর যখন তিনি ইস্কাবনের দশ দিয়ে গেলেন তখন তাঁর হাতে যে মাত্র দুইখানি ইস্কাবন তা' প্রকাশ হয়ে গেল। এইরূপে গণনা করে ডাকদার ধরতে পার্‌লেন যে 'প'র হাতে একখানি চিড়িতন; সুতরাং তিনি অতি সহজেই চিড়িতনে 'ফিনাস' করে নিয়ে গেম করে নিলেন।

(১২ ও ১৩) 'উ'র হাত থেকে চিড়িতন খেলে গোলাম 'ফিনাস' করে নিলেন, আর তারপর সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে ডাক অনুযায়ী খেলা করে নিলেন। এইবার চারিটী হাত একত্রে দেখুন।

ইস্কাবন—সাতা, পঞ্জা, চৌকা।
হরতন—দশ, তিরি, দুরি।
রুহিতন—নয়, সাতা, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, দশ, ছক্কা, তিরি।

ইস্কাবন—গোলাম, ×, ×, ×, ×।
হরতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, ×, ×
রুহিতন—গোলাম, ×।
চিড়িতন—×।

ইস্কাবন—সাহেব, দশ।
হরতন—×, ×, ×।
রুহিতন—দশ ×, ×, ×
চিড়িতন—বিবি, নয়, ×, ×

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, আটা।
হরতন—সাহেব, পঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, পঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, গোলাম, ×, ×।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আশা কলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "দেখবে নির্ম্মলদা; কতখানি ভেঙ্গে দিয়ে গেছে?" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া কহিল, "এই পাশের বাড়ীর পুষ্পদিদি জামা তৈরী ক'রে দেবে বলে মাপ নিতে নিয়ে গেছে; একটু দাঁড়াওনা এখুনি আমি নিয়ে আসছি" বলিয়া হাসিমুখে সে পাশ কাটাইয়া পুতুল আনিতে চলিয়া গেল। বড়দি বলিবার সূত্র পাইয়া আগ্রহে প্রায় ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, কহিলেন, "কার কাছে শুনলে?"

—"প্রেমেন্দ্র যেয়েই চিঠি লিখে আমায় জানিয়েছে।"

—"কি লিখেছে? দেখিনা চিঠিখানা।"

—"তা' দিচ্ছি।" বলিয়া পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিতে ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কিন্তু তার আগে আমার একটা কথা আছে, বড়দি। খুব সম্ভব আজই প্রেমেন্দ্রর বৌদির একখানা চিঠি এখানে আসবে। সেই চিঠির উত্তরে আপনাকে লিখতে হবে,—প্রেমেন্দ্রর এখানে মন বসেনি। তাই সে চলে গেছে, নইলে যেত না।"

—"বেশ, দিলুম কথা।" বলিয়া নির্ম্মলের হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া বড়দি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ হইলে মুখ তুলিয়া দেখেন নির্ম্মল নিকটে নাই। ঘরে গিয়া দেখিতে পাইলেন,—কাপ ডিস্ পাড়িয়া নায়েববাবুর চা'-মিষ্টির কতকাংশ লইয়া বন্ধুর বিবাহ-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে সে তাহার পানাহার চালাইয়াছে দেখিয়া এই তরুণ যুবার কুণ্ঠাহীন ব্যবহারে মনের প্রশস্ততায় আজ আবার নূতন করিয়া বড়দির বুক পুলকে ভরিয়া গেল। হাসিমুখে কহিলেন, "আমি তোমায় কথা দিয়ে ফেলেছি তাই, নইলে এই চিঠি এখুনি এর দাদার কাছে পাঠিয়ে দিতুম। উঃ কী শয়তান! দেখ-দেখ কি শয়তানী বুদ্ধি।" বলিতে বলিতে তিনি চিঠি সমেত হাতটা বাড়াইয়া ধরিলেন।

নায়েববাবুর পানাহার শেষ হইতেছিল। তিনি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "না," বড়দি কহিলেন, "পরের চিঠি তুমি পড়না তা' জানে, কিন্তু—তারও সময় অসময় আছে। সে তার এই এতবড় চিঠিখানায় কোথাও কিছু গোপন করার কথা লেখেনি।"

ইহার উপর নির্ম্মল আবার বলিয়া উঠিল, "তা' ছাড়া এ চিঠি যাকে লেখা তার যদি দেখানোর মত না থাকে, তাহ'লে তার দেখতে বলা সত্বেও আপনার না দেখা অনুচিত; আমিও আপনাকে পড়ে দেখতে বলি।"

নায়েববাবু পরাস্ত হইলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা—পড় কি লিখেছে, আমি শুনি। বড়দি পড়িয়া শুনাইলে তিনি স্তব্ধ হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

নির্ম্মল কিন্তু সে ধার দিয়াও গেল না। পানাহার শেষ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, "গোপন করতে না বলার কোন কারণ আছে কিনা জানিনা; তবে এটুকু বেশ বুঝা যায়, এই চিঠি লেখবার সময় তার মনের কোন স্থিরতা ছিলনা। যে মনোভাব নিয়ে সে লিখতে সুরু করেছিল শেষ পর্য্যন্ত তা' বজায় রাখতে পারেনি। এজন্যে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়?"

নায়েববাবু ও বড়দি সভয়ে মনে মনে বলিলেন, তবে কি দোষটা আশার? আশার এই ঘটনাটা তাঁহাদের গ্রামে হইলে প্রতিবেশীর মুখে মুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া যে জঘন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত, নির্ম্মলের মনেও কি সেই রূপই দেখা দিল নাকি? অন্য কেহ হইলে কথা ছিলনা কিন্তু নির্ম্মলের নিকট এরূপ প্রত্যাশা করিতে কোথায় যেন বাধে, তাই তাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

নির্ম্মল সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ করিল না। সে প্রশ্ন করিয়াছিল আত্মগতভাবে —নিজের মনে ইহাকে একবার যাচাই করিয়া লইতে—উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশায় নয়। প্রশ্ন করিয়া সে ক্ষণকাল ভাবিয়া লইতেছিল, পূর্ব্বকথার জের টানিয়া কহিল, "না" দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, সে এমন কাণ্ডটা ক'রে ব'লেছে কেবলমাত্র নাজানার ভুলে, বুঝবার দোষে। ভুল বুঝে কেউ যদি ঘৃণ্য কিছু ক'রে বসে তাহ'লে সেই ভুলটাকে ধ'রে মানুষটাকে বিদায় করা চলে না। এছাড়া অন্যদিক দিয়ে দেখলেও, দেখা যায় এটা তার ক্ষণেকের মোহ। মানুষের মোহ নিয়েও মানুষকে বিদায় করা চলে না। মানুষকে বিদায় করতে হ'লে তার স্বাভাবিক জ্ঞান, মন,—

নায়েববাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি নির্ম্মলকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, "না-না নির্ম্মল, এ তোমার বন্ধুপ্রীতি। সঠিক সমালোচনা করতে হ'লে আমি দ্বিধাশূন্য হ'য়ে এই কথাই বলব যে, প্রেমেন্দ্র একটি মস্ত বড় লম্পট। মন তার জঘন্য; তার মধ্যে মনুষ্যত্ব কিছু নেই, থাকলে আশাকে পাশের বাড়ীর মেয়ে মনে করবার কথা লিখত না। বলত, আশার রূপ ও স্বাস্থ্য দেখে তার উচ্ছৃঙ্খল মন পাগল হয়েছিল; তাকে সংযত করবার শক্তি তার নেই। সে স্থির করতে পারেনি বয়সের অনুপাতে আশার মনটা এখন কি বস্তু এবং যেমন ক'রে হোক পেতে চেয়েছিল আশালতাকে। এখনো সে তার সেই ইচ্ছাটাকে সমূলে তুলে ফেলতে পারেনি তাই লিখেছে একটা শয়তানীর সংস্পর্শে একে আত্মহত্যা করতে কোথায় যেন বাধে। সে ভেবেছে—কি জানি, নির্ম্মল যদি একথা পড়ে আশাকে শয়তানী ব'লে বিশ্বাস ক'রে ফেলে, পথ ছেড়ে দাঁড়ায়, তা'হলে আশাকে বিয়ে করবার জন্যে তাকেই গিয়ে সাধাসাধি করতে হবে আমাদের। মূর্খ একথাটা একবারও ভাবেনি, তার মত একটা অপদার্থ লম্পটের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়ের গলায় পাঁচমন পাথর বেঁধে মাঝগঙ্গায় ফেলে দেওয়া অনেক অনেকগুণে ভাল।

(ক্রমশঃ)

বিদ্যাসাগর স্মৃতি তর্পণ

বঙ্গাব্দ ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন বীরসিংহে সিংহশিশুর আবির্ভাব হইয়াছিল। Wise men of the East হয়ত শিশুকে দেখিবার জন্য নক্ষত্রচালিত পথে আগমন করেন নাই, কিন্তু মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য্য বুঝিবা তার সমস্তখানি ভাস্বরতা ও ঔজ্জ্বল্য দিয়া এই মহামানবের অনাগতকালকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া, তার প্রথম আগমনকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব যে বাংলায় কত বড় একটা যুগান্তরের পূর্ব্বাভাষ, বাঙ্গালী জাতির কতখানি সৌভাগ্যের সূচনা, কী বিরাট একটা পরিবর্ত্তন দ্বারা যে তিনি জড় ও পঙ্কিল বাঙ্গালী জীবনের রুদ্ধ প্রবাহকে মুক্তস্রোতা স্রোতস্বিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলেও মস্তক সম্ভ্রমে আপনি অবনমিত হয়।

বিদ্যাসাগরের জীবনের এতগুলি দিক্ আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত আছে যে সবগুলি আলোচনা করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে। তাই আমি তার জীবনের মাত্র দুই একটা দিক খুব সংক্ষেপে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব।

একদিকে শাস্ত্র ও আর একদিকে সমাজ যখন জগদ্দলপাথরের মত বাংলার বুকের উপর চাপিয়া তার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় করিয়া আনিয়াছিল, বাংলার সেই চরম ও পরম দুর্দ্দিনে অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমাজের সমস্ত বিধিনিয়ম অবিচলিত-চিত্তে পালন করিবার শিক্ষা শৈশবাবধি পাইলেও যে মুক্ত ও স্বাধীন মন তার ছিল, তারই জোরে তিনি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে পণ্ডিতদের বহুদিন প্রচলিত আচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এমন কি শাস্ত্রীয় বিচারে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে দেশের পণ্ডিতগণ এই বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেন যে পৃথিবীতে যা কিছু জ্ঞান সমস্তই সংস্কৃত গ্রন্থের অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে, তার বাহিরে জানিবারও কিছু নাই। মনের এই যে জড়ভাব য, তখনকার দিনে লোকদিগকে তৃপ্তি দিত, যার অহঙ্কারে তারা মনে মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, তার প্রভাব থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তার জ্ঞানপিপাসু দৃষ্টি শুধু অতীতেই নিবদ্ধ থাকিত না, বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতেও প্রসারিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সংস্কারের চেষ্টার বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নয় তাই, আমি সংক্ষেপে তার একটুমাত্র উল্লেখ করিব।

বর্ত্তমানযুগে সমাজ তন্ত্রবাদ বলিলে যা বুঝায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর লোক হইলেও তার সম্পূর্ণ পরিপোষক ছিলেন। সমাজ তন্ত্রবাদের মূল কথা হইল সম্পত্তি কাহারও ব্যক্তিগত নয়, উহা সাধারণের। বিদ্যাসাগর তার, স্বোপার্জ্জিত অর্থ সম্পদের, এক কপর্দ্দকও নিজের মনে করেন নাই বা নিজের ভোগের জন্য সঞ্চিত রাখেন নাই। সমস্ত উপার্জ্জন সাধারণের ভোগে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাই বিংশ শতাব্দীর এই গণতন্ত্রের যুগে যখন, সাম্যবাদ, সমাজ তন্ত্রবাদ, গনতন্ত্রবাদ প্রভৃতি বড় বড় বাদ বৈষম্যের প্রভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার এক অপূর্ব্বরূপ আমাদের চক্ষুকে ঝলসিত করে, তখন তারই একটা প্রধান পন্থাকে উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রাচ্য পণ্ডিতের জীবনে রূপ পাইতে দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। তারপর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত এবং খাটী স্বদেশী।

প্রাচীন পরিচ্ছদের অন্তরালে এই যে চিরনবীন হৃদয়, প্রাচ্য রুদ্ধস্রোতের সঙ্গে এই যে পাশ্চাত্য প্লাবনের সম্মিলন, প্রাচ্য অতীত পন্থীর সঙ্গে এই যে পাশ্চাত্য ভবিষ্যৎ পন্থীর সমন্বয়, এর মূলে ছিলেন সেই অনাড়ম্বর সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়ত জীবনে তিনি হন নাই, জড়পন্থী দেশ তখন হয়ত: তাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাই দেশবাসী অধিকাংশই প্রতিবাদ দ্বারা তার সংস্কার চেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছিল। কিন্তু সেটা মানবধর্ম্ম। প্রচলিত বিধির সমস্তটুকু সার শূন্য হইয়া যখন শুধু মাত্র খোলসটা পড়িয়া থাকে, তখন তাকে পরিত্যাগ করিবার সাহস সাধারণের থাকে না। কিন্তু সত্যের পক্ষে দাঁড়াইয়া একাকী সমস্ত জাতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ না করার গৌরব না থাকিলে অভিমন্যুর পরাজয় তাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাময়িক পরাজয় ও বিজয়ীর জয় গর্ব্বকে ম্লান করিয়াছিল। আপামর

সাধারণের দুঃখে যে করুণা অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়া সমাজ সংস্কারের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই দু' একফোঁটা ধরণীর বক্ষ আর্দ্র করিয়া কোমল করিয়াছিল, যার স্নেহস্পর্শ মাঝে মাঝে সমাজের দু' একস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান কতখানি তাহা বুঝিতে গেলে তাঁর পূর্ব্বের গদ্য সাহিত্য কতখানি দীন ও হীন ছিল তা বুঝিতে হইবে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টিকাল নির্ণয় অবশ্য অত্যন্ত দুরূহ। তবে মিশনরীরা যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা এটা অস্বীকার করার মত উপাদান আজকাল আমাদের হাতে আছে। নরোত্তম দাস নামক এক ব্যক্তির লিখিত আটপৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, যার জন্মকাল অন্ততঃ ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বেকার। তাহার ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে অন্ততঃ আর ১৫০ বৎসর বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্মকাল পিছাইয়া যাইবে। কাজেই মিশনরীদের অন্ততঃ আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলা গদ্যসাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল এটা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। তবে মিশনরীর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রসার ২।১ খানা হস্তলিখিত পুঁথিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, মিশনরীদের কৃপায় মুদ্রাযন্ত্র এর অস্তিত্বকে অনেক প্রসারিত করে। কাজেই তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ শুধু এইজন্য যে অবগুণ্ঠনবতী ক্ষীণা বাংলা ভাষাকে লোক চক্ষুর অন্তরাল থেকে তারা প্রকাশ্য সূর্য্যালোকেও উন্মুক্ত বাতাসে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আনিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ এই সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে তিনটী পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্য্যায় কেরি, মার্শম্যান্ প্রভৃতি মিশনরী হাল্‌হেড, ফরষ্টর প্রভৃতি সিভিলিয়ান্ সাহেবদের ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনুবাদ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় পর্য্যায়—রামরাম বসুর লিপিমালা, রাজাবলী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মার বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি। তৃতীয় পর্য্যায়—রামজয় তর্কলঙ্কারের "সাধ্য ভাষা সংগ্রহ", লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কারের মিতাক্ষরা দর্পণ। কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চাননের ন্যায়, দর্শন ও পুরুষপরীক্ষা হিতোপদেশ প্রভৃতি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের, প্রবোধ চন্দ্রিকা। বলা বাহুল্য যে, প্রথম পর্য্যায় হইতে দ্বিতীয় পর্য্যায় এবং দ্বিতীয় পর্য্যায় হইতে তৃতীয় পর্য্যায়—ভাষা ক্রমশঃই পুষ্টতর লিখিবার পদ্ধতি বিশুদ্ধতর। এই তৃতীয়, পর্য্যায়ের সময় হইতেই ভাষার বিশেষ প্রসারতা লাভ করে।

বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বের লেখকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাজেন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদের মধ্যে রামমোহন রায় যদিও প্রকৃতপক্ষে মার্জ্জিত বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রবর্ত্তক ছিলেন তবু, তার ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ, তারপর রাজেন্দ্র লাল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও প্রাঞ্জল। এদের পরেই প্রকাশিত হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসুদেব চরিত্র। সংস্কৃত বহুল হইলেও ভাষার প্রাঞ্জলতায় ও সাবলীলতায় রচনার মধুরতায় ও মনোহারিতায়, তখনকার গদ্য সাহিত্যকে উহা এক অপূর্ব্ব সম্পদে বিভূষিত করিয়াছিল। এর কয়েক বৎসর পরেই বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা বাসুদেব চরিত্র অপেক্ষাও প্রাঞ্জল ও সহজ। তারপর ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা ইতিহাস, বোধোদয়, শকুন্তলা, বর্ণ পরিচয়, চরিতাবলী, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, রামের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক যুগান্তরের সৃষ্টি করে। আর্ত্তের পরিত্রাতা, দুঃখীর সমবেদক, বিদ্যাসাগরের এ সব গুণই সাধারণ্যে প্রচারিত। তাতে হয়ত বহু অনাথ আতুরের প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের নির্ম্মমতার যে বেদনাপ্রকৃতির তার চক্ষুকে সমগ্র জীবন সজল করিয়া রাখিয়াছিল, তার আপাতব্যর্থ প্রয়াস আজ চল্লিশ বৎসর পরে যখন আংশিকরূপে ফলবতী দেখিতে পাইতেছি, তখন কি মহাপুরুষের মহানুভবতায় একবারও মন সম্ভ্রমভরে শ্রদ্ধাবনত হয়? যে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আসন পাইতে দেখিয়া গর্ব্বে বুক দশহাত ফুলিয়া উঠে, তার ভাগ্য বিধাতাকে কি একবার ও কৃতজ্ঞতা ভক্তি স্মরণ করি? আজ এই মহাপুরুষের স্মৃতিবাসরে শুধু এই কথাই আমার বারবার মনে হইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উপস্থিত সভ্যবৃন্দের প্রতিও আমার অনুরোধ, বিদ্যাসাগর সৃষ্ট সাহিত্যের

কণ্ঠহারা

হোসনে আরা বেগম

আমার মনের বনের পাখী
স্বর হারাল হায়
তার জীবনে মলয় আজি
বৃথাই বয়ে যায়।
আকাশে তারার মালা
জাগাল দাহন জ্বালা
যতনে গাঁথা মালা
আজি ঝরিল ধূলায়॥
কালো ধরণীর বক্ষে আজি
বেদনার মেঘ ছায়
সেই বেদনা মোর বুকে এসে
ঘন ঘন মুরছায়।
প্রজাপতির মেলেনাকো পাখা
তারকারা ঘুম যায়
মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকে চাঁদে
নাম হারা ভীরুতায়॥
মলয় এসে দুয়ারে মোর
ডাক দিয়ে যে যায়
এমনি দিনে বিহগ আমার
সুর হারাল হায়॥

পরিপূর্ণ আলোচনা হইলে পরিষদের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইবে এবং সেই মহা-পুরুষের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইবে। ইতি—

শ্রীঅনাথ বন্ধু বেদজ্ঞ সাহিত্যবিশারদ

---

* (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মৃতি সভায় পঠিত)

"Calcutta Music Association"-এর মুখপত্র "Music of India"-র প্রথম সংখ্যাখানি আমাদের হস্তগত হোয়েছে। এই সঙ্গীত সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র বসু বি, এ, সহকারী সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত বিমলা কান্ত রায় চৌধুরী বি, এ, এম্‌, সি, এল্‌, ও শ্রীযুক্ত আমিরুল ইসলাম এম্‌-এস্‌-সি। ৮২।২ই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুত শৌকত আলি খাঁ সাহেব কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হোয়েছে। পত্রিকাখানি সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের নজরে পড়ল। পত্রিকাখানির নাম-ধাম-পরিচয় সবই ইংরাজীতে। এর ভূমিকা বা পরিচায়িকাও লিখেছেন পণ্ডিত শ্রীযুত অশোক শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজীতে। কিন্তু ভিতরের সব প্রবন্ধই বাংলায়। এর রহস্য ঠিক বোঝা গেলনা। বর্ত্তমান সংখ্যায় যে সকল খ্যাতনামা সঙ্গীতকলাবিৎ ও সঙ্গীত রসিকগণের প্রবন্ধ বা স্বরলিপি প্রকাশিত হোয়েছে তাঁদের নাম—গৌরীপুরের স্বনামধন্য রাজাবাহাদুর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীযুক্ত শৌকত আলি খাঁ প্রভৃতি। আমরা এ পত্রিকাখানির সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

"প্রিয়দর্শী"
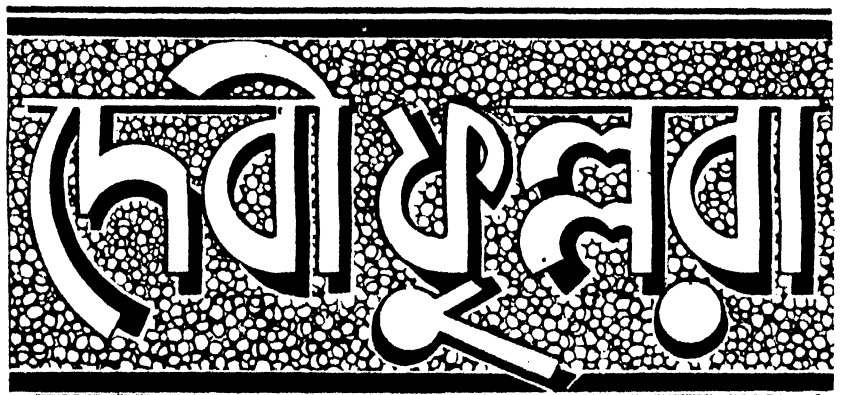
(সি, বি)

আন্তর্প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা

আগামী জুলাই মাসের শেষের দিকে 'প্যালেষ্টাইনে' দ্বিতীয় ওয়েষ্টার্ণ এসিয়াটিক্ গেমসের অনুষ্ঠান হবে। পূর্ব্বের অনুরূপ অনুষ্ঠানগুলিতে ভারতবর্ষ হকি খেলায় জগতের অন্যান্য দেশগুলির প্রতিযোগিতা করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এবারেও প্যালেষ্টাইনে যাতে ভারতবর্ষের সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন' 'ওয়েষ্টার্ণ এসিয়াটিক গেমসে' অংশ গ্রহণ করবার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক ভারতীয় হকি টীম পাঠাবার সঙ্কল্প করেছেন। পূর্ব্বরীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের খেলা দেখবার পর এই দলটি গঠিত হবে। যাতে প্রত্যেক প্রদেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা নিজেদের হকি খেলায় নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পায় সেই অভিপ্রায়ে গত ১১ই মার্চ্চ থেকে কলকাতায়, 'বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে এবারকার 'আন্তর্প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা' সুরু হয়েছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই প্রতিযোগিতাটির এই রকম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতের এতগুলি হকি খেলায় উৎসাহী প্রদেশ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ভূপাল, গোয়ালিয়র, পাঞ্জাব এবং বাঙ্গালা প্রদেশ এই প্রতিযোগিতাটিতে যোগদান করেছেন। অন্যান্য প্রদেশগুলি যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও টীম পাঠাতে পারে নি তাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।, কারণ তাদের প্রাদেশিক্ হকি এসোসিয়েশনগুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যই এই অখেলোয়াড় জনোচিত মনোভাবের পরিচয় দিতে হয়েছে। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক দারা, এবং ধ্যানচাঁদের মত ভারতের দুইটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হকি খেলোয়াড়দের খেলা দেখা থেকে বাঙ্গলার হকি ক্রীড়ামোদীদের বঞ্চিত হতে হয়েছে। মাদ্রাজ প্রদেশ আর্থিক অনটনের জন্য কোন টীম্ পাঠাতে না পারলেও তাদের চারটি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে 'অল ইণ্ডিয়া ট্রায়াল্ ম্যাচ খেলার জন্য কলকাতায় পাঠিয়েছে। পূর্ব্ববন্দোবস্তমত এই আন্তর্প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতাটি নক্ আউট্' পদ্ধতিতে খেলা হবার ব্যবস্থা থাকলেও প্রতিযোগীদলগুলির সংখ্যা খুব কম হওয়ায় ইহা লীগ প্রতিযোগিতা হিসাবে খেলা আরম্ভ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটি শেষ হবার পর তিনটি অল্ ইণ্ডিয়া ট্রায়াল্ ম্যাচ খেলা হবে। নির্ব্বাচকগণ এই খেলাগুলির পর নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করবেন।

বাংলা প্রদেশ গত ১৯৩৬ সালের আন্তর্প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে 'মান্‌ভাদার' হকি দলকে হারিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল। এবারেও যাতে সেই সুনাম বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করার জন্য গত সপ্তাহে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসন তাঁদের অন্তর্গত দলগুলির মধ্যে থেকে ভাল খেলোয়াড়দের বাছাই করে দল গঠন করে তিনটি ট্রায়াল ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় ট্রায়াল ম্যাচ গুলিতে বাংলা দলের নির্ব্বাচকদের অভীষ্ট সিদ্ধ হলেও তৃতীয় ট্রায়াল ম্যাচটি বিশেষ কার্য্যকরী হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত এই তিনটি ট্রায়াল্ ম্যাচ খেলার পর বাংলা দল এইরূপ ভাবে গঠিত হয়।

গোলরক্ষক :—এলেন্ (পোর্ট কমিশনার)

ব্যাক্‌দ্বয় :—সি ষ্ট্যাপলেল (বি এন আর) এবং সি হজেস্ (কাষ্টমস্)

হাফব্যাকগণ :—আরিফ (মোহন-বাগান), সি ডিফেন্টস্ (কাষ্টমস) এবং গালিবার্দ্দী (বি, এন আর)

ফরওয়ার্ড :—এ মিত্র (গীয়ার), হেণ্ডারসন্ (কাষ্টমস্), আর কার (বি এন আর), রেন্টন (কাষ্টমস) এবং জি সিষ (ক্যাভেরিয়ানস্)

খুবই আক্ষেপের বিষয় যে কেবল মাত্র দুইটি বাঙ্গালী খেলোয়াড়গণ বাংলা দলে স্থান পেয়েছেন। অবশ্য এজন্য নির্ব্বাচকদের একেবারেই দায়ী করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ তাঁরা যথাসম্ভব শক্তিশালী করেই টীম গঠন করেছেন। বাংলা দলটি মনোনীত হবার পর তারা বাছাই করা 'রেষ্ট' দলের সঙ্গে একটি প্র্যাকটিস্ ম্যাচ খেলে। কিন্তু এই খেলাটিতে তারা ৪-২ গোলে জয়লাভ করলেও তাদের খেলা খুব সন্তোষজনক হয় নি। তাদের সেদিনকার খেলা দেখে ক্রীড়ামোদীরা এবারে বাংলার সুনাম বজায় থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন।

গত শনিবার ১২ই মার্চ্চ থেকে আন্তর্প্রদেশিক হকি লীগ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। এই দিনে বাংলা দলের

সঙ্গে গোয়ালিয়র দলের খেলা হয়। বাংলা দলটি মনোনীত হবার পর তারা যে প্র্যাকটিস্ ম্যাচটি খেলে সেটি দেখে অনেকেই তাদের ১৯৩৬ সালের অর্জ্জিত গৌরব বজায় থাকবে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু গোয়ালিয়র দলকে প্রথম ম্যাচটিতে ৪-১ গোলে পরাজিত করার পর তাঁরা সে ধারণা পরিবর্ত্তন করতে সাহসী হয়েছেন। বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় রূপসিং গোয়ালিয়র দলের অধিনায়ক হয়ে এসেছেন। তাছাড়া 'ঝান্সি হিরোজ' দলের মথুরাপ্রসাদ এবং ছোটেবাবু এই দলের পক্ষে খেলেছিলেন। বাংলা দলে নির্ব্বাচিত প্রত্যেক খেলোয়াড়ই এই খেলাটিতে যোগদান করেছিলেন। খেলাটি যত উচ্চাঙ্গের হবে আশা করা গিয়েছিল একেবারেই সেরূপ হয় নি। প্রথম পাঁচ মিনিট আগন্তুক দল তীব্রভাবে আক্রমণ করলেও বাংলাদলের রক্ষণভাগকে পরাস্ত করতে পারেনি। প্রথমার্দ্ধে উভয় দলই সমানে আক্রমণ করে খেললেও দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলা দলই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছিল। গোয়ালিয়র দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে গোলরক্ষক খলিল খুব কৃতিত্বপূর্ণ খেলা না দেখালেও অনেকগুলি অব্যর্থ গোল রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ব্যাক হালিম্ এবং হাফব্যাক আবদুল হামিদের খেলা অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েছিল। ফরওয়ার্ডদের মধ্যে রূপসিং নিজ সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। অবশ্য সেজন্য তাঁকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না কারণ অল্প কিছুদিন আগে তাঁকে উপর্যুপরি দুইবার মানসিক শোক সহ্য করবার দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মথুরাপ্রসাদ এবং ছোটেবাবুর আক্রমণগুলি খুবই প্রশংসনীয় হলেও বিশেষ কার্য্যকরী হয় নি। বাংলা দলের অধিনায়ক এবং গোলরক্ষক এলেনকে বিশেষ উদ্বিগ্ন না হতে হলেও তাঁর বিপক্ষে যে একটি মাত্র গোল হয়েছিল সেটি তাঁর পক্ষে রক্ষা করা উচিৎ ছিল। ব্যাকের খেলাই ভাল হয়েছিল তবে হজেসের খেলা অপেক্ষাকৃত দর্শনীয় এবং কার্য্যকরী হয়েছিল। হাফব্যাকদের মধ্যে আরিফ এবং গ্যালিবার্দ্দী সন্তোষজনক খেলা দেখিয়েছেন। ফরওয়ার্ডের মধ্যে সকলের আগে আর কারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনিন্দ্যনীয় ক্রীড়া নৈপুণ্য বিপক্ষদলের ভীতির কারণ হয়েছিল। হেণ্ডারসন নিজ খেলা দেখিয়ে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। রেণ্টন এবং নিস্ আশানুরূপ খেলতে পারেন নি। এ মিত্র নিজ খেলা দেখাবার সম্পূর্ণ সুযোগ না পেলেও তাঁর সেণ্টারগুলি দর্শনীয় হয়েছিল। বাংলা দলের 'কার' প্রথমে একটি গোল করার পর (১—০) ছোটেবাবু গোলটি পরিশোধ করেন ও (১—১)। তারপর বাংলা দলের রেণ্টন আর একটি গোল করার পর (২—১) প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাংলা দলের 'কার' এবং 'হেণ্ডারসন' প্রত্যেকে একটি করে গোল দেবার পর গোয়ালিয়ার দল ৪—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করে।

বাংলা দল

এলেন, ক্যাপ্টেন (পোর্টকমিশনার), সি টাপলেস (বি, এন আর) এবং সি হজেস (কাষ্টমস), আরিফ (মোহনবাগান), সি ডিফোণ্টস্ (কাষ্টমস) এবং গ্যালিবার্দ্দী (বি, এন আর), এ মিত্র (গ্রীয়ার), হেণ্ডারসন (কাষ্টমস), আর কার (বি, এন আর), রেণ্টন (কাষ্টমস) এবং জি নিস্ (ক্যাভেরিয়ানস)।

গোয়ালিয়র দল

খলিল মহম্মদ, বি জুৎসি এবং হালিম মামুদ আলি, আবদুল হামিদ্ এবং শকৎ খাঁ, এস জ্যাকেল ছোটেবাবু, মথুরাপ্রসাদ, রূপ সিং (ক্যাপ্টেন) এবং যুজক

গত সোমবার ক্যালকাটা মাঠে এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হয়। ভূপাল এবং গোয়ালিয়র দল দুটি এই খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এই খেলাটি খুবই নৈরাশ্যজনক হয়েছিল কারণ কোন দলই নিজেদের খেলায় কোন বিশেষত্ব দেখাতে পারে নি। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার খেলা হলেও খেলাটি খুবই সাধারণ স্তরের হয়েছিল। কোন দলই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারে নি সেই কারণে খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হওয়া উচিৎ ছিল। ভূপাল দলে ফারুক, আসান খাঁ, বাসি খাঁ, মুনির আমেদ, শাকুর ও আহম্মদ শেরের মত নামকরা খেলোয়াড়েরা যোগদান করায় অনেকেই আশা করেছিলেন তারা বেশ আকর্ষণীয় খেলা দেখিয়ে বিপক্ষ দলকে অনেক গোলে হারাতে সক্ষম হবে। রূপসিং প্রথম দিনের তুলনায় উন্নত ধরণের খেলা দেখিয়ে প্রথমেই একটি দর্শনীয় গোল করেন (১—০) প্রথমার্দ্ধের শেষের দিকে ভূপাল দলের আমেদ শের পরাজয় সূচক গোলটি পরিশোধ করেন (১—১) খেলাটি শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে এই দলের ফারুক আলি খাঁন আর একটি গোল করার পর (২—১) ভূপাল দল ২—১ গোলে জয়লাভ করে। বিজয়ী দলের বাসি খাঁ এবং অর্গান খাঁ এবং বিজিত দলের খলিল এবং রূপ সিংয়ের খেলা দর্শনযোগ্য হয়েছিল।

ভূপাল দল

মহসিন খাঁ সাগির ও ফারুক আলি খাঁ, আসান খাঁ বাসি খাঁ এবং কিফায়েৎযুল্লা, আমেদ শের, ফজল হোসেন, আকল সাকুর মুনির আমেদ্ এবং কেনেটু।

গোয়ালিয়র দল

খলিল, বি জুৎসি এবং হালিম্, মামুদ, হামিদ্ এবং সাকাৎ, জ্যাকেল, ছোটেবাবু, মথুরাপ্রসাদ, রূপসিং এবং মহম্মদ ইউনুফ।

প্রফুল্ল পিক্চার্সে'র
নবতম চিত্রার্ঘ্য
ঃ ভূমিকায় ঃ
অরুণা, দেববালা, সমর, ভাস্কর দেব (এঃ), ভানু রায় (এঃ), সানু গোসাই, সত্যধন ঘোষাল, রাসু বোস, পশুপতি ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি
সুর ঃ
ডাঃ সুধামাধব
কাহিনী ঃ
কেশব গুপ্ত এম-এ বি-এল
প্রযোজনা ঃ
প্রফুল্ল ঘোষ
চিত্র-শিল্পী ঃ
মায়ার-বার্গেন্ট
পরিচালনা ঃ
নির্ম্মল গোস্বামী
শব্দ-যন্ত্রী ঃ
ডগলাস ওয়ালটার্স
শ্রী-তে
চলিতেছে

প্রেম এবং পলায়ন

প্রভা দে, সরস্বতী

নিজের নির্জ্জন ঘরের মাঝখানে বসে শেখর যা-তা ভাবছিল। ভাবছিল, প্রেম মানে কী, আরও ভাবছিল, আধুনিক মেয়েরা এই প্রেম দান করে প্রতিদানে কী চায়? একটা অবলম্বন? চিরদিনের জন্য একটা দায়িত্ব গ্রহণ? হয়তো তা-ই, হয়তো তা নয়—

সে তো বই-তে পড়েছে, রাশিয়ার মেয়েরা এই প্রেমের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সেন্টিমেন্টের গন্ধ পায় না! তারা যেমনি সহজে আসে, তেমনি চলে যায় সহজে। আলাপ হ'ল, বন্ধুত্ব হ'ল, সব হ'ল—কিন্তু কবিতা নিয়ে মাতামাতি করবার সময় কোথায়? তাদের আছে রাজনীতি, আছে বিজ্ঞান, আছে সারা বিশ্বের অর্থহীন (?) বিরুদ্ধতাকে ঠেলে, ফুঁড়ে, বেরিয়ে যাবার প্রচেষ্টা; প্রেম, প্রেম কোথায় সেখানে!

আজ শনিবার। এক রথীনবাবু ছাড়া সবাই উইক-এণ্ডে বাড়ী গেছেন। জায়গাটা কলকাতার খুব কাছাকাছি—এরা সবাই স্কুল মাষ্টার। স্কুল—কম্পাউণ্ডের পেছনেই তাঁদের মেস্।

…সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। খোলা জানালা দিয়ে অস্তমুখী সূর্য্যের খানিকটা রক্তিম আভা ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। অদূরে, রেল ষ্টেশানের এন্‌জিন্ সেডে, কতগুলো এন্‌জিন্ একসাথে বিশ্রীরকমের আওয়াজ করছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শেখর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

তার মনটা আজ চঞ্চল। অনেক মেয়ের সাথে সে মিশেছে—কিন্তু দুর্ব্বল প্রেম নিয়ে হ্যাকামীপনা তার ধাতে কোনদিনই পোষায় নি। সাধারণ লোকে যা-কে 'ভালোবাসা' বলে, সে তা পেয়েচে—অপর্য্যাপ্তভাবে; শুধু মেয়েদের দিক থেকে নয়, পুরুষদের দিক থেকেও। এদিক দিয়ে সে ছিল (এখনও আছে) অজস্র রকমের সুখী—সে সুখ অর্দ্ধ-বিস্মৃত সুখ, অচেতন।

এর কারণ ছিল। যদিও ইদানিং সে স্কুল-মাষ্টারী নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে এসেচে, পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনে সে নিজেকে অনেকপ্রকার কাজে ব্যাপৃত রাখিত, এবং হয়তো এখনও রাখে। এই ব্যস্ত জীবনের মধ্যে—অনেক মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে—জ্যোতি—তাকে—ই—যাকে বলে ভালোবেসেছিল? এবং পরে এই মেয়েটি আর একটি লোকের সাথে ছিট্‌কে গেল—এবং সেই দিনই শেখর বুঝল প্রেম মানে কী! এই পরাজয়-গ্লানি তার অন্তরকে মথিত করে দিল, সে ভাবলে: এতদিন তার সুখের সূর্য্য লজ্জাম্বর অন্ধকারে মুখ ঢাকল।

ঐ পর্য্যন্ত। কলকাতায় থাকতে জ্যোতিকে নতুন উপগ্রহের কথা জিজ্ঞেস করায় সে কথা বন্ধ করল। পাশাপাশি বাড়ীতে থেকেও জ্যোতি অনেকদিন কথা বলে নি, শেখরও তা করে নি।

শেখরের মনটা আজ চঞ্চল—কেননা, সেই মেয়ে আজ তাকে লম্বা এক চিঠি লিখেচে। লিখেচে অনেক কিছু—যা সে লিখতে পারে এবং পারে না। অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক বুক-ফেটে-যাওয়া, অনেক অভিমান—এবং শেষ পর্য্যন্ত পায়ে ধরা!

শেখর একটা বিড়ি ধরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

অবশ্য, এ পর্য্যন্ত আমি যা বলেচি—সবই শেখরের মুখে শোনা: শেখরের মতানুযায়ী আমি ভাব এবং ভাষা প্রয়োগ করছি। শেখর বলে—অনেক মেয়ে তা-কে ভালোবেসেছে; কিন্তু, আমি তো জানি, মেয়েরা কোনদিনই ভালোবাসে না। 'ভালোবাসা' কথাটা পুরুষের তৈরী। আশ্চর্য্য, শেখর এই বলে বাহাদুরী নেয়, কোনদিন কারো কাছে সে ধরা দেয় নি!

এখানে এসে সে বিমল বলে একটি ছেলেকে পড়ানো সুরু করেছে। টাকা না নিয়েই সে পড়ায়—কোনদিন বিমল তার মেসে আসে, কোনদিন বা শেখর নিজেই বিমলদের ওখানে যায়। আজ সন্ধ্যায় সে সেইখানেই যাবে মনে করল।

বিমলের বিধবা বোন শান্তা সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়ে এসে সভা সমিতি নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। স্থানীয় স্কুলের (মেয়েদের) তিনি শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, জেল খাটার দরুণ চাকরি গেছে। এখন বেকার—শুদ্ধ ভাষায় বেকারিণী!

এ কয়দিন ধরে শেখর তার 'সিনিক্যাল' চোখ দিয়ে বিমলের দিদিকে লক্ষ্য করেছে। মেয়েটির হাবভাবে, গতিতে, ছন্দে কোন রহস্যই উঁকি দেয় না—সাদা, সহজ। বিমলের মুখে সে শুনেছে, শান্তার স্বামী কোন বোমা কেসে ধরা পড়ে এবং বিচারে তার ফাঁসী হয়। শান্তার জেল এবং কিছুদিন পূর্ব্বে তার স্বামীর ফাঁসী—এ দু'টো মারাত্মক ঘটনায় Govt-aided স্কুলের কর্ম্মকর্ত্তারা শান্তার চাকরিটা কিছুতেই বজায় রাখতে পারলেন না! এ কয়দিন শান্তা এবং বিমলের সাথে শেখর অনেক ঘোরাঘুরি করেছে—কিন্তু কোন ফল হয়নি।

অথচ, শেখর তো জানে বিমলদের সংসারের অবস্থা। ছোট ছোট আরো গোটা দুই তিন ভাই বোন আছে, বৃদ্ধ পঙ্গু বাবা আছেন, আর আছে শান্তার এক বছরের ছোট একটা মেয়ে। অনুরুদ্ধ হয়ে বিমলকে পড়াতে গিয়ে শেখর তাদের সংসারের হাহাকারের কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনেছে। শান্তার মাইনের কয়টা টাকাই তাদের সম্বল ছিল—এ কয়মাস ভীষণ কষ্টে কেটেচে—ভবিষ্যতে আরো কী হবে কে জানে।

সময় সময় শেখরের রাগ হয়েছে: এতো যার অভাব—তার দেশ সেবা করাটা বাবুগিরিরই নামান্তর। আরও সব চেয়ে সে ক্লিষ্ট হয়েছে এই ভেবে—শান্তার চরিত্র নিয়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা কানাঘুষো করে কেন? তবে কি সত্যিই……শেখর তা জানে না।

একয় দিনেই শান্তার সাথে সে যথেষ্ট পরিচিত হয়েছে। এক পয়সার 'ডাষ্ট' চা কিনে এনে বাড়ীর সকলে খেয়েচে। দিদির সঙ্গে শেখরের এতো আলাপ দেখে বিমলের আনন্দ আর ধরে না।

আজ পথে বেরিয়ে শেখরের প্রথমেই দেখা হল সুধীর মোক্তারের সাথে। স্থানীয় কোর্টে সুধীর মোক্তারী করে পয়সা করেছে। শেখরের সাথে তার আলাপ আছে।

সুধীর বললে: কী মাষ্টার মশাই—চললেন নাকি 'ওখানে'?

হ্যাঁ।

আপনারা মাষ্টার—আপনাদেরও নীতি-জ্ঞান হারালো মশাই?

উপায় নেই। এ জায়গার বাতাসটা contagious।

ধন্যবাদ, শেখরবাবু।

ধন্যবাদ আপনাকেও, শেখরবাবু।

কেন?

যেহেতু, রাস্তাঘাটেও আপনি 'মোক্তারী' করেন। বলেই শেখর পাশ কাটিয়ে চলে এল।

বিমলের পড়বার ঘরের সামনে এসে শেখর চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। জানলা দিয়ে লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেল তক্তপোষের ওপর বিমলের বৃদ্ধ পিতা এবং বিমল বসে আছে—আর অদূরে, দরজার কাছে, মাথা নীচু করে শান্তা দাঁড়িয়ে।

বৃদ্ধ বলছেন: সভা-সমিতি করে বেড়ালে হয়তো আবার জেল হতে পারে। সংসারের যা অবস্থা—এখন অন্ত্য কোথাও চাকুরি বাকুরির চেষ্টা করো মা।...আর, তোমার বয়স অল্প…বৃদ্ধ এইখানেই থামলেন।

বিমল বললে: শেখরবাবু বলছিলেন, কলকাতায় গিয়ে সুভাষবাবুকে বললে হয়তো কর্পোরেশনে চাকুরি হতে পারে। দিদি, তুমি যাবে?

মাথা নেড়ে শান্তা বললে: না।

বিমল উসখুস করে উঠল: তা হলে চলবে কী করে শুনি? স্কুলের মাইনে দিতে পারছি না…আমার পড়াও তাহলে বন্ধ হবে?

তা যদি হয়, হবে।

কিন্তু দিদি, আর কয়েকমাস পরেই যে আমার ম্যাট্রিক একজামিন্। তবু যা হক, বিনে পয়সায় শেখরবাবু পড়াচ্ছেন, মাইনে নিলে এ্যাদ্দিনে—বলতে বলতে বিমল যেন রেগে গেল—মাইনে নিলে আবার তো উপায়ই থাকত না।

শান্তা বললে: তা হ'লে মাষ্টার ছাড়িয়ে দাও।

ছাড়িয়ে দেব! পরীক্ষার খাতায় অঙ্কগুলো তুমি কষে' দিয়ে আসবে নাকি?

আমি তা জানি না—বলে শান্তা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন: ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিমল। নইলে, এমন মতিভ্রম হবে কেন? এতো কুৎসা, এতো নিন্দে—তা যেন ওর গায়েই লাগে না!

এমন সময় শান্তা পুনরায় ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল: কী গায়ে লাগে না বাবা?

উত্তরে বৃদ্ধ কিছুই বললেন না। মাত্র একবার শান্তার মুখের দিকে চেয়ে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন। একটু পরে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

তুমি কাঁদচ বাবা?

বৃদ্ধ কোন কথাই বললেন না। তেমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শান্তা এগিয়ে এল। বাবার পাশে বসে পড়ে, তাঁর হাত ধরে, আশ্চর্য্য হয়ে বললে: তুমি কাঁদচ বাবা?

বৃদ্ধ তাঁর দুই হাতের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে শান্তাকে অবজ্ঞায় ঠেলে দিলেন। বললেন: কাঁদচি…কাঁদচি কেন জানো না? তোমার সুটকেসে ওসব চিঠি কে লিখেচে? তারপর ব্যথায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে বললেন: তোর মা যে খুব বড় সতী ছিল রে…

উঠে দাঁড়িয়ে শান্তা বললে: তা হলে তুমি চুরি করে আমার সব চিঠি পড়েচ বাবা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পড়েচি—বৃদ্ধের মুখের প্রতিটি শিরা উপশিরা তীক্ষ্ণ ছুরির মতো ফণা তুলে উঠল—হ্যাঁ, পড়েচি। তোমায় তারা যা খুশী লিখতে পারে, আর আমি তা পড়তে পারি না? বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন।

না, পারো না।

বৃদ্ধ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ, শান্তার ছোট মেয়েটি কোথা থেকে এসে মা-র কোলে ঝাপিয়ে পড়ল। তাকে নিয়ে শান্তা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেখর সব কথা শুনল। তার আর ভেতরে যাবার প্রবৃত্তি হল না। ভাবতে ভাবতে সে পথ চলতে লাগল।

বিমলদের রান্নাঘরের পাশ দিয়ে পথটা মোড় ফিরেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পুনরায় শেখর দেখতে পেল, শান্তা তার মেয়েকে কোলে করে দুধ খাওয়াচ্ছে আর গুণ গুণ করে গান গাইছে :

স্রোতের পাতা ভেসে ভেসে যাই,
ঠেকি যাই বন্ধ বাঁকে—
ওরে, তারা যে আমায় ডাকে,
আমায় ডাকে।
ঝাউ বনের চাপা কান্না,
নদীর বুকে ভরা বন্যা—
ওরে, আমার মন মানে না, মানে না—
শুধু ফিরে চায় দূর থেকে।
আমায় ডাকে, আমায় ডাকে।

সত্যি সত্যি তখন রান্নাঘরের পিছন দিকের ঝাউগাছগুলো সাঁ সাঁ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। বিস্মিত শেখর তাড়াতাড়ি পা চালালো।

আবার তাকে থামতে হ'ল। নিজের খুকীকে সম্বোধন করে শান্তা বলছে :

শুনলি তো খুকী, তোর দাদু আজ আমায় কতো কথা বললে। রবিবাবুর 'ঘরে বাইরে' পড়েছিস্ তো? পড়িস নি? বাইরে বেরুলেই এইসব হয় রে—বুঝলি? তারপর খুব ধীরে ধীরে, কতোকটা আপন-ভোলা অবস্থায় শান্তা ফিস্ ফিস্ করে তার খুকীকে বলে যেতে লাগল। কিন্তু, যারা আমার পথে এসেচে—তারা যে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহ্য করেও এখনও দেশকে স্বাধীন করতে পারল না রে। এই সব ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়ার দল—কারো কাছ থেকে কিছু পায় নি তারা,—তারা যদি আমার একবিন্দু ভালোবাসা চায়—আমি তা দেব না খুকী? নিশ্চয় দেব—তুই-ও দিস খুকী—তোর ভালোবাসা দিয়ে লক্ষ্মীছাড়াদের দুঃখ ঘোচাস। এই কর্ত্তব্যের কাছে মান, অপমান, লজ্জা—সব তুচ্ছ হয়ে যায়......

শেখর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। ভাবল : এ কি সত্য? শান্তা কি পাগল হয়ে গেল?...কিন্তু, মনের ভিতরে শেখর এক অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করল। মেয়ে, মেয়ে—এই তো মেয়ে—। রাশিয়ার?

সেই রাত্রি থেকে শেখর মুষড়ে গেল। স্পষ্ট সে অনুভব করল, এতোদিনে—সে একটি মেয়েকে পেয়েচে—যাকে সে ভালোবাসতে পারে।...

শেখরের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে চলল। কিন্তু,—তার প্রতিজ্ঞা—সে কোন মেয়ের কাছে আত্ম-সমর্পন করবে না—তাই সে কিছুদিন পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এল কলকাতায়।

নাট্য-তরঙ্গ

(শ্রীনটশেখর)

হাতিবাগান সর্ব্বজনীন সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে পল্লীর যুবকবৃন্দ গত ১৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "রীতিমত নাটক" ও "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র অভিনয়ের আয়োজন কোরেছিলেন। "ঘৃতং পিবেৎ" অভিনয় হ'বে ব'লে প্রথমে ঘোষণা করা হোলেও শেষ অবধি এই প্রহসন খানির অভিনয় হোয়ে ওঠে নি। 'রীতিমত নাটকে'র নতুন কোরে পরিচয় দেবার কিছু নেই। বর্ত্তমান বাঙলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় রীতিমত নাটকের রচয়িতা, পরিচালক ও প্রধান ভূমিকার অভিনেতা। অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদারের ভূমিকায় তাঁ'র যে অনবদ্য অভিনয় আমরা একাধিকবার দেখেছি সে ছবি অবশ্য জীবনে ভুলবার নয়, আর তাঁ'র তুলনা করতে যাওয়াও বাতুলতা। তবু আমরা এ ক্ষেত্রে দিগম্বর ভূমিকাভিনেতা শ্রীযুত হরিধন মুখোপাধ্যায়ের এই ব'লে প্রশংসা না কোরে থাকতে পারছি নি যে, তিনি শিশিরবাবুর অন্ধ অনুকরণ করেন নি। একজন তরুণ অভিনেতার পক্ষে শিশিরবাবুর ছায়া অতিক্রম করা বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। তারপর সান্ত্বনার শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর দৃশ্যটি যবনিকার অন্তরালে রেখেও পরিচালক হরিধনবাবু রীতিমত নাটকের মূল পরিচালক অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বিবেচনা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পুরোহিতের দৃশ্যে হরিধনবাবুর অভিনয় ভাল হোলেও দৃশ্যটির পরিকল্পনা বিশেষ রসবোধের পরিচয় দেয় নি। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে এক নবকৃষ্ণের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। প্রেসম্যান্ পদক পেলেও অতি অভিনয় কোরে কাতুকুতু দিয়ে লোক হাসিয়েছেন মাত্র। স্বাগতার রূপসজ্জা বড়ই বিশ্রী দেখাচ্ছিল। বুলবুলটি একেবারে অচল। "মানময়ী" আমরা দেখি নি; অতএব, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশে বিরত রইলুম।

প্যারামাউণ্টের "ব্যারিয়ার"-র ছবির একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে লিও ক্যারিলো ও জিন পার্কার। ছবিখানি [illegible] হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই চৈত্র ১৩৪৪, ২৪শে মার্চ্চ ১৯৩৮ } ১২শ সংখ্যা

জানকীনাথ কংগ্রেস ভবন

বাংলার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু স্বর্গীয় জানকীনাথ বসুর কটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভবনখানি উৎকল কংগ্রেস কমিটিকে দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্বর্গীয় জানকীনাথের সম্পত্তির যে ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়াছে তদনুযায়ী শরৎচন্দ্র উক্ত ভবনের বর্ত্তমান অধিকারী এবং তাঁহার স্বনামধন্য পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি উহা উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎকল বিশেষতঃ কটক জানকীনাথের কর্ম্মস্থল এবং সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের ন্যায় ভারতের দুই প্রতিষ্ঠাবান নেতার জন্মস্থান এবং তাঁহাদের বাল্যের ও প্রথম যৌবনের কর্ম্মবহুল স্মৃতি-বিজড়িত সুতরাং কটকে তাঁহাদের পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ শরৎচন্দ্রের এই দান অতুলনীয় ও মহনীয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দারিদ্র্য-দুঃখ-প্রপীড়িত যে যুবক ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বাংলার বাহিরে রেলপথ-বিহীন উৎকলে যাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অপূর্ব্ব চরিত্রবলে ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে তিনি উৎকলে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিতে পরিণত হন।

৺জানকীনাথ বসু

"যশে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ" জানকীনাথের ভাগ্যে যেরূপ হইয়াছিল তাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। অজাতশত্রু ব্যক্তি বলিতে যাহা বুঝায় জানকীনাথ তাহার মূর্ত্ত প্রতীক। পুত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য ও চরিত্রগঠনে জানকীনাথের চেষ্টা যে আশাতীতভাবে ফললাভ করিয়াছে তাহা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য পঞ্চ ভ্রাতার চরিত্রে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বহু দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়া—এমন কি জয়নগর স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া—যিনি প্রথম যৌবনে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন কটকের তদানীন্তন প্রথিতযশাঃ ব্যবহারাজীব ৺হরিবল্লভ বসু মহাশয়ের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় জানকীনাথ কর্ম্মজীবন সুরু করেন কটকেই। তৎপরে ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে জানকীনাথ যখন সৌভাগ্যের সুউচ্চ শিখরে আসীন হইলেন, তখন তিনি রিক্তহস্তে দান করিয়া বহুজনের দুঃখ কষ্ট লাঘব করিয়া উৎকলে ও বাহিরে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন ভাগ্যবান পুত্রবর্গের ভাগ্যবান পিতারূপে

গৌরবময় ও কর্ম্মবহুল জীবন যাপন করিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় টিভলী গার্ডেনে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তখন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে জাহাজে আসিতে হইত। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই উড়িষ্যার প্রতিনিধি হিসাবে জানকীনাথ যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পিতা জানকীনাথ উড়িষ্যার প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন আর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পুত্র সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির পদে ও মধ্যমপুত্র শরৎচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যরূপে বর্ত্তমান কংগ্রেসের অধিনায়কত্ব করিতেছেন।

মহাত্মাজী এপ্রিল মাসের প্রথমে জানকীনাথ কংগ্রেস ভবনের উদ্বোধন করিবেন এবং কটক মিউনিসিপালিটি জানকীনাথের স্মৃতি রক্ষার্থে বর্ত্তমান "উড়িয়াবাজার" রোড "জানকীনাথ রোড" রূপে নামাকরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের সম্পত্তি পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে দান করা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই যে সম্ভব—যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। অর্থ উপার্জ্জন ও অকুণ্ঠিতচিত্তে দান—শরৎচন্দ্রের চরিত্রে এই বিশেষত্ব পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ। গুণমুগ্ধ দেশবাসী ইহার জন্য শরৎচন্দ্রকে আন্তরিক অভিনন্দন করিতেছে।

—✱—

দুর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ২০শে মার্চ্চ রবিবার, ১০ নং রিচি রোডে, শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে "দুর্ব্বার সঙ্ঘের" তৃতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ফাল্গুনী রায় সভাপতিত্ব করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত জগত দাশ গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

সভায় ফাল্গুনী রায়ের "বাজপাখী" নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রী', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "যুদ্ধ" প্রভৃতি কবিতা এবং জগতদাশের "শুক্রস্থান", সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের "গানের পাটীর পর" ও সমীর ঘোষের "নীলতারা" প্রভৃতি গল্প পঠিত হয়।

অতঃপর আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সভায় গভীর আলোচনা হয়। পরিমল বসু, অমিয় রাহা, নিমাই দাস এবং কল্যাণ সঙ্ঘের রমাকৃষ্ণ মৈত্র ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আলোচনায় যোগদান করেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় সভার কাজ শেষ হয়।

ইম্পিরিয়াল টি,

আজকাল বাজারে প্রচলিত চায়ের মধ্যে "ইম্পিরিয়াল চা" স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে এক-প্রকার অতুলনীয় বলতেই হবে। ক্লান্তি অপনোদনে এক কাপ চা খুবই ভাল। কিন্তু চাটি ভাল হওয়া চাই। ইম্পিরিয়াল টিতে এ সব গুণই আছে।

নিলিমা-রোহিনী

ছায়া-চিত্র জগতের প্রদর্শক মহলের সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ, এম্-এ-বি-এল মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী নিলিমার সহিত, বিক্রমপুর মালখানা নিবাসী ৺ কৃতান্তকুমার বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রোহিনী কুমারের শুভ-উদ্বাহ গত পূর্ব্ব সপ্তাহে কলিকাতায় সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের টালীগঞ্জস্থ ভবনে বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ হিসাবে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মিলন ঘটিয়াছিল। বাঙলার বহু সংবাদপত্র সেবী, সিনেমা জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু ডিষ্ট্রিবিউটার্স, চিত্র-প্রদর্শক, চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পী এবং বহু ব্যবসায়ী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী হাস্য পরিহাস ও গল্প গুজবের মধ্যে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার মিটাইয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন অন্তে, আমরা অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছি। এই শুভ অনুষ্ঠানে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মিঃ আর, এন, সরকার, মিঃ বি, এন, সরকার, শেঠ রাধাকিষণ চামারিয়া, মিঃ বি, এল, খেমকা, শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মিঃ এল, আর, হেমাদ, শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু, মিঃ ভাস্কর

রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" চিত্রের একটি দৃশ্য

নিউ থিয়েটার্স

বিদ্যাপতি

"দিন আগত ঐ"............

তাই আজ লোকের মুখে মুখে বিদ্যাপতির নাম, তাঁর চিত্তহারী পদাবলীর আলোচনা, তাঁর অভিনব প্রেম-জীবনের মর্ম্ম কথা!

মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বি, এন, ঘোষ, মিঃ চন্দ্রশেখর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র নান, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ নান, শ্রীযুক্ত পি, এন, রায়, শ্রীযুক্ত সুধীর গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দেবদত্ত শীল, শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার ঘোষ।

শনিবার, ২রা এপ্রিল! এই শুভ-দিনটির প্রতীক্ষায় কতজন তাকিয়ে আছে, কতজন অধীর আগ্রহে দিন গুনছে! এই দিন আসচে উত্তর কলিকাতার নয়নাভিরাম প্রমোদাগার—"চিত্রায়," নিউ থিয়েটার্সের সর্ব্বজন আকাঙ্খিত এই বিচিত্র চিত্র কথা—"বিদ্যাপতি"!

বৎসরাধিক কাল আলোচনার অন্তে, এই ছবিখানি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার মত পরিচয় আর আমাদের জানা নেই। তাই আজ শুধু এইটুকু বোলেই শেষ কোরতে চাই যে—বিদ্যাপতি হোয়েচে নিউ থিয়েটার্সের এমন একটি সর্ব্বরসপুষ্ট অত্যুজ্জ্বল চিত্র, যা পরিচালনায়, অভিনয়ে, নৃত্য গীতাদির উৎকর্ষে, এবং দৃশ্যপটাদির মাধুর্য্যে—ভারতীয় ছায়াচিত্রের গৌরব ও আভিজাত্যকে আরো বাড়িয়ে তুলবে।

দেবকী বোসের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি এই "বিদ্যাপতি", আমরা আশাকরি তাঁর চণ্ডীদাসের গৌরবকেও ছাড়িয়ে যাবে। বিদ্যাপতির আর্টিষ্ট সম্বন্ধেও নতুন কিছু পরিচয় দেবার মত প্রয়োজন আছে বোলে আর মনে হয় না। এই চিত্রের শিল্পী-সঙ্ঘ, নিজ নিজ অভিনয় প্রতিভায় ভারতীয় ছায়া চিত্রের দরবারে তাদের স্থান করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা—বিদ্যাপতিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত কোরেচে। আমরা প্রার্থনা করি—এই সব শিল্পীদের শিল্প সাধনা অধিকতর শ্রীমণ্ডিত হোক।

অভিজ্ঞান

"আমিনা, আমিনা, আমিনা!"

বন্দিনী সন্ধ্যার কাছে আজ এই নামটি কত মধুর!

সে তাঁদের সমাজের নয়। সে এক মুসলমানের গৃহবধূ। স্নেহ, মমতা, করুণা ও সমবেদনায় তার অন্তরটি ভরা। সুন্দরী সে নিশ্চয়ই—কিন্তু মনের সম্পদের কাছে তুচ্ছ তার দৈহিক লাবণ্য।

সন্ধ্যার জীবনে অমিনার আবির্ভাব—যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ। সন্ধ্যা-উদ্ধারের ব্যাপারে অমিনা যে উপস্থিত বুদ্ধি ও দুর্দ্দমনীয় সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, ছায়া-চিত্রে তার প্রমান পেয়ে আপনি মুগ্ধ হ'বেন। পাশাপাশি এই দুটি বিভিন্ন ধর্ম্মী নারী-চরিত্রকে অবলম্বন কোরেই এই বিচিত্র ঘটনা-বহুল সামাজিক কাহিনীটি শাখাপল্লবিত হোয়েচে। হিন্দু ও মুস্লিম—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথায় বিরোধ এবং কেমন কোরে প্রীতি ও ঐক্যতার মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব—"অভিজ্ঞান" চিত্রে তার ইঙ্গিত পাবেন।

স্বামী পরিত্যাক্তা নারী, তার ভাগ্য দোষে অধিকার চ্যুত হোয়েও, কেমন কোরে তা'র মান মর্য্যাদা ও ধর্ম্ম রক্ষা কোরেও নিজেকে স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে পারে, সন্ধ্যার ঘটনা-বহুল জীবনের মধ্য দিয়ে তারই সুমহান কাহিনী, বাঙ্গলার তরুণ তরুণীর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। ইতিপূর্ব্বে এমন কাহিনী চিত্রপটে খুব কমই প্রতিফলিত হোয়েচে, যা' নিছক আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই সামাজিক জীবনের একটি বৃহত্তম সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতে সুস্পষ্ট কোরতে পেরেছে।

অভিজ্ঞান চিত্রটির পরিচালনা কোরেছেন অভিজ্ঞ পরিচালক প্রফুল্ল রায় এবং গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত, সর্ব্ব বিষয়ে এর সহায়তা কোরেছেন—ভারতীয় ছায়া-চিত্র জগতের সর্ব্বজনপ্রিয়, তরুণ পরিচালক—ফনী মজুমদার। সুতরাং এদের যুগল প্রচেষ্টায়, 'অভিজ্ঞান' চিত্র-টি যে নিউ থিয়েটার্সে'র সুনাম ও মর্য্যাদার উপযোগী হোয়ে উঠবে—একথা নিশ্চিত বলা যায়। এই ছবির সঙ্গীতাংশ পরিচালনা কোরেছেন স্বনামধন্য সুর-শিল্পী রাইচাঁদ বড়াল। প্রায় ১৪।১৫খানি গান এর সম্পদ বাড়িয়েছে।

শব্দানুলেখন ও ফটোগ্রাফীর উৎকর্ষতার দিক দিয়েও আমরা নিঃসন্দেহ। এই দুই বিভাগে নিউ থিয়েটার্সে'র দুইজন অভিজ্ঞ কর্ম্মীর হাত যশের তারিফ করবার আমরা অবকাশ পাব। এদের আপনারা সকলেই জানেন—বাণী দত্ত ও বিমল রায়।

আর্টিষ্ট নির্ব্বাচনের দিক দিয়েও কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন ত্রুটি রাখেন নি—তা' এর ভূমিকা-লিপির দিকে চাইলেই বোঝা যায়। আমরা বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আবার আলোচনা কোরব।

ছবিখানির বাঙ্গলা সংস্করণের সম্পূর্ণ পরিবেশনার ভার পেয়েছেন বাঙলার সুবিখ্যাত ডিষ্ট্রিবিউটার্স—প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড। কলিকাতায় "অভিজ্ঞান" প্রথম মুক্তিলাভ কোরবে—রূপবাণীতে।

অধিকার

এদের আনওয়ারশা রোডের দু' নম্বর ষ্টুডিওতে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার পরি-চালনায় যে সামাজিক চিত্রটি তোলা হচ্ছে, উভয় সংস্করণে তা'র নামকরণ করা হ'য়েচে—"অধিকার"।

জীবন-যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। নায়িকা ইন্দিরার জীবনেও পরাজয়ের গ্লানি সইতে হোয়েছিল। কিন্তু তা'র বিনিময়ে, ইন্দিরার নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত কোরতে পারে নি। এই দিক দিয়ে বিচার কোরলে এই নামকরণের সার্থকতা আমরা স্বীকার কোরতে বাধ্য।

ছবিখানির শিল্পী নির্ব্বাচন হোয়েছে ভালই। নায়ক নিখিলেশের ভূমিকায় বড়ুয়া—একমেবাদ্বিতীয়ম্! এই শ্রেণীর ভূমিকাভিনয়ে বড়ুয়ার জুড়ি নেই।

উপ-নায়িকা রাধার ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকার অভিনয় যে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাকে ম্লান কোরে দেবে—এর প্রমাণও আমরা পেয়েছি।

বস্তীবাসীদের মধ্যে উপনায়ক রতনের ভূমিকায় পাহাড়ীর নির্ব্বাচন যথাযথই হ'য়েচে। এ শ্রেণীর Boisterous lover বা 'জবরদস্ত প্রেমিক' বোলতে পাহাড়ী অতুলনীয়।

এ ছাড়া বস্তী বাসিন্দারূপে গান মাত কোরে দেবে—পঙ্কজ মল্লিক এবং প্রতাপ মুখুজ্জ্যে।

শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখুজ্জ্যে—দুটি মাণিক-জোড়ের কথা আমরা গত হপ্তায় লিখেছি। হাসির খোরাক জুগিয়ে এই যুগল অভিনেতা (লরেল ও হার্ডি?) এবার আমাদের কী হাল কোরবেন, আমরা আজ শুধু সেইটুকুই ভাবচি!

দু' নম্বরের কর্ম্ম-সচীব ছোটাইবাবু, প্রডাকশান্ ব্যাপারের সর্ব্ব বিষয়ে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার সহযোগীতা কোরছেন। তাঁদের যুগল প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক—আমরা আজ এই প্রার্থনাই করি।

বড়দিদি

নায়িকা—মাধবী; আমাদের বড়দিদি। ছোটবোন—প্রমীলা; ছোট্ট মেয়েটি!

হিন্দি ও বাঙলা সংস্করণের জন্য প্রমীলা'র ভূমিকাভিনয়ের উপযোগী, দুটি ছোট মেয়েকে সংগ্রহ কোরতে পরিচালক মল্লিক মহাশয়কে বিলক্ষণ বেগ পেতে হোয়েচে। কিন্তু আমরা সুখী হ'লাম—মল্লিক মহাশয় সফলকাম হোয়েছেন। যে দুটি নবাগতা এই চিত্রে প্রমীলারূপে হিন্দি ও বাঙলায় আত্মপ্রকাশ কোরবে—ষ্টুডিওর টেকনিকাল বিভাগের টেষ্ট পরীক্ষায় তা'রা সসম্মানে উত্তীর্ণা হওয়ার পর, পরিচালকের বিচারেও অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে, ছাড় পত্র পেয়েচে। প্রডাকশান বিভাগে বহুকাল 'পোড়খেয়ে' মল্লিক মহাশয় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন, আজ প্রাপ্ত বয়সে, স্বাধীন ভাবে পরিচালনার ভার লাভ কোরে, আশাকরি

তিনি তা' ষোল আনা কাজে লাগাতে পারবেন। এই ছবিখানিকে সকল দিক্ দিয়ে, সর্বাঙ্গসুন্দর কোরে গোড়ে তুলতে যতখানি আন্তরিকতা, যত্ন ও পরিশ্রম দরকার—তার সবখানি প্রয়োগ কোরতে, তিনি যে কার্পণ্য কোরছেন না—এর পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দ লাভ কোরলুম। সহকারী হিসাবে মল্লিকমহাশয়ের সহযোগীতা কোরছেন আমাদের পরম স্নেহভাজন, কৃতবিদ্য সহ-কর্ম্মী শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

আশাকরি আগামী বারে 'বড়দিদি'-র সম্পূর্ণ ভূমিকা লিপি এবং টেকনিশিয়ানদের পরিচয় জানাতে পারব।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

ডাইরেক্টার ফণী মজুমদারের নতুন বই ষ্ট্রীট সিঙ্গারএর বাঙলা সংস্করণ হ'বে বলে স্থির হয়েছে। শুধু স্থির হয়েছে কেন শুটিংও আরম্ভ হয়ে গেছে। এই বইখানিতে যে 'ষ্টার' গুলিকে নামান হ'চ্ছে তাতে মনে হয় যে এর বাঙলা সংস্করণ অদ্ভুত সাফল্য লাভ করবে। কানন ও সাইগাল ভারতের চিত্রামোদীদের কাছে এরা যে কত প্রিয় তা বোধহয় কারও অজানা নেই। তাছাড়া মল্লিক মশাইও এর বাঙলা সংস্করণে নামবেন।

দেশের মাটী

"দেশের মাটীর" বহির্দৃশ্যের কাজ শেষ কোরে নীতীন বসু ষ্টুডিওর সেটে কাজ করবার জন্য তৈরি হ'চ্ছেন। এই সেট্‌টি খুব বৃহৎ বলে পরিচালক শব্দযন্ত্রী মুকুল বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা কোরছেন।

সাইগল, জগদীশ, দুর্গাদাস, উমা, কমলেশ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি এই দৃশ্যে নামবেন বলে নিজ নিজ ভূমিকার উৎকর্ষের জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

নিউ সিনেমা

এখানে গত শনিবার থেকে কুলদীপক বা "পাহাড়ী হীরা" দেখান হচ্ছে। ছবিখানা

নিউ থিয়েটাসের "বিদ্যাপতি" চিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও কাননবালা

থিলে ভরা। মানুষ যতক্ষণ বসে দেখবে—তার সমস্তটাই পুরো আনন্দে ভোগ ক'রবে। দেশী ছবির মধ্যে—এরকম উত্তেজিত আবহাওয়া খুব কমই দেখা গেছে। —আমরা আশাকরি ছবিখানি এখানে ভাল-ভাবেই চল্‌বে।

চিত্রা

এই সপ্তাহই মুক্তির শেষ সপ্তাহ। এর পর অর্থাৎ ২রা এপ্রিল থেকে এখানে বিদ্যাপতি দেখান সুরু হ'য়ে। —মুক্তি যে ভাবে এখানে এখনও চল্‌ছিল তাতে আমাদের ধারণা ছিল যে—আরও ১০ সপ্তাহ চলার মতই চলতে পারে। কিন্তু কতৃপক্ষ বিদ্যাপতিকে আর বাক্স বন্দী করে রাখতে চান্ না। কেন না এখানে বিদ্যাপতি দেখান সুরু না হ'লে বাঙলা সংস্করণ আর কোথাও দেখান হ'তে পারে না।

পূর্ণ থিয়েটার

আস্‌ছে শনিবার ২৬শে থেকে মুক্তি এখানে দেখান হ'বে। যাঁরা এখনও চিত্রায় "মুক্তি" দেখে উঠতে পারেন নি—তাঁরা দক্ষিন কলিকাতায় এই চিত্র গৃহে দেখে নিতে পারবেন—এই আশায় নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ এই রকম Continuous run এর ব্যবস্থা করেছেন। মুক্তি সম্বন্ধে নূতন করে কিছু বলবার নেই। ছবির প্রধান সম্পদ পঙ্কজ বাবুর ও কাননের গান যে দর্শকদের মোহিত করে দেবে, তা আমরা জোর করেই বলতে পারি।

কালী ফিল্মস্,

এদের রবিন্দ্রনাথের "চোখের বালি"-র

শুটিং দ্রুতগতিতে চলেছে। সম্প্রতি পরিচালক সতু সেন বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্র উধাও হওয়ার পরের দৃশ্যটি একটি বৃহৎ সেটে তোলা আরম্ভ করেছেন। শোনা যাচ্ছে এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রে সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়, ডাঃ, হরেণ মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি চরিত্রোপযোগী অভিনয় কোরছেন। বি, পি, মেহরার তত্ত্বাবধানে ছবিখানা তোলা হ'চ্ছে।

"সর্ব্বজনীন বিবাহোৎসব"

উত্তরায় "সর্ব্বজনীন বিবাহউৎসব"—এই শনিবার থেকে পঞ্চম সপ্তাহে পড়বে। ছবিখানা সাধারণে সাদরে গ্রহণ কোরেছে তার প্রমাণ "উত্তরা'য় জনসমাগম। এখানি একখানি নূতন ধরণের কমেডি-চিত্র। শিক্ষা ও আমোদ দু'দিক থেকেই এই ছবিখানির মূল্য সমভাবে দর্শকদের আকৃষ্ট করে।

হাজরা পিকচার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভক্তিমূলক বাণী চিত্র "দেবী ফুল্লরা"-র শুটিং তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় অর্দ্ধেকের উপর সমাপ্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে একটি বৃহৎ সেটে রাজ-প্রাসাদের আংশিক দৃশ্য তোলা শেষ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কালকেতু দেবী আরাধনায় যখন ব্রতী সেই দৃশ্যটীও অতি চমকপ্রদ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। এতাবধি এখানে যতগুলি পৌরাণিক ছবি তোলা হইয়াছে, কাহিনীর চমৎকারিত্বে "দেবী ফুল্লরা"-কে অপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে আছে সতীত্বের তেজ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের চাঞ্চল্যকর অভিযান, শয়তানের বিভীষিকাময় প্রতিচ্ছবি, প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। তদুপরি বাঙ্গলার অন্যতম যশস্বী পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ছবিখানা পরিচালনা করিতেছেন, তরুণ শিল্পীদ্বয় বিভূতি লাহা ও যতীন দত্ত যথাক্রমে আলোক চিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজে নিয়োজিত আছেন। ছবিখানির ভূমিকালিপিতে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুবালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রাধারাণী, মোহন রায়, বাণী চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। এই সবের যোগাযোগে "দেবী ফুল্লরা" যে বাঙ্গলার চিত্র জগতে এক অভিনব আকর্ষণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে এ ধারণা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

রাধা ফিল্মস্

পরিচালক ফণি বর্ম্মা "জনক নন্দিনী" নামে একখানি পৌরাণিক ছবির শুটিং সুরু কোরেছেন। ছবিখানিতে বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন—সুশীল রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, রবি রায়, ছায়া প্রভৃতি।

মতিমহল থিয়েটার্স

পরিচালক হরি ভঞ্জের পরিচালনায়

এদের হেমেন রায়ের "যখের ধনের" শুটিং চলেছে। সুনীল রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছায়া প্রভৃতি আপাততঃ ভূমিকালিপিতে নির্ব্বাচিত হ'য়েছে।

জ্যোতিষ ব্যানার্জির পরিচালনায় এরা "সুভদ্রা হরণ" নামে একখানা পৌরাণিক চিত্র তোলার ব্যবস্থা কোর্‌ছেন। এতে রাণীবালা নাম ভূমিকায় অবতীর্ণা হবেন।

প্রাইমা ফিল্মস

অত্যল্পকালের মধ্যে এই চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটি চিত্রজগতে সুপ্রসিদ্ধি লাভ কোরেছে—জনপ্রিয় চিত্রের পরিবেশনা কোরে। এদের পরিবেশিত নিউ থিয়েটার্সের "মুক্তি" আজ বাংলার আবালবৃদ্ধ বণিতাদের মনে এক নব উন্মেষণার রেখাপাত কোরেছে। সম্প্রতি এরা নিউ থিয়েটার্সের "অধিকার" চিত্রের পরিবেশনার অধিকার লাভ কোরেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে আছেন মনোরঞ্জন ঘোষ, সুধীর নান, ফণি নান ও এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য কর্ম্ম সচীব নরেশ ঘোষ। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির কামনা করি।

প্রফুল্ল পিকচার্স

এদের পরবর্ত্তী সামাজিক চিত্র প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "দানের মর্য্যাদা"-র শুটিং আরম্ভ হ'য়েছে। এদিকে প্রফুল্ল ঘোষ পৌরাণিক কাহিনী "কমলে কামিনী" পূজার সময় দেখাবার জন্ত তৈরি হ'চ্ছেন।

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

ভারতের হিন্দু রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে শ্রীযুত শুভেন্দ্র মোহন বসু মজুমদার মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানাইতেছি।

তিনি পৌরাণিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে রাজমালা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপত্তিগুলি একে একে দেশের ঐতিহাসিক এবং সুধীসমাজের সম্মুখে যথাশক্তি আলোচনা করিতেছি।—

বসু মজুমদার মহাশয় রাজা যযাতির পৌত্র (পুরুর পুত্র) জনমেজয় হইতে রাজমালার প্রথম সূচনা করিয়াছেন। তিনি জনমেজয়ের পৌত্র (প্রাচিম্বানের পুত্র) করিয়াছেন প্রবীরকে। প্রবীর প্রাচিম্বানের পুত্র নহেন, খুল্লতাত। রাজা যযাতির পুত্র পুরুর প্রথমা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জনমেজয় এবং দ্বিতীয়া মহিষী পৌষ্টীর গর্ভে প্রবীর, ঈশ্বর ও রৌদ্রাশ্ব এই চারিপুত্র জন্মে। (কালীপ্রসন্ন-অনূদিত মহাভারত আদিপর্ব)। প্রাচিম্বানের পুত্র সংযাতি।

পুরুরাজ-পুত্র রৌদ্রাশ্বকে তিনি দেখাইয়াছেন অহম্পাতির পুত্র। অহম্পাতির সহিত রৌদ্রাশ্বের কোন যোগাযোগ খুঁজিয়া পাই নাই। রৌদ্রাশ্বের ঋচেয়ু, ঋক্ষেয়ু (কক্ষেয়ু), কৃকণেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, বনেয়ু, জলেয়ু, তেজেয়ু, সত্যেয়ু, ধর্ম্মেয়ু, সন্নতেয়ু নামক যে দশপুত্র জন্মিয়াছিল তাহা অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে, ঘৃতাচির গর্ভে নয় (কালীপ্রসন্ন-অনূদিত মহাভারত—আদিপর্ব)—"মিশ্রকেশী গর্ভেতে জন্মিল দশজন—" কাশীরাম দাস। বসু মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—'কক্ষেয়ুর সভানর, চাক্ষুষ ওপরমন্যু নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। কক্ষেয়ুর পুত্রমধ্যে তিনি সভানরকে কোথায় পাইলেন? তিনি কি জানেন না যে সভানর পুরুরাজের অগ্রজ যযাতি-তনয় অনুর পুত্র?—"অনোঃ সভানরঃ পুত্রস্তস্মাৎ কালাঞ্জয়োহভবৎ।" সভানরের পুত্র কালানল বা কালাঞ্জয়। তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়, পৌত্র পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয় (২য়), তৎপুত্র মহাশাল। মহাশালের পুত্র উশীনর বা মহামনা। মহামনার পুত্র তিতিক্ষু। তিনি (বসু মজুমদার মহাশয়) কিন্তু মহাশালের পুত্র মহামনা, মহমনার উশীনর ও তিতিক্ষু দুই পুত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি করিয়া হয়! গরুড় পুরাণে আমরা পাইতেছি—"জনমেজয়স্তু তৎপুত্রো মহাশাল-সুতাত্মজঃ। মহামনা মহাশালা দুশীনর ইৎস্মৃতঃ॥···মহামনোজাস্তিতিক্ষো:।"

তিতিক্ষু হইতে ধর্মরথ পর্য্যন্ত বসু মজুমদার মহাশয় কয় পুরুষ, যাহা হউক একপ্রকার টানিয়া আনিয়া আবার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—'ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ।···চিত্ররথের পুত্র দশরথ। দশরথ রোমপাদ নামে প্রসিদ্ধ।' আমরা তাঁহাকে অন্ততঃ মহাভারত খানি মনোযোগ সহকারে পড়িবার জন্ত সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। তিনি মহাভারত উল্‌টাইয়া দেখুন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন —"রোমপাদ রাজা দশরথের সখা। তিনি

অঙ্গদেশের অধিপতি।" অঘোর নাথ বরাট অনুবাদিত রামায়ণ; আদিকাণ্ডের একস্থানে সুমন্ত্র বলিতেছেন—"ইক্ষাকুবংশে দশরথ নামে সত্যপ্রতিজ্ঞ, শ্রীমান্ ও অতিশয় ধার্মিক একরাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। অঙ্গরাজ-পুত্র রোমপাদের সহিত রাজা দশরথের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে।

তাঁহার মতে—"রোমপাদের পিতা চিত্ররথ।" কিন্তু চিত্ররথ তো হইবে না, হইবে ধর্মরথ। —"রোমপাদো ধর্মরথাচ্চ-তুরঙ্গস্তদাত্মজঃ"—প্রামান্য গ্রন্থের উক্তি। বসুমজুমদার মহাশয় তারপর যাহাই লিখুন, তবু তাঁহাকে স্বীকার পাইতে হইবে যে, বৃহৎ-কর্মার পুত্র বৃহদ্ভানু, পৌত্র বৃহন্মনা, প্রপৌত্র জয়দ্রথ, বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিজয় এবং অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ধৃতি। —"বৃহৎকর্মা সুতস্তস্য বৃহদ্ভানুস্ততোঽভবৎ॥ বৃহন্মনা বৃহদ্ভানোস্তস্য পুত্রো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্য বিজয়ো বিজয়স্য ধৃতিঃ সুতঃ॥" —গরুড়পুরাণ। পরে ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, পৌত্র সত্যধর্মা, সত্যধর্মার পুত্র অধিরথ, অধিরথ-সুত মহাবল কর্ণ, কর্ণনন্দন বৃষকেতু বা বৃষসেন—ঠিকই লিখিয়া পরিশেষে বৃষকেতুর পুত্রে পৃথুসেনকে তিনি কোথা হইতে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। গরুড় পুরাণে বৃষকেতুর একপ্রকার সমসাময়িক এক পৃথুসেন আমরা পাই, তিনি —"রুচিরাশ্ব সেনজিতঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ।" বসু মজুমদার মহাশয় সম্ভবতঃ সেই পৃথুসেনকে গোঁজামিল দিয়া প্রকাণ্ড একটি হাঙ্গামা মিটাইয়াছেন।

ইতিহাসকে তিনি এতখানি সহজ ভাবিলেন কেন?

তাঁহার প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে বীর সেন বৃষকেতুর পৌত্র। স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রি-খণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে কি আছে বসু মজুমদার মহাশয় একবার তাহা অভিনিবেশ সহকারে দেখুন—"সৌম্মিনী দেবতাভক্তঃ শাণ্ডিল্যাখ্য ঋষেঃ কুলে। মহারাজ ইতিখ্যাতস্ততোভুস্তুবশঙ্করঃ। তদন্বয়ে চক্রবর্তী চন্দ্রসেন ইতীরিত। তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোঽপিচ।" কাজেকাজেই বীরসেনকে সামন্ত সেনদেবের পিতার আসনে বসাইতে পারি না, তেমনি আবার পৃথুসেনকে বীরসেনের পিতা করাও চলে না। বিজয়সেনদেবের দেওপাড়া লিপিতে আছে—"দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতি যে সকল কীর্তিমান নৃপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, পরাশর নন্দন বেদব্যাসের লেখনীতে যাঁহাদের কীর্তি বিঘোষিত হইয়াছে, তাঁহাদেরই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন" ইহার মানে কি হয় বীরসেন সামন্তসেনের পিতা? অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র তদীয় Indu Aryan নামক ইংরাজী গ্রন্থে মহারাজ সামন্তসেন দেবের ঊর্দ্ধ এবং অধস্তন পুরুষের তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বীরসেনের পুত্র সামন্ত সেন লিখিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে সম্বন্ধ নির্ণয়ের লেখক লালমোহন বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"এই তালিকাদ্বারা তিনি (রাজেন্দ্রলাল) সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রমাণকে অতি দুর্ব্বল বলেন,, বস্তুতঃ তাঁহারই প্রমাণ অতি ক্ষীণ।"

কর্ণ নন্দন বৃষসেন ভারত যুদ্ধে নিহত হন। মহাবীর কর্ণও নিহত হইয়াছিলেন। ভারত যুদ্ধের সময় হইতেছে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৯৩৭ বৎসর পূর্ব্বে। এবং সামন্তসেনদেব সিংহাসনারোহণ করেন ১০২১ খৃষ্টাব্দে (নগেন বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সামন্তসেন দেবের সিংহাসনারোহণ বর্ষের ২৯৫৮ বৎসর পূর্বে ভারত যুদ্ধ হইয়াছিল। অর্থাৎ বৃষকেতু হইতে সামন্ত-সেনদেব পর্য্যন্ত সময় হইতেছে ২৯৫৮ বৎসর। এই দীর্ঘাতিদীর্ঘতম ২৯৫৮ বৎসরের মধ্যে বসুমজুমদার মহাশয় মাত্র দুইটি পুরুষকে রাজত্ব করাইয়াছেন।—একটি পৃথুসেন অপরটি বীরসেন। ইতিহাস রচনা করিতে বসিলে অনেকখানি বিচার বুদ্ধি এবং বিবেচনা আবশ্যক হয়। তাঁহার এতখানি যথেচ্ছাচার তাই সকলের মনে গভীর আঁচর পাত করিয়াছে।

গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনদেবের তিন পুত্র ইহা আমরা চিরদিনই জানি। কোনো ইতিহাসেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং বহুতেই উক্ত হইয়াছে মাধব (বা দনুজ মাধব), কেশব এবং বিশ্বরূপ লক্ষ্মণসেন দেবের এই তিন পুত্রই। বসুমজুমদার মহাশয়ের পুরন্দর সেন লক্ষ্মণসেন দেবের "অন্যতম পুত্র" কিছুতেই হইতে পারেন না। পুরন্দরসেন বাৎসুকীগোত্রীয় সেন কুলোদ্ভূত দক্ষিণ রাঢীয় মৌলিক কায়স্থ রমানাথ সেন নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র। আর লক্ষ্মণসেনদেব ছিলেন ব্রহ্ম বা কর্ণাট ক্ষত্রিয়। বিজয়সেনদেবের দেওপাড়া লিপিতে আছে—"স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাম জানি কুলশিরো-দাম সামন্তসেনঃ।" সিরাজগঞ্জের তাম্রশাসন ও লক্ষ্মণসেনদেবের মাধাইনগরের তাম্র-লেখ তেও ঐ একই কথা উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। রমানাথ সেনের পূর্ব্বপুরুষ সর্ব্বপ্রথম কান্যকুব্জে আগমন করেন। রমানাথ পরে কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। মহেশ ঠাকুরের বাৎসুকী কুলগাথায় আছে—

(ক্রমশঃ)
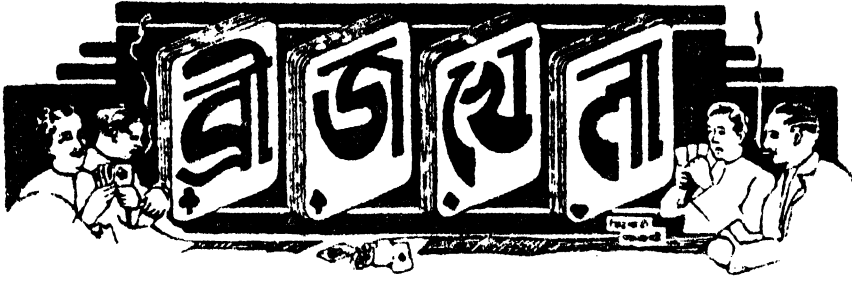
শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রতিযোগিতার একটি হাত

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, × ।
হরতন—গোলাম, আটা, দুরি ।
রুহিতন—দশ, চৌকা ।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, দশ, সাতা, ছক্কা ।

ইস্কাবন—×, ×, × ।
হরতন—টেক্কা, বিবি, দশ, ×, ×
রুহিতন—টেক্কা, × ।
চিড়িতন—সাহেব, ×, × ।

পূর্ব্বোক্ত হাতে ডাক হয়েছিল এইরূপ,

'দ'	'প'
একটি হরতন ।	পাশ ।
দুইটি হরতন ।	পাশ ।
চারটি হরতন ।	পাশ ।
'উ'	'পূ'
দুইটি চিড়িতন ।	দুইটি রুহিতন ।
তিনটি হরতন ।	পাশ ।
পাশ ।	পাশ ।

যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে এই হাতখানি দেখলে চাওটির খেলা করা অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কেমন অনায়াসে এই হাতটিতে গেম করে নেওয়া যায়।

(১) 'প' রুহিতনের দুরি খেলায় 'উ' রুহিতনের চৌকা, 'পূ' রুহিতনের সাহেব দিলেন। 'দ' টেক্কা মেরে পিট নিলেন।

(২) 'দ' হরতনের টেক্কা খেড়ে খেলায় সকলেই ছোট ছোট হরতন দিয়ে গেলেন।

(৩) 'দ' পুনরায় হরতনের ছোট তাস খেললেন, এবং 'উ' হরতনের আটার পিট নিয়ে গেলেন। এ ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের মনে সাধারণতঃ প্রশ্ন আস্তে পারে যে 'দ' এইভাবে খেল্লেন কেন? তার উত্তরে বলা যায় যে, 'দ' দেখলেন যে সর্ব্বশুদ্ধ প্রতিপক্ষকে তাঁর দেয় পিট হচ্ছে চারখানি (একখানি ইস্কাবনে, একখানি হরতনে, একখানি রুহিতনে ও একখানি চিড়িতনে), অথচ একখানি পিট কম না দিলে তাঁদের গেম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং সাধারণ খেলোয়াড়গণ যা' করে থাকেন তিনি তা' করলেন না অর্থাৎ ইস্কাবনের টেক্কায় 'উ'র হাতে নিয়ে হরতনের গোলাম খেলে 'ফিনাস' নিলেন না। তার কারণ তিনি দেখলেন যে 'ফিনাস'টি যদি একবার ফস্কে যায়, তাহলে তাঁর গেমটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য তিনি 'উ'র হাতে যাবার দুইটি পন্থা বর্ত্তমান রেখে দিয়ে প্রথমতঃ রঙের সাহেবের পিটখানি দিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন। এরূপ করার ফলে অতি অনায়াসেই তিনি গেম করে নিতে সমর্থ হলেন। বিপক্ষদল মাত্র পিট পেলেন একটি রুহিতনে, একটি চিড়িতনে ও একটি হরতনে,—বাকি ইস্কাবনের পিটখানি তাঁরা আর পেলেন না। এই হাতখানি দেবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে অনেক সময় ডাক দেওয়ার ভুল হয়ে যায় বটে, কিন্তু সবিশেষ চিন্তা করে খেললে অনেক ক্ষেত্রেই খেলা করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। বিপক্ষদলের হাতখানি ছিল এইরূপ,

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, × ।
হরতন—সাতা, ছক্কা ।
রুহিতন—সাহেব, বিবি, ×, ×, × ।
চিড়িতন—টেক্কা, ×, × ।

ইস্কাবন—বিবি, দশ, আটা, দুরি ।
হরতন—সাহেব, ×, × ।
রুহিতন—গোলাম, পঞ্জা, চৌকা, দুরি ।
চিড়িতন—×, × ।

বাসন্তিকা

শ্রীসমীর কুমার ঘোষ

(১)

অশোক ফুলে দুয়ার খুলে
আনলে তুমি কে—
আঁচল ভরা পলাশ-ঝরা
চিনতে পারিনে!
অরুণ রংয়ে সারা আকাশ
রঙীন দোল—সারা বাতাস
চাঁপার কলি সাজাঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল যে!

(২)

সবুজ পাতা গায় কি গাঁথা
কাহার বিজয়ে—
আমের ডালে সাজ-সকালে
মুকুল নিলয়ে
মৌমাছিরা কিসের তরে
গুণ্ গুণায়ে আমোদ ভরে,
হঠাৎ আসি' উঠলো হাসি
কার মানসী এ!

(সি, বি)

মেয়োরী শীল্ড

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা

গত সপ্তাহে শনিবার বাংলা দলের সঙ্গে ভূপাল দলের খেলাটি হবার পর আন্তঃপ্রাদেশিক হকি লীগ প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হয়েছে। বাংলা দল এই প্রতিযোগিতাটির একটি খেলাতেও পরাজয় স্বীকার না করায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে বিজয়ী সম্মানে ভূষিত হয়েছে। ১৯৩৬ সালের আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে 'মানভাদার' হকি টীমটিকে এক গোলে পরাজিত করে বাংলা দল এই প্রতিযোগিতার বিজয়লাভের সূত্রপাত করে। সেই বৎসর এই প্রতিযোগিতাটি 'নক্ আউট' পদ্ধতিতে খেলা হয়েছিল এবং এ বছর প্রতিযোগীদলগুলির সংখ্যা কম হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ 'লীগ' পদ্ধতিতে খেলাতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৩০ সালে লাহোরের দ্বিতীয় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতাটিও প্রতিযোগীদলগুলির সংখ্যা অল্প হওয়ায় লীগ পদ্ধতিতে খেলান হয়েছিল। ১৯২৮ সালে আমষ্টার্ডামে একটি ভারতীয় হকি টীম পাঠানর উদ্দেশ্যে টীম মনোনয়ন করবার জন্য এই আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। এইবার নিয়ে এই প্রতিযোগিতাটি পাঁচবার খেলা হয় তার মধ্যে চারবার কলিকাতাতে খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল, কেবলমাত্র ১৯৩০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এ বছরের প্রতিযোগী প্রদেশগুলির মধ্যে বাংলা দল তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এমনকি অবশিষ্ট তিনটি দলের বাছাই করা খেলোয়াড়দের সম্মিলিত দলটিকেও বাংলাদল ৩—২ গোলে পরাভব স্বীকার করাতে বাধ্য করেছে। এই খেলাটির ফলাফল থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি যদি এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করত তাহলেও বাংলা দলের এই গৌরব অর্জ্জন সম্ভব হত। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় হকি টীম 'নিউ জিলাণ্ডে' তাদের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখাবার জন্য সেখানকার মেয়োরী অধিবাসীরা নিজেদের পছন্দমত একটি শীল্ড তৈয়ারী করে ভারতীয় দলটিকে উপহার দেয়। সেই 'মেয়োরী' শীল্ডটি ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশন কর্ত্তৃক আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা বিজয়ী দলকে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে বলে সাব্যস্ত হয়। এই বছর বাংলা দল এই শীল্ডটি প্রাপ্ত হয়েছে।

গত ১৫ই মার্চ্চ পাঞ্জাব এবং গোয়ালিয়র দলের খেলাটি হয়। শেষোক্ত দলটি ২—০ গোলে পরাজিত হয়। এই খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও উভয় দলই সমান শক্তিশালী ছিল এবং খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়া উচিৎ ছিল। গোয়ালিয়র দলের গোল রক্ষক খলিল, ব্যাক হালিম, এবং ফরওয়ার্ডে মথুরাপ্রসাদ ও ছোটেবাবুর খেলা ভাল হয়েছিল। রূপসিং প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচটির তুলনায় ভাল খেললেও তাঁর খেলা আশানুরূপ হয় নি। পাঞ্জাব দলের ব্যাক রাজিন্দার সিং, হাফব্যাকদ্বয় গিরধারীলাল ও কালেব এবং ফরওয়ার্ডদের মধ্যে বলবন্ত সিং ব্যতীত অন্যান্য সকলেই নিজেদের কর্ত্তব্য প্রয়োজনানুযায়ী পালন করেছিলেন। বিজয়ী দলের দুঃখভঞ্জন এবং চিরঞ্জিৎ প্রথমার্দ্ধেই একটি করে গোল করেন। বাংলা ও পাঞ্জাব দলের ম্যাচটি গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখে খেলা হয়েছিল। এই খেলাটি খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় এবং দুই দলকেই নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। পাঞ্জাব দল ৩—২ গোলে পরাজিত হলেও তাদের খেলা বিজয়ী দল অপেক্ষা কতকাংশে ভাল হয়েছিল। পাঞ্জাব দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সমবেত শক্তির প্রয়োগ এবং জয়লাভের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলা দলের অধিনায়ক এলেন, গালিবার্দ্দী, আর কার এবং অরুণ মিত্রের খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। পাঞ্জাব দলের মেহের সিং, রাজিন্দার সিং, কালেব, চিরঞ্জিৎ এবং গুরবচন সিং প্রশংসনীয় খেলা দেখিয়েছিলেন। প্রথমার্দ্ধে বাংলা দলের রেণ্টন এবং কার একটি করে গোল করার পর বিপক্ষ দলের দুঃখভঞ্জন একটি গোল প্রতিশোধ করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাঞ্জাব দলের
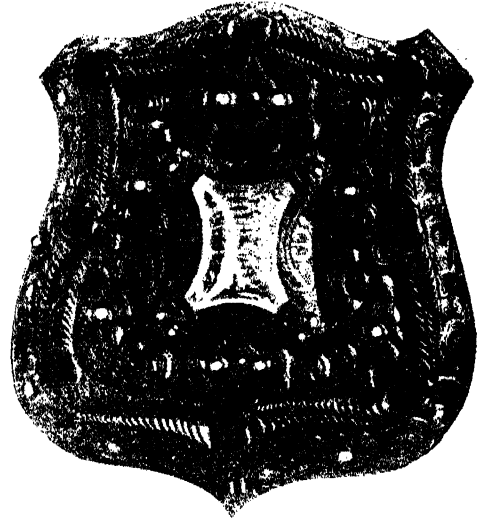
নাসিব পরাজয় সূচক গোলটি প্রথমে প্রতিশোধ করেন। শেষ সময়ে আর কার একটি গোল করায় বাংলা দল ৩-২ গোলে জয়ী হয়।

১৭ই মার্চ্চ তারিখে বাংলা দলের সঙ্গে বাকী তিনটি দলের বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে 'রেষ্ট' নামে একটি টীম গঠন করে একটি ট্রায়াল ম্যাচ্ খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই খেলাটিতেও বাংলা দল ৩-২ গোলে জয়লাভ করে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এই দিনের খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতা এবং উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। প্রথমার্দ্ধে মহম্মদ সাকুর একটি গোল করলে রেণ্টন কিছুক্ষণ পরে সে গোলটি শোধ দেন। শেষের দিকে কার আর 'দুটি গোল করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে পাঞ্জাব দলের গিরধারীলাল একটি গোল প্রতিশোধ করেন। আর কোন গোল না হওয়ায় বাংলা দল ৩-২ গোলে জয়লাভ করে।

বাংলা দল :—এলেন, সি ট্যাপসেল এবং সি হজেস, স্কট, সি ডিফোলটস, এবং গ্যালিবার্দ্দী, এ মিত্র, হেণ্ডারসন, আরকার, রেণ্টন এবং জি নিস্।

রেষ্ট দল :—খালিল আমেদ্ (গোয়ালিয়র) রাজিন্দার সিং (পাঞ্জাব) এবং হালিম (গোয়ালিয়র), আসান খাঁ (ভুপাল), বাস্রে খাঁ (ভুপাল) এবং গিরধারীলাল (পাঞ্জাব), আমেদ শের (ভুপাল), চিরঞ্জিৎ রায় (পাঞ্জাব), আব্দুল সাকুর (ভুপাল), মুনির আমেদ (ভুপাল) এবং বলবন্ত সিং (পাঞ্জাব)।

এই খেলাটি হবার পরের দিন পুনরায় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পাঞ্জাব ও ভুপাল দলের খেলাটি হয়। এই খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক আশা করা গেলেও প্রকৃতপক্ষে খেলাটিতে উত্তেজনা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব একেবারেই দৃষ্ট হয় নি। প্রত্যেক দল একটি করে গোল করায় খেলাটি অমীমাংসীত ভাবে শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতাটিতে এই একমাত্র খেলাটির শেষ মীমাংসা হয় নি। পাঞ্জাব দলের রাজিন্দার সিং এবং মেহের সিং গিরধারীলাল, চিরঞ্জিৎ, দুঃখভঞ্জন এবং মহম্মদ্ নাসিব উল্লেখযোগ্য খেলা দেখিয়েছিলেন। ভুপাল দলের ব্যাক ফারুক, সেণ্টার হাফ্ বাস্রে খাঁ, আসান খাঁ, মুণীর আমেদ এবং শাকুর দর্শনীয় খেলা দেখিয়েছিলেন। প্রথমার্দ্ধের শেষের দিকে পাঞ্জাব দলের দুঃখভঞ্জন একটি গোল করলে দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভুপাল দলের মুণীর আমেদ গোলটি পরিশোধ করেন। অবশেষে প্রতিযোগি দল দুটি একটি করে পয়েণ্ট ভাগ করে নেন।

গত শনিবার ১৯শে মার্চ্চ ক্যালকাটা মাঠে বাংলা দলের সহিত ভুপাল দলের খেলাটি হবার পর আন্তঃপ্রাদেশিক হকি

প্রতিযোগিতার এবারকার সব খেলাগুলি শেষ হয়ে গেছে। এই খেলাটি এই প্রতিযোগিতার সব চেয়ে ভাল খেলা হবে আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তার বিপরীত ব্যাপার ঘটেছিল। ভূপাল হকি টীমটির ভারতের মধ্যে একটি শক্তিশালী দল বলে খ্যাতি আছে এবং সেই কারণে বাংলা দলের সঙ্গে তাদের খেলাটি খুবই প্রতিযোগিতামূলক হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু খেলাটি আরম্ভের পরই বাংলা দলের প্রাধান্য পরিস্ফুট হয় এবং ভূপাল দল খুব নিন্দনীয় ভাবে খেলতে থাকে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভীষণভাবে আক্রমণ করে যদিও বাংলা দল ৪-০ গোলে জয়লাভ করেছে তা হলেও তারা আরও বেশী গোলে জয়ী হলে অস্বাভাবিক হত না। বাংলা দলের রক্ষণভাগকে সেদিন দর্শক হিসাবে সময় কাটাতে হয়েছে বলা চলে। এলেন সমস্ত খেলাটির মধ্যে মাত্র একবার বল স্পর্শ করেছিলেন। ভূপাল দলের মুণির আমেদ্‌ এবং সাকুর মাঝে মাঝে যে আক্রমণগুলি করছিলেন তা হজেস এবং ট্যাপসেলের অননুকরনীয় খেলার জন্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। বাংলা দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড আর কার সেদিন যে ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা সেদিনকার দর্শকেরা অনেকদিন স্মরণ রাখবে। ধ্যান চাঁদের পরই যে তাঁকে স্থান দেওয়া চলতে পারে তা তাঁর শত্রুরাও সেদিনকার খেলার পর স্বীকার করতে দ্বিধা করবে না। তিনি সেদিন ভূপাল দলের বিভীষিকা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। একমাত্র কারের অনসুকরনীয় আক্রমণ করিবার কৌশলের জন্যই সেদিন বাংলা দল চারটি গোল করতে পেরেছিলেন। তবে রেণ্টন এবং এ মিত্র তাঁকে উপযুক্ত ভাবে সাহায্য করেছিলেন। প্রথমার্দ্ধেই কার দুটি গোল করেন এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে রেণ্টন তৃতীয় গোলটি করার পর খেলাটি শেষ হবার এক মিনিট আগে কার চতুর্থ গোলটি করার পর ভূপাল দল ৪-০ গোলে পরাজিত হয় এবং বাংলা দল ১৯৩৮ সালের আন্তপ্রাদেশিক হকি চ্যাম্পিয়ান প্রতিপন্ন হয়।

বাংলাদল:—এ.লন (ক্যাপ্টেন), সি ট্যাপসেল এবং সি হজেস, আরিফ, সি ডিফোলটস্‌ এবং গ্যালিবার্দ্দী, এ মিত্র, হেণ্ডারসন, আর কার, রেণ্টন, এবং জি নিস্‌।

পাঞ্জাব দল:—মেহের সিং, রাজিন্দার সিং এবং হরভজন সিং, বলবীর কিষেণ, এ কালেব এবং গিরধারীলাল, গুরবচন সিং, চিরঞ্জিৎ রায় (ক্যাপ্টেন), মহম্মদ নাসিব, দুঃখভঞ্জন এবং বলবন্ত সিং।

ভূপাল দল:—মোসিন খাঁ, ইসমাইল (ক্যাপ্টেন) এবং ফারুক আলি খাঁ, আসান খাঁ, বাস্রে খাঁ, এবং কফিয়াৎ উল্লা, আমেদ শের, বদরুদ্দীন, আব্দুল সাকুর, মুণির আমেদ এবং কেনেট্‌।

গোয়ালিয়র দল:—খলিল মহম্মদ, বি জুতসি এবং হালিম, মামুদ আলি, আব্দুল হামিদ এবং সাফাত খাঁ, এস জ্যাঙ্গেল, ছোটেবাবু, মথুরাপ্রসাদ্‌, রূপ সিং (ক্যাপ্টেন) এবং কুঞ্জরু।

আন্তপ্রাদেশিক হকি লীগ টেবল

	খে	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
বাংলা	৩	৩	০	০	১১	৩	৬
পাঞ্জাব	৩	১	১	১	৫	৪	৩
ভূপাল	৩	১	১	১	৩	৬	৩
গোয়ালিয়র	৩	০	০	৩	২	৮	০

মিঃ ডিমেলো

এতদিন বাদে মিঃ ডিমেলো ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল্‌ বোর্ড এবং ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক পদ ত্যাগ করেছেন।

আই এফ এ

আই এফ এর নবনির্ব্বাচিত ইউরোপীয়ান সম্পাদক মিঃ ডেভিস্‌ পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

———

বড়দি

শ্রীসুশীল কুমার দত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

নির্ম্মল সশব্দে আপত্তি করিতে গেল কিন্তু বলা আর হইল না। বড়দি আশার সশব্দ আগমন টের পাইয়া চোখ টিপিতেই নির্ম্মলকে মৌন হইতে হইল। এবং অনতিবিলম্বে আশা পুতুলসহ আসিয়া পড়িলে, তাহার পুতুল দেখানো, সেদিনকার পুতুল দেখানোর বিভ্রাট বলা ও নির্ম্মলের উচ্চহাস্যে কক্ষটা মুখরিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া নায়েববাবু ও বড়দির বুকের দুঃসহ বোঝা অর্দ্ধেক যেন নামিয়া গেল। বাকীটা নামিল না আশার প্রতি নির্ম্মলের মনোভাব স্পষ্টভাবে জানিয়া লওয়ার অপেক্ষায়। অপেক্ষায় থাকিয়া দেখা পাওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাঁহাদের বুকের ভার পুনরায় দুঃসহ হইতে সুরু করিলে অকস্মাৎ একদিন অভাবনীয়রূপে ইহার মীমাংসা হইয়া গেল। সেদিন বৈকালিক চা পানের জন্য প্রস্তুত হইয়া নায়েববাবু তাঁরা ঢালা বিছানার একাংশে বসিয়াছিলেন। অন্যাংশে নির্ম্মল অন্যান্য দিনের মত আসিয়া এইমাত্র বসিয়াছে, সম্মুখেই মেঝেয় আশা তার পুতুলের ঘর-সংসার পাতিয়াছে এবং বড়দি চা-পানের অনুপানাদি আনিয়া সেই ঘরের এক কোণে বসিয়া সাজাইতেছেন; এমন সময়—

ইদানীং নির্ম্মল সেই হাতভাঙ্গা পুতুলের ভাঙ্গা হাতটা টিপিয়া দিলে আশা অত্যন্ত ঃঠিত। বলিত, তাহার পুতুল না হয় কথাই বলিতে পারে না তাই বলিয়া কি ভাঙ্গা হাত টিপিয়া দিলে তাহার লাগিবেনা? এখন তারই পুনরাভিনয়ে আশা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাতের ছোট্ট কাঁচের পুতুলটা নির্ম্মলের দিকে ছুড়িয়া বসিল। এবং নির্ম্মলের মাথায় তাহা আঘাত করিয়া বেশ একটু শব্দের সৃষ্টি করিলে বড়দির দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি চায়ের সাজ সরঞ্জাম ঠেলিয়া রাখিয়া সজোরে পা ফেলিয়া উঠিয়া আসিলেন।

পুতুলটা ক্রোধের বশে ছুড়িয়াছিল, তাহা যে সত্যসত্যই নির্ম্মলের মাথায় আঘাত করিবে আশা এমন চিন্তার ধার দিয়াও যায় নাই। তাই সে ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; এখন প্রহারের ভয়ে নির্ম্মলের পিছনে সরিয়া যাইতেই নির্ম্মল উঠিয়া বড়দিকে সবলে বাধা দিল। বাধা দেওয়ায় অনেক বাকবিতণ্ডার পর বড়দি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, আশাকে এখ'ন শাস্তি দেওয়া দরকার।

নিজের দোষের কথা স্মরণ করিয়া নির্ম্মল ব্যাকুল হইয়া বলিল, "আমি বলছি—এখুনি শাস্তি না দিলে ক্ষতি কিছু নেই। আমার কথাটা আজকের মত রাখুন বড়দি।" বিলম্বে রাগ পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব।

বড়দি পুনরায় কহিলেন, "না; এখুনিই দরকার নইলে তিরস্কার করায় কোন লাভ নেই। পরন্তু পাশের বাড়ীর পুষ্পবালার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে, কাল তার ছোট্ট বোনটাকে মিছিমিছি মেরেছে, আজ তোমাকেও বাকী রাখলেনা। শাসন না করলে, এরপর, এই ঝগড়া মারামারি শুরু একটা মস্ত বদস্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে।

—"মিথ্যেমিথ্যি 'ও' মারেনি বা ঝগড়া করেনি এ আমি স্বচক্ষে না দেখেও বলতে পারি। কেননা সে শ্রেণীর মেয়ে 'ও' নয়। তা' ছাড়া ছোট বেলায় একটু মারহাট্টা বা কলহপ্রিয় সকলেই থাকে; থাকা ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তা' বয়স বড় হলেও সে দোষ থাকে কিম্বা প্রত্যেকেরই বদস্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় এমন কোন নজীর নেই। আপনি হয়তো জোর করে বলবেন, হ্যাঁ আছে। থাকে ভাল নাথাকে নাভাল, সেকথায় কথা ক'য়ে আমি তর্ক করতে চাইনা। আমি যে বড় গলায় জোর করে বললাম আমার কথাটা রাখুন, তা আপনি রাখবেন না?"

—"কে তুমি বলত? ওর নেমন্তন্ন তুমি একবারো রাখনি, আমিও তোমায় অনেকবার ব'লেছি কিন্তু সবই হয়েছে ভস্মে ঘী ঢালা। আজ কিসের জোরে তোমার কথা মেনে চলতে আমায় তুমি বল? যেখানে সত্যিকারের সম্বন্ধ নেই সেখানে মান থাকেনা জোরও খাটেনা। তুমি স'রে দাঁড়াও আমি ওকে মারবই।"

—"একহাতে তালি বাজেনা। আমি ওকে আগে ঠুকেছি তবে 'ও' মেরেছে নইলে আমাকে মারতনা। তাহ'লেই বুঝুন, ওকে একথা' মারলে সেইটা পাঁচগুণ হ'য়ে আমারই বুকে বাজবে।"

বড়দি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "তা' বাজুক। অত কথায় কাজ নেই, তুমি এখন স'রে দাঁড়াও।"

—"তবু স'রে দাঁড়াতে হবে?"

—"হ্যাঁ হবে।"

—"তার মানে ঘুরিয়ে নাক দেখানো। মেয়েলী কথায় যাকে ব'লে ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো এ দেখছি তাই। স্পষ্টভাবে খুলে বললেই তো ভাল হয় যে, আমার বন্ধু এই

কাজ করেছে ব'লে আমাকেও আর বিশ্বাস করা চলে না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমার এখানে আসা সম্বন্ধে কিছু বলতে না পেরে আজ একটা তর্কের ছলে জানিয়ে দিতে চান। কেমন, তাই নয়?"

শুনিয়া বড়দির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল সেমুখে সহসা কোন কথা ফুটিল না। তাঁহাকে মৌন দেখিয়াই নির্ম্মল দরজার দিকে যাইতে উদ্যত হইয়া পুনরায় কহিল, "আমার অনুমানই তাহলে ঠিক্! বেশ—যাই তাহ'লে?"

বড়দি ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ যেন ফাটিয়া পড়িলেন। নির্ম্মলের পিঠেই গুম্‌গুম্ করিয়া দুই তিনটা কীল বসাইয়া দিলেন, কহিলেন, "বেরো, দূর হ'। আর কোন দিন এবাড়ীতে মাথা গলালে মাথা কাটিয়ে তবে ছাড়ব, চাকর দিয়ে বের ক'রে দেব—ইত্যাদি। নির্ম্মল চকিতে—তাঁহার মুখপানে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়াই চোখের জল মুছিতে মুছিতে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

নায়েববাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহেন নাই। হাসিমুখে দুই পাতানো ভাই-বোনেদের ঝগড়া দেখিতেছিলেন। এখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "ওকি! নির্ম্মলকে তাড়িয়ে দিলে? নির্ম্মল চলে গেল যে কাঁদতে কাঁদতে—এযে আমি স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না!"

বড়দি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কাতরতা লক্ষ্য করিলেন। আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "না গো না ওর চোখের জল 'ও' জল দুঃখের নয়, আনন্দের। 'ও' আবার আসবে।" বলিয়াই তিনিও খুব সম্ভব নিজের মুখ লুকাইতেই বাহিরে চলিয়া গেলেন। আশা অতশত বুঝিল না, ইহাই অব্যর্থ সুযোগ দেখিয়া পাশের ঘরে আত্মগোপন করিলে কিছুক্ষণ পরে বড়দি ফিরিয়া আসিলেন, স্বামীকে চা মিষ্টি দিলেন; দিয়া চুপ করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিলেন। যতই সময় কাটিতে লাগিল ততই নির্ম্মলের প্রত্যাবর্ত্তনে নিরাশ হইয়া আশঙ্কায় তাঁহার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন, নির্ম্মল কি তাঁহাকে ভুল বুঝিল নাকি?

নির্ম্মল ভুল বোঝে নাই। আত্মীয় স্বজনহীন সে দূর সম্পর্কের কাকার কাছে চাকরের মত থাকিয়া আগাছার মত অবহেলায় অযত্নে মানুষ হওয়ার কথা ভাবিয়া বুঝিয়াছে, তাহার বড়দি স্নেহের তুলনা হয় না। সেই গভীর স্নেহে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল বলিয়া নিজেকে সংবরণ করিতে তাহার বিলম্ব হইতেছিল। আসিয়াই বড়দির পায়ে প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনি আমার বড়দি নয়, সেই ছোট্টবেলা'র মা!"

শুনিয়া বড়দির মুখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিমুখে বলিলেন, "আমি যখন যা বলব শুনবে তো? আর অবাধ্য হবে না?"

নির্ম্মল সলজ্জে হাসিয়া কহিল, "না। যদি কখনো ক্রোধের বশে অবাধ্যতা কিছু ক'রে বসি তাহ'লে আজকের মত শাসন করবেন।"

—"বেশ। আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আশার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি তাহ'লে—

এ প্রস্তাব নির্ম্মল কখনো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তাই তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সে সম্মুখে যেন সাপ দেখিয়া বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল, "বিয়ে? আশার সঙ্গে?"

বড়দি সহাস্যে কহিলেন, "ভয় নেই। মা তার ছোট্ট ছেলেকে কখনো সাপ নিয়ে খেলা করতে দেয় না, বরং সেদিকে খুব সাবধানই থাকে।"

নির্ম্মল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া—হাসিল। সে হাসি জয়ের, কি লজ্জার বলিতে পারি না; জানি, তবু সে মৃদু আপত্তি করিতে ছাড়ে নাই। বলিয়াছিল, একথা শুনলে প্রেমেন্দ্র কিন্তু—, বাধা দিয়া বড়দি বলিয়াছিলেন, "থাক্। ওর নাম ক'রে এই সময়টাকে আর অপবিত্র ক'রো না। বলিয়া নির্ম্মলের পুনঃ প্রণামের পূর্ব্বেই তিনি তাহার প্রশস্ত ললাটে একটী নিখুঁত চুম্বন আঁকিয়া দিয়া নায়েববাবুর দিকে সস্নেহে ঠেলিয়া বলিয়াছিলেন, "ওকে প্রণাম কর।" মিনিট কয়েক পূর্ব্বে নির্ম্মলের

ভীতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে আশালতা পাশের কক্ষ হইতে বড় ভয়ে ভয়ে আসিয়াছিল। আসিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতেছিল কিন্তু তখন কিছুই বুঝে নাই, বুঝিয়াছিল—নির্ম্মলের সহিত তাহার বিবাহের সময়।

তারপর প্রায় সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। নায়েববাবুর টাকায় এবং দুর্দ্দম্য আবেগে নির্ম্মল ইউরোপ ঘুরিয়া বিদ্বান ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার উপাধি লইয়া ডাক্তার হইয়া ফিরিয়াছে। এ সংবাদ প্রেমেন্দ্রর কানে গেল আরো তিন বৎসর পরে,—তাহার কোন এক বন্ধু কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় চিকিৎসার্থে আসিয়াছিল, নির্ম্মলকে দেখাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিতেই সে কাঙালের মত ছুটিয়া আসিল নিজের দুরারোগ্য ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভের আশায়;—ডাক্তার নির্ম্মলের নাম তখন সহরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সে নিবিষ্টমনে বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কহিল, "সঙ্গদোষ না ঘটলে তো এমন রোগ হয় না! হ'ল কি ক'রে?" প্রেমেন্দ্র নতমুখে মৌন হইয়া রহিল দেখিয়া, নির্ম্মলের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। কহিল, " এ রোগ দুই-এক দিনে সারবার নয়। দু' তিন মাস এখানে থাকতে হবে।"

প্রেমেন্দ্র ব্যাকুল হইয়া হতাশকণ্ঠে কহিল, "থাকব কোথায়? এ রোগ যে বড় ছোঁয়াচে, থাকবার জায়গাই বা দেবে কে?

—"কেন আমার কাছে? অত কিন্তু হচ্ছিস কেন—এ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রে, নড়চড় হবার নয়।"

প্রেমেন্দ্র কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। মুখ লুকাইতে সে তাহার নতমস্তক আরো একটু নামাইয়া ফেলিল। মাস দুই থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিলে অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করিল, "শুন্‌লাম তুই নাকি আমার মাকে আজও বড়দি ব'লে ডাকিস্। একথা কি সত্যি?"

—"হ্যাঁ। পূর্ব্বের তুলনায় বিয়ের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত বড়দির কাছে যা' পেয়েছি তা' কিছুই নয়।"

প্রেমেন্দ্র স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ভাবিয়া পাইল না, কি সেই বস্তু (!) যার কাছে সুন্দরী স্ত্রী ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ—অর্থাৎ কামিনী এবং কাঞ্চন—দুই-ই ম্লান হইয়া যায়!

(সমাপ্ত)

নিয়তি

(গল্প)

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঘোড়াটা অষ্ট্রেলিয়ান্ ওয়েলার, হয়ত' কোন লক্ষপতি রেসের জন্যে আনিয়েছিলেন। নিয়তি তাকে বেঁধেছে দিল্লীর রাজপথে এক টাঙ্গার জোয়ালে। কে জানে কি খুঁৎ হয়েছিল, হয়ত' রেসকোর্সে তার জীবনের প্রথম রেসেই ইঁদুরের গর্ত্তে পা পড়েছিল, কিংবা নালগুলো খুব যত্নকরে ঠোকা হয়নি, কিংবা হয়ত' জকিটাকে কেউ ঘুষই খাইয়েছিল, —ঘোটের মাথায় টারফে তার স্থান হয়নি। পরিবর্ত্তে সে দিল্লী জংসন থেকে দরিয়াগঞ্জের সড়ক ধরে' নিউ দিল্লী পর্য্যন্ত ছোটে, পিছনে ওই দু'চাকার টাঙ্গা, মানুষগুলো বসেছে ঘোড়ার দিকে পিছন ফিরে। শুধু টাঙ্গাওয়ালা চাবুক হাতে তার দিকে ফিরে আছে।

হতভাগা ঘোড়া, টাঙ্গাওয়ালা নিলামের ডাকে তাকে কিনে এনেছে, তার দাদার কিংবা ডেমের খবর সে রাখেনা। অষ্ট্রেলিয়ান্-ওয়েলারই হোক্ আর আরবের টাট্টু হোক্, টাঙ্গাওয়ালা চায় কদমচালে তার টাঙ্গাখানা টানাতে। বেশী তেজের দরকার নেই, একটু নিবীর্য্য হওয়াই ভাল, কম কম খেতে দিয়ে ক্রমশঃ তাকে ধাতে এনেছে। পাঁজরার হাড় তার বেরিয়েছে, ঠুলিবাঁধা চোখে সে আশেপাশে দিল্লীর কেল্লা, কুতব্‌মিনার, হুমায়ুনের পতন প্রসিদ্ধ সিঁড়ি কিছুই দেখ্‌তে পায় না, যখন যাত্রীদের সেখানে পৌঁছাতে নিয়ে যায়।

এই হতভাগ্য ঘোটকেরই গ্রেট-গ্রাণ্ড-সায়ার, প্রপিতামহের পিঠে দাঁড়িয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কোন আদিম অধিবাসী জোয়ান সবলে তার চুমেরাং ছুড়ত। দিশেহারা তেপান্তরের মাঠে তার উদ্দাম বিদ্যুৎগতি, সে গতির ফলে বাতাস তার অঙ্গ বেয়ে ঝড়ের বেগে বয়ে যেত—

সেই জাতের ঘোড়া, চোখ দিয়ে এর দুর্দ্দশা দেখা যায় না! কিন্তু উপায় কি? —নিয়তি।

টগ্‌বগ্, টগ্‌বগ্ কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়ে টাঙ্গাওয়ালা আমায় দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়াল, এক নাগাড়ে আধবেলায় ঘোড়া প্রায় দশক্রোশ রাস্তা ছুটেছে, পাথর বাঁধানো রাস্তা। কুতব্‌-মিনার থেকে ফিরে চাঁদ্‌নি চকে এসে সে চার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দুলে দুলে হাঁপাতে লাগল, এখুনি বুঝি পড়ে'যায়। কন্‌কনে শীতের হাওয়া বইছে, আমার হাড়ের ভিতর অবধি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল, তাই ঘোড়ার গা বয়ে' ঘাম ঝর্‌ছিল না বটে, কিন্তু তার ক্লান্তি দেখে মায়া হ'ল! আমি টাঙ্গাওয়ালাকে বল্‌লাম, "আর আমি তোমার টাঙ্গায় চড়ে থাক্‌ব না, আরও একঘণ্টা অবশ্য ভাড়া হিসেবে বাকি আছে, কিন্তু তোমার ঘোড়া বড় হাঁপিয়ে গিয়েছে।"

টাঙ্গাওয়ালা বল্‌লে, "নেহি সাব! ঘোড়া হাঁপাতেই পারে না, ভালো জাতের ঘোড়া—হাঁপালেই হ'ল! কোথায় যাবেন আপনি বলুন, আপনাকে পৌঁছে দেব"—

আমি বল্‌লাম, "আমার বড় শীত করছে, একটা ওভার-কোট তৈয়েরী করাতে হবে। খুব সস্তায় করাতে চাই,—আমাদের কল্‌কাতায় শীতেত' আর ওভারকোট লাগে না, ওটা পড়ে' থাক্‌বে। তুমি কোন দোকান জান, যেখানে সস্তায় একটা ওভার-কোট তৈয়েরী করে' দেবে?—কিন্তু তোমার টাঙ্গায় আমি চড়ছি না, তোমার ঘোড়া মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, প্রাণহত্যার ভাগী আমি হ'তে পারব না।"— তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেই সে আহ্লাদে বিগলিত হয়ে আমায় লম্বা সেলাম করলে, আর বল্‌লে, "ঠাহ্‌রিয়ে সাব, আমি আপনাকে খুব ভালো দর্জ্জির দোকানে নিয়ে যাচ্ছি, খুব সস্তাও, আমার টাঙ্গাটাকে ওই গাড়ীর আড্ডায় রেখে আসি, ঘোড়াটার মুখে "দড়ুগোলার বালতিটা ঝুলিয়ে দিয়েই আমি আস্‌ছি।"—

টাঙ্গাওয়ালা পথ দেখিয়ে আমায় যেখানে নিয়ে চলল, সেখানটা কল্‌কাতার চীনাপাড়ার গলির মতই সঙ্কীর্ণ—অন্ধকারে আর জনাকীর্ণ-তায় দিল্লীর চাঁদনিচকের এ গলি বোধকরি চীনাপাড়াকেও হার মানায়। শীতের দ্বিপ্রহর হ'তে চলল, এখনও এখানে সূর্য্যালোক প্রবেশের কোন ভরসাই নেই। গলির পথের উপরে জল পড়ে যে সামান্য কর্দ্দম রয়েছে, ঠাণ্ডায় তা' তুষারের মত জমে রয়েছে!

গলির দু'পাশে ছোট ছোট কুঠুরি—তাতে নানাপ্রকার কারখানা। কোন কুঠুরিই পাঁচ,

ছ হাতের বেশী নয় আয়তনে, তারই মধ্যে কোনটায় ছোপান কাপড় ছাপা হচ্ছে নানা-নক্সার, কোনটায় পনেরো বিশজন মেয়ে পুরুষ চক্রাকারে বসেছে আর একমনে চর্ম্ম-পাদুকা সেলাই করছে। অনেক মেয়ের ক্রোড়েই নবজাত শিশু! জুতার উপর জরির কাজের নক্সা সেলাই হচ্ছে, এতে তারা দিনান্তে কয় পয়সা উপার্জ্জন করে? বিনিময়ে যে আহার তারা পায় তাতে ব্যয়িত শোণিতের কতখানি আবার পাকস্থলির ভিতর দিয়ে ফিরিয়ে পায়? পায়ে আমার মোটা পশমের মোজা, তথাপি যেন, পায়ের জুতা জোড়া আমায় দংশন করছিল! এমনিধারা কোন শ্রমিক কন্যাই হয়ত' এ ডার্ব্বি সু জোড়াও সেলাই করেছে।

অবশেষে পৌছে গেলাম এক দর্জ্জির দোকানে সেখানেই সস্তায় আমার ওভারকোট তৈয়েরী করে দেবে। দেখে শুনে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল, এখানে সত্যই খুব সস্তায় কাজ পাওয়া যাবে, টাঙ্গাওয়ালা সেলাম করে' বিদায় নিলে।

দর্জ্জি পাঞ্জাবী, বৃদ্ধ আর তার পুত্র দোকানে কাজ করছে। পুত্রের বয়স বোধকরি বছর চল্লিশ হবে, সেই সেলাইএর কলটা পা দিয়ে চালিয়ে চলেছে, একটা শেরোয়ানি জামা সেলাই করছে। বৃদ্ধ মেঝেয় একটা কম্বলে বসে' একটা সুতো বাঁধা চশমার সাহায্যে অভিনিবেশ সহকারে হাতে সেলাই করছে। উত্তর পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অধিবাসীর মত প্রকাণ্ড আয়তন। পিতাপুত্র, বৃদ্ধ অবশ্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু ছেলেকে দেখলেই বোঝা যায় যৌবনে সবল পুরুষই ছিল সে। দারিদ্র্যের কঠোর সংগ্রামও তাদের বেশী কাবু করতে পারে নি।

বৃদ্ধ যেখানে বসে আছে, তারিই পিছনে ঘর খানিতে শাদা কাপড়ের পর্দ্দা টাঙানো. ওই পর্দ্দার পিছনেই এদের অন্দরমহল। সেলাইএর কল ছেড়ে খলিফা সাহেব যখন আমার শরীরের মাপ নিচ্ছিল, তখনই ওই পর্দ্দা ঠেলে একটা দশ এগারো বৎসরের ছেলে বাইরে এল, মুখে তার উচ্ছিষ্ট ডাল খানিকটা লেগে রয়েছে দেখেই বুঝতে পারলাম, সে ওই অন্দরমহলে বোধকরি, তার মায়ের কাছে ডাল রোটী খাচ্ছিল।

বালক তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছিল, বৃদ্ধ তাকে ডেকে বল্‌লে, "কোথা যাচ্ছিস্ রে বাচ্চা? কেবলই খেলা?"— বালক ছুটে বেরিয়ে গেল, তার ক্রীড়া সঙ্গীরা ওই দিকে কোথায় তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। বৃদ্ধ আমার পানে চেয়ে সহাস্যে বল্‌লে, "যেমন বাপ ছিল, তার বেটাও হয়েছে তেমনি—কেবল খেলা, কেবল খেলা! কাজকর্ম্ম শেখবার নাম নেই।"

বাচ্চার পিতা মুখখানা একটু আড়াল করে হাস্‌ল, তারপরে আমায় বল্‌লে, "তা' হ'লে কাপড় কিনে নিয়ে আসুন! জামা আপনার কখন চাই?"—

আমি বললাম "আজ সন্ধ্যের মধ্যে দিতে পারবে না?" সে তত্‌ক্ষণে আবার তার কলে বসেছিল, আমায় বল্‌লে, "হাঁ, তা' পারব বৈ কি! আপনি, সাআব "লাঞ্চ" করে কাপড় নিয়ে এসে এখানে বসুন ওই কুর্‌সিটাতে আমরা তিন আদমি খেটে আপনার কোট শেষ করে দেব, সন্ধ্যার মধ্যেই।" তারপরে একটু থেমে বললে, "আপনি কলকাত্তার লোক—আপনার খাতির করব বৈ কি!" শুনে একটু গর্ব্ব অনুভব করলাম, দিল্লীর লোক তাহ'লে কলকাত্তার লোকের খাতির করে!

আমি "লাঞ্চ" করবার জন্যে তাদের কাছে বিদায় নিলাম, সারা সকাল ঘুরেছি, জঠরে ক্ষুধানল জল্‌তে সুরু করেছে, পিতাপুত্রে দাড়িয়ে উঠে আমায় সেলাম করে' পথে নামিয়ে দিল।

বেলা একটার পূর্ব্বেই আমি ফিরে এসে পর্দ্দার কাছটিতে হাতলভাঙ্গা কাঠের কুর্‌সি-খানা টেনে নিয়ে বস্‌লাম। চারগজ 'পট্টু' কাপড় কিনে এনেছিলাম। বৃদ্ধ গজর্ গজর্ করছিল, সন্ধ্যার বাতির পূর্ব্বে বাচ্চা খেলা-থেকে বাড়ী ফির্‌বেনা।

পিতাপুত্র দু'জনে মিলে চট্‌পট্ কাপড়-টাকে কেটে ফেললে, তাদের হাতের কাজ

পর্দ্দার অন্তরালে তৃতীয় ব্যক্তিটীকে দিয়ে দিলে, আমার কাজটাই দু'জনে মিলে করবে বলে!

তাদের কাজ করবার তৎপরতা সত্যিই মনকে মুগ্ধ করে' দেয়,—একটা জামা তৈরেরীতে পরিশ্রম কি কম? ইতিপূর্ব্বে কখনও আমি বসে' বসে' দেখিনি। পটুটা কাটা হ'ল, একে একে আস্তিন, গলা হাতে সেলাই হ'ল—

সেটা আমার অঙ্গে চাপিয়ে ট্রাই দেওয়া হ'ল, পুরাণো আর্সিটার একস্তর ময়লা জমে গিয়েছে, তার মধ্যে আমি কিছুই বুঝতে পারলামনা, জামাটা আমায় মানাচ্ছে কিনা। কিন্তু দর্জ্জি দুজনার উপর আমার যথেষ্ট আস্থা জন্মে গিয়েছিল, কাজেই এদিক ওদিক টেনে টুনে, দু'চার জায়গায় সেপ্‌টিপিন্ এঁটে যখন তারা কোটটা আমার অঙ্গ থেকে নামিয়ে নিলে, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বৃদ্ধ সহাস্যে বললে, "আমার ছেলে যে কল্‌কাত্তামে চৌরঙ্গীর বড় খলিফার কাছে কাজ করত সে অবশ্য আজ বারো, তেরো বছর আগে!—দেখুননা আপনার জন্যে ইংলিস্ কাট্ কোট বানিয়ে দিচ্ছি।

আমি পুনরায় কুরসিতে বসে পড়লাম, প্রতীক্ষা এখানে অনেকক্ষণই করতে হবে, খট্ খট্, খট্, খট্, অতিদ্রুত সেলাইয়ের কল চলেছে,—তার একটানা সঙ্গীত শুনতে শুনতে আমার মন কখন সুদূর কলিকাতায় চলে গিয়েছে! চৌরঙ্গীর পাশে ময়দানে সেখানে এতক্ষণ শীতের পড়ন্ত রৌদ্র শ্যামল ঘাসের উপর একখানা ফিকে সোণালী রংএর পাতলা মসলিন বিছিয়ে দিচ্ছিল।

একটা কীর্ত্তনের সুর যেন কোথা থেকে কানে ভেসে ভেসে আসছিল।

শতেক বরষ পরে,
বঁধুয়া আইল ঘরে
রাধিকার হৃদয়ে উল্লাস—

* * *

গুণগুণ ধ্বনি, কুরসিটাতে বসে বসে আমার মন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল, তন্দ্রার ঘোরে বাংলাদেশের কোন সুদূর পল্লী থেকে যেন কোন্ সার্থকপ্রতীক্ষা বিরহিনীর আনন্দোচ্ছল সঙ্গীত আমার কানে ভেসে আসছিল। বড় মিষ্টি লাগছিল, সামনে যে সেলাইএর কলটা খট্, খট্, খট্, খট্ অতিদ্রুত একটানা বেজে চলেছে, তা' আমি ভুলেই গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে' কি জানি কেন, হঠাৎ তন্দ্রাটা ভেঙে গেল! তখনই মনে হয়, সঙ্গীতের গুণগুণ ধ্বনি ত' তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন নয়, এই পর্দ্দার অপর পার হতে কে যেন আনমনে মৃদুকণ্ঠে গান গাইতেছে! কিন্তু এযে একেবারে বাংলার নিজস্ব সুর, বাংলার কীর্ত্তন! তবে কি—

* * *

সন্ধ্যা লাগায় সত্যি সত্যিই আমার ওভারকোটটা তৈয়েরী হয়ে গেল। তবু আমার মন চাইছিলনা দর্জ্জির দোকানটী ছেড়ে আসি! পর্দ্দার অপরপারে দর্জ্জির পত্নীকে একবার আমি দেখতে পেয়েছি, বোধহয় সে ইচ্ছে করেই আমায় দেখা দিয়েছিল। ডাগর চোখ দুটী তার একবার আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে দৃষ্টি নত করে' নিয়েছিল। ভুল হবার জো নেই!—সে বাঙ্গালিনী। বাংলার রূপে রসে গড়া বাঙ্গালীর মেয়ে, অদৃষ্টের কোন পরিহাসে উত্তর পাঞ্জাবের এক দর্জ্জির সঙ্গে পরিণীতা হয়ে' আজ পর্দ্দার আড়ালে পায়জামা আর ওড়নার ঢাকায় পাঞ্জাবী বধূ হয়েছে, কোন্ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ফলে কোন অনাথা আশ্রম থেকে এই পাঞ্জাবী দর্জ্জি তাকে কিনে এনেছিল কে জানে?

বংশীর বিয়ে

শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বংশী তাড়াতাড়ি বল্লে "তা দেখা তো হয়েছে। এইবার—"

খুড়ো বল্লে "হ্যাঁ, চল এইবার যাওয়া যাক্। পরের আইবুড়ো মেয়ে—কত রাতে ফিরবি রে বাঁদর?"

বলে আবার সেই মিঠে আদর।

বংশী দেখলে শেষে সিনেমায় একটা কেলেঙ্কারী হবে। খুড়োর বিজ্ঞাপনাগিরিতে এখনই হয় তো কোন মেমসাহেব উঠে গিয়ে জানাবে হায়ার অথরিটিকে। ফলে হাস্তাস্পদ এবং বিতাড়িত। বংশী মনে মনে "দুর্গা" বলে ঝেড়ে উঠে পড়ে বল্লে "তাই চলো। আসুন মিস্ ডাট।"

বংশী ও বিনোদিনী সিনেমায় এসেছিল ডক্টর ডাটের কারে। বাইরে এসে বংশী বিনোদিনীকে ট্রেনে ল্যাগেজ তোলার মত তাড়াতাড়ি কারে তুলে দিয়ে বল্লে "আচ্ছা আপনি এখন আসুন মিস্ ডাট। রাম সিং, মিসি বাবাকো লে যাও বাড়ী। মিস্ ডাট কিছু ভাববেন না। আমি ফিরবো ট্যাক্সিতে।"

শত্রুর ঘাটি পেরিয়ে যাবার মত সাই করে মোটরখানা চলে গেল—যাকে বলে danger zoneএর বাইরে। বংশী বিনোদিনীকে তো বাঁচালে, এখন নিজের বরাতে যাই থাক্। বংশী খুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখলে অন্ধকার জঙ্গলে দুটো বাঘের চোখ যেন রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। বংশীর বুকের ভেতরটা হাঁচোর পাঁচোর করতে লাগলো।

খুড়ো হাঁক দিলে—হালুম নয়—"বংশী!"

পড়া টিয়ার মত বংশী জবাব দিলে "খুড়ো!"

খুড়ো কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর হত্যাদৃশ্যে গোবিন্দলালের মত বল্লে "একটা কথা আছে।" একটু থেমে ফের বল্লে "বুঝেছি কিছু কিছু।"

প্রায় আঁতকে উঠে বংশী বল্লে "বুঝেছ কিছু কিছু?"

খুড়ো বংশীকে ধমক দিয়ে বল্লে "কিছু কিছু নয়। সব জানতা হাম খুড়ো যেন বংশীর ভুল শুধরে দিলে।

তারপর বল্লে "হুম্ প্রেম হয়েছে?"

বংশী বল্লে "হ্যাঁ, তা হয়েছে"

খুড়ো বলে উঠলো "আমারও।" বাজ পড়লেও বংশী বোধ হয় এর চেয়ে বেশী আঁতকে উঠতো না।

সে বল্লে "তোমারও?"

খুড়ো বল্লে "জানিসতো আমার শীকারের principle? বাঘ মারি কিন্তু বাঘিনী খাঁচায় পুরি।"

বংশী আবার বল্লে "বাঘিনী?"

খুড়ো হাঁক ছেড়ে
হ্যাঁ, বাঘিনী। বাঘিনী
এই ঠিক তোদের মিস্
আর আমার principl
নজর দেয় তার মাথা—"
বংশী আবার আওয়
খুড়ো হা, হা কর
মাথা? এই মাথায় গ
বুঝলে কিছু বংশীবদন?
আচ্ছা, এখন আসি।"
বোম্বাই লরীর পিছু
পিঠের দিকে চেয়ে বংশী
দাঁড়িয়ে রইলো। খা
শিখ ড্রাইভারের "বাবুজি
উঠে বংশী দেখলে গাড়ী
নয়। ট্যাক্সি? ওঃ—
তার চাই। গাড়ীতে
ধপ করে বসে পড়ে বংশী
খানিকটা সামনের দিকে
বংশীর দিকে ফিরে শু
হোগা, বাবু সাব তো
বংশী পেছু থেকে direct
আর শেষে ড্রাইভার ট্যা
বংশীর বাড়ীর সামনে।
দুটো টাকা তার হাতে
bell টা বাজালে আর স
চন্দর দরজা খুলে দিতে
ঢুকে নিজের দরজাটা বেশ
তারপর চন্দরকে ওপরের
কাপ কফি দিতে বলে
রকমে উঠে গেল। B
ধপ করে spring খাটখা
খানা যেন আচমকা চা

লে উঠলো "হ্যাঁ,
র রূপতো দেখিসনি
ডাটের মতন। হ্যাঁ,
ও, আমার শীকারে
লে "তার মাথা?"
র হেসে বল্লে "তার
তাজা দেখেছিস?"
হ্যাঁ, খুব হুসিয়ার।
দিকটার মত খুড়োর
খানিকক্ষণ হাঁ করে
সি একখানা ট্যাক্সির
ট্যাক্সি" ডাকে চমকে
খ বটে, তবে খুড়োর
হ্যাঁ! ট্যাক্সি তো
উঠে পেছুকার সীটে
শুধু বল্লে "চালাও।"
এসে শিখ ড্রাইভার
ধালে "কিধার যানে
হি বোলা।" তখন
ion দিতে লাগলো
য় এনে দাঁড় করালে
মিটার না দেখেই
দিয়ে বংশী calling
ঙ্গে সঙ্গে ওর চাকর
। বংশী বাড়ীতে
করে বন্ধ করলে।
ঘরে খুব গরম" এক
টলতে টলতে কোন
ed-room এ ঢুকে
নায় বলতেই খাট-
প পেয়ে কাঁপিয়ে

উঠে বংশীকে ছিটকে ফেলে দেবার জোগাড় করলে। বংশী বিরক্ত হয়ে একখানা সোফায় বসলো আর তখনই চন্দর গরম কফি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সোফার সামনে একটা টিপয় টেনে এনে তার ওপর কাপটা রাখতেই বংশী কাপে লম্বা লম্বা গোটা দুয়েক চুমুক দিলে। তারপর কয়েক চুমুকে কাপটা খালি করে তার বুকের ধড়ফড়ানি অনেকটা কমলো। একটা সিগারেট ধরাতে যেন তার ভাববার ক্ষমতা ফিরে এলো। সে চন্দরকে বলে দিলে "দেখ চঁদরা, আজ রাতে কেউ ডাকলে দরজা খুলবি নে। যদি কেউ আমাকে ডাকে বলবি বাড়ীতে নেই। যদি বলে কোথায় গেছে, বলবি জানিনে। আচ্ছা, এখন যা। হঁ্যা, দেখ, আজ রাত্তিরে জেগে জেগে ঘুমোবি, বুঝলি ?"

চন্দর চোখ দুটো বড় বড় করে বল্লে "জেগে জেগে ঘুমোব কি ? আপনার কি হয়েছে দাদাবাবু ?" বংশী ঝাকি মেরে বলে উঠলো "হবে আবার কি ?...জেগে জেগে মানে যতটা জেগে জেগে পারবি, বুঝলি ? আচ্ছা, এখন যা ; হঁ্যা দেখ খাবার ঢাকা দিয়ে রাখিস্। পরে খাই খাবো, না খাই নেই নেই।"

চন্দর যেতে যেতে দরজার কাছে থেমে পেছু ফিরে একবার বংশীর পানে চেয়ে ঘরের বাইরে এসে বিড় বিড় করে বল্লে "ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে আসনাই ছুটে গেছে।"

বংশী "ডাক্তারের মেয়ে" কথাটা শুনতে পেয়ে হাঁক দিলে "কি বলছিস্ রে বাঁদর ?"

চন্দর ফিরে এসে দরজায় একবার মুখটি বাড়িয়ে ঘাড় নেড়ে শুধু "আহা" বলে চলে গেল। বংশী তখন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসলো। পুরো দুটি ঘণ্টা ভেবে শেষে একটা মতলব এটে ফেল্লে। মনটা একটু হালকা হতে সে খাবার ঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে এসে শোবার ঘরের দরজাটা বেশ করে বন্ধ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

যে মতলবটা এটে বংশী হালকা মনে ঘুমোল সেটা অবশ্য খুব বীরের যোগ্য নয়। তবু তাকে ভীতু বলতে পারিনে। কারণ সব দিক বিচার করে তো রায় দিতে হবে। বিপদটা এমনি আচমকা তার ওপর এসে পড়েছিল যে হতবাক্ হয়ে যাওয়াই বংশীর মত ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক। তার ওপর খুড়ো লোকটি তো বড় সোজা ছিলেননা। একে তো বংশীদের বংশের ছেলেরা সাধারণতঃ শিক্ষিত, ভদ্র, অমায়িক আর বলতে কি একটু আয়েসী স্বভাবের ছিল আর খুড়োর জীবনটা কেটেছে বাঘ ভাল্লুকের পেছু পেছু ছুটে। কাজেই এরকম দুই different type এর পালোয়ানের challengeই বে-আইনী। সত্যি বলতে কি, ফুটফুটে চেহারা, বি, এ, ডিগ্রী, বাপের পয়সা, মিঠে গলা, ইংরিজি বুলি আর নিজের কার চালাবার ক্ষমতা নিয়ে তো আর শিকারী শিকদারের সঙ্গে লড়া চলেনা। বিশেষ করে তার ক্ষমতা তো আর সুন্দর বনের বাঘ ভাল্লুকের চেয়ে বেশী নয়। ভেবে চিন্তে সে দেখলে বিপদ এড়াবার একটি মাত্র পথ তার সামনে খোলা আছে। বিনোদিনীকে ছাড়তে তার বুক ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু মাথাটাও তো আর বুকের চেয়ে কম দামী জিনিষ নয়। আর ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছে যে বর্ত্তমানে মাথার পক্ষে ভোট দেওয়াই স্বাভাবিক আর বুদ্ধিমানের কাজ।

বংশী শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু ঘুম কি সে তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছিল ? চোখ বুঁজে খানিকটা এপাশ ওপাশ করে সে ঝেড়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে আলো জালিয়ে চিঠি লিখতে বসে গেল। সে বিনোদিনীকে লিখলে "বড় দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে কাল বৈকালে আপনার সঙ্গে দেখা করবার যে কথা দিয়েছিলুম তা রাখতে পারলুমনা। কারণ জরুরী দরকারে কালই আমাকে কাশী যেতে হচ্ছে। আরো একটা কথা আপনাকে জানাচ্ছি। তার জন্যে আগে থেকে আপনার কাছ থেকে শতবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি খুব সুখী হয়েছি। কিন্তু এজীবনে যদি আমাদের আর দেখা না হয় তাহলে আরো সুখী হবো। জীবনে আপনাকে সুখী হতে দেখলে আমার চেয়ে বেশী সুখী কেউ হবে না জানবেন। সব সময়েই আপনার খবর পাবার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, উপস্থিত বড় ব্যস্ত, হাতে মোটে সময় নেই। আবার ক্ষমা চেয়ে চিঠি শেষ করলুম।

ভাগ্যহীন

বংশী—

চিঠিখানা খামে ভরে ঠিকানা লিখে বংশী তাড়াতাড়ি চন্দরকে বিছানা থেকে তুলে বল্লে "চিঠিখানা এখনই ফেলে দিয়ে আয় চন্দর।

চন্দর হাঁ করে বংশীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বংশী বলে উঠলো "যা বল্লুম শুনতে পেলি নে ? ঘুম ছাড়েনি বুঝি ? জরুরী চিঠি, এখনই গিয়ে ফেলে দিয়ে আয়। দেরী হলে—কি যে তার বরাতে আছে ভেবে বংশী নিজেই চুপ হয়ে গেল।

চন্দর বল্লে "কিন্তু আজ রাতে তো"—

বংশী বল্লে "হঁ্যা, আজ রাত্তিরেই"—

চন্দর আর একবার হতাশভাবে মাথাটা নেড়ে "আহা" বলে চিঠিখানা নিয়ে চলে

গেল। বংশী নেমে গেলো তার পিছু পিছু। চন্দর বাড়ীর সামনে ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলে দিয়ে এলো স্বচক্ষে দেখে বংশী আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। এবার আর তাকে বেশীক্ষণ ছটফট করতে হোল না। হতভাগ্য বংশীকে নিদ্রাদেবী অন্ততঃ একটু কৃপার চোখে দেখলেন।

পরদিন অনেক বেলাতে বিছানার পাশে টেলিফোনের ঝনঝনানিতে বংশীর ঘুম ভাঙলো। রিসিভারে হাত না দিয়ে ঘাড় তুলে ঘড়ি দেখলে সাড়ে দশটা বেজে গেছে। সে বুঝলে তার চিঠি পেয়েই বিনোদিনী ফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। সে উঠে পড়লো। ঘণ্টা বেজে থেমে গেল। দাড়ী কামিয়ে, কাপড় ছেড়ে সবে বংশী চায়ের কাপটি খালি করেছে এমন সময় চন্দর এসে বল্লে, "ডাক্তার সাহেবের দাদা দামোদর দত্ত এসেছেন দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।"

যেন মরা মানুষ দানোয় পেয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে বংশীর শির দাঁড়াতে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলে। তার মনে হোল পা দুটো যেন দেহটার সঙ্গে অসহযোগ করেছে। তবু মরি কি বাঁচি করে কোন রকমে উঠে তালগাছের মত লম্বা, কবাটের মত বুক, কদমফুলী ছাঁটা চুল, জবরদস্ত সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বংশী নীচে বৈঠকখানায় নেমে এলো, বিনোদিনীর ওই জ্যাঠা মশাইটির নাম বংশীর শোনা ছিল বটে, কিন্তু দেখা কখন হয়নি আর এখনও না হলেই সে সুখী হোত। তবু বিনোদিনীর জ্যাঠা মশাই, তার উপর অতিথি। বংশী এগিয়ে গিয়ে মাথাটা প্রায় হাঁটুতে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বল্লে "নমস্কার! চা দিতে বলি?"

দামোদর দত্ত বল্লেন "না, না! চা দিতে বলবেন! চা! ওঃ—চা দিতে বলবেন! থাক্!" ভদ্রলোক চায়ের নামে এমন নাক সেঁটকালেন যে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে অনায়াসে ভেবে নিতো ভদ্রলোক নিশ্চয়ই চা পান নিবারিণী সভার সভাপতি হবেন। কিন্তু বংশীতো বুঝতেই পেরেছিল বিশেষ করে ভদ্রলোকের পরিচয় পেয়ে আর তাঁর পিলে চমকানো গলার আওয়াজ শুনে। ওই বাজখাঁই গলার ধমকে দিল্লীর হরদমদাস বেদমরামের ব্যাঙ্কের কত কেরাণীর সাড়ে দশটার একটি মিনিট পরে অফিসে এসে পেটের ভাত চাল হয়ে গেছে তার হিসেব আছে কি? তাই যখন দত্তমশাই মিনিট দুয়েক বংশীর পানে কটমট করে তাকিয়ে একেবারে চিঠির কথা তুললেন তখন বংশী মনে মনে নিজের ভাগ্যকে আশীর্ব্বাদ না করলেও খুব বেশী অবাক হোল না।

"বংশী, আমাদের নেড়ী তোমার সেই বেয়াদব চিঠিখানা পেয়েছে, বুঝলে?"

দম কমাবার দুরাশায় বংশী বল্লে "ওঃ—তাহলে ঠিক পেয়েছে?"

"হাঁ, আজ সকালে একটু আগে পেয়েছে। তা ডাক টিকিট লাগাতে ভুলেছ কেন হে? বেয়ারিং চার্জ্জ দিতে হোল, বুঝলে?"

"সত্যি, আমি খুব দুঃখিত। ভুল হয়ে গেছে। তাছাড়া রাত্তিরেই—আচ্ছা আমি—"

দত্তমশাই তার দুঃখ প্রকাশের চেষ্টাকে দমিয়ে দিয়ে বল্লেন "আরে—ও দু' চারটে পয়সা নেড়ীর কিছু নয়। কিন্তু চিঠিতে যা লিখেছ, তা একদম অসহ্য। নেড়ী বলছিল কাল সিনেমাতে তুমি ওকে—"

বংশী মাথা চুলকে, কেশে, ঘাড় নীচু করে বল্লে "হ্যা, কাল—তবে ঠিক তা নয়। আমি—মানে, আপনি বুঝছেন—"

"হ্যা, খুব বুঝেছি, বহুত বুঝেছি, জলের মত সাফ বুঝেছি। তুমি আমাদের নেড়ীর মনে ব্যথা দিয়েছ, বুঝলে হে বংশী-বদন? ভাইঝিদের আমি বেজায় ভাল-বাসি। তাদের মনে ব্যথা দিলে পিঠের ছাল চামড়া—বুঝতে পেরেছ ব্যাপারটা?" বেয়াদব বাটপাড়ের নাম শুনেছ?"

"আজ্ঞে না।"

"বদমায়েস, বেয়াদব—বাটপাড়। চিনলে ভাল করতে হে। সাবধান হতে পারতে আগে থেকে। ইয়া গালপাট্টা দাড়ী, জোরা গোঁফ'। সুষমাকে নিয়ে সেবার পুজোর ছুটিতে শিবপুরের সরকারী বাগানে গিয়েছিলুম। সন্ধ্যের অন্ধকারে সুবিধে পেয়ে বাটপাড় সুষমার গলা থেকে হীরের নেকলেসটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে যেই না ইয়া বাঘের মত নখওয়ালা হাতটি বাড়িয়েছে অমনি কব্জিটিতে কসে একটি প্যাঁচ—শুনলে ভাল করেত হে। কোন খবরই রাখো না দেখছি।"

বংশী দত্তকে খুসী করবার জন্যেই বোধহয় বল্লে "আজ্ঞে, সবই তো জানলুম। এইবার একটু চা আনতে বলি?"

দামোদর আর একবার বংশীর বাক্যকে হাসির বানে ভাসিয়ে দিয়ে বল্লেন "হা! হা! হা! হা! চা আনতে বলি! চা আনিয়ে নিজেই খাও হে, দরকার হয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আমি তাহলে চল্লুম এখন। মনে থাকে যেন—"

(ক্রমশঃ)

অদূর ভবিষ্যতের ভাবনা

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং জাতির পরিবর্ত্তন নানা ভাবেই হইয়া থাকে। হাজার বছর পুর্ব্বে যে শিক্ষা এবং যে সভ্যতা মানুষকে বাঁচাইয়াছিল, কালের ইতিহাসে তাহার মূল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার পক্ষে তাহার মূল্য কতটুকু তাহার বিচার অবশ্য প্রয়োজন। একই সভ্যতা, একই পদ্ধতি যদি চিরকাল মানবের জীবন রক্ষার পক্ষে সত্য হইত, তাহা হইলে যুগে যুগে কালে কালে মানুষ নিত্য

চন্দ্রাবতী

নবীপথের বা সত্যের সন্ধান কখনই করিত না। এই কথাই আজ আমাদের জীবনে বাচাই করিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের মাটি চিত্রখানি ও এমনি ধারা একটি সত্য বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতেছে। এই চিত্রখানির চরিত্র যাহারা, তাহারা আছে কি নাই, তাহাদের আমরা জানি কি জানিনা, তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় আছে কি পরিচয় নাই,
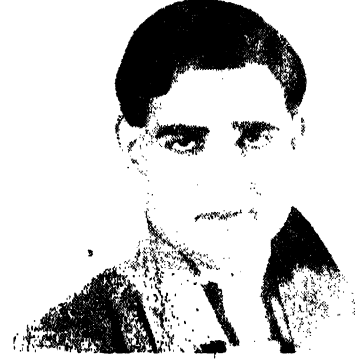
সাইগল

তাহাও জানিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেখিবার কথা, দেশের চারিদিকে যাহাদের দেখিতেছি, তাহাদের লইয়া আমাদের সকল সুখ দুঃখ, তাহাদের জীবনধারাকে পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রেয়তর করা যায় কি না। দেশের মাটি চিত্রে নায়ক অশোক কে, তাহার অস্তিত্ব কোথাও আছে কি নাই, তাহাও আমাদের ভাবিবার কথা নহে। আমাদের দেখিতে হইবে অশোক যদি আজ দেশে না থাকে—তবে কাল তাহাকে সত্য করিয়া তোলা যায় কিনা। অশোক যে ভাবে নিজের এবং তাহার কয়েকজন নিকট বন্ধুর জীবনকে যে কর্ম্মে নিয়োগ করিল, ঠিক সেইভাবেই যে সকলের জীবনকে একই ধারায় নিযুক্ত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্তু ইহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে—অশোকের কর্ম্ম-পদ্ধতি এবং চিন্তাধারা সত্য সত্যই দেশের কল্যাণে নিয়োগ করা যায় কিনা। যদি ইহা অপেক্ষা শ্রেয়তর পথ বর্ত্তমানে আমরা না পাই, তাহা হইলে আমাদের কল্পলোকের মানুষ অশোকের কর্ম্মপদ্ধতিকে কাজে লাগাইতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করিনা। অশোকের কাজের পথে বাধা অনেক। প্রতি পদে, প্রতি মঙ্গলকাজে সে তাহারই দেশের লোকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে সকল লোক প্রথমে নিজেদের মঙ্গলকে বুঝিতে পারে নাই। তাহারাই একদিন অশোকের পরম সহায়রূপে তাহারই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সত্যটিকে আমাদের মনে রাখা দরকার। যে কোন ভাল কাজে,

অমর মল্লিক

যে কোন নূতন পথে চলিবার সময় প্রথম পথযাত্রীরা বহু প্রকার বাধার দ্বারা নানা-ভাবে আক্রান্ত হয়, কিন্তু যে জন বীরের মত সকল বাধাকে তুচ্ছ করিয়া আগে চলিয়া যায় সেই হয় জয়ী। পথ সত্য, পথের বাধা মিথ্যা অথবা মায়া—বহু মহাজন বহুবার এই কথা বলিয়াছেন, কাজে কাজেই, আমাদের পথকে, সত্য পথকেই আশ্রয় করিতে হইবে—বাধাকে যেমন করিয়াই হোক বিতাড়িত করিতে হইবে। দেশের মাটি চিত্রেও এই কথাই হয়ত বলা হইয়াছে। দেশের সকল জনই পণ্ডিত বা বৈজ্ঞানিক

হইতে পারেনা। সকলজনই কেবল কেতাবের পাতা মুখস্ত করিয়া জীবন যুদ্ধ চালাইতে পারেনা। আমাদের দেশে এমন একটি সময় আসিয়া পড়িয়াছে। যখন আমাদের দেখিতে হইবে যে শতকরা ৯০ জন লোক ভাল করিয়া এমন কি করিতে পারে? যাহাতে তাহাদের পেট ভরিয়া দুইবেলা খাবার জুটিতে পারে। স্বভাবতই আমাদের সেই চিরপুরাতন সকল সহা মাটির কথাই মনে আসে, কিন্তু এই মাটির দানও গ্রহণ করিতে হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে।

উমা

মূল্য কি ভাবে দিতে হইবে, তাহা ভাবিবার কথা তাঁহাদের যাঁহারা দেশকে এবং জাতিকে দুঃখের সময়, অন্ধকার রাত্রিতে আশার পথ দেখায়। অশোক যে ভাবে মাটিকে আশ্রয় করিল, যে ভাবে বা পদ্ধতিতে যে মাটিকে উপযুক্ত মূল্য দিয়া, তাহার দান প্রার্থনা করিল, তারা সত্য পথ এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কিনা আমাদের যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। অশোক যাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিল—তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা কম বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

আমরা ইহাও মনে করি যে অশোকের প্রাণে যে বিশ্বাস এবং যে আশা আছে, আমাদের দেশের বহু জনের, বহু কর্মীর প্রাণেই তাহা বর্ত্তমান—কেবলমাত্র অভাব উপযুক্ত ক্ষেত্র বা প্রেরণার। দেশের অর্দ্ধেকেরও বেশী দুঃখ কষ্ট দূর হইবে সেইদিন যে দিন লোকে পেট ভরিয়া অন্তত একবেলাও খাইতে পাইবে। দেশের মাটি চিত্রের নায়কও এই কথা বিশ্বাস করিত। তাই সে প্রথমেই এই চেষ্টা করিল, যাহাতে গ্রামের লোক, চাষীর দল পেট পুরিয়া অন্নলাভ করিতে পারে। অশোক দেশের অন্যান্য মঙ্গল চেষ্টাকে ভুল বলে নাই, বা প্রধান করিবার চেষ্টা করে নাই। সে কেবল নিজের বিচার বুদ্ধিতে যাহা শ্রেয়-মনে করিয়াছিল, অধিকতর মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই পথে নিজের কর্ম্মশক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। দেশের মাটি চিত্র সম্বন্ধে যতদূর জানি বা শুনিয়াছি, তাহাতে অশোকের মত কর্ম্মীর যে প্রয়োজন আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই।

—

গান

শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

কুটির ঘিরে নিবিড় হ'লো
সাঁঝের আঁধিয়ার;
আজ নিশাতে আমার হ'বে
প্রথম অভিসার।
সেরে নি' মোর কর্ম্ম যতো,
সাজতে হ'বে মনের মতো,
খুলিয়া ফেলে ছিন্ন বাস—
মলিন ধুলিকার॥
কোন্ সুদূরে সে ডাকিয়া গেছে
আকুল ক'রে বাজিয়ে বীণা;
বিজন পানে চাঁদের রূপে
সরিৎ সেথা স্বপন-লীনা।
সেথায় বঁধু উচ্ছকিয়া—
অধর-সুধা-পরশ নিয়া;
(আজি) রাঙবে হিয়া সকল ক'রে—
মিলন নিরালার॥

—:•:—

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দ্বাদশ পরিচ্ছেদ)

নীরদ বাবুর একটি ছোটভাই এই বাড়ীতে থাকিত তাহার নাম নিরাপদ। তাহার বয়স আঠারো কি উনিশ হইবে। —যৌবনের প্রথম রেখাপাত গুলি তাহার মুখে চোখে কায়েমি হইয়া বসিয়াছিল। ওষ্ঠাধরে গুম্ফ-শ্মশ্রুর শ্যামল বর্ণ-বিন্যাস বর্ষাশেষে প্রান্তরের মত চারিদিক্কার শোভা বর্দ্ধিত করিত। নিরাপদ লেখাপড়া শিখিতে কলেজে যাইত, কিন্তু কলেজে যাইলেই যে লেখাপড়া হয়, এমন প্রমাণ সে নিজের উপর দেখাইতে পারিত না। তবে কলেজে যাইবার যে মামুলি প্রথটা তাহার দাদা বহাল করিয়া দিয়াছিল, সেইটাই সে মান্য করিয়া চলিত মাত্র।

নিরাপদ থাকিত তাহার দাদার নিকট হইতে দূরে। সে নীচেকার এক-খানি খালি ঘর অধিকার করিয়া থাকিত। ঘরখানি তাহার দাদার বৈঠকখানা হইতে তফাতে,—একেবারে শেষ দিকে! তাহার ঘর পার হইলেই বাটীর পশ্চাতের বাগান আসিয়া পড়ে। নিরাপদ এই ঘরে থাকিয়া লেখাপড়া করিত—আবার তাহার চেয়ে বেশী, ফুলের গন্ধ শুকিয়া যৌবনের পুষ্পে বাতাস দিত। এই ভাবেই তাহার দিন কাটিত।

সহরে একটা বায়োস্কোপ কোম্পানি আসিয়াছিল, তাহারই সুলভ আসনের একখানা টিকিট কিনিয়া সে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত বায়োস্কোপ দেখিয়া সে দিন বাটী ফিরিয়াছিল। তাহার দাদা টের পান নাই, কেননা তিনি ভার্য্যার অসুখ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। বৌদির অসুখ নিরাপদর পক্ষে সুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; নিরাপদ এ সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

রাত্রির প্রথমটা ভাল করিয়া ঘুম হইতে-ছিল না, বায়োস্কোপে দেখা নায়কনায়িকা গুলো মুদ্রিত চক্ষের উপরে কলরব তুলিতে ছিল। কিন্তু শেষে একখানা বাস্তব মুখ ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খাওয়া দাওয়া সারিতে কোনও গোলমাল হয় নাই, কেননা সেটা সরবরাহের ভার ছিল মাহিনা করা ঠাকুর চাকরের উপর। দাদা কি বউদির সঙ্গে সেটার কোনও সোজাসুজি সম্বন্ধ ছিল না।

নিরাপদ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই স্বপ্নটার মাঝখানে তাহাদের বাড়ীতে নূতন আসা তরুণীটি জমকাইয়া আসিয়া দৃশ্যপট নামাইতেছিল তুলিতেছিল, নিরাপদ তাহা মুগ্ধ দৃষ্টিতে উপভোগ করিতেছিল। রঙ্গমঞ্চের ক্রম-পরিণতি কতদূর আগাইয়াছিল, বলিতে পারা যায় না, —এমন সময়ে একটা চিৎকারে অভিনয় ব্যথিত হইয়া পড়িল। তাহার ঘুমটাও হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া একেবারে চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সে চোখ খুলিতে বাধ্য হইল, এবং দ্বারের ফাঁক দিয়া একটা আলোর রশ্মি আসিতে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে শুনিতে পাইল, দ্বারে কে করাঘাত করিতেছে, এবং তাহারই নাম ধরিয়া কে ডাকিতেছে।

"নিরাপদ বাবু! নিরাপদ বাবু? একবার উঠুন! একটু দরকার আছে!"

গলাটা যেন চেনা-চেনা!

নিরাপদ জিজ্ঞাসা করিল, কে ও?

দরজা খুলুন; তাহলেই বুঝতে পার্ব্বেন! বিশেষ দরকার! একবার উঠুন।

নিরাপদ উঠিল! কৌতুহল তাহাকে পুরদস্তুর সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। সে উঠিয়া ঘরের খিল খুলিয়া দিল। দরজা খুলিয়া যাইতেই সে যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিস্ময়ে এবং আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেল। স্বপ্নের মধ্যে এই ছবিটিকেই সে এতক্ষণ দেখিতেছিল।

আপনি? আপনি?

"হাঁ আমি! আপনি একবার ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনতে পারেন? দিদির জ্বর বড় বেড়েছে! আমরা ভয় পাচ্ছি।"

—কার? বউদির?

—হাঁ! জ্বর এখন ১০৬ ডিগ্রি! কি কর্ব্ব, ভেবে পাচ্ছিনে!

—১০৬ ডিগ্রি? তবেই তো! তাহলে তো এখন যেতে হয়! কি বলেন?

—হাঁ, এখনই আর দেরি কর্ব্বেন না! শীগ্‌গির যান।

—কোন্ ডাক্তার বাবুকে ডাকতে হবে?

—তাও জানেন না! যে ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়ী দেখেন! সতীশ ডাক্তার! তিনিই তো দিদিকে দেখচেন!

—সতীশ ডাক্তার! আচ্ছা যাচ্ছি!

—নিরাপদ কামিজ লইবার জন্য, ঘরের এককোণে যে পোষাকের আলনাটি ছিল, তাহারই নিকটে গেল। আলনা হইতে সেটা টানিতে টানিতে বলিল! সতীশ ডাক্তার! তার ঠিকানাটা কোথায়, বলতে পারেন?

এই ভারতের

মহামানবের সাগরতীরে

মানবতার যে পরম সত্য

মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে

তাহারই মূর্ত্তরূপ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

সেই অতুলনীয় সৃষ্টির

চিত্রানুবাদ

করিবার গৌরব

লাভ করিয়াছেন

দেবদত্ত ফিল্মস্

—তার ঠিকানাটাও আপনি জানেন না? তবেত, ভাল লোককে আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠাচ্ছি!

কথাটা নিন্দার! কেননা, বাড়ীর ডাক্তারের ঠিকানা বাড়ীর একজন যুবাপুরুষ যে চিনে না, ইহা কখনই সম্মানের কথা নয়! নিরাপদর বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ না হইলেও, এটুকু বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। এই সুন্দরী অশরিরী স্বপ্নদেবীর নিকট এরূপ নিন্দাসূচক মন্তব্য কুড়াইতে সে একেবারেই রাজি ছিল না! কাজেই সে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

না—না! আচ্ছা আমি ঠিকানা জেনে নিচ্ছি রামদীনের কাছে। হাঁ, বাড়ীর ডাক্তারের ঠিকানাটা জেনে রাখা উচিত ছিল বটে! কিন্তু কি জানেন, পড়াশুনা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, — আর এবারের ম্যাথামেটিক্স্ এর প্রফেসারটা এমন সব ভারি অঙ্ক করতে দিয়েছে, —যে ডাক্তারের ঠিকানাত' দূরের কথা, —নিজের ঠিকানা অবধি ভুলে যেতে বসেছি।

আগন্তুক ফস্ করিয়া একটু শ্লেষের স্বরে বলিল!

দেখবেন সেটা যেন কর্ব্বেন না! এই রাত্রে ডাক্তার ডেকে আনতে যদি আপনি নিজের ঠিকানা ভুলে যান,—তাহ'লে আমরা আবার আর এক বিপদে পড়বো! বাড়ীর মধ্যে এই বিপদ,—আবার বাইরেও যদি,—

—না! না! তা নয়! নিজের ঠিকানাটা কি আর সত্যি সত্যি ভুলচি! তা নয়! তবে সেই রকম অবস্থা হবার মত হয়েছে!

—হয়েছে না কি? তবেত আপনার চেয়ে রামদীনকে পাঠানই ভাল ছিল! সে হয়তো মাথা ঠিক ক'রে আপনার চেয়ে আরও তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ডেকে আনতে পারতো!"

যাহাকে স্বপ্নে দেখিতে এত সুন্দর, সে যে বচনে এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারে, নিরাপদর তাহা জানা ছিল না। কিন্তু তবু এই অকরুণ প্রচ্ছন্ন নিন্দাটুকু এমন একজোড়া বিম্বফল রক্তিম ওষ্ঠাধর হইতে আসিয়াছিল, যে নিরাপদ এই নিন্দার কাটান দেওয়া অপেক্ষা অন্য প্রকারের সন্তুষ্ট করিবার উপায় যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিল।

—আপনার শীগগির শীগগির ডেকে আনলেইত হোলো!

—আবার কি! এই তো—ঠিক আঠারো বছরের ছোকরা বাবুদের কাজ! আঠারো বছরে যেমন আগুণ ছুটবে, তেমন কি আর,—

ততক্ষণে নিরাপদর জামা ও জুতা পরা হইয়া গিয়াছে। এবং সে টপ করিয়া একটি ছড়ি ঘরের কোণ হইতে তুলিয়া লইয়াই ছুটিল।

যাইবার সময়ে একবার পিছন্ দিকে তাকাইয়া সবজর হাস্যোজ্জল মুখখানি হইতে চক্ষের দাড়া দিয়া খানিকটা সুধা খাম্চা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। সবজর মুখখানি তাহাতে মেঘভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যুবকের চাহনিতে সবজর আশঙ্কা হইল, তাহার ভবিষ্যতের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিতে পারে!

(ক্রমশঃ)

পাড়ি

শ্রীসমীরকুমার ঘোষ

(১)

সাগর পথে চপল রথে
আজ প্রভাতে ছুটি
আত্মহারা ঝরণা ধারা
শিলার 'পরে লুটি।
উপল পরে উপল শিরে
নৃত্য বিভোল ফিরে ফিরে
বাউল এমন প্রতিটি ক্ষণ
বাঁধন ফেলে টুটি।

(২)

আকাশ তলে শুভ্র জলে
লাল মেঘের ছায়া
চল্‌ত গিয়ে লুটিয়ে দিয়ে
আস্‌ছে মেঘ-মায়া।
দেবদারু বন সারে সারে
ডাক দিয়ে যায় বারে বারে
—মুক্ত আমি আর কি থামি
মিললো যবে ছুটি।
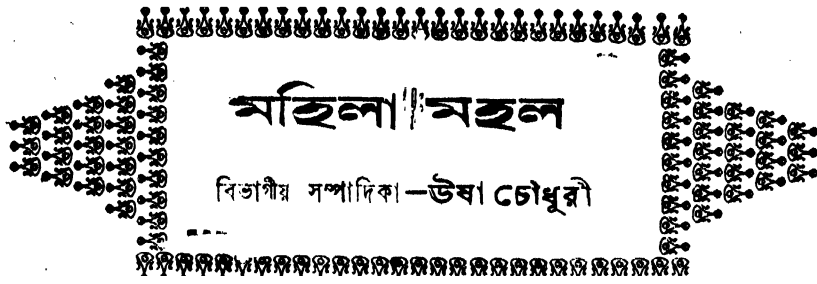
আনন্দ শব্দের মধ্যে যে সাবলীল ঝঙ্কার নিহিত আছে, তার অর্থ একের মধ্যে সহজে বোধগম্য হয় না। বহুর মধ্যে নানারূপে নানা রংএ তার প্রকাশ পায় মানুষের প্রকৃতিতে, মানুষের জীবনে। আনন্দ প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। মানুষ এই নশ্বর জগতে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে আপনাকে উপভোগ করে থাকে। ত্যাগের বিমল জ্যোতি যে সাধকের অন্তর আলোকিত করতে পেরেছে; স্নিগ্ধ, প্রশান্ত, সুন্দররূপে আনন্দ সেখানে বাসা বেঁধে থাকে। পরোপকার প্রবৃত্তি মানব-প্রকৃতির মধ্যে আত্মগোপন করে অপরিপূরণীয় আনন্দরসে সঞ্জীবীত থাকে। দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতার ভেতর যে গভীর আনন্দরহস্য অপ্রকাশ থাকে; নশ্বর সংসারে তার তুলনা চলে না। আধ্যাত্মিক আনন্দ কি মোহমুগ্ধকর—তার বর্ণনা দিতে অক্ষম।

সংসারে সংসারী জীব এই মানুষ, যে সুখ দুঃখ নিয়ে প্রতিদিন চলাফেরা করছে, তারই মধ্যে একটা দিকে একটা জিনিষ আছে, সেটা সত্যই আনন্দদায়ক। পতি-পত্নীর প্রেমে যে আনন্দ আছে—সে আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ যে প্রতীক অর্থাৎ সন্তান, মা বাপের কাছে আসে, সত্যই সেটা আনন্দের। জীবনের প্রথম উষার প্রভাত-অরুণের মত তরুণ তরুণীর বুকে তারা যে আনন্দ, যে স্নেহ হিল্লোল জাগিয়ে তোলে; পরবর্ত্তী চলার পথে সেই অনাবিল আনন্দের রেশটুকু কখনও স্মরণের কোণে জেগে ওঠে আনন্দে, হর্ষে, কখনও মা বাপের বুকে অসহনীয় বিষাদের বিচ্ছেদ ব্যথায় আকুল হয়ে ওঠে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সুখ দুঃখ হাসি ও অশ্রু বৈশাখী ঝড়ের মত আসে আর যায়। স্মৃতির আনন্দ তখন জনক জননীর ব্যথিত অন্তর প্লাবিত করে সান্ত্বনার সুর ডেকে আনতে চেষ্টা করে। কালের রূপান্তরে মানুষ দুঃখকে ভুলে আনন্দকে পেতে চায় নবরূপে নব নব সন্ধানে।

সংসার পথ দুর্গম, বনপথের চেয়ে কত বন্ধুর, সেটা মানুষ প্রথম জীবনে সুখের স্রোতে চলার সময় বুঝি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। যদি সেটা মানুষ পারত তাহাহলে স্বেচ্ছাকৃত অশান্তি বা দুঃখকে ভোগ করতে হোত না। জন্ম মৃত্যু যখন সৃষ্টির নিয়মে আসে যায়; তখন মানুষ এই বাসাবাড়ীতে যে কটা দিন থাকতে পায় সেইখানে আনন্দকে স্থায়ী ও সুন্দর করে বাঁধতে পারেনা কেন?

সংসার পথে চলতে গিয়ে দম্পতীরা লাভ করে সন্তান জীবন, এক থেকে বহু। সন্তানের মা হওয়ার আনন্দ অবর্ণনীয়। আনন্দময়ী মায়েদের দায়িত্ব সেই মুহূর্ত্ত থেকে সুরু হয়। মায়ের দায়িত্ব আজ কত শিথিল তারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। হয়ত কোন মায়ের ভাল লাগতে পারে। সংখ্যায় একক হলেও সার্থক। সন্তানের দায়িত্ব যখন মা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে তখন মাকে স্বতঃই সজাগ হতে হয়। আধুনিক তরুণীমায়েরা কি বুঝে চলতে চায়, সেটা বুঝতে পারা যায় না। যখন শিশু মায়ের কোল থেকে চলে যায় অসময়ে, অযত্নে, অনিয়মে তখন মায়ের বুকে যে ব্যথা আসে সে ব্যথাও অবর্ণনীয়।

মায়ের দায়িত্ব শিশুপালন, শিশুপরিচর্য্যা জ্ঞানের মধ্যে কার্য্যকরী হওয়া একান্ত দরকার। শিশু প্রকৃত মানুষ হতে সময় লাগে ১৮ বৎসর। শিশুর স্বাস্থ্যদিকে লক্ষ্য রাখা মায়ের কর্ত্তব্য। দাসদাসীর হাতে শিশুকে বাহিরে বেড়িয়ে আনা পর্য্যন্ত নির্ভর করা চলতে পারে। প্রথমাবধি স্তন্যদুগ্ধে শিশুর পরিপুষ্টি হচ্ছে কিনা; অর্থাৎ, পেট ভরছে কিনা সে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত। তারপর নিত্য স্নান, মুক্ত হাওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ দেহ বাড়তে পারছে কিনা দেখতে হবে। লিভার কৃমি, কোষ্ঠবদ্ধতা সর্দ্দিভাব যাহাতে শিশুর শরীরে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে, মায়ের খরদৃষ্টি সে দিকে থাকা দরকার। বিলাতী পেটেন্ট দুধ, বিলাতী অনুকরণ ফিডিং-বোতল ও রবারচুষি একেবারে বর্জ্জনীয়। যে ভাবে শ্বেতাঙ্গসমাজ আপনাদের ছেলে মেয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবের শোভা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে থাকে; সেভাবে অন্ধ অনুকরণ আমরা করতে পারিনা; আধা-অনুকরণ সন্তানের স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর সেটা না বুঝে চলে আমরা ঘরে বাইরে হাস্যাস্পদ হয়ে থাকি। ১ ছটাক গরুর দুধে সমপরিমান জল দিয়ে ফুটিয়ে তালের মিছরি সহযোগে শিশুকে, ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়ালে; পেটেন্ট দুধের অপেক্ষা বেশী পুষ্টিকর হয়; অর্থের দিক দিয়াও সাশ্রয় হয়ে থাকে।

শিশুর বয়সের সঙ্গে তার খেলার ব্যবস্থা, তারপর শিশুর লেখাপড়ার সময় যখন আসে, তখন পিতার চেয়ে মায়ের দায়িত্ব বেশী বলে প্রমাণ হয়ে থাকে। মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্তানের প্রথম শিক্ষা সুরু হয়। কৈশোরে সেই প্রাথমিক শিক্ষা কোন পথে, কি ভাবে, কি গতিতে চলেছে, একমাত্র গর্ভধারিণী

জননী সেইটা লক্ষ্য করতে পারে। মায়ের হাতে কিশোর চরিত্র যে ভাবে গঠিত হয়, মায়ের অমনোযোগের ফলে সেই কিশোরমনে পঙ্কিল ছায়ার রেখাপাত করতে পারে; ভবিষ্যৎ জীবনে তার বিষময় ফল একটা সংসারকে প্রজ্জ্বলিত করতে সাহায্য করে। মায়ের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির ওপর সন্তান চরিত্র উত্তম হয়ে সংসার, সমাজ ও বংশধরের কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর হতে পারে।

আমার মনে হয় আজকাল সহরে, পল্লীতে কোন সন্তানই মায়ের বশীভূত নয়। সে দোষ কি ছেলেদের, সে দোষ কি সঙ্গীর? সে দোষ কি কালের? কখনই নয়, মায়ের সুশিক্ষিত মন ছেলে মেয়ের সঙ্গে ছায়ার মত অনুসরণ করা দরকার। চরিত্র গঠনই কৈশোর জীবনের মূলভিত্তি স্থাপন স্বরূপ। চরিত্র যদি সাময়িক দুর্ব্বলতার মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে, তাহা হলে ভবিষ্যৎ জীবনে বৈচিত্র্য কি? আনন্দ কোথায়? পুঁথিগতবিদ্যায় যদি চরিত্রোপযোগী শিক্ষা দৃঢ়তর না হোতে পারল, সে শিক্ষা যদি বৈদেশিক কলুষ আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হতে আগ্রহশীল হয়; সে শিক্ষা কি মায়ের অভিশাপ স্বরূপ নয়?

আজকাল চোখের সামনে দেখা যায় প্রতি কিশোর প্রত্যেক সিনেমার নূতন বইয়ের প্রকাশ দিনে ভোর হতে ফটকের ধারে ধারে ধর্ণা দেয়। যদিস্যাৎ প্রবেশের সুবিধা না পায়; তাহা হলে গুণ্ডার কাছ থেকে বেশী পয়সা দিয়েও সেদিনের টিকিট কিনে থাকে। সিনেমার চিত্র ভাল কি মন্দ, সুরুচী কিনা জানবার প্রয়োজন তাদের নেই বলে মনে হয়। এই ভাবেই কিশোর মনে অসংযমের পরিচয় প্রকাশ পায়। নৈতিক স্বাস্থ্য তারাই অকালে হারায়। মায়ের সুশিক্ষা যদি তীক্ষ্ণভাবে সন্তানের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলত, তাহা হলে এভাবে কিশোররা স্বাস্থ্য এবং সংযম হারাত না। কিশোর কিশোরীর আদর্শমূলক সিনেমাচিত্র আমাদের দেশে তৈরী হওয়া সম্ভব নয় বলে পরিচালকবর্গ মনে করে থাকেন বোধহয়; নহিলে অনুকরণশীল দুর্ভাগা দেশে শিশুচিত্র সম্পাদনে এত অমনোযোগ কেন? কাজে কাজেই তরলমতী কিশোর কিশোরী বাংলা সবাক দেখেই বৈচিত্র্যহীন প্রেমের গ্লাকারজনক চিত্রও মিষ্টান্নের মত গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে। প্রতিকার কোথায়? নূতন মায়েরা চায় যে ভাবে তাদের ভাইপো ভাইঝিরা চলে আসছে সেই নূতন সাজে, নূতন ধাজে ছেলেমেয়েদের সাজাতে। ধারণা,—শিক্ষা সে আপনি সময় হলে হবে। এখন ১॥০-২ বছরের শিশু মেয়েরা কাপড় পরতে চায় ঘুরিয়ে আঁচল দিয়ে, সামান্য এদিক ওদিক হলেই রসাতল। জননী হাসিয়া হাসিয়া শিশুর মতামতে নির্ভর করে থাকে। শিশুমনে যে বিলাস যে প্রসাধন গোপনে নীড় বাঁধতে চায়, জননীর অনাগ্রহ সুশিক্ষায় তার মূল দৃঢ় হতে চলে কৃত্রিম চুণ বালীর সংযোগে। অপরিণামদর্শিতার ফল সামান্য ভূমিকম্পেই ধ্বংসস্তুপের সৃষ্টি।

তরুণীরা আজ বিলাতী ফ্যাসানে নিজেদের জ্যাকেট, ব্লাউজ, বডি তৈরী কোরে জনবহুল রাস্তা দিয়ে পদব্রজে চলে যায়; বিলাতী অনুকরণীয় চঞ্চলমুখর হাসির স্রোত ছড়িয়ে। ফ্যাসানের এই নগ্নরূপ মায়েদের চোখ এড়িয়ে যায়' বলে মনে হয় না। মনে হয় তরুণী মেয়েদের, বোনেদের প্রসাধন ও সুসংযমে পথ চলার সম্বন্ধে ইঙ্গিতে শিক্ষা দেওয়ার সাহসের অভাব। সুসংযত সুশিক্ষা ছেলেমেয়েকে জননী যদি দিতে কুন্ঠিত বা ঔদাস্য প্রকাশ করে তার ফল সমাজ সংসারে বিশৃঙ্খল আনতে দেরী হয় না। গাছের সুমিষ্ট সুরসাল ফল বা মনোহারী বৃহৎ গন্ধবহ ফুল বাগানের মালীর কৃতিত্বেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। বীজ যত উৎকৃষ্টই হোক—চারাকে সযত্নে না রাখলে, বীজের ভালমন্দর কোন মূল্যই থাকেনা। সংসারে জনক জননী যত মহান্ হউক; সন্তান প্রতিপালনই তাঁদের কৃতিত্ব। কৃত্রিম আনন্দের পিছনে আলেয়ার মত বাংলার ছেলেমেয়ে ছুটে চলেছে। আনন্দ! প্রকৃত আনন্দ আজ কোথায়? বিত্তায় আনন্দ উৎসাহ আজ নেই। বিলাসে আনন্দ নেই; অশিক্ষাতেও আনন্দ নেই। গার্হস্থ্য জীবন সুন্দর আনন্দমুখর করে গড়ে তোলবার দায়িত্ব জননীর সুশিক্ষার ওপর নির্ভর করছে। কিশোর কিশোরী আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি—তারাই একদিন চরিত্র মাধুর্য্যে—শিক্ষার বিমল আলোকে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বাস্থ্যদীপ্ত মনে দেশের বুকে প্রতিভা বিতরণ করতে পারবে এ আশা প্রত্যেকেই করে থাকে; সুসন্তানের জননী-গৌরব আমাদের বোনেদের কর্ত্তব্যকে জাগরিত করুক। ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জন্য সমানভাবে এগিয়ে দিতে হবে; মেয়ের শিক্ষাপথ যেন সহজ সুন্দর শীলতা ও নারী জনোচিত মহিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। অদূর ভবিষ্যতে তারা জননীর কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে যেন পালন করতে পারে।

ছেলেদের লেখাপড়া, খেলা, ব্যায়াম, ভ্রমণ এবং সঙ্গীর দিকে দৃষ্টি যেন অব্যাহত থাকে। এইভাবে মায়ের চলা উচিত। অবাধ্য সন্তান অঙ্কুরেই পরিচয় দিয়ে থাকে। তখন যদি শাসনগণ্ডি সীমাবদ্ধের মধ্যে না রাখা হয়; তাহা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী। অধিক শাসন আরও ভীতিপ্রদ। সত্য, ন্যায় এবং শালিনতাকে ছোট ছেলেমেয়ের মনের মধ্যে ছোট অবস্থা থেকেই বদ্ধমূল করান চাই। এই ধারণা একদিন সত্যপথের সাথী হতে পারে। শুধু মায়ের একাগ্রতায় সন্তান লক্ষ্যপথে পৌঁছে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করতে সক্ষম হয়। নারী যে রত্ন প্রসবিনী—একথা নারী যদি ভুলে না যায়, হয়ত একদিন আবার শত সহস্র পূতচরিত্র মনিষীর অভ্যুদয় হবে।

নিউ থিয়েটার্সের "বিদ্যাপতি" চিত্রের **একটী** দৃশ্যে বিদ্যাপতির ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ও অনুরাধার ভূমিকায় কাননবালা। এই সপ্তাহে চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ত্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই চৈত্র ১৩৪৪, ৩১শে মার্চ ১৯৩৮

রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ব্বাচন

বাংলার নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট রাজবন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির গঠন ও বাংলা কংগ্রেসে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীন সেন, শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও ভূতপূর্ব্ব 'ফরওয়ার্ড' ও 'লিবার্টি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী অদ্যাবধি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডের'র সম্পাদকরূপে পুণরায় সাংবাদিক জীবন গ্রহণ করিবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প খুবই সুসঙ্গত ও সমীচিন হইয়াছে। বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি তাঁহার আনুগত্য সর্ব্বজনবিদিত সুতরাং তাঁহার রাজনৈতিক মত বা ভাবধারা বিশ্লেষণ করা বাহুল্যমাত্র।

অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ আমাদের বন্ধুবর কাউন্সিলার শ্রীযতীন্দ্র নাথ বিশ্বাসের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় পূতচরিত্র সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় ত্যাগী কর্ম্মী-নেতার পূর্ণআবির্ভাবে কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে।

সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের যে ময়মনসিংহে বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত জ্ঞান মজুমদারও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জিলায় তাঁহারও প্রতিপত্তি বিশেষ কম নহে। বন্দী হইবার পূর্ব্বে সুরেন্দ্র বাবু বসুভ্রাতৃদ্বয়ের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় নলিনীবাবুর প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ড বাহাল থাকায় তাঁহার আনুগত্য সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতেছে। নলিনীবাবুর প্রতি স্নেহাধিক্যহেতু হয়ত বসুভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি তাঁহার আনুগত্য একটু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—কেহ কেহ এরূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের অবিসংবাদী নেতা শ্রীযুক্ত সতীন সেন বসুভ্রাতৃদ্বয়কে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা হেতু হয়ত যুগান্তর-দল দ্বিধাবিভক্ত নাও হইতে পারে। সতীনবাবুর দুর্দ্দমনীয় কর্ম্মশক্তি সুপ্রসিদ্ধ সুতরাং তাঁহার পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির আসন্ন নির্ব্বাচনে বসু-দল সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে।

মধ্য-কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাজবন্দী নেতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতা নিবন্ধন বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে সোৎসাহে যোগদান এখনও করেন নাই। তবে আশা করা যায় তিনিও বসু-দলকেই সমর্থন করিবেন।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্র নাথ রায় পুনরায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাবধি তিনি স্পষ্টভাষায় কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। তিনি স্থায়ীভাবে বাংলায় থাকিবেন কি না বা বাংলার রাজনীতিতে নিবিড়ভাবে যোগদান করিবেন কি না তাহা এখনও অজ্ঞাত।

শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় গভীর জলে বিচরণ করেন। বিশিষ্ট রাজবন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কিরণবাবু একটু স্বতন্ত্র ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। বিগত এ্যাসেমব্লি নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিরোধিতায় কিরণবাবুর রাজনীতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিতে বসিয়াছিল। সুতরাং তিনি যে আর সহজে কোন ভুল চাল দিবেন তাহা বলিয়া মনে হয় না।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সমিতির বার্ষিক নির্ব্বাচন হইবে। আমরা আশা করি নির্ব্বাচন সুসংযতভাবে সম্পন্ন হইবে এবং যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে লইয়া শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

কাহার ইঙ্গিতে?

দিল্লীর "রায়স্ উইক্‌লি" "(Roy's Weekly)"র ২৮শে মার্চ্চের সংখ্যায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি সম্বন্ধে এক সন্দেহজনক ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়াছে। "And the inclusion of his brother Mr. Sarat Chandra Bose is found to be more a liability than an asset, in view of the recent developments in the Bengal Congress Politics. The desire to be in command has not been backed by an equal display of discipline and statesmanship." শুধু তাহাই নহে "রায়স্ উইক্‌লি"র সর্ব্বজ্ঞ সম্পাদক শরৎচন্দ্রের মুণ্ডপাত প্রার্থনা করিয়া আকুল আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছেন: "A change in the leadership of the Congress Party in Bengal is the need of the hour. We suggest that the Congress Working Committee which is meeting in Calcutta next week will review the position and hand over the task of cleansing and toning up the politics of Bengal into the hands of some other leader." মাননীয় অর্থসচিব নলিনীরঞ্জনের বাসনার এই বরষী প্রতিধ্বনি দিল্লীর মরুভূমি হইতে বাংলার শ্যামল ক্ষেত্রে ভাসিয়া আসিতেছে। মহাত্মাজীর কলিকাতায় অবস্থিতির সুযোগ লইয়া উডবর্ণ পার্কে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডল পুর্ণগঠন বিষয়ে নলিনীপ্রেমিক ব্যক্তিবর্গের গুঞ্জনধ্বনি মুখর হইয়া উঠিতেছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে শিখণ্ডি খাড়া করিয়া নলিনীরঞ্জন বাংলা কংগ্রেসে পুনঃ প্রবেশের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু আমরা জানি মহাত্মাজী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে নলিনীরঞ্জন মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ করিয়া কৃতকর্ম্মের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে মিশ্র-মন্ত্রীমণ্ডলে তাঁহার স্থান হইবে না।

স্যার নাজিমুদ্দিনের বৈঠকখানায় চা-চক্রে নলিনীরঞ্জনের দূতরূপে সদ্যমুক্ত কোন বিশিষ্ট রাজবন্দীর অভিসার রহস্যাবৃত। 'অনুশীলন', 'শ্রীসঙ্ঘ' ও সরস্বতী"-সম্প্রদায় ভুক্ত রাজবন্দীদের আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মেম্বার হইবার শেষ তারিখের পূর্ব্বে মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে কে বা কাহারা মাননীয় অর্থসচিব তাহা লোক সমাজে প্রকাশ করিবেন কী? মহাত্মাজীর মধ্যস্থতা বাংলার রাজবন্দীগণ মানিতে রাজী নহেন—এইরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির যথোচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন শ্রীযুক্ত সতীন সেন। কাহার ইঙ্গিতে বা কাহার প্ররোচনায় একজন বিশিষ্ট সদ্যমুক্ত রাজবন্দী মহাত্মাজীকে এইরূপ কথা বলিতে পারেন তাহা বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। কাহার ইঙ্গিতে বা প্ররোচনায় "রায়স্ উইক্‌লি"তে শরৎচন্দ্রের প্রতি বিষোদ্গার হইয়াছে তাহাও পরিস্ফুট।

"The depressed classes group has been swaying between the present Ministry and the Congress but neither * * * nor Mr. Sarat Chandra Bose with his membership of the Congress High Command has been able to shephered them well." —"রায়স্ উইক্‌লি"র এই মন্তব্য যে কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা গত রবিবার "আনন্দবাজার পত্রিকার" কার্য্যালয়ে ব্যবস্থা পরিষদের তপশিল-ভুক্ত সদস্যগণ ও বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের চা-চক্রের মিলন বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। হক—নাজিম—নলিনী সচিব সঙ্ঘ বহুদিন পূর্ব্বে চূর্ণ হইত যদি না বিধানচন্দ্রের স্নেহসিক্তি খণ্ডদল তলে তলে শরৎচন্দ্রের বিরোধিতা করিয়া তাঁহার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম না করিতেন। শরৎচন্দ্রের

ঔদারতার সুযোগ লইয়া কংগ্রেসীদলে বিধান-নলিনী প্রেম-পুষ্ট কয়েকজন সদস্য আশ্রয় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারাই নিয়মানুগত্য অস্বীকার হইয়া কংগ্রেসীদলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছেন। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যাঁহার প্রকাশ্যে অবতীর্ণ হইবার শক্তি ও সাহস নাই, রাজনীতিক গগন ঘন-কুহেলী-কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইলে যিনি শিলংয়ের শান্তিকুঞ্জে পলায়ন করেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় যাঁহার নেতৃত্বের একমাত্র কৃতিত্বের পরিচয়, কংগ্রেসের মনোনয়নের ছাপ পাইয়াও শেষ মুহূর্ত্তে নেতা শরৎচন্দ্রকে না জানাইয়া বা তাঁহার অনুমোদন না গ্রহণ করিয়া যিনি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কংগ্রেসী নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন সেই বিধানচন্দ্রের সচতুর ছুতিয়ালী ক্ষমার্হ নহে। যে অপরাধে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত নেতা মিঃ ন্যারিম্যান ওয়ার্কিং কমিটির ভর্ৎসনা লাভ করিয়াছেন কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে রায়—রুণী চুক্তি করিয়া ও ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে শেষ মুহূর্ত্তে শরৎচন্দ্রের বিনা অনুমতিতে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কি তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ করেন নাই? তবে মহাত্মাজীর চিকিৎসক হইলে যদি সব দোষ ত্রুটী মার্জ্জনীয় হয় তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

নিখিল-বঙ্গীয়-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন

(আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রেরিত)

গত শনিবার, ২৬ মার্চ্চ, সন্ধ্যা ৬॥টায় মাননীয় নাটোরাধিপ মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্র নাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌম্য-দর্শন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদাত্তগম্ভীর কণ্ঠে সংস্কৃত মঙ্গলাচরণ ও বৈদিক স্বস্তিবাচন দ্বারা প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন। ইহার পর প্রতিযোগিতার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় একটি লিখিত বিবৃতিতে জানান যে, সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত কলারসিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের দীর্ঘ দিনব্যাপী অসুস্থতার জন্যই এবার প্রতিযোগিতার কার্য্যারম্ভ হইতে বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের কথাও তিনি সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তার পর আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত দামোদর দাস খান্না (লালা বাবু) প্রথমে পরিষ্কার সাধু বাংলায় ও পরে সুমধুর হিন্দী বক্তৃতায় সম্মেলন ও প্রতিযোগিতার কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহার পর মহারাজ নাটোর একটি সুষ্ঠু সংযত বক্তৃতা দ্বারা প্রতিযোগিতার কার্য্যারম্ভ করেন।

এবারের প্রতিযোগিতায় অনেকগুলি বৈশিষ্ট আমাদিগের দৃষ্টিতে পড়িল। উহাদিগের কয়েকটি উল্লেখ এস্থলে করিব; অপর কয়েকটির কথা পরে সমালোচনায় প্রকাশ করা যাইবে। প্রথমতঃ, এইরূপ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ মন্ত্রের পরেই সুশিক্ষিত গায়ক গায়িকা গণের সম্মিলিত কণ্ঠে বাঙলার নিজস্ব মাতৃনাম মহামন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিত হইল না কেন? আমরা কয় বৎসর হইতেই লক্ষ্য করিতেছি যে, "বাসন্তী বিদ্যাবীথী" নামক একটি তথাকথিত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন স্বয়ম্ভু নায়ক মিলিত হইয়া সম্মেলনের উদ্বোধনে বাসন্তীরঙে ছোবান কাপড়-পরা কয়েকটি শিশু বালিকা ও তরুণীর অমিলিত কণ্ঠে উহাদিগের বহু প্রচারিত ও চির-সমালোচিত রাজবন্দনাগীতি "জনগণমন অধিনায়ক" পেটেণ্ট গীতটি গাওয়াইয়া থাকেন। গতবার তবু স্বনামধন্য সঙ্গীত মার্ত্তণ্ড ওঙ্কারনাথজী ঠাকুর গন্ধর্ব্ব-নিন্দিত কণ্ঠে এই বন্দেমাতরম্ গানটি গাহিয়া সম্মেলনের সকল ত্রুটি নাশ করিয়াছিলেন। এবারও শুনিতেছি, পণ্ডিতজীর শুভাগমন হইবে। আমরা মাননীয় নাটোরাধিপ, ভূপেন্দ্র বাবু ও লালা বাবুকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, সম্মেলনের উদ্বোধনে এবার যেন ওঙ্কার নাথজীকে (অথবা তাঁহার অভাবে অন্য যে কোন গায়ক বা গায়িকাকে) দিয়া "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি অখণ্ডভাবে গাওয়ান হয়। আর বাসন্তী বিদ্যাবীথীর পরিচালক-বৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিই—যদি মাতৃমন্ত্র কলঙ্কিত করিতে তাঁহাদিগের ইচ্ছা না থাকে, তবে তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের ঐ পেটেণ্ট সঙ্গীতটি পরিত্যাগ করিয়া দেশপ্রিয় শ্রোতৃবর্গকে অব্যাহতি দেন।

অধ্যাপক অশোক নাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় অভিনয় দর্পণ নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপনও সভাস্থলে নজরে পড়িল। এই বইখানি সত্যই অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। শুধু বাংলায় নয়, ইংরাজী বা অন্য কোন ভাষাতেও প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য-কলা সম্বন্ধে এজাতীয় আলোচনা এ পর্য্যন্ত আমাদিগের চোখে ঠেকে নাই। শুদ্ধ মুদ্রার যে ৬৫ খানি আর্টপ্লেটে হাফটোন চিত্র ইহাতে দেওয়া হইয়াছে, বই আসলে না পড়িয়াও কেবল এই চিত্রগুলির সাহায্যেই যে কোন বালক বালিকাই উত্তমরূপে ও শুদ্ধভাবে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্য শিখিতে পারিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। বর্ত্তমান নৃত্য প্রতিযোগিতায় যে সকল বালক বালিকা নামিবেন, তাঁহারা এ গ্রন্থখানি একবার করিয়া দেখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা বারান্তরে করিব।

নিখিল-বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অসুস্থতার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বাঙলার সঙ্গীত রসপিপাসুগণ তাঁহার নিকট উচ্চ সঙ্গীত রসাস্বাদনের সুযোগ লাভের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। অতএব তিনি যে নিরাময় হইয়া এবার প্রতিযোগিতায় যোগদানে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত। আশা করি, তাঁহার সম্মেলনও এবার পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে।

অন্যান্য আলোচনা বারান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

দীর্ঘদিন পরে আমরা আবার রেডিও নিয়ে আলোচনা করছি।

বেতারে পল্লীমঙ্গল আসরের কিছু কিছু উন্নতি আমরা লক্ষ্য করছি। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অধুনা এদিকে কিছু লক্ষ্য দিয়েছেন। পল্লী-মঙ্গল আসরে তাঁর আলোচনা গল্পচ্ছলে বক্তৃতাগুলি আজকাল বেশ ভালোই হচ্ছে। কিন্তু তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এখনও অনেক দূরে পেছিয়ে রইয়েছেন। ভালো আর্টিষ্ট বাইরের ভালো বক্তা, পল্লী-উন্নতি বিষয়ক আলোচনাদির এখনও অভাব রয়েছে এই বিভাগে। বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত চট্টোপাধ্যায় এদিকে দৃষ্টি দিন!

* * *

বিদ্যার্থী মণ্ডলের বক্তৃতাগুলি পূর্ব্বের তুলনায় কিছু পরিমাণে সহজ, সরল জ্ঞাতব্য তথ্যে পর্য্যবসিত হয়েছে আজকাল। বাংলা-দেশের প্রতি জিলার ভৌগলিক বিবরণের আলোচনা প্রশংসার্হ। বাংলাদেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির সহজ আলোচনা Out Knowledge এর জন্য বিশেষ পরিমাণে আবশ্যক। আমরা এই বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তার প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামগুলি আশানুরূপ হচ্ছে না। আমরা বহুদিন ধরে এই বিভাগটি সম্বন্ধে আলোচনা করে আসছি; কিন্তু বিশেষ উন্নতির ধারা আমরা লক্ষ্য করছি না। এ বিভাগটির প্রতি রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে উদাসীন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রেডিও জন শিক্ষার বাহন, বাংলা-দেশে স্ত্রীশিক্ষা অত্যন্ত হতাশাজনক। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান মহিলাদের জন্যেই বিশেষ করে; অতএব এ বিভাগের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে রীতিমত কৃতিত্বের প্রয়োজন হয়। শুধু কয়েকটি গান, বাজনা, ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা আর পাঁচালী দিলেই কর্ত্তব্য শেষ হবে না। মহিলা বিভাগে চাই মহিলাদের উপযুক্ত আসর। মহিলা প্রসঙ্গ, সাহিত্য প্রসঙ্গের সবিশেষ আলোচনাদির আবশ্যক। আমরা এ বিভাগটির প্রতি বিশেষ অবহেলা কয়েক-দিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। আমাদের ধারণা রেডিও সেট বাড়ীর মহিলাদের জন্যেই বিশেষ করে। এই বিভাগ সম্বন্ধে বেতার-গ্রাহিকা বহু মহিলা আমাদের অভিযোগ জানান। আমরা এবারে শুধু দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের কয়েকদিনের প্রোগ্রামের সমা-লোচনা পত্রস্থ করলুম।

গত সোমবার ২১শে মার্চ্চ নির্ম্মল ভট্টা-চার্য্যের ব্যবস্থাপনায় গানের আসর বসলো। কুমারী দেবীরাণী সিংহ গান গাইলেন, সমালোচনার বাইরে। সুষমা ভট্টাচার্য্যের গান, চলন সই। অনিল ভট্টাচার্য্যের গান ভালোই। নির্ম্মল ভট্টাচার্য্যের গান সুন্দর।

এদিনে মহিলা-প্রসঙ্গ কিছুই নেই।

* *

মঙ্গলবার ২২শে মার্চ্চ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে পাঁচালী পাঠ করলেন গৌর মোহন মুখোপাধ্যায়, সেই এক ধারা। পরে সাহি-ত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্য্যের প্রয়োজনায় "জয়দেব" অনুষ্ঠিত হোল। অনিল বাবু জয়দেবের জীবনী এবং জয়দেব কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কুমারী লাবণ্য

গোরা

ভারতবর্ষের আত্মা
ভারতবর্ষের হৃদয়
ভারতবর্ষের তপস্যা
ভারতবর্ষের উপলব্ধি
যাহাতে
প্রতিফলিত
বর্ত্তমান যুগের
মহাভারত স্বরূপ
সেই অদ্বিতীয় কাহিনীর
চিত্ররূপ দিতেছেন
দেবদত্ত ফিল্মস্

—পরিচালনা—
শ্রীনরেশ মিত্র

শ্রেষ্ঠাংশে
জীবন গাঙ্গুলী
রাণীবালা

বিশ্বাসের সংস্কৃত পদাবলী গান অপূর্ব্ব হয়েছিল। পঞ্চানন বাবুর গান "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" -চলনসই। সমবেত বন্দনা গীত গাইলেন কুমারী উষা মুখার্জ্জী, লাবণ্য বিশ্বাস, ভানুদেব ভাদুড়ী, পঞ্চানন দে প্রভৃতি—সুন্দর হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন নির্ম্মল সিংহ। আমরা মহিলা-আসরে এই ধরণের সাহিত্য আলোচনার পক্ষপাতী। সঙ্গীতে, কাব্যে "জয়দেব" প্রসংসার দাবী রাখে।

* * *

বুধবার ২৩শে মার্চ্চ "ভারতীয় নারীর আদর্শ" চতুর্থ পর্য্যায়ে 'গার্গী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন শ্রীবিমল বসু। এ ধরণের বক্তৃতা মহিলা-আসরে প্রয়োজন আছে। বিমল বাবুর আলোচনা আরও 'গার্গী' সম্বন্ধে স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। পরে নমিতা চট্টোপাধ্যায় কণ্ঠসঙ্গীত গাইলেন—সমালোচনার বাইরে। যন্ত্রীসঙ্ঘ অর্কেষ্ট্রা বাজালেন, সুন্দর। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্যের গান মন্দ নয়।

* * *

বৃহস্পতিবার, ২৪শে মার্চ্চ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে তারাপদ চক্রবর্ত্তী 'খেয়াল' গাইলেন সুন্দর। পরে সন্তোষ সেনগুপ্তের প্রযোজনায়, শ্রীযুত পরিমল গোস্বামী রচিত গীতনাট্য 'পদ্মরাণী' অনুষ্ঠিত হোল। লেখক পরিমল বাবু নিশ্চয়ই এটি শিশুদের জন্যে রচনা করেছেন। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে এরকম প্রোগ্রাম নির্ব্বাচনের কোন অর্থ আমরা খুজে পাইনে। এটি ছোটদের বৈঠকে অনুষ্ঠিত হলে সামঞ্জস্য থাকতো। অভিনয় প্রসঙ্গ অতি বাজে। গান দু'খানি ভালো।

* * *

শুক্রবার ২৫শে মার্চ্চ কোরাণ পাঠ এবং ইসলামী সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল।

শনিবার ২৬শে মার্চ্চ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক "অলঙ্কার শিল্প" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বিভিন্ন যুগের অলংকার প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা মহিলা-আসরের যথার্থ উপযোগা। বক্তৃতাটি আমরা বিশেষ উপভোগ করেছি, এধরণের বক্তৃতার প্রয়োজন দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে। পরে ডি, এন, ঘোষের ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান—ভালো নয়। দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিরক্তি-কর প্রোগ্রাম।

বর্ত্তমান বৎসরের স্মরণীয় অবদান

এই শনিবার থেকে 'চিত্রায়' নিউ থিয়েটাসের স্মরণীয় কথা-চিত্র 'বিদ্যাপতির' প্রদর্শন সুরু হ'বে। এই সর্ব্বজন পরিচিত সাধক কবির পূত জীবনের চিত্তহারী কাহিনী, ছবির পর্দ্দায় যে একটি নতুন মাধুর্য্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ কোরবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দরদী ও মরমী প্রয়োগ-শিল্পী—দেবকী বোস, তাঁর বুকের দরদ দিয়া এর চিত্র-নাট্য রচনা কোরেছেন। পদাবলীর বহু বিখ্যাত গান, অপূর্ব্ব সুরের মূর্চ্ছনায়, সুর-শিল্পী রাই বড়ালের পরিচালনাধীনে, বাণী-চিত্রে মূর্ত্ত হোয়ে উঠেচে। আলোক-চিত্র এবং শব্দ সংরক্ষণের দিক দিয়ে, স্বাভাবিক সঙ্গতি ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন নিউ থিয়েটার্সের দুই যুগল শিল্পী—ইউসুফ মুলজী এবং লোকেন বসু। সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে সব শিল্পীর দল এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলেছেন—বাঙলার চিত্র রসিকদের দরবারে তাঁদের প্রতিষ্ঠার কথা আজ আর কারু অজানা নাই।

প্রধান ভূমিকাগুলি এই ভাবে বিতারিত হোয়েছে:

নাম ভূমিকায়···পাহাড়ী সান্যাল সঙ্গীতের মাধুর্য্যে ও অভিনয়ের উৎকর্ষে তিনি কবি বিদ্যাপতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কতখানি রাখতে পেরেছেন, আপনারা তার বিচার কোরবেন।

কবি সঙ্গিনী অনুরাধা, চিত্র নাট্যকারের একটি অপরূপ সৃষ্টি। এই ভূমিকায়, গানে ও অভিনয়ে, প্রাণ সঞ্চার কোরেছেন, —কানন দেবী।

কানন

রাজা শিবসিংহ ও রাণী লছমীরূপে আপনাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কোরতে পারবেন বাঙলার চিত্র-রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ছায়া দেবী।

কবির পরিচর্য্যাকারী ও শুভানুধ্যায়ী, 'বৃদ্ধ মধুসূদন দাদা'-র ভূমিকায় মধুর সঙ্গীতের উৎসে সকলের অন্তর আলোকিত কোরবেন সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে।

৫। রাজ বয়স্য, সৈণ বিদুষকরূপে আত্ম-প্রকাশ কোরবেন—অমর মল্লিক। বিদুষক-পত্নী (দেববালা) এবং পেয়ারের ভৃত্য (অহি সান্যাল)—এদের সম্মিলিত অভিনয়, সমগ্র নাটকে যে আনন্দের সন্ধান দেবে, এখবরটাও আপনাদের আজ গোপনে জানিয়ে রাখা দরকার।

মহা-অমাত্য এবং সেনাপতিরূপে স্বাভাবিক অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেবেন বাঙলার অপর দুই জনপ্রিয় নট—প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন পাল।

শেষ দৃশ্যে দেবদাসী রূপে, অপূর্ব্ব নৃত্য-কুশলতার পরিচয় দেবেন,—লীলা দেশাই।

—নাটিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

নাটকের সুরু—মিথিলাধিপতির প্রমোদ কাননে, বসন্তোৎসবের সমারোহের মধ্যে।

এইখানে রাজা শিবসিংহের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিদ্যাপতির অকস্মাৎ দেখা হয়, বহুদিন পরে।

তারপর হয় কবির সহিত রাণী লছমীর পরিচয়।

বিস্মিত স্তব্ধ মহারাণী অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন কবির দিকে। উৎসবের প্রারম্ভ থেকে এক অপূর্ব্ব গরিমায় আকৃষ্ট হোয়ে, যে যুবককে তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত, উদ্যানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনুসরণ কোরে ফিরেছেন—এই সেই যুবক, বিদ্যাপতি!

কৃষ্ণচন্দ্র দে

রাজা পেয়েছিলেন প্রাণহীন প্রতিমা। তাতে প্রাণ সঞ্চার কোরতে ডাক দিলেন তাঁর বাল্য সখা বিদ্যাপতিকে। বিদ্যাপতি হোলেন মিথিলার রাজ কবি। বিদ্যাপতির সঙ্গে বিশপী থেকে এসেছিলেন কবি সঙ্গিনী অনুরাধা।

তার পর সুরু হোল গোপন ষড়যন্ত্র। যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে রাজা চলে গেলেন সীমান্তে। রাণীকে দেখা শোনার ভার দিয়ে গেলেন কবির উপর।

ততদিনে বিদ্যাপতির প্রভাবে রাণী লছমী দেবীর অন্তরের আলোক জ্বলে উঠলো। আলো যে জ্বেলেচে—রাণীর মন পড়লো তার উপর। রাজা সবই জানলেন। তাঁর বুকে ছিল ব্যথা, কিন্তু অবিশ্বাস ছিল না।

রাণী যে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি কবির চরণে অর্পণ কোরে আজ ধন্য, সাধক তা' শুধু দেবতার চরণেই অর্পণ করে। কিন্তু মিথিলার জনসাধারণ তাঁর প্রেমের সে শুদ্ধ মূর্ত্তিটি সাধারণ দৃষ্টিতে গ্রহণ কোরতে পারে নি। তাই তাদের হীন কল্পনায় ভেসে উঠলো, এক জঘন্য লালসা-দিপ্তি কামনার চিত্র!

কিন্তু যে প্রেমের সাধনার অনুরাধা সিদ্ধি লাভ কোরেছিল, সে প্রেম হিংসা-দ্বেষ বিবর্জ্জিত। তাই অন্তর্দ্বন্দ্বে, রাজা ও রাণী যখন কাতর, তখন অনুরাধা সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কোরেছিল, প্রেমের এই মহামন্ত্র উচ্চারণ কোরে—

"আমার বাহির দুয়ারে
কপাট লেগেচে,
ভিতর দুয়ার খোলা"—

রাজা এদিকে হঠাৎ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অন্তরের আঘাতে শয্যাশায়ী হলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর প্রেম কী এমন ব্যর্থ হবে, এর কী কোনই দাম নেই?

কিন্তু অনুরাধার মুখের বাণী প্রেমের সেই মহা-মন্ত্র, রাজারও চক্ষু ফুটিয়ে তুললো। কেমন কোরে, প্রেম সাধনার সেই পুত-বেদীতে দাঁড়িয়ে, সকল বিরোধ, সকল দ্বন্দ্বের অবসান হোয়ে গেল—নাটকের পরিসমাপ্তিতে তারই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আপনার চক্ষুকে অশ্রুসজল কোরে তুলবে।

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স—অভিজ্ঞান

অভাগিনী সন্ধ্যা—আজ সকল দিকেই সর্ব্বহারা!

অমিনা তা'কে উদ্ধার করেছিল সত্য। কিন্তু লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। সমাজ তাকে আশ্রয় দিলে না। জমশেদপুরে, প্রকাশের আশ্রয়ে এসে, তার মহানুভবতার পরিচয় পেয়ে, সন্ধ্যা প্রথমটা খানিকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল। সন্ধ্যার প্রতি প্রকাশের স্নেহ, সন্ধ্যার বেদনায় প্রকাশের দরদ—প্রকাশের স্ত্রী সবিতার অন্তরে সন্দেহ জাগিয়ে তুললো। সবিতার ধারণা, এত শুধু স্নেহ নয়, তার চেয়েও এমন কিছু ধারালো, জোরালো বস্তু, যার দ্বারা তার ষোল আনা পত্নী স্বত্বের খানিকটা কেটে বেরিয়ে, সন্ধ্যার এলাকায় গিয়ে জুড়তে পারে! আর সত্য কথা বোলতে কী, সন্ধ্যার মত এমন একটি অপরূপ পদার্থকে পাশে রেখে, স্বামীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে বাস কোরতে পারে, এমন মনের জোর কয়জন মেয়ে মানুষের আছে? স্ত্রীলোক অবস্থা বিশেষে হয় ত' স্বামীর সবটা ছাড়তে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই খানিকটা ছাড়তে পারে না।

সন্ধ্যাকে তাই প্রকাশের আশ্রয় ছাড়তে হোল।

এ পৃথিবীতে আশ্রয় যে কত বড় বস্তু তা' যার নেই সেই জানেনা। অনাহারে দেহ ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সেই দেহটার অবস্থিতির জন্য, এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে একহাত ভূমি অধিকারে না থাকার মত বড়ো বিড়ম্বনা আর নেই!

সন্ধ্যার সেই বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী, "অভিজ্ঞান" চিত্রের মর্ম্মকথা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়িয়েও, এই পথের চরম দুর্গতি থেকে ভগবান তাকে বাঁচিয়েছিলেন। তার বিবেক, তার ধর্ম্ম, তার সতীত্ব—অব্যাহত রেখে, সন্ধ্যা তার জীবনের চরম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হোয়েছিল।

• নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিখানিতে আপনারা তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হবেন। সন্ধ্যার ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন—শ্রীমতী মলিনা। প্রকাশ ও সবিতার ভূমিকায় সুবিখ্যাত শিল্পী শৈলেন চৌধুরী ও দেববালার অভিনয় আপনাদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারবে বোলে আমাদের বিশ্বাস।

কালী ফিল্মস—চোখের বালি

কালী ফিল্মসের "চোখের বালি" সমাপ্তির পথে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই "চোখের বালি" উপন্যাস বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতা এমন কেউ নেই যে একাধিকবার পড়েছেন! এই উপন্যাস খানির ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এত চিত্তাকর্ষী যে এই গল্পটি সিনেমার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই জন্য কালী ফিল্মস্ বহু অর্থব্যয়ে এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় শিল্পীদের সমাবেশে এই গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন।

সম্প্রতি ছবিখানার কাশীতে অন্নপূর্ণার বাড়ীর দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে। মহেন্দ্রের মন প্রাণ অশান্তিতে ভরে উঠেছে। একদিকে আশা অন্যদিকে বিনোদিনী। আশাকে সে ভুলতে পারে কিন্তু কই বিনোদিনী ত' এখনও তাকে ধরা দিচ্ছে না। বিনোদিনীর ভালবাসা পাবার জন্য সে সব কোরতেই প্রস্তুত; কিন্তু বিনো-দিনীর মনের ভাব যে সে এখনও বুঝতে পারছে না। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কাশীতে এল বেড়াতে। মহেন্দ্রকে দেখে অন্নপূর্ণা

সকলের কুশল জিজ্ঞাসা কোর্লেন পরে বেহারী সম্বন্ধে বল্লেন—"সে কি আর বিয়ে কর্বে না?" মহেন্দ্র জবাব দিল—"কই কিছুমাত্র উদ্যোগ দেখি না।"

এর পরে মহেন্দ্র আবার কোলকাতায় ফিরে এল। ইতিমধ্যে বেহারী মহেন্দ্র আশা বিনোদিনীকে কেন্দ্র কোরে নানা গণ্ডগোলের বীজ রোপিত হ'ল। আশা বিনোদিনীর উপর মহেন্দ্রের ভার দিয়ে কাশীতে গেল অন্নপূর্ণার কাছে। আশাকে দেখে অন্নপূর্ণা সকলের খবর জিজ্ঞাসা কোর্লেন এবং বেহারীর ব্যাপার জানতে চাইলেন। আশা এই প্রশ্নের জবাবে বল্ল—"তার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করো না।" এমন সময় বাইরের দরজায় কে কড়া নাড়ল। আশা দরজা খুলেই দেখল বেহারী। আশা অমনি দরজা বন্ধ কোরে দিল এবং অন্নপূর্ণাকে এসে অনুরোধ কোর্ল—"ওকে এখুনি যেতে বলে দাও।" বেহারী এই কথা শুনতে পেয়ে যাবার উপক্রম কোর্ছে এমন সময় অন্নপূর্ণা বাইরে আসতেই বেহারী গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বল্ল—"আর নয়—আর একটা কথাও তুমি বলো না কাকীমা!"

এদিকে বিনোদিনীকে পাবার জন্য মহেন্দ্র পাগল হ'য়ে উঠ্ল। হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হ'য়ে সে একদিন গভীর রাত্রে চোরের মত বিনোদিনীর ঘরে—যেখানে রাজলক্ষ্মী ও বিনোদিনী ঘুমাচ্ছিল সেখানে প্রবেশ কোর্ল। এই সময় হঠাৎ রাজলক্ষ্মীর ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় এবং মহেন্দ্রকে সাম্নে পেয়ে বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কোর্লেন—"মহীন, তুই এত রাত্রে এখানে?" মহীনের বাক্‌রুদ্ধ হ'ল। রাজলক্ষ্মীর আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না। তিনি বিনোদিনীকে তার ব্যবহারের জন্য দোষারোপ কোর্তে লাগলেন। কিন্তু বিনোদিনী হটবার মেয়ে নয়, সে রাজলক্ষ্মীকে বল্ল—"……তুমিও কি তোমার বৌয়ের ওপর ছেলের মন ভোলাতে চাও নি……?—পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত! ফাঁদ আমিও কতকটা জেনে, কতকটা না জেনে পেতেছি—ফাঁদ

কতকটা তুমিও পেতেছ! আমাদের জাতের ধর্ম্ম এই—আমরা মায়াবিনী!"

উপরি উল্লিখিত এই দৃশ্যগুলোতে বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়, রমা ব্যানার্জ্জি, মিসেস্ ঘোষ, ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় কোরে রবীন্দ্রনাথের অমর চরিত্রগুলির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা কোরছেন। মিঃ বি, পি, মেহেরা এই ছবিখানির তত্ত্বাবধান কোর্ছেন। ছবিখানির খুটিনাটি সব ব্যাপারেই মিঃ মেহেরার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সতু সেনের পরিচালনা, মধু শীলের শব্দগ্রহণে, ও ননী সান্যালের আলোক চিত্রে "চোখের বালি" যে নবশ্রীমণ্ডিত হবে—একথা বলাই বাহুল্য।

দেবী ফুল্লরা

বাঙ্‌লার অন্যতম প্রধান পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় হাজরা পিক্‌চার্সের প্রথম পৌরাণিক চিত্র নিবেদন "দেবী ফুল্লরা"র শুটিং সমাপ্তির পথে। যুগ-যুগান্তর অতীত গরিমার চিত্ত আলোড়নকারী প্রেম ভক্তি ও শৌর্য্য বিমণ্ডিত এই অপূর্ব্ব কাহিনীটি কালী ফিল্মসের সুযোগ্য টেকনিশিয়ানদের সাহায্যে বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনে এক পুলক-শিহরণ যাতে জাগিয়ে তুলতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী থেকে আরম্ভ করে সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

গেল হপ্তায় এই ছবিখানির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য তোলা হয়েছে, যেখানে ভীলগন কর্ত্তৃক কালকেতু ও ফুল্লরা, রাজা ও রাণী বলে অভিষিক্ত হন। বন কেটে নগর বসিয়ে সেখানে ভীলরা তাদের রাজা ও রাণীকে নিয়ে মনের আনন্দে আছে সেখানে এসে জুটল পাপাত্মা ভাড়ুদত্ত। শিক্ষিত ভাড়ুদত্তের বাকজালে ও মায়াজালে কালকেতু ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে লাগল, মদ্য, সর্দ্দার রাজার এই অধঃপাতের কথা দেবী ফুল্লরার গোচরীভূত ক'রল কিন্তু ফুল্লরা নিরুপায়—আজ বৎসরাধিককাল ফুল্লরা তার হৃদয়ের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে। ভাড়ুদত্তের মায়াজালে কালকেতু মদ ও পরনারীতে হয় আসক্ত। বহু চেষ্টা করে ফুল্লরা একদিন তার সাক্ষাৎ পেলেন কিন্তু কালকেতু তখন এত মত্ত ছিল, যে সে ফুল্লরাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিল। এই ব্যাপারের পর প্রজারা ক্ষেপে উঠল রাজপুত্র ও ভাড়ুর জীবন হরণ করবার জন্যে। তারপরের ঘটনা আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় জানাব।

দেবদত্ত ফিল্মস্

গোরা শুধু ভারতবর্ষের আদর্শ, ভারতবর্ষের সাধনা, ভারতবর্ষের সমস্যার রূপক-

কাহিনী মাত্র নয়, তার চেয়ে বেশী কিছু। অতীতের কাছে বর্ত্তমানের, অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে শুভবুদ্ধির, উদার আদর্শের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সঙ্ঘর্ষে আলোড়িত, প্রেম ও ত্যাগের মহিমময় উজ্জ্বল, এই বিশাল, বিচিত্র কাহিনীর তুলনা যে কোন যুগেই বিরল। নরেশ মিত্রের পরিচালনায় দেবদত্ত ফিল্মসের চেষ্টায় ও যত্নে এই কাহিনীটি যে রকম তাড়াতাড়ি চিত্রে নিখুঁতভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে তাতে বাংলা দেশের দর্শকদের আর বেশী দিন উৎসুক হয়ে অপেক্ষা বোধ হয় করতে হবে না।

রবীন্দ্র নাথের এই অপূর্ব্ব কাহিনীটি দেবদত্ত শীল প্রচুর অর্থব্যয়ে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত কোরছেন—তার এই বিপুল প্রচেষ্টাকে আমরা অন্তরের সহিত সমর্থন করি। কিন্তু "গোরার" ভূমিকা-লিপি যেভাবে বণ্টিত হয়েছে তা' দেখে আমরা বিশেষ সন্দেহাকুল হ'য়েছি। 'গোরার' ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর মনোনয়ন ভালই হয়েছে। তার বন্ধু মোহন ঘোষাল ও তার দাদা রবি রায় সম্বন্ধেও কারুর কিছু অভিযোগ করবার নেই। নরেশ মিত্রের পানুবাবু হবে অপূর্ব্ব। পরেশ বাবুর অংশে অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চে অভিনয় কোরেছেন তা' তার শিল্পী-জীবনের অনবদ্য দান। ঐ চরিত্রে আমাদের মনে হয় বাঙলাদেশে তার জুড়ী নেই। এই ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মনোনয়ন আমাদের মনে লাগছে না। সুচরিতার ভূমিকায় প্রথমে নির্ব্বাচিত হয়েছিল বীণা এখন দেখছি উক্ত ভূমিকায় নামবেন রাণীবালা। রাণী একজন সুঅভিনেত্রী তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আলোচ্য ভূমিকায় রাণীর মনোনয়নও আমরা সমর্থন করিনা।

রবীন্দ্রনাথ তুলির পরশে 'সুচরিতা'র যে রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন—তার সঙ্গে পর্দার সুচরিতার সাদৃশ্য নিয়ে পদে পদে বাঁধবে গণ্ডগোল। তবে যদি বয়োবৃদ্ধ নরেশ বাবু খোদার ওপর খোদকারি করেন অর্থাৎ সুচরিতাকে একটি সৎ সাজান তা' হ'লে আমাদের বল্‌বার কিছু নেই। ললিতার ভূমিকায় একটি নতুন মেয়ে নাম্‌ছে—নাম জানিনা উপাধি দাশগুপ্তা। এর সম্বন্ধে এখন আমরা কিছুই বল্‌তে পারি না। এই ক্ষেত্রে আমরা দেবদত্তের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা কোরছি ভূমিকা লিপি বণ্টন কোরছেন কে? নরেশ মিত্তির না দেবদত্ত শীল?

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

"অভিনয়ে"র যবনিকা পড়বে কবে? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'লাম যে, "অভিনয়" এখনও অর্দ্ধেক শেষ হয়নি—এই ছবির কোন প্রকার প্রচারকার্য্য এখনও আরম্ভ হয়নি অথচ এরই মধ্যে প্রায় নব্বুই
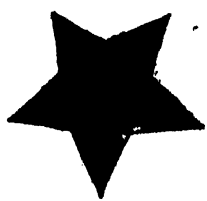
হাজার টাকা এই ছবির জন্য খরচ হ'য়ে গেছে। বাবুলাল চোখানি একজন ঝুনো ব্যবসায়ী হ'য়ে একি কোরছেন! "অভিনয়ে"র অভিনেত্রী 'ক্যানোভা'র 'ককটেল' পার্টিতে যে সময়টা অতিবাহিত করেন তার অর্দ্ধেক সময়ও যদি তাকে দিয়ে শুটিং করানো যেত, তা' হ'লে ত' এতদিনে কবে ছবি শেষ হ'য়ে যেত। মধু সাধনার "অভিনয়" শেষ হ'তে যত দেরী হ'চ্ছে লোকে যে ততই সংশয়াকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

নিউ সিনেমা

আসছে কাল ১লা এপ্রিল শুক্রবার থেকে প্রথম ভারতীয় রঙীন্ ছবি 'কিষাণ কন্যা' এখানে দেখান হ'বে। ভারতীয় রঙীন্ ছবির আদর আমাদের দেশে আছে। এবং সেই হিসেবে মনে হয় নিউ সিনেমায় এ ছবিখানি বেশ কিছু দিন চল্‌বে।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার ২রা এপ্রিল থেকে 'মুক্তি' দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়বে। প্রথম সপ্তাহের জনসমাগম দেখে মনে হয় যে 'মুক্তি' দক্ষিণ কলিকাতা থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে না।

রূপবাণীতে হাল বাঙলা

এই শনিবার হইতে মেট্রোপলিটন পিকচার্সের হাল-বাঙলা রূপবাণীতে চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিল। কৌতুকরস, ব্যঙ্গ, প্রণয় ও সঙ্গীত সমন্বয়ে হাল বাঙলার যে অভিনব রূপ ছায়াচিত্রে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে তাহা দর্শকবৃন্দকে শুধু অপরিসীম আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

—

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"বাসুকী ঋষির শিষ্য পৌলব হইল।
তেঁই সে বাসুকী গোত্র পৌলব পাইল॥
পৌলবের বংশে জন্ম নিল বিশ্বনাথ।
সেনাপতি কর্ম্মে তিনি ছিল বড় খ্যাত॥
কান্যকুব্জ-রাজার হইল সেনাপতি।
বিশ্বনাথ বহু যুদ্ধে লভিল সুখ্যাতি॥
তাহে তিনি হইলেন বিশ্বনাথ সেন।
তাঁর বংশে মহীপতি সেন জন্মিলেন॥
সেই বংশে রমানাথ উদ্ভব হইল।
কনোজ হইতে তিনি গৌড়ে আইল॥"

এই রমানাথ সেনই আদিশূরের নিকট হইতে বাসার্থ দীর্ঘগঙ্গা গ্রাম পাইয়াছিলেন।

"ভাগীরথী নদীতীরে দীর্ঘগঙ্গা গ্রাম,
সর্ব্বস্থানে দিগঙ্গা বলিয়া ঘুষে নাম।
সুন্দর সে গ্রামখানি কি শোভা তাহাতে,
সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে।"

—(বাসুকী-কুলগাথা)

দিগঙ্গা প্রাপ্ত হইবার পর তিনি (রমানাথ) তথায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার ৭ম অধস্তন পুরুষ শ্রীমান্ সেনের সময় দিগঙ্গা বিখ্যাত শহর এবং সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এখন সেখানে মাত্র কয়েকটি দীঘি ও ঢিবি ব্যতীত অন্য কোনও ভগ্নাবশেষ নাই।

বসুমজুমদার মহাশয়ের পুরন্দর সেন উল্লিখিত রমানাথ-সেনেরই ঔরসজাত সন্তান। আমরা রমানাথ হইতে বরিশালের অন্তর্ভুক্ত রায়েরকাটির মুল রুদ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত উনিশ পুরুষের বংশলতা দিতেছি। (১) রমানাথ—(২) পুরন্দর—(৩) মাধব-নারায়ণ—(৪) রামনারায়ণ—(৫) দিবাকর—(৬) ভাস্কর—(৭) শ্রীমান্—(৮) মালাধর—(৯) হরিহর—(১০) রামগোপাল—(১১) দৈত্যারি—(১২) যজ্ঞেশ্বর—(১৩) শিবশঙ্কর—(১৪) রত্নেশ্বর—(১৫) বিশ্বম্ভর—(১৬) মদনমোহন—(১৭) রাজা শ্রীনাথ রায়—(১৮) রাজা শ্রীরাম রায়—(১৯) রাজা রুদ্রনারায়ন রায়। ইনি রায়েরকাটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বলেশ্বরের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ অরণ্যানী আবাদ করিয়া রুদ্রনারায়ণ রায়েরকাটি নামে রাজধানী স্থাপন করেন দিগঙ্গা এবং হইতে পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন আনিয়া স্থায়ীভাবে বাস করেন।

'পুরন্দর সেন ১২০২ খৃষ্টাব্দে বগড়ি প্রদেশে অধুনা ২৪ পরগনার দিগঙ্গায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছেন'—বলিয়া বসুমজুমদার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহারও কোন ভিত্তি নাই। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ডে আছে—"শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনদেবের কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সেনদেব একপ্রকার স্বাধীন ভাবে সুদূর বিক্রমপুরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। বগড়ীর অন্তর্গত যশোহর, খুলনা তখন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ছিল।" —এই বিষয়কে তিনি সাবধানে পুরন্দরের উপর সাজাইয়া ইতিহাস (?) লিখিয়াছেন; এমন কি পুরন্দর সেনকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় পাণ্ডুবংশীয় (!!) বলিয়া দৃঢ়তায় প্রচার করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। ইতিহাস—চিরদিনই ইতিহাস। মনগড়া কথার ছড়া নহে।

তিনি তাঁরপর ছায়াচিত্রের মত মুহূর্তে শাণ্ডিল্য গোত্রকে বাসুকী গোত্রে পরিবর্তিত

করিয়া দিয়াছেন এক রীতিমত টেকনিকের পরিচয়। তাঁহার এই ছায়া-চিত্র-গল্প প্রসঙ্গের একস্থানে লিখিত হইয়াছে—'এই রাজবংশধরগণ সেই হইতে পূজাপার্ব্বন, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মের সময় শাণ্ডিল্য গোত্র বলিয়া পশ্চাৎ বাসুকী গোত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।—ইহা শ্রেফ্ তিনি তাঁহারই শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কিনা তিনিই হলপ করিয়া বলুন। শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের পিতামহ ষষ্ঠিবর সেনের পিতামহী হরিমণি দাসীর ও পিতা যদুনাথ সেনের শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং ষষ্ঠীবরের দুই কন্যার ও যদুনাথের তিন কন্যার বিবাহ—এই কয়টি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো কতিপয় ক্রিয়া-উপলক্ষ্যে যশোররাজবংশীয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজা শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় তদীয় ব্যবস্থায় এবং কর্তৃত্বে সকল সুসম্পন্ন করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রত্যেকবারে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ক্রিয়াগুলি সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইয়াছিল। তিনি বলেন—"উহাদের অনেক ক্রিয়া আমি করাইয়াছি; কিন্তু আজ অবধি বাসুকীগোত্র ব্যতীত শাণ্ডিল্যগোত্র ঘুনাক্ষরে উচ্চারিত হইতে শুনিনাই।" খুলনা জেলার মারকা নিবাসী শ্রীযুত বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় ঐ বংশের বর্ত্তমান পুরোহিত। তাঁহাকেও আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছিলে—"আপনারা-ও কি ঐ সঙ্গে ক্ষেপিয়াছেন?"

যেখানে একটা ইতিহাসকে টানিয়া আনিয়া যবনিকার অন্তরালে ইচ্ছানুযায়ী রূপ দিতে হইবে, অথচ প্রকৃত বিষয় যেখানে নির্ব্বাক, সেখানে একটি মামুলী উপন্যাসের অবতারণা করিয়া পাদপূরণ যেন এ যুগের একটা বৃহৎ ধর্ম্ম।

রমানাথ সেনের প্রপৌত্র রামনারায়ণ সেন গৌড়েশ্বর বিজয় সেনদেবের মন্ত্রী ছিলেন। বিজয় সেনদেবের রাজত্বকাল হইতেছে খৃষ্টীয় ১০৭২—১১১৮ পর্য্যন্ত। এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে রামনারায়নের পিতামহ পুরন্দর সেন কোন্ এবং কাহার আমলে গিয়া পড়েন। গৌড়েশ্বর মহারাজ সামন্ত সেনদেবের প্রায় সমসাময়িক হন না কি তিনি? সুতরাং কি প্রকারে আমরা পুরন্দরকে শ্রীমল্লক্ষণ সেনদেবের পুত্রদিগের সময়ে আনিতে পারি?

পুরন্দর সেনের পুত্র মাধব নারায়ণ সেন। এই মাধব নারায়ণের পর তাঁহারই পৌত্র দিবাকর সেন পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মাধবের পুত্র রামনারায়ণ। রামনারায়ণ মহারাজ বিজয় সেনদেবের মন্ত্রী ছিলেন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই রামনারায়ণকে যদি বসুমজুমদার মহাশয় মাধবনারায়ণের পত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহা হইলে সত্য ইতিহাসকে পঙ্গু করিতে পারিতেন না। সকল বুঝিয়া তিনি বুদ্ধির সহিত রামনারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুধু একটি নয়—অমন আরো দুইটি পুরুষকেও (ভাস্কর সেনের পুত্র শ্রীমান্ সেন ও তৎপুত্র মালাধর সেনকে) অবিচলিত চিত্তে পরিত্যাগ করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ

বালক সঙ্ঘ

বালক সঙ্ঘ দক্ষিণ কলিকাতার একটী শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসরের ন্যায় গত রবিবার এদের বাৎসরিক ষ্টীমার সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। বেলা সাড়ে এগারটায় চাঁদপাল ঘাট থেকে প্রায় ৩০০ শত যাত্রী নিয়ে 'হাওড়া' নামক ষ্টীমার ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে রওনা হয় এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় পুনরায় চাঁদপাল ঘাটে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার প্রোগ্রামের মধ্যে যে সকল আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়ের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স-হিন্দুস্থান রেকর্ডের আর্টিষ্টদের সঙ্গীত ও সঙ্ঘের সভ্যদের নানা প্রকার 'রূপসজ্জা' উল্লেখযোগ্য।

যে সকল সভ্য এই অনুষ্ঠানটীকে সর্ব্বপ্রকার সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সলিল দত্ত ও অমর রুদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেহালা বাণীমন্দির

বিগত ২৮শে ফাল্গুন বাণী মন্দিরের সভ্যগণ ৺অপরেশ চন্দ্রের 'চণ্ডীদাস' নাটক অভিনয় করেন। শ্রীযুক্ত করালী চক্রবর্ত্তী (চণ্ডীদাস), গোবর্দ্ধন দাস (হারাধন), ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (জমিদার), নলিনী নাথ নস্কর (নস্কর মামা) এবং স্ত্রী ভূমিকায় পশুপতি ঘোষক (রামী), সুশীল কুমার (নিত্যা) কৃষ্ণধন দাস (চাঁপা) প্রভৃতি ভূমিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শকদের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দত্তজা তো গেলেন। কিন্তু বংশীর বুকে যে হাতুড়ির ঘা পড়া সুরু হোল তার তুলনায় আগের রাতের ঘা গুলো তো ফুলের ঘা। পুরো একটি ঘণ্টা ভাবনার জগদ্দলভার বুকে নিয়ে সে বসে রইলো। চন্দর কখন চা রেখে গিয়েছিল। কাপ থেকে ধোঁয়া উঠে উঠে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বংশীদের বংশটাই ছিল বুদ্ধিমানের বংশ, তবু বংশী হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলো। শেষে সে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে Algebra কষে দত্ত শিকদার সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু তাতে সঠিক উত্তর না পেয়ে আবার মন নিয়ে তোলপাড় করতে বসলো; শেষে চন্দর এসে বল্লে "দাদাবাবু অনেক বেলা হোল যে। নাওয়া খাওয়া করবেন না?"

চমকে উঠে বংশী বল্লে "ওঃ—তাইতো বেলা যে শেষ হতে চল্লো রে।"

চন্দর গালভরা হাসি হেসে বল্লে "হ্যাঁ, উঠে পড়ুন, আর ভাবনা কি? দত্ত মশাই যাবার সময় আমাকে তো বলেই গেলেন 'ওহে চন্দর, আমাদের নেড়ীর সঙ্গে তোমার দাদাবাবুর বিয়ের তো সব ঠিক। জোগাড়-যন্তর করো হে, এ বিয়ে দিয়ে তবে আমি দিল্লী যাবো।' ভাগ্যি দত্তমশাই কথাটা আমাকে জানিয়ে গেলেন তাইতো ভদ্রলোককে বলে খবরটা জানাতে পারলুম।"

"ভদ্রলোক! কে ভদ্রলোক?"

"কে এক সদরের শিকদার, জমীদার।"

বংশী কতকটা আপনার মনে বল্লে "জমীদার, না যম।" তারপর চন্দরকে বল্লে "তা সে লোকটাকে তুই দত্ত মশাইয়ের কথা বলতে গেলি কেন?"

চন্দর মুখভার করে দুটো হাত নেড়ে বল্লে "তা আমি কি করবো? তিনি যে বল্লেন, আপনার বিয়ের খবর পেয়েছেন। খবরটা পাকা কিনা তিনি যে জানতে চাইলেন। তা লোকটি বেশ ভদ্দর আর বিয়ের খবরে বেশ খুশী হয়েছেন বলে মনে হোল। হ্যাঁ, তিনি আবার জানতে চাইছিলেন, কখন তবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?" বংশীর মনে হোল চেয়ারখানা তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ডাক দিলে "চন্দর!"

চন্দর জবাব দিলে "দাদাবাবু!"

আমাকে আজই একটু বাইরে যেতে হবে। কোথায় যে যাবো তা বলতে পারছি নে। কাশী কি লঙ্কা, গয়া কি গোয়া যেখানে হোক। ফিরতেও একটু দেরী হবে। বাড়ী বন্ধ করে তোদের সব জবাব দিয়ে যাবো। অবশ্য তিন-মাসের মাইনে বেশী পাবি, তিন মাস পরে যদি ইচ্ছে হয়তো ফিরে খবর নিস্ ফিরেছি কিনা।"

চন্দর হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বল্লে "আচ্ছা দাদাবাবু।"

"হ্যাঁ, আর দেখ চন্দর—"

"দাদাবাবু!"

"একটা ছবি তোলা—মানে ওই বায়স্কোপের দলে চাকরী পেয়েছি। দেখ দেখি কোন সাজের দোকানে পরচুল, দাড়ী-গোঁফ, লম্বা নাকের মুখোস আর কোথাও এক জোড়া নীল কাচের চশমা পাস্ কিনা।"

ঘণ্টা দেড়েক পরে বংশী বাড়ীর খিড়কির দরজা খুলে মুখটা বাড়িয়ে সাবধানে সামনে, বাঁয়ে, ডাইনে একবার দেখে নিলে। তারপর দরজায় তালা দিয়ে পা টিপে টিপে ট্যাক্সিতে উঠে, ওই কড়েয়ার দিকে ট্যাক্সি চালাতে বলে চুপ করে গাড়ীতে বসে রইলো। সেখানে মাথা ঠোকা এক গলির ভেতর ছোট্ট একটা হোটেলের দোতালার একখানা খুপরী গোছের ঘরে ঢুকে চুল, দাড়ী, মুখোস লাগিয়ে নীল কাচের ঠুলি এঁটে দত্ত শিকদার কোম্পানীর বিরুদ্ধে Campaign চালাবার মতলব আঁটতে বসলো। সারাটা দিন সে আর ঘর থেকে বেরোল না। তারপর দিন ভোরেই একটু চা খেয়ে সেলামৎ মিঞার সস্তা সাজের দোকানে গেল টুরিষ্টের পোষাক কিনতে। শুনেছিল ওখানে খোদার সৃষ্ট কোন বস্তুর সস্তা Editionএর অভাব হয় না। মতলবটা যত শীঘ্র পারে দত্ত শিকদার কোম্পানীর চোখে ধুলো দিয়ে হাওড়ায় এসে এগারোটা প্ল্যাটফরমের যে কোন একটার টিকিট কিনে রেলে চেপে পায়ে হেঁটে পৃথিবী চক্কর দেওয়ার পালা সুরু করবে। তারপর কাশী কি লঙ্কা, কাশ্মীর কি কামস্কাটকা যেখানে হোক গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসবে।

সেলামৎ মিঞার দোকানের চৌকাট ডিঙোতেই যত ওস্তাগর, নোকর, সেলামতের ভাইয়ের দল সব সেলাম ঠুকতে সুরু করলে। তারপর বংশীকে মস্ত খদ্দের ঠাওরে তাকে ঘিরে প্রশ্নবান ছাড়তে সুরু করলে। বংশী তাদের দু' একটা জবাব দিয়ে চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলো সন্ন্যাসীর চিমটে, লোটা, কম্বল থেকে সুরু করে ফকীরের আলখাল্লা টুপী, মালা কি বস্তু না সাজানো আছে। একবার দোকানের চৌকাট ডিঙোলে সেলামৎ মিঞার পাঁচ ভাই আর যত ওস্তাগর, নোকরদের এস্তাজারিতে কিছু সওদা না করে বেরোবার

জো আছে? দেখতে দেখতে পাকা লোকের তদ্বিরে যে জিনিষগুলো বংশীর সামনে এসে জুড়ো হোল তা দিয়ে দত্ত শিকদার কোম্পানী তো তুচ্ছ স্বয়ং যমরাজের চোখে ধুলো দেওয়াও অতি সহজ কাজ। লোকগুলো তাকে একদম ভুল বুঝেছে দেখে বংশী বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠলো। তারা ভেবেছে বংশী বোধহয় সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বৈরাগ্যের পথে পা বাড়াবে বলে এসেছে সেলামৎ মিঞার সস্তা সাজের দোকানে। নিজের দরকারের কথা সেলামৎ মিঞাকে জানাতেই মিঞা সাহেব একমুখ হেসে বল্লে "ওঃ, তা এতক্ষণ বলতে হয় বাবুসাহেব। আপনার ভাগ্যি বহুত ভালো যে আপনাকে পরামর্শ দেবার মত লোক ঠিক সময়ে আমাদের দোকানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। ভদ্রলোক শিকারের ঝোঁকে সব দেশই ঘুরেছেন। শিকারী সহদেব শিকদারের নাম শুনেছেন নিশ্চয়।" দাঁড়ী গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে বংশীর মুখ বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না তবু যেটুকু দেখা যাচ্ছিল ততটুকু ছাই রঙের হয়ে গিয়েছিল।

"শিকারী সহদেব শিকদার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! জবরদস্ত শিকারী!"

"হাওয়া—বেজায় গরম—হাওয়া!"

হাওয়ার সন্ধানে বংশী দোকান থেকে হাওয়ার মত বেরোতে যাচ্ছে এমন সময় দরজা জুড়ে দোকানে ঢুকলেন স্বয়ং দামোদর দত্ত। চমকে পেছু হটতেই বংশী গিয়ে পড়লো গাদা করা পায়জামার গর্ত্তে। সেলামৎ মিঞার পল্টন দিকে দিকে ছিটকে পড়ে জাব্বা, পায়জামা, টুপী, মালা, কম্বল যা হাতের কাছে জুটে গেল এনে হাজির করলে দরজার সামনে। হাত নেড়ে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে দত্তজা হাঁক দিলেন "ঘোড়ার চাবুক মিলবে?"

"খোদাবন্দ! হুজুর! বহুত মিলবে!"

"বহুতে দরকার নেই। বেঁটে বাঁট ওয়ালা বেজায় মজবুৎ চাই একগাছা।"

তখনই সেলামতের ভাই নেয়ামৎ নিয়ে এলো সহদেব শিকদারকে। যথেষ্ট সহবৎ দেখিয়ে সহদেব শুধোলে "ওনার কথাই বলছিলে নাকি হে? নমস্কার, শুনলুম নাকি পায়ে হেঁটে পৃথিবী চক্কর দিতে বেরোচ্ছেন? আপনার উপগার করতে পারলে কেতাত্ত হবো।"

দত্তজা লাফিয়ে উঠে বল্লেন "আরে কেও? শিকদার খুড়ো নাকি? যা অন্ধকার চিনতে পারিনি। মাপ করবেন, মনে কিছু করবেন না।"

সেলামৎ হাঁক দিলে "আরে কোন হ্যায়? ডিবিয়া লেও।"

বংশী গলার স্বর চেপে বলে উঠলো "না, না ও ডিবের গন্ধে আমার বমি আসে, ভুষোয় চোখ জ্বলে। চোখ বেজায় খারাপ কিনা।"

সহদেব উপগার করবার উৎসাহে তাড়াতাড়ি বল্লে 'ওরকম আকারে স্বভাব, খাটো দর্শন নিয়েতো চক্কর দিতে বেরোন ঠিক নয়।"

দত্তজা বল্লেন "চেনা মানুষ নাকি হে খুড়ো?"

"না, না। ঘুরতে বেরোচ্ছেন শুনলুম, যদি সাহায্য করতে পারি। মানে পরের উপগার পরম ধর্ম্ম, বুঝলেন না দত্তজা?"

সেলামৎ বল্লে "উনি তো আগেই একদফা লোটা, কম্বল, চিমটে, আলখাল্লা, টুপী, মালা নিয়েছেন।"

সহদেব শিকদার বল্লে "ত বেশ হয়েছে। এখন দু'চারটে কুমীর, সাপ, ব্যাঙ, বিছে, বাঘের কামড়ের দাওয়াই, একখানা বাঘছাল আর একটা ছাতি নিতে হবে।"

পরে যখন দেবে দাম তখন জিনিষ বাছাই করতে আর দেরী হয়? খুড়ো ভবঘুরের দরকারী যত রকম জিনিষ আছে বংশীর নামে কিনে ফেল্লে। দত্তজা শুধোলেন "তা এখানে কি মনে করে খুড়ো?"

"আমি? বাঁশের বেঁটে একগাছা দরকার হয়ে পড়েছে। বেয়াদবের মাথা—"

"আরে নাও! আমিও যে এসেছি চাবুকের খোঁজে। বেয়াদবের পিঠের ছাল—"

"বহুত আচ্ছা!…আজ আমার ওখানেই থ্যাট, কি বলেন দত্তজা?"

"তোফা হবে খুড়ো। আলবৎ যাচ্ছি।"

দুহাত কপালে ঠুকে বংশীকে নমস্কার করে শিকদার বল্লে "নমস্কার, মশাই নমস্কার!"

অপনার উপগার করতে পেরে কেতার্থ হলুম। তাহলে বেরোচ্ছেন কবে?"

মাঝখান থেকে সেলামৎ মিঞা গলা বাড়িয়ে বল্লে "আক্‌কের তুফান মেলে।"

চিৎকার করে দত্তজা বল্লেন "দিল্লী হয়ে পাঞ্জাবের দিকে কোথাও নাকি? বড়ই দুঃখিত যে আমি উপস্থিত কোলকাতায়। ও দিল্লীতে বহু আলাপী আছে, দোব চিরকুট লিখে। অনেক সুবিধে হবে। আর ট্রেনের সময় হাওড়ায় আসছি। দেখা করা যাবে, তখনই দিয়ে দোব চিরকুট….বিলক্ষণ! ওর জন্যে আবার ধন্যবাদ? কিস্‌স্যু দরকার নেই। ভূর্ণিতে আমার দুটি চক্ষের বিষ। নেড়ীর জন্যে মনে সুখ নেই, কারো উপগার করতে পেলে ভারী সুখী হবো।"

শুড়িখেরে হোটেলের খোঁপে ঢুকে বংশী ভাবলে ভাগ্য তাকে আচ্ছা জিভ ভেঙ্গাতে সুরু করেছে। সত্যি যদি দামোদর দত্ত তার সঙ্গে দেখা করতে হাওড়ায় আসেন তাহলে সেই দিকে ঘেসাতো মোটেই নিরাপদ নয়। যা খামখেয়ালে লোক, হঠাৎ যদি একখানা টিকিট কেটে তার সঙ্গ নেই তা হলেই তো বিপদ। ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়লে যদি দাড়ী গোঁফ, পরচুল খশে পড়ে—বংশী নিজের পিঠে একবার হাত বুলিয়ে নিলে। পিঠের শিরদাঁড়ায় কে যেন একবার বরফের মত ঠাণ্ডা আঙ্গুল চালিয়ে গেল। বুঝলে ওতে চলবে না, নতুন কোন ফন্দি আঁটতে হচ্ছে। চায়ের হুকুম করে, মাথায় ভিজে রুমাল জড়িয়ে বংশী আবার ভাবতে বসলো। বংশীর বংশের কাউকে হতবম্ব করা চলে কিন্তু একেবারে মুষড়ে দেওয়া সোজা নয়। ভাত খেতে যাবার আগেই বংশী বড় একটা Plan ঠিক করে ফেল্লে। ভেবে দেখলে আগের চেয়ে পাকা মতলব এবার সে এটেঁছে।

কাশী কি লঙ্কার চেয়ে এই কলকাতাতেই কোথাও লুকিয়ে থাকা ভাল। খেয়াল হলে গাধাপেটা চাবুক গাছটা বগলে নিয়ে দত্তজা

বরং তুফান কি মাদ্রাজ মেলের টিকিট কাটতে পারেন কিন্তু মেটে বুরুজের বাসের টিকিট নিশ্চয়ই কাটবেন না। মেটে বুরুজের বুরুজই হোল দত্ত শিকদার কোম্পানীর ওপর লুকিয়ে কামান দাগবার ঠিক জায়গা। বংশী ঠিক করলে রাত বারোটায় বেরিয়ে চুপি চুপি বাড়ী গিয়ে দামী জিনিষগুলো, কোম্পানীর কাগজ পত্র নিয়ে চলে যাবে মেটে বুরুজ অঞ্চলে তারপর একবার সেখানে গা ঢাকা দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসতে পারলে আর তারে পায় কে।

রাত্তির এগারোটায় চারদিক নিঝুম হয়েছে দেখে বংশী নবকান্ত নন্দীর হোটেল থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে বাড়ীতে এসে দরজায় তালায় চাবী ঘোরালে। তার ভয় হয়েছিল শিকদার খুড়ো হয়তো চব্বিশ ঘণ্টা তার বাড়ী পাহারা দেবে। কিন্তু চারদিক তাকিয়ে খুড়োর দাড়ীর ডগা কি বাঘের চোক দেখতে না পেয়ে ভাবলে "দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী!" বাড়ীতে ঢুকেই বংশী দরজায় হুড়কো লাগালে।

পা টিপে টিপে ভেতরে এসে হঠাৎ দেখলে রান্নাঘরের দিক থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে লম্বা দালানে। বাড়ীতে লোক ঢুকেছে ভেবে বংশীর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। তারপর ভয় করলে চলবে না ভেবে অনেক কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা কি?

হতভাগা চাঁদরাটা কি তাহলে তালার duplicate চাবী তৈরী করিয়ে রেখেছিল? মনিব বাড়ীতে নেই ভেবে হতভাগা বোধ হয় পাশের রায়বাহাদুরদের বাড়ীর চাকর নন্দাকে নিয়ে ফুর্ত্তির জোগাড় করেছে। রেগে বংশী ছুটলো রান্নাঘরের দিকে। খাবার ঘরে আলো জ্বালা, এক কোনে ঘোড়ের মকবুল মিঞার দোকানের ডেকচী আর গোটা দুয়েক ধেনো মদের বোতল কিন্তু লোকজন কেউ নেই। তাহলে মাল যখন রেখে গেছে তখন মালদার আসছে এখনই।

বংশীর মাথার পরচুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাঁ! বামন ঘরে গেলেই লাঙ্গল ওঠে শিকেয়, বটে? খাবাররাখা আলমারীর পেছুতে বংশী গা ঢাকা দিলে। মতলবটা ছিল, যখন চাঁদরা হতভাগা জুৎ করে খেতে বসবে তখন বেরিয়ে এসে এমন তোড়া তুড়বে সেই বাঁদরাকে যে দত্ত শিকদার কোম্পানীর ওপর গায়ের ঝাল পর্য্যন্ত ঝেড়ে নেবে সেই গাধাটার ওপর। কথাটা ভেবে কেমন একটা ফুর্ত্তিতে তার মন নাচতে লাগলো।

একটু পরেই বাইরে পায়ের ভারী শব্দ পেয়ে বংশী তাড়াতাড়ি পরচুল, চশমা, গোঁফ দাড়ী সব খুলে চাঁদরাকে নিজ মূর্ত্তি দেখিয়ে ভড়কে দেবার জন্যে তৈরী হয়ে, লাফিয়ে পরবার জন্যে লুকিয়ে রইলো। কিন্তু লাফিয়ে আর বংশীকে পড়তে হোলনা। উলটে খোলের ভেতর কচ্ছপ ঢোকার মত সে সেঁদিয়ে গেল আর যতটা পারে চুপ করে থাকবার জন্যে কান দিয়ে নিঃশ্বেষ ছাড়বার চেষ্টা করতে লাগলো। ঘরে ঢুকলো চাঁদরাও নয়, নন্দাও নয়, ঢুকলো এমন দুই নরমূর্ত্তি যাদের সামনে দত্তজা কি শিকদার তো তৃণাদপি তুচ্ছ।

বংশীর পা দুটো যেন মেঝের সঙ্গে এটে গেল। বংশী এর আগে সিঁদেল চোর কখনও দেখেনি। যদি দূরবীণটা হাতে থাকতো তা হলে ভাল করে ভগবানের আজব সৃষ্ট দুটি এই জীবকে ভাল করে দেখে নিতো। তবু এটা তার দেখতে বাধলো না যে ভাঁটার মত চোখ ঘুরিয়ে ডেকচী বোতল নজরে পড়তেই ত্যাঁদাটা ডেকচীটা খুলে দেখে আহ্লাদে নেচে উঠে, তারপর আলমারী থেকে দুখানা প্লেট বের করে ভারী হাতা দিয়ে মাংস ঢাললে। চাঁদরা এনে রেখে, গেছে বোধ হয় নন্দাকে ডাকতে, এমন দুটো দানা দত্যির মত আকাশ ফুড়ে পড়ে সাবার করতে লেগে গেল। তবু ভাল যে মিনিট দেড়েক বন্ধ করে রাখা নিঃশ্বেষটা বংশী যখন হুস্ করে ছাড়লে তখন ঝোলের হাপুস্ হুপুস্ শব্দে সে শব্দটা চাপা পড়ে গেল। তার পর এলো বোতল দুটো। হতভাগা চাঁদরা তাহলে লুকিয়ে নেশাও করে? যদিও তার ওপর বংশীর রাগ হচ্ছিল তবু বেচারার পয়সাগুলো মাঠে মারা গেল দেখে বংশীর কষ্টও হোল। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করবার মত জায়গা আর অবস্থা তো আর নয়।

প্রথম প্রথম ভূত দুটো মুখ বুঁজে খেয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ধেনো মদ পেটে পড়তেই ব্যাটাদের মুখ খুলে গেল।

"তোফা খ্যাঁট জুটে গেল রে বেন্দা।"

"যা বলেছিস্ বাবা। কিন্তু আমার মতলব তো শুনছিলি নে। আজ যা মিলবে তার তিন ভাগ আমার এক ভাগ তোর।"

"কি রকম? আধাআধি বখরাই তো হয়ে আসছে এতদিন। নেশায় তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

"চুপ কর বাবা। আধছটাক মদে নেশা হবে বাবা, তুই আমাকে তেমনী পেঁচী মাতাল ঠাওরাস্ নাকি?

"তা নোস্ বলেই তো জানতুম। কিন্তু আজ তোর বেয়াড়া কথা শুনে তাই তো মনে হচ্ছে।"

"হাতের বোতলটা উচিয়ে বেন্দা বল্লে এই ছটাকে-বোতলে নেশা হয়েছে যদি বলবি তো মারবো তোর মাথায় এই বোতলের বাড়ি এক ঘা।"

"বোতল বুঝি আমার হাতেও নেই? তবে উঁচাই নি। পেঁচোরাইতো কথায় কথায় বোতল উঁচায়।"

আলমারীর আড়াল থেকে উঁকি মেরে বংশী দেখলে গুণ্ডা দুটো মদের নেশায় ষণ্ডা

হয়ে উঠেছে। গলা জড়িয়ে আসছে আর লাল চোখ দুটো বন্ বন্ করে ঘুরছে। বাঘা বেন্দাকে পেঁচো মাতাল বলে গাল দিয়ে নিজে গলায় ঢক ঢক করে বোতলটা ঢালতে লাগলো আর সেই ফাঁকে বেন্দা হাতের বোতলটা তুলে দিলে বাঘার মাথায় বসিয়ে। বংশী আলমারীর পাশ থেকে উঁকি মারা বন্ধ করলে। যদিও বিনা টিকিটে এমন একটা আজব মজা দেখা ফস্কে গেল তবু উঁকি মেরে দেখতে তার ভরসা হোল না। তবু কানে যা আসছিল তাতেও কম মজা ছিল না। বংশী যা শুনল তাতে বুঝলে এক আলমারী আর দেওয়াল ছাড়া সব কিছু লড়াইয়ের সড়কি হয়ে উঠেছে। তারপর বাঘা বেন্দার মেঝেতে পড়ে ধস্তাধস্তি চললো আর হাতের কাছে যা জুটলো তাই দিয়ে ঘায়ের পর ঘা চলতে লাগলো। যে সব অভিধানবহির্ভূত গাল বংশীর বংশের কেউ কখনো শোনেনি সে সবের ঢেউ এসে বংশীর কর্ণপটকে ধাক্কা দিতে লাগলো আর যতই লড়াই জমে উঠতে লাগলো ততই বংশী ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা গড়াবে কতদূর? হঠাৎ যেমন একটি শব্দ করে লড়াই সুরু হয়েছিল তেমনি একটি শব্দ করে লড়াই ফতে হয়ে গেল।

তবু মিনিট কতকের আগে বংশীর আর উঁকি মেরে দেখবার সাহস হোল না। যখন দেখলে তখন মনে হোল এমনি সব scene থাকলে সিনেমা জমে কি চমৎকার! সিনেমার সব সরঞ্জামই মজুত, খালি নেই বোতল বাহিনী সাকী একটি। আলমারীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের অবস্থা দেখে বংশী বদনব্যাদন করে রইলো। বাঘা বেন্দা জড়াজড়ি করে একদম বেহুস হয়ে পড়ে আছে। দেখে কে বলবে যে একটু আগে এরাই শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই সুরু করেছিল। বাঘা যেন আওমাড়া কল থেকে ছিবড়ের মত বেরিয়ে এসেছে আর বেন্দাকে কে যেন তুলোধোনা করে ছেড়ে দিয়েছে। গুণ্ডা দুব্যাটা যদি পুলিশের চেনাও হয় তবু এখন তাদের চিনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। পুলিশের কথা মনে পড়তেই বংশী ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে ফোনে পুলিশকে খবর জানাতে পাল্টা জবাব এলো এখনই তারা আসছে গুণ্ডা দুটোকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। বংশী খাবার ঘরে গেল, কিন্তু গন্ধে আর বিকট দৃশ্যে তার গা বমি করতে লাগলো। ফাঁকা হাওয়ার অভাবে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। সে সদর দরজা খুলে বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, ফাঁকা হাওয়া নাক দিয়ে টেনে টেনে বুকটা হালকা করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এমন সময় অন্ধকারে পেছু থেকে বংশীর কাঁধে ভারী পাথরের মত একখানা হাত পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় সহদেব খুড়ো বল্লে "বংশী নাকি হে? দুটো কথা ছিল তোমার সঙ্গে।" পেছু ফিরে খুড়োর গোঁফ দাড়ীর জঙ্গলে অন্ধকারে বাঘের মত যে চোখদুটো জ্বলছিল তার পানে চেয়েও তখন কিন্তু বংশীর চোখের পাতা পড়লো না। কি জানি কেন, ও সময় তার মনে একটুও ভয় ছিল না। তার কেমন মনে হোল, তার আর খুড়োকে ভয় করবার দরকার নেই। এমন কি খুড়োকে তার অতি তুচ্ছ লোক বলেই মনে হোল। বাঘাবেন্দার লড়াই চোখে দেখার পর খুড়োকে তো তুচ্ছ বলে মনে হবেই।

এমন সময় ব্রেক কষার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একখানা থানার লরী থামলো আর তা থেকে লাল পিঁপড়ের সারির মত পুলিশ নামতে আরম্ভ করলে। দারোগা দয়াময় দণ্ডধর এগিয়ে এসে ভাঙা বাঙলায় শুধোলে "কে? বংশীবাবু নাকি?"

বংশী যথেষ্ট সহবৎ দেখিয়ে বল্লে "দারোগাবাবু নাকি? আসুন, আসুন। সোজা ভেতরে চলে যান। খাবার ঘরেই আপনার আসামীদের পাবেন। তবে শিক্ষাটা বোধহয় একটু বেশী রকম দেওয়া হয়ে গেছে। ফোনে বরং গোবদ্যি গয়ারাম গবাকান্তকে খবর পাঠান।"

"অবস্থা খারাপ নাকি?"

"খারাপ মানে? রীতিমত কাহিল। কি করি বলুন, রোগটা বেশী হয়ে গিয়েছিল আর হাতটাও বেপরোয়া চলেছিল।"

দারোগা দয়াময় বল্লে "তা ও যেমন কুকুর তেমনি মুগুরই হয়েছে।"

হঠাৎ বংশী হিন্দিতে বলে উঠলো "শান্তি বোলা।"

বংশীর কাণ্ড শুনে খুড়োর চোখ তো কপালে উঠে গেছে। দাড়ী গোঁফের জঙ্গলের ভেতর থেকে চোখ পিটপিটিয়ে খুড়ো বল্লে "ব্যাপার কি বংশী?"

প্রথমটা বংশী চমকে উঠলো। তখনই সামনে গিয়ে বল্লে "তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ খুড়ো?"

খুড়ো বল্লে "হ্যাঁ।"

"ওঃ—কি জরুরী কথা আছে আমার সঙ্গে, না?"

"হ্যাঁ, পাঁচ মিনিট আড়ালে দুটো কথা বলবো।"

"বংশী বল্লে "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! একটু দাঁড়াও। ওরা আগে বিদায় নিন্।

তারপর তোমার সঙ্গে—বাঘাবেন্দা ঢুকেছিল আমার বাড়ী। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই ?"

খুড়ো বলে উঠলো "বাঘা বেন্দা !" এমন সময় পুলিশের দল চ্যাংদোলা করে নিয়ে বেরিয়ে এলো সেই গুণ্ডা দুটোকে। তাদের পেছু পেছু হাঁকডাক করতে করতে বেরিয়ে এলো দারোগা দয়াময়। বংশীর পানে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে দারোগা দয়াময় বল্লে "আপনি দিন কতক একটু সাবধানে থাকবেন বংশীবাবু। বদমায়েস দুটোকে আচ্ছা সাজা দিয়েছেন। তবে একটু সাবধান হওয়া ভাল। কে জানে, কোন্‌দিন—"

"হ্যাঁ, শিক্ষাটা একটু বেশীই দেওয়া হয়ে গেছে। তবে সাবধান হবার দরকার দেখিনে। আচ্ছা, নমস্কার দারোগা বাবু, নমস্কার।" খুড়ো ? তা বাইরে কেন ? ভেতরে এসো। বেশ নিরিবিলি মোলাকাৎ হবে। চাকর বাকরদের আজ সব ছুটি দিয়েছি। বেশ দুজনে—"

খুড়ো আস্তে আস্তে বংশীর হাত থেকে হাত দুটি ছাড়িয়ে নিয়ে বাঁচলো। খুড়ো তো আর খুড়োই ছিল না। রাস্তার আলোয় দেখা গেল তার মুখ ছাইয়ের মত হয়ে গেছে। ঢোঁক গিলে খুড়ো বল্লে "তুমি কি সত্যি—তুমিই কি ও দুটোকে—"

"আমি কি ? ওঃ—তুমি গুণ্ডাদুটোর কথা বলছো ? হ্যাঁ, সিনেমায় গিয়েছিলুম বিনোদিনীকে—মানে মিস ডাটকে নিয়ে। ফিরে দেখি ভূতদুটো খাবার ঘরে দিব্যি চালিয়েছে। তাই একটু শিক্ষা দিয়ে দিলুম। দারোগা মশাই ঠিক কথাই বলে গেলেন। সত্যি, রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।" তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে গাঁট দিতে দিতে বল্লে "নাঃ—মেজাজটা ঠাণ্ডা করতে হবে। রাগ চণ্ডাল। ব্যাপারটা কি জানো খুড়ো, গায়ে যে আমার এত জোর, সব সময়ে সেটা নিজেরই খেয়াল থাকে না। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কি দরকার ছিল তাতো বল্লে না ?"

সহদেব শিকদার তাড়াতাড়ি দুবার ঢোক গিললে। তারপর বংশীকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় নেমে এলো।

"না না। এমন বিশেষ কিছু নয়।"

"কিন্তু খুড়ো এত রাতে দরকার না থাকলে এমনি কি আর এসেছ আমার খোঁজে ?" খুড়ো বার কতক কেশে নিলে। "হ্যাঁ, ডাক্তারের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা শুনলুম। তাই জানাতে এলুম সুখবরে আমি অত্যন্ত খুশী। আর—আচ্ছা—বিয়েতে কি উপহার দেওয়া যায় বলো দেখি ?"

"ধন্যবাদ খুড়ো ! তুমি লোকটি খুব মাই ডিয়ার বলতে হবে। তা ভেতরে একটু আসবে না ?"

"না ভেতরে আর যাবো না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। কাল ভোরেই আবার সোঁদর বনে যেতে হচ্ছে। ডাকে বিয়ের নেমতন্ন পাঠাতে ভুলো না, বুঝলে ভাই ?"

বংশী বল্লে "বিলক্ষণ। তোমরাই তো করবে কম্মো'বে। তা খুড়ো সেলামৎ মিঞার এখান থেকে বাঁশের খেটে নিচ্ছো তো ? কে জানে, শুনেছি সোঁদর বনের বাঘগুলো আজকাল বেজায় বেয়াদবী আরম্ভ করেছে।"

শিকারী সহদেব শিকদার বল্লে "শিকার টিকার সব ছেড়ে দোব ভাবছি। বয়েস তো হচ্ছে। আর ও বয়েসে জীব হত্যা—"

বংশী হুস করে একটা নিঃশ্বেষ ছেড়ে বল্লে "তাইতো খুড়ো, বড়ই দুঃখের বিষয়।"

খুড়ো বল্লে "বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা ভাই, এখন আসি।"

বংশী বল্লে "হ্যাঁ, তবে এসো এখন।"

"বিদায় !"

"বিদায় !"

শেষ পত্র

শ্রীদেবাশীষ সেনগুপ্ত

গোরস্থান। বহু পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী পরিপূর্ণ হয়ে—দেখাচ্ছে ফুলের বাগানের মত। লালটুপী, পায়জামা, সোনালী ডোরা ও বোতাম, তরওয়াল, কর্ম্মচারীদের ঘাড়ের পিট-গুলি, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সোনালী ফিতে—সমস্ত এদিক ওদিক দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সাদা কালো ক্রশগুলো লোহা, পাথর বা কাঠের শোকোদ্দীপ্ত বাহু বিস্তার করে শোভা পাচ্ছে।

ওরা গোর দিচ্ছে কর্ণেল লিমৌবির স্ত্রীকে; দু'দিন পূর্ব্বে স্নানকালে তিনি জলমগ্ন হন।

সব শেষ হলো। ধর্ম্মযাজক বিদায় নিলো। কিন্তু কর্ণেল দুজন কর্ম্মচারীর, পর ভর দিয়ে সেই উন্মুক্ত কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন,—ওর তলে তিনি এখনও দেখতে পাচ্ছেন সেই কৃষ্ণবর্ণ "কফিনটাকে"……ওরই মধ্যে যে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর যুবতী স্ত্রীর বিকৃত শবদেহ।

ওর বয়স যেন এগিয়ে গেছে—কত বছর! লম্বা পাতলা চেহারা…… সাদা গোঁফ-জোড়া!…… তিন বছর পূর্ব্বে ওঁর এক সহকর্ম্মী কর্ণেল সরটি'র কন্যা—পিতার মৃত্যুতে অনাথ হয়ে পড়ায়—উনি তাকে বিবাহ করেন।

যাদের 'পর উনি ভর দিয়েছিলেন—ক্যাপটেন ও লেফটেন্যাণ্ট ওকে দূরে নিয়ে যেতে চায়; উনি বাধা দেন। অশ্রুজলে চোখ ভরে আসে, জোর করে তা ফিরিয়ে দিতে হয়। "না! না!! আর একটু দাঁড়াও" চাপা গলায় মৃদু গুঞ্জন করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যে তিনি বল প্রয়োগ করেন।

আর কবরের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই। মনে হয় ওর গভীরতার আর সীমা নেই—অতল অসীম ও; যেন একটা সীমাহীন সাগর—তার অফুরন্ত প্রেম, তার স্বপ্নময় জীবন—সব এ বিশ্বে তার যা কিছু ছিল সমস্ত গ্রাস করে ফেলেছে!

সহসা জেনারেল ওরমো এসে উপস্থিত হলেন। সবলে কর্ণেলের বাহু ধরে তাকে টেনে নিয়ে চল্লেন। বল্লেন, "চলে এসো! চলে এসো বন্ধু! তুমি কিছুতেই ওখানে থাকতে পাবে না।"

কর্ণেল আত্মসমর্পণ করে বাড়ী ফিরলেন।

ঘরের দরজা খোলা মাত্র ওর লক্ষ্যপথে আসে একখানা চিঠি। তা' তুলে ধরে বিস্ময় ভাবাতিশয্যে উনি কাঁপতে লাগলেন; —স্ত্রীর হস্তাক্ষর তিনি চিনতে পেরেছিলেন। চিঠির উপর ডাকঘরের মোহর ছিলো সেইদিনের। খামখানা ছিঁড়ে ফেলে তিনি পড়লেন :—

বাবা, আশাকরি এখনও আপনাকে "বাবা" বলতে পারি, যেমন আমি চিরদিন বলে এসেছি। যখন আপনি এই চিঠি পাবেন তখন আমি থাকবো মৃত ও প্রোথিত। সুতরাং বোধ হয় আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন।

আমি আপনার করুণা উদ্রেক করবার জন্যে ব্যস্ত নই। আত্মদোষস্খালন করতেও আমি চাই না। আর একঘণ্টার মধ্যে যে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেবে—সে তা'র স্ত্রী-জীবনের সমগ্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে আনুপূর্ব্বিক সত্য ঘটনার যথাযথ বিবরণ আপনার নিকট প্রকাশ করতে উৎসুক।

সহৃদয়তা বশতঃ আপনি আমায় বিবাহ করেন—প্রতিদানে আমিও আপনার হয়েছিলাম। একটি ছোট্ট মেয়ে যত খানি ভালবাসতে পারে আমিও আপনাকে ততখানি ভালবাসতাম। আপনাকে ভালবাসতাম যেমন আমি ভালবাসতাম আমার জন্মদাতা পিতাকে;—হ্যাঁ! প্রায় তেমনই। একদিন আমি যখন আপনার হাঁটুর উপর বসেছিলাম আপনি আমাকে আলিঙ্গন করছিলেন,—আমি নিজের অজ্ঞাতে 'বাবা', বলে চিৎকার করে উঠি! সে ডাক স্ফূর্ত্ত হয়েছিলো আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে। আপনি আমার কাছে আমার পিতাই, হ্যাঁ—আর কিছু নয়—শুধু পিতা! আপনি হেসে আমায় বলেছিলেন, "সব সময়ে ঐ নামেই আমায় ডেকো খুকী—আমিও ভালবাসি।"

আমরা এলাম এই সহরে, এবং বাবাগো আমায় মার্জ্জনা করুণ,—আমি—আমি প্রেমে পড়লাম। ওঃ কতদিন আমি সংগ্রাম করিলাম ওর বিরুদ্ধে, কতদিন—প্রায় দুবছর। আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন—প্রায় দুবছর! ওঃ!! শেষে আত্মসমর্পন করলাম। তখন আমি দোষী ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক।

সে কে? আপনি কাউকে সন্দেহ করতে পারবেন না। সেদিক দিয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কারণ যাদের আপনি আমার বারজন গ্রহ উপগ্রহ নামে অভিহিত করতেন সেই বারোজন পদস্থ কর্ম্মচারী আমায় ঘিরে থাকতো—আমার সঙ্গে থাকতো।

বাবা! তাঁকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন না। তার বিরুদ্ধে ক্রোধ পোষণ করবেন না। অন্য কেউ হলে তার জায়গায় যা করতো সেও তাই করেছে। আর এও আমি জানি সে আমাকে ভাল-বাসতো তার সম্পূর্ণ হৃদয়খানি দিয়ে।

কিন্তু—শুনুন! একদিন আমরা 'বিক্যাসি' দ্বীপে গিয়ে মিলিত হবার বন্দোবস্ত করলাম। আপনি চেনেন—সেই ছোট্ট দ্বীপটীকে!—সেই বায়ু চালিত কলের কাছে! কথা ছিলো আমি সাঁতার কাটতে কাটতে তীরে উঠবো আর সে আমার অপেক্ষায় ঝোপের মধ্যে বসে থাকবে—হ্যাঁ!—তার পরেও, সে সেইখানে থাকবে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত,—যা'তে কেউ তাকে যেতে দেখতে না পারে।···আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবামাত্র একটা ঝোপের ডালপালা সরে গেল। চেয়ে দেখি—আপনার আর্দ্দালী 'ফিলিপ'। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মনে হলো যেন আমরা জ্ঞান হারিয়েছি;—আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। কিন্তু সে···সে···বুঝেছেন···সে বললে কেঁদনা প্রিয়তমে যাও একটু সাঁতার দিয়ে এসো। আমাকে এই লোকটার সঙ্গে রেখে যাও।

আমি চলে এলাম। উত্তেজনায় জলের তলে তলিয়ে যাচ্ছিলাম; তারপর আপনার বাড়ীতে ফিরে এসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম—ভয়ানক একটা কিছু ঘটনার।

এক ঘণ্টা পরে বাইরের ঘরে পোষাক-পরিহিত ফিলিপের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। চাপাগলায় সে বললো, "আমি হুজুরাইনের আজ্ঞাধীন—যদি কোনও পত্র তাঁর দেবার থাকে তিনি আমায় দিতে পারেন।" তখন আমি বুঝলাম—লোকটা আত্মবিক্রয় করেছে এবং আমার প্রণয়ই ওর এই মৌনতার ক্রেতা।

হ্যাঁ! আমি তাকে অবশ্যই আমার সব চিঠি দিতাম—সব চিঠি। সে সেগুলি পৌঁছে দিতো এবং আমার কাছে এনে দিতো তাদের উত্তর।

এমনি করে দুমাস চললো। আমরা তাকে বিশ্বাস করতাম—আপনি স্বয়ং তাকে যেমন বিশ্বাস করতেন।

এখন—·······দেখুন!··· বাবা!····. কি ঘটলো!···একদিন সেই দ্বীপেই আমি সাঁতরে গিয়ে উপস্থিত হলাম; এবারে আমি একা; আপনার আর্দ্দালীর সঙ্গে আবার দেখা হলো। সে আমার প্রত্যাশাতেই ছিলো···

আমায় শাসালে যদি আমি তার কামনার পরিতৃপ্তি সাধন না করি তবে সে আপনার নিকট আমাদের ধরিয়ে দেবে। যে চিঠিগুলি সে চুরী করে রেখে দিয়েছিলো সেগুলিও সে আপনাকে দেবে।

ওঃ বাবাগো! দুনিয়ার ভয় আমাকে চেপে ধরলো—হীন নীচতাময় ভয়, সর্ব্বোপরি আপনার ভয়—হায় এত সহৃদয় তবুও প্রতারিত! ভয় তার জন্যেও—কারণ আপনি তার প্রাণ নাশ করতেন! বোধহয় ভয় আমার নিজের জন্যেও!—কি করে বলি! ভয়ে আমার সত্ত্বা যেন বিলুপ্ত হলো!—তাই স্থির করলাম আর একবার আমি ঐ দুষ্টের মৌনতা ক্রয় করবো। ও আমাকে কামনা করে। ওঃ কি লজ্জা।

আমরা—আমরা স্ত্রীলোকেরা এত দুর্ব্বল! আমরা আপনাদের চেয়ে সামান্যতেই দিশেহারা হয়ে পড়ি। আর তারপর? যে একবার পতিত হয়েছে—ক্রমশঃই সে নীচে তলিয়ে যায়। কি করে আমি বলি—আমি কি করছিলাম! আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে মরতে হবে—এইই শুধু আমি জানতাম! তাই এই পশুর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

বাবা! দেখুন! আমি নিজেকে বাঁচাতে কোনও রকম সুযোগ অনুসন্ধান করছি না।

তারপর—আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম ভবিষ্যতে তাই হলো। বারবার আমায় ভয় দেখিয়ে সে তার খুসীমত আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতো। অন্যটীর মত সেও আমার প্রণয়ী হয়ে পড়লো। ঘৃণার কথা নয়? আর কি শাস্তি তার জন্যে—বাবা!

অবশেষে আমি স্থির করলাম—আত্মহত্যা করবো। জীবিতাবস্থায় আমি কিছুতেই আপনার কাছে এ অপরাধ স্বীকার করতে পারতাম না। মৃত্যুর পর কিসের ভয়? এভিন্ন অন্য উপায়তো নেই। অন্য কিছুই আমার এ কলঙ্কের চিহ্ন ধুয়ে দিতে পারে না। আমি বুঝলাম আর কোনদিন আমি ভালবাসতে পারবো না—ভালবাসার পাত্রীও হতে পারবনা। এমন কি আমার হস্তকম্পনও মনে হতো কি কালিমাময়!

অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই আমি স্নান করতে যাবো—আর ফিরে আসবো না।

আপনার নামে এই চিঠি যাবে আমার প্রণয়ীর বাড়ীতে। আমার মৃত্যুর পর সে এটা পাবে এবং এর অন্তর্ভুক্ত কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় আমার শেষ অনুরোধ পালনার্থে আপনার নিকট তা প্রেরণ করবে। আপনি স্বয়ং অন্তে ষ্টিক্রিয়া অন্তে ফিরে এসে এই চিঠি পড়বেন।

বিদায়! বাবা! আর আমার কিছু বলবার নেই।

যা ইচ্ছা করুন—আর—আর, আমায় মার্জ্জনা করুন। ইতি—

কর্ণেল কপাল থেকে ঘাম মুছলেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় ও যুদ্ধকালীন স্থিরতা আবার যেন ফিরে এলো।

তিনি ঘণ্টাধ্বনি করলেন—একটি ভৃত্য প্রবেশ করলো।

"ফিলিপকে পাঠিয়ে দাও" বলে ড্রয়ারটী টেনে অর্দ্ধেক খুলে রাখলেন।

প্রায় সেইক্ষণেই লোকটী তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো। লাল পাকান গোঁফ, লোমশ দেহ, ধূর্ত্ত দৃষ্টি ও চাতুরীপূর্ণ চক্ষু তার।

কর্ণেল তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

"আমার স্ত্রীর প্রণয়ীর নাম? বলো!…"

"কিন্তু…কিন্তু…হুজুর……"

সৈন্যাধ্যক্ষ দেরাজ থেকে পিস্তলটী উঠিয়ে নিলেন।

"হুঃ—তারপর? বলো! বলছি!! তুমি জানো এ সামান্য কারণে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছে আমার নেই!"

'হ্যা—অ্যা—হুজুর! তার নাম—… ক্যাপ্টেন সেণ্ট এ্যালবার্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার চক্ষু স্পর্শ করলো……কপালের মাঝখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে সে পড়ে গেলো। *

* গীজ মোপাসা

বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়ে তুমি

শ্রীঅমিয় কুমার রায় চৌধুরী

বাংলাদেশের শ্যামলা মেয়ে তুমি,
নহ তুমি স্বর্গের অপ্সরী।
সত্যি যদি কল্পলোকের পরী হতে তুমি—
হতে যদি পটে আঁকা ছবির মতন,
তোমার মাধুরী তাতে উঠতো নাকো ফুটে,
তার চেয়ে এই আছ বেশ।

অন্য কেউ দেখে যদি তোমা'
বলবে তুমি অতি সাধারণ!
আমি কিন্তু অন্যরূপ ভাবি—
মোর চোখে তুমি,
—জীবনের পূর্ণতায় সর্ব্বদা উজ্জ্বল,
কবিতার শুকতারা সম।

হাল্কা মেঘের মত স্বাভাবিক ছন্দে,
তুমি কর যাওয়া আসা,
দখিন বাতাসের মত
স্নিগ্ধ শান্ত ভাবে।
চরণের চাপে তব ফোটে নাকো ফুল,
মুক্তাও ঝরেনা হাসিতে।

তুমি যবে ভেসে যাও দৃষ্টির সুমুখে,
জীবনের প্রবাহের মত,
প্রাণে কোন উৎস হতে ভেসে আসে গান,
তোমার হাসিতে আছে জীবনের সুর।
প্রকৃতির মেয়ে কিনা তুমি,
তাই তব সবই স্বাভাবিক

তাই তুমি করনা হেঁয়ালী,
করনাকো মিছে অভিনয়।
মুক্ত তুমি আধোভীরু হরিণীর মত,
ব্রীড়াহীনা নও তুমি মোটে।

আপনার ঢঙে তুমি অত স্বাভাবিক,
আধফোটা পাপড়ির মত
লাজেভরা আভরণ দিয়ে
পরাণের পরাগে ঢেকে রেখেছ।
তাহলেও চঞ্চল মধুপের সম,
আমার এই তৃষিত হৃদয়ের কাছে,
আধফোটা পাপড়ির বিকাশের মাঝে
দিয়েছ যে মধুর আভাষ—
মর্ম্মের সুকোমল রেণুর সন্ধান।
কৈশোরের কল্প হতে, যৌবনের উচ্ছ্বাসের সাথে,

যে রূপসাধনার করেছি সন্ধান,
আঁধারের পথহারা মুসাফির আমি—
আজ ভাবি তারে আর নাহি প্রয়োজন!
তোমার ঐ স্নিগ্ধতার স্পর্শটুকু দিয়ে,—
বুঝিয়েছ তুমি, তোমারেই চায় মোর মন,
কল্পনায় বাস্তবের বিকাশের তরে।
তাই বলি বেশ মেয়ে তুমি,
তুমি মোরে, দূরে থেকে, করেছ আপন,
তাই তোমায় ভাল লাগে অত।
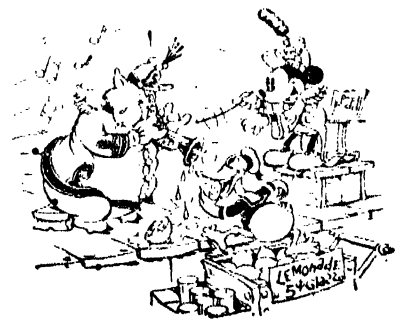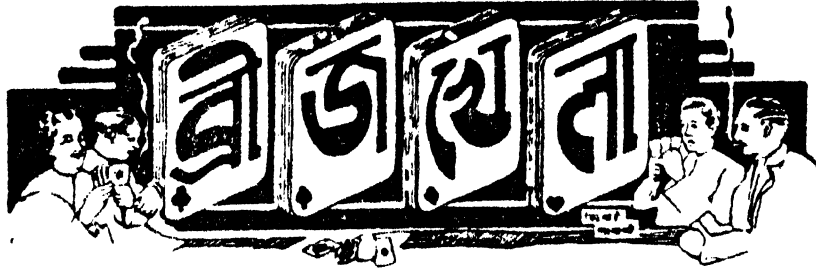
শ্রীদুর্ব্বাসা

ফিনাস গ্রহণঃ—ফিনাস নিয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেক সময় মতদ্বৈধ হতে দেখা যায়। এই ব্যাপার নিয়ে এই জন্য কয়েকজন পাঠক আমাদের কয়েকটি হাত পাঠিয়ে দিয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা এবার কয়েকটি অবস্থা নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ও তার সমাধানগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

(১)

উ। চিড়িতন—বিবি, সাতা, তিরি।
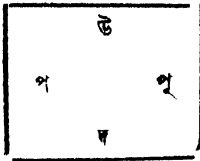
পূ। চিড়িতন—টেক্কা, দশ, ছরি।

আপনার একটি ফেরাইএর ডাকে বিপক্ষ 'প' চিড়িতনের ছকা খেলেছেন, ডামি চিড়িতনের সাতা দিয়েছেন। 'পূ' কি দেবেন বলুন তো?

'পূ' চিড়িতনের দশ মারবেন, কারণ যদি 'প'র হাতে সাহেব ও গোলাম থাকে, তবে ডাকদারেরা ঐ রঙে একটিও পিট পাবেন না। অথচ যদি 'প'র হাতে একটি মাত্র বড় তাস থাকে, তাহলে ডাকদারেরা মাত্র একটি পিট পাবেন।

(২)

উ। চিড়িতন—সাহেব, বিবি, দশ।

পূ। চিড়িতন—টেক্কা, সাতা, পঞ্জা।

এ ক্ষেত্রেও ডাকদার ফেরাইএর খেলা খেলছেন। 'প' চিড়িতনের তিরি খেলেছেন, 'উ' বিবি দিয়েছেন। 'পূ' কি ভাবে খেলবেন বলুন তো?

'পূ' এ ক্ষেত্রে টেক্কা না মেরে ছেড়ে দেবেন, কারণ দ্বিতীয়বার এই রঙে খেলা হলে টেক্কা কার হাতে আছে ডাকদারের পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর হবে। ডাকদার যদি ভুল করে সাহেব মেরে ফেলেন, তাহলে 'পূ' টেক্কা দিয়ে পিট ধরে বাকি কয়খানি চিড়িতনের পিট অনায়াসে নিয়ে নিতে পারবেন।

(৩)

উ। চিড়িতন—টেক্কা, আটা, ছরি।

প। চিড়িতন—সাহেব, পঞ্জা, চৌকা।
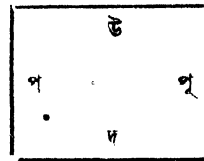
ডাকদার এবার ইস্কাবন রঙের খেলা খেলছেন। প্রথম পিটখানি নিয়ে তিনি চিড়িতনের বিবি খেলেছেন। বলুন তো 'প'র কি করা কর্ত্তব্য।

'প' এখানে সাহেব না মেরে ছেড়ে দেবেন, কারণ বিবি খেলায় বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর হাতে গোলাম আছে। প্রথম-বারে সাহেব মারলে বিশেষ কোন লাভই হচ্ছে না, কিন্তু যদি ডাকদারের হাতে বিবি, গোলাম, নয় থাকে তাহলে বরং ক্ষতিই হচ্ছে। কেন না তিনি অনায়াসে 'উ'র হাতে গিয়ে চিড়িতনের নহলা ফিনাস করে নিতে পারছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বারে গোলাম খেললেই তিনি তৎক্ষণাৎ সাহেব মেরে খেঁড়ীর হাতের দশখানি বড় করবার চেষ্টা করবেন।

এইবার এই তিনটি অবস্থা দেখানো হল ভবিষ্যতে যত রকমের অবস্থা হয় দেখাবার চেষ্টা করব।

অ-ধরা

—সনেট—

এম-সিরাজউদ্দীন চৌধুরী

দূরে আর রবে কত ওহে প্রিয় মম—
দিবে নাকি ধরা আজ হৃদয়ে আমার?
সন্ধ্যা আসে আনমনে খুল খুল দ্বার;
ফিরে কিগো যাব আমি অজানার সম?
বিশ্ব ভরে আছ তুমি ছায়াপথ সম—
পথ শ্রান্ত ক্লান্ত আমি পাই নাই তবু;
নিরাশায় ক্ষণে ক্ষণে কাঁদি বলি কভু;
বলে দাও কোথা তুমি ওগো নিরুপম।

মাটির মানুষ আমি···নিরাকার নহি;—
নিরাকারে আজি তাই নাহি বসে মন।
আছ কিনা নাহি আছ জানিবারে চাহি;
দেবী নহে মানবীতে দাও দরশন।
অ-ধরার পিছু ছুটে, পরে আঁখি বাহি,
শ্রাব ণর বারি ধারা···পা'য়ার স্বপন।

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নিরাপদ চলিয়া গেলে, লবঙ্গও উপরে আসিবার জন্য সিঁড়ির নিকটে আসিল। সিঁড়ির পাশেই বৈঠকখানার ঘর। বৈঠকখানা ঘরে নিরাপদ ও রামদীনে কথা কহিতেছে, লবঙ্গ শুনিতে পাইল। সে সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিবার মুখে দাঁড়াইয়া সে কথাগুলি শুনিল।

নিরাপদ বলিতেছে, হাঁরা রামদীন? ডাক্তারবাবুর ঠিকানা কি বলতে পারিস্?

—ডাগ্দার বাবু? যো ডাগ্দারবাবু হামলোক্কা বাড়ীমে আতা হ্যায়, উস্কো?

হাঁ, হাঁ—উসকো।

—এতো একদম সিধা রাস্তা! বাড়ীসে বাহার হোগা, ত ডাহিনা চলিয়ে। একদম সিধা চলা যাইয়ে। পয়লা, বাঁয়েমে একঠো গলি মিল জাগা! উস্কো ছোড়কে ফিন্ যো গলি মিলেগা, উস্মে ঘুস যাইয়ে। ওহি গলিমে বরাবর চলা যাইয়ে! যাতে যাতে যাহা একঠো মন্দির মিলেগা, ওহি মন্দিরকা বগলমে সতীশ ডাগ্দার বাবুকো খোজ করিয়ে,—মিল্ যাগা!

—নিরাপদ রামদীনের সিধা রাস্তার বিস্তারিত ভৌগলিক বিবরণ শুনিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল: আরে ও গলির নাম কি বল্ না! বাঁয়ে যাও, ডাহিনা যাও, ও হাম সম্ঝেগা নেহি!

—গলিকা নামত বাবু হাম্ নেহি জান্তা হায়!

—ডাক্তার কোথায় থাকে, সে গলির নাম তুমি জানোনা! বেটা, বিশ বচ্ছর এখানে চাকরি কচ্ছিস, এটুকু উপকার তোর দ্বারায় হয়না!

—আরে বাবু হাম্ মেড়ুয়া হ্যায়, উস্কো নাম হাম্ ক্যায়সে জানেগা!

—কেবল রহড়্ ডাল আর রোটি বানানে জানেগা, আউর কুছ জানেগা নেহি!

—আরে বাবু! এতো সিধা রাস্তা হ্যায়, চলা যাইয়ে না! আন্ধা লোকবি ত যানে শক্তা হ্যায়!

—তোর মাথা হ্যায়! তোর গুষ্টিকা পিণ্ডি হ্যায়! বেটা ভূত কোথাকার! বাড়ীর ডাক্তার, তার ঠিকানাটা অবধি তুই জানবিনে?

একটু থামিয়া, নিরাপদ কি ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল বাড়ীর নম্বর কত জানিস্?

বাড়ীকা নম্বর কই বারো কি পনেরো হোগা!

—তাও তোম্ জান্তা নেই! কেবল বৈঠকে বৈঠকে তুলসীদাস পড়তা হ্যায়! দাদাকে বলে এমাসে তোর মাইনে কমিয়ে দেবো! দেখি, তুই জব্দ হ'স কিনা!

আরও কি বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বোধহয় রামদীনের পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে করিতে, নিরাপদ বাহির হইয়া গেল।

লবঙ্গ এতক্ষণ সিঁড়ির নীচেকার ধাপে দাঁড়াইয়া অতি কষ্টে, মুখে কাপড় দিয়া হাস্য সম্বরণ করিতেছিল; যখন বুঝিল, নিরাপদ গিয়াছে, তখন রামদীনকে ডাকিয়া বলিল: রামদীন! তুমিও একবার ডাক্তারের বাড়ী যাও। ছোটবাবু ঠিকানা জানেন না, কোথায় যেতে কোথায় যাবে,—শেষে তাঁকে নিয়েও হয়তো আমরা বিপদে পড়বো। তার চেয়ে তুমি একবার পেছন পেছন যাও। ডাক্তারের বড় দরকার।

রামদীন একটা বিকট হাই তুলিয়া, তাহার শনি নিবারণের জন্য আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল: কাহে মাসিমা! বাড়ীমে কিয়া হুয়া?

লবঙ্গ বলিল: দিদির যে বড় অসুখ, তুমি শোননি? যাও শীগগির যাও!

—কিস্কো? বহু-মাইজীকো? আরে, হাম উস্কো ওয়াস্তে এতনা পূজা হোম, যাগ কিয়া, তব্ বি আরাম নেহি হুয়া! আচ্ছা, কাল হাম্ একঠো ভূত ঝাড়নেওয়ালাকো ছিয়া বোলায়গা! ও বড় ওস্তাদ হ্যায়! ও মন্তরতন্তর আওড়ায়কে বহুমাইজীকো জরুর আরাম কর দেগা!

—আচ্ছা সে পরে হবেখুনি! এখন তুমিত ডাক্তারকে ডেকে আনো!

—হামারা বি যানে হোগা? আচ্ছা যাই! কিয়া করি! নক্রি করতা হ্যায়! জরুর যানে হুগা!

বলিয়া সেই গয়া জিলা নিবাসী বীরপুঙ্গব বাঁশের একটা খেঁটে কোথা হইতে বাহির করিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে বাহির হইল। যাইবার সময়ে লবঙ্গ তাঁহার অঞ্চল হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া, রামদীনের হাতে দিয়া বলিয়া দিল!

ফিরে আসবার সময়ে পাঁচেদের বরফ অমনি নিয়ে আসবে। যা বরফ আছে, সমস্ত রাত কুলোবেনা।

রামদীন আধুলিটি লইয়া ঘাড় নাড়িয়া বিজ্ঞের মত বলিল: এত্না বরফ মাত্ দেও মাসিমা! উস্মে বেমার আউর বাড় যাগা! হামলোক বুঢ্ঢা হ্যায়, হামলোক বহুত দেখা। এইসান মাত করো!"

লবঙ্গ বলিল: আচ্ছা, তুমি এসে রাখোতো! তারপর ডাক্তার যা বলে, তাই করবো!

রামদীন সে কথায় সন্তুষ্ট হইলনা। বলিল: ডাগদার লোক কেয়া জানতা হ্যায়! করদম বেমার বাড়ায় দেতা হ্যায়!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

লবঙ্গ রোগীর ঘরে ঢুকিতেই নীরদ বলিয়া উঠিল; "লবঙ্গ! রোগীকে যদি বাঁচাতে চাও, শীগ্‌গির মাথায় বরফ দাও! জ্বর ভয়ানক বেড়েছে। আমি থার্ম্মোমিটার তুলে রেখেছি! তুমি আর দেরী করোনা! শীগ্‌গির বরফ দাও। আমি রামদীনকে বলি, একবার ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনুক!"

লবঙ্গ তাড়াতাড়ি বরফের ব্যাগটি তুলিয়া লইয়া বারাণ্ডায় গিয়া কতকগুলি বরফের চাপ কুচা করিয়া ভাঙিয়া, জল দিয়া ধুইয়া তাহাতে ভর্ত্তি করিল, এবং ত্বরিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া ললিতার মাথায় ব্যাগটি ধরিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নীরদ বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল! "বাবু! আপনি ব্যস্ত হবেন না! আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি!

—পাঠিয়েছ? বাঃ! এই না হ'লে রোগীর তদারক! লবঙ্গ? তোমার বুদ্ধি দেখছি পাশ করা নার্স'দেরও হার মানায়!

প্রশংসা শুনিয়া লবঙ্গর মুখ খানির উপর একটু রক্তের ঝলক খেলিয়া গেল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। উদ্বিগ্নতার মধ্যেও তাহার মুখখানি দেখিয়া নীরদ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

ঘরে খানিকক্ষণ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। দেওয়ালে যে বড় ঘড়িটা ঝুলিতে ছিল, শুধু সেই নির্জীব যন্ত্রটিই টিক্ টিক্ করিয়া মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছিল। বাহিরে একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, তাহার স্বর বড় বীভৎস।

নীরদ এতটা নীরবতা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে আশঙ্কা হইতেছিল, বুঝি নীরবতা রোগকে সুযোগ দিবে তাহার অন্তিম জয়লাভ সুকর করিয়া আনিতে। এত বড় রোগে এত নীরবতা সে পছন্দ করিল না। লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিল: লবঙ্গ? তুমি যদি মা'র সঙ্গে এখানে এসে না পড়তে, তাহ'লে আমাদের কি দশা হতো?

—কারুর অভাবে কারুর আটকায় না বাবু! আটকায় শুধু তখন, যখন মনকে বাঁধতে পারা যায় না।

—কিন্তু মন বাঁধতেও ত একটা খুঁটি চাই!

লবঙ্গ উত্তর করিল: খুঁটি মানুষের নিজের বুদ্ধি। বুদ্ধি থেকে জ্ঞান আসে,—জ্ঞান মনুষ্যকে সহস্র দুঃখের মাঝেও অটল ক'রে রেখে দেয়!

—আমার সে বুদ্ধিও নেই, জ্ঞানও নেই! কাজেই বুদ্ধি ধার কর্ত্তে হবে। কিন্তু কে ধার দেবে? একজন পাকা লোক কাছে না থাকলে, কোথা থেকে সে বুদ্ধি ধার পাবো?

—তবেই হয়েছে! আমাকে বুঝি সেই বুদ্ধির উত্তমর্ণ পেয়েছেন! যার নিজের এক-কড়া কাণাকড়িও পুঁজি নেই, সে অপরকে ধার দেবে কি করে?

নীদেবাবু একটু হাঁসিয়া বলিল: তোমার কড়ির বহর কত, তা আমায় নতুন করে জানাতে হবে না, লবঙ্গ! এ কয়দিনেই বাড়ীর সকলেই জানতে পেরেছে, তোমার বুদ্ধির দৌলত কত বেশী!

—সে দৌলতে যদি আপনার ধার নেওয়া চলে, ত পাবেন। কিন্তু শেষে দেনাদার আর মহাজন দুজনেই না গনেশ উল্‌টে বসে!

—দেনাদারের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, যে তার মহাজনটি একটি টাকার কুমীর! তবে কাবুলীওয়ালাদের মত সুদখোর না হয়, সেইটেই ভয়!

—সুদ, কিছু দিতে হ'বে বৈকি বাবু! নইলে মহাজনের চলে কি করে! তা, আপনি এর মধ্যেইতো দাদন দিতে আরম্ভ করেছেন!

—কাণে জল ঢুকিয়ে জল বার কর্ত্তে হয়, লবঙ্গ; এ কথাটাতো মিথ্যে নয়!

—কিন্তু কাণ যে এদিকে কালা হতে বসেছে, জলের ভারে। সে দিকেও একটু লক্ষ্য রাখবেন! আপনার উপকার কি আর আমি জীবনে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো! আমি অনাথা স্ত্রীলোক, নিরাশ্রয়! আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনার শুধু পুণ্য সঞ্চয়ই হচ্ছে, প্রত্যুপকার কিছুই আশা করতে পার্ব্বেন না!

যেটা কর্চ্ছ, সেটা প্রত্যুপকার নয়, নিছক নিঃস্বার্থ উপকার! রোগের সময়ে রাত জেগে, উপবাস ক'রে শুশ্রূষা করা শুধু পুণ্য সঞ্চয় নয়, মানুষের চরম মনুষ্যত্ব! এর মধ্যে স্বার্থের কীট মোটেই থাকে না, প্রত্যুপকার পাবার বাসনা মোটেই কাঁকর ফোটায় না। সেবা মানুষের সত্যিকারের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম,—পুষ্প বিল্ব দলে দেবতাপূজার চেয়ে তার পবিত্রতা আরও অধিক, তীর্থভ্রমনের চেয়ে তার আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি সর্ব্বতোব্যাপী।

—হাঁ, যদি সত্যকারের শুশ্রূষা করা হয়? যদি আপনাকে ভুলে রোগীকে বাঁচাবার জন্যে ও আরাম দেবার জন্যে উঠে লাগা হয়, তাহ'লে। এখানে শুশ্রূষার প্রধান অঙ্গ আত্ম বলিদান। কিন্তু আমি কি তা কর্ত্তে পার্চ্ছি? শরীরে হয়তো কিছু কিছু কর্চ্ছি; কিন্তু মন যে আমার বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

নীরদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল: কেন, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে কেন?

লবঙ্গ মাথা নীচু করিয়া, ফিক্ করিয়া একটু হাঁসিয়া উত্তর দিল! থাকবে না? আমরা কি স্বাধীন? ভগবান নারীকে গড়েছেন সহস্র বন্ধনের বাঁধন দিয়ে জড়িয়ে! প্রথমতঃ তার শরীরেই একটা মস্ত বাঁধন!

ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, নারীর শরীরটার ওপর প্রতিবিম্বের শনিদৃষ্টি যেন সদাই হাঁ ক'রে চেয়ে আছে! তারপর তার মন! সেটাকেও ভগবান্ কাঁটা দিয়ে ভর্ত্তি কর্ত্তে ভোলেননি বাবলাগাছেরও গায়ে যত কাঁটা থাকে, মেয়ে মানুষের মনে বোধহয় তার চেয়ে বেশী কাঁটা লুকানো থাকে।

নীরদ বাধা দিয়া বলিল: সেটাতো নারীর নিজের ইচ্ছায় রচা।

লবঙ্গ বলিল: নিজের ইচ্ছায় রচাও কতকগুলি আছে! আবার ভগবানের দেওয়া, সমাজের দেওয়া কাঁটা সকলের চেয়ে বেশী? নারীর মনে ভগবান্ এত দুরাকাঙ্খা সৃষ্টি করেছিলেন কেন? সমাজের নিয়মের জন্যই হোক্, —আর ভগবানের দেওয়াই হোক্ —তার মনে এত লজ্জার ছড়োছড়ি কেন? তার সম্ভ্রম, তার প্রচ্ছন্নতা, সমস্তই কি তার জীবনগতির ভয়ানক অন্তরায় নয়?

নীরদবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন: হঁ, সবগুলো অন্তরায় বটে! কিন্তু অন্তরায়ের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা অনুকুল বৃত্তিওতো তোমাদের আছে! সেগুলোর কথা ধরচো না কেন?

লবঙ্গ চোখ তুলিয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল: কোন্টা অনুকুল?

নীরদ তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: অনুকূল কিছুই নেই? তোমাদের মনের ও দেহের যে একটা সহজ সুশ্রীকতা আছে; সেটা কি তোমাদের জীবনযাত্রার অনুকুল নয়?

তর্ক ও বিশ্লেষণ আরও কতদূর অগ্রসর হইতে পারিত বলা কঠিন, কেননা ঠিক এই সময়ে নিরাপদ ঘরে ঢুকিয়া বলিল: ডাক্তার বাবু এসেছেন!

নীরদ বড় বড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন: এসেছেন? নিয়ে এসো ঘরে।

লবঙ্গ রোগীর মাথার কাছে বসিয়াছিল, ডাক্তার বাবুর আগমন সংবাদ পাইয়া মাথার কাপড়টুকু টানিয়া দিল, এবং সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নীরদ বলিলেন "তুমি উঠতে চাইচ কেন? তুমিত আজকাল ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কও?"

লবঙ্গ মাথা নাড়িয়া খুব মৃদুস্বরে বলিল: কথা কইনে! তবে তিনি এলে, আর উঠে যাবার সুবিধে হয়না! সব কথাতো আমায় শুনে নেওয়া চাই!"

—তবে, ঐখানেই থাকোনা!

লবঙ্গ আর উঠিলনা, শুধু অঙ্গের বসনখানি আরও টানিয়া টুনিয়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

(সি, বি)

আই, এফ, এঃ—

হকি খেলার মরশুম পুরোদমে চললেও ফুটবল খেলার আয়োজনও আরম্ভ হয়ে গেছে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের ইতিমধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গভর্ণিং বডির সভা হয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রথমটিতে এ বছরের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তারা নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

- সভাপতি:—স্যার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী, (সন্তোষের মহারাজা)
- সহ-সভাপতি—মিঃ নিকলস্
- সম্পাদকদ্বয়—মেসার্স এম দত্ত রায় এবং ডেভিস্
- কোষাধ্যক্ষ—মিঃ সুরুদ্দীন্

দ্বিতীয় সভাটীতে পূর্ব্ব প্রথামত নিম্নলিখিত সাবকমিটীগুলি গঠিত হয়েছে।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ:—

মেসার্স ইস্পাহানি, পেপার এবং এস এম বসু।

রেফারীস্ কমিটী:—

লে: উইলসন, কলোনেল্ জাইনিং এবং ইনস্পেক্টার জিনস্

মাইনর টুর্ণামেণ্ট কমিটী:—

ডাঃ মিত্র, মেসার্স রোসেটি এবং এক।

টুর সাব কমিটী:—

মেসার্স এস এন কর, পি সি মিত্র এবং বি সি ঘোষ।

চ্যারিটীর টাকা ব্যয়ের কমিটি:—

মেসার্স ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড, পিক্, প্রেষ্টন, বি সি ঘোষ, এস সি তালুকদার এবং এস সি সেন।

প্রাদেশিক কমিটী:—

আই, এফ এর প্রতিনিধিগণ:—মেসার্স এস এন ব্যানার্জ্জি, এস সি সেন, পি গুপ্ত, এ কে সেন, এস সি তালুকদার, ডি এইচ পিক্ এবং জে এস ই সেগেল্।

আই এফ এ টিম নির্ব্বাচন কমিটি:—

মেসার্স পি সি মিত্র, ইস্পাহানি, এস
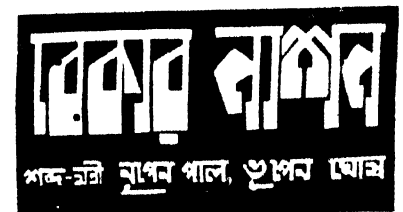
পি তালুকদার, জে এন ই নেগেল, লেঃ উইলসন এবং বি এইচ পিক্।

খেলোয়াড়দের টিম পরিবর্ত্তন কমিটি:—

মেসার্স এস পি তালুকদার, ফিট্জেরাল্ড এবং প্রেষ্টন্।

আই এফ এ টুর্ণামেণ্ট:—

মেসার্স এস এন ব্যানার্জ্জি, এন আর ষ্ট্রাট্ফোর্ড এবং পি গুপ্ত।

অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে আই এফ এর প্রতিনিধিদ্বয়

মেসার্স এস এন কর এবং জে এন ই নেগেল।

ফেডারেশনের প্রতিনিধিদ্বয় নির্ব্বাচন আইনসঙ্গত না হওয়ার জন্য মিঃ পি গুপ্ত আপত্তি উত্থাপন করায় রেঞ্জার্স ক্লাবে আই এফ এর গভর্ণিং বডির তৃতীয় সভাটি হয়। অনেক বাক্ বিতণ্ডা এবং মনোমালিন্যের পর মিঃ গুপ্তের আপত্তি বাতিল্ হয়ে যায় এবং মেসার্স কর এবং নেগেলের নির্ব্বাচন বহাল থাকে। এমন কি গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভায় যোগদান করবার জন্য উপরোক্ত প্রতিনিধিদ্বয় দিল্লী চলে গেছেন। মিঃ গুপ্ত আই এফ এর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত না হওয়ায় সম্ভবতঃ ঢাকা স্পোর্টস এসোসিয়েসনের তরফ থেকে ফেডারেশনের সভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন।

দ্বিতীয় সভাটিতে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়। সম্রাট্ বাহাদুরের 'যক্ষ্মা নিবারণী ভাণ্ডারের' সাহায্যকল্পে 'নারী সমিতি' এবং 'পুরুষ সমিতি' প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি করে চ্যারিটী ম্যাচের ব্যবস্থা করবার জন্য 'আই এফ এ-কে' অনুরোধ করা হয়। আই এফ এ দুইটি সমিতির পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত চিঠি পাঠাইবার জন্য এই দুইটি সমিতিকে জানিয়েছেন। এই চিঠি পাবার পর 'আই এফ এ' এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা করবেন।

আই এফ এর একটি মনোনীত দলকে 'অষ্ট্রেলিয়াতে' খেলতে পাঠাবার জন্য সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা আই. এফ এর নিকট আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। আই এফ এর নিজের এ বিষয়ে স্থির করবার সম্পূর্ণ অধিকার না থাকায় তাঁরা 'অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের' অনুমতির জন্য আবেদন করেছেন। ফেডারেশনের অনুমোদন পাবার পর আই এফ এ এই আমন্ত্রণের বিষয় পুনরায় আলোচনা করবেন।

খেলোয়াড়দের খেয়াল:—

খেলোয়াড়দের মধ্যে টীম্ পরিবর্ত্তন করবার একটি অভ্যাস প্রতি বছরেই দৃষ্ট হয়। সেই কারণে আই এফ এ'কে ক্যালকাটা ফুটবল লিগ কাউন্সিলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে একটি আইনও প্রনয়ণ করতে হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ২৫শে মার্চ্চ তারিখের মধ্যে টীম পরিবর্ত্তনেচ্ছুক ফুটবল খেলোয়াড়দের আই এফ এর সম্পাদকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নির্দ্দিষ্ট 'ফরমে' সই করে নিজেদের অভিপ্রায় জানাতে হয়।

যে সকল খেলোয়াড়দের কোন অনিবার্য্য কারণে কিংবা নিজেদের খেলার উন্নতি করবার জন্য টিম পরিবর্ত্তন করতে হয় তাঁরা হয়ত ক্রীড়ামোদীদের আন্তরিক সমর্থন দাবী করতে পারেন। কিন্তু প্রতি বছর খেলোয়াড়দের টীম পরিবর্ত্তনের তালিকা প্রকাশিত হবার পর তার সংখ্যার আধিক্য দেখে মনে হয় যে উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য যে সমস্ত খেলোয়াড়দের নূতনের সন্ধান করতে হয় তাঁদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আসলে এই টিম পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে কোন গুপ্ত আকর্ষণ আছে যার জন্যে অনেক খেলোয়াড়দের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা শক্ত হয়ে উঠে। এবং সেই কারণে বর্ত্তমানে যে ক্লাবের খেলোয়াড় আকর্ষণ করবার ক্ষমতা যত বেশী সেই ক্লাবের পক্ষে ভাল খেলোয়াড় পাওয়াও তত সহজ হয়। এই সকল সাময়িক আকর্ষণের প্রভাব যে সকল খেলোয়াড়দের কোন রকমে টলাতে পারে না তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন স্পোর্টসম্যান্ পদবাচ্য এবং তাঁদের খেলার মধ্যে বিশিষ্টতার লক্ষণ দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য 'ভবঘুরে' খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন খুব গুণী খেলোয়াড় হলেও তাঁর খেলার তারিফ হতে পারে তবে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা বা সম্মান কোন ক্রমেই পাবার যোগ্য নয়।

খেলার মধ্যে 'ব্যবসার' ভাব ঢুকিয়ে ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে আনন্দ এবং দুঃখের আদান্ প্রদান হয় বটে, কিন্তু এই ব্যাপারটিকে কোন প্রকারেই উৎসাহ প্রদান করা চলেনা। ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষেরাও খেলা আরম্ভ হবার পর আন্তরিকতা এবং ব্যবসাদারী খেলোয়াড়দের খেলায় কত পার্থক্য তা বেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। অনেকেই এবছর কালীঘাট ক্লাবের শোচনীয় অবস্থার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে এবছর ব্যবসাদারী খেলোয়াড়দের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে প্রকৃত খেলোয়াড়দের সাহায্য বরণ করে নিয়েছেন—এতে করে তাঁদের ক্লাবের যশ কতকাংশে খর্ব্ব হবার সম্ভাবনা থাকলেও এই নব প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তনের তৃপ্তি তাঁদের অনেকখানি সান্ত্বনা দেবে। অবশ্য কালীঘাট ক্লাব এতদিন এবিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হন নি, কিন্তু সেই কারণে অতীতের দোহাই দিয়ে বর্ত্তমানকে অনাদর করার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই

গত বছরের তুলনায় এবছরে খেলোয়াড়দের 'ছাড়পত্র' নেবার সংখ্যা অল্প হলেও গত ২৫শে মার্চ্চ তারিখে ৮নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসস্থিত আই, এফ এ আফিসে খুব চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্লাবেরই বিশেষ করে প্রথম ডিভিসন ফুটবল টীমগুলির কর্তৃপক্ষদের কঠোর শ্রমস্বীকার করে উৎকণ্ঠায় এবং প্রায় অনশনে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁদের চেয়েও আই এফ এ আফিসের 'লিফ্‌টম্যান্‌টিকে' সেদিন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ যদি সেই তারিখের পর এই হতভাগ্য জীবটিকে দুএকদিনের বিশ্রাম দিয়ে থাকেন তাহলে তার প্রতি সুবিচারই করা হয়েছে। এ বছরে মোট ২৮২ জন খেলোয়াড় ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন। দুএকজন খেলোয়াড়কে সই করবার পরই শৈলশিখরে পাঠাবার ব্যবস্থাও কোন কোন ক্লাব কর্তৃপক্ষকে করতে হয়েছে বলে শোনা গেছে। এই 'ছাড়পত্রের' জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষদের লাভ কিংবা ক্ষতি যাই হোক্ আই এফ এর তহবিল্ প্রতি বছরেই সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ হয়।

এবছরে যতগুলি খেলোয়াড় টীম পরিবর্ত্তন করেছেন তাঁদের মধ্যে এরিয়ান্স ক্লাবের বিখ্যাত খেলোয়াড় সন্তোষ কুমার মজুমদার ওরফে ছনে মজুমদারের পরিবর্ত্তনটিই খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এমন কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই খবরটি অনেকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন নি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর খুল্লতাত পরলোকগত দুঃখী রাম মজুমদার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এরিয়ান্স ক্লাব পরিত্যাগ করে তিনি যে তাঁর, খেলোয়াড় জীবনের শেষ সময়ে ভবানীপুর ক্লাবে এসে যোগদান করবেন একথা তিনি নিজেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি। তাছাড়া আরও কয়েকটি নামকরা প্রথম ডিভিসন খেলোয়াড়ের পুরাতন ক্লাবের মায়া ত্যাগ করে নূতন ক্লাবের আদর লাভ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। মোহন বাগান ক্লাবের নামকরা গোলরক্ষক কে দত্ত অনেক 'গড়িমসি' করার পর পাশের তাঁবুতে নিজের দেশের ক্লাব 'ইষ্টবেঙ্গলে' চলে গেছেন। আন্তর্জ্জাতিক খেলোয়াড় 'দেবী ঘোষ' গত বছরে মোহন বাগান ক্লাবে সুবিধা করতে না পেরে তাঁর নিজ পুরানো ক্লাব হাওড়া ইউনিয়নে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। পূর্ব্বে হাওড়া ইউনিয়ন এবং গত বছরের ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের গোল রক্ষক পি ব্যানার্জ্জি এবছর মোহনবাগান ক্লাবকে নিজের 'মরা খেলা' নিয়ে সাহায্য করবেন। উদীয়মান খেলোয়াড়দ্বয় গনেশ ঘোষ এবং সৌরেন দে যথাক্রমে কালীঘাট ক্লাব এবং এরিয়ান্স ক্লাব ত্যাগ করে ইষ্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবে যোগদান করেছেন। যামিনী ব্যানার্জ্জি অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষ পর্য্যন্ত এবছরে মোহন বাগান ক্লাব ত্যাগ করে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে গিয়ে জুটেছেন। কল্‌কাতার নামকরা রাইট্ আউট নির্ম্মল ঘোষ এরিয়ান্স ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে হতাশ করে মোহনবাগান ক্লাবের মানা জুঁইয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য এই ক্লাবের শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু শেষোক্ত খেলোয়াড়টি মিঃ ঘোষের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে—মানে মানে চলে এসে তাঁর পূর্ব্বেকার লীলাক্ষেত্র ভবানীপুর ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে আনন্দদান করেছেন। কালীঘাট ক্লাবের ক্যাপ্টেন সুবোধ ব্যানার্জ্জি এবং ভাইস ক্যাপ্টেন্ এস সিংহ যথাক্রমে মোহন বাগান এবং ভবানীপুর ক্লাবের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে 'মরা হাতী লাখটাকা' এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করে দেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছেন। বসির আমেদ গত বছর দিল্লী থেকে এসে কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে অজ্ঞাতে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে 'হিন্দুমুসলমান্' একতা সমর্থন যোগ্য নয় বিবেচনা করে এবছর নিজেদের মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। রেঙ্গুনের বিখ্যাত বেঁটে বুট্‌পরা খেলোয়াড় 'ডেলাটেষ্ট' গত বছরে কালীঘাট ক্লাবের শোভা বর্দ্ধন করলেও এবছরে জাহাজ থেকে নেমেই ভবানীপুর ক্লাবের গাইড নিয়ে আই এফ এ অফিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভবানীপুর ক্লাব তাঁকে যতটা কড়া পাহারায় কলকাতায় এনে হাজির করেছেন অতটা না করলেও চলত কারণ শোনা গেল যে কালীঘাট ক্লাব তাঁর জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল না। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ছোট রসিদ্ এবছর তাঁর পুরানো কালীঘাট ক্লাবে খেলাই সমীচিন মনে করছেন। আগেকার মোহনবাগানের যশস্বী গোল রক্ষক সন্তোষ দত্ত এবার হঠাৎ স্পোর্টিং ইউনিয়নের ফেরতা

ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবে হাজির হয়েছেন। রবিন্ নীল কাষ্টমসে চাকরী করা সত্ত্বেও কালীঘাট ক্লাবে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ড্যাল্-হাউসি ক্লাব এবছর 'বি' ডিভিসনে খেলতে হবে বলে দু'চারজন পার্শী খেলোয়াড় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এর পূর্ব্বে তাঁরা ইউরোপীয়ান কিংবা এংলোইণ্ডিয়ান ছাড়া অন্য সভ্যকে তালিকাভুক্ত করা মর্য্যাদা হানিকর মনে করতেন। এই সুবিবেচনাটা আগে হলে হয়ত তাঁরা আরও দুএক বছর প্রথম ডিভিসনে খেলতে পেতেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় ডিভিসনের কয়েকটি খেলোয়াড়ের টীম পরিবর্ত্তনের তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল।

খেলোয়াড়ের নাম	পুরাতন ক্লাব	নূতন ক্লাব
১। যামিনী ব্যানার্জ্জি	মোহন বাগান	ইষ্ট বেঙ্গল
২। জিতেন চক্রবর্ত্তী	মোহন বাগান	মাড়োয়াড়ী
৩। সৌরেন্দ্র দে	এরিয়ান্স	মোহন বাগান
৪। যোগজীবন দত্ত	স্পোর্টিং	মোহন বাগান
৫। রবি ধর	ঐ	এরিয়ান্স
৬। কালীপদ দত্ত	মোহন বাগান	ইষ্ট বেঙ্গল
৭। দেবী ঘোষ	মোহন বাগান	হাওড়া ইউঃ
৮। গনেশ ঘোষ	কালিঘাট	ইষ্ট বেঙ্গল
৯। নির্ম্মল ঘোষ	এরিয়ান্স	মোহন বাগান
১০। ফয়েজ খাঁ	ভবানীপুর	ঐ
১১। আক্তার হোসেন	ইষ্ট বেঙ্গল	মহামেডান স্পোর্টিং
১২। এন, এইচ, মিলস্	ডালহৌসি	পুলিশ
১৩। গোপীনাথ মুখার্জ্জি	কালীঘাট	এরিয়ান্স
১৪। এ মজিদ	ইষ্ট বেঙ্গল	মঃ স্পোর্টিং
১৫। এইচ, বি, মার্শাল	ওয়াই, এম, সি, এ	ডালহৌসি
১৬। মায়ার	নেপিয়ার	রবার্ট হার্সাল
১৭। রবিন মিল	কাষ্টমস্	কালীঘাট
১৮। ডব্লিউ পেরিস	সেণ্ট জোসেফ	রেঞ্জার্স
১৯। এল, এইচ, পিক্	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	হাওড়া ইউঃ
২০। জে, এ রেটন	ক্যাভেলিয়ার্স	কাষ্টমস্
২১। এ, রহমন	কালীঘাট	মেহামেডান
২২। এ, এ, চৌমি	স্পোর্টিং ইউঃ	ভবানীপুর
২৩। এইচ, মেকডোনাল্ড	সেণ্ট জোসেফ	জর্জ্জ টেলিঃ
২৪। সুবোধ ব্যানার্জ্জি	কালিঘাট	মোহনবাগান
২৫। মহম্মদ ওসমান	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	ব্রাউন
২৬। জুম্মান	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	ভবানীপুর
২৭। লিও জর্জ্জ	ক্যামেরোনিয়ান্স	ডালহৌসি
২৮। বীরেন্দ্র মুখার্জ্জি	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ	কালিঘাট
২৯। এ, সি, জোসেফ	কাষ্টমস্	রেঞ্জার্স
৩০। ই, এ, ক্লার্ক	সেণ্ট জোসেফ	ঐ
৩১। এ, ই, এ্যামেসি	আর্ম্মেনিয়ান্স	ডালহৌসি
৩২। এ, জোহানিস	ঐ	ঐ
৩৩। ধীরাজ দাস	ইষ্ট বেঙ্গল	মোহন বাগান
৩৪। এম, রাও	ক্যাঃ জিমখানা	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ
৩৫। লিও, ম্যাডনস্	আর্ম্মেনিয়ান্স	ডালহৌসি
৩৬। রঞ্জিৎ নারায়ন	হাওড়া ইউঃ	কালিঘাট
৩৭। টি ভট্টাচার্য্য	মোহন বাগান	মাড়োয়ারী
৩৮। বসির আমেদ	কালিঘাট	মহামেডান
৩৯। এন, মজুমদার	ইষ্ট বেঙ্গল	কালিঘাট
৪০। জে, আডিড	বৌবাজার	এরিয়ান্স
৪১। এস্ ডিলাটেষ্ট	কালিঘাট	ভবানীপুর
৪২। সন্তোষ সিংহ	ঐ	ঐ
৪৩। বিনয় সেন	ভবানীপুর	এরিয়ান্স
৪৪। ডি ব্যানার্জ্জি	ইষ্ট বেঙ্গল	জর্জ্জ টেলিগ্রাফ
৪৫। এ কালেক	ঐ	ভবানীপুর
৪৬। এস্, গুই	মোহন বাগান	ঐ
৪৭। সারওয়ার হোসেন	কুমারটুলি	কালিঘাট
৪৮। ডোনাল্ড ইয়ং	ঐ	অরোরা
৪৯। টি, সি, কক্স্	ঐ	ঐ
৫০। মহম্মদ সাইদ	ভবানীপুর	মেহামেডান
৫১। পি কজরয়	কুমারটুলি	হাওড়া ইউঃ
৫২। কে নাজিম	মেহামেডান	এরিয়ান্স
৫৩। ডি, জি, ফ্যানেল	সেণ্টজোসেফ	রেঞ্জার্স
৫৪। সন্তোষ দত্ত	স্পোর্টিং ইউঃ	ইষ্ট বেঙ্গল
৫৫। জিতেন ঘোষ	মোহন বাগান	এরিয়ান্স
৫৬। কে প্রসাদ	ইষ্ট বেঙ্গল	এরিয়ান্স
৫৭। সন্তোষ মজুমদার	এরিয়ান্স	ভবানীপুর
৫৮। খগেন বেরা	বৌবাজার	কুমারটুলি
৫৯। রসিদ আমেদ	মেহামেডান	কালিঘাট
৬০। পি, ব্যানার্জ্জি	ইষ্ট বেঙ্গল	মোহন বাগান
৬১। এম্ ব্রাউটন	ড্যালহাউসি	ক্যালক্যাটা

আমার অভিযানে

শ্রীবীরানন্দ ঠাকুর

আমি কোন বাধাই মান্‌বনাকো
চল্‌বো সুমুখ পানে,
ভাসিয়ে দোবো হাসির হাওয়ায়
সুরের তরী গানে।
ঐ যে যেথা দূর গগনে,
তপন চলে কার স্বপনে,
দূরের মায়া সোণার হরিণ
ধ'রবো আমি প্রাণে।
চল্‌বো আমি সেই যে যেথায়
হারায় সকল পথ,
হারিয়ে যাবে মিলিয়ে যাবে
শূন্যে আমার রথ।
দূর আকাশে গ্রহে তারায়
ফুলের ভাষায় গানের মায়ায়
চিহ্ন রবে সকল ঠাঁয়ে
আমার অভিযানে।

মেজর সি, কে, নাইডু:—

বোম্বাই হিন্দু জিমখানায় ব্যবস্থাপক সভায় এবৎসর মেজর সি কে নাইডুকে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় বিবেচিত করে 'এল আর তারাবনী' স্বর্ণ পদকটি তাঁকে পুরস্কার দিয়েছেন। হিন্দু জিমখানা প্রতি বৎসরই এই পুরস্কারটি প্রদান করেন।

প্যারামাউন্টের "ডটার অফ সংহাই" চিত্রের একটী বিশিষ্ট দৃশ্য। ছবিখানা এলফিন্‌ষ্টোনে দেখান হচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ টেলিফোন
'ভ্যারিটি' সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, চতুর্দ্দশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে চৈত্র ১৩৪৪, ৭ই এপ্রিল ১৯৩৮

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ ছয়দিনের পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কলিকাতার অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মাজী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করার দরুণ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের ও শরৎ বাবুর গৃহে বিভিন্ন সময়ে হইয়াছিল। আসামে ও বাংলার মিশ্র-মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন ও মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রি-মণ্ডল সঙ্কট ও মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ডাঃ সাম্বমূর্ত্তির বিলাতে গমন ওয়ার্কিং কমিটিতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছিল। আসামে মিঃ বরদলই মিশ্র-মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে পুরাপুরি সম্মতি লাভই পাইয়াছেন। তবে বাংলার ও অন্যান্য অ-কংগ্রেসী প্রদেশ সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটি কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। অ-কংগ্রেসীদল সমূহ যদি কংগ্রেসী আদর্শে আস্থাবান হইয়া মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে সম্মত হন তাহা হইলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সমুহ স্থান কাল ও পাত্র অনুযায়ী সমিচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন এইরূপ নির্দ্দেশ ওয়ার্কিং কমিটি দিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনকালে বাংলার কংগ্রেসী এসেম্রী দলের চীফ হুইপ, মিঃ জে, সি, দত্তের ভবনে এক ভোজসভায় কংগ্রেস আদর্শানুরাগী খণ্ডদল সমূহের সহিত মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল এবং সেই আলোচনার ফলাফল বাংলার কংগ্রেসী-দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটীতে জ্ঞাপন করেন। সর্ব্বদিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করা যাইতে পারে যে অদুর ভবিষ্যতে বাংলায় মিশ্র মন্ত্রিমণ্ডল শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

মধ্য প্রদেশে, বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সরিফের আচরণ সম্পর্কে বহু সদস্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারের মতামত সমর্থন করিলেও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অহেতুকী জিদ বশতঃ ওয়ার্কিং কমিটি আপাততঃ ব্যাপারটি ধামাচাপা দিয়া রাখিয়া মধ্য প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলকে আরো কিছুদিন বিরুদ্ধ আন্দোলনের চাপে বিব্রত করিয়া রাখিলেন। মিঃ সরিফ যখন তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, এমনকি পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিয়াছেন তখন এই প্রসঙ্গের যবনিকা বিগত অধিবেশনেই টানিয়া দিলে শোভন ও সঙ্গত হইত।

মান্দ্রাজ পরিষদের সভাপতি ডাঃ সাম্বমূর্ত্তি প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজাগোপালাচারিয়ার ও সর্ব্বদলের পূর্ণ সম্মতি লাভ করিয়া বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটী মিঃ সাম্বমূর্ত্তির বিলাত যাত্রা প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বিহারের বিহারীয়—বাঙ্গালী প্রসঙ্গের বিবেচনার ভার বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। শ্রীযমুনালাল বাজাজের রাঁচির বক্তৃতা ও কলিকাতায় তাহার বক্রভাবে সমর্থন যে জাতীয়-তার আদর্শের পরিপন্থী ও কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মিঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সার্কুলার সমূহ যে বাঙ্গালী বিদ্বেষে পরিপূর্ণ সে বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটী প্রায় একরূপ ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া গিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যাঁহারা ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনার আভাষ পাইয়াছেন তাঁহারা এ কথাই স্বীকার করিবেন যে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ন্যায় জবরদস্ত দক্ষিণপন্থী নেতার ব্যক্তিত্বের চাপে ও শ্রীযমুনালাল বাজাজের অর্থানুকূল্যে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিবাদী বামপন্থীদল একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

মিঃ এ, কে, সেন কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের ষ্টেশন ডাইরেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করায় আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। মিঃ সেন বাঙালী, বাংলাদেশের অভাব অভিযোগের সহিত পরিচিত। সুতরাং আমরা আশা করি বাঙালী সমাজের কল্যাণকর অনুষ্ঠান মিঃ সেনের কর্ম্মসংস্থারূপে বিবেচিত হবে।

*   *   *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান আজ তার শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে। বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে আজ শুধু আমরা দুটো ভালো গান বাজনা শুনেই খুসি থাকি না; পরন্তু আমরা চাই এর বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের জাতি ও সমাজের গঠনমূলক অনুষ্ঠান সমূহ। এবং এই আদর্শের দিক থেকে বিচার করতে গেলে একথা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা লাগে না যে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান আজও বহু পশ্চাতে পড়ে আছে।

*   *   *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র "বেতার জগতে" যতই আত্মপ্রশংসার ভেরী নিনাদিত হোক না কেন, প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে আমরা বিশেষ কিছুই কৃতিত্ব খুজে পাইনে। "বেতার জগৎ" সগর্ব্বে বলেছেন "বেতারের অনুষ্ঠানগুলি যে প্রীতিপ্রদ হয়েই থাকে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই" একথার বিরুদ্ধে আমাদের শুধু এই বক্তব্য এবং আশাকরি এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মা কখনও তাঁর সন্তানকে অসুন্দর দেখেন না, তাহোক্ না সে বিকলাঙ্গ।

*   *   *

আমরা আমাদের একাধিক আলোচনায় প্রোগ্রাম সমালোচনায় একথা বহুবারই প্রমাণিত করেছি যে বেতারের অধিকাংশ অনুষ্ঠানই নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং বেতার প্রোগ্রামের কোন একটা standard নেই। এর প্রকৃত কারণের কথা যদি উল্লেখ করা যায় তবে অনেক অপ্রিয় সত্যের কথা বলতে হয়।

*   *   *

এই অপ্রিয় সত্যের কথা আমরা বহুবারই বলেছি। আজও আবার বলছি বেতারে গুণগ্রাহিতার অভাব। গুণী আর্টিষ্টের স্থান এখানে অধিক দিন হয় না। জনসাধারণের দাবীকে কর্ম্মকর্ত্তা উপেক্ষা করেন। বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের ধারণা তাঁরা সকলেই এক একজন 'কেষ্ট বিষ্টু'। রাশি রাশি অযোগ্য আর্টিষ্টের নিয়মিত দর্শন পাওয়া যায় প্রোগ্রামের মাঝে অথচ প্রকৃত যাঁরা গুণী তাঁদের 'কালে ভদ্রে' ডাকা হয়।

*   *   *

বিভাগীয় অনুষ্ঠানগুলিতে, বিভাগীয় পরিচালকদের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত অযোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে, দৃষ্টিতে যা সাধারণের কাছে অসার্থকরূপে প্রতিপন্ন হয় বেতারের বিভাগীয় পরিচালকদের সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকে না কেন? দ্বিপ্রাহরিক 'অনুষ্ঠান' মহিলা আসরে দেখি মহিলা প্রসঙ্গ উপেক্ষিত। "বিশ্বের বার্ত্তার" স্থান আছে—বৈদেশিক সামুদ্রিক অভিযান আছে 'শিশু প্রসঙ্গের নাটিকা' আছে অথচ 'ঘর সংসারের খুটি নাটি' 'রন্ধন শিল্প' 'শিশু প্রতিপালন' স্বাস্থ্য, সাহিত্য 'শিল্প কলা' প্রভৃতি এসবের পর্য্যাপ্ত আলোচনা নেই। "ছোটদের আসরে" রন্ধনশালার প্রসঙ্গ আছে অথচ শিশু সাহিত্যের সবিশেষ প্রসার নেই জেনারেল প্রোগ্রামে 'অসার বক্তৃতা' কর্ণপীড়াদায়ক একঘেয়ে আনাড়ী আর্টিষ্টের চীৎকার দিনে দিনে চলেছে বেড়ে। ছোট নাটিকার অত্যাচারে শ্রোতারা তো অতিষ্ঠ! থিয়েটারের নামে রাবিশ যাত্রা প্যাটার্নের ত্রেতাযুগের বই-এর আমদানি। এর প্রতিকার প্রতিবাদ উত্থাপিত হলেই বেতার কর্ত্তৃপক্ষ ধামা চাপা দেবার চেষ্টায় বলে ওঠেন—এক শ্রেণীর শ্রোতা আছেন যাঁদের এসব ভালো লাগে।

*   *   *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের নূতন বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেনের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই আশা করি। আমাদের দৃঢ় ধারণা মিঃ সেন আমাদের বন্ধু বলেই গ্রহণ করবেন এবং আমাদের সমালোচনাকেও নিরপেক্ষজ্ঞানে বেতারের গলদ সংশোধনে যত্নশীল হবেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণ, শিল্পীরা যেন মনে করতে পারে এটা তাদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

*   *   *

স্থানাভাবে আমরা মাত্র কয়েকটি প্রোগ্রামের সমালোচনা পত্রস্থ করলুম।

মঙ্গলবার ২৯শে মার্চ্চ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ধীরেশ উকীল দুখানি গান গাইলেন বিশ্রী। শ্রীযুত অমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য 'কথকতা' করলেন গীতায় মাধুর্য্যভাব সম্বন্ধে বক্তা বললেন—কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কর্কশ মাধুর্য্যভাবে বক্তার রুদ্রকণ্ঠে বক্তৃতা কর্ণপীড়াদায়ক। পরে লীলা দেবীর ব্যবস্থাপনায় একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান হোল। কুমারী আভা বসাক

কীর্ত্তন গাইলেন—বাজে। জগদীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন 'অভিমান ভরু ভোল'—মন্দময়। সুপ্রভা মজুমদার গাইলেন—"আমার গান শুনে কি-" সুন্দর। গীতা বসুর "নাইবা ঘুমালে প্রিয়"—কাব্য ভাব মধুর। তাপস দত্তের পিয়ানো অতি সাধারণ। হেম সোম রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' আবৃত্তি করলেন যেন—রিডিং পড়ে গেলেন। আবৃত্তিকারকের না আছে কবিতার ছন্দ জ্ঞান, না আছে ভাব প্রকাশের অভিব্যক্তি, একথায় সমালোচনার অযোগ্য।

*　　*　　*

বুধবার ৩০শে মার্চ্চ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কল্যাণী মল্লিক স্বর্ণকুমারী দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল—অতি বাজে প্রোগ্রাম।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে 'বেতার বিচিত্রার' বাণী কুমার রচিত 'বারুণী মেলা' অনুষ্ঠিত হোল। মেলার একটি সুন্দর চিত্রের আভাব আমরা পেলুম।

*　　*　　*

বৃহস্পতিবার ৩১শে মার্চ্চ দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে হেনা বন্দ্যোপাধ্যায় গান গাইলেন, ফোর্থক্লাশ। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করলেন। অশোক বাবুর সুমিষ্ট কণ্ঠে ভাগবৎ ব্যাখ্যা দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অবদান।

*　　*　　*

শুক্রবার ১লা এপ্রিল দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ইসলামী সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হোল। ছোটদের বৈঠকে লীলাদেবীর ব্যবস্থাপনায় "এপ্রিল ফুল"—কাষ্ট-রসিকতা। রচনায় কোন মৌলিকতা নেই, অভিনয় প্রসঙ্গ বাজে।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শরদিন্দু মুখোপাধ্যায় প্রণীত এ, আই, আর, প্লেয়ার্স কর্ত্তৃক "বন্ধু" অভিনীত। দুর্গাদাস বাবু এবং রতীন বাবু ছাড়া আর কারুর অভিনয়ই প্রশংসার দাবী করতে পারে না, গানগুলিও নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

বিদায় সম্বর্দ্ধনা

ফ্যাক্টরী একাউণ্টস আফিসের জনপ্রিয় ডেপুটী এসিষ্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষের অবসর-গ্রহণ উপলক্ষে ঐ আফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ বিগত ২রা এপ্রিল শনিবার এক বিদায়-সভার অধিবেশন করেন। যথারীতি সঙ্গীত সহ সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে আফিসের পক্ষ হইতে রায়সাহেবকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দন পত্রটির স্থানে স্থানে অসংলগ্নতা ও মধ্যে মধ্যে ভাষার দৈন্য বড়ই পীড়াদায়ক মনে হইতেছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমরা জানি এই ডিপার্টমেণ্টে অনেক সুলেখক আছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও অভিনন্দন পত্রটির এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল তাহা বুঝিলাম না। ইহাকেই বলে "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট"। সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বন্ধুবর যতীশবাবুর "পাষাণের স্নেহাশীষ" নামক মুদ্রিত প্রবন্ধটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কল্পনার বৈচিত্র্যে, ভাবের মাধুর্য্যে ও ভাষার ঝঙ্কারে প্রবন্ধটী হইয়াছিল অনবদ্য। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "একক অভিনয়"ও অভিনবত্বের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। পরে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে ভূরিভোজন করান হইলে 'এসপ্লানেড ইন্‌ষ্টিট্যুটের' সভ্যগণ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। অভিনয়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল বলা চলে।

পরলোকে নারায়ণী দেবী

গত শুক্রবার রাত্রি ২ ঘটিকার সময় ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী নারায়ণী দেবী ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার হুগলী জেলাস্থ বাগাটী গ্রামের নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মভাবাপন্না, পরদুঃখকাতরা এবং দানশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি ছয়পুত্র, এক কন্যা দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকসন্ কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার এবং পঞ্চম পুত্র ডাঃ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিবেণী হাঁসপাতালের মেডিক্যাল্ অফিসার।

প্রাচ্য নৃত্যশিল্পী বিভূতি মজুমদার (এমেচার)

উদয় শঙ্করের পর থেকে যাঁরা নৃত্যজগতে নেবেছেন তাঁদের মধ্যে বিভূতি মজুমদার
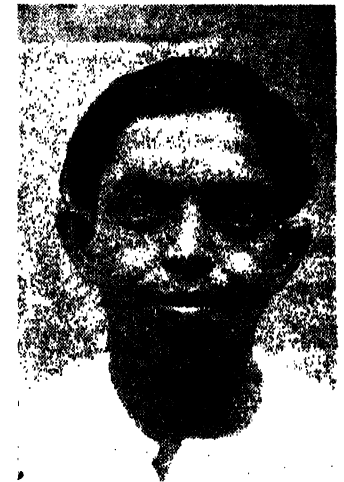
বিভূতি মজুমদার

অন্যতম। 'ইনি একজন এমেচার নৃত্যশিল্পী। চাকুরীর অবসর সময়ে নৃত্যচর্চ্চা

করে যেরূপ কৃতিত্ব দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

তাঁর নৃত্যগুলির মধ্যে, ইন্দ্র, অসি, আরতি, শিব শিকারী, সাপুড়ে, উড়িয়া ও রাক্ষস নৃত্য-গুলির পরিকল্পনা ও নৃত্য অতীব সুন্দর। ইঁহার সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত খগেন দে। আমরা তাঁহার উত্তোরত্তর উন্নতি কামনা করি।

শুভবিবাহ

গোপিমোহন দত্ত লেন নিবাসী শ্রীকানাই লাল বসুর কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা বসুর সহিত এটনি স্বর্গীয় গোপাল কৃষ্ণ

অমল কৃষ্ণ-সান্ত্বনা

ঘোষের পুত্র আমাদের পরম সুহৃদবর শ্রীযুক্ত অমল কৃষ্ণ ঘোষের শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বর শুরুগৃহে ভাগ্যবান শ্বশুর লাভ ও তৎসহ ভাগ্যবতী পত্নী লাভ করিয়া বন্ধুবর অমলকৃষ্ণ অটুট কৌমার্য্যব্রত উদযাপন করিয়াছেন। চক্ষুলজ্জার প্রাবল্য হেতু বন্ধুজন ও 'ইতর' জনের জন্য মিষ্টান্ন বিতরণে বিরত হইয়া অমলকৃষ্ণ বহু বন্ধুর বিরাগ ভাজন হইয়াছেন! আমরা তাঁহাদের শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

চিত্র-নির্ম্মাতা—নিউ থিয়েটার্স লিঃ
চিত্র-পরিবেশক—অরোরা ফিল্ম কোং
পরিচালনা, চিত্রনাট্য, সংলাপ—দেবকী কুমার বসু
সঙ্গীত পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল
আলোক-চিত্র-শিল্পী—ইউসুফ মুলজী
শব্দযন্ত্রী—লোকেন বসু
ব্যবস্থাপক—পি, এন, রায়
সম্পাদক—সুবোধ মিত্র
শিল্প নির্দ্দেশক—পি, এন, রায় ও সৌরেন সেন
ইউনিট ব্যবস্থাপক—জলু বড়াল

চরিত্রলিপি: বিদ্যাপতি—পাহাড়ী, শিবসিংহ—দুর্গাদাস, বিদূষক—অমর মল্লিক, মধুসূদন—কৃষ্ণচন্দ্র দে, মহামন্ত্রী—প্রফুল্ল মুখোঃ, পিতাম্বর—অহি সান্ন্যাল, অনুরাধা—কানন, লছিমা—ছায়া, বিদূষকপত্নী—দেববালা প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তিলাভ 'চিত্রায়' ২রা এপ্রিল, শনিবার ৩ ঘটিকায়।

নিউ থিয়েটার্সের বহু বিজ্ঞাপিত ছবি বিদ্যাপতি প্রায় এক বছর পরে গত শনিবার চিত্রায় মুক্তিলাভ করেছে। বাঙলাদেশ ভাব প্রবণের যায়গা। সেই হিসেবে কবি বিদ্যাপতির কাহিনী বাঙলার ঘরে ঘরে পরিচিত। এমন একটি প্রিয় ও পরিচিত কাহিনী নিয়ে নিউথিয়েটার্স এর তরফ থেকে দেবকী বাবু তার যে রূপ পর্দ্দায় প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

প্রায় পাঁচশত বছর আগে একদিন এক বসন্তোৎসবে মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রমোদ উদ্যানে অকস্মাৎ কবি বিদ্যাপতির সঙ্গে রাজা ও রাণী লছিমার দেখা। রাজার অনুরোধে কবি বিদ্যাপতি মিথিলায় এলেন রাজকবি হয়ে। কবির সঙ্গে এলেন এক সুন্দরী যুবতী অনুরাধা। কবির প্রভাবে রাণী লছমীর অন্তরের আলোক জ্বলে উঠল। কিন্তু আলো যে জ্বেলেছে রাণীর মন প'ড়ল তাঁরই ওপর। রাজাও বুঝলেন। মনে তিনি ব্যথাও পেলেন কিন্তু অবিশ্বাস করলেন না।

এদিকে রাজ্যের মধ্যে রাণীর এই প্রেম নিয়ে নানারকম আলোচনা সুরু হ'ল। রাজ্যের মন্ত্রী এই সুযোগ নিয়ে রাণীর হাতে তুলে দিলেন বিষের পাত্র। রাণী সেই বিষ হাসি মুখে পান করলেন—মিথিলার প্রজা ও রাজাকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধার করবার আশায়।

এই হচ্ছে মোটামুটী আমাদের আলোচ্য 'বিদ্যাপতির' কাহিনী। পরিচালক মহাশয় এই কাহিনীটী ফুটিয়ে তোলবার জন্যে নানা-রকম ঘটনার সমাবেশ করলেও বেশ ভাল-ভাবে জমিয়ে তুলতে পারেন নি। সব সময়ই যেন কেমন খাপছাড়া ভাব। এবং তারই জন্যে ছবির 'টেম্পো' নষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে boring হয়ে পড়েছে। দেবকী বাবু যদি দর্শকদের ভালভাবে কাঁদাতে পারতেন তাহলে আমাদের মনে হয় এসব ঢাকা পড়ে যেত। তিনি এবারে সে দিক্ দিয়ে না গিয়ে একটা বিরাট grandeur এর ভেতর দিয়ে ছবিটি present করতে চেয়েছেন কিন্তু সে দিকেও তিনি বিশেষ exploit করতে পারেন নি। তা না হ'লে,

৯ই এপ্রিল হইতে

সগৌরবে দ্বিতীয় সপ্তাহ
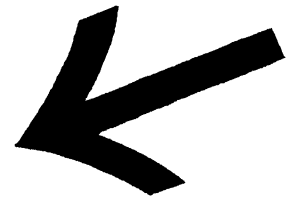
নিউ থিয়েটার্সের

বহু প্রশংসিত

অপরূপ চিত্রকথা

বিদ্যাপতি

●●

পরিচালক : দেবকী বসু

: চিত্র-পরিবেশক :

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বনজ্যোৎস্নাদেবের এ ছবির সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায়? এ ছাড়াও ছবির finishing touchটা হয়েছে অত্যন্ত weak. রাণী লতিমা বিষ খেলেন বটে কিন্তু এমন কি বিশেষ কারণ ঘটল—তা ঠিক্ বোঝা গেলনা। যদি দর্শকদের মনে রেখাপাত করবার জন্যেই ওরকম করা হয়ে থাকে—তাহলে আমরা বলব যে idea ভালই তবে execution ঠিক হয় নি।

অভিনয়এর দিক থেকে ধরতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে কানন এর অনুরাধা। এক কথায় এটাকে কাননএর ছবিই বলা যেতে পারে। যদিও এই চরিত্রটীর পেছনে Directorএর যথেষ্ট backing আছে। তবুও আমাদের মনে হয় কানন ছাড়া আর কেউ এ চরিত্রটি—অন্ততঃ lighter দিকটা ফুটিয়ে তুলতে পারত' না। গান গুলিও কানন গেয়েছে চমৎকার। এর পরেই নাম করতে হয় দুর্গাদাসএর রাজা শিবসিংহ। সুন্দর সুসংযত অভিনয় করে দুর্গাবাবু প্রমাণ করেছেন যে, চিত্ররাজ্যে তার স্থান আজও শীর্ষে। তবে শেষদিকে তার অত বেশী close up না দিলেই ভাল হ'ত।

বিদ্যাপতির ভূমিকায় পাহাড়ীর অভিনয় প্রথম দিকে চলনসই হ'লেও শেষের দিকে ভালই বলা যেতে পারে। এরপর কৃষ্ণবাবু, ছায়া প্রভৃতির অভিনয় চলনসই। মল্লিক মশাইএর বিদূষক ও অহি সান্যালএর পীতাম্বর যে দর্শকদের হাসাতে পারবে তা জোর করেই বলা যায়।

মহামন্ত্রীর ক্ষুদ্র চরিত্রাভিনয়ে প্রফুল্ল মুখার্জ্জি বিশেষ দক্ষতা ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এর ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

সঙ্গীত পরিচালনায় রাইবাবু বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আলোক চিত্রে ইউসুফ মুলজী মন্দ কাজ করেন নি। কোন রকম প্যাঁচএর মধ্যে না গিয়ে নিতান্ত সাধারণভাবে সব সময়ই একটা standard maintain করে গেছেন।

শব্দ যন্ত্রের কাজ আশানুরূপ হয়নি। লোকেনবাবু N. T.র standard রাখতে যে কেন পারলেন না—তা আমরা বুঝলাম না।

সম্পাদনায় সুবোধবাবু বেশ চমৎকার কাঁচি চালিয়েছেন। কোন রকম বাজে জিনিষ রাখেন নি। তিনি তাঁহার সুনাম রাখতে পেরেছেন।

শিল্প-নির্দ্দেশকদ্বয়এর পরিকল্পনায় যে বিরাট সেটের ব্যবস্থা হয়েছিল তা সত্যই সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলি fully exploited হয় নি। Makeup ও বেশ-ভূষার যে ব্যবস্থা হয়েছিল—তা ভালই। কেবল দেববালার অঙ্গে এ প্রকার বেশভূষা মার্জিত রুচির পরিচয় দেয় নি।

কিষাণ কন্যা

ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোংর প্রথম ভারতীয় রঙিন ছবি কিষাণ কন্যা গত শুক্রবার ১লা থেকে নিউ সিনেমায় দেখান আরম্ভ হয়েছে। রঙীন ছবি হিসেবে ভারতীয় দর্শকেরা এ ছবিকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে।

অভিনয়ের দিক্ থেকে আমাদের সব-চেয়ে ভাল লেগেছে গোলাম মহম্মদ ও জিল্লুর অভিনয়। গোলামের রুনধীর বাস্তবিকই চমৎকার হয়েছে।

অভিজ্ঞান

সন্ধ্যা শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশের আশ্রয় ছেড়ে প্রমথর সঙ্গে যেতেই রাজী হোল।

সমাজের চোখে, এ বড় নিন্দিত কুলত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু এ ছাড়া জীবনে যে আর তার কোন পথই খোলা রইল না।

সহসা আজ তার মনে পড়লো—পঞ্চবটী নিবাসিনী জানকীর কথা। তাঁকেও একদিন লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ ক'রে এমনি কোরে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান কোরেছিলেন। কিন্তু তা'কে উদ্ধার কোরবে কে? উদ্ধার ত' দূরের কথা, রামচন্দ্র গ্রহণ করতেও জানেন না, বোঝেন শুধু বর্জ্জন করার যুক্তি!

তাই আজ প্রমথর প্রস্তাবে সন্ধ্যা বাধা দেবার মত ভাষা খুঁজে পেলোনা। সমাজের কসাইখানা থেকে উদ্ধার কোরে একজন অসামাজিকের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবার আশায় সে অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দিলে!

তাই, জয়শেখরপুর থেকে ত'ার শেষ আশ্রয় ছেড়ে যাবার পূর্ব্বে, সন্ধ্যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রুর রাশি ঝর্ ঝর্ কোরে ঝরে পড়লো—এর মধ্যে যে কত দুঃখ কত বেদনা কত গ্লানি সঞ্চিত, তা' একমাত্র তার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেউ জানেনা। কিন্তু আজ নতুন কোরে তার প্রাণে যে মর্ম্মন্তুদ্ যন্ত্রণা উদ্বেল হয়ে উঠে—তা'র হেতু কী? উৎপত্তি কোথায়? যে সমাজের শেষ সীমা আজ সে অতিক্রম কোরে যাচ্ছে বোলে মনে করছে, সে সমাজের কাছথেকে ত' নির্ব্বাসন-পত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই সে পেয়েচে—সে সমাজের মধ্যে এ কয়েকদিনের বাস ত' অধিকারের বাসনায়, অনুগ্রহের বাস।

তবু, আশ্রয় যে কত বড় বস্তু তা যার নেই সেই জানে। অনাহারে দেহত্যাগ করা সহজ, সেই দেহটার অবস্থিতির জন্য এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে একহাত মাত্র ভূমি অধিকারে না থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই।

তাই সন্ধ্যা, শেষ পর্য্যন্ত প্রমথকে আশ্রয় কোরে অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়িয়ে দিলে।

ছায়া-চিত্রে, সন্ধ্যার জীবনের এই করুণ অংশটি, তার অন্তরের দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা।

প্রফুল্ল রায় এবং ফণী মজুমদার—উভয়ে মিলে এই কাহিনীর চিত্রনাট্য (সিনারিও) রচনা কোরেছেন এবং পরিচালনা ব্যাপারেও এদের যুগ্ম-শক্তির বিকাশ দেখতে পাব।

অভিজ্ঞান চিত্রে অনেকগুলি গান সংযোজিত হোয়েচে। এগুলির রচয়িতা সুবিখ্যাত গীতকার শ্রীযুক্ত অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য। গানগুলির সুর দিয়েছেন—রাইচাঁদ বড়াল। সুবিখ্যাত গায়ক বিনয় গোস্বামী একটি চরিত্রে অনেকগুলি গান গাইবেন।

অভিজ্ঞান-এর বিভিন্ন চরিত্রে নট-নটীর সমন্বয় ঘটেচে অপূর্ব্ব। শ্রীমতী মলিনা ছাড়াও, একটি মুস্লিম বধূর ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকা তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেবেন। এই চরিত্রটি সম্বন্ধে গত হপ্তায় আমরা লিখেচি। আদর্শ নারী চরিত্র হিসাবে এই মুস্লিম বধূটি সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের বরণীয়া।

আপন ভোলা, উদার প্রকৃতি, আশ্রিত-বৎসল প্রকাশ এই কাহিনীতে অনেকখানি স্থান অধিকার কোরে আছে। এই ভূমিকাটিতে শৈলেন চৌধুরী যে উচ্চতর অভিনয় নৈপুণ্যের ছাপ দিতে পারবেন—একথাও আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাঙলায় নারী-নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অভিজ্ঞান-এর মত ছবি অভিযান চালিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা-পথকে অনেক বেশী সহনশীল ও সুগম কোরে তুলতে পারবে এ থেকেই ছবিখানির স্বার্থকতা উপলব্ধি করা যায়।

স্ট্রীট সিঙ্গার

একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। দুজনে তারা মানুষ হয়েছিল একই সঙ্গে। ছেলেটী অর্থাৎ ভুলুয়া (সাইগল) ছোট বেলা থেকেই থিয়েটারে অভিনয় করবার ইচ্ছা ছিল। প্রথম যখন সে থিয়েটারে চাকরী পেল তখন মেয়েটী অর্থাৎ মঞ্জু (কানন) তাতে রাজি হ'ল না। বরং ভুলুয়াকে অনুরোধ করলে যাতে তারা এদেশ ছেড়ে চ'লে যেতে পারে কিন্তু ভুলুয়া (ছেলেটী) রাজি হ'ল না পরে ঘটনাচক্রে মেয়েটী একটী চাকরী পেল কিন্তু ছেলেটী পেল না। একদিন ছেলেটী থিয়েটারে গিয়ে দেখলে সে মেয়েটি তারই তৈরি একটী গান নেহাৎ বেসুর করে গাইছে। মেয়েটী নিতান্ত ছেলেমানুষী করে এ রকম করেছিল কিন্তু ছেলেটী তা বুঝিতে না পেরে অত্যন্ত হট্টগোল করে গানটী বন্ধ করে দিয়ে মেয়েটীকে নিয়ে অন্য দেশে চলে যেতে চাইল। মেয়েটী রাজি হ'ল না। ছেলেটী চলে গেল অনেক দূরে—তারপর অনেক ঘটনা বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে তাহাদের কি ক'রে মিলন সম্ভব হ'ল—এই নিয়েই ডাইরেক্টর ফণী মজুমদার তাঁর বই তুলতে আরম্ভ করেছেন। পরিচালক মশা'ই এই সুন্দর 'প্লট'টী কে ফোটাবার জন্যে যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মেলন করেছেন—তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে।

অধিকার

শ্রীমতী মেনকার অসুস্থতার জন্য কয়েকদিন শুটিং বন্ধ ছিল। সম্প্রতি পরিচালক বড়ুয়া আবার চিত্র-গ্রহণ সুরু কোরেছেন।

এই চিত্রে বস্তি-বাসিনী রাধার ভূমিকায় শ্রীমতী মেণকা তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন। জীবন-যুদ্ধের বৃহত্তর প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে, ধনীর দুলালী ইন্দিরা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইন্দিরার ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন শ্রীমতী যমুনা।

অপর আর একটি নারী চরিত্রে আত্মপ্রকাশ কোরেছেন—নবাগতা চিত্র-লেখা। এই সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েটির নির্ব্বাচনে পরিচালক যে ভুল করেননি, কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয় দেখে আমরা তা উপলব্ধি কোরতে পেরেচি।

ইতিমধ্যে 'প্লেব্যাক্' পদ্ধতিতে পাহাড়ীর একটি গান গৃহীত হোয়েচে। বস্তিবাসী যুবক রতনের ভূমিকায় পাহাড়ী অভিনয় কোরছেন।

"চোখের বালি"

বিনোদিনীর রূপের আগুনে মহেন্দ্র দিন-রাত্তির পুড়ে ছারখার হ'চ্ছে। সে বিবাহিত আর বিনোদিনী বিধবা। তবুও তার বিনোদিনীকে চাই। সেই রাত্রে চোরের মত সে বিনোদিনীর শোবার ঘরে ঢুকে বিনোদিনীর রূপসুধা পান করবার জন্য হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু তার প্রতিদান স্বরূপ সে বিনোদিনীর কাছ থেকে পেল তিরস্কার। বিনোদিনী বললে—"...ভীরু, কাপুরুষ! না জানো ভালবাসতে না জানো কর্ত্তব্য করতে। মাঝ থেকে আমায় কেন নষ্ট করছ?" এই কথায় মহেন্দ্র ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে বিনোদিনীকে জোর কোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলল—"...আমি সব ছেড়ে চলে যাবো—বলো তুমি যাবে?" এর উত্তরে বিনোদিনী ঘৃণাভরে বলল—"...তুমি আমায় সর্ব্বনাশের মুখে টেনে এনেছ।...আজ তোমার ঘৃণাও আমায় ফেরাতে পারবে না।—তোমায় যেতে হবে।" এই সময় রাজলক্ষ্মী সেখানে ঢুকেই এই দৃশ্য দেখে লজ্জা পেলেন। কিন্তু মহেন্দ্র আজ লজ্জা ঘৃণার বাইরে। আর বিনোদিনী সে রাজ-লক্ষ্মীকে দেখে জ্বলে উঠল, তাই বলল—

"যাবো ." এই কথায় মহেন্দ্র উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠল—"তবে আজকের মত অপেক্ষা কর। কাল থেকে তুমি ছাড়া কেউ থাকবে না ."

উপরোক্ত দৃশ্যটি গেল হপ্তায় ষ্টুডিওর ভেতর তোলা শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, সুপ্রভা মুখার্জ্জি ও মিসেস্ ঘোষ চরিত্রোপযোগী অভিনয় কোরে এই তিনটি চরিত্রের প্রাণ-স্পন্দন কোরে তুলেছেন।

এরপর মহেন্দ্র বিনোদিনী উধাও। নানা দেশ ঘুরে ঘুরে তারা বেড়াচ্ছে। কিন্তু বিনোদিনী দু'দিনের বেশী কোথায়ও থাকতে চায় না। এত কোরে মহেন্দ্র বিনোদিনীর মন পেল না। সে তাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে টেনে এনে তার মনের পরিবর্ত্তন আনতে চায়—কিন্তু কিছুতেই তার মনোবিকারের পরিবর্ত্তন ঘটে না। মহেন্দ্র ফাঁদ পেতে চলেছে—সে ফাঁদে বিনোদিনী ধরা দেয় না। কেমন কোরে তা' সম্ভব হয়—বিধবা যখন কামনার আগুনে পুড়েছে তখন তার লক্ষ্যভ্রষ্ট করা মহেন্দ্রের সাধ্য কী? সে চায় বেহারীকে—সেই তার ধ্যান, জ্ঞান। মহেন্দ্র যে একথা বোঝেনি, তা' নয়—তবুও সে মরিয়া হ'য়ে উঠল! শেষ পর্য্যন্ত সে বীরের মত লড়াই কোরবে—দেখবে সে বিনোদিনীকে পায় কিনা!

উপরোক্ত এই দৃশ্যটি তোলার জন্য গেল হপ্তায় মিঃ বি, পি, মেহেরার তত্ত্বাবধানে এই ছবির পরিচালক সতু সেন, শব্দযন্ত্রী মধু শীল, আলোকচিত্রী ননী সাণ্যাল, তাঁর সহকারী গোবিন্দ গাঙ্গুলী, শিল্পীদের মধ্যে ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি ও শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জ্জি ওয়াল্টিয়ার গিছলেন এবং সেখান থেকে এই দৃশ্যটি সুচারুভাবে গ্রহণ কোরে সম্প্রতি কোল্‌কাতায় ফিরেছেন। আমরা শুনলাম, ওয়াল্টিয়ারে সাণ্যাল মশাই তিনটি চারটি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে এনেছেন তা' সত্যই "চোখের বালি"কে নব-রূপে রূপায়িত কোরবে। আমরা কালী ফিল্মসের এই বিপুল চেষ্টাকে সাফল্য হ'তে দেখলেই খুসী হব।

দেবদত্ত ফিল্মস

দেবদত্ত ফিল্মসের সুচরিতার ভূমিকা বণ্টন নিয়ে গেল হপ্তায় আমরা যে আলোচনা কোরেছিলাম তা' পড়ে অনেকেই আমাদের এই আলোচনার পক্ষ সমর্থণ কোরে এবিষয়ে আমাদের আরও মন্তব্য প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব থেকে আমরা আর বিশেষ কিছু আলোচনা কোরতে চাই না। শুধু নরেশ মিত্তিরকে বলছি, তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের এই অমর উপন্যাস "গোরা" আর একবার পড়ে দেখেন—বিশেষতঃ সুচরিতার চরিত্রটি। আমাদের মনে হয়, নরেশ বাবু ভাল কোরে পড়লেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

ম্যাডানে নিরঞ্জন পাল

নিরঞ্জন পাল ম্যাডান ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে একখানা হিন্দী ও বাঙ্‌লা ছবি তোলার তোড়জোড় কোরছেন। এর সঙ্গে জড়িত আছেন বোম্বাইয়ের দু' একটি ধনী ব্যবসায়ী।

"হাল-বাঙলা"

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের প্রথম হাস্য-রসাত্মক বাণী-চিত্র "হাল-বাঙলা" আসছে শনিবার থেকে 'রূপবাণী-'তে পঞ্চম সপ্তাহে পড়বে। হাসির ছবি হিসাবে "হাল-বাঙলা" সবাইকে হাসাচ্ছে খুব। ছবিখানির গল্পটি ভাল কিন্তু বর্ণনা কৌশলের অক্ষমতা হেতু ছবিখানির রস সব জায়গায় দানা বাঁধতে পারেনি। পরিচালনায় ডি-জি আহা মরি কিছু না দেখালেও—তিনি তাঁর কাজ মোটা-মুটি চালিয়ে দিয়েছেন। আলোক-চিত্রে দ্রোণাচার্য্যের কাজ ও শব্দগ্রহণে ইরাণীর কাজ আরও উন্নত হওয়া উচিৎ ছিল। সম্পাদক যদি "হাল বাঙলা-"র ওপর আরও হস্ত-বর্ষণ কোরতেন তা' হ'লে ছবিখানি আরও জমে উঠ্‌বার অবকাশ পেত।

অভিনয়ে ধীরেন গাঙ্গুলীর ভূপেন সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ছায়াদেবীর শেফালি মোটের ওপর মন্দ নয়। নায়ক মহাদেব পালের নির্ব্বাচন আমরা সমর্থণ করিনা। মৃণাল ঘোষের অভিনয় ভাড়ামির নামান্তর মাত্র। তুলসী লাহিড়ীর বাঙ্গাল জমিদার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েছে। চন্দ্রিকা দেবীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নয়। প্রভাত সিংহ, পদ্মাবতী চলনসই।

মোট কথা, দোষগুণে মিশ্রিত "হাল-বাঙলা" 'রূপবাণীতে' যে বেশ কিছুদিন হাসির বন্যা বহাবে—এ ধারণা করা অসমী-চীন নয়।

রাধা ফিল্ম

প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পরিচালনায়, রাধা ফিল্মসের কারখানায়, মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের হাস্য-রসাত্মক চিত্র-নিবেদন "বেকার নাশন কোম্পানীর" চিত্র-গ্রহণ কার্য্য দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। "বেকার নাশন কোম্পানী" নামটী সমস্যামূলক এবং বর্ত্তমান কালোপযোগী হ'লেও ছবি-খানির মধ্যে একমাত্র হাস্যরস বিতরণ করা ছাড়া আর কোন সমস্যার লেশমাত্র নেই।

জনক নন্দিনী—ফণী বর্ম্মা তার পরবর্ত্তী পৌরাণিক চিত্র-কাহিনী জনক নন্দিনীর চিত্র গ্রহণ কার্য্য বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'বিষ্ণু শর্ম্মার' কুটীর দৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে।

পূর্ণ থিয়েটার

মুক্তি প্রথম সপ্তাহের চেয়েও দ্বিতীয় সপ্তাহে এখানে বেশী জনসমাগম করতে সক্ষম হয়েছে। 'মুক্তি'র গান, 'মুক্তি'র ফটোগ্রাফী, 'মুক্তি'র শব্দযন্ত্রের কাজ যে এ ছবির কত বড় সম্পদ—তা যারা না দেখেছেন তাঁরা বুঝবেন না।

(সি, বি)

হকি ঃ—

গত দু'মাস ধরে 'বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন' কর্ত্তৃক পরিচালিত লীগ্ প্রতিযোগিতাগুলির খেলা চলছে এবং আর এক সপ্তাহ বাদে এই প্রতিযোগিতাগুলির সমস্ত খেলা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক এর পরেই বিখ্যাত "বাইটন্ কাপ" হকি প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে এবং এই প্রতিযোগিতার শেষ খেলাটি হবার পরই কলকাতার গড়ের মাঠ আবার ফুটবল্ খেলার উত্তেজনায় ও চাঞ্চল্যে ভরে উঠবে। প্রথম ডিভিসন হকি লীগ্ প্রতিযোগিতাটিতে প্রত্যেক বছরের মত এবারেও 'লীগ্ বিজয়' এবং 'দ্বিতীয় ডিভিসনে' অবনতির সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে কাষ্টমস্ ক্লাব এবং রেঞ্জার্স ক্লাবের মধ্যে লীগ্ বিজয়ের জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছে এবং এবছরেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। গত সোমবার পর্য্যন্ত কাষ্টমস দল মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে ৩০ পয়েন্ট লাভ করে প্রথম স্থান অধিকার করে রয়েছে। তার পরেই রেঞ্জার্স দল ১৬টি খেলে ২৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে এবং তাদের অগ্রবর্ত্তী দলটিকে তীব্রভাবে অনুসরণ করছে। প্রত্যেক দলটির এখন দুটি করে খেলা বাকি আছে। দুটি ক্লাবেরই একটি খেলার প্রতিপক্ষ হচ্ছে লীগ্ টেবলের সর্ব্বনিম্ন টাউন ক্লাব। সুতরাং এই খেলাটিতে তাহারা অনায়াসে জয়লাভ করে আরও দুটি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারবে এবং তখনও এই দল দুটির মধ্যে দুই পয়েন্টের পার্থক্য থাকবে। কাষ্টমস্ এবং রেঞ্জার্স দলের শেষ খেলাটি হবে তাদের পরস্পরের মধ্যে। এই খেলাটির গুরুত্ব হবে খুব বেশী কারণ রেঞ্জার্স দল যদি তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দলটিকে পরাজিত করতে পারে তাহলে সমান পয়েন্ট হয়ে যাবে।, সম্ভবতঃ আগামী ১৩ই এপ্রিল এই গুরুত্বপূর্ণ খেলাটির শেষ মীমাংসা হবে এবং তারপর লীগ্ বিজয়ী নির্দ্ধারণ হবে। অবশ্য সমান পয়েন্ট হলেও কাষ্টমস্ দলই লীগ বিজয়ের অধিকারী হবে কারণ কাষ্টমস দলের 'গোল্ এভারেজ' তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করবে। এই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী টীমগুলির পরেই 'মোহনবাগান' ক্লাব তৃতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারা গত সোমবার পর্য্যন্ত মোট ২৪টি ম্যাচ খেলে ২২ পয়েন্ট পেয়েছে। এই ক্লাবটি শেষ খেলাগুলি বেশ সন্তোষজনকভাবে খেললেও প্রথম থেকে চেষ্টা করলে তারাও হয়ত রেঞ্জার্স এবং কাষ্টমস দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত।

লীগ্ টেবলের উপর দিকে এইরূপ প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হলেও নীচের দিকেও তার বিশেষ অভাব হয় নি। টাউন ক্লাব এ বছরেই প্রথম ডিভিসনে উন্নত হয়ে আবার এবছরেই বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। গত সোমবার পর্য্যন্ত তারা মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে মাত্র ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। তাদের বাকি দুটি ম্যাচ্ খেলতে হবে রেঞ্জার্স এবং কাষ্টমস্ দলের সঙ্গে। সুতরাং তারা যে পয়েন্ট লাভ করতে পারবে তা মনে হয় না। তাদের ঠিক উপরে পাঞ্জাব ৭ পয়েন্টের অধিকারী হলেও তারা সৈনিক দল বলে অবনতির কবল থেকে রেহাই পাবে। তার উপরেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এবং সেণ্ট-জোসেফ দল, দুটির স্থান। এরা ১৫টি করে ম্যাচ খেলে যথাক্রমে ৮ এবং ৯ পয়েন্ট পেয়েছে। এই দুটি দলের মধ্যেই একটি দলকে আগামী বৎসরে দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে হবে বলে মনে হয়। তবে প্রত্যেকটি দলেরই এখন তিনটি করে খেলা বাকী সেই কারণে আপাততঃ কিছুই নিশ্চয় করে বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

গত সোমবার পর্য্যন্ত শেষ সাতটি টীমের লীগ্ টেবল্ নিম্নে দেওয়া হল।

	খেঃ	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
আর্ম্মেনিয়ানস্	১৫	৩	৪	৮	১০	১৬	১০
ভবানীপুর	১৪	৩	৪	৭	৭	২৫	১০
ড্যালহাউসি	১৪	৩	৪	৭	১০	২৮	১০
সেণ্ট জোসেফস্	১৫	৩	৩	৯	১০	২৩	৯
ইষ্টবেঙ্গল	১৫	২	৪	৯	৭	২২	৮
পাঞ্জাব রেজিঃ	১৬	৩	১	১২	১৩	৩৬	৭
টাউন ক্লাব	১৬	০	৬	১০	৮	২৮	৬

বাইটন্ কাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত ৫ই এপ্রিল বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ধার্য্য হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেখানকার শক্তিশালী হকি দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অভিপ্রায় জানিয়েছে। অবশ্য বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক সন্তোষজনকভাবে আর্থিক সাহায্য

না পেলে তাদের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হবে না।

গত ১লা এপ্রিলের সভায় স্থির হবার পর বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসন নিম্নলিখিত সাতটি বিখ্যাত হকি টীমকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।

(১) লুসিটানিয়ানস্ (বোম্বাই)
(২) বম্বে কাষ্টমস (বোম্বাই)
(৩) ঝাঁসি হিরোজ (ঝাঁসি)
(৪) এন ডবলিউ রেল (লাহোর)
(৫) ভূপাল হকি টীম (ভূপাল)
(৬) ডিষ্ট্রিক্ট স্পোর্টস্ (মীরাট)
(৭) মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েসন (মাদ্রাজ)

নিম্নলিখিত দলগুলি ইতিমধ্যে যোগদান করেছে :—

স্থানীয় দল

(১) পোর্ট কমিশনারস্
(২) বি, এন, আর,
(৩) ক্যালকাটা
(৪) ক্যালকাটা কাষ্টমস

আগন্তুক দল

ওয়াই এম ক্লাব (রংপুর)
সালেগ্রো ইউনিয়ন (ফরিদপুর)
ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট (ফরিদপুর)
এলবার্ট ইউনিয়ন (রাজসাহী)

হকি প্রদর্শনী খেলা :—

আগামী ১০ই এপ্রিল চুঁচড়ায় ভারতীয় বাছাই করা দলের সঙ্গে ইউরোপীয়ান বাছাই করা দলের একটি প্রদর্শনী হকি খেলা হবে বলে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসন সম্মতি জানিয়েছেন।

অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন

গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বাৎসরিক সভা হয়ে গেছে। গত বৎসরে ফেডারেশনের গঠনমূলক সভায় আই এফ এর দুজন প্রতিনিধি ছাড়া ঢাকা ফুটবল এসোসিয়েসনের একজন প্রতিনিধিকে ফেডারেশন কাউন্সিলে আসন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বৎসর ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেণ্ডির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্বেও অন্যান্য সভ্যেরা ঢাকা এসোসিয়েসনকে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাখতে রাজি হন নি এবং সেই কারণে ঢাকা এসোসিয়েসনকে আই এফ এর অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সভ্যদের মধ্যে অনেকে মত প্রকাশ করেন যে 'ঢাকা সহর' বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত তা তাঁদের জানা ছিল না সেই জন্য তাঁরা গত বৎসর ঢাকা এসোসিয়েসনকে পৃথক আসন দিতে রাজী হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেণ্ডি এই সভার সভাপতিত্ব করেন এবং বর্ত্তমান বৎসরে সভাপতি পদের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় ব্রিগেডিয়ার ম্যাজেণ্ডি বিলাত প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সভাপতি থাকবেন বলে সাব্যস্ত হয় এবং তাঁহার কার্য্যভার যিনি গ্রহণ করবেন তাঁকেই ফেডারেশনের পরবর্ত্তী সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হবে। ভবিষ্যতে অন্ততঃ দু বৎসরের জন্য কোন ভ্রাম্যমান ফুটবল টীম ভারতে আমন্ত্রণ করে আনা হবে না কিংবা ভারতের বাহিরে পাঠান হবে না বলে ঠিক হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদক মেজর উইলসনের জায়গায় ক্যাপ্টেন জে, বি ডোনাল্ডসন আগামী বৎসরের জন্য সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন। মিঃ পি গুপ্ত এ বৎসরের জন্য পুনর্ব্বার কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন।

আই এফ এর অন্তর্গত সমস্ত ক্লাবগুলির মধ্যে থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে—আই, এফ, এ' দল নাম দিয়ে একটি ফুটবল টীম অষ্ট্রেলিয়ার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারে এইরূপ অভিমত ফেডারেশন আই এফ একে জানিয়েছেন।

আই এফ এ এই অনুমতি পাবার পর এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা এখনও করেন নি।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ :—

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের সকল ডিভিসন গুলিতে ষোলোটী করে টীম নেবার যে একটা গুপ্ত প্রচেষ্টা চলছিল তা অন্ততঃ এবৎসরের মত ব্যর্থ হয়েছে। আগামী ২রা মে তারিখ থেকে ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ

হয়ে আগামী ৯ই জুলাই শেষ হবে এই রকমের তালিকা প্রস্তুত হয়েছে।

পাওয়ার মেমোরিয়াল ফুটবল লীগ :—

এই মাসের ২০শে তারিখ থেকে পাওয়ার মেমোরিয়াল ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হবে।

অমরনাথ ও অমর সিং :—

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দ্বয় অমরনাথ ও অমর সিং গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বোম্বাই থেকে 'কণ্টি বাই আন্ কামানো' জাহাজ যোগে খেলার উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করেছেন। অমরনাথ 'নেলসন' ক্লাব এবং অমরসিং 'কলনি' ক্লাবের পক্ষে ক্রিকেট খেলবার সম্মতি জানিয়েছেন।

ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড :—

আগামী ১৭ই এপ্রিল ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সভা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় নওনগরের জামসাহেব এবং মিঃ ডিমেলোর পদত্যাগ পত্র আলোচনা হবে। তা ছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সভায় আলোচনা হবে।

সিংহলে অষ্ট্রেলিয়া দল

গত ৩০শে মার্চ্চ অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সহিত সিংহল দলের একটি ক্রিকেট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে ৩৬৭ রাণ করবার পর ডিক্লেয়ার করে। হ্যাসেট্ ও ব্যাডকক্ প্রত্যেকে ১১৬ রাণ করেন। সিংহল দলের প্যারেরা ১০৬ রাণে ৫টি উইকেট লাভ করেন। অষ্ট্রেলিয়া দলে ব্র্যাডম্যান, ওরিলি, ফ্লিটউড স্মিথ, বার্নেট্ ও ম্যাককর্ম্মিক্ এই খেলাটিতে যোগদান করেন নি।

সিংহল দল ৭৫ মিনিট খেলার পর সাত উইকেটে ১৪৪, রাণ করার পর অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টি হওয়ার দরুণ খেলাটি বন্ধ করতে হয় এবং খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া দলের চিপারফিল্ড ২৪ রাণে চারটি উইকেট লাভ করে প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

অষ্ট্রেলিয়া দল :—ব্রাউন, ফিঙ্গলটন, হ্যাসেট, ব্যাডকক্, ম্যাকেব, বার্ণিশ, চিপারফিল্ড, ওয়েট, হোয়াইট, ওয়াকার এবং ওয়ার্ড।

সিংহল দল :—পুলী, হুবার্ট, ডিসারাম, ম্যাকার্থী, জয়বিক্রম, কেলায়ার্ট, গুণশেখর, সরভানমাতু, ব্যাকলীম্যান এবং জয়াপ্যারেরা।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

আগামী ৭ই মে 'টিউবার কিউলিসিস্ নিবারণী ভাণ্ডারের' সাহায্যার্থে একটি ফুটবল চ্যারিটী ম্যাচ খেলা হবার পর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নূতন মাঠের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হবে।

—:০:—

শ্রীদুর্ব্বাসা
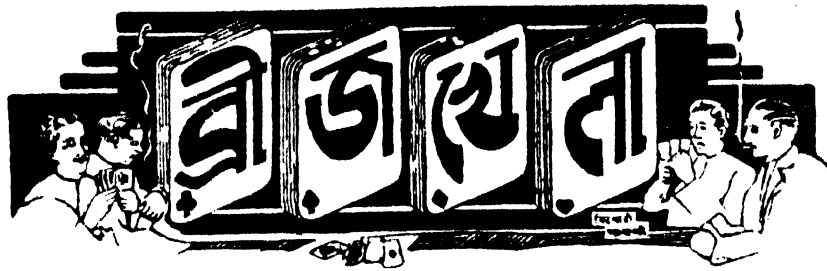
প্রতিযোগিতার একটি হাত ঃ—

হাতে পিট ধরবার উপযুক্ত তাস না থাকলে আহ্বানকারী ডবল দেওয়া বিধেয় নয়। অনেক সময় খেলোয়াড়দের মধ্যে এই প্রকার ডবল দিতে দেখা যায়, যার ফলে সুবিধার পরিবর্ত্তে ডবলকারীদের অসুবিধাই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নের হাতটি লক্ষ্য করলে আপনারা অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে ডাকদারের বিপক্ষদল যদি আহ্বানকারী ডবল না দিতেন তা'হলে ডাকদারেরা বোধহয় গেম অবধি ডাক তুলতে পারতেন না। হাতখানি নিম্নে দেখুন

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, ×, ×।
হরতন—সাহেব, গোলাম, ×, ×।
রুহিতন—সাহেব, ×, ×।
চিড়িতন—সাহেব, ×।

ইস্কাবন—×, ×, ×, ×।
হরতন—টেক্কা, দশ, ×।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম
চিড়িতন—×, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা।
হরতন—বিবি, নয়, আটা, সাতা, পঞ্জা।
রুহিতন—×, ×।
চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, ×, ×, ×।

ইস্কাবন—গোলাম, দশ, ×, ×।
হরতন—×।
রুহিতন—গোলাম, ×, ×, ×।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, ×, ×।

এই ক্ষেত্রে ডাক হয়েছিল এইরূপ,

'দ'	'প'
পাশ।	একটি রুহিতন।
পাশ।	দুইটি হরতন।
পাশ।	চারটি হরতন।
পাশ।	পাশ।
'উ'	'পূ'
ডবল।	একটি হরতন।
পাশ।	তিনটি হরতন।
ডবল।	পাশ।

এ ক্ষেত্রে ডাকের বিষয় বিশেষ কিছুই বল্‌বার নেই, শুধু এই বল্‌লেই চল্‌বে যে বিপক্ষদল ডবল না দিলে এই হাতে চারটি হরতনের ডাক দেওয়া যেত না। নিম্নে দেখুন ডাকদার কত সহজে খেলাটি করে নিয়ে গেলেন।

(১) 'দ' ইস্কাবন খেলায় সকলেই ইস্কাবন দিলেন; 'পূ' ইস্কাবনের টেক্কা মেরে পিটখানি নিলেন।

(২) 'পূ' রুহিতনের ছোট তাস খেলে ডামির হাতে ফিনাস নেওয়ায় 'উ' সাহেব দিয়ে পিট ধরলেন।

(৩) 'উ' ইস্কাবনের সাহেব খেল্‌লেন; সকলেই ইস্কাবন দিলেন, 'পূ' তুরুপ করে পিটখানি নিলেন।

(৪ ও ৫) 'পূ' শেষ রুহিতন খানি খেলে ডামির বিবি দিয়ে পিট নিলেন এবং রুহিতনের টেক্কার পিটও নিলেন। 'পূ' এ পিটে চিড়িতনের দুরি দিয়ে গেলেন।

(৬ ও ৭) ডামি ছোট চিড়িতন খেলায় 'পূ' বিবি ফিনাস করে পিট নিয়ে টেক্কা পেড়ে খেলে আর একখানি পিট নিলেন। আর সকলে চিড়িতন দিয়ে গেলেন।

(৮) 'পূ' পুনরায় চিড়িতন খেলায় ডামি দশ তুরুপ করলেন, 'উ' তার উপর গোলাম দিয়ে পিট নিলেন।

(৯) এইবার 'উ' পুনরায় আর একখানি ইস্কাবন খেলায় 'পূ' তুরুপ করে পিটখানি ধরলেন।

(১০) 'পূ' আবার একখানি চিড়িতন খেলায় 'দ' চিড়িতনের শেষ তাস গোলাম খেললেন, ডামি টেক্কা তুরুপ করে পিটখানি নিলেন।

(১১) ডামির হাত থেকে এইবার রঙ খেলাতে চারটির খেলা করা মোটেই অসুবিধাজনক হলনা। অবিবেচনা প্রসূত আহ্বানকারী ডবল দিয়ে ডবলকারীদের কিরূপ ক্ষতি সাধিত হল দেখুন।

শরৎ সাহিত্যে মাতৃত্ব
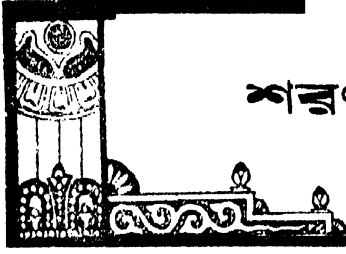
শ্রীসমীর ঘোষ
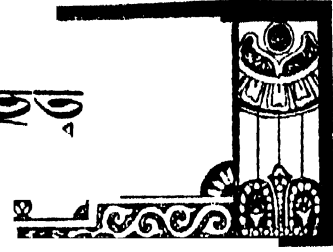
বাংলা সাহিত্যে বোধ হয় আর কোন লেখক নারীকে লইয়া এতটা আলোচনা করেন নাই, যতটা করিয়াছেন শরৎচন্দ্র।

নারীর প্রতি শরৎচন্দ্রের এই যে পক্ষপাতিত্ব, সে সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ পাল মহাশয় তাঁহার, 'শরৎ সাহিত্যে নারী'তে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের নিকট এই পক্ষপাতিত্বের কারণ অনেকাংশে ধরা পড়ে। ইহা ছাড়া সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শরৎ প্রতিভা' ও 'শরৎচন্দ্র' পাঠককে শরৎ সাহিত্য বুঝিতে অনেকখানি সাহার্য্য করে এবং পাঠককে বুঝাইয়া দেয় শরৎ সাহিত্যে নারী কেন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। সর্ব্বোপরি শরৎ চন্দ্রের রচিত 'নারীর মূল্য' হইতে আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি, কেন শরৎ সাহিত্যে নারীর স্থান বেশী আর কেন পুরুষের স্থান নগন্য; অনেকের মতে সেখানে প্রকৃত পুরুষ নাই বলিলেও চলে।

যাহা হউক মোটের উপর শরৎ সাহিত্যে পাঠক দেখিতে পায়, এই সাহিত্যে নারীই প্রধানস্থান অধিকার করিয়া আছেন। আজ আমিও সেই শরৎ সাহিত্যের নারীকে লইয়া সামান্ত আলোচনা করিব।

সুবিখ্যাত উপন্যাস 'দুইবোন'-এর গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে নারী দুই প্রকার; এক স্বভাবত মাতৃজাতীয়, আর অপর হইতেছেন প্রিয়া জাতীয়। যদিও শরৎ সাহিত্যে প্রিয়া জাতীয় নারীই অধিক স্থান অধিকার করিয়া আছেন তথাপি মাতৃজাতীয় নারীর স্থান যে তথায় নগন্য নয় সে সম্বন্ধে আজ যথোকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত মাতৃত্ব সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক বিমাতার স্নেহ আর দ্বিতীয় হইতেছে নিসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার স্নেহ।

আমাদের দেশে. বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে, কোন নারী তাঁহার সপত্মীকে, কখনও ভালোবাসিতে পারেন না বা তাহার (সপত্নীর) সম্পর্কিত কোন কিছু সহ্য করিতে পারেন না। এই যে না পারার চিত্র আমাদের মহাকাব্য 'রামায়ণে' অংকিত হইয়াছেন 'কৈকেয়ী'রূপে।

কৈকেয়ীর নিকট পিতা দশরথ যে সত্যবদ্ধ ছিলেন, তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য. বিমাতার অভিলাষ পুরণের নিমিত্ত সপত্নীপুত্র রামকে বনে যাইতে হইয়াছিল।

এই ঘটনায় বিমাতার সপত্নীর উপরে হিংসা ও সপত্নীপুত্রের উপরে সেই হিংসা চরিতার্থ করাতে কৈকেয়ীকে সকলে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যদি ঘটনার মূলে যাই, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই বস্তুত রামচন্দ্রের উপর কৈকেয়ীর কোনরূপ হিংসা ছিল না। বরং মন্থরা যখন কৈকেয়ীকে রামচন্দ্রের অভিষেকায়োজনের সংবাদ প্রদান করে, তখন তিনি মন্থরাকে রত্নহারে বিভূষিতা করিতে গিয়াছিলেন। তারপরে মন্থরার কূট পরামর্শে ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছিল, তাহাতে আমাদের উপস্থিত কোন প্রয়োজন নাই। আমরা শুষ্ক বিচারে জানিতে পারি মন্থরার উপদেশে ও তিরস্কারে কৈকেয়ীর মনে এই প্রশ্ন জাগরিত হয়: রাম সপত্নীপুত্র, সে রাজা হইলে কৈকেয়ীর রাণীর সম্মান হয়তো বজায় থাকবে না। সেই ভীতিই তাঁহাকে কোথায় টানিয়াছিল তাহা রামায়ণ পাঠক মাত্রই জানেন। এই ভীতি উৎপাদিত হইবার আগে রামের প্রতি কৈকেয়ীর বিমাতা হিসাবে যে কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাহা অতি সহজেই প্রমানিত হয়।

কিন্তু এই মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ রামায়ণের ঘটনাবলী পড়িয়া বা শুনিয়া বিমাতা যে সপত্নীপুত্রের শত্রু, তাহা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এবং মেয়েদের মনেও এমন দৃঢ়সংস্কার জন্মাইয়া গিয়াছে যে তাঁহারাও সপত্নীপুত্র বা কন্যাদের শত্রু মনে করেন আর সপত্নী পুত্র বা কন্যারা বিমাতাকে মহাশত্রু জ্ঞানে তাঁহার মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিতে ভয় পায় বা ঘৃণা করে।

এই কারণবশতঃ যখন 'দেবদাস'এর 'পার্ব্বতী' স্বামীগৃহে উপস্থিত হয়, তখন বাড়ীর ছেলে 'মহেন্দ্র' নিরুপায় হইয়া গৃহে থাকিয়া যায় ও পরের বউ 'যশোদা' শ্বশুর বাড়ী হইতে অতি আদরের বাপের বাড়ী আসিতে রাজী হয় নাই। ঠিক এই একই কারণে ও সংস্কারে বৈকুণ্ঠের উইল'এ 'গোকুল'কে পাঠশালা ছাড়ানো হইলে পাড়ার লোক বলিয়া বেড়াইয়াছিল যে সৎমায়ের পরামর্শে বাপ ছেলেটাকে মানুষ হইতে দিলে না। শুধু তাহাই নয় পরবর্ত্তী ঘটনায় যখন 'গোকুল' রাগ করিয়া 'বিনোদ' সম্বন্ধে বলিল, "আমার যে ভাই ছিল সে মরে গেছে, তখন 'জয়লাল বাড়ুয্যে' স্পষ্টই বলিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন," বেদে পুরাণে যা কস্মিন-কালে ঘটে নি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে,"—অর্থাৎ মানুষ কখনও বৈমাত্র ভাইকে আপনার সহোদর ভাইরূপে ভাবিতে পারে না।

এই ধারণার প্রচলন থাকা যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্যে দেখাইয়াছেন যে এই ধারণা মিথ্যা, এবং এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করাও স্নেহময়ী করুণারূপিনী জননী নারীর পক্ষে অসম্ভব।

বিমাতা ও সপত্নী সন্তান লইয়া শরৎচন্দ্র যতোগুলো চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'বৈকুণ্ঠের উইল' শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিমাতা 'ভবানী'র হাতে 'গোকুল' মানুষ হইয়াছিল। মাত্র লোকের মুখে সে শুনিত 'ভবানী' তাহার বিমাতা। তাহার নিজের মনে কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কোন দিন উঠে নাই।

মরণের পূর্ব্বে 'বৈকুণ্ঠ' উইল করিলেন, আর পত্নীর সম্মতিক্রমেই 'ভবানী'র ছেলে 'বিনোদ'কে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন।

পিতার মৃত্যুর সময় 'বিনোদ' কলিকাতায় পড়িতেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে পিতার মৃত্যু সংবাদ বা উইলের কথা জানিতে পারিল অনেক পরে। এইখান হইতেই প্রকৃত ঘটনা বা সংঘর্ষ আরম্ভ হইল 'ভবানী'র সহিত 'গোকুলের। এই দুইটি চরিত্রের গতি লক্ষ করিলেই চোখে পড়ে একজন স্বল্পভাষী, সহিষ্ণু। তাই তাঁহার হৃদয়ের বেগ, স্নেহের গভীরতা বা চরিত্রের মাধুর্য্য আমরা বুঝিতে পারি চপলমতি অপরজনের অভিমানপ্রসূত কথায় বা কার্য্যে।

'বিনোদ' বাড়ী আসিয়াছে, উইলের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু 'গোকুলের' প্রদত্ত সিন্দুকের চাবী লয় নাই এবং পিতার শ্রাদ্ধে পণ্ডিত বিদায়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। 'গোকুল' ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। 'ভবানীর' কাছে সে নালিশ করিতে গেল। কিন্তু 'ভবানী' কোন কথা কহিলেন না। কারণ তিনি প্রথমতঃ স্বল্পভাষিনী, দ্বিতীয়তঃ গোকুলের অভিমানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই আর সর্ব্বোপরি 'মনোরমার', ব্যবহার তাঁহাকে যে আঘাত দিয়াছিল তাহাতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

'গোকুল' রুষ্ট হইয়া উঠিল। চতুরা মনোরমা এইখানে এক চাল চালিল। সে 'গোকুলকে' বুঝাইয়া দিল যে 'ভবানীর' এই উপেক্ষা ও নীরবতা 'বিনোদের' বিষয় বঞ্চিত হওয়ায় এবং সপত্নীপুত্র 'গোকুলের যে সম্পত্তি লাভের সৌভাগ্য জাগিয়াছে। সরল 'গোকুল' অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, "সব কথা ছাপাইয়া এই একটি কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয় সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিষ! এবং শুধু সেই জন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন।"

গোকুলের সেদিনের এই আশঙ্কা নিদারুণ সত্যে পরিণত হইল যখন 'ভবানী' 'বিনোদের' বাসায় চলিয়া গেলেন। অভিমানী 'গোকুল' সবাইকে জানাইয়াছিল, তাহারতো আর নিজের মা নেই 'ভবানী' যে এখন সত্যিকারের সৎমা হইয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সে সবাইকে আরো জানাইয়া দিল যে 'ভবানী' সৎমা বা অন্য যাহা কিছুই হউন না কেন, 'গোকুল' তাঁহার উপরে নিজের দাবী ছাড়িতে পারেনা, তাঁহার সম্মান যে নষ্ট হইতে দিতে পারে না। সে 'বিনোদের' বাসায় গিয়া 'হেবুর মার' কাছে দুঃখ করিল, "বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, "বাবা গোকুল এই নাও তোমার মা" আমি ভালো মানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্য কি, সে আমার মাকে জোড় করে নিয়ে আসে! কেন আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি এখনই জোর করে নিয়ে যেতে পারি নে?"

এই কটি কথায় আমরা জানিতে পারি 'গোকুলের "বিমাতাকে নিজের বলিয়া দাবী করিবার মূলে 'ভবানীর" কতখানি স্নেহ রস ঢালা ছিল।

হতভাগিনী 'পার্ব্বতীর' জীবনও বিমাতার অভিনয়ে অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ 'ভুবন চৌধুরীর' গৃহে সেই ছলনাময়ী 'ভুবন চৌধুরী'র গৃহলক্ষীর অংশ হইতে সযত্নে নিজেকে সরাইয়া নিয়া 'ভুবন চৌধুরী'র প্রথম পক্ষের সন্তানের মাতৃপদে নিজেকে এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে তাহাকে সেখান হইতে নিজের কাছে টানিয়া আনিতে 'দেবদাস'ও সঙ্কুচিত হইত যদি সে নিজে কোন দিন 'পার্ব্বতীকে' এই আসনে স্বচক্ষে দেখিত। এই মাতৃত্বের মহিমায় নিজেকে আবৃত ও সমাজের সর্বাপেক্ষা গৌরবের স্থানে নিজেকে স্থাপিত করিয়াই সমাজের ও নারীত্বের প্রতি 'পার্বতী' তার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছে। সত্যই 'ভুবন চৌধুরীর' গৃহে যদি 'মহেন্দ্র' না থাকিত, আর তাহার মা হইবার সুযোগ যদি না ঘটিত তাহা হইলে 'ভুবন চৌধুরীর' গৃহে আগুন জ্বালাইয়া 'পার্বতী' নিজেও বোধ হয় সেই আগুনে সমানে প্রত্যক্ষরূপে পুড়িয়া মরিত।

'পার্বতীর জীবনের এই অংশ সমালোচনা করিতে গিয়া শরৎ সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়াছেন, "পার্বতী প্রকৃত পক্ষে স্বামীর ঘর করিতে আসে নাই। তাহার অন্তরের স্বামী 'দেবদাস'। দেবদাসকে সে হৃদয় হইতে বিদায় দিতে পারে নাই। অথচ অনুষ্ঠানিক বিবাহের দ্বারাই 'ভুবন চৌধুরী' তাহার স্বামী হইয়া দাঁড়াইয়াছে * * * সে 'ভুবন চৌধুরীর' বাড়ীতে আপনাকে এমন ভাবে মানাইয়া লইয়া চলিয়াছে, যাহাতে

কেহই বুঝিতে পারেনা, যে, এ তাহার প্রকৃত স্বামীর গৃহ নয় বা তাহার হৃদয় তলে প্রেমের আর এক ফল্গু বহিয়া যাইতেছে * * * *"

এই ছলনাময়ী নারী যাহাকে স্বামী বলিয়া মানিল না, অথচ তাহারই সন্তানের বিমাতা হইয়া যে তাহাদের মধ্যে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অপ্রমাণিত থাকে না, যখন জলদ বালার নামে 'মহেন্দ্র' আনিয়া পার্বতীর কাছে অভিযোগ উপস্থিত করে। এইস্থলে আমরা দেখি মাতৃত্বে 'ভবানী' ও 'পার্ব্বতী'র মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং মাতৃহৃদয়ের দ্বার সকল সন্তানের নিকটেই উন্মুক্ত। সে কাহারও বিধি নিষেধ কিছুই মানে না, বিচার করে না কে স্বীয় বা কে সপত্নী সন্তান। সে স্বভাবজাত উদারতায় সবাইকে সমান করিয়া লয় ও দেখে।

'নিষ্কৃতি' গল্পেও দেখা যায় 'শৈলজা' তাহার সপত্নীপুত্রের প্রতি আপনার গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় স্বাভাবিক ব্যবহার করিয়াছে ও প্রয়োজন বোধে কঠোর হইয়াছে। কিন্তু কোথাও দুর্ব্যবহার বা বিদ্বেষ বশতঃ অত্যাচার করে নাই।

ব্যর্থ ও বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয়ের চরম চিত্র হইতেছে 'পণ্ডিত মশাই'এর 'কুসুম'—প্রথম জীবন তার সামাজিক কলহের মধ্যে কাটিয়াছে। তার মা কলঙ্ক সহ্য করিতে না পারিয়া মেয়ের সহিত এক আসল বৈরাগীর কণ্ঠি বদল করাইয়া জাত রাখিয়া গিয়াছেন। তাহারি যাত্রাপথের অনুসরণ করিয়া আসল বৈরাগীও একদিন চলিয়া গিয়াছেন। 'বৃন্দাবনের' সহিত 'কুসুমের' আর কোন সম্বন্ধ নাই, এমনকি 'কুসুম' ভুলিয়া গিয়াছে তাহার 'বৃন্দাবনের' সহিত বিবাহ হইয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনার পর কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; 'কুসুম' বামুন কায়েত প্রভৃতি ভদ্রঘরের মেয়েদের সহিত মিশিয়া লেখা পড়া শিখিয়া যৌবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু 'রাজলক্ষ্মী'র (শ্রীকান্ত) কথায় "এ লোভ (অর্থাৎ জননী হওয়ার লোভ) আবার কোন মেয়েমানুষের নাই?" তাহা সে জানিতে পারে নাই। তাই ঘটনাচক্রে যখন 'বৃন্দাবন' সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ মিটমাট করিয়া আবার তাহাকে ঘরে লইয়া যাইতে চাহিল, তখন তাহার শিক্ষিত সংস্কারিত মন বলিল যে তাহা হয় না। 'বৃন্দাবন' ফিরিয়া গেল। কিন্তু সে পিতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়াছিল। তাই বোধ হয় সে 'চরণ'কে আনিয়া 'কুসুমে'র কোলে তুলিয়া দিয়া 'কুসুম'কে 'চরণে'র মা হইতে ডাকিল—বৃন্দাবনের গৃহিনী হইতে নয়।

'কুসুমে'র মনে দোলা লাগিল। তাহার সমস্ত হৃদয় মাতিয়া উঠিল: এমন ছেলের মা না হইলে যে চলে না। কিন্তু তাহার গর্ব্বিত মন সেই সঙ্গে বিরুদ্ধ আন্দোলন তুলিল: এমন ছেলের মা হইতে হইলে, তোমাকে যাইতে হইবে সেই 'বৃন্দাবনে'র ঘরে, যাহার পিতা একদিন তোমার মায়ের নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়াছিল। তাহার শিক্ষিত মনও সেই আন্দোলনে যোগ দিল: আবার বিবাহ, আবার কণ্ঠীবদল, সে তো বিধবা, না ছি:!......এই দ্বন্দ্বে পড়িয়া আর 'কুসুম'কে কে দেখিবে ভাবিয়া 'কুসুম' 'চরণে'র চিন্তা দূরে সরাইতে চেষ্টা করিল। এমন কি সেদিন যখন 'বৃন্দাবন' মহামারীর ভয়ে 'চরণ'কে 'কুসুমে'র কাছে রাখিতে চাহিল, তখন কঠিন হইয়া সে 'চরণ'কে ফিরাইয়া দিল—নিজেও দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু 'কুসুমে'র দেহ দূরে সরিয়া গেলেও, তাহার বুভুক্ষিত নবোন্মেষিত মাতৃহৃদয় অমঙ্গলের মধ্যে সন্তানকে ফেলিয়া দূরে সরিয়া থাকিতে পারিল না। সে সমস্ত সংস্কার সকল দ্বন্দ্ব সব লজ্জা ঠেলিয়া 'চরণে'র কাছে ছুটিয়া আসিল—'চরণ'কে বুকের ভিতর টানিয়া লইতে। কিন্তু 'চরণ' তখন সকল মাতৃস্নেহ বন্ধনের বাহিরে গিয়া 'কুসুমে'র উপেক্ষার প্রতিশোধ লইয়াছে।

'শরৎ সাহিত্য সমালোচনা' করিতে গিয়া প্রমথনাথ পাল মহাশয় একস্থানে বলিয়াছেন, "অপরের সন্তানের প্রতি স্নেহ না জন্মানই তো স্বাভাবিক। সেই জন্যই বুঝি সমাজে স্বর্ণমঞ্জরী, দিগম্বরী, কাদম্বিনী, রাসবিহারী শ্রেণীর রমনীই অধিক। কিন্তু যে সমাজে এই জাতীয় নারী সংখ্যায় যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে, সেই সমাজে আবার ভামিনী, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতিরও স্থান আছে এবং তাহারাই বোধ হয় এতদিন রমনীর রমনীয়তা বজায় রাখিয়াছে বলিয়া, অনাথ আশ্রয়হীন ও অভাগাদের স্থান মরুভূমিতে না হইয়া এখনও সমাজেই আছে।"

শরৎ সাহিত্যের মাতৃত্বের মূলেও বোধ হয় এই তথ্যই নিহিত আছে। নিজের সন্তান যখন আসে নাই, সংসারে সে যখন সবে পুতুল খেলা ছাড়িয়াছে, এমন সময়ই 'নারায়ণী'র হাতে 'রামলাল'কে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুষ্ট ছেলেটি সেদিন 'নারায়ণী'র অন্তরে ও সংসারে যে শান্তি ও সুধা ঢালিয়াছিল, সেই কথাও তাহার মাধুর্য্য 'গোবিন্দ'কে কোলে

পাইয়াও 'নারায়ণী' ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার একটি চক্ষু ও কান সর্ব্বদাই এই অতি সরল, অতি দৃঢ় অথচ অতি দুষ্ট ছেলেটির দিকে স্নেহরস সিক্ত হইয়া প্রসারিত থাকিত। সে কখন কাহার অনিষ্ট করে, সে কখন কাহার সহিত মারপিট করে এই ভয়ে। কাজেই 'দিগম্বরী' যখন আসিলেন, তখন মেয়ে মাকে চিনিত বলিয়া তাহার সতর্কতার কাজ বাড়িয়া গেল। 'রামলালে'র প্রতি 'দিগম্বরী'র বিদ্বেষ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই 'নারায়ণী'র স্নেহধারা গোপনে 'রামলালে'র উপর অজস্রধারে বর্ষিত হইতে লাগিল।

বড় প্রেম শুধু নিকটে টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়—মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে কিন্তু এই নিয়ম খাটে না। সেই জন্যই সংঘর্ষ যখন চরমস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, 'রামলাল' তারকেশ্বরে চলিয়া যাইতে চাহিল, তখন সকল বাঁধন নিয়ম নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মাতৃস্নেহেরই জয় হইল—সে সন্তানকে দূরে পাঠাইতে পারিল না, স্নেহ উদ্বেলিত বক্ষে নির্য্যাতিত সন্তানকে সস্নেহে সজোরে চাপিয়া ধরিল।

শুধু 'রামের সুমতি' নয়, 'মামলার ফল' এতেও দেখিতে পাওয়া যায়, গঙ্গামণি গৃহত্যাগী 'গয়ারামে'র ভাত রাঁধিতেছে, সেইখানে গিয়া যেখানে কলের সাজ লইয়া 'গয়ারাম' গৃহত্যাগী হইয়াছে।

মাতৃস্নেহের আর একখানি অত্যুজ্জল মনোরম চিত্র 'বিন্দুর ছেলে'। গল্পের নামকরণ থেকেই বুঝিতে পারা যায় এখানকার যতো কিছু ঘটনা, যতো কিছু দ্বন্দ্ব সবই 'বিন্দুর' ছেলে অর্থাৎ 'অমূল্যধন'কে কেন্দ্র করিয়া।

যাহার ছেলে তাহারই সহিত ছেলের দুধ গরম, পাঠশালায় পড়ানো, সুপারী কাটা জাতি সাবধান ইত্যাদি- লইয়া 'বিন্দু' বড়জা 'অন্নপূর্ণা'র ছেলেকে মানুষ করিতেছিল নিজের সন্তানরূপে। তাহার আশা ছিল 'অমূল্যধন' হৃদয়ের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইবে। এই আশা যে 'বিন্দু'র কতখানি হৃদয় জুড়িয়াছিল তাহার একটা ক্ষণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'বিন্দু'র নিজেরই 'অন্নপূর্ণা'র কাছে অজ্ঞাতসারে উচ্চারিত কটি কথায়। "না দিদি, ও আমায় যদি কোন দিন ঘা পড়ে ত আমি পাগল হয়ে যাব।"

'বিন্দু'র সদা সর্ব্বদা সস্নিগ্ধ মাতৃহৃদয়ের দিন যখন 'অমূল্যধন'কে লইয়া এমনভাবে কাটিতেছিল, সেই সময়ে 'নরেন্দ্র' আসিল দশ আনা বারো আনা চুল ছাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া যাত্রার দলে 'সীতা' সাজিবার গৌরব লইয়া। 'বিন্দু' 'অন্নপূর্ণার' কাছে দাবী করিল, 'নরেন্দ্রে'র এখানে অন্ততঃ 'অমূল্যধনে'র কাছে থাকা চলিবে না। 'অন্নপূর্ণা' সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু যেদিন 'অমূল্যধনে'র 'নরেন্দ্রে'র মতো দশ আনা বারো আনা চুল ছাঁটিবার সখ চাপিল, সে দিন 'অন্নপূর্ণা'র উপহাসে 'বিন্দু' স্পষ্টই বলিল, "ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে—সব জিনিষের সুরু এমনি করেই হয়।"—ছেলের বিলাসিতা সুরু হইলে লেখাপড়া নষ্ট হইবে—'বিন্দু'র মাতৃহৃদয় সে দিন যে এই আশঙ্কা করিয়াছিল তাহা যে মিথ্যা নয়। তাহা প্রমাণ হইয়া গেল যখন দুদিন পরে 'অমূল্যধনে'র পকেট হইতে আধপোড়া সিগারেট বাহির হইল আর মাষ্টার জানাইল, সে অপরের বাগানে চুরি করিয়া স্কুলে জরিমানা দিয়াছে।

তাহার পর এই অতি সুখের সংসারে যে বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হইলেও, ছেলেকে ছাড়াইয়া তাহা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যেও দেখা গেল 'অমূল্য' 'বিন্দু'র কতখানি, আর 'বিন্দু' 'অমূল্য'র ভালবাসা পাইবার দাবী কতখানি রাখিয়াছে, সেই সময়ে যখন নতুন বাড়ীতে বামুন ঠাকুরুণ বলিতেছে, তোমার মূর্চ্ছা হ'য়েছিল, এ সব কথা জান না। অমূল্যধন কোথা থেকে ছুটে এসে তোমার বুকের উপর প'ড়ে যে কি কান্না! সে আর কখন দেখে নি, বলে ছোট মা মরে গেল…"

'মেজদিদি' 'হেমাঙ্গিনী' ও অনাথ পিতৃমাতৃহীন 'কেষ্টকে' দেখিয়া সহসা নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন। তাই সকলকে উপেক্ষা করিয়া, সকলের উপেক্ষিত কেষ্ট'কে বুকে চাপিয়া ধরেন।

শরৎ সাহিত্যে এই দুরকম মাতৃত্ব ছাড়া আর এক প্রকার মাতৃত্ব আছে 'বিশ্বেশ্বরী', 'ভুবনেশ্বরী', 'সিদ্ধেশ্বরী'র মধ্যে। ইহারা সাধারণ বিবাদ কলহ, সুখ দুঃখ হইতে অনেক দূরে বিরাজমান অথচ তাঁহাদের বক্ষ নিস্রুত স্নেহপীযূষের ছোঁয়া পাইতে হৃদয় স্বতই মাতিয়া উঠে।

'রমেশে'র সহিত 'বেণী'র যতই বিবাদ বিসম্বাদ মাথা কাটাকাটি হউক না কেন,

‘রমেশে’র পিতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করিতে ‘বিশ্বেশ্বরী’র আঁচলে ‘রমেশে’র ভাড়ারের চাবী উঠিবেই, এবং ‘বেণী’কে ‘বিশ্বেশ্বরী’র আজ্ঞায় ‘রমেশ’ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য সম্মানে নিমন্ত্রণ করিবে। (পল্লীসমাজে)

আট নয় বছর হইতে ‘ললিতা’র মা হইলেন ‘ভুবনেশ্বরী’। কিন্তু সেই মায়ের চোখে কোন দিন ধরা পড়িল না যে ছেলে ‘ললিতা’র প্রেমে পড়িয়াছে। আবার সে কথা যখন ‘শেখর’ প্রকাশিত করিল, তখন ‘ভুবনেশ্বরী’ খুব বিস্মিত হইলেন না। বরং খুব সহজেই তিনি তাহা মানিয়া লইলেন: তাঁহার এত ভালবাসা ছাড়িয়া ‘ললিতা’ কোথায় যাইবে। (পরিণীতা)

‘সিদ্ধেশ্বরী’ ‘শৈলজা’র উপরে রাগ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। অথচ রাত্রে তাঁহার ‘শৈলজা’র ছেলে ‘কানাই বলাই’এর কথা ভাবিয়া ঘুম আসিল না; তিনি ঠিক করিলেন পরের দিন মামলা করিয়া তিনি ‘কানাই বলাই’কে ‘শৈলজার কাছ হইতে কাড়িয়া আনিবেন। (নিষ্কৃতি)

শরৎচন্দ্রের অমর লেখনী এই সমস্ত ছাড়া অতি সামান্য, ছোট যে সকল চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও কেহ ভুলিতে পারে না। নিজের সন্তান মারা গিয়াছে। তাহার মৃত্যুকালে ‘বৃন্দাবন’ পুকুর ব্যবহার করিতে না দিয়া অপমান করিয়াছে। তবুও ‘ঘোষালের পত্নী’ ‘ঘোষাল’কে অনুরোধ করিতেছেন, ‘বৃন্দাবন’কে আশ্বাস দিতেছেন —ডাক্তার ‘চরণকে দেখিতে যাইবে। এই সদ্যশোকাহতা নারী যেন সমস্ত অন্তরের গোপন কথা এই অনুরোধে আশ্বাস প্রদান করিয়া গেলেন; আমি সন্তানের মা, সন্তানের মঙ্গলময়ী জননী; আমি সন্তানের অমঙ্গল দেখিতে পারি না—সে সন্তান আমারই হউক বা অপরের হউক (পণ্ডিত মশাই)

‘অরক্ষণীয়া’ পাঠকের মনে যে সর্ব্বাগ্রে কোন রেখা পাত করে সে হইতেছে ‘পোড়া-কাঠ’ ‘ভামিনী’। ভারতীয় চিত্রকর যেমন ভাবে বিভোর হইয়া শুদ্ধ রেখার টানে চিত্রের ভাব গভীরতা প্রকাশ করে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভাশালিনী লেখনী ঠিক সেই ভাবে কটি কথার মধ্যে দিয়া যাহার রূপ হইতে যে ‘পোড়াকাঠে’র ন্যায় তাহার অন্তর যে সুবর্ণোজ্জ্বল তাহা দেখাইয়াছে ‘ভামিনী’র মধ্যে।

মা যদি সন্তানের প্রতি নিজের প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন এবং শক্ত করিয়া সংসারের হাল ধরিতে অক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সংসারের ও সন্তানের কি পরিণাম হয়, তাহাও শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন ‘দেবদাসে’। ‘দেবদাস’এর জননী যদি ‘পার্ব্বতী’র সহিত ‘দেবদাসের বিবাহ দিতেন তাহা হইলে তিনি যথার্থ সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্খিনী মাতৃহৃদয়ের কাজ করিতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তে’র উইলের কথা মনে পড়ে। একদিন ঠিক এই রকম অবস্থায় সন্তানের উপর জননীর পরিমাণ ঠিক করিতে না পারিয়া ‘গোবিন্দলালে’র জননী ‘ভ্রমরে’র সংসার ডুবাইয়া দিয়া কাশী চলিয়া যান।

‘বড়দিদি’ ‘মাধবীতে’ আমরা আবার অতি সত্য অথচ অতি পরিচিত মাতৃত্বের বিকাশ দেখিয়াছি। ছেলে মানুষ ‘সুরেন্দ্রনাথকে’ শাসিত ও প্রতিপালিত করিতে ‘মাধবী’র সময় নষ্ট ও কাজের ক্ষতি হইলেও সে কখন না বলিতে পারে নাই। ‘মাধবীকে নারীর স্বাভাবিক মাতৃহৃদয় এই না বলিতে অক্ষম করিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী বিভূতি ভূষণের ‘অপরাজিতা’ একখানি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। এই ‘অপরাজিতের’ যথাযথ নায়ক ‘অপুর’ জীবনেও যে ঘর ছাড়িয়া ঘরের এই অন্যতম মিষ্ট আকর্ষণটি লক্ষ্য করিয়াছে, যে তাহার ছেলে মানুষীর জীবনে বারবার ‘নির্ম্মলা’, ‘নিরুপমা’, ‘লীলা’ প্রভৃতির দেখা পাইয়াছে,—যেমন ‘মাধবীর’ দেখা পাইয়াছিল ‘সুরেন্দ্র নাথ’।

জগতের নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, জননী হওয়াই নারীর চরম আকাঙ্খা—নারীর প্রণয়ের মূলেও এই তথ্য নিহিত আছে। এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ‘শ্রীকান্তর’

'অভয়া'র মধ্যে। সংসার সমাজত্যাগিনী রাজলক্ষ্মীও এই আকাঙ্খার নাগপাশ হইতে ছাড়ান পায় নাই। 'রাজলক্ষ্মী' নিজেকে বঙ্কুর মাতার আসনে বসাইয়াছিল। তাই যখন সে 'শ্রীকান্তর' সন্ধান পাইল, তখন মাতৃত্বের সহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। এই সমস্যায় 'দেনাপাওনার' 'অলকা' বা 'ষোড়শী:কে' পড়িতে দেখা যায়; 'হৈমর কোলে সুন্দর ছেলে আর 'জীবানন্দের' ঘর বাঁধিবার প্রবল আকাঙ্খা তাহাকে মোহন্তর গদী হইতে, চণ্ডীগঞ্জের পূজার আসন হইতে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শরৎচন্দ্র নিজেকে কোনদিন সমাজ সংস্কারক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যে আমরা যে নীতিযুক্ত সংস্কারিত চিত্রগুলি দেখিতে পাই, তাহা সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, জানি না বটে, তবে তাহা যে, সাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্যে যথেষ্ট রেখাপাত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবাসী'তে সংগৃহীত একশত পুস্তকের মধ্যে গোকুল নাগের 'পথিক' অন্যতম। এই বইটি ঘটনাবহুল। অনেক চরিত্রই এখানে ভীড় করিয়াছে; নিজেদের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 'মনীষা' ও 'কল্যাণী'র কথা আমরা সহজে ভুলিতে পারি না। 'মনীষা'কে মনে হইত তিনি 'কল্যাণী'র ছোট বোন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন তাহার বিমাতা। তাঁহার এই বিমাতা হইবার ইতিহাস ও পরে বিমাতার ব্যবহার যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অনেকাংশে আমাদের 'ভবানী'কে (বৈকুণ্ঠের উইল) মনে পড়ে —যদিও উভয়ে বিভিন্ন সমাজ ও অবস্থায় অবস্থিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে অচিন্ত্যকুমার তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার একখানি শ্রেষ্ঠ অবদান 'আকস্মিক'এ আমরা 'কুঞ্জ' ও 'রাধাহরি'র যে সম্বন্ধ দেখি তাহাতে 'হেমাঙ্গিনী' ও 'কেষ্ট'র কথা আমাদের স্মৃতিপথে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 'কুঞ্জ' মেয়েটি সংসারের জটিল লোকারণ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু নিরাশ্রয়, অনাথ 'রাধাহরি'র মা হওয়ার অভিলাষে সে আবার সূর্য্যালোকে উন্নীত মস্তকে পৃথিবীর পাঁচজনের মতো দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। এমন কি যে পঙ্কু'র প্রেম তাহার অতি লোভনীয় ছিল তাহাও সে দূরে ঠেলিয়া দিল। এই প্রসঙ্গে 'প্রেমেন্দ্র মিত্রে'র 'সাগর সঙ্গমে'র গল্পের 'দাক্ষায়ণী' ও বাতাসী' আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে—নবোন্মেষিত মাতৃত্ব সমাজের কোন বাঁধন না মানিয়া অপরের কলুষিত সন্তানকে নিজের বলিয়া বুকে টানিয়া নিয়া চাপিয়া ধরিল এবং প্রকাশ করিল নারীর চরমকথা, অভয়া'র সমাজ বিদ্রোহের ইতিহাস।

'নারীর মূল্যে' একস্থানে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, সুসভ্য দেশেও বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া তাহার প্রথম পক্ষের সন্তান-গুলির উপরে অনেক সময়ই নির্দ্দয় হইয়া উঠেন......" পুরুষের এই কঠিন কঠোর হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত পরিচিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের মঙ্গলাকাঙ্খী মনটি ভবানী প্রভৃতির হাতে 'গোকুলের ভার তুলিয়া দিয়াছে। আর পুরুষ চিরদিন সমাজ সমাজ করিয়া লাফাইয়াছে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে যে সমাজের প্রতিষ্ঠার মূলে কতখানি আত্মদান করিয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিন্তু নারী যে তাহার স্বাভাবিক মঙ্গলময়ী মাতৃত্বের বলে এই সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, সমাজকে রক্ষা করিয়াছে ও রক্ষা করিতেছে তাহা শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন 'নারায়ণী', 'হেমাঙ্গিনীর' মধ্যে। ইহারা না থাকিলে ভবিষ্যত সমাজের, 'রামলাল', 'কেষ্ট' কোথায় থাকিত তাহা কে বলিতে পারে।

মৃত্যুর আগে

শ্রীকিরণ সেনগুপ্ত

অন্ধকারে এলো মৃত্যু দীর্ঘ অবরোধে।
নিশীথে নগরীগৃহে
শুভ্র শয্যা 'পরে প্রিয়াক্রোড়ে পুণ্য পূর্ণিমায়
মহা সমারোহে চলে মৃত্যুর উৎসব।
এই লগ্নে আমার সন্ধান
সমগ্র পৃথিবী খুঁজি' নভস্থল পর্ব্বত-প্রান্তর
প্রিয়া ছাড়া পাবে নাকো কেহ :
মোর হাতে হাত রাখি অধীর আলসে
দীপ্তিময় দেহলতা ন্যস্ত করি' বক্ষোমাঝে মোর
কপট নিদ্রায় লীনা প্রিয় প্রিয়তমা।

ওষ্ঠপ্রান্তে মধুক্ষরা হাসি
ঝলকিছে অন্ধ কক্ষ করি আলোকিত ;
সুরভিত অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশদাম
শ্বেতশুভ্র শয্যা-'পরে কুন্দশুভ্র বাহুযুগে বঙ্কিম
গ্রীবায়
স্তরে-স্তরে রাশি-রাশি রয়েছে ছড়ায়ে :
সমুন্নত ভীরু বুক সুগঠিত উরুদেশ আরক্তিম
নম্র পদ নখ
আসন্ন সঙ্গম মাগি' অতৃপ্তিতে গাঢ় মোহাবেশে
শিহরি' উঠিছে বার-বার।
এরপর আর নাহি শোক :
ক্ষতি নাহি যদি নিঃশেষে
জীবনের যৌবনের যতো লেনা দেনা,
চিরন্তন শোক-তাপ হাসি-কান্না সব বলিবনা
সারম্বড়ে মৃত্যু এসে মুছে নিয়ে যায়।

বাহিরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
তারাময়ী নীল নভে অন্ধকারে অন্তরীক্ষে বসি'
স্তব্ধ মৃত্যু হানিছে ভ্রুকুটি :
আমারো আত্মার তটে আছাড়িছে অনন্ত
ক্রন্দন।

অনঙ্গের তীক্ষ্ণ শর মর্ম্ম বিদ্ধ করি'
মহারবে হাহাকারে তুলিয়াছে অবিন্যস্ত ঝড়।
দক্ষিণের বন হ'তে গন্ধ লয়ে দুরন্ত পবন
কারে যেন করে অন্বেষণ,—
সদ্যোস্নাত যূথী-যাতী মুকুলিত মহালসা হেনা
গর্ব্বভরে গন্ধ-হাস্যে বিলাইছে আয়ু :
ক্ষীণ কীট জোনাকীরা অন্ধকারে ম্লান আলো
জ্বেলে'
ঝাঁকে-ঝাঁকে বরাভয় করিছে ঘোষণা।

প্রিয়া যবে পাশ ফিরে শোয়—
চোখে চোখ রেখে মুহূর্ত্তের তরে একবার
দর্পণের মতো বুঝি দেখে লই নিজ প্রতিচ্ছবি,
তারপর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে ধরে'
মধুকণ্ঠ শাদা গ্রীবা শ্বেত বাহু নগ্ন বক্ষতল
অচঞ্চল ক'রে তুলি চঞ্চল চুম্বনে :
ক্ষণে-ক্ষণে স্তূপীকৃত কৃষ্ণ কেশদামে
অকপটে মুখ ঢেকে অসহ সে সৌরভেতে
রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে
করি হাহাকার।
ক্রমে-ক্রমে বেড়ে যায় তীব্র ব্যাকুলতা :
নিমেষে-নিমেষে
প্রস্ফুটিত যুগ্ম স্তনে প্রলুব্ধ চুম্বনে
মৃত্যু-সত্ত পান করি যেন।

এই প্রেম এতো শুধু নয়নের নেশা,
কোনোদিন এতে কারো মেটেনি পিপাসা।
সম্পূর্ণ বক্ষোদেশে অবিরত ওষ্ঠের পীড়নে
প্রিয়ারে কাতর হেরি' তবু মনে যেন
অনুতাপে ক্লান্তি নাহি আসে।
অন্তরের স্বার্থপর লোভ
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া মণিহারা ক্রুদ্ধ সর্পসম
লক্ষ হাতে লুটে লয় কামনা-সঞ্চয়!
কৌমার্য্যের স্পন্দময় সতেজ কাননে
প্রিয়া মোর প্রস্ফুটিত শুভ্র শেফালিকা :
হাসিটুকু আভাটুকু নয়নের দৃষ্টিটুকু তার
আর মিষ্ট কথা গুটি দুই তিন
কভু তাহা যথেষ্ট কি নয় মিটাতে
মিলন-ব্যাকুলতা ?
শ্রদ্ধা নাই শুধু দেহ ভরে'
শুচিহীন অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ :
প্রেম গেছে শুধু আছে প্রাণপণ
অতৃপ্ত আত্মার লাগি' জ্যোতিহীন
বন্দনা-সঙ্গীত ॥

পরম পিপাসা

(গল্প)

শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

'পিগ্ম্যালিয়ন ও গ্যালেসিয়া' গল্পের শেষ অংশটুকু আজ মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। অনেকগুলি পাতা উল্টাইয়া পরিশেষে স্বপ্নবীর পূর্ব্বদিনের 'পেজমার্ক' বাহির করিল। মাধুরী ইতঃপূর্বেই আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়াছে। তাহার আয়ত ঘন নীল চোখের বিমুগ্ধ দৃষ্টি স্বপ্নবীরের মুখের উপর নিবদ্ধ। সযত্নে পুস্তকখানি ধরিয়া সুমিষ্ট গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে স্বপ্নবীর পড়িতে থাকে: 'At first the sculptor could not believe that what he saw and heard was not a dream but all doubt vanished when his new-made wife laid her warm cheek against his and whispered, 'Nay, this is no dream, dearest Wilt thou not speak to me as lovingly as thou didst when I stood lifeless in yonder niche? Then, in overwhelming rapture, he kissed and gave her a glad welcome to his home

এই অবধি আসিয়া স্বপ্নবীর থামিয়া যায়। পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া মাধুরীর দিকে তাকাইতে গিয়াই তাহার সহিত একেবারে চোখাচোখি হইয়া যায়। লজ্জারক্ত আরক্তিম মুখে মাধুরী অমনি দুই চোখ নত করিয়া ঘরের মেঝেয় দৃষ্টি ফিরাইয়া নেয়। স্বপ্নবীরও আর আত্মসংবরণ করিতে পারে না। ধীরে ধীরে মাধুরী আকর্ষণ করিয়া নিজের কম্পমান বিশাল বুকের উপর টানিয়া লয়। তারপর তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া আস্তে আস্তে বলে: Then, in overwhelming rapture, he kissed her, and gave her a glad welcome to his home.

তাহার বুকের মাঝে মাধুরী নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া থাকে।

'আচ্ছা, যদি তোমার স্বামী আচমকা ফিরে আসে?' স্বপ্নবীর আবার বলে: 'এখানে এসে যদি দাবী করে তার স্ত্রীকে? মানুষ যেমন ভুল করে, ভুল ভাঙাও তো স্বাভাবিক। বর্ম্মায় গিয়ে সেই বার্ম্মিস রমনার সাহচর্য্যে এতদিনে সে হয়তো সঞ্চয় করছে অজস্র তিক্ততা। সাংসারিক শান্তি লাভের জন্যে বাংলার বধূর কাছে ফিরে আসা তার পক্ষে এখন সহজেই সম্ভবপর। তখন কী করবে?'

মাধুরীর দেহ নড়িয়া উঠে। 'পাগল'! সে ইহার বেশী কিছু বলিতে পারে না।

'পাগল নয়'- স্বপ্নবীর বলে: 'যদি ভ্রম ভাঙতেই হয়, তার জন্যে এই ছয় মাসই যথেষ্ট। এরপর এখানে সে যদি আসে, আশাকরি তোমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না।'

'তুমি কী বলতে চাও শুনি? বঙ্কিম-ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাধুরী বলে: 'সে ফিরে এলেই আমি সাক্ষাৎ সতী স্ত্রীর মতো তার পদপ্রান্তে পড়ে মাথা কুটতে থাকবো? নির্লজ্জ নাকি স্বরে আর্ত্তনাদ করে বলবো, দাসীকে পায়ে ঠাঁই দাও?'

'যদি তাতে ফল হয় তো তা-ও করবে বই কী!' স্বপ্নবীর সংযত স্বরে বলে।

'তুমি আমাকে পরিক্ষা করছো নাকি?' মাধুরী নিমেষে উষ্ণ হইয়া উঠে: 'তার চরিত্র তো অজানা নয় তোমার! যে ফিরিঙ্গী মেয়েটির সর্ব্বনাশ করে সে বর্ম্মায় পালিয়ে গেছে সন্তান লয়ে সে হতভাগিনী এখনো চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে! লোকটাকে ও নাকি সত্যি ভালো বেসেছিলো!'

স্বপ্নবীর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে।

তারপর স্বপ্নবীরই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম। 'তুমি এতো অপরূপ'! মাধুরীর চোখের উপর চোখ রাখিয়া সে বলে: 'এরকম অসামান্য রূপলাবণ্যবতী অথচ, কেন সে অভিভূত হলো না! কী করে সে এড়িয়ে গেল এই চরমতম শক্তি সম্পন্ন চুম্বককে!'

'আমাকে তার কোনো কালেই প্রয়োজন ছিলোনা—'চোখ বুজিয়া কম্পিত গলায় মাধুরী বলে: 'তার একমাত্র প্রয়োজন ছিলো অর্থের। বাবার টাকা-পয়সা যথেষ্ট ছিলো—সবকিছু নিয়ে লোকটা উধাও হলো বিয়ের পর বারো সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই!' একটু থামিয়া একফালি সরু হাসিয়া আবার বলে: 'কিন্তু আমার চুম্বককে তুমিও অস্বীকার করতে চাও নাকি?'

'অসম্ভব।' স্বপ্নবীর বলে: 'যার বিন্দুমাত্র সৌন্দর্য্য জ্ঞান আছে তার পক্ষেই অসম্ভব। নট্ অন্‌লি ইম্‌পসেব্‌ল্, বাট্ অল্‌সো অ্যাবসার্ড!'

'তুমি আজকাল ভারী ছেলেমানুষ হয়ে গেছো,' মাধুরী এইবার শাসনের ভঙ্গীতে ভ্রূকুঞ্চিত করে: 'তুমি একজন শিল্পি। ছবি আঁকা তোমার নেশা এবং পেশা। অধ্যবসায় আর সংযম তোমার সহায়। আমার মতো অনেক মডেল তুমি পাবে—তার জন্যে অতোটা উচ্ছ্বাস শোভা পায়না। উচ্ছ্বাস, উদ্‌ব্যস্ততা এবং আড়ম্বর এ তিনটেই তোমাদের পক্ষে মারাত্মক!'

তাই নাকি? স্বপ্নবীর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চোখে মাধুরী একটা জীবন্ত বিস্ময়, একটা মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহ; উদ্ভাসিত অলৌকিক আলোচ্ছটা।

'আজকে ছবি আঁকার কথা?' স্বপ্নীর বলে: 'মনে আছে? তুমি ঠিক্ হয়ে নাও, ঘণ্টা দেড়েকের ভেতরই রাফ্ স্কেচ্ হয়ে যাবে। ডিটেলস্ পরে দেবো এখন।'

'এখনই?' মাধুরী ব্যস্ত হইয়া উঠে: 'কতো বড় ছবি? কোন্ অবধি আঁকবে?'

নিজের কোমরের উপর হাত রাখিয়া, স্বপ্নীর দেখায়, এই অবধি। তারপর সুটকেশ খুলিয়া ছবি আঁকিবার সমস্ত সরঞ্জাম বাহির করে। একাধিক রঙের বাক্স তুলির বাণ্ডিল পুরু কাগজ, ইরেজার আর পেন্সিল—এই সব। কাষ্ঠফলকে কাগজ আঁটিয়া, রঙ গুলিয়া হাত মুছিয়া ফেলে।

মাধুরীও তাহার নির্দ্দেশ মতো জল-চৌকিটার উপরে যাইয়া বসিয়াছে।

'ওকি?' অবাক হইয়া স্বপ্নীর মাধুরীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসে: 'এরকম আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয়? আমি তোমাকেই আঁকতে চাচ্ছি, তোমার শ্রীদেহের সুবিন্যস্ত শাড়ী আর ব্লাউজকে নয়!' বলিয়া আলগোছে তাহাকে স্পর্শ করে। পিছন দিকে দুই হাতের তালুতে ভর দিয়া হেলানো অবস্থায় মাধুরীকে বসাইয়া দেয়। সুচিক্কণ কেশদামের বিদ্রোহী গুচ্ছগুলিকে কপালের উপর হইতে একদিকে সরাইয়া দেয়। তারপর শ্রীদেহের সমগ্র শাড়ীটাকে শিথিল করিয়া দিয়া সতর্কতার সহিত মাধুরীর অনাঘ্রাত আবরণ উন্মোচিত করে। বিচক্ষণ বসনের আড়াল হইতে অনেকখানি অনাবৃত বুক জল্ জল্ করিতে থাকে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও স্বপ্নীর সেই মুহূর্ত্তে নিজের চোখদুটিকে অন্যদিকে ফিরাইয়া লইতে পারে না।

মাধুরী বাধা দেয় নাই। চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে।

নিজের স্থানটিতে ফিরিয়া গিয়া স্বপ্নীর কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহার নিঃসঙ্গ নাগরীক জীবনে এই নারীই বন্ধন এবং বান্ধবী।

অকস্মাৎ শীর্ণ শব্দ প্রহার!

কে যেন রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়াছে: মাধুরী নিমেষে নিজেকে বিন্যস্ত করিয়া লয়। স্বপ্নীর ততক্ষণে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। সাত আট বছরের একটি সুশ্রী ছোট্ট ছেলে কলরব করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া মাধুরীর দিকে ছুটিয়া আসে। 'এই চিঠিটা বাবা তোমাকে দিতে বললেন, দিদি' বলিয়া মাধুরীর কোলের কাছে একখানা খামে ভরা চিঠি ফেলিয়া দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি চঞ্চল পদে বেগে বাহির হইয়া যায়। বাহিরে তাহার খেলার সঙ্গীরা অপেক্ষা করিতেছে নিশ্চয়।

চিঠিটা অবিনাশের। আজিকার ডাকে আসিয়াছে!

আধঘণ্টা আগে স্বপ্নবীর এই আশঙ্কার প্রসঙ্গই তুলিয়াছিল। চিঠিটা মাধুরীর পিতা প্রকাশ বাবুর কাছে লিখিত। পাতায় পাতায় অশ্রুভিক্ষা আর ক্ষমা প্রার্থনা। পরিশেষে অবিনাশ জানাইয়াছে, বার্মা হইতে রওয়ানা হইয়া আগামীকাল সে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। তাহার ভ্রান্তি ভাঙ্গিয়াছে। পত্নী মাধুরীকে লইয়া এইবার সে কর্মময় জীবনযাত্রার শান্তিপ্রদ ছায়াপথে অগ্রসর হইতে চায়!

মাধুরীর মুখচোখ ফ্যাকাসে হইয়া গেছে। বিকম্পিত হাতে চিঠিখানা সে স্বপ্নবীরের দিকে বাড়াইয়া দেয়। 'ওতে কী লেখা আছে আমি জানি।' স্বপ্নবীর চিঠিটা আর গ্রহণ করে না! একঘণ্টা আগে এঘরে তোমার বাবাই এসেছিলেন ও চিঠিটা হাতে করে। আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এটা তাঁর মেয়ের হাতে দিলে কোনো ফল হবে কিনা। আমি বলেছিলুম, হবে।'

'আমি বলেছিলুম হবে!' সুন্দর মুখে শিশুর মতো অপরূপ ভেংচী কাটিয়া মাধুরী বলিল: 'তোমার মুখে এতোটুকু বাধলো না?' স্বপ্নবীর স্তিমিত হাসি হাসিল। তারপর মাধুরীর পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল: 'কিন্তু তোমার পোর্ট্রেটটা আর এজীবনে শেষ করে নিতে পারবোনা বোধহয়!'

বড়ো বড়ো চোখ করিয়া মাধুরী তাকায় স্বপ্নবীরের দিকে।

পর মহূর্ত্তে ক্ষীপ্র গৌড় হস্তে অবিনাশের চিঠিখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। বাধা দিবার সময়ও স্বপ্নবীরের হইয়া উঠে না। অবাক হইয়া সে মূঢ়ের মতো বসিয়া থাকে।

'তুমি কী সুন্দর!' অকস্মাৎ মাধুরী দুটি নিটোল বাহু দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরে: 'তোমার ঠোঁটে একটা চুমা খাবো?' স্বপ্নবীর ক্রমশঃ অতলে ডুবিতেছে। কোথায় সেই মাধুরী, যার ভিতরে একদিন ছিল ভীরু বধূর বিনম্রতা? বিবাহিতার বাধা বাধকতা? আজিকার উচ্ছ্বাস আত্মপ্রকাশে সে আলৌকিক হইয়া উঠিতে চায়!

'দ্বার খোলা রয়েছে দেখেছো?' স্বপ্নবীর উঠিয়া পড়ে। নিজের পরিত্যক্ত জায়গায় ফিরিয়া ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম স্যুটকেশটাতে গুছাইয়া তুলিতে থাকে। অধ্যবসায় তাহার অনন্য সাধারণ।

'সেকি: ছবিটে শেষ করে নেবে না?' মাধুরী সাভিমানে হইয়া উঠে।

'উৎসাহের বড়ো অভাব।' বলিয়া স্বপ্নবীর স্যুটকেশের ডালা বন্ধ করিয়া দেয়।

পাশাপশি বাড়ী নয়। এক বাড়ীরই দুই ভাড়াটে। স্বপ্নবীরের একটিমাত্র ঘর, বাকী কটা মাধুরীদের। একটি বন্ধনহীন বারান্দার মাত্র ব্যবধান। কাজেই যাওয়া-আসারও সময় লাগে না। স্যুটকেশের ডালা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘাড় ফিরাইয়া স্বপ্নবীর দেখে, সন্তর্পনে মাধুরী কখন প্রস্থান করিয়াছে।

অর্দ্ধরাত্রে অকস্মাৎ স্বপ্নবীরের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়।

কাহার শীতল স্পর্শে শরীরের সমগ্র অন্তরাত্মা থরথর করিয়া উঠে। দুই হাতে চোখ ডলিয়া চারিধারে ভাল করিয়া তাকায়। একি! স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি? ধবধবে সুকোমল শয্যায় তাহার পাশেতে মাধুরী শুইয়া রহিয়াছে! মাধুরী নিদ্রিত নয়! ঘরের অস্পষ্ট দীপালোকে, স্পষ্ট দেখা যায়, বিস্ময়-বিমুগ্ধ স্বপ্নবীরের পানে চাহিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে! তাহার হাসিতে অপূর্ব্ব মাদকতা।

'তুমি এখানে কেন এসেছো? স্বপ্নবীরের অধর নড়িয়া ওঠে।

'কেন এসেছি! মাধুরী চেষ্টা করিয়া উষ্ণ নিশ্বাস অবরোধ করে: 'কাল সেই শয়তানটা এখানে ফিরে আসবে। অথচ সে আমার স্বামী!' মাধুরী পরিপূর্ণ অসন্তোষের একটা অসহায় ভঙ্গী করে।

'কিন্তু তোমার বাবা আমাকে বিশ্বাস করেন, মাধুরী! স্বপ্নবীরের বিষন্ন কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে: 'এবং আমিও যে তোমাকে বিশ্বাস করি! তোমার কী আর কোনো উপায় নেই?

মাধুরীও ভাবিয়া দেখিয়াছে বই কী! কিন্তু উপায় বাস্তবিকই নাই তো।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মুখ তুলিয়া স্বপ্নবীর তাকাইয়া দেখে। কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল থাকিয়া কী ভাবিয়া চাপা গলায় হাসিয়া উঠে! রাত্রির নিস্তব্ধতা তাহাতে ভঙ্গ হইবার কথা নয়। চিন্তাবিষ্ট মাধুরীর কানের কাছে মুখ লইয়া বলে: I should have been cruel enough to bring you through the flame! মাধুরী তথাপি কোন সাড়াশব্দ দেয় না।

'তোমার কী এতো দুঃখ মাধুরী—, স্বপ্নবীর বলিয়া চলে: 'আগামীকাল অবিনাশ ফিরে আসছে! আমার কাছে যা তোমার প্রত্যাশা তারচেয়ে অনেক বেশী কিছু পাবে তার কাছে। তোমাদের ব্যবহারীক যুগ্ম-জীবন নতুন সংসারে সাফল্যমণ্ডিত হোক এই কামনা।'

মাধুরীর নিস্পন্দ দেহ এইবার নড়িয়া উঠে।

'শুধুই প্রলাপ শোনবার জন্যে—' তাহার কণ্ঠস্বরে আস্তে আস্তে উচ্চারিত হয়: 'এতোরাত্রে এঘরে এসে তোমার শয্যাসঙ্গিনী হইনি! তুমি কী আসবে না দয়া করে?' হাত দিয়া সে স্বপ্নবীরের

মুখটাকে চাপিয়া ধরে। আর স্বপ্নাীরের হঠাৎ খেয়াল হয়, মাধুরীর বক্ষাবাসের বুতামগুলি একেবারে খুলিয়া গেছে। তাঁহার অনাবৃত বক্ষোদেশ আবেগ এবং উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

'ঘরে ফিরে যাবে না?' স্বপ্নাীর প্রাণপণ শক্তিতে আত্মসংবরণ করিবার চেষ্টা করে: তুমি এখান থেকে না গেলে কিন্তু আমার প্রলাপ থামবে না।' তাহার কম্পিত কণ্ঠস্বরে অজস্র উত্তেজনার আভাস!

মাধুরী বিছানার উপর উঠিয়া বসে। শ্রীদেহের স্রস্ত বসনকে সংযত করিতে যাইয়া আরোও অসংযত করিয়া ফেলে। নগ্নকান্তির নর্ম্ম-আলোক স্বপ্নাীরের চোখ দুইটাকে যেন ঝলসাইয়া দেয়।

'তুমি যাবে কিনা বলো!' নিতান্ত রূঢ় গলায় স্বপ্নাীর প্রায় চীৎকার করিয়া বলে: আমাকে ঘুমুতে দেবে না?'

'ঘুমোবেইতো!' মধুর ম্লান হাসিয়া মাধুরী তাহার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে: তার আগে আমাকে মেরে ফেল গলা টিপে!' চক্চকে চারু চোখের সেকি অসহ্য দৃষ্টি! স্বপ্নাীরের চোখের পাতা তাড়াতাড়ি বুজিয়া আসে।

তুমি একটি অতিমাত্রায় অদ্ভুত ছেলে, স্বপন—'মাধুরী বিড় বিড় করিতে থাকে: 'এতোদিন তোমার সাথে রয়েছি, অথচ একদিনের জন্যেও তুমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমাকে একটা চুমো পর্য্যন্ত খাওনি!

*   *   *

স্বপ্নাীর চুপ করিয়া শুনিতে থাকে। সে জানিত, মাধুরীর আরোও অনেক কথা বলিবার আছে।

আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই—' মাধুরী বলে: আমাকে বুকের মাঝে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বসে থাকবার নেশা তোমার আজও কাটেনি! অনেকবার অনেক অদ্ভুতভাবে তুমি আমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করেছো, আমি বাধা দেইনি! ভাবতুম, আমি যদি তোমার উপকারে আসি, ক্ষতি নেই।'

মাধুরী ক্রমশঃ মরিয়া হইয়া উঠিতেছে।

তারপর বুঝলুম, আমার এতাদৃশ উদারতা নেহাৎ পরোপকারের জন্য নয়। লক্ষ্য করে দেখলুম, তুমি ধরা দিতে ইচ্ছুক নও। ভাবলুম, তুমি কি আসবে না তোমার অদৃশ্য ব্যবধান অতিক্রম করে?

কিন্তু তোমার সন্তানকে তো পেতে পারি, তারও তো উপায় আছে!'

অসম্ভব, সে হয়না মাধুরী।' স্বপ্নবীর একটুও থেকাইলনা: শক্তির অপচয়ে সৃষ্টির উৎসাহ আমার নেই।' একে তুমি অপচয় বলছো! মাধুরীর আরক্তিম ওষ্ঠাধর আবেগে কাঁপিয়া ওঠে।

স্বপ্নবীর আর কিছু বলেনা।

তুমি যে আমার জীবনে এসেছিলে—' মাধুরীর সবকথা এখনও শেষ হয় নাই: তার কি কোনো প্রমান থাকা উচিত নয়? আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তোমার লাভ কি?

স্বপ্নবীর কোনো কথা বলে না।

এটুকু জেনো—'মাধুরীর ইতিমধ্যে বুকের বসন বিস্রস্ত করিয়া লইয়াছে: তোমার জন্যে আমি সব রকম কলঙ্ক আর গ্লানি মাথায় পেতে নিতে রাজি আছি। জীবন আর যৌবনের গূঢ় অর্থ তোমার কাছ থেকেই জেনেছি প্রথম। পৃথিবীতে যে এতো আলো আছে অবশ্য তোমার সংস্পর্শে না এলে হয় তো জানতেই পারতুম না কোনদিন।'

বাহিরের ঘরের বড়ো ঘড়িতে একটা শব্দ করিয়া সাড়ে তিনটা বাজে। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর যেন সম্বিত ফিরিয়া আসে। তাড়াতাড়ি সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তারপর ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ঘরের বাহির হইয়া যায়! আর ঘরের ভিতরে স্বপ্নবীর বিছানা আকড়াইয়া ধরিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।

শীতের দিন। সন্ধ্যা' সাতটায় ট্রেন আসিবার কথা।

একেবারে হন্তদন্ত অবস্থায় প্রকাশবাবু স্বপ্নবীরের ঘরে প্রবেশ করেন। জামাকাপড় ঠিক নাই, মাথার চুল উস্কখুস্কো, চোখ-মুখ আশঙ্কায় বিস্ফারিত। 'প্রকাণ্ড প্রতারণা আর জালিয়াতির দায়ে—' কাঁপিতে কাঁপিতে কোনো রকমে তিনি বলেন: 'অবিনাশকে নাকি পথেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে! এখন কী যে করি!'

হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তিনি ঘরময় পায়চারি করিতে থাকেন। 'তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে?' স্বপ্নবীরকে অগত্যা প্রশ্ন করিতে হয়।

'পুলিশ তাকে বরাবর হাজতে নিয়ে গেছে' উৎসাহিত হইয়া প্রকাশবাবু বলেন: 'তুমি কী একটিবার যাবে সেখানে? দ্যাখ, যদি কোনো উপায়ে কিছু করা যায়!'

স্বপ্নবীর সার্টটা গায়ে চড়াইতে থাকে। মুখে কোনো কথা নাই।

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি স্বপন, আনন্দিত হইয়া প্রকাশবাবু সস্নেহে তাহার পিঠে হাত রাখেন: 'তুমি ফিরে না আসা অবধি এখেনেই অপেক্ষা করবো—' স্বপ্নবীরের বিছানার উপরেই তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন। আর স্বপ্নবীর? সুটকেশ খুলিয়া কতকগুলি কী প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র সে তাহার সার্টের দুই পকেটে পুরিয়া নেয়। মুদ্রাভরা মানিব্যাগটা বুকপকেটে রাখে। তারপর ঘরের বাহির হইয়া পড়ে।

এমন অসময়ে মাধুরী কোথায়?...

বারান্দা পার হইয়া স্বপ্নবীর মাধুরীর ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসে। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। আরাম কেদারায় হেলান দিয়া মাধুরী চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে সব খবর তাহার কাছে পৌঁছিয়াছে কী? ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নবীর দ্বার ভেজাইয়া দেয়। তারপর কেদারার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই চোখ ভরিয়া মাধুরীকে দেখিতে থাকে। প্রদীপ্ত দীপালোকে চিন্তাক্লিষ্ট মাধুরীকে অপরূপ দেখাচ্ছে।

স্বপ্নবীর হাত বাড়াইয়া মাধুরীর বক্ষ স্পর্শ করে।

চমকাইয়া উঠিয়া মাধুরী অমনি চক্ষু মেলিয়া দেখে। ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠে মুখে। পুনরায় চোখ বুঁজিয়া বুকের বসনের বোতামগুলি খুলিয়া স্বীয় সুডোল বক্ষের অনেকখানি অনাবৃত করিয়া দেয়। আর স্বপ্নবীর শিশুর মতো মাধুরীর বুকে মুখ গুঁজিয়া দিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া যায়। মাধুরী তথাপি মরে নাই। কোলের সন্তানের মতো স্বাভাবিক স্নেহে স্বপ্নবীরের প্রশস্ত কপালের উপর নিজের আতপ্ত ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরে।

অনেকক্ষণ বাদে স্বপ্নবীর উঠে দাঁড়ায়। মূর্চ্ছিতপ্রায় মাধুরীর এলায়িত হাতের মাঝে কি একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে প্রস্থান করে।

তারপর প্রহরের পর প্রহর কাটিতে থাকে।

পরিশেষে রাত্রি—মধ্যরাত্রিতে আসিয়া ঠেকে।

ওদিকে পিতাপুত্রী কাহারও চোখে ঘুম নাই। স্বপ্নবীরের বিছানায় বসিয়া প্রকাশবাবু তখনও সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। উদ্‌গ্রীবতা থাকিলেও তাহার মনে নতুন কোনো সংশয় নাই। তিনি যে স্বপ্নবীরকে বিশ্বাস করেন! আর নিজের ঘরে বাতীর আলোকে মন্ত্রমুগ্ধা মাধুরী তখন তৃতীয়বার স্বপ্নবীরের দেওয়া কাগজখানা পড়িয়া দেখিতেছে :

"প্রিয়তমা মাধুরী, অবিনাশ যে অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে তাতে তাকে এখন মুক্তি দেয়া অসম্ভব। আমি সেইজন্যেই আর বাড়ী ফিরছিনে। কেননা, অবিনাশের অভাবে তুমি যদি আমাকে আবার আমন্ত্রণ কর, আমি আত্মরক্ষা করতে পারবো কিনা সন্দেহ। তাই আমার এই মহাপ্রস্থান। তোমার ইতিহাস আমার জীবন থেকে কখনো মুছে যাবার নয়। সেজন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ।

ইতি—

তোমার স্বপন।"

মুহূর্ত্তের জন্য বেদনাবিহ্বল মাধুরী চিঠিটা দুইহাতে অন্ধ উত্তেজনায় বুকের মাঝে চাপিয়া ধরে। তারপর টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। গতকাল ঠিক এমনই ভাবেই তাহার হাতে প্রকাশের পত্রখানিও শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

রুদ্ধধারা

[সামাজিক উপন্যাস]

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সতীশ ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন : কি হল? জ্বর নাকি খুব বেড়ে গেছে?

নীরদ বাবু বলিলেন : ডাক্তার বাবু! রুগীকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবেনা, আপনি একটু ভাল করে দেখুন!

ডাক্তার বাবু নাড়ী দেখিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। সবজার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। বরাবর বরফ দেওয়া হচ্ছিল?

সবজ নিরাপদের দিকে তাকাইয়া মৃদুস্বরে বলিল : বরাবর দেওয়া হয়নি! মাঝে জ্বর নেমে গিয়েছিল, তাই বন্ধ করে দিয়েছিলুম। জ্বর বাড়া অবধি আবার আরম্ভ করেছি।"

সতীশ ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন : "না, আর বন্ধকরা চলবেনা : এখন বরাবর দিয়ে যান।"

তারপর নিজের ডাক্তারি যন্ত্রটি বাহির করিয়া রোগিনীর বুক পিঠ দেখিতে লাগিলেন। দেখা হইলে বলিলেন : তাইতো! রোগটা একটু বেশী"—

সবজ অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় ধীরে ধীরে বলিল : ডাক্তার বাবু! আমাদের বাবু বড়ো ভীতু মানুষ। আপনার যা বলবার তা আড়ালে বলে যান, বাবুর সুমুখে বলবেন না।

কথাটা শুনিয়া ডাক্তার বাবু অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন "আচ্ছা তাই করবো! আমার ওটা বড় ভুল হয়েছে!"

ডাক্তার বাবু আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া রুগীকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে, সবজ অস্ফুট অশ্রুত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল : "এখন আপনি কি ব্যবস্থা করেন?

ডাক্তার বাবুও খুব মৃদুস্বরে বলিলেন : বুকটা বড় দুর্ব্বল বলে মনে হচ্ছে! যদি হার্টফেল হয়, সেই একটা ভয় আছে!"

কথাটা শুনিয়া সবজর মুখ কুজ্ঝটিকা-চ্ছন্ন হেমন্ত প্রভাতের মত মলিন হইয়া গেল। কিন্তু তবু অতি কষ্টে সে বলিল : সেটা যাতে না হয়, তাই করুন ডাক্তারবাবু! দিদিকে আমার, কোনও রকমে বাঁচাতেই হবে! দিদি গেলে এ সংসারের আর কিছুই থাকবে না!"

ডাক্তারবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন! "অক্সিজেন একটু দিতেই হবে!" নিরাপদ'র দিকে ফিরিয়া বলিলেন নিরাপদ বাবু! আপনি একটা অক্সিজেন আনবার ব্যবস্থা করুন!"

"অক্সিজেন!" নীরদবাবু একেবারে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। "অক্সিজেন! সে. কি? এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! ওঃ! ললিতা! ললিতা!" বলিয়া একেবারে ঝাপাইয়া রোগীর বিছানার উপর পড়িলেন।

ডাক্তারবাবু উঠিয়া নীরদবাবুকে ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু সেগুলিতে বিশেষ কোন কাজ হইল না। সেগুলি যতো ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল, নীরদবাবু ততই বালকের মত চিৎকার করিয়া উঠিতে লাগিলেন।

সবজ নিরাপদকে হাতছানি দিয়া কাছে ডাকিয়া বলিল!

ঠাকুরপো! তুমি একটু কোমর বাঁধো! নইলে, সবদিকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হবে। ডাক্তারবাবু যে জিনিষটার কথা বলছেন,

তুমি সেই জিনিষটা আনিয়ে দাও! দিদির অবস্থাতো দেখতে পাচ্ছ!"

নিরাপদ ব্যস্ত সমস্তের মত আকৃতি করিয়া বলিল: আচ্ছা! আমি এনে দিচ্ছি! ডাক্তারবাবু ওষুধটার নামটা কি লিখে দেন তো!"

ডাক্তারবাবু তখন নীরদবাবুকে নানা সান্ত্বনা বাক্য বলিতে ব্যস্ত, তাহার মধ্যেই তিনি বলিলেন: ওহে! ওটা ওষুধ নয়—ওটা একটা গ্যাস্! এতটা বড় লোহার সিলিণ্ডারে দেবে—তোমরা সেটা নিয়ে এসে, তার চাবি খুলে, তাই থেকে গ্যাস দেবে! তুমি তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, আমি দেখিয়ে দিয়ে যাবো! দত্ত কোম্পানীর দোকানে যাও, এখনই গেলেই পাবে! গোটা ষাটেক টাকা নিয়ে যাও চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা জমা নেবে আর বাকি টাকা থেকে গ্যাসের দাম শোধ করে নেবে!"

নিরাপদ টাকার জন্য লবঙ্গর মুখের দিকে তাকাইল। লবঙ্গ তখন ললিতার মাথায় একটু অডিকোলন ভিজাইয়া দিতেছে, এবং বামহস্তে হাওয়া করিতেছে। পাখা করা আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া সে উঠিল, এবং নীরদবাবুর কাছে গিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল: "বাবু! গোটা ষাটেক টাকা দিতে হবে!".

নীরদবাবু বাষ্পাকুলস্বরে বলিলেন: ঐ ওরই আঁচলে চাবি বাঁধা আছে, খুলে বার ক'রে নাও!"

লবঙ্গ ললিতার আঁচল হইতে চাবি খুলিবার জন্য গেল। এবং অনেক কষ্টে, রোগীকে বেশী নাড়াচাড়া না করিয়া, অনেক কৌশলে আঁচল খুঁজিয়া তাহা হইতে চাবি খুলিয়া লইল। নীরদবাবুর নিকট পুনরায় গিয়া বলিল: এই চাবি নেন! আপনি টাকাটা বার করে দেন!

নীরদবাবু বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিলেন: আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না লবঙ্গ! তুমি নিজেই বাক্স খুলে টাকাটা বার ক'রে এনে দাও। আর এখন থেকে চাবিটা তোমার কাছেই রেখে দাও, যখন যা দরকার হবে, বার ক'রে দেবে। আমাকে আর ঐ হাতের ময়লার জন্যে বিরক্ত করো না।

এ প্রস্তাবের ইতিকর্ত্তব্যতা নিরূপণ করিবার এখন সময় নয়! কাজেই লবঙ্গ এ বিষয়ে আর বেশী মাথা খোঁড়াখুঁড়ি না করিয়া চাবিটি লইয়া পার্শ্বের ঘরে গেল, টাকা বাহির করিয়া আনিয়া দিতে। ক্যাস্ বাক্স ও লোহার সিন্দুক ছিল পাশের ঘরে, লবঙ্গ তাহা দেখিয়াছিল।

নিরাপদ দাঁড়াইয়া দেখিল, দাদা ক্যাস্ বাক্সের চাবি দিল এই দিন কতকের জন্যে আগতা তরুণী অতিথিটার হাতে! নিরাপদ জানিত, কুটুম্বিতার সম্পর্কও যে তাহার সঙ্গে খুব নিকট, তাহাও নহে! একটা সামান্য সূত্র মাঝখানে আছে মাত্র কিন্তু সেটাও কত সূক্ষ্ম! বৌদিদির বাপের বাড়ীর কাছে সম্পর্কের গন্ধ একটু আছে মাত্র! কিন্তু তার কাছে দাদা দিল চাবির তোড়া! বিশ্বাসটা যেন একটু অতিরিক্ত রকমের বলিয়া তাহার নিকট ঠেকিল।

টাকা আনিয়া পঁহুছিল। ছয়খানা দশ টাকার নোট গুনিয়া লবঙ্গ নিরাপদের হাতে দিল। নিরাপদ যতটা উৎসাহ সহকারে প্রথমটা আরম্ভ করিয়াছিল, যাইবার সময়ে তাহার সে উৎসাহে যেন একটু ঠাণ্ডা জল পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

—ষোড়শ পরিচ্ছেদ—

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অক্সিজেন দেওয়া হইল, ডাক্তারবাবু তিন চারিটি ইনজেকসন করিলেন, তথাপি ভোর বেলার নিশা শেষের সঙ্গে সঙ্গে, ললিতার চক্ষু পলকহীন হইল, হাতপা ঠাণ্ডা হইল, এবং তাহার প্রাণবায়ু অজস্র অনুরোধ উপরোধের মাঝখানেও একান্ত নিষ্ঠুর ও বধিরভাবে মহাপ্রয়াণ করিল।

নীরদবাবু ললিতার অসার দেহের উপর একেবারে ঝাপাইয়া পড়িলেন, লবঙ্গ যত তাঁহাকে ধরিতে যায়, তিনি তত শোকের বেগ বাড়াইয়া তোলেন। নীরদের বাহিরের ঘর হইতে অনেক গুলি বন্ধু বান্ধব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা অনেক করিয়া নীরদ বাবুকে গৃহান্তরিত করিলেন। নিরাপদ কি করিবে, তাহার নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিল না। লবঙ্গ খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার কেহই ছিল না, কাজেই তাহার শোকাবেগ খুব উচ্চ আকার ধারণ করিতে পারিল না। যে স্নেহময়ী নারীটি তাহাকে ঐকান্তিক বাৎসল্যে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীটির মত করিয়া সংসারের অন্যান্য বিপদে তাহাকে আপনার কোমল ডানার মধ্যে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যে এত শীঘ্র তাহার ডানা গুটাইয়া লইয়া তাহাকে পৃথিবীর মরুপ্রান্তরে একা ফেলিয়া যাইবে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কাজেই প্রথমটা সে ভ্যাবাচাকা মারিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যখন অবস্থাটা নিতান্তই কঠিনতার সহিত সত্য আকারে তাহার নিকট দেখা দিল, তখন সে হতাশ মর্ম্মযাতনায় নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। ললিতা তাহার নিকট-আত্মীয়া ছিল না, কিন্তু এই কয়দিনের সাহচর্য্যের মধুরতায় ও অপ্রাথিত স্নেহবর্ষণে সে এতই নিকট হইতে নিকটতর হইয়া পড়িয়াছিল যে, লবঙ্গ এই প্রথম অনুভব করিল যে তাহার মাথার উপর সত্যই আজ সে সমস্ত আশ্রয় করিয়া গেল. এবং সে

শুধু তুমি নাই

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (কবিরত্ন)

১

শুধু তুমি নাই, আর সবই আছে নিখিল বিশ্ব মাঝে,
প্রতিক্ষণে তাই ভুল করি আমি জীবনের প্রতি কাজে।
তেমনি র'য়েছে বিপুল বিভব
তোমা বিনে আজ ম্রিয়মান সব
আজিও তেমনি একটী প্রদীপ জ্বলে প্রতিদিন সাঁঝে।
শুধু তুমি নাই, আর সবই আছে নিখিলবিশ্ব মাঝে।

২

তুমি নাই তবু পাখীগুলি আজ গান গেয়ে ফেরে বনে
রাখাল বালক প্রভাতী গাহিয়া মাঠে লয় ধেনুগণে;
এখনো দুপুরে বাবলা শাখায়
কোকিল পাপিয়া শিস দিয়ে যায়,
এখনো তেমনি সান্ধ্য সমীর বয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
বিশ্বের নানা বিকাশের মাঝে তোমারেই পড়ে মনে।

৩

সেই মনে পড়ে তোমায় আমায় প্রথম যেদিন দেখা:
পুকুরের ঘাটে কলসী ডুবায়ে চেয়েছিলে একা একা;
চাঁদ উঠেছিলো পূরব গগনে
বেজেছিলো বাঁশী যে মধু-লগনে,
তোমার নয়নে, পলক বিহীন আমার নয়ন রেখা,
প্রথম প্রেমের মিলন সেদিন মোর ভালো ছিল লেখা।

৪

তারপর এক মধু যামিনীর উৎসব কোলাহলে
হৃদয়ে তোমারে করিনু গ্রহণ জীবনের সাথী বলে';
শুভ-দৃষ্টির সেই চাহনিতে
পেড়েছিলে তুমি মোরে জেনে নিতে
মোর যাহা কিছু দিয়াছি বিলায়ে তোমার চরণ তলে,
জীবনের সেই প্রিয় সাথি মোর! কোথা তুমি গেলে চলে

৫

দিবসে দুপুরে, নিশার স্বপনে যখনি তোমারে স্মরি,
খুঁজে নাহি পাই কোন্ অপরাধে আমারে গিয়াছ ছাড়ি?
কেন এসেছিলে কোথা গেলে চলে'
গেলে যদি কেন স্মৃতি রেখে গেলে?
কোন কাজ আর পারিনা করিতে, ভুলে যাই যেন সবই,
তোমার তরেই জীবন-প্রভাতে হয়েছি উদাসী কবি।

-:০(×)০:-

...কান্নাটা বাহির হইয়া পড়িল, তাহা একান্তই জলদভারাক্রান্ত ও বজ্রবিদ্যুতের হুড়োহুড়িতে পরিপূর্ণ।

যে কয়দিন ললিতার অসুখ বাড়িয়াছিল, সে কয়দিন সবঙ্গর এমন অবকাশ ছিলনা যে তাহার মনের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করিয়া লয়। নদীর গর্ভ ছাপাইয়া যেমন করিয়া বর্ষাকালীন জলস্রোত বহিয়া চলিয়া যায়, এ কয়দিন সময়ের স্রোতও তেমনই বহিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার শরীর ও মনকে পরিপূর্ণভাবে ছাপাইয়া রাখিয়া। কিন্তু আজ হঠাৎ সকাল হইতে স্রোতের জল শুকাইয়া গেল, এবং তাহার শরীর ও মনের তটভূমি নিদাঘের নদীচরের মত শীর্ণ উলঙ্গতায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন যেন সহস্র বিপদের শকুনি আসিয়া সেই তটভূমির উপর তাহাদের লম্বা লম্বা ঠ্যাং চালাইয়া হা হা রবে চিৎকার করিতে লাগিল। হতাশার কুৎসিৎ ছায়াগুলি নিভিয় মরীচিকার মত তাহার চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। একান্তই সঙ্গিহীন, আশ্রয়হীন বলিয়া তাহার নিজেকে নিজে মনে হইতে লাগিল। সে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিয়া গৃহের ছাদ বিদীর্ণ করিল না বটে, কিন্তু মন অবিরল অস্ফুট আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

যখন নীরদবাবুর দুই চারিজন আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল আসিয়া নানা পুষ্প-মাল্যে সুশোভিত করিয়া শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, এই অকারণ স্নেহময়ী রমণীর অন্তিম সময়ে তাহারও একটা কর্ত্তব্য আছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটি আলমারি হইতে এককৌটা সিন্দুর ও একশিশি তরল আলতা বাহির করিয়া, অতি যত্নে অতি

শ্রদ্ধার সহিত, অশ্রুর সহিত মিলিত করিয়া ললিতার সিঁথিতে ও তাহার চরণতলে লাগাইয়া দিল। রক্তজবার কোরকগুলি ফুটিয়া উঠিলে জবাগাছে যেমন সন্ধ্যারাগে জ্বলিয়া উঠে, শীতল বিবর্ণ মৃতদেহও তেমনই সিন্দূর ও অলক্তক রাগে অস্তায়মান সূর্য্য বিম্বের মত সুশোভিত হইয়া উঠিল। পাতিব্রত্যের রক্তনিশান যেন পরকাল ও ইহকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আন্দোলিত হইতে লাগিল। লবঙ্গ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইল এবং বাষ্পভার তুষারায়িত চক্ষে অনিমেষভাবে তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

কখন যে নীরদবাবুর বন্ধু ও আত্মীয়গণ আসিয়া দীর্ঘসিন্দুররেখারঞ্জিত পুষ্পমালাবৃত শুষ্ক বৃন্তচ্যুত মনুষ্য কুসুমটিকে বহিয়া লইয়া গেল, লবঙ্গর সেদিকে সংজ্ঞা ছিল না। যখন সে খাটের দিকে চাহিল, তখন দেখিল, শুটিকত বৃন্তচ্যুত ফুলের পাপড়ি সেখানে বিষণ্ণ ঔদাস্যে গড়াগড়ি যাইতেছে, স্নিগ্ধতার যে অপরিসীম শৈলস্তূপটি কিছুক্ষণ আগেও সেখানে পুণ্যধারা বর্ষণ করিতেছিল, তাহা কালের কঠিন নিয়মে সেখান হইতে অন্তর্হিত।

সময়ের গতি মানুষের শোকের ঝঙ্কারে কখনও হোঁচট খায় না। মানুষ নিজে হোঁচট খায়, কিন্তু যে বিশালকায়া জননী কোটি কোটি মানুষকে ও কোটি কোটি জীবকে আপনার বক্ষ মধ্যে রাখিয়া স্তন্যদানে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তিনি কোনও সন্তানের রোদনেই আপনার কর্ত্তব্য ভুলেন না, সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একফোঁটা চ'খের জলও ফেলেন না, বরং ধমক দিয়া সন্তানদিগকে আবার তাহাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। ললিতার মৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল, গৃহের দাসদাসীগুলি পর্য্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী কাতরোক্তি করিতে লাগিল, নীরদবাবু ও লবঙ্গ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, কিন্তু যে কর্ম্মধারাগুলি জগতের বাহিরে ও ভিতরে আপনা আপনি সংঘটিত হইয়া থাকে, সেগুলি নির্ম্মম ঔদাসীন্যে আপনাদিগের চাকা ঘুরাইতে লাগিল, সেখানে একটি ক্ষুদ্র সংসারের অপরিসীম বিপর্য্যয় কোনও কলঙ্ক রেখা টানিতে পারিল না। সকাল গড়াইয়া মধ্যাহ্ন আসিল; মধ্যাহ্ন গড়াইয়া অপরাহ্নের স্নিগ্ধ শীতল ছায়াসঙ্কুল রথখানি আসিয়া দেখা দিল; পরে সায়াহ্নের বহুবর্ণবিশিষ্ট চিত্রাভিনয় আসিয়া সে রথকেও সরাইয়া, তমিস্রাময় অবগুণ্ঠনে পথ, ঘাট, প্রান্তর, নগর মণ্ডিত করিয়া দিল; কিন্তু এই বিশাল গতিচক্রের কোনও নিয়মই সেই একটি ক্ষুদ্র সংসারের আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার গতি শিথিল করিল না,—একবার দাঁড়াইল না,—একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইল না; যেখানে নিয়মতন্ত্র এত কঠোর, এত উদাসীন, এত আত্মম্ভরি,—সেখানে কোন্ আশায় যে মানুষ তাহার বিপদের সময়ে প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মধ্যাহ্নের সময়ে লবঙ্গ একবার উঠিয়াছিল; উঠিয়া পাচক ব্রাহ্মণের নিকট সংবাদ লইল,—বাবুর জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে কিনা। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিল "শ্মশানে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা ফিরে না এলে উনুনে আগুন দিতে নাই!" তখন লবঙ্গর হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। যে ওলট পালটটি আজ সকালে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা যেন আকাশজোড়া বাহু বিস্তার করিয়া আবার তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তবু সে একবার বাবুর খোঁজে, তাঁহার ঘরে আসিয়া হাজির হইল, নীরদবাবু তখন একটা বালিশের উপর বুক রাখিয়া উপুড় হইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছেন।

লবঙ্গ কোনও কথা না বলিয়া একখানি পাখা লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে বসিল।

(ক্রমশ:)

কালী ফিল্মসের "চোখের বালী" চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা রায় ও মিসেস্ ঘোষ। ছবিখানির পরিচালক সতু সেন।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ | টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা বৈশাখ ১৩৪৫, ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৮

নববর্ষের প্রাক্কালে শুভ সূচনা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কুমিল্লার সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কংগ্রেস-নেতা মৌলভী আস্‌রাফ্‌উদ্দিন চৌধুরী সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন। বাংলার কংগ্রেসী ইতিহাসে আস্‌রাফউদ্দিন সাহেবের নির্ব্বাচন এক নব যুগের শুভ সূচনা করিতেছে।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসর বার্ষিক নির্ব্বাচন বিশৃঙ্খলা বা বাক্‌বিতণ্ডার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সমাধা হয় নাই। মুক্তির পর হইতেই সুভাষচন্দ্র সর্ব্বদলসমন্বিত কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী এ বৎসর কর্ম্মকর্ত্তা ও কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভ্যযুক্ত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, অভয় আশ্রমের নেতা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্রমিক দলের নেতা শ্রীবঙ্কিম মুখোপাধ্যায় সুভাষচন্দ্রকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহারা যে সে প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। তবে বাংলার কংগ্রেসের গ্রহমণ্ডলে যাহারা শনিরূপে প্রতিভাত সুতরাং তাঁহাদের ন্যায় দুর্জ্জেয় ব্যক্তিদের আশ্বাস-বাণীতে কেহ সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারেনা। নির্ব্বাচন পর্ব্ব সমাধা হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিরণবাবু যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ছত্রে ছত্রে সশস্ত্র নিরপেক্ষতা ARMED NEUTRALITYর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনোভাব যে পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহা তিনি স্পষ্টভাষায় না বলিলেও প্রকারান্তরে জানাইয়া দিয়াছেন। কিরণবাবুর বিবৃতির গূঢ় অর্থ ও ইঙ্গিত এই যে: এ বৎসর সুভাষচন্দ্র স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার হস্তেই কংগ্রেসী শাসন-দণ্ড; ভ্রাতা শরৎচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে প্যাটেল ও জহরলাল প্রভৃতি সকলেই বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রবল সমর্থক সুতরাং এ বৎসর আর বিরোধিতা করিলাম না— আর অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়কে এখনও পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে করায়ত্ত করা সম্ভবপর হয় নাই—সুতরাং এ বৎসর বিরোধিতা করিলাম না—আগামী বৎসর দেখিয়া লইব। নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই এইরূপ বিবৃতি প্রকাশ করার অর্থ মফঃস্বলবাসী কর্ম্মী-বৃন্দকে ইঙ্গিতে জানান তাঁহারা যেন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মনে করিয়া বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তা ও কার্য্যকরী সমিতির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা না করেন। এই সকল চক্রীগণকে যতদিন না বাংলা কংগ্রেস হইতে বিদায় করা সম্ভব হইবে ততদিন বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি মিটিবে না। বিগত এ্যাসেম্ব্লি নির্ব্বাচনে শরৎচন্দ্রের উদারতায় কিরণশঙ্করের রাজ-নীতিক জীবন পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। বিগত কর্পোরেশন ও এ্যাসেম্ব্লি নির্ব্বাচনে শরৎচন্দ্র নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হইতেছে। যাঁহারা তাঁহার উদারতার সুযোগ লইয়া কর্পোরেশনে, এ্যাসেম্ব্লিতে ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ রায়-নলিনীর প্রতি স্নেহ বশতঃ বসুভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধিতা করিতেছেন। মুক্তির পর শরৎচন্দ্র সর্ব্বময়কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া যে সুযোগ পাইয়াছিলেন তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে

পারেন নাই বলিয়া আজ তাঁহাকে বিরোধিতার এই চক্রান্ত জালে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। তিনি যদি সে সময়ে দৃঢ় হস্তে ও নির্ম্মম হৃদয়ে বিধানী দলের ব্যক্তিবর্গের উচ্ছেদ সাধন করিতেন—সে সুযোগ তাঁহার তখন হইয়াছিল—তাহা হইলে আজ তাঁহাকে এই বিষাদময় পরিস্থিতিতে পড়িতে হইত না। "রায়স উইক্লি"তে তাঁহার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার ও এ্যাসেমব্লির নেতৃত্ব পদ হইতে অপসারণের যে ষড়যন্ত্র তাহা যে কাহার বা কাহাদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছে তাহা বোধহয় তিনি এখন বুঝিতে পারিতেছেন।

যেখানে আদর্শগত অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান সেখানে মিলন অসম্ভব ও সমীচিন নহে—আর রাজনীতিতে বিরুদ্ধবাদীকে স্নেহসিক্তিত করা যে বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে তীক্ষ্ণধী শরৎচন্দ্রকে যে সে কথা মধ্যে মধ্যে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় তাহা দুঃখের বিষয়।

যাহা হউক, যখন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বাংলার কংগ্রেসের উপদলীয় দ্বন্দ্ব খর্ব্ব হইয়াছে তখন আগামী দ্বাদশ মাসের মধ্যে বিনা বাধায় ও প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তামণ্ডলী ও কার্য্যকরী সমিতি বাংলার কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিলে সুভাষচন্দ্রের অনুসৃত নীতি সফল হইবে। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের প্রতিশ্রুতির যদি কিছু মুল্য থাকে তাহা হইলে বাংলার জনসাধারণকে নবগঠিত কার্য্যকরীসমিতির কার্য্য সম্বন্ধে যে হতাশ হইতে হইবে না তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। আমরা আশা করিতে পারি কি যে বাংকের তরেও কিরণবাবু প্রতিশ্রুতির মুল্য রক্ষা করিবেন। দ্বিধাসঙ্কোচচিত্তে আমরা নববর্ষের প্রারম্ভে বাংলা কংগ্রেসের দলাদলির সমাপ্তির শুভ সূচনায় উৎফুল্ল হইয়াছি।
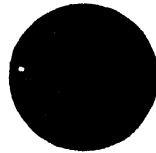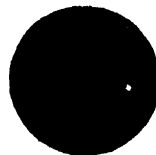
.০(X)০.

নাট্য-তরঙ্গ

(শ্রীনটনাথ)

স্বামী-স্ত্রীর রজত জয়ন্তী

শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্তের সমস্যামূলক নাটক 'স্বামী স্ত্রী'র রজত-জয়ন্তী উৎসব গত শনিবার 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন।

গ্রন্থকার ও শ্রীবীরেন্দ্র ভদ্রের আবাহন-বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় টকির সজ্ঘাতে রঙ্গমঞ্চের পরিণতি সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

রঙমহলের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থকার হইতে আরম্ভ করিয়া শিল্পীবৃন্দকে যথাযোগ্য উপহারে তাঁহাদের সফল শ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

অভিনয়ে শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও কোন কোন অংশে লঘু রসের মাত্রাধিক্য হেতু সমতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সস্ত্রীক মিঃ দাসের জামাতা-গৃহে আতিথ্য গ্রহণের পর তাঁহার আপ্যায়নের সময় দুর্গাদাস যে হাস্য-রসের সঞ্চার করেন তাহা বাহুল্য দোষে দুষ্ট সুতরাং বর্জ্জনীয়। দুর্গাদাস এই দৃশ্য একটু সংযত অভিনয় করিলে তাঁহার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

স্ত্রী ভূমিকায় শ্রীমতী রাণীবালা ও শ্রীমতী উষার অভিনয় মনোরম হইয়াছিল। চঞ্চল-চপলা ইঙ্গ-বঙ্গ-গৃহে প্রতিপালিতা ললনার চরিত্রের বিশৃঙ্খলা ও ক্রম-বিকাশ রাণীবালা সুষ্ঠুরূপেই ফুটাইতে পারিয়াছেন। প্রেম ও মহনীয় আদর্শের বেদীমূলে আত্মত্যাগের চিরন্তন দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের অপরূপ রূপ ফুটাইয়াছেন শ্রীমতী উষা দেবী তাঁহার ধীর, স্থির ও সুসংযত অভিনয়ে। সহজ ও সরল ভঙ্গীতে তিনি এই জটিল ভূমিকাটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়া গ্রন্থকারের মধুর লেখনী নিঃসৃত চরিত্রটীর পূর্ণ প্রতিচ্ছবি রঙ্গমঞ্চে প্রতিফলিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবাগতার আড়ষ্ট পদক্ষেপে ছায়ালোকে যাঁহার শিক্ষানবিশী সুরু হয় পাদ প্রদীপের প্রোজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁহার অভাবনীয় বিকাশ তাঁহার অনাগত উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। অন্যান্য ভূমিকায় শিল্পীদের অভিনয়-বৈশিষ্ট্য অটুটই ছিল।

গ্রন্থকারের বাক্য-বিন্যাস ও চরিত্র গঠন চাতুর্য্য-স্বামী স্ত্রীর সাফল্যের যে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে তাহা স্বীকার না করিলে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হয়। আমরা পরিশেষে স্নেহাস্পদ শচীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।
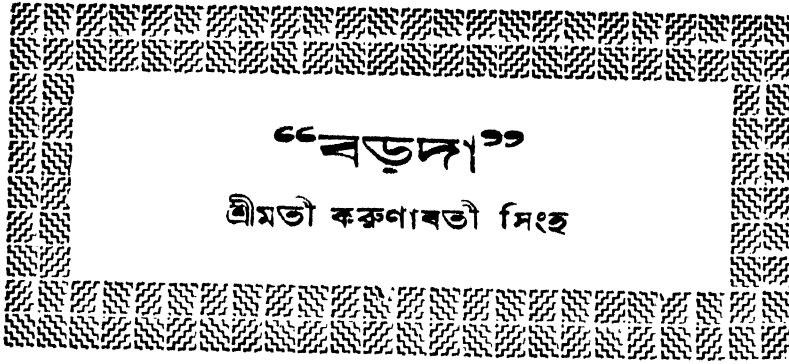
চাকার মত গ'ড়াতে গ'ড়াতে ডিক্সন লেনের মেসে এসে হাজির হ'লাম।— এ'টা নিয়ে আমার তিনটা মেস হ'ল কোন স্থানেই আমার দলবলের অভাব হয় নি, আগের মেসের পাশ দিয়ে এখনও নির্ব্বিঘ্নে যাবার উপায় নেই, ছেলেরা ত' আছেই, গিন্নীরা, মেয়েরা এমন কি বৌঝিরাও ডেকে নিয়ে বসায়, গল্প গুজবে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটিয়ে দরকারী কাজ অক্ষুণ্ণ রেখেই ফেরৎ আসতে হয়। শুনেছিলাম, কলিকাতার বাসিন্দারা মেসের বাবুদের বিশ্বাস করে না, ঘেন্নাও করে। কারণ যাই থাক, এইটাই প্রবল জনরব, ২।১ স্থানে তার প্রমাণও পেয়েছি। এই প্রমাণই যদি এক মাত্র অভক্তির কারণ হয় 'ত' আমি বলি তাদের নিজেদের দেহ মন পরিষ্কার করবার মত সৎসাহস তারা শেখেনি এবং সেটা যেমন ভাববার তেমনই হাসবার।

আমার বর্ত্তমান মেসের ছাদের উপর গঙ্গাজলের একটা খালি ট্যাঙ্ক আছে, রোজ ৬টার পর তার উপর বসি। আমার মনে হয়, মেসই হ'বে কিংবা বাসাই হক এই সময়টা সকলেই ছাদ চায়, নইলে চলে কিনা, জানিনে, তবে অসুবিধা হয় খুব বেশী! ঠিক এই কারণে নাকি পাশের জনৈকা ভদ্র মহিলা, আমার বিশিষ্ট বন্ধুর সেনির কাছে নালিশ ক'রে পাঠাইয়াছেন!

সে'দিনও নিয়ম মত তখন আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে আছি, এমন সময় আমার বন্ধু সেনি হাসতে হাসতে এসে বললে কি হে সিংহ তোমার যে ভয়ানক চরিত্র দোষ, হ'য়েছে, এ'ত জানতাম না!

হঠাৎ চরিত্র সংক্রান্ত ব্যাপারটী না বুঝতে পেরে থতমত খেয়ে গেলাম, তার পরই একটু গম্ভীর হ'য়ে উত্তর করলাম— জানা উচিত ছিল, এ'ত আর একদিনের নয় প্রায় ১০ বৎসর হ'ল!

আমার বন্ধু সত্যিই চিন্তাকুল হ'য়ে পড়লো, বেশ লক্ষ্য করলাম, হাসি তামাসার ভাব মহূর্ত্তে উপে গেল, আমার এই স্পষ্ট বাদীর কি উত্তর দেবে এবং কি প্রশ্ন দিয়ে তার তথ্য তোলে নেবে, এ ভাবনায় অস্থির হ'য়ে উঠলো।

তার ভাব দেখে মনে মনে হাসতে লাগলাম। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে পুনরায় বললাম—কি করবো ভাই, যা হ'য়ে গেছে তার ত' আর হাত নেই, তবে তোমার মত বন্ধুরা যদি তখন মানা করতো তাহ'লে হয়ত রক্ষে পেতে পারতাম।

মিনিট দুই খেয়ে তার মুখ চোখ একবার ভাল ক'রে দে'খে নিলাম! একেবারে কালি হোয়ে গে'ছে, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, নইলে হয়ত হেসে ফেলতাম, আপনার মনেই যেন বলছি, এইভাবে বললাম—যা'ক্ যা হ'বার হ'য়েছে, তবে সে মহিলা তোমারও পরিচিতা।

একরকম চমকে উঠে বললে—আমার প'রি'চিতা!

সেইভাবেই বললাম—নিশ্চয়, কেন দাদুর মা।

দাদু আমার ছেলের নাম, এবং তারও সুপরিচিত! তারপরই আমার পিঠে যে তাল পড়লো, আমোদের হ'লেও সহ্য করতে কষ্ট হ'ল!

তারপর ভদ্র মহিলার নালিশ বর্ণনা করতেই ভয়ানক চটে গেলাম, উক্ত মহিলার স্বামী নাকি আমার বন্ধুর সুপরিচিত এবং এক আফিসে চাকরী করেন! ক্ষনিকের জন্য আড় চোখে একবার তাদের জানালা পানে তাকিয়ে দেখি, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, বোধহয় নালিশের ফলাফল জানবার জন্যে। তাই আরও রাগ বাড়িয়ে তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলাম।—তুমি এদের কথা বলছো, ইনি ত' স্কুলে পড়েন, অনেকদিন ট্রামে, বাসেও দেখা হ'য়েছে, সেদিনও ঠিক আমারই পাশে বসে বায়স্কোপ দে'খে এ'লেন, কই তাতে ত' এর কোন অসুবিধা মনে হয় না! এই যে ২ বেলা শত শত চোখের উপর দিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন, তখন ইনি কার চোখে সোহার চশমা পড়ান, শুনি! যত অসুবিধা, যত

লজ্জা, দেখা দের কি বাড়ীতে এসে। আমায় ক্ষমা কর ভাই। তোমার বন্ধুস্ত্রীর লজ্জা কিংবা পর্দানবিশ ভাবটা ঠিক অনুমান করতে পারছি নে, মেনে নিতেও কেমন খটকা লাগে।

আমার বন্ধু সেদি অনুকূল বাবু আমায় ৮বছর হ'তে জানে। চরিত্রের উপর কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে সত্যিকার রাগি, এও তার অজানা নেই। তাই হাসি তামাসার ভাবটা কমিয়ে অনেকটা উপদেশ দেবার ছলে বললে—তা হ'ক ভাই তবুও উঁরা যখন বলছেন, তা ছাড়া অনেক সময় কি গায়ে কাপড় চোপড় থাকে ভাই, তুমিই বলনা, তোমার স্ত্রীই কি বাড়ীতে তাই করেন!

বোধহয় তাঁর বন্ধুটিকে স্বস্ত্রীক দাঁড়িয়ে থাকতে তিনিও দেখেছেন, তাই তাঁদের

মিউনিসিপ্যাল গেজেট

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বর্ত্তমান বৎসরের স্বাস্থ্য সংখ্যা রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের মুখবন্ধ সহ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা সৌষ্ঠবে ও প্রবন্ধ সম্ভারে বর্ত্তমান সংখ্যা বন্ধুবর অমল হোমের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের কৃতিত্বকেও পরিম্লান করিয়াছে। "I was also responsible, as Chief Executive officer in 1924, for the choice of the Editor, and it affords me real pleasure to find it admitted on all hands that my choice has been justified."

সাংবাদিক হিসাবে অমল বাবু যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং গত চৌদ্দবৎসর যাবৎ যেরূপ কৃতিত্বের সহিত তিনি মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন তাহাতে রাষ্ট্রপতির অভিনন্দন-উক্তি অত্যুক্তি হয় নাই।

হ'য়ে একটু ওকালতি করতে ইচ্ছে হয়েছে, অন্ততঃ তাদের তৃপ্তির জন্যে।

আমি কিন্তু সেই রকম ঝাঁজানো সুরে উত্তর করলাম—আমার মতে কলিকাতার মত সহরে সকল স্ত্রীরই উচিত আগে কাপড় চোপড় সাবধান করে তবে জানালা খোলা! এ যিনি না করেন, হয় তিনি জানেন না কিংবা ইচ্ছে করেই ভুল করেন। তাই বলে এরকম পরের নামে দোষ দিয়ে বেড়াতে কোন শিক্ষিতা মহিলাকে আজ পর্য্যন্ত দেখিনি। আপনার বন্ধুকে এবং বন্ধুপত্নীকে আমার নমস্কার দিয়ে বলবেন, এ পাড়ায় একমাত্র আমি ছাদে উঠিনে আরও লোক আছে, তিনি কজনের চোখ ঢেকে বেড়াবেন, সারাদিন আফিস করে আসার পর ভদ্রলোকের পক্ষে কি সম্ভব হ'বে ভাই, বাড়ী-বাড়ী সকলকে বলে বেড়াতে, যে আমার জানালা পানে চাইবেন না, না তাই কেও শুনবে! লোকে পাগল বলবে যে!

কখন যে জানালাটা বন্ধ হ'য়ে গেছে খেয়াল করিনি। উভয়েই তখন নীচে চলে এলাম! আশ্চর্য্যের বিষয় তারপর হ'তে আর কোন নালিশ আসেনি, বরং পাড়ার সব বাড়ীর ছেলেরা আমার ঘড়ে আড্ডা করলো। আর এই কুলটা হ'ল তাদের সেক্রেটারী মেয়েদের, সরস্বতী পূজা ক্লাবের জয়েণ্ট ম্যানেজার মিস্ চঞ্চলা বোস, বেথুন কলেজের ষষ্ঠ ক্লাসের ছাত্রী!

পাড়ার গয়া, টুনু, কেষ্ণু ছাড়াও আরও যে কত ছেলেরা আসতো তাদের বাড়ীও চিনতামনা আর নামও জানতাম না! তবুও তাদের অবারিত দ্বার ছিল! যেন ব'লে, অসুবিধা হ'য়েছিল আমার নারী ক্লাবের। এইজন্য রোজ সন্ধ্যাকালে অন্ততঃ ২ মিনিটের জন্য তাঁদের খাতাপত্র দেখে, আসতে হয়। আশ্চর্য্যের এবং ভাববার বিষয় যে, আমার মত একজন নিরক্ষর লোককে কেন এরা চায়।

এই পাড়ার ভেতর একজনদের সংসারে এমনভাবে জড়িয়ে পড়লাম যে, মনে হ'ল হয়ত জীবনে আর কোনদিন এ বন্ধন কাটাতে পারবো না! এই বাড়ীর ছেলেরা আমায় বেশী জ্বালাতন করতো! এদের মাকে মা বলতাম এবং একটী বয়স্থা বোন ছিল, তাকে ঠিক নিজের বোনের মত দেখতাম। তাকে জ্বালাতনও করতাম সবচেয়ে বেশী! সকাল বিকাল সব সময়ে সেই আমার চা করে মেনে পাঠিয়ে দিত! মায়ের যে কি প্রাণঢালা স্নেহ, তার তারতম্য করতে গিয়ে অনেক সময়

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীপ্রভাত কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের মাঝে যতেক স্বপন মায়া
ছায়া হয়ে ক্রমে মিলায় দিগন্তরে
কঠিন পৃথিবী মেলিয়া রুক্ষ কায়া
বিদ্রূপ করে সকল স্বপ্নাতুরে।
বলে ডেকে যত স্বপনবিলাসী নরে
স্বপনের হেথা নাহি কোনো অবকাশ
জীবনের সুধা গরলে হয়েছে ভরা
বিষের বাষ্প ভরিছে প্রতিটি শ্বাস।
আকাশের নীল ঢেকেছে ধূসর মেঘে
পূর্ণিমা নাই আছে শুধু অমানিশা
মধু বসন্ত ফুরায়ে গিয়াছে কবে
কালবৈশাখী ঘেরিছে সকল দিশা।
জীবনের নীল সিন্ধু শুকালো কবে
দূর বালুচরে কাঁদে মরণের পাখী
ছায়াহীন পথ একা উতরিতে হবে
মরু বালুকায় নয়ন দিতেছে ঢাকি।
স্বার্থান্বেষী ধনিক সম্প্রদায়
ক্ষুধার অন্ন লুণ্ঠন করে লবে
ভিখারী হৃদয় করুণ ব্যথায় ভরা
কারে বা জানাবে কোন সেই বান্ধবে।

বিচারের আগে দাঁড়াইতে নাহি ঠাঁই
দণ্ড পেতেছি কিসের সে অপরাধে
নাহি জানি তাহা—আঁখিভরে আসে জল
ক্ষুধিত আত্মা কাঁদে কামনার ফাঁদে।
স্নেহ মায়াহীন জন অরণ্য মাঝে
পথ খুঁজে নিতে হবে তো আমারও লাগি
ভাবিলে সে কথা চোখে নাহি আসে ঘুম
একাকী বসিয়া বিচিত্র নিশা জাগি।
ছিল মধুঋতু ছিল দক্ষিণ বায়
দীপউজ্জ্বল ছিলগো বাসর বাতি
বজ্রঝড়ে সবে ধূলায় লুটান হায়
দূরে চলে গেল জীবনের সব সাথী।
কজ্জল দিয়া হরিণীর মত চোখে
প্রিয়া বেঁধেছিল বাহুর মালিকা দিয়া
আজি সব আছে নাহি সে স্বপন মায়া
রূঢ় বাস্তব বিদীর্ণ করে হিয়া।
মহাকাল বুকে অসীম শূণ্য পরে
খেয়ালী বিধাতা হাসে নিষ্ঠুর হাসি
নিপীড়িত আমি কামনার কারাগারে
স্বপনবিলাসী নয়ন সলিলে ভাসি।

হাঁপিয়ে যেতাম! কেবলই ভাবতাম মেসে এত উপযুক্ত ছেলেকে বাদ দিয়ে এই অশিক্ষিত ছেলেটিকে তিনি বেছে নিলেন কেন! তবুও এই অমূল্য স্নেহ কেমন করে কাটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম সেই কথাই'ত বলবো।

আমার শত কাজ সত্বেও মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যার পর একবার দেখা করতামই। এটা আমার নিত্য কাজ, নইলে ঘুম হ'ত না, শান্তিও পেতাম না।

একদিন গল্প করতে করতে মা আমার বললেন—হাঁ বাবা "মণি" তোর বোনের বিয়ের একটা ছেলে দ্যাখ, আর কতদিন ঘরে রাখবি, ও বড় হয়নি!

হেসে ফেললাম, উত্তর করলাম—যাক না, ওকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন, কেন, বলুনত? বিয়ে হ'লেই ত' পরের বাড়ী চলে যাবে, তখন কি আর আমার চা হ'ল কিনা, ফিরে দেখবে মনে করছেন!

কমলা তখন আমার সম্মুখে বসে গান করছিল, তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললাম এই কমলি! তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে নাকি রে! মাকে বলেছিস্ বুঝি।

লজ্জা করা দূরে থাক্ সে মুখ ভেঙচে বললে না, তা হ'বে কেন! তুমি বিয়ে করে ঠুটো বগ হ'য়ে বসে আছ কি না, তাই না!

তার বলার ভঙ্গিমা দে'খে মা আর আমি দু'জনেই হেসে ফেল্‌লাম।

বাঁ হাত দিয়ে তার খোঁপাটা ধরে দু'ঘা কিল বসিয়ে দিয়ে বল্‌লাম আরে মার সাক্ষাতে নিজের বিয়ে নিয়ে ঝগড়া করতে লজ্জা করে না, তোর।

বিভীষিকা !

?

আগামী সপ্তাহে এই পৃষ্ঠায়
বিশদ বিবরণ লক্ষ্য করুন।

দু'হাত দিয়ে আমার হাত খানা সজোরে চেপে ধরে চিৎকার করে বললে ও'মা দেখছো, তোমার দস্যি ছেলেটা কি করছে :

মা তিরস্কার স্বরে বললে ও'রে ছাড় ছাড়, লাগছে ওর! দু'দিন বাদে যখন পরের বাড়ী যাবে তখন দেখিস্ কত মন কেমন করবে।

তারপর থপ করে বসে বললেন আর ত" হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না বাবা! দেশ শুদ্ধ যদি তুই হতিস্ তা' হলে না হয় আরও কিছু দিন পরে হ'লেও চলতো। তা ত" হবার যো নেই, বাবা! তোর বন্ধু বান্ধবের ভেতর প্রথমে দেখিস্ বাবা! এ যদি হয় ত" আমি বলছি, ও নিশ্চয় সুখী হবে আমার দু'টীর ভেতর মাত্র ১টীর সিন্দুর নোয়া···

আর বলতে পারলেন না, ২।৩ বার ঢোক গিলে আবার কি বল্‌বার চেষ্টা করতেই তাঁর মুখ চেপে ধরে বললাম পাপের ভাগী কেন করছেন, মা! আমি কমলার ভাল বরের চেষ্টা করবো।

তাড়াতাড়ি নিজের চোখ মুছে বললেন না বাবা, মায়ের চোখের জল যে তোর আশীর্ব্বাদ রে বোকা। আমি যে তোর মা! মা!

তারপর বললেন তোরা গল্প কর বাবা, যাই আহ্নিক করিগে।

আমি নিজেও উঠলাম। কমলার উপর নজর পড়তেই মুখ শুকিয়ে গেল, চটুলতায় ভরা কমলা ভাবনা চিন্তায় মুহ্যমান হ'য়ে একে বার আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে! সে যে কি ভাবছে, নিজের এত ব্যাকুলতা এ আমার অজানা নেই! মাকে সে কত ভালবাসে, ভক্তি করে এর তথ্য প্রতি পদে পদে দেখতে পাই! তার ছোট ছোট ভাইরা যখন মাকে বিরক্ত করে, সে কতখানি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠে এ আমার চোখ এড়ায় না! তাই তার জন্ত মায়ের চোখে জল দেখে, সে যে পরিমাণে লজ্জিতা হয়েছিল, ব্যাথাও অনুভব করছিল তার তুলনায় শতগুন বেশী! এই ভেবে যে তার সিন্দুর নোয়া অক্ষুন্ন থাকবে কিনা, কিংবা কতদিন থাকবে, থাকলে ও তার জীবনটা ফলে ফুলে চারিদিক আলো করবে কিনা, এই চিন্তা পর পারের যাত্রী, তার শোকাতুরা জননীর অন্তর হ'তে হয়ত পরপারে গিয়ে ও দূর হ'বে না। এ যে তার কত বড় দুঃখ কত বড় অশান্তি, জানেন তার অন্তর্যামী! যে জানে, তার অকাল গত পাঁচটি ভগ্নিপতির ভেতর কেউ বা ছিল মদ্যপায়ী, আর কেউ বা ছিল অস্থির প্রকৃতি, অতীব চঞ্চল মতি, সমাজের কণ্টক স্বরূপ! সিন্দুর নোয়া থেকেও তার মা কোন দিন শান্তি পায়-নি, এখন কার "ত" কথাই নেই, আজ একজন অনাত্মীয় তার মায়ের স্নেহ যে ভাবে চিনে অমূল্যদান ব'লে মাথা পেতে নিচ্ছে, এর সিকি কোণা ও তার কোন ভগ্নিপতি ভক্তিভরে নিতে পারে নি বা যে শিক্ষা তাদের কারও ছিল না, এমনি নিকৃষ্টে ছিল তারা

স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, তারপর স্নেহভরে বললাম আমি আসি, ভাই, কমলা!

কমলা কোন উত্তর করিল না, সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এ'ল, দরজা পার হ'য়ে পা দুই যেতেই, কমলা একটু চাপা গলায় বললে মায়ের আদেশ ভুলে যেওনা, দাদা! ঠিক তোমার বন্ধুর ভেতর।

(ক্রমশঃ)

কালীঘাট হাইস্কুল প্রাক্তন ছাত্রদের প্রীতি সম্মেলন

বিগত রবিবার ৫০ নম্বর মহিম হালদার রোডস্থ কালীঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় বাটীতে ঐ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদিগের প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লণ্ডনের এল, আর, সি, পি এডিনবার্গ ও ইংলণ্ডের এফ, আর, সি, এস উপাধি প্রাপ্ত ও এই বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রীতিসম্মেলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উৎসবে অন্যূন চারিশত প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি তাঁহার বয়স হইল ৭৩ বৎসর।

প্রাক্তন ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নীতিন্দ্রনাথ রায় অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে আই এফ এ'র প্রথম বাঙ্গালী সম্পাদক ও এই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ৺মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁহারা যে এলিয়ট শিল্ড খেলিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করেন। কালীঘাট স্কুলের পূর্ব্বে এই প্রতিযোগীতায় অন্য কোন স্কুল খেলেন নাই। শ্রীযুক্ত ফণী মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, প্রাক্তন ছাত্রদিগকে বৎসরে একআনা চাঁদা ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের মধ্য হইতে ষোলজন নূতন সদস্য করিয়া দিতে হইবে। তিনি অনুরোধ করেন, প্রাক্তন ছাত্র মাত্রেই তাঁহাদের নাম ঠিকানা প্রভৃতি যেন তাহাকে পাঠান।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ বিশেষ চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া তিনি বলেন— "দেশের ও দশের উপকারে যাহাতে আসিতে পার তোমরা তাহাই করিবে। শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তোমাদের ছাত্রজীবনের সবখানি নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছাত্রদল সমাজ ও রাষ্ট্রের কতখানি— তাহাদের আশ্রয় করিয়া মহৎ যাহা কিছু তাহা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে, সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে— মনে রাখিতে হইবে, তোমাদেরই উপর বিশেষ করিয়া দেশের সমস্ত আশা নির্ভর করিতেছে।"

পরিশেষে জল যোগান্তে এই অনুষ্ঠানের অবসান হয়।

—:০:—

ভবানীপুর ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন :—

গত ১০ই এপ্রিল এসোসিয়েশন প্রাঙ্গনে ৫৮-১ নং কাঁসারীপাড়া রোডে এসোসিয়েশনের ত্রয়োবিংশ বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ এস, কে বোস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তথায় আগমন করেন।

বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ

গত ৬ই এপ্রিল বুধবার নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত হইয়া বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করিয়াছেন :

১। বিংশ শতাব্দী সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার যুগ। যখন দেশের সকল সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন তখন বাঙালার শিল্পীগণের কোনো সঙ্ঘ নাই এটা সত্যই লজ্জার বিষয়। তাই অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ নামে শিল্পীদের একটী স্থায়ী সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করা হইতেছে।

২। শিল্পীদের অভাব অভিযোগ, আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে এই সঙ্ঘ গঠন মূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন—এবং তাহাই হইবে সঙ্ঘের প্রধান এবং প্রথম কার্য্য।

৩। সমগ্র বাঙলা দেশে যাঁহারা চারু ও কারুশিল্প সাধনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন যাঁহারা শিল্পানুরাগী তাঁহারাই এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারিবেন।

৪। বাঙলা দেশের প্রত্যেক শিল্পীর ঠিকানা জানা সম্ভব নয় বলিয়া দেশের সংবাদ পত্রের মারফৎ প্রত্যেক শিল্পীকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হইতেছে যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে অস্থায়ী সম্পাদকের নিকট পত্রযোগে নিজের নিজের ঠিকানা জানান এবং এই সঙ্ঘের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবার সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। কেননা অতি শীঘ্রই বাঙলাদেশের প্রত্যেক শিল্পীকে আহ্বান করিয়া কলিকাতায় একটী শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

৫। প্রতি বৎসর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুরূপ 'বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের' ব্যবস্থা এই পরিষদ যাহাতে করেন এবং চিত্র-শিল্পীর বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে প্রথিতযশা শিল্পী ও শিল্প সমালোচকগণ যাহাতে শিক্ষামূলক বক্তৃতা দান করেন সঙ্ঘ যেন সে বিষয়ে বিশেষ অবহিত হন।

৬। এতদ্ব্যতীত শিল্পীগণ যাহাতে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার মিলিত হইয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন পরিষদের সে বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করা উচিত।

(স্বাঃ) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
শিল্পী হরেন্দ্র নাথ গুপ্ত।
" দেবেন্দ্র নাথ মজুমদার।
" ক্ষিতিশ চন্দ্র রায় (এ, আর, সি, এ)
" পূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" ফণীভূষণ গুপ্ত।
" প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।
" অবনীকৃষ্ণ বসু।
" যোগেশ চন্দ্র রায়।
" জ্যোতিষ চন্দ্র দাশ গুপ্ত।
" নরেন্দ্র নাথ দত্ত।
" অখিল নিয়োগী। (অস্থায়ী সম্পাদক)

সঙ্গীত আসর

● গত রবিবার ১৩ই চৈত্র ইং ২৮শে মার্চ্চ রাত্রে সঙ্গীত আসরের সভ্য শ্রীদীনেন্দ্র নারায়ন সিংহ মহাশয়ের ১৫নং কালীদাস সিংহ লেনস্থ বাটীতে উক্ত আসরের ১০ম বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উচ্চাঙ্গের খেয়াল ও ঠুংরী গান করেন। পরে শ্রীখগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় স্বরোদ বাজান। শ্রীদীন নাথ ধর (অন্ধদীনু) ইহাদের সহিত সঙ্গত করেন।

ছোট গল্প ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

৫৩নং সারপেন্টাইন্ লেনের ইষ্ট লাইব্রেরীর উদ্যোগে আগামী এপ্রিল মাসে বাংলা "ছোট গল্প" ও "আবৃত্তি" প্রতিযোগিতা হইবে।

গল্প—ছোট গল্পের জন্য গুণানুসারে তিনটী পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। গল্প একসারসাইজ্ খাতার ১৬ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। প্রেরিত গল্পের উপর লাইব্রেরীর সকল স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে। গল্পের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য নির্ব্বাচিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য্য হইবে। আগামী ১৫ই মের মধ্যে লিখিত গল্প লাইব্রেরীতে পাঠাইতে হইবে।

আবৃত্তি—আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় গুণানুসারী তিনটী পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। আবৃত্তির বিষয় (প্রত্যেকের জন্য):—

(১) গদ্য:—রবীন্দ্রনাথের সন ১৩৪৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বিতরণী সভায় পঠিত অভিভাষণ হইতে—"আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবী-ব্যাপী জন সমুদ্র··· ঝাঁপ দিয়া পড়াকেই গর্ব্বের বিষয় না মনে করি।

(২) রবীন্দ্রনাথের কাহিনী হইতে "দীন দান"। কেবল-মাত্র স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

আগামী ৩১শে এপ্রিলের মধ্যে প্রতিযোগিগণ নিজ নিজ নাম ও ঠিকানা দিয়া সম্মতিপত্র দিবেন। অন্যান্য বৃত্তান্তের জন্য লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করুন।

দুর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ২৭শে চৈত্র রবিবার, ১৩নং রিচি রোডে, শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে 'দুর্ব্বার সঙ্ঘের' চতুর্থ অধিবেশন হয়। সুকবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বাগচী মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন।

সভায় ফাল্গুনী রায়ের 'হাঁস', নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিরুদ্দেশে', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'রোম্যানটিক' ও 'দুর্ঘটনার আগে' প্রভৃতি কবিতা এবং সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'সূর্য্যোদয়' নির্ম্মল দাসগুপ্তের 'দিনমজুর' এবং সমীর ঘোষের 'জীবন, যৌবন ও যবনিকা পতন' প্রভৃতি গল্প পঠিত হয়।

অতঃপর বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতা ও গল্পের প্রভাব সম্বন্ধে সভায় গভীর আলোচনা হয়। পরিমল বসু, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'কল্যাণ সঙ্ঘের' সুধাংশু সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র আলোচনায় যোগদান করেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় সভার কার্য্য শেষ হয়।

জ্যোতিষ স্মৃতি গ্রন্থাগার

গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ৫১ এ সুবার্ব্বন স্কুল রোডে জ্যোতিষ স্মৃতি গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন হয়। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

(বিলাসী)

'বিদ্যাপতির' অপরাপর সকল আকর্ষণকে ছাড়িয়ে, আজ বাংলার আকাশে বাতাসে শুধু একটি কথাই ছড়িয়ে পড়েছে—অনুরাধা বেশিনী কাননের গান, কাননের অভিনয়! সমগ্র নাটকের মধ্যে এই চরিত্রটি, অন্তরের দরদ ও ঔদার্য্যে, আগাগোড়া আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন কোরে রাখে। চিত্র-নাট্যকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই অনুরাধা। যেখানে বিরোধ, যেখানে বেদনা, সেখানেই যেন সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিতে—অনুরাধার আবির্ভাব।

প্রেমের সাধনায় চির বিজয়িনী এই অনুরাধা—নর-নারীর অন্তরকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ কোরবে। আজ অনুরাধার পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু এই কথা টুকুই বোলতে পারি—

"অতৃপ্ত অনাদি প্রেম বিরহীরে করি সপ্রাতুর
ধ্যানের সুবর্ণ সেতু বাঁধিয়াছ স্বর্গ মরতের।"

তাই আজ অনুরাধার পরিচয় না দিলে, বিদ্যাপতির পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

যে গান পঞ্চদশ শতক থেকে আরম্ভ কোরে অদ্যাপিও কণ্ঠে সুধাবর্ষণ করে, সেই গীত লহরীকে সার্থক কোরে তুলেছেন—কানন দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং পাহাড়ী। আশাকরি বাংলার সঙ্গীত-পিপাসু নর-নারী বিদ্যাপতির মধ্যে সে মধুর রসের আংশিক সন্ধানও পাবেন।

অভিজ্ঞান

হিন্দি 'অভিজ্ঞান', যাতে আগামী মাসের গোড়ায় বাঙলায় বাইরে মুক্তিলাভ কোরতে পারে, কর্ত্তৃপক্ষ তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা কোরছেন। প্রফুল্ল রায় ও ফনী মজুমদারের যুগ্ম পরিচালনায়, 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসটির মর্ম্মকথা যে অবিকৃত ভাবে ছায়াছবির মধ্য দিয়ে নর-নারীর অন্তর স্পর্শ কোরতে পারবে এমনটা আশা করা অন্যায় হবেনা।

এই নাটকের বিকাশ ও পরিণতির মধ্যে স্বভাবতই একটা 'ট্র্যাজিডির' সুর ধরা পড়ে। কিন্তু সেই সুরটাই যাতে ছবির কাহিনীকে আচ্ছন্ন না কোরে ফেলে, তার জন্যে পরিচালক দ্বয় এর মধ্যে রস-বৈচিত্রের আমদানি কোরেছেন। স্থান কালোপযোগী, নাটকীয় ঘটনাধারাকে অব্যাহত রেখে, সঙ্গীত এবং হাস্য রসাদির অবতারণার মধ্যেই, পরিচালকের রসবোধ এবং নৈপুণ্য ধরা পড়ে। আশাকরি অভিজ্ঞান-এর যুগল পরিচালক, এই চিত্রের পরিচালনায় তারই পরিচয় দিতে পারবেন।

বৈষ্ণবের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামী এবং বৈষ্ণবীর ভূমিকায় শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) তাঁদের মধুকণ্ঠ নিঃসৃত সুর তরঙ্গে যে সকলকে পাগল কোরে তুলবে, একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অধিকার

আসামের জঙ্গলে, সামরিক ভাবে শীকার পর্ব্ব চুকিয়ে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া সদলবলে ফিরে এসে, পূর্ণ উদ্যমে আবার ছবির কাজ সুরু কোরেছেন।

বর্ত্তমানের মার্জ্জিতরুচি তরুণ তরুণীদের চিন্তাধারার সঙ্গে মিল রেখে এই আধুনিক কাহিনীটি রচিত। আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে চিন্তার খোরাক মেলে, এমন জিনিষ পরিবেশনের মধ্যেই পরিচালকের বৈশিষ্ট্য। প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে আমরা তারই সন্ধান পাই। এই কাহিনীর কয়েক প্রধান চরিত্রে, যমুনা, বড়ুয়া, মেনকা, চিত্রলেখা, পাহাড়ী, প্রতাপ, পঙ্কজ মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী এবং ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আপনাকে অভিভূত কোরবে। অপূর্ব্ব আবহ-সঙ্গীত এবং কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখাবেন—তিমিরবরণ। দৃশ্যপটাদি গঠন কোরছেন অর্জ্জুন রায়। সুতরাং ছবিখানি যে সকল দিক দিয়ে শ্রীমণ্ডিত হোয়ে উঠবে—একথা একরকম জোর কোরেই বলা যায়।

বড়দিদি

এ হপ্তায় 'বড়দিদির' ভূমিকা-লিপির পরিচয় দেবার সময় এসেছে। আর্টিষ্ট নির্ব্বাচনের দিক দিয়ে 'বড়দিদি' যে সত্যই বিশেষ আকর্ষনের বস্তু হয়েছে, একথা নিম্নের তালিকা দেখলেই অনুধাবন করা যায়। পরিচালক মল্লিক মহাশয় পূর্ণ-উদ্যমে 'বড়দিদি'র মহলা সুরু কোরছেন এবং যে যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি কাজ কোরছেন তাতে ছবিখানি যে সত্যই তাঁকে ছায়া-চিত্রের একজন গুণী পরিচালক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে পারবে—এমন ধারণা করাও অসঙ্গত হ'বে না।

ভূমিকা লিপি :

সুরেন—পাহাড়ী
মাধবী—মলিনা
সুরেনের পিতা—শৈলেন চৌধুরী
শিব চন্দ্র—কেষ্ট দাশ
বিধু (ভৃত্য)—নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
মথুর বাবু—ইন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোরমার স্বামী—ভানু বন্দোপাধ্যায়
শান্তি—চন্দ্রাবতী
ম্যানেজারের সহকারী—অহি সান্যাল

কালী ফিল্মস

বি. পি, মেহেরার প্রযোজনায় এই প্রতিষ্ঠানের রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশার অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি "চোখের বালি-র শুটিং দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটার ভেতর সিনেমার উপযোগী মাল-মশলা প্রচুর পরিমাণে থাকায় এবং এই ছবির জন্য উপযুক্ত শিল্পী নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমাদের মনে হয়, "চোখের বালি" রবীন্দ্রনাথের মর্য্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস কোরবে না।

শক্তিময়ী, কলা-নিপুনা ভদ্রবংশোদ্ভূতা অভিনেত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা মুখার্জ্জি ও ইন্দিরা রায় ইতিমধ্যেই চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা হ'য়েছেন। এই চিত্রে যথাক্রমে বিনোদিনী ও আশার ভূমিকায় এই দু'টি মেয়েকে মানাবে চমৎকার এবং সংস্কৃতির সৌকার্য্যার্থে তাঁদের অভিনয় বিশেষ মনোজ্ঞ হবে আশা করা যায়। এ ছাড়া দুইটি পুরুষ চরিত্র মহেন্দ্র ও বেহারী রূপে ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি ও ছবি বিশ্বাসের নির্ব্বাচনের তারিফ করা যায়।

ছবিখানির টেকনিক্যাল বিভাগে যাঁরা কাজ কোরছেন, তাঁরা সাধারণের কাছে এত বেশী পরিচিত যে, তাঁদের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। এই সব দেখেশুনে আমাদের মনে হয়, "চোখের বালি" সাধারণকে ভাল ভাবেই খুশী কোরতে পারবে।

হাজরা পিক্‌চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের "দেবী ফুল্লরা"র আর একটি 'সেটে'র কাজ শেষ হ'লেই ছবিখানি মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকবে।

গেল হপ্তায় এই ছবির ফুল্লরা ও কালকেতুর দেবীআরাধনা দৃশ্যটি মহাসমারোহে তোলা হয়।

রাজা কর্ত্তৃক দেবী দর্শণে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে ফুল্লরা ও কালকেতু নদীর জলে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ভাসিয়ে দিয়ে বনে এসে নিরম্বু উপবাসে দেবী আরাধনায় মত্ত হ'লেন—প্রতিজ্ঞা কোরলেন যতক্ষণ না দেবীর দর্শন পাবেন, ততক্ষণ দেবীর পূজা থেকে বিরত হবেন না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফুল্লরা ও

"অভিজ্ঞান" চিত্রের একটি দৃশ্যে মলিনা ও শৈলেন পাল

কালকেতুর অভিযান ও ফুল্লরার মরন পন আরতি নৃত্য কৈলাসে ভগবতীর সিংহাসন টলে উঠল—তিনি তাঁদের সামনে উপস্থিত হ'য়ে ভক্তের মান রক্ষা কোরলেন।

উপরোক্ত এই দৃশ্যটি গেল হপ্তায় কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় মহাসমারোহে গৃহীত হয়েছে। নবীন চিত্র-শিল্পী বিভূতি লাহা এই দৃশ্যটিকে সুন্দরভাবে গ্রহণ কোরছেন। এই চিত্রের শব্দযন্ত্রী যতীন দত্ত নিজের সুনাম প্রসারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন। এদের সমবেত চেষ্টা জয়যুক্ত হ'ক।

নালান্দা ফিল্মস্

নিরঞ্জন পাল ও জয়গোপাল পিলের পরিচালনায় বাঙলাদেশে আর একটি প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেল, এ সংবাদ গেল হপ্তাহেই জানানো হ'য়েছে। শোনা যাচ্ছে, এরা সাধনা বোসকে এদের প্রথম ছবির নায়িকা করবার জন্য চেষ্টা কোরছেন এবং ব্যবস্থা কতকটা এগিয়েছে।

ইউনাইটেড টকীজ

আজ এদের শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হবে। এদের বইয়ের নামকরণ হ'ল "ছন্দ"। এতে অভিনয় করবার জন্য মনোনীত হ'য়েছেন, অহীন্দ্র চৌধুরী যোগেশ চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, শরৎ চ্যাটার্জ্জি, নৃপতি চ্যাটার্জ্জি, জ্যোৎস্না গুপ্তা।

সরমা পিক্‌চার্স

'অরোরার' ষ্টুডিওয় এদের প্রথম ছবি "মায়ামৃগের" শূটিং দ্রুতগতিতে চলছে। এই ছবির পরিচালক থেকে আরম্ভ কোরে শিল্পীরা পর্য্যন্ত সবাই একেবারে আনকোরা।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের প্রযোজনায় ও শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় "অভিনয়ের" চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে সমাপ্তির দিকে চলেছে। একটা বিরাট থিয়েটার ষ্টেজ ও অডিটোরিয়ামের সেটিং তৈরী হচ্ছে, সেই জন্য ইনডোর শূটিং এখন বন্ধ আছে; তবে ইতিমধ্যে কতকগুলি বহির্দৃশ্য তোলা হচ্ছে। সেদিন ত্রিপুরার মহারাজার গৃহে ও রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের উদ্যান বাটীতে কয়েকটি দৃশ্যের শূটিং চলেছিল।

* * *

প্রকাশ যে, ধীরেন গাঙ্গুলী এই প্রতিষ্ঠানে একটা Chance পাবার জন্য ঘোরাঘুরি কোরছেন। বাবুলাল চোখানিকে বই প'ড়িয়েও শুনিয়েছেন—তিনি এখনও রায় দেন নি। "অলীক বাবু" হ'লে মন্দ হয়না।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে মেট্রোপলিটন পিক্‌চার্সের কৌতুক এবং বিদ্রূপাত্মক সরস চিত্রকাহিনী "হাল বাঙলা" ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ কোরল।

(গল্প)

শ্রীজগত দাশ

ট্রামে গিজগিজে-ভির—পাশ ফেরবার উপায় নেই যেনো। উপরি উপরি ক'দিন শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। মনটাও নেতিয়ে আছে—একদম বাজে হোয়ে গেছি আর কি!

বৃষ্টি ছিলনা, অনেকদিন কোলকাতাকে খুব সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ সেদিন কোথা থেকে আকাশে বান ডাকলো, উপর থেকে অজস্র জলের ফোয়ারা পড়লো পৃথিবীর বুকে—পৃথিবীর রূপ গেলো বদ্‌লে কদর্য্য, সঁ্যাতস্যাতে হয়ে!

এস্‌প্ল্যানেড-গামী ট্রাম্ খিদিরপুর ঘুরে যাবে। ভীষণ ভীড় আর এক ঘেয়েমী। সময়টা কাটানো মুস্কিল।

ক'দিন থেকে একটা গল্প লিখি-লিখি করে লেখা হচ্ছেনা। পূজোর ছুটীতে দেশে গিয়েছিলাম। মেসের অবস্থা এই ক'দিনেই বর্ণনাতীত, শোচনীয়। দোয়াতে যে কালি ছিল তা' শুকিয়ে গেছে। মর্চে ধরা নিব শুদ্ধ হ্যাণ্ডেলটা গড়িয়ে আছে তক্তপোষের তলায়, কুৎসিৎ মেয়েরও হাসি পায় এমনি-তরো দশা হোয়েছে বিছানার। ঘরে পা দিতে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে—এর ভেতর সাহিত্য করে কার সাধ্যি।

বৃষ্টিটা ধরেছে একটু, চারিদিকে বেশ একটু জমাট শীত-শীত আবহাওয়া। কল্পনা করতে ভারী আরাম। দেহটা আলসেমির মরফিয়া-মায়া কাটিয়ে উঠেছে প্রায়, মনে লাগলো গল্পের নেশা।

বৃন্দাবন চোখ খুলেই হাত বাড়ালো, ওপাশে পাশবালিশে হাত লাগলো। সুন্দরী নেই। উঠে গেছে সুন্দরী এই ভোরেই। সুন্দরীর আজ কত কাজ, ওর কি আলসেমী করে বেলা ক'রে উঠলে চলে? কাল রাত্রে এটো বাসন মাজা হয়নি। আজ না মাজলে কাউকে একগ্লাস জল দেবারও উপায় নেই। স্বাধীনভাবে কি তাই ঘাট পাবার জো আছে যে সুন্দরী চট্ ক'রে মেজে আনবে? এ যায়গায় পাঁচ সাত খানা বাড়ী। সবার ঐ মাচা বাঁধা একখানি ঘাট। এ সময় পৃথিবীর সব জল যেনো এই ঘাটেই এসেছে। একটুখানি পরিশ্রম করলে সবাই একটা একটা আলাদা ঘাট বেঁধে নিতে পারে—কিন্তু চলে যখন যায়—

খুব যদিও নিরুপদ্রবে চলেনা। ঝগড়া-ঝাটিতো লেগেই আছে। নূতন বৌ একরাশ বাসন পত্র নিয়ে ঘাটে নেমেছে। সেই যে একটার পর একটা ছাই আর ঘাস দিয়ে ঘসছে তো ঘসছেই—খেয়াল নেই কিছুরই। আঙ্গুরের রসে ভরা টসটসে ওর যৌবন। মাজায় আচ্ছা করে কাপড় জড়ানো, গায়ে খাটো একটা জামা। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই বুকের বোতাম খোলা। দু'খানা হাত আর দু' পায়ের হাটু উলঙ্গ। বুকের মাংসের উচ্চতাও সম্ভাব্যতা ছাড়িয়ে গেছে। রূপ যৌবন নিয়ে নূতন বৌ যেনো ঘাটে এসেছে লোক দেখানো বাসন-কোসন নিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করতে—নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে।

"আমরাও একদিন এগ্রামে বৌ হোয়ে এসেছিলাম" বুঝা গেলো নূতন বৌয়ের ঔদ্ধত্য সরলার সহ্য হয়নি। সহ্য হবে কেনো সরলার? বলুক তো কেউ, সরলা গ্রামের পূজনীয় কারও সঙ্গে মুখ উঁচু ক'রে কথা বলেছে নাকী এপর্য্যন্ত? তিন চার বছর অবধি মেয়েরা কেউ ঘোমটা না তুলে তার মুখ দেখতে পায়নি। কেউ ঘোমটা তুলে ধরলে সুন্দরী যথাসম্ভব চোখ বুজেই রয়েছে। অস্বীকার করুকতো কেউ?

হাপাতে হাপাতে এতক্ষণে সরলা কথা-গুলো বুঝতে পেরেছে।

"তা ছাড়া চোখ তো আছে দেখতে তো পাচ্ছে অসুখ মানুষ।" নেত্যর মা ছাই দিয়ে দাঁত ঘস্‌ছিল সরলাকে সহানুভূতি দেখানোর এ সুযোগ উপেক্ষা করলো না। সরলাকে যদি সন্তুষ্ট করা যায় লাভ বইকি! নিশ্চয়ই লাভ আছে নেত্যর মায়ের। রোগে ভুগে ভুগে মেজাজ-মাজা-ঘসা না থাকলে কি হয়? মনটী সরলার খুব পরিষ্কার তা' অতদিন রোগে ভুগলে মেজাজ খিটখিটে একটু সবারই হয়। নিজের ঘরে না থাকলে তেল, নুন, মরিচ এমনকি চা'ল, ডা'ল অবধি নেত্যর মাকে ধার দিতে কোনদিন না করেনি সরলা। কতদিন তো ধার শোধ নিতেই ভুলে গেছে সরলা। দিতে গেলেও সে না করে' মাঝে মাঝে। নেত্যর মাকে পর তো ভাবে না সরলা।

রূপসী ব'লেই একসময় খ্যাতি ছিল সরলার। পরপর একটী ছেলে, একটী মেয়ে এবং অনেক দিনের সুতিকা ভোগা চেহারা এক রকম ভেঙেই পড়েছে বলতে হ'বে। রংটাও আগের মত তত ডাকসাইটে নেই, অনেকখানি ফ্যাকাসে হোয়ে গ্যাছে।

সরলা নূতন বৌকে একেই সুনজরে দেখে না। যে রূপের দেমাক নূতন

বৌয়ের! রূপ তো একদিন তাদেরও ছিলো।

এতক্ষণে হাতের ওপর এটো বাসন সাজিয়ে সুন্দরী এলো। "একটু তাড়াতাড়ি করো নূতন বৌ আমার আজ আবার ম'রবার সময় নেই।" উপর থেকেই তাড়া দেয়।

সরলা এতোক্ষণ কলসীটা সামনে নিয়ে বসেছিল। সরলা এবার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পড়লো—একটু তীক্ষ্ণ হোয়েই দাঁড়ালো সরলা।

মানুষের আক্কেল ব'লে একটা কিছু থাকা চাইতো! সেই ভোর থেকে ঘাটের আশায় এরা বসে আছে; অথচ সুন্দরী এলেই—অত নবাবী বাপু এখান চলবে না। সে রকম হোলে নিজেদের একটা ঘাট বেঁধে নিতে হয়। কথাগুলো অবিশ্যি নরম করেই বলে সরলা। সুন্দরীর সঙ্গে তো আজ ঝগড়া করা চলে না। সুন্দরীর মনও আজ বিবাদে বিমুখ। যে পথে এসেছিল সুন্দরী বাসন রেখে আবার সেই পথেই চ'লে গেলো।

দীর্ঘ দু' বছরের বন্দীদশা কাটিয়ে তারা আজ পৃথক হচ্ছে। দু'বছর আগে এ বাড়ীতে এসেছে সুন্দরী। চারিদিকে মাঠ মাঝখানে কোঠা বাড়ীর মতো একখানি গ্রাম। গাড়ী নেই, বাড়ী নেই, সহরের কোনো চিহ্নই নেই; আছে কতকগুলো ছোট ছোট কুটীরে আর অর্দ্ধ-সভ্য একগাদা মানুষ। সুন্দরীর দম আটকে এসেছিল প্রথমে। এরা না জানে কথা বলতে না বা আচার, ব্যবহার। কি ছাই, অসভ্য রসিকতা এরা যে করে। ঘেন্না করে সুন্দরীর এদের সাহচর্য্যে।

সুন্দরী ছোট বেলা থেকেই সহরেই মানুষ। ধরতে গেলে প্রায় বিনা কারণে বৃন্দাবনের সঙ্গে তার বিয়ে হোয়ে গেলো। সুন্দরী শুনেছিল বৃন্দাবনের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে। তাই বলে বৃন্দাবন যে তাকে নিয়ে সেই পাড়াগাঁয়েই ঘর বাঁধবে সে কথা ভাবেনি সুন্দরী। আর পাড়াগাঁ সম্বন্ধে এত কদর্য্য ধারণাও ছিলনা সুন্দরীর—কোনো ধারণা ছিলনা বল্লেই হয়।

সহরে ছোট খাটো একটা চাকুরী পেতে বৃন্দাবন শুধু প্রাণ দিতে বাকী রেখেছে। চাকুরী জোটেনি, তাইতো সহরে বৌ সুন্দরীকে নিয়ে অবশেষে বৃন্দাবনকে বাড়ীতেই উঠতে হলো। কিন্তু বসে থাকলে দেশেও বেশীদিন থাকা চলেনা, সংসার অচল হোয়ে আসে, গ্রামের লোকে সামনে নানারকম সুপরামর্শ দেয়। আড়ালে কেউ হাসি ঠাট্টা করে কেউ বা গালাগালি করে, গ্রামের হাওয়াটা যেনো নোংড়া হোয়ে গেছে। সবাই বলে পাটের ব্যবসায়ে নাকী খুব লাভ। দু'চারজন গ্রামের অন্যলোকও যাবে বৃন্দাবনের সঙ্গে ব্যবসায় করতে। এই বর্ষার কটা মাস ঘুরে এলে, সারা বছর ঠিক পায়ের উপর পা দিয়ে না কাটাতে পারলেও ভাবতে যে বেশী হবেনা একথা ঠিক। গ্রামের চার ধারে বর্ষার কালো জল টল টল করছে—তার মাঝে এই ছোট্ট গ্রামখানি যেনো টাল সামলাতে পারছে না।

গাঁয়ের গেঁয়োমী এতোদিনে প্রায় স'য়ে এসেছে সুন্দরীর। তবুও এই তেপান্তরের মাঠে, বর্ষার ঘন-নীল নীরবতার মধ্যে সুন্দরীকে রেখে যেতে বৃন্দাবনের মন সায় দেয় না। ছেলেমানুষ সুন্দরী যদি কোনো বিপদ্ আপদ্ কণ্টকিত হোয়ে উঠে বৃন্দাবন একদিনও তো বাঁচতে পারবে না সুন্দরীকে ছেড়ে। এই আত্মীয় পরিচয়হীন পুরীর মধ্যে বৃন্দাবনই সুন্দরীর একমাত্র বন্ধু—সহচর।

বৃন্দাবনের আপনার বলতে কেউই নেই। বুড়ীমা অনেকদিন বেঁচে ছিলেন ছেলের বৌ দেখবেন বলে। কিন্তু সুন্দরী আস্বার কিছু আগেই তিনি চলে গেছেন। একে অন্যকে ভালো চোখে দেখতে না পারা এ গ্রামের স্বাভাবিক রীতি। যে অপেক্ষাকৃত সুখী তাকে সবাই বিস্ফোটকের মত বিদ্ঘুটে মনে করে। বৃন্দাবনের অবস্থা এই নিয়মে শোচনীয়। যেখানে গ্রামের প্রায় সবাইকে মাসে দু'চারদিন না খেয়ে থাকতে হয়, সেখানে দু'চারজন অন্য লোককে খাইয়েও বৃন্দাবনকে না খেয়ে থাকতে হয় না। বৃন্দাবনের বাবা কিছু ধানের জমি রেখে যান—ধান তাতে ভালই ফলতো—প্রচুর বলা যায়। বৃন্দাবন গ্রামের দশজনের রাঙ্গা চোখ আর ভাঙ্গা স্নেহ উপেক্ষা কো'রে লেখাপড়াও শিখেছিল কিছু। এসবও ততটা মারাত্মক ছিল না। কিন্তু যখন বৃন্দাবনের সহরে বিয়ের খবর গ্রামে এলো, গ্রামের মেয়ে পুরুষ সে দিন মরিয়া হোয়ে উঠলো, কিছুতেই তাদের সমালোচনাকে সামলানো গেলো না। এ গ্রামের এই ঘাট সর্ব্বজনীন বৈঠক।

নেতার মাই প্রথমে আরম্ভ করলে, "শুনেছিস্ সরলা বৃন্দাবন যে বিয়ে করেছে সে নাকী কায়েতের মেয়ে নয়।"

"কায়েত না ছাই! পাঁচু বিশ্বাস সব খবর নিয়ে এসেছে, তাঁকে তো আর ফাঁকী দেবার উপায় নেই, বৃন্দাবন নাকী বদ্দি বিধবার মেয়ে বিয়ে করেছে। কালে কালে আরও কত দেখতে হবে," সরলা উপসংহার টানলো।

রমা কথা কম বলে, হাসে বেশী। এমন একটা মুখরোচক আলাপে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো রমা, তা'ছাড়া রমার মনও আনন্দে ভরা—এইতো সেদিন বিয়ে হোয়েছে রমার। ভাল ঘর-বরেই বিয়ে হোয়েছে রমার।

শুধু মেয়েদের ঘাটেই নয়। মাঠে রাখাল ছেলেদের ভেতরও এ নিয়ে আলোচন হোয়েছিল সে দিন।

সেদিন যদিও আর নেই, বৃন্দাবন তারপর সুন্দরীকে নিয়ে এ গ্রামেও এসেছে, এ বাড়ীতে বাসও সে করছে দু'বছর। সুন্দরী নিজের চেষ্টায় সে সব কুশ্রী আবহাওয়া কাটিয়ে উঠেছে, সবাই তাকে—বলা যায়—বেশ ভালোবাসে।

সে সব দিনের কথা বৃন্দাবন কিছুতে ভুলতে পারে না। সুন্দরীকে একা রেখে যেতে মন তার তাই সায় দেয় না। সেই সব লোকই তো আছে যারা সুন্দরীকে সব সময় জালিয়েছে একদিন। মন ওদের বদ্‌লেছে চেহারা ঠিকই আছে। পুরনো প্রবৃত্তি ফিরে পেতে কতক্ষণ।

অনেক চেষ্টায় শেষে বৃন্দাবন নিজেকে রাজী করতে পেরেছে। তা'ছাড়া উপায়ই বা কী? সারাজীবন ঘরে বসে থাক্‌লে কি চল্‌বে? এখন না হয় দু'টো প্রাণী এক রকম চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে—বলা তো কিছুই যায় না। অবিশ্যি দু'বছরের মধ্যে সেরকম কিছু লক্ষণ দেখাতে না পারায় ছোট খাটো একটা অখ্যাতি আছে সুন্দরীর।

টাকার অভাবে বৃন্দাবন অনেক দুঃখ নিজের ভেতরে পুষে রেখেছে। সহরের চাক্‌চিক্য ছাড়িয়ে সুন্দরীকে আদিম পাড়া-গাঁয়ে নিয়ে এসেছে বৃন্দাবন, তবু প্রলোভনের সামান্য রকম কিছুই এ পর্য্যন্ত সে দিতে পারেনি সুন্দরীকে—না বা একটা খোকা। কানে দুটো দুল পড়বার সুন্দরীর বড় সখ। এবার অনেক দিনের জন্য বৃন্দাবন বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে। প্রথমে সে যদি দুল দু'টো নিয়েই বাড়ী ফিরতে পারে কি আনন্দই না হবে সুন্দরীর। ব্যবসায়ে সেরকম লাভ হলে ওরা দু'জন না হয় একবার কোলকাতাই ঘুরে এলো, টাকা পুঁজি ক'রে তো কিছু লাভ নেই।

সুন্দরী কোন ভোরে উঠে গেছে। খাটের অঘটনের মধ্যেও কোন্ সময় সে বাসন মেজে এনেছে, ঘরদোর পরিষ্কার করেছে। স্নান সেরে নিয়ে ধান দূর্ব্বা তুলেছে। শোবার ঘরের মেঝের উপর এক রকম পূজোর আয়োজন ক'রেছে পর্য্যন্ত।

বৃন্দাবনের বিছানা ছাড়বার নামও নেই, উঠলেই যেনো তাকে চলে যেতে হবে। আর কতদিন সুন্দরীর সঙ্গে দেখা না হয় তার ঠিক কি? "ওঠো কত বেলা হলো।" বৃন্দাবনকে নাড়া দিল সুন্দরী। এতক্ষণে চোখের পাতা খুল্ল বৃন্দাবন—টেনে খোলবার মত। বৃন্দাবন অবাক! এসব কী? বাঘের চোখের মত একটা মাটীর প্রদীপ জ্বলছে মেঝেতে। জানালার ফাঁকে ঘরে রোদ ঢুকেছে—চুরি ক'রে ঢোক্‌বার মতো। তার যাত্রার আয়োজন। বৃন্দাবন কেঁপে উঠলো। তাকে চলে যেতে হ'বে। সুন্দরীকে ছেড়ে বহুদিনের জন্য বহু দূরে আজ তাকে চলে যেতে হ'বে।

আকাশের আলস্য কেটে বৃন্দাবনের দেহে এলো যান্ত্রিক ক্ষুধা। উদগ্র কামনা দিয়ে সুন্দরীকে ও বুকের উপর টেনে নিলো—প্রায় মাতালের মতো। বুকের মাংসপেশী হলো সুন্দরীর আবেক-কুঞ্চিত। ওরা ভুলে গেলো পৃথিবীকে, এত সব আয়োজন কেন, উচ্ছল রক্তবিন্দুগুলির দ্রুত পদচালনা ওরা প্রাণভরে শুন্‌লো—শরীরের সবটুকু শীতলতা দিয়ে।

নৌকাখানা বেশ বড়। ফুলপাতা ও তেল সিঁদুরে পরিপাটী ক'রে সাজানো। অনেক লোকে এসে ভীড় করেছে, —এ গ্রামে এ বছর এই প্রথম নৌকা যাত্রা কি না। যে সব যায়গা অসাবধানে অসমাপ্ত রয়েছে—দড়ি ও ছুঁড়ি হাতে বসন্ত সে গুলি মেরামত করছে, ললিত আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র তুলছে আর হাক ডাক করছে।

"একখানা চাটাই আন্‌তে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। শিগ্গির একগোছা পাট নিয়ে এসো—নৌকোর আগ্‌ডালে বাঁধতে হবে।"

"খুঁজে কি আর পাওয়া যায়, যে কোণে রেখেছিলো ললিত দা।" বসন্ত আবার এক গোছা পাট আনতে যায়।

মোট চারিজন যাত্রী, বৃন্দাবন, বসন্ত, ললিত ও মদন। এদের ভেতর বৃন্দাবন বিত্তায় জ্যেষ্ঠ আর মদন বয়সে কনিষ্ঠ, কাজের লোক ললিত আর বসন্ত। এতক্ষণ বৃন্দাবন একবারও নৌকার কাছে এলো না। মদনতো কোনো কাজ করতে পারে না—ছেলেমানুষ তাই টুকটাক্ এগিয়ে দিচ্ছে মাত্র। ললিত আর বসন্ত কর্ম্মীলোক কাজ কি আর প'ড়ে থাক্‌বে? পঞ্জিকার মতে যাত্রার শুভ লগ্ন চ'লে যায়। বৃন্দাবন আর দেরী করতে পারে না। বৃন্দাবনও সেজেছে কম না। ঠিক বিয়ের দিনের মতো। সুন্দরী আর বৃন্দাবন খাটের ওপর বসেছে পা ঝুলিয়ে, গায়ে গায়ে ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে।

"আমার জন্য কি খুব কষ্ট হ'বে মনি?" বৃন্দাবন প্রায় সুন্দরীর কানে কানে বলে। সুন্দরী কথা বল্‌তে পারে না—আরও একটু ঘণ হোয়ে যায় বৃন্দাবনের বুকের কাছে।

"আমি কত টাকা নিয়ে আস্‌বো। তোমার অনেক দিনের সখ দুটো দুল পড়—এবার এসেই তোমার দুল গড়িয়ে দেব।" আদর ক'রে সুন্দরীর গাল টিপে দেয় বৃন্দাবন। কে যেনো সুন্দরীর গলা টিপে ধরেছে—কথা সুন্দরী বল্‌তে পারে না; বোবার মত চেয়ে থাকে বৃন্দাবনের দিকে।" যখন যে বন্দরে থাকি তোমায় চিঠি লিখবো—উত্তর দিও কিন্তু। হাটবারে অক্ষয়দাকে দিয়ে বেশী ক'রে পোষ্ট কার্ড কিনে রেখো। বৃন্দাবন সুন্দরীর ঠোঁটে চুমু খায়।

সুন্দরী বৃন্দাবনকে প্রণাম ক'রে বলে "চিঠি দিতে ভুলো না যেনো।"

সবই তৈরী নৌকা ছাড়লেই হয়। যথেষ্ট লোক জমেছে ঘাটে। ভীষণ ভীড়। তারা যেনো তীর্থ কর্‌তে চলেছে। অকারণ পুলকিত হোয়ে উঠে বৃন্দাবন। নৌকা ছেড়ে দিল। বৃন্দাবন শেষ বারের জন্য সুন্দরীর চোখের ওপর হাসলো।

* * *

ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে। নড়বার নামও নেই। এতক্ষণে হাজড়ার মোড়। ভীড়ের ওপর অসম্ভব ভীড়—বোঝার ওপর শাকের আঁটী—এক সঙ্গে অনেকগুলি লোক উঠছে, পিঁপড়ের সারীর মতো। উড়িষ্যাবাসী এক পাল মেয়ে পুরুষ মিলে বাংলায় এসেছে তীর্থ ক'র্‌তে। এতক্ষণে ওদের ওঠা শেষ হলো এবার বসবার পালা। সারবন্দী মেঝের ওপর ওরা বসে গেলো—বণ্ডাক-টারের টিকেট দেবার পথ রাখলে না পর্য্যন্ত। বসলো ওরা নীচে, ন'ড়ে চ'ড়ে বসতে বড় ভয়ে মরে, টিকেট চাইলে কাঁপে অসুস্থ জীবের মতো তাঁদের চাউনী

চিড়িয়াখানা দেখতে চলেছে।

এদিকে এক হিন্দুস্থানী পুলিশ আর মৈমনসিংহবাসীতে আলাপ জমে উঠেছে। আমার হাতে কোনো কাজ নেই মনোযোগ দিলাম হিন্দুস্থানীটি কতদিন মৈমনসিংএ কাটিয়েছে, বাংলার কোন্ জেলার জলবায়ু কেমন, ন্যাশকাটা পুলিশে আর বেঙ্গল পুলিশে,—এস্ বি তে আর আই বি তে কি পার্থক্য তার ক্রমিক বর্ণনা দিচ্ছে, ভদ্রলোকও চুপ ক'রে শুনছেন না। এখন তাঁর কতজন আত্মীয় পেন্সনভোগী সরকারী কর্মচারী,—তার মেজো মামার বড় ছেলে দারোগা,—এখন কোথায় আছে এবং আরও অনেক কিছু ধারাবাহিক ইতিহাস।

এদিকে পাণ্ডা ঠাকুর যাত্রীদের জন্য এক সঙ্গে আঠারোখানা টিকেট কাটে, গুনে দেখা গেলো তারা ষোলটী প্রাণী। দু'খানা টিকেট ফেরৎ দেয়া নিয়ে হিন্দুস্থানে আর উড়িষ্যায় ছোটো খাটো একটা প্রলয় হোয়ে গ্যালো।

পুলিশটা বোধহয় এবার নেমে যাবে।

"আপনার বাড়ী কোথায়?" পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

"বিহাণীর কাছে মৌছি"

"Your Behani and Mauchi both dead to me" ভদ্রলোক সশব্দে হেসে উঠলেন।

চুপ চাপ

পদ্মার গভীর বুকে দাগ কেটে বৃন্দাবনের নৌকা চলেছে। নৌকা বুঝাই পাট। প্রথম প্রথম বৃন্দাবনের ভয় হয়েছিল। করেনিতো কোনোদিন বৃন্দাবন একাজ। আসলে কাজটা তত কঠিন নয়—অন্ততঃ যতটা ভাবা গেছিলো।

তিন চালান দিয়েছে বৃন্দাবন। এপারের হাটে কিনে ওপারে মহাজনের ঘরে পৌছে দিলেই বৃন্দাবন খালাস। তিনবারের একবারও মন পিছু আট আনার কম লাভ হয়নি। বৃন্দাবনের বড় দুঃখ তাঁর নৌকা-খানা বড্ড ছোট। পঞ্চাশমন পাটও ধরে না ভালো করে। আগে কি জানত বৃন্দাবন, না হয় আর বিশ টাকা ঢালতো নৌকোর পিছনে।

বসন্ত আর ললিত প্রাণপণে দাঁড় টান্‌ছে। মদন অন্যকাজ করে—ছেলেমানুষ তো সে। বৃন্দাবনের অভ্যাস নেই এ কাজ তবু হাল ধরতে সে জানে। বসন্ত যখন ঠাট্টা ক'রে তাকে মাঝি মশায় বলে—মনে মনে পুলকিত হয় বৃন্দাবন।

রোদের আলো কমে চারিদিকে পাতলা অন্ধকার নেমে আসছে জলের ওপর পড়েছে তামাটে রং।

"সকাল সকাল পাড়ি জমানো ভালো—কি বল ললিতদা।" বৃন্দাবন মন্তব্য করে।

"সেই ভালো দক্ষিণ-পশ্চিম করে ধরো।"

বৃন্দাবন নৌকো দক্ষিণ-পশ্চিম করে ধরে।

এ পর্য্যন্ত সুন্দরীকে একখানা চিঠিও লিখবার সময় ক'রে উঠতে পারেনি বৃন্দাবন। সুন্দরী হয়তো কতকি ভাবছে, রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারছেনা। স্নান-খাওয়া-দাওয়া হয়তো বন্ধ করে দিয়েছে। যে ছেলেমানুষ সুন্দরী। আর দেরী না কালই একটা চিঠি লিখবে বৃন্দাবন। তার সাফল্যের কথা শুনে সুন্দরী না জানি কত পুলকিত হোয়ে উঠবে।

ছলাৎ ছল্ শব্দে জল কেটে নৌকো চলেছে। কবিতা আসে বৃন্দাবনের। ক'মাস পর বৃন্দাবন সুন্দরীকে দেখবে। এতোদিনে আরও সুন্দর হ'বে সুন্দরী। এ ক'মাসে নূতন প্রেমের মতো হয়তো ওদের ভেতর মধুর অপরিচয় জমে উঠবে। প্রথম প্রথম আবার হয়তো সুন্দরীর ঠোঁট কাঁপবে।

পদ্মার ঢেউগুলি ক্রমে যেনো বড় হচ্ছে আকাশের গায়ে টুক্‌রো টুক্‌রো কালো পাহাড়। মেঘ না তো? সর্ব্বনাশ মেঘ যদি ঝড় ওঠে। বৃন্দাবনের বুক শুকিয়ে যায়। আরও জোড়ে দাঁড় টান্‌ছে ওরা সবার মনেই পুঞ্জিভূত ভয়। নৌকো আর একটু কম বুঝাই করলেই পার্‌তো বৃন্দাবন। প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আসছে। এবার বোধ হয় নৌকো আর বাঁচেনা।

এক সঙ্গে সবাই হায় হায় ক'রে উঠলুম। একখানি প্রকাণ্ড ট্যাক্সী দু'জন আরোহীসহ একটা রিক্সাকে গুড়িয়ে দিয়ে গেলো।

ট্রাম দাঁড়িয়ে গেছে।

—শেষ—

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রমানাথ হইতে অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ কিঙ্কর সেন রত্নেশ্বর সেনের পুত্র। কিঙ্কর পাঠান আমলের শেষ ভাগে একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন (তিনি সাধারণতঃ ভুঞা বলিয়া খ্যাত)। আমরা একেবারে স্তম্ভিত যে, বসুমজুমদার মহাশয়ের নিকট প্রাচীন রাজা চন্দ্রকেতু এবং কিঙ্কর সেন অভিন্ন-ব্যক্তি। একথার কোন মূল্যই কোনদিন দিতে আমরা স্বীকৃত নহি। রাজা চন্দ্রকেতু কিঙ্কর সেনের বহু পূর্ব আমলের। এতদ্ব্যতী-রেকে কিঙ্কর দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ, এবং রাজা চন্দ্রকেতু পৌণ্ড্র (অথবা পৌণ্ড্র) বংশোদ্ভূত। এক্ষণে সংক্ষেপে তাঁহার (চন্দ্রকেতুর) কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

২৪ পরগণার দেউলিয়া নামক স্থানে রাজা চন্দ্রকেতু রাজত্ব করিতেন। শেখ জয়নুদ্দিন ও শেখলাল রচিত দুইশত বৎসর পূর্বের প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়।

"চন্দ্রকেতু নামে রাজা দেউলায় যাঁর স্থান
মরা মানুষ জীয়ায় রাজা বড় পুণ্যবান্॥"

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বিখ্যাত সেন রাজবংশের রাজত্বকালে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু কোন্ সময় জন্মিয়াছিলেন। তাহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হইবার উপায় নাই। তবে তিনি যে বঙ্গেশ্বর আলাউদ্দীনের (ইনি সম্রাট আলতামস্ কর্ত্তৃক বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন) সময় (১২৩০—১২৩৭ পর্য্যন্ত) বিদ্যমান ছিলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহার অবসান ঘটে সে সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন পীর গোরাচাঁদ (গোরাই গাজী) নামে একজন মুসলমান ফকির তাঁহাকে মুসলমান করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রতাপান্বিত নিষ্ঠাবান রাজাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই।

"* * * তবু রাজা চন্দ্রকেতু আঁড়ি করে রয়॥
নামানে গোরাই পীর,দেমাগ করিয়া * * * *—

(শেখ জয়নুদ্দীন ও শেখলাল রচিত প্রাচীন পুঁথি)। ফলে গোরাই গাজী রাজ সরকারে তাঁহার নামে নালিশ করেন। ঐ সময় বালাণ্ডায় পেয়ার শাহ নামক এক ব্যক্তি পাঠান শাসন-কর্তা ছিলেন। রাজা চন্দ্রকেতুর সর্বনাশ সাধনের ভার পেয়ার শাহের উপর ন্যস্ত হয়। পেয়ার শাহ সাতন নামক দূতের দ্বারা রাজাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। (পল্লীবাণী —১৩২৫)। অনেক ভাবিয়া রাজা চন্দ্রকেতু তখন পেয়ার শাহের সহিত সন্ধি করিতে মনস্থ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে যান। তথায় তাঁহার উপর নানাবিধ অত্যাচার হয়। তাঁহার নিকট খিরিণী পায়রা (Carlix Pegeon) ছিল (Hunter's Statistical Accounts Vol. 1)। পেয়ার শাহ তাঁহাকে বন্দী করিলে পায়রা উড়িয়া গিয়া সংবাদ দেয়, তাহাতে পরিবার-বর্গ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাজা চন্দ্রকেতু শেষে উদ্ধার পাইলেও স্বজনহীন জীবন ধারণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া, পরিবারবর্গের পথানুসরণ করেন।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে একটি প্রধান বিষয় অবগত হইতে পারা যায় যে, রাজা চন্দ্রকেতু যে সময়েই জন্মগ্রহণ করুন না কেন ১২৩০—১২৩৭ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, অর্থাৎ ১২৩৭ এর পর তিনি জীবিত ছিলেন না। এবং রত্নেশ্বর-তনয় কিঙ্কর সেনের কাল হইতেছে তাহার পর—পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি অবধি।

বসুমজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—(১) হুসেন শাহ, সুলেমান কররাণী এবং দাউদ খাঁকে রাজস্ব না দেওয়ায় পাঠান দিগের সহিত কিঙ্কর সেনকে বহুযুদ্ধ লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তিনি নাকি পাঠানদিগকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আরো পড়িলাম (২) কিঙ্কর না-কি বাদশাহ আকবরের নিকট হইতে প্রধান ভুঞা, রায় রাইয়া, রায় বাহাদুর, পুরুষানুক্রমিক রাজা বাহাদুর উপাধি এবং স্বর্ণমাণিক্য-খচিত তরবারি খেলাত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, সকল প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে চুনো-পুঁটিটির পর্য্যন্ত বিবরণ আছে, সে সবে কিঙ্করের সামান্য নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। রমানাথ বা তদাত্মজ পুরন্দর সেন বংশীয়গণ কেহই বাদশাহ আকবরের নিকট কোন উপাধি পান নাই। তবে রমানাথ হইতে ১৭শ পর্য্যায় অধস্তন শ্রীনাথ সেন সম্রাট শাহজাহানের সময় শুধু "রাজা" উপাধি প্রথম লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে "বাহাদুর" লেজুড় ছিল না। তাঁহার ঘোষণা আর একস্থানে উচ্চতর হইয়াছে—'বাদশাহ আকবরের কৃপায় দ্বিগঙ্গা বিশাল রাজ্য ১৭০টি পরগণা নিয়া গঠিত হইয়াছিল। ঐ রাজ্যের জন্য দিল্লীশ্বর সম্রাটকে বাৎসরিক একটি ছাগল ও একখানি কম্বল মাত্র রাজস্বস্বরূপ প্রদান করিতে হইত।'—এইরূপ

কথা তিনি বোধ হয় তাঁহারই শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের মনঃকল্পিত তাম্রশাসন ও দলিল-পত্রাদি হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। বাদশাহের সহিত কি তবে বিক্রম সেনের কিছু মিষ্ট কুটুম্বিতা ছিল? ঐতিহাসিকেরা এমন একটি মধুরতম বিষয়কে ইতিহাসে স্থান না দিয়া নিতান্ত ভ্রম করিয়াছেন। 'মহারাজ বিক্রম সেন কায়স্থ দিগের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠিপতি আখ্যাপ্রাপ্ত হন—' ইহা তাঁহার অপর ঘোষণা। বিক্রম সেনকে শ্রেষ্ঠ করিতে তিনি সব একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। মারাত্মক অন্যায়! আসল কথা হইতেছে—বিক্রম সেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় ১৮ পর্য্যায়ভুক্ত কুলীনদিগের একজাই করিয়া সমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

তিনি দ্বাদশ ভৌমিকের তালিকা যাহা দিয়াছেন, তাহাতে কাঁচ ঐতিহাসিকের মত-ও কোন বিচার বা শৃঙ্খলা নাই। এই প্রসঙ্গে মোগল পাঠানের সন্ধিযুগের ইতিহাস কিছু আলোচনা না করিয়াই বসুমজুমদার মহাশয় দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তাঁহাদের সংখ্যা নানাভাবে পূরণ করিতে বিন্দু পরোয়ার অবকাশ রাখেন নাই। আমরা সকল সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত নিম্নে দ্বাদশজন প্রধান ও প্রতাপী ভৌমিকের তালিকা দিতেছি।—(১) ঈশা খাঁ মসনদ আলি—কত্রাভূ (২) প্রতাপাদিত্য গুহ—যশোর (৩) চাঁদরায়-কেদার রায়—শ্রীপুর (৪) কন্দর্পনারায়ণ রায়—চন্দ্রদ্বীপ (৫) লক্ষণ মাণিক্য—ভুলুয়া (৬) মুকুন্দরাম রায়—ভূষণা (৭) ফজল গাজী—ভাওয়াল (৮) হাম্বীর মল্ল—বিষ্ণুপুর (৯) কংস নারায়ণ—তাহিরপুর (১০) রামকৃষ্ণ—সাস্তোল (১১) পীতাম্বর—পুঁটিয়া (১২) ঈশা খাঁ লোহাণী—হিজলী। এই দ্বাদশজন ভৌমিক ব্যতীত আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিক অনেক ছিল। তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিক্রম-পুত্র মদনমোহন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক, এই মদনমোহনের সহিত প্রতাপের একবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রম সেন বাদসাহ আকবর কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গের ১৪টি পরগণার সনন্দ পান। বিক্রম-পুত্র তাহাই ভোগ করিতেছিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মদনমোহনের নিকট হইতে ১৪টির মধ্যে ১৩টি পরগণা—কাশেমপুর, শিবপুর, তাপ্পে রুদ্রপুর, বনগ্রাম, মধুদিয়া, সুলতানপুর, সৈয়দ্‌খাংকুল, আবদুল্লাপুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, সেলিমাবাদ, নাজিরপুর ও হাবেলী অধিকার করিয়া লন ("বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যুবরাজ শাহাজাহান যখন পিতৃদ্রোহী হইয়া বঙ্গে আসেন (১৬২২), তখন মদনমোহন উপহার সম্ভার সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মোগল সরকারে কর্ম্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ক্রমে তিনি কার্য্যদক্ষতাগুণে ঢাকার নবাবের সুদৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার সুবিধার সহিত পূর্ব্ববঙ্গের পরগণা সমূহের রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে মদনমোহন নিজ পুত্র শ্রীনাথ সেনের নামে সেলিমাবাদ পরগণায় ফরমাণ প্রাপ্ত হন (Beveridge's History of Bakhargunj)। পরে তিনি আরো কতিপয় পরগণা লাভ করিয়া সম্রাট শাহজাহানের সময় "রাজা" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নথুল্যাবাদ তাঁহার রাজ কাছারী, গড় ও দেবমন্দির ছিল (যশোহর খুলনার ইতিহাস)।

তারপর বসুমজুমদার মহাশয়ের মতে রাজা 'শ্রীনাথ রায়ের (শ্রীনাথ সেনের) সময় যশোরের জায়গীরদার প্রতাপাদিত্য গুহ রায়ের অভ্যুদয় হয়।'—ইহা কি কোন প্রামাণিক ইতিহাসে তিনি দেখাইতে পারেন? তদ্ব্যতীত মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে তিনি স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রকাশ্যভাবে মোগলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহার পরাক্রমে দিল্লীর প্রবল বিজিগীষু ভারত সম্রাটের সিংহাসনও কম্পিত হইয়াছিল। H. J. Rainey's Proceedings of the Asiatic Society-তে আছে—"Maharaja Pratapaditya became so powerful as to exercise sway over all the Rajahs of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul." রামরাম বসু লিখিয়া গিয়াছেন—"এখন বাঙ্গালা ও বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার। ইহাদের রাজচক্রবর্ত্তী প্রতাপাদিত্য একছত্রী রাজা দিল্লীতে কর দেয় না।" ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাসে পাই—"প্রতাপাদিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা (coin) প্রচারিত করেন। কোনও

রাজার পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার এমন নিদর্শন আর নাই।" সে মুদ্রা যশোর রাজবংশীয়গণের এবং অন্যান্যের মধ্যে ২১ জন স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। মহারাজ বসন্ত রায়ের ৯ম অধস্তন স্বর্গীয় রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় বি-এল তদীয় ইংরাজী "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"Pratapaditya gradually became the undisputed Monarch of Bengal and declared himself independent of Delhi. He struck coins in his own name, some of the coins were seen by the author in his early age."

মদনমোহন-পুত্র রাজা শ্রীনাথ রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের কোন যুদ্ধ হয় নাই এবং হইতেও পারে না। ১৬০৯—১৬১০ মধ্যে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। যুবরাজ শাহজাহানের সময় ১৬২২ খৃষ্টাব্দের পরে পূর্বে লিখিয়াছি শ্রীনাথ সেলিমাবাদ (অর্থাৎ মাত্র প্রথম ক্ষমতা) পান। কিন্তু "রাজা" উপাধি তখনো পান নাই। বেহুলীর দুর্গের নিকট এক যুদ্ধের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যতো দূরের কথা তাঁহার উর্দ্ধতন চতুর্বিংশতি পুরুষের মধ্যে অসনতর নামধেয় স্থানে বা স্থানের চতুঃসীমায় কেহ যুদ্ধ করিয়াছেন কিনা আজো পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ করিতে সক্ষম হন নাই। রাজা শ্রীনাথ রায়ের সহিত বসিরহাটের সন্নিকট সংগ্রামপুরে আরো একবার তিনি প্রতাপের যুদ্ধ বাধাইয়া তৎপুত্র যুবরাজ উদয়াদিত্যকে নিহত এবং শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে বন্দী করিয়াছেন। লজ্জাকর অসত্য! যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান সঙ্কুচিত সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ করা শুধু অনধিকার নয়, অমার্জনীয় অপরাধ। সংগ্রামপুরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের যে যুদ্ধ হয় তাহা বর্দ্ধমানের তদানীন্তন জায়গীরদার শের আফগানের সহিত।—

"সসৈন্যে সামন্ত শের জায়গীরদার,
ছুটিলো ক্রোধান্ধ হ'রে প্রতিশোধ নিতে;
অধুনা বসিরহাট তারি' পরপার
স্থাপিলো শিবির আসি'
অতি অতর্কিতে।"

—(বঙ্গেশ-"বিজয়" কাব্য)
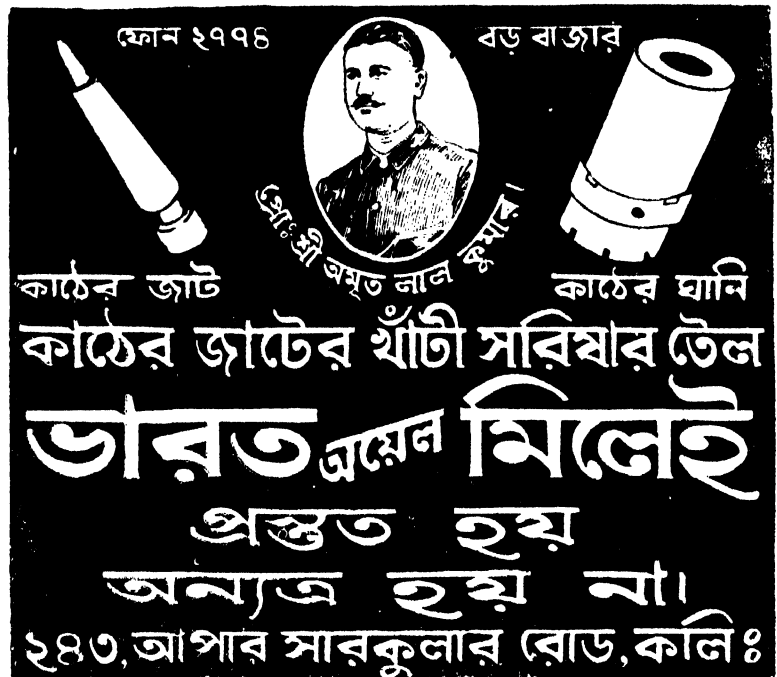
এই যুদ্ধে প্রতাপই বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। সংগ্রামপুরের যুদ্ধে যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং মন্ত্রীবর শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কেহই নিহত অথবা বন্দী হন নাই। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঢাকায় বিশ্বাসঘাতী ইসলাম খাঁ কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দী হইবার পর যুবরাজ উদয় মোগল সেনাপতি মির্জা নথনের সহিত শেষ যুদ্ধে কুশলী রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। উদয়াদিত্য যে মোগল-সেনানী ইনায়েৎ খাঁ ও মির্জা নথনের সময় ছিলেন এবং তাহাদের সহিত বীরবিক্রমে লড়িয়াছিলেন বাহারিস্তান্-ই-ঘাইবী নামক পারসিক গ্রন্থ চিরদিনই তাহার সাক্ষ্য দিবে। মন্ত্রীবর শঙ্কর মানসিংহের সহিত যুদ্ধে বিশেষভাবে আহত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন (সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্য ও সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড)।

তারপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য। আমরা বাহার্-ই-স্তান্-লেখকের চাক্ষুষ প্রমাণ হইতে দেখিতে পাই যে, মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করেন নাই; বন্দী করিয়াছিলেন সুবেদার ইস্লাম খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, এবং তাহাও মানসিংহের ৫।৬ বৎসর পরে। বাহার্-ই-স্তানের ৫৭ (খ) পৃষ্ঠায় অনুবাদাংশ এইরূপ—"* * * * যশোহর হইতে রওনা হইয়া এবং পথ বিভাগগুলি দ্রুত অতিক্রম করিয়া অতি অল্প সময়ে তিনি (ইনায়েৎ খাঁ) জাহাঙ্গীর নগর পৌঁছিয়া নিজে ইস্লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। * * * ইস্লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে শৃঙ্খলের আজ্ঞা দিয়া যশোহর দেশের নেতৃত্বে ইনায়েৎ খাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন।" —ইহার পরেও কি বসু মজুমদার মহাশয় বলিবার সাহস রাখিবেন

যে প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিলেন ?

"সেখানে (ঢাকায়) কারাবাসের সময়েই তাঁহার (প্রতাপের) মৃত্যু ঘটে" —তাঁহার এ কথাও সত্য নহে। —"অথ বদ্ধস্য পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্য বারাণস্যাং পঞ্চত্বম্ ভবৎ"—ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত। —"প্রতাপাদিত্য কাশী পঁহুচ্ 'কর মার্গামে হী কালবশ হুয়া"—রামনাথ বারেটের ইতিহাস রাজস্থান। —"The prisoner (Pratap) however, died on the way, at Benares"—Westland's Report of Jessore. —"He (Pratapaditya) died at Banares on the way"—Rainey's Proceedings of the Asiatic Society. —"পথে যাইয়া বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইল"—রামরাম বসু। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বন্ধু মজুমদার মহাশয় রাজা শ্রীনাথ রায়ের সহিত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ জয়—প্রতাপ পলায়ন করেন—সংগ্রামপুরের যুদ্ধে যুবরাজ উদয় নিহত এবং শঙ্কর বন্দী হন—পরে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপের বন্দীত্ব ও ঢাকায় কারাবাসের সময় মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় লইয়া প্রবন্ধ প্রনয়ন কালে হয় সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিল না, না-হয় তাঁহার পৃষ্ঠপোষিত শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের অমূল্য উপদেশ প্রনোদিত হইয়া তিনি মূল ইতিহাসকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন।

রাজা শ্রীনাথ রায়ের পুত্র রাজা শ্রীরাম রায় মগদস্যু গণের অত্যাচার নিবারণ করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎপুত্র রায়েরকাঠি বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ রুদ্র-নারায়ণ। তিনি আত্মীয়-পরিবার দিগজা হইতে রায়েরকাঠি আনিয়া ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অপর কোন সহোদর ভ্রাতা ছিল কিনা আমরা তাহা পাই নাই। যদিও থাকে রাজা রুদ্রনারায়ণ যে তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাশীধামে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। জ্যেষ্ঠ রায়েরকাঠি থাকেন; মধ্যম বনগ্রামে, তৃতীয় চিংড়িখালিতে এবং কনিষ্ঠ মধ্যিয়ায় উঠিয়া যান। এই ভাবে এই রাজ বংশের জ্যেষ্ঠ মাত্র বরিশাল জেলায় থাকিলেন, এবং অপর তিনজন খুলনায় আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন (রাজা রুদ্রনারায়ণের বিষয় মুখ্যতঃ আমাদের বর্ণনীয় না হইলেও, প্রসঙ্গতঃ বাদ দেওয়া যায় না বলিয়া লিখিলাম)।

বন্ধু মজুমদার মহাশয় কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে রুদ্রনারায়ণকে "কুমার" করিয়া "রামদয়াল" নামক এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে রুদ্র-নারায়ণের অগ্রজ এবং "রাজা" করিয়াছেন। এই করাতে, অর্থাৎ এই জোড়ে, অর্থাৎ রামদয়ালের অস্তিত্বে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ রহিয়াছে। যে হেতু সপ্তদশ শতকের প্রাচীন ঐতিহ্যে আমরা রাজা রুদ্রনারায়ণ —সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাই; কিন্তু বন্ধু মজুমদার মহাশয় "রামদয়াল" সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাস একেবারেই মূক। তবুও আমরা আলোচনা চালাইবার জন্য সাময়িকভাবে তাঁহার আবিষ্কৃত রামদয়ালকে মানিয়া লইলাম। (ক্রমশঃ)

দুর্দ্দিন
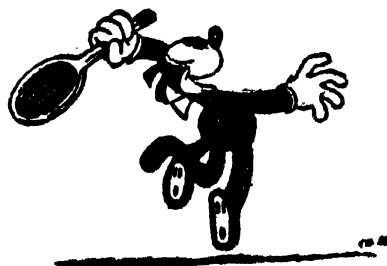
(শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

দুর্দ্দিন ঘনায়েছে বোঝোনি ?
আর কেন আছ তুমি দাঁড়ায়ে ?
মোর খেয়া ডুবেছে যে অতলে,
সংবাদ তুমি তার শোননি ?

সন্ধ্যার মোহানায় দাঁড়ায়ে—
মিছে কেন ফিরে চাও আমারে ?
মোরে অনুসরণের মাঝারে
মৃত্যুর রিনিঝিনি শোননি ?

মন্দির দ্বার তব খুলিয়া—
ইঙ্গিতে আজ মোরে ডেকেছো ?
সীমাহীন নীলাকাশ ভরিয়া
দুর্দ্দিন ঘনায়েছে বোঝোনি ?

ওগো দুর্গম পথ চারিণী
কেন এসেছিলে মোর জীবনে ?
কেন দিয়েছিলে দোলা সহসা
মোর উন্মন মন খানিরে ?

সাথে ছিলে নিশিদিন আমারই
করোনাই প্রতিবাদ অকাজে
ঘুরে মরেছিনু যবে আঁধারে
তুমি এনেছিলে মোরে আলোকে।

তবু রাণী ছেড়ে দাও আজিকে
আর কেন মিছে থাকো দাঁড়ায়ে
—দুর্দ্দিন ঘনালো যে বোঝোনি
বলো রাণী কবে আর বুঝিবে ?

———

বঙ্গীয়-সঙ্গীত সমিতি

(দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন)

[আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

গতপূর্ব্ব শনিবার ২রা এপ্রিল, সন্ধ্যা ৭ঘটিকার শ্রীযুক্ত কেশরীসিংহ নাহার মহাশয়ের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত "বঙ্গীয়-সঙ্গীত সমিতির" উদ্যোগে বঙ্গীয়-সঙ্গীত-সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ম্যাডান থিয়েটারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বছর চার সাড়ে চার আগে, পাথুরিয়াঘাটার স্বনামধন্য সঙ্গীতকলারসিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, তালতলার মিঃ কেশরীসিংহ নাহার ও অখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত প্রণবেশ সিংহের পরিচালনায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে একটি সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে একটি সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সে বৎসর সুপ্রসিদ্ধ খেয়ালী ফৈয়াজ খাঁ সাহেব তাঁহার অননুকরণীয় সঙ্গীতনৈপুণ্য প্রদর্শনে আমাদের চমৎকৃত করিয়াছিলেন। পর বৎসর এই সম্মেলনটির অনুষ্ঠান হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে। এবৎসর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী স্বর্গত সঙ্গীতরত্নাকর নাসির উদ্দীন খাঁ সাহেব (লোকপ্রসিদ্ধ আলাবন্দে খাঁ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র) তাঁহার পাণ্ডিত্যে, কণ্ঠ ও চরিত্র মাধুর্য্যে, ও অপরূপ কলাকৌশলে আমাদের চিত্ত জয় করিয়া যান। কিন্তু এই বৎসরই সঙ্গীত-সম্মেলনে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে, ও তাহার ফলে বঙ্গীয়-সঙ্গীত-সমিতির উদ্ভব হয়। তাই তৃতীয় বৎসর আমরা দুইটি সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আর এবার এই চতুর্থ বৎসরে দেখিতেছি কলিকাতায় তিনটি সঙ্গীত-সম্মেলন হইতেছে। প্রণবেশ বাবুর কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত একটি অনুষ্ঠান অত্যন্ত শোচনীয় বিশৃঙ্খলার সহিত প্রায় মাস আড়াই পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টি মিঃ নাহারের পরিচালিত সঙ্গীত-সমিতির উদ্যোগে সদ্য অনুষ্ঠিত হইল। আর তৃতীয়টি ভূপেন্দ্র বাবুর তত্ত্বাবধানে আগামী কল্য হইতে অনুষ্ঠিত হইবে। শুনিয়াছিলাম যে মিঃ নাহারের প্রথম অধিবেশনে নানারূপ বিশৃঙ্খলাও ঘটিয়াছিল। এবার দ্বিতীয় বার্ষিক, অধিবেশনে নিমন্ত্রণ কিছু বিলম্বিত হইলেও আমরা অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর পাইয়াছিলাম।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সম্মেলনের উদ্বোধনে নেতৃত্ব করেন সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়। মহারাজার প্রস্থানের পর সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি সভার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দের উপস্থিতিতে এই দিনত্রয়ব্যাপী অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খলে পরিসমাপ্তি লাভ করে। প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়দর্শন পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত স্তুতিগীতিদ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন; ও তাঁহার মুখে উচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্য্যারম্ভ হয়। কতিপয় বালিকা সুনীলচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে "জনগণমন" গানটি গাহিবার পর মাননীয় সন্তোষাধিপতি অতি সংক্ষেপেই তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন। এই "জনগনমন" গানটি কি সঙ্গীত-সম্মেলন মাত্রেই সংক্রামিত হইয়া পড়িল। ভূপেন্দ্র বাবুর সম্মেলনে ত বাসন্তী বিদ্যাবীথী ইহা একরূপ অপরিহার্য্য অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে। প্রণবেশ সিংহের সম্মেলনেও এই গান শুনিয়াছি। আবার মিঃ নাহারের প্রতিষ্ঠানেও সেই একই গান! তাহার উপর আবার গানটির পরিসমাপ্তির মুখে কেবলই তাল কাটিয়া যাইতেছিল। ইহার পর সমিতির অন্যতম সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহার পর নিউথিয়েটার্সের প্রসিদ্ধ সুকণ্ঠ চিত্রাভিনেতা সাইগল একখানি গজল গান করেন। এই সকল চিত্রাভিনেতার গান চিত্রেই চলিতে পারে। উচ্চ সঙ্গীতের আসরে, বিশেষ করিয়া উদ্বোধনের সময়ে অন্য কোন বিশিষ্ট গায়কের উপর এভার ন্যস্ত করিলেই ভাল হইত। ইহার পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু ইমন কল্যাণে একখানি খেয়াল গান করেন। আমাদিগের মনে হয়, রমেশবাবু স্বয়ং উদ্বোধন-সঙ্গীতের

বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধা গীতরাণী—
শ্রীমতী গঙ্গাবাই গান্ধারী

ভার লইলেই পারিতেন। কারণ, স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ যে কয়জন এ আসরে দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক প্রবীণ সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে রমেশ বাবুর আলাপ ও খেয়াল গানই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইহার পর কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মন্ তাঁহার সেই পেটেণ্ট তথাকথিত বাংলা ক্ল্যাসিক্যাল্ গান (?) "ঝন ঝন মন্দিরা বাজে" গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের কাণ ঝালা-পালা করিবার উপক্রম করেন।

ইহার পর আসরে অবতীর্ণ হইলেন পণ্ডিচেরী-ফেরৎ আমাদের অতি আদরের 'চিরপুরাতন অথচ চিরতরুণ মণ্টু দা' (ওরফে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়)। দিলীপ-কুমারের একটা বাহাদুরি আছে এই যে, তিনি ভারতের কোন সঙ্গীতের আসরে বড় একটা খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাহেন না, গাহেন বিদেশী লোকসঙ্গীত (Folksong); আবার বিদেশে গিয়া সে সব দেশের সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্মুখে প্রাচীন ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল্ সঙ্গীতের নমুনা দেখাইতে কোমর বাঁধেন। যাহা হউক, তাঁহার সেদিনকার গানের মধ্যে ছিল একটি রাশিয়ান লোকসঙ্গীতের অতিবিকৃত অনুকরণে রচিত (স্বরচিত?) একটি বাংলা লোকসঙ্গীতের ন্যাকামীপূর্ণ আবৃত্তি। ইহাকে আবৃত্তি বলিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু ইহা যদি সঙ্গীত হয়, তবে বুঝিতে হইবে সারা ভারতে এক দিলীপ-কুমার ছাড়া আর কেহই গান জানেন না। দ্বিতীয় গানটি মীরার সুবিখ্যাত ভজন— "মেরে গিরিধারী গোপাল দুসরা ন কোই"। শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম, বোধ হয় এইরূপ গানের নমুনা নিত্য একাকী শুনিলে পাছে লোকে ভাবে স্বার্থপর, এই আশঙ্কায় পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে সবরমতির মহাত্মার আশ্রমে ডেপুটেশনে পাঠাইয়াছেন। আমাদের কোন রসিক বন্ধু সেদিন গান শুনিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন— একেবারে "ভক্তাবভাবিত" অবস্থা!—পূর্ণ মীরার ভাবে ওতপ্রোত—অনুপ্রাণিত—ডগমগায়িত ইত্যাদি। Souvenir প্রোগ্রামে দিলীপকুমারের যে উদাস-ভক্ত-কবি-cum-সাধকভাবের চিত্র ছাপা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তিনি শীঘ্রই খেচরত্ব লাভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। শুধু দেবর্ষি নারদের মত একটি ঢেঁকির যা অভাব! সেইটি জুটিলেই এ ধূলিমলিন হেয় মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া তিনি এবার হইতে শূন্য-মার্গেই শুধু বিচরণ করিবেন! দিলীপবাবুর এরূপ গীতিলতা আশ্রমের অনুকূল আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট ও পুষ্পিত হইতে পারে; কিন্তু সঙ্গীত-আসরের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাহাকে তুলিয়া রোপণ করিলে অকালে শুকাইয়া যাওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব, আমরা সঙ্গীত-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে স্মরণ করাইয়া দিই, যেন তাঁহারা অচিরে দিলীপকুমারকে "গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং" বলিয়া মুঠো মুঠো রাঙা জবার অঞ্জলি দিয়া বিদায় দেন; নতুবা প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

ইহার পর বরোদার ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ সাহেব একখানি বেহাগের আলাপ ও খেয়াল গান আরম্ভ করেন। খাঁ সাহেবের গীতিপদ্ধতিতে ভারতের স্বনামধন্য খেয়ালিয়া ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখা যায়। অথচ ফৈয়াজ খাঁর গানে যে প্রাণ, দরদ ও ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে —নিসার হোসেন খাঁ সাহেবের গানে তাহার একান্ত অভাব। ফৈয়াজ খাঁর তান-বাটের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজগুলি অসঙ্গীতজ্ঞেরও চিত্তে চমৎকার জমাইয়া দেয়। তাঁহার সুরের বৈচিত্র্য ও কণ্ঠের ঐশ্বর্য্যও সকল গায়কেরই একান্ত কাম্য। পক্ষান্তরে নিসার হোসেন খাঁ সাহেবের সুরে সে সমৃদ্ধি বৈচিত্র্য বা মাধুর্য্যের আভাসও মিলিল না। বেহাগের মত মনপ্রাণমুগ্ধকর সুরও তাঁহার গলায় উঠিয়া নিতান্ত একঘেয়ে শুনাইতে লাগিল— ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি থাকিতে পারে! ইহার পর আসিলেন বোম্বাইয়ের শ্রীমতী ভাৎসেল্লা কুম্ভেকার। ইঁহার খেয়াল গানখানি চলনসই। গাহিবার ঢঙের জোরেই কোনরকমে উৎরাইয়া গিয়াছিল। ঠুম্‌রী খানি ইনি মন্দ আরম্ভ করেন নি। ইঁহার যেরূপ কণ্ঠ, তাহাতে খেয়াল অপেক্ষা ঠুম্‌রীই লাগে ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে সঙ্গের সঙ্গতীটি একেবারে অসামাল হইয়া উঠিলেন। গায়িকা তাঁহার সুরমা-আঁকা

উত্তর ভারতের কথক নৃত্য সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তক লক্ষ্ণৌনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র

আঁখিতে দুই চারিবার চোখ রাঙানি দিলেন—অবশেষে রসভঙ্গ হয় দেখিয়া মধ্যপথেই গান বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন।

এইবার আসিলেন বোম্বাইবাসিনী বাই গঙ্গাবাই গান্ধারী। ইঁহার অনাকর্ষক দর্শনডালি ও হাবভাব দেখিয়া প্রথম মনে হইয়াছিল যে, ইনি আর কি

গাহিবেন-শুধু সোরগোল সার হইবে মাত্র! কিন্তু শ্রীমতী স্থির-ধীর ভাবে বসিয়া ধীরে অতি ধীরে যেরূপ অনবদ্য ভঙ্গীতে মিঞা মল্লারের আলাপ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রথমেই মনে পড়িল স্বর্গত সঙ্গীত-সম্রাট খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁ সাহেবের কথা। সম্মেলনের কোন একজন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসায় জানা গেল বাই গঙ্গাবাই আবদুল করিমের পরিণতবয়সের ছাত্রী। যখন সঙ্গতীর সহিত পাল্লা দিয়া তিনি কণ্ঠে বিভিন্ন সুরের সারগম তুলিতেছিলেন, তখন প্রত্যেক শ্রোতাই প্রস্তরপ্রতিমার মত নিশ্চল-ভাবে বসিয়া সে অপরূপ সঙ্গীতনৈপুণ্যের তারিফ করিতেছিলেন। তাঁহার তান-বাট প্রভৃতি খেয়ালের বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের তুলনা বিরল। তাঁহার কণ্ঠ মধুর, সুরেলা ও সতেজ-সুউচ্চ। মোটের উপর এবারকার সম্মেলনে বাহির হইতে আগত শিল্পিবৃন্দের ইনিই শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথম দিনে মিঞা মল্লার ও জয়-জয়ন্তী, দ্বিতীয় দিনে হিন্দোল ও যোগিয়া ও তৃতীয় দিনে শঙ্করা, তিলঙ্গ ও বাহারের সাহায্যে শ্রীমতী গঙ্গাবাই যে সুরের ইন্দ্রজাল বুনিয়াছিলেন, তাহার মোহ চিরদিন আমাদের মনে অবিস্মরণীয় থাকিবে। সোমবারে শঙ্করা তিলঙ্গ ও বাহার গানগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য "ব্রডকাষ্ট" করা হইয়াছিল।

ইহার পর উদীয়মান ধ্রুপদী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধ্রুপদ আলাপ আর তেমন জমে নাই। এই দিনের অন্যান্য গায়ক-গায়িকাগণের প্রযত্ন উল্লেখ-যোগ্য নহে।

পরদিবসে (রবিবার) প্রাতে অধিকাংশ গায়ক-গায়িকার উদ্যমই অনুল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া লাহোরের কুমারী শীলা সারদার ভৈরবীর খেয়াল নিছাত বাজে বলা চলে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রমোহন বসুর ভজন ও আধুনিক বাঙ্গলা গান একশ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের প্রীতিকর হইয়াছিল। অনন্তর সঙ্গীত-সমিতির অন্যতম সহযোগী সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর উপযুক্ত দরদ দিয়া "মালকোষ" গাহিয়া আসরের শ্রী ফিরাইয়া আনেন। বাঙ্গলার যুবক গায়কগণের পক্ষ হইতে একমাত্র রমেশবাবুই অবাঙ্গালীর মধ্যে বাঙলার মুখ উজ্জ্বল রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিলে অতি-শয়োক্তি করা হইবে না। আমরা আশা করি, আরও কঠোর সাধনার দ্বারা রমেশবাবু তাঁহার নিজ বংশগৌরব অটুট রাখিয়া বিষ্ণুপুর সম্প্রদায়ের নাম বাঙলা সঙ্গীতের ইতিহাসে চির সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন।

ইহার পর কুমারী চিত্রলেখা গাঙ্গুলীর ঠুমরী গান শিক্ষার্থিনী হিসাবে সুশ্রাব্য। কুমারী অরুণা বাগচীর আধুনিক নৃত্য অচল। অনন্তর বরোদার নিসার হোসেন খাঁ সাহেব এদিনও একখানি কেদারা ও একখানি জয়-জয়ন্তী রাগের মোট দুইখানি খেয়াল গাহেন। গান দুইখানি ব্রডকাষ্ট করা হইলেও পূর্ব্ব দিনের মতই নীরস ও একঘেয়ে লাগিতেছিল। কুমারী তুষারিকা মুখার্জ্জির আধুনিক নৃত্যটি বিশেষত্ববর্জ্জিত। কুমারী গীতিরায় ও দীপ্তিরায়ের নৃত্যাঞ্জলি এরূপ আসরের অনু-পযোগী—প্রতিযোগিতায় স্থান পাইতে পারে। লাহোরের রেখা সারদা মীরার ভূমিকায় যে নৃত্য ও ভজনের নমুনা দেখাইলেন, সত্যকার মীরার ভজনকে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ভাল বলিয়া কল্পনা করিলেও শ্রদ্ধা রাখিতে পারা যায় না। এই শীলা ও রেখা সারদা দুইটিকে লাহোর হইতে আমদানী করিয়া সম্মেলন-কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাবের সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিলেন, তাহা নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে বহু বৎসর লাগিবে। শ্রীমতী ডৎসেল্লা কুস্তেকার 'মালকোষ' ও ভৈরবী (ঠুমরী) গাহেন। প্রথম দিন অপেক্ষা এদিন তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার পর লক্ষ্ণৌএর সুবিখ্যাত কথকনৃত্যবিৎ পণ্ডিত শম্ভুপ্রসাদ মিশ্র তাঁহার অপরূপ নৃত্যকলা দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে বিমোহিত করেন। তাঁহার নৃত্যকলার সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা আমরা রাখি না। অথবা আমাদের প্রদত্ত প্রশংসাপত্রেরও কোন তোয়াক্কা তিনি না রাখিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সামান্য দুই একটি ব্যাপার যাহা আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে বা কর্ণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না। তিনি যেন স্মরণ রাখেন যে, তাঁহার সুচিরাভ্যস্ত নৃত্যকলাজ্ঞান অপেক্ষাও উগ্রবীর্য্য তরল পানীয়ের প্রভাব অনেক অধিক কার্য্যকরী, এবং দ্বিতীয়ের অধীন হইয়া পড়িলে প্রথমটির লোপ হইতে বেশী দেরী লাগে না। স্বর্গত সঙ্গীত সম্রাট্ বিষ্ণুনাথজী রাও হইতে বর্ত্তমানযুগের শিল্প-দর্শন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালী শাস্ত্রী পর্য্যন্ত কেহই এ অসামান্য শক্তিময়ী বারুণী দেবী ও তাঁহার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব অতিক্রমে

সমর্থ হন নাই—ইহা অনেকেরই প্রত্যক্ষদৃষ্ট। তাই এই সতর্কতার বাণী আমরা পূর্ব্ব হইতে উল্লেখ করিতেছি। পণ্ডিত শম্ভুপ্রসাদের নৃত্যের সহিত তুলনায় শ্রীমতী কমলেশ কুমারীর নৃত্যদৃশ্য নিতান্তই ছেলেমানুষী বলিয়া বোধ হইতেছিল। এসব জিনিষ ফিল্মেই লাগে ভাল। মঞ্চের উপর—বিশেষ করিয়া এইরূপ একটি গুরুগম্ভীর সঙ্গীতের আসরে এ সকল দৃশ্য একেবারেই বর্জ্জনীয়।

তৃতীয় দিবসে (৪ঠা এপ্রিল প্রাতঃকালে) সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরবাহার বড়ই সুমধুর লাগিল। অন্যান্য শিল্পিগণের প্রযত্ন অনুল্লেখযোগ্য। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদিয়া সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছায়ানট রাগের আলাপ ও ধ্রুপদ গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীতজগতে বাঙলার বৈশিষ্ট্য ধ্রুপদে। আর এই ধ্রুপদ গানের শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া বিষ্ণুপুরের নাম ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে চিরসমুজ্জ্বল রহিবে। বর্ত্তমানে গোপেশ্বরবাবু এই বিষ্ণুপুর-সম্প্রদায়ের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক রূপে বাঙলার সঙ্গীতাকাশে শোভা পাইতেছেন। তাঁহার যৌবনের দীপ্তি এ পরিণত বয়সে কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া পড়িলেও তরুণের দলে তাঁহার সমকক্ষতা করিবার মত একটিও গায়ক এ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিল না—ইহা একাধারে আমাদের আনন্দ ও দুঃখকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে।

গঙ্গাবাই গান্ধারীর শঙ্করা, তিলঙ্গ ও বাহারের খেয়াল এই আসরের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণের বিষয়। প্রকৃতির জীবন্ত স্নিগ্ধ রূপ গানের প্রতিটি ছত্রের মধ্যে দিয়া কিরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, সে নৈপুণ্য গঙ্গাবাই গান্ধারীর সঙ্গীত যিনি শুনেন নাই, তিনি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমরা এই তরুণ গীতসাধিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

রামপুরের মেহেদী হোসেন খাঁ সাহেবের মালকোষের খেয়াল অন্তরে কোনরূপ দাগ দিতে পারে নাই। এই দিনও নিসার হোসেন খাঁ সাহেব একসঙ্গে ধ্রুপদ, খেয়াল ও তেলেনা গান করেন। বসন্ত রাগের অতি বিখ্যাত গান "ফাগুয়া বিহরে ঘন" গানটিও ইঁহার গাহিবার দোষে প্রায় মাঠে মারা গেল বলা চলে। সঙ্গীতের technique আয়ত্ত করিলেই যে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায় না—খাঁ সাহেব তাহার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত।

কুমারী সবল নাহারের নৃত্য দেখিয়া বোধ হইল—ইঁহার শিক্ষাদাতার এখনও বহু শিক্ষা ও সাধনা প্রয়োজন। দীপ্তি ও গীতি রায়ের নৃত্য প্রশংসার অযোগ্য হইলেও লাহোরের রেখা শায়দার নৃত্যের মত নিছক বাজে নহে।

এই দিনের আসরে চিত্রাভিনেতা সাইগলের গীতের ব্যবস্থা না থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত। তবে অধিক মিষ্ট ভোজনে অরুচি হইলে কখন কখন তিন্তিড়ীতেই রুচি ফিরাইয়া আনে। বোধ হয়, এই হিসাবে কর্তৃপক্ষগণ মধ্যে মধ্যে এই জাতীয় কয়েকটি নৃত্য-গীতের সমাবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদারের ঐক্যতান বাদনেও এইরূপ নূতনত্বের বৈচিত্র্য কিছু ছিল। তবে বিদেশী সুরের সহিত ভারতীয় সুরের মিশ্রণ করিবার জন্য যতদূর মাত্রাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, ততটার প্রকাশ হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

অধিবেশনের সমাপ্তি হয় পণ্ডিত শম্ভুপ্রসাদ ও তাঁহার ছাত্রী শ্রীমতী কমলেশকুমারীর যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে। শ্রীমতী পণ্ডিতজীর ছাত্রী হউন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতজী তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান, পদমর্য্যাদা, বংশগৌরব ও সাম্প্রদায়িক কলাবিদ্যার অভিজাত্য একেবারে অতলান্তিকের অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহা অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে নিকৃষ্টা এক অতি সাধারণ চিত্রাভিনেত্রীর সহিত যুগ্মনৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিলেন না—ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। শ্রীমতীর নৃত্যে অকুশলতা পণ্ডিতজীর অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নৃত্যকলা-কৌশলকে প্রতি পদেই ব্যাহত করিতেছিল—ইহা সে রজনীর রসিক দর্শকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমতীকে সুবিধা দিবার জন্য শম্ভুপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ আপনার শক্তিকে খর্ব্ব করায় নৃত্যের রস

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন

[আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরিত]

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা-পর্ব্ব এবারের মত সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু নিতান্ত নির্ব্বিঘ্নে কি না, সে বিষয়ে বহু মতান্তরের সন্ধান আসিতেছে। তবে বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিব না। অন্যান্য পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য রূপেই প্রতিযোগিতার বিচার-প্রণালীর বিরুদ্ধে নানারূপ অপ্রিয় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে কোন কোন সাংবাদিকের নামও জড়িত থাকায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া বিস্মিত হইলাম। অবশ্য প্রতিযোগিতার শেষদিনে শ্রদ্ধেয় লালাবাবু স্বয়ং বক্তৃতার মধ্যে এ বিষয়ে অপক্ষপাত অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হইতে সাধারণকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন, ও সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়ও সেই মর্ম্মে একখানি পত্র দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন সাধারণের তরফ হইতে এ বিষয়ে একটি "অনুসন্ধান-সমিতি" গঠিত করিয়া অনুসন্ধানের ফলাফল সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান অবিলম্বে আবশ্যক বলিয়া মনে করি। যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ অনুসন্ধানের পর কোনরূপ যথার্থ অভিযোগ পত্র দ্বারা আমাদিগকে জানান, তাহা হইলে আমরা সে পত্র সাদরে প্রকাশিত করিব। কিন্তু অভিযোগের মূলে যদি কোন সত্য না থাকে, অথবা অভিযোগ পত্রগুলি যদি কেবল কুৎসা বা পরনিন্দায় পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেরূপ পত্র প্রকাশিত করা হইবে না। পত্রে প্রেরকের নাম ও ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রতিযোগিতা-পর্ব্বের পর সম্মেলনের আসর। এবার সম্মেলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় ম্যাডান থিয়েটারে। স্থান নির্ব্বাচনে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। গত বৎসর ও তাহার পূর্ব্ব বৎসর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে কোন বিশেষ গোলমাল হয় নাই। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে চিত্রজগতের পেশাদার অভিনেত্রী এণাক্ষী রমারাও ইনষ্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে তাঁহার তথা কথিত তাঞ্জোর নৃত্য দেখাইবার পর শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী মহাশয় এই খেয়ালীর পৃষ্ঠাতেই অতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ মাস দুই আড়াই পূর্ব্বেও একটি সঙ্গীতের আসর উপলক্ষে এই ইনষ্টিটিউটেই আর একজন আরও বিখ্যাত পেশাদার গায়িকা শ্রীমতী কেশরবাই একাধিক দিবস তাঁহার গীত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তখনও কোন আপত্তি হয় নাই। হঠাৎ দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত কেশরীসিংহ নাহার মহাশয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত-আসর ও নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের আসর ম্যাডানের রঙ্গমঞ্চে স্থানান্তরিত হইল। কারণ, উভয় অনুষ্ঠানেই একাধিক পেশাদার চিত্রাভিনেত্রী, নর্ত্তকী ও গায়িকার আমদানী হইতেছে। ইনষ্টিটিউটের পবিত্রতা অবশ্য ইহাতে অটুট রহিল দেখিয়া আমরা সুখী। কিন্তু ম্যাডানে যে বাঙ্গালী পাড়ার মত গানের আসর জমিতে পারে না, ইহা আমরা নাহার-সঙ্গীত-সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার পরিবর্ত্তে যদি উত্তর কলিকাতায় কোন রঙ্গমঞ্চ বা চিত্রগৃহে ঐ চারিদিনের জন্য ভাড়া লওয়া হইত, তাহা হইলে দেশী আবহাওয়ায় দেশী গান জমিত বেশী। এত আর বন্ধুবর হরেন ঘোষের পরিচালিত উদয়শঙ্করের দেশী-বিদেশী খিচুড়ী নাচ নয়—যে বঙ্গালী না দেখুক, সাহেবেরা দেখিয়া তারিফ করিলেই হইল!

আর একটি কথা। সঙ্গীত সম্মেলন অর্থে কেবল নাচ গান বাজনার ফোয়ারা নহে। সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষার্থী জনের নানা সমস্যা থাকা খুবই স্বাভাবিক। অতএব, এসকল সমস্যার সমাধানকল্পে একটি বিচার সভার আয়োজন হইলে বড় ভাল হয়। বিচারসভা বলিতে আমরা শুধু গতবৎসরের মত একটা ফাঁকা বক্তৃতা-সভার প্রহসন করিতে বলিতেছিনা। উহাতে রীতিমত বিচার চলিবে। কেহ প্রশ্ন করিবেন, অপরে উত্তর দিবেন—এইরূপে বাদানুবাদ চলিবে—অবশেষে মধ্যস্থগণ একটা ন্যায় সঙ্গত ও শাস্ত্র সঙ্গত মীমাংসা করিয়া দিবেন। শুনা পরিপূর্ণ মাত্রায় ফুটিতে পারে নাই। তাই এ অধিবেশন যথার্থতঃ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তথাপি মিঃ নাহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে আমরা মোটামুটি সাফল্যমণ্ডিত বলিয়াই স্বীকার করিব। এবং আশা করি যে, আগামী বৎসরে তৃতীয় অধিবেশন ইহা অপেক্ষাও উজ্জ্বল-মধুর হইয়া উঠিবে।

যাইতেছে, কাশীর সুবিখ্যাত প্রবীণতম ধ্রুপদী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবার সম্মেলনে আসিতেছেন। সঙ্গীতমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজী ঠাকুরও আসিবেন। এখানেও বহু সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি রহিয়াছেন। ইঁহাদের সমবায়ে একটা বিচারসভা বসিলে মন্দ দৃশ্য হইবে না। অবশ্য এই বিচার সভাটি সম্মেলনের চারি দিন ছাড়া অন্য একটি পৃথক্ দিনে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আহূত হওয়াই উচিত। এদিন যাঁহারা দর্শক থাকিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দর্শনী লওয়া হইবে না—এরূপ ব্যবস্থাও করা উচিত। ইহাতে কোনরূপ গোলমালেরও সম্ভাবনা নাই। কারণ, এরূপ সভায় সঙ্গীতজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোক যোগ দিবেন না—ইহা নিঃসন্দেহ। আগামী কল্য শুক্রবার ১২ই এপ্রিল হইতে সম্মেলনের প্রারম্ভ। সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সময় থাকিতে আমরা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, এবার যেন বৈদিক স্বস্তিবাচনের অব্যবহিত পরেই "বন্দে মাতরম্" গীতটি অখণ্ডভাবে গীত হইতে কোনরূপ ভুল না হয়।

এবার সম্মেলনে যোগ দিবেন—পণ্ডিত হরিনারায়ণজী মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজী ঠাকুর, শ্রীমতী কেশরবাই ও শ্রীমতী হীরাবাই, শ্রীমতী ফিরোজ দস্তুর, ইত্যাদি বহু প্রসিদ্ধ গায়ক ও গায়িকাবৃন্দ।

আমরা শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র বাবুর এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। এবিষয়ে আমাদিগের নিজস্ব সমালোচনা ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতে থাকিবে।
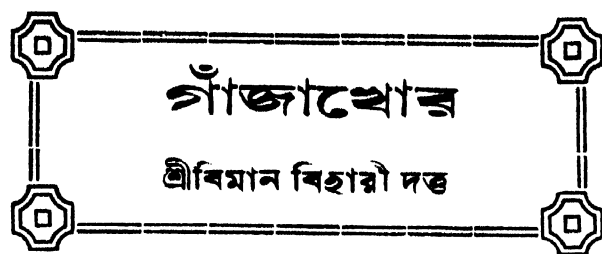
ভিখন্ ও সুখলাল, ভিখারী তারা। আমাদের পাড়ার সকলেই সেই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিখ্যাত গাঁজাড়ে বা গাঁজাখোর ব'লে জানতো। ভিখন,—সে কথা কইত আধ-ভাঙ্গা তীব্র স্বরে, একটা হাত তার ছিল না; আর একমাথা চুল, চোয়াড়ে গাল ও ভিখিরীর উপযোগী শতচ্ছিন্ন তালি দেওয়া কাপড় ছিল তার সম্বল। তবু ওই এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলের দ্বারাই সে যে রকম ভাবে গাঁজা খেতো টেনে, সে নিজেই ক'রত গর্ব্ব অনুভব,—কেননা ও অঞ্চলে ওরকম ভাবে গাঁজা টানতে আর কেউ পারত না। সুখলাল,—বয়সে কিছু কম। এর আবার একটা পা ছিল না। চেহারায়, পৃথিবীর সমস্ত নিম্নস্তরের যা কিছু সমস্তই ওতে প্রকাশ পেত। বহুদিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ খোঁড়া হবার আগে, ও' একজন ওরই দেশী মেয়েকে ক'লকাতায় ফুসলায়ে আনে। তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, একজন প্রকাণ্ড জমীদার ব'লে। ব্যাপার প্রকাশ হ'লে সে মেয়েটাত ওর মুখে একরকম লাথি মেরেই চলে গেল। ও' তাতে শুধু করুণ হাসি হেসেছিল। বাস্তবিক সুখলালের ওই দন্তবিহীন মাড়ি পান খেলে দেখতে বেশ মজা লাগ্ত

ভিখন্ ও সুখলাল ও-ই ডাষ্টবিনটার সামনে ব'সে একই সাথে ভিক্ষা ক'রত। পাড়ার লোকের সাথে এমন আলাপ জমেছিল যে, পয়সা উপায় ওদের পক্ষে ছিল বেশ সহজ। বাস্তবিক দু'জনেই ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু।

...... হঠাৎ একদিন রাত্রে গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চীৎকার শুনে' বাইরের ফুটপাথে এসে দেখি আরও বহুলোক জমা হ'য়ে গেছে এবং তার মধ্যে অশ্রাব্য গালাগালির ভিতর দিয়ে ভিখন্ ও সুখলালের হাতাহাতি চ'লেছে। তাদের কোনরকমে থামানোর পর, ভিখন্ এসে ব'ললে,—"বাবু, ও শালা সুখলাল কালকের ছোঁড়া, ও বলে কিনা আমার সাথে পাল্লাদিয়ে গাঁজা খাবে? আমার মত কখন খেতে পারে? কিন্তু ও শালা ব'লছিল, ও আমার চাইতে বেশী গাঁজা খায়। ওই জন্যেই ত বাবু আচ্ছা ক'রে ঠুকে দিয়েছি।"

আমরা ত অবাক! তখনও সুখলালের কপাল ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে। বললাম—"এখন পালা, তা'না হ'লে পুলিসে যেতে হবে।"

রাত্রি তখন অনেক। ঘুম আসছিল না; উঠে আলো জ্বাললাম। হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তার কল হ'তে জল এনে ভিখন্ সুখলালের কপাল ধুইয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় তখন কেউই নেই; নিস্তব্ধ রাত্রি।

কয়েকদিন পরেই কিন্তু ফুটপাতের উপর ভিখন্ বা সুখলাল—কাউকেই আর দেখতে পেলাম না। মনে ভাবলুম, বেটা গাঁজাখোরেরা আবার হয়ত অন্য জায়গায় গিয়ে গাঁজাটানার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়েছে। দূর হোক্‌গে ছাই যত ভিখিরীর দল। .... পাড়ার সবাই ভুলে গিয়েছিল ওদের কথা; আমি-ও। মাসখানেক পরে হঠাৎ ভিখনের সাথে দেখা হ'লো আমাদের পাড়াতেই। দেখিলাম পোষাক পরিচ্ছদ পূর্ব্বের মতই আছে; তবে তাতে আরও কয়েকটা তালি প'ড়েছে,—আর একটা ছেঁড়া

(সি, বি)

বিলাতের পথে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আজমীরের 'রাজপুতনা ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় একটি 'ভারতীয় প্রাইভেট ক্রিকেট টীম' গত ১২ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই বন্দর থেকে 'এস এস্ কণ্টি রসো' জাহাজ যোগে বিলাতের পথে যাত্রা করেছে। গত কয়েক বৎসরের পরিত্যক্ত এই ক্রিকেট দলের বিলাত ভ্রমণের প্রচেষ্টাটি এতদিন বাদে কার্য্যে পরিণত করবার জন্য রাজপুতনা ক্রিকেট ক্লাবের সম্পাদক মিঃ ডবলিউ ডি বেগ ক্রীড়ামোদীদের প্রশংসা এবং শুভেচ্ছা দাবী করতে পারেন। তা ছাড়া কলিকাতার, ভবানীপুর ক্লাবের জনপ্রিয় সম্পাদক মিঃ এন এন মিত্র, আজমীরের মিঃ এইচ সি দাস্ এবং করাচীর মিঃ বি ডি শঙ্কর এই বিষয়ে মিঃ বেগকে অনেকাংশে সাহায্য না করলে হয়ত তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারত না। ভোজারপুরের হিজ্ হাইনেস্ মহারওয়াল্ শ্রীলক্ষ্মণ সিংজী বাহাদুরের (কে, সি, আই, ই) দান্ এবং উৎসাহ এই প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এই ভ্রাম্যমান দলটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে ভারতের যে সকল ক্রিকেট খেলোয়াড় 'নিখিল্ ভারতীয় 'দলে' স্থান পাইবার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত সে সৌভাগ্যলাভ করেন নি কেবলমাত্র তাঁরাই এই দলে স্থান পেয়েছেন। বাঙ্গালা প্রদেশ থেকে এরিয়ান্স ক্লাবের উদীয়মান ক্রিকেটার শ্রীযুক্ত কমল্ ভট্টাচার্য্য এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ ক্রিকেট্ খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক বসু এই ভ্রাম্যমান্ দলটিতে স্থান পেয়েছেন। কার্ত্তিক বসুর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে তিনি যে নিখিল ভারতীয় দলে কেন স্থান পান্ নি তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কমল ভট্টাচার্য্য 'অল্ রাউণ্ডার' হিসাবে এই দলের শক্তিবর্দ্ধন্ করে নিজ প্রদেশের গৌরব বজায় রাখতে পারবেন বলে আশা করা যেতে পারে। বাঙ্গালার এই দুটি তরুণ খেলোয়াড় গত ১০ই এপ্রিল্ তারিখে বি, এন, আর বোম্বাই মেলে বোম্বাই যাত্রা করেছেন। মেজর ই, ডবলিউ, সি রিকেট্স বিলাতে এই ভ্রাম্যমান দলটির ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। মেজর রিকেটস্ এবং মিঃ বেগ এই প্রাইভেট্ ক্রিকেট টীমটির বিলাতে খেলা সম্বন্ধে যথাক্রমে এম সি সি এবং অল্ ইণ্ডিয়া ক্রিকেট কনট্রোল্ বোর্ডের সম্মতি লাভ করেছেন।

রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাব গত ১৯৩০ সালে এই বিলাত ভ্রমণ সম্বন্ধে প্রথম কল্পনা করেন এবং পরলোকগত যুবরাজ ভিক্টর এন নারায়ণ ভূপ বাহাদুর একটি সন্তোষজনক খেলার তালিকাও প্রস্তুত করেন কিন্তু অনিবার্য্যকারণে সে বছর এই ভ্রমণ, কার্য্যে পরিণত হয় নি।

১৯৩৫ সালে পুনরায় বিলাত ভ্রমণের একটি খেলার তালিকা প্রস্তুত হবার পর ক্রিকেট কনট্রোল্ বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ভ্রমণ সম্বন্ধে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেও হঠাৎ কোন সন্তোষজনক কারণ না দেখিয়ে এই ভ্রমণের সমস্ত আয়োজন বিফল করে দেন্। সেই কারণে এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মিঃ বেগ ১৯৩৮ সালে তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যতায় পর্য্যবসিত করায় নিজের কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের খ্যাতি ও যশ অক্ষুণ্ণ রেখে বিলাত থেকে সসম্মানে প্রত্যাবর্ত্তন করলে মিঃ বেগই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুখী ও আনন্দিত হবেন।

নিম্নে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম ও খেলার তালিকা দেওয়া হল।

কালো আলেষ্টার কোথা হ'তে জোগাড় ক'রেছে। চোখদুটোর মধ্যে একটার ত কিছুই বুঝলাম না; আর একটা লালে লাল। জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কিরে ভিখন, এতদিন কোথায় ছিলি? তোর সুখলাল কোথায়? তাকে দেখ্‌চিনা অথচ তুই একা একাই গাঁজা খেয়ে চোখ লাল ক'রে ব'সে আছিস?"

ভিখন্ নিস্তব্ধ ভাবে খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল; পরে হঠাৎ রুদ্ধস্বরে কেঁদে উঠলো, "বাবু, সুখলাল মরে গেছে………কার সাথে আর গাঁজা খাব……?" টস্ টস্ ক'রে কয়েক ফোঁটা চোখের জল তার চোয়াড়ে গালের 'পর দিয়ে গড়িয়ে ছেঁড়া আলেষ্টারের ওপর গিয়ে প'ড়ল। তার কানা চোখটাও তখন জলে ভর্ত্তি।

বাড়ী এলাম। শোবার সময় শুধু এই-ই মনে এলো, আজ ভিখন গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করেনি। চোখের জলেই চোখ লাল ক'রেছে তার বন্ধুর স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য।

নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণ—

১। এ ইউ বোটাওয়াল্ (বোম্বাই)
২। বাপুরিয়া (বোম্বাই)
৩। এল রামজী (কাথিয়ার ও হুজারপুর)
৪। এন্ পি বেশরী (হুজারপুর)
৫। ভি এল হাজারী (মধ্যভারত)
৬। গোপালদাস দেওয়ান (করাচী)
৭। আত্তিক্ হোসেন্ (আলওয়ার এবং টঙ্ক)
৮। কার্ত্তিক বসু (বাঙ্গালা)
৯। কমল ভট্টাচার্য্য (বাঙ্গালা)
১০। আসাদ্ ওয়াহাব (যুক্ত প্রদেশ এবং টঙ্ক)
১১। বি ডি শঙ্কর (করাচি এবং সিন্ধুপ্রদেশ)
১২। তাজাম্মল হোসেন (দিল্লী)
১৩। আজিম্ খাঁ (আল্‌ওয়ার ও জয়পুর)
১৪। দীপচাঁদ (করাচী)
১৫। রামপ্রকাশ (লাহোর)
১৬। আব্বাস্ খাঁ (করাচী)
১৭। ধনীরাম চোপরা (কাশ্মীর এবং লাহোর)
১৮। সি এইচ ব্যাঙ্কার (আমেদাবাদ)
১৯। ডবলিউ ডি বেগ (আজমীর)
২০। গুলাব সিং (আজমীর)
(২১) জি কে কুরেশী (জয়পুর)

খেলার তালিকা—

১০ই মে—বেকেন্‌হাম সি সি (বেকেন্‌হাম্)
১১ই মে—ইণ্ডিয়ান্ জিমখানা ক্লাব (অষ্টারলি)
১৩ই মে—সাৱে একাদশ (কনিংটন্ ওভ্যাল)
১৬ই মে—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (অক্সফোর্ড)
১৭ই মে— " " "
২০শে ও ২১শে মে—স্যার জুলিয়ান্‌কানের একাদশ (নটিংহাম্)
৩রা এবং ৪ঠা জুন্ আণ্ডারলট্ ক্যাম্প্ (আন্ডারলট্)
৬ই, ৭ই এবং ৮ই জুন্—ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (তিনদিন ব্যাপী) (ক্যাম্‌ব্রিজ)
১০ই এবং ১১ই জুন—উইল্টসায়ার সি সি (সুইংডন্)
১৩ই এবং ১৫ই জুন—ইষ্টনরফক্ সি, সি (কিংসলিন্)
২০শে ও ২১শে জুন্—কোক্‌ষ্টোন্ সি, সি, (কোকষ্টোন্)
২৪শে ও ২৫শে জুন্—নর্থ মিডল্‌সেক্স সি, সি (হর্ণসী, নর্থ লণ্ডন)
২৯শে ও ৩০শে জুন্—ডারহাম্ কাউন্টি ক্লাব (সাণ্ডারল্যাণ্ড)
১লা ও ২রা জুলাই—নর্দাম বারল্যাণ্ড কাউন্টি ক্লাব (নিউকাসল)
৮ই ও ৯ই জুলাই—বার্কসায়ার সি সি (রিডিং)
১৩ই জুলাই—গ্রেভসেণ্ড একাদশ (গ্রেভসেণ্ড)
১৫ই ও ১৬ই জুলাই—হাউসহোল্ড ব্রিগেড সি সি (চেলসিয়া, সাউথ লণ্ডন)
২০শে ও ২১শে জুলাই—ইণ্ডিয়ান্ জিমখানা ক্লাব (অষ্টারলি)
২২শে ও ২৩শে জুলাই—ল্যাঙ্কাসায়ার সি সি, (ম্যাঞ্চেষ্টার)
২৫শে ও ২৬শে জুলাই—লিন্‌কন্‌সায়ার (ক্লেন্টস্ধেন (লিনকন্)
২৭শে ও ২৮শে জুলাই—ক্রিকেট ক্লাব কনফারেন্স (লণ্ডন)
৩০শে ও ৩১শে জুলাই—বেসিংষ্টোক্ ও নর্থ হ্যাম্পসায়ার সম্মিলিত দল—(বেসিংষ্টোক্)

বাইটনকাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত শুক্রবার বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক পরিচালিত বিখ্যাত বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। আগামী ১৫ই এপ্রিল থেকে এই প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে। এবছর মোট ৪৪টি দল যোগদান করেছে। এই প্রতিযোগিতায় এর আগে কখনও এত বেশী টীম যোগদান করে নি। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশিষ্ট দলগুলি কলিকাতায় তাদের নৈপুণ্য দেখাতে আসবে। বোম্বাই থেকে লুসিটানিয়ানস্ এবং কাষ্টমস দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। প্রথমোক্ত দলে অলিম্পিক প্লেয়ার কার্ণী-ভিজ এবং কাষ্টমস দলে অলিম্পিক খেলোয়াড় আসলাম, ফিরোজ ও ক্রশ খেলতে আসবেন বলে জানা গেছে। গত বছরের বিজয়ী বি এন আর দলে আর কার, ট্যাপসেল ও গ্যালিবর্ডী অংশ গ্রহণ করবেন। গ্রাণ্ডার্স ক্লাবের পক্ষে পাঞ্জাব প্রাদেশিক হকি দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যাবে। ঝান্সি হিরোজ দলে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড ধ্যানচাঁদ ও তাঁর ভাই রূপসিংহ খেলবেন। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে কাষ্টমস্, রেঞ্জার্স, মোহনবাগান, পোর্ট কমিশনার ও মহামেডান স্পোর্টিং দল আগন্তুক দলগুলির সন্তোষজনক ভাবে প্রতিযোগিতা করবেন বলে আশা করা যায়। নিম্নে এই প্রতিযোগিতার খেলার তালিকা দেওয়া হল।

প্রথম রাউণ্ড

(১) বি এন আর : মোহনবাগান
(২) সেণ্টজোসেফ : পুলিশ
(৩) ইউনিয়ন স্পোর্টিং : পোর্ট কমিশনার
(৪) ইষ্ট বেঙ্গল : গিডিন ক্লাব
(৫) মিলিটারী মেডিক্যাল : টাউন ক্লাব
(৬) এলবার্ট ইউনিয়ন : রেঞ্জার্স
(৭) শ্যামবেরপুর স্পোর্টিং : উয়াড়ী
(৮) ডালহৌসি : গ্রীয়ার স্পোর্টিং
(৯) ভাবানীপুর : ই বি রেলওয়ে
(১০) ব্যাচেলার ইউনিয়ন (ঢাকা) : সি এফ সি
(১১) বি জি প্রেস : আর্ম্মেনিয়ান্স
(১২) মহমেডান স্পোর্টিং : ক্যালকাটা কাষ্টমস

দ্বিতীয় রাউণ্ড

(ক) পিণ্ডি টাইগার : কে পি কলেজ (এলাহাবাদ)
(খ) ভুপাল : কম্বয়েড ক্লাব লক্ষ্ণৌ
(গ) মুসলিম জিমখানা : ইয়ং মেন্স ক্লাব
(ঘ) বেরিলী স্পোর্টিং : ব্রাণ্ডার্স ক্লাব
(ঙ) আলীগড় ইউনিভারসিটী : বোম্বাই কাষ্টমস
(চ) মীরাট : জব্বলপুর স্পোর্টিং
(ছ) ঝাঁসি : অকেশানালস (দিল্লী)
(জ) লাহোর ডিষ্ট্রিক্ট : মণিপুর ষ্টেটস্
(ঝ) আর্ম্মানিটোলা (ঢাকা) : নিউ ষ্টার (দিল্লী)
(ঞ) করিমপুর ক্লাব : লুসিটানিয়ান্স (বম্বে)

———
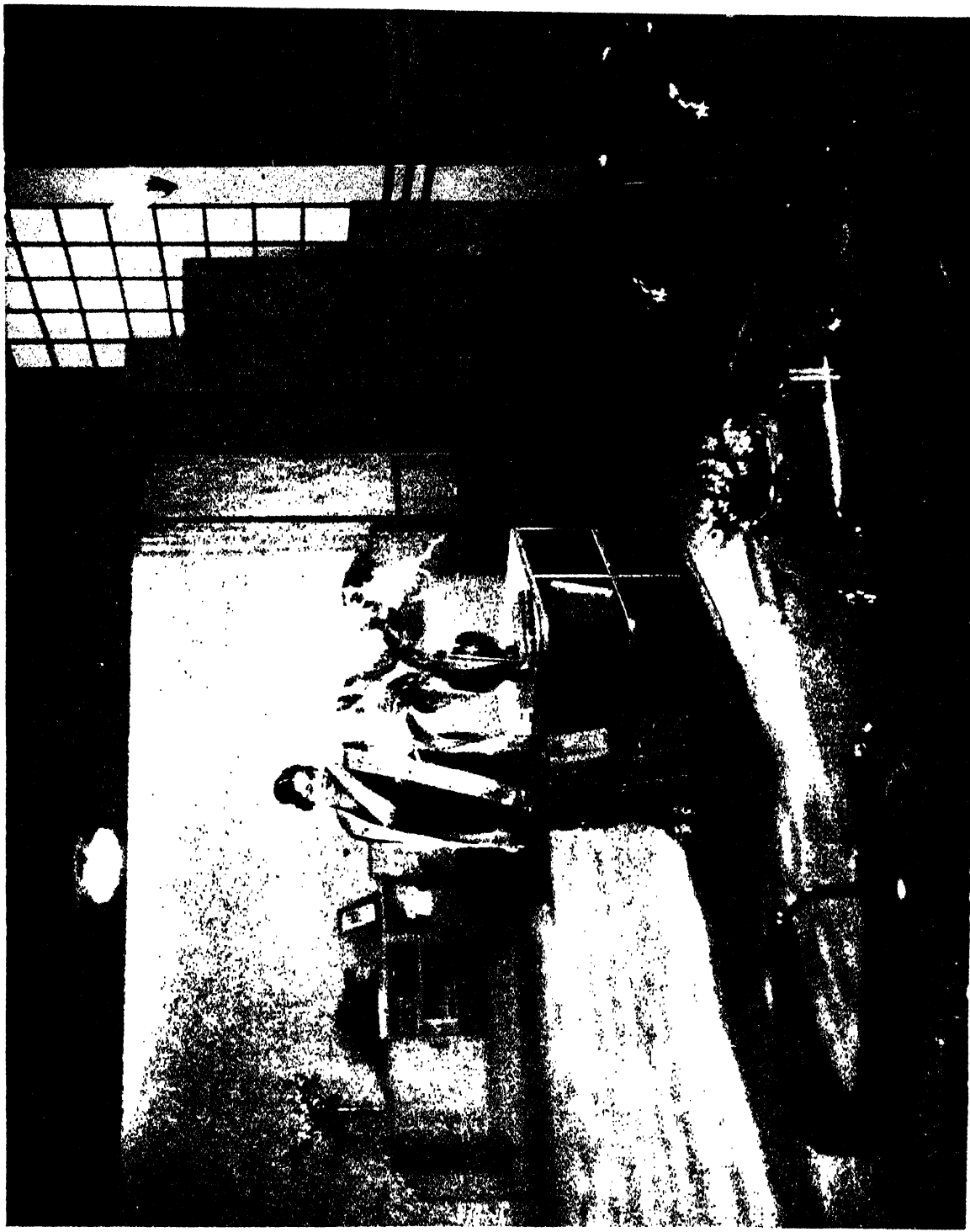
শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের "অভিনয়" চিত্রে
অভিনেত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—**শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়**

অষ্টম বর্ষ, ষোড়শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ই বৈশাখ ১৩৪৫, ২১শে এপ্রিল ১৯৩৮

মেয়র, ডেপুটী মেয়র ও চব্বিশ পরগণার চেয়ারম্যান

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত নির্ব্বাচনে মৌলভী আসরাফ্ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীকে সম্পাদক রূপে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলার কংগ্রেসে নূতন কর্ম্ম পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে অনাচার দূরীকরণকল্পে যে কর্ম্মসূচির আভাষ দিয়াছেন তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি কলিকাতার বিভিন্ন জিলা কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। কর্পোরেশনের ১৯৩৯ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাথমিক বন্দোবস্ত করা এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন পল্লীর জনমত গঠন ও কংগ্রেস-আদর্শে একনিষ্ঠ, দলগত শৃঙ্খলায় আস্থাবান প্রার্থী মনোনয়ন কার্য্যে এখন হইতেই মনোনিবেশ করিলে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য যে সুনিশ্চিত তাহা বলাই বাহুল্য।

আসন্ন মেয়র ও ডেপুটী মেয়রের নির্ব্বাচনের দিন স্থির হইয়াছে ২৯শে এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র এই নির্ব্বাচনে যে নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন আমরা তাহার পূর্ণ সমর্থন করি। তাঁহার অভিমত যে এই বৎসর পৌরপতি (Mayor) একজন মুসলমান হওয়া সমীচিন ও তাঁহার সহকারী হিসাবে একজন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে কংগ্রেসের মুসলিম গণ-সংযোগ ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের নীতির যথার্থতা প্রতিপন্ন হইবে।

মেয়রের পদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বিখ্যাত টালিগঞ্জ পরিবারের প্রতিনিধি প্রিন্স ইউসুফ্ মির্জ্জা এম্, এল্, এ, প্রজাদলের অন্তর্ভুক্ত মিঃ জালালুদ্দিন হাসেমী ও বর্ত্তমান কংগ্রেসী ডেপুটী মেয়র মিঃ জ্যাকেরিয়া প্রার্থী হিসাবে সমুপস্থিত হইয়াছেন। ঐক্য সম্মিলনে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বে শিয়া সম্প্রদায় যে কংগ্রেসে যোগদান করিবার মনস্থ করিয়াছে উক্ত শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মিঃ ইউসুফ মির্জ্জার মনোনয়ন বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেসী ডেপুটী মেয়র হিসাবে মিঃ জ্যাকারিয়ার দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। অবশিষ্ট প্রার্থী মিঃ হাসেমী বহু বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে যিনিই মনোনীত হউন তিনি যে কংগ্রেসী আদর্শে আস্থাবান রহিবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের ডেপুটী লিডার হিসাবে শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র নস্কর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসীদলের সহিত একযোগে কাজ করিতেছেন। সুভাষচন্দ্রের হেমবাবুকে তপশীলভুক্ত জাতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচনের মনোনয়নের সঙ্কল্প সর্ব্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশনে, ব্যবস্থা পরিষদে ও চব্বিশ পরগণার জিলা বোর্ডে বহু বৎসর যাবৎ

জনসেবার একাগ্রতা প্রদর্শন করিয়া হেমচন্দ্র সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিও নাই।

রায় বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র সেনের ২৪-পরগণা জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্ম্মকাল সমাপ্তপ্রায়। বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদে রায় বাহাদুর যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতা-দোষদুষ্ট হক মন্ত্রীমণ্ডলীকে অবিচলিতচিত্তে সমর্থন করিতেছেন তাহাতে তিনি জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়াছেন। বাংলার জিলা বোর্ডের মধ্যে ২৪ পরগণার ন্যায় বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে রায় বাহাদুরের কর্ম্মহীনতা ও ক্লৈব্য তাঁহার পুর্ণনির্ব্বাচনের আশার দীপ নির্ব্বাপিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর কলিকাতার ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইলে তিনি বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হইবেন, সুতরাং ২৪ পরগণার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আসন্ন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত সুধাংশু মিত্র রায় বাহাদুরকে সহজেই পরাজিত করিতে পারিবেন। ২৪-পরগণার জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সুপরিচিত চেয়ারম্যান শশিশেখর বসু মহাশয়ের পুত্র বন্ধুবর শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর বসু সুধাংশু বাবুর সহকারীর পদ-প্রার্থী। কয়েক বৎসর যাবৎ জিলা বোর্ডে বিরুদ্ধ-বাদীদলের অন্যতম নেতা হিসাবে পুর্ণেন্দু বাবু যে কর্ম্মদক্ষতা ও দল পরিচালনে বিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি ও সুধাংশু বাবু একযোগে কর্ম্ম করিলে ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের প্রভূত উন্নতি সাধন হইতে পারে। বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রবেশ-পথে আমরা সুধাংশু বাবু ও পূর্ণেন্দু বাবুর সাফল্য কামনা করিতেছি।

মুস্লিম লীগ

জাতীয় সংগ্রামের অগ্রগতিকে কেন্দ্র করিয়া যাহাদের চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুস্লিম লীগ অন্যতম। তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান সকল সময়েই প্রচার করিয়া আসিতেছে, এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই মুস্লিম সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে, মুস্লিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতীকই হইতেছে এই মুস্লিম লীগ, সুতরাং মুস্লিম সমাজের উন্নতি কল্পে মুসলমান মাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য এই লীগের পতাকা তলে সমবেত হওয়া।

সম্প্রতি কলিকাতায় এই লীগের যে অধিবেশন সমাপ্ত হইয়া গেল তাহাতেও আমরা অনুরূপ আভাষ লক্ষ্য করিয়াছি। মিঃ জিন্না তাঁহার অভিভাষনে যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়াইয়াছেন তাহাতে প্রত্যেকেই বিস্মিত হইবেন। ইতিপুর্ব্বে তিনি যে কয়টি দাবীকে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করিয়া আসিতেছিলেন সেই দাবীর সংখ্যাও এবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আব্দারে বালকের ন্যায় ইহাদের আব্দার ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে।

কিছুদিন পুর্ব্বেও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু কলিকাতায় কোন বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আকাশ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। জাতীয় সংগ্রামের একমাত্র প্রতীক কংগ্রেস এবং এই সংগ্রামকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া ইহার শক্তি বৃদ্ধি করুন। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি, বর্ত্তমান এপ্রিল মাসের শেষভাগে মহাত্মা গান্ধী ও লীগ-বাহন মিঃ জিন্নার সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত আলোচনা হইবে এবং মহাত্মাজী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী ও মিঃ জিন্নার মধ্যে একটা আপোষ রক্ষা করিবার জন্য মধ্যস্থতা করিবেন।

ইতিপূর্ব্বে মিঃ জিন্না ও তাঁহার লীগের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে জিন্না-আন্দোলনের প্রায় অবসান ঘটিয়াছিল। তখনই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য ছিল, মিঃ জিন্না ও লীগকে বাদ দিয়া জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করা--শরীরের অসুস্থ অংশকে কাটিয়া একেবারে বাদ দেওয়ার নীতিই প্রধান চিকিৎসকগণ মানিয়া থাকেন। তাহাতে সদ্যসদ্য সাময়িক নিরাময় না হইলেও ফল লাভ হয় স্থায়ী, নচেৎ সারাজীবন দেহের সেই অসুস্থ অংশকে বহন করিয়া অশান্তিতে দিন কাটাইতে হয়।

বর্ত্তমানে এই জিন্না-তুষ্টি-নীতির প্রতি-কুলে মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস-সভাপতি ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী যদি অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যে আরও শক্তিশালী হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘটনা-প্রবাহের গতি দেখিয়া মনে হয় জিন্না-তুষ্টির দুরতিক্রম্য মোহে মহাত্মাজী, কংগ্রেস-সভাপতি ও জহরলালজীও আকৃষ্ট!

৩১নং ওয়ার্ড

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশনের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শুধু সাংবাদিকের জীবনে পরিতুষ্ট নহেন। আমরা জানিয়া প্রীত হইলাম দাদা কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে ৩১নং ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। গত সপ্তাহে কাশীপুর অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির সম্বর্দ্ধনার সময় বহু বিশিষ্ট অধিবাসী এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। দাদা ও বিশ্বনাথবাবু এক যোগে নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইলে তাঁহারা বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

বালক-সঙ্ঘ

আগামী ২৩শে এপ্রিল ভবানীপুর বালক-সঙ্ঘের সহার্ণ পার্কস্থ ক্রীড়া প্রাঙ্গনে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভা হইবে। মিঃ এস, সি, মিত্র (ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রীস, বেঙ্গল) সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং মিসেস্ জে, সি মুখার্জ্জী পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

আনন্দ পরিষদ

আগামী ২৬শে এপ্রিল 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে আনন্দ পরিষদের আধুনিকতম সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' বা নাট্যরূপান্তরিত 'সরযূ' অভিনীত হইবে। চিরপরিচিত সন্তোষবাবু প্রযোজনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নারায়ণী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া

গত সোমবার ১১ই এপ্রিল হুগলী জেলার অন্তঃর্গত বাগাটী গ্রামে ৺শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী পরলোকগতা নারায়ণী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার ছয় কৃতী পুত্রগণ শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মহাআড়ম্বর এবং জাকজমকের সহিত তাঁহাদের নিজ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বহু প্রবাসী পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীগণ নিজগ্রামে সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়া পরলোকগতা নারায়ণী দেবীর শোকার্ত্ত পুত্রগণ এবং আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। প্রায় একসহস্র উপস্থিত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করিবার পর দুইহাজার দরিদ্রনারায়ণকে বস্ত্র এবং খাদ্য বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি পরলোকগতার সৌভাগ্য এবং সদগুণাবলীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

শ্যামল ভাণ্ডার

গত ১লা বৈশাখ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহাসমারোহে নূতন খাতা মহরৎ হইয়া গিয়াছে সেই উপলক্ষ্যে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং তাহাদিগকে ভুরি-ভোজনে সযত্নে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

বালিগঞ্জ ষ্টুডিও

গত ১লা বৈশাখ বালীগঞ্জ ষ্টুডিওর (গরিয়াহাটা রোড) শুভ-উদ্বোধনউৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত নাগরীক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ষ্টুডিও কর্ত্তৃপক্ষ সমাগত অতিথিবর্গকে জলযোগেরদ্বারা আপ্যায়িত করেন। এই উৎসবে সুরশিল্পী ভানুদেব ভাদুড়ীর কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষ শ্রুতিমধুর হইয়াছিল।

পরলোকে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী

গত ২২শে চৈত্র মঙ্গলবার জনষ্টন্ হফম্যানের ভূতপূর্ব্ব হেড আর্টিষ্ট ৺যোগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার

৯০নং কাঁশারীপাড়া রোডস্থিত বাটীতে সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে স্যার আশুতোষ ও জাষ্টিস্ গ্রীভসের, সিনেট হলে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের এবং আশুতোষ বিল্ডিংএ আশুতোষের তৈল চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পোর্ট্রেট পেন্টিংএ বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, বৃদ্ধ মাতা, এক পুত্র, তিন কন্যা এবং পৌত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমান। গত ২রা

বৈশাখ তাঁহার আগুকৃত্য শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধ বাসরে স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

ভবানীপুর বারোয়ারী সমিতির বিংশ বার্ষিক উৎসব

গত শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৪৫ হইতে ৫ই বৈশাখ সোমবার পর্য্যন্ত ভবানীপুর বারোয়ারীর উৎসব এল্গিন রোডস্থ প্রাঙ্গনে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমদিন "মল্লিকস্ হেলথ হোমের সভ্যগণ 'বিজয় মল্লিক ও বিষ্ণু ঘোষের পরিচালনায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শন করেন, বিশেষ করিয়া শ্রীমণি রায়ের প্যারালাল বার খেলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে। দ্বিতীয় দিবস শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের সভাপতিত্বে জলসা হয়, শ্রীযুক্ত জ্ঞান গোস্বামীর কণ্ঠ সঙ্গীত সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, তৎপরে সভাপতি মহাশয় ও বিখ্যাত টপ্পা গায়ক শ্রীকালী পাঠক মহাশয় গান করেন এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহেড়ী মহাশয় বিশ্বকবির 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করেন। তৃতীয় দিবস ৺রক্ষাকালী মাতার পূজা উপলক্ষ্যে প্রসিদ্ধ-কীর্ত্তনীয় ভূপেন বসুর কীর্ত্তন হয়। গত রবিবারে 'মহামন্ত্র' গীতাভিনয় এবং সোমবারে 'মুক্তি' যাত্রাভিনয় হইবার পর বারোয়ারীর এ বৎসরের উৎসব সমাপ্ত হয়। প্রতি বৎসর বারোয়ারী সমিতির আক্লান্ত চেষ্টায় ভবানীপুর অঞ্চলের এই আনন্দ উৎসব প্রতিবেশীগণকে যে আনন্দ দান করে তাহার জন্য কর্ম্মীবৃন্দ সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

গত সপ্তাহে ঈষ্টারের ছুটি উপলক্ষে চিত্রায় প্রতি প্রদর্শনীতে 'বিদ্যাপতি' দেখবার জন্য প্রচুর জনসমাগম হোয়েছিল। বিদ্যাপতি বাঙলার প্রায় বারোটি শহরে সমান সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হ'চ্ছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ডিব্রুগড়, শ্রীহট্ট, বর্দ্ধমান, আসানসোল, পুরুলিয়া, পাবনা, জমশেদপুর, কুচবিহার ও রংপুরের প্রধান চিত্রগৃহ গুলিতে 'বিদ্যাপতি' জনপ্রিয়তা অর্জ্জন কোরেছে।

এই সপ্তাহে 'বিদ্যাপতি' চিত্রায় চতুর্থ সপ্তাহে পড়লো। আশাকরি বহুসপ্তাহ ধরে এই ছবিখানি বাঙলার চিত্র-রসিকদের আনন্দ দিতে পারবে।

অভিজ্ঞান

অভিজ্ঞান কাহিনীটিকে চিত্র-নাট্যে রূপান্তরিত কোরেছেন—ফনী মজুমদার এবং এর পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ কোরেছেন—প্রফুল্ল রায়। ছবিখানির পরিচালনা ব্যাপারে রায় মহাশয়ের সহকারী হিসাবে কাজ কোরছেন ফণী বাবু। এই বিবৃতির মধ্যে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি ধরা পড়ায় কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে চূড়ান্ত মীমাংসা কোরেছেন, তার উপর নির্ভর কোরে আমরা এই খবরটি এবার পত্রস্থ কোরলুম। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের উপর পরিচালনার দায়িত্ব থাকলেও যে কোন ছবির সাফল্য নির্ভর করে—এর Team work-এর উপর। অভিজ্ঞান-চিত্রে সেই team-work এর সন্ধান আমরা পূর্ণ মাত্রাতেই পা'ব। নিউ থিয়েটার্সের অপরাপর চিত্রের মত এর বিভাগীয় কার্য্যগুলি যোগ্যতম ব্যক্তির উপরেই নিয়োজিত হোয়েচে। সুতরাং আমরা আশা করি এই বিচিত্র ঘটনাবহুল, সমাজ সমস্যা-মূলক সুন্দর কাহিনীটি, তার নিজস্ব মাধুর্য্য নিয়ে, অখণ্ডাকারে ছায়া-চিত্তাকারে ফুটে উঠবে।

এই চিত্রের উপনায়িকা 'আমিনা'র নামটি ছায়া চিত্রে পরিবর্ত্তিত হোয়ে 'নাজমা' রূপে পরিচিত হ'বে। মুস্লিম সমাজের এই গৃহবধূর চরিত্রটি যে কোন সমাজের পক্ষেই আদর্শ চরিত্র। জমিদারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে, জমিদারের পুত্র বধূ সন্ধ্যাকে হরণ কোরেছিল গফুর। নাজমা তাকে উদ্ধার করে। হৃদয়হীন জমিদারের বিচারে অপহৃতা নারীর স্থান হোল না তাঁর অঙ্কলে। তাই ভাগ্যের উপর নির্ভর কোরে স্রোতের জলে, শুক্নো ফুলের মত ভেসে চল্লো—সন্ধ্যা।

এখান থেকেই অভাগিনী সন্ধ্যার জীবনে হোল এক মর্ম্মান্তিক নাটকের সূচনা।

সন্ধ্যার সেই বিচিত্র ঘটনা-বহুল জীবন-নাট্যের প্রতি অঙ্কে এক একটি নর-নারীর আবির্ভাব হোতে লাগলো! এদের মধ্যে আমরা উল্লেখ কোরতে পারি—সন্ধ্যার দূর-সম্পর্কের ভগ্নী সবিতা ও তার স্বামী প্রকাশকে। তারপর এলো, সন্ধ্যার উদ্ধার কর্ত্তারূপে দৈব-প্রেরিত প্রমথ। প্রমথর বন্ধু সুরেশটিও চিত্র-নাট্যকারের একটি মৌলিক সৃষ্টি। এই সব ভূমিকায় দেববালা, শৈলেন চৌধুরী, জীবন গাঙ্গুলী ও ভানু বন্দোপাধ্যায় অতি অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন বোলে প্রকাশ।

নিতান্ত ঝোঁকের বশেই গফুর বন্দী কোরেছিল সন্ধ্যাকে। তাঁর সর্ব্বনাশ সাধন করার উদ্দেশ্য ছিল না তার। কিন্তু বিরোধ বাধলো গোবিন্দকে নিয়ে। গোবিন্দ জাত-ডাকাত। মায়া-মমতা বা ধর্ম্মাধর্ম্মের ধার ধারে না সে। সে চায় বিলাসের পণ্য হিসাবে চড়া দামে এক তরুণীটিকে কোথাও বিলিয়ে দিতে।

দৈবাৎ নাজমা পেয়েছিল তারই সন্ধান এবং সুকৌশলে সে তাকে উদ্ধার কোরে আনে নিজের বাড়ীতে। নারীর জন্যে কেঁদেছিল নারীর প্রাণ। তাই জাতে মুসলমান হ'লেও একটি হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা ও বেদনা তাকে কাতর কোরেছিল বোলেই তার ভেতর হোয়েছিল কর্ত্তব্যের উন্মেষ।

"অভিজ্ঞান" চিত্রে শৈলেন পাল, শৈলেন চৌধুরী ও মলিনা

মলিনা ও মেনকা—সন্ধ্যা ও নাজমা রূপে সকলের অন্তরেই গভীর ভাবে রেখাপাত কোরবে। দুজনেই সুন্দরী, দুজনেই তন্বী। তবে একজন ভাগ্যদোষে পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা। অপরটি সদ্য ফোটা বসন্তের ফুল। আপনার সৌরভে, অন্তরের মাধুর্য্যে, আপনি ভরপুর! হৃদয়স্পর্শী সংলাপের মধ্যে দিয়ে এই দুটি নারী চরিত্র পূর্ণ বিকশিত হোয়ে উঠবে।

ভাগ্য বিড়ম্বিতা সন্ধ্যার জীবন-নাট্যে পর পর, মেঘের পর মেঘ জমে এলো। একজন যে গৃহ-বধূকে গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হবে বোলে পথের বার কোরে দিলে—তাকেই আর একজন গৃহের বধূ করবার জন্যে পাগল হোল। কিন্তু পতিপরায়ণা হিন্দু-ললনার কাছে—স্বামীই তার ধ্যান জ্ঞান, স্বামীই তার চিন্তা। একদিকে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য

এবং অপর দিকে, তার আশ্রয় দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা…

সন্ধ্যা পড়েছিল জীবন-সমস্যার এক চরম সঙ্কট সমাধানে। কেমন কোরে সে, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হোয়েছিল—চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে এই পরিচয় যদি ফুটে ওঠে ত' জনসাধারণ তৃপ্তি পাবে।

বড়দি

পরিচালক মল্লিক মশাই মোটামুটি ভূমিকা নির্ব্বাচন শেষ কোরে, এই চিত্রের মহলা সুরু করেছেন। বহুকাল পরে নায়ক-নায়িকারূপে পাহাড়ী ও মলিনাকে একত্রে দেখা যাবে। এই যুগল-শিল্পী আর একবার 'মীরাবাঈ' চিত্রে একত্রে আবির্ভূত হোয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আমাদের চমৎকৃত কোরেছিলেন। বহুকাল পরে মাধবীও সুরেন্দ্র রূপে এদের একত্রে দেখা যাবে। সুরেন্দ্রের স্ত্রী 'শান্তির' ভূমিকায় বাঙলা ও হিন্দিতে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী চিত্রাবতরণ কোরবেন। ছায়া-চিত্র জগতে একজন প্রথম শ্রেণীর চরিত্রাভিনেত্রী হিসাবে চন্দ্রাবতীর খ্যাতি আজ সুদূর বিস্তৃত। প্রমীলার ভূমিকায় দুইটি নবাগতা মেয়েকে দেখা যাবে। চরিত্রের উপযোগী সুন্দর চেহারা আছে এই মেয়ে দুটির। তা' ছাড়া মল্লিক মশায়ের শিক্ষা গুণে এরা উৎরে যাবে। এই চিত্রের অপর কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অহি সান্যাল হ'বে অন্যতম আকর্ষণ। ছবিখানি সকল দিক দিয়ে যাতে নিউ থিয়েটার্সের সুনামের উপযোগী হয়, তার জন্য পরিচালক মহাশয় প্রাণপাত পরিশ্রম কোরছেন। বড়দিদির সঙ্গীতাংশের পরিচালনা কোরবেন—রাই বড়াল এবং আলোক-চিত্রের কাজ কোরবেন সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী বিমল রায়। এই চিত্রের শব্দানুলেখক কোরবেন বাণী দত্ত।

অধিকার

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া হঠাৎ প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হওয়ায় 'অধিকারের' শুটিং আপাততঃ বন্ধ আছে।

দেশের মাটী

সাইগলের অসুস্থতার জন্যে গত সপ্তাহে দেশের মাটীর শুটিং স্থগিত ছিল।

সারা ভারতে এর ট্রেলার প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

ফণি মজুমদার 'অভিজ্ঞানের' দায়িত্ব থেকে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার'-এর শুটিং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবেনা।

গত সপ্তাহে 'চীপ থিয়েটারের' শুটিং হয়েছে।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

'অভিনয়ের' মন্থর গতি দ্রুততর হয়েছে কিনা তার সঠিক সংবাদ আমরা এখনও পাইনি। ক্যাসানোভার ককটেল পার্টির মায়া না কাটলে বাবুলালজীর অর্থব্যয় অপব্যয়ে পরিণত না হয়—এই আশঙ্কা এখনও আমাদের পূর্ণভাবে বিদূরিত হয় নি। "অভিনয়ে" আর একটী নারী চরিত্র—রম্ভার ভূমিকায় একটি নূতন সুন্দর মুখ দেখতে পাওয়া যাবে—শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জ্জি চিত্রজগতে নবাগতা হ'লেও তিনি প্রথম আবির্ভাবেই দর্শকদের মনে দাগ কাটতে পারবেন বলেই শুনছি।

"অভিনয়ে" অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রীতি মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়ো বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। বাইরের অনেকগুলি কণ্ট্রাক্ট এদের পাবার সম্ভাবনা ঘটেছে। নবপ্রতিষ্ঠিত ইউনাইটেড টকীজ "চন্দা" নামে একখানি সামাজিক ছবি এদের ষ্টুডিও থেকে তুলবেন। আর যামিনী মিত্র "কলেজ কন্যা" নামে একখানি সামাজিক ছবি এদের হয়ে তোলবার ব্যবস্থা করছেন। ডি-জি এখানে খুব ঘোরাঘুরি করছেন, তবে এখনও কোন সুরাহা হয়ে উঠেনি।

"হাল বাঙলা"

মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের জনপ্রিয় এই সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হাস্যরসাত্মক কথা-চিত্রটি এই শনিবার থেকে সপ্তম ও শেষ সপ্তাহে পড়ল।

দেবদত্ত ফিল্মস্

"গোরার" কাজ যদিও ধীরে ধীরেই অগ্রসর হচ্ছে তথাপি কাজ যা হচ্ছে তাকে নিখুঁত বলা যেতে পারে। নরেশ মিত্রের পরিচালনায় ও আর্টিষ্টদের সহযোগিতায় কাজের ভেতর সব সময়ই একটা সুশৃঙ্খলা রয়েছে। এই team-work ভিন্ন কবিবরের "গোরাকে" পর্দ্দায় রূপান্তরিত করা দুরূহই হত। গোরার ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলী ও সুচরিতার ভূমিকায় রাণীবালা নূতন ভাবে দর্শকদের আনন্দ দেবেন। তাছাড়া ললিতার ভূমিকায় প্রতিমা দাশ গুপ্তা যদিও একেবারে আনকোরা তবুও তার উপর অনেকটা আশা রাখা যায়।

ইঁহারা কাহারা?

আসন্ন মেয়র নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সিদ্ধান্তের অন্তরালে

মেয়র ও ডেপুটী মেয়র মনোনয়ন ব্যাপারে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের যে অধিবেশন রাষ্ট্রপতির গৃহে হয় তাহাতে নিম্নলিখিত কংগ্রেস সভ্যগণ অনুপস্থিত ছিলেন।

হরিশঙ্কর পাল
মৃগেন্দ্র মজুমদার
নিতাই পাল
বিধু সরকার
নিশীথ সেন (দলপতি)
কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ
ধীরেন ঘোষ
দেব নারায়ণ দে
ও
ডাঃ ভূপেন বসু

প্রকাশ যে চব্বিশ জন মনোনীত ও ইউরোপীয় সদস্যবৃন্দের সহায়তায় কতিপয় কংগ্রেস কাউন্সিলার দলপতি বলিয়া খ্যাত মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেনকে খাড়া করিয়া কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধিতা করিয়া মেয়র নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। জলপাইগুড়িতে পলায়ন, চিফ্ নিয়োগ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ উপেক্ষা 'ক্যাসানোভায়' সুপরিচিত মিঃ নিশীথ সেনের দলগত নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং তাঁহার এইরূপ সঙ্কল্প যদি কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। তবে আমরা এখনও আশা করি বিধু-নিশীথ প্রমুখ মুষ্টিমেয় কংগ্রেস কাউন্সিলার শেষ মুহূর্ত্তেও দলগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হইবেন।

ইউনাইটেড টকীজ

এ প্রতিষ্ঠানটি একেবারে নূতন। এবং এর বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও নূতন। প্রযোজক শ্রীঅমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই লাইনে নূতন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম ছবি "চন্দা"র সুটিং আসছে শনিবার থেকে সুরু হবে। ইতিমধ্যেই আনুষঙ্গিক কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, সুশীল মজুমদার, বিভূতি গাঙ্গুলী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ধীরেন পাত্র, প্রফুল্ল দাস, রঞ্জিত রায়, রমেন চাট্যার্জ্জি, প্রভৃতিকে দেখা যাবে। তাছাড়া, "মুক্তি-স্নান" ছবিতে টাইপ-চরিত্র অভিনয়ে নৃপতিবাবু একটা নূতন বৈশিষ্ট দেখিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গেও এদের চুক্তি হয়ে গেছে। এই বইতেও তিনি অনুরূপ এক ভূমিকায় দেখা দিবেন। পরিচালনা করবেন গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকারী থাকবেন কুমার সেন।

স্বাশ্রা ফিল্মস্

জনকনন্দিনীর কাজ ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। পরিচালক ফণি বর্ম্মা এজন্য খুবই ব্যস্ত আছেন।

বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, দশরথের ভূমিকায় রবি রায় ও অন্যান্য ভূমিকায় সুশীল রায় (এঃ), জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখা যাবে।

পুরুষোত্তম এর নূতন নাম হয়েছে "নর-নারায়ণ"। খুব শীঘ্রই এর সুটিং সুরু হবে।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন্ আর্টস.

এই নামের প্রতিষ্ঠানটি আজ বছর দু'য়েক ধরে কোল্‌কাতার বুকে বেশ তিড়িং বিড়িং সুরু কোরেছে। 'এরা প্রথমে "রামকান্ত" নামে একখানা ছবি তোলেন কিন্তু এযাবৎ অবধি সেই ছবির কোনও পাত্তা নেই। ভেতরে বাবুদের মধ্যে এই ছবি নিয়ে হস্তুরমত শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বেঁধেছিল বলে কানাঘুষা শুনা যায়।

তারপর এই প্রতিষ্ঠানই ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টসকে সর্ট কাট্ কোরে 'ও-কে-এ' নাম দিয়ে "রূপোর ঝুম্‌কো" ছবি তুলেছেন। প্রতিষ্ঠানের নাম বদলের মধ্যে অবশ্য একটু যে রহস্য নেই এমন নয়! তবে সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময় এখনও আসে নি। "রূপোর ঝুম্‌কোর" ঠুংঠুং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বটে কিন্তু সেই আওয়াজে কেউ ভুলছেন না। গদাইবাবু ও রঘুনাথ বাবু এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

পূর্ণ থিয়েটার

এই শনিবার থেকে মুক্তি, পঞ্চম সপ্তাহে পড়ল। বর্ত্তমানে যেরূপ জনসমাগম হচ্ছে তাতে মনে হয়, ছবিখানা আরও কিছুদিন চলবে।

—:০:—

কিরণবাবুর সশস্ত্র নিরপেক্ষতা

এবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও কর্ম্মকর্ত্তা নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র যে পন্থাবলম্বন করিয়াছেন তাহা যে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি যে ঘোরতর সন্দেহজনক তাহা অনেকেই অনুভব করিতেছেন। সহযোগী 'বসুমতী' এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"কিরণশঙ্কর রায় দীর্ঘকাল হইতে বাঙ্গলার কংগ্রেসী দলে কোন্ গ্রহ বলিয়া পরিচিত তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক ও সদস্যনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে সুভাষচন্দ্র যদি সতর্কতাবলম্বন করেন তবে ভাল হয়। পূর্ব্ব হইতে সতর্কতাবলম্বন করিলে বিপদের জন্য সশস্ত্র থাকা যায়।"

কিরণবাবু যে বর্ত্তমান সচিব-সঙ্ঘের কোন সচিবের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং অনুরূপ বিবৃতি অধিকতর সন্দেহজনক ও আশঙ্কাজনক।

পরিশেষে সহযোগী "বসুমতী" বলিয়াছেন :— "যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা ও সদস্য-নিয়োগ সর্ব্বসম্মত বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত তাঁহাদিগের নিকট সহযোগলাভের আশা কিরূপ সুদূরপরাহত আমরা আশা করি, সুভাষচন্দ্র তাঁহার এত দিনের অভিজ্ঞতায় তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।"

জানিনা রাষ্ট্রপতি সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন কি না। তবে কিরণ বাবুর 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা' (armed neutrality) যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা মোটেই বিস্মিত হইব না!

———

বরুণা! হ্যাঁ, একটি মেয়ে। সাধারণ মেয়েদের পর্য্যায়ে ফেললে ওকে ভুল বুঝা হবে। আশালতা, শান্তিলতাপ্রমুখা লতা বিশেষিকা মুষড়ে পড়া মেয়ে ও নয়। ওর চরিত্রে আছে দৃঢ়তা, মাধুর্য্য, শ্রী। বয়েস উনিশ থেকে বিশের মধ্যে—বেশী হওয়াই দৃষ্টি সঙ্গত—স্বাস্থ্যবতী, দীর্ঘ বাড়ন্ত চেহারা। যৌবনের প্রাচুর্য্য সারাদেহে লীলায়িত। পিতা-মাতা স্বর্গীয়, দাদা ও বৌদি অভিভাবক।

কলেজে পড়ে বরুণা, থার্ড ইয়ার চলছে। শুধু পাঠ্য পুস্তকে ওর তৃপ্তি হয়না, ও পড়ে বিভিন্ন আধুনিক সাময়িক পত্রিকা। শুধু তাই নয়, কলেজের আলাপী মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুলেছে নারী সমিতি। সমিতির উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য—মেয়েদের পরমুখাপেক্ষী না হওয়া, নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করা আর 'অবলা' কলঙ্ক মোচন করা। নারী সমিতিরও সেক্রেটারী পাকা মাথাওয়ালা। ওর সামনে অঢেল কাজ, অশেষ সমস্যা।

ও গম্ভীরা, অযথা হাসি তামাসা ওর স্বভাবের অতীত। ও নিজেকে কখনো হাল্কা করেনি—অন্ততঃ কোন পুরুষের সামনে নয়। ছোটরা ওকে ভক্তি করে, বেশী করে ভয়, আর সমবয়সীরা করে সমীহ।

* * *

হঠাৎ এল রণেন—বউদির একমাত্র সহোদর। দীর্ঘ পাঁচ বছর অজ্ঞাতবাসের পর এই তার প্রথম প্রকাশ। রণেন যখন এবাড়ীতে এল, বরুণা তখন নিজের ঘরে টেবিলের সামনে বসে সমিতির কাজ করছিল। দরজা ভেতর থেকে ভেজানো। চেয়ারে বসেই দরজার স্বল্প ফাঁক দিয়ে নবাগতকে দেখবার চেষ্টা করল। ব্যর্থ হল। সে তখন পাশে বৌদির ঘরে। শুনতে পাওয়া গেল—বৌদি বলছেন—'বেশ ছেলে যা হোক তুই! সেই যে কাউকে না জানিয়ে উধাও হোলি সে আজ পাঁচ বছরের কথা, তারপর এই এ্যাদ্দিন পরে দিদিকে মনে পড়লো। এক কলম লিখে খবর পর্য্যন্ত দিলিনা। আমরা ভেবে মরি তোর পর! বেশ!' বৌদির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর।
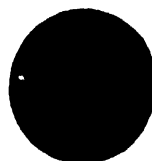
আগন্তুক হেসে উঠল সশব্দে। হাসি থামিয়ে বলল—'কী কোরে দেবো বলো দিদি! তখন নিজেকে নিয়ে এতো ব্যস্ত যে, আশে পাশে তাকাবার ফুরসুৎ ছিল না। জানো-নাতো কী দারুণ বিপদে পড়েছিলুম!'

'জানবো কী কোরে শুনি! আমরা কী এখান থেকে ঘড়ি পেতে তোর খবর নেবো। ছেলের এমন কাজের চাপ যে দুটো কথা লিখে জানাতে পারলে না। থাক্ থাক্ ঢের হোয়েচে। বোনেদের ওপর ভাইদের দরদ যে কতোখানি তা জানতে আর বাকী নেই। আমরাই শুধু তোমাদের জন্য কেঁদে মরি নিষ্ঠুর কোথাকার।'

'সত্যি বলচি দিদি, লিখলুম না এই ভয়ে পাছে তুমি আমার চিঠি পেয়ে কান্নাকাটি সুরু করো। তোমাদের তো আর জানতে বাকী নেই! বাঙালীর মেয়ে করুণরসের বন্যা—'

বৌদি ধমক দিয়ে উঠলেন—'থাম ঢের হোয়েচে, লেক্‌চার দিয়ে বাহাদুরী কোরতে হবে না। এই পাঁচ বছর ধরে কী কর্ম্মোটা কোরে এলে শুনি?

'বেশী কিছু নয়। সারাটা ইউরোপ প্রদক্ষিণ কোরে শেষকালে ঘরের পাশে এশিয়ার কোলে চীনে গিয়ে রংয়ের কাজ শিখে এলুম।'

'খুব কর্ম্ম কোরেচো—' একটু থেমে বৌদি বললেন' হ্যাঁরে এখন এখানে কিছুদিন থাকবিতো?'

'কোথায়? এই বাড়ীতে? পাগল নাকি! তা'লে তোমাদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘর-বাড়ী ছেড়ে বানপ্রস্থ নিতে হবে। বন্ধু-বান্ধবদের যা অমানুষিক অত্যাচার, সে বাঙালীর বাড়ীতে সইবে না। সেইজন্য সোজা গিয়ে আস্তানা পেতেচি এক ম্যানসনে জিনিষপত্র সবই সেখানে!

বৌদি চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওরে ছেলে! তুমি বুঝি একবার চোখের' দেখা দেখতে এলে! কী দরকার ছিল আসবার! না এলেই তো পারতিস, কে তোকে আসবার জন্য দিব্যি দিয়েছিলো!"—বৌদির—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল। বোঝা গেল চোখের কোনে জল এসে দাঁড়িয়েছে।

নবাগতর গলা ভারি ভারি, বলল—"ওকি, রাগ হ'লো বুঝি? সত্যি দিদি তুমি, ভাই অমন মুখভার কোরে থেকোনা, আমার ভারি কষ্ট হয়। কদ্দিন পরে এলুম, কোথায় একটু আদর যত্ন কোরবে, তা নয় কেবল চোখের জল ফেলচো। দূর ছাই আমি চল্লুম কিন্তু বোলে দিচ্চি এই আমার অগস্ত্য যাত্রা।

"যা যেখানে খুশী—ওকি সত্যি চল্লি—" বুঝতে পারা গেল যে, নবাগত গমনোদ্যত—"ওরে পাগল শোন্। এখনো সেই ছেলে মানুষটী আছিস। কিছুটী বদলায়নি, শুধু মাথায় ঢ্যাঙা হোয়েছিস। তুই মাথা ঠাণ্ডা কোরে বুঝে দেখ, আমরা এখানে থাকতে তুই পরের মত এক জায়গায় গিয়ে উঠলি, এটা কী ভালো কথা? উনি শুনলে কী ভাববেন বলতো!

"সব বুঝি দিদি, কিন্তু উপায় নেই। ওঁকে বোলো এই অধম শালাটীকে মাপ করতে। তুমি কল্পনা কোরতেও পারবে না তাদের অত্যেচার! সেখানে " অতোটা সুবিধে কোরে উঠতে পারবে না। আর, এক আধটা জাত নয় সর্ব্বজাতি সমন্বয়। বাঙালী, মাদ্রাজী, বোম্বেওয়ালী থেকে সুরু কোরে গয়ার পাপ ট্যাম্মু পর্য্যন্ত! কোনো বাদ বিচার নেই,' এলাহি কাণ্ড।—কথান্তে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—"ওরে বাবাঃ পেটে আগুন জ্বলচে। শীগগির তোমাদের যা-আছে সব নিয়ে এসো—ভীষণ ক্ষিদে পেয়েচে, উঃ অসহ্য!"

বৌদি ধমক দিয়ে উঠলেন— "ওরে পোড়ারমুখো থাম। তোর সামনে দাঁড়াতে বাপু ভয় হয়, যা হাত-পা ছোঁড়ার বাই! বোস দিকি চুপটী কোরে এক জায়গায়! আমি আসচি এক্ষুনি—" —আর সাড়া পাওয়া গেল না কারো। বোঝা গেল বৌদি অগ্নির নিবৃত্তির ব্যবস্থা করতে গেছেন।

তারপর জোরে জোরে ফেলা জুতোর শব্দ কানে এল। ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে—একেবারে তার দোরের কাছে। অতঃপর ভেজানো দরজা দুটো দমকা ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলে সে ঘরে ঢুকল।—দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ চেহারা। তার পরণে আভূমি লম্বা আমেরিকান প্যাণ্ট, গায়ে দামী সিল্কের হাফ সার্ট। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, ঈষৎ উলটে দেওয়া। প্রশস্ত কপাল—মসৃণ, রেখাহীন। আয়ত চোখদুটী অধীর, স্বতঃ চঞ্চল। সর্ব্বাঙ্গে একটা উত্তেজনার ঢেউ। কোথায় জড়তা নেই কিংবা একটু সঙ্কোচ। বরুণা ঝলসে গেল রণেনকে দেখে। ওর জীবনে প্রথম দেখা সত্যিকারের পুরুষ।

বরুণাকে সামনে দেখে রণেন চমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি দু-পা পেছিয়ে গেল। সবিনয়ে বলল—"ঃ too sorry! don't take any offence, Please.

বরুণা আড়ষ্ট গলায় বলল—"no need. আমি আপনাকে চিনি, আসুন।" —ব'লে পাশের চেয়ারটী এগিয়ে দিলে।

চেয়ারে বসে রণেন বলল—"ধন্যবাদ!"—টেবিলের ওপর কাগজ খানা দেখে—বলল "লিখচেন? গল্প নিশ্চয়?"

বরুণা কাগজখানার ওপর দু-হাত চাপা দিয়ে সসঙ্কোচে বলল—"না, এমনি একটা"—

* * *

নিরুদ্দেশ

ভাই সুকুমার,

আর রাগ কোরোনা, ফিরে এস। বাড়ীতে সকলে উৎকণ্ঠিত। তোমার পছন্দ মতন ব্যবস্থা হবে। বাবা মা অমত করবেন না।

মেজদা (সুধীর)

পরে এক শনিবার সন্ধ্যের সময় বরুণা হিন্দু স্যানসনে গিয়ে উঠল। ঘর খুঁজে বার করতে কষ্ট হ'ল না। বেয়ারা দেখিয়ে দিলে। দোতলায় কোণের দিকে একখানা ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিলে। বরুণা দরজার গায়ের কলিং বেলটা টিপে দিলে। কয়েকমুহূর্ত পর ভেতর থেকে অস্পষ্ট গলায় উত্তর এল—'আসুন!'

দোর ঠেলে ও ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। দেখল, অদূরে জানালার ধারে খাটের উপর রণেন শুয়ে। গায়ে একখানা বিচিত্র রংয়ের কম্বল। মাথার চুলগুলো রুক্ষ, এলোমেলো। ওকে দেখে রণেন শুয়ে থেকেই হাততুলে নমস্কার করল। শুকনো ঠোঁটের ওপর নিঃশব্দ হাসির রেখা টেনে চেয়ার দেখিয়ে বলল—'বসুন!'

বরুণা যন্ত্রচালিতের মত চেয়ারে বসে পড়ল, পরে জিজ্ঞাসা করল—আপনার অসুখ কোরেচে নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ, জ্বরাক্রান্ত। পরশু শেষ রাত থেকে জ্বর হোয়েচে।

বলবার কথা খুঁজে না পেয়ে বরুণা বলল—হঠাৎ! অত্যেচার করেছিলেন নিশ্চয়!'

'তা একটু করেছিলুম বটে। পরশু অনেক রাত পর্যন্ত মোটরে ঘুরে ব্যাধিটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরেচি—' বরুণার হাতের খাতার দিকে চোক পড়তেই বলল—'ও: আপনাদের চাঁদাটা আজ দেবো বলেছিলুম, না?

'থাক্ না, সেরে উঠুন, যেদিন হোক দেবেন!'

'তা কী হয়! Word is word! আমার উঠতে কষ্ট হোচ্চে। আপনি দয়া কোরে ওই আলনায় ঝুলানো কোটটার বুক পকেট থেকে মনিব্যাগটা নিয়ে উচিত মত চাঁদাটা কেটে নিন্।'

'না-না আপনি—'

'লজ্জা কোরচেন কেন? আপনি কী আমার পর, না অবিশ্বাসী! আর, আমার কথা ছেড়ে দিন। আজ রাজা, কাল ফকির! ভালো চান তো এই সময় বুদ্ধিমতীর মতো নিয়ে নিন্।'

অগত্যা ও উঠে গিয়ে কোটের পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করে একখানা দশটাকার নোট তুলে ব্যাগটা যথাস্থানে রেখে দিল।

রণেন জিজ্ঞাসা করল—'আর দরকার নেই?'

'না'—নোটখানা ভ্যানিটী ব্যাগে পুরে বলল—'এতেই হবে। আপনি হয়তো আমায় heartless মনে কোরলেন!

(ক্রমশঃ)

পরলোকে ভবানীশঙ্কর

কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাইবুন্যালের প্রথিতযশাঃ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীভবানীশঙ্কর মিত্র কিছুকাল রোগভোগের পর আকস্মিক-ভাবে প্যারিসে মাত্র আটাশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গত দশ বৎসর

যাবৎ অধ্যয়নব্যপদেশে শ্রীমান্ ভবানীশঙ্কর প্যারিসে অবস্থান করিতেছিলেন এবং প্যারিসে ভারতীয় ও অভারতীয় ছাত্রমহলে বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি তথাকার ভারতীয় ছাত্র সঙ্ঘের সম্পাদক ছিলেন।

ভবানীর চরিত্রে যে দৃঢ়তা বাল্যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত সে বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। গতানুগতিকের মোহ-মুক্ত এই অনুজপ্রতিম যুবকের অকাল মৃত্যুতে আমরা প্রিয়জনবিয়োগ ব্যথাতুর-চিত্তে মিত্র-পরিবারের পরিজনবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। শোকার্ত্ত পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই তবে কবির বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহাদের শোক-উপশমার্থে বলি :—

Gods love those who die young.

পরলোকে ললিত মিত্র

সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র-অভিনেতা ললিত মিত্র গত রবিবার রাত্রি ৩টার সময় মাত্র সাত দিন জ্বর ভোগান্তে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলার রঙ্গ-জগতের ও চিত্রজগতের যে বিশেষ ক্ষতি হইল—একথা বলাই বাহুল্য।

গোয়ালটুলির প্রসিদ্ধ মিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত ললিত মোহন মিত্র প্রথমে কিলিক্ নিক্সন কোম্পানীতে এ্যাকাউণ্টাণ্ট হিসাবে কর্ম্ম জীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে ললিতবাবু ও সন্তোষ দাস প্রভৃতি তরুণ শিক্ষিত যুবককে লইয়া রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের দ্বিতীয় নাটক "নিবেদিতা"র রতিকান্তের ভূমিকায় ললিতবাবু প্রথম রঙ্গাবতরণ করেন। তাহার পর ১৯২৮ সালের শেষভাগে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে সাজাহান নাটকে দিলদারের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তৎপরে "গোপিকা রমণ শ্রীকৃষ্ণ' যখন "গোপিনী রমণে" নামান্তরিত হয় তখন তিনি নাম ভূমিকায় যে অনবদ্য অভিনয় করেন তাহা তাঁহাকে রঙ্গ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

তৎপরে তিনি "গৈরিক পতাকায়" যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয় করেন। "ঝড়ের রাতে" তাঁহার রায়বাহাদুরে, "সতীতীর্থে" তর্কালঙ্কারে তাঁহার তুলনাবিহীন অভিনয় চিরদিন রঙ্গামোদিদের স্মরণে থাকিবে।

ইহার পর তিনি আর্ট থিয়েটারে যোগদান করেন। "বড়বৌ" নাটকে পুরোহিতে, "মন্দির প্রবেশে" সমাজপতিতে "মানময়ী গার্লস স্কুলে" ফার্ণেণ্ডেজে, "চির কুমার সভায়" মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পুনরায় নাট্য-নিকেতনে যোগদান করিয়া তিনি 'মা' নাটকে হরিপ্রসন্নের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া, রূপমহলে যোগদান করিয়া "জহিরণ" "আত্মাহুতি" ও "আবুল হোসেন" নাটকে বিভিন্ন ভূমিকায় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়া পুনরায় ক্যালকাটা থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে 'আলাদিন' নাটকে বাদশা ও "গোরায়" শিরোমণি তাঁহার রঙ্গমঞ্চে শেষ অভিনয়। ইহার পর একবৎসর

নকুড়মামা: ললিত মিত্র

তিনি সিনেমায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। Excause me Sirএ যমরাজ তাঁহার প্রথম চিত্রাবতরণ। "তরুণীতে" কালাপাহাড় "মুক্তিস্নানে" দারোগা, "কচি সংসদে" নকুড়-মামা আজও আমাদের চক্ষু অশ্রু-সজল করে।

চরিত্র-মাধুর্য্যে বিনয়-নম্র ব্যবহারে খোলামন ললিত বাবু প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চিরপ্রিয় ছিলেন। অজাতশত্রু নটের অকাল তিরোধানে রঙ্গ-জগতে আজি সকলেই ব্যথিত। আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীমান কানু ও তাঁহার পরিবারবর্গ ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার দাসকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

থমকে দাঁড়ালাম, মা ও মেয়ের উত্তেজনা দেখে সত্যই বড় অন্য মনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম তাই হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারলাম না। একটু ইতস্ততঃ করে বল্লাম, না ভাই, মায়ের আদেশের মূল্য কি ভুল দিয়ে শোধ করতে পারি। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি-নে কমলা, তুই ও মা কেন আমার বন্ধুদের ভেতর চাইছিস্। অন্য স্থানে হয়ত ভালও পেতে পারি।

কমলা এবার বেশ জোড় দিয়ে তিক্তস্বরে বল্লে তুমি কি মায়ের চেয়ে বেশী বোঝ, বড়দা, না, তাঁর আদেশের বিচার কর্ত্তা!

তাড়াতাড়ি চলে এলাম, এবং জানিয়ে এলাম তাই হ'বে।

কমলাদের বাড়ী হ'তে এসে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতেই রাজ্যের ভাবনা এসে ঘিরে ধরলো! আমি জোর করেও কল্পনা করতে পারলাম না যে, মা ও মেয়ে একযোগে কেন আমায় বন্ধুদের ভেতর চান! কি এর কারণ থাকতে পারে। খুজে দেখবো ঠিক করে, চিন্তার বোঝা জোর করে ঠেলে উপর তলায় খেলায় যোগ দিতে গেলাম।

ঘরে ঢুকতেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল একযোগে বলে উঠলো, এই যে কমলার দাদা এতক্ষণে ছুটী পেয়েছে। কমলার দাদা সকলের কাছে হ'টে গেলেও কুৎসিৎ ইঙ্গিত করতে কেও কসুর করতো না, নিছক হাঁসি দিয়ে উড়িয়ে দিতাম। এ ছাড়া উপায়ই বা কি! মনে মনে ভাবতাম, ভগবান রক্ষে করেছেন যে কমলার "বড় কাকা" বলে না! তা হ'লে আমাকে ও পাড়া ছাড়তে হ'ত কি না কে জানে।

তারপর ৭ দিন কমলাদের বাড়ী যাই নি! পাত্র দশার অক্ষমতার হেতুও বটে, মেসের বন্ধুদের বিদ্রূপ৹কমাবার জন্যেও বটে! ৮ দিনের দিন কমলার ছোট ভাইটী "পাপী" আমার ঘরে ঢুকলো! তাকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যালো, রিপোর্টার! কি সংবাদ।

এই ছেলেটীকে বেশী ভালবাসি, যেমন দুষ্ট, তেমনই ড্যাম্পেটে! আমার মেসে যে যে কথা হয় তার প্রত্যেকটি কমলাকে গিয়ে বলে। আবার তাদের বাড়ীর সব কথাই আমাকে জানিয়ে যায়, এই জন্য তাকে রিপোর্টার বলি!

রিপোর্টার এক রকম জোড় করেই আমার কোঁচা ধরে টান্তে সুরু করে বললে শিগির আসুন। মা, আপনাকে ডাক্চেন।

সে যে পরিমাণে ব্যস্ততা দেখা'ল ততখানি জরুরী কিছু মনে হ'ল না, তাহ'লে অন্য কেউ আস্তেন যাই হ'ক, বললাম—চান করে যাচ্ছি, তুমি যাও।

সন্ধ্যে তখন ৭টা! চান আমি দু'বেলাই করি এ তারা সকলেই জানে, তাই দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল!

স্নান করে কমলাদের দুয়াড়ে ঘা দিতেই কমলা এসে দুয়াড় খুলে দিয়ে একমুখ হেঁসে বললে—এই যে বড়দা! বলি এতদিন কোথায় ছিলে, শুনি। আমার বর খুঁজে খুঁজে বুঝি হয়রাণ হ'য়ে মরছো, আহা একেবারে রোগা হয়ে গেছ।

তার বলার ভঙ্গিমা দেখে হেঁসে ফেললাম, গুম্ গুম্ ক'রে দু'টা কিল বসিয়ে দিয়ে বল্লাম—হাঁ,, হয়েছিই ত, তুই কি কম কষ্ট দিচ্ছিস্। বল্লাম, বিয়ে করিস্ নে, তা হ'ল না, বিয়ের নাম শুনে জিব দিয়ে জল পড়ে গেল!

কমলা তিরস্কার স্বরে বললে—আচ্ছা দাদা! তুমি বাড়ী ঢুকেই আমাকে নিয়ে অমন কর কেন বলত। কখনও খোঁপা ধরে টান, হাত ধরে হিড় হিড় করে টান্তে থাক। সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে এমনি করতে, মনে কর তোমার মেস থেকেই যদি কেউ দেখে তখন কি হ'বে!

শেষের দিকে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেও দুষ্টমীতে তার মুখখানা ভরে গেল! সে যে সোমত্ত এ কথা বিদ্রূপস্থলে আমাকে মনে করিয়ে দে'বার সত্যিকার কোন কারণ ছিল কি না জানি নে। আমার কিন্তু কেমন খট্কা লাগলো! এইটুকু কথাতেই চোখ দু'টো আপনা হ'তে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গর উপর বুলিয়ে নিলাম। আজ দু মাস তাকে নিয়ে ময়দা মাখার মত ছান্‌ছি, এর মধ্যে এক মুহূর্ত্তও আমার দেখবার সুযোগ হয় নি, কিংবা দরকার পড়ে নি, যে সে সোমত্ত কিংবা অসোমত্ত! বোন,—তার রূপ যৌবন, ভাইএর কাছে তৃপ্তির হ'তে পারে, কিন্তু যেমন মূল্যহীন, তেমনি অকেজো, অদামী, অথচ এই অকেজো জিনিষের দোহাই দিতে দেখে সত্যিই বড় লজ্জিত হ'লাম!

মনে মনে স্বীকার করতেই হ'ল, শুধু সে সোমত্ত হয় নি, তার সারা দেহে রূপ যৌবন এক সঙ্গে ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে!

হাঁসি মুখেই বললাম—না, রে ভাই! সত্যিই তুই দস্যি হ'য়ে উঠেছিস্, এবার তোর বরের দরকার!

কমলা হাত তালি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলো—দাদা এবার স্বীকার করেছে, কেমন ঠকিয়েছি।

এমন সময় ভেতর হ'তে মা ডেকে বললেন—হারে মনি এসেছে নাকি, কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস্।

আমি আর কমলা এক সঙ্গে মায়ের কাছে হাজির হ'লাম। দেখি আর একজন নূতন লোক রয়েছেন, পরিচয় জানবার জন্য কমলার পানে চাইলাম, সে আমার অতি নিকটে ছিল।

আমার উদ্দেশ্য বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'ল না, হেঁসে ফেলে বললে—ইনি আমার বিয়ের পাকা ঘটক গুণধর ভগ্নিপতি। তোমার দ্বারা "ত" কোন কাজ হ'বার যো নেই, খালি, কমলির পিটু ব্যথা করতেই জান!

হেঁসে ফেললাম, মাকে লক্ষ্য করে বললাম—দেখচেন, মা, কি দুষ্ট, আমি যেন খালি ওকে কিল দিতেই আসি।

তারপর কমলাকে লক্ষ্য ক'রে বললাম—তুই যে, ধোঁকা চাপিয়ে বসে আছিস্, তা ত আর জানি-নে, ভাই!

আমাদের ঝগড়ার মাঝে, মা বলে উঠলেন আচ্ছা, থাক্ রে বাবা! আমার জামাই কি বলেন শোন, ইনি একটী ছেলে ঠিক করেছেন, গভর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরী করে, দেখতে মন্দ নয়, আমি নিজেও দেখেছি! খুব কমেই হ'বে, তোর কি মত বলত, বাবা! তোকে ছেড়ে ত কিছু করতে পারি নে!। তোরাই বা আর কত খোঁজাখুঁজি করবি, বল।

বয়স্থা মেয়ের বিয়ে এত সংক্ষেপে হ'লে মানুষ যে পরিমাণে খুসি হয় মায়ের সে ভাবের কোন লক্ষণই দেখলাম না। অবসাদ অনিচ্ছাকৃত মত দেওয়ার আভাষ তাঁর সারা মুখখানায় ফুটে উঠলো। কমলার মুখ পানে চেয়ে দেখি, সে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে! তার যৌবন শ্রীতে ভরা চটুলতায় মাখান মুখখানি কেন যে হঠাৎ এমন বার্দ্ধক্যে পরিণত হ'ল, এর কোন তথ্য বুঝতে পারলাম না। মনে হ'ল তার ভেতর বাইরে একটা কিসের অব্যক্ত জ্বালায় খাঁ খাঁ করছে, কিন্তু কিসের এই জ্বালা পোড়া! মা ও মেয়ের ভাব দেখে মনে করলাম, স্পষ্ট বলে যাই, না, মা, থাক, এ বিয়েতে কাজ নেই, একটা অজানা, অদেখার হাতে বোনটীকে আমার এমন করে দিতে পারবো না। কিন্তু তা আর পারলাম না, মায়ের অন্তরের যাই থাক, মুখে তিনি মত দিচ্ছেন, আর এর উদ্যোগী হ'চ্ছেন, একমাত্র তাঁরই জামাতা। আমি কেন ধূমকেতুর মত এর ভেতর উদয় হ'য়ে একটা অনর্থক করে বসি!

কোনরূপ দ্বিরুক্তি বা ইতস্ততঃ না করে বেশ জোর করেই বললাম বাঃ চমৎকার। এর মধ্যেই দিতে হ'বে, মা!

তারপর কমলার পিঠ চাপড়ে বললাম কি ভাই! বর এলে দাদাকে মনে থাকবে ত।

সে কোন উত্তর করলো না, সেই রূপ আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলো। আমি কোনও কথা বলবার ফুরসৎ না দিয়ে এক লাফে চলে এলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনেই কমলার বিয়ে হ'য়ে গেল! পরের দিন রবিবার! অনেক দেশে প্রথা আছে, রবিবারে বর কনে বাড়ী হ'তে যেতে নেই। তাই কমলার বরকে রইতে হ'ল।

এই দিনটায় অন্ততঃ ১০০ বার কমলাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, তাদের পছন্দ হ'য়েছে কিনা, বাস্তবিক কমলার বর খুব ভাল! এই টুকুর ভেতর যে ব্যবহার পেয়েছি, তাতে সত্যিই বড় খুসি হ'য়ে গেছি। কমলারও মুখখানা হাঁসিতে ভরে গেছে! বিয়ের আগে তার মলিন মুখখানা দেখে যে পরিমাণে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, তার পরিবর্ত্তে এই হাঁসি ও তৃপ্তিতে ভরা মুখখানা যে আমার কাছে কতবড় দামী তা বুঝবেন তারাই, যারা আমার মত লক্ষ্মী বোনের বড়দা! —কমলাদের মটরে তুলিয়ে দিতেই সে আমাকে হাত তুলে নমস্কার করলো! কি জানি কেন, আপনা হ'তে আমার চোখে জল দেখা দিল! তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে এলাম।

কমলার শ্বশুর বাড়ী বরিশাল জেলায়। বিয়ের পরই কমলার স্বামী অনিল বাবু আমার আফিসের সন্নিকটে বাসা করলো! আমি প্রতিদিনই তাদের বাসায় যেতাম। কমলার স্বামী আসতো ৬৷০টায়! আমার ৪টায় ছুটী। ৭টা হ'তে অনিল বাবু, আমি ও কমলা রাত ১০টা পর্য্যন্ত মাসিক পত্রিকার আলোচনা করে কাটাতাম! বাড়ীখানি মন্দ নয়। নীচের তলায় আরও কতকগুলী ভাড়াটে থাকতো! কমলা থাকতো দোতালায়! বেশ নিরিবিলি, আমার কোন অসুবিধা হ'ত না।

৮৷১০ দিন পর বলেই মনে হয়। ঠিক করলাম আজ আর কমলাদের বাড়ী যাব না! তার বাড়ীর দোর দিয়ে যেতেই অনিল বাবুর সঙ্গে দেখা! ২৷৪টা কথার পর মিথ্যে শরীরের দোহাই দিয়ে যাবার উপক্রম করতেই অনিল বাবু অনেকটা অস্পষ্টভাবে বললে বড়দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, রাগ করবেন না ত।

এতক্ষণ তার মুখপানে তাকিয়েছিলাম মনে হ'ল সত্য এবং মিথ্যার ভেতর দিয়ে লোকটা অনেক কিছু ভেবে দেখেছে। তা

না হয় হ'ল! কিন্তু এমন কি শক্ত কথা, আমার রাগের প্রশ্নই বা উঠে কেন! ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমাকে এমন ভাবে দোল দিলে যে ক্ষণিকের জন্ত বাকশূন্য হয়ে গেলাম।

সাহস সঞ্চয় করে বললাম বলুন, না, রাগ করবো কেন!

সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল আপনার নামটা জানতে পারি-'ন, অথচ আপনার মত আমার আপন জন আর কেও নেই।

খুব সোজা প্রশ্ন! তবুও সহসা কোন উত্তর দিতে পারলাম না। তবে কি কমলা আমার পরিচয় দেয়নি, কিংবা কি ভাবে দিয়েছে! অনিল বাবুর মুখপানে চেয়ে দেখি আমার উত্তরের জন্য উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রয়েছে! কিসের এত ব্যগ্রতা আর কেনই বা এত ভণিতা।

যাই হ'ক আমি জোড় করে হেঁসে বললাম—ও এই, সত্যিই আমার নাম জানেন না, কমলা বলেনি আমার নাম··· "মণি মোহন বসু"।

কমলার স্বামী চম্‌কে উঠ্‌লো, কিছুক্ষণ আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে আপন মনে বল্‌তে লাগলো—কমলার আপন দাদা নয়, তা হ'লে ত ঠিকই বলেছে।

আর একটা কথাও না বলে হন্ হন্ করে বাড়ীর ভেতর চলে গেল! আমি হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি যে ব্যাপারটা অনুভব করতে না পেরে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম। হঠাৎ কমলাদের উপর হ'তে ঝন্‌ঝন্ করে কিসের শব্দ কানে আস্‌তেই এক লাফে দোতলায় কমলার ঘরের বাইরে সিড়ির পাশে লুকিয়ে যতদূর সম্ভব তার ঘরের ভেতর পানে দেখতে লাগ্‌লাম! চায়ের বাসনগুলি ঘরের চারিদিকে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পরে আছে।

কমলার স্বামী কর্কশ স্বরে কমলাকে লক্ষ্য করে বল্‌ছে—কেন তুমি এতদিন আমাকে বলনি, যে মণিবাবু তোমার আপন দাদা নয়। আমাকে এতদিন লুকিয়ে এসেছ কেন! কি তোমার উদ্দেশ্য!

কমলা সজল চোখে অথচ জোড় দিয়ে বল্‌ছে—মণিবাবু আমার বড়দা, তার চেয়ে ভাইয়ের মত ভাই আর আমার একটীও নেই। তোমাকে আমি কিছু ফাঁকি দিই-নি, তাঁর সম্বন্ধে কি তুমি শুনেছ ব'ল! আমাকে কি কোনদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তিনি আমার আপন ভাই কিনা? হ'ক তিনি কায়েস্থ, তিনি আমার বড়দা! ভারী বামুন গিরি দেখাতে এসেছ!

কমলার স্বামী ব্যঙ্গভরে বললে—খুব সতীগিরি ফলাচ্ছ, থাক, আমার বাড়ীতে ওসব চল্‌বেনা।

মুহূর্ত্তের জন্যে কমলার চোখ দুটো ধপ্ করে জ্বলে উঠল। রাগে এবং অভিমানে কাঁপ্‌তে কাঁপতে বিকট চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলো—আমার নারীত্ব নিয়ে কখনও কুৎসিৎ ইঙ্গিত করোনা।

প্রবল উত্তেজনায় এই কটী কথা বলেই হাঁপিয়ে উঠলো, তারপরই আছাড় খেয়ে বিছানায় উপুর হ'য়ে পড়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো।

কমলার স্বামী হয়ত এরজন্য প্রস্তুত ছিল না, তাই ভয়ে থতমত খেয়ে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লো, এবং অনেকটা শান্তস্বরে বললে—তা হ'ক তুমি এক্ষণই মণিবাবুকে লিখে দাও, তিনি যেন কোনদিন আমার বাড়ী না আসেন।

কোনরকমে মাথাতুলে সাশ্রুনয়নে কমলা জিদ্ করে বল্‌লে—লিখিতে হয় তুমি লেখ-গে। আমি কক্ষনও তা পারবো না। তিনি আমার বড়দা, বড়দা! বড়দা।

আমার নিজের মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, কোনরকমে রেলিংটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভাবতে লাগলাম, হায়রে অদৃষ্ট অনিল বাবু কেবল এইটাই বড় করে দেখ্‌লেন যে সম্বন্ধটাই জগতে বড়, এ ছাড়া নির্ম্মল স্নেহ পবিত্র ভালবাসা কি সম্ভব নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মণিবাবু! দেওর, বৌদি, পিসি, মাসি যে সব সম্বন্ধকে এত বড় করে মনে করছ, তাই তার অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা কি রেখে চ'ল তোমরা! তবে ও সুতোর বাঁধন যা একটা ফু দিলে উড়ে যায় তার এত বড়াই কিসের ভাই। মানুষের কাজ বুঝবার, কিংবা অন্তর যাচাই করবার শক্তি যদি না পেয়ে থাক, ত জেনে রাখ সংসারে সম্বন্ধটাও একটা নিছক ন্যায়ের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়! এ'টাকে সত্য ব'লে দাঁড় করালে সত্যিকার জিনিষ হ'তে বাদ পড়েই রইবে ভাই! কমলা আমার আপন বোন নয়, এই হ'ল আমার বড় অপরাধ। বেশ ভাই।

মাতালের মত চুপে চুপে যখন পালিয়ে আসি, অস্পষ্ট ভাবে কাণে এল, আচ্ছা আমিই লিখে দিচ্ছি।

—:শেষ:—

শুটিংএর কাট ছাট

দেশের মাটি ছবিতে উমা যে সকল শাড়ী, জামা ইত্যাদি ব্যবহার করিতেছেন—তাহাতে গ্রামের ছাপ শতকরা একশ ভাগ। নিকটস্থ কোন গ্রামের তাঁতী তাহা প্রস্তুত করিয়াছে।

* * *

চন্দ্রাবতী শিক্ষিতা অরুণার ভূমিকায় যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেশীয় কোন মিল হইতে প্রস্তুত। মিলের লোক এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ফলে কতকগুলি নূতন ডিজাইন লাভ করিলেন।

* * *

সহরের ঘরামী দ্বারা গ্রাম্য কুটীর তৈয়ার করা যায় না। সেই জন্য দেশের মাটির কুটীর প্রস্তুত করিবার জন্য পাড়াগাঁ হইতে প্রায় ২০ জন ঘরামীকে "দেশের মাটি" চিত্রে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে খরচ বেশী হইলেও কাজ নিখুঁত হইতেছে।

* * *

এই চিত্রে সহরের শিক্ষিত ধনী লোকের যে প্রকার ঘর বাড়ীর নমুনা দেখানো হইতেছে, তাহাও বাস্তবিক অতি চমৎকার। ভবিষ্যতে আমরা হয়ত বহু ধনীর গৃহ এবং গৃহ সজ্জা "দেশের মাটির" নমুনা মত দেখিতে পাইব।

* * *

ফণী মজুমদারও তাঁহার প্রথম বাংলা এবং হিন্দি "The Street Singer" চিত্রে নানা প্রকার নূতন জিনিষ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। বিশেষ করিয়া কানন এবং সায়গলের সাজ সজ্জায়।

* * *

ফণীবাবু সেটের ডিজাইনেও কতকগুলি একেবারে নিজস্ব পরিকল্পনা করিয়াছেন। পরিচালক ফণী মজুমদার বয়সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ হইলেও—অভিজ্ঞতায় কাহারো অপেক্ষা কম নহেন। যে ভাবে তিনি তাঁহার ছবির কাজ চালাইতেছেন, তাহা বাস্তবিক পক্ষে আশ্চর্য্যজনক।

* * *

উমা-সায়গলকে এক সঙ্গে অভিনয় করিতে দেখিয়াছেন, এইবার ফণী বাবুর চিত্রে সায়গল কাননকে এক সঙ্গে দেখিবেন। বহুজন এই দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে একসঙ্গে দেখিবার আশা করিয়াছেন, এতদিনে তাহাদের আশা পূর্ণ হইল। 'দি ষ্ট্রীট সিঙ্গার' চিত্রে গানের মাত্রা এবং রকম কি প্রকার হইবে—তাহা কানন এবং সায়গল একসঙ্গে থাকাতেই বুঝা যায়। সঙ্গীতে ইহাদের সমকক্ষ আর কে আছে—? অবশ্য আমরা উমা সায়গলের কথা বাদ দিয়ে বলিতেছি।

* * *

চন্দ্রাবতী দেশের মাটি চিত্রে যে ভূমিকায় নামিয়াছেন, তাহা তাঁহার 'দিদি'র ভূমিকা অপেক্ষা বৃহত্তর হইলে বহু বিষয়ে মিল আছে। দেশের মাটি চিত্রে চন্দ্রাকে তাঁহার অভিনয় শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করিতে হইতেছে। প্রত্যেকটি দৃশ্যের জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ বেশ কয়েক ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইতেছে। মানসিক পরিশ্রমও তাঁহাকে কম করিতে হইতেছে না।

* * *

সায়গলকে এইবার দেশের মাটি চিত্রে আমাদের আদর্শ বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে দেখা যাইবে। যে মহৎ আদর্শ সামনে রাখিয়া সায়গল এবং তাহার বন্ধুবর্গ গ্রামে কাজ করিতেছে—তাহা তাহাদের সত্যকার জীবনেও বহু পরিমাণে এবং ভাবে প্রতিফলিত হইবে।

* * *

'মহৎ কিছুর অভিনয় করাও ভাল' এই বাক্য এইবার দেশের মাটি চিত্রে প্রমাণিত হইবে। মহৎ কোন কিছুর অভিনয় করিতে করিতে তাহা বহু ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে সত্য সত্যই ফলিয়া যায়। দেশের মাটির চিত্রেও ইহা দেখা যাইবে।

* * *

"দি ষ্ট্রীট সিঙ্গার" চিত্রে কানন যে ভূমিকায় নামিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব এক আনন্দ পরিবেশনের চরিত্র। ইতিপূর্ব্বে কানন যে সকল ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—তাহাকে কমবেশী পরিমাণে 'দুঃখান্ত' বলা যায়। কিন্তু পথের গায়িকার ভূমিকায় এইবার কানন "সুখান্ত" চরিত্রে নামিয়াছেন।

* * *

সুখ দুঃখে দুইটি অসহায় জীবন কেমন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে এক সঙ্গীতময় রাজ্যে গিয়া পড়িল—তাহাই ফণীবাবুর চিত্রে দেখিতে পাইবেন। এই চিত্রে অমর মল্লিক এবং শৈলেন চৌধুরীও দুইটি ভূমিকায় নামিয়াছেন। "বড় দিদির" কাজ ছাড়া অমর বাবু ফণীবাবুর চিত্রের কাজ লইয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আমরা জানি অমর মল্লিক দুঃসাহসী লোক এবং তাহার এ যোগ্যতাও আছে।

শ্রীদুর্ব্বাসা
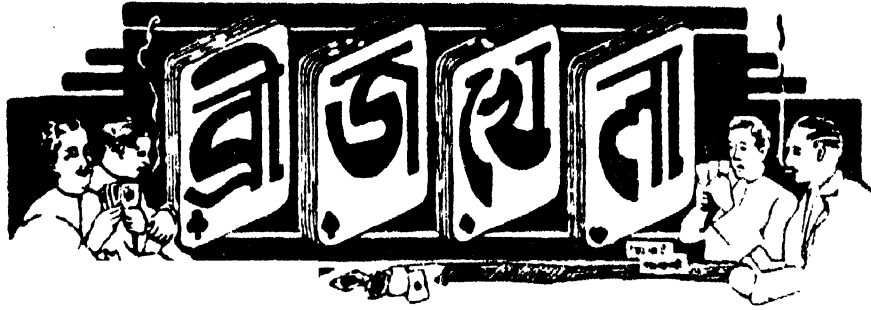
ফিনাস নেবার কয়েকটি অবস্থা :—মনে করুন আপনি দক্ষিণে বসেছেন,—আপনার হাতে আছে।

ইস্কাবন—সাহেব, x।

ইস্কাবন—গোলাম, সাতা, চৌকা।

আপনার ফেরাইএর খেলায় প্রতিপক্ষ ইস্কাবনের ছক্কা খেলেছেন,—আপনি কি খেলবেন বলুন তো? 'দ' 'উ'র হাত থেকে এ ক্ষেত্রে ছোট একখানি ইস্কাবন দেবেন। এই ধরণের খেলায় ইস্কাবনে একবার মাত্র পিট আটকাতে পারা যায়, অন্য কোন প্রকার খেলায় কোনমতে ইস্কাবনে পিট আটকান অসম্ভব।

(২) ইস্কাবন—সাহেব, ছক্কা, তিরি

ইস্কাবন—বিবি, দশ, দুরি।

এক্ষেত্রে 'দ' ফেরাইএর খেলা খেলছেন। ইস্কাবনের সাতা খেলার পর 'উ' তিরি দিয়েছেন, এখন বলুন তো 'পূ' কি দেবেন?

'পূ'র বিবি মারা উচিত; কারণ 'পূ' দশ দিলে কোন ফল হচ্ছেনা, বরং ক্ষতিকর হয়, যে হেতু 'দ'র হাতে গোলামও থাকতে পারে।

(৩) ইস্কাবন—বিবি, x, x।

ইস্কাবন—টেক্কা, x, x।

'দ' ফেরাইএর খেলা খেলছেন, 'প' ছোট একতাস ইস্কাবন খেলেছেন। এখন 'দ' 'উ'র হাত থেকে কি তাস দেবেন বলুনতো?

'উ'র হাত থেকে একতাস ছোট ইস্কাবন দেওয়াই উচিত, কারণ 'পূ'র হাতে শুধু ইস্কাবনের সাহেব বা সাহেব x থাকলে তিনি ইস্কাবনের সাহেব ফেলতে বাধ্য হবেন; অতএব ডাককারীর এই রঙে দুইখানি পিটই হয়ে যাচ্ছে।

(৪) ইস্কাবন—পঞ্জা, চৌকা, তিরি।

ইস্কাবন—বিবি, ছক্কা, দুরি।

'দ'র ফেরাইএর খেলায় 'প' ইস্কাবনের সাহেব খেলেছেন, তাহলে 'পূ' কি তাস দিয়ে যাবেন।

'পূ'র বিবি দেওয়াই উচিত, কারণ হাতে টেক্কা সাহেব গোলাম সমেত তাস নিয়েই অথবা টেক্কা সাহেব সমেত ছয় বা সাতখানি তাস নিয়েই ইস্কাবনের সাহেব পেড়ে খেলেছেন। যে কোন অবস্থা ধরুন না কেন 'প' তার ইস্কাবনগুলি পর পর খেলবেন এবং দ্বিতীয়বারেই আপনাকে বিবি ফেলে দিতে বাধ্য করবেন। ইহা অপেক্ষা প্রথমবারেই বিবি ফেলে দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে খেঁড়ীকে ঐ রঙে খেলতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত।

(৫) ইস্কাবন—সাহেব, দশ, তিরি, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, x

'দ' ফেরাইয়েই খেলা খেলছেন, উত্তরের হাত থেকে দুরি খেলা হয়েছে এবং 'পূ' বিবি দিয়েছেন। 'প' এখন কোন্ তাসখানি দেবেন।

'প'র টেক্কা দেওয়া উচিত, কারণ টেক্কাটিকে এক্ষেত্রে ধরে রেখে কোন ফল হচ্ছেনা; অথচ যদি তাঁর খেঁড়ীর হাতে গোলাম, x, x সমেত তিনখানি তাস থাকে, তাহলে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

ইছাপুর অর্ডন্যান্স ক্লাব:—
বিগত রবিবার ৩রা এপ্রিল থেকে ইছাপুর অর্ডন্যান্স ক্লাবের বাৎসরিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। এবার এদের প্রতিযোগিতাটির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এরা আবার নূতন একটি কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট বিভাগে প্রতিযোগিতা বের করেছেন এবং কলিকাতার প্রত্যেক দলকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন। সুখের বিষয় এদের আহ্বান সানন্দে গৃহীত হওয়ায় কলিকাতার বহু ক্লাবই দলে দলে প্রতিযোগিতার আসরে পদার্পণ করছেন এবং মাঝে মাঝে কোন কোন দলবিশেষ unconventional ডাক দিয়ে প্রতিপক্ষের বিস্ময় উৎপাদন করে আসর সরগরম করে তুলছেন। তবে অর্ডন্যান্স ক্লাবের সভ্যবৃন্দের সুমধুর ভদ্র ব্যবহার ও উপভোগ্য আতিথেয়তা প্রত্যেকের মনেই যে বহুকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে, ইহা আমরা স্বীকার করি।
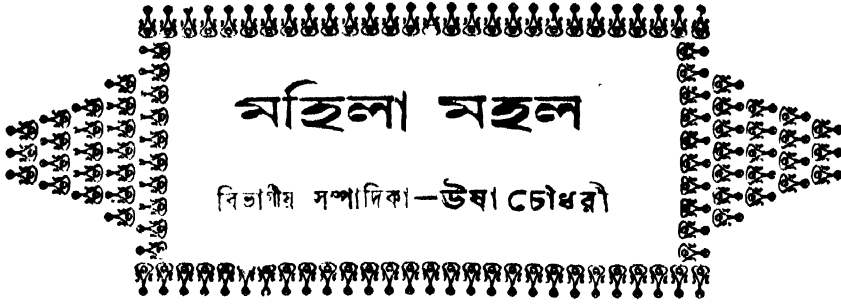
মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—ঊষা চৌধুরী

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর এই ছোট আলোচনার মধ্যে নারী-ধর্ম্মের কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাবেক কালের নারীর এবং আধুনিক নারীর জীবনের বিচিত্রতার দিক্ নিয়ে আজ বহুল আলোচনার প্রয়োজন।

আমরা এই আলোচনামূলক প্রবন্ধ আমাদের পাঠিকা-মা-বোনদের কাছ থেকে আহ্বান করছি।

(সঃ মহিলা-মহল)

মাননীয়া "খেয়ালী মহিলা-মহল সম্পাদিকা"

সমীপেষু—

বহুল প্রচারিত 'খেয়ালী'র পাতায় মহিলা-মহলের প্রয়োজনীয় আলোচনা পাঠে আমরা মহিলা সম্প্রদায় সবিশেষ উপকৃতা। গৃহশিল্প সম্বন্ধে আপনার ধারাবাহিক আলোচনা প্রকৃতই মহিলা সমাজের কল্যাণকর।

বাঙ্‌লার নব আলোকপ্রাপ্তা নারী-সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে আজ জীবনের গতিকে অনেকখানি পাল্‌টে দিয়েছে। ত্যাগ ধর্ম্ম আজকের নারীর আর সাধনা নয়—বিলাস আর আত্মসুখ আজকের নারীর অলাভরণ। সাবেক কালের নারীর জীবন-ধারা আর আজকের নারীর জীবন ধারায় অনেকখানি প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। আজকের নারী সভ্য বলে গর্ব্ব প্রকাশ করে থাকে—জীবন যাত্রায় পাশ্চাত্য শিক্ষালাভে সাবেক কালের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়ে পাশ্চাত্য কৃষ্টিকেই আধুনিক জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করে নিচ্ছে। নতুন ভাবে নারী আজ তার জীবনকে গড়ে তুল্‌তে চাইছে এবং এরই ফলে সমাজে এক বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য একথা খুবই সত্যি—আধুনিক কালের নারী সাবেক কালের অনেক জড়তা-দীনতা-কুসংস্কার পরিত্যাগ করে জ্ঞানালোকে পরিশুদ্ধ হয়েছে অনেক অন্ধসংস্কার-কুনীতি আজ পশ্চিমের আলোকে সংস্কৃত হয়েছে। জীবনের ক্ষেত্র আজ কয়েকদিকে বিস্তীর্ণতর। কিন্তু অনেক দিক থেকে আমরা আবার ক্ষতিগ্রস্থ। বহু-দিক থেকে গৃহধর্ম্ম—গৃহশান্তি আজ ব্যহত। উপকার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে—শিক্ষা, সংস্কার এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আজকের নারীর জীবনে বহু অপকার, অমঙ্গল, অশুভ সংস্কার এবং কুশিক্ষা নেমে এসেছে। গৃহস্থ আজ কতখানি হীন—গৃহস্থ আজ ডাক্তারের খরচে রিক্ত—রান্না ঘরের তার রুদ্ধ—বিদেশীর হাতে তার চাবি—সাবেক কালের দুটি সম্পদ থেকে আজকের নারী রিক্ত, এসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আপনাদের খুবই সুবিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

মাতৃত্বাকাঙ্খী নারী সন্তান প্রতিপালনে স্বভাবগত যত্নশীলা—আজকের নারীর সে স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। কথাটি খুবই অপ্রিয়—কিন্তু অসত্য নয়। অপেক্ষাকৃত অর্থহীন সংসারে ঝি, চাকরের কোলে প্রতিপালিত ছেলে মেয়ের মুখে মাতৃসম্ভাষণ "মামি" শুন্‌লে সত্যিই দুঃখ হয়। ছেলেরা "মা" বলে না - মায়েরাও "মা" নামের চেয়ে বিলাতি সুরের "মামি" শুন্‌তে চান। পার্কে বেড়াতে গেলে নিত্যই দেখা যায় এই "মামি" সম্ভাষণকারী এই শিশুসম্প্রদায় মাতৃ-অঙ্কবিচ্যুত—এই সন্তান-দলের আয়া-ঝি-চাকরের কাছে কি অশেষ-বিধ লাঞ্ছনা। জীবনের প্রভাতে যারা আয়া-ঝি চাকরকেই চিন্‌লো তাদের পরিচর্য্যাকারীরূপে-মাকে বল্‌লো 'মামি' এবং আয়া 'ঝি' 'চাকরের' কোলেই পেলে মায়ের আদর তাদের মায়ের কৃতজ্ঞতা কতখানি থাকতে পারে যাকে তারা কতখানি চিন্‌তে পারে—সে কথা কি ভাববার মত সময় আজ আসেনি?

আজকের নারী নিজহস্তে সন্তান প্রতিপালন করে নিজেদের দরিদ্র বলে পরিচিত দানে লজ্জা অনুভব করে। এখনও এ মারাত্মক ব্যাধি আমাদের সমাজে খুব বিস্তারলাভ করেনি কিন্তু এর গতি এখন প্রতিহত না হলে অদূর ভবিষ্যতে বিস্তৃততর হতেও বেশী বিলম্ব হবে না।

আমার এই ছোট আলোচনাটি পত্রস্থ করলে খুশি হব, নমস্কার। বিনীতা—

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ—বিদ্যার্থী মণ্ডল, দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান, ছোটদের বৈঠক, সান্ধ্য অনুষ্ঠান তারই মধ্যে আবার পল্লীমঙ্গল আসর বেতার বিচিত্রা, থিয়েটার বক্তৃতা প্রভৃতি। এই বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার জন্যে আবার বিভিন্ন প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টরও নিযুক্ত আছেন। বাঙ্গলা দেশেও গুণী আর্টিষ্টের অভাব নেই। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্যে লোকেরও অভাব নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রোতাদের কাছ থেকে নিত্যই শোনা যাচ্ছে অভিযোগ। শ্রোতাদের অভিযোগ আর্টিষ্টদের অভিযোগ দিনে দিনে চলেছে বেড়ে!

* * *

সকলেরই মুখে প্রধান অভিযোগ প্রোগ্রাম ভালো হচ্ছে না, কোন বিভাগেরই কার্য্যধারা সম্পূর্ণ সুখ্যাতিযোগ্য নয়। কোন বিভাগের প্রোগ্রামেরই একটা নির্দ্দিষ্ট standard নেই। প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে আমরা মোটেই নতুনত্বের আস্বাদ খুঁজে পাচ্ছি নে।

* * *

ছোটদের বৈঠক দিনে দিনে অবনতির স্তরে নেমে যাচ্ছে। মাসিমা এবং দাদুমণি কোনই কৃতিত্ব দেখাতে পাচ্ছেন না। মধ্যে এ আসরটির বেশ খানিকটা উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল কিন্তু ইদানিং সমালোচনার অযোগ্য হয়ে উঠছে এ আসর। যত বাজে আর্টিষ্টের ভীড় দেখছি এ আসরে। নৃপেন-বাবুর দীর্ঘসময়ব্যাপী চিঠি পাঠ আর ফোর্থক্লাশ নাটিকা অভিনয়—গান বাজনা!. শিশু সাহিত্য শিশুদের আসরে উপেক্ষিত।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানও তথৈবচ! মহিলা-দের জন্যে এ আসর বেতারে চিরদিনই উপেক্ষিত। বেতার কর্ত্তৃপক্ষকে এ আসরের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দেখা যায় না। কোন রকমে জোড়াতাড়া দিয়ে রেকর্ড বাজিয়ে ফোর্থক্লাশ আর্টিষ্টদের দ্বারা দেড় ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া।—বেতার জগতে অপরাপর বিভাগের প্রাধান্য দেওয়া হয় কিন্তু দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান তথা মহিলা আসর উপেক্ষিত!

* * *

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে তবু পাওয়া যায় কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয় রাবিশের গাদায় সেগুলি চাপা পড়ে যেতেও দেরী হয় না। যে সব প্রোগ্রামে থাকে বৈচিত্র্য—যে সব আর্টিষ্ট খানিকটা মৌলিকতা এবং গুণের পরিচয় প্রদান করেন—এই অনুষ্ঠানে কিছুদিন বাদে আর তাঁদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

* * *

“গোধূলী চিত্র” “মাইকেল বধ কাব্য” বেতারে বিশিষ্ট অবদান। বহুদিন যাবৎ আমরা এমন সুনিপুণ রসজ্ঞানের পরিচয় বেতারে পাইনি। কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতি অনুষ্ঠানও বেতারে প্রশংসনীয়। বাণীকুমার রচিত এবং প্রযোজিত বেতার-বিচিত্রা আজকাল বেশ ভালোই হচ্ছে।

* * *

বক্তৃতা বিভাগের আমরা কোন উন্নতিই দেখতে পাচ্ছিনা। বেতারে মাঝে ছোট গল্পের প্রচলন দেখেছিলুম, কয়েকটি ভালো গল্পও শুনেছিলুম বহুদিন পূর্ব্বে। অধুনা প্রোগ্রামে আর রসসাহিত্যের আলোচনা বড় দেখিনা। বেতারের প্রোগ্রাম পরিচালনায় এইখানেই কৃতিত্ব দেখি। শ্রোতারা যা চায় কর্ত্তৃপক্ষ তা পরিবেশনে গররাজী।

* * *

মিসেস এস, এন, ঘোষ কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের নিম্নলিখিত গুণী শিল্পীদের ছয়খানি রৌপ্যপদক পুরস্কৃত করেছেন।

(১) পল্লীমঙ্গল আসর সুপরিচালনার জন্যে সাহিত্যিক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

বাউল সঙ্গীতের মূলকথা

দেবাশীষ সেনগুপ্ত

'বাউল' শব্দটীর সঙ্গে আমরা সকলেই সবিশেষ পরিচিত। 'বাউল' সঙ্গীতের সুমধুর মূর্চ্ছনাতে মুগ্ধ হয়না এমন লোক বিরল। লোকসঙ্গীতের যে অপরূপ রূপটী এই বাউল সুরে মূর্ত্ত হয়ে উঠে শ্রোতা-মণ্ডলীর অন্তর সুধারসে প্লাবিত করে তা সত্যিই অনিন্দ্যসুন্দর! উদাস শান্ত সুরে কোন ঘরছাড়া পাগলকরা বিবাগী যেন ডাক দিয়ে যায় সেই প্রান্তর পরে—দিক হতে দিগন্তরে, পাখীর কলকূজনের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে জেগে উঠে রাখালের বাঁশী— ক্ষুদ্র তটিনীর কলোচ্ছাসের তালে তালে তাল রেখে যেখানে আবেগ আনন্দে গান গেয়ে চলে যায় এপার ওপারের খেয়া মাঝির দল।

বাউল গান আজকাল যেন বাঙ্গলার অন্যান্য লোক সঙ্গীতের সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেরই ধারণা বাউল ভাটিয়ালী ইত্যাদি সমশ্রেণীর সঙ্গীত এবং এদের সকলেরই মূল এক। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বাউল গানের সঙ্গে ভাটীয়ালী শ্রেণীর গানের তেমন কোন সম্বন্ধই নেই। বাউল ও ভাটিয়ালীর মিশ্র সুর বর্ত্তমানে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত—শ্রোতাদের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ সমূহের মধ্যে এটাকেও একটা বিশেষ স্থান দেওয়া যেতে পারে।

বাউল সঙ্গীতের তথা বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা বোধ করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'বাউল' কথাটীর উৎপত্তি 'বাতুল' থেকে —যার অর্থ উন্মাদ বা পাগল। হরিনাম শ্রবণে আনন্দে অধীর হয়ে বাহ্যজগতের সকল বিস্মৃত হয়ে যারা উদ্দাম নৃত্য-হাসিকান্না সংমিশ্রণে নানাবিধ পাগলের মত আচরণ প্রকাশ করতো—জনসাধারণ তাদেরই 'বাতুল' আখ্যায় ভূষিত করে দিয়েছিলো। একদল লোক যেমন এদের 'খ্যাপা' বা প্রকৃত 'বাতুল' ইত্যাদি বলে এদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে চলতো, অন্যদল তেমনি এদের প্রকৃত সাধু 'প্রেম-বাতুল' বলে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে ছায়ার মত প্রতিনিয়ত অনুসরণ করে বেড়াত। ইতিহাসে এমন কয়েকজন মহাবাউলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যারা 'ঈশ্বরের অবতার' রূপে বঙ্গদেশে সর্ব্বসাধারণের পূজ্য আরাধ্য দেবতা বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। ৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাদের মধ্যে অন্যতম।

বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। বস্তুতঃ বৈষ্ণব সমাজেরই কিয়দংশ বাউল সমাজে পরিণত হয়। উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে—বৈষ্ণবেরা প্রশান্তভাবে হরিনাম গানের পক্ষপাতী এবং বাউলেরা হরিনামে উন্মত্ততা প্রদর্শনের পক্ষপাতী।

আলোচ্য শতাব্দীতে সন্ন্যাসীরা প্রায়ই পরিব্রাজকের বেশে দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষায় চাল সংগ্রহ করতো। অবশ্য উদরান্ন সংস্থানের জন্যেই তাদের সন্ন্যাসগ্রহণ তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন 'গোসাঞী মাধব পুরী'—ইনি কখনও কারও কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন নি। স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ কিছু দিলে তিনি তা খেতেন আবার কিছু না জুটলেও নির্ব্বিকারভাবে উপবাস দিয়ে উপাসনায় মত্ত থাকতেন।

শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইনি সেই পুরী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। পুরী সন্ন্যাসীরা অদ্বৈতবাদী—ব্রহ্মই তাদের উপাস্য, কিন্তু গোসাঞী মাধব পুরী ছিলেন বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক—বিষ্ণুমন্ত্র জপের দ্বারা আপন অন্তরে তিনি সেই লীলাময় দেবতার চিরপ্রসন্ন মূর্ত্তিখানি প্রতিষ্ঠা করে রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। অদ্বৈতবাদসম্মত ব্রহ্মজ্ঞানকে তিনি নিরস বলে উপেক্ষা করতেন। ভগবান কৃষ্ণের লীলাকথা শুনবা মাত্র মাধবপুরী বাহ্যজ্ঞান বিরহিত হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ে অশ্রুপাত করতেন। আবার পর মুহূর্ত্তেই হয়ত বিকট হাসির সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করে দিতেন। যথার্থ গুণ-গ্রাহীরা-ভাবগ্রাহীরা—তার এই ভাববিচলতা দেখে তাকে ভাবোন্মত্ত বৈষ্ণব আখ্যায় অলঙ্কৃত করেন কিন্তু অবোধ জনসাধারণের নিকট তিনি বাতুল রূপেই অবজ্ঞাত হয়ে রইলেন। এই 'বাতুল' আখ্যাই ক্রমশঃ মুখে মুখে বর্ত্তমান 'বাউল'রূপ প্রাপ্ত হয়।

গোসাঞী মাধবপুরী যে কেবলমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ ছিলেন তা' নয়—সর্ব্বশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। মুখে মুখে তিনি এমন সুন্দর সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে পারতেন যে, তৎকালীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেরও

---

(২) সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনার জন্যে সাহিত্যিক অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য।

(৩) গুরুভিনয়ের জন্যে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র।

(৪) "আজু গোঁসাই বনাম রামপ্রসাদ" শ্রীকালীপদ পাঠক এবং

(৫) শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ

(৬) সংবাদ সরবরাহের জন্যে শ্রীবিজন বসু

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

আকাশ সমুদ্র শৈল মেরু মরু অরণ্য কান্তার
সবাই স্বাধীন আজো ভূচর খেচর জলচর,
হিংস্র শ্বাপদ আর ভুজঙ্গের সর্প বিষধর
আমরা স্বাধীন বলি সিংহ দ্বীপি ছাড়িছে হুঙ্কার।

ইরানী কাবুলী তুর্কী ক্ষুদ্র জাপ চৈনিক মোঙ্গল
সবাই স্বাধীন আজো ফিরিতেছে উল্লসিত মনে
উহারা স্বদেশ ভক্ত নহে কভু পরাঙ্মুখ রণে
বাজায় ভৈরব শিঙ্গা, পদভরে ক্ষিতি টলমল,
হে স্বদেশ ভক্ত কবি, শুধু তব মাতৃভূমি
পরাধীনা ঘুমায় কেবল।

শতবর্ষ ক্ষুদ্রনদী সীমাহীন কালসিন্ধু পানে,
কোথায় মিলায়ে গেছে তোমার জন্মের দিন হ'তে
কত রাজা লুপ্ত হ'ল বুদ্‌বুদের মত তা'র স্রোতে,
উত্থান ও পতনের অশান্ত কল্লোলময়ী গানে।

তোমার কাব্যের বহ্নি শুধু আজো হয়নি নির্ব্বাণ
তব উদ্দীপনাময়ী বিশাল আত্মার বজ্রভেরী
স্পন্দিত গর্জ্জনে কয় হে স্বদেশ আরো কত দেরী?
কবেরে মরণ ঘুম ভারতের হ'বে অবসান?
তোমার বিদেহ আত্মা নিরালম্ব তাই জাগে
শুনিবারে মুক্তি মন্ত্র গান।

কবে যে ভাঙ্গিবে ঘুম, এ ঘুম কি ভাঙ্গিবার নহে?
আর্য্য বংশধর গণ সবাকার শ্মশান শয্যায়,
পরাধীনতার দুঃখে আজো কেন মরেনি লজ্জায়?
ভাবিলে ঘৃণায় মরি অপমানে মর্ম্মতল দহে।

স্বদেশ জননী তব শোন কবি করিছে—ক্রন্দন
ভীরুতার মহাপঙ্কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি
ক্রমধ্বংসী অধঃপাতে ডুবে যায় হেরি অন্ধরাতি,
জাতির কঙ্কালে আজ নাহি পাবে প্রাণের স্পন্দন!
তুমি নাই হৈমজ্যোতিঃ- বিচ্ছুরিয়া কে শুনাবে
জাগো জাগো সুপ্ত জনগন।

আর তুমি আসিবেনা মুক্তি যজ্ঞে প্রথম উদ্গাতা
শতাব্দী কাটিয়া গেল শুভলগ্ন আসিলনা হায়
দধিচীর অস্থি আজ শীতল মাটিতে মিশে যায়
দানব-বৃত্রের তপে তুষ্ট আজ স্বয়ং বিধাতা।

বঙ্গের অঙ্গন তলে তব শত বার্ষিকী উৎসবে
যা'রা স্মৃতি পূজা করে, সে পূজা কি করিবে গ্রহণ?
অসম্ভব; মহাকবি, জানি তব কী দুরন্ত পণ?
মিথ্যা স্মৃতি পূজা, জাতি যতকাল পরাধীন র'বে?
নিরুদ্ধ শিঙায় তাই শব্দহীন বাণী কাঁদে
দ্যুতিহারা চাহি নীলনভে।

———:০(X)০:———

অবনত মস্তকে তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হয়েছে। মধুর স্বভাবের গুণে তিনি ব্যক্তিমাত্রেরই পূজনীয় ছিলেন—আপামর সাধারণ লোক তাকে ভালোবাসতো—ভক্তি করতো—শ্রদ্ধা করতো।

বাঙ্গলাদেশ তখন শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ের প্রভাবাচ্ছন্ন। শঙ্করের ভাষ্যই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র—শঙ্করের অদ্বৈতবাদই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। পুরী সম্প্রদায়ের কোন সন্ন্যাসীই এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মাধবপুরীই সর্ব্বপ্রথম যুক্তিতর্ক দ্বারা তাদের এই মত খণ্ডন করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি বললেন—শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, কৃষ্ণপ্রেমই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। ফলে তার শিষ্যেরা দু'দলে বিভক্ত হলেন। একদল—পূর্ব্বের মত শঙ্করভাষ্যকেই সার মনে করে অদ্বৈতবাদকে আঁকড়ে পড়ে রইলেন—অন্যদল গোসাঞী মাধবের প্রকৃত শিষ্য সকলে 'বাউল বৈষ্ণব' রূপে ঈশ্বর প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে মেনে নিলেন। ক্রমশঃ এরা 'বাউল' সম্প্রদায় নামে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

সুবিখ্যাত প্রাচীন পন্থী পুরী সন্ন্যাসী রামচন্দ্র পুরী ছিলেন প্রথম দলের মধ্যে—দ্বিতীয় দলের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা সন্ন্যাসী ঈশ্বর পুরী।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই পুরী মাধবেন্দ্রই বাউল সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

চন্দননগর সঙ্গীত সম্মেলন

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

চন্দননগরের নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার পালিত এম্‌-এ যে অভিভাষণ পাঠ করেন নিম্নে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইল। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রীর অভিভাষণ আগামী সপ্তাহের 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত হইবে।

অভ্যাগত বৃন্দকে আহ্বান করিয়া শ্রীযুক্ত পালিত বলেন :—

ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা। মানব মনের চিরন্তন অজ্ঞেয়ভাব সঙ্গীত ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করে, বাদ্য এবং নৃত্য তা'র সহায়তা করে। রাগ রাগিণীর সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মূর্ত্তি দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু সেই যে অনাদিকাল হ'তে মানব মনে কি যে ভাবের প্রবাহ চ'লেছে যা' ফুটিয়ে তোল্‌বার, জন্যে কবি তা'র লেখনীসঞ্চালনে আজ অবধি নিরস্ত হ'তে পারল না, বৈজ্ঞানিক তার যন্ত্র নির্ম্মাণের কৌশলে মেতেই উঠল, শিল্পীর তুলির নিখুঁত ঘায়ে যা' ধরা দিল না,—গায়কের সঙ্গীতে গগন বিকম্পিত হ'য়ে উঠল তবু মূর্ত্ত হ'য়ে উঠল না— কি সে ভাব যা চিরন্তন অথচ চিরঅজ্ঞেয়—যার অনুভূতির ব্যাকুলতায় মানুষ যুগ যুগান্তর ধরে ব্যর্থ প্রচেষ্টায় ঘুরে মরছে তাকেই দার্শনিক বলেছে রসো বৈ সঃ—সেই unknown and unknowable সেই রসেরই অন্বেষণে ছুটেছে আমাদের সুরসিক সুরশিল্পিগণ এবং কলাবিদ্‌গণ! সেই রসের পরিকল্পনা তাঁরা ফুটিয়ে তুলতে চান রাগরাগিণীর মধ্যে, বাদ্যে এবং নৃত্যে। সেই কোন সনাতন যুগে একবার দেবাদিদেব মহাদেব নাকি প্রলয়ের রাগিণী প্রকট করেছিলেন তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে। মেনকা নাকি কত মহামুনির তপ ভঙ্গ করেছিলেন তাঁর লাস্যে। এমন কি তানসেনের সঙ্গীতে নাকি প্রকৃতিও বশ মেনেছিল। তাই বুঝি কবি বলেছেন নবিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা—যে বিদ্যার মোহিনী মূর্ত্তিতে জগৎ স্তম্ভিত—সে বিদ্যা যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলে পরিগণিত হবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

হে সঙ্গীতজ্ঞ সুরসিক শ্রোতৃবৃন্দ, হে শিল্পিগণ ভাগ্যদেবীর এতবড় নিষ্ঠুর পরিহাস—আজ সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তারই উপর ভার পড়েছে সেই অমৃতরস পরিবেশনের। তাই আজ উদ্বাহুরিব বামনঃ—আমার স্পর্দ্ধা আপনারা ক্ষমা করবেন। যোগ্যের সম্বর্দ্ধনায় আমার যোগ্যতা নাই সন্দেহ নাই, কিন্তু হে শিল্পিবৃন্দ আমার অবজ্ঞা করবেন না—আমিও মানুষ আমিও অমৃতের অধিকারী—আপনাদের সঙ্গীত যদি আমার প্রাণের কোন তন্ত্রীতে আঘাত না দিতে পারে, হয়ত হ'তে পারে আমার গ্রহণ করবার শক্তি নেই—হয়ত হ'তে পারে আপনার তারের ঝঙ্কারে আমার অবশ মানস তন্ত্রীর কোনটাই সাড়া দিল না—তা'হলে হে অমৃতের প্রয়াসী শিল্পিবৃন্দ—আমি বলব আপনার তারের মধ্যে এমন ঝঙ্কার সৃষ্টি করুন যাতে অবশ তন্ত্রীও বেজে ওঠে, যাতে মৃতের মধ্যেও প্রাণ সঞ্চার হয়। কবি সেই গান গাও—যে গানে অসাড়ের মধ্যেও সাড় আনে—নির্জ্জীবকেও সজীব করে তোলে—অরসিকও রসিক হয়। আজ দুনিয়ার মধ্যে যে প্রলয়ের সৃষ্টি হ'য়েছে তার মধ্যে কোন রাগিণী বেজে উঠেছে আমি প্রশ্ন করব আপনাদের। এ প্রলয়ের রাগিণী কোন দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর তাণ্ডব নৃত্যে ফুটিয়ে তুলতে চান—কেন চান? হয়ত একটা অশ্রুতপূর্ব্ব রাগিণীর প্রবর্ত্তন করতে চান—যার পরিকল্পনা মানবমনের বাহিরে। হে শিল্পিবৃন্দ যে কথাটা আমি আপনাদের প্রথমেই বলতে চাইছিলাম সেই অজ্ঞেয় ভাবের অভিব্যক্তি—সেই অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতের অস্ফুট ধ্বনি—যার অনুভূতির জন্য মানুষ মাত্রই পাগল হয়ে ছুটেছে—সেই মহা সঙ্গীত

অতএব হে শিল্পিবৃন্দ যদি আপনার রাগিণী আমার প্রাণের অবশ তন্ত্রীর মধ্যে কোন সাড়া না আনতে পারে তাহলে আমায় ক্ষমা করবেন—কিন্তু যদি সেই অজ্ঞেয় (unknowable) ভাবের অন্বেষণে কোথাও কোন সাড়া পাই তাহলে নিজেকে সার্থক মনে কোরব— মনে করব সেই অশ্রুত পূর্ব্ব রাগিণীর কোন অস্ফুটধ্বনি আমার কানে পৌঁছেচে—সেইদিনই আমার জীবন সার্থক হবে। সেইদিনই বুঝব সঙ্গীত মূর্ত্ত হ'য়ে আমায় সেই অজ্ঞেয়ের আংশিক স্পর্শের

বাঙ্গলায় বহু বৈষ্ণব বাউল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং ছিলেন এক মহাবাউল—তার শিষ্যেরা প্রায় সকলেই 'বাউল' আখ্যা প্রাপ্ত হন। অদ্বৈত মহাপ্রভুও মাধব গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে বাউল সমাজে যোগদান করেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও গোসাঞী মাধবের দলভুক্ত হয়ে 'মহাবাউল' রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন।

এই হলো বাউল সম্প্রদায়ের আদি ইতিহাস। কিন্তু বর্ত্তমানে বাউল সঙ্গীতের সঙ্গে এই বাউল সম্প্রদায়ের কোনও সম্বন্ধ আছে কি?···বিলাসী বাবুদের ইয়ার মহলে আজকাল বাউল গানের আদর।—আর এর অধিকাংশেরই রচয়িতা বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত আধুনিক কবির দল।

(সি, বি)

কলিকাতা হকি লীগ :—

গত বুধবার ১৩ই এপ্রিল প্রথম ডিভিসন হকি লীগ প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানীয় কাষ্টমস এথেলেটিক ক্লাবের সহিত দ্বিতীয় স্থানীয় রেঞ্জার্স ক্লাবের খেলাটি হবার পর এবছরের মত কলিকাতা হকি লীগের খেলাগুলির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যদিও এই খেলাটির আগেই কাষ্টমস্ দল তাদের পরবর্ত্তী রেঞ্জার্স দল অপেক্ষা দুই পয়েণ্টে অগ্রগামী ছিল তাহলেও এই খেলাটিতে রেঞ্জার্স দলের নিকট পরাজিত হলেও গোল এভারেজে তারাই লীগ বিজয়ী হত। তবে রেঞ্জার্স দল তাদের বিপক্ষকে দুই গোলে হারাতে পারলে কাষ্টমস দলের গোল এভারেজের প্রাধান্যও খর্ব্ব হত সেই কারণে এই খেলাটির গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। শেষ পর্য্যন্ত এই খেলাটিতে কোন দলই একটিও গোল করতে না পারায় এই দুইটি টিমের পূর্ব্বের অবস্থাই বহাল্ থেকে গেছে কেবলমাত্র দুইদলেরই মোট পয়েণ্ট সংখ্যায় আরও একটি করে পয়েণ্ট যোগ হয়েছে। এই বছর লীগ বিজয় করার পর কাষ্টমস দল পর পর তিন বছর এই সম্মান অর্জ্জন করলে এবং মোট সতেরো বার এই গৌরবের অধিকারী হল। ১৯০৫ সালে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হব্বার প্রথম বছরে 'বি ই কলেজ' (শিবপুর) জয়ী হবার সৌভাগ্যলাভ করলেও কাষ্টমস্ দলের মত গৌরবময় রেকর্ড কোন স্থানীয় দল স্থাপন করতে পারেনি। যদিও স্মিথ ভ্রাতৃদ্বয়, গ্যালব্রেথ ম্যাক্রেডি, সৌকত আলি এবং আসাদ আলির ন্যায় বিখ্যাত হকি খেলোয়াড়েরা কাষ্টমস্ দলকে আর সাহায্য করতে পারেন না, তাহলেও তাঁদের পরবর্ত্তী খেলোয়াড়েরা নিজ দলকে পূর্ব্বের গৌরবময় স্থানে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

কলিকাতায় হকি খেলা অনুষ্ঠিত হবার প্রারম্ভ থেকেই রেঞ্জার্স দল কাষ্টমস্ দলের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে এবং এখনও পর্য্যন্ত তা বর্ত্তমান রয়েছে। কেবলমাত্র পার্থক্য এই যে এই দলটি পূর্ব্বে 'সেন্ট্রাল্ ভলান্টিয়ার্স' নামে পরিচিত ছিল। সেই কারণে কলিকাতায় গত তিরিশ বছরের হকি খেলার ইতিহাসের এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যতিক্রম হয় নি। এই বছরে নব উন্নীত টাউন ক্লাব এবং বহুদিনের পুরণো প্রথম ডিভিসনের অন্তর্গত সেণ্ট জোসেফ্ স্ কলেজ দল সর্ব্বনিম্ন স্থান দুইটি অধিকার করায় আগামী বছরে দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে বাধ্য হবে। এবং প্রথম ডিভিসনের শূন্য স্থান দুটি এবছরকার দ্বিতীয় ডিভিসনের শীর্ষস্থানীয় রেসার্স এবং হাওড়া ইনষ্টিটিউট দল দুটি কর্ত্তৃক পূর্ণ হবে। পূর্ব্বগৌরব জড়িত বি ই কলেজ দল এবং শ্যামবাজার ইউনাইটেড দল দ্বিতীয় ডিভিসনে সর্ব্বনিম্ন স্থান অধিকার করায় আগামী বছরে তৃতীয় ডিভিসনে যোগদান করবে এবং তাদের জায়গায় তৃতীয় ডিভিসনের সেণ্ট থমাস এবং কলেজিয়ানস্ তৃতীয় ডিভিসনের কৃতীদল দুটি দ্বিতীয় ডিভিসনে অংশ গ্রহণ করবার অধিকার পাবে। তৃতীয় ডিভিসনের সর্ব্বনিম্ন নারিকেলডাঙ্গা ইন্ষ্টিটিউট এবং বি ওয়াই এসোসিয়েশন দল দুইটি আগামী বৎসর এনট্রান্স ডিভিসন পর্য্যায়ভুক্ত হবে। তবে যদি এই ডিভিসনটি আগামী বছরে খেলান না হয় তাহলে এই হতভাগ্য দল দুটিকে লীগ প্রতিযোগিতায় খেলার লোভ সম্বরণ করতে হবে।

এবছরের প্রথম ডিভিসনের ফ্যাইন্যাল লীগ টেবল :—

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	স্বঃ	বিঃ	পয়েণ্ট
কাষ্টমস্	১৮	১৫	৩	০	৪৪	৫	৩৩
রেঞ্জার্স	১৮	১৩	৫	০	৪৯	৭	৩১
মোহনবাঃ	১৮	১২	৪	২	২৭	৭	২৮
পোর্ট কমিঃ—	১৮	১০	৭		২০		২৭

অনুভূতি দিয়েছে। সেই দিনই বলব 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'। কিন্তু হে শিল্পিবৃন্দ তার মধ্যে হয়ত তোমার বাঁধাধরা তাললয়ের সংযোগ না থাকতে পারে—সে রাগিণী হয়ত তোমার সুর লয় তানে বেজে না উঠতে পারে—তাহলেও আমি বলব সে সঙ্গীত—সে অজ্ঞেয়ের আস্বাদ এনে দেয়—সে প্রাণবান্।

হে কবি, হে শিল্পিন্ আমি সবিনয় অনুরোধ করি, তোমার সঙ্গীতের মধ্যেও যেন আমি প্রাণের স্পর্শ অনুভব করতে পারি—তোমার বাদ্যে যেন আমি অজ্ঞেয়ের তালের অস্ফুট ধ্বনি শুনতে পাই—তোমার নৃত্যের মধ্যে যেন অনৈসর্গিকের রস উপভোগ করতে পারি।

আজ যে Friends Club এর প্রচেষ্টায় এই ছোট্ট নগরীর মধ্যে এত বড় বড় শিল্পীর এবং গায়ক গায়িকার সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছে তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে থাকতে পারছি না চন্দননগর ধন্য—চন্দননগরবাসী ধন্য তাহাদেরই জন্য।

———

মিলিঃ মেডি—

১৮ ১০ ৫ ৩ ২৬ ১১ ২৫

মহমেডান স্পোর্টিঃ—

১৮ ১০ ৫ ৩ ২৭ ১৪ ২৫

পুলিশ ১৮ ৮ ৪ ৬ ২০ ২০ ২০

ই বি আর ১৮ ৮ ৩ ৭ ২৫ ১৭ ১৯

বি জি প্রেস—

১৮ ৭ ২ ৯ ২১ ১৫ ১৬

ক্যালকাটা—

১৮ ৫ ৫ ৮ ২৫ ৩৩ ১৫

আর্ম্মেনিয়ানস্—

১৮ ৫ ৪ ৯ ১৪ ১৮ ১৪

ভবানীপুর—

১৮ ৪ ৬ ৮ ১০ ২৯ ১৪

গ্রীয়ার স্পোর্টিং—

১৮ ২ ৯ ৭ ৩ ২৫ ১৩

ড্যালহাউসি—

১৮ ৪ ৫ ৯ ১৩ ৩২ ১৩

অ্যাভেরিয়ানস—

১৮ ২ ৮ ৮ ১২ ২৫ ১২

ইষ্টবেঙ্গল—

১৮ ৩ ৫ ১০ ১১ ২৪ ১১

সেণ্ট জোসেফ—

১৮ ৩ ৪ ১১ ১৩ ২৮ ১০

পাঞ্জাব রেজিঃ—

১৮ ৪ ১ ১৩ ১৫ ৩৮ ৯

টাউন ক্লাব—

১৮ ০ ৬ ১২ ৮ ৩৮ ৬

ব্যাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত বৃহস্পতিবার ১৪ই এপ্রিল তারিখ থেকে বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সকল হকি টীম এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র 'ঝান্সি হিরোজ' দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার অক্ষমতা জানিয়েছে। এই দলটি যোগদান না করায় যশস্বী হকি খেলোয়াড়দ্বয় ধ্যানচাঁদ এবং তাঁহার ভ্রাতা রূপসিংহের সম্মিলিত ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখবার সৌভাগ্য থেকে বাংলার ক্রীড়ামোদীগণকে বঞ্চিত হতে হবে এবং তাছাড়া এই কারণে প্রতিযোগিতার আকর্ষণও অনেকখানি কমে যাবে।

প্রথম দিনে যে চারিটি প্রথম রাউণ্ডের খেলা হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে স্থানীয় দলগুলি যোগদান করেছিলেন। নিম্নে সেগুলির ফলাফল দেওয়া হল।

মিলিটারী মেডিকেল (২) টাউন ক্লাব (০)
পুলিশ (২) সেণ্ট জোসেফ (১)
পোর্ট কমিশনার (২) ইউনিয়ন স্পোর্টিং (০)
ই বি আর (৩) ভবানীপুর (০)

দ্বিতীয় দিনে মাত্র দুটি খেলা হয়। তার মধ্যে একটিতে লীগ বিজয়ী কাষ্টমস দলের সহিত স্থানীয় মহমেডন্ স্পোর্টিং দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং অপরটিতে মণিপুর রাজ্য দল ও ফরিদপুর হইতে আগত সালেগ্রো ইউনিয়ন দলের শক্তি পরীক্ষা হয়। কাষ্টমস্ দল ও মণিপুর রাজ্য দল যথাক্রমে ৬-০ ৩২-০ গোলে জয়লাভ করে।

মণিপুর রাজ্য দল :—আই সিং, বীরেন সিং ও রবীন সিং, রেবতী সিং, ধনবীর সিং ও তুম্বী সিং, আর কে সেনাহাল্, কে মুখার্জ্জি, ধীরেন সিং, মোহনবাবু সিং এবং মণিহর সিং। সালগ্রো ইউনিয়ন :—এ খাঁ, পরেশ সেন ও পবিত্র সেন, ওয়াই খাঁ, খালেক খাঁ এবং এস কাহালী. বি দাস গুপ্ত, আর খাঁ, কে দাশ গুপ্ত, নরেন্দ্র এবং এস ঘোষ।

তৃতীয় দিনে মোট পাঁচটি প্রথম রাউণ্ডের ম্যাচ খেলা হয়। তাহার মধ্যে গত বছরের বাইটন্ কাপ্ বিজয়ী বি এন আর দলের সহিত মোহনবাগান দলের খেলাটি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় হইয়াছিল। মোহনবাগান দল নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলে দুর্দ্ধর্ষ বি এন আর দলের নিকট মাত্র এক গোলে (১-০) পরাজিত হয়েছে। ট্যাপ-সেল্ এবং গ্যালিবার্দ্ধীর ন্যায় দুইজন অলিম্পিক খেলোয়াড় সংশ্লিষ্ট বি এন আর দলের নিকট পরাজিত মোহনবাগানের খ্যাতি এবং যশ এতটুকু ম্লান হয় নি। রেঞ্জার্স ক্লাব রাজসাহী হইতে আগত এলবার্ট ইউনিয়ন ক্লাবকে ৯-০ গোলে পরাজিত করেছে। ম্যাক্লাক্সি-গঞ্জ হইতে আগত গিড্নী ক্লাব স্থানীয় ইষ্ট বেঙ্গল দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। ১৯৩৭ সালের বাইটন কাপ্ প্রতিযোগিতার রাণার্স আপ্, ঢাকা হইতে আগত ব্যাচিলার ইউনিয়ন ক্লাব ক্যালকাটা ক্লাবের নিকট ৩-২ গোলে পরাজয় স্বীকার করে নিজেদের পূর্ব্ব গৌরব ম্লান করেছে। ড্যালহাউসি এবং গ্রীয়ার দলের খেলাটি কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় অমীমাংসীত ভাবে শেষ হয়েছে।

এলবার্ট ইউনিয়ন (রাজসাহী)—কে দত্ত, অমূল্য সরকার ও অমল সরকার, এ দাস, বি আচার্য্য ও জি দাশগুপ্ত, ডি সরকার, টি গাঙ্গুলী, এ আচার্য্য, এস রায় এবং বি রায়।

গিড্নী ক্লাব (ম্যাক্লাক্সিগঞ্জ)—উড্, ষ্টুয়ার্ট এবং ওকনোর, ডবলিউ কনোর, বাস্কাষ্টার এবং ব্যাথলস্, পামার, লাভডে, ভিকনোর, কোটেস্ এবং ম্যাথিউস্।

ব্যাচিলার ইউনিয়ন ক্লাব (ঢাকা)—আজিজুদ্দীন সমিহুল্লা এবং বদরুদ্দীন, ওয়াহিদুল্লা, জহিরুদ্দীন এবং এ রেজা, রহমন্, কে রেজা, মুরমহম্মদ্, যমীমুদ্দীন্ এবং ফজলুল হক্।

গত সোমবার যে পাঁচটি খেলা ছিল তার মধ্যে দুইটি দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা এবং একটি প্রথম রাউণ্ডের খেলার শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে। বাকী দুটি প্রথম রাউণ্ডের খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নি। নিম্নে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল।

প্রথম রাউণ্ড

সংসারপুর (৬) উয়ারী (০)
ড্যালহাউসি (১) গ্রীয়ার স্পোর্টিং (১)
বি জি প্রেস (০) আর্ম্মেনিয়াস্ (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

বি এন আর (৫) পুলিশ (০)
(রেলদলের আর কার এই খেলাটিতে হ্যাট্‌ট্রিক্‌ করেন)
পোর্ট কমিশনার (৩) গিড্‌নী ক্লাব (০)

সংসারপুর স্পোর্টিং ক্লাব (জলন্ধর)—নর সিং, লোহি সিং এবং হরভজন্‌ সিং, মাস্না সিং নগিন্দল্‌ সিং এবং পেশম্‌ সিং, আস্তার সিং, মোহন সিং, গুরপাল সিং, সাধু সিং এবং সোহন সিং।

ওয়ারী ক্লাব (ঢাকা):—পি গুপ্ত, এ দত্ত এবং এস ঘোষ, আর সেন, পি ঘোষ, এবং জে রায়, এস বসাক্‌, এস দাসগুপ্ত, এম মহম্মদ, এ দাশগুপ্ত এবং এন ঘোষ।

গত ১৭ই এপ্রিল্‌ নয়াদিল্লীতে মিঃ আর ই গ্রাণ্ট গোভেনের সভাপতিত্বে অল্‌ ইণ্ডিয়া কনট্রোল বোর্ডের বাৎসরিক সভা হয়ে গেছে। সভার প্রারম্ভেই পাতিয়ালার মহারাজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার পরে বোর্ডের সভাপতি নবানগরের জাম সাহেব এবং সম্পাদক ডি মেলো পদত্যাগ করায় তাঁহাদের স্থলে মাদ্রাজের মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ সুব্বরাওয়ান এবং মিঃ রঙ্গ রাও যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪১ সালে ভারতীয় দলকে ইংলণ্ডে পাঠান্‌ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ইংলণ্ড দলকে ভারতে আনার জন্য এখন হইতে সমস্ত ব্যবস্থা করার ঠিক হয়।

ইহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে দুইটি ক্রিকেট দল ভারতে আনার ব্যবস্থা করার ঠিক হয়। আগামী অক্টোবর মাসে মিঃ ফ্রাঙ্ক ট্যারাণ্ট যে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলকে ভারতে আন্‌বেন বলে জানিয়েছেন বোর্ড সেবিষয়ে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াকে সমস্ত ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছেন এবং এরা সমস্ত আয়োজন করলে বোর্ড তাঁদের সম্মতি দেবেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করবেন। মিঃ ট্যারাণ্ট ইতিমধ্যেই নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে এই অষ্ট্রেলিয়ান টীমে আনবার ব্যবস্থা করছেন।

রিচার্ডসন, গ্রিমেট, কিপ্যাক্স, ওল্ডফিল্ড, ওয়েণ্ডেল্‌ বিল্‌, সিভার্স, ফিঙ্গলটন্‌, চিপারফীল্ড, হ্যাসব্রউন, লুস, ট্যাল্‌ন, গ্রেগরী, ম্যাকরমিক্‌, ব্রমলে, ওব্রায়েন এবং বার্ণেট। ব্রাডম্যানের আসার সম্ভাবনা থাক্‌লেও তিনি এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু জানান নি। উক্ত দলটি ১৫ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাই পৌঁছে আমেদাবাদ, রাজকোট্‌, জামনগর, করাচী, পেশোয়ার, লাহোর, অমৃতসর, পাতিয়ালা, দিল্লী, আজমীর, ইন্দোর, বোম্বাই, নাগপুর, এলাহাবাদ, কলিকাতা, সেকেন্দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, পুণা এবং বোম্বেতে খেলে ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলম্বো থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। পাঁচটি প্রতিনিধিমূলক খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। তার মধ্যে দুটি বোম্বাইয়ে এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং লাহোর প্রত্যেক জায়গায় একটি করে খেলা হবে। প্রতিনিধিমূলক খেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য খেলাগুলি তিনদিনব্যাপী হবে বলে ঠিক হয়েছে।

ভারতীয় অলিম্পিক ও বাংলা

এ বৎসর ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় অষ্টম ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অলিম্পিকে বাঙ্গলা প্রদেশ ফল ভাল করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গলা প্রদেশ সকল বিষয়ে বিজয়ী না হইলেও দৌড়ের বিভিন্ন বিষয় ও রিলে রেসে জয়ী হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে বাঙ্গলা প্রদেশ এবার বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবে না। কিন্তু বাঙ্গলা রিলে-রেসে বিজয়ী না হইয়াও পাতিয়ালার সঙ্গে যুক্ত ভাবে ৩৭ পয়েণ্টে পুরুষ বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে। মেয়েদের বিষয়ে, বাঙ্গলা ৩০ পয়েণ্ট পাইয়া প্রথম হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বাঙ্গলা বোম্বাইর সহিত যুক্ত ভাবে সাইকেল রেসে ৯ম পয়েণ্ট পাইয়া প্রথম হইয়াছে। এবং কুস্তি, বাস্কেট বল কপাটীতে প্রথম এবং ভলিবলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এবার অলিম্পিকে দুই বিষয়ে নিখিল ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত ও দুই বিষয়ে নিখিল ভারতীয় রেকর্ডের সমান হয়। বাঙ্গলায় এফ্‌, এইচ, প্রাইজায় ৪০০ মিটার দৌড় নিখিল ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন ও ২০০ মিটার দৌড়ে নিখিল ভারতীয় রেকর্ডের সমান করেন।

বাঙ্গলায় এত সাফল্যেও দুঃখের বিষয় এই যে আমরা বাঙ্গলার প্রতিযোগী হিসাবে অধিক বাঙ্গালী প্রতিযোগীকে দেখিতে পাই নাই অবশ্য এথলেটিক বিষয়ে। এথালিটিক বিষয় গুলির অধিকাংশ বিষয়েই ইউরোপীয়ান যুবক বাঙ্গলার হইয়া প্রতিযোগীতা করিয়াছে। যদি এথালেটিক বিষয়ে পোলভল্টে এ, কে, মুখার্জ্জি ও এইচ, কে, মুখার্জ্জি এবং ২০০ মিটার দৌড়ে জেড, এইচ, খাঁন এবং সাইকেল রেসে আর, মেহেরা ও এস নন্দী ও লেরাথন রেসে পি, বি, চন্দ্র ও হোয় প্রভৃতি প্রতিযোগী না থাকিতেন তবে আমরা উহাকে বাঙ্গলার অলিম্পিক না বলিয়া ইউরোপিয়ান যুবকদের প্রতিযোগীতাই বলিতাম ও বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালী এথালেটদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়া পড়িতাম। অন্যান্য সকল প্রদেশ কিছু না কিছু ইউরোপীয় যুবকের সাহায্য লইয়াছে, কিন্তু পাঞ্জাব এই বিষয়ে সকলের উপরে। সে একটীও ইউরোপীয়ানের সাহায্য লয় নাই কেবল মেয়েদের বিষয়ে দুই একটী ইউরোপীয় মেয়ে ছিল। পাঞ্জাব যে পুরুষ বিভাগে প্রথম হইয়াছে ইহা তাহার সম্পূর্ণ প্রাদেশিক ও জাতীয় গৌরব। বাঙ্গলার কুস্তিদল, কপাটী, ভলিবল, ও বাস্কেট বল টীম বাঙ্গালী যুবক দ্বারা গঠিত ইহাই আনন্দের

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ্, বাড়ী কালিঘাটে।

অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।

রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।

অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

ইস্কাবনের টেক্কা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।

বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।

অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

হলের ঘড়ীতে ১২টা বাজলো। মধ্য-রাত্রির নীরবতা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিক্ষুব্ধ হয়ে' উঠলো। তার পর আবার নিরবচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করলে।

অবিনাশ বল্লে—"আর কেন, হরেন? বারোটা তো বেজে গেল। এখনও এই এদো ঘরে বসে' বালীগঞ্জের সুবিখ্যাত মশার কামড় খাই কেন? চল, তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করে' বিদায় নেওয়া যাক্। 'ইস্কাবনের টেক্কা' দলের তো কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমি—"হাঁ, চল। 'ইস্কাবনের টেক্কা' দল-এর আগে যাকে যে সময়টা দিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে কাজ শেষ করেছে। অবশ্য, এর আগে মাত্র দু'বার এদের কাজের সন্ধান পেয়েছি। তারপর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এদের সঙ্গে একবার বুদ্ধির লড়াইও হ'য়ে গেছে। সেই ব্যাপারের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বোধ হয় আমার কাকা এই চিরঞ্জীব বাবুর উপরে তাদের দৃষ্টি পড়েছে।"

আমরা বাইরে হলঘরে এলুম। ঘরটা অন্ধকার। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল—কে একজন উপর থেকে নীচে নেমে আসছে। টর্চ্চের আলোয়ে দেখলুম একজন পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর। আমাকে দেখবামাত্র তিনি বলে' উঠলেন—"এই যে হরেনবাবু! নমস্কার।" তাঁর হাতেও ইলেট্রিক্ টর্চ্চ।

একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনি কে?"

ইন্‌স্পেক্টর—"আমি এই থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর—পোষাকেই বুঝতে পারছেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবুরই এখানে থাকবার কথা ছিল। কিন্তু আর একটা খুব জরুরী কেস্ থাকায় আমাকে পাঠাতে বাধ্য হ'য়েছেন। এতক্ষণ আমি চিরঞ্জীব বাবুর কাছেই ছিলুম। আপনার সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হ'চ্ছিল। আমাকে আপনি না চিনলেও আমি আপনাকে বিলক্ষণ চিনি। আপনি যে আসবেন, সেকথা চিরঞ্জীব বাবু আমাকে বলেছিলেন। আস্‌তে এত বিলম্ব হ'লো যে?"

আমি বল্লুম—"আমি সন্ধ্যার একটু পরেই এসে'ছি। চাকরদের মধ্যে মাত্র সনাতন তখন এখানে ছিল। কাকাবাবুকে না জানিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে ওৎ পেতে বসেছিলুম। সব চাকর-বাকরদের ছুটী দেওয়া হয়ে'ছে শুনলুম। সেও চলে গেছে। ১২টা বাজলো—এখনও 'টেক্কা' দলের কোন সাড়া-শব্দ পেলুম না। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ীর দিকে রওনা হই।"

ইন্‌স্পেক্টর—"হাঁ। 'টেক্কা' দল খুব punctual. ১২টার পর আর কোন ভয় নেই—যখন তারা সেই সময় ঠিক করে' দিয়েছে। আপনার কাকা তাই আমাকেও যেতে বল্লেন। যা'হোক্, আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় বড়ই আনন্দিত হ'লুম। পরে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হ'বে। আচ্ছা—good night!"

আমি—"Say—rather, good-morning!"

ইন্‌স্পেক্টর হেসে বল্লেন—"হাঁ, তা বটে। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় সুরু হ'চ্ছে—সুতরাং good morning!"

হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি চলে গেলেন। আমরাও উপরে উঠ্‌তে লাগলুম।

দোতলায় উঠে কর্ত্তার ঘরের দরজায় ঘা দিলুম। ডাকলুম—"কাকাবাবু!" কোন উত্তর পেলুম না। এর মানে কি? এর মধ্যে তিনি ঘুমিয়েছেন? এই তো ইন্‌স্পেক্টর গেলেন! দরজা খুলে ফেললুম।

চিরঞ্জীব বাবু চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে ঝুঁকে রয়েছেন। সামনে টেবিলের উপরে একখানা বইখোলা। কানে কম শুনেন—তাই বোধ হয় আমার ডাক শুন্‌তে পাননি।

তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লুম—"বারোটাতো বেজে গেল। আমি আপনার চিঠি পেয়ে আপনাকে না জানিয়েই এখানে এতক্ষণ—"

হঠাৎ অবিনাশ চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"হরেন, দেখ, দেখ। দেয়ালের ঘড়িটা ঠিক ১২টার সময় বন্ধ হয়েছে—আর তার সামনে কাচের উপর আঁটা একখানা ইস্কাবনের টেক্কা!"

চম্‌কে সেই দিকে চাইলুম। তারপর চিরঞ্জীব বাবুর গা-ঠেলে উচ্চকণ্ঠে ডাকলুম—"কাকাবাবু!" দেহটা গড়িয়ে পড়লো মাটীর

বিষয়। এই সমস্ত দল বাঙ্গলায় ও বাঙ্গালীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আমরা আশা করি বাঙ্গালী যুবকগণ এথলেটিক বিষয়েও অল্পদিন মধ্যেই গৌরবের সহিত সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপর—নিস্পন্দ—অসাড়! পরীক্ষা করে দেখলুম—নিষ্প্রাণ! অবিনাশ তাড়াতাড়ি তুলতে যাচ্ছিল। আমি বারণ করলুম। চাপা আওয়াজে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে—"হরেন একি?"

আমি পরীক্ষা করে বল্লুম—"এ খুন—আর কি? 'টেক্কা' দল তাদের কথা রেখেছে। ঠিক বারোটার সময় তারা কাজ সেরেছে, এবং তা' বুঝাবার জন্যে দম্ভ করে ঘড়ীটা ঠিক বারোটার সময় বন্ধ করে দিয়েছে। খুনটা করেছে কোন তীব্র এ্যাসিডের সাহায্যে—খুব সম্ভব হাইড্রো-শিয়ানিক এ্যাসিড। সেটা অবশ্য ঠিক বলা যাচ্ছেনা, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শব-ব্যবচ্ছেদ না হয়।"

অবিনাশ বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে বল্লে—"কিন্তু বারোটার পরে তো সাব-ইনস্পেক্টর এখান থেকে গেছেন।"

আমি বল্লুম—"সাব-ইনস্পেক্টর কে? হুঁ—হু, ঠিক বলেছ। বারোটার পরেই তিনি এখান থেকে গেছেন বটে।"

অবিনাশ বল্লে—"তবে?"

একটু চিন্তা করে ফোনটা তুলে নিলুম। থানা এখান থেকে বেশীদূর নয়। সাব-ইন্‌স্পেক্টর এতক্ষণ নিশ্চয় সেখানে গিয়ে পৌঁচেছেন। থানাকে ডেকে নিজের পরিচয় দিয়ে কোথায় আছি বল্লুম। সাব-ইন্‌স্পেক্টর থানায় পৌঁচেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় যে উত্তর পেলুম, তাতে আমি চম্‌কে উঠলুম।

ফোনের উপর ঝুকে পড়ে বল্লুম—"কি বল্লেন? আপনি সাব-ইনস্পেক্টর? এখানে আপনি আসেননি? ইন্‌স্পেক্টর নিজে এসেছেন, এবং এখনও এখানে আছেন?"

ফোনে স্বর ভেসে এলো—"আজ্ঞে হাঁ। ইন্‌স্পেক্টর এখানে নূতন এসেছেন বটে, কিন্তু আমি পুরানো লোক। হরিপদ রায়কে মনে আছে আপনার?"

আমি—"ও—খুব আছে। আপনি হরিপদ বাবু? ভালই হয়েছে। আপনি এখনি একবার এখানে আসুন। একটা বড় অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। শীগগির আসুন। চিরঞ্জীব বাবুর বাড়ী। এখানে এলে সাক্ষাতে সব কথা হবে।"

ফোন রেখে অবিনাশকে বল্লুম—'অবিনাশ, আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে খুনি পালিয়েছে।"

অবিনাশ বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বল্লে—"সে কি?"

আমি বল্লুম—"'টেক্কা' দলের লোক সত্যই আমার সঙ্গে আজ সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আলাপ করে গেল। যাক—আপাততঃ পুলিশ আসবার আগে মৃতদেহটা একটু ভাল করে দেখে নেওয়া যাক্।"

দেহ পরীক্ষা করে বিশেষ কিছু দেখতে পেলুম না। শরীরে কোনপ্রকার মারাত্মক দাগ নেই। দু'এক স্থানে একটু আধটু ছড়ে গিয়েছে মাত্র। একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রমাণ ভিন্ন সেগুলো আর কিছুই নয়। মৃতের হাতের মুঠোয় একখানা কাগজ ভাজ করা পেলুম। তাতে লেখা আছে—"নং ৩—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি।"

অবিনাশ ঔৎসুক্যবশে কাগজটা নিতে যাচ্ছিল—বাধা দিলুম। সেটা যেমন ছিল সেই রকমই থাকা উচিত। বল্লুম—"কাগজখানা নিয়ে কি করবে অবিনাশ? তার চেয়ে মৃতদেহটা একটু ভাল করে দেখ। আচ্ছা, চোখদুটো দেখ দেখি!"

অবিনাশ দেখে বল্লে—"বুজে আছে।"

আমি—"হ্যাঁ।" তারপর চোখদুটো খুলে দিয়ে বল্লুম—"এইবার দেখ।"

অবিনাশ—"খুলে গেল।"

আমি—"Hopeless! আরে, বোকা-চোখ খুলে দিলে যে খুলে যায়, একথা সকলেই জানে। আমি এই চোখে কি দেখছি জান? আমি দেখ্‌ছি, বিস্ময়-মেশানো ভয়!"

অবিনাশ—"কেমন করে বুঝলে?"

আমি—"ভ্রূদুটো একটু উঁচু হ'য়ে র'য়েছে এখনও, চোখের তারা দুটো ঠিক মাঝখানে রয়েছে বল্লেও হয়। উপরের পাতাটা একটু ঝুলে পড়ে চোখ দুটোকে অর্দ্ধেকটা ঢেকে ফেলেছে মাত্র, কিন্তু ভয় ও বিস্ময়ের ভাবটা এখনও চক্ষু থেকে অন্তর্হিত হয় নি। তারপর ঠোঁট দুটো দেখ একটু ফাঁক হ'য়ে রয়েছে, এটাও বিস্ময়ের চিহ্ন সন্দেহ নেই। খানিক পরে দেহটা শক্ত হ'তে Rigor mortis আরম্ভ হ'লে এই চিহ্নগুলো একটু একটু করে' লুপ্ত হ'য়ে যেতো। আর, থাকলেও, সে গুলো এত অল্পমাত্রাও থাকতো যে ধরা শক্ত হ'তো।"

অবিনাশ—"দোয়াত-দানীটা টেবিলের উপরে র'য়েছে, অথচ মেঝেয় কালি পড়লো কি করে?"

আমি—"Bravo! অবিনাশের Power of observation মানে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ক্রমশঃ develop করছে (বাড়ছে) বলতে হ'বে। আচ্ছা, তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে একটু ছোট খাট ধ্বস্তাধ্বস্তিও হ'য়ে গেছে। এই যে গালের এক পাশে একটা ছড়া-দাগ; নখ-দিয়ে ছড়ে গেছে। তা'হলে মুখ টিপে ধরা হ'য়েছিল।"

এই বলে' এদিক ওদিক চাইতেই একটা রুমাল আমার নজরে পড়লো। সাবধানে সেটাকে তুলে নিয়ে পকেটে রাখলুম। তারপর আমি ও অবিনাশ দুজনে মিলে ঘরের মধ্যে বেশ করে' খোঁজ করলুম, সন্দেহ-জনক আর কিছু নজরে পড়লো না।

এইবার টেবিলের উপরটা একটু ভাল করে' দেখতে লাগলুম। দু'পেয়ালা চা খাওয়া হ'য়েছে—পেয়ালা দু'টো তখনো সেখানে। বেশ বোঝা গেল একটা কাপে "ইনস্পেক্টর" আর একটা কাপে কর্ত্তা চা খেয়েছেন। কর্ত্তার দিকের চায়ের পেয়ালাটা

তুলে নিয়ে শুঁকে দেখলুম, কোনরকম আপত্তিকর গন্ধ পেলুম না। তবু এটাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ঐ ঘরের এক পাশে ব্রাকেটের উপর একটা ছোট হোমিওপ্যাথিকের বাক্স ছিল। সেটা খুলে তা'থেকে একটা খালি-শিশি নিয়ে খানিকটা চা তাইতে ঢেলে নিলুম।

অবিনাশ বল্লে— "আচ্ছা, হরেন, এই এ্যামেচার ডিটেকটিভগিরিতে লাভ কি? "ঘরের খেয়ে বনের মোষ (মহিষ) তাড়ান" বইতো নয়? তার চেয়ে ভাল করে নিজের প্রাক্‌টিসটায় মনোযোগ দিলে হয় না? তোমার পেশেন্টের সংখ্যাওতো কম নয়; পোষ্যের সংখ্যাও যথাসময়ে বাড়বে।"

আমি হেসে বল্লুম— "আরও কিছুদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর—বুঝবে এই ব্যাপারে আনন্দ কোন্‌খানে। কাল সকালে— "

এই সময়ে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেয়ে থেমে গেলুম। ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লেন পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর, দু'জন কনষ্টেবল, আর এক অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তি।

সাব-ইন্‌স্পেক্টরের নাম প্রাণকুমার বাবু—তিনি আমার পরিচিত। আমাকে দেখেই তিনি বলে' উঠলেন— "এই যে হরেন বাবু ব্যাপার কি?" তারপর সেই অর্দ্ধনগ্ন মূর্ত্তির দিকে ফিরে বল্লেন—"এই হরেনবাবুই আমাকে এই খুনের কথা ফোনে জানান।"

অর্দ্ধনগ্ন লোকটী প্রশ্ন করলেন—"ইনিই হরেন বাবু?" তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লেন—"নমস্কার। আপনার নাম অনেক-দিন থেকে শুনে আস্‌ছি। চাক্ষুষ পরিচয় কখনো হয় নি। যাই হোক্ বড়ই আনন্দিত হলুম। আমার পরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছি। তবু শুনুন—আমি এ থানায় নূতন এসেছি, ইন্‌স্পেক্টর হ'য়ে। এসেই এই কেস্। একেবারে দিগম্বর করে ছেড়ে দিয়েছে!" বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

তারপর বল্‌তে লাগলেন—"সকালবেলা চিরঞ্জীব বাবু আমাকে ডেকে পাঠান, এবং একখানা চিঠি দেখান। তাতে লেখা ছিল "আজ ঠিক রাত্রি বারোটায় তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হ'বে।" দেখলুম তিনি বড়ই ভীত হ'য়েছেন। চিঠির সঙ্গে একটা ইস্কাবনের টেক্কা দেওয়া ছিল। এই 'ইস্কাবনের টেক্কা' দলের বিবরণ এর আগে আমি দু'বার শুনেছি। দু'টো ব্যাপারেই হতব্যক্তির হাতে একটা কাগজ ভাজকরা ছিল। তাতে লেখা ছিল—'নং ১—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি,' 'নং ২—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি'।

অবিনাশ মুখ চুলকোচ্চে দেখে চোখ টিপে ইঙ্গিতে বারণ করে' দিলুম। যা' বল্‌তে যাচ্ছিল অবিনাশ সেটা গিলে ফেল্লে। আমরা যে মৃতদেহ পরীক্ষা করছি তা' ইন্‌স্পেক্টরকে জানান দরকার বলে মনে হ'লো না।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব বলে যেতে লাগলেন—"কাজেই চিরঞ্জীব বাবুর ভীত হওয়ায় অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিলনা। তিনি আমায় শীলকরা একতারা কাগজ দিয়ে বল্লেন—'যদি আমি মরি তো এই শীল ভেঙ্গে এটা পড়বেন। যদি কিছু না ঘটে, তো আমা'য় ফেরত দিবেন। তার পরে এখানে আমার আসবার কথা ঠিক হোলো রাত্রি ৯টায়। তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁর এক ভাইপো Criminology নিয়ে মাথা ঘামায় এবং যথেষ্ট বিচক্ষণ হয়েও উঠেছে; তাকেও খবর দেওয়া হয়েছে আসবার জন্যে। এখন বুঝছি তিনি আপনারই কথা বলছিলেন। ঠিক ৯টার সময় আমি এখানে আসি। তারপর বাগানের মধ্যে আসবামাত্র জনকতক লোক আমার উপর লাফিয়ে পড়ে। একজন আমার মুখ বেঁধে ফেলে, তারপর আমার পোষাক খুলে নিয়ে আর একজন পরে। শেষে এই অবস্থায় আমার হাত পা বেঁধে একটা ঝোপের মধ্যে রেখে তারা চলে যায়। একটু আগে আমার এই এ্যাসিষ্ট্যান্ট আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওঃ! কি মশার প্রতাপ এই অঞ্চলটায়!"

অবিনাশ বলে উঠলো—"ইস্। খুনেটা আমাদের হাতের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেছে! একটু আভাস পেলে এক আছাড়ে—যাক্, সে কথা আর বলে কি হবে?"

ইন্‌স্পেক্টর বল্লেন—"হ্যাঁ, গতস্য শোচনা নাস্তি। আপাততঃ, আমার পিঠে একটা কি মেরে দিয়েছে দেখুন তো"।

দেখলুম, একখানা ইস্কাবনের টেক্কা।

বল্লুম—"আপনাকে টেক্কা দিয়ে দেগে দিয়েছে।"

ইন্—"খুলে দিন্—খুলে দিন্। ছিঃ—আমি একটা গাড়োল।"

আমি—"দুঃখিত হবার কারণ নেই। কিন্তু এ এমন কায়েমী করে আঁটা, যে এটা তুলতে সময় লাগবে। বোধ হচ্চে রবার সলিউসন্ দিয়ে জুড়ে দিয়েছে।"

ইন্—"আচ্ছা থাক। ঐ ছাপ নিয়েই তাদের শ্রাদ্ধের যোগাড় কচ্চি। এখন একপ্রস্থ কাপড়-জামা দরকার হচ্চে।"

সাব-ইন্‌স্পেক্টর চাকরের সন্ধানে কনষ্টেবল পাঠাচ্ছিলেন,—ইন্‌স্পেক্টর বাধা দিয়ে বল্লেন—"সে বালাই নেই। চাকরদের আজ রাত্রিতে ছুটি দেওয়া হয়েছে। নিকটে কোথায় এমেচার থিয়েটার হচ্চে; তারা সব সেইখানে। অবশ্য, এটা আমারই পরামর্শে হয়েছে। আর, চিরঞ্জীব বাবুর সংসারে কেউ নেই—তিনি একাই বাস করছিলেন।"

"আচ্ছা আমি দেখছি"—বলে অবিনাশ বেরিয়ে গেল।

একটু পরে সে কাপড়-জামা নিয়ে এলো। 'ভদ্রবেশ ধারণ করে' ইন্‌স্পেক্টরবাবু মোটামুটী তদন্ত সুরু করলেন।

আমাদের জবানবন্দী নেওয়া হ'লে, আমরা ছাড়া পেলুম। বাইরে এসে আমাদের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

(ক্রমশঃ)

নিউ থিয়েটাসের "অধিকার" চিত্রে শ্রীমতী মেনকা। ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

সম্পাদক :—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৫ই বৈশাখ ১৩৪৪, ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৮ } সপ্তদশ সংখ্যা

আগামী মেয়র নির্ব্বাচন

আগামী ২৯শে এপ্রিল কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন হইবে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন দলও বিভিন্ন ব্যক্তি মেয়র গদী অধিকার করিবার জন্য তদ্বির করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশান বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে একজন মুসলমান প্রার্থীকে মেয়র পদে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করায় অনেকের আশা তরুর মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে।

কংগ্রেসের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে যে গণ-সহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সুভাষচন্দ্রের এই নির্দ্দেশ, অর্থাৎ মুসলমান মেয়র এবং তপসিল জাতিভুক্ত ডেপুটি মেয়র—সাতিশয় সমীচিন হইয়াছে। বাঙ্গলার বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে এবং জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচারে কলিকাতার কর্পোরেশনে কংগ্রেসীদলের কর্ম্মধারা যে অনেক খানি রেখাপাত করে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুভাষচন্দ্র এইদিক বিচার বিবেচনা করিয়া সম্ভবতঃ মুসলমান মেয়র ও তপসিল জাতিভুক্ত ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া যে সকল কংগ্রেস ভেকধারী স্বার্থান্বেষী তথা "কংগ্রেসী" কাউন্সিলার কংগ্রেসের অনুজ্ঞা অমান্য করিতে তৎপর হইয়াছেন তাহাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। তবে এখনও সময় আছে এবং আশা করা যায় যে তাঁহাদের মেয়র নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই সুবুদ্ধির উদয় হইবে।

শেষোক্ত কংগ্রেসদ্রোহীদল শ্রীযুক্ত নিশিথ-চন্দ্র সেনকে খাড়া করিয়া সুভাষচন্দ্র তথা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিতে কোমর বাঁধিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের বক্তব্য এই যে নিশিথ বাবু গত বৎসরের কংগ্রেসীদলের নেতা হিসাবে এই বৎসরকার মেয়রপদের সম্মান নিশিথ বাবুর প্রাপ্য এবং গত বৎসর মেয়র নির্ব্বাচনের প্রাকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নাকি ১৯৩৮ সালে নিশিথ বাবুকে মেয়রের গদীতে বসাইতে কথা দিয়াছিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে যিনি কংগ্রেসীদলের নেতা থাকেন তিনিই পর বৎসরে মেয়র নির্ব্বাচনে কংগ্রেসীদলের মনোনয়ন পান। সেই নীতি অনুসারে নিশিথ বাবুই এবৎসর মেয়র নির্ব্বাচনে

কংগ্রেসীদলের মনোনয়ন লাভ করিতেন। কিন্তু গত বৎসরের কর্পোরেশনে কার্য্য পরিচালনায় দলের নেতা হিসাবে নিশিথ সেন মহাশয় যে ভাবে কংগ্রেসী আদর্শে পদাঘাত করিয়া বারবার স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আর তাঁহাকে কংগ্রেসের লোক বলিয়া বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কিছু দিন পূর্ব্বেও যখন কর্পোরেশনে প্রধান কর্ম্মকর্তার নিয়োগের প্রশ্ন উঠে তখন তিনি যেভাবে লুকোচুরী খেলিয়া এবং গোপনে কংগ্রেসীদলের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে এবং অন্যান্য কংগ্রেসী কাউন্সিলারগণকে লঙ্ঘন করাইতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন তাহা জনসাধারণ এত শীঘ্রই ভুলিয়া যান নাই। দক্ষিণ কলিকাতার সুভাষ সম্বর্দ্ধনা সভায় নিশিথ বাবুর সম্বন্ধে দক্ষিণ কলিকাতা তথা সারা সহরের করদাতাগণ কিরূপ ধারণা পোষন করেন আশা করা যায় নিশিথ বাবু নিজেও তাহা বিস্মৃত হন নাই।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াও যে সকল কংগ্রেসী কাউন্সিলার আগামী ১৯শে এপ্রিল তারিখে মেয়র নির্ব্বাচনে কংগ্রেসীদলের নির্দ্দেশ অমান্য করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহাদের চিনিয়া রাখা সহরবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা আশা করি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র আগামী মেয়র নির্ব্বাচনের দিন কর্পোরেশন সভায় উপস্থিত থাকিয়া দল পরিচালনা করিবেন এবং নির্ব্বাচনে হাত তুলিয়া ভোট দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যাহারা কংগ্রেসের বিপক্ষে ভোট দিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে এখন হইতেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিৎ এবং তাহারা যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ছাপ কোন মতেই না পান এবং কর্পোরেশনে না প্রবেশ করিতে পারেন সে বিষয়ে এখন হইতেই সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন।

-:০(×)০:-
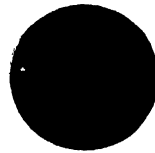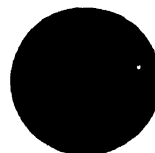
(সি, বি)

বাইটন্ কাপ হকি প্রতিযোগিতা

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার খেলাগুলি গত ১৪ই এপ্রিল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং তৃতীয় রাউণ্ড পর্য্যন্ত কোন কোন দিন দৈনিক ছয়টি পর্য্যন্ত ম্যাচ খেলা হবার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে যদি আসছে শনিবার ফাইন্যাল খেলাটি কোনক্রমে অমীমাংসীতভাবে শেষ হয় তা হলেই হয়ত প্রথম দিনের ফুটবল্ লীগের খেলাগুলি বন্ধ রেখে হকিখেলার এবছরের বিদায়পর্ব্ব ২রা মে তারিখে শেষ করতে হবে। গত মঙ্গলবার পর্য্যন্ত খেলাগুলি হবার পর নিম্নলিখিত চারটি দল এই প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যালে উপনীত হয়েছে। সেমি ফাইন্যালের একটি খেলাতে গত বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী 'বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে দল' বোম্বাই কাষ্টমস দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে। অপর খেলাটিতে ক্যালকাটা হকি লীগ বিজয়ী 'ক্যালকাটা কাষ্টমস' দলের সঙ্গে বোম্বাই হইতে আগত লুসিটেনিয়ানস্' দলের প্রতিদ্বন্দিতা হবে। যতদূর আশা করা যায় ফাইন্যালে স্থানীয় দুইটি দলই কাপ বিজয়ের জন্য নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করবে। বাংলার বাইরে থেকে যতগুলি হকি দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে 'পিণ্ডি টাইগারস,' 'ভূপাল্ ষ্টেট' (গত বছরের রাণার্স আপ), এবং কমরেডস ক্লাব অনিবার্য্য কারণে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ গুহকে তাদের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। প্রথম ডিভিসন ক্যালকাটা হকি লীগের এবছরের রাণার্স আপ 'ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব' প্রথম রাউণ্ডে রাজসাহীর 'এলবার্ট ইউনিয়ন' ক্লাবকে ৯—০ গোলে পরাজিত করে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্থানীয় 'মিলিটারী মেডিকেল' দলের নিকট এক গোলে পরাস্ত হওয়ায় এই পতিযোগিতার গোড়ার দিকে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। রেঞ্জার্সের ন্যায় শক্তিশালী দলটি এত শীঘ্র বিদায় গ্রহণ করাতে বিশেষ করে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এলাহাবাদ হইতে আগত 'কায়স্থ পাঠশালা কলেজ' তৃতীয় রাউণ্ডে রেঞ্জার্স বিজয়ী দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে বি এন্ আর দলের কাছে ২-১ গোলে পরাভব স্বীকার করেছে। নাগপুরের 'মুসলীম্ জিমখানা' রামপুরের 'ইয়ং মেনস্ ইউনিয়নকে' দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২-১ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে বিখ্যাত বোম্বাই কাষ্টমস্ দলের নিকট শোচনীয়ভাবে ৫-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। 'বরিশী স্পোর্টিং এসোসিয়েশন' দ্বিতীয় রাউণ্ডে লাহোরের 'ব্রাদার্স ক্লাবকে' ২-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে 'বোম্বাই কাষ্টমস্' দলের কাছে ১—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে এই প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। নামকরা 'আলিগড় ইউনিভার্সিটী' হকি টীম্ প্রথম দিন খেলেই দ্বিতীয় রাউণ্ডে ২—০ গোলে বোম্বাই কাষ্টমস্ দলের নিকট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সেই কারণে বোম্বাই কাষ্টমস্ দল তিনটি আগন্তুক দলের অভিশাপ বরণ করেছে: সুদূর জলন্ধরের গ্রাম্য হকি দল 'সানসেরপুর স্পোর্টিং ক্লাব' এই প্রতিযোগিতার এ বছরে প্রথম যোগদান করেছে। এটি যে একটি শক্তিশালী দল তা এদের খেলাগুলিতে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে এদের আক্রমণভাগের মাঝখানের তিনটি খেলোয়াড় তাদের দলের খ্যাতি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। সান্সেরপুর স্পোর্টিং প্রথম রাউণ্ডে ঢাকার 'ওয়ারী ক্লাব', দ্বিতীয় রাউণ্ডে স্থানীয় ড্যালহাউসি ক্লাব এবং তৃতীয় রাউণ্ডে ক্যাল্কাটা ফুটবল ক্লাবকে যথাক্রমে ৬—০, ৩—২ এবং ৪—২ গোলে পরাজিত করে চতুর্থ রাউণ্ডে ক্যালকাটা কাষ্টমস্ দলের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় খেলার পর ৩—০ গোলে পরাজিত হয়েছে। জব্বলপুর স্পোর্টিং দ্বিতীয় রাউণ্ডে মীরাট্ ডিষ্ট্রীক্ট হকি টীম্কে ১—০ গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে ক্যালকাটা কাষ্টমস্ দলের নিকট ৪—১ গোলে বশ্যতা স্বীকার করেছে। দিল্লী অকেসনাল্ স্পোর্টস্ ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে মণিপুর রাজ্যদলকে ৫—০ গোলে পরাজিত করে নিজেদের নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও চতুর্থ রাউণ্ডে বোম্বাই হইতে আগত লুসিটেনিয়ানস্ ক্লাবের কাছে ৪—০ গোলে পরাস্ত হয়ে পূর্ব্বার্জ্জিত গৌরব ম্লান্ করেছে। দিল্লীর আর একটি নবাগত হকি দল 'নিউ ষ্টার ক্লাব' দ্বিতীয় রাউণ্ডে ঢাকার আর্ম্মানীটোলা ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় রাউণ্ডের প্রথম দিনের খেলাটি লুসিটেনিয়ান্স দলের সঙ্গে অমীমংসীতভাবে শেষ করে দ্বিতীয় দিনে ২—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করে। বোম্বাইয়ের লুসিটেনিয়ানস্ দল দ্বিতীয় রাউণ্ডে ফরিদপুর স্পোর্টিং এসোসিয়েশনকে ৬—০ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় ও চতুর্থ রাউণ্ডে

যথাক্রমে নিউষ্টার ক্লাব এবং অকেশনাল্ ক্লাবকে ২—০ এবং ৪—০ গোলে পরাজিত করে সেমিফাইন্যালে ক্যালকাটা কাষ্টমস দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

প্রদর্শনী হকি খেলা :—

গত শনিবার ক্যালকাটা মাঠে বাংলার মনোনীত দলের সঙ্গে 'রেষ্ট' দলের একটি প্রদর্শনী হকি খেলা হয়ে গেছে। দুই দলই তিনটি করে গোল প্রদান করায় এই খেলাটিতে প্রতিপক্ষ দল দুটি সমান ভাগ করে নেয়। খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় 'রূপ সিং' এ বছর বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতায় কোন দলকে সাহায্য না করলেও রেষ্ট দলের পক্ষে খেলেছিলেন এবং এই দলের তিনটি গোলের মধ্যে একটি তাঁর অবদান। বাংলা দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের মধ্যে ট্যাপসেল, আর, কার এবং হেণ্ডারসনের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। খেলাটি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং প্রারম্ভ থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্য্যন্ত এবছরে কলকাতায় যতগুলি হকি খেলা হয়েছে সেগুলির মধ্যে এ খেলাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা বলা চলে। বিশেষ করে রেবেলো এবং রূপসিং এই খেলাটিতে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমার্দ্ধে বাংলা দলের রেন্টন্ এবং রেবেলো একটি করে গোল করেন (২-০) দ্বিতীয়ার্দ্ধে সাকুর একটি গোল পরিশোধ করবার পর (২-১) হয়। বাংলা দলের রেবেলো আর একটি গোল করতে সক্ষম হন (৩-১) তারপর রেষ্ট দলের রূপ সিং এবং শুইণি প্রত্যেকে একটি করে গোল করায় (৩-৩) খেলাটি অমিমাংসীত-ভাবে শেষ হয়। নিম্নে উভয়দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল।

বাংলা দল	রেষ্ট দল
এলেন্ (ক্যাপ্টেন)	সীন্ (বম্বে কাষ্টমস্)
পি দাস	মুস্তাক (নিউষ্টার)
এবং	এবং
হজেস্	আসলাম্ (বম্বে কাষ্টমস)
আরিফ	সাগির আলী (আলিগড়)
সি ডিকোস্টস্	ক্রইন্ (বম্বে কাষ্টমস)
এবং	এবং
মহম্মদ্ নাইম	জাহির (আলিগড়)
অরুণ মিত্র	সুইনি (বম্বে কাষ্টমস)
রবিনস্	মোহন সিং (সাসনেরপুর)
রেবেলো	সাকুর (আলিগড়)
রেন্টন্	রূপ সিং (ক্যাপ্টেন) (অসংশ্লিষ্ট)
এবং	এবং
জি নিস্	পি পি ফার্ণাণ্ডিজ (লুসিটেনিয়ান্স)

আম্পায়ারদ্বয় :—মেসার্স পি গুপ্ত এবং হাফিজ

ভারতীয় বঃ ইউরোপীয়ান দল

গত রবিবার যক্ষ্মানিবারণী ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে চুঁচূড়ায় বেঙ্গল হকি এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক মনোনীত ভারতীয় দলের সহিত ইউরোপীয়ান দলের একটি চ্যারিটি হকিম্যাচ খেলা হয়েছিল। ভারতীয় দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শেষ পর্য্যন্ত ৩-১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

ক্রিকেট মতানৈক্যের অবসান

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে আসন সম্পর্কে বোম্বারের হিন্দুজিমখানার সঙ্গে ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার যে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রীতিপ্রদ অবসান ঘটেছে। ক্রিকেট ক্লাব জিমখানাকে অতিরিক্ত ৫০০ আসন প্রদান এবং তাঁদের দুইজন প্রতিনিধিকে ক্রিকেট ক্লাবের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য করতে রাজী হয়েছেন।

কলিকাতায় নূতন চিত্র-গৃহ

"প্রভাত সিনেমার" শুভ-উদ্বোধন

আমরা সবিশেষ আনন্দের সহিত কলিকাতার নূতন চিত্রগৃহ 'প্রভাত সিনেমার শুভ-উদ্বোধন ঘোষণা করিতেছি। আগামী বৃহস্পতিবার 'ম্যাডান থিয়েটার্স'-এর চিত্রগৃহে নব রূপসজ্জায় সজ্জিত, নব নব রস-পরিবেশনে উন্মুখ, "প্রভাত সিনেমা" সাগর ফিল্মসের "জাগীরদার" চিত্র লইয়া কলিকাতার জনসাধারণের অভ্যর্থনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

"ম্যাডান থিয়েটার্স" আজ সম্পূর্ণ নবশ্রী পরিগ্রহ করিয়া, 'প্রভাত সিনেমা' রূপে সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। চিত্রগৃহটিতে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন উপকরণে, নূতন রূপসম্ভারে সুসজ্জিত করা হইয়াছে।

"প্রভাত" চিত্রগৃহ আজ কলিকাতার জনসাধারণের সম্মুখে কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগুলি পরিবেশন করিবেন। ইহার দ্বারা কলিকাতাবাসীর বহুদিন সঞ্চিত এক অভাব বিদূরিত হইল। যাঁহারা এতদিন 'চৌরঙ্গি মহলে' একটী সম্পূর্ণ ভারতীয় চিত্রগৃহের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহাদের সে অভাব আজ বিদূরিত হইতে চলিয়াছে। আমাদের একান্ত বিশ্বাস "প্রভাত" চিত্র গৃহটি, চিত্রামোদি দর্শকগণের অন্তরে একান্ত প্রিয়স্থান অধিকার করিবে।

কলিকাতার জনসাধারণের সম্মুখে আজ এই নব রস পরিবেশনে অগ্রসর হইয়াছেন—"এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটারস" প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বজনপ্রিয় কর্ম্মকর্তা মিঃ হেমাদ্রকে, আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

"প্রভাত" চিত্রগৃহ 'সাগর ফিল্মসের' অপ্রতিদ্বন্দ্বি চিত্র-"জাগীরদার" লইয়া, আগামী বৃহস্পতিবার কলিকাতাবাসীগণকে অভিনন্দিত করিবে। চিত্রখানির অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তার কথা আমরা পূর্ব্বেই অবগত আছি।

শরৎচন্দ্র

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্র

(শ্রীকান্তের "ইন্দ্রনাথ")

শরৎচন্দ্রের বিষয় অনেক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে অথচ যৌবনে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে য পরিবারের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন সেই মজুমদার পরিবারের কথা কোন লেখকই বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। এই মজুমদার পরিবার আমার মাতুল গোষ্ঠী। সুতরাং এ বিষয়ে কিছু লিখিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

শরৎচন্দ্রের সহিত এই মজুমদার পরিবারের নিশ্চয়ই মূলতঃ কোন ঐক্য ছিল যাহার কারণে এই বন্ধুত্ব এত নিবিড় হইয়াছিল। তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমার মাতুল পরিবারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রয়োজন।

আমার মাতামহ ৺বামরতন মজুমদার সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বি-এ পাশের পরের বৎসর বি-এ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তৎসঙ্গে বি-সি-ই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন ও বেহারে একজিকিউটিভ ও ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার হইলেও তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত খাপছাড়া মানুষ। তিনি চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত পদ্মানদীর ধারে মাছ চুরী করিয়া, ডিঙ্গিতে ঘুরিয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, গাছে গাছে সময় কাটাইতেন। তাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। পিতা কর্ত্তৃক বিষম প্রহৃত হইয়া, শিশুপত্নী ও মাতাকে কাঁদাইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন। কলিকাতায় পদব্রজে আসিয়া অতি হীন অবস্থার মধ্যে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করেন।

পিতা সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি পিতার কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পাঠ সাঙ্গ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। (পিতৃদেবের এই পরিবারে বিবাহ হওয়ার পর ৺দ্বিজেন্দ্র লালের সহিত ৺বামরতন মজুমদার মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। দ্বিজেন্দ্র লাল আমাকে বলিতেন "তোমার মাতামহের ন্যায় ইংরাজী বলিতে আমি খুব কম বাঙ্গালীকে দেখিয়াছি") আমার মাতামহ যে "কলিযুগ" নামে বাংলা কাগজ প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সংবাদ শরৎচন্দ্রই আমায় দেন।

আমার মাতুলগণ প্রায় সকলেই একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ও খাপছাড়া। এক এক জন এক এক type—তবে প্রত্যেকেই বিশেষ বুদ্ধিমান Artist ও Musician—ও abnormal—সর্ব্বাপেক্ষা abnormal ছিলেন আমার রাজুমামা—শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মজুমদার (শ্রীকান্তর ইন্দ্রনাথ)। তিনি পিতার মাছ চুরী ডিঙ্গিতে বেড়ান ইত্যাদি গুণ পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে পান। এই রাজেন্দ্র নাথই শরৎচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শরৎচন্দ্রও ছিলেন খাপছাড়া abnormal ও বড়ো Artist—। আমার বড় মাতুল ৺রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার সঙ্গীত, সাহিত্য জগতে বিশেষ সুপরিচিত।

আমার সেজ মাতুল শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার ও কম্ abnormal ছিলেন না—তিনি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হইলেও, বি-এল পাশ করিয়া উকীল ও পরে ডাক্তারী করিলেও সে কালে অভিনয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও, বি-এ পাশ করার পর পিশাচসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত শবের উপর অমাবস্যা রাত্রিতে শ্মশানে কালী পূজা করিতেন, ধ্যান করিতেন, মড়ার মাথার উপরে বসিতেন। শরৎচন্দ্র সেজ মাতুলকে চিরদিনই "ছোড়দা" বলিতেন। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই সেজ মাতুলের এই সব প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়াছিলেন কারণ তিনিই আমাকে সেজ মাতুলের এই সব গুনাগুণ প্রকাশ করেন। পরে সংবাদ লইয়া জানি এ সব সত্য ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ মাতুলালয়ে—। রাজু মামা ও আমার মাতৃদেবী পিঠো পিঠি ভাই বোন—মা বড় ও রাজু মামা ছোট। রাজু মামা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমি নিজে ছেলে বেলায় অত্যন্ত দুষ্ট থাকিলেও দেবদেবী, সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি কি জানি কেন বিশেষ ভক্তি ছিল ও অতি অল্প বয়স হইতেই সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি ছিল। রাজুমামা ও মা আমাকে ছেলে বেলায় এই গানটী শিখাইয়াছিলেন ও শরৎ চন্দ্রও আমার নিকটে এই গান শুনিতেন ও আমায় নাচাইতেন। "তোর নাম রেখেছি হরি বোলা, মনের সাধে ও আমার মন, খেল না হরি নামের খেলা, প্রেমে মেসে ভক্তি মাটী, গড়না হরির চরণ দুটী, আর দুজনে সেই চরণে, গড়িয়ে দি বোন ফুলের মালা।"

(ক্রমশঃ)

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলন
চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন

অহোবল

বিগত ইষ্টারের ছুটীতে চারদিন ধরিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন ম্যাডান থিয়েটারে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী ধারাবাহিকরূপে আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম—আমাদের আলোচনায় নিরপেক্ষভাবে অধিবেশনের গুণদোষ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের আশা ও বিশ্বাস ছিল যে কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের আলোচনার বিচার করিয়া যাহাতে বর্ত্তমান অধিবেশনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারেন সে বিষয়ে প্রয়াসী হইবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গত দুইটী অধিবেশনে যে সকল দোষ ত্রুটী লক্ষিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান অধিবেশনে তাহার সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই দেখা গিয়াছে। এই সকল দোষ ত্রুটীর উল্লেখ আমরা প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা মুখে করিতে থাকিব।

উদ্বোধনী

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় সময় নাটোরাধিপতির সভাপতিত্বে নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমেই বোম্বাই-এর সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, স্বর্গত পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরজীর প্রধানতম ছাত্র, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বৈদিক স্বস্তিবাচন করেন। সঙ্গীতের আসরে সঙ্গীতজ্ঞ-কর্ত্তৃক স্বস্তিবাচন বেশ শোভনীয় ও সমঞ্জস দেখাইতে পারে যদি ইহা একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন কোন সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যদি সেরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারসম্পন্ন কোন সঙ্গীত-শিল্পীকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে বৈদিক স্বস্তিবাচন কোন ধর্ম্মবিশ্বাসী আচারনিষ্ঠ সুধীব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ বৈদিক স্বস্তিবাচন কার্য্যে কেবল সঙ্গীতবিদ্ অপেক্ষা আচারবান্ ও শাস্ত্র রহস্যজ্ঞ পণ্ডিতেরই অধিকার বেশী। আর বৈদিক স্বস্তিবাচনের নামে যিনি পৌরাণিক স্তব স্তুতি পাঠ করেন তিনি যে বৈদিক স্বস্তিবাচন কার্য্যে কিরূপ অভিজ্ঞ তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। বৈদিক স্বস্তিবাচনে স্বস্তিসুক্তটি পাঠ করিতে হয়; কিন্তু পণ্ডিতজী যে তিনটী শ্লোক—[(১) ব্রহ্মগ্রন্থি···(২) যংব্রহ্মা···(৩) যা কুন্দেন্দু···] উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই বৈদিক মন্ত্র নহে। সুতরাং শাস্ত্ররহস্যের বোধ যাঁহার অল্প, তাঁহার দ্বারা শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইবার ব্যবস্থা নিন্দিত বলিয়াই বোধ হয়। অধিকন্তু দেবদেবীর স্তুতি করিবার সময়ে যে ব্যক্তি চর্ম্মপাদুকা পরিত্যাগ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন না, কর্ত্তৃপক্ষগণ যে তাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা কিরূপে স্বস্তিবাচন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য
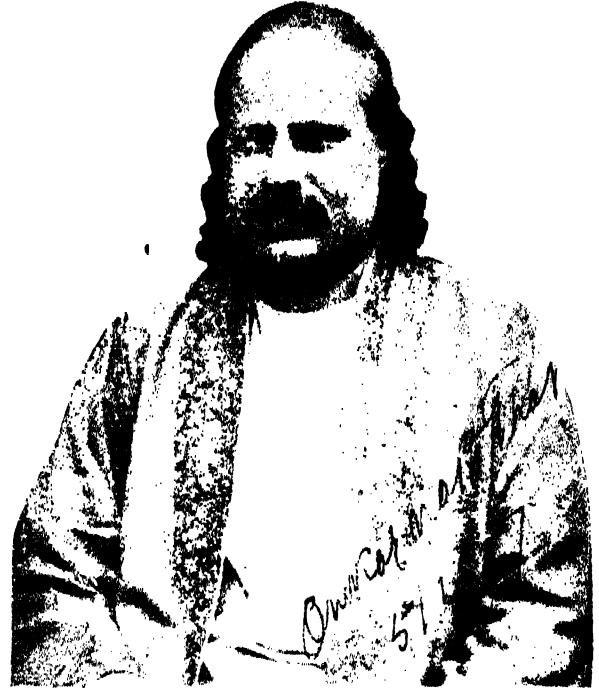
পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর

উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আর তাহা ছাড়া আমাদের এই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ সারা বাংলাদেশে এমন কি কোন সদাচারসম্পন্ন সঙ্গীতজ্ঞ অথবা কেবলমাত্র আচারবান্ সুধী সুপণ্ডিত ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন না, যাঁহার দ্বারা এই সাত্ত্বিক বৈদিক স্বস্তিবাচন সম্ভবপর হইত? কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি প্রয়োজন বোধ করিতেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ সুধীব্যক্তির সন্ধানই ঐ দিনের সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেই মিলিতে পারিত। আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে পণ্ডিতজীর দ্বারা স্বস্তিবাচন করান মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ছিল এবং এবিষয়ে তিনি সাধারণ সম্পাদকের নিকট অনুযোগ করেন; কিন্তু সাধারণ সম্পাদক কোন সদুত্তরই দিতে পারেন নাই। স্বয়ং সভাপতির অনভিপ্রেত ব্যবস্থা অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষের প্রবর্ত্তন করান কি রুচিসঙ্গত?

স্বস্তিবাচনের পর বাসন্তী বিদ্যাবীথীর ছাত্রীবৃন্দকর্ত্তৃক "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গীত হয়। আমাদের অনুরোধে কর্ত্তৃপক্ষেরা যে রবীন্দ্রনাথের "জনগণমনে"র প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া "বন্দে মাতরম" সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিতে পারিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তবে বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালীর ঘরের মেয়ে হইয়া এবং বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার যুগে বাস করিয়াও বিদ্যাবীথীর ছাত্রীগণ ঋষি বঙ্কিমের স্বদেশ-সাধনার মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতকেও এখনও কণ্ঠস্থ করিতে পারেন নাই—কারণ ইহা বেশ সুস্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইয়াছিল যে গানটী গাহিবার সময় প্রায় প্রত্যেক কুমারীর করকমলে উক্ত সঙ্গীতটীর আদর্শলিপি শোভা পাইতেছিল—ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা কি স্বাভাবিক নহে যে বস্তিদার মহাশয় গ্রহের ফেরে পড়িয়া মাত্র অল্পদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ছাত্রীগণকে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছিলেন। কারণ, আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছি যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গানটী সমস্বরে ও সমতালে সুগীত হয় নাই। তবে গানটীকে গাহিবার সময় যত ত্রুটীই প্রকাশ পাইয়া থাকুক না কেন—রবীন্দ্রিক সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে যাঁহারা "বন্দে-মাতরম্" সঙ্গীতটী নির্ব্বাচন করিয়া ছাত্রীগণকে অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহারা জনসাধারণের প্রীতির পাত্র।

"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের পর স্বাগত-কারিণী সভার সভাপতি রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। মামুলী রীতিতে লিখিত এইরূপ অভিভাষণ কেবল বাংলাদেশের সঙ্গীত সম্মেলনের আসরেই চলিতে পারে। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে সঙ্গীত-জগতের এমন কোন একটী বিষয়বস্তু লইয়াও আলোচনা করেন নাই যাহাতে সঙ্গীততত্ত্বান্বেষীর কুতূহল

বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতম ধ্রুপদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণজী মুখোপাধ্যায়

কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইতে পারে। আর কতদিন বাংলার সঙ্গীত সম্মেলনে অন্তঃসার-শূন্য কেবল ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসাবাদ-বহুল অতি-দীর্ঘ ধৈর্য্যচ্যুতিকারিণী রচনা উপহৃত হইতে থাকিবে!

রাজা বাহাদুরের বক্তৃতার পর সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তৃতীয় বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করিতে না পারায় সম্মেলনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বসু উহা পাঠ করেন।

কার্য্যবিবরণী পাঠের পর শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খান্না (লালাবাবু) তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত ও সতেজ কণ্ঠে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাচনভঙ্গীতে পরিতৃপ্ত হইয়া বিরাট্ শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় ধীর-স্থির হইয়া বসিয়াছিল। লালাবাবুর বক্তৃতার পর সম্মেলনের সভাপতি মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। মহারাজের ইচ্ছা ছিল যে তিনি মাতৃভাষায় অভিভাষণ পাঠ করিবেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ করেন যে তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা না করিলে উহা নানাভাষাভাষী সমবেত শ্রোতার বোধগম্য হইতে পারিবে না। সেজন্য মহারাজ পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ইংরাজিতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। কিন্তু, পড়িবার সময় মহারাজ অভিভাষণটীকে এতই সংক্ষিপ্ত করিয়া লইলেন (বোধহয়, শ্রোতৃমণ্ডলীর ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে) যে তাহা হইতে কোনরূপ অর্থই আমাদের বোধগম্য হইল না। আমরা প্রথমে শুনিলাম—মহারাজ কয়েকটী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি কতকগুলি পাতা উল্টাইয়া গেলেন। তাহার পর হঠাৎ শুনিলাম তিনি পড়িতেছেন—Dhrupad=Dhruvapada=padas are fixed. তার পরেই দেখিলাম তিনি বসিয়া পড়িলেন। আমরা মহারাজের এরূপ বক্তৃতা ইহার পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই।

মহারাজবাহাদুরের অভিভাষণপাঠ সমাপ্ত হইলে প্রায় সাড়ে নয়টার সময় সম্মেলনের demonstration কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বীণকার দবির খাঁ সাহেব বীণে টোড়িরাগের আলাপ করেন। কালস্রোতে বীণের ন্যায় যন্ত্রের প্রয়োগ উত্তরভারতে প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। যে কয়েকজন শিল্পী এখনও এই দুর্দ্ধর্ষ যন্ত্রের সেবা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে খাঁ সাহেবের প্রয়োগ নৈপুণ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

খাঁ সাহেবের বাজনার পর বারাণসীর বিখ্যাত ধ্রুপদাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধ্রুপদ গান করেন। তাঁহার সহিত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৃদঙ্গ-সঙ্গত করেন। এই দুই প্রধানতম গুণীর সমাবেশে ধ্রুপদ

সঙ্গীতের যে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা সঙ্গীতরসিকগণের বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রধান গুণীকে যে কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্মেলনে আনিতে পারিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদভাজন। কিন্তু অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় তাঁহাকে দিয়া কেবল গান গাওয়াইবার পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের এইরূপ বুদ্ধির প্রশংসা কোনমতেই করা যায় না। কারণ, সম্মেলনের সার্থকতা বজায় রাখিতে হইলে কেবল নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অনুষ্ঠান করিলেই চলিবে না, সঙ্গীত জগতে বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যার উদয় হইয়াছে ও হইতেছে বিশিষ্ট গুণিগণের সাহায্যে সেগুলির সমাধানের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। হরিনারায়ণবাবুর মত প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ সুরশিল্পীকে

বাম হইতে অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রী, মুষ্টি-যোদ্ধা ও নৃত্যবিৎ রবিন্ সরকার, আলোক-চিত্রশিল্পী নির্ম্মল নিয়োগী, পণ্ডিত হরি নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র নাথ মিত্র, অধ্যাপক অশোক শাস্ত্রী ও কৈলাস নাথ ভট্টাচার্য্য আলোক-চিত্র — শ্রীনির্ম্মল নিয়োগী

পাইয়াও সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করিলেন না দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। কর্ত্তৃপক্ষগণের ঔদাসীন্য-প্রসূত এইরূপ ক্রটীর কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? আজ প্রায় ষোল বৎসর পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে পুনরায় কলিকাতায় আসিবেন তাহা আমাদের মনে হয় না। সুতরাং এ সুযোগ নষ্ট করিয়া আলোচনা সভার আয়োজন না করা মোটেই সুসঙ্গত হয় নাই।

ধ্রুপদগানের পর বাংলার প্রসিদ্ধ গুণী শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ললিত রাগের একটী খেয়াল "মাধব দিন যাওয়ে" ও আর একখানি ঠুংরী "নয়না সু নিধিয়া আওয়ে শ্যাম" গান করেন। শ্রীমানের গান আমরা পূর্ব্বে এই conferenceএ এবং অন্যত্রও শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহাকে আর কখনও গান গাহিবার সময় এরূপ nervous হইতে দেখি নাই। এর কারণ কি, তা' শ্রীমানই জানেন। ললিত

রাগের খেয়ালটীতে অনেক দোষ ত্রুটী পাওয়া গেল। স্বাধীনভাবে ধৈবতের প্রয়োগ করায় এবং মধ্যমের মীড়ের সহিত উহাকে ব্যবহার না করায় শ্রীমানের গানে রাগরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বাণীশুদ্ধির দিকে শ্রীমান্‌কে আমরা পূর্ব্বেও মনোযোগী হইতে বলিয়াছিলাম কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কোনও মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ঠুংরী গাহিবার সময় যখন তিনি "বং" হইতে "দুনী ত্রিতালীতে" যাইতেছিলেন তখন তাঁহার লয় ভ্রষ্ট হইয়াছিল। Conference এ গাহিবার সময় এ জাতীয় ত্রুটী বিচ্যুতি মোটেই শোভা পায় না।

শ্রীমান্‌ রথীন্দ্রনাথের গানের পর স্বর্গত তবলা-বাদক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ সাহেবের বিশিষ্ট শিষ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এটর্নী অ্যাট-ল মহাশয় তবলায় চিমা তিনতালে লহরা বাজান। হীরেনবাবুর লহরা morning programme এর একটী বিশিষ্ট আকর্ষণ হইয়াছিল। তাঁহার লহরার ছন্দ ঠেকার বন্দেশ ও অঙ্গুলীর ক্ষেপণ অতি উপভোগ্য হইয়াছিল, Professional না হইয়াও তবলা-বাদনে তাঁহার যে নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বর্ত্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আশাকরি ভবিষ্যতে তিনি ভারতের সঙ্গীত-সমাজে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিবেন।

তবলা বাজনার পর, স্বর্গত গুণিপ্রবর আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অন্যতম ছাত্র প্রোঃ সুরেশ বাবুমান গুর্জ্জরী টোড়ির দুইখানি খেয়াল (একটী বিলম্বিত ও অপরটী দ্রুনী লয়ে) গান করেন। ইহার গান মোটের উপর মন্দ নহে, তবে ইনি খাঁ সাহেবের রীতির অনেকস্থলে ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া গানের মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। ইঁহার গানের পর প্রথম দিনের পূর্ব্বাহ্ণের সভা ভঙ্গ হয়।

(বিলাসী)

অধিকার

গত কয়েক হপ্তা ধরে আমরা এ বইয়ের কোন খবর প্রচারবিভাগ থেকে পাচ্ছি না। যদিও আমরা জানি দু নম্বর ষ্টুডিওতে এর সুটিং জোর ভাবেই চলেছে। গেল সোমবার সকাল, সাতটা থেকে এটর্ণি (শৈলেন চৌধুরীর) Chamber এর দৃশ্য তোলা হচ্ছে। এই Chamber এর জন্যে যে চমৎকার সেটটী তৈরি হয়েছে তাকে অনায়াসে বিলেতি সেটের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এ বইয়ের গতি যেভাবে তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে তাতে প্রচার বিভাগের আর একটু তৎপরতার সঙ্গে কাজ করা উচিত। আমরা আশাকরি সামনের বুলেটীনে এ বিষয়ে অনেক খবর পাব।

বিদ্যাপতি

কলিকাতার দুটি প্রধান চিত্র-গৃহে (নিউ সিনেমা ও চিত্রা) নিউ থিয়েটার্সের 'বিদ্যাপতি'—হিন্দী ও বাঙলা, একাদিক্রমে চলছে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে, সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের দর্শকদের সুবিধা দেবার জন্য। কর্তৃপক্ষ একই সময়ে দুখানি বিভিন্ন ভাষার ছবি দেখাবার ব্যবস্থা কোরে সকলেরই ধন্যবাদভাজন হোয়েছেন।

বাঙলার এগারোটি বিভিন্ন সহরে 'বিদ্যাপতি' চলছে। চিত্রা-য় এ হপ্তা থেকে পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ কোরল। আশাকরি বহু সপ্তাহ ধরে বিদ্যাপতি বাঙলার নর-নারীকে আনন্দ পরিবেশন কোরতে, চিত্রা-র ভরা আসর অধিকার কোরে থাকবে।

নিউ থিয়েটার্স

ছায়া-চিত্রে সামাজিক কাহিনীর সমাদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চিত্র-শিল্পের প্রসার ও পুষ্টির জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমাদের সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, ছোট-খাটো অভাব-অভিযোগ এবং তাহার নিরাশনের মধ্যেই আমরা আমাদের জীবনটাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জীবনের সহিত আমরা প্রতিদিন পরিচিত, যাহার সুখ দুঃখ, হাসি কান্না আমাদের সমস্ত চেতনা ও অনুভূতিকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া আছে—ছায়া-চিত্রাকারে তাহারই প্রতিচ্ছবি আমাদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। নিছক আনন্দ দান ছাড়াও ইহারই মধ্যে আমরা পাই জীবন-যুদ্ধে বাঁচিবার মত এবং সংগ্রাম করিবার মত প্রেরণা। এইভাবে জীবনের ছোট-খাটো এবং বৃহত্তর সমস্যাগুলির সমাধানের পথও ছায়া-চিত্রের মধ্য দিয়া প্রশস্ত হইতে পারে।

ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে, ছায়া-চিত্রের মধ্য দিয়া, আমাদের সামাজিক জীবনকে প্রতিফলিত করিয়া, নিউ থিয়েটার্স সম্প্রদায় যে ভারত-জোড়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন—তাহার ইতিহাস আজ চিত্র-রসিক মহলে কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রতিষ্ঠানের 'দেবদাস', ভাগ্যচক্র, দিদি, মুক্তি, অনাথ আশ্রম—ইত্যাদি চিত্রের অভাবিত সাফল্য এই উক্তির সাক্ষ্য দিবে। পরিকল্পনা, গঠন-নৈপুণ্য এবং অভিনয় উৎকর্ষ এই শ্রেণীর সামাজিক ছবিগুলি যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে, সকল শ্রেণীর দর্শক মহলেই বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে, একথাও আজ কাহারও অজানা নহে। সুতরাং সামাজিক কাহিনীর প্রতি জনমত আকৃষ্ট করিয়া নিউ থিয়েটার্স যে এই শিল্পকে নব-জীবন দান করিয়াছেন, একথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেই গর্ব্ববোধ করিবে।

নিউথিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের চাহিদার সম্মান করিতে জানেন তাই বর্ত্তমান বৎসরে তাঁহারা মূলতঃ সামাজিক কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া, বিভিন্ন টাইপের সমাজ-চিত্র গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে নিউথিয়েটার্সের বিভিন্ন কৃতিপরিচালক যে সকল ছবি তুলিতেছেন তাহাদের নাম:—(১) অভিজ্ঞান (২) দেশের মাটী (৩) অধিকার এবং (৪) ষ্ট্রীট সিঙ্গার।

"দেশের মাটী"র একটী দৃশ্যে দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতী

অভিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত উপেন গঙ্গোপাধ্যায় রচিত একখানি বহু আলোচিত এবং সুখ-পাঠ্য, সামাজিক উপন্যাস। নারীর প্রতি সমাজের দায়িত্ব; এবং অবিচার করিলে তাহার পরিণাম ও প্রতিকারের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য-বোধকে সজাগ করিয়া দেওয়ার মধ্যেই এই কাহিনীর সার্থকতা।

এই কাহিনীর নায়িকা সন্ধ্যার চরিত্র ও জীবনী লইয়া আমরা এই পত্রিকায় নানা ভাবে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সমাজের বিচারে সে চরম নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ করিয়াও আত্মহত্যা করে নাই। ইহা এমন একটি দুর্ঘটনা, যাহা যে কোন নারীর জীবনে ঘটিতে পারে। বাঙলা দেশের শত সহস্র দুর্ভাগিনী মেয়ে, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া যে পথ অবলম্বন করে, সন্ধ্যাও সেই অন্ধকার পথেই পা বাড়াইয়াছিল। কিন্তু রক্ষা করিল তাহাকে তাহার বিবেক, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি, তার অন্তরের দৃঢ়তা। যে আদর্শে বাঙলার মেয়েদের জীবন গঠিত হইলে তাহা সকলের নিকটেই বরণীয় হইতে পারে—সেই আদর্শের উপরেই সন্ধ্যার চরিত্রের ভিত্তি।

এই কাহিনীটিকে বাণী-চিত্রাকরের রূপ দিতে গিয়া, ইহার বিভিন্ন চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিতে নিউ থিয়েটার্সের যে সকল শিল্পীর সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাহারা সকলেই চিত্রাভিনয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বিমল রায়ের ফটোগ্রাফী, বাণী দত্তের শব্দানুলেখন এবং রাই বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনার গুণে—অভিজ্ঞান যে সত্যই একখানি মনোরম এবং লোভনীয় চিত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

সুপরিচিত চিত্রনাট্যলেখক শ্রীযুক্ত ফণি মজুমদার যে চিত্রখানি পরিচালনা করছেন

তার বাংলা নাম সাধারণের জ্ঞাতার্থে কিছু আজও দেওয়া হয়নি, ইংরাজি নাম আমরা জেনেছি 'দি স্ট্রীট সিঙ্গার'। এ ছবির গল্প আমরা শুনেছি। বাংলায় তথা ভারতে এ ধরণের গল্প নিয়ে ছবি প্রস্তুত করার কল্পনা আর কেউ করতে পারে নি। মজুমদার মশাই ছবির নাটক—পাকা লিখিয়ে কাজেই কাগজের পাতা হতে সেলুলয়েডের ফিতেয় রূপান্তরিত ছবি ভালই হবে।

বাংলায় এই প্রথম ছবি—যাতে নামছেন শ্রীযুক্ত সায়গল ও শ্রীমতী কানন। টিম তৈরী করা নিউ থিয়েটাসে্র এই প্রথম প্রচেষ্টা। সুকণ্ঠের সুর মাধুর্যো, সুঅভিনয়ে এরা দুজনেই চির-রূপপিপাসুদের এত বেশী মুগ্ধ করেছেন যে কেউ বলতে পারে না কে বড়।

নাচ গানে সারা ছবিখানি ছেয়ে আছে। খবর পেলুম শ্রীযুক্ত সায়গল, শ্রীমতী কাননে ঝগড়া বেঁধেছিল কারণ দুজনেই বলতে চাইছিলেন যে তিনি গানের যে অংশটি গাইছেন সেটাই সুরে ভাল। অবশেষে রাইচাঁদ বড়াল ঝগড়া মেটালেন সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়র লোকেন বসুকে ডেকে। তিনি চুলচেরা হিসেব করেও বলতে পারলেন না কার অংশটি ভাল। প্রমাণ হোলো দুজনেই ভাল।

দেশের মাটী

দেশের মাটীর কাজ খুব ভালভাবেই চলেছে। মাঝে সাইগলের অসুখের জন্যে এর গতি একটু মন্থর হয়ে পড়েছে। ষ্টুডিওর সেটের মধ্যে যে বিরাট ধান্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা হয়েছে তা দেখে অনেকের মনে বাঙলা মায়ের শস্য শ্যামলা মাটীর কথা স্মরণ করে দেয়। নীতিন বাবুর মত এমন চমৎকার atmosphere তৈরি করতে সহজে কেউ পারে বলে বিশ্বাস হয় না। শোনা যাচ্ছে আর ঠিক দিন দশেক স্যুটিং করলেই এই শেষ হয়ে যাবে।

ইউনাইটেড টকীজ

গত শনিবার এক প্রীতি সম্মেলনের ভেতর এদের প্রথম অবদান 'ডঙ্কার' উদ্বোধন স্যুটিং হয়। কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী এই উৎসবের পৌরহিত্য করেন।

উৎসবের প্রারম্ভে পরিচালক গুনময় বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনাইটেড টকীজের তরফ থেকে মহারাজাকে উৎসবের হোতারূপে বরণ করিলে শ্রীযুত চন্দ্রশেখর তাহার সমর্থন করেন। অতঃপর মহারাজা তাঁহার অভিভাষণে বাংলার তথা ভারতের ফিল্ম-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য বর্ণণা করিয়া এই নবজাত শিশু প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যাবতীয় সাংবাদিক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসবান্তে নিমন্ত্রিত গণকে ভুরি ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। প্রযোজক শ্রীঅমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এবিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন।

পূর্ণ থিয়েটার

'মুক্তি' এখানে আর মুক্তি নিতে চাইছে না। দুএক সপ্তার মধ্যে যে নেবে তাও বোধ হয় না।

অভিনয়

অভিনয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে। গেল শনিবার ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে 'অভিনয়ের' দুটি সেট আমরা দেখেছিলাম। চমৎকার এই সেট্ দুটী। বিশেষতঃ Hotel এর যে সেটটী সুধাংশু বাবু এখনও তৈরী করছেন তা দেখে আমাদের American সেটের কথা মনে পড়ে গেল। মিঃ চোথানি সেটের জন্যে কি পয়সা না খরচ করেছেন। তাঁর খরচ ও চেষ্টা সফলতা লাভ করুক এই আমাদের ইচ্ছা।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে প্যারামাউন্ট পিকচার্সের "বুকানিয়ার" দেখানো হইবে। এই বিপুল কথাচিত্রটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করিয়াছেন সুবিখ্যাত সিসিল বি ডি মিলি। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন ফ্রেড্রিক মার্চ, ফ্রান্সিস গল, একিম টমিরয়ং মর্গাট গ্রেহাম, এবং আরও সহস্রাধিক অভিনেতৃ। এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুর প্রণয় সিঞ্চিত জীবন এবং একটী জাতিকে বাঁচাবার জন্য তাহার রোমাঞ্চিত দুঃসাহসিক কীর্ত্তিকাহিনীর এই কথা চিত্রটি প্রত্যেক দর্শককেই প্রসন্ন করিবে।

বিবিধ

দুর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ১৬ই বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় ১০নং রিচি রোডে শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে দুর্ব্বার সঙ্ঘের পঞ্চম অধিবেশন হয়। কবি শ্রীযুক্ত সুধাংশু সেন গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দাশগুপ্তের 'দুরন্ত', সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'তাই তুমি মা', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'একটি দিন' রমাকৃষ্ণ মৈত্রের 'প্রেমের গল্প' প্রভৃতি গল্প এবং সমীর ঘোষের 'যুদ্ধ' ও 'স্বস্ত্যাহত' নামে দুইটী কবিতা পঠিত হয়।

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘ

ভবানীপুর ব্যায়াম সঙ্ঘের ৪র্থ বার্ষিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী শনিবার ২৬শে চৈত্র বৈকাল ৬-৩০ ঘটিকায় সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বার-এট-ল, কাউন্সিলার, কলিকাতা করপোরেশন, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘের ২৫০ শত যুবক ও বালক সভ্য সঙ্ঘের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীকানাই লাল নন্দী, ও শ্রীকৃষ্ণ

মোহন দাসের পরিচালনায় নানাবিধ ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। প্রায় আড়াই হাজার নরনারী দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ফ্লাইং রিংসে, শ্রীমান কমল, সেভেন-ইন-ওয়ান এরিয়ালে দীনেশ, নারায়ণ, কমল, গোকুল, অমল, সলিল, অমিয়, ফ্লাইং ট্রাপিজে, কালিপদ, বঙ্কিম, দীনেশ বরেণ, এ্যাক্রোবেটিকে মন্মথ, কমল, বাঁকা দর্শকবৃন্দকে খেলা দেখাইয়া বিমোহিত করেন।

কলিকাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত ২১শে, ২২শে ও ২৩শে মার্চ ১৯৩৭ "কাশীপুর সাহিত্য মিলন সমিতির" এবং উক্ত প্রতিযোগিতার সুযোগ্য সম্পাদক নীরেন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় উক্ত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বহু ছাত্র ছাত্রী উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রতিযোগিতায় কুমারী অন্নপূর্ণা চক্রবর্ত্তী, পূর্ণিমা মুখার্জ্জি, নিলীমা চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি এবং পুরুষ বিভাগে সুধানাথ রায়, সত্যদেব চৌধুরী, দুলাল চন্দ্র পাত্র, দীপেন রায় চৌধুরী ইত্যাদি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন।

তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে ১৪ই মে ১৯৩৮ হইতে মধ্য কলিকাতায় এক বিশিষ্ট প্রাঙ্গনে। আগামী প্রতিযোগিতায় একটি For good best teacher's Cup ও Female 'B' group এর খেয়াল ও আধুনিক সঙ্গীত বিভাগে দুইখানি For good cup দেওয়া হইবে। প্রবেশিকা প্রতি বিভাগের মাত্র আট আনা। বিষয়,—(১) খেয়াল, (২) ঠুংরী, (৩) ভজন, (৪) কীর্ত্তন, (৫) আধুনিক বাংলা গান, (৬) ভাটিয়ালী। আগামী অধিবেশনের কয়েকজন বিচারকের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—সঙ্গীত নায়ক প্রফেসার গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য প্রফেসার গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, রায়কিরণ মিত্র, মিঃ যোগজীবন ব্যানার্জ্জি, ভবানী সেবক মিশ্র, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, কে, সি, বড়াল, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয় চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, শীতল ঘোষ, জ্যোতিষ চন্দ্র মণ্ডল, কে, এল, মুখার্জ্জি, হরিসাধন গুপ্ত, বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়, জীবন চন্দ্র উপাধ্যায়, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর মুখার্জ্জি, অনিল বাগচি, পাহাড়ী সান্যাল, কে, এস, নাহার, সুধীন্দ্র নাথ মজুমদার, রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজি নজরুল, কুমার শচীনদেব বর্ম্মন, যামিনী গাঙ্গুলী, ভোলানাথ দে, ধীরেন দাস, কাশিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গিরিন চক্রবর্ত্তী, ননীগোপাল মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, খানসাহেব মেহেদি হোসেন ইত্যাদি।

আগামী ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত নিম্ন ঠিকানায় ফরম্, বিবরণ ইত্যাদি সমস্ত পাওয়া যাইবে।

(১) নীরেন মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক) ৭৮নং কাশীপুর রোড। (২) বিনয় মুখোপাধ্যায়, ১২৪-৬ রসারোড, ভবানীপুর। (৩) ১৩নং হাজরা রোড কালীঘাট। (৪) বিমল মুখোপাধ্যায়, ৮৪নং চৌরঙ্গি রোড, ভবানীপুর।

বালক সঙ্ঘ

গত শনিবার ২৪শে এপ্রিল, ভাবনীপুরের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বালক-সঙ্ঘের ত্রয়োদশ বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এস, সি, মিত্র, ডিরেক্টর অব ইনডাষ্ট্রীস্ সভাপতির আসন গ্রহন করেন ও মিসেস জে, সি, মুখার্জ্জী পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণের পরে সঙ্ঘের ৪০০ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "মার্চ পাষ্ট" করিয়া সভাপতিকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং পরে নানারূপ ক্রীড়া কৌতুকে দর্শকদের বিমোহিত করে। তৎপরে সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ব্যায়াম কৌশলে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ অতীব প্রীত হন। মাষ্টার হেমানন্দের বোম্বাই গরুর গাড়ী পিঠে করিয়া মোটরের গতিরোধ-সকলকে স্তব্ধ করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত ইন্দুভূষণ চন্দের মস্তক দ্বারা লোহার কড়ি বক্রকরণও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরিশেষে শ্রীমান সমর রুদ্রের ত্রুটী বিহীন উদ্যোগ আয়োজনের জন্য আমরা তাহাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং তিনি ও তাহার ন্যায় অন্যান্য অক্লান্ত কর্ম্মীগণ "বালক সঙ্ঘ"কে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে লইয়া যান ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

দীপ্তি গোস্বামী

শ্রীরামপুর নিবাসী জমিদার শ্রীনলাই চন্দ্র গোস্বামীর অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা কুমারী দীপ্তি গোস্বামী চন্দননগর সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীরামপুরের সুগায়ক শ্রীহেমন্ত কুমার লাহিড়ী দীপ্তির শিক্ষক।

দীপ্তি গোস্বামী
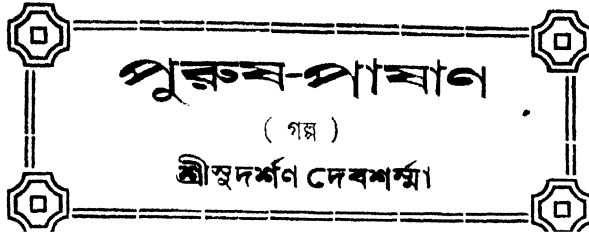
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'মোটেই না, বরং heartfull বোলে স্বীকার কোরে নিলুম।'

'কারণ ?'

'বলা যায়না, হয়তো দু'দিন বাদে আমার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে। তখন আপনাকে পুরোদস্তুর 'ফুল' বনে ফিরে যেতে হোতো।

উভয়ে নীরব। ঘরের ভেতরকার আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল।

হঠাৎ রণেন বলে উঠল—'মিস্ রায়

বরুণা চম্‌কে উঠল, বলল—'বোলুন।'

'টিপয়ের ওপর থেকে থার্ম্মোমিটারটা দিনতো, দেখা যাক্ জ্বরটা কতো উঠলো! বোধ হয় বেড়েচে, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কোরচে!'—

টিপয়ের ওপর থেকে থার্ম্মোমিটারটা নিয়ে রণেনের হাতে দিয়ে বারকতক ঢোক গিলে নীচু গলায় বলল—'কপালটা টিপে দিলে বোধ হয় যন্ত্রণার একটু স্বস্তি হবে।

'না-না কোনো দরকার নেই। এতো-টুকুতে আমায় কাবু কোরতে পারবে না। মনে পড়ে, প্রবল জ্বর অবস্থায় জার্ম্মানে অনাহারে ছেঁড়া জুতো পরে খালি মাথায় চরে বেড়িয়েচি। কই, কিছুই তো হয়নি!' কথান্তে থার্ম্মোমিটার বগলে পুরে দিলে।

বরুণা অকারণে ভ্যানিটী ব্যাগের বোতামটা খুঁটতে লাগল। আনত দৃষ্টি।

খানিকপর থার্ম্মোমিটার বরুণার হাতে দিয়ে রণেন বলল—'দেখুন তো কতো উঠলো!'

বরুণা সেটাকে আলোর দিকে তুলে ধরে দেখে বলল—একশ তিন!'

'ও: এবার দয়া কোরে টিপয়ের ওপর ওটা রেখে দিন—'

এমন সময় কলিং বেলটা আর্ত্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে সরু গলায় কে যেন বলল—'May I come in, Sir?

বরুণা রণেনের দিকে চেয়ে বলল—'কে যেন ডাকচেন!'

রণেন সে কথা কানে না তুলে, বলল—'Yes madam!'

দোর ঠেলে ঢুকল এক ফিরিঙ্গি মেয়ে। একমাথা সোনালী চুল, পরণে বিচিত্র রংয়ের ঘাগর', পায়ে গোড়ালি উঁচু জুতো আর ঠোঁট দুটো লিপষ্টিকে রক্ত-রাঙা। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে সোজা গিয়ে রণেনের বিছানার ওপর বসে পড়ল। তার হাতদুটো ঝাঁকানি দিয়ে ইংরাজীতে বলল—'কেমন আছ বন্ধু?'

'মোটেই ভাল নয়!'

বরুণা ঘেমে উঠল, অস্বাভাবিক জোর-গলায় বলল—'রণেন বাবু, আমি চললুম!'

'সে কী! এরি মধ্যে?'

'হ্যাঁ কতোকগুলো বিশেষ কাজ আছে!'

'আচ্ছা একটু বসুন, এর নাম লিলি আর্থার, আমার বিশিষ্টা বন্ধু! জাহাজের ডেকে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। কলম্বোতে এদের মস্ত টুপির কারবার আছে।'

এর সঙ্গে আপনর পরিচয় করিয়ে দেই। লিলির দিকে চেয়ে বললো—

"ইনি মিস বরুণা রায়, আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ও বন্ধু।"

লিলি বরুণার হাতখানা নেড়ে দিয়ে বলল—'গুডইভনিং!'

'গুডইভনিং'—

রণেনের দিকে চেয়ে বরুণা বলল—চললুম, সেরে উঠুন, বৌদি আপনাকে বিশেষ কোরে যেতে বোলে দিয়েছেন। যাবেন অতি অবিশ্যি! নমস্কার।'

'যাবো—নমস্কার।'—

* * •

দিন পাঁচেক পর একদিন সন্ধ্যায়—বরুণা তখন শ্যামবাজারগামী ট্রামের প্রতীক্ষায় ষ্টপেজে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল একেবারে ওর গা ঘেসে। ভয়ে চকিতে ও ফুটপাতে উঠে দাঁড়াল।

'নমস্কার!'—

চমকে উঠে গাড়ীর ভেতর তাকাতেই দেখে রণেনবাবু। মুখে মৃদু হাসি!

বরুণা দু-হাত তুলে নমস্কারান্তে হেসে বলল—'মানুষ খুন কোরতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

'ভয় নেই—কদ্দুর গন্তব্য?'

'যাবো একবার সমিতিতে, জরুরি মিটিং আছে!'

'চলুন!

'কোথায় যাবো?'

'আপনাকে সমিতিতে পৌঁছে দেবো, তারপর সহর প্রদক্ষিণ কোরতে বেরুবো। উঠে পড়ুন, রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে একটী ছেলে একটী মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ কোরচে এই দৃশ্য এদেশের লোক এখনো সহ্য কোরতে শেখেনি!'

বরুণা নীরবে গাড়ীতে উঠে গিয়ে বসল।

গাড়ী চলল।—

উভয়েই নির্ব্বাক। খানিকপর রণেন বলল—'আপনার attendance কটায়?

'আটটায়।'

'ও:'—

'কেন বোলুন তো?'

'না, তাই জেনে নিলুম। এই সময়টা খানিকটা বেড়িয়ে নিতুম—অবিশ্যি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'বেশতো চলুন না!'

আবার পড়ল নীরবতার পালা। গাড়ী ছুটছে। রণেন ষ্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে চুপটি করে। বরুণার সাড়ীর কাঁধের কাপড়টা রণেনের জামায় বার বার স্পর্শ করছে।

গ্র্যাণ্টট্রাঙ্ক রোডে পড়ে গাড়ী ছুটল তীরবেগে। চোখে মুখে বাতাস লেগে বরুণাকে বিপর্য্যস্ত করে তুলল। ডাকল—'রণেন বাবু!'

'বোলুন।' তেমনি সামনের দিকে চেয়ে সহজসুরে বলল।

'দয়া কোরে স্পিড্ কমিয়ে দিন!'

'কেন?' ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির রেখা—

'বিপদ হোতে পারে'।

'হোক গে। আমি আস্তে চালাতে পারিনা। বলে কাঁটাটা ঘুরিয়ে দিয়ে আরো জোরে ছুটীয়ে দিলে। গাড়ী ঝড়ের মত এগিয়ে চলল। বরুণা শিউরে উঠল আতঙ্কে। রণেনের বাঁহাত খানা সবেগে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট চিৎকার করে উঠল—'রণেনবাবু আস্তে চালান।

রণেন নীরব।

'দোহাই আপনার আস্তে চালান'—

ওপক্ষ তবুও নিরুত্তর। বরুণা হতাশ হয়ে দু'চোখ বুজিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ওর কানের পাশের ও কপালে পড়া চুলগুলো রণেনের চোখে মুখে এসে পড়েছে। চেতনা অতীত দেহ-মন।

কতক্ষণ পর মনে নেই, রণেন বরুণার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডাকল—'চোখ খুলে দেখুন, এবার আর ভয় নেই।

বরুণা চমকে উঠে চোখ খুলে দেখে গাড়ী এসে দাঁড়িয়েচে একেবারে সমিতির গেটের সামনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি চালিয়ে দেখলে গেটের সামনে কেউ নেই। রক্ষে, এই অবস্থায় দেখলে কী মনে ভাবত। আঁচলটা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। তারপর রণেনের দিকে চেয়ে, হাততুলে নীরবে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল গেটের ভেতর। আর রণেন একটা বিশ্রী শব্দ করে গাড়ী চালিয়ে দিল।

* * *

বরুণা ভাবে রণেনের কথা। কী সুন্দর চেহারা, কী দুর্জ্জয় সাহস, কথা বলবার কী ভঙ্গী, ওকে পেলে যে কোন মেয়ে তার নারী-জীবনকে স্বার্থকতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারবে। স্বামীত্বের ওপর অভিযোগ করবার ফাঁকটুকু সে সারাটা জীবনেও পাবে না, সে সৌভাগ্যবতী।

বৌদি ভাবেন—মা-বাপ হারা বেদুইন ভাইটীর কথা। বরুণার সঙ্গে ওকে মিলিয়ে দিতে পারলে ওর দুরন্তপনা যাবে থিতিয়ে। বরুণার বন্ধন ও কিছুতেই পারবেনা ছিড়তে—হ'ক ও যতোবড়ো হৃদয়হীন। স্নেহের বন্ধন যে এড়িয়ে চলে, প্রেমের নাগপাশ তাকে বন্দী করুক।

* * *

সেদিন কলেজ থেকে বাড়ী ঢুকতেই বৌদি ছুটে এসে বরুণাকে জড়িয়ে ধরলেন। ও ত রীতিমত অবাক্! হেসে বলল—'তোমাকে আবার ভুতে পেলে নাকি?

'লোকের দেখে শুনে একটু একটু পাচ্ছে। একটা শুভ সংবাদ দেবো কী খাওয়াবে বলো?

'এক পয়সার চিনে বাদাম।'

'তা-ই সই, না দিলেও আপত্তি নেই। দুপুরে একজন আমাদের বাড়ী এসেছিলো?'

'কে সে?'

'তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

'কী নাম তার শুনি?'

'রণেন সেন।'

'দূর! ছাড়ো পেটে আগুন জ্বলচে।'

'বিশ্বাস হোলো না বুঝি আমার কথাটা?

'কেন হবে না! দিদির কাছে ছোট ভাই এসেচে, এতে অবিশ্বাসের কী আছে!'

'আজ্ঞে না মশাই, দিদির কাছে সে আসেনি, এসেছিলো তোমার কাছে!'

একটু চুপ করে থেকে বরুণা সহাস্যে বলল—'অশেষ সৌভাগ্য আমার! কিন্তু, আগমনের কারণটা শুনি?'

'আসচে শনিবার হাজারিবাগ যাবে, তাই তুমি যদি সঙ্গে যাও, তাই জানতে এসেছিলো। আমি তোমার মত না জেনেই

সাফ বোলে দিয়েচি—হ্যাঁ, সে যাবে! যাবে তো?'

'আচ্ছা যাবো!'

বৌদি স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

* * *

পরদিন বিকেলে—বৌদির ঘরে খাটের ওপর রেলিংয়ে ভর দিয়ে বসে বরুণা একখানা সাপ্তাহিক খেয়ালীর গল্প পড়ছিল। বৌদি ওর কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। লেখক অখ্যাত হ'লেও গল্পটী সুন্দর।

এমন সময় খাটের পাশে টেবিলের ওপরকার টেলিফোনটা আর্তনাদ করে উঠল। কাগজখানা ফেলে রেখে বরুণা তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে নিয়ে ডাকল—'হ্যালো'! কে আপনি? ওঃ রণেনবাবু? নমস্কার!'

বৌদি উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'রণেন ডাকচে বুঝি?'

বরুণা সে কথার জবাব না দিয়ে ও-পক্ষকে বলল—'দমদম এরোড্রোম থেকে?

কেন? চলে যাচ্ছেন? কলম্বো? আজই? সেকী! আর ফিরবেন না? রণেনবাবু! রণেনবাবু! ওর হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে গেল বিছানার ওপর।

বৌদির শিউরে উঠল আপাদমস্তক। আকুল উৎকণ্ঠায় ডাকলেন—ঠাকুর ঝি! কি হ'ল? কাঁপচো কেন?

'রণেনবাবু কলম্বো চলে গেলেন'—ব'লে বৌদির কোলের ভেতর মুখ গুঁজে বরুণা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সে কী! চকিতে বিবর্ণ হয়ে গেল বৌদির মুখখানা। কোনো বন্ধন মানলেনা ও! পালিয়ে গেল? দু-চোখের কোলে জল উথলে উঠল, তিক্তকণ্ঠে বার বার আবৃত্তি করলেন—নিঠুর! নিঠুর!! নিঠুর!!!

—ঃশেষঃ—

তুমি ও আমি

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার ঘরে আজ যে আলো জ্বলে,
—সবুজ রং করা 'শেডে'তে ঢাকা
আমার মন যেন তাহারি তলে,
উড়িয়া যাবে বলে মেলেচে পাখা!

বসিয়া আছ তুমি আপন মনে
সমুখে খোলা তব 'জ্যামিতি' খানা
বাহিরে ঝি ঝি ডাকে ঘন-রণ নে
শুনিবে না যেন তারা কাহারো মানা!

আকাশে কালো রাত ঘনায়ে এলো
ফুটেছে সারি সারি তারকা কত,
এলান কালোচুল কী এলোমেলো
তোমার মুখে এসে প'ড়েছে যত

ঘড়িতে দেখ চেয়ে বারোটা বাজে
জাগিবে আরো রাত? পড়িবে আরো?
—সারাটা দিন তব কেটেছে কাজে
—জানি না কী পড়াই পড়িতে পারো!

তোমার ঘরে আজ যে আলো জ্বলে
নীরবে ব'সে আমি সে আলো দেখি;
—উদার গগনের আঙিনা তলে
আজিকে মনে হয়, সকলই মেকী!

আজিকে মনে হয় তুমি ও আমি
চলিয়া যাব যেন দূরের দেশে;
আজিকে মনে হয় দিবা ও যামী
আমরা শুধু পথ চলিব হেসে!

সমুখে চেয়ে দেখ পথের 'পরে
নেমেছে কালো রাত কী ঘন হ'য়ে
'জ্যামিতি' খুলে আর কী হবে প'রে
এমন ঘন রাত যায় যে ব'য়ে!

সকল কোলাহল পিছনে ফেলে
আজিকে চলো যাই বাঁধন হারা,
মিছামিছি কেন আর ও আলো জেলে
হবে না—যা-হওয়াবার চেষ্টা করা?

চন্দননগর সঙ্গীত সম্মেলন

অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর অভিভাষণ

অখিল অমরমণ্ডলী অবিরাম দিব্য মন্ত্রোচ্চারণে যাঁহার স্তুতিগান করিয়া থাকেন, সামগ ঋষিবৃন্দ নিরন্তর বেদ-নিনাদ-সহযোগে যাঁহারা অর্চনার আয়োজন করেন, ও তদ্গতচিত্ত যোগিগণ ধ্যানযোগে যাঁহার দুর্লভ দর্শন লাভের আশায় সতত উন্মুখ, সকল শুভানুষ্ঠানের প্রাক্কালে সেই অচিন্ত্য-শক্তি সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ পরমদেবতার উদ্দেশে অগণিত নতি নিবেদনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ-পাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিরন্তর শুভপথে পরিচালিত হউক।

পিতামহ ব্রহ্মা তালধর, স্বয়ং শ্রীহরি পটহবাদ্যে নিবিষ্টচিত্ত, বাগ্দেবী ভারতী বীণাবাদনরতা, রবি-শশী বংশী আলাপনে বিভোর, সিদ্ধ-অপ্সরাঃ-কিন্নরগণ স্তুতিধর, নন্দী-ভৃঙ্গী মর্দ্দলবাদনে নিরত, আর দেবর্ষি নারদ গীতালাপে বাহ্যজ্ঞানহারা ;—এরূপ অবস্থায় অর্দ্ধনারীশ্বরবিগ্রহ দেবাধিদেব নটরাজ মাঙ্গলানৃত্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই লীলানর্ত্তনেই নিখিল বিশ্বের অভিব্যক্তি। উহা আমাদিগের অশেষ কল্যাণ বিধান করুক।

মানসসরসীর শ্বেতকমলদল-বিহারিণী সর্ব্বশুক্লা হংসবধূটির মতই চতুর্ম্মুখের মুখপদ্ম-বনচারিণী দেবী সরস্বতীর সিত-সমুজ্জ্বল নখমণিচন্দ্রিকা আমাদিগের মানস-তিমির নিঃশেষে বিনাশ করুক।

যাঁহারা মাতামহ শৈলরাজ, কিন্তু পিতামহের কোন সন্ধানই মিলে না, কণ্ঠোপরি বারণ-বদন-শোভিত সেই বিঘ্নরাট্ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের মঙ্গল-করাবলেপ আমাদিগের এই অভিনব যাত্রাপথের সকল বাধা বিদূরিত করিয়া দিক—ইহাই প্রার্থনা।

আজিকার এই সঙ্গীত-সম্মেলনে সমবেত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বর্ণে, বয়সে, বিদ্যায় ও সুকুমারকলাজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অর্জ্জন-পূর্ব্বক লোকসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমার সবহুমান অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

অতি দুর্ব্বল আমি—এই গুণিজন-সম্মেলন পরিচালনার গুরুভার বহন করিবার মত শক্তি আমার নাই। পক্ষান্তরে, এ অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিবার যোগ্য সুধী ব্যক্তি একাধিকজন এ সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে অশোভন প্রগল্ভতা প্রকাশ করিতে যাইয়া অন্তর আমার প্রতিক্ষণেই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে।

যাঁহারা আজ আমাকে এই গৌরবময় অগ্রাসনে বসাইয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ভাবিয়াছিলেন—"অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ"—মহতের প্রতিষ্ঠিত পাষাণ-প্রতিমাও দেবতার পদবীতে উন্নীত হইতে পারে। তাঁহাদিগের যাহাতে আশাভঙ্গ না হয়, এজন্য আপনাদিগের নিকট হইতে সানুগ্রহ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদিগের সম্মিলিত শক্তি ও সহানুভূতি ব্যতীত আজিকার কার্য্যপরিচালনা আমার ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতীত বলিয়াই মনে করি।

প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে—গীত, বাদ্য ও নৃত্য এ তিনের মিলিত নামই 'সঙ্গীত'; তবে ইহাদিগের মধ্যে গীতই প্রধান বলিয়া 'সঙ্গীত' নামে খ্যাত হয়। প্রকারান্তরে বলিতে হয়—গীতই মুখ্য সঙ্গীত, আর বাদ্য ও নৃত্য গৌণ সঙ্গীত। এ দৃষ্টিতে দেখিলে অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে, মুখ্যতঃ না হউক অন্ততঃ গৌণতঃ সঙ্গীত শাস্ত্রের দুই একটি পৃষ্ঠা উল্টাইবার সৌভাগ্য আমার জীবনে দেখা দিয়াছে। কিন্তু পুস্তকস্থা বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞানে অধিকার দাবী করা চলিতে পারে না। তথাপি আমার শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর্গের নির্দ্দেশ অনতিক্রমণীয় বোধে কিঞ্চিৎ প্রগল্ভতা করা ব্যতীত গত্যন্তর দেখিতেছি না। আর সে প্রসঙ্গে আমার সকল অনুপপত্তিই যাহাতে আপনারা নিজগুণে উপেক্ষা করেন, এজন্য প্রথমেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেছি।

সঙ্গীতের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ সঙ্গীতের তত্ত্ববিচারে অধিকার না থাকিলেও সঙ্গীতের শিক্ষা ও প্রসার সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা নিরপেক্ষ শ্রোতা মাত্রেই করিতে পারেন। আর কেবল এই অধিকারটুকুর বলেই আমি এস্থলে দুই চারিটি কথা বলিতে দুঃসাহস করিতেছি।

চতুঃষষ্টি ললিতকলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা এই সঙ্গীত। শাস্ত্র এই গীতকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়াছেন। এমন কি কোন কোন স্থানে এতদূরও বলা হইয়াছে যে, ইহা নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টতর; অন্যথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি দেববৃন্দ ও দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষিগণেরও চিত্ত ইহাতে আকৃষ্ট হইত কি নিমিত্ত ? সঙ্গীতের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত শাস্ত্র হইতে প্রমাণ আহরণের বিশেষ প্রয়োজন নাই—উহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্ব। অতএব, আমাদিগের সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়াবলীর মধ্যে সঙ্গীতের অন্তর্ভাব যে বিশেষরূপে কামনীয়, সে বিষয়েও সংশয় বা সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। সুখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলদৃষ্টি

এদিকে পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কার্য্য অতি ধীরমন্থর গতিতে অগ্রসর হইলেও অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কিছু সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে।

বাঙলা দেশ চিরদিনই উচ্চ-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছে। মধ্যে কয়েক বৎসর হইল, আধুনিক সঙ্গীতের চাপে উচ্চ সঙ্গীতের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু আজ চার পাঁচ বৎসর সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির কৃপায় বাঙলায় উচ্চসঙ্গীতের গতি আবার ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এ কারণে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্ব্বাগ্রে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের বহুল প্রচার সম্বন্ধে আধুনিকযুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যেরূপ উদ্যম দেখাইয়াছে, বাঙলায় সেরূপ কোন প্রযত্ন আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয় হইলেও অতি কঠোর সত্য সন্দেহ নাই। বাঙলার বিভিন্ন নগরীতে ও গ্রামে—বিশেষ করিয়া রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে—শত শত অচিরোদ্গত সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান দেখা দিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গীত কলেজের মত একটা সর্ব্বজনমান্য সঙ্গীত-বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, বাঙলার জলবায়ুর এমনই গুণ যে, উহা কেবল পরস্পরবিরোধ সৃষ্টি করিতেই সমর্থ। অথচ এই সকল অবিরত ও অগণিত ক্ষুদ্র দলাদলির নিঃশেষ অবসান ঘটাইবার জন্য যেরূপ বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, বাঙলার সঙ্গীতজ্ঞ-জগতে বর্ত্তমানে সেরূপ লোকোত্তর প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষের একান্ত অভাব। বাঙলায় সুধী সঙ্গীতরসিক, বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিৎ, দরদী সঙ্গীতশিক্ষক বা অকপট সঙ্গীতশিক্ষার্থীর অভাব নাই; কিন্তু স্বভাবতঃ বিভিন্নমুখগামিনী সঙ্গীত-ধারাকে একমুখে প্রবাহিত করিবার মত শক্তিমান্ ধীমান্ নিষ্কাম-কর্ম্মী পুরুষের সন্ধান মিলিতেছে না। আর তাহার ফলে বাঙলায় উচ্চসঙ্গীত অনুশীলনের উৎসাহ অঙ্কুরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

সঙ্গীতের প্রাথমিক শিক্ষা আজ বাঙলায় বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের যে কোন সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ প্রতিযোগিগণের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এই সকল প্রতিযোগিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা আবার প্রথম শিক্ষার্থী, উৎসাহের আধিক্যও তাঁহাদিগের মধ্যে সমধিক। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, পাঁচ ছয় হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বার বৎসর বয়সের প্রতিযোগিগণ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের প্রতিযোগিগণ অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু বয়স্ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা যখন ক্রমদুর্গমপথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন আর পূর্ব্বের সে শিশুসুলভ আগ্রহ বর্ত্তমান থাকে না। অতএব, দুই তিন স্তর অগ্রসর হইতে না হইতেই শিশুর সঙ্গীতশিক্ষা চিরতরে সমাপ্ত হইয়া যায়।

বাঙলায় সঙ্গীতশিক্ষার অবনতির আর একটি প্রধান কারণ চারিদিকে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার ঘন ঘন আবির্ভাব। সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাগুলি উচ্চসঙ্গীতের প্রতি আমাদিগের সানুরাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে সন্দেহ নাই। আর সে দিক্ দিয়া তাহাদিগের উপযোগিতাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আধিক্য সকল ক্ষেত্রেই একান্ত বর্জ্জনীয়। বর্ত্তমানে বাঙলার সঙ্গীতরসপিপাসুগণ এই সকল সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার বাহুল্যজনিত উৎপীড়নে নিরতিশয় শঙ্কাকুল হইয়া উঠিতেছেন। এই সকল প্রতিযোগিতায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও অত্যধিক পারিতোষিকের প্রলোভন নিতান্ত তরলমস্তিষ্ক শিশু প্রতিযোগিগণকে এরূপ উদভ্রান্ত করিয়া দেয় যে, অল্প কয়দিনের মধ্যেই সঙ্গীতজগতে তাহাদিগের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠে। এ বৎসর দেখিলাম যে—আট নয় বৎসরের একটি বালক বা বালিকা ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুমরী-টপ্পা-ভজন-কীর্ত্তন-আধুনিক সঙ্গীত প্রভৃতি সকল বিভাগেই সমান সুন্দর গাহিয়া আসর মাত করিয়া দিল, অথবা ঐরূপ কোন শিশু প্রতিযোগী কোন যন্ত্রের মোহন আলাপে প্রবীণ বিচারকগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিল, কিংবা কোন সুদর্শন পাত্র মনোহর অঙ্গহার-বিলাসে রুদ্ধশ্বাস দর্শক-গোষ্ঠীর উচ্ছ্বসিত করতালি-ধ্বনিরূপ মহার্ঘ পুরস্কার আহরণে আপনাকে আপনিই একজন কৃতী শিল্পীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু এক বা দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই নিতান্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয় যে—সেই শিশু শিল্পী তাহার সকল গুণপণা চিরতরে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এ অধঃপতনের মূল কারণ কি? অবশ্য অসাধারণ কারণ বহু থাকাই সম্ভব; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি

সাধারণ কারণ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব অতিশয়োক্তি ও পুরস্কার লাভের ফলে শিশুচিত্তে অকালে যে আত্মপ্রতিষ্ঠাবোধের উদ্রেক হয়, সেই দুর্নিবার অহমিকাই উচ্চতর শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তরুণ প্রতিযোগীর অধঃপাতের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। পাছে এই আত্মশ্লাঘার উদয়ে শিষ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া না উঠে—এই আশঙ্কায় অনেক প্রাচীনপন্থী সঙ্গীত-কলাবিৎ নিজ নিজ শিষ্যকে শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্ব্বে শ্রোতৃসমাজে নিজ বিদ্যা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিতেন না। মনে হয়, শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে এইরূপ একটু দৃঢ় বন্ধন না দিলে উচ্চসঙ্গীতের যথার্থ পুনরুজ্জীবন সম্ভব হইবে না। প্রথমশিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু এই সকল প্রতিযোগিতাকে প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত না করিয়া কঠিন পরীক্ষাগারে পরিণত করাই মঙ্গল। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ দর্শক, প্রতিযোগীর অভিভাবক ও সঙ্গীতশিক্ষক বা সাংবাদিকগণের উপস্থিতির কোন হেতুই দেখা যায় না। যাঁহারা বিচারক হইবেন, তাঁহাদিগের গুণবত্তা অবিসংবাদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর প্রতিযোগিতাস্থলে বিচারকগণের সহিত প্রতিযোগী, শিক্ষক বা পরীক্ষকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবার সুযোগ যাহাতে না হয়, সে বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। এজন্য যদি প্রদেশান্তর হইতে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বিচারক আনিবার প্রয়োজন হয়, তাহাও উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। অর্থাৎ এক কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগৃহে যে সকল নিয়ম সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাতেও সেই সকল নিয়ম যতদূর সম্ভব পালিত হওয়া উচিত। অধিকন্তু, সঙ্গীতের মৌখিক পরীক্ষা ব্যতীত একটি লিখিত পরীক্ষারও প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; ও সম্ভব হইলে লিখিত পরীক্ষার উত্তর-পত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেশী ও বিদেশী পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইতেও হইবে। অবশ্য কেহ কেহ হয়ত আপত্তি তুলিবেন যে, এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা এক সর্ব্বজনমানিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ধীরে ধীরে এইরূপ একটি সর্ব্বজনীন সঙ্গীতবিদ্যালয় বাঙ্গলায় গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বাঙ্গলাদেশকেই অগ্রণী হইতে হইবে—ইহা আর এমন বিস্ময়ের বিষয় কি? ভারতে সাধারণশিক্ষার বিশ্ব-বিদ্যালয়ও ত এই বাঙ্গলাতেই সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিশ্ববিদ্যালয়ই বা এখানে প্রথম প্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন? যতদিন এইরূপ কোন সর্ব্বজনমান্য প্রতিষ্ঠানের অখণ্ড-সত্তায় দেশের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান আপনাদিকের খণ্ডতা বিলুপ্ত করিয়া না দিবে, ততদিন এই সকল ভিন্নরুচি ব্যক্তি-পরিচালিত সঙ্গীত-প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে লজ্জাকর দলাদলি-রেষারেষি তিক্ততা শত্রুতা পক্ষপাত প্রভৃতির অবসান ঘটিবে না। বাঙ্গলার সঙ্গীতকলারসিক গুণিগণ এ বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন কি?

এইবার সঙ্গীতসম্মেলন সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। প্রায়ই দেখা যায়—ব্যক্তিগত খাতির বা সুপারিশের বলে অখ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সম্মেলনে বহু পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়। এই দূষণীয় পদ্ধতি চিহ্নিত গুণিগণের মনঃক্ষোভ ও সহৃদয়-সমাজের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়া থাকে। সম্মেলনকে যথার্থতঃ সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে এই প্রকার ব্যক্তিগত প্রশ্ন সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়। আর একটি কথা—সঙ্গীতসম্মেলন বলিতে আজকাল কেবল একটি বিরাট জলসাই বুঝায়। কিন্তু সম্মেলনের যাহা মুখ্য অঙ্গ—সেই বিচারসভার আয়োজন বড় একটা হইতে দেখা যায় না। ইহার প্রধান কারণ, বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের অধিকাংশেরই শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। অথচ সম্মেলন ত শুধু ব্যবহারিক গুণপনার প্রতিযোগিতা নহে। সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল চিরন্তন প্রশ্ন মানবের অন্তরে সতত জাগরূক রহিয়াছে, অথবা সাময়িকভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়া থাকে—সে সকলের যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত সমাধান পূর্ব্বক সঙ্গীতের রাজ্যে নব নব গবেষণার পথনির্দ্দেশ করাই সঙ্গীত-সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অথচ বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় যাঁহারা সঙ্গীতরসিক বা সঙ্গীতজ্ঞসমাজের গোষ্ঠীপতি বলিয়া আত্মগৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীশ্রীসুর-ভারতীর বীণার ঝঙ্কারে ইঁহাদিগের অন্তর-দুয়ার খুলিবে আর কবে?

যাহা প্রকৃত সঙ্গীত-সম্মেলন তাহা কখনও বিরোধের পরিপোষক হইতে পারে না। অথচ ইদানীং দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সঙ্গীত-সম্মেলনকে নিমিত্ত করিয়া বাঙলায় প্রায় প্রতি বর্ষেই নানা ভেদ, গৃহবিবাদ, অন্তঃকলহ প্রভৃতির সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতেই অনুমান করিতে হয়, আমরা সঙ্গীতসম্মেলনের মুখ্য স্বরূপ ও মূল উদ্দেশ্যে বিস্মৃত হইয়াছি। অজ্ঞতাজনিত বিস্মৃতির এই তিমির যতদিন আমাদিগের অন্তরকে গ্রাস করিয়া রাখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের এই সকল ভেদ-ব্যবহার লোপ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই আপনাদিগের সমক্ষে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ-সহকারে এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিতেছি যে,—বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রের আত্মত্যাগী ও মিলনাকাঙ্ক্ষী সঙ্গীতপ্রেমিক,
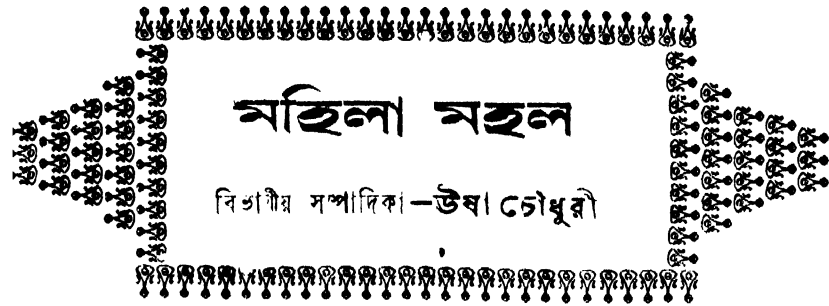
মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—ঊষা চৌধুরী

সন্তান পালন

গত সংখ্যায় খেয়ালীর মহিলা-মহলে শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী লিখিত প্রবন্ধে শিশু প্রতিপালন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই শিশু প্রতিপালন—অথচ বড়ই পরিতাপের বিষয় আমরা নারী সমাজ আজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এবং গর্ব্বিতা হইলেও এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীনা। বাংলাদেশের শিশু মৃত্যু এবং অমানুষের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দেখিলে আমাদের মন অত্যন্ত হতাশায় ভরিয়া উঠে।

নারী জীবনের সার্থকতা সাজসজ্জা-বিলাস অলঙ্কারে নয়—কায়দা দুরস্ত হইয়া সরেটো ডায়োলেসন হইতে বাহির হইয়া চোস্ত ইংরাজী বুকনি ছড়াইয়াও নয়—আদর্শ গৃহিনীরূপে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর্শ জননীরূপে। আদর্শ জননী হইবার যোগ্যতা আমাদের কয়জনের আছে এবং আদর্শ জননী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমরা কয়জনে লাভ করিয়া থাকি?

যে সমাজে আমরা বসবাস করি—যে সমাজের স্নেহচ্ছায়ায় আমরা পরিপুষ্টা, সেই সমাজের প্রতি আমাদের নিশ্চয়ই একটা গুরু দায়িত্ব আছে—সে সমাজের যাহাতে অবনতি ঘটে এমন কাজ আমরা কিছুতেই করিতে পারি না। নারীর জীবনের প্রধান দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য হইতেছে সমাজকে, দেশকে সুসন্তান দান করা। সুসন্তান দান করিতে হইলে সুজননী হইতে হইবে এবং সুজননী হইবার জন্য সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা লাভও করিতে হইবে। আমরা নারীসমাজ এ গুরু দায়িত্বের বিষয় আন্তরিকতার সহিত কি গ্রহণ করি?

সন্তানের শিক্ষা কৃষ্টি এবং সংস্কার মাতৃ-শিক্ষানুযায়ী হইয়া থাকে। শিশু প্রতিপালন অতএব নারী-ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ।

নারীশিক্ষা আজ আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করিতেছে—আনন্দের কথা! অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকের পথে আমাদের অভিযান সুরু হইয়াছে—ভাত-কাপড়ের দাসী হইয়া পুরুষের বোঝারূপে আমরা আর থাকিতে চাইনা—আমরা চাই প্রগতিবাদ আমরা চাই নারী-জাগরণ।

কিন্তু যে academic শিক্ষা আজ আমরা লইতেছি,—কলেজে Co-education এর মাঝে, ট্রামে, বাসে নির্ব্বিচারে অবাধ ভ্রমনে—তাহার ভিতর Motherly training কোথায়?—শিক্ষাকে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষাকে আমি নিন্দাবাদ করিতেছি না—আমি বলিতেছি ইহার সহিত মাতৃ-শিক্ষার সংযোগ থাকা চাই।

যে সন্তানকে নারীর মাতৃরূপে শিক্ষিত এবং প্রতিপালিত করিতে হইবে সেই মাতাকে শিশু মনস্তত্ব শিখিতে হইবে—শিশু সন্তানের অভাব অভিযোগের সহিত সুপরিচিতা হইতে হইবে এবং বিরাট কর্ত্তব্য এবং দায়িত্বের সহিত সমাজের, দেশের কুলাঙ্গার না করিয়া রত্নরূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

নারীকে শিখিতে হইবে—জানিতে হইবে কুসন্তানের জননী হইলে তাহা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নহে তাহা সমাজের ক্ষতি।

বর্ত্তমান নারী-প্রগতির যুগে নারীর এই সকল দিকে সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শ্রীনির্ম্মলা দেবী।

[শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর আলোচনাটি ক্ষুদ্র হলেও নারী-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় একটি দিকের কিছু ইঙ্গিত এতে পরিস্ফুট হয়েছে। বর্ত্তমানে এই ধরণের আলোচনার সবিশেষ প্রয়োজন আছে। খেয়ালীর পাঠিকাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত "নারী-ধর্ম্মের" যাবতীয় আলোচনাদি সাগ্রহে প্রকাশিত হবে।

সঃ মহিলা-মহল]

সঙ্গীতশিক্ষার্থী ও সঙ্গীতকলাবিদগণ মিলিত হইয়া এমন একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন করুন, ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া যাহাতে যোগদান করার ফলে সকল কলহের চিরতরে অবসান ঘটিবে, পবিত্র সঙ্গীত-রসামৃতধারায় অবগাহন করিয়া দুঃখ-দৈন্য-ভেদ-চ্ছেদ প্রপীড়িত শান্তি-কামী বঙ্গবাসীগণ পরমা নির্ব্বৃত্তিলাভে ধন্য হইবেন, সঙ্গীত-সম্মেলনের "সম্মেলন" নাম সার্থক হইয়া উঠিবে, উচ্চসঙ্গীতের আসরে বাঙ্গালী আবার পূর্ব্বগৌরবের আসন ফিরাইয়া পাইবেন। "বন্দেমাতরম্" !!!

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে এবার উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী। জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন প্রশংসনীয়। যাঁদের অমর অবদানে বাংলা সাহিত্য পরিপুষ্ট তাঁদের সাহিত্য আলোচনা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন কর্ত্তব্য। রেডিওতে আমরা এই ধরণের প্রোগ্রাম বৃদ্ধি হতে দেখলে খুসি হব।

* * *

ছোটদের আসরের কিছু উন্নতি এবারে দেখেছি। 'দাদুমণি' এদিকে একটু নজর দিয়েছেন। ছোটদের আসরের উপযুক্ত পরিচালক 'দাদুমণি' তাঁর কাজের 'পর শক্তির 'পর আমাদের আস্থা আছে, কিন্তু তাঁর কতকগুলি অকর্মণ্য সাঙ্গোপাঙ্গ প্রোগ্রামকে নিকৃষ্টতায় ভরিয়ে তোলে। চিঠিপাঠে অত্যন্ত দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়, চিঠির ফাইল হাল্কা করে নেওয়া দরকার।

* * *

বেতার নাটক পরিচালক শ্রীযুক্ত ভদ্র এবার খানিকটা রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বেতারে রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ" অভিনয়ে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা অচিরাৎ আবার দেখবো যাত্রাগানের কসরৎ।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের "মহিলা-সংবাদ" প্রয়োজনীয় এবং বৈচিত্র্য পূর্ণ। কিন্তু নারীধর্ম্মের সবিশেষ আলোচনাদির একান্ত প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠানে পূর্ব্বে ভালো ছোট গল্প পঠিত হোত আমরা তার পুন-প্রবর্ত্তন চাই।

* * *

মঙ্গলবার ১৯শে এপ্রিল গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় পাঁচালী পাঠ করলেন অত্যন্ত একঘেয়ে। সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান হোল। সুনীল দাস, গীতা বসু, কল্যাণী মুখোপাধ্যায় গাইলেন চলনসই।

ছোটদের বৈঠকে দাদুমণির পরিচালনায় অজিত দে রচিত গীতিনাট্য, "পুতুলের বিয়ে" অনুষ্ঠিত হোল, প্রযোজনা করলেন ইন্দিরা দেবী। পুতুলের বিয়ে—ছোটদের উপযুক্ত রস রচনা আমরা খুবই উপভোগ করেছি, মেয়েদের পুতুল খেলার একটি সুন্দর রস-চিত্র। দাদুমণি চমৎকার Cairy করে নিয়ে গেলেন। Beck ground music রুচি সম্পন্ন। মাঝে পল্লী সঙ্গীত রসহীনতার পরিচয় দিয়েছিল—গান রচনাও দুষ্ট ছিল।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে "হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী" অনুষ্ঠান হোল—সাফল্যমণ্ডিত।

* * *

বুধবার ২০শে এপ্রিল সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বেতার বিচিত্রা "ঋতু-মালিকা" উপভোগ্য হয়েছিল, ছয়টি ঋতুর পরিচিত কাব্যে গানে ছন্দে গেঁথে তুলেছিলেন রচয়িতা বাণীকুমার। সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমারের রস পরিবেশনে কোন ত্রুটিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার পরিচয় প্রদান করলেন।

* * *

বৃহস্পতিবার ২১শে এপ্রিল দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। জ্ঞান দত্তের ব্যবস্থাপনায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোল। কুমারী মঞ্জুলিকা দত্ত দুখানি গান গাইলেন বাজে। কুমারী করুণা মুখার্জ্জীর দুখানি গানও তথৈবচ। সুধীর সাহার ঠুংরী গান চলনসই। সত্য চৌধুরীর পিয়ানো বাজনা মন্দ নয়।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পল্লীমঙ্গল আসরে আব্বাস উদ্দীনের পল্লী-সঙ্গীত অপূর্ব্ব। সমবায় ভাণ্ডারের উপকারিতা বোঝানো হোল।

* * *

শুক্রবার ২২শে এপ্রিল ছোটদের বৈঠকে দাদুমণি দীর্ঘসময়ব্যাপী চিঠি পড়লেন—অনাবশ্যক "বুঝলে" অত্যন্ত শ্রুতিকটু লাগে। শিশিরকুমার ঘোষ গল্প বললেন মটির ডাকাত ধরা—গল্পটি জমেছিল মন্দ নয়। নির্ম্মল বসু উপদেশমূলক একটি গল্প বললেন—চিত্তাকর্ষক হয়নি। পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় এ, আই, আর প্লেয়ার্স কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ প্রবেশ' অভিনীত হোল।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন

চন্দননগর অধিবেশন

গত ১৩ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল চন্দননগর "নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে" ফ্রেণ্ডস্-ক্লাব পরিচালিত নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৩ই এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় "বিচিত্রা"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। পণ্ডিচেরীর সন্ন্যাসি-গায়ক শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় মহাশয় ঐ দিন কয়খানি স্বরচিত ও সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরোয়ানার গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলেন। ঐ দিন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল— ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকায় প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। উহাতে বিষয় নির্দ্দিষ্ট ছিল—আধুনিক সঙ্গীত, পল্লীসঙ্গীত ও ভজন। ১৬ই এপ্রিল শনিবার ২ ঘটিকায় প্রতিযোগিতার তৃতীয় অধিবেশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, কীর্ত্তন ও নৃত্য (আধুনিক ও প্রাচ্য) সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা গৃহীত হয়।

রবিবার ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী এম্ এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের নেতৃত্বে সম্মেলনের প্রারম্ভ হয়। প্রথমে সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতি বরণের প্রস্তাব করেন। পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য মহাশয় কর্ত্তৃক জাতীয় সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" অখণ্ডভাবে সুগীত হয়। অনন্তর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র পালিত মহাশয় তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণটি পাঠ করেন। (অভিভাষণটি খেয়ালীর পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।)

অনন্তর সভাপতি শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণটি সুললিত স্বরে পাঠ করেন। উক্ত অভিভাষণ ও তাঁহার উপর আমাদিগের মন্তব্য স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল।

সভাস্থলে বাঙ্গলার কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিৎ গুণী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ধ্রুপদাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই বাঙ্গলার গতযুগের সুনামধন্য সঙ্গীত সম্রাট্ স্বর্গত বিশ্বনাথজী রাও মহাশয়ের উপযুক্ত ছাত্র। অধিকন্তু অমরবাবু ভারতবিশ্রুত বাঙালী সঙ্গীতসার্ব্বভৌম সিদ্ধ ধ্রুপদাচার্য্য স্বর্গত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও অন্যতম প্রিয় ছাত্র। সভাপতি মহাশয় এই দুই প্রাচীন সঙ্গীতাচার্য্যকে অতি মনোরমভাষায় শ্রোতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত করাইয়া দিয়া তাঁহার বক্তব্যের উপসংহারে বলেন যে, স্বর্গত পুণ্যশ্লোক অঘোর বাবু ও শ্রদ্ধেয় অমরবাবু যে তাঁহার স্বশ্রেণীভুক্ত ইহা স্মরণ করিয়া তিনি বিশেষ গর্ব্বানুভব করিতেছেন। ইহার পর শ্রদ্ধেয় দানীবাবুর প্রস্তাবে অমরবাবুই প্রথম সঙ্গীতরস পরিবেষণে স্বীকৃত হন।

অমরবাবু পাঁচখানি ধ্রুপদ গান করেন—(১) তুম বিনা রহো না পারে (পূরবী), (২) নয় রোজা ভইলোয়া (ইমন), (৩) আল্লা মোপর (ইমন), (৪) মালনিয়া লায়ে (শ্যাম) ও (৫) আওরে পাওস (শ্রাবণ মল্লার)। পাঁচখানিই অঘোরবাবুর ঘরের গান। এই প্রৌঢ় বয়সে কণ্ঠের সে পূর্ব্ববৎ সতেজভাব না থাকিলেও অমরবাবু সে দিনের স্মরণীয় সন্ধ্যায় যে অপরূপ কৃতিত্বের সহিত গান কয়খানি গাহিলেন তাহার স্মৃতি এ জীবনে ভুলিবার নহে। অথচ এই অমরবাবুই পূর্ব্বদিন কলিকাতায় নিখিল বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনের আসরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার উপযুক্ত মর্য্যাদা পান নাই ইহাই আশ্চর্য্য! ইহার পর দানীবাবুও তিন খানি ধ্রুপদ গাহিয়াছিলেন—(১) শঙ্কর বৃষধর চন্দ্রমা (কামোদ), (২) মান জিন করোরি (কেদারা) ও ওড়ত বুন্দন (বসন্ত)। বলা বাহুল্য, দানীবাবুরও কলাকুশলতা সেদিন তাঁহার সম্প্রদায়ের গৌরব সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। অমর বাবু ও দানীবাবুর ধ্রুপদ গানের সহিত অতি সুন্দরভাবে পাখোয়াজ সঙ্গত করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ইহার পর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যে ধ্রুপদ, শ্রীযুক্ত প্রণব চন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র দে, ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়কগণের খেয়াল ও ঠুংরী গানে শ্রোতৃবর্গ পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

সভাস্থলে চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ, সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ প্রভৃতি স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও বহু ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখো-

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক পাঠশালা কার্য্যালয়, ৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, দাম একটাকা।
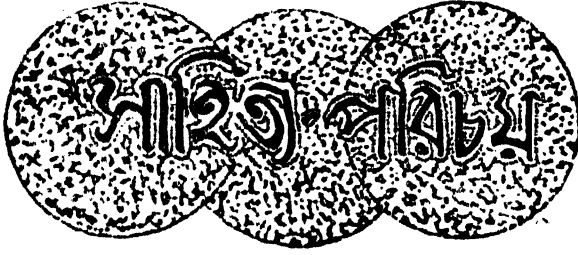
প্রায় একশত পাতায় আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার যে অনবদ্য আলেখ্য সুসাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন তার জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। জগদীশচন্দ্রের জীবনী লেখার জন্য এর চেয়ে কোন যোগ্যতর ব্যক্তির কথা আমাদের মনে হয় না। চারুচন্দ্র আচার্য্যদেবের বিশিষ্ট ছাত্র ও ভক্ত। বইখানি বিজ্ঞানের বহু দুরূহ তথ্য পরিপূর্ণ হ'লেও সাহিত্য-রসে এতই পরিপুষ্ট যে বইখানির পড়া একবার সুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। শুধু ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এর প্রচার সীমাবদ্ধ থাকবে না, যে কোন জ্ঞান ও রস পিপাসু এই পুস্তিকা থেকে চিত্ত বৃত্তির উৎকর্ষ ও বিনোদন লাভ করবে।

পাধ্যায় প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণও কলিকাতা হইতে সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সোমবার ১৮ই এপ্রিল চন্দননগরের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মঁসিয়ে বার-এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরিত হয়। কলিকাতা হইতে বহু বিশিষ্ট গায়ক এ দিনের অধিবেশনেও যোগ দিয়াছিলেন।

ভাইবোন—ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু কার্য্যালয়—৭নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—প্রতিসংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক দু'টাকা।

সাহিত্য জগতে কবি প্রভাত কিরণের বিশিষ্ট স্থান আছে। শিশুদের আসরে তিনি সুপরিচিত "কাকাবাবু"। কাকাবাবু সম্পাদিত এবং পরিচালিত "ভাইবোন" শিশুসাহিত্যে অদ্বিতীয়। আমরা "ভাইবোনের" হাস্য উজ্জ্বল মুখ দেখে খুবই আশান্বিত হলাম। এর বৈশিষ্ট্য প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত সরলতায় পূর্ণ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রভাত কিরণ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস "রাজার-ছেলে", হাসির গল্প "জগা পিসি", খগেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস "অজানা দেশ", শিবরাম চক্রবর্ত্তীর গল্প "বাগান বনাম বাগানে" প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষনীয়।

গেট্‌আপ্ আধুনীক রুচিসম্মত—ছবিগুলি চিত্তাকর্ষক।

অর্চ্চনা ৩৫ বর্ষ—১ম সংখ্যা, সম্পাদক—শ্রীসুধীর কুমার চন্দ্র, ৪২।১ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা, অর্চ্চনা প্রিন্টিং-ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন আনা,—বার্ষিক সডাক দেড়টাকা।

দীর্ঘকাল যাবৎ অর্চ্চনা মাসিক সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পত্রিকা মড়কের দেশে সুদীর্ঘকাল আয়ু সঞ্চয় করে বেঁচে থাকার মধ্যে যথেষ্ট গৌরব আছে।

অর্চ্চনার বিশেষত্ব বর্ত্তমান নববর্ষের সংখ্যায় সবিশেষ দৃষ্ট হোল। শ্রীযুত কেশব চন্দ্র গুপ্ত, মেঘেন্দ্র লাল রায়ের প্রবন্ধ, বি, বড়ালের গল্প, প্রভাতকিরণ বসুর উপন্যাস, প্রতুল রায়, অনিল কুমার ভট্টাচার্য্যের কবিতা, সারদা রঞ্জন পণ্ডিতের মঞ্চ-পর্দ্দা-আলোচনা সুখপাঠ্য।

নববর্ষের অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রভাত কিরণ বসু, অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য এবং প্রতুল রায়ের যুক্ত লেখনী প্রসূত অভিনব উপন্যাস "ত্রিবেণী"। ত্রিবেণী আধুনিক নাগরীক জীবনের বিচিত্র ঘটনাবহুল আলেখ্য।

সহযোগীর দীর্ঘ আয়ু লাভ করে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

"সাকী"

শ্রীসুনিল কুমার দাশ গুপ্ত

আমার মনের গুল-বাগানে
গাইছে সাকী গান,
তাইতে, ওগো, মোর নয়নে
উথ্‌লে ওঠে বান্।
মাতাল্ আজ ইরাণ কবি
রূপ মদিরা পিয়ে,
আঁকছে ছবি তন্বী সাকীর
স্বপন-তুলি দিয়ে;
বসন্ত তাই উঠলো গেয়ে
অঙ্গতে অভিমান।
দেখেছিলাম সাঁঝের আলোয়
জোড়া-আঁখি কালো,
জীবন্‌ভোর প্রেমের নেশায়
তারেই বাসি ভালো।
বল্‌ছে সাকী—"হেথায় আমি
গাইছি তব গান,"
উঠ্‌লো ছেয়ে আমার হিয়ায়
সাকীর কণ্ঠ তান্;
তাইতে, ওগো, মোর নয়নে
উথ্‌লে ওঠে বান্॥

—:০:—

ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ

শ্রীপঙ্কজ কুমার মুখোপাধ্যায়

"সমাজতন্ত্র" বলিতেই আতঙ্কের উদ্রেক হওয়ার কোন কারণ নাই, গুপ্তচরের প্রাণেও আনন্দের হিল্লোল বওয়ার কোন প্রকৃষ্ট ঘটনা নাই। ঐ শব্দটী আধুনিক ভারতে দুই শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক শুনিলেই ভয়ে চার হাত সরিয়া পালান, আর এক শ্রেণীর লোক প্রাতীচ্যের আদর্শের অন্ধকার দিবটার জন্যই উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যেই শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নাই। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে দেখিবেন প্রত্যেক মানুষই সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। যার মধ্যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে বা যে মানব সমাজের কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছে সেই 'সমাজতন্ত্রবাদী"। সমাজ বিষয়ক কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করাই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ পরিপালন করা। ভারতবর্ষে সমাজ-তন্ত্র একেবারেই নূতন নয়—এর জন্ম যদি প্রথমে কোথাও হইয়া থাকে তাহা হইলে ভারতবর্ষেই হইয়াছে। যখন বিবেকানন্দের বাণী ভারত সন্তানকে বলিল "মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত হও" তখন ভারতের আকাশ মুখরিত হইয়াছিল, সেই বাণীতে দিগন্ত সমাজতন্ত্রের আদর্শেই প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় যখন ভঙ্গুর সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়াস করিয়াছিলেন তখন কে বলিবে যে তিনি সমাজতন্ত্রীর কার্য্য করেন নাই? মানুষকে মানুষ হতে দেওয়ার জন্য যিনি চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই সমাজতন্ত্রবাদীর কার্য্য করিয়াছেন। কবীর যখন হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিচারে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন তখন কি তিনি নূতন সমাজের গঠন দিবার চেষ্টা করেন নাই। শিখ-গুরু নানক যখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন জাতি নাই, ধর্ম্ম হইল মনুষ্যত্ব আর কর্ম্ম হইল পূজা, তখন তিনি কোন্ আদর্শের প্রচার করিয়াছিলেন—ব্যক্তিতন্ত্র না সমাজতন্ত্র? আকবর যখন রাজপুতের সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যখন নব আদর্শ মুসলমান ধর্ম্মের গঠন দিয়াছিলেন তখন কি তিনি রাজতন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন না সমাজতন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন? সমাজতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্র বা রাজতন্ত্র যে তন্ত্রই হউক না কেন, মানুষের কার্য্য-কলাপ দেখেই তাহাকে সেই তন্ত্রভুক্ত করা প্রয়োজন। আজ যদি "ক" সমাজতন্ত্রী হইয়া নিজের স্বার্থের জন্য সাধারণের স্বার্থকে বলি দেন তাহা হইলে কি বলিবেন—তিনি সমাজতন্ত্রী না ব্যক্তিতন্ত্রী?

সমাজতন্ত্রের আদর্শ হইল ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগতস্বার্থে লুপ্ত করিয়া দেওয়া। নিজের চাওয়াকে ছোট করিয়া পরের চাওয়াকে বড় করিয়া ধরা। ব্যক্তিতন্ত্র বলে "নিজে বাঁচলে বাপের নাম"। আমার স্বার্থ-সুখ যতটা, আমার ক্ষমতা থাকে আমি আহরণ করিয়া লইব। যদি কাহারও শক্তিতে কুলায় তবে সে আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে পারে এবং এই কাড়াকাড়ির সংগ্রামে কোন লোক বাধা দিতে পারিবে না। কারণ ব্যক্তিতন্ত্রের স্ফুরণ হইবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—মনুষ্যত্বের দিক্ থেকে তাহার দাম যাহাই হউক ব্যক্তিগত স্বার্থ যদি অটুট করিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা আপনি অটুট হইয়া পড়িবে। তাহাদের ধারণার মূলে রহিয়াছে একটী বিরাট ভ্রান্তি। —যে সমষ্টি ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক এককের কোন না কোন কার্য্য আছে এবং প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সমাজকে সাহায্য করিবারও আছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে দুর্ব্বলের বা পঙ্গুর সাহায্যে সমাজের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই অতএব তাহাদের বাদ দেওয়া আবশ্যক। তাহার উত্তরে সমাজতন্ত্রের কথা হইল মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে না দিলে তোমার অন্ধ খঞ্জ ভ্রাতাকে তুমি কেমন করিয়া সংসার হইতে মুছিয়া ফেলিতে চাও। ব্যক্তিতন্ত্র যেখানে বলে "survival of the fittest" উপযুক্তেরই জয়জয়কার অবশ্যম্ভাবী সেখানে সমাজতন্ত্রের কোমল অন্তর মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে কর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বলে "না, মানুষকে বাঁচতে দাও। তোমারই ভাই, আজ তাকে সংহার করার ক্ষমতা তোমার নাই। তার অস্তিত্ব লোপ করার অধিকার কাহারও নাই।" যেখানে সংগ্রামের জন্য ব্যক্তিতন্ত্র প্রস্তুত সমাজতন্ত্র বলে বিফলে শক্তি অপচয় করা অপেক্ষা সেই শক্তির প্রকৃত এবং সুষ্ঠু নিয়োগে সমাজের অনেক কল্যাণ হইবে। ব্যক্তিতন্ত্র ব্যক্তিত্বেও উন্নতি দেখে তাহাতে সমাজ থাক্ আর যাক্ কিন্তু সমাজতন্ত্র দেখে সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ক্ষীণ উদ্দেশ্য থাক্ আর যাক্ মিলের ব্যক্তিতন্ত্রবাদই অন্যরূপ ধারণ করিয়া আজ "মহাজনীবাদ্" হইয়াছে। এখানেও সেই বিরাট যুদ্ধ। যে সবল সে তার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সব ধ্বংস করিতে প্রস্তুত আর যে দুর্ব্বল সে প্রবল শক্তির পদতলে নিষ্পেষিত হতে যাচ্ছে, তখন ক্ষীণ-কাতরস্বরে মনুষ্যত্বের কোলে আশ্রয় ভিক্ষায় জন্যে

সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহন করিয়াছে। সমাজতন্ত্র দুর্ব্বল, নিষ্পেষিতের জন্য ব্যক্তিতন্ত্র প্রবল অত্যাচারীর জন্য। যে মুহূর্তে "মিলের" দেশে 'ওয়ার্ক ম্যান্ কম্পেনসেসনের আইন' হইল, যে দিন "ফ্যাক্টরী আইনের" আবির্ভাব হইল, যে সময় "পুয়োর হাউস্" গঠিত হইল, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্ত, সেই সময় হইতে ইংলণ্ড সমাজতন্ত্রী ছাড়া আর কিছু নহে। মানুষকে তাহার কার্য্য দেখিয়া, উদ্দেশ্য দেখিয়া, প্রবৃত্তি দেখিয়া বিচার করাই শ্রেয়। আইনের পর আইন যে ক্রমবিকাশের পথে চলিয়াছে তাহার গতি পরিলক্ষিত করিলে নিশ্চিত বোঝা যইবে যে মানুষ মনুষ্যত্বের বিকাশের দিকে চলিয়াছে বনাম সমাজতন্ত্রের উপাসক হইতেছে। "মিলের" ভায়েরাই প্রথমে "দাসত্বের" বন্ধন মোচনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া "দাস" বিক্রয় তুলিয়া দিয়াছে। তাহারাই ভারতে আসিয়া "সতীদাহ" প্রথা উঠাইয়াছে, তাহারাই "বিধবা বিবাহ" প্রচলনের আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারাই রেলওয়ে এবং পোষ্ট্যাল টেলিগ্রাফ প্রভৃতিকে ব্যক্তিগত শাসন হইতে মুক্ত করিয়া রাজকীয় শাসনের মধ্যে আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারাই জেলায় জেলায় হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে। কাজেই সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রবাদী বলিতেই আঁৎকে উঠিবার কোন কারণ নাই।

সমাজতন্ত্রের জন্ম প্রথম যদি কোথাও হয় তবে ভারতবর্ষে, যদিও কার্লমার্ক্সের মত ভারতে কেহ ইহার বিশিষ্ট আদর্শরূপে প্রচার করে নাই তাহা হইলেও ইহার আদর্শ ভারতের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে। মুসলমানের মসজিদে দেখ কোথায় নবাব কোথায় পথের ভিখারী সব একত্রে নমাজ পড়িতেছে, অর্থের আভিজাত্যকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। জগন্নাথের মন্দিরে দেখ চণ্ডাল আর ব্রাহ্মণে একত্রে একই অন্নে পরিপুষ্ট হইতেছে। বুদ্ধ কবীর, নানক, চৈতন্য "মানব-কল্যাণের" জন্য জতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের দীক্ষা ত্যাগ, তাঁহাদের শিক্ষা মনুষ্যত্ব। যে ব্রাহ্মণ বহুশক্তিমান্ ছিল তাহারাই ছিল দরিদ্রের সন্তান। যে ক্ষত্রীয় বাহুর শক্তিতে ধরিত্রীর শান্তি রক্ষা করিত তাহারা ছিল ভিখারী ব্রাহ্মণের দাস। সমাজের গঠন হইয়াছিল সত্য "ব্যবসায়" হিসাবে শ্রেণীতে ঠিক আধুনিক "ইউনিয়ন" বা "সমিতি" প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মত। কিন্তু কালের গতিতে সমাজ যে সংখ্যাতীত দুর্ম্মোচ্য জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে তাহারই ফলে ব্যক্তিতন্ত্রের উপাসক হইয়াছে ভারতবাসী, স্বার্থ হইয়াছে সঙ্কীর্ণ, দৃষ্টি হইয়াছে ক্ষীণ। এই সঙ্কীর্ণতাকে বর্জ্জন না করিলে ভারত আপন ধর্ম্ম কখনও পাইবে না, এই ক্ষীণতাকে অপসারিত না করিলে পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু সেই ক্ষীণতা আর সঙ্কীর্ণতাকে উৎপাটিত করিতে হইলে সমাজতন্ত্রের আদর্শই কি তাহার সম্মুখে হাজির হয় না?

আধুনিক ভারতীয় "কমিউনিষ্ট" বা "সোসিয়ালিষ্ট" দলের যে সংগ্রাম চলিয়াছে তাহা নিতন্ত অমূলক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ। উভয় দলই সংগ্রাম করিয়া, শক্তির অপচয় করিয়া, আদর্শকে বলি দিয়া, মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ কার্য্য সমাধান করিবে? আজ দেশ নায়ক রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রবাদী, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান জহরলাল সমাজতন্ত্রবাদী, গান্ধী মুখে না বলুন কার্য্যতঃ তাঁহার অপেক্ষা বড় সমাজতন্ত্রী কেহ নাই। কারণ তাঁহার "ধর্ম্মই হইল মনুষ্যত্ব, কর্ম্ম হইল ত্যাগ"। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজতন্ত্রীর আদর্শ পশ্চিমাদের নকল করা অপেক্ষা ঠিক ভারতের উপযোগী নব সমাজতন্ত্রের গঠন করা উচিত। ভারতীয় সমাজতন্ত্রীর আদর্শ জহরলালের কর্ম্ম, গান্ধীর সত্য এবং সুভাষের নিষ্ঠা এই ত্রিশক্তির মিশ্রণে উদ্ভূত হউক।
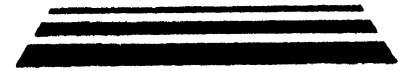
ইস্কাবনের টেক্কা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ্, বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

পরদিন সকাল আটটা আন্দাজ অবিনাশকে থানায় পাঠিয়ে দিলুম, চিরঞ্জীব বাবুর পাণ্ডুলিপিগুলোর একটা নকল নিয়ে আসবার জন্য। তাতে আমার তদন্তের সুবিধা হবে বলে মনে করলুম।

অবিনাশ চলে গেলে চায়ের শিশিটা নিয়ে পরীক্ষা করলুম। পরীক্ষা করে দেখলুম চা-টা নির্দ্দোষ। তারপর রুমালটা নিয়ে বসলুম। এমন সময় অবিনাশ ফিরে এলো।

আমি—"কি হ'ল ?"

অবিনাশ—"ইন্‌স্পেক্টর বাবু বল্লেন, লেখাটার একটা true copy করে শীঘ্রই কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। তুমি অত মনোযোগ দিয়ে রুমালখানা দেখ্‌ছ কেন ? রুমালে কি আছে ?"

আমি—"রুমাল আমায় অনেক খবর দিয়েছে।"

অবিনাশ—"কি রকম ?"

আমি—"আমি যা বলি লিখে রাখ। নাও লেখ।"

অবিনাশ—"সত্যি লিখবো ?"

আমি—"আরে আমি কি ঠাট্টা করছি ?"

অবিনাশ—কাগজ কলম নিয়ে বসলো।

আমি—"নাও—লেখ। 'চিরঞ্জীববাবুর হত্যাকারীর আকৃতি—খর্ব্বকায়, ৪॥০ থেকে ৫ ফিট মাথায়, ছিপছিপে শরীর কিন্তু শক্তিশালী, খুব পান খাওয়া অভ্যাস আছে, কড়া-গন্ধওয়ালা এসেন্স্ ব্যবহার করে, হাতে সব সময়ে ঘাম থাকে ও ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করে।"

অবিনাশ—"লেখা তো হোল, তারপর ?"

আমি—"যদি কখনও ধরা পড়ে তো মিলিয়ে নিও।"

অবিনাশ—"কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর-বেশী লোকটাকে তো আমরা দেখেছি। তার সঙ্গে—"

আমি—"কোন মিল নেই—সত্যি। কিন্তু ও লোকটার সঙ্গে আর একটা লোক ছিল। সে কোন-না-কোন সুযোগে চিরঞ্জীব বাবুর ঘরের মধ্যে ঢুকে লুকিয়েছিল। ঠিক সময়ে বেরিয়ে আক্রমণ করেছে। তোমার ঐ পুলিশ বেশী খুনী নয়। খুনী অন্য কেউ।"

অবিনাশ—"কিন্তু তুমি অত জান্‌লে কি করে ?"

আমি—"চোখদুটোর সদ্ব্যবহার করে। লোকটা খর্ব্বকায় কেন বলুম—ঘড়ীটা যতটা উঁচুতে ছিল তাতে একটা মাফিকসই লম্বা লোক শুধু সোফাটার উপর উঠেই ঘড়ীটা বন্ধ করে দিতে পারতো, সোফার উপর একটা চেয়ার দেওয়ার দরকার হ'তোনা। ছিপ্‌ছিপে শরীর—কারণ, ঐ ঘরের মধ্যে সে লুকিয়েছিল। ওখানে লুকিয়ে থাকবার আর কোন জায়গা নেই, শুধু একটা সোফার তলা ছাড়া। সেখানে লুকুতে হ'লে ছিপ্‌ছিপে চেহারা হ'তেই হ'বে। রুমালটায় খুব কড়া গন্ধ আছে—যদিও কিছুদিনআগে এসেন্সটা লাগানো হ'য়েছে। রুমালে ঠোঁট মোছা হয়েছে অনেকবার এবং অনেক জায়গায় পানের দাগ আছে। রুমালটা যখন পাই তখন সেটা ভিজে। শুঁকে দেখ্‌লুম ঘামের গন্ধ। যাদের হাত অনবরত ঘামে, তারা ঘাম মুছে মুছে রুমাল ঠিক ঐ রকম করে' ভিজিয়ে রাখে। আর লোকটা বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করে বল্লুম, তার কারণ, সাধারণতঃ লোকে আক্রমণ করবার সময় বাঁ হাতে ধরে এবং ডান হাতটা ব্যবহারের জন্য স্বাধীন রাখে। এ লোকটা ডান হাতে চিরঞ্জীববাবুর মুখ চেপে ধরেছিল, কারণ নখের দাগ বলেছে বাঁ দিকের গালে—বা হাতটা তার ফ্রী (free) ছিল—তার অর্থ বাঁ হাতটা সে ব্যবহার করে বেশী।"

অবিনাশ আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে বসে রইলো।

আমি—"কি ? কি দেখ্‌ছ ?"

অবিনাশ—"সকলের চোখ সমান কাজ দেয় না।"

আমি—"হয়। চোখকে কাজ করতে শেখাতে হয়।"

এই সময়ে বাইরে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল। অবিনাশ বাইরে বেরিয়ে গেল, এবং একটু পরেই একতাড়া কাগজ নিয়ে এলো। বল্লে—"এই চিরঞ্জীববাবুর পাণ্ডুলিপির নকল।"

বল্লুম—"পড়।"

অবিনাশ—"এখনই ?"

আমি—"দেরী করে লাভ ?"

অবিনাশ পড়তে আরম্ভ করলে।

যা শুনলুম তা সংক্ষেপে এই :—

চিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, হারুকেশ্বর ঘোষ, হরিমোহন বটব্যাল, রমানাথ মিত্র ও নীলাম্বর

চক্রবর্ত্তী এই কয়জন মিলে ঘোড়ার ব্যবসায় করেন। কারবারে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হ'তে থাকে।

কারবারের অধিকাংশ মূলধন ছিল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর, যখন কারবারের আয় মাসিক ত্রিশহাজারে পৌঁছুল, তখন নীলাম্বর তাঁর অংশের মূলধন বাদে বাকী টাকাটা ফিরে চাইলেন।

প্রতিবৎসর বিদেশ থেকে ঘোড়া এদেশে আমদানী করবার জন্যে অংশীদারদের মধ্যে একজন করে বাইরে যেতেন। সে বছর নীলাম্বরের পালা পড়েছিল। নীলাম্বর বর্ম্মায় গেলেন, সেখান থেকে যেতে হ'লো অষ্ট্রেলিয়ায়। কিছুদিন পরেই হঠাৎ কারবারের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে যেতে লাগল। এক দিন শোনা গেল কারবার ফেল হয়েছে। নীলাম্বর তখন বিদেশে।

খবর পেয়ে নীলাম্বর ফিরে এলেন। তখন কোম্পানী লিকুইডেশনে (liquidation) গেছে। দেনা পত্র চুকিয়ে দিয়ে একটী পয়সাও উদ্বৃত্ত হলো না। অংশীদাররা কিছুই পেলেন না। কিন্তু দেখা গেল, যে শুধু নীলাম্বরই পথে বসেছেন, বাকী চারজনের অবস্থা যেমন তেমনি আছে। ছয়মাস যেতে যেতেই নীলাম্বর ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন। নীলাম্বরের একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা রাণী ভিক্ষাপাত্র হাতে সত্য সত্যই রাস্তায় বেরুল। কিছুদিন পরে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সে কোথায় গেল বা তার কি হ'ল সে খবর কেউ রাখলে না। তখন রাণীর বয়স মাত্র বারো বৎসর।

এক দুই করে ক্রমশঃ দশ বৎসর কেটে গেল। একদিন হঠাৎ দারুকেশ্বর ঘোষ একখানা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা আছে —"দশ বৎসর আগে এক ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করেছিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই দশবৎসর তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৩ই জুলাই শুক্রবার, ঠিক রাত্রি ১২টার সময় ইহ-জগত থেকে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থেকো।" চিঠির সঙ্গে একখানা ইস্কাবনের টেক্কা। দারুকেশ্বর গ্রাহ্যই করলে না। কিন্তু দেখা গেল, ঠিক সেই দিন—রাত্রি ১২টার সময় কে তাঁকে খুন করে গেছে, আর তাঁর কপালের উপর পেরেক দিয়ে মেরে দিয়ে গিয়েছে একখানা "ইস্কাবনের টেক্কা"। হাতের মধ্যে তাঁর একখানা চিরকুট; তাতে লেখা ছিল—"১ নং—বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি।"

তারপর ঠিক ঐ রকম অবস্থায় মরেছেন রমানাথ মিত্র। তিনি খুব সাবধান হয়েই ছিলেন। একজন লোক চাকর সেজে তাঁকে খুন করে পালিয়েছিল। এই জন্যেই ইন্‌স্পেক্টরের পরামর্শে চিরঞ্জীব বাবু চাকরদের 'ঐ রাত্রে বিদায় করে' দিয়েছিলেন।

৩ নং হ'চ্ছেন চিরঞ্জীব বাবু।

রাণী—উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ইহুদী স্ত্রীলোকের মত রঙ্, কোঁকড়া কালো চুল, টানাটানা চক্ষু—তারা ঈষৎ কটা, ভ্রূদুটী যেন তুলি দিয়ে আঁকা, নাক একটু চাপা তবে বলা বলা যায় না, ঠোঁট পাতলা ও টুকটুকে লাল যেন রংমাখান, শরীরের গড়ন নিটোল' পাদুটী ছোট ছোট—পায়ের অনামিকাদু'টী অন্যান্য আঙুলের অনুপাতে খর্ব্ব—মাটীতে ঠেকে না।

এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ খবর জানে একমাত্র রাণী আর নীলাম্বরের এক দূর সম্পর্কীয় ভাইপো নরেন ভট্টাচার্য্য। সে রাণীর চেয়ে মাত্র ৯১০' বৎসরের বড়। দারুকেশ্বর ও রমানাথের হত্যার মূলে হয় রাণী অথবা নরেন, কিংবা রাণী ও নরেন দুজনেই আছে এই চিরঞ্জীববাবুর বিশ্বাস।

নরেন লম্বা-চওড়া, জোয়ান, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তীব্রদৃষ্টিযুক্ত বড় বড় চক্ষু, জোড়া লোমশ ভ্রূ, নাক সরল ও দীর্ঘ, ঠোঁটের দুটোপাশ একটু চাপা, চুল কালো ঢেউখেলান, শরীর পেশীবহুল—পেশীগুলো বাইরের দিক থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। একটা অদ্ভুত স্বভাব তার এই, যে কোন লোক কাছ ঘেসে বসলেই, সে কেমন একটু চঞ্চল হ'য়ে ওঠে আর নাক দিয়ে একটা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করে—বিশেষতঃ যদি সে লোক একটু নোংরা হয় কিংবা তার গায়ে কোনরকম দুর্গন্ধ থাকে।

রাণী ও নরেন প্রায় একসঙ্গেই নিরুদ্দেশ হয়।

এইখানেই চিরঞ্জীববাবুর পাণ্ডুলিপি শেষ হ'য়েছে।

* * *

ঘড়ীতে দেখলুম বেলা প্রায় ন'টা। কাজেই উঠে পড়তে হ'লো। ডিস্পেন্সারী থেকে একটা লোক খবর দিলে অনেকগুলি রোগী অপেক্ষা করছে।

অবিনাশকে বাড়ীতে রেখে মোটর নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনীবাকে বলে গেলুম একেবারে 'কল্' সেরে ফিরবো।

(৩)

বাড়ীতে ফিরলুম যখন, তখন বেলা প্রায় দুটো। খাওয়া দাওয়া সেরে

একখানা বই নিয়ে পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। হঠাৎ অবিনাশের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়।

বল্লুম—"কি হে, কি খবর ?"

অবিনাশ—"ওঃ! কি ঘুম! ভাবলুম—"

আমি—"অজানা পথে এগিয়ে গেছি ?"

অবিনাশ—"God forbid ভাবলুম ডেকে দি'। এই ব্যাপারটায় হাত দিয়ে পর্য্যন্ত আমার একলা থাকতেই যেন গা ছম্ ছম্ করছে। চোখ বুজোলেই দেখছি—বেশ পরিষ্কার দেখছি একখানা ইস্তাবনের টেক্কা। এর মধ্যে বউদিকে order (অর্ডার) দিয়ে আমি চার গেলাস বেলের সরবৎ খেয়েছি—বরফ দিয়ে।"

বেয়ারা রামদহিন্ এসে একখানা কার্ড দিলে। তাতে লেখা—"মহম্মদ নবাবালী বেগ—নবাব বাহাদুর অব নাসিরাবাদ।"

অবিনাশকে বল্লুম অভ্যর্থনা করে বসাতে। অবিনাশ চলে' গেল।

নবাব বাহাদুরের সঙ্গে কোথাও দেখাশুনা বা পরিচয় হ'য়েছিল বলে' মনে পড়লো না। বোধ হয় এটা প্রোফেশন্যাল্ কল্।

"হু ইজ হু"—বইখানা খুলে একবার পাতাটা উল্টে দেখে নিলুম। হ্যাঁ, আছে বটে। "নাসিরাবাদের নবাব বয়স ৩২ বৎসর ৩ মাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ উপাধী ধারী—বিবাহিত—সন্তানাদি নাই—বহুসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে প্রীতিকামী। গোঁড়া মুসলমান হ'লেও হিন্দুদের অতি প্রীতির চক্ষে দেখেন। মোক্তবে মাদ্রাসায় যেমন তাঁর দান আছে—পাঠশালায় টোলেও তাঁর সেইরকম দান আছে। প্রজাসাধারণে তাঁর অশেষ খ্যাতি এবং সকলেই তাঁর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করে।

নীচে নেমে এলুম। ঘরে ঢুকতেই অবিনাশ আমাকে দেখিয়া বল্লে—"ইনিই ডাক্তার হরেন মুখার্জ্জী।"

একজন দীর্ঘকায়, সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর, যুবক একখানি চেয়ারে বসে ছিলেন। বুঝলুম তিনিই নবাব বাহাদুর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, আমার করমর্দ্দন করে, নবাব বাহাদুর বল্লেন—"আপনার নাম শুনেছি। আমার ভগিনী কয়েক মাস যাবৎ জ্বর রোগে ভুগ্‌ছেন। এখানে যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি, সেই আমাকে আপনার কাছে আসতে উপদেশ দিয়েছে। আপনাকে একবার অনুগ্রহ করে' আমার ওখানে আস্‌তে হ'বে। কখন সুবিধা হ'বে? আমার ঠিকানা ৪৮নং টালিগঞ্জ সারকুলার রোড্।"

আমি হেসে বল্লুম—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বড়ই আনন্দিত হ'লুম। আমরা ডাক্তার মানুষ। সুবিধা অসুবিধা দেখে কাজ করলে আমাদের চলে না। বরং রোগীর সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা বেশী দরকার বলে আমাদের মনে হয়। যে সময় যেতে বল্‌বেন, সেই সময়েই আমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'ব। তবে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আমি ডিস্‌পেন্সারীতে থাক্‌বো।"

নবাব বাহাদুর বল্লেন—"বেশ। আমি তা'হলে ঠিক ৮টার সময়েই গাড়ী পাঠিয়ে দেব। ডাঃ, এম্, এন্, দাস দেখছেন; তিনিও উপস্থিত থাকবেন বলেছেন। ডাঃ এম্, এন্ দাসকে জানেন বোধ হয় ?"

আমি—"কে? ভবানীপুরের এম্. এন্, দাস ?"

নবাব বাহাদুর—"হ্যাঁ। তিনিই আপনাকে ডাকবার কথা বল্লেন।"

আমি—"ও! তাঁকে সকলেই চেনে। তিনি এ অঞ্চলের অতি বিখ্যাত চিকিৎসক। খুব বিচক্ষণ। আচ্ছা, আমি প্রস্তুত হ'য়েই থাকবো। আপনার গাড়ী এলেই যা'ব।"

নবাব বাহাদুর অভিবাদন করে' চলে গেলেন।

সন্ধানে

শ্রীভৈরব নাথ আচার্য্য

রাত্রির বিজনতায় নাহি কলরব,
নিদ্রার অলসতায় সুপ্ত এবে সব,
শুধু আমি-একা বসি' বাতায়ন-পাশে,
ভাবি আর হাসি কত বিপুল উল্লাসে
উদিত গগনে আজি পূর্ণ শশধর
জ্যোৎস্নায় আলোকিত সর্ব্ব চরাচর।
কলকল তানে নদী চলিছে বহিয়া
মিষ্ট তার সুরে মোর ভরি' উঠে হিয়া'
দূরে কোন নিশাচর পক্ষদুটী মেলি'
বহুদূরে খাদ্যতরে ছুটে যায় চলি'।
আমি শুধু বসে রহি জেগে একা একা
ভাবিতেছি কোথা গেলে পাব তার দেখা॥
শনশন রবে বায়ু বহে নিজ মনে,
কি বারতা দেয় মোরে আজি ক্ষণে ক্ষণে।
মনে হয় কাঁদিছে কে একা বনমাঝে
ব্যাকুল অন্তর মোর ছোটে তারি খোঁজে॥
বনমাঝে ব্যস্ত হয়ে হেরি চারিদিকে।
ফিরে আসি অবশেষে ক্ষুব্ধ মনোরথে॥
খুঁজিলাম কত করি' হইলনা দেখা।
আমি শুধু রহিলাম ধরামাঝে একা॥

তিনি চলে গেলে অবিনাশ বল্লে—"হরেন, রাত্তিরের 'কল্' মনে কর—"

অবিনাশের ভাব দেখে আমি হেসে ফেল্লুম। বল্লুম—"এইবার ঠিক হ'য়েছে। বন্ধু আমার এতদিন পরে detective mentality (গোয়েন্দার মনোভাব) পেয়েছেন: নবাবের উপরেও সন্দেহ ?"

অবিনাশ ইতস্ততঃ করে বল্লে—"কিন্তু—মনে কর, সে যদি—যদি সে—"

আমি—"বল বল। যদি সে নবাব নাই হয়"—এই তো? অবিনাশ, তুমি শিক্ষানবীশ হ'লেও তোমার প্রশংসা করছি।

কিন্তু সে যে নবাব সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়েই আমি নেমে এসেছি। "হু ইজ হু" (Who is who) বইখানা দেখে তারপর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তা' হ'লেও, আমি সাবধান হ'য়েই সেখানে যাব। তুমিও না হয় আমার সঙ্গে চল।"

অবিনাশ একগাল হেসে বল্লে—"আমিও সেই কথাই বলছিলুম।"

ঠিক হ'লো, আমি আর অবিনাশ দুজনেই যা'ব।

হেসে বল্লুম—"ডাক্তার দাসও সশস্ত্র হ'য়ে আসবেন বোধ হয়—কি বল অবিনাশ?"

অবিনাশ—"ডাক্তার দাস? হাঁ। দেখা যাবে। তিনি আসুন আগে।"

আমি—"নাঃ—অবিনাশ, তুমি রীতিমতন ডিটেকটিভ হ'য়ে উঠেছে—হঠাৎ! My complements."

অবিনাশ—Thank you.

ডিসপেন্সারীতে যে সব রোগী এসে জমা হ'য়েছিল, তাদের পরীক্ষা করে' ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। বাইরে এসে দেখলুম নবাব সাহেবের গাড়ী অপেক্ষা করছে। অবিনাশ ইতিপূর্ব্বেই এসে উপস্থিত হইয়াছিল। দুজনে নবাবসাহেবের গাড়ীতে রওনা হলুম।

ড্রাইভারকে চোখের কোণ দিয়ে একটু দেখে নিলুম। সন্দেহের তো কোন কারণই দেখলুম না।

গাড়ী ছেড়ে দিলে অবিনাশকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম—"কি আছে সঙ্গে?"

অবিনাশ কানে কানে বল্লে—"একটা 'খোকা' (রিভলভার)।"

আমি—নবাব যদি মনে করেন, তাহ'লে আমাদের ডাকাত বলে চালান দিতেও পারবেন।"

আর কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছুলুম।

নবাব-সাহেব নিজে এসে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন।

বাড়ীখানা খুব বড়। চারিপাশে আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগান। বাড়ী বাগানের ঠিক মাঝখানে, বড়রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দু'চারজন চাকর-বেয়ারা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন রকম গোলমাল নেই। মোটের উপর জায়গাটা এত নির্জ্জন, যে সহরের গোলমালের মধ্যে সমস্ত দিন যাপন করার পর উপকণ্ঠের এই শান্তভাবটাকে যেন অত্যন্ত নিস্তব্ধতা বলে মনে হ'তে লাগলো।

বৈঠকখানায় আমাদের বসতে দিয়ে, নবাবসাহেব বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। একটু পরেই একজন বেয়ারা ট্রেতে করে দু'পেয়ালা চা' নিয়ে এলো। টেবিলের উপর ট্রেটা রেখে দিয়ে সে বাইরে চলে গেল।

আমার চায়ের পেয়ালা যেমন তেমনি রইলো। অবিনাশকে বল্লুম খেতে। অবিনাশ বল্লে—"দেখ হরেন, তোমাকে একটা খুব সোজা কথা বলি। তুমি যাই বল না কেন, আমি এই অযাচিত আমন্ত্রণটা আদৌ পছন্দ করছি না।"

আমি হেসে বল্লুম—"ডাক্তারের আমন্ত্রণ আবার কোন কালে 'যাচিত' হ'য়েছে বল।"

অবিনাশ—"বটে। কিন্তু আদর-আপ্যায়নটা একটু অতিরিক্ত নয় কি?

আমি—"না। আমি তো আদৌ তা দেখতে পাচ্ছি না। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এলে যদি এক পেয়ালা চা দেওয়া যায়, তো সেটা এমন অতিরিক্ত যত্ন করা কি হ'লো?"

অবিনাশ—"তবে খাও। এক পেয়ালা কেন দশ পেয়ালা খাও, খেয়ে হাত-পা খেঁচে মুখ দিয়ে ফেণা তুলে কেষ্টকে জবাব দাও।"

আমি হেসে ফেল্লুম। বল্লুম—"এঃ! তুমি নবাবসাহেবকে বড্ড সন্দেহ করছো দেখছি। কিন্তু কেন? ভদ্রলোক—"

বাধা দিয়ে অবিনাশ বল্লে—"নাও, রাখ তোমার 'ভদ্রলোক'। আচ্ছা বাপু, তুমি ছাড়া কোন সিনিয়র হার্ট-স্পেশালিষ্ট নেই কি? ডাক্তার দাস তোমার সিনিয়র। সিনিয়র ডাক্তার জুনিয়ারকে ডেকে পাঠালে পরামর্শের জন্য। বিশেষতঃ ডাক্তার দাস—যে "স্পেশালিষ্ট" বলে কিছু মানতেই চায় না। না হরেন, আমি ভাল বুঝছি না।"

(ক্রমশঃ)

বীরত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত ইষ্টার্ণ পিকচার্সের "দেবী ফুল্লরা"-তে কাল-কেতুরূপী অহীন্দ্র চৌধুরী। ছবিখানির পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ক্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ | টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক- শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম বর্ষ, অষ্টাদশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে বৈশাখ ১৩৪৫, ৫ই মে ১৯৩৮

বাংলা কংগ্রেসে শান্তিময় পরিস্থিতি

স্বাটাল সফরের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশনে শাস্তিমুলক দণ্ডে দণ্ডিত বাংলার কংগ্রেসকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অপসারণ করিয়া এক প্রস্তাব স্বয়ং উত্থাপিত করেন। প্রস্তাব সভায় গৃহীত হওয়ায় ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীকামিনী কুমার দত্ত, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দ মুক্ত হইয়াছেন। কেবলমাত্র মাননীয় অর্থসচিব শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত নিশিথ নাথ কুণ্ডুর উপর দণ্ডাজ্ঞা বাহাল রহিল। নলিনী বাবু এখনও অকংগ্রেসী মন্ত্রীত্বপদে আসীন সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা বাহাল থাকাই স্বাভাবিক। প্রকাশ যে নিশিথবাবু কিছুদিন পূর্ব্বেও স্থানীয় লোকাল বোর্ড নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্টীর বিরোধিতা করিয়াছেন সেই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা নাকচ করা সম্ভবপর হয় নাই। আশা করি নিশীথ বাবু শীঘ্রই তাঁহার অতীত কৃতকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন এবং তাহা হইলে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা যে তুলিয়া লইবেন তাহা সুনিশ্চিত। যদি মিশ্র কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয় তাহা হইলে হয়ত তাহার পূর্ব্বাহ্নে নলিনী বাবুর বিরুদ্ধেও দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত হইবে। ততদিন নলিনীবাবু বাংলার কংগ্রেসী মহলে প্রকাশ্যে অস্পৃশ্যই রহিবেন কারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে বিধানবাবু ও কিরণবাবুর সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ও সামাজিক ও রাজনৈতিক আদানপ্রদান অতীতেও যেমন ছিল বর্ত্তমানেও তদ্রূপই আছে।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলা কংগ্রেসে যে শান্তিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কল্যানময় ভবিষ্যতের সুচনা করিতেছে। ডাঃ সেনগুপ্তের ন্যায় প্রবীন ও ত্যাগহিতব্রতী কর্ম্মীর কংগ্রেসে পুনরাগমনে যে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীযুক্ত ধীরেশচন্দ্রের ন্যায় কর্ম্মঠ অধ্যয়নশীল ও শক্তিমান যুবকের রাজনীতিক জীবন পুনর্জ্জীবিত করিয়া প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। কুমিল্লার প্রথিতযশাঃ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত কামিনী দত্ত ও তদীয় ভ্রাতা ক্যাপ্টেন দত্ত যদি বর্ত্তমান শান্তিময় আবহাওয়া অনুযায়ী আত্মশুদ্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে বাংলা কংগ্রেস বিশেষ লাভবান হইবে। তাঁহারা উভয়েই বিশেষতঃ ক্যাপ্টেন দত্ত উদ্যোগী পুরুষ সুতরাং তাঁহারা যদি পুনরায় বিভ্রান্ত না হন তাহা হইলে তাঁহারা বাংলা কংগ্রেসে পুনঃ-প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।

বাংলার কংগ্রেসে এই শান্তিময় আবহাওয়ার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের উপর। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সহিত সান্ধ্য-ভ্রমণ যদি কিরণবাবুর সশস্ত্র নিরপেক্ষতাকে প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় পরিণত না করে তাহা হইলে চিরতরে বাংলা কংগ্রেসের ব্যক্তিগত দলাদলির অবসান হইবে। আদর্শগত দলাদলি দোষনীয় নহে কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলা কংগ্রেসে আদর্শের বৈষম্য কোথায়?

—:•(x)•:—

(সি, বি)

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতা

গত শনিবার ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারত বিখ্যাত বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলাটি হয়ে যাবার পর কলকাতায় এ বছরের হকি খেলার বিদায় পর্ব্ব শেষ হয়েছে। গত বছরের বাইটন কাপ বিজয়ী বি এন আর দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে প্রতিপক্ষ কাষ্টমস দল অপেক্ষা উন্নত ধরণের খেলা দেখিয়েও এক গোলে পরাজিত হয়েছে। এতে করে পূর্ব্ব ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কারণ এর আগে আরও তিনবার ১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৫ সালে এই দল দুটি এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কিন্তু প্রতি বারেই যথাক্রমে (২—০), (১—১, ২—০) এবং (০—০, ২—১) গোলে রেল দলকে কাষ্টমস্ দলের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। এ বছর বাইটন কাপ জয়ী হবার পর ক্যালকাটা কাষ্টমস দল এগারবার এই সম্মান লাভের অধিকারী হল। তাছাড়া এরা ১৯১৫ সালের পর থেকে আটবার রাণার্স আপ হবার সৌভাগ্যও লাভ করেছে। এখন পর্য্যন্ত এরূপ অভাবনীয় সাফল্য অর্জ্জন করা আর কোন দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার উপর এ বছরে একটি খেলাতেও পরাজয় স্বীকার না করে লীগ বিজয় করতে এদের খ্যাতি আরও বেড়ে গেছে।

এ বছরের ফাইন্যাল খেলাটিতে রেল দল বিজয়ী হবার উপযুক্ত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্যের জন্যই তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। বি এন আর দল খেলাটির প্রারম্ভ থেকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করতে থাকে এবং অন্ততঃ তিনটি নিশ্চিত গোল করবার সুযোগের অসদ্ব্যবহার করে কিন্তু খেলাটি শেষ হবার দু-মিনিট আগে কাষ্টমস দলের ভিয়ার্স একটি সেণ্টার করলে সিম্যান সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত-ভাবে বিজয়সূচক গোলটি করে রেল দলের সমর্থকগণকে হতাশ করে দেন্। কাষ্টমস্ দল জয়ের সম্মান লাভ করলেও গোলরক্ষক জার্ডিন্, অলিম্পিক-ব্যাক্ হজেস এবং হ্যাফব্যাক্ স্মিথ্ তাদের পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচিয়েছে। বিশেষ করে হজেস্ এবং জার্ডিন্ এত উচ্চাঙ্গের ক্রীড়া-নৈপুণ্য এবং কৌশল সেদিন প্রদর্শন করেছিলেন যে কোনরূপ বর্ণনাই তার উপযুক্ত হবে না। সেই কারণে এই বিজয়ের গৌরব এরা দুজনে অনেক খানি দাবী করতে পারেন। আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহই তাদের নিজেদের স্বাভাবিক খেলা দেখাবার সুযোগ পায় নি।

পরাজিত বি, এন, আর দলের গোল রক্ষক গিল্ কয়েকটি অব্যর্থ গোলরক্ষা করে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যাক-দের মধ্যে প্রথমেই অখ্যাতনামা, অল্পবয়স্ক খেলোয়াড় মিডের নাম উল্লেখযোগ্য। এই খেলাটিতে হজেসের পরেই ইনি দর্শক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মিড্ তাঁর নিজ ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখিয়ে বিশ্ববিখ্যাত ব্যাক্ দি ট্যাপ্সেলের খেলাও ম্লান করে দিয়ে-ছিলেন। হাফব্যাকদের মধ্যে জো গ্যালিবার্দ্দী এবং এন্থনির খেলা প্রশংসাযোগ্য হয়েছিল। ফরওয়ার্ডদের মধ্যে নামকরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড রবার্ট ডিক্ কার সতর্ক পাহাড়ার জন্য নিজ হকি প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পান নি। তা ছাড়া তাঁর খেলাও সেদিন আশানুরূপ হয় নি। হারবিন্, লেনন্ এবং হিল সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের দ্বারা বিপক্ষ দলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। বিশেষ করে হারবিন্ এবং লেনন্ প্রতিপক্ষদলের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন।

কাষ্টমস্ :—জার্ডিন, হজেস এবং ব্রেন্ডিস, স্মিথ, ক্রোয়ার এবং ডেভিস, ভিয়ার্স, হেণ্ডার-সন্, রেবেলো, রেণ্টন্ এবং সিম্যান্।

বি, এন, আর :—গিল্, দি ট্যাপসেল্ এবং মাড্, এন্থনি, এম্ গ্যালিবার্দ্দী, জে গ্যালিবার্দ্দী, ডিফোণ্টেস, এম্ হিল্, আর কার, হারবিন্ এবং লেনন্।

আম্পায়ার দ্বয় :—মেসার্স সিধু দত্ত এবং বি, এন ঘোষ (দিল্লী)

নিম্নলিখিতভাবে কাষ্টমস্ দল বাইটন্ কাপ বিজয়ী হয়েছে—

মহমেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবকে—
৬—০ গোলে পরাজিত করে

বি, জি, প্রেস্ ক্লাবকে—
১—০ " " "

জব্বলপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে—
৪—১ " " "

সানন্দেরপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে—
(জলন্ধর) ৩—০ " " "

লুসিটেনিয়ানস্ ক্লাবকে—
(বোম্বাই) ১—১, ১—০ " " "
বি, এন, আর ক্লাবকে—
১—০ গোলে " "

পূর্ব্ববর্ত্তী বাইটন্‌কাপ বিজয়ীগণ

১৮৯৫-৯৬	নেভাল্ ভলেন্টিয়ার্স এ সি
১৮৯৭-৯৮	এস, পি, জি মিশন (রাঁচী)
১৮৯৯—	ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯০০—	সেন্ট জেমস স্কুল
১৯০১ ১৯০২	রয়াল আইরিশ রাইফেলস্
১৯০৩—	এস পি জি মিশন (রাঁচী)
১৯০৪—	ফরেষ্টার্স এ সি
১৯০৫—	বি ই কলেজ (শিবপুর)
১৯০৬-১৯০৭	এস পি জি মিশন (রাঁচী)
১৯০৮-১০	কাষ্টমস এ সি
১৯১১—	ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯১২—	কাষ্টমস্ এ সি
১৯১৩—	ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯১৪—	এম এ ও কলেজ (আলীগড়)
১৯১৫—	ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯১৬—	বি ওয়াই এসোসিয়েসন (লক্ষ্ণৌ)
১৯১৭—	ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯১৮—	বি ওয়াই এসোসিয়েসন (লক্ষ্ণৌ)
১৯১৯—	জ্যাভেরিয়ানস ক্লাব
১৯২০—	আসানসোল রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯২১—	বি ই কলেজ (শিবপুর)
১৯২২—	ই বি আর স্পোর্টস্ ক্লাব
১৯২৩—	ওয়াই এম এ (লক্ষ্ণৌ)
১৯২৪—	ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব
১৯২৫-২৬	কাষ্টমস্ এ সি
১৯২৭—	জ্যাভেরিয়ানস ক্লাব
১৯২৮—	টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব
১৯২৯—	ই আই আর স্পোর্টস ক্লাব
১৯৩০-৩২	কাষ্টমস্ এ সি
১৯৩৩—	ঝান্সি হিরোজ
১৯৩৪—	ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯৩৫—	কাষ্টমস্ এ সি
১৯৩৬—	বোম্বাই কাষ্টমস
১৯৩৭—	বি এন আর

এবছরের বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতার দুটি সেমি ফাইন্যাল খেলায় একটিতে বি এন আর দল বোম্বাই কাষ্টমস্ দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। খেলাটিতে প্রথম থেকেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয়েছিল এবং এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার সমস্ত বিশিষ্ট-গুলিই বর্ত্তমান ছিল। উভয় দল সমশক্তি-সম্পন্ন থাকলেও রেল দল অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের খেলা দেখায়। খেলাটি শেষ হবার তিন মিনিট আগে রেল দলের এস হিল্ একটি গোল করায় সেমিফাইন্যাল খেলাটির শেষ নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

অপর সেমিফাইন্যাল খেলাটিতে ক্যালকাটা হকি লীগ বিজয়ী কাষ্টমস্ দল এবং বোম্বাই হকি লীগ বিজয়ী লুসিটেনিয়ান্স দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রথমার্দ্ধের শেষের দিকে কাষ্টমস্ দলের হেণ্ডারসন্ একটি গোল করবার পর (১-০) দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা পুনরারম্ভের চার মিনিট অতিবাহিত হবার পরে লুসিটেনিয়াসস্ দলের পি ফার্ণাণ্ডিস্ গোলটি পরিশোধ করে। অতিরিক্ত পনেরো মিনিট সময় খেলেও কোন পক্ষই আর গোল করতে না পারায় প্রথম দিনে খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়। পরের দিন পুনরায় খেলাটি হয়—এবং কাষ্টমস্ দলের হেণ্ডারসন্ প্রথমার্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে একটি গোল প্রদান করে (১-০) নিজ দলকে এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উপনীত করেন।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ফাইন্যাল

গত শনিবার বেলা চার ঘটিকার সময় ক্যালকাটা মাঠে লক্ষ্মীবিলাস্ কাপ প্রতি-যোগিতার ফাইন্যাল খেলাটি হয়। জলন্ধর হইতে আগত সান্দেরপুর স্পোর্টিং ক্লাব এবং আলীগড় ইউনিভার্সিটী এই প্রতি-যোগিতার ফাইন্যালে উপনীত হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত আলিগড় দল্ বিপক্ষদলকে ৫-১ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে কাপটি জয় করেছে।

কাইভান কাপ ফাইন্যাল্

গত শুক্রবার মোহনবাগান মাঠে কাইভান কাপের ফাইন্যাল খেলায় কলেজিয়ানস্ দলের সিকুভার একটিমাত্র গোল করে সিলুয়াদলকে পরাজিত করেছে।

হকি চ্যারিটী ম্যাচ

গত রবিবার জামসেদপুর যক্ষানিবারণী ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে মোহন বাগান ক্লাবের সহিত লুসিটেনিয়ানস্ দলের একটি প্রদর্শনী হকি ম্যাচ খেলা হয়। মোহনবাগান দল গোল করার অনেকগুলি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও শেষ অবধি ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে।

এফ এ কাপ ফাইন্যাল

ওয়েম্বলিতে এফ, এ, কাপ ফাইন্যাল ম্যাচে অতিরিক্ত সময় খেলে 'প্রেষ্টন্' 'হাডার্স ফিল্ড' দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে।

মানভাদার হকি দল

আগামী ১৪ই মে মানভাদার হকি টীম কলম্বো থেকে 'ওরণসে' জাহাজ যোগে

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কথায় আছে 'অন্ধ জাগোরে'—না 'কিবা রাত্র কিবা দিন!' কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ঠিক এই অন্ধের জাগরণের ন্যায়। সেই মান্ধাতা আমলের একই জিনিষ থোড়বড়ি খাড়া আর খাড়াবড়ি থোড়। প্রোগ্রামে না আছে কোন বৈচিত্র্য না আছে কোন নতুনত্ব! গান, বাজনা, থিয়েটার, বক্তৃতা তাও আবার যত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। দীর্ঘ দিনের সমালোচনার মাঝে আমরা নতুন জিনিষ খুব কমই পেয়েছি। প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে এমন জিনিষ অতি অল্পই পাওয়া যায় যাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভরিয়ে তোলা যেতে পারে। বিভিন্ন বিভাগে এতগুলি এ্যাসিষ্টেণ্ট প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর থাকা সত্বেও এ অভাব কেন এ প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না।

*　　*　　*

আরও একটা কথা, বেতারে যে সব শিল্পী প্রথমে খানিকটা কৃতিত্বের পরিচয় দেন কিছুদিন বাদে প্রোগ্রামে তাঁদের নাম খুব কমই দেখা যায়। বেতার প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। প্রোগ্রামের নিয়ন্ত্রণে তাঁরা এসব কথা মোটে ভেবেই দেখেন না, শ্রোতারা কাদের চায় কার যোগ্যতা কতদূর! কোন শিল্পী কিরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। নূতন শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান কিংবা তাদের যোগ্যতা অনুধাবন বেতারে এসব কিছুই নেই।

*　　*　　*

শিল্পীরা এখানে ভাবতেই পারে না যে বেতার প্রতিষ্ঠান তাদের। শিল্পীদের আমরা কখনও কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের গুণকীর্ত্তন করতে শুনি না। তাদের অভাব, অভিযোগ লেগেই আছে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহারও চলে আসছে। বহুদিন ধরে আমরা এ নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছি এর কোন প্রতিকার হোল না।

*　　*　　*

এবারে বেতারের উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম হবে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথিতে বেতারের সম্বর্দ্ধনা দান কবিগুরুকে প্রশংসনীয়। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শান্তি নিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী অর্ঘ্য জানাবেন কবিগুরুকে। রবীন্দ্র গীতি বাসর পরিচালনা করবেন সুরশিল্পী অনাদি কুমার দস্তিদার। অনাদিবাবু রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর মুখে রবীন্দ্র সঙ্গীত আমাদের খুবই ভালো লাগে কিন্তু তিনি কোনদিনই গান না। যে সমস্ত আর্টিষ্ট তিনি আমদানি করেন অনেকেই তার মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতে অজ্ঞ এবং অসমর্থ।

*　　*　　*

দিলীপ কুমারের গান ও গান সম্বন্ধে আলোচনা আগামী ১০ই মে বেতারে অনুষ্ঠিত হবে। বহুদিন পরে দিলীপ কুমারকে বেতারে পেয়ে আমরা আনন্দ লাভ করছি।

*　　*　　*

বেতার নাটক পরিচালক মিঃ ভদ্র যাত্রার আসর থেকে বহুদিন বাদে আমাদের একখানি নূতন নাটক উপহার দিচ্ছেন 'লক্ষহীরা'। 'লক্ষহীরা' রচনা করেছেন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী। আমরা প্রতীক্ষায় রইলুম।

কলঙ্কিত প্রেম

শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

নিরমল তুমি ইন্দু চির জানা মোর :
কলঙ্ক তোমার মাঝে থাকিতে যে পারে
কে বুঝিতো—তুমি যে একের প্রেমে ভোর
অনুদিন চলিয়াছো স্বপ্ন-অভিসারে!
বিবসনা বসুধারে বাসিয়াছো ভালো,
পরকীয়া প্রেমে তুমি ভুলেছো আপনে;
নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া কলঙ্কের কালো
হাসিমুখে মাখিয়াছো অনিন্দ্য আননে।
অযুত আঁখির তলে তব নির্ভীকতা
প্রাত্যহিক ব্রতখানি চলিয়াছে নিয়া;
প্রেমমুগ্ধা পৃথ্বী বুঝি তাই প্রেমরতা
সোনালী প্রেমের রঙে শ্যামলা সাজিয়া?
সহস্র কলঙ্ক ঘিরে আছে সর্ব্বদাই,
তোমার নীরব প্রেমে এতো মধু তাই।

নিউজিল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করবে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ এই দলের পক্ষে খেলবার জন্য মনোনীত হয়েছেন। গোল-রক্ষক—বি আব্রাহাম্, ব্যাকগণ:—গুরুনারায়ণ সিং, ফরাসৎ খাঁ এবং মহম্মদ হোসেন, হাফব্যাকগণ:—মহয়া, সাহসুর খাঁ, লাজপৎ এবং এ কোয়াভি, ফরওয়ার্ডগণ:—সাহাবুদ্দিন আহমেদ খাঁ, আব্দুল লতিফ, সুলতান খাঁ, পি পি ফার্ণেণ্ডিজ, সুলেমান, নারায়ণ এবং মানভাদারের নবাব (অধিনায়ক)। প্রফেসার জগন্নাথ ম্যানেজার হয়ে টীমের সঙ্গে যাবেন।

বিবিধ

মাষ্টার হেমানন্দ

স্বামী পূর্ণানন্দ বালক-সঙ্ঘের ব্যায়াম বিভাগের শিক্ষক, প্রথম লোক বোঝাই গরুর গাড়ী পিঠে করিয়া মোটরের গতি রোধ করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন। উপস্থিত তাঁহার পুত্র মাষ্টার হেমানন্দ এই বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের স্নেহভাজন হইয়াছে।

সাহায্য অভিনয়

কলিকাতার রাজা রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীটস্থিত অনুরূপা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে Y.W.C.A. এর হলে শনিবার ১৪ই মে, অপরাহ্ণ ৬-৩০ টায় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লালের মেবার-পতন অভিনীত হইবে। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

রচনা প্রতিযোগীতা

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে হুগলীজেলাবাসীগণের পক্ষ হইতে চুঁচুড়ায় যুগস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে কয়েকটী রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী বিভাগে যাহাদের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনোনীত হইবে তাঁহাদিগকে একখানি করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

রচনার বিষয়-বস্তু—

রচনা প্রেরণের শেষ দিবস ১৫ই জুন

পুরুষ বিভাগ—

১। বঙ্কিম সাহিত্যে পাশ্চত্য প্রভাব।

স্ত্রী বিভাগ—

২। বঙ্কিম সাহিত্যে নারী

হুগলী জেলার স্কুল সমূহের ছাত্র-ছাত্রী-গণের জন্য—

৩। দেবীচৌধুরাণীর চরিত্র

পুরস্কার—স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক

রচনাগুলি প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর স্বাক্ষরিত হইয়া—২১শে জুনের মধ্যে পৌঁছান চাই।

রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল
চৌমাথা ষ্ট্রীট, চুঁচুড়া

অথবা—

শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
সেণ্ট্রাল রোড, চুঁচুড়া।

দীনদয়ালের রোজনামচা

শ্রীঅনাথবন্ধু দেবদত্ত

আগ্রার তাজ, চীনের প্রাচীর বা মিশরের পিরামিডের মতই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল দাক্ষায়নী ওরফে দাখী বামনী তার অতি নিষ্ঠার জন্য। রসিকপুরের এমন কেউ ছিল না যে, দাখী বামনীকে চেনে না। প্রাণ বায়ুর চেয়েও শুচিবায়ুর মর্য্যাদা তার কাছে যে অনেক বেশী ছিল তার পরিচয় গ্রামবাসী সকলেই কিছু কিছু পাইলেও তার স্বামী রামদয়ালের প্রাণবায়ু এতে যাই যাই করিত।

ঘটনাটী আরও বিশ বৎসর পূর্ব্বের থেকে আরম্ভ করা যাক। রামদয়ালের পিতা দীনদয়াল ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। উদারতা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নিরভিমানতা প্রভৃতি দ্বারা গ্রামের সকলের শ্রদ্ধাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মে পণ্ডিত বিদায় ও গ্রামের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারে যাজন তার সরল জীবনযাত্রার পক্ষে এই পর্য্যাপ্ত ছিল। তার একমাত্র পুত্র দীন-দয়ালকে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা দিতেছিলেন—উদ্দেশ্য পিতার বৃত্তি অনুসরণ করিলে পুত্রের উদরান্নের চিন্তা থাকিবে না। রামদয়াল লেখাপড়ায় খুব মেধাবী না হইলেও শৈশবাবধি তার উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল।

রামদয়াল একবার পিতার সঙ্গে দূরগ্রামে কোন এক জমিদারের মাতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যায়। তখন তার বয়স দশ বৎসর। সেখানে বহু বিখ্যাত নৈয়ায়িক, স্মার্ত্ত, বৈদান্তিক পণ্ডিতের কলরবে তার খুব আমোদ লাগিল। সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য প্রমাণে ব্যস্ত। কেউ বা মুক্তকচ্ছ কারো বা উত্তরীয় ধূলাবলুণ্ঠিত, কারো বা শিখা মস্তকের ঘন ঘন আন্দোলনে বায়ুতাড়িত কদলী বৃক্ষের শীর্ষের মত দোদুলিত, কারো বা চশমা দড়িসহ এককানে ঝুলিতেছে। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল বায়ু। কুক্ষণে কাব্যের এক পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কীদৃশী ব্যাধিতে রোগিনীর প্রাণবায়ু দেহের মায়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে?" অমনি সমস্ত পণ্ডিত ঝঞ্জাবায়ুর মত বায়ু কথাটার উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িল। বায়ু কয় প্রকার, পঞ্চভূতের বায়ু, উনপঞ্চাশ বায়ু, আকাশস্থ বায়ু—এর কোন বায়ুর স্থান কোথায়, প্রাণবায়ু কি মস্তকে থাকে না হৃদয়ে থাকে, শরীরস্থ বায়ু স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধগামী না অধঃগামী ইত্যাদি। দশ বৎসরের বালক আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। পিতার কাছে আসিয়া বলিল "বাবা! আমি আরও একপ্রকার বায়ুর নাম করিতে পারি।" ভোজনে উপবিষ্ট কলরব মুখর দেশের ছাত্রদের পাতে যেন

তাকের পর ডাল পড়িল। পণ্ডিত মহাশয়েরা একেবারে নিশ্চুপ। বৃদ্ধ নৈয়ায়িক কালীশ্বর তর্করত্ন পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন "বল বাবা! বল।" রামদয়াল বলিল "শুচিবায়ু।" চীৎকার করিতে গিয়া সামলাইয়া দেখে যে সে তখন বৃদ্ধের স্কন্ধে, সতীস্কন্ধে শিবের নৃত্যের ছন্দ তার পায়ে।

সেদিন কিন্তু রামদয়াল কল্পনাও করিতে পারে নাই যে তার এই উত্তর তার ভবিষ্যৎ-জীবনের কতবড় পূর্বাভাষ।

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কালীশ্বর তর্করত্নের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা দাক্ষায়ণীর সঙ্গে অতঃপর রামদয়ালের বিবাহ দু'তিন মাসের মধ্যেই হইয়া গেল। রামদয়াল এবার ব্যাকরণ ও ন্যায় একসঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিল।

মানুষ ভাবে এক আর হয় অন্যরকম। কি এক অশুভক্ষণে কি শুভক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয় বালক রামদয়ালের উপর তাদের সব চেয়ে অর্থশালী যজমান দিগীন মিত্রের নজর পড়িল।

ব্যাপারটা কিছুই না। দীনদয়ালের স্ত্রীর অসুস্থ থাকায় পুত্র রামদয়ালকে পাঠাইয়াছিলেন যজমান দিগীনবাবুর বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা করতে। দ্বাদশবর্ষীয় বালক অনেক কষ্টে লক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্রটা মুখস্থ করিয়াছিল, কিন্তু অনেকবার পড়া সত্ত্বেও ধ্যানটা আর কিছুতেই আয়ত্ব করিতে পারিল না। আবার পূজাপদ্ধতি সঙ্গে নিতেও সম্মত হইল না, পাছে যজমান বাড়ীর লোক মনে করে যে ঠাকুর মশাই পূজা করিতে জানেন না।

পূজার আসনে রামদয়াল খুব স্মার্টলিই বসিল। এবং কারণে অকারণে—সজোরে আওড়াইতে লাগিল "লক্ষ্মীত্বং সর্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। স্থিরাভব সদা দেবী মম জন্মনি জন্মনি।" মাঝে মাঝে ফুল ও বিল্বপত্র চন্দনলিপ্ত করিয়া ঘটশীর্ষস্থ কদলী গুচ্ছের উপর দিতে লাগিল। এইরূপে ঘন্টারব দে, ধূপের ধূমায়, আর ঘন ঘন প্রণামমন্ত্র আওড়াইয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক পূজাপ্রাঙ্গন সরগরম করিয়া তুলিল। বাড়ীর মহিলারা বিশেষতঃ বৃদ্ধারা ত মুগ্ধ। পূজার শেষে দিগীনবাবু নবীন পুরোহিতকে কোল দিলেন। রামদয়াল মুটের মাথায় নানাবিধ পূজোপকরণ সহ মস্ত একটা ধামা চাপাইয়া বিজয়গর্বে বাড়ী পৌঁছিল।

তরুণ বালকের পূজার আড়ম্বরে দিগীন-বাবুও মুগ্ধ। তিনি ছুটিলেন পিতার কাছে পুত্রের প্রশংসা জানাইতে। ঠাকুরমহাশয়ের দরজার কাছে আসিয়া নিজের নাম শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দীনদয়াল বলিতেছেন "দিগীনবাবুর কাছে এখনই গিয়ে মাপ চা। প্রবঞ্চনা মানুষের সঙ্গেই ঘোর অন্যায়, তুই দেবীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছিস্, বেটা অনজ্ঞান্, ব্রাহ্মণ কুলধুরন্ধর।" দিগীনবাবু আর দাঁড়াইলেন না।

৫।৬ দিন পরে দিগীনবাবু রামদয়ালকে কলিকাতায় নিয়া গেলেন ব্যবসা শিখাইতে। বৃদ্ধ পুরোহিতও ছেলের মতিগতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তাই সহজেই অনুমতি দিলেন।

(২)

দিগীনবাবু বউবাজার ষ্ট্রীটে 'মিত্র এণ্ড কোং' ফার্মের সত্বাধিকারী। বাজে লোহাকে টাটা ষ্টেট্‌ড ষ্টীল নামে চালাইয়া কলিকাতায় অনেক বাড়ীর ভিত্তির চেয়ে তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের ভিত্তি দৃঢ়তর করিতেছিলেন। কোন বাড়ীর লোহার কাজের কন্‌ট্রাক্ট নেবার পর অন্ততঃ ৬।৭ দিন তাকে ঠন্‌ঠনিয়ার আশে পাশে, চাল্‌তা বাগানে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কোন কোন যায়গায় ঘুরিতে দেখা যাইত। দেখা হইলেই বলিতেন "মা বেটীর এম্‌নি টান যে শ্যামবাজার থেকে পায় হেটে বেটীকে একবার না দেখলে মনটা ছটফট্ করতে থাকে। মাগো! করুণাময়ী!" বলিয়াই যুক্তকরে আবার নমস্কার। অনেকে তার ভক্তি গদগদমুখের দিকে চাহিয়া 'থ' খাইয়া যাইত।

*　　*　　*

বিশ বৎসর পরের কথা। রামদয়াল দিগীন বাবুর ফার্মে কাজ করিতেছে। সে যে এহেন দিগীন বাবুর উপযুক্ত শিষ্য তা দিগীনবাবু যখন বুঝিতে পারিলেন তখন রামদয়ালের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দিগীনবাবুর খুব বেশী নীচে ছিল না। তিনিও আস্তে আস্তে রামদয়ালের হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন টাটা ষ্টেট্‌ড ষ্টীল এবং খাঁটী বিলাতী ছাপমারা ষ্টীল রামদয়ালই ঠন্‌-ঠনিয়া হইতে ক্রয় করে। এবং খরচের টাকা কয়েকগুণ হইয়া ব্যাঙ্কে দিগীনবাবুর একাউন্টে জমা হয়। শুধুমাত্র বাড়ীগুলির ভিত্তি ক্রম-শঃই শিথিল হইয়া আসিতে থাকে, এবং ঠন্‌ঠনিয়ার মহাজনেরা রামদয়ালের কাছ থেকে যা পায় তার কয়েকগুণ দিগীনবাবুর রাম দয়ালকে দিতে হয়।

একদিন আকস্মিক ভাবে সব ওলটপালট হইয়া গেল। বালীগঞ্জের মস্ত একটা বাড়ীর আয়রণ কন্‌ষ্ট্রাক্‌সনের কন্‌ট্রাক্ট দিগীনবাবু পাইয়াছেন। রামদয়াল সব দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া বলিল "আমি বালীগঞ্জ থেকে সমস্ত কাজটার মাপ নিয়ে এসেছি। কালীতলায় গিয়েছিলাম। অনেক দর দস্তুর করে একটা ফার্মের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, আমায় লিষ্টমত সব মাল যে দেবে মাত্র ১৩৫০৲ টাকায়। পার্টির কাছে কোন্ না আট নয় হাজার টাকা পাওয়া যাবে?"

দিগীনবাবু বলিলেন "আচ্ছা! তুমি তবে আজই টাকাটা নিয়ে গিয়ে সমস্ত মাল কাজের ওখানে রেখে এস। কাজটা খুব আর্জেন্ট।"

রামদয়াল টাকা নিয়া প্রথম ব্যাঙ্কে গেল, নিজের একাউন্টে ১৩৫০৲ টাকা জমা করিয়া কালীতলা মার মন্দিরের সামনে খুব ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তারপর তার পরিচিত লোহার দোকানে গিয়া হাজির। দর দস্তুর

আগেই ঠিক করা ছিল। নগদ ২২০৲ টাকার বিনিময়ে ১৩৫০৲ টাকার একটা ক্যালমেযো ও লিষ্ট মত সমস্ত মাল নিয়া সে বিদায় নিল।

তারপর ধুমকেতুর মত আসিল পিতার অসুখের খবর। রামদয়াল এক মাসের ছুটি নিয়া বাড়ী গেল। ট্রেনে গুটিতিনেক সুন্দরী যুবতী দেখিয়াই তার দৃষ্টি প্রখর হইল, বহুদিন বিস্মৃত শিশু স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া। ভাবিতে লাগিল গত বিশবৎসরে তার পঞ্চম বর্ষীয়া স্ত্রী হয়ত এত বড়ই হইয়াছে, নিজের স্ত্রীর রূপ অপরিচিতাদের মুখে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঘন ঘন তাকাইয়া শেষে নিজেই লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া নিল। স্ত্রীর সান্নিধ্য কল্পনা করিয়া তার সর্ব্বাঙ্গে পুলক শিহরণ জাগিল। কোন এক নিদ্রিত অনুভূতি হঠাৎ চেতনা পাইল।

বৃদ্ধ পিতাকে যখন কিছুতেই বাঁচান গেল না, তখন রামদয়াল স্ত্রীর দিকে মনোযোগ দিল। দাক্ষায়নীর সর্বাঙ্গে এমন একটা কঠিন রুক্ষতা ছিল যে যৌবনের সমস্তখানি মধুরিমা এবং রহস্যও মাঝে মাঝে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িত। সে যেন প্রভাতসূর্য্য। দূর থেকে খুব মনোরম, কত কবির লেখনী দিস্তায় দিস্তায় কাগজ মসীসিক্ত করিতে পারে তার নমনীয়তা ও কমনীয়তার বর্ণনায়, কিন্তু সামনে গেলে পবন নন্দনের মত দশা। বিশেষতঃ দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্বন্ধ, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে সম্বন্ধ, পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে নোটবুকের যে সম্পর্ক, জল ও গোবরের সঙ্গে দাক্ষায়নীর যে সেইরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল এটা রামদয়াল অল্প দিনেই বুঝিতে পারিল। আরও বুঝিল দাক্ষায়নীকে পাইতে গেলে তাদের বাদ দিয়া তাকে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বৈষ্ণব ভক্ত যেমন কণ্ঠে তুলসীর মালা ও সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া সর্বদা বিষ্ণুর সান্নিধ্য অনুভব করেন, দাক্ষায়নীরও শরীরের নানাস্থানে বরুণদেবের কৃপাচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

বিশ বৎসর পরে প্রথম মিলন ছিল এইরূপ। রাত্রে আহারান্তে দাক্ষায়নী চৌকীতে নিদ্রিতপ্রায়া। রামদয়াল বৈষয়িক কাজে খাওয়ার পর একটু বাহিরে গিয়েছিল। পা টিপিয়া টিপিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া দেখে পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া স্ত্রী তার শয্যায়—বসন অসংযত, কেশপাশ স্রস্ত, বক্ষ অর্ধাবৃত। নারীকে এ বেশে এই নিশীথে এত কাছে পাওয়া তার জীবনে এই প্রথম। নারীকে দেখিয়াছে সে শুধু কলেজের মেয়েরূপে, মেসের ঝিরূপে, আর নটীরূপে। সে নারীকে যে এত কাছে পাওয়া যায়, এরূপ সম্পূর্ণভাবে—যেখানে

নিন্দার ভয় নাই; চারিদিকের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নাই, এই প্রখর সত্য তার মনের যৌবনকে মুহূর্তে সজাগ করিয়া দিল। যৌবনের সমস্ত উন্মত্ততা ঠোঁটে মাখিয়া দাক্ষায়ণীকে স্পর্শ করিতেই সে সশব্দে ফাটিয়া পড়িল।

"বলি! আক্কেলের মাথা কি একেবারেই খেয়েছ? বামুনের ঘরের ছেলে, আর এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও নেই তোমার! এমন খৃষ্টেনি আমার চৌদ্দপুরুষেও দেখিনি।"

রামদয়াল ত 'থ'। এ যেন পুরস্কার গ্রহণেচ্ছু বালকের গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত। অনিন্দ্যসুন্দরী রাজরাণী যেন বিরাট মুখব্যাদান করিয়া একটা আস্ত ষাঁড় গিলিয়া ফেলিল। বেচারা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

দাক্ষায়ণী বলিয়াই চলিল—"বামুনের ছেলে হয়ে এটাও জান না যে এটোকাপড়ে বিছানায় যেতে নেই। এই যে সমস্ত বিছানা এটো হয়ে গেল মায়—লেপ, তোষক, বালিশ—এখন রাত্রে শোব কিসে?"

বলিয়াই উঠিয়া দুম দুম করিয়া লেপ, তোষক, বালিশ সমস্ত বাহিরে ফেলিয়া দিল। রামদয়াল বলিতেই সাহস পাইল না যে কাপড়টা তার কখন এটো হইল। গৃহিণীর শুচিবায়ুতা ও অতিরিক্ত মুখরতা সে যাহা শুনিয়াছিল তাহা যে এরূপ রূঢ় সত্যরূপে দেখা দিবে এটা তার কল্পনার বাহিরে।

রাত্রে ছেঁড়া মাদুরের উপর তুলার বস্তা মাথায় দিয়া উভয়ের দাম্পত্যজীবনের প্রথম নিশার অবসান হইল।

পরদিন বেলা আটটা। প্রচণ্ড ঝাকানি খাইয়া রামদয়াল একলম্ফে একেবারে উঠানে। বিহারের ভূমিকম্পের ভয় তখনও লোকে ভুলে নাই। চিৎকার করিয়া ডাকিল "ওগো শুনছ! শীগগীর বাইরে এসো। ঘর চাপা পড়ে মরবে যে

দশ-বার-খানা কাঁসার থালা এক সঙ্গে ঝন ঝন ঝন শব্দে পড়িয়া গেল। রামদয়াল শুনিতে লাগিল—"বলি, আটটা পর্যন্ত শুয়ে থাকলে পিণ্ডি চটকাবো কে দিয়ে। বাজার টাজার নেই। বিছানা শুয়ের মুখেত কাল রাত্রে নুড়ো জ্বেলে দিয়েছ"

হায় কালিদাস! হায় চণ্ডিদাস! হায় রবীন্দ্রনাথ! স্বকীয় প্রেমের কি এই পরিণতি! রামদয়াল জলের মত বুঝিয়া ফেলিল বিবাহিতা পত্নী কেন প্রেমকাব্যে অচল—কৃষ্ণের কেন রাধা, চণ্ডীদাসের কেন রামী। আরও বুঝিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কেন পত্নীর স্থান নেই।

(ক্রমশঃ)

সাধুচরণ বেশে—অহী সান্যাল

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

গত চার সপ্তাহ ধরে বিদ্যাপতি 'চিত্রা'-য় সমানভাবে দর্শক আকর্ষণ কোরছে এবং বাঙলা দেশের নর-নারীর অন্তরে বিদ্যাপতি যে বিশেষভাবে রেখাপাত কোরতে পেরেচে তার একাধিক প্রমান পেয়েচি। গত চার সপ্তাহ 'চিত্রায়' বিদ্যাপতির টিকিট সেল্ হোয়েচে, ২৩,৩৪৭৮৹ টাকা নেট্। এ থেকে দর্শক মহলে নিউ থিয়েটার্স-এর ছবির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও, সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককে আনন্দ দেবার মত প্রচুর উপাদান এই চিত্রে বর্ত্তমান। কানন, দুর্গাদাস, পাহাড়ী এবং অমর মল্লিকের প্রাণঢালা অভিনয় এবং কানন ও কৃষ্ণচন্দ্রের সুধা-কণ্ঠের অপূর্ব্ব গানগুলির আলোচনা আমরা ইতি পূর্ব্বেই কোরেচি। এই গানগুলি সঙ্গীত পিপাসুর অন্তর মথিত কোরে তুলবে।

নর-নারী নির্ব্বিশেষে, সকল সম্প্রদায়ের কাছেই অনুরাধা চরিত্রটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হোয়ে উঠেচে। পরিকল্পনার অভিনবত্বে এবং পরিস্ফুটন মাধুর্য্যে, এই চরিত্রটি অপরাপর সকল চরিত্রটিকে ছাড়িয়ে, এই নাটকে শীর্ষস্থান অধিকার কোরেচে। যে বিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা এবং আত্মদানের মধ্যে সাধনার সিদ্ধি—কবি-সঙ্গিনী অনুরাধা, প্রেমের সাধনায়, তার-ই জোরে সিদ্ধিলাভ কোরেছিল। বস্তুতঃ কবি বিদ্যাপতির মহা-কাব্যের সত্য পরিচয় অন্ততঃ আংশিক ভাবেও, এই অপরূপ নারী-চরিত্রটি অবলম্বন কোরে বিকাশ লাভ করবার অবসর পেয়েছে।

তাই, আমাদের মনে হয়, বিদ্যাপতি-র অপরাপর বহু আকর্ষণের কথা ছেড়ে দিলেও, অনুরাধার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যও বাঙলার নর-নারী বিদ্যাপতি থেকে জীবন সার্থক কোরে তুলবেন।

নিউ সিনেমায় হিন্দি 'বিদ্যাপতি' তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ কোরল এবং 'চিত্রা'-য় বাঙলা বিদ্যাপতি এগিয়ে এলো—ষষ্ঠ সপ্তাহে।

অভিজ্ঞান

বাঙলা সংস্করণের মুক্তি সম্বন্ধে সঠিক ভাবে এখনও কিছু বলা না গেলেও, এই মাসের শেষের দিকে ছবিখানি যে রূপবাণীতে আত্মপ্রকাশ কোরবে, একথা নিশ্চিত।

পরিচালক প্রফুল্ল রায় এর বাঁকী কাজটুকু শেষ কোরে আনবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা কোরছেন। ছবি খানির 'ট্রেলার' এই সপ্তাহের মধ্যেই মুক্তি পাবার কথা।

অভিজ্ঞানএর মত একখানি বিরাট উপন্যাসকে ছায়া-চিত্রের উপযোগী কোরে গঠন কোরতে, চিত্র-নাট্যকার ফণি মজুমদারকে অনেক কিছু রদ-বদল কোরতে হোয়েচে। সন্ধ্যার রক্ষা কর্ত্তা প্রমথর বাল্য বন্ধু হিসাবে, চিত্রশিল্পী 'সুরেশ'-চরিত্রটির পরিকল্পনাটিও নতুন। অভিজ্ঞান এর মত Heavy নাটকে, অনেকখানি 'রিলিফ্' দিয়েচে এই সুরেশ। কাশীর এক জনবহুল রাস্তায়, বৃক্ষমূলে বারিসেচন রতা সন্ধ্যাকে প্রথম দেখেছিল এই সুরেশ। সুরেশের কবি মনে ভেসে উঠল এক ছবি। পাশের এক রং এর দোকান থেকে রং ও তুলি ক্রয় কোরে, কল্পনা-বিলাসী, আপন ভোলা সে শিল্পী, স্থান কাল ভুলে গিয়ে, সেই দণ্ডে আঁকতে বসলো সন্ধ্যার সেই বিশেষ পোজের ছবি।

—"ওকী, ওকী, নড়বেন না"

অলক্ষিতে বেরিয়ে এলো সুরেশের মুখ থেকে এই কটি কথা। উদাসী সন্ধ্যার কানে সুরেশের কথা পৌছুতেই, সে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে অপরিসীম লজ্জা ও সংকোচের প্রাবল্যে, বিদ্যুৎ গতিতে সে স্থান ত্যাগ কোরল। কিন্তু সুরেশের হাতে রয়ে গেল সেই 'স্কেচ'। পরবর্ত্তী কালে, সুরেশ তাতে রং ফলিয়ে সম্পূর্ণ কোরে তুলেছিল!

নিতান্ত দৈববশে সন্ধ্যা পড়েছিল সুরেশের চোখে—। সুরেশ জানতো না কে এই মেয়েটা। সন্ধ্যাও কল্পনা কোরতে পারে নি, এই চিত্রশিল্পীই তার আশ্রয়দাতার বাল্যবন্ধু! কিন্তু তাদের জীবনে পরিচয় বিনিময়ের সুযোগ যখন এলো—তখন সেই শিল্পী ও নারীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো

প্রথম দিনের সে ছবি! পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বিগত দিবসের সেই 'thrill' টুকু, আরও গভীরভাবে সন্ধ্যার মন স্পর্শ কোরল, যখন ধীরে ধীরে সুরেশ তাকে, সদ্য পরিচিত বন্ধু-পত্নী জ্ঞানে, তার হাতে পৌঁছে দিলে, পথের ধারে আঁকা, বৃক্ষমূলে বারি-সেচন রতা, সুন্দরী সন্ধ্যায় সেই পটে আঁকা ছবি!

বড়দিদি

বড়দিদির আংশিক ভূমিকা লিপি আমরা ইতিমধ্যে প্রকাশ কোরেছি। ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় আর্টিষ্ট নির্ব্বাচিত হোয়েচে। নায়িকা মাধবীর ছোটবোন প্রমীলা একটি অপূর্ব্ব চরিত্র। এই চরিত্রের জন্য একটি অতি সুদর্শনা মেয়েকে মল্লিক মশাই নির্ব্বাচিত কোরেচেন। দৈহিক রূপ ছাড়াও মেয়েটির জন্মগত অভিনয় প্রতিভা আছে। এই বালিকা অভিনেত্রীটির নাম—শ্রীমতী ছবি। এই মেয়েটি নাট্য সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরীর দৌহিত্রী। এ ছাড়া শুনচি 'ব্রজরাজ লাহিড়ী'র ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরবেন সুবিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং 'বিন্দু ঝি'র ভূমিকায় অভিনয় কোরবেন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী নিভাননী।

বাঈজী 'এলোকেশী-র ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য শুনলুম মল্লিক মশাই এমন একটি মেয়েকে মনোনীত কোরেছেন—যে নৃত্য গীত এবং অভিনয়ে—সকল দিকেই চৌখষ!

সুতরাং ভূমিকা নির্ব্বাচনের দিক দিয়ে আর্টিষ্ট সমাবেশ যে পরম লোভনীয় হোয়েচে এ কথা স্বীকার কোরতে আমরা বাধ্য।

পরিচালক মল্লিক মশাই, সাধ্যমত অবসর সময়ে মহলা পরিচালনা কোচ্চেন। 'দেশের মাটি'র কাজ থেকে তিনি সম্পূর্ণ অবসর লাভ কোরলে মহলার কাজে আরও অধিক মনোনিবেশ কোরতে পারবেন।

অধিকার

নিউ থিয়েটার্স এর দু' নম্বর ষ্টুডিওতে বড়ুয়ার পরিচালনায় 'অধিকার' এর কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এটর্ণি অম্বিকা চরণের চেম্বারের দৃশ্যটী এখন তোলা হচ্ছে। এতে অভিনয় করছেন শৈলেন চৌধুরী ও ইন্দু মুখোপাধ্যায়। এরা দুজনা এর আগে জুটী বেঁধে 'মুক্তি'তে যে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন তা এখনও আমাদের মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকার-এও ঠিক তেমনই জুটী বেঁধে আবার এরা সবাইকে হাঁসাবার ব্যবস্থা করছেন। সুটিং এর পর যে রকম শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় এরা তাদের পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখতে পেরেছেন।

'অধিকার' এর আর একটী জিনিষ যা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হচ্ছে তা হচ্ছে এ ছবির সঙ্গীতাংশ স্বনামধন্য সুরশিল্পী তিমিরবরণ যে অপূর্ব্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছণা এই ছবিতে সংযোগ করছেন তা অবর্ণনীয়। তার ওপর আবার পঙ্কজ ও পাহাড়ীর গান। পঙ্কজ বাবুর একটী হিন্দি গান শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তা যে কি চমৎকার তা বলা যায় না। তিমিরবাবুর সুর আর তার ওপর পঙ্কজ বাবুর দরদ দিয়ে গাওয়া এ থেকেই সকলেই বুঝতে পারবেন আশা করি। ধন্য! তিমিরবরণ তোমার সাধনা, তোমার পরিশ্রম, সব স্বার্থক হউক এই আমাদের কামনা।

দেশের মাটি

সাইগল এর অসুখের জন্যে এ বই এর সুটিং কয়েক দিন বন্ধ ছিল। সাইগল সম্প্রতি শিলং থেকে ফিরেছেন। আবার যথারীতি সুটিং আরম্ভ হয়েছে। আসছে হপ্তায় আমরা এ ছবির আরও বিশদ বিবরণ জানাব।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

পরিচালক ফণী মজুমদার অমরচাঁদের বাড়ীর আভ্যন্তরিক দৃশ্য শেষ করলেন। এ সেটে অভিনয় করলেন শৈলেন চৌধুরী জগদীশ শেঠি ও শ্রীমতী কানন। এদের প্রাণস্পর্শী অভিনয় পরিচালককে প্রীত ও মুগ্ধ করেছে। 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' বা 'ভুলুয়া'র ও পত্রের পৃষ্ঠার উপরকার রূপটি বাস্তবে কাজের মধ্যে ও নিখুঁতভাবে ধরতে পেরেছেন।

সুন্দর সাজানো সবুজ সেটের মধ্যে সোফায় বসে শ্রীমতী কানন। গভীর রাতের আলো ছায়া বড় আলমারির গায়ে—টেবিলের পাশে দেওয়ালে সরু লতায় জড়িয়ে জড়িয়ে।

—ঘরে একটি মেয়ে—এখনও জেগে। খোলা চোখে জল কখন শুকিয়ে গেছে। নিটোল রাঙা কপোলে একটি মূর্চ্ছিত কুন্তল—আঙুর অলকে সাঝের মলিন মায়া। একটি নিভাজ যৌবনকে জড়িয়ে গোলাপি সাড়ীতে রক্ত-রঙীণ জামাতে সবুজ বেণারসী চাদরে ইথারের কম্পণ। কানন কেঁপে উঠল অর্থাৎ মঞ্জুর ধ্যান ভঙ্গ হোল। ঘড়িতে পিয়ানোর সুর—টুং টাং টুং—রাত তিনটে। অন্তরের বেবাক আর্ত্তনাদ বায়ুর সঙ্গে মিশে গেল। মঞ্জু ডাকলে—ভুলুয়া! ভুলুয়া!—অমরবাবু অমরবাবু—রাই বড়ালের ঘরে তখন পিয়ানোর ওপর থেকে সাতটি পোষা পাখী সস্তরখানি সেতারের ওপর লুটো-পোটি খাচ্ছে।

ক্যামেরার একটি চোখে চোখ মিলিয়ে যিনি এতক্ষণ নিঃশব্দে সেলুলয়েডের ফিতের ওপর চিত্র গ্রহণ করছিলেন—তাঁর ঠোঁটে উঠল চেষ্টারফিল্ড সিগারেট। ফ্লোরের বাহিরে এসে ফণিবাবুর গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, Realy, it is wonderful—you have Conceived……

ওপাশ থেকে একটি মোটা লোক বলছেন: বলেছিনা, ও বাস্তু ছেলে। বড়ুয়া, তুমি দেখে নিও—কান কেটে দেবে।

পরিচালক ফণী নস্যির টিপটা জোর টান দিলেন—আধ ময়লা হলদে গেঞ্জির ওপর ষ্টপ ওয়াচটা রামখোকার গলায় মাদুলির মত দুলতে লাগল এদিক ওদিক।

'স্ট্রীট সিঙ্গার' বা 'ভুলুয়ার' চিত্রনাট্য মুগ্ধ করেছে ষ্টুডিওর সকলকে। ভারতের চলচ্চিত্রে দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এই ছবিতে একদিনের জন্যও কাজ করেছেন। পরিচালক ফণির প্রতি প্রীতির জন্যই পরিচালক প্রমথেশ একদিন সহকারী পরিচালকের কাজ করেছেন। সেদিন অপর শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রীনীতীন বসু দৃশ্য পরিকল্পনায় মুগ্ধ 'ভুলুয়ার' প্রায় হাজার ফিট চিত্র গ্রহণ করলেন।

সুবিখ্যাত মিউজিক ডিরেক্টর রাইচাঁদ বড়াল এই ছবিতে মিউজিক দিচ্ছেন। নাচ গান ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক, এফেক্ট মিউজিক প্রভৃতি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে রাত দশটার আগে মিউজিক ঘরের বাহিরে তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। 'ভুলুয়া'র চিত্রনাট্য তাঁর কাছে ভাল লেগেছে। পরিচালক ফণি তাঁর প্রিয়—অতি প্রিয়।

চোখের বালি

কালী ফিল্মসের নবতম আকর্ষণ হ'চ্ছে রবীন্দ্রনাথের সেই বহু-পঠিত সর্ব্বজন প্রশংসিত অমর সামাজিক চিত্র-কাহিনী "চোখের বালি"। নর-নারীর প্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য্য কী—রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেমের ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর চারটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত কোরে তুলেছেন এই কাহিনীতে। 'বিনোদিনী' সে বাল-বিধবা। সমাজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রেমের অধিকার থেকে সে বঞ্চিতা। কিন্তু নারীর যৌবনে তার সর্ব্বাঙ্গে যে প্রেমের তড়িৎ প্রবাহের স্ফুরণ হয়—সে প্রেম-প্রবাহ থেকে সে অব্যাহতি পেল না। তাই সে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। 'আশা' স্বামীর হৃদয়হীনতার পরিচয় পেল—কিন্তু তবুও সে সাধারণ মেয়ের মত আশায় বুক বেঁধে নিজের কর্ত্তব্যপথ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'ল না। 'বিনোদিনী' ও 'আশা' রবীন্দ্রনাথের দু'টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের প্রেমিকা। 'মহেন্দ্র' সে বিবাহিত অথচ সে মজল একটি বিধবার রূপজালে। মহেন্দ্র যত তাকে ধরতে যায় সে তত মরীচিকার মত সরে যায়—অথচ তবুও সে মানসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে তারই পেছনে চল্‌ল ছুটে। 'বেহারী' লাজুক, স্বল্পভাষী। তার প্রাণের কামনা সে কারও কাছে ব্যক্ত করে নি; অথচ মাঝে মাঝে তার মন যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত, কিসের জন্য।

এই অপূর্ব্ব চারটি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ তার তুলির পরশে যেমন অমরত্ব দান কোরেছেন—ছায়াচিত্রে যা'তে তা' কিছুমাত্র ম্লান না হয়, তার জন্য এই ছবির প্রযোজক মিঃ বি, পি, মেহরা চরিত্র নির্ব্বাচন থেকে আরম্ভ কোরে সব বিষয়েই বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে কাজ কোরছেন। অভিজাত্য-বংশীয়া ও বিদুষী সুপ্রভা মুখার্জ্জি ও ইন্দিরা রায় ও মাজ্জিত রুচিসম্পন্ন ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি ও

• ছবি বিশ্বাস উপরোক্ত চারটি চরিত্রের জন্য নির্ব্বাচনে কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। "চোখের বালি"-র সাফল্য সম্বন্ধে এই সব কারণে বিশেষ আশান্বিত হ'য়েছি।

হাজরা পিক্‌চাস

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানের পৌরাণিক উপাখ্যান "দেবী ফুল্লরা"-র শুটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এল। রাজ-প্রাসাদের সেট্‌টি সম্প্রতি তৈরি হ'চ্ছে। এই অপূর্ব্ব কাহিনীটি সতীত্ব গরিমায় উদ্ভাসিত, সভ্য ও শিক্ষিতের সঙ্গে অসভ্য ও অশিক্ষিতের সংঘর্ষ, রাজার অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রজাপুঞ্জের প্রতিহিংসা-পরায়ণা, ভক্ত ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা ভগবান প্রভৃতি আবেদনপূর্ণ ঘটনাকে আশ্রয় কোরে গ্রথিত হ'য়েছে। কাহিনীর নায়কতায় অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুবালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রাধারাণী, সাবিত্রী, মোহন ঘোষাল, চিত্রা দেবী প্রভৃতি শিল্পিগণের অভিনয় নৈপুণ্যে, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী সুপরিচালনায় ও কালী ফিল্মসের টেক্‌নিশিয়ানদের সহায়তায় 'দেবী ফুল্লরা' বাঙ্গলার নর-নারীদের মনে যে এক অপূর্ব্ব পুলক শিহরণ তুলবে একথা বলাই বাহুল্য।

বেকার নাশন

রাধা ফিল্মসের পরিচালনায়, মতিমহল থিয়েটারের হাসি কান্নায় ভরা কথা চিত্র 'বেকার নাশন কোম্পানী'র চিত্র গ্রহণ কার্য্য সমাপ্তির পথে এসেছে। কর্ম্মকর্তারা আশা করেন ৪ঠা জুন ছবিখানিকে 'উত্তরা'র পর্দায় প্রতিফলিত করতে পারবেন।

গত সপ্তাহে ছবিখানির একটি মনোরম দৃশ্য তোলা হ'য়েছে; এক শিক্ষিত অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় গ্রামের জমিদার বাড়ীর প্রাঙ্গণে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছে—তারই 'গ্রীন রুম দৃশ্য' তোলা হয়েছে গত সপ্তাহে; এইবার মঞ্চের উপর মূল নাটকের অভিনয় দৃশ্য তোলা আরম্ভ হবে। উক্ত মঞ্চাভিনয়ে 'হেলেন'এর ভূমিকায় রবীন এর (ছবির নায়ক) অভিনয় তার রূপসজ্জা গ্রামের লোককে শুধু মুগ্ধই করেনি, বিস্মিতও করে তোলে। রবীন এর প্রশংসায় সারা গ্রাম যখন উল্লাসে মুখরিত—রবীনের পিতা ভয় ক্রোধে অন্ধ হয়ে ছটফট কচ্ছেন। সত্যই তো! কোন্ নীতিবাগিশ পিতা যার পুত্র বারবার তিন বার বিয়ে ফেল্ করে নটী সেজে বেড়াবে তা সহ্য করতে পারে? ফলে রবীনকে যথারীতিঃ 'মা'! যদি কখন মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আস্‌বো—নচেৎ এই শেষ বলে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। কলকা-তার মেসে তখন নাচ-গানের হুল্লোড় বয়ে চলেছে। প্রয়াগ শিল্পী মশাই এই দৃশ্যটিকে যে ভাবে প্রাণময় করে তুলেছেন, তা দর্শক সাধারণ পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবেন আশা করা যায়। ...নায়ক রবীনএর হাস্য করুণ ভূমিকায় শ্রীসুনীল রায় (ঃ), নীতি-বাগিশ পিতার ভূমিকায় বিখ্যাত চরিত্রা-ভিনেতা শ্রীমন্মথ পাল (হাঁদুবাবু) এবং তৎ পত্নীর ভূমিকায় জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী দেববালার অভিনয় কচ্ছেন।

পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটার্স এর 'মুক্তি' এর আগে চিত্রায় ২৮ সপ্তাহ চলে চিত্রায় রেকর্ড স্থাপন করেছিল। পূর্ণ থিয়েটারেও 'মুক্তি' আলিবাবার রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে চলেছে। মুক্তির জনপ্রিয়তা' সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলবার নেই। প্রতিঘরে ঘরে ছেলে বুড়ো সকলের মুখে মুক্তির গান চলেছে। পরি-বেশক প্রাইমা ফিল্মস লিঃএর কোন ছবিই এর আগে এত সাফল্য লাভ করতে পারে নি। এক কথায় এ ছবিকে তাদের 'লক্ষী' বলা যেতে পারে। আমাদের মনে হয় দক্ষিণ কলিকাতার এই জনপ্রিয় চিত্র গৃহে মুক্তির এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য একটী উৎসবের আয়োজন করা উচিত।

নালান্দা ফিল্মস

ম্যাডান ষ্টুডিওতে এদের প্রথম ছবি 'দেশবন্ধু'র কাজ চু' একদিনের মধ্যেই আরম্ভ হ'বে। এ ছবির বাঙলা ও হিন্দি পরিচালনা করবেন নিরঞ্জন পাল ও জয় গোপাল পিলে। এতে অভিনয় করবেন সীতা দেবী, রেখা রায় ও এম্ এন্ রায়। শেষোক্ত দুজনই পাটনা থেকে এসেছেন।

রূপবাণী

উত্তেজনা, রোমাঞ্চ এবং আগ্রহোদ্দীপক কথাচিত্র শুধু একটি অভিনেতার অভিব্যক্তিতে যে কি অভিনব রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহা বোরিস কার্লফ প্রমাণ করিয়াছেন। আপনারা এতদিন এই রূপদক্ষ অস্বাভাবিক চরিত্রাভিনেতাটিকে নানা ভীতিপ্রদ এবং বিভিষীকাময় ভূমিকায় দেখিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু নিউ ইউনি-ভার্স্যালের 'নাইট-কি' চিত্রে কার্লফকে আপনারা একটি নূতন ধরণের ভূমিকায় দেখিয়া অধিক বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইবেন।

—

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ্‌ বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

ইস্কাবনের টেক্কা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি স্মিতচক্ষে অবিনাশের দিকে চেয়ে বল্লুম—"বাহবা—বাহবা! এই যে, শিষ্য আমার deduction আরম্ভ করেছে! বেশ, বেশ! আচ্ছা, তোমার কথাই রইলো—চা-খাওয়া হ'বে না। আমার পেয়ালাটা যেমন আছে অমনি থাক্, বলা যাবে আমি চা খাই না; আর তোমার পেয়ালার চা জানালা দিয়ে বাগানে ঢেলে দাও।"

তাই করা হ'লো। অবিনাশের আনন্দ ধরে না।

একটু পরেই নবাব-বাহাদুর এলেন। বল্লেন—"কই? চা খেলেন না?"

আমি—'Thanks. মাপ করবেন আমি চা খাই না।'

নবাব-বাহাদুর বেয়ারা ডেকে চা'এর ট্রে নিয়ে যেতে বল্লেন।

টেবিল পরিষ্কার হ'লে নবাব-সাহেব বসলেন। বল্লেন—'ডাঃ দাস এখনও আস্‌লেন না কেন ফোনে খবর নিয়েছিলুম। তিনি একটা 'আর্জেন্ট' কলে বাইরে গেছেন, আসতে একটু দেরী হ'বে।'

তারপর নানা রকমের জল্পনা চল্লো। দেখতে দেখতে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। বল্লুম—'কই? ডাক্তার দাসের খবর কি? আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

নবাব-বাহাদুর বল্লেন—'হ্যাঁ—দেখছি। Excuse me please' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

আমি উঠে স্ক্রীন্ সরিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলুম। দেখলুম হলঘর পার হয়ে তিনি সিড়িতে উঠছেন। উঠতে উঠতে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি একবার ফিরে দেখলেন, তারপর ইদারায় একজন বেয়ারাকে ডেকে কি বলে' উপরে উঠে গেলেন। বেয়ারাটা আস্তে আস্তে এসে বৈঠকখানার সামনে একটা টুল নিয়ে বসলো। আমি ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলুম।

অবিনাশ একদৃষ্টে আমার চালচলন লক্ষ্য করছিল। চাপা আওয়াজে বল্লে—'কিহে, ব্যাপার কি?'

গম্ভীরভাবে বল্লুম—'না অবিনাশ, আর চালাকী চলচে না। শোন। আমি ডিস্পেন্সারী থেকে আগেই ডাক্তার দাসের কাছে ফোন করে' জেনেছি, এখানে তাঁর কোন এনগেজমেন্ট নেই। সুতরাং আমি জানি এটা সর্ব্বৈব মিথ্যা, এবং কোন একটা উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে আনা হ'য়েছে। তবে তোমার আমার সঙ্গে আসাটা এদের অপ্রত্যাশিত, কাজেই একটু গোলযোগ পড়েছে। দেখ, শীঘ্রই আমাদের উপরে যাবার নিমন্ত্রন হ'বে। আমি যখন রোগী দেখব, তুমি খুব সাবধানে সকলের উপর লক্ষ্য রাখবে। আর আমি 'অবিনাশ, এদিকে এস তো' বলবামাত্র আলোটা যেমন করে পার নিবিয়ে দেবে। বুঝেছ? আর আ'লো নিবলেই আমার পাশে এসে দাঁড়াবে।'

অবিনাশ—'তবে নাকি তোমার সন্দেহ হয় নি?'

আমি—'একটা জিনিষ শেখ। সন্দেহ হ'লেই যে সন্দেহ প্রকাশ করতে হ'বে তার মানে কি? সেটাকে চেপে রাখতে হ'বে। কারণ, ঘুণাক্ষরে সন্দেহ প্রকাশ পেলেই শত্রু সাবধান হ'য়ে যাবে। চুপ্, কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি! বোধ হয় নবাব-সাহেব আস্‌চেন।'

অবিনাশ—'নবাব-সাহেব?'

আমি—'ধরে নেওয়া গেল আপাততঃ; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বুঝতে পারা যায় উনি কোন্ 'সাহেব'।'

অবিনাশ—'ইস্কাবনের সাহেব।'

আমি—'চুপ্!'

নবাব-সাহেব ঘরে ঢুকলেন। স্ক্রীনটা সরিয়ে, একটু উঁচু করে ধরে তিনি বল্লেন—'আসুন ডাক্তারবাবু। ডাক্তার দাসের আসবার তো কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তিনি এখনও ফেরেন নি। হয়ত বরাবর এইখানেই আসবেন। রাত্রি প্রায় দশটা হোলো। আপনি আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন?'

আমি উঠে পড়ে বল্লুম—'নাঃ, চলুন।' তারপর অবিনাশের দিকে ফিরে বল্লুম—'অবিনাশ, তুমি আমার ব্যাগটা নিয়ে এস।'

নবাব-সাহেব—'ওঁকে আর কষ্ট দেবেন কেন? আপনার ফিরতে আর কতক্ষণ লাগবে? উনি এইখানেই বিশ্রাম করুন একটু; আমার একজন বেয়ারা আপনার ব্যাগ ওপরে পৌঁছে দেবে'খন।'

অবিনাশ উঠে পড়ে বল্লে—'না-না-তাতে কি হ'য়েছে? আমিই নিয়ে যাচ্ছি। আর, এমন কিছু পরিশ্রম করিনি, যে বিশ্রাম করা দরকার হ'বে। বিশেষতঃ রোগীর পরীক্ষা লক্ষ্য করবার জন্যই তো আমি মাসে মাসে ওকে টাকা দিয়ে থাকি।'

বলেই, অবিনাশ ব্যাগ তুলে নিয়ে আমার পিছু নিলে। আমরা উভয়েই নবাব-সাহেবের পিছনে পিছনে উপরে চল্লুম। অবিনাশ extempore (প্রস্তুত না হয়েই) কথা কইতেও শিখছে যে!

উপরে একখানা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবাব-সাহেব বল্লেন—'একটু অপেক্ষা করুন, আমি আস্‌ছি।' এই বলে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। এক মিনিট পরে দরজায় মুখ বাড়িয়ে বল্লেন—'আসুন।'

আমরা ঘরে প্রবেশ করলুম। আস্তে আস্তে বিছানার ধারে গিয়ে এক আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা মূর্ত্তিকে দেখিয়ে নবাব বল্লেন—'ডাক্তারবাবু, এই আপনার পেশেন্ট (Patient)।'

আমি বিছানার কাছে এগিয়ে গেলুম, অবিনাশ দরজার নিকটে রইলো। দেখলুম সে আলোর সুইচের কাছে দাঁড়িয়েছে।

রোগিণীকে লক্ষ্য করে হিন্দীতে বল্লুম—'আপ্‌কো হাত দেখলাইয়ে।'

আস্তে আস্তে একখানি হাত বেরিয়ে এলো—নিটোল, নধর, পরিপুষ্ট হাত, রং দুধে-আলতার মতন। ইলেকট্রিক আলোর চেয়ে তার জৌলুষ বেশী। শুধু মনি বন্ধের নীচে একটী ছোট্ট লাল জড়ুল। ঘড়ীর দিকে চোখ রেখে আঙুল দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলুম।

এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ—ছয়—

হঠাৎ আলো ঝপ্ করে নিবে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক জোড়া সবল হাত আমার দু'টো হাতকে যেন শরীরের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। মুক্তিলাভের জন্য প্রাণপনে ধস্তা-ধ্বস্তি করতে করতে বলে উঠলুম—'অবিনাশ, ছাড়। তখনি আর এক হাত আমার মুখ চেপে ধরলে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে অতি ক্ষিপ্রভাবে কে যেন রুমাল দিয়ে আমার হাত ও মুখ বেঁধে ফেললে। আমি মুক্ত হ'বার জন্যে প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগলুম। একজন আমাকে পা ধরে টেনে মাটিতে ফেলে দিলে। পড়বার সময়ে হাতের বাঁধনটা খুলে যাওয়ায় আমি সুবিধা পেয়ে যে লোকটা আমার পা ধ'রে টান্‌ছিল, তাকে জড়িয়ে ধরে', এক ঝাপটায় মাটিতে ফেলে, বুকের উপর বসে তার গলাটা টিপে ধরলুম। মুখের বাঁধনটা খুলে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলুম—"অবিনাশ!"

কোন সাড়া-শব্দ নেই। আমার হাঁটুর নীচে লোকটা গোঁ-গোঁ করে উঠলো। আবার ডাকলুম—"অবিনাশ!"

কোন উত্তর নেই!

আবার লোকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করলে। এক হাতে তার গলা টিপে ধরে, আর এক হাতে বিছানা হাতড়াতে লাগলুম। তখন আমার একটা সন্দেহ হ'লো। বিছানার উপর নিশ্চয়ই কেউ নেই। আমি একলা একটা লোকের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, ঘরে আর কেউ আছে বলেও তো মনে হ'চ্ছে না—তবে কি—তবে কি—!

ঠিক এই সময়ে আলো আবার জলে উঠলো। আর, একখানা মোটর সশব্দে বাগানের বাইরে চলে গেল।

আরে, এ কি! এ আমি কারে চেপে ধরেছি? এ যে অবিনাশ!"

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে তাকে টেনে তুললুম। সে তখন হাঁফাচ্ছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"আমার পা ধরে ফেলে দিয়েছিলে কেন?"

সেও হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে—"তোমার মুণ্ডু! ডিটেক্টিভগিরি করতে এসেছ! আমাকে তো তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে বলেছিলে? আলো নিভে যাবামাত্র ভাবলুম আমার কাজটা ভগবান করে' দিলেন। ছুটে তোমার কাছে আসবো, এমন সময়ে কার সঙ্গে আমার ধাক্কা লাগলো। তারপর এদিকে ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে তোমার সাহায্য করতে যাবো, এমন সময়ে তুমি বাঘের মত লাফিয়ে উঠে আমাকে ফেলে দিয়ে আমার গলা টিপে ধরলে। তারপর, তুমি ডাক, আর আমি গোঁ গোঁ করি। এইবার আলো জেলে দিয়ে আমাদের বোকা বানিয়ে তারা সরে পড়লো। আর আমাদের এমন শক্তি নেই যে আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাই। ওঃ! কি বিপদেই পড়ে-ছিলুম! ইচ্ছা হ'চ্ছিল এক ঘুষিতে তোমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিই—কিন্তু উপায় নেই। এঃ! বেড়ালের সন্দেশের খিদে পেয়ে গেছে!"

ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, সব তেমি আছে—কেবল লোকগুলো নেই।

অবিনাশ বল্লে—"আচ্ছা, বেটারা যে মাল-পত্র ফেলে পালাল? এই সমস্ত খাট বিছানা, টেবিল চেয়ার, আসবাবপত্র—এসবের দাম তো কম হ'বে না!"

আমি—"হঁ্যা—টাকার মায়া খুব কমই দেখা যাচ্ছে। যাক্, সময় নষ্ট করে' আর কি হবে? এইবার একটু তদন্ত করে দেখা যাক্ কি মেলে।"

অবিনাশ—"মিল্‌বে একটী বেশ মোলায়েম বকুচু।

আমি—"বেশ তো, তাই ভাগাভাগি করে খাওয়া যা'বে এখন। চল নীচে যাই। এ ঘরে কিছুই নেই দেখছি; শুধু কতকগুলো ছবি, একখানা খাট, মেঝেতে একটা কার্পেট, আর—"

অবিনাশ—"আর একটা দেরাজ, দুটো আলমারী, একটা ড্রইংরুম সেট্, একটা বুক-কেশ—তারপর?"

আমি হেসে ফেল্লুম। অবিনাশ বড়ই রেগে গিয়েছে। মার খেয়ে বেমালুম মার হজম করলে অবিনাশ এই প্রথম।

বল্লুম—"তারপর, কিছু না। চল নীচে যাই। কারণ, ওগুলোর মধ্যে যদি ধরা পড়বার মতন কিছু থাক্‌তো, তা' হ'লে এমন অবস্থায় আমাদের এখানে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তারা সরে পড়তো না। আমাদের যাহোক কোনরকম একটা ব্যবস্থা করে যেত।"

অবিনাশ বল্লে—"ব্যবস্থা তো আমাদের খুব ভালই করে গিয়েছিল।" দুজনে নীচে নেমে এলুম।

বৈঠকখানায় ঢুকেই প্রথম চক্ষু পড়লো টেবিলটার দিকে। সেখানে একখানা 'ইস্তাবনের টেক্কা' আর একখানা চিঠি। চিঠিতে লেখা—"নিজের চরকায় তেল দিতে কোন্ মহাপুরুষ প্রথম বলেছিলেন জানি না, তবে ডাক্তারবাবুকে আমরা সেই পরামর্শ দিচ্ছি। এবারে শুধু সাবধান করে দিলুম মাত্র—এর পর এত সহজে না ছাড়তেও পারি। পরিচয় এবার একটু ঘনিষ্ঠ হ'লো না কি? আরও ঘনিষ্ঠ হবার আগে সাবধান হওয়াই সঙ্গত।"

আমি ও অবিনাশ দু'খানা চেয়ারে বসে হাঁফ ছাড়তে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ বল্লে—"কই হে, তদন্ত আরম্ভ করলেনা?"

আমি—"না। কোন লাভ হ'বেনা। এই চিঠিখানা শুধু রেখে দাও।"

অবিনাশ—"তবু একবার দেখ্‌লে হ'ত। তুমি না দেখ, আমিই না হয় একটু দেখি। ঐ একটা রাইডিং হুইপ। কেউ নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়্‌তো। ঐ দেখ একটা বর্ষাতি (Rain-coat) নিশ্চয় কেউ বৃষ্টি হ'লে ওটা গায় দিত। ঐ সোফাটার তলায় একজোড়া ময়লা এল্‌বার্ট শু, নিশ্চয়—"

আমার চক্ষু জুতাজোড়াটার উপর পড়্‌লো। তাইতো—দেখি।

উঠে গিয়ে জুতা জোড়াটা তুলে নিতেই, ঝরঝর্ করে' কতকগুলো কয়লার গুড়ো পড়্‌লো। নিষ্ফল অনুশোচনায় আমার হৃদয়টা ভরে গেল। বলে উঠলুম—

"অবিনাশ—অবিনাশ—চিরজীব বাবুর হত্যাকারী এবার আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পালাল।"

অবিনাশের শ্লেষ বিদ্রূপ করা ঘুরে গেল। প্রায় এক লাফে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি—কি দেখলে?"

আমি—"বলেছিলুম না, যে সাবইন্‌স্পেক্টর-বেশী লোকটা ছাড়া আর একজন সেখানে কোথাও ছিল, আর সেই হত্যাকারী? এই জুতা জোড়াটা ছেলেমানুষের পায়ের মাপের। সে লোকটাও মাথায় ৪॥০ থেকে ৫ফিটের মধ্যে বলেছিলুম! যখন আমরা সেদিন উপরে উঠি, তখন সাব্‌ইন্‌স্পেক্টর-বেশীকে আমরা দেখেছি। আর একজন লোক আগেই নীচে নেমে এসেছিল। আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে, খুব সম্ভব সিঁড়ির নিচে কয়লা থাক্‌বার জায়গায় লুকিয়ে পড়েছিল। তারপর, আমরা উপরে উঠে গেলে, সেও বেশ নিশ্চিন্ত মনে সরে পড়েছিল।"

অবিনাশ—"এখানে কোন ছোট ছেলে—'

আমি—"থাক্‌তে পারে; আর, এ জুতো হয়ত তারি' এই বল্‌তে চাইছ তো? না। তা' যদি হ'ত তো এ জুতো ঝাড়া-মোছা বুরুশকরা ঝক্‌ঝকে হ'য়ে থাক্‌তো। আর এর দিল্ দেখ। অনেকটা ক্ষয়ে গেছে—একপাশে ঝুকে পড়েছে বল্‌লেই হয়। তাতে অনেক পথ হাঁটার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যে বয়সের ছেলের জুতো বলে মনে হয়, সে বয়সের ভদ্রঘরের ছেলে অত হাঁটে না—হাটতে পারে না। যদি বল, ছোকরা চাকরের জুতো, তাও নয়। কারণ, চাকরের জুতো বৈঠকখানায় সোফার নীচে থাকতে পারে না। আমার মতন ভালমানুষের চাকরেরও সে সাহস হবেনা। না, অবিনাশ, আমাদের মুখে চুণকালী দিয়ে হত্যাকারীই সরে' পড়েছে।"

অবিনাশ—"তা হ'লে নবাব-সাহেব—"

আমি—"নবাব-সাহেব নয় নিশ্চয়। নবাব-সাহেব তো প্রায় ছ'ফিট মাথায়। তবে নবাব-সাহেব বোধ হয় এই দলটার মস্তিষ্ক। সাবইন্‌স্পেক্টর-বেশী লোকটাও নিশ্চয়ই এখানে ছিল। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির বাইরে ছিল—কেন, তা বুঝতেই পারছ। আর এই নবাব নরেন ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর কেউ নয়। চিরজীববাবুর পাণ্ডুলিপির বর্ণনাটা একবার মনে মনে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।"

এই সময়ে একটা লোক বৈঠকখানায় ঢুক্‌লো। একগাল হেসে বল্লে—"মশাইরা ভাল আছেন?"

অবিনাশ তেড়ে আক্রমণ করে আর কি! ইঙ্গিতে বারণ করে বল্লুম—"আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন।"

লোকটার মাথায় উস্কোখুস্কো চুলের রাশি, পান খেয়ে খেয়ে দাঁতে ছোপ্ ধরে গেছে—ছুরি দিয়ে একটু চাঁচলে ময়লায় ও পানের রসে বোধ হয় ছটাকখানেক উঠে আসে; গায়ে একটা ময়লা শার্ট—পিতলের বোতাম পরান, পরণে ধবধবে ধোপদস্ত ধুতি, পায়ে একজোড়া অতি জীর্ণ স্যাণ্ডেল। মাথায় সে ৫ফিট আন্দাজ হবে, শ্যামবর্ণ রঙ, দেহের গাঁটগুলো তার জামা ফুঁড়ে বাইরে আস্‌তে চাইছে, চোখদুটো যেন ভাতুখেয়ে ভেঙে পড়ছে।

লোকটি চেয়ারে বসে, আবার একগাল হেসে বল্লে—"বেশ ভাল ছিলেন? কোন অসুবিধা হয় নি? কর্ত্তাবাবাকে দেখতে পাচ্ছি না যে? মা মণি বোধ হয় উপরে আছেন? তা' থাকুন আপনারা। কাল গেলেও চলবে। আর, এখন গ্রীষ্মের ছুটি, আমার ইস্কুল এখন বসবে না। তাড়া নেই

বিশেষ কিছু। থাকুন—একটা রাত্রি বইতো নয়? কাল গেলেই চল্‌বে—কি বলেন?"

আমি—"আজ্ঞে হ্যা; তাইতো ঠিক করেছি। তারপর আপনার খবর?"

লোক—"আমি ডায়মণ্ডহারাবার থেকে কাল ফিরে আস্‌বো ইচ্ছা ছিল। কিন্তু দেরী হ'য়ে গেল। বন্ধুরা ছাড়লেনা, আর তাছাড়া মহিলা ছিলেন তিনজন। তাঁরা আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না।" এই বলে একবার সে চুলটা গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলে।

আবার সে আরম্ভ কল্লে—"যাই হোক্, আমার দোষেই আপনাদের এখানে একদিন বেশী থাক্‌তে হ'ল যখন, তখন আর আজকের ভাড়া বাবদ ১০০৲ টাকা আপনাদের দিতে হ'বে না। চারদিনের দরুণ ৪০০৲ টাকাতেই হ'বে। কি জানেন? —এখন গ্রীষ্মের ছুটী কিনা— বাড়ীটা খালি পড়ে থাকে। সুবিধা পেলে এই রকম বেঞ্চী চেয়ার পাশের একটা ঘরে পুরে রেখে বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দি'। আমার মনিব লম্বোদর সাউ—ঐ যে লম্বোদর শুঁড়ি—সে এসব জান্‌তেও পারে না। হিঃ—হিঃ—হিঃ! বুঝেছেন?"

আমি—"এসব কথা আমাদের বল্‌ছেন কেন?"

লোক—"না; বল্‌বার আর কোন কারণই নেই। শুধু এইটুকু, যে আপনারা যদি আর কখনও, মনে করুন, আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্যে বাড়ী খোজেন, তো এখানে একবার দয়া করে' আগে খোঁজ করবেন; আর, আমার সঙ্গেই কথা কইলে চলবে। লম্বোদরকে বলবার কোন দরকার নেই—এই মাত্র। আর কি কারণ?—আর কিছুই নয়।"

আমি—"আপনার আর কি কি কারবার এখানে চলে? আমাদের সন্দেহ করবেন না। বুঝতে পারছেন তো—মেয়েমানুষ নিয়ে এখানে এসে উঠেছি আমরা। আমরাই আপনার আশ্রিত।"

লোক—"না—না সন্দেহ কি? কেন হ'বে? আমার এখানে আর কিছুই হয় না—প্রেমারা পর্য্যন্ত উঠি, তার উপরে যাই না। তা' একবার কর্ত্তাকে ডাকুন, তাঁর সঙ্গে একবার কথা কয়ে' নি। আঃ! আপনাদের অগ্রিম ৪০০৲ টাকা যে আমার কি উপকারে লেগেছে, তা বলতে পারি না। বিশেষতঃ তিনজন মহিলা ছিলেন আমাদের পার্টীতে। মহিলার খরচা—বুঝতেই পারছেন তো—আমাদের ঝাঝাল জল হ'লেই চলে—তাঁদের চাই শেরী। অবাক্ হচ্ছেন? হ'বার কথাই বটে—কিন্তু হবেন না। —আরে মশাই, আমি কি মাষ্টার? আমি লম্বোদরের আদ্যশ্রাদ্ধের পুরোহিত। আর এটা কি ইস্কুল? ওটা লম্বোদরের আদ্যশ্রাদ্ধের সভামণ্ডপ। হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ! হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—হাঃ—হাঃ হাঃ—হাঃ—আ—আ—আরে ব্বাপরে!"

অবিনাশ চঞ্চল হ'য়ে উঠছে দেখলুম। ব্যাপারটা বোঝা গেল। এটা লম্বোদর শুঁড়ির বাগান বাড়ী। সাজান গোছান সবই তার। এই লোকটীর উপর দেখাশুনার ভার আছে; আর, এখানে লম্বোদরের একটা ইস্কুল আছে—এ সেই ইস্কুলের মাষ্টার। লম্বোদরের অজ্ঞাতসারে এ এখানে সবরকম কারবারই চালায়। আর, লম্বুর এত বিশ্বাস এই লোকটার উপরে, যে তার গলায় এ যখন ছুরি চালায়, তখন সে চুলকে দেওয়ার আরাম পায়, আর বলে "বাহবা, ভাই বাহবা —আর একটু জোরে।" 'ইস্কাবনের টেক্কা' দল ৪ দিনের জন্যে এই বাড়ী ভাড়া নিয়েছিল। অর্থাৎ চিরঞ্জীববাবুর হত্যাটা তারা এইখানে থেকেই সেরেছে।

কাজেই ঐ জুতো জোড়াটা ছাড়া আর কোন সূত্র এখান থেকে আবিষ্কৃত হ'বার আশা নেই দেখে বল্লুম—"আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের আর আর সকলে চলে গেছেন, আমরা দু'জনে শুধু আপনার অনুপস্থিতিতে বাড়ী আগ্‌লে বসে আছি। তা', আপনি যখন এসেছেন, তখন আর আমাদের থাকবার দরকার নেই। আমরা উঠি, আপনি একবার উপরে গিয়ে দেখে আসুন সব ঠিক আছে কি না।"

"যে আজ্ঞে। ও ঠিকই আছে—আপনারা মহাশয় ব্যক্তি—ও ঠিকই আছে নিশ্চয়"—বল্‌তে বল্‌তে লোকটী বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পায়ের শব্দ যখন আর শোনা গেল না, তখন অবিনাশকে বল্লুম—"অবিনাশ, নাও নাও। জুতোটা একটা কিছুতে মুড়ে গুছিয়ে নাও। ও এখনি এসে পড়বে।"

অবিনাশ তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে' জুতা জোড়াটা বেঁধে নিলে। এদিকে লোকটাও এসে উপস্থিত হ'লো। বল্লে—"নাঃ—সব ঠিকই আছে। কেবল ওপরের ঘরটা একটু বেগোছ হ'য়ে গেছে। তা' হোক। আমি সব ঠিক করে' নেব 'খন। আপনারা মহাশয় ব্যক্তি আবার যদি দরকার হয়—"

বাধাদিয়ে আমি বল্লুম—"তা' হ'লে আপনার খোঁজ আগে করবো। আচ্ছা, রাত্রি ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে তা' হ'লে আমরা উঠি। নমস্কার।

একটা মস্তবড় হাই তুলে লোকটী বল্লে—"যে আজ্ঞে! নমস্কার। কিছু ডোনেশন (donation) রেখে গেলে পারতেন। তা' যা'ক—আবার যখন পায়ের ধুলো দেবেন তখন দিলেও চলবে। নমস্কার—নমস্কার।"

রাস্তায় এসে একখানা ট্যাক্সী নিয়ে একেবারে থানায় গেলুম। ইন্‌স্পেক্টর আমার চেনা। তাঁকে ঐ বাড়ীটার উপর একটু নজর রাখতে বলে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনটনাথ

"সরযু"

গত ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার সুবিখ্যাত আনন্দপরিষদের "সরযূ" অভিনয় দেখে এলাম। অভিনেতৃবর্গ সমস্তই নূতন—পুরাতন প্রতিভামণ্ডিত অভিনেতৃবর্গের কাউকেই পাদ-প্রদীপের সামনে দেখা যায় নি।

ভূমিকালিপি দেখে তাই আশঙ্কা হয়েছিল, হয়তো নূতন অভিনেতৃবর্গ আমাদের আশানুরূপ আনন্দ দান কোরতে পারবেন না, কিন্তু পরিষদের প্রতিভাশালী নাট্যাচার্য্য শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের অসাধারণ প্রয়োগ নৈপুণ্যে এই নূতন অভিনেতৃগণই "সরযূ" অভিনয়ে একখানি অতি স্নিগ্ধ, সুন্দর ও মর্মছোঁয়া চিত্র আমাদের চোখের উপর উদ্ঘাটিত করে দিতে পেরেছিলেন। সে রাত্রে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি ক'রে এলাম যে সম্পূর্ণ এক নূতন অভিনেতৃদল নিয়েও নাট্যপরিচালনার বলে দর্শকমণ্ডলীকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ ক'রে রাখাও সম্ভব! এই অভিনয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে, নেপথ্য-সঙ্গীত সংযোজিত করা হয়েছিল। ফলে নায়ক ও নায়িকার প্রীতি, উল্লাস, ব্যথা ও বেদনায় সূক্ষ্ম সুরধারা এক অনুপম রসঘন মূর্ত্তিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল দর্শকদের চোখের উপর।

নেপথ্য সঙ্গীত অনেক অভিনয়েই শোনা গেছে। সচরাচর সে সবক্ষেত্রে নায়ক বা নায়িকার মাত্র করুণ দৃশ্যগুলি একখানা বাঁশী বা বেহালা দিলে আবহাওয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা হয়। মিত্র মহাশয় কিন্তু Full orchestra বাজিয়ে প্রীতি-উল্লাস, ব্যথা-বেদনা, নায়ক ও নায়িকার মনের এই দুই aspect ই রঞ্জিত ক'রে তুলে ধরেছিলেন। আমাদের মনে হয় এই experiment সার্থক হয়েছে।

নাম ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন পরিষদের আধুনিকতম সভ্য শ্রীসুধাংশু কুমার। এঁর অভিনয় হয়েছিল এক কথায় চমৎকার! এঁর সুন্দর সাবলীল গতি, নারীসুলভ ভঙ্গিমা সুমিষ্ট বাচন, সুসংযত অভিব্যঞ্জনা আমাদের বিশেষভাবে আনন্দ দান কোরতে পেরেছে।

বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে আত্মহারা সরযূর "একটা আশীর্ব্বাদও কলে' ন." বলে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুট মর্ম্মভেদী ক্রন্দন।

পঞ্চম দৃশ্যে বিদায়ের প্রাক্কালে, সজল চোখে "ডেকোনা, আমার নাম ধরে ডেকোনা" বলে মিনতি ভিক্ষা এই দু'টি জায়গায় অভিনয় এমন 'নিখুঁত ও প্রাণবন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল যে শ্রীমান সুধাংশু কুমারের অভিনয়কে একেবারে প্রথম শ্রেণীর অভিনয় বলে অভিনন্দিত কোরতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করি না।

চন্দ্রনাথের অংশে অভিনয় কোরেছেন শ্রীইন্দু প্রকাশ ঘোষ।

এঁর অভিনয়ও ভাল হ'য়েছে। কতক-গুলি দৃশ্য বিশেষ মর্ম্মস্পর্শীও হ'য়েছে, যথা; ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য, ২য় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য ও ৩য় অঙ্ক ৪র্থ দৃশ্য। কিন্তু ইন্দুবাবুর অভিনয়ে একটা বড়ো ত্রুটি লক্ষ্য করলাম, তা হচ্ছে—Personality'র অভাব। ফলে স্থানে স্থানে অভিনয়ের ভেতর এসে গেছে affectation. মন্তব্যটুকু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

এতদ্ব্যতীত সুলোচনা, রাখাল ও ব্রজ-কিশোরের অংশে যথাক্রমে সুকুমারবাবু, প্রণববাবু ও চারুবাবুর অভিনয়ও অতিসুন্দর হয়েছে।

কৈলাস, দয়াল, মণিশঙ্কর, হরকালী প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সু অভিনীত হ'য়েছে।

ছোট ছোট চরিত্র গুলিও মন্দ হয়নি।

হরিবালার অংশে শ্রীপ্রমথ নাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় কিন্তু আমাদের একেবারে নিরাশ কোরেছেন। মরমিয়ার গান খানি আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দান কোরেছে।

নাট্যরূপ-চমৎকার। এ জন্য শ্রীতিনকড়ি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

অন্তরালে

(গল্প)

নীতীশ রায়

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। 'রূপসী' থিয়েটারের Matinee showএর আর বড় দেরী নাই। সেখানে 'ফুলশর' না "রামধনু' এমনি কি একটা বই Play হইতেছে। কয়দিন হইতে সহরে লোকের ভীড়ে থিয়েটার ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে; চায়ের দোকানে, খেলার মাঠে, আপিসে, কলেজে সর্ব্বত্রই এই বইখানির নায়িকা সুরূপা অভিনেত্রিটীর লোককে হাসাইবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথাটাই সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

যাহাকে লইয়া সহরে এতখানি কলগুঞ্জন চলিয়াছে, সে তখন বৈকালিক প্রসাধন শেষ করিয়া সুমুখের বড় আয়্নাটায়, আকাশ-খানির প্রতিফলিত ছায়ার দিকে অপলক-চোখে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, সেই জানে। হঠাৎ বাহিরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দে চম্কাইয়া উঠিয়া সংযত হইয়া বসিতেই, হাসিমুখে ঝি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পিওন ছোক্রা চিঠি নিয়ে এল মা, ছোঁড়া বলে, একখানা পাশ দিয়ে দাওনা কালাদিদি। বলুন, খুশীর খবর যদি থাকে চিঠিতে, দিদিমণিকে বলবখন। একগাল হাসিয়া ঝি চলিয়া গেল। থিয়েটারে নামিয়া পর্য্যন্ত আর যে বস্তুরই অভাব থাক্, চিঠির অভাবতো ছিলই না বরং আতিশয্যের দারায় মন অহরহ পালাই পালাই করিতেছিল। কত না মিনতি কত না স্তুতি, কত না গুঞ্জন। কেহ তাহার রূপ দেখিয়া মরিয়াছে, শুধু একটী দিন চোখ ভরিয়া দেখিতে চায়, কেহ বা তাহার যৌবনমত্তা স্বতনুটীকে সাতরঙে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে উৎসুক, কেহবা তাহার অনবদ্যহাসির ভঙ্গীটার জীবন-নির্ঝরিণীর উৎসটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প, আর কেহবা তাহাকেই মানে, তাহার রূপ-যৌবন সম্পন্ন দেহটার জন্য অর্থ, যশ, মর্য্যাদা সবকিছুই জলাঞ্জলি দিতে মনে মনে পণ করিয়াছে। রক্তাধরদুটী হাসিতে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; অন্যমনস্কভাবে খামখানা ছিঁড়িতেই একদা অপরিচিত একখানি হাতের এই কালো অক্ষরগুলা একপাল সাপের মত কিলবিল করিয়া উঠিল। যে পৃথিবীটার সঙ্গে পরিচয় সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, যেখানে ফিরিবার সব পথগুলাকেই দুপায়ে মাড়াইয়া শেষ করিয়া দিয়াছে, সেখান হইতে বিরহ লগ্নে হারাইয়া ফেলা একটী লোক আজ তাহাকেই স্মরণ করিয়াছে। মাত্র একছত্র লেখা, 'তোমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছি, কিন্তু আমাকে আর তুমি খুঁজিয়া পাইবেনা।'

মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন তুব্ড়ির ফুলঝুরি ছুটিয়া গেল; বিস্মৃত বহুদূরগত বহু-দিন-রাত্রির কত না কথা, কত না ইসারা, সমস্ত চেতনা অবচেতনার মধ্যে দাপাদাপি করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, আজিকার এই পথচারিণী অভিনেত্রিটি এক-দিন পুরবাসিনী নারীই ছিল; সে কবে, কোথায়, একথা হয়ত আর কেহই জানিবেনা, কিন্তু সেতো তাহা ভুলিতে পারে না। সে-দিন তাহার অর্থ ছিল না, না ছিল যশ, কিন্তু যাহা ছিল, সে বস্তুকে এ জীবনে আরতো সে খুঁজিয়া পাইবে না, পরবর্ত্তী জীবনেও সে পাইবে এমন তপস্যা তাহার কী বা আছে। ঝর ঝর করিয়া আয়ত চক্ষুদুটী দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, 'ওমা! দিদিমণি কাঁদতে বসেছো, এখুনি যে থিয়েটারের গাড়ী আসবে—' অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি তুলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিতেই, মুখের উপর মেঘ ও রৌদ্র খেলিয়া গেল। ধরা-গলায় বলিল, তাইই বটে! আমার যে ছাই আবার হাসিরই পার্ট' তুলিতরিয়া Powder তুলিয়া মুখে লাগাইয়া দাঁড়াইতেই, দরজায় গাড়ী আসিয়া থামিল। লঘুপদক্ষেপে গাড়ীতে উঠিয়া গুন্ গুন্ সুর করিতে করিতে থিয়েটারে আসিয়া পৌছলি, অপেক্ষমান Managerএর সঙ্গে একটা কথা বলিতে না বলিতে, ঘণ্টা পড়িল।

সাতসহস্র দর্শকের দৃষ্টির সামনে দাঁড়াইয়া সস্মিতমুখে অভিবাদন কুড়াইল। ঘণ্টার পর ঘণ্ট হাসি পরিবেশন করিয়া থিয়েটার শেষ করিয়া যখন পা বাড়াইল, তখন একজন গোলগাল, হাসিমুখ প্রৌঢ়বয়সের ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া Manager সাম্নে দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোকটী বলিলেন, আপনার মত এরকম genuine Play, আমি খুব কমই দেখেছি—এইতো অভিনয়, এ হাসি ধার করা নয়, জোর করা নয়—'

বোধকরিবা তিনি সমালোচক শ্রেণীর একজন হোম্রা-চোম্রাই হইবেন। মাথা হেলাইয়া সহাস্যমুখে জবাব দিল, আমার অভিনয়, যে আপনাকে বিরক্ত করেনি, এতে আমি যথার্থই সুখী—'

কি যে বলেন!

যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। কালই

একটা তুলনামূলক সমালোচনা লিখব—'

—ধন্যবাদ—

Camera হাতে একজন সুসজ্জিত, ফিট্‌-ফাট যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল, আপনাকে বিরক্ত করছি—মাপ করবেন—আমি 'আলো-ছায়া' কাগজের তরফ থেকে ছবি নেবো আপনার, খুব কি অসুবিধে হবে ?

—অসুবিধে ? কিচ্ছু না—

—এক মিনিট কষ্ট দেব—আচ্ছা একটা কথা বলি কিছু মনে করবেন না, Stage-এ প্রথম এসে যেমন দাঁড়িয়েছিলেন—স'নে মুখ খানা এখন একটু ভারী দেখাচ্ছে—

—ও হাস্‌তে হবে !

—exactly······ ··· O. K. হয়ে গেছে—

গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িল, পোষাক বদলাইয়া সাদা আটপৌরে একখানা সাড়ী পরিয়া, আলো নিভাইয়া বারান্দায় একেবারে আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল ; রাত্রি প্রভাতের কূলে দ্রুতগতিতে চলিয়াছে, শরতের নীলাভ আকাশ তারায় তারায় জ্বলিয়া উঠিতেছে, কি জানি কেন অকারণে মন তাহার খারাপ হইয়া গেছে। এত আলো, এত সমারোহ, সহস্র প্রণয়ীর কলগুঞ্জন, সহস্র দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি, সহস্র নটনটীর শ্রদ্ধা কিছুই আজ তাহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিতেছে না ; বহুদিন আগেকার যেন একটা পুরাণ ব্যথা আবার জাগিয়া উঠিয়া দীর্ঘশ্বাসে বুকখানাকে ভাসিয়া দিতেছে। চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে, এমন সময় লঘুপদক্ষেপে কখন যে Manager তাপস সেন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে কিছুই সে জানিতে পারে নাই। "একি ! তুমি···তুমি কাঁদছ ?" চম্‌কাইয়া উঠিয়া চোখের জল না মুছিয়াই সে বলিল, 'আমাদের কি নিজেদের হাসিকান্না কিছুই নেই ?" থিয়েটারের জগতে একমাত্র এই তরুণ ম্যানেজারটীকে সত্যসত্যই সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কি জানি কেন এই লোকটীর স্বপ্নাতুর চোখদুটীর দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত, থিয়েটার তাহাকে মানায় না ; তাহার উচিত ছিল কবিতা লেখা, না হয়তো লোকে যাকে বলে মহত্তর প্রতিষ্ঠান, সেবাশ্রম, শিশুসদন এমন একটা কিছু করা। কোটী কোটী স্তাবকের ভীড়ে এই একটী মাত্র লোকের মুখ হইতে কখনও একটা কামনার গুঞ্জন কেহ শোনে নাই। তাপস ব্যথিত চোখদুটী তুলিয়া কহিল, হাসি কান্নার হিসাবের খাতা সবারই আছে জানি, তবু তুমিও কাঁদতে পার, তোমারও কাঁদ্‌বার প্রয়োজন হয়, এমনটা আমি ভাবিনি।" মেয়েটী তাপসের একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, তাপসবাবু আমাদের জীবনের সবগুলো দিনরাত্রি নিজেকে ব্যঙ্গ করেই কাট্‌ছে, যখন চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, তখনই হচ্ছে হাসতে, আবার যখন মন অকারণ খুশীতে রাঙা বেলুনের মত উঠ্‌ছে ফুলে, তখনই ফেল্‌তে হচ্ছে চোখের জল—কী বরাত !

—তাহাই বটে।

স্তব্ধ দুটী নরনারী নক্ষত্রগুঞ্জিত আকাশের নীচে মূক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল আর দুজনকারই মনে হইতে লাগিল, যে জীবনের যাত্রাপথে নিজেকে ভুলাইবার জন্য, পৃথিবীর সকলের ভাল লাগাইবার জন্য কত না খেলা, কত না ছল, কত না হাসি, আর কত না চোখের জলের ঢালাফেলার প্রয়োজন হয় জগতের সবাই যেন মুখোস পরিয়া চলিয়াছে······ প্রত্যেকেরই প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দের মধ্যে বেদনা বাসা বাঁধিয়া আছে। এমনই নিস্তব্ধনিশীথে তারাভরা আকাশের তলায় আত্মার একেবারে সাম্‌না সামনি দাঁড়াইলেই সকল আবরণ, সকল ছদ্মবেশ খুলিয়া পড়িয়া যায়, আর যাযাবর মন আর্ত্তনাদ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলে·········

শরৎচন্দ্র

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

এই আমার প্রথম সঙ্গীত শেখা জীবনে। রাজুমামা যখন যোগ করিতে আরম্ভ করেন তখন বাটীস্থ সকলের নিকটে "পাগল' বলিয়া না ডাকে কিন্তু তা'ও অব্যাহতি পান নাই—ভগবানে বিশ্বাস ছিল ডাক্তারীতে বিশ্বাস ছিল না—অদ্ভুত খাপছাড়া মানুষ।

আমার মেজ মাতুল শরৎ চন্দ্রের "মেজদা" ৺নগেন্দ্র নাথ মজুমদার এণ্টান্সে ২০৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া—F A পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় স্থান অধিকার করিয়া কেদার দাস মহাশয়ের সহিত এম্-বি পাশ করেন। শুডিভ্ মেডেলিষ্ট ছিলেন ডাঃ নীল রতন সরকার, ৺সুরেশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিখ্যাত ডাক্তার তাঁহাকে Genius বলিয়া মনে করিতেন, তিনি সুন্দর ধ্রুপদ গাহিতেন। তিনি যে স্থানে বেশী প্র্যাক্‌টীশ হইত সেই স্থান হইতেই পালাইতেন। শেষকালে ভবানীপুরে ডাক্তারী করেন বেশী ডাক্ হয় বলিয়া ৩২, ৬৪৲ টাকা Fees করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকে নির্য্যাতিত হইলেও আমার মাতৃদেবী ও আমার ৺ পিতৃদেব রাজু-মামাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। রাজুমামার ন্যায় অতো মধুর বাংলা গান আমি তো শুনি নাই, আমার বড় মাতুল ৺সঙ্গীতাচার্য্য রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, আমার মণি মামা যিনি একজন অতি উচ্চাঙ্গের বেহালা-বাদক ও Painter ও সুকণ্ঠ এবং আমার কৃষ্ণ মামা তিনিও এক জন অতি সুগায়ক সকলেই বলিয়াছেন যে, রাজুমামার ন্যায় অতো মধুর কণ্ঠ বড়ই কম শোনা যায়—। এই বাটীতেই আদমপুর ক্লাবের বৈঠক বসিত, এই ক্লাবের অভিনয়ে Heroর পাঠ গ্রহণ করিতেন আমার সেজ মাতুল। শরৎচন্দ্র, রাজুমামা ও সুকুমার বাবু মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করিতেন—। পৌরাণিক নাটকে যুগল মিলনের সময় শরৎচন্দ্র ও রাজু মামা আমাকে অনেক ভুলাইয়া নাকে ন'লক্ পরাইয়া রাধা সাজাইয়া দোল্‌নায় তুলিয়া দিতেন। শরৎচন্দ্রও রাজুমামার গানের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "কী-গান—পাগলিনীর গান" "আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা," তোমার মামা যা গেয়েছিল মনে বৈরাগ্য এনে দেয়—তার নিজেরও বৈরাগ্য এসেছিল এই গান গাওয়ার পর থেকে—মানুষ ছিল না যেমন—দেবতা—দেবতা" .. .. !

রাজুমামা যে সময়ে যোগ করিতে ছিলেন—সে সময়ে অনেক অদ্ভুত ইচ্ছা তাঁহার প্রকাশ পাইত। এই ইচ্ছা প্রকাশের নিমিত্ত বড়ই নির্য্যাতিত হইতেন। রাজুমামা এই অবস্থাতে আমাকে কাধে করিয়া (দৈহিক শক্তি তাঁর অদ্ভুত ছিল) সমগ্র সহর বেড়াইতেন, ও জিলিপী খাইতে দিতেন। যদিও আমার তখন কাঁধে চড়িবার বয়স অতিক্রম করিয়াছে লজ্জাও করিত, কি করিব কাঁধে চড়িতাম—ও গরম পশ্চিমে টাটকা জিলিপীর লোভও কম ছিলনা ও সে যে কী লোভ, তাহা যাঁহারা পশ্চিমের জিলিপী না খাইয়াছেন অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। আমি ব্যতীত সে তাঁহার ভ্রাতাদের পুত্র কন্যা ছিল না তাহা নহে। তবে কেহই এক "পাগলের" হাতে ৩, ৪ ঘণ্টা পুত্র কন্যা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজুমামার সহিত সেই সময়ে এক যুবককে প্রায়ই দেখিতাম রাস্তায়। তিনি আমাদের বিশ্ব বরণ্য শরৎচন্দ্র।

শ্রীকান্তের "অশ্বথ" গাছ আমাদের ভাগলপুরস্থ বাটীর পশ্চাতে গঙ্গার উপরে। এই গাছের তলা, ভীষণ পাড়, ও জটার ন্যায় গাছের শিকড় গঙ্গার মধ্যে নাবিয়া গিয়াছে এই সব দৃশ্য আমার নিকটে বিশেষ প্রিয় ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি ছেলেবেলায় অসম্ভব দুষ্ট ছিলাম, গঙ্গার ধারে কাঁকড়ার গর্ত্ত সাপের গর্ত্ত এ সবের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমার রাজুমামা সেই কারণেই বোধহয় আমায় এতো ভাল বাসতেন।

এই অশ্বথ গাছের দুটো মোটা ডালের উপরে রাজুমামার এক কাঠের ঘর ছিল একটা ছোট পাল্কীর ন্যায়-ঘরের মেজে ছিল ঠিক পাল্কীর মতন খুব মোটা বেত দিয়ে বোনা ও কিঞ্চিৎ নীচে দুটো গাছের ডালের ব্যবধানের মধ্যে মোটা কাঠ ছিল। ঘরটা ঠিক গঙ্গার উপরে ডাল বাহিয়া যাইতে হইত। গঙ্গার গর্ভে বলিলেই হয় ঐ ঘর।

এই ঘরেতে কখন রাজুমামা কখনও শরৎচন্দ্র আমাকে অতি সতর্কতার সহিত এক প্রকার কোলে করিয়াই লইয়া যাইতেন। এখানে রাজুমামা ও শরৎচন্দ্রের দুই ভক্ত শিষ্যকেও দেখা যাইত—আমার আর দুই মামা মণীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার। আমি শরৎচন্দ্র ও রাজুমামার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরমায়েস খাটিতাম। যথা শরৎচন্দ্র ও রাজু মামার নিমিত্ত চা, কখনও বা লুচী, বেগুন ভাজা, কখনও বা জিলিপী সব মাতৃ-দেবীর নিকট হইতে লইয়া যাইতাম। ঘরের

মধ্যে ছিল বাঁশী, Clareonet ছোট হারমনিয়াম, কিছু বই ও বন্দুক ও নীচে সদা সর্ব্বদা একটা ডিঙী বা ছোট নৌকা বাধা থাকিত। যতদূর মনে আছে আমি এই ঘরে শরৎচন্দ্রকে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে দেখিয়াছি। বোধহয় এই স্থানেই শরৎচন্দ্রের সহিত রাজুমামার মাছ চুরীর জল্পনা কল্পনা চলিত। কখন কখন শরৎচন্দ্র একাকী ডিঙী লইয়া বাহির হইতেন নদীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে।

সে দিন রাজুমামা নিজের বাড়ীতেই "পাগল" বলিয়া বিশেষ নির্য্যাতিত হইয়া গীতার কথা বলিতে বলিতে গৃহ পরিত্যাগ করেন ও ভূট্টার ক্ষেত্রের দিকে পলায়ন করেন তখন আমি ব্যাকুল হইয়া সজল নেত্রে এই শরৎচন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরি—তখন তো আমার আর কেহ সহায় ছিলনা সকলের কাছেই সে রাজুমামা পাগল—। শরৎচন্দ্র আমায় আশ্বাস দিয়া রাজুমামার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন। আমিও ছুটিলাম, ছেলেমানুষ ভূট্টার ক্ষেতে গোঁজ ফুটিয়া পড়িয়া গেলাম—আমার আর এক মাতুল সজোড়ে চপেটাঘাত করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন—মা দোতালার বারান্দায় দাড়াইয়া কাঁদিতেছেন আমাকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন আরও একবার কেবল বলিলেন "ন্যাড়া" গিয়েছে হয় তো ফিরিয়ে আনতে পারবে"— "ন্যাড়া" আর কেহই নহেন—শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র যে রাজুমামাকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই এর জন্য তাঁহার দুঃখ যে কী গভীর ছিল তাহা তিনি বহুদিন পরে ভাগলপুরে এক দিন গঙ্গার ধারে আমায় বলিয়াছিলেন। তাঁহার সেই করুণ ম্লান মুখ সান্ধ্য আকাশে আজও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

রাজুমামা হয় তো জীবনে ফিরিবেন না আর কখনও। হয় তো হিমালয়ে বা অন্য কোথাও আজ সাধনায় ব্যাপৃত আছেন বা পরলোকে গিয়াছেন।

যদি কোন দিন "শ্রীকান্ত" পাঠ করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়া থাকে তাঁহার প্রিয় দরদী বাল্যবন্ধুর অমর লেখনীকে তিনি নিশ্চই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র ও ৺দ্বিজেন্দ্রলাল

তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত ও ইস্কুল ও কলেজে পাঠের সময় শরৎচন্দ্রকে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ নাই। কলেজে পাঠের সময় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বাটীতে ৺প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্যের (সুবিখ্যাত অভিনেতা, বিখ্যাত নাটক ক্লিয়োপাট্রার নাট্যকার) নিকটে শরৎ চন্দ্রের কথা শুনি। তিনি বলেন যে শরৎচন্দ্র আমাকে খুব চেনেন। শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত মূলতঃ দায়ী শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও ৺প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্য। ভারতবর্ষের শরৎ-অনুরাগী সম্পাদক ও শ্রদ্ধেয় হরিদাস ও সুধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের বাটীতে শরৎচন্দ্রের কথা শুনি। দ্বিজেন্দ্রলাল বড় দরদী রসিক ছিলেন—তিনি "রামের সুমতি" পাঠ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। আমাকে বলিয়াছিলেন "এতো দিন পরে দেখছি এক সত্যিকারের Genius এসেছে—বেঁচে থাকলে সাহিত্যে হুলস্থুল বাধাবে" "হুলস্থুল" সে বাধাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। খুল্লতাত মহাশয়ের কথা শুনিয়া মাতৃদেবী ব'লেন—"ও আমাদের ভাগলপুরের ন্যাড়া—রাজুর বিশেষ বন্ধু" তখন সব মনে পড়িল।

প্রায় একুশ কি বাইশ বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদে শরৎ সম্বর্দ্ধনা—।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের পর ১৯১৩ সালে দ্বিজেন্দ্র লালের মৃত্যু হয়। আমরা তখন ভাগলপুরে ফিরিয়া গিয়াছি। পিতৃদেবের কলিকাতা হাইকোর্টে পসার হইলেও শরীর এমন ভাঙ্গিয়া যায় যে তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ভাগলপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। সেই সময়ের কিছু পরে আমি বি, এ, পাশ করিয়া ইস্কুলে শিক্ষকতা করি ও এম-এ পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হই। পরে কর্পোরেশনে আসি। শরৎচন্দ্রের নিজের মাতুল পরিবারের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল না—তবে "দূর" সম্পর্কীয় মাতামহ ও মাতুল সম্প্রদায়ের সহিত ৺অঘোর নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্রগণ ৺মনীন্দ্র নাথ, সুরেন্দ্র নাথ, ৺গিরীন্দ্র নাথ ও শরৎচন্দ্রের আর এক মাতুল সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত আমার পিতৃদেবের ও আমার মাতুলদের ও আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। পিতৃদেবের সহিত গাঙ্গুলী পরিবারের সাহিত্যিক যোগ ছিল। তাঁহারা পিতৃদেবকেই অবলম্বন করিয়া ১৩১১ সালে ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে এই ভাগলপুর সাহিত্য পরিষদের যুগ্মসহঃ সম্পাদক ছিলাম আমি ও শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ—(এখন রায় সাহেব চণ্ডীচরণ ঘোষ-এম-এস-সি-বি-এল-উকীল) সুরেন্দ্র বাবু ছিলেন সম্পাদক ও পিতৃদেব...৺দ্বারেন্দ্র লাল রায় ছিলেন সভাপতি।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনিলাম যে শরৎচন্দ্র আসিতেছেন বহুদিন পরে। আমাদের কী আনন্দ। শরৎচন্দ্র আসিলেন। শরৎচন্দ্রকে ছায়ার স্থায় অনুসরণ করিলাম—তাঁহার সহিত গল্প, নৌকায় বেড়ান, গঙ্গার ওপারে বালুর তটে নগ্নপদে শরৎচন্দ্র ও আমরা অনেক বেড়াইলাম—পাখী শীকার সবই হইল। আমাদের ইচ্ছা শরৎচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা দি। পিতৃদেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন "নিশ্চয়ই—শরৎকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া উচিত—আমিই তোমাকে ব'লবো ভাব্‌ছিলাম।" সুরেন্দ্রবাবুর নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন "সম্বর্দ্ধনা দেওয়া তো উচিতই তবে আমি শরতের মামা আমার Position বড় delicate আমি তো এক্ষেত্রে কিছু করিতে পারি না। তুমি ও চণ্ডী যাহা হয় ক'রো"। উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ঐ কথাই বলিলেন। সন্ধ্যার সময় ক্লাবে জল্পনা কল্পনা করিতেছি। ক্লাবের অনেকেই কিছু interest লইতেছেন না আর জন কয়েক পরিষদের সভ্য (পদস্থ ব্যক্তি) বিরোধিতা আরম্ভ করিলেন। সে প্রায় একুশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বের কথা তখন শরৎচন্দ্রকে অনেকে সুচক্ষে দেখিতেন না। জন কয়েক সভ্য বলিলেন শরৎচন্দ্র মূল পরিষদের সভ্য নহেন শাখা পরিষদ সভায় এ বিষয় বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া সম্ভব নহে, আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সম্বর্দ্ধনা দিবই—রাত্রে গিয়া পিতৃদেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন Notice issue করে দাও—when I am the President my order is final—"

Notice issue করিয়া দিলাম কিন্তু প্রবন্ধ কে পাঠ করিবে—আমি অবশ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারিতাম কিন্তু আমি গান করিব আবৃত্তি করিব আবার প্রবন্ধ পাঠ করিব ইহা অশোভন হয়। প্রবন্ধ কেহই লিখিতে অগ্রসর হয় না। এসব সঙ্কটে সুরেন্দ্রবাবু অনেকবার আমাদের রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু এবারে তাঁহার "delicate position" মহা বিপদ, এক দিনের মধ্যে কেহই প্রবন্ধ লিখতে চাহেন না—পিতৃদেব বলিলেন "বক্তৃতা করিব"—আমি বলিলাম "তবে কে প্রবন্ধ লিখিবে?" তখন প্রায় রাত্রি দশটা পিতৃদেব বলিলেন "যা সুরেনকে ব'ল—সে লিখতে পারবে।" রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় উপস্থিত হইলাম বড় মাতুল ৺রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সঙ্গীতাচার্য্যের নিকটে তাঁহাকে গানের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম এই শরৎ সম্বর্দ্ধনাতে। তিনি বলিলেন "আচ্ছা লিখবো এই বসলাম লিখতে—শরতের ওপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে অতো বড়ো genius"। তার পর দিন সকালে

দেখি প্রবন্ধটী হাতে করিয়া পিতৃদেবের নিকটে মাতুল আসিয়াছেন ও প্রবন্ধ মাতুল পাঠ করিতেছেন। আমি তখন মার কাছে ও স্ত্রীর নিকটে একশো পেয়ালা চাতে কত চিনি লাগিবে তাহাই ঠিক করিতেছিলাম। মার কী উৎসাহ শরৎ-চন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। পিতৃদেবের মেঘ মন্দ্রে ডাক আসিল "মেঘেন" ছুটীলাম নীচে পিতৃদেবের ঘরে। বড় মাতুল বলিলেন "দেখো মেঘেন, আমি তো এ পড়তে পারবো না, এর পরেই গান ক'রতে হ'বে—তুমিই প'ড়ো—"। আমি বলিলাম "হ্যা সে আর কি শক্ত কাজ"—পিতৃদেব হাসিয়া বলিলেন "প্রেমসুন্দরকে ব'লো না প'ড়তে।" তখনই ছুটীলাম মাষ্টার মশায় ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু এম-এ-ডি-লিট্ পি-এইচ-ডিএর কাছে কলেজের সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন ও দর্শনের বিশেষ নামজাদা অধ্যাপক। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের সহিত রাস্তায় দেখা তিনি বলিলেন "এ সম্বর্দ্ধনা দেওয়া কেন মেঘেন—কি দরকার?—এটা বন্ধ ক'রলে ভাল হোত"। আমি অনেক তর্ক বিতর্ক করিলাম শরৎচন্দ্র শেষে হতাশ হইয়া বলিলেন "নেহাৎই কথা শুনবে না যাও—ভালোবাসো।" সাহিত্য পরিষদে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতও যখন তাহা হয়তো শরৎচন্দ্র জানিতেন সম্বর্দ্ধনা বেশ হইল। প্রথমে আমি গাহিলাম দ্বিজেন্দ্রলালের গীত "জননী বঙ্গ ভাষা।" তৎপরে পিতৃদেব পরিষদের সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন ও সুন্দর বক্তৃতা দেন। তাহার পর প্রেমসুন্দরবাবু রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ "শরৎ প্রতিভা" পাঠ করেন তাহার পর আমি এক আবৃত্তি করিলাম। শরৎচন্দ্র পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইলেন। তৎপরে শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র বসু এম-এ-বি-এল সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত শ্রীঅনাথনাথ বসুর পিতৃদেব ও তেজ নারায়ণ জুবিলী কলেজে পঠদ্দশায় শরৎচন্দ্রের অধ্যাপক, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শরৎচন্দ্র বক্তৃতায় বলেন যে ভাগল-পুরে তাঁহার বিদ্যারম্ভ। পাঠও শেষ হইয়াছে এই স্থানেই। তিনি আজ বিশেষ আনন্দিত যে তাঁহার অধ্যাপক শিক্ষক সব গুরু স্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে এই সম্মান দিলেন। এই সভাতে যিনি আজ তাঁহার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তিনি শুধু সঙ্গীতাচার্য্য বা সদস্য হাকিম নহেন তিনি বাংলার কথা সাহিত্যে হাস্য রসের গল্পের রাজা তাঁহাকে আজ বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। শরৎচন্দ্র নিজের গলার পুষ্পমাল্য সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া প্রণাম করিলেন। শেষে শরৎচন্দ্র বলিলেন সাহিত্য সেবার জন্য আমি ভাগলপুরের কাছে বিশেষ ঋণী। সভায় বেশ জন সমাগম হয় পরিষদের "সদস্য" ব্যক্তি যাঁহারা পরিষদের সভাদিগের মধ্যে বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে আসিয়া সভায় যোগদান করেন। তৎপরে মাতুলের গীত আরম্ভ তখন সভা মজলিসে পরিণত হয়।

(ক্রমশঃ)

মায়া ও মোহ

শ্রীহিল্লোল কুমার বিশী

'পনের বছর বয়স তাহার—
বস্তী পাড়ের মেয়ে—
বড়ো বড়ো কোঁকড়া চুলে
মুখটী আছে ছেয়ে।
উদাসী তার মুখের পরে
করুণাতার হাসি—
রোজ সকালে ভিক্ষা তরে
দ্বারে দাঁড়ায় আসি'।
বাৎসল্য কোন স্নেহ জাগে
চেয়ে তাহার পানে—
কোন সে মায়ায় হৃদয় আমার
সিক্ত ক'রে আনে!
(তার) ঘন কালো আঁখির তলে—
জাগে গহীন ব্যথা—
কোকড়া কালো কেশের মাঝে—
ঢেউয়ের উচ্ছলতা!
তার—ছেঁড়খেলা ওই শাড়ীর তলে
শুভ্র তনুলতা—
সবুজ রংয়ের চুমনেতে—
জানায় ব্যাকুলতা!
তার—লীলায়িত ভঙ্গি খানি—
চরণের তলে—
মোহ আনে প্রাণে মোর—
কোন্ সে ইন্দ্র জালে।
স্বপন ভরা কিশোর বয়স—
একটু খানি মেয়ে—
তবুও কতো বলতে যে চাই—
ওর পানেতেই চেয়ে!
ভিক্ষা তরে ঘরের দ্বারে
যখন আসে মোর—
গভীর ব্যথায় চোখ ছাপিয়ে—
ঝরতে থাকে লোর!

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

গত ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার সময় নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রথম দিবসের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে প্রতিযোগিগণের demonstration হইয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত গিরিন চক্রবর্ত্তী দুইখানি গ্রাম্য-সঙ্গীত গান করেন। গিরিনবাবুর মতে তাঁহার প্রথম গানখানি ছিল ভাটিয়ালী জাতীয় এবং দ্বিতীয়টী ঝুমুর-জাতীয়। গ্রাম্য-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "শ্রী" রাগের দুইখানি ধ্রুপদ গাহিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত যিনি মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন, তিনি যদি মৃদঙ্গের সুরের দিকে একটু অবহিত হইতেন তাহা হইলে গানগুলি আরও উপভোগ্য হইত। যোগেনবাবুর গানের পর নাচের আসর বসিল। কুমারী হেনা বর্ম্মণ ও প্রতিভা মোদক যথাক্রমে তাঁহাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করিলেন। আমরা গত বৎসর হইতে লক্ষ্য করিতেছি যে যোগেনবাবুর ধ্রুপদ-গানের অব্যবহিত পরেই নাচের আসরের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এ বছরের ছাপা Programmeএ তো যোগেনবাবুর নাম নাচের কিছু পরে ছিল; কিন্তু Director মহাশয় নাচের ঠিক আগেই তাহার গানের ব্যবস্থা করিলেন কেন? আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে যোগেনবাবু ঐ সময়ে গাহিতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন—কিন্তু তথাপি Director মহাশয় গায়কের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং programmeর ক্রম নষ্ট করিয়াও তাঁহাকে এক প্রকার জোর করিয়াই গাওয়াইলেন—ইহা কি রায় বাহাদুর মহাশয়ের স্ব-ইচ্ছা-প্রসূত অথবা ইহার মধ্যে অন্য কোনও গূঢ় রহস্য নিহিত আছে? নাচের পর আবার ধ্রুপদের আয়োজন হইল। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "শ্রী" ও ধানেশ্রী "পুরিয়া" রাগের দুইখানি ধ্রুপদগান করিলেন। ধ্রুপদের প্রকৃতি ও রীতি সম্বন্ধে এখনও যাঁহার কোনও ধারণা হয় নাই, তাঁহার জন্য সঙ্গীতের demonstrationএ গানের ব্যবস্থা করিয়া অনর্থক শ্রোতৃবর্গকে উদ্বেলিত করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ত আমরা দেখি না। কর্ত্তৃপক্ষগণ কিরূপ সুপারিশের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া এজাতীয় গায়কদিগকে programmeএ স্থান দেন তাহা তাঁহারাই ভাল বোঝেন।

বিগত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে বারাণসীর বিখ্যাত ধ্রুপদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ধ্রুপদের পর প্রতিযোগিগণের অন্যতম শ্রীমান্ মানবেন্দ্র মুখার্জ্জী কীর্ত্তন গান করেন। কীর্ত্তনের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধ্রুপদের demonstration আরম্ভ করেন। তিনি গৌড়মল্লার ও পুলিন্দিকা রাগের দুখানি ধ্রুপদ গান করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্রী কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জ্জী "আড়ানা" রাগের একখানি খেয়াল গান করেন। কুমারীর গান আমাদের মন্দ লাগে নাই তবে ইঁহার তানকর্ত্তবের রীতি ঠুংরীর ছায়াসম্পাতে খেয়ালের আভিজাত্যকে বিশেষ ভাবেই ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। কুমারী এখনও শিক্ষার্থিনী; আমরা সেজন্য গানের বাণীর স্পষ্টতা ও শুদ্ধির দিকে তাঁহাকে মনোযোগী হইতে বলি। কুমারীর খেয়াল গানের পর বাংলার প্রখ্যাত ধ্রুপদাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গান আরম্ভ হইল। গোপালবাবু প্রথমে চৌতালে একখানি ছায়ানট রাগের ধ্রুপদ গাহিয়া পরে ঝাঁপতালে আর একখানি ধ্রুপদ আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি সবেমাত্র দ্বিতীয় গানটী আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময়ে আমরা লক্ষ্য করিলাম যে যিনি black-boardএ programme লিখিতে-ছিলেন, তিনি নিজের আসন হইতে উঠিয়া গিয়া গোপালবাবুকে একখানি জয়জয়ন্তী গাহিতে অনুরোধ করেন। আরব্ধ গানটী শেষ করিয়া পরে অন্য গান গাহিবেন গোপালবাবু উত্তরস্বরূপে এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পুনরায় তাঁহার আরব্ধ গানটী গাহিতে সুরু করিয়াছিলেন এমন সময় সম্মেলনের সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর স্বয়ং মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া গোপালবাবুকে জয়জয়ন্তী গাহিতে অনুরোধ করেন। তখন গোপালবাবু বলেন—"মহারাজের নিকট আমারও তো একটা অনুরোধ থাক্‌তে পারে যে তিনি কিছুক্ষণ বসে আমার গান শুন্‌বেন।" তাহাতে মহারাজ বলেন—"তাত বটেই; কিন্তু এদের Programme-এ সময় সব বাঁধা আছে; বেশী সময় ত' আর পাওয়া যাবেনা।" তখন গোপালবাবু উত্তর করেন—"তা যদি বলেন, তা' হলে আমি এখানেই গান বন্ধ করে দিচ্ছি; আমি সময়ের চাকর নই।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে মহারাজ সময়ের ব্যবস্থা করিতে না পারায় গোপালবাবু গান বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়েন এবং অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণের তরফ হইতেও তখন তাঁহাকে পুনরায় গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করা হয় নাই।

সম্মেলন-সভাপতির সাময়িক অনবধানতায় ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণের ঔদাসীন্যের ফলে এই যে নিতান্ত অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল তাহাতে যে কেবল সাধারণ শ্রোতৃবর্গ ও স্থানীয় সুরশিল্পিগণ ব্যথিত হইয়াছেন তাহা নহে; প্রদেশান্তর হইতে অভ্যাগত যে সকল বিশিষ্ট গুণিজন সে সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাও প্রত্যেকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আমরা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজীকে বলিতে শুনিয়াছি "প্রবীণ ধ্রুপদাচার্য্যের প্রতি এজাতীয় অসম্মান প্রদর্শন সঙ্গীত-সম্মেলনের পক্ষে অতি লজ্জাজনক ব্যাপার। কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত উচিত যে, তাঁহারা যেন আর একদিনের অনুষ্ঠানে গোপালবাবুর গানের ব্যবস্থা করিয়া শ্রদ্ধেয় আচার্য্যের ও নিজেদের সম্মান রক্ষা করেন।" কর্ত্তৃপক্ষগণ অবশ্য ইচ্ছা করিলে এরূপ ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহারা তাহা করা সমীচীন বোধ না করায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বোধের প্রতি শ্রোতৃবর্গের সন্দিহান হওয়া অসঙ্গত নহে। বাংলায় সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে প্রকৃত গুণীর সংখ্যা বর্ত্তমানে অল্প হইয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু ধ্রুপদ-সঙ্গীতে এখনও অনেক বিশিষ্ট সুরশিল্পী বর্ত্তমান রহিয়াছেন; আর এই সকল ধ্রুপদীগণের মধ্যে গোপালবাবুর স্থান যে সর্ব্বোচ্চে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তাঁহার ন্যায় সঙ্গীত-সেবীর অমর্য্যাদায় যে বাংলার সঙ্গীত-সমাজের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের ত্রুটী স্বীকার করা একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয় ছিল। সঙ্গীত-সম্মেলনে সঙ্গীতজ্ঞগণের যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা হওয়াই স্বাভাবিক—বর্ত্তমানে সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেরূপ কোন ব্যবস্থা ত করেনই না; উপরন্তু তাঁহারা অনেক সময়ে স্বল্পসময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বিশিষ্ট স্থানীয় শিল্পিগণেরও গাহিবার স্বাধীনতটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিতে প্রয়াসী হন। অখ্যাতনামা ও সম্মেলনে demonstration এর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণকে অকারণে অথবা সুপারিশের প্রভাবে programme-এ স্থান দিয়া সময়ের অপব্যবহার না করিয়া যদি বিশিষ্ট গুণিগণকে তাঁহাদের অপূর্ব্ব কলা-কৌশল দেখাইবার সুযোগ না দেওয়া হয় তাহা হইলে Conference আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হইয়া যায় সে কথা কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয়দের কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?

গোপালবাবুর গানের পর লাহোরের কুমারী লীলা সইদা হংসনারায়ণ রাগের একখানি খেয়াল গান করিলেন। শাস্ত্রে হংসনারায়ণের উল্লেখ নাই—গানের মধ্যে পূরবীর ছায়া সুস্পষ্টভাবেই আসিয়া পড়িয়াছিল। আজকালকার দিনে নূতন কিছু না করিলে ত আর বাহাদুরী হয় না—কাজে কাজেই বোধ হয় কুমারী আমাদের হংস-নারায়ণ উপহার দিলেন।

কিন্তু কুমারী নূতন রাগ সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি আবার একটী গানকেই একবার বিলম্বিত একতালায় ও আর একবার ঢিমায় গাহিয়া যে কৃতিত্বের পরিচয়ের দাবী করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহা সঙ্গীত-কলায় অনভিজ্ঞের নিকট চমকপ্রদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু রসিক-সমাজে ইহা নিতান্ত বালসুলভ চপলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। কলিকাতার আসরে কুমারী ইহার পূর্ব্বেই নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয় সেখানে সুবিধা করিতে না পারায় এবারে তিনি নূতন আবিষ্কারে শ্রোতৃবর্গকে বিমূঢ় করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু দুঃখের বিষয় এত করিয়াও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কুমারীর গানের পর ভারতবিখ্যাত প্রবীণ তবলিয়া খলিফা নাথু খাঁ সাহেব তবলায় ঢিমা ত্রিতালে লহরা বাজাইলেন। খাঁ সাহেবের পরিচয় অনাবশ্যক—বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও তিনি তবলায় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। তবলার পর শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল একখানি হোলির ঠুম্‌রী গাহেন। কোনও বৈচিত্র্য না থাকিলেও গানখানি শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। Black board অধ্যক্ষ মহাশয় সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেন যে সান্যাল মহাশয় ঠুম্‌রী গানের পর ভজন গাহিবেন; কিন্তু পাহাড়ীবাবু ঠুম্‌রী গানের পর অধ্যক্ষ-মহাশয়ের পুনর্ব্বার মৌখিক অনুরোধ সত্ত্বেও ভজন গানটী না গাহিয়াই উঠিয়া গেলেন। Programme অনুসারে পাহাড়ীবাবুর ত ঠুম্‌রী গাইবার কথা ছিল না—তবে এ ব্যবস্থা কি Black-board অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিজের—না Programme Director মহাশয়েরও ইহাতে সম্মতি ছিল? গানের পর শ্রীমান রবিন্ সরকার তাহার চির-পুরাতন ব্যাধ-নৃত্য দেখাইলেন। গত বছর প্রতিযোগিতার দিন ও Conference এর আসরে শ্রীমান এই একই নৃত্য দেখাইয়াছিলেন—কিন্তু এবৎসরেও আবার সে নৃত্য কেন? নূতন নৃত্যের

কল্পনা যদি তিনি না করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার স্বধর্ম্মে অর্থাৎ মুষ্টিযুদ্ধেই আত্মনিয়োগ প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার পর কুমারী রেখা সইহার কথক নৃত্য অনুষ্ঠিত হইল। কথক-নৃত্যের যে কয়েকটী item আমরা দেখিয়াছি তাহাতে জয়পুরের নৃত্যবিদ্ প্রোঃ সোহনলালের (যিনি ইহার পরেই নাচিয়াছিলেন) নৃত্য আমাদের মন্দ লাগে নাই। তবে প্রোফেসরের নৃত্যে grace র অভাব দর্শকবৃন্দকে বড়ই পীড়িত করিতেছিল। অল্পবয়সে প্রোফেসর হইবার বাসনা যাঁহাদের থাকে, ললিত-কলায় প্রাবীণ্য লাভ করা তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিতে পারে না। ইহার পর শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল দাসের পরিচালনায় আর্য্য Orchestra'র আয়োজন হয়। রাত্রি অধিক হওয়ায় শ্রোতৃবর্গের একদিকে ধৈর্য্য চ্যুতি ও অপরদিকে শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকারের গান শুনিবার আগ্রহ—এই উভয়টানে পড়িয়া বেহাগরাগের development undeveloped রাখিয়া দিতে হয়।

আলোচ্য রাত্রের শেষ আকর্ষণ ছিল স্বর্গত গুণী আবদুল করিম খাঁ সাহেবের শিষ্যা শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকারের গান। শ্রীমতী প্রথমে শঙ্করারাগের দুইখানি খেয়াল (একটী বিলম্বিত ও অপরটী দ্রুত ত্রিতালীতে) গান করিয়া প্রসিদ্ধ কাফি-হোরির ঠুমরী "হোলি খেলত নন্দকুমার" গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে অপরূপ রসমাধুর্য্য উপভোগের সুযোগ দেন। শ্রীমতীর সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তবলবাদক প্রোঃ সামসুদ্দিন হায়দার। *

ভানু সিংহ।

---

* শ্রীমতীর গানের আলোচনা আমরা শেষ প্রবন্ধে করিব।

আমার কথা

উমা দেবী

লেখবার তাগিদ এসেছে—লিখতেই হ'বে। য'দও লিখতে পারিনা তবু চেষ্টা করতে হ'বে নচেৎ হয়ত বন্ধু বান্ধবদের বিরাগ ভাজনের কারণ হয়ে দাঁড়াব।

আমি সামান্যা অভিনেত্রী। আমার জীবনে এমন কি ঘটনা থাকতে পারে যা নিয়ে আমার নিজের বিষয়ে লিখব। আমাদের দেশে অভিনেত্রী জীবন যেন একটী অভিশপ্ত জীবন, লোকে ভাবতে পারে না যে অভিনয় ছাড়া আমাদের আর একটী

উমা দেবী

সাংসারিক জীবন আছে। এবং সেই জীবনেই আমাদের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার বেলায় অনেক সময় অভিনয়ের কথা ভুলিয়ে দিয়ে একেবারে সাধারণ স্তরে এনে পৌঁছে দেয়। অভিনয় ক্ষেত্র ছাড়া আমরা যে সাধারণ নারী বই আর কিছুই নই, এ বোধহয় আর আমাকে লিখে বোঝাতে হ'বে না।

যাক্ এসব কথা নিয়ে বেশী আলোচনা করবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমার অভিনয় জীবনের দু' একটী কথা ব'লব বলে আজ লিখতে বসেছি আর তা ব'লেই আজ লেখা শেষ করব।

এতদিন ধরে অনেক ছবিতে বহু বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছি। এবং সেই সকল বিভিন্ন ভূমিকার রূপ আমার বাস্তব জীবনের ওপর যে একটা বিশেষ দাগ কেটে দিয়ে বসে আছে তার কোন সন্দেহই নেই। 'রাণী', 'সুলেখা', 'মীরা', প্রভৃতি বিশিষ্ট "স্ত্রী" চরিত্রগুলির ছাপ আমার মধ্যে বসে বাস করছে। মানুষের চোখে তা ধরা না পড়লেও আমার মনের চোখে তার জীবন্তরূপ সচারচরই ধরা পড়ে।

এর আগে যে সকল চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি, দেশের মাটির "গৌরীর" রূপ তাদের কাছে অচেনা—অজানা। কিন্তু এই "গৌরীর" রূপ আমার মনের গহণকোনে এতদিন যেন লুকিয়ে ছিল। আজ সেই "গৌরী"—গ্রামের মেয়ে "গৌরী"—নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে। গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামকে আমি সত্যই ভালবাসি। তাই আজ গ্রামের মেয়ের-ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেও সৌভাগ্যবতী মনে করছি।

দেশের মাটী চিত্রের—পরিচালক মশাই যখন আমায় তাঁর অসাধারণ বর্ণনার দ্বারা "গৌরী" চরিত্রটী বুঝিয়ে দিলেন,—তখন সত্যি সত্যিই আমার মনে হয়েছিল যে নীতিন বাবু কেমন করে আমার মনের কথাটী জানতে পারলেন। কল্পিত চরিত্রের সঙ্গে যদি অভিনেতা বা অভিনেত্রীর

মনের যোগ না থাকে তা হ'লে অভিনয় কেবল অভিনয়ই থাকে, তা জীবন্ত সত্য হয়ে উঠে না।

"দেশের মাটি" চিত্রে আমার আর একটী বিশেষ সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর স্থায় সুবিখ্যাতা অভিনেত্রীর সঙ্গে আমি অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছি। তাঁহার স্থায় শিক্ষিতা ও শক্তিশালী অভিনেত্রীর সঙ্গে একই চিত্রে অভিনয় করবার লোভ আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। ভগবানের কৃপায় আমার সে আশা আজ ফলবতী হয়েছে। তাছাড়া এর হিন্দি সংস্করণে বিখ্যাতা নর্ত্তকী শ্রীমতী কমলেশ কুমারীর সঙ্গে অভিনয় করবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি।

প্রশংসাতে খুসী হয় না এমন লোক খুব কমই আছে। আমি সামান্যা নারী, প্রশংসা পেলে সত্যিই আমার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠে। আজ পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে অভিনয়ের নিন্দা কখন পাই নি। দেশের লোকের স্নেহ, প্রশংসা আমার কপালে খুব বেশী পড়িয়াছে। এই প্রশংসা স্নেহ-চন্দন এর অমূল্য সম্পদ নিয়েই আজ এই বাঙলা দেশের গ্রামের সম্পদ আপনাদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে এগিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছি। জানিনা কতটা সফলতা লাভ ক'রব। তবে মনে আশা আছে শক্তি আছে আর তার চেয়ে বড় পরিচালক মশাই-এর যে অদম্য প্রেরণা আছে তার দ্বারা মনে হয় হয়ত' আপনাদের একেবারে নিরাশ ক'রব না।

লীগ-কংগ্রেস আপোষের স্বরূপ কি?

শ্রীসচী শীল

গত ২১শে এপ্রিল তারিখের 'খেয়ালী'তে "মুশ্লিম লীগ" সম্বন্ধে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে এবং মহাত্মাজীর বর্ত্তমান আপোষ চেষ্টার বিরুদ্ধে যে কথা বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হবে—এর চেয়ে সত্যি কথা বলা যায় না।

আমার মনে হয় কংগ্রেস তার বৃহত্তর আদর্শকে ভাসিয়ে দিতে চলেছে। এখানে ওখানে Patch-work করবার জন্য ব্যস্ত। এই অবনতি শুরু হয়েছে সেইদিন থেকে, যে দিন কংগ্রেস Communal Award না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন করার Hybrid principle মেনে নিয়েছিল।

সুভাষবাবু মুখে যা বলছেন, কংগ্রেস কাজে ঠিক তার বিপরীত করছে। পণ্ডিত নেহেরু এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন যাতে আছে খাটি আদর্শবাদ; কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যাবলীতে সে আদর্শের ছায়াও নেই।

গত জানুয়ারী মাসে পণ্ডিত নেহেরু লীগপতি জিন্নাকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাতে বিশেষ করে বাংলার-জাতীয়তাবাদী মহলে বিশেষ চাঞ্চল্য জেগেছিল। তিনি বলেছিলেন—Communal Award রইল, যতদিন না একটা agreed formula-তে পৌঁছান যায়। এ যে British imperialist-এর কথার নিছক প্রতিধ্বনি! Sir Samuel Hoare-ও এর চেয়ে খারাপ কথা কিছু বলেন নি।

League-Congress reapproachment এর চেষ্টায় আশঙ্কা প্রকাশ করে আমি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে এক পত্র লিখি। আমি বলেছিলাম— "I am deeply pained to find you running off at a strange tangent. Previously you stood for a full-steam programme of mass-contract. * * * * You have blown much wind into the Jinnah sails by welcoming the recent re-orientation of League ideal and programme, just when people were beginning to see through the Jinnah game."

আপনারাও বলেছেন—"ইতিপূর্ব্বে মিঃ জিন্না ও লীগের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে জিন্না-আন্দোলনের প্রায় অবসান ঘটিয়াছিল।" কংগ্রেস যেভাবে সুযোগ হারাচ্ছে ও বৃহত্তর আদর্শকে patch-work-এর বেদীতে বলি দিচ্ছে, তাতে অবস্থা এমন হবে যে কংগ্রেসে আদর্শবাদীদের আর স্থান হবে না।

মিঃ জিন্নার আব্দার সহ্য করার কোন মানে হয় না। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ-সম্প্রদায়কে অভয় দিয়াছে কংগ্রেস আজকে নয়, ৭ বৎসর আগে Principles of responsible democracy বজায় রেখে minorityদের যে আশ্বাস দেওয়া যায় তা দেওয়া হয়েছে Karachi resolution-এ। তাই আমি পণ্ডিত নেহেরুকে উক্ত পত্রে বলেছিলাম— "The Karachi pledges to minorities should be the last word on the subjects." তার কিছুদিন বাদেই Mr. M. S. Aney ঠিক এই কথারই উপর জোর দিয়েছিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত নেহেরু উত্তরে লেখেন—

Dear Mr. Sil,

Some time back I received your letter. You must not be misled by erroneous statements in the press.

The Congress is not compromising on any question of principle, nor indeed is there any question of compromise, I have tried in my statements to remove erroneous impressions. We are always bound to do that.

Yours sincerely,
Sd. J. Nehru

Compomise-এর প্রশ্ন নেই ত মি: জিন্নার দ্বারস্থ হওয়ার মানে কি? মহাত্মাজীর না কি একটা appellation আছে—the miracle man of India. মি: জিন্নাকে Nationalism-এ Convert করে তিনি আবার একটা miracle করবেন না কি? এ সম্ভব নয়; তাহলেও Round Table Conferenceএ তা সম্ভব হতে পারতো!

আগে বলেছি, "Communal" Award must be replaced by an agreed settlement"—এ বড় dangerous proposition. মুস্লীম লীগ যদি agree না করে, জোর করে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে ত Solution আসবে কোথা থেকে? Award এ মুসলমানরা পেয়েছে সুবিধা বেশী। Equitable settlement আনতে গেলেই অনেক কিছু তাদের ছাড়তে হবে। এমন ক্ষেত্রে কি করে agreed solution-এর আশা পোষণ করা যায়। এতে আসবে agreed standstill. বৃটিশ ওস্তাদরা Devaleraর সঙ্গে ঠিক এইরকম চতুর খেলা খেলেছিলেন। চেম্বারলেন সাহেব বলেছিলেন "আলষ্টার যদি স্বেচ্ছায় Eire-এর সঙ্গে মিলতে চায় মিলুক, আমাদের কোন আপত্তি নেই। Re-union-এর ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাইনে।"

শান্তি আপোষের কথা তুললেই জিন্না-সাহেব আরও আব্দার করে বসবেন। ত্যাগের পর ত্যাগ করতে করতে হিন্দুদের আর কিছু থাকবে না। তার চেয়ে বড় ক্ষতি হবে ভারতের জাতীয় অগ্রগতির দিক থেকে।

মি: চিন্তামণি সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে যা বলেছেন তাকে improve করা যায় না। তাঁর স্পষ্টবাদিতার আলোকে ঐ প্রশ্নের নিছক সত্যটা ফুটে উঠেছে: "If, on the Communal issue there is a Community genuinely grieved, it is the Hindu Community. Having got the Communal Award, I suppose Mr. Jinnah wants now something more as the price of abandoning Hindu baiting. He goes on saying—'Communal settlement first and everything else afterwards.' My reply is that I am sick unto death of this interminable talk of Communal settlement. Every time a point of difference is made up, the call for a fresh concession springs up."

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ মুসোলিণীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যগ্র হয়েছে বৃটিশ মন্ত্রীসভা। মুসোলিনীর policy of gangsterism and blackmail আজ ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মি: জিন্নার কার্য্যাবলীতে স্পষ্ট ছায়াপাত করেছে। গান্ধীজী যদি থাকতেন চেম্বারলেনের পদে, তবে তিনিও Anglo-Italian pact-এর মত ঐরকম একটা কিছুর জন্য নিশ্চয়ই ব্যগ্র হতেন।

অল্প কথায় বলবো—The basis of Commanalist gangsterism is the knowledge that Congress is always willing for a Compromise and wants peace at any cost

হিন্দু মুসলিম সমস্যার পথ এদিকে নয় এতে সমস্যা আরও জটীল হয়ে ওঠবার বিশেষ সম্ভাবনা। মুসলমান সম্প্রদায়কে মি: জিন্না ও মুসলিম লীগের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে। কমা কিছুই শক্ত ব্যাপার নয়, অন্ততঃ জিন্না-তুষ্টির চেয়ে সহজ। আসল কাজ ছেড়ে দিয়ে, এখানে-ওখানে দু'একটা Cleverly engineered riot দেখে ভয় খেয়ে গিয়ে আপোষ করতে গেলে বিরোধী পক্ষ বুঝবে তাদের চতুর নীতি বেশ কাজ দিচ্ছে।

কালী ফিল্মসের "চোখের বালি"-তে শ্রীমতী ইন্দিরা রায় 'আশা'-র ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোর্‌বেন। ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, উনবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে বৈশাখ ১৩৪৫, ১২ই মে ১৯৩৮

বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে

গত রবিবার বোম্বাই মেলে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র মিঃ জ্যাকেরিয়া প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির বিদায় সম্বর্দ্ধনার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। খোজা সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধি-স্থানীয় মুসলমান ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া মনে হয় তাঁহারা সাম্প্রদায়িক মিলন-ফরমুলা সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে রাষ্ট্রপতির সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। বোম্বাইয়ে বসু-জিন্না আলাপের পক্ষে এই আলোচনা হয়ত বিশেষ সহায়ক হইতে পারে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মধ্য প্রদেশের মন্ত্রী মিঃ শরীফের কার্য্য বিশেষভাবে বিচার করা হইবে। প্রকাশ যে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মিঃ শরীফের প্রতিকূলে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ শরীফ যখন তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন তখন আমাদের মনে হয় তাঁহাকে অব্যাহতিই দেওয়া সমীচিন।

এই হপ্তায় বোম্বাইয়ে ভারতের কংগ্রেসী প্রদেশ সমূহের মন্ত্রীবর্গ একত্রিত হইয়া তাঁহাদের অনুসৃত কর্ম্মপন্থার বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও সর্দ্দার প্যাটেল যে পন্থা প্রদর্শন করিবেন আশা করা যায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীগণ তাহার অনুমোদন করিবেন।

মহীশূরে কংগ্রেস পতাকা লইয়া যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সূচনা হইয়াছে সর্দ্দার প্যাটেল তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাহা অনুমোদিত হইবে।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাংলায় সাময়িকভাবেও কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনেও কংগ্রেসী দলের মধ্যে দলগত শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমগ্র ভারতের কর্ম্মসূচীর ব্যস্ততার মধ্যেও রাষ্ট্রপতি যে বাংলার সমস্যাগুলির সমাধানে বিশেষভাবে অবহিত তাহা নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এমনকি বোম্বাই যাত্রার সময়ে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক মৌলভী আস্‌রাফ্‌-উদ্দিন সাহেবকে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যান—ট্রেণের কামরায় তাঁহাকে বাংলা কংগ্রেসের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যথোচিত নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রায় তিন সপ্তাহ পর রাষ্ট্রপতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং তৎপরে উড়িষ্যা সফরে বাহির হইবেন। বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির সহিত বাংলার প্রধান মন্ত্রী হক্ সাহেবের সহিত এক ঘণ্টাব্যাপী গভীর আলোচনা হইয়াছে। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর হয়ত রাষ্ট্রপতির সহিত হক্ সাহেবের আলাপ-আলোচনার ফলাফলের আভাষ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ধৈর্য্য ধারণ করাই সঙ্গত।

—:•(x)•:—

শ্রীঅশোক শাস্ত্রীর প্রতি শনির দৃষ্টি

শ্রীগ্রহাচার্য্য

রুদ্র বৈশাখের রৌদ্রতেজে শনিমণ্ডলের উপগ্রহগুলি ক্ষিপ্ত হ'তে হ'তে এবার নিজেদের কক্ষ থেকে প্রায় উৎক্ষিপ্ত হোয়ে উঠেছেন। সচিত্র সবঙ্গানুবাদ অভিনয়-দর্পণ প্রকাশ কোরে অশোকশাস্ত্রী ম'শায় এবার তাঁদের কোপদৃষ্টিতে প'ড়েছেন। 'প্রথমতঃ তাঁদের সন্দেহ জন্মেছে শাস্ত্রীম'শায়ের শাস্ত্রী উপাধিটি শাস্ত্রীয় কিনা। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদের মধ্যেই এই লোভনীয় উপাধিটি অন্তরীণ আছে—এ অদ্ভুত সেকেলে ধারণা তাঁ'দের মনে এ সন্দেহের অঙ্কুর জন্মাবার সাহায্য করেছে। তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, বাইরের কথা ছেড়ে দিলেও এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমন একাধিক "মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী" আছেন, যাঁরা কোন দিন ঐ উপাধিটি লাভের প্রত্যাশায় সংস্কৃত কলেজের দ্বারস্থ হ'ননি অথবা যাঁ'দের হাতে 'কলম' থাক্‌লেও পিছনে 'কাগজ' থাকার অপবাদও কেউ দেয় না। অথচ যাঁ'দের 'শাস্ত্রী' উপাধির শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে কোন অশাস্ত্রীয় সমালোচকও এ পর্য্যন্ত প্রশ্ন তোলবার সাহস পান নি। আরও এক কথা, সংস্কৃত-কলেজের 'শাস্ত্রী' উপাধিটি বর্ত্তমানে উক্ত কলেজের ছাত্রদেরও দুষ্প্রাপ্য হোয়ে উঠেছে; কারণ, ছাত্রীগণ উহা প্রায় একচেটিয়া করবার চেষ্টায় আছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্রী-ম'শায়ের গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তার পিতৃব্যের ছবির নিচে নিজের ছবি ছাপানটা নাকি বড়ই অশাস্ত্রীয় এবং "——" হোয়েছে। যাঁ'রা নিজেরা নানা শ্রেণীর সংবাদপত্রে প্রবন্ধ বা গল্প-কবিতা ছাপাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের বরবপুর কমণীয় প্রতিলিপি পাঠকদের কাছে (তাঁ'দের ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও) উপহার দেবার শুভ উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় বিভাগের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে থাকেন তা'দের পক্ষে অন্ততঃ এ জাতীয় সমালোচনা থেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরেও নিবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল।

তৃতীয় কথা—শাস্ত্রী-ম'শায়ের অকৃতজ্ঞতা। সমালোচক ম'শায় পরের মুখে ঝাল খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে যদি নিজের চোখের ঠুলি খুলে সরল দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন, তা'হোলে অবশ্য এ অভিযোগ আন্‌তে তাঁ'র সঙ্কোচ বোধ হ'ত। কারণ, গ্রন্থখানির যথাযোগ্য স্থল-গুলিতে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করার কোন অভাব আমাদের নজরে পড়ে না।

চতুর্থ কথা—মুদ্রাতঙ্ক। যা'রা শুধুই গোলাকার মুদ্রা ও অবস্থা-বিশেষে তান্ত্রিক মুদ্রা-বিশেষের উপাসক, তাঁ'রা অন্য সকল প্রকার মুদ্রাকেই অশাস্ত্রীয় বোলে অবজ্ঞা কোরে থাকেন। আর যেখানে উক্ত দুই প্রকার আত্মতৃপ্তিকর মুদ্রা ছাড়া অন্য কোনরূপ মুদ্রার অবাঞ্ছনীয় আবির্ভাব ঘটে, সেখানে নিজ অধিকারভুক্ত মুদ্রাদ্বয়ের তিরোভাবের আশঙ্কায় যে নানারূপ মুদ্রাদোষ বাহির হোতে থাকবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি! এ যে স্বভাব-সিদ্ধ ব্যাপার!

পঞ্চম অভিযোগ—বাঙ্গলা টিপ্পণীর মাঝে মাঝে কচিৎ ইংরাজী শব্দের ব্যবহার। এ দোষটি উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে সমালোচক-প্রবর নিজেই সেই দোষ কোরে ব'সেছেন। 'রতি' শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দিতে গিয়ে এই সমালোচকই মাত্র সাত আট লাইন পরেই লিখেছেন—"রতি যে pure and simple—।" সমালোচনায় আদর্শ বটে!

তারপর ষষ্ঠ অভিযোগ—ব্যাখ্যার ভুল। ভুল অবশ্য মানুষের হওয়াই স্বাভাবিক, আর শাস্ত্রী মশায়ও কিছু তা'র ব্যতিক্রম ন'ন। তবে 'ত্রব' ও 'রতি'র যে ব্যাখ্যা উপগ্রহগণ কোরেছেন, তা'তে বোধ হয় ম'ল্লনাথও পরলোকে লজ্জায় মুখ ঢাক্‌তে পথ পাচ্ছেন না। এ অভিনব মল্লিনাথের দল প্রথমতঃ ভুলে গিয়েছেন যে, শ্লোকটি নাট্যশাস্ত্র বা তৎসজাতীয় রসশাস্ত্রের শ্লোক, কামশাস্ত্রের নয়। রসশাস্ত্রে সম্ভোগশৃঙ্গারের চুম্বনালিঙ্গনের যতই ছড়াছড়ি থাকুক না কেন—সংবেশনের ব্যাবহারিক পদ্ধতির উপদেশ তা'তে দেওয়া হয় না। তা'র পর অষ্টরস ও সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের কয়েকটি অবস্থার বর্ণনা যে প্রকরণে আছে, সে প্রকরণে যে সংবেশনের বিধান খোলাখুলি ভাবে দেওয়া হ'বে—এ একেবারেই অসম্ভব। আগের শ্লোক কয়টিতে যে চক্ষুঃপ্রীতি ও হৃৎসঙ্গের কথা বলা হোয়েছে—এ শ্লোকটিতে তাই একটু ধাপে ধাপে পরিষ্কার কোরে বলা আছে মাত্র। কোন গ্রাম্য ব্যবহারের আভাসমাত্রও এতে নেই।

তা'র পর শেষ অভিযোগ—'চরণায়ুধ'। কুক্কুট যে গ্রহরাজের প্রিয় বাহন ও শনি-মণ্ডলের অন্যতম অপরিহার্য্য উপাস্য। এ হেন অবশ্যপাল্য কুক্কুটকে নিজ গ্রন্থ থেকে অপাঙ্‌ক্তেয় কোরে শাস্ত্রী ম'শায় নিশ্চয়ই ঘোরতর অপরাধ কোরেছেন। "লজ্জাত্যাগ" অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে কুক্কুটের চীৎকারে নায়ক-নায়িকার নিদ্রাভঙ্গের সার্থকতা কতটুকু তা শাস্ত্রী ম'শায়দের বোঝবার কোন উপায় নেই। যাঁ'রা কুক্কুটলাঞ্ছন পত্রিকার গোষ্ঠীভুক্ত, তাঁ'রা নিশ্চয়ই খণ্ডিতা মানিনী নায়িকার চরণাঘাত অপেক্ষাও অশুশ্রবণ-কারিণী কুক্কুটীর ডাক-কেই অধিক সরস ও কাব্যসৌন্দর্য্যে মণ্ডিত বোলে ভাব্‌বেন।—তা' তা'তে যদি শ্লোকের ভাবার্থের আদ্যশ্রাদ্ধ হয়, তাঁ'দের কি আসে যায়!

শ্লোকটির মাথার উপর বিবরণ আছে—এটা "লজ্জাত্যাগের" দৃষ্টান্ত। নায়ক-নায়িকা পরস্পর মিলিত অবস্থায় নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময় কুক্কুটরবে নায়কের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল—এতে লজ্জাত্যাগের সার্থকতা রক্ষিত হোল কোথায়? বরং—প্রগল্ভা নায়িকা নিদ্রাভঙ্গে নায়কের অঙ্গে স্বকৃত সম্ভোগচিহ্ন প্রত্যক্ষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই স্মরজাত বিভ্রান্তিবশে সে গুলিকে প্রতিনায়িকাকৃত মনে কোরে ঈর্ষায় সকল লজ্জাত্যাগপূর্ব্বক নায়কের দেহে চরণার্পণ কোরলেন—এরূপ রোম্যান্টিক চিত্র সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে নিতান্ত বিরল নয়। অন্ততঃ লজ্জাত্যাগের সার্থকতা তাতে থাকে।

প্রতিপক্ষ হয়ত বল্‌বেন—কুক্কুটরবের আমদানীতে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত সরল অর্থ না হোতে পারে, কিন্তু ঘুম ত ভাঙ্গে! সধবার একাদশীর নিমে দত্ত ও অটল ঠিক এই ভাবেই ব'লেছিল—ব্র্যাণ্ডিপানিতে মানে না হোক্ মজা ত হয়!

"যোগরূঢ়" শব্দও প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে কখন কখন "যৌগিক" অর্থে ব্যবহৃত হোতে পারে—এ নিয়ে আলঙ্কারিক ও মীমাংসক নৈয়ায়িক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রজ্ঞগণ অনেক বিচার কোরেছেন। সে সব কথা এখানে—"মা লিখ মা লিখ।"

সংস্কৃতের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—বাঙ্গ্লাতেও প্রকরণ-সঙ্গতির জন্যে যোগরূঢ় শব্দের যৌগিক অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সাহিত্য-শিক্ষা" (অষ্টম মান) পুস্তকে তাঁহারই লিখিত "প্রাচীন গ্রীস" প্রবন্ধে (পৃঃ ৫২) পাওয়া যায়—

"এখনও এই দেশ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত সৌমনস্য লইয়া তাহার সাহিত্য ললিত-কলা দর্শনের মধ্য দিয়া মানবের চিরন্তন চিত্তসুখের ভাণ্ডার খুলিয়া আছে।"

এখানে "সৌমনস্য" মানে অবশ্য শ্রাদ্ধে পুষ্পদানের মন্ত্র নয়—সুন্দর মনের ভাব মাত্র। শকুন্তলাতেও কালিদাস "সুমনো-মূল্য" শব্দে ঠিক এইভাবে যোগরূঢ় অর্থের অন্তরালে যৌগিক অর্থের ইঙ্গিত কোরেছেন।

যাই হোক্! শাস্ত্রী ম'শায়ের প্রতি আমাদের পরামর্শ এই যে, তিনি একদিন শনিমণ্ডলের উপগ্রহদের ডেকে গ্রহরাজের পাঁচালি গাইবার বায়না দিন, তা' হোলে গ্রহরিষ্টি হোতে মুক্তিলাভ করতে পারবেন। আর যদি বন্য কুক্কুটে আপত্তি না থাকে, তা হোলে তা'কেই না হয় এক পাশে একটু স্থান দেবেন!!

উজ্জল করিতে বেদনা রাশি

চলচ্চিত্র বিষয়ক সমালোচনা-রচনায় মনোনিবেশ মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে—আর চঞ্চল মনের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে "আমার ঘরে সান্ধ্য-প্রদীপ আজিকে জ্বালিবে কে?

উজ্জল করিতে বেদনারাশি আজিকে আসিবে সে!"

অনাগত ৭ই জ্যৈষ্ঠের শুভাগমন-প্রতীক্ষায় উৎগ্রীব 'পত্রিকার' শ্রীযুক্ত নির্ম্মল ঘোষের এই উচ্ছ্বাস সময় ও বয়স উপযোগীই বটে!

খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব

গত ৩০শে এপ্রিল শনিবার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন খিদিরপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শ্রীযুত বিমল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য কার্য্যকরী সমিতির সভা মনোনীত হইয়াছেন—

পৃষ্ঠ-পোষকগণ মহামান্য মহারাজা বাহাদুর, কুচবিহার; মহারাজা বাহাদুর সন্তোষ, শ্রীযুত সন্তোষ কুমার বসু এম-এল-এ, মিঃ জে, সি, মুখার্জ্জি—প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা কলিকাতা কর্পোরেশন; মিঃ টি, পি, ঘোষ; শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি কাউন্সিলার কলিকাতা করপোরেশন, শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এস্‌সি, মিঃ এস্‌, এন্‌, বসু; রায় ভাস্করচন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর।

সভাপতি—শ্রীযুত বিমল চন্দ্র ঘোষ।

সহঃ-সভাপতিগণ—ডাঃ সুধীর কুমার বসু, মিঃ বি, এন্‌, রায় চৌধুরী, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌-এ, বি-এল; শ্রীযুত বিজয় রতন বসু, বিনোদগোপাল মুখার্জ্জি, শ্রীযুত নগেন্দ্র নাথ পাল, মহম্মদ এস্‌, এম্‌, ইস্‌রাইল।

সম্পাদক—শ্রীযুত বঙ্কিম বিহারী সরকার।

সহঃ-সম্পাদক—শ্রীযুত হীরেণবিহারী মুখার্জ্জি। শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ—বি-এ, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুত সুকুমার বন্দোপাধ্যায়। হিসাব-পরীক্ষক—শ্রীযুত শীতলচন্দ্র মিত্র। কেপ্টেনদ্বয়—শ্রীযুত পঞ্চানন সাহা (সন্তরণ) শ্রীযুত পরেশ নাথ মাইতি (রোইং) সহঃ-কেপ্টেন—শ্রীযুত হরিহর সাহা। সন্তরণ-শিক্ষক—শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র মাইতি। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট—শ্রীযুত সমরেন্দ্র মোহন চাটার্জ্জী।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ—শ্রীযুত বৈদ্যনাথ দাস বি-এল, শ্রীযুত সুধীর কুমার ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত হারাণ চন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুত প্রভাত কুমার ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত রাধাশ্যাম ব্যানার্জ্জী, শ্রীযুত সুশীল কুমার বর্দ্ধণ, সুশীল কুমার চাটার্জ্জী।

শুভ-বিবাহ

শ্রীজ্যোৎস্না দেবীর সহিত সদ্য-অন্তরীণ-মুক্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুমুদ ভট্টাচার্য্যের শুভ-বিবাহ গত মঙ্গলবার ৫০নং প্রতাপাদিত্য রোডে সুসম্পন্ন হইয়াছে। রাজরোষবন্ধন-মুক্ত কুমুদলালের নব-বন্ধনে শুধু আমরাই আনন্দিত হইলাম না তাঁহার একান্ত শুভানুধ্যায়ী পুলিশ-বিভাগের বন্ধুগণও উল্লসিত হইলেন! শ্রীমতী জ্যোৎস্নার সতর্ক দৃষ্টির হেপাজতে কুমুদলাল যে অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন তাহা চিরকাল অটুট থাকুক, ইহাই আমরা কামনা করি।

ঝরণা সাহিত্য সঙ্ঘ

বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদ্বারা পরিচালিত 'ঝরণা' পত্রিকার কার্য্যকরী সমিতির গত বৃহস্পতিবার ৮ই বৈশাখ শ্রীঅরুণা দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে ৩৫-২ বিডন ষ্ট্রীট 'ঝরণা' কার্য্যালয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এক শোক সভা হয়। সভায় একটী শোক-সূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীশিশির বিশ্বাস (বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা—সেক্রেটারী) শ্রীতুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঝরণা—সম্পাদক) শ্রীসচ্চিদা-নন্দ দাসগুপ্ত (স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) প্রভৃতি বিভিন্ন কলেজের ছাত্রেরা এবং সভাপতি মহাশয় সাহিত্যিকের জীবনী এবং রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভার প্রারম্ভে মৃতের প্রতি সম্মানার্থ এবং আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া সকলেই একমিনিটকাল দণ্ডায়মান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হে বিশ্ববরেণ্য কবি ! হে রবীন্দ্রনাথ !
তোমারে প্রণাম করি আজি বিশ্বসাথ—
হে বাঙলার, ভারতের গৌরবের রবি।
তোমার কাব্যের মাঝে আঁকিয়াছ ছবি
সারাটি বিশ্বের। বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি
অপূর্ব্ব মুরতি লভি উঠেছে উল্লাসি
কাব্য-কুঞ্জবনে। আজি সারা বিশ্বমাঝে
একই সুরে তব নাম নানা কণ্ঠে বাজে।
যে গান যে কাব্য তুমি করিলে রচনা
অপূর্ব্ব তা ; তার সাথে নাহি ছিল চেনা
কারো, কোন কালে। কভু কেহ ভাবে নাই,
কোন স্বর্গ হ'তে তুমি এসে লবে ঠাঁই,
আমাদের মাঝখানে। মোরা ভাবি মনে
আমরা হ'য়েছি ধন্য তব আগমনে।
হে কবি সম্রাট্ ! আজি তব দীপ্ত ভালে,
খ্যাতির হোমাগ্নি শিখা ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে
অনিবার। যুগ স্রষ্টা হে মহান কবি !
তোমার ব্যক্তিত্বে আজ ভেসে গেছে সবি।
সারা বিশ্বে আছে আজি হেন সাধ্য কার
তোমারে মনের কাছে করে না স্বীকার।
কাব্যের লীলায় তব সারা প্রাণ মন
হে কবিন্দ্র ! ফুটিয়া র'য়েছে অনুক্ষণ—
নানা ছন্দে গানে। হে বিশ্বপ্রেমিক কবি !
তোমার প্রিয়ার চোখে প্রেমের সে ছবি
নানা রূপে, রসে, তুমি দেখিয়াছ আঁকি
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি সম্মুখেতে রাখি।
তোমার "অন্তর হ'তে লইয়া বাসনা
তোমার গোপন প্রেম করেছে রচনা"
তব মানসীরে। তোমার প্রেমের নীরে
হে দরদি ! ভাসায়েছ বিশ্ব সাহিত্যেরে।
আজি তব জন্মদিনে কিবা দিব আর
হে মহান ! এ দীনের লহ নমস্কার।
আজি মোর অন্তরের একান্ত বাসনা
হে কবি ! শতায়ু লভ করি এ কামনা।

(কবির ৭৮তম জন্মতিথি উপলক্ষে কোন্নগর 'পাঠচক্রে' পঠিত)

ইউনাইটেড্ ক্লাব

গত রবিবার ৮ই মে পাথুরিয়াঘাটাস্থিত ইউনাইটেড ক্লাবের টেনিস শাখার পারিতোষিক বিতরণী সভা শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষএর সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভায় ক্লাবের প্রায় ৫০ জন সভ্য ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে ৺অক্ষয় কুমার ঘোষ মহাশয়ের কন্যা কুমারী স্মৃতি ঘোষ সভাপতি মহাশয়কে মাল্য প্রদান করেন। তারপর ক্রীড়াকৌতুক বিভাগের সম্পাদক মন্মথনাথ ঘোষ একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতায় টেনিস শাখার কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। এবৎসর একটী Inter club Tennis League Tournament আরম্ভ হয় এই tournamentএর পুরস্কার স্বরূপ ৺ঘোষ মহাশয়এর ষ্টেটের একজিকিউটরদ্বয়-শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র আঢ্য সভ্যগণকে উৎসাহ দান করিবার জন্য "অক্ষয় কুমার Memorial Challenge Cup" উপহার দিয়াছেন। শ্রীমান বীরেন মিত্র এবৎসর অন্যান্য সভ্যকে পরাজিত করিয়া এই Cupটী অর্জ্জন করিয়াছেন। ক্রীড়াকৌতুকের সম্পাদক শ্রীমন্মথ নাথ ঘোষ মহাশয় ৺অক্ষয় কুমার ঘোষ মহাশয়ের পত্নী ৺সমীরারাণীর স্মৃতিরক্ষার্থে "সমীরারাণী মেমোরিয়াল রাণার আপ চ্যালেঞ্জ কাপ" ক্লাবকে দান করিয়াছেন। এবৎসর শ্রীমান বিভূতি বোস ও শ্রীমান জীতেন বসু উভয়েই ব্রাকেটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এই Cup অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র মল্লিক মহাশয় আরও দুইটী পদক উপহার দেন।

বেতারের অগ্রগতি

এলা বসু

বেতারের যুগ এসেছে; এখন বেতার-যন্ত্র সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। নয় দশ বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বেতারের দুরাবস্থা গেছে; কিন্তু বর্ত্তমানে বেতার সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

জনসাধারণ এখন বেতারকে খুবই সুনজরে দেখছে। জনসাধারণ এখন বুঝেছে বেতারের কাছ থেকে কী পাওয়া যায়। বেতার শিক্ষা, আনন্দ, পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা বাণী বহন ক'রে এনেছে। বেতারের মারফৎ আমরা শুনতে পাই দেশ বিদেশের বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা, প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকাদের গান, অভিনয়, গল্প, কত মজার খবর আরও অনেক কিছু।

সকলেই সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যার সময় একটু বিশ্রাম চায় এবং বিশ্রাম ক'রতে গেলেই তার সঙ্গে একটু আমোদ প্রমোদের দরকার হয়; সুতরাং বেতারের সৃষ্টি না হ'লে এই রকম আমোদ আমরা উপভোগ ক'রতে পেতাম না। যার যত দুঃখ কষ্টই থাক না কেন বেতার যে তাকে তার গান, গল্প প্রভৃতি দ্বারা তার দুঃখ ভুলিয়ে তাকে আনন্দে রাখবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বেতারের মারফৎ আমরা সকল বিষয়েই অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ ক'রছি; কারণ যে কোন বিষয়ে কোথায় কী হ'চ্ছে না হ'চ্ছে প্রভৃতির খবর আমরা বেতার মারফৎই পাই এবং সকলের আগে পাই। সুতরাং আমরা যদি প্রত্যেক দিন সংবাদ পত্র না পড়ি তা হ'লেও কোন বিষয় যে আমাদের অজানা থাকবে, তা নয়।

এ জায়গায় বেতারই আমাদের একমাত্র সাহায্য দাতা।

তবে বেতার সম্বন্ধে অনেকের মন থেকে কুসংস্কার এখনো যায়নি। তাঁদের ধারনা ওটা শুধু বিলাসীতার জিনিষ—আর কিছু নয়। অনেক শিক্ষিত পরিবারেরও এই ধারণা বদ্ধমূল। অদূর ভবিষ্যতে এ কুসংস্কার হয় ত' তাদের মন থেকে চলে যাবে। তখন তারা বেতারকে শুভাকাঙ্খী বলেই গ্রহণ করবেন।

বেতার জনসাধারণের—জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় মানুষ, জনসাধারণের উন্নতি করেই সে তার জীবন উৎসর্গ ক'রেছে ও ক'রবে। দূর পল্লীতে শিক্ষা প্রচার ক'রা একমাত্র বেতারের ভেতর দিয়েই সম্ভব এবং হ'চ্ছেও তাই।
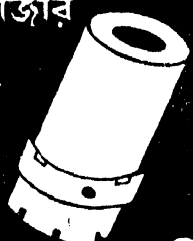
লণ্ডনে আজকাল Television ব্রড্‌কাষ্টিং হ'চ্ছে। আরো কয়েক বছর পরে দেখা যাবে আমাদের দেশেও Television ব্রড্-কাষ্টিং হ'চ্ছে; তখন বেতারের ভেতর দিয়ে জনশিক্ষা প্রচার করবার কত সুবিধা হবে।

পাশ্চাত্য দেশে বেতারের খুবই উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। বেতারের মারফৎ কী করে জনশিক্ষা প্রচার করা যায়; কী করে শিশুদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় তার জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে ও হ'চ্ছে। জার্ম্মানীতে কী করে বেতারের মারফৎ ছেলে-মেয়েদের জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয় তার একটু নমুনা এখানে দিচ্ছি।

বিকেলবেলা ছেলেমেয়েরা পার্কে খেলা ক'রছে; তারপর যেই সন্ধ্যা হ'ল অন্ধকার আকাশের গায়ে একটী তীর ফুঠে উঠল্ এবং সেই তীরটী একে বেঁকে ও সঙ্গে সঙ্গে কথা ব'লে সেই পার্কে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের খেলা শেখাতে লাগল্।

আমাদের দেশেও এই রকম দিন আসবে। তবে পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের দেশের

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

দেখতে দেখতে পাঁচটি সপ্তাহ কেটে গেল এবং প্রতি সপ্তাহেই দেখা গিয়েচে, 'চিত্রা'-র ভরা-আসর সরগরম কোরে রেখেচে "বিদ্যাপতি"। সর্বশ্রেণীর দর্শক-মহলে বিদ্যাপতি যে বিশেষভাবে সমাদর লাভ কোরেচে, তা, চিত্রায়, গত পাঁচ সপ্তাহের Steady box-office receipt থেকে বিলক্ষণ বোঝা যায়।

চিত্র-পরিবেশকের রিপোর্ট থেকেও আমরা জানতে পেরেচি, বাঙলার মফঃস্বলে 'বিদ্যাপতি' সমানভাবেই সমাদৃত হোয়েচে।

বিদ্যাপতির অভিনয় এবং তার চিত্তহারী সঙ্গীতের আকর্ষণের বিষয় আমরা বহুবার লিখেচি। নরনারী নির্বিশেষে, কাননএর 'অনুরাধা' সকলের কাছেই চিরস্মরণীয় হোয়ে থাকবে। অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের গানগুলিও বিদ্যাপতির অন্যতম স্মরণীয় আকর্ষণ।

যাঁরা এখনও এই ছবিখানি দেখবার সুযোগ পাননি, তাঁদের অবিলম্বে চিত্রায় গিয়ে ছবিখানি দেখতে বলি। ছবিখানি সপরিবারে উপভোগ করবার মত ছবি আশা করি বহু সপ্তাহ ধরে চিত্রায় আসর সমান ভাবে ভরিয়ে রাখবে।

অভিজ্ঞান

যে সমস্যাকে অবলম্বন কোরে অভিজ্ঞান-এর নাট্যাংশ রচিত হোয়েচে, ইতিপূর্ব্বে সে সমস্যা সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা কোরেচি।

অভাগিনী সন্ধ্যার জীবন-নাট্যে পর পর এমন বিপর্য্যয় ঘটে গেল, যার কথা স্মরণ কোরতে, প্রত্যেক হৃদয়বান নর-নারীর অন্তর সমবেদনায় ভ'রে উঠবে।

স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে সে যখন বিপন্ন। তখন তার ভগ্নীপতি প্রকাশ স্বেচ্ছায় তার ভার গ্রহণ কোরেছিল। কিন্তু প্রকাশের স্ত্রী সবিতা, স্বামীর এ অনুগ্রহকে সুদৃষ্টিতে দেখলে না।

সন্ধ্যার প্রসারিত দৃষ্টির সামনে সমস্ত পৃথিবী আঁধার হোয়ে এলো। যে দিকে চায়, শুধুই অন্ধকার।

অনির্দ্দেশ যাত্রা-পথে, সন্ধ্যার সেই প্রথম পদ বিক্ষেপ। দৈব প্রেরিত সহচররূপে, সেই পথে এসে দেখা দিল—প্রমথ। সে ছন্নছাড়া, সে ভবঘুরে! দুনিয়ার এক অর্থ ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য ছাড়া তার আর কোন অবলম্বন নেই। নারীর সেবা, নারীর স্নেহ বা প্রেম কি বস্তু, সে জানে না।

সন্ধ্যার সান্নিধ্যে এসে প্রমথর জীবনে আজ যেন নব অরুণোদয়! তাই সন্ধ্যার নাম পাল্টে, সে তার নূতন নামকরণ করলে—উষা!

বহুদিনের ছন্নছাড়া, গৃহহারা, ভবঘুরে—জীবনে আজ প্রথম উপলব্ধি কোরতে সুরু কোরল, ঘর বাঁধবার আনন্দ!

জানি, সে গৃহ-বধূকে এক সমাজ গৃহের বার কোরে দেয় আর একজন তাকেই গৃহের বধূ করবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করে!

কিন্তু প্রমথ ও উষার জীবনে, দৈবাৎ যদি সে সুযোগ এলো, শেষ পর্য্যন্ত তা কী সার্থকতায় ভ'রে উঠেছিল?

প্রিয়লালের 'সন্ধ্যা' এবং প্রমথর—'উষা'!

একই নারী, অবস্থা বিপর্য্যয়ে তার দ্বৈত রূপ নিয়ে উদয় হোয়েছিল, জীবন-নাট্যের দুটি বিভিন্ন অঙ্কে! নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তারই অখণ্ড চিত্র ফুটে উঠেচে 'অভিজ্ঞান'-এ।

ছবিখানি শীঘ্রই 'রূপবাণী'তে মুক্তি লাভ কোরবে এবং এর বিভিন্ন ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরবেন,—মলিনা, মেনকা, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, বোকেন চট্টো, নির্ম্মল বন্দ্যোঃ, কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি।

বেতার এখনো বালক। অনেক টাল সামলে তবে সে এখন দাঁড়াতে সমর্থ হ'য়েছে। তবে এইটুকু আশার বাণী যে সে এরই মধ্যে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

বেতারের এই অগ্রগতির মূলে রয়েছে বিপুল জন-সমাজের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা।

বড়দিদি

এই চিত্রের প্রধান দুটি নারী চরিত্র—মাধবী ও শান্তি।

কুশলী কথা-শিল্পী আপনার বুকের দরদ দিয়ে এই দুটি অপরূপ নারীচরিত্র সৃষ্টি কোরেছেন।

বড়দিদি 'মাধবী'—যেন আমাদের কত পরিচিত, কত আপনার জন। বাস্তব জীবনে, রক্তে-মাংসে গড়া নারীর মতই এই মহিয়সী মহিলা নারী, অতি নিবিড় ভাবে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে।

সেবা, দাক্ষিণ্য, স্নেহ ও প্রেমের মধ্য দিয়ে এই চরিত্রটি প্রাণরসে সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে। স্বামীর মৃত্যুর পর, সে ভাদ্র মাসের ভরা-গঙ্গার মত, রূপ, স্নেহ ও মমতা নিয়ে তার পিতৃভবনে ফিরে আসে। সেখানে সে স্নেহময়ী, সর্ব্বময়ী। বাড়ীর পোষা কুকুরটা পর্য্যন্ত যেন দিনান্তে

"অভিজ্ঞান" চিত্রে জীবন গাঙ্গুলী

তাকে একবার দেখতে চায়। বাড়ীর প্রভু-থেকে সরকার, গোমস্তা, দাস-দাসী, সবাই ভাবে বড়দিদির কথা, সবাই তার উপর নির্ভর করে।

এই চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ কোরে, ছায়াচিত্রে ফুটিয়ে তোলবার ভার পেয়েছেন—সুন্দরী ও যশস্বিনী অভিনেত্রী, শ্রীমতী মলিনা।

এর পরেই আসে, সুরেন্দ্রনাথের সাধ্বী স্ত্রী শান্তি। সে তার স্বামীর বেদনা কোথায় তা' বুঝতে পেরেছিল। শান্তির অন্তরে অবিশ্বাস ছিল না—ছিল তার স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার, তার উদাসীন মনকে সচেতন কোরে তোলবার প্রচেষ্টা।

শান্তির চরিত্রের মধ্যে যে 'স্পার্ক' আছে, তাকে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে না পারলে, নায়ক সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ কোরতে পারে না। তাই এই সুকঠিন নারী চরিত্রটিকে প্রকাশ করবার ভার পেয়েছেন, বাঙলার অন্যতমা শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।

ছায়া-চিত্রে আর একবার মলিনা ও চন্দ্রাবতীর যোগাযোগ সম্ভব হোয়েছিল।

রাবাঈ এর পর আবার তাঁরা একত্রে চন্দ্রাবতরণ কোরবেন বড়দিদিতে—প্রধান টি নারী-ভূমিকায়।

বিভিন্ন ভূমিকায় অপরাপর গুণী-শিল্পীদের তালিকা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ কোরেচি। বহুদিন পর মলিনা ও চন্দ্রাবতীর যোগাযোগের কথা উল্লেখ কোরলুম, এই কারণে যে এদের teaming-এর ফলে, মাধবী ও শান্তি, দুটি ভূমিকাই তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে, ছায়া-পটে ফুটে উঠবার অবকাশ পাবে। আশাকরি রসজ্ঞ দর্শক মাত্রেই এ খবর শুনে আনন্দ প্রকাশ করবেন।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

ভপোঁ—পোঁ—ভপোঁ—পোঁ— ডুম—ডুম বাজি উঠছিল সে দিন টালিগঞ্জে। মেচো, মুদী, মুদ্দফরাস, ছুতোর, কামার, বিড়িওয়ালা, কাবলীওয়ালা, কেউ বাকি ছিল না। হৈ হৈ গোলমাল, গায়ে গায়ে ভীড়। সবাই ঢুকবে ওই 'দি গ্রেট স্থাশান্যাল থিয়েটারে'র মধ্যে।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও আজ ফাঁকা। পরিচালকদের উঠেছে গালে হাত। প্রোডাকশন চিফ পি, এন, রায় ঘুরছেন এদিক ওদিক।

'অভিজ্ঞান'এর সেটের বড় থামের পেছনে একা প্রফুল্ল রায়, আপন মনেই বসে আছেন, মাথাটা কেবল নড়ছে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

জলু বড়াল চেচাচ্ছেন: খোঁজ! খোঁজ! খুঁজে বার কর! কিন্তু কে খোঁজে, কাঁকে খোঁজে! ... ...

হঠাৎ 'পেয়েছি পেয়েছি' রবে ছুটেছেন শ্রীঅনাথ, পেছনে সৌগীন। চিফ-থিয়েটারের দরজায় দেখা গেছে বুচেন পরে দুর্গা বাড়ুজোকে।

থিয়েটারের তাঁবুর দরজায় এলেন রায় সাহেব। টিকিট না পাওয়া দর্শকরা তখন ফিরছেন। সুঙ্গর ভিড়ের মধ্যে দেখি পূর্ণ-থিয়েটারের ম্যানেজার সান্নু বাবু, পেছনে সুকবি অজয় ভট্চাজ (বেচারা গলার চাদর দিয়ে ঘাম মুছচেন)। পালোয়ান জগদীশ শেঠি পাশে শৈলেন চৌধুরী ও কোনে ম্যাডাম চন্দ্রা (তাঁর কপাল হতে প্রকাণ্ড তেলা-পোকার টিপটা তখন খসে পড়ে গেছে), গেঁয়ো পোষাকে ম্লান মুখে পঙ্কজ মল্লিক, সবায়ের বেজায় দুঃখ চার পয়সা টিকিটের চিফ-থিয়েটার, তাও তাঁরা দেখতে পেলেন না।

রায় সাহেব চেঁচাচ্ছেন: আর সব গেলো কোথায়? পর্দ্দা'র ফটক তখন বন্ধ। নাচ সুরু হয়েছে। চিফ থিয়েটারের সস্তার নাচ, সস্তার গান—হাত-তালি—শিশ—আর হৈ হৈ গোলমাল, তার পরেই গণ্ডগোল। সাত বছরের ছেলে সুবীর আলি ষ্টেজের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। 'ধর ধর! মার মার! পাকড়ো পাকড়ো!' চিৎকার উঠল। হলো সব ওলট পালোট। অ্যাকটর অ্যাকট্রেস, পেন্টার লিফটার, ষ্টেজ ম্যানেজার সবাই বেরিয়ে পড়লেন ষ্টেজ ছেড়ে, সুবীর পালাচ্ছে তাদের চেয়ারের ওপর দিয়ে, বেঞ্চির তলা দিয়ে, মেয়েদের আঁচলে গা ঢেকে, তাঁবুর ধার দিয়ে। আর দর্শক—সাইগলের মাথার বার্ণাড়শা'র চুল খসে গেল, পৃথ্বীরাজের মুখের গোঁপ ছিঁড়ে পড়ল, মেনকার মাথার পাঞ্জাবী পাগড়ী খুলে দিলে সুবীর। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী বিমল রায় বসে ব্যাপারে ঘোমটা দিয়ে,—দিলে খুলে। চাবীর বজরার পেছনে লুকিয়ে অভিনয় দেখছিলেন শ্রীমতী কানন—তাও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ডিরেক্টার ফণি মজুমদার চেঁচিয়ে উঠলেন কাট! কাট! —একি আপনারা সব এখানে!

বিস্ময়ে পরস্পর পরস্পরের পানে তাকিয়ে রইলো। কে কখন কি ভাবে, কি সাজে অভিনয় দেখতে বসেছিল কেউ তা জানত না, ডিরেক্টরও না।

সুবীর আলি সেজেছে ভুলুয়া। অভিনয় হচ্ছিল ষ্টুডিওর দু-নম্বর ফ্লোরে, এই বই খানার নাম 'ভুলুয়া' বা 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার'।

দেশের মাটী

আকাশে মেঘ নেই। ধরণীর পিঠের ওপর আগুণ ঝরছে। রাস্তা ধূলোর স্তম্ভ আকাশে গিয়ে মিশছে। চারিদিকে হাহাকার! জল! জল! আর জল! এক ফোটা জলের জন্যে পৃথিবী পাগল। জল না পেলে এ পৃথিবীর প্রাণী, জীব জন্তু, উদ্ভিদ, মানুষগুলো সমস্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মাটি আজ ফুটিফাটা।

আকাশের বুক চিরে গেলো। বিদ্যুৎ চমকালো। কোথা থেকে এলো দৈত্যের মত প্রকাণ্ড রাশি রাশি মেঘ। সারা আকাশ ছেয়ে গেলো।

এলো ঝড়! এলো জল! সারা পৃথিবী ধরে মাতন সুরু হলো। তৃপ্তি! তৃপ্তি! বিরাট তৃপ্তি! আবার ফসল, আবার ধান—থরে থরে ফুটবে সোনা—দেশের লোক বাঁচবে। গাইবে তারা 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা।'

অপরূপ এই দৃশ্য পরিকল্পনা—প্রতিভাবান পরিচালক নীতীন বসুর। আটখানা প্রপেলার লাগান হয়েছে নীতীন বসুর সেটে গ্যালন গ্যালন জল উঠছে ওপরের ট্যাঙ্কে, পাইপে।

ঝড় জল অন্ধকার বিদ্যুৎ—তার মাঝখানে এ সেটের আর্টিষ্টরা পূর্ণ তৃপ্তি নিঃশ্বাস নিয়ে উর্দ্ধমুখে আকাশের পানে তাকিয়ে রইলো—আমি অতি দূর থেকে কার ক্ষীণ কণ্ঠে যেন শুনতে পেলুম—হে খোদা! হে ভগবান! হে পৃথিবীশ্বর! দাও দাও আরো দাও সারা দুনিয়া ভরিয়ে দাও। আমাকে বাঁচতে দাও! আমার সোনার পৃথিবীকে বাঁচতে দাও।

"চোখের বালি"

মিঃ বি পি মেহেরার প্রযোজনায় কালী-ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিনন্দিত সামাজিক কাহিনী "চোখের বালি" সমাপ্তির পথে। নারীর কামনা আর পুরুষের বাসনা—এরা যে কোন বন্ধনেরই বাঁধ মানে না। বিশ্বকবির "চোখের বালি" সেই সমস্যারই ওপর ভিত্তি কোরে গ্রথিত। এই অমূল্য কাহিনীটি যাতে নবরূপে উদ্ভাসিত হ'য়ে বাঙলার রস-পিপাসুদের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হয়—তার জন্য পরিচালক সতু সেন, শব্দযন্ত্রী মধু শীল, আলোক-চিত্র-শিল্পী ননী সান্যাল ও কালী ফিল্মসের অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ নিজ নিজ বিভাগে নিজেদের সুনাম অর্জ্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। "চোখের বালি"-র চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বমূলক—সেইজন্য এই কাহিনীর জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আভিজাত্য বংশীয় বিদুষী মহিলা ও মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন অভিনেতা নিয়োজিত কোরেছেন। এর মধ্যে সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়, শান্তিলতা ঘোষ, রমা ব্যানার্জ্জি, ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সবের যোগা-যোগে আমাদের বিশ্বাস, "চোখের বালি" সকলের মনোনয়নে সমর্থ হবে।

হাজরা পিক্চার্স

আগামী ৪ঠা জুন উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ "উত্তরা"-য় হাজরা পিকচার্সের প্রথম পৌরাণিক চিত্র নিবেদন "দেবী ফুল্লরা" বহু প্রতীক্ষার পর মুক্তিলাভ কোরবে। হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, নৃত্য-গীত, শৌর্য্য-বীর্য্য, সারল্য ও কার্পণ্য বিমণ্ডিত ভক্তি-রস-সিক্ত চির-নূতন পৌরাণিক উপাখ্যান এই "দেবী ফুল্লরা"। শুধু পৌরাণিক চিত্র হিসাবেই নয়—নবীন ভারতের নব-যুগের এক মহান্ আদর্শের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত জন-সাধারণের মনের ওপর বিশেষভাবে রেখা-পাত কোরবে। "দেবী ফুল্লরা"-র কাহিনী আজও বাঙলার প্রতি ঘরে ঘরে মুখরিত। —সেই জন্যই আমাদের মনে হয়, কাহিনীর বৈচিত্র্যে, সুবিজ্ঞ পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্তীর পরিচালনায়, সর্ব্বজন-প্রিয় মধু শীলের যন্ত্র-শিল্পের নির্দ্দেশনায়, তরুণ কর্ম্মীযুগল বিভূতি লাহা ও যতীন দত্তের আলোক-চিত্র

শব্দানুলেখনে, স্বায়োদীয়া ধীরেন বসু ও গোকুল মুখার্জ্জির সঙ্গীত পরিচালনায়, আভিজাত্য সম্প্রদায়ের সুপরিচিত বিভূতি মজুমদারের (এঃ) নৃত্য-পরিকল্পনা এবং সর্ব্বোপরি সুঅভিনেতৃ সংযোগে ছবিখানা বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে এক নতুন রস পরিবেশন কোরবে। "দেবী ফুল্লরা" সম্পূর্ণ চরিত্র-লিপি নিয়ে প্রস্তুত হ'ল।

মহামায়া—সাবিত্রী, দেবী ফুল্লরা—শিশুবালা, সুরমা—রাধারাণী, সুষমা—চিত্রা দেবী, কালকেতু—অহীন্দ্র চৌধুরী, ভাড়ু দত্ত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, যুবরাজ—মোহন রায়, বুনো সর্দ্দারদ্বয়—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দুর্গাপ্রসন্ন বসু।

ইউনাইটেড টকীজ

এদের প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। শুটিং তোলার কাজ নিয়ে আপাততঃ পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই ব্যস্ত আছেন, ছবিখানি যাতে সকল রকমে প্রথম শ্রেণীর হয় তজ্জন্য তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দ আপ্রাণ খাটছেন।

বেকার নাশন

গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম; 'বেকার নাশন' জুন মাসের প্রথম ভাগে 'উত্তরা'য় দেখানো হবে। এখন শুনছি তা' হবে না। কোথায় এবং কবে দেখানো হবে তা' শীঘ্রই জানাতে পারবো আশা করি।....এখন অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকাভিনয় দৃশ্যের চিত্র গ্রহণ চ'লছে। উক্ত মঞ্চাভিনয়ে, গত সংখ্যায় একটি নূতন ধরণের 'ব্যাধ নৃত্য' দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। নেচেছেন: চিত্র-জগতে নবাগতা শ্রীমতী বেলা এবং শ্রীরবীন সরকার। নাচ্ ছাড়া ঐ দৃশ্যটির আর একটি প্রধান আকর্ষণ হ'চ্ছে 'ব্যাক্ গ্রাউণ্ড মিউজিক'! ঐ সঙ্গীতানুষ্ঠানের সমস্ত প্রশংসা শ্রীকুমার মিত্র-র প্রাপ্য! কুমারবাবু যে শুধু হাল্কা ভূমিকাভিনেতা নন—সঙ্গীত শাস্ত্রেও যে ওঁর বেশ্ দখল আছে—ছবিখানি পর্দার গায়ে দেখার সময় দর্শকসাধারণ তা' উপলব্ধি করবেন আশা করি।

নর-নারায়ণ

'বেকার নাশন'-এর কাজ শেষ ক'রেই প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাধা ফিল্মসের পরবর্ত্তী পৌরাণিক নিবেদন 'নর-নারায়ণ' তোলার কাজে হাত দেবেন।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে 'মুক্তি' এই চিত্র গৃহে অষ্টম সপ্তাহে পড়বে। কোলকাতায় এর আগে কোন বাঙলা ছবিই একাধিকক্রমে ৩৫ সপ্তাহ ধরে চ'লবার সৌভাগ্য লাভ করে নি। মুক্তির এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের জন্যে আজ সকলেই বিশেষ আনন্দিত। এই ছবির মধ্যে সঙ্গীত ও কমিক রস্ যে ভাবে

প্রভাত সিনেমা

চৌরঙ্গী অঞ্চলে বহুদিন থেকে এমন একটী চিত্রগৃহের অভাব ছিল, যেখানে শুধু প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় চিত্রই দেখান হবে। সম্প্রতি সে অভাব আর নেই। সম্প্রতি পুরাতন ম্যাডান থিয়েটার নব পরিকল্পনায়, নুতন নাম দিয়ে, নূতন বন্দোবস্তে প্রভাত সিনেমা রূপে রূপান্তরিত হয়েছে, চিত্রামোদী মাত্রেই যে এতে আনন্দিত হবেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সাহেব পাড়ায় সম্পূর্ণ ভারতীয় বন্দোবস্তে ভারতীয় চিত্রগৃহে একমাত্র ভারতীয় চিত্র দেখার সুযোগ অভাবনীয়, অভূতপূর্ব বললে ও কোন অত্যুক্তি হবে না।

দর্শকগণ যাতে সকল রকম সুবিধা এখানে উপভোগ কর্ত্তে পারেন কর্ত্তৃপক্ষ তার কোন ত্রুটিই রাখেন নাই। অত্যুজ্জল আলোক মালায় সুসজ্জিত এই চিত্রগৃহে দর্শকগণ প্রথম শ্রেণীর চিত্র দেখার যে বিমল আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পারবেন তা নিঃসন্দেহ।

পরিবেশন করা হয়েছে তাতে করে মনে হয় যে বাঙলা দেশের চিত্রামোদীরা একে আরও কিছু দিন আঁকড়ে ধরে রাখবে।

রূপবাণী

পলমুনি পৃথিবীর ছায়া-চিত্রাভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা বলিয়া পরিচিত। আর কে ও রেডিও পিক্‌চার্সের 'এক্সাইল'-এ এই সুন্দর অভিনেতা পলমুনির সহিত নায়িকা রূপে দেখা দিয়াছেন সুন্দরী ও কুশলী অভিনেত্রী মিরিয়ম হপকিন্স। বর্ত্তমানে এই চিত্রগৃহে এ ছবিখানি দেখান হইতেছে।

এই চিত্রগৃহে নির্ব্বাচিত হিন্দি ও উর্দ্দু চিত্র দেখাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এর পরিচালনা ও অন্যান্য বন্দোবস্ত আপাততঃ মেসার্স এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রি-বিউটরস করিতেছেন কিন্তু নিউ থিয়েটার্সের মিঃ বি, এন সরকার, মেট্রোপলিটন পিক্‌চার্সের মিঃ বি, এল্ খেমকা এবং সাগর ফিল্ম কোম্পানিও এতে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

ফিল্ম জগতে মিঃ এস্, আর হেমাদ আজ সর্ব্বত্র পরিচিত। ফিল্ম ব্যবসা সম্পর্কে যাহাদের নাম প্রথমে উল্লিখিত হয় মিঃ হেমাদ তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার বিচক্ষণতায় ও দূরদর্শিতায় আজ এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরস উন্নতির শীর্ষ স্থানে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার কোম্পানীর পরিচালনায় প্রভাত সিনেমা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

তামিল ছবি

তামিল ও তেলেগু ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই বলিলেও চলে। মিঃ হেমাদ দক্ষিণ ভারতীয়দের এই অসুবিধা দূর করিবার মানসে স্থির করিয়াছেন অতঃপর প্রভাত সিনেমায় প্রত্যেক রবিবার সকাল ১১টায় নির্ব্বাচিত তামিল ও তেলেগু ছবি দেখান হবে, আসছে রবিবার মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের পৌরাণিক বাণী-চিত্র "দক্ষযজ্ঞ" প্রথম দেখান হবে, এই বন্দোবস্তে তামিল বাসীদের বহু দিনের একটা অভাব যে বিদূরিত হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

জায়গীরদার

সাগর মুভিটোনের হিন্দি সামাজিক চিত্র

প্রভাত সিনেমায় গত ২৮শে এপ্রিল থেকে দেখান হচ্ছে। দর্শকদের ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানি আরও কিছুদিন চলবে। ঘটনার সংঘাতে, গানের মাধুর্য্যে ও বার্থ-প্রেমের করুণ কাহিনী ছবিখানিকে খুবই জনপ্রিয় করেছে, ধনী জায়গীরদার এক সামান্য কৃষাণ কন্যার সঙ্গে ভালবাসায় আবদ্ধ হয়। কিন্তু অদৃষ্ট-দেবতার ক্রুর ইঙ্গিতে তাদের মিলন হলনা। কার্য্য ব্যপদেশে জায়গীরদারকে বিদেশে যেতে হয়। এদিকে সমাজ কৃষাণ কন্যা নীলাকে ঘরে ঠাঁই দিতে নারাজ—কেননা সে কলঙ্কিনী। অবশেষে এক কৃষক দয়া পরবশে তাকে বিবাহ করে। দিন কেটে যায়। অবশেষে খবর রটে যে জায়গীরদার—যাকে লোকে এতদিন মৃত ভেবে এসেছে—পুনরায় তাঁর বাসগৃহে নিজ গ্রামে ফিরে আসছেন। গ্রামশুদ্ধ সকলেই জায়গীরদারকে অভ্যর্থনা করলে। কিন্তু জায়গীরদারের মনে শান্তি নেই। সর্ব্বদাই সে নীলার কথা চিন্তা করে। অসহ্য আবেগে সে নীলার নিকট চিঠি লেখে ও গোপনে সাক্ষাৎ করে। নীলার স্বামী খুবই ক্রুদ্ধ হয়—কিন্তু ঘটনার বিপাকে মৃত্যু তাকে টেনে নেয়। নীলার স্বাস্থ্য ও শরীর ক্রমশঃ ভেঙে যায় এবং একদিন সেও চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করে।

জায়গীরদারের জীবন হয়ে উঠে অসহ্য—কিন্তু অবশেষে রমেশ—তারই পুত্রের সঙ্গে তার মিলন হয়।

ঘটনার বৈচিত্র্যে চিত্রখানি যে প্রথম শ্রেণীর তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ফটোগ্রাফীর কাজ হয়েছে অনবদ্য। সর্ব্বাপেক্ষা এই ছবিখানির প্রধান আকর্ষণ গান প্রত্যেক চিত্রামোদীরই এ ছবিখানা দেখা উচিত।

দীনদয়ালের রোজনামচা

শ্রীঅনাথবন্ধু দেবদত্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মন্থরপদে রামদয়াল বাজারে গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল যে, যে ব্যবসাবুদ্ধিতে দিগীন মিত্রের মত ধুরন্ধর চোৎচাকা বলদের মত অন্ধ, একরাত্রের হুঙ্কারে তা কি সবই লোপ পাইল! রাস্তায় সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিল। বাজার থেকে ফিরবার সময় দেখা গেল তার এক হাতে বাজারের থলে অন্য হাতে সাবানের বাক্স ও স্নোর শিশি। অত্যধিক চমকিত করিবার জন্য সোজা রান্নাঘরে গিয়া গিন্নীর পায়ের উপর স্নো ও সাবান রাখিল। তিন চারিটা মোটরের টায়ার যেন একসঙ্গে ফাটিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সাবানের বাক্স উঠোনের মধ্যে খুলিয়া সাবান ছত্রাকার। অর্দ্ধ শায়িত অধসুপ্ত এক কুকুরের মুখে স্নো'র শ্বেত প্রলেপ।

রামদয়াল ভাবিতে লাগিল "শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি।"

সঙ্গে সঙ্গেই সানুনাসিক গর্জ্জন—"আমার কেন মরণ হয় না? হতচ্ছাড়া মিন্সে বাজা-রের কত জাতের ছোঁয়া তার ঠিক নেই, রান্নাঘরে ত এনেছেই, তা আবার একেবারে আমার পায়ের উপর। বলি, এতটুকু জ্ঞানও কি নেই যে বাজারের কোন জিনিষ না ধুয়ে ঘরে তোলা যায় না? আর এই যে যেখানে সেখানে থেকে ঘুরে এসে হাতপা না ধুয়ে কাপড় না ছেড়ে হন্ হন্ করে রান্না ঘরে ঢোকা হয়, ম্লেচ্ছরাও এরকম অনাচার করে না। ১৫।১৬ বছর এই বাড়ীতে আছি, এ রকম অনাসৃষ্টি—, একদিনও চোখে দেখিনি।"

রাম দয়াল স্তম্ভিত! একবার ভাবিল "দুত্তোর এর চেয়ে কোলকাতায় থাকাই ঢের ভাল। কালই চলে যাব।"

আবার ভাবে নারিকেলের উপরের অনেক কাঠিন্য ও রুক্ষতা সহ্য করিতে না পারিলে ভিতরের সুমিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায় না।

কিন্তু বাহিরের কাঠিন্য রামদয়ালের কাছে প্রায় অভেদ্য মনে হইল। সে এত চেষ্টা করিত গৃহিনীর শুচিতা অধিকৃত রাখিতে, কিন্তু দমকা হাওয়ার মত হঠাৎ সব উলটপালট হইয়া যাইত। ইতর প্রাণীরাও এর হাত থেকে অব্যাহৃতি পাইত না।

প্রত্যেক ঘরের প্রবেশ মুখে দুর্গ পরিখার মত দুই হাত চওড়া একটা করিয়া পরিখা থাকিত। সেগুলি অবশ্য গোবর জলে ভরা। যে কেউ হোক না কেন—মানুষ, বিড়াল, ইঁদুর, পিপড়া গোবরজলে শুদ্ধ না হইয়া ঘরে ঢোকবার উপায় নাই।

বাড়ীতে রামদয়াল যে ভাত খাইত তাতে কি রকম একটা দুর্গন্ধ ছিল। রামদয়াল অনেকবার চাউলওয়ালাকে বলিয়া আসিয়াছে। সে ত অবাক্। বলে—"মশাই, একই চাল আরো দশ জনকে দিচ্ছি, নিজে খাচ্ছি, কোনদিন কোনরকম গন্ধ পাওয়ার কথা কেউ বলে না, আপনি কি বেতালপঞ্চবিংশতির ভোজন বিলাসীর আত্মীয়? দুর্গন্ধ যদি কিছু থাকে তবে এখানে তার কারণ না খুঁজে বাড়ী গিয়ে খুজুন।" আরও ২।৩ জনে অমনি হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ মশাই! আমরাও এদের চাল নিয়ে থাই। কই, কোনরকম গন্ধ-টন্ধ আজ পর্য্যন্ত পেলুম না।" রামদয়াল অপ্রস্তুত।

কারণটা একদিন আপনিই বাহির হইয়া পড়িল। দাক্ষায়নী উনুনে আঁচ দিয়াছে। রামদয়াল উঠানে বসিয়া জ্বালানি কাঠগুলি গোবরের জালায় ডুবাইয়া রৌদ্রে রাখিতেছে। এরূপ না করিলে বাহিরের কোন জিনিষ ঘরে ঢুকিতে পায় না। গোবরের শুচিতা হইতে গরুকেও রেহাই দেওয়া হয় না। হঠাৎ দেখিল দাক্ষায়ণী একটা বালতীতে জলের মধ্যে গোবর গুলিতেছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু এবার রামদয়াল বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইল যখন দেখিল যে, ঐ জলের মধ্যে দাক্ষায়ণী সে বেলার রান্নার চাউল ঢালিয়া দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাতের দুর্গন্ধ-সমস্যা জলের মত পরিস্কার হইয়া গেল। দাক্ষায়ণীর পঁচিশ বৎসরের যৌবনও তার কাছে সমস্ত মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলিল। রূপমুগ্ধ যুবক যেন হঠাৎ আবিস্কার করিল পথে পরিচিতা প্রেমিকা তার ছদ্মবেশী যুবক। মনে মনে মোহমুদ্গর আওড়াইয়া রামদয়াল মনটাকে খুব দৃঢ় করিতে লাগিল। কি রকম একটা নৈর্ব্যক্তিক বিমুখতা তার সর্ব্বাঙ্গে দেখা দিল।

রামদয়াল সোজা কলিকাতা চলিয়া আসিল, ভাবিল বাব্বাঃ! খুব বেঁচে গেছি। মনে হচ্ছে এক বছর গোশালায় ছিলুম।"

বউবাজারের নিকটেই ছোট্ট একখানা বাড়ী ভাড়া নিল।

(৪)

কলিকাতায় তখন খুব বেরিবেরি দেখা দিয়াছে। বাজারে টমাটো পাওয়া দুর্ঘট। বায়স্কোপ ও ফুটবল ছাপাইয়া ভিটামিনের আলোচনায় চায়ের দোকান ও রেস্তোরাগুলি সরগরম। ডাক্তারেরা প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ভিন্নমত। গুজব রটিল ফুলকপিতে বেরিবেরি হয়। আর যায় কোথা! বড় বড় ফুলকপি পয়সায় তিনটা, তবুও কিনিবার লোক নাই। হঠাৎ দেখা গেল রামদয়াল ১৩।১৪টা খুব বড় বড় ফুলকপি মুটের মাথায় দিয়া চলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া রামদয়াল মনে মনে খুব হাসিল। বিদ্যুৎবেগের মত তার মনে হইল এই বেরিবেরির ভয় মূলধন করিয়া ভাল ব্যবসা করা যায়। বিশেষতঃ দিগীন বাবুর ওখানে যাওয়ার পথ এতদিন হয়তঃ নিশ্চয়ই বন্ধ হইয়াছে।

চট্‌পট্ সব ঠিক হইয়া গেল। সেইদিনই সমগ্র কলিকাতার এবং সহরতলীতে যত দুগ্ধবতী অশ্বিনী ছিল সকলের মালিকের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হইয়া গেল, পরদিন থেকে টাকায় ২ সের করিয়া ঘোড়ার দুধ দিবে। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছু কমাইয়া অগ্রিম দাদনও দেওয়া হইল। ভোরেই কলিকাতা সহরের সর্বাঙ্গে এক চাঞ্চল্যকর বিজ্ঞাপন দেখা গেল।

বেরিবেরির অত্যাশ্চর্য্য প্রতিষেধক !! অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কার !!

বেরিবেরি হইলে হতাশ হইবেন না। ডাক্তারের শরণাপন্ন হইয়া মরণাপন্ন হইতে হইবে না। রোজ সন্ধ্যার পরে এক পোয়া ঘোড়ার দুধ সেবনে ইহা সমূলে নির্ম্মূল হইবে। ২৲ টাকা সের। একমাত্র প্রাপ্তি-স্থান—১৭ বউবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অশ্বিনীর মালিকেরা ত অবাক। ঘোড়ার দুধ যে কেউ পয়সা দিয়ে নেয়, এ তাদের জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। যে যা পারিল দুধ নিয়া আসিয়া হাজির। সমস্ত দুধে তার সমান পরিমান জল মিশাইয়া জাল দিয়া রামদয়াল একটা বড় জালায় রাখিল।

সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই রামদয়ালের বাড়ীর সামনে অসম্ভব ভীড়। তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দুধ নিঃশেষ।

দিন দশেকের মধ্যেই রামদয়াল প্রচুর টাকা রোজগার করিয়া ফেলিল। ভাবিল যদি অন্ততঃ মাসখানেকও এই ভাবে যায়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু সব উল্টাইয়া গেল। একটু বেশী প্রচারের পর এসব কথা স্যার নীলরতন, ডাঃ বিধান প্রভৃতির কানে গেল। একদিন স্যার নীলরতন, ডক্টর বিধান রায়, নলিনী রঞ্জন প্রমুখ প্রায় জন কুড়ি চৌষট্টি ও বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ১৭নং বউবাজারে আসিয়া উপস্থিত। খবর পাইয়া রামদয়াল হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। এতগুলি চিকিৎসক ধুরন্ধরকে তার ক্ষুদ্রকক্ষে কোনমতে বসাইয়া সে যেন বিনয়ে গলিয়া গেল।

নীলরতনই সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিল "বেরিবেরির এ প্রতিষেধক আপনি কোথায় পেয়েছেন? এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন শাখার অন্তর্গত—এটা কি হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদ, হাইড্রোপ্যাথি, না ইউনিপ্যাথিক? এটা কি স্বপ্নলব্ধ না দৈবলব্ধ।"

ডক্টর রায় বলিলেন "আমি ত সদ্য ইয়ুরোপ প্রত্যাগত। সেখানে কোন ঔষধা-গারে বা ডাক্তারের মুখে ত ঘোড়ার দুধের কোন উপকারিতার কথা শুনি নি? ঘোড়ার ডিমের উপকারিতা তবু বাংলা কংগ্রেসীদের কিছু কিছু বুঝিয়েছি।"

নলিনীরঞ্জন প্রভৃতিও বলিবার কিছু না পাইয়া চুপ করিয়া মাথা নাড়িলেন। রাম-দয়াল খুব বিনীতভাবে নিবেদন করিল "দেখুন স্যারেরা! আমার একটা সবিনয় নিবেদন আছে। প্রগলভতা ক্ষমা করবেন। বত্রিশ চৌষট্টি টাকা পকেটে পুরবার আগে ত ঢের রোগী মরে এ আমি দেখছি। আর যদিও না মরে, যেটুকু জ্ঞান রোগীর থাকে তাতে যদি সে জানতে পারে, খুব বড় কোন ডাক্তার কয়েকবার এসে তাকে দেখেছে, তখন টাকার অঙ্ক হিসেব করতেই তার রোগযন্ত্রণা চির-কালের জন্য উপশমের দিকেই যায়।"

ডক্টর রায়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রামদয়াল বলিয়া চলিল "অথচ খুব বড় ডাক্তারের একবার দর্শনে বা স্পর্শনে যে কোন রোগীর রোগ উপশম হয়, এ আমার চোখে আজ পর্য্যন্ত পড়ে নি। এমনো দেখেছি একজন চৌষট্টি, দুজন বত্রিশ, ৪ জন ষোল টাকায় পরামর্শ সমাপ্তির পূর্ব্বেই রোগীর ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। আপনারা কিছু মনে না করলে জিজ্ঞাসা করি বেরিবেরির কোন অমোঘ প্রতিষেধক কি আপনারা পেয়েছেন?"

স্যার সরকার গম্ভীর হইয়া গিয়াছিলেন। শুধু সমান্তরালে মাথা নাড়িলেন।

রামদয়াল সোৎসাহে বলিল "তবেই দেখুন! আপনাদের মত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকও ত experiment কচ্ছেন, আমি আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কচ্ছি মাত্র।"

নলিনীরঞ্জন যেন কি বলিতে যাইতে-ছিলেন। রামদয়াল বাধা দিয়ে বলিল "হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক ত শুনেছি, একদিন ঔষধ দিয়ে ৭ দিন জল দেয়। জানিনা সব কয় দিনই জল দেয় কিনা! কিন্তু কই, ভিজিট নেওয়াটা সে অন্যায় মনে করে না। আমিত মনে করুণ জলের মত কোন ঔষধ বেরিবেরির প্রতিষেধক হিসেবে চালাচ্ছি। ওদের টাকা নেওয়া যদি সঙ্গত হয়, আমার অসঙ্গতি কোথায়?"

এতক্ষণে স্যার নীলরতন গম্ভীরভাবে বলিলেন "দেখুন! ডাক্তারেরা কি ঔষধ দেয় না দেয় সেটা গর্ভমেণ্ট দেখবে কারণ তারা গর্ভমেণ্ট-স্বীকৃত। কিন্তু আপনি যে ঔষধের নামে যা তা চালিয়ে লোকের সঙ্গে প্রবঞ্চনা কচ্ছেন তাদের অর্থের বিনিময়ে, এর ফল আপনার পক্ষে খুব খারাপ হবে।" এই বলিয়া তিনি দলবল নিয়া চলিয়া গেলেন।

৪৫ দিন পরে ১৭নং বউবাজার ষ্ট্রীটের দরজায় ফৌজদারির সমন সহ পেয়াদার সহিত মুচিপাড়া থানার দারোগার দেখা হইল। দারোগার সঙ্গে ৪ জন কন্‌ষ্টেবল।

সমনে দিগীন মিত্র বাদী। রামদয়াল বিবাদী। অভিযোগ প্রতারণা করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ।

শরৎচন্দ্র

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শরৎচন্দ্রের সঙ্গীত প্রিয়তা

ইহার পরে শরৎচন্দ্র আর একবার ভাগলপুরে আসিলেন। সে দিন সকালে শরৎচন্দ্রকে তাঁহার প্রিয় ছোড়দা (আমার সেজ মাতুল শরৎচন্দ্র মজুমদার, নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রে বড় মাতুলের বাড়ীতে গানের আসর হয় মাতুলের বিরাট হলে। যে হলে শরৎচন্দ্র যৌবনে বিশেষ দক্ষতার সহিত অনেকবার অভিনয় করিয়াছেন, যে হলে তাঁহার সময় কাটিয়াছে সেই হলে শরৎচন্দ্র আসিয়া বসিলেন আমারই পার্শ্বে। আমি মাতুলের গানের সহিত হারমনিয়াম বাজাইতে বসি, মণিমামা শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু বেহালা বাজাইতে বসিলেন, ধরণীবাবু তবলা লইয়া বসিলেন ও বড় মামা তানপুরোর সহিত গীত ধরিলেন। মাতুল যখন গাহিতে ছিলেন "বল্ মারে ধুনেবিয়া বা চামেলী বেলা চম্পে" শরৎচন্দ্র তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন।

যখন মাতুল গাহিতেছেন "নিবীড় আঁধারে মা চমকে তোর রূপরাশি"—শরৎচন্দ্র ধ্যানস্থ (এইরূপ মূর্ত্তি কিছুদিন পূর্ব্বে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের দেখিয়াছিলাম ৺দ্বিজেন্দ্র লালের বাটীতে ঝামাপুকুর লেনে যখন মাতুল ঐ গীতটীই গাহিতে ছিলেন এবং ৺দ্বিজেন্দ্রলালকে বহুবার "রবিবাবু রবিবাবু" বলিয়া রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইয়াছিল। শরৎচন্দ্র যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। মাতুল গীত শেষ করিবার নিমিত্ত ধরিলেন "রামকেলী" সুর ওমর খৈয়মের বিখ্যাত গীত "পিয়ালা মুঝে ভরেছে"—শরৎচন্দ্রের কি আনন্দ—বলিলেন "বড়দা ভোর হয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে"—তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

প্রবীন সাহিত্যিকের রচনার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

শরৎচন্দ্র এবারে আসিয়া দুইদিন কি তিনদিন পিতৃদেবের নিকটে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেবের নবপ্রভা ও পতাকার সম্পাদক হিসাবে বহুপূর্ব্বে যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও নব্যভারতে প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র এতে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন যে পিতৃদেব অবাক—। আমার মনে আছে পিতৃদেবের নবপ্রভায় লিখিত "বসন্তে" প্রবন্ধটী একাধিক পাঠ করিয়া শরৎচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন "দেবেন্দ্রবাবু লেখেন না কেন ?"—পিতৃদেব বলিলেন "হরিদাসের কাগজে একটা প্রবন্ধ '"বিদ্যাবত্তা বনাম ধনবত্তা"—পিতৃদেব বলিলেন "যখন ভারতবর্ষ দ্বিজু প্রতিষ্ঠা করে তার কিছুদিন আগে আমায় বলেছিল যে একটা কাগজ রাজাদা start করতে হবে—তুমি একটু কুড়েমী ছেড়ে লিখতে পারবে ?" শরৎবাবু বলিলেন "আহা এমন সুন্দর লেখা আপনার অথচ আপনি আর লেখেন না—লিখুন, আপনি প্রবন্ধ যা সব লিখেছেন, কুড়ি পঁচিশ বছর আগে এখনও সে সব অতি সুন্দর ভাবে খাপ খায়। শরৎচন্দ্রকে চা ডিম লুচী ইত্যাদি আমি আনিয়া দিলাম। শরৎচন্দ্র সন্ধ্যার সময় উঠিয়া সুরেন বাবুর বাড়ীতে গেলেন।

শরৎচন্দ্রের সাপ ধরা

শরৎচন্দ্র একদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে আম বাগানের মধ্য দিয়া আসিতে ছিলেন—সেজ মাতুলের বাগান হঠাৎ দেখিলেন এক আমগাছের নিকটে গর্ত্ত হইতে গোখুরা সর্প বাহির হইয়াছে, তিনি বলিলেন "খানিকটা কাপড়—" কাপড় খানিকটা দেওয়া হইলে তিনি তাহা হাতে জড়াইয়া গোখুরা সর্পের মুখ ধরিয়া এক হাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাইলেন হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; সর্প হাঁড়ীর মধ্যে গর্জ্জন করিতেছিল—কিয়ৎক্ষণ পরে হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া দিলেন সর্প ফণা বিস্তার করিয়া যেই দংশন করিতে বাহির হইল লাঠির অল্প আঘাতেই সর্পকে মারিলেন। আমি বলিলাম "শরৎ বাবু যদি কামড়ে দিত।" শরৎ বাবু বলিলেন "তা কখন হয়—ও অভ্যাস আমার—ছিল বেদেদের সঙ্গে কতোদিন ঘুরেছি জানো।"

শরৎচন্দ্রের দৈহিক শক্তি

শরৎচন্দ্র এবারে প্রায়ই গঙ্গাস্নান করিতেন কোন কোন দিন বাড়ী হইতে তৈল মাখিয়া আসিতেন কোন দিন বা আমার পড়ার ঘরে আসিয়া তৈল মাখিতেন। আমিও দু' এক দিন পীঠে তৈল মাখাইয়া দিয়াছি। তৈল মাখিয়া ঘরের দরজাটী বন্ধ করিয়া সিগারেট খাইতেন পিতৃদেবের সম্মুখে তামাক

ওয়ারেণ্ট ও প্রবঞ্চনার অভিযোগ : বাদী গবর্ণমেণ্ট, বিবাদী রামদয়াল। অভিযোগ বেরিবেরির প্রতিষেধক বলিয়া ঘোড়ার দুধ চালাইয়া জনসাধারণকে ঠকান।

দরজার বাহিরে কিন্তু To let লট্কান ছিল। ইতি

বা সিগারেট শরৎচন্দ্র কখন খাইতেন না। স্নানের অগ্রে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া বর্ষায় অনেক গল্প বলিতেন—কি করিয়া প্রেগ হইল, কি করিয়া নেপ্‌থেলিন খাইলেন ইত্যাদি" আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতাম—।

(এক দিন মাত্র দেড় ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা বর্ষার গল্প শুনিয়াও তাহা বিবৃতি করা যুক্তি যুক্ত নহে)

তিনি গঙ্গা স্নান করিতে নাবিয়া অবলীলা ক্রমে খর স্রোতা নদীর স্রোত কাটিয়া সোজা অনেক দূরে চলিয়া যাইতেন, কখন বা ডুব সাতার দিয়া বহুদূর গিয়া উঠিতেন। স্রোতকে উপেক্ষা করিয়া সোজা সাতার দেওয়াতে যে কত খানি দৈহিক শক্তি ও দমের প্রয়োজন তাহা যাঁহারা সাতার জানেন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন। শরৎচন্দ্র আর গঙ্গা হইতে উঠিতে চাহেন না, আমাদের স্নান হইয়া গিয়াছে। আমরা ডাকিতাম "শরৎ বাবু ফিরে আসুন।" শরৎ বাবু নদীর মধ্য হইতে হাঁসিতেন। হায় যদি এই ভাবে জীবন কাটাইতেন দীর্ঘ কাল বাঁচিতেন প্রচুর Sodi by carb খাইয়া ক্যান্‌সার পেটে হইত না।

কলিকাতায় শরৎচন্দ্র

শরৎ চন্দ্রের কলিকাতার বাটীতে আমি বিশেষ ঘন ঘন উপস্থিত হইতাম না। তাঁহার সে জন্ত যে আমার উপর অভিমান ছিল না তাহা নহে। তবে পীড়ার সংবাদ পাইলে প্রত্যহই যাইতাম ও সংবাদ লইতাম। তবুও অনেকবার শরৎচন্দ্রের নিকটে গিয়াছি সভা সমিতিতে সভাপতি হইতে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত, কখন বা সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত গ্রহণের নিমিত্ত অন্তের অনুরোধে। শরৎচন্দ্রের সহিত সাহিত্য লইয়া বিশেষ আলোচনা হইত না। তবে তিনি আমাকে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন "বিপ্রদাস কেমন লাগলো শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব সম্বন্ধে তোমার কি মত, শেষ প্রশ্ন কেন মণ্টু (দিলীপ কুমার) শ্রীঅরবিন্দকে পড়তে দিল ইত্যাদি। অভিনয় ও শিশির কুমার ভাদুড়ীকে লইয়াও অনেক আলোচনা হইয়াছে।

আমাকে তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে মনে হয় শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে নির্ভীক সমালোচনা পছন্দ করিতেন—ভাগলপুরে একবার শরৎচন্দ্রের সহিত ৺দ্বিজেন্দ্র লালের "পরপারে" নাটক লইয়া আমার ঘোর তর্ক বিতর্ক হয় ও ঘরে বাইরের নিখিলেশের চরিত্র সম্বন্ধে। "পরপারে" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন "দাদামশায় সরযূ মহিম এ সব আমার ভাল লাগে। শান্তাও ভাল লাগে কিন্তু চরিত্রটী unnatural বলিয়া মনে হয়—বেশ্যা কি অমন হয়?"—আমি বলিয়াছিলাম "সাবিত্রী মেসের ঝি কি অমন হয়?" সাবিত্রীর চরিত্রও তা হ'লে unnatural হয়েছে।" তিনি বলিলেন "আমি অনেক ভেবেছি দেখেন, মেসের ঝি ছাড়া অন্ত কিছু হয় না" আমি বলিলাম "দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত থাক্‌লে ঐ-কথাই ব'ল্‌তেন।" শরৎচন্দ্র হাঁসিতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র ঢাকা ইউনিভার্সিটী হইতে ডিলিট্ পাইবার পর আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। বড়ই দুঃখিত হইয়া বসিয়া আছেন। দুঃখ করিয়া বলিলেন "কাগজ ব'ল্‌ছে আমি দেশের কাজ থেকে গা ঢাকা দিয়েছি—দেশের কাজ কোন কালে ছাড়িনি আজও ক'র্ছি—সুভাষ নেই—কাজ কর্ব্ব কার সঙ্গে—সে আসুক—যখন বড় বাজারে বন্দুক চ'ল্‌ছিলো, লোকে গুলি খেয়ে প'ড়ে যাচ্ছে আমি তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে আহত লোকদের হাঁসপাতালে পাঠিয়েছি, কল্‌কাতার বড় বড় নামজাদা নেতাদের কাউকে দেখতে পাই নি—দেখা পেয়েছিলাম কেবল ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীকে তাঁকে অযথা লোকে বহু নিন্দা করেছে"। কলিকাতার শরৎচন্দ্রকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাইলেও ভাগলপুরের উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে গঙ্গার তীরে বালুতটে শরৎচন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইতাম না—। কলিকাতার বাটীতে দুইদিন আমাকে এক রকম টানিয়া তাঁহার মোটরে লইয়া গিয়াছিলেন। এক দিন Popular stores-এ ভবানীপুরে আমাকে সঙ্গে করিয়া গড়গড়ার মোটা রাবারের নল কিনিতে লইয়া যান। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কিন্‌তে এলেন গড়গড়ার নল এ গঙ্গা ওষুধ কেন—?"—বলিলেন "শরীর বড় খারাপ ও না খেলে থাক্‌তে পারি না—। দুধ খাওয়ার কথা বলিলাম—দুধ যদি না সহ্য হয় ছানা খাইতে পারেন, ছানা সহ্য না হয় সন্দেশ খাইতে পারেন শরৎচন্দ্র বলিলেন "লোককে এতো কষ্ট দেবো শরীরের জন্ত" কেউ ব্যস্ত নয় আমার জন্ত—। তিনি সে দিন আমার প্রতি এত প্রীত হইয়াছিলেন ঠিক শিশুকে যে রকম পিতা আদর করিয়া গাল চাপড়ায় তাই করিলেন সেই ডিস্‌পেনসারীর মধ্যে ও তার পর ক্রমাগতঃ আমার দুটী হাত ধরিয়া জোরে চাপিতে লাগিলেন—হায় সে আদর সে স্নেহের ডাক আর জীবনে কখনও পাইব না—।

তাহার পর আমাকে শরৎচন্দ্র বলিলেন "চলোনা মোটরে একটু বেড়াই" আমি বলিলাম "না—আমি এখন তিন মাইল বেড়াবো গড়ের মাঠে—মোটরে বেড়ালে চ'ল্‌বে না আমার"। দুঃখিত হইয়া বলিলেন "তবে যাও"—হায় তখন জানিতাম না শরৎচন্দ্রকে এতো শীঘ্র জন্মের মতন হারাইব।

আমার খিদিরপুরে বাসের সময় শরৎচন্দ্র কয়েক বার আমার বাসাতে গিয়াছিলেন এবং পারিবারিক ব্যাপারও কিছু আমার নিকটে বলেন—তাহা হইতে জানিতে পারি যে শরৎ চন্দ্রের দরদী হৃদয়ের সুবিধা গ্রহণ করিয়া অনেক অনাত্মীয় অকারণ টাকা ঠকাইয়া

লইতেন এবং সেই জন্ত আত্মীয়ের সহিত বিরোধ ঘটিত। সুখের বিষয় দু-এক ব্যাপারে আমার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে বিষয় বিবৃত করবার প্রয়োজন দেখি না।

শরৎচন্দ্রের মাতুল পরিবার

শরৎচন্দ্রের মাতামহ ও মাতুল সম্প্রদায়ের উপর অযথা কটূক্তি বর্ষিত হইতেছে। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। শরৎচন্দ্র নিজে ইহার জন্ত দায়ী। শরৎচন্দ্র আমাদের নিকটেও প্রায় সকলকেই বলিয়াছেন যে কুড়ী টাকা ফিস্এর নিমিত্ত তাঁহার F. A. পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি আর তাঁহার বন্ধু রাজেন্দ্র নাথ মজুমদার যে ভাবে গঙ্গার তীরে, অশ্বথ গাছের উপরে, ইস্কুল পালাইয়া সময় কাটাইতেন তাহাতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিলেও তাঁহার অভিভাবকগণ ইহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে শরৎচন্দ্র সত্যিকারের F. A. পরীক্ষা দিতে উৎসুক। ইহা যদি তর্কের খাতিরে গ্রহণ করা যায় যে তাহার মাতুল গোষ্ঠি ইচ্ছা করিয়া পরীক্ষার fees দেন নাই তাহা হইলেও তাঁহার বন্ধুবর্গ এতো স্নেহ করিতেন যে তাহারাই পরীক্ষার fees দিতেন। শরৎচন্দ্র আমার সেজ মাতুল শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার ৺কুমার সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৺ রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মাত্র পুত্র) নিকটে বহু রাত্রি তাহার রচনা পাঠ করিতেন—তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন—। ৺ কুমার সতীশচন্দ্র সেই সময়েই নিজ অর্থ ব্যয়ে ঐ রচনা মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ও তিনি বিবেচনা করিতেন যে শরৎচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা বর্ত্তমান।

শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি কখনও কাহারও নিকট অর্থ সাহায্য চাহেন নাই—কিন্তু না চাহিলেও তিনি সত্যিকারের seriously পরীক্ষা দিবেন এরূপ মতামত প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করিলে ৺কুমার সতীশচন্দ্র সেই টাকা তৎক্ষণাৎ দিতেন। ৺কুমার সতীশচন্দ্র এ কথা আমায় বলিয়াছিলেন।

যাহারা যৌবনে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের জীবনের সহিত পরিচিত তাঁহারা কেহই শরৎচন্দ্রকে নির্য্যাতন করিবার জন্ত বা ফীস্ না দেওয়ার জন্ত মাতুল পরিবারকে দোষী করিবেন না।

শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিবার পর যখন বহুবার তাঁহার মাতুলালয়ে শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবাসে গিয়াছেন, ও দীর্ঘকাল থাকিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তিনি বাল্যকালে বা যৌবনে মাতুল পরিবারের নিকট এমন কিছু নির্য্যাতিত হন নাই যাহা বিস্মৃত হওয়া কঠিন ছিল। শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র পত্রে জানাইয়াছিলেন এবং সে পত্র আজও বর্ত্তমান যে সাহিত্যে তাঁহাকে প্রচার করিবার নিমিত্ত তিনি সুরেন্দ্র নাথের নিকট বিশেষ ঋণী।

এইরূপ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিতে হইলে তাহার মধ্যে মাতুলপরিবারকে বা সুরেন্দ্র নাথ বা উপেন্দ্র নাথকে যাঁহারা সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত তাঁহাদের লোক চক্ষে হীন করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পায়—আমরা আশা করি এ বিষয়ে যবনিকা টানিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

এ আলোচনায় মানুষ শরৎচন্দ্রকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। শিল্পী শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা নাই। কিন্তু কোন এক সমালোচক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে শরৎচন্দ্রের "গভীরতা ছিল কিন্তু সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতি ছিল না"—এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। ইহার অর্থ ঠিক উপলব্ধি করা কঠিন। গভীরতার কি অর্থ সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতিরই বা কি অর্থ তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন—গভীরতা সূক্ষ্মতা বিস্তৃতি ব্যতীত থাকা সম্ভব কি না তাহাও বিবেচ্য। গভীরতা ব্যতীত যে সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হয় অনেক ক্ষেত্রে তাহা সত্যিকারের সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতি কি না বা তাহা গভীরতা কিনা তাহাও বিবেচ্য। আমাদের মনে হয় গভীরতার সহিত সূক্ষ্মতাও বিস্তৃতি ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট, গভীরতা হইতে সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতিকে পরিহার করা কঠিন।

শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে খেয়ালীতে ও সব মাসিক পত্রিকায় বহু আলোচিত হইয়াছে সেই কারণ শরৎ সাহিত্যের বিস্তৃতি আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

তবে এই প্রবন্ধে চরিত্র হীনের "সাবিত্রী" লইয়া কথঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে না করেন যে চরিত্রহীন সম্বন্ধে লেখক হীন ধারনা পোষণ করেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন "tragedy of passion"। ঋষি টলষ্টয় সম্বন্ধে Charles Sarolea যাহা "Anna Karenina" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমরাও তাহা বলিতে পারি।

"Like every great novel of Balzac, and every great drama of Shakespeare, "Anna Karenina is pre-eminently a tragedy of passion. It shows the all concuming fire of one over-mastering feeling, which ignores every law and convention, until the individual is crushed by the relentless action of the very laws which he ignores or transgresses. And like Balzac or Shakespeare, Tolstoy refrains from superficial and cheap moralizing. He does not preach a sermon from a text. Yet, if ever writer was in danger of writing with a purpose and of making his heroes and heroines, the mouth pieces of his theories, Tolstoy was that writer" —Sarat Chandra too.

অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গীত সম্মেলন

প্রবীন ধ্রুপদাচার্য্যের নির্ভীক অভিমত

———:o:———

বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ধ্রুপদাচার্য্য ও সিদ্ধ সঙ্গীত-সাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণজী মুখোপাধ্যায় নিখিল বঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে অতীত ও বর্ত্তমান কালের সঙ্গীত সম্মেলনের প্রভেদ ও প্রার্থক্য নির্ভীকভাবে সমালোচনা করিয়াছেন :

আমরা বালককালে দেখিয়াছি তথনকার মহারাজ, রাজা, জমিদার ও বড় বড় ধনীরাই তন্ত্রকার, গুণী-গায়ক-বাদকদিগকে পোষণ করিতেন; কোন কোন পর্ব উপলক্ষে গুণি-সম্মেলন আহ্বান করিয়া সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা ও উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। ৺ কাশীধামে রাজা দিব্যাপতির বাড়ীতে প্রথম গুণি-সম্মেলন হয়। ইহাতে বাংলা হইতে ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নুলো গোপাল) মহাশয় (ধ্রুপদী ও খেয়ালিয়া), পশ্চিম হইতে বন্দে আলি খাঁ (বীণকার) এবং স্থানীয় ৺মহেশচন্দ্র সরকার (বীণাচার্য্য), রামদাস-বাবু (ধ্রুপদী) প্রভৃতি গায়কগণ উপস্থিত ছিলেন এবং দুই-তিনদিন যাবৎ তাঁহাদের বিদ্যার আদান-প্রদান হইয়াছিল। আমরা তখন স্কুলে পড়ি; সঙ্গীত কি তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না। এখন বয়স হইয়াছে—এখন বুঝিতে পারিতেছি তাঁহারা কি করিয়া গিয়াছেন। সভার মধ্যে কোন অশান্তির সৃষ্টি বা অন্য কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ইহার অল্পদিন পরে—আমাদের

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণজী মুখোপাধ্যায়

শিক্ষাকালেই—৺ কাশীধামে রায়বাহাদুর ৺গিরিশচন্দ্র লাহিড়ি (বাংলার একজন বর্দ্ধিষ্ঠ জমিদার) মহাশয়ের বাড়ীতে গুণিসম্মেলন হয়। ইহাতেও অনেক বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্ যোগদান করিয়াছিলেন। দুই দিন যাবৎ গান-বাজনা হইয়াছিল এবং উপস্থিত সহৃদয় সামাজিক সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন। তন্ত্রকারগণ, গায়ক, বাদক, গুণী সকলেই যথোচিতভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে নেপালে সঙ্গীত-সম্মেলনের বৈঠক বসে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে বিশিষ্ট গায়ক, বাদক ও তন্ত্রকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাবু তখন চাকুরী হইতে অবসর লইয়া ৺কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। লক্ষ্মীবাবু প্রসিদ্ধ কলাবিৎ নথে খাঁর শিষ্য। ধ্রুপদী ও খেয়ালিয়া হিসাবে সে সময়ে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। দেশ-দেশান্তর হইতে গায়ক বাদক যাঁহারা নেপালে যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তাঁহারা লক্ষ্মীবাবুর নিকট নিজ নিজ গুণের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সন্তোষ প্রদান করিলে তাঁহার অনুমতিতে দরবার হইতে তাঁহাদের পাথেয় ও অন্যান্য খরচ মঞ্জুর হইলে তাঁহারা দরবারে যাইতে পারিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে লক্ষ্মীবাবুর এক বন্ধু (বিশেশ্বর পাণ্ডা) নেপাল দরবারে চাকুরী করিতেন—লক্ষ্মীবাবু যে একজন বিশিষ্ট ধ্রুপদী ও খেয়ালিয়া ইহা সেই বন্ধুটী জানিতেন। সেই নিমিত্ত লক্ষ্মীবাবুর মারফৎ পরীক্ষান্তে গায়ক-বাদকগণকে সম্মেলনে প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত সম্মেলনে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য একটী বিষয় এই যে, প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী তাজখাঁ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পঞ্চসহস্র রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছিলেন। অন্যান্য গুণী গায়কগণও পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। একপক্ষে খাঁ সাহেব পুরস্কৃত হইলেও, অপরপক্ষে তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। কারণ নেপাল মহারাজের আদেশ হইল যে তাঁহাকে দরবারের চেটীদিগকে গানশিক্ষা দিতে হইবে। তাজ খাঁ তখন অগত্যা স্বীকৃত হন বটে, কিন্তু অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া দুইমাস

শরৎচন্দ্রের "শেষ প্রশ্ন" সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে "আমি" কিছু প্রবল আকারে দৃষ্ট তৎজন্য পাঠক বর্গের মার্জ্জনা আশা করি—তৎব্যতীত উপায় ছিল না। শরৎচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল।

———

পরে সেখান হইতে লুকায়িত ভাবে কলিকাতায় রওনা হইয়াছিলেন। আসিবার পথে মুজফরপুর ষ্টেশনে আমাদের সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয়। আমরা তখন কর্ম্মোপলক্ষে মুজফরপুরে বাস করিতেছিলাম। খাঁসাহেব একদিন মাত্র সেখানে অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে তিনিই আমাদের নিকট তাঁহার পলাইয়া আসার গল্প করেন। তাঁহারই মুখে তখন শুনিয়াছিলাম যে প্রকৃত কলাবিদ্‌গণ অবশ্য কোনও সঙ্গীত-সম্মেলনে সসম্মানে আহূত হইলে সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিতে অস্বীকৃত হইতেন না এবং উপযুক্ত সঙ্গীতানুরাগী ছাত্র পাইলে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না; কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তাঁহারা কোন ছাত্রীকে শিক্ষা দিতে কোনমতেই রাজী হইতেন না। ঢাড়ী অতাই প্রভৃতি একশ্রেণীর ওস্তাদগণ ছিলেন তাঁহারাই স্ত্রী (তাওয়ায়েফ) শিক্ষার্থিনী-দিগকে নাচ গান প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ইঁহাদের সহিত কলাবিদ্‌গণের কোনও সম্বন্ধ বা সংস্রব ছিল না।

ইহার কিছুদিন পরেই—আমাদের শিক্ষাকালে—সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদী উজীর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা য়ুসফ খাঁ (ইঁহারা জুড়িতে গান করিতেন) ঐরূপ স্ত্রীসম্পর্কে আসিয়া রামপুর হইতে ৺কাশীধামে পলাইয়া আসেন। তাঁহাদের মুখ হইতে আমরা ঘটনাটি এইভাবে শুনিয়াছি। রামপুরে রাত্রিতেই দরবার হইত। একসময়ে প্রথম রাত্রে তাওয়ায়েফ দিগের গান হইয়া যাইবার পর শেষরাত্রে খাঁসাহেবদিগের গান গাহিবার ডাক আসিল। অনন্যোপায় হইয়া দুই ভ্রাতা সসঙ্কোচে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। গান করিবার আদেশ হইলে তাঁহারা নিজ নিজ নাক কাণ মোচড়াইয়া সরস্বতীবন্দনার পর গান ধরিলেন। তাঁহারা দু'ঘণ্টা ধরিয়া এরূপ অপূর্ব্ব গান করিলেন যে নবাবসাহেব তাঁহাদের গানে সন্তুষ্ট হইয়া—তাঁহাদিগকে সহস্র মুদ্রার একটী তোড়া পুরস্কার দিলেন। তখন খাঁসাহেবরা আদাব কুরনিস্ করিয়া দরবারে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এইরূপ:—ভগবান্ আমাদের লজ্জামান রক্ষা করিয়াছেন নচেৎ আজ পেশাদার বাইজীগণের সম্মুখে গান করিয়া মৃত্যুতুল্য অপমান ভোগ করিতে হইত। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন কিন্তু আমরা এখানে আর ক্ষণমাত্রকাল থাকিব না। এই বলিয়া তাঁহারা পরদিন সকালের গাড়ীতেই রামপুর হইতে কাশী চলিয়া আসেন।

আমাদের শিক্ষাকালে আমরা মধ্যে মধ্যে রামদাস বাবুর সহিত শ্রীরামপুরে আসিতাম এবং নিত্যই কলিকাতায় আমাদের যাওয়া আসা হইত। স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে সেই সময়ে এক গুণিসম্মেলন হয়। সেখানেও গোপালবাবু (মুলো গোপাল), আমার খুল্লপিতামহ মহেশবাবু (খেয়ালিয়া), একজন ভাল সেতারী (নাম স্মরণ নাই) ও কয়েকজন গুণী মৃদঙ্গবাদক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমাদের গান এবং বিদ্যাচর্চার আদান প্রদান বেশ ভালভাবেই হইয়াছিল। কিন্তু তথায় কোনরূপ পেশাদার স্ত্রী-গায়িকাদের সমাগম দেখি নাই। তখনকার দিনে কলিকাতার প্রধান প্রধান বর্দ্ধিষ্ণু ধনী ও জমিদারদিগের মধ্যে অনেকের বাড়ীতে গানবাজনা (ধ্রুপদ, খেয়াল) হইত। কিন্তু সে সকল আসরে কোনওরূপ দ্বেষাদ্বেষী বা ঝগড়া কলহ কিছুই হইত না। বসন্ত হাজরা (মৃদঙ্গী) মহাশয়ের বাজনা একদিন মাত্র বোধহয় অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে হইয়াছিল। দীনু হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে দুই চারিবার আমাদের গান হইয়াছিল। কিন্তু কোনওরূপ ঝগড়া বিবাদ হয় নাই। তখনকার দিনে ধ্রুপদী কেবল ধ্রুপদগান করিতেন, খেয়ালিরা খেয়াল গান করিতেন, টপ্পাবাজ কেবল টপ্পা গান করিতেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে গোপালবাবু (মুলো গোপাল) ধ্রুপদ গাহিতেন, মহেশবাবু খেয়াল গাহিতেন এবং গোঁদল-পাড়ার মধু বাবু টপ্পা গাহিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে গান বাজনা, বিশেষতঃ ধ্রুপদ ও খেয়াল রূপান্তরিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যে যথেচ্ছা-চারিতার ভাব বহুলপরিমাণে দেখা দিয়াছে। এখন সব রকম গান সকলেই করিয়া থাকেন।
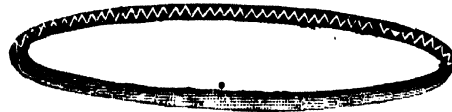
এই যথেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধকল্পে এবং সঙ্গীতের অন্যান্য লুপ্ত বিষয়গুলির উদ্ধারের জন্য সঙ্গীত-সম্মেলনের বৈঠক বসিতেছে এবং প্রায় দশ পনরটী বৈঠকও হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সঙ্গীতের স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সব প্রতিষ্ঠান হইতে বছরে বছরে ছাত্রও বাহির হইতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য রুচি-অনুসারে এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। স্ত্রী-পুরুষ সমান ভাবে গানবাজনা শিখিতেছে—নৃত্যকলার শিক্ষাও ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে। কাশীতে যখন সঙ্গীত-সম্মেলনের বৈঠক বসে তখন সম্মেলনের অধ্যক্ষগণ পেশাদার স্ত্রী-নর্ত্তকী বা গায়িকাদিগকে উক্ত বৈঠকে যোগদান করিতে দেন নাই। বোধ হয় এইরূপ নিষেধ অতি অল্পদিনই রক্ষিত হইয়াছিল। কারণ ইহার পরেই এলাহাবাদ সম্মেলনে দেখা গেল যে স্ত্রী-গায়িকা ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে সম্মেলনের উদ্যোগে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইতেছে তাহাতেও বালকদিগের অপেক্ষা বালিকাগণের কলানৈপুণ্যের অতিমাত্রায় স্তুতি করিয়া তাহাদিগকে অযথা উৎসাহিত করা হইতেছে।

সম্প্রতি কলিকাতায় চারদিন ধরিয়া সঙ্গীতের যে বৈঠক বসিল উহা নামেই All Bengal Music Conference বটে কিন্তু কার্য্যতঃ উহা নাচগানের জলসা বা তামাসা ছাড়া আর কিছুই নহে। হিন্দু সন্তান জুতা পরিয়া দেবদেবীর স্তুতি করিতেছেন—বেশ সুদৃশ্য বটে! বিনা আবাহনে বা স্তব-স্তুতিতে বীণাবাদন—সেও বেশ উত্তম আদর্শ, সন্দেহ নাই! কথাটা উল্লেখযোগ্য বলিয়াই লিখিলাম—যিনি বীণাবাদন করিলেন ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ উজির খাঁ বীণাবাদনের পূর্ব্বে স্তবস্তুতি করিয়া মিনতিপূর্ব্বক নাক কান ধরিয়া সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিতেন। যাক্ সে কথা। রঙ্গমঞ্চের উপরে একধারে নর্ত্তকীগণ অপর দিকে গায়িকাগণ। তাছাড়া পেশাদার গায়ক-বাদকগণের সহিত সৌখীন গায়ক-বাদকদিগের সমান আসনের ব্যবস্থা—সেও বেশ রুচিসঙ্গত। এই কলিকাতাতেই পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সৌখীন গায়কদিগের পৃথক্ আসনের ব্যবস্থা থাকিত। কাহারো বাড়ীতে সভা হইলে সেখানে গৃহস্বামীর সহিত সমান আসনে তাঁহাদের বসিবার বন্দোবস্ত হইত। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে আমরা যে বাড়ীতে এবারে অতিথিরূপে ছিলাম পূর্ব্বে সেখানেও এই ব্যবস্থা দেখিয়াছি। এবারে কিন্তু দেখিলাম — বাড়ীর ভিতরে ভিন্ন-জাতীয় গায়ক, পেশাদার ও সৌখীন সকলেরই বাসস্থানের আয়োজন হইয়াছে। বিজাতীয় ভাবাপন্ন নর্ত্তকীরও থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কেবল ইহাই নহে; হিন্দুর বাড়ীতে যেখানে বিশেষ করিয়া ঠাকুর আছেন ও পূজাদি হইয়া থাকে, সেখানে অমেধ্য খাদ্যাদির ব্যবস্থা ও ম্লেচ্ছরুচির পরিচয় আমাদের মত প্রাচীনপন্থীদের নিকট অতীব অশোভন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বোধ করি, শূণ্য হইতে গৃহকর্ত্তার পূর্বজগণ এ দৃশ্য দর্শন করিয়া আমাদেরই ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া আছেন।

এই All Bengal Music Conference অবশ্য সাধারণের অর্থে অনুষ্ঠিত হইয়াছে—সাধারণের তৃপ্তির জন্যও উহা ব্যয়িত হইবে। কেহ নাচ চায়, তাহাকে নাচ দেখাইতে হইবে, কেহ ঠুমরী চায়, তাহাকে তাহাই শুনাইতে হইবে; কেহ টপ্পা শুনিবে, তাহার জন্য টপ্পার আয়োজন করা আবশ্যক। অনেকে ধ্রুপদ চায় না, এটা ঠিক্—অতএব তাহাদিগকে ধ্রুপদ না দেওয়াই বিধেয়। আমার মনে হয় ধ্রুপদের জন্য পৃথক্ সভা, এইরূপ অন্যান্য সঙ্গীতের জন্য পৃথক্ আসর ও নাচের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যিনি যে জাতীয় সঙ্গীত পছন্দ করেন তিনি সে জাতীয় সঙ্গীতের আসরে আসিবেন। তাহাতে কোনওরূপ গোলযোগ বা অপ্রীতির কারণ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অধিকন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিলে শ্রোতৃবর্গের অর্থব্যয়ও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারিবে। বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছতার দিনে যখন লোকে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে আছে তখন যাহাতে সাধারণের অর্থ অসঙ্গতভাবে ব্যয়িত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও কি কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য নহে?

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ্, বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

ইস্কাবনের টেক্কা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪)

উক্ত ঘটনার পর তিন দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি। মধ্যে একদিন ইন্‌স্পেক্টর-বাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তাঁর মুখে শুনলুম খুনের কিনারা হয়-হয় হ'য়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি খুনীকে ধরতে পারেন, তবে একটু প্রমাণাভাব।

আমার হাসি এলো। একবার একজন অভিনেতা অভিনয়ের শেষে সমালোচককে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন অভিনয় হ'লো, মশাই?" সমালোচক বল্লেন—"চমৎকার হ'য়েছে—শুধু নিষ্প্রাণ।" আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল।

সেদিন বৈকালে খুব খানিকটা ঝড়-বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—একটু বেড়াতে যা'ব মনে করছি, এমন সময় ডাক-পিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল। মনে করলুম চিঠিগুলো দেখে উঠ্‌বো। এক এক করে চিঠি দেখতে দেখতে একখানা দেখে আমি চম্‌কে উঠলুম। সেখানেতে লেখা আছে—"ডাক্তার, তোমাকে সাবধান করার পরেও তুমি প্রমাণ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছো। কেন অকালে মৃত্যুকে ডেকে আন্‌বে? পুলিসকে ভয় আমরা ততটা করি না; কিন্তু তুমি অকারণ কেন আমাদের পথে এসে দাঁড়াচ্ছ? এবারেও তোমাকে সাবধান করে দেওয়া হ'চ্চে, এর পরে তোমার মৃত্যু পরোয়ানা জারী করা হ'বে—সাবধান!" সঙ্গে একখানা ইস্কাবনের টেক্কা।

তা হ'লে আমি ঠিক পথেই যাচ্চি। নইলে টেক্কার তরফ থেকে আমাকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা চল্‌তো না। এ দলটাকে যতটা ধড়ীবাজ মনে করি ততটা নয় দেখছি। তা' যদি হ'তো, তা' হ'লে এরা আমাকে বারবার সাবধান করে' নিজেদের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করতো না।

অবিনাশ এসে বল্লে—"কি হে বেড়াতে যাবার কি হ'লো?"

আমি উঠে পড়ে বল্লুম—হ্যাঁ, চল।" চিঠির কথা তা'কে কিছু বল্লুম না।

অবিনাশ—"কোথায় যাওরা যা'বে?"

আমি—"তুমিই বল।"

অবিনাশ—"ইডেন গার্ডেনের দিকে চল"

আমি—"বেশ।"

গাড়ী নিয়ে বেরুলুম। একটু ঘুরে চৌরঙ্গী দিয়ে চল্লুম। ধর্ম্মতলার মোড়ে পুলিশ গাড়ী রুখে দিলে; স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে হ'ল। একে একে অনেকগুলো গাড়ী দেখতে দেখতে জমে গেল। হঠাৎ আমার চক্ষু পাশেই যে-গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর পড়লো। এক অপরূপ সুন্দরী, সঙ্গে একটী ভদ্রলোক। প্রথম দর্শনে স্ত্রীলোকটীকে মেমসাহেব বলে' ভ্রম হ'য়েছিল।

আমার দৃষ্টির অনুসরণ করে অবিনাশ বলে উঠলো—"কি হে? ব্যাপার কি? বৌদিকে report (রিপোর্ট) করতে হ'বে না কি?"

আমি—"চুপ্।"

অবিনাশ—"একেবারে তন্ময়!"

আমি—"আঃ!"

অবিনাশ চুপ করে গেল।

এই সময় হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মেয়েটী বলে' উঠলো—"সাড়ে ছ'টা বাজে। আমরা বোধহয় দেরীতে গিয়ে পৌঁছুব, দাদা।"

পুরুষ—"এত দেরী হ'য়েছে? ঠিক্ দেখেছিস্?"

ভাল করে দেখবার জন্যে বাইরে হাত বাড়িয়ে সে ঘড়ি দেখলে।

—ওকি!! আমি চম্‌কে উঠলুম। বাঁ-হাতের মণিবন্ধে একটী ছোট্ট লাল জড়ুল চিহ্ন!

পুলিশ বাঁশী দিলে গাড়ীর স্রোত চল্‌লো।

আমার গাড়ী কিন্তু বাঁদিকে না বেঁকে সমান সেণ্ট্রাল এভেনিউ দিয়ে চল্‌তে লাগলো।

অবিনাশ অবাক হ'য়ে বল্লে—"কি হে দিগ্‌ভ্রান্ত হ'লে না কি?"

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলুম—"না।"

অবিনাশ—"তবে কি ঐ গাড়ীটার পিছু নিয়েছ নাকি? এ রোগ তোমার আবার কতদিন থেকে হ'লো?"

আমি—"অনেকদিন থেকে, সখে। আপাততঃ চুপ কর। ঐ গাড়ীতে সুন্দরী আছেন, উনি আমার তিন দিন আগেকার রোগিনী।

অবিনাশ বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠলো—"তাই নাকি? খুব কড়া নার্ভ (nerve) তোমার তো! আমি হলে' তো এতক্ষণ চেঁচিয়ে উঠতুম।"

আমি কোন কথা না বলে' সুন্দরীর গাড়ীর অনুসরণ করে' চল্লুম।

গান

শ্রীঅমল চন্দ্র ঘোষ

দিনের শেষে কোন বিদেশী মন ভুলানো সুরে
এই পরাণের আঙ্গিনাতে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
কি নাম তাহার তাও না জানি হায়,
আমার কাছে সে জন এসে কী গান গেয়ে যায়
সেই কথাটি বলবে কে আমায়
ওগো বলবে কে আমায়

অনেক দিবস হ'তে সে যে করছে আনাগোনা
তবু যে হায় তার সাথে মোর হয় নি জানাশোনা
তবু যে গো এই কথটি জানি
সকল জানার অগোচরে লয় সে আমায় টানি
ওগো লয় সে আমায় টানি।

গাড়ীখানা অনেক রাস্তা ঘুরে, অনেক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শেষে চিৎপুর রোডে উপস্থিত হ'লো। আমি একমুহূর্তের জন্যও তাকে চোখছাড়া করলুম না। সন্ধ্যা হ'লো, পথে পথে আলো জ্বলে উঠলো। আমাদের গাড়ী তখনও চলেছে—চলার বুঝি শেষ নাই।

অবিনাশ বল্লে—'ওরা বুঝেছে তুমি অনুসরণ করছ।'

আমি বল্লুম—'বুঝুক।'

অবিনাশ—'কিন্তু আমরা নিরস্ত্র।'

আমি—'তুমি বটে, আমি নই।'

অবিনাশ আর কিছু বল্লে না, আমাদের গাড়ী যেমন চলছিল, তেমি চলতে লাগলো।

হঠাৎ সামনের গাড়ীখানা একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়লো।

অবিনাশ বল্লে—'কি করবে?'

আমি—'দেখ।'

আমার গাড়ীও গলির মধ্যে ঢুকলো।

গলিটা সরু; একখানার বেশী দু'খানা গাড়ী চলে না। একটা মোড়ের মুখে গিয়ে আমাকে বাধ্য হ'য়ে গাড়ী থামাতে হ'ল। সামনের গাড়ীখানা থেমেছে একখানা বাড়ীর সমুখে ঠিক বেঁকের মাথায়। কি করবো ভাবছি—এমন সময় দু'পাশ থেকে দু'টো রিভলভারের নল আমাদের নাকের কাছে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হ'ল—"নেমে আসুন।"

আমি নামলুম। আমাকে নামতে দেখে অবিনাশও ভাল ছেলেটীর মতন নেমে এলো। আহা, যেন শান্ত, পোষমানা হাতীটী!

আমাদের নিয়ে সামনে একটা বাড়ীতে তারা ঢুকলো। অন্ধকার পথে কোন রকমে আমরা এগুতে লাগলুম। অবিনাশ আমার কানে কানে কি বলবার উপক্রম করতেই তার হাত টিপে আমি বারণ করলুম। কাজেই তার বক্তব্য তারই কাছে রয়ে' গেল। আমরা সিঁড়িতে উঠতে লাগলুম।

দোতলায় উঠতেই ইলেক্ট্রিক আলো জ্বলে উঠলো। আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল একটী সুসজ্জিত ঘরে। আমাদের ঘরের মধ্যে রেখে তারা বাইরে চলে গেল।

অবিনাশ চুপি চুপি বল্লে—"কই হে—তোমার অস্ত্র কই?"

আমি—"ঠিক সময়ে বেরুবে'খন। চুপ কর। শুধু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক।"

অবিনাশ—"সেদিনকার মতন নাকি?"

আমি—"চুপ।"

বাইরে কার পদশব্দ শোনা গেল। একটু পরেই একজন লোক এসে বল্লে—"আপনারা আসুন।"

তার সঙ্গে আমরা বাইরে চল্লুম। বারান্দা পার হ'য়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে দরজা খুললে। তারপর আমাদের ঘরের ভিতর যেতে ইঙ্গিত করলে। সুশীল ও সুবোধ বালকের মতন আমরা তার আদেশ-অনুযায়ী কাজ করলুম। তালা বন্ধ করে সে চলে গেল।

অবিনাশ বল্লে—"ব্যস্! সব চুকে গেল। কই হে তোমার অস্ত্র কই?"

আমি হেসে বল্লুম—"আছে হে, আছে। ঠিক সময়ে বার করবো। এখনও সময় হয়নি।"

অবিনাশ—"শুনে সুখী হ'লুম। এখন তোমার সুন্দরী যে তোমায় বন্দী করলেন।"

আমি—"সুন্দরীরা তো বন্দী করেই থাকেন। তবে এ বাঁধনে বাঁধা থাকলে আমার চলবে না।"

অবিনাশ—"যেচে ফাঁদে পড়ার উদ্দেশ্য?"

আমি—"কিছু নিশ্চয়ই আছে। আজ সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছিল, কোন্ মূর্খ সে সুযোগ পরিত্যাগ করে?"

অবিনাশ—"আমার আশা ছিল সংসারী হ'ব একটা বিয়ে থা' করে—"

বাধা দিয়ে বল্লুম—"হবে হে হবে। বিয়ে হ'বে, সংসার হ'বে, বরযাত্রী যা'ব—"

অবিনাশ—"হ্যাঁ, হুরীর বেশে।"

আমি—"মন্দ কি? রাখ তোমার হ্যাবলামী—আমায় একটু ভাবতে দাও।"

অবিনাশ—"ভাব। আমার খিদে পাচ্ছে।"

এই সময়ে একটী লোক দু'টো প্লেটে করে কিছু খাবার নিয়ে এলো। টেবিলের উপর সে দুটো রেখে, দু গেলাস জল দিয়ে, সে বেরিয়ে গেল। আবার দরজায় তালা বন্ধ হ'লো। বাইরে কার নিয়মিত পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। বুঝলুম একজন প্রহরী নিযুক্ত হ'য়েছে।

সতৃষ্ণদৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে চেয়ে অবিনাশ বল্লে—"কি বল হে?—সদ্ব্যবহার করবো নাকি?"

আমি—"ওগুলি যদি অসদ্ব্যবহার করে?"

অবিনাশ সাগ্রহদৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে চেয়ে বল্লে—"তবে থাক্।"

আমি—"সেই ভাল।"

বসে' বসে' সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকতে লাগলুম। ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হ'ল। দূরে একটা গীর্জ্জার ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। অবিনাশ বল্লে—"ওহে হরেন, কি করবে কর। ওদিকে বউদি খাবার নিয়ে হাঁ করে বসে আছেন নিশ্চয়।"

আমি—"হাঁ, হচ্ছে। এখনও সময় হয়নি। ভালকরে' শোন দেখি বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা? আমি তো পাচ্চি না।"

অবিনাশ ভাল করে' কান পেতে শুনে বল্লে—"না, কোন শব্দ নেই।"

আমি—"তা' হলে আমাদের দরজার প্রহরী বোধ হয় ঘুমিয়েছে।"

দরজায় একবার ঘা দিলুম। কোন সাড়া নেই। একবার যেন একটু নাক ডাকার শব্দও শুনলুম।

বল্লুম—"এইবার হ'য়েছে। অবিনাশ, তুমি চিৎ হ'য়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়। আমি তোমার মাথায় আর মুখে দু'গেলাস জল ঢেলে দি।" চোখ বুজিয়ে শুয়ে পড়ে থাক, মাঝে মাঝে যেন খেঁচুনি হয়। বুঝলে? তারপর যা' করবার আমি করবো। আর তুমিও তারপর স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করো, কেবল দেখবে যেন শব্দ না হয় বেশী।"

অবিনাশ বিনা বাক্যব্যয়ে শুয়ে পড়লো, আমি জল ঢেলে দিলুম। একবার খেঁচুনীর অভিনয় করে চোখ খুলে আমার দিকে চেয়ে অবিনাশ বল্লে—"চলবে?"

হেসে বল্লুম—"splendid! চমৎকার! ডাক্তারেরও সাধ্য নেই যে ধরে।"

আবার অবিনাশের অভিনয় আরম্ভ হ'লো। আমি দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলুম—কে আছ এখানে? কে আছ।"

কে যেন ধড়মড় করে উঠে বসলো। বল্লে—"কি চান?"

আমি—"আমার বন্ধুটী মারা যায়, ভাই। সাহায্য কর। একটু জল দাও।"

তালাখোলা শব্দ পেলুম। একটু পরেই দরজা খুলে লোকটা ভিতরে এলো, তার হাতে একটা রিভলভার। বল্লে—"কি হ'য়েছে?"

আমি যেন উন্মত্তের মতন বলে উঠলুম—জল—জল—একটু জল। বন্ধুটী মারা যায় অবিনাশ—অবিনাশ—ভাই আমার! কি হ'বে, ভাই, একটু জলের কি হ'বে?"

লোকটী একটু ভাবলে। তারপর বাইরে গিয়ে আবার তালা বন্ধ করলে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার তালা খুলে সে ঘরে ঢুকলো। এক হাতে এক লোটা জল আর অন্য হাতে রিভলভার।

ব্যস্তভাবে জলের লোটাটা নিয়ে, যেন অবিনাশের দিকেই আসছি এই রকম ভাব করে ফিরলুম। লোকটাও পিছন ফিরলে বাইরে যাবার জন্যে। ঝাঁ'করে তার সামনে ঘুরে গিয়ে সেই একলোটা জল সজোরে তার মুখে ছুড়ে দিলুম। লোকটা হতভম্ব হ'য়ে যেমন মুখ মুছতে যাবে, আমি অমনি ঝাকরে' তার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিলুম। তারপর তার দিকে লক্ষ্য করে বল্লুম—"খবরদার! চেঁচিয়েছ কি মরেছ।"

লোকটা একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক। অবিনাশ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

বল্লুম—"অবিনাশ, এই দেখ আমার অস্ত্র। এইবার দরজাটা বন্ধ করে দাও।" অবিনাশ তাই করলে।

লোকটাকে বল্লুম—"যা' বলি তার উত্তর দাও। নইলে মরেছ। আমার গাড়ী কোথায়? কোন উত্তর নেই।

তার বুকের উপর রিভলভারটা ছুঁইয়ে বল্লুম—"কথা কও—উত্তর দাও। এক—দুই—"তাড়াতাড়ি লোকটা বল্লে—"গ্যারাজে।"

আমি—"চল সেখানে। কিন্তু সাবধান! একটু চালাকি করেছ কি ঘোড়া টিপেছি।

তুমি তো যা'বে, তারপর আমাদের যা' হয় হ'বে। বুঝেছ? এখন চল।"

লোকটা আগে আগে চল্লো', আর অবিনাশ রইলো তার হাত ধরে'। আমি লোকটার পিঠে পিস্তল দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চল্লুম। নীচে নেমে এলুম।

অন্ধকার পথটা খুব সন্তর্পণে পার হ'বার পর সদর দরজায় এলুম। অবিনাশ হাতড়ে হাতড়ে দরজা খুলতে লাগলো। পাশের ঘর থেকে কে জিজ্ঞাসা করলে—"কে?"

আমি পিস্তলটা লোকটার পিঠে একটু চেপে ধরে চাপা স্বরে বল্লুম—"সাড়া দাও।"

লোকটা দাঁত কড়মড় করে উঠলো', কিন্তু বল্লে—"আমি রামানীস্।"

আর কোন প্রশ্ন হ'লো না। এদিকে দরজাও খোলা হ'ল।

রাস্তায় এলুম। জনমানব নেই। বল্লুম—"কোথায় গ্যারাজ?"

লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্লো। গ্যারেজে তালা দেওয়া!

আমি—'অবিনাশ, ভেঙে ফেল তালা।'

অবিনাশ—"শব্দ হ'বে না?"

আমি—"তাই তো।"

লোকটা একটু নড়লো। পিস্তল তার পিঠে চেপে ধরে বল্লুম—"খবরদার! অবিনাশ, ভেঙে ফেল তালা। একটু শব্দ হয় হোক।"

অবিনাশ একবার মোচর দিলে। বল্লে—"হবে না, ভাই। একটু বেশী জোর দিতে হ'বে। দাঁড়াও।" খানিক পরেই অবিনাশের দারুণ মোচরের সশব্দে তালাটা ভেঙে গেল।

(ক্রমশঃ)

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

(চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন)

রত্নাকর

গত ১৩ই এপ্রিল শনিবার সকাল ৯টার সময় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসের প্রাতরনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবস্থা অনুসারে বেলা ৮টার সময় programme আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখি যে অনেক শ্রোতৃবৃন্দ প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন কিন্তু তখনও programme আরম্ভ হইবার কোন সূচনাই নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই এবং প্রবেশ-দ্বারের স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে একজনও তখন আসিয়া উপস্থিত হন নাই—সে কারণেই সমবেত শ্রোতৃবর্গ বাহিরে Booking office এর আশে পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং ৮।৪০ মিনিটের পূর্ব্বে auditorium এ প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমন্ত্রিত গায়ক-বাদকগণ উপস্থিত না হওয়ার দরুণ programme আরম্ভ করিতে না পারার কারণ খানিকটা বুঝিতে পারা যায় কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের অনুপস্থিতির জন্য প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকার কোনও রুচিসঙ্গত কারণ ত দেখা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষগণ টিকিট বিক্রয় করিয়া একটী public function এর আয়োজন করিয়াছিলেন; সুতরাং উপস্থিত সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ যাহাতে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিতে কোনও অসুবিধা ভোগ না করেন, সে দিকে দৃষ্টি রাখা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই?

যাহা হউক বেলা ৯টার সময় programme আরম্ভ হইলে প্রথমে চারিজন প্রতিযোগির demonstration হইয়া যায়। তাহার পর শ্রীযুক্ত বিনোদলাল গোস্বামী মহাশয় ধ্রুপদের demonstration আরম্ভ করেন। তিনি চৌতালে রামকেলীরাগের ধ্রুপদ গান করেন। গোস্বামী মহাশয় বয়সে অর্ব্বাচীন নহেন—তাঁহারই কাছে আমরা শুনিয়াছি যে তিনি ভারতবিখ্যাত অনেক ধ্রুপদীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন—আলোচ্য দিবসে তিনি স্বর্গত গুণিপ্রবর আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সুললিত স্বরের অনুকরণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে ধ্রুপদ গান শুনাইবেন এইরূপ আভাস তাঁহারই মুখে আমরা পূর্ব্বাহ্নে পাইয়াছিলাম। তাঁহার বিশ্বাস যে সাধারণতঃ ধ্রুপদীরা বড় অস্বাভাবিক চীৎকার করিয়া সুরের মাধুর্য্য নষ্ট করেন ও শ্রোতৃগণকে এইভাবে বড়ই পীড়িত করিয়া তোলেন; এইজন্য গোস্বামী মহাশয় সুমধুর স্বরে ধ্রুপদ শুনাইয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু, আমরা সেদিন যাহা শুনিলাম তাহা যদি তাঁহার মতে শ্রুতিমধুর ও মোলায়েম স্বরের গান হয় তাহা হইলে তাঁহার ওজস্বিকণ্ঠের হুঙ্কার শুনিবার মত সাহস জনসাধারণের আছে বলিয়া তঁ মনে হয় না। কারণ তাঁহার সুললিত স্বরলহরী মাত্র পাঁচ মিনিট কাল শ্রবণ করিতে না করিতেই প্রেক্ষাগৃহের তিন তলা হইতে একতলা পর্য্যন্ত সকল স্থান হইতেই শ্রোতৃবর্গ ঘন ঘন করতালি দিয়া তাঁহাকে গান বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু, "উলটা বুঝিলি রাম"—গোস্বামী মহাশয় সেই করতালিধ্বনিকে তাঁহার গানের

evation মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ও প্রোচ্চণ্ড স্বরে গান গাহিয়া চলিলেন। যত জোরে করতালি পড়িতে লাগিল, গোঁসাইজীও তত জোরে গলা চড়াইতে লাগিলেন। পনর মিনিট কাল এই-ভাবে উভয়পক্ষের tug-of-war চলিল। পরে দানীবাবুর ইঙ্গিতে গোঁসাইজী গান বন্ধ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে আসন হইতে উঠিয়া গেলেন। এ দৃশ্য হইতে যাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছেন, এরূপ কোনও ভাষা নাই যাহা দ্বারা তাঁহাদের নিকট বিশদভাবে আমরা ইহা বর্ণনা করিয়া দিতে পারি। যাহা হউক, গোঁসাইজীর রামকেলীর মধ্যে আমরা কেবলই ভৈরবের ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। রামকেলী ও ভৈরবের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তিনি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বজায় রাখিতে পারেন নাই। কারণ, রাম-কেলীতে কোমল ধৈবতের ব্যবহার ভৈরব অপেক্ষা বহুল এবং রামকেলীর ধৈবত সর্ব্বদা নিষাদাশ্রিত। গোঁসাইজী ধৈবতের বহু-প্রয়োগ ত করেনই নাই অধিকন্তু ধৈবতকে নিষাদাশ্রিত না করিয়া তিনি শুদ্ধভাবে কোমল-ধৈবত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়সের পক্ষে এ জাতীয় ত্রুটী মোটেই শোভনীয় হইতে পারে না।

ধ্রুপদগানের পর কুমিল্লার সেতারিয়া আলি আহম্মদ ভৈরবী বাজাইলেন। কলিকাতায় যে সকল গুণী সেতারিয়া আছেন তাঁহাদের বাজনার সহিত ইঁহার বাজনার কোনই তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর বাদককে —যাঁহার নাম আবার প্রোগ্রামে ছিল না— বাহির হইতে আনাইয়া demonstration দেওয়াইয়া অযথা সময় অপব্যবহারের কোন সঙ্গত হেতু দেখা যায় না।

সেতার বাজনার পর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু) মাত্র পাঁচমিনিট-কাল টপ্পা গান করেন। বর্ত্তমান বয়সে কালোবাবুর Conference-এ demonstration দিবার মত শক্তি যখন নাই, তখন তাঁহার পক্ষে অল্পসময়ের জন্য কেবল একবার শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করার প্রলোভন সংযত করিলেই সুধীজনোচিত বলিয়া বিবেচিত হইত। টপ্পাগানের পর বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তবলাবাদক প্রো: সামসুদ্দিন হায়দার তবলায় দুইটী বিভিন্ন তালে (ত্রিতালা তিনতালায় ও ১৯ মাত্রার বাজিত্রাতালে) লহরা বাজান। প্রোফেসর যে একজন বিশিষ্ট গুণী তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে তাঁহার লহরা অপেক্ষা গানের সহিত সঙ্গত করিবার রীতি আরও উচ্চাঙ্গের বলিয়া মনে হয়। লহরার পর কুমারী গীতা রায় দেশী রাগের একখানি খেয়াল গাহিলেন। দেশীকে যথার্থ ভাবে রূপায়িত করিতে হইলে শ্রুতির নিপুণ ব্যবহার আবশ্যক। কেবল মাত্র কোমল নিষাদ বা কোমল ধৈবত প্রয়োগ করিলে দেশীর রূপ কখনই রীতিসঙ্গতভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমতী তাঁহার গানে শ্রুতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু একই তানের পুনরাবৃত্তির জন্য গানটী বড়ই এক-ঘেয়ে হইয়াছিল। কুমারী আরও বেশ কিছুদিন নিয়মিতভাবে শিক্ষানবীশী করিলে তবেই সাধারণ্যে গাহিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। গানের পর শ্রীযুক্ত মণ্টু ব্যানার্জ্জী টোড়িরাগে হারমোনিয়াম বাজাইলেন। মণ্টুবাবুর বাজনার মধ্যে এমন কোনই বিশেষত্ব ছিল না যাহার জন্য তিনি Music Conference এ demonostration পাইতে পারেন—তবে সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহার তাও বাতলানতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে programme এ স্থান দিয়া থাকেন তবে উহা স্বতন্ত্র কথা। সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক বড়ই আশ্রিতবৎসল—তিনি মুখ ফুটিয়া কাহারও আবদার অসঙ্গত হইলেও উহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমাদের বিবেচনায় তিনি যদি নিজের বাড়ীতে এই শ্রেণীর বাদক বা গায়কদিগের লইয়া জলসা করেন তাহা হইলেই উহা বেশ শোভন হয় —গুণিসমাজে এ জাতীয় শিল্পীর বাজনা বা গান যে চলিতে পারে না তাহা বুঝিয়া ভবিষ্যতে তিনি ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি শিল্পী নির্ব্বাচনে বিশেষ মনোযোগী হন তাহা হইলে জনসাধারণের তরফ হইতে বলিবার কিছু থাকে না। যে সম্মেলনে শ্রীযুক্ত মুনেশ্বর দয়াল হারমোনিয়াম বাজাইয়া শ্রোতৃ-বর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন সেখানে মণ্টুবাবুর বাজাইবার আগ্রহ যে ধৃষ্টতা মাত্র তাহাতে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, যন্ত্র হিসাবে সঙ্গীত জগতে harmonium এর যে বিশেষ কোনও স্থান নাই তাহা সুধীগণ বিলক্ষণই জানেন। প্রাচীনপন্থীর গায়কগণ তাঁহাদের গানের সহিত harmoniumকে অনুগামী যন্ত্রহিসাব ব্যবহার করিতে ঘোর আপত্তি প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে conference এ স্বতন্ত্রভাবে harmonium এর demonstration এর কোন আবশ্যকতাই নাই। তবে যদি অতি সুনিপুণ কোন শিল্পী উহা বাজান তাহা হইলে তাঁহার বাজনা বেশ উপভোগ্য হইতে পারে—নচেৎ নিতান্ত সাধারণশ্রেণীর বাদকের হাতে এই যন্ত্রের বাজনা শ্রোতৃ-বর্গের কর্ণ পীড়াই জন্মাইয়া থাকে।

মণ্টুবাবুর বাজনার পর ৺ কাশীধামের গুণিপ্রবর স্বর্গত পণ্ডিত শিবসেবক মিশ্রের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র ও পণ্ডিত শ্রীভবানীসেবক মিশ্র টোড়ীরাগের দুইখানি খেয়াল (একখানি বিলম্বিত এক-তালায় ও অপরটী দ্রুতত্রিতালীতে) গান করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এটর্নী-এট্-ল মহাশয় তবলা-সঙ্গত করিয়া-ছিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণের খেয়ালে যে প্রয়োগনৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মনে হয় যে বাংলার তরফ হইতে বর্ত্তমান Conference এ আমরা যে কয় জন

খেয়ালিয়ার গান শুনিয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার স্থান যে সকলের উচ্চে ইহাতে কোনও বিসংবাদ থাকিতে পারে না। রাগের যথাযথ বিস্তারে, তানকর্ত্তবের বৈচিত্র্যে ও লয়ের অসামান্য দক্ষতায় পণ্ডিতজী তাঁহার খেয়াল গানে যে আভিজাত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে পণ্ডিতজীর পূর্ব্বপুরুষগণের ঘরানা গৌরব তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছি। গানের সহিত উপযুক্ত সঙ্গত হইলে যে কিরূপ অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হইতে পারে তাহা পণ্ডিতজীর গান ও হীরেন্দ্রবাবুর তবলা-সঙ্গত যাঁহারা ঐদিন শুনিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পণ্ডিতজীর গানের পর প্রো: মস্তাক আলি খাঁ সেতারে ভৈরবীর গৎ বাজাইলেন। ইহার সহিত প্রো: অনাথনাথ বসু তবলা সঙ্গত করেন। প্রোফেসর সাহেবের বাজনা আমরা গতবৎসর Conference-এ শুনিয়াছি এবং এবৎসরও শুনিলাম, কিন্তু তাহার বাজনায় কোনও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে মঙ্গলের বিষয় এই যে তিনি মাত্র পাঁচ-মিনিটকাল বাজাইয়াছিলেন।

সেতার বাজনার পর বোম্বাইএর বিখ্যাত খেয়ালিয়া প্রো: আলাদিয়া খাঁসাহেবের সুযোগ্য শিষ্যা শ্রীমতী কেশর বাই (কারকার) প্রথমে গান্ধারীর একখানি খেয়াল গান করিয়া পরে দুইখানি শুদ্ধ সারঙ্গের খেয়াল গান করেন। পরিশেষে একখানি ভৈরবীর ভজন গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ তৃপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী প্রায় ২॥০ ঘণ্টা কাল ধরিয়া তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁহার গানের সহিত ভারত-বিখ্যাত তবলিয়া প্রো: মহম্মদ জান (থেরাকুয়া) সঙ্গত করেন। শ্রীমতীর গানের সহিত সেদিনকার প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান শেষ হয়। *

* শ্রীমতীর গানের আলোচনা আমাদের শেষ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ ষ্টেপলটনএর স্থলে বর্ত্তমানে বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ এ, কে, সেন নিযুক্ত হলে আমরা আশা করেছিলাম যে হয়ত বা গতানুগতিক ধারার পরিবর্ত্তন কিছু পরিলক্ষিত হবে; কিন্তু আকাশ কুসুমের ন্যায় আমাদের সে আশা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মিঃ সেন বেতারের কোন উন্নতিরই কিংবা নতুনত্বের কোন আভাষই দিতে সক্ষম হন নি।

* * *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে শ্রোতাদের জনসাধারণের যে সব অভাব অভিযোগ ইতিপূর্ব্বে ছিল আজিও তা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। বহু শ্রোতা পত্রযোগে আমাদের জানিয়েছেন যে, সব অনুরোধ তাঁরা বেতার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানান সেগুলির প্রত্যুত্তরে আশার বাণী শোনানো হয় বটে; কিন্তু কার্য্যকালে বিশেষ কিছুই ঘটে ওঠে না।

* * *

প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে আমরা ভেবেছিলাম বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর বাংলা দেশের জনশিক্ষার প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেন বিশেষ করে কিন্তু সেদিকের নতুন কোন পরিচয়ই নেই। ইংরাজ ষ্টেশন ডাইরেক্টরের আমলে প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে যে ধারা অবলোকন করেছিলুম বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের বেলায়ও তার কোন ব্যতিক্রম দেখি না। তবে আমরা নতুন কী পেলুম?

* * *

মহিলা আসর দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান নিয়ে এযাবৎ বহু আলোচনা করেছি কিন্তু যে আঁধারে সে আঁধারেই। মহিলা আসরের জন্যে এক ঘণ্টা কোনদিন বা দেড় ঘণ্টা মাত্র সময় নির্দ্দিষ্ট। তার মধ্যে আছে গ্রামোফোন রেকর্ড, পনের মিনিট মাত্র বক্তৃতা আর বাকী সময় গান বাজনা। বক্তৃতার মধ্যে অধিকাংশই বাজে। মহিলা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং সাহিত্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রয়োজনানুযায়ী থাকে না। বেতারে এ বিভাগটির গুরুত্ব কর্ত্তৃপক্ষ উপলব্ধি করেন না। তাই এ বিভাগের প্রোগ্রামে দেখি জোড়া তালির ব্যবস্থা—কোন রকমে সময়টাকে কাটিয়ে দেওয়া।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে পাঁচালী আসর এবং ধর্ম্ম বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত বাজে লাগে। গৌরমোহনবাবুর সঙ্গীতের সুরে বেসুরো কণ্ঠে শ্লোক আওড়ানো অত্যন্ত শ্রুতিকটু। পণ্ডিত অশোক শাস্ত্রীর মদ্ভাগবৎ পাঠ আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা নিয়মিত ভাবে পেতে চাই।

* * *

এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যিক অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য খানিকটা নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সাহিত্য বিষয়ক বৈষ্ণবধর্ম্ম সাহিত্য সম্বন্ধে সঙ্গীতাদির মধ্য দিয়ে তাঁর আলোচনাগুলি আমাদের খুবই ভালো লাগতো। শ্রীমতী লীলা দেবীও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রোগ্রামগুলিও বেশ সুখশ্রাব্য হয়। নির্ম্মল ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থাপনায় সঙ্গীতানুষ্ঠানও উপভোগ্য হয়।

শ্রীদুর্ব্বাসা

পাঠকবর্গের বোধহয় স্মরণ আছে যে হাতের বিভাগে অনুযায়ী অনারের পিটের তারতম্যে গেম বা স্লাম হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত হাতখানি লক্ষ্য করলে অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে আপাতঃদৃষ্টিতে যে খেলায় গেম করা অসম্ভব বলে মনে হয়, সেই হাতে ডাকদার স্লাম পর্য্যন্ত ডেকে অনায়াসে স্লাম করে নিয়ে গেছেন। যদিও এই স্লামের ডাক দেওয়া ডাকদারের পক্ষে হঠকারিতা প্রকাশক, তথাপি তিনি সবিশেষ কারণ বশতঃই উক্তরূপ ডাক দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। হাতটি এইরূপ

ইস্কাবন—গোলাম, ×, ×, ×, ×।

হরতন—সাহেব, ×, ×, ×।

রুহিতন—টেক্কা, সাতা।

চিড়িতন—দশ।

উ

ইস্কাবন—নাই।

হরতন—টেক্কা, ×।

রুহিতন—সাহেব, গোলাম দশ, ×, ×।

চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, ×, ×, ×।

ডাক হয়েছিল,

দ	প
একটি চিড়িতন।	পাশ।
দুইটি রুহিতন।	পাশ।
তিনটি চিড়িতন।	পাশ।
চারটি ফেরাই।	পাশ।
ছয়টি রুহিতন।	পাশ।

উ	পূ
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
দুইটি ফেরাই।	পাশ।
তিনটি রুহিতন।	পাশ।
পাঁচটি চিড়িতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।

(১) 'প' হরতনের বিবি খেলায় ডাকদার সাহেব মেরে পিটখানি নিলেন। ডাকদার সাহেব দিয়ে পিট নেবার পূর্ব্বে এই ভেবে দেখলেন যে চিড়িতন রঙটিকে দাঁড় করাতে না পারলে খেলা করা একেবারে অসম্ভব, অতএব প্রথমে সাহেব দিয়ে পিটখানি নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

(২) 'উ'র হাত এবার চিড়িতনের দশ-খানি খেলে ডাকদার গোলাম দিয়ে ফিনাস করে পিটখানি নিলেন। এইস্থলে সাধারণ খেলোয়াড়দের মধ্যে মতদ্বৈধ হবে এই নিয়ে যে যখন পিট আপনা হইতেই পাওয়া যায়, হাতে যখন টেক্কা-সাহেব রয়েছে তখন গোলাম দিয়ে ফিনাস করতে যাওয়া মূর্খের কাজ। কিন্তু এবিষয়ে ভাল করে চিন্তা করলে বুঝতে পারা যাবে যে এ ক্ষেত্রে এরূপভাবে খেলা বিশেষ প্রয়োজন। ডাকদারদের সম্মিলিত হাতে সাতখানি চিড়িতন, প্রতিপক্ষের হাতে মোট ছয়খানি। এখন এই ছয়খানির বিভাগ ২-৪, ৩-৩, ৫-১, বা ৬-০ হতে পারে; অতএব যেরূপ বিভাগ হওয়া বিশেষ সম্ভবপর সেইটাই আন্দাজ করে নেওয়া উচিত। চিড়ের বিভাগ যদি ৫-১ বা ৬-০ হয় তো খেলা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কাজে কাজেই ৪-২ বা ৩-৩ হিসাবে খেলা করতে যাওয়া উচিত। এ-স্থলে ৪-২ বিভাগ ধরেই খেলা যুক্তিসিদ্ধ, কারণ ৩-৩ বিভাগ ধরে খেলতে গেলে খেলা অতি সহজ হয়ে যায়। এখন যদি উক্ত ফিনাস গ্রহণ কার্য্যকরী না হয়, তাহলে স্লাম হওয়া একেবারে অসম্ভব।

(৩) 'দ' এবার চিড়িতনের দুরি খেলে ডামির হাতে তুরুপ করে নিলেন।

(৪) ডামি 'উ' রুহিতনের টেক্কা খেলে পিট নিলেন।

(৫) 'উ' হরতনের ছোট একতাস খেলায় ডাকদার টেক্কা দিয়ে পিট ধরলেন।

(৬) তারপর ডাকদার রুহিতনের সাহেব খেলে পিট নিয়ে রুহিতনের গোলাম খেলে বিপক্ষদের পিট দিয়ে বাকি সব কয়খানি পিট নিয়ে ডাকানুযায়ী খেলা করে নিলেন। চারিটী হাত ছিল এইরূপ।

ইস্কাবন—গোলাম, আটা, সতা, পঞ্জা, চৌকা, দুরি।

হরতন—সাহেব, আটা, চৌকা, তিরি।

রুহিতন—টেক্কা, সাতা।

চিড়িতন—দশ।

ইস্কাবন—নয়, দুরি।

হরতন—বিবি, গোলাম, ছক্কা, পঞ্জা, দুরি।

রুহিতন—বিবি, নয়, পঞ্জা, দুরি।

চিড়িনন—×, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, দশ, ছক্কা।

হরতন—দশ, সাতা।

রুহিতন—নয়, চৌকা।

চিড়িতন—বিবি, নয়, পঞ্জা, চৌকা।

ইস্কাবন—নাই।

হরতন—টেক্কা, দুরি।

রুহিতন—সাহেব, গোলাম, দশ, ছক্কা, তিরি।

চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, সাতা, ছক্কা, দুরি।

প্যারামাউন্ট-এর "হার-জঙ্গল-লাভ" চিত্রে ডরথি লামুর ও রে মিলাণ্ড। ছবিখানা গত শুক্রবার থেকে রিগ্যাল-এ দেখান হচ্ছে।

পরিচালক

টেলিগ্রাম ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ টেলিফোন

'ন্যারিটি' সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, ত্রিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ১৯শে মে ১৯৩৮

মিলন না আর কিছু?

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। রাজবন্দী ও আন্দামান-প্রত্যাগত বন্দীদের মুক্তি প্রসঙ্গে বাংলা সরকার এক বে-সরকারী সমিতি গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইবেন এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্র নাথ বসু, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ সদস্য পদে মনোনীত হইবেন। এই সমিতি যাঁহাদের মুক্তি সুপারিশ করিবেন বাংলা সরকার তাঁহাদের মুক্তির আদেশ দিবেন। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইবে—আমাদের দার্জ্জিলিং-স্থিত সংবাদদাতা এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে মন্দের ভাল হিসাবে বাংলার রাজবন্দী সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইবে।

অপর পক্ষে বাংলা কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত প্রাধান্য-প্রসূত দলাদলির এক মিমাংসা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, নিখিল-ভারতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার পক্ষে প্রাদেশিক কংগ্রেসের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেওয়া সম্ভবপর নহে। সেই জন্য নাকি ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁহাকে বাংলার কংগ্রেস কর্ম্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে কর্পোরেশনে ও এ্যাসেম্ব্লিতে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কর্পোরেশনে ডাঃ কুমুদ শঙ্কর রায় অল্ডারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং ডাঃ বিধান চন্দ্র তাঁহার স্থলে অল্ডার-ম্যান নির্ব্বাচিত হইবেন। আবার রায় হরেন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিলে ডাঃ রায় নির্ব্বাচিত হইয়া এ্যাসেম্ব্লিতে প্রবেশ করিবেন এবং এ্যাসেম্ব্লিতে নাকি তিনি শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বেই কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা এই মিলনে বিশ্বাস করি না কারণ অর্থসচিব মহাশয়ের সহিত ডাঃ রায় যে প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ তাহাতে তিনি যে কতদিন বসুভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্ব অবিচলিতচিত্তে মানিয়া চলিতে পারিবেন তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে ডাঃ রায় তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন তিনি অবশ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তবে যতদিন না শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা" পরিহার করেন ততদিন ডাঃ রায়ের প্রতিশ্রুতির কোন মুল্য নাই বলিয়া আমরা মনে করি কারণ নলিনী-কিরণের অচ্ছেদ্য বন্ধন অদ্যাপিও অটুট। যাহা হউক রাষ্ট্রপতির অভিলাষ যদি বাংলার কংগ্রেসী মহলে সত্যই মিলন সাধন করিতে পারে তাহা বিশেষ আনন্দের বিষয়।

তবে রাষ্ট্রপতি একটু ভাবিয়া দেখিবেন যে একবার ডাঃ রায়কে কর্পোরেশন ও এ্যাসেম্ব্লির মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিলে রাষ্ট্রপতি যখন বাংলার বাহিরে পরিভ্রমণে রত থাকিবেন এবং নষ্টস্বাস্থ্য শরৎচন্দ্র স্বাস্থ্য-উদ্ধারে কলিকাতার বাহিরে যাইবেন সেই সময়ে বিধানচন্দ্র কাউন্সিলার ও এ্যাসেম্ব্লির সদস্যদের মধ্যে বর্ণচোরাদের যেন একেবারে কুক্ষীগত করিয়া না ফেলেন। শ্রীযুক্ত বিধু সরকার প্রভৃতির আনুগত্য কোন দিকে তাহা সর্ব্বজনবিদিত। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে সে আনুগত্যকে ষড়যন্ত্রে পরিণত করিবার লোভ ডাঃ বিধানচন্দ্র সম্বরণ করিতে পারিবেন ত?

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

আজও সমান ভাবে 'বিদ্যাপতি' চিত্রার ভরা আসর জমিয়ে রেখেচে। অর্থাগমের দিক দিয়ে বিদ্যাপতি যে বিশেষ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হ'য়েচে—একথা মানতেই হ'বে।

বাঙলার নর-নারীদের মাতিয়ে রাখবার মত বহু উপাদান বিদ্যাপতি চিত্রে আছে। পদাবলীর গানগুলির এমন একটা মোহ আছে যা একবার শুনলে বার বার শুনতে ইচ্ছা করে। তা ছাড়া এতে আছে, পরিচালক দেবকী বাবুর সৃষ্টি—এর অনুরাধা চরিত্রটি। এই ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে মাত করে দিয়েছেন কাননবালা।

আশাকরি 'বিদ্যাপতি' এখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চিত্রায় দর্শক আকর্ষণ কোরতে থাকবে।

* * *

'অভিজ্ঞানে'র শেষ দৃশ্যের একটি অংশ গত সপ্তাহে ১নং ষ্টুডিওতে তোলা হোল।

এটি প্রমথর আশ্রয় থেকে নায়িকা সন্ধ্যার বিদায় দৃশ্য। একদিকে স্বামী এবং এক-দিকে তার দুর্দ্দিনের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা প্রমথ। উভয়ের বন্ধু ও আত্মীয় প্রকাশও জামশেদপুর থেকে এসেছিল, সন্ধ্যার জীবনের চরম বিরোধের দিনে পরামর্শদাতারূপে। কিন্তু তর্কযুদ্ধে প্রকাশকে শেষ পর্য্যন্ত হার স্বীকার কোরতে হোল। স্বামীর সঙ্গে ফিরে যেতে সে সন্ধ্যাকে রাজী করাতে পারলে না।

একদিকে বিবেক ও মনুষ্যত্ব এবং অন্য দিকে তার স্বামী ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার জীবন দেবতা কোন পথে সায় দিল, তা' এখন অনুমান করা শক্ত। তবু সে অনুমানের সুযোগ দিতে আমরা নিশ্চুপ রইলাম। সন্ধ্যার জীবনের শেষ পরিণতি আপনারা অবিলম্বেই ছবির পর্দ্দায় দেখতে পাবেন।

প্রমথ ও প্রকাশের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরবেন বাঙলার দুই জনপ্রিয় শিল্পী—জীবন গাঙ্গোপাধ্যায় ও শৈলেন চৌধুরী। সন্ধ্যার চরিত্রের রূপ দেবেন—শ্রীমতী মলিনা।

অভিজ্ঞান এর মত একখানি 'drama'কে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকের রুচি অনুযায়ী যতখানি entertaining করা সম্ভব, তা' কোরতে এই চিত্রের চিত্র-নাট্যকার কার্পণ্য করেন নি। সঙ্গীত আকর্ষণ ছাড়াও, এই চিত্রের অপর কয়েকটি 'টাইপ চরিত্রে' হাল্কা রস পরিবেশন কোরবেন—পঙ্কজ মল্লিক, বিনয় গোস্বামী, অহি সান্যাল প্রভৃতি।

এই ছবির কয়েকটি 'Patch work' এখনও বাকী আছে। সম্পাদন কার্য্য

নিউথিয়েটার্সের "অভিজ্ঞান" চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে মলিনা, দেববালা ও শৈলেন চৌধুরী

বাহির হইল

সমাজ,
শাসন, ও
শৃঙ্খলা, এই নিয়ে
মেতে উঠলো

"ত্রিমূর্ত্তি"

নারী হত্যা কর্ত্তেও সে কুণ্ঠা বোধ কর্লেনা
সুরু হল সংস্কার না অত্যাচার?
সমাজ তাকে মেনে নিলে কিনা?

নারী হত্যার কারণ কি?

এ রহস্য আপনাদের সামনে প্রকাশ
কর্বে 'বিভীষিকা' সিরিজের
প্রথম নিবেদন—
রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ
উপন্যাস
ত্রিমূর্ত্তি

বাহির হইল
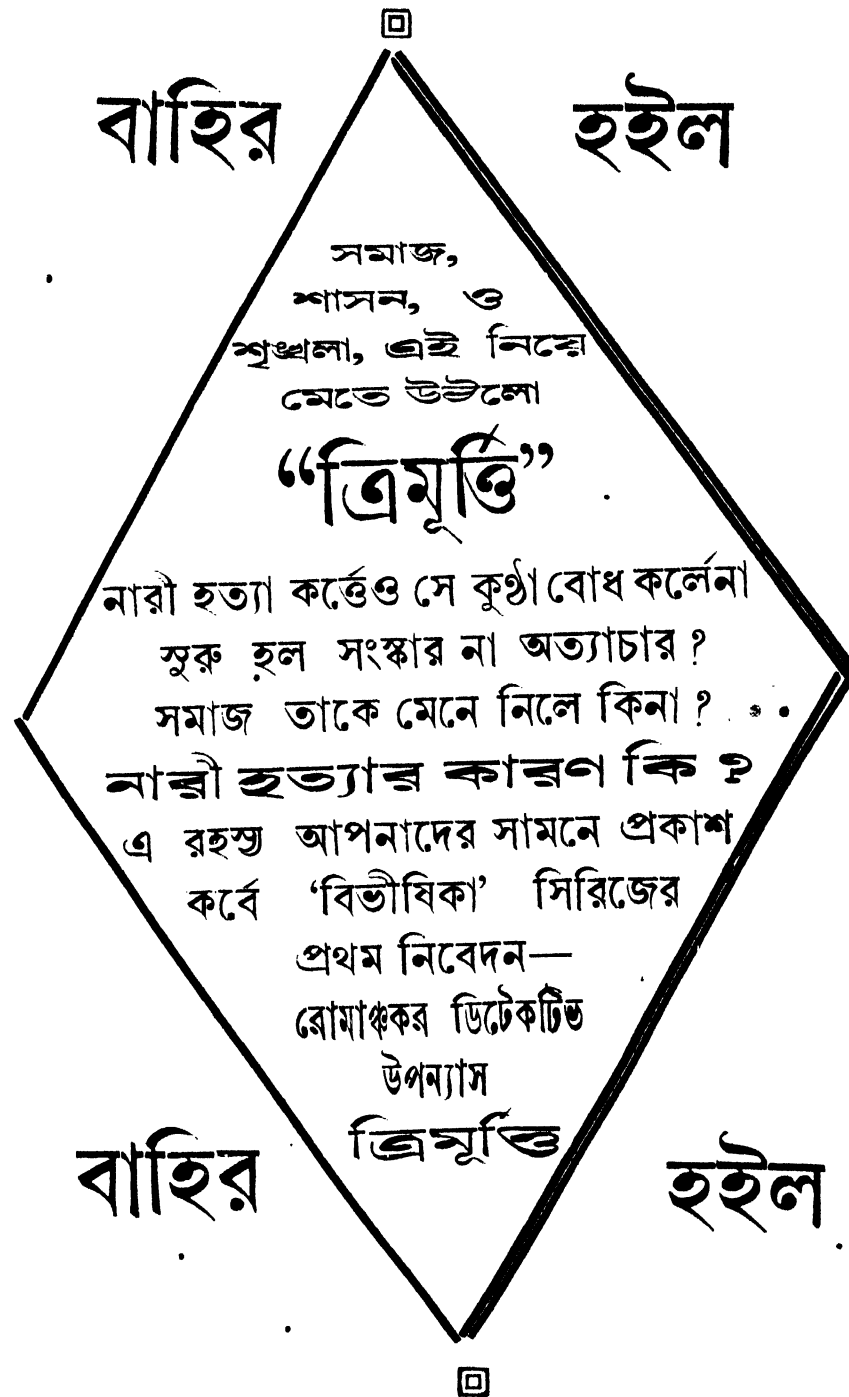
—প্রকাশক—

কথা সাহিত্য পরিষদ

১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), ভবানীপুর, কলিকাতা।

নির্দোষ ভাবে সুসম্পন্ন কোরতে হোলে—এই 'Patch'-গুলি প্রয়োজন। পরিচালক প্রফুল্ল বাবু সম্প্রতি সে কার্য্যে অবহিত আছেন। হিন্দি ছবির 'ট্রেলার' তৈরী হ'য়েচে। বাঙলা ট্রেলার খানি খুব সম্ভবতঃ এক হপ্তাতেই রূপবাণী ও চিত্রাতে মুক্তি লাভ কোরবে।

* * *

বড়দিদি সম্বন্ধে ছোট্ট একটি খবর এ সপ্তাহে জানিয়ে রাখি। শ্রীমতী চন্দ্রাবতী হিন্দি সংস্করণেও 'শান্তি'-র ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরবেন। এই বিশিষ্ট চরিত্রের অভিনয় কালে যাতে তাঁর হিন্দি উচ্চারণ নির্দোষ হয় এবং কোন রকম জড়তা না আসে, তার জন্যে পরিচালক মল্লিক মশাই, হিন্দি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা কোরেছেন। ষ্টুডিওর অপর একটি মহলা-ঘরে এই অভিনেত্রীটি নিয়মিত ভাবে, প্রতিদিন হিন্দি উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা কোরছেন।

আমাদের মনে হয়, শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর মত একজন সুশিক্ষিতা অভিনেত্রীর পক্ষে, সামান্য চেষ্টাতেই হিন্দি ভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি আয়ত্ব করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না। তাছাড়া ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী হিন্দি পূজারিন্ চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরেছেন। আশা-করি এবার অতিরিক্ত যত্ন, সতর্কতা ও সাধনার ফলে, তাঁর দ্বারা অভিনীত এ নতুন ভূমিকাটি, বাংলার মতই সাবলীল হোয়ে উঠবে।

* * *

পরিচালক ফণি মজুমদার এ সপ্তাহে বেশী ব্যস্ত ছিলেন 'ভুলুয়া' বা 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' অপেক্ষা 'অভিজ্ঞান'এর কাজে। এতাবৎ তিনি প্রতিদিন দুখানি ছবিতেই কাজ করে আসছিলেন কিন্তু এ সপ্তাহে তা হয়নি।

নিউথিয়েটার্সে'র "অধিকার" চিত্রের একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যথাক্রমে রাধা ও নিখিলেশের ভূমিকায় মেনকা ও বড়ুয়া।

একদিনের শুটিং-এর খবর আমরা পেয়েছি। স্নিগ্ধ-যৌবন-শ্রী-মণ্ডিতা-অভিনেত্রী মঞ্জু অর্থাৎ শ্রীমতী কাননের রূপমায়ায় বন্দী ও মুগ্ধ—শিক্ষিত, সৌখীন, বকাটে 'ডায়মণ্ড থিয়েটার' এর নটসূর্য্য অমর চাঁদ মানে শৈলেন চৌধুরী মোটর গাড়ী চালিয়ে চলেছেন পাশে তাঁর প্রিয়তমা। অমর কত কথা বল্লে, মঞ্জু কি সে সব কথা বুঝতে পারে?......

হাতের রুমালটা তুলে বল্লে: বলুনতো এটা কি?—সবাই হো হো করে হেসে উঠল। রুমালটা যেন একটা কি জানোয়ার তৈরী হয়েছে।

অন্ধকার হতে আলোয় এগিয়ে এসে পরিচালক নীতীন বোস 'বুকে জড়িয়ে ধরলেন পরিচালক ফণিকে, প্রকাশ করলেন nice idea,—it is wonderful.

ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্তকে কাছে ডেকে বল্লেন বেশ ভাল লাইটিং হয়েছিল।

হিন্দী অমরচাঁদ জগদীশ শেঠির হাতে হাত মেলালেন।

ক্লোরের কটকে ঝোলা কম্বলের পাশ হতে বাহিরে এলেন বড়াল রাইচাঁদ। ঠোঁটের 'মার্কোভিচে' কাঠির আগুন পড়ল। একরাশ ধোঁয়া, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে এলো বেরিয়ে। মগজে তাঁর তখন নতুন সুর জন্ম নিচ্ছে—পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা—

* * *

এ্যাটর্নি অম্বিকাচরণএর chamber এর দৃশ্যগুলি পরিচালক বড়ুয়া সাহেব গেল হপ্তায়

শেষ করে ফেলেছেন। এ হপ্তায় বস্তীর কয়েকটী দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে। এই দৃশ্য কয়টী তোলা হ'লে বইএর প্রায় বার আনা ভাগ শেষ হয়ে যাবে। বাকী চার আনা আর মাস খানেকের মধ্যেই শেষ হ'বে। সুতরাং মনে হয় জুনের মধ্যেই 'অধিকার' এর উভয় সংস্করণই শেষ হ'বে। সাবাস্ বড়ুয়া। Speed এ তোমার সমকক্ষ কেউ নেই।

* * *

দেশের মাটির কাজ প্রায় সমাপ্তির দিকে টেনে এনেছে। ষ্টুডিওর মধ্যে যে যে বিরাট ঝড়ের সিন্ তোলা হচ্ছে তা শেষ হ'তে বোধ হয় আর এক সপ্তাহ লাগবে। ঝড়ের দৃশ্যগুলি নেবার জন্যে যে বিরাট ব্যবস্থা করতে হয়েছে তা একমাত্র নিউ থিয়েটার্স এর মত প্রতিষ্ঠানএর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। গল্পের নতুনত্ব দৃশ্যের অভিনবত্ব, পঙ্কজ বাবুর অভিনব সঙ্গীত মূর্চ্ছণা এবং সর্ব্বোপরি নীতীন বাবুর নিখুঁত পরিচালনায় 'দেশের মাটি' যে আমাদের সিনেমা ইণ্ডাষ্ট্রিকে অনেক দূর এগিয়ে দেবে তা আমরা জোর করেই সাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছি।

"চোখের বালি"

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত বি, পি, মেহেরা প্রযোজিত "চোখের বালি" সমাপ্তির পথে। যে গতিতে কাজ চলেছে তা'তে মনে হয়, এই মাসের মধ্যেই ছবিখানির শূটিং শেষ হ'য়ে যাবে। "চোখের বালি" সম্বন্ধে নানা খবরই পূর্ব্বে প্রকাশিত হ'য়েছে। এবারকার সবচেয়ে বড় খবর হ'চ্ছে, এই ছবিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি অনাস্বাদিত সঙ্গীত সাধারণের শোনবার সৌভাগ্য হবে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুর-সংযোগে যাঁরা একমাত্র অধিকারী শান্তিনিকেতন থেকে তাঁরা এসেছেন কোল্‌কাতায় "চোখের বালি"-র সুর-সংযোজনার জন্য। সুতরাং সব-দিক থেকেই ছবিখানাকে আভিজাত্য-গৌরবে বিভূষিত কর্‌বার জন্যে এই ছবির প্রযোজক যে যোগাযোগ করেছেন—তা'তে তাঁর রুচি-জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রশংসা করা যায়। নতুন রূপে, নতুন রসে রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি" যদি চিত্রামোদীদের সন্তুষ্টিসাধন কোরতে পারে তা' হ'লে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী থাক্‌তে পারে।

দীনু পিক্‌চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম হাস্যরসাত্মক চিত্র "রেশমী রুমাল" জুনের প্রারম্ভেই 'শ্রী' চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করিবে। মঞ্চ-সাফল্য-নাটক হিসাবে "রেশমী রুমাল" যা'তে হাস্যরসের ফল্গুধারায় সবাইকে অবগাহন করাতে পারে সুদক্ষ পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী সে চেষ্টাই কোরেছেন। ছবিখানিতে যাঁরা নেমেছেন জনপ্রিয়তার দিক থেকে ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, প্রভা, ঊষা, সাবিত্রী, প্রকাশমনির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাজরা পিক্‌চাস

কত বছর আগে কে জানে—জঙ্গলে বুনোরা বাস কোর্‌ত—পেশা ছিল তাদের পশু হত্যা করা। হিংস্র পশু অপেক্ষাও তারা ছিল ভয়ঙ্কর। একটা জাতির জীবনে এই বর্ব্বরতা তাদের দিন টেনে নিয়ে চলে-ছিল যে পথে—সেই পথে আর কিছুদিন যদি তারা এগিয়ে চলত তা হ'লে জগদ্ব্যাপী উঠত এক হাহাকার। স্বর্গ থেকে মহামায়া এই দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে না পেরে ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর ও পুত্রবধূ ছায়াকে পাঠালেন মর্ত্তে কালকেতু ও ফুল্লরারূপে এই বুনোদের এক নির্ভীক ও সত্যবাদী জাতিতে গঠন করবার জন্যে।... তারপর ফুল্লরা ও কালকেতুর আরব্ধ কার্য্য সুরু হ'ল এবং নানা ঘটনা বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে তারা নিজেদের কাজ শেষ কোরে স্বর্গে চলে গেলেন। পৌরাণিক যতগুলি ঘটনা এতাবধি চিত্রে রূপান্তরিত হ'য়েছে, কাহিনী হিসাবে "দেবী ফুল্লরা" সত্যই চমকপ্রদ! বাঙ্গলার অন্যতম অভিজ্ঞ জনপ্রিয় চিত্র-পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এই কাহিনীটিকে সবদিক থেকেই সাধারণের মনোরঞ্জনে যা'তে সমর্থ হয় সেই চেষ্টাই কোরেছেন। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী একজন কর্ম্মী লোক—এই বৃদ্ধবয়সেও তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাঁর নিজহাতে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে যে সুনামের উচ্চশিখরে আসীন কোরবে—একথা বলাই বাহুল্য। তিনকড়ি বাবুর সহকারী হিসাবে কালীপদ রায়ও এই ছবির জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার কোরেছেন।

এই সপ্তাহে ছবিখানির শূটিং শেষ হ'য়ে গেল। রাজপ্রাসাদের একটি বিরাট সেটে অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুবালা, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নিজ নিজ ভূমি-কায় অসামান্য অভিনয় চাতুর্য্যের নিদর্শন দেখিয়ে সেদিন শূটিংয়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের চমকৃত কোরেচেন। 'উত্তরা'য় ছবি-খানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে।

পূর্ণ থিয়েটার

মুক্তির 'অষ্টম' সপ্তাহ শেষ হয়ে এলো। সপ্তম সপ্তাহে প্রায় দু'হাজার টাকা সেল্ হয়েছে। এই চিত্রগৃহে এর আগে কোন ছবিই এত অর্থাগম করতে পারেনি। এই সেল্ রিপোর্ট দেখে আমাদের মনে হয় যে এ ছবি বেশ ভাল ভাবেই দশ সপ্তাহ

চল্‌বে। অবশ্য এতদিন যে চল্‌বে তা কেউ আগে ধারণা করতে পারেনি। ছবির মধ্যে মাল মশলা থাক্‌লে এই ভাবেই চলে।

রূপবাণী

এই শনিবার থেকে মঙ্গলবার অবধি এখানে নিউ থিয়েটার্সের বিজয়া পুনরায় প্রদর্শিত হবে। আধুনিক প্রণয় কাহিনী হিসাবে "বিজয়া" বাঙলা কথা-সাহিত্যে অনন্য সাধারণ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বললেও হয়তো অত্যুক্তি হয় না। "বিজয়ার" এই পুণরাগমন চিত্র-রসিকগণের নিকট আনন্দ আয়োজন সন্দেহ নেই। "বিজয়ার" পর বুধবার থেকে শুক্রবার অবধি রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক ছবি—কৃষ্ণ সুদামা প্রদর্শিত হবে। ভক্তিরসঅনুরাগীদের জন্য এই আয়োজন ক'রে রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ হলেন।

মোশন পিকচার্স—এসোসিয়েশন্

আগামী শনিবার ২১শে মে দক্ষিণ কলিকাতায় আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বাঙ্গলা দেশে একটী স্থায়ী মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন্ গঠন করবার উদ্দেশ্যে একটী সভা হবে। বাঙ্গলার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষরিত একটী নিমন্ত্রণ পত্র-ও বিলি করা হয়েচে। এই প্রচেষ্টার জন্য উদ্যোক্তাদের আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

(পত্র)

এবারকার সঙ্গীত সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকারের সঙ্গীত। তিনি বোম্বায়ের সুবিখ্যাত ওস্তাদ ওহায়দ খাঁর শিষ্যা। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে শ্রীমতীকে খাঁসাহেব আবদুল করিম খাঁ সাহেবের শিষ্যা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমতীর গানের ঢঙ পণ্ডিত বালগন্ধর্ব ও পণ্ডিত কৃষ্ণরাও-এর style এর সহিত মেলে; তবে কোথাও কোথাও খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁর ছাপ বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কণ্ঠ মধুর, সুরেলা ও ঝাঁম। সহজ ও টুকরা টুক্‌রা তানে শ্রীমতী কণ্ঠে সুরের ইন্দ্রজাল বুনিয়া ছিলেন। খেয়ালের গম্ভীর ও ছুট্‌তান, গমক ও তানের বিস্তার না থাকিলেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুরের কাজগুলি অসঙ্গীতজ্ঞদেরও চিত্তে চমৎকার জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি স্থির-ধীরভাবে বসিয়া ধীরে অতি ধীরে যেরূপ অনবদ্য-ভঙ্গীতে প্রকৃতির জীবন্ত স্নিগ্ধরূপ গানের প্রতিটি ছত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন সে নৈপুণ্য শ্রীমতী হীরাবাই-এর সঙ্গীত যিনি শুনেন নাই, তিনি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমরা আশা করি, এই তরুণ গীত-সাধিকার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।

পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ ঠাকুরের "শুদ্ধ কল্যাণ" রাগের খেয়াল গানখানি, খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁ সাহেবের "ওডিয়ন" রেকর্ডের ছায়া বেশ সুস্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল। তাঁহার বিলম্বিত বিস্তার, দ্রুত তান, বোল বাট ইত্যাদির সময় একই রাগের রূপ ছিল না। প্রথমে "ভূপালি" ও "সালেশরী"র ছায়া প্রকট হইয়াছিল। "ভৈরো-বাহারে"র খেয়ালটী "মেরে বসন্ত কি মোবারক" গানখানি শত করা ৫০ ভাগ "আভীর-ভৈরবী"। গানের মুখ মধ্য সপ্তকে ছিল না। মন্দার-সপ্তকের কোমল নিখাদ থেকে সুরু হয়েছিল, যাহা বাহারে রীতি-বিরুদ্ধ, বাহারের প্রধান স্থান মধ্য-সপ্তকের মধ্যম, তার-সপ্তকের ষড়জ (সা) পর্য্যন্ত। অস্থায়ী মন্দার-সপ্তকের ধৈবত, মধ্য-সপ্তকের মধ্যে হইয়াছিল। অস্থায়ী আখেরি তান শুদ্ধ গান্ধার থেকে কোমল ঋষভে আসিতেছিল। ইহা ভৈরোয় চলে না। ভৈরো-বাহার দুই সংযুক্ত রাগ, ষড়জ থেকে মধ্য-সপ্তকের মধ্যম (সা, রে, গা, মা,) পর্য্যন্ত। পণ্ডিতজী বাহারে নি, ধা, নি, সা, রে রে সা, এই সরগম লাগাইতেছিলেন। কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। বাহারে পা, মা, নি, ধা, নি, সা—এই সরগম লাগান উচিত। যেমন প্রাচীন সুবিখ্যাত "ডারিয়া ঝোক রে হি" গানখানি গোয়ালিয়ারের ওস্তাদেরা গাহিয়া থাকেন।

পণ্ডিতজীর ২য় দ্রুত তালের "যৌবনা রে" গানখানি আগেরটির চেয়ে ভাল গেয়েছেন। তানবন্ধনে beauty ও link ছিল না, যেমন ওস্তাদ ফয়েজখাঁর থাকে। দ্রুত সরগমের কিছু ওলট পালট হয়েছিল। "ধা, নি, ধা, সা," "নি, সা, ধা, নি অনেকবার repeat করেছিলেন। এ সরগম বাহার-বিরুদ্ধ।

রামু মিশ্রের মিয়া কি তোড়ী রাগের খেয়াল গানখানি তান ও লয় শুদ্ধ—নীরস ও প্রাণহীন। সুরে কোন বৈচিত্র্য ছিল না।

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁহার patent মালকোষ রাগের "পীর না জানে" খেয়াল গানখানি গাইয়াছিলেন। আলাপের চার অংশের কোন অংশেরই রূপের বিকাশ দেখা যায় নাই। সুরের বা তানের কোন বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। তেলঙ্গ তেতালা গানখানির বোল বাটের কোন সৌন্দর্য্য ছিল না। ঠুম্‌রী গানে style এর অভাব। রাস্তা ভুলিয়া পথ খুঁজিতেছিলেন, পথ পাওয়ার আগেই গান শেষ হইয়াছিল কণ্ঠ মিষ্ট, light technique শুদ্ধ, সুরে দরদ, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। ইতি

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস

[এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত পাইলে আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব। সঃ খেঃ]

রবীন্দ্রনাথের
চোখের বালি
মুক্তি-পথে
বি, পি, মেহেরার
প্রযোজনায়
সুপ্রভা মুখার্জ্জি
ইন্দিরা রায়
শান্তিলতা ঘোষ
রমা ব্যানার্জ্জি
ডা: হরেন মুখার্জ্জি
ছবি বিশ্বাস
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অভিনীত

কলিকাতায় এনাক্ষী রমা রাও

এনাক্ষী রমা রাও শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছেন। অতিরঞ্জিত কিম্বা ভিত্তিহীন সংবাদ নহে। প্রভাত সিনেমায় "জায়গীরদারের" পরই ভাবনানীর ছবি "অমর প্রেম" দেখান হ'বে এবং উক্ত ছবির নায়িকা দেবদাসীর ভূমিকায় এনাক্ষী রমা রাওকে দেখা যাবে। ভাবনানীর ছবি এবং এনাক্ষী রমা রাও—উভয়েরই অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, যাঁরা ছবি ভালবাসেন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা ছবি দেখে থাকেন তাঁরাই জানেন অভিনয় নৈপুণ্যে এনাক্ষী রমা রাও কতদূর পারদর্শিনী। সুতরাং বহুদিন পরে এনাক্ষী রমা রাওয়ের কলিকাতায় আগমনে চিত্রামোদী মাত্রেই উৎফুল্ল হবেন।

মন্দির-পূজারিণী দেবদাসী এনাক্ষী রমা রাও নিজের খেয়ালে নিজেই আত্মহারা। মনে মনে সে জানে মন্দির পূজারিণী মন্দির নর্ত্তকী সে দেবতার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। তাই আপনার মনে সে মন্দির-দেবতার সম্মুখে নৃত্যে নিজের প্রেমকে ব্যক্ত করে।

মন্দিরে এল রাজা। নিজের পাপে জর্জ্জরিত হয়ে রাজা এল মন্দিরে দেবতা অমরনাথের সম্মুখে নিজ পাপ ব্যক্ত করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কিন্তু দৈব প্রতিকূল। নৃত্যরতা দেবদাসীকে দেখে রাজার মনে পুনরায় লালসার বহ্নি জেগে উঠে। প্রধান মন্ত্রীকে উৎকোচে বশীভূত করে রাজা দেবদাসীকে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এল। রাজা দেবদাসীকে বিবাহ করবে। কিন্তু দেবদাসী এতে আপত্তি জানিয়ে বলে এ কোন প্রকারে হ'তে পারে না, এ যে অসম্ভব। মন্দিরের দেবদাসী সে, দেবতা অমরনাথের চরণে সে উৎসর্গীকৃতা। মর্ত্তের মানবের সঙ্গে তার পরিণয় অসম্ভব।

মন্দিরেই থাকত বীরভদ্র। একজন উদাসীন, সে ভালবেসেছিল দেবদাসীকে, কিন্তু মনের নিভৃত কোনে সে প্রেম লুকান থাকত। রাজা যখন দেবদাসীকে প্রাসাদে নিয়ে যায় বীরেন্দ্র চুপে চুপে তাদের অনুসরণ করে এবং রাজকন্যার সাহার্য্যে দেবদাসীকে নিয়ে পলায়ন করে। কিন্তু রাজার সৈন্য তাদের গ্রেপ্তার করে। লাঞ্ছিত বীরেন্দ্র পথের ধূলায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। কতিপয় সাধু বীরভদ্রকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করে ও তুষারতীর্থে যেখানে দেবতা অমরনাথ অবস্থান করেন সেখানে নিয়ে যায়। ওদিকে দেবদাসীর অপমান দেবতার অপমান। দেবতা অমরনাথের রোষাগ্নি জ্বলে উঠে। চতুর্দ্দিকে প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা সুরু হয়—তারপর···রাজার শোচনীয় পরিণতি—দেবদাসীর পরিণাম—বীরভদ্রের অবস্থা—আপনাকে বিস্মিত ও হতবাক্ করবে।

ছবিখানির বিশেষত্ব এই যে এর সম্পূর্ণ দৃশ্য নির্ব্বাচন করা হয়েছে কাশ্মীর ও অন্যান্য যথানির্দ্দিষ্ট জায়গা থেকে। বিরাট হিমালয় পর্ব্বত, অতুলনীয় তুষাররাজি ও ভূমিকম্পের দৃশ্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষতঃ কাশ্মীরের নয়ন-মনোহর দৃশ্যাদি ছবিখানির এক অপূর্ব্ব সম্পদ।

তামিল ছবির সাফল্য

গত রবিবার সকাল ১১টায় মেট্রোপলিটান পিক্‌চার্সের পৌরাণিক তামিল ছবি "দক্ষ-যজ্ঞ" প্রভাত সিনেমায় দেখান হয়। ছবিখানি অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছে। দর্শকের ভীড় হয়েছিল খুবই। দক্ষিণ ভারতীয়—যারা কলিকাতায় আছেন তাদের জন্য এ বন্দোবস্ত করে প্রভাত সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ—ব্যবসায় দিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন বলতে হবে।

আসছে রবিবার বেলা ১১টায় শ্রীভারত লক্ষ্মী পিক্‌চার্সের তেলেগু ছবি "রুক্মিণী কল্যানম্" দেখান হবে। ছবিখানির গল্পাংশ পৌরাণিক এবং ভারতের সকল অঞ্চলেই সুপরিচিত। "দক্ষযজ্ঞের" ন্যায় এ ছবিখানাও তামিলবাসীগণ কর্ত্তৃক আদৃত হবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জায়গীরদার

প্রভাত সিনেমায় সাগর মুভিটোনের হিন্দি সামাজিক ছবি "জায়গীরদার" দর্শকগণ অভাবনীয়রূপে গ্রহণ করেছে। শনিবার থেকে ছবিখানা তৃতীয় সপ্তাহে পড়ল। ছবিখানা এখানে আরও কিছুদিন চলবে বলে মনে হয়, হিন্দি ছবি হলেও এর "হিন্দি" এত সহজ যে বাঙ্গালী মাত্রই তা বুঝতে সক্ষম হবে এবং এ জন্যে বাঙ্গালী দর্শক মহলেও এ ছবিখানার আদর আছে।

ছবিখানার গল্পাংশ খুবই সহজ ও সরল। এবং নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে পরিচালক মহাশয় গল্পের গতির ধারা বজায় রেখেছেন। আবহ সঙ্গীত, গান ছবিখানার অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া কতিপয় দৃশ্যে,—যথা

সরাইখানায় অগ্নিকাণ্ড, মোটর দৌড় ইত্যাদির ফটোগ্রাফী হয়েছে অনবদ্য।

বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ইয়াকুব, ও মায়া ব্যানার্জ্জি। একখানা প্রথম শ্রেণীর ছবি দেখার আনন্দ "জায়গীরদার" দেখে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এ কথা জোর করেই বলা যেতে পারে।

উৎকৃষ্ট সিনেমা হাউস

খারাপ জায়গায় ভাল জিনিষ থাওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি ভাল ছবি হলেই হয় না। বস্‌বার ভাল বন্দোবস্তটি চাই। তবেই ভাল ছবি দেখার বিমল আনন্দ উপভোগ করা যায়। এ গরমের দিনে হাউসটি হবে ঠাণ্ডা, আসনটি হবে আরামপ্রদ—চতুর্দ্দিকের আবহাওয়া হবে স্নিগ্ধকর এবং এর প্রত্যেকটি বন্দোবস্তই "প্রভাত সিনেমায়" পাবেন। পুরাতন ম্যাডান থিয়েটারকে আমূল সংস্কার করে নূতন বন্দোবস্তে নূতন নাম "প্রভাত সিনেমায়" রূপান্তরিত করা হয়েছে।

আপনারা যদু চক্রবর্ত্তীর নাম শুনিয়াছেন কি? নামটি নূতন হইলেও বহু পরিচিত। এই যদু চক্রবর্ত্তী অন্য কেহ নহে—'দেশের মাটি' চিত্রের একটি বিশেষ চরিত্র। আমাদের মধ্যে যাঁহারা গ্রামে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে গ্রামের একজন মোড়ল থাকে, সে গ্রামের ও সমাজের শাসন কর্ত্তা। আমাদের আলোচ্য যদু চক্রবর্ত্তীও সেই মোড়ল, কোন গ্রামের তাহা জানিবার প্রয়োজন নাই। মোড়ল জাতীয় লোকেরা অন্য লোকের মোড়লি সহ্য করিতে পারে না—সেইজন্য একই গ্রামে দুইজন মোড়ল দেখা যায় না, যদি এমন অবস্থা হয় তাহা হইলে গ্রামের শান্তি নষ্ট হয়—গ্রামবাসীদেরও জীবন অসহ্য হইয়া ওঠে।

আমাদের আলোচ্য যদু চক্রবর্ত্তীর টাকা ছিল, ক্ষমতা ছিল, আর ছিল তাহার কাছে গ্রামের বহুজনের জমি জমা বাঁধা। এই জোরে সে সকলকে সহজেই নিজের শাসন স্বীকার করাইতে বাধ্য করিত। কিন্তু মানুষের দিন সমান যায় না।

যে গ্রামে যদু চক্রবর্ত্তীর বাস—কোথা হইতে সেই গ্রামে আসিল একদল সহরে যুবক—অশোক তাহাদের নেতা। এই যুবকদলের অন্য কাজ নাই বোধহয়, তাই

তাহারা গ্রামে বাস করিয়া চাষবাস করিতে চায়। যদু চক্রবর্ত্তীর নিকট ব্যাপারটা ভাল ঠেকিল না। ডাক্তার, উকিল, ব্যবসাদার—এই সকল শিক্ষিত লোকেদের কথনও বিশ্বাস করা যায় না—তাহারা কি না করিতে পারে। গ্রামের লোক বোকা, তাহাদের দ্বারা সহজেই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইতে পারে।

কিন্তু আসল কথা তাহা নয়। যদু চক্রবর্ত্তীর ভয় হইল তাহার নিজের মোড়লির কথা মনে করিয়া। লোক যতদিন মূর্খ থাকে, তাহার উপর বহু কিছু চালান যায়, কিন্তু একবার তাহার বুদ্ধি খুলিলে এবং আত্মপ্রত্যয় ঘটিলে সহজে আর তাহার উপর মোড়লি করা যায় না। বহু যদু চক্রবর্ত্তী বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে রাজত্ব করিতেছে—সমাজের, দেশের কল্যাণ তাহারা দেখে না। তাহারা চায় কেবল নিজেদের শক্তি এবং অর্থ বৃদ্ধি।

নিউ থিয়েটার্সে'র 'দেশের মাটি' চিত্রে আমাদের আলোচ্য এই যদু চক্রবর্ত্তীর দেখা পাইবেন। দেখিলেই চিনিতে পারিবেন যে অমর মল্লিক এই ভূমিকায় অভিনয় করিতে-ছেন। যদুর চরিত্র যেমন ভাবে চিত্রিত হইতেছে তাহাতে তাহাকে অভিনয় বলিয়া মনে করিবার অবকাশ খুব কমই আছে।

কিন্তু আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় এই যদু চক্রবর্ত্তীর জীবনকথা নহে। আমরা আলোচনা করিতে চাই কেমন করিয়া কোন পথে গ্রামের জীবনে সকল প্রকার ভেদ-বিবাদ দূর করিয়া গ্রামবাসীদের একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদের দুঃখ কষ্টের অনেক অংশ লাঘব করা যায়। 'দেশের মাটি' চিত্রেও এই বিষয়ে নানা ভাবে নানা কথা বলা হইয়াছে, এবং ইহার কাহিনীর অন্তরালে দেখানো হইয়াছে যে যদু চক্রবর্ত্তীর মত ভীষণ লোকের মনের কুটিল গতির পরিবর্ত্তন করা সম্ভব।

লোকে আজ গ্রামে বাস করিতে চায় না। গ্রামে আজ আর কোন সুখ বা আনন্দ নাই। সামান্য নানা প্রকার ক্ষুদ্রতা লইয়া আজ তাহারা দিন কাটাইতেছে। অথচ একথা সত্য যে গ্রামের শতকরা ৯০ ভাগ দুঃখকে যদু চক্রবর্ত্তীর মত লোকেরাই ইচ্ছা

"দেশের মাটী" চিত্রে যদু চক্রবর্ত্তীর ভূমিকায়—অমর মল্লিক

করিলে দূর করিতে পারে। যে লোক আজ চুরি, ডাকাতি এবং খুন খারাবি করিয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহার মনের দরজায় ঠিক ভাবে এবং ঠিক সময়ে ঘা দিতে পারিলে সেই ব্যক্তিই এক নিমিষে মানুষের পরম সেবকে পরিণত হইতে পারে। যে মানুষ কেবল হত্যাই করিত, সেই মানুষই নিজের প্রাণ দিয়া পরকে বাঁচাইবে। যদু চক্রবর্ত্তীর জীবনেও এই ঘটনা একদিন পরম সত্যের রূপে দেখা দিয়াছিল। কেমন ভাবে এবং কি করিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল, কোন অমৃত পরশ পাইয়া তাহার শুষ্ক প্রাণ সজল হইয়াছিল, তাহা আমাদের বক্তব্য বিষয় নহে, তাহা 'দেশের মাটি' চিত্রের কথা, এবং যথাসময়েই তাহা আপনারা দেখিতে পাইবেন। আমরা কেবল এই কথা মাত্র বলিতে পারি যে, এমন দিন যেন দেশে অচিরে আসে যখন যদু চক্রবর্ত্তীর দল আমাদের 'দেশের মাটি' যদু চক্রবর্ত্তীতে পরিণত হইবে।

এই যদু চক্রবর্ত্তীর জীবনে গৌরী নামক একটি গ্রাম্য বালিকার প্রভাব অতি অদ্ভুত ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই গৌরীর নামেই যদু চক্রবর্ত্তী একদিন কলঙ্ক আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। অথচ ভবিষ্যতে আর একদিন এই গৌরীকেই সে মা বলিয়া সম্বোধন করিতে কোন সঙ্কোচই বোধ করে নাই। যাহার নামের সহিত গৌরীর নাম যুক্ত করিয়া যদু চক্রবর্ত্তী কুৎসা রটনা করিয়াছিল, পরে একদিন সেই অশোককে সেই যদু চক্রবর্ত্তী বুকে জড়াইয়া ধরিতেও লজ্জা বোধ করে নাই। মানুষের মনের গতি কোন ভাবে, কোন বিচিত্র পথে কোন সময় নিজের যাত্রাপথ বাছিয়া লয়, তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে সকল সময় আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু মানুষের মনে যে দেবতা অলক্ষ্যে বসিয়া অঘটন ঘটাইতেছেন—সেই দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদ সকল সময় আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে। আশীর্ব্বাদ ইঙ্গিত বুঝিয়া যে জন কাজ করিতে পারে, জীবন পথ চলিতে পারে—সেই জনই কেবলমাত্র মানুষের সেবাতে নিজেকে দান করে। 'দেশের মাটি' চিত্রে যদু চক্রবর্ত্তীর জীবন লক্ষ করিবার বিষয় এবং যে ব্যক্তি এই চরিত্রটিকে বাস্তব-রূপ দিতেছে—তাহার অদ্ভুত ক্ষমতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

*

তিনখানি
স্মরণীয়
চিত্র
অবিলম্বে
আসিতেছে

*

হাজরা পিকচার্সের পৌরাণিক চিত্রার্ঘ্য…

ভূমিকায় : অহীন্দ্র, শিশুবালা, মনোরঞ্জন, রাধারাণী, মোহন, সাবিত্রী

দিনু পিকচার্সের হাসির ঝরণা ধারা…

শ্রেষ্ঠাংশে : ডাঃ হরেণ, প্রভা, ঊষা দেবী, সাবিত্রী, প্রকাশমণি, কমলা

রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সামাজিক আলেখ্য…

বুকিংয়ের জন্য
আবেদন করুন

রীতেন
এণ্ড কোং

৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট

ফোন :

তরুণ সম্প্রদায়

গত ১৫ই মে রবিবার অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে তরুণ সম্প্রদায়ের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

প্রথমে সম্পাদক শ্রীবিনয় ভূষণ বসু বার্ষিক বিবরণীতে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, ছেলেদের নৈতিক চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্যে ড্রিল করান হয়। তৎপর সম্প্রদায়ের সভাপতি শ্রীযুত সদাশিব মিত্র মহাশয় একটি সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ কথায় ভারতের ব্যায়াম চর্চ্চার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্প্রদায়ের সভ্যগণ নানারূপ শারীরিক ব্যায়াম কৌশলের মধ্য দিয়া ফিজিকাল ড্রিল, তরবারি, সোর্ড ড্রিল, হরাইজেণ্টল বার ও ব্যালেন্সিং বেশ চমকপ্রদ করিয়াছিল, এবং ক্লাইং ট্রেপিজের খেলার সাফল্যের জন্য সম্প্রদায়ের শিক্ষক শ্রীযুত সন্তোষকুমার নন্দীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মোটের উপর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমানে অভিনব আয়োজন!

বাংলার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা ও বাদকগণের সমাবেশে বর্দ্ধমান জেলা সঙ্গীত প্রতিযোগীতা ও জলসা।

স্থান—"বিচিত্রা", বর্দ্ধমান।

তারিখ—১৫ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

বর্দ্ধমান জেলাবাসী যে কেহ এই প্রতিযোগীতায় যোগদান করিতে পারিবেন, তাঁহারা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ৷৷০ আনা ফি-সহ সঙ্গীত ও বাদ্যের শ্রেণী উল্লেখে ১০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে "শ্রীপ্রমথনাথ দে, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বর্দ্ধমান" এই ঠিকানায় আবেদন করুন। এক বা একাধিক শ্রেণীতে যোগদান করা চলিবে।

কণ্ঠ সঙ্গীত—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন ও আধুনিক বাংলা।

যন্ত্র সঙ্গীত—সেতার, এস্রাজ ও ব্যঞ্জ।

মাননীয় মিঃ এস্, সি, মিত্র

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র গত-সপ্তাহে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন, তথায় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি মাননীয় মিঃ আজিজুল হক অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা অধিকার সমিতিতে যোগদান করিবেন। মিত্র মহাশয় আগামী ১লা জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শরৎচন্দ্র বসু

কংগ্রেসী বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎ বসুর স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাইয়ের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি প্রায়ই দার্জ্জিলিং ও কার্শিয়াং যাতায়াত করিতেছেন।

কবিরাজ গণনাথ সেন

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয় প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে পুরী যাইবার সময় ট্রেনের কামরার মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় প'ড়য়া আহত হন। এতদিন পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন বর্ত্তমানে তাঁহাকে কলিকাতার ভবনে আনা হইয়াছে। যদিও তিনি এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন তবে এখনও শয্যাগত এবং আরও মাসাবধিকাল তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হওয়া সম্ভবপর নহে। তিনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠুন ইহাই আমরা কামনা করি।

শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীঅবিনাশ ভট্টাচার্য্য স্বগ্রামে পাণিগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের (বরানগর) উদ্যোগে, প্রথম বাৎসরিক "রচনা ও আবৃত্তি" প্রতিযোগিতা হইবে।

রচনার বিষয় বস্তু—

সর্ব্বশ্রেণীর বালক বালিকাদিগের জন্য:

"বর্ত্তমান যুগে কাব্যের স্থান কোথায়?"

আবৃত্তির বিষয় বস্তু—

১। ৭ম হইতে ১০ম শ্রেণীর বালকদিগের জন্য— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"সেকাল"

২। সর্ব্বশ্রেণীর বালকদিগের জন্য:
যতীন্দ্রমোহন বাগচী—"অন্ধবধূ"

৩। ৬ষ্ঠ হইতে নিম্ন শ্রেণীর বালক-বালিকাদিগের জন্য
হেমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—"জাগরণ"

নাম পাঠাইবার ঠিকানা—

সম্পাদক—"ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন"
১৬৩ নং হেজার রোড,
আলামবাজার পোঃ আঃ, ২৪ পরগণা।

টেক্কা

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ্, বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবিনাশ আমার গাড়ীখানা বার করে' নিয়ে এলো। পিস্তল দিয়ে ধাক্কা মেরে লোকটাকে বল্লুম—"ওঠ!"

সে করুণচক্ষে আমার দিকে চাইলে। আবার ধাক্কা দিয়ে বল্লুম—"ওঠ!" সে উঠে বস্‌লো; আমিও রিভলভারটা তার গায়ে ঠেকিয়ে রেখে তার পাশে বস্‌লুম। অবিনাশ ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

অবিনাশ—"কোথায় যা'ব? থানায়, না বাড়ীতে?"

আমি—"বাড়ীতে। কারণ, থানায় নিয়ে গেলে একে প্রশ্ন করবার আমার সুবিধা হ'বে না। শেষে তো থানায় নিয়ে যেতেই হ'বে।"

গাড়ী চল্লো। পথে লোকটা যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তির মতন নিশ্চল হ'য়ে বসে রইলো। সে বোধ হয় বুঝলে, যে গোলমাল হ'লে আমাদের চেয়ে তার বিপদই বেশী।

বাড়ীর দরজায় যখন গাড়ী পৌঁছুলো তখন রাত্রি তিনটে। লোকটাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালুম। বল্লুম—"দেখ, তোমার কোন আশা নেই। তবু যদি সব কথা খুলে বল, তো অন্ততঃ তোমায় বাঁচাবার চেষ্টা করবো।"

লোক—"আমি যা' বল্‌বো, তা' যে সত্যি হ'বে তার ঠিক কি?"

আমি—"আমার কাছে নেকী চালাতে পারবে না। অনেক কিছু জানি—শুনবে?"

এই বলে' আমি হত্যা ও হত্যাকারীর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার যে থিওরি সেটা বেশ রঙ্ ফলিয়ে বল্লুম। লোকটা যেন অবাক হ'য়ে গেল। বল্লে—"অদ্ভুত কথা! এমন তো কখনো শুনি নি। যা' বল্লেন আপনি—সবটাই সত্যি। আমি সেদিনকার ব্যাপারে ছিলুম না। ছিদাম খুন করেছিল। ছিদামের চেহারাটা আপনি হুবহু বলছেন। তা'কে চিন্‌লেন কি করে?"

আমি—"অনেকদিন থেকে আমি তা'কে জানি। তা'কে খুঁজছিল অনেকদিন থেকে। এবার দলশুদ্ধ ধরবো।"

লোকটা হেসে বল্লে—"অসম্ভব। মা-ঠাকরুণের বুদ্ধির কাছে আপনাদের বুদ্ধি খাটবে না। বাবাঠাকুর মারা গেছেন বটে, কিন্তু মামাবাবু আছেন। সাধ্য কি আপনি তা'দের কিছু করেন! আমি? আমি তো কিছুই নয়। আমাকে ধরাও যা' না ধরাও তা'।"

মাথাটা ঘুরচে বলে মনে হোল—শরীরটাও বড়ই অবসন্ন বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু সময় নষ্ট করলে তো চলবে না। তারা যেইমাত্র জানবে যে আমরা পালিয়েছি—বিশেষতঃ তাদেরই একজন আমাদের সঙ্গে উধাও হ'য়েছে—তখনই তারা সরে' পড়বে।

লোকটাকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করে, বেয়ারা রামদহিন ও অবিনাশকে পাহারায় রেখে আমি আবার গাড়ী নিয়ে চল্লুম বালীগঞ্জ থানায় ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সঙ্গে দেখা করতে। যাবার সময় এবার একটা রিভল্‌ভার নিয়ে বেরুলুম।

সেখানে গিয়ে সব বল্‌তে, তিনি তখনই আমার গাড়ীতে চল্লেন চিৎপুর থানায়। সেখানকার ইন্‌স্পেক্টর ও আর দুজন পুলিস কনেষ্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চল্লুম ইস্কাবনের টেক্কার আড্ডার দিকে। আমরা গলির কাছাকাছি হ'য়েছি, এমন সময় এক-খানা মোটর তীরবেগে বেরিয়ে এলো। স্পষ্ট দেখতে পেলুম তার মধ্যে সেই সুন্দরী নারীটীকে। বলে উঠলুম—"ঐ যায়! ঐ যায়!"

হাওয়ার বেগে আমাদের মোটরটা তাদের মোটরের অনুসরণ করলে।

তখনও রাত্রি শেষ হতে কিছু বাকী আছে! হুহু শব্দে দুখানা গাড়ী ছুটেছে। খালি রাস্তা থাকায় গাড়ী ছাড়বার খুব সুবিধা হয়েছে। ষ্টীয়ারিং হুইলের উপর ঝুকে পড়ে' সামনে চোখ রেখে আমি প্রাণপণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি। সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সামনের গাড়ীটাকে ধরবার অপেক্ষায় আছেন। সামনের আরোহীরাও ঠিক সেইরকম প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে গাড়ী ছেড়েছে। সোজা বাগবাজারের পোল পার হয়ে না গিয়ে, তারা ডানদিকে বেঁকলো। তারপর শ্যামবাজারের মোড় ঘুরে সমান বেলগাছিয়ার দিকে ছুটলো। দু'একটা পুলিশ প্রহরী তাদের ডেকে দাঁড়াতে বল্লে—কে তাদের কথা শোনে!

বেলগাছিয়া অতিক্রম করে' পাতিপুকুরের ভিতর দিয়ে তারা যশোহর রোডে গিয়ে পড়্‌লো। আমাদের গাড়ী তাদের পিছনে ছুটেছে সমান বেগে। ক্রমশঃ অন্ধকার ভেদ করে একটু একটু করে আলো ফুটতে সুরু হলো। হঠাৎ সামনের গাড়ী থেকে শব্দ হ'লো "গুড়ুম্"!

বালীগঞ্জ থানার ইন্‌স্পেক্টরবাবু বলে উঠলেন—"হরেনবাবু, সাবধান! ওরা গুলি চালাচ্ছে।"

"আমি—আপনারাও চালান।"

আমাদের মোটর থেকেও গুলি ছুটতে লাগলো। এদিকে আমার মোটর প্রায় তাদের কাছাকাছি গিয়ে পড়লো। হঠাৎ সামনের গাড়ীর পিছনে দপকরে আগুন জ্বলে উঠলো। গাড়ীখানা কিছু দূর গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। আমার গাড়ীটা বেগ সামলাতে না পেরে প্রায় সামনের গাড়ীখানার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়লো। পাশের একটা খানার ভিতর থেকে ৪।৫টা বন্দুকের আওয়াজ হোলো।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু বল্লেন—"নেমে পড়—নেমে পড়। গাড়ীতে থাকলে নিশ্চয়-মৃত্যু। ওরা গুলিমেরে গাড়ীখানাকে ঝাঝরা করে' ফেল্‌বে। ওরা ডানদিকের খানায় আছে। বাদিকের খানায় নেমে ছড়িয়ে পড়।"

তাই করা হ'লো। তারপর চল্লো জীবন-মরণ যুদ্ধ।

হুহু করে গাড়ীখানা জ্বলছে। তার আলোতে লক্ষ্য কতকটা স্থির হলো। ডান দিকের খানার ভিতর থেকে চারটে বন্দুক চলছিল। হঠাৎ তিনটে হয়ে গেল। বুঝলুম একজন কমলো। আমাদের পক্ষে একজন পাহারাওয়ালা আহত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

হঠাৎ আমার গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দে আমরা চম্‌কে উঠলুম। এতক্ষণ শুধু খানার দিকে লক্ষ্য রাখতে বাধ্য হওয়ায় আমরা গাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখতে অবকাশ পাইনি। দেখলুম ষ্টীয়ারিং ধরে একজন লোক বসেছে। সেই দিক লক্ষ্য করে গুলি ছাড়লুম। কিন্তু গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

খানার ডানদিক থেকে গুলি ছুটলো—'গুড়ুম্‌' 'গুড়ুম্‌'! আবার সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হলো। ইতিমধ্যে বিদ্যুদ্বেগে গাড়ী ছেড়ে দিল। তখন বেশ আলো ফুটে উঠেছে—কাজেই দু'জন ইন্‌স্পেক্টরের ডাকাত দুটোকে আহত করতে দেরী হোলো না। আমি একটু দূরে ছিলুম। গাড়ীটা আমার সামনে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল। একটা স্ত্রীকণ্ঠ বাতাসে ভেসে এলো।

শুনলুম—"স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া বাকী আছে। হরেনবাবু আবার দেখা হবে!"

'ইস্কাবনের টেক্কা' দলের দু'জন হত ও তিনজন আহত হ'য়েছিল। একখানা ট্যাক্সী করে তাদের হাঁসপাতালে চালান দেওয়া হ'ল।

আহতদের মধ্যে 'বেটে-হিদাম' নামে একজন ছিল। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে—সে স্বীকার করেছিল যে সে হত্যাকারী। সাব-ইন্‌স্পেক্টর সেজে চিরঞ্জীব বাবুর সঙ্গে যে দেখা করেছিলো, তার নাম 'রাঙা নেপাল'। নেপাল ও হিদাম একসঙ্গেই চিরঞ্জীববাবুর বাড়ী যায়। নেপাল চিরঞ্জীব-বাবুকে যখন কথায় ব্যস্ত রেখেছিল, সেই অবসরে সে ঘরে ঢুকে সোফার তলায় লুকিয়ে থাকে। ১২টা বাজবার একটু আগেই সে বেরিয়ে এসে পিছন থেকে চিরঞ্জীববাবুকে আক্রমণ করে। বাহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে সে তাঁর লিভারের উপর চাপ দেয়। তিনি অজ্ঞান হ'য়ে মাটীতে পড়ে যান। তারপর সাব-ইন্‌স্পেক্টর-বেশী নেপাল একটা শিশি থেকে কি একটা আরক নিয়ে খুব সাবধানে ড্রপারে (droper) করে' তাঁর চখের মধ্যে এক ফোঁটা ফেলে দেয়। একবার মাত্র চিরঞ্জীববাবুর দেহটা কেঁপে উঠলো, তারপর একেবারে স্থির। তাড়াতাড়ি তার দেহটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে এমনভাবে টেবিলের উপর হেলিয়ে রাখা হ'ল যে, দেখলে যেন মনে হয় তিনি ঘুমোচ্ছেন। কাজটা শেষ করতে অতি অল্প সময়ই লেগেছিল। ঘড়িটা ঠিক বারোটার ঘরে বন্ধ করে' দিয়ে হিদাম বাইরে বেরিয়ে আসে। হলঘরে নেপালের সঙ্গে কারা কথা কইছে শুনে সে সিঁড়ির ধারে একটা কয়লার ঘরে লুকিয়ে থাকে। আসল ইন্‌স্পেক্টরকে বাগানের মধ্যে ধরে' তাঁর পোষাক খুলে নেওয়ার মতলব নেপালের মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। 'টেক্কা'-দলের বর্ত্তমান কর্ত্তার নাম কি, দলের কেউ তা জানে না। তারা তাঁকে 'মামাবাবু' বলেই জানে। তাদের দলের যিনি 'মা'—বর্ত্তমান কর্ত্তা তার ভাই।

রামাশীষকেও পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। বিচারে সকলেই দোষী সাব্যস্ত হ'লো।

* *

সেদিন বিকালে মনীষা চা তৈরী কচ্ছে; অবিনাশ জলযোগে ব্যস্ত। হঠাৎ মনীষা বলে' উঠলো—"স্ত্রীলোকটী খুব সুন্দরী—না ঠাকুরপো?"

অবিনাশ একটা রসগোল্লা চিবোতে চিবোতে বল্লে—"হু-থু-উ-ব! রং যেন মোল্লার চকের ক্ষীর!"

মনীষা হেসে বল্লে—"ঐ রকমের 'ক্ষীর' খানিকটা বাড়ীতে আনলে হয় না?"

অবিনাশ চক্ষু বিস্ফারিত করে বল্লে—"মাপ কর, বউদি। ওতে লঙ্কার ঝাল!"

আমি বল্লুম—"আবার দেখা হ'বে বলে' গেছে।"

অবিনাশ আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে বল্লে—"শুনে খুব উচ্ছ্বসিত হলুম না।"

আমি বল্লুম—"দুর্ভাগ্য!"

অবিনাশ কিছু না বলে' রাবড়ীর পেয়ালায় চুমুক দিলে মনীষা হো—হো করে' হেসে উঠলো।

—শেষ—

পাত্র-পাত্রী

কাশীশ্বর—বড়লোক। দিলীপ—বড় ছেলে। দ্বিজেন—ছোট ছেলে। অজয়, রহমৎ—দিলীপ-দ্বিজেনের বন্ধুদ্বয়। যোগমায়া—কাশীশ্বরের স্ত্রী। মনীষা—ছোট মেয়ে। সুনীলা—কাশীশ্বরের বন্ধুর মেয়ে।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ড্রইং রুম

কাশীশ্বর ও যোগমায়া

কাশী—সুনীলার সঙ্গে দিলীপের বিয়ে হবেনা, ওদের বলে দিও।

যোগ—বলে ওদের কাউকে দিতে হবেনা, কারণ, এ বিয়ের জন্য ওদের কারুর মাথাব্যথা নেই।

কাশী—তা যদি নেই, তবে তোমার এতোখানি সুপারিশের কারণ কি?

যোগ—আমি মনে করি এ বিয়ে হ'লে ওরা সুখীই হবে।

কাশী—তোমার মনে করবার কোন মূল্য নেই। ওরা নিজেরা যদি মনে ক'রতো তা হ'লেও বা কথা ছিল।

যোগ—তা হলেই কি তুমি এ বিবাহে সম্মতি দিতে?

কাশী—তা ঠিক, তা হ'লেও সম্মতি দিতাম না। কিন্তু——কিন্তু দিলীপের উপর আমার যা শ্রদ্ধা আছে তাও এক নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে যেত।

যোগ—কারণ?

কাশী—কারণ, দিলীপ তখন বাংলাদেশের অতি সাধারণ যুবকের পর্য্যায় নেমে আস্তো। নিখিলভারত ওকে যে সম্মান দেখিয়েছে আমি তখন বলতুম ও সে সম্মান পাবার যোগ্য নয়।

যোগ—তোমার মতে তাহ'লে যারা সম্মানিত লোক তারা বিয়ে কর্ব্বেনা? সংসারে এতো যে লোক বিয়ে কর্চ্ছে—

কাশী—সংসারের লোকের কথা ছেড়ে দাও। দিলীপ যে ব্রত নিয়েছে তাতে তার বিয়ে করা চলেনা। দুদিন বাদে ও হবে Indian National Congress এর President, সমস্ত ভারতবর্ষ ওর গতিবিধির উপর অপলক দৃষ্টি দিয়ে রেখেছে। জাতির ও একটা গৌরবের পরিচয়! ও চ্যাংড়ার মতো হ'লুদে সুতো হাতে বেঁধে, মুখে একরাশ চন্দনের ফুটকি কেটে বরের আসনে বসে গেছে—এ আমার ভাবতেও কষ্ট হয়। ছিঃ! ... ...

যোগ—কিন্তু একে যদি চ্যাংড়ামিই বলো, তুমিই বা বিয়ে কর্ত্তে গেছলে কেন? তোমার নিজের বেলায় তো কোন অজুহাত হাজির কর্ত্তে পারনি?

কাশী—আমি যে ধাতুর লোক, আমার ছেলে ঠিক সেই ধাতুর লোক নয় যোগমায়া! কিন্তু, যাক্ সে কথা। যা হবার নয় তার আলোচনা নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইনা। সংসারে অন্য কোন কথা থাকে তো বলো।

যোগ—তাহ'লে সুনীলাকে ব'লে দিও আমাদের বাড়ীতে যেন আর না আসে।

কাশী—তা আমি কি করে বলতে পারি? তুমি বরং তাকে পরামর্শ দিও লোকের বাড়ী ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বাড়ী বসে পড়াশোনা করা ঢের ভালো।

যোগ—পড়াশোনা তার অনেককাল শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া সে আমাদের বাড়ী আসে বেড়াতে নয়—সে আসে, দেশের কাজে দিলীপের সহকারিতা করবার জন্য। দিলীপও তাকে ডাকে।

কাশী—দিলীপ যদি তাকে ডাকে আমি অবশ্য তাকে ফেরাতে চাইনা, কিন্তু তার মা কি মেয়ের চলাফেরার উপর থেকে লাগাম একেবারে ছেড়ে দিয়েছে?

যোগ—লাগাম!

কাশী—হ্যাঁ! লাগাম।

যোগ—তার মা কোন কালেই মেয়ের চলাফেরার উপর লাগাম্ দিয়ে রাখেনি, এখনও রাখেনা। উনি বলেন মেয়েকে আমি যৎপরনাস্তি স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি এবং এই কারণেই মেয়েও কখনও স্বাধীনতার অপব্যবহার করেনি—বা কর্ব্বে বলেও আশা করিনা। তা সে যাক্। বেশতো, সুনীলার আসা যদি তুমি পছন্দ না করো আমিই না হয় বলে দোবো। এতো হাঙ্গামারই বা কি দরকার। (প্রস্থানোদ্যত)

কাশী—না তুমি ব'লে দিও না।

যোগ—তার মানে?

কাশী—তার মানে সুনীলা যেমন আসে তেমন আসবে।

যোগ—ওদের সম্বন্ধে তোমার যা মত তা জানিয়ে দিয়েও, তুমি কি করে ওকে আসতে বল?

কাশী—আমি আসতে নিমন্ত্রণ করিনা। কিন্তু ও আসে যদি, আমি বাধা দোবনা, কারণ দিলীপ ওকে চায়।

যোগ—দিলীপ চাইলেও দিলীপ ওকে পাবেনা।

কাশী—রাগ করোনা, রাগের কথা নয়।—তুমি ভাবছো, দিলীপ যাকে বিবাহ কর্ত্তে পারবেনা তাকে দিলীপ চাইবেনা?

যোগ—হ্যাঁ—তাই ভাবছি।

কাশী—তার মানে স্ত্রী পুরুষের যে ঘনিষ্ঠতার অন্তরালে বিবাহরূপ Safegaurd জেকে বসে নেই সেটা নিরাপদ নাও হতে পারে—এই না তোমার সার কথা যা তুমি বল্‌তে চাও?

যোগ—আমি কিছু বলতে চাইনা। তোমার যা হচ্ছে হবে তাই তুমি কর্ব্বে।

(প্রস্থান)

(কাশীশ্বর মিনিটখানেক কিসের এক চিন্তায় আকৃষ্ট হইলেন দেখা গেল, কিন্তু সে ভাব তিনি সজোরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

(প্রবেশ করিল বেহারা)

বেহারা—Tea sir?

কাশী—ওঃ, তুই আমায় চা' খাইয়েই মারবি!

বেহারা—No sir.

কাশী—আচ্ছা নিয়ে আয়। ওরে শোন, বড়োবাবুকে একবার ডেকে দাও।

বেহারা—Sorry sir, তিনিতো কাল রাত্তির থেকে বাড়ী নেই। সকালে ফিরবেন ব'লে গেছেন।

কাশী—কোথায় গেছেন?

বেহারা—আজ্ঞে তিনি গেছেন আসন্‌-সোলের কুলী Strike মেটাবার জন্য।

কাশী—Strike! সেখানে যে গুলি চলছে শুনেছিলাম!—একলা গেছেন নাকি?

বেহারা—No sir.

কাশী—তবে?

বেহারা—নীলাদি' সঙ্গে আছেন।

কাশী—হু; আচ্ছা তবে ছোট বাবুকে একবার ডেকে দিয়ে যা।

বেহারা—Sorry sir, তাঁর দরজা এখনও বন্ধ, ঘুমুচ্ছেন।

কাশী—তুলে দে, দরজা ভেঙ্গে গায়ে জল ঢেলে দে। ৯টা পর্য্যন্ত ঘুমানো চলবেনা। শীগ্‌গীর যা।

(বেহারার প্রস্থান)

(যোগমায়ার প্রবেশ)

আবার কি খবর?

যোগ—একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এলুম।

কাশী—বলো—

যোগ—তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলে স্ত্রী-পুরুষের ঘনিষ্ঠতার অন্তরালে বিবাহ বস্তুটা না-থাকাকে আমি নিরাপদ বলে মনে করি কিনা। আচ্ছা আমি যদি বলি, না, আমি ও অবস্থাটাকে নিরাপদ বলে মনে করিনা, তুমি কি বল্‌বে?

কাশী—আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বলবো যে দিলীপ সম্পর্কে তোমার এ আশঙ্কা অমূলক। পুরুষ বল্‌তে সাধারণতঃ যা বোঝায় ও তার উপরে। একটা কেন, অমন যদি দশটা স্ত্রীলোকের সঙ্গেও বিশেষ ঘনিষ্টভাবে দিলীপ ঘুরে বেড়ায় আমি বিচলিত হবনা, বা, তাদের একটীকে ধরে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবো না।

যোগমায়া—দিলীপকে তুমি এতো বড়ো ভাবো?

কাশী—দিলীপকে এর চেয়ে ছোট ভাবা অসম্ভব। আমি চেষ্টা করেছিলাম ওকে অতি সাধারণ বলে ভাব্‌তে, ওকে হীন বলে প্রতিপন্ন করতে, কিন্তু ও সবলে ওর নিজের শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল ক'রে বসে আছে। সেখান থেকে ওকে কেউ নামাতে পারবেনা যোগমায়া!

যোগমায়া—বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব, তুমি রাগ্‌ কর্ব্বেনাতো?

কাশী—না!

(কিন্তু কথাটা বলিতে গিয়া যোগমায়ার আটকাইয়াছে, 'বলি বলি' করিয়াও যেন বাহির হইতে চাহেনা)

কাশী—বলো, কি কথা?

যোগমায়া—তুমি কি তবে সুনীলাকে সন্দেহ করো? মানে, তাকে ভাল মেয়ে মনে করনা?

কাশী—পরের মেয়ে, বন্ধুর মেয়ে—আমি তাকে ভালো ছাড়া আর কি মনে করতে পারি! তবে—থাক্‌গে সে সব কথা।

(বলিয়াই কাশীশ্বর পাথরের মতো স্তব্ধ হইয়া গেলেন)

যোগমায়া—বলোনা কি কথা?

কাশী—না, না, সে থাক্‌—সে কিছু নয়।

যোগমায়া—আমার মাথা খাও যদি না বলো?

কাশী—কি শুনতে চাচ্ছ?

যোগমায়া—ঐ যে সুনীলার বিষয়, যা তুমি বলতে গিয়ে থেমে গেলে?

কাশী—ও সুনীলার বিষয় নয়, কারণ, তার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা। সে ভালোও হতে পারে, সে মন্দও হতে পারে।

যোগ—তবে তুমি কি ব'লতে গিয়ে থাম্‌লে?

কাশী—আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলুম যে সুনীলাকে দেখে আমার মনে পড়ে তোমার কুমারী জীবনের কথা।

যোগ—আমার কুমারী জীবন! আমার আইবুড়ো বয়েসের কথা! আমার যখন ও বয়স, তখন তুমি আমায় দেখতে যেতে নাকি?

(হাসিয়া ফেলিলেন)

কাশী—তা যেতাম না, কিন্তু তুমি আমায় সমস্ত গল্প করে বলেছ। ঠিক ঐ বয়সে তোমার উপর একদিন যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, যে অসতর্ক মুহূর্ত্তে তোমার কুমারী-জীবনে—

যোগ—থাক্‌, আমি বুঝতে পেরেছি।

কাশী—তুমি কষ্ট পাবে বলে আমি বলতে চাইনি, তুমিই আমায় বলতে বাধ্য করালে।

যোগ—মনের মধ্যে যে জিনিষ রাত্রিদিন তোলপাড় করে তা বলে ফেলাই ভালো। ভালোই করেছ, খুব ভালো।

কাশী—মনের মধ্যে রাত্রিদিন তোলপাড় করে। আজ এই ত্রিশ বৎসর পরে তুমি একথা বল্‌তে পারলে!

(কিন্তু যোগমায়া সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া গেল; বোঝা গেল যে তিনি বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়াছেন।

কাশীশ্বর স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—কাজটা ভালো হইল কিনা। চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল বেয়ারা)

বেয়ারা—Tea sir. Hot tea.

(কাশীশ্বর চিন্তিত, সুতরাং স্তব্ধ)

তৈরী করে দোব? নইলে সেই লিকার্‌টা deep হয়ে যাবে, ঢালবো Sir?

কাশী—চা' আর এতোবেলায় খাবোনা। ও তুই নিয়ে যা।—

বেয়ারা—এই যে বললেন?

কাশী—মত বদলে ফেলেছি। তুই তো জানিস আমার মত কতো শীগ্‌গীর বদলায়।

বেয়ারা—কিন্তু—আপনিই বলেন যে, ভালো জিনিষ থেকে আপনার মত কখনো বদলায় না?

কাশী—আমি বলি একথা?

বেয়ারা—Yes sir.

কাশী—তা হলে অবশ্য ওটা খেতেই হবে। রাখো।

কাশী—কিন্তু ছোটবাবুকে যে আমি ডেকেছিলাম বলে মনে হচ্ছে?

বেয়ারা—তিনি এখুনি আস্‌ছেন। Brushing his teeth.

কাশী—Brushing his teeth! বাপ্‌! তুই তো থেকে থেকে অনেক ইংরিজী কথা শিখে ফেল্‌লি দেখছি!—

বেয়ারা—No sir.

কাশী—পেলিটি কিংবা ফিংপোতে বুঝি চাকরী খুঁজচিস্‌?

বেয়ারা—কে বললেন আপনাকে?

(একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেল)

কাশী—আমার মনে হচ্ছে। নইলে এ বাড়ী বেয়ারাগিরি কর্ত্তে তো ইংরিজির দরকার হয়না, হবেওনা। সত্যি ব্যাপারটা কি বল দিকিন?

বেয়ারা—ও কিছু নয় বাবু। আমি শুনে শুনে দু'একটা কথা শিখে ফেলেছি—ও কিছু নয়।

কাশী—তা হ'লে তোমার এই চা' রইলো, ও নিয়ে যাও। ও আর আমি খাচ্চিনা।

(কাশীশ্বর গম্ভীর হইলেন এবং তাহা দেখিয়া বেয়ারা বেচারী সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইল)

বেয়ারা—আজ্ঞে না বাবু আপনি চা'টা খান্‌—আমি বলি না হয় সত্যি কথা—

কাশী—বলো শুনি।

(এই বলিয়া কাশীশ্বর কাপে চা ঢালিতে লাগিলেন)

বেয়ারা—বড়োবাবুর ভারী ইচ্ছে যে আমি ইংরিজি শিখি।

কাশী—অর্থাৎ দিলীপবাবুর?

বেয়ারা—Yes sir.

কাশী—কেন সে তোকে কি ম্যাজিষ্ট্রেট করে দেবে?

বেয়ারা—Yes sir.

কাশীশ্বর এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ড হাসিতে ঘর ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

বেয়ারা—No sir. সত্যি তিনি দেবেন। তিনি বলেন ওরে হতভাগা, ছোট ঘরে জন্মেছিস বলে কি চিরটাকাল তুই লোকের গোলামী কর্ত্তে থাকবি। তুই লেখা পড়া শেখ—আমি চাই তুই ইংরিজি শিখবি, সব কিছু শিখবি। আমি তোকে মস্ত

লোক করে খোঁজ। বড়োবাবুতো মিথ্যা কথা বলেন না বাবু?

কাশীশ্বর—ও, আচ্ছা তুই যা। ছোট-বাবুকে শীগগীর করে আসতে বলগে।

(বেয়ারার প্রস্থান)

স্তব্ধ হইয়া কাশীশ্বর চাটুকু শেষ করিলেন—

প্রবেশ করিল দ্বিজেন্দ্র—

দ্বিজেন্দ্র—বাবা আমায় ডাকছিলে?

কাশী—হ্যাঁ, বসো—

(দ্বিজেন্দ্র একখানা চেয়ারে বসিয়া কাশীশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কারণ, বক্তব্যটুকু বলিতে গিয়া তাঁহার মুখখানি অযথা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে)

আমি ব'লছিলাম দ্বিজেন—ভালো কথা, দিলীপ কোথায় গেছে তুমি বোধহয় জানো?

দ্বিজেন্দ্র—জানি। দাদা আসানসোল গেছে, কুলী strike মেটাবার জন্যে। সঙ্গে গেছে সুনীলা।

কাশীশ্বর—কতবড়ো ব্যাপার তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ?

দ্বিজেন্দ্র—নিশ্চই সেখানে গুলি চলছে। এ পর্য্যন্ত ১১৩ জন কুলী এবং ৩৩ জন কর্ম্মী হত বা আহত।

কাশীশ্বর—কালকের Statesman, Amrita Bazar Patrika বোধ হয় দিলীপের ছবিও বার করবে?

দ্বিজেন্দ্র—সে আর নতুন কি। তার ছবি কতো বেরিয়েছে।

কাশীশ্বর—কিন্তু তোমার ছবি একবারও বেরুলনা, ছবি দূরের কথা, কখন কেউ ভুলেও বোধ হয় তোমার নামোল্লেখ করে না।

দ্বিজেন্দ্র—তার কারণ আমি অতি সাধারণ, দাদার মত অসাধারণ নই।

কাশী—তা যে নও সে আমি জানি। সে কথা আমি বলছিনা, আমি বলছি তুমি তোমার দাদার মতো হ'তে পারনা?

দ্বিজেন্দ্র—না, অসম্ভব।

কাশী—কেন অসম্ভব? সেও মানুষ, তুমিও মানুষ?

দ্বিজেন্দ্র—সবাই কি ইচ্ছা করলেই সমস্ত ক্ষমতা অর্জ্জন কোরতে পারে? আমি কি ইচ্ছা করলেই একটা রাসবিহারী ঘোষ হ'য়ে যেতে পারি?

কাশীশ্বর—পারেনা যে, তা আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই অবগত আছি। তুমি পার শুধু ঘুমুতে আর দাদার খোসামদীগিরি কর্ত্তে। আচ্ছা, তুমি যেতে পার।

(দ্বিজেন বকুনি খাইয়া অল্পখন স্তব্ধ রহিল পরে পুনরায় কথা বলিতে লাগিল)

দ্বিজেন—আচ্ছা আজ এ সমস্ত কথা আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছ বলবে?

কাশী—গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন-'না'

দ্বিজেন—কিন্তু আমি জানি কেন তুমি আমায় এসব জিজ্ঞাসা করছ।

কাশী—কি রকম?

দ্বিজেন—তুমি আমায় দাদার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চাও!

কাশী—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন 'আমি'!

দ্বিজেন—হ্যাঁ তুমি। শুধু আজ নয়, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেকদিন থেকেই তুমি আমায় এমন সব কথা বলে আসছো যার ফলে আমি ইচ্ছা করলেই তার একটা ভীষণ শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতে পারি।

কাশী—শেষের লাইনটা বলতে পারলিনি ঠিক্ করে।

দ্বিজেন—কেন?

কাশী—উত্তেজিত যদি তোকে আমি করে থাকি—যদিও করেছি কিনা তা আমি নিজেই জানিনা—তা হলে দিলীপ কুমারের শত্রু করবার জন্য তোমায় উত্তেজিত করিনি; করেছি হয়তো, তোমাকে তার প্রতিভার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলবার জন্য।

চিরসাথী

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

ও অজানা বন্ধুরে আমার
আঁধার রাতের সাথী।
আলোর সাথী রয়না সাথে,
এলে নিবিড় রাতি।
আঁধার যবে আসে, নেমে
আমার চলার পথে।
জ্বালিয়ে আলো তুমিরে বন্ধু—,
প্রেমের বাতি, সাথে।
সেই আঁধারে শুনাও মোরে,
তোমার প্রেমের গীতি,
পুলক তখন, জাগে পরাণে
আনন্দে মন, মাতি।
তোমার সুরে সুর মিলায়ে
গাইতে প্রাণ চায়,
তোরেই, সাথে পেলে বন্ধু
(আমার) স্বপন ভেঙ্গে যায়।
তাই তোরে মোর মন সপেছি
ওরে চির সাথি!
আলোর সাথী রয় না সাথে,
এলে আঁধার রাতি॥

—*—

দ্বিজেন—তাই যদি হয়, তা হ'লে সংসারে আমায় যে সব advantage দাও তাকে তা দাও না কেন?

কাশী—কারণ, সে advantage নেবার প্রত্যাশাই করে না এবং তুমি ও জিনিষটি না পেলে এগোতেই পার না।

দ্বিজেন—আচ্ছা স্বীকার করলাম তোমার কথা। কিন্তু উইল করে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করে আমার নামে বিষয় লিখে দেওয়াটাও কি মাত্র শুধু আমায় advantage দেবার জন্যে বাবা?

কাশী—উইল! কে বললে এ কথা?

দ্বিজেন—আমি জানি।

কাশী—এতো বড়ো নির্লজ্জ মিথ্যে কথা কে বলতে সাহস করে আমি শুনতে চাই?

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগমায়া—দ্বিজেন!

দ্বিজেন—কি মা?

যোগমায়া—এ সব আলোচনা কি বন্ধ থাকতে পারে না?

দ্বিজেন—তুমি বললেই পারে মা।

যোগমায়া—তাহলে আমি বলি এ সব এখন থাক্।

দ্বিজেন—কিন্তু, তুমি আমি নিয়েই এ সংসার নয়,—সবাই যখন এই আলোচনা কর্ত্তে থাকবে তখন তুমি তাদের কি দিয়ে মুখ বন্ধ কর্ব্বে বলতো?

যোগমায়া—সবাই যখন সে আলোচনা কর্ত্তে থাকবে, বিষয়ের মালিক যে, সেই তখন তার সমাধান কর্ব্বে। তুমি আমি তো সে কাজ পারবো না! (এই বলিয়া কাশীশ্বরের দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন)

কাশী—ঠিক্ তাই; এবং তারা তখনই জান্তে পারবে যে কাশীশ্বর বসু মহাশয় যে কাজ করেন তাতে কখনও অবিবেচনার ছাপা থাকে না।

দ্বিজেন—বেশ, তবে তাই—(প্রস্থান)

মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন: —তুমি একে বিবেচনা বলো?

কাশী—কি সম্পর্কে এই প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা আগে শোনা উচিৎ।

যোগমায়া—উইল, উইল গো!...বুঝতে পেরেছ বোধ হয়?

কাশী—হ্যাঁ—বুঝলাম। তুমি কি একেবারে ঠিক্ ধরে নিয়েছ যে, দ্বিজেনের অনুমান একেবারে অভ্রান্ত সত্য?

যোগমায়া—অন্তদিন হলে আমি বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু, আজ তুমি সব পার বলে আমার মনে হয়। তাই আজ তোমার নিজের মুখ থেকে শুন্তে চাই—বলো এ একেবারে নির্লজ্জ মিথ্যা কথা?

কাশীশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

—এই পরেশ উকিলটাকে এখানে ডেকে দেত'।

যোগমায়া—আমি এখানে যতক্ষণ আছি, পরেশ উকিল যেন না আসে; এই, কে ওখানে আছিস, শুনে রাখ।

কাশী—চাকরেরা তোমার কথা শুনবে, না, আমার কথা শুনবে?

যোগমায়া—তোমার কথাই শুনবে; কিন্তু আমি যাতে অপদস্থ হই এমন কথাও আমি ওদের শুনতে দোবনা!

কাশী—পরেশ উকিল এখানে এলে তুমি অপদস্থ হচ্ছ কেমন করে?

যোগমায়া—তুমি তাকে ডাকছো জবাব দিহি কর্ত্তে কি করে তোমার এই অতি গোপনীয় উইলের খবরটি প্রকাশ হয়ে গেচে, যা তোমার স্ত্রী জানেনা, ছেলে জানেনা। তুমি কি ভাবো, দিলীপের মা হয়ে, দ্বিজেনের মা হয়ে, এ আমার হবে খুব গৌরবের জিনিষ তার সামনে দাঁড়িয়ে এই অপরাধের কৈফিয়ৎ শোনা?

নেপথ্যে ভৃত্য—বাবু, পরেশবাবু এসেছেন। ভিতরে যাবেন কি?

কাশী—ওকে এখন যেতে বলে দে, আমি পরে বলে পাঠাবো।

অল্পক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন:

—যাক, পরেশ চ'লে গেল। হ্যাঁ—তুমি কি বলছিলে এইবার বলো।

যোগমায়া—উইল তা হলে সত্য?

কাশী—যদি বলি সত্য?

যোগমায়া—আমি সে উইল নাকচ কর্ত্তে বলবো।

কাশী—কি বিবেচনার বলে তুমি আমায় সে কাজ কর্ত্তে বলবে?

যোগমায়া—সে কি তোমার ছেলে নয়?

কাশী—আমি এই প্রশ্নের জবাব দিলে তোমার মনে আজ এই ত্রিশ বৎসর পরে আবার নূতন করে আঘাত লাগবেনা?

যোগমায়ার মুখ সহসা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কোন কথাই তিনি আর বলতে পারলেন না: কাশীশ্বরের প্রতি অপলক দৃষ্টি দিয়ে মাত্র যে দুটি মর্ম্মান্তিক কথা বেরিয়ে এল তাহচ্ছে—ও! তাই বটে!

অল্পক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কাশীশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইল যোগমায়া 'আকুল স্বরে' কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল: হ্যাঁ—তুমি ঠিক বলেছ। দিলীপ তোমার ছেলে নয়। কিন্তু তাকে ভাসিয়ে যদি দেবে, তাকে বাঁচতে দিলে কেন? পৃথিবীর আলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গে—তাকে মেরে ফেললে না কেন? সমস্ত আপদ চুকে যেত।

কাশীশ্বর—তা যেত, কিন্তু হত্যা আমার ব্যবসা নয়। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, তাকে লালন-পালন করেছি, শিক্ষায় দীক্ষায় জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ দিয়েছি। এর বেশী যদি আমি না দিতে পারি, আশা করি আমার খুব অপরাধ হবে না। (প্রস্থান)

যোগমায়া সজল চোখে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপথ্য হইতে সমবেত কণ্ঠের জয়ধ্বনি শোনা গেল: 'দিলীপ কুমার কি জয়'! বন্দেমাতরম্! —প্রবেশ করিল দিলীপ)

দিলীপ—মা!

যোগমায়া—দিলীপ! ওরে, ঐ জয়ধ্বনি থামতে বল। ও থাকবে না,—ও চুরি—ও কলঙ্কিত। থামতে বল। (প্রস্থান)

দিলীপ যোগমায়ার আচরণে বিস্মিত ও স্তব্ধ। ডাকিল—"দ্বিজেন"!

(প্রবেশ করিল দ্বিজেন)

দিলীপ—দ্বিজু, মায়ের কি হয়েছে জান?

দ্বিজেন—আমিও তোমায় এই প্রশ্ন করব ভাবছিলাম।

দিলীপ—মায়ের চোখে দেখলাম জল—যা কখনও দেখিনি। ওরা জয়ধ্বনি করলে মা বলে গেল ও থাকবে না, ও চুরি, ও কলঙ্কিত। থামতে বল। মায়ের মুখ দিয়ে আজ একথা কেন বেরুল দ্বিজেন?

দ্বিজেন—আমি তো কিছু বুঝতে পারিতেছি না

দিলীপ—আমিও না।

(দিলীপ ভাবিতে লাগিল এবং পরে বলিল) মাকে আমি জিজ্ঞাসা কর্ব্ব। এর কারণ আমি জান্তে চাই।

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

নারীর অশ্রু

নারীর দুঃখ, নারীর বেদনা, নারীর চোখের জল—সমাজ কতক্ষণ উপেক্ষা কোরতে পারে?

ধনীর দুলাল—প্রিয়লাল। সুদর্শন ও কৃতবিদ্য। স্ত্রীকে সে প্রাণদিয়ে ভালবাসতো। স্ত্রী—সন্ধ্যা, স্বামীর অনুরাগিণী, স্বামী সোহাগিনী। দেহ-মনে পরিপূর্ণ যুবতী সে নারী; অপরূপ সুন্দরী।

সুখে ও শান্তিতে তাদের জীবন চলে। এমন দিনে সন্ধ্যার জীবনে অতর্কিতে ঘনিয়ে এলো বিষাদের মেঘ।

এ এমন একটি দুর্ঘটনা, যা যে কোন নারীর জীবনে ঘটতে পারে। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে এটা গণ্য হোল—মহা অপরাধ বোলে।

হৃদয়হীন নিষ্ঠুর সমাজ তাকে বিচার কোরলে না—দিলে দণ্ড!

জীবনের সেই চরম পরীক্ষার দিনে, বিচার প্রার্থী হোয়ে সে অভাগিনী নারী শরণ নিলে তার স্বামীর।

কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট! পিতার প্রতি অন্ধ ভক্তি, তার কর্ত্তব্য বোধকে জাগ্রত কোরতে পারলে না।

স্ত্রী ভেসে গেল—জীবনের পথে স্রোতের ফুলের মত! স্বামীর কাছেও সে সুবিচার পেল না।

তারপর, সন্ধ্যার জীবন-নাট্যে যে অঙ্কের সূচনা হোল, বোধ করি অনেকের দৃষ্টিতেই তা' ভয়াবহ বোলে বোধ হ'বে।

নিতান্ত দৈবপ্রেরিত হোয়ে, সন্ধ্যার জীবনে এলো প্রমথ। সে তাকে দিলে আশ্রয়। আর সেই সঙ্গে দিলে সন্ধ্যাকে পরিচিত হবার সুযোগ—তার স্ত্রী বোলে!

কিন্তু সন্ধ্যার জীবনদেবতা তা'তে কী সায় দিয়েছিল?

না। সন্ধ্যার জীবনে সে অধঃপতন ঘটেনি। প্রমথর আশ্রয়ে এসে, সে পরিচয়ের গ্লানি তাকে দুর্ব্বিসহ বেদনার সঙ্গে সহ্য কোরতে হয়েছিল সত্য—কিন্তু সে কতদিনের জন্য?

অন্তরের অবিচলিত নিষ্ঠায় সে তার নারীত্বের মর্য্যাদাকে কেমন কোরে শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছিল, 'অভিজ্ঞান'-চিত্রে তারই পরিণতি আপনাকে ভাবিয়ে তুলবে।

ছবিখানি সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স তুলেছেন এবং শীঘ্রই 'রূপবাণী'তে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

বাঙলা ছায়া-চিত্রের যাঁরা শ্রেষ্ঠ শিল্পী, অভিজ্ঞান-এর বিভিন্ন ভূমিকায় তাঁদেরই দেখা পাবেন।

মলিনা ও মেনকা—এদের দু'জনকে আপনারা নিশ্চয়ই ভোলেন নি। প্রধান দুটি নারী চরিত্র—'সন্ধ্যা' ও 'নাজ্‌মা' রূপে, এরা আপনাদের অভিবাদন কোরবেন। এ ছাড়া প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিতে দেখা দেবেন জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়-গোস্বামী, অহি সন্ন্যাল, বোকেন চট্টোপাধ্যায় ।।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(সোমেশ্বর)

বিগত ১৬ই এপ্রিল শনিবার পৌনে সাতটায় সময় সম্মেলনের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে দুইজন প্রতিযোগীর গান হইয়া যাইবার পর শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাস কীর্ত্তনের demonstration আরম্ভ করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে সাধারণ শ্রোতৃবর্গ দাস মহাশয়ের ন্যায় গুণী কীর্ত্তনীয়ার গানের বৈশিষ্ট্য না বুঝিতে পারিয়া এরূপ অস্বাভাবিক গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহার জন্য তাঁহাকে গান প্রায় অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়াই অল্পসময়ের মধ্যেই উঠিয়া পড়িতে হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে সকল কীর্ত্তনীয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় রাধারমণ দাস মহাশয় যে অগ্রণী তাহা কীর্ত্তন রসরসিক সামাজিক বোদ্ধা মাত্রেই জানেন। গত বৎসর এই Conference-এ তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু এ বৎসর তাঁহার গানের সময় সমাগত শ্রোতৃবর্গের ঐরূপ অসঙ্গত অজ্ঞানতাপ্রসূত অসন্তোষের ভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি। দাস মহাশয়ের কীর্ত্তনের পর প্রতিযোগিগণের অন্যতমা কুমারী শান্তিলতা সরৎ শর্ম্মা নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। গুণিজনের demonstration-এর মধ্যে প্রতিযোগিগণের নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা করা মোটেই শোভন দেখায় না Programme Director মহাশয়ও এদিন সকালেই জানাইয়াছিলেন যে, যদি কোনও প্রতিযোগী যথা সময়ে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রদর্শন বাতিল করা হইবে। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তিনি সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁহার নিজের নির্দ্দেশ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তনের demonstration-এর পর একজন প্রতিযোগীর নৃত্যের ব্যবস্থা করিলেন—আইন যিনি করেন তিনি নিশ্চই আইন ভাঙ্গিতে পারেন। তবে Director মহাশয় সকল বিষয়েই তাঁহার এইরূপ স্বাতন্ত্র্যরক্ষার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন কি? যাহা হউক, নৃত্যের পর গয়ার বিখ্যাত গায়ক প্রোঃ হনুমান্‌প্রসাদের পৌত্র মাষ্টার গোপাল সিং প্রথমে harmonium-এ ধানী রাগের গৎ বাজাইয়া পরে কামোদ রাগের একখানি খেয়াল (ত্রিতালীতে) গান করেন। শ্রীমানের গানের পর স্বর্গত গুণিপ্রবর অঘোর চক্রবর্ত্তী ও বিশ্বনাথজী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ধ্রুপদ গান আরম্ভ হয়। অমরবাবু যখন dais-এর উপরে আসিয়া বসিলেন তখন তাঁহার গানের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য মৃদঙ্গ বা কোনও মৃদঙ্গীর ব্যবস্থা করা হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে মৃদঙ্গ আসিল বটে, কিন্তু মৃদঙ্গীর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু অমরবাবুর ইহাই চরম দুর্গতি নহে। মৃদঙ্গী আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত জুটিল বটে, কিন্তু মৃদঙ্গকে সুরে বাঁধিবার জন্য হাতুড়ি পাওয়া গেল না। এদিকে নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া (এবং কতকটা লাল বাতির ভয়ে) মৃদঙ্গী তখন অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার হাতের লাঠির সাহায্যে মৃদঙ্গের সুর বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মঞ্চের উপরে স্বেচ্ছাসেবকের অভাব ছিল না—কিন্তু একজন স্বেচ্ছাসেবকও একটা হাতুড়ি আনিবার আবশ্যকতা আছে মনে না করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে পাখোয়াজ বাঁধার প্রহসন দেখিতে লাগিল। সম্মেলন-সভাপতি মঞ্চের উপরেই বসিয়াছিলেন—সাধারণ সম্পাদক auditorium-এর সম্মুখের আসনে এ সমাসীন—অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ অনেকেই সেদিন আসিয়াছিলেন—কিন্তু একটা হাতুড়ীর ব্যবস্থা হইল না। কর্ত্তৃপক্ষগণের অহমিকা আছে যে তাঁহাদের এই Conference নাকি অতি উচ্চাঙ্গের এবং ইহার ব্যবস্থাও নাকি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এদিনের রাত্রিতে আমরা তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়াছি। যাহা হউক, অনেক কসরৎ করিয়াও মৃদঙ্গকে যখন কিছুতেই সুরে আনা গেল না, তখন অমরবাবু ধ্রুপদের আলাপই আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় দশ মিনিট পরে একটী হাতুড়ির আবির্ভাব হইল বটে, কিন্তু সুর বাঁধিতে না বাঁধিতেই বোধহয় কোনও অদৃশ্য প্রয়োজন সাধিবার জন্য সে মূল্যবান্ বস্তুটীকে অন্তর্হিত হইতে হইল। অমরবাবু প্রথমে একটী কল্যাণ রাগের ধ্রুপদ গাহিয়া পরে আর একটী চৌতাল আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময়ে পূর্ব্বরাত্রে গোপালবাবুর গানের সময় যেরূপ প্রহসন সংঘটিত হইয়াছিল তাহারই পুনরাবৃত্তির সূচনা দেখা

আশাকরি প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনাধীনে তোলা এই ছবিখানি আপনাদের সকলকেই তৃপ্ত দিতে পারবে। গানের দিক থেকেও আপনারা নিরাশ হবেন না। বর্ত্তমান বাঙলার জনপ্রিয় গীতকার অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য এর গানগুলি লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়াছেন—বিখ্যাত সুর-শিল্পী রাই বড়াল।

আলোক-চিত্র ও শব্দানুলেখনের কাজগুলিতেও আশাকরি বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী বিমল রায় ও বাণীদত্তের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

গেল। নাটোরাধিপতি আসন ত্যাগ করিয়া dais-এর উপর অমরবাবুর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন এবং তাঁহাকে বসন্ত রাগের আরব্ধ গান বন্ধ করিয়া "মাধব মাধব" গানটী গাহিতে অনুরোধ করিলেন। সভাপতির আদেশ অমান্য করা রুচি সঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়াই বোধ হয়, অমরবাবু আরব্ধ গানটী বন্ধ করিয়া সভাপতির নির্দ্দেশানুযায়ী "মাধব মাধব" গানটী গাহিলেন। বলা বাহুল্য, যে অমরবাবুর গানের techniques ও style-এর সৌন্দর্য্য, রাগের শুদ্ধতা ও কণ্ঠের সতেজতার সমন্বয়ে আমরা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

অমরবাবুর ধ্রুপদগানের পর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল মহাশয় চাঁদনী কেদারা রাগে একখানি বাংলা খেয়াল গান করেন। খেয়াল গানের পর কুমারী গীতা দাস ও কুমারী আরতি দাস তাঁহাদের চিরপুরাতন ঠুমরীখানি "বালম তোরি" গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিবিধান করিতে নিস্ফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ঠুমরী গানের পর মঞ্চ ও পর্দ্দার জনপ্রিয় অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয় পুরিয়া রাগে একটি চৌতাল ও আর একখানি ধামার গান করেন। এতদিন পরে কৃষ্ণবাবু যে নূতন করিয়া ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ধ্রুপদের পর নৃত্যের আসর বসিল। বাসন্তী বিদ্যাবীথীর ছাত্রীগণ শকুন্তলা নৃত্য দেখাইলেন। নৃত্যের পর শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুত যামিনী গাঙ্গুলী বাহার রাগের একখানি খেয়াল ও একটি ঠুমরী গান করেন। যামিনীবাবুর গান গাহিবার সময় যে সকল মুদ্রাদোষ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অতি দৃশ্যকটু। খেয়াল গানটী গাহিবার সময় তিনি নিজ কর্ণরন্ধ্র দুইটী দুইহস্ত দ্বারা এরূপ সজোরে চাপিয়া ধরিয়া গান করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইতেছিল যে তানপুরা ও হারমোনিয়ামের সুর তাঁহার কর্ণপীড়া জন্মাইতেছিল। গায়কদিগের অবশ্য মুদ্রাদোষ যে থাকে না তাহা আমরা বলি না—কোনও কোনও গায়ক মস্তক সঞ্চালন অথবা হস্তভঙ্গীর দ্বারা নিজেদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু যামিনীবাবু দুই কাণ চাপিয়া গাহিবার যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা তাঁহার পক্ষে একান্তভাবেই মৌলিক। যাহা হউক, যামিনীবাবু বাহার রাগের খেয়ালটী আরম্ভ করিয়া যে ভাবে তান প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহাতে গানটী অতিশয় একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। বাহারে বক্র-প্রকৃতিকে সম্যকরূপে ফুটাইতে হইলে যেরূপ নিপুণতার সহিত তানের প্রয়োগ করিতে হয় তাহার কোনও পরিচয়ই আমরা যামিনীবাবুর সেদিনকার গানে পাইলাম না। সরল তান করিয়া তিনি কখনও বা আড়ানা কখনও বা বাগেশ্রীর রূপ প্রকাশ করিতেছিলেন। উপরন্তু যামিনীবাবুর গানের গায়কীও সুন্দর নয় বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গকে কোনও তৃপ্তি দিতে পারেন নাই। পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এবৎসরেও তিনি ঠুমরী গানটী যে ভাবে গাহিলেন, তাহাতে সাধারণের পক্ষে তাঁহার গানের উপর অপ্রীতি জন্মানই স্বাভাবিক। গিরিজাবাবুর মত গুণী লোকের শিষ্য বলিয়াই যে শ্রোতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা পাইবেন ইহা ত আর সম্ভব নহে। প্রকৃত গুণের পরিচয় না পাইলে সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ (?) কেমন করিয়া গৌরব দিতে স্বীকৃত হইবেন? যামিনীবাবুর গানের পর প্রোঃ সফিউল্লা খাঁ সাহেব সেতারে কোশ বাজাইলেন। শাস্ত্রে কোশরাগ বলিয়া কিছু পাওয়া যায় না; তবে খাঁসাহেব কৌশিক বা কৌশী বাজাইয়াছিলেন। Black-Board-অধ্যক্ষ মহাশয় কি রাগের নামগুলি গায়ক বা বাদকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিতে কষ্ট অনুভব করেন? সেতার বাজনার পর কুমারী আশা ওঝা কথকনৃত্য দেখাইলেন। দুইবৎসর পূর্ব্বে এই Conference-এই কুমারীর যেরূপ শিক্ষার পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম—তাহার তুলনায় এবৎসরের প্রয়োগবিধি উৎকৃষ্ট ত হয় নাই, বরং উহাতে যথেষ্ট অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কারণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে নাচিবার সময় কয়েক বার বিশেষভাবে তিন স্থলে কুমারী লয়ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। নৃত্যের পর স্বর্গত গুণিপ্রবর আমির খাঁ সাহেবের ছাত্র শ্রীমান্ রাধিকামোহন মৈত্র স্বরোদে বেহাগ আলাপ করিয়া তিলঙের ঠুমরী বাজান। শ্রীমানের বাজনায় আমরা গতবৎসর শিক্ষার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম; কিন্তু এবারে তিনি যেন সমস্তই সংক্ষেপে শেষ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেন তাহা তিনি নিজেই জানেন, অথবা অন্য কোন রহস্যও থাকিতে পারে। ইহার বাজনার পর সঙ্গীত-মার্ত্তণ্ড পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর গান আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজী শুদ্ধ কল্যাণের দুইখানি খেয়াল ও তাঁহার অতিপ্রিয় আনন্দ-ভৈরবীর ভজনটী "কান্‌হৈয়া নাব কর মোরি পার" গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে চিত্রাপিত রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রায় ২ ঘণ্টা কাল গান করেন।

অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক মেয়ের মা-ই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেন। অমল ছেলেটিই তাঁদের লক্ষ্য। কে যে কোন ফাঁকে তার সবল স্কন্ধে নিজের কন্যারত্নকে বসিয়ে দিতে পারবেন তা নিয়েই উদ্বিগ্ন। কন্যারত্নরাও চঞ্চল, একটু বেশীরকম সজ্জিত—হয়ত তা যুদ্ধ সাজই। অমলের রূপ ত বটেই—তার কথা বলার ভঙ্গী, চলার দৃঢ়তা, মিষ্টি হাসি তাদের মুগ্ধ করে। আলাপ তার সঙ্গে বড় একটা কারও হয়নি, যাদের হয়েছে তারা কিন্তু ভীত। ওর কথার মধ্যে এমন একটা সুর ভেসে ওঠে যা আর যারাই সহ্য করুক অভিজাত মেয়েরা কিছুতেই করতে পারে না। আজ ঘোষ সাহেবের বাড়ীতে পার্টি—ভয় তাকে এতটুকুও নয়—ভয় তাঁর মেয়ে রমাকে। চটকদার, কৌশলী, বুদ্ধিমতী রমা—মেয়েদের ঈর্ষা, মনে মনে দেওয়া অভিসম্পাতেও তার রূপ এতটুকুও কমেনি—হয়ত বা বেড়েইছে অন্ততঃ তারা তাই মনে করে।

মেয়েদের রূপের প্রতি পুরুষের একটা আকর্ষণ আছে, সৃষ্টির আদিতেও ছিল আজও আছে—নেই বলে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। আর সেইটেই মস্ত ভয়ের কথা।

পণ্ডিতজীর গানের সহিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ্যাটর্নী-এট্-ল মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন। গানের পর ঐ রাত্রির অনুষ্ঠান শেষ হয়। *

* পণ্ডিতজীর গানের আলোচনা আমাদের শেষ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

—:০:—

অমল পুরুষ, রমা নারী—যুবতী। যদি অমল—। মেয়েরা আর ভাবতে পারে না। যে যার সুন্দরতম পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। হোক্ রমাদের বাড়ীতেই পার্টি দরকার হলে এটাকেও যুদ্ধক্ষেত্র করে নিতে দ্বিধা বোধ করবে না কেউ।

বিকেল বেলা ঘোষ সাহেবের বাড়ীতে বহু বাঙ্গালী সাহেব ও মেম এবং মিসিবাবারা এসে উপস্থিত হয়। লনে টেনিস্ খেলা চলতে থাকে। অমল কিছুতেই খেলতে নামে না, বলে, খেলুন সবাই আমি না হয় দেখি একটু। রমাকে নামতেই হয় আর একটী মেয়েও নামে—মেয়ে পার্টনার না হ'লে পার্টির কোন মানেই নেই। কায়দা বজায় রাখতে অনিচ্ছুক মেয়ে দুইটিকে খেলতেই হয় তাই।

যুথীকা যেন সময় কাটাবার আর কোন উপায় না দেখে অমলের কাছে এসে বলে, চলুন একটু ওদিকে যাওয়া যাক্, বড্ড ভীড় এদিকটায়—কি করে যে এত লোক এক-জায়গায় থাকে! ওই ওদিকে চেয়ারগুলো আছে, চলুন।

ওরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারে বসে। যুথীকার মা মেয়ের বুদ্ধিকে মনে মনে তারিফ করে বান্ধবীদের সঙ্গে সোৎসাহে গল্প করতে লেগে যান। খেলতে খেলতে ওদের দু'জনকে একজায়গায় দেখে রমার হাত কেঁপে কেঁপে উঠে—যুথীকা রমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

অনিমা এসে বলে, তাইত, আপনি এখানে? অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি যে আপনাকে। সেদিনকার কথা মনে আছে ত' আপনার, তাই নিয়েই আজ আবার কথা কইতে চাই।

অমল হাসে, বলে, সে-সব কথা আমি ভুলে গেছি ব'লেই বোধ হয় আমাকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না নইলে আমার পাশ দিয়ে বার দশেক গিয়েও আমাকে খুঁজে না পাবার ত' কারণ দেখি না।

তাড়াতাড়ি যুথীকা বলে, পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। সে-সব থাক্ অমু, কিন্তু দেখ এসোনা ভাই ওদের খেলা শেষ হ'তে কত দেরী আর।

একটা চেয়ারে বসে' পড়ে অনিমা বলে, ওসব খেলা ভাল লাগেনা আমার—তোমার জানতে ইচ্ছে হয়ত' জেনে আসতে পার।

অমল নিতান্ত সহজ ভাবেই বলে, তার চেয়ে দু'জনেই থাকুন, ক্ষতি কি।

কে আর একজন এসে বলে, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে খুবই ভাল লাগে আমার, কিন্তু অনেকেই ওসব নিয়ে কথা বলতে যেন ভয়ই পায়, কেন বলতে পারেন?

অমল বলে, জিনিষটা সহজ নয়, বিশেষ কিছু না জানা থাকলে ভয় পাবার কথাই ত' বটে। আনন্দে মেয়েটির চোখ মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বলে, সত্যিই তাই। কিন্তু আপনার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলা যায়। আচ্ছা সেক্সপিয়রের কোন বইটা আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?

টেনিস্ খেলা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যায়। দ্রুত এগিয়ে এসে রমা বলে, আসুন এদিকে, চা দেওয়া হয়ে গেছে। চল তোমরাও।

ওরা এগিয়ে যায়।

ঘণ্টা দু'য়েক পর। সবাই বিদায় নেয়।

বাগানের একটা বেঞ্চে বসে রমা আর অমল।

রমা বলে, আচ্ছা আপনি ত' এরোপ্লেন চালাতে পারেন খুব জোরে, আমাকে একদিন নিয়ে চলুন না—কত জোরে চালাতে পারেন দেখব'। আচ্ছা অনেক উঁচুতে উঠে হঠাৎ সমস্ত কল বন্ধ ক'রে হু হু ক'রে নেমে আসতেও পারেন ত'?

হাসিমুখে অমল বলে, তা পারি কিন্তু আপনি ভয় পাবেন তাতে।

'ভয়? ছাই।' রমা হেসে ওঠে।

'হ্যাঁ ভয়ই, ভয় পেতেই হয়। কেবলমাত্র—।' ও হঠাৎ থেমে যায়। ওর চোখে মুখে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় কিন্তু সেই অন্ধকারে রমা তা' দেখতে পায় না।

রমা বলে, কিন্তু সত্যি ভয় আমার পাবে না।

অমল বলে, বেশত' আজই চলুন আমার মটরে, একটু নমুনা দেখে আসি।

ওরা দু'জনেই উঠে পড়ে অমলের মোটরে। গাড়ী চ'লতে সুরু করে। হাওড়ার পোল পার হ'য়ে গাড়ী এসে পড়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে। সে রাস্তা ধ'রে গাড়ী হু হু ক'রে এগিয়ে চলে। একটা মোড় এমনি ভাবে কাটিয়ে অমল এগিয়ে যায় যে রমার মনে হয় বুঝিবা গাড়ী উল্টে যাবে। আরও, আরও জোরে। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। সামনেই আর একটা মোড়—কাছেই একটা গাড়ীর আলো এসে পড়ে। উল্টো দিক থেকে আর একটা গাড়ী আসছে বোঝা যায়—কিন্তু গতিবেগ কমাবার উপায় নেই, আর সময়ও নেই। বাঁকের মুখে আসা মাত্রই ওদিককার গাড়ীটাও এসে পড়ে—একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাশ কাটিয়ে অমলের গাড়ী বেরিয়ে যায় কিন্তু রমার চোখের সামনে থেকে সব কিছুই যেন স'রে যায়। ও ভয়ে চীৎকার ক'রে অমলকে জড়িয়ে ধরে। আরও খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ী থামিয়ে অমল বলে, এবার বাড়ী ফেরা যাক, এরোপ্লেন থেকে হু হু ক'রে নামা বড় সোজা কথা নয়।

অমল গাড়ী ঘুরিয়ে নেয়—ওই টুকু জায়গায় গাড়ী ঘোরাতে দেখে রমা বিস্মিত হ'য়ে যায় কিন্তু কিছুই বলে না।

বাড়ী ফিরে এসে অমল বলে, তা হ'লে এরোপ্লেন একদিন চ'ড়বেনই?

এতক্ষণে রমা নিজেকে সামলিয়ে নিয়েছে, বলে, হ্যাঁ, তা আমি চড়বই। আজকের ব্যাপারেই সব কিছু প্রমাণ হয় না। এরোপ্লেনের ভেতর ব'সে থেকে নামা আর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া এক নয় কিছুতেই। জোরে চালালে ভয় কিছুই নেই—কিন্তু তাই ব'লে ধাক্কা লাগলেও ভয় পাবনা তাত' বলিনি।

অমল বলে, বেশ একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

দিন দশেক পর।

রমাদের ড্রয়িংরুমে এসে অমল দেখে গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চড়িয়ে দিয়ে রমা ব'সে আছে চুপ করে।

ও সোজা এগিয়ে গিয়ে গ্রামোফোনের হাতলটা তুলে দেয়—গান যায় থেমে।

রমা ব্যস্ত হ'য়ে বলে, হ'ল কি আপনার? এর ওপর রাগের কারণ কি? আর্টের জ্ঞান কি একটুও নেই আপনার? জানেন বুঝি শুধু মোটর আর এরোপ্লেন।

অমল বলে, না—আর্টও বুঝি কিছু কিছু আর তাই বন্ধ ক'রে দিলুম এটা। গান যদি নিজের জানা থাকে ত' করুন আর সেটাই হবে সত্যিকার আর্ট—এত' ফাঁকী।

'কিন্তু এতে গান শেখা যায়।' রমা বলে।

অমল জবাব দেয়, শেখা যায় ভাল, কিন্তু এমনি ভাবে শিখতে হ'লে ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে দিয়ে বাজাতে হয়—ড্রয়িংরুমে এসবের পরিবেশন চলে না। অনেক লোক দেখেছি বিশেষ ক'রে মেয়ে লোক যারা প্রতিদিন এক কৌটা পিন্ খরচ করে—গান শুনবে, কলের ভেতর দিয়ে চড়াও করতেই তারা ব্যস্ত নিজেদের কথা একেবারেই ভুলে যায়। একটা গান এমনি ক'রে কতদিন শোনা যায়—এ যে আর্টের অপমান।

'বেশ আপনার সামনে আর বাজাব না কোনদিন।' রমা বলে।

অমল ব'লে চলে, আর একটা জিনিষ আছে—ওই পিক্‌টোগ্রাফ্। আর্টকে ফাঁকী দেবার কি সহজ পন্থাই না বের হ'চ্ছে। যে কোন লোকও এমনি ক'রে আর্টের সমজ্‌দার হ'য়ে ওঠে। আমি আশ্চর্য্য হই শুধু এই ভেবে যে, এই সব ছবিগুলোর তলায় নাম লিখে বাঁধিয়ে মানুষে বিশেষ ক'রে মেয়েরা বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখে কি ক'রে। এইত' দেখছি আপনার কয়েকটা। বাঃ বেশ হ'য়েছে, তারিফ্ ক'রতে হয়, কি বলুন!

রমার মাথা নীচু হ'য়ে আসে, বলে, কিন্তু আপনি কি খোঁচা না দিয়ে পারেন না? 'বোধ হয় তাই। কিন্তু চলুন আজ আপনাকে খানিক উড়িয়ে নিয়ে আসি।' অমল বলে 'কিন্তু তার আগে বলুন এতদিন আসেন নি কেন?' রমা ওর দিকে তাকায়। অমল হাসে বলে, আসবার চেষ্টা ক'রেছিলুম কিন্তু পারিনি। কারও সঙ্গে ক'রতে হ'ল সেক্সপীয়রের আলোচনা, কারও সঙ্গে বা দর্শন নিয়েই মাততে হ'ল। বাড়ী থেকে বের হ'তেই পারিনি। দুপুর থেকেই যুথীকা অনিমার দল নিয়ে গিয়ে হাজির—তর্কের মীমাংসা চাই যেন আমিই একমেবাদ্বিতীয়ং—শঙ্করাচার্য্য থেকে ফ্রয়েড পর্য্যন্ত। কিন্তু থাক সে সব কথা, চলুন।—

ওরা বেরিয়ে যায় দমদমের পথে।—অনেক উঁচুতে উঠে অমল বলে, প্রস্তুত হ'ন। সেদিনকার মত করবেন না যেন—বিপদ হ'তে পারে, আমার হাত পা আর চোখ খোলা থাকা চাই।

রমা বলে, ভয় নেই আমি ঠিকই আছি। হঠাৎ কল কব্জার শব্দ থেমে যায় যেন কোন এক যাদু মন্ত্রে সমস্ত কিছুই স্তব্ধ হ'য়ে গেছে—ওপর থেকে বিরাট পৃথিবীটাকে দেখে সমস্ত যন্ত্রই যেন বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে শুধু চেয়েই থাকে। প্লেন হু হু ক'রে নেমে আসে। মধ্যাকর্ষণের যে কি অসীম শক্তি। বাইরের দিকে নজর পড়া মাত্রই ভয়ে রমার চোখ বুঁজে আসে। জোরে চীৎকার ক'রে সে অমলকে প্রাণপন বলে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আজ অমল তাকে জোরে ঠেলে সরিয়ে দেয়, মাথায় একটু আঘাত লাগে—ভয়ে রমা জ্ঞান হারিয়েই ফেলে হয়ত।

অমল তর্জ্জন ক'রে বলে, জানি সে ছাড়া প্রত্যেক মেয়েই ভয় পাবে, ভয় পেতেই হবে তবু স্বীকার করা যেন মহাপাপ। স্পর্দ্ধা, কিন্তু কেন! এত সহজেই কি ভোলান যায়?

ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে অমল বলে, নিজের ওপর বিশ্বাস থাকা ভাল কিন্তু নিজের শক্তির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও রাখিতে হয় নইলে যে বিপদ আসে পদে পদে ভয় তাকে দেয় আরও বাড়িয়ে।

গ্রীষ্মের সময় অভিজাত সম্প্রদায় দার্জ্জিলিংয়ের শৈল শিখরে অভিযান করে। রমা, যুথীকা এবং আরও অনেকে, তাদের মায়েরা কারও কারও পিতাও বাদ যান না এ তাদের বাৎসরিক রীতি। তাদের দেখে ঠিক বোঝা যায় না যে দার্জ্জিলিংয়ে গেছে তারা—না দার্জ্জিলিং এসেছে কলকাতায়। অমলও বাদ যায় না। মেয়েরা আর তাদের মায়েরা তাকে নিজের নিজের আবাসে থাকতে বলেন সে কিন্তু গিয়ে ওঠে হোটেলে। মেয়েদের সঙ্গে ঠিক তেমনি করেই কথা বলে সে কিন্তু ঠিক তেমনি ভাবেই মেসে না যেন। প্রত্যেকেই এক একটা ফাঁকী ব'লেই মনে হয় তার। যা তারা নয় তাই তারা এমনি ভাব তাদের চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে। হাই হিল্ জুতো পরে দু পাক ঘুরে বেড়িয়ে পুরুষদের মনে আকাঙ্খার সৃষ্টি করতেই যে মনে মনে ভালবাসে সেও মুখে চোখে বিজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে ইবসেন, টুর্গেনিকের কথা বলে।

অমল কোন কথা বলে না মনে মনে শুধু হাসে। সেদিন বিকেলে যুথীকাদের 'ভিলায়' একটা পার্টি। অমলকে আসতে হবে।

সকালে বিকেলে অমল ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। বহু দূর চলে যায় সে। যে সব পথে ধীরে ধীরে চলতেই ভয় পায় অনেকে সে সব পথেও সে জোরে ছুটিয়ে দেয় ঘোড়া।

বাড়ীতে আসতে হবে তাই সে সেদিন একটু আগে আগেই ফেরে। একটা বাঁকের মোড় ঘুরতেই বিপরীত দিক থেকে আর একটা ঘোড়া প্রায় তার গায়ের ওপর এসেই পড়ে। কোন মতে দুজনেই সামলিয়ে নেয়—ঘোড়া দুটো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার চেঁচিয়ে সামনের পা দু'টো তুলেই থেমে যায়।

অমল সোজা চেয়েই আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়, বলে, তুমি? বিলেত থেকে কবে এলে কৃষ্ণা?

মিষ্টি হাসি হেসে কৃষ্ণা বলে, আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলে যে? আমি ছাড়া কোন মেয়ে এমনিভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে পারে নাকি! তবে বিলেত থেকে এসেছি কিনা তা তুমি জানতে না, সেকথা ঠিক।

'কিন্তু জানাও নি কেন বলত'? অমল বলে।

'দেখা হবেই তা জানতুম যে। দুর্দ্ধর্ষ অমল আর বেপরোয়া কৃষ্ণা মিলবেই এত সোজা কথা। তাই মাসখানেক আগে বিলেত থেকে ফিরেও তোমার কোন খোঁজ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য যোগাযোগ—কালই এখানে এসেছি আর আজ বিকেলেই সহর চ'ষে বেড়াতে বেরিয়েছি।' কৃষ্ণার মুখে হাসি লেগেই থাকে।

হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে অমল বলে, চল একটা পার্টী আছে সেখানে যাই।—ওখানে অনেক তরুণীই আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছে—তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাদের পার্টীর সঙ্গে মিশিয়ে দিই চল।

কৃষ্ণা হাসে, বলে, তাই নাকি, এতদিনেও তোমাকে তারা চিনতে পারেনি আশ্চর্য্য!

ও ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ওর পাশে পাশে চ'লতে থাকে।

স্বর্ণদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

—এক—

কর্ম্মক্লান্ত জীবনের ধারা পরিবর্ত্তনের আশায় ডাক্তার অরুণ গুপ্ত ও সাহিত্যিক অমল সান্যাল আজ চন্দননগরে হোটেল ডি প্যারিসে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন। ডা: অরুণ ও সাহিত্যিক অমল উভয়েই যুবা ও সুপুরুষ। ডাঃ অরুণের দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে এবং মনের দৃঢ়তারও অভাব নাই তাহা তাহাকে দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। অমলের আকৃতিতে যৌবনসুলভ চঞ্চলতা পরিস্ফুট। ডাঃ অরুণ বিবাহিত, কিন্তু অমল অদ্যাপি কোন নারীর পাণিস্পর্শ করিবার সুযোগ পায় নাই। বিশেষতঃ অমলের ধারণা ছিল যে নারীজাতি বাহ্যিক যতই সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হোক্ না কেন, তাহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ পুরুষের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পুরুষের ন্যায় হস্তপদবিশিষ্ট হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীব। অতএব এ যাবৎ কোন নারীকে সে জীবনের সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই।

সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যা। মেঘমালা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইয়া নীল আকাশটীকে ঘনকৃষ্ণ মসীময় করিয়া তুলিল। সেই মেঘমালার মধ্য হইতে বিজলীবধূর অজবাসও দুই চারিবার পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস হোটেল ডি প্যারিসের গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়া পর্দাগুলিকে বিলক্ষণ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

চায়ের কাপটী মুখ হইতে নামাইয়া অরুণ বলিল, "চল্ যাওয়া যাক্, ঝড় উঠবে।"

বাটার রোল চিবাইতে চিবাইতে অমল উত্তর করিল, "ব্যস্ত কেন? দেরী হলে বৌদি তোকে ডাইভোর্স করবে এমন আশঙ্কা আছে নাকি?"

"না, সে ভয় আমার নেই অমল; কিন্তু জল ঝড় হলে গাড়ী চালান বড় কষ্টকর হয়ে উঠবে কিনা তাই বলছিলাম! আর—আর দেরী করে লাভই বা কি? শেষে কি পথ হারিয়ে ফ্রেঞ্চ পুলিশের আতিথ্য গ্রহণ করবো?

"সেও ভাল" বলিয়া অমল বাকী বাটার রোলটী মুখে পুরিল। সেটাকে গলাধঃকরণ করিয়া অমল আবার বলিল, "যাই বল্ অরুণ পেটের ধান্দা না থাকলে আমি কলকাতায় ফিরতামনা। যদি তোর মত আমার অবস্থা হতো তা হলে কোন নির্জ্জন পল্লীতে বা পাহাড়ে গিয়ে একটা ছবির মত বাড়ী করে ইজিচেয়ারে বসে সাহিত্য সুধা পান করে জীবন কাটিয়ে দিতুম।"

আকাশের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অরুণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "ওরে থাক্ তুই, আমি চল্লাম।"

অগত্যা অমল শান্ত বালকের ন্যায় সোফারের সীটের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অরুণ স্বয়ং মোটর ড্রাইভ করিতেছিল। সে যে স্পীডে মোটর চালাইবে স্থির করিয়াছিল তাহা হইল না। সে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিল। পার্শ্বে বসিয়া অমল সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিল, অরুণকে দুই একটা প্রশ্ন করিল; অরুণ উত্তর দিল না, অগত্যা সে গলা ছাড়িয়া গাহিয়া উঠিল,

"নিশীথ রাতের
বাদল ধারা।"

কয়েক মিনিট যাইতে না যাইতেই অরুণের গাড়ী সশব্দে থামিয়া গেল—উভয় বন্ধু বিস্মিত নেত্রে দেখিল, গাড়ীর চাকার দুই ফুট তফাতে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গসিক্ত অষ্টাদশী যুবতী।

অরুণ ও অমল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল—হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোকে তাহারা দেখিল যুবতী গৌরী, বারিধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, ওষ্ঠ দুইটী নীলাভ হইয়া উঠিয়াছে। বালিকা বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অরুণ বলিল, "এত দুর্যোগে কি বেরুতে আছে?"

তরুণী কাঁদিয়া ফেলিল এবং ক্ষণপরে বলিল, "ডাক্তারের বাড়ী, ডাক্তারের বাড়ী,—আমাদের বড় বিপদ—আমার দাদার অবস্থা বড় খারাপ—দয়া করে বলে দিন এখান থেকে ডাক্তারের বাড়ী কতদূর?"

অরুণ বলিল "এখানের কোন খবর আমি জানি না, কারণ আমরা এদেশে আজই নূতন এসেছি। তবে তুমি ডাক্তার চাচ্ছ—আমিও ডাক্তার। আমাকে দিয়ে যদি তোমার কাজ চলে, চল আমি যেতে প্রস্তুত আছি।"

তরুণী যেন হাতে স্বর্গ পাইল—সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তবে আর বেশী দেরী করবেন না। চলুন আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

অরুণের অনুরোধে সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তাহার শুধু মনে হইতেছিল পথ বুঝি আর ফুরায় না, যেন কত দেরী তাহাদের বাটী পৌছাইতে।

অমল অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল; সে একটীও কথা বলে নাই। একটী পল্লী গলির পাশে আসিয়া বালিকা বলিল, "থামুন, ঐ আমাদের বাড়ী দেখা

যাচ্ছে। গাড়ী থামিলে সে গাড়ী হইতে উন্মাদের ন্যায় নামিয়া পড়িল—অরুণ তাহার ব্যাগটী হাতে করিয়া তরুণীর পশ্চাতে চলিল। অমল সেই সুগভীর অন্ধকারে গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল।

অরুণ জীর্ণকুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল কুটীরের এক প্রান্তে মলিন শয্যায় এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি শুইয়া আছে, ঘরের এক কোণে একটী নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপ ক্ষীণ আলোকে বিকীর্ণ করিতেছে। অরুণ রোগীর শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্ব্বে বেচারীর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহাশূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে। মৃতের হিম-শীতল হাত খানি ক্রোড় হইতে নামাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "সব শেষ হয়ে গেছে।" তরুণীর কর্ণে এই কথাটী শত বজ্র-ধ্বনির ন্যায় প্রবেশ করিল—সে কাঁপিতে কাঁপিতে অরুণের পদতলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

—দুই—

মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহলোক ত্যাগ করিবার সময় পৃথিবীতে ফেলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার ভগ্নপ্রায় বাস্তুভিটা আর একটী পুত্র ও একটী শিশু কন্যা। তাঁহার মৃত্যুকালে পুত্র অমরনাথের বয়ঃক্রম আনুমানিক বিংশ বৎসর, সে বি, এ, পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টা দেখিতেছিল এবং মাতৃহীনা চারিবৎসরের ভগ্নী কণাকে তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া সংসার সাগরে ভেলা ভাসাইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুতে অমরনাথ শোকে মুহ্যমান হইলেন বটে কিন্তু যখন কণা তাহার ছোট ছোট হাতদুইটী লইয়া আধ আধ ভাষায় 'দাদামণি' বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, তখন তিনি বুঝিলেন পিতামাতার শেষ নিদর্শন কণার কল্যাণে তাহাকে বাঁচিতে হইবে এবং কণাকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহাকে সুপাত্রে ন্যস্ত না করিতে পারিলে স্বর্গীয় পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যের হানি হইবে। সেইদিন হইতে অমরনাথ নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া কণাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ইহার পর সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ভ্রাতার অসীম যত্নে কণা চন্দ্র-কলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণ যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অমরনাথ যাহা কিছু রোজগার করিতেন তাহার অর্দ্ধেক ভগ্নীর বিবাহের জন্য সঞ্চয় করিতেন। এইরূপে গত কয়েক বৎসরে পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়াও অমরনাথ ভগ্নীর বিবাহের জন্য বাইশ শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলে পাছে খরচ বাড়িয়া যায় এবং পাছে ব্যয়াধিক্য বশতঃ কণার বিবাহে বাধা পড়ে এই জন্য অমরনাথ চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। অমরনাথ নিজের জন্য অতি অল্প ব্যয় করিতেন কেবল যাহা না হইলেই নয় সেইটুকু তিনি নিজের জন্য ব্যয় করিতেন; কিন্তু ভগ্নীর কোন আবদার তিনি কোন দিনই অপূর্ণ রাখেন নাই।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে অমরনাথকে যক্ষা রোগ আক্রমণ করিল—তথাপি তিনি

রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া কার্য্যে বাহির হইতেন এবং ফলে গত দুই সপ্তাহ যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। রোগের চিকিৎসা করাইতে হইলে পাছে তাহার ভগ্নীর জন্য সঞ্চিত অর্থে হাত পড়ে এইজন্য ডাক্তার বা কবিরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। যে দিন সন্ধ্যায় তাঁহার মৃত্যু হইল সেই দিনই সকালে পোষ্ট অফিসের পাশ বহিটী ও একটী পত্র ভগ্নীর হাতে দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "কণা, দিদি আমার, অনেক কষ্টে তোর জন্য এই বাইশশ' টাকা যোগাড় করেছিলাম—তোকে ভাল পাত্রে সমর্পণ করব বলে। ভগবান্ না করুণ যদি আমার কিছু হয় তুই ঐ টাকাগুলো তুলে নিস। আমি ও পাড়ার পাঁচু কাকাকে তোর ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেছি।"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কণা উত্তর করিয়াছিল, "ও কথা বোলনা দাদা, ভগবান তোমায় নিশ্চয় ভাল করে দেবেন।" সে আর কথা বলিতে পারে নাই, ভ্রাতার শীর্ণ বক্ষে মুখ লুকাইয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষে জগদীশ্বরের চরণে ভ্রাতার আরোগ্য কামনা করিয়াছিল।

সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই অমরনাথের কাশি অত্যন্ত প্রবল হইল ও কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই এক ঝলক তপ্ত শোণিত তাঁহার বাহির হইল, কণা আর স্থির থাকিতে পারিল না। বাহিরে দারুণ দুর্য্যোগ চলিতেছিল তথাপি সে ডাক্তারের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠকবর্গ অবগত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

এবারের বেতার-জগৎ খুলে দেখা গেল প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে খানিকটা পরিবর্ত্তন। বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মি: এ, কে, সেনের কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা নীতিতে আমরা গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তন চেয়েছিলাম এবং সাধারণতঃ বেতার শ্রোতারা কী চায় তারও অনেক ইঙ্গিত আমরা ইতঃপূর্ব্বে বহু বারই দিয়েছি। মি: সেন গত ৪ঠা মে তারিখের বক্তৃতায় বেতারের কার্য্যসূচী এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন তাঁদের পক্ষে অসুবিধার কথা ও আমাদের কিছু জানিয়েছেন আমরা এমনি খোলাখুলি আলোচনায় খুসি হয়েছি এবং সুবিধা ও লাভ করেছি শ্রোতাদের পক্ষ থেকে এ নিয়ে বাদানুবাদ এবং আলাপ আলোচনার সুযোগ লাভ করে। মি: সেন আমাদের আশা দিয়েছেন মাসে একবার করে তিনি শ্রোতাদের সঙ্গে সমালোচকদের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

* * *

আমাদের উদ্দেশ্য বেতারের অগ্রগতির দিনে এর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি। শ্রোতাদের অশেষবিধ অনুযোগ শিল্পীদের অভিযোগ থেকে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করা, বেতারের বৃহত্তর উদ্দেশ্যকে সফলতার পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করা ও প্রসারিত করাই একমাত্র আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমাদের সমালোচনা।

* * *

কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অভাব অভিযোগকে উপেক্ষা করলে চলবে না। গুণী আর্টিষ্টদের বিতাড়িত করা অযোগ্যদের দিনের পর দিন প্রোগ্রামে স্থান দেওয়া কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে বহুদিন ধরে চলে আসছে। Party politics আর favouritism এখানে প্রবল। মি: সেনকে এদিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

* * *

আর্টিষ্টদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহারও সবসময়ে করা হয় না। যারা প্রোগ্রাম চাইতে যায় তারা যেন মহা অপরাধী—তাদের প্রতি অখণ্ড অন্যায় ব্যবহার করা হয় মাঝে মাঝে। প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর কী এদিকে লক্ষ্য দেন?—তাঁর সহকর্ম্মীদের 'পর নির্ভর করেই তিনি এবিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন। আমরা বিশেষভাবে জানি যে আর্টিষ্টদের প্রোগ্রাম চাইতে যাওয়ায় অত্যন্ত আত্ম সম্মানে আঘাত লাগে। অনেক গুণী আর্টিষ্ট এই লজ্জাকর ব্যবহারে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করেছেন। বিভাগীয় প্রোগ্রাম পরিচালকরা মনে করেন তাঁরা যেন প্রোগ্রাম দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

* * *

এ অভিযোগের কী প্রতিকার সাধন করা হয়েছে? দিনের পর দিন এই অবিচার কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে চলে আসছে। প্রতিবাদ করলে—অভিযোগ প্রকাশ করলে আর্টিষ্টদের অযোগ্যতার দোহাই দেওয়া হয়; কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যোগ্যতার মাপ কাঠি কী?—কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে কী প্রকৃতই যোগ্যের সম্মান করা হয়? এবং যাঁরা যোগ্য অযোগ্যের বিচার করেন তাঁদের রসবোধের 'পর শ্রোতারা আস্থা রাখতে পারে কিনা?

* * *

তা যদি পারতো তা হলে বেতার প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে এত রাবিশের আমদানি কখনই হোত না। শ্রোতাদের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে অভিযোগ দিনের পর দিন বেড়ে উঠতো না।

খেয়ালী চিত্রপট
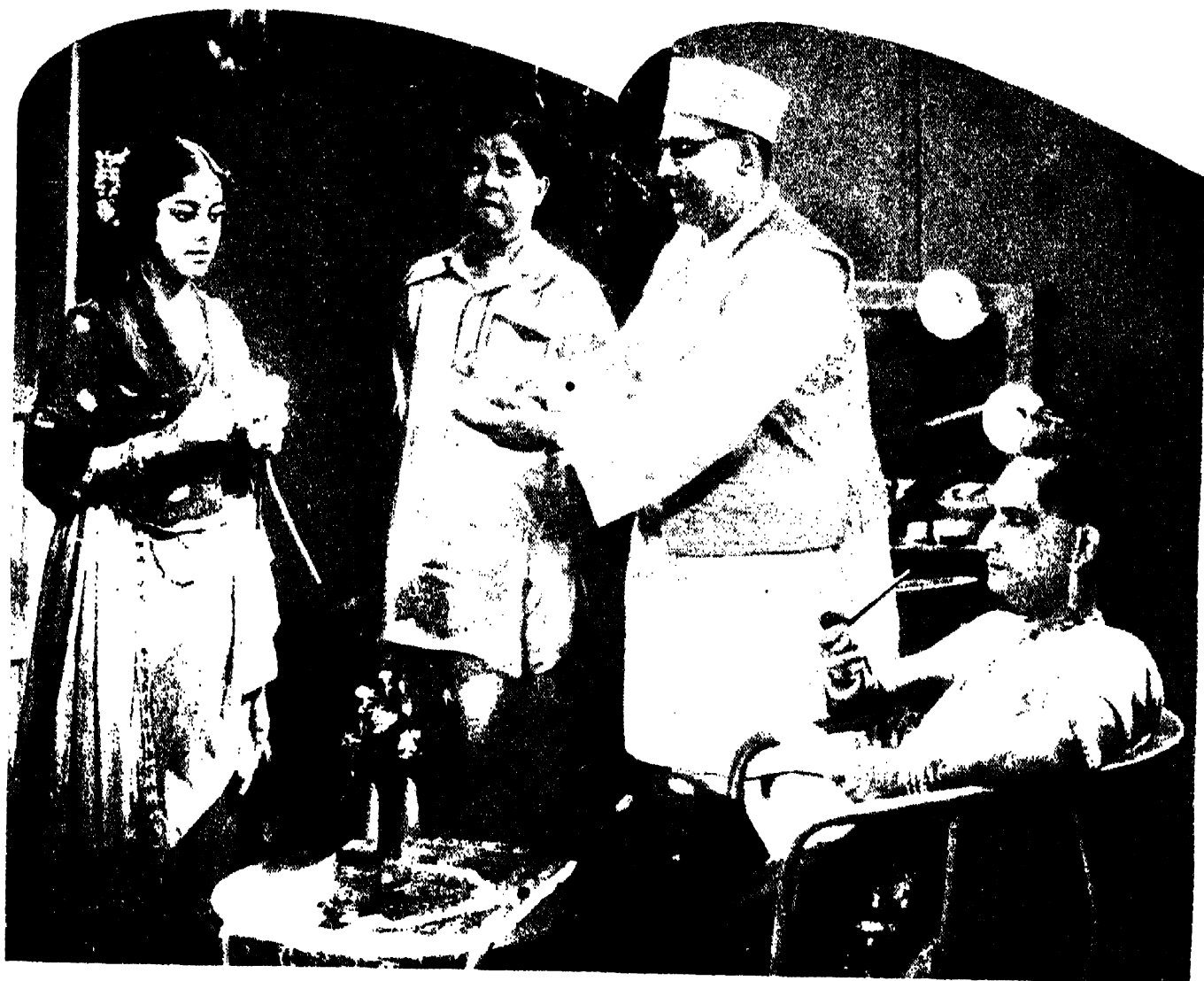
নিউ থিয়েটার্সের "স্ট্রীট সিঙ্গার" চিত্রের বিশিষ্ট দৃশ্যে শ্রীমতী কানন, অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী। শ্রীযুক্ত ফণি মজুমদার মহাশয় ছবিখানার পরিচালনা কচ্ছেন।

পরিচালক
টেলিগ্রাম — ন্যাশনাল নিউজপেপার লিঃ — টেলিফোন
'ভ্যারিটি' — সাউথ ৪৬৬
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, একবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ২৬শে মে ১৯৩৮

চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড

প্রায় বৎসরাধিক কাল হইল চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধিও প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্যদের নাম ঘোষণা করা হয় নাই। মনোনীত সভ্যদের নাম প্রকাশিত না হইলে নূতন বোর্ড গঠিত হইতে পারে না। প্রাদেশিক সরকারের এই বিচ্যুতির সুযোগ লইয়া বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ও ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দাস তাঁহাদের পদে বাহাল আছেন। তাঁহাদের কার্য্যকাল সমাপ্ত হইলেও তাঁহারা যে অধিককাল তাঁহাদের পদে বাহাল আছেন তাহার জন্য দায়ী বিভাগীয় মন্ত্রীর দীর্ঘসূত্রতা। মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও বিভাগীয় মন্ত্রীর অনুরূপ দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া প্রকাশ।

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনে এমন কোন ধারা নাই যাহাতে সাধারণ নির্ব্বাচনান্তে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই যাহার মধ্যে মনোনীত সভ্যদের নাম ঘোষণা করিতে হইবে। আইনের ভুলের এই রন্ধ্রপথে তদবিরবাজ চেয়ারম্যান বা দয়ালু মন্ত্রীবর জনমতকে উপেক্ষা করিয়া পুনর্নির্ব্বাচন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে পারেন। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন-দ্বারা প্রবর্ত্তনের জন্য আমরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চব্বিশ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র সেন দার্জ্জিলিংয়ে যাইয়া সম্প্রতি যে তদ্বিরে রত ছিলেন তাহার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। রায় বাহাদুর হক্-নাজিম-মন্ত্রীমণ্ডলের নির্লজ্জ সমর্থক সুতরাং তাঁহার আবদার মন্ত্রী-মণ্ডলের পক্ষে সহজে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান তাঁহাদের সুদীর্ঘ কার্য্যকালের মধ্যে এমন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই যাহার জন্য তাঁহারা প্রাদেশিক সরকার বা জনসাধারণের নিকট কোনরূপ সহানুভূতি পাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন নীতির দিক দিয়া বিচার করিলে আইনের ভুলের রন্ধ্রপথে জনমতের অবজ্ঞা করা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে। রায় বাহাদুর বা অনুকুলবাবুর পুণরায় নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইতে ত বাধা নাই—তবে কেন তাঁহাদিগকে ও বিদায়ী সভ্যবৃন্দকে অযৌক্তিকভাবে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য ত্রিশঙ্কুর-অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

আমরা প্রাদেশিক সরকারের বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। তিনি যেন অবিলম্বে মনোনীত সভ্যদের নাম ঘোষণা করার আদেশ দেন এবং আমরা আশা করি তিনি মনোনয়ন ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন। তদ্বিরের চাপে বা আশ্রিত-বাৎসল্য হেতু পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট না হন—মন্ত্রীবরের নিকট এইরূপ আশা করা কি দুরাশা হইবে? যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া মন্ত্রীবর চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ডকে মৌরশী-স্বত্বভোগী ব্যক্তিবর্গের কবল হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তিনি জিলার অধিবাসীবৃন্দের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

আমরা বারান্তরে বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য্যাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদ

গত শনিবার অপরাহ্ণে বন্ধুবর দেবকী কুমার বসুর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রবীণ পরিবেশক শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ বসু পৌরহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া প্রথম হইতেই দেবকী বসুকে পূর্ণ সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট বহু প্রধান, কর্ম্মী ও টেক্‌নিশিয়ান উদ্বোধন সভায় সোৎসাহে যোগদান করিয়া বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে এইরূপ প্রতিষ্ঠান বহুদিন হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলায় এতাবৎকাল কোন চেষ্টাই হয় নাই।

ফিল্ম কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়ার মিঃ কাপরা যে সারগর্ভ ও সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে পরিষদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। মিঃ বি এন সরকার, মিঃ দেসাই, মিঃ ডোলানী ও খেমকার স্থায় সুপরিচিত ও প্রতাপশালী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা লাভে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের প্রবর্ত্তকগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

বিভিন্ন ষ্টুডিওর তরুণ কর্ম্মীবৃন্দের উৎসাহ ও পূর্ণ সহযোগিতা পরিষদের বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বের পক্ষে বিশেষ শুভ সূচনা বলিয়া মনে করি। শ্রীযুক্ত মধু শীল ও শ্রীযুক্ত সুধীশ ঘটক টেক্‌নিসিয়ানদের পক্ষে বক্তৃতা করিয়া পরিষদের শুভ কামনা করেন।

শ্রীযুক্ত অনাদি নাথ বসুর বিজ্ঞজনোচিত পরিচালনায় বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদ বাংলার ক্রমবর্দ্ধমান চলচ্চিত্র শিল্পের আশা, আকাঙ্খা পরিস্ফুটনের ও বাধা বিপত্তির নিরাকরণের এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক— ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা।

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

যাঁরা এখনও এই ছবিখানি দেখবার অবকাশ পান নি, তাঁদের আমরা এ সপ্তাহে চিত্রায় গিয়ে দেখে আসতে বলি

এ এমন একখানি ছবি যা সপরিবারে এবং সবান্ধবে উপভোগ কোরে স্বস্তি পাওয়া যায়।

যে সব আর্টিষ্ট দিনের পর দিন, নিউ থিয়েটার্সের নানা চিত্রে, নানা ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরে আপনাদের আনন্দবর্দ্ধন কোরেছেন, তাঁদের অনেকেই এই চিত্রের প্রধান চরিত্রগুলি বিশ্লেষিত কোরেছেন। এ ছাড়া, মুক্তি চিত্রের নায়িকা কানন— বিদ্যাপতি-র একটি স্মরণীয় আকর্ষণ। যেমন ভক্তকে বাদ দিলে দেবতার পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি হয় না, তেমনি কবি-সঙ্গিনী অনুরাধাকে বাদ দিলে, কবি বিদ্যাপতির জীবনের অনেক কিছুই পরিস্ফুট হয় না। তাই নাটকীয় রস সৃষ্টির দিক দিয়ে এই মৌলিক চরিত্রটি, এই চিত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার কোরেছে এবং অপূর্ব্ব গীতাবলী ও অভিনয় মাধুর্য্য এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোরেছেন স্বনামধন্য চিত্রাভিনেত্রী, কানন দেবী।

এ ছাড়া অপরাপর ভূমিকার মধ্যে দুর্গাদাস, কৃষ্ণচন্দ্র ও অমর মল্লিক, উল্লেখ-যোগ্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রায় গত সাত সপ্তাহে বিদ্যাপতির টিকিট বিক্রয় হোয়েছে চল্লিশ হাজার টাকার উপর। এখনও সমানভাবে বিদ্যাপতি দর্শক আকর্ষণ কোরে চলেছে।

অভিজ্ঞান

গত সপ্তাহে এই চিত্রের রেলওয়ে ষ্টেশনের দৃশ্যগুলি সারারাত ধরে শিয়ালদহ ষ্টেশনে তোলা হয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর দৃশ্যগ্রহণাদির বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় অন্যত্র ছাপা হোল। এই শ্রেণীর দৃশ্যগুলি নিপুণভাবে গ্রহণ কোরতে কর্ত্তৃপক্ষকে কতখানি অর্থব্যয়, সতর্কতা ও পরিশ্রম কোরতে হয়—আশাকরি তা এই বিবরণ থেকে আপনারা খানিকটা উপলব্ধি কোরতে পারবেন।

রেলওয়ে ষ্টেশনের মত সর্ব্বদাই জনবহুল একটি public placeকে ছায়া-চিত্র গ্রহনের উপযোগী কোরে তুলতে যে কত রকমের বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা ভোগ কোরতে হয়, এ ধারণা অনেকের নেই। আশাকরি এই দৃশ্যের চিত্র গ্রহণের বিবরণ আপনারা উপভোগ কোরবেন।

বড়দিদি

অভিজ্ঞান-এর 'ফ্লোর' খালি হওয়া মাত্র বড়দিদির চিত্র গ্রহণে সুরু হ'বে। ইতিমধ্যে মল্লিক মহাশয় বড়দিদি চিত্র-নাট্যের অংশ বিশেষের সংশোধন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ কোরেছেন

এই শ্রেণীর মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীকে ছায়া-চিত্রের উপযোগী কোরে গোড়ে তোলা যে বিশেষ কঠিন ব্যাপার একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার কোরবেন। সাহিত্যে যে পথ অবলম্বন কোরে রস-সৃষ্টি

করা সম্ভব, সিনেমায় তা সম্ভব নয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রকাশের পথ (medium of presentation) ভিন্ন অথচ মূল গল্পের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরিচালককে তার কার্য্য সমাধা কোরতে হয়। পরিচালক হিসাবে মল্লিক মশাইয়ের দায়িত্ব কম নয়। তাই চিত্র গ্রহণের পূর্ব্বে এর ট্রিটমেণ্ট যাতে সর্ব্বরকমে ত্রুটি বর্জ্জিত হয়—সেদিকে মল্লিক মশাই বিশেষ অবহিত হোয়েছেন নিশ্চয়ই। তাঁর মত অভিজ্ঞ কর্ম্মীর হাত থেকে আমরা প্রথম শ্রেণীর প্রডাকশানই কামনা করি। আশাকরি ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁর এই বিরাট প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে।

দেশের মাটি

দেশের মাটির উভয় সংস্করণই প্রায়ই শেষ হয়ে এলো। গেল সপ্তায় এক নম্বর সাউণ্ড ফ্লোরে একটা বিরাট 'ক্যাম্প' সেটের কাজ শেষ হয়েছে। এই সেটের মধ্যে জগদীশ, দুর্গাদাস, কমলেশ, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি আর্টিষ্টরা অপূর্ব্ব অভিনয় কলা প্রদর্শন করেছেন।

অধিকার

'রতন'-এর কুঁড়ে ঘরের দৃশ্যটী গেল সপ্তায় তোলা হয়েছে। এই দৃশ্যে পাহাড়ী, মেনকা, মণ্ট ও পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি ছিলেন। পাহাড়ী ও পঙ্কজ মল্লিকের তিনখানি গান ছাড়াও বস্তীর কয়েকটী সুন্দর দৃশ্যও তোলা হয়েছে। তাছাড়া এই দৃশ্যে যে সব সাজ পোষাকের ব্যবস্থা হয়েছিল তা নাকি খুবই সুন্দর। ভারতবর্ষের সবরকম জাতের লোকের সমাগমে এই বস্তী সীনটা একেবারে Cosmopolitan ভাবে গঠিত হয়েছিল।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

Street Singer এর সেট্—ভুলুয়া ও র বড় বাড়ীর সীড়ি—। কখন দেখছি অমর মল্লিককে, কখন ভুলুয়াকে, কখন তাদের চাকর-বাকরদের। কখন হাসি মুখে, কখন দ্রুত পদবিক্ষেপে, কখন অতি ধীরে।

সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে কি?—না।

মজার কিছু ঘটেছে কি?—না।

তবে?

না, কোন অঘটনই ঘটেনি। শুধু Street Singer এর যে সব ছবিগুলো সীড়িতে তোলবার কথা ছিল সে গুলো তোলা হয়ে গিয়েছে।

কোন sound recordist-কে যদি দেখা যায় সে একগাদা বই আর কলকব্জা নিয়ে মেতে আছে, তা হ'লে কি তাকে ঠাট্টা করে বলা যায় না—'আপনার recordist না হয়ে Sound Engineer হওয়া উচিত ছিল।'

এতে শ্রীমান লোকে বসুর ক্ষেপবার কি কারণ থাকতে পারে? সে ক্ষেপে আমাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল movista room-এ। তার সাকরেদ শ্যাম-সুন্দরকে বল্ল—"Street Singer এর কত-গুলো shot শুনিয়ে দাও দেখি।"

Street Singer-এর রেকর্ডিং খুব ভাল হচ্ছে বলে কী অহঙ্কার লোকেন বাবুর।

চোখের বালি

মিঃ বি, পি, মেহেরার প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহের অমর কাহিনী "চোখের বালি"-র শুটিং যথারীতি কালী-ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত হ'চ্ছে। সম্প্রতি ছবিখানির গীতাংশ নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যস্ত আছেন। অনাদি দস্তিদার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর সংযোজনা যা'তে অবিকৃত থাকে সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন। এ বিষয়ে তিনি একজন 'অথরিটী'। আবহাওয়া সঙ্গীত নিয়ে সুরেন দাশ একটা কিছু নতুনত্ব দেখাবার জন্য চেষ্টার কসুর কোরছেন না। মোট কথা "চোখের বালি" যা'তে রবীন্দ্র-নাথের লেখনীর মর্য্যাদা রক্ষা কোরতে পারে তার জন্য সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন।

হাজরা পিক্‌চার্স

এই প্রতিষ্ঠানের "দেবী-সুন্দরা"র শুটিং গত সপ্তাহে সমাপ্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু

"চোখের বালি"-র একটি দৃশ্যে—শান্তিলতা ঘোষ ও সুপ্রভা মুখর্জ্জী

বৃষ্টির জন্য শেষ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এই সপ্তাহে ষ্টুডিওর সমস্ত কাজ শেষ করিয়া তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী সদলবলে বাহিরে গিয়াছেন একটি বহির্দৃশ্য তুলিবার জন্য এবং এই দৃশ্যটির কাজ শেষ করিয়া আগামী সপ্তাহে সম্ভবতঃ তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি ছবিখানির সম্পাদনা কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

"দেবী ফুল্লরা"-কে যাহাতে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়, তাহার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী চেষ্টার কসুর করিতেছেন না। অর্থ ও সামর্থ্য দুইয়ের ব্যয়ে তাঁহার নিজ হাতে গঠিত ষ্টুডিওর প্রথম অবদান যদি চিত্রামোদীদের স্নেহলাভে সমর্থ হয়, সেইজন্য তিনি বিশিষ্ট টেকনিশিয়ান ও সুঅভিনেত্রী সংযোগে ছবিখানি তুলিয়াছেন। মধু শীল, বিভূতি লাহা, যতীন দত্ত প্রভৃতি যন্ত্রশিল্পী এবং অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায়, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দুর্গাপ্রসন্ন বসু, শিশুবালা, রাধারাণী, সাবিত্রী, চিত্রা, রাণী চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পী সমন্বয়ে "দেবী ফুল্লরা" রূপ-রস-গন্ধে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। মঞ্চে অহীন্দ্র ও মনোরঞ্জন যথাক্রমে 'কালকেতু' ও 'ভাঁড়ুদত্তের' ভূমিকায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। চিত্রেও তাঁহারা এই দুইটি ভূমিকাতেই নামিয়াছেন। যুবরাজের অংশে মোহন রায়কে মানাইবে সুন্দর—ইহার উপর সামান্য অভিনয় করিতে পারিলেই তিনি চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী সর্দ্দাররূপে দেখা দিবেন এবং তাহা যে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। নাম-ভূমিকায় শিশুবালার মনোনয়নকে আমরা সমর্থন করি। তিনি শক্তিমতী অভিনেত্রী তাহার উপর ব্যাধ-কন্যা রূপে তাহাকে মানাইবে চমৎকার। গীত-বহুল ভূমিকায় রাধারাণী, মহামায়া রূপে সাবিত্রী, সুষমা রূপে চিত্রা নিজেদের ভূমিকার সুনাম অর্জ্জন করিবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই নব-উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইব। ছবিখানি 'উত্তরা'য় আসিতেছে শীঘ্রই।

দীপ্তি পিক্‌চার্স

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত এই প্রতিষ্ঠানের হাসির-নক্সা "রেশমী-রুমাল" আগামী ১১ই জুন 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করিবে। হাসির গল্প হিসাবে "রেশমী রুমালে"-র ভিতর যথেষ্ট পরিমাণেই হাসির খোরাক আছে এবং সেই জন্যেই এই নাটকখানি মঞ্চে বহুদিন ধরিয়া সাধারণের মনস্তুষ্টিতে সমর্থ হইয়াছিল। পর্দ্দায়ও ছবিখানিকে তদপেক্ষা সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শব্দযন্ত্রী মধুশীল, আলোক-চিত্র-শিল্পী ননী সান্যাল প্রভৃতি চেষ্টায় ত্রুটি করেন নাই। এই সকল গুণী শিল্পীর যোগাযোগে ছবিখানি 'শ্রী' চিত্রগৃহে যে বেশ কিছুদিন চলিবে। একথা বলাই বাহুল্য।

মেট্রোপলিটন পিকচার্স

শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকার উদ্যম ও উৎসাহের আমরা প্রশংসা না করে পারি না। নানা বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া তিনি ইতিমধ্যেই শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স ষ্টুডিও-এ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'খনা'-র চিত্র-সংস্করণের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র-পারদর্শিনী 'খনা' শুধু গণনা-নিপুনতার জন্যই নয়—নারীত্বের গরিমায় তিনি আমাদের নমস্যা। নারীর মহিমান্বিত নারীত্ব এবং পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্খার দ্বন্দ্বে মহিয়সী 'খনা' স্বয়ং নিজের জিহ্বা ছেদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'খনা'র জীবনকাহিনী এই জন্যই অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। 'খনা' চিত্রে শ্রীমতী ছায়া দেবী, অরুণা, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায় (ঃ), অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করিতেছেন। তৎকালীন সাজসজ্জা ও দৃশ্যশোভায় যাহাতে 'খনা' সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত খেমকার বিশিষ্ট সহকারী শ্রীউপেন্দ্র

ওরিজিন্যালের অপমৃত্যু

(রস রচনা)

শ্রীফেলু চক্রবর্ত্তী

নিদাঘের উত্তাপ তরঙ্গ যখন সারা গাঁখানি পুড়িয়ে দিয়ে গেল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু' এক পসলা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ সমীরণ এসে তাকে সঞ্জীবিত করে দিলে। প্রকৃতির এই শাসন ও পালন দেখে কবি কবরীনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না—খাতা কলম নিয়ে উঠলেন ছাদের উপর দু একটী ভাবপূর্ণ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল নিদ্রাদেবীর অত্যাচারে। হাতের কলম হাতেই রইল, অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন।

সংসার বলতে তিনি নিজে, তাঁর স্ত্রী ফাল্গুনী ও একটী ভৃত্য। তিনি একাধারে গাঁয়ের ডাক্তার, কবি ও অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়ের শিক্ষক—এক কথায়, বেশ একজন মান্যগণ্য নামজাদা লোক। গাঁয়ের কোথাও যদি কোন সভা সমিতি হয়, কবরী মণ্ডলকেই সভাপতির আসন গ্রহণ ক'রতে হয়। তিনি বক্তৃতা করেন গদ্যে নয়—পদ্যে। তিনি যখন অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁর নিজ রচিত অসংলগ্ন কবিতা আওড়াইতে আরম্ভ করেন, বোধগম্য না হ'লেও তাদের জোর গলায় স্বীকার ক'রতে হয় যে, কবরীবাবু বাস্তবিকই একজন উঁচুদরের কবি। সেদিন গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় চাকরী থেকে যখন অবসর গ্রহণ করেন—তখন সেই সভায় তিনি রাবীন্দ্রিক ছন্দে বলেছিলেন :—

"এ পারের খেলা সাঙ্গ করে,
চলিলে গো তুমি ওপারে।
জীবনের পার কোন পারে গিয়ে—
শুধুই কাঁদালে আমারে॥"

পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলেও, গাঁয়ের সকলেই ত করতালি দিয়েছিলো, বাহবা দিয়েছিলো, বলেছিলো কবরীবাবুর মুখে যেন মা সরস্বতী বিরাজমানা। এ হেন প্রতিভাসম্পন্ন জনপ্রিয় কবরীনাথ যে গ্রামের নেতা ব'লে গণ্য হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

রাত্রি তখন অনেক হবে। সারা গাঁখানি সুষুপ্তির কোলে শায়িত। মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের ঝাউ গাছের উপর থেকে দু একটা পেঁচক গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে রাত্রির গভীরতা জ্ঞাপন ক'রছে। এমন সময় হঠাৎ বাহির হতে একজন ডাক দিলে "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু বাড়ীতে আছেন।" দু চার ডাকের পর ডাক্তারের ঘুম ভেঙ্গে গেল ধড়মড় করে উঠে সাড়া দিলেন "কে হে"। কাঁদ কাঁদ স্বরে আগন্তুক উত্তর দিলে "আমি, আমি—বাহির দীঘি গ্রাম থেকে এসেছি, বড় বিপদ, একবার দয়া করে আসতে হবে। ছেলেটী আমার গাছ থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।" বিরক্তি সহকারে ডাক্তার কবরীনাথ বল্লেন "এত রাত্রে পাঁচ ক্রোশ পথ যাওয়া ত আর ছটী খানি কথা নয়, টাকা বেশী লাগবে, যদি রাজী হও, যেতে পারি, নতুবা অন্যত্র দেখ"—

"আজ্ঞে অন্যত্র আর কোথায় দেখব বলুন, আপনার মত বিচক্ষণ ডাক্তার আর কে আছে বলুন, আপনি যা চান তাই দোব, দয়া করে আসুন" আগন্তুক জবাব দিলে।

"আচ্ছা, তা হ'লে দাঁড়াও" বলিয়া ডাক্তার বাবু তাঁর পুরাতন ভৃত্যটাকে ঘুম

নাথ গোস্বামী 'ধনা' চিত্রের নিঃসংশয় সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের জনপ্রিয় নৃত্য-গীতবহুল কথাচিত্র 'আলিবাবা' প্রদর্শিত হইবে। 'আলিবাবার' রোমাঞ্চকর কাহিনী চিরদিন আমাদের কাছে চিরনূতন রূপে আনন্দিত করেছে, 'মর্জ্জিনার' চরিত্রে নৃত্য-গীত-পটীয়সী রূপময়ী শ্রীমতী সাধনা বোসের অভিনয় আপনাদের মুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

আগামী শনিবার ৪ঠা জুন নিউ-থিয়েটার্সের নূতনতম ছবি অভিজ্ঞান আসিতেছে।

পূর্ণথিয়েটার

মুক্তি নবম সপ্তাহ শেষ করে আসছে শনিবার থেকে দশম সপ্তাহে পড়বে। পূর্ণ-থিয়েটারএ 'মুক্তি' যে একটা রেকর্ড স্থাপন করতে পারবে এ আমরা অনেক আগেই জানিয়ে ছিলাম।

থেকে তুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন রোগী-চিকিৎসায়। যাবার সময় ফাল্গুনীকে বলে গেলেন সদর দরজা বন্ধ করে দিতে, তিনি অচিরেই ফিরে আসবেন। চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ফাল্গুনী উঠে দরজা বন্ধ করে দিলে এ রকম একলা থাকা তার অভ্যাস আছে কারণ স্বামীকে প্রায়ই রাত্রে বাহিরে যাইতে হয়। কিন্তু দোষের মধ্যে এই যে স্বামী বাহিরে থাক্‌লে তার কেমন ঘুম আসে না। তিনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে এ পাশ ও পাশ করে সময় কাটিয়ে দেয়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে সদর দরজায় করাঘাত শুনে ফাল্গুনী জিজ্ঞাসা করলে "কে ?" উত্তর এল "দরজা খুলে দাও, আমি ফিরে এসেছি" ফাল্গুনী দরজা খুলে দিয়ে উপরে উঠবার সময় জিজ্ঞাসা করলে "এত শীঘ্র এসে পড়লে"—হ্যাঁ, বিশেষ কিছু নয়, হাতটায় একটু লেগেছে"—তারপর উপরে উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিতেই তার নকল স্বামী একখানি ছোরা বাহির করিয়া ফাল্গুনীর সামনে ধরিয়া বলিল "যা আছে, সব বার করে দাও নতুবা খুন করে ফেলব"—। ফাল্গুনী এক রকম অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হয়েই পড়েছিল। আঁচল থেকে চাবিটা ফেলে দিয়ে বল্লে "খুন কোরো না বাবা, ঐ বাক্সে সব আছে।" দুর্ব্বৃত্ত বাক্স খুলে ডাক্তার ও কবি কঙ্করীর সঞ্চিত যা কিছু ছিল সব লুটে নিয়ে চলে গেল—ফাল্গুনী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে কঙ্করীবাবু ফিরে এলেন এবং সদর দরজা খোলা দেখে একটু বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি উপরে উঠে ব্যাপারটা দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। স্ত্রীর মুখে চোখে জল দিয়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনে সমস্ত শুনে নিজের কপালে করাঘাত ক'রতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধারণা করলেন যে ফাল্গুনীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই আজ তাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'ল। কিছুক্ষণ পরে ঈষৎ বিরক্ত-সহকারে তিনি বললেন "তুমিই ডোবালে ফাল্গুনী, তুমিই ডোবালে। তুমি স্কুলে পড়া মেয়ে বলেই না তোমাকে বিয়ে করেছিলাম—তোমার এ উপস্থিত বুদ্ধিটা অন্ততঃ থাকা উচিত ছিল যে একবার টেনে দেখি Original কি false—আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে চলে গেল—সম্বল মাত্র রইল এই মাত্র পাওয়া visit-এর এই কয়টী টাকা"—বলতে বলতে কঙ্করীবাবুর চোখ জলে ভেসে গেল, তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে পড়লেন।

কথাগুলো শুনে দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক ফাল্গুনীর মুখ রাগে লাল হ'য়ে উঠল। সে চীৎকার ক'রে বলে উঠল "বিয়ের আগে আমার বাবার উচিত ছিল তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখা, বাস্তবিক তোমার কোন পদার্থ

আছে কি না—আমার মনে হয় তা হ'লে আজ আর আমায় এ অপবাদ সহ্য ক'রতে হোত না। তুমি ব'লছ কি—আমায় সন্দেহ করবার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে? টেনে দেখবার আমার কোন কারণ থাকতে পারে? দুর্ব্বৃত্ত, তোমার গলার স্বর পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় নকল করে ছিলো—তা জান? আচ্ছা ধর, আমি যদি টেনেই দেখতাম—ফল কি হ'ত—আমাকে একলা পেয়ে সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তার উদ্দেশ্য সাধন ক'রত না? তুমি তোমার কেবল টাকাটাই দেখছ। আমি ত আমি—খবরের কাগজে পড়ে দেখিছ কি—যে পাষণ্ডেরা running train থেকে স্ত্রীর মন্মথ মুখার্জ্জীর-ও সমস্ত অপহরণ করেছে। যাক্, তর্কে কাজ নেই, বাস্তবিক যদি আমি একটা আবর্জ্জনা, একটা অপদার্থ, একটা বোকা, তুমি অনায়াসেই আমার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করতে পার" বলিয়া ফাল্গুনী বিদ্যুৎ বেগে ঘর হ'তে বেড়িয়ে গেল।

"আ-হা-হা, রাগের কি কারণ আছে, শোন, শোন, আরে এ দিকে এস। আমি বুঝিতে পারছি, তোমার বিশেষ কোন দোষ নেই" বলিতে বলিতে কঙ্করীবাবু তাহার অনুসরণ করলেন। ফাল্গুনী ইতি মধ্যে তার ঘরে ঢুকে বিছানায় মুখ গুজে ফোঁপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সব হারানোর জন্য তার দুঃখ নয়—দুঃখ হয়েছে তার স্বামীর কথায়—স্কুলে পড়া মেয়ে সে—তাকে কি না বলে··· ছি ছি ছি ছি লজ্জায় তার মাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রতে ইচ্ছা ক'রছে। একটা অপদার্থ স্বামীর হাতে প'ড়ে তার কি লাঞ্ছনা—অপদার্থ নয়? নিশ্চয়ই—মনে মনে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হ'য়ে লম্বা দাড়ি রেখেছেন, লম্বা চুল রেখেছেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই তাঁর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁকে কে বুঝিয়ে দেয়—ফাল্গুনী নিজে। কবিতা রচনা ক'রতে তাকে শিখিয়েছে কে—সে নিজে। সে সব কথা ভুলে গিয়ে, আজ কি না তাকে অপমান।

ব্যাপারটা একটু ঘনিয়ে এসেছে দেখে কঙ্করীনাথ ফাল্গুনীকে বুকের মধ্যে টেনে এনে বল্লেন "আমার অন্যায় হয়েছে তোমার ঘাড়ে দোষ চাপান—আমার কপালের দোষ। বাস্তবিক ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন—দুর্ব্বৃত্ত তোমার উপর কোন অত্যাচার করে নি। তুমি রাগ ক'রো না আমার উপর, এস আমরা দুজনে একটা সোলেনামা ক'রে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি ক'রে নি। দেখ পাষণ্ডেরা যখন একবার কৃতকার্য্য হয়েছে, তখন আমার মনে হয়, তারা আবার আসবে হয়ত অন্য কোন উদ্দেশ্যে—তাই বলি এবার থেকে বিশেষ

তাবে সাবধান হতে হবে আমাদের। দেখ, এবার থেকে তুমি এক কাজ ক'রবে—দরজা খোল্‌বার আগে প্রত্যহ একবার টেনে দেখবে সেটা original কি false.

ফাল্গুনী স্বামীর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বল্লে "দরজা খোল্‌বার আগে কি ক'রে টেনে দেখব—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল"—?

ভ্রূদুটী কুঞ্চিত ক'রে কবরীনাথ উত্তর দিলেন "কেন, বৈঠকখানা ঘরের জানালার ধারে আমি এসে দাঁড়াব আর তুমি টেনে দেখে তবে দরজা খুলে দেবে"—

হাস্‌তে হাস্‌তে ফাল্গুনী বল্লে "বৈঠকখানার জানালার ধারে আসাটাই ত একটা গুপ্ত সঙ্কেত আবার টেনে দেখতে হবে কেন" ?

দাড়িটি গম্ভীরভাবে নেড়ে কবরী বাবু বল্লেন "দেখ ফাল্গুনী, মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক না কেন, পুরুষের চেয়ে তাদের বুদ্ধি কখনই তীক্ষ্ণ হয় না। এই দেখ, তুমি রাগ ক'রছিলে, অথচ এটা তোমার মাথায় এল না যে সেই দুর্বৃত্তই হয়ত একদিন ঐ সঙ্কেতটা অন্তরাল থেকে দেখে অনুকরণ ক'রতে পারে এবং আমারই মত এসে জানালায় দাঁড়াতে পারে" —

লজ্জিত হ'য়ে ফাল্গুনী হার স্বীকার করে মুচকে হেসে বল্লে "আচ্ছা তাই হবে, প্রত্যহ রাত্রে যখন তুমি ফিরবে, আমি টেনে দেখে তবে পটলাকে দরজা খুলে দিতে বলব"—বলা বাহুল্য তারপর থেকে প্রত্যহ সোলেনামার সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়ে গেল।

—দুই—

বহুকাল থেকে পুরাতন প্রথা অনুযায়ী অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে গ্রাম্য দেবতার নাট-মন্দিরে মহাসমারোহে যাত্রা, কীর্ত্তন, অভিনয় ইত্যাদি হয়ে আস্‌ছে এবারেও গাঁয়ের অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে তথায় এক বিরাট অভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছে। কবি কবরীনাথই এই নাট্য সম্প্রদায়ের শিক্ষক। অভিনয় হবে 'জয়দেব'—কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে 'পরাশরের' ভূমিকায় অভিনয় করবার উপযুক্ত লোক না থাকায় অন্যত্র হ'তে একজন সুকণ্ঠ গায়ককে এনে অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। গ্রামের পুরুষ-পুঙ্গবেরা তাদের সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ প্রয়োগ ক'রে আজ অভিনয় ব্যাপারে মেতে আছে। পড়ে আছে কেবল তাদের শিক্ষক কবরীবাবু নিজের গৃহভূমিতে। তাঁর মানসিক অবস্থার একটু ব্যতিক্রম ঘটেছে। ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। ভিজিটের কয়েকটা টাকায় তাকে এখন সংসার চালাইতে হয় সুতরাং রাত্রের ডাক উপেক্ষা করা তার কোন উপায় নেই। আর এমন গ্রহের ফের যে এর পর হতেই প্রত্যহ রাত্রে ডাক আসে কারণ গাঁয়ের চারিধারে টাইফয়েড, নিউ-মনিয়া ইত্যাদির প্রকোপ বেড়েছে। আর ফিরিবার কালে প্রত্যহই পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে গৃহে প্রবেশ করতে হয়। এই পরীক্ষার ফলে, তাঁর দাড়ির কেশাগ্রে কি যে অসহ্য ব্যথার সৃষ্টি হয়েছে—তা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। এবং কতক কতক কেশগুচ্ছ উৎপাটীতও হয়ে গেছে। তিনি বেদনা ক্লিষ্ট অন্তরে কেবল রবিন্দ্রনাথকেই দোষী করেছেন "হে রবীন্দ্রনাথ, তোমার জন্তই আজ আমার এই দশা আমি যদি তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত না হয়ে দাড়ি না রাখতাম তা হ'লে এ হেন যন্ত্রনা আমায় সহ্য ক'রতে হ'ত না। সমস্ত দাড়ি টাটিয়ে ফোড়ার মত হয়ে আছে, তার উপর ও আবার প্রত্যহ টেনে দেখা—এই টানবার সময় আমার যে কি যন্ত্রণা হয় তা কেবল তিনিই জানেন। ছেলে বেলায় বাবার কাছে শুনেছিলাম, সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রতে হ'লে অনেক বাধা বিঘ্ন, অন্তরায় ও দুঃখ কষ্ট আছে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমি এ কষ্টও সহ্য ক'রতে পারি যদি আমার সাধনা সিদ্ধ হয়"—বলতে ব'লতে ভক্তিপূর্ণ আঁখি দুটী হতে দু'চার ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নির্গত হ'য়ে দাড়ির কেশগুচ্ছের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এদিকে ঠাকুর তলায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে—অভিনয় ব'সব ব'সব হোলো অথচ মণ্ডল মশাইএর দেখা নেই। তাঁর অনুপস্থিতি উপেক্ষা ক'রে অভিনয় করবার শক্তি ও ইচ্ছা তাদের নেই। তিনি সামনে থাকলে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে অভিনয় ক'রে দর্শকবৃন্দের প্রীতি ভাজন হতে পারে। তাই তারা দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এল মণ্ডল মশাইয়ের দরজায়। তাদের এ হেন কাতর প্রার্থনা মণ্ডল মশাই বা কি করে উপেক্ষা করেন। যাদের জন্তই তাঁর এত সুনাম—যারা তাঁকে গুরুর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাদের উৎসাহিত করতে মণ্ডল মশাই সকল সময়েই স্বীকৃত ছিলেন, মাঝখান থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া এসেই না সব গোলমাল করে দিলে। যাহা হউক—তিনি তাঁর সমস্ত দুঃখ ঠেলে ফেলে দিয়ে নাট্য সম্প্রদায়ের সভ্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন হেতু চলে গেলেন নাট মন্দিরে—বাড়ীর মধ্যে রইল কেবল ফাল্গুনী ও তাদের পুরাতন ভৃত্য।

(ক্রমশঃ)

রিক্তা

শ্রীসুধাংশু কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাস। দুপুর বেলা, ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিলো, তার আর বিরাম নেই। রাস্তায় লোক চলছিলো কম। বিছানায় শুয়ে সামনের খোলা জানালা দিয়ে উষা চেয়ে ছিলো মেঘলা আকাশের পানে; দৃষ্টি উদাস। চিরদিন সে এই বর্ষাকে ভাল বাসতো, কিন্তু—আজ সেই বর্ষার স্মৃতি তার প্রাণে বিষাদ জাগিয়ে দিচ্ছে।

জীবনের চলা পথের কত স্মৃতি মনে পড়লো। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপের বাড়ীতে সে যখন ছিল, ভোরের আলোয় নির্ম্মলা, শান্তি, কুসুম, মালতীর সঙ্গে বাগানে সে ফুল তুলতে যেত—তারপর মালা গাঁথার প্রতিযোগীতায় হার--জিৎ—আড়ি--ভাব। বর্ষায় যখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তো—কাগজের নৌকা করে সেই জলে ছাড়া আর তার জন্য মা-বাপের তিরস্কার ও লাঞ্ছনা। দিনের পর দিন কেটে গেল, সে খেলার স্মৃতি পিছনে ফেলে নির্ম্মলা, শান্তি, কুসুম, মালতী, সকলেই শ্বশুর বাড়ী চলে গেল।

বাপ-মায়ের এক মাত্র মেয়ে বলে তাড়া-তাড়ি উষার বিয়ে দিতে মা-বাপের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলেন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এতে কারো হাত নেই। কাজে কাজেই মা-বাপের অনিচ্ছা সত্ত্বেও একমাত্র প্রজাপতির দৌত্যে অল্প বয়সেই উষার বিয়ে হয়ে গেল। মা বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুর বাড়ী সম্বন্ধে তাকে অনেক উপদেশ দিলেন। বাপ রমেশবাবু বিদায়কালে জামাই প্রভাতের হাতে উষার হাত খানি তুলে দিয়ে কাতর কণ্ঠে বল্লেন,—"বাবা, আমার একমাত্র মেয়ে আজ তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি দেখো। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তোমারা দু'জনে সুখী হও।" তারপর উষা চোখের জল ফেলতে ফেলতে গাড়ীতে উঠলো। বাল্যের স্বপ্ন ও স্মৃতি-বিজড়িত বাসস্থান ছেড়ে চলে গেল সে দূরে অনেক দূরে।

শ্বশুর বাড়ীর দ্বারে এসে দাঁড়াল সে, নানা-লোকের মুখে নানা ভাবে রূপ-সমালোচনার মধ্যে। শাশুড়ী তাকে বরণ করে ঘরে তুললেন। শ্বশুরের স্নেহ, শাশুড়ীর যত্নে, স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসায় উষা কিয়দংশে বাপের বাড়ীর কথা ভুললো।

কিছুদিন পরে প্রভাত চলে এলো কলকাতায় এম, এ পড়তে। স্বামীছাড়া নিঃসঙ্গ জীবন উষার কাছে ক্রমে একঘেয়ে হয়ে এলো; গোপনে বাপকে সে চিঠি লিখে দিলে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। শ্বশুর, শাশুড়ীর অনিচ্ছায় নানারূপ কাকুতি মিনতি করে রমেশবাবু উষাকে নিয়ে এলেন। উষা ফিরে এলো আনন্দে তার বাল্য-স্মৃতি-বিজড়িত পুরাতন ঘরে। কিন্তু হায়! বাল্যের লীলাভূমি সে গ্রামকে বাল্যের বান্ধবীদের সে পূর্ব্বের মত আর নিবিড় করে পেলে না। কিছুদিন পরে আবার তাকে ফিরে যেতে হ'ল তার স্বামীর ঘরে। মাঝে মাঝে প্রভাত কলকাতা থেকে বাড়ী যায়, বহুদিনের আকাঙ্খিত একটী মধুর রজনী—দুই বিরহী আত্মার মিলন—মনে হয় এ সুখরজনী যেন ভোর না হয়। নানারূপ মান-অভিমান হাসি-কান্নার মধ্যে রাত্রি তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যেত। ভোরের বাতাসে দু'জনে ঘুমে অচেতন। প্রভাতে নানা পাখীর কলরবে ঘুম ভেঙে স্বামীর বাহুপাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে মিশিয়ে দিত আপনাকে সংসারের কাজে—নারীর দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে—ভবিষ্য-গৃহিনীপণার শিক্ষানবিশীতে।

কিছুদিন পরে প্রভাত বাপকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলে, সে এক ফিল্ম-কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছে মাইনে বেশ ভাল। কাজেই তার পড়বার ইচ্ছা আর নেই। সে ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী করবে। এই পত্র পেয়ে তার পিতা অমরেশবাবু স্ত্রীকে বল্লেন—"গিন্নি! বড় আশাকরে ছেলেকে পড়তে পাঠিয়েছিলুম, মানুষ হবে, লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু সে আমায় লিখে জানিয়েছে—"এক ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী পেয়েছি, আমি পড়বো না।" রাগে গর-গর্ করতে করতে তিনি ফিল্মের অভিনেতা অভিনেত্রীদের জীবনযাত্রা ও চরিত্র সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য কল্লেন, তা শুনে উষার বুক কেঁপে উঠলো। মনে মনে ভগবানকে ডেকে প্রার্থনা কল্লে—"ঠাকুর তাঁর সুমতি দাও।" কিন্তু সে প্রার্থনা সফল হ'লো না।

অমরেশবাবু পত্র দ্বারা প্রভাতকে জানিয়ে দিলেন—"যদি তুমি আমার অমতে ফিল্ম-কোম্পানীতে চাকরী কর', তা হ'লে তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না এবং আমি তোমার মুখদর্শন করা পাপ বিবেচনা করবো।" অভিমানে, রাগে প্রভাত তার উত্তর কিছুই দেয়নি। নামের মোহ প্রভাতকে উন্মত্ত করে দিলে, স্ত্রীর ভালবাসা মাতা-পিতার স্নেহ সব উপেক্ষা করে ফিল্ম-কোম্পানীতেই সে কাজ নিলে।

এক বৎসরের মধ্যেই প্রভাত পরিচিত হয়ে উঠলো। কাগজ-পত্রে তার নাম দূর পল্লীতে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'লো। কিছুদিন পরে

প্রভাত নিজের দেশে ফিরে গেল। স্ত্রীকে নিয়ে যাবে বলে সে ইচ্ছা জানালে। উত্তরে মা-বাপ বল্লেন—"তোমার ইচ্ছা।" বিদায় কালে উষা কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"মা আপনার মেয়েকে ভুলবেন না।" উত্তরে অশ্রু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শাশুড়ী বলেছিলেন "তুমি আমার মা, আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমায় ভুলবো? আশীর্ব্বাদ করি মা, যেন সুখী হও।"

প্রভাত উষাকে নিয়ে চলে এ'লো বালীগঞ্জে এক তেতালা বাড়ীতে। চারিদিকে চাকর বাকর ছুটোছুটি কর্চ্চে; সাহেবী কায়দায় বাড়ীটা সাজানো। সমস্ত দেখে শুনে উষা অবাক হয়ে গেল। আবার কোথায় এলো সে? কিছুদিনের মধ্যে সঙ্কোচের জড়তা কেটে গেল; স্বামী-স্ত্রীর মিলন মধুর হয়ে উঠলো। স্বামীর আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে উষা বুঝলে স্বামী তার চরিত্রহীন ও মাতালও নয়। স্বামী তার সেই স্বামীই আছে; কেবল বাহ্য চাল চলনে সে অন্যরূপ। যাক্, তাতে উষার কিছুই এলো গেল না।

তারপর কালের পরিবর্ত্তনে শ্বশুর শাশুড়ী মারা গেলেন। উষার জীবনে মাতৃত্ব দেখা দিলে। তার নারী জীবন ধন্য করে স্বর্গের দেবশিশুর মত খোকা এ'লো এক নতুন অতিথি। তার পরিচর্য্যায় উষা আত্মহারা। কপট ক্রোধে প্রভাত প্রায়ই অভিযোগ করে "উষা তুমি আমায় ভালবাসো না।" শঙ্কিত হয়ে উষা বলে—"আমি তোমায় খুব—"··· কথা শেষ হবার আগেই প্রভাত তাকে বুকে টেনে এনে সব শঙ্কা, কুণ্ঠার মীমাংসা করে দেয় একটীমাত্র চুম্বনে।

সেদিন প্রভাতের শরীর ভাল নয়; তবু ষ্টুডিওতে সেদিন শুটিং থাকায় তাকে যেতে হ'লো। সেইটাই ছবির শেষ দৃশ্য। জল-ঝড়ের মধ্যে নায়ক নায়িকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে; সেই দৃশ্যে অভিনয় করে প্রভাত বাড়ী ফিরে এলো জ্বর নিয়ে। ক্রমশঃ অসুখ খুব কঠিন হ'য়ে উঠলো। খবর পেয়ে রমেশ বাবু বিন্ধ্যবাসিনী সবাই এলেন। সুচিকিৎসক ডাক্তার অনিল কৃষ্ণ চৌধুরী যথাসাধ্য চিকিৎসা কল্লেন কোন ফল হ'লো না। মাত্র পাঁচদিন রোগ ভোগের পর এমনি এক বর্ষার দুপুরে প্রভাত চলে গেল চিরদিনের তরে তার সোনার সংসার পিছনে ফেলে।

হাহাকারে শূণ্যতায়, শোকে উষার বুক ভেঙ্গে গেল। রমেশবাবু, বিন্ধ্যবাসিনী কন্যার দুর্ভাগ্যে, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। পত্রিকায় শোক-সংবাদ প্রকাশিত হ'লো সমস্বরে সকলে শোক জ্ঞাপন করে নীরব হ'য়ে গেল। এই দুর্দ্দিনে খোকাই উষার একমাত্র সম্বল নইলে উষার চিন্তা স্তব্ধ হয়ে যায়, আর ভাবতে পারে না; শেষে কি সে পাগল হয়ে যাবে?

কত পূর্ণিমার রাত্রি জ্যোৎস্নায় ভরে ওঠে, কোকিল ডেকে ডেকে নীরব হয়, বাগানে ফুল ফুটে ঝরে যায়, কিন্তু যে তার বিরহিনী-প্রাণের শান্তি, সুখ ও আশা আজ সে কোথায়? উষার প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। চলার পথে কান্নাই তার সাথী! মুক্তি নেই—মুক্তি নেই। লোকে বলে এ জগতে যাকে প্রয়োজন, পর জগতেও নাকি তাকে প্রয়োজন হয়। উষা খোকাকে বুকে আঁকড়ে রেখে ছিল, নিষ্ঠুর ভাগ্য দেবতার তাও সহ্য হ'লো না। যে খোকা ছিল উষার নয়নের তারা, আশার দীপ সেও তা'কে ফাঁকি দিলে। স্বর্গের দেবশিশু ফিরে গেল তার নিজের দেশে।

এ শোক উষা সহ্য করতে পারলে না, তিন দিন সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রইলো। যখন জ্ঞান ফিরে এলো, তখন দুর্ভাগ্যের কোন নিম্নতর স্তরে সে নেমেছে তা সে বুঝতে পারলে। স্বামী পুত্র-হারা রিক্তা সে! অনেকদিন সে স্বপ্নের ঘোরে খোকা-ভ্রমে বালিসটাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। কোথাও শিশু কণ্ঠের কান্না শুনলেই সে অস্থির হয়ে ওঠে। মনে হয় খোকা "খোকা কাঁদছে।" স্বামীহারা পুত্র শোকাতুরার বিকল নারীত্ব ও মাতৃত্ব হাহাকার করে ওঠে; বিশ্বশক্তির চরণে সে আবেদন জানায়—"প্রভু, আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও।" শ্রাবণের এই বাদল-সজল দুপুরে তার দুঃখের স্মৃতি তাকে বিমনা করে দিয়েছিলো। বাইরের জলের ছাট বিছানায় লাগতেই তার চিন্তা-সূত্র ছিঁড়ে গেল। সেই শ্রাবণের ধারা যেন তারই মত প্রিয় হারার আকুল অশ্রু! জল-ভরা চোখে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

বিবিধ

জলসা

গত শনিবার রাত্রিতে সুলঙ্গের শ্রীসুধীন্দ্র চন্দ্র সিংহের রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ ভবনে সন্ন্যাসী গায়ক শ্রীদিলীপ কুমার রায়, শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কুমারী হাসি বসু, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার প্রভৃতি গায়ক ও গায়িকাবর্গের সমাবেশে এক মধুর জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলার ধরণী কুমার বসু, এডোয়ার্ড ডট কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ জি, ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হারীত কৃষ্ণ দেব, অধ্যাপক নীরেন্দ্র নাথ রায়, অধ্যাপক প্রভাষ চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ২২শে মে রবিবার, ১০৭বি রাসবিহারী এ্যাভেনুতে মিঃ এস্ মুখার্জ্জী মহাশয়ের ভবনে, দুর্ব্বার সঙ্ঘের ষষ্ঠ অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। সুকবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

সম্পাদক শ্রীযুত জগত দাস গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। সন্তোষ ঘোষ আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে—প্রবন্ধ, সুধাংশু সেনগুপ্ত, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর ঘোষ—কবিতা, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছোট গল্প পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিভাষণের পর রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকায় সভার কাজ শেষ হয়।

বয়েজ ক্লাব

গত মাসে কালীঘাট বয়েজ ক্লাবের দশম বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হাইকোর্টের অন্যতম এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রারম্ভে জাতীয়তার প্রতীক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" গানটি ক্লাবের সভ্য বিভূতি চট্টোপাধ্যায় গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের মনে এক অনুপ্রেরণা আনিয়াছিলেন তৎসঙ্গে পঞ্চম বর্ষীয় বালক মাষ্টার কিরণ সুললিত ভাবে তবলায় সঙ্গত করেন। ক্লাবের কার্য্যাবলীর শেষে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

'রংমশাল' বার্ষিক

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে আশুতোষ হলে 'রংমশাল' দলের বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পাচার্য্য ডাঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সস্ত্রীক অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন ও সম্পাদক
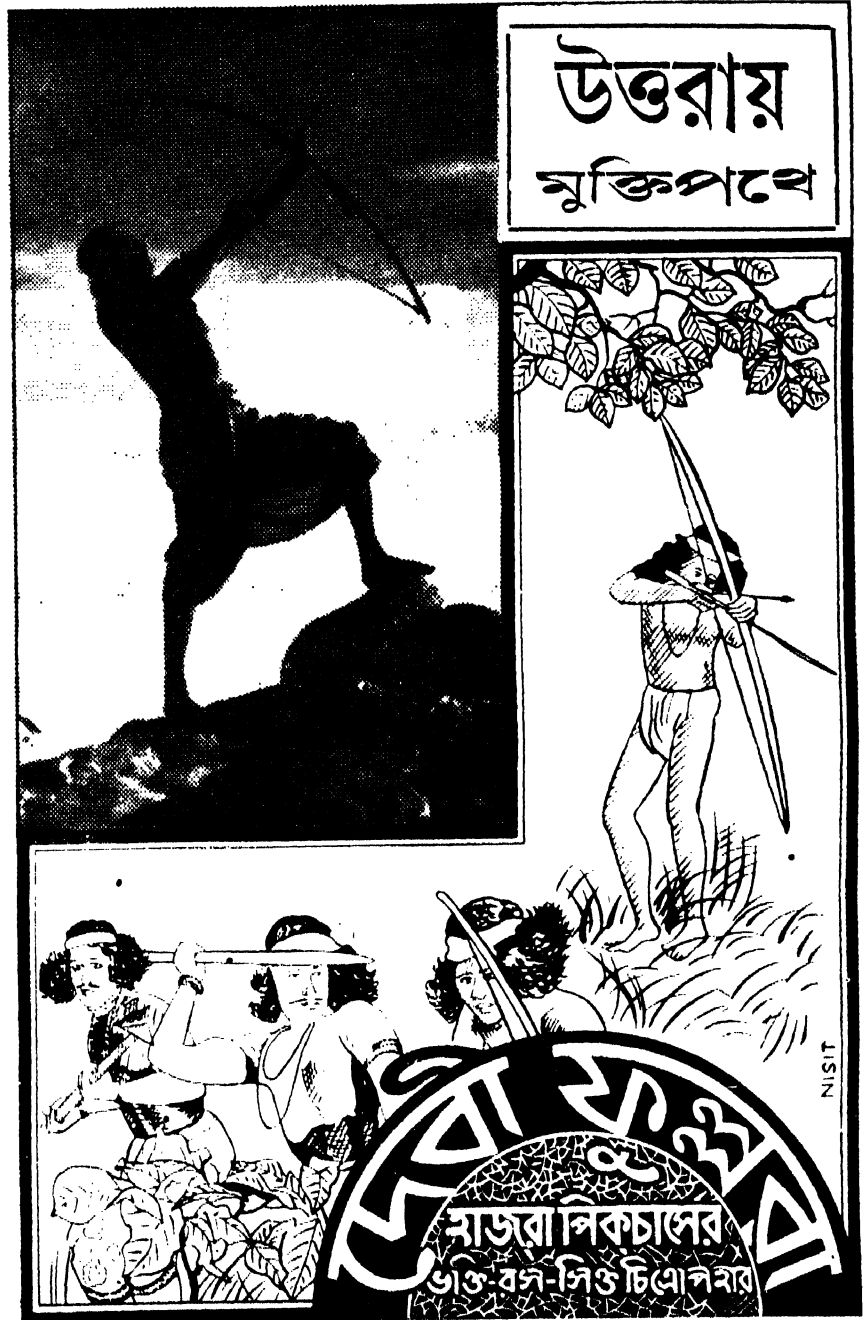
নূতন তারকা শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জ্জি

ছোট্ট একটি মেয়ে, তার প্রাণখোলা হাসি, সুমধুর সঙ্গীত ও অপরূপ নৃত্য যে কিরূপ উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে চোখে তা না দেখলে বোঝা যায় না। অভিজ্ঞতা ও বয়সের দিক থেকেও কচি, অথচ যখন সুযোগ ও সুবিধা তাকে দেওয়া হল—দেখা গেল পূর্ণ মাত্রায়ই সে তার সদ্ব্যবহার করেছে। এমনি ভাবেই যখন কেউ তার নিজস্ব প্রতিভা ও ক্ষমতায় অপর সকলকে ডিঙিয়ে যায় তখন মেঘ-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় তার দীপ্তির দিকে সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। "জায়গীরদার" ছবিখানা দেখলে ঠিক এই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

এই ত' কয়েকদিন পূর্ব্বেও কেউ কি মায়া ব্যানার্জ্জির নাম শুনেছিল? কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারত, ঐ এক কোণে ছোট্ট একটি মেয়ে—তার ভেতর প্রতিভার অত প্রকাশ লুকান রয়েছে? অথচ সুযোগ যখন এল দেখা গেল অভিনয়ে, হাস্যে, গানে ও নাচে ঐ মেয়েটি হয়ে আছে প্রাণবন্ত। "জায়গীরদার" ছবিখানা দেখলে আগাগোড়া শুধু এ কথাই মনে আসে যে, একটি মেয়ের অভিনয়ে সমগ্র ছবিখানা কি করে অতি মুখর হয়ে উঠে।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র উৎসবটাকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্ত আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্রম আশাতীতভাবে সফল হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ী। এক বাড়ীর একটি ছেলে ও অপর বাড়ীর একটি মেয়ে—সারাদিনরাত একই সঙ্গে খেলা করে বেড়ায় ও পাঠশালায় যায়। গুরু-মশাইকে ফাঁকি দিয়ে অলস মধ্যাহ্নে নদীর তীরে বসে থাকা—একটানা নদীর স্রোতের কলকল শব্দে নিজেদের কণ্ঠ মিলিয়ে দেওয়া—এই ভাবেই ছেলেমেয়ে দুটী ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কৈশোরের এই প্রীতি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেমে পরিণত হয়। সে প্রেম স্বর্গীয় ও মধুর। তারপর কত ঝড় কত বিপদ এল তাদের জীবনে—কিন্তু প্রেম তাদের অটুট রইল। ছেলেটি বলে, "ঊষা আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণ দিয়েও ভালবাসি, কিন্তু আমাদের এ মিলন হবে কী?"—মেয়েটি ত' হেসেই অস্থির তারপর বলে—"রমেশ, তোমার এ কথা মনে হয় কেন? মিলন ত আমাদের হয়েই রয়েছে। কেন অত ভয় পাও"।

'না ঊষা, ভয় নয়, আমার মনে হয় তোমায় এত ভালবাসি, তুমি যদি আমার না হও নিশ্চয়ই আমি মরে যাব"।

এই ঊষার ভূমিকায় মায়া ব্যানার্জ্জি অভিনয় করেছেন এবং এই একখানা ছবিতে অভিনয় করেই তিনি আজ সর্ব্বত্র পরিচিত। অভিনয়ে গানে ও' নৃত্যে সকল রকমেই তিনি দেখিয়েছেন সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করায় পুরস্কার সত্যই রয়েছে।

গত চার সপ্তাহ ধরে, প্রভাত সিনেমায় সাগর মুভিটোনের হিন্দি-চিত্র "জায়গীরদার" দেখান হচ্ছে, শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জ্জি উক্ত ছবিতে ঊষার ভূমিকায় যে নূতন রূপ দিয়েছেন তা প্রত্যেক চিত্রামোদীরই দেখা উচিত।

তামিল ছবি

সকাল ১১ টায়

সম্প্রতি প্রভাত সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক রবিবার সকাল ১১ টায় তামিল ও তেলেগু ছবি প্রদর্শনীর যে বন্দোবস্ত করেছেন তা অভাবনীয়রূপে সাফল্যলাভ করেছে। গত দু' সপ্তাহে দুখানা ছবি দেখান হয়েছে, একখানা তামিল ছবি "দক্ষযজ্ঞ" ও অপর খানা তেলেগু ছবি "রুক্মিনী কল্যানম্"। দুদিনই কলিকাতা প্রবাসী বহু মাদ্রাজী এই ছবি দেখতে আসেন, ব্যবসায় দিক থেকে যে এ বন্দোবস্ত খুবই সাফল্য লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তাছাড়া কলিকাতা প্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয়দেরও এতদিনকার একটা বড় অভাব দূরীভূত হল।

আসছে রবিবার সকাল ১১ টায় তামিল ছবি "গুল বকাউলী" দেখান হবে, ছবিখানার আখ্যান ভাগ, দৃশ্যাদি ও গান ইত্যাদি যে দর্শকদের ভাল লাগবে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভূস্বর্গ কাশ্মীর

আপনি কলিকাতায় বসেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অনাবিল সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ত্তে পারেন। ভাবনানী ছবি "অমর প্রেম" শীঘ্রই প্রভাত সিনেমায় দেখান হবে, এবং "অমর প্রেমের" অধিকাংশ দৃশ্যাদিই কাশ্মীর হইতে নেওয়া। কাশ্মীরের নয়ন-মুগ্ধকর দৃশ্যাবলী, সুউচ্চ হিমালয় পর্ব্বত শিখরে অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অবিশ্রান্ত তুষারপাত—যাবতীয় দৃশ্যই স্বাভাবিকভাবে এই ছবিতে তোলা হয়েছে। তাছাড়া আগ্নেয়গিরির অনল বর্ষণের ভয়াবহ দৃশ্য ও ভূমিকম্পের তাণ্ডবলীলা, আপনাকে বিস্ময়ে হতবাক্ করবে, সকল রকমেই ছবিখানা প্রথম শ্রেণীর হবে বলে আশা করা যায়।

সুজাতার পরিচয়

শ্রীজ্ঞানময় সেনগুপ্ত

নিশীথ,

বাংলা ছাড়বার পর থেকে বাংলাদেশে আর যাই নি, তা'ছাড়া যা নিয়ে আছি তাতে সেখানকার কেউ আমার স্মৃতিতে এসে আমায় বিরক্ত করতে পারে না, এমন কি তুইও না। জানি তুই খুব Sentimental, তবুও সত্যিকথাগুলোই লিখে পাঠাচ্ছি।

যেদিন তোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি সেদিন তুই জিজ্ঞেস করেছিলি কোথায় যাব, কেনই বা যাব। সে প্রশ্নের সমাধান জানা থাকলেও তখন বলতে পারিনি, বললে আমার এই অজ্ঞাতবাস, আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রা ব্যর্থ হ'ত। লোকসমাজের বাইরেই আমি থাকতে চাই, যেখানে সামান্য ত্রুটীর জন্যে সহস্র প্রশ্নের উৎপত্তি হবে না, প্রায়শ্চিত্তের নাম করে, সমাজকে ব্যঙ্গ করে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সেখানে সমাজপতিরা এগিয়ে আসবেন না।

আমি কোথায় আছি জানিস্—নাম বলব না, তবে বর্ণনাটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। ছয় মাইল লম্বা আর সাড়ে চার মাইল চওড়া ছোট্ট একটু চর—চারিদিকে নীল-সমুদ্রের জল। যতদূর চোখ যায় শুধু জল, আর যার বাইরে দেখবার মত চোখের ক্ষমতা নাই সেখানে নীলাকাশের কোলে ওরা ঝাপিয়ে পড়ছে। সমুদ্রকে কত ভাবেই যে দেখি! আজ প্রায় কুড়ি বছর ধরে দেখছি কিন্তু একঘেয়ে মোটেই লাগে না—তাঁর নিত্য নূতন ভঙ্গী বৈচিত্র্য আনিয়ে দেয়। যখন হাওয়ার সাথে দোলা দিয়ে জলগুনো' নাচতে থাকে তখন মনে হয় পৃথিবীতে প্রলয় ঘটলো বুঝি! একশ গজ উঁচু হয়ে ঢেউগুলো যখন পাড়ের উপরে এসে আছড়ে পড়ে তখন মনে হয়না যে, ঐ বিশাল জলরাশির ধাক্কা এতটুকু দ্বীপটা সইতে পারবে, কিন্তু বেশ সয়ে যাচ্ছে। এমনি হয় বোধ হয়, প্রথমে মনে হয় সওয়া মুস্কিল তারপর আপনি অভ্যাস হয়ে যায়। আবার যখন সমুদ্র স্থির হয়ে থাকে তখন এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য আর হতেই পারেনা। Examination এর সময়ে দেখেচি Hall এ পাঁচশ ছেলে বসেছে, একটু শব্দ নেই, সভাতে দেখেচি কোন বক্তা এসে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন—দশ হাজার শ্রোতা শুনছে—টু শব্দটী পর্য্যন্ত নেই। তাও সুন্দর—কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তুলনা চলে না,—করতে গেলে হয়ত তাদের নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ হবে মাত্র!

দিনে দেখি সূর্য্যোদয়,—দিনের শেষে সূর্য্যাস্ত। এক পক্ষে পর পর জলের সঙ্গে চাঁদের খেলা চোখে পড়ে। প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, আজও তেমনটী, কিন্তু আশ্চর্য্য, এরা পুরানো হয় না। মন্ত্র পড়ে বিয়ে হবার মতই চিরপুরানো অথচ চিরনূতন।

হ্যাঁ, যা বলব! 'অনেক দিনের কথা, তোর মনে আছে কি না জানি না, তবে আমি এখনো ভুলিনি, ভোলবার কথাও নয়। সুজাতাকে জানিস ত! সেবারে ডায়সেশন থেকে বি, এ পাশ করে সবে বেরুল। তোকেও ত একদিন দেখালুম—পাতলা গড়ন, রং কর্সা বলাই চলে; চুল হাতখোঁপায় বাঁধা, অথচ দু'গাছা চুল একে বেঁকে ঘাড়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ত। মুখখানি নিখুঁত সুন্দর না হলেও attractive—যে দেখবে নিশ্চয় কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু চোখদুটো বন্যহরিণীর মতই চঞ্চল,—সুন্দর। সুমুখে মাত্র দুটী ভাজ দিয়ে যখন পাতলা শাড়ীগুনো অক্টোপাসের বাধনের মত গায়ে জড়িয়ে তুলত তখন সুজাতা ছিল uncomparable—জলন্ত আগুনের একটা ফুঝি,—আকাশের গায়ে চমকানো একটা বিদ্যুৎ। মনে হ'ত চোখ ঝলসে দিয়ে যাওয়াই তার কাজ, আলো বিতরণ করা নয়। তাকে আমি ভালবেসেছিলুম, সেও একদিন আমার বুকে মাথা রেখে বলেছিল,—

—তোমায় ভালবেসে যা পেয়েছি, অনেক মেয়ের ভাগ্যেই তা জোটে না। ভাগ্যবতী আমি সন্দেহ নাই কিন্তু দেখো আবার কেড়ে নিয়ো না।

উত্তরে সেদিন কিছুই বলিনি শুধু তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম—ভরসা দেবার আশাতেই।

তুই জানিস আমি গরীবের ছেলে, সুজাতাকেও লুকাইনি। যেদিন বললুম সু', আমায় ভালবেসে ঠকলে কিন্তু! আমি নেহাতই গরীব, বাড়ীতে ভাঙ্গা একটী খড়ের ঘর ব্যতীত পিতৃসম্পত্তি আমার কিছুই নেই। শিক্ষিতা মেয়ের মুখ সেখানে দেখবে না—

সে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, আমি শুনতে চাই না, ওসব শুনতেও আমার ভাল লাগে না! তোমরা যদি সেখানে থেকে বড় হতে পার তাহলে আমিও সেখানে আমার দিনগুলো অনায়াসেই কাটাতে পারব।

সেইটেই ত মুস্কিল সু, অভ্যেস ছিল বলেই আমাদের কষ্ট হয় না কিন্তু তোমায়—

মেয়েদের কষ্টকে বড় করে দেখলে সংসার করা চলে না। 'দেবদাসে' দেখনি পারুকে, দেবদাসকে অতটা ভালবাসলেও স্বামীর ঘরে দুদিনেই নাম কিনে ফেললে। দেবদাসকে হারাবার কষ্টটাই যদি সে ভাবত তা হলে তার সুনাম কেনা হয়ে উঠত না।

—তা বটে, অচলা কিন্তু পারে নি।

—অচলার যে শত্রু ছিল—মৃণাল!

হেসে বললুম, এখানে যে মৃণাল নেই তাই বা তোমায় কে বলবে!

সুজাতাও হেসে ফেললে, বলল, এখানে মৃণাল থাকলেও ভয় আমার এতটুকু নেই। তার জন্যে আমি সুরেশের সাহায্য নিতে যাব না। নিজেই বুঝিয়ে দিতে পারব।

—দুজনেই হেসে ফেললাম।

সেবারে দিল্লীতে চাকরী পেলুম। সুজাতাকে জানাতেই সে বললে—তাই ভাল, বেশ হবে। শুধু দু'জনার সংসার, বাইরের কেউ আসবে না বিরক্ত করতে।

ঠাট্টা করবার সুযোগ ছাড়তে পারলুম না, সুজাতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হেসে বললুম,—বাইরের না হয় কেউ নাই বা এল বিরক্ত করতে, কিন্তু ভিতরের কেউ এসে যদি বিরক্ত করে!

সুজাতার মুখ লজ্জায় হাসিতে লাল হয়ে উঠল, অনেকক্ষণ আমার বুকে মুখ লুকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললুম,—

—আচ্ছা সু', সংসার না হয় দুজনে করব, কিন্তু সংসারী হব কবে?

—বেশী দেরী নেই, মাঝে আর একটী মাস মাত্র বাকী, হেসে সুজাতা উত্তর দিল।

আনন্দে সুজাতাকে কাছে টেনে নিলাম, সেও এল আমার একান্ত সন্নিকটে। মনে হ'ল, এমনকরে আত্মসমর্পণ কেউ কোনদিন করে নি।

দিল্লীতে appointment হয়ে গেল। দিন পনেরো পরের কথা, সুজাতার টেলিগ্রাম পেলাম, আমায় কলিকাতা যেতে হবে। চলে এলাম কলিকাতা, সুজাতা প্রায় কেঁদে ফেলল, বলল, আমায় তুমি নিয়ে যাও, এদের অত্যাচার আমি সইতে পারি না। আমায় বাঁচতে দাও।

বললুম, এখন কোথায় নিয়ে যাব সু!

—যেখানে হোক্! না হয়, তোমার ভাঙ্গা বাড়ীতে।

তা হয় না সু।

তা হলে দিল্লী?

তাও হয় না!

—তা হ'লে, সুজাতা কেঁদে ফেলল।

সুজাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, দাঁড়াও, ভেবে দেখি। তুমি বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

Eden Garden এ বসে আছি, অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। সুজাতা এসে আমার পাশটীতে বসল। অন্ধকারে তার মুখ ভাল করে দেখি নি কিন্তু উত্তেজনায় যে সে কাঁপছে তা বেশ বুঝতে পারলুম। তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলুম,—

—কি হয়েছে সু?

সুজাতা আরও কাছে সরে এল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আমায় নিয়ে আজই তোমায় পালাতে হবে।

জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে খুলে বল!

—সে সব শোনবার সময় নেই। এ রাত্রেই আমাদের পালাতে হবে। এমন জায়গায় যেখানে কেউ খোঁজ করবে না, থাকার মধ্যে থাকব শুধু আমি আর তুমি। আমাদের দু'জনকে নিয়েই তৈরী হবে সমাজ; —আমাদের সংসার।

—কিন্তু দুজনকে নিয়ে ত বাস করা চলে না সু। বাঁচা, মরার উপর হাত কারুরও নেই, যদি—

সুজাতা বাধা দিয়ে বলল, কি বাজে বকছ! বল কোথায় যাবে!

—দেখি।

মাথায় কতগুলো বাজে চিন্তা এসে ভিড় করে দাঁড়াল। খুঁজে কিনারা পেলুম না, তাই গেলাম তোর কাছে। তুই যে জায়গার কথা বললি সে জায়গা লোভনীয় হলেও আমাদের অজ্ঞাতবাসোপযোগী নয়। উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যাত্রা নয়—নিরুদ্দেশের পথেই আমাদের চলতে হবে। তারপর খুঁজে বের করলুম এই জায়গা,—সুজাতার brain আর আমার physical strength এর দরকার হ'লো আমাদের বাসোপযোগী ঘর গড়ে তুলতে। বালুর উপর ঘর তুলতে হবে, সঙ্গে হাতিয়ার নেই, আছে শুধু সুজাতার এক বাক্স গয়না আর হাজার পাঁচেক টাকা। বেচারী! ভাবতেও পারেনি যে, পৃথিবীতে এমন জায়গায় আছে যেখানে অর্থের মূল্য বোঝবার মতন লোক নেই। বলল, এ কোথায় নিয়ে এলে?

কেন? এই ত তোমার কল্পনার রাজত্ব, এখানকার রাণী তুমি।

সুজাতা হেসে ফেলল, বলল, তা যেন হল, কিন্তু খাব কি! রাণী হলেই তো পেট ভরবে না! থাকব কোথায়?

—এসেই যখন পড়লাম তখন ব্যবস্থা যা হোক একটা হবেই! ভগবান যাকে পৃথিবীতে পাঠান, তার জন্যে খাবারও সঙ্গে সঙ্গে মেপে রাখেন। আর যদি নেহাতই না খেয়ে মরতে হয় তবে বুঝতে হবে কপালে এই অপমৃত্যুই হয়ত লেখা ছিল।

আমাদের বিয়ে হ'ল মন্ত্র পড়ে নয়—চন্দ্র, সূর্য্য আর সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে। অত বড় চরে দুটী প্রাণীর বেশ কাটত—ছুটোছুটি, বেড়ান, লুকোচুরি খেলা, এই নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন চলে যেত। ঐ চরের বাইরে বিশাল জগৎটাকে আমরা ভুলে গেলুম। বাইরের কেউ দেখলে মনেই করতে পারত না যে, সুজাতা Graduali আর আমি M. A; P. H. D; —যেন খেলা ঘরের

অসীত আর অতসীর একটা সকাল

শ্রীলীলাময় দে

আর ঘুমায়ো না আঁখি মেলি চাহ লজ্জা-জড়িত আঁখি
বেয়ারা কখন সকালের চা টেবিলেতে গেছে রাখি।
ওঠ ওঠ প্রিয়া এই নাও ধর ওষ্ঠের চুমা দাও
অবসাদ যত দূরে চলে যাবে বেড-টিটা খেয়ে নাও।
তারপর যাও, বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এসে
দহটী তোমার নিপুন হস্তে সাজাও নিখুত বেশে।
মাঃ কী যে কর, লক্ষ্মীটি ছাড় আঁচল টেনো না, শোন,
ায়ে কিছু নেই, শাড়ীও অবশ—চাকর-বাকর কোন
রে ঢুকে যদি দেখে ফেলে কিছু ম'রে যাবো লজ্জায়:
—ঠাণ্ডা যে হিম! ছুয়েই দেখ না? এ কি ছাই খাওয়া যায়
কাছে ব'সে ব'সে হাসছ' যে বড় হাসি পেল কিসে শুনি?
াগ্‌গীর বল বলবে না? বেশ ত' চললুম এক্ষুনি।
ী যে লোক তুমি এখনত' কৈ বলনি বয়কে ডেকে
এক কাপ চা, তাও আবার খেতে হবে নাকি মেগে?
লিতে বলিতে মুখ ভার ক'রে শয্যায় উঠে বসে
ংযত করে দেহের বসন কোমরে আঁচল ক'ষে
লের গোছাটা বাঁধিতে বাঁধিতে 'স্যাণ্ডেল' পায়ে দিয়ে
ণ-রঙ্গিনী অভিমান ভরে দাঁড়ালো সিড়িতে গিয়ে
"আরে কোথা যাও, রাগ হল নাকি?" অসীতে পুছিল হাসি
"বেয়ারাকে বলে চা আনিয়ে রাখ, বাথ-রুম থেকে আসি
"দেখি কটা বাজে? ওমা সাড়ে সাত! উঠিয়ে দাওনি কেন?
'অষ্টিন' খানা ফটকে এখুনি ঠিক করে রাখে যেন।"
"সে কি গো প্রেয়সী, অভিসারে যাবে অষ্টিনে করে শেষে!"
"তাই যদি যাই, ভয় পেলে নাকি? দাঁড়াও বলছি এসে"
বলেই অতসী দিয়ে বাঁকা হাসি, বাঁকা চাহনির তলে
চটির চটকে মুখর করিয়া সিড়ি বেয়ে গেল চলে…
অসীতকুমার লাফদিয়ে উঠে 'প্যান্স'গুলো ঝেড়ে ফেলে
'সিগারেট মুখে বসিল চেয়ারে সমুখে কাগজ মেলে।
হঠাৎ কি এক মধুর গন্ধ উছলি উঠিল ঘরে
অসীত পুছিল—আসলে কখন 'টয়লেট' শেষ করে?
"এই ত' এখুনি, চা কোথায় বল—পেয়েছি, শুনবে তবে?
"নারী-জাগরণী সভার মিটিং 'প্রিজাইড' করতে হবে
"সাড়ে আটটায় মিটিং বসবে তুমিও চলনা সাথে?"
"যেতে পারি, শুনি ফিরবে কখন?—বেলা সেই বারটাতে!
"না না তবে আমি রইলাম ঘরে তুমি দেবী যাও একা
আমায় আবার একটার আগে করতেই হবে দেখা।
ফোনেতে সাহকে বারবার করে থাকতে বলেছি ঘরে
যদি বইখানা 'রূপবাণী' ঘরে ভালভাবে যায় তরে।
ব্যস বাজী মাৎ নামে ও টাকায় নিমিষে হইব বড়…
"শেষ হ'ল বলা? কোচে গিয়ে বস যেতে দাও মোরে—সর।"

াথী দুটী ছোট্ট ছেলে-মেয়ে। আমাদের রকমও বেশ চলত,—একটুতে হত অভিমান ার অন্যকে যেতে হত তা ভাঙাতে। স্থায় দেখলে তার শাস্তি ছিল,—চুম্বন। ামরা ছিলুম স্বর্গচ্যুত ইভ আর আদম।

তারপর কেটে গেল কত বছর। আর সই চপলতা আমাদের মধ্যে নেই। আমার াইতে সুজাতা হ'ল আরও বেশী সংযমী। া যে দুটী সন্তানের মা! কিছু বলতে গেলেই হেসে বলত, চুপ, আগে মায়ের কর্ত্তব্য রতে দাও, তারপর তোমারটা করব। ওরা ছোট্ট, আমাদেরি সন্তান, ওদের বড় করে তুলতে হবে ত! আমরা যদি না দেখি তবে মানুষ হবে কি করে! •

……তারপর আজ বছর পাঁচেক হ'ল, সুজাতা নেই। কত চেষ্টা করলুম তাকে আটকাতে কিন্তু পারলুম না। সন্তান হবার আগে সে যে অত উচ্ছৃঙ্খল ছিল, তাও তাকে যদি কোনদিন জড়িয়ে ধরেছি, সে নড়তে পর্য্যন্ত পারে নি। সেদিন কত আঁকড়ে ধরলুম, কিন্তু পারলুম না। সুজাতা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

নালিশ জানই, সু, এখানে যখন এলাম, তখন তুমি ছিলে সাথী। কিন্তু যাবার বেলা গেলে একা, আমি থাকি কি করে?

এ অভিযোগ তার কানে পৌঁছায় কি না জানি না, তবে সেই দিনটার অপেক্ষাতেই বসে আছি। জানি একদিন সে শুনতে পাবেই। ছেলে দুটোকে নিয়ে ভারী মুস্কিলে পড়েছিলাম, তাই রেখে এলাম বম্বেতে এক আশ্রমে আর বলে দিয়ে এলাম তোর address. আর্থিক কষ্ট ওদের কোনদিনই হবে না জানি, তবু যদি মাতৃপিতৃহীন হয় তাদের আশ্রয় দিস।

সুজাতা যখন যায়, জিজ্ঞেস করলুম, সু, ওদের যে আমার কাছে রেখে গেলে, আমিও যদি তোমার মত একদিন হঠাৎ চলে যাই!

উত্তরে সে হেসে বলেছিল, তোমার সেই কথাটাই যে আমার একমাত্র ভরসা। জন্ম যখন ওরা নিলই তখন ব্যবস্থাও একটা হবেই। দিনরাত ভগবানকে ডেকে বলছি, ভগবান, যার কেউ নেই, তার তুমি আছ। ওদের কেউ রইল না—ওদের তুমি দেখ। যিনি রইলেন, তাঁর উপরে ভরসা নেই—নিজের খেয়ালই হয়ত তাঁর থাকবে না।

সু' চলে গেল। ভগবানের কানে তার ডাক পৌঁছেছিল, ওরা আশ্রয় পেয়েছে। শুধু আমিই রইলুম আশ্রয়হীন।

ছেলেরা বলেছিল ওদের সঙ্গে থাকতে, উত্তরে হেসেছিলুম, বলব কি! ছেলেমানুষ বইত নয়!

যে আমার জীবনে নিয়ে এল জাগরণের প্রেরণা,—যার কাছ থেকে পেলাম ফুল, ফল, গন্ধের সৌরভ,—রূপ, রস মধুর স্বার্থকতা, যে এতকাল নিজে হাল ধরে আমায় পারের কাছে পৌঁছে দিলে, বাকীটুকু যদি বইতে না পারি তবে আমার এ পারাপার মিথ্যে। সুজাতা আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।—যেখানে সুজাতার চিতা জ্বালিয়েছিলুম, সেখানে রোজ যাই, বলি, সুজাতা আর অপেক্ষা করতে হবে না। ওরা আশ্রয় পেয়েছে, আমার ডাকও পড়ল বলে। তুমি যাবার পর থেকে হাল বইছি আমি, দিক ভুল হলে অদৃশ্য থেকেও জানিয়ে দিয়ো—দেখো, পথ যেন না ভুল হয়!

জ্বালা যখন সইতে পারি না, এত দূরেও থেকেও যখন সংসারের কান্না আমার কাণে ভেসে আসে তখন ছুটে যাই সুজাতার চিতার উপরে, সেখানকার বালু বুকে তুলে আকুল ভাবে বলি, সু' আমার রক্ষা করো, এ যে আর সইতে পারি না। তুমি নেই, ওরাও নেই, তবু কেন সংসারের ডাক এসে কাণে পৌঁছে!

—সব চুপ হয়ে যায়, শুধু দূর থেকে ভেসে আসে দু'চারটা সামুদ্রিক পাখীর চিৎকার। সারাজীবন যে আমায় রক্ষা করে এলো, আজও সেই আমায় রক্ষা করছে, তাকে ফেলে আমি যাই কি করে! এখানকার আকাশ, বাতাস, জল, সবই সুজাতার স্মৃতি মাখানো—আমার শেষ নিঃশ্বাসটীও যেন এদের দেখতে দেখতে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায়

ইতি;

তোমারই হতভাগ্য বন্ধু,

"সরিৎ"

—

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তিন—

শ্রাবণের আকাশ যেন শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অবিশ্রান্ত বারিধারার ফলে রাজপথগুলি জলমগ্ন ও জনরহিত হইয়া উঠিয়াছে, মুহুর্মুহু বজ্রপাত, উন্মত্ত বায়ুর প্রচণ্ড কোলাহল নিশিথিনীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জনগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। এইরূপ প্রলয় রজনীতে কলিকাতার কোন প্রকাণ্ড রাজপথের একটী অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষে একটী অনিন্দ্য-সুন্দরী তরুণী উন্মাদিনীর ন্যায় পাদচারণা করিতেছিল; এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল। পরমুহূর্ত্তেই প্রবল ঝটিকা বেগে একটী গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। তরুণী ছুটিয়া গিয়া রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তথায় কোন মোটর বা কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কি জানি কোন এক অজ্ঞাত ভয়ে তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। ক্যাবিনেটের উপর রাধা-কৃষ্ণের মুর্ত্তির কাছে গিয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর, যদি কোন বিপদ হয় সে যেন আমার হয়; আমার স্বামীকে রক্ষা কর, তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও।"

শুভ্রার বক্ষ-স্পন্দন যেন ক্রমেই বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল; সে যে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সেই খানেই বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, ঘড়িতে একটা, দুইটা করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। সে নিজের অজ্ঞাতসারে মেঝের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

এইখানে শুভ্রার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

শুভ্রা কোন ধনী জমিদারের একমাত্র কন্যা; শুভ্রা দেখিতে অনিন্দ্যসুন্দরী। তাহার পিতা দিলীপবাবু কন্যার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে কখনও কোন কৃপনতা করেন নাই।

শুভ্রা ঘোড়ায় চড়া, লাঠি খেলা, মোটর চালান প্রভৃতি সমস্তই শিখিয়াছিল ও হিন্দু-সংসারের যাবতীয় কাজ তাহার নিকট অজানা ছিল না। দিলীপবাবু অরুণের সুন্দর আকৃতি ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া একমাত্র কন্যা শুভ্রাকে তাহার হস্তে সযৌতুক অর্পন করিলেন। সত্যই কোন শুভ মুহূর্ত্তে তাহাদের দৃষ্টি বিনিময় হইয়াছিল।

অরুণ ও শুভ্রা পরস্পর পরস্পরকে এতই ভালবাসিত যে কয়েক ঘণ্টা অদর্শনও তাহাদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিত।

আজিকার এই আকস্মিক বিরহে শুভ্রা যে শুধু একটু ভীতা হইয়াছিল তাহা নহে বিবিধ অলীক আশঙ্কা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিদ্রায় সে স্বপ্নে দেখিল অরুণ যেন কাহার বাহুবন্ধনে বদ্ধ—তাহারই প্রাণপ্রিয় স্বামী অন্য নারীর বাহুলতায় বদ্ধ হইয়াও মুক্তিলাভের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া নিজকে তাহার নিকট বিলাইয়া দিতেছেন। শুভ্রার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু তাহার মনে হইল কে যে তাহার বুকে বিশ মণ বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। সে অতি কষ্টে উঠিয়া বসিল—দুই হাতে চোখ মুছিয়া চোখ খুলিতেই সে দেখিল তাহার কক্ষ দিবালোকে উদ্ভাসিত। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া দেখিল চাপরাসী রামলাল অপরাধীর ন্যায় দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রামলাল যুক্তকরে অর্দ্ধবাংলায় নিবেদন করিল—"মাইজী, বাবু কাল থেকে বাড়ী ফেরেন নি। নীচে চার পাচটী রোগী তার জন্যে অপেক্ষা করছে তাদের কি বলা হবে?"

শুভ্রার বিগত রজনীর সব কথা মনে পড়িয়া গেল—সহসা তাহার বক্ষের ভিতর তুমুল আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল। সে শুষ্ক-কণ্ঠে বলিল, "তাইত রামলাল, কি হবে বলত।"

সহসা তাহার মনে পড়িল সে ত মোটর চালাইতে জানে, তাহার লাইসেন্সও আছে। বৃদ্ধ রামলালকে সঙ্গে লইয়া সে স্বয়ং স্বামীর অন্বেষণে বাহির হইবে।

সে পরক্ষণে ধীর কণ্ঠে বলিল, "রোগী-দের বিকেল বেলায় আসতে বলে দাও। আর মরিস গাড়ী খানা গ্যারাজ থেকে বা'র করে দেউরীতে রাখ, আমি আসছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।"

মিনিট পনের পরে ডাক্তার অরুণের মরিস কার সশব্দে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অভিমুখে যাত্রা করিল।

—চার—

সমস্ত রাত্রি অরুণ ও অমল অমরনাথের মৃতদেহ সৎকারে বিব্রত ছিল। তাঁহারা অশেষ চেষ্টা করিয়াও শবদাহের জন্য রাত্রিতে একটী গাঁজাখোর ছোকরাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, সেই রাত্রিতে তিনজনে মিলিয়া ব্রাহ্মণের পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুটির দ্বারে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন বহু গ্রাম-বাসী সেখানে জড় হইয়া নানাবিধ কল্পনা জল্পনা করিতেছেন। সেই বহুমূল্য মোটরটী কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, কণার সহিত মোটর গাড়ীর অধিকারীর অবৈধ সম্বন্ধ আছে কিনা, আর কিরূপেই বা কণা এত বড় একটা বিরাট রোহিত মৎস্যকে টোপে ফেলিল ইহাই ছিল আলোচনার বিষয়।

বৃদ্ধ লোচনঠাকুর বলিলেন, "দাদা, এত বড় হাওয়াগাড়ীটার যাতায়াত আমরা একটুও টের পেলুম না।" পঞ্চানন ঘোষাল সজোরে মাটীতে লাঠি ঠুকিয়া বলিলেন "টের পেলে কি রক্ষে রাখতুম্?" হাওয়া গাড়ী তো হাওয়া গাড়ী ও মনিবকে পর্য্যন্ত হাওয়া করে দিতাম—তবে আমার নাম পাঁচু ঘোষাল।"

হরিশ মোড়ল বলিল, "দেখ, ও মেয়েটার জাত গেছে, এই বাড়ীটা অপবিত্র হয়েছে। দাহ করে ফিরে এলে বলবো, দেখ বাপু, মাথাটা আর গাড়ীটা যদি ঠিক রাখতে চাও এই মুহূর্ত্তে তোমার ঠাকুরনটীকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে যাও, নইলে"—চার পাঁচজন মাতব্বর একসঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলেন, "মাথা ভেঙ্গে ছাতু করে ফেলব।"

ঠিক এই সময় অরুণ, অমল ও গাঁজাখোর ছোকরাটাকে সেইদিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গ্রাম্য মাতব্বরগণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া স্তব্ধ হইলেন। তাহারা বুঝিতে পারিলেন না অমল ও অরুণের কোনটী কণার ভাগ্য বিধাতা।

গ্রামবাসীদের নিকটে অরুণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া তাহাদের সকলকে অনাথা বালিকাকে স্থান দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

পঞ্চানন ঘোষাল গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "কি বলে ইয়ে—আমরা তো কচি খোকা নই, আর ঘাসও খাইনা যে আপনারা আমাদের কি বলে ইয়ে—যা বুঝিয়ে দেবেন আমরা তাই বুঝবো।"

সাহস পাইয়া হরিশ মোড়ল বলিলেন, "দেখুন ডাক্তারবাবু, যখন বামুনের মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছিলেন তখন তো আর আমাদের জিগ্যেস করেন নি; আজ এই মেয়েটাকে আমাদের ঘাড়ে চড়িয়ে দুই বন্ধুতে লম্বা দেবেন' তা হবে না। ওটাকে নিয়ে যেতে হবে আপনাদের।

লোচন ঠাকুর বলিলেন, "তা দেখুন বাবুরা, ঐ অতবড় ধাড়ী মেয়েকে···এমন সাধ্য আমাদের নাই—আপনারা যেমন অপকর্ম্ম করেছেন তখন ওর ভার আপনাদেরই নিতে হবে।

অমল ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিল, "খবরদার, মিথ্যে কথা বললে জিভ ছিঁড়ে দেব। পাজি, নচ্ছার কোথাকার।"

পাঁচু ঘোষাল সরোষে বলিল "ও: আমাদের গাঁয়ে এসে আমাদের চোখ রাঙ্গান, কি বলে ইয়ে—জান এটা ফরাসী মুলুক—এমন মজা দেখিয়ে দেব যা জীবনে—কি বলে ইয়ে—ভুলবেনা।"

অরুণ অমলকে শান্ত করিয়া বলিল "এই ভূতগুলোর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। কণা যদি যেতে চায় চল, সঙ্গেই নিয়ে যাই।"

"তা বেশ বাবাজী, সঙ্গেই নিয়ে যাও, তাতে ধর্ম্ম হবে, একটা অনাথার আশ্রয় হবে—কি বল হে পাঁচু?"

পাঁচু ঘোষাল লোচনের সুরে সুর মিশাইয়া বলিল, হ্যাঁ তা বটে তো, তা বটে তো, বাবাজীদের আকৃতিতে ধর্ম্মভাব ফুটে রয়েছে। অধর্ম্ম করা কি তাঁদের পক্ষে সম্ভব?"

কে একজন নীচু গলায় ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, কণার মত সুন্দরী তরুণীকে আশ্রয় দিতে ধর্ম্ম কেন ধর্ম্মরাজও রাজী হবেন।"

অমল বলিল, "কিন্তু এখানে যে ধর্ম্ম-রাজের বাহনগুলি উপস্থিত আছেন তাঁরা কেউ রাজী হবেন না একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

হরিশ ক্রোধে চীৎকার করিয়া বলিল, "কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? জান, আমরা ইচ্ছে করলে তোমাদের—"

অমল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কহিল, "কচু করতে পার। বামুনের পৈতে গলায় দিয়ে ইতরামো করে যারা সমাজের মাথা হয়ে উঠতে চায়, আর যারা বিপন্ন ব্রাহ্মণ কন্যার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে ধর্ম্মের নাম করে লোক শাসায়, তাদের আমরা কুকুর বেড়ালের চেয়ে ছোট ও নীচ মনে করি।

পাঁচু ঘোষাল আর সহ্য করিতে পারিল না। সে তাহার যষ্টীটাকে উঁচু করিয়া বলিল, "বটে, বটে, কোলকাতার ফোতো বাবু, দেখ আমরা মানুষ কি কুকুর, বেড়াল। এই মার মার ছুটো বাঁদরকে, দে গাড়ীখানায় আগুন ধরিয়ে। বুঝুক ওরা, আমরা মানুষ না পশু।

জনতা মার মার শব্দ করিয়া উঠিল। অরুণ এক লম্ফে মোটর গাড়ীর পাদানে উঠিয়া পড়িল ও চক্ষের নিমেষে একখানি লৌহ নির্ম্মিত টায়ার লিভার বাহির করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "দেখ তোমরা যদি কেউ আমার বন্ধুর গায় হাত দাও, সত্যিই তোমাদের রক্তপাত করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হব না, সাবধান।"

বাহিরের জনতার চীৎকারে কণার তন্দ্রা-ভঙ্গ হইল। সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল এবং দেখিল দশ পনের জন লোক তাহার পরম হিতৈষী সাহায্যকারীদের প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

কয়েকদিনের অনাহারে ও অনিদ্রায় কণার আকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সহসা তাহাকে দেখিলে উন্মাদিনী বলিয়াই ভ্রম হইত। সে অরুণ ও অমলকে বিপন্ন দেখিয়া পাগলের ন্যায় জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, ওঁদের তোমরা কিছু বলোনা, ওরা নির্দ্দোষী যত দোষ সব আমার। আমাকে সাজা দাও, আমি মাথা পেতে নেব।"

জনতা সহসা স্তব্ধ হইল। জনতা ঠেলিয়া পাঁচু ঘোষাল বলিল, "দেখ কণা, তুই এখুনি যদি ওদের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে রাজী হোস্, ওদের আমরা কিছু বলবোনা, আর যদি না কথা শুনিস্ তো দেখবি দু'মিনিট পরে জন্মের মত হতভাগা দুটো মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, বুঝলি?"

কণা মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিয়া লইল—পরে বলিল, "ঘোষাল কাকা, আমার ভার যদি তোমাদের পক্ষে এত বেশী হয়ে থাকে তাহলে আমি এখুনী গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি আজ যে অবস্থায় আমায় তোমরা গ্রাম থেকে বিদেয় করে দিচ্ছ, অনার্য্য, অসভ্য যারা তারাও এরকম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন কর্ত্তে লজ্জা পেত। আমার কিছু বলবার নেই—যার কঠোর বিধানে আমার আপনার বলবার কেউ নেই আজকে তোমাদের এই কঠোর শাসন আমি তাঁরই বিধান বলে মেনে নিচ্ছি। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও। আমি এখুনি আসছি।" কণা কুটীরে প্রবেশ করিল, চার পাঁচটী শাড়ী ও সেমিজ লইয়া একটী পুঁটলী বাঁধিয়া লইল। ভ্রাতৃপ্রদত্ত পাশ বহিটী ও পত্রখানি সঙ্গে লইতে সে ভুলিল না। পরে সে বাহিরে আসিয়া বলিল, "আমার পৈতৃক বাস্তুটাও আমার জন্যে অপবিত্র হয়ে গেছে পাঁচুকাকা। আমার যাওয়ার পর সেটায় আগুন লাগিয়ে দেবেন। মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কোন স্মৃতি আপনাদের গ্রামে রেখে গ্রামটাকে অপবিত্র করলে আপনাদের ধর্ম্ম হানি হতে পারে।"

অরুণ তাহার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। কণা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। অরুণ ও অমল গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টার্ট দিলেন। ধীরে ধীরে গাড়ীর চাকা নড়িয়া উঠিল।

কৃত্রিম শোকের ভাণ করিয়া লোচন ঠাকুর বলিল, "আহা, মহেনদার শেষ চিহ্নও আজ গ্রাম থেকে শেষ বিদায় নিলে; হা ভগবান্।"

অরুণ, অমল ও কণা কেহ কিছু বলিলেন না। গাড়ী কুটীর দ্বার পরিত্যাগ করিল। তখন বেলা দশটা।

চন্দননগর পার হইয়া অরুণ ইংরাজীতে বলিল, "দেখ অমল, নিয়ে তো এলাম, কিন্তু একে রাখা যায় কোথা?"

অমলও গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "তাইতো।" তিন চার মিনিট কেহ কোন কথা বলিল না। অমল পুনরায় রাজভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল, "তাইতো জানিস অরুণ আমার বাপ মা একদম সে কালের লোক যাকে বলে অর্থডক্স। একে যদি বাড়ী নিয়ে যাই, তা হলে আমার বিশ্বাস ও

সেখানে স্থান তো পাবেই না বরং আমাকেও গৃহত্যাগ কর্ত্তে হবে। জানিস তো আমাদের পাঁচজনের সংসার—একটা কথা উঠতেই বা কতক্ষণ। তার চেয়ে আমি বলছিলাম যে তুই—"

অরুণ গম্ভীর মুখে বলিল, "না, আমার নিজের ওকে নিয়ে যেতে কোন আপত্তি নাই। তবে ভাবছি এই অতিথিকে কি শুভ্রা ভাল মনে গ্রহণ কর্ত্তে পারবে? অবশ্য সে জীবনে আমার অবাধ্য হয়নি একথা সত্য; কিন্তু বড় গম্ভীর সে—আর অভিমানিনী—যদি অন্য কিছু মনে করে।

"সে একটা ভাবনার বিষয় বটে" বলিয়া অমল একটী সিগারেট ধরাইয়া লইল। অরুণ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল, "বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষটী আমার গৃহে অভিনীত হোক্ এ ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। সূর্য্যমুখীর মত শেষে শুভ্রা যদি আমায় ছেড়ে যায় একটা অলীককে সত্য বলে মনে নিয়ে, তা হলে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার অন্য উপায় থাকবে না, অমল।"

অমল বলিল, "কিন্তু বৌদি তো সেকেলে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে নয়—যথেষ্ট এডুকেশন ও ইনটেলিজেন্স তার আছে। ও রকম বৌ পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা। সত্যি কথা বলতে কি তোর ভাগ্যকে মাঝে মাঝে ঈর্ষা করি, অরুণ।

হঠাৎ হাসিয়া অরুণ উত্তর করিল, "অসাধারণ ইনটেলিজেন্স আছে বলিয়া শুভ্রার কল্পনাশক্তিও অনন্যসাধারণ। হয়তো কোনদিন সে কল্পনাটাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে আমায় এমন কোন—"

কণা গাড়ীর ভিতর বসিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে সকল কথা শুনিতেছিল। অরুণ ও অমল ইংরাজীতে কথা বলিতেছিল যাহাতে কণা বুঝিতে না পারে। কিন্তু তাহারা জানিত না যে অমরনাথের যত্নে কণা ইংরেজী ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিল। অরুণ যখন অমলের নিকট নিজ অসুবিধার কথা বলিতেছিল সেই সময় কণা মৃদু ও স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "ডাক্তারবাবু" তাহার কণ্ঠস্বরে অরুণ নিতান্ত বিব্রতের মত মুহূর্ত্তকাল থামিয়া বলিল, "কি? বল।"

কণা বলিল, "কল্‌কাতায় গিয়ে আমাকে কোন অবলা আশ্রমে বা অনাথ আশ্রমে ভর্ত্তি করে দেবেন, ডাক্তারবাবু, আপনাদের কারো বাটীতে আমি থাকতে চাই না।"

অরুণ গাড়ী চালাইতেছিল, সে পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাদের সব কথা তুমি বুঝতে পেরেছ দেখছি। শোন, আমি পূর্ব্বেই আমার অসুবিধার কথা আমার বন্ধুকে বলেছিলাম। সে কথার পুনরাবৃত্তি কর্ত্তে চাই না। আমি স্থির করেছি ক্যালকাটা হোটেলের একটী কামরা ভাড়া নিয়ে তোমায় রাখবো। আমরা দুজনে তোমার দেখা-শুনো করবো, কোন অসুবিধা হবে না তোমার।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে কণা উত্তর করিল আমার অসুবিধা হবে না সত্য কিন্তু এতে আপনাদের যথেষ্ট অসুবিধা হবে নিশ্চয়। শুধু তাই নয়, এতে আপনাদের সুনাম নষ্ট হতে পারে। আমার ও আপনাদের বয়স বিবেচনা করে কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই আপনাদের এই অনুগ্রহকে নিস্বার্থ পরোপকার বলে ধরে নেবে না। বরং আমার জন্যে আপনাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে হবে।"

অমল অস্ফুট ভাষায় বলিল, "তা সত্যি।" কণা বলিতে লাগিল, "আমার জন্যে কারও কোন ক্ষতি হয় তা আমি চাই না। আমাকে আপনারা দয়া করে অনাথাশ্রমেই ভর্ত্তি করে দিন।

অরুণ সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহারই মরিস গাড়ী তীব্র বেগে তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজের গাড়ী থামাইয়া ফেলিল।

শুভ্রা তাহার গাড়ীখানি আনিয়া অরুণের সম্মুখে থামিল। অরুণ ও অমল গাড়ী হইতে নামিয়া শুভ্রার নিকট ছুটিয়া গেল। অরুণ বলিল, "একি শুভ্রা তুমি?"

"হ্যাঁ আমি তোমারই স্ত্রী। দেবদর্শনের আশায় এত পথ এসেছি। তোমাদের ব্যাপার কি বলত? কাল সারারাত কি করে কেটেছে আমার বুঝতে পার কি? ও কে? গাড়ীর ভিতর?"

শুভ্রার স্বপ্ন মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তে দেহ ঘামিয়া উঠিল। তাহার নিশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত পড়িতে লাগিল।

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল "ও কে তা ওর কাছেই শুনো। তুমি এসেছ ভালই হয়েছে ওকে তোমার গাড়ীতেই নাও। চল আমরা তোমার গাড়ীর পেছুই যাচ্ছি।"

শুভ্রা কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া কণার নিকটে গিয়া বলিল, "এস বোন, আমার গাড়ীতে।"

কণা বিস্মিত হইয়া এই নবাগতা সুন্দরীর স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটীর দিকে নির্নিমেষে চহিয়াছিল। সে বিনা-বাক্য-ব্যয়ে শুভ্রার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

শুভ্রার সুমধুর সংযত ব্যবহারে কণা মুগ্ধ হইল এবং গাড়ীতে যাইতে যাইতে তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা শুভ্রার নিকট বলিয়া ফেলিল। কণার প্রতি একান্ত সহানুভূতিতে শুভ্রার শুভ্র হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

বাড়ীতে পৌঁছিয়াই অরুণ শুভ্রাকে বলিল, "এবার ওকে ছেড়ে দাও আমি অবলা আশ্রমে দিয়ে আসি।"

মৃদু হাসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া শুভ্রা বলিল, "তুমি যাকে অভয় দিয়ে আশ্রয় দিয়েছ

আমার নবজন্ম

শ্রীমতী কানন দেবী

কানন দেবী

আমি বহুকাল ধরে অভিনয় কচ্ছি—এবং আমার প্রথম থেকেই এই ইচ্ছে ছিল যে একদিন নিউ থিয়েটার্সের চিত্রে অভিনয় করবার সৌভাগ্য আমার হবে। মনে মনে এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে অনেকবার আমি করেছি—এবং একদিন ভগবান আমার সেই প্রার্থনা শুনলেন। আমি অবশেষে নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করবার সুযোগ এবং সুবিধা পেলাম। এখানে আমার প্রথম ছবি মুক্তি, দ্বিতীয় বিদ্যাপতি এবং তৃতীয় শ্রীযুক্ত ফণী মজুমদারের ষ্ট্রীট সিঙ্গার। এই ছবিখানি এখন তোলা হচ্ছে। সব কয়টি ছবিতে আমি হিন্দী এবং বাংলা দুই সংস্করণেই অভিনয় করেছি, এবং সব কয়টি চরিত্রেই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন দর্শক মহোদয়দের কয়েকখানি করে গান শোনাবার সৌভাগ্যও লাভ করেছি।

নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করার পর আমার অভিনয় জগতে যেন নবজন্ম লাভ হ'ল। পূর্ব্বে যা শিখেছিলাম—তার যেন সব কিছু ভুলে গিয়ে আমাকে আবার নূতন করে শিখতে হল। এই শেখাতে আমার আনন্দ হয়েছে প্রচুর এই মনে করে যে—শ্রদ্ধেয় দর্শকগণ আমার কাছে যা আশা করেন, এতদিনে তা যেন পূর্ণ মাত্রায় দান করতে পারব। এই আশা আমার মুক্তি এবং বিদ্যাপতি চিত্রে কিছু পরিমাণে পূর্ণ হয়েছে। ষ্ট্রীট সিঙ্গার চিত্রে আমি আশা করি আমার অভিনয়কে আরো সুন্দর করে লোকের সামনে ধরতে পারব। এই চিত্রে যে চরিত্রে আমি অভিনয় করছি, তার সঙ্গে যেন আমি আমার জীবনের একটা মিল খুজে পাই। জীবনে আমার এমন একদিন গেছে যে আমাকে প্রায় আশ্রয় হীনার মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তখন মনে মনে ভগবানকে ডেকে বলছি যে "ভগবান—আমি এমন কি করেছি, যার জন্য আমার এত শাস্তি এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।" কিন্তু এতদিন পরে বুঝছি ভগবান আমাকে কষ্টের মধ্যে দিয়ে এই শিক্ষা দিয়েছেন যাতে আমি নিজের পায়ে দাড়াতে পারি। হাজার বিপদের মধ্যেও যেন নিজেকে অসহায় মনে না করি।

ফণী বাবুর ছবিতে যে মেয়েটির ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি। সেই মেয়েটির জীবনে বহু ঝড়ঝাপটা এসেছিল। কিন্তু সে তার মনের জোরে এবং সত্যিকার প্রেমের ওপর ভর করেছিল বলে, সকল বিপদ কাটিয়ে শেষে সুখের মুখ দেখতে পায়। এই চরিত্রটী আমার এত ভাল লেগেছে যে, আমি সত্যিই যেন নিজের জীবনে একে অনুভব কচ্ছি, এর সাড়া পাচ্ছি।

কাজের ফাকে যখন অবসর থাকে—রাত্রে যখন ঘুমুই, এই চরিত্র আমার সকল দেহ মন অধিকার করে থাকে। পৃথিবীতে সত্য, প্রেম এবং ভালবাসা যে অসীম ক্ষমতা আছে—তা আমি নিজের অন্তরে স্বীকার করি। মানুষ যে স্তরেই বাস করুক—সত্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা বোধহয় কারুরই নেই। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। বড় বড় কথা বলা হয়ত আমার মুখে শোভা পায় না—কিন্তু বাংলার দর্শক এবং পাঠক যাঁরা আমাকে স্নেহ করেন, তাঁদের কাছে আমি আমার মনের কথা বলবার দাবী জানাতে নিশ্চয়ই পারি। আমি জানি—তাঁরা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করবেন।

ফণী বাবুর ছবির "মঞ্জুর" চরিত্র সত্যিই বড় চমৎকার। এই ভূমিকায় অনেকগুলি গান আছে। এবং আমি আমার সাধ্যমত এই গান গেয়ে দর্শকদের মনে কিছু আনন্দ দিতে নিশ্চয়ই পারব। এই ভূমিকায় আর একটি জিনিষ আমার মনের মত আছে। আমার বহুদিনের ইচ্ছা—অভিনয়ের মধ্যে নাচের কিছু দেখান। আজ "ষ্ট্রীট সিঙ্গার" চিত্রে আমি দর্শককে আমার নাচ দেখাতে পারব। অনেকদিন থেকে আমি নাচ শিখেছি এবং শিখছি, এতদিন পরে আজ আমার

—আমি তাকে গৃহে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হব এত নীচ আমায় মনে করো না। ওকে আমি কোথাও যেতে দেব না, ও থাকবে আমারই ছোট বোন হয়ে।

এই কথা বলিয়া কণার শীর্ণ দেহখানি নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল। পরমুহূর্ত্তে অমলের দিকে চাহিল; একটু দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া শুভ্রা বলিল, তোমার ত এখনো বিয়ে হয়নি ঠাকুরপো, না? কণা লজ্জায় যেন মাটীতে মিশাইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ভূমিকায় নাচের পার্টও পেয়েছি। সুনাম এবং যশ সবাই চায়। আমিও চাই। তাছাড়া আমাদের যেমন কাজ তাতে লোকের প্রশংসা পেলে আমাদের কাজের উৎসাহ যেন শতগুণ বেড়ে যায়। সেই জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'চ্ছি, যাতে এই ছবিতে আমি যেন সব লোকের কাছে সমান এবং খুব বেশী প্রশংসার পাত্রী হতে পারি। কাজ ভাল করলে সুনাম এবং প্রশংসা আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করি।

ফণী বাবুও আমাকে সকল দিক্ থেকে সব রকমে সাহায্য কচ্ছেন। এইখানে আর একটি কথা বলে আজকের মত শেষ করব। শ্রীযুক্ত সায়গলের সঙ্গে অভিনয় করার সৌভাগ্য ভারতে সকল অভিনেত্রী মনে মনে কামনা করেন। আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছে। আজ আমি নিজেকে সেই কারণে শ্রীমতী উমা, চন্দ্রাবতী এবং কমলেশ কুমারীর মত সমান সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। শ্রীযুক্ত সায়গল বিদেশী হলেও এখন মনে প্রাণে একেবারে বাঙ্গালী। তাঁর কথা-বার্ত্তায়, আচারে ব্যবহারে আমি অবাঙ্গালীর মত কোন কিছু পাই না।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন
চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন
(হৃদয়নারায়ণ)

বিগত ১৭ই এপ্রিল রবিবার বেলা ৮।৪৫ মিনিটের সময় সম্মেলনের তৃতীয়-দিবসের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে চারিজন প্রতিযোগীর demonstration হইয়া যাইবার পর বাংলার অন্যতম প্রবীণ ধ্রুপদী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) টোড়ি ও আসাবরী রাগের দুইখানি চৌতাল গান করেন। ধ্রুপদগানের পর শ্রীযুক্ত লক্ষণ ভট্টাচার্য্য সেতারে পরোজ-বসন্তের গৎ বাজান। Demonstration-এর জন্য যে সকল শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করা হয় তাঁহাদের শিক্ষানৈপুণ্য সম্বন্ধে যদি কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ পরিচয় না থাকে, তাহা হইলে কেবল নিজেদের মৌখিক ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখাইবার জন্য সেই সকল শিল্পীকে programme-এ স্থান দিয়া অযথা সময়ের অপব্যবহার ও শ্রোতৃবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার কোন সঙ্গত কারণও দেখা যায় না। আলোচ্যক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে বাদক মহাশয়ের এখনও যন্ত্রে হাতই ভালভাবে set করে নাই—রাগরূপকে যথার্থভাবে ফুটাইয়া তোলা ও সেতারের উপযোগী ঝালা মীড় প্রভৃতি কাজ দেখান ত দূরের কথা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কর্ত্তৃপক্ষগণের অবিবেচনার ফলে এ জাতীয় শিল্পীরা programme-এ স্থান পাইয়া বাজাইবার বা গাহিবার সুযোগ পাইলেন, অথচ সময়াভাবের অছিলা দেখাইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থানীয় প্রকৃত গুণী গায়ক ও বাদকদিগের মধ্যে অনেককে মোটেই গাহিতে ও বাজাইতে দেন নাই; এবং কৃপা করিয়া যাঁহাদেরও বা programme-এ স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সময় সঙ্কোচ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। যাহা হউক, সেতার বাজনার পর কুমার শচীন্দ্রকুমার দেববর্ম্মণ একখানি বাংলা গান (জাগো মম সহেলি গো) করেন। কুমারের গানের পর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের শিষ্যা শ্রীমতী পিরোজ দস্তুর মিয়া-কি-টোড়ির দুইখানি খেয়াল (একখানি বিলম্বিত একতালায় ও অপরটী দ্রুনী ত্রিতালীতে) গান করিয়া পরে ভৈরবীর ঠুম্‌রী গান করেন। শ্রীমতীর গানের সহিত প্রোঃ থেরাকুয়া তবলা সঙ্গত করেন। শ্রীমতী এই Conference-এই প্রকাশ্যভাবে প্রথম গান গাহেন। উপযুক্ত গুরুর শিক্ষার গুণে তাঁহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। শ্রীমতীর গানের পর বাংলার প্রসিদ্ধ ধ্রুপদগায়ক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় গৌড়সারঙ্গের একখানি চৌতাল ও আর একখানি ধামার গান করেন। গত-বৎসর ললিতবাবু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর সহিত জুড়িতে ধ্রুপদ গাহিয়াছিলেন। এবছরের ছাপা programme-এও উভয়ের জুড়িতে গাহিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় কোন্ অজ্ঞাত কারণে যে এবারের Conference-এ যোগদান করেন নাই, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। পূর্ব্ব রাত্রির programme-এ তাঁহার এককভাবে খেয়াল গান করিবার কথা ছিল—সে রাত্রিতেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন—উদ্বোধন-

দিবসেও তাঁহাকে একবারও মঞ্চের উপরে দেখা যায় নাই—এমন কি, চারদিন ধরিয়া দুইবেলায় যে আটটি sitting বসিয়াছিল, তাহার একটীতেও তাঁহাকে দেখা যায় নাই। অথচ আমরা বিশেষভাবে জানি যে তিনি অধিবেশনের সময় কলিকাতাতেই উপস্থিত ছিলেন। আর তাহা ছাড়া গত কয় বৎসর ধরিয়া তিনি conference-এর ও বিশেষতঃ conference-এর সাধারণ সম্পাদক মহাশয়ের সহিত যে ঘনিষ্ঠভাবেই আবদ্ধ ছিলেন তাহাও সাধারণের অবিদিত নহে। সুতরাং এ বৎসর জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অনুপস্থিতিতে সাধারণের মনে সংশয়ের বীজ উপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যাহা হউক, ললিত-বাবুর গৌড়সারঙ্গের ধ্রুপদ আমাদের ভালই লাগিল। বর্ত্তমান বাংলার নবীন ধ্রুপদী-গণের মধ্যে ইঁহার গানে বেশ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্রুপদগানের পর শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকার ঢিমা লয়ে শুদ্ধ সারঙ্গের একখানি খেয়াল গান করিয়া পরে ঐ রাগে দুনী ত্রিতালীতে তাঁহার প্রসিদ্ধ রেকর্ড-গানখানি "যা রে ভোরা দূর" গান করেন। খেয়াল গান শেষ করিয়া শ্রীমতী প্রথমে সুপ্রসিদ্ধ ভজন-সঙ্গীত "রাধে কৃষ্ণ বোল্ মুখসে" ও পরে স্বর্গত আবদুল করিম খাঁ সাহেবের অতিপ্রিয় ঠুমরী গানখানি "যমুনাকে তীর" গাহিয়া উপস্থিত সঙ্গীত-রসিকবৃন্দকে অতিশয় আনন্দ দিয়াছিলেন। শ্রীমতী আলোচ্য দিবসে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা কাল গান করেন। শ্রীমতীর গানের পর বেলা দেড়টার সময় ভারতবিখ্যাত গুণিপ্রবর প্রোঃ এনায়েৎ খাঁ সাহেব ও তাঁহার বালক পুত্র বিলায়েৎ খাঁ সেতার বাজান। খাঁ সাহেব প্রথমে সুরবাহারে ভৈরবের আলাপ করিয়া পরে পুত্রের সহিত একযোগে ভৈরবীর গৎ বাজান। ইঁহার সহিত প্রোঃ খেরাকুয়া তবলা সঙ্গত করেন। খাঁ সাহেব তাঁহার বাজনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে dais উপরে দাঁড়াইয়া উপস্থিত শ্রোতৃ-বর্গের নিকট বলেন—"এখন ভৈরব বা ভৈরবী বাজাইবার সময় নহে—কারণ সে সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী এই অসময়েও আমাকে ঐ দুইটী রাগই বাজাইতে হইবে।" খাঁ সাহেব এইরূপ নিবেদন করিলে গৌরী-পুরের কুমার বাহাদুর বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় (যিনি তখন President-এর চেয়ারে সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন) নিজের আসন হইতে উঠিয়া খাঁ সাহেবকে জৌনপুরী বাজাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খাঁ সাহেব প্রত্যুত্তরে বলেন—"আমাকে কর্ত্তৃপক্ষ-গণ যাহা বাজাইতে বলিয়াছেন তাহা ছাড়া অন্য রাগ কেমন করিয়া বাজাইব?" সুতরাং খাঁ সাহেব কুমার বাহাদুরের অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া ভৈরবের আলাপ সুরু করেন। কিন্তু জনসাধারণের তরফ হইতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে কে বা কাঁহারা খাঁ সাহেবকে এইরূপ অসঙ্গত ও রীতিবিরুদ্ধ অনুরোধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের সহিত যাঁহাদের কোনও পরিচয় নাই এবং বিশেষতঃ কালানুসারে রাগের বিভাগ সম্বন্ধেও যাঁহাদের কোনই ধারণা নাই তাঁহাদের পক্ষেই বেলা দেড়টার সময় ভৈরব বা ভৈরবী বাজাইবার আদেশ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সেই সকল non-musical ব্যক্তিগণের উপর যদি সঙ্গীত-সম্মেলনের programme নির্দ্দেশ করিবার ভার দিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেদের দায়িত্ব যথা-যথ পালিত হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তাঁহারা Music Conference-এর আয়োজন করিবার যোগ্যতা কতটুকু রাখেন তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। অসময়ের রাগ শুনিবার সখ যদি কাহারও একান্তই হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজের বাড়ীতে বা ক্লাবে তাহার ব্যবস্থা করিলে কোনও কথা উঠিতে পারে না—কিন্তু সঙ্গীতের demonstration-এর আসরে নিজেদের খামখেয়ালীর পরিচয় দিয়া অথবা নিজেদের আলস্য ও ঔদাসীন্যের জন্য অপর কোন ব্যক্তি-বিশেষকে খামখেয়ালী আচরণ করিবার সুযোগ দিয়া, শিল্পীকে তাঁহার ইচ্ছা ও শিক্ষার বিরুদ্ধে অসময়োপযোগী রাগের আলাপ করিতে আদেশ করিয়া প্রকারান্তরে অপদস্থ করিবার প্রচেষ্টা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের মত ব্যক্তির Music Conference-এর অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তা রূপে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সাধারণ সম্পাদক মহাশয় ত একজন প্রকৃত সঙ্গীত-রস-রসিক সামাজিক। সভাপতি মহাশয়ও নিজে একজন গুণী শিল্পী ও সুধী সহৃদয়। Programme-Director মহোদয়ও স্বয়ং একজন সুপ্রতিষ্ঠিত তবলা-বাদক। ইঁহারা ও অন্যান্য গুণগ্রাহী ব্যক্তি কর্ণধার থাকিতে খাঁ সাহেবকে অন্যায় অনুরোধ করার জন্য দায়ী কে তাহা আমরা জানি না—কিন্তু এমন কেহ বা কয়েকজন না থাকিলেই বা খাঁ সাহেব যন্ত্র বাজাইবার পূর্ব্বে ঐরূপ অসঙ্গত নির্দ্দেশের উল্লেখ করিলেন কেন?

আমরা এইটুকু মাত্র জানি যে কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে বিশিষ্ট কোনও এক ব্যক্তি Conference-এ কয়েকবৎসর ধরিয়াই প্রসিদ্ধ গায়ক বা গায়িকামাত্রকেই প্রতি Sitting-এই ভজন গাহিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিয়াছেন—এবৎসরও তিনি তাঁহার অভ্যাস ছাড়েন নাই।—ভজন যে উচ্চ সঙ্গীত নহে এবং উহা যে সাধারণের অপ্রিয় তাহা আমরা মোটেই বলিতেছি না, কিন্তু, প্রত্যেক অধিবেশনেই গায়ক-গায়িকাগণকে ভজন গাহিতে অনুরোধ করা মোটেই শোভনীয় দেখায় না। হয়ত তিনি বা তাঁহারই মত অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিই ঐদিন খাঁ সাহেবকে বেলা দেড়টার সময় ভৈরব ও ভৈরবী বাজাইতে অনুরোধ বা আদেশ করিয়াছিলেন। খাঁ সাহেব অবশ্য নিজের স্বভাবোচিত সৌজন্যে সে আবদার বা হুকুম রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, এ জাতীয় অন্যায় আবদার বা হুকুম আর কতদিন Public-function-এ চলিতে থাকিবে? যাহা হউক, খাঁসাহেবের বাজনার পর বেলা প্রায় ২।১৫ মিনিটের সময় ঐ দিনের সকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

—

রেলওয়ে ষ্টেশনে—বিদায়-দৃশ্য

সেদিনের সে দুর্য্যোগের রাত প্রমথ আজও ভুলতে পারে নি! কিন্তু সেই রাত ও আজকের রাতে কত তফাৎ।

লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানিতে মরিয়া হ'য়ে যখন সে পথের বার হোয়েছিল তখন প্রমথই তাকে কুড়িয়ে এনেছিল, সেই পথের ধার থেকে। আশ্রয় দিয়েছিল তাকে নিজের ভবনে। গৃহবধূর সম্মান দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত কোরেছিল ঐশ্বর্য্য বিলাসের মাঝে! কিন্তু সেই ছন্নছাড়া ভবঘুরের জীবনে যে অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তিই থেকে গেল। তার জীবনে, ঘন মেঘের আবরণ ভেদ কোরে, উঁকি দিয়েছিল পূর্ণিমার চাঁদ। অন্ধকারে জ্যোৎস্না ছড়াতে যদি বা সে এলো, কিন্তু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরা গেল না। যে মায়া রজ্জু দিয়ে সে তাকে বেঁধেছিল, একদিন দেখলে তার ফাঁস ক্রমশঃ আলগা হোয়ে আসচে।

এতখানি অতৃপ্তির মধ্যে হয় ত' বা নারীর জীবন চলে। কিন্তু পুরুষের চলে না। তাই সহসা একদিন যখন তার সে ভুল ভাঙলো, সে তখন মরিয়া হোয়ে ছুটে চল্‌লো রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে। প্রমথর মনে হোল, তার এ প্রবাস জীবনের যা কিছু মাধুর্য্য ছিল—মায়াবিনী সন্ধ্যা তার সবখানি নিঃশেষ কোরে নিয়েচে। সেই বেদনার স্মৃতিকে ভোলবার জন্যেই প্রমথ আজ সকলের অলক্ষিতে বেরিয়ে পড়েচে—অন্ততঃ আর কোথাও অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে! সন্ধ্যার সঙ্গে তার বোঝাপড়া শেষ হোয়েচে, আজ শুধু নিষ্কৃতি নেবার পালা।

* * *

বহু যাত্রীর কলরবে জনবহুল ষ্টেশনটি পূর্ণ। ব্যাগ হাতে প্রমথ এসে উঠলো একটি থার্ড ক্লাশ কামরায়। পরিচিতের সতর্ক চক্ষুকে বঞ্চনা করবার উদ্দেশ্যেই সে এই পথ অবলম্বন কোরেছিল। কিন্তু ট্রেন ছাড়বার কিছুক্ষণ আগে এক অঘটন ঘটে গেল।

সে দেখলে প্লাটফর্ম দিয়ে হেঁটে চলেচে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ট্রেনের সমস্ত কামরাগুলিকে বিদ্ধ কোরতে কোরতে—প্রকাশ, প্রিয়লাল।

আমরা শেষ পর্য্যন্ত শুনলুম, সে পলাতককে আবিষ্কার কোরতে এদের পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি।

কিন্তু সে আজ সর্ব্বস্ব দান কোরে ফতুর হোল—সে কী শেষ পর্য্যন্ত কিছুই পেল না সন্ধ্যার কাছ থেকে?

* * *

বাহির হইল

সমাজ,
শাসন, ও
শৃঙ্খলা, এই নিয়ে
মেতে উঠলো

"ত্রিমূর্ত্তি"

নারী হত্যা কর্ত্তেও সে কুণ্ঠা বোধ কর্লেনা
সুরু হল সংস্কার না অত্যাচার ?
সমাজ তাকে মেনে নিলে কিনা ?

নারী হত্যার কারণ কি ?

এ রহস্য আপনাদের সামনে প্রকাশ
কর্বে 'বিভীষিকা' সিরিজের
প্রথম নিবেদন—
রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ
উপন্যাস
ত্রিমূর্ত্তি

বাহির হইল

—প্রকাশক—

ক থা সা হি ত্য প রি ষ দ

১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), ভবানীপুর, কলিকাতা।

প্রশ্নের জবাব আপনারা শীঘ্রই পাবেন 'অভিজ্ঞান' চিত্রে। উপরের এই চাঞ্চল্যকর দৃশ্যটি সেদিন তোলা হোল শিয়ালদহ ষ্টেশনের ৮ নং প্ল্যাটফর্ম্মে। সারারাত ষ্টেশন ষ্টাফ সমেত একখানি স্পেশাল ট্রেন এই দৃশ্য গ্রহণের জন্য প্ল্যাটফর্ম্মে হাজির ছিল। ষ্টেশনের স্বাভাবিক জনতা ছাড়াও 'special passenger effect' দেবার জন্যে শতাধিক 'এক্‌ষ্ট্রা' আর্টিষ্টকে সময়োপযোগী সাজ পোষাকে সুসজ্জিত কোরে এই দৃশ্যের কাজে লাগানো হোয়েছিল। আগাগোড়া প্ল্যাটফর্ম্মটি cable করা হোয়েছিল প্রয়োজনীয় আলোকপাতের জন্য। এই দৃশ্যগুলি গ্রহণের সময় ১নং ষ্টুডিওর প্রধান কর্ম্মসচীব মিঃ পি, এন রায় সারাক্ষণ ষ্টেশনে উপস্থিত থেকে তদ্বির কোরেছিলেন। পরিচালক প্রফুল্ল রায়, ফনী মজুমদার ও এই ইউনিটের বিভিন্ন কর্ম্মী ও টেকনি-শিয়ানের দল সমবেতভাবে এই দৃশ্যগুলি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করার জন্যে তাঁদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ কোরেছিলেন। শব্দ-যন্ত্রী বানী দত্ত তাঁর যন্ত্রপাতির সাহায্যে, জনতার ও ট্রেনের স্বাভাবিক 'সাউণ্ড এফেক্ট' অতি নির্দ্দোষভাবে গ্রহণ কোরতে পেরেছেন।

উপরের রেলওয়ে ষ্টেশনের দৃশ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় মলিনা, মেনকা, জীবন গাঙ্গুলী, পৃথ্বিরাজ, শৈলেন চৌধুরী, বিক্রম কাপুর, শৈলেন পাল ও বিজয়কুমার স্বাভাবিক অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন বোলে মনে করি। আশাকরি এই sensational দৃশ্যটি আপনারা ছবির পর্দ্দায় পূর্ণভাবে উপভোগ কোরতে পারবেন। এই দৃশ্য গ্রহণের সময় প্রডাকশান বিভাগের কর্ম্মীদের মধ্যে অজিত লাহিড়ী, জলু বড়াল ও কৃষ্ণ হালদারের কর্ম্মতৎপরতা প্রশংসনীয়।

———

কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দা

পরেশ উকিল ও রামগতি সরকার মহাশয় কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

পরেশ—তিন কোয়াটার তো হ'য়ে গেল, আরও কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে! আপনি ঠিক শুনেছেন আমায় ডেকেছিলেন ত' ?

রামগতি—আপনার না বিশ্বাস হয়, আপনি চলে যান না মশাই। কে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছে বলুন তো? কি বিপদ!

পরেশ—কানে যখন শুনেছি তখন দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। সরকারমশাই-তা সে তিন কোয়াটারই হোক আর তিন ঘণ্টাই হোক্। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি তাতো আমি বুঝতে পারছি না। আপনার কি মনে হয়? চাকরি যাবে, না, থাকবে?

রামগতি—চাকরি! সে যেতেও পারে, থাকতেও পারে, আমি কি করে বলবো বলুন! কি বিপদ! —ত.ব শুনছি যা, তা বড়ো ভালো নয়।

পরেশ—কি রকম, কি রকম?

রামগতি—আপনি তো প্রশ্ন ক'রে বসলেন সোজা, কিন্তু উত্তরটি দিতে গিয়ে ঐ দরজাটি খুলে যদি হঠাৎ বেরিয়ে পড়েন, তাহ'লে কি রকম ব্যাপারটা হবে ভাবুন তো!

পরেশ—সে তাল আমি সামলাবো 'খন। আপনি বলুন।

রামগতি—কিন্তু—আঃ। আমাকে নিয়েই বা এতো পীড়াপিড়ি কেন হ্যা? বুড়ো-মানুষ, সাতেও নেই পাচেও নেই। আমি ও সব কিছু জানি না। কি বিপদ!

পরেশ—বিপদ তো আপনার নয়, বিপদ আমার। তাইতো এতো পীড়াপিড়ী করছি সরকার মশাই।

রামগতি—ওরে বাবা, সে ভীষণ ব্যাপার। কর্ত্তার মুখ একেবারে এই চাকা-পানা হ'য়ে আছে। মা ঠাকরুণ কাল থেকে অন্নজল পরিত্যাগ ক'রে আছেন। আমায় কর্ত্তা ডেকে ব'ললেন—এই, পরেশ উকিল। তখুনি বুঝেছি, পরেশ উকিল গেছে!

পরেশ—কিন্তু পরেশ উকিলের অপরাধটা হ'ল কি সেটা কিছু বুঝতে পারলেন?

রামগতি—আর অপরাধের বাকী কি রৈল বল! মা ঠাকরুণ অন্নজল পরিত্যাগ ক'রেছেন। বড় ছেলের অবস্থাও তদ্রূপ, সে ফতোয়া দিয়েছে—মা যতোক্ষণ না খাবেন, আমিও খাচ্চি না। তার উপর কর্ত্তার ঐ চাকামুখ—

পরেশ—কিন্তু আমার অপরাধটা কি বলুন?

রামগতি—আরে বাবা, সেটা আমি বলবো কি করে! কি বিপদ! —ঐরে, ঐ চটিজুতোর পটাপট্ শব্দ আসছেন এবার। ব্যস্, খতম্!

পরেশ—আসছেন না কি?

রামগতি—ও আওয়াজ তো আর ভুল হবার জো নেই বাবা, বিশ বৎসর ধ'রে শুনে আসছি।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—উকিলবাবু আসুন।

রামগতি—আরে স'লো তুই! চটীজুতা পরা হ'য়েছে আবার! বিপদ আর বলে কাকে! —

পরেশ—বাবু কোন ঘরে ?

বেহারা—লাইব্রেরী ঘরে র'য়েছেন।

পরেশ—আর কে আছেন সেখানে ?

বেহারা—কেউ নেই, একলা। চলুন শীগগীর, জরুরি তলব। Urgent.

পরেশ—চলো।

(পরেশ ও বেহারার প্রস্থান)

রামগতি—দুর্গা শ্রীহরি। যাঃ, পরেশ উকিলের হ'য়ে গেল

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়—ওহে রামগতি, তুমি এখানে কি কর্চ্ছ ?

রামগতি—কিছু না মশাই। এমনি এসেছিলাম, চলে যাচ্ছি। পরেশ উকিল বল্লে, কর্ত্তার কাছে যেতে হবে, একলা পারব না—আপনি দাঁড়াবেন চলুন। তাই আসা, নইলে—

অজয়—বুঝতে পেরেছি। এখন আমার একটি কাজ কর্ত্তে হবে। দিলীপকে আমার একবার চাই। এখুনি। ডেকে দিতে পারবে ?

রামগতি—বেহারাগুলো ডেকে দিলে না ?

অজয়—না, তারা বলে বাবুর কাছে যাবার আজ অর্ডার নেই।

রামগতি—ও! হ্যাঁ হ্যাঁ,—বলেছে ঠিক। কি বিপদ!—আমার নিজেরই মনে ছিল না ব'লেছে ঠিক্।

অজয়—কিন্তু কি হ'য়েছে ব'লতে পার ? সকাল থেকে অফিস ঘরে আসেনি। সমস্ত কাজ পড়ে র'য়েছে। এক রাশ চিঠি এসে গেছে। কম ক'রে প্রায় ত্রিশজন লোক দেখা করবার জন্য বসে আছে। —এখন ঘরের ভেতর চুপ ক'রে বসে রইল! আমি তো ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

রামগতি—ভীষণ ব্যাপার মশাই। চাকর বাকর সব থর থর ক'রে কাঁপছে। দুদিক থেকে দুই কর্ত্তা, দু'খানি ঘরে না বসে, সমস্ত বাড়ী খানি কে ওলোট-পালোট ক'রে দেবার মতলব। ডেকে দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁর ঘরের সিঁড়ির ধারেই কেউ যাবে না। এদিকে কর্ত্তামশাই লাইব্রেরী ঘরে পরেশ উকিলকে নিয়ে প'রেছেন, ওদিকে—

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—সরকারমশাই, বাবুর কাছে আসুন।

রামগতি—আমি !

বেহারা—হাঁ—

রামগতি—আমায় ডাকছেন !

বেহারা—হাঁ—

রামগতি—আমায় ডাকছেন কিরে! কি বিপদ !

বেহারা—আপনাকেই ডাকছেন।

রামগতি—আপনার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমার এই সর্ব্বনাশ হ'ল। —চলো। —দুর্গা শ্রীহরি।

অজয়—এই, বড়োবাবুকে ডেকে দিতে পারিস ?

বেহারা—No sir, তাঁর কাছে আজ কেউ যাবে না এই রকম order. কাল দেখা হবে। আসুন সরকার মশাই।

(বেহারা ও রামগতির প্রস্থান)

অজয়—ডেকে যখন কেউ দেবেনা, তখন চেঁচিয়েই ডাকবো। —দিলীপ, দ্বিজেন !

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—কি অজয় ?

অজয়—তোমরা কি সব ক্ষেপে গেছ ?

দ্বিজেন—কেন বল্‌তো ?

অজয়—হাজার কাজ ফেলে দিয়ে দাদা-তো ঘরের ভেতর কোন নিয়েছেন।

ডেকে দিতে বলে কেউ ডেকে দেয় না। বলে—order নেই।

দ্বিজেন—কথাটা সত্য।

অজয়—কিন্তু মানেটা কি ?

দ্বিজেন—তুমি তো জান, দাদা একটু Sentimental. মা'য়ের যদি দুঃখ হ'ল, ও আর সামলাতে পারে না। ওর সব কাজ যায় ভেসে।

অজয়—সে তো জানি। কিন্তু আজ হ'ল কি ?

দ্বিজেন—সেই মায়ের কাছে ব'সে আছে। কি দুঃখ তাই বলো। মাও ছাড়বে না, সেও ছাড়বে না।

অজয়—মাকে ব'লে দিলেই তো হয় যে, মা, তোমার দুঃখের কথাটা বলে ফেল, দাদাকে রেহাই দাও।

দ্বিজেন—তা তো হয়ই। সেতো সকলেই জানে। কিন্তু দুঃখের কথা দূরে থাক, ওরা কোন কথাই কেউ বলে না। আমি একবার ঘরের ভেতর গিয়ে পড়েছিলাম ? কি দেখলাম জানো ?

অজয়—কি ?

দ্বিজেন—ছোট ছেলে যেমন ক'রে মায়ের কোলে মাথা গুজে পড়ে থাকে, ও ঠিক তেমনি ক'রে নিঃসাড়ে প'ড়ে আছে। আমার পায়ের শব্দে চেয়ে দেখলে বটে কিন্তু কথা 'বললে না। হাত নেড়ে যে কথা জানালে তার মর্ম্ম বোধ হয় এই, যে, আমাদের শান্তি 'ভঙ্গ' ক'রো না।'

অজয়—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এরকম পাতলা লোক্ দেশের কাজে না এলেই ভালো। He should resign. ব'লো তাকে।

দ্বিজেন—আমি ব'লতে যাবো কেন। ব'লতে হয়, তুমি ব'লো। আমি দেশের কাজ করিওনা, দেশের কথাও বলিনা।

অজয়—আচ্ছা, আমিই বলবো।

(প্রস্থান)

(দিলীপের প্রবেশ)

দিলীপ—অজয়ের কথায় রাগ হল না কি রে ?

দ্বিজেন—তুমি বেরিওছ তা হ'লে ঘর থেকে।

দিলীপ—হাঁ্যা। কিন্তু অজয় বলে কি ?

দ্বিজেন বলে—You should resign, এরকম পাতলা লোক দেশের কাজে না এলেই ভাল।

দিলীপ—অজয় আমায় সত্যিই ভালবাসে।

দ্বিজেন—ভালবাসে! না, সে তোমায় হিংসা করে।

দিলীপ—হিংসা আমায় কেউ কর্ত্তে পারে না দ্বিজেন।

দ্বিজেন—তোমায় যে হিংসা না ক'রল, সে মানুষই নয়।

দিলীপ—এ বড় অদ্ভুত কথা !

দ্বিজেন—হাঁ্যা, অদ্ভুত কথা। কিন্তু সে এখন থাক। মায়ের দুঃখের কারণ জানতে পারলে ?

দিলীপ—হাঁ্যা, পেরেছি। সেই কথা বলতেই তোমার কাছে এসেছি দ্বিজেন।

দ্বিজেন—বলতো শুনি ?

দিলীপ—বাবা—তাঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে আমায় বঞ্চিত কোরে......।

দ্বিজেন—ও! থাক্, থাক্,—সে আমি শুনেছিলাম। সেই উইলের কথা। দাদা তুমি এই অন্যায়ের এই অবিচারের প্রতিবাদ কর্ব্বে ত ?

দিলীপ—অন্যায় বা অবিচার বলেই যা মনে ক'রতে পারি না, তার আবার প্রতিবাদ কি দ্বিজেন !

দ্বিজেন—অন্যায় নয় ? তুমি একে অবিচার বলোনা।

দিলীপ—বাবার সম্পত্তি, তিনি যাকে খুসী দিতে পারেন। আমাকে দিলেই যেমন সুবিচার হয়না, না দিলেই বা অবিচার কি কোরে হয় তা বলো ?

দ্বিজেন—বুঝতে পেরেছি। সম্পত্তি যদি তিনি কাউকে না দিতেন, তোমার এ কথা মানতাম্। কিন্তু আমি পেলাম সবটুকু, আর, তুমি রাস্তার লোকের মত শুধু অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল,—এ রকম ব্যবস্থা কেন হবে ? কি তোমার অপরাধ ?

(দিলীপ স্তব্ধ হইয়া রহিল)

চুপ কোরে থেকো না, উত্তর দাও ?

দিলীপ—উত্তর আমি এখুনি দিতে পারলাম না দ্বিজেন, কিন্তু উত্তর হয়তো এরও একটা আছে !

দ্বিজেন—এর উত্তর নেই।

দিলীপ—বর্ত্তমানে যা তুমি পেলে না, ভবিষ্যতেও যে তা পাবে না, এমন কথা তুমি ব'লতে পার না !

ভাটিয়ালী গান

শ্রীঅলকা গুহ

গহীন জলে ভাঙ্গা তরী
একলা বেয়ে যাই
বন্ধুর লাগি নয়ন ঝরে
তারে যদি পাই।
গাঙের কূলে কেয়ার বনে,
ঝরা পাতার ধ্বনি শুনে
বন্ধু আমার এল ভেবে
চমকে উঠি তাই!
সে বুঝি হায় আমায় স্মরি
কোন কুঠীরে জানি,
সাঝের বেলা সজল চোখে,
জ্বালে প্রদীপ খানি।
বৃথাই খুজে জীবন গেল,
কত অচেনা আপন হোল
তারেই শুধু পেলাম নাকো
যারে আমি চাই।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতার প্রোগ্রামে, দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে দেখা গেল পরিবর্ত্তন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেন তাঁর আলোচনায় শ্রোতাদের অনুরোধ জানিয়েছেন এই পরিবর্ত্তনের ধারা লক্ষ্য করার জন্যে। আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের এই অভিনব কৃতিত্বের (!) পরিচয় লাভ করে। এই অহেতুক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করে বহু শ্রোতা আমাদের পত্র দিয়েছেন।

*　　*　　*

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান মহিলাদের আসর। এ আসরের প্রোগ্রামে চিরদিনই ঔদাসীনতার পরিচয় পাওয়া গেছে। কোন রকমে জোড়া-তাড়া দিয়ে এ অনুষ্ঠানটিকে চালান হয়। যত বাজে গ্রামোফন রেকর্ড, আনাড়ী আর্টিষ্ট দিয়ে ঘণ্টাখানেক কিংবা দেড়ঘণ্টা পরিপূর্ণ করা হোত। মধ্যে কিছুদিন দেখা গিয়েছিল এ আসরের উন্নতির ধারা কিন্তু শ্রোতাদের অজ্ঞাত কারণে গেল তা বন্ধ হয়ে। তারপরও ভালোয় মন্দয় মিশিয়ে কোন রকমে চলছিল। এবারে বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের আমলে দেখা গেল মাত্র এ আসরে স্বল্প নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘণ্টা আবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন দু'টা থেকে তিনটে হচ্ছে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সময়। এর মধ্যে আছে আবার বিদ্যার্থী-মণ্ডল এবং অর্দ্ধঘণ্টা ব্যাপী গ্রামোফন রেকর্ড। সপ্তাহে একদিন নবাগতের আসর আর বিষ্ণুশর্ম্মার মহিলা-মজলিশ এই হচ্ছে পরিবর্ত্তন!

*　　*　　*

আমরা বরাবর অভিযোগ প্রকাশ করে আসছি মহিলা আসরের নির্দ্দিষ্ট সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময় মহিলা আসরের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। আবার এই সংক্ষিপ্ত সময়কে আরও সংক্ষিপ্ততর করে তোলবার ভেতর কী যুক্তি থাক্‌তে পারে?

*　　*　　*

বেতার কর্ত্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত বেতারের দ্রুত প্রসার মহিলাদের জন্যই বিশেষতঃ বেড়ে চলেছে। সমস্তদিন সাংসারিক গৃহধর্ম্মের কাজে লিপ্ত থেকে মহিলাদের recreation এর জন্যেই অধিকাংশই বাড়ীতে সেট্ রাখা হয়।

*　　*　　*

তারপর এদেশের মহিলা শিক্ষা অত্যন্ত হতাশজনক। এখানে মহিলাদের জন্যে বেতারের কর্ত্তব্য কত অধিক এবং গুরুতর তা অন্ততঃ বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টরের ভেবে দেখা উচিত।

*　　*　　*

এ, আই, আর প্রেয়াস'এর অতিরিক্ত প্রোগ্রামে শ্রোতারা অতিষ্ঠ। সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরের যাত্রাগানের প্যাঁচ মহিলা আসরেও প্রবেশ লাভ করছে। এদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের বদ্ধমূল ধারণার পরিবর্ত্তন ঘটা উচিত।

*　　*　　*

দ্বিপ্রাহরিক আসরে যে সব গুণী আর্টিষ্ট ছিল প্রোগ্রম নিমন্ত্রণে কী তাঁদের পাওয়া যাবে? সুরশিল্পী সুখেন্দু গোস্বামী, নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, অনিল ভট্টাচার্য্য, ভানুদেব ভাদুড়ী, তারাপদ লাহিড়ী, প্রভৃতির কণ্ঠ সঙ্গীত—পঞ্চানন দে, কুমারী লাবণ্য বিশ্বাসের কীর্ত্তন, সমরেন্দ্র দাশগুপ্তের যন্ত্র সঙ্গীত—এমনি অনেক আর্টিষ্টই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে। নবাগতের আসরে আমরা কী তাদের দেখা পাবো?

দ্বিজেন—আমরা সাধারণ মানুষ, বর্ত্তমানটাই বুঝলাম। তুমি অসাধারণ, তুমি ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে বসে থেকো—উত্তরের আশায়।

দিলীপ—থাক্‌বো তাই। কিন্তু ওরে দ্বিজু, অসাধারণ আমি মোটেই নই। তোদের সকলেরই মত আমি অতি সাধারণ। বাবার বিষয়টার অর্দ্ধেক ভাগ পেলে খুসী ছাড়া অখুসী হ'তাম না। তবে নাকি তুমি বিষয়টার সবটাই পেয়ে যাবে—এটা আমার অর্দ্ধেক পাওয়ার চেয়েও ভালো; কারণ, আমিও তাহলে সবটাই পাব।

(সুনির্ম্মল হাস্যসহকারে কথাগুলি বলিয়া দ্বিজেনের হস্তে প্রবল এক ঝাকানি দিয়া প্রস্থান করিল)

দ্বিজেন পুলকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ রহিল ক্ষণকাল, পরে ধীরে ধীরে বলিল: একি লোক! —কিন্তু আমি এ কিছুতেই বরদাস্ত ক'রতে পারব না।

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

নিউ থিয়েটার্সের—"অধিকার" চিত্রে শ্রীমতী যমুনা। ছবিখানা পরিচালনা কচ্ছেন শ্রীযুক্ত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া।

পরিচালক

টেলিগ্রাম — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন

'স্যারিটি' — সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, দ্বাবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ২রা জুন ১৯৩৮

যশোহরে দক্ষ যজ্ঞ

যশোহর-খুলনা কর্ম্মী সম্মেলনে সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ। সম্মেলনের অধিবেশনের প্রারম্ভে বহু বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মী সম্মেলনের সহিত অসহযোগিতা জ্ঞাপন করিয়া দূরে থাকিবার অভিপ্রায় প্রচার করেন। তাহাতেই যে ভাঙ্গনের সূচনা হয় পরে তাহা দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি প্রখ্যাত নেতৃবর্গের যোগদানেও কোন ফল হয় নাই। বহু প্রচেষ্টা স্বত্ত্বেও সম্মেলনের অধিবেশন পণ্ড হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সম্মেলনের বিরুদ্ধে জনমত এতই প্রবল ছিল যে কোন মতেই সম্মেলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বিষয় যে মতবিরোধ ও দলাদলি এতই প্রবল আকার ধারণ করে যে তাহার ফলে কয়েকজন কর্ম্মী গুরুতর ভাবে আহত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন কলিকাতায় আনীত হন এবং বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইলেও তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহা যেরূপ আকস্মিক তদ্রূপ মর্ম্মান্তিক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে এই খণ্ড দলাদলির ফলে আর একটী বালককে অকালে পরলোক গমন করিতে হয়। বাংলার আভ্যন্তরিক দলাদলির ইহা এক বীভৎস দিক।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের মিলন-আহ্বানের কি ইহাই প্রত্যুত্তর? বিবদমান দলের মধ্যে একদল ত' রাষ্ট্রপতির অবিসংবাদিত আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় পরিচালিত দলত' অন্ততঃ একবৎসরের জন্য "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা" ঘোষণা করিয়াছেন। এই অবস্থায় দলাদলির এইরূপ শোচনীয় ও বীভৎস পরিণতি কেন? তবে কি বুঝিতে হইবে যে রাষ্ট্রপতির প্রতি তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই? রাজনীতির নামে সঙ্ঘযুক্ত "দাদা"-শ্রেণীভুক্ত মাতব্বর ব্যক্তিবর্গের যে তাণ্ডব লীলা সুরু হইয়াছে তাহার শেষ কোথায় তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অতীত যুগের বীর-গরিমার বড়াই করিয়া তাঁহারা যে বেসাতী করিতে বসিয়াছেন তাহা ব্যক্তিগত ও উপদলগত প্রাধান্য-প্রচেষ্টার জন্য।

বাংলার তরুণবৃন্দ আর কতদিন তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক হইয়া থাকিবেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রকে কলুষ মুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যক্তিগত বা উপদলগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আত্মহারা দাদা-শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে অপসারিত করা। 'যুগান্তর'ও 'অনুশীলনের' চিরন্তন দ্বন্দ্বের কি শেষ নাই?

—:•(x)•:—

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান অস্থায়ী শিক্ষাসচীব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ দায়িত্ব-জ্ঞানহীনসম্পন্ন ও নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। শিক্ষয়িত্রী-ঘটিত ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের বিশ্লেষণ না করিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে শৈলেন ঘোষ মহাশয় "প্রতিভা রায়ে"র কাহিনী অনুসন্ধান করিতে যে পরস্পর বিরোধী কার্য্য করিয়া ও উক্তি করিয়া বালসুলভ হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতে "প্রতিভা রায়" প্রহেলিকাই হউন বা রক্তমাংসের মানবীই হউন শৈলেন ঘোষের তথাকথিত অনুসন্ধান-প্রহসন তাঁহাকে কোনরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুতরাং কর্পোরেশন তাঁহার পদচ্যুতির নির্দ্দেশ দিয়া যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। কর্পোরেশন নির্ব্বোধ সাবালকদের বা মার্কিন-ভারবাহী ব্যক্তিবর্গের পিঁজরাপোল নহে!
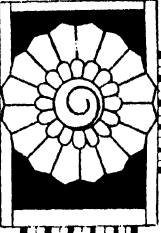
শৈলেনবাবুর মুষ্টিমেয় সমর্থকবৃন্দ তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভাবনায় আতঙ্কিত হইয়া তদ্বির সুরু করিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে কর্পোরেশন দাতব্য-প্রতিষ্ঠান নহে। বিশ বৎসর অ্যামেরিকায় যে ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছেন শৈলেনবাবু প্রয়োজন বোধ করিলে পুনরায় অ্যামেরিকায় ফিরিয়া গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পারেন! তাঁহার কর্ম্মশূন্যতার আশঙ্কায় কয়েকটী ব্যক্তির অহেতুকী আতঙ্ক দুর্জ্ঞেয়।

শৈলেনবাবুর পদচ্যুতির প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাসচীবের পদের জন্য বর্ত্তমান এ্যাসেসার মিঃ আর, এম্, সেনগুপ্ত, ভূতপূর্ব্ব 'লিবার্টি'—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী ও ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের নাম বিশেষভাবে শোনা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তাহা বর্ত্তমানে সঠিকভাবে বলা সহজসাধ্য নহে। তবে রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশে যে যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন তাহা সুনিশ্চিত।

সদ্য আই, সি, এস্ পদপরিত্যাগকারী মিঃ বিষ্ণু কামাথ বর্ত্তমানে কলিকাতার রাষ্ট্রপতির অতিথি। তাঁহাকে কলিকাতার কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে কর্পোরেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী স্পেশাল অফিসার ভাবে বর্ত্তমানে নিযুক্ত করিলে কর্পোরেশন-শাসন-যন্ত্রে সিভিল সার্ভিসের

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

যে সব শিল্পীদের সমবেত শক্তি প্রয়োগে, ছায়া-পটে "বিদ্যাপতি" বিশেষ সমাদর লাভ কোরেচে, তাঁদের মধ্যে অভিনয় ও গানের দিক দিয়ে সব চেয়ে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন—অনুরাধারূপিণী কানন। বিশেষ কোরে নারী-মহলে এই চরিত্রটি যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কোরেচে তার অনেকগুলি কারণ বর্ত্তমান।

নারী তার জীবনের সার্থকতা খোঁজে—সেবা ও প্রেমের মধ্য দিয়ে। অনুরাধার জীবনে, এই সেবা প্রেমটাই, তার চরিত্রগত অপরাপর গুণাবলীকে ছাপিয়ে উঠেচে। সেবার মধ্যে দিয়ে অনুরাধা তার সাহচর্য্য পেয়েছিল আর প্রেমের সাধনায় সে বিজয়িনী হয়েছিল তার প্রবল নিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের জোরে।

তাই অনুরাধার জীবনের আদর্শ এত নিবিড়ভাবে নারীর হৃদয়স্পর্শ করে। ভারতীয় ছায়া-চিত্রের ইতিহাসে, তাই "বিদ্যাপতি" চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে—শুধু এই চরিত্রটির জোরেই।

মাত্র গত দু'মাসে, একমাত্র চিত্রাতে-ই প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকার টিকিট বিক্রয় হ'য়েচে। এথেকেই ছায়া চিত্রের দর্শক-মহলে এই চিত্রের অভাবিত সাফল্যের কারণ উপলব্ধি করা যায়।

তা ছাড়া বিদ্যাপতির মত ছবি একবার দেখে বিশেষ উপলব্ধি করা যায় না।

অন্তত: আর একবার না দেখলে এর dialogue গুলিকে সম্পূর্ণভাবে follow করা যায় না।

অভিজ্ঞান

অভিজ্ঞান-এর বিজ্ঞাপনী-চিত্র (trailor) গত হপ্তা থেকে "চিত্রা" ও "রূপবাণী"-তে প্রদর্শিত হ'চ্ছে। ট্রেলার থেকে যতখানি অনুমান কোরতে পারা যায়, তাতে বুঝলুম, মূল চিত্রখানি সকল দিক থেকেই হৃদয়গ্রাহী হ'বে।

শিল্পী ও টেকনিশিয়ান সমাবেশের দিক থেকে এই ছবিখানি, নিউ থিয়েটার্সের অপরাপর ছবির মতই মনোজ্ঞ হ'বে বলেই আশা করা যায়।

বিচিত্র ঘটনা-বহুল এই কাহিনীটির মধ্যে আমাদের চিন্তাধারাকে আলোড়িত করবার মত বহু উপাদান বর্ত্তমান। কুশলী চিত্র-নাট্যকার বনী মজুমদার যে সেই সব বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে চিত্রনাট্যাকারে গেঁথে তুলে, ছবির পর্দায় তার একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে পারবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। প্রয়োগ-শিল্পী প্রফুল্ল রায়ের কাছেও আমরা তাঁর নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ পেতে চাই।

গেল মঙ্গলবার নিউ সিনেমায় এই ছবির "প্রেস্‌সার শো" হয়ে গেছে। তা থেকে আমরা যা রিপোর্ট পেয়েছি তা খুবই আশাপ্রদ।

"রূপবাণী"-তে ছবিখানির উদ্বোধন-দিবস আগামী শনিবার, ১১ই মে। আপাততঃ আমরা সেই শুভ-দিনটির প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলুম।

ধরিত্রী মাতা

নীতীন বসুর দু' ভাষার ছবি "ধরিত্রী মাতা"র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। ঝড়ের দৃশ্যের নানান জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলো পরিচালক সেরে নিচ্ছেন।

সেদিন সেটের মধ্যে অনেকগুলি তাঁবু খাটান হয়েছিল। মাঠে ধান নেই, ঘরে খাবার নেই, হাতে পয়সা নেই—ঘরে হাহাকার। দলে দলে লোক আসছে তাঁবুর মালিকের কাছে জমী বিক্রী করতে। এরাই খুঁজে পেয়েছেন মাটির ভেতরে কয়লার খনি। অশোক এলো এদেরই তাঁবুতে। বিধাতার ইচ্ছায় তার জীবনে নতুন অধ্যায় গড়ে উঠল।

স্ট্রীট সিঙ্গার

শ্রীমতী মঞ্জু তাঁর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন......ভুল করবেন না—শ্রীমতী কানন নয়—শ্রীমতী কানন তাঁর বাড়ীও ছাড়েন নি—New Theatres-এর studioও ছাড়েন নি।

অমরচাঁদ মহা খুসী—দুইজনেই শৈলেন চৌধুরী আর জগদীশ শেঠী। মঞ্জু বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে বলে নয়—ছোট্ট হলেও কঠিন দৃশ্যগুলির মধ্যে একটা আজ ভাল ভাবে উৎরে গেল বলে।

কর্ম্মের অভিজ্ঞতা প্রসূত দক্ষতা ও ত্যাগ-ব্রতীর আদর্শ সম্মিলিত হইয়া কলিকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের বহু কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের শাসনযন্ত্রে কংগ্রেসের আদর্শ প্রতিফলিত হইবে। রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি?

অধিকার

নিউ থিয়েটার্স ২ নং ষ্টুডিওতে কাজ চলছে দিনে রাতে। কর্ম্মী বড়ুয়ার কাজের কামাই নেই। এরই মধ্যে তিনি ছবির অনেকখানি কাজই সেরে ফেলেছেন।

আনোয়ার শা রোডে সেট পড়েছে রেবার ঘর। যন্ত্রারুগীর রেবা. সেজেছেন বাংলার পাহাড়ী-প্রিয়তমা। তাঁর রুগ্ন চেহারায়—পিয়াসী দৃষ্টিতে—অনবদ্য অভিনয়ে মুগ্ধ করছেন সবাইকে।

হিন্দীতে রেবার অংশে নামছেন শ্রীমতী রামকুমারী। হঠাৎ যে ইসরাত জাহান কেন বাদ পড়লেন, তা আমরা বুঝতে পারলাম না।

ফটকের ধারে মিউজিক রুমে রিহার্সাল দিচ্ছেন তিমির বরণ। 'ক্যামেল' সিগারেটের খালি কৌটোর জাহাজ তৈরী হয়েছে। গাইয়ে ও আর্টিষ্টদের বিশ্রাম নেই। বড়ুয়া আর বরণ আবার মিলেছেন। দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সমন্বয়ে উনিশশো পঁয়ত্রিশ খৃষ্টাব্দে যে ছবি হয়েছিল তাঁর নাম ছিল 'দেবদাস (হিন্দী)' বর্ত্তমানে পুনরায় চার অক্ষরে আর একখানি ছবি উঠছে। সারা ভারতের লোক আজ দর্শন আকাঙ্খায় উন্মুখ, ব্যাকুল। অর্কেষ্ট্রা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী 'অধিকার' ছবিতে যে রকম সুর দিয়েছেন তা নাকি আর হয়নি।

বড়ুয়া বলেন—তিমির বরণের সুর আমার এত ভাল লাগছে যে ছবির অন্যান্য অনেক অংশ বাদ দিয়ে আমি গানই রাখলাম।

এই ছবিতেই গাইছেন সুকণ্ঠ গায়কবৃন্দ—পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল ও প্রতাপ মুখোপাধ্যায়।

বন্ধুবর পাহাড়ীর গান—"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"—এতে নব-রূপে জন্ম নিয়েছে।

এ ছাড়াও এ ছবির 'ট্রেলারের' যে পরিকল্পনা হয়েছে তা একেবারে নূতনত্বে ভরা। কোন প্রকার টাইটেল থাকবে না এতে।

হাজরা পিক্‌চার্স

আগামী ১১ই জুন উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ 'উত্তরা'য় হাজরা পিক্‌চার্সের প্রথম পৌরাণিক চিত্রার্ঘ্য "দেবী ফুল্লরা" বহু প্রতীক্ষার পর মুক্তিলাভ করিবে। "কালকেতু ও ফুল্লরার" রোমাঞ্চকর কাহিনী বাঙলার নর নারীর প্রাণে চিরদিনই এক নব উন্মেষণার সৃষ্টি করে। এমন এক সময় এই কাহিনী রচিত হয়, সে সময় মানুষ পশু অপেক্ষা হিংস্র ও বর্ব্বর ছিল। মানুষের অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া স্বর্গে মহামায়া হইয়া উঠিলেন বিচলিতা—তিনি কর্ম্মঠ এক জাতিকে নির্ভীক ও সত্যবাদীরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহাদের অধিনায়করূপে মর্ত্ত্যে পাঠাইলেন ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধূকে কালকেতু ও ফুল্লরারূপে। এইখান হইতেই এই কাহিনীর সূত্রপাত এবং নানা অলৌকিক ঘটনার ভিতর দিয়া তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

অভিনেতৃ নির্ব্বাচন, দৃশ্যপট সংস্থাপন, অভিজ্ঞ যন্ত্র-শিল্পী যোগাযোগে ছবিখানি যাহাতে বাংলার আবালবৃদ্ধবণিতার প্রাণে নূতন আনন্দ ও নবরসের সঞ্চার করে তাহার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়াছেন। ছবিখানির মুক্তি প্রতিক্ষায় বাঙলার নরনারীরা যেরূপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন তাহাতে আমরা ছবিখানির সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেম-বিরহের অমর আলেখ্য "চোখের বালি"-র বহির্দৃশ্য অবিশ্রান্ত বারিপাত হেতু তোলা স্থগিত রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ছবিখানির সঙ্গীতাংশের কাজ যাহাতে শেষ করা যায় কর্ত্তৃপক্ষ সেই চেষ্টাই করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প ও গান যাহাতে রবীন্দ্র প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ না করে এই প্রতিষ্ঠানের হোতারা সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন। মোট কথা সাহিত্যের দরবারে "চোখের বালি" আজ যে সম্মানে ভূষিত চিত্ররাজ্যেও যাহাতে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হয় তাহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের চলিয়াছে ঐকান্তিক চেষ্টা।

দীনু পিক্‌চার্স

শোনা যাচ্ছে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই "শ্রী" চিত্রগৃহে এই প্রতিষ্ঠানের চিত্র-নিবেদন "রেশমী রুমাল" মুক্তিলাভ করিবে। একখানি "রেশমী রুমাল"কে কেন্দ্রীভূত করিয়া দুই পরিবারের মধ্যে যে ভুলচুকের সৃষ্টি হয় তাহারই যবনিকাপাত হয় অফুরন্ত হাসির উৎসের ভিতর। এই হাস্যরসাত্মক চিত্রখানি পরিচালনা করিয়াছেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। অভিনয় করিয়াছেন যাহারা তাঁহারাও চিত্ররাজ্যে সুপরিচিত। ইহাদের মধ্যে ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, প্রভা, ললিত মিত্র, উষাদেবী ও সাবিত্রী প্রভৃতির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই সবের যোগাযোগে "রেশমী রুমাল" সাধারণকে আনন্দদানে সমর্থ হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ণ থিয়েটার

এই সপ্তাহই মুক্তির শেষ সপ্তাহ। সামনের শনিবার থেকে এখানে 'কমলা

টকীজের "রাজগী" দেখান আরম্ভ হ'বে। তরুণ পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত এই ছবির পরিচালনা করেছেন। কুমার শচীন দেববর্ম্মন এর সঙ্গীত ও শ্রীমতী মেনকার অপূর্ব্ব অভিনয় কলার সমন্বয়ে যে এ ছবি দক্ষিন কলিকাতার জনপ্রিয় চিত্রগৃহ পূর্ণ থিয়েটারে বেশ কিছু দিন চলবে—তা আশাকরা যায়।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে নিউ-থিয়েটার্সের তথা ভারতের দুইখানি অন্যতম কথাচিত্র 'দেবদাস' এবং 'ভাগ্যচক্র' যথাক্রমে চারদিন ও তিনদিন করিয়া প্রদর্শিত হইবে। যে ছবিগুলি বার বার করিয়া দেখিয়াও দেখিবার আনন্দ মেটে না সেই সর্ব্বাঙ্গীন দুইটি চিত্র রূপবাণীর আলোক ও শব্দ প্রক্ষেপন যন্ত্রের নিয়ন্ত্রনে দর্শকবৃন্দ যে বিশেষ করিয়া উপভোগ করিবেন সে সম্বন্ধে বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদ

গত শনিবার "বঙ্গীয় চলচ্চিত্র পরিষদের" অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ বসু মহাশয়ের আহ্বানে একটী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নানাপ্রকার আলোচনার পর একটী ছোট কমিটী নির্বাচন হইয়াছে। এই কমিটী পরিষদের Rules and Regulations-এর খসড়া প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত করিবেন। কমিটীর মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত অনাদি বসু, যতীন্দ্রনাথ মিত্র, মধু বসু, চিত্ত ঘোষ, মিঃ হেমাদ, মিঃ বাগ্‌ডে ও মিঃ চন্দ্রশেখর।

পুত্র-স্নেহ

"নীলা! তোমায় আমি কত ভালবাসি—আমাদের বিবাহিত জীবন নিশ্চয়ই স্বর্গীয় হবে",—সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার সুরেন্দ্রনাথ যখন এক কৃষক কন্যা নীলাকে এই কথা বলিতেছিল তখন স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারে নাই যে এই প্রেমই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কতবড় দুর্ব্বিসহ হইবে।

অদৃষ্টের পরিহাসে—বিধাতার নির্ম্মম ইচ্ছায় এই প্রেমিক যুগলের মিলনে এক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। নীলা অন্য এক কৃষককে বিবাহ করিয়া যখন দিনাতিপাত করিতেছিল তখন জায়গীরদার সুরেন্দ্রনাথ বিদেশে।

দীর্ঘ বার বৎসর পর। ইতিমধ্যে নীলার এক ছেলে জন্মগ্রহণ করে, ছেলের নাম রমেশ—কিন্তু এই রমেশ সুরেন্দ্রনাথেরই ঔরসজাত। যখন রমেশের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় পুত্র স্নেহে আপ্লুত হইয়া উঠে কিন্তু তাহার পরিচয় সে দিতে পারে না। অথচ দিনের পর দিন এই পুত্রস্নেহ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। অতঃপর নানাপ্রকার অজুহাতে সুরেন্দ্রনাথ প্রায়ই রমেশকে তাঁহার বাড়ীতে আহ্বান করে।

এদিকে নারায়ণলাল নামক জনৈক ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের চির শত্রু ছিল এবং এই সুরেন্দ্রনাথের জন্যই সে নীলাকে পায় নাই।

এইখান হইতেই গল্প আরম্ভ। রমেশ এখন যুবক। রমেশ তাহার শৈশবের সঙ্গিনী উষাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় মনে করে, এবং উষাও রমেশকে পূর্ণভাবে ভালবাসে। শৈশবের প্রীতি পরিণত বয়সে স্বর্গীয় প্রেমে পরিণত হইয়াছে।

ঘটনার আবর্ত্তনে নীলা নিজ প্রেমিকের কোলেই ইহলীলা শেষ করে, এবং রমেশের দেখা শুনার ভারও জায়গীরদারের উপর সমর্পণ করিয়া যায়। কিন্তু রমেশের মর্য্যাদা বোধ বেশী ছিল। জায়গীরদারের সুখৈশ্বর্য্য অপেক্ষা গরিবীই তাহার ভাল লাগিত।

নারায়ণলালও সুযোগ বুঝিয়া কৌশলের সহিত এমন উপায় করিল যাহাতে পুত্রই পিতার অপরাধের শাস্তি দিতে প্রস্তুত হইল।

রমেশের কি হইল—নারায়ণলালের দ্বারা কাহার হত্যা হইল—জায়গীরদারকে কে মারিল—নারায়ণলালের অসৎ কর্ম্মের কি ফল মিলিবে এবং পুত্রস্নেহের স্বর্গীয় চিত্র দেখিতে হইলে আপনি নিশ্চয়ই প্রভাত সিনেমায় আসিয়া "জায়গীরদার" ছবিখানা দেখিয়া যাইবেন।

মিঃ রেবাশঙ্কর পাঞ্চোলী

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের স্বত্বাধিকারী মিঃ রেবাশঙ্কর পাঞ্চোলী গত সপ্তাহে বিমানপোত যোগে ইউরোপ গমন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ প্যারিসে গমন করিবেন পরে লণ্ডন হইয়া হলিউড প্রদর্শন করিবেন। হলিউডে আর, কে, ও রেডিও পিকচার্সের বাৎসরিক সম্মিলনীতে

নারী কী শুধুই ভোগের বস্তু বা খেলার পুতুল!

আগামী শনিবার ১১ই জুন, রূপবাণীর রূপালী পর্দায়, নিউ থিয়েটার্স-এর বহু-আলোচিত এবং বহু-বিজ্ঞাপিত চিত্র-কথা 'অভিজ্ঞান' মুক্তিলাভ কোরবে।

অভিজ্ঞান-এর বিষয়-বস্তুর মধ্যে আমরা অনেক কিছু নতুনত্বের সন্ধান পাব বোলে আশা করি।

'সন্ধ্যা' চরিত্রটি এই কাহিনীর মেরুদণ্ড। এই মেয়েটির বিচিত্র জীবন কাহিনী অবলম্বন কোরেই ছায়া-চিত্রে গল্পটি শাখা-পল্লবিত হয়েচে।

অপরাধ কোরলে অপরাধীকে দণ্ড ভোগ কোরতে হয়। কিন্তু দণ্ড দেবার পূর্ব্বে মানুষ চায় সে অপরাধের বিচার। কিন্তু সমাজ যেখানে অপরাধের বিচার না কোরে শুধু অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়—সেখানে সমাজের সে নির্দ্দেশ আমরা কতক্ষণ মাথা পেতে নিতে পারি?

অভাগিনী সন্ধ্যার জীবনে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ তার বিচার করলে না। দিলে তাকে দণ্ড।

দুনিয়ার কারু কাছে সে প্রতীকার পেলে না। অন্ধ পিতৃভক্তিতে মোহাচ্ছন্ন তার স্বামী, কেবল জানালে মৌখিক সমবেদনা। তেত্রিশ-কোটী দেবতার নামে শপথ গ্রহণ কোরে, অগ্নি-সাক্ষী কোরে তাকে বিবাহ কোরেছিল। সুখে বা দুঃখে, বিপদে বা সম্পদে তাকে আশ্রয় দেবে বোলে।

কিন্তু জীবনের সে চরম পরীক্ষার দিনে, স্বামী তার কর্ত্তব্য, তার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল। অসহায় নারী জীবনের পথে ভেসে চল্‌লো, স্রোতের ফুলের মত।

এমন অবস্থায় পড়লে হয় নারী বিপথ গামিনী হয়, নয় সে করে আত্মহত্যা। কিন্তু সন্ধ্যার জীবন দেবতা তাতে সায় দেয় নি।

কিন্তু জীবন-যুদ্ধে এগিয়ে যাবার মত সৎ-সাহসের তার অভাব হয় নি। তাই অবিচলিত নিষ্ঠায়, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দুর্দ্দমণীয় সাহসের জোরে, সে সেই নিষ্ঠুর, হৃদয়হীণ সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কোরতে বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি।

এই বিজয়িনী নারীর কাছে একদিন মতিচ্ছন্ন স্বামীকে পরাজয় স্বীকার কোরতে হোয়েছিল। স্বামীকে সে ক্ষমা কোরেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তার নারীত্ব ও আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে, সে তার দাসত্ব স্বীকার করে নি।

* * *

নারী যে শুধু ভোগের বস্তু বা খেলার পুতুল নয়—পুরুষের মতই যে তার অধিকার বোধ, আত্মসম্মান বোধ, তাকে সচেতন কোরে তুলতে পারে—সন্ধ্যা-সতীর মর্ম্মন্তুদ জীবন-নাট্যের মধ্যদিয়ে, তারই অশ্রু সজল কাহিনী আপনাদের অন্তর স্পর্শ কোরবে।

নিউ থিয়েটার্সের অপরাপর ছবির মতই অভিজ্ঞান-চিত্রের প্রযোজনায়, এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, টেকনিশিয়ান্ এবং কর্ম্মীসঙ্ঘের যোগাযোগ ঘটেচে। সুতরাং ছবিখানি যে সকলদিক দিয়ে রসবেত্তার চিত্ত জয় কোরতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অভিজ্ঞান-এর প্রধান চরিত্রগুলিতে চিত্রাবতরণ কোরেছেন : মলিনা, মেনকা, দেববালা, কমলা (ঝরিয়া), রাজলক্ষ্মী, জীবন গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, শৈলেন পাল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ মল্লিক, অহি সান্যাল, বিনয় গোস্বামী, বোকেন চট্টো, প্রভৃতি।

এই চিত্রে প্রায় আটখানি গান সন্নিবেশিত হ'য়েচ। গানগুলি রচনা কোরেচেন—সুবিখ্যাত গীতকার, অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য। এতে সুর-সংযোজনা কোরেছেন স্বনামধন্য সুর-শিল্পী : রাই বড়াল।

—:•:—

যোগদান করিবার জন্যও তিনি আহুত হইয়াছেন।

মিঃ পাঞ্চোলীর কর্ম্মময় জীবন প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। আজ তিনি প্রায় ত্রিশটি চিত্রগৃহের পরিচালনা করেন এবং করাচী, বোম্বাই লাহোর, দিল্লী, কলিকাতা, রেঙ্গুন, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে তাহার অফিস বর্ত্তমান। কিন্তু একদিন ব্যাঙ্কের সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন মাত্র, নিজ ক্ষমতা ও অধ্যবসায় গুণে আজ তিনি ফিল্ম ব্যবসায় মহলে সুপরিচিত।

আর, কে, ও রেডিও পিকচার্সের ভারতবর্ষ, বার্ম্মা' ও সিলোন প্রভৃতি স্থানের ডিষ্ট্রিবিউটার্স ব্যতীতও তাঁহার আর, সি, এ ফটোফোনের এজেন্সী রহিয়াছে।

খুব সম্ভব ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মিঃ পাঞ্চোলী, স্বয়ং ছবি তোলার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যার খেয়ালীতে প্রকাশিত "রিক্তা" গল্পের লেখকের নাম শ্রীহিমাংশু কুমার মুখোপাধ্যায় হইবে।

খেঃ সঃ।

(সি, বি)

বার্ম্মা ফুটবল টীম

গত দু'সপ্তাহ ধরে "বার্ম্মা ফুটবল টীম" কলকাতায় খেলতে আসবে কি না সে বিষয়ে নানারকমের জল্পনা কল্পনা সুরু হয়েছিল। প্রত্যেক দিনই নূতন নূতন খবর প্রচারিত হচ্ছিল। কোনদিন খবর পাওয়া গেল বার্ম্মা দল জাহাজে চড়েছে আবার পরের দিন খবর পাওয়া গেল যে তারা কবে রওনা হবে তা এখনও ঠিক হয় নি। এই রকমের বিপরীত নৈরাশ্যজনক খবর প্রচারের জন্য বার্ম্মাদল ততটা হতাশ না হলেও কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা এরা যে এখানে এসে হাজির হবে এ আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই প্রকারের আশা ও নিরাশাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টির জন্য ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনকে কতকাংশে দায়ী করা যেতে পারে। কারণ তাঁরা এই সম্পর্কে নিজেদের স্থানীয় ব্যবস্থা-গুলি সম্পূর্ণ না করেই নিমন্ত্রিতদের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বার্ম্মা দল আসবার জন্য প্রস্তুত হবার পর আই এফ এর সম্মতি জানতে চাইলে এদের 'হ্যাঁ এস' বলতে দিন তিনেক সময় লেগেছিল। যাক শেষ পর্য্যন্ত আই এফ এর নবনির্ব্বাচিত সম্পাদক মিঃ এম দত্ত রায়ের আপ্রাণ চেষ্টায়—'বার্ম্মা ফুটবল টীম' বি আই এস এন্ কোম্পানীর 'এরোণ্ডা' জাহাজে গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছেছে। তাঁহাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য আই এফ এর সম্পাদকদ্বয় মেসার্স এম দত্ত রায় ও রবিনসন্, মিঃ পি গুপ্ত, মিঃ জি এন দাস, মিঃ সাফি ইস্পাহানি, মিঃ নুরুদ্দীন্, মিঃ প্রেষ্টন এবং সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আই এফ এর সভাপতি মাননীয় সন্তোষের মহারাজা বাহাদুর ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে এই আগন্তুক দলটিকে অভ্যর্থনা করতে অক্ষম হওয়ায় তিনি একটি লিখিত অভ্যর্থনাজ্ঞাপক বাণী প্রেরণ করেন এবং মিঃ রবিনসন্ জাহাজের ডেকের উপর বার্ম্মা দলটির সম্মুখে তাহা পাঠ করেন। আউটরাম ঘাট থেকে তাঁরা বরাবর 'কন্টিনেন্ট্যাল হোটেলে' এসে অবস্থান্ করেন। ঐদিন্ বিকালে তাঁরা কালীঘাট ও মহমেডান্ স্পোর্টিং এবং ক্যালকাটা ও ই বি আরের খেলাটি আংশিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। এর আগে কলিকাতার ক্রীড়ামোদীদের কালী-ঘাট ক্লাবের প্রচেষ্টায় বর্ম্মী খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ উপস্থিত হলেও বার্ম্মার কোন ফুটবল দলের ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আগন্তুক দলটি যে দুটি ম্যাচ খেলেছেন সেগুলিতে দর্শক সমাগম কলকাতার সুনাম্ অনুযায়ী হয় নি। এর একটা কারণ হচ্ছে মহমেডান্ স্পোর্টিং ক্লাব বার্ম্মা দলের সঙ্গে খেলতে রাজী না হওয়ায় এই সম্প্রদায়ের দর্শকেরা এই খেলাগুলিতে উপস্থিত হন নি। তার উপর গত শনিবার বার্ম্মা দল্ ও ক্যালকাটা এবং মোহন-বাগানের সম্মিলিত দলটির খেলা আরম্ভ হবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হওয়ার জন্য অনেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বার্ম্মা দল গত জানুয়ারী মাসে লণ্ডনের 'ইসলিংটন্ করিন্থিয়ানস্ দলকে এবং রেঙ্গুনে কলকাতার ঈষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে ও চাইনীজ অলিম্পিক্ ফুটবল টীমের বিরুদ্ধে নৈপুণ্যপূর্ণ খেলা দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে। আমাদের প্রতিনিধি বার্ম্মা দলের ম্যানেজার মিঃ ডি ক্রুজ এবং ক্যাপ্টেন্ মিঃ স বেলীর কাছ থেকে বার্ম্মার ফুটবল খেলা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানতে পারেন। বার্ম্মায় জুন মাস থেকে পাঁচ মাসব্যাপী ফুটবল খেলার মরসুম সুরু হয়। সেই কারণে তাঁদের দলের খেলোয়াড়েরা এখানে আসার আগে প্র্যাক্‌টিস্ করার সুযোগ পান নি। চাইনীজ দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড লী ওয়াই টংয়ের অনুরূপ খেলোয়াড় ইতিপূর্ব্বে তাঁরা আর দেখেন নি। বার্ম্মার খেলোয়াড়দের মধ্যে পেশাদারী মনোবৃত্তি একেবারে নেই। বর্ম্মীরা রাগবী খেলে না। কাষ্টমস্, রেলওয়ে মিউনিসিপ্যাল সেঞ্চুরিয়ানস্, ইউরোপীয়ান জিমখানা, কয়াল, পুলিশ ইত্যাদি প্রায় দশটি ফুটবল ক্লাব বার্ম্মায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রেঙ্গুন কাষ্টমস্ ওখানকার সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন দল। অনিবার্য্য কারণে তিনজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ম্যাংথান, লোন্ এবং ইয়াবা এই দলে আসতে পারেন নি। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ এই দলের পক্ষে খেলবার জন্য কলকাতায় এসেছেন। গোল—বাসিন্ (মিউনিসিপ্যাল), ব্যাক্—দীনা (পোষ্টালস্) ও লেষ্ট্রেঞ্জ (কাষ্টমস্), হাফব্যাক—গালিং (রেলওয়ে), স ভেলী (কাষ্টমস্) ও ফোগার্টি (সেঞ্চুরিয়ানস), ফরওয়ার্ড—উইলিন্ এবং কানিয়ান্ (বার্ম্মা পুলিশ), বা বা (রেলওয়ে), পাগসলী (কাষ্টমস্) ও রবার্টস্ (বি আই এস এন্)।

রিজার্ভস্—জোহানিস্, পেস্, মেটার ও মেটল্যাণ্ড (এরা সকলেই রেলওয়ে দলের খেলোয়াড়)

সপত্নী মিঃ ক্রুজ এই দলের সম্পাদক ও ম্যানেজার হিসাবে সঙ্গে এসেছেন।

বার্ম্মা দলের প্রথম খেলা

গত শুক্রবার ক্যালকাটা মাঠে আই এফ এর বাছাই দলের সহিত বার্ম্মা দলের প্রথম খেলাটি হয়। আগন্তুক দল প্রথমার্দ্ধে বিজয়সূচক ক্রীড়া প্রদর্শন করেও শেষ পর্য্যন্ত এক গোলে পরাজয় স্বীকার করে। আই এফ এ দলে গোলরক্ষক আর্ম্মষ্ট্রং মনোনীত হলেও তিনি যোগদান করতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁর দায়িত্ব ই. বি, আর দলের গোলরক্ষক রোজারিওর উপর অর্পিত হয়। বার্ম্মা দল প্রথম দিনের এই খেলাটিতে পরাজিত হওয়ায় তাদের খ্যাতি অনেকাংশে ম্লান হয়। তাছাড়া বার্ম্মা দল এই দিনে তাদের খ্যাতি অনুযায়ী উচ্চাঙ্গের খেলা দেখাতে সমর্থ হয় নি। এই দলের খেলোয়াড়েরা হেড করতে একেবারেই অভ্যস্ত নয় বলে প্রতীয়মান হল। এই ত্রুটি যদি তাদের খেলায় না দেখা যেত তাহলে হয়ত প্রথম দিনে পরাজয় স্বীকার করতে হত না। প্রথমার্দ্ধে বার্ম্মা দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেলে। তবে তাদের খেলার মধ্যে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু আই এফ এ দলের রক্ষণ ভাগের প্রশংসনীয় খেলার জন্য তারা কোন গোল প্রদান করতে পারে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে উভয় দলই সমানভাবে আক্রমণ করবার সুযোগ পায়। পনেরো মিনিট ব্যর্থ আক্রমণ চলবার পর আর লামস্ ডেন্ গোলের সম্মুখে একটি পাশ করলে রহিম বিজয়সূচক গোলটি করেন ১—০। আই এফ এ দলের অধিকাংশ আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা নৈরাশ্যজনক-ভাবে না খেললে এই দলটি আরও বেশী গোলে জয়ী হতে পারত। বিজয়ী দলের রক্ষণভাগে গোলরক্ষক রোজারিও, ব্যাকদ্বয় পি দাসগুপ্ত ও ই ম্যার্ডে, এবং হাফব্যাক-দিগের মধ্যে জে লামসডেন্ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল খেলেন। আক্রমণভাগে রহিম্ এবং আব্বাসের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। বার্ম্মা দলের গোলরক্ষক বালিন্ নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ব্যাকদিগের মধ্যে দীনা, হাফ ব্যাক সন্তেলী (ক্যাপ্টেন্) এবং ফরওয়ার্ডের মধ্যে পাগস্লে, বা বা, কানিয়ান্ এবং উইলীন্ বার্ম্মার ক্রীড়া চাতুর্য্যের পরিচয় দেন।

আই এফ এ দল—রোজারিও (ই, বি, আর); পি, দাস গুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) এবং ই কার্ডে (পুলিশ); হেণ্ডারসন (কে, ও,

এস, বি); টেগর (ক্যালকাটা) ক্যাপ্টেন, এবং জে, সামসডেন্ (রেঞ্জার্স); সেলিম (মহমেডান); রহিম (মহমেডান্), আর সামসডেন্ (রেঞ্জার্স), ব্রাওয়ার (ক্যামেরোনিয়ানস) এবং আব্বাস্ (মহমেডান্)

বার্ম্মা দল—বাসিন্, দীনা এবং লেট্রেঞ্জ, গালিং, সবেলী এবং ফোগার্টি, উইলীন, কানিয়ান্, বা বা, পাগসলে এবং রবার্টস,

রেফারী—জগদীশ চক্রবর্ত্তী

লাইনসম্যানদ্বয়—সি বি চ্যাটার্জ্জি ও এস্ সরকার।

বার্ম্মা দলের দ্বিতীয় খেলা—

কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং শীল্ড বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সহিত বার্ম্মা দলের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর অপ্রত্যাশিতভাবে মহমেডান দল আই এফ এর নিকট দুটী সর্ত্ত পেশ করে। আই এফ এ সেগুলি অস্বীকার করায় মহমেডান দল খেলতে অসম্মতি জানায়। সেই কারণে ক্যালকাটা ও মোহনবাগান দলের বাছাই করা খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি টীম গঠন করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে গত শনিবার ক্যালকাটা মাঠে ক্যালকাটা মোহনবাগান সম্মিলিত দলের সঙ্গে বার্ম্মাদলের দ্বিতীয় ম্যাচটি খেলা হয়। এইদিনে খেলা আরম্ভ হবার আগে থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝড় সুরু হয়। সেই কারণে খুব অল্পসংখ্যক দর্শক এই খেলাটিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এইরূপ চূড়ান্ত দুর্য্যোগের মধ্যে খেলাটি হওয়া উচিৎ কি না সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হবার পর শেষ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখার নানাপ্রকার অসুবিধা হওয়ায় খেলাটি যথাসময়ে আরম্ভ হয়। প্রথম থেকেই মাঠটিতে বৃষ্টির জল জমে যায়। স্থানীয়দলের এইরূপ মাঠে খেলতে বিশেষ অসুবিধা হলেও আগন্তুক দলটি এইরূপ মাঠে প্রথম দিন অপেক্ষা উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং ৩-২ গোলে জয় হবার সৌভাগ্যলাভ করে। এই খেলাটিতে প্রমাণিত হয় যে বার্ম্মার খেলোয়াড়েরা জল কাদায় নিজেদের উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। বার্ম্মা দল উন্নত ধরণের খেলা দেখিয়ে প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যে তিনটি গোল প্রদান করতে সক্ষম হলেও স্থানীয় দল আশাতিরিক্তভাবে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াচাতুর্য্য প্রদর্শন করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে দুটি গোল পরিশোধ করে। তবে বার্ম্মা দলের একটী গোল এবং সম্মিলিত দলের দুটি গোল পেনাল্টি কিক্ থেকে হয়। আগন্তুক দলের বা বা এবং পাগসলে যথাক্রমে একটি ও দুটি গোল প্রদান করেন। স্থানীয় দলের এস চৌধুরী দুটি গোল পরিশোধ করবার সৌভাগ্যলাভ করেন। বিজয় দলের রক্ষণভাগে বা সিন, দীনা, গালিং এবং আক্রমণ ভাগে রবার্টস ব্যতীত সকলেই দর্শকদের তৃপ্তি দান করেন। বিশেষ করিয়া বা বা তাঁহার নিজ সুনামের প্রশংসনীয় পরিচয় দেন। এই দিনের খেলার পর সকলেই স্বীকার করছেন যে, বা বা প্রকৃতই একজন গুণী খেলোয়াড়। বিজিত দলে আর্ম্মষ্ট্রং গ্যালসম্যান, বিমল মুখার্জ্জি, টেলর, বেণীপ্রসাদ, এস চৌধুরী এবং প্রেমলাল দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রক্ষণভাগে বেণীপ্রসাদের খেলা সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হয়েছিল।

বার্ম্মাদল—বাসিন, দীনা এবং লেট্রেঞ্জ, গালিং, সভেলী এবং ফোগার্টি, উই লীন, কানিয়ান, বা বা, পাগসলে এবং রবার্টস্।

ক্যালকাটা ও মোহনবাগান দল—আর্ম্মষ্ট্রং (ক্যালকাটা), দরবারী দত্ত (মোহনবাগান) এবং গ্যালসম্যান্ (ক্যালকাটা), বিমল মুখার্জ্জি (মোহনবাগান), টেলর (ক্যালকাটা) এবং বেণীপ্রসাদ (মোহনবাগান), নির্ম্মল ঘোষ (মোহনবাগান), ম্যাকে (ক্যালকাটা), এ রায় চৌধুরী (মোহনবাগান), প্রেমলাল এবং এস চৌধুরী (মোহনবাগান)।

রেফারী—সার্জ্জেণ্ট রবিনসন্

লাইনসম্যানদ্বয়—হীরালাল দত্ত এবং এম্ আমেদ।

বার্ম্মা দলের অভ্যর্থনা—গত রবিবার বার্ম্মা দলের কোন খেলা না থাকায় জন্য অনেকগুলি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হয়েছিল। চন্দননগর সেণ্ট্রাল ক্লাব কর্ত্তৃক জলযোগে আপ্যায়িত হবার পর বার্ম্মা ফুটবল টীম গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আই এফ এ কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'লানচন্ পার্টিতে' যোগদান করেন।

এই দিনে বিকাল পাচটার সময় কালীঘাট ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এ কে সেন তাঁর ৩নং নিউ রোডস্থ ভবনে বার্ম্মা টীমকে 'চা পানে' অভ্যর্থিত করেন। ক্লাবের সভাপতি মাননীয় মিঃ এস, কে সিংহ, মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে আই-সি-এস, মিঃ সুশীল সেন ইত্যাদি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সম্মেলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

হীরার হার

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ, বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(এক)

"ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ !"

সকলে চমকিত হ'য়ে ফিরে চাইলেন। বাড়ীর অন্দরের দিকে হলঘরের যে দরজা ছিল, তার সামনে গৃহস্বামী মিঃ ঘোষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে হাসি থাকলেও চক্ষুতে যেন কেমন একটা উদ্বেগের ভাব রয়েছে। মিঃ ঘোষ বারাসত মহকুমার অন্তর্গত গুস্তিয়ার জমিদার। আজ মিসেস্ ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষে ভোজের ব্যবস্থা হ'য়েছে। থিয়েটার রোডের বিরাট "ঘোষ-ম্যানশন" সুসজ্জিত ও আলোকিত। কলকাতার অসংখ্য গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সপরিবারে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। সামনের বিরাট্ হলঘরে সকলে সমবেত হ'য়েছেন। ঐ উপলক্ষে অনেক খ্যাতনামা গায়ক-গায়িকারও সেখানে সমাবেশ হ'য়েছে। ঘরের একপ্রান্তে বিখ্যাত "লোটাস্ অরকেষ্ট্রা"র যন্ত্র-সঙ্গীত চলছিল। এমন সময়ে হঠাৎ এইরকম বাধা উপস্থিত হওয়ায় সকলেই একটু বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। যন্ত্র-সঙ্গীত থেমে গেল—সকলে শুদ্ধ হ'য়ে গৃহস্বামীর দিকে চাইলেন।

মিঃ ঘোষ বল্লেন—"ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, হঠাৎ আনন্দের মাঝখানে বাধা দিয়ে আমাকে আপনাদের বিরাগ-ভাজন হ'তে হ'লো—মাফ করবেন। কিন্তু, আমার এই বিরক্তিকর কাজটা একান্ত অনিচ্ছাকৃত উপায়ন্তর না থাকায় আমাকে এই রকম করতে হ'লো। জন্মদিন-উপলক্ষে কাল আমি আমার স্ত্রীকে একটা হীরার হার উপহার দিয়েছিলুম। হারটীর দাম ২ ,০০০৲ বিশ হাজার টাকা। আজ আমার স্ত্রী সেই হার পরে' নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করেছেন। দশ মিনিট আগে আমার স্ত্রী এই ঘর থেকে বাইরে যান। আমি সেই সময়ে এইদিকে আসছিলুম। পথে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'লো। তিনি খুব চঞ্চল হ'য়েছেন দেখলুম। তাঁর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে, আমি বল্লুম—'কি হ'য়েছে, হীরা? তোমাকে বড়ই চঞ্চল দেখছি কেন?' আমার স্ত্রী বল্লেন—"আমার হারছড়াটা দেখতে পাচ্ছি না। একটু আগে আমার গলায় ছিল—বেশ মনে আছে। মিনিটখানেক আগে, যখন আমি মিস্ গুপ্তার সঙ্গে কথা কইছিলুম, তখন হঠাৎ আমার গলাটা খালি-খালি মনে হ'লো। হাত দিয়ে দেখলুম গলায় হার নেই। আমার পাশেই বিখ্যাত অভিনেত্রী সতী দেবী দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমার চঞ্চলতা লক্ষ্য করে' ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁর কানে কানে ঘটনাটা বল্লুম। তিনি ও আমি দু'জনে একটুখানি এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করবার পর হারের কোন খোঁজ না পাওয়ায়, তিনি তোমাকে খবর দিতে বল্লেন।' আমার স্ত্রীর কথা শুনে, আমি সতী দেবীকে ডেকে এ সম্বন্ধে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলুম। তারপর আপনাদের জানান দরকার বিবেচনা করে আপনাদের জানাচ্ছি। আপনাদের কারো নজরে পড়লে অবশ্যই আপনারা আমাকে জানাবেন। এমনও হ'তে পারে, যে ভবিষ্যতে যাতে আমার স্ত্রী আরও সতর্ক হ'ন, সেই জন্যে আপনারা কেউ অলঙ্কারটী লুকিয়ে রেখেছেন। তা' যদি হয়, তো তাঁর বিলক্ষণ শিক্ষা হ'য়েছে। যিনি লুকিয়ে রেখেছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

মিঃ ঘোষ চুপ করলেন। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ—সকলেরই মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার ছায়া। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। এক মিনিট কেটে গেল, কিন্তু কেউ এগিয়ে গেলেন না।

মিঃ ঘোষের হাসি একটু ম্লান হ'য়ে গেল। তিনি আবার বল্লেন—"ওঃ! আমার একটু ভুল হ'য়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে। সুতরাং আমি বুঝলেও অপরে হয়তো বুঝবেন না, এই ভয়ে যিনি রেখে দিয়েছেন, তিনি ফিরিয়ে দিতে লজ্জিত হ'চ্ছেন। আচ্ছা, আমি এই টেবিলের কাছে দাঁড়াচ্ছি। দু' মিনিট পরে সব আলো নিবে যাবে। এক মিনিট ঘর একেবারে অন্ধকার হ'য়ে থাকবে। সেই অবকাশে হার আমার কাছে ফিরে আসবে আশাকরি। কেউ জানতেও পারবেন না, কে হার ছড়াটী রেখেছিলেন।"

এই বলে তিনি একজন সরকারকে ডেকে কানে কানে কি বলে দিলেন। সরকার চলে গেল। মিঃ ঘোষ অরকেষ্ট্রা পার্টিকে আবার বাজনা সুরু করতে অনুরোধ করলেন। যন্ত্র-সঙ্গীত আবার আরম্ভ হ'লো, কিন্তু যন্ত্রের আলাপে আর সে সজীবতা ছিল না। সকলেই রুদ্ধ-নিশ্বাসে আলো নিবে যাবার অপেক্ষা করে রইলেন। ঘোষ সাহেব

টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরেই আলো নিভে গেল—সব অন্ধকার। অর্কেষ্ট্রা থেমে গেল।

অতবড় বিরাট ঘরখানায় একটা অনুভবনীয় স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। "ফিশ ফিশ" করে কথাবার্ত্তার চাপা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। সকলেই প্রতীক্ষমান হৃদয়ে প্রত্যেকটী সেকেণ্ড যেন মনে মনে গুনতে লাগলেন। কেউ কি হার ঘোষ-সাহেবের হাতে ফিরিয়ে দেবে? দিলে কি কেউ হার ফিরিয়ে?

এক মিনিট খুব অল্প সময় বটে। কিন্তু, অন্ধকারের মধ্যে এই একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। হঠাৎ ঘোষ-সাহেবের স্বর শোনা গেল। তিনি বল্লেন—"মিনিট প্রায় শেষ হ'ল। আমি হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আচ্ছা, আরও এক মিনিট সময় দেওয়া গেল।"

অন্ধকারের মধ্যে আরও একমিনিট কাটাতে হ'বে ভেবে অনেকেই একটু বিরক্ত হ'লেন। কিন্তু উপায় কি? ক্রমে সে মিনিটটাও কেটে এলো। খানিক পরেই সব আলো আবার জ্বলে উঠলো। ঘোষ সাহেব তখনও টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গোঁফ ও দাড়ী থাকায় তাঁর মুখে গাম্ভীর্য্য যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ফুটে উঠেছিল।

সেই স্তব্ধ নিমন্ত্রিতগণকে সম্বোধন করে' ঘোষ সাহেব বল্লেন—"দেখুন, এইবার পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। আপনাদের মধ্যে কেউ এ ঘর ত্যাগ করে যাবেন না, এই আমার অনুরোধ। গান বাজনা যেমন চলছিল চলুক।"

তিনি একজন নেপালী দরোয়ানকে দরজায় দাঁড়াতে আদেশ করে বাইরে চলে গেলেন। পাঁচ—দশ—ক্রমে পনেরো মিনিট কেটে গেল, ঘোষ সাহেব বা পুলিশের আসবার কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না। অর্কেষ্ট্রা আবার আরম্ভ হ'য়েছে বটে, কিন্তু সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই। সকলেই নিম্ন-স্বরে কথা-বার্ত্তা কইছেন।

হঠাৎ প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিঃ মুখার্জ্জী বলে উঠলেন—"একি! আমার ঘড়ী ও চেন কোথায় গেল?" ইঞ্জিনিয়ার সুরেশ চ্যাটার্জ্জীর স্ত্রী বলে' উঠলেন—"তাইতো আমার হীরা-বসান ব্রুচটা কি হ'ল?" ডাঃ মুখার্জ্জীর পত্নী বল্লেন—"তাইতো, আমার মুক্তোর কলার?" এই রকম অনেকগুলো—"কি হ'ল?" "কোথায় গেল?" প্রশ্ন অল্প সময়ের মধ্যেই শোনা গেল। দেখা গেল আরও প্রায় সাত আটটা দামী জিনিস হারিয়ে গেছে। সকলেই চমকিত ও অত্যধিক উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন।

এই সময়ে অন্দরের দিকের দরজা হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল ও মিসেস ঘোষ এবং সতী দেবী অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন। সকলেই "কি ব্যাপার?" কি হ'য়েছে?" বলে তাঁদের ঘিরে ফেল্লেন।

হাঁফাতে হাঁফাতে মিসেস ঘোষ বল্লেন—"আমার স্বামী কোথায় গেলেন?"

মিসেস চ্যাটার্জ্জী বল্লেন—"তিনি মাত্র ১৫ মিনিট আন্দাজ আগে পুলিসে খবর দিতে বাইরে গেছেন। কিন্তু, আপনি এত উত্তেজিত হ'য়েছেন কেন? ব্যাপার কি? আরও কোন জিনিস হারিয়েছে না কি? আমাদের কয়েক জনেরও কিছু কিছু গহনা পাওয়া যাচ্ছে না।"

মিসেস ঘোষ বল্লেন—"হার হারিয়ে গেছে বুঝতে পেরেই আমি সতীদেবীর পরামর্শে স্বামীকে খবর দিতে যাই। পথে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ায়, তাঁকে সব খুলে বল্লুম। তিনি সতীদেবীকে কয়েকটা প্রশ্ন করে এদিকে এলেন, আর আমাকে উপরে আমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে বল্লেন। আমরা তার কথা মত আমার ঘরে গিয়ে বসি। এই হার-হারানো সম্বন্ধেই আমাদের কথা-বার্ত্তা চলতে থাকে। হঠাৎ পাশের ঘরে কে যেন দরজায় লাথি মারছে বলে' মনে হ'লো। আমরা ছুটে দরজার কাছে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—"কে ওখানে?" কোন সাড়া পেলুম না। দরজা ঠেলে দেখলুম—কড়ায় শক্ত তালা দেওয়া। ঐ ঘরটায় আমাদের কাপড়-চোপড় থাকে, আর বাইরে এই তালাটাই আটকানো থাকে। কিন্তু, ভিতরে কে আছে? বাহাদুর, আমার সঙ্গে এলো—যে যে চাকর দরোয়ান এখানে আছো সকলে এলো।"

এই বলেই তিনি অন্দরের দিকের দরজা দিয়ে ভিতরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকর-বাকর ও দরোয়ানেরা তো গেলই, নিমন্ত্রিতেরাও সকলে হুড়-মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। উপরের যে ঘরটার দরজায় তালা দেওয়া ছিল, তার সামনে একটা মস্ত-বড় ভীড় জমে গেল। সকলেই অসম্ভব উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

তালা ভেঙে সকলে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। আলো জ্বালা হ'লো। আশ্চর্য্য—এ কি! হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় ঘোষ-সাহেব দরজার কাছেই পড়ে আছেন।

কারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'লো না। একি ঘোষ-সাহেব এমন অবস্থায় এখানে কি করে' এলেন?

(ক্রমশঃ

নটরাজ

শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

জাগো শিব-শঙ্কর মেঘ বরিষণে,
জ্বলিছে বিজলী-শিখা দূর গগনে।
গুরু গুরু বাজে মেঘ নূপুরের ছন্দে,
গাহিছে মাভৈঃ বাণী পুলকে আনন্দে;
ধরণী উঠিছে 'মাতি' মৃদঙ্গ সনে।
ববম্ ববম্ বাজে ডমরুর তাল,
তাথৈ তাথৈ ওই নাচে মহাকাল;
"হর হর বম্ বম্"—মেঘ গরজনে॥

—*—

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—পাঁচ—

গত তিনমাস যাবৎ কণা অরুণের গৃহেই রহিয়াছে। শুভ্রার যত্নে ও অরুণের অনুগ্রহে কণা তাহার ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন করিয়াছে। তাহার ভ্রাতার প্রদত্ত অর্থে অরুণ তাহাকে কয়েকখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে ও বাকী টাকায় তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট পেপার ক্রয় করিয়া দিয়াছে। কণা এখানে সুখেই আছে বলিতে হইবে। শুভ্রা তাহাকে যত্ন করে আপনার সহোদরার মত, তাহার কিছু প্রয়োজন হইবার আগেই তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়। কিন্তু সে যাহাতে অরুণের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিতে না পায় সে বিষয়েও সে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিত না। শুভ্রার ধারণা তাহার স্বামীর ন্যায় সুপুরুষ পৃথিবীতে অল্পই আছে; এই জন্য যে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে তিনি লোভনীয় সামগ্রী।

যে নারী তাহার স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং স্বামাকে অধিক সুন্দর দেখে তাহারাই স্বামীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে ইহাই জগতের নিয়ম। শুভ্রাও স্বামীকে হারাইবার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত।

অরুণ শুভ্রার মনের কথা বুঝিত এবং যতদূর সম্ভব কণার নিকট হইতে দূরেই থাকিবার চেষ্টা করিত। তাহার সুমধুর দাম্পত্য জীবনে কণার জন্য পাছে একটা ব্যবধান আসিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সে নিজেকে সংযত রাখিবার অশেষ চেষ্টা করিত।

আর কণা? সে সর্ব্বরকমে এখানে সুখেই ছিল—শুভ্রাকে সে ভালবাসিয়াছিল সত্য, কিন্তু অরুণকে সে যেন হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার আসনে বসাইতে চাহে। পাছে দিদি রাগ করেন তাই পারৎপক্ষে অরুণের সম্মুখে সে আসিত না কিন্তু সুবিধা পাইলে লুকাইয়া অরুণকে দেখিবার লোভ সম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিত। তাই চোরের মত সুবিধা পাইলেই সে অরুণকে দেখিয়া লইত। কণার চৌর্য্যবৃত্তি অরুণের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। সে বুঝিয়াছিল কণা তাহাকে ভালবাসে কিন্তু কণার এই অপরাধের জন্য শুভ্রার এজলাসে সে বিচার-প্রার্থী হইবার সাহস পাইত না। কারণ সে বুঝিয়াছিল আসামী দণ্ড পাইলে আসামী অপেক্ষা ফরিয়াদীই অধিক মনঃকষ্ট পাইবে।

কণার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আর একজনের বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; সে আমাদের সাহিত্যিক বন্ধু অমল। প্রথম মাসে নারী-জাতি সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা সে বন্ধ করিয়াছিল। দ্বিতীয় মাসে নারীর চরিত্রের মধুরতা ও তাহাদের জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল। তৃতীয় মাসে নারীর ও পুরুষের ভগবৎদত্ত অটুট সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া সে প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। এই কয়েক মাস সে প্রত্যহই কণার সংবাদ লইবার জন্য অরুণের বাটীতে আসিয়াছে এবং শুভ্রার অনুমতি লইয়া কণার সহিত সাক্ষাৎও করিয়াছে। শুভ্রা আধুনিক যুগের সুশিক্ষিতা তরুণী হইলেও অকারণে পুরুষ-দের সম্মুখীন হইতে চাহিত না। অতএব অমল কণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কণার হাতেই সে চা ও জলখাবার পাঠাইয়া দিত। উভয়ের অলক্ষ্যে থাকিয়া চতুরা শুভ্রা অমল ও কণার কথাবার্ত্তা শুনিয়া লইত।

সেদিন সন্ধ্যায় অমল যখন কণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল শুভ্রা তখন শিরঃ-পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া শুইয়াছিল।

চাপরাসী অমলের আগমন সংবাদ দিলে কণা মৃদুস্বরে শুভ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অমল বাবু এসেছেন, দেখা করতে যাব কি দিদি?" শুভ্রা চক্ষু বুজিয়াই বলিল, "আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে কণা তুই দেখা করে শীঘ্র চলে আয়।" কণা 'আচ্ছা' বলিয়া চলিয়া গেল।

শুভ্রা পাশ ফিরিয়া শুইয়া রহিল। প্রায় আধঘণ্টা পরে শুভ্রার তন্দ্রা ভাঙ্গিল; চক্ষু মেলিয়া শুভ্রা ডাকিল, 'কণা'।

দাসী বলিল, "দিদিমণি, অমল বাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে গল্প করছেন বো'ঠান।" ছোট একটী 'ওঃ' শব্দ করিয়া শুভ্রা ঘড়ির দিকে চাহিল, বুঝিল অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে কণা অমলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গিয়াছিল। এখনও সে ফেরে নাই। শুভ্রা কৌতুহল দমন করিতে পারিল না। সুসজ্জিত বৈঠকখানার ভারী পর্দ্দার পাশে নিরবে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন অমল আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলিতেছিল, "কণা, আমার কথা শোন, অরুণের আশা তুমি ছেড়ে দাও, তাকে তুমি পাবে না। তার স্ত্রীকে তো দেখেছ—কত সুন্দরী আর বিদুষী তিনি।

কণা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনাকে কে বলেছে অমলবাবু, আমি ডাক্তারবাবুর আশা করি? তিনি আমার আশ্রয়দাতা, রক্ষক—তাঁকে পাবার আশা করা, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার প্রচেষ্টা সে আমি জানি। আপনি ও সব কথা বলবেন না অমলবাবু। যদি দিদি শুনতে পান তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাববেন বলুন তো?

অমল কহিল, "কিন্তু অরুণ তোমায় ভাল-বাসে তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কথা শোন কণা তার আশা ছাড়।"

কণা অত্যন্ত ভীত ও বিরক্তভাবে বলিল, "ছিঃ অমলবাবু, আপনি ও কথা বল্‌বেন না। আমার ন্যায় পথের ভিখারীকে কি তাঁর পক্ষে ভালবাসা সম্ভব? হয়ত তিনি আমায় অনুকম্পার চোখে দেখেন, হয়ত আমার অসহায় অবস্থা দেখে আমার প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু সেই অনুকম্পা, দয়া ও সহানুভূতিকে আপনি প্রেম বা ভালবাসা বলে ধরে নিলে আপনি তাঁর ও আমার প্রতি অবিচারই করবেন। কণা দুই মিনিট চুপ করিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং পুনরায় বলিল, "আমাকে নিঃসহায় ও বিপন্না দেখেই আজ আমাকে অপমান কর্ত্তে সাহস করলেন অমলবাবু, কিন্তু একদিন ছিল যেদিন আমরাও আপনারই মত সমাজের মাথাতে ছিলুম— কণা আর বলিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অমল নিতান্ত বিব্রত হইয়া বলিল, "তুমি কেঁদনা কণা! তুমি ব্যথা পাবে জানলে ওকথা তোমায় বলতাম না আমি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমায় বলা যে, আমি, আমি তোমায় ভালবাসি—সত্যি কণা, বড্ড ভালবাসি। ভাষায় প্রকাশ করার মত শক্তি আমার নেই। তাই বুঝুতে পারবো না কত ভালবাসি তোমায়। তুমি আমায় ঘৃণা করোনা। বল তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

"আমি জানিনা, আমার আশ্রয়দাতা যারা তাঁদের কাছেই আপনার আবেদন বল্‌বেন।" এই বলিয়া কণা দ্রুতপদে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

শুভ্রা ধীরপদে গিয়া আপন শয্যার আশ্রয় গ্রহন করিল। তাহার ক্ষুদ্রবক্ষে তখন প্রলয় ঝটিকা বহিতেছিল।

—ছয়—

শুভ্রা অনেক কাঁদিল। বোধহয় তাহার জীবনে এরূপ অসহায় ভাবে সে আর কখনও কাঁদে নাই। আজ তাহার মনে হইতেছিল পৃথিবীতে সকলেই বিশ্বাসঘাতক—সকলেই স্বার্থপর। সে যেন আজ নিতান্ত অসহায়। আত্মীয় শূন্য আজ যেন পৃথিবীর সকল জিনিষ তাহার সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। সে যে আজ তাহার চিরপ্রিয় সর্ব্বস্বকে হারাইতে বসিয়াছে। তাহার বারবার মনে হইতেছিল তাহার যেন কেহই নাই, কিছু নাই। এই বিশ্ব সংসারের বাজারে সে যেন আজ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। কণা অরুণকে ভালবাসে, অরুণ কণাকে চাহে, অমল একথা স্পষ্টই বলিতেছিল—সে নিশ্চয়ই তাহার স্বামীর নিকট হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে নচেৎ কি সাহসে সে বলিল "অরুণ তোমাকে ভালবাসে তা আমি বুঝতে পেরেছি।" ওঃ কি বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর এই পুরুষজাতি। মুগ্ধা স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা করিতে তাহাদের এতটুকুও বাধে না। চক্ষুলজ্জা, হাঁ চক্ষুলজ্জা বৈ কি, তাহারই খাতিরে এখনও পর্য্যন্ত কণার সহিত তাহার প্রকাশ্য প্রণয় এখনও ঘটিয়া উঠে নাই। সে যদি একটুও বুঝিত তাহার দেবতুল্য স্বামী এত কপটাচারী এত ধূর্ত্ত ও বিশ্বাসঘাতক তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অরুণকে শিক্ষা দিবার জন্য কণাকে বিদায় করিয়া দিত। আজ শুভ্রার মনে হইল অরুণ এতদিন তাহার চক্ষে কিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করিয়া সাধু সাজিয়া আছে। আজ সে বুঝিল যখনই কণা তাহার সম্মুখে আসে সে কেন ঘর ছাড়িয়া পালায়—এই পালানটাই যে ভালবাসার লক্ষণ। সে কণার কথা উঠাইলে কেন অরুণ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কণার কথা চাপা দেয়। এই কথা চাপা দেওয়াও অরুণের দুর্ব্বলতা। কণার জন্য যখনই কোন দ্রব্য আনিবার জন্য অরুণকে সে অনুরোধ করিয়াছে "দারবানকে দিয়ে আনিয়ে নাও" বলিয়া অরুণ যে উপেক্ষা প্রকাশ করিত, আজ শুভ্রার চক্ষে সে উপেক্ষা অনুরাগেরই রূপান্তর বলিয়া মনে হইল। শুভ্রার স্মরণ হইল কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহার পিতার অসুস্থতার সংবাদ আসিলে অরুণ তাহাকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পাঠাইতে চাহিয়াছিল—আজ সেই পাঠাইতে চাওয়া-টাকে শুভ্রা প্রেমালাপের সুযোগ অন্বেষণ বলিয়াই স্থির করিয়া লইল। সে বুঝিল অরুণ ও কণা তাহার বিরুদ্ধে দারুণ ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মনে মনে সে বলিল, "হায় স্বার্থান্ধ নারী, আমার হৃদয় দেওয়া ভালবাসার কি এই পুরস্কার?" তাহার মনে হইল কণা অরুণকে চায় অর্থাৎ কণা চায় তাহার বক্ষপঞ্জরটাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হৃৎপিণ্ড-টাকে ছিঁড়িয়া লইতে, অক্ষিকোটর হইতে তাহার চক্ষুদুইটী উপড়াইয়া লইতে, তাহার জীবন মরণের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুটীকে তাহার বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া লইতে। ওঃ এত নিষ্ঠুর সে! একদিনও তাহার সরল মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা কল্পনাও করিতে পারে নাই। আজ সে বুঝিতে পারিল সত্য, সময়ে সময়ে কল্পিত কাহিনী অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া থাকে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

* * *

কণা শুভ্রার পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি"। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; শুভ্রা উঠিয়া বসিল কিন্তু কোন কথা কহিল না। কণা পুনরায় বলিল, "দিদি তুমি না গেলে জামাইবাবু খাবেন না বলছেন।" "কেন তুমি তো আছ" বলিয়া শুভ্রা মৃদু হাসিল।

কণা কি বলিতে চাহিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

বাহির হইতে অরুণ বলিল, "ওঁকে বিরক্ত করোনা কণা, আজ আর আমি খাবনা।"

অরুণের কথায় অভিমানের সুর ছিল। শুভ্রা ও কণা উভয়েই তাহা বুঝিল। শুভ্রা বিলম্ব না করিয়া শয্যাত্যাগ করিল এবং অরুণের জন্য খাবার সাজাইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত হইল।

"তোমার কি কোন অসুখ করেছে শুভ্রা?"

"না" বলিয়া শুভ্রা মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

"মুখখানা যেন বড় মেঘাচ্ছন্ন, কি হয়েছে বলনা লক্ষীটি" বলিয়া অরুণ শুভ্রার হাত ধরিল।

"কিছু না, খেতে চলো।"

অরুণ আহার করিতে করিতে বারবার শুভ্রার দিকে চাহিল; শুভ্রা যেন মর্ম্মর মূর্ত্তি, প্রাণহীন, পাষাণী। অরুণ ভাবিতে লাগিল তাহার কোন্ ব্যবহারে শুভ্রার মনে আঘাত লাগিয়াছে।

আহারান্তে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "খাবে না তুমি? যাও, খেয়ে এসো শুভ্রা।"

"আমি খাব না"

"কেন বলতো, কি হয়েছে তোমার, অসুখ করেছে?"

"না।"

"তবে কি হলো—খাবেনা কেন?"

"ইচ্ছে নেই।"

এই সময় দাসী আসিয়া উচ্ছিষ্ট থালাখানি লইয়া আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া চলিয়া গেল। দাসী চলিয়া গেলে শুভ্রা উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। অরুণও এই অবকাশে একখানা মেডিক্যাল জার্ণাল লইয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল। শুভ্রা ক্ষণকাল দ্বারের নিকট দাঁড়াইল—পরে সে অরুণের পদপ্রান্তে বসিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করো না—সত্যি করে বল আর কাউকে তুমি ভালবাস কি না?"

অরুণ হাসিয়া ফেলিল ও সযত্নে শুভ্রাকে উঠাইয়া লইল ও বলিল, "কেন, বলতো?"

শুভ্রা বলিল, "তুমি হাসছো। আমার চোখের জল দেখে তুমি আজ হয়তো হাসতে পার, কিন্তু আমার মনের অবস্থা যদি একটুও বুঝতে যদি একটুকুও জানতে, আজ আমার কি দুর্দ্দিন, কি—"

অরুণ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার দুর্দ্দিন কেন হবে শুভ্রা, কেউ তোমায় ব্যথা দিয়াছে কি? বল, আমার নিকট ঢাকবার চেষ্টা করো না—কেন তুমি বল্লে আমি আর কাহাকেও ভালবাসি কি না?"

আমি জানি, আমাকে লুকিয়ে তুমি কণাকে ভালবাস, সেই আজ তোমার চোখের মণি। আমি তোমার কেউ নই।"

হো-হো করিয়া অরুণ হাসিয়া উঠিল, পরে বলিল, "কলম্বসের আবিষ্কারের চেয়ে তোমার এই আবিস্কার ছোট নয়, শুভ্রা, একথা আমি শপথ করে বলতে পারি।"

"আমার চোখে তুমি ধূলো দেবার যতই চেষ্টা করন কেন আমার নিকট যে তোমার কিছুই চাপা থাকে না সে কথা তোমার আগেই জানা উচিত ছিল।"

অরুণ বলিল, "একজন অসহায়া অবলার প্রতি করুণা করাকে যদি ভালবাসার চিহ্ন বলে তুমি ধরে নাও তাহা হলে আমার বলবার কিছুই নাই। তবে এইটুকু তোমার স্পর্শ করে আমি বলতে পারি তুমি ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসি না—বাসা সম্ভবও নয়।"

"কেন নয় বলতো? কণা রূপসী, চমৎকার তার স্বভাব, তা ছাড়া তুমি তাকে ঘরে এনেছ।" সত্যি বল না, আমি রাগ করবো না, তুমি কণাকে ভালবাস কি না। যদিই বাস আমি তাতে বাধা দেব না, আপত্তি করবো না, তোমাদের মিলনের পথ থেকে আমি নিঃশব্দে বিদায় নেব" —শুভ্রা পুনরায় কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণ সস্নেহকণ্ঠে বলিল, "শুভ্রা, তুমি হয়তো কোন আয়নায় নিজের মুখ খানা দেখবার সুবিধে পাওনি, তা হ'লে কখনই বলতে না আমি আর কাউকে ভালবাসি। আমার জীবনের পূর্ব্বাহ্নে আমি যে রূপসীকে ভালবেসেছি তাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তা তুমি বুঝতে পার না কেন শুভ্রা?"

শুভ্রা তখনও ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতেছিল; এখনও তাহার মনে হইতেছিল অরুণ বুঝি তাহার সহিত অভিনয় করিতেছে। অরুণ পুনরায় তাহাকে বুঝাইল যে সে তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভালবাসে না। প্রমান স্বরূপ সে আগামীকল্য সকালেই কণাকে কোন অবলাশ্রমে পাঠাইয়া দিবে এবং কখনও তাহার সংবাদ লইবার চেষ্টা করিবে না। কথাটা শুভ্রার বুকের ভিতর যেন আঘাত করিল। সে বলিল, "না, না' তাহা হইতেই পারে না। একটা সন্দেহের বশে আমায় সুখী করিবার জন্য তুমি তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে এরূপ কিছুতেই হইতে দিব না।"

অরুণ বলিল, "তাহাকে আশ্রমে পাঠাতে দিবে না অথচ নানারূপ কল্পনা করে নিজকে কষ্ট দিবে।

শুভ্রা বলিল, "দেখ, আমি কল্পনা করে কোন কথা বলি নাই—তোমারই বন্ধু আজ কণাকে বলিতেছিল সে যেন তোমার আশা ত্যাগ করে। যদিও তুমি তাকে ভালবাস—কিন্তু তোমার স্ত্রী আছে এজন্য তাকে তাকে গ্রহণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এবং পরে সে নিজে কণাকে ভালবাসে এবং তাকে বিয়ে করতে চায় এই কথা বলেছে। আমি পর্দ্দার আড়াল থেকে সব শুনেছি।"

অরুণ রাগতভাবে বলিল, ছঁ পিউটা নিজের কার্য্যসিদ্ধির মতলবে বেমালুম আমার ঘাড়ে দোষ চাপাইল। আচ্ছা, কালই তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিব।

শুভ্রা বলিল, "থাক, বোঝাপড়ায় কাজ নেই, সত্যি তুমি যদি আমায় ভালবাস। কালই তুমি যদি অমলের পিতার কাছে গিয়ে কণার সহিত অমলের বিয়ের প্রস্তাব করবে বুঝলে ?"

অরুণ বিস্মিতভাবে বলিল, "শেষে কি আমায় ডাক্তারী ছেড়ে ঘটকালী করতে হবে ?"

শুভ্রা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি যদি এতে রাজি না হও তাহলে বুঝবো তুমিই কণাকে চাও।"

অগত্যা সে শুভ্রার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সে শুভ্রার সহিত সন্ধি স্থাপিত করিল। এতক্ষণে শুভ্রা বুঝিল অরুণ তাহারই, আর কাহারও নহে।

(ক্রমশঃ)

ওরিজিন্যালের অপমৃত্যু

(রস রচনা)

শ্রীফেল্লু চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যথা সময়ে অভিনয় আরম্ভ হয়ে গেল। 'পরাশরের' ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য আনা হয়েছে নারান বাবুকে—ভিন্ন গ্রাম থেকে। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়া খ্যাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গত ছয় মাস পূর্ব্বে তিনি বায়ুরোগে আক্রান্ত হন এবং তিড়োল কালীর বালা হাতে ধারন ক'রে রোগমুক্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখনও এক একবার মাথাটা গরম হ'য়ে ওঠে আবার পরক্ষণেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান। তাই তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্য নাট্য সম্প্রদায় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখেছেন। এ দিকে ককরী বাবু প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখের আসন অলঙ্কৃত করে মনগুল হ'য়ে অভিনয় দেখতে সুরু করেছেন। কিছুক্ষণ পরে সাজ ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীষণ কোলাহল দর্শকবৃন্দের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে দুই একজন ভিতরে প্রবেশ ক'রে জানলে যে 'পরাশরের' নকল দাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় তিনি দাড়িটা কোনখানে খুলে রেখেছিলেন কিন্তু রঙ্গমঞ্চে নাম্‌বার সময় সেটা আর খুঁজে পাচ্ছেন না এবং সজ্জাকর ও তার নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ বেশী দাড়ি ও চুল আনে নি। কথা-গুলো প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে হাসির রোলের সঙ্গে সঙ্গে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করলে। নারান বাবু এ দিকে ভীষণভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন এবং বিস্ফারিত নয়নে চারি-দিকে তাঁর দাড়িটি অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন আর মনে মনে বিড়বিড় করে কি সব আওড়াচ্ছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ককরী বাবুর উপর এবং তিনি সিংহের মত গর্জ্জন করে তার দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর দাড়িতে সজোরে একটা টান দিয়ে বল্লেন "এখানে লুকিয়ে বসে আছ nonsense, খোল দাড়ি"—তার আচরণে সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। ককরীবাবু যন্ত্রনার প্রকোপে চিৎকার করে উঠলেন "আরে মশাই, এযে Original, সাজা নয়, তা দেখতে পাচ্ছেন না। ও রে বাবা রে—হে রবিন্দ্রনাথ, তোমার জন্যই আমার এত যন্ত্রণা, আমার সাধনা আজ আমি জলাঞ্জলি দেবো; এ দাড়ি আমি আর রাখবনা তোমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমি দাড়ি মুণ্ডন

[ক]রে ফেলব"—ইতিমধ্যে দর্শকবৃন্দের মধ্যে [ক]য়েকজন এসে নারান বাবু ওরফে 'পরা-[শ]রকে' বাহুপাশে আবদ্ধ করে ফেলেছে আর [ত]িনি দলিত ভুজঙ্গের মত গজরে গজরে [উ]ঠেন "Rascal-টা এমন ভাবে gum দিয়ে [স]াটকেছে যে টেনে খোলা যায় না"—তার [ম]ূর্ত্তি দেখে মনে হচ্ছে যে তার ব্যাধিটা আবার [ত]ার মাথার উপর চেপে বসেছে।

কথাটা শুনে তাদের মধ্যে একজন প্রতিবাদ করে বল্লে "মশাই আপনি ভুল [ক]রছেন, ও সাজা নকল দাড়ি নয়, ওটা [আ]সল অর্থাৎ আপনা আপনি গজায়, বুঝলেন" —সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীষণ হুলুস্থুল আরম্ভ [হ]য়ে গেল, এমন কি হাতাহাতি হতেও [ব]াকী রইল না। অভিনয়ের কাজ সেদিন-[ক]ার মত স্থগিত রইল, কারণ ওরূপ অবস্থায় পরাশরকে' অভিনয় করান দুরূহ ব্যাপার [ত]ার উপর তার দাড়ির অভাব—

কর্ম্মীবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন এখনই দাড়ির শেষ ক'রে [ত]বে বাড়ী ফিরবেন। গাঁয়ের সকলেই [স]েটা অনুমোদন ক'রলে কারণ ঐ দাড়ির [জ]ন্যই তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হ'য়েছে আর [ঐ] দাড়ির জন্যই তার এই উপস্থিত বিপদ।

অভিনয়ের পূর্ব্বে ক্ষৌরকার্য্যের জন্য নিধু পরামানিককে আনা হয়েছিল এবং সে [ত]ার কার্য্য সমাধা করে অভিনয় দেখছিলো। [ম]ণ্ডলমশায়ের এ অবস্থা দেখে তার চোখেও [জ]ল এল এবং সকলে অনুরোধ করায় ও [ম]ণ্ডল মশাই স্বীকৃত হওয়ায়, সে তার যন্ত্র-পাতি বার ক'রে তার কার্য্য শেষ ক'রে নিলে। ক্ষৌর কার্য্যের পর মণ্ডলমশাই [ত]ার চ্যুত দাড়িগুলি নাড়তে নাড়তে বললেন 'কতদিন, কতদিন তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে —আজ তোমায় ত্যাগ ক'রতে আমার বুক [ফ]েটে যাচ্ছে—এ ত্যাগ করা শুধু তোমায় [ত]্যাগ করা নয়—আমার সাধের কবিতাকে ত্যাগ করা, আমার গুরুদেবকে ত্যাগ করা, আমার সাধনা, আমার সিদ্ধি, আমার সমস্ত ত্যাগ করা। হে ভগবান, তোমার মনে এও ছিল"—

পরক্ষণেই তাঁর Original এর উপকারীতার কথা স্মরণ পথে উদয় হয়ে উঠল এবং তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলে উঠলেন "কি সর্ব্বনাশ, আমার যে বাড়ী প্রবেশের পথ আমি নিজেই বন্ধ করে দিলাম—। ম্যানেজার, ম্যানেজার! শীঘ্র gum নিয়ে এস, আমার দাড়ীগুলো gum দিয়ে জোড় ক'রে আটকে দাও, যাতে টানলে না উঠে আসে—বুঝলে"—। ম্যানেজার তার কথা মত সাজঘর থেকে gum নিয়ে সেই দাড়ি-গুলো আটকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে "ব্যাপার কি মণ্ডলমশাই, দাড়ি কামিয়ে ফেলে আবার সে গুলো আটকালেন কেন?"—

"আরে ভায়া! সোলেনামার সর্ত্ত অনুযায়ী দাড়ি আমাকে রাখতেই হবে, নতুবা বাড়ী ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে। বাড়ীতে যখন নকল মণ্ডলমশাই প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুটে নিয়ে গেল, সেই দিন থেকে এক পন্থা আবিষ্কার করেছি যে বৈঠকখানার জানালা থেকে হাত বার ক'রে সেটা নকল কি আসল পরীক্ষা করে তবে তিনি দরজা খুলে দেবেন"—। ম্যানেজার মশাই, মণ্ডলমশায়ের বুদ্ধির তারিফ না ক'রে থাকতে পারলেন না—এবং বল্লেন "আমি যে ভাবে আটকে দিয়েছি তাতে আমার মনে হয় টান দিলেও খুলবে না"—

তোমায় ধন্যবাদ, ভাই, ধন্যবাদ। দেখ আজকের রাতটা কোন গতিকে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বললেই তিনি বুঝতে পারবেন যে ঐ দাড়িগুলোই সব অনর্থের মূল। দেখ ভাই, তোমরা দু-চার জন আমার সঙ্গে এস, কি জানি যদি আবার কোন আকস্মিক বিপদ হয়"—মণ্ডলমশাইয়ের কথা অনুযায়ী তাদের মধ্যে জন কতক তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হইল। যখন তারা বাড়ীর সদর-দরজার নিকট উপস্থিত হ'ল তখন রাত্রি ১২টা আন্দাজ হবে। ফাল্গুনী তখনও জেগে। ডাকবামাত্র নেমে এসে বৈঠকখানার জানালার নিকট এল এবং টেনে দেখে পটুদাকে দরজা খুলে দিতে বল্লে। স্বামীর কষ্টের দিকে লক্ষ্য ক'রে কয়েকদিন হ'ল টানটা ফাল্গুনী একটু অল্প ভাবেই দিচ্ছিলো। তাই আজকের টানটায় কোন বিভ্রাট ঘটল না। নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছে সমস্ত কথা স্ত্রীকে বলবার পর ফাল্গুনী বল্লে "ভালই হয়েছে, আপদ গেছে, তোমারও Original-এর দরকার নেই, false-এর কাজ নেই। এ সুন্দর মানিয়েছে। ও রকম বিপদ আছে বলেই ত আজকালকার ছেলেরা দাড়ি গোঁফ কিছুই রাখে না। রবীন্দ্রনাথের শিষ্য হইলেই যে দাড়ি রাখতে হবে তার কোন মানে নেই। রবীন্দ্রনাথের চাল চলন অনুকরণ না ক'রে তার প্রতিভা অনুকরণ করাই শ্রেয়। রবীন্দ্রনাথের কত শিষ্যই ত আছে, সবাই কি দাড়ি রেখেছে। তোমার এ Original-এর অপমৃত্যুতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। দেখ, এত দিন বলি নি, আজ বলি। ঐ আবর্জ্জনা গুলো থাকার জন্য আমার জীবনের একটী সাধ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, আজ হতে তা সম্পূর্ণ হবে।" বলিয়া সেটী কার্য্যে পরিণত করে দিল।

—শেষ—

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(হৃদয়নারায়ণ)

বিগত ১৭ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিনিটের সময় সম্মেলনের তৃতীয় দিবসের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে দুইজন প্রতিযোগীর demonstration হইবার পর শ্রীযুক্ত পবন বিশ্বাস ঝুমরা তালে ঢোল বাজান। ইঁহার সহিত প্রোঃ চম্মু মিশ্র সারেঙ্গী বাজাইয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীমতী কেশর বাই (কারকার) ললিতা গৌরী ও পটমঞ্জরীরাগের দুইখানি খেয়াল গান করিয়া পরে এক খানি ভজন "মথুরা মে সোহি" গান করেন। শ্রীমতী ৭-২৫ মিনিট হইতে ৯-২৫ মিনিট অবধি গান গাহিয়াছিলেন। শ্রীমতীর গানের পর পণ্ডিত সুখেশ্বর দয়াল পীলুরাগে হারমোনিয়াম বাজান। ইঁহার সহিত প্রোঃ সরযু মিশ্র তবলা-সঙ্গত করেন। পণ্ডিতজীর বাজনার পর প্রতিযোগিগণের অন্যতমা কুমারী সবিতা চ্যাটার্জী কালিয়দমন নৃত্য প্রদর্শন করেন। কুমারীর নৃত্যের পর শ্রীযুক্ত রবিন্ সরকার একটী লোকনৃত্য করেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের Orchestra party ইঁহার নৃত্যের সহিত অনুগামী বাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রবিন্‌বাবুর নূতন পরিকল্পিত নৃত্যটী অনুগামী বাদ্যের সহযোগে বেশ সুন্দর ও উপভোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু, নৃত্যটী শেষ হইয়া গেলে রবিন্‌বাবু মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দর্শকবৃন্দের নিকট নিবেদন করেন যে যদি অনুগামী বাদ্যের মধ্যে কোনও দোষ-ত্রুটী প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা যেন উহা ক্ষমা করেন; কারণ যাঁহারা অনুগামী বাদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহারা রবিন্‌বাবুর নৃত্যের সহিত বাজাইতে অভ্যস্ত নহেন। আমরা অবশ্য এই Orchestra party-র বাজনায় বিশেষ কোনও দোষ ত্রুটী লক্ষ্য করি নাই। এক্ষেত্রে রবিনবাবুর পক্ষে অনর্থক দোষ-ত্রুটীর উল্লেখ করিয়া প্রকাশ্য সভায় উক্ত Orchestra party-র প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা চপলতার কার্য্য হইয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। নৃত্যের আসর কিন্তু এখানেই সমাপ্ত হইল না। এক রবিন্‌বাবুর নাচ শেষ হইতেই আর এক রবিন্‌বাবুর (রবিন্ বর্ধন) আবির্ভাব হইল। ইনি মণিপুরী নৃত্যকলা দেখাইলেন। নাচের আসর ভাঙ্গিবার পর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পটদীপরাগের একখানি খেয়াল গান গাহিলেন। শৈলেনবাবু যে কি গাহিলেন তাহ। তিনিই, একমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, বাণীর অস্পষ্টতা, তানের জড়তা ও স্বরের অসুচ্চতা—এই সব কয়টীর দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া রসাহরণ করা শ্রোতৃবর্গের পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। বাল্য-কৈশোরের সীমারেখা যে ইনি অতিক্রম করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আলোচ্য রাত্রিতে তিনি যে ভাবে গান গাহিলেন তাহা তাঁহার বয়সের প্রাবীণ্যের পক্ষে নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। শৈলেনবাবু গুণিপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য। গিরিজাবাবুর দুইজন প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যামিনী গাঙ্গুলী এই Conference এ গান গাহিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাদের দুইজনের গানের দোষত্রুটি যথেষ্টই আছে, এবং আমরা এরূপ Conferenceএ ইঁহাদের এজাতীয় demonstration এর অনুমোদন করি না। কিন্তু ইহাদের গানের সহিত যদি শৈলেনবাবুর গানের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে শৈলেনবাবুর গান যে সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট, ইহা যাঁহারা এই তিন জনের গান শুনিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষগণ শৈলেনবাবুর কিরূপ প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাকে demonstration এ নির্ব্বাচন করিলেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা সহজ নহে। এবৎসরে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি যে, কর্ত্তৃপক্ষগণ শিল্পিনির্ব্বাচনে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুগ্রহপুষ্টগণের নিকট তাঁহাদের আত্মীয়তা ও সৌজন্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে সন্দেহ নাই; তবে সহৃদয় শ্রোতৃবর্গ যে পয়সা দিয়াও নিরন্তর নিগ্রহ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার প্রতিবিধান হইবার কোনও আশা আছে কি? প্রোঃ সত্য ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রোঃ জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রোঃ অনাথ নাথ বসু প্রভৃতি বাংলার প্রতিষ্ঠিত শিল্পিবৃন্দের নাম Programme এ থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে গাহিতে না দিয়া অতি সাধারণ ও তথাকথিত গায়কদিগকে গান গাহিতে দেওয়ায় কি All-Bengal Music Conference এর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে? কিন্তু শৈলেনবাবুকে গাহিতে দেওয়াই যে কর্ত্তৃপক্ষগণের একমাত্র অনুচিত কার্য্য হইয়াছে তাহা নহে; আলোচনা মুখে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধেও যথাস্থানে—অনৌচিত্যগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। শৈলেনবাবুর গানের পর কুমারী মায়া ব্যানার্জ্জি

কৌশিক কানাড়া গাহিলেন। কুমারীর সঙ্গীত সাধনার কিছু পরিচয় এক্ষেত্রে আবশ্যক করে। গতবৎসর এই Conference এর উদ্যোগে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কুমারী Group II. Fএ খেয়াল, ঠুংরী, গজল ও আধুনিক বাংলা সঙ্গীত—এই চারিটি বিভাগে পরীক্ষা দেন। ইহার মধ্যে খেয়াল, ঠুংরী ও বাংলা সঙ্গীতে তিনি কোন স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই এমন কি, certificateও পান নাই। কেবল গজলে তিনি প্রথম হইয়াছিলেন (অবশ্য তাহাও মাত্র ৩ জন প্রতিযোগীনীর মধ্যে) এবৎসর কুমারী, বোধ হয়, নিজে এতই অভিজ্ঞ হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন যাহাতে তিনি পুনরায় পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হন নাই। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার শিক্ষার এমন কি উন্নতির পরিচয় পাইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা কুমারীকে demonstration এ স্থান দিলেন। আমরা গতবৎসর কুমারীর গান শুনিয়াছি এবং আলোচ্য রাত্রিতেও শুনিলাম—কিন্তু তাঁহার গানে এমন কোন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বা তাহার সূচনাও পাইলাম না, যাহাতে তিনি Conference-এর demonstration এ গান করিতে পারেন। যাহা হউক, অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষগণ Conference-এর আয়োজন বন্ধ করিয়া যদি একটী জলসার অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে আমাদের এ সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয় না—সঙ্গীত Conference ও জলসার মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা এইরূপ Conference-র প্রচলন বন্ধ করুন—ইহাই সম্মেলনের সহৃদয় সভাপতি নাটোরাধিপতির নিকট রসপিপাসু সামাজিকবর্গের নিবেদন। Conference আয়োজনের পর যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী জলসার আয়োজন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে চাহেন তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, কুমারীর গানের পর শ্রীমান্ মুরারিমোহন মিশ্র বসন্ত রাগের একখানি খেয়াল গান করিলেন। ইঁহার পরিবর্ত্তে যদি ইঁহার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিশ্র মহাশয় গান করিতেন (তাঁহার নামও Programme এ ছাপা ছিল এবং তিনি সভাস্থলে উপস্থিতও ছিলেন) তাহা হইলে সব দিক দিয়া ভালই হইত। ইঁহার গানের পর প্রোঃ সুনীল বোস বসন্ত-পঞ্চম রাগের খেয়াল গান করেন। তিনি যে শ্রেণীর গায়ক তাহাতে তাঁহাকে Conference-এর demonstration-এ স্থান না দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। ইঁহার গানের পর বাংলার উদীয়মান নবীন গায়ক শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মালকোশ-রাগের একখানি খেয়াল ও ঠুংরী গান করিয়াছিলেন। পর পর কয়েকটী অতি সাধারণ শ্রেণীর গান শুনিবার পর আশা ছিল যে, ভীষ্মবাবুর গান শুনিয়া একটু স্বস্তি পাওয়া যাইবে কিন্তু সকলেরই বোধ হয় তাঁহার গান ঐ রাত্রিতে মোটেই জমে নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গগণ বলিতেছিলেন যে ভীষ্মবাবু নাকি অসুস্থ—তাই প্রথম যে দিন তাঁহার গাহিবার কথা ছিল, সেদিন তিনি গাহিতে পারেন নাই—আলোচ্য রাত্রিতেও তিনি বিশেষ সুস্থ ছিলেন না।—আমরা অবশ্য কয়দিনই প্রায় দুবেলাতেই ভীষ্মবাবুকে সভাতে আসিতে দেখিয়াছি—সঙ্গীতপ্রেমিক যিনি, শরীরের অসুস্থতা কি তাহাকে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে পারে? তবে আমাদের বিবেচনায় আলোচ্য রাত্রিতে তিনি অসুস্থ শরীরে গান না গাইলেই ভাল করিতেন। ভীষ্মবাবুর পর শ্রীযুক্ত সুরেশ বাবু যান শুদ্ধ-কল্যাণের খেয়াল ও একখানি ঠুংরী গান করেন। ইহার পরে দর্শকশূন্য প্রেক্ষাগৃহে স্বয়ম্ভু নর্ত্তক মণি বর্দ্ধন তাঁহার নিজস্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন করিতে থাকেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঐ রাত্রির অনুষ্ঠান শেষ হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই রাত্রির মত অতি নিকৃষ্ট programme আর কোনও sitting-এ ছিল না। এক মাত্র শ্রীমতী কেশরবাই তাঁহার অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমতীর গান প্রথমরাত্রেই শেষ হওয়ায় প্রেক্ষাগৃহ পরবর্ত্তী সময়ে প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল।

ইউরোপীয় রাজনীতির চেকার বোর্ড

শ্রীসচী শীল

গত নভেম্বর মাসে লর্ড হ্যালিফাক্স বার্লিনে গিয়েছিলেন হিটলারের সঙ্গে আলাপ জমাতে। এর ফলে নাকি একটা গোপন সন্ধি হয়েছিল এই মর্ম্মে যে, জার্মানী মধ্য ইউরোপে free hand পাবে আর ৬ বছরের জন্ত কলোনী ফেরতের দাবী করবে না। তখন এই রকম একটা চুক্তির বড় দরকার হয়ে পড়েছিল, কারণ মুসোলিনী ভূমধ্যসাগরে Italian hegemony সৃষ্টি করবার জন্ত ইংরেজকে বড় জ্বালাতন করতে আরম্ভ করেছিলেন। হিটলারের সঙ্গে আপোষ করে যদি মুসোলিনীকে কোণঠাসা করা যায়, তবে একা মুসোলিনী ইংরেজের সঙ্গে কিছু করে উঠতে পারবেন না—এইটাই ছিল তখন ইংরেজী ডিপ্লোমেসির Key idea.

তারপর ফেব্রুয়ারী মাসে দেখা গেল ইংরেজ ইটালীর দিকে ঝুকেছে! এ ব্যাপারে Sir Robert Vansittart সাহেবের হাত ছিল বলে মনে হয়। তাঁর নাকি একটা Sounding নেবার মতলব ছিল এই মর্ম্মে যে—"How many pieces of silver Mussolini would require to betray the Rome-Berlin axis."

২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দেখা গেল যে, মুসোলিনীর অনুরোধে বা হুমকীতে চেম্বারলেন সাহেব ইডেন সাহেবকে Foreign Office থেকে সরাতে বাধ্য হলেন। তাই Lord Cranborne কমন্স সভায় বলেছিলেন—"This is not a contribution to peace, but a surrender to Blackmail."

এর পরে লণ্ডন এবং রোমের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হল, তারই ফলে Easter-এর ছুটীতে সৃষ্টি হল Anglo-Italian Pact. এই ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তি ইউরোপীয় রাজনীতিতে নূতন অধ্যায় প্রবর্ত্তন করলো। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: চেম্বারলেন দিনের প্রখর আলোয় Fascism-এর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন, এবং বৃটেনের Pro-fascist diplomacy অনাহত ধারায় বইতে আরম্ভ করলো। স্পেনের Democracy-র মহাসঙ্কট এই ডিপ্লোমেসির ফলে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠলো। ফ্রান্স হতবাক্ হয়ে মূঢ়ের মত বৃটিশ পদাঙ্ক অনুসরণ করলো, কারণ স্পেনে Gen. Franco-কে বাধা দিতে গেলে বৃটিশ ফরাসীকে বাধা দেবে।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতি অবশ্যই এক জিনিষ নয়। যা দেখছি তাতে রয়েছে মাত্র একটা forced parallelism. ফরাসী চায় না যে তার নিজের সমস্যা বেড়ে যাক। কিন্তু So-called Non-intervention এবং বিশেষ করে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির ফলে ফ্র্যাঙ্কো সাহেব দাঁড়াচ্ছে Pyreness-এর অপর পাশে, অর্থাৎ ফ্রান্সকে রাইন নদী ছাড়া আর একটা সীমান্ত বেশ ভাল করে সুরক্ষিত করতে হবে। Gibraltar-এ বৃটিশের বিপদও একদিক দিয়ে কম নয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ফরাসী যাকে ভয় করছে, বৃটিশ সন্ধি-আপোষের মধ্য দিয়ে সেই বিপদকে এড়াবার চেষ্টা করছে। এইরকম বিপদ এড়াবার চেষ্টা কতটা সফল হবে সেইটাই একটা বড় রকমের সমস্যা। এটা বেশ বোঝা যায়, যদিও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রান্স ইটালীর সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে তবু জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অগ্রগতিকে সে বড় ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখছে। এই সেদিন খবর পাওয়া গেল যে ফ্রান্স নাকি স্পেন গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধোপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছে এবং তারই ফলে ইটালী ফরাসীর আপোষ চেষ্টায় dead-lock উপস্থিত হয়েছে। সম্প্রতি যে ইঙ্গ-ফরাসীর আলাপ আলোচনা লণ্ডনে হয়ে গেল, তারপর এরকম dead-lock একেবারেই আশঙ্কা করা যায় না; কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনার গতি যে রকম চলছে, তাতে মনে হয় British plan বিশেষ কার্য্যকরী হবে না। স্পেন বিদ্রোহীদের প্রতি ফরাসীদের বিশেষ করে French Left circle-এর—attitude যদি আরও কড়া হয়ে ওঠে তবে Anglo-Italian Pact-এ ভাঙন ধরবার বিশেষ সম্ভাবনা।

চেম্বারলেন সাহেব যে মনে করছেন ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির ফলে London-Paris-Rome axis তৈরী হবে as a bulwark against German aggression, আর Russia হয়ে যাবে out of the picture, আর তার ফলে British Capitalismও বাঁচবে,

Empire ও বাঁচবে, এই Sinister Calculation কতটা sound হতে পারে তা সত্যিই ভাববার বিষয়। রাশিয়াকে নয় এইভাবে বাদ দেওয়া গেল। তারপর? মুসোলিনীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া কি এতই সোজা? আসবে কেন সে? এই প্রসঙ্গে Rome-Berlin axis-এর কথা উঠে পড়ে। সেটার আসল মর্ম্ম কি? কোনখানে তার Reality? কোনখানেই বা তার weakness?

Rome-Berlin axisএর weakness এর কথা ভেবে যে ইংরেজ, সান্ত্বনা পাবে, সে রকম সান্ত্বনা উপস্থিত তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। মুসোলিনী বড় চতুর রাজনীতিক—এই কথাটা তাকে ভাল করেই মনে রাখতে হবে।

ইউরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানী এই চতুঃশক্তির মধ্যে বোঝাপড়া আরম্ভ হয়, তবে London-Paris axis কখনোই Rome-Berlin axisকে আঘাত দিতে সাহস করবে না। এর কারণ, ফ্যাসিষ্টরা এর মধ্যেই এমন গোটা-কতক strategic position পেয়ে গেছে, যার ফলে তারা সশস্ত্র কলহে জেতবার ভরসা রাখে। এমন ক্ষেত্রে, মুসোলিনীর মৈত্রী ইংরেজ ফরাসীর কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে পড়বে। এই রকম চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুসোলিনী অতি সহজেই হয়ে পড়বেন Arbiter in Anglo-French affairs এবং নিজের যা কিছু দরকার সবই এইভাবে আদায় করে নিতে তাঁর একটুও বেগ পেতে হবে না। তখন ইংরেজ ফরাসীর কি রকম অবস্থা দাঁড়াবে? ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে তখন Democrasy দাঁড়াবে কোথা? ইংরেজ-ফরাসীর সাম্রাজ্যই বা তখন নিরাপদ হবে বা অক্ষুন্ন থাকবে কী করে? Rome-Berlin axisকে এক পকেটে আর Anglo-Italian Pactকে আর এক পকেটে নিয়ে মুসোলিনী তাঁর Bargaining powerকে চরম সীমায় তুলতে চান—এটা বোধ হয় এখন থেকেই অনেকে বুঝতে পেরেছেন।

হিটলারের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দিলে মুসোলিনী এসে যান ইংরেজ-ফরাসীর কবলে, ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে মুসোলিনী কখনই এমন কথা বলবেন না যে ইংরেজ ফরাসীর মৈত্রী তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। জার্ম্মাণ-ভীতি তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছে—একথা প্রকাশ করবেন না তিনি, যতদিন তার প্রয়োজন হবে Rome-Barlin axis as an instrument of blackmail.

তাই Austro-German Anschluss তাঁকে বিব্রত করে নি। অষ্ট্রিয়া হিটলারের কবলে গেল এতে মুসোলিনীর এমন কিছু এসে যায় না। কখনও যদি সত্যিই ভয়ের কারণ ঘটে, তখন ত পড়েই আছে London-Paris-Rome axis. এই এ্যাক্সিসের dominant element হবার আগে তিনি চান না যে এটার বিশেষ প্রয়োজন হোক। খুব শীঘ্র যদি হিটলারকে বাধা দিতে হয় তবে মুসোলিনীর তাতে সত্যিই অস্বস্তি হবার কথা, কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ ফরাসীর কাছ থেকে প্রয়োজন মত সব কিছু আদায় করা অসম্ভব। কাজ বাকী রয়ে গেল অথচ Rome-Berlin axis ভেঙে গেল—এ তিনি মোটেই চান না। হিটলার যদি এখনই Adriatic Sea পর্য্যন্ত হাত বাড়াতে চান তবে মুসোলিনীর পক্ষে neutral attitude নেওয়া সম্ভব নয়। চেকোশ্লোভিয়াকে ভেতরে ভেতরে হাত করে হিটলারকে তখন তিনি বলবেন—"Avoid agression, Oh! Fuehrer." এখনই যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার নিয়ে সাধারণ যুদ্ধ বাধে ত জার্ম্মানীর সঙ্গে একজোট হয়ে ডিমক্রেশিগুলোর বিপক্ষে অস্ত্র ধরা মুসোলিনীর পক্ষে মোটেই লাভজনক হবে না। তাই সেদিন যখন Sudeten Germanদের ব্যাপার নিয়ে বিরাট রকমের কাণ্ড বাধবার উপক্রম হয়েছিল, তখন মুসোলিনী হিটলারকে যুদ্ধ এড়াবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন; অবশ্য চোখ রাঙান নি। যা নিয়ে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা থাকবে, সে ব্যাপারে মুসোলিনী হিটলারকে উপদেশ দেবেন খুব হিসেবী হয়ে চলতে। এই হচ্ছে এখন ইটালীর সর্ব্বময় প্রভুর চতুর রাজনৈতিক খেলা। মুসোলিনীর স্বপ্ন যদি বাস্তবে পরিণত হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতাপ ক্ষীণ হতে হতে কোন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছুবে তা বলা যায় না। ফ্রান্স যদি সময় থাকতে বেঁকে দাঁড়ায় ত ভাল; নইলে ধরে নিতে হবে ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তির পর থেকে Mussolini's era আরম্ভ হয়ে গেছে।

কালকেতু
অহীন্দ্র চৌধুরী

ফুল্লরা
শিশুবালা

যুবরাজ
মোহন রায়

পৌরাণিক চিত্র

কেন আদৃত হবেনা?

প্রাচীন আড়ম্বরহীন বাঙ্লায় আমাদের যে অন্তর সম্পদ ছিল, আজিকার বাহ্য-ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। সেদিন তাহার চণ্ডীমণ্ডপে স্তিমিত মৃৎপ্রদীপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া বাঙ্গালী যে কাহিনী শুনিত, যে কথা পড়িত, আজ বিংশ শতাব্দীর চোখ-ঝলসানো বিদ্যুতালোকের সম্মুখে তাহা নিতান্তই ফিকা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেদিন ছিল—"দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে." আর আজ মানব ভিখারী দানব দুয়ারে। তাই আজিকার এই নব-সভ্যতার দিনেও সব সময়ই নিছক প্রেমের গল্প না শুনিয়া মাঝে মাঝে প্রাচীন কথা, সেই দেব-দেবীর কাহিনী সকলেরই শোনা ভাল। তাহাতে হৃদয়ে শক্তি এবং মনে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে। গতদিনে আমাদের এই জাতি, ধর্ম্ম ও সংস্কারে যে কত গরীয়ান্ ছিল, তাহা আজিকার ভূয়ো মানব সমাজের সহিত তুলনার কথা আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে-দের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি জানিয়া উঠে তাহা কম মঙ্গলজনক নয়।

মানব জীবন গঠন ও তাহাদের সুপথে চালনা করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রদ ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের ভিতর দিয়া যত শীঘ্র সম্ভবপর, তাহা বোধ হয় আর কিছুতেই সহজসাধ্য নয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের প্রযোজকদের লক্ষ্য সেদিকে একেবারে নাই। তাঁহারা প্রেমের গল্প ও হাল্কা রসের পরিবেশনে এত ব্যস্ত যে পৌরাণিক কাহিনীর নাম শুনিলেই নাক সিট্কাইয়া উঠেন। তাঁহাদের এই অবিমিশ্রকারিতার জন্য বাঙ্লার ছেলেমেয়েদের মনও দিন দিন কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। তবে একথাও সত্য যে, বাঙ্লাদেশের এই কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোনও সহরে বা গ্রামে যেখানে

সর্দ্দার
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

সিনেমা আছে সেখানকার লোকদের মধ্যে এখনও এ দুরারোগ্য ব্যাধি প্রবেশ করে নাই। আমরা জানি, সেই সব জায়গায় ভাল ভাল সামাজিক চিত্র যে অনাদর পায় নাই ধর্ম্মপ্রবণ বাঙ্গালীর কাছে পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক চিত্র তদপেক্ষা শতগুণে সমাদর লাভ করিয়াছে। কলিকাতার সভ্যসমাজ আজ যে রসাস্বাদনের জন্য সর্ব্বকালে, সর্ব্ব-স্থানে যে কাহিনীর আবেদন অগ্রাহ্য করিতেছে—অদূর-ভবিষ্যতে হয় তো সেই কাহিনীই পর্দ্দায় দেখিবার জন্য তাহারা হইবে ব্যাকুল। তবে একথা সত্য যে, পৌরাণিক বা ভক্তি মূলক ছবি তুলিতে হইলে তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য যদি যথাযথভাবে প্রকাশ না পায় তাহা হইলে সেই ছবির সার্থকতাও ক্ষুণ্ণ হয়।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যেদিন "দেবী ফুল্লরা" তুলিবেন স্থির করেন সেইদিন তাঁহার এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"ওহে আজকালকার দিনে তুমি পৌরাণিক ছবি তুল্‌ছো?" তাহাতে তিনকড়িবাবু হাসিয়া জবাব দেন—"কেন, পৌরাণিক ছবি কী তোমাদের অস্পৃশ্য নাকি?—আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেখ ভাই, আমি যদি ভাল কোরে ছবি তুলতে পারি তা হ'লে আমি যে গল্প নিয়ে ছবি তুলতে যাচ্ছি সে নিশ্চয়ই সাধারণে বরণ কোরে নেবে। তা' ছাড়া "দেবী ফুল্লরা"-কে তুমি যদি শুধু পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক কাহিনী হিসাবে গ্রহণ কর, তা' হ'লে মস্ত বড় ভুল করা হবে। পৌরাণিক আবহাওয়ার ভেতর এই কাহিনীর ভেতর এমন কতকগুলি

সুষমা
রাধারাণী

ভাড়ু-দত্ত
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

নর্ত্তকী
রাণী চৌধুরী

উত্তরায়
শুভ-উদ্বোধন
শনিবার, ১১ই জুন
হাজরা পিকচার্সের
ভক্তি-রস-সিক্ত চিত্রোপহার
NISIT

কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

ঘর

কাশীশ্বর ও যোগমায়া

কাশী—তুমি ব্যাপারটার যে রকম কুশ্রী রূপ দিয়ে দিলে, এমন আর কেউ পারলে না। দিলীপও না।… …

(যোগমায়া চুপ করিয়া রহিল)

সে বেচারী যেই শুনলে যে, এ একটা সামান্য উইলের ব্যাপার, সে স্থির হয়ে গেল। স্থির হ'তে পারলে না তুমি। লোক জড় কোরে, একটা scene create ক'রে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা কোরতে লাগলে।

যোগমায়া—তোমাকে অপদস্থ কি ক'রে ক'রলাম ?

কাশী—করনি ; চেষ্টা ক'রছিলে। সংসারের মধ্যে এমন ভাবটা দেখালে যেন তোমার উপর কতো অত্যাচার হ'য়েছে। বড়ো ছেলের প্রতি কি ভীষণ অবিচার হ'য়েছে। আমি যেন নির্ম্মমতার একটা প্রতিমূর্ত্তি !

যোগমায়া—মাপ করো, আমি আর এ সবের জবাব দিতে পারবো না।

কাশী—কিন্তু প্যাঁচ হ'ল ঐ খানেই। তুমি জবাব দিতে পারবে না—জবাব নেই ব'লে নয়। তুমি জবাব দিতে পারবে না—জবাব দেবেনা বোলে ! তুমি ভেবেই নিয়েছ তোমার যা কিছু জবাব, যা কিছু বক্তব্য, আমি খেলো ব'লে ফেলে দোব। মনের কোণেও ঠাঁই দোব না। অর্থাৎ তোমার কথার আর কোন মূল্যই আমার কাছে নেই। কেমন, এই না ?

যোগমায়া—এরকম যদি ভেবেও নিয়ে থাকি, অন্যায় বোধ হয় কিছু ক'রিনি ?

কাশী—তা হয়তো করনি। কিন্তু অন্যায়টুকু না কোরলেই কি সব কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গেল ?

যোগমায়া—তা হয়তো গেল না, কিন্তু করবারও আমার শক্তি রইল কোথায় ?

কাশী—কেনই বা রইল না ! এক-ছেলেকে যদি আমি উইল কোরে সর্ব্বস্ব দান কোরে দিই, এই কি তার থেকে প্রমাণিত হয় যে, আর এক ছেলেকে আমি—

যোগমায়া—বলো, কথাটা শেষ করো। থেমে যেয়োনা।

কাশী—হাঁ, কথাটা ঠিক দাঁড়াচ্ছে না বটে ! আমি গুছিয়ে ব'লতে পারছি না। আচ্ছা, এ কথা এখন থাক।… …

যোগমায়া—সেই ভালো। —আমিও বাঁচলাম। (প্রস্থান)

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—বাবা, তুমি নাকি পরেশ উকিলকে তাড়িয়ে দিয়েছ ?

কাশী—হ্যাঁ—

মনীষা—কেন বাবা ?

কাশী—তোকে সে কথা ব'লতে হবে ?

মনীষা—হ্যাঁ—

কাশী—হ্যাঁ ?—তুই আমার মুখের উপর এতো বড় উত্তর করতে পারলি !

মনীষা ভয় পাইয়া গেল, সে মুহূর্ত্ত কাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল: ও ! আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, তবে থাক্‌গে।

(প্রস্থানোদ্যত)

কাশীশ্বর—এই শোন্—

(মণীষা ফিরিয়া আসিল)

তোকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে কে ব'ললে রে ?

মনীষা—তুমি তো আবার রেগে যাবে। কথা না কওয়াই ভালো।

কাশীশ্বর—না, রেগে যাবো না। তুই বলতো ?

মনীষা—পরেশ উকিল চ'লে যাচ্ছিল, আমায় নমস্কার কোরতে এসে কেঁদে ফেললে। জিজ্ঞাসা করলাম, একি ! আপনি যাচ্ছেন কোথা ? বল্লে, মণিমা, দেশে চ'ললুম। তোমার বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কাশীশ্বর—তুই জিজ্ঞাসা ক'রলিনি কেন, পরেশবাবু ! আপনার অপরাধ হ'ল কি যে, বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন ?

সমস্যা রূপ পেয়েছে যা' আজকালকার দিনের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে। ধনী নির্ধনীর সংঘর্ষ, হরিজন সমস্যা, কৃষিশিল্প প্রভৃতি বিষয়গুলির আলোচনা এই কাহিনীর কম বড় সম্পদ নয়। তা' ছাড়া ছবিখানাকে অভিনয়ের দিক থেকেও উচ্চাঙ্গের করবার জন্য যার যে ভূমিকা চরিত্রোপযোগী হবে সেই ব্যবস্থাই কোরেছি। এখন ফলাফল ভগবানের হাত।"

বাস্তবিকপক্ষে কথাপ্রসঙ্গে তিনকড়িবাবু যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য এবং আমরা জানি তিনি এই "দেবী ফুল্লরা" চিত্রে রূপান্তরিত করিবার জন্য আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। তিনকড়িবাবুর এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে না তাহার প্রমাণ আমরা বহুদিক হইতে পাইয়াছি।

মনীষা—ঠিক্‌ এই কথাটা আমার মুখের ডগায় এলো, কিন্তু ব'লতে পারলাম না। ভাবলুম একটা শক্ত প্রশ্ন কোরে বলবো, আর যদি উত্তর না দিয়ে চ'লে যায়! তোমাকে তাই জিজ্ঞাসা কোরতে এসেছি। ব'লবে আমায়, কেন তাকে তাড়িয়ে দিলে?

কাশীশ্বর—সে বেইমানী ক'রেছে।

মনীষা—বেইমানী!

কাশীশ্বর—হ্যাঁ। একটা অতি গোপনীয় সংবাদ—কেন, তুই তোর মা'র কাছ থেকে কিছু শুনিস্‌নি?

মনীষা—কিচ্ছুনা। মা আবার কোন কথা ব'লবে। এমন চাপা মেয়ে নয়! কিন্তু—

কাশীশ্বর—আর কিন্তু আমি কোন কথা তোমায় বলতে পারব না।

মনীষা—আর একটা কথা। তারপর আর এক টুকরোও তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রব না।

কাশীশ্বর—বলো তাহ'লে—

মনীষা—পরেশ উকিলকে গোপনীয় সংবাদটি দিয়েছিল কে?

কাশীশ্বর—আমি।

মনীষা—সে সেই সংবাদটি বেইমানী কোরে প্রকাশ কোরে দিলে!

কাশীশ্বর—হ্যাঁ—

মনীষা—কিন্তু—একি! তুমি উঠে যাচ্ছ?

কাশীশ্বর—তুই যদি আমায় cross examine ক'রিস কতোক্ষণ আমি টিকতে পারি।

মনীষা—এবার যেটা ব'লছিলাম সেটা কিন্তু কোন প্রশ্ন নয়, সেটা আমার মন্তব্য।

কাশীশ্বর—মন্তব্য তুই যা করবি, তা আমি বুঝে নিয়েছি।

মনীষা—তা হ'লে ভালই হ'ল, আমায় আর গোছ করে ব'লতে হ'ল না। তা হ'লে পরেশ উকিলকে ডেকে ব'লে দিতে হয়, চাকরি তার বহাল রইলো।

কাশীশ্বর—না, তা আর হয় না।

মনীষা—কিন্তু আমার মন্তব্য মত তার অপরাধটা খুব গুরুতর দাঁড়াচ্ছিল না বাবা।

কাশীশ্বর—এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আমি আর কিছু কল্পনা ক'রতে পারি না। বিশেষতঃ, একটা উকিলের পক্ষে।

মনীষা—তুমি যখন ব'লছ, তখন হয়তো তাই ঠিক। কিন্তু আমি যা ভাবছিলাম, তা তোমার ভয়ে ব'লতে পারছিনা।

কাশীশ্বর—বল শুনি, কোন' ভয় নেই।

মনীষা—তুমি হয়তো হাসবে, কিংবা ভাববে মেয়েটা বোকা!

কাশীশ্বর—হাসবোও না, বোকাও ভাববো না। মন্তব্যটা শুধু শুনবো। আরম্ভ কর।

মনীষা—আমি ভাবছিলাম, যে, গোপনীয় সংবাদটি পরেশ উকিলকে দেওয়াই উচিৎ হয়নি!

কাশীশ্বর—এমন যদি হয়, যে, এ সংবাদটি পরেশ উকিলকে না দেওয়া ছাড়া আর উপায়ই ছিল না?

মনীষা—অর্থাৎ, মাকে দিলেও হ'তনা, দাদাকে দিলেও হ'ত না, ছোট দা'কে দিলেও হ'ত না;—এই কথা ব'লছোত'?

কাশীশ্বর—দাঁড়া, তুই কোন দিকে আমায় ঠেলে নিয়ে যাচ্চিস্‌, তা দেখি।

মনীষা—ঠেলবো কেন, আমি তো দাঁড়িয়েই র'য়েছি।

কাশীশ্বর—আমি দাঁড়াতে পারছি না!...

মনীষা—দাঁড়াতে পারছ না। মানে কি, আমি বুঝতে পারলাম্‌ না:—ও! কথার ভেতর বোধ হয় আর একটা কথা আছে।

কাশীশ্বর—থাম্‌। আচ্ছা ধর, এমন যদিই হয়, যে, গোপন সংবাদটি বাড়ীর আর কাউকেই দেওয়া চলত না অথচ পরেশ উকিলকে—

মনীষা—অথচ পরেশ উকিলকে সংবাদটি দিতেই হবে! আমি তা হ'লে ব'লবো—হাসতে পাবে না কিন্তু—এমন কোন সংবাদই হওয়া উচিৎ ছিল না! মা জানবেনা, দাদা জানবে না, অথচ পরেশ উকিল এসে টুক কোরে জেনে যাবে!—উঃ!—বেশ হ'য়েছে, তার চাকরি গেছে। আমি খুব খুসী হ'য়েছি। (প্রস্থান)

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—পরেশবাবু একবার দেখা ক'রতে চাচ্ছেন।

কাশীশ্বর—কেন?

বেহারা—ব'লছেন, বাড়ী যাবার আগে বাবুর সঙ্গে একবার দেখা কোরে যেতে চাই।

কাশীশ্বর—আমার সময় হবে না। যা বলবার ছোট বাবুকে ব'লে যেতে বল।

বেহারা—Thank you sir. (প্রস্থান)

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগমায়া—নীলা এসেছে। ভয়ে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারছে না। তাকে ডাক্‌বো এই খানে?

কাশীশ্বর—ভয় আবার তার কি জন্য হ'ল?

যোগমায়া—আমি তাকে এ বাড়ী আসতে বারণ ক'রেছিলাম। ব'লেছিলাম তুমি এ সব পছন্দ করো না। তাই বোধ হয় সে ভয় পেয়েছে।

কাশীশ্বর—ও! কিন্তু আমি তো তাকে এ বাড়ী আসতে বারণ ক'রিনি!

যোগমায়া—করনি বটে, কিন্তু চেয়েছিলে তাই।

কাশীশ্বর—আমি চাইনি। বরং ওদের বিবাহের সম্ভাবনা নেই শুনে তুমি তাই চেয়েছিলে। মনে ক'রে দেখ:—ভেবেছিলে ......থাক সে কথা। এক কথার বারংবার উল্লেখ ক'রলে সৌন্দর্য্য হানি হয়। তুমি নীলাকে ডাকো।

যোগমায়া—যে কথা ব'লতে গিয়ে সংযম প্রকাশ ক'রলে তা কিন্তু বলাই হ'ল।

মনে কোরোনা এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও আমার নেই।

কাশীশ্বর—বুদ্ধি তোমার নেই একথা আমি বলি না। অকারণ খোঁচা দিয়েও তোমার মনে আঘাত দেবার চেষ্টা ক'রি না —যার ইঙ্গিত তুমি এই মাত্র ক'রলে।... দুঃখ আমি কাউকে দিতে চাইনা যোগমায়া, দুঃখ আমি কারুর কাছ থেকে পেতেও চাই না! আমার নিজের পাওনা গণ্ডা শুধু আমি বুঝে নিতে চাই। শুধু এইটুকু।—

যোগমায়া—দুঃখ আমিও কাউকে দিতে চাই না। আজ এই ত্রিশ বৎসরের ভেতর এমন একটা দিনও তুমি খুজে পাবেনা, যে দিন আমার জন্ত তোমায় কোন' কষ্ট, কোন দুঃখ পেতে হ'য়েছে! শেষের কথা-গুলি বলিতে গিয়া অশ্রুভারে যোগমায়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় নেপথ্য হইতে সুনীলা ডাকিল: জ্যাঠাইমা, আমি আসবো?

কাশীশ্বর—নীলা! আয়, ভেতরে আয়।

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—আমি ভাবলুম, বুঝি জ্যাঠাইমা ভুলেই গেল!

(যোগমায়ার প্রস্থান)

একি! জ্যাঠাইমা'র কি হ'ল!

কাশীশ্বর ক'য়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন:—হয়তো কিছু হ'য়ে থাকবে। আজকাল ওদের ব্যাপারই অন্তরকম।—তা সে যাক।—তুই নাকি ভয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারছিলি না?

সুনীলা (মৃদু হাসিয়া বলিল) হ্যাঁ, আপনি যে আমায় আসতে বারণ ক'রেছিলেন!

কাশীশ্বর—তোর জ্যাঠাইমা ব'লে-দিয়েছিল বুঝি?

সুনীলা—হ্যাঁ—

কাশীশ্বর—তা হ'লে অবশ্য আমি বারণ ক'রেইছিলাম।—কিন্তু তুই কেন আমার কাছে এসে কৈফিয়ৎ তলব ক'রলিনি?

সুনীলা—আমি জানতাম এই নিষেধ আজ্ঞা আপনি নিজেই প্রত্যাহার ক'রবেন।

কাশীশ্বর—ঠিক।

সুনীলা—তাহ'লে তো আমার এ বাড়ী আসতে কোন বাধাই রইল না?

কাশীশ্বর—নীলা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমায় কিন্তু পুলিশের লোক ব'লে মনে হবে। (সুনীলা হাসিয়া উঠিল) স্বাধীন গতি যেখানে স্বাভাবিক, বাধার বালাই সেখানে কে নিয়ে আসবে?—সে কাজ করুক ওরা, আমাদের সে কাজ নয়।

সুনীলা—কিন্তু এ বাড়ীতে আমার স্বাধীন গতি তো স্বাভাবিক নয় জ্যাঠা মশায়?

কাশীশ্বর—অর্থাৎ তুমি এ বাড়ীর মেয়ে নও, এখানে তোমার স্বাধীন গতি কি কোরে হ'তে পারে—এই হ'য়েছে একটা মহাসংশয়—কেমন?

সুনীলা—কথাটা বলে ফেলেই বুঝতে পেরেছি, আমার ওকথা বলা উচিৎ হয়নি।—(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া বলিল) থাক্ জ্যাঠা মশায়, আমি আর এ বিষয়ে কোন কথাই কইতে চাই না। কোন জিনিষ জানবারও আর আবশ্যক নেই।

কাশী—এ বাড়ী আসতে কখনও কৃপণতা কোরো না। বাধা যদি কারুর কাছ থেকে আসে,—আমার কাছ থেকেও যদি আসে, ঠেলে ফেলে দিও সে বাধা!—এবাড়ী শুধু তোমার বাবার প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ী ব'লে বিবেচনা কোরো না,—এবাড়ী তোমার—

(এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাশীশ্বর সহসা স্তব্ধ হইয়া যাইলেন)

সুনীলা—আমায় আর কিছু কি ব'লবেন?

কাশীশ্বর—হ্যাঁ—কি ব'লছিলুম।—এ বাড়ী শুধু তোমার বাবার প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়ী ব'লে বিবেচনা কোরনা।—এ তোমারও বন্ধুর বাড়ী!—

সুনীলা—আমি তা জানি। এ আমার বাবার বন্ধুর বাড়ী, আমার মায়ের বন্ধুর বাড়ী, আর আমারও বন্ধুর বাড়ী—যদিও বন্ধু আমার সঙ্গে কখনই দেখা করে না।

কাশীশ্বর—সে কি! দিলীপ যে তুমি না হ'লে—

সুনীলা—ও তো আমার বন্ধু নয়। আমি মনীষার কথা ব'লছিলাম।—আচ্ছা—

(প্রস্থানোদ্যত)

কাশীশ্বর—আর একটা কথা—

(সুনীলা দাঁড়াইল)

দিলীপ তোমার বন্ধু নয়? তাকে তুমি বন্ধু ব'লে ভাবো না?...

সুনীলা—না জ্যাঠামশায় সে আমাদের বন্ধু নয়। সে আমাদের গুরু। তার চেয়ে যদি আরও কিছু বড়ো থাকে সে তাই।

কাশীশ্বর—বেশ! কিন্তু আরও একটা কথা আমার আছে সুনীলা,—তার জবাবও আজ আমার দিয়ে যেতে হবে।

(সুনীলা অবাক্ হইয়া কাশীশ্বরের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল)

তোমার মায়ের ইচ্ছা দিলীপের সঙ্গে তোমার এমন একটা সম্বন্ধ, এমন একটা গুরুতর সামাজিক বন্ধনের সৃষ্টি হয় যাকে আমরা চলিত কথায় বলি বিবাহ!—তুমি লজ্জা পাবে আমি জানতাম। আমারও এরূপ একটা রূঢ় প্রশ্ন তোমায় করা উচিৎ নয়, তাও আমি জানি: কিন্তু আমার দরকার হয়ে পড়ছে কথাটা জানবার। বলতো মা, তোমার এ বিষয়ে কোন মতামত আছে কি না?

(সুনীলা চুপ করিয়া রহিল)

বলো মা, লজ্জা কোরো না?

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

(পত্র)

মাননীয়
খেয়ালী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আপনার ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রিকায় শ্রীবিনোদবিহারী দাস মহাশয় নিখিলবঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলনের বর্ত্তমান বর্ষের অধিবেশনে যাঁহারা গাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র চারজনের গানের আলোচনা করেছেন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। Conference-এ ত বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক গায়ক-গায়িকাই গান করিয়াছিলেন ; কিন্তু সমালোচক মহাশয় অন্য সকলকে ছেড়ে দিয়ে মাত্র চারিজন (যথা শ্রীমতী হীরাবাই, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, রামু মিশ্র ও ভীষ্মবাবু) গায়ক-গায়িকার উপর বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন কেন ? তিনি কি মনে করেন যে অন্যান্য যাঁহারা গাহিয়াছিলেন (যথা শ্রীমতী কেশরবাই, শ্রীমতী দস্তুর, প্রোঃ সুরেশ বাবুমান ও স্থানীয় অন্যান্য গায়কগণ) তাঁহারা সকলেই হয় তাঁহার সমালোচনার অযোগ্য না হয় বা তাঁহারা এত ভাল যে সমালোচক তাঁহাদের সমালোচনা করিতে নিজেই অসমর্থ। যে কারণেই হোক্, তাঁহারা যে গ্রহের কোপে না পড়ে বেঁচে গেলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্য !

বিনোদ বাবু তাঁর সমালোচনায় শ্রীমতী হীরাবাই, রামু মিশ্র ও ভীষ্মবাবুর সম্বন্ধে যা লিখেছেন, গানের সমালোচনা হিসাবে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। ভীষ্মবাবুর গানে তিনি নাকি আলাপের চার অংশের কোন অংশেরই রূপের বিকাশ দেখেন নি—রাগরূপের বিকাশ কাণে শুনে হৃদয়েই উপলব্ধি করা যায়—চোখে কেহ দেখেন ব'লে ত শোনা যায় নি। সমালোচক মহাশয় চোখে দেখবার চেষ্টা না ক'রে যদি কাণে শুন্‌তেন তা' হ'লে এরূপ অসঙ্গত প্রলাপ কর্‌তেন না। এছাড়া আর যা কিছু তিনি সমালোচনা করেছেন তাতে তাঁর ব্যক্তিগত উষ্মাই প্রকাশ পেয়েছে। লেখক মহাশয় লিখেছেন যে ভীষ্মবাবু নাকি ঠুম্‌রী গানের সময় "রাস্তা ভুলিয়া পথ খুজিতেছিলেন, পথ পাওয়ার আগেই গান শেষ হইয়াছিল"—আমাদের কিন্তু কৌতূহল রহিয়াই গেল যে, ভীষ্মবাবু "পথ পাওয়ার আগেই" গান শেষ করিলেন বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পথ খুঁজে বাড়ী গিয়ে পৌঁছিলেন কি না ?

লেখক মহাশয় রামুমিশ্রের গানে কোন রস ও প্রাণের স্পন্দন দেখিতে পান নাই এবং সুরেও নাকি কোন বৈচিত্র্য পান নাই। ভীষ্মবাবুর গানেও তিনি এরূপ "সুরে কোন বৈচিত্র্য" পান নি। বিনোদবাবু সুরের কি বৈচিত্র্য যে খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, তাহা তাঁহার সমালোচনা থেকে ত বোঝা যায় না।

শ্রীমতী হীরাবাইকে সমালোচক মহাশয় সুবিখ্যাত ওস্তাদ ওয়াহেদ খাঁর শিষ্যা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন—তাছাড়া তিনি লিখেছেন যে, শ্রীমতীর গানের চঙ্ পণ্ডিত বালগন্ধর্ব ও কৃষ্ণরাও-এর styleএর সহিত মেলে, তবে মাঝে মাঝে নাকি উহাতে আবদুল করিম খাঁ সাহেবের রীতির ছাপ সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। একাধারে শ্রীমতীর গানে এতগুলি বিশিষ্ট গুণীর style ও রীতির ছাপ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এবং বিনোদবাবু শ্রীমতীর সুরের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে পড়েও শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, শ্রীমতীর গানে খেয়ালের উপযোগী style বা technique নাই। তাঁহার এরূপ সামঞ্জস্যবিহীন সমালোচনার কোনও ভাবার্থ সঙ্গীতরসিকগণ করিতে পারেন কি ?

আর সকলের চেয়ে মজার হচ্ছে যে শ্রীমতীর গানের সমালোচনায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটা মোটেই তাঁর নিজস্ব নয়। খেয়ালী পত্রিকায় কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী গঙ্গাবাইয়ের গানের সমালোচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছিল তার হুবহু ছাপ এতে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের গানের সমালোচনায় কিন্তু সমালোচক মহাশয় কেবল সাদাসিধে মন্তব্য করেই ক্ষান্ত হন নাই, উপরন্তু তিনি যে সঙ্গীতশাস্ত্রের মস্ত একজন মর্ম্মজ্ঞ তা প্রকাশ করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর সকল

সুনীলা—আমার মা, আমার জ্যাঠা-মশায় যা হুকুম কোরবেন তাই আমি কারব।

(যোগমায়ার প্রবেশ)

কাশীশ্বর—এসো—। আচ্ছা, ধরো, যদি আমি বলি,—না, এ যোগাযোগটা ভালো হবে না, নীলা, তুমি তোমার মন প্রস্তুত করো ?

সুনীলা—আমি প্রস্তুত ক'রেই নেব আমার মন।

কাশীশ্বর—নীলা ! আশীর্ব্বাদ, আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করি।

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

মন্তব্যই যে ফাঁকা আওয়াজ তা বুঝতে বেশী দেরী থাকে না। পণ্ডিতজীর শুধ্ কল্যাণে খাঁসাহেবের ওডিয়ন record গানের ছায়া কি ভাবে যে তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝেছিলেন তা আলোচনায় যদি তিনি স্পষ্ট করে বল্‌তেন তাহ'লে তার একটা প্রতিবাদ করা যেত। কারণ না দেখিয়ে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে অযথা চুরীর দায়ে সোপর্দ্দ করা মোটেই ভদ্রতাজনক কাজ নয়। তা ছাড়া তিনি লিখেছেন যে, পণ্ডিতজীর "শুধ্ কল্যাণ" গানে একই রাগের রূপ ফুটে ওঠেনি—ভূপালী ও মালেশ্বরী (?)-র ছায়া নাকি তাঁর মতে প্রকট হয়েছিল। সমালোচক মহাশয়ের মতে ওঙ্কারনাথজী খাঁসাহেবের গানের অনুকরণ করেছেন। তা হ'লে জিজ্ঞাস্য এই যে, খাঁসাহেবের record গানেও কি ভূপালী ও মালেশ্বরীর ছায়া প্রকট হয়ে উঠেছে! এ ত গেল এক কথা। তা ছাড়া ওঙ্কারনাথের গানে কেমন ক'রে যে ভূপালী ও মালেশ্বরীর ছায়া এসেছিল তা ত তিনি পরিষ্কার করে কিছুই লেখেন নি। শুধ কল্যাণের প্রকৃতির সঙ্গে অবশ্য ভূপালীর অনেক সামঞ্জস্য আছে এবং সে পার্থক্য বজায় রাখা প্রকৃত গুণিজন ছাড়া সাধারণ শিল্পীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কিন্তু, সমালোচক মহাশয় জানেন কি যে শুধ্ কল্যাণ ও ভূপালীর স্বরূপ সাধারণতঃ সারগম ও বাদীসম্বাদীর উপর নির্ভর করে না—পরন্তু এই রাগ দুইটীর গানের "চঙ্" ও "ধরণের" উপরেই নির্ভর করে—সুতরাং এই দুইটী রাগের পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বিশিষ্ট ওস্তাদগণ যখন এই রাগ দুইটীর আলাপ ও বিস্তার করেন তখন তাঁহাদের গান ধীরভাবে শ্রবণ ও পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। অন্যথা সাধারণ শ্রোতার পক্ষে শুধ্ কল্যাণের মধ্যে ভূপালীর ছাপ প্রকটভাবে পাওয়াই স্বাভাবিক।

যা হো'ক সমালোচক মহাশয় যে শুধ্ কল্যাণে ভূপালীর ছাপ পেয়েছেন তাতে আমরা তত বিস্মিত হই নি, যত বিস্মিত হয়েছি তাঁহার মালেশ্বরীর ছাপের উল্লেখ দেখে। মালেশ্বরী ব'লে ত কোনও রাগ শাস্ত্রে বা লোকে প্রসিদ্ধ নেই যা আছে তার নাম "মালশ্রী"। কিন্তু "মালেশ্রী"-র প্রকৃতি থেকে শুধ্ কল্যাণের প্রকৃতি এত ভিন্ন যে মস্তিষ্কের বিকৃতি ছাড়া একের মধ্যে অপরের ছাপ পাওয়ার কল্পনা করা সম্ভব নহে।

এখন শুধ্ কল্যাণের কথা ছেড়ে দিয়ে তাঁর ভৈরব-বাহারের সমালোচনার কথা তোলা যাক্। বিনোদবাবু আলোচনা প্রসঙ্গে ভৈরব-বাহারের যে সরগম দিয়েছেন তা'ত সাদা কথায় বল্‌তে গেলে একেবারেই বেঠিক্। ভৈরব-বাহারের ঠাঁট্ হচ্ছে স র গা গ ম প ধা ধ না ন। এক্ষেত্রে দুই প্রকার গান্ধার, দুই প্রকার ধৈবত ও দুই প্রকার নিষাদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে; এবং ইহাতে মধ্যম মাত্র কোমল। তাছাড়া বাহারের রূপ সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাও একেবারেই অসঙ্গত। বাহার রাগের আরোহী ও অবরোহীর সহিত যদি তাঁহার কথঞ্চিৎ পরিচয়ও থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও মন্দ্রসপ্তকের কোমল নিষাদ থেকে বাহার সুরু করা রীতিবিরুদ্ধ একথা লিখতে সাহস করতেন না। বাহারের আরোহী ও অবরোহী এইরূপ হইয়া থাকে—না স গা মা ধ না স, না ধ না প, মা প গা মা র স। এছাড়া সমালোচক মহাশয় যে পণ্ডিতজীর গানের মুখে বাহারের ছাপ কি ক'রে পেলেন তা বোঝা শক্ত, কারণ ভৈরব-বাহার গাহিতে হ'লে সর্ব্বক্ষেত্রেই ভৈরবকে পূর্ব্বাঙ্গে গাহিয়া পরে উত্তরাঙ্গে বাহার গাহিতে হয়—এবং পণ্ডিতজীও সেদিন ঠিক্ এইরূপ শুদ্ধ-রীতিতেই তাঁহার ভৈরব-বাহার "ষেয়ে বসন্ত" গানখানি গাহিয়াছিলেন। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যে বিনোদবাবু নিক্তির ওজনে তৌল করে পণ্ডিতজীর গানে শতকরা ৫০ ভাগ আহীর-ভৈরবী (?)-র রূপ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কেমন ক'রে তিনি তৌল করলেন তার সম্বন্ধে তিনি আমাদের কোনও সন্ধান দেন নি। সুতরাং সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরিশেষে বিনোদবাবু বলিয়াছেন যে ভৈরব-বাহার গাহিতে হইলেই গোয়ালিয়রের ওস্তাদেরা যেমন ক'রে "ডারিয়া ঝোক দে হি" গানটী গাহিয়া থাকে তেমনি করেই গাহিতে হবে। এর যুক্তি কতটুকু, তা সঙ্গীত-সেবীরা অনায়াসেই বুঝতে পারেন। তবে আমাদের মনে হয় যে তাঁর এই সমস্ত সমালোচনা কেবল যে অজ্ঞানতা-প্রসূত তা নয়—এর মধ্যে বিদ্বেষের ভাবও যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। পণ্ডিতজীর গান যে কিরূপ উচ্চাঙ্গের ও কতটা শাস্ত্রসম্মত তা সঙ্গীত-রসিকেরা ভালই জানেন। প্রকাশ্য-ভাবে প্রকৃত গুণীকে অপদস্থ করার হীনচেষ্টা উপেক্ষা করা যায় না বলিয়াই এই প্রতিবাদ।

ইতি—

শ্রীসুনীতি সেন

এসোসিয়েটেড প্রডিউসার্সের "চোখের বালি"-র একটি
বিশিষ্ট দৃশ্যে শ্রীযুক্ত হরেন মুখার্জ্জী ও ছবি বিশ্বাস।
ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুক্ত সতু সেন।

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ন্যাশনাল নিউজপেপার লিঃ টেলিফোন

'ন্যাশনিট' সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, ত্রয়োবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, ৯ই জুন ১৯৩৮

চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ড

চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকা যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আয় সেইরূপ অর্থশালী বোর্ড চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের কর্ম্মশৈথিল্যহেতু ক্রমশঃ মন্দের পথে চলিয়েছে। ১৯৩২ সালে বর্ত্তমান বোর্ড গঠিত হয় কিন্তু নূতন নির্ব্বাচন হইয়া গেলেও প্রায় বৎসরাধিককাল হইতে চলিল এখনও প্রাদেশিক সরকার মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা না করার ফলে পূর্ব্ব বোর্ডই বাহাল আছে। আর নূতন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য স্থগিত আছে। এবং আরও কিছুদিন এইরূপভাবে চলিলে চব্বিশ পরগণা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। আমরা বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাস্তা নির্ম্মাণ বিষয়ে যে শিথিলতা ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে আমরা বর্ত্তমানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বিভিন্ন হৃদয়বান ব্যক্তি রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে বোর্ডের হস্তে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন কিন্তু এতাবৎকাল দাতার পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সমস্ত রাস্তা তৈয়ার হয় নাই অধিকন্তু আমরা সংবাদ পাইলাম সেই সমস্ত অর্থ বোর্ডের সাধারণ তহবিলে মিশ্রিত হইয়া অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কি বলিবার আছে?

অপরপক্ষে প্রকাশ যে ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র দাসের বাড়ীর সহিত সংযুক্ত মোটে দেড় মাইলব্যাপী গড়িয়াবাজার রোড প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে আর তাহারই সন্নিকটে মগরাহাট থানার অন্তর্গত শিবপুর রোড নির্ম্মাণের জন্য জনৈক ব্যক্তি পাঁচ হাজার টাকা দান করিলেও অদ্যাপি সেই রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্যে হস্তার্পণ করা হয় নাই। এই বৈষম্য যেরূপ দৃষ্টিকটু তদ্রূপ নিন্দনীয়। জিলা বোর্ড যে চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের পৈত্রিক সম্পত্তি নহে ইহা সমঝাইয়া দিবার মতন তেজস্বী সদস্য কি জিলা বোর্ডে কেহই নাই?

এতদ্ভিন্ন জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানের অন্যান্য কার্য্যাবলীও মোটেই প্রশংসনীয় নহে। তাঁহার ভ্রমণ-ভাতা (T. A.) সম্বন্ধে নানারূপ কাণাঘুষা শুনা যায়। লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত খগেন পাড়ুই মহাশয়ের পিতৃ-শ্রাদ্ধের সময় অনুকূল বাবু কাহার গাড়ীতে গিয়াছিলেন ও তিনি ভ্রমণ-ভাতা বিল করিয়াছিলেন কিনা শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুশেখর বসু সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন কি? আমরা জানি পূর্ণেন্দুবাবুও অনুকূলবাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার পক্ষে সঠিক সংবাদ জানা স্বাভাবিক! বিগত এ্যাসেম্ব্লী নির্ব্বাচনের সময় নারায়ণপুর দাতব্য চিকিৎসালয় পরিভ্রমণ অছিলায় কোন ভাতা বিল করা হইয়াছে কিনা জিলা বোর্ডের মেম্বার ও নারায়ণপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা আমাদের জানাইবেন

কি? এতৎসম্পর্কে রেকর্ডে সিদ্ধেশ্বরবাবুর স্পষ্ট ও লিখিত মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও চেয়ারম্যান এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান বা অন্যপ্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য আমরা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিভাগীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রাস্তা নির্ম্মাণ কল্পে দানশীল ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত অর্থ এতদিন কেন ব্যয়িত হয় নাই এবং কেনই বা সেই অর্থ জেলা বোর্ডের অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে সে সম্বন্ধে বিভাগীয় মন্ত্রীর জবাবদীহি দাবী করা কর্ত্তব্য কারণ জিলা বোর্ড এইরূপ অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে জনসাধারণ রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে জিলা বোর্ডের হস্তে অর্থ অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবে এবং বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের অর্থানুকুল্য না পাইলে বাংলার বিভিন্ন জেলার রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যাপক পরিকল্পনা ব্যহত হইবে। জিলা বোর্ডের এইরূপ ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়। আমরা বারান্তরে ক্যানিং, টাকি ও মগরাহাট চিকিৎসালয়ের পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

আমরা অবগত হইলাম বর্ত্তমান চেয়ারম্যান রায় যোগেশচন্দ্র সেনের স্বাস্থ্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং গত ছয় মাস যাবৎ তিনি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এই বৎসর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন হইতে বিরত হওয়াই সঙ্গত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় অমায়িক ব্যক্তি তবে তিনি ভাগিনেয়-প্রীতির আধিক্য হেতু অনেক সময় স্বীয় মত-নিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারেন না। চব্বিশ পরগণা জিলা বোর্ড তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির নিকট হইতে অনেক কিছুই আশা করে।

•(×)•:

শুভ-বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীমান অমল চন্দ্রের সহিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের পৌত্রী শ্রীমতী গৌরী দেবীর শুভ পরিণয় গত সোমবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের আশীষ-বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি :

"নামুক দোঁহার শুভদৃষ্টিতে বিধাতার শুভদৃষ্টি।"

* * *

'মিটারস্ লিমিটেডের' অন্যতম বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরীর সহিত হাওড়া নিবাসী শ্রীপ্রতুলকুমার বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রমলার শুভ পরিণয় গত সোমবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। পদ্মপুকুরের উপকণ্ঠে 'চিরকুমার সভা'র শেষ সভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমারের কুমার-সভার সভ্যপদ পরিত্যাগে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্লকুমার হয়ত তাঁহার বিগত-যুগের কাব্য-রচনার পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিবেন : বিচিত্র এ বিশ্ব মাঝে বৈচিত্র্যের লীলা বয়ে যায়।

স্যার মন্মথ সম্বর্দ্ধিত

মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব নিয়োগ উপলক্ষে আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পক্ষ হইতে গত শুক্রবার অপরাহ্নে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এক প্রীতি-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতার মেয়র মিঃ জেকারিয়া, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন ডিরেক্টার অফ ইন্ডাষ্ট্রীস্ মিঃ এস্. সি. মিত্র, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় সহকর্ম্মীবৃন্দসহ অভ্যাগত বৃন্দের আদর আপ্যায়নের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

নিজে বড় হয়ে বাঙ্গালী জাতিরে বড় করিয়াছে যারা
স্বদেশ-সেবারে ব্রত বলে যারা শ্রদ্ধায় রাখে শিরে
মাতৃ পূজার অঙ্গনতলে নিত্য পূজারী তারা
মঙ্গল ঘট করিছে পূর্ণ সকল তীর্থ-নীরে।
আপনার হাতে নিভৃতে বসিয়া সাজায় পূজার বেদী
ঢাক বাজাইয়া করে না প্রচার পূজার বিজ্ঞাপন,
নিষ্ঠায় তারা লভিছে সিদ্ধি সব সংশয় ছেদি'
হৃদয়-অর্ঘ্য-উপচারে করি আত্ম-সমর্পণ।
তারা সত্যের চির-উপাসক, ন্যায়ের বিচারপতি
অন্যায়ে রুখে কঠোর দণ্ডে, ন্যায়ের করে সম্মান,
অগ্রণী তুমি আজি তাহাদের তোমারে জানাই নতি
হে বরপুত্র বঙ্গবাণীর, কীর্ত্তিতে মহীয়ান।
মা'র মন্দিরে যে দীপশিখায় আরতি করিলে তুমি
সে আলোকে দেশ হ'ল উজ্জ্বল, পুণ্য জনম ভূমি।

[গত শুক্রবার অপরাহ্নে আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান ডিরেক্টার মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন সচিব নিয়োগ উপলক্ষে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের প্রীতি-সম্মিলনে পঠিত। সঃ খেঃ]

কুমারী সরযূ রায়

চট্টগ্রামের কুমারী সরযূ রায় সঙ্গীত জগতে ইতিমধ্যেই দুর্ল্লভ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন বৈঠকে, সঙ্গীত সম্মেলনে এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি তাঁহার
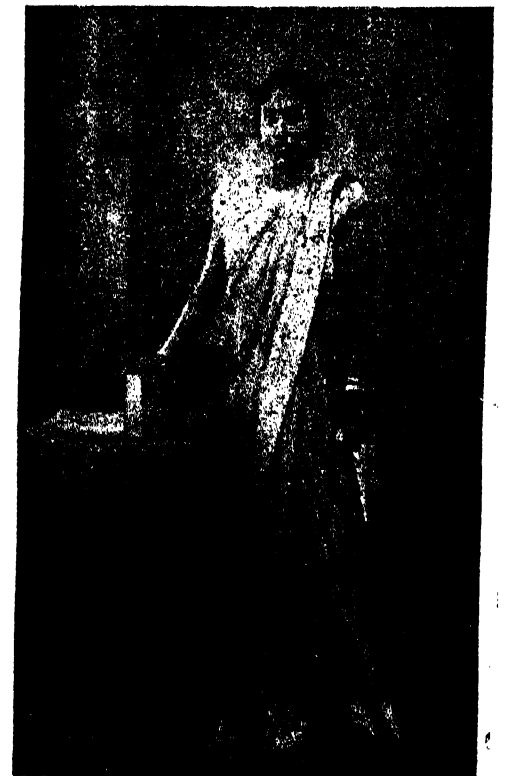
কুমারী সরযূ রায়
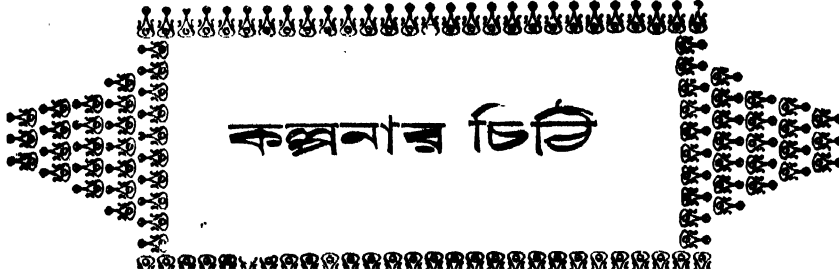
স্নেহের বোন প্রতীমা—

তোমার বিয়ের রঙ্গীন্ চিঠি আজ আমাদের হাতে এসে পড়লো। তবু ভাল যে এতদিনে বিয়ের ফুল ফুটলো।

জীবনটা আজ তোমার চোখে নিশ্চয়ই স্বপ্নময়! নীল আকাশের মত শান্ত, সন্ধ্যার রক্তমায়ার মত চঞ্চল! কিন্তু বাস্তবে যদি স্বপ্নটা সত্য হয়, তবেই ত' জীবন মধুময় হয়।

কিন্তু, শুধু স্বপ্ন-বিলাসের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করা যায় না। সংসারের বৃহত্তম পরিধির মধ্যে, আমাদের ঘরোয়া জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন ও বিরোধের অন্তরালে যে জীবন—সেই জীবনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা। তুমি বুদ্ধিমতি ও শিক্ষিতা। জীবনের পথ বড় পিচ্ছিল। সেই পথে যাকে জীবন সঙ্গী কোরে তুমি আজ এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত, আশাকরি তিনি তোমার অকুতোভয় পথ-চলবার সাহস ও অবলম্বন দেবেন।

আজ তোমার, এই নব-জীবনের নূতন পথে, যাত্রার প্রারম্ভে, আর একটি মেয়ের কথা কী মনে পড়ে?

সেই মেয়েটি, যার কথা আমরা দুজনে কতদিন নিভৃতে আলোচনা কোরে গোপনে কত চোখের জল ফেলেচি।

অভাগিনী সন্ধ্যা—প্রিয়লাল চৌধুরীর গৃহ-বধূ।

মনে পড়ে—সেই দুর্ঘটনা, যা' যে কোন নারীর জীবনে যখন তখন ঘটতে পারে—তার ফলে, শ্বশুর তাকে ত্যাগ কোরেছিল এবং আজ বাপের বিধান অন্যায় জেনেও তার মেরুদণ্ডহীন নির্ব্বোধ পুত্র, বাপের বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে, স্ত্রীকে সেই চরম দুর্দ্দশার দিনে রক্ষণ কোরতে পারে নি?

মনে পড়ে—সন্ধ্যার জীবন-নাট্যের সেই আকস্মিক পরিবর্ত্তন?

স্বামীই যে স্ত্রীলোকের জীবনের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন—সন্ধ্যা শেষ পর্য্যন্ত তা' মানতে পারে নি। কারণ স্বামীর হৃদয়-হীনতাই তার বিশ্বাস ও নিষ্ঠাকে আলগা কোরে তুলেছিল।

মেয়েটি জীবনের পথে তৃণের মত ভেসে চললো—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অকূলে পড়ে নি। দুর্জ্জয় সাহস ও অন্তরের অবিচলিত নিষ্ঠায়, তার নারী-ধর্ম্ম, নারীর সম্মান, সম্পূর্ণ অটুট রেখে, সে তার জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ কোরেছিল।

অনুতপ্ত স্বামী একদিন তাকে গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল সত্য। কিন্তু তার আত্মসম্মানে, তার অবহেলিত নারীত্বের গৌরবটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে, সে কী আর স্বামীর অনুগমন কোরতে পেরেছিল।

তুমি আমি দুজনেই জানি, ঘটনাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। উপেন গাঙ্গুলীর বিখ্যাত উপন্যাস 'অভিজ্ঞান' থেকে ধার করা। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার অমিল কতটুকু? আমাদের সমাজে এমন ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ত' নিত্যই ঘট্‌চে!

শুনে সুখী হবে, এই কাহিনীটি, যা আমরা বইয়ে পড়ে প্রচুর শান্তি পেয়েচি—নিউ থিয়েটার্স তাকে টকী চিত্রাকারে রূপান্তরিত কোরেছেন।

এদেরই দেবদাস, ভাগ্য-চক্র, মুক্তি দেখে আমরা তার কত তারিফ কোরেচি।

তোমার বিবাহ-অনুষ্ঠান সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানি 'রূপবাণী'-তে দেখানো সুরু হবে।

আমার অনুরোধ, অন্ততঃ একদিনের জন্যও তোমার জীবন সঙ্গীকে নিয়ে ছবিখানি সামনের সপ্তাহে রূপবাণী-তে গিয়ে দেখে আসবে।

সমাজের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের দাবী সুনিয়ন্ত্রিত না হোলে আমাদের যে কল্যান নেই, এ কথাটি আজ প্রত্যেক বিবাহিত নর নারীর ভেবে দেখবার সময় এসেচে।

তোমার ভাবী দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক—আজ এই প্রার্থনাই করি। ইতি

তোমার বোন
কল্পনা

সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। কুমারী সরযু রায় রেডিয়োতে ও নিউথিয়েটার্স হিন্দুস্থান-রেকর্ডে গান দিয়া জনপ্রিয়া হইয়াছেন। আমরা এই শিল্পীর আরো উন্নতি কামনা করি।

সঙ্গীত আসর

"সঙ্গীত আসরের" দ্বাদশ মাসিক অনুষ্ঠান আসরের সভ্য শ্রীদীনেন্দ্র নারায়ণ সিংহ মহাশয়ের ১৫নং কালীদাস সিংহ লেনস্থ বাটীতে হইয়া গিয়াছে। প্রথমে শ্রীনগেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় উচ্চাঙ্গের অপ্রচলিত রাগের খেয়াল ও টপ্পা গান করেন, পরে শ্রীবিভূতি দত্ত খেয়াল ও ঠুংরী গানে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে তুষ্ট করেন। শ্রীরাধা-শ্যাম দত্ত ইহাদের সহিত সঙ্গত (তবলা) করেন।

(বিলাসী)

"বিদ্যাপতিঃ"

প্রাণস্পর্শী অভিনয় এবং চিত্তহারা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, বাঙলার হাজার হাজার নর-নারীর অন্তর মথিত কোরে, নিউ থিয়েটাসে'র "বিদ্যাপতি", এই শনিবার থেকে 'চিত্রা'-য় একাদশ সপ্তাহে পড়লো।

বিদ্যাপতির অগ্রগতি এখনও অনেকদিন ধরে সাবলীল থাকবে বোলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ ছবির মধ্যে লোকচিত্ত-আকর্ষণ করবার উপযোগী বস্তু থাকলে, সংখ্যাধিক্যের জন্ত তার সমাদর কমে না। যে প্রেমের গান, ভারতের কাননে-কান্তারে, গগনে-পবনে চির মুখরিত—'বিদ্যাপতি'-তে আছে সেই ভক্ত হৃদয়ের চিরধ্বনিত, অনুপম বাঁশরী বিলাস।

সুতরাং নিউ থিয়েটাসে'র এই অবিস্মরণীয় চিত্র-কথা 'বিদ্যাপতি', এখনও হাজার হাজার নর-নারীর অন্তরে আনন্দ বিতরণ কোরতে চিত্রার আসর যে অনেকদিন ধরে জমিয়ে রাখতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

"অভিজ্ঞান"

স্বামীর আশ্রয়ই যে স্ত্রীর জীবনের এক-মাত্র অবলম্বন—এ বিশ্বাস সন্ধ্যার ভেঙেছিল। শ্বশুর যেদিন তা'র অপরাধের বিচার না কোরে সন্ধ্যাকে গৃহ থেকে বহিষ্কৃত কোরে দেন, সেদিন সে প্রতিকার ও আশ্রয়ের আশায় তার স্বামীর শরণাপন্ন হোয়েছিল। কিন্তু পিতার বিধান নিতান্ত অন্যায় জেনেও সে কৃতবিদ্য পুত্র, কেবল মাত্র পিতার বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে—স্বামীর কর্ত্তব্য পালন কোরতে পারলে না।

সন্ধ্যার জীবনে তখন আর কোন্ অবলম্বন বাকি রইল?

জীবনে চলার পথে সে একটি সাথি পেয়েছিল সত্যি। চরম দুর্দ্দশার দিনে সে যেন নিতান্তই দৈব প্রেরিত হ'য়ে এসেছিল সন্ধ্যাকে উদ্ধার কোরতে।

লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে সন্ধ্যা নিষ্কৃতি পেল বটে; কিন্তু এক অনাত্মীয় পুরুষের সাহচর্য্যে, এত ঐশ্বর্য্য বিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে বাস করেও, শান্তি তার জীবনে এলো না। মন তার আবার বিদ্রোহ ঘোষণা কোরলে...

সন্ধ্যার জীবন নাট্যের শেষ পরিণতি কোথায়—ছায়া চিত্রের মধ্য দিয়ে তার

নিউ থিয়েটাসে'র "অভিজ্ঞান" চিত্রে সন্ধ্যা অপহরণ দৃশ্য। ছবিখানা এই শনিবার থেকে রূপবাণীতে দেখান হবে।

পরিচয় পরিস্ফুট হ'য়েচে। ছবিখানি এই শনিবার থেকে রূপবাণী-তে প্রদর্শিত হ'বে। আশাকরি কল্পনা-প্রবণ বাঙ্গালী মাত্রেই এ ছবিখানি দেখে তৃপ্তি লাভ কোরবেন। নিউ থিয়েটার্সের নামজাদা শিল্পীর দল, এই চিত্রের বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন। এদের মধ্যে মলিনা, মেনকা, শৈলেন চৌধুরি, ভানু বন্দ্যোঃ এবং পঙ্কজ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

সেদিন ছিল রান্না ঘরের একটি ক্ষুদ্র সিন। মঞ্জুর রান্না ঘরে মঞ্জু বসে রাঁধছে। দিনের কাজ হিসাবে নিশ্চয়ই খুব অল্প।

মঞ্জু অর্থাৎ শ্রীমতী কানন বল্লেন; রাঁধতেই যদি হয় আমাকে তো আমি ভাল করেই রাঁধব। লোককে খাওয়াতে শ্রীমতী কানন জোয়ান ক্র্যাফোর্ডের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। কাজেই ছবির জন্যে সত্যি-কারের রান্না ভাল ভাবেই প্রস্তুত হোল।

রান্না খুব ভালই হোল। যারা খেলেন তাঁরা সবাই বল্লেন: রূপসী কানন উত্তম রাঁধুনীও বটে।

কঠিন নিয়মনিষ্ঠ প্রবর্দ্ধক প্রমোদ রায় পর্য্যন্ত এ রান্নার সুখ্যাতি না করে পারেন নি।

পরিচালক ফণি মজুমদার ফ্লোরের ওপরের কাজ তিনি নিজেই সেরে নেন এর জন্যে তিনি কোন ফ্লোর ম্যানেজারের আবশ্যক বোধ করেন না। নিজে হাতে সব করেন বলেই তাঁর সব জিনিষই হয় অতি নিখুঁত এবং অত্যন্ত ভাল। এই জন্যেই তিনি মিঃ পি এন রায়ের অতি প্রিয় ব্যক্তি। অত্যন্ত পরিশ্রম করে 'ভূলুয়ার বাড়ী'র একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর সেট তিনি তৈরী করে দিয়ে-ছেন। সুটিং আরম্ভ হবে আজ কিম্বা কাল।

অধিকার

গত সপ্তাহে নায়ক নিখিলেশ-এর বোন রেবার রোগ শয্যার দৃশ্যগুলি তোলা হ'ল। এই খানেই বস্তীর মেয়ে রাধা প্রথম নিখিলেশ ও ইন্দিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সৌভাগ্য লাভ করলে।

গেল মঙ্গলবার সারারাত্র ধরে সুটিং চলেছিল। সেদিন যে দৃশ্য তোলা হ'ল তা সত্যই চমৎকার। ভীষণ ঝড় আর সেই ঝড়ে বস্তী ভেঙ্গে চুরে ছারখার হ'ল। 'প্রোপাইলেট'র এর সাহায্যে যে ঝড়ের আয়োজন হয়েছিল তা একমাত্র নিউ থিয়েটার্সের পক্ষেই সম্ভব।

দেশের মাটী

দেশের মাটীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কয়েকটা সংশ্লিষ্ট 'রিটেক্' ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

সম্পাদক সুবোধ বাবু—তাঁর সম্পাদনা গৃহে ফিল্ম এর বাণ্ডিল নিয়ে কাজে লেগে-ছেন। সম্পাদনা কাজ নেহাৎ বাজে কাজ নয় তবে সুবোধ বাবুর ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা আছে।

হাজরা পিক্‌চার্স

এই শনিবার হাজরা পিক্‌চার্সের "দেবী ফুল্লরা" 'উত্তরা'-য় মুক্তি পাবে বলে ঘোষিত হ'য়েছিল—কিন্তু বর্ষার জন্য কলিকাতার বাইরে একটি জনতা-দৃশ্যের কাজ শেষ না হওয়ায় ছবিখানির মুক্তিলাভে আরও এক সপ্তাহ বিলম্ব ঘটল। বাঙ্গলার জনসাধারণ "দেবী ফুল্লরা"-র মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরছেন—তা' দেখে মনে হয় ছবিখানির ভবিষ্যৎ খুব ভাল। প্রেম-ভক্তি, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার ভেতর দিয়ে যে কাহিনীর পরিণতি ঘটেছে বাঙ্গালীর কাছে সে আবেদন কোনদিনই অগ্রাহ্য হবার নয়। এতদ্ভিন্ন "দেবী ফুল্লরা"-র যাঁরা প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোরেছেন চিত্ররাজ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা কম নয়! তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনা, মধু শীলের যন্ত্রশিল্পের নির্দ্দেশনা, তরুণ কর্ম্মীযুগল বিভূতি লাহা ও যতীন দত্তের যথাক্রমে আলোকচিত্র ও শব্দযন্ত্রের কাজে এবং আভিজাত্য সম্প্রদায়ের কলা-কুশলী নৃত্যশিল্পী বিভূতি মজুমদার (ঃ) নৃত্য পরিচালনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাবেন বলেই মনে হয়। ছবিখানির ভূমিকা-লিপি বণ্টনেও কর্ত্তৃপক্ষের বুদ্ধি পরিচয় করা যায়।

ভূমিকা-লিপি এরূপ—

দেবী মহামায়া—সাবিত্রী
কালকেতু—অহীন্দ্র চৌধুরী
ফুল্লরা—শিশুবালা
ভাড়ু দত্ত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
সুরমা—রাধারাণী
যুবরাজ—মোহন রায়
সুষমা—চিত্রা
সর্দ্দার—দুর্গা বসু
নর্ত্তকী—রাণী চৌধুরী
সর্দ্দার—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অর্ঘ্য রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস "চোখের বালি"-র শূটিং মন্থরগতিতে অথচ বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ মনীষীদের গল্প এতাবদি ছায়াপটে বিকৃত রূপেই আত্মপ্রকাশ কোরেছে। সেইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সতর্কতা নিয়ে ছবিখানির সাফল্যের জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়েছেন। এমন কী এরা রবীন্দ্রনাথের গান ও গল্প সম্বন্ধে

যাঁরা 'অথরিটি' তাঁদের হেড কোয়ার্টার থেকে আনিয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ কোরছেন। মোট কথা, আমরা যতদূর জানি তা'তে রবীন্দ্রনাথের এই গল্পটিকে চিত্রে সুসমৃদ্ধ কোরে তোলবার জন্য এরা চেষ্টার কসুর কোরছেন না।

অভিনয়

গত সপ্তাহে শ্রীভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের "অভিনয়" চিত্রের থিয়েটার লবীর দৃশ্য তোলা হয়েছে। এই সেটটীও শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীর সূক্ষ্ম কলাবোধের পরিচয় দেবে। অভিনয়ান্তে থিয়েটার-লবীতে বিচিত্র নর-নারীর সমাবেশ দেখা গিয়েছিল। এই দৃশ্যে প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে থিয়েটার ম্যানেজার রূপে তুলসী লাহিড়ী, সহকারী সত্য মুখার্জ্জি এবং নায়ক ধীরাজকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এইবার থিয়েটার দৃশ্যের ষ্টেজের সেট্ তৈরি আরম্ভ হয়েছে। ১০-১২ দিন পরে এই সেটে শুটিং আরম্ভ হবে।

এই সেট তৈরির মাঝখানে পরিচালক মধু বসু মনে করেছিলেন যে তাঁর সি-এ-পি দল নিয়ে বাইরে অভিনয় করতে যাবেন, কিন্তু আমরা খবর পেয়েছি, বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে বলে তাঁর সে সব engagement cancel হয়ে গেছে।

এদের "কলেজ কন্যা"র আর কোন খোঁজ খবর নেই। বোধহয় স্কুল কলেজ খুলিলে নতুন করে Session আরম্ভ হবে। যামিনি বাবু কি বলেন?

যখের ধন

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানির আংশিক কার্য্যভার আপাততঃ রাধা ফিল্মসের কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সেইজন্য মন্তিমহলের নূতন বাণীচিত্র "যখের ধন"-এর চিত্র ও শব্দগ্রহণ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহিত হইতেছে।

"যখের ধন" লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায়ের লেখনিপ্রসূত রহস্য জনক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী।

'বকার নাশন' এখন সম্পাদনা গৃহে। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় ও যাহারা চিত্রগ্রহণের সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই এ চিত্রের সফলতা সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত।

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় এখন "নরনারায়ণ" বা "পুরুষোত্তমে"র কাজে ব্যস্ত। এর কাজ যাহাতে দ্রুত গতিতে চলে সে ব্যবস্থা করা হইতেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি।

পরিচালক ফণী বর্ম্মা দশরথ (রবি রায়) রাম (সুশীল রায়) ও লক্ষ্মণ (পঞ্চানন বন্দো-পাধ্যায়) সহ ঋষি বশিষ্ঠের (ধিরেন পাত্র) পরামর্শের দৃশ্য তোলা শেষ করিয়াছেন। কিরূপে বিশ্বামিত্রের কোপানল হইতে সূর্য্য বংশ রক্ষা পায় তাহারই উপায় উদ্ভব এই পরামর্শের উদ্দেশ্য। অতি বৃষ্টির জন্য রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্রের (অহীন্দ্র চৌধুরী) সহিত পরশুরামের সাক্ষাতের বহির্দৃশ্য তুলিতে পারা যায় নাই। এ সপ্তাহে তাহাই তোলা হইবে।

অহীন্দ্র চৌধুরী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী রাধা ফিল্মে বাংলা ছবির পরিচালক রূপে যোগ দিয়াছেন। এতদিন কেবল মাদ্রাজি ছবির পরিচালক রূপেই তিনি অন্য এক প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অহীন্দ্র বাবুর নির্দ্দেশ মত নিজের উপযুক্ত ভূমিকা-সহ গল্প লেখান হইতেছে।

সুরা ও নারী মোহ-মদিরায় উন্মত্ত কালকেতু। "দেবী ফুল্লরা"-র একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে চিত্রা, রাধারাণী ও অহীন্দ্র চৌধুরী।

৩০০শত দিবস পরে

মিঃ চিমনলাল দেশাই তাঁর ষ্টুডিওতে বসে আছেন, খুবই চিন্তামগ্ন এমন সময়ে এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে নমস্কার করে বল্লেন, আসতে পারি কি? মিঃ দেশাই খুবই সৌজন্য দেখিয়ে বল্লেন—নিশ্চয়, আসুন। তারপর উভয়ের ভেতর নানা বিষয়ের আলোচনা চলতে লাগল। ভদ্রলোক কথার মাঝে হঠাৎ এক সময় বল্লেন,—আচ্ছা মিঃ দেশাই আপনি "৩০০ শত দিবস পর" ছবি খানার একটা নূতন জিনিষ দেখাবার চেষ্টা করেছেন সন্দেহ নেই—কিন্তু কখনও এর পরিণাম ভেবেছেন কী?

মিঃ দেশাই বল্লেন—"না, ছবিখানা তোলার সময় আমি শুধু একথাই ভেবেছি যে এ দেশের ফিল্ম ব্যবসায়ে আমি নূতন এমন এক বিষয় উপস্থিত কর্ব্ব যা লোক হাসি মুখেই গ্রহণ কর্ব্বে। ওদের দেশে—হলিউডে অসংখ্য অপেরা ছবি তোলা হয়। নাচ ও গানের হুল্লোড় লেগেই আছে। প্রাণের খুশীতে ওদের জীবনটা যেন ঝক্ মক্ করছে। প্রাণ ভরে ওরা হাঁসতে জানে, কিন্তু আমাদের দেশের কথা স্বতন্ত্র। অভাবের তাড়নায়, দারিদ্রের কষাঘাতে জীবন হয়ে ওঠে দুর্ব্বিসহ। প্রাণকে পঙ্গু করে ফেলা হয় দুঃশ্চিন্তার করাল গ্রাসে। বেচে থাকাই যেন একটা বিড়ম্বনা। তাই এ ছবিতে আমি হাসির খোরাক যোগাতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। কিন্তু জীবনে যেমন একটানা হাসির স্রোত কখনও থাকেনা তেমনি যেটা সত্য চোখের জলের ভেতর তাও দেখিয়েছি।

মিঃ দেশাইয়ের উপরোক্ত কথায় নিশ্চয়ই আমাদের ধারনা হয়েছে "৩০০ শত দিবস পর" ছবিখানা কিরূপ হবে। বিভিন্ন ভূমিকায় সবিতা দেবী, মতিলাল বিব্বু প্রভৃতি রয়েছে। ছবিখানা শীঘ্রই প্রভাত সিনেমায় দেখান হবে।

ছায়াচিত্র জগতে সবিতা দেবীর নাম খুবই পরিচিত। কিন্তু এ ছবিতে তার অভিনয় তার পূর্ব্ব প্রতিভাকেও ক্ষুন্ন করেছে বলতে হবে। আবহাওয়ার পরিনতির সঙ্গে সমান তালে পা রেখে তিনি যে ভাবে এ ছবিতে অভিনয় করেছেন তা হয়েছে অনবদ্য, অপূর্ব্ব।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টিস

এদের "রূপোর ঝুমকোর" পরিবেশনার স্বত্ত পেয়েছে মতিমহল থিয়েটার্স। যাক্ এতদিন পর রূপোর ঝুমকোর একটা হিল্লে হোল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এদের পৌরাণিক চিত্র—"একলব্য"র চিত্র গ্রহণ নাকি শীঘ্রই সুরু হবে। শোনাগেল নায়িকারূপে অবতীর্ণা হবেন—শ্রীমতী লীলা হালদার—ছবি খানি রূপোর ঝুমকোর সঙ্গে মুক্তি লাভ করবে।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে "রাঙ্গী" এখানে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়বে। প্রথম সপ্তাহের জনসমাগম দেখে মনে হয় যে এ ছবির ভবিষ্যৎ ভালই। কুমার শচীন দেব বর্ম্মনের গান এ ছবির একটা প্রধান আকর্ষণ।

নৃত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা

সঙ্গীত প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু নৃত্য তাকে করে প্রাণবন্ত নৃত্য জীবনকে মূর্ত্ত করে তোলে। নৃত্য এনে দেয় কর্ম্মে প্রেরণা এবং জীবনের চলার পথকে নৃত্য করে লীলায়িত। এই নৃত্যকে যিনি নিখুঁত-ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত শিল্পী, প্রকৃত গুণী। নচেৎ নৃত্যের কোনই মূল্য থাকে না এবং তা হয় সম্পূর্ণ অর্থ হীন।

মন্দিরের নৃত্যরতা দেবদাসীকে রাজা বলপূর্ব্বক নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে। কামনার যে অগ্নি হৃদয়ে প্রজ্জলিত হয়েছে দেবদাসীর স্পর্শে তা নির্ব্বাপিত হবে। কিন্তু মন্দিরের পুজারিণী, দেবতার উদ্দেশ্যে সে উৎসর্গীকৃতা, মর্ত্তের মানবের সঙ্গে তার প্রেম কেমন করে সম্ভব। রাজা বল্লেন দেবদাসী তুমি আমার হও, আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব। মন্দিরে তুমি যে নৃত্য কর আমার প্রসাদও আজ তোমার ঐ অলক্ত রঞ্জিত পাদ-স্পর্শে ধন্য হউক। দেবদাসী তুমি নৃত্য কর। দেব-দাসীর প্রাণে তখন রুদ্র জেগে উঠল। সমগ্র সৃষ্টি বুঝি আজ ধ্বংস হবে।

দেবদাসীর ভূমিকায় এনাক্ষী রামা রাও এই নৃত্যের পরিকল্পনাটি অতি চমৎকার ভাবে ফুটিয়া তুলেছেন। ছবিখানার নাম 'হিমালয় কী বেটী' অথবা 'অমর প্রেম'—প্রভাত সিনেমায় শীঘ্রই দেখান হবে।

গুল বকাওলী

স্বপ্নে অনেকেই অদ্ভুত অবস্থায় উপনীত হন। কেউ বা রাজা হন, কেউ বা এমন এক দেশে চলে যান যেখানে দুঃখ দৈন্য বলে কোন কিছুর উল্লেখই থাকে না। এ রকম এক স্বপ্নের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে "গুল বকাওলী" উপকথার সৃষ্টি হয়। প্যারামাউন্ট ইণ্ডিয়ান সিবাটি এই কথাকে চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন। ছবিখানা আসছে রবিবার বেলা ১১টায় প্রভাত সিনেমায় দেখান হইবে, এই তেলেগু ছবিখানা ইতি মধ্যেই বহু স্থানে খুবই আদৃত হয়েছে।

সংস্কার

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র সেনগুপ্ত

ছোট্ট একটী পানের দোকানের পেছনে তদনুরূপ শোবার একটী মাত্র ঘর। দুটী প্রাণীর শোবার মত একটী তক্তপোষও আছে। তক্তপোষের ওপরে শতছিন্ন মলিন একটী বিছানা। বিছানায় শুয়ে কঙ্কালসার রোগক্লিষ্ট একজন প্রৌঢ় কিন্তু অচেনা লোক তাকে বৃদ্ধই বলবে এমনি তার চেহারা।

সংসারে মাত্র দুটী প্রাণী সে আর তার ছেলে। ঐ পানের দোকানে দুজনের বেশ চলে যেত। কিন্তু ম্যালেরিয়া তাকে এমনি-ভাবে আক্রমণ করে বসল যে দোকান করা ত দূরের কথা উঠে বসবার মত ক্ষমতাও ক্রমে সে হারিয়ে ফেলল।

ছেলেটীর বয়স মাত্র বার বছর। তার ভাবনাই সেবানন্দের মনটীকে অস্থির করে তুললো। সে ত পরপারের যাত্রীই, মরবার ভয় বা ভাবনা তার নেই।

"ভুপু."

"বাবা!"

ভগবান পিতার নিকট এসে দাঁড়াল।

"এক টুকরা সাদা কাগজ ও একটী সাদা লেফাফা যোগাড় করে নিয়ে এসত বাবা!

বালক চলে গেল।

সেবানন্দ বুঝতে পেরেছিল যে তার আর দেরী নেই। চিরতরে চোখ বুজবার পূর্ব্বে ভগবানকে ডেকে তার হাতে খামে বন্ধ চিঠিখানা দিয়ে বললো—"আমার আর দেরী নেই বাবা, মারা যাওয়ার পর শিরোনামা দেখে চলে সেও হয়ত ঠাঁই মিলবে—"

ভগবান পিতার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে উঠলো। সেবানন্দের চোখও জলে ভরে উঠল। কিন্তু ইহা যে বিধাতার সৃষ্টি রহস্য। মাত্র তের বছর পূর্ব্বেও ছিল এই সেবানন্দ মহাসুখী। বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না কোনকালেই। রূপে, গুণে, বিদ্যায় সে কারো কম ছিল না। মনিব জমিদারের নজরে পড়ে গেল। জমিদার করল তাকে একমাত্র কন্যার গৃহ শিক্ষক।

যুবক ও কিশোরী। বান্ধবতা সুদৃঢ় হতে কদিনইবা লাগে! কমাস চলে গেল দেখতে না দেখতে। হঠাৎ সেবানন্দ সুদূর পাঞ্জাব হতে ভাল একটী চাকুরীর খবর পেল। আশা-আকাঙ্খা প্রচুর মনে। পেটের সংস্থান হলেই কামনার কামনা করতে পারে নির্ভয়ে। অসীম উৎসাহে কামনাকে আশ্বাস দিয়ে চলে গেল সুদূর প্রদেশে।

বিধাতার বিচিত্র বিধান। পাঞ্জাবে পৌছেই সেবানন্দ পড়লো জ্বরে। দুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ তার নেই বটে, কিন্তু দেশে থাকলে ছিল বান্ধব—ছিল মনিব ছিল কামনা। কিন্তু বিদেশে……।

জ্বর নয় যেন সাক্ষাৎ যম। আক্রান্ত হওয়ায় ঘণ্টা তিনেক পরেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সে চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাকেই ফিরে পেয়ে চারদিকে তাকিয়েই বুঝলে যে সে হাঁসপাতালে।

কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছাও তার হল না। শুধু ভাবতে লাগলো কেমন করে এল সে হাঁসপাতালে। তারপর অনেক কথা। নানান দুর্য্যোগের ভিতর দিয়ে চার মাস কেটে গেল। একটু সুস্থ হয়ে ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত ফিরে এল ঘরে স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায়। গাঁয়ে পা দিয়েই জানতে পারলো যে কামনারা হাওয়া বদলাতে যাচ্ছে। কামনার সাথে দেখা করতে যেতেই সাক্ষাৎ হল মনিবের সাথে। মনিব তাকে গোপনে ডেকে রীতি-মত শাসিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। মনিবের আচরণে প্রথমে বিস্মিত হলেও অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে তার সময় লাগলো না। বুঝলে দুনিয়ায় পাপ ঢাকা থাকে না সে যত গোপনেই অনুষ্ঠিত হ'ক না কেন। অসীম বেদনায় মন ভরে উঠল। কলঙ্ক, ঘৃণা, লজ্জা ও অপমান মাথা পেতে নিয়ে সেবানন্দ বললো—"কামনাকে আমার হাতে—"

জায়গীরদার

সাগর মুভিটোনের হিন্দি চিত্র "জায়গীরদার" আসছে শনিবার থেকে প্রভাত সিনেমায় ৭ম সপ্তাহে পড়বে। এতে ছবি-খানির জনপ্রিয়তা যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই বুঝা যাচ্ছে। মায়া ব্যানার্জ্জির গান মতিলাল ও সুরেন্দ্রনাথের অভিনয় মিস্ বিব্বর ভাবাভিব্যক্তি ও এড্‌ভানির হাস্য কৌতুক প্রভৃতিতে ছাবিখানা চেত্রামোদী মাত্রেরই ভাল লাগবে।

চাপা গর্জ্জনে মনিব বল্লেন—"চুপ। নিঃশব্দে গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যাও অপদার্থ চরিত্রহীন।"

তীক্ষ্ণ একটা জবাব ঠোঁঠের কাছে এসে থেমে গেল। শুধু কামনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই অবণত মস্তকে সেবানন্দ তখনকার মত ধীরে ধীরে চলে গেল। কিন্তু চতুর মনিবের সঙ্গ সে ছাড়ল না। সেও চললো বিদেশে ছায়ার মত তাদের পেছন পেছন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

যথা সময়ে কামনার গর্ভজাত সন্তান কাশীর রাস্তা হতে কুড়িয়ে এনে সেবানন্দ বঙ্গের কোন এক অখ্যাত নামা পল্লীতে সংসার পেতে বসলো। উপার্জ্জন পানের দোকানে—সংসার ধর্ম্মপালন 'ভগবান'কে বুকে নিয়ে—এই হল তার ব্রত। এ সুখও তার কপালগুণে বেশী দিন রইল না। দারুণ ম্যালেরিয়া দিনের পর দিন তিলে তিলে তাকে মৃত্যুর কোলে টেনে নিয়ে চললো। সেই মায়ের কোলে মাথা রেখে দিয়ে গেল তার বড় আদরের ভগুকে "থামথাম্বা."

২

কলকাতার বুকে জনাকীর্ণ পথের মাঝে ভগবান নির্ব্বাক নিস্পন্দ। বার বছরের ছেলে দুনিয়ার বুকে এমন কেউ তার নেই যে এক মুঠো ভাত ও দুধের কথা একটু মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। চোখের জল শুখিয়েছে চোখের কোণে বিশ্ব সংসারের কেউ ত মুছিয়ে দেয়নি। তাই বড় আশা বুকে নিয়ে থামথানা সযত্নে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে পেটের কাছে গুঁজে পথ চলে চলে এসে পৌঁছবে কলকাতায় যদি কার দেখা পায়। বাবা ত তায় বলেছেন "হয়ত বা ঠাঁই মিলবে।"

ট্যাকে ছিল সম্বল উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত আটগণ্ডা পয়সা। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে এক পয়সার মুড়ি খেয়ে রাস্তার কল থেকে পেট ভরে জল খেয়ে নিল। তারপর একটী পথিককে জিজ্ঞেস করে আবার চলতে লাগলো।

হঠাৎ বাঁ পাশ দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাস্ সোঁ করে চলে গেল। ভগবান ভয়ে দৌড়ে দিয়ে সরে যেতেই একটা কলার খোসায় পা পড়ায় পড়লো পিছলে ফুটপাথের ওপর। মাত্র একটা শব্দ শোনা গেল— উঃ—"দুর্ঘটনা দেখে লোকজন জমে গেল বটে কিন্তু প্রথমে কেউ তেমন সাজ্ঘাতিক
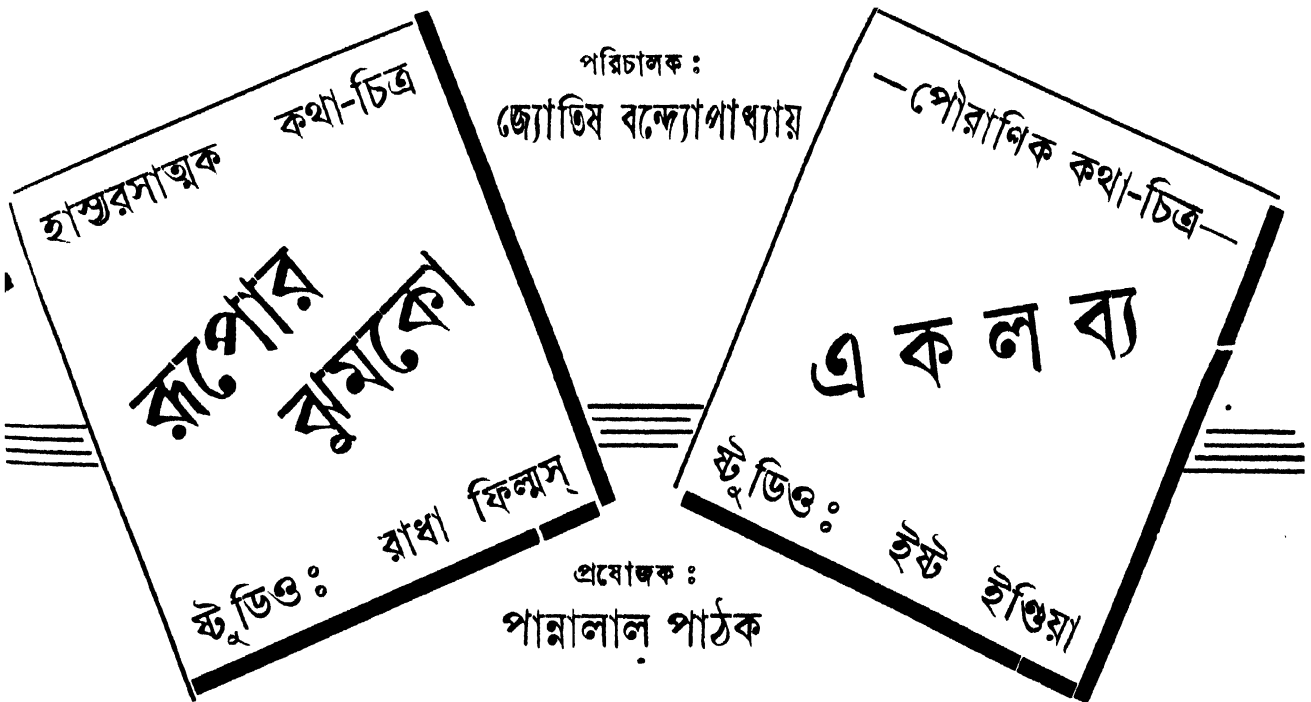
মনে করলো না। কিন্তু অচিরেই সমবেত জনতার বিশ্বাস হল যে ছেলেটা সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কলের জলের ঝাপসায় জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা সফলকাম না হওয়ায় সবাই মিলে ভগবানকে হাঁসপাতালে নিয়ে চললো যদিবা ছেলেটাকে বাঁচান যায়।

৩

"মনতু, তুমি ভয়াবক দুষ্ট, হয়েছ। যাও পড়তে যাও, মাষ্টার এসে বসে রয়েছেন।"—বলতে বলতে এক সুশ্রী বিধবা এসে মনতুর কাছে দাঁড়াল। এমন সময় বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য সরকারী শ্যামদা সেখানে এসে বললো—"এই নাও মা। একজন লোক এই চিঠিখানা নিয়ে এসে বলছে তোমাকে এক্ষুনি হাঁসপাতালে যেতে। এই চিঠির মালীক একটা ছেলে নাকি সেখানে মাথায় আঘাত লাগায় মৃত্যুশয্যায়।

মলিন দুমরান লেফাফাখানার উপর তার নাম দেখে ও শ্যামদার কথা শুনে কামনা বিস্মিত হল। পত্র খুলে মনে মনে পড়তে লাগলো।

—তোমাকে নাম ধরে ডাকবার বা সম্বোধন্ করবার অধিকার আমার আর নেই' কাজেই সম্বোধনহীন চিঠিই আমাকে লিখতে হলো। তোমার বাবার কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলুম ও তোমাকেও চেয়েছিলুম। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন—জানি না তুমি এসব জান কিনা! আজ আমি মৃত্যুশয্যায়, তোমার প্রথম সূত্র আমার সম্মুখে মিথ্যা কি সত্য কি ভাবে কোথায় ছিলুম, সে সব কথা সবিস্তারে না বললেও এরূপ সময় মিথ্যা যে বলবনা এ কথা দিনের আলোর মত সত্যি। পাঞ্জাব হাঁসপাতালে খোঁজ করলেই সবিশেষ খবর পাবে। যাক্, বিতাড়িত হয়ে ভাবলুম প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু কিভাবে তা কোনও রকমেই স্থির করতে পারছিলুম না। হঠাৎ কে যেন কানে কানে বলে দিল—"তোমার এ সন্তানের স্থান কি পথের ধুলোয়? তুমি তার জনক হয়ে নিষ্পাপ শিশুকে অবহেলা করবে তাতে যে আরও পাপ হবে। তার চেয়ে ওকে পালন করে দুনিয়ার বুকে মানুষ করে ছেড়ে দাও।" চোখ খুলে গেল, কর্ত্তব্য জ্ঞান হল, দিব্যজ্ঞান পেয়ে তোমাদের পেছনে পেছনে ঘুরে ভগুকে কুড়িয়ে পেলুম কাশীর এক অখ্যাতনামা গলির বুকে। বুকে করে মানুষ করবার চেষ্টা করেছিলুম সেদিন থেকে কিন্তু সাধ মিটলো না। অসমাপ্ত কর্ত্তব্য রেখেই যেতে হচ্ছে, কারণ বেশ বুঝতে পাচ্ছি মরণ ঘনিয়ে এসেছে। তাই চোখের আলো নিভে যেতে না যেতে দু-লাইন লিখে খামে বন্ধ করে দিলুম আমাদের ছেলে ভগুর হাতে। যদি কোন ছেলে এ পত্রের বাহক হয়ে যায় দেখেই চিন্‌তে পারবে যে, সে কে? তারপর যা তোমার অভিরুচি। মায়ের আদর পায়নি সে, অথচ নিরপরাধ—। তোমার কর্ত্তব্য তোমার কাছে—যা হয় করো, আমি—।

কামনার মনে হ'ল যেন কে তাহার বুকখানার ভিতর অনবরত কি দিয়ে ঘা দিচ্ছে। চোখ দুটীর জল ত দূরের কথা সমস্ত রক্ত যেন এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল।

কতকাল—কতদিন পরে......।

কাশীর সেই মহাদুর্দ্দিনের পরেই দেহ সবল হতে না হতেই পিতা বিয়ে দিয়ে দিলেন ধুমধাম করে বড় ঘরে। কলঙ্ক রটেনি সুচতুরা মাতার চাতুর্য্যে কর্ম্মদক্ষ পিতার কার্য্যপদ্ধতিতে। সেবানন্দ ও অপমান হজম করেই নিরুদ্দেশের পথে চলে গেছে। কাজেই বেশ নিশ্চিন্ত মনে সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল। মনতুর জন্মের পাঁচ বছর পরেই সে হল বিধবা। সেই মনতু এখন ন'বছরের ছেলে। চলমান সংসার কি চমৎকার। আবার ঘুরে এল বিস্মৃতির কোলে চাপা দেওয়া প্রথম জীবনের প্রণয় প্রতীক ঠিক দশ বছর পরে। এ যে বড় কঠিন সমস্যা—অভাবনীয় ভয়ঙ্কর পরীক্ষা! উপায়! কিন্তু ছেলেটার ত কোনও অপরাধ নেই! সন্তানের চেয়ে সমাজ বড় হল! চোখ দুটী জলে ভরে উঠলো কিন্তু কামনার চোখের জল চোখেই চেপে রাখলো। ধরা গলায় বললে "শ্যাম, গাড়ী বার করতে বল হাঁসপাতালে যেতে হবে, সেখানে—"

"সেখানে কে মা?"

"একটী ছেলে—।" বলে ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেল। ভয়, যদি শ্যাম আরও কোন প্রশ্ন করে বসে।

দশ মাস দশদিন গর্ভে ধরেছিল বলেই পারলে না তাকে অবহেলা করতে কিন্তু সত্যিকার পরিচয় দিতেও তার সংস্কারে বাঁধলো। তাই অচিরেই দেখা গেল সেবানন্দের চিঠিখানা রান্নাঘরের উনোনের আগুনে দপ দপ করে জ্বলে উঠতে। ছাই চাপা দিল ভগুর জন্ম বৃত্তান্ত কিন্তু কামনার বুকের মাঝে তাই বেঁচে রইল মৃত্যুর মত ভয়াবহ হয়ে।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—সাত—

অমলের পিতা মহীতোষ সান্যাল সে-কালের লোক ঠিক একথা বলা যায় না। কলিকাতায় শেয়ারের কার্য্য করিয়া তিনি দেশে বিলক্ষণ জমিজমা কিনিয়াছিলেন এবং ভবানীপুরে বাসাবাটীও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র, একটী ছোট আদালতের উকীল, নাম কমল সান্যাল অপরটী সাহিত্যিক, নাম পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত আছেন। মহীতোষবাবু অত্যন্ত রুক্ষ প্রকৃতির লোক; অর্থটাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার টাকা ধার দেওয়া কারবার ছিল এজন্য অনেক খাতকই তাঁহার নাম সকালে উঠিয়া করিত না এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিলে নানাবিধ অনর্থ হইয়া থাকে এরূপ প্রচারও করিত। মহীতোষবাবু পুত্র দুইটীর বিবাহে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিবেন বহুদিন হইতেই এরূপ ইচ্ছা পোষণ করিতেন এবং প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের নিকট বলিতেন, কমল অমল তো শুধু আমার ছেলে নয়, ওরা দুটো জমিদারী। কমলের বিবাহে তিনি আশানুরূপ অর্থ পাইয়া একটী হিপোপটেমাসের ন্যায় সুন্দরী ও সুষ্ঠু বধূ ঘরে আনিয়াছিলেন এবং অমলের জন্য পাত্রী নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় যখন অরুণ মহীতোষ বাবুর নিকট বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত হইল তখন মহীতোষ সর্ব্বপ্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন কণার জন্য অরুণ কতটা খরচ করিতে পারে। অরুণ উত্তরে বিনীতভাবে নিবেদন করিল, "দেখুন, সান্যাল মহাশয়, ওরা অত্যন্ত গরীব, আপনায় বলতে মেয়েটীর কেউ নেই। ভাই মৃত্যুকালে হাজার দুই টাকা মাত্র রাখিয়া গিয়াছিল সেই টাকার উপর আমি বড়জোর একহাজার খরচ করিতে পারি।"

ক্রুদ্ধ সান্যাল বলিলেন, "এই তিন-হাজার টাকার বাজী ধরে অমলের মত গ্রাজুয়েট সাহিত্যিক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা কইতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল অরুণ। আজকাল ম্যাট্রিক পাশ ছেলের দাম পাঁচ-হাজার টাকা, তা জান?"

"আজ্ঞে, আপনি যে ছেলে বিক্রীর ব্যবসা সুরু করেছেন তা আমার জানা ছিল না, সান্যাল মশায়। আচ্ছা আরও শ' পাঁচেক আমি দিতে পারি, আপনি দয়া করে মেয়েটাকে আপনার ঘরে স্থান দিন এই আমার অনুরোধ।"

গম্ভীর কণ্ঠে সান্যাল উত্তর করিলেন, "তোমার অনুরোধ রাখতে গিয়ে তো আমি অমলের ভবিষ্যতটা নষ্ট করতে পারবো না বাপু। কোথাকার কে, চাল নেই চুলো নেই, একটা উল্লেখযোগ্য পরিচয় নেই, উপযুক্ত পাওনা নেই; এমনি একটা মেয়েকে ঘরে আনবার জন্য অনুরোধ করাটা একটা ধৃষ্টতা—লেখাপড়া জানা ছেলে তুমি তোমার জানা উচিত ছিল।"

অরুণ পুনরায় মিনতির কণ্ঠে বলিল, "দেখুন, মেয়েটী সুন্দরী, দেখলে আপনার পছন্দ হবে।"

অত্যন্ত বিরক্তভাবে মহীতোষবাবু বলিলেন, রেখে দাও তোমার সুন্দরী। সুন্দরী নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর এতই যদি সুন্দরী তো তুমি নিজেই তাকে বিয়ে করনা বাপু—হিন্দু সমাজে তো দুটো তিনটে বিয়ে চলে। তাতে সুন্দরীটী আর টাকাগুলো তোমার বাড়ীতেই থাকবে।"

উত্তেজিত হইয়া অরুণ বলিল, "দুটো তিন-টে বিয়ে আপনাদের মত হিন্দুরই সাজে। আমাদের সাজে না। আমরা—অহিন্দু কিনা তাই দয়াধর্ম্ম এখনও পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিনি সান্যাল মশায়। আপনি টাকার বোঝা না পেলে বিয়ে দেবেন না, ভাল, তাই-ই স্পষ্ট করে বলুন, এত উপদেশ না দিলেও চলতো।"

—"বড় বাচাল তুমি হে অরুণ। দেখ আমি তোমার খাতক নই যে মেজাজ দেখাচ্ছ; ওই সামনে দরজা আছে ভাল চাও তো বেরিয়ে যাও।"—বলিয়া মহীতোষবাবু দরজার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া দিলেন।

ক্রোধে ও অপমানে অরুণের সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে ক্রোধ দমন করিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহিরে আসিল ও আপনার গাড়ীতে উঠিয়া আপনার গৃহে ফিরিল। সাগ্রহে শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "গিয়েছিলে অমলদের বাড়ী, সব ঠিক করে এলে তো?"

"অমলের সঙ্গে কণার বিয়ে হবে না "বলিয়া ধপ করিয়া অরুণ চেয়ারে বসিয়া পড়িল ও টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া শুভ্রা পুনরায় বলিল, "কেন গো, কি হয়েছে?"

"এখানে তো আমি বলতে পারবো না শুনতে চাও তো আমার সঙ্গে গাড়ীতে এস।"

কিছুক্ষণ পরে অরুণ ও শুভ্রা বায়স্কোপ দেখিতে যাইবার ছল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

—আট—

কণা, অরুণের সহিত শুভ্রার কথাবার্ত্তা দূরে থাকিয়া শুনিয়াছিল। সে বুঝিল অমলের পিতার সহিত অরুণের যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল তাহা মোটেই আশাপ্রদ

নয়। অমলের সহিত তাহার বিবাহ হইবে না একথাও অরুণ শুভ্রাকে বলিয়াছিল। অথচ এদিকে অরুণ সম্বন্ধে শুভ্রা তাহাকে সন্দেহ করিতে সুরু করিয়াছে। অধিকদিন তার এখানে থাকা ঠিক নয় কণা তাহা বুঝিত। তবে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে, এই বিশাল পৃথিবীতে জগদীশ্বর তাহার মাথা গুঁজিবার স্থানও রাখেন নাই। সে নিরাশ্রয়, অবলম্বনহীনা, তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। ইহারা অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিয়েছেন তাই সে বাঁচিয়া আছে। নতুবা হয় তাহাকে আত্মহত্যা করিতে হইত নয়তো অনাহারে মরিতে হইত। সে তাহার ভাগ্য আলোচনা করিতে বসিল—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতা চিরবিদায় লইয়াছেন। চার বৎসর বয়সে তাহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সংসারের একমাত্র অবলম্বন অসীম স্নেহশীল ভ্রাতাও তিনমাস পূর্ব্বে তাহাকে ফেলিয়া অমরাবতীতে আশ্রয় লইয়াছেন। এ পৃথিবীতে আপনার বলিতে তাহার কেহ নাই! সে শুধু একা—নিতান্ত নিঃসঙ্গ ও অবলম্বনহীনা। সে ভাবিল তাহার মরাই উচিত। কারণ ভগবান এক রূপ ভিন্ন তাহাকে আর কিছুই দেন নাই; বরং তাহার যাহা কিছু ছিল তাহাও কাড়িয়া লইয়াছেন। এই হতভাগ্য জীবনটাকে বহণ করা যে কত কষ্টকর কণা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারে কিন্তু তথাপি সে অরুণকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। এই প্রলোভন যে তাহার পক্ষে অন্যায় তাহাও সে বুঝিয়াছিল। আজ তিনমাস যাবৎ আপনার মনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং বারংবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। শুধু দেখা মাত্র—চোখের দেখা—এই দেখিবার আশা সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

আজ কণা স্থির করিল সে পালাইয়া যাইবে। এমন কোথাও পালাইয়া যাইবে যেখান হইতে চেষ্টা করিয়াও সে অরুণকে দেখিতে পাইবে না। শুভ্রার জীবনে কণ্টকস্বরূপ হইয়া সে আর এ বাটীতে থাকিতে চাহে না।

তাহার এই চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া অমল ডাকিল, "কণা।"

কণা চমকিত হইল, দেখিল তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমল তাহাকে ডাকিতেছে। কণা উঠিয়া দাড়াইল; অত্যন্ত ভীত হইয়া সে বলিল, "ওরা সব বেরিয়ে গেছেন। আপনি বাড়ী যান অমলবাবু।"

আবেগের আতিশয্যে অমলের কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইতেছিল সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "তা আমি জানি কণা।"

"জেনেও আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন?—ভাল করেন নি অমল বাবু—আপনি বাড়ী যান।

অমল বলিল, "আজ তোমার হাতে আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে কণা, তুমি আমায় রক্ষে কর।

কণা বিস্ফারিত নেত্রে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমল পুণরায় বলিতে লাগিল, "তুমি শুনেছ বোধহয় কণা, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার বাবা মোটেই রাজী নন। কিন্তু আমি তোমায় না পেলে কিছুতেই বাঁচব না। আমার সমস্ত জীবন বিফল হয়ে যাবে।"

সব শুনিয়া কণা বলিল, "দেখুন অমল-বাবু, আপনার পিতামাতার অমতে আমায় বিয়ে করা কিছুতেই উচিত নয়; আর আমার মত ভিখারিণীর ওরকম আশা করাই বৃথা। আপনি আর কোন কথা বলিবেন না অমলবাবু, আপনি বাড়ী যান। অমল পকেট হইতে একটা কাগজের পুরিয়া বাহির করিল ও কণাকে বলিল, "দেখছ কণা আমার কাছে এই তীব্র বিষ আছে; এর নাম পোটাসিয়ম সাইনায়েড এ খেলে এখুনি আমার মৃত্যু হবে। তুমি যদি আমার কথায় রাজী না হও তাহ'লে আমি এই বিষ খেয়ে তোমার সামনে আমি আত্মহত্যা করব। আমি মান, সম্ভ্রম, টাকা, পয়সা, সমাজ কিছু চাই না; আমি তোমায় ধর্ম্মমতে বিবাহ করে নূতন করে জীবন গড়তে চাই। বল কণা তাতে তুমি রাজী আছ কিনা?

কণা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত ক্ষণকাল দাড়াইয়া রহিল পরে বলিল, "আপনি সত্য বলছেন অমলবাবু আমায় ধর্ম্মমতে বিবাহ করবেন! তা যদি করেন তাতে আমি রাজী আছি। আমিও আর এমন করে বেঁচে থাকতে পারছি না।"

অমল আর কোন কথা না বলে কণার হাত ধরে বাইরে বাহির হইয়া আসিল ও বলিল, "চল কণা, একুনি চলে যাই আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।" কণা বলিল, "আপনি এদের বলে যাবেন না?" অমল বলিল, "না, অরুণ ও বৌদিদি তাতে রাজি হবেন না। আজই আমরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাব।" কণা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অমলের সহিত গাড়ীতে বসিল। মার্কেটে গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অমল কিনিয়া লইল পরে উভয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া পৌছিল।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া অমল কণাকে লইয়া একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিল। সে গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। কয়েক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িল। হাওড়া ষ্টেশন পার হইয়া রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিল আপনার গন্তব্য পথে। কণা গাড়ীর এককোণে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিতেছিল ভগবান তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। আজিকার এই অভিসারের পরিণাম কি?

অমল কয়েক মিনিট মুগ্ধ দৃষ্টিতে কণার দিকে চাহিয়া রহিল ও পরে তাহার দৃঢ় বক্ষের উপর একরূপ জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া কণার আরক্ত ওষ্ঠে প্রেম চিহ্ন নিবিড়ভাবে আঁকিয়া দিল।

—নয়—

শুভ্রার নিকট অরুণ তাহার অপমান কাহিনী বর্ণনা করিয়া বহুল পরিমানে স্বস্তি অনুভব করিল। পরে ষ্ট্রাণ্ড, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি ঘুরিয়া যখন স্বামীস্ত্রীতে বাটী ফিরিল তখন রাত্রি ১০৷৷৹টা বাজিয়াছে। বাটী ফিরিয়া অরুণ আপনার টেবিলে বসিয়া চিঠিপত্র খুলিতে বসিল; শুভ্রা স্বামীর আহারের আয়োজন করিতে ভিতরে গেল। কয়েকখানি পত্র উল্টাইয়া অরুণ দেখিল নিতান্ত পরিচিত হস্তাক্ষরের শিরোনামা লেখা একটী খাম। পোষ্ট অফিসের ষ্ট্যাম্প দেখিয়া অরুণ বুঝিল অদ্য বেলা ১২টায় উহা জেনারেল পোষ্ট আফিসেই পোষ্ট করা হইয়াছে। সে পত্রখানি খুলিয়া ফেলিল।

পত্রখানি এইরূপ :—

অভিন্নহৃদয় বন্ধু,

আমার পিতার মত লইয়া জানিলাম যে কণার সহিত তিনি আমার বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক। অতএব তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিওনা।

কণাকে না পাইলে আমার জীবন ও মৃত্যু সমানই বোধ করি। এইজন্য আজ কণাকে লইয়া আমি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিব; কণা যদি আমার সহিত যাইতে রাজি না হয় তবে পৃথিবী ছাড়িয়া এমন দেশে আশ্রয় লইব যে আমাকে শত অন্বেষণেও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না। আমাকে ক্ষমা করিও।

ইতি—

পত্রখানি পাইয়া অরুণ যে শুধু বিস্মিত হইয়াছিল তাহা নহে একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাহার দৃঢ়চিত্ত বারংবার কাঁপিয়া উঠিল। সে কলিং বেলটী টিপিয়া ধরিল। ঠিক এই সময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুভ্রা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—

"ওগো, শুন্‌ছ শুন্‌ছ কণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ম্লান হাসি হাসিয়া অরুণ বলিল, "তা আমি জানি।"

"তুমি জান? তুমি জান্‌লে কি করে?" বলিয়া শুভ্রা বসিয়া পড়িল।

অরুণ ধীরকণ্ঠে বলিল, "এই দেখ, তুমিও আমার মতই জানতে পারবে," বলিয়া অরুণ শুভ্রার হস্তে পত্রখানি দিল। পত্র পাঠ করিয়া শুভ্রা বলিল, "তবে কি হবে? তাদের কি ফিরিয়ে আনা যায় না?"

"না, যেতে দাও। যারা গেছে তাদের কথায় আর কাজ নেই। যেতে দাও।"

"তোমার কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না, এতদিন ছিল আমাদের এই বাড়ীতে।"

শুভ্রা তাহার আয়ত চক্ষু দুইটী অরুণের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "একটুও কষ্ট হচ্ছে না তোমার?"

"না শুভ্রা, একটুও নয়; বরং আজ আমি নারীচরিত্র জানবার সুযোগ পেয়েছি। আজ বুঝেছি তাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া, প্রেম কৃতজ্ঞতা কিছুই নাই। তারা বোঝে নিজেদের সুখটাকে সবচেয়ে বেশী। যাও—বিরক্ত করো না। সে আমাদের কেউ ছিল না; আজও কেউ নয়।"

শুভ্রা ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল—দ্বারের নিকট যাইতেছিল—কিন্তু অরুণ উঠিয়া আসিয়া দুই হস্তে তাহার হাত দুইটী দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "সত্যি বল শুভ্রা, তুমি তো আমাকে ছেড়ে যাবে না?"

দৃঢ় কণ্ঠে শুভ্রা বলিল, না গো না, এ দেহ থাকতে তোমায় ছেড়ে যাব না—যাব না। তুমি সরে গেলেও আমি যাব না—তুমি—তুমি ছাড়তে চাইলেও নয়। ঘৃণা করলেও নয়—অত্যাচার করলেও নয়—এমন কি চোখের সামনে যদি অন্য নারীর বাহু-বন্ধনে বদ্ধ থাকতে দেখি তবুও নয়। তবু তোমায় ছেড়ে যাব না।"

দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া অরুণ একটী শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শুভ্রার মাথাটী নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ক্ষণকাল পরে শুভ্রা আদরের সুরে বলিল,

"তুমি মন খারাপ করোনা লক্ষ্মীটি।"

* * *

ইহার পর দুই তিন মাস কাটিয়া গেল। শুভ্রা লক্ষ্য করিল অরুণের দীপ্তমুখ যেন ম্লান হইয়া আসিতেছে। অরুণ হাসে, কাজ করে কিন্তু তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই, যেন বিদ্যুত চালিত যন্ত্র। তাহার প্রতি অরুণ কোনপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার করে না, তথাপি তাহার ব্যবহারে চিরদিনের উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের অভাব শুভ্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। অরুণকে দেখিলেই শুভ্রা বুঝিতে পারে তাহার দেহ ও মন যেন অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিলে অরুণ বলে, "পাগলামো করোনা আমি বেশ আছি শুভ্রা। বরং তুমিই দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।" একদিন সত্যই অরুণ অসুখে পড়িল এবং ডাক্তারদের উপদেশ মত শুভ্রা, অরুণকে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘর যাত্রা করিল। (ক্রমশঃ)

হেমচন্দ্র পাঠাগার
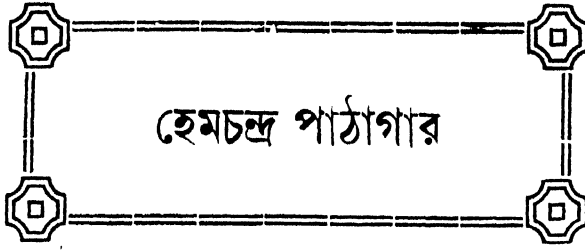
এমন একদিন ছিল যখন খিদিরপুর বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তার কবিতীর্থ নাম হয়েছিল। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল এখানেই বাস করে গেছেন। তাঁদের অনেক কাব্য ও কবিতা এখানেই রচিত হয়েছে। কিন্তু আজ সে নিস্ব। বাংলার আধুনিক সাহিত্যে খিদিরপুরের দান এতটুকুও নেই। কাব্যের পূত রসধারা আর এখানে প্রবাহিত হয় না। পদ্মপুকুরের নির্ম্মল জল এখনও টলমল করে কিন্তু ভাবের প্রেরণা তার থেকে আর আসে না। আজকালের পরিবর্ত্তন তার জীবনেও পরিবর্ত্তন এনেছে। নির্ব্বিঘ্ন শান্তির জীবন তার চলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে অরূপ রূপের স্বপ্নও তার ভেঙ্গে গেছে। যে অবিমিশ্র অবসরের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি তা তার ভাগ্যে আর জোটে না। সকাল থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অন্নবাস্ত্রের চিন্তাতেই তার কেটে যায়। মাথার ঘাম পায় ফেলে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও উদরান্নের সংস্থান সে করতে পারে না। আগের মত সূর্য্য এখনও ওঠে, বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাট নতুন আলোয় তেমনিই হাসে, কিন্তু তা দেখে মুখে কারও হাসি ফোটে না, সে শোভা দেখতে ঘর ছেড়ে কেউ ছুটে বারও হয় না। সকালে উঠে ঘরের জানালা খুলে দিলেই দেখা যায় অগণিত শ্রমিক ছুটে চলেছে কর্ম্মের উদ্দেশে। পরণে তাদের ময়লা জীর্ণ বস্ত্র, মুখে তাদের দারিদ্র্য ও ব্যস্ততার ছাপ। ইহাই কবিতীর্থের আধুনিক রূপ, মধুসূদন হেমচন্দ্রের খিদিরপুরের এই হল বর্ত্তমান অবস্থা।

কিন্তু ভাব সম্পদে তারা আজ দীন হীন হলেও যে পরলোকগত মহাকবিগণ তাদের বাসভূমিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন তাঁদের তারা ভোলে নি। তাঁদের প্রতি ভক্তি এতটুকুও হ্রাস পায় নি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের স্মৃতি হৃদয়ে জাগরুক রাখবার, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার প্রত্যেক উপলক্ষ্যটিকে আগ্রহের সহিত চেয়ে থাকে। রঙ্গলাল, মাইকেল দত্ত, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট তৈরি হয়েছে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় রাখবার মানসে, সমগ্র যুবক সম্প্রদায় মিলে বৎসর বৎসর "বাণী বন্দনা" ও "মধু মিলন" উৎসবের আয়োজন করে তাঁদের প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদনের আকাঙ্খায়, তাঁদের চিন্তা তাঁদের ভাবে সর্ব্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে মাইকেল ও হেমচন্দ্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মধ্যে। যে কেহ এখানে এলেই দেখতে পাবেন সমগ্র পল্লীটি যেন স্বর্গীয় কবিগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নে মণ্ডিত হয়ে আছে। রঙ্গলাল ভবন নিত্য নূতন রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। হেমচন্দ্রের অতি পুরাতন বাটীখানি সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে। বাটীর সম্মুখস্থ সুবৃহৎ পুষ্করিণী তটে শীঘ্রই কবির মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ছবি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উন্মুক্ত রাখবার জন্যে।

হেমচন্দ্র পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি-কল্পে যুবক সম্প্রদায় যে দবিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। অসাধ্য-সাধন করেছে বলতে হবে। প্রথমে খোলার ঘরে, তারপর ভাড়া বাড়ী, তারপর নিজস্ব দ্বিতল অট্টালিকায় সে স্থান পেয়েছে। একটি বক্তৃতা হলও তৈরি হয়েছে। তিন তালে পরিণত করা হয়েছে বলতে হবে। পুস্তকের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার, সভ্য সংখ্যা প্রায় চারিশত। করপোরেশনের সর্ব্বোচ্চ সাহায্য সে পেয়ে থাকে। এক কথায়, সমগ্র দক্ষিন কলিকাতার মধ্যে এইটিই বৃহত্তম লাইব্রেরি।

একটা কথা আছে "যেখানে বাঙ্গালী, সেখানেই দলাদলি," খিদিরপুরেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অনেক প্রতিষ্ঠান এখানে আছে এবং দলাদলিও আছে অনেক। কিন্তু একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, হেমচন্দ্র পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে ১৩১৪ সালে, সুদীর্ঘ এই ৩২ বৎসরের মধ্যে পাঠাগারের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনে কখনও ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। যে বৎসর যে নামের তালিকা উপস্থিত করা হয়েছে এক-বাক্যে সবলে তাহাই মেনে নিয়েছেন। পরলোকগত কবি ও তাঁর স্মৃতিমন্দিরের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা কতখানি এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি।

শিক্ষার বিস্তার কল্পে লাইব্রেরীর সহায়তা কি রূপ তা বোধ হয় আজকালকার দিনে কাহারও অবিদিত নাই। লেখাপড়া চর্চ্চার সুযোগে বঞ্চিত জনৈক পল্লী-বন্ধু একবার আমাকে বলেছিলেন "ভাই, একদিন যে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নিয়ে বার হয়েছিলাম সে কথা যেন আজ আর বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না।" কথাটা যে কত দুঃখে তিনি বলেছিলেন তা বোধহয় অনুমান করতে পারা যায়। যে গ্রামে তিনি বাস করেন সে-খানে লাইব্রেরির অভাবটা যে কতবড় অভাব তা তিনি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব

করেছিলেন। বাস্তবিক লেখাপড়া চর্চ্চার যদি সুযোগ না থাকে মানুষ লেখাপড়া শিখেও নিরক্ষর হয়ে পড়ে। পল্লীগ্রামে যাঁরা উচ্চপ্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়ে অন্ন কাজে যোগ দেন শেষ জীবনে তাদের অনেকেরই এই অবস্থা ঘটে। শিক্ষার বিস্তার কল্পে লাইব্রেরির সহায়তা তাই অপরিমেয়। স্কুল, কলেজের দরজা মাড়াননি, রাত্রে বাড়ীতে কাজের অবসরে একটু লিখতে পড়তে শিখে, পরে উত্তর জীবনে লাইব্রেরির সাহায্য নিয়ে মহাপণ্ডিত হয়ে গেছেন, কলেজের অধ্যাপক এবং আইন সভার সদস্যপদ আপন যোগ্যতার জোরে লাভ করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত জগতে অনেক মেলে। পাঠাগার, স্কুল কলেজ ছাড়া ছেলেদের স্কুল কলেজ বিশেষ। কিন্তু স্কুল কলেজের মত এখানে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের মধ্যে মন নিবিষ্ট করে থাকতে হয় না। যাঁর যে বিষয়ে অভিরুচি যত ইচ্ছা পড়াশুনা করে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারেন। জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি কল্পে হেমচন্দ্র লাইব্রেরি এপর্য্যন্ত কতটুকু কাজ করেছে তার হিসাব নেবার সময় এখনও আসেনি। তবে এ আশা একেবারেই দুরাশা নয় যে, এই হেমচন্দ্র পাঠাগারকেই কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে কবিতীর্থে আবার একটি লেখক সঙ্ঘ গড়ে উঠবে। এবং সেইদিনই আসবে "হেমচন্দ্র পাঠাগার" নামের চরম সার্থকতা।

শ্রীপ্রিয়লাল দাস।
সহঃ পুস্তকাধ্যক্ষ, হেমচন্দ্র পাঠাগার।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীবাণভট্ট

বিগত ১৮ই এপ্রিল সোমবার সকাল ৯টায় সম্মেলনের চতুর্থ ও শেষদিবসের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে প্রতিযোগিনীগণের অন্যতমা কুমারী ইভারানী রায় একখানি গজল গান করেন। কুমারীর গানের পর Programme Director মহাশয় নিবেদন করিলেন যে, কোনও শিল্পী উপস্থিত না থাকায় Demonstration আরম্ভ হইতে অন্ততঃ দশমিনিট দেরী হইবে। কিন্তু দশ মিনিটের জায়গায় প্রায় আধঘণ্টা সময় চলিয়া যাইবার পর কুমারী উমা মিত্র ভৈরবীর একখানি ঠুমরী গান আরম্ভ করেন। Programme আরম্ভ হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল ৮টায়, কিন্তু সুরু হইল ত ৯টায়—তারপর একজন প্রতিযোগিনীর গান হইতে না হইতেই পুনরায় আধঘণ্টা ধরিয়া শ্রোতৃবর্গকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের management-এর যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা যে অতি অগৌরবের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহারা হয়ত এইরূপ অছিলা তুলিবেন যে শিল্পীরা যথা-সময়ে উপস্থিত না হইলে তাঁহারা কেমন করিয়া programme এর নিয়মমত ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু, এরূপ অছিলা যাঁহারা দেখান তাঁহারা কেবল নিজেদের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন। কারণ, প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এলাহাবাদে গত কয়েক বৎসর যে Music Conference চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে ত পূর্ব্বোক্তরূপ Mismanagement হইতে দেখা যায় না। সেখানকার কর্ত্তৃ-পক্ষগণের পক্ষে যদি বিভিন্ন শিল্পীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনাইয়া তাঁহাদের গানের বা বাজনার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে All Bengal Music Conference-এর পক্ষেই বা তাহা অসম্ভব হইবে কেন? নিজেদের আলস্য, ঔদাসীন্য ও অক্ষমতার জন্য তাঁহারা যে দেড় ঘণ্টা সময় অযথা নষ্ট করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে সেই দারুণ-গ্রীষ্মে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিলেন তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে কি? তাহা ছাড়া প্রথমদিকে এই ভাবে সময়ের অপ-ব্যবহার করিলে অনর্থক বেলা ২৷৩টা পর্য্যন্ত সময় অধিবেশন শেষ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহার পরে আবার ৫৷৷০টার সময় আসিয়া রাত্রি ১১৷৷০।২টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া programme শোনা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি বিবেচনা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বোধহয় যাহাতে অকারণ সময়ের অপব্যবহারে শ্রোতৃবর্গের অসুবিধা না হয় সেদিকে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হইত।

যাহা হউক, কুমারীর গজল গানের পর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রথমে সুর-বাহারে জৌনপুরীর আলাপ করিয়া পরে

সেতারে আলাহিয়া বিলাবল রাগের গদ বাজান। জৌনপুরীর আলাপ ভালই হইয়াছিল কিন্তু সেতারটীর তারগুলি যথাযথভাবে বাঁধা হয় নাই বলিয়া গৎবাজনা মোটেই হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। সেতারবাজনার পর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভৈরবী এক খানি টপ্পা গান করেন। সেদিন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কণ্ঠে টপ্পার যে মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তাঁহার যৌবনের সাধনারই পরিচয় দেয়। টপ্পাগানের পর কুমারী বীণাপাণি মুখার্জ্জি জৌনপুরীর খেয়াল ও একখানি ভজন গান করেন। কুমারীর গানের পর প্রোঃ সৌকত আলি খাঁ সাহেব সুরশৃঙ্গারে টোড়ি রাগের আলাপ করেন। আমরা ভালরূপেই জানি যে খাঁসাহেব একজন গুণী রবাবী। কিন্তু তিনি যে কয়েক-বৎসর এই Conference-এ যোগদান করিয়াছেন, সে কয়েক বৎসরের মধ্যে একবারও তাঁহাকে রবাব বাজাইতে শুনা গেল না। সম্মেলনের অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষগণ হয়ত খাঁসাহেবের রবাব সাধনার পরিচয় না জানিতে পারেন কিন্তু সম্মেলনের সভাপতি নাটোরাধিপতির (যাঁহার দরবারে খাঁসাহেব অনেক দিন ছিলেন) নিকট-ত এ সংবাদ অবিদিত থাকিবার কথা নহে। সুতরাং মহারাজ স্বয়ং খাঁসাহেবের রবাব বাজাইবার programme করেন নাই কেন? আমরা অবশ্য মহারাজকে এই সম্মেলনেই নিজমুখে বলিতে শুনিয়াছি যে, এ বৎসর programme স্থির করিবার সময় উদ্যোক্তারা মহারাজের অজ্ঞাতসারেই programme এর সকল ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছিলেন এবং মহারাজেরই মৌখিক অনুমতিরও অপেক্ষা রাখেন নাই। এক্ষেত্রে সঙ্গীতরসিকগণের জিজ্ঞাস্য এই যে, মহারাজের ন্যায় সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ ও গুণী সহৃদয় সামাজিককে সভাপতিরূপে পাইয়াও যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ সে সৌভাগ্যের যথোচিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা না করেন তাহা হইলে তাঁহারা কি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্যই এরূপ একজন নিরভিমান ও non-interfering ব্যক্তিকে সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন? যাহা হউক, সুরশৃঙ্গার বাজনার পর বারাণসীর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত খেয়ালিয়া প্রোঃ রামু মিশ্র বিলম্বিত একতালায় ও দ্রুত ত্রিতালিতে দুইখানি টোড়ি গাহিয়া পরে ভৈরবীর একখানি ভজন গান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভজন গানটী আরম্ভ করিতে না করিতেই মিশ্রমহাশয়ের ভাগ্যে Director মহাশয় নিয়ন্ত্রিত লালবাতির উদয় হইলে তিনি গানটী অসমাপ্ত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িলেন। মিশ্রমহাশয়ের খেয়াল গানের রীতি ও ঢঙ্ তাঁহার ঘরানা গৌরবের উত্তম পরিচয় প্রদান করে এবং তিনি যে স্বল্পকাল ধরিয়া ভজনটী গাহিয়াছিলেন তাহাতে সহৃদয় চিত্ত যে উল্লসিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। মিশ্রমহাশয়ের গানের পর রামপুরষ্টেটের বিখ্যাত তবলিয়া প্রোঃ থেরাকুয়া সাহেব ঢিমা তিনতালে তবলায় লহরা বাজান। ইহার বাজনা অতি উপভোগ্য হইয়াছিল। লহরা বাজনার পর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বেলা ১-২০ মিনিটের সময় গান আরম্ভ করেন। পণ্ডিতজী ভাবোজ্জ্বল-উদাত্তকণ্ঠে প্রথমে ভৈরব-বাহার রাগের পরপর দুইখানি খেয়াল গান ("মেরে বসন্ত কি মোবারক" ও "যৌবন রে") গাহিয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভৈরবী-ভজন (যোগি মতজা মতজা) গান করেন। পণ্ডিতজীর গানের পর বেলা প্রায় পৌনে-তিনটার সময় ঐদিনের প্রাতরনুষ্ঠান শেষ হয়।

সান্ত্বনালাভ

শ্রীহিল্লোল কুমার বিশী

যৌবনের ফুলবনে করিয়া প্রবেশ
থমকি' দাঁড়ানু আমি ক্ষণকাল তরে—
চারিদিকে কতো ফুল ধরি কতো বেশ
ফুটিয়াছে রাশি রাশি থরে থরে থরে।
ধাধিল নয়ন মোর কাঁপিল হৃদয়—
চমকি উঠিনু আমি দেখি শত রূপ—
কতো আশা জেগে উঠি' হ'ল পুনঃ লয়
উদ্বেলিত হৃদয়েতে রহিলাম চুপ!
হঠাৎ দেখিনু দূরে সরোবর মাঝে
জাগিছে অসংখ্য বীচি পবন-হিল্লোলে
গলিত রজত প্রায়, সেথানেতে রাজে
রক্তিম কমল এক কেঁপে দুলে দুলে।
ফুটন্ত পাঁপড়িগুলি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়
আমার নয়ন কোণে উঠিতেছে জেগে—
দয়িতের বক্ষ রক্ত যেন মাখি গায়
উঠিতেছে রক্তিম হয়ে, শিহরণ লেগে!
বিকশিত সৌরভেতে দিগন্ত প্লাবিত
অবাক হইয়া আমি সেই দিক পানে
চলিতে লাগিনু ধীরে; হইতে মিলিত
বিকচ কমল সাথে, নীরব সে গানে!
মর্ম্মর সোপান পড়ে সলিলের পাশে
আসিলাম ধীরে ধীরে, আপনার মনে—
তুলিতে বাড়ানু হাত, মৃদু মৃদু হাসে—
নিজেরে সে সঁপি দিল, মম আলিঙ্গনে
বুকেতে চাপিয়া ধড়ি লইনু আঘ্রাণ—
কোমল সে দল পড়ে করিনু চুম্বন—
পাগল হইল মোর দেহ মন প্রাণ
আবেশে বিহ্বল মোর নাচিল এ মন!
তখনও বুঝি নাই সেই সে কমল,
চিরকাল মনে মোর শিহরণ আনি
প্রেমের মধুর স্পর্শে করিবে অমল
শীতল বক্ষেতে মোরে রাখিবেগো টানি।

—*—

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

রেবা সবে ম্যাট্রিক আর রতীন বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে এমন সময়, ওদের হয়ে গেল বিয়ে। রেবা যে স্কুলে পড়তো রেবার বাবা নীতিশবাবু ছিলেন সেখানকার শিক্ষক আর রতীনের বাবা মাধববাবু ছিলেন পলাশ-পুরের বিদ্যোৎসাহী তরুণ জমীদার রমেন-বাবুর নায়েব। স্কুলে রেবা শান্তশিষ্ট মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমানযুগের ঢেউয়ের তালে যখন অন্যসব মেয়ের দেহ নাচতে সুরু করেছিল তখন রেবার মনেও সে নাচের দোলা লেগেছিল। নীতিশবাবুর নামের সঙ্গে স্বভাবের বেশ মিল ছিল অথচ চাকুরী বজায় রাখবার জন্যে মুখ বুজে মেয়েদের আধুনিক হবার প্রাণপন চেষ্টা দেখে যেতেন কারণ স্কুলের কর্ত্তাদের সবাই ছিলেন এই প্রচেষ্টার পক্ষপাতী। তাই নিজের সব নৈতিক মতামত খাটাতেন রেবার ওপর। এই ঢেউয়ে পড়ে রেবা যাতে তলিয়ে না যায় তার জন্যে বাড়ীতে তাকে নীতিশবাবুর উপদেশ দেওয়ার অন্ত ছিল না। কাজেই রেবার মনে নাচ, গানের ঢেউ লাগলেও বাইরে তা ফোটাবার উপায় ছিল না, স্কুলে সে সপ্রশংস, মুগ্ধ অথচ নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো এই নৃত্যগীত, হাস্য ক্রীড়াচঞ্চল মেয়েদের পানে। দেখতে দেখতে তার মন ভেসে যেতো বাবার নিষেধের গণ্ডির বাইরে অনেক দূরে—সে কোন্ কল্পলোকে। হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে সে ফিরে আসতো বাবার বিধি নিষেধে-ঘেরা রঙ্বিহীন বাস্তবরাজ্যে।

রতীনকে কাছাকাছি কোন মফঃস্বলের কলেজে না দিয়ে মাধববাবু যে তাকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলেন তার মূলে ছিল বিদ্যোৎসাহী, তরুণ জমিদার মনিবের আন্তরিক আগ্রহ এবং অর্থ সাহায্য। অথচ আজকালকার সিনেমা, সভাসমিতি, স্বদেশ উদ্ধার, নাচ গানের জলসায় ভিড়ে ভবিষ্যৎ নষ্ট না করার উপদেশ, সুবিধে পেলে মুখে এবং নিয়ত চিঠিতে কোলকাতায় পাঠাতে কসুর করতেন না। রতীন কলেজে ছেলে-দের উৎসাহে উজ্জ্বল মুখের পানে চেয়ে কি ভাবতো সেই জানে। হোষ্টেলের ছোট ঘরটিই তার জগত। সেখানে সে থাকতো, পড়াশুনো করতো আর মাঝে মাঝে হোষ্টেলের সামনে ছোট পার্কটিতে গিয়ে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে তার মন ভেসে যেতো সুদূরের কোন্ মায়ারাজ্যে। তারপর হঠাৎ তাকেও ফিরে আসতে হোত বাস্তব রাজ্যে।

রেবা যখন স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন স্কুলের সেক্রেটারীর দৃষ্টি পড়লো শান্ত-শিষ্ট, সুন্দরী এই মেয়েটির ওপর। স্কুলের পারিতোষিক্ বিতরণ উৎসব উপলক্ষ্যে তখন অভিনয়ের জন্যে মেয়ে বাছাই চলছিল। সেক্রেটারী নীতিশবাবুকে রেবাকে অভিনয় করবার অনুমতি দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সেক্রেটারীর এই অনুরোধের অন্তরালে যে আদেশ ছিল সেটা বুঝতে পেরে নীতিশবাবু বাধ্য হয়ে মত দিলেন কারণ তার অনুরোধ না রাখার ফল যা দাঁড়াবে তা এই বুড়ো বয়সে তাঁর বা তাঁর সংসারের পক্ষে সফলজনক হবে না এটা বুঝতে তাঁর দেরী হয়নি।

রতীন একা কত কি ভাবতো আর সেগুলো প্রকাশ করতো গল্পে বা গানে। সেগুলো ক্রমে সে মাসিক, সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগলো আর সে গুলো প্রকাশিত হোতে লাগলো। কাগজে রতীনের গান, গল্প পড়ে রমেনবাবু ভারী খুশী হয়ে মাধব বাবুর কাছে ছেলের সুখ্যাতি করলেন আর তাকে এ বিষয়ে বাধা না দিয়ে উৎসাহিত করতে অনুরোধ করলেন। এ অনুরোধ না রাখার ফলটা বুঝে বুদ্ধিমান নায়েব ছেলেকে বাধা দিলেন না তবে বিশেষ উৎসাহিতও করলেন না।

বাবার উপদেশপূর্ণ চিঠির সংখ্যা যত কমে আসতে লাগলো রতীনের খাতার পাতা ততই লেখায় ভরে উঠতে লাগলো। রাশ-মুক্ত তেজী ঘোড়া যেমন নিজের গতির খেয়ালে ছোটে রতীনের কলমও তেমনি চলার ফলে শীঘ্রই তার লেখক বলে নাম রটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্ধুও জুটলো। তাদের আগ্রহে সে সভাসমিতিতে আর নিয়মিত ভাবে সিনেমায় যাওয়া আরম্ভ করলে। তবে পড়াশুনোয় তার ঝোঁক ছিল বলে সেদিকে বেশী অবহেলা, বা অনাস্থা এলো না।

রেবার দাদা মনীশ ছিল রতীনের সহপাঠি। মনীশের অনুরোধে রেবার অংশে নাটকে যে দুখানা গান ছিল তার বদলে রতীন নতুন দুখানা গান লিখে দিলে, আর যেদিন রেবাদের অভিনয় হোল সেদিন মনীষের অনুরোধে রতীনও গেল অভিনয় দেখতে। রেবার গলা ছিল মিষ্টি তার ওপর শিক্ষা আর নিয়ত চেষ্টার ফলে অভিনয়ে গান গেয়ে রেবা সকলের প্রশংসা পেলে। নীতিশবাবুও মনে মনে মেয়ের এই সুনামে খুশী হলেন। মনীষের মধ্যস্থতায় রেবা আর নীতিশবাবুর সঙ্গে রতীনের পরিচয় হয়ে গেল।

লেখা পড়ায় ভাল, সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছে তবু রতীনের ভদ্র, সরল, অমায়িক ব্যবহারে নীতিশবাবুর তাকে খুব ভাল লেগে গেল। তারপর থেকে রতীন প্রায়ই নীতিশবাবুর বাড়ীতে যেতে লাগলো। মনীশ ছিল রতীনের প্রিয় ভক্ত আর রেবারও রতীনকে বেশ লাগতো। ক্রমে পরিচয় যখন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো তখন রেবা রতীনকে ভাল বেসে ফেললে। রতীন তো আগেই রেবাকে ভালবেসেছিল।

নীতিশবাবু সব দেখে শুনে তলে তলে রতীনের বাড়ীর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে মনীশকে রতীনের অভিলাষটা জেনে নিতে বল্লেন আর রতীনের মনের যে খবরটুকু পেলেন তাতে উৎসাহিত হয়ে মাধববাবুকে একখানা চিঠিতে নিজের মনের কথা খুলে লিখলেন। মাধববাবুও চিঠির কি জবাব দিতেন বলা যায় না। কিন্তু রমেনবাবু খবরটা শুনেই উৎসাহিত হয়ে নায়েব মশাইকে রাজি হতে বল্লেন। রতীনের মত ছেলের রেবার মত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত এই হোল তাঁর মত।

বিয়ের পর কিছুদিন রতীন রেবাকে নিয়ে গাঁয়ের বাড়ীতে রইলো। এই সময়ে একদিন রতীনের রমেনবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হোল। পাশের খবর বেরোলে রতীন কি করতে চায় তা রমেনবাবু জানতে চাইলেন। মাধববাবুর মত, সে আইন পাশ করে উকিল হয়ে বসলে জমীদারীর মোকর্দ্দমা গুলো তো পাবেই তার ওপর যা হয়। দুই মিলিয়ে আজকাল নতুন উকিলের যা হবে তা তুচ্ছ করবার মত নয়। রতীনের ইচ্ছে, কোলকাতায় থেকে মাসিকে নবীন উৎসাহে লেখা শুরু করে। আগেই তো সে নাম করে নিয়েছে। তার ওপর যদি সমস্ত সময়টুকু সে সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত করতে পারে তাহলে তার ভবিষ্যৎ সে উজ্জ্বল বলেই মনে করে। শুনে রমেনবাবু তাকে খুব উৎসাহিত করলেন। প্রথম প্রথম রেবার গাঁয়ের জীবন কতকটা ভাল লেগেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রানহীন পল্লীজীবন আর একঘেয়ে সংসারের ওপর তার মনে মনে বেশ বিরক্তি এসে গিয়েছিল।

রতীন কথাটা রেবার কাছে পাড়তেই সে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে কোলকাতায় যাবার বন্দোবস্ত করবার জন্যে রতীনকে চেপে ধরলে। সব দিক থেকে উৎসাহ পেয়ে রতীন কথাটা বাবার কাছে পাড়লে আর জমীদার মশাইয়ের মতটাও তাঁকে জানিয়ে দিলে। এমন কি এ বিষয়ে তিনি যে তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন সে খবরটাও মাধববাবুর অজানা রইলো না।

প্রথমে আপত্তি তুলে শেষে রতীনের জেদ দেখে মাধববাবু বল্লেন "দেখ বাপু, এসব আমি মোটে বুঝিনে। তবু বাবুর যখন ইচ্ছে আর তিনি যখন সাহায্য করবেন তখন করো, যা তোমরা ভাল বোঝ।"

রতীন রেবাকে নিয়ে কোলকাতায় রমেনবাবুর ছোট একখানা বিনাভাড়ার বাড়ীতে এসে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করলে। সে আগে যে সব মাসিকে, সাপ্তাহিকে লেখা দিতো তাদের অফিসে গিয়ে কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করলে। তাঁরাও রতীনকে খুব উৎসাহিত করলেন এবং সাহসও দিলেন। রতীনবাবুর মত যুবকরাই তো গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করে নতুনের সন্ধানে চলবেন। নইলে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। তাঁরা মাসে মাসে কিছু পারিশ্রমিক রতীনকে দেবার আশ্বাসও দিলেন। দেশ থেকে কিছু আসতো আর বাড়ীর ভাড়া তো লাগতোই না। রতীনের সাহিত্য সাধনা এক রকম চলতে লাগলো। বিশেষ করে সাহিত্যিকের সংসারের সাধারণ খরচ তো আর এমন বেশী নয় আর হওয়া উচিতও নয়। রতীন নিজের কাজের খোঁজে এদিক ওদিক ঘোরে, বাকী সময়টা নিজের ছোট ঘরে বসে লেখে। রেবা যা পারে রাঁধে বাড়ে, রতীনের সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু শেষে তার সময় কাটা ভার হয়ে উঠলো। তার ওপর রতীনকে সে যে কোলকাতায় আসতে উৎসাহিত করেছিল তার পেছুতে নিজেরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে স্বপ্ন সে ছাত্রী জীবনে দেখতো অথচ নানা কারণে তা সার্থক হয়নি এখন বাধাবিহীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্ন আবার তাকে পেয়ে বসলো। সে মেয়েদের এক সমিতির সভ্য হয়ে পড়লো। সেখানে নাচ, গান, সাহিত্যচর্চ্চা থেকে মেয়েদের উন্নত করবার সব রকম আয়োজনই ছিল। মাঝে মাঝে দুঃস্থ পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যের জন্যে অভিনয়ের বন্দোবস্তও হোত। রেবা দেখলে ওদের দলে আন্তরিকভাবে যোগ দিলে তার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন সফল হতে পারে। রেবা "গীতবীথির" কাজে মন প্রাণ ঢেলে দিলে। কিন্তু ওদিকে নির্জ্জন ঘরে একজন যে মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছে সাহিত্য সাধনায় তার হতে লাগলো নানা রকম অসুবিধে। নিজের দলে রেবার তখন গায়িকা বলে খুব নাম। তার ওপর "গীতবীথি"র সব রকম সৎকাজে তার অসীম উৎসাহের ফলে সে আজকাল দলের প্রধান অগ্রণী হয়ে উঠেছে। নব্য সভ্য মিসেস দত্ত আজকাল "গীতবীথি"র সকলের রেবাদি।' তার দিন কাটে মন্দ নয়। কিন্তু রতীনের ঘটতে লাগলো সাধনায় নানা বাধা, অসুবিধা।

একে তাদের কেউ সংসারের বিশেষ কিছু জানে না। রেবা যদিও বা কিছু জানতো তা সেও আজকাল থাকে বাইরে বাইরে। এদিকে রতীনের যে অর্থের বিশেষ স্বচ্ছলতা তাও নয়। ঘর দোর গোছগাছ করবার কথা উঠলেই রতীনের জাগে প্রেরণা আর রতীন বেরোলে তার স্নানাহারের

ব্যবস্থা না করেই রেবাকে বেরিয়ে পড়তে হয় "গীতবীথি"র জরুরী কাজে। রেবা যে এটা না বুঝতো তা নয়, তবু ভাবতো রেকর্ড আর রেডিয়োতে গান দেওয়ার পাকা একটা ব্যবস্থা করে নিয়েই সে রতীনের দিকে নজর দেবে আর রতীনও ভাবতো উপস্থিত যে উপন্যাসখানা ধরেছে সেখানা শেষ করলেই রেবার কাজে সাহায্য করবার জন্যে একটা বয় রাখতে পারবে। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উপন্যাসখানা শেষ হলেই কোন প্রকাশক সাদরে নিয়ে নেবে আর বেনো জলের মত বইখানা বাজার ছেয়ে ফেলবে। তাদের সুদিনের যখন আর দেরী নেই তখন উপস্থিত ঘর ঝাড়া, হাটবাজার করার কাজ করে সময় আর হাত নষ্ট করবে কেন? তাদের ভেতরে লুক্কায়িত যে প্রতিভার দীপ্তি মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাচ্ছে সেটা একবার ভাল করে ফুটলে আর লোকে তার কদর বুঝলে আর তাদের পায় কে? এতো আর স্কুল মাষ্টার কিম্বা নায়েবের সংসার নয়।

এদিকে তাদের সংসার চলছিল স্কুল মাষ্টার আর নায়েবের স্নেহের দানেই। নীতিশবাবু রেবার কাজের সমর্থন না করলেও তাঁর স্ত্রী লুকিয়ে মেয়েকে যা পারতেন সাহায্য করতেন। কিন্তু রেবার রেকর্ডে কিম্বা রেডিয়োতে মোটে সুবিধে হোল না আর রতীনের উপন্যাস যে কোন প্রকাশক নিয়ে নেবে এমন আশা দেখা গেল না। তবু নিজেদের সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ ছিল না আর কেউ নিরাশও হয়নি। তবে কিছু সুবিধে যে হচ্ছে না তার জন্যে মনে মনে দুজনেই পরস্পরকে দায়ী করতো আর একজনের অন্যের ওপর বিশ্বাসও ছিল না। আজও সংসারের কথা উঠলেই রতীনের জাগে প্রেরণা আর রেবারও যখন তখন আসে "গীতবীথি" থেকে ডাক।

কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগমায়া—ওরে পাষাণী, তুই কি কোরে একথা ব'ললি! দিলীপকে ছেড়ে তুই একদণ্ডও বাঁচতে পারবি!

সুনীলা—তোমরা ব'ললেই পারবো জ্যাঠাই মা।

যোগমায়া—কিন্তু বিয়ে তো ক'রতেই হবে। কার গলায় 'তবে মালা দিবি বল?—ওরে, সে যে তোরই জন্যে ব'সে আছে যেন যুগ যুগান্ত ধ'রে! তুই যে তার নয়নের মণি!—আমি মায়ের চোখ নিয়ে দেখে এসেছি, তুই দেখিস্‌নি?

সুনীলা—জানি আমি জানি।...কিন্তু তোমাদের জন্যে যদি আমার এটুকু ছেড়ে দিতে হয়, আমি ছেড়ে দোব। আর বিয়ে? কতো লোক যে বিয়ে না কোরেও থাকে!—ওর জন্য কোন ভাবনা নেই।

(প্রস্থান)

(কাশীশ্বরের প্রবেশ)

কাশীশ্বর—নীলা চলে গেল?

যোগ—হ্যাঁ।

কাশীশ্বর— চোখে কি জল দেখলে তার?

যোগ—তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে পেতে সে জল নয়, সে আর কিছু। দাঁড়িয়ে বুঝি সে ছবি দেখতে পারলে না?

কাশীশ্বর—না। এ রকম অভিভূত আমি জীবনে মাত্র একবার হয়েছিলাম, আর আজ হ'লাম

যোগমায়া—অভিভূত। তুমি মানুষের দুঃখে অভিভূত হ'তে পার? দয়ামায়া বলে কোন বস্তু তোমার অন্তরে আছে!

কাশীশ্বর—যদি না থাকতো ভালো হ'ত। দয়ামায়া দুজনেই একদিন বিষপাত্র আমার মুখের কাছে ধ'রেছিল। 'সে বিষ আমি আকণ্ঠ পান করিয়াছিলাম। সেই থেকে আমি বোধ হয় নীলকণ্ঠ!—যেয়ো না, পালিয়ে যেও না যোগমায়া। মর্ম্মের কথা আজ তোমার কাছে উজাড় ক'রে দিতে চাই, যেয়ো না তুমি।

যোগমায়া—জানি, সব জানি।

কাশীশ্বর—কিন্তু কণ্ঠের বিষ আজ সর্ব্বাঙ্গে নাবতে সুরু করেছে তা জান না। দেবতা যা সহ্য ক'রে নিয়েছিলেন, মানুষ আমি, বোধ হয় আর সহ্য করিতে পারব না।

(দিলীপ ও মনীষার প্রবেশ)

কাশী—এই যে দিলীপ! কি দিলীপ?

দিলীপ—একটা কথা ছিল।

কাশী—বলো ?

দিলীপ—পরেশ।

কাশী—ও, পরেশ!—

দিলীপ—পরেশ আমায় ধরেছে আপনাকে বলতে যাতে তাকে ক্ষমা করা হয়।

কাশী—পরেশের অপরাধটা জান বোধ হয়?

কাজেই পূর্ব্বের "শুনছো" আজকাল "কানের মাথা খেয়েছ" কিম্বা "কি আপদ হোল তোমাকে নিয়ে" তে এসে দাঁড়িয়েছে।

(ক্রমশঃ)

মনীষা—পরেশের একলারই অপরাধ নয় দাদা, বাবারও ছিল।

দিলীপ—চুপ কর তুই।—পরেশের অপরাধ কি জানি। সে হিসেবে তাকে ক্ষমা করা মোটেই যায় না। কিন্তু আমি জিনিষটা অন্য দিক দিয়ে ভাবছিলাম।

কাশী—কি বলো শুনি?

দিলীপ—ভাবছিলাম ওর ঘাড়ের কথা। ওর স্ত্রীপুত্র পরিবারের কথা। এই দুর্দিনে আবার একটা বাঙালী পরিবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো—ভাবছিলাম সেই কথা।

কাশীশ্বর—দিলীপ, আমি তাকে বরখাস্ত ক'রেছি। তুমি যদি তাকে ক্ষমা করো, আজ আমি তোমার বিচারই মেনে নোব—তুমি যদি খুশী হও।

দিলীপ—কিন্তু তুমি ওকে ক্ষমা না কোরলে আমি কি করে ক্ষমা কোরতে পারি!

কাশীশ্বর—ও, আচ্ছা, আমার হয়েই তুমি ওকে ক্ষমা কোরো—

(দিলীপ প্রস্থানোদ্যত কিন্তু মনীষা তাহাকে ধরিয়া বলিল)

মনীষা—না, তুমি না। আমি আগে খবর দোব। খবরদার তুমি আগে আসতে পাবেনা—(বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)

দিলীপ হাসিয়া বলিল: পরেশ ওকেই সুপারিশ কোরেছে প্রথম, তাই ও আগে খবর দেবে।—অদ্ভুত!

(প্রস্থানোদ্যত)

কাশীশ্বর—দিলীপ!

(দিলীপ ফিরিল)

আমার একটা কথা।

যোগমায়া—আবার তুমি ওকে কি কথা বলতে চাও। না না আর কথা নয়, —না।

কাশীশ্বর—সে কথা আমি না জিজ্ঞাসা করে পারব না, চুপ করো। দিলীপ, তুমি উইলের বিষয় কিছু বলতে চাও না?

দিলীপ—না, কিছু বলতে চাই না।

কাশীশ্বর—কেন চাওনা?

দিলীপ—আপনার সিদ্ধান্ত এতই ভালো যে আমার কিছু বলবার নেই। সমস্ত সম্পত্তি দ্বিজেনের নামে থাকার ফলে ওর দায়িত্ব-জ্ঞান বাড়বে, কার্য্যকুশলতা বাড়বে। জীবনের পথে সত্যকার অভিজ্ঞতা লাভ কোরতে পারবে।—আমি এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি বাবা।

(প্রস্থান)

যোগমায়া—দিলীপ দীর্ঘজীবী হও! মায়ের আশীর্ব্বাদ—কোন দিন কোন অমঙ্গল তোকে স্পর্শ কোরতে পারবে না!

কাশীশ্বর—যোগমায়া, উৎসব করো! তোমার গৌরবান্বিত সন্তান, উৎসব করো। আমি আঘাত কোরতে এসে পরাজিত হ'য়ে ফিরে চললাম, উৎসব করো!

(প্রস্থানোদ্যত)

যোগমায়া—কিন্তু একটা কথা বলে যাও।

কাশীশ্বর—বলো—

যোগমায়া—ভক্তি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, পূজা—যা কিছু দেবতার কাছে দেয়—দিলীপ সব তোমায় দিয়েছে। কোন আত্মজ সন্তানও এর বেশী তার বাবাকে দিতে পারে না। বিনিময়ে তুমি কেন দিতে পারবে না পুত্রের পরিপূর্ণ গৌরব? আত্মজ আর অনাত্মজ নিয়ে তুমি কেন সংঘাতের সৃষ্টি কোরবে?

কাশীশ্বর—সংঘাত আমি সৃষ্টি করি না, সংঘাত সৃষ্টি করে আমার রক্ত প্রবাহ। সৃষ্টি করে দ্বিজেনের জন্মদাতা ব'লে যে এক স্বার্থপর ব্যক্তি এর মাঝখানে বসে আছে, সে

যোগমায়া—সুনীলার সঙ্গে দিলীপের মিলন পথেও বাধা সৃষ্টি করে কি তারাই?

কাশীশ্বর—সে বাধা সৃষ্টি কোরে গেছে সুনীলের বাবা। ছোট, এতটুকু মেয়েকে আমার কোলে তুলে দিয়ে ওর বাবা আমায় বলেছিল মেয়েটি আমি তোমায় দিলাম, কাশীশ্বর। তুমি ওকে তোমার পুত্রবধূ কোরো। পুত্র বলতে সে অবশ্য বুঝেছিল আমার আত্মজ। সুনীলা কিন্তু ভালবাসলে এক সাধুর সন্তানে।

যোগমায়া—থাক্ থাক্—ওগো থাক্। আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরতে চাইনা—

(দিলীপ ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া যোগমায়া মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। শেষের কথা আর তাহার বলা হইল না। দিলীপ প্রশ্ন করিল)

দিলীপ—কে সাধুর সন্তান বাবা?

কাশীশ্বর—তুই—তুই সাধুর সন্তান দিলীপ!

দিলীপ—(হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল) আমি!—তুমি তা হ'লে সাধুও ছিলে একদিন?

কাশীশ্বর—হঁ্যা দিলীপ, একদিন সাধুও ছিলাম আমি!

(প্রস্থান)

দিলীপ—মা, তুমি তো কৈ আমাকে এ কথা কোনদিন বলোনি?

(যোগমায়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপলক নেত্রে শুধু চাহিয়া আছেন। মুখ দেখিয়া মনে হয় তাহাতে রক্তের লেশ মাত্র নাই। দিলীপের প্রশ্নে তাঁহার যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, ধীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন)

যোগমায়া—ভেবেছিলাম একদিন তুমি জানতেই পারবে, আমার বলবার দরকার হবে না। তাই বলিনি। (বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন)

দিলীপ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—

যবনিকা নামিয়া আসিতেছে......

(ক্রমশঃ)

(সি, বি)

বার্ম্মা দলের শেষ খেলা

গত সোমবার ক্যালকাটা মাঠে বার্ম্মা হইতে আগত ফুটবল দলটির সহিত আই এফ এ ভারতীয় দলের খেলাটি অমীমাংসীত-ভাবে শেষ হয়েছে। এইটি বার্ম্মা দলের কলিকাতায় তৃতীয় এবং শেষ খেলা। এই খেলাটির এইরূপ পরিণাম হওয়ায় ফুটবল খেলায় যে তিন প্রকার ফলাফল হতে পারে বার্ম্মা দল তিনটি খেলায় সেইরূপ তিন প্রকারে খেলাগুলির শেষ নিষ্পত্তি করে সসম্মানে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। পূর্ব্বেকার দুইটি খেলা অপেক্ষা এই শেষ খেলাটি অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। যদিও এই খেলাটি অমীমাংসীত ভাবে শেষ হওয়ায় বার্ম্মা দলের সৌভাগ্যের প্রকাশ পেয়েছে তাহা হলেও তাদের খেলা অতিশয় প্রশংসনীয় হয়েছিল। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে স্থানীয় ভারতীয় দলের যে এই খেলাটিতে জয়ী হওয়া উচিৎ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মুর্গেশের ব্যর্থতা এবং আগন্তুক দলের গোল রক্ষক বাসিনের চিত্তাকর্ষকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন স্থানীয় দলকে বিজয়ী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল। মুর্গেশ একটি পেনাল্টি কিকের সহজ সুযোগ গ্রহণ করতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত আরও অন্ততঃ তিনটি অব্যর্থ গোল প্রদানের সুযোগ কার্য্যে পরিণত করতে পারেন নি। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কতকাংশে এই দোষে দোষী করা গেলেও তিনি একটিমাত্র গোল প্রদান করে পরাজয়সূচক গোলটি পরিশোধ করায় তাঁর ক্রটির অখ্যাতি অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে। তাহা ব্যতীত ভারতীয় দলের অধিকাংশ আক্রমনগুলির মূলেই তাঁহার দক্ষতা দৃষ্ট হয়েছিল। প্রথমার্দ্ধে উভয় দলই সমভাবে আক্রমন করে অনেকগুলি গোল করবার সুযোগ নষ্ট করেছিল। সেগুলির মধ্যে মুর্গেশের পেনাল্টি সট্ হইতে গোল করিতে না পারা সর্ব্বাপেক্ষা হতাশার সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতীয় দলের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও বার্ম্মা দল ষোলো মিনিট অতিবাহিত হবার পর এই খেলাটিতে প্রথম গোল করেন ১—০ গাগসলে এই গোলটি করবার সৌভাগ্যলাভ করেন। তার চার মিনিট পরে লক্ষ্মীনারায়ণ পেনাল্টি সীমানার বাহির হইতে একটি তীব্র সট করিয়া পরাজয়সূচক গোলটি পরিশোধ করেন ১—১। প্রতিপক্ষ দল দুইটির আরও কয়েকটি সুযোগ ব্যর্থ হইবার পর কোন শেষ নিষ্পত্তি না হয়ে খেলাটি শেষ হয়। ভারতীয় দলের নির্ব্বাচিত অধিনায়ক এস দত্ত এবং নির্ম্মল ঘোষ যোগদান না করায় তাঁহাদের স্থলে যথাক্রমে পি দাস গুপ্ত এবং পাথী সেন খেলছিলেন। কে ভট্টাচার্য্য ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। এই দলের কে দত্ত, পি দাস গুপ্ত, বিমল মুখার্জ্জি, বেণীপ্রসাদ, পাথী সেন, লক্ষ্মীনারায়ণ, কে ভট্টাচার্য্য, এবং প্রসাদের খেলা উল্লেখ-যোগ্য হয়েছিল। আগন্তুক দলের বাসিন্, দীনা, স বেলী, বাবা এবং পাগসলে সন্তোষ-জনক ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

আই, এফ, এ দল:—কে দত্ত (ইষ্টবেঙ্গল), পি দাস গুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল) এবং আর মজুমদার (ইষ্টবেঙ্গল); বিমল মুখার্জ্জি (মোহনবাগান), বি সেন (ইষ্টবেঙ্গল) এবং বেণীপ্রসাদ (মোহনবাগান); পাথী সেন (ই বি আর), লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্টবেঙ্গল), মুর্গেশ (ইষ্টবেঙ্গল), কে ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস) এবং কে প্রসাদ (এরিয়ান্স)।

বার্ম্মা দল:— বাসিন, দীনা এবং লেষ্ট্রেঞ্জ, গার্লিং, স বেলী এবং ফোগার্টি, উইলীন, কানিয়ান্, বাবা, পাগসলে এবং রবার্টস্।

রেফারী:—সুশীল ঘোষ।

চার দিন লীগ প্রতিযোগিতাগুলির খেলাগুলি বন্ধ থাকবার পর গত মঙ্গলবার ৩১শে মে পুনরায় আরম্ভ হয়। এই দিনে প্রথম ডিভিসনে তিনটি ম্যাচ খেলা হয়। সেগুলির মধ্যে মোহনবাগান এবং ভবানীপুর দলের খেলাটি সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষনীয় হয়েছিল। প্রথমার্দ্ধে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রথম কয়েক মিনিট খেলাটি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় উভয় দলই সমভাবে আক্রমন করবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোন দলই কৃতকার্য্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ার্দ্ধের অধিকাংশ সময় মোহনবাগান দল ভীষণভাবে আক্রমন করে বিপক্ষদলকে বিপর্য্যস্ত করতে সক্ষম হয়। খেলাটি শেষ হবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে প্রেমলাল হেড করে একটি গোল প্রদান করলে ভবানীপুর দল এক গোলে পরাজিত হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং মাঠে কালীঘাট ও এরিয়ান্স দলের খেলাটি হয়। কালীঘাট দল প্রথমার্দ্ধে দুইটি গোল প্রদান করে এই খেলাটিতে জয় লাভ করে। এইটি কালীঘাট দলের এই বৎসরের তৃতীয় জয়লাভ। বিজয়ী দলের জন্য এবং জোসেফ এই গোল দুইটি প্রদান করে। এরিয়ান্স দলের খেলা

প্রেমলাল
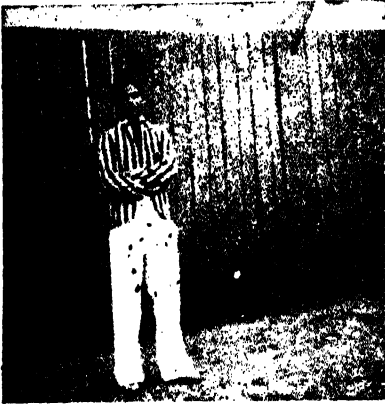
আদৌ সন্তোষজনক হয়নি সেই কারণে কালীঘাট দলের জয়লাভ যথোপযুক্ত হয়েছে।

কাষ্টমস্‌ এবং ক্যালকাটা দলের সহিত এই দিনের তৃতীয় খেলাটি হয়। কোন পক্ষই গোল করতে না পারায় খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। খেলাটির মধ্যে কোনপ্রকার উত্তেজনা সৃষ্ট হয় নি।

গত বুধবার প্রথম ডিভিসনের দুটী খেলা হয়। তার মধ্যে একটিতে কে, ও, এস, বি সৈন্যদল ই, বি, আর, দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। হেণ্ডারসন ও সাইমন্‌ সৈন্যদলের পক্ষে এই দুটি গোল করেছিলেন। অপর খেলাটিতে ব্যারাকপুরের ক্যামেরোনিয়ানস্‌ সৈন্য দল পুলিস দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে।

বৃহস্পতিবার যে তিনটি খেলা হয়েছে তার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয় হয়েছিল। ইষ্টবেঙ্গলদল লীগ তালিকায় নীচের দিকে অবস্থান করলেও গত চার বছরের লীগ বিজয়ী এবং বর্ত্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানীয় মহমেডান স্পোর্টিং দলকে অনায়াসে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। এই খেলাটি বিজিত দলের মাঠে হয়েছিল। খেলাটির এইরূপ ফলাফল হওয়ায় ইষ্টবেঙ্গল দল গত বৎসরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হয়েছে। বিজয়ীদলের খেলোয়াড়েরা প্রথম থেকেই জয়ী হবার তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে খেলতে থাকে এবং উপর্য্যুপরি আক্রমণ করে বিপক্ষ দলকে ব্যতিব্যস্ত করে। সেই কারণে অধিকাংশ সময় মহমেডান দলকে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়। তারা তাদের স্বাভাবিক খেলা খেলবার মোটেই সুযোগ পায় নি। এইটি মহমেডান দলের এবছরের এখন পর্য্যন্ত তৃতীয় পরাজয়। এর আগে এই দুর্দ্ধর্ষ দলটি পুলিশ এবং কালীঘাট ক্লাবের নিকট পরাভব স্বীকার করেছে। প্রথমার্দ্ধের পনেরো মিনিট অতিবাহিত হবার পর জুম্মাখাঁ করিমকে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ফাউল করার জন্য ইষ্টবেঙ্গল দল একটি পেনাল্টি কিক্‌ পায়। লক্ষ্মীনারায়ণ তাহা হইতে প্রথম গোলটি করেন ১-০ দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষের দিকে মুর্গেস্‌ আর একটি গোল করবার সৌভাগ্য লাভ করেন ২-০ বিজয়ী দলের পি, দাশগুপ্ত, এ নন্দী, লক্ষ্মীনারায়ণ ও মুর্গেশ এবং বিজিত দলের

নুর মহম্মদ

ওসমান, সিরাজুদ্দীন ও রহিম ভাল খেলেছিলেন। কালীঘাট ও ভবানীপুর দলের খেলাটিতে উভয়পক্ষের একটি করে গোল হওয়ায় শেষ নিষ্পত্তি হয় নি। কালীঘাট দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেলেও বিজয়ী হবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এরিয়ান্স ও কাষ্টমস দলের খেলাটিতে প্রথমোক্ত দলটি ৩-২ গোলে জয়লাভ

করেছে। শুক্রবারের একটি মাত্র খেলায় পুলিশ ক্লাব ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছে। গত শনিবারের তিনটি খেলার মধ্যে মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোটিংয়ের খেলাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দর্শক আকর্ষণ করেছিল। প্রত্যেক দল একটি করে গোল করায় খেলাটি প্রথমোক্ত দলের মাঠে অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। মোহনবাগান দল এখন পর্য্যন্ত এ বৎসরে নিজেদের অপরাজিত রাখবার সম্মান বজায় রেখেছে। এবং প্রথম ডিভিসন দলগুলির মধ্যে এই গৌরব একমাত্র তারাই দাবী করতে পারে। মহমেডান দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেললেও মোহনবাগান দলের গোলরক্ষক রমেন ভট্টাচার্য্যের অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যে তারা বিজয়ী হবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। মোহনবাগান দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে এস, দত্ত (ছোট), বিমল মুখার্জ্জি, যোগজীবন দত্ত, বেণীপ্রসাদ ও প্রেমলালের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। বিশেষ করে বিমল এবং প্রেমলাল তাঁদের দলের সম্মান অক্ষুন্ন রাখবার জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। মহমেডান দলে জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খা, নুর মহম্মদ, রহিম, মহবুব ও জাব্বারের খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। খেলাটিতে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমতঃ আগন্তুক দল তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সভ্যদের আসন সংখ্যা না পাওয়ায় তার প্রতিবাদ স্বরূপ কেহই মোহনবাগান ক্লাবের সভ্যদের গ্যালারীতে আসন গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ বাঁচ্চি খা প্রেমলালকে বিপজ্জনকভাবে ফাউল করায় দ্বিতীয়ার্দ্ধের পাঁচমিনিট অতিবাহিত হবার পর রেফারী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে মাঠ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের সতেরো মিনিটের সময় সিধু পেনাল্টি সীমানার মধ্যে এস ঘোষকে ফাউল করায় বি রায় চৌধুরী পেনাল্টি কিক্ থেকে নিজ দলকে এক গোলে অগ্রগামী করেন ১—০। খেলাটি শেষ হবার দু মিনিট আগে রহিম্ একটি ফ্রি কিক্ থেকে দর্শনীয়ভাবে সট করে পরাজয়সূচক গোলটি পরিশোধ করেন ১—১। অপর দুটি খেলাতে ভবানীপুর ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যথাক্রমে ই বি আর ও ক্যামেরোনিয়ানস্ গোরা দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করেছে।

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিঃ	পয়েণ্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	১০	৫	২	৩	১৬	১০	১২
মোহনবাগান	৯	২	৭	০	৮	৫	১১
কালীঘাট	১০	৩	৫	২	৯	৭	১১
ই বি আর	১০	৪	৩	৩	৮	৯	১১
পুলিশ	৯	৪	২	৩	১৬	১২	১০
ক্যামেরোনিয়ান্স	১১	৩	৪	৪	১০	১০	১০
কাষ্টমস	১১	২	৬	৩	১১	১২	১০
কে ও এস বি	৮	৪	১	৩	৯	৭	৯
ইষ্টবেঙ্গল	৯	৩	৩	৩	৯	৮	৯
ভবানীপুর	১১	৩	৩	৫	১৩	১৫	৯
এরিয়ান্স	১০	৩	৩	৪	৯	১৬	৯
ক্যালকাটা	১০	২	৩	৫	৫	১২	৭

অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে

আই এফ এ দল

গত বুধবার চৌরঙ্গী ওয়াই, এম, সি, এ হলে সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে আই এফ এর প্রাদেশিক কমিটীর একটি সভা হয়ে গেছে। এই সভায় অষ্ট্রেলিয়ার ফুটবল এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণ অনুসারে একটি আই এফ ফুটবল্ দলকে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠান সাব্যস্ত হয়। যদি সম্ভব হয় তাহলে কেবলমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড়দের দ্বারাই এই দলটি গঠিত হবে। এই দলটি আগামী ১২ই জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করে ১৭ই জুলাই কলম্বো থেকে জাহাজে রওনা হবে এবং তিনমাস ভ্রমণের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করবে। মিঃ পি গুপ্ত এবং মিঃ এম্ দত্ত রায় যথাক্রমে এই ভ্রাম্যমান দলটির ম্যানেজার এবং নন্ প্লেয়িং ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েছেন। মিঃ গুপ্ত যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে মিঃ এম দত্ত রায় ম্যানেজার হয়ে যাবেন এবং তাঁহার শূন্য স্থানে অপর কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করা হবে। এই ভ্রমণ সম্বন্ধে সমস্ত ব্যয় 'অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন' বহন করবে।

সন্তরণে বাংলার প্রাধান্য

গত রবিবার ২৯শে মে হেদুয়ার পুষ্করিণীতে নিখিল ভারতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার শেষ অনুষ্ঠানে বাংলা প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজ প্রাধান্য বজায় রেখেছে। নিম্নে ইহার ফলাফল দেওয়া হল :—

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল :—প্রথম দিলীপ মিত্র (বাংলা), দ্বিতীয়—রাজারাম সাউ (বাংলা), তৃতীয়—পি এম আর ভেরুচা (বোম্বাই)।

সময় :—১ মিঃ ৬ ২/৫ সেঃ ২০০ মিটার বুক সাঁতার :—প্রথম প্রফুল্ল মল্লিক, দ্বিতীয় :—হায়দার আলি (পাঞ্জাব), তৃতীয় হরিহর ব্যানার্জ্জি (বাংলা)।

সময় :—৩ মিঃ ৯সেঃ (রেকর্ড)। ১০০ মিটার ফ্রী ষ্টাইল (মহিলা) প্রদর্শনী ১ম—কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জি, ২য়—রমা সেন গুপ্ত, ৩য়—সুখলতা পাল ১মিঃ ৩২সেঃ। ৪০০ মিটার ফ্রী ষ্টাইল—দুর্গা দাস (বাংলা) মদন সিংহ (বাঙলা) অর্জ্জুন সিংহ (পাঞ্জাব)।

সময় ৫ মি ৩৮ ৩/৫ সেঃ (রেকর্ড) মীডেল রীলে—৩×১০০ মিটার ১ম—

বাঙলা, ২য়—পাঞ্জাব রাজারাম সাউ, প্রফুল্ল মল্লিক ও দিলীপ মিত্রকে লইয়া বিজয়ী দল গঠিত হইয়াছিল।

প্রদর্শনী ডাইভিং—আশু দত্ত ও অজিত রায়।

প্রদর্শনী ওয়াটার পোলো—বাঙলা অবশিষ্ট দলকে ৩-২ গোলে পরাজিত করে। দুর্গা দাস (২) ও জি এইচ দাস বিজয়ী দলের পক্ষে এবং পক্ষে এবং তারুচা ও মদন সিংহ অবশিষ্ট দলের পক্ষে গোল করেন।

ক্রিকেট

বিলাতে কার্ত্তিক বসুর কৃতিত্ব—

গত ২০শে ও ২১শে-মে নটিংহামে রাজপুতনার ক্রিকেট ক্লাব এবং স্যার জুলিয়ান কাহানের একাদশের খেলায় বাংলার কার্ত্তিক বসু দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রান করে নিজ ক্রিকেট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

ব্র্যাডম্যানের ৫ রান

অষ্ট্রেলিয়া ও মিডলসেক্সের খেলায় ব্র্যাডম্যান্ প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ রান করে আউট হয়ে যান।

ব্র্যাড্ম্যান্ ও এডরিচের ১000 রান

অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্যাপ্টেন ডন ব্র্যাডম্যান গত মে মাসের মধ্যে মাত্র ৭টি ইনিংস খেলে নিজস্ব ১০০০ হাজার রান পূর্ণ করেছেন। ইহাতে ব্র্যাডম্যান নূতন রেকর্ডে স্থাপন করেছেন। মিডল্‌সেক্স দলের এডরিচও গত মে মাসের মধে নিজস্ব এক হাজার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বিশেষত্ব যে তিনি একমাত্র 'লর্ডস্' মাঠে খেলেই এই গৌরব অর্জ্জন করেন।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড—

আগামী ১০ই জুন নটিংহাম্পাসায়ারে ইংলণ্ড দলের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি খেলা হবে। ইংলণ্ড দলে খেলবার জন্য নিম্ন-লিখিত খেলোয়াড়গণ মনোনীত হয়েছেন—

(১) হ্যামণ্ড (ক্যাপ্টেন) (গ্লসেষ্টার)
(২) হাটন্ (ইয়র্কসায়ার)
(৩) ভেরিটী („)
(৪) এমস্ (কেণ্ট)
(৫) ফার্ণেস (এসেক্স)
(৬) ক্লে (গ্ল্যামোরগান্)
(৭) বার্ণেট (গ্লসেষ্টার)
(৮) রাইট (কেণ্ট)
(৯) কম্পটন্ (মিডলসেক্স)
(১০) এডরিচ („)
(১১) হাউইক (নটস্)
(১২) পেণ্টার (ল্যাঙ্কসায়ার)
(১৩) পোপ (ডার্ব্বিসায়ার)

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভা

শ্রীমতী স্নেহলতা পাইন

বাংলার সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ঠিক রবি ঠাকুরের পরেই আসন পেতে পারেন। শরৎ-চন্দ্রের সৃষ্টি প্রতিভা বাংলার সাহিত্যে নতুন প্রবাহ এনে দিয়েছে। বাংলার হৃদয়রাজ্যের অসীম রূপ-ঐশ্বর্য্য নতুন করে পূর্ণ সজীবতায় প্রকটিত হল শরৎচন্দ্রের প্রতিভার সোণার কাঠির পরশ পেয়ে। জগত বিস্ময়ে তাকাল এই প্রতিভার দিকে। সমারোহের মুখরতায় ভরে উঠলো আকাশ, বাতাস, বন-বনানী। বাংলার সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সহরের অলিতে, গলিতে, পল্লীর ছায়াঘন স্তব্ধ আঙিনায় নব উৎসবের কলধ্বনি জেগে উঠলো ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আগমনে।

বাংলার পল্লীর সাথে শরৎপ্রতিভা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাংলার ঘুমন্ত সুর পল্লীর নিরালায় কেঁদে মরছিল। তার সত্যিকার প্রকাশ আগে হয়নি। শরৎ-প্রতিভার স্পর্শে বিচিত্রভাবে নন্দিত হল বাংলার অপ্রকাশিত ঐশ্বর্য্য। নূতন করে দেখতে শিখলো, ভাবতে শিখলো, গাইতে শিখলো বাংলার জনগণ।

বাংলার বাণীর বেদীমূলে যে পূজার ডালি এনেছিলেন শরৎচন্দ্র, তার ঘন সৌরভের মধ্যে রয়েছে সুখ-দুঃখ-আনন্দ-অশ্রুর ঝঙ্কার। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি আমাদের মুখে এনেছে তৃপ্তির হাসি, আবার নয়নে এনেছে তপ্ত অশ্রুজল। এই হাসিকান্নার মাঝখানেই শরৎ-প্রতিভার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অসীম সাহস, অপরিমিত সহানুভূতি, অপার উদারতা এবং অলৌকিক প্রকাশ-শক্তি—এই সবের সমাবেশে পুষ্ট ও গঠিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবন।

হৃদয়ের আকুল দরদ ছিল বলেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেই দিকে, যেখানে শান্ত যৌন সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত বাংলার স্নেহ-মমতা-কম্পিত হৃদয়লক্ষ্মার। তাঁর প্রেম-প্রতিভা তাঁকে আবিষ্কার ও সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর স্নেহ শুভ্র দৃষ্টির স্পর্শে বাংলার স্নেহ-ভাণ্ডার জগতের অগণিত চোখের সাধনে অনাহত সৌন্দর্য্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। জগত সেদিন বিস্ময়ে দেখেছিল বাংলার অন্তরের ঐশ্বর্য্য কত বিরাট, কত স্বর্গীয়। বাংলার সমাজে জীর্ণতা ও পঙ্কিলতার অভাব নেই। সংস্কারের অস্ত্র নিয়ে তিনি ভাঙতে সুরু করেছিলেন বাংলার যুগযুগের পুরাণো কলঙ্কের জীর্ণ প্রাচীর। বাংলা-পল্লীর লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত অভাগাদের বুকে তুলে নিয়েছিলেন মানবপ্রেমিক শরৎচন্দ্র।

তাদের জন্য তিনি কেঁদেছিলেন নিজে আর কাঁদিয়েছিলেন আমাদেরকে। কত পাঠক-পাঠিকার অশ্রুজলে ভিজেছে শরৎগ্রন্থের পাতা, কত সুস্থ হৃদয় বিদারিত হয়েছে বাংলার নরনারীর অভিশপ্ত জীবনধারার করুণকাহিনী পড়ে। কত সহানুভূতির তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়েছে আমাদের স্নেহপ্রবণ অশ্রু-নিবিড় হৃদয়ে। শরৎপ্রতিভার পূজার জন্য আলাদা করে অনুষ্ঠান সমারোহের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি মুহূর্ত্তে সেই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বাংলার ঘরে ঘরে, যখন শরৎগ্রন্থ পড়ে আমরা হেসেছি, কেঁদেছি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।

সুখ-দুঃখ নিয়েই ত এই সংসার। এর বিচিত্র সমাবেশকে অনাহত রেখে তবেই না মানবজীবনের ছবি-আঁকা। পদে পদে মন ভোলাবার জন্য স্বর্গের লোভনীয় সৌন্দর্য্য-লোককে পৃথিবীর মাঝে টেনে এনে লাভ নেই। তাতে মন হয়ত ভোলে কিন্তু গলে না। সুদূর দিগন্তের অনাহত রক্তরাগ স্বর্গীয় বলে প্রশংসিত হতে পারে, কিন্তু এই ধরণীর ভাঙা-গড়ার মাঝে যে জীবনধারা, তা অশ্রুজলে সিক্ত হয়েও মানুষের একান্ত আপনার।

▶ শরৎচন্দ্র গোধূলীর দিগন্তের সুবর্ণসম্ভার অবজ্ঞা করে এই পৃথিবীর ধূলিময় পথে দৃষ্টি নিবেশ করেছেন। বাংলা-পল্লীর মৌন মাটির পথ তাই ভাষা পেয়েছে, ধন্য হয়েছে। এই ধরনীর জীবনধারা ঠিক যেখানে জটিল হয়ে উঠেছে, সমস্যা এনেছে—সেইখানেই হয়েছে শরৎ-প্রতিভার আলোক পাত।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভা যেমন আকৃষ্ট হয়েছে বাংলার নারীর দিকে, তেমন আর কোনদিকে নয়। বঙ্গনারীর প্রতি দরদ তিনিই সবচেয়ে বেশী দেখিয়েছেন। সমাজের তথাকথিত কলঙ্কিতা নারীর মধ্যেও অনেক সময়ে তিনি মানব-প্রেমিকের দৃষ্টি দিয়ে আবিষ্কার করেছেন অপূর্ব্ব হৃদয়-ঐশ্বর্য্য। অবজ্ঞা-নির্য্যাতন-উপেক্ষার কবল থেকে কলঙ্কিতার অশ্রুবিদীর্ণ জীবনকে উদ্ধার করেছে শরৎপ্রতিভা। পথের ধুলো থেকে শ্রদ্ধার সিংহাসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শরৎচন্দ্র।

সামান্য একটি গল্পের মধ্যেও শরৎ-প্রতিভার বিকাশ বেশ চোখে পড়ে। "রামের সুমতী" ফুটিয়েছে বাংলা-পল্লীর দুরন্ত ছেলে রামকে; তার চেয়েও বেশী ফুটিয়েছে রামের জননী-স্বরূপা বৌদি নারায়ণীকে। নারায়ণীকে সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন—এই ত বাংলার নারী! এই-ত হৃদয়সম্ভারে বিভূষিতা বাংলার মা-বোনদের একজন! এই-ত মমতাময়ী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!

গল্পের গতি যেখানেই মোড় ফিরেছে, সেখানেই নারায়ণীর স্নেহধারা হয়েছে গভীর। নারায়ণীর স্নেহে বাধাহীন স্রোতস্বিনীর শান্তধারার মৌন শোভায় সুন্দর নয়। সেই স্নেহ আঘাতক্ষুব্ধ তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস। সেই স্নেহের শক্তি বেড়ে গেছে বাধা পেয়ে। দিগম্বরীর উপস্থিতিজনিত পরিস্থিতিতে চরম পরীক্ষা হয়েছে নারায়ণীর স্নেহ-বাৎসল্যের। গল্পের শেষদিকে যে ভাঙন লেগেছিল, সে ত আসলে ভাঙন নয়। নারায়ণীর স্নেহধারাকে ঘনীভূত হবার সুযোগ দিল এই বিচ্ছেদ। গল্পের পরিণতি বিচ্ছেদ নয়, স্নেহ-সমারোহের মাঝে অপূর্ব্ব পুনর্মিলন। আর এই অপরূপ দৃশ্যের কেন্দ্র-স্থলে শোভিতা স্নেহসম্ভারময়ী নারায়ণী।

নারায়ণী ধনীর প্রাসাদের ঔজ্জ্বল্যের মাঝে প্রতিষ্ঠিতা গৃহদেবী নয়; সে পল্লী-প্রাঙ্গনে ম্লান আলোর মাঝে প্রস্ফুটিত সুন্দর একটি ফুল। পল্লীর স্তব্ধ নিরালায় শান্ত ছায়াতলে তার পরিপূর্ণ অনাহত বিকাশ।

মেয়ে

শিশির কুমার সরকার

যদি না বাস্‌বে ভালো, কেন বা আসলে মেয়ে,
নীলিমা পড়লো ধরা ও-আঁখি নীলেতে যেয়ে।
তুমি কি জান্‌তে ছাই কেমনে কইবে কথা
আমিই শিখানু তোমায় জানাতে বুকের ব্যথা।
প্রথম প্রভাতে যবে আসলে ছোট্ট মেয়ে
পালাতে সলাজ হেসে আধেক চকিত চেয়ে।
আজকে তুমিই মেয়ে বলছ কত কি সব
ফুটানু তোমারই মুখে আমারই সে কলরব।
আরতো নহে সে তুমি ছোট সে দুষ্ট মেয়ে
মাধবী বনের স্নেহ তনুতে পড়ছে বেয়ে।
মনে কি পড়ছে মেয়ে সেদিন সে বিকেল বেলা
তোমায় ভুবিতে আমি খেলেছি কত না খেলা।
হাতেতে দেছিনু ফুল সধর অধর চুমি
বল্লে ছোট্ট করে—"দুষ্টু হয়েছ তুমি।"
যবে আসনু চলে আবারো আসবো বলে
তুমি বল্লে নাকো কথা···চুপটি র'লে।
নভের বাদল তব নামলো নয়ন ছেয়ে
কেন বা আসলে মেয়ে!
সোনালী রঙিন শাড়ী-সেজেছ বধূটি বেশ
ফুলেলী ফুলের হারে বেঁধেছ খোপার কেশ।
যদি না আসবে আর কেন বা আসলে বল
কাঁদিছে কেশের বাস্ শিথিল শয্যাতল।
তোমার দুয়ারে মেয়ে চাতক পথিক শুধু
পিপাসা সলিল চেয়ে পেয়েছে মরুর ধূ-ধূ
তুমি যা বল্লে সেদিন সবি মিথ্যে কথা
তবু যে লাগতো ভালো তব সে প্রগল্‌ভতা।
গোলাপী পাপড়ী রাঙা তব সে কপোল কোলে
জানিতা সত্যি জানি মোদেরই মরণ দোলে।
তবুও তোমায় আমি করেছি সুস্বাগতা
ভীরু হাসি কোথা? কোথা সে ভীরু চঞ্চলতা?
গলেতে দোলে না তব ছোট সে হুল্‌কি হার
বুকেতে জোয়ার এল যৌবন যমুনার।
তাই কি শঠতা দিয়ে দিলে এ-কৃতজ্ঞতা
আমার কবিতা কুঞ্জে তুমি সে মহাশ্বেতা।
পুলকে নভের মেঘ অলকে নাম্‌ছে বেয়ে
কেনবা আসলে মেয়ে!

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে অভিনয় প্রসঙ্গে আমরা অনেক কথা বলেছি—দীর্ঘ দিনের আলোচনার মধ্যেও আমরা কোন উন্নতির ধারা দেখতে পাচ্ছি না। যত রাজ্যের বস্তা পচা নাটককে টেনে নিয়ে এসে অপটু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে বিরক্তিকর চীৎকারে শ্রোতাদের কান ঝালাপালা করে তোলবার এবং শ্রোতাদের অবকাশ মুহূর্ত্তকে এ ভাবে অপচয় করাবার সার্থকতা কি?

* * *

বেতারে অভিনয় প্রসঙ্গে যে অর্থ ব্যয়িত হয় সেটা অপব্যয় হচ্ছে কিনা সে কথা ভেবে দেখা দরকার। শ্রোতাদের যদি তা আনন্দ দিতে, শিক্ষা দিতে সমর্থ না হয় তা হলে এ বিভাগের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করতে পারি না।

* * *

বেতার নাটক পরিচালককে আমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারি ক'খানা নূতন রসবান আদর্শ নাটক তিনি পরিবেশনে সমর্থ হয়েছেন? কি আদর্শ নিয়ে এ বিভাগ পরিচালনা করছেন? অভিনয়ের মধ্যে কি নূতনত্ব তিনি দেখাতে পারছেন?

* * *

নাটক নির্ব্বাচনে নেই কৃতিত্ব—অভিনয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম রসবোধের অভাব—সঙ্গীত পরিচালনায় পল্লীর যাত্রার প্যাঁচ—বেতার অর্কেষ্ট্রা যাত্রার কনসার্ট, কোনটি তবে উপভোগ্য?

* * *

যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করা চলে না। আজকের দিনে নাটক দর্শকের মন গত দশবৎসরের তুলনায় ও যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তার প্রমাণের বোধ করি কোন অভাব নেই। সাধারণ রঙ্গালয় গুলির অবস্থা দেখেই দর্শকদের রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

* * *

আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু এর পরও বেতার নাটক পরিচালক চন্দ্রহাসের মত নাটককে কেমন করে মনোনীত করেন। বাংলা দেশে নূতন নাটকের-ভালো নাটকের অভাব আছে স্বীকার করি—কিন্তু সে অভাব পূরনের প্রচেষ্টা কোথায়?

* * *

বেতার বিচিত্রায় ছোট ছোট নাটিকার মধ্যে যে রসবস্তুর আভাস পাই মধ্যে মধ্যে তার দ্বারা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে বেতারে নূতন নাটকের বিশেষ অভাব ঘটতে পারে।

* * *

বাংলা দেশে ভালো লেখকের সংখ্যা আজ নিতান্ত অপরিমিত নয়। এ স্থলে তাঁদের লেখনীর সাহায্য নিয়ে তাঁদের বেতারে আহ্বান করলে এ গতানুগতিকতার যে পরিবর্ত্তন ঘটে না এমন বলতে আমরা পারি না।

* * *

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিলেন দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের 'নবাগতের আসরের' প্রতি। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—আমরা এ আসরের কোনদিনের বৈঠককেই প্রশংসা করতে পারি না। যত রাজ্যের আনাড়ী আর্টিসের বেসুরো কণ্ঠে এ আসর কোলাহল মুখরিত।

* * *

বক্তৃতার বিভাগে এবার আমরা কিছুটা উন্নতির আভাষ পেয়েছি। কণ্ঠ সঙ্গীতে বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতে সুরশিল্পী সমরেশ চৌধুরী বেশ আনন্দ দান করছেন।

ইউনাইটেড টকিজের "ছন্দা" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় একে দেখা যাবে—এ মেয়েটি শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা। ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১লা আষাঢ় ১৩৪৫, ১৬ই জুন ১৯৩৮ } চতুর্বিংশ সংখ্যা

মিলনের পরিহাস

বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি ব্যক্তিগত ও উপদলগত দ্বেষ-দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই ঘাতপ্রতিঘাতের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আদর্শগত বৈষম্য নাই আছে শুধু ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বা উপদলগত স্বার্থসিদ্ধির দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা। "দাদা"-বৃন্দের মুক্তিতে বাংলাদেশে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি বিশেষ যত্নবান হইলেও সংঘর্ষের বিকটরূপ ইতিমধ্যেই যশোহরে প্রকাশ পাইয়াছে। অনুসন্ধান সমিতি বর্ত্তমানে সাক্ষী-সাবুৎ গ্রহণে তৎপর সুতরাং যশোহর-ঘটনা সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ বর্ত্তমানে অসমীচীন। তবে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে যেরূপ খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় উপদলগত দ্বন্দ্বের সংঘাত প্রবলতর হইয়া শীঘ্রই পরিস্ফুট হইবে। উপদলদ্বয় স্ব স্ব দলপুষ্টির জন্য ও রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলি দখলের জন্য উপদলীয় শাঠ্যের আশ্রয় লইতেছেন এবং এই মুহূর্ত্তে সদ্যমুক্ত বেকার-দাদাবৃন্দ তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় "সশস্ত্র নিরপেক্ষতার" প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে ও প্রতিশ্রুতিপালনে বিশেষ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। যে কিরণবাবুকে অধুনা কংগ্রেসের অধিবেশনেও কলিকাতা ত্যাগ করিতে দেখা যায় না তিনি যে কেন সহসা যশোহরের কর্ম্মীসম্মেলনে যোগদান করিতে গেলেন তাহা প্রহেলিকা-সমাচ্ছন্ন। শুধু তাহাই নহে মালদহে জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কিরণবাবু সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে। সহসা কিরণবাবুর সভাপতিত্ব করিবার এত সখ হইল কেন? কিরণবাবুর মফঃস্বল পরিভ্রমণ কি আগামী বৎসরের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ব্বাচনে সশস্ত্র বিরোধিতার উদ্যোগ-পর্ব্ব নহে?

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় যখন প্রায় প্রকাশ্যে স্বীয় দলপুষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর সেই মুহূর্ত্তে সরকার 'যুগান্তর'-দলের নায়ক শ্রীযুক্ত প্রতুল গাঙ্গুলী মহাশয়কে

অতর্কিতভাবে বিনা স্বর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন—বোধ হয় সুরেন্দ্র-কিরণ-সংযুক্ত উপদল এই আকস্মিক মুক্তির ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। যাহা হউক প্রতুল বাবুর মুক্তিতে "যুগান্তর"-দল শক্তিশালী হইবে এবং তাহার ফলে হয়ত উপদলগত সংঘর্ষ প্রবলতর হইয়া উঠিবে।

কলিকাতায় উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতায় ও পল্লী-কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনে উপদলগত দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে উত্তর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদারের আনুগত্য পরিহার করিয়া নবানুগত্যে দীক্ষিত হইয়াছেন। রাজনৈতিক আঁতাতের যে নগ্নরূপ ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত। উত্তর কলিকাতায় হেমন্তবাবু যে সুরেশবাবুর দল পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহা যাঁহারা বিগত সতের বৎসরের কংগ্রেসী রাজনীতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই ভাবিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে হেমন্তবাবুর ন্যায় একনিষ্ঠ কর্ম্মীও যেখানে মতস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন না সেখানে বৃহত্তর মিলনের বুলি কি অসার বাক্য-আড়ম্বর নহে?

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র হয়ত সকল উপদলের আনুগত্য পাইবেন—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ না হইলেও রাষ্ট্রপতি বলিয়াই—কিন্তু বাংলার কংগ্রেসী উপদলীয় সংঘর্ষ যে অদূর ভবিষ্যতে প্রবল আকার ধারণ করিবে তাহা ঘটনা-বৈচিত্রে ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমাধান কোথায় কে বলিতে পারে?

———:•(×)•:———

(বিলাসী)

অভিজ্ঞান

চিত্রনির্ম্মাতা—নিউ থিয়েটার্স লি:
কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্র-নাট্য—ফণী মজুমদার
পরিচালক—প্রফুল্ল রায়
চিত্র-শিল্পী—বিমল রায়
শব্দযন্ত্রী—বাণী দত্ত
সঙ্গীত-পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল
সঙ্গীত-রচয়িতা—অজয় ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক—সুবোধ মিত্র
চিত্র পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্ লি:

ভূমিকায়—সন্ধ্যা—মলিনা, সবিতা—দেববালা, নাজমা—মেনকা, প্রিয়লাল—শৈলেন পাল, প্রমথ—জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ—শৈলেন চৌধুরী, জহরলাল—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কেশব—টোপা রায়, সুরেশ—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধুচরণ—অহী সান্যাল। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র ভূমিকায়—রাজলক্ষ্মী, মনোরমা, পঙ্কজ মল্লিক, সুকুমার, কালীপদ দাস, বীরেন বল প্রভৃতি।

গত শনিবার রূপবাণী চিত্র-গৃহে নিউ থিয়েটার্সের 'অভিজ্ঞান' মুক্তিলাভ করেছে। বর্ত্তমান দিনে বাঙলা ছবির পরিচালক হিসেবে প্রফুল্লবাবুর নাম দর্শকদের কাছে বিশেষ পরিচিত না থাকাতে অনেকেই হয়ত' অনেক কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আমরা আজ বড় আনন্দের সঙ্গেই বলছি যে তিনি সকল সন্দেহের অবসান করে একখানি ভাল ছবি দিয়েছেন। ছবিখানা যে কয়েক ঘণ্টা ধরে ব'সে আনন্দের সঙ্গে দেখা যাবে তার আর কোন সন্দেহই নেই।

ছবিখানার কাহিনী হচ্ছে এক অপহৃতা সমাজ বিতাড়িতা নারীর জীবন-এর ঘটনা নিয়ে। জমিদার জহরলাল-এর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে গফুর একদিন জমিদার পুত্র প্রিয়লালএর নবপরিণীতা পত্নী-সন্ধ্যাকে অপহরণ করে। গফুর-এর বোন নাজমার সাহায্যে সন্ধ্যা একদিন গফুর-এর কবল থেকে মুক্তি লাভ করে জামসেদপুরে তার বোন সবিতার বাসায় আশ্রয় পায়। সবিতার স্বামী প্রকাশ-এর সাহায্যে যদিও সন্ধ্যা একদিন শ্বশুরালয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিল তথাপি সমাজের ভয়ে তাকে নিরাশ হয়েই পুনরায় প্রকাশের আশ্রয়েই ফিরতে হয়েছিল। এই খানেই তার জীবনে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে হচ্ছে প্রমথ—প্রকাশের দূরসম্পর্ক ভাই। প্রমথর ছিল প্রচুর অর্থ—আর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র।

ভাগ্য যখন বিরাগ হয় তখন মানুষ প্রতিপদেই বাধা পায়। সন্ধ্যার জীবনে হলোও তাই। প্রকাশের অত্যধিক স্নেহই হ'ল সবিতার বিরাগের কারণ। সবিতার মনোভাব বুঝতে পেরে একদিন রাত্রে সন্ধ্যা প্রকাশের আশ্রয় ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। প্রমথ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো কিন্তু প্রথমে সন্ধ্যা তাতে রাজি হ'লো না। পরে প্রমথর কাছ থেকে একটা নির্ভরতার আভাষ পেয়েই সন্ধ্যা প্রমথর সঙ্গেই কাশী রওনা হ'ল। কাশীতে এসে তারা স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়েই বাস করতে আরম্ভ ক'রল। অবশ্য এটা সন্ধ্যার সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যেই করা হয়ে ছিল।

কিন্তু তাদের এই জীবনযাত্রা আর একটি লোককে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে হ'চ্ছে প্রমথর বাল্য-বন্ধু চিত্র-শিল্পী সুরেশ।

এদিকে সন্ধ্যা এই কাল্পনিক জীবন-যাত্রার প্রণালী ব'দলে ফেলবার জন্যেই একদিন স্বামী অচলানন্দের আশ্রমে এ'সে উপস্থিত হ'ল। এবারে সেই আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকবার অভিপ্রায় জানিয়ে স্বামীজীকে রাজী করলেন।

যেমন করিয়া হউক সন্ধ্যার শ্বশুরালয়ে এই সংবাদটা আর গোপন ছিল না। জহরলাল মতলব দিয়া তাঁহার কুচক্রী নায়েবএর নিকট হ'তে এক পত্র পেলেন যে সন্ধ্যা ম'রে গেছে।

স্ত্রীকে সত্যিই প্রিয়লাল ভালবাসত। এতদিনে হয়ত' সে নিজের ভুলও বুঝতে পারল। তাই সন্ধ্যার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সে কাশীতে এসে উপস্থিত হ'ল।

এখানে এসে সে সন্ধ্যার দর্শন পেল। কিন্তু আজ সন্ধ্যা আশ্রয় হারা নয় জেনেও তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। প্রমথ প্রথমে ভীষণ আপত্তি জানালে কিন্তু পাছে তার উপস্থিতি পুনর্মিলনের পথে বাধা জন্মায় সে ভয়েই সে কাশী ছেড়ে চলে গেল। আর এদিকে সন্ধ্যাও স্বামীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে আশ্রমে এসে হাজির হ'ল।

উপরের কাহিনী থেকে সহজেই বোঝা যায় যে আলোচ্য চিত্রের কাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর অনেক তফাৎ। আমরা কিন্তু চিত্র নাট্যকারের পরিবর্ত্তন কাহিনীটিকেই support করি। সত্যি কথা বলতে কি যে, চিত্রনাট্য এই ভাবে সব সময়েই পরিবর্ত্তন করে ছবির উপযোগী করা উচিত।

তাতে ছবির সম্পদ বাড়ে বই কমে না। ফণী বাবু এবিষয়ে বাস্তবিকই একটা ভাল কাজ করেছেন যার ফলে গল্পটীর narration হয়েছে তকতকে ঝরঝরে। সুরেশ চরিত্রটীও তাঁর চমৎকার সৃষ্টি। আর ভানু বাবু অভিনয়এর রূপ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। তবে একথাও আমরা ব'লব যে মধুর চরিত্রটী একেবারে বাদ দেওয়া উচিত হয়নি।

পরিচালনায় প্রফুল্ল বাবু কোন রকম মার পাঁচের মধ্যে না গিয়ে ভালই করেছেন। এত বড় একটা heavy themeকে সোজাভাবেই দর্শকদের সামনে ফেলে দিয়ে তিনি যথেষ্ট ভাববার অবকাশ দিয়েছেন। আর তারই জন্যে ছবির মধ্যে কোন রকম relief না থাকার অভাবটা সহজে ধরা পড়ে নি।

অভিনয়এর দিক থেকে আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছে সুরেশ চরিত্রে ভানু বাবুর অভিনয়। সত্যিই এমন একটী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। আর একজনের অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে সেটী হচ্ছে নাজমা রূপী মেনকা। মলিনা সন্ধ্যা চরিত্রটীর spiritটীকে যেভাবে শেষ পর্য্যন্ত maintain করে রেখেছে তাতে সত্যিই তার অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। শৈলেন চৌধুরীর প্রকাশ ও জীবন গাঙ্গুলীর প্রমথকে ভালই বলা যেতে পারে তবে আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। ক্ষুদ্র চরিত্রের মধ্যে গফুর এর চরিত্রটী আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

আলোকচিত্রের কাজ বিমল বাবুর কাছ থেকে যেমন আশা করা গিয়েছিল তেমনই পাওয়া গেছে। রাত্রের দৃশ্যগুলি খুব চমৎকার, এর পূর্ব্বে আর দেখা যায়নি।

বাণী যন্ত্রের শব্দ গ্রহণ ভালই। তবে যে একটু দোষ দেখা গেছে তা 'ফেডার' গোলমালের জন্যেই হয়েছে বলে মনে হয়।

সঙ্গীতএর দিক্ থেকে বলতে গেলে এর আবহসঙ্গীত আমাদের মোটেই ভাল লাগেনি। গানের মধ্যে মলিনার মুখে 'রূপ কথার-ই রাজা এসে' গানটীর সুরটী আমাদের খুব ভাল লেগেছে। গানের সুরটী কিন্তু আমাদের পঙ্কজ বাবুর সুর দেওয়া বলে মনে হ'ল। অথচ title cardএ সঙ্গীত বিভাগে পঙ্কজ বাবুর কোন নামই দেখলাম না—এমন কি সহকারীদের মধ্যে নয়। এর কারণ কি? পঙ্কজ বাবুর রবীন্দ্র সঙ্গীত বেশ ভালই হয়েছে। যদিও এর সঙ্গে Dramaর কোন সম্বন্ধই নেই তবুও এটার দরকার ছিল কেন যে তা না বলাই ভাল। যাক্ দর্শকদের পক্ষে এটা একটা কম্ লাভ নয়। একে পঙ্কজ মল্লিক—তাই রবীন্দ্র সঙ্গীত। বীরেন বল এর গানটীও ভাল হয়েছে।

সম্পাদনা ও লেবোরেটারীর কাজ সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই।

মোট কথা 'অভিজ্ঞান' হয়েছে এমন একটী ছবি যা প্রকৃত 'বাংলা ছবি'র গর্ব্ব দাবী করতে পারে।

"রেশমী রুমাল"

চিত্র-নির্ম্মাতা—দীপ্তি পিক্‌চার্স

কাহিনী—৺মনোজ বসু

পরিচালনা—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

আলোক-চিত্র—ননী সান্যাল

শব্দযন্ত্রী—মধুশীল

শিল্প-নির্দ্দেশক—পরেশ বসু

ভূমিকায়—মিঃ হ্যাটো—ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, মিসেস্ হ্যাটো—প্রভা, রামলোচন—গোকুল মুখার্জ্জি, আন্নাকালী—উষা দেবী, ওস্তাদ—৺ললিত মিত্র, মিরা—সাবিত্রি, যামিনী—দেবীদাস ব্যানার্জ্জি, বেলা—কমলা।

চিত্র পরিবেশক—প্রীতেন এণ্ড কোং

প্রথম মুক্তি—'শ্রী' বুধবার, ৮ই জুন।

"রেশমী রুমাল" ছবিখানি বছর দু'য়েক আগে তোলা। ছবিখানি সেই সময় মুক্তি লাভ কোরলে হয়তো কিছু শোভন হ'ত কিন্তু এখন ছবিখানার মুক্তি না হ'য়ে যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল তেমনি থাকলেই ভাল হ'ত এবং কর্ত্তৃপক্ষের তা'তে রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যেত।

একখানি "রেশমী রুমাল"-কে কেন্দ্রীভূত কোরে আশা-নিরাশা, প্রেম-অভিমান ও হাস্য-রসের ভেতর দিয়ে এই ছবির যবনিকাপাত হয়। গল্পটি অতি নিম্নস্তরের।

আলোকচিত্র, শব্দযন্ত্র এবং অভিনয়ে ডাঃ হরেণ, প্রভা, গোকুল, ললিত মিত্র ও উষার অভিনয় ছাড়া ছবিখানির প্রশংসা করবার মত আর কিছু খুঁজে পেলাম না বলে আমরা দুঃখিত।

"জগাপিসি"

এই সঙ্গে বাণী-ফিল্মস্ নামে হঠাৎ গজানো প্রতিষ্ঠানের ছোট হাসির ছবি "জগাপিসি" দেখানো হয়। এ সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখা নিস্প্রয়োজন।

দেশের মাটি

পরিচালক নীতীন বসুর ছবি প্রায় শেষ হয়ে এলো, আর কয়েকদিন বাদেই সেলুলয়েডের ফিতের বস্তা গুলো সম্পাদকের কাঁচির মুখে জড় হবে।

নিউ থিয়েটার্স'দের এক নম্বর ফ্লোরে বস্তীর সেট খাড়া হয়েছে। সরু রাস্তা আর গায়ে গায়ে মেটো ঘর। মোড়ে মোড়ে গাছের তলায় জটলা। লোক হাঁকছে—চীৎকার

করছে। চারিদিকে রব উঠেছে—জমী বেচো, জমী বেচো।

পরিশ্রমের অন্ত নেই নীতীন বসুর। এ ছবি ভাল হবে সবাই আশা রাখে। নীতীন বাবু যে নতুন কিছু করেন এ কথা সবাই জানে।

স্ট্রীট সিঙ্গার

সুন্দর নিখুঁত সেট, ভুলুয়ার এই দোতালা বাড়ী। চরিত্র এবং অবস্থার মিল রেখে এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘর খানি সাজানো। পরিচালক ফণি মজুমদার এবং প্রবর্দ্ধক প্রবোধ রায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন এ সেটের প্রত্যেক জিনিষটিকে সুন্দর করতে। কয়েকদিন ধরে এই সেটে সুটিং চলছিল।

এই সেটে অভিনয় করলেন শৈলেন চৌধুরী, জগদীশ শেঠী, শ্রীমতী কানন প্রভৃতি। কান্না ও হাসি, মান ও অভিমান কত পালাই এখানে হোল। পরিচালকের মতে সব কটিই ভাল হয়েছে।

বড়দিদি

অভিজ্ঞান চিত্রখানি সমাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক মল্লিক মশাই এই ইউনিটের কুশলী শিল্পীদের সহযোগে বড়দিদির কাজ সুরু কোরলেন। পাঁজীর বিধান অনুযায়ী, অদ্যকার এই শুভ দিনে মল্লিক মশাইয়ের ছবির উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হবার কথা। যে উদ্যম, যত্ন ও উৎসাহ নিয়ে মল্লিক মশাই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, আশা করি নট নাথের আশীর্ব্বাদে তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে। আমরা বারান্তরে এই চিত্রের অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ কোরবো।

অধিকার

আনোয়ার শা রোডে নিউথিয়েটার্সের দু' নম্বর ষ্টুডিওতে ছবি উঠছে দিনে রাতে। আর্টিষ্ট আর টেক্‌নিসিয়ানদের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। পরিচালক প্রমথেশ তাঁদের প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন। জুন মাসেই তিনি ছবি শেষ করবেন।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারার পরিচালকের সুনাম আছে কাজেই এ ছবি যে এ মাসে শেষ হবে এ আশা আমরা করতে পারি।

আর মিউজিক রুমে রিহর্সাল চালাচ্ছেন তিমির বরণ। সবাই বলাবলি করছে এমন মিউজিক নাকি বাংলা ছবিতে আর দেওয়া হয়নি।

ভারতের অর্কেষ্ট্রা জগতে তিমির বরণের স্থান অতি উচ্চে। সুরে তানে লয়ে ও মেলডিতে আর কয়জন তাঁর মত অর্কেষ্ট্রা সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলা শক্ত।

বাংলা গানের সঙ্গে অর্কেষ্ট্রির মেলেডি হয়ত তিনিই আমাদের প্রথম শোনাবেন।

নিউ থিয়েটার্সের "দেশের মাটি" চিত্রে যথাক্রমে অজয় ও অরুণার ভূমিকায় দুর্গাদাস ও চন্দ্রাবতী।

বিদ্যাপতি

চিত্রায় বিদ্যাপতি ১২ সপ্তাহে পড়িল। ১০ সপ্তায় চিত্রায় ৫৩ হাজার টাকা নেট্ সেল হয়েছে। এই ছবির সঙ্গে নব নির্ম্মিত 'এয়ার কুলিং প্লাণ্ট' ও একটী আকর্ষনীয় বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পানুবাবুর এত দিনকার পরিশ্রম সার্থক হ'ক এই আমাদের ইচ্ছা।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকী বসু মহাশয় তাঁর পরবর্ত্তী ছবির 'পেপার ওয়ার্কস' শেষ করে ফেলেছেন। আশা করা যায় এই মাসের মধ্যেই তিনি মহলা বসিয়ে দেবেন। যতদুর শোনা যাচ্ছে তাতে এবার নাকি কানন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রথীন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর ছবিতে স্থান পাবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটী কথা বলতে চাই। দেবকী বাবু এবার যে গল্প ঠিক করেছেন তা নাকি বাঙলা দেশের পল্লী-গ্রামের একটী 'সাপুড়ের' কাহিনীর উপর রচিত। আর সেই গল্প রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম। আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হ'লাম যে কয়েকদিন আগে যে কাজী সাহেব দেবকী বাবু ও নিউ থিয়েটার্সকে 'সাময়িক' পত্রিকার পাতায় অমন অভদ্রভাবে গালাগালি দিলেন তিনি কি করে আবার নিউ থিয়েটার্সের দরজায় ঢুকলেন? এবারও কি নিউ থিয়েটার্স তাঁর দরজায় হত্যা দিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছে? আগামী সপ্তায় এ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা ক'রব।

হাজরা পিক্‌চার্স

নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যে রাণীগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে সুখজোড়া নামে একটী সাওতাল পল্লী থেকে "দেবী ফুল্লরা"-র বহির্দৃশ্য তুলে পরিচালক তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, সহকারী কালীপদ রায়, আলোকচিত্র-শিল্পী বিভূতি দাহা ও নায়িকা শিশুবালাকে নিয়ে কোল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কোরেছেন। এই দৃশ্যটি ছিল যখন দেব-চরিত্র স্বামী কালকেতু ভাভুদত্তের প্রভাবে সুরা ও নারীর মোহমদিরায় নিমজ্জিত সেই সময় দেবী ফুল্লরা তাঁর প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান কোরলেন স্বামীকে এই অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে। এই দৃশ্যটিকে সবদিক থেকে সুসমৃদ্ধ কোরে তুল্‌বার জন্য পরিচালক স্থানীয় প্রায় দেড় হাজার সাওতাল জমায়েৎ করেন এবং আমরা খবর পেলাম প্রোজেকশন রুমে এই দৃশ্যটি দেখা হ'লে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন—"বাঙ্‌লা ছবিতে এই দৃশ্যটি নুতনত্বের দিক থেকে নিশ্চয়ই সম্বর্দ্ধিত হবে।"

"দেবী ফুল্লরা" পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই সপ্তাতেই মুক্তি পেত কিন্তু তিনকড়ি বাবু ছবিখানিকে সবদিক থেকে সুন্দরভাবে যা'তে আত্মপ্রকাশ কোরতে পারে তার জন্য আর এক হপ্তা পরে অর্থাৎ ২৫শে জুন মুক্তিদিবস ধার্য্য কোরেছেন। আমরা "দেবী ফুল্লরা" সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করি।

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন

বিগত অধিবেশনে এই বৎসর কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন হইয়াছে।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু
লিডার—শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু
ডেপুটী-লিডার—শ্রীযুক্ত নিশীথ চন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী
সেক্রেটারী—কুমার বিশ্বনাথ রায়
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভুবণ বিদ
মিঃ খলিলুলর রহমান্
চীফ্—শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্র কুমার মজুমদার

সম্প্রতি যুবরাজ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত ফুল্লরা ও কালকেতুর দৃশ্যটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানির শুটিং শেষ হ'য়েছে। এই দৃশ্যটি ছবিখানির একটি বিশিষ্ট দৃশ্য সেইজন্য অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুবালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায় প্রভৃতি সবাই-ই এই দৃশ্যটিকে সুঅভিনয়ের দ্বারা সুসমৃদ্ধ কোরে তুল্‌বার যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেছেন।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্স

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র নিবেদন রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"-র একটি বহির্দৃশ্য গেল হপ্তায় শেষ হ'য়েছে। প্রকাশ যে, এই ছবিতে বিনোদিনীরূপে সুপ্রভা মুখার্জ্জি, আশার ভূমিকায় ইন্দিরা রায় এবং মহেন্দ্র ও বেহারীর অংশে যথাক্রমে ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি ও ছবি বিশ্বাস সুঅভিনয়ের দ্বারা ছবিখানির গৌরব বৃদ্ধি কোরবেন। এদিকে পরিচালনায়, শব্দশিল্পে ও আলোকচিত্রে সতু সেন, মধু শীল ও ননী সান্ন্যাল অসামান্য কিছু না দেখালেও তাঁদের কাজ যে আধুনিক পর্য্যায়ে স্থানলাভ কোরবে, এ ধারনা করা অসমীচীন নয়। তা' ছাড়া সঙ্গীত বিষয়ে যে "চোখের বালি" নিজ বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে এ কথা ধ্রুব সত্য। কারণ, অনাদি দস্তিদার ও সুরেন দাস প্রভৃতি যাঁরা এই বিভাগ পরিচালনা কোরছেন তাঁরা সবাই এ বিভাগে কৃতিশিল্পী। "চোখের বালি"-র সাফল্যের জন্য মিঃ বি, পি, মেহেরা যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে কাজ কোরছেন, তা' আমাদের মনে হয়, কখনই বৃথা যাবে না।

পূর্ণ থিয়েটার

'রাজগী' আসছে শনিবার থেকে এখানে তৃতীয় সপ্তা'হে পড়বে।

রাজগী ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ কুমার শচীনদেব বর্ম্মনের গান—তাছাড়া মেনকা, ধীরাজ ও অন্যান্য সকলেই তাদের স্ব স্ব ভূমিকায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিখানি হয়ত আরও ২।১ সপ্তাহ চ'লবে।

ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুবালা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মোহন রায়, রাধারাণী, সাবিত্রী, দুর্গা বসু, চিত্রা, রাণী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

❋

পরিচালক :—**তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী**

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী :—**মধু শীল**

আলোকচিত্র-শিল্পী :—**বিভূতি লাহা**

শব্দ-যন্ত্রী :—**যতীন দত্ত**
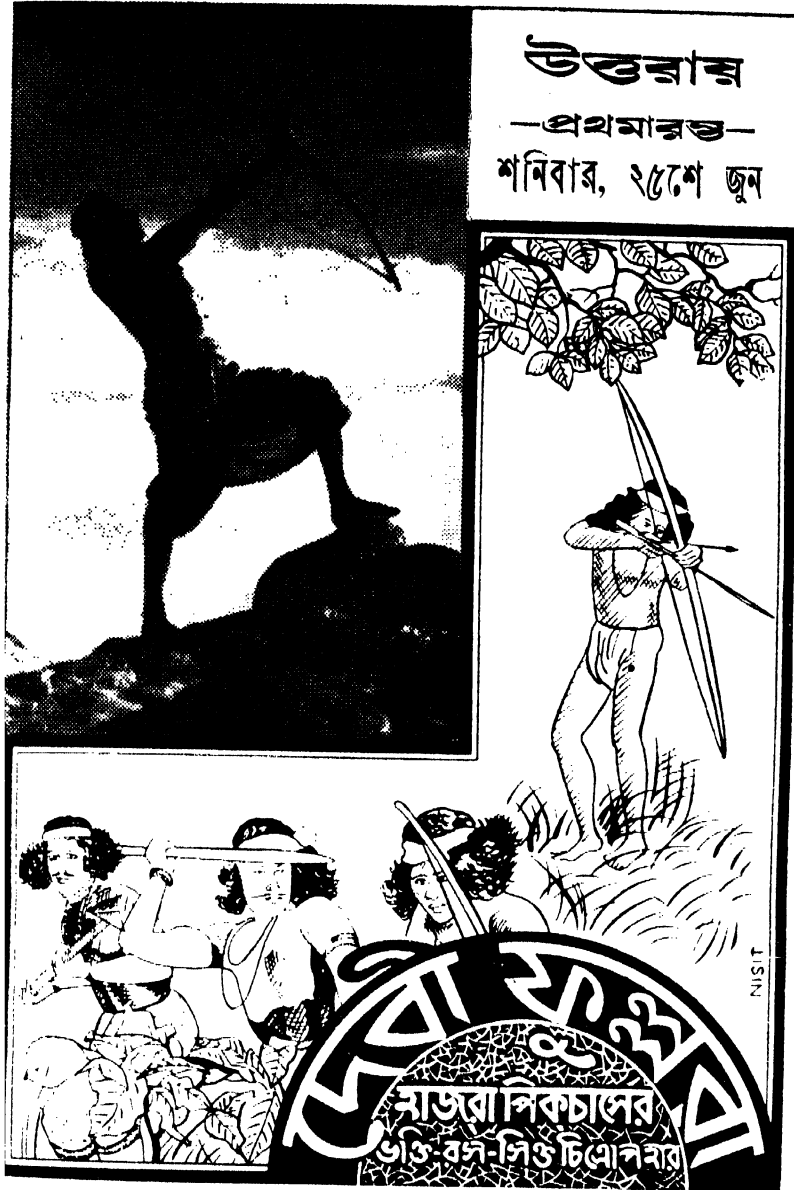
দেবী ফুল্লরা

❋

একদিকে—

প্রেম ও ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন!
কর্ত্তব্য ও নিষ্ঠায় মহিমোজ্জ্বল!
শৌর্য্য ও বীর্য্যে গরীয়ান্!
স্বামী ভক্তিতে মহীয়ান্!
পত্নী প্রেমে আদর্শোজ্জ্বল!

অন্যদিকে—

কূটচক্রীর চক্রান্ত-জাল!
নারীর রূপে লালসাদগ্ধ নর!
শয়তানির চরম পরিণতি!
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দ্বন্দ্ব!

প্রভৃতি বহু ঘটনার সমাবেশে সমুজ্জ্বল।

❋

দেবী ফুল্লরা

বাড়ীর ছেলেমেয়ে থেকে বুড়-বুড়ী সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে ছবিখানি দেখলে প্রকৃত আনন্দ পাবেন।

❋

অগ্রিম প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করুন।

বি বি ধ

শুভ-বিবাহ

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহরায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান গুণেন্দ্র কুমার গুহরায়ের সহিত শ্রীযুত অমল কুমার বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অর্পনার শুভ-পরিণয় গত মঙ্গলবার ৭ই জুন ৫০নং মহিম হালদার রোডে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমরা নব দম্পতীর শুভ কামনা করি।

মিতালী সংসদ

রাজা কিশোরী লাল মেমোরিয়াল হলে শ্রীরামপুর গোস্বামীপাড়া মিতালী সংসদ কর্ত্তৃক জুন মাসের শেষ সপ্তাহে এক বিরাট জলসার আয়োজন করা হইয়াছে। শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও চেয়ারম্যান শ্রীকানাইলাল গোস্বামী ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।

শিল্প-সদন

প্রথিতযশা শিল্পী শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিবার জন্য ৮৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাসন্তী বিদ্যাবীথি ভবনে শিল্পসদন নামে একটি চিত্র বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সকাল ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে ছাত্র ও ছাত্রিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিয়াও ছাত্র ছাত্রিগণ যাহাতে চিত্রাঙ্কণে পারদর্শী হইতে পারেন সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য সন্ধ্যাবেলা ৭টা হইতে ৮টার মধ্যে দেখা করা বাঞ্ছনীয়। আমরা এই নব গঠিত প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

—*—

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আরো মাস কতক এমনি জোড়াতাড়া দিয়ে কাটলো। আজও প্রত্যেকের আত্ম-প্রত্যয় আছে প্রচুর তবে আত্মীয়ের ওপর প্রত্যয়ের ঘটেছে একান্ত অভাব।

একদিন রতীন বেরিয়েছে নিজের ধান্দায় এমন সময় রেবা খুললে রতীনের উপন্যাস-খানা। এখানা রতীন আরম্ভ করেছিল মাসচারেক আগে কিন্তু আজও তার চতুর্থ পরিচ্ছেদের বেশী এগোয় নি। খানিকটা পড়েই রেবা রায় দিলে "রাবিশ।" ওসব লেখা আবার পাঠক সমাজে চলবে আর তাই দিয়ে রতীন পাবে ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি! দিন তিনেক পরেই রেবা যখন পাশের ঘরে একখানা নতুন গান অভ্যাস করছিল তখন রতীন কাণ পেতে শুনে মত প্রকাশ করলে "সেই থোড় বড়ি খাড়া।" এই গান আবার লোকে পয়সা দিয়ে কিনবে!

ব্যস! দাম্পত্য জীবনের আশা, ভরসা, শান্তি, সাচ্ছন্দ্যের হয়ে গেল অকাল সমাধি। ওই যে নিজের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস, তাই দুজনের মাঝে পাঁচিলের মত খাড়া হয়ে উঠলো, মিটমাট আর সম্ভবপর হোল না। সে কথা তুলে ছোট হবার ভয়ে কেউ সে কথা তুলেও না। রেবা ভাবলে অন্য পাঁচজনের মত কোন অফিসে চাকরী করে রতীনের সংসার চালানো উচিত আর রতীনও ভাবলে অন্য পাঁচটা মেয়ের মত রেবারও ঘরে থেকে সংসার দেখা শুনো করা উচিত। তবু সে কথা স্পষ্ট করে বলা মানে আগুন নিয়ে দুঃসাহসিক খেলা ভেবে দুজনেই চুপ চাপ রইলো আর দিন আগে যেমন কোন রকমে কাটছিল তেমনি কাটতে লাগলো।

মাসখানেক পরে একদিন ভাদ্রের পচা গরমের রাত আটটায় বাড়ী ফিরে রতীন দেখে রেবা বাড়ী নেই। সে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরে এক কাপ চা না পেয়ে লেখবার টেবিলের সামনে চুপ করে বসে রইলো। আর রাত দশটায় "গীতবীথি"র বাৎসরিক উৎসব থেকে বাড়ী ফিরে রেবা দেখে বাথরুমে না আছে জল, না আছে একখানা সাবান।

বারুদে আগুন রতীনই লাগালো। রেবা ঘরে পা দিতেই রতীন ঘাড় ফিরিয়ে বল্লে "তারপর?"

রেবার জামা ঘামে ভিজে গেছে, চুলগুলো কপালে ঝুলে পড়েছে, মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সেও বলে উঠলো "বাথরুমে জল একটু রাখলেও পারতে।"

রতীন জ্বলে উঠে বল্লে "তেতে পুড়ে এসে চা এক কাপ দরকার হয় সেটা হুস্ রাখলেও পারতে। আমি রাখবো ওর নাইবার জল! বলতে লজ্জাও হয় না?··· চুপ করে থাকো, মুখ নেড়ো না।"

(ক্রমশঃ)

রাণীমা এসেছে............

শ্রীমতী শিশুবালা

সুখজোড়া, সুখজোড়া, সুখজোড়ার সুখস্মৃতি আমি ভুলতে পারবো না। সুখজোড়া একটি অসভ্য পার্ব্বত্য-পল্লী তবুও তার ভেতর এত আনন্দের কলরব আমার মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে কেন? বোধ হয় সুখজোড়ায় গিয়ে আমি নবজন্ম লাভ কোরেছি তাই সেই পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র-পল্লীর মধুর-স্মৃতি আমার জীবনকে মধুময় কোরেছে —আমার অভিনেত্রী জীবনকে সার্থক কোরে তুলেছে।

আসল ব্যাপার কী তাই আপনাদের জানাবো। জানিনা এই অল্প বিদ্যা নিয়ে তা' ভালভাবে ব্যক্ত কোরতে পারবো কিনা! তবুও এ গল্প একজনকে, দু'জনকে দশজনকে বলে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি না—তাই কাগজে কলমে লেখার আমার এ দুঃসাহসিকতা!

আপনারা বোধ হয় জানেন, কাজরা পিকচাসের পৌরাণিক চিত্র "দেবী ফুল্লরা"-তে আমি নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবার সৌভাগ্যলাভ কোরেছি। এই ছবিরই একটি বাইরের দৃশ্য তোলবার জন্য গেল হপ্তায় আমাকে সুখজোড়ায় যেতে হয়। দৃশ্যটি ছিল—যখন মহামায়ার আশীর্ব্বাদে ব্যাধ-পল্লী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হ'ল এবং সেখানকার রাজা-রাণী হ'ল কালকেতু ও ফুল্লরা···তারপরে কুটচক্রী ভাঁড়ুদত্তের প্রভাবে যখন কালকেতু সুরা ও নারীর মোহমদিরায় নিমজ্জিত; সেই সময় দেবী ফুল্লরা দেব-চরিত্র স্বামীকে এই অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তূর্য্যনিনাদে তার প্রিয়তম প্রজাদের আহ্বান কোরলেন। তারা রাণীর এই আহ্বান শুনতে পেয়ে দলে দলে বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম কোরে দেবী ফুল্লরার সমীপে উপস্থিত হ'ল। এই দৃশ্যটি চমকপ্রদভাবে গ্রহণ করবার জন্য কোলকাতা থেকে বহুদূরে সুখজোড়া নামে এক সাওতাল পল্লীতে আমাদের যেতে হয় এবং সেখানে গিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা-লাভ কোরেছি সেই কাহিনীই আজ আমি এখানে বলবার চেষ্টা কোরব।

সুখজোড়া রাণীগ্রাম ষ্টেশন থেকে পাঁচ, ছয় মাইল দূরে। রাণীগ্রামেরই এক ভদ্রলোক এই সুখজোড়াতে আমাদের শূটিং করবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু তিনি জানতেন না যে, কোন মেয়েছেলে এই দৃশ্যে আছেন কিনা—তাই আমাকে দেখে তিনকড়িবাবুকে বল্লেন—"একে নিয়ে সেই লোকেশনে যাওয়া ত' মুস্কিল! কারণ, ওখানে পৌঁছবার কোন রাস্তা নেই। ধানক্ষেতের আল, মাঠ, নদী ও পাহাড় ভেঙ্গে তবে সেখানে পৌঁছুতে হবে। এই শুনে তিনকড়িবাবু প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন—"মিস্ শিশু কী হবে?" আমি মনে সাহস এনে বল্লাম—"দেখা-যাক না কতদূর পৌঁছুতে পারি। আমার কথা শুনে তিনি মনে একটু বল পেয়ে সেই ভদ্রলোককে বল্লেন—"ও শক্ত মেয়ে আছে, দেখা যাক্ মহামায়ার ইচ্ছের কত-দূর কী হয়!"

এই বলে দুর্গানাম স্মরণ কোরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমার জন্য একখানা পাল্কির ব্যবস্থা হ'ল আর সবাই চল্ল হেঁটে। প্রথম মাইল দেড়েক ধান ক্ষেতের

শ্রীমতী শিশুবালা

আলের ভেতর দিয়ে গিয়ে আমরা একটি নদী পেলাম। সাওতালদের পারাপারের জন্য নদীতে দু'খানা সালতি ছিল। কোনরকমে এক এক কোরে আমরা সেই সালতির সাহায্যে ত' পার হ'লাম। তারপর আরও নানা দুর্ভোগের পর পাঁচ-ঘণ্টা পরে আমরা যথাস্থানে পৌঁছুলাম। এখানে এসে দেখি চারিপাশে বনজঙ্গল এবং উঁচু উঁচু পাহাড়। —আর সেই সব স্থান অধিকার কোরে রয়েছে অসভ্য সাওতালরা ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারে। শোনা গেল, বাঘের উৎপাত রাত্রে খুবই হয় কিন্তু তা'তে যত ভয় নেই তার চেয়ে বেশী ভয় হ'চ্ছে সাপের। এবং একথা যে খুব সত্য তার প্রমাণ আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পেলাম। পাঁচ-মিনিটের মধ্যেই কেউটে ও গোখরা সাপ চার পাঁচটা আশে পাশে দেখতে পেলাম। এই অবস্থায় সকলেরই ত' প্রাণ শুকিয়ে গেল কিন্তু তখন এখানে থাকা ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না।

আমরা এখানে এসে যেখানে উঠেছিলাম সেটি হ'চ্ছে এখানকার জমিদারের খাজনা-বাড়ী। লোকজন কেউ ছিল না, আমাদের সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনিই পূর্ব্ব থেকে আমাদের এখানে থাকবার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি এই দৃশ্যের জন্য প্রায়

দেড়-হাজার সাওতাল নিয়োজিত কোরে রাখেন। আমরা যেদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলাম সেদিন আর শুটিং করা সম্ভবপর হ'ল না। পরদিন সকাল আটটায় শুটিং আরম্ভ হবে এরূপ ঠিক হ'ল—কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের আবার আর এক মুস্কিলে পড়তে হ'ল—যে সকল সাওতালদের এই দৃশ্যে জনতার জন্য ঠিক করা হ'য়েছিল তারা কেউ আর ঘর ছেড়ে বেরুতে চাইল না। খবর নিয়ে জানা গেল, তাদের নাকি কারা বুঝিয়েছে আমরা তাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। এই খবর শুনে ত' তিনকড়ি বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এত কষ্ট স্বীকার কোরে যদি সব পণ্ডশ্রম হয়, তা হ'লে ত' মুস্কিলের কথা। গত্যন্তর না দেখে ঠিক হ'ল কাল সকালেই তা'হলে পত্রপাঠ যাত্রা কোরতে হবে। এমন সময় যে ভদ্রলোকটি আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি বললেন—"এক কাজ কোরলে হয়, কিন্তু তা'তে বিপদ আছে।" আমরা সব উন্মুখ হ'য়ে তাঁর কথা শুনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলাম। তিনি বললেন—"সাওতালদের মধ্যে যদি প্রচার কোরে দেওয়া যায় যে, তাঁদের রাণীমা এসেছে, তা' হলে দলে দলে ছেলে বুড়ো সব আসবে রাণীমাকে দেখতে। কারণ, রাণীর ওপর তাদের ভক্তি অপরিসীম। কিন্তু যদি জানতে পারে যে, এ নকল রাণী তা' হ'লে হয়তো কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।" এই দুঃসাহসিক কাজ কোরতে সবাই ইতস্ততঃ কোরতে লাগলেন। আমি কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে সাহস পেয়ে বললাম—"আমি রাজী আছি।" আমার সাহস দেখে অন্য সকলে মনে মনে ভয় পেলেও মুখে আর কেউ কিছু বললেন না। তখনই সেখানকার সর্দার শ্রেণীর দু'একজন সাওতালকে ডেকে বলা হ'ল রাণীমা আসবেন সব তৈরি হ'। তারা এই খবর পেয়ে একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল এবং সেই সন্ধ্যের সময়ই ঢাক বাজিয়ে সেই খবর চারিদিকে রাষ্ট্র কোরে দিল।

পরদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙবার পূর্ব্বেই দেখি দলে দলে সাওতাল নরনারী কোলাহল কোরতে কোরতে পাহাড়ের পাদ-দেশে জমায়েৎ হ'চ্ছে—তাদের রাণীমাকে দেখবার জন্যে। আমাদের সবাইও তাদের আশ্বাস দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। তিনকড়ি বাবু যাবার সময় বললেন—"খুব সাবধান! তুমি ততক্ষণ রঙটঙ মেখে কাপড়-চোপড় পরে রাণী সেজে থাক—আমি ওদের গিয়ে বলি তোদের রাণীমা আজ তোদের সঙ্গে নাচবে, খেলবে—তোদের পয়সা দেবে।"

কিছুক্ষণ পরে আমি সেজে গুজে পাল্‌কি কোরে সেখান উপস্থিত হ'লাম। আমার পাল্‌কি দেখে দলে দলে সাওতাল আমার পালকির চারিপাশে ঘিরে ধরল আমায় দেখবার জন্যে। এই সময় পাল্‌কির ভেতর ভয়ে থর্ থর্ কোরে আমি কাঁপ্‌ছি। তিনকড়িবাবু তখন সাওতালদের বুঝিয়ে বললেন—"তোরা সব পাহাড়ের ওপারে গিয়ে জড় হ' রাণীমা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন; তিনি একটু পরে বাঁশী বাজালেই তোরা এসে রাণীমার সঙ্গে নাচবি খেলবি।" এই কথা বলতেই সাওতালরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঁচু উঁচু পাহাড় অতিক্রম কোরে পাহাড়ের পরপারে সব জমায়েৎ হ'ল। তখন আমি পাল্‌কি থেকে বাইরে এসে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তূর্য্যনিনাদ করায় দলে দলে সাওতাল এসে আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাণ্ডব নাচ সুরু কোরল। ওদিকে আমাদের ক্যামেরাম্যান খোকাবাবু (বিভূতি লাহা) যথাস্থানে ক্যামেরা রেখে এই দৃশ্যটি সুন্দরভাবে গ্রহণ কোরে চেঁচিয়ে বললেন—'ও-কে'। আমি তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে পাল্‌কিতে উঠলাম। কিন্তু তাতেও কী নিস্তার আছে। দলে দলে সাওতাল নরনারী পাল্‌কির আশে পাশে উঁকি ঝুকি মারতে লাগল আমায় আবার দেখবার জন্যে। তিনকড়িবাবু সেই সময় তাদের রাণীমা সবাইকে বক্‌শিস্ দিয়েছেন বলে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে টাকা পয়সা দেবার ব্যবস্থা কোরলেন। আর আমায় সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত কোরলেন। সেই-দিনই তৎক্ষণাৎ প্রাণে বেঁচে আমরা সেই দুর্গম পথ অতিক্রম কোরে রাণীগ্রামে পৌঁছিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সেইদিন রাত্রেই খাওয়া দাওয়া কোরে আমরা কোলকাতায়

(সি, বি)

ফুটবল

গত ৬ই জুন তারিখে প্রথম ডিভিসন লীগ প্রতিযোগিতার তিনটী খেলা হয়েছিল। তার মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ও কে ও এস বি দলের খেলাটি উভয় পক্ষ দুটি করে গোল প্রদান করায় অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। এই খেলাটিতে সৈন্য দল গর্ব্ব অনুভব করলেও মহমেডান দল খেলাটির পরিনামে বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নি। সৈন্য দল প্রকৃতই এই খেলাটীতে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ন্যায় শক্তিশালী দলের নিকট দুবার একটি করে গোলে পশ্চাতে থেকে দু'বার তা পরিশোধ করে তারা নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে। তবে মহমেডান দলের রহিমের একটি গোল অফ্ সাইডের অজুহাতে অগ্রাহ্য হওয়া এবং তাঁর পেনাল্টি সটটি পোষ্টে লেগে ফিরে আসতে এই খেলাটির দুর্ভাগ্যের প্রকাশ পেয়েছিল। মহমেডান দলের জুম্মা খাঁ, নুর মহম্মদ (বড়), আব্বাস, রহিম, ও নুর মহম্মদের (ছোট), খেলা ভাল হয়েছিল। সৈন্য দলে ফার্টন্, থমসন, মুনি, রা, মিকল্, ও সাইমনের খেলা উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। প্রথমার্দ্ধে চার মিনিট খেলা চলবার পর আব্বাস একটি গোল করলে (১-০) শেষের দিকে ফিলিপস্ গোলটি পরিশোধ করেন (১-১)। সাহু আর একটী গোল করবার পর (২-১) প্রথমার্দ্ধে শেষ হয়। খেলাটি শেষ হবার কিছুক্ষণ আগে সুইনি হেড করে দ্বিতীয় গোলটি পরিশোধ করেন ২-২। দুটি খেলার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ও ক্যামেরোনিয়ানস দলের খেলাটিতে কোন গোল না হওয়ায় প্রতিপক্ষ দল দুটি একটি করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের আর মজুমদার, বি সেন, ও এ নন্দীর খেলা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়েছিল। কালীঘাট ও কাষ্টমস্ দলের খেলাটিতে শেষোক্ত দল কোনক্রমে ১-০ গোলে জয়লাভ করেছে। কালীঘাট দল অধিকাংশ সময় আক্রমণ করে খেলেও তাদের জুনিয়র গোলরক্ষক এন্ দাসের ত্রুটিপূর্ণ খেলার জন্য পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে।

গত সপ্তাহের আরেকটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা পুলিশ দলের নিকট মোহনবাগান দলের পরাজয়। এ বছর এই ভারত বিখ্যাত দলটি এর আগে পরাজিত হয় নি। অবশ্য এ জন্য মোহনবাগান দলের অধিনায়ক বিমল মুখার্জ্জী ও সতু চৌধুরীর অভাব অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া অধিকাংশ জুনিয়র খেলোয়াড় দ্বারা এই দিনকার দলটি গঠিত হওয়ায় মোহনবাগান দলের খেলা আশানুরূপ হয় নি। পুলিশ দলের টেম্পলটন্ ও জেনিংস্ প্রথমার্দ্ধের শেষের দিকে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম দিকে একটি করে গোল প্রদান করবার পর শেষ সময়ে এ রায় চৌধুরী একটি গোল পরিশোধ করতে সক্ষম হন্ (২-১)। ক্যালকাটা ও এরিয়ান্স দলের খেলাটিতে প্রথমোক্ত দল একটিমাত্র গোলে জয়লাভ করে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করে। এই খেলাটিতে বিজয়ী দলের গোলরক্ষক এডেনের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য।

বুধবার ৮ই জুন তারিখের দুটি খেলার মধ্যে একটিতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের বিপক্ষ ভবানীপুর ক্লাবকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছে। এই খেলাটিতে এস্ চ্যাটার্জ্জি বিজয়ী দলের আক্রমণ ভাগের শক্ত অনেকাংশে বর্দ্ধিত করেছিল। প্রথমার্দ্ধেই তিনটি গোল প্রদত্ত হওয়ায় খেলাটির শেষ মীমাংসা হয়ে যায়। পনেরো মিনিটের সময় লক্ষীনারায়ণ একটি গোল প্রদান করবার (১-০) পাঁচ মিনিট পরে এস চ্যাটার্জ্জী আর একটি গোল করেন ২-০। আলেকজান্দার একটি গোল পরিশোধ করলে (২-১) প্রথমার্দ্ধে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে আর কোন গোল হয় না। অপর খেলাটিতেও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ২-১ গোলে ই বি আর দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। প্রথমার্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে রহিম একটি গোল প্রদান করে ১-০ দ্বিতীয়ার্দ্ধে রেল দলের বি কর গোলটি পরিশোধ করবার পর (১-১) খেলাটি শেষ হবার ঠিক পূর্ব্বে মহমেডান দলের নুরমহম্মদ (ছোট) একটি গোল প্রদান করে (২-১) নিজ দলকে জয়যুক্ত করেন।

গত বৃহস্পতিবার মোহনবাগান্ ও কে ও এস বি দলের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষ একটি করে গোল প্রদান করতে সমর্থ হওয়ায় খেলাটির শেষ নিষ্পত্তি হয় নি। প্রথমার্দ্ধের নয় মিনিট অতিবাহিত হবার পর মোহনবাগান দলের এ রায় চৌধুরী নিজ দলের একটিমাত্র গোল করেন ১-০ দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ সময়ে সৈন্য দলের সাইমন গোলটি পরিশোধ করলে খেলাটি শেষ হয়। খেলাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটির কোন কোন

রওনা হ'লাম—কিন্তু বায়োস্কোপে অভিনয় কোরতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছি তা' আজও আমার মনকে এক দিনের যেন আনন্দে মাতোয়ারা কোরে রেখেছে।

খেলোয়াড় অখেলোয়াড়জনোচিত মনোভাবের পরিচয় দেন। এবং শেষ পর্য্যন্ত পরিচালক, এস্ চ্যাটার্জ্জি এবং নিবলুকে মাঠ পরিত্যাগ করবার আদেশ প্রদান করতে বাধ্য হন।

কালীঘাট ও ক্যামেরোনিয়ানস্ দলের খেলাটির আশ্চর্য্যজনক' পরিণতি হয়েছে। কালীঘাট দল উভয়ার্দ্ধে একটি করে গোল প্রদান করে জয় সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে নিজেদের খেলায় শৈথিল্য প্রকাশ করে। সৈন্য দল এই সুযোগের অবসর নিয়ে শেষ তিন মিনিটের মধ্যে দুটি গোল পরিশোধ করে (২—২), অবশ্য সৈন্য দলের একটি গোল্ পেনাল্টি কিক্ থেকে হয়। কালীঘাট দলের জয়া ছুটি এবং সৈন্য দলে রে, এবং স্মিথ প্রত্যেকে একটি করে গোল প্রদান করেন।

শুক্রবারের একটিমাত্র খেলায় কাষ্টমস্ দল তাদের বিপক্ষ পুলিশ দলকে শেষ সময়ে একটি পেনাল্টি কিক্ থেকে গোল প্রদান করে পরাজিত করেছে।

শনিবার প্রথম ডিভিসন লীগ প্রতিযোগিতার তিনটি খেলা হয়। তার মধ্যে একটি খেলায় মোহনবাগান দল ব্যারাকপুরের ক্যামেরোনিয়ানস্ সৈন্য দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। মোহনবাগান দলের এ গাঙ্গুলী প্রথমার্দ্ধের শেষ সময়ে দর্শনীয়ভাবে লট্ করিয়া এই বিজয়সূচক গোলটি প্রদান্ করেন ১—০ বিজয়ী দলের দুটি নিয়মিত খেলোয়াড় বিমল মুখার্জ্জি ও যোগজীবন দত্ত না খেলা সত্ত্বেও তাহাদের জয়লাভ প্রকৃতই গর্ব্বের বিষয়। এই খেলাটিতে ক্যামেরোনিয়ানস্ দল্ একটি পেনাল্টি কিকের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে নি। ইষ্টবেঙ্গল ও ক্যালকাটা দলের খেলাটি কোন গোল না হয়ে অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল দল একটি পেনাল্টি কিক্ পেয়েও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে নি।

কালীঘাট ও ই বি আর দলের খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। উভয় দলই দুটি করে গোল্ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমার্দ্ধে সামাদ একটি গোল প্রদান করবার পর (১—০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের গোড়ার দিকে জোসেফ গোলটি পরিশোধ করে ১—১ বারো মিনিটের সময় জোসেফ আর একটি গোল্ প্রদান করে নিজ দলকে অগ্রগামী করে (২—১) দুই মিনিট পরে রেল দলের বি কর গোলটি পরিশোধ করার পর প্রতিপক্ষ দল দুটি একটি করে পয়েন্ট লাভ করে।

গত শনিবার পর্য্যন্ত প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান:—

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিঃ	পয়েন্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	১২	৬	৩	৩	২০	১৩	১৫
মোহনবাগান	১২	৩	৮	১	১১	৮	১৪
কাষ্টমস	১৩	৪	৬	৩	১৩	১২	১৪
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৪	৪	৩	১১	৯	১৩
কালীঘাট	১৩	৩	৭	৩	১৩	১২	১৩
পুলিশ	১১	৫	২	৪	১৮	১৪	১২
ই বি আর	১২	৪	৪	৪	১১	১৩	১২
ক্যামেরোনিয়ান্স	১৪	৩	৬	৫	১২	১৩	১২
কে ও এস বি	১০	৪	৩	৩	১২	১০	১১
ক্যালকাটা	১২	৩	৪	৫	৬	১২	১০
ভবানীপুর	১২	৩	৩	৬	১৪	১৭	৯
এরিয়ান্স	১১	৩	৩	৫	৯	১৭	৯

ক্রীকেট

গত ১০ই জুন্ 'নটিংহাম্' মাঠে ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার এই বারের প্রথম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ' আরম্ভ হয়েছে। পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াল্টার হ্যামণ্ড এবং ডন্ ব্র্যাডম্যান্ যথাক্রমে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার দলের অধিনায়কত্ব করছেন। তবে এই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব হ্যামণ্ডের উপর এই প্রথম অর্পিত হয়েছে। এই দুটি ক্রিকেটামোদী জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলার পরিনামের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে একটা সাড়া পড়ে গেছে। উভয় দলের

প্রথম দিনের খেলা

খেলাটি আরম্ভ হওয়ার সময় প্রায় ১৫০০০ হাজার দর্শক সমাগম হয়। ইংলণ্ড দল টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাটিং করে এবং দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৪২২ রান করে। বার্ণেট শতাধিক রাণ করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহা বার্ণেটের ইংল্যাণ্ডে অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলায় প্রথম শতাধিক রাণ। ১৯৩৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ার এডিলেড্ মাঠে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে বার্ণেট ১২৯ রান করেছিলেন। সুতরাং টেষ্ট ম্যাচে বার্ণেটের ইহা দ্বিতীয় শতাধিক রান। তাছাড়া বার্ণেট ও হাটন প্রথমে খেলে দু'শর বেশী রান করে ইংলণ্ডের টেষ্ট খেলায় প্রথম জুটীর খেলার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। হাটনও নিজস্ব একশো রান করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা

দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ড দল ৮ উইকেটে ৬৫৮ রাণ করে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। ইংলণ্ড দল টেষ্ট ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই ইনিংসে বার্ণেট, হাটন, পেণ্টার এবং কমটন্ একশো কিম্বা তার চেয়ে বেশী রাণ করেছেন। টেষ্ট ইতিহাসে এর আগে পৃথিবীর কোন ক্রিকেট দল দলের চারজন খেলোয়াড় এক ইনিংসে প্রত্যেকে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তাছাড়া ইংলণ্ড দল এর আগে কোন টেষ্ট ম্যাচে এত রাণ তুলতে পারে নি। দ্বিতীয় দিনে প্রায় ৪০০০০ দর্শক সমাগম হয়। এবিষয়েও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব্বের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জনসমাগম হয়েছিল ৩৫২৫০ জন। অষ্ট্রেলিয়া দল দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৩৮ রাণ করবার পর খেলা শেষ হয়।

—

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—দশ—

জামসেদপুর টাটানগরে পৌছিয়া কণাকে Ladies' waiting room এ রাখিয়া অমল বাড়ী খুজিতে বাহির হইল এবং বেলা ১১টায় ফিরিয়া আসিয়া কণাকে লইয়া নূতন বাসা বাটীতে গেল। বাড়ীখানি দ্বিতল; উপরে দুইটী ঘর। নীচে রান্না ও ভাড়ার ঘর ছোট একটী উঠান। অমল একটী চাকরও ঠিক করিয়া আনিয়াছে বয়স তাহার ষাট; কাণে শোনে কম ও চোখে তাহার ছানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাল দেখিতে পায় না। অমল বাজার হইতে কিছু খাবার আনিয়া নিজে খাইল ও কণাকে খাইতে দিল। পরে নিজেই একটা গৃহস্থালীর ফর্দ্দ করিয়া লইল ও তাহা কণাকে দেখাইয়া বাজার করিতে বাহির হইল। কণা তাহার নূতন বাটীর এক কোণে বসিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল। বেলা তিনটায় বিছানাপত্র বাসন ও হাটবাজার করিয়া অমল বাটী ফিরিল। অমল পাকা গৃহিণীর ন্যায় সমস্ত দ্রব্য আনিয়াছিল তাহাতে সেই দিনই তাহার শতমুদ্রা ব্যয় হইল। সে কণাকে খুসী করিবার জন্য বিবিধ বস্ত্র ও প্রসাধন সামগ্রী ক্রয় করিয়াছিল। বৈকালে কণা ও অমল স্নান করিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা করিল ও আটটার মধ্যে আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িল। কণার ক্লান্তিবোধ অত্যধিক হইতেছিল সেজন্য সে শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। অমল রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত তাহার কর্ণে প্রেমগুঞ্জন করিল বটে, কিন্তু তাহার আশানুরূপ ফললাভ হইল না।

কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই অমলের সুমধুর ব্যবহারে কণা অমলের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল ও অচিরেই তাহার ধারণা হইল অমলের কথাগুলি শুধু মৌখিক নয়। ইহা যে সত্যই অন্তরের কথা তাহা কণা বিশ্বাস করিল। দুইজনে প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হইল ও কণা অচিরেই অমলের পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিল। অরুণ বা শুভ্রার কথা আর তাহার মনে পড়ে না এখন তাহার সমস্ত হৃদয়টা অমলই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মমতে বিবাহ করাটা যে একান্ত প্রয়োজন একথা কণা ও অমল সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। তাহারা স্রোতে তৃণের ন্যায়, কর্ণধারহীন তরীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। তাহারা ভাবিল এই উদ্দাম প্রণয়োচ্ছ্বাস, অনাবিল আত্মবিস্মৃতির আনন্দ বুঝি এই ভাবেই চিরকাল চলিবে।

অধরসুধা পান করিয়া যে পেটের ক্ষুধা মেটে না তিনমাস যাইতে না যাইতে অমল ও কণা উভয়েই বুঝিতে পারিল। অমল আসিবার সময় যে পাঁচশত টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল এই কয়মাস নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকায় তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অমল বুঝিল চাকরী করা ভিন্ন আর উপায় নাই। সে চাকরীর চেষ্টায় বাহির হইল। কিন্তু চাকরী করিব বলিলেই চাকরী হয় না; অমল ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও তাহার কেবলই মনে হয় তাহার কবিত্বপূর্ণ সরল জীবনে যত কিছু বাধা, যত কিছু বিপত্তি, কঠোরতা সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছে ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে কণা। কণার নেশা তখনও কাটে নাই তাই অমলকে সুখী করিবার জন্য তাহার গহনাগুলি বিক্রয় করিবার জন্য এক একটী করিয়া খুলিয়া দেয়, কারণ এ ভিন্ন সম্মান রক্ষার অন্য পন্থা ছিল না।

ইদানীং কণা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য অমলকে বারবার অনুরোধ করিয়াছে কিন্তু অমল তাহাতে কর্ণপাত করে না বরং উত্তরে বলিয়া থাকে, "পাথরের দুটী সামনে রেখে আগুন জেলে দুটো সংস্কৃত আওড়ালেই বিয়ে হয় একথা তোমায় কোন পণ্ডিত শিখিয়েছে বল তো?" কণা ইহার পর তাহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিলে সে কণাকে শাসাইয়া বলিয়া থাকে, "বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমায় রেখে কলকাতায় চলে যাব, তখন বিয়ে করবার মজা টের পাবে'খন।" কণা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। তাহার অদৃষ্ট যেমন ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সে আশা করিতে পারে?

অবিরাম উমেদারী ও অশেষ চেষ্টার ফলে অমল ত্রিশ টাকা বেতনের একটী চাকরী সংগ্রহ করিল। চাকরী পাইয়া সে ভাবিল আরও কিছুদিন সে কণার যৌবনসুধা পান করিবার সুযোগ পাইল। কিন্তু কার্য্যতঃ দাড়াইল অন্যরূপ। সমস্তদিন লৌহ কারখানায় কার্য্য করিয়া সে যখন বাটী আসে তখন ক্লান্ত দেহখানাকে সে যেন বহন করিতে পারে না। কোন প্রকারে কিছু আহার করিয়া শুইয়া পড়ে: রাত্রি কেমন করিয়া কাটিয়া যায় তাহা সে বুঝিতেও পারে না। কবিত্ব, সাহিত্য, প্রেম, উচ্ছ্বাস তাহার মস্তিষ্ক হইতে কর্পূরের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সে গ্রাজুয়েট, সে সাহিত্যিক একথাও সে ভুলিতে বসিয়াছে। যদি বা রাত্রিতে সে জোর করিয়া নিদ্রাকে বিতাড়িত করিয়া কণার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছে পরদিন অফিসে গিয়া নিদ্রাদেবীর আক্রমণ হইতে সে নিজকে রক্ষা করিতে

পারে নাই এবং উপরওয়ালাদের নিকটে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া রুষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া কণার উপর তাহার সমস্ত অপমানের শোধ লইয়াছে। দুই একদিন সে ক্ষিপ্ত হইয়া কণাকে প্রহারও করিল। এইরূপে এক বাটীতে বাস করিয়া তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল। অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগ আসিয়া উভয়ের হৃদয় অধিকার করিল। কণার কবল হইতে সে কিরূপে নিজেকে মুক্ত করিবে অমল আজকাল তাহাই চিন্তা করে। তাহার মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় সে কণাকে রাখিয়া পলায়ন করিবে, কিন্তু কি জানি কোন্ আকর্ষণ তাহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বাধা দেয়। সে চেষ্টা করিয়াও পলায়ন করিতে পারে নাই। অবশেষে সে অরুণকে একটী পত্র লিখিল—তাহাতে পলায়নের প্রথম রাত্রি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া অবশেষে আবেদন করিল যে সে আর কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, জীবন তাহার বিষময় হইয়া উঠিয়াছে, পিতার নিকট ফিরিবার পথ বন্ধ। যদি দয়া করিয়া অরুণ তাহাকে ও কণাকে আশ্রয় দেয় তাহা হইলে দুইটী জীবন রক্ষা পায়।

অরুণ পত্র পাইল ও সেই পত্রখানা অবিলম্বে অমলের জ্যেষ্ঠ কমলবাবুর নিকট খাম সমেৎ পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং কোন উত্তর দিল না। বিতৃষ্ণায় তাহার সমস্ত মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল।

—এগার—

কনিষ্ঠ পুত্র অমলের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে মহীতোষবাবু স্তম্ভিত হইলেন। ক্রোধে ও ক্ষোভে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। তিনি প্রথমে স্থির করিলেন অবাধ্য পুত্রের মুখ দেখিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। অমলের বিদায়ের কয়েক দিন পরেই তিনি অরুণের বাটীতে গিয়া তাহাকে অকথ্য ভাষায় অপমান করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে যদি অমলকে তিনি ফিরিয়া না পান তাহা হইলে অরুণকে খুন করিতেও তিনি দ্বিধা বোধ করিবেন না। অরুণ সমস্ত শুনিল, তাঁহার কথার একটী প্রতিবাদও করিল না বা বৃদ্ধকে কোনরূপ উপেক্ষাও করিল না। অবশেষে বৃদ্ধ যখন তাহার সম্মুখে বসিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন—অরুণ অমলকে ফিরাইয়া আনিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

মহীতোষ যেখানে যত আত্মীয় ছিল সকলকেই অমলের সংবাদ লইবার জন্য পত্র লিখিলেন। কাহারও নিকট হইতে আশাপ্রদ উত্তর পাইলেন না। অবশেষে, যে অমলের সংবাদ দিতে পারিবে তাঁহাকে পাঁচ-শত টাকা পুরস্কার দিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। তাহাতেও সুফল ফলিল না। মহীতোষ ও তাহার পত্নী নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিতে লাগিলেন। কমল বাবুও ভ্রাতার সন্ধান লইতে ক্রটী করিলেন না. অরুণের নিকট হইতে অমলের পত্র পাইয়া মহীতোষ বলিলেন, "কমল, আজই তুই টীটাগরে যা বাবা, যেমন করে পারিস পাগলটাকে ফিরিয়ে আন—কিন্তু খবরদার সেই ডাইনীটাকে যেন সঙ্গে আনিস্‌নি। পিতা-মাতার অনুরোধে কমলবাবু সেই রাত্রিতেই টীটাগরে যাত্রা করিলেন ও পর দিবস অফিসে গিয়া অমলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি অমলকে বলিলেন, "দেখ ভাই, আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়। বাবা ও মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। তুমি বাড়ী চল।"

অমল বলিল, "এই মুখ আমি বাবাকে কি রূপে দেখাব বলত? আমার যাওয়া হইবে না।" কমলবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন পিতামাতা তাহাকে পাইবার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। ক্ষমা তাহাকে তাঁহারা পূর্ব্বেই করিয়াছেন নচেৎ কমলকে তাঁহারা পাঠাইতেন না।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া অমল বলিল সে কণাকে ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও যাইতে পারিবে না কারণ কণা তাহার জন্য যাহা করিয়াছে সেই কৃতজ্ঞতা সে ভুলিতে পারে এরূপ পশু সে নহে। তাহাকে যাইতে হইলে কণাকেও লইয়া যাইতে হইবে।

কমলবাবু তাহাকে পুনরায় বুঝাইলেন যে একটা তুচ্ছ নারীর জন্য নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই উচিত নহে। ভগবান যাহাকে পৃথিবীর আবর্জ্জনা মনে করিয়া সমাজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে চাহেন তাহাকে সুখী করিবার প্রয়াস মরুভূমিতে বারি সিঞ্চন করিবার মত বাতুলতা মাত্র। অমল যদি বুদ্ধিমান হয়-তো অবিলম্বে কণাকে ছাড়িয়া তাহার ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন সে যদি এখনও ফিরিয়া না যায় পিতা তাহাকে ত্যজ্যপুত্র করিবেন এ ভয়ও অমলকে দেখাইতে ভুলিলেন না। পাছে বাটী ফিরিলে অমলের মতির পরিবর্ত্তন হয় সেই জন্য অফিস হইতে সোজা ষ্টেশনে যাইবার জন্য অমলকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমল অবশেষে তাহারই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধ্যাসমাগমে ভ্রাতার সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

রাত্রি আটটার ট্রেন। অমল কণার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কমল বাবু বিবিধ উপদেশে তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টোটানায় পড়িয়া অমল চঞ্চল ও উত্তপ্ত হইয়া পড়িল। সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একদিকে স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার কাতর আহ্বান, অপর দিকে কণার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল তাহার দুঃসহ কেরানী জীবন ও লাঞ্ছনা। সে স্থির করিল ফিরিয়া যাইবে। কণার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার ঘটিবে। তাহার জন্য ভাবিয়া লাভ কি? বাটী ফিরিয়া গেলে সে নিজে সুখী হইতে পারিবে। অতীতকে পদদলিত করিয়া ভবিষ্যতে সে নিজের জীবনকে মধুর করিয়া তুলিতে পারিবে। দাদা সত্যই বলিতেছেন—"কণার জন্যে আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা একই কথা।"

ট্রেন আসিল, শিষ্ট যুবকের ন্যায় সে ভ্রাতার সহিত ফার্ষ্ট-ক্লাশ কামরা অধিকার করিয়া বসিল। সে ভাবিল আজ তাহার দুঃখের অবসান হইল। গাড়ীতে উঠিয়াই উভয় ভ্রাতা জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়িল। সারাদিনের ক্লান্তিতে কমলবাবু কাতর হইয়াছিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন—কিন্তু অমলের নিদ্রা আসে নাই। সে শুইয়া শুইয়া কণার সহিত প্রথম দর্শন দিবস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিল। বিবেকের বেত্রাঘাতে সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার সমস্ত শরীর ভেদ করিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে কে যেন শতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল কণার সর্ব্বনাশের জন্য সেই দায়ী, সেই দোষী। আজ সে অবলা রমণীকে শতবিপদের মধ্যে রাখিয়া নিজের সুখের জন্য চোরের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। তাহার এই কৃতঘ্নতার শাস্তি মিলিবে, পলায়ন করিয়া সে ঈশ্বরের রোষ-বহ্নি হইতে রক্ষা পাইবে না। সে উঠিয়া পড়িল, জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিল টাটানগরের অগ্নিতপ্ত লোহিত আকাশ তখনও দেখা যাইতেছে। বাতাস যেন হু-হু করিয়া তাহার কর্ণে বলিয়া গেল, ওরে, ওরে তস্কর, ওরে কাপুরুষ এখনও সময় আছে ফিরিয়া চল। তাহার চোখের সম্মুখে কণার বিষাদনেত্র ফুটিয়া উঠিল। অমল গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিল ও কালক্ষেপ না করিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল।

অমলের কি হইল নিদ্রিত যাত্রীদল তাহা জানিল না; দৈত্যের ন্যায় হুঙ্কার দিতে দিতে ট্রেনখানি অন্ধকারের কোলে মিশাইয়া গেল।

—বার—

কণা রন্ধন করিয়া অমলের অপেক্ষায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। অমল আসিল না। কণা উদ্বিগ্ন হইয়া বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচরণকে বলিল, "যা বাবা রাইচরণ, একবার দেখে আয়, বাবুর কি হলো।" রাত্রিতে রাইচরণ চোখে ভাল দেখিতে পায় না তথাপি সে অমলের খোঁজে বাহির হইল। সেই নির্জ্জন গৃহে কণা একাকিনী বসিয়া রহিল অমলের প্রতীক্ষায়। রাত্রি বারটায় রাইচরণ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে বাবুকে খুজিয়া পাওয়া গেল না। আফিসে বাবুর এক ভাই আসিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আফিস ত্যাগ করিয়াছে, আফিসের বাবুদের কাছে রাইচরণ সে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে। কণা এই সংবাদ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রথমে সে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে অমল এতটা নিষ্ঠুর ও নৃশংস হইতে পারে যে তাহাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সংবাদ না দিয়া অমল চলিয়া যাইবে। কিন্তু সমস্ত রজনী প্রতীক্ষায় থাকিয়াও অমলের আগমনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তাহার পর আরও দুইদিন সে অমলের প্রতীক্ষা করিল তথাপি অমল ফিরিল না। অমল তাহাকে যে ভয় প্রদর্শন করিত এত শীঘ্র যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে কণা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। তাহার শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। নিশ্বাস রুদ্ধ হইতে লাগিল—সে প্রমাদ গনিল। সে বুঝিল অমলের মোহ কাটিয়াছে প্রেম পিপাসা মিটিয়াছে আর তাহাকে তাহার প্রয়োজন নাই তাই সে তাহাকে ফেলিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়াছে। কণা বিচার করিয়া দেখিল অমল যাহা করিয়াছে এই অবস্থায় সকল তরলমতি যুবাই এইরূপ করিত; সে তাই অমলকে অভিসম্পাত দিল না; অমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া জগদীশ্বরের নিকট বিচার প্রার্থনা করিল না। সে ভাবিল এমন কোন দেশে যদি সে যাইতে পারিত যেখানে পুরুষ নাই তাহা হইলে সে শান্তি পাইত।

চতুর্থ দিন প্রাতঃকালে তাহার হাতের চারগাছি চুড়ি খুলিয়া রাইচরণের হাতে দিয়া বলিল, "রাইচরণ, ক'গাছা সোনার চুড়ি সেক্‌রার বাড়ী থেকে বিক্রী করে আনতো বাবা। রাইচরণের চোখে জল আসিল। সে বলিল, "ছিঃ মা, অমন কাজও করোনা। বাবু থাকতে সব গয়নাগুলো তিনিই খোয়ালেন, ঐ ক'গাছা যা আছে তা আর বিক্রি করো না মা। সতী লক্ষ্মী মেয়ের কি হাতশুধু করতে আছে?"

কণা এবার তাহার অশ্রুরোধ করিতে পারিল না। সে রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "রাইচরণ, তুমি যাকে সতী লক্ষ্মী ভাবছ সে সত্যি সতী লক্ষ্মী নয়। সতীত্ব কাকে বলে তা জানবার সুযোগ আমাকে ভগবান দিয়েছিলেন কিন্তু হতভাগিনী আমি, আমি তা গ্রহন না করে নিজের উদ্দাম আকাঙ্খা পরিতৃপ্তির জন্য তোমাদের অমলবাবুর আশ্রয় নিয়েছিলেম। অমল বাবু আমায় ধর্ম্মতঃ বিবাহ করবার আশা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু এই সুদীর্ঘ ছয়মাসে তা করবার অবকাশ পান নি। ধর্ম্মের চোখে আমি তার গণিকা, রক্ষিতা ভিন্ন আর কিছুই নয় রাইচরণ। এই তো আমার সতীত্ব, তবে কোন সাহসে তার দোহাই দেব তুমি বলতে পার? আর লক্ষ্মীর কথা বলছো? আমার সমস্ত জীবনে তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই নেই। আমার হাওয়া লেগে হয়তো তাঁর নামের মহিমা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি ভেবনা রাইচরণ, যার ইহকাল পরকাল দুইটী অন্ধকারাবৃত তার আবার অলঙ্কারের মোহ। তুমি যাও বাবা ওগুলো বিক্রয় করে যে কটা টাকা পাও আমায় এনে দাও। তোমাদের দেনা শোধ করে আমি মুক্তি পেতে চাই।"

রাইচরণ পুনরায় বলিল "না মা, তুমি তোমার বুড়ো বেটাকে মিথ্যে বলে ভোলাতে পারবে না। আমি কি কখন ব্যবসাদার মেয়ে দেখিনি বলতে চাও? তারা কি ওম্‌নি করে তোমার মত সেবা করতে পারে না মার খায়? না গায়ের গয়নাগুলো খুলে দেয় বাবুর হাতে ওড়াবার জন্যে? বাবু নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া তাই তোমার মত সতী-লক্ষ্মীকে চিন্তে পারে নি। যাই বল মা এই বাক্যিগুলো আমায় বলো নি। তুমি যদি বেশ্যে হও তবু তুমি আমার মা। তোমার হাত শুধু দেখতে পারবোনি আমি। তুমি তো ছ'মাসে ছত্রিশ টাকা মাইনে আমায় দিয়েছো সেই গুলো ন্যাও। দেনা শোধ কর তার পর মা বেটায় বেরিয়ে পড়বো যে দিকে দু'চোখ যায় সে দিকে।"

কণা তাহাকে বুঝাইল কমপক্ষে একশত টাকার কমে দেনা শোধ হইবে না। অন্ততঃ দুইগাছি চুড়ি তাহাকে বিক্রয় করিতেই হইবে নচেৎ মানরক্ষা অসম্ভব। অগত্যা রাইচরণ চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে চুড়ি বিক্রয় করিতে চলিল। কণা মনে মনে বলিল, সমাজের চোখে নীচ যারা তাহাদের ভিতরে যে মহত্ব লুপ্ত থাকে, ভদ্রবেশী মানবের হৃদয়ে তাহার এত অভাব কেন?

রাইচরণ চলিয়া গেলে কণা একটী ট্রাঙ্কে তাহার কাপড়গুলি গুছাইয়া লইল। কয়েক-জন ভিখারীকে ডাকিয়া সংসারের জিনিষ পত্র বিলাইয়া দিল এবং অবশেষে অমল ও তাহার একত্রে যে ছবিখানি ছিল তাহা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া ধূমায়মান অগ্নিশিখার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

আবার আসিলে?

শ্রীসৌরেন সেন

আবার আসিলে?
আবার বলিলে কাণে বসন্তের রূপরাশি যত
অপেক্ষায় আছে শুধু মোর দৃষ্টি তরে?
যত রং যত ফুল যত গন্ধরাজি
যৌবন-কানন ঘেরি নৃত্য করে সদা
হঠাৎ এসেছে আজি সীমান্তের পথিকের কাছে
ফেলে-আসা যৌবনের উচ্ছ্বাস জাগাতে?
বহু বার বহু দেহ করিয়া আশ্রয়
বহু ব্যথা মরমের তটে দেহ ভরি
তবুও আজিকে কেন আবার আসিলে
অতিক্রান্ত যৌবনের গোধূলির গানে?
ছিনু আমি মত্ত যবে আপন সুবাসে
নাভির কস্তুরীগন্ধে দৃষ্টিহারা সম
প্রতিপদে এঁকে গেছে মিলনের ছবি,
প্রতিটি উচ্ছ্বাস যবে গান হয়ে ঝরাইত মধু
তখন ত' বহুবার এসেছ সুন্দর
তখন ত' বহু রংয়ে রাঙায়েছ মন
বাধা কভু দিই নাই—অনাহূত বলি নাই তোরে
প্রতিটি প্রকাশ তোর বহু স্পর্শে ধরেছি হৃদয়ে
বিনিময়ে কত কত সেই অন্তঃপুরে
দিয়ে গেছ লীলাকর। বলেছি কি কভু
কেন দিলে নিষ্ঠুর আঘাত? মোর মন, রিক্ত
যবে আজি গোধূলিতে, তোমার পরশসুখ
অনুভূতি স্বপ্ন দেখে যবে, মানব দেহের মোহ
লুপ্ত যবে ভিক্ষুমন হ'তে, শ্বেত বস্ত্র সব রংয়ে
করেছে বিদায়—তখন আবার তুমি?
এখনো কি মনে ভাব—দুঃখপাত্র পূর্ণ নহে
মোর?
এখনো কি ফুলশর মোর রক্তে রক্তজবা নহে?
আজিকে দিগন্তে মোর ধূসর আলোক,
যে-আলোকে সন্ধ্যাতারা লুপ্ত নহে সুপ্তির
বিলাসে,
যে-আলোকে মিলন বাসর নহে কভু
আলোকিত,
যে-আলোকে গৃহবাসী হয় পরবাসী,
সেই আলো পথ দেয় ক্লান্ত পদে মোর।
আজ তাই ক্ষমা চাই—পথ ছাড় গ্রন্থিপটিয়ান
তোমার আমার পথ এক নহে আর।

—

হীরার হার

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ, বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

মিঃ ঘোষের বাঁধন খুলে দেওয়া হ'ল। লজ্জায় ও রাগে তিনি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গেলেন। সেবা-শুশ্রূষার ও আত্মীয়-বন্ধুগণের সান্ত্বনায় কতকটা শান্ত হ'য়ে তিনি যা বল্লেন তার মর্ম্ম এই :—

উপরের পোষাকের ঘরে যখন পোষাক বদলাবার জন্য তিনি যান, তখন পাশের ঘরে একটা খস্-খস্ শব্দ তাঁর কানে আসে। একটু মনোযোগ দিয়ে শোনবার পর, তাঁর মনে হ'লো যে পাশের ঘরে একজন কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে পাশের ঘরে উঁকি মেরে দেখেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পান না। তিনি ঘরের মধ্যে ঢোকেন ও প্রত্যেক লুকিয়ে থাকবার মত স্থান পরীক্ষা করে দেখতে থাকেন কিন্তু কোন লোকের অস্তিত্বের কোন চিহ্নও তাঁর নজরে পড়ে না। তখন তিনি আবার পোষাক-পরিবর্ত্তনের জন্য পোষাকের ঘরে ফিরে আসেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ কে এসে তাঁর চোখ দু'টো বেঁধে ফেল্লে। তারপর তিনি চীৎকার করে সাহায্য ডাকবার পূর্ব্বেই; একটা সবল হাত তাঁর কণ্ঠরোধ করে; এবং চাপাগলায় কে তাঁকে চুপ করে থাকতে বলে—নইলে তখনি গলাটিপে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। তারপর সেই অজ্ঞাত আততায়ী ক্ষিপ্রহস্তে তাঁর হাত ও পা বেশ শক্ত করে বাঁধে। লোকটা এত শক্তিমান্ যে তিনি সহস্র চেষ্টা করেও তাকে বাধা দিতে পারলেন না। যখন বাধ্য হ'য়ে তাঁকে নিশ্চেষ্ট হ'তে হ'লো, তখন সেই লোকটা তাঁকে এক পাশে ঠেলে রেখে আয়নার সামনে বসলো।

ধ্বস্তাধ্বস্তির সময়ে চোখের বাঁধন একটু আল্গা হ'য়ে সরে গিয়েছিল। তিনি কতক-কতক রুমালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলেন। লোকটা পকেট থেকে খানিকটা ক্রেপ চুল ও স্পিরিট গাম্ (Spirit Gum) বার করে মুখে দাড়ী-গোঁফ এঁটে নিলে। তারপর যখন আয়নার সুমুখ থেকে সে সরে এলো, তখন মিঃ ঘোষ সবিস্ময়ে দেখলেন, যে লোকটার মুখে ও তাঁর নিজের মুখে কোন প্রভেদ নেই। লোকটা তখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বল্লে—"মিঃ ঘোষ, এইবার আপনার কিছু কাপড়-জামা আমি ধার নেব। প্রতিজ্ঞা করছি তিন দিনের মধ্যে আপনার কাপড়-চোপড় আপনি ফিরে পাবেন।" মিঃ ঘোষ অবাক্ হ'য়ে গেলেন। লোকটার কণ্ঠস্বরও তাঁর কণ্ঠস্বরের অবিকল নকল!

তারপর লোকটা তাঁর কাপড়-চোপড় পরে নিলে। তালা খুলে মিঃ ঘোষ সেই ঘরে ঢুকেছিলেন; তালাটা ড্রয়েস্ট টেবিলের উপর ছিল। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ করে দিয়ে লোকটা চলে গেল।

সে চলে যাবার পর মিঃ ঘোষ অতি কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দেরীতে দরজার কাছে যান। তারপর দুই'পা দিয়ে তিনি সবলে দরজার উপর আঘাত করতে থাকেন। কিছুক্ষণ আঘাত করবার পর বাইরের দিকে লোকের সাড়া পান। কিছু পরে দরজার তালা ভেঙে সকলে ঘরে ঢোকেন।

লোকটা কি রকম দেখতে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যে যতক্ষণ তার মুখে গোঁফ-দাড়ী আঁটা হয় নি, ততক্ষণ তার পিছনটাই তাঁর দিকে ছিল। সুতরাং, তিনি ঠিক বল্তে পারেন না, যে লোকটা কি রকম দেখতে।

* * *

পরের দিন সকালে আমি (ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেক্টিভ) আমার প্রাইভেট ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় আমার স্ত্রী মনীষা এসে বল্লে—"একটা খবর শুনেছ?"

আমি—"না বল্লে শুনবো কি করে?"

মনীষা—"কাল রাত্তিরে থিয়েটার রোডে মিসেস ঘোষের বাড়ীতে পার্টি ছিল। তুমি গেলেনা বলে আমারও যাওয়া হ'ল না। যদি যেতে, তো একটা বেশ বড় কেস হাতে পেতে।"

চায়ে চুমুক দিয়ে আমি একটু হেসে বল্লুম—"আপাততঃ হাতে কেস্ নেই বলে তুমি একটু দুঃখিত হ'য়েছ দেখছি। তা', ব্যাপারটা কি শুনি।"

মনীষা বল্লে—"এই মাত্র—একটু আগে—মিসেস্ ঘোষ এসেছিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম, তাঁর বাড়ীতে সেই পার্টির দিনেই একটা খুব বড় ডাকাতী হ'য়ে গেছে। সে এক বড় অদ্ভুত ব্যাপার।"

আমি একটু কৌতূহলী হ'য়েই জিজ্ঞাসা করলুম—"এতগুলো নিমন্ত্রিত লোকের মধ্যে ডাকাতী?—সে কি রকম? ঘটনা কি বলতো।"

তখন মনীষা সমস্ত বল্লে। আমি শুনে "হো-হো" করে' হেসে উঠলুম। বল্লুম—"বড় মজার ব্যাপার তো! বেচারীরা খাওয়া-দাওয়া করতে এসে কিছু খাইয়ে গেল—এ্যা! ঐ দলের মধ্যে অবিনাশ থাকলে বড় মজা হ'তো। চমৎকার খাওয়া দাওয়া এই রকমে গোলমাল হ'য়ে গেলে তার আপ্‌সোষের সীমা থাকতো না। যাক সেদিন যে আমরা সেখানে ছিলুম না ভালই হ'য়েছে। কারণ, যদি অন্যান্য সকলের জিনিসপত্রের মধ্যে আমার বা তোমার কিছু চুরি যেত, তা হ'লে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকতো না। অপরে ঠকে কিছু যায় আসে না। কিন্তু কেউ যদি ধাপ্পা দিয়ে হরেন মুখুজ্জেকে ঠকিয়ে যায়, তাহ'লে হ'রেন মুখুজ্জে অন্ততঃ বড়ই লজ্জিত হয়—মনে মনে। তার আত্মসম্মানে বড়ই ঘা লাগে, মনীষা! মিসেস ঘোষ এই ব্যাপারের তদন্ত আমার হাতে দিতে চান নাকি?"

মনীষা বল্লে—"না। এমন কোন অভিপ্রায় তিনি প্রকাশ করেন নি। তবে মিঃ ঘোষ হয়তো উত্তেজিত অবস্থায় যে-কোন মুহূর্ত্তে তোমার কাছে এসে হাজীর হ'তে পারেন। কেসটার তদন্ত পুলিসের হাতেই আছে আপাততঃ।"

খবরের কাগজেও ব্যাপারটার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশিত হ'লো। তারপর দু-তিন দিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন রাত্রিতে একটা ব্যাপার ঘটলো, যাতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হ'লো।

সেদিন রাত্রিতে হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। একজন স্ত্রীলোক খুব করুণ ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আমার সাহায্য চাইলেন। তার স্বামী একজন বিখ্যাত অভিনেতা। থিয়েটারে সেদিন 'পরপারে' নাটক অভিনীত হ'চ্ছিল। তাঁর স্বামী মঞ্চের উপরেই নাকি হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার হ'য়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

আমি অনুমতি দিলে, তিনি সেই রাত্রিতেই আমার সঙ্গে দেখা করেন। এবং কান্না ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যে কাহিনীটি বলেন তাহার মর্ম্ম এই—তাঁর স্বামী মহিমের ভূমিকা অভিনয় করছিলেন। এবং সতী দেবী নামে একজন অভিনেত্রী শান্তার ভূমিকা অভিনয় করছিল। ঐ নাটকে একটা দৃশ্য আছে, যেখানে নায়ক মহিম মাতাল অবস্থায় শান্তা বেশ্যাকে গুলি করে' মারবার চেষ্টা করে। সেই দৃশ্য অভিনয়ের সময়, ব্যাপারটা বাস্তবেই পরিণত হ'য়েছে। শান্তাবেশিনী সতীদেবীর কপাল ভেদ করে নাকি মহিমের গুলি চলে গিয়েছে, এবং মহিমবেশী তাঁর স্বামী হত্যাপরাধে ধৃত হ'য়েছেন।

তাঁকে প্রশ্ন করে যতদূর জানলুম, তা'তে সতীদেবীকে খুন করবার তাঁর স্বামীর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে হ'লো না। যা'হোক, তাঁর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁর সঙ্গে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হ'লুম এবং তদন্ত সুরু করলুম। পুলিস ইতিপূর্ব্বেই এসে উপস্থিত হ'য়েছিল। ইন্‌স্পেক্টর মহিমের অংশের অভিনেতাকেই দোষী স্থির করে চালান দিলেন।

আসামীর স্ত্রীর কাকুতি-মিনতিতে আমি ঐ ঘটনার তদন্তের ভার নিলুম। ঘটনাবলী ভালকরে বিবেচনা করে দেখে আমার মনে হ'লো, হত্যাকারী বলে গ্রেপ্তার হ'লেও অভিনেতাটী নির্দ্দোষ হ'লেও হ'তে পারে। অনেক সুবিধা ছিল তাঁর অভিনেত্রীটিকে হত্যা করবার। তা' না করে' তিনি ষ্টেজের উপর সহস্র দর্শকের সামনে সেকাজ করবেন কেন?

ঐ ঘটনার তদন্তক্রমে একদিন রাত্রিতে সতীদেবীর পরিত্যক্ত বাড়ীটা সকলের অগোচরে খানা-তল্লাস করতে যাই। আমার সঙ্গে সেদিন অবিনাশ ছিল। চারিদিক অন্বেষণ করবার পর আমার চক্ষু পড়লো দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ীটার দিকে। ঘড়ীটা বন্ধ হ'য়ে রয়েছে। সাতদিনের দম-দেওয়া ঘড়ী বন্ধ হ'বার কোন কারণ না দেখে আমি ঘড়ীটাকে পরীক্ষা করলুম। যতবার Pendulumটী নেড়ে দিলুম, ততবারই সেটা একটুখানি দুলেই বন্ধ হ'য়ে যেতে লাগলো। সতীদেবীর মতন সৌখীন স্ত্রীলোক এমন চমৎকার ঘড়ীটাকে মেরামত না করে' রেখে দিয়েছে—এও কেমন অসম্ভব বলে আমার মনে হ'লো। ঘড়ীটাকে নামিয়ে নিয়ে সেটাকে খোলবা-মাত্র তার কলের সঙ্গে জড়ানো একটা 'হীরের হার' পেলুম।

তখনি আমার মিসেস্ ঘোষের পার্টির কথা মনে পড়লো। এইটা নিশ্চয় মিসেস্ ঘোষের 'হীরের হার'! অবিনাশকে সব খুলে বল্লুম।

আমরা ঘরের বাইরে আসবো স্থির করছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলুম। আমরা তাড়াতাড়ি একটা বড় দেরাজের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পায়ের শব্দ ক্রমে ঘরের মধ্যে এলো, এবং ঘরের আলো জ্বলে উঠলো।

একজন বল্লে—"পাহারাওয়ালা সাহেব, আমি দেখেছি এই ঘরে লোক ঢুকেছে এইখানেই তারা আছে।"

বুঝলুম কেউ পাহারাওয়ালা নিয়ে এসেছে। তাইতো—অবস্থা তো বড়ই সঙ্গীন হ'য়ে উঠলো।

একজন পাহারাওয়ালা বল্লে—"দেখো তো উধার, ক্ষুড়ীধার। হম ইধার দেখতে হু।"

এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে পাহারাওয়ালারা ক্রমে দেরাজের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ঘর

দিলীপ ও সুনীলা

সুনীলা—অমৃতবাজারে লেখাটা পড়ে সমগ্র ভারত অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছে। পেশোয়ার, লাহোর, দিল্লী, এলাহাবাদ, বেনারস, পুনা, বম্বে, মাদ্রাজ, পাটনা, পুরী এবং শিলং। বেঙ্গলের কিন্তু একখানাও চিঠি নেই।

দিলীপ—জানি।

সুনীলা—গোয়ালিয়র থেকে এক মুসলমান যে পত্র লিখেছেন, সেখানা এক অপূর্ব্ব পত্র। পড়েছো সেটা?

দিলীপ—পড়েছি।

সুনীলা—সে বলছে যে ভারতের দশটা প্রদেশ থেকে যদি দিলীপকুমারের মত দশজন হিন্দু—

দিলীপ—থাক সুনীলা, আমি জানি।

সুনীলা—তোমার আজ কি হ'য়েছে দিলীপ? কোন জিনিষেই যেন তুমি মন দিতে পারছো না।

দিলীপ—আমি তো জানি না, কিছু আমার হয়েছে কিনা!

সুনীলা—কিন্তু আমি দেখছি তুমি যেন কি এক দুঃখের ভারে পীড়িত।

দিলীপ—আমার সম্বন্ধে আমি নিজে যা বুঝতে পারি না, তুমি তা বুঝতে পার, তুমি তো দেখতে পাও।—এ কম গৌরবের কথা নয় সুনীলা!

সুনীলা—কিন্তু গৌরব কার? আমার না, তোমার?

(বলিয়া সুনীলা হাসিল)

দিলীপ—গৌরব তোমার; কারণ, তুমি লোকের মনের অবস্থা বুঝতে পার।—

সুনীলা—লোকের বুঝতে পারি না। পারি শুধু—কিন্তু চিঠিগুলোর উত্তর দেবার কি হবে? একখানা ড্রাফট ক'রে দাও না, ঝপাঝপ টাইপ কোরে দিই?

দিলীপ—না, থাক্।

সুনীলা—উত্তর দেবে না?

দিলীপ—না।

সুনীলা—কেন?

দিলীপ—অভিনন্দন পাবার জন্য লিখি না। সুতরাং অভিনন্দন পেয়ে আনন্দ জ্ঞাপন করার কোন অর্থ হয় বলে মনে করি না।—

সুনীলা—কিন্তু অভিনন্দন যারা পাঠায়, তারা উত্তরের আশা রাখে।

দিলীপ—আমি যদি উত্তর না দিতে পারি, তারা আমায় ক্ষমা কোরবে।

সুনীলা—কিছুতেই ক্ষমা কোরবে না। তারা ভাববে তুমি দাম্ভিক, শিষ্টাচার জান না এবং আরও হয়তো কত কি।

দিলীপ—তা ভাবলেও আমার ক্ষতি কি তা বলো?

সুনীলা—আমার কিন্তু এরকম ভালো লাগে না।

দিলীপ—ওটা একটা সম্পূর্ণ পারিবারিক কথা।

সুনীলা—পারিবারিক কথা। (অল্প থামিয়া বলিলেন) তোমার সঙ্গে তর্ক কোরবো না, কিন্তু তুমি আমায় প্রায়ই যে কথা বল তার হিসাব মতো আমি তোমার পরিবার অন্তর্ভুক্ত কেউ নই। আমি তোমার সহকর্মী, comrade,—দেশমাতৃকার সেবিকা! তা যদি হোল, তবে আমার একটা অনুরোধ—আচ্ছা অনুরোধ নাই ব'ললাম—আমার পরামর্শ কেনই বা পারিবারিক কথা বোলে ঠেলে ফেলে দেবে?

দিলীপ—কিন্তু সুনীলা, পরামর্শের অন্তরালে পারিবারিক স্নেহ বা ভালোবাসার আবেদন কেন এসে উঁকি মারবে?

সুনীলা—ভালোবাসার আবেদন!…

দিলীপ—তুমি পছন্দ কর না আমায় কেউ দাম্ভিক্ বলে। পছন্দ কর না শিষ্টাচার অনভিজ্ঞ ব'লে কেউ আমায় মনে করে—কেন তুমি তা পছন্দ কর না?

সুনীলা—তুমি কি কোরে জানতে পার এটা পারিবারিক ভালোবাসার আবেদন মাত্র? সহকর্মী কি সহকর্মীর খ্যাতি অখ্যাতি, নিন্দা যশ প্রভৃতি ভালোমন্দ'র দিকে একেবারেই লক্ষ্য রাখবেনা?

দিলীপ—নিশ্চয়ই রাখবে। তেমন কোরেই রাখবে যেমন অন্য সব সহকর্মীদের ভালোমন্দ'র দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে!—অর্থাৎ তোমার কাছে আমি বা অজয় হবো সমান ব্যক্তি।—যেমন আমার কাছে তুমি বা হেমনলিনী।—'দিলীপ' কেন তোমার মনের কোনে একটা বিশিষ্ট আসন দখল্ কোরে থাক্‌বে?

সুনীলা—(চিন্তা করিয়া বলিল) বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা তাই। (বলিয়া সে ছোট্ট একখানি খাতা বাহির করিয়া কয়েক ছত্র কি 'নোট' করিয়া লইল)।

দিলীপ—ও কি লিখে রাখলে?

সুনীলা—লিখে রাখলাম আমি আর হেমনলিনী তোমার কাছে এক।

দিলীপ—(হা' হা' করিয়া হাসিয়া বলিল) কিন্তু একটু তফাৎ আছে।

সুনীলা—কি তফাৎ?

দিলীপ—হেমনলিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নেই। তোমার সঙ্গে সে সম্ভাবনা আছে।

সুনীলা—(ঠোঁট চাপিয়া উত্তর করিল) সে সম্ভাবনা আমার সঙ্গেও আর নেই। জ্যাঠামশাই বলেই দিয়েছেন।

দিলীপ—কি ব'লে দিয়েছেন?

সুনীলা—তিনি ব'লেই দিয়েছেন আমাদের এ যোগাযোগটা ভালো হবে না!

দিলীপ—ও!—ভালোই হ'য়েছে!

সুনীলা—হ্যাঁ, ভালোই।

(কয়েক মুহূর্ত্ত দুইজনে স্তব্ধ রহিল)

দিলীপ—যোগাযোগটা কেন ভালো হবে না নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

সুনীলা—না, তা পারিনি। কিন্তু তার দরকার নেই।

দিলীপ—আমিও তাই বলি। তোমা'র সঙ্গে আমার এ বিষয়ে মতের মিল।

সুনীলা—জানি।—সে যাক্, আমি ও ঘরে রই'লুম, দরকার হ'লে ডেকো।

(প্রস্থান)

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—দাদা,—

দিলীপ—কি দ্বিজেন?

দ্বিজেন—বাবার কি হ'ল বোলতে পার?

দিলীপ—কেন?

দ্বিজেন—উইল যা কোরেছেন তার আঘাত সামলাতে তো সকলকে বেগ পেতে হচ্ছে। আজ আবার আমায় ডেকে কি ব'ললেন জানো?

দিলীপ—কি?

দ্বিজেন—ব'ললেন—দ্বিজেন! তুই নাকি সুনীলাকে ভালো বাসিস্?… …আমি স্তম্ভিত একেবারে! ব'ললাম—এ কথা ভাবাও অন্যায়! উত্তরে যা ব'ললেন, শুনলে তোমারও রাগ হবে। ব'ললেন—'আমি সব জানি, আমায় লুকোস্ নি। আমি সেই জন্য ঠিক ক'রেছি তোর সঙ্গেই সুনীলার বিয়ে দোব'!… …

দিলীপ—বেশ তো।

দ্বিজেন—বেশ তো!… …দেখ' দাদা, সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে। উইলের বিষয় কোন উচ্চ-বাচ্য ক'রলে না, বাবা আরও এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিলেন।—ব'ললে—সুনীলার সঙ্গে হবে দ্বিজেনের বিয়ে! এতেও যদি ব'সে ব'সে বলো 'বেশ তো',—আমি আর কিছু না পারি বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারবো।

দিলীপ—দ্বিজেন, বিবাহ আমি ক'রব না। আমারই বরং একথা আগে বলা উচিৎ ছিল। সুতরাং তুমি যদি বিবাহ করো, তাতে ক্ষোভের কি কারণ থাকতে পারে, তা'তো আমি বুঝি না।

দ্বিজেন—দাদা, তুমি সুনীলাকে জানো?

দিলীপ—জানি।

দ্বিজেন—তুমি জান না? ওকে বরং হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া সহজ হবে, কিন্তু আর কাউকে বিয়ে ক'রতে রাজী করানো যাবে না। পাঁচ বৎসর বয়স থেকে যে তোমায় ধ্যান কোরে এসেছে আজ তাকে ফেরানো শুধ্ কঠিন বা অসম্ভব নয়,—ফেরানো হবে পাপ্!

দিলীপ—পাঁচ-বৎসর বয়স থেকে যা কোরে এসেছে সেটা হয়তো হ'য়েছে একটা অভ্যাস মাত্র। মানুষের কোন অবস্থাতেই কোন অভ্যাসের দাস হওয়া উচিৎ নয়—এ কথা আমিও জানি এবং সুনীলারও জানা আছে দ্বিজেন।

দ্বিজেন—সে কথা আমিও জানি। কিন্তু যার বলে একটি ছোট মেয়ে তোমার দুর্দান্ত অসুখের সময় আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে দিবারাত্র তোমার মাথার কাছটিতে ব'সে থাক্‌তে পারতো তাকে তুমি শুধু অভ্যাস বলো?

দিলীপ—না, তা' বলিনা, কিন্তু—

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—কে আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে মাথার কাছে বসে থাকতো দ্বিজেন?

দ্বিজেন—কেউ না।

সুনীলা—কে বসে থাক্‌তো দিলীপ?

দিলীপ—তুমি।

সুনীলা—কার মাথার কাছে?

দিলীপ—আমার।

সুনীলা—ও, সেই কথা!—সে যাক—। আজ তিনটের সময় এলবার্ট হলে মিটিং—সাড়ে পাঁচটায় দেশপ্রিয় পার্কে। সাড়ে সাতটায় রেডিওতে তোমার 'এ্যাড্রেস্', ন'টায় প্রভিন্সিয়্যাল কনফারেন্স।

দিলীপ—মনে আছে।

সুনীলা—কিন্তু বেলা হ'ল, নাওয়া খাওয়া গুলো এখনও বাকী রয়েছে, একটু হিসাব রেখো।

(প্রস্থান)

(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিজেন জিজ্ঞাসা করিল)

হ্যাঁ, কি বলছিলে?

দিলীপ—বলছিলাম—না, অভ্যাস আমি তাকে বলিনা। যে আমার দুর্দান্ত অসুখের সময় আহার নিদ্রা ভুলে দিবারাত্র আমার মাথার কাছটিতে বসে থাক্‌তে পেরেছে সে শুধু অভ্যাসের বশবর্ত্তী হ'য়ে পারে নি, পেরেছে ভালবাসার বলে। এ কথা সত্য। কিন্তু তাকে বিবাহ কোরে বসলেই কি সেই ভালোবাসার চরম প্রতিদান দেওয়া হবে দ্বিজেন?

দ্বিজেন—বিবাহ না কোরলেও তা হবে না! বরং সে ক্ষেত্রে তুমি তাকে এমন অবস্থায় ফেলে দিতে পারবে যাতে তার জীবনটা হ'য়তো—

(কাশীশ্বরের প্রবেশ)

কাশী—দ্বিজেন এখানে কি করছিস্?

(সহসা কাশীশ্বরের আগমনে দ্বিজেন চমকিত;—সামলাইয়া লইয়া বলিল)

দ্বিজেন—না, কিছু করিনি।

কাশী—শুনলাম বিয়ে নিয়ে কি সব বলছিলি?

(দ্বিজেন চুপ করিয়া আছে)

ও এখানে বসে দেশের কাজ করে, তুমি এখানে disturb কোরতে আস কেন?

(দ্বিজেন চুপ করিয়াই রহিল)

চারিদিকে বলে.বেড়াচ্ছিস উইল মানবোনা, বিয়ে করবনা।—ব্যাপারখানা কি?

দ্বিজেন—আমার তো একটা মতামত আছে!

কাশী—নিশ্চই আছে। কিন্তু তোমার মত হিসেবে আমি চলতে বাধ্য কিনা সেটাও একটু বুঝে দেখা দরকার।

দ্বিজেন—আমার মত হিসেবে তুমি কেন চলবে! তবে যে কাজের সঙ্গে আমি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট সে কাজ আমার মত অনুযায়ী হ'লে ভালো হয়।

কাশী—কিন্তু এই ভালোর বিচার কোরবে কে? তুমি, না, আমি?

দ্বিজেন—তুমি কোরবে। কিন্তু আমারও বোঝা দরকার যে আমার ভালোই হচ্ছে। আমি অন্ধ বা অবোধ নই যে, বুঝতে পারবো না আমার মস্ত একটা ভালো করা হচ্ছে!—দাদার বিরুদ্ধে তুমি যে সমস্ত—

দিলীপ—আঃ, দ্বিজেন!

(দ্বিজেন সহসা থামিয়া গেল ও দিলীপের মুখের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রস্থান করিল।—কাশীশ্বরও স্তব্ধ রহিলেন ক্ষণকাল; বোঝা গেল চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে ভিতরের ক্রোধ দমন করিতে হইল। সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে তিনি বলিলেন)

—কথাটা শুন্‌লে দিলীপ?

দিলীপ—ওকথার কোন মানে হয় না বাবা।

কাশী—কোন কথার বল দিকিনি?

দিলীপ—"যে বিচার তুমিই কোরবে, অথচ আমায় বোঝা দরকার যে আমার ভালোই হচ্ছে।"

কাশী—তুমি হ'লে কি বলতে?

দিলীপ (হাসিয়া উত্তর দিল)—তুমি বিচার কোরবে—সেই হবে শ্রেষ্ঠ বিচার। আমি আবার বুঝে দেখতে যাবো কি!

কাশী—দিলীপ, তুমি কেন আমার নিজের—না, তুমি ঠিক্ বলেছ;—তুমি ঠিক্ বলেছ! আমার ভারী আনন্দ হ'ল!

(বলিয়া কাশীশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)

—ভালো কথা, সুনীলাকে দেখতে পাচ্ছি না—সে কোথা? সে কি আর আসে না?

দিলীপ—ঐ ঘরে আছে। ডাকবো?

কাশী—না থাক। আমি এম্‌নি জিজ্ঞাসা কোরছিলাম।

(প্রস্থান)

(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া দিলীপ সুনীলাকে ডাকিল)

—নীলা!

(ক্রমশঃ)
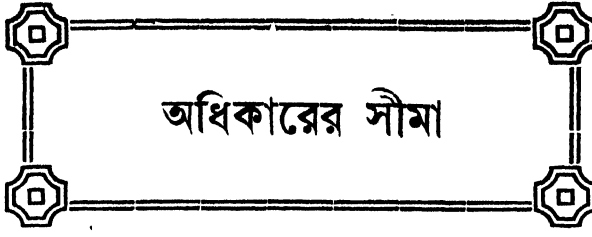
অধিকারের সীমা

পাঁকের ফুল কি শুকনো ডাঙায় বাঁচে? এই কথা বহুভাবে বহুবার বহুজন আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের যথাযথ জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

যে কথা ফুলের জীবনে খাটে, মানব জীবনেও তাহার ছায়া দেখা যায়। এমন ব্যাপার দেখা যায় যে—মানুষ জন্মলাভ করিল পৃথিবীর গহণ এক কোণে, জীবনের বহুভাব তাহার সেই অন্ধকারেই কাটিল। তারপর হঠাৎ তাহাকে একদিন ঘটনার স্রোত আনিয়া ফেলিল তীব্র আলোকময় এক জগতে। হঠাৎ এই স্থান পরিবর্ত্তনের প্রভাব তাহার জীবনে কি ভাবে কাজ করে, তাহা ভাবিবার কথা। এমন ঘটনাও শুনা যায়, যেখানে দীন দরিদ্র এক ব্যক্তি লটারির জোরে হঠাৎ হইয়া পড়িল লক্ষ টাকার মালিক! এই অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহার মানসিক অবস্থা কি হয়? কি যে হয় তাহা স্থির নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তিই বলিতে পারে না।

নিউ থিয়েটার্সের প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'অধিকার' চিত্রেও এমনিধারা একটি ব্যাপার দেখা যায়। ঘটনার স্রোতে এক দরিদ্রা বালিকা হঠাৎ একদিন প্রচুর ধন দৌলতের অধিশ্বরী হইয়া পড়িল। তাহার পূর্ব্ব জীবনের সহিত এই হঠাৎপ্রাপ্ত জীবনের কোন যোগ নাই। এই অবস্থায় সেই বালিকা কি করিবে—কি ভাবিবে এবং কোন পথে তাহার জীবন ধারার স্রোত প্রবাহিত হইবে—তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রমথেশ বড়ুয়া কোন পথে এই বিচিত্র কাহিনীর সমাপ্তি করিবেন, তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্যা ভাবিবার কথা সকল জনের। ছায়াচিত্রে যে কাহিনী বা যে সমস্যা লইয়া পরিচালক তাঁহার চিত্র গড়িতেছেন, তাহা সকল সময় একেবারে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ছায়াচিত্র হইতে বহু সময় বহু চিন্তাধারা আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়, আবার অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবন হইতে বহু কথা, বহু ঘটনা ছায়াচিত্র পরিচালকের মনে কাজ করে।

অধিকার চিত্রের বিষয় বস্তু লইয়া প্রমথেশবাবুর সহিত একদিন আলোচনা কালে তিনি বলেন—"কোন্ মানুষের অধিকারের সীমা কতদূর সেই কথা লইয়াই আমার চিত্র। আমি যে কাহিনী লইয়া কাজ করিতেছি, তাহাতে দুইজন নারীর অধিকারের সীমা লইয়া কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুই নারীর জীবন আমার কল্পিত হইলে—সত্যকার জীবনে এমন নারীর দেখা পাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যকর নহে। যে সমস্যা অধিকার চিত্রে পাওয়া যাইবে বাস্তব জীবনেও সেই সমস্যার উদয় হওয়া বিচিত্র নহে।"

কথাগুলি ভাবিবার কথা। নারীদের বাদ দিয়া সমাজ চলিতে পারে না। কাজে কাজেই নারীর মনে যে প্রশ্ন বা যে সমস্যার উদয় হয় বা হইতে পারে—তাহা সমাজ তুচ্ছ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারে না। যদি সমাজ তাহা করে, তবে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাজকে একদিন না একদিন করিতে হইবেই।

'মুক্তি' চিত্রেও বর্ত্তমান সমাজের বহুতর বিষয় আলোচিত হয়। যে সকল বিষয় আলোচিত হয়, তাহা বহু পরিমাণে বাংলা দেশের প্রায় সকল নর-নারীর মনে আঘাত করিয়াছিল। এবং আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই 'মুক্তি' চিত্রখানি হাজার হাজার জন বার বার দেখিয়াও আবার দেখিয়াছিল এবং এখনও দেখিতেছে। অধিকার-চিত্রেও এই প্রকার নানা সামাজিক ব্যাপার বিচিত্রতর মনোহর কাহিনীর মধ্যে দিয়া দর্শকগণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

যে দুইজন নারীকে আমরা জীবন যুদ্ধে এবং প্রেমের প্রাঙ্গনে সামনাসামনি দেখিতে পাইব, তাহাদের আপনারা সকলেই জানেন। তাহাদের নাম এখন করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে—ঐ দুইজন নারী তাহাদের নিজেদের জীবন দিয়া কাহিনীর বিষয় বস্তুকে অন্তরে সত্য বলিয়া—অন্তত অভিনয় কালে গ্রহণ করিয়াছে। সত্য বলিয়া কাহিনীকে অন্তরে গ্রহণ না করিলে, অভিনয় হইত কেবল অভিনয়, তাহাতে প্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইত না।

যে নারীকে বস্তির নারী বলিয়া অভিনয় করিতে হইতেছে, তাহাকে দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত বস্তির জীবন—সত্যকার বস্তির জীবন দেখানো হইয়াছে। বস্তির মেয়েরা কি ভাবে থাকে, কেমন তাহাদের জীবন, কেমন ভাবে তাহারা দিন কাটায়, তাহাদের পোষাকই বা কি প্রকার ইত্যাদি সকল বিষয়েই এই নারীকে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। বস্তির মেয়েরা জীবন অভিনয় করিতে বলিয়া তাহাকে নিজের শিক্ষা দীক্ষা এবং সত্য জীবনকে সাময়িক ভাবে ভুলিতে হইয়াছে।

বস্তির এই নারীর জীবনে আরো কয়েকটি পুরুষ অভিনেতাকে দেখা যাইবে। তাহারা

শিল্পী সাক্ষাৎ

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

যদিও সেটা ছুটির দিন তবু মন ছিল স্ফূর্ত্তিহীন। কারণ কানায় কানায় ভরে উঠেছিল সারা হপ্তায় যত কাজের আবর্জ্জনায়। অন্যদিন উঠি ছটায়, সেদিন উঠলাম সাড়ে পাঁচটায়। এ কাজে ও কাজে বেজে গেল নটা। তখন স্ত্রী বললে সব কাজই আজ হবে, হবে না কেবল খাওয়াটা। অর্থাৎ? অর্থাৎ—তিনি একটু বাড়িয়েই বললেন—বেজে গেল দশটা, তবু হল নাকো বাজারটা, তবে আজ বন্ধ থাক ওটা। হাতের কাজ অন্য সময়ের জন্য রেখে যাওয়া গেল বাজারে। রোদে পুড়ে গলদঘর্ম্ম হয়ে ফিরলাম তখন সাড়ে দশটা। নাইতে খেতে বাজলো একটা। বিশ্রাম আর করবো কি? মনে পড়লো সন্ধ্যা বেলার নিমন্ত্রণের কথাটা। Swimming Club-এর ছেলেরা করেছে জলসা ও জলযোগের আয়োজন, আসবেন ছোটাই বাবু, হরিপদ, পাহাড়ী, পঙ্কজ মল্লিক, মণ্টু, আর আসবেন তিমিরবরণ। সামলানো যায় কি দেখবার লোভটা? যতই থাক কাজ, যেতেই হবে। কাজেই ডাকতে হল ছেলেকে সেরে নিতে তার সন্ধ্যার পড়াটা। রেহাই যখন পেলাম বেলা তখন তিনটা। তারপর সুরু হল বিকেলের কাজ।

কোন রকমে সব সেরে, সান্ধ্যকৃত সমাপন করে বার যখন হওয়া গেল, দেহমন তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, নির্জ্জীব, নিস্তেজ। তখন নদীর ধারে কিম্বা ফাঁকা মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর বসে চোখ বুজে ঝিমানো চলে, আর কোন কিছু করা চলে না। দুঃখের জীব। ইহাই আমার প্রাত্যহিক জীবনের ইতিহাস, আমার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালীর ধারা।

গিয়ে যখন শুনলাম তাঁদের আসতে রাত হবে নটা মন যেন পড়লো ভেঙ্গে। অনেক লোক একটা ঘরে গরমে গা ঘেসাঘেসি করে বসে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলাম তখন মোটরের শব্দ গেল কানে। সঙ্গে সঙ্গে খবর এল তাঁরা এসেছেন। বাইরে গিয়ে দেখি, পঙ্কজ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মোটর থেকে বহিরাগমনোদ্যত পাহাড়ীকে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলছেন, ওরে পাহাড়ী, কি হবেরে?

—কেন রে?

—দরজায় যে লেখা আছে "Members only" গলার স্বর ও বলার ভঙ্গীতে সকলে হো হো করে হেসে ফেললে।

—তা হলে কি করা যায়! মোটর থেকে নেমে পাহাড়ী অসহায়ের সুরে বললেন।

আবার উচ্চ হাসির রোল উঠলো।

ক্লাবের কর্ত্তা এসে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন আসুন ভিতরে?

—আজ্ঞে, তাহলে আমরা Honorary members, কি বলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

সকলে হাসতে হাসতে গেলাম ভিতরে।

বিস্ময়ে সকলকে অবাক করে দিয়ে পাহাড়ী বললেন, ওটা কি দেখলুম বলুন দেখি?

—কোথায়? কোথায়? সকলে সম-স্বরে বলে উঠলো।

—ওই যে গো মোটরটা যেখানে দাঁড়াল তার ওধারে, রাস্তার ওপারে ছোট্ট ঘরটায়। প্রথমে মনে হল ঘরটা অন্ধকার, তারপর দেখা গেল, না, আলো আছে। একটু জোর করে দেখতে হয়। যখন নামছিলাম মোটর থেকে সেই অস্পষ্ট আলো আঁধারের ভেতর থেকে কি একটা দেখছিল মুখ বাড়িয়ে। এক রাশ চুল তার মুখে। ছোট ছোট ছেলেরা হেসে লুটিয়ে পড়লো। বললো, ওই ওদের দারোয়ান।

—দারোয়ান! তবু রক্ষে।

তারপর আরম্ভ হল গান। গানের পর হাসি গল্প। তারপর আবার গান। "ভাল বেসেছিনু এই ধরণীরে—আমি কি পাইনি।" মাটির পৃথিবীর প্রতি কি অন্তরের দরদ! অপূর্ব্ব ভাবের মাধুর্য্যে, সুরের ঝঙ্কারে ঘর ভরপুর হয়ে গেল। কিন্তু তিমিরবরণের বাজনা শোনা হল না। তিনি আর একবার এসে শোনাবেন বললেন নিজের যন্ত্র নিয়ে এসে!

পাহাড়ী অমনি ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, সেই ভাল, instalment এ হোক আমাদেরও খাওয়াটা হবে।

তারপর আবার গান। সুরের লহরী ঘরের মধ্যে খেলে বেড়াতে লাগলো।

এই নারীর সত্য বন্ধু। বিপদ আপদে এই নারীকে এই বন্ধুর দলই রক্ষা করে। এই বন্ধুর দলকেও বহু কষ্ট করিয়া বস্তি জীবনের পরিচয় এবং আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইতেছে। পরিচালক বড়ুয়া ফাঁকিতে কাজ সারিতে পারেন না। যে বিষয় বা বস্তু পর্দ্দায় তিনি প্রতিফলিত করিবেন তাহা একেবারে নিখুত না করিয়া তিনি নিরস্ত হন না।

'অধিকার' চিত্রের ব্যাপার বর্ত্তমানে নিউ থিয়েটার্সের ২নং ষ্টুডিও পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া আছে। পরিচালক বড়ুয়া ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া যাইতেছেন—যতীন মিত্র মহশয় সেই কাজের ঘড়িটার নিয়মিত দম দিয়া যাইতেছেন। দুই বিখ্যাত কর্ম্মীর সহযোগীতা অপূর্ব্ব আনন্দের বিষয়।

—

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রতিযোগিতার একটি হাত

এ বৎসরের ল্যান্সডাউন কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতা থেকে নিম্নের হাতখানি উদ্ধৃত করা গেল। এক ঘরে এক পক্ষ উক্ত হাতে খেলা করার দরুণ জয়ী হলেন, আর অন্য ঘরে ক্রীড়কদল চিন্তাহীনতার জন্য ডাক দেওয়া সত্ত্বেও হেরে গেলেন। হাতখানি এইরূপ,

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ, ×, × ।
হরতন—টেক্কা, ×, × ।
রুহিতন—×, ×, × ।
চিড়িতন—টেক্কা, × ।

ইস্কাবন—বিবি, × ।
হরতন—সাহেব, গোলাম, নয়, ×, × ।
রুহিতন—× ।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, দশ, নয়, × ।

উভয় ঘরেই একই রকমের ডাক হয়েছিল,

'দ'	'প'
একটি হরতন।	পাশ।
দুইটি চিড়িতন।	পাশ।
পাঁচটি হরতন।	পাশ।
পাশ।	পাশ।
'উ'	'পূ'
একটি ইস্কাবন।	পাশ।
চারটি ফেরাই।	পাশ।
ছয়টি হরতন।	পাশ।

অতঃপর খেলা আরম্ভ হল। প্রতিপক্ষ রুহিতনের টেক্কা খেলে পিটখানি নিয়ে পুনরায় রুহিতন খেল্‌লেন। ডাকদার তুরুপ করে ঐ পিটখানি নিয়ে ছোট এক তাস রঙ্ খেল্‌লেন। ডামির হাতে টেক্কা দিয়ে পিট নিয়ে আবার ছোট রঙ খেলে নিজ হাতে ফিনাস করে পিট সংগ্রহ করলেন। অতঃপর ডাককারী চিন্তা করলেন যে রঙের সাহেব খেলে তিনি যদি বিবি ধরে নেন এবং বিপক্ষ দলের ইস্কাবনের বিভাগ যদি ৩—৩ না হয়ে ৪—২ বা ৫—১ হয়, তাহলে তাঁদের সবগুলি পিট নেওয়া একেবারে অসম্ভব; কারণ তাঁকে দুইখানি চিড়িতন পাশাতে হবেই হবে। অতএব আগে থেকেই যদি একখানি চিড়িতন তুরুপ করে নিয়ে রেখে দিই, ডামির হাত থেকে তাহলে খেলা করা বিশেষ শক্ত নয়। এইরূপ চিন্তার পর চিড়িতনে তিনি একখানি পিঠ তুরুপ করে নেওয়ার পর খেলা করে নিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ঘরে ঐরূপ চিন্তা না করার দরুণ ডাককারী খেলা করতে পারলেন না এবং প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করে চলে এলেন।

এই ধরণের তাস হাতে পড়লেই খেলা আরম্ভ করার পূর্ব্বেই প্রত্যেক ক্রীড়কের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করা অতীব আবশ্যক যে পাশযোগ্য তাসগুলি যে রঙে পাশানো হবে সেই রঙের বিভাগটি কিরূপ। উক্ত রঙের বিভাগ যদি সন্দেহজনক হয় তাহলে সেই বিভাগ ঠিক করে তবেই খেলা বিধেয়, অন্যথা পূর্ব্বোক্ত তাসের মত টেক্কা সাহেব বিবি থাকা সত্ত্বেও একটি কম পিট নিতে বাধ্য হবেন। নিম্নে চারিটী হাত দেওয়া গেল,—

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ, ×, × ।
হরতন—টেক্কা, ×, × ।
রুহিতন—×, ×, × ।
চিড়িতন—টেক্কা, × ।

ইস্কাবন—গোলাম, ×, ×, × ।		ইস্কাবন—×, × ।
হরতন—×, × ।	উ	হরতন—বিবি, ×, × ।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×, × ।	প পূ	রুহিতন—বিবি, ×, ×, ×
চিড়িতন—×, × ।	দ	চিড়িতন—গোলাম, ×, ×, ×

ইস্কাবন—বিবি, × ।
হরতন—সাহেব, গোলাম, নয়, ×, × ।
রুহিতন—× ।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, দশ, নয়, × ।

কোথা দিয়ে সময়টুকু কেটে গেল বোঝা গেল না।

সব শেষ হলে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম সন্ধ্যা বেলার শ্রান্তি ক্লান্তি তখন দূরে গেছে। সবল সতেজ মন আবার সব কিছুই নূতন প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে সক্ষম। সংসারের অতি কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতায় ক্লিষ্ট-পিষ্ট মানুষের পক্ষে শিল্পী-সাহচর্য্য কতখানি মূল্যবান তা নূতন করে উপলব্ধি করলাম। বুঝতে পারলাম এদের প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

কর্ম্মবীর

সুন্দর প্রভাত। সবে সূর্য্য উদিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক পাখীর গুঞ্জনে মুখরিত। এমন সময়ে গ্রাম্য কৃষক ভগীরথ তাহার স্ত্রী অঞ্জলী ও তাহাদের একমাত্র নবজাত শিশু সহ গঙ্গার তীরে উপস্থিত হল। এত বড় পৃথিবী কিন্তু তাহাদের মত ক্ষুদ্র পরিবারের থাকিবার জায়গা নেই। সুন্দর প্রভাত সকলেই সুন্দরের জয়গানে পুলকিত। কিন্তু এহেন সুন্দর প্রভাত তাহাদের নিকট আনিয়াছে দুঃখের এক বিরাট পসরা।

রাজার পাইক বলপূর্ব্বক কৃষক ভগীরথকে রাজার আদেশে রাজদরবারে হাজির করে। ভগীরথের স্ত্রী অঞ্জলী স্বামীর এই অবস্থায় খুবই বিচলিত হয় এবং পাগলিনীর ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করে। নদীর তীরে অযত্নে অবহেলায় তাদের একমাত্র শিশুপুত্র পড়ে রইল। বুঝি বা নদীর জলেই সে শিশু ভেসে গেল।

রাজদরবার থেকে ফিরে এসে ভগীরথ পুত্রকে তন্ন তন্ন করে সর্ব্বত্র খোঁজ করে,—কিন্তু কে তাকে জানাবে যে নদীর জলে তার ছেলে ভেসে গেছে। ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় ভগীরথ প্রতিজ্ঞা করে, যে ভাবেই হউক এর প্রতিশোধ সে নিবেই। তার এ প্রতিহিংসার অনল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না।

এদিকে নদীর জলে শিশু ভেসে যায়। কিন্তু রাজগুরু তা দেখতে পেয়ে নিজ আশ্রমে শিশুকে নিয়ে আসে। অনাথ শিশু রাজগুরুর আশ্রমে প্রতিপালিত হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সে শিশুর শৌর্য্য বীর্য্য মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় প্রতিভাত হয়। রাজগুরু তার নাম দিলেন, "কর্মবীর"। কর্মবীর হল দরিদ্রের বন্ধু, অনাথের সহায় ও পাপীর দুঃস্বপ্ন।

কর্মবীরের শৈশব সঙ্গিনী ললিতা ও কর্মবীরের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মে। কিন্তু বেকল নামক জনৈক গ্রাম্য যুবকও ললিতার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয় কিন্তু ললিতাকে কর্মবীরের প্রতি আকৃষ্ট দেখে বেকল প্রতিজ্ঞা করে কর্মবীরের অনিষ্ট সাধন সে করবেই।

ইতিমধ্যে রাজ্যে খুবই অরাজকতা দেখা দেয়, রাণী প্রভাবতী যখন স্থির করেন যে তাঁহার দত্তক পুত্র অমর সিংকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার পরিবর্ত্তে কুমার চন্দ্র শেখরকে অভিষিক্ত করা হবে তখন অমর সিং কুমার চন্দ্র শেখর ও রাণী প্রভাবতীর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করে। ভগীরথ এসে অমর সিংয়ের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু কর্মবীর রাণী প্রভাবতী ও কুমার চন্দ্র শেখরের পক্ষে থাকায় অমর সিং ও ভগীরথের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

অমর সিং ও ভগীরথ অতঃপর রাজার ধনাগার লুণ্ঠন করে ও রাজাকে হত্যা করে। অদৃষ্টের পরিহাসে রাজগুরু এই খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। অমর সিং তখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

অমর সিংয়ের দক্ষিণ হস্ত ভগীরথ অমর সিংকে চিঠি লিখে জানায় যে, বন্দিনী রাজকন্যাকে বলি দেওয়া হবে, অমর সিং যেন শীঘ্র তথায় উপস্থিত হয়। ভুলক্রমে অমর সিং সে চিঠি ফেলে রাখে এবং তা কর্ম্মবীরের হস্তগত হয়।

এখান থেকেই অদৃষ্টের চাকা ঘোরে, রাণী রাজগুরুর মুক্তি দান করেন, সর্ব্বত্র যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। রাণী তাঁর বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী সহ 'সমরানলে অবতীর্ণা হন।' ভগীরথ তার বাহিনী সহ কর্ম্মবীরের পশ্চাৎধাবন করে। অমর সিংহের শোচনীয় পরিনতি, ললিতার সার্থক ভালবাসা, পিতা পুত্রে যুদ্ধ ও তার পরিনাম ইত্যাদি দেখিতে হলে আপনি নিশ্চয়ই নিউ আলফ্রেড টকীতে "কর্ম্মবীর" দেখিবেন।

প্রভাত সিনেমা

বর্ত্তমানে এই চিত্র গৃহে সাগর মুভি-টোনের হিন্দি চিত্র জায়গীরদার দেখান হইতেছে। ছবিখানা ৭ম সপ্তাহ চলিলেও এর জনপ্রিয়তা এখন পর্য্যন্তও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করেছেন "জায়গীরদারের" পর এখানে ভবনানী ছবি "হিমালয় কি বেটী" দেখান হবে। এনাক্ষী রমারাওয়ের অতুলনীয় নৃত্য ও রামানন্দের অপূর্ব্ব সঙ্গীত উভয়ের মিশ্রনে ছবিখানা হইয়াছে চমৎকার। 'হিমালয় কি বেটীর' পর "৩০০শত দিবস পরে" নামক ছবিখানা দেখান হইবে। গল্পের নূতনত্বে, গানে ও অভিনয়ে ছবিখানা বর্ত্তমান সময়ের আবহাওয়া উপযোগী একখানা শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

নিখিল-বঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন

চতুর্থ-বার্ষিক অধিবেশন

শ্রীউশ্রোদাস

সম্মেলনের শেষ রাত্রির অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬৷১৫ মিনিটের সময় আরম্ভ হইয়াছিল। এই দিনের সকালের অধিবেশনে সম্মেলনের কোষাধ্যক্ষ মহাশয় (লালা বাবু) নিবেদন করিয়াছিলেন যে সান্ধ্য অনুষ্ঠানটী ছাপা programme অনুসারে হইবে না। তিনি সান্ধ্য অনুষ্ঠানের যে তালিকা ঘোষণা করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

৫৷-৬৷টা প্রতিযোগিগণের demonstration

৬৷-৭৷ শ্রীমতী দত্তর

৭৷-৮ প্রোঃ সুরেশ বাবুমান

৮-৮৷ কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

৮৷-১০ শ্রীমতী হীরাবাই

১০-১১ নৃত্য

১১-১১৷ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে

১১৷ হইতে শ্রীমতী কেশর বাই

তাঁহার এই ঘোষণা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় (যিনি সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন) আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া লালাবাবু অপ্রতিভ হইয়া দিলীপবাবুর নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষাপূর্ব্বক পুনরায় ঘোষণা করেন যে তাঁহার পূর্ব্ব নিবেদিত programmeএর মধ্যে কোনও এক সময় ৫ মিনিটের জন্য দিলীপবাবু গান করিবেন। লালাবাবুর এই ঘোষণা শুনিয়া দিলীপবাবু অবশ্য ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিজ আসন গ্রহণ করেন।

এই ত গেল সকালের পালা। কিন্তু, যদিও লালাবাবু সম্মেলনের ছাপা programme (যাহার দাম আবার চারি আনা) নাকচ করিয়া নূতন programme সৃষ্টি করিয়াছিলেন তথাপি বৈকালে দেখা গেল যে কার্য্যতঃ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে programmeএরও কোন মূল্য রহিল না। যাহা হউক, নূতন programme অনুযায়ী ৫৷টায় আরম্ভ হইবার স্থলে ৬-১৫ মিনিটের সময় অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথমে দুইজন প্রতিযোগীর demonstrationএর পর শ্রীযুক্ত মনমোহন সবৎশর্ম্মা সেতার বাজাইলেন। সেতার বাজনার পর বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সারেঙ্গী প্রোঃ মজিদ খাঁ সাহেবের বালকপুত্র মাষ্টার মসিদ খাঁ ভীমপলশ্রী রাগে সারেঙ্গী বাজাইয়াছিলেন। পরপর দুইটী বাজনার পর Programme Director মহাশয় ঘোষণা করিলেন যে শ্রীমতী সন্ধ্যা দত্ত কীর্ত্তন গান করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পূর্ব্বোক্ত ঘোষণার পর Programme Director মহাশয়কে মঞ্চের উপর তাঁহার আসনে আর দেখা যায় নাই। তিনি অবশ্য আর একবার চারি-ঘণ্টা বাদে মাত্র ১০ মিনিটের জন্য আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তখন তাঁহাকে আর programme পরিচালনা করিতে দেখা যায় নাই। তাঁহার আসনত্যাগের মধ্যে কোনও রহস্য লুক্কায়িত ছিল কি না তাহা অবশ্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য নয় তবে তিনি যখন পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও আচরণে যে ইঙ্গিত ও আভাস পাওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে মনে হয় যে তাঁহার উপস্থিতিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ যে অপর কোনও ব্যক্তিকে নিরর্থক নূতন programme ঘোষণা করিতে দিয়াছেন এবং সে programme মতও তাঁহারা কার্য্য করিতেছেন না ইহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়াই তিনি অন্তরে অভিমান বোধ করিয়াছেন। আমরা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছি যে গত কয়দিন ধরিয়াই Programme ঘোষণার বিষয়ে Director মহাশয়ের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কারণ যখনই কোনও বিশিষ্ট গুণীকে পরিচিত করিয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল তখন মাত্র একটী স্থল ব্যতীত যাহাতে অবশ্য সভাপতি মহাশয় নিজেই পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, অন্য সকল ক্ষেত্রেই লালাবাবু অগ্রণী হইয়াছিলেন—Committee হইতে যখন একজন Programme Director নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে তখন তাহার উপস্থিতিতে অন্য কাহারও পক্ষে programme পরিচালনা করিতে যাওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে অবশ্য ভদ্রতা বিরুদ্ধ। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ মহাশয় বোধ হয় director মহাশয়ের কর্ম্ম-কুশলতায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়াই মাঝে মাঝে programme পরিচালনাও করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি শুধু programme পরিচালনা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না; পরন্তু সাধারণ সম্পাদকেরও অনেক কর্ত্তব্য তাঁহাকে পালন করিতে দেখা গিয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় লালাবাবুর মত সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মপটু ও উৎসাহশীল ব্যক্তিকে শুধু কোষাধ্যক্ষের পদে না রাখিয়া যদি সাধারণ সম্পাদকের পদে অচিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে যথারীতি সমাদর করিবেন বলিয়াই বিশ্বাস।

কীর্ত্তনগানের পর শ্রীমতী দত্তর পুরিয়া রাগের দুইখানি খেয়াল (একটী বিলম্বিত একতালায় ও অপরটী দুনী-ত্রিতালীতে) ও যোগিয়া রাগের একখানি ভজন গান করেন। ইহার পর প্রোঃ সুরেশ বাবুমান বাগেশ্রী

রাগের একখানি খেয়াল গাহিয়া "হোলি খেলত নন্দকুমার" এই ঠুমরীটী গান করেন। খেয়াল গানটী অবশ্য আমাদের ভালই লাগিয়াছিল কিন্তু প্রোফেসর সাহেব যদি অন্য কোনও ঠুমরীগান গাহিতেন তাহা হইলে বোধহয়, তাহাতে শ্রোতৃবর্গ অধিকতর আনন্দ পাইতেন। কারণ, এই গানটীই শ্রীমতী হীরাবাই প্রথম রাত্রির অধিবেশনে তাঁহার অনন্যসাধারণ অনিন্দিত ভঙ্গিতে গান করিয়া সহৃদয় সামাজিককে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে তাহার পর অন্য কোনও শিল্পীর পক্ষে উহা গাহিয়া তুল্যভাবে রসসৃষ্টি করিতে না পারাই স্বাভাবিক। প্রোফেসর বাবুখানের গানের পর গৌরীপুরের কুমার বাহাদুর বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সুরশৃঙ্গারে দরবারী কানাড়া ও মিশ্র-পিলুর আলাপ করেন। সময় যখন বেশী হওয়া হয় নাই তখন কুমার বাহাদুর যদি এই স্বল্পকালের মধ্যে দুইটী রাগের আলাপ না করিয়া যে কোনও একটীর আলাপ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে সংক্ষেপে কাজ সারিতে হইত না। বাজনার পর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় কৃষ্ণবিষয়ক এক খানি বাংলা ভজন ("ঐ বৃন্দাবনের লীলা") গান করেন। দিলীপবাবুর গানের পর নাচের আসর আরম্ভ হইল। প্রথমে প্রতিযোগিনীগণের অন্যতমা কুমারী সরোজিনী রায় নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। ইহার পর কুমারী আশা ওঝা মণিপুরী রীতিতে "পূজারিণী" নৃত্য আরম্ভ করেন। গত বৎসর কথক নৃত্যে কুমারীর যে শিক্ষার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবৎসর সে শিক্ষার যথেষ্ট অবনতি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম—কিন্তু আলোচ্য রাত্রিতে কুমারীর তথাকথিত মণিপুরী নৃত্য দর্শন করিয়া ইহা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা গিয়াছিল যে তথাকথিত মণিপুরী নৃত্যের প্রতি কুমারীর এই আকস্মিক অনুরাগই তাঁহার পূর্ব্বশিক্ষার অবনতির একমাত্র কারণ। কুমারী ওঝার নৃত্যের পর বাসন্তী বিদ্যাবিথির ছাত্রীগণ "মহুয়া" নৃত্য আরম্ভ করিলেন। পরিকল্পিত নৃত্যটী চারিটী অংশে সম্পূর্ণ। প্রথম অংশটী শেষ হইতে না হইতেই দেখা গেল যে সম্মুখের আসনে কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে যাঁহারা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই নাচ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি যে ঐ দিন সকালে লালাবাবু মহাশয় নূতন programme-এ আলোচ্য রাত্রিতে এক ঘণ্টার জন্য নাচের ব্যবস্থা আছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র ২৫ মিনিট কাল নৃত্য হইতে না হইতেই কর্ত্তৃপক্ষগণ এত বিচলিত হইয়া পড়িলেন কেন? এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে লালাবাবুর ঘোষিত programme কি কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমোদিত নহে? যদি উহা অনুমোদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত আচরণ মোটেই শোভন হয় নাই। আর যদি উহা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কেবল লালাবাবুর নিজ অভিরুচি অনুসারে হইয়া থাকে তাহা হইলে লালাবাবুর এই স্বতন্ত্র আচরণ করিবার অধিকার তাঁহাকে কে বা কাঁহারা দিয়াছিলেন? যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে যখন উক্ত নাচের দ্বিতীয় অংশটী আরম্ভ হইল তখন আবার দেখা গেল যে লালাবাবুর dais হইতে নামিয়া আসিলেন এবং সম্মুখের আসনে বসিয়া প্রকাশ্যভাবে নিজে করতালি দিয়া এবং পাশের পরিচিত দর্শকবৃন্দকেও করতালি দিতে অনুরুদ্ধ করিয়া নাচ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কিন্তু ইহাতেও যখন লালাবাবু দেখিলেন যে বিদ্যাবীথীর নাচের পালা বেশ পুরা দমেই চলিতেছে তখন তিনি পুনরায় dais এর উপর গিয়া যাহাতে বাকী দুইটী অংশ প্রদর্শিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—এবারে অবশ্য তাঁহার উদ্যম সফল হইল। কারণ দ্বিতীয়াংশের পর যে যবনিকাটী ফেলা হইল তাহাকে বহু চেষ্টা করিয়াও আর উত্তোলিত করা গেল না। আমরা, অবশ্য তখন ভাবিলাম যে ঐ রাত্রির বাকী programme বুঝি বা যবনিকার অন্তরালেই রহিয়া গেল—, কিন্তু, যবনিকাটীকে যখন কোনওরূপে পার্শ্বে সরাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল তখন শ্রোতৃবর্গের আশা হইল যে তাঁহারা শ্রীমতী হীরাবাইয়ের গান শুনিতে পাইবেন। কিন্তু, তখন দেখা গেল যে নাটোরাধিপতির জ্যেষ্ঠপুত্রের নিকট হইতে একটী রৌপ্য পদক প্রাপ্তির সংবাদে পুলকিততনু আমাদের Black board অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিতেছেন Dance by Moni Bardhan. লেখা সমাপ্ত হইতে হইতেই প্রেক্ষাগৃহের সকল স্থান হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"No more dance, No more dance" কিন্তু নয়তু নর্ত্তক ইহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহার একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন তথাকথিত বলি নৃত্য দেখাইতে লাগিলেন—আমরা মণিবাবুর ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না; কারণ তিনি যতক্ষণ নাচিলেন ততক্ষণ অনবরত যেরূপ করতালি পড়িতে লাগিল তাহাতে অন্য যে কোনও রথীকে অবশ্যই রণে ভঙ্গ দিতে হইত।

যাহা হউক, নাচের পালা থামিলে শ্রীমতী হীরাবাই বরোদকার মারু বেহাগ রাগের একখানি খেয়াল গান করিয়া পরে খাম্বাজ রাগের একখানি ঠুমরী ও ভজন গান করেন। এই রাত্রিতে শ্রীমতীর গাহিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না; তবে নাটোরের মহারাণীর ইচ্ছানুসারে তাঁহার গানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীমতী হীরাবাইয়ের গানের পর শ্রীমতী কেশরবাই (কার কার) হিন্দোল বাহার, জয়জয়ন্তী ও নট এই তিন-রাগের খেয়াল গান করেন। শ্রীমতীর গান শেষ

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা মহিলা শ্রোতাদের নিকট হতে চতুর্দ্দিক থেকে অভিযোগ পত্র পাচ্ছি। আমরা বহুবারই বলেছি দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে বেতার কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদাসীনতার পরিচয় প্রদান করে থাকেন এই অনুষ্ঠানটির তেমন যেন গুরুত্ব বেতারে নেই। কোনরকমে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দেবার দুর্ব্বলতা এ বিভাগে বার বার দেখা যায়। যত রাজ্যের বাজে রেকর্ড, নভিস্ আর্টিষ্ট—এই দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান।

* * *

মধ্যে এ বিভাগে কিছু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সে ক্রমোন্নতির স্রোত হঠাৎ গেল রুদ্ধ হয়ে। যে কয়জন গুণী সুরশিল্পী সুবক্তা রসালোচকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যাঁদের আগমনে বেতারে বেজেছিল নূতন সুরের আগমনী আভাষ, আজ অজ্ঞাত কারণে আর তাঁদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আবার সেই যে আঁধারে সেই আঁধারেই।'

* * *

সেই বিষ্ণুশর্ম্মার একঘেয়ে বাণী আর 'গ্রামোফোনের নাকি সুর' বৈচিত্র্যহীন সময়ের অপব্যবহার মাত্র! চারিদিকেই শোনা যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি—বেতার কর্তৃপক্ষের মোহনিদ্রা কিন্তু ঘোচে না।

* * *

অথচ এ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা বাংলা দেশে কত অধিক! নারী শিক্ষা, মাতৃ শিক্ষা, সন্তান প্রতিপালন, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নারী ধর্ম্ম এ সবের কতটুকু আভাষ বেতার কর্তৃপক্ষ নারী সমাজকে দান করে থাকেন!

* * *

আমাদের ধারণা বেতারের মহিলা শ্রোতা অধিক। মহিলাদের চিত্তবিনোদন অবসর যাপন—এই জন্যেই অধিকাংশ বাড়ীতে রেডিও সেট রাখা হয়। মহিলা শ্রোতাদের দাবী অতএব অকিঞ্চিৎকর হতে পারে না।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের স্বল্প নির্দ্দিষ্ট সময়কে আরও কমিয়ে দেওয়া হোল কেন? ৩া০টার স্থলে ৩টায় দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এর বিরুদ্ধে আমরা বহু অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে বহুদিন বাদে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা শোনা গেল। দাঠাকুর মধ্যস্থতায় নারী ধর্ম্ম আলোচনা বিশেষ শিক্ষনীয় হয়েছিল। দাঠাকুরকে মহিলা আসরে আমরা নিয়মিতভাবে দেখতে চাই।

হইল পর পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর "বন্দে-মাতরম্" ও "রঘুপতি রাঘব" এই দুইখানি গান গাহিলে রাত্রি ৩ ঘটিকায় সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

কেবল লম্বাড শুধু সুন্দরী নয়—অভিনয়ও তিনি খুব ভাল করেন।

পরিচালক

টেলিগ্রাম "ভ্যারিটি" | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ | টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, পঞ্চবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই আষাঢ় ১৩৪৫, ২৩শে জুন ১৯৩৮

কর্পোরেশনের আশে পাশে

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা-সচীব-নিয়োগ সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী প্রার্থী হইয়াছেন। শিক্ষয়িত্রী বিষয়ক তদন্তের ফলে যে সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে হাতে জনৈকা সহকারী মহিলা শিক্ষা-সচীব নিযুক্ত হয়া উচিত। শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর ন্যায় প্রবীণা ও উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করার জন্য কুমার বিশ্বনাথ রায় প্রভৃতি তরুণ কংগ্রেস কাউনসিলারবৃন্দ বিশেষ উৎসাহী। শিক্ষা বিভাগে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর অভিজ্ঞতা বহুবৎসর-সঞ্জাত। কটকে, কলম্বোতে ও কলিকাতাতে শিক্ষকতা করিয়া শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী বিশেষ সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং শৃঙ্খলা-রক্ষায় ও নৈতিক আদর্শ গঠনে নিষ্ঠাবতী শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলীর নিয়োগ সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বিগত নির্ব্বাচনে তাঁহার প্রতি যে অবিচার করিয়াছে বর্ত্তমানে তাঁহাকে এই পদের জন্যে মনোনীত করিয়া উদার মনোভাবের পরিচয় দিলে পূর্ব্বকৃত অবিচারের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরা দলপতির দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

শিক্ষা-সচিবের পদে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্করের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে উক্ত পদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে এবং কর্পোরেশনের শিক্ষা-বিভাগে লুপ্ত-শৃঙ্খলা ও নৈতিক আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিরণবাবুর অন্যান্য সমস্ত দোষ ত্রুটি থাকিলেও তিনি যে নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান ব্যক্তি সে বিষয়ে কোনই মতদ্বৈধ নাই। রাজনীতিতে যোগদানের পূর্ব্বে তিনি অধ্যাপকরূপে জীবনারম্ভ করেন এবং অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার সুনাম আছে। "সবুজ-পত্রের" গোষ্ঠিভুক্ত কিরণবাবু বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসাবে সুপরিচিত এবং রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে না পড়িলে কিরণবাবু আজ বাংলা সাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক রূপে পরিগণিত হইতেন। কিরণ-বাবুর সহিত অন্যান্য বিষয়ে আমাদের ঘোর মত-বিরোধ থাকিলেও আমরা তাঁহার শিক্ষা-সচিব পদে নিয়োগ সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি কারণ তাঁহার শিক্ষা-সচীবের পদে নিয়োগ উপযুক্ত হইবে এবং কর্পোরেশনে কংগ্রেসী আদর্শ ও নিষ্ঠা পুর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইবে। অপর পক্ষে বাংলার রাজনীতি শনি-মুক্ত হইবে।

কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যালের অ্যাসেসার নিয়োগ আসন্ন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, এল, এ, ও শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় প্রার্থী হইয়াছেন। আমরা এ বিষয়ের আলোচনা বারান্তরে করিব।

টাউন-হলের আইন কর্ত্তার পদে ভূত-পূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষকে সমর্থন করিবার জন্য কংগ্রেস-দলপতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

—:o:—

(বিলাসী)

বিদ্যাপতি

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, "বিদ্যাপতি" সমানভাবে দর্শক আকর্ষণ কোরে চলেচে "চিত্রায়"। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত এবং অভিনয় ও দৃশ্যপটাদির অভিনবত্বে—নিউ থিয়েটার্সের 'বিদ্যাপতি' যে সর্বত্রই বিশেষভাবে সমাদৃত হ'য়েচে, একথা আর নতুন কোরে বলবার প্রয়োজন নেই।

অভিজ্ঞান

বাঙলার হাজার হাজার কলা-রসিকের অভিনন্দন লাভ কোরে, সদ্যমুক্ত নিউ-থিয়েটার্স-এর সমাজ চিত্র-খানি এই শনিবার থেকে তৃতীয় সপ্তাহে পড়লো। উৎকৃষ্ট অভিনয়, পরিচালনা ও নিখুঁৎ সম্পাদনার গুণে এই প্রাণস্পর্শী কাহিনীটি ছায়া-চিত্রে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হ'য়েচে। আশাকরি বহু সপ্তাহ ধরে ছবিখানি রূপবাণীর আসর ভরিয়ে রাখবে।

বড়দিদি

গত বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ছিল মহেন্দ্রযোগ। এবং এই শুভ-মুহূর্ত্তে, বন্ধুবর অমর মল্লিকের প্রথম ছবি 'বড়দিদি'-র শুভ-উদ্বোধন সুসম্পন্ন হোল।

আমরা এই প্রাথমিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।

নিউ থিয়েটার্স-এর প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার মহাশয় থেকে এই প্রতিষ্ঠানের অপরাপর বহু কর্ম্ম-সচীব ও পরিচালক যথা: শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মিত্র, মিঃ পি, এন, রায়, শ্রীযুক্ত দেবকী বসু, শ্রীযুক্ত নীতিন বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধ দে প্রভৃতির উপস্থিতিতে নির্বিঘ্নে এই শুভ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'য়েচে। উপস্থিত সকলেই মল্লিক মহাশয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমরাও সর্ব্বান্তঃ-করণে প্রার্থনা করি তাঁর প্রচেষ্টা সকল দিক দিয়েই সাফল্য মণ্ডিত হোক।

প্রথম দিনে যে সেট্‌টিতে কাজ হোল, সেটিতে দেখানো হয়েচে—জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর কলিকাতায় বাড়ীর শয়ন কক্ষ।

গল্পের নায়ক সুরেন্দ্র নাথ (পাহাড়ী) রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ছিল। ব্রজবাবু, সুরেন্দ্রের খবর নিয়ে সবে মাত্র বাড়ী ফিরেই তাঁর কন্যা মাধবীকে জানালেন—উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই, সুরেন ক্রমশঃ সেরে উঠচে।

বাঙলা সংস্করণে, ব্রজরাজ লাহিড়ীর ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন, সুবিখ্যাত নট ও নাট্যকার···যোগেশ চৌধুরী। মাধবীর ভূমিকায় নেমেছেন শ্রীমতী মলিনা।

এই ছবির সঙ্গীতাংশের পরিচালনা কোরবেন—পঙ্কজ মল্লিক। ছবি তুলছেন—বিমল রায় এবং শব্দানুলেখন কোরছেন বানী দত্ত।

পরিচালক মল্লিক মহাশয়ের সহকারী রূপে কাজ কোরছেন—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

ভুলুয়ার বাড়ীর অন্দর মহলের অনেকগুলি দৃশ্য তোলা হয়ে গেল। ভুলুয়ার অভিমান, মঞ্জুর দুঃখ, অমরচাঁদের আনন্দের আকাঙ্খা, ঝি চাকরদের উদ্বেগ প্রভৃতি কত অভিনয়ের পালা শেষ হলো।

ভুলুয়া পথের ছেলে—জীবনে তার একটা জিনিষে সব চেয়ে বড় শ্রদ্ধা ছিল, তা হচ্ছে গান। ভুলুয়া বলে; গানটাই আমার প্রাণ। আমার সুখ শান্তি আকাঙ্খা সবটাই আমার গানের মধ্যে।

সেই ভুলুয়ার একখানি প্রিয় গান, যাকে সে ভগবানের চেয়ে ভালবাসত, অমরচাঁদের ইচ্ছায় মঞ্জু কুখেয়ালে ভুল সুরে গাইবে।

শিল্পী ভুলুয়ার প্রাণে ওঠে আর্ত্তনাদ, তার কপালে, তার ভ্রূতে তার চোখে—শরীরের রেখায় রেখায় ব্যথার যে ব্যঞ্জনা তা কে ভুলবে? দুনিয়ার কোন শিল্পীর প্রাণ ভুলে যেতে পারে?

আর মঞ্জু সে ভাবছে শুধু গাইতে হবে! কেন গাইতে হবে জানে না—তার ওষ্ঠে, আঙ্গুলের আগায় আগায় যে কম্পন সে কী থাকে বীণার তারে?

সেদিনের অভিনয় দেখে এলাম। সব কথা বুঝি নি। গল্পের কোন খানটায় সে কথা কেউ বলে দেয় নি। দেখে এলাম শুধু শিল্পী সাইগলকে আর কামতত্ত্ব কাননকে। তাদের অভিনয়কে ভুলতে পারব না! হয় তো সত্যিই ভোলা যায় না।

সুবিখ্যাত চিত্রনাট্য-লেখক ও পরিচালক ফণি মজুমদার এইবার একটি নতুন ধরণের ছবি দেবেন এই আশা করা আমাদের অসমীচিন হ'বে না।

দেশের মাটী

গেল সপ্তাহ "দেশের মাটীর" সব কাজই শেষ হয়ে গেছে। পরিচালক নীতীন বাবু এখন সুবোধ বাবুকে সম্পাদনা কাজে সাহায্য করছেন।

"দেশের মাটীর" ট্রেলার' নির্ম্মান কার্য্য এখনও চলেছে, আশাকরা যায় এই মাসের শেষের দিকে কোলকাতায় বিশিষ্ট চিত্রগৃহ-গুলিতে দেখান হ'বে।

অধিকার

গেল সপ্তায় "স্নান" সেটের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে। বড়ুয়া সাহেব যেভাবে সকাল বিকেলে কাজ চালাচ্ছেন তাতে আশা করা যায় জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই এ ছবি শেষ হয়ে যাবে।

সঙ্গীতের দিক থেকে এছবি হ'বে অপূর্ব্ব। এতগুলি সঙ্গীতজ্ঞ এক সঙ্গে মিলে কাজ করছেন তা বোধ হয় নিউ থিয়েটার্সের কোন ছবিতে এর আগে হয়নি।

তিমিরবরণ, পাহাড়ী, পঙ্কজ আর তাঁদের সঙ্গে আছেন হরিপদ, প্রতাপ ও বেনু।

পূর্ণ থিয়েটার

এই সপ্তাহই "রাঙ্গী"র শেষ সপ্তাহ। আসছে শনিবার থেকে এখানে দেবদত্ত ফিল্মসের "গ্রহের ফের" দেখান হ'বে। এতে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী লীলা হালদার, রবী রায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

নরনারায়ণ

ডাইরেক্টর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নরনারায়ণ'-এর কাজ খুব দ্রুত গতিতে চালাচ্ছেন। একটী বিরাট সেট্ নির্ম্মাণ হ'চ্ছে যেখানে সত্রাজিৎ (অহীন্দ্র), সূর্য্য (জ্যোৎস্না মিত্র), সত্যভামা (লীলা হালদার), কৃষ্ণ (ধীরাজ), অক্রুর (জহর) প্রভৃতির উপস্থিতি দরকার হ'বে।

জনকনন্দিনী

পরিচালক ফনী বর্ম্মা 'কৈলাশ'এর দৃশ্য শেষ করে ফেলেছেন। এইখানেই মহাদেব (ষষ্ঠী মুখার্জ্জি) তাঁর বিখ্যাত হরধনু পরশু-রামকে (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) দান করেন। এবং পরে এই 'হরধনু'র দ্বারাই রামচন্দ্র ও সীতার মিলন সম্ভব হয়েছিল।

দ্রৌপদী

প্রসিদ্ধ অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীকে বাঙলা ছবির পরিচালক হিসাবে এবার প্রথম দেখা যাবে। তিনি এর আগে 'আরোরা ফিল্ম কোম্পানীর' হ'য়ে একখানি তামিল ছবি তুলেছিলেন। এবার ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে 'দ্রৌপদী' নামে একটি পৌরাণিক ছবি তুলতে আরম্ভ করেছেন। ছবিখানি মতিমহল থিয়েটার্সের। অভিনয়-এর দিক থেকে অহীনবাবু বাঙলা দেশকে অনেক কিছুই দেখিয়েছেন। সুতরাং পরিচালনার দিক থেকে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই পাবার আশা রাখি।

যখের ধন

মতিমহল থিয়েটার্সের ছবি 'যখের ধন' পরিচালক হরি ভঞ্জের হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

এই ছবিখানিতে লীলা হালদার-এর কয়েকটী নৃত্যের ব্যবস্থা হয়েছে। এবং সেই জন্যেই শ্রীমতীও নাকি খুব পরিশ্রম করছেন।

অভিনয়

ভারতলক্ষ্মীর ছবি "অভিনয়"-এর কাজ নতুন সেটে আবার সুরু হয়েছে। এ সেট্‌টী হচ্ছে একটি থিয়েটার এর 'অডিটোরিয়াম'-এর দৃশ্য। চমৎকার সেট নির্ম্মান করেছেন সুধাংশু বাবু।

ছবিখানা 'অভিজ্ঞান'এর পর মুক্তি পাবে রূপবাণীতে।

হে মহাদেব

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে মহাদেব, ভাঙের নেশায়
থাকবে বিভোর দিবস রাতি,
এমনি করেই রইবো বসে
তোমার পূজার আসন পাতি?
তিনটে বড়ো নয়ন মেলে
দেখবে নাকি ধরার পানে
দস্যুরা আজ কেমন ক'রে
দুঃসহ শেল বক্ষে হানে।
ঘরে ঘরে ধরার মেয়ে
হচ্ছে আজি নির্য্যাতিতা,
ভস্ম মেখে শ্মশান মাঝে
চুপটী করে দেখছো কি তা?
দেবালয়ের দ্বার খুলে মোর
আর কতকাল থাকতে হবে
চিত্ত তোমার টলবে না কি
আর্ত্তজনের কলরবে?
হে ভোলানাথ! দাঁড়াও রুখে
তোমার জটা এলিয়ে দিয়ে
দৈত্য দানব নৃত্য করুক
অত্যাচারীর বুক কাঁপিয়ে।
তোমার চোখে উঠুক জ্বলে
ধ্বংস অনল ভীষণ ভাবে,
নির্য্যাতিতা আজকে যারা
তোমায় দেখে সাহস পাবে।
রুদ্র তুমি এগিয়ে এস
ত্রিশূলখানি হস্তে নিয়ে
তাকাও দেখি তাদের মুখে,
মরছে যারা দুঃখ সয়ে।
এমনি ঘন অন্ধকারে
প্রলয়-বিষাণ বাগিয়ে ধরো
হে মহাকাল রুদ্রতেজে
অন্যায়েরে চূর্ণ করো!

শ্রীদুর্ব্বাসা

এবার আমরা এমন একটি হাতের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব, যে হাতের অভিজ্ঞতা সম্প্রতি আমরা লাভ করেছি কোন একটি প্রতিযোগিতায় একটা হাজার হাত খেলাতে প্রায়ই দেখা যায় একহাতে টেক্কাসমেত ছয়খানা রঙ থাকলে খেড়ীর হাতে সেই রঙের একখানি তাস থাকে এবং উভয় খেড়ীর অন্য রঙের ডাকাডাকিতে অধিকাংশ সময় স্লাম পর্য্যন্ত ডাক উঠে যায়। তখন ডাকদারের পক্ষে হাতখানি খেলানো বেশ কষ্ট সাধ্য হয়ে ওঠে, যদি তুরূপ-রঙটি বিপক্ষদল খেলে দেন। এই রকমের হাত কি ভাবে খেলানো উচিত নীচের হাত থেকেই জান্‌তে পারবেন এবং ঐ ধরণের যে কোন রকমের তাস আসুক না খেলোয়াড় অনায়াসেই ডাক অনুযায়ী খেলা করতে সমর্থ হবেন। নিম্নের হাতটী দেখুন,—

ইস্কাবন—বিবি, নয়।

হরতন—সাহেব, ×, ×, ×।

রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×, ×, ×।

চিড়িতন—টেক্কা।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, দশ, ×।

হরতন—টেক্কা, ×, ×।

রুহিতন—×।

চিড়িতন—গোলাম, ×, ×, ×।

এই হাতে ছয়খানি ইস্কাবনের ডাক হয়েছে। বিপক্ষদল চিড়িতন খেলেছেন, আপনি কি খেলবেন বলুন তো?

সাধারণ ক্রীড়ক প্রথমতঃ চিড়িতনের টেক্কা দিয়ে পিট নিয়ে রুহিতনের টেক্কা ও সাহেব খেলে একখানা হরতন পাশাবেন। তারপর রুহিতন খেলে তুরূপ করে নিজের হাতে পিট নিয়ে চিড়িতন খেল্‌বেন এবং ডামির হাতে তুরূপ করে নিয়ে হরতনের টেক্কায় নিজের হাতে উঠে, আর একখানি চিড়িতন তুরূপ করে নেবেন। এই রকম খেলার পর ডাকদার দেখতে পাবেন যে তাঁর হাতে চিড়িতনের একখানি পিট দেয় থাকে, এবং ডামির হাত থেকে নিজের হাতে আসবার একমাত্র উপায় থাকে হরতনে বা রুহিতনে তুরূপ করা। অথচ এই হরতন বা রুহিতনে তুরূপ করে নিজের হাতে ওঠার পর অধিকাংশ সময় বিপক্ষদলের সবগুলি তুরূপ রঙ ধরা একেবারে অসম্ভব হয়। তাতে অনেক সময় সুপ্রচুর খেসারৎ দিতে হয়। কারণ এই রকম খেলার দরুণ ডাকদারের হাতে মাত্র তিনখানি রঙ অবশিষ্ট থাকে। এখন প্রতিপক্ষের হাতে রঙের বিভাগ যদি ৩-৩ ধরণের হয় তবেই খেলা হতে পারে, কিন্তু ৪-২ ভাবে হলে খেলা করা শক্ত। অতএব এই ধরণের হাতে খেলানোর সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বিপক্ষদলকে প্রথমে একখানি পিটে দিয়ে দেওয়া। নিয়ে দেখুন প্রথমে একখানি পিট প্রতিপক্ষকে দিলে কত সহজে খেলাটী করা যায়।

পূর্ব্ববৎ প্রথম পিটখানি টেক্কা দিয়ে নিয়ে এক তাস ছোট রুহিতন খেলে দ্বিতীয় পিটখানি ছেড়ে দিন। এইবার তাঁরা যে কোন রঙেই খেলুন না কেন, আপনি খেলা করে নিচ্ছেন। তাঁরা যদি চিড়তন খেলেন তো তুরূপ করে একটি পিট তুলে নিচ্ছেন, আর যদি রঙ খেলেন তো আপনি বিপক্ষদের সব কয়খানি ধরে নিয়ে একখানি রুহিতন তুরূপ করে নিয়ে আপনার ডাক মত খেলা আপনি করে নিচ্ছেন। এই কথা পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নিজের হাতের বিভাগ ৬-৪-২-১ ভাগে থাকলে খেড়ী যদি ডাকদার হন, তো নির্ভয়ে একখানি তাস ছেড়ে দিয়ে খেললে ডাকানুযায়ী খেলা করে নিতে কোনরূপ বেগ পেতে হয় না। আসছে বারে এই ধরণের আরও কয়েকটি হাত দেখিয়ে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌বার চেষ্টা করব।

চোখ

অমৃত কুমার দত্ত

তোমার ঐ দু'টো চোখ,
কালো দু'টো চোখ
আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌লো
বিচ্ছিন্ন করে দিলো সমস্ত জগত হ'তে।
তোমার ঐ চোখে আমি দেখেছি
ভোরের উজ্জ্বলতা
দুপুরের ক্লান্তি
আর, সন্ধার স্লানিমা।
কোথা হতে এনেছো তুমি ঐ দু'টো চোখ?
কোথা হ'তে শিখলো তারা
হরিণের চকিত চাওয়া আর সাগরের ইঙ্গিত?
তোমার ঐ ভীরু চোখের চাওয়া
তোমার ঐ উজ্জ্বল চোখের তীক্ষ্ণতা
সদাই টানে মোরে
মিলিতে তোমার সনে।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্সের
নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের
চোখের বালি
দিনী – সুপ্রভা মুখার্জ্জি

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রেবাও সমান ওজনে জবাব দিলে "চুপ করে থাকব ? এক বালতি জল রাখলে লেখকের হাতখানা ক্ষয়ে যেতো ।"

দু'জনের মাঝখানে টেবিলে ছিল কাগজের স্তূপ আর বৈকালের চায়ের কাপ, প্লেটগুলো। রতীন দাঁড়িয়ে উঠে মারলে টেবিলে এক লাথি আর সঙ্গে সঙ্গে কাপ, প্লেটগুলো মেঝেতে পড়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর কতকগুলো কাগজ, বই ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। চারদিক চেয়ে রতীন যেন খুব খুশী হয়ে চেঁচাতে লাগলো "আমি বলছি—অমন মাতামাতি তোমার চলবে না—চলবে না—চলবে না।"

রেবা রতীনের মুখের কাছে দুটো হাত নেড়ে কি বলবার উপক্রম করতেই রতীন খপ্ করে রেবার হাত দুটো ধরে খুব কশে নাড়া দিতে লাগলো। ক্লান্ত, অবসন্ন রেবা উত্তেজনা সামলাতে না পেরে ধপ করে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো। চশমার পেছু থেকে রতীনের জলন্ত চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছিল, তার চুলগুলো মুখের ওপর ঝুলে পড়েছিল, তার সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। মনে হোল সে বুঝি রেবাকে মেরেই ফেলে।

চিৎকার করে রতীন ফের বল্লে "চলবে না সহরময় নেচে বেড়ানো, বুঝলে? কেউ চায় না তোমার গান। গান গাওয়া তোমার কর্ম্ম নয়, তোমার কাজ হাঁড়ি ঠেলা তার বেশী যোগ্যতা তোমার নেই ততদিনে এটাও বোঝ নি ?...উনি গাইবেন গান ! যত সব—"

হঠাৎ রেবা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মরিয়া হয়ে আহতা ব্যাঘ্রী যেমন শিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেও তেমনি করে থাবার মত হাত দুটো বাড়িয়ে অগ্নি দৃষ্টি রতীনের জলন্ত দৃষ্টির ওপর রেখে আস্তে আস্তে তার দিকে এগোতে লাগলো। ভয় পেয়ে রতীন পেছিয়ে গেল।

"গান গাওয়া আমার কর্ম্ম নয়, বটে ? দেখাচ্ছি তোমাকে। কুঁড়ের বাদশা, অকর্ম্মা, মুরোদ নেই এক কড়ার তেজ আছে খুব। বিষ নেই কুলো পানা চক্কর ! বলে, ভাত দেবার—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রতীন বল্লে "আমাকে বলো ওই সব কথা, এত স্পর্দ্ধা তোমার ? গায়ের রক্ত জল করে খেটে মরছি ওর জন্যে. আর আমি হলুম কুড়ের বাদশা ? ...না, না, না ! গান গাওয়া তোমার কর্ম্ম নয়।"

হঠাৎ রেবার নজর পড়লো টেবিলের ওপর। টেবিলে রতীনের যে উপন্যাস খানা ছিল সেখানা তুলে নিয়ে রেবা ছুড়ে মারলে রতীনের মুখের ওপর। "রাবিশ! চারমাস ধরে চলেছে ওর চায়ের পরিচ্ছেদ আবার বলেন গান গাওয়া আমার কর্ম্ম নয়, নিজের তো মুরোদ ভারী ।"

"এই নরকে পচে, শুকিয়ে মরে এর বেশী কে পারে ?"

"স্বর্গে গেলেও ওর বেশী তোমার দ্বারা হবে না, বুঝলে বোকারাম ? কুঁড়ের বাদশা, লেখা তোমার কর্ম্ম নয়।"

"আমি পারিনে লিখতে ? আমি বলছি—"

"থাক্, যা বলছ বুঝতে পেরেছি। লেখার দোহাই পেড়ে আর কুঁড়েমী ঢাকতে হবে না। অফিসে কলম পেষা কেরাণী-গিরি ছাড়া উপায় নেই তোমার।"

"আমি হবো কেরাণী !"

"হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! তাই হবে তুমি।...... তোমার পাল্লায় পড়েই আমার হোল না কিছু, বুঝলে ?"

"আমার পাল্লায় পড়ে তোমার হোল না কিছু ? তোমাকে বিয়ে না করলে—"

"শুকিয়ে মরতে, আর তোমার হাতে না পড়লে আমি অনায়াসে কোথাও গিয়ে হতে পারতুম একটা কিছু। তোমারই জন্যে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল আমার।"

"তোমারই ভার বইতে গিয়ে আমার এত বড় শক্তিটা গেল নষ্ট হয়ে।"

গলাবাজি চলতে লাগলো। যদিও সেগুলো শ্রুতিমধুর নয় তবু গরম মেজাজের স্বামী, স্ত্রী বিশেষ করে অভাবে পড়লে এমনি ব্যাপারই ঘটে থাকে। তবে অন্য-ক্ষেত্রে যেমন জ্বলে, নিভে, আবার জ্বলে সারাজীবন কাটে এ ক্ষেত্রে সে রকম যে হোল না এইটাই একটু অস্বাভাবিক। রতীন হঠাৎ থেমে গিয়ে মুঠোর ওপর দাড়ি রেখে কি একটু ভাবলে। তারপর নিজের কাগজ পত্রগুলো তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গেল। ভাঙ্গা চায়ের বাসন, খালি ভাঁড়ার, আর কতকগুলো সামান্য কাপড় চোপড়ের সংসার নিয়ে একা পড়ে রইলো রেবা।

হঠাৎ রতীনকে এভাবে চলে যেতে দেখে রেবা প্রথমটা অন্ধকার দেখলে বটে কিন্তু যে ভাবে সে এ অন্ধকার কাটিয়ে উঠলো সেটাতে অন্ততঃ এটা প্রমাণিত হোল যে রতীন তাকে যতটা অযোগ্য বলেছিল ততটা অযোগ্য সে নয়। প্রথমে গানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে না

পারলেও দৃঢ় সঙ্কল্প যে তার ছিল তার পরিচয় সে দিলে।

কোলকাতা থেকে রতীন সোজা পলাশপুরে গিয়ে ব্যাপারটা আভাসে মাধব বাবুকে জানালে। মাধববাবু ছেলের মুখের পানে চেয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লেন "বাবুই তো তোমাকে বলেছিলেন ওই রাস্তা ধরতে। তাঁকে পারো তো সব কথা জানাও গে। তিনি হয়তো কোন পরামর্শ দিতে পারবেন।" সেই ভাল ভেবে রতীন সোজা রমেনবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে সে যা করতে চায় তাও জানালে। রমেনবাবু এবারও তাকে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখালেন। রতীন তাঁর কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা ধার হিসেবে নিয়ে অদৃশ্য হোল।

রেবার সঙ্কল্প ছিল রতীনের চেয়ে দৃঢ় আর নিজের ক্ষমতায় তার বিশ্বাসও ছিল কম নয়। তার এক মামা দিল্লীতে লাট-দপ্তরে বড় চাকরী করতেন। রেবা সব কথাই তাঁকে খুলে লিখলে আর অনুরোধ জানালে যেন দিল্লীর কোন মেয়ে স্কুলে তিনি 'নিকট আত্মীয় মঞ্জুরী দেবীর জন্যে" একটা কাজের সন্ধান করে যত শীঘ্র পারেন তাকে জানান। সে আরো লিখলে, কিছুদিনের মত কোলকাতা তাকে ছাড়তেই হবে। নইলে পাঁচজনে পাঁচ কথা তুলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মামা ছিলেন দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের একজন পাণ্ডা বিশেষ। তাঁর চেষ্টা আর সুপারিশে সেখানকার নামকরা এক মেয়ে স্কুলে মঞ্জুরী দেবী সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী পদের নিয়োগ পত্র পেয়েই মায়ের চোখের জল আর বাবার সংশয়পূর্ণ গম্ভীর দৃষ্টি উপেক্ষা করে মনীষাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী চলে গেল।

দিল্লীর মেয়ে স্কুলের কাজে সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী মঞ্জুরী দেবীর মাস ছয়েক কাটলো। তার যোগ্যতা যে কিছুই ছিল না, তা নয়। তার ওপর রতীনের কাছে অযোগ্য আখ্যা পেয়ে তার আন্তরিক ইচ্ছা দৃঢ় সঙ্কল্পে পরিণত হয়েছিল। মামার বাড়ীতে সে নামকরা এক ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত বিজ্ঞানের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো শিখে নিয়ে তার ওপর চড়ালে আধুনিকতার ভঙ্গি। তারপর স্কুলে গুটিকতক মেয়েকে নিজের মনের মত গড়ে নিয়ে তাদের সহযোগিতায় সেখানকার ভদ্র, শিক্ষিত রসিকমহলে বেশ নাম করে নিলে। ওই সময় একদিন মামার চেষ্টায় তার দিল্লীর বেতার প্রতিষ্ঠানের বড় একজন কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তারপর থেকে বেতার বার্ত্তায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে লাগলো মঞ্জুরি দেবীর নাম। ক্রমে ছোট-খাটো অভিনয়ের পরিচালনায় আর আধুনিক সঙ্গীত মঞ্জুরী দেবীর নাম সংবাদ পত্রে বিঘোষিত হতে লাগলো। সে উৎসাহিত হয়ে হিন্দি ভাষা আর প্রাচিন গান আয়ত্ত করবার সাধনায় মন প্রাণ ঢেলে দিলে।

এই সময় দিল্লিতে ভারতের যত নামকরা সিনেমা ষ্টুডিয়োর মালিকদের একটা কনফারেন্স বসলো, কি করে ভারতের এই শিশু-প্রচেষ্টায় বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে বাঁচিয়ে সব রকমে উন্নত করা যায় তার সম্বন্ধে আলোচনা এবং উপায় নির্দ্ধারণের জন্যে। এমন একটা গুরুতর ব্যাপার, তবু সিনেমার কাজ যখন ভারতের অগনন জনগণের আনন্দ বিধান করা, তখন কনফারেন্স আরম্ভ হবার আগে এবং গুরু কার্য্যের শেষে একটু গান বার অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে দোষ বা অসঙ্গতি কোথায়? এর ভার পড়েছিল কিম্বা চেষ্টা করেও ভার নিয়েছিল মঞ্জুরী দেবী।

এমন শোভন আর সুরুচির সঙ্গে মঞ্জুরী নিজের কাজ শেষ করলে যে উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় এবং ষ্টুডিয়োর মালিকদের আগ্রহে মঞ্জুরীর অনেকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। বোম্বের বড় একটা ষ্টুডিয়োর মালিক তার হিন্দি গান শুনে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি মঞ্জুরীকে চাকরী পর্য্যন্ত দেবার ইচ্ছে জানালেন। মঞ্জুরী মামাকে রাজি করিয়ে বোম্বে চললো। সঙ্গে রইলো তার এক মামাতো ভাই। মঞ্জুরীর দৌলতে তার বেকার এই ভাইটির সেই ষ্টুডিয়োর প্রচার বিভাগে একটা চাকরীও হয়ে গেল।

বোম্বেতে মঞ্জুরী অভিনেত্রীদের গান শেখাতে লাগলো। ক্রমে শিল্পীদের সাহচর্য্যে

জীবনের স্বপন বিকাশ

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

যেখানে হাসির মাঝে
ভরা আছে প্রাণের বাস
সেথানে ছুটুক পরাণ
নিয়ে অলির আকুল আশ!
মধু সেথা থাকবে বুকে;
শুনবে সে গান সোহাগ সুখে,
ক্ষণিকের হাসির মাঝে
জীবনের স্বপন বিকাশ;
আনন্দ পরশে তার
নিত্য অমৃত প্রকাশ!
প্রাণ-ধোয়া শান্তি মাখা
কোথা সেই হাসি?
কোথা পাব সেই হাসি
যারে ভালো বাসি?
বিশ্বের কল্যাণ সে হাসি—
আনন্দ-নির্ভর-আশ্বাস!
বাঁধা রবে প্রাণ-মন
চিরদিন তাহারি পাশ!

সে অভিনয়ের কিছু কিছু শিখে নিলে। তার গলা ছিল মিষ্টি আর সে দেখতে ছিল সুন্দরী। এমনিভাবে কিছুদিন কাটার পর শেষে সে নিজে রূপোলী পর্দার গায়ে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য অনুরোদ্ধ হোল। আনন্দে, দ্বিধায় তার বুকটা একবার দুলে উঠলো। কিন্তু যখনি রতীনের কথা মনে পড়লো তখনই দ্বিধার জায়গায় জাগলো সাহস আর দৃঢ় সঙ্কল্প। ষ্টুডিয়োর মালিক ছিলেন ভদ্র আর শিক্ষিত। তাছাড়া যাতে তাঁর ষ্টুডিয়োতে এবং অভিনয়কালে কোন বিশৃঙ্খলা না আসে সে বিষয়ে তাঁর ছিল সতর্ক দৃষ্টি আর অভিনয়ের সময় তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সব তত্ত্বাবধান করতেন। যেমন মঞ্জুরী রূপোলী পর্দার গায়ে আত্মপ্রকাশ করলে অমনি চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় সমস্ত মাসিক সাপ্তাহিকে তার জয়ধ্বনি উঠলো।

হঠাৎ একদিন বম্বের ছবিমহলে রব উঠলো এই ষ্টুডিয়োর প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রতিষ্ঠান মিঃ দত্তকে যে ফ্রান্সে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে পাঠিয়েছিল তিনি সেখানকার অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট এবং সম্মানকর ছাপ নিয়ে ফিরছে ভারতে। প্রতিদ্বন্দ্বীতা সত্বেও এখন বম্বের মত প্রতিষ্ঠান রেষারেষি ভুলে মিলিত হোল দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানের অভ্যর্থনায় বিরাট আয়োজনের জন্যে।

মঞ্জরী কৌতুহলী হয়ে নিজেদের ষ্টুডিয়োর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে জিজ্ঞাসা করলে "বলতে পারেন কে এই মিঃ দত্ত?"

মিঃ বিলিমোরিয়া সাগ্রহে উত্তর দিলেন "মিঃ মনোজ ডাট। দেশের গৌরব, ভারতের সুসন্তান তিনি। চিত্র পরিচালনার কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসছেন দেশে। ভারতের চিত্র-জগতে যুগান্তর আনবেন বাংলা মায়ের এই কৃতি সন্তান।"

বাঙলার সুসন্তানের এই অসামান্য সাফল্য গৌরবে মঞ্জরীর বুকখানা ভেতরে ভেতরে নেচে উঠলো। সেও মিঃ মনোজ দত্তকে নীরব অথচ আন্তরিক শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দেবার জন্যে তৈরী হতে লাগলো।

জাহাজ থেকে যেদিন মিঃ দত্তের নামবার কথা সে দিন সকালে সকলের সঙ্গে মঞ্জরী গিয়ে দাঁড়ালো জাহাজ ঘাটে। সুন্দর আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে জাহাজ ঘাটে যেন রঙের মেলা বসেছিল। শাড়ী, স্যুট, ফুলের মালা, মোটরের সমারোহে চারদিক যেন ঝলমল গমগম করছিল। সচল, অচল ছবি নেওয়ার ক্যামেরার সারির পেছুতে ভারতের সুসন্তানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাবার জন্যে জনতা উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে ছিল জাহাজের পানে। আগের দিন রাতে জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছিল ঘাটে। সব তৈরী দেখে অভ্যর্থনা সমিতির এক জন প্রতিনিধি সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠলেন আর একটু পরে দেখা গেল ফরাসী দরজীর নিখুৎ ছাঁটের স্যুট পরা, চোখে কালো লেন্সের চশমা আঁটা, এক হাতে টুপী ধরা বেশ সুন্দর দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক জনতার কোলাহলমুখর অভ্যর্থনার উত্তরে মাথা নোয়াতে নোয়াতে সহাস্য মুখে নেমে আসছেন। সকলের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরী দেবীর দৃষ্টিও গিয়ে পড়লো মিঃ দত্তের ওপর। সবাই আনন্দে আর একবার কোলাহল তুললে আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুরীর মুখ থেকে অস্পষ্ট একটা বিস্ময়ের শব্দ বেরিয়ে গেল। কিন্তু কোলাহলে সে শব্দ ডুবে গেল। মিঃ দত্ত মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য এবং ছায়ালোকের উজ্জ্বল জ্যোতিস্কদের সাথে মঞ্জুরীও এগিয়ে গেল চিত্রাকাশের দীপ্ত ভাস্করের আননে। তার চোখে ধাধা লেগে গেল নাকি? ভাল করে চেয়ে দেখে তার সামনে রতীনের মত—

রতীনের মত নয়।

রতীন নিজে।

রতীন দেখে—

রেবা।

চরম মুহূর্তের মিনিট পাঁচেক যে কি করে কাটলো কেউ বুঝতে পারলে না। দুজনেই খুব সামলে নিয়ে ছিল যদিও তাদের বিস্মিত মুগ্ধ ভাব সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের শ্যেন দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। পরদিন কাগজে মিঃ মনোজ দত্তের মঞ্জুরী দেবীর সঙ্গে আসন্ন একটি মধুর সম্বন্ধের ইঙ্গিত বেরোলো।

এদিকে অভ্যর্থনার কোলাহল কমে আসতে যেটুকু সময় লাগলো তারই মধ্যে দুজনে অনেকটা সামলে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গ সাবধানে এড়িয়ে গেল। আকস্মিক

হাজরা পিক্‌চার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন

—পরিচালক—

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

প্রধান যন্ত্রশিল্পী :
মধু শীল

আলোক-চিত্রী : **বিভূতি লাহা**

শব্দ-যন্ত্রী : **যতীন দত্ত**

ভূমিকায় : অহীন্দ্র, শিশুবালা, মনোরঞ্জন, রাধারাণী, মোহন, সাবিত্রী, তিনকড়ি, চিত্রা।

একদিকে...

প্রেম-ভক্তির জলন্ত নিদর্শন !
কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় মহিমোজ্জ্বল !
শৌর্য্যে-বীর্য্যে গরীয়ান !
স্বামী ভক্তিতে মহীয়ান !
পত্নী প্রেমে আদর্শোজ্জ্বল !

অন্যদিকে...

কুট চক্রীর চক্রান্ত জাল !
নারীর রূপে লালসাদগ্ধ নর !
শয়তানির চরম পরিণতি !
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের দ্বন্দ্ব !

কালী ফিল্মস
ষ্টুডিওতে গৃহিত

পরিবেশক
রীতেন এণ্ড কোং
৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
ফোন ক্যাল ১০৯২

আজই সিট্
রিজার্ভ করুন।

দেখার ধাক্কা সম্পূর্ণ সামলে ওঠবার জন্যে এটা তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

মঞ্জুরী তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই তিন বছরে যতবার সে রতীনকে মনে করেছে ততবারই তাকে দেখেছে বেকারের দলভুক্ত ক্ষুধার্ত, অপরিচ্ছন্ন হতভাগ্যরূপে। তাই হঠাৎ স্যুটপরা, পরিষ্কার, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রতীনকে দেখে প্রথমে সে নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু দেখলে সে রতীন ছাড়া আর কেউ নয় তখন তার যা অবস্থা হোল তা সেই জানে। তারপর সে অনেক ভেবে দেখবার চেষ্টা করলে যে রতীন কি করে নিজের অবস্থা এই তিন বছরে এতখানি ফেরালে। বম্বের ছবিওয়ালারা রতীনকে ঠাওরে ছিল কি? কি করে তারা ভেবেছিল যে রতীনের ভেতর বড় একটা প্রতিভা লুকিয়ে আছে?

এদিকে রতীন ও ভাবছিল রেবারই কথা। বিদেশে আহার, নিদ্রা পর্য্যন্ত এক রকম ত্যাগ করে নিজের কাজে মেতে ছিল যখন তখন রেবার কথা মনে পড়েনি। কিন্তু যখন তার শিক্ষা শেষ হোল তখন তার মনে পড়েছিল রেবার কথা। কিন্তু রেবাকে সে যা ভেবেছিল তার সঙ্গে সত্যিকার রেবার যে কোথাও মিল নেই। অনেকবার সে ভেবেছিল রেবাকে সাহায্য পাঠানো তার কর্ত্তব্য কিন্তু কাজের চাপে বিশেষ কিছু করা হয়ে ওঠেনি। অথচ ওদিকে রেবা ভারতের চলচ্চিত্রাকাশে দেখা দিয়াছে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে। এই বোম্বাইওয়ালারা রেবাকে ঠাওরেছিল কি?

সেদিন বৈকালে বোম্বের শ্রেষ্ঠ ষ্টুডিয়োর মালিক মিঃ রোস্তমজীর আয়োজিত মিঃ দত্তের অভ্যর্থনার পার্টিতে যখন আবার দেখা হোল তখন দুজনে একেবারে টাল সামলাতে পারেনি। পার্টি খুব জমকালো গোছের হয়েছিল। যদিও অনেকে পানীয় বিশেষের প্রভাবে রীতিমত অসাবধান হয়ে পড়েছিল তবু রেবা রতীন নিজেদের সাবধানে দূরে রেখেছিল। দুজনের কেহই এই তিন বছরে চিত্রজগতের পিছল পথে পা বাড়ায় নি।

মিঃ রোস্তমজী সকালে জাহাজ ঘাটে উপস্থিত হতে পারেনি। তাঁরই সাগ্রহ রেবা রতীন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো।

"মিঃ ডাটের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যে বিশেষ আনন্দিত হলুম।"

"মঞ্জুরী দেবীর সঙ্গে আলাপে বিশেষ ধন্য হলুম।"

তাদের পরিচিত করে দিয়ে যেই না মিঃ রোস্তমজী গেলেন একটু আশ পাশে রতীন ডাকলে "রেবা!"

রেবা কোন উত্তর না দিয়ে মুগ্ধ, আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার প্রিয়তমের হাসি মুখের পানে।

রতীন বল্লে "প্রথমটা আমি নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারিনি।"

রেবা এবারও উত্তর না দিয়ে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাইলে রতীনের পানে। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে—

তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে?"

"তুমি একটুও বদলাও নি।"

"তুমি যদিও সামন্ত বদলেছ তবু তোমাকে দেখেই চিনেছি।"

সত্যি তিনবছর আগেকার কথা মনে করে এখন হাসি পাচ্ছে।"

পুরাণো দিনের কথা উঠতেই দুজনেই চুপ করে গেল। দুজনেই মনে মনে চাইছিল কেউ এসে পড়ে তাদের বাঁচাক্। শেষে রেবা বলে "আমাকে চিনতে পেরে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে?" রতীন ইতস্ততঃ করে বল্লে "আমি? হ্যাঁ—তা একটু হয়েছিলুম। কিন্তু......তবে আমি ভেবেছিলুম তুমি একটা কিছু হবেই।"

"সত্যি ভেবেছিলে তাই?"

"অবশ্য! আচ্ছা, তুমি আমার সম্বন্ধে কি ভাবতে?"

"ভাবতুম, তুমিও একটা কিছু হবে নিশ্চয়ই।"

"সত্যি ভাবতে?"

"অবশ্য! কিন্তু তিন বছর আগেকার কথা ভাবতে আমারও মজা লাগছে।"

বলবার মত কিছু খুজে না পেয়ে দুজনেই মিনিট ছয়েক চুপ করে রইলো। তারপর রতীন একটু ইতঃস্তত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে "তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে রেবা?"

"সে কথা ভাববার সময়ই পাইনি এই তিন বছরে। তুমি ভেবেছিলে?

"না রেবা। আমারও অবস্থা হয়েছিল তোমারই মত।"

"আমিও ভাবতুম তাই।"

"সত্যি, অনেকদিন হয়ে গেল......"

"সত্যি, অনেকদিন......"

"কারো মনেই যে ছাড়ার কথা ওঠেনি এটা ভারী মজার, নয়?"

"সত্যি, ভারী মজার।"

"এখনো আমরা স্বামী-স্ত্রীই আছি।"

"তাই তো মনে হয়।"

"ভারী মজার কিন্তু।"

মিঃ দোস্তমজা আবার এলেন তাদের কাছে। রতীন তাড়াতাড়ি রেবার পাশ থেকে উঠে পড়লো।

"আচ্ছা, কিছু যদি না মনে করেন তাহলে—"

"আপনার সঙ্গে পরিচয় সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। আচ্ছা, তখন তাহলে—"

দুজনেই হারিয়ে গেল আনন্দ প্রবাহে।

তখনকার মত দুজনে কাছ ছাড়া হোল বটে তবে তারপর থেকে রোজই তাদের দেখা হোত। রতীন রেবাকে শোনাতো, বিদেশে কেমন করে কেটেছে তার দিনগুলো, সেই কথা। কি অক্লান্ত পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছে, কত কষ্ট, কত চেষ্টা······

রেবাও বলতো কোলকাতা থেকে দিল্লী, সেখান থেকে বম্বে, সেই দিনগুলির কথা। ঝড়ের মুখে অসহায়, নীড়হারা পাখীর মত······

দুজনেই ভাবতো বিয়ের আগে ছাত্র জীবনের কত আশা আকাঙ্খা, সুখস্বপ্নের কথা। সেই প্রাইজের দিনে তাদের প্রথম দেখা। তারপর...স্বপ্নের মোহভরা মুহূর্ত-গুলি! তারপর?

আলোছায়ার কল্পলোক তাদের মনে নতুন করে রঙের তুলি বুলিয়ে দিয়েছিল। এত দুঃখ, কষ্ট, পরিশ্রমের ফল কত মধুর হবে যদি আবার তারা নতুন জীবন আরম্ভ করতে পারে। সে জীবনে থাকবে না তুচ্ছ কলহ, অভাবের অভিযোগ, নিজেদের ভুলে আশা মরীচিকার পেছু পেছু ভিন্ন পথে ছুটতে হবে না তাদের। ব্যর্থতা তাদের জীবনে কোথাও থাকবে না। থাকবে শুধু অবিচ্ছিন্ন মিলনের সুমধুর ক্ষণগুলি। নতুন মিলন, নতুন জীবনকে তারা সার্থক করে তুলবে সে এক বিচিত্র কল্পলোকে। মিঃ মনোজ দত্ত তখন যে কোন মেয়ের কামনার ধন।

মনোজও ভাবছিল, মঞ্জুশ্রী তখন যে কোন পুরুষের সাধনার ধন, হোক না সে খ্যাতি ঐশ্বর্য্যের যত উচ্চ শিখরেই অধিষ্ঠিত।

এক রক্ত রঙীন গোধূলিতে রতীন গেল রেবার সঙ্গে দেখা করতে সহরের জন কোলাহল থেকে দূরে নিস্তব্ধ, শান্ত প্রকৃতির কোলে অবস্থিত রেবার পটে আঁকা ছবির মত ছোট বাড়ীতে।

রেবা যত্ন করে নিজে তার জন্তে তৈরী করলে চা। চায়ের পর রতীন রেবার পাশে একখানা সোফায় বসলো। আস্তে আস্তে তার ফুলের মত হাতখানা তুলে নিলে নিজের হাতে। তার চোখে চোখ রেখে বল্লে "মনে পড়ে রেবা তোমার সেই দিনের কথা যেদিন তুমি আমার চোখের সামনে দেখা দিলে—"

রতীনের চোখে চোখ মিলিয়ে রেবা উত্তর দিলে "পড়ে।"
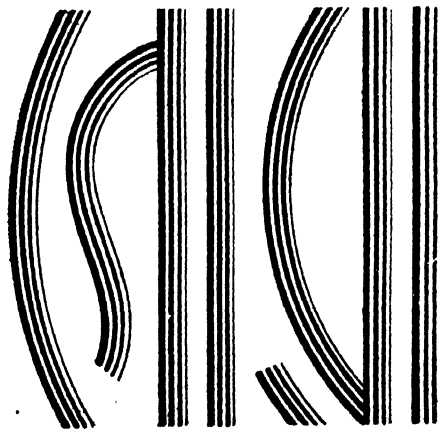
রতীন রেবার হাতে চাপ দিয়ে বল্লে "তারপর মনে পড়ে কোলকাতার সেই ছোট্ট বাড়ীতে লেখক হবার জন্যে আমার প্রাণপন পরিশ্রম আর তোমার চেষ্টা গানের আসরে নাম করবার ?"

রেবা রতীনের হাতে হাত রেখে বল্লে "আজ তো তুমি ছায়ারাজ্যের রাজা। লেখক হলে ওর বেশী কি হোত ?"

"সে কথা সত্যি। আর আজ তুমি তো জ্যোৎস্নালোকিত ছায়াকাশের উজ্জল তারকা। আজ সবাই দু'চোখ ভরে দেখেছে তোমার অভিনয়, দু'কান ভরে শুনেছে তোমার গান। গ্রামোফোন, রেডিও এর বেশী কিছু দিতে পারতো ?"

"হাঁ, জানি সে কথা যে আমি আজ ছায়ালোকের উজ্জল তারকা।"

রতীন নিজের সোফা ছেড়ে রেবার পাশে তার গা ঘেসে বসে আবেগের সঙ্গে বল্লে "যা চেয়েছিলুম তা দুজনেই পেয়েছি—পাইনি শুধু—"

"নিজেদের।"

"সত্যি, পাইনি শুধু নিজেদের। কিন্তু তখন কি সে চাওয়া সার্থক হতে পারে না, মনি ? আমরা মনকে বোঝাবো 'এই আমাদের প্রথম প্রেম।' তাকে স্বার্থক করবার জন্যে যা কিছু দরকার এখন তো সবই পেয়েছি। এসো, আমরা আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করি। পুরোনোকে মুছে ফেলে নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলি নিজেদের মনকে।"

"বলেছ সুন্দর !"

"জানি, একদিন সে চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু তার জন্যে দায়ী তো আমরা নই। সে দোষ ছিল আমাদের ভাগ্যের। তার জন্যে লজ্জার কিছু তো নেই। বিরাট প্রতিভা আমাদের ভেতর লুকিয়ে ছিল তাই তো আমরা খাঁচার জীবনে সুখী হতে পারিনি। আজ আমাদের চোখের সামনে উজ্জল, উন্মুক্ত নীল আকাশ। সেখানে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হবো। সেখান থেকে পাবো সে জীবনের দীপ্তি, আনন্দ তাই আমাদের জীবনে আনবে সর্থকতা। ভাগ্য আজ যখন আমাদের পানে প্রসন্ননয়নে চেয়েছে তখন আমরা হাসি, গানে জীবনকে ভরে তুলবো না কেন ?" রতীন রেবাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে তার রক্তাধরে এঁকে দিলে.........। তারপর রেবার কানে গুনগুনিয়ে বল্লে "রেবা ! রেবা ! এই তো পেলুম আমরা নিজেদের খুঁজে।"

"আমাদের জীবনের শেষ স্বপ্নও সফল হতে চললো।"

(ক্রমশঃ)

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

রেডিও প্রোগ্রাম দিনে দিনে অবনতির স্তরে নেমে যাচ্ছে। কোন অনুষ্ঠানেই কোন বিভাগেই আমরা একটা ক্রমোন্নতির ধারা দেখতে পাচ্ছি না। কিছুদিন হয়ত প্রশংসাযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গেল কোন একটা বিভাগে কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তা অতি নিম্নস্তরে গেল নেমে।

* * *

এর যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে গেলে বলতে হয় রেডিওতে গুণগ্রাহিতার অভাব আছে। আর্টিষ্টদের প্রতিও অত্যন্ত অনাদর উপেক্ষা ভাব প্রদর্শিত হয় একথা আমরা বহু আর্টিষ্টদের মুখে শুনেছি। সুতরাং গুণী আর্টিষ্ট অধিক দিন থাকে না।

* * *

সর্ব্বোপরি রেডিও প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ ভার যাঁদের 'পর ন্যস্ত তাঁদের ভেতর অনেক গলদ আছে। তাঁরা নিজেদের এক একজন পরম বসজ্ঞ এবং 'কেষ্টবিষ্টু' (?) বলে ভেবে থাকেন এবং এখানে party politics ও favouritism পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

* * *

আমাদের কাছে এমনি ধরণের অনুযোগ লিপি প্রায় প্রত্যহই আসে যে শ্রোতাদের অনুরোধ প্রতিপালনে রেডিও কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্তই উদাসীন। মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করে তাঁরা অনুরোধ লিপির প্রত্যুত্তর দেন বটে এবং শ্রোতাদের অনুরোধ প্রতিপালিত হবে এমনও আশ্বাস দিয়ে থাকেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কার্য্যকরী হয় না।

* * *

জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

* * *

নাট্যকার বরদা প্রসন্ন কর্ম্মবীর সুপরিচালক বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় এ, আই-আর প্লেয়ার্স কর্ত্তৃক 'কর্ম্মবীর' অভিনীত হোল। শিবকালীর চীৎকারে যাত্রার আসর বেশ জমে উঠেছিল। আমরা ভাবছি অতঃপর আমরা কোন যুগে বাস করছি !

* * *

ষ্টারে "চক্রধারী" বেশ যাত্রার আসর সাজিয়েছে ওদিকে মিনার্ভায় "বিষ্ণুমায়া", শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণের নিকট আমাদের অনুরোধ অচিরাৎ তিনি এ দুখানি নাটককে বেতারের জন্যে নির্দ্দিষ্ট করে রাখুন !

—*—

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তেরো—

আধুনিক যুগের সুশিক্ষিতা তরুণী হইলেও প্রগতির বিষাক্ত বায়ু শুভ্রার শুভ্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে রাজানুগৃহীত ধনী জমিদারের কন্যা ও উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারের স্ত্রী হিসাবে বিবিধ সোসাইটীতে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিল কিন্তু তথাপি সে তাহার বেশ বিন্যাসে ও কার্য্যপ্রণালীতে পুরাতনযুগের হিন্দু সংসারের স্ত্রীরূপেই নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিত। পাশ্চাত্যের হেলেন, ক্লিওপেট্রা বা জুলিয়েট অপেক্ষা ভারতের সীতা সাবিত্রীর চরিত্রেই সে অধিক মাধুর্য্যের সন্ধান পাইত। মুক্ত-বায়ু ও অবাধ স্বাধীনতা অপেক্ষা স্বামীর কঠোর কারাগারই সে পছন্দ করিত। এজন্য অনেকে তাহাকে "সৃষ্টিছাড়া মেয়ে" বলিয়া উপহাস করিত। তথাপি, শুভ্রার মতির পরিবর্ত্তন হয় নাই, সে স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিল। শুভ্রার যত্নে ও সেবায় অচিরেই অরুণ আরোগ্য লাভ করিল এবং কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিল। শুভ্রার অসীম যত্নে সে আরোগ্যলাভ করিয়াছে এজন্য সে শুভ্রার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কণার গৃহত্যাগের পর হইতে সমস্ত নারীজাতির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল সেই বিদ্বেষবহ্নির উত্তাপ যে শুভ্রার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই একথা বলা যায় না। তাহার তাচ্ছিল্য ও অবহেলা সত্ত্বেও তাহার অসুস্থতায় শুভ্রা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যে অক্লান্ত সেবা, ঘৃণাহীন পরিচর্য্যা, ও আকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে অরুণ বুঝিয়াছে যে পৃথিবীতে সকল নারী একই ধাতুতে গঠিত নহে। কণার চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহার হৃদয়ে যে অন্ধকার ও তমসা উপস্থিত হয়, শুভ্রার চরিত্র আলোচনা করিলে সেই তমসা বিদূরিত হইয়া তাহার হৃদয় প্রেমালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সে স্থির করিল যে কণার চিন্তা বিস্মৃতির অতল কন্দরে বিসর্জ্জন দিবে ও শুভ্রাকে তাহার জীবনের একমাত্র দেবীরূপে তাহার হৃদয়মন্দিরে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজের জীবনকে ধন্য করিবে।

অরুণ প্রতিজ্ঞা করিল বটে কিন্তু তাহার অলক্ষ্যে থাকিয়া সর্ব্বনিয়ন্তা ভাগ্যবিধাতা যে ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন তাহা সে বা শুভ্রা কেহই জানিতে পারিলনা।

সেদিন প্রাতে চা পরিবেশন করিতে করিতে অরুণকে শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগো, অমল আর কণার খবর পেয়েছ কিছু?"

বিচলিত কণ্ঠে অরুণ বলিল, তাদের কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরনা শুভ্রা, তাদের কথা আমি জানিনা, জান্‌তে চাইনা। অকৃতজ্ঞ পশু বিশ্বাসঘাতক যারা তোমার মত দেবীর মুখে তাদের নাম উচ্চারিত হয়ে তাদের পাপের বোঝা কমে যাবে।"

"অমন কথা বোলনা তুমি, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় তারাও একটা উত্তেজনাবশে মোহে পড়ে একটা ভুল করেছে তাই বলে কি তারা ক্ষমা পেতে পারেনা?" বলিয়া শুভ্রা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিল।

"অমল যে দোষ করেছে আমি যদি সেই দোষ করতাম শুভ্রা, তাহলে তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পারতে?"

অরুণের এই প্রশ্নের উত্তরে শুভ্রা বলিল, "দেবতার দোষাদোষের বিচার করার অধিকারী ভক্ত নয়, তার কাজ শুধু পূজা করা, সেবা করা, তাঁর চরণে নিজের প্রণতি জানান এইমাত্র। তুমি যদি অপরাধ করতে তাহলে আমি যে কি করতাম তা আমি নিজেই জানিনা, তবে এইটুকু তোমায় বলতে পারি যে আমার দিক্ থেকে তোমায় সেবাযত্নের কোন শিথিলতাই আসতনা। তোমার বিচারের ভার নেওয়া ত দূরের কথা এজন্য তোমায় আমার অভিযোগও জানাতামনা। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; তোমায় যে ভালবাসতে পেরেছি, তোমার কাছে যে ভালবাসা পেয়েছি, তাতেই আমি আশাতীত সৌভাগ্যের অধিকারিণী মনে করি। তোমার বিচারের অধিকার আমার নেই কিন্তু তোমায় রক্ষা করার অধিকার আমার আছে। যদি এমনিই দুর্দ্দিন আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তোমায় ঘৃণাকরে দূরে সরিয়ে রাখবনা, পিচ্ছল পথে পা পিছলে পড়ে যাতে তোমার ক্ষতি না হয় সেই চেষ্টাই আমি করব।"

অরুণ এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শুভ্রার কথা শুনিতেছিল, চায়ের বাটী তাহার হাতেই ছিল অধর স্পর্শ করে নাই এতক্ষণে এক চুমুক চা পান করিয়া চল বলিল, "আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে তোমার নিজেরও তো বিপদ হতে পারে শুভ্রা।"

"সে যত বড়ই বিপদ হোক্‌না কেন সে বিপদের বোঝা মাথায় তুলে নেবার শক্তি ও

সাহস আমার আছে, "বলিয়া শুভ্রা জল-খাবারের রেকাবিটা অরুণের দিকে আগাইয়া দিল। এই অবসরে অরুণ তাহার বাহুদ্বারা শুভ্রার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি শপথ করে বলতে পারি শুভা এমন দুর্দিন তোমার জীবনে কোনদিনই আসিবেনা।"

মৃদু হাসিয়া শুভ্রা বলিল, "তা আমি জানি।"

* * *

সেদিন বৈকালে অরুণ যখন আপনার রোগী দেখিবার ঘরে কয়েকজন রোগীকে লইয়া ব্যস্ত এই সময় একটা সেকেণ্ড ক্লাশ ভাড়া গাড়ী হইতে একটা বৃদ্ধ ও তাহার সহিত একটি সুদর্শনা তরুণী আসিয়া তাহার গৃহদ্বারে পৌঁছিল। চাপরাশিকে বৃদ্ধ বলিল, "আমি আমার কন্যাকে দেখাইবার জন্য আসিয়াছি। ডাক্তারবাবুর দর্শনী যাহা লাগে তাহা বৃদ্ধ দিতে প্রস্তুত আছে একথাও বার বার শুনাইয়া দিল। চাপরাশি সংবাদ দিলে অরুণ আগন্তুকদের স্ত্রীলোকদের বসিবার ঘরে পাঠাইয়া দিল। সর্বাঙ্গ রেশমী চাদরে আবৃত করিয়া নবাগতা রোগিণী ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ বাহিরে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিল। রোগীদিগকে বিদায় করিয়া অরুণ ষ্টেথস্কোপটী হাতে লইয়া স্ত্রীলোকদের কামরায় প্রবেশ করিয়া রোগিণীর নিকট বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কষ্ট হয় আমায় বলুন।"

রোগিণী উত্তর করিল না। অরুণ পুনরায় বলিল, "আপনার পিতাকে আসিতে বলি কারণ আপনি বড় বেশী লজ্জা বোধ করিতেছেন।"

রোগিণী ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন মোচন করিল। বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে অরুণ আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "একি, এযে কণা।"

কণা কোন কথা বলিল না। একবার ম্লান দৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল। অরুণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "এখানে এসেছ কেন? লজ্জা করেনা ওই মুখ দেখাতে? কুলটা, ভ্রষ্টা তুমি কোন সাহসে আমার বাড়ীতে পদার্পণ কর্ত্তে সাহস কর?"

কণা কোন উত্তর করিলনা। সে মাটীতে বসিয়া পড়িয়া অরুণের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল, "অমল তোমায় থিয়েটারে বা কোন ষ্টুডিয়োতে ভর্ত্তি করে দিলেই পারতো তাহলে তার অর্থ কষ্ট থাকতোনা। আর তোমারও এমনি করে পায়ে ধরার দরকার হতোনা। কণা পূর্ব্ববৎ পা দুইটী দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া রহিল; কোন কথা বলিলনা।

অরুণ তাহার পা ছাড়াইবার চেষ্টা না করিয়াই বলিতে লাগিল, "দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষলেও সাপে ছোবল মারতে ভুলে যায়না তা আমি জানি। শুভ্রা নিজের বোনের মত তোমায় বুকে তুলে নিয়েছিল—তার উপযুক্ত পুরস্কার তাকে দিয়েছ; আজ আবার এসেছ আরও একটা বড় মতলব নিয়ে না? পা ছাড়, আমায় অভিনয় দেখবার ফুরসৎ নেই।" অরুণ সজোরে কণার মাথাটা পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া দিল। কণা করুণনেত্রে অরুণের দিকে চাহিল। অরুণ দেখিল কণা যেন আরও সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখে বিষাদের ছাপ সুপরিস্ফুট। সে মুখে অরুণ শারদপূর্ণিমার মেঘঢাকা চন্দ্রিমার ছায়া দেখিল। সে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। নিজের হৃৎস্পন্দন যেন সে নিজেই শুনিতে পাইল। সে নিজকে যথাশক্তি দমন করিয়া বলিল, "আমি তোমায় কোন সাহায্যই করতে পারবোনা। তুমি চলে যাও এই মুহূর্ত্তে। আমাকে—আমাকে তুমি—" কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। সে সেই কক্ষে তেমনই দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধ কেশরীর ন্যায় ক্ষোভে ও ক্রোধে অস্ফুট গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কণা তেমনই অবিচলিত ভাবে তাহার পা দুইটী আলিঙ্গন করিয়াই রহিল।" অমল কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, যখন আমার বাড়ী তুমি ছেড়ে গিয়েছিলে তখন আমাদের কারও অভিমত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল সে কথাও তোমার মনে পড়েনি। কারণ তখন বোধ হয় মনে হয়েছিল আমরা তোমার পরম শত্রু না? আজ যখন অমল অকূলে ভাসিয়ে সরে পড়েছে তখন বুঝি আমাদের মনে পড়েছে না? অথচ সেইদিনই তোমার জন্যে অমলের পিতার কাছে যে অপমান সহ্য করেছিলাম তা আমি জীবনেও ভুলতে পারবোনা।"

কণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমায় একবারটী ক্ষমা করো।—তোমার পায়ে পড়ি একবার। আমি জানি আমার দোষ ক্ষমার অযোগ্য তবু তোমার কাছে ক্ষমা পাব এ আশা আমার আছে।"

অরুণ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল কোন্ সাহসে কণা আজ তাহাকে তুমি সম্বোধন করিতে সাহস করিলে। সে গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল, "ক্ষমা করবার আমি কে? তুমি বরং শুভার কাছে যাও, সে যদি ক্ষমা করে তোমায় স্থান দেয় আমি তাতে আপত্তি করবোনা।

কণা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তিনি স্বর্গের দেবী। তাঁর কাছে আমি যাবনা, যেতে পারবোনা। তুমি আমায় ও আদেশ করোনা, পায় পড়ি তোমার।

ক্রুদ্ধস্বরে অরুণ উত্তর করিল, তবে আমার কাছেও তোমার ক্ষমা হবে না মনে রেখ।

কম্পিতাকণ্ঠে কণা আবার বলিল, তুমি আর যা আদেশ কর সব করতে পারবো

কিন্তু দিদির সামনে গিয়ে দাড়াতে পারবোনা, কিছুতেই না। ওগো, দয়া কর, আমায় ও আদেশ করোনা।

অরুণ ভাবিল, আশ্চর্য্য দয়া ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি শুভ্রা, তাহার নিকট যাইতে ইহার এত ভয় কেন? অদ্ভুত এই নারী চরিত্র। বিধাতার বিচিত্র সৃজন। সে ধীরকণ্ঠে বলিল, আমার পা ছাড় কণা— কোন লোকই বিশ্বাস করবেনা তোমায় দেখলে যে আমি এতক্ষণ রোগী দেখছিলাম। আমার দ্বারা তোমার কোন উপায়ই হবেনা। তবে একটা কথা, তোমার হাজার খানেক টাকা আমার কাছে আছে। সেটা তুমি নিয়ে যাও। উপস্থিত কোন হোটেলে ঘরভাড়া নিয়ে থাক তারপর একটা সিনেমায় ঢুকে পড়ো। টাকার অভাব তোমার হবেনা। অমলের মত অমন অনেক শিকার মিলবে তোমার। অরুণ বাহিরে আসিল। দেরাজ হইতে একটা চেকবহি বাহির করিয়া কণার নামে নয়শতটাকার একটা চেক লিখিল ও আয়রণ চেষ্ট হইতে নগদ একশত-টাকা লইয়া কণার নিকট গিয়া সেগুলি তাহার হস্তে দিয়া বলিল, আজ থেকে আর কোন সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার নেই। রাইচরণকে ডাকিয়া বলিল, গ্রেট ইণ্ডিয়াণ হোটেলে গিয়ে আমার নাম করে বলবেন যে চিকিৎসার জন্যে আপনারা কলকাতায় এসেছেন। নগদ একশ টাকা কাছে রইল তা দিয়ে উপস্থিত খরচ চলবে। পরে কি করলে আপনাদের অভাব থাকবেনা তা আপনার মেয়েকেই বলে দিয়েছি। রাইচরণ বাহির হইয়া গেলে কাঁদিতে কাঁদিতে কণা বলিল, একটুও কি ভালবাসনা আমায়? শুভ্রা ভিন্ন অন্যকোন স্ত্রীলোককে ভালবাসবার অধিকার আমার নাই বলিয়া অরুণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাইচরণ কণাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল গাড়ী ধীরে ধীরে বাটীর সীমানা ছাড়াইয়া গেল। অরুণ দেখিল—চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিল, মস্তকের ভিতর যেন একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল। সে তাহার কক্ষের একটী চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বার-বার আপন মনেই বলিতে লাগিল, শুভ্রা ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিবার অধিকার তাহার নাই।

— চোদ্দ —

কি জানি কেন কণার বহুদিন হইতে ধারণা হইয়াছিল যে অরুণ তাহাকে ভাল-বাসে। ভালবাসার কোন লক্ষণ বা আভাষ কণা যদিও অরুণের নিকট হইতে কোন দিন পায় নাই তথাপি সে স্থির করিয়া-ছিল তাহার প্রেম বিফলে যায় নাই ও সে অনেক পরিমানে অরুণের হৃদয় অধিকারে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এইরূপ ভাবিবার কারণ যে কি তাহা কণা নিজেই বলিতে পারে না। কলিকাতায় তিন-মাস সে ছিল এবং তিনমাস প্রত্যহ সে অরুণকে দেখিবার চেষ্টা করিত। এইজন্য অরুণ কোনদিন তাহাকে তিরস্কার করে নহে এইমাত্র। কণার ধারণা হইয়াছিল সে যখন অরুণকে চায় অরুণও তাহাকে চাহিবে এবং সত্যই অরুণকে পাইবার আশা একদিন তাহাকে আত্মহারা করিয়াছিল। সে শুভ্রাকে ভাল বাসিত যতটা, ভয় করিত তাহার দশগুণ অধিক। সে জন্য কোনদিনই সে অরুণের নিকটবর্ত্তী হইবার সাহস করিত না। ঐ গম্ভীর স্বল্পভাষিণী তরুণীর চক্ষে বজ্রকঠোর শাসনবাণী বার বার কণার হৃদয় স্পর্শ করিত। কণা যখন অমলের সহিত গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিল তখন অরুণের আশা সে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু টাটা-নগরে অমল যখন অরুণের কথা লইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার সহিত ব্যঙ্গ ও রসিকতা করিত তখনও কণার মনোমধ্যে অরুণকে পাইবার আশা জাগরুক হইয়া উঠিত। "ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহাতেই তাহার তৃপ্ত হওয়া উচিত" এইরূপ সান্ত্বনা দিয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। অরুণের কথা লইয়া অমলের সহিত তাহার যে দুই-চারিবার বচসা হয় নাই এরূপও নহে। মধ্যে যখন অমল তাহার প্রতি বিবিধ অত্যাচার শুরু করিল, তাহার ইচ্ছা হইত সে অরুণের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আজ যখন চারদিন যাবৎ অমল ফিরিয়া আসিল না তখন তাহার অরুণের নিকট ফিরিয়া যাইবারই বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল এবং সত্যই সে রাইচরণের সহিত অরুণের নিকট ফিরিয়া আসিল। সে ভাবিয়াছিল অরুণ নিশ্চয়ই তাহাকে পায়ে ঠেলিবে না এবং সে তাহাকে গ্রহণ করিবে কিন্তু অরুণ যখন তাহাকে প্রত্যাখান করিল কণার প্রাণে আপনার উপরে ধিক্কার আসিল। সে স্থির করিল দুই একদিনের মধ্যেই বিষপানে তাহার অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি করিবে। সে ভাবিল ব্যর্থতাই তাহার জীবনের সহচরী, অপমান তাহার অঙ্গের আভরণ, এমন ঘৃণিত জীবন বহন করিয়া লাভ কি? হোটেলে আসিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া কণা বহুক্ষণ কাঁদিল। রাইচরণ ঘরের কোণে বসিয়া কণার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না এই ডাক্তার বাবুটীর সহিত কণার সম্বন্ধ কি?

রাত্রি এগারটা বাজিতেছে দেখিয়া রাইচরণ বলিল, "হোটেল-ওয়ালারা খাবার রেখে গেছে, মা একটু কিছু খাও।" বলিয়া রাইচরণ কণার পায়ের নিকট আসিয়া দাড়াইল।

কণা উঠিয়া বসিল, বলিল, "আমি খাব না বাবা, তুমি সারাদিন উপবাস করে রয়েছ তুমি কিছু মুখে দাও।"

রাইচরণ হাত জোড় করিয়া বলিল, "মা উপোসী থাকলে ছেলেকে যে কিছু খেতে নেই।" অগত্যা কণা উঠিল। মুখ ধুইয়া কণা আহারে বসিল বটে; তাহার গলা যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কিছুই সে গলধঃকরণ করিতে পারিল না। মুখে সমস্ত বিস্বাদ ও তিক্ত লাগিতে লাগিল। সে একটু দুধ পান করিয়া রাইচরণকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিল। অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া রাইচরণ আহারে বসিল। দুই-চারি গ্রাস মুখে দিয়া রাইচরণ বিনীতভাবে বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মা, সন্তানের অপরাধ নিওনি, আজ যে ডাক্তার বাবুটীর কাছে গিয়েছিলে উনি তোমার কে?"

ম্লান হাসি হাসিয়া কণা বলিল, "আজ তিনি আমার কেউ নন। কিন্তু একদিন ছিল, তিনি ছিলেন আমার আশ্রয় দাতা, প্রভু, আমার ইহকাল পরকাল, আমার রক্ষক, আমার সর্ব্বস্ব।"

রাইচরণ ক্ষণকাল কণার মুখের দিকে বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর অন্ন মাখিতে মাখিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এবার বুঝেছি মা তোমার কথা। সত্যি মা তুমি বড় বোকা মেয়ে। অমন সোয়ামী ফেলে তুমি ওই হাড়-হতভাগা অমলবাবুর সেবা করেছ? একেই বলে সোণা ফেলে আচলে গেরো। আহা অমন রূপের সোয়ামী তোমার, আর তুমি ওই——"

বাধাদিয়া কণা বলিল, "আমায় আর বেশী কিছু বোলনা রাইচরণ, সবই আমার অদৃষ্ট।" কণা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।

রাইচরণ ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে সে কণার সহিত ডাক্তারবাবুর পুনর্মিলন করাইতে পারিবে। সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ-মা, অমলবাবুকে ডাক্তারবাবু চিন্তেন কি?

উত্তরে কণা বলিল, "তা চিনতেন বৈ কি? দুজনে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আমাকে তারা দুজনে মোটরে করে প্রথম দিন বাড়ী আনেন। সে অনেক কথা রাইচরণ, আজ মনে হয় আমার জীবনের সে একটা স্বপ্ন। ঘুম ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। আমার নিজের কর্ম্মদোষে আজ আমি পথের ভিখারী, সমাজের আবর্জ্জনা, সকলের চোখে ঘৃণিত।"

হাই তুলিয়া রাইচরণ বলিল, "ডাক্তার বাবু তোমায় অতগুলান টাকা কেন দিলে বলতো?"

"লোকে ভিখারীকে যেমন দয়া করে ভিক্ষে দেয় বোধ হয় তেমনই করে।" বলিয়া কণা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

"তুমি কি টাকা চেয়েছিলে মা?"—

—"না," বলিয়া কণা বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু জলভারে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

"দেখ মা আমার বিশ্বাস বাবু এখনও তোমার মায়া ছাড়তে পারেনি—এখনও ডাক্তারবাবু তোমায় ভুলেনি মা। তোমার অপরাধ খুব বড়, একথা সত্যি, তবু আমার বোধ হয় ডাক্তারবাবু তোমায় ক্ষমা করিতে পারিবে। দেখ মা, তুমি কাল আমার হাতে একটা চিঠি লিখে দাও দেখি কি করতে পারি আমি।"

ভীত ও কম্পিত কণ্ঠে কণা বলিল, "না, না, তা আমি পারবো না, কখনই নয়। এত বড় অপমান, এত বড় প্রত্যাখ্যান তার পরেও চিঠি লেখা? না রাইচরণ, খেতে না পেয়ে মরি তাও ভাল তবু তাঁর কাছে আর কোন অনুগ্রহ চাইবনা আমি।"

উপদেশের সুরে রাইচরণ বলিল, "পাগলামী করোনি মা—যা বলি তাই শোন। দোষ তোমারই। ব্যথা তুমিই দিয়েছ তাঁকে। আজ যে ব্যথা পেয়েছ তাঁর কাছ থেকে, তোমার দেওয়া ব্যথার কাছে তা কিছুই নয়। এত বড় দোষের পর যে সোয়ামী একটী কথা না বলে তোমার হাতে হাজার টাকা তুলে দিলে সে মানুষ নয় মা, সে দেবতা। তুমি একটা চিঠি লিখে দাও হয়তো দয়া তার হতে পারে।" বলিয়া রাইচরণ কণার দিকে চাহিল। দেখিল কণা শুধু বালিশে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। রাইচরণ প্রশ্ন ও উপদেশে তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল—তথাপি কণা বলিতে পারিল না যে অরুণ সত্যই তাহার স্বামী নহে এবং এই হাজার টাকা সে দয়া করিয়া দান করে নাই। তাহার দাদার দেওয়া টাকা—তাহার প্রাপ্য শোধ করিয়াছে মাত্র।

কণার নিকট সদুত্তর না পাইয়া হতাশ ও বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ রাইচণ ঘুমাইয়া পড়িল। সারারাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশাশেষে কণাও নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহন করিল।

(ক্রমশঃ)

হ্যাঁ-বার্লি
—তবে—
লিলি
ব্র্যাণ্ড
হওয়া চাই
একমাত্র
• নির্ভরযোগ্য •
পথ্য ও পানীয়
LILY BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FINEST FOOD DRINK
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO.
PROPS = P. SETT & CO
ULTADANGA: CALCUTTA

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"অতল সমুদ্র হতে যে ভারতলক্ষ্মীর মতন
দেখা দিল পূর্ণাঙ্গণে শিরে যার অরুণকিরণ
প্রথম উদয় দীপ্তি, নব ধান্য এক হাতে যার
আর হাতে বরাভয়; তুমি সেই ভারত মাতার
গেয়েছিলে জয়গান।"

আজ আমি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কিছু বলিব। এর রচনা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা দুরূহ। নগণ্য কীটানুকীট আমরা, কি করে এই মহান উন্নতচেতা বিরাট পুরুষের রচনা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিব। তবুও নিরস্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ভক্ত হয়ত সেই বিরাট পুরুষ দেবতাকে তাঁর যথাযোগ্য পূজা করিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত যে আন্তরিক চেষ্টা করে তাই দেবতা আনন্দের সহিত লইয়া থাকেন তদ্রূপ আমরাও দ্বিজেন্দ্রলালের অধম ভক্ত। আমরা যদি কিছু গুরুর পদে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ নিবেদন করি, গুরু কি তা লইবেন না? অবশ্যই লইবেন কারণ এ যে তাঁর ভক্তের ক্ষুদ্র দান।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সত্যকার একজন স্বদেশ প্রেমিক। নিজের দেশকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। এ ভালবাসা তাঁর মৌখিক শূন্যগর্ভ ভালবাসা নয়। এ ভালবাসা ছিল অসীম, বিরাট। যখন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' মহামন্ত্রে ভারতবর্ষের সকল নরনারী নির্ব্বিশেষে দীক্ষিত; সকলের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' বাণী ব্যতীত আর কিছু ধ্বনিত হইত না তখন দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" বাঙ্গালায় এক অপূর্ব্ব শিহরণ আনিয়া দিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বঙ্গের চারণ কবি। পুরাকালে রাজপুত চারণেরা যেমন রাজপুত রাজাদের বীরত্বগাথা গাহিয়া প্রতি ঘরে ঘরে যে স্বদেশপ্রেমের এক আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল সেই স্বদেশপ্রেমের আগুন এ দেশে জ্বালাইয়া তোলেন। তাঁহার "ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা" এই গান বাঙ্গলার প্রতি গ্রামে গ্রামে, প্রতি ঘরে ঘরে, হাটে মাঠে চতুর্দ্দিকে তাই এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশে নাচাইত মাতাইত। এ গানের ছিল এক প্রাণ জাগানো, মন ভুলানো সুর, এই সুরের মূর্চ্ছনার আকর্ষণে ছিল এক তীব্র আকাঙ্খা, যে আকাঙ্খায় প্রণোদিত হইয়া শ্যামের বাঁশরী শুনিয়া ব্রজগোপীরা একদিন যেমন ঘরসংসার ভুলিয়া বাহির হইয়াছিল অজানার সন্ধানে তদ্রূপ বাঙ্গলার যুবকেরা দ্বিজেন্দ্রলালের এই বাঁশীর ডাকে বাহিরে অজানা কণ্টকময় পথে বাহির হইয়াছিল। এককালে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন বঙ্গালা দেশের স্বাদেশিকতার অন্যতম গুরু। তাঁহার স্বদেশী কবিতা ও নাটকগুলির মধ্যে আমরা বীর্য্যের সহিত করুণার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। আমাদের এই জাতীয় পরাধীনতার জন্য যে দুঃখ তাহা দূর করিবার জন্য তিনি পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাই বলিয়াছেন, "জাগো, সব মলিনতা, সব দৈন্য. হ'তে জাগো, আত্মপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করে তোলো।" দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে এদেশ একজন সত্যিকার দরদী বন্ধু পাইয়াছিল। তিনি নিজে এই দীন ভারতবর্ষকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন, তাই বলিয়া তিনি বিদেশের প্রতি যে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার অনেক বিদেশী বন্ধু ছিল এবং তিনি কয়েক বৎসর কৃষিকার্য্য-শিক্ষার্থ ষ্টেট্ স্কলারশিপ লইয়া বিলাতে অতিবাহিত করেন। তিনি নিজ দেশকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা বুঝা যায় তাঁহার

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের সেরা সে যে মাদের জন্মভূমি।"

ইত্যাদি পড়িয়া মিডলটন মারি তাঁর এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "Love creates love—but it must be love which seeks not the return of love." দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁহার এক গানে লিখিয়াছেন,

"ভালোবাসো নাহি বাসো নইকো তারও
অভিলাষী,
আমরা শুধু ভালোবাসি, ভালোবাসি,
ভালোবাসি।"

আজ যে প্রত্যেক দেশবাসী পরস্পর স্বার্থ লইয়া মোহান্ধকারে আবৃত যাহার জন্য সর্ব্বত্র বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা এ দ্বিজেন্দ্রলালও কখন ক্ষমা করেন নাই, তাঁহার মতে এই সমস্ত কারণেই জাতীর এত অবনতী। তাই বলিয়াছেন, "বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ করবে তাঁর নিজের সন্তান।" আবার অপরস্থানে বলিয়াছেন, "যখন একটা জাতী যায়—নিজের দোষেই যায়—সে এইরকম করেই যায়। যখন জাত নির্জ্জীব হয়ে পড়ে, তখন ব্যাধি প্রবল হয়ে

উঠে, আর এই রকম বিভীষণ তার ঘরে ঘরে জন্মায়।”

দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি জাতীয়তার বাণীও প্রচার করিয়াছেন। ভারত যদি সংহতিবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহাকে সামলাইতে কি কেহ পারিবে? কবি ইহা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন, ভয় দেখিয়ে এই প্রকাণ্ড জাতকে কেউ দমন কর্ত্তে পারবেনা। তা'রা ইচ্ছে ক'রে যদি অধীন থাকে ত থাকবে; আর যদি সমস্ত জাতি বিরূপ হয় ত তাদের শুষ্ক মিলিত উষ্ণ নিঃশ্বাসে মোগল সাম্রাজ্য উড়ে যাবে। ভারতে যে জাতীয় মহাসভায় যোগদানের জন্য রাষ্ট্রপতি জহওরলাল নেহেরু মুসলমানদের আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার প্রেরণা বহুদিন পূর্ব্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের দিয়া গিয়াছেন। শূদ্রের মনুষ্যত্বের দাবী তাঁর সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। কবি উদাত্তস্বরে বলিয়া উঠিয়াছেন, “হিন্দু-মুসলমান এক হোক; মন্দিরে মসজিদে স্বাধীনভাবে আল্লার ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক; এক সঙ্গে দামামা-শঙ্খধ্বনি উঠুক। হিন্দু-মুসলমান একবার জাতি-দ্বেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে আলিঙ্গন করুক।” কবি বলিতেছেন, “হিন্দু-মুসলমান কেন এক হবে না?” তারা এতদিন একই আকাশের নীচে একই বাতাস সেবন করে, একই জলপান করে, একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনও কি তাদের প্রাণ এক হয়নি? তারা একবার ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হ'য়ে করযোড়ে ভক্তিভাবে গদগদ-স্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে একবার প্রাণভরে মা বলে ডাকুক দেখি।” দীনা জন্মভূমির যে দুঃখ তিনি তাহা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন তাই না তিনি বলিয়াছেন,

“আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
হৃদয় রক্ত করিয়া শেষ।”

দ্বিজেন্দ্রলাল যে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক কবি ছিলেন তাহা তাহার ‘আষাঢ়ে’ ও ‘হাসির গান, পড়িলেই বুঝা যায়। তাহার হাসির কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন থাকিতনা তাহা নিছক হাস্যরসে ভরপুর যেমন:—

“খেটে খেটে
দিবস গেল, মাসও গেল, বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর মেয়ের ভাবনাই বাঙ্গালীবাবু
খেটে খেটে না খেয়ে চল্লিশেই বাবু।”

তিনি নিজে ছিলেন ডেপুটী তৎসত্ত্বেও তিনি ডেপুটীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“তড়বড় খেয়ে ভাত দড়বড় ছুটী
আফিসেতে চলে যান নবীন ডেপুটি
তাতে এক লক্ষ্মীছাড়া, ছক্কর করিয়া ভাড়া
তাতে দুটী পক্ষীরাজ বাঁধা
একটি লোহিতবর্ণ অপরটী সাদা।” ইত্যাদি

এই মন্ত্রসিদ্ধ সাধনালব্ধ কবির ‘ভারতবর্ষ’ অতুলনীয়। এ সঙ্গীত শ্রবণে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। তা ছাড়া এর ছন্দ চাতুর্য্যও অপূর্ব্ব—

“যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সেকি মা ভক্তি,
সে কি মা হর্ষ।” ইত্যাদি।

স্বদেশ সেবার সাধনা সহজ নহে। এর জন্য চাই ঐক্য, সমবেদ কার্য্যশক্তি। তাতে করতে হবে সকলকে ত্যাগ; তার জন্য চাই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ম্মক্ষম মানুষ। তাই কবি বলিয়াছেন,—“ক্ষীণ সঙ্কল্প, দ্বিধাসন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে আমি চাইনা! একাগ্র, দৃঢ়, স্থির প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমি চাই। দুই পথ আছে, বেছে নাও! একদিকে বিলাস, আমোদ, আরাম আর উপভোগ; আর অন্যদিকে শ্রম, অনাহার, কর্ত্তব্য, দারিদ্র্য ও দুঃখ। একদিকে নিজের সুখ; আর একদিকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য,—বেছে নাও।’ দেশ গিয়াছে দুঃখ কি? তাই কবি বলিয়াছেন,

“গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই
আবার তোরা মানুষ হ।”

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—উঃ! এখনো ব'সে!

দিলীপ—হ্যাঁ। খুব ব্যস্ত তুমি?

সুনীলা—হ্যাঁ।

দিলীপ—আমার একটু কথা ছিল।

সুনীলা—শীগ্গীর বলো। আমার সময় নেই।

দিলীপ—কেন, ক'রছো কি ?

সুনীলা—অজয় এসেছে, কনফারেন্সের ব্যাজগুলো ঠিক্ কোরে নিচ্ছি।

দিলীপ—অজয় কখন এল?

সুনীলা—এসেছে অনেকক্ষণ।

দিলীপ—আচ্ছা, তবে এখন থাক্। তুমি কাজ সেরে এসো, আমি ব'সে রইলাম।

সুনীলা—কাজ সেরে আসতে পারবোনা, বেলা থাকবেনা। তা ছাড়া, ও বলছে ওর সঙ্গে যেতে হবে একবার বাণীবিদ্যাপীঠে,—কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবিকা যোগাড় করবার জন্য। —তার চেয়ে এখন থাক, কাল শুনবো।

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—অজয় বাবু ডাকছেন?

(নিম্নস্বরে) Awfully angry.

সুনীলা—যাচ্ছি—

(বেহারার প্রস্থান)

দিলীপ—আচ্ছা, তবে কালই।—

সুনীলা—বেশ। কিন্তু ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে দেখো। (প্রস্থান)

(ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া দিলীপ বেহারাকে ডাকিলেন)

দিলীপ—নিবারণবাবু!

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—আমায় অমন ধারা কোরে ডাকলে বড়ো খারাপ লাগে বড়ো বাবু।

দিলীপ—আমার কিন্তু বেশ লাগে।—আচ্ছা নিবারণ, ইংরিজি কথাটা অতো আস্তে আস্তে বলার কেন ইচ্ছা হ'ল রে?

বেহারা—আজ্ঞে আপনার সামনে ইংরিজি কথা আমার ভারী আট্কে আসে।

দিলীপ—ও তাই!—যাক্—তুমি গাড়ীটা বার কোরতে বলো, আমি এখুনি বেরুবো।

বেহারা—ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরে আসি তাহ'লে?

দিলীপ—ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরবে কি?

(বেহারা চুপ করিয়া রহিল)

ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কোরবে কি তা বলো?

বেহারা—মা বলে দিয়েছেন গাড়ী ব্যবহার ক'রতে হ'লে ছোটবাবুকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়।

দিলীপ—কেন?

বেহারা—গাড়ী নাকি ছোটবাবুর।

দিলীপ—ও!

(দিলীপ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল) মা এই কথা বলে দিয়েছেন?

বেহারা—আজ্ঞে।

দিলীপ—শুনতে ভুল করোনি নিবারণ? মা এইকথা বলতে বলেছেন?—মা?

বেহারা—আজ্ঞে—

(দিলীপ একেবারে স্তব্ধ; পরে বলিল)

দিলীপ—আচ্ছা, তুমি ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা করেই এসো।

(বেহারার প্রস্থান)

(সুনীলার প্রবেশ)

দিলীপ—একি! তুমি বাণীবিদ্যাপীঠে গেলেনা অজয়ের সঙ্গে?

সুনীলা—না, স্বেচ্ছাসেবিকা যোগাড় হ'য়ে গেছে—তাই আর যেতে হ'লনা। টেলিফোন্ কোরে হেমনলিনী খবর দিলে।

দিলীপ—এই মেয়েটি ভারী বুদ্ধিমতী। এমন মাথা ঠাণ্ডা কোরে কাজ কোরতে পারে যে, কোন কাজের বিশৃঙ্খলা হয়না।

সুনীলা—আমরাও পারি।

(দিলীপ হাসিয়া উঠিল)

সুনীলা—কেন হাস্লে, আমি কিন্তু ব'লতে পারি?

দিলীপ—বলতো কেন হাসলুম?

সুনীলা—হেমনলিনী যা পারে আমিও তাই পারি এই কথা বলেছি ব'লে হেসেছ। ভাবলে হেমের সুখ্যাতি আমি বুঝি সহ্য কোরতে পারলুম না!

দিলীপ—কিন্তু আমি একথাই বা কেন' ভাবতে যাবো সুনীলা?

সুনীলা—হয়তো ভাবো 'দিলীপ' আমার মনের কোনে একটা বিশিষ্ট আসন দখল কোরে আছে, তাই অন্য কোন' মেয়ের সুখ্যাতিতে আমার গা' জ্বলে যায়।

দিলীপ—(ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল) আমি যে তোমায় এর চেয়ে ঢের বেশী বড়ো কোরে ভাবি সুনীলা! তুমি কি কোরে কল্পনা কোরলে তোমার বিষয় আমার ধারণা এতোখানি ছোট হ'য়ে আছে!……

সুনীলা—আমার ভুল হ'য়েছে। কিন্তু আমায় তুমি কেন এতো বড়ো কোরে ভাবো আমায় বলবে? আরও পাঁচজন র'য়েছে, তারাও কি এই বৈশিষ্ট্য দাবী কোরতে পারেনা?

দিলীপ—তুমি শুনতে চাও—না তারা দাবী কোরতে পারে না, এ বৈশিষ্ট্য আর কারুর নেই!—আমিও তাই বলবো সুনীলা। তোমার মন যে জিনিষ জানতে চাইছে, আমার মন সেই জিনিষ বলবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রইলো আজ!

সুনীলা—আমি কিছু শুনতে চাইনা দিলীপ।

দিলীপ—চাওনা সুনীলা?

সুনীলা—না—

দিলীপ—শুনতে চাওনা—তুমি আমার দুর্দান্ত এক অসুখের সময় আহার নিদ্রা ভুলে আমার মাথার কাছটিতে বসে থাকতে—শুনতে চাওনা তোমার সে সেবা, সে যত্ন। আমার ভালো লেগেছিল?

সুনীলা—সে আমি জানি। নূতন কোরে শোনাবার দরকার আছে মনে করিনা।

দিলীপ—কিন্তু দ্বিজেন বলে এ ঋণের প্রতিদান আমি কিছু দিতে পারলুম না বোলে, নীলার জীবন—

সুনীলা—হ'য়ে গেল মরুভূমি! (বলিয়া দিয়া উঠিলেন)—দ্বিজেন যা চায় বলুক, কিন্তু লোক সম্পর্কে তুমি যে আজ এতো মুখর হ'য়ে উঠবে, এ আমার কল্পনার অতীত!

দিলীপ—ঠিক্ তাই। কিন্তু সুনীলা, আজ আমার জীবনের মাঝে চারিদিক থেকে যে সমস্ত ঘটনা অনুষ্ঠিত হ'য়ে চলেছে, সে কোনোও কল্পনার অতীত!—তুমি আমায় জ্বালা কোরলে কি দুঃখের ভারে আমি পীড়িত; —আমি তখন বলতে পারিনি, বলতে পারিনি। কিন্তু এখন—

(দিলীপ সহসা থামিয়া গেল, কথা আর শেষ করিতে পারিল না—নির্ব্বাক হইয়া শুধু ঘরের ভিতর পাচয়ারি করিতে লাগিল। সুনীলা ধীরে ধীরে দিলীপের কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল)

সুনীলা—দিলীপ, আমায় বলো? কি তোমার হয়েছে আমায় বলো?

দিলীপ—(হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল) না।

সুনীলা—কোনদিন কোন কথা তুমি আমার কাছে গোপন করোনি, ভেবে দেখো। ছেলেবেলা কোন দিন কোন কথা বলার দরকার হ'লে,—

দিলীপ—না,—থাক্।

সুনীলা—বড়ো হ'য়েও, কতোদিন তুমি আমায় বাড়ী থেকে ডেকে এনে তোমার কথা বলেছ, ভেবে দেখো। —আজ কেন বলবে না?

দিলীপ—সে থাক সুনীলা। সে আমার একান্ত নিজের কথা। সংসারের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই: জাতির সেবকের কাছে সে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ!

দুঃখ যদি আমি কিছু অনুভব কোরে থাকি, সে আমার দুর্ব্বলতা, তুমি তাকে আর জাগিয়ে তুলনা।

(বেহারার প্রবেশ)

কি নিবারণ, গাড়ী পাওয়া যাবে?

বেহারা—আজ্ঞে হাঁ। ছোটবাবু নিজেই আসছেন।

Awfully—মানে, ভীষণ রেগেছেন।

(প্রস্থান)

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—দাদা, কার গাড়ী কে চেয়ে পাঠিয়েছিল?

দিলীপ—তোমার গাড়ী আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম।

দ্বিজেন—(তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিল) আমার গাড়ী নয়। আমার কিছু নয়, কোন সম্পত্তি আমার নেই। তুমি তোমার নিজের জিনিষ আমার কাছ থেকে চাইবে না, চাইবে না, চাইবে না!

দিলীপ—কিন্তু মা আমায় হুকুম দিয়েছেন গাড়ী ব্যবহার করবার আগে তোমার অনুমতি নিতে হবে, কারণ—

দ্বিজেন—মা হুকুম দিয়ে থাকেন, মায়ের কাছে যাবে। আমার এ ষড়যন্ত্রের ভেতর থেকে দূরে রেখে দিও।

(প্রস্থান)

মোর হৃদিখানি রহিল আঁধার

উমা দাস

শূন্য আমার হৃদিখানি লয়ে, মন্দির দ্বারে ঘুরেছি কত,
খোলেনি দুয়ার খোলেনি বন্ধু, ফিরিয়ে এসেছি পাগল মত !
দেউলে দেউলে আরতি ডঙ্কা বেজেছে যখন সাঁঝের বেলা,
ছুটে গেছি প্রভু পূজিতে তোমায়, পূজা না করেছি, করেছি খেলা !
শত উপচারে সাজায়ে ডালাটি
কতনা পূজারী আসিছে ওই
আমার ডালাটি শূন্য রহিল—
পূজার অর্ঘে ভরিল কই ?

ক্রমে সে প্রভাত অদূরে মিলাল, যৌবন বীনা উঠিল বেজে
আকাশ বাতাস ভরে গেল এবে, তরুণ রবির অরুণ তেজে।
ঝলমলি উঠে পথ মাঠ ঘাট, ঝলমল করে সুদূর দিশি—
ঝঙ্কারি উঠে শত তারে বীণা, শত আনন্দে আপনি মিশি !
মাতায়ে আকাশ মাতায়ে বাতাস
নব আনন্দ মাতিল ওই
মোর হৃদি খানি রহে নিস্তেজ
ভকতির তেজে ভরিল কই ?

নিশার প্রান্তে দূর দিগন্তে উঠেছে যখন প্রভাত রবি—
গলানো স্বর্ণ ঢেলে চারিধার এঁকেছে যেথায় নিখুঁত ছবি ;
নিশির শিশিরে সিক্ত পত্র ভরেছে যখন রক্ত রাগে—
দূর দিগন্ত ভরে গেছে সবে, প্রভাত রবির হোলীর ফাগে,
ভেবেছি প্রভাত রক্ত বেদীতে
দেবতা বুঝিবা দাঁড়ায়ে ওই
সারা হৃদি খানি খুঁজেছি তখন
ভকতির ফুল ফুটিল কই ?

রক্ত করবী আঁচলে উড়ায়ে নীরব সন্ধ্যা আসিল নামি'—
করম ব্যস্ত কল কোলাহল একে একে সব গিয়াছে থামি।
পল্লী প্রান্তে আঁকাবাঁকা পথ দূর দিগন্তে গিয়াছে মিশি,
সুদূর হইতে আসিছে যে পথে সঘন করুণ শান্ত নিশি।
পূজার বেদীতে তুলসীতলায়
একে একে দীপ জ্বলিল ওই
মোর হৃদিখানি রহিল আঁধার
পূজার প্রদীপ জ্বলিল কই ?

—:০:—

সুনীলা—(বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল) মা এই হুকুম দিয়েছিলেন ?

দিলীপ—হ্যাঁ—

সুনীলা—অধিকার তোমার একটু একটু কোরে সবই গেল সংসার থেকে।

দিলীপ—হ্যাঁ গেল। কিন্তু কেন গেল বুঝলাম না। এ এক রহস্য ! আমার জীবনের এক মহা বিস্ময়।...

সুনীলা—কিন্তু তুমি যে বলো অধিকার মানুষকে শক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা কোরতে হয়, মনীষা দিয়ে পালন কোরতে হয় ; —এ কথা কি শুধু সমষ্টির পক্ষে প্রযোজ্য ? ব্যক্তির পক্ষে কি নয় ?

দিলীপ—ব্যক্তির পক্ষেও এ কথা সত্য। কিন্তু যেখানে একদিন অধিকার ছিল অনায়াসলব্ধ—অধিকার ছিল স্নেহের, ভালো-বাসার, সেখানে শক্তির প্রয়োগ তো দূরের কথা, একটা অভিযোগ কোরতেও লজ্জায় আমার—কিন্তু থাক্, আমার আর সময় হবে না।

(এই বলিয়া দিলীপ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল)

ভালো কথা, তুমি কার সঙ্গে আসছো ? আমার সঙ্গে, না, অজয়ের সঙ্গে ?

সুনীলা—তুমি যা বোলবে।

(দিলীপ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল)

দিলীপ—তুমি আমার সঙ্গেই এসো।

(প্রস্থানোদ্যত)

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—বাবু !

দিলীপ—কি বলো।

বেহারা—আপনি এখনো যান্‌নি। মা খাবার নিয়ে বসে আছেন।

দিলীপ—আজ আর হ'লনা, মাকে ব[illegible] দিও নিবারণ।

সুনীলা—কিন্তু তোমায় সামনে বসে না খাওয়ালে কোনদিন তাঁর চলে না। এ তাঁ[illegible] চিরদিনের অভ্যাস এটা একবার ভেবে দেখ[illegible] সময়ও আছে।

দিলীপ—জানি—কিন্তু অভ্যাস আমা[illegible] অনেক পরিবর্তন কোরতে হচ্ছে, তাঁকে[illegible] কোরতে হবে। এসো—

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

স্মরণীয় পৌরাণিক চিত্র

বহু প্রতীক্ষার পর আগামী শনিবার 'উত্তরা' চিত্রগৃহে হাজরা পিক্‌চার্সের পৌরাণিক চিত্র-নিবেদন "দেবী ফুল্লরা" মুক্তি-লাভ করিবে। ধর্ম্মপ্রবণ বাঙলাদেশে "দেবী ফুল্লরা"-র আগমন-বার্ত্তায় চিত্রামোদিদের মধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চারিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বাঙালী এখন চায় সেই আনন্দ, যাহাতে মনপ্রাণের প্রতিটি গ্রন্থের ভিতর নির্ম্মল আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়। যুগ-যুগান্তের অতীত গরিমার প্রেম-ভক্তি, শৌর্য্য-বীর্য্য বিমণ্ডিত সেই কাহিনীই "দেবী ফুল্লরা"। সেইজন্যই বোধ হয়, এই ছবির মুক্তিলাভে বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতা এতদিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে-ছিল। এতদ্ভিন্ন "দেবী ফুল্লরা"-র কাহিনীটি পৌরাণিক বলিয়া অভিহিত হইলেও ইহার ভিতর অধুনাতম হরিজন, কৃষিশিল্প, দুর্ব্বল ও প্রবলের সংঘর্ষ প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যার বিকাশলাভ ঘটিয়াছে। মোট কথা, "দেবী ফুল্লরা"-র কাহিনীটি গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহু ঘটনার সমাবেশে চিত্রোপযোগী ও আবেদনপূর্ণ।

এই কাহিনীটিকে যাঁহারা রূপ-রস-গন্ধে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন সিনেমাক্ষেত্রে তাঁহারা সুপরিচিত ও জনপ্রিয়। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যিনি এতাবধি বহু ছবি পরিচালনা করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যাঁর প্রায় প্রত্যেকখানি ছবিই অর্থের দিক হইতে কর্ত্তৃপক্ষের মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে—তিনিই এই ছবির পরিচালনা করিয়াছেন। বাঙলাদেশ আজ কী চায় বহুদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি সেই জিনিষটি বিশেষভাবেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন—সেইজন্যই তাঁহার নিকট হইতে আমরা

হাজরা পিক্‌চার্সের "দেবী ফুল্লরা" চিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী ও শিলবালা।

আশানুরূপ সুফল পাইব বলিয়াই আশা করি। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রী মধু শীল এই ছবির প্রধান যন্ত্র-শিল্পী রূপে কাজ করিয়াছেন। আলোক-চিত্রে ও শব্দ-যন্ত্রে তরুণ কর্ম্মীযুগল বিভূতি লাহা ও যতীন দত্ত স্বাধীনভাবে "কচি সংসদ" ছবিতে কাজ করিয়াই সর্ব্বসাধারণের সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিভাগেও যে সকল শিল্পীরা কার্য্য করিয়াছেন সকলেই জ্ঞানী ও গুণী।

"দেবী ফুল্লরা"-র চরিত্র-লিপি বণ্টনেও অন্যান্য বিভাগের মত কর্তৃপক্ষ যে সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'কালকেতু'-র ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী মঞ্চে যে অসম্ভব সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা আজ কাহারও অবিদিত নাই। কবিকঙ্কণ 'কালকেতু' সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়াছেন বাঙলাদেশে তাহার উপযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি অহীন্দ্র চৌধুরী ভিন্ন অপর কাহাকেও কল্পনা করা যায় না। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ভাড়ুদত্ত সম্বন্ধেও ঐ এক মতই পোষণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যুবরাজ রূপে প্রিয়দর্শন অভিনেতা মোহন রায় এই সব শক্তিশালী অভিনেতৃদের সংস্পর্শে যে আমাদের সুখী করিতে পারিবেন না এ ধারনা আমরা করি না। সর্দ্দাররূপে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও দুর্গাপ্রসন্ন বসু আত্মপ্রকাশ করিবেন। ইঁহাদের দুইজনের বিষয় কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন। স্থিরচিত্রে তিনকড়ি বাবুর রূপসজ্জার যে নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহা দেখিয়া মনে হয়, এই চরিত্রটি তাঁহার হইবে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ব্যাধ-বালিকা "ফুল্লরা"-র ভূমিকায় শিশুবালাকে মানাইবে যে চমৎকার এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তিনি শক্তিময়ী অভিনেত্রী। অভিনয়েও যে তিনি এই চরিত্রটির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবেন না, এ ধারণা করা অমূলক নয়। সুরমা নামে একটি গীতবহুল ভূমিকায় সুবিখ্যাত গায়িকা রাধারাণী ও সুষমা নাম্নী একটি চঞ্চলার অংশে সুদর্শনা চিত্রার মনোনয়নকে আমরা সমর্থন করি। মহামায়া রূপে উদীয়মানা অভিনেত্রী সাবিত্রী সম্বন্ধে আমরা উচ্চ ধারণা পোষণ করি। নর্ত্তকীরূপে নৃত্যগীত-পটিয়সী রাণী চৌধুরী যে অপরূপ নৃত্যকলা প্রদর্শনে সকলকে বিমোহিত করিবেন এ আস্থা তাঁহার উপর আমাদের আছে।

এই সবের যোগাযোগে আমাদের মনে হয়, "দেবী ফুল্লরা" বাঙ্গলার চিত্ররস-পিপাসুদের মনে এক নব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিবে। আগামী সপ্তাহে "দেবী ফুল্লরা" সম্বন্ধে আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হইবে।

হিটলারের হুমকি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিস্থিতি

মিঃ সচী শীল

Hindusthan Review-র ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম :

"If Hitler shoves beyond his frontiers, Czechoslovakia will have to bear the first shock of German thrust, as was the case with Belgium in 1914. But Czechoslovakia is fortified by alliances with France and Russia, apart from her being a member of the Little Entente. The German military circles do not believe in a quick coup in Czechoslovakia, which they can grab only by a full-dress war, and even then, not without inviting a general conflagration."

তিন সপ্তাহ আগে Sudeten German-দের ক্ষেপিয়ে দিয়ে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর প্রচণ্ড রকমের ঘা দেবার মতলব করেছিলেন। কিন্তু হিটলার অষ্ট্রিয়াতে যেমন walk-over পেয়েছেন, এক্ষেত্রে কি আর তা সম্ভব হল 'না', হতে পারে?

অষ্ট্রিয়া গ্রাস করবার পরই হিটলারের সেরা চেলা Gen Goering চেকদের চোখ রাঙিয়েছিলেন। এর উত্তরে ফ্রান্স ও রাশিয়া চেকদের অভয় দিল। হিটলার এর পর কী করতে পারেন? হিটলারের পক্ষে এক্ষেত্রে যে জবরদস্ত নীতি চালান বিশেষ সম্ভব হবে না, তা অনেকে বুঝতে পেরেছিলেন।

Hindusthan Reviewর এপ্রিল সংখ্যায় "The Gathering world crisis and the Role of Britain"—শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করে বলেছিলাম :

"Thanks to France and Russia they have realised the gravity of the situation, and lest it should be too late, they have rushed assurances to the Czechs of their full military support in the event of Nazi aggression. Hitler must now think ten times before pouncing upon Czechoslovakia, inspite of Britain's cowardly policy of isolation. His recent coup was a success. The next, if and when launched, may prove to be his undoing."

Gen. von Fritsch ছিলেন জার্ম্মানীর Chief of Staff, তিনি নাকি খুব বিবেচক লোক ছিলেন, আর হিটলারকে তিনি বুঝে সুঝে কাজ করতে পরামর্শ দিতেন। এত moderate policy হিটলারের সইল না। তাই জেনারেলের হল পদচ্যুতি। ঠিক তার

পরেই হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনী চালিয়ে দিলেন অষ্ট্রিয়ার সীমান্তের ওপর দিয়ে। অষ্ট্রিয়াকে ত বিনা বাধায় এইভাবে পাওয়া গেল। এই শক্ত নীতির সাফল্যে হিটলারের আনন্দ আর ধরে না! Gen. Fritschকে তাড়ান সার্থক হয়েছিল বটে!

তারপর এল চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার। হিটলারের সেই নীতি কি খাটলো? কেন খাটলো না তার উত্তর আগে দিয়েছি। এইবার "New York Times"এর প্রেগ (Prague) সংবাদদাতা কি বলছেন শুনুন—

"Indications that Gen. Von Fritsch, ousted chief of Staff, has been received back in favour in Berlin suggest that the justice of his frequent warnings that Germany was not in a position to face a major was, has been recognised.

চেকোশ্লোভাকিয়া যে বড় কঠিন ঠাঁই একথা বুঝতে হিটলারের এত দেরী হল কেন তা বুঝতে পারি না। নেহাৎ না ঠেকলে হিটলার শিখতে রাজী নন—এ বেশ বোঝা যাচ্ছে এখন। হিটলার কি ভেবেছিলেন যে, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেবকে হাত করে ফ্রান্সের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেন, যাতে ফ্রান্সের প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়ে পড়ে?

খুব সুখের কথা যে ফ্রান্স টলেনি। এই দৃঢ় নীতিই অনেকটা সঙ্কট উপশমের জন্য দায়ী। অবশ্য বৃটিশমন্ত্রীরা কম চেষ্টা করেন নি যাতে ফ্রান্স এ নিয়ে না মাথা ঘামায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বার্লিন ও প্রেগে (Prague) খুব জোর diplomatic effort চালালেন। তবু কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে definite commitment করতে বৃটিশ রাজী হয় নি।

আমার মনে হয়, বৃটিশ যখন স্বার্থের দায়ে পড়ে diplomatic action নিয়েছিল, তখন আরও একটু সাহস করে জার্ম্মানীকে চোখ রাঙিয়ে দেওয়াই ছিল তার স্বার্থের পক্ষে খুব অনুকূল। যুদ্ধ বন্ধ করাই যখন বৃটিশের উদ্দেশ্য, তখন উচিত হচ্ছে firm-stand নেওয়া। ১৯১৪ সালের সামান্য একটা ভুল এবং তার ভীষণ পরিণাম থেকেও কি বৃটিশের কোন শিক্ষা হয় নি। বেলজিয়ামকে সাহায্যের ব্যাপারে Sir Edward Grey যদি বিশ্রী ভাবে ঘোনাঘোনা না করতেন, যদি তিনি জার্ম্মানীকে তখন স্পষ্ট জানিয়ে দিতেন যে বৃটিশ বেলজিয়ামের জন্য অস্ত্র ধরতেও প্রস্তুত, তাহলে যুদ্ধটা তখন নাও ঘটতে পারতো। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে ইংরেজ যখন যুদ্ধ ঘোষণা করলো, জার্ম্মানী ত তখন হকচকিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলো—এমন যদি আগে জানতাম তবে কি আর এ কাণ্ড করতাম। দোষ অবশ্য দু'পক্ষেরই। জার্ম্মানীর অত সামরিক প্রতাপ, অত thoroughness—এ সব থাকা সত্বেও vital calculation করতে গিয়ে সেখানে ছোট্ট একটি মারাত্মক ভুল করে বসেছিল। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের পেছনে ছিল-England's vacillation and Germany's miscalculation. ১৯৩৮ সালে ইংরেজ আবার সেই ভুল করছে। যেখানে সময় থাকতে চোখ রাঙালে কাজ হবে, সেখানে ইতস্ততঃ করার ফলে যুদ্ধ বেধে গেলে তারপর যুদ্ধে নামলে আর শান্তি রইল কোথায়? আশঙ্কা হয়, জার্ম্মাণীও ১৯১৪ সালের সেই fatal miscalculation করে ফেলতে পারে। "Garmany in the International Arena"—শীর্ষক প্রবন্ধে তাই আমি বলেছিলাম—

"Hitler should find nothing encouraging for himself in the vacillaticres of British Policy. It will undoubtedly swing sharply in favour of the victims of Fascist aggression, and the Supreme Moment will come when the Maginot Line is violated."

সম্প্রতি যে মহাসঙ্কট ঘনিয়ে উঠেছিল, তাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার শাসনকর্ত্তারা খুব দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুদেতেন জার্ম্মাণদের দাবীর যথার্থতা সম্বন্ধে বিবেচনা করতে তাঁরা যেমন উৎসুক, আবার দেশের স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বজায় রাখতেও তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চেক গভর্ণমেণ্ট যে Minorities statute draft করছেন, আশা করি তাতে তাঁদের সঙ্কল্প ও দূরদর্শিতার ছাপ থাকবে। দূরদর্শিতা বলছি এই জন্য যে, এখন সাময়িকভাবে শান্তি কিনতে গিয়ে তাঁরা যেন সুদেতেন জার্ম্মাণদের অতিরিক্ত কিছু না দিয়ে বসেন। তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। জার্ম্মাণদের মধ্যে যে সব Socialist ও Democratরা আছেন তাদের নিরাপত্তার কথাও মনে রাখতে হবে। সুখের কথা এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট Dr. Benes খুব বিচক্ষণ রাজনীতিক।

একটা কথা বলা হয়নি। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ না বাধতে দেওয়ায় বৃটিশের স্বার্থটা কি? চেম্বারলেন সাহেব মোটেই চাননা যে এই রাষ্ট্রটিকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ ঘনিয়ে উঠুক। কারণ এরূপ যুদ্ধে ইংরেজ, ফরাসী ও সোভিয়েট—এই তিন শক্তির একত্র সমাবেশ হতে বাধ্য। Franco-Soviet Pact এখনো অটুট রয়েছে। একমাত্র London-Paris Moscow alliance-ই Fascismকে খর্ব্ব করতে পারে। ফ্যাসিজম ধ্বংস হলে যা আসবে তা ইংরেজ ধনিকসম্প্রদায়ের চক্ষুশূল। তাই এই যুদ্ধকে এত ভয়।

(সি, বি)

কলিকাতা ফুটবল লীগ

গত সোমবার ১৩ই জুন প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের যে তিনটি খেলা হয়েছিল তার মধ্যে ই-বি আর দল ব্যারাকপুরের ক্যামেরো-নিয়ানস্ সৈন্য দলকে ৯-২ গোলে পরাজিত করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এবছর প্রথম ডিভিসনের কোন খেলায় এত বেশী গোল প্রদান সম্ভব হয় নি।

ক্যালকাটা ও কে ও এস বি দলের খেলায় প্রথমোক্ত দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে। ক্যালকাটা দলের নিয়মিত গোল-রক্ষক আর্মষ্ট্রং এই দিনে আক্রমণভাগে খেলেন এবং তিনিই বিজয়সূচক গোলটি করেন।

আর একটি খেলাতে এরিয়ান্স দল তাদের বিপক্ষ পুলিশ দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে দুটি মূল্যবান পয়েন্ট লাভ করেছে।

মঙ্গলবারে দুটি খেলার মধ্যে একটিতে লীগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান্ স্পোর্টিং দল গত বছরের রাণার্স আপ ভবানীপুর দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছে। ভবানীপুর দল যদিও কয়েকটি অব্যর্থ গোল প্রদানের সুযোগ কার্য্যে পরিণত করতে পারেনি, তাহলেও তাদের খেলা অতিশয় নৈরাশ্যজনক হয়েছিল। তাদের এই পরাজয়ের জন্য গোলরক্ষক আর বসু অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া আক্রমণ-ভাগের খেলোয়াড়েরা যে ভাল খেলতে পারেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। মহমেডান্ দলের সাবু এবং মজিদ প্রথমার্দ্ধে একটি করে গোল করার পর দ্বিতীয়ার্দ্ধে নুরমহম্মদ (ছোট) আর একটি গোল প্রদান করেন।

অপর খেলাটিতে কাষ্টমস্ দল একটিমাত্র গোল প্রদান করে মোহনবাগান দলকে পরাজিত করে। বিজয়ীদলের সিদ্দান্ এই গোলটি প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। মোহনবাগান দলে এই দিনে নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই অনুপস্থিত থাকায় তাদের খেলা সন্তোষজনক হয় নি।

বুধবার প্রথম ডিভিসন্ লীগের তিনটি খেলা হয়। তার মধ্যে দুটি খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ও এরিয়ান্স দল যথাক্রমে কে, ও, এস, বি এবং ক্যামেরোনিয়ান্স সৈন্য দল দুটিকে ২-০ ও ২-১ গোলে পরাজিত করে লীগ টেবলে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করেছে। অনেকদিন বাদে রামানা ইষ্টবেঙ্গল দলের পক্ষে খেলেন।

তৃতীয় খেলাটিতে ই, বি, আর—পুলিশ দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করে। রেল দলের পাখী সেন্ একাই দুটি গোল করেন।

বৃহস্পতিবার বৃষ্টির মধ্যে ক্যালকাটা ও কালীঘাট দলের একমাত্র প্রথম ডিভিসন্ লীগের খেলাটি হয়। উভয় পক্ষ একটি করে গোল প্রদান করায় খেলাটি অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। মান্‌রো ও জোসেফ যথাক্রমে ক্যালকাটা ও কালীঘাট দলের পক্ষে একটি করে গোল করেন। কালীঘাট দল এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খেলেও অমীমাংসীতভাবে খেলা শেষ করে নিজেদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

শুক্রবারের তিনটি খেলার মধ্যে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মহমেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রথম ডিভিসনে নবাগত পুলিশ দলের নিকট দ্বিতীয়বার শোচনীয়ভাবে পরাজয় সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ দল এই খেলাটিতে ৫-১ গোলে জয়লাভ করেছে। প্রথম ডিভিসন্ লীগের ইতিহাসে মহমেডান্ দলের একই দলের কাছে দুবার এবং এরূপ শোচনীয় পরাজয় এর আগে আর হয় নি।

মোহনবাগান্ ও কে ও এস বি দলের রিটার্ণ ম্যাচটিতে প্রথমোক্ত দলটী ২-০ গোলে জয়লাভ করেছে। মোহনবাগান্ দলের জয়লাভে সৈন্য দল প্রথম খেলাটিতে যে অখেলোয়াড়জনিত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর হয়েছে।

এরিয়ান্স ও ই বি আর দলের খেলাটিতে কোন গোল না হওয়ায় অমিমাংসীত ভাবে শেষ হয়েছে। গত শনিবার পর্য্যন্ত প্রথম ডিভিসন লীগ টেবল্ দেওয়া হল।

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিঃ	পয়েণ্ট
ই বি আর	১৫	৬	৫	৪	২২	১৫	১৭
মহমেডান স্পোর্টিং	১৪	৭	৩	৪	২৪	১৮	১৭
মোহনবাগান	১৪	৪	৮	২	১৩	৯	১৬
কাষ্টমস	১৪	৫	৬	৩	১৪	১২	১৬
ইষ্টবেঙ্গল	১৩	৫	৫	৩	১৩	৯	১৫
পুলিশ	১৪	৬	২	৬	২৪	১৯	১৪
কালীঘাট	১৪	৩	৮	৩	১৪	১৩	১৪
এরিয়ান্স	১৪	৫	৪	৫	১৩	১৮	১৪
ক্যালকাটা	১৪	৪	৫	৫	৮	১৩	১৩
ক্যামেরোনিয়ান্স	১৬	৩	৬	৭	১৫	২৪	১২
কে ও এস বি	১৩	৪	৩	৬	১২	১৫	১১
ভবানীপুর	১৩	৩	৩	৭	১৪	২০	৯

আন্তর্জ্জাতিক খেলা

গত শনিবার ইউরোপীয়ান্ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের বাৎসরিক আন্তর্জ্জাতিক

ফুটবল ম্যাচটি খেলা হয়ে গেছে। গত ৪ঠা জুন এই খেলাটি হবার ঠিক্ থাকলেও বার্ষা দলের আগমনের জন্ত গত ১৮ই জুন এই খেলাটি হবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। খেলাটিতে পূর্ব্বের ন্যায় দর্শক সমাগম না হওয়ায় ইহার জনপ্রিয়তা যে অনেকাংশে কমে গেছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য ব্যাণ্ডবাদ্য, পতাকা উড়ান ইত্যাদি পূর্ব্বের জাকজমক্ আদৌ খর্ব্ব হয় নি। গত বৎসরের বিজয়ী ভারতীয় দল এ বৎসর ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছে। ইউরোপীয়ান দলের হেণ্ডারসন্ দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ সময়ে একটি মাত্র গোল প্রদান করে নিজ দলকে জয়ী হবার যোগ্যতা প্রদান করেন। খেলাটি আদৌ উচ্চাঙ্গের হয় নি। প্রথমার্দ্ধে প্রতিপক্ষ দল দুটি সমভাবে আক্রমন করায় সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অধিকাংশ সময় ইউরোপীয়ান দলকে আক্রমন করতে দেখা যায়। প্রথমার্দ্ধে ভারতীয় দল অনেকগুলি গোল প্রদানের নিশ্চিত সুযোগ পেয়েও কার্য্যে পরিণত করতে পারে নি। বিজয়ী দলের গোলরক্ষক এডেন, কার্ভে, ম্যাকুয়েন্, জেনামস্ডেন্, ড্রিসকল্ ও ফিগুলের খেলা দর্শনযোগ্য হয়েছিল। বিজিত দলের রক্ষণ বিভাগে ওসমান্, পি দাস গুপ্ত, বি সেন ও জন্ এবং আক্রমন ভাগে কে ভট্টাচার্য্য ও নির্ম্মল ঘোষ ভাল খেলেন।

ইউরোপীয়ান দল :—এডেন (ক্যালকাটা) গ্রসম্যান (ক্যালকাটা) এবং ই কার্ভে (পুলিশ); টেলর, ক্যাপ্টেন (ক্যালকাটা), ম্যাকুয়েন্ (ক্যামেরোনিয়ান্স) হেণ্ডারসন্ (কে ও এস বি), বিয়ার্ড (ক্যালকাটা) এবং ফিগুলে (পুলিশ)

ভারতীয় দল :—ওসমান্ (মহমেডান); এস দত্ত (মোহনবাগান) এবং পি দাস গুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল); জন্ (কালীঘাট), বি সেন (ইষ্টবেঙ্গল) এবং ভৌমিক (কাষ্টমস্); এন ঘোষ (মোহনবাগান), কে ভট্টাচার্য্য (কাষ্টমস) ক্যাপ্টেন মুর্গেস্ (ইষ্টবেঙ্গল), সাবু (মহমেডান) এবং কে প্রসাদ (এরিয়ান্স)।

রেফারী—বি ডি চ্যাটার্জ্জি।

লাইন্সম্যানদ্বয় :—এ রায় এবং জিমুর।

ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ—

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার এবারকার প্রথম টেষ্ট ম্যাচটি গত ১০ই এবং ১১ই জুন খেলা হবার পর ১২ই জুন রবিবার থাকার জন্য খেলাটি বন্ধ থাকে। সোমবার ১৩ই জুন পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। অষ্ট্রেলিয়া দল টেষ্ট খেলাটির আগের প্রায় সব কয়টি ম্যাচেই বিপক্ষ দলকে ফলো অন্ করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এই প্রথম টেষ্ট ম্যাচটিতে ইংলণ্ড দল প্রথমে ব্যাট্ করে অপ্রত্যাশিতভাবে ৮ উইকেটে ৬৫৮ রান করে ডিক্লেয়ার করায় অষ্ট্রেলিয়া দল 'ফলো-অনের' অসম্মান থেকে অব্যাহতি পায় নি। আগন্তুক দলের এস জে ম্যাকেব অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে ২৩৫ মিনিটে ২৩২ রান করা সত্ত্বেও 'ফলো-অন্' রক্ষা করতে পারেন নি। ইহাই ম্যাকেবের টেষ্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রান। ইতিপূর্ব্বে ১৯৩২ সালে সিড্নীতে টেষ্ট খেলায় তিনি ১৮৭ রান করে নট আউট ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়াদল প্রথম ইনিংসে মোট ৪১১ রান করায় বিপক্ষ দল অপেক্ষা ২৪৭ রান্ পশ্চাতে থাকে। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া দল নিজেদের সুনাম অনুযায়ী কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং করে খেলাটি অমীমাংসীত ভাবে শেষ করেছে। পরাজয়ের উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়ে খেলা সত্বেও অমীমাংসীত ভাবে খেলা শেষ করে অষ্ট্রেলিয়া দল ক্রিকেট জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই গৌরবের জন্ত অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্যাপ্টেন ডি জি ব্রাডম্যান্ এবং ডবলিউ এ ব্রাউন্ অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। এই দুইজন খেলোয়ারের জন্তই যে খেলাটির এইরূপ পরিণতি হয়েছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাডম্যান্ ১৪৪ রান করে নট আউট থাকেন এবং ব্রাউন নিজস্ব ১৩৩ রান করেন। অষ্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ৬ উইকেটে ৪২৭ রান করবার পর খেলাটি শেষ হয়। এই টেষ্ট খেলাটিতে মোট নয়টি সেঞ্চুরি হয়। তার মধ্যে ইংল্যাণ্ড দলের হাটন্, বার্নেট্ কম্‌টন প্রত্যেকে একটি ও পেণ্টার দুটি এবং অষ্ট্রেলিয়াদলের ম্যাকেব দুটি; ব্রাড্ম্যান একটি ও ব্রাউন একটি সেঞ্চুরী করেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের ওরিলী ও ফ্লিটউড্ স্মিথ এবং ইংল্যাণ্ড দলের রাইট্ ও ভেরিটীর বোলিং উল্লেখ যোগ্য হয়েছিল। নিম্নে খেলাটির ফলাফল দেওয়া হল।

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস

হাটন এল বি ডব্লিউ ব

ফ্লিটউড্স্মিথ	১০০
বার্নেট ব ম্যাককর্ম্মিক	১২৬
এডরিচ ব ওরিলী	৫

হ্যামণ্ড ব ওরিলী	২৬
পেণ্টার নট আউট	২১৬
কম্পটন ক ব্যাডকক ব ফ্লিটউডস্মিথ	১০২
এমস ব ফ্লিটউডস্মিথ	৪৬
ভেরিটী ব ফ্লিটউডস্মিথ	৩
লিনফিল্ড এল বি ডব্লিউ ব ওরিলী	৬
রাইট নট আউট	১
অতিরিক্ত	২৭
মোট (৮ উই:)	৬৫৮

বোলিং :—

	ও	মে	রা	উই
ম্যাককর্মিক	৩২	৪	১০৮	১
ওরিলী	৫৬	১১	১৬৪	৩
ম্যাককেব	২১	৫	৬৪	০
ফ্লিটউডস্মিথ	৪৯	৯	১৫৩	৪
ওয়ার্ড	৩০	২	১৪২	০

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস

ফিঙ্গলটন ব রাইট	৯
ব্রাউন ক এমস ব ফার্ণেস	৪৮
ব্র্যাডম্যান ক এমস ব লিনফিল্ড	৫১
ম্যাককেব ক কম্পটন ব ভেরিটী	৩২
ওয়ার্ড ব ফার্ণেস	২
হ্যাসেট ক হ্যামণ্ড ব রাইট	১
ব্যাডকক ব রাইট	৯
বার্ণেট ক রাইট ব ফার্ণেস	২
ওরিলী ক পেণ্টার ব ফার্ণেস	৯
ম্যাককর্মিক ব রাইট	২
ফ্লিটউডস্মিথ নট আউট	
অতিরিক্ত	২১
মোট	৪১১

বোলিং :—

	ও	মে	রা	উই
ফার্ণেস	৩৭	১১	১০৬	৪
হ্যামণ্ড	১৯	৭	৪৪	০
লিনফিল্ড	২৮	৮	৫১	১
রাইট	৩৯	৬	১৫৩	৪
ভেরিটী	৭৩	০	৩৬	১

অষ্ট্রেলিয়া

দ্বিতীয় ইনিংস

ফিঙ্গলটন ক হ্যামণ্ড ব এডরিচ	৪০
ব্রাউন ক পেণ্টার ব ভেরিটী	১৩৩
ব্র্যাডম্যান নট আউট	১৪৪
ম্যাককেব ক হ্যামণ্ড ব ভেরিটী	৩৯
হ্যাসেট ক কম্পটন ব ভেরিটী	২
ব্যাডকক ব রাইট	৫
বার্ণেট এল বি ডবলিউ ব লিনফিল্ড	৩১
ওয়ার্ড নট আউট	৭
অতিরিক্ত	১৬
মোট (৬ উই:)	৪২৭

	ও	মে	রা	উই
ফার্ণেস	২৪	২	৭৮	০
হ্যামণ্ড	১২	৬	১৫	০
রাইট	৩৭	৮	৮৫	১
লিনফিল্ড	৩৫	৮	৭২	১
ভেরিটী	৬২	২৭	১০২	৩
এডরিচ	১৩	২	৩৯	১
বার্ণেট	১	০	১০	০

এই খেলাটিতে আর একটি নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটি দলের টেষ্ট খেলায় এর আগে হবস্ বারোটি ১২ সেঞ্চুরী করে রেকর্ড করে ছিলেন। কিন্তু এই খেলাটিতে সেঞ্চুরী করার পর ব্র্যাড্ম্যান মোট তেরোটি (১৩) সেঞ্চুরী করে হবসের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

বোম্বাইয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের স্বদেশে ফেরার পথে বোম্বাইয়ের 'ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ার' উদ্যোগে ব্র্যাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে একটি ম্যাচ খেলার প্রচেষ্টা হচ্ছে। সম্ভবতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত হবে। .

রাজপুতানা ক্রিকেট দল

রাজপুতানা ক্রিকেট দল আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু সম্ভবতঃ অবশিষ্ট খেলাগুলি বাতিল করে খুব শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হবেন।

অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে

আই, এফ, এ দল

অষ্ট্রেলিয়া ফুটবল এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রাপ্ত শেষ সংবাদ অনুযায়ী আই, এফ, এ দলের অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণ কার্য্যে পরিণত হবে বলে জানা গিয়েছে।

অমর সিং ও অমরনাথ

ভারতীয় ক্রিকেটারদ্বয় অমর সিং ও অমর নাথ বর্ত্তমানে লণ্ডনের 'কলনি' ক্লাব নেলসন্ ক্লাবের পক্ষ হয়ে ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন।

অমলিন

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

এযে শুধুই কাঁটার মত বিধ্বে আমার প্রাণে
একটু বাকী রইল শুধু তোমার সকল দানে
চিরদিনের আসা যাওয়া,
সকল দেওয়া সকল পাওয়া,
সরার মাঝেই অসীম ফাঁকা ক্ষণিক ব্যবধানে ;
তুচ্ছ যত পাওয়ার গরব মিথ্যা অভিমানে।
এযে শুধু অশ্রুতে মোর ভ'রবে নয়ন দুটী
নিখুঁৎ তোমার সকল কাজে একটুখানি ত্রুটী।
তোমার দানের একটু নিয়া
পূর্ণ আমার বিরাট হিয়া
একটু তোমার অবহেলায় ব্যথায় কেঁপে উঠি
তারই ছোঁয়ায় অস্ফুট এ হৃদয় ওঠে ফুটি।
এযে আমার স্মৃতির মাঝে ক্ষণিক মরীচিকা ;
তোমার গ্লানি আমার প্রাণে রক্ত দিয়া লিখা।
তোমার ত্রুটি, তোমার বাকী—
আমার মাঝেই লুকিয়ে রাখি ;
আমার মাঝেই থাকুক গোপন্ দহন-অগ্নিশিখা
তোমার মাঝে উঠুক ফুটে মোহন-মুকুলিকা।

"চোখের বালি"-র একটী বিশিষ্ট দৃশ্য এতে দেখা যাচ্ছে সুপ্রভা মুখার্জ্জি—বিনোদিনী, ইন্দিরা রায়—আশা, হরেন মুখার্জ্জি—মহেন্দ্র ও ছবি বিশ্বাসকে—বিহারীরূপে। সতু সেন ছবিখানি পরিচালনা করছেন।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৫ই আষাঢ় ১৩৪৫, ৩০শে জুন ১৯৩৮ } ষট্‌বিংশ সংখ্যা

আর কত দিন ?

বিদায়ী শিক্ষা-সচীব শ্রীযুক্ত শৈলেন ঘোষ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে প্রস্তাব কর্পোরেশনের গত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী উত্থাপন করেন মিঃ নিশীথ সেন প্রভৃতি কাউনসিলারবৃন্দের বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য হয়। আমরা মিঃ শৈলেন ঘোষের পুনর্নিয়োগ বা অন্য কোন প্রকার করুণা-প্রদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও স্বয়ং রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশের বিরোধিতা কোন মতেই সমর্থন করি না। রাজনীতিতে বা অনুরূপ কোন সংঙ্ঘবদ্ধ-কার্য্যে ব্যক্তিগত মতামতের কোন স্থান নাই। ব্যক্তিগত মতামতের প্রখরতায় গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলতা নষ্ট হয়। গোষ্ঠীগত বা দলগত শৃঙ্খলাকে চূর্ণ করিয়া ব্যক্তিগত মতামতের প্রখরতার প্রসার হইলে কঠিন ও নির্ম্মম হস্তে তাহাকে নিষ্পেষিত করা উচিত—তাহা না হইলে রাষ্ট্র-পরিচালনায় বা দল-নিয়ন্ত্রণে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়।

মিঃ নিশীথচন্দ্র সেন প্রভৃতি বর্ণচোরা কাউন্সিলারবৃন্দের ঔদ্ধত সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কাসানোভা যাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ও প্রমোদকেন্দ্র তাঁহাকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যে ভুল করিয়াছেন তাহার ফল তিক্তভাবে প্রকট হইতেছে। মিঃ সেন সহকারী-দলপতি হইয়াও দলপতি ও রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া যে ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার সমুচিত শিক্ষা দেওয়া একান্ত ও অবশ্য প্রয়োজনীয়। মিঃ সেনের এই আচরণ সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

যাঁহারা রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ, কবিরাজ সত্যব্রত সেন ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সাধুখাঁর নাম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। 'গদাই'-বাবু ও বিপিনবাবুর দলগত নিষ্ঠা সর্ব্বজন-বিদিত সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে রাষ্ট্রপতির আবেদন সত্ত্বেও বিপক্ষে ভোট দেওয়া সমীচিন হয় নাই ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। 'গদাই'-বাবু ও বিপিনবাবু আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু সুতরাং তাঁহাদের এই আচরণে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি।

রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব ও কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের পদ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্পে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ধীর ভাবে বিচার করিয়া দেখা

উচিত। নেতার নির্দ্দেশে যাঁহারা ব্যক্তিগত মতামতকে দমন বা সংযত করিতে পারেন না তাঁহাদের পক্ষে রাজনীতিতে যোগদান করা উচিত নহে। রাজনীতি বসন ও বিলাসের ন্যায় ব্যক্তিগত অভিরুচিতে পর্য্যবসিত হইলে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইবে তাহার পরিণতি কোথায় বুদ্ধিমান কাউনসিলার-বৃন্দ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি ?

বর্ত্তমানে যাঁহারা কর্পোরেশনে কাউনসিলার-রূপে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাগ্যান্বেষী, সতত চঞ্চল, অস্থিরমতাবলম্বী ও ব্যক্তিগতপ্রাধান্য-প্রয়াসী। তাঁহাদিগকে সংযত করিবার শক্তি কি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির নাই ? যে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-ভার পরিচালনা করিতেছেন ও মন্ত্রীবর্গের কার্য্যাবলী কঠোর শাসনে সংযত করিতেছেন সেই কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ কি এতই হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেসী কাউনসিলারবৃন্দকে সায়েস্তা করিতে অক্ষম !!

বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে কলিকাতা কর্পোরেশনে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সুভাষচন্দ্রের উপর সর্ব্বময়কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। যে কঠোর শাসন প্রয়োগ করিলে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে পারে অদ্যাবধি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সেরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। আর কতদিন কর্পোরেশনে কংগ্রেসের নামে ব্যক্তিগত ষড়যন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ?

:(×):

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাইব্যুনালের এ্যাসেসর

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাইবুন্যালে কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে যাহাতে যোগ্য ব্যক্তি এ্যাসেসরের পদে নিয়োজিত হন তাহা সর্ব্বতোভাবে দেখা কর্ত্তব্য। ট্রাই-ব্যুনালে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এবং বলা বাহুল্য যাঁহাদের সততা পরীক্ষিত ও সর্ব্ব-সন্দেহাতীত কেবল সেইরূপ ব্যক্তিকেই এ স্থলে পাঠান যুক্তিযুক্ত।

পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে সেই জন্য যে উমেদারেরা শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য "প্রতি-বারে নূতন লোক হওয়া উচিত" বলিয়া বেড়াইতেছেন আমরা তাঁহাদের সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারি না। এ নীতি অনুসরণ করিলে কোন কাউন্সিলারেরই দ্বিতীয় বার কর্পোরেশনে প্রবেশ করা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এল্, এ মহাশয়ের মত দেশনেতার পক্ষে এই কার্য্যের জন্য চেষ্টা করা মোটেই শোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায় মহাশয় এই বৃদ্ধবয়সে গত চারি বৎসর যাবৎ কাহার প্ররোচনায় পড়িয়া এই কার্য্যের জন্য 'try' দিয়া আসিতেছেন ? আমাদের সংবাদ সঠিক হইলে মনে হয় গত বারে Congress Municipal Association-এর অধিবেশনে ভোট গ্রহণ কালে তিনি কেবল একটী মাত্র ভোট পাইয়াছিলেন !

শ্রীযুক্ত অমৃত লাল চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তিনি তাঁহার এ্যাসেসারির কার্য্যকালে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট-এর সহিত মতের অনৈক্য ঘটিলে স্বীয় রায় পৃথকভাবে দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

১৯৩৪ সালের কর্পোরেশনের ইতিহাস স্মরণ করিলে অমৃতবাবুকে যে তাঁহার পূর্ব্বকার্য্যে বহাল করাই কর্ত্তব্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এই বৎসরের "রায় পার্টি" (পূর্ব্বে যাহাকে বোস-পার্টি বলা হইত) ইউরোপিয়ান ও গভর্ণমেণ্ট মনোনীত দলের সহিত কতকগুলি গোপন সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া মিঃ নলিনারঞ্জন সরকার মহাশয়কে মেয়রের উচ্চাসনে বসাইয়াছিলেন। তৎকালীন Congress Municipal Association-এর Secretary মিঃ নলিন চন্দ্র পাল ভালরূপেই জানেন কিরূপে অমৃত বাবুকে 'Victim of a clique' হইতে হইয়াছিল। ন্যায় বিচারের সহায়তা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় সেই বৎসরের assessorship সংক্রান্ত সমুদয় গুপ্ত-ব্যাপার রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে বলিবেন কি ?

ইংলণ্ডের রাজনীতি ও বৃটিশ লেবার পার্টি
ইতিহাসের সাবধান-বাণী
সচী শীল

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে জার্ম্মানীর চ্যান্সেলর Baron Von Papen কী রকম সাহস ও ধূর্ত্ততা দেখিয়ে Prussian Republic এর উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন, তা রাজনৈতিক মহলের অনেকেরই এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রবাদীদের বেশ মনে আছে নিশ্চয়ই।

Carl Severing তখন Prussia-র Social-Democratic Minister of the Interior. Von Papen প্রথমতঃ ডিক্টেটরী মেজাজে হুকুম দিলেন যে প্রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট Braun সাহেব ও Severing সাহেবকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে হবে। Severing প্রথমে যে বাধা দিয়েছিলেন সে কেবল কথায়; তিনি প্যাপেনকে বলেছিলেন :

"I consider your action a breach of the law and of the constitution. I shall yield only to violence."

ধূর্ত্ত কূটনৈতিক Von Papen উত্তরে বলেছিলেন :

"Oh, if you are looking for a chance to save your face, Herr Severing, no doubt we can come to an agreement about tne amount of violence to be employed."

তারপর দু'একদিনের মধ্যেই প্যাপেনের জবরদস্ত নীতিরই জয় হল। Social-Democrat-রা বিনা বাধায় তাদের অমন সাধের গণতন্ত্র—যা লিপিবদ্ধ হয়েছিল Weimar Constitution-এ—তাকে বিসর্জ্জন দিল। ১৯২০ সালে যখন এই শিশু-গণতন্ত্রের বিপদ দেখা দেয় তখন এরাই সেই নবজাত শিশুকে বাঁচিয়েছিলেন Genearl Strike call করে। ১২ বছর বাদে আবার সেই বিপদ যখন দেখা দিল, তখন তাঁদের উচিত ছিল পূর্ব্বের মত দেশময় General Strike সৃষ্টি করে প্যাপেনের জবরদস্ত নীতিকে বাধা দান করা। তা তাঁরা করলেন না। সামান্য জুলুমের কাছে অনায়াসেই তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। ১৩ বছর ধরে ভোগ-করা স্বাধীনতা আর রইল না। এই ভীষণ ভুলের চরম পরিণতি আজকের ফ্যাসিজম।

এইভাবে ডিমক্রেসিকে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাশিয়ার কর্ত্তারা সগর্ব্বে ঘোষণা করলেন যে তাঁদের জন্যই একটা Civil War অর্থাৎ বড় রকমের রক্তপাতের হাত থেকে জার্ম্মানী বেঁচে গেল। কিন্তু এই যে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ, এর পেছনে একটা মস্ত বড় কারণ রয়েছে। জার্ম্মানীর সোস্যালিষ্টরা সবাই আশা করেছিল একটা General Strike-ই হবে প্যাপেনের নীতির যথার্থ উত্তর। কম্যুনিষ্টরাও চেয়েছিল এইভাবে প্যাপেন সাহেবের ধ্বংস নীতিকে প্রবল বাধা দিতে। কিন্তু Severing প্রমুখ Democrat-Socialist-রা এই উপায় অবলম্বন করলো না কেন ?

তাদের ভয় হয়েছিল পাছে কম্যুনিষ্টরা General Strike-এর সুযোগ নিয়ে সেই জনশক্তিকে রাশিয়ার মত বিপ্লবের পথে প্রবাহিত করে। এতে Social Democracy ভেঙে গিয়ে হয়ত ডিক্টেটরী কম্যুনিজম এসে পড়ার সম্ভাবনার কথা সোস্যাল ডিমক্র্যাটদের মতিভ্রম ঘটিয়েছিল। অন্যদিক দিয়ে বিপদ আসার সম্ভাবনাকেই তারা বড় করে দেখেছিল। নিজের কর্ত্তৃত্ব চলে গিয়ে কম্যুনিষ্ট কর্ত্তৃত্ব আসবে—এই ভয়ে তারা প্যাপেন সাহেবের হুমকির সামনে Mass Front-রূপ বিরাট বাধা সৃষ্টি করতে তাদের প্রবৃত্তি বা সাহস হল না। জার্ম্মানীতে ফ্যাসিজমের অগ্রগতির জন্য Social Democrat-রাই প্রধানতঃ দায়ী।

আজকের ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে যাদের নজর আছে তারা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে যে, ইংলণ্ডের লেবার পার্টি জার্ম্মানীর Social Democrat-দের মতই শোচনীয় ভুলের পথ ধরে চলেছে। ৬ বছর আগে জার্ম্মানীতে যা হয়ে গেছে আজ তারই Repetition হচ্ছে ইংলণ্ডে। ১৯৩৬ সালে ফ্রান্সের অবস্থা বড় সঙ্কটময় হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে Popular Front-এর সৃষ্টি হল, এবং তার ফলে Fascism-এর অগ্রগতি প্রচণ্ডভাবে বাধা পেয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

আজকে চেম্বারলেন গভর্ণমেণ্টের শোচনীয় রাজনীতি ইংলণ্ডে যে সঙ্কট এনেছে, সে সঙ্কট শুধু ইংরেজের নয়, সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎএর ওপর নির্ভর করছে। এই সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ইংলণ্ডের গণতন্ত্র ধ্বংস হবে, ফ্যাসিজমের প্রতিষ্ঠা হবে, সংবাদপত্র ও জনমত আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা হারাবে, ফ্রান্সের ওপর তার পরিপূর্ণ ছায়াপাত হবে, হিটলার মুসোলিনীর পৈশাচিক নীতি ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এক কথায় এখনকার সুন্দর সভ্যতার যুগ শেষ হয়ে গিয়ে Dark Age এসে পড়বে সর্ব্বত্র। এখনই শক্ত হতে না পারলে, অনেক

দিনের গড়ে-তোলা সাধের সভ্যতা ও স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ এই ভয়াবহ পরিণামের কথা ভাবছেন। তাই তাঁরা এনেছেন আন্দোলন। World Peace Campaign ঠিক এই রকমই একটা আন্দোলন নয় কি ?

চেম্বারলেন গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করবার কি উপায় ঠিক করেছেন লেবার পার্টির কর্ত্তারা ? আমাদের নজরে যতটা পড়ে তাতে মনে হয় আসল পথ ছেড়ে দিয়ে, ইতিহাসের Lesson ভুলে গিয়ে লেবার পার্টি একটা imbecile ও sincidal policy অনুসরণ করছে। কাজের মধ্যে করা হয়েছে—(১) Motion for Enquiry into Britain's state of air defence, এবং (২) A long, absurd Manifesto decrying the movement towards a British United Front.

এখন একটা Powerful People's Government-ই চেম্বারলেন গভর্ণমেণ্টের স্থান দখল করে দেশকে রক্ষা করতে পারে। একমাত্র United Front-ই ন্যাশান্যাল গভর্ণমেণ্টকে নষ্ট করে বৃটিশ ডিমক্রেসিকে বাঁচাতে পারে। ইংলণ্ডের যে চারদিক দিয়ে বিপদ ঘনিয়ে আসছে—এ কথা অবশ্য Labour Manifestoতে স্বীকার করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, পরবর্ত্তী ইলেকশনে লেবার পার্টি না জিতলে সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতি। কিন্তু একা লেবার পার্টি কী করতে পারে ? অতএব মনে হয়, লেবার পার্টি চায় যে, দেশ যদি বাঁচতে চায় ত লেবার পার্টির সাহায্যেই বাঁচুক ! United Front এসে যদি দেশকে রক্ষা করে ত তাতে লেবার পার্টির কি কৃতিত্ব রইল ! অর্থাৎ লেবার পার্টি Power-এ না আসার দরুণ যদি দেশ ভেসে যায় ত তাতে ক্ষতি কি ? সেই সর্ব্বনাশকে বরদাস্ত করবো, কিন্তু United Frontকে নয়—এই হচ্ছে এখন Labour mentality.

এই Psychology ভয়ের Psychology. United Front এলে এখনকার শ্রমিক কর্ত্তাদের প্রভুত্ব বজায় থাকবে না। নরম পন্থা চলে গিয়ে Extreme Socialism এসে পড়বে—এ বড় ভয়। জার্ম্মানীর Social Democratদের সঙ্গে বৃটেনের Labouriteদের এই দিক দিয়ে স্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এত বড় দেশের বিপদে যারা এইভাবে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য উঠে পড়ে লাগে, তারাও বলে 'দেশকে অবশ্যই বাঁচান দরকার।'

এদিকে চেম্বারলেন সাহেব ত এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেকে বেশ করে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন। Armament factoryগুলো full pressure-এ চলছে। ধনীদের পকেটে অজস্র টাকা যাচ্ছে। Conscription Act পাশ হবার আর বেশী দেরী নেই। আজ আবেদন জানান হচ্ছে for voluntary co-operation, কালকে এর বদলে চলবে চরম ফ্যাসিষ্ট নীতি। বৃটিশ ডিমক্রেসির ওপর frontal attack এখনো তেমন হয়নি। তবে দেশরক্ষার নামে যা করা হচ্ছে, তার ফলে ডিমক্রেসির আসল যা কিছু সব নষ্ট হয়ে যাবে। চেম্বারলেন সাহেব ও Clivedenএর ওস্তাদরা চান—A Fascist England will face Nazi Germany. ইংলণ্ডের পয়লা নম্বর ফ্যাসিষ্ট Sir Oswald Mosley সেদিন বলেছেন—"We shall reach the helm in five years." একেও টেক্কা দেবেন মিঃ চেম্বারলেন।

উত্তরা
সগৌরবে
দ্বিতীয় সপ্তাহ
NISIT
ভক্তি-রস-সিক্ত চিত্রোপহার

প্রবাসে শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ

শ্রীঅজিত সেন

অনেকেই জানেন, শ্রীযুত হরেন ঘোষ আজ নিজেকে উৎসর্গ করেছেন আর্টের বেদীতলে। তিনি বাঙলার ভাবুক প্রাণে নব নব ভাবের বন্যা এনে দিয়েছেন। দেশের মধ্যে রসের পিপাসাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন অধিক পরিমাণে। যে সব জিনিস ছিল অনেকের অগোচর, ভারতের কোথায় কোন রত্ন লুকিয়ে আছে, সেই সব তিনি এনে ধরে দিয়েছেন আমাদের চোখের সুমুখে, সারা ভারতবর্ষে। তাঁরই উদ্যোগে আমরা দেখেছি উদয়শঙ্কর ও তার মোহন সম্প্রদায়, রবীন্দ্রনাথের গীতি-উৎসব, শান্তি নিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণের অভিনয়, দক্ষিণ ভারতের অসাধারণ নৃত্য-পটীয়সী বালা সরস্বতী ও কেরালাকলামণ্ডলমের নৃত্য-বিশারদ শঙ্করম নাম্বুদ্রী, বাঙ্গালার কনকলতা, বোম্বাইয়ের এনাক্ষী রমা রাও, সেরাইকেল্লার "ছউ" নৃত্য প্রভৃতি আরও কত রসের উপাদান। শিল্পের চর্চ্চা এবং তার অধিকতর প্রচারের জন্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে এবং বহু পরিশ্রম করে "Four Arts" বার্ষিক প্রকাশ করেছেন।

কুমারী বাণী মজুমদার

তাঁর শিল্পী মন বুঝেছে যে, ভারতের শিল্প, শুধু ভারতের গণ্ডীর মধ্যে থাকলে চলবে না, তাই তিনি আজ বেরিয়ে পড়েছেন, বিজয় অভিযানে, সেরাইকেল্লার মহারাজার সৌজন্যে সেই প্রসিদ্ধ ছউ নৃত্যের দল নিয়ে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখীন হতে। এই ছউ নৃত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে শিল্পীদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভূমিকানুযায়ী নারী ও পুরুষের মুখোষ ব্যবহার করেন। তাই এই নৃত্যকে মূর্ত্ত করে তোলবার জন্যে, শ্রীযুত হরেন ঘোষের উদ্যোগে মাত্র একটী বাঙলার মেয়ে কুমারী বাণী মজুমদার এই সম্প্রদায়ে যোগদান করে সাগরপারে প্রভূত সুনাম অর্জ্জন করেছেন, তাঁর অপরূপ নৃত্য নৈপুণ্যের দ্বারা। এই সাম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান নৃত্য-শিল্পী কুমার শুভেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র তাঁদের অভিনব নৃত্য কৌশলে সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করে তুলেছেন। এদের সঙ্গে আরও দু'জন আশাতীত নাম করেছেন, এ'দের নৃত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। তাঁরা হচ্ছেন শ্রীপান্নালাল ঘোষ ও শ্রীজিতেন্দ্র কুমার দাশ; পান্নালালের সুমোহন বাঁশী ও জিতেন্দ্রের সেতার সমুদয় দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে তুলেছে।

সম্প্রতি রোমের ও নীশের কয়েকটী বিখ্যাত সংবাদপত্রে এদের প্রশস্তি ও সুখ্যাতি বেরিয়েছে।

অমর প্রেম

গত শনিবার ২৫শে জুন থেকে প্রভাত সিনেমায় ভাবনানীর অনবদ্য হিন্দি ছবি "হিমালয় কি বেটী" অথবা "অমর প্রেম" ছবিখানা দেখান হইতেছে। এনাক্ষী রমা রাওয়ের নাম চিত্রামোদীমাত্রের নিকটই সু-পরিচিত। অভিনয়ে, সঙ্গীতে এবং নৃত্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, এবং এই ছবিতেও তিনি দেবদাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়ে যে অভিনয়-নৈপুণ্য ও নৃত্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁর পূর্ব্ব গৌরব মোটেই ম্লান হয়নি। বরঞ্চ তাহা আরও বৃদ্ধিই পেয়েছে বলতে হবে। দেবদাসীর ভূমিকায় তিনি কয়েকটা নূতন নৃত্যের অভিনব পরিকল্পনা দেখিয়েছেন। নৃত্য হবে প্রাণময়—তালের সঙ্গে নৃত্য হয়ে উঠবে মূর্ত্ত। পার্ব্বতী নৃত্য, তাণ্ডব নৃত্য প্রভৃতি নৃত্যে তিনি তা যথেষ্ট নৈপুণ্য সহ ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবিখানার আর একটি প্রধান সম্পদ গান। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে মূর্চ্ছনা রয়েছে কোথাও তার এতটুকুও অসঙ্গতি ঘটে নাই। প্রোফেসর রামানন্দের নাম যুক্ত প্রদেশে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে খুবই পরিচিত। এ ছবিতেও তিনি যে কয়টি গান করেছেন তা বাস্তবিকই উপভোগ্য।

ছবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়েছে এর দৃশ্যাবলী, এরূপ দুরূহ ও বিপদসঙ্কুল স্থানের দৃশ্যাবলী যেভাবে তোলা হয়েছে তা ভাবলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। চির তুষারের দেশ, সর্ব্বদাই বরফ পড়ছে, তারও ১৬০০০ ফিট উচ্চের ছবি তোলা যে কিরূপ বিপজ্জনক তা স্বচক্ষে না দেখলে মোটেই বুঝা যায়না। তুষারতীর্থ "অমরনাথ" আপনি কলকাতায় বসেই দেখতে পাবেন। তাছাড়া বিরাট ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দৃশ্যে প্রত্যেকেই বিস্মিত হবে। মোটের উপর ছবিখানা না দেখলে আপনার অনেক কিছুই দেখবার বাকী রইল।

তামিল ছবি

প্রায় একমাস হতে চলল প্রভাত সিনেমায় প্রত্যেক রবিবার সকাল ১১টায় তামিল ও তেলেগু ছবি দেখান হচ্ছে। কর্ত্তৃপক্ষের এ বন্দোবস্ত যে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে তা প্রত্যেক রবিবারের জনসমাগমেই বুঝা যায়। তামিল ও তেলেগু ভাল ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত দ্বারা কলিকাতা-প্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয়গণের পক্ষেও এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসছে রবিবার তামিল সাহু টকিজের "মহাভারত" ছবি দেখান হবে।

খনা

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের ছবি "খনা"র প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। ছবিখানার গল্পাংশ এতই পরিচিত যে তার নাম করলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে সেই রাজা বিক্রমাদিত্য—তাঁর নবরত্নের অন্যতম রত্ন বরাহ, সেই সোণার লঙ্কা তারপর খনার বচন—এত জেগেই আছে। এই কল্পনা যাতে ছবিতেও ব্যাহত না হয় পরিচালক জ্যোতিষ বাড়ুজ্জে সেদিকেও খুবই খরদৃষ্টি রাখছেন।

কর্ম্মবীর

নিউ আলফ্রেড টকীতে সীতারাম সিনেটোনের "কর্ম্মবীর" এখনও চলিতেছে এবং দর্শকের ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানা আরও কিছুদিন এখানে বেশ চলবে।

শোক সংবাদ

রামবাগান দত্ত পরিবারের প্রবীণ এটর্ণি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত ৬৭ বৎসর বয়সে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে—অন্যতম মিঃ এস্, কে, দত্ত বার, এট্, ল, কলিকাতা হাইকোর্টের বার কাউনসিলের সেক্রেটারী। আমরা যোগেন্দ্রবাবুর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

রূপ-তরঙ্গ

(বিলাসী)

অহীন্দ্র চৌধুরী

দেবী ফুল্লরা

চিত্র-নির্ম্মাতা : হাজরা পিকচার্স
প্রয়োজক : রাজপতি হাজরা
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
প্রধান যন্ত্রশিল্পী : মধু শীল
আলোকচিত্র শিল্পী : বিভূতি লাহা
শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত
সুর-শিল্পী : ধীরেন বসু
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি
নৃত্য-পরিচালক : বিভূতি মজুমদার (এঃ)

ভূমিকায়—কালকেতু—অহীন্দ্র চৌধুরী, ফুল্লরা—শিশুবালা, ভাঁড়ু দত্ত—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, দেবী মহামায়া—সাবিত্রী, যুবরাজ—মোহন রায়, সুরমা—রাধারাণী, সর্দ্দারদ্বয়—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও দুর্গাপ্রসন্ন বসু, সুষমা—চিত্রা, প্রভৃতি।

পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং
প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা', শনিবার, ২৫শে জুন।

পৌরাণিক চিত্র হিসাবে "দেবী ফুল্লরা" হাজরা পিকচার্সের প্রথম ছবি হ'লেও বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিতার প্রাণে যে আনন্দের বন্যধারা প্রবাহিত কোরবে, সেদিন উত্তরায় ছবিখানা দেখতে গিয়ে দর্শকগণের পুলকোচ্ছ্বাসে তা' প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। "দেবী ফুল্লরা"-র কাহিনী কতদিন আগেকার তার সঠিক খবর এতাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নি। তবে এই কাহিনীটি বাঙলাদেশের সকলেরই কাছে বিশেষ পরিচিত। সেইজন্য এখানে তার পুনরুল্লেখ আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মঞ্চে "ফুল্লরা" নাটক অভিনীত হয়। পর্দ্দায় এই কাহিনীর তার সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য নেই। অনেকে হয়তো বল্‌বেন যে মঞ্চের নাটকখানিই চিত্রে রূপান্তরিত কোরলেই যুক্তিযুক্ত হ'ত। কিন্তু আমরা বলি, মঞ্চে যা' চলে পর্দ্দায় তা হয় অচল। এবং সেই বিবেচনা কোরেই কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্চের নাটক পরিত্যাগ কোরে "দেবী ফুল্লরা"-র যে কাহিনী চিত্রে গ্রথিত কোরেছেন তা'তে তাদের সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা কোরেছেন এবং এই দু' বিভাগেই তাঁর কাজ প্রশংসার যোগ্য। তিনি সাদাসিধে ভাবে এই কাজ সম্পাদন করায় ছবিখানির গতি কোথায়ও বাধা পায় নি।

আলোকচিত্রের কাজে বিভূতি লাহা বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিশেষতঃ অন্তর্দৃশ্যের আলোছায়ার সামঞ্জস্য ও বহির্দৃশ্য গ্রহণে বিভূতিবাবুর কৌশল আমাদের বিমুগ্ধ কোরেছে।

যতীন দত্তের শব্দগ্রহণও হ'য়েছে নিখুঁত।

আবহাওয়া সঙ্গীত ও সুরসংযোজনায় ধীরেন বসু একেবারে নতুন হ'লেও তার কাজ একেবারে নিন্দনীয় নয়।

সম্পাদনা ও পরিস্ফুটনাগারের কাজ প্রশংসনীয়।

নৃত্য পরিকল্পনা উচ্চাঙ্গের নয়।

অভিনয়ে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'কালকেতু', শিশুবালার 'ফুল্লরা' ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের 'ভাড়ু দত্ত' চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে। তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর 'সর্দ্দার' ছবিখানির

শিশুবালা

অন্যতম আকর্ষণ। মোহন রায়ের "যুবরাজ' অচল। অন্যান্য ভূমিকাগুলি আশানুরূপ হয়েছে। রাণী, চিত্রা ও বিভূতি মজুমদারের নৃত্যের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তির সাঁওতালী নাচখানা আমাদের খুসী কোর্‌তে পেরেছে। চিত্রার নাচ আমাদের ভাল লাগেনি। রাধারাণীর গান দু'খানি সুগীত হয়েছে।

মোট কথা, সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও "দেবী ফুল্লরা" যে ধর্ম্মপ্রবণ বাঙলাদেশে আবাল-বৃদ্ধবণিতার প্রাণে নবরস সঞ্চারিত কোরে 'উত্তরা' চিত্রগৃহ জনকোলাহলে বহুদিন মুখরিত কোরে রাখবে এ ধারণা করা অসমীচীন নয়।

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের স্মরণীয় কথা-চিত্র "বিদ্যাপতি" সপ্তাহ ধরে চিত্রায় গৌরবের সহিত চলচে। নৃত্য-গীত, অভিনয় ও দৃশ্যপটাদির আকর্ষণে যে ছবিখানি ইতিমধ্যেই বাঙলার নর-নারীর চিত্ত জয় কোরতে সমর্থ হ'চ্ছে, তার আর নতুন পরিচয় অনাবশ্যক।

অভিজ্ঞান

সামাজিক ছবির মধ্যে নিউ থিয়েটার্স-এর "অভিজ্ঞান" যে আর একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হোয়ে উঠেচে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সোসিয়েটেড প্রোডিউসার্সের
নিবেদন
বীন্দ্রনাথের
চোখের বালি
নোদিনী–সুপ্রভা মুখার্জি

যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে একটি মহিয়সী নারীর চরিত্র, রূপে-রসে সঞ্জীবিত হোয়ে উঠেচে, কোন হৃদয়বান নর-নারীর কাছে সে নারীর বেদনার ইতিহাস ব্যর্থ হ'তে পারে না।

'অভিজ্ঞান'-এর নায়িকা শ্রীমতী মলিনার প্রাণস্পর্শী অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেই কাহিনী আপনাদের অন্তর স্পর্শ কোরবে।

"বড়দিদি"

এমন এক একটি চরিত্র আমাদের নজরে পড়ে, যারা হাজার কাল্পনিক হ'লেও আমাদের মনে দাগ বসিয়ে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন প্রিয়জনের স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না, তেমনি কাল্পনিক চরিত্র-গুলিও আমাদের সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে আজীবন অক্ষয় হ'য়ে জড়িয়ে থাকে।

'বড়দিদি'-র সুরেন্দ্রনাথ এমন একটি স্মরণীয় সৃষ্টি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই।

বিমাতা তাকে বিলাত যাত্রার অনুমতি দেন নি। তাই সে অভিমান কোরে এক দিন গৃহত্যাগ করে। তখন তার মনে হয়েছিল এমন পরাধীনভাবে থাকার চেয়ে ভিক্ষে কোরে খাওয়া ভাল। তাই স্বাবলম্বী হবার আশায় সুরেন্দ্রনাথ এলো কোলকাতায়।

সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শরীর তার ক্লান্তি ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়েচে; অর্থও ফুরিয়ে এসেচে, জামা-কাপড় ময়লা', আশ্রয়ের স্থান টুকুরও কোন ঠিকানা নেই—চোখে তার জল এলো।

এমনি অতর্কিতে পথ চলতে, ছোট্ট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে যেন সুরেনের জীবনে একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন এলো।

এম-এ পাশ সুরেন্দ্রনাথ, একটি নিরক্ষর চাকরের সুপারিশে তার মনিব, জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর বাড়ীতে আশ্রয় পেল।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই আশ্রয় যে কত বড়ো এবং এ থেকে তার জীবনে যে বিরাট ও স্মরণীয় পরিবর্ত্তনের সূচনা হোল, 'বড়দিদি-তে তারই করুণ কাহিনী চিত্রিত হ'য়েচে।

গত সপ্তা'হে, এই চিত্রের পরিচালক অমর মল্লিক, উপরের দৃশ্যটি অতি নিপুণ ভাবে গ্রহণ কোরেছেন। সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকায়, অপরূপ রূপ-সজ্জায় চিত্রাবতরণ কোরেছেন সুদর্শণ অভিনেতা—পাহাড়ী সান্যাল। জমিদারের বিশ্বাসী ও পেয়ারের ভৃত্য 'নিম'—চিত্র-নাট্যকারের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর ষ্টুডিওতে যে ইউনিটে ষ্ট্রীট সিঙ্গার ছবি উঠছে, ষ্টুডিওর প্রত্যেক লোকই সেই ইউনিটের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। ষ্টুডিওর এতখানি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও দরদ এর পূর্ব্বে খুব কম ইউনিটই পেয়েছে।

হ্যাঁ, বার্লি
তবে
লিলি
ব্র্যাণ্ড
হওয়া চাই
একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়
LILY BRAND
BARLEY
FINEST FOOD DRINK
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT Co.
PROPS :- P. SETT & CO
ULTADANGA : CALCUTTA

অধিকার

'অধিকার-এর' কাজ পুরোদমেই চলেছে। আশা করা যায় যে ১৫ই জুলাইএর মধ্যেই এ বই শেষ হয়ে যাবে। মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে বড়ুয়া বই আরম্ভ করেছেন আর শেষ করবেন জুলাই-এর মাঝামাঝি। মাত্র চার মাসের মধ্যেই উভয় সংস্করণই শেষ হবে। এরকম তাড়াতাড়ি আর কোন পরিচালকই কাজ করতে পারেন না।

অনাদর না হতাদর

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মস্ত বড় অভিনেতা—শুধু মস্ত বড় নয়, তার নাকি জনপ্রিয়তাও আছে, তার নাকি Box-office Draw আছে। এই কথাটা তিনি হয়তো মনেপ্রাণে অনুভব করেন। তাই তিনি যে সকল স্থানে কাজ করেন সেখানকার মালিক-দের ওপর যথেচ্ছার অত্যাচার কোরে তাদের পদে পদে ক্ষতিগ্রস্থ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মানুষমাত্রেরই একটা কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকা উচিৎ। বিশেষতঃ যিনি শত সহস্র লোকের আনন্দ বিতরণে নিজেকে উৎসর্গীকৃত কোরেছেন, তার ব্যক্তিগত জীবন যতই বিষময় হ'ক—বাইরের খোলস তাকে বজায় রেখে ভদ্র হ'তে হবে। সাধারণে তাকে যতটুকু সম্মান করে সেটুকু তাকে কড়ায়-গণ্ডায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

দুর্গাদাস হয়তো একথা বিশ্বাস করেন না তাই তিনি নির্লজ্জভাবে নিজের স্বরূপ প্রকাশ কোরছেন। গেল রবিবার রঙমহলে ম্যাটিনী শো-তে তিনি ইচ্ছে কোরে না এসে কর্ত্তৃপক্ষ ও দর্শকদের যে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও লাঞ্ছিত কোরেছেন সে খবর বোধ হয় কারও অজানা নেই। সেদিন উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় চোদ্দ শ' টাকা টিকিট বিক্রি হয় এবং দুর্গাবাবু অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে অভিনয়ে যোগদান না করায় কর্ত্তৃপক্ষকে বাধ্য হ'য়ে টাকা ফেরৎ দিতে হয়। রাত্রে তিনি ন'টার সময় থিয়েটারে আসেন এবং যে অবস্থায় তিনি অভিনয় করেন তা অতি লজ্জাজনক। তারপর গেল মঙ্গলবার এই নিয়ে দুর্গাবাবু সহযোগী 'যুগান্তরে' নিজের স্বপক্ষে এক কিফিয়ৎ বের করেন। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমাদের মনে হয় দুর্গাবাবুর চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে হ'লে কর্ত্তৃপক্ষ ও দর্শক যদি একযোগে তাঁকে বর্জ্জন করেন তা' হলে হয় ত' সকল দিক থেকে সুফল পাওয়া যেতে পারে। নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষ দুর্গাবাবুর এই কুপ্রবৃত্তি দমনের জন্য তাঁকে প্রায় সব ছবি থেকেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর ওপর কড়া আইন জারি কোরেছেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের হয় তো আরও কিছু লিখতে হবে।

স্বর্গদূতী
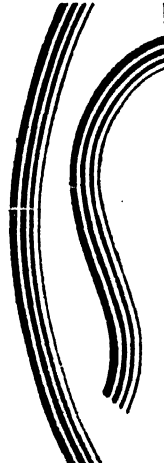
শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—পনর—

অমল বিবেকের তাড়নায় ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল বটে কিন্তু বিধিলিপি তাহাকে ঈপ্সিতের নিকট যাইবার অবকাশ দিলনা। সে ট্রেন হইতে নামিয়া কয়েক পা পিছু হটিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বজ্র কঠিন পদার্থের সহিত তাহার মাথাটা ঠুকিয়া গেল। একটী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া অমল ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পর তাহার কি হইল সে নিজে কিছুই জানিতে পারিলনা।

* * *

টাটানগরের সুবৃহৎ রেলওয়ে হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বহির্বিভাগের রোগীদিগকে বিদায় করিয়া আপনার গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় কয়েকজন সাঁওতাল নারী ও পুরুষ একটী সুদর্শন যুবকের দেহ স্কন্ধে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তারের আর বাটী যাওয়া হইল না। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন রোগী তখনও জীবিত আছে। তাহার গাত্রাবরণ গেঞ্জিটী রুধির সিক্ত। রোগী সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন ও অচেতন। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন কুলীরা রেল লাইনে কার্য্য করিতে গিয়া এই যুবককে একটী টেলিগ্রাফ পোষ্টের পাশে শায়িত দেখে। সম্ভবতঃ টেলিগ্রাফ পোষ্টের সহিত আঘাত লাগিয়া তাহার মস্তকের পিছনে গভীর ক্ষত হইয়াছে। প্রথমে তাহারা যুবাকে মৃত মনে করিয়াছিল পরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছিল তাহার দেহে তখনও প্রাণ রহিয়াছে।—পাঁচ সাত মাইল হাটিয়া অনার্য্যেরা তাহাকে হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার তৎক্ষনাৎ তাহার ক্ষতে ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডেরা বাঁধিয়া দিলেন এবং উপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিয়া বাটী ফিরিলেন। সন্ধ্যায় আসিয়া দেখিন রোগী তখনও অচেতন এবং প্রবল জ্বরে তাহার সমস্ত গাত্র জ্বলিয়া যাইতেছে। ডাক্তারবাবু কাল বিলম্ব না করিয়া ধনুষ্টঙ্কার প্রতিষেধক ঔষধ সূচীদ্বারা রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি রোগীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। এইরূপে তিনদিন কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিবসে রোগী নানাবিধ প্রলাপ বকিতে সুরু করিল। ডাক্তারবাবু বুঝিলেন যুবক বাঙ্গালী। সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। রোগী যাহাতে রক্ষা পায় এজন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। ডাক্তারবাবু ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার উভয়েই বাঙ্গালী এবং প্রলাপ কালীন রোগীর নিকট হইতে পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিলেন না। কয়েক দিনে অচেতন রুগীর মুখে তাহারা কণা, অরুণ, দাদা, বড়সাহেব, ক্ষমা, মহাপাপী ভিন্ন অন্য কোন কথারই তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

কয়েকদিন পরে যুবকের জ্বর কমিল বটে কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে আঘাত লাগার ফলে তাহার স্মরণশক্তি ফিরিলনা। সে কখনও আপনমনে হাসিতে থাকে কখনও বা গান গায় আবার কোন সময় আত্মহারা হইয়া রোদন করে। তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে কতরকম নামই বলিয়া থাকে। নিজের কোন পরিচয় সে সম্যকভাবে দিতে পারেনা। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সে হাসপাতাল ছাড়িয়া পালাইতে চাহে।

এইরূপে তিনমাস কাটিল। কর্ত্তৃপক্ষ ডাক্তারবাবুকে বলিলেন এই উন্মাদটীকে তো আর অধিক দিন হাসপাতালে রাখা যায়না তাহার রোগের চিকিৎসার জন্য রাচীতে মেন্‌টাল হসপিটালে পাঠান হউক। ডাক্তার বাবুর কথাটা ভাল লাগিলনা। এই হতভাগ্য যুবকের প্রতি তাঁহার কেন যে সহানুভূতি হইয়াছিল তাহা ভগবানই জানেন। তিনি যুবককে নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং সে যাহাতে আরোগ্য লাভ করে তদ্বিষয়ে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুর বাটীতে আসিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত রোগীর কোন উপসর্গ কমিলনা। অবশেষে একদিন তাহার নিজ নাম মনে পড়িল। ডাক্তারবাবুকে সে নিজে ডাকিয়া বলিল যে তাহার নাম অমল—অমল সান্যাল। ইহার অধিক কিছুই সে বলিতে পারিলনা; কিন্তু ডাক্তারবাবুর তাহাকে আরোগ্য করিবার আশা বহুল পরিমাণে বাড়িয়া উঠিল।

এই কোমল হৃদয় ডাক্তারটীর নাম পরিমল সেন; সে অরুণের সহপাঠি।

—ষোল—

অরুণ কণাকে বিদায় করিয়া দিল বটে কিন্তু সে মনে একটা দারুণ ব্যথা অনুভব করিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কেমন একটা অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এতটা কঠোরতা, এতটা নিষ্ঠুরতা করা তাহার উচিত হয় নই। কণার প্রতি সহানুভূতিতে হৃদয় তাহার পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে মুক্তবায়ু সেবনের জন্য বাহির হইয়া পড়িল। ইডেন উদ্যানের একটা বেঞ্চিতে বসিয়া

সে ভাবিতে লাগিল সে যদি স্ত্রীলোক হইত, কণার মত তাহারও যদি আপনার জন কেহ না থাকিত এবং অমলের প্রলোভনে পড়িয়া সেও যদি কণার মত গৃহত্যাগ করিত ও পরে পরিত্যক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিত তবে কি সমাজের কাহারও কাছে তাহার আশ্রয় মিলিতনা? কণা নারী—তাই তাহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কিন্তু পুরুষ শত অন্যায়, শত অবিচার করিলেও সমাজের চোখে সে ক্ষমাই ও ত্যাজ্য নহে। জগদীশ্বরের সৃষ্টি, স্ত্রী পুরুষও। একই ভাবে তাহাদের জনকজননী লালনপালন করেন, একই সমাজে উভয়ে বর্দ্ধিত। তবে একের প্রতি এত কঠোরতা ও অপরের প্রতি এত শিথিলতা কেন? অপরাধের ওজন স্ত্রী ও পুরুষের সমান। তবে মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য যদি কোন নারী কোন অন্যায় করে সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিবেনা কি জন্য? সে দিন শুভ্রা তাহাকে বলিয়াছিল যে অরুণ যদি কোন অন্যায় করে সে তাহাকে ক্ষমা করিবে। তবে শুভ্রা বা কণা কোন অপরাধ করিলে সেই বা কেন তাহাদের ক্ষমা করিতে পারিবেনা? সে স্থির করিল মনের দুর্ব্বলতা মুছিয়া ফেলিয়া সঙ্কীর্ণতাকে দূরে ঠেলিয়া দিবে, হতভাগিনী কণাকে সে ক্ষমা করিবে এবং ফিরাইয়া আনিবে। কিন্তু কোথায় তাহাকে পাওয়া যাইবে? সে নিশ্চয়ই গ্রেট-ইণ্ডিয়ান হোটেলে যায় নাই। না যাইবারও যথেষ্ট কারণ আছে। তবে সে কি করিবে, কোথায় যাইবে? পৃথিবীর বিশাল বক্ষে কণার জন্য কি ভগবান একটুও স্থান রাখেন নাই? বেচারী যাইবার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "একটুও কি ভালবাস না আমায়?" সে উত্তরে বলিয়াছিল "না", তাহার ভালবাসিবার অধিকার নাই। অরুণের কেবলই মনে হইতেছিল তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই আছে কেবল দানবীয় আত্মম্ভরিতা, যুক্তিহীন কঠোরতা, হৃদয়হীন নির্ম্মমতা। নহিলে কেন সে সেই বিপন্না, আত্মীয়হীনা, প্রতারিত কণাকে এমন করিয়া বিদায় করিয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যদি কণা পুনরায় ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সে তাহাকে আশ্রয় দান করিবেই তাহাতে সমাজের চক্ষে ও সাধারণের চক্ষে সে যত নীচ ও ঘৃণিত প্রতিপন্ন হউক না কেন! কিন্তু তাহারই পর মুহূর্ত্তে শুভ্রার হাস্যোজ্জ্বল প্রণয়-প্রদীপ্ত মুখখানি মানসপটে ভাসিয়া উঠিল। অরুণ ভাবিল শুভ্রাকে ব্যথা দিয়া, আঘাত দিয়া, সে মানবত্ব দেখাইতে চাহে না। পৃথিবীর সমস্ত দ্রব্যের বিনিময়েও শুভ্রার কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারিবে না। শুভ্রা যে তাহার বন্ধু, সঙ্গিনী, তাহারই সেবিকা, হৃদয়ের জ্যোতি, তাহারই স্ত্রী, তাহার সহধর্ম্মিণী। সে স্থির করিল কণার চিন্তা হৃদয় হইতে সে মুছিয়া ফেলিবে। কণার জন্য যে ক্ষণিক দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়ে আসিয়াছে তাহা দূর করিয়া দিবে। কণা তাহার কেহ ছিল না আজও সে তাহার কেহ নয়। অরুণ বাটী ফিরিল বটে কিন্তু সে শুভ্রার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা, কি হয়েছে তোমার? মুখখানা বড় শুকনো দেখাচ্ছে, যে।" উত্তরে অরুণ বলিল, "দেখ কি জানি আজ বিকেল থেকে মাথাটা বড় ধরেছে"। শুভ্রা অচিরেই অরুণকে কাপড় ছাড়াইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। অরুণ এক কাপ কোকো পান করিয়া শুইয়া পড়িল। শুভ্রা তাহার সেবায় মনোনিবেশ করিল। অরুণ ভাবিল প্রতিমার মত রূপসী, প্রেয়সী স্ত্রী যাহার, তাহার পক্ষে অন্য নারীর চিন্তা কি দারুণ অপরাধ।

* * *

জীবন যাহার অভিশাপের নামান্তর, —বাঁচিয়া থাকা তাহার বিড়ম্বনা তাহা কণা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল। অরুণের নিকট প্রত্যাখ্যাতা হইয়া কণা যেন মরমে মরিয়াছে। অমলের অবিমৃষ্যকারিতায় ও পলায়নে সে যে আঘাত পাইয়াছিল অরুণের প্রত্যাখ্যানে তাহার হৃদয়ের ক্ষত যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। সে হোটেলে আজ আট দিন আশ্রয় লইয়াছে বটে কিন্তু এই আটদিনে সে হয়ত চার বেলার অধিক আহারে বসে নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রসাধনের সাধ, সমস্তই তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। চিন্তা, শুধু চিন্তা—সীমাহীন অনন্ত চিন্তাধারা তাহার ছোট হৃদয়টিকে কাল-বৈশাখীর আকাশের ন্যায় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কণা ভাবে তাহার বাঁচিয়া লাভ কি? যাহার আশা নাই, আনন্দ নাই উৎসাহ নাই, বর্ত্তমান নাই, ভবিষ্যত নাই তাহার বাঁচিবার প্রয়োজনই বা কি? ভয়াবহ বিষাদাচ্ছন্ন অতীত, তাহারই নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিচ্ছবি নিয়তই তাহাকে কষাঘাত করিতেছে। কণা চায় সে স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ঈর্ষা-দ্বেষ, ঘৃণা-বিদ্বেষের হস্ত হইতে সে চায় মুক্তিলাভ করিতে। সে তাহার শরীরকে নষ্ট করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চেষ্টা বিফলে যায় নাই। অচিরেই তাহার তপ্তকাঞ্চন বর্ণ ম্লান হইল; চক্ষের নিম্নদেশে কালিমা পড়িল, শক্তিহীন দেহলতা লুটাইয়া পড়িল রোগশয্যায়। রাইচরণ তাহাকে অনেক উপদেশ দিল, তিরস্কার করিল, তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসন করিল। উত্তরে কণা বলিল, "যাকে আপনার সকল জন ছেড়ে গেছে, বাবা, তাকে তুমিও ছেড়ে যাবে তাতে বিচিত্র কি? এবার আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার চেষ্টা করছি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি এতে বাধা দিওনা। আমায় শান্তিতে মরতে দাও। শুধু আমার অনুরোধ রইল রাইচরণ যখন আমার জীবন-

বাকে খুশী নিয়ে যাও না বাপু, আমায় কেন জ্বালাতন কর ?"

উত্তরে রাইচরণ বলিল, "বাবু সে হবে না, তোমায় যেতেই হবে। এমন দেবতার মত চেহারার নীচে যে পাষাণে-গড়া প্রাণ থাকতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বাবু, তুমি যত টাকা চাও তাই দেব ; চিরদিন আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব, তুমি আমার মাকে ভাল করে দেবে চল।"

অরুণ তথাপি প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। রাইচরণের ক্রন্দন ধ্বনি শুভ্রার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া রাইচরণ বলিল, "মাগো, তুমি বাবুকে একবার বলো যাবার জন্যে। বেশী দেরী হলে হয়তো আর তাকে বাচানোই যাবেনা।"

শুভ্রা আসিয়া অরুণের কাছে দাড়াইল, ও বলিল "তুমি কেন যেতে চাইছ না ? গরীব মানুষ যদি টাকা দিতে নাই পারে তাহাতে তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। চিকিৎসকের জীবন রোগীর জীবন রক্ষার জন্য ; শুধু অর্থোপার্জ্জনের জন্য নয়। আমার মিনতি তুমি এই বৃদ্ধের সঙ্গে যাও একে অপত্যশোক থেকে রক্ষা করার চেষ্টা কর।"

অরুণ একবার কঠোর দৃষ্টিতে শুভ্রার দিকে চাহিল ও অস্ফুট স্বরে বলিল, "ভাল করলেনা শুভ্রা।" তারপর রাইচরণকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল।

অরুণ চলিয়া গেলে শুভ্রা আপন মনে বলিল, "এমন স্বামী ক'জনার আছে ?"

অরুণ ও রাইচরণ হোটেলে আসিয়া কণাকে অচৈতন্য ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখিল। কণার পরিবর্ত্তনে অরুণের হৃদয়ের সকল কঠোরতা নিমিষের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল। সে রোগিণীর শয্যা প্রান্তে বসিয়া কণার হাতখানি তুলিয়া লইয়া বলিল, "কণা, কণা, এই দেখ আমি এসেছি। তুমি এমন হয়ে গেছ কণা, আমার উপর অভিমান করে। দেখ আমি অরুণ তোমারই পাশে বসে, চোখ খোল দেখ, আমি নিজেই এসেছি।"

কণা একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিল ও পরে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "একটুও কি ভালবাস না আমায় ?" অরুণ তাহার শীর্ণ হাতখানি নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিল ও ক্ষণপরে তাহার বিশাল চক্ষু দুইটির প্রান্ত হইতে দুইফোঁটা প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাইচরণ বুঝিল এখানে তাহার থাকা উচিত নয়। তাই ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

—সতের—

পরদিন প্রভাতে কণার সংজ্ঞা ফিরিলে রাইচরণ কণাকে বলিল, "কাল ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, রাত এগারটা পর্য্যন্ত তোমার কাছে বসে তোমার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন তুমি কি কিছু জানতি পারনি মা ?

কণা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমায় মিথ্যে বলে ভুলাচ্ছো রাইচরণ। আমি জানি তিনি কখনই আসবেন না।"

"এই হোটেল শুদ্ধ লোক তার সাক্ষী দেবে। তোমার বুড়ো বেটা গরীব হতে পারে, মিথ্যুক নয়" বলিয়া রাইচরণ চুপ করিল। ক্ষণপরে বলিল, সত্যি ডাক্তারবাবু দেবতা বটে, কিন্তু তাঁর চেয়ে আর একজনকে কাল দেখলাম মা, যার মুখখানা দেখা পর্য্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর পায়ে হাজার দণ্ডবৎ করি। শ্রীপঞ্চমীর সরস্বতী ঠাকুরুন মা ?

কণা জিজ্ঞাসা করিল, "তাকে দেখলে কি করে ? সেই বুঝি ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিলে ? তার কাছে আমার নাম করেছিলে কি রাইচরণ?"

রাইচরণ বলিল, না, মা, শুধু বলেছিলাম আমার মেয়ের বড় অসুখ ; ডাক্তারবাবুকে একটীবার যেতে বলে দাও। তা তিনি বলে দিলেই বলে ডাক্তারবাবু এসেছিলেন।"

কণা নীরবে রাইচরণের কথা শুনিতেছিল কোন উত্তর দেয় নাই। রাইচরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওই মেয়েটা কে মা?"

নিতান্ত অবসন্ন ও অপ্রসন্নভাবে কণা বলিল, "আমি জানিনা বাবা।" কণা দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইল। তাহার চক্ষু হইতে যে অশ্রুধারা পড়িতেছে রাইচরণকে তাহা সে জানিতে দিতে চাহেনা। এমন সময় অরুণ আসিয়া পৌছিল—অরুণকে দেখিয়া রাইচরণ কক্ষ ত্যাগ করিল।

অরুণ কণার শয্যায় বসিয়া বলিল, "কণা, ফের আমার দিকে, অভিমান করো না? এই দেখ তোমার আকুল আগ্রহ আমায় টেনে এনেছে। একটা কথা বলো লক্ষ্মীটি। খেয়েছ কিছু? এখন কি একটু ভাল বোধ হচ্ছে না কণা? অরুণের কণ্ঠে আকুলতা ও বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কণা ভাবিল সে স্বপ্ন দেখিতেছে। অরুণ যে তাহার এত সন্নিকটে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। যাহাকে এতদিন সে সমস্ত অন্তর দিয়া চাহিতেছিল, যাহার চিন্তা তাহার নিত্য সহচরী, যাহাকে পাইবার আশা তাহার পক্ষে মরুভূমির মরীচিকা—আকাশকুসুম, সে যে তাহারই পার্শ্বে বসিয়া এত কোমল কণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিবে ইহা সে কিরূপ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবে? কেমন করিয়া সে বিশ্বাস করিবে বিগত ঘটনায় সেই কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ অরুণ আজ এমন করিয়া তাহাকে আত্মসমর্পন করিল? পাষাণের বুকে কি মন্দাকিনীধারা বহিয়া থাকে? অগ্নি কি তাহার দাহিকা শক্তি বিসর্জ্জন করিতে পারে? কণা ভাবিল এ তাহার স্বপ্ন—তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। সে ভাবিল যে চক্ষু খুলিবে না, চক্ষু খুলিলে তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পাঠক পাঠিকা হয়তো অরুণের ব্যবহারে বিস্মিত হইতেছেন, হয়তো ভাবিতেছেন অরুণের ন্যায় পত্নীপ্রেমোন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ ব্যবহার সম্ভব কিনা। অরুণের ব্যবহারে আপনাদের সহিত লেখিকাও বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন—তবে একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে অরুণ পুরুষ এবং পুরুষের পক্ষে ইহা তাহাদের জাতিগত ধর্ম্ম বলিতেই হইবে। সে তাহার পৌরষকে অবনমিত করে নাই।

পুরুষ জাতির মধ্যে এমন অনেক পুরুষ আছেন যাহারা সাধারণের চক্ষে ও নিজ পত্নীর সমক্ষে নিজের সাধুতা ও চরিত্রের উচ্চতা প্রকাশের জন্য বিড়াল তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ধার্ম্মিকের মুখোসধারী পুরুষগণই পরকীয়া প্রেমাস্বাদনে অধিকতর তৎপর এবং ইহাদের উদাহরণ সমাজের ইতিহাসে বিরল নহে।

ডাক্তার অরুণ গুপ্তকে উপরোক্ত পুরুষের পর্য্যায়ে ঠিক ফেলা চলেনা, কারণ যদিও বহুদিন হইতে তাহার হৃদয়ে কণার যৌবনসুধা পানের পিপাসা জাগরুক হইয়াছিল তথাপি সে অকৃত্রিম পত্নীপ্রীতি হেতু তাহার লালসাকে দমন করিবার বিধিমত চেষ্টা করিত। সে সত্যই প্রতিনিয়ত নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে এবং কণার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার কঠোরতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তাহার মানসিক শক্তি আজ দুর্দ্দমনীয় প্রণয়াকাঙ্খার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। হৃদয় নিহিত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির লেলিহান শিখা তাহার লৌকিক চরিত্রকে ভস্ম করিয়া দিল।

সে কণার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কণার মনোযোগ আকর্ষণের আশায় বলিতে লাগিল, "কণা, আমার কণা, একবার দেখ আমি এসেছি, তোমায় দেখতে এসেছি।"

পাশ ফিরিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কণা উত্তর করিল, "কেন এসেছেন ডাক্তারবাবু? আমায় শান্তিতে মরতে দিন। যার কেউ নেই, কেউ যাকে ভালবাসেনা, পৃথিবীতে বেচে থাকবার মত যার কোন সম্বলই নেই তাকে কেন দেখতে এসেছেন ডাক্তারবাবু? তাকে যেতে দিন সেইখানে, যেখানে গেলে তার চিরজীবনের সমস্ত অভাব পূর্ণ হবে।"

কণার মুখের নিকট অরুণ মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ছি, কে বললে তোমার কেউ নাই কণা? পৃথিবীর কেউ যদি তোমায় গ্রহণ না করতে চায় আমি তোমায় গ্রহণ করব, আমি তোমায় বুকে তুলে নেব।"

নৈরাশ্যের ম্লান হাসি হাসিয়া কণা বলিল, "ক্ষণিক উত্তেজনায় আপনি এসব কথা বলছেন ডাক্তারবাবু। আপনার নিজকে বিলিয়ে দেবার অধিকারই নাই; আমি যদি দিদিকে না দেখতাম তাহলে বিশ্বাস কর্ত্তে পারতাম। রূপে, গুণে, শিক্ষায়, বংশমর্য্যাদায় আমি তাঁর পায়ের তলায় দাঁড়াবার উপযুক্ত নই, তবে কোন সাহসে আশা বা বিশ্বাস করব যে আপনি আমার হবেন?—না, না, কাজ নেই, আমায় আপনি মরতে দিন, আমার জীবন-সন্ধ্যায় আমায় বৃথা লোভ দেখাবেননা ডাক্তারবাবু, আমায় শান্তিতে মরতে দিন।" অরুণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্নভঙ্গ

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"রেবা! আমার রেবা!"

"আমার—আমার—"

"রতীন—প্রিয়!"

তারা নিজেদের আগেকার নামে পরিচিত হবে, না নতুন মিলনোৎসবের আয়োজন করবে এই হোল কথা। কিন্তু পুরোনো কথা কি সবাই বিশ্বাস করবে? কে জানে, তাদের ঘিরে তুলবে হয় তো কুৎসার ঢেউ। এখন তাদের অনেক কিছু ভেবে করতে হবে, সব দিক দিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হবে। হয় তো সবাই বিশ্বাস করবে না যে এরা পূর্ব্বে বিবাহিত হয়েছিল। হয় তো সবাই জানতে চাইবে তাদের সাময়িক বিচ্ছেদের কারণ। কাজেই সব দিক বজায় রাখবার জন্যে দরকার নতুন করে বিবাহের। মূল কারণ মাধব আর কোলকাতায় মনীশকে জানিয়ে রেবা নতুন বিয়েতে মত দিলে। বছর খানেক আগে নীতিশবাবু মারা গিয়েছিলেন।

রতীনও সব কথা চিঠিতে রমেনবাবুকে জানালে। রমেনবাবুর অনুরোধে মাধব বাবু এতে মত দিলেন। ভেতরের কথা যারা জানবার তারা ছাড়া কেউ জানলে না।

সংবাদ পত্রে বঙ্গের চিত্রজগতের চমকপ্রদ এক বিবাহের বার্ত্তা বিঘোষিত হয়ে গেল। সাংবাদিকদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চললো দেখে তারা আত্মগর্ব্বে স্ফীত হয়ে নবীন উৎসাহে আসন্ন বিবাহের অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য ছাপতে সুরু করলে। রতীন তখন সাগরপারের অভিজ্ঞতাকে রূপ দিচ্ছেলো নতুন একখানা ছবিতে। সব রকমে এ ছবিখানা হবে নাকি চিত্রজগতে অনবদ্য দান। এই নবতম অবদান তাদের নতুন জীবনকে ভূষিত করবে জয়মাল্যে। তাই রতীন ছিল বেজায় ব্যস্ত। তাই বিয়ের সব আয়োজনের ভার নিতে হোল রেবাকে। নিজের ছোট্ট বাড়ীর নামফলক থেকে আসবাবপত্র পর্য্যন্ত নতুন সাজে সাজিয়ে অভিনব করে তুলবে এই হোল রেবার একান্ত ইচ্ছা এবং আন্তরিক চেষ্টা। সব তদ্বির করবার জন্যে রেবার বাড়ীতে ছোট খাটো একটা অফিস বসে গেল। ভারতের চিত্রজগতের দিকপাল যত সবাই হোল নিমন্ত্রিত। পাত্র-পাত্রীর আত্মীয়দের মধ্যে বাছাই করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হোল। ছোট্ট বাড়ীতে এ উৎসবের প্রসারকে সঙ্কুচিত করতে হবে ভেবে রেবা নিজের ষ্টুডিয়োর মালিকের সহরের বড় একখানা বাড়ী না চাইতেই পেয়ে গেল।

রেবার সব চেষ্টা সার্থক হোল। এমন শোভন, সুরুচিসঙ্গত, সমারোহের বিয়ে আলোছায়ার রাজ্যে কারো হয়নি এই মর্ম্মে কাগজে প্রকাশিত হোল বিয়ের সাড়ম্বর কাহিনী। বিয়ের পর নিমন্ত্রিত, আত্মীয়-স্বজনের বিদায়কালীন শুভাশীষ নিয়ে নব-দম্পতি ফিরলো নবীন প্রেমের নিভৃত নীড়ে। আলোক-চিত্রী, সাংবাদিকদের ভীড়ের মাঝখান দিয়ে শব্দহীন, মূল্যবান মোটর হাঁকিয়ে "মঞ্জরী-মঞ্জিলে" পৌঁছে রেবা রতীনকে জিজ্ঞাসা করলে "এইবারে পাবো তো নিজেদের বুকের কাছটিতে নিবিড়ভাবে, নির্ব্বিঘ্নে?"

রতীন বল্লে "তুমি সত্যিই আমাকে সুখী করলে রেবা। তোমার মায়াহাতের ছোঁয়াচে সফল হোল আমার জীবনের স্বপ্ন।"

"বাড়ীখানা ভাল করে দেখবার আগ্রহ তোমার হচ্ছে না?"

"আমি রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছি মণি।"

"রেবা খুশীতে উপচে পড়ে বল্লে "সত্যি? এসো তাহলে আমার সঙ্গে।" রতীনকে একরকম টানতে টানতে রেবা নিয়ে চললো এগিয়ে। প্রথমে রেবা রতীনকে দেখালে বড় একখানা ড্রয়িং রুম, গাঢ় লাল রঙের ওপর উজ্জ্বল সোনালী কাজ করা পুরু কার্পেট মেঝেতে পাতা। ঘরে পরিপাটি সাজানো কার্পেটের সঙ্গে ম্যাচ করা রঙের রেশমী কাপড়ে মোড়া সোফা, সেটি, ফুলদানী প্রভৃতি আনুষঙ্গিক আসবাব। রতীন একবার বিস্মিত দৃষ্টি চারদিকে বুলিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে চাইলে রেবার মুখের পানে। তারপর রেবা তাকে নিয়ে গেল লাইব্রেরীতে। ঘরে গোটা তিনেক মেহগনির আলমারীতে সাজানো নতুন, ঝকঝকে হাজার খানেক বই। এসব কোনদিন পড়া হবে এ উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীতে জায়গা পায়নি। লাইব্রেরী হোল যে কোন শিক্ষিত বাড়ীর অন্যতম প্রধান অলঙ্কার। রতীন আবার চাইলে রেবার তৃপ্ত, গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের পানে। তারপর তাকে টানতে টানতে বাথরুম, রান্নাবাড়ী সব ঘুরিয়ে শেষে নিয়ে এলো শয়নকক্ষে। রূপসী, হাস্যোজ্জ্বল রেবার হাত ধরে সে ঘরের মেঝেতে পা দিয়েই রতীনের মনে হোল সে বুঝি এলো কোন স্বপ্নলোকে। খোলা জানলা দিয়ে একদিকে দেখা যায় দূরে নীল সাগর আর নীল আকাশের মেশামেশি। একদিকে দেখা যায় আকাশ ছোঁয়া কোন্ পাহাড়। অস্তগামী সূর্য্যের কিরণের আভা সেই ধূসর, নীরস পাহাড়ের বুকে ফুটিয়ে তুলেছে রামধনুর

রঙের বৈচিত্র্য। একদিকে খোলা দরজা দিয়ে যাওয়া যায় লতানেগাছে-ছাওয়া যে ছোট বারান্দার কুঞ্জে, সেখান থেকে নীচে দেখা যায় ছবির মত ফুলের ছোট একটি বাগান। একদিক থেকে ভেসে আসছে নকল ঝর্ণার ঝর ঝর নৃত্যঝঙ্কার আর একদিক থেকে আসছে নানা রঙের, নানা দেশের পাখীর আনন্দ কাকলী।

সেখান থেকে রেবা রতীনকে নিয়ে গেল তার মহলে। যে ছোট ড্রয়িং রুমখানা দেখিয়ে রেবা হাসতে হাসতে "বল্লে এখানা তোমার" তার মেঝেতে পাতা সাধারণ গালচে। সোফা, সেটির সম্পর্ক আছে, আড়ম্বর নেই। রতীন রেবার পানে চাইবার আগেই রেবা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দেখে রতীন গেল তার পেছু পেছু। রতীনের লাইব্রেরীতে খালি একটিমাত্র আলমারী। সে যে বই পছন্দ করবে কিনে পরে ভরে নেবে। রেবার শয়নকক্ষের অনেকখানি তফাতে রতীনের শয়নকক্ষে একা শোবার মত একটা স্প্রিং খাট। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দেবার মত কোন বারান্দা নেই সে ঘরের লাগাও। জানলা থেকে বাগানের যে অংশটা দেখা যায় সেখানে রান্নাঘরের বাসন, উচ্ছিষ্টের স্তূপও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাবে। কারণ সে ঘরের প্রায় নীচেই রান্নাঘর। ঝর্ণার নাচের ঝঙ্কার আর পাখীর গানের অতি ক্ষীণ একটা রেশ মাঝে মাঝে সেখান থেকে পাওয়া যায়। রতীনের স্নানকক্ষে ছোট চৌবাচ্চামাত্র, ঘরের মেঝেটা শ্বেত পাথরে মোড়া নয়। রতীনের মুখ থেকে একটা কথাও বেরোল না। তবে তার নাক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাসের কয়েকটা ফোঁস্ ফোঁসানি শোনা গেল। রেবার হাত তখন রতীনের হাতের মধ্যে ছিল না। রেবা রতীনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করলে জিজ্ঞাসা করলে "ঘর কি তোমার পছন্দ হয়নি? পর্দার রঙটাতো খারাপ নয়।"

রতীন বল্লে "রঙটা খারাপ নয়। কিন্তু—রেবা—সত্যি—"

"কি বলতে চাইছো বুঝতে পারছি নে কিছু।"

"না যাক্। বিশেষ কিছু নয়। সত্যি বাড়িখানা সাজিয়েছ খুব ভালো।" তারপর রেবার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল তার শয়নকক্ষে। তারপর বলে ফেল্লে "এই ঘরখানা হবে আমার। কেমন, সেই বেশ হবে না? তা তুমি যদি—"

রেবা বড় খাটের ওপর পালকের মত নরম বিছানায় বসে পড়ে অবাক হয়ে রতীনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে "এখানা হবে তোমার শোবার ঘর!"

রতীন আবার সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো। নিজের বিরুদ্ধ মতকে নিরুদ্ধ করবার এই অমোঘ কৌশল তাকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। সে বল্লে "সত্যি তোমার কি মনে হয় নি যে ভাল ঘর গুলো তুমিই সব দখল করেছ?"

"কেন স্ত্রীরা তাতো করেই থাকে।"

রতীনের রক্ত ঊর্দ্ধগামী হতে সুরু করে ছিল। তার গতির চাঞ্চল্য সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলো "কিন্তু তার আগে স্ত্রীর ভেবে দেখা দরকার কাকে বিয়ে করবার সৌভাগ্য তার হয়েছে। এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে হেঁজি পেঁজি একটা কাকেও বিয়ে তুমি করোনি। তুমি ভালোই জানো ছবির জগতে আমার জায়গা কতখানি উচুতে। আমার মত পরিচালক কটা আছে এই পোড়া দেশে? সে অবস্থায় আমার নিজের তো একটা মান সম্ভ্রম আছে। কেউ এসে যদি দেখে আমার ঘরগুলো তাহলে তারা বলবে কি?"

রেবা রেগে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"লোকে বলবে? বলবে শুধু তোমাকে? আমাকে বলবে না কিছু? মস্তরী দেবীর না আছে ভাল শোবার ঘর, না আছে পাঁচ-

জনকে বসাবার মত একটা ড্রয়িং রুম, এই যদি তারা দেখে তাহলে বলবে কি, তা বুঝি ভাবছো না ?”

রতীন ব্যঙ্গ বিকৃত বিশ্রী গলায় বল্লে “মঞ্জরী দেবীর সম্বন্ধে এত ভাববার জন্যে লোকের ঘুম হচ্ছে না।”

“তাহলে বিয়েতে অতগুলো বড় লোক এসেছিল কেন ?”

“বিয়েটা তোমার একলার হয়নি।”

“তাহলে তুমি ভাবো তৃতীয় শ্রেণীর এক পরিচালকের বিয়ের লালচিঠি পেয়েই দেশের যত বড় বড় লোক কাজ কর্ম্ম বন্ধ রেখে ছুটে এসেছিল ?”

“তৃতীয় শ্রেণীর পরিচালক !”

“তাছাড়া আবার কি ? নিজের মুরোদ নেই লেখবার। ভাল লেখকের লেখা নিয়েই তো তোমার যত জাড়িজুড়ি।”

রতীনের নাকের বদলে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল নিঃশ্বাসের ফোঁস্ ফোঁসানি। তবু রেবা নরম হোল না দেখে হঠাৎ হো হো করে হাসির অট্টরোল তুলে বল্লে “ছাসালে দেখছি। আমার হোল জগতের রসিকমহল জোড়া নাম আর তোমার নাম তো ফেরে গ্যালারীর ভীড়ে। অভিনয় ! অভিনয়ের যুগ্যি তুমি নও রেবা, বুঝলে ? কতকগুলো নাকি সুরের চিৎকার আর সাড়ির পাড়ের বাহার ! তার নাম অভিনয়ও নয়, গানও নয়। ওই তো নিজের মুরোদ।”

দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। দুজনেরই নাক থেকে বেরিয়ে আসছিল ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ আর চোখ থেকে আগুন। হঠাৎ দুজনেই এগোতে লাগলো দুজনের দিকে। তারপর তেমনি হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার দুজনে মুখোমুখি দাঁড়ালো।

হে বীর

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বীর,
ভাল তুমি বাসিলে দেশ
সহিলে কত না দুঃখ
কত না ক্লেশ
মুক্তির লাগি করিলে মৃত্যুপণ
হে বীর
মুক্তির লাগি ত্যজিলে আপন সুখস্বপন

নত নাহি করিলে কভু শির
হে বীর
সুসংযত উন্নত ধীর,
বরণ করিলে বন্দীর বেশ
সহিলে তুমি দেশের লাগি
অপার দুঃখ-ক্লেশ
ভাল তোমায় বাসিল দেশ ॥

হে বীর,
মরণভীরুরে শুনালে অভয়বাণী
মুকের মুখে দিলে ভাষা
নির্য্যাতিতের বুকে জাগালে আশা
হে বীর,
যুগে যুগে তাই ওঠে
তোমার জয়ধ্বনি ॥

দানব দলনে দধিচী রচিল বাজ
প্রাণের রক্ত; হে বীর
দেশের লাগি গড়িলে তুমি
অপরূপ তাজ
হে বীর
নমিল তাই তোমারে
সকলের আগে
বিশ্ব (মানুষ) সমাজ ॥

কাশীপুর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিটিংরুম সংলগ্ন লবি

(মহিম, অতুল, সুশীল, যোগেন প্রভৃতি কনফারেন্সের সভ্যগণ কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল)

মহিম—অত মুসলমান প্রীতি অজয়দেশে চলতে পারে, বাঙলায় চলবেনা। স্পীচটার আগাগোড়া শুধু মুসলমানের কথায় ভর্ত্তি। কেন, দেশের কি আর কোনও প্রব্‌লেম্ নেই !

অতুল—তাও যদি বুঝতাম মুসলমানেরা ওকে Support ক'রছে, না হয় কথা ছিল তাও না, তারাও ওকে Support করেনা।

সুশীল—তাদের Support ক'রতে বোয়ে গেছে। তারা হিঁদুর দুর্ব্বলতা ভালো রকমই জানে, সুতরাং চাপ্ দিতে তারা কোন কালেই ছাড়বেনা। কেন ছাড়বে ? ওদের যতই দেবে ততই চেপে ধরবে সংসারের নিয়মই তাই।

যোগেন—অজয় বাবু, অজয় বাবু—

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়—তোমরা কি বলো হে ?

সুশীল—আমরা আপনাকেই Support কোরব।

অজয়—কিন্তু All India দিলীপকে কতোয়া দিতে চায়।

মহিম—আমরা All India-র সিদ্ধান্ত হয় Revise করাবো, নয় তো আমরা Solid Block সবে দাঁড়াবো। Pact বন্ধ হ'য়ে গেছে, Pact-এ আর চলবেনা Sir।

অজয়—দিলীপের বাবার মতও বোধ হয় তোমরা জানো ?

অতুল—কৈ না, তা'তো জানিনা! তাঁর মতটা নিশ্চয় শুনে রাখা দরকার,—প্রোপাগাণ্ডায় কাজে লাগতে পারে।

অজয়—শুনে রাখো, কিন্তু Confidential মনে থাকে যেন।

অতুল—Certainly।

(ভদ্রলোকেরা অজয়কে ঘিরিয়া দাড়াইল)

অজয়—(অল্প গলা খাটো করিয়া কথা বলিতে লাগিল) ওর বাবা এইসব ব্যাপারে এমনই ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন যে উইল কোরে সমস্ত সম্পত্তি থেকে ওকে বঞ্চিত কোরেছেন। সে উইল রেজিষ্ট্রীও হয়ে গেছে। মানে বাপের এক পয়সাও পাবেনা। ব্যাপারটা বোঝ।

মহিম—(আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিল) বন্দেমাতরম্

অজয়—চুপ করো, চেঁচিওনা। ও এখুনি এই দিকেই আসবে। আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।—এমনি ওকে থামিয়ে রাখা চলবেনা। দুর্দ্দাম গতিতে ও চলতে থাকবে। বাধা বিপত্তি ওর কাছে কিছু না। ওকে আটকাতে হ'লে অন্য কোন পন্থাই চ'লবেনা। ওকে আটকাবার একমাত্র অস্ত্র—ওর বাবার উইল। ঐতে ও ভেঙে পড়বে। সুতরাং—

সুশীল—সুতরাং ঐ লাইনেই চালাতে হবে প্রপাগাণ্ডা। ওহে সাংবাদিক, সংবাদটা স্মরণ কোরে রাখো।

(বলিয়া অতুলের স্কন্ধে মৃদু আঘাত করিল)

অতুল—কালই বড়ো বড়ো Caption দিয়ে বার কোরবো :

Bengal Leader's Disinherison !

Astounding Revelation By Father

(যোগেন মুখে একটা আওয়াজ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন দিলীপ আসিতেছে, সকলে স্তব্ধ হইয়া গেল)

(দিলীপের প্রবেশ)

দিলীপ—অজয়, মুসলমানদের দাবী তুমি কি কোরে অগ্রাহ্য কোরতে পার ?

অজয়—ওহে, তোমরা এখন যাও (অন্য সকলের প্রস্থান) মুসলমানদের দাবী অগ্রাহ্য কোরতে চাইনা দিলীপ, তবে মুসলমানদের অযথা আস্কারা দিতেও চাইনা। জাতীয় জীবনে যারা আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে Struggle কোরে এলো তারা রইলো পড়ে, আর যারা কিছুই কোরলনা—বসে বসে শুধু মজা দেখলো, তারা এল ভাগ্ মারতে।

দিলীপ—Struggle তুমি যা কোরেছ শুধু হিন্দুর জন্য করোনি। কোরতে পারনা। করেছ সমগ্র জাতির জন্য। হ'তে পারে জাতীয় আন্দোলনে তারা বিশেষ কিছু কোরতে পারেনি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তুমি তাদের কোনঠাসা ক'রে রেখে দেবে চিরকালের জন্যে !

অজয়—তারা যদি পারে তারা নিজের শক্তির বলে অর্জ্জন করুক ক্ষমতা, বসুক গিয়ে দিল্লীর মসনদে, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে নবাব বানিয়ে দেবার প্রচেষ্টা কোরবনা।

দিলীপ—মসনদে বসবার ক্ষমতা যদি তার না থাকে তোমাকেই হাত ধরে তাকে মসনদে বসিয়ে দিতে হবে। অবাক্ হ'য়ো না, তোমাকেই সাহায্য কোরতে হবে যাতে সে একদিন তার লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে

রে! ওদের শক্তিবান কোরে তোলা মাদের দায় অজয়, দয়া নয়;—একটা National necessity!

অজয়—যে শক্তি তুমি ওদের দান করবে সেই শক্তি দিয়ে ওরা তোমার চ্ছেদ কোরবে। এই ওদের History,

দিলীপ—মানুষের কখনও এরকম History হ'তে পারেনা। ওরা তোমার ঙ্গে বিরোধ করে শক্তিবান বলে নয়; বরোধ করে, শক্তিহীন বলেই। ওদের ভয়, াবনা, হিন্দুরা ওদের Crush ক'রে ফলবে। এ ভাবনা যদি ওদের না থাকতো, রাও তোমার সঙ্গে সমান তালে জাতীয়তার থে এগিয়ে আসতো।

অজয়—কিন্তু হিন্দুরা ওদের Crush ক'রতে চায়নি, সে চেষ্টা বরং ওরাই কোরে এসেছে।

দিলীপ—হিন্দুরাও চেয়েছে অজয়, তবে হিন্দুদের Policy অন্যরকম। হিন্দুরা Social Boycott চালিয়ে ওদের যতখানি ক্ষতি করতে পেরেছে, ওরা লাঠি চালিয়ে তার সিকির সিকিও পারবেনা!

অজয়—Social Boycott চালিয়েছে হিন্দুরা? তুমি তো হিন্দুদের সবই দোষ দখছো। তার চেয়ে বরং—

দিলীপ—যা দেখছি তা বলবো। একজন মুসলমান পানওয়ালা নিজেকে মুসলমান ব'লে না জাহির কোরে যদি কোন হিন্দুকে পান বেচে ফেলে?

দিলীপ—তুমি কল্পনা কোরতে পারবেনা কী ভীষণ Riot বেধে যায় রাওলপিণ্ডির ত যায়গায়! তুমি কল্পনা কোরতে পারবে । একজন বাঙালী হিন্দুকে কী নির্য্যাতন হ্য কোরতে হ'য়েছিল লাহোরগামী এক ট্রেনের কমপার্টমেণ্টের ভেতর, মুসলমান এক দকারের কাছ থেকে তার খাবার কেনবার ধৃষ্টতা হয়েছিল বলে!—আজকের কংগ্রেসের মহানুভবতা দেশের লোকের মধ্যে বরাবরই ছিলনা অজয়, আজও আছে কিনা ঘোর সন্দেহের বিষয়। ওরা Communal এ কথা সত্য। কিন্তু নিজেদের Communalism-এর ঘোরও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। ওরাই বা পারবে কি ক'রে?

(যোগেন প্রভৃতির প্রবেশ)

যোগেন—মশাই, মাফ্ কোরবেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো। আপনার পিতাঠাকুর মহাশয় কি এই রকম উদ্ভট মতামতের জন্যই তাঁর সম্পত্তি থেকে আপনাকে বঞ্চিত কোরেছেন?

অজয়—আঃ! Personal কথা এখানে তুমি কেন নিয়ে আসছো যোগেন?

যোগেন—Leader যারা তাদের Personal খবরগুলোও দেশের লোকের জানবার অধিকার আছে। সেই গুলোই আসল খবর।

অজয়—না, নেই। ওঁর বাড়ীতে কি হচ্ছে তুমি সে সব জানবার দাবী করতে পার না।

দিলীপ—আপনি ঠিক বলেছেন যোগেন বাবু—Leader যারা তাদের সব খবরই দেশের লোকের জানা দরকার। বলুন, কি আপনি জানতে চান?

যোগেন—কাশীশ্বর বাবু আপনাকে disinherit কোরেছেন?

দিলীপ—হ্যাঁ।

মহিম—আমরা কি জানতে পারি কেন তিনি এ কাজ করেছেন?

দিলীপ—তাঁর ইচ্ছা। প্রত্যেক লোকেরই একটা স্বাধীন মত আছে। তিনি সেই মত অনুযায়ী কাজ করেছেন।

অতুল—কিন্তু আপনি তাঁর বড়ো ছেলে। দেশ জোড়া আপনার খ্যাতি। আপনার বিরুদ্ধে তাঁর এমন কি নালিশ থাকতে পারে যাতে কোরে তিনি এই কাজ কোরতে পেরেছেন?

দিলীপ—আমি নিজেই তা জানিনা অতুলবাবু।

অতুল—কিন্তু আমাদের তা জানা দরকার।

অজয়—এ সব আলোচনা কি বন্ধ থাকতে পারে না হে? Political field-এ এসব কথা কেন?

যোগেন—Sir, Social aspect বাদ দিয়ে নিছক Political কারবার আমরা কোরতেও চাইনা, কাউকে কোরতে দিতেও চাইনা। নীতিজ্ঞানহীন কোন রাজনৈতিক পণ্ডিতও যদি Public Platform-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা কোরতে আসে, আমরা তা বরদাস্ত কোরতে পারবো না!

(এই কথা বলিয়া আড়চোখে দিলীপের দিকে চাহিল)

অজয়—সে কথা ঠিক।

সুশীল—গরীব দুঃখীর টাকাটা ফণ্ডে লাগিয়ে দিয়ে নিজের টাকাটা বেনামী কোরে রাখলেন না ত'?

(সকলে হাসিয়া উঠিল)

দিলীপ—না, এ অভ্যাস আমার নেই সুশীল বাবু।

যোগেন—টাকাটা বদখেয়ালে উড়িয়ে দেন এমন ভয়ও বোধ করি কাশীশ্বর বাবুর নেই?

দিলীপ—তাও বোধ হয় নেই।

মহিম—অথচ সেই রকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হ'য়ে গেল! বাহাদুরী আছে!

দিলীপ—(মহিমের হাত চাপিয়া ধরিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল) আমার বাবা তাঁর বিষয় সম্পত্তি কি কোরেছেন, তার জন্য কি আমি দায়ী?

অজয়—তুমি দায়ী হ'তে যাবে কেন। ওঁরা বলছেন কি রকম type-এর লোক আমাদের জাতীয় জীবনে নেতৃত্ব করবার

উপযুক্ত, সেটা ওঁরা বিচার কোরে দেখে রাখতে চান।

দিলীপ—ও! কিন্তু আমার বাবা যদি তাঁর সমস্ত আমার নামে লিখে দিতেন, তা হলেই কি আমি নেতা হিসেবে অকলঙ্ক হ'তে পারতাম?

অজয়—Not necessarily. সম্পত্তি লিখে দেওয়া এক জিনিষ আর সম্পত্তি থেকে disinherit করা আর এক জিনিষ। উপস্থিত ক্ষেত্রে সোজা কথায় দাঁড়াচ্ছে—তুমি তোমার বাবার ত্যজ্য পুত্র। এরা বলছেন, এ রকম লোক, কংগ্রেসী গদীতে না বসলেই ভালো।—এসো যোগেন।

(অজয় প্রভৃতির প্রস্থান)

(দিলীপ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নেপথ্যে ধ্বনিত হইল 'জয়, অজয় কুমার কি জয়। প্রবেশ করিল সুনীলা)

সুনীলা—একলা দাঁড়িয়ে কি ভাবছো?

দিলীপ—ভাবছি। কিন্তু কি ভাবছি তার একটা পরিস্কার ধারণা কোরতে পারছি না। কতক কথা বুঝতে পারছি, কতক কোথায় তলিয়ে রয়েছে!…

(বেগে দুইজন গুণ্ডার প্রবেশ)

প্রথম—কিসকো নাম দিলীপ?

দিলীপ—হামারা নাম দিলীপ।

দ্বিতীয়—মুসলমানকো নাম লিয়ে পত্রিকামে কৌন লিখা?

দিলীপ—হাম লিখা।

প্রথম—লিখা যব তব জাহান্নমে যানে হোগা।

(বলিয়াই ক্ষিপ্র গতিতে দিলীপের মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল। সুনীলা স্তম্ভিত সুতরাং কোন বাধাই সে দিতে পারিল না, কিন্তু লোকটা দ্বিতীয় আঘাত করিবার সময় সুনীলা প্রাণপণে তাহার লাঠি চাপিয়া ধরিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল—খবরদার! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

সুনীলা—Volunteers! শীঘ্র! গুণ্ডা! দিলীপবাবু আহত!

(গুণ্ডাদ্বয়ের দ্রুত প্রস্থান এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই volunteersগণ, রহমৎ ও বিস্তর লোকজন সব ছুটিয়া আসিল)

সুনীলা—(তখনও সে হাঁপাইতেছে) শীঘ্র ছুটে যাও। দু'জন মুসলমান। ধরে আনা চাই—শীঘ্র যাও।

(জনকয়েক volunteers ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

দিলীপ—না, না—তারা যাক্। তাদের যেতে দাও।

(বলিয়া প্রহৃত স্থান হইতে হাতখানি সরাইয়া বারণ করিতে উদ্যত হইল এবং মুহূর্ত্তেই চোখে পড়িল সমস্ত স্থানটি রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে)

রহমৎ—কিছুতেই না দিলীপ। তারা মুসলমান হ'য়ে মুসলমান জাতির উপর কলঙ্ক লেপন কোরে চলে গেল। তাদের শাস্তি হওয়া চাই। —Exemplary Punishment.

দিলীপ—রহমৎ, তারা মুসলমান নয়।

সুনীলা—তারা মুসলমান।

রহমৎ—তারা মুসলমান, আমি নিজে দেখেছি।

দিলীপ—তারা শুধু ভারতবর্ষের সন্তান রহমৎ!—এ ছাড়া তারা মুসলমান কি তারা হিন্দু—এ আমি দেখতে চাইনা। ভারতবর্ষের সন্তান—এ ছাড়া তাদের অন্য কোন গোত্র, বা পরিচয় আমার কাছে নেই। তাদের যেতে দাও।

রহমৎ—দিলীপ, সমগ্র মুস্লিম্ সমাজের তুমি অভিনন্দন গ্রহন করো।—বন্দেমাতরম্!

দিলীপ—(মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল) বন্দেমাতরম্! (মৃদু হাসিয়া বলিল) আল্লা-হো-আকবর!

সুনীলা—কিন্তু শীঘ্র একে বাড়ী নিয়ে যাওয়া দরকার। আর দেরী করা কিছুতেই চলবে না।

স্মৃতি

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরা'তে বাহুর মালা তোমারে এখন
সুযোগ না'হিক মোর। পুষ্পমালা তাই
প্রতিদিন সখী করে করি সমর্পণ।—
হয় তো বা কোন দিন, যেথা তব ঠাঁই
সাহাজে-মিলন ক্ষণে সেথায় তোমার,
কুমুদীরে দিবে শশী চুম্বন যখন,
মালিকা লাগিবে গিয়ে বুকেতে তোমার,
হয়তো লভিবে তব কুচ-পরশন।
মরুভূমি সহেছে বহ্নির মাঝার
বিকশিত হ'য়ে রহে যথা মরূদ্যান,
দুঃখ-ঝড়-উপদ্রুত জীবনে আমার
উর্দ্ধশিখ তব স্মৃতি আজো দীপ্যমান।
"ঘর করি" তারে লয়ে আমি বারোমাস;
মিটাই সে মরূদ্যা'নে কাশ্মীর-পিয়াস।

রহমৎ—হ্যাঁ, শীঘ্র নিয়ে চলুন, উনিও আর দাঁড়াতে পারছেন না।

সুনীলা—তুমি এইটুকু হেঁটে যেতে পারবেত'?

দিলীপ—পারবো, কিন্তু বাড়ী ছাড়া আমার আর কোথাও নিয়ে যাওয়া যায়না সুনীলা?

সুনীলা—হাঁসপাতালে যাবে?

দিলীপ—সে বরং ভালো, তাই চলো।—কিন্তু না,—কার উপর অভিমান কোরবো আমি! মা আমার জন্যে বসে আছে! বাড়ীতেই নিয়ে চলো সুনীলা।

সুনীলা—চলো।

সুনীলা দিলীপকে লইয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। অনুসরণ করিয়া চলিল সমবেত জনতা। Volunteers-রা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে যাইলে দিলীপ হাত তুলিয়া স্তব্ধ থাকিতে মিনতি জানাইল। ধীরে ধীরে সকলে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)
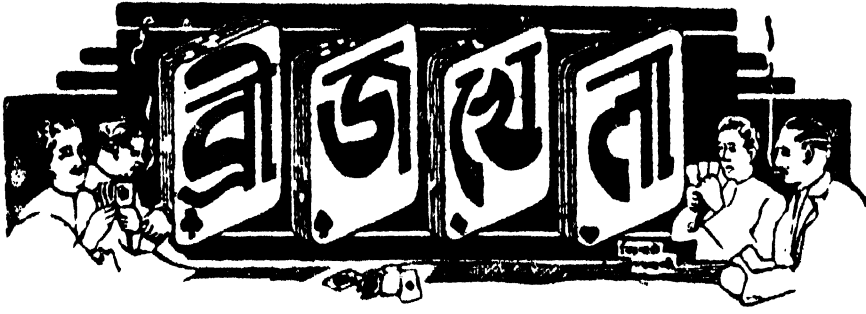
শ্রীদুর্ব্বাসা

একটির ডাকের জবাবে তিনটির ডাক:—খেলোয়াড়দের মধ্যে আমরা ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত তিনটির ডাক দিতে প্রায়ই দেখে থাকি। অনেক সময় দেখা যায় ক্রোড়কের হাতে খেঁড়ীর কথিত রঙের চারখানা তাস থাকলে এবং অন্য রঙের একখানি থাকলেই তৎক্ষণাৎ সেই কথিত রঙে তিনটি ডেকে দেন, ফলে খেঁড়ী ডাক শুনেই চারটির ডাক দিতে বাধ্য হন। কারণ যে কোন রঙে একটি ডাক দেবার পর সেই রঙে তিনটির ডাক দিলেই ডাকটি হয় শক্তি ব্যঞ্জক এবং তদুত্তরে সেই রঙে চারটির ডাক দেওয়া খেঁড়ীর পক্ষে বাধ্যতা মূলক। সুতরাং হাতের কিরূপ অবস্থা থাকলে খেঁড়ীর একটির ডাকের উপর সেই রঙে তিনটির ডাক দেওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) ন্যূনকল্পে হাতে গোলাম সমেত চারখানি রঙ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(২) অন্য কোন রঙে একক তাস ও দুইখানি অনারের পিট থাকা আবশ্যক। কিন্তু অন্য রঙে একক তাসের পরিবর্ত্তে দ্বৈত তাস থাকলে আড়াইখানি অনারের পিট থাকা দরকার।

(৩) যদি হাতের বিভাগ ৪-৩-৩-৩ হয় তা'হলে তিনটির ডাক ডাকতে গেলে তিনখানি অনারের পিট থাকা চাই।

হাতের অবস্থা পূর্ব্বোক্তরূপ না হলে ডাকদারের একটি ডাকে একেবারে তিনটির ডাক দেওয়া কখনও উচিত নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় ডাকদার হয় তো ন্যূনতম অনারের পিট নিয়ে এই ডাক্ ডেকেছেন। এই জন্যে হাতে উল্লিখিতরূপ তাস থাকা সত্ত্বেও ডাকদারের একটি ডাকের জবাবে তিনটির ডাক দেবার অগ্রে ডাকযোগ্য অন্য রঙ থাকলে বা কোন Shaded Suit থাকলে সেই রঙে ডাক দেওয়াই কর্ত্তব্য। এতদ্বারা ডাকদারের হাতের অবস্থা সুবিধা জনক কি না অনায়াসে বুঝা যায়। মনে করুন আপনার খেঁড়ী একটা ইস্কাবন ডেকেছেন, আর আপনার হাত এসেছে এরূপ,

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, ×, × ; হরতন—টেক্কা, বিবি ; রুহিতন—আটা, সাতা, ছক্কা ; চিড়িতন—সাহেব, নয়, পঞ্জা, চৌকা।

তাহলে একটি ইস্কাবন ডাকের উত্তরে আপনি অনায়াসেই তিনটি ডাকতে পারেন কিন্তু তবু আপনি ঐ রূপ ডাক না দিয়ে দুইটি চিড়িতন ডাকবেন। অতঃপর যদি আপনার খেঁড়ী দুইটি হরতন বা দুইটি রুহিতন ডাকেন আপনি তদুত্তরে তিনটি ইস্কাবন ডাকবেন, কিন্তু যদি আপনার খেঁড়ী দুইটি ফেরাই বা দুটি ইস্কাবন ডাকেন তাহলে আপনি একেবারে চারখানি ইস্কাবন ডেকে যেতে পারেন। এখন একটা কথা উঠতে পারে যে ডাকদার যদি ডাক ছেড়ে দেন তাহলে কি হবে? তার উত্তর এই যে যদি কোন রঙে ডাক দেবার পর তাঁর খেঁড়ী অন্য রঙে সেই ডাকটি বাঁচিয়ে যান, তাহলে প্রথম ব্যক্তি যে কোন প্রকারে ঐ ডাক বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হবেন, কেন না এই ডাকগুলিকে একটি বারের মত শক্তি ব্যঞ্জক ডাক বলা হয় (One round forcing)। আবার দেখুন আপনার খেঁড়ী একটি হরতনে ডাক দিয়েছেন, আর আপনার হাত হচ্ছে নিম্নলিখিতরূপ,

ইস্কাবন—টেক্কা, ×, ×, × ; হরতন—গোলাম, সাতা, ছক্কা, তিরি ; রুহিতন—× ; চিড়িতন—টেক্কা, ছক্কা, চৌকা, দুরি।

এ ক্ষেত্রেও আপনার পক্ষে তিনটি হরতনে ডাক দেওয়ার চেয়ে একটি ইস্কাবনে ডাক দেওয়া ভাল। ইহার উত্তরে ডাকদার যদি একটি ফেরাই, দুটি রুহিতন বা দুইটি চিড়িতন বলেন আপনি তিনটি হরতন ডেকে নিয়ে ডাকটি রক্ষা করবেন। কিন্তু ডাকদার যদি দুইটি হরতন বলেন, তবে আপনি চারটি হরতন ডেকে ডাক শেষ করবেন। উপরের অবস্থা দেখে এইবার আপনারা বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে খেঁড়ীর একটি ডাকে কি ভাবে তিনটির ডাক দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ। এ স্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যদি খেঁড়ীর কথিত রঙের অনারের পিট আপনার হাতে থাকে, তবে সেই রঙের ডাক সহসা তিনের পর্য্যায় না তুলে বেশীর ভাগ দুয়ের পর্য্যায়েই রাখা ভাল। মনে করুন আপনার খেঁড়ী একটি ইস্কাবন ডেকেছেন আর আপনার হাতখানি এই ধরণের,—

(ক) ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ, চৌকা ; হরতন—ছক্কা ; রুহিতন—আটা, ছক্কা, চৌকা, দুরি ; চিড়িতন—গোলাম, আটা, পঞ্জা, তিরি।

(খ) ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, গোলাম, × ; হরতন—সাতা; তিরি ; রুহিতন—টেক্কা, পঞ্জা, চৌকা ; চিড়িতন—সাতা, ছক্কা, তিরি, দুরি।

তাহলে দুয়ের পর্য্যায় ডাক রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি হাতখানি নিম্নরূপ হয়,

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব বিবি, × ; হরতন—সাতা, তিরি ; রুহিতন—সাহেব, সাতা, পঞ্জা, চৌকা ; চিড়িতন—বিবি, আটা, তিরি।

তাহলে দুইটি না ডেকে তিনটির ডাক দেওয়াই বিধেয়। তবে যদি খেঁড়ী কোন গৌণ রঙে ডাক দেন তাহলে সেই ডাক তিনের পর্য্যায় তোলা সর্ব্বক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে তিনটি ফেরাইএর ডাকে খেলা করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়, কারণ গৌণ রঙে ১১খানি পিট না হলে গেম হয়না। অতঃপর নিম্নের হাতগুলি পর্য্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবেন কোন্ কোন্ স্থানে তিনখানি ডাক দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইস্কাবন—আটা ; হরতন—সাহেব, আটা, পঞ্জা, চৌকা ; রুহিতন—টেক্কা, ×, ×, × ; চিড়িতন—সাহেব, সাতা, ছক্কা, দুরি।

এ ক্ষেত্রে একটি হরতন বলাই বিধেয়। কিন্তু নিম্নের হাতগুলিকে সর্ব্বতোভাবে তিনটি রুহিতনে ডাক দেওয়া উচিত।

(অ) ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, ছক্কা ; হরতন—নয়, ছক্কা, চৌকা, দুরি ; রুহিতন—সাহেব, বিবি, সাতা, পঞ্জা, চৌকা ; চিড়িতন—তিরি।

(আ) ইস্কাবন—সাহেব, পঞ্জা, দুরি ; হরতন—আটা, তিরি ; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, সাতা, পঞ্জা ; চিড়িতন—আটা, চৌকা, দুরি।

(ই) ইস্কাবন—ছক্কা ; হরতন—সাহেব, বিবি ; রুহিতন—সাহেব, বিবি, ×, ×, × ; চিড়িতন—বিবি, সাতা, ছক্কা, পঞ্জা।

এই শেষোক্ত তিনটি হাতে ডাকদার যদি তিনটি ফেরাইএর ডাক দেন তো তৎক্ষণাৎ ডাক ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত।
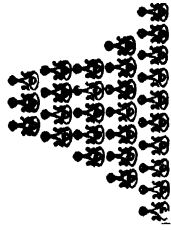
অজানার মায়া

(গল্প)

মন্মথ কুমার চৌধুরী
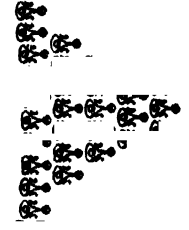
মানুষের ভবিষ্যত কি আর গুণে বলা চলে ?

ঈশ্বরের মতো এ জিনিষটা চিরদিনই আমাদের কাছে রহস্যময়। আমরা সবাই ছুটে চলেছি একটা মৃত্যু-পরিণতির অন্ধ আকর্ষণে। আঁধার রাতে আকাশের বুক থেকে তারা যেমন করে ছিটকে পড়ে, নিমিষেই গভীরতর অন্ধকারের মাঝে নিঃশেষে বিলিয়ে যায়—মানুষ তেমনি যাত্রা করেছে বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতে ডুবে যেতে। এই অনিশ্চিত শক্তির কাছে আমরা অসহায়—ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ানো অপরাধীর মতো ভীরু, অসহায়। তবু আমরা বেঁচে আছি—প্রতিদিন প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টায় আমরা দুর্দ্দম—কারণ না বেঁচে আমরা পারি না। বেঁচে থেকে কি লাভ, কেনই বা এত আয়াস স্বীকার করে বাঁচবো—সে প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কাছে অবান্তর। মানুষ বাচে কেন—এই অসামঞ্জস্য এবং বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ সংসারে মানুষের হাস্যকর বাঁচবার দুরন্ত প্রয়াসের হয়তো কোন হদিস্ খুঁজে পাওয়া যাবে না, তবে এটা সত্যি যে ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা উজ্জ্বল আশা—তা সে যতই কুয়াসাচ্ছন্ন এবং অসম্ভব হোক—মানুষকে নানা দুঃখ সয়েও বেঁচে থাকতে প্রেরণা জুগিয়েছে। ভবিষ্যত চিরকালই আমাদের কাছে অজ্ঞেয়, স্বয়ং বিধাতা ভিন্ন এ জানবার অধিকার আর কারো নেই। আদিম যুগ থেকে ভবিষ্যতকে জানবার দুরূহ চেষ্টা করেছে মানুষ—কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এই অজ্ঞানতার কালো যবনিকা মানুষের চোখের সামনে আজো সমভাবেই টাঙানো রয়েছে। বিংশ-শতাব্দীর অধঃপতিত মানুষের' পরে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে হচ্ছে ভবিষ্যত সম্বন্ধে তা'র এই অন্ধতা। তবু আমরা বাঁচি—অত্যাচার অনাচারে জর্জ্জরিত মানুষ আমরা পশুর মতো বাঁচবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠি—কেন ? আমরা বাচবার আসুরিক ব্যায়াম করি—মানুষ উপাধি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে করযোড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। পরম করুণাময় ঈশ্বর মুখ ফিরিয়ে তাকান না, তবু ভীরু আমরা মরতে সাহস পাইনে। জঘন্যতম কীটের মতো বেঁচে থাকবার অন্ধ উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। কেন ?—কারণ ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদের এই নিচ্ছিদ্র অন্ধতা। আগামী দিনগুলি নিয়ে সবাই আশান্বিত—হয়তো ভগবান মুখ তুলে চাইবেন। দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মতো মূঢ় মানুষ আমরা—ঈশ্বরের সুবিচারে বিশ্বাস করে স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে বর্ত্তমানকে কাটিয়ে দি'। নইলে সুপ্রিয় বাঁচলো কি করে ? এতবড় নিদারুণ ভাগ্য বিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের শুভলগ্ন দিনের প্রত্যাশায় এমনি কঠোর তপস্যা কোরবার শক্তি ওকে দিলে কে ?

সুপ্রিয়ের বাবা ছিলেন জুটমিলের এক জন বড় অংশীদার, ভবানীপুরে ছিল তাদের

সপ্রতিভ ভঙ্গীতে।... ...তারপর—তারপর কাহিনী বাড়িয়ে লাভ নেই। তাদের বিয়ে হয়ে গেলো। কেমন করে তাদের হ'লো পরিচয়—হু'জনের অন্তরঙ্গতা হয়ে এলো নিবিড়,—এ সবের ইতিহাস না বললেও চলে। আসল কথা তা'দের বিয়ে হয়ে গেলো। তা'ও আবার নির্ব্বিবাদে। এতটুকু নির্ঝঞ্ঝাটে হয়তো বিয়ে করা সম্ভব হয়ে উঠতো না। সুপ্রিয়ের বাবা তখন মদের নেশায় জমানো টাকা জলের মতো ঢেলে দিচ্ছেন। ছেলের ইচ্ছাকে প্রতিহত কোরবার মতো মনের বলও তাঁর ছিল না। নইলে যদি থাকতো তাঁ'র আগেকার মতো কঠিন শাসন,—সুপ্রিয়ের ভাগ্যে যে কি জুটতো—থাক্, সে বলে লাভ নেই।

...বিয়ে করে সুপ্রিয় সুখী হয়েছিল। বিয়ের পর মাস কয়েক সব ছেলেই সুখী হয়। সুপ্রিয়ের সুখী হওয়ার কারণটা ছিল একটু ভিন্ন ধরণের। সে সুখী হয়েছিলো রুণু কবিতা লিখতে পারে বলে। বিধাতার সমকক্ষ হওয়ার গৌরবলাভে সব মানুষের চোখে মুখেই আনন্দের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুপ্রিয় স্বপ্ন দেখতো—জেগেও স্বপ্ন দেখতো—তার সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে! সহস্র লোকের নীরব শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ছে—আর তারই পাশে আপনার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়িয়ে আছে রুণু। তার গল্প এবং রুণুর কবিতায় বাংলা সাহিত্যের মর্য্যাদা অনেকখানি বেড়ে যাবে। গোটা দশেক গল্প দিয়ে সুপ্রিয় শীগ্‌গিরই একখানি বই বের করবে। রুণুর অনেকগুলি কবিতাই ত লেখা রয়েছে। ভাগ্যিস্ সে ধনীর ঘরে জন্মেছিলো। নইলে তার প্রতিভার কুঁড়িতেই হতো অপমৃত্যু—খাসরোধ-করে-মরা লোকের মতো শোচনীয় বিবর্ণ অপমৃত্যু।...

...রাত তখন দশটা বেজেছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রুণু তখন প্রসাধন করছিলো। লজ্জা! নিজের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে মানুষ লজ্জায় মরে যায় বুঝি? কোল্ডক্রীম মাখবার বেলা রুণু নিজের অজান্তে সুরের হিল্লোল তুললে।...

সুপ্রিয় একটা গল্প লিখছিলো। বস্তী জীবনের একটা করুণ কাহিনী! গল্পের মাঝখানটায় এসে সুপ্রিয় হোঁচট্ খেয়ে দাঁড়ালো। তার নায়কের তখন সঙ্কট-ঘন মুহূর্ত। কলমটা খাতার'পর ঠেস দিয়ে রেখে—সুপ্রিয় নিজকে ডেক্ চেয়ারে গিলিয়ে দিলে। ফ্যাকাশে নীল রঙের শাড়ীখানা রুণুর গা গড়িয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ছিলো। সুপ্রিয় কথার সমুদ্রে ঢিল ছুড়লে!

"মেয়ে মানুষের ঘুমোবার আগটাই সব চাইতে সর্ব্বনেশে সুন্দর, না রুণু?"

রুণু ফিরে তাকালে। ততক্ষণে হাত দু'টো ওর খোপাতে কাঁটা গুঁজতে ব্যস্ত। সুরটাকে রাতের আদরপনায় গাঢ়তর করে বললে, "শেষ হ'লো তোমার গল্প লেখা? কি ঝকমারি এই গল্প লেখবার। তার চাইতে কবিতা লেখা হাজার গুণে সহজ।" একটা সহজ আরামে ওর স্বর যেন মৃদুকোমল হয়ে এলো!

প্রোফেসররা যেমন করে ছেলেদের উপদেশ দেন—সুপ্রিয় স্বরে একটা তেমনি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য টেনে বললে, "সব বিরাট সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বেদনা—বিপুল বেদনার

ইতিহাস। আর এই গল্প লেখা কঠিন, বেদনার চাইতে ও যা' তীব্রতর" !—নিজের স্বরে ওর নিজেরই হাসি পাচ্ছিল। রুণুর প্রসাধন শেষ হয়ে গেছে।

"পড়েই শোনাও না তোমার গল্পটা," রুণু শব্দের ঢেউ তুললো—"বসে বসে সারমন্ আওড়াতে হবে না।" রুণু পাশের চেয়ারটায় ঝুপ করে বসে পড়লো।

রুণুকে সত্যিই ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। "তা ঘুমোবার আগে সব মেয়েকেই মানায় ভাল।"— সুপ্রিয় যেন মনে মনে কথা গুলিকে উচ্চারণ করলে। "সৌন্দর্য্য জিনিষটা রূপে নয়—বর্ণে নয়, এমন কি গুণেও নয়—এ হচ্ছে একটা কবিতার ছন্দের মতো। বিশিষ্ট পরিবেশে ও জিনিষটা মধুরতর হয়ে দেখা দেয়।" "তা ঘুমোবার আগে"—সুপ্রিয় যেন খুঁজে পাওয়া ছন্দকে বার বার আওড়াচ্ছে —"প্রসাধনের আয়নায় সব মেয়েকেই সুন্দরী মনে হয়। ডুবে যাবার আগে সূর্য্য যেমন ভীষণ ভাবে লাল্‌চে হয়ে দেখা দেয়।"

"আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কি গল্পপড়া হবে নাকি ?"

কথার ঝাঝে রুণু উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

"যখন তখন তোমার মুখের দিকে যদি না তাকাব—তবে কি অপরিচিত মেয়েকে দেখবার জন্তে তোমায় বিয়ে করেছিলুম।"—তরল কণ্ঠস্বরে কথাগুলি যেন লাফিয়ে উঠলো।

"সব সময় যদি তোমার সাথে বসে বসে অভিনয় করতে হয়—তাহলে তোমাকে বিয়ে না করে থিয়েটারে গেলেই পারতুম।"

দু'জনেই হেসে উঠলে—সেই হাসির জোয়ারে তারা যেন সাতার কাটবে।

* * *

অকস্মাৎ একদিন সুপ্রিয়কে পথে দাড়াতে হ'লো। "পথে দাড়ানো কে" বহুব্যবহারে ঐ কথাটার অর্থকে আমরা মামুলী করে তুলেছি। সুপ্রিয়ের অবস্থায় না পড়লে ঠিক অনুভব করা চলে না।—এ যে কী কঠোর সত্য। ঋণের দায়ে তা'দের সব কিছু নীলামে উঠলো......সুপ্রিয় রুণুকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলে। রুণুকে একটা হোটেলে রেখে—সুপ্রিয় বেরিয়ে পড়লো চাক্‌রীর খোঁজে। সাতদিন হাটাহাটির পর জুটমিলের ম্যানেজার দয়া করে একটা চাক্‌রী দিলেন—খুবই অল্প বেতনে—যার টাকার সংখ্যা বলতে রীতিমত লজ্জিত হতে হয়।

সুপ্রিয় উঠে এলো একটা স্যাঁত-স্যাতে গলিতে। এত অল্প বেতনে আর দালান বাড়ীতে বাস করা চলে না। গলিটায় সারাদিন মেঘলাদিনের মতো অন্ধকার। রোদের মুখ দেখতে হলে তপস্যা করতে হয়। তবু তাদের উঠে আস্‌তে হলো।

* * *

বলছিলাম, মানুষ বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্নীল কল্পনায়। তা যদি না হয়—তাহলে সুপ্রিয় বাঁচলো কি করে? রাজৈশ্বর্য্য থেকে পথের ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে সুপ্রিয়ের বাচবার এমন কি প্রলোভন থাকতে পারে। রুণু ! সুপ্রিয়ের দস্তুর মত কান্না পায়।

রাতে রুণু যখন ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বহুদিনের অভ্যাস অনুসারে নিজেকে সাজাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে—সুপ্রিয়ের তখন কি মনে হয়,—রুণু শুন্‌লে হয়তো অভিমানে লাল হয়ে উঠবে, তবু সুপ্রিয়ের মনে হয়—এযেন তাদের বিশ্রী, বীভৎস দারিদ্র্যের প্রতি একটা তীব্র বিদ্রূপ ! ঘুমোবার আগে সেই সব মেয়েরই মুখে ক্রীম মেখে নেওয়া সাজে—পয়সা আছে যাদের প্রচুর,—দু'হাতে খোলাম-কুচির মতো যাদের টাকা ছিটিয়ে দেবার সামর্থ আছে।......রুণুকে ত কিছুতেই বুঝানো যাবেনা। এমনি যা কটা টাকা বেতন—তার মধ্য থেকে যদি ক্রীম্ কিন্‌তেই......অসহ্য ! তবু সুপ্রিয়কে বাঁচতে হবে। এতো জীবন ধারণ নয়, শুধুমাত্র উদর পূর্ত্তি, একটা কুৎসিত পশুক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যে লক্ষ্যহীন অভিসার—ঘৃণিত দাসত্বের কষাঘাতে নিজকে পিষে ফেলা।

......সুপ্রিয়ের অফিস থেকে ফিরে আস্‌তে প্রায় রোজই সন্ধ্যা হয়ে যেতো। আর এই সঙ্কীর্ণ গলিটা ! বিশীর্ণতায় গলিটার চেহারা তখন রুক্ষ, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে তখন বেচা-কেনার কর্কশ কোলাহল। একটু সরে গেলেই মদের আড্ডার হল্লা শুন্‌তে পাওয়া যায়। তার পাশের বাড়ীগুলিতে সার বেধে দাড়িয়ে আছে মেয়েরা.........

চা খেয়ে সন্তর্পণে সুপ্রিয় বাইরের হাওয়ায় এসে দাড়ালে। এই কুৎসিত গলিতেই তাদের থাক্‌তে হবে অনিশ্চিত কাল ধরে। ভাড়াটা যা হোক আশাতীত রকমের কম্—নইলে ত ওরা দু'বেলা পেট পুরে খেয়ে পরে থাক্‌তে পার্‌তোনা।

এতোগুলি মেয়ে দাড়িয়ে আছে......সুপ্রিয় আতঙ্কে চোখ বুজলে। শুধুমাত্র বেঁচে থাক্‌বার যুক্তিহীন লোভে ওরা দাড়িয়েছে পুরুষের কামনার যুপকাষ্ঠে...কিন্তু ওদের চাইতে ওর অবস্থা কি খুবই-উন্নত ? টাকার জন্যে যদি মনকে আমরা বিকিয়ে দিতে পারি—তাহলে দেহ কি মনের চাইতেও পবিত্র। তার কথাই ধরা যাক্‌না কেন। নিজকে সে নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়েছে—জুটমিলের ম্যানেজারের কাছে। তার মাথায় বোমা মার্‌লেও বোধ হয় সে একলাইন লিখতে পার্‌বেনা—লিখবার ইচ্ছাটুকু পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেলেছে। সে পরিণত হয়েছে একটা অন্ধ অটোম্যাটনে। "অটোম্যাটন" কি ভালবাস্‌তে পারে।

(ক্রমশঃ)

দ্রব্যগুণ-সংহিতা—(প্রথম ভাগ)—কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেন কবিরত্ন এম্, এস্-সি প্রণীত—কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন, ২২৩ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ—বাং ১৩৪৪ সাল—পৃঃ ॥৵০+২৩০+১১+৵০—সোনার জলে কাপড়ের বাঁধাই—মূল্য ২॥০ মাত্র।

আমরা আজ স্বরাজ্যলাভের জন্য যতটাই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি না কেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই যে বিদেশীর মুখাপেক্ষা করিতে হয়—তাহা অস্বীকারের উপায় নাই। আমাদের অশন-বসন-চাল-চলন প্রত্যেক বিষয়েই আমরা পরতন্ত্র। ইহার মধ্য হইতে মাত্র বসন-সমস্যাটির সমাধান কল্পে মহাত্মা গান্ধি যে চরকারূপ মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের জনসাধারণ কিছু জাগরূক হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভের দিন এখনও সুদূর।

চিকিৎসাজগতেও আমরা এইরূপ বিশেষভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া আছি। গত এক শত বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান এদেশবাসীর চিত্তকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, বাড়ীর দুগ্ধপোষ্য শিশুটিও দুইবার হাঁচিলে একজন পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদকে ডাকাইয়া বিদেশের চিকিৎসালয়ে বৈদেশিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ (যে ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ঐ পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাভিজ্ঞেরও নিজ ব্যক্তিগত কোনরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নাই) খাওয়াইয়া (বা দেহমধ্যে আসুরিক প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া) স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি যে, রীতিমত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা করা যাইতেছে—ইহাতেও যদি রোগী না বাঁচে তাহা হইলে তাহার না বাঁচারই প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান সমালোচকও যে 'এই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম তাহা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন না। আচ্ছা, ঔষধের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল; কিন্তু পথ্য সম্বন্ধেও যখন উক্ত চিকিৎসকপুঙ্গব ব্যবস্থা করেন যে, অমুক বিদেশী চিকিৎসাগারের প্রস্তুত বোতলাবদ্ধ অমুক প্রকার তরল, অর্দ্ধতরল বা কঠিন খাদ্য সেবন না করিলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পথ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবেনা, ও তাহার ফলে রোগীর ঔষধান্ত চিকিৎসা ফলপ্রসূ হইতেই পারে না,—তখনও আমরা সোৎসাহে তাঁহার নিকট হইতে বহুমূল্য-ক্রীত বিধানের অনুমোদন করিয়া থাকি। একবারও ভাবিয়া দেখিনা যে—এই ভাগ্যহত অবৈজ্ঞানিক দেশে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে রোগ হইলে তৎকালীন বিজ্ঞানবিহীন চিকিৎসক-নামধারিগণ রোগীকে কিরূপ ঔষধ ও পথ্য দিতেন, আর তাহাতে দেশের তদানীন্তন গড়পড়তা মৃত্যু-সংখ্যা বর্ত্তমানের তুলনায় অধিক কি অল্প হইত।

অবশ্য ভাবিবেন না যে, শুধু পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি কটাক্ষ করাই এ সমালোচনাটির একমাত্র উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা করা এ দেশীয় চিকিৎসকগণের বিশিষ্ট কর্ত্তব্য,' ইহা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি ও পথ্য নিয়মন শিক্ষা করিয়া দেশীয় উপাদানে ঔষধ নির্ম্মাণ ও দেশীয় পদ্ধতিতে পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। আর উচিত—সেই সঙ্গে আলোচনা করা যে আপনার নিজস্ব প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্রে তত্তজ্জাতীয় যে সকল ঔষধ-পথ্যাদির বিধান

গ্রন্থ হইতে মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, ও তাহাদের নিম্নে সরল সটীক বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল প্রকরণে আধুনিক খাদ্যাদির বর্ণনা আছে, সেগুলিতেও যাহাতে প্রক্রম ভঙ্গ না হয়—এজন্য কবিরাজ মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ফলে "নিমুকী" (নিম্‌কী), "কুণ্ডলিনী" (জিলাপী) হইতে আরম্ভ করিয়া "মৎস্য-ঝালঃ" (মাছের ঝাল), মায়—"ঘৃতপোচঃ" (আমলেট) প্রভৃতি খাদ্যেরও প্রস্তুত পদ্ধতি ও গুণাগুণ সংস্কৃত শ্লোকাকারে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা শাস্ত্রে অনুক্ত খাদ্য খাইতে এখনও কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করেন অথচ লোভ পূর্ণ মাত্রায় আছে, কবিরাজ মহাশয়ের গ্রন্থ তাঁহাদিগের বিশেষ বলাধান করিবে।

গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বে "পরিশিষ্ট" অংশে "পাশ্চাত্য মতে খাদ্য বিজ্ঞান" সংযোজিত করিয়া কবিরাজ মহাশয় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাব-সম্মেলন ঘটাইয়াছেন। ইহার পরে আর পাশ্চাত্য চিকিৎসাভিজ্ঞগণ গ্রন্থখানিকে অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

গ্রন্থখানি যাহাতে সাধারণ পাঠকের নিকট সহজ বোধ্য হয় ও সকলেরই উপকারে লাগে, সেজন্য কবিরাজ মহাশয় চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ছাপা, বাধাই, কাগজ ভাল। কিন্তু আড়াই টাকা মূল্যটি সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু অধিক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, আমরা এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

"প্রিয়দর্শী"

প্রতিজ্ঞা

হিল্লোল কুমার মিশ্রী

প্রেম ছিল মোর কতো যে গভীর
খুঁজিয়া কভু
পাইনি তল—
আজিকে ঝরে আঁখির জল।
ভুলিয়া গিয়াছি—
তব ভালোবাসা—
ব্যথা হৃদয়েতে—
বাঁধিয়াছে বাসা।
কতো সে রজনী গিয়াছে অমনি
করিয়া ছল—
নীরবে ঝরেছে নয়ন-জল!
ওগো সখী মোর
এমনি করে—
কতো সে কাঁদিব
জীবন ভ'রে—
আঁখির জলেতে করে কী স্নান—
মেটেনি আশ—
করেছি ব্যজন দীর্ঘ শ্বাস।

(২)

তোমারে বাসিয়া ভালো—
হৃদয়ে কোথায় জ্বলিবে আলো—
তাহা নয় হায়; পাইনে দিশা!
নিভেছে দেউটী, এখন নিশা!
আরকী আমায় বুকের মাঝেতে—
পারনা লইতে প্রিয়া—
আরকী পারোনা বাসিতে ভালো—
সকল হৃদয় দিয়া!
তব অবহেলা দুঃসহ চাপে—
করে মোরে নিষ্পেষণ—
উদাসীন ভাব সময়েতে—
কাঁদায় আমার মন!
জানিনা করেছি কী দোষ আমি যে
তোমার কাছেতে সখি—
ঝরায়ে আমার ব্যথা আঁখি-জল
খুব সুখ পাও নাকি?
তবে তাই হোক কাঁদিব অমনি
ঝরায়ে অশ্রু ধারা—
বেদনারে নিয়ে বুকের মাঝারে—
থাকিব আত্মহারা!

রাধা ফিল্মসের পরিচালনায় তোলা মতিমহল থিয়েটার লিমিটেডের "বেকার নাশন" চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী রাণীবালা।
প্রয়োগ-শিল্পী : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালক

টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, সপ্তবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০শে আষাঢ় ১৩৪৫, ৭ই জুলাই ১৯৩

আদান প্রদান

কলিকাতা কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে যে আদান প্রদানের সূচনা হইয়াছে তাহা নানা কারণে বিশেষ বিশ্লেষণ-যোগ্য। শিক্ষা-সচীব ও এ্যাসেসার পদ সম্বন্ধে ভাগ-বাঁটোয়ারার গবেষণা সুরু হইয়াছে। মিঃ শৈলেন ঘোষের পদচ্যুতির অন্তরালে মিসেস্ সেনগুপ্তা ও মিঃ নিশিথ সেনের অভিলাষ এই যে মিঃ ঘোষের বিদায়ের পর মিঃ আর, এম্, সেনগুপ্তকে ঐ পদে বাহাল করা। মিঃ সেনগুপ্ত সম্প্রতি মাদ্রাজী মহিলার পানিগ্রহণ করিয়া অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ জীবনে দীক্ষিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মিসেস্ সেনগুপ্তার সচেতন হওয়াই স্বাভাবিক।

অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের পক্ষে কিছু অর্থ উপার্জ্জন প্রয়োজন কারণ একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত কিরণবাবু কংগ্রেসী রাজনীতিতে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সেই আত্মনিয়োগ কংগ্রেসী কোন্দল বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে কিনা সে বিষয়ে তীব্র মতদ্বৈধতা থাকিলেও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক দিক হইতে তাঁহার সততা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীর আয়ে ক্রমবর্দ্ধমান সাংসারিক দায়িত্বের সুচারু সমাধান হওয়া সম্ভবপর নহে সুতরাং তাঁহার পক্ষে সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের আকাঙ্খা কোনমতেই উপেক্ষনীয় নহে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে তাঁহাকে কিভাবে প্রতিপালন করা যাইতে পারে? ওয়াকিবহাল মহলে প্রকাশ যে তিনি শিক্ষা-সচীবের পদ অপেক্ষা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুনালের এ্যাসেসার পদের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মিঃ নিশীথ সেন মহাশয়ের সহিত এইরূপ একটা আদান-প্রদানের কথাবার্ত্তা চলিতেছে যে মিঃ সেনের উপদল যদি কিরণবাবুকে এ্যাসেসার পদের জন্য সমর্থন করেন তাহা হইলে কিরণবাবুর পক্ষীয় উপদল মিঃ আর, এম্, সেনগুপ্তকে শিক্ষা-সচীব পদে সমর্থন করিবেন। এই কথাবার্ত্তা যদি সার্থক হয় তাহা হইলে কিরণ বাবু ও মিঃ সেনগুপ্তের অভিলাষ যে সফল হইবে তাহা নিশ্চিত। মিঃ সেনগুপ্ত উক্ত পদ বা অনুরূপ কোন পদ লাভ করিলে কাহারও কিছু বলিবার নাই কারণ তিনি শান্তিপ্রিয় নির্ব্বিরোধী পুরুষ কিন্তু কিরণ বাবু এ্যাসেসারির পদ পাইলে বাংলা কংগ্রেসের কলহ অধিকতর জটিলভাবে দেখা দিবে কারণ একে কিরণবাবুর প্রতিভা তাহার উপর অর্থ-স্বাচ্ছল্য। এই দুইয়ের সমাবেশ কিরণবাবুকে বাংলা কংগ্রেসে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবে! মজুমদার-দল কি স্বেচ্ছায় আত্ম-হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? মিঃ নিশীথ সেনকে সংযত করিতে কি পরিতোষ বাবু প্রভৃতি অক্ষম?

বিগত এ্যাসেম্ব্লি নির্ব্বাচনের সময় মিঃ যোগেশ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত গোপন চুক্তি করিয়া ধীরেশবাবুর মনোনয়ন প্রসঙ্গে কিরণবাবু গুপ্ত সাহেবের সমর্থন লাভ করেন। বর্ত্তমানে তীক্ষ্ণ চতুরতার সহিত মিঃ নিশীথ সেনের সমর্থন লাভের চেষ্টা চলিতেছে। মজুমদার-দলের সংহতি যদি এইরূপভাবে নষ্ট হইয়া

যায় তাহা হইলে বাংলার কংগ্রেসে তাঁহাদের প্রাধান্য খর্ব্ব হইতে হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। উত্তর কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদার ও শ্রীহেমন্ত বসুর মধ্যে যে মনোমালিন্যের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে তাহা কোন মতেই সমর্থন-যোগ্য নহে। উত্তর কলিকাতায় কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের আশু প্রয়োজন তাঁহারা যেন এই অশোভনীয় রেষারেষী পরিহার করেন। তাহা না করিলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের দলগত শক্তি একেবারে লোপ পাইবে এবং কিরণবাবুর উপদলের শক্তি অপরিসীমভাবে বৃদ্ধি পাইবে? মজুমদার-দলের বাহক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় কি এ' বিষয়ে অবহিত হইবেন, না তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত-জনিত বিতৃষ্ণাবশতঃ রাজনীতি হইতে দূরে চলিয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছেন? সুরেশবাবুকে কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে রাজনীতিতে অভিমানের স্থান নাই। সংসার-বিড়ম্বনা-মুক্ত সুরেশবাবুর পক্ষে বিতৃষ্ণা-ক্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। আমরা আশা করি তিনি পুনরায় সবল চিত্তে কংগ্রেসী রাজনীতিতে মনোনিবেশ করিবেন।

•:(×):•

ইঙ্গ-ফরাসীয় আঁতাত এবং ফ্রেঞ্চ ফরেন পলিসি

সচী শীল

গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বৃটেন যে পথ দেখাচ্ছে ফ্রান্স তাকে অনেকটা অন্ধের মতই অনুসরণ করছে। এক কথায়—France is in the leading strings of Britain. ফ্রান্সের এ অবস্থা হল কেন? বৃটেনের সঙ্গে তার এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধটা তার পক্ষে কতকটা মঙ্গলজনক হয়েছে? বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতি সজ্ঞানে সর্ব্বনাশের দিকে প্রবাহিত। ফ্রান্স যদি সত্যিই বৃটেনকে আপন করে দেখে ত তার উচিত সর্ব্বনাশ থেকে বৃটেনকে রক্ষা করা, এবং রক্ষা করতে গিয়ে যদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অপ্রিয় কিছু করতে হয় ত বিনা দ্বিধায় তা করতে হবে। একথা ত সত্যি—One has got to be cruel in order to be kind.

শুধু বৃটেনকে রক্ষা করার কথা বলছি না, ফ্রান্সের নিজের স্বার্থও এর মধ্যে গূঢ়ভাবে জড়িত। সেই স্বার্থের দিকে চেয়েও কি ফ্রান্সের উচিত এখনও বৃটেনকে follow করা?

এই থেকে অনেক কথা উঠে পড়ে। ফ্রান্স নাকি বৃটেনকে অনুসরণ করতে বাধ্য, কারণ বিপদে গতে কাছাকাছি এক বৃটেনই আছে যে তাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এমন বন্ধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়া মানে পশ্চিম ইউরোপে তার নেহাৎ একলা পড়ে যাওয়া। ইঙ্গ-ফরাসীর বিচ্ছেদের কথা ফরাসীরা মোটেই ভাবতে পারে না।

এ কথা সত্যি মানলুম। কিন্তু তার সঙ্গে একথাও ত সত্যি যে বৃটেনও ফ্রান্সের বন্ধুত্বকে বিসর্জ্জন দিতে পারে না; ফ্রান্সের যেমন বৃটেনকে দরকার, বৃটেনেরও তেমনি ফ্রান্সকে দরকার। দুয়েরই স্বার্থ এক। পরস্পরের স্বার্থ যখন এরকম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তখন একপক্ষ ভুল করলে অপরপক্ষের অধিকার ও ক্ষমতা আছে তাকে ভুলের পথ থেকে টেনে আনবার। Anglo-French Entente এর এই perspectiveটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি ফ্রান্সের কর্ত্তারা।

বৃটেনকে বন্ধু হিসেবে হারাবার কোন ভয়ই নেই ফ্রান্সের। ফ্রান্স যদি এখন নিজেকে এবং চ্যানেল-পারের বন্ধুটিকে বাঁচাতে চায় ত তার উচিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে যখন কোন Major policy নির্দ্ধারণ করবার কথা উঠবে, তখন লণ্ডনের কাছে উপদেশ না চাওয়া। আমি অবশ্য এখনকার চেম্বারলেন-গভর্ণমেণ্টের কাণ্ড বিবেচনা করেই এ সব কথা বলছি।

গত এপ্রিল মাসের ২৮শে তারিখে ইঙ্গ-ফরাসীর বৈঠক হয়েছিল। তাতে চেকোস্লোভাকিয়া ও স্পেনের কথাই বিশেষ করে আলোচনার বিষয়-বস্তু ছিল। চেম্বারলেন সাহেব ইঙ্গ-ইটালীয় চুক্তিকে practical effect দেবার জন্যই এত আয়োজন করে ফরাসী মন্ত্রীদের সঙ্গে জোর কথাবার্ত্তা চালিয়েছিলেন। স্পেনের ব্যাপারটাই হচ্ছে Key issue in the whole game. তাই M. Daladier better termএর জন্য fight করা সত্ত্বেও চেম্বারলেন সাহেব জোর করে ফ্রান্সকে বৃটেনের সঙ্গে স্পেনের ব্যাপারে একমত হতে রাজী করিয়েছিলেন এবং গভর্ণমেণ্ট পক্ষের বৃটিশ-প্রেস ফরাসী মন্ত্রীদের বেশ করে পিঠ চাপড়ে বলেছিল—"Congratulations on your good sense. ডেলি টেলিগ্রাফ বলেছিল—"France has a Premier with a magic wand"

কিন্তু কী মূল্য দিয়ে যে এই সব প্রশংসা-বাণী কিনতে হয়েছিল তা ফরাসী মন্ত্রীরা বেশ ভাল করেই মনে রাখবেন।

Hon Ivor Montagu এই সম্বন্ধে আসল সত্যি কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন: "For a heavy price France has bought co-operation with the British military, naval and air forces. The bargaining was done in an atmosphere menacing through its velvet courtesy. A night at Windsor Castle was thrown in to gild the pill."

আসল প্রশ্ন হচ্ছে, British Co-operation পাবার জন্য এই "Heavy Price" দেবার প্রয়োজন বা সার্থকতা কোথায়? এই রকম অযথা বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টার ফলে স্পেনে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার শেষ পরিণতি ফ্রান্সের তথা বৃটেনের পক্ষে পরম শোচনীয়। যা হাতের মুঠোতে রয়েছে তাকে দাম দিয়ে কেনার কথা হাস্যকর ছাড়া আর কি হতে পারে? পরন্তু British Co-operation যদি কিনতেই হত, তার জন্য এত বেশী মূল্য কেন? এই political transaction-এর ফলে ফ্রান্সের দুটো সীমান্ত রক্ষা করতে হবে। আগে ছিল শুধু Franco-German Frontier; এখন আর একটা সমস্যা এসে জুটলো: Pyrenees frontier.

আমি অনেকদিন ধরেই বিশ্বাস করে আসছি যে—Anglo-French Entente indissoluble. Baldwin সাহেব পার্লামেন্টে এক স্মরণীয় বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন: "Our frontier is on the Rhine." ভাবের উচ্ছ্বাসে সাধ করে তিনি এ কথা বলেন নি। তাই আমি Hindusthan Review পত্রে "The Gathering World Crisis and the Role of Britain"—শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছিলাম:

"If France follows Britain, she will be landed in disaster. If France pushes ahead independently, Britain is bound to follow her. The opening of the Pyrenees frontier is irresistible at this hour."

আমার এই মতের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি রয়েছে "The Living Age" পত্রের সম্প্রতি প্রকাশিত মন্তব্যে: "Britain's security is so intimately bound up with that of France that she must support her old ally in any emergency, even if the latter should go to war to aid Czechoslovakia or Russia."

ইঙ্গ-ফরাসীর বাঁধন বজায় রাখবার বা শক্ত করবার জন্যে বড় বড় আলোচনার বৈঠক Stage করবার দরকার হয় না। সাহায্যের জন্য বৃটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কোন মানেই হয় না—এ কথা আমার অনেক দিনের বিশ্বাস। ফ্রান্স এগিয়ে গেলে তাকে অনুসরণ করতে এবং বিপদে তাকে সাহায্য করতে বৃটেন বাধ্য—এ কথা তিনমাস আগে আমি বলেছি।

ঠিক এই সত্যি কথাটার ওপর জোর দিয়ে লণ্ডনের বিখ্যাত "Daily Herald" পত্র ২০শে মে তারিখের সংখ্যায় কি বলেছে শুনুন:

"It is a wonder that the French cannot see that at bottom Britain cannot desert them. Whatever Conservative ministers may say in after-dinner speeches, or in the House of Commons, the National Government did not cement the Anglo-French Alliance for love of the blue eyes of the French, or because of "our common ideals of liberty." It has made an alliance with France for the good and simple reason that the defence of France is essential to the security of Britain, that once France was crushed Britain would be helpless."

প্রত্যেক ফরাসীর এটা জেনে রাখা উচিত যে রাইন নদী বৃটেনের outer ring of defence. এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ফ্রান্স অনেক কিছু issue-ই force করতে পারে, চেম্বারলেনের plan-কে torpedo করে দিতে পারে। স্পেনের মধ্য দিয়ে জগতের ডিমক্রেসিকে বাঁচাবার দায়িত্ব একমাত্র ফ্রান্সই এখন নিতে পারে।

কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যান

রেখা দেবী

পৃথিবী বিরাট খেলাঘর।
ভালমন্দ দুই স্রোত মিশে আছে ওতপ্রোত
অভিশাপবেশে কভু আসিতেছে বর।
দেব ও মানবে মেলা যুগে যুগে চলে খেলা
কবির লেখনী মাঝে তাহারি কাহিনী,
আঁধারেতে জ্বালে শিখা সাধনার সলাটিকা
মৃতসঞ্জীবনী সম অমৃতবাহিনী।

শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর ইন্দ্রের তনয়
ধরাতলে ব্যাধবংশে আসি জন্ম লয়
কালকেতু হ'য়ে; আর তার পত্নী ছায়া
ফুল্লরারূপেতে হেথা লভিলেক কায়া'।
কালকেতু মহাবীর—নাহি শক্তি-সীমা,
ফুল্লরা সে শোভাময়ী দেবীর প্রতিমা।
ব্যাধের তনয় ক্রমে হ'ল দলপতি
কিন্তু তার ধীরে ধীরে অহিংসাতে মতি।
প্রাণী-হত্যা হিংসাব্রত ত্যজিয়া তখন
কৃষি কার্য্য করি' করে জীবন ধারণ।

একদা ফুল্লরা আসি কহে ফুল্লমনে
রাজার প্রাসাদে আজি শুনি শুভক্ষণে
দেবীর প্রতিষ্ঠা হবে মহা সমারোহে
দেবীর দর্শনে আজি চল যাব দোঁহে।
কালকেতু কহে মোরা অস্পৃশ্য মহীতে
রাজার প্রাসাদে নাহি দিবে প্রবেশিতে।
ফুল্লরা উতলা অতি—কাতর অশেষে
দেবী দরশনে দোঁহে চলে অবশেষে।
প্রাসাদের দ্বারী নাহি দেয় প্রবেশিতে
অবশেষে যুবরাজ—চোখের ইঙ্গিতে
ছাড়ি দিল দ্বার ছাড়ি—শুধু ফুল্লরারে
আহ্বানিল যুবরাজ অশেষ প্রকারে।
দুষ্টবুদ্ধি বুঝি তার পরুষ বচনে
সম্বোধি ফুল্লরা কহে; স্বামী সেই ক্ষণে
অস্ত্র ধরিবারে যায়; কালকেতু তবে
যুবরাজে বধিতে উদ্যত ঘোর রবে।
ফুল্লরা তাহারে টানি আনে নিজ ঘরে
পতী-পত্নী তপঃসিদ্ধ এক মন ক'রে।
প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যজিবারে চায়
যদি না স্বয়ং দেবী আসিয়া হেথায়
দেখা দেন তাহাদের। দেবী মহামায়া
তপে তুষ্ট হ'য়ে তবে ধরি নিজ কায়া
আবির্ভূতা হইলেন সহসা আসিয়া

সব দুঃখ সব দৈন্য পলকে নাশিয়া
বিরাট বৈভব দিলা, অতুল প্রাসাদ
লভিয়া তপস্যাবলে দেবীর প্রসাদ
কালকেতু রাজা হ'ল—আনন্দ উথলে
ব্যাধরাজ্য মুখরিত কল কোলাহলে।
এই দিন করিবারে চিরস্মরণীয়
কালকেতু সবে মিলি এই বরণীয়
ব্রত নিল—প্রাণীহত্যা আর করিবে না,
মরিবে তবুও কভু অস্ত্র ধরিবে না।

এই দিকে ভাঁড়ু দত্ত বিশারদ কূটতত্ত্ব
যুবরাজ পার্শ্বচর পাষণ্ড মহান্
আসি সেথা ছদ্মবেশে তোষামদে হেসে হেসে
কেতুরে ভুলায়ে তার রাজ্যে অধিষ্ঠান।
নারীমোহে ভুলাইয়া আসবেতে ডুবাইয়া
কেতুরে ভাসায়ে দিল বিভ্রম প্রবাহে
হেথা তার অত্যাচারে কেতুরাজ্য হাহাকারে
ভরিয়া উঠিল, তার খোঁজ কেবা চাহে!
একদা সুযোগ বুঝি নিপুণ কৌশল খুঁজি
ভাঁড়ু দত্ত বন্দী করে কেতু-ফুল্লরারে
যুবরাজ ফুল্লচিত কূট ভাঁড়ু হরষিত
নিক্ষেপ করিল দোঁহে অন্ধকারাগারে।
তারপর কি বাখানি ফুল্লরারে লয়ে টানি
আনিয়া রাখিল কালকেতুর সম্মুখে
তাদের উদ্দেশ্য বুঝে ক্ষুব্ধ বন্দী মুক্তি খুঁজে
শতেক বৃশ্চিক জ্বালা কালকেতু বুকে
একি বিধি ভাগ্যহীন সে-দিন যে ব্রতদিন
অস্ত্র ধরিবার তার নাহিক উপায়
এই হ'ল ভাগ্যদোষে হেরিবে সে ক্ষুব্ধ রোষে
সতীর এ অপমান হ'য়ে নিরুপায়!
নহে নহে কভু নহে হৃদে দেব রক্ত বহে
পলকে ছিঁড়িল কেতু বন্দীর শৃঙ্খল।
কারাগার চুরমার বধিল স্বহস্তে তার
যুবরাজ, ভাঁড়ু দত্ত—প্রহরী সকল।

তারপর ব্রতভঙ্গ মহাশাপ নাশি'
চিতার উপরে দোঁহে উঠে হাসি হাসি
সেইক্ষণে আঁখিজলে সকলে হেরিল
শাপমুক্ত দেব-দেবী স্বর্গেতে চলিল
যে জ্যোতি জ্বালিয়াছিল সেদিন আকাশে
সেই আলো সেই স্মৃতি আজি পটে ভাসে।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্সের
নিবেদন
শ্রী
চিত্রগৃহে
রবীন্দ্রনাথের
চোখের বালি
বিনোদিনী — সুপ্রভা মুখার্জি
শীঘ্রই
আসিতেছে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

—ঘর—

ডাক্তার, কাশীশ্বর ও দ্বিজেন।

ডাক্তার—মাথায় আঘাত বেশী লাগতে পায়নি, কারণ, হাতদিয়ে আট্‌কে ফেলেছিলেন। হাতটাও সেই জন্য বেশ জখম হ'য়েছে।—ব্যবস্থা সব কোরে গেলাম, রাত্রে ঘুমও হবে, ভয়ের কোন কারণ নেই। কাল আট্‌টার সময় আমায় খবর দেবেন।

(ডাক্তার প্রস্থানোদ্যত। দরজার পাশে যোগমায়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি মৃদু শব্দ করিয়া দ্বিজেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন ডাক্তার দাঁড়াইল এবং দ্বিজেন তাঁহার কাছ হইতে মন্তব্যটুকু শুনিয়া আসিয়া ডাক্তারকে বলিল)

দ্বিজেন—মা জিজ্ঞাসা কোরছেন অত কথা কইছে কেন? ভুল ব'কছেনা ত? মাথায় কোন গোলমাল হয়নি ত'?

ডাক্তার—না না, সে সব কিছু নয়। তোমরা তা ব'লে সারবন্দি হ'য়ে ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না। ওষুধের Action-টা শুরু হ'লেই ঘুমিয়ে পড়বে।...... যদি দেখ ঘুমুতে কিছুতেই পারছেনা, খুব ছটফট কোরছে, তা হ'লে অবশ্য আর একটা পুরিয়া দিয়ে দেবে। জ্বরও হয়তো একটু হবে,—তা ওর জন্তে কোন চিন্তা নেই। আচ্ছা—

দ্বিজেন—জ্বর খুব বেশী হ'লে?

ডাক্তার—হবে না।

(ডাক্তার ও দ্বিজেনের প্রস্থান)

(যোগমায়ার প্রবেশ)

কাশী—আবার কি কথা কইছে?

যোগমায়া—সেই একই রকম কথা।—"আমি কি বাবার ত্যাজ্যপুত্র? কি অপরাধে এত বড়ো শাস্তি? টাকাকড়ি আমি চাই না। কিন্তু স্নেহ, ভালোবাসা আমার জন্মগত অধিকার; তা থেকে তোমরা আমায় বঞ্চিত করোনি'ত?"—এই রকম সব। আমার হাতদুটি ধরে ব'ললে "মা, গাড়ী, আসবাব পত্র, সবকিছু তুমি দ্বিজুকে ষোল আনাই দিও, কিন্তু তুমি মা নিজেকে সবটুকুই বিলিয়ে দিও না। আমার জন্যও একটুখানি রেখে দিও!"

কাশী—চোখে জল না এনে কোন কথাই তোমরা ব'লতে পার না! আমার ও ভালো লাগে না।

যোগমায়া—ভেবেছিলাম চোখের জল আর ফেলবো না। ওর দিকে ফিরেও আর চাইবো না, কিন্তু ওকে দেখলে থাকতে পারা যায় না।—তুমি ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারো? এমন কিছু কোরতে পারো যাতে কোরে ও আমার অন্তরের বাইরে চ'লে যেতে পারে, যেমন গেছে তোমার—

কাশী—পারি।

যোগমায়া—তা হ'লে তাই কোরে দিও। চোখের জল ফেলবার আর দরকার হবে না। (প্রস্থান)

(পরেশ উকিলের প্রবেশ)

পরেশ—আমায় কি ডাকছিলেন?

কাশী—তোমায়? হাঁ, ডেকেছিলাম। কিন্তু এতোক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি? ডেকেছি প্রায় একঘণ্টা হ'ল। আর একটু আগে এলে ক্ষতি ছিল কি?

পরেশ—আমি গেছলাম বাদ্‌গেটের ওখানে, তা'ই—

কাশী—সেই খানেই যাও, আমার আর দরকার হবে না। (পরেশের প্রস্থান)

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—মা এখানে ছিল, না?

কাশী—ছিল, এই চ'লে গেল।

মনীষা—উঃ! মায়ের জন্য আর পেরে উঠিনা!

কাশী—কেন রে মণি?

মনীষা—এই দেখি এই খানে কথা কইছে, মিনিটের মধ্যে একেবারে তেতলায়। তুমিই বলো খুঁজে বার কোরতে গেলে কি রকম সিঁড়ি ওঠানাবা কোরতে হয়!

কাশী—কি জন্য অত খুজে বেড়াচ্ছিস?

মনীষা—ঠাকুর ডাকছে। সে হাড়ি-কুড়ি তেল-নুন, আলু পটল নিয়ে বোসে আছে। 'মেনু' বলে না দিলে আজকের খাবারই তৈরী হবে না।

কাশী—তুই যাহোক্ ব'লে দেনা?

মনীষা—আমি বলে দোব! তাহ'লেই হ'য়েছে! কাকে কি বলে আমি তাই জানি না, বলে দেওয়া তো দূরের কথা!

কাশী—তা হ'লে আর কি হবে! আজ কিছু না হ'লেও হয়তো চ'লে যাবে!

মনীষা—তুমি বড়ো একটুতেই রেগে ওঠ।

কাশী—রাগবো কেন। আজকের যা ব্যাপার তাতে খাবার ইচ্ছা কারুর নেই। তোমার মায়েরও না, আমারও না। তাই বলছিলাম।

মনীষা—কিন্তু আমরা? আমাদের যে খেতেই হবে? এখন ইচ্ছে না থাকলেও ঘণ্টা দু'য়েক পরে যে ভীষণ খিদে পাবে! আচ্ছা সে না হয় থাক্—বাবার অসুখের

জন্য ভাবছো ত'? কিন্তু ডাক্তার তো বলেই গেল ভালোই আছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু তোমরা এতো মুষড়ে পড়ছো কেন বুঝতে পারি না!

কালী—তুই বুঝতে পারবি না। যা তুই, ঠাকুর কি কোরছে দেখগে যা। তাকে বলেও দিতে পারিস আজ সে যা খুসী তাই কোরতে পারে।

মনীষা—যাচ্ছি, কিন্তু আমি বুঝাতে পারবো না! নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো। আমাদের কলেজের অমিতার ভাইয়ের—

কালী—আঃ। মনীষা, আমার আর কোন কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

মনীষা—কিন্তু এ কথাটা শুনতে ভালো লাগবে আমি নিশ্চয় কোরে বলতে পারি।

কালী—তাহলে বলো শুনি,—শীগগীর সেরে নাও।

মনীষা—আমাদের কলেজের অমিতা'র ভাইয়ের ঠিক্ এই রকম হয়েছিল। সবাই ভয় পেলে কিন্তু ডাক্তার ব'ললে ভয় নেই। সেই রুগী ন' মাস শয্যাশায়ী রইলো। প্রাণ একেবারে এখন-তখন। —কিন্তু বেঁচে গেল।

কালী—তার সঙ্গে উপস্থিত ক্ষেত্রের কি মিল দেখলি?

মনীষা—মিল দেখলাম না। তাই তো আমার কোন ভয় নেই। আমাদের বেলায় সবাই বলছে ভয় নেই, ডাক্তারও বলছে ভয় নেই। —অমিতার বেলায় সবাইয়ের সঙ্গে ডাক্তারের মতভেদ হয়েছিল!

(ব'লিয়া হাসিয়া ফেলিল)

কেমন, কথাটা শুনতে ভালো লাগলো ত'?

(কালীশ্বর স্থির দৃষ্টি দিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন, কথা বলিলেন না)

রাগ হচ্ছে বুঝতে পারছি। কাজ নেই ও সব কথায়, আমি ঠাকুরকে বলতে চললুম তার ইচ্ছামত যেন আজ রেঁধে রাখে।

(প্রস্থানোদ্যত)

কালী—শোন্—

(মনীষা ফিরিল)

দিলিপ এখন কি কোরছে জানিস?

মনীষা—বোধ হয় কিছু কোরছে না। —কিন্তু আমি কি কোরে জানবো, আমি তো এইখানে আটকে রয়েছি।

কালী—তার কাছে এখন র'য়েছে কে?

মনীষা—নীলাদি। তুমি যাওনা, তার কাছে গিয়ে একটু বোসোগে না। তোমায় পেলে খুব খুসি হবে।

কালী—না থাক্।

মনীষা—তোমার বুঝি রোগীর কাছে বসতে ভয় করে?

কালী—হাঁ মনি, আমার ভয় করে।

মনীষা—আমাদের ভয় হয় না, তোমার ভয় হয়!— অবাক্ কোরলে!

কালী—আমি ওর কাছে গেলেই ও আমায় প্রশ্ন কোরতে থাকবে। আমি সে সবের উত্তর দিতে পারি না।

মনীষা—কেন, সে আর এমন শক্ত কাজ কি? আমায় যদি ও ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন কোরে যায় আমি অনর্গল উত্তর দিয়ে যেতে পারি।

কালী—জানি, কিন্তু আমি একটা উত্তর দিতে গেলেই হয়তো সমস্ত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে!

মনীষা—এমন যদি উত্তরের তেজ তা'হলে কাজ নেই কথা ক'য়ে, চুপ করে থাকাই ভালো।

কালী—কিন্তু মনি, প্রশ্ন যদি ধারাল হয় উত্তর রুখে রাখতে হয় না, সে আপনিই আসে। চুপ কোরে থাকলেও মৃকভাষা বুঝে নিতে মানুষের দেরী হয় না।

মনীষা—এতো যদি হাঙ্গামা, তা হ'লে প্রশ্নকর্ত্তাকেই বোলে দিতে হয় যে, ওহে বাপু, প্রশ্ন তুমি মোটেই কোরে না। —বেশ আমি তাই বলে দোব'খন। তোমার ভাবনা নেই।

কালী—না-না-না!

মনীষা—কেন তুমি বারণ কোরছ? বিষয়টা সরল হ'য়ে যেত বোলে দিলে!

কালী—আমি সরল হওয়া চাইনা। তুমি কোন কথা তাকে ব'লতে পাবেনা।

(মনীষা ক্ষণকাল অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল)—বেশ, ব'লবনা। সে কিন্তু সব জানে।

কালী—সে জানতে পারেনা। সংসারে এমন কেউ নেই যে সে কথা তাকে বোলতে পারে।

মনীষা—তা জানিনা, কিন্তু কথাটা আর গোপন নেই। আমি পর্য্যন্ত জেনে গেছি।

কালী—কি তুই জানিস্ আমায় বল।

(বলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে মনীষার হাত চাপিয়া ধরিল; মনীষা ভয় পাইয়া গেল কালীশ্বরের কথা বলার ভঙ্গিতে, তথাপি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল)

মনীষা—সে আমি বলতে পারবোনা।

(তীব্রস্বরে কালীশ্বর বলিলেন)

কালী—তোকে বোলতেই হবে।

মনীষা—(কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল) উইলের কথা, উইলের কথা আমি জানি বাবা।

কালী—ও, উইল। সে সবাই জানে। সে জানলে কারুর ক্ষতি নেই।

(কালীশ্বর মনীষার হাত ছাড়িয়া দিলেন। মনীষা সজলচোখে প্রস্থান করিল। প্রবেশ করিল দ্বিজেন)

কালী—তোমার কি খবর? ডাক্তার চলে গেল?

দ্বিজেন—ডাক্তার চলে গেল।—আমি বলছিলাম একটা নার্স রাখলে ভালো হয় রাত্তিরে জাগবার জন্য।

কালী—কেন, তোমার মা?

দ্বিজেন—মা এমনিতেই শুয়ে পড়েছে। মাকে কেউ দেখলে বরং ভালো হয়।

(ক্রমশঃ)

ধনিকের অপূর্ব্ব খেয়াল

সুধীর ধনীর দুলাল। ব্যাঙ্কে বেশ একটা মোটা টাকার অঙ্ক রেখে বাপ মারা যায়। এবং হঠাৎ এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে প্রথমতঃ সুধীর দিশেহারা হয়ে উঠল। তারপর এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে সুধীরেরও তাই হল। অর্থাৎ সুধীর ধীরে ধীরে পাপের পঙ্কিল পথে অগ্রসর হতে লাগল। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তাই সুধীরেরও তার চিরাচরিত অভ্যস্ত জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল। যে দুর্দ্দমনীয় বেগে সে অগ্রসর হ'চ্ছিল ঠিক ততখানিই বিতৃষ্ণা নিয়ে সে ঘরেই চুপ করে বসে রইল। কিন্তু তাতেও তার মনে কোন শান্তিই এলনা। শরীরও ভেঙ্গে পড়ল। অগত্যা একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সুধীর ডাঃ প্যাটেলের কাছে উপস্থিত হল। ডাক্তার এহেন যুবকদের কোন সময়েই পছন্দ করত না। সুতরাং সুধীরকে দেখেই ডাক্তারের ধৈর্য্যচ্যুতি হল। তিনি সুধীরকে এই অকারণ কুড়েমির জন্য খুবই তিরস্কার কর্লেন এবং বল্লেন দেশের যত ধনী আছে তাদের অলসতায় সমাজের খুবই ক্ষতি সাধন হয় এবং এ সকল দূরীভূত না হলে সমাজের ও দেশের কোনই উন্নতি নাই। সুধীর তখন প্রতিজ্ঞা কর্লে কপর্দ্দক-হীন অবস্থায় ৩০০ শত দিনের জন্য সে বিদেশে বাহির হবে; এবং যদি কোন প্রকারে সে কোন সাহায্য নিজ বাড়ী থেকে নেয় তাহলে একটা মোটা টাকা সে ডাক্তারের হাসপাতালে দিবে।

অতঃপর সুধীরের জীবনে এক নূতন অধ্যায় সুরু হল। পকেটে একটা পয়সা নেই—অথচ নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে, একটি পয়সাও যদি সে সাহায্য নেয় তাহলে প্রতিজ্ঞায় সে ডাক্তারের কাছে হেরে যাবে।

প্রথমেই সুধীর নিজের নাম বদলিয়ে নূতন নাম কর্ল "ভিম", এবং নানা জায়গায় চাকুরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

নানা ঘটনার পর অবশেষে এক সাবান কারখানায় সে চাকরী পেল। এই সাবান কারখানার কর্ত্রী শ্রীমতী শরদার সঙ্গে সুধীরের খুব বন্ধুত্ব জন্মে কিন্তু চাকরী সুধীরের অদৃষ্টে নেই। তাই তার এই চাকরীটিও গেল। কিছুদিন বাদ শ্রীমতী শরদাও উক্ত কারখানা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন কারখানার মালিকের প্রেম নিবেদনের ফলে।

অতঃপর নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাতের পর বহুদিন বাদে পুনরায় সুধীর ও সরদার দেখা হয়। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ, তাই একদিন সুধীর ও শরদাকে জেলে যেতে হয়। অতঃপর কিরূপে তাহারা জেল হইতে অব্যাহতি পায় সুধীরকে নিজ ভাগ্যান্বেষণে কিরূপে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে হয় ইত্যাদি সুক্ষ্ম মনস্তত্বমূলক ঘটনার সমাবেশ আপনি সাগরের ছবি "৩০০ শতদিবস পরে" দেখিতে পাইবেন। ছবিখানি শীঘ্রই প্রভাত সিনেমায় দেখান হবে।

হিমালয়-কী-বেটি

ভাবনানী ছবি "অমর প্রেম" অথবা "হিমালয়-কী বেটী" প্রভাত সিনেমায় তৃতীয় সপ্তাহে পড়ল। এনাক্ষী রমা রাওয়ের অভিনব নৃত্য এবং প্রফেসর রামানন্দের অতুলনীয় সঙ্গীতের সংমিশ্রনে ছবিখানি হইয়াছে অনবদ্য। তদুপরি হিন্দি খুবই সহজ থাকায় বাঙ্গালী দর্শকদের বুঝিতে কোনই অসুবিধা হয় না! এবং যতই দিন যাইতেছে ছবি-খানির জনপ্রিয়তা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

ছবিখানার প্রধান সম্পদ হইতেছে কাশ্মীর ও হিমালয়ের নয়ন মনোহর দৃশ্যাবলীর সমাবেশ। আপনি কলিকাতাতেই কাশ্মীর ও হিমালয়ের দৃশ্য সন্দর্শন করিতে পাইবেন।

(বিলাসী)

নীতীন বসু

পরিচালক নীতীন বাবু তাঁর নতুন ছবির কাজ গেল ২৯শে জুন আরম্ভ করে দিয়েছেন। মাত্র গেল ১৬ তারিখে 'দেশের মাটীর' কাজ তিনি শেষ করেছিলেন। এত অল্পসময়ের ব্যবধানে ভারতের কোন পরিচালকই নতুন ছবি আরম্ভ করবার কল্পনা করতে পারেননা।

এই ছবির বর্ত্তমান নাম দেওয়া হয়েছে 'চক্র'। বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে সাইগল, লীলাদেশাই, দেববালা, বিক্রম নাহার, শৈলেন চৌধুরী, ছন্দা, বোকেন চট্টোপাধ্যায়, টৌনা রায়, নাজাম প্রভৃতিকে।

প্রথম দিনে একটা বিশিষ্ট হোটেলের দৃশ্য তোলা হয়েছে। রুগ্ন সাইগলকে হোটেলে বসে ঠাণ্ডা সরবৎ খেতে দেখা গিয়েছিল। হোটেলের ম্যানেজার বোকেন চট্টোপাধ্যায় সকলের তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছিলেন।

এ ছবির শব্দ যন্ত্রের কাজ করছেন মুকুল বসু আর ক্যামেরার হাতল ঘোরাচ্ছেন অমূল্য মুখুজ্জে, পরিচালক নীতীন বাবুর আদেশ মত। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন পঙ্কজ মল্লিক।

অধিকার

ডাইরেক্টর প্রমথেশ বড়ুয়া তাঁর বইএর উত্তর সংস্করণই প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। চার মাসের মধ্যে অধিকারের মতন ছবির উত্তর সংস্করণই শেষ করা নেহাৎ বাজে কথা নয়। তবে ছোটাই বাবু ও বড়ুয়া সাহেবের একত্র সম্মিলিত চেষ্টায় বলেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

এ ছবি শেষ হতে আর বোধ হয় এক সপ্তাহ লাগবে। 'Dream land' এর একটা বিরাট সেট তৈরি হচ্ছে।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকী বসু এবার নিউ-থিয়েটার্সের দু'নম্বর ষ্টুডিওতে তাঁর পরবর্ত্তী ছবি তুলবেন, এই রকমই স্থির হয়েছে। দেবকী বাবুর পরবর্ত্তী ছবির গল্প হচ্ছে বাঙলা দেশের চিরপরিচিত একটা 'সাপুড়ে'র কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে কাজি নজরুল ইস্‌লাম এই গল্পাংশ তৈরি করেছেন। সিনারিও লিখেছেন দেবকী বাবু নিজে।

যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় এ ছবিতে স্থান পাবে পাহাড়ী সান্যাল, কাননবালা, মেনকা, বিনয় গোস্বামী, কৃষ্ণ চন্দ্র দে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রতীন বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এছবির কাজ আরম্ভ হ'বে 'অধিকারের' কাজ শেষ হলেই।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

আবহাওয়া ভাল থাকার দরুণ পরিচালক ফণি মজুমদার যেন সব্যসাচীর মত তড়িৎকর্ম্মা হয়ে গিয়েছেন। এদিকে গানের পর গান তোলা হচ্ছে। ওদিকে আগুনের দৃশ্য খতম করে নূতন সেটের কাজ হচ্ছে। সাথে সাথে সুযোগ বুঝে location-এ গিয়েও ছবি তুলে আসচে। বাচ্চা ভুলুয়া ও মজুর, একটি ছোট্ট দৃশ্য ছাড়া আর সবই তোলা হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতির বাধাকে জয় করবে বলে ফণি পণ করেছিল। তার সেই পণ সে রক্ষা করেছেন। ষ্টুডিও হতে বহু মাইল দূরে অজপাড়া গাঁয়ের আধমরা নগণ্য হাটকে জীবন্ত করে সে যে দৃশ্য কাল তুলে নিয়ে এসেছে, তা শুধু নয়নতৃপ্তি দায়ক নয়—সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্য পরিবেষ্টনীতে অপূর্ব্ব। গ্রামের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুধীর রেখাকে গ্রামের লোকজন বালক বালিকাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়ে দিয়েছিল যে, না জানা থাকলে বোঝা শক্ত ছিল যে এরা গ্রামের ছেলে নয়। সত্যি, গ্রাম্য পথে গেয়ে গেয়ে ভিখ্যে করে ভেড়াচ্ছে, না অভিনয় করচে মাত্র।

বড়দিদি

আর একটি নতুন 'সেট'-এ, এই হপ্তার মাঝামাঝি থেকে আবার 'বড়দিদি'-র চিত্র-গ্রহণ সুরু হোল।

গল্পের নায়ক সুরেন্দ্র নাথ, ব্রজবাবুর বাড়ীতে শেষ পর্য্যন্ত কেমন কোরে আশ্রয় লাভ কোরেছিল—সে বিবরণ আপনাদের গত সপ্তাহে জানিয়েছি।

মাধবীর ছোটবোন প্রমীলা, এই নতুন মাষ্টারটিকে খুসী মনেই গ্রহণ কোরেছে।

কিন্তু বিরোধ বেধে গেল মাধবীর। এই আপন ভোলা, আত্মনির্ভরতা শূন্য, অদ্ভুত জীবটির স্বভাবের পরিচয় পেয়ে। মাধবীর কাছে—প্রমীলাও যেমন, তার মাষ্টারটিও

জেনি। দু'জনেই ছেলে-মানুষ। প্রমীলা যেমন বোঝে না তার কখন কী দরকার তার মাষ্টারও সেই রকম। নিজের কিছু বোঝেনা অথচ অসময়ে এমন জিনিষ চেয়ে বসে যে মাধবীকে সামলে উঠতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়। তবু একজন বাইরের পড়বার ঘরে বসে, আপন খেয়াল-খুসী মত জিনিষের হুকুম করে, আর একজন অন্দর মহলে, তার নাগালের বাইরে থেকেও সে হুকুম তামিল কোরে কত না সান্ত্বনা লাভ করে।

এই স্নেহময়ী, সর্ব্বময়ী, করুণাময়ী নারী 'বড়'দি'র পিতার আশ্রয় এসে, পলাতক ধনী পুত্র সুরেন্দ্র নাথের জীবন নাট্যে যে বিপ্লব ঘটেছিল—তারই পূর্ব্বাভাষ উপরের দৃশ্যে সূচিত হ'বে। এই দৃশ্যগুলির চিত্র-গ্রহণ, অমর মল্লিকের নিপুণ পরিচালনাধীনে সম্প্রতি তোলা হচ্ছে।

এই চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় কোরছেন—যশস্বী ও প্রিয়দর্শন নট—পাহাড়ী সাম্যাল। ছাত্রী প্রমীলার ভূমিকায় শ্রীমতী ছবির অভিনয়ও বিশেষ হৃদয় গ্রাহী হচ্ছে বোলে জানা যায়।

অভিজ্ঞান

গত-পূর্ব্ব সপ্তাহে, লাহোর, অমৃত সহর এবং দিল্লীতে, 'অভিজ্ঞান' চিত্রের হিন্দি সংস্করণ মুক্তি লাভ কোরেচে এবং সর্ব্বত্রই বিচিত্র ঘটনাবহুল সমাজ-চিত্রটি দর্শক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ কোরেচে, এ সংবাদ আমরা পেয়েচি।

এই সপ্তাহ থেকে বোম্বাই 'মিনার্ভা' টকীতে 'হিন্দি অভিজ্ঞান প্রদর্শিত হবে।

জনক নন্দিনী

পরিচালক ফণী বর্ম্মা জনকনন্দিনীর কাজ নিয়ে বেশ এগিয়ে চলেছেন। গেল সপ্তায় যে দৃশ্য তোলা হয়েছে তাতে দেখান হয়েছে যে জনক (তুলসী চক্রবর্ত্তী) মাঠ থেকে একটী সদ্যজাত শিশু কুড়িয়ে পান। পরে এক বিষ্ণুমন্দিরে রাণী (দেববালা) কে তিনি এই শিশুটিকে উপহার দেন। রাজ্যের পুরোহিত এই সময় এই শিশুর নাম দেন সীতা।

নর নারায়ণ

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এখন একটী বিশিষ্ট দৃশ্যের মহলায় ব্যস্ত আছেন। কালী ফিল্মসের জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এই ছবির 'কৃতবর্ম্মা'র ভূমিকায় নামচেন। শ্রীমতী রাণীবালা 'জয়ন্তী'র ভূমিকায় নামবে এও ঠিক হয়েছে।

যখের ধন

ডাইরেক্টর হরি-ভঞ্জ এই ছবির কাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। নায়িকা রেখা (লীলা হালদার)

ও তার ভাই বিমল (অহর গাঙ্গুলী) কে নিয়ে কয়েকটী দৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে।

রূপবাণী

এই চিত্রগৃহে নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্র অভিজ্ঞান সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বিপুলভাবে দর্শক আকর্ষণ কোরেছে।

বাঙলার প্রত্যেক প্রগতি পন্থি তরুণ-তরুণীর এ ছবিখানি দেখতে যাওয়া উচিত। একটি ভাগ্যবিড়ম্বিতা, সর্ব্বহারা নারীর হৃদয় রহস্যের অপরূপ কাহিনী প্রত্যেক হৃদয়বান নর-নারীর অন্তরে সাড়া জাগিয়ে তুলবে।

বঙ্গীয় মহিলা শাখার তত্ত্বাবধানে যক্ষ্মা-নিবারক ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে প্রফুল্ল পিক্‌চার্সের সহযোগিতায় মঙ্গলবার ১২ই জুলাই সাড়ে নটায় প্রভাত সিনেমায় শ্যামসুন্দরের নেতৃত্ব নৃত্যাবলী ও চিত্র প্রদর্শন

টিকিট প্রাপ্তির স্থান :—

মিসেস এ, এন চৌধুরী
৪২নং ঝাউতলা রোড বালিগঞ্জ

মিসেস কে, নুরুদ্দিন
২৪নং থিয়েটার রোড

প্রফুল্ল ঘোষ
২০ নং নন্দন রোড

চিত্রা

গত তিনমাস ধরে 'বিদ্যাপতি' সাফল্যের সঙ্গে 'চিত্রা'র আসর জমিয়ে আছে। এই শনিবার থেকে পঞ্চদশ সপ্তাহে পড়লো। সঙ্গীতানুরাগী নর-নারী মাত্রেই বিদ্যাপতি দেখে যে পুলকিত হবেন, একথা জোর কোরে বলা যায়। তা'ছাড়া উৎকৃষ্ট অভিনয়ের আকর্ষণে ও যে 'বিদ্যাপতি' অনেকের উপরে, এ কথাটিও অস্বীকার করবার উপায় দেখি না।

পূর্ণ থিয়েটার

এখানে আগামী শনিবার হইতে "গ্রহের ফের" তৃতীয় সপ্তাহে পড়লো। ছবিখানার জনপ্রিয়তা বেশ অনুভব করা যাচ্ছে তার কারণ এখনো জন সমাগম কোন মাত্রায় কম নয়—আর ছবিখানার মধ্যে দেখবার বেশ মাল মসলা আছে যাতে দর্শকগণ তৃপ্ত হবেন।

ভ্যারাইটী ফিল্মস

রাতেন প্রপ্ত কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যানেজার নলিনীরঞ্জন বসু উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কোরে ৬৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট 'ভ্যারাইটী ফিল্মস্' নামে চিত্র-নির্ম্মাণ ও পরিবেশনার একটি আফিস্ খুলছেন। নলিনীবাবু একজন স্বাবলম্বী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তি। কুড়ি বছরের ওপর এই কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত আছেন—তা' ছাড়া তিনি নিরহঙ্কারী ও অমায়িক। নিজের কর্ম্মশক্তি ও ব্যবহারে তাঁর অভীষ্ট কার্য্য যে অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা কোরতে পারি।

আমরা শুনলাম ইতিমধ্যেই নলিনীবাবু একটি প্রতিষ্ঠানের সকল চিত্রের পরিবেশক-রূপে নিয়োজিত হ'য়েছেন এবং পূজোর আগেই এদের কাছ থেকে একখানা পৌরাণিক ছবি পাবেন আশা করেন।

বিবিধ

কলিকাতা প্রদর্শনী সংসদ

সম্রাটের যক্ষ্মা নিবারণী সমিতির সাহায্যার্থে আগামী ১৯শে ও ২০শে জুলাই ফার্ষ্ট এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে একটী জলসার ব্যবস্থা হয়েছে। শ্রীযুক্ত প্রভাংশু গুপ্ত এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন।

স্বর্গীয়া কাত্যায়নী দেবী

নকিপুরের রায় সতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মাতা কাত্যায়নী দেবীর দানসাগর শ্রা গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় মহাসমারো সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন উপাচারের মধ্যে দুই হাজা তোলা ওজনের রৌপ্যের জিনিষপত্র দেও হয়। বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য বিদায়ের পর দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজ করান হয়।

শুভ-মিলন

প্রাইমা ফিল্মসের শ্রীযুক্ত নরেশচ ঘোষের ভগ্নী শ্রীমতী প্রতিমার সহিত গোয় বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দ মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান মোহি

কুমারের শুভ-উদ্বাহ গত ১০ই আষাঢ় সুসম্পা হইয়াছে—এই উপলক্ষে নিরোদচন্দ্র ঘো মহাশয়ের বৃন্দাবন লেনস্থ বাসভবনে ব বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হয় এবং তাঁহার সকলেই আদর আপ্যায়নে ও ভূরি ভোজে পরিতুষ্ট হন। আমরা নব দম্পতীর শান্তিম নবজীবন কামনা করি।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—আঠার—

ম'তালের মত টলিতে টলিতে অরুণ বাটী ফিরিল। তাহার যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া গিয়াছে, সে আজ যেন নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছেনা। সে বাড়ী আসিয়াই শুভ্রা'কে ডাকিল ও তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল শুভ্রা ও কণার মধ্যে কে অধিকতর সুন্দরী। শুভ্রা'র শান্ত, স্নিগ্ধ, সুগৌর মুখখানিতে শারদপূর্ণিমার স্নিগ্ধতা থাকিলেও কণা'র রোগক্লিষ্ট মুখে যে মাদকতা আছে সে ম'দকতা তাহাতে নাই। অরুণের ব্যবহার দেখিয়া শুভ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে কি দেখছ আমায় ?"

"কিছুনা" বলিয়া অরুণ শুভ্রাকে ঠেলিয়া দিল।

"সত্যি বলনা কিছু দোষ করেছি কি আমি," বলিয়া শুভ্রা অরুণের নিকটে আসিল।

উত্তরে অরুণ বলিল,"তুমি কোন্ সাহসে আশাকর যে আমি চিরদিনই তোমার অনুগত থাকবো ?"

"এরকম যে আশা আমি করি তা তো কোন দিনই তোমায় বলিনি। তবে কথাটা যখন তুললে তখন শুনে রাখ; সত্যি আমার বিশ্বাস যে তুমি চিরদিন আমারই থাকবে।" বলিয়া শুভ্রা তাহার দিকে স্থির-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। অরুণ আর কিছু বলিলনা; শুভ্রার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া আপনমনে গলার টাই খুলিতে লাগিল।

* * *

বৈকালেই অরুণ কণার নিকটে গেল। তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিল সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। অরুণ কণাকে বলিল, "তুমি হয়ত বিশ্বাস করবেনা কণা আমি প্রথম দিন থেকেই তোমায় ভালবেসেছিলাম।"

কণা চুপ করিয়া রহিল। অরুণ পূর্ব্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিল "আমায় দেখার নেশা তোমায় যেমন পেয়ে বসেছিল আমাকেও তেমনিই পাগল করে তুলেছিল।"

কণা বলিল, "তাই বুঝি আমায় দেখলে সরে যেতেন।"

"হ্যাঁ, সত্যিই তাই! পাছে আমার জন্ম তোমায় ধরা পরতে হয় সেই ভয়ে। আমায় বিশ্বাস কর কণা তুমি একদিন আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিলে। তারপর যখন আমায় না বলে তুমি আমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে ক'দিন যে কি সাংঘাতিক নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা শুধু আমিই জানি।"

বাধা দিয়া কণা বলিল, "আমায় ক্ষমা করুন ডাক্তারবাবু, আমায় ক্ষমা করুন। আমি যে কেন গিয়েছিলাম তা বললে হয়তো আপনি বিশ্বাসই করবেননা।"

"নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবো" বলিয়া অরুণ কণার হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইল।

কণা বলিল, "যখন আপনার চিন্তা আমায় দিশেহারা করে তুললো তখন আপনাকে দেখবার পিপাসা বেড়ে উঠলো শতগুণ বেশী। আপনি দুপুরে যখন ঘুমুতেন তখন কতদিন চোরের মত আপনার ঘরে গিয়ে আপনার ঘুমন্ত মুখখানাকে দেখে এসেছি। আপনার স্পর্শ পাবার জন্যে আমার দেহের প্রত্যেক পরমাণু ব্যাকুল হয়ে উঠতো ডাক্তারবাবু। কিন্তু আপনাকে পাবার আশা আমার ছিল না। দিদির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করবার সাহস, শক্তি ও রূপ যে আমার নেই তাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই যেদিন অমলবাবু আমায় ধর্ম্মপত্নী বলে গ্রহণ করবার লোভ দেখালেন সে লোভ আমি ছাড়তে পারিনি ডাক্তারবাবু। পাছে আপনাকে দেখলে যাওয়া না হয়, পাছে যেতে না পারি তাই পালিয়েছিলুম বাড়ী থেকে চোরের মত অন্ধকারে মুখ ঢেকে।" কণা উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে লাগিল। ডাক্তার অবিলম্বে তাহার মুখে দুই ড্রাম ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিলেন।

ক্ষণকাল কণা বিশ্রাম করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "পালিয়ে গিয়েই কি আপনার চিন্তার হাত থেকে রক্ষে পেয়েছি ? সেখানেও ঐ একই চিন্তা আমার আর অমলবাবুর মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদের আগুন জ্বালিয়ে দিলে। অমলবাবু আমার কাছে বসলেই আপনার সঙ্গে তার তুলনা করবার ইচ্ছে হতো আর তার ফলে অমলবাবু নেমে যেতেন অনেক নীচে। তবুও ডাক্তারবাবু, অনেক চেষ্টা করেছি আমি আপনাকে ভুলতে, আপনার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে অমলের সেবা করতে। মানুষ কায়মনোবাক্যে যা চায় হয়তো ভগবান তাকে তাই দেন। অমল আমায় যখন ত্যাগ করে গেল আমি ভাবলাম যে আমার শাপে বর হল। আপনার কাছে ছুটে এলাম অনেক আশা নিয়ে। তারপর যা হয়েছে আপনিই জানেন। আমি বেশ বুঝেছি আমার বেঁচে থাকবার কোন অধিকারই নেই। আমার একমাত্র সান্ত্বনা একমাত্র শান্তি মৃত্যুতে। আপনার কাছে শুধু একটী প্রার্থনাই আছে আমার। আমার সেই চির আকাঙ্খিত বন্ধুকে পাবার সুযোগ করে দিন। অনেক ওষুধ আছে

আপনাদের এমন একটা ওষুধ দিন যা খেলে আমার ঘুম আর না ভাঙ্গে।"

অরুণ বলিল, "আমায় আর ব্যথা দিওনা কণা। আমি আর পারি না। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমিও কত বিক্ষত হয়ে গেছি। আজ সত্যই তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। কণা, একটী বার বল তুমি আমার। সত্যি, তুমি ভালবাস আমায়।"

কণা উত্তরে বলিল, "আমি পতিতা, আমার কথার মূল্য কি বলুন তো?"

"মূল্য আছে বৈ কি কণা, আজ আমি তোমায় চাই আমার নিতান্ত আপনার করে নিতে; একবার আমায় বল সত্যি তুমি আমায় ভালবাস। আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলবো, সুস্থ করে তুলবো তোমায়, জীবনের সবটুকু ভালবাসা তোমায় দিয়ে নিজের অপরাধের শাস্তি নেব। আমি চাই তোমার চিরমলিন মুখে হাসি ফুটাতে, তোমার জীবনকে দেবতার আশীর্ব্বাদ করে তুলতে। অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি, আজ সকল কষ্টের বোঝা দূরে সরিয়ে অভিনব বেশে তোমায় সাজিয়ে আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে নিতে।" অরুণ এই বলিয়া কণার শীর্ণ দেহখানি আপনার হৃদয়ের সন্নিকটে তুলিয়া ধরিল—চক্ষু বুজিয়া কণা বলিল, "ওগো, দেবতা আমার, সত্যি বল এ আমার ইহকাল না পরকাল? আমি জীবিত না মৃত? এ আমার জাগরণ না মুক্তি?" কণার দুর্ব্বল মস্তিস্ক এত উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

—উনিশ—

উপরোক্ত ঘটনার পর গত দুইমাস হইতে অরুণের যে অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে সাধ্বী শুভ্রা তাহা নীরবে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রথম প্রথম অরুণ অধিক রাত্রিতে বাটী ফিরিতে আরম্ভ করিল। পরে বারটা একটা বাজিতে সুরু করিল; আজকাল মধ্যে মধ্যে সে বাটীতে আসাও বন্ধ করিয়াছে! শুভ্রার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। শুভ্রা বাঁচিয়া আছে না মরিয়াছে অথবা সে কিরূপ আছে তাহাও অরুণ একবার খোঁজ করেনা। শুভ্রা যে তাহার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী—সে যে তাহার জীবন মরণ শুভাশুভের জন্য দায়ী একথাও অরুণ ভুলিয়া গিয়াছে। অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, অপমান আজ সেই আদৃতা শুভ্রার অঙ্গের ভূষণ। তথাপি শুভ্রা প্রাণপণে চেষ্টা করে স্বামীর সেবা ও মনোরঞ্জন করিতে। দুইমাস পূর্ব্বে যাহারা অরুণ ও শুভ্রাকে দেখিয়াছে আজ তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিবেনা যে তাহারাই সেই প্রীতিপ্রণয়বদ্ধ দম্পতী। এই দুইমাসে অন্ততঃ পনর রাত্রি শুভ্রাকে সেই বিরাট জনহীন পুরীর মধ্যে একাকিনী রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে। অন্য যে কয়দিন অরুণ বাটীতে রাত্রি যাপন করিয়াছে সে কয়দিনও তাহার সহিত এমনি কটু ও বিরক্তিকর ব্যবহার করিয়াছে যে তাহাতে শুভ্রা যেন মরমে মরিয়াছিল। সে কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই তাহার কোন অপরাধ ও কোন ব্যবহার তাহাকে তাহার চির আদরের স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত করিতেছে। তাহার গৃহদেবতা গোবিন্দজীর চরণে তাহার হৃদয়ের ব্যথা জানাইয়া স্বামীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য কত মিনতি করিয়াছে, কত অশ্রু ফেলিয়েছে তথাপি পাষাণ দেবতার হৃদয়ে শুভ্রার প্রতি করুণার সঞ্চার হয় নাই। শুভ্রা একদিন অরুণকে বলিল, "দেখ আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি আমাকে বল—কেন তুমি অমন হয়ে যাচ্ছ? আমায় দিয়ে কি তোমার সেবা চলে না এতই পুরোণো হয়ে গেছি আমি? অরুণের মনে ক্ষণিকের জন্য শুভ্রার প্রতি প্রীতির সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া দাড়াইল, শুভ্রাকে সে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চুম্বন করিতে গেল কিন্তু পারিল না—সে পরমুহূর্ত্তে তাহাকে পশ্চাতের দিকে ঠেলিয়া দিল ও বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী তাই তুমি সাহস করলে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে। ভবিষ্যতে স্মরণ রেখ স্ত্রী আর দাসীতে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাকে ঘরে রেখে বড় জোর দুটো খেতে পরতে দেওয়া যেতে পারে—তার সঙ্গে প্রেম করা চলে না।"

অরুণ মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। সেই জনহীন কক্ষে শুভ্রা দাড়াইয়া রহিল পাষাণী প্রতিমার মত। বক্ষে তাহার অভিমানের দারুণ দীর্ঘশ্বাস—চক্ষে তাহার অবমাননার অশ্রু।

* * *

"হ্যালো, হ্যালো, সাউথ ফাইভ এইট সিক্স্। হাঁ, কে আপনি? আমি রায় বাহাদুর দিলীপ রায়ের বাড়ী চাই। কে বাবা? ভাল আছ হাঁ—আমি বেশ আছি—না কোন কষ্ট নেই তো? কে বল্লে তোমায়? না, না, উনিতো আমায় অবজ্ঞা করেন নি। হতেই পারে না। কৈ, এক-দিনও উনি রাত্রিতে বাইরে থাকেন না বাবা। হয়তো কেউ তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে বলেছে ওই সব মিথ্যে কথা-গুলো। আমি বেশ আছি, ভাল আছি, কোন দুঃখ নেই আমার।"

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে যে প্রশ্ন আসিল তাহার উত্তরে শুভ্রা বলিল, কৈ না, গলা ভার হতে যাবে কেন? তোমার যত ছেলেমানুষী। আমার কষ্ট দুঃখ হলে তোমায় জানাবোনা সে কি হয়? পৃথিবীর সবাই আমায় ফেলতে পারে কিন্তু তুমি যে কোনদিন পারবে না তা আমি জানি।"

শুভ্রার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল কণ্ঠ রোধ হইতেছিল সে তাড়াতাড়ি টেলি-ফোন ছাড়িয়া দিল। টেলিফোনের ঘণ্টা পুনরায় সশব্দে বাজিয়া উঠিল। শুভ্রা নিজকে সামলাইয়া লইল। চক্ষু মুছিয়া রিসিভার

তুলিয়া বলিল, "না আমি তো ছাড়িনি, ওরাই বোধ হয় ডিসকানেক্ট করে দিয়েছিল। হ্যাঁ, অমনই ওরা। কখন যে কেটে দেয় লাইন তার কিছুরই ঠিক নেই। কি বল্লে? বাইরে যাব তোমার সঙ্গে? বেশতো, কিন্তু কে দেখবে ওকে? —ওইতো মুস্কিল। একবার সমরকে পাঠিয়ে দিওনা বাবা—আমার দরকার আছে। তুমি একদিন সকাল বেলা এসো। না, বিকেল বেলা রোজই আমায় নিয়ে বেড়াতে বের হন কিনা। ডাক্তারেরা বলেছে রোজ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মাঠে বা গঙ্গার ধারে থাকতে ওকে। আমি না গেলে আবার যেতে চাননা উনি। সমরকে পাঠিয়ে দিয়ো—ভুলোনা।

শুভ্রা টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিতার সহিত এতগুলো মিথ্যাকথা বলিয়া তাহার নিজের নিকট নিজেকে ছোট ও নীচ বলিয়া মনে হইতেছিল। সে আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আপন মনে বলিল, "ওঁর দোষের কথা বাবাকে বলে, তাঁর চোখে ওকে কিছুতেই ছোট করতে পারবো না আমি।"

—বিশ—

সমর দিলীপবাবুর ভাগিনেয়। তাহার দশবর্ষ বয়সে দিলীপ বাবুর ভগ্নির দেহান্ত হইলে দিলীপবাবু তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। সে এই বৎসর বি, এ, পাশ করিয়াছে। তাহার বর্ণ শ্যাম বা উজ্জল শ্যাম, দোহারা, কাবুলীধরণের কাপড় পরে, লম্বা ঝুলপী রাখিয়াছে। চুলগুলি কিছু বড়—কাবুলীদের বাবরী করা চুলের অনুরূপ। বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম করায় তাহার দেহ পেশীবহুল ও সুগঠিত। ডিটেকটিভ নভেল পাঠ করিয়া এডগার ওয়ালেস, শার্লক হোমস্, কোনান ওয়েল, রবার্ট ব্লেক-এর মত একজন লেখক ও ডিটেকটিভ হইবার প্রবল বাসনা তাহার হৃদয়ে। একটা রোমাঞ্চকর তদন্তের ভার কেন যে অদ্যাবধি কেহ তাহাকে দিতেছেনা ইহাই তাহার জীবনের একটা প্রকাণ্ড আফশোষ। সে লালবাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবিধ প্রকার পরচুলা, গোফদাড়ি, স্পিরিটগাম্ প্রভৃতি ক্রয় করিয়াছে। বাঙ্গালী, মারোয়ারী বিহারী প্রভৃতি লোকদের পরিধেয় বিবিধ বস্ত্রাদি এমন কি দারবান চাপরাশী খানসামাদের পোষাকও সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাহা কাজে লাগাইতে পারে নাই। মাতুল তাহাকে একটা মোটর বাইক কিনিয়া দিয়াছেন তাহা পাইয়া ডিটেকটিভের বাসনা দ্বিগুণিত হইয়াছে। দিলীপবাবু যখন তাহাকে শুভ্রার নিকট যাইবার আদেশ করিলেন সে তখন একটা উত্তেজনাপূর্ণ নভেল পাঠ করিতেছিল। তাহা ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা সমরের ছিল না তথাপি মামার হুকুম অমান্য করিবার সাহস তাহার ছিল না; তাই অধিক বিলম্ব না করিয়া সে শুভ্রার নিকট আসিয়া পৌছিল।

শুভ্রাকে দেখিয়াই সে চমকিত হইল—চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "তুই এমনি হয়ে গেছিস দিদি! অরুণবাবু কি চোখের মাথা খেয়েছে? ওঃ মামা দেখলে ক্ষেপে যাবেন নিশ্চয়ই।"

শুভ্রা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, সে ভালই আছে। "ভাল থাকলে কেউ এমনি রোগা হয়? না কারো চোখে এমনি কালী পড়ে? জানিস্, আজকাল আমি ছেলেমানুষ নই, রীতিমত একজন ভদ্রলোক—গ্রাজুয়েট। কি হয়েছে বলনা দিদি? আমার কাছে লুকুস্‌না কিছু।"

শুভ্রা বলিল, "তোকে একটা কাজ করতে হবে সমু। কিন্তু কাজটা হাতে নেবার আগে তুই দিব্যি কর যে বাবাকে ঘুণাক্ষরে জানাবিনা।"

"কাজটাই আগে বল, আমি পারবো কিনা ভেবে দেখি।"

"খুব পারবি। কিন্তু দিব্যি না করলে কিছুতেই বলবোনা আমি।"

অগত্যা সমর শপথ করিল যে কোন ক্রমেই সে মাতুলের নিকট কিছুই প্রকাশ করিবেনা। শুভ্রা বলিল, "কাজটা বিশেষ কিছু নয়; একটা গোয়েন্দাগিরি, বুঝলি?"

"গোয়েন্দাগিরি! সমর লাফাইয়া উঠিল। সে বলিল, ও কাজ আমি নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু কিসের গোয়েন্দাগিরি? খুন, ডাকাতি, চুরি না বার্গলারী?"

শুভ্রা বলিল, "না ওসব কিছুই নয় সমু, একটা কথা আমার জানবার দরকার হয়েছে। কথাটা হচ্ছে এই যে তোর জামাইবাবু, আজকাল সন্ধ্যার পরে কোথায় যান—কার বাড়ীতে—সে লোকটা কে? এই সমস্ত সংবাদ আমায় এনে দিতে হবে বুঝলি? কিন্তু উনি যেন জানতে না পারেন এ বিষয় লক্ষ্য রাখবি। বুঝেছিস!"

হতাশ হইয়া সমর বলিল, "এ আবার একটা কি কাজ, এতো ইচ্ছে করলে তোমার রামলাল চাপরাশীই এনে দিতে পারে। এতে না আছে একসাইটমেণ্ট—না আছে রোমান্স—না আছে থ্রিল। এ আবার একটা কাজ?"

শুভ্রা হাসিল, "গাছে উঠতেই কি এক কাঁদি হয়? তুই যে রকম হতাশ হচ্ছিস তাতে বোধ হচ্ছে তুই পারবিনা। আর রোমান্স নেই তাই বা তুই জানলি কি করে?"

"সমর পারেনা এমন কাজ পৃথিবীতে নেই। আজ থেকে তিনদিনের মধ্যেই খবর এনে দেবো তোমায়। তবে একটা বেলা তোমার এখানে লুকিয়ে থাকবার জায়গা চাই।"

"বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দেব।"

সমর বলিল, "ব্যাপারটা আমায় খুলে বলনা দিদি কি হয়েছে?"

শুভ্রা বলিল, "আমিই জানিনা তো তোকে কি বলবো? তবে এইটুকু বলতে পারি, কি জানি কেন উনি আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। আজকাল বাড়ী ফেরেন অনেক রাতে। হয়তো কোন সর্ব্বনেশে বন্ধু জুটেছে অথবা—"

সমর বলিল, "তুই মন খারাপ করিস্‌নে দিদি। আমি সঠিক খবর এনে দেবই তোকে" তৎপরে দশ মিনিট কাল সমর নানাবিধ আলোচনা করিয়া প্রস্থান করিল।

শুভ্রা ভাবিয়া পাইলনা সে যাহা করিল ভাল কি মন্দ।

দুইদিন পরে বৈকালে যখন অরুণ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল তখন একজন নবীন মারোয়াড়ী যুবক একটী মোটর বাইকে উঠিয়া বসিল ও অরুণের গাড়ীর পশ্চাতে অলক্ষ্যেই চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাতটায় অরুণ ম্যাজেষ্টিক হোটেলে নামিল ও লিফটে করিয়া উপরে চলিয়া গেল। ক্ষণপরে মারোয়াড়ী যুবক লিফটম্যানকে একটী টাকা বকশিস দিয়া বলিল, এই ডাক্তার সাহেব যে কামরায় গেছে সেই কামরাটী যদি সে দেখিয়ে দিতে পারে তাহলে আরও এক টাকা বকৃশিস্ পাবে। লিফটম্যান্ তাকে নিয়ে উঠলো তিন তলায়; যে ঘরখানি দেখিয়ে দিলে সে ঘরখানির নম্বর বায়ান্ন। যুবকটী নোট বুকে নম্বরটী টুকে নিয়ে চল্লো সোজা হোটেলের ম্যানেজারের কক্ষে। ম্যানেজার মারোয়ারী-টীকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপকা জরুরৎ ফরমাইয়ে।"

উত্তরে বঙ্গভাষায় যুবক বলিল, "দেখুন, আমি বাঙ্গালী, প্রয়োজন বলেই এই পোষাকটা পরতে হয়েছে। দয়া করে একটা ইন্‌ফরমেশন দিতে হবে।"

ম্যানেজার কিয়ৎকাল সমরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "আপনার বক্তব্যটা বলুন শুনি।"

সমর একটী ষ্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট ম্যানেজার বাবুর হাতে দিয়া নিজেও সিগারেট ধরাইয়া সহজসুরে বলিল, "এই বায়ান্ন নম্বর কামরায় কে থাকে আর কতদিন থেকে বর্ত্তমান অধিবাসীরা ওখানে আছেন তা আমি জানতে চাই।"

ম্যানেজার ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন তো?"

"দেখুন, প্রয়োজনটী আজই বলতে পারবোনা মশায় তবে এইটুকু শুনে রাখুন এই সংবাদটা আমি চাচ্ছিনি, এটা চেয়েছেন রায় বাহাদুর দিলীপ রায়, সি, আই, ই,।

"ওঃ, তাই নাকি, বেশ, বেশ, আপনি তাঁর কে হন বলুন তো?"

"আমি তার ভাগিনেয়। পোষ্যপুত্র বল্লেও অন্যায় হয়না।"

ম্যানেজার উঠিয়া সমরের সহিত করমর্দ্দন করিয়া খাতা খুলিয়া বলিলেন, "এই যে পেয়েছি—ওরা হচ্ছেন ডাক্তার আর মিসেস্ সেন। গত ১২ই মার্চ্চ থেকে ওরা ওখানে আছেন—এই আড়াই মাস হলো আর কি?

সমর নোট বুকে সমস্ত তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ডাঃ অরুণ গুপ্ত কি এখানে রোজই আসেন?

ম্যানেজার ডাক্তার অরুণের নাম শুনিয়া বিস্মিত হইল ও বলিল, "না মহাশয়, রোজ ত দূরের কথা আজ পর্য্যন্ত তিনি কখনও এসেছেন বলে তো শুনিনি?"

"বলেন কি স্যার! আমি স্বচক্ষে তাঁকে ঐ ঘরে ঢুকতে দেখেছি।"

ম্যানেজার লিফ্‌ট-ম্যানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কোন নূতন লোক ঐ ৫২ নং কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে কি না।

উত্তরে লিফটম্যান বলিল ডাক্তার সেন ভিন্ন গত দুই মাসে সে ঐ কক্ষে অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেখে নাই। সমর বুঝিল তাহার ভগ্নীপতি এই হোটেলে ডাক্তার সেন নামে পরিচিত। কিন্তু মিসেস্ টী কে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। হোটেলের ম্যানেজার বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চিন্তাকুলচিত্তে সে বাটী ফিরিল। তাহার রাত্রিতে নিদ্রা হইলনা। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল এই মিসেস্ লোকটীকে কেমন করিয়া সে দেখিবে।

(ক্রমশঃ)

হ্যাঁ, বার্লি
তবে
লিলি
ব্র্যাণ্ড
হওয়া চাই
একমাত্র
নির্ভরযোগ্য
পথ্য ও পানীয়
LILY BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FINEST FOOD DRINK
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
THE LILY BISCUIT CO.
PROPS = P. SETT & CO
ULTADANGA : CALCUTTA

অজানার মায়া
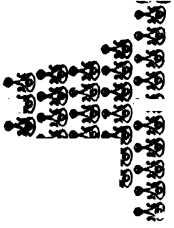
(গল্প)

মন্মথ কুমার চৌধুরী
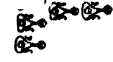
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষ যখন দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছায় তখনই সে হয়ে উঠে অতিমাত্রায় ভাগ্যান্বেষী। দৈবকে সেই শুধু উপেক্ষা করতে পারে, বুকে জ্বল্‌ছে যার যৌবনের তাজা আগুন। কিন্তু, মানসিক যৌবন-পঙ্গু মানুষের পক্ষে অনাগত দৈবের সদিচ্ছার পর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকেনা। মানুষ তখন লটারীর টিকেট কিনে, বক্ষে কালীর পূজো দেয়, জ্যোতিষের কাছে হাত দেখাতে ব্যস্ত হয়ে ছুটে। সুপ্রিয়ের জীবনে এটা শুধু রূঢ় নয়—একটা মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি।

বেশ একটু রাত করেই সুপ্রিয় সে দিন বাড়ী ফিরেছিলো। রুণু শুধালে, "আজ এত দেরী যে? বেতনের দিন ছিলো বুঝি?"

পকেট থেকে দুটো নোট এবং কয়েকটা টাকা বের করে সুপ্রিয় জবাব দিলে "দুটো টাকা খরচ করে এসেছি"...

বাধা দিয়ে রুণু বল্লে, মেট্রো'য় গিয়েছিলে বুঝি? তা কি ছবি দেখলে?

সুপ্রিয় হাসলে। অতি করুণ সে হাসি! কান্নার চাইতেও যা' কুশ্রী।—

—"পাগল হয়েছে? মেট্রোয় যাব আমি! দুনিয়ায় আর মানুষ খুঁজে পেলে না।"

—চাপা আর্ত্তনাদের মতোই শুনালো তার কথাগুলো।

রুণু ষ্টোভ জ্বেলে চা'র জল চড়িয়েছে। সামনে সাজানো রয়েছে চা'য়ের সরঞ্জাম। ষ্টোভে কয়েকটা দম্ দিয়ে রুণু সুপ্রিয়র কাছে এসে বল্লে,—"একদিন মেট্রোয়ে গেলে চলে না—এক মধুর সন্ধ্যায়" কবিতার ছন্দের মতো লীলা চঞ্চল হয়ে উঠলো। সুপ্রিয় তখন ভাবছিলো হাত দেখানোর কথা। রুণুর আবদার সে শুনতে পেলে না।

পকেট থেকে একটা 'স্নো'-র কৌটা দেওয়ালে টাঙানো থাকের'পর রেখে সুপ্রিয় খুশী ছড়ানো স্বরে বল্লে, "আজকে একটা য়্যাডভেঞ্চার্ করা গেলো।"

"য়্যাড্‌ভেঞ্চার!—বিস্ময়চকিত স্বর।

"মানে বাঙ্গালী জীবনে একেই য়্যাডভেঞ্চার বলতে হবে। কাজটা এমন কিছু জমকালো নয়—যা' দিয়ে উপন্যাস লিখা চলে। সোজা কথায়—হাত দেখাতে গেছলুম জ্যোতিষ পাড়ায়।"

রুণু চা'র পেয়ালা এগিয়ে দিলে। চুমুক দিয়ে সুপ্রিয় সুরু করলে, "জ্যোতিষ কি বললে জানো? বল্লে,"......সুপ্রিয় আনন্দের আতিশয্যে চা'য়ে চুমুক দিলে।

—"বললে—শনিরেখা নাকি আমার খুবই ভালো—স্পষ্ট কথা বলে দিলে—এরকম্ prominent শনিরেখা নাকি সাধারণ হাতে সচরাচর চোখে পড়ে না।"

রুণু ততক্ষণে সুপ্রিয়ের আরোও কাছে এসে বসেছে।

"শনিরেখার মানে কি জানো রুণু? জ্যোতিষের ভাষায়, "প্রভূত অর্থ, অসামান্য শক্তি, অসাধারণ যশঃ... ..."

চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে সুপ্রিয় যেন বক্তৃতা আরম্ভ করলে।

"তারপর অনেকক্ষণ হাতের দিকে তাকিয়ে রইলো। তখন আমার যা অবস্থা। গম্ভীর ভাবে হাতটা ছেড়ে দিয়ে জ্যোতিষ রূপোর রঙের ফ্রেম-করা জীর্ণ চশমা খুলে রেখে বল্লে, "হাতদেখা শেষ হয়েছে।"

"শেষ হয়েছে? কি দেখলে আর......"

বললাম আমি।

চশমাটা আবার চোখে এটে জ্যোতিষ বললে, "রবিস্থানের মাউন্ট আপনার চমৎকার। যদিও রেখাটা বিশেষ সুবিধের নয়। তা' থাক্‌লে অবিশ্যি আপনাকে নোবেল প্রাইজের জন্যে কম্‌পিট্ করতে বলতুম......" সুপ্রিয় থামলে। সাবষ্টেশনে গাড়ী যেমন করে হণ্ট করে।

"রবিস্থানের মানে জানো রুণু?"

"ওর মানেই যদি জানতুম, তবে কি তুমি জ্যোতিষকে দু'টাকা দিয়ে আস্‌তে?"

"দু' টাকা দিয়েছি কে বল্লে? আগে সব ব্যাপার শুনই না, ব্যস্ত হ'লে চলবে কেন?" জ্যোতিষ বলে গেলো,—"মাউন্ট যখন ভালো, তখন সাহিত্যিক খ্যাতি আপনার হবেই তা' আজ বা দু' বছর পরেই হোক।" সুপ্রিয়ের জীবনে যেন খুশীর জোয়ার এসেছে। রুণুর হাতটা টেনে ওর আঙুলটিতে মোড়ে দিয়ে সুপ্রিয় বললে,—"জ্যোতিষ খানিকটা ভেবেই যেন আরম্ভ করলে—তবে আরো দু'মাস অন্ততঃ আপনার 'পরে কি কুগ্রহের প্রভাব রয়েছে, —এর পর থেকে আপনি এগিয়ে যাবেন নিশ্চিত যশ এবং অর্থলাভের পথে।"...... জ্যোতিষ দু'টাকা চার্জ্জ করেছিলো। বল্লে কিনা জন্ম-নক্ষত্র মিলিয়ে সে কুগ্রহের প্রভাব বের করেছে। একটাকা দিয়ে ও ভবিষ্যতের আশা দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। পথে বেরুতেই রমেনের সাথে দেখা। সে নিয়ে গেলো ওর বাড়ীতে চা' খাওয়াতে। রমেনকে চেন না? এজেন্সি নিয়েছে। আসবার সময় লটারীর টিকেট একটা গছিয়ে দিলে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে তাই টাকাটা দিতে হ'লো। বাড়ীর কাছে এসে

মনে হ'লো—এতো পয়সাই যখন বেজায় খরচ হ'লো—তাহলে তোমার স্নো'টাই একসঙ্গে কিনে নিই না কেন?"...... এক নিঃশ্বাসে এতগুলো বলে সুপ্রিয় যেন হাঁফিয়ে উঠলো।

"স্নো'টা মুখে ঘষে তুমি একবার প্রসাধন কর না কেন রুণু? ঐ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আবার নূতন করে আবিস্কার কর।"......অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললে সুপ্রিয়।

রুণু আনন্দে ভেঙ্গেই পড়ছিলো আর কি। নিজের খুশীতে টুকরো টুকরো করে চুরমার করে শুধালে, "আর আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা?"

যাতনায় যেন কালো হয়ে এলো সুপ্রিয়র চেহারা। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সে প্রতিধ্বনি করলে—"আরো দু'মাস।"

"আরো দু'মাস?"—আর্ত্তনাদ করে উঠলো রুণুর কণ্ঠস্বর।

আর সুপ্রিয় নিশ্চল, স্থবির।......

"হ্যাঁ, আরো দু'মাস"—মনে মনে সুপ্রিয় মন গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করলো, সে অক্ষম, স নিরুপায়। সে খাওয়াবে কি? পঁচিশ টাকা বেতন দিয়ে ছেলেমেয়েদের দুধের খরচই যোগান যাবে না। নিজেকে উপবাসী না রাখলে ছেলেদের মরতে হ'বে।—রুগ্ন কঙ্কালসার ছেলেরা তা'র চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায়—বেঘোরে মারা যাবে। না, সুপ্রিয় এমনি নিউরেটিক ছেলেমেয়েদের পিতা হ'তে চায় না।...... তার সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। মাত্র দু'মাস—তার কতক দিন পরে......!

সুবিনয় বললে—তোমার শরীর নাকি অসুস্থ রুণু!

রুণু রুমালে এমব্রয়ডারি করছিল। মুখ তুলে চাইলে।

"সৌভাগ্য বলতে হ'বে" চিকন সুরে বললে রুণু, "ভুলেও তোমার মনে পড়লো।"

"ভুলে পড়লো মানে?" জিজ্ঞাসু কৌতূহলে বললে সুবিনয়।

"মানে দু'সপ্তাহ তোমার পায়ের ধূলো পাবার সুযোগ আমাদের হয়ে উঠেনি।"

"কি যে তোমার কথার ছিরি রুণু।" সুবিনয় হেসেই লুটোপুটি।

"আমি আবার দেবতা হয়ে উঠলুম কবে থেকে?"

"দেবতা না হ'লেও" কৃত্রিম অভিমানের রেশ টেনে বললে," রুণু,—আমার দর্শন পাওয়া দেবতার মতোই দুর্লভ যে।"

সুবিনয়ের সেই প্রাণখোলা হাসি।

"ডাক্তার মানুষের দুর্লভ হ'লে পসার জমানো দায় হয়ে উঠে রুণু! মধুলোভী মক্ষিকার মতো রোগীর পেছনে ঘুরে বেড়ানোই তাদের কাজ।"

"সে সুযোগেই বুঝি আজ তোমার দেখা পাওয়া গেল সুবিনয়দা।"

সুবিনয় কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে—পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না যে।

রুণু নীরবে লতাপাতা বুনছে।

সুবিনয় শুধালে—তোমার আগের মতোই ফিট্ হচ্ছে রুণু?"

রুণু প্রশ্নটার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রলে।

—"মেয়েমানুষের একটু আধটু সইতে হয় সুবিনয়দা! এ' নিয়ে হৈ চৈ করে ওকে শুধু শুধু বিব্রত করে কিছু লাভ হবে মনে কর!"

উত্তেজিত কণ্ঠেই বল্লে সুবিনয়—এর অর্থ? অসুখ হ'লে চিকিৎসা করাতে হবে না। আসুক আজ··· ···। সারা দিন সাহিত্য নিয়ে থাকবেন আর এদিকে......।"

বাধা দিলে রুণু—পরের কথায় মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই সুবিনয়দা? মেয়ে-লোকের এটুকু সইতেই হয়?"

"পরের কথা মানে? বন্ধুর প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে রুণু! তিল তিল করে তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে আর ডাক্তার হয়ে আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখবো ভেবেছো?

সুপ্রিয় পেছন থেকে বললে—"এই যে সুবিনয়! তোমাকেই খুঁজছিলাম ভাই!"

"গল্প লেখার ফাঁকে আমাকে খোঁজ করবার অবসর তোমার হয়ে উঠে সেটাই আশ্চর্য্য।"

নিরস কণ্ঠে বললে সুপ্রিয় "অফিসের গাধার খাটুনীর পর কোন ভদ্রলোকের পক্ষে কলম নিয়ে বসা সহজ ভেবেছো?"

"তা নয় বুঝলুম। কিন্তু এদিকে রুণুর চেহারা যে ভেঙ্গে পড়ছে, সে খবর রাখো।"

"সে জন্যই ত তোমাকে খুঁজছিলুম। ফিটের মাত্রাটা ওর আগের চাইতে বেড়ে গেছে অনেক, আমার মনে হয়" সুপ্রিয় যেন নিজকে সজ্ঞানে প্রবঞ্চনা করলে, মাঠের দিকে বেড়'তে নিলে মন্দ হয় না। তোমার ত নিজেরই মটর রয়েছে।"

সুবিনয় ছেদ দিলে বেশ ত! ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি আছে নাকি?"

সুপ্রিয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সুবিনয় রুণুকে তৈরী হওয়ার জন্যে তাড়া দেয়। বেশি দেরী করবার সময় নেই তার।......

* * *

ছ'টা বাজতেই সুপ্রিয় অফিসের বাইরে এসে দাঁড়ালো। এই ধূলি-মলিন কোলকাতার সান্ধ্যরূপটা তার চোখে বড় কমনীয় মনে হ'লো। কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় জানলায় দাঁড়িয়ে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে আমরা যেমন কল্পনাপুরীর রাজকন্যার স্বপ্ন দেখি, আজকের এই ধোয়াটে সন্ধ্যায় পাশে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়ের মন তেমনি তন্দ্রিল হয়ে উঠেছে। রাস্তার মোড়ে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। বাস আর ট্রামের ঘর্ঘর শব্দের সাথে জনতার কোলাহল, সুপ্রিয়ের বিচিত্র মনে হ'লো।

একটা রহস্যতার ছাপ পড়েছে মাটি আর মানুষের 'পরে—বিচিত্র কলরবের অন্তরে বেজে উঠেছে একটা অনুদ্ঘাটিত জগতের সঙ্কেতধ্বনি। এমনি ধূসর সন্ধ্যা বড় বেশী একটা চোখে পড়ে না। "আকাশের নীল রঙ," সুপ্রিয়ের মনে হলো', "যেন ছায়ান্বিত সন্ধ্যাকে স্পর্শের বন্যায় স্নান করিয়ে দেবে।" সত্যি, এই ধরণের শীতের সন্ধ্যা নেশা ধরিয়ে দেয়। এই ধূসরায়িত সন্ধ্যায় সহ গিলে রেস্তোরায় চা খেয়ে, পার্কে বসে নোতুন পরিচিত বন্ধুর সাথে মিষ্টি আলাপ করে কাটিয়ে দেওয়া চলে না। তাই এমনি অলৌকিক দ্যোতনায় ভরা সন্ধ্যায় বসে গল্প লেখা চলে—মানে নিজের পরমতম আত্মার সাথে খানিকক্ষণ নির্জন আলাপ। সুপ্রিয়ের দেহে মনে যেন রঙের পরশ লেগেছে। সুপ্রিয় নিজকে অবিশ্বাস কোরবে নাকি? দশটাকা বেতন বেড়ে যাওয়া—তার পক্ষে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ নয়ত আবার কি? শনিগ্রহের ফল এবার মাত্র আরম্ভ হলো বৈ কি। সুপ্রিয় খুশীতে যেন গান গেয়েই ফেলবে। লটারীর তারিখটা দেখতে হচ্ছে। আজকে বাসে গেলে হয় না। রুণুর জন্যে একটা শাড়ী কিনতে হবে—আর এক প্যাকেট চা। সুবিনয়কে একদিন ধুম করে খাওয়ানো চাই-ই।

এই যে বাস এসেছে। সুপ্রিয়ের কল্পনা যেন হঠাৎ বাধা পেলো। সে চট্‌ করে বাসে উঠে পড়লো।...

...হ্যাঁ, তা সুবিনয়কেও আর রোজ পাওয়া যাবে না। ...রুণুর এবার কষ্ট ঘুচবে। একটা ছোকরা চাকর রাখতে হবে। আর রুণুর কাপড়ট:—খুব বেশি টাকা সে খরচ করতে পারবে না অবিশ্যি। তবে এই টাকা দশেকের মধ্যে।... ভগবান যদি মুখ তুলে চান—তাহলে তাদেরকে এই এঁদো গলিতে পচতে হবে না—প্রকাণ্ড বাড়ী, একখানা ফ্ল্যাট...সুপ্রিয় ভাবতে পারে না। ...প্রকাণ্ড একটা দোকান দেখে সুপ্রিয় ঢুকে পড়লো। কোন রঙটা রুণুর মানাবে ভালো? লাল? হলদে? সুপ্রিয় মনে মনে কল্পনা করে নেয়—তাদের প্রাসাদোপম বাড়ী। জলছে নীল বিজলী বাতি। ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুণু। "নীল আলোর সাথে" সুপ্রিয় যেন মনে মনে আন্দাজ করে নেয়, "নীল শাড়ীটাই মানাবে ভালো।" এই শাড়ীটা পরে রুণু তার সাথে মেট্রোয় যাবে। মানে কালকেই। সুবিনয়ও তাদের সাথে যাবে নিশ্চয়ই। ভদ্রতার অনুরোধে একবার বলতে হবে—তার অবিশ্যি অন্য কাজও থাকতে পারে। তা' হলে এই নীল শাড়ীটা নেওয়াই ঠিক।

জিজ্ঞেস করলে, "এই শাড়ীটার দাম দেখে দাও ত?"

দোকানী বল্লে, "এর দাম কিছু বেশী পড়বে বাবু। সিল্কের কিনা। পনর টাকার এক সিকি কমেও আপনি পাবেননা কোথাও কোল্‌কাতায়।"

পায়ের তলায় জগতখানি

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন

পায়ের তলায় জগতখানি
দিনে দিনে যাচ্ছে স'রে;
কোন্ বাধনে অচল ক'রে
বল, তারে রাখব ধরে?

সকাল বেলা আলোর খেলা,
আঁধার এল সন্ধ্যা বেলা;
ডুব্‌ল রবি দিনের মত
কাল উঠবে আবার ভোরে;
যে কাল এল সে কাল গেল
কে পারে ফেরাতে ওরে।

আসার পথে আশার হাসি,
আনন্দ তার বাজায় বাঁশী;
যাবার পথে মেঘের খেলা
পড়ে কেবল অশ্রু ঝরে;
ঝরা ফুলের গুল-বাগেতে
ভুলে আছি মায়ার ঘোরে।

"পনর টাকা"—বড্ড বেশী দাম মনে হচ্ছে। সুপ্রিয়ের দেখছি মনের মতো জিনিষ কেনা হবেনা। পনর টাকা দিয়ে কিনে ফেলবে নাকি? হাতটার দিকে ত'ার চোখ পড়লো। শনিরেখা যেন এই ক'দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু'মাস ত শেষ হ'লো বলে। কেজানে লটারীর টাকাটাও হয়তো পেয়ে যেতে পারে। তা'রপর......অফুরন্ত সুখ, এতো সুখ কি তা'র সইবে? সুপ্রিয় নীল কাপড়টা বেধে দিতে বল্লে। দশটাকার দু'খানা নোট বের করে দিলে সুপ্রিয়।—...কাপড়টা দেখে রুণুর যা আনন্দ হবে। সুপ্রিয় ভেবেই যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আর মেট্রোয়

যাবার কথা···সুপ্রিয় হ'লফ করে বলতে পারে, ···মেট্রোয় যাবার কথা বললে ছোট ছেলে-মেয়েদের মতো রুণু খুশীতে কেঁদেই ফেলবে।

"আপনার পাঁচটাকা নিয়ে যান বাবু!" দোকানী বললে।

তাইতো। পাঁচটাকা সে ফেলেই যাচ্ছিল বুঝি। দোকানের ঘড়িটার দিকে তাকালে। আটটা বাজতে ন'মিনিট বাকী। এবার বাড়ী ফেরা চাই। সুপ্রিয় বালেই যাবে। কাপড়টার রঙ······রুণু আনন্দের আতিশয্যে একদম নির্ব্বাক হয়ে যাবে! তারপর আবার মেট্রোয় যাবার প্রস্তাব ···।

···বাড়ীটাকে বড্ড নির্জ্জন মনে হচ্ছে। এরা সব গেলো কোথায়? কণ্ঠের স্তিমিত আলোকে সুপ্রিয় উজ্জ্বল করে দিলে। ঘরের সব জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে ছড়ানো রয়েছে। বিছানা পর্য্যন্ত পাতা হয়নি। না—রুণু ভারী অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে। চায়ের জল পর্য্যন্ত চড়ানো হয় নি। কী থাবে মাথামুণ্ডু। কিন্তু রুণু কোথায়? বাইরের কোঠার দরজা খোলতেই জমাট আঁধার বেরিয়ে এলো। কিন্তু রুণুর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছেনা যে! সে কি বাতাসে মিশে গেল নাকি? আর খুঁজবই বা কোথায়? বাড়ীতে ত আর একশ' গণ্ডা কোঠা নয় যে অন্য কোথাও গিয়ে বসবে। সুবিনয়ের সাথে সিনেমায় গেছে; সিনেমায় সে কি নিয়ে যেতে পারতো না? এইভাবে না বলে কয়ে সিনেমায় যাওয়া—সুপ্রিয়ের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হলো।···হয়রাণ হয়ে সুপ্রিয় নিজেই চা' করতে বসলে। টাইম্-পিসের দিকে তাকালে। ন'টা বাজতে আর মিনিট দশেক বাকী। কাপে চা ঢেলে হঠাৎ সুপ্রিয়ের মনে হ'লো—রুণু যদি আর ফিরে না আসে? বুকটা তা'র অকারণে কেঁপে উঠলো। রুণু আসবে না তো যাবে কোন্ চুলোয়? বা শাড়ী কিনে এনেছে!

সিনেমা থেকে ফিরবে বোধ হয় এক্ষুনি। শুধু শুধু ভেবে মনকে ভারী করে লাভ নেই। তা'র চাইতে গল্পটা শেষ করে রাখা ভাল।···কলতলায় ঝপ্ ঝপ্ শব্দ হচ্ছে কিসের? রুণু কলতলায় নাকি? এত রাত্তিরে ও কলতলায় কি করতে গেছে?···সুপ্রিয় উঠে গেলো। "এই যে তোমার শাড়ী"—সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠেছিলো আর কি! 'কোথায় ঘুমটো দিয়ে ভাড়াটে বাড়ীর বৌ একরকম পালিয়ে বাঁচ্ছিলেন বলতে হয়।···আর ভুল নয়। রুণু নির্ঘাত সিনেমায় গেছে। এই অবসরে সুপ্রিয় তার অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পটা শেষ করে ফেলবে। রুণুর সিনেমা দেখবার সখকে সে অপূর্ণ রাখবেনা। শনিরেখা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছেনা? তারপর অসহ্য সুখে সুপ্রীয় চোখ বুজলে —তারপর প্রভূত অর্থ, অসামান্য প্রতিপত্তি, অসাধারণ যশঃ।···" লটারীর টিকেটের তারিখ আর নম্বরটা আবার দেখে রাখা দরকার।

···এগারোটা বাজবার শব্দে সুপ্রিয়ের চমক্ ভাঙলো। গল্পলিখার নেশায় সময়ের হিসাব তার ছিলনা। এবার কিন্তু সুপ্রিয়ের বুকটা ভয়ানক আতঙ্কে কেঁপে উঠলো চেয়ার থেকে উঠবার সামর্থ্য-টুকুও যেন সে হারিয়েছে। বাড়ীটা যেন শূণ্যে ঘুরতে আরম্ভ কোরেছে।···সুপ্রিয় জানালার সামনে এসে দাঁড়ালে।—

গলিটাতে তখন কুৎসিত নরনারীর বিশ্রী কোলাহল। শাড়ীটার দিকে চোখ পড়লো সুপ্রিয়ের। সে চেঁচিয়ে উঠবে নাকি?

···বাইরে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো না? সুপ্রিয় লাফিয়ে উঠলো। ওঃ রুণু বেড়াতে গিয়েছিল বুঝি সুবিনয়কে নিয়ে! তাকে বলে গেলেই ত সব গোল চুকে যেতো। নীল শাড়ীটা দেখে রুণু এক্ষুণি খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।···

···ঝড়ের বেগে সুপ্রিয় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো? কিন্তু···ঘটরটা মন্থর গতিতে তার সামনা দিয়েই এগিয়ে চলেছে।···

নিশাচর মানুষের অভিসার···এতো কম ভাড়ায় এই ধরণের গলি ছাড়া আর কোথাও বাড়ী পাওয়া যাবেই বা কেন? রুণু তাহলে আর আসবেনা?···সুপ্রিয় চেঁচিয়ে উঠবে নাকি? প্রেতায়িত কণ্ঠস্বরে সে একবার রুণুর নাম ধরে ডাকতে পারেনা? সাহস হয়না। শূন্য বাড়ীটা হয়তো তেমনি প্রেতকণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠবে।···

আলেখ্যদর্শন

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে

অধ্যাপক **শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী**

আষাঢ়ের নীরদকুন্তলা চপলাপাঙ্গী অমানিশীথিনী। তড়িৎস্ফুরণপিঙ্গল মেঘমেদুর অম্বরতল হইতে বিরহিনী যক্ষবধূর হৃদয়বিগলিত নয়নাসারের ন্যায় অবিরাম রিমিঝিমি বরিষণ সুরু হইয়া একতানাবদ্ধ মন্দাক্রান্তা ছন্দকে যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষণ-মুখর নিশীথে নির্জ্জন কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়নপার্শ্বে নীরবে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তামসী বর্ষাযামিনীর ঘনশ্যামল সজল রূপ দু'নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিতেছিলাম—আর ইহারই মধ্যে লোচনগ্রাহিনী মনোহারিণী তন্দ্রাদেবী বিনা আবাহনে সুপ্তিলোক হইতে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া কখন আমার অক্ষিপদ্মাসনে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, তাহা ক্ষণিকের তরেও জানিতে পারি নাই।

সহসা দীপ্ত আলোকসম্পাতে নিদ্রাভারাতুর নয়নযুগল ধাঁধিয়া গেল। ধীরে ধীরে দেখিবার শক্তি ফিরাইয়া পাইলে লক্ষ্য করিলাম—সে ঘোর দুর্দ্দিনরজনীর অবসান ঘটিয়াছে। নিরভ্র নিসীম নভস্তলে যুগপৎ অভ্যুদিত শত রাকা শশীর মধুরোজ্জ্বল ময়ূখমালিকা দিঙ্মণ্ডল উজলিয়া ধরণীতলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে অপরূপদীপ্তিতে নিদাঘমধ্যাহ্নের ভানুকিরণের ভাস্বরতা আছে, কিন্তু প্রখরতা নাই। এ ত' বিশ্বদাহিকা জ্বালাময়ী বহ্নিশিখা নহে—এ যে স্পর্শক্ষম জ্যোতিষ্মতী রত্নপ্রভা। সে অপ্রাকৃত আলোকের উৎস-সন্ধানে আকাশপটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু সূর্য্যচন্দ্রতারকাবিহীন গগনতলে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোন অভিনব জ্যোতিষ্কের দর্শন মিলিল না।

তারপর—ধীরে অতি ধীরে—দিগন্তপ্রান্ত হইতে সে স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভাজাল মধ্যগগনে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল—যেন গ্রহনক্ষত্র-সৃষ্টির প্রাক্‌কালে শুভ্রস্বচ্ছ নীহারিকাপুঞ্জ ঘনীভূত হইবার উপক্রম করিতেছিল। ক্রমে দেখিলাম—মাথার উপর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছে—আর তাহারই রশ্মিরাজি-বিচ্ছুরণে প্রতিক্ষণে অগণিত তারকার উৎপত্তি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সে নক্ষত্রসনাথ সিতাংশুবিম্ব ধরিত্রীর দুর্নিবার আকর্ষণে যেন সচল হইয়া অধোদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী হইতেই সবিস্ময়ে দেখিলাম—এ ত আমাদের নিত্যদৃষ্ট চন্দ্রমণ্ডল নহে—তাহার পরিবর্ত্তে এক লোকোত্তর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নিজ দিব্য দেহদ্যুতিতে এ অপার্থিব আলোকচক্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর্ভেদী নেত্রদ্বয়ে প্রোজ্জ্বল প্রতিভার রবিরশ্মি—উন্নত প্রশান্ত ভালপট্ট যেন বাণীর লীলানিকেতন—দৃঢ়সম্মিলিত প্রক্ষীণ ওষ্ঠাধর তীব্র শ্লেষানুরঞ্জিত মৃদুস্মিতরেখায় উদ্ভাসিত। এ চিরপরিচিত মূর্ত্তি ত কভু ভুলিবার নহে। দেখিবামাত্র শ্রদ্ধায় মস্তক আপনি অবনত হইয়া পড়িল

পুনরায় চাহিতেই দেখিলাম—সে জ্যোতিমণ্ডল দূর গগনের কোলে কখন সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়া এক বিচিত্ররূপা তারকা সমুদিত। তারকার অভ্যন্তরে সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! একদিকে—সান্ধ্যসমীরণ-বিকম্পিতা স্ফুটনোন্মুখা বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় বেপথুমতী—ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা—অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা—দুকূল প্রাবরণ-পরিমণ্ডলিতা মুগ্ধা কিশোরীর বালেন্দু-কিরণপ্রতিম অমলদেহকান্তি এক নির্জ্জন দেবাগারের গর্ভগৃহ আলো করিয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে — প্রভাতবাতাহতি-কম্পিতাকৃতি তরুণরবিকরোৎফুল্লা জলনলিনীর ন্যায় এক বরারোহা যবনবালা মুক্তাহারবিশোভিত আবেগকম্পিত পীবরোন্নত হৃদয় পদ্মারক্ত কোমল করকমলে চাপিয়া—নীলোৎপলনিন্দী নয়নপ্রান্তে পূর্ব্বাহ্ণিক নবারুণকিরণের ন্যায় মধুরোজ্জ্বল কটাক্ষ হানিয়া—সুপক্ক বিম্বপ্রতিস্পর্দ্ধী সরস ওষ্ঠাধর গর্ব্বে বিস্ফুরিত করিয়া—রোগশয্যায় শায়িত প্রাবৃট-সম্ভূত প্রত্যগ্রদূর্ব্বাদলকান্তি দীর্ঘায়তদেহ এক বীর যুবকের পানে রত্নাঙ্গুরীবিমণ্ডিত চম্পককোরকনিভ অঙ্গুলী সঞ্চালনে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিতেছেন—"এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!" মধ্যস্থলে—এ কোন বেণীবিলম্বিত-শিরোরুহা—মণিমুক্তাভরণভূষিতাঙ্গী—বিলম্বভূমিষ্ঠঘোঠনা প্রমদা কজ্জলনিবিড় আয়তচঞ্চল আবেশ-মদির নয়নপ্রান্ত হইতে বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত অপাঙ্গবিভঙ্গে বিবেকবিমূঢ় দর্শকের চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া—তাম্বূলরাগরঞ্জিত ফুল্লাধরে শাণিত-ছুরিকাফলকপ্রভার ন্যায় ক্রূর হাস্যরেখা লুকাইয়া—অনবদ্য অঙ্গহার সহকারে লাস্যবিলাসে মাতিয়াছেন?

এইরূপে এক এক করিয়া সে সকল আলেখ্য-শ্রেণী আমার নয়নপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে লাগিল। দেখিলাম—একদিকে—ঊর্দ্ধে মস্তকোপরি অচঞ্চল আনীল অম্বর-সায়র ও নিম্নে পদতলে ফেনিলোর্ম্মি-বিচঞ্চল সুনীল লবণসাগরের পূত সঙ্গম-স্থলকে পটভূমিকায় রাখিয়া—সেই অস্তায়মান সূর্য্যালোক ও ঘনায়মান বনান্ধকারের লক্ষ্যালক্ষ্য মিলনভূমে—দিনক্ষপামধ্যগতা সন্ধ্যারাণীর মতই এক ব্যক্তাব্যক্তরূপলাবণ্যময়ী ছায়াশরীরিণী দাঁড়াইয়া।—কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধি তখনও তাঁহার

অতিক্রান্ত হয় নাই।—আগুল্ফলম্বিত অবেনীসংবদ্ধ কেশভার কপালপ্রান্ত বাহিয়া কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গীর ন্যায় তাঁহার যৌবনবন্ধুর প্রতি অঙ্গে প্রলম্বিত হইতেছিল। সহসা সে মূর্ত্তিমতী কাননকুন্তলা বনদেবী-প্রতিমার অধর ঈষৎ প্রস্ফুরিত হইল—দূরাগত মোহন বংশীধ্বনির ন্যায় কল-কাকলী শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া চিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলিল—"পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" চমকিয়া দিগন্তরে চাহিয়া দেখি—অন্তরীক্ষচ্যুতা স্থির-সৌদামনী-লেখার ন্যায়—নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়—নিস্তরঙ্গ পারাবারমধ্যবর্ত্তিনী পুর্ণ-বিকশিতা পদ্মিনীর ন্যায় এক স্পন্দনহীনা রাজমোহিনী মূর্ত্তি—বাধিতগতি স্রোতোবিহারিণী রাজ-হংসীর মত—চলিত-ফণিনীর মত অভিরাম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে উন্মাদিনীর প্রায় সে কোপনা প্রৌঢ়যৌবনা যবনী অনবনমনীয় গর্ব্বে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে—ভামিনীর বিলোল গ্রীবা হইতে সুগন্ধি যূথিকার মালা খসিয়া পড়িয়াছে। মন্মথ-শরাসনসদৃশ কুটিল ভ্রূযুগ ঈষৎ কোপকুঞ্চিত—অনিমেষ আয়ত প্রদীপ্তচক্ষু ক্ষুধিতা শার্দ্দুলবনিতার ক্রুদ্ধ নয়নের ন্যায় অনলোদ্গারণ করিতেছে অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতিম সুন্দর ললাটে ধমনী স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা বিকাশ করিয়াছে—অধিবিস্ফারিত নাসারন্ধ্র যুগল থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছে। বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের ন্যায় সে ভীমকান্ত তনুমহিমা দর্শনে এক অজ্ঞাতভয়ে নয়ন আপনি মুদিয়া গেল। পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে দৃশ্য [illegible] আবার দেখিলাম। একদিকে—প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার ন্যায় বিমলিনা এক অর্দ্ধোন্মাদিনী বরবর্ণিনী আপন হাতে সযত্নে চিতা সাজাইতেছেন। বয়সে বালিকা—কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার কুসুমপেলব মুখমণ্ডলে প্রৌঢ়াসুলভ গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়াছে। পরিধানে রক্তাম্বর গলদেশে বনফুলহার—সীমন্তে সমুজ্জ্বল সিন্দুররেখা। দেখিতে দেখিতে সতীর স্বহস্তরচিত চিতা ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডার্পিতা নবমালিকার মতই চিতানলসন্তাপে সে মনোরমা কুসুমকলিকা নিমেষে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। অন্যদিকে—হরিণ-পরিহীন-হিমকরবদনা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি আর একটি মৃণালমৃদুলা ললনা দুঃশ্চিন্তাভারাবনম্র বদনে উপবিষ্টা। কুবলয়-দলদৃপ্ত নয়নযুগল হইতে অবিরল জলধারা বিগলিতা হইয়া করতলন্যস্ত বিবর্ণ কপোল-যুগল প্লাবিত করিয়া দিতেছে। দেখিলে মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতী করুণা—অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা! অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এক খর্ব্বকায়া ভ্রমরকৃষ্ণাঙ্গী নর্ম্মসখী সুললিত কোমলকণ্ঠে দিক্ মুখরিত করিয়া গাহিতেছে—

"কণ্ঠকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে।"

নয়ন মেলিয়া দেখি আবার দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত।—বৃন্তচ্যুতা হিমনিষিক্তা কুন্দ-কলিকার ন্যায় এক সদ্যঃ পতিবিয়োগ-বিধুরা বালবিধবা নিদারুণ অন্তর্দাহে হর্ম্ম্য-তলে ধূলিলুণ্ঠিতা। অদূরে দাঁড়াইয়া এক নবযৌবনোদ্ধতা পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী পরিচারিকা হীরকমৌলি নাগিনীর ন্যায় নিস্পলক ক্রূর দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণে নিরতা। আর সূর্য্যমুখাবলোকিনী প্রস্ফুট স্থলকমলিনীর ন্যায় স্থিরপ্রশান্তবদনা সৌম্য-স্নিগ্ধলাবণ্যময়ী মানিনীমূর্ত্তি বিষাদ-করুণ কণ্ঠে বলিতেছেন—"যিনি বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেন, তিনি যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

এ আবার কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সৌধতলে এক কৃষ্ণাঙ্গী বর্ষীয়সী শয়ানা। তাঁহারই পদপ্রান্তে বৈকুণ্ঠবিচ্যুতা ইন্দিরার ন্যায় এক হীনবেশা নিরাভরণা বিকচনলিননয়না অপরূপরূপবতী তরুণী নিঃশব্দে তপ্তাশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে আত্মগত ভাবে বলিতেছেন—"কালির বোতলটায় গলায় গলায় কালি!" নিকটে দাঁড়াইয়া আর একটি চূর্ণালকগুচ্ছবেষ্টিত প্রস্ফুট কুসুম-মুখী হাস্যরঞ্জিতাধরা সদানন্দময়ী সুভাষিণী মাতৃমূর্ত্তি নীরব নয়নসঙ্কেতে তাঁহাকে সাদরে সান্ত্বনা দিতেছেন।

সহসা কলকলনাদে চমকিয়া চাহিয়া দেখি—দিক্‌চক্রবালচুম্বী অসীমনীলাম্বরতলে পীযূষধারা-প্রবাহিণী দিব্য তটিনী উদ্বেলিতা হইয়া উঠিয়াছে। সে অনন্তভারাপথ-ব্যাপিনী মন্দপবনতাড়িতা ক্ষুদ্র-বীচি-মালিনী শুভ্রসলিলা সুরশৈবলিনীবক্ষে চন্দ্রকরস্নাত দুই তরুণ-তরুণী মনের সুখে বিরামবিহীন সন্তরণে বিভোর। শিশির-বিধৌত প্রফুল্ল শ্বেত-কমলাননা সে প্রস্ফুট-যৌবনার সুগভীর কৃষ্ণতার নয়নতলে তলাইয়া যাইতে যাইতে সহগামী প্রিয়দর্শন যুবা ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় ডাকিলেন—"শৈ!" তরুণী চমকিয়া চক্ষু মুদিল। বিক্ষুব্ধ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া হলাহলদিগ্ধ কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল—"আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?" সঙ্গে সঙ্গে

প্রবল ঝঞ্ঝায় গঙ্গার সে স্থির শ্বেত-বারিবিস্তার উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল হইয়া উঠিল। দুর্ব্বার স্রোতাবেগ ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় এই দুই যুবক-যুবতীকে কোন্ অকূলে ভাসাইয়া লইয়া গেল—আর দেখা গেল না।

মুহূর্ত্তমধ্যে সুরতরঙ্গিণী আবার দেখা দিলেন—কিন্তু এবার তাঁহার রূপান্তর ঘটিয়াছে। চৈত্রবায়ুসংস্পৃষ্টা—তরঙ্গ রত্ন-কিরীটিনী উচ্ছল-কলনাদিনী গঙ্গার প্রবাহ-মধ্যে খররবিকরতাপিতা সুকুমার কুসুম-কলিকার ন্যায় ম্লানমুখী দীনা হীনা মলিনা এ কোন্ বালিকা ধীরে অতি ধীরে নিঃশব্দে নামিয়া আসিতেছে!—তাহার মুদ্রিত পঙ্কজ-কোরকনিভ-নয়নযুগলে অতি ঘোরা রজনী বুঝি চিরতরে ঘনাইয়া আসিয়াছে!

পুনরায় পট পরিবর্ত্তন!—এ যে দেখি—কাকচক্ষুতুল্য স্বচ্ছসলিলপূর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরগ্রথিত এক সুবিশাল দীর্ঘিকা। তীরস্থিত বিবিধ তরুলতার নয়নরঞ্জন কুসুমস্তবকবর্ষণে সে নির্ম্মল দর্পণাভ স্থির জলরাশির চতুর্দ্দিক্প্রান্ত বিচিত্র বর্ণসুষমায় অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুশীতল সুরভি জলতলে—মর্ম্মরসোপানশ্রেণী যথায় গিয়া শেষ হইয়াছে—তথায় স্ফটিকাধারে সুরক্ষিতা হৈম-প্রতিমার ন্যায়—সহকারশাখারোহিণী ছিন্নমূলা মাধবীলতার ন্যায় বর্ষাস্নাত চম্পককান্তি নিমীলিতোৎপলনয়না ফুল্লকুসুমরক্তাধরা বিকীর্ণধারাধরমূর্দ্ধজা অশান্তশোভাশালিনী এক রহস্যময়ী রমণীমূর্ত্তি যেন বাপীতল আলো করিয়া শুইয়া আছে। অতীতের সে অনিন্দ্যসুন্দর আনন আজ মৃত্যুর করাল কালচ্ছায়ায় গাহমান; সেথানে যেন মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বন্দ্ব চলিতেছে; নয়ন মুদ্রিত, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসায় বুঝি বা শ্বাসও বহিতেছে না। দূরে সৌধবাতায়নপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণাপরাজিতা-কলিকার ন্যায়—মৃদুগুঞ্জিতা ভ্রমরবালার ন্যায়—একটি অর্দ্ধস্ফুট-যৌবনা সরমজড়িতা বালিকাবধূ মরমে মরিয়া বিষাদক্লিষ্ট নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিতেছে।

চক্ষু পালটাতেই আবার নূতন দৃশ্য দেখিলাম।—একদিকে—সজীব মর্ম্মর-প্রতিমার ন্যায় গর্ব্ব-সুরঞ্জিতদেহা ভুবনমোহিনী এক রূপবতী রাজপুতকুমারীর চঞ্চলচরণক্ষেপে একটি গজদন্তবিনির্ম্মিত আলেখ্যফলক শতধা বিচূর্ণিত। অন্যদিকে—সঞ্চারিণী দীপশিখার ন্যায় নির্ম্মলকান্তি আর এক চতুরা ক্ষত্রিয়-বালার সকৌতুক অঙ্গুলিসঙ্কেতলীলায় শ্বেত-শ্মশ্রু রাজরাজেশ্বর পর্য্যস্ত পরিচালিত হইতে-ছেন। আর অতি দূরে—রত্নপুষ্পভূষণসম্ভার অযত্নে চারিপার্শ্বে ছড়াইয়া ফেলিয়া কাদম্বিনী-ছায়াপ্রচ্ছন্না শশিলেখার ন্যায়—হিমোপরাগ-গ্রস্তা মৃণালিনীর ন্যায় চিরাভ্যস্ত বিলাসবিভ্র-মালসা অপ্সরোরূপনিন্দী এক যবনাঙ্গনা অশ্রুক্লিন্নবদনে কঠিন পাষাণকুট্টিম আলিঙ্গনে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছেন।

বর্ষার প্রবল জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণা খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর উত্তাল-তরঙ্গজাল ভেদিয়া বিস্তৃতপক্ষা রাজহংস-বধূটির মতই তর তর বেগে একখানি পালতোলা বজরা ছুটিয়া চলিয়াছে। বজরার ছাতের উপর উন্মুক্ত অম্বরতলে কে এ মহীয়সী রমণী—দেবী না মানবী? ভাদ্রের ভরা নদীর ন্যায় তনুযমুনায় যৌবনজোয়ার লাগিয়াছে।—পুরুষোচিত বীরভাবে ভাবিত স্বাস্থ্যায়ত দেহ—অথচ নারীসুলভ কমনীয়তা-বর্জ্জিত নহে। টলমল নদীজলের ন্যায় সে লাবণ্য সততচঞ্চল—কিন্তু নিস্তরঙ্গা তরঙ্গিণীর মতই সে লাবণ্যময়ী স্থিরাধীরা—গম্ভীরা পরিপূর্ণ আনন্দময়ী। নদীসৈকতের ঘনান্ধকার তালীবনচ্ছায়ার ন্যায় আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম অংসে পৃষ্ঠে বাহুতে ও বক্ষে বিসর্পিত। ইন্দুকরপ্রতিফলিত বিপাণ্ডুর বারিপূরসদৃশ সূক্ষ্ম ক্ষৌমবসনের মধ্য হইতে অর্দ্ধচন্দ্রবিনিঃসৃতা জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ দেহকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মূর্ত্তিমতী বীণাপাণির মত এ ত্রিদিবললামভূতা দেবীপ্রতিমা একতানে বীণাবাদনরতা। বল্লকীর বিচিত্র তন্ত্রীঘাতের মধ্য দিয়া শ্রুতি-গ্রাম-মূর্চ্ছনার আবির্ভাবের তালে তালে কোমল পীবরাংসচুম্বী কর্ণাভরণ দুলিতেছে। আর বন্যকুসুম-সুরভিত কৌমুদী-বিধৌত বায়ুস্তরে সে অপার্থিব স্বরলহরী খেলিয়া বেড়াইতেছে। বজরার অভ্যন্তরে মহেন্দ্রের বৈজয়ন্তীপ্রাসাদ-বিনিন্দিত সুসজ্জিত দীপাবলীসমুজ্জ্বল প্রকোষ্ঠমধ্যে বিচিত্র কারু-কার্য্যসনাথ পালঙ্কে দুগ্ধফেনধবল সুকোমল শয়নে আর এক তরুণীর তনুবল্লরী এলায়িতা। সুসূক্ষ্ম দুকূল-মুখাবরণের ভিতর হইতে কষিতকাঞ্চনকান্তি ও ভ্রমরকৃষ্ণ কেশপাশ ঈষৎ অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। আর প্রকোষ্ঠ-ভিত্তিবিলম্বিতা দীপমালার প্রভা ম্লান করিয়া কুটিলনীলালকমধ্যশোভী অমল বদন-কমলে সৌরকরবিভাসিত স্বচ্ছসাগরবারিবৎ বিলোল কটাক্ষ ঝলসিতেছে। অতনুর ফুলধনুতুল্য আকর্ণপ্রসারী সুবঙ্কিম ভ্রূযুগনিম্নে মদনের কুসুমশর-সদৃশ মর্ম্মভেদী নয়নবাণে বিদ্ধ হইয়া এক তরুণ সেই অবগুণ্ঠিতা সুন্দরীর ফুল্লকোকনদনিভ রাতুল চরণযুগল নিজ অঙ্কে সযত্নে স্থাপনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে সংবাহন করিতেছেন।

তারপর আসিল এক অপরূপ ছবি!—নভঃস্পর্শী মহামহীরুহের শাখাবিলগ্নচরণা শ্যামলপল্লবান্তরে অর্দ্ধাবলুপ্তদেহাবয়বা এ কোন্ রিপুভয়বারিণী দানবদলনী মূর্ত্তি! বিচঞ্চল চেলাঞ্চল স্বাধীন হিন্দুশাসকগণের রাজশ্রীর বিজয়কেতনের মতই সগৌরবে উড্ডীন—আলুলায়িত কুন্তলভার প্রতিকূল-

পবনে পশ্চাতে উড়িতেছে—দৃপ্তচরণ ভরে বিটপযুগল ক্রমান্বয়ে নামিতেছে উঠিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে সেই বঙ্গবীরাঙ্গনার অনিন্দ্যসুন্দর করাল-কোমল তনু টলমল করিতেছে—যেন সিংহবাহিনী নগেন্দ্রনন্দিনী অসুরবধে মাতিয়া রণরঙ্গে নাচিতেছেন। বিস্ফারিত সুনাসায় সঘন দীর্ঘশ্বাস বহিতেছে—অবঙ্কিম কটাক্ষ নিরন্তর কৃশানুকণা বর্ষণ করিতেছে—চূর্ণকুন্তলবিজড়িত অর্দ্ধচন্দ্রললাটে মুক্তানিন্দী স্বেদবিন্দু সমুদ্গত হইয়াছে—আর স্ফুরিত বিম্বাধরে মুহুর্মুহুঃ সঘনে নিনাদিত হইতেছে "মার মার শত্রু মার!" দেখিতে দেখিতে আবেগে মুখ দিয়া বাহির হইল—'অবলা কেন মা এত বলে!"

নিমিষে দৃশ্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। আর এক তেজস্বিনী বঙ্গবালা অবলীলাক্রমে লৌহধনুতে গুণযোজনা করিতেছে। গৈরিক বসনাবৃতা সে বীরললনা শরন্মেঘাবলুপ্ত জ্যোৎস্নার মতই শোভাময়ী—উজ্জ্বল নয়নে তাঁহার মা ভবানীর তৃতীয় নেত্রের বহ্নিশিখা—সৌম্য সহাস সুন্দর বদনে পতিগতপ্রাণার ত্রিভুবনবিজয়িনী সতীত্বদীপ্তি—বাহুতে অপরিমিত বল—অন্তরে দুর্জ্জয় সাহস—কণ্ঠে মোহন গীতিধ্বনি—"এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?"

একটির পর একটি করিয়া এই আশ্চর্য্য চিত্রাবলী নয়ন ভরিয়া হেরিতেছিলাম, সহসা সে দিব্য আলোকদীপ্তি নিভিয়া গেল। সূচীভেদ্য তমিস্রার মধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে দেখিলাম—নিবিড় অন্ধকারকে নিবিড়তর করিয়া নীলাশ্মদ্যুতি এক কালিকামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়াছেন। ক্ষুৎক্ষামা, শুষ্কমাংসা, বিগলিতচিকুরা জিহ্বাললনভীষণা, নিমগ্ন-রক্তনয়না নগ্নিকামূর্ত্তিতে দেশব্যাপী মহা-শ্মশানবক্ষে সে কঙ্কালমালিনী করালবদনা শ্যামা অসিকরে তা-তা-থৈ-থৈ নৃত্য করিতেছেন। অকস্মাৎ সে অন্ধতমসার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া অশরীরিকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—'দেখ, মা যা হইয়াছেন।" সে বিভীষিকা-ময়ী মূর্ত্তি দর্শনে আতঙ্কে চক্ষু মুদিলাম।

মুহূর্ত্তমধ্যে জলদগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'চাহিয়া দেখ, মা যা' হইবেন।" নয়ন মেলিয়া দেখিলাম—কোটি বালারুণ-ছটায় দিগবলয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আলোকপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলে দশভুজা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা জগজ্জননী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি ধরিয়া হাসিতেছেন।—"রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা—নানাপ্রহরণ-ধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য-রূপিণী—বামে বাণী-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়—কার্য্যসিদ্ধিরূপীগণেশ…"—অভিভূত হইয়া ধূলায় মস্তক লুঠাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে!'

অমনি দূর অম্বরতলে অমরার গায়ক-গায়িকাগণের মিলিত কণ্ঠে শ্রবণমঙ্গল গীতিধ্বনি উঠিল—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে॥
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী—নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্॥"

অপরাজেয় প্রতিভার অপূর্ব্ব ছায়ালোক-সম্পাতে, অতুলনীয় লেখনীমুখে অনবদ্য

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ

হুগলী জেলার অনুষ্ঠান

গত ১৬ই আষাঢ় (ইং ১লা জুলাই) শুক্রবার চুঁচুড়া রূপালী চিত্রগৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে হুগলী জেলা বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। প্রথমে শ্রীমতী সতী দেবীর পরিচালনায় ঋষি বঙ্কিমের সাধনলব্ধ মন্ত্রসঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' গীত হইবার পর বর্ষীয়ান্ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত এ, কে, এম্ জ্যাকারিয়া মহাশয়ের উদ্বোধন করিবার কথা ছিল; কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার কর্ত্তব্যভার মহাস্থবির জলধরদাদার এখনও বহনক্ষম স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছিল। অথচ কি আশ্চর্য্য শনিবারের (১৭ই আষাঢ়) দৈনিক বসুমতীতে যে সভা-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ছাপা দেখিলাম যে কলিকাতার মেয়রই সভার উদ্বোধন কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। 'বসুমতীর' প্রবীণ সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু যে অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিয়া আসিলেন, তাহারই বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহারই সম্পাদিত দৈনিকে এরূপ অমার্জ্জনীয় ভুল—বিস্ময়কর বটে! যাহারা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহাদের কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে হয়ত দাদা হেমেন্দ্র প্রসাদ স্বয়ংই শুক্রবার বেলা ১২টার পূর্ব্বে সভার ভাবী বিবরণটুকুর কপি প্রেসে দিয়া সাড়ে বারটায় নিশ্চিন্তচিত্তে সভাপতিত্ব করিতে চুঁচুড়া গিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার এরূপ প্রমাদ ত বড় একটা দেখা যায় না।

জলধরদাদার উদ্বোধনের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর তাঁহার সুলিখিত সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ" পাঠ করেন। ইহার পর প্রিয়দর্শন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সতেজ সুললিতকণ্ঠে সরল সংস্কৃত ভাষায় বঙ্কিম-বন্দনামূলক একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবেত জনমণ্ডলীর করতালিধ্বনি হইতেই অনুমান করা যায় যে বক্তৃতাটি জনপ্রিয় হইয়াছিল।

অতঃপর কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। পরে ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বক্তৃতা প্রদান করেন। ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতায় আমরা বঙ্কিম সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন কথা শুনিবার আশা করিয়াছিলাম কারণ, বাঙলা ভাষায় থিসিস্ দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনিই প্রথম ডক্টর হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে হইয়াছে। তিনি শুধু বলিয়াছেন যে বঙ্কিম পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যভাবমিশ্র যে রীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আজও পর্য্যন্ত আমরা তাহারই অনুবর্ত্তন করিতেছি। তাঁহার প্রদর্শিত এই পথই সত্যমার্গ আর এই সত্যদর্শনজনিতই তাঁহার ঋষিত্ব। এই কয়টি কথাই কেবল ঘুরাইয়া ফেনাইয়া হাত-পা নাড়িয়া তিনি এরূপ অনাকর্ষক ভাব ও ভাষার সাহায্যে বহুক্ষণ ধরিয়া বলিয়াছিলেন যে, চুঁচুড়াবাসীর ধৈর্য্যের প্রশংসা করা ছাড়া আমাদের এ বিষয়ে অন্য কোন বক্তব্য নাই। এইরূপ পণ্ডিতগণের সম্বন্ধেই কালিদাসের সেই বিখ্যাত উক্তিটি ("আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ") সুপ্রযোজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর শ্রদ্ধেয় সুবক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি মহোদয় বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন "বঙ্কিম রচনায় শিশুচিত্র" সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন; কিন্তু কণ্ঠস্বর অতি মৃদু হওয়ায় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ বিশেষ আকর্ষণকর হয় নাই। ইহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় (কমরেড?) বোধহয় একটু চমক লাগাইবার জন্যই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদের আদর্শ সহ্য করিবার শক্তি বাঙলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নাই বলিয়াই তাঁহাদের

স্বর্ণবিন্যাসে, অপরূপ চরিত্রচিত্রগুলি অঙ্কন করিয়া যিনি বাঙলার সরস কথাসাহিত্যে অভিনব শৈলীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—এ ভাগ্যহত দেশের অকৃতী সন্তানগণকে যিনি 'মা' চিনিতে শিখাইয়াছেন—সেই ক্রান্তদর্শী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চির-অম্লান স্মৃতির উদ্দেশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতই এ বাক্য-পুষ্পোপহার সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি। *

বন্দে মাতরম্!

* চন্দননগর বঙ্কিমশতবার্ষিক উৎসবে পঠিত।

স্বপ্নাহত

শ্রীসমীর ঘোষ

আজিকে সন্ধ্যা হয় নি মুখর গুঞ্জরণে ;
বিধুর হোয়েছে বিরহী হিয়ার আমন্ত্রণে ;
দিনের শেষে
আকাশে যখন নিভিলো গোধূলি স্বর্ণআলো—
জড়ালো ধরণী অঙ্গে অঙ্গরাখাটি কালো
মলিন হেসে—
তখন চোখেতে আসে নাই নেমে নিবিড় ঘুম
সুপ্তি পরী যে আনিয়া কপালে দেয় নি চুম
ভালো গো বেসে
—ডুবেছি দিনের ক্লান্ত সীমায় দিনের শেষে।

মুখেতে কাহারো পড়েনি আসিয়া আলুলো চুল ;
বাতায়ন পথে আসেনি বাতাস করিয়া ভুল ;
ঝলক দিয়া
সবুজ ঢাকাতে ঢাকা নীল বাতি উঠে নি জ্বলি—
ছাদের কোণেতে টবেতে ফোটে নি হেনার কলি ;
বলো কি নিয়া
চীনা ফুলদানি ভরিবো আবার টেবিল পরে,—
কালিকার ফুল ঝরিয়া পাপড়ি গিয়াছে মরে
—মরেছে দিয়া—
বাতায়ন পথে আসে নি বাতাস ঝলক দিয়া!

নিঝুম রাত্রি সহর ঘুমায় বিজলী-বাতি
পথে পথে জাগে, জেগে আছে আর তারকা পাতি—
আকাশে জাগে—
চোখের তারকা জেগে আছে কার, কাহার আশে ;
বিস্মরণীর তীর হোতে যদি, যদি সে আসে—
স্বপন লাগে :
জড়ায়ে তাহারে বুকের শয়নে লবো গো টানি'
চোখেতে চুলেতে চুম্বন ঢালি ডাকিব, রাণি!
কী অনুরাগে—
আঁখিতারা আর আকাশের তারা তাইতো জাগে।

গভীর রাত্রি নিশাচর ডাকে—বাদুড় ডাকে,
বাহিরে হয়তো দখিনা বাতাস পসরা হাঁকে
সুরভি ঢেলে ;
পাশের বাড়ীতে ছোট্ট ছেলেটি উঠিলো কেঁদে ;
ঘুমের ঘোরেতে জননী তাহার বুকেতে বেঁধে
নিয়েছে ছেলে—
আবার দুজনে ঘুমায়ে পড়েছে—রয়েছি জেগে;
বিরহী সন্ধ্যা রয়েছে দুইটি নয়নে লেগে
—দুয়ার ঠেলে
জানি আসিবে না ঘরেতে চুলের সুরভী ঢেলে!

নিরন্তর বাধাদানে বঙ্কিমের আদর্শ কোনদিন মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। অতএব, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়োজিত এই স্মরণোৎসবে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই তুষ্টিলাভ করিতে পারেন না—এরূপ সভায় প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলিও বঙ্কিমের চরণপ্রান্তে কোন দিনই পৌঁছিবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি সভার সভাপতির উপর কটাক্ষ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান সভাপতি হেমেন্দ্রবাবু যে বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক, সেই বসুমতী হইতে প্রকাশিত "বঙ্কিম গ্রন্থাবলী"তে তাঁহার "সাম্য" প্রবন্ধের তেজস্কর অংশগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া উঠাইয়া দিয়া উহাকে নির্ব্বিষ সর্পের মতই প্রাণশক্তিহীন করা হইয়াছে। বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে নীহারবাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু জলদগম্ভীর স্বরে নীহার বাবুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে বঙ্কিমের আদর্শ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যতটা বজায় রাখিয়া রাখিয়াছেন, ততটা আর কেহই পারেন নাই। তাঁহার আদর্শ খর্ব্ব করিবার জন্য প্রকৃতপক্ষে যাহারা দায়ী সেই শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিতে নীহারবাবুর জিহ্বা রুদ্ধ হইল কেন? আর বসুমতী-সংস্করণে সাম্য প্রবন্ধের অংশ বিশেষ বর্জ্জন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে—ঐ সকল অংশ বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার জীবদ্দশায় বর্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন ; রাজপুরুষগণের অনুমতি অনুসারে বর্জ্জিত অংশেরও যতটুকু রাখা যায়, বসুমতী ততটুকুই রাখিয়াছেন। ইহার পর

সভাপতি মহাশয়ের নানাতথ্যপূর্ণ, সুচিন্তিত সুরসাল সুদীর্ঘ মুদ্রিত অভিভাষণ পঠিত হয়। অতঃপর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। সভাপতি মহাশয় উপসংহারে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ মূলক একটি প্রস্তাব আনয়ন করিলে উহা বিনা বাধায় পরিগৃহীত হয়।

সভাস্থলে স্থানীয় ও বিদেশাগত বহু সুপণ্ডিত, সামাজিক, সহৃদয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়, উৎসবের তরুণ সম্পাদক শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ গান ও অন্যান্য উদ্যোক্তৃবর্গের আদর আপ্যায়ন ও জলযোগের ব্যবস্থায় অতিথিগণ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

চন্দননগরের অনুষ্ঠান

চুঁচুড়ার উৎসব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতে হইল চন্দননগরে। চন্দননগর নৃত্যগোপাল সাধারণ পাঠাগারে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শ্রীমতী সতী দেবীর পরিচালিত 'বন্দেমাতরম্' এখানেও গীত হইয়াছিল। ইহার পর চন্দননগরের অন্যতম বিশিষ্ট নাগরিক প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিশারদ ও সুধী সাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় 'উৎসব সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' পাঠ করেন। অতঃপর জরাতুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ও ততোধিক সুদীর্ঘ মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলেন। চন্দননগরবাসিগণের ধৈর্য্য বোধ হয় চুঁচুড়াবাসিগণের অপেক্ষাও প্রশংসনীয়। এরূপ অত্যাচার কলিকাতার শ্রোতৃবৃন্দ কোন দিনই বরদাস্ত করিতেন না। অতঃপর প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় সংক্ষিপ্ত সরল ভাষায় সভাপতি মহাশয়ের বরণকার্য্য সমাধা করিলে প্রিয়দর্শন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লিখিত 'বঙ্কিম-প্রশস্তি' পাঠ করেন। প্রশস্তিটি দীর্ঘ হইলেও অপূর্ব্ব শব্দ সম্পদে বর্ণঝঙ্কারে ও শাস্ত্রী মহাশয়ের অনবদ্য বাচনভঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারে নাই। আমরা অন্যত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশস্তিটি প্রকাশ করিলাম।

ইহার পর মহাস্থবির জলধরদাদা মহাশয় মাত্র একটি কথা বলিবার জন্য উঠেন ও তাহাতেই আধঘণ্টা কাটিয়া যায়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে কিছু বলিবার জন্য আবাহন করিলে তিনি বলেন যে অপ্রস্তুত অবস্থায় অন্য যে কোনও সভায় বক্তৃতা করা চলিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় ঐরূপ চালাকির দ্বারা কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা প্রত্যবায়জনক। শুধু তাহাই নহে, ঐরূপ ফাঁকির চেষ্টা করিতে যাইয়া সম্প্রতি কোন একজন বিজ্ঞ অধ্যাপকও মারাত্মক রকমের ভুল করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ঐ সময় অতি পুরাতন হইলেও চির-সবুজ অধ্যাপক খোসমেজাজ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে সোৎসাহে "Here, here" ধ্বনি করিতে শুনা গেল! সন্দেহ হইতেছে —তবে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার প্রধান অধ্যাপক রায় বাহাদুরই হেমেন্দ্রবাবুর এ অবগুণ্ঠনান্তরিক তীক্ষ্ণ কটাক্ষের লক্ষ্য! ইহার পর ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমবন্দনাগীতি গান করেন। পরে একটি কিশোরী, একটি যুবক ও একটি বালককে আবৃত্তি ও পরীক্ষার ফলানুসারে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বালকটির আবৃত্তি ("লাঠি") মন্দ লাগে নাই।

সভাস্থলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ, মৌলবি রেজাউল করিম, বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বক্তৃতা প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন। কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বঙ্কিম সম্বন্ধে একটি কবিতা পাঠ করেন, ও প্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচিত একটি মুদ্রিত কবিতা সভাস্থলে বিতরিত হইয়াছিল।

অতঃপর জলযোগের আবাহনে আমাদিগকে সভা ত্যাগ করিতে হয়। চন্দননগরের মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দে মহাশয়, চন্দননগরের সকল সৎকর্ম্মের প্রাণভূত শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহোদয়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কর্ম্মিবৃন্দের আদর আপ্যায়ন ও জলযোগের ব্যবস্থায় আমরা পরমপরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

একটা কথা আমরা বুঝিতে অক্ষম যে সর্ব্বত্রই "বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব" লেখা হইতেছে! শতবার্ষিক উৎসব বলিলেই-ত বেশ শুনায়—ব্যাকরণও বজায় থাকে। অথবা শুধু "বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী" বলিলেও কোন গোলমাল থাকে না। অথচ বাঙলার সকল সাহিত্যিক মিলিয়া কেন যে "শতবার্ষিকী উৎসব" করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন।

উপরে : অভিনেত্রী ইন্দিরা রায় একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমায়—
"চোখের বালি"-র একটি দৃশ্যে।

নিম্নে : অভিনেত্রীবর্গ শান্তিলতা ঘোষ ও ইন্দিরা রায়কে এসোসিয়েটেড প্রডিউসার্সের "চোখের বালি" চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে — ছবিখানা

পরিচালক

টেলিগ্রাম ... রিটি' — ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ — টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

প্রথম বর্ষ, অষ্টবিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০শে আষাঢ় ১৩৪৫, ১৪ই জুলাই ১৯৩৮

বাংলায় মন্ত্রী-সঙ্কট

মিঃ নৌশের আলীর পদত্যাগের পর হইতেই হক-নলিনী-নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলীর নাভিশ্বাস সুরু হইয়াছে। জুলাইয়ের শেষে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের প্রারম্ভেই বেতন মঞ্জুর প্রস্তাবের কি পরিণতি হইবে তাহা ভাবিয়া হক সাহেবের সুখী-পরিবার আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। সহযোগী "আজাদের" আর্ত্তনাদের মাত্রাধিক্যে বন্ধুবর ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেনের নাম উল্লেখ করিয়া ফেলিয়া "আজাদ" প্রকারান্তরে ডাঃ সেনের লীপিকুশলতারই প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ নৌশের আলীর পরামর্শদাতা মনে করিয়া "আজাদের" কর্ণধার ও তাঁহার পার্শ্বচরবৃন্দ শ্রীযুক্ত মাখম লাল সেন প্রভৃতির উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

অপর পক্ষে হক-নলিনীর দূতরূপে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইতিমধ্যে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একটা বোঝা-পড়া করিয়া ফেলিবার আগ্রহে এলগিন্ রোড, উডবার্ণ পার্ক ও যাদবপুর কলোনি চসিয়া ফেলিতেছেন। তন্মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলপতি অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও "ইউনাইটেড প্রেসের" ম্যানেজিং ডিরেক্টার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশ যে রাষ্ট্রপতি ওয়ার্দ্ধা যাইবার প্রাক্কালে মাননীয় অর্থসচীব তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া কংগ্রেসের সহিত রফা করিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি নাকি ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলপতি শরৎচন্দ্রের অনুমোদন ব্যতীত কোন রফার অনুকুলে মত প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। মাননীয় অর্থসচীবের প্রতি শরৎচন্দ্রের মনোভাব পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর থাকায় কৌশলী অর্থসচীব স্বয়ং শরৎচন্দ্রের নিকট কোনরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী না হইয়া 'আনন্দবাজারে'র কর্ণধার মাখমবাবুর নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। অর্থনীতি-বিশারদ হিন্দুসভা ও কংগ্রেসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রন-জাত অধ্যাপকপ্রবর রাধাকুমুদবাবু মাখমবাবুর গৃহে শুভাগমন করিয়া হক-নলিনী-নাজিমের সহিত কংগ্রেস বা কংগ্রেস-স্নেহাসিক্ত দলের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিবার বিবিধ প্রস্তাব করিয়াছেন। বিবিধ প্রস্তাবগুলির মুল সর্ত্ত এই যে হক-নলিনী-নাজিম ও সুরাবর্দ্দী ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রীবর্গকে খেদাইয়া তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত রফা করিয়া ফেলিতে প্রস্তুত। মাখমবাবু নাকি দৃঢ়তর ভাবে পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছেন যে নলিনী-সহ সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের প্রস্তাবের পূর্ব্বে নলিনীবাবুকে বিনা সর্ত্তে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী ঘোষণা করিতে হইবে। তৎপরে অবশ্য মাখমবাবু নলিনীবাবুর বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে সহায়তা করিতে পারেন—তৎপূর্ব্বে নয়। মাখমবাবুর সহিত নলিনীবাবুর সাক্ষাৎ করিবার আকাঙ্খা এতই প্রবল হইয়াছে যে বিধুবাবু এক প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু মাখমবাবু এতই বেরসিক যে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন—হয়ত বিব্রত হইবার ভয়েই! তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে মাখমবাবুরও চক্ষুলজ্জা আছে। নাছোড়-বান্দা রাধাকুমুদবাবুর দৌত্য কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহা সকলেই সোৎসাহে ও উৎগ্রীবচিত্তে অনুধাবন করিবে।

মিঃ নৌশের আলী বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডল ভঙ্গ করিয়া নবগঠিত মন্ত্রী-মণ্ডলের প্রধান মন্ত্রীর স্বপ্নে মশগুল।

কংগ্রেস দলপতি শরৎচন্দ্র যদি বিচক্ষণতার সহিত মন্ত্রীমণ্ডলের কম্পমান সুখী-পরিবারের ক্রমশঃ শীথিলতর বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে হক্-নলিনী-নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন অবশ্যম্ভাবী।

শেষ মুহূর্ত্তে সংবাদ পাওয়া গেল যে ভদবীরবিশারদ অর্থসচীব মহাশয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে দিয়া রাষ্ট্রপতিকে নলিনীবাবুর সঙ্কল্পের অনুকূলে মত দেওয়াইবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মিঃ সুরাবর্দ্দী ইতিমধ্যে শান্তি-নিকেতন পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উপর কমলার বরপুত্র অর্থসচীবের প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত সুতরাং অর্থসচীবের অনুরোধ বিশ্বকবির পক্ষে উপেক্ষা করা সহজ হইবে না। জরাজীর্ণ কবিকে রাজনীতির কোলাহলের মধ্যে টানিয়া আনা উৎপীড়নের নামান্তরমাত্র! কবির পরমশুভকামী অধ্যাপক মহালনবিশ মহাশয় কবিকে এই উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করুন ইহা আমরা কামনা করি।

—— •:(×):• ——

হাওড়ার এ্যাসেসার

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অ্যাসেসার পদ শূন্য হইয়াছে। এই শূন্য পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন শিবপুরের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত শিক্ষা-সচীব মিঃ শৈলেন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন মহাশয়ের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে খগেন বাবুকে উক্ত পদে বাহাল করেন কারণ খগেনবাবুর বরদা বাবুর প্রতি আনুগত্য সন্দেহাতীত। সেই আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ বরদাবাবুর পক্ষে খগেন বাবুকে সমর্থন বরদা হৃদয়েরই পরিচায়ক। তবে খগেনবাবুর বৃদ্ধত্ব তাঁহার পক্ষে প্রবল অন্তরায় কারণ বিদায়ী অ্যাসেসারের বয়স ৫৫ পার হওয়ায় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় দিয়াছেন। তৎপরে প্রায় ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে উক্ত পদে বসান যুক্তিযুক্ত হইবে না বোধে বরদাবাবুর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ই তাঁহাকে বিরত করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন।

হরেনবাবু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক। হাওড়ায় পাইন-রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া হরেনবাবু উহাকে স্থায়ীত্বে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিরোধীদলের নেতা অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমানে নানাভাবে বিপর্য্যস্ত। সুতরাং তাঁহাকে এ্যাসেসারী পদে ব্রতী করিয়া হাওড়ায় চিরতরে দলাদলির উচ্ছেদ করিবার মানসে কমিশনার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক দত্ত ও হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ বিশেষ সচেষ্ট। পাইন-বিরোধী দলের পরিপোষক ডাঃ বেণী চরণ দত্তকে ইতিমধ্যেই হরেনবাবু মনোনয়নের টোপে গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বসু মৃত্যু-শয্যায়। শ্রীযুক্ত রজনী দত্ত রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত আলা মোহন দাসের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আর শ্রীযুক্ত সুশীল ব্যানার্জ্জি ও শ্রীযুক্ত কালোবরণ ঘোষ হরেন বাবুর দলকেই সমর্থন করিবেন। সুতরাং বিজয়বাবুকে এ্যাসেসারির পদে বসানর জন্য হরেনবাবু ও কার্ত্তিকবাবুর প্রচেষ্টা বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। আর বৃহত্তর দিক হইতে দেখিলে বিজয়বাবুর ন্যায় বহুদুঃখব্রতী কংগ্রেস-কর্ম্মীকে উক্ত পদে নিয়োগ সর্ব্বতোভাবে সমর্থন-যোগ্য। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বরদা বাবু হরেনবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছিল কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আমেরিকা-প্রত্যাগত ও কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত মিঃ শৈলেন ঘোষ গঙ্গা-পারে বাসা বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। বরদাবাবুও একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন নাকি তিনি মিঃ শৈলেন ঘোষকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার বাসনা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত এক কর্ম্মচারীকে হাওড়ায় বসাইলে যে অমার্জ্জনীয় ত্রুটি করিয়া বসিবেন বরদাবাবু কি তাহা এখনও পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। হরেনবাবু ও কার্ত্তিকবাবু এ বিষয়ে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছেন বরদাবাবুর পক্ষে তাহা অনুসরণ ও অনুমোদন করা একান্ত সমীচিন। তাঁহার নিজের প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া বিচার করিলে বরদাবাবুর পক্ষে অন্য পন্থা অবলম্বন করা একেবারেই ভ্রমাত্মক। হরেনবাবু কি বরদাবাবুকে এখনও বিরত করিতে পারিবেন না?

কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাশী—সুনীলা থাক্‌বেনা ?

দ্বিজেন—থাক্‌তে পারে, কিন্তু তুমি কি ওর থাকা পছন্দ কোরবে ?

কাশী—কেন কোরবনা ? তুমি আমায় কি ভাবো দ্বিজেন ? (প্রস্থান)

(দ্বিজেন অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল কাশীশ্বরের অদ্ভুত ব্যবহার। প্রবেশ ক'রিল সুনীলা)

সুনীলা—পাশের ঘরটাতেই রোগী রয়েছে,—এ ঘরে এত গোলমাল কিসের দ্বিজেন ?

দ্বিজেন—অন্যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু কর্ত্তা নিজে যে এমন ভাবে গলা ছেড়ে দেবেন তা আমার ধারণাই ছিলনা। দাদার ঘুম ভেঙ্গে গেছে নাকি ?

সুনীলা—ঘুম !—গোড়াতেই ভেঙ্গেছে। মনীষার সঙ্গেও কি যেন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল; সেই কথাবার্ত্তার রেশটুকু নিয়ে ও এমন ধড়ফড় কোরতে লাগলো যে কি আর বলবো। তারপর আবার এখন। এরকম কোরলে চলবেনা, তুমি বলে দিও।

দ্বিজেন—আচ্ছা।

(সুনীলা প্রস্থানোদ্যত)

একটা কথা—

(সুনীলা ফিরিয়া দাড়াইল)

তুমি রাত্তিরেও থাকবেত' ?

সুনীলা—কেন তোমাদের আর কেউ আছে নাকি ?

দ্বিজেন—না।

সুনীলা—তা হ'লে না-থাকা ছাড়া উপায় কি ?

দ্বিজেন—যদি কেউ থাকতো, তুমি কি থাক্‌তে না ?

সুনীলা—না,—তা হ'লে আ'র কি জন্য থাকতুম !

দ্বিজেন—ও !

সুনীলা—হাসলে যে ?

দ্বিজেন—না, ও কিছু নয়।

সুনীলা—না, তোমায় বলতে হবে। বলো শীগগীর ! আমার সময় নেই, ও একলা রয়েছে।

দ্বিজেন—বললুম তো, ও কিছু নয়।

সুনীলা—যে না বলবে, আমার—দিব্যি দোব কিন্তু।

দ্বিজেন—আমার বিশ্বাস হয়না তুমি এ সময় ওর কাছে না থেকে পারতে—লোক থাকুক, বা, না থাকুক !

সুনীলা—এই কথা।

(সুনীলা প্রস্থান করিল, মনে হইল তাহার ঠোঁটের কোনে অল্প একটুকু হাসির রেখা)।

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—ছোটদা, তুমি আজ খাবে ত ?

দ্বিজেন—হাঁ, কেন রে ?

মনীষা—ঠাকুরকে ব'লে দিতে হবে। মা আজ কিছুই পারবে না।

দ্বিজেন—কিন্তু তুই কাঁদছিলি ?

মনীষা—না

দ্বিজেন—হ্যাঁ কাঁদছিলি।—কি হ'য়েছে বল দিকিন ?

মনীষা—কিছুই হয়নি, তুমি খাবে কিনা বলো ?

দ্বিজেন—নাঃ, আজ আর কিছু খাবো না ভাবছি।

মনীষা—কেন, খাবেনা কেন ?

দ্বিজেন—বাড়ীশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত,—কেউ-বা শুয়ে আছে, কেউ বা কাঁদছে। খাবার কথা আজ মনেই হয় না।

মনীষা—কাঁদছে আবার কে ?

দ্বিজেন—মনীষা।

মনীষা—কোথায় আবার কাঁদতে গেলুম। লোকের চোখে জল দেখলেই তুমি বুঝি ভাবো সে কাঁদছে।

দ্বিজেন—লোকের চোখে জল দেখলে ও ছাড়া অন্য কিছু ভাবা মুস্কিল; বিশেষতঃ মেয়েদের চোখে।

মনীষা—(হাসিয়া) কিন্তু চোখেও আমার জল নেই, ও তোমার দেখার ভুল।

দ্বিজেন—দেখি, দেখি—ওরে সত্যিইতো, চোখ একেবারে শুখনো খট্‌ খট্‌ কোরছে ! যাক্‌ বাচা গেল। তা হ্যাঁরে মণি, বাবার সঙ্গে তোর নাকি এই মাত্র কথা কাটা-কাটি হ'য়ে গেল ? সত্যি বল, আমায় লুকোসনি ?

মনীষা—তোমায় কে ব'ললে ?

দ্বিজেন—শুনেছি।

মনীষা—হ্যা—

দ্বিজেন—কেন বলতো ?

মনীষা—আমি সেই উইলের কথা জানি ব'লেছিলাম ব'লে একেবারে আগুণ ! এমন জোরে আমার হাত চেপে ধরেছিল যে চুড়িটা বেঁকে গেছে।

দ্বিজেন—তুই কেন সে কথা ব'লতে গেলি ?

মনীষা—সেইটাই আমার ভুল হ'য়ে গেছে। বলতুম না। আমায় ব'ললে "ও কথা সে জানতে পারে না। সংসারে এমন কেউ নেই যে সে কথা তাকে বোলতে পারে"—আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা 'আমিও জানি এবং সবাই জানে। গোপন আর কিছুই নেই!'

দ্বিজেন—তোদের এই এক দোষ। কোন কথা চেপে রাখতে পারিসনা। যেমন মনে হ'ল অমনি বেরিয়ে প'ড়ল!

মনীষা—দোষ বটে! কিন্তু ছোটদা, আর এক ব্যাপার শোন। বাবাকে তো বললাম উইলের কথা আমি জানি। শুনে, দেখলুম খুসী হল। ব'ললে—"ও উইল! সে সবাই জানে। জানগে যা সে কথা।"... এর মানে কি, বুঝতে পারিনি। তুমি বুঝ্‌তে পারছো?

দ্বিজেন—বোধ হয় উইল ছাড়া আরও কিছু আছে যা আমরা কেউ জানিনা।

মনীষা—বোধ হয়। খবর নিওতো—

(নেপথ্যে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল) এই ছোটদা, বাবা ঐ খানে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে!—সামলে নিও ভাই। (সহজ কণ্ঠে) তুমি রোজ যা খাও, তাই খাবে ত?

দ্বিজেন—হ্যাঁ—

(কাশীশ্বরের প্রবেশ মনীষা ও দ্বিজেন প্রস্থানোদ্যত)

কাশী—আমাকে অমন পাশ কাটিয়ে চোলে যাস্‌নে তোরা। একটুখানি না হয় দাঁড়িয়েই গেলি।

(মনীষা দ্বিজেন দাঁড়াইল)

মণি, চোখের জল তোর এসে আবার চলে গেল। ভাবলি কি কঠিন আমি, কি কর্কশ আমার কণ্ঠ! ভাবলিনা শুধু—

(মনীষার প্রস্থান)

খুব রেগেছে!—কি, তুমিও চলে গেলে না দ্বিজেন?

দ্বিজেন—আমায় যে দাঁড়াতে বোললে?

কাশী—ঠিক—"বোধ হয় উইল ছাড়া আরও কিছু আছে যা আমরা কেউ জানিনা—একথাটা বলবার ভঙ্গি তোমার বেশ!

দ্বিজেন—আমার যা মনে হয়েছে তাই বলেছি।

কাশী—তোমার মন হাল্‌কা হয়ে গেল। আমার যা মনে আছে তা আমি বলতে পারিনা, মন আমার তাই ভারী!

(ক্রমশঃ)

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্সের
নিবেদন
শ্রী
চিত্রগৃহে
চোখের বালি
সুপ্রভা মুখার্জ্জি
শীঘ্রই
আসিতেছে
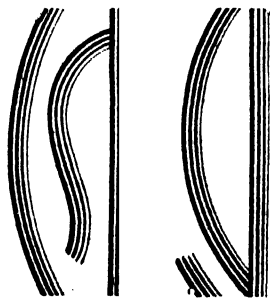
প্রভাত সিনেমা

আগামী ১৬ই জুলাই শনিবার থেকে এখানে সাগর মুভিটোনের নূতন ধরনের ছবি "৩০০ শত দিবস পর" দেখান হবে। নূতন ধরনের ছবি এই জন্য যে, এতে গল্পের আখ্যান ভাগে, অভিনয়ে ও সঙ্গীতে সেই এক ঘেয়ে ভাব মোটেই না রেখে সম্পূর্ণ নূতন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা হয়েছে। তাতে ছবিখানা সকলের কাছে ভালই লাগবে বলে আশা করা যায়।

৩০০ শত দিবস পর,—একথা শুনে ভাববেন না যে আজ থেকে ৩০০ শত দিবস পর কী হবে তাই নিয়ে গল্পটি লেখা হয়েছে। বরং ঠিক তার বিপরীত। এক বিলাসী ধনী যুবক নিজের খেয়ালে কী রূপে ৩০০ শত দিবস নানা জায়গায় চাকুরীর তল্লাসে ঘুরছিল তারই ঘটনাবলীকে গ্রথিত করে গল্পটী তৈরী করা হয়েছে।

বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে সবিতা দেবী, মতিলাল, বিব্বু ও ইয়াকুব। এদের অধিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ছায়াচিত্র জগতে সবিতা দেবীর স্থান চিত্রামোদী মাত্রেরই পরিচিত। এই ছবিতে তাঁর গৌরব মোটেই ম্লান হয়নি, বরং তাহা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুধাকণ্ঠী মিস্ বিব্বু এ ছবিতে ৩ খানা গান গেয়েছেন এবং তার প্রত্যেকখানিই হয়েছে এককথায় চমৎকার।

ঘটনার নূতনত্বে, অভিনয়ে, ও সঙ্গীতে ছবিখানি প্রত্যেক চিত্রামোদীরই প্রিয় হইবে এবং আশা করা যায়—ছবিখানি বেশ কিছুদিন প্রভাত সিনেমায় চলিবে। হিন্দি ভাষার সংলাপ এতই সহজ ও সরল যে, বাঙ্গালী মাত্রেরই তাহা বোধগম্য হ'বে।

হিমালয় কী বেটি

ভাবনানীর ছবি "হিমালয় কি বেটী" আগামী কাল পর্য্যন্ত চলবে, এনাক্ষী রমা রাওয়ের নৃত্য ও অভিনয় এখনও যাহারা দেখেন নাই তাঁহারা নিশ্চয়ই এ সুযোগ হারাবেন না। তাছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হতে হলে এ ছবি আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন। চির তুষারবৃত হিমালয় পর্ব্বতের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও কাশ্মীরের মন মুগ্ধকর দৃশ্যাদি অতি নিখুঁত ভাবে তোলা হয়েছে।

মীরাবাই

আসছে রবিবার বেলা ১১টায় তামিল ছবি মীরাবাঈ দেখান হবে। মীরাবাঈ হিন্দি ও বাংলা সংস্করণ যেভাবে আদৃত হয়েছে তাতে মনে হয় এর তামিল সংস্করণ ও দক্ষিন ভারতীয়দের কাছে যথেষ্ট আদৃত হবে।

সোনার সংসার

জীবনের প্রত্যেক কাজটি ভাগ্যদেবতার অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত হয়। আজ যে রাজা কাল হয় সে ফকীর। এবং আজ যে ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা খুন্নিবৃত্তি কচ্ছে কাল হয়ত সে হবে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। রমেশ সওদাগরী আফিসের কেরাণী। সংসারে স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান। সুখের সংসার, সোনার সংসার—কিন্তু অদৃষ্টের অঙ্গুলি হেলনে তার এই সুখের সংসার এক মিনিটেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারপর এক একটি দিন করে সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর পর কী ভাবে রমেশের সংসার পুনরায় সোনার হল "সোনার সংসার" চিত্রে তাই দেখান হয়েছে। বাংলা সংস্করণ বহু পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ করে চিত্রজগতে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। হিন্দি সংস্করণ গত ৯ই জুলাই থেকে প্যারাডাইস চিত্র-গৃহে দেখান হইতেছে। আশাকরা যায় বাংলার ন্যায় হিন্দি সংস্করণও রেকর্ড কর্ত্তে সক্ষম হবে।

N. I. P.

...সু বংশ পরিচয়

দশঘরার শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী বসু ...হাশয় কর্ত্তৃক সম্প্রতি বসু বংশের সম্পূর্ণ ...রিচয় একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ...কুঞ্জবাবু কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে অবসর ...হণ করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে ...নোনিবেশ করেন। তাঁহার সুযোগ্যা ...ধূ শ্রীমতী সতিকা বসু এই কার্য্যে ...শেষ্ট সাহায্য করেন। আমরা আশাকরি ...যুক্ত বসু মহাশয়ের এই কষ্টসাধ্য পুস্তক ...গ্র কায়স্থ সমাজ সাদরে বরণ করিয়া ...ইবে।

...লাহাবাদে শিশির-সম্প্রদায়

...হুইলার এণ্ড কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার ...যুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জ্জির কনিষ্ঠ পুত্র ...মান রাজেন্দ্র ব্যানার্জ্জির শুভ-বিবাহোপ-...ক্ষে নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ী এলাহাবাদে ...নকড়িবাবুর বাটীতে 'বিজয়া', 'রীতিমত ...টক', ও 'আলমগীর' অভিনয় করে-...সেছেন।

অভিনেতাদের মধ্যে শিশির কুমার, ...শ্বনাথ ভাদুড়ী, জীবেন বসু, পঞ্চানন ...নার্জ্জি, শীতল পাল, অরুণ চট্টোঃ শ্রীমতী ...রাবতী, শেফালিকা (পুতুল) প্রভৃতির ...ভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়।

তিনকড়িবাবু এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় ...কুল ও রাজেন্দ্রবাবু শিশির-সম্প্রদায়ের ...খস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখেন।

...উনাইটেড ক্লাব

গত ২৪শে জুন শুক্রবার পাথুরিয়াঘাটার সুপরিচিত ইউনাইটেড ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাহাদের ৪৭ নং পাথুরিয়াঘাটাস্থিত ক্লাববাটীর প্রাঙ্গনে শরৎবাবুর "বিজয়া" অভিনয় হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, বাবু দামোদর দাস খান্না, বাবু প্রতাপচন্দ্র মল্লিক, বাবু দুলালচন্দ্র আইচ, বাবু সুধাংশু কুমার মিত্র প্রভৃতি বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি অভিনয় রজনীতে উপস্থিত থাকিয়া ক্লাবের সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। মোটের উপর আমাদের অভিনয়টী বেশ সুন্দর লাগিয়াছিল। Stage, দৃশ্যপট, সাজ-সজ্জা প্রভৃতি খুব মানানসই হইয়াছিল। প্রতি ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয় সুন্দর হওয়ায় প্রধান ভূমিকাগুলিও সুন্দর হইয়াছিল। মহিলা চরিত্রগুলির অভিনয়ের মধ্যে—"বিজয়া" ও "নলিনী"-র অভিনয় এমন মানানসই হইয়াছিল যে আমরা Amateur অভিনয়ে এইরূপ দেখিব বলিয়া আশা করি নাই। বিজয়ার ভূমিকায় ধীরেন মিত্র ও নলিনীর ভূমিকায় সত্যেন বসু সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শীতল বসুর—রাসবিহারীর ভূমিকা সত্যই অপূর্ব্ব হইয়াছিল। নরেন্দ্রের ভূমিকায় অজিত মিত্র কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বিলাসের ভূমিকায় প্রভাত মিত্রের part-টী আর একটু polished হইলে ভাল হইত। পরেশের ভূমিকায় ক্ষুদ্র বালক সরোজের অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। আমন্ত্রিত আচার্য্যগণের মধ্যে জীতেন বসুর makeup-টী বড় সুন্দর হইয়াছিল। উদাসী-দ্বয়ের মধ্যে জটাধর পাইনের নেপথ্যে গীতটী ভাল লাগিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে অভিনয়টী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া

ছিল। পরিশেষে ক্লাবের অন্যতম সভ্য বাবু মন্মথনাথ ঘোষ, অরুণচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সমাগত অভ্যাগতবৃন্দকে আদর আপ্যায়ন দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমরা এই ক্লাবের দিন দিন উন্নতি কামনা করি।

গল্প রচনা প্রতিযোগীতা (বালিকা-দিগের জন্য)

রচনা নিজস্ব হওয়া চাই। যে কোন মাতৃ-ভাষায় লিখিলে চলিবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার দুইটি রৌপ্যপদক। রচনা পাঠাইবার শেষ দিন ৩০শে জুলাই। ফল ১৫ই আগষ্ট বাহির হইবে। রচনা ফলাফলের জন্য এক আনার stamp সহ সেক্রেটারি সান ডে ক্লাব ১৯নং অ্যাণ্টনি বাগান লেন কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সঙ্গীত সম্মেলন

চন্দননগর হইতে শ্রীমতী রাধা দেবী লিখিয়াছেন :—

আপনাদের সঙ্গীত প্রতিনিধিগণ শেষ প্রবন্ধে শ্রীমতী হীরাবাঈ, শ্রীমতী কেশর বাঈ ও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গানের সমালোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। অথচ এ যাবৎ সে সমালোচনা বাহির হইল না। আমরা আর কতকাল শেষ প্রবন্ধের আশায় থাকিব ?

আমরা এ বিষয়ে আপনাদের প্রতিনিধি-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(বিলাসী)

বড়দিদি

সাউণ্ড ষ্টেজ নম্বর তিন সারা ফ্লোর-টি জোড়া সুদৃশ্য একটি সেট। এই সেট-এ গত সারা সপ্তাহ ধরে পূর্ণ গতিতে কাজ কোরে-ছেন সদলবলে পরিচালক অমর মল্লিক। বর্ত্তমান সপ্তাহেও বাকী কাজ চলবে উপরের সেটটিতেই।

জমিদার ব্রজরাজ লাহিড়ীর বাড়ীর বাইরের মহল। এই মহলের একটি প্রশস্ত কক্ষে স্থান পেয়েছেন 'মাষ্টার' সুরেন্দ্রনাথ। এই সংলগ্ন আর একটি সুসজ্জিত কক্ষ—অন্দর-মহলের সঙ্গে সংযুক্ত। এই পাশের কক্ষটিতে, পর্দ্দার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে ব্রজবাবুর সংসারের সেই স্নেহময়ী, সর্ব্বময়ী, নারী—বড়দিদি, কখনও 'বিন্দু ঝি' কখন বা 'নিমু' চাকরের মধ্যস্থতায়, আপন-ভোলা সুরেন্দ্রনাথের খোঁজ খবর এবং তদারক করেন।

ছোটখাটো অভাব-অভিযোগ নিরাশের মধ্য দিয়ে, স্নেহের অনুশাসনে—এই ছন্নছাড়া ও পরম অন্যমনস্ক লোকটার জীবনে ধীরে ধীরে কেমন কোরে শৃঙ্খলা আসতে সুরু হয় এবং কেমন কোরে আবার তার মন বিদ্রোহী হোয়ে ওঠে—সুরেন্দ্রনাথের জীবন নাট্যে সেই সংঘাতের সূচনা হয় এখান থেকেই

বাঙলা সংস্করণে বিন্দু ঝি-র ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় কোরছেন—প্রতিভা-শালিনী শ্রীমতী নিভাননী। হিন্দিতে-বেলা।

মাধবীর ভাই শিবচরণের ভূমিকায় হিন্দি ও বাঙলায় যথাক্রমে অভিনয় কোরছেন—চমন এবং কেষ্ট দাশ।

বড়দিদির আলোক-চিত্রের কাজে অনেক কিছু নতুনত্বের পরিচয় দেবার জন্য সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী বিমল রায় বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। সঙ্গীতাংশের পরিচালনাতেও, সুর-শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পারবেন—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

কদিন ধরে আকাশেও যেমন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলেছে 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' সেটেও যেন ঠিক তেমনি খেলা চলেছিল মেঘ ও রৌদ্রের। প্রকৃতির পাগলী মেয়ের মত শ্রীমতী কানন অভিনয় করচেন—ক্ষণে খিলি খিলি হাসি, ক্ষণে আঁখিতে বাদর ঝর ঝর। বেচারা সাইগল বুঝেই উঠতে পারছেন না শ্রীমতীর 'মুড্'টা কি? সবাই বলাবলি করছিল এটা ভুলুয়া ও মঞ্জু চরিত্রের মধুর রসপূর্ণ যথার্থ অভিনয়। আমরা কিন্তু দেখেছিলুম সাইগল ও কাননের যথার্থ খুনসুটি। এটাকে অভিনয় বলে মনেই হচ্ছিল না। দুজনেই ভাল গাইয়ে, অতএব তাদের খুনসুটিতে গান ও সুর লোকের মন এমন করে হরণ করে নেবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল তাঁর পুরাণ পদ্ধতি ছেড়ে এবার কতকগুলি নতুন ধরনের সুর এ ছবির গানে দিয়েছেন। চিত্র পরিচালক ফণি মজুমদার বেজায় খুসী।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকী বসু তাঁর পরবর্ত্তী ছবির মহলা আরম্ভ করে দিয়েছেন। নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর ষ্টুডিওতে এই মহলা কার্য্য পুরোদমে চলেছে। যতদূর মনে হয় আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এই ছবির কাজ আরম্ভ হবে নিউ থিয়েটার্সের দু'নম্বর বাড়ীতে। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন রাই চাঁদ বড়াল।

"বঙ্কিমের স্মৃতি আছে ভাষা নাই"

"বঙ্কিমের স্মৃতি আছে, ভাষা নাই"—এই অপরূপ ভঙ্গিমায় বীরবল মহাশয় বঙ্কিমের স্মৃতিপূজা করিয়াছেন এলবার্ট হলে ছাত্রছাত্রী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসবে। এই উক্তির মধ্যে কোন শ্লেষের ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে কি না সাহিত্যসেবী বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ বিষয়ে বাঙলার সাহিত্যসেবীবৃন্দের মতামত আমরা বারান্তরে "খেয়ালী"তে প্রকাশ করিব।

নীতীন বসু

নীতীন বসু তাঁর নতুন ছবির কাজ আস্তে আস্তে চালাচ্ছেন। 'দেশের মাটীর' সম্পাদন কার্য্যে তাঁকে বেশী সময় দিতে হচ্ছে বলে তিনি এই নতুন ছবির দিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারছেন না।

দেশের মাটী

'দেশের মাটী'র ট্রেলার দেখার জন্যে পড়ে আছে। আশা করা যাচ্ছে যে আসছে শনিবার থেকে এই ট্রেলারটা চিত্রার ও অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। মূল ছবিখানি বোধ হয় আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি চিত্রায় মুক্তি পাবে।

অধিকার

অধিকার-এর উত্তর সংস্করণই প্রায় শেষ হয়ে এলো। এই ছবির শেষের দৃশ্যটী তোলবার জন্যে যে একটী বিরাট সেটের নির্ম্মাণ কার্য্য চলেছে তা বোধহয় নিউ থিয়েটার্সের আর কোন ছবিতে দেখা যায় নি। এই সেটটী হচ্ছে নায়ক নিখিলেশের 'dream land'। নায়ক নিখিলেশ নায়িকা ইন্দিরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এই গৃহে প্রবেশ করবে বলে স্থির করে রেখেছিল।

বড়ুয়া

আসছে ৩০শে জুলাই পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া 'এয়ারে' বিলেত যাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে যে তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী যমুনাও যাবেন। বাঙলা দেশের কোন অভিনেত্রীর ভাগ্যে বোধ হয় এই সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত হয়ে উঠেনি।

গোরা

শোনা যাচ্ছে যে 'চিত্রায়' বিদ্যাপতির পরই ছয় সপ্তাহের জন্যে দেবদত্ত ফিল্মস্-এর 'গোরা' দেখান হ'বে। এবং 'গোরা'র পরই 'দেশের মাটী' দেখান হ'বে।

চোখের বালি

এসোসিয়েটেড্ প্রোডিউসার্সের প্রথম নিবেদন রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'-র সম্পাদনা চলছে। এই মাসেরই শেষভাগে ছবিখানি শ্রী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। আমরা যতদূর জানি ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যতদূর সাধ্য চেষ্টা করছেন। 'চোখের বালি'-র মত মনস্তত্বমূলক কাহিনীকে চিত্রে রূপ-রস-গন্ধে সঞ্জীবিত করে তুলতে কর্ত্তৃপক্ষের যা প্রয়োজন তার কিছুরই ত্রুটি রাখেন নি। এই চিত্রে অভিনয় করেছেন—সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়, শান্তি লতা ঘোষ, রমা ব্যানার্জ্জি, ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি, ছবি বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। শিক্ষাদীক্ষা ও আভিজাত্যের দিক থেকে 'চোখের বালি'-র বিভিন্ন চরিত্রে এদের মনোনয়ন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

চিত্রা

'বিদ্যাপতি'র জনসমাগম এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে। কানন-এর—অনুরাধা যারা এখনও না দেখেছেন তাদের অন্ততঃ এখনও একবার দেখা উচিত।

নিউ সিনেমা

এখানে রঞ্জিতের 'বন কি চিড়িয়া' আসছে শনিবার থেকে ৪র্থ সপ্তাহে পড়বে। এই ছবিটী যে ভাবে দর্শক আকর্ষণ করছে

নিরুদ্দেশের যাত্রী

(গল্প)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মধুপুর ষ্টেশনে নেবে 'বড় বাঁধ' অভিমুখে যে রাস্তাটি গেছে সেই রাস্তা ধরে মলয় বরাবর যেতে লাগল। 'বড় বাঁধ' ষ্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল পথ, পশ্চিম দিকের সব শেষের যে বাড়ীখানি, সেই বাড়ীতে থাকেন মলয়ের পিসতুত ভাই মহিম মিত্র। আগে উনি হুগলী জেলার অন্তর্গত চুচুড়ায় থাকতেন। এইখানেই এর নিজ বাড়ী।

বছর খানেক হ'ল মহিমবাবু স্ত্রীপুত্র নিয়ে মধুপুরে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। কোন পাথরের খনিতে নাকি তার শেয়ার আছে। চাকরী বাকরীর কোন ধার ধারেন না। খান্ দান্ আর তাস খেলে বেড়িয়ে বেড়ান।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে মলয়। বাড়ী কোলকাতাতেই, পুজোর ছুটীতে আসছে মহিমদার বাড়ী। ইচ্ছেটা এইখানেই যাবে ছুটীটা কাটিয়ে।

(২)

মলয় রোজ সন্ধ্যার সকালে বেড়াতে বেড়োয় এধার ওধার। বেড়ান তার একটা নেশার মত। কোন দিন নদীর ধারে ধারে কোন দিন বা এমনি মাঠে মাঠে বেড়িয়ে আসে। একদিন সন্ধ্যায় 'পাথর-চিপটীর' দিকে বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে সবুজ মখমলের মত ঘাসের ওপর ব'সে আপন উচ্ছ্বাসে মলয় তার পেতলের বাঁশীটা বাজিয়ে চ'লেছিল একান্ত আগ্রহে। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পোড়েছিল তার সুমধুর সুর-লহরী। বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাঁশীর সুরে নিজেই সে হয়ে গেছল তন্ময়। ভুলে গেছল সে বাড়ী ফেরার কথা। বাঁশীতে সত্যিই ছিল তার অদ্ভুত দখল। বাঁশী যখন থামল বেশ একটু রাত হ'য়েছে তখন। শুক্লা একাদশীর শুভ্র জ্যোৎস্নায় ছেয়ে গেছে সারা মাঠ বটে। বাঁশী থামিয়ে উঠতে যাবে—দেখলে হাত চার-পাঁচ দূরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং এক অপূর্ব্ব নারী মূর্ত্তি। বৃদ্ধ যেন কার ধ্যানে মগ্ন। চোখ দুটী তার অর্দ্ধমুদ্রিত। আর সেই নারী মূর্ত্তি যেন তারই দিকে চেয়ে প্রশংসমান দৃষ্টিতে।

মলয় তার নিজের দৃষ্টি শক্তির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্লে যেন। মনে মনে ভাবলে এও কি সম্ভব, না স্বপ্ন দেখছে সে। এ যে তার মানসী। একেই সে খুঁজে ফিরছিল সে সারা যুগ যুগ ধরে, তার সবখানির বিনিময়ে। কি সুন্দর ছিপছিপে গড়ন তার। পদ্মের ডাঁটার মত দুটি বাহু। আঙুলগুলি দেখে ম'নে হয় যেন একরাশ চাঁপার কুঁড়ি। আর কি অপরূপ তার গায়ের রং; যেন শরৎ কালের সূর্য্যের একঝলক রদ্দুর তার গায়ে কে ছড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহলতাকে বেষ্টন ক'রে আছে ফিকে নীল রংয়ের একখানি পারিজাত শাড়ী, তার শাড়ীর বাঁধন টুটে তার যৌবনশ্রী যেন উপচিয়ে পোড়ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আত্মস্থ হ'য়ে হাত জোড় করে প্রথমে নমস্কার কোরলেন। মলয়ও বিস্ময়াবিষ্টের মত প্রতি-নমস্কার জানাল, বিস্ময়ের ঘোর তার তখনও কাটেনি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রথমে কথা বোল্লেন। "কি সুন্দর আপনি বাঁশী বাজান্! আপনার বাঁশীর সুমধুর সুর আমাদের বাড়ী ফেরার অন্তরায় হল। ফেরা আর হল না আমাদের। দূর থেকেই শুনছিলাম আপনার বাঁশী তন্ময় হ'য়ে, তার পর ইচ্ছে হ'ল, একবার দেখে আসতে সেই মহাপুরুষকে যিনি এমন প্রাণের দরদ দিয়ে ক'রেছেন সুর সৃষ্টি। আমরা এসে খানিক বসবার পরই গেল আপনার বাঁশী থেমে। আশা করি ক্ষমা কোরবেন আমাদের অনধিকারের এ অপরাধ।" একান্ত বিনীতভাবে বোল্লেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। "এমন ক'রে আমাকে বোলে আপনার কাছে অপরাধী কোরবেন না। বাস্তবিক আমি লজ্জা পাব। একে আমি বাজাতে প্রায় কিছুই জানিনা, তার ওপর এ অযথা প্রশংসা শুনলে অপরাধের মাত্রা আরো বাড়বে। তবে আমি যাঁর কাছে শিখেছি তিনি একজন বিখ্যাত বাঁশী বাজিয়ে। তাঁর বাঁশী শুনলে বনের পশু পাখীও বশ হয়, এবং এটা যে শুধু কথার কথা নয়

তাতে মনে হয় কোলকাতায় এ ছবির ভবিষ্যত ভালই।

পূর্ণ থিয়েটার

দেবদত্তর 'গ্রহের ফের' এই সপ্তাহেই শেষ। আসছে শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটার্সের 'দিদি' দেখান হ'বে।

রূপবাণী

নিউ থিয়েটার্সের নূতন সমাজ-চিত্র 'অভিজ্ঞান' এই শনিবার থেকে এখানে ষষ্ঠ সপ্তাহে পড়লো। চিত্র-কাহিনীর সতেজ এবং সকরুণ বিষয় গুণে, শ্রীমতী মলিনা ও জীবন গাঙ্গুলীর নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণে, পরিচালনা ও আলোকচিত্রের রস বোধের পরিচয়ে এই কথাচিত্র বাঙলা ছায়াচিত্র-তালিকায় একটি স্মরণীয় ও পরম উপভোগ্য বাণীচিত্র বললেও বোধ করি, অত্যুক্তি করা হয় না।

তা যিনিই তাঁর বাণী শুনেচেন তিনিই বলবেন" লজ্জিতভাবে মলয় বললে। "সে বিষয় আমার তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ যার শিষ্য এমন গুণী তাঁর গুরু যিনি তিনি যে একজন অদ্বিতীয় হবেন এ নিঃসন্দেহ" বৃদ্ধ ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন এবং হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলেন, "আর এখানে দাড়ান মোটেই নিরাপদ নয়। চলুন এবার যাওয়া যাক।" বৃষ্টি নাবল বলে, কথায় বলে শরতের মেঘ। চলুন আমার ওখানেই। ওই সামনের দু' তিনটে বাড়ীর পরই আমার বাড়ী।" সত্যিই বৃষ্টি নাবল মুষলধারে, মলয়কে আর কোন কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তার সঙ্গের সেই নারীকে একটু দ্রুত হাঁটতে বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন। দু' তিন মিনিটের মধ্যেই একটা বড় গেটওয়ালা বাড়ীর সমুখে এসে পৌছুলেন। গেটের সামনে দুদিকে দুটো গ্যাস লাইট জলছে। গ্যাসের আলোয় মলয় দেখল—ফটকের গায়ে পাথরের ফলকে লেখা—'শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী এম্, এ, বি এল, এবং আর একদিকে লেখা আছে—"মলয়াচল।" সেই গেটের মধ্যে দিয়ে সামনের গোলাপ বাগান পার হয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকও সেই নারীটির অনুসরণ কোরতে কোরতে একবারে দোতালায় এক হল ঘরে এসে পৌছুল মলয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সামনের একটা সোফায় মলয়কে বসবার নির্দ্দেশ দিয়ে তিনি একটি আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত হয়ে একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন। মলয়ও বিনা বাক্যব্যয়ে মোহাবিষ্টের মত বসে পড়ল। "যাক্ এইবার যত বৃষ্টিই আসুক না কেন কোন আপত্তি নেই। কি বল মা ঝরণা?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভদ্রলোক পার্শ্বোপবিষ্টা ঝরণার দিকে চাইলেন। এই অহেতুক প্রশ্নের কি জবাব দেবে ভেবে ঠিক করতে পারলো না যেন ঝরণা। সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক অপ্রতিভভাবে বোললেন, "তাইত' আমার ঝরণা মার সঙ্গে যে এখনও পরিচয় করিয়ে দোওয়া হয়নি আপনাকে।" ধীরে ধীরে তিনি পার্শ্বে উপবিষ্টা ঝরণার মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন সস্নেহে। "ওহ! তোমার কাপড় চোপড় সব ভিজে গেছে যে একেবারে; ছেড়ে ফেল। নইলে অসুখ করবে আবার।" আব্দার এবং আদেশ মিশ্রিত সুরে ঝরণা বলল "তাইত আমার কাপড় চোপড় যে ভিজে গেছে এত আমার মনেই ছিলনা মোটে।" বলেই তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন যেন এটা মস্ত একটা হাসির ব্যাপার, তারপর হঠাৎ হাসির ব্রেক ক'সে মলয়ের দিকে চেয়ে বোললেন, "আপনারও ত" কাপড় চোপড় সব ভিজে

গেছে তাহলে। হ্যাঁ, ভাল কথা আপনার নামটি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন।" "না না মনে কি করবার আছে। আমার নাম মলয় বসু।" বেশ সপ্রতিভ ভাবেই মলয় বলল। "বেশ! চমৎকার নামটি আপনার। মা! ঝরণা মলয় বাবুকেও অমনি একখানা কাপড় দিও। আর তুমিও কাপড় চোপড় বদলে আমার জন্তে কফি এবং মলয় বাবুর জন্তে চা নিয়ে এস।" মলয় মৃদু আপত্তি জানাল। কিন্তু ভদ্রলোকের ঐকান্তিক অনুরোধে তাকে শেষ পর্য্যন্ত সম্মতি জানাতে হ'ল। অবশ্য 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' এইভাবে। অতঃপর ঝরণা উঠে গেল পিতার আদেশ পালন কোরতে। তখন মলয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক অনেক কথাই কইতে লাগলেন বসে বসে। বাইরে তখনও অবিরাম ভাবে বর্ষণ চলেছে। তাঁর নিজ বাড়ী 'বেনারসে' সেইখানেই তিনি প্র্যাকটিস কোরতেন তাঁর নাম অনঙ্গ মোহন চৌধুরী। তাঁর স্ত্রীর অনেক দিনকার সখ ছিল মধুপুরে বাস করবার। আজ পাঁচ বছর হ'ল প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে তিনি স্ত্রী এবং একমাত্র কন্তা ঝরণার সহিত মধুপুরে বাস করিতেছেন। আজ দু'বছর হ'ল বেরি বেরিতে তাঁর স্ত্রী এইখানেই দেহত্যাগ ক'রেছেন। সেই থেকেই তিনি এইখানে রয়ে গেছেন। শেষদিকে অনঙ্গবাবুর স্বর কান্নায় ভারী হয়ে এল। মলয় অনঙ্গবাবুকে যতই দেখছিল এবং যতই তার পরিচয় পাচ্ছিল ততই তাঁর অমায়িক ব্যবহারে এবং শিশুর মত সারল্যে মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল। এবং এখন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদে সত্যই ব্যথা অনুভব করল। একটি 'বয়' অনঙ্গবাবুর জন্তে একখানি কাপড় ও একটি মিরজাই ও মলয়ের জন্তে একখানি কাচান ধুতি ও গেঞ্জি আনল। অনঙ্গবাবু কাপড় জামা ছাড়লেন এবং বাধ্য হ'য়ে মলয়কেও তাঁর অনুসরণ করতে হল। তারপর ঝরণা চা ও কফি নিয়ে এল এবং যথাক্রমে মলয়কে চা ও অনঙ্গবাবুকে কফি পরিবেশন করল। এবং একটা প্লেটে করে খানকতক গরম কচুরীও দিল মলয়কে। অনঙ্গবাবু এসময় কিছু খান্না সেই জন্তে তাঁকে শুধু কফি দিল এবং শেষে বোধ হয় কোনও কার্য্য উপলক্ষে ঝরণা সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। জলযোগান্তে মলয়ের সঙ্গে অনঙ্গবাবুর আরও কথাবার্ত্তা হ'তে লাগলো। তাঁর গানবাজনা শোনার গভীর অনুরাগের কথা, মলয় এখানে কোথায় এবং কার বাড়ীতে এসেছে? কতদিন থাকবে কি করে ইত্যাদি আরও অনেক কথা হ'তে লাগল। মলয় এখানে 'বড়বাধে' 'কুবিলজে' থাকে এবং মহিমবাবু তাঁর পিস্তুত ভাই শুনে তিনি যারপর নাই আনন্দিত হ'লেন। এবং তার সঙ্গে যে অনঙ্গবাবুর বিশেষ আলাপ আছে সে কথা জানালেন। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মলয়কে আপনার ক'রে নিলেন। অনঙ্গবাবুর মনটা খুব সরল। তাঁর মনে কোন রকম গ্লানি ছিলনা। তিনি অত্যন্ত মিশুক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন।

পরদিন থেকে মলয় তাঁর বাড়ী নিয়মিত ভাবে আসবে এবং কোন রকম সঙ্কোচ করবে না আসতে। নিজের বাড়ীর মত মনে ক'রবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি ল'য়ে মলয় বাড়ী ফিরল সেদিন। বাড়ী এসে যখন পৌঁছল সে, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। এতখানি রাত হওয়ার জন্তে একটু আধটু কৈফিয়ৎ ও দিতে হল। তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল। তার মনে আজ অপূর্ব্ব পুলকের মাতন। সে পেয়েছে আজ তার মানসীর দেখা। বিচিত্র কল্পনার জাল বুনতে বুনতে সে নিদ্রার কোলে আত্ম সমর্পণ ক'রল।

(৩)

.........এখন প্রত্যহই অনঙ্গবাবুদের বাড়ী আসে মলয়। আজকাল ওঁদের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে তার। এখন অনঙ্গবাবুর মলয়বাবু সম্বোধন কেবল মাত্র মলয়এ এবং আপনি বলাটা তুমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ঝরণা আজ কাল আর লজ্জা করে না মলয়কে দেখে। মলয় এখন ঝরণাকে ঝরণা দেবীর পরিবর্ত্তে কেবল ঝরণা বলেই ডাকে। আজকাল সে প্রায়ই সন্ধ্যা সকালে ঝরণাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। প্রায়ই অনঙ্গবাবু এদের দলে যোগ দিতে পারেন না। কারণ তাঁর বাতের ব্যথাটা মাঝে মাঝে বড়ই বেশী হ'য়ে পড়ে।

কোনদিন মাঠে বসে মলয় বাঁশী বাজায়, পাশে বসে শোনে ঝরণা নিবিষ্ট মনে। ঝরণা তার পাশে থাকলে তার বাঁশী যেন আপনি বেজে ওঠে বিচিত্র সুরে। এমনি করেই মলয়ের ছুটীর দিন গুলি একটির পর একটা কোরে কেটে যেতে লাগল জলের মত

......শরৎ কালের পূর্ণিমা। সমস্ত প্রকৃতি যেন রূপোর পাতে জেগে। গাছ পালার সর্ব্বত্রই রূপালীর আমেজ। গ্রামের শেষে একটি অতি ছোট ক্ষীণকায় নদী বর্ষার জলে কথঞ্চিত পুষ্ট। ঝিরঝির করে অবিরাম বয়ে চলেছ। নদীর পাড়ে একখণ্ড পাথরের ওপর মুখোমুখি ভাবে বসে মলয় আর ঝরণা। মলয়ের প্রাণে আজ যেন তাণ্ডব সুরু হয়েছে। সে আজ বাঁশীতে করেছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। তার প্রাণের সমস্ত আবেদন বাঁশীর প্রমুখ শোনাচ্ছে তার মানসীকে। কারও ভাল লাগালাগির ওপর তার কোন খেয়াল নেই যেন আজ। সে আজ শুধু শুনিয়েই সুখী। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাতের দিকে গড়িয়ে চলেছে ক্রমশঃ। তবু বিরাম নেই তার অন্তহীন আলাপের। নেই তার ক্লান্তি।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—একুশ—

অরুণ ডাক্তার পরিমল সেনের পত্র পাইল। তাহাকে ডাক্তারবাবু লিখিয়াছেন যে গত কয়মাস যাবৎ একটী যুবক তাঁহার নিকট আছে সে অত্যন্ত পীড়িত ছিল কিন্তু ইদানীং ভাল আছে। সে অরুণের নিকট যাইতে চায়, নাম তার অমল সান্যাল। সে ডাক্তারবাবুকে বলিয়াছে যে অরুণ তাহার বাল্যবন্ধু এবং অরুণ এ সংবাদ পাইলেই তাহাকে লইয়া যাইবে। ইহার পর অমলকে তিনি কিরূপে পাইয়াছিলেন এবং তাহার ব্যাধি কিরূপ সাংঘাতিক হইয়াছিল তাহাও লিখিয়াছিলেন।

অরুণ ভাবিল সে অমলের কোন উপকারই করিতে পারিবেনা; অমল তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্বাসঘাতক। তাহার মরাই উচিত ছিল। কিন্তু পরে অমলের অবস্থা পাঠ করিয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিল। সে তাহার পুরাতন কর্ম্মচারীকে পত্রসহ টীটানগরে পাঠাইল এবং অমল আসিয়া যে ঘরে থাকিবে তাহারও ব্যবস্থা করিল। শুভ্রাকে ডাকিয়া বলিল, "অসুস্থ অমল আসছে; তার সেবা ও দেখাশুনার ভার তোমার উপর রইল। দেখ যেন তার ত্রুটী না হয়।" শুভ্রা নীরবে স্বামীর আদেশ শুনিল, ভালমন্দ কিছুই বলিলনা। শুভ্রার উত্তর না পাইয়া সে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ওই গোমড়া মুখের মেয়েদের মোটেই সহ্য করতে পারিনা আমি; আমার হুকুম শুনলে? তোমার মত কি?"

শুভ্রা বলিল, "তুমি প্রভু, আমি বাঁদী। তুমি যা হুকুম করবে তা পালন কর্ত্তে আমি বাধ্য। এতে আবার মতামত কি?"

কথাটায় অরুণ একটু বিদ্রূপের আভাষ পাইল—সে সরোষে বলিল, "হ্যাঁ—তাই, তুমি বাঁদী ছাড়া আর কিছু নও, বুঝলে?"

"তা আমি জানি," বলিয়া শুভ্রা বাহিরে যাইতেছিল, অরুণ সরোষে চীৎকার করিয়া বলিল, "শোন এদিকে।"

শুভ্রা ফিরিল—অরুণ বলিল, "শুনলাম তুমি তোমার বাবাকে বলেছ আমি রাতে বাড়ী থাকিনা, তোমার উপর অত্যাচার করি।—"

"আমি বলিনি"—বলিয়া শুভ্রা দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ বলিল, "মিথ্যে কথা, পাজী, শয়তানী, তুমি বলনি তো আর কে বলবে? ন্যাকামী করবার জায়গা পাওনি, না? আমি বলিনি—তবে কে বলতে গেল শুনি?"

"তা তো জানিনা। কেউ বলে থাকবে হয়তো—সহরশুদ্ধ লোকত অন্ধ নয়। তারা হয়তো লক্ষ্য করবে তোমার এই বিসদৃশ ব্যবহার। কে যে বলেছে তা জানিনা তবে সত্যই যদি কেউ বলে থাকে সে হয়তো তোমার সুহৃদ বা বন্ধু।"

অরুণ আরও চটিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার কথা নিয়ে লোকের মাথা ব্যথার দরকার নেই, লাভও নেই। তাদের স্বার্থ কি? এসব তোমারই কাজ। খবরদার বলছি; আমার সম্বন্ধে যদি কারও সঙ্গে আলোচনা কর তবে এমন শিক্ষা তোমায় দেব যা জন্মে ভুলবে না, বুঝলে?"

"এর আর অধিক শিক্ষা কি দেবে আমায়?" বলিয়া শুভ্রা স্থিরদৃষ্টিতে অরুণের মুখের দিকে চাহিল—পরে সে কঠোর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তুমি যে কোন নরকে কোন স্তরে নেমে যেতে বসেছো তা হয়তো ঠিক আমি জানিনা, কিন্তু জানতেই হবে আমায় একদিন। তুমি আমায় দাসী, বাঁদী যে আখ্যাই দাওনা কেন ধর্ম্মতঃ আমি যে তোমার স্ত্রী তা কোনদিনই অস্বীকার করতে পারবেনা। তাই তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি যে নিজের ভবিষ্যতের দিকে একটু চেও। বর্ত্তমানকাল যে অতীতের স্মৃতিতে ডুবে যাবেনা তাইবা তুমি জানলে কি করে?"

অরুণ ক্রোধে কাঁপিতেছিল, সে টেবিল হইতে একটী মাসিক পত্রিকা তুলিয়া লইয়া উহা বাগাইয়া ধরিল। শুভ্রা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ যেটা মধুর বলে মনে হচ্ছে কালকে যে সেটা তিক্ত হবেনা তারও মানে নেই। যে জিনিষ পেয়ে আজ তুমি স্বর্গ হাতে পেয়েছ কালই যে সে জিনিষ তোমার অঙ্গে নরকের জ্বালা ছড়িয়ে দেবেনা একথাও বলতে পারনা।"

অরুণ আর সহ্য করিতে পারিলনা। সে তাহার মুষ্টিবদ্ধ মাসিক পত্রিকার দ্বারা শুভ্রার মুখে বার বার সজোরে আঘাত করিয়া বলিল, 'শয়তানি, মাষ্টারী করবে আর?"

ঠিক এই সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—অরুণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। শুভ্রা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠাকুর, আর কতদিন ভুলে থাকবে আমায়? এবার তুলে নাও আমাকে।"

সে আয়নার নিকট দিয়া যাইবার সময় লক্ষ্য করিল তাহার গণ্ডে ও গলদেশে কয়েকটী লম্বা কালদাগ পড়িয়াছে। সে আপনার

শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল। সে কাঁদিলনা, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার স্বর্গীয়া জননীর তৈল চিত্রের দিকে তাকাইয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিল, "মা, তোমার মেয়ে আমি, সকল ব্যথা সকল অত্যাচার সইবার ক্ষমতা আমি যেন পাই। এই আশীর্ব্বাদ করো মা অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করবার বাসনা আমার হৃদয়ে যেন না আসে। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল এমন সময়ে অরুণ দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিল, "বেরিয়ে এস" শুভ্রা মুখখানি যতটা সম্ভব ঢাকিয়া বাহিরে আসিল। অরুণ বলিল, "দেখ ঠাকুর আর দাসীকে জবাব দিয়ে দিলাম। আজ থেকে রান্না, বাসন মাজা, ঘর ধোওয়া, কাপড় কাচা, সবই তোমায় করতে হবে বুঝলে? শুয়ে শুয়ে নভেল পড়া আর লেকচার মুখস্থ করা চলবে না তোমার।"

শুভ্রা বলিল, "তাই হবে।" অরুণ চলিয়া গেল। শুভ্রা ভাবিতে লাগিল অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিহাস। একদিন তাহার মুখ একটু ম্লান দেখিলে যে স্বামী সংসার অন্ধকার দেখিত আজ সেই তাহার প্রতি কঠোরতা অত্যাচার করিতে একটুও কুণ্ঠিত নহে। তাহার সৌভাগ্য আজ প্রাবৃটের আকাশের ন্যায় অন্ধকার; অদৃষ্ট রবি মেঘাবৃত। কে জানে ইহজীবনে যে মেঘ সরিবে কিনা। সে ভাবিল সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, আঁধারের পর আলো, অমানিশার পর আবার পূর্ণিমা আসে এ জগতের নিয়ম। প্রকৃতির এ নিয়মের ব্যতিক্রম কি তাহার ভাগ্যে লেখা আছে? সুদিন কি তাহার ভাগ্যে আর ফিরিয়া আসিবেনা?

—বাইশ—

সুদীর্ঘ নয় মাস পরে অমল কলিকাতায় ফিরিল। এই নয়মাস রোগ ভোগ করিয়া অমলের যে শারিরীক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে তাহাকে আর সুপুরুষ বলা চলে না। সে শীর্ণ ও জরাগ্রস্থের ন্যায় কতকটা কুব্জ হইয়া গিয়াছে। তাহার উজ্জল শ্যামবর্ণ এখন রৌদ্রতপ্ত তামাটে হইয়া উঠিয়াছে। কেবল তাহার উচ্চ নাসা ও চক্ষু দুইটী তাহার অতীত সৌন্দর্য্যের সাক্ষী স্বরূপ মাত্র বর্ত্তমান। তাহাকে দেখিয়া অরুণ ও শুভ্রার মনে করুণার উদয় হইল। উভয়ে সাগ্রহে তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল ও সে যাহাতে অচিরেই আরোগ্যলাভ করিয়া তাহার ক্ষতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে সে বিষয়েও তাহারা তৎপর হইল। অরুণ ও অমল প্রথমে পরস্পর পরস্পরের নিকট দোষী ও অপরাধী এই মনোভাব লইয়া অধিক কিছু বলিতে পারিল না। কেবল অমল অরুণকে একটুকু বলিল যে সে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহে। সে যদি কণাকে ফিরাইয়া পায় তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মতঃ সর্ব্বজন সমক্ষে বিবাহ করিবে এবং যাহাতে সে মানুষ হইয়া সংসারে মুখ দেখা-ইতে পারে তাহাই করিবে। আর যদি তাহাকে ফিরিয়া না পায় তাহা হইলে জীবনের শেষ কয়টা দিন তাহারই ধ্যানে কাটাইয়া দিবে। জীবনে সে আর বাড়ী ফিরিবে না। অরুণ অমলের কথাগুলি নিস্পন্দভাবে সম্মুখে বসিয়া শুনিল আর শুভ্রা শুনিল একান্ত আগ্রহ লইয়া যবনিকার অন্তরাল হইতে। অরুণ অমলের কথার উত্তরে শুধু এইটুকু বলিল বিগত জীবনের কথা তাহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত ও শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া পিতামাতার ইচ্ছামত বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়া তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। অমল অনেক কথাই বলিতে চাহে কিন্তু সেগুলি শুনিবার পূর্ব্বেই অরুণ তাহাকে বলে "ওসব পাগলামী ছেড়ে ভাল হয়ে উঠবার চেষ্টা কর।" অমল ভাবে পৃথিবীর কেহ বুঝি তাহার হৃদয়ের বেদনা বুঝিবার শক্তি রাখেনা। তাহার অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি? শুভ্রা অমলের মাতার নিকট পত্র লিখিয়া জানাইল অমল ফিরিয়াছে। পত্র পাইয়াই মহীতোষ ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে লইতে আসিলেন ও বিবিধ উপদেশ দিয়া তাহাকে ঘরে ফিরিবার অনুরোধ করিলেন কিন্তু অমল তাহাদের স্পষ্টই বলিল যে কণাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই সে ঘরে ফিরিবে নচেৎ ইহজীবনে সে ফিরিবে না। তাহাতে যদি পিতা তাহাকে বর্জ্জন করেন ও ত্যজ্য বলিয়া ঘোষিত করেন তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই। সে যাহাকে ভুলাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহারই জন্য যে আজ পথের ভিখারী হইয়াছে তাহাকে ফেলিয়া সে গৃহে ফিরিতে চায় না। তাহাকে ফেলিয়া পলায়নের সাজা জগদীশ্বর তাহাকে হাতে হাতে দিয়াছেন এবং এমনও যদি সে তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহা হইলে জগদীশ্বরের শাসন বজ্র নিশ্চয়ই তাহার উপর পড়িবে আর সে অনলে সে শুধু নিজে পুড়িবে না তাহার আত্মীয়স্বজন সকলকে জ্বলিতে হইবে।

মহীতোষ বাবু অগত্যা বলিলেন, "বেশ বাবা, তুই তাকে নিয়েই ফিরে আয় আমার বাড়ী। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম সে যেমনই হোক আমি তাকে পুত্রবধূ বলে ঘরে তুলে নেব।" মাতা বলিলেন "আমাদের আর টাকায় কাজ নেই অমল, তুই যাকে পেলে সুখী হোস সেই আমাদের ঘরের আলো হোক্। তুই ফিরে চল বাবা।" অমল পিতামাতার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিল যেদিন সে কণাকে ফিরিয়া পাইবে সেই দিনই সে ঘরে ফিরিবে। কিন্তু সে একা যাইবে না তাহার সহিত যাইবে তাহার পরিণীতা পত্নী কণা।

—তেইশ—

সেদিন কৃষ্ণাষ্টমী; নীল আকাশের বক্ষ ভেদ করিয়া লক্ষ লক্ষ তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আকাশে একখানিও মেঘ নাই শুধু তারা আর তারা। উপরে সীমাহীন অনন্ত আকাশ তাহাতে অগণিত দীপপুঞ্জ, আর নিম্নে অরুণের সদীম গৃহসংলগ্ন উদ্যান। সেই উদ্যানের একপ্রান্তে অমল। অরুণের বাড়ীর প্রশস্ত ছাদের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুভ্রা। দুইজনেরই হৃদয়ে অসীম চিন্তাস্রোত প্রবাহিত। সেই চিন্তার যেন বিরাম নাই। সে চিন্তা উভয়কেই আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছে।

শুভ্রা ভাবিতেছিল কেন সে অরুণকে হারাইতে বসিয়াছে; কেন সে তাহার প্রতি বিরূপ হইল; কোন অপরাধে তাহাদের আনন্দময় দাম্পত্য জীবনে এরূপ বিভীষিকাময় দুর্দিন আসিয়া দেখা দিল, কাহাকে পাইয়া অরুণ আজ তাহাকে পায়ে ঠেলিয়া দিতেছে? কে সে? কেমন সে? কত সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী সে? যাহার রূপচ্ছটায় অরুণের চোখে শুভ্রা আজ প্রভাতী চন্দ্রিমার মত নিস্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ কত চিন্তা একের পর এক তরঙ্গের ন্যায় আসিতেছে ও মনোমধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছিল।

নীচে বসিয়া অমল ভাবিতেছিল কণা কোথায়? কেমন আছে সে? সে বাঁচিয়া আছে, না ক্ষোভে, দুঃখে, লজ্জায় ইহজীবনের সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে? তাহাকে কি সে কখনও পাইবে না? কেমন করিয়া পাইবে, কোথায় গেলে পাইবে, কে তাহাকে কণার সংবাদ বলিয়া দিবে ইত্যাদি। তাহারও চিন্তা যেন শেষ হইবার নহে সে চিন্তাও বুঝি অনন্ত—অসীম সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বিরামহীন! কাহার শীতলস্পর্শে শুভ্রার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। শুভ্রা ফিরিয়া দেখিল তাহারই কাছে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া সমর। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সমরই প্রথম কথা বলিল, "দিদি, এই হিমে তুই একলা দাঁড়িয়ে আছিস? অসুখ করবে যে। যে রকম রোগা হয়ে যাচ্ছিস দিন দিন শেষে দেখছি মারা যাবি তুই।"

ম্লান হাসি হাসিয়া শুভ্রা বলিল, "না সমু, মারা যায় তারা যাদের জীবনে প্রয়োজন আছে, মূল্য আছে, আদর আছে। আমার এই মূল্যহীন জীবনটায় হয়তো যমেরও প্রয়োজন হবেনা। আমায় বেঁচে থাকতে হবে এমনি করে সঙ্গীহীন অনাদৃতজীবন নিয়ে।"

শুভ্রা সহসা থামিয়া গেল। সে ভাবিল এসব সে কি বলিতেছে—তাহার বুদ্ধি লোপ পাইল নাকি? সে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, "খুব খবর এনে দিলি তো তুই পাঁচদিন হয়ে গেল আজ।" সমর বলিল, "সেই জন্যেই তো এসেছি—অনেক খবর, চল্ নীচে যাই।"

ভ্রাতাভগ্নীতে আসিয়া দ্বিতলের একটা ঘরে বসিল। সমর বলিতে লাগিল—"হোটেলের ম্যানেজারকে বললাম—একটা উপকার করতে হবে মশায়। আজ যখন ডিনার সার্ভ করা হবে তখন আমি খানসামা সেজে ডিনার সার্ভ করতে চাই। আরে সে কি রাজী হতে চায়? ভয়েই অস্থির বলে যদি কোন বিপদ হয় তা হলে তাল সামলাবে কে? অনেক অনুনয় বিনয় মিনতি সবই করা গেল বেটা কিছুতেই রাজী হয়না। শেষে পচিশ টাকা তার হাতে গুজে দিলাম—তখন রাজী হলো বল্লে, একলা যাওয়া হবেনা মশায়। সঙ্গে আমাদের একজন বয় থাকবে। আমি তাতেই রাজী হয়ে গোঁফ-দাড়ী লাগিয়ে বয়ের পোষাক পড়ে ফেললাম। ডিনার নিয়ে হাজির হলাম সেলাম ঠুকে একেবারে অরুণবাবুর সামনে।

শুভ্রা বলিল—"তারপর।"

"তারপর আর কি? তারপর আরম্ভ নাটক সুরু হলো, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটলো। রাগে ক্ষোভে সর্ব্বশরীর জ্বলে যেতে লাগলো আমার। কিন্তু কি করি রাগ করলে পাছে সব পণ্ড হয়ে যায় তাই ভাল ছেলের মত একে একে ডিনার ডিশগুলো এগিয়ে দিলাম।"

"উনি তোকে চিনতে পারেন নি সমু?" বলিয়া শুভ্রা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

"চিনতেই যদি পারবে তবে মেক্ আপটার বাহাদুরী আর হল কি? ডাক্তার মোটেই বোঝেনি আমি তার সম্বন্ধী সমর চৌধুরী।"

"বেশ, তারপর কি হল বল?"

সমর বলিতে লাগিল, "ঘরে ঢুকেই দেখি একটা বছর কুড়ির মেয়ে, তার পাশে বসে তোমার বর। চেয়ার দুটো এত কাছে যে তাদের দুজনের শরীরের মাঝে ফাঁক ছিল বড় জোর দুই ইঞ্চি।"

"মেয়েটা কেমন দেখতে?" বলিয়া শুভ্রা সাগ্রহে সমরের দিকে চাহিল।

সমর বলিল, "হঠাৎ দেখলে মনে হয় খুবই সুন্দরী। কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে তোর পায়ের যুগ্যি নয়। ডাক্তারবাবু তাকে বলছিল যে সেই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য—লাভকুইন—কিন্তু এখনও তার মনে হয় যে ডাক্তারবাবু তাকে যত ভালবাসেন সে হয়ত ততটা ভালবাসতে পারেনি তাকে। সে নাকি অমল বলে কোন ছোকরাকে এখনও ভালবাসে বলে অনুযোগ জানালে তাকে।

"কাকে ভালবাসে সে?"

"কাকে আবার? —জামাইবাবুকে?

শুভ্রা হাসিয়া বলিল, "নারে, ঐ যে কি একটা নাম করলি তুই।"

—"ওঃ—হ্যাঁ—অরুণবাবু তাকে বলছিলেন, আমার মনে হয় এখনও অমলকে ভুলতে পারনি তুমি?"

—"আমি?"

"নারে—তুমি নয়—তুমি নয়—সেই মেয়েটা।"

"বেশ বলে যা। দেরী করিস না।" শুভ্রার কণ্ঠে আকুল আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল।

সমর বলিতে সুরু করিল, "মেয়েটা বল্লে, নাগো না। সে আমার কেউ নয়—তাকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি—তুমি আমার সব। জীবনমরণ— ঘুমজাগরণ — আরও কত কি! ওসব মনে থাকে না আমার। সে বল্লে তুমি পায়ে ঠেলোনা আমার এই মিনতি—"

"বেশ থামলি কেন? বলনা!"

"আরে মনে করে নিচ্ছি। দিদি, ব্যাপার রেগুলার রোমাণ্টিক—আর মুখ-রোচক। তবে সেই স্বাদটা নিতে পারলাম না আমি।"

"কেন রে? তোর আবার কি হলো?" বলিয়া শুভ্রা মৃদু হাসিল।

গম্ভীর মুখে সমর বলিল, "কি হলো? চোখের সামনে দেখলাম জামাইবাবুর অধঃপতন, তোর দুর্দ্দশা, তোর এই দুঃখ দেখে আমার বুকটায় কি রকম হচ্ছে তুই কি বুঝতে পারিস না দিদি? বুঝতে পারিস না কি তোর কিছু হলে মামার কি হবে? তিনি কি বাঁচতে পারবেন একটা দিনও, যদি তিনি তোর—সমরের চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মুখ আরক্তিম হইয়াছে, দ্রুত নিশ্বাস পড়িতেছে দেখিয়া শুভ্রা সস্নেহে তাহাকে বলিল, "ছিঃ ভাই সমু, অমন করে অধীর হতে আছে কি? জীবন কি সবায় একই-ভাবে কাটে? —তা যদি কাটতো, আমার মনে হয়, মানুষের জীবন এমনই একঘেয়ে হয়ে উঠতো যে সে বেঁচেই থাকতে পারতোনা সমর। যাঁর যাদু দণ্ডস্পর্শে দিনের পর রাত্রি আসে, আবার রাত্রি কেটে গিয়ে পৃথিবী আলোর রাজ্যে ফিরে আসে তাঁরই ইচ্ছাক্রমে সুখদুঃখ; শান্তিঅশান্তি, আসে-যায় দিনরাতেরই মত। সুদিন আর দুর্দ্দিন উভয়কেই আমাদের বরণ করে নিতে হবে তাঁর আশীর্ব্বাদ বলে। আজ যেটা লোকচক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক অসহ্য বলে মনে হচ্ছে সেই যন্ত্রণা সেই বিষাদই যে আবার তাকে সাধনা আর স্বর্গের পথে টেনে নিয়ে যাবেনা তাই বা জানবো কি করে। আমার বিশ্বাস সমু, আমার জীবনের এ মেঘ কেটে যাবে আবার তাকে ফিরে পাব আমি এমনই একান্তভাবে যে শত চেষ্টায়ও তিনি দূরে যেতে পারবেন না।"

সমর বলিল, "তাই যেন হয় দিদি; ভগবান তোর সুদিন ফিরিয়ে দিন। তোর এই বিপদে আমার দিয়ে যেটুকু সাহায্য হয় তোর তা আমি করতে রাজী আছি।" শুভ্রার অনুরোধে সমর পুনরায় বলিতে লাগিল, "সে মেয়েটা অদ্ভুত, এমন ভাণ করছিল সে যে আমারই মনে হচ্ছিল সে বুঝি সত্যি ভালবাসে অরুণবাবুকে তোর চেয়ে বেশী।"

"কি করে বুঝলি তা?"

ডিস্ সার্ভ করতে করতে শুনতে পেলাম মেয়েটা বলছে, "ওগো তোমার কাছে আমার অনুরোধ আমায় পেয়ে দিদির প্রতি অবিচার করোনা। তিনি যেন এক দিনও না জানতে পারেন আমি তাঁর জীবনে রাহুর মত এসে দাঁড়িয়েছি। বড় ভাল, বড় উঁচু, বড় উদার তিনি; আমি তার দাসী হবার যোগ্য নই সে কথা আমি জানি। তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস পড়লে আমাদের মিলন স্থায়ী হবে না। তাঁর চোখের জল পড়লে হয়তো—" বাধা দিয়ে ডাক্তারবাবু বল্লেন "এমনতো কোন কথা নেই যে চিরদিনই আমাকে তাঁর বশীভূত হয়ে থাকতে হবে—আজ্ঞাবাহী ক্রীতদাসের মত।" উত্তরে সে কি বললে "জানিস দিদি?"

সাগ্রহে শুভ্রা বলিল, "কি ভাই, বলনা তাড়াতাড়ি।"

"সে বললে ও কথা বলোনা তুমি। অগ্নি সাক্ষী করে জগদীশ্বরের পবিত্র নাম গ্রহণ করে তাকে তুমি তুলে নিয়েছ স্ত্রী বলে, সহধর্ম্মিণী বলে। তোমার সুখদুঃখ, শুভাশুভ তার সঙ্গে বিনিময় হয়ে গেছে সেদিন যেদিন তাকে বিবাহ করেছিলে। আজ যে তুমি আমার কাছে নিজকে বিলিয়ে দিয়েছ সেটাও করবার অধিকার নাই তোমার। কারণ তোমার ও দেহ ও প্রাণটার সত্যি অধিকারিণী তিনি—তোমার স্ত্রী, আমার দিদি।"

"সত্যি দিদি, আমার শ্রদ্ধা হচ্ছিল মেয়েটার প্রতি। মনে হচ্ছিল হয়তো সে সত্যিই অরুণ বাবুকে ভালবাসে, তার হিতই চায়, অহিত চায়না।"

শুভ্রা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল "উত্তরে কি বললেন উনি?"

উত্তরে জামাইবাবু হাস্‌লেন বল্‌লেন "নভেল পড়ে পড়ে তোমারও দেখছি শুভ্রার মত মাথার দোষ হয়েছে। আগেকার দিনে মানুষ দশটা বিয়ে করতো তাতে স্ত্রীদের কোন কথা বলবার অধিকার থাকতোনা। যার শক্তি আছে, অর্থ আছে, বিদ্যা আছে সে কেন যেচে নেবে স্ত্রীগুলোর প্রভুত্ব বলত? আমার যাকে ভাল লাগবে সেই হবে আমার সঙ্গিনী, প্রিয়া।"

উত্তরে হেসে সে বললে, "বেশ কথা যেদিন আর ভাল লাগবেনা সেদিন সে হবে তোমার পায়ের পরিত্যক্ত চটীজুতো এইতো? অথবা শুকনো ফুলের মত তার ঠাই হবে আস্তাকুড়, মনের ফুলদানীতে কোন স্থান থাকবেনা তার। তার সে স্থান অধিকার করবে আবার এক নবীনা বৃন্তচ্যুতা মঞ্জরী। ভাল কথা, এমনও তো হতে পারে দুদিন পরে আর কাউকে ভাল লাগবে তোমার; আর তখন আমিও দিদিরই মত হয়ে পড়বো তোমার চক্ষুশূল—তোমার বিদ্বেষের সামগ্রী। আর দশটা বিয়ের কথা—ওসব গুলো বিয়ে নয়—

ওগুলো ছিলো পুরুষের উদ্দাম বাসনা তৃপ্তির ইন্ধন। যখনই পুরুষরা সুবিধা পেয়েছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির, তখনই পুথিতে বিধান লিখে প্রচার করেছে শাস্ত্রবাক্য ভগবৎবাণী বলে।"

"বাঃ! বেশ তো কথা বলতে পারে সে! তার মতের সঙ্গে আমারও মত মিলে যাচ্ছে সমু।"

"বেশ, বলে বেশ—চমৎকার—মার্ভেলাস; দিদি, সত্যি মেয়েটা এডুকেটেড বলে বোধ হল। সে বল্লে, না যদি সত্যি ইচ্ছে থাকে নতুন ফুলের মধু খাবার স্পষ্ট করে বলো আমায়। তোমাকে হারাবার আগে মরতে চাই আমি। নূতনের স্পৃহা আমার নেই, জীবন আমার শুধু বিভীষিকা—এই কদিন শুধু সুখের মুখ দেখেছি—আমার এই সুখস্বপ্ন ভাঙবার আগেই বিদায় নিতে চাই পৃথিবী থেকে।"

"আহা বেচারী! হ্যারে নামটা তো বল্‌লিনা তার?" বলিয়া সমরের দিকে শুভ্রা চাহিল।

সমর ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "নামটা তো ঠিক মনে আসছেনা দিদি—তবে বোধ হচ্ছে কণা না ফণা এমনি একটা কিছু!"

কণা—কণা! ঠিক শুনেছিস্ তার নাম কণা' বলিতে বলিতে শুভ্রা যথেষ্ট উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সমর কেমন বিব্রত হইয়া বলিল, "কেন দিদি, তুই তাকে চিনিস্ কি?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া শুভ্রা বলিল, "তুই এখুনি হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বল ওদের ডিনার সার্ভ করবে কাল আমার ছোট ভাই, তার জন্য যা খরচ লাগে আমি দেব।"

"ছোট ভাইই নেই আমার তো ছোট ভাইকে পাব কোথা থেকে?"

"নারে সমর কাল আমি ছেলে সেজে যাব ঐ হোটেলে। তারপর মজা বর! বুঝ্‌লি?"

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বেতারে রবিবারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল—কিন্তু ইদানিং তার আকর্ষণ দিনে দিনে যাচ্ছে কমে। গত দুই সপ্তাহের দুই রবিবারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর ছিল। বহু আশা নিয়ে ছিলাম কৃষ্ণ বাবুর গান শোনার আশায়—কিন্তু অনুপস্থিত।

*　　*　　*

আর্টিষ্ট অনুপস্থিতের মাত্রা বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনের কোন না কোন অনুষ্ঠানে আর্টিষ্ট অনুপস্থিত লেগেই আছে। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ভালো প্রোগ্রাম পাওয়া যায় না, বিশেষ যদি বা গেল পাওয়া তবে অনুপস্থিত অনিবার্য্য কারণবশতঃ।

*　　*　　*

গ্রামফোন রেকর্ড বেতারের বৈশিষ্টাকে ক্ষুন্ন করে চলেছে। প্রতিদিনই গ্রামফোন রেকর্ড দুপুরে সন্ধ্যায় এবং তাও আবার যত রাজ্যের নিম্নশ্রেণীর সাবেক কালের বাজে রেকর্ড। বেতারে কী আর্টিষ্ট-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে?

বাঙালী ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেনের আমলে আমরা আশা করেছিলাম কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অনেক উন্নতির ধারা লক্ষ্য করা যাবে—প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনে দেখা যাবে কিছু নতুনত্ব, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আমরা ক্রমে ক্রমে অবনতিই দেখতে পাচ্ছি।

কেন প্রোগ্রাম ভালো হয় না—আর্টিষ্টদের আন্তরিক পূর্ণ সহযোগিতা বেতারে কেন পাওয়া যায় না—তার অনেক কারণের অনেক ইঙ্গিতই আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়েছি। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের ষ্টেশন ডাইরেক্টরের সে দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

*　　*　　*

গুণী আর্টিষ্টরা কেন বেতার-প্রোগ্রামে স্থান পায় না? বেতারে পক্ষপাতিত্বের স্থান কার' রেখেছে? এর অনুসন্ধান করলে জানা যাবে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার স্থান নেই কেন।

*　　*　　*

আমরা বিশেষভাবে জানি শ্রোতারা যাদের চায়—যাদের প্রোগ্রামে পাওয়া যায় যোগ্যতার পরিচয়, অকারণে কিছু দিন বাদে বেতার প্রোগ্রামে আর তাদের স্থান থাকে না।

আমাদের সহজ প্রশ্ন শ্রোতারা যাদের চায় এবং যাদের প্রকৃত যোগ্যতা আছে কেন তাদের প্রোগ্রামে দেওয়া হয় না? কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ সেন এ সম্বন্ধে সন্ধান নেবেন কী?

"দূর, তা কি হয়? তোর মুখখানা যে একেবারে মেয়েলি—সবাই ধরে ফেলবে দিদি।"

"তবে আর তোর মেক আপ এর বাহাদুরী কি? তুই সাজিয়ে দিবি সব। আমি দেখবই তাকে।"

শুভ্রা তাহার হাতে ব্রিচেস্, সার্ট, পরচুলা, জুতো, প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য ও অন্যান্য খরচের জন্য একখানা একশত টাকার নোট দিল; সমর আপত্তি করিল।

শুভ্রা বলিল, "তুই তো রোজগার করিসনা ভাই। বাবা দুশো টাকা মাসে মাসে পাঠান আমার হাত খরচের জন্য। সেই টাকা থেকে দিচ্ছি—তোর জামাইবাবুর টাকা নয়।"

অগত্যা টাকা লইয়া সমর প্রস্থান করিল। শুভ্রা ভাবিতে লাগিল কতক্ষণে এই চব্বিশ ঘণ্টা অতীত হইবে—কতক্ষণে সে কণাকে দেখিবে ও চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবে।

(ক্রমশঃ)

পথের পা

(গল্প)

শ্রীধর্ম্মদাস মিত্র

পশ্চিমগামী একখানা ট্রেন; হাওড়া থেকে ছাড়লো রাত সাড়ে ন'টায়। প্যাসেঞ্জার নয় এক্সপ্রেস। সেই ট্রেনের একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ইণ্টারক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট কোনরকমে উঠে পড়লাম। সকলেই একথা অবগত আছেন যে, ট্রেনে আরামে যাবার জন্য কত লোক, কথা কাটাকাটি, ঝগড়া, এমন কি হাতাহাতি পর্য্যন্ত করে বসে। যে লোক একটা ষ্টেশনে যাবে, সেও ট্রেনের ছোট্ট কামরাটির মধ্যে ঐ অল্পসময়ের জন্যও নিজের "আমিত্বকে" প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমারও অন্য কোন দিকে নজর নেই; কিভাবে একটু আরামে শুয়ে যেতে পারবো তারই সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

প্রথমেই বলেছি ট্রেনখানা এক্সপ্রেস; সব ষ্টেশনে ষ্টপেজ নেই। শুধু হু হু শব্দে বাতাস কেটে, অন্ধকার প্রকৃতির বুক চিরে ছুটে চলাই যেন এর একমাত্র উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে দু'একটা টিম্‌টিমে আলো ও জনকয়েক লোক নিয়ে এক একটা ষ্টেশন; ট্রেন, এ সব ষ্টেশনকে চক্ষের পলকে পিছনে ফেলে গর্ব্বিত ভাবে ছুটে চলে। মাঝে মাঝে এক একটা জংশন ষ্টেশন; গাড়ীর গতী কমে আসে; ট্রেন থামে। মিনিটকয়েক প্লাটফর্মের কোলাহল; চা-ওয়ালার বিচিত্র 'চা-গ্রাম' বুলি; 'পান-বিড়ি-সিগ্রেট', 'পুরি-কচৌড়ি'; তারপর, আবার সিটি বেজে ওঠে; ট্রেন ছুটে চলে।

বর্দ্ধমান গাড়ী পৌঁছুলে, একটা লোক বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে নেমে পড়লো। আমিও কালবিলম্ব না করে তার জায়গাটিতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে ফেলালম। হোল্ডল খুলে বিছানাটা পাততে যাবো এমন সময় ওপাশের বাঙ্কের ওপর থেকে স্পষ্ট বাঙ্গালী মেয়ের গলার আওয়াজ পেলাম—'শুনছেন'?

সেইসাথে আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া কম্বলের ভেতর থেকে একখানা সুন্দর মুখ বাইরে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ ভেবেছিলাম, কামরায় সবই বিজাতীয়; এতদূর পথ যাবো কি করে? ও বাঙ্কের ওপর আমি কাবুলিওয়ালাদের কারুকে আশা করেছিলাম। মোটা কম্বলের ভেতর যে, একটি ক্ষীনাঙ্গী সুন্দরী বাঙ্গালী মেয়ে অবস্থান করেছেন, তা কে জানতে? কামরায় আর দ্বিতীয় বাঙ্গালী নেই; তাই বুঝলাম কথাটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। তবু দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করলাম আমায় বলছেন কিছু?

হেসে মেয়েটি জবাব দিল—হ্যাঁ, এটা কোন ষ্টেশন ছাড়লো?

—বর্দ্ধমান।

—ওঃ, আমি ভেবেছিলাম বুঝি আসানসোল। তবে বেশী ঘুমোই নি; কি বলুন? দ্বিধাহীন, নিঃসঙ্কোচ আলাপ। যদিও এটা নারীপ্রগতীর যুগ, তবু বাঙ্গালীমেয়ের নারী সুলভ নম্রতা ও সঙ্কোচের অভাব দেখলে একটু বিস্ময় জাগে বৈকি। সেভাব চেপে বললাম—না না, বেশী ঘুমোলেন কোথায়; এই ত' only an hour.'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো—আপনি কতদূর যাবেন?

—যাবো, এলাহাবাদ।

—ওঃ, তবে ত' অনেকদূর পথ যাবেন আপনি; আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তবে আমাকে বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট-এর আগে তুলে দেবেন দয়া করে। মিনতিভরা অনুরোধ। হেসে জবাব দিলাম—আপনি ঘুমুতে পারতেন, যদি আমার মত বাক্যবাগিশ লোকের সঙ্গে আলাপ না জমিয়ে ফেলতেন; কিন্তু এখন আপনার ঘুমের আশা ছাড়তে হবে। তাছাড়া বেনারস-ক্যাণ্টনমেণ্ট পৌঁছুতে ত' সকাল হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, গল্প করার বদঅভ্যেস আমারও আছে: তবে আমি ভাবছিলাম, যদি আপনার ঘুমের ডিসটারবেন্স হয়; তাই আপনাকে বিরক্ত না করে ঘুমোনই ভাল। যাক্—এলাহাবাদে বুঝি আপনি চাকরি করেন?

—না না, চাকরী করিনা; সখ হয়েছে তাই বেড়াতে চলেছি। তাছাড়া এ বছর প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন এলাহাবাদেই হচ্ছে কিনা, ওটা attend করবারও ইচ্ছে আছে।

—আপনিও দেখছি সাহিত্য বিষয়ে ইন্‌টারেষ্টেড: লেখেন টেখেন নাকি?

—যৎসামান্য; তবে লেখা আমার পেশা নয়, নেশা। তাছাড়া জানেন ত; আজকাল বেকারদের মধ্যে শতকরা নব্বইভাগ সাহিত্যিক বা সাহিত্যসেবী। হাতে কাজ নেই, সাহিত্যচর্চ্চা করি। বাবার Bank Account debit করে খরচ চলে; বাবাকে লিখি চাকরির চেষ্টা করছি। আজকাল সাহিত্যিক মানেই জানবেন হয় বেকার; নয় হতাশ প্রেমিক।

এতক্ষণ মেয়েটি চুপ করে আমার কথা শুনছিল; আমার কথা শেষ হতে হেসে বললো—আপনি বেশ মজার লোক; হাসাতে পারেন মানুষকে। কিন্তু আপনার শেষের কথাটা যে সবক্ষেত্রেই সত্য একথা মেনে নিতে পারিলাম না। এই দেখুন না আমিও সাহিত্যচর্চ্চা করি, কিন্তু আমি বেকার নই, তার প্রমান, আমি কলকাতার Brahmo Girl's School-এ মাষ্টারী করি। তাছাড়া

আজ পর্য্যন্ত কোনও পুরুষের কাছ থেকে...... !

বুঝলাম সব। আঘাত পেয়েছিল কিনা, সেই জানে আর অন্তর্য্যামী জানেন। কিন্তু আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম মেয়েটির কথায়। ভাবাবেগে এমন কথা বলে ফেলেছি, যা অপরপক্ষের মনে আঘাত করেছে। অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিৎ বিবেচনায় বললাম—মাপ করবেন, আমি কথাটা ইন্ জেনারল বলেছি। তাছাড়া আপনিও যে একজন সাহিত্যিক এখবর আমার জানা ছিলনা মোটেই। যাক্, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় খুশী হলুম।

স্ত্রীলোকের নাম জিজ্ঞেস করা শোভা পায়না; তাই, ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অন্য কথা পড়লাম। আচ্ছা, আপনি যে বেনারস্ যাচ্ছেন, ওখানে কি আপনার কোনও আত্মীয় আছেন?

হ্যাঃ হেসে মেয়েটি জবাব দেয়। বাবা ওখানকার পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আবার অন্য প্রশ্ন করলাম আচ্ছা এতদূর পথ একা যেতে dare ক'রলেন কেন, কারুকে সাথে নিলেই ত' পারতেন।

মেয়েটি কথাটা গায়ে মাখলোনা; সহজ ভাবেই জবাব দিল—দেখুন, আপনি যা' বলেছেন কথাটা সত্যি: একে পশ্চিমের ট্রেনে, খোট্টার কারবার, একা যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু যেটা ঠিক নয়, যেটা সমাজকে আঘাত করবে এই সব কাজ করাই আমাদের নেশা দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা ভুলে যেতে বসেছি, আমরা বাঙলাদেশের মেয়ে, পাশ্চাত্যের মত, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাঁটা আমাদের শোভা পায়না। আর তা ছাড়া একাই যে যেতে হবে, আমি তা' ভাবিনি; ভেবেছিলাম, ট্রেনে কোনও বাঙ্গালী যাত্রী কি থাকবেননা, তাঁর সাথে আলাপ ক'রে ফেলবো।

শুধু একটা 'ওঃ' ব'লে, চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়লাম। মনে কত আকাশ কুসুম কল্পনা। এই যে মেয়েটি, কেমন সুন্দর এর ব্যবহার; কেমন গুছিয়ে কথা বলতে পারে। এর কথায় বার্ত্তায় বা ব্যবহারে আভিজাত্যের বা শিক্ষার গর্ব্বত' ফুটে ওঠেনি। কিন্তু ওটাই আজকাল প্রগতীশালিনী মেয়েদের ভূষণ।

আমার চিন্তার গ্রন্থি ছিঁড়ে দিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো একটা কথা, অভয় দেন ত' বলি; বলুন রাগ করবেন না? হেসে ব'ললাম—পাগল হয়েছেন আপনি। রাগ আমার ধাতে আসেনা। আর তাছাড়া আপনার ওপর, রাগ বা অভিমান করবার কি অধিকার আমার আছে বলুন?

ম্লান হেসে মেয়েটি জবাব দিল—আপনি এখনও বাঁধা পড়েন নি বুঝি; তাই ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

মানস প্রিয়া

শ্রীরথীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

তুমি গো আমার জীবনের সাথী
সুখে, দুখে চির বন্ধু মম;
হে মোর প্রেয়সী! প্রিয়া, প্রিয়তমা
ওগো আত্মীয়া নিকটতম!

২

তোমার ওই বাহু তোমার ওই আঁখি,
তোমার দেহের সুরভি সে মাখি;
মেটেনাক মোর আশ।
মনে হয় মোর থাকি তোমা ঘিরে
জনম জনম যুগ যুগ ধ'রে
তোমাতেই করি বাস।

৩

রূপালী রাতের ঝরা জোছনায়
ফুলবনে দোঁহে বসি,
তুমি গাবে গান আমি শুনে যাব
মাথায় হাসিবে শশী।

৪

গান শেষ হ'লে কাননের ফুলে,
গাথিয়া মালিকা দোব এলচুলে;
কণ্ঠে বাহুতে আর।
তুমি সে ভ্রমিবে ফুল বনে বনে,
দূর হ'তে আমি মুগ্ধ নয়নে;
চেয়ে রব অনিবার।

লঘুপদে তুমি হরিণীর মত
বনে ও বনান্তরে,
পদাঘাতে কত ফুটাবে কুসুম
চলিবে গর্ব্বভরে।

৬

দখিনা বহিবে অলক দুলায়ে,
ফোটা কুসুমের গন্ধ ছড়ায়ে;
সারা বনানীর বুকে।
ধীরে ধীরে মোরা এসে নদীকূলে,
তরী-পরে উঠি দোব তরী খুলে;
ব'সে রব দোঁহে সুখে।

৭

নিজ মনোমত বহে যাবে তরী
ধরিবনা কভু হাল,
বাতাস যখন উঠিবে তখন
তুলে দোব শুধু পাল।

৮

ক্রমে ক্রমে যবে তব আঁখি দুটি,
তন্দ্রার ঘোরে পড়িবে সে লুটি,
সব তোমা কোলে কোরে।
কুসুম গন্ধে যাবে তরী ছেয়ে,
আমি রব তব মুখপানে চেয়ে;
চাঁদ ডুবে যাবে দূরে।

হেসে ব'ললাম—ওঃ, এই কথা; আমাদের মত অভাগাকে কেইবা বাঁধবে বলুন; বাঁধবার মত কারুকে খুঁজে পাইনা।

নিজেকে ঢাকবার চেষ্টায় সে অন্য কথা পাড়লো—আচ্ছা, আপনি যখন বেড়াতেই চ'লেছেন, তখন আমাদের ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে যেতেও ত' পারেন। আপনারও বেড়ানো হয়, আমারও একজন সঙ্গী জোটে; একা একা দিনগুলো কাটতেই চায়না আমার। আর দেখুন দেখি কি ভোলা মন আমার; আপনাকে নিজের পরিচয়টা পর্য্যন্ত দেইনি ভাল করে, অথচ বাড়ীতে যেতে নেমন্তন্ন করছি: আপনি ভাববেন কিনা; আমার নাম মীরা সেন, বাকী পরিচয়ত' কথা থেকেই পেয়েছেন আমার। প্রতিটি সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায় যার নাম ছড়িয়ে আছে, যার সাইকলজী আমাকে মুগ্ধ করেছে কত সময়; যার সরল উক্তি, মনে জাগিয়েছে নূতন প্রেরণা; সেই মীরা সেনের এ যেন নূতন রূপ। নিজের মনকে যখন সে প্রবোধ দিতে পারেনা, যখন মনে হয়, হয়ত বাঁধা পড়াই ছিল ভাল; তখন তার কলমের মুখে ফুটে ওঠে, পাঠকের প্রতি সান্ত্বনার বাণী, কর্ত্তব্যের অনুপ্রেরণা। মীরা সেন একজন নামকরা লেখিকা হতে পারেন, যশের অধিকারিণী হতে পারেন কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে শুধু তাঁর একমাত্র পরিচয়—নারী। তাঁর অন্তরের ঘুমন্ত নারী কোনও অশুভ মুহূর্ত্তে শত বাধা বিপত্তি ভেঙ্গে দিয়ে একদিন জেগে উঠবেই; কোনও পুরুষকে ক'রে নেবে একান্ত আপনার; তার কাছে বিলিয়ে দেবে, নিজের প্রাণ, মন, য।' কিছু নিজস্ব স্বত্ব।

ততক্ষনে ট্রেন এসে আন্দোলনে থেমেছে। কামরার দরজা থেকে মুখ বের করে ডাকলাম—এই চা! হিন্দু-চা; ইধার!

চা-ওয়ালা আসতেই দুকাপ চায়ের অর্ডার করে দিলাম। কথাটা কাণে যেতেই মীরা ব'ললো—দেখুন চা আমি খাইনা।

বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে জবাব দিলাম—আপনি চা খান না; বলেন কি! এই টুয়েন্‌টিয়েথ সেন্‌চুরিতে!...কিন্তু আজকের মত আমার অনুরোধে খেতে হবে আপনাকে। তাছাড়া সারারাত যাবেন, একটা ষ্টিমুলেণ্ট না পেলে শরীর খারাপ হ'তে পারে।

উপরোধে প'ড়ে অনিচ্ছাসত্বেও মীরাকে চা খেতে হল। এতরাত্রে খাবার খেতে সে কিছুতেই রাজী হয় না। আবার ট্রেন ছাড়ে, গল্প সুরু হয়।

আশাভরা চোখদু'টিকে আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে, মীরা বলে "তাহলে নাবছেন ত' আমাদের ওখানে"?

—দেখুন আজ থাক, ফেরবার পথে নামবো'খন। আপনি ত' ওখানে থাকছেন কিছুদিন।

—মাস দুই আছি বোধ হয়। কথা দিয়ে যাচ্ছেন, আশা চাই কিন্তু। সত্যি একা একা আমার বড্ড খারাপ লাগে। দিনগুলো খুব বড় মনে হয়।

মনে অনেক কথা জাগলেও সবকথা মুখফুটে বলা যায় না; সেই জন্যেই সমস্যার সমাধান হয় না অনেক সময়।

বেনারাস ক্যাণ্টনমেণ্ট-এর আগের ষ্টেশনে মীরা নিজের জিনিষপত্তর গুছোতে থাকে; আমিও তা'কে সাহায্য ক'রছিলাম তা'র কাজে। আমারও কিন্তু এতক্ষনে মনটা ফাঁকা ঠেকে; মনে হয়, মীরার সঙ্গে আমার পরিচয়, যেন কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেকার নয়; বহু যুগের।

ট্রেন এসে বেনারস-ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট এ থামলো। নামতে নামতে মীরা কথা বলে; আমি তা'র জিনিষগুলো বিলিয়ে কুলীর মাথায় তুলে দিতে থাকি। একবার ভাবলাম, নেমে পড়া যাক্ দু'টো ত' জিনিষ! কিন্তু, সঙ্কোচ বাধা দিল।

এমন সময় মীরা বলে উঠলো—sorry দেখুন ত', অপনার নামত' জানতে পারলাম না; আর ওখানকার আপনার address টাই বা দিলেন কৈ?

কথাগুলি বলার সাথে সাথে মীরা, তা'র ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা চকচকে চামড়া বাঁধানো ছোট্ট ডায়েরী বের ক'রলো; ব্লাউজের কলারের ওপর থেকে খুলে নিল, তার পার্কার-পেন-তারপর আমি বলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম ঠিকানা তা'র ছোট্ট ডায়েরীটির পাতায় লিপিবদ্ধ ক'রে নিল।

যতদূর তা'কে দেখা গেল, আমি তাকিয়ে থাকলাম, তা'র চলমান চলার পথের পানে। তারপর, একটা দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে নিজের জায়গায় এসে ব'সলাম।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কথা দিয়েও ফিরবার পথে মীরার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমার নাম ঠিকানা লেখা ডায়েরীখানা আজও মীরার কাছে আছে কিনা কে জানে। আমি কিন্তু ডায়েরীতে তার নাম ঠিকানা না টুকলেও, একরাত্রির পথের পরিচিতা মিস্ মীরা সেনকে আজও ভুলতে পারিনি। মনের নোটবুকখানা ডায়েরীর থেকে অধিক দিন স্থায়ী বোধহয়॥

শ্রীদুর্ব্বাসা
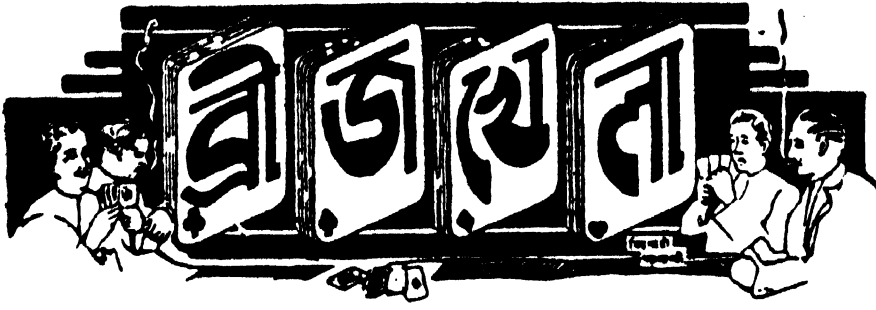
ডাক দেবার পূর্ব্বে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে স্মরণ রাখতে হবে যে যদি তাঁর একটি ডাকের প্রত্যুত্তরে খেঁড়ী কর্ত্তৃক কোন রঙে দুইটির ডাকের উত্তর আসে, তাহলে সেই ডাকের দ্বারা হাতের গঠনকার্য্য সুন্দররূপে কার্য্যকরী হবে কিনা। অথবা ইহাও চিন্তনীয় যে সেই ডাকের দ্বারা তাঁদের কোন ক্ষতি সাধিত হওয়া সম্ভব কিনা। সে ডাকে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে ডাক দিতে বিরত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনেক সময় দেখা যায় যে হাতে ৩ খানি অনারের পিট বর্ত্তমান, অথচ ডাক দিলে বিপদগ্রস্ত হতে হবে, - সে সব ক্ষেত্রে কি ভাবে ডাক দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মিঃ কালবার্টসন্ একটি সুন্দর পন্থা প্রদর্শন করেছেন যেমন ধরুন আপনার হাতে আছে,

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×; হরতন—টেক্কা, সাতা, ছক্কা, চৌকা, দুরি; রুহিতন—নয়, পঞ্জা; চিড়িতন—পঞ্জা, চৌকা।

এই হাত নিয়ে আপনি যদি একখানি হরতন ডাকেন ও তদুত্তরে খেঁড়ী যদি কোন রঙে দুইটির ডাক দেন এবং তার প্রত্যুত্তরে আপনি যদি দুইখানি ইস্কাবন ডাকেন, ফলে হাতে ইস্কাবন না থাকার দরুণ যদি খেঁড়ী তিনখানি হরতন ডেকে ডাকটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, তবে তিনখানি হরতনে খেলা করা বিশেষ শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। রঙ বাছাই করে ডাক দিতে খেঁড়ী বাধ্য, অথচ তার ফলে খেঁনারং দিতে হল। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে প্রথমেই যদি ইস্কাবনে ডাক দেওয়া হত, তাহলে খেঁড়ী যে কোন রঙে দুইটির ডাক দিয়া উত্তর দিতেন, আর আপনি পুনরায় দুইটি হরতনে ডাক দিতেন। ফলে খেড়ী এখন অনায়াসে এই ডাকে পাশ দিয়ে যেতে পারেন বা হরতন না থাক্‌লে দুইটি ইস্কাবনে ডাক দিতে পারেন। এই ধরণের ডাকে আপনাদের বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আবার মনে করুন আপনার হাতে আছে—

(১) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, আটা; হরতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×, ×; রুহিতন—×, ×; চিড়িতন—×, ×।

(২) ইস্কাবন—সাহেব, ×, ×; হরতন—সাহেব, বিবি, ×, ×; রুহিতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, ×, ×; চিড়িতন—×।

এ সকল ক্ষেত্রে আপনাকে একটি ইস্কাবন (১) বা একটি হরতনে (২) ডাক দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি আপনার ডাকের পর খেঁড়ীর ডাকের উত্তরেও যদি একটির ডাক দিতে পারেন তবে নিম্ন রঙের ডাক দেওয়াই বিধেয়। যেমন ধরুন আপনার হাতটি এইরূপ,

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, ×, ×; হরতন—×, ×; রুহিতন—×, ×; চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×, ×।

এক্ষেত্রে আপনি যদি একটি চিড়িতনে ডাক দেন, তার উত্তরে খেঁড়ী যে কোন রঙে ডাক দিলে আপনি অনায়াসে একটি ইস্কাবন ডাক্‌তে পারেন। অতএব যখনই ডাক দিতে হবে নিম্নলিখিত কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

(১) যত কম ডাকে বেশী খবরের আদান প্রদান করা যেতে পারে তার চেষ্টা করা।

(২) অনেক ভাবনা-চিন্তার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক ডাকে খেঁড়ীকে নিজের হাতের স্বরূপ বলে দেওয়া।

(৩) খেঁড়ীকে ডাকের দ্বারা বিপদ-গ্রস্ত না করে নিজেদের উভয়ের মধ্যে যতগুলির খেলা হওয়া সম্ভব, সেই সীমা উল্লঙ্ঘন না করার চেষ্টা করা।

চরিত্র (পুরুষ)

ডাঃ হরেন মুখার্জ্জী—প্রাইভেট ডিটেকটিভ, বাড়ী কালিঘাটে।
অবিনাশ—ঐ অমিতশক্তিশালী বন্ধু ও সহকারী।
রামদহিন—হরেনবাবুর বিশ্বস্ত বেয়ারা।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

হীরার হার

(রোমাঞ্চকর মৌলিক গল্প)

চরিত্র (স্ত্রী)

মনীষা—হরেনবাবুর পত্নী।
বেহারীর মা—ঐ বাপের আমলের বুড়ো ঝি।
অন্যান্য চরিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে পাইবেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লোকগুলো ঘরের ভিতর ঢুকেই আলো জ্বেলে দিয়েছিল। উজ্জ্বল আলোয় ঘর আলোকিত। আমরা দেরাজের পিছনে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি।

অবিনাশ আমার কানে কানে বল্লে—"বাইরে বেরিয়ে দেব নাকি ফাটিয়ে? তিনটে লোক বইতো নয়!"

আমি তার গা-টিপে তাকে চুপ করতে বল্লুম। পাহারাওয়ালাটা সিন্দুকটার দিকে আসছে—পিছন দিকে উঁকি মারলেই আমাদের দেখতে পাবে! সব গোলমাল হ'য়ে গেল! কিন্তু তৃতীয় লোকটা কে? তার কথা শুনে মনে হ'লো, সে যেন সন্ধান দিয়ে পাহারাওয়ালা দুটোকে ডেকে এনেছে। তবে কি আমরা এখানে ঢোকবার সময় কারো নজরে পড়ে গেছি?

"জুড়িদার! ইধর্ রি হ্যায় দো আদমী! এই! নিকল আও!—পাহারওয়ালা সাহেব উঁকি মেরেছেন!

আস্তে আস্তে বাইরে এলুম। অবিনাশও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সুবোধ ও সুশীল' বালকের মতন আমার পিছন পিছন বেরিয়ে এলো।

দ্বিতীয় পাহারাওয়াটা একটু দূরে ছিল। আমাকে দেখে বলে উঠলো—"আরে, এতো বাবু হ্যায়! আপলোগ এৎনা রাতমে হিঁয়া ক্যা করতে হো, জী?"

দরজার কাছে কোট-প্যান্টালুন পরা একটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। বুঝলুম informant (সংবাদ দাতা)। তিনি বলে উঠলেন—"অমন 'বাবুলোক' আমার ঢের দেখা আছে। রাত্তির বেলা, খালি বাড়ীতে অন্ধকার ঘরে কেন এসেছেন এরা—এ আবার জিজ্ঞাসা করে জানতে হ'বে নাকি? থানায় নিয়ে চল—সেখানে গিয়ে জবাব দেবেন এরা।"

দেখলুম অবিনাশের বুকখানা ফুলে উঠছে। চোখ টিপে দিলুম। বল্লুম—"সেই ভাল। চলো থানাকে—হুঁয়া যা'কে যো বোল্না ও বোলেগা।"

কোট-প্যান্টপরা ভদ্রলোকটী বলে উঠলেন—"আরে পাহারাওয়ালা সাহেব, আগে দেখ—বন্দুক-ছোরা-ছুরি কি আছে কাছে।"

পাহারাওয়ালারা তল্লাস করতেই আমাদের কাছ থেকে দু'টো রিভলভার পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল হারছড়াটা। বামালশুদ্ধ চোর গ্রেপ্তার করে' পাহারাওয়ালারা মহাখুসী। অবিনাশ বল্লে—"গেরো দেখ। এ যে নির্ঘাত প্যাঁচ!"

আমি কোন জবাব না দিয়ে বল্লুম—"হুঁ"।

আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত হ'তে লাগলো। একজন পাহারাওয়ালা বাড়ীতে পাহারায় রইলো। আর একজন আমাদের নিয়ে চল্লো। ভদ্রলোকটীকেও সঙ্গে নিয়ে চল্লো। তিনি প্রথমে রাজী হ'ন নি। পাহারাওয়ালার পীড়াপীড়িতে তাঁকে রাজী হ'তে হ'লো। কারণ, তাঁকে 'গাওয়া' (সাক্ষী) দিতে হ'বে। আমি পাহারাওয়ালাটীকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ইনি কে?"

পাহারাওয়ালা গম্ভীরভাবে বল্লে—"নগীজমে রহেনেওয়ালা হ্যায়। আওর কোন্? কুছ জরুরৎ হ্যায় জী মহারাজ?"

চারজনে বাড়ীর বাইরে এলুম। রাস্তা-দিয়ে একখানা ট্যাক্সী যাচ্ছিল। পাহারা-ওয়ালা ট্যাক্সীটাকে দাঁড় করিয়ে উঠে বসলো, আমরাও উঠলুম। পাহারাওয়ালার নির্দ্দেশমত ট্যাক্সী খানিক পরে বাঁদিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকলো। এই গলির মোড়েই থানা। কিছুদূর গিয়েই আমাদের গাড়ীখানাকে থামতে হ'লো—সামনে আর একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের ড্রাইভার সামনের গাড়ীর ড্রাইভারকে গাড়ী সরাতে বল্লে। সে কান-ই দেয় না কোন কথায়। পাহারাওয়ালা হেঁকে বল্লে—"এই! সড়ক্ ছোড়কে!" কে কার কথা শোনে! তখন পাহারাওয়ালা গাড়ী থেকে নেমে পড়লো। ড্রাইভারকে ডেকে বল্লে—"গাড়ী রাখকে হিঁয়া নিদ্ যাতে হো? চালাও; পিছুমে পুলিশকা গাড়ী হ্যায়।"

ড্রাইভার বলে উঠলো—"ওঃ! কসুর হো গিয়া। হমারা ফেয়ার (Fare) নগীজমে গিয়া; উস্‌লিয়ে মর থাড়ে হু।" সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলে।

কোটপ্যান্টপরা ভদ্রলোকটী বলে উঠলেন—"হু! পাহারওয়ালার একটী ধমকীতে কাজ হয়ে গেল। মনে করেছিলুম, এখন আর যাব না, দরকার হয় পরে যাব। তা আমার আর যাবার দরকার হবে না। কাজ তো হয়ে গেল। ড্রাইভার, এই ড্রাইভার

গাড়ী চালাও। হু—পাহারওয়ালার লাল পাগড়ী, বাবা! ঐ পাগড়ীর ভেতর বড় দামী জিনিস আছে—ভারী দামী ঐ পাগড়ী!"

এই সময় একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। সামনের গাড়ীর ড্রাইভার হঠাৎ পাহারওয়ালার মাথা থেকে পাগড়ী ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমাদের কোটপ্যান্টপরা ভদ্রলোকটী তড়াক করে' গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে—"চোর—চোর—ডাকাত—ডাকাত—খুন করলে—মেরে ফেল্লে" বলে চীৎকার করতে করতে ছুটলেন। চারিদিক থেকে লোক ছুটে এসে আমাদের গাড়ীর চারিপাশে বড় একটা ভীড় জমিয়ে তুল্লে। ভীড় হটিয়ে আমাদের গাড়ীর পথ খোলসা করতে বেশ কিছু সময় লাগলো। তখন সামনের গাড়ী তো অদৃশ্য হয়ে গেছেই, ভদ্রলোকটীরও কোন সন্ধান নেই।

অবিনাশ নামতে যাচ্ছিল; বাধা দিয়ে বল্লুম—"নিষ্প্রয়োজন, বন্ধু সে সরেছে।"

পাহারওয়ালা ভদ্রলোকটীর উদ্দেশ্য উৎকণ্ঠ গালি দিতে দিতে চল্লো, আমার কাছে হার পাওয়ার কথা পর্য্যন্ত! ইন্‌স্পেক্টর বল্লেন—"আপনারা এত রাত্তিরে ও বাড়ীতে কি করছিলেন? কে আপনারা?"

আমি আমার কার্ডখানা তাঁর হাতে দিলুম। ইন্‌স্পেক্টর আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"আপনিই হরেনবাবু প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ? আপনার নাম আমরা শুনেছি। আপনি কি এই 'ট্রেজ-মার্ডার' কেসের তদন্ত করছেন নাকি?"

আমি বল্লুম—"বড় interesting (কৌতুহলোদ্দীপক) কেস। তাই একটু দেখতে ইচ্ছা হলো। আপনাদের বিরক্ত না করে লুকিয়ে দেখতে গিয়ে এই গোলযোগ।"

ইন্‌স্পেক্টর—"মাফ করবেন—কিছু করবেন না—আপনার identification—"

আমি—"ও! নিশ্চয়! কিন্তু—তাইতো! বাড়ী না গেলে তো—"

অবিনাশ বাধা দিয়ে বলে উঠলো—"তা কেন? তোমার লাইসেন্সখানা তো আমার কাছে রয়েছে!"

তবে নাকি অবিনাশ শুধু ঘুষোবাজ! বলে উঠলুম—Thank you! তাওতো বটে!"

আমার identification হলো। ইন্‌স্পেক্টর বল্লেন—"তাইতো, বড় কষ্ট পেতে হয়েছে আপনাদের।" তারপর পাহারওয়ালাকে বল্লেন—"রিভলভার তো মিলা। তাহার কাঁহা?"

তখন পাহারওয়ালা রাস্তায় তার পাগড়ী-রাহাজানীর কথা বল্লে। পাগড়ীর মধ্যে সে হারছড়াটা রেখেছিল; পাগড়ীর সঙ্গে হারও গিয়েছে!

ইনস্পেক্টর শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন! পাহারওয়ালাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে আমাদের লক্ষ্য করে বল্লেন—"যাক্। আপনাদের আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি? তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো। হারছড়া আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?"

আমি—"ঘড়ির মধ্যে।"

ইন্‌স্পেক্টর একটু চিন্তা করে বল্লেন—"সেটা পাওয়া গেলে অনেক সুবিধা হতো এই কেসের পক্ষে। আচ্ছা, দেখা যাক্। আপনাদের আর কষ্ট দেব না। আপনারা যেতে পারেন।"

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা একখানা ট্যাক্সী ডাকলুম। ট্যাক্সীতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন পাহারাওয়ালা আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"আপ্ হরেন বাবু হ্যায়?"

আমি বল্লুম—"ক্যা জরুরৎ?"

পাহারাওয়ালা—"কোই বাঙ্গালীবাবু একঠো চিঠি দেকে বোলা—সিপাহীজীকো

গান

শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

শ্যামা মা তোর রাঙা পায়ে
নেগো আমায় তুলে,
দিবানিশি তোরই লাগি'
কাঁদছি মা মা ব'লে।
তুই যে বড় পাষাণী মা,
ছেলের দুঃখেও মন গলেনা,
ভুবন্-ভরা রূপ দেখিয়ে
রইলি মোরে ভুলে।
ছেড়েদে তোর হাতের অসি,
গলার মুণ্ডমালা,
অভয়-হাতে ধর মা বাঁশী,
পর মা কমল-মালা;
চরণ-কমল পূজবো বলে,
ভাস্‌ছি সদাই নয়ন জলে,
ঠাঁই দিস্ মা বারেক্ মোরে—
তোর ঐ চরণ তলে॥

সাবকো সাথ বাৎচিৎ করকে আপকো লউট্‌নেকো বখৎ এইঠো আপকো দেনা।"

আমি—"ও চিঠি কাঁহা?"

পাহারাওয়ালা আমাকে একখানা চিঠি দিলে তখনই সেটা খুলে পড়লুম। তাতে লেখা—"হরেনবাবু, নমস্কার। আমরাও ঘরটা সন্ধান করেছিলুম—হারটার সন্ধান করতে পারি নি। খুঁজে বার করে দেওয়ার দরুণ আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে আপনাকে একটু কষ্ট দিতে হ'লো, মাফ করবেন। আপনি শত্রু হ'লেও আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করে থাকি। তাই বলছি, সতীদেবীর মৃত্যুর জন্য আমরা মোটেই দায়ী নই। সে

আমাদের দলের একজন ছিল। এই হার-চুরির ভার তার উপরেই পড়েছিল। তার খুনের পর আমরা হারের সন্ধানে এখানে এসেছিলুম। আপনারা যখন বাড়ীতে ঢোকেন তখন আমরা আপনাদের উপর নজর রেখেছিলুম। কাজেই আপনারা যে সফলকাম হ'য়েছেন তাও আমরা জানতে পেরেছিলুম। অন্য উপায়ে নিতে পারা যেতো, কিন্তু তাতে গোলমালের সম্ভাবনা থাকায় এই নিরাপদ পন্থা অবলম্বন করেছি। এই হার আমরা ছয়মাস আমাদের কাছে রাখবো। তারপর সুইডেনে চালান করবো। পারেন তো উদ্ধার করবেন। ইতি— প্রেসিডেণ্ট—আই, পি, সি, এ।"

অবিনাশও আমার কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে চিঠিখানা পড়েছিল। বলে উঠলো—"বাহবা! Three cheers for—"

বাধা দিয়ে বল্লুম—"থাক্।"

(ক্রমশঃ)

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা পরিচালকমণ্ডলীর বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনী

বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিন কমিটির বার্ষিক প্রীতি-সম্মিলনী গত রবিবার সায়াহ্নে এলবার্ট হলে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন ও ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনকে সম্মানিত অতিথির আসন দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মিলনী উদ্বোধন করিয়া সভাপতি মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন এবং তৎকালীন বাঙ্গলার আদর্শ ও কৃষ্টির অনুসরণ করিতে ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন।

ডাঃ সেন তাঁহার বক্তৃতায় অধ্যাপক ও সাংবাদিকদিগের কার্য্যের তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং বলেন কাহারও কাহারও মতে অধ্যাপকগণ গভীরভাবে উভয় দিক বিবেচনা করিবার মত প্রকাশ করেন; কিন্তু সাংবাদিকগণের চিন্তাধারা ভাসা ভাসা। আসল কথা এই যে অধ্যাপকগণ একথা বলিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন যে, উভয় পক্ষেই বলিবার অনেক কিছু আছে। পক্ষান্তরে সাংবাদিকগণকে একটা দৃঢ় মত প্রকাশ করিতে হয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছাত্রদিগকে স্কুল বা কলেজ শিক্ষার বহির্ভূত অনেক কাজ করিতে হয়। উহা দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য সূচিত হয়। কলেজ ম্যাগাজিনের পরিচালনা দ্বারা ছাত্রেরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে ও চরিত্রগঠন করিতে শিখে। তাহারা দেশ সেবা, জাতীয় ধন ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং দেশের সমস্যা সম্বন্ধে ম্যাগাজিনে মতামত প্রকাশ করিতে পারে। "উভয় পক্ষেই অনেক কিছু বলিবার আছে" অধ্যাপকদিগের এইরূপ নিরপেক্ষ তরল মত ম্যাগাজিন পরিচালনায় ছাত্রদিগকে বিশেষ সাহায্য করে না। শব্দমাত্র সার রচনায় কোন সার্থকতা নাই। ভাবের সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃষ্টির পরিসর রোধ করিবার অথবা ষ্টেটের হুকুম মাফিক তাহাকে চালিত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তাধারা বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চাপে লোপ পাইয়াছে। দি কাষ্টমস এ্যাক্টের ফলে বিদেশের অনেক বই এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুর "ভারতের সংগ্রাম" নামক বই পর্য্যন্ত এদেশে আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদ দমন আইনের ফলে যাহারা নিষিদ্ধ পুস্তক ঘরে রাখিবে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এইরূপ আবহাওয়ার মধ্যে সংবাদপত্রের প্রচার অসম্ভব।

সভাপতি শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, এই কলেজ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ছিলেন, স্বনামধন্য এবং স্বাধীনচেতা পুরুষ, কখনও কাহারও নিকট তিনি মস্তক নীচু করেন নাই। অতঃপর তিনি বলেন যে, লর্ড ডাফরিণ যে সময়ে ভারতের বড়লাট ছিলেন সেই সময় "ইণ্ডিয়ান মিরর" কাগজের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে একদিন আহ্বান করেন। তাঁহাকে দেখিয়া লর্ড ডাফরিণ বলেন যে "আপনি সেই নরেনবাবু যিনি আমাকে প্রত্যহ গালি দেন।" তখন নরেন্দ্রনাথ সেন উত্তর দেন "আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন আমি আপনার অতিথি এবং আপনার ঘরের ভিতরেই আছি,—I am under your roof"। লর্ড ডাফরিণ তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কোন এক ভদ্রলোককে বিলাতী পোষাক পরিহিত হইয়া উপস্থিত হইলে ফিরিঙ্গী বলিয়া হাস্যাস্পদ হন। তাহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে "এরা কেনই বা যায় আর কেনই বা গালাগালি খায়।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার চটি এবং চাদরের সম্মান সর্ব্বত্র পাইয়াছেন। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; তাঁহার "প্রথম ভাগ" এবং "দ্বিতীয় ভাগ" না পড়িলে অনেকের শিক্ষালাভই হইত না, এবং তাঁহার উপক্রমণিকা না পড়িলে সংস্কৃত শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। বহু পরিশ্রমে যে প্রতিষ্ঠান তিনি গড়িয়াছিলেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজি চূড়ান্তরূপে বিরাজ পাইতেছে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন তাঁহারা যেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

অতঃপর বক্তা বলেন—খবরের কাগজের সম্পাদন করা কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজ, আজ আমার বহুদিনের পূর্ব্বের একটি কথা মনে পড়িতেছে, অধ্যক্ষ পার্সিভ্যাল আমাকে দেখিয়া একদিন বলেন যে হেমেন্দ্রপ্রসাদ, আমার আজ আনন্দ এই যে, আমার ছাত্রগণের একজন সাংবাদিক হইয়াছেন।

সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের জেলের যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ম্যাগাজিনের সম্পাদকদিগের সে ভয় নাই, সুতরাং তাঁহারা ভালভাবেই সাময়িক পত্র চালনা করিতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, যা লিখিবে তাহা পূর্ব্বে চিন্তা করিবে এবং লিখিয়া পরে পড়িয়া দেখিবে। ছাত্রদিগকে আমিও সেই উপদেশ দিই। তাঁহারা যেন নিজেদের ভিতর আলোচনা করেন, প্রয়োজনমত অধ্যাপকদিগের সহিত পরামর্শ করেন। তাহার পরে পাকা লেখক বলিয়া ভবিষ্যতে খ্যাতি লাভ করিবেন। প্রথম যদি মনে করেন পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিব, তাহা হইলে কিছুই হইবে না।

অতঃপর শ্রীবিমল কর এবং পরিমল সরকার সঙ্গীত করেন এবং শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য নানা প্রকার শব্দানুকরণ দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করেন। অবশেষে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমাগত অতিথিগণকে জলযোগের দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন।

ডাঃ বি সি ঘোষ, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত বঙ্কিম সেন, মিঃ শ্যামাচরণ মুখার্জ্জি, মিঃ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জীতেশচন্দ্র গুহ, অধ্যাপক প্রভাস চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক এস এন চ্যাটার্জ্জি, অধ্যাপক পি সি ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপক অমূল্য রাইকত, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, অধ্যাপক দুর্গেশ্বর চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক বি গোস্বামী, অধ্যাপক পি বি সরকার, অধ্যাপক সুধাংশু বসু, অধ্যাপক এস পালিত, শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুত অবনী বসু, শ্রীযুত অক্ষয় সরকার, শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ রায়, মিঃ এইচ দে, মিঃ সি এল দত্ত, পণ্ডিত কবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য

মুসোলিনী কি এ যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক?

রোম-বার্লিন এ্যাক্সিসের তাৎপর্য্য কি? হিটলারের ভাগ্যে জুটবে কতটা?

সচী শীল

এই প্রবন্ধের headingএ যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে তারই উত্তর দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মুসোলিনী যে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ diplomatic genius, এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য। মুসোলিনীর career of triumphs এ যুগের সত্যিই একটা বিস্ময়ের জিনিষ। যদি বলা যায় যে গোটাকতক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মুসোলিনীর অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা আজ সম্ভব হয়েছে, তাতে হয়ত সত্যের অপলাপ হবে না, কিন্তু যে বিস্ময়ের কথা বলেছি সে বিস্ময়ও কমবে না।

মুসোলিনীর প্রথম জয়—এ্যাবিসিনিয়া; দ্বিতীয় জয়—Withdrawal of sanctions; তৃতীয়—স্পেনে foot hold পাওয়া; এবং চতুর্থ ও সবের সেরাজিত—Anglo-Italian Pact. আমি অবশ্য গত তিন বছরের কথাই বলছি। এই তিন বছরের মধ্যেই লোকটা যে কোথা থেকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে—তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মুসোলিনী একজন মস্ত বড় dreamer তার চেয়েও বড় as a man of action; তার চেয়েও বড় হচ্চে তাঁর Dynamism. যদি কেউ জায়গা বিশেষে তাকে pin down করে বলে—এইখানে মুসোলিনী, তার পরেই দেখা যাবে তিনি আর সেখানে নেই। স্বয়ং মুসোলিনীকে যদি একটা particular moment এ জিজ্ঞাসা করা যায়—"আপনি এখন ঠিক কোনখানে?", তবে সে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিতে পারবেন না। ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক! কেন? এর উত্তর হচ্চে—তিনি নিজেই একটা বিরাট রহস্য।

এককালে তিনি ছিলেন ইটালীর একজন সমাজতন্ত্রী নেতা। ইতিহাসের চঞ্চল ধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে এবং নিজের সঙ্গে ইতিহাসকে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে তিনি ১৯২২ সালে হয়ে দাঁড়ালেন ইটালীর সর্ব্বময় প্রভু।

আজকে তিনি মস্কোকে উদ্দেশ করে হুমকি দিয়ে বলছেন—কম্যুনিজম্‌কে বরদাস্ত করবো না। স্পেনের ব্যাপারে বলছেন—Gen. Franco must win. অথচ মাত্র

পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩৩ সালে রাশিয়ার সঙ্গে ইটালীর একটা Pact of friendship রচিত হওয়ার পর তিনিই তাঁ'র নিজের কাগজে লিখেছিলেন: "This Treaty is one of the events which are bringing forth a new future. The two great revolutions, the Fascist and the Bolshevist, meet and join hands for the purpose of understanding each other, of working together and of bringing the other nations to their side The two new Governments, placed between the past and the future, will settle probably, in agreement, the new aims of mankind."

অর্থাৎ সেদিনও তাঁ'র স্বপ্ন ছিল ফ্যাসিজম ও কম্যুনিজম দুজনে মিলে মিশে জগতটাকে ভাগ করে নেবে। পাঁচ বছর আগেও তাঁর বিশ্বাস ছিল এবং হয়ত খুব আশাও ছিল: Fascism and Communism will not collide but coalesce in their proselytising activities.

এই সেদিন পর্যন্ত ইংরেজের সঙ্গে মুসোলিনীর কি শত্রুতা! Bari Radio Station থেকে Near East-এ ইংরেজের বিরুদ্ধে সে কী প্রোপাগাণ্ডা! এ্যাবিসিনিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন সুয়েজখাল বন্ধ করবে কথা উঠেছিল, তখন Signor Gayda হুমকি দিয়ে বলেছিলেন—"Any such attempt will be repulsed.

Anglo-Italian Pact হয়ে যাবার পরও মুসোলিনীর আদেশ অনুযায়ী বৃটিশ জাহাজের ওপর বোমার পর বোমা পড়েছে, যাতে চেম্বারলেন সাহেব তড়কে গিয়ে Franco সাহেবকে খুব তাড়াতাড়ি জেতাবার ব্যবস্থা করেন! কারণ যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেলে ত আর ও সব বালাই থাকবে না।

সেদিন তিনি হিটলারকে রোমেতে রাজোচিত সম্মান দেখাবার জন্তে কি টাকাই না খরচ করলেন! অথচ হিটলারের সঙ্গে বন্ধুত্ব জলাঞ্জলী দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী হবে না, যখন প্রয়োজন হবে। আজকে হিটলার-মুসোলিনী-প্রীতি বা তার অভিনয় কালকে খোলাখুলি দ্বন্দ্বে গিয়ে দাঁড়াবে। ধূমকেতুর মত ছুটে বেড়াচ্ছে এই লোকটা। বিশ্রাম নেই; শিথিলতা নেই, বিবেকের তাড়না নেই, অতীতের জন্ম অনুতাপ নেই। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তটাই তার কাছে সত্য, কিন্তু একবার চলে গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস কিছুই নেই।

Mr. Richard Child, ex-American Ambassador in Rome, এই মুসোলিনীর সম্বন্ধে বলছেন: "I imagine as he reaches forth to touch reality in himself, he finds that he himself has gone a little forward, isolated, determined, illusive, untouchable, just out of reach—onward!"

এই যে আজকের রোম-বার্লিন এ্যাক্সিস্—এ কার তৈরী? মুসোলিনী এ্যাবিসিনিয়া জয় করবার সময়ই বুঝেছিলেন—এই রকম কিছু একটার বিশেষ দরকার। Discontented Germanyকে হাতে রেখে কাজ উদ্ধার করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকের বিশ্বাস—মুসোলিনীর ইচ্ছা হচ্ছে Fascist Internationalকে জয়যুক্ত করা, অর্থাৎ Rome-Berlin axisই হবে তার Nucleus. কিন্তু এ মস্ত বড় ভুল ধারণা। Rome-Berlin axis-এর জীবন আর কতদিন? Instrument of Blackmail হিসেবে মুসোলিনীকে অনেক কাজ দিয়েছে এই axis. জার্ম্মানীকে কি দিয়েছে? ধরতে গেলে এমন কিছুই নয়। অষ্ট্রিয়ার ব্যাপারে axis কাজ করে নি। করেছে মুসোলিনীর রাজনৈতিক চাল। মুসোলিনী এমনভাব দেখিয়েছিলেন যেন তিনি নিজেই অষ্ট্রিয়াকে হিটলারের হাতে তুলে দিচ্ছেন। আভাসে-ইঙ্গিতে তিনি হিটলারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন —"অষ্ট্রিয়া নিচ্ছ, কিন্তু মনে রেখো এ শুধু আমারই জন্তে পেলে।" হিটলার উত্তরে বলেছিলেন—"অবশ্যই, সে কথা কি আমি ভুলতে পারি।" অষ্ট্রীয়া ছাড়া হিটলার আর কি পেয়েছে? কলোনী কি হল? জার্ম্মানীর কলোনী ফেরতের ব্যবস্থা এখনও মুসোলিনী কিছুই করেন নি! গত সেপ্টেম্বর মাসে এ নিয়ে একটু গলাবাজী রোমে হয়েছিল, তবে সেটা মুসোলিনীর নিজের সুবিধের জন্তে।

৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মুসোলিনীর Mouthpiece—Sig. Gayda জার্ম্মানীর colonial claim support করে বলেছিলেন: "The problem is one of European justice and equilibrium. Italian nationals, just emerged from a European political conflict aroused by the claim to the same right, can therefore understand Germany's needs. Europe must expect a deliberate movement in Germany for a revision of the colonial status quo created by the Treaty of Versailles."

হঠাৎ এই সব চমক লাগান কথা শুনে ত ইউরোপের রাজধানীগুলোতে বেশ হৈ-চৈ পড়ে গেল। মুসোলিনী কি তাহলে হিটলারকে একান্তই তার ঈপ্সিত পাইয়ে দিতে উদ্যত?

কিন্তু যাদের আসল চোখ আছে, তাদের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। মুসোলিনীর এই Epic avowal of friendship-এর পেছনে আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? কলোনী না পেয়ে জার্ম্মানী মরে যাচ্ছে—তাতে মুসোলিনীর কি?

প্রায় ঐ সময়টাতেই ইংরেজ চেষ্টা করছিল জার্ম্মানীকে পূর্ব্ব ইউরোপে free-hand দিয়ে অন্ততঃ কিছু বছরের জন্য হিটলারকে থামিয়ে রাখে; এবং এর সঙ্গে আরও একটা মতলব ছিল এই যে, হিটলারকে এইভাবে সন্তুষ্ট করে মুসোলিনীকে diplomatically isolate করতে হবে যাতে Mediterraneanএ মুসোলিনী বেশী বাড়াবাড়ি না করে। জার্ম্মানীর সঙ্গে আঁতাত করে মুসোলিনীকে জব্দ করাই ছিল ইংরেজের মতলব। তাই মুসোলিনী কলোনীর দিকে হিটলারের মনকে টেনে রেখে বৃটিশ-জার্ম্মাণ শত্রুতাকে জাগিয়ে রাখবার মতলব করেছিলেন এই declaration-এর ভেতর দিয়ে। চতুরতায় কি মুসোলিনীর জুড়ি আছে না কি? হিটলার বা চেম্বারলেন সাহেব ত ওর কাছে ছেলেমানুষ।

শান্তি বলে জিনিষটার যদি দরকার কারও থাকে ত মুসোলিনীর। মুসোলিনী আসলে যুদ্ধ চান না—এ কথাটা হয়ত অনেকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেবে—কিন্তু তা হলেও আমি বলছি এ কথাটা সত্যি। শান্তির পথ ধরে এখন মুসোলিনীর subtle political manoeuvres চলতে থাকবে—এ কথার সত্যতা আর কিছুদিনের মধ্যেই বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এখন মুসোলিনীর চারদিক দিয়ে খুব সুবিধে। ইংরেজ যে মনে করেছিল মধ্য ইউরোপে হিটলারকে freehand দিয়ে Rome-Berlin axis-কে আলগা করে দেবে, সে আর হবার জো নেই। Franco-Czecho-Soviet axisএ পথে মস্ত বড় বাধা। কাজেই হিটলারকে হয়ত আবার কিছুদিন বাদেই Colonial cry তুলতে হবে। তুললেই মুসোলিনীর সুবিধে হল—ইংরেজ-জার্ম্মাণ বিরোধ বেশ চমৎকার বজায় রইল। অতএব কোন না কোন অজুহাতে কলোনী ক্ষেত্রের ব্যাপারে হিটলারকে সাহায্য করবার ভয় দেখালেই ইংরেজ মুসোলিনীকে তোয়াজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে মুসোলিনী পাবে—Concession after concession. এই Process-এ মুসোলিনীর শক্তি ও গৌরব বেড়েই চলবে। অপরপক্ষে ইংরেজের Imperial Might ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকবে। হিটলারের হয়ে যুদ্ধ করতে গেলে ঠকতে হবে—এ কথা চতুর মুসোলিনী খুব ভালরকমই বোঝেন। আর হিটলারের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করতে হয়? করতে হয়ত হতে পারে, কিম্বা করবার ভয় দেখানোর occasion হয়ত আসতে পারে, কিন্তু তা এখন এলে চলবে না। এখানে আবার মুসোলিনীর বেশ একটু ভয়ের কারণ রয়েছে। তাই যেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে হিলটারকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দিয়েছিলেন মুসোলিনী—হাঁ, বন্ধুহিসাবে উপদেশের কথাই বলছি, তবে তার পেছনে সূক্ষ্ম implied threat যে ছিল না তা নয়। London-Paris-Rome axisএর যেই মুসোলিনী dominant element হয়ে পড়বেন, তখনি Rome-Berlin axis-কে তিনি জলে ফেলে দিতে দ্বিধা করবেন না। হিটলারকে যদি তিনি ততদিন পর্য্যন্ত নিজের উপদেশমত চালাতে পারেন তবে তারপর যদি হিটলার বাড়াবাড়ি করেন তখন মুসোলিনী নির্ভয়ে চোখ রাঙাতে পারবেন হিটলারকে। তখন London-Paris-Rome axis হবে Bulwark against German agression. আর ইটালী হবে সেই axis-এর সবচেয়ে বড় power.

হিটলারের ভবিষ্যৎ আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি সেটার সবটাই অন্ধকার। এখনই যদি যুদ্ধ বাধে ত London-Paris-Moscow alliance ফ্যাসিজমকে নষ্ট করে দেবে। পরে যদি বাধে ত' হিটলার নষ্ট হয়ে যাবে আর মুসোলিনী Summit-এ উঠে বসবেন। স্পেনের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে—অর্থাৎ Franco সাহেব জিতলে মুসোলিনীর Strategic advantage এত বেশী বেড়ে যাবে যে তার ফলে Franco Soviet Pact ভেঙ্গে যাবে। অর্থাৎ মুসোলিনীর ascendency-কে বাধা দেবার কেউ থাকবে না। আর যেকোশ্লোভাকিয়া-কে আশ্রয় করে যদি এখনি যুদ্ধ বাধে ত স্পেনের গণতন্ত্র বাচবে, হিটলার-মুসোলিনী নষ্ট হয়ে যাবে। এর বেশী আর বলতে পারা যায় না।

দেবদত্ত ফিল্মসের মহিমান্বিত চিত্রকাব্য—"গোরা"-র
একটি বিশিষ্ট দৃশ্যে রাণীবালা, জীবন গাঙ্গুলী, মনোরমা
মোহন ঘোষাল, মঞ্জু দাস ও প্রতিমা দাশগুপ্তা। ছবিখানি
পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র। আগামী ৩০শে
জুলাই শনিবার এই চিত্রখানি 'চিত্রা'-য় মুক্তিলাভ করিবে

পরিচালক
টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ | টেলিফোন সাউথ ৪৬৬
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

অষ্টম বর্ষ, ঊনত্রিংশৎ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই শ্রাবণ ১৩৪৫, ২১শে জুলাই ১৯৩৮

ওয়ার্দ্ধায়

এই সপ্তাহের শেষে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় স্পষ্ট ও তেজোদ্দীপক উক্তি বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। তৎব্যতীত মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসঙ্কট অন্যতম কার্য্যসূচী।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রপতির উক্তি বল্লভভাই-বুলাভাই-রাজাজী-সংসদের মনঃপূত হয় নাই। এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে বুলাভাই সাহেব পর্য্যটকের বেশে বিলাতে যাইয়া তলে তলে একটা রফা করার মানসে গুপ্ত বৈঠকে যে মনোভাব অতর্কিতে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসু-প্রচেষ্টায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের যাঁহারা রজ্জু-ধারক তাঁহাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করায় পণ্ডিত জহরলাল বিদেশে পাড়ি দিয়াছেন। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের ইঙ্গিতে নিখিল ভারত কংগ্রেসের এলাহাবাদ দপ্তরে বামপন্থী-বিতাড়ন পণ্ডিতজী অশেষ চেষ্টা করিয়াও রোধ করিতে পারেন নাই। সুতরাং রাষ্ট্রপতির এই আকস্মিক উক্তিতে বল্লভভাই প্রমুখ দক্ষিণপন্থী যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীত্ব-প্রয়াসী নেতৃবর্গ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তবে বল্লভভাই চতুর ব্যক্তি—মেঘের অন্তরাল হইতেই যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে তিনিও তদ্রূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভ্রাতার উইল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রায় লক্ষাধিক টাকা জমে এই আশঙ্কায় তিনি এটর্ণি মানাভাতি এণ্ড কোং, এড্‌ভোকেট জেনারেল স্যার চিমললাল শিতলবাদ ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে খাড়া করিয়া আইনের ফাঁকে বিঠলভাই প্যাটেলের শেষ ইচ্ছাকেও নাকচ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অপর পক্ষে বল্লভভাই মাদ্রাজের বাক্যবীর মিঃ সত্যমূর্ত্তিকে শিখণ্ডী খাড়া করিয়া রাষ্ট্রপতির যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় উক্তির বিরুদ্ধে অশোভন ও শিষ্টতা-বর্জ্জিত বিবৃতি প্রকাশ করাইয়াছেন। মদ্রবাসী সত্যমূর্ত্তির বিবৃতি বোম্বাই হইতে প্রচারিত হইয়াছে—ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মহলের কথোপকথনে প্রকাশ যে ওয়ার্দ্ধার অধিবেশনে রাষ্ট্রপতিকে বিব্রত করিবার ষড়যন্ত্রে বল্লভভাই ইতিমধ্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের গিল্টিকরা কাঠামোর তদ্বিরী-রত সত্যমূর্ত্তির মতামতের যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে একেবারেই কোন মূল্য নাই তাহা এমন কি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে"র Political Notesএর লেখকও গত রবিবারের সংখ্যায় স্বীকার করিয়াছেন। মিঃ নারিম্যান, মিঃ মাসানি প্রভৃতি বল্লভভাই-বন্ধন-মুক্ত নেতৃবর্গ রাষ্ট্রপতির উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। সাগরপারে পণ্ডিত জহরলাল স্বীয় মত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপতির উক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন। রাজনৈতিক তপ্ত হাওয়ার গতি কোন দিকে ওয়ার্দ্ধাই তাহার ইঙ্গিত দিবে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসঙ্কটের অন্তরালেও বল্লভভাইয়ের চক্রান্ত ইন্ধন যোগাইতেছে। বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি, জি, খেরের ন্যায় মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারে বল্লভভাইয়ের খেয়াল-খুসির ক্রীড়নক হইতে নারাজ। সেইজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে

অন্যান্য মন্ত্রীদের প্ররোচিত করার স্পষ্ট ইঙ্গিত অনেকদিন হইতেই প্রচারিত হইতেছে। পাঁচমারিতে যে রফার খসড়া হইয়াছিল তাহাও টিকিল না। দুইজন মন্ত্রী পদত্যাগ ঘোষণা করিয়া পুণরায় পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। ওয়ার্দ্ধায় নাকি ইহার শেষ মিমাংসা হইবে। হয় ডাঃ খারেকে পদত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে নচেৎ তাঁহাকে কর্ম্মবিহীন জগন্নাথরূপে মন্ত্রীমণ্ডলে বিরাজ করিতে হইবে।

কংগ্রেস রাজ্যগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলের উপর বল্লভভাইয়ের এই প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টার মূলে আছে আসন্ন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভের আকাঙ্খা। বল্লভভাই ও বুলাভাই—এই দুই "ভাই" মিলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীমণ্ডল দখল করিবেন—একজন প্রধান মন্ত্রী অপরে অর্থসচীব ও স্বরাষ্ট্র-সচীব। সেই অনাগত মন্ত্রীত্ব-মসনদের লোভনীয় আকর্ষণ বল্লভভাই ও বুলা-ভাইকে রাজনীতিক যমজ ভ্রাতায় পরিণত করিয়াছে এবং তাঁহাদেরই গোপন ইঙ্গিতে বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নীতি পরিচালিত হইতেছে ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও খর্ব্বতার সামঞ্জস্য হইতেছে। তাঁহারাই বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসের দুই শক্তিধর পুরুষ।

রন্ধ্রপথে

সহযোগী "আনন্দবাজার পত্রিকা" সংবাদ দিয়াছেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুকূলে পদত্যাগ করিয়াছেন। সহযোগীর প্রকাশিত সংবাদের এই অংশটুকু সত্য তবে সহযোগী যে লিখিয়াছেন যে "রাষ্ট্রপতির নির্দ্দেশে" কুমুদবাবু পদত্যাগ করিয়া-ছেন তাহা আমাদের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির মতে সত্য নহে।

ডাঃ কুমুদশঙ্কর স্বেচ্ছায় শিলংয়ের লতা-কুঞ্জে বিশ্রাম-রত বিধানবাবুর নিকট পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন এবং বর্ত্তমানে সেই পদত্যাগ পত্রসহ বিধানবাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিধানবাবু নাকি আব্দার ধরিয়াছেন যে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসেম্বিয়ন বা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট মনোনয়নের জন্য আবেদন করিবেন না তবে যদি মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েন প্রস্তাব করিয়া স্বয়ং রাষ্ট্রপতির মারফতে অনুরোধ জানান তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া অল্ডারম্যান পদে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। বিধানবাবুর এই আব্দার শিষ্টতা ও ধৃষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সময় বিশেষে পলায়ন করিয়া বিধানবাবু বহুবার সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাঁহার বৈরাগ্য এতই প্রবল হয় যে তিনি রাজনীতি হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আত্মগোপন করেন। তবে তাঁহার এই বৈরাগ্য কখনই চিরস্থায়ী হয় না—কিছু দিন পরেই আবার তিনি উসখুস্ করিতে আরম্ভ করেন। আর যতদিন আত্মগোপন করিয়া থাকেন ততদিনও অন্তরাল হইতে সমস্ত ষড়যন্ত্রের ইন্ধন যোগান। রায়-রুণী-প্যাক্টের প্রবর্ত্তক কি রাষ্ট্রপতি বা শরৎচন্দ্রের নিকট কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন? তৎপূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি বা শরৎচন্দ্র বিধানবাবুকে অল্ডারম্যানের জন্য সমর্থন করিলে প্রকারান্তরে কংগ্রেস-দ্রোহিতারই প্রশ্রয় দিবেন এবং কুমুদবাবুর পদত্যাগের রন্ধ্রপথে যে শনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করিবে তা কংগ্রেস মিউনিসি-প্যাল এ্যাসোসিয়েনে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিবে।

শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার পদত্যাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার যে উপ-নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহাতে বিধানবাবুকে মনোনীত করিবার জন্য কিরণবাবু প্রভৃতি বিধান-পন্থীরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু দৃঢ়তার সহিত বিধান-পন্থীদের আব্দার উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রীযুক্ত ঈশ্বর দাস জালানকে মনোনীত করেন। তাহাতে বিধান-শিষ্য-পরিচালিত সহযোগী "যুগান্তরের" আক্ষেপ ও ক্ষোভ-মিশ্রিত প্রলাপ উপভোগ্য হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার যদি এত বাসনাই থাকে ত' বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় বিধানবাবু আকস্মিকভাবে শরৎচন্দ্রের বিনা অনুমতিতে ২৪ পরগণার কেন্দ্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেনই বা কেন আর হরেনবাবুকে সমর্থন করিবার জন্য আবেদন করিলেন কেন? কোন পদগৌরবে তিনি সে আবেদন করিবার অধিকারী? অনুরূপ অপরাধে যদি বোম্বাইয়ের মিঃ নারিম্যানের শাস্তি হয় ত' বিধানবাবু তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইলেন কেন? নলিনীবাবু যাহা প্রকাশ্যে করেন বিধানবাবু লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহাই করেন। এক হিসাবে নলিনীবাবু অপেক্ষা বিধানবাবুর কংগ্রেস-দ্রোহিতা অধিকতর ক্ষতিকর। তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগও করিবেন না অধিকন্তু বাংলার কংগ্রেসের যত কংগ্রেসদ্রোহিতা ও বিশৃঙ্খলতার মূলে তাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলী-সঙ্কেত বিদ্যমান রহিবে। কুমুদবাবুর পদত্যাগপত্র পকেটে করিয়া বিধানবাবু সারা কলিকাতাময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং লোক-পরম্পরায় প্রচার করাইতেছেন: "রাষ্ট্রপতি বা শরৎচন্দ্র একবার বলিলেই যাই।" শাসন-বিদ্ধ এক নির্ভীক যুবক বিধানবাবুর এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিতেছে: "আর একবার বলিলেই যাইব।"

সাহিত্যের কষ্টিপাথর

অশনি

শনির কবলে রোহিণী

যে আসরে শ-কার ব-কার ও ম-কার চলে, সে আসর ভদ্রলোকের পক্ষে শুক্কার-জনক। সম্প্রতি শনির আসরে শ-কার, ব-কার ও ম-কারের উৎপাত ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। এখানকার ইয়ারেরা সাহিত্যিক সাজিবার প্রচেষ্টায় যে সকল ইতরতা ও বেয়াদপির পরিচয় দিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক বা না হউক, প্রচুর হাস্য ও বীভৎস-রসের যে সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

* * *

শ-কার সাহিত্যের আঁস্তাকুড় ঘাটিয়া "মণিমুক্তা" সংগ্রহ করিতে করিতে হঠাৎ সম্পাদক বনিয়া গিয়াছেন। প্রিণ্টারি করিয়া ইঁহার অন্ন যুটিত, কিন্তু অন্নদাতাকে গালি-দিবার সৎসাহসের ইঁহার কখনও অভাব হয় নাই। কেমন করিয়া জানি না, সম্প্রতি, ইনি প্রেসের অধিকারী, পরিষদের প্রসাদ-ভাজী এবং বাজারে সাহিত্যের অধিবেশনের ঘাড়াটিয়া সভাপতি। সম্বল কিন্তু সেই সনাতন "মণিমুক্তা।" মুসার ঢেকুর যখন তখন তুলিয়া থাকেন। নকল বঙ্কিমপন্থী বটে, আসলে কিন্তু শ-কার ও ম-কার ইঁহারা উভয়েই "অগ্রগতি-"র প্রেম-সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহেন।

* * *

ব-কারের পেটে বোমা মারিলে ক-অক্ষর বাহির হয় না। ইঁহার পুঁজি কেবল তারিখ। নিজের জন্ম-তারিখের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ইনি অবশ্যই নিঃসন্দেহ নহেন, অথচ বঙ্কিমের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে একেবারে "অথরিটি"! ভুল হইলে পরের দেখিয়া শুদ্ধিপত্রদ্বারা ভ্রমসংশোধন করা ইঁহার scientific পদ্ধতি। প্রথম জীবনে সরকার মহাশয়ের তল্পিদারী করিয়া ঐতিহাসিক হইবার সাধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। কাজেই এখন ইনি হতাশ ঐতিহাসিক। অনধিকার-চর্চ্চায় ইঁহার প্রবল অনুরাগ। নাট্যশালার গবেষণা করিতে গিয়া ট্র্যাজিডিকে অপেরা এবং অপেরাকে ট্র্যাজিডি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাজেই কথায় কথায় শ-কার ব-কারের তারিফ করেন এবং ব-কারও শ-কারের বাহবা দেন। নহিলে যে উপায় নাই!

* * *

ম-কার একেবারে মূর্ত্তিমান্ গুরুচণ্ডাল—কি ভাবে, কি ভাষায়। ইনি শ-কারের গুরুস্থানীয়, কাজেই ব-কারেরও। ম-কারকে এককথায় "Inconsistency is thy name" বলিলেই ঠিক আখ্যা দেওয়া হয়। ইঁহার লিখিত প্রবন্ধ পড়িলেই পাঠক সে কথা বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে পাটনা প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন ইঁহাকে ঠিক চিনিয়াছিল। নিজের বিয়ের কবিতা নিজে লিখিয়া ইনি কবিপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—অবশ্য তাহা এখন বিস্মরণীয় কোঠায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। ম-কার ঢাকাই মাষ্টার—কাজেই একটু discount দিতেই হইবে!

* *

এ হেন শ-কার, ব-কার ও মকারের হাতে বঙ্কিম-সাহিত্য যে নাস্তানাবুদ হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? শনির বঙ্কিম-সংখ্যায় ইঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় উৎকটাকারে প্রকট হইয়াছে। সে পরিচয় প্রয়োজন হইলে পরে দেওয়া যাইবে। এই বিদ্যাবুদ্ধি লইয়া আবার ইঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদন করিতেছেন! আশঙ্কার কারণ যে যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহা আর বলিতে হইবে কি? বঙ্কিম-প্রীতি ইঁহাদের হাড়ে-মাসে নাই। বঙ্কিম-কে অবলম্বন করিয়া অর্থ ও যশ অর্জ্জন করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। "শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন—শ্রীচরণকমলেষু। আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু—আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন"—ইহাই ইঁহাদের পলিটিক্স্! কমলাকান্তের বাহাদুরি আছে বৈ কি!

কিন্তু মশা মারিতে আমরা কামান দাগিব না। ইঁহাদের গুরুর গুরু "রোহিণী" নামক প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্কিম-সংখ্যায় যে পাণ্ডিত্য ও সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহার সম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। ইনিও ঢাকাই অধ্যাপক—একেবারে প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ! ইঁহার লেখায় অবশ্য প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের পরিচয় যথেষ্ট আছে। গুরুর পরিচয় পাইলেই পাঠক নিশ্চয়ই শিষ্যদের পরিচয় পাইতে উৎকণ্ঠিত হইবেন না—কারণ গুরুর অপেক্ষা শিষ্য-বিদ্যা যে গরীয়সী তাহা ত প্রবাদবাক্যই হইয়া আছে!

কুক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী ঠাকুরাণীকে অসামান্য রমণী-রূপলাবণ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। কুক্ষণে রোহিণী সুন্দরী সরোবর-পথ আলো করিয়া জল লইতে গিয়াছিল। কুক্ষণে বকুলের ডালে বসিয়া সেই সময়ে বসন্তের কোকিল "কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ" রবে ডাকিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"রোহিণী চারিদিক চাহিয়া দেখিল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রোহিণীর সেই ঊর্দ্ধবিক্ষিপ্ত স্পন্দিত বিলোল কটাক্ষ ডালে বসিয়া যদি সে কোকিল

দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই—ক্ষুদ্র পাখী-জাতি—তখনই সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি-পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া ঝুপ করিয়া পড়িয়া যাইত।" কিন্তু ক্ষুদ্র পক্ষিজাতি যাহা দেখে নাই, রক্তমাংসের পূজারী পণ্ডিতেরা তাহা অবশ্যই চুরি করিয়া দেখিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রূপ দেখিবার মত চক্ষু তাঁহাদের ছিল না। তাই তাঁহারা রোহিণীর কটাক্ষ-শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি-পালটি খাইয়া, পা গোটো করিয়া ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেলেন এবং পড়িয়া গিয়া অত্যন্ত আফশোষের সহিত লিখিতে লাগিলেন :—

(১) "রোহিণীর বিনাশ ঘৃণ্য ও ভয়াবহ।"

(২) বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে "নিষ্ঠুরভাবে হত্যার হস্তে সমর্পণ" করিয়াছেন।

(৩) "রোহিণীর দুর্ভাগ্যকে কেবল পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত হইবে না। তাহা যদি হয় তবে নিষ্পাপ ভ্রমরও কেন শাস্তি ভোগ করিয়াছে? বিভিন্ন প্রকারে উভয়েরই ভাগ্যে অবশেষে মৃত্যুদণ্ড আসিয়াছে। রোহিণীর পাপ স্বীকার করিয়া লইলেও, অনভিজ্ঞ বালিকার অভিমান ও অবিমৃশ্যকারিতা তাহার সহিত কি সমান দণ্ডে দণ্ডিত হইবে?"

কিন্তু মৃত্যু যে অবস্থা বিশেষে "দণ্ড" নহে এবং ভ্রমর ও রোহিণী যে "সমান দণ্ডে দণ্ডিত" নহে তাহা এই পণ্ডিত-লেখককে বুঝাইয়া বলিতেও আমাদের ঘৃণা হয়। এ ক্ষেত্রে রোহিণীর বিনাশ ঘৃণ্য ও ভয়াবহ নহে, পণ্ডিত প্রেমচাঁদের রোহিণী-রূপলালসা-কলুষিত হৃদয়ের চিত্র "ঘৃণ্য ও ভয়াবহ।" আসল কথা, রোহিণীর অতখানি রূপ-যৌবনের ঐরূপ অকালে ও বেঘোরে অবসান ইঁহারা কিছুতেই পরিপাক করিতে পারিতেছেন না। তাই না গোবিন্দলালের উপর রাগ করিয়া লেখক লিখিয়াছেন—"রূপসাধনার শক্তি তাহার ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, গোল্লায় যাই-তেছি যাইব; কিন্তু গোল্লায় যাওয়া নিতান্ত সহজ নহে। বক্ষের তলে যাহার প্রাণ নাই, চরিত্রে স্থৈর্য্য নাই, ত্যাগের কথা দূরে থাক্, ভোগ ভুঞ্জিবার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে?" আমরাও বলি, সত্যই ত, গোল্লায় যাওয়া নিতান্ত সহজ নহে! বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জ্জিত এতখানি পাণ্ডিত্যকে এরূপ "নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যার হস্তে সমর্পণ" করিতে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? "চরিত্তির" স্থির রাখিয়া রোহিণীর রূপসাধনা করা কি সোজা কথা মহাশয়?

* * *

পণ্ডিত প্রেমচাঁদের মনস্তত্ত্ব বুঝিয়া বঙ্কিম-চন্দ্র স্বয়ং যে কথা বহুকাল পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা মাত্র তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যেই পণ্ডিতদের সকল কথারই উত্তর আছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"রোহিণীকে মারিলেন কেন?" অনেক সময়েই উত্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি—'আমার ঘাট্ হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র—একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি মন্তব্য তাঁহার উপন্যাস-মধ্যেই রহিয়াছে—তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন—ভ্রমরকে আর রোহি-ণীকে। রোহিণী মরিল—ভ্রমর মরিল। রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন—যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ্ণা শান্ত করিতে পারেন নাই। ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহেন—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দর-ঘর্ষণ-পীড়িত-বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে এ হৃদয়-সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল। সে বিষ জীর্ণ হইবার নহে, সে বিষ উদ্গীর্ণ করিবার নহে, কিন্তু তখন সেই পূর্ব্বপরিজ্ঞাতাস্বাদ বিশুদ্ধভ্রমরপ্রণয়সুধা—স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, চিত্ত-পুষ্টিকর, সর্ব্বরোগের ঔষধস্বরূপ, দিবারাত্রি স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদ-পুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধিকারী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া; রোহিণী অত্যজ্যা—তবু ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে। তাই রোহিণী অত শীঘ্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃথাই এ আখ্যায়িকা লিখিলাম।" ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ দুইটী উক্তির মধ্যেই আধুনিক রূপদক্ষদের সকল প্রশ্নের উত্তর আছে। কিন্তু রূপলালসার মত রিপু আর নাই, তাই পণ্ডিত প্রেমচাঁদের প্রথম রিপু কিছুতেই দমিত হইতেছে না!

এইবার পণ্ডিত-লেখকের অকাট্য লজিকের বহর দেখুন। পণ্ডিত-প্রবর লিখিতেছেন—"একথা সম্পূর্ণ সত্য নহে যে

রোহিণী প্রথম হইতেই কেবল কুৎসিত লালসার বশবর্ত্তী গোবিন্দলালের অনুগামী (?) হইয়াছিল। তাহা যদি হয়, তবে উপন্যাসের প্রারম্ভে রোহিণীর বিবরণে যে কাব্যাংশের অবতারণা তাহার কোনই অর্থ হয় না। * * এই অপরূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনা যেরূপ চরম সীমায় গিয়াছে তাহা তাঁহার উপন্যাসের অন্যত্র বিরল।" অর্থাৎ বর্ণনা যখন এতটা অপরূপ, তখন রোহিণীর মনে কুভাব থাকিতেই পারে না। আমাদের "তরুবালা" নাটকের অখিলের কথা মনে পড়িতেছে—পারুলের সঙ্গে অখিলের "পবিত্র প্রণয়" তাহাতে "কুভাব" নাই। সে যাহা হউক, লেখক অতঃপর উপন্যাস হইতে যে—অপরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যদি যত্ন করিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন ঐ বর্ণনার মধ্যেই তাঁহার অকাট্য লজিকের সমাধান রহিয়াছে। কোকিল এতক্ষণ "কুহুঃ কুহুঃ-কুহুঃ" ডাকিতেছিল কিন্তু "আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—"কু-উ"! ঐ "কুহুঃ"-র পরে এই "কু-উ" নিরর্থক নহে এবং ঐ "অশোক"—উহারও, স্বর্গীয় পাঁচকড়িবাবুর ভাষায়, "দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা" আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতগুলির অন্তর্নিহিত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা ঢাকাই পণ্ডিতদের কর্ম্ম নয়। চুল চিরিয়া মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা না করিলে উঁহারা কোন কথাই বুঝিতে পারেন না। তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ঐ শ্রেণীর লেখকদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহার উপন্যাসের অন্যত্র ঐ-শ্রেণীর "অপরূপ বর্ণনার" সার্থকতা কোথায় —তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—"এইখানে যবনিকা পাতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয় তাহা আমরা দেখাইব না। যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু তথাপি সেই অশোক-বকুল-কুটজ-কুরবক-কুঞ্জমধ্যে ভ্রমর-গুঞ্জন, কোকিল-কূজন, সেই ক্ষুদ্র নদীতরঙ্গচালিত রাজহংসের কলনাদ, যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ; সেই গৃহমধ্যে নীলকাচ-প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজতস্ফটিকাদি-নির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুম-গুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ আর গায়কের বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি—এই সকলের—ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম। কেন না, যুবক নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্টি করিতেছে, তাহার হৃদয়ে ঐ কটাক্ষের মাধুর্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতেছে। এই যুবা গোবিন্দলাল—ঐ যুবতী রোহিণী ....।" লেখকের উদ্ধৃত অপরূপ বর্ণনায়, সেই আকাশ, সেই পুকুর, সেই গোবিন্দলাল, আর সেই কোকিলের "কু-উ" ডাকের সঙ্গে রোহিণীর মনের যে কি সম্বন্ধ তাহা লেখক বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিলেন শুধু রোহিণীর মনে কুভাব ছিল না। সাধে কি আর বঙ্কিমচন্দ্র ইঁহাদের মত পণ্ডিতদের এই সকল উপন্যাস পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনও মজা শেষ হয় নাই। লেখক লিখিয়াছেন—"যে সুন্দরীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টা তাহার সৌন্দর্য্যে আপনি মুগ্ধ ....তাহাকে শেষে তিনিই পাপীয়সী রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু এই গালিই শেষ কথা নহে। রমণী-রূপলাবণ্য গোবিন্দলালকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে কিন্তু তাহার কবিস্রষ্টাকেও আপনার অজ্ঞাতে আকৃষ্ট করিয়াছে; তাহাতেই এই গালির সার্থকতা। ....রোহিণীর চরিত্রে যে অপরূপ সম্ভাব্যতা ছিল, তাহা উপন্যাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।" অর্থাৎ "হে বঙ্কিম, শুধু আমরাই মজি নাই, তুমিও আমাদেরই মত রোহিণীর রূপ দেখিয়া মজিয়াছিলে, নহিলে তুমি রোহিণীকে গালি দিবে কেন?" অমৃতলালের গঙ্গাগোকুল বিশ্বাস শৈবলিনীকে বলিয়াছিল—"হুঁ হুঁ, মাগী গাল্ দিয়ে কথা কয়, বুক বাঁধবো না কি? মুখখানা বেশ, হলেই বা পাগল, আমারই বা কি এমন জ্ঞান টন্‌টনে?" ইহাও দেখিতেছি, তাহাই। পণ্ডিত প্রেমচাঁদের নিশ্চয়ই ঢাকা অঞ্চলে বুক বাঁধিবার অবস্থা হইয়াছিল এবং অবশ্যই তিনি ভাবিয়াছিলেন তাঁহারই বা কি এমন জ্ঞান টন্‌টনে! নহিলে এমন আঁতের কথা লেখনীমুখে বাহির হইবে কেন? তাহার পর "রোহিণীর চরিত্রে অপরূপ সম্ভাব্যতা"! এই "অপরূপ," আর এই "সম্ভাব্যতা" যে কি বস্তু তাহা এ পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত লেখকই স্পষ্ট করিয়া লেখেন নাই। দামোদরবাবুও মরিয়া গিয়াছেন, নতুবা তিনি ইঁহাদের অনুরোধে হয়ত রোহিণীর উপসংহার লিখিতে পারিতেন। আমাদের মনে হয় সম্ভাব্যতা-টা এইরূপ হইলে অপরূপ হইত। রোহিণী গোবিন্দলালকে যুগল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইল। কলেজের অধ্যাপক এই অপরূপ ছাত্রী পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেলেন। অধ্যাপকের বয়স হইয়াছিল, স্ত্রীও বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু তাহাতে আটকাইল না। চুপে-চুপে ছাত্রীর সহিত অধ্যাপকের কণ্ঠী-বদল হইয়া গেল, ছাত্রেরা কেহ বাধা দিল না। রোহিণী পুত্রবতী হইল এবং একদিন একটা রাক্ষসী-সভায় ছেলে কোলে করিয়া সগৌরবে অধ্যাপককে দেখাইয়া শ্রীকান্তের অভয়া রোহিণীদাদাকে দেখাইয়া যেরূপ বক্তৃতা দিয়াছিল, সেইরূপ বক্তৃতা দিতে লাগিল। চটাপট্ শব্দে ড্রপ পড়িয়া গেল। কেমন, পণ্ডিত প্রেমচাঁদের এই "অপরূপ সম্ভাব্যতা" পছন্দ হইল ত?

উপসংহারে পণ্ডিত লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"শুধু 'মহাপাপিষ্ঠা' বলিয়া ছাড়িয়া

দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। একথা বলিতেছি না যে, রোহিণী নিরপরাধ, কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে more sinned against than sinning বলে, হতভাগ্য (অধ্যাপক মহাশয়ের লিঙ্গজ্ঞান বড় ভাল নয় তিনি ইতিপূর্ব্বে আর একবার রোহিণীকে গোবিন্দলালের "অনুগামী" করিয়াছেন, পাঠক বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন) রোহিণী তাহার শোচনীয় নিদর্শন। যে দুইটি নারীর করুণ জীবন-কাহিনী লইয়া সমগ্র ঘটনাচক্রের গভীর tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম, গোবিন্দলাল মূলে না থাকিলে সে চক্র ঘুরিত না। কিন্তু তাহারা মরিল, গোবিন্দলাল শেষে পরম শান্তির অধিকারী হইল, ইহাই কি নিয়তি? হয়তো ইহাই তাহার পরম শাস্তি।" অধ্যাপক মহাশয়ের বোধহয় ইচ্ছা যে, গোবিন্দলালেরও মরা উচিত ছিল এবং শুধু মরা নয়, আরও শোচনীয় ভাবে মরা উচিত ছিল। তবেই তাহার উচিত শাস্তি হইত। কিন্তু সে মরিল না, উপরন্তু পরম শান্তির অধিকারী হইল। তাহা হইলে আর কি করা যায়, ঐ পরম শান্তিকেই পরম শাস্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়া মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যাউক। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—শান্তি কি শাস্তি? অধ্যাপক মহাশয়ের মনের ভাব—শান্তি কি শাস্তি? সত্যই ইঁহাদের লেখা লইয়া আলোচনা করিতেও ঘৃণা হয়। যাঁহারা গোবিন্দলালের, ভ্রমরের মৃত্যুর পর সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সেই ভগ্ন পুষ্করিণী পদতলে, ভ্রমর-রোহিণীময় অনলকুণ্ডে, আত্মপ্রায়শ্চিত্তের কথা ভুলিয়া যান, গোবিন্দলালের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী সন্ন্যাসের কথা ভুলিয়া যান এবং ভুলিয়া গিয়া গোবিন্দলালকে তখনও অধিকতর অপরাধে অপরাধী ভাবিয়া তাহার বিচার করিতে বসেন, তাঁহারা সেই গোবিন্দলালের সর্ব্বস্ব বিনিময়ে ভক্তিমূল্যে অর্জ্জিত শান্তিকে শাস্তি বলিবেন বৈ কি? রক্তমাংসের উপাসক ইহা ছাড়া আর কি কল্পনা করিতে পারেন! ইঁহাদের কাছে জ্যোতির্ম্ময়ী ভ্রমর মূর্ত্তির সেই উক্তি—"মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? আমার অপেক্ষাও প্রিয় কেহ আছেন! বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।" —ইহার কোনও মূল্য নাই। ইঁহাদের কাছে গোবিন্দলালের সেই উক্তি—"বিষয় সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য, তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি। ....ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি, তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।" —বোধ করি, একেবারে নিরর্থক। ভগবৎপাদপদ্মে মনঃসংলগ্ন গোবিন্দলালের অর্জ্জিত শান্তি হইল শাস্তি। এতগুণ না থাকিলে লোকে পণ্ডিত প্রেমচাঁদ বলিবে কেন? তাই এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে গোপনে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। সে কথাটা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে মারিয়া ঠিকই করিয়াছেন। কারণটা, বঙ্কিমচন্দ্রের জবানীতেই বলিয়া রাখা ভাল। "মালী সেই দেবদুল্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ দিয়া ফুঁ দিত, তার পর যদি রোহিণী বাঁচিয়া উঠিয়া আবার সেই ঠোঁট ফুলাইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া মালীর পানে চাহিয়া ঘরে যাইত, তবে তাহাকে ফুলবাগানের কাজ করিতে হইত না। সে খোন্তা, খুরপো, নিড়িন, কাঁচি, কোদালী বারুণীর জলে ফেলিয়া দিয়া একদৌড়ে তদরক পানে ছুটিত সন্দেহ নাই—বোধহয়, সুবর্ণরেখার নীলজলে ডুবিয়া মরিত।" রোহিণী যদি বাঁচিয়া থাকিত, তাহাহইলে মালীর ন্যায় খোন্তা খুরপো লইয়া না হউক, যাহার যাহা যন্ত্র—প্রেমচাঁদের, যাহা যন্ত্র, তাহা লইয়া প্রেমচাঁদের, তদরক পানে না হউক, অন্য কোথাও ছুটিতে হইত। সেটা কি ভাল হইত? মালীর আর প্রেমচাঁদের আদিম চিত্তবৃত্তি যে একই, তাহা বলা বাহুল্য।

সুখ কীসে—চুম্বনে—না উদ্বন্ধনে?

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

প্রণয়ের পরিণতি কোথা কেবা জানে—
সুখ কীসে—চুম্বনে? না উদ্বন্ধনে?
যে চায় ফুলের মধু, দেখে না সে হায়—
চোরা-কাঁটা তারি সাথে, পাতায় পাতায়!
প্রণয়ের বাঁকা-পথে—সর্টকাট্ নাই,
পিছলে চলিতে গেলে, ল্যাঠা বড় ভাই!
গুছায়ে গোপন-কথা বলিয়াছ তার—
তুমি যে রোগীর বন্ধু—ঝুনো ব্যাচিলার!
Un-licensed লভ্—ইথে নাহি GAIN
বোঝেনা মেয়ের বাপ—তাই KCN.

* গত সপ্তাহে প্রকাশিত ভ্যারাইটিজ পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ "Suicides and Kisses" স্মরণে লিখিত।

(বিলাসী)

স্ট্রীট সিঙ্গার

ঝুমুর ঝুমুর নুপুর বাজছে—দুলছে হিয়ার হার, মাথার বেণী, কানে দুল, পথ চলেছে মঞ্জু অর্থাৎ আপনাদের কানন। তার গায়ের কোর্ত্তা, কোমরের ঘাঘরা, মাথার ওড়না হাওয়ায় উড়ছে মিল রেখে তাল রেখে হারমোনিয়ামের রেশের সঙ্গে। প্যাঁ-প্যাঁ-প্যাঁ-পেঁ-পেঁ, ঝুন্ ঝুন্—ঝুঝুন্-ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্ আর মিষ্টি গানের সুর মুখরিত করেছে ময়নামতীর মাঠ, হিজল বনের ধার, কাজলা দিঘীর পাড়। কত অজ পাড়াগাঁয়ে, কত হাটে, কত বাটে কত গঞ্জে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে সাইগল আর কানন। পাঞ্জাবীর ওপর ওয়েষ্ট কোট পরে মাথায় রঙীণ রুমাল বেঁধে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে সে যখন গান ধরছে তখন কে তাকে চিনবে এই সেই সাইগল যাকে দেখেছে তারা 'দেবদাসে' আর 'দিদি'তে। আর মঞ্জু! ঘাঘরা পরা মঞ্জু, ছোট্ট মঞ্জু মনোহারী মঞ্জু যদি কারোর সামনে তার সুরমাটানা চোখে বিজলী হেনে পাতলা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক রেখে মিষ্টি সুরে বলে: মেরে নাম—ম-ন্-জু! তখন কে তাকে বলবে এই সেই 'চিত্রা' যে গায়—'তার বিদায় বেলার মালা খানি—"

এ সবই সম্ভব করেছেন পরিচালক ফণি মজুমদার—বাংলার চলচ্চিত্র-রসিকদের একখানি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ছবি উপহার দেবেন বলে।

দেশের মাটী

'দেশের মাটী'র সম্পাদনা কার্য্য খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পরিচালক নীতীন বাবু নিজে সবসময়েই সুবোধ বাবুর সঙ্গে লেগে আছেন। মনে হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যেই 'সেন্সার' করবার ব্যবস্থা করা হ'বে।

এ ছবির 'ট্রেলার' গেল শনিবার থেকে চিত্রায় দেখান হচ্ছে। ট্রেলার থেকে যতদূর বোঝা যায় তাতে মনে হচ্ছে যে এ ছবি হ'বে একখানি outstanding one; যেমন Photography তেমনই Sound ও Technical production-এর দিক্ থেকে এ ছবির তুলনা নেই। অভিনয়-এর দিক থেকে 'চন্দ্রা'র অভিনয় সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

দেশের মাটী আসছে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি 'চিত্রা'য় মুক্তিলাভ করবে

অধিকার

গেল শনিবার থেকে এ বইএর কাজ ফের সুরু করা হয়েছে। বিরাট 'Dream-land'-এর সেটে রোজ সকাল থেকে কাজ পুরোদমে চলেছে। আশাকরা যাচ্ছে যে এক সপ্তাহের মধ্যেই এ বইএর উত্তর সংস্করণেই শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই এ বইএর প্রায় ৫ রীল 'প্রিন্ট' হয়ে গেছে। সঙ্গীত এর দিক থেকে এ ছবির তুলনা নেই। তাছাড়া শোনা যাচ্ছে যে তিমির বাবু যে অপূর্ব্ব 'টাইটল্ মিউজিক্' দিয়েছেন তার মুর্চ্ছনা দর্শকদের মুগ্ধ করে দেবে।

বাজারে প্রবল জনরব যে 'নিউ সিনেমা' খুব শীঘ্রই বাঙলা চিত্রগৃহে পরিণত হ'বে। এবং আগষ্ট মাসের শেষাশেষি 'অধিকার' চিত্র-নিয়ে এই চিত্রগৃহের উদ্বোধন হ'বে।

বড়দিদি

পরিচালনা কার্য্যে নতুন ব্রতী হলেও, মল্লিক মশাই যে বিশেষ করিৎকর্ম্মা লোক, তা গত একমাসের কাজের প্রগ্রেস্ দেখে বেশ বোঝা যায়।

আমরা অনেক সময় একটি কথা শুনে থাকি, যাকে ইংরাজীতে বলে Economy of Footage. মল্লিক মশাই সেই ধরণের কর্ম্মী, যাঁর কর্ম্মপন্থার মধ্যে এই শ্রেণীর রক্ষণশীলতার হদিশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ একদিনে হাজার ফুট্ ফিল্ম তোলা হলে তা থেকে নির্ঘাৎ ন' শত ফুট কাজের মাল বের হবে।

নিউ থিয়েটার্সের "অধিকার" কথা চিত্রের একটি বিশিষ্ট দৃশ্য।

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্সের
নিবেদন
শ্রী
চিত্রগৃহে
চোখের
সুপ্রভা
শীঘ্রই
আসিতেছে

কিন্তু তা বোলে আপনারা ভাববেন না, তিনি শুধু Quantity-র দিকে নজর দেন—Quality বাদ দিয়ে।

এক একটি সেট ভাঙবার আগে তিনি নিয়মিত Rushprint এর প্রক্ষেপণ দেখে, Quality সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে, তবে পরের সেট-এ এগিয়ে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন।

আর Punctuality-র পুরস্কার বোলে যদি কিছু ষ্টুডিও মহলে থাকতো, তবে মল্লিক মশাইয়ের কর্ম্মী-দলের অনেকেই সেটি পেতেন। যাকে বলে এক কথায় Clock work regularity—এমন মিলিটারী ডিসিপ্লিন্ সচারাচর নজরে পড়ে না।

পুরোনো চাল যে ভাতে বাড়ে—মল্লিক মশাইয়ের গুণের বিশ্লেষণ করে দেখলে এই সত্যটি ষোল আনাই মিলিয়ে পাওয়া যাবে।

এই চিত্রের নায়িকা মলিনার অসুস্থতা এবং নওয়াবের পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী সেটের কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হলেও, করিৎকর্ম্মা পরিচালকের তৎপরতার গুণে, এর মধ্যে ছবির অন্যান্য অংশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

আরও দুটি সেট মল্লিক মশাই ইতিমধ্যে শেষ কোরেছেন, তার একটিতে দেখানো হয়েছে নায়ক সুরেন্দ্র নাথের পাটনার ভবন। এই সেট-এ, সুরেনের পিতা ও বিমাতার ভূমিকায় শুনেছি সুন্দর অভিনয় করেছেন যশস্বী অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী ও সু-অভিনেত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী।

এই সপ্তাহে অন্য একটি সেট-এ বড়দিদির চিত্র-গ্রহণ পূর্ণ উদ্যমে চলেচে।

অভিনয়

অভিনয়এর সুটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। মাত্র কয়েকটা দৃশ্য তোলা বাকী আছে। একদিকে পরিচালক মধু বসু সম্পাদনা কাজ নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন অপর দিকে আর্টিষ্ট সুধাংশু চৌধুরী Manager's room, Make-up room, 1st Class compartment প্রভৃতি সেট নির্ম্মাণ কার্য্য নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সে'র "অভিনয়ের" একটি সুন্দর দৃশ্য।

যতদূর ঠিক হয়ে আছে তাতে মনে হয় আসছে ২০শে আগষ্ট 'রূপবাণী' চিত্র-গৃহে ছবিখানি মুক্তিলাভ ক'রবে।

গোরা

আসছে ৩০শে জুলাই শনিবার থেকে 'চিত্রায়' দেবদত্ত ফিল্মস-এর 'গোরা' দেখান হ'বে। আমরা যতদূর খবর পেয়েছি তাতে মনে হয় 'গোরা'র ভবিষ্যত ভালই। ছবি-খানা পরিচালনা করেছেন যশস্বী অভিনেতা নরেশ চন্দ্র মিত্র। এতে অভিনয় করেছেন যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গ তাদের মধ্যে শোনা যাচ্ছে নরেশবাবু ও জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় হয়েছে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর।

চোখের বালি

আগামী ৩০-এ জুলাই 'শ্রী' চিত্রগৃহে এসোসিয়েটেড্ প্রোডিউসার্সে'র প্রথম নিবেদন রবিন্দ্রনাথের অমর সামাজিক কাহিনী "চোখের বালি" মুক্তিলাভ করিবে। নর-নারীর অতৃপ্ত আকাঙ্খা জীবনের চলার পথে তাদের জীবনকে বিষময় করে না, অমৃত সেচনে সিঞ্চিত করে এই এক মহা সমস্যার সমাধান হইয়াছে এই চিত্রে। ভগবানের আদেশ অমান্য করিয়া আদম ও ঈভ যখন জ্ঞানবৃক্ষেরফল ভক্ষন করিয়াছিল তখন সমাজের নির্দ্দেশ মহেন্দ্র-বিনোদিনী যে উপেক্ষা করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ছবিখানি রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর আব-হাওয়াকে যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া চিত্রে রূপান্তরিত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টার কসুর করেন নাই। শোনা যাচ্ছে, "চোখের বালি"-র সঙ্গীতাংশ বাঙলা ছবির মধ্যে হইবে এক অতুল সম্পদ এবং অভিনয়ের দিক থেকেও ছবিখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইবে বলিয়াই মনে হয়।

কালী ফিল্মস্

আগামী আগষ্টের প্রথম হপ্তা থেকে কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আবার ছবি তোলার কাজ সুরু হবে। এদের অর্দ্ধসমাপ্ত "শ্রীকৃষ্ণ" চিত্রখানি সুশীল মজুমদারের

পরিচালনায় নূতনভাবে তোলা হবে। সুশীলবাবু এখন এই কাহিনীটির চিত্রনাট্য ও ভূমিকা বণ্টন ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। গাঙ্গুলীমহাশয়ের পুনরাগমনে আমরা সত্যই সুখী।

কমলা টকীজ

সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় শ্রীকান্ত সেন লিখিত এদের দ্বিতীয় ছবি "রাজকুমারের নির্ব্বাসনে"র শুটিং সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকেই সুরু হবে। ইতিমধ্যে সুকুমার বাবু অংশ বণ্টন ও মহলা শেষ কোরে ফেল্‌বেন। ছবিখানির সঙ্গীত পরিচালনা কোর্‌বেন কুমার শচীন দেব বর্ম্মণ। সুকুমার বাবু গুণী লোক তাঁর গুণের পূর্ণ বিকাশ হ'তে দেখলেই আমরা খুশী হব।

বেকার নাশন

প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং রাধা ফিল্মসের তত্ত্বাবধানে মতিমহল থিয়েটারের 'বেকার নাশন ছবিখানির চিত্রগ্রহণ শেষ হ'য়ে গেছে—যতদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় আসছে ২০শে আগষ্ট মতিমহল-এর ছবি বেকার নাশন 'উত্তরা' চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

নর-নারায়ণ

একটি বিরাট পার্ব্বত্য আশ্রমের 'সেট' রাধা ফিল্মসের সমস্ত ষ্টুডিও জুড়ে আছে যাতে নর-নারায়ণের দৃশ্য গ্রহণ চলছে। দৃশ্যটি হচ্ছে সত্রাজিতের আশ্রম দৃশ্য। ঐ মনোহারী দৃশ্যটিতে বর্ত্তমানে অহীন্দ্র চৌধুরী, লীলা হালদার, রবি রায়, ভূমেন রায় এবং জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি অভিনয় ক'চ্ছেন।

যখের ধন

হরি ভঞ্জর পরিচালনায়, 'যখের ধন' উপন্যাসের চিত্র-গ্রহণ-কার্য্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সের ষ্টুডিওতে পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। এখন একটি বিরাট 'ষ্টেয়ার কেস হল'-এ নায়িকা 'রেখা'-র (লীলা হালদার) একটি অতি আধুনিক নৃত্যদৃশ্য সযতনে গ্রহণ করা হ'চ্ছে। দৃশ্যটিতে শ্রীমতী হালদারের সঙ্গে অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় ক'চ্ছেন জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী।

চিত্রা

আসছে সপ্তাহই 'বিদ্যাপতি'র শেষ সপ্তাহ। উত্তর কলিকাতায় যারা এখনও এ ছবি দেখে উঠতে পারেন নি তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে 'চিত্রায়' এ ছবিখানা দেখবার ব্যবস্থা করেন।

পূর্ণ থিয়েটার

বাজে ছবির চেয়ে ভাল পুরানো ছবির দর কত তা আমরা এই সপ্তাহে 'দিদি'র অপূর্ব্ব জনসমাগম দেখে বুঝতে পেরেছি।

পূর্ণ থিয়েটারএর কর্তৃপক্ষ তাই সামনের সপ্তাহে দেবদাস, ভাগ্যচক্র ও মীরাবাই দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন।

রূপবাণী

নারীর অভিশাপ এবং তার চোখের জল যে ব্যর্থ হয় না—হৃদয়হীন এক মৃত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা কোরে, সন্ধ্যা তার প্রমাণ দিয়েছিল। সমাজ তাকে সহ্য কোরতে পারে নি—সেও সমাজকে সহ্য কোরতে পারেনি।

এই মর্ম্মন্তুদ্‌ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সেই মহিয়সী নারীর আত্ম-বিজয়ের কাহিনী সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েচে—অভিজ্ঞান-চিত্রে।

রূপবাণীতে এই ছবিখানি দেখবার জন্য প্রতি সপ্তাহে দর্শকের জনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শনিবার থেকে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পণ কোরল।

"স্ট্রীট-সিঙ্গার" চিত্রের নায়িকা কাননবালা

৺কৃষ্ণদাস পালের বার্ষিক স্মৃতিসভা

স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের বার্ষিক স্মৃতিসভা আগামী ২৪শে জুলাই রবিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউট হলে পাঁচটার সময় অনুষ্ঠিত হইবে। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, মৌলভী শামসুদ্দিন আহম্মদ, অধ্যাপক সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিসেস হেমপ্রভা মজুমদার, মিসেস চারুপ্রভা সেন, অধ্যাপক বিনয় কুমার সেন, মিঃ ভট্টাচার্য্য শিওকেষণ ভাট্টার ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন।

শোক সংবাদ

কালী ফিল্মসের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর মাতা শ্রীযুক্তা ভুবন মোহিনী দেবী গত বুধবার রাত্রি ১-২০ মিনিটের সময় তাঁহার কালীঘাটস্থ প্রতাপাদিত্য রোড বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ঢাকায় নবাবের দেওয়ান পরলোকগত চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর স্ত্রী এবং স্বর্গত রায় বাহাদুর বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় সি-আই-ঈ রেট কলেক্টরের ভগিনী। তিনি একজন ধার্ম্মিকা মহিলা ছিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহার একটী মাত্র পুত্র, একটি মাত্র কন্যা, বহু পৌত্র-পৌত্রী ও আত্মীয় স্বজন শোকে মুহ্যমান্‌। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

হাওড়ার এ্যাসেসর

গত সপ্তাহে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক দত্তের গৃহে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েসনের সভায় এ্যাসেসর পদে অধ্যাপক বিজয় ভট্টাচার্য্যকে মনোনীত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। কার্ত্তিক বাবু ও হরেন বসু বরদাবাবুকে এই প্রস্তাবে সম্মতি করাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজয় বাবু শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং শরৎবাবু, হরেন বসু তাঁহাকেই ঐ পদে সমর্থন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিরুদ্দেশের যাত্রী

(গল্প)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঝরণা বললে, "চলুন মলয়বাবু এবার ওঠা যাক্, অনেক রাত হয়ে গেল।" মলয় আজ যেন মরিয়া হয়ে বলল "হক না রাত ঝরণা, তাতে ক্ষতি কি! তুমি বলছ বাড়ী ফেরার কথা কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান? আমার মনে হচ্ছে এই ভাবে তোমার পাশে আজীবন বসে শোনাই আমার বাঁশী, শোনাই আমার প্রাণের আবেদন বিরামহীন আকুলতায়। তোমাকে প্রথম যেদিন দেখি—" মলয়কে থামিয়ে দিয়ে ঝরণা বলল, "বাবা কি ভাববেন বলুনত আমাদের এখনও না ফিরতে দেখে!" ঝরণার এই ক্ষীণ আপত্তিকে উপেক্ষা করে, দম্ দেওয়া গ্রামোফোনের মত পুনরায় বোলে যেতে লাগল, "না না ঝরণা, তুমি আমাকে আজ বাধা দিও না। আমাকে বলতে দাও। হয়ত এটা তোমার ওপর জুলুম করা হচ্ছে। হয়ত তোমার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হচ্ছে। কিন্তু কি করব উপায় নেই। কিন্তু আমি আর পারছিনা মনের কোনে অহর্নিশি চাপা দিয়ে রাখতে এ অন্তরের আগুন। জানত অগ্নি আগুনকে কখনও রাখা যায় না ছাই চাপা দিয়ে। সেই ছাই চাপা আগুনই সৃষ্টি করে একদিন এক বিরাট আগ্নেয়-গিরির। তাতে সে নিজে ত দগ্ধ হয়ই উপরন্তু ভস্মীভূত করে দেয় গ্রামের পর গ্রাম দেশের পর দেশকে। সে আগুন যে কি বিরাট এবং তার দাহিকা শক্তি যে কিরূপ প্রবল একবার ভাবত ঝরণা। সেই-রূপ অন্তরাগ্নিতে আমি নিয়ত পুড়ছি। আজ আমি যেটুকু শক্তি সঞ্চয় ক'রেছি আমার প্রাণের অন্তরতম কথাগুলি তোমায় বোলতে এই রূপালী রাতের আবহাওয়ায়, কাল দিনের আলোয় এ কথা বোলতে হয়ত আর তাহা থাকবে না। আজ আমায় নিষেধ কোরোনা ঝরণা, বোলে যেতে দাও আপন উচ্ছাসে আপন উদ্দামতায়। তারপর তুমি আমাকে কোরো ঘৃনা, ক'রো উপহাস। ফিরে চেয়োনা আর আমার পানে নিদারুণ বিতৃষ্ণায়।" এক নিশ্বাসে এত কথা বলার পর একটু থামল মলয়। তারপর আবার ব'ল্লে, "তোমায় প্রথম যে দিন দেখি সেই দিনই আমার মনে হ'য়েছে যেন কত যুগ যুগান্তর ধরে তোমার আমার মাঝখান দিয়ে মিলনের ফল্গুধারা ব'য়ে যাচ্ছে। ব'য়ে যাচ্ছে প্রেমের অন্তঃসলীলা অবাধে। তোমার সঙ্গে ন'তুন ক'রে পরিচয় করবার দরকার নেই যেন আমার। তুমি বহু যুগ ধ'রে আমার একান্ত আপনার। এ জীবনেও যে ফিরে পাব তোমায় আমার চিরকালের দাবীতে এ বিশ্বাস আমি কোন দিনই হারাইনি বুঝলে ঝরণা।" সে আপন উচ্ছাসে ব'লে চ'লল, "তুমি হয়ত ভাবছ আমি পাগল, এ সমস্ত উচ্ছাস পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু জান কি ঝরণা এ পাগলামীর উৎস কোন খানে? একি! তুমি উঠে প'ড়লে ঝরণা!" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মলয় ব'ললে। "কিছু মনে কোরবেন না মলয়বাবু, এবার বাড়ী যাওয়া যাক চলুন। সত্যিই অনেক রাত হ'য়ে গেছে বাবা হয়ত বড্ড ভাবছেন আমাদের এখনও বাড়ী না ফেরাতে। তা না হ'লে, সত্যি ব'লছি আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে করছে না এমন চাঁদনী রাত এবং আপনার চমৎকার বাঁশী বাজান ছেড়ে। আমায় সে জন্যে ক্ষমা করবেন মলয়বাবু।", অনুনয়ের সুরে বললে ঝরণা। "বেশ তবে চল।" হতাশ কণ্ঠে মলয় বল্লে কথা কয়টী। একটু থেমে পুনরায় বল্লে মলয়, "তোমায় আনন্দ দেওয়ার পরিবর্ত্তে হয়ত তোমায় দিলুম কেবল বেদনা। কি করব বল আমি আর থাকতে পারলুম না তোমায় না বলে। না প্রকাশ কোরলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যেতুম। কিন্তু এবার আমি নিশ্চিন্ত। আমি জানতে চাই না তুমি আমার এ সমস্ত কথা শুনে আমায় করলে ঘৃণা অথবা অনুকম্পা। জানত রাত্রির দুর্ব্বলতা বলে একটা জিনিষ আছে। সেই তারই সহায়তায় তোমায় বোলতে পেরেছি আমার অন্তর নেঙড়ান কথা-গুলি। না হলে পারতুম কি না সন্দেহ। কাল হয়ত আর লজ্জায় তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারবনা। আর তুমিও হয়ত কাল আমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু তাহলেও আমার এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে আমার অন্তরের দেবীকে জানিয়েছি আমার অন্তরের সবখানি উজার ক'রে।" একটু থেমে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনীত কণ্ঠে বল্লে মলয়, "যদি পারত আমার সব কিছুকে পাগলের পাগলামী ব'লে উড়িয়ে দিও।" তারপর তারা আপন আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে পথ চলতে লাগল।......

ঝরণাকে পৌঁছে দিয়ে যখন বাড়ী ফিরল মলয়, তখন অনেকটাই রাত হ'য়ে গেছে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার কলেজ খুলবে আর চার দিন পরে। এতদিন তার খেয়াল ছিল না মোটেই। সে ঠিক ক'রলে কাল সকালে

উঠেই অনঙ্গবাবুও ঝরণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবে। এবং বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় রওনা হবে।

পরদিন সকালে উঠে মলয় অনঙ্গবাবুদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চল্‌ল। বাড়ীর সামনে গিয়ে তার যেন কেমন লজ্জা ক'রতে লাগল, গত কল্যকার রাত্রের ঘটনা মনে ক'রে, বাগান পার হ'য়ে সিড়ির কাছে যখন পৌচেছে, ওপরের বারান্দা থেকে ঝরণা কলকণ্ঠে ব'লে উঠল, "আজ আপনি খুব সকালেই উঠেচেন দেখচি। আসুন চাও রেডি।" মলয় চেয়ে দেখল, বেশ সহজ ভাবেই তাকে সম্বর্দ্ধনা করলে ঝরণা। এতে মলয় অনেকখানিই সাহস পেল। মৃদু হেসে বল্লে সে, "ধন্যবাদ।" মলয় মনে মনে ভাবলে, বৃথাই সে ঝরণার ওপর সন্দিহান হ'য়েছিল কাল। সে স্ত্রীলোকের চিরন্তন লজ্জাকে বিরক্তি ব'লে ভুল ক'রে নিজেকে—নিজের অন্তরকে ব্যথাতুর ক'রেছে কেবল। মলয় হৃষ্টচিত্তে বেশ একটু দ্রুতই সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আজ অনঙ্গবাবু অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আছেন। বাতের কন-কনানি অনেক কম। তিনি দালানে আরাম কেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মলয়কে দেখেই বলে উঠলেন, "এস বাবা এস, আজ এত সকালেই যে? কোথাও যেতে হবে নাকি?" ততক্ষণে ঝরণাও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। মলয় সম্মতিসূচক স্বরে বল্লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ বিকেলের ট্রেনে কলকাতা রওনা হচ্ছি। পরশু কলেজ খুলবে। আর ত দেরী করা চলে না। দুপুরে হয়ত আসা হয়ে উঠবে না। সেইজন্যে সকালেই এলুম"।......তারপর বসে বসে অনেক কথাই চলতে লাগল অনঙ্গবাবুর সঙ্গে। ঝরণা আজ নিজের হাতে মাছের কচুরী ভেজে খাওয়ালে মলয়কে। খাওয়ার খানিক পরে মলয় উঠল। অনঙ্গবাবু মলয়কে চিঠি দিতে এবং বড়দিনের ছুটীতে পুনরায় আসতে বার বার করে বলে দিলেন। মলয় জানাল, বড়দিনের ছুটীতে তার আসা বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কারণ মার্চ্চে এগ্‌যামিন, অতএব অনঙ্গবাবু মলয়কে নিয়মিত চিঠি দিতে এবং এগযামিন হয়ে গেলেই অবিলম্বে এখানে চলে আসতে বলে দিলেন। ঝরণা মলয়ের সঙ্গে রাস্তায় খানিকদূর পর্য্যন্ত এল। এবং মলয় চলে যাওয়ায় তার বিকেলের বেড়ানটা যে মোটেই ভাল লাগবে না এবং তার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়বে বার বার একথা জানালে ঝরণা, এবং মলয় মধ্যে মধ্যে তাকে চিঠি লিখবে এবং এগজামিন হয়ে গেলেই মলয় মধুপুরে চলে আসবে, এর অন্যথা করবে না এ এক রকম প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলে ঝরনা মলয়কে দিয়ে। মলয় এখান থেকে বিদায় নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে 'রুবিলজ' থেকে ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলে। এবং যথা সময়ে কলিকাতাগামী ট্রেনে মলয় উঠে পড়ল।

* * * আজ দুদিন হ'ল মলয়ের এগজামিন শেষ হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে সে মধুপুরে চারখানি চিঠি দিয়েচে। দু'খানি অনঙ্গবাবুর নামে এবং দুখানি তার মানসী ঝরণার নামে। তার উত্তরও পেয়েচে যথাসময়ে, ঝরণার দু'খানি চিঠিতেই মলয়কে এগজামিন হয়ে গেলেই যাওয়ার জন্যে বার বার অনুরোধ করেছে, অনঙ্গবাবুও বার বার করে লিখেছেন যেতে, এবং মলয় না গেলে তিনি নিজে এসে তাকে ধরে নিয়ে যাবেন, এ ভয়ও দেখাতে ভোলেননি তাঁর দুখানা চিঠিতেই। মধুপুর থেকে এসে পর্য্যন্ত একদিনের জন্যেও ঝরণার কথা ভুলতে পারেনি মলয়। তার ধ্যান জ্ঞান হ'য়েছে ঝরণা। এমন কি সে মনে মনে ঠিক ক'রেছে ঝরণাকে তার সঙ্গিনীরূপে না পেলে তার জীবন হ'য়ে যাবে ব্যর্থ এমন কি ঝরণাকে সে পাবে না এ কথা ভাবতেও তার ভয় হ'ত। 9th April সে মধুপুর উদ্দেশ্যে যাত্রা ক'রলে, এবং পরদিন সকালে মলয় অনঙ্গবাবুদের বাড়ী যখন দ্যাখা ক'রতে গেল, ঝরণা বাড়ী ছিল না তখন। অনঙ্গবাবু বাগানের সামনে পায়চারী করছিলেন। মলয়কে দেখতে পেয়েই অনঙ্গবাবু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ব্যগ্রভাবে বললেন, "এস বাবা এস। কবে এলে? তোমার শরীর ভাল আছে ত? ষ্টেশন থেকে বরাবর আস্‌ছ নাকি? এমনি একরাশ প্রশ্ন। মলয় নমস্কার করলে এবং সে কাল রাত্রে এসে পৌচেছে এবং শরীর তার ভালই আছে জানালে। অনঙ্গবাবু একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে, মলয়কে একখানি বেঞ্চে ব'সতে নির্দ্দেশ দিয়ে নিজেও তার পাশে ব'সে পড়লেন। "আপনি একা রয়েছেন যে ঝরণা কোথায়?" মলয় জিজ্ঞাসা ক'রলে।

"ঝরণা গেছে নিশীথের সঙ্গে বেড়াতে," ব'লেই বোল'লেন "এই ছাখ আমার কি ভুল, তুমি এখনও নিশীথকে চিন'লেই না, আমি ব'ললুম নিশীথের সঙ্গে ঝরণা গ্যাছে বেড়াতে," ব'লেই তিনি অপ্রতিভের হাসি হাস'তে লাগ'লেন, মলয় কিছু বুঝ'তে না পেরে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনঙ্গবাবুর মুখের দিকে, অনঙ্গবাবু বুঝতে পেরে বল'লেন "এই নিশীথ হ'চ্ছে আমার এক বন্ধুর ছেলে। এবার- বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ ক'রে এসেছে, তোমাকে বল'তে ভুলে গেছ'লুম যে, এই নিশীথের সঙ্গেই আমার ঝরণা'র বিয়ের কথা আমার স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে ঠিক ক'রে গেছেন, তাঁর ইচ্ছেই ছিল এদের দুজনের মিলন স্বচক্ষে দেখে যাবার, তা' আর ভাগ্যে হ'য়ে ওঠেনি, ঝরণাও নিশীথকে ভালবাসে এবং আজও তার মতের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটেনি।" অনঙ্গবাবু আপনার মনেই ব'লে

যাচ্ছিলেন, মলয়ের দিকে লক্ষ্য করেননি, কর'লে দেখ'তে পেতেন তাঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। তার ধমনীর রক্ত চলাচল বন্ধ হ'য়ে আস'ছে ক্রমশঃ, পৃথিবীটা তার চোখের সাম'নে দুল'ছে যেন। যে আশা-তরুর অঙ্কুর তার মনে গজিয়েছিল আজ সমূলে হয়ে গেল তার বিনাশ। সে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসে শুনতে লাগ'ল, তার মনে হ'তে লাগ'ল কে যেন সীসে গলিয়ে তার কর্ণ-রন্ধ্রে ঢেলে দিচ্ছে। এমন সময় গেটের সাম'নে ঝরণা এবং একটী সুদর্শন যুবককে দেখা গেল, তাদের দেখ'তে পেয়েই অনঙ্গবাবু ব'লে উঠ'লেন, "এই যে, তোমাদের বেড়ান হ'য়ে গেল নিশীথ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" নিশীথ বল'ল। ঝরণা মলয়কে দেখেই কলকণ্ঠে ব'লে উঠ'ল, "আপনি কখন এলেন? আমি রোজই ভাব'তুম আজ বোধহয় নিশ্চয় আস'বেন, কতদিন আপনার বাঁশী শুনা হয়নি বলুন ত!!" তারপর নিশীথের দিকে ফিরে বল'ল "ইনিই হ'চ্ছেন মলয় বসু। যার কথা তোমায় ব'লেছিলুম। মস্তবড় বাঁশীবাজিয়ে।" অতঃপর নিশীথ মলয়কে এবং মলয় নিশীথকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার কর'ল। মলয় বুঝ'লে ইনিই নিশীথবাবু অনঙ্গবাবুর ভাবী জামাতা। মলয়ের দিকে ফিরে ঝরণা বল'লে "আপনারা ততক্ষণ একটু বসুন। আমি আপনাদের জন্যে চা নিয়ে আসি। চা, টা খেয়ে এখুনি একটু বাঁশী শুনাতে হ'বে কিন্তু।" মলয়কে আর কিছু বলা'র অবকাশ না দিয়েই সেখানকার বাতাসকে 'সেন্টে'র গন্ধে আমোদিত ক'রে শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে ছোট্ট বালিকার মত লঘুপায়ে দৌড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। নিশীথ সেইখানেই একটা বেঞ্চে ব'সে পড়'ল। মলয় অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ঝরণার গতির দিকে। বাগানে রৌদ্দুর এসে পড়াতে অনঙ্গবাবু বল'লেন "চল বাড়ীর ভেতর যাওয়া যা'ক এবার। বড্ড রোদ্দুর লাগ'ছে, আর এতক্ষণ বোধ হয় 'চা'ও রেডি হ'য়ে এ'ল।" অতঃপর তিনজনেই উঠে বাড়ীর দিকে চল'লেন। মলয়ের আর এক দণ্ডও এখানে থাক'তে ইচ্ছে কর'ছিল না। এখানকার বায়ু যেন বিষাক্ত মনে হচ্ছিল তার।

ওপরে হল ঘরে তিনজনেই গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে ঝরণা চা ও খাবার নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ কর'ল। মলয়ের খাবারে একেবারে রুচি ছিলনা। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে খেতেও হ'ল। খেতে খেতে মলয়ের মনে হ'চ্ছিল তার গলার ছিদ্র যেন ছোট হয়ে গেছে আজ। আর ক্ষিধে তেষ্টাও যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। খাওয়া দাওয়া'র পর মলয় বিদায় নিলে। সঙ্গে তার বাঁশীটা ভাগ্যে ছিল না। এ যাত্রায় তাই রক্ষা পেয়ে গেল সে। আস'বার সময় তাকে বিকেলের দিকে সকাল সকাল আস'তে বার বার ক'রে ব'লে দিলেন অনঙ্গ বাবু। মলয় মাতালের মত টল'তে টল'তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়'ল। পথ চল'তে চল'তে ভাবতে লাগল—এখানে আসবার আগে পর্য্যন্তও এমনকি নিশীথের কথা অনঙ্গবাবু'র মুখে না শুনা পর্য্যন্ত তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ঝরণা তাকে ভালবাসে। সে ঝরণাকে নিয়ে কত আকাশ-কুসুমই না রচনা ক'রেছে এতদিন। ঝরণা হ'বে তার জীবনের সাথী, তার বন্ধু, তার স্ত্রী, তার প্রিয়া………আর ভাবতে পারেনা সে। তার মনে হ'তে লাগল একখানা ধারাল ছুরি নিয়ে তার বুকের ভেতরটাকে খান খান ক'রে দিচ্ছে যেন। সে উন্মাদের মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াল খানিকটা। মধুপুর তার আর ভাল লাগ'ছে না মোটেই। মধুপুরের জল হাওয়া গায়ে যেন বিঁধ'ছে। সে ঠিক কর'লে আজই সে মধুপুর ত্যাগ কর'বে। এখানে থাকলে সে পাগল হ'য়ে যাবে। সে বাসায় গিয়ে তার মহিমদা'কে জানালে সে আজই কল'কাতা যাবে। বিশেষ দরকার। না গেলেই নয়। মহিমবাবু প্রথমে আপত্তি করলেন। শেষে যখন দেখ'লেন মলয়ের একান্ত ইচ্ছে যাবার তখন আর বাধা দিলেন না। মলয় সেই দিনই বিকেলের ট্রেনে মধুপুর ত্যাগ কর'লে।

(৫)

বৈশাখ মাসের পনেরই আজ, দুদিন হ'ল মলয়ের নামে মধুপুর থেকে দুখানা চিঠি এসেছে। একখানি অনঙ্গবাবুর লেখা এবং অপরখানি ঝরণার। অনঙ্গবাবু লিখেছেন বিশে বৈশাখ ঝরণার বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। মলয়কে তিনি বিশেষ করে যেতে লিখেছেন। চিঠি পেয়েই সে যেন চলে আসে। কারণ তাকেই সব দেখাশোনা করতে হবে। তাঁর আর দ্যাখবার শোনবার কেউ নেই। আর তাছাড়া তিনি নিজে মোটেই ঘোরাঘুরি করতে পারবেন না। কারণ একে তিনি বৃদ্ধ তার ওপর আজ দুদিন হল তাঁর বাতের ব্যথাটা আবার দ্যাখা দিয়েছে। পরিশেষে জানিয়েছেন তিনি মলয়ের আশাপথ চেয়ে রইলেন। তার যা ভাল হয় সে করবে; ইত্যাদি। ঝরণা সংক্ষেপে লিখেচে—মহিম বাবুর বাড়ী গিয়ে সে জেনেছে যে সেই দিনই মলয় মধুপুর ত্যাগ করেছে বিকেলে। বিশেষ কি একটা দরকারে। সেই বিশেষ দরকারটা কি জানতে চেয়েছে ঝরণা। এবং সেদিন সকালে তাদের বাড়ী চায়ের মজলিসে সহজ ভাবে কথা বার্ত্তায় যোগ না দিতে পারার কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠিয়েচে—মলয়কে। এবং শেষের দিকে তাকে বিশেষ করে যেতে লিখেচে আগামী শুভদিনে তাকে (ঝরণাকে) কংগ্রাচুলেট করবার জন্যে। মলয় না

গেলে তাদের মিলন সার্থক হবে না। এ কথাও জানাতে ভোলেনি।

......মলয় ঝরণার চিঠিখানা পড়ে কেবল ভাবছে—"উঃ মেয়ে মানুষ কি নিষ্ঠুর! মলয় তাকে ভালবাসে জেনেও এমন অক্লেশে তার বুকে ছুরী চালাতে পেরেছে ঝরণা! এরা সবাই কি এই রকম। আশ্চর্য্য! এমন করে অপমান করতে একটুও কি কুণ্ঠিত হয় না। একটুও কি দরদ জাগে না এদের প্রাণের ভেতর! অথচ কবিরা এদেরি না বোলেছেন কোমলা! এই কি কোলকাতার নিদর্শন! না কেবল তার ভাগ্যেই এমন হল। একি সত্যি যে 'অভাগা যে দিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে মলয়। চিঠি দুখানা পেয়ে পর্য্যন্ত মলয় ভেবে ঠিক করতে পারছে না কি করবে সে। সে ওখানে যাওয়ার কথা অনেক ভেবে দেখেছে। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে তার ঝরণাকে আর একজন তার (মলয়ের) চোখের সুমুখে গ্রহণ করবে......তারপর আর ভাবতে পারে না সে। এই পর্য্যন্ত মলয় ঠিক করলে দুজনের নামে দুখানি চিঠি লিখে পোষ্ট করে দেবে। তার বেশী আর সে পারবে না। তাই আজ মলয় অনজবাবুকে ও ঝরণাকে চিঠি লিখতে বসেছে। প্রথমে লিখলে অনজবাবুকে। লিখতে বসেই সেই সরল হৃদয় বৃদ্ধের কথা মনে করে মিথ্যে কথা লিখতে যেন একটু বাধ বাধ ঠেকতে লাগল তার। শেষ পর্য্যন্ত মনকে এই বলে প্রবোধ দিলে যে সে কি করবে উপায় নেই। সেখানে গেলে সে নিজেকে ঠিক প্রকৃতিস্থ রাখতে পারবে না।

সে যা লিখলে, তার মর্ম্মার্থ এই—আজ তিন দিন হল তার খুব জ্বর। সেই জন্যে সে যেতে পারলে না। তা না হলে সে নিশ্চয়ই যেত। সে জ্বর গায়েই তাঁকে চিঠি লিখছে। তিনি যেন কিছু মনে না করেন এবং তার ত্রুটি মার্জ্জনা করেন ইত্যাদি। সেই চিঠিখানা খামে মুড়ে রেখে, ঝরণাকে লিখতে বসলো। লেখার পূর্ব্বেই তার এক সমস্যা এসে উপস্থিত হল। কি বলে সে (মলয়) সম্ভাষণ করবে ঝরণাকে—অনেক ভেবেচিন্তে তাকে শুধু 'ঝরণা' লেখাই সমিচীন মনে করলে। তারপর লিখলে "—ঝরণা! তোমায় চিঠি লিখতে বসেই প্রথম আমার ভাবনা হ'ল তোমায় সম্ভাষণ কোরবো কি বলে। কারণ তুমি আজ এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েচ যে তোমায় চিঠি লেখা আমার আর সাজে না। কেন যে সাজে না সে কথা এখন থাক। শেষ পর্য্যন্ত তোমায় শুধু ঝরণা লেখাই সমিচীন মনে করি। তুমি আমাকে যেতে লিখেছ আগামী 'শুভদিনে' তোমাকে কংগ্রাচুলেট করতে। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, আমি যেতে পারলাম না—অনেক চেষ্টা করেছিলুম যাবার—কারণ তোমাকে আজও আমি ভুলতে পারিনি। ওখানে গিয়ে হয়ত নিজেকে আমি ঠিক রাখতে পারব না। আমার 'হৃৎপিণ্ড' কেটে ছিঁড়ে আর একজনের হাতে তুলে দেবার সামর্থ আমার নেই। তোমাকে আজ সব কথাই বলব। ভেবেছিলুম কিছুই বলব না কিন্তু আর হয়ত বলার সুযোগ ঘটবে না কোনও দিন এ জীবনে তাই বলছি। অনেক কথাই সেদিন নদীর ধারে জানিয়েচি। অনেক কেন প্রায় সবই। তবু যেটুকু বাকী আছে তাও বাকী রাখব না আজ।......তোমাকে আমি ভালবেসেচি। প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। এমন ভাল কেউ কাউকে কোনদিন বেসেচে কিনা জানি না। একেবারে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যাকে বলে তাই। সত্যি কথা বোলতে কি—তুমি বিশ্বাস কর আর না কর—তুমি আমাকে পাগল করেচ। যেদিন নদীর ধারে বসে তোমাকে আমার প্রেম নিবেদন করি। সেদিন—সেদিন কেন, অনজবাবু যতক্ষণ না নিশীথের কথা জানিয়েছিলেন আমাকে অর্থাৎ নিশীথ বাবুর সঙ্গে চাক্ষুষ হবার কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত—ঘুণাক্ষরেও জানতুম না যে আর এক জনের বাক্‌দত্তা তুমি। না জেনে তোমার উপর যে অন্যায় করেচি সে জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো ঝরণা। তোমাকে আমি এখান থেকে আশীর্ব্বাদ ক'রচি এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা কোরচি, তোমাদের উভয়ের সারাজীবনের চলার পথটা কুসুমাস্তীর্ণ হোক। তুমি সুখী হও। আমি আর কখনও তোমার হৃদয়াকাশে ধূমকেতুর মত উদয় হব না। চিরদিন থাকব তোমার কাছ থেকে দূরে বহু দূরে। কারণ, আমি তোমাকে ভালবাসি। হঠাৎ দুফোঁটা চোখের জল মলয়ের অজ্ঞাতে, টপ্‌ টপ্‌ ক'রে ঝরে পড়ল চিঠির হরপের ওপর। তাড়াতাড়ি মুছে করে নিয়ে আবার লিখতে আরম্ভ ক'রলে মলয়। আমি তোমার মিলন রাত্রির থেকে যাত্রা ক'রব নিরুদ্দেশের পথে। কারণ আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখলুম থাকতে আমি পারবনা বাড়ীতে, তাহলে আমি পাগল হ'য়ে যাব। আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেছে একেবারে। এ আর কখনও জোড়া লাগবেনা। আর তুমি জানতে চেয়েচ আমি হঠাৎ সেদিন কেন মধুপুর ত্যাগ ক'রলুম। এবং কেন সেইদিন তোমাদের বাড়ীতে চায়ের মজলিসে সহজভাবে যোগ দিতে পারিনি? এই দুটো কেনর উত্তর আমি আর দেবনা। পারত আবিষ্কার করে নিও।

আর একটা কথা ব'লেই এবার শেষ ক'রব আমার চিঠি। বেশী লিখে আর চিঠির কলেবর বৃদ্ধি ক'রতে চাইনা। আর তা ছাড়া তোমারও হয়ত ধৈর্য্য থাকবে না পড়বার। কারণ এখন তুমি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। হ্যাঁ, কি বলছিলুম শোন, তোমার কাছে এই

আমায় প্রার্থনা—এই হতভাগ্য নিরুদ্দেশের যাত্রীর কথা কখনও কোন ভুলের মুহূর্ত্তে যদি মনের কোণে জাগে, তোমার কাছে এইটুকু আমার নিবেদন, একটী দীর্ঘশ্বাস যেন আমার উদ্দেশ্যে পড়ে। আর···আর···আমার কিছু বলবার নেই।

চিঠি শেষ করে দুখানা চিঠি পৃথক পৃথক খামে ভরে ঠিকানা লিখে চিঠি দুখানা রেখে দিলে মলয়। এবং চিঠি পোষ্ট কোরতে যাওয়ার আগে আর একবার—ঝরণার নামে লেখা চিঠিখানা—ভাল ক'রে পড়ে দেখলে মলয়। এবং কি ভেবে কি জানি চিঠি দুখানা পোষ্ট কোরতে যাবার পরিবর্ত্তে চিঠি দুখানা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলে মলয়। তারপর দুম ক'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল। তার চোখ যেন জ্বালা ক'রতে লাগল। এবং কি জানি কেন তার চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল প'ড়তে লাগল। সে কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাতে পারলেনা।······

বৈশাখ মাসের বিশে আজ। আজ ঝরণার বিয়ে। রাত্রি তখন ন'টা। বর এসে পৌঁছুল। হৈ, হৈ, ব্যাপার প'ড়ে গেছে চারিদিকে। মেয়েরা শুভ শঙ্খধ্বনি ক'রছে ঘন ঘন। কাজের ব্যস্ততায় সকলে ছুটাছুটি ক'রছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা আনন্দে করতালি দিচ্ছে। চারিদিকে আজ আনন্দের বন্যা অনঙ্গবাবুদের বাড়ীতে। শুধু তাঁর (অনঙ্গবাবুর) মনটায় যেন আজ সুখ নেই। তিনি এখনও টাইম টেবল নিয়ে দেখচেন মলয়ের আসবার আর ট্রেন আছে কিনা ক'লকাতা থেকে। এখনও তিনি আশা ক'রছেন পাঞ্জাব মেলে যদি আসে মলয় তাহ'লে এখনও তার আসবার সময় আছে। বার বার তিনি নিজে নিজেই বলছে, "তাইত কেন এলনা মলয়। কোন অসুখ বিসুখ কোরলো না ত।······

• • এদিকে মলয় তখন ঝারশুগুডা ষ্টেশনে নেবে, ষ্টেশন পার হয়ে যে রাস্তাটী বরাবার উত্তরমুখো চলে গেছে সেই রাস্তা ধ'রে মলয় চলেছে···চ'লেছে···ক্রমাগত চ'লেছে; তার চলার আর বিরাম নেই। যেতে যেতে অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল, আর দেখা গেলনা। হাতে তার একটি পয়সা নেই। টিকিটের দাম ছাড়া আর কিছু সঙ্গে আনেনি। চুল উস্কোখুস্কো ক'দিন অনিদ্রায় চোখদুটী তার রক্তবর্ণ, • • • তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ কেউ জানেনা। শুধু যার চোখে কিছুই এড়ায়না, যার কাছে কোনও কিছুই অজানা নেই, যার দৃষ্টি সর্ব্বব্যাপী শুধু তিনিই র'ইলেন এই নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গী হ'য়ে। এই হতভাগ্যের জন্যে তি'ন বোধহয় অন্তরাল থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এদিকে বিবাহ বাড়ীতে মঙ্গল সুচক ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হ'তে লাগল।

—:•-(শেষ)-•:—

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—চব্বিশ—

প্রভাতে অরুণ বাটী ফিরিল—নিচে বসিয়াই রোগী দেখিল এবং বেলা ১২টায় পুনরায় রোগী দেখিতে বাহির হইল। শুভ্রা মধ্যে তাহাকে উপরে উঠিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল বটে কিন্তু সে অনুরোধ সে গ্রাহ্য করে নাই। বেলা দুইটায় অরুণ বাটী ফিরিল; আহারে বসিয়া এটা ভাল হয় নাই, ওটায় লবণ বেশী, ঝোলটা ঝাল ইত্যাদি নানাবিধ দোষ ধরিতে আরম্ভ করিল। রন্ধন লইয়া শুভ্রাকে ব্যঙ্গ করিল, তিরস্কার করিল; শুভ্রা কোন প্রতিবাদ করিল না, শুধু আপন মনেই ভাবিল যে আঠার ঘণ্টা পরে আসিয়া স্বামী তাহাকে যে মধুর সম্বোধন করিতেছেন তাহা সে সহ্য করিবে—কোন প্রতিবাদই করিবে না। আহারান্তে অরুণ বলিল, "অম্বলের অযত্ন হইতেছে না তো?"

উত্তরে শুভ্রা বলিল অযত্ন হইতেছে কিনা তাহা সে জানে না। মূল কাটিয়া গাছের মাথায় জল ঢালিলে সে গাছ বাড়েনা ইহা অরুণের জানা উচিত ছিল।

অরুণ বলিল, "তার মানে?"

উত্তরে শুভ্রা বলিল, "মানে বুঝবার জ্ঞান ও শক্তি তোমার আছে, ব্যাখ্যা বা টীকা নিজে করে নিতে পার আমি জানি না।"
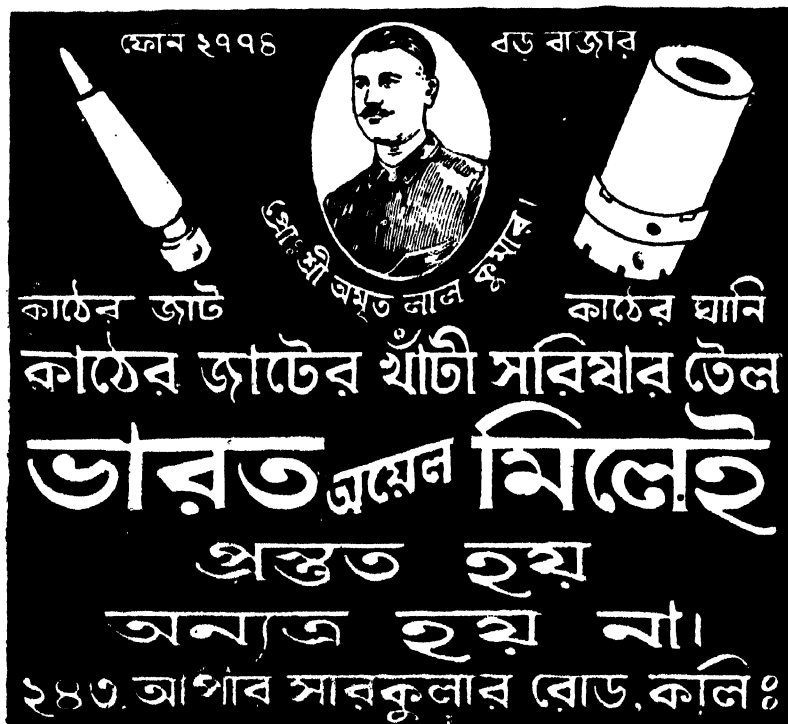
অরুণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কোন কথা বলিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইল। শুভ্রাও বেশীক্ষণ সেস্থানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া চলিয়া গেল। যথাসময় অরুণ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শুভ্রাকে ডাকিয়া বলিল, "আজও আসতে পারবো না আমি—হাঁসপাতালে থাকতে হবে।"

শুভ্রা বলিল, "বেশ, খাবার পাঠিয়ে দেব কি?"

অরুণ বলিল "না, দরকার নেই, ওখানেই খাব আমি। শুভ্রা নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। অরুণ আপনার গাড়ীতে উঠিয়া যথাস্থানে গমন করিল।

আধঘণ্টা পরে সমর একটা মস্ত চামড়ার ব্যাগ লইয়া উপস্থিত হইল। শুভ্রা এই অর্দ্ধঘণ্টায় নিজে প্রস্তুত হইয়াছিল। রামলালকে ডাকিয়া উপরতলার চাবি বন্ধ করিয়া বলিল, "বাবু যদি ফিরে আসেন

তাঁকে বলো ভবানীপুরে যাবার কাছে যাচ্ছি আমি। ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরবো।"

তৎপরে সে সমরের আনীত বেশ পরিধান করিল, মাথায় পরচুলা পরিল, মুখের উপর একটী নয়োম আচিন প্রস্তুত করিয়া এমন বেশ ধারণ করিল যে বহু পুরাতন চাপরাশী রামলালকেও তাহাকে বোঝা বলিয়া চিনিতে বিলক্ষণ কষ্ট হইল। এখন সে আর সলজ্জ কুলবধূ শুভ্রা নহে এখন সে রায় বাহাদুর দিলীপ রায়ের পুত্র সুদর্শন কিশোর বা নবীন যুবক। প্রথমে আয়নায় নিজেকে দেখিয়া নিজে খুব খানিকটা হাসিল ও সমরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেউ বোধ হয় চিনবেনা, কি বলিস্ সমু।"

সমু বলিল, "নিশ্চয়ই না, চল, বেরিয়ে পড়া যাক্। শুভ্রা বেতের ছড়ি ঘুড়াইতে ঘুড়াইতে মোটর বাইকের সাইড কারে উঠিয়া বসিল এবং সমর অবিলম্বে গাড়ী চালাইয়া দিল হোটেলের দিকে। শুভ্রা বাহির হইয়া গেল অমল তাহা দেখিল। চাকরদের জিজ্ঞাসা করিল সমর বাবুর সঙ্গে ঐ ছোকরা কে? ভৃত্যদের কেহই এই সুদর্শন কিশোরটির পরিচয় বলিতে পারিলনা। হোটেলে আসিয়া সমর ও শুভ্রা ম্যানেজারের কক্ষে উপস্থিত হইল। এবারেও ম্যানেজারবাবুকে দক্ষিণা দিতে হইল। শুভ্রা যথারীতি খানসামার পোষাক পরিল। এ পোষাক সমর নূতন ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। পোষাক ও পাগড়ী পরিধান করিয়া শুভ্রাকে বছর চোদ্দ বয়সের বালক ভৃত্য বলিয়াই বোধ হইতেছিল।

ম্যানেজার হাসিমুখে বলিলেন, মাষ্টার রায়, তোমার সত্যিই 'বয়' বলেই মনে হচ্ছে। তবে রংটা যেন বড় বেশী ফরসা ঠেকছে না সমর বাবু?" সমর তাড়াতাড়ি কি একটা তামাটে চূর্ণ ও ভেসেলিন বাহির করিয়া শুভ্রার হস্তে দিল। সে সেটাকে হাতে ও মুখে মাখাইয়া লইল। তাহার গৌরবর্ণ ম্লান হইল। তাহাকে সাধারণ গরীবের ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শুভ্রা মনে মনে খুশী হইল।

সমর বলিল, "উঠাবার সময় খানিকটা তেলের দরকার হবে কিন্তু।"

ম্যানেজার বল্লেন, "তা আমি আনিয়ে রাখছি। বাস্, চলে যান আপনারা ডিশগুলো নিয়ে। শুভ্রা পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া তিনটীকে পরিস্ফুট করিল তাংপরে জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া ভ্রাতার সহিত এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইল।

কক্ষে উপস্থিত হইয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হৃদয়ে প্রলয়ের ঝটিকা উপস্থিত হইল। হৃদপিণ্ড দ্রুত হইতে দ্রুততর চলিতে লাগিল। চক্ষের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ডবেগে ঘুরিতে লাগিল। পদদ্বয় কম্পিত হইল;—তাহার শিরায় শিরায় অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিয়া গেল। সে অতিকষ্টে নিজের অবস্থা ও মনোভাব দমন করিয়া ডাইনিং টেবিলে প্লেটগুলি সাজাইয়া দিল। শুভ্রা যে এবেশে এখানে আসিতে পারে অরুণ বা কণা তাহা কল্পনা করে নাহ। তাই ঐ অল্পবয়স্ক বালকের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই তাহারা কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। শুভ্রা উদগ্রীব হৃদয়ে কাজ করিতে করিতে তাহাদের বাক্যালাপ শুনিতে লাগিল।

অরুণ বলিতেছিল, "একদিনতো ঐ অমলকে ভাল লেগেছিল তোমার, আজ তার নাম করলে চটে যাও কেন?"

কণা অরুণের হাতের উপর হাতখানি রাখিয়া বলিল, "সেটা কি রকম জান, দায়ে পড়ে কুইনিনের বড়ি গেলার মত। ভালবাসি চিরদিন একই লোককে; আর সে লোক তুমি।"

"তাই যদি তবে বলনি কেন এতদিন আমাকে?"

"দিদির বড় বড় চোখ দুটো দেখলেই আমার মনে হতো তিনি বুঝি আমার অন্তরের ভেতরটা দেখতে পান, মনে হত হয়তো যাদুমন্ত্র ওঁর জানা আছে, আমার মনের কথা বুক থেকে টেনে নিতে পারেন তিনি।"

"তাহলে বল তুমি শুভ্রাকে ভয় করতে? ওকে আবার কারো ভয় হয় নাকি?" বলিয়া অরুণ হাসিয়া উঠিল।

কণা বলিল, "মিথ্যে বলোনা, তুমিও তাঁকে ভয় করতে। —আর ভয় করা বিচিত্র নয়—প্রথমতঃ তিনি রূপসী, বিদুষী, সত্যিকার প্রেমময়ী, তার উপর আমি দেখেছি এমনি একটা শক্তি আছে তার যে, যে কোন লোককেই বশ করে ফেলতে পারেন।"

"কিন্তু আমায় পেয়েছেন কি? যাক্ ও কথা যা বলছিলাম। মনে কর, আজ যদি অমল আসতো তোমার সামনে তা হলে কি করতে তুমি?"

কণা বলিল, "ফের এই কথা? না, তুমি আমায় থাকতে দেবে না দেখছি?"

"কেন কি হলো।"

—"আমি জানি না," বলিয়া কণা দূরে সরিয়া বসিল।

অরুণ তাহার নিকটে গিয়া বলিল, "রাগ করছো কেন বলতো? একদিন তো সে তোমায় ভালবাসতো।"

"ছাই বালতো। না তার নাম কোরনা আমার কাছে। যদি তবুও কর তবে সত্যি বলছি বিষ খেয়ে মরবো আমি। তার মত নীচ, দুশ্চরিত্র, লম্পট, স্বার্থপর কি দুটো আছে? সত্যি বলছি তাকে আমি ঘৃণা করি। পৃথিবীর আবর্জ্জনা মনে করি তাকে? তার নাম আমার কাছে করো না।"

মনে মনে খুশী হইয়া অরুণ বলিল, "তা না হয় হলো, কিন্তু মনে কর যদি আমাদের মাঝে সে যদি অনুতপ্ত হয়ে এসেই হাজির হয় তা হলে কি করবে তুমি?"

বিরক্ত হইয়া কণা বলিল, "সত্যই যদি তার এমনি দুর্দ্দিন আসে তা হলে হয় তার না হয় আমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমি কিছুতেই তা সহ্য করবো না।"

"যাক্ বয় বেচারা খাবার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চল খেতে বসবে চল।" অরুণ ও কণা টেবিলে আহারের জন্য বসিল।

শুভ্রা দেখিল আহারের সময় কণা অতি অল্পই আহার করিতেছে এবং নিজ হস্তে পরম আদরে অরুণের মুখে আহার্য্য তুলিয়া দিতেছে।

অরুণ বলিল, "সত্যি তোমার হাতে পড়ে খাবারগুলো অনেক বেশী মিষ্টি হয়ে ওঠে।"

কণা বলিল, "খাবারগুলো তৈরী হোটেলের, সার্ভ করেছে বয়, এতে আর আমার বাহাদুরী কি? এমন কপাল একদিন নিজে হাতে রেঁধে তোমাকে খাওয়াতে পারলুম না।"

হাসিয়া অরুণ বলিল "রান্না করবে তুমি? পুতুলের মত দেহ নিয়ে?"

বাধা দিয়া কণা বলিল, "দিদি ভাগ্যবতী, রোজ কত রান্না করতেন তোমার জন্যে।"

"ওঃ তাই নাকি? তার যা রান্নার ; মানুষে মুখে দিতে পারে না।"

"অথচ এই মানুষই একদিন তার রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ঘরখানাকে ভরিয়ে তুলতো—আর তা আমি নিজ কানে শুনেছি।"

রাগতঃ ভাবে অরুণ বলিল, "দেখ কণা, তার কথা তুমি তুলোনা, তাকে দেখলে আমার রাগ হয়; তার কথা শুনলে আমার মাথা ধরে।"

কথাটা শুভ্রার কানে গেল, মনটা বিচলিত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তথাপি আত্মদমনের শক্তি তাহার আছে তাই সে সংযতভাবে আহার দিতে দিতে সকল কথা শুনিতে লাগিল।

কণা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তার অপরাধ?"

উত্তরে অরুণ বলিল, "অপরাধ? হাঁ, অপরাধ আছে বৈ কি কণা। সে যে রকম বুদ্ধিমতী আমি বিশ্বাসই করিনা যে সে বুঝতে পারেনি আমার মনের বন্যা ছুটেছিল আকুল আগ্রহে তোমারই দিকে। সে ইচ্ছে করলে বাধা দিতে পারতো; কিন্তু সে কেন তা করলেনা? কেন যে আমায় পতঙ্গের মত ঝাঁপ দিতে দিলে তোমার রূপের অগ্নিশিখায়। যদি কেউ তার আপনার জনকে গোখরো সাপের সঙ্গে খেলা করবার উৎসাহ দেয়, তবে তারপর কি করে সে আশা করতে পারে যে সাপের বিষে তার প্রিয়জন ঢলে পড়বেনা? সে কেন আশা করে, আগুনে তার স্বামীর হাত পুড়বেনা; জলে তার গা ভিজবেনা। যখনই তোমার কথা হোত তখনই তুমি নির্দ্দোষ এইটাই সে চাইতো প্রমাণ করতে। কেন সে সেদিন জোর করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে বলতে পার?"

কণা বলিল' তিনি দেবী, তিনি এই পৃথিবীর মানুষ নন।" অরুণের কথাগুলো শুভ্রার কর্ণে অতি সত্য বলিয়া বোধ হইল। তাহার বোধ হইতেছিল এই পৃথিবীতে উদারতা করে যারা, অতিরিক্ত বিশ্বাস করে যারা, তারাই ঠকিয়া থাকে শুভ্রারই মত। হায়, এই জগতে আত্মদান, উদারতার কোন মূল্যই নাই। কে যেন তাহার বুকের উপর দশ মন বোঝা চাপাইয়া দিল। তাহার চক্ষের সম্মুখে কতশত বিভীষিকাময়ী দৃশ্যাবলী ছায়াচিত্রের ন্যায় খেলা করিতে লাগিল। জিহ্বা তালু শুকাইয়া গেল, তাহার অজ্ঞাতসারে জলের জগটি মুহূর্ত্তে স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। সে এবার নিজেকে সামলাইয়া লইতে পারিলনা। শুভ্রা নিজেও পড়িয়া যাইতেছিল—সম্মুখের একখানা চেয়ার ধরিয়া কোনরূপে দাঁড়াইয়া রহিল।

অরুণ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো হে তোমার ছোকরা?" সমরও ডিনার সার্ভ করিতেছিল সে অরুণের প্রশ্নের উত্তর দিল, "হুজুর আজই ও চাকরী পেয়েছে। তবে যে রকম অসাবধান তাতে আর চাকরী থাকবেনা ওর, কাজের আজই খতম।"

কণা বলিল, "বেচারা! ছেলেমানুষ, ও যা ভেঙ্গেছে তার দাম আমরাই দেব, বলো আমিই ভেঙ্গে ফেলেছি ওটা। দেখ বয়, ওর চাকরী যেন না যায়।"

অরুণ শুভ্রার নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিল, "দেখ বয়, কি নাম তোমার?"

শুভ্রা ভয়ে ও আতঙ্কে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সেলাম করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "রঘুনাথ"।

"আচ্ছা রঘুনাথ, তোমার মুখখানা যেন চেনা চেনা বোধ হচ্ছে—আর কোথায় দেখেছি বলত?"

অরুণের এই প্রশ্নের উত্তরে সমর বলিল, "ওকে আর কোথায় দেখবেন হুজুর। ও আমার পিসতুত ভাই আজই দেশ থেকে এসেছে।"

অরুণ বলিল, "বেশ রঘুনাথ, তোমায় যদি এরা জবাবই দেয় তাহলে আমার কাছে কাজ করবে?"

শুভ্রা ঘাড় নাড়াইয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, "কত মাইনে দেবেন ?" সে এমন ভঙ্গীতে কথা বলিল যে অরুণ ও কণা উভয়েই হাসিয়া ফেলিল।

অরুণ বলিল, "কত চাও তুমিই বল।"

শুভ্রা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কিছুনা, শুধু একটু ভালবাসা—একটু স্নেহেরবাণি।"

ঠিক এই সময়ে রাজপথে কে একজন ভাটিয়ালী সুরে গাহিতেছিল।

"চাঁদ যদি গো হৈতে বঁধু,
চেয়ে রইতাম চোখে।
ফুল হৈলে মালা গেথে,
দুলিয়ে দিতাম বুকে।"

অরুণের বুকের ভিতর কেমন একটা আঘাত পৌঁছিল রঘুনাথবেশী শুভ্রার এই কথাটায় ও বাহিরের অপরিচিতের এই সঙ্গীতে। তাহার মনে হইল ঠিক এই কথাই এমনি ভাবে আর একজন তাহাকে বলিত—কে সে ? অরুণের মনে পড়িল সে আর কেহ নহে তাহারই পরিত্যক্তা, পীড়িতা পত্নী শুভ্রা। সে মানিব্যাগ বাহির করিয়া দশটাকার একখানা নোট বাহির করিয়া শুভ্রার হাতে দিয়া বলিল, "ঐ টাকা থেকে একটা জগ কিনে দিও হোটেলের ম্যানেজার বাবুকে।" পরে সমরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ বয়, ম্যানেজার বাবুকে বলো রঘুনাথ যেন রোজই আসে আমার খাবার সার্ভ করতে। এজন্য আমি তোমাকে বক্‌শিস করবো, কিহে আসবে তো রঘুনাথ ?"

সমর সেলাম করিয়া বলিল, "যো হুকুম।" তাহার স্বর ও ভঙ্গীর হুবহু অনুকরণ করিয়া শুভ্রাও বলিল, "যো হুকুম।"

তাহারা চলিয়া গেলে কণা বলিল, "ওর উচিত ছিল রাজারাজড়ার ঘরে জন্মান। কি পাপে ওকে বয় হতে হল ভগবানই জানেন।"

অরুণ কিছু বলিলনা। তাড়াতাড়ি আলো নিভাইয়া বাহুমূলে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। কণা নিকটে বসিয়া সপ্রেম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো বলনা তোমার ?"

অরুণ উত্তর দিলনা। তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল ভেদ করিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। অরুণের বাহুখানি ধীরে ধীরে কণা সরাইয়া লইয়া মুখে হাত দিতেই দেখিল অরুণের গণ্ডদুইটী অশ্রুসিক্ত।

কণা শুনিল তখনও রাজপথে পথিক তেমনই প্রাণস্পর্শীসুরে গাহিতেছিল।

"জীবন গেল বৃথাই বয়ে
এসো বন্ধু মরণ হয়ে,
তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিব,
জনম-ভরা ব্যথা।
ওগো আমার সোনার বঁধু,
শোন প্রাণের কথা—
তরু যদি হইতে তুমি
আমি হইতাম লতা।"

—পচিশ—

গত দুইতিন দিন যাবৎ দিলীপবাবুর মনে কেমন একটা সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। সমর এত রাত্রি পর্য্যন্ত থাকে কোথায় ? সমর দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে এবং দিলীপবাবুর ধারণায় তাহার মতি অত্যন্ত তরল। আজকালকার কলিকাতার তরুণী-গণ যেরূপ বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত সমরের বাহিরে যাপন করা একটা আতঙ্কের বিষয় বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

তাঁহার মনে হইল হয়ত কোন আধুনিকার অপাঙ্গবাণে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার আদরের সমর অধঃপতনের প্রশস্ত পথে নামিয়া যাইতেছে। তিনি এত কষ্টে পুত্রাধিক স্নেহে যাহাকে পালন করিলেন সে কি তাঁহারি অনবধানতায় শেষে নরকের পথে নামিয়া যাইবে ? সে যে তাঁহারি স্বর্গীয়া ভগিনীর একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা যে তাঁহার জীবনের একটা বৃহৎ কর্ত্তব্য।

তিনি স্থির করিলেন যে অদ্যই তিনি সমরকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে এত রাত্রি পর্য্যন্ত সে থাকে কোথায় ? কিসের মোহে সে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করে ? ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন তখন রাত্রি সাড়ে বারটা। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া সমরের কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সমর সবেমাত্র শুভ্রার নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাতমুখ ধুইয়া টেবিলে ঢাকা দেওয়া খাদ্যদ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য বসিয়াছে এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া সভয়ে দেখিল তাহার মামা দ্বারের নিকট দাড়াইয়া রহিয়াছেন।

দিলীপবাবুর মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া সে ভীত হইলেও কোনমতে উঠিয়া দাড়াইল ও মামাকে চেয়ার আগাইয়া দিল। দিলীপবাবু নিজেও বসিলেন ও তাহাকেও বসিতে বলিয়া জলদগম্ভীরস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন সমর, আজ আমি তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করতে চাই, এবং এও আশাকরি যে তুমি নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন ও আমাকে প্রতারিত করবেনা।"

সমর ধীরকণ্ঠে কহিল, "আমি জ্ঞানতঃ কখনও মিথ্যা বলিনি, কেননা, সে শিক্ষা পাইনি এবং আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌বার সাহসও আমার নেই।"

দিলীপবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি জানতে চাই যে, বর্ত্তমানে তোমার পক্ষে রাত বারোটার আগে বাড়ী ফেরা অসম্ভব হয়ে উঠেছে কেন? তুমি আগের মত সময়নিষ্ঠ নেই তা দেখতে পাচ্ছি; কোথায় তুমি থাক বা কি কর আমায় বল।"

মামার প্রশ্নে সমর মনে মনে প্রমাদ গনিল ও বিব্রত হইয়া উঠিল। সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে যে কোনও কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব কিন্তু—"

তাহাকে কথা শেষ না করিতে দিয়াই বিরক্ত কণ্ঠে দিলীপবাবু বলিলেন, "এই কথাটাই বা এমন কি যা তুমি আমার কাছে বলা অসম্ভব বলে মনে কর। আমি জানতে চাই কি কারণ তোমার সকাল সকাল বাড়ী ফেরার বাধা হয়, বল।"

সমর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আমার নিজের কোনও কাজে বাইরে থাকিনা; দিদির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে একথা কাউকে এমন কি আপনাকেও ঘুণাক্ষরে জানাবনা।"

"দিদি" শুনিয়াই দিলীপবাবুর স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। তিনি ধীর সংযত কণ্ঠে সমরকে বলিলেন যে শুভ্রার কি হইয়াছে সে তাহাকে বলুক কেননা শুভ্রার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য তিনিও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী; উপরন্তু সে এবং শুভ্রা উভয়েই ছেলেমানুষ। তাহাদের শপথের কোন মূল্য নাই অথবা এমন কোন কথা থাকিতে পারে না যাহা পিতার নিকটেও বলা অসম্ভব। অতএব সে যেন সমস্ত ঘটনাই তাহাকে বলে, শুভ্রার নিকট বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী তিনিই হইবেন।

মাতুলের সান্ত্বনাবাক্যে শান্ত হইয়া সমর তাহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্তই বলিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমি জানি এই কথাগুলো আপনাকে কি ভয়ানক আঘাত দিয়েছে তবুও—সমরের দুইচক্ষু জলভারে অবনত হইয়া পড়িল; কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে নিঃশব্দে মাটীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বজ্রাহত বনস্পতির ন্যায় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর দিলীপবাবু বলিলেন, "শোন আমি স্থির করলাম যে এ বিষয়ে যা করবার এরপর আমিই তা করব এবং আমি নিজ চোখে হোটেলে গিয়ে তাদের দেখে আসতে চাই, বুঝেছ, যদি তুমি মিথ্যা কথা বলে থাক আমায়, তা হলে এও জেনে রাখ তা জানতে পারলে আমি তোমার মুখও দেখবো না।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমর খাবার ফেলিয়া রাখিয়া হাত ধুইয়া শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল সে মামাকে সকল কথা বলিয়া ভাল করিল কিনা।

* * *

দিলীপবাবুর মনে পড়িল আজই মধ্যাহ্নে অরুণ টেলিফোনে তাঁহাকে তাঁহার অসুখের কথা এবং তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল—উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার শরীর ভাল আছে এবং একমাসের মধ্যে কোন অসুখই তাঁহার হয় নাই। সম্ভবতঃ শুভ্রাই অরুণকে পিতা অসুস্থ এবং এজন্যই সে রোজ ভবানীপুরে যায় এইরূপ কোন কথা বলিয়াছে এবং অরুণ টেলিফোনে তাঁহার উত্তর পাইয়া শুভ্রা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিয়াছে তাহাও ভাবিবার বিষয়। দিলীপবাবুর ইচ্ছা হইতেছিল এই রাত্রিতেই তিনি কন্যার নিকট ছুটিয়া যান ও যে সকল সমাচার আজ সমরের নিকট শুনিলেন তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া লন। সমস্ত রাত্রি বৃদ্ধ নিতান্ত অস্বস্তিতেই কাটাইলেন।

ঊষালোক পরিস্ফুট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সত্বরেই কন্যার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইলেন।

প্রভাতের পক্ষী কূজন আরম্ভ হইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রায় বাহাদুর দিলীপ রায়কে অরুণের গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিয়া বাটীস্থ ভৃত্যবর্গ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহাকে সমাদর করিয়াই তাহারা উপরে লইয়া গেল। শুভ্রা তখন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়াছে। সে পিতাকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। তাহার মুখে আনন্দ চিহ্নের পরিবর্ত্তে আতঙ্ক ও ভয়ের রেখাই পরিস্ফুট হইল।

দিলীপবাবু ছড়িগাছা দেওয়ালে রাখিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণ কোথায়?" উত্তরে শুভ্রা কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে সভয়ে মৃত্তিকাপানে চাহিয়া বস্ত্রাঞ্চলখানি টানিয়া নিজের আঙুলে জড়াইতে লাগিল। দিলীপ বাবু পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যি করে বল দেখি অরুণ কোথায়?"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে শুভ্রা বলিল, "হাঁসপাতালে আছে।"

উত্তরে দিলীপবাবু কিঞ্চিৎ রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি যা বল্লে সেটা যে সত্য কথা তা' আমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পার কি?"

"তিনি যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন যে তিনি হাঁসপাতালে যাচ্ছেন ও সেখানেই থাকবেন রাত্রে।"

"তার কথা যে সত্য নয় তা তুমি ভাল করেই জান ও সে যে কাল রাত্রে কোথায় ছিল তা যে তুমি স্বচক্ষে দেখে এসেছ আমি তা' জানি।"

পিতার কথা শুনিয়া শুভ্রার প্রায় মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। সে কি বলিবার

চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না শুধু তাহার ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া উঠিল।

দিলীপবাবু অবিচলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তুমি যে আমার মেয়ে হয়ে আমার কাছে কিছু লুকাতে পার তা' আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। তুমি জান তুমি ভিন্ন এ সংসারে কেউ নেই আমার। আমাকে সব কথাই জানান উচিৎ ছিল তোমার, কিন্তু তুমি তা' জানাওনি কেন, এই ভেবে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হচ্ছি। তুমি একবারও ভেবে দেখনি যে, যে কাজে তুমি অগ্রসর হচ্ছ তা কত বড় দুঃসাহসিক কাজ ও তাতে তোমার কত রকমের বিপদের আশঙ্কা আছে।

কথাগুলি শুভ্রা নিঃশব্দেই শুনিয়া যাইতেছিল—হঠাৎ মুখ তুলিয়া পিতার দিকে তাকাইল ও ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু বাবা তুমি ত জান কোনও কিছুতেই কথা বলা আমার স্বভাব ছিল না, তুমি যখন সবই শুনেছ তখন তোমাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে আপত্তি নেই আমার, তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছিল কিন্তু নেবু যেমন কচলাতে কচলাতে তেতো হয়ে যায় তেমনি—সে হঠাৎ থামিয়া গেল, তাহার কথা বলিবার শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইল, তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর পিতার মনে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছে।

দিলীপবাবু কন্যার অপ্রত্যাশিত আচরণে বিস্ময় বোধ করিলেও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, "তোমার কথা আমি বুঝেছি মা, কিন্তু নারী তুমি একথা ভুলে যাওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায়না। আমি জানি অরুণের ব্যবহারে তুমি খুবই ব্যথা পেয়েছ। এমন কি তা তোমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা যে তার চেয়েও কত বেশী অত্যাচার সহ্য করেছে তা' ত তোমার অজ্ঞাত নয় মা। তুমি যে তাঁদেরই অংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার মঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী।"

শুভ্রা কোনও কথা বলিল না। তাহার সকরুণ দীর্ঘনিশ্বাস ঘরের আবহাওয়াকে ব্যথায় ভরিয়া তুলিল। দিলীপবাবু তাহার ভাব দেখিয়া কিছুক্ষণ কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। ঘরের নিস্তব্ধতায় উভয়েই মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দিলীপবাবুই কথা কহিলেন ও বলিলেন, "দেখ মা তোমার এই রকম একা একা হোটেলে গিয়ে কাজ করায় যে যথেষ্ট বিপদ আছে তা' আগেও বলেছি এখনও বলছি—এবং আমি যখন সমস্ত কথা জেনেছি তখন আমি পিতা হয়ে তোমায় সেই বিপদের মধ্যে যেতে বলবনা। সুতরাং আমি বলছি যে এইবার থেকে সময় ভেতরে যাবে ও তুমি ও আমি দুই-জনে আলাদা আলাদা গাড়ীতে বাইরে বসে থাকব, সেই ঠিক হবে নাকি মা? তা'হলে বোধ হয় আমাদের সংবাদ পাওয়ারও বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটিবেনা।"

কিছুক্ষণ পরে শুভ্রা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। মাথা তুলিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিয়া ঘড়ি দেখিল বেলা তখন প্রায় নটা। সে পিতার নিকট অনুমতি লইয়া নিজ কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। দিলীপ বাবু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার পরও অরুণের দেখা না পাইয়া নিরাশচিত্তে একটী ট্যাক্সি ডাকিয়া গৃহাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাতের নির্ম্মল আলো
মেঘ দেখি কোথা লুকাইল
ধরণীরে করিয়া আঁধার।
গুড়ি গুড়ি জল পড়ে
এ যেন ধরার পড়ে
কাহাদের অশ্রু বেদনার॥
জীবনে আজিকে কারা
ভোরে হ'ল পথহারা;
আঁধারেতে দিশা হারাইয়া,
যতদূর গিয়াছিল,
সেইখানে দাঁড়াইল
বক্ষে রুদ্ধ ব্যর্থতারে নিয়া॥
আমিও তারি একজন;
আজ ভোরে আঁধারে মগন,
পথ ভুলি দাঁড়াইয়া থাকি।
যাব যেথা ভেবেছিনু
সে আশারে ছেড়ে দিনু;
অভিমানে ভিজে গেল আঁখি॥

শ্রীদুর্ব্বাসা
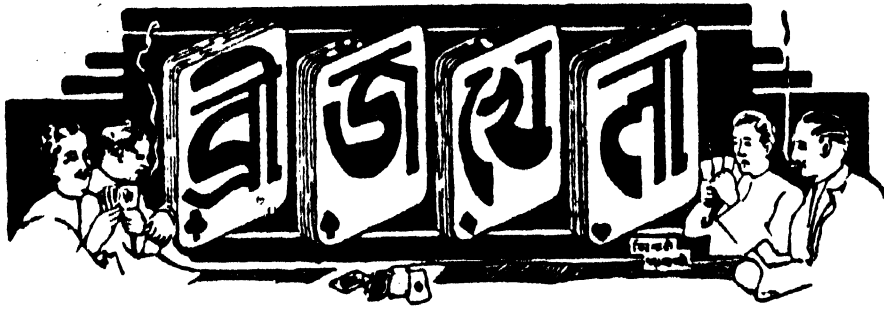
প্রতিযোগিতার একটি হাত—নিয়ে একটি হাত প্রদত্ত হল, যা' থেকে অনায়াসে আপনারা বুঝতে পারবেন, যে যে সকল হাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে খেলা করা অসম্ভব বলে মনে হয়, তাদের মধ্যে অনেকগুলি একটু ভেবে চিন্তে খেললে খেলা করা সুসাধ্য হয়ে ওঠে। এই প্রতিযোগিতার হাতটিতে এক-পক্ষ ছয়টির ডাক দিয়ে খেলা করেছিলেন, অপরপক্ষ স্লাম অবধি তো ডাকই দেন নাই, উপরন্তু যাঁরা স্লাম ডেকে খেলা করেছিলেন তাঁদের খেলার দীর্ঘ সমালোচনার পর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে খেলা করা সে হাতে সম্ভবপর। হাতটি এইরূপ,

ইস্কাবন—সাহেব, ×, ×।

হরতন—×, ×, ×, ×।

রুহিতন—সাহেব, ×।

চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, ×।

উ

ইস্কাবন—বিবি, ×, ×।

হরতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম,×,×,×।

রুহিতন—টেক্কা, ×।

চিড়িতন—দশ, ×।

এই হাতে ডাক হয়েছিল,

'দ'	'প'
একটি হরতন	পাশ
দুইটি ফেরাই	পাশ
পাঁচটি রুহিতন	পাশ
পাশ	পাশ
'উ'	'পু'
দুইটি চিড়িতন	দুইটি ইস্কাবন
চারটি রুহিতন	পাশ
ছয়টি হরতন	পাশ

এই ডাকের বিষয় আমাদের কিছু বল্‌বার নেই, কিন্তু খেলানোটি কিরূপ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা নিয়ে লিপিবদ্ধ হল।

(১) 'প' ইস্কাবনের আটা খেলে প্রাথমিক চাল দেওয়ায় 'দ' বিবি দিয়ে পিটখানি ধরলেন। 'পু' এই স্থলে ভেবে দেখলেন যে যদি তিনি ইস্কাবনের টেক্কা দিয়ে পিট ধরেন, তাহলে প্রতিপক্ষরা দুটি পিট পেয়ে যাচ্ছেন তাঁর খেঁড়ীর হাতে বিবি নাই।

(২ ও ৩) 'দ' পিট নিয়েই রুহিতনের ছোট একতাস খেলে দিয়ে রুহিতনের সাহেব দিয়ে ডামির হাতে পিট নিলেন এবং হরতনের দশ পেড়ে খেললেন। দশের ওপর 'পু'র হরতনের সাহেব পড়ে যাওয়ায় টেক্কা দিয়ে 'দ' পিটখানি ধরলেন।

(৪) 'দ' হরতনের বিবি খেলায় 'পু' হরতনের আটা, 'উ' হরতনের তিরি ও 'পু' ইস্কাবনের পাঞ্জা দিলেন।

(৫) এবার 'দ' চিড়িতনের দশ খেললে 'প' চিড়িতনের পাঞ্জা, 'উ' টেক্কা ও 'পু' চিড়িতনের চৌকা দিলেন।

(৬) 'উ'র হরতনের নয়ের ওপর 'পু' ইস্কাবনের দশ, 'দ' হরতনের দুরি ও 'প' রুহিতনের চৌকা দিলেন।

(৭) 'উ' এবার হরতনের পাঞ্জা খেললে 'পু' চিড়িতনের আটা, 'দ' হরতনের গোলাম ও 'প' রুহিতনের পাঞ্জা দিলেন।

(৮) 'দ' হরতনের সাতা খেল্‌লেন; তাতে 'প' রুহিতনের সাতা, 'উ' রুহিতনের ছক্কা ও 'পু' রুহিতনের গোলাম দিলেন।

এই স্থলে সাধারণ খেলোয়াড়েরা চিড়ি-তনের ফিনাস নেবার চেষ্টা করেন এবং তার জন্য খেসারৎ দেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐরূপ না করে 'দ'র মত খেললে অনায়াসে 'পু'র হাতের বিভাগ কি রকম বুঝতে পারি এবং তার ফলে অতি সহজেই খেসারৎএর হাত থেকে অব্যাহতি পাই। এক্ষণে 'পু'র হাতের তাসের হিসাব করে দেখা যাক। দেখা যাচ্ছে যে তাঁর হাত থেকে তিনখানি ইস্কাবন, একখানি হরতন, দুইখানি রুহিতন ও একখানি চিড়িতন খেলা হয়েছে; সুতরাং তাঁর হাতের বিভাগটি মোটামুটি ৫—১—৩—৪ বা ৫—১—৪—৩ এই ধরণের হওয়াই সম্ভবপর। তার পরের পিটগুলি দেখুন—

(৯) 'দ' হরতনের ছক্কা খেলায় 'প' ইস্কাবনের তিরি, 'উ' ইস্কাবনের নয় ও 'পু' রুহিতনের বিবি দিলেন।

(১) অতঃপর 'দ' রুহিতনের টেক্কা পেড়ে খেললেন; 'প' দিলেন রুহিতনের নয়, 'উ' ইস্কাবনের সাহেব ও 'পু' ইস্কাবনের গোলাম।

এবার দেখা যাচ্ছে ডাকদারের খেলা কত সহজ হয়ে এসেছে। এখন ডাকদার

রেডিও

সত্যভাষী

বহুদিন নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রনের পর এবারে আমরা কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামে কিছুটা রাবিশের পরিবর্ত্তন দেখেছি। নূতনত্ব হিসেবে কিছু না থাকলেও কয়েকটি প্রোগ্রাম বেশ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, অচিরেই আবার দেখবো 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই'!

* * *

বিশেষ করে আমরা প্রশংসাবাদ জানাচ্ছি বক্তৃতা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ মুখার্জ্জীকে। বক্তৃতা বিভাগের এবার বেশ কিছুটা সংস্কার সাধন হয়েছে। বর্ত্তমান সমাজের কয়েকটী দিকের আলোচনা এবার আমরা পেয়েছি। মিঃ হুমায়ুন কবীরের সাহিত্য আলোচনা সাহিত্য রসিকজনোচিত।

* * *

নটসূর্য্য শিশির কুমারকে বক্তৃতার আসরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বক্তৃতা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের জীবনী আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল। তবুও যোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই আলোচিত হচ্ছে।

* * *

আমরা চাই বেতারে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। এবারে মিঃ মুখার্জ্জীর পরিকল্পনা দেখছি সেই দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে।

* * *

শ্রীযুত বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতির বক্তৃতায় অন্ততঃ রসানুভূতির পরিচয় থাকবে একথা জোর গলাতেই বলা চলে।

* * *

বেতারে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা শুনতে আমরা চাই। সমাজের নানা দিকের নানা সমস্যা জীবনের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ—নানা ঘাত প্রতিঘাতের বিকাশ চাই আমরা বেতারে বাণীর মধ্যে। জাতীয়তা আজ আমাদের কোথায়? ভারতীয় কৃষ্টি-শিক্ষার সুষ্ঠ পরিচিতি দিনের পর দিন বেতার আমাদের দিয়ে যাবে এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

যন্ত্রীসঙ্ঘের অর্কেষ্ট্রা বেশ শ্রুতিমধুর হচ্ছে কিন্তু তারকনাথ দের পাটি যাত্রায় প্যাচ সুরু করেছে।

শ্রীযুত বীরেন ভদ্রের পরিচালনায় বেতারে এবার আমরা একখানি উচ্চাঙ্গের নাটকের অভিনয় শুনেছি। "নিবেদিতা" এককথায় সুন্দর। মিঃ ভদ্রের অভিনয় রতিকান্ত—উপভোগ্য তবে মাঝে মাঝে চীৎকার কর্ণ-

---

যদি অনায়াসে ইস্কাবনের পিট খানি 'পূ'র হাতে তুলে দেন, তা হলে 'পূ' বাধ্য হয়ে চিড়িতন খেলবেন, ফলে ফিনাস না নিয়েও অনায়াসে আপনার ডাক অনুযায়ী খেলা সম্পন্ন হবে।

'প'

ইস্কাবন—x, x।
হরতন—x, x, x।
রুহিতন—x, x, x, x, x।
চিড়িতন—x, x, x।

পশ্চিম ও পূর্ব্বের হাত দুখানি এইরূপ—

'পূ'

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, দশ, x, x।
হরতন—সাহেব।
রুহিতন—বিবি, গোলাম, x।
চিড়িতন—বিবি, নয়, x, x।

কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিজেন—মনে যা আছে তা বললেই হয়। বাধা কি আছে ?

কাশী—বাধা। —বাধা আমি নিজে।

দ্বিজেন—তুমি নিজে !

কাশী—হ্যাঁ দ্বিজেন। হেসো না। একটা অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল ফুটে আছে আপন গরিমায় ! আমি তাকে নষ্ট কোরতে চাইলেও—পারি না !

দ্বিজেন—ফুল যদি ফুটে আছে আপন গরিমায়, কেনই বা তুমি তাকে নষ্ট কোরতে চাইবে ?

কাশী—মানুষের স্বভাবের দোষে। মানুষ শুধু ফসল দেখেই তৃপ্ত হয় না ; দেখতে চায় কোন মাটি থেকে তার উদ্ভব ! বিচার কোরতে চায় তার সুন্দর হওয়া সঙ্গত কিনা !

দ্বিজেন—তোমার আবছাওয়া কথা বুঝলাম না। হয় পরিষ্কার কোরে বলো, না হয় আমায় যেতে দাও। দাদার কাছে সুনীলা ছাড়া আর কেউ নেই।

কাশী—না, আমি কিছু বলতে চাইনা। তুমি যেতে পার।

(দ্বিজেন প্রস্থানোদ্যত)

কাশী—একটা কথা দ্বিজেন—

(দ্বিজেন ফিরিল)

একটা ভারী নিষ্ঠুর কথা জিজ্ঞাসা কোরব, আমায় জবাব দিতে হবে।

দ্বিজেন—নিষ্ঠুর কথা ! আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস না কোরলে হয় না ?

কাশী—না তুমি ছাড়া আর কাউকে সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি না।

দ্বিজেন—দাদাকে ?

কাশী—কাউকে না। শুধু পারি তোমাকে।

দ্বিজেন—বলো তা হলে, শুনি।

কাশী—(এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন)

আমার যদি ধরো সহসা মৃত্যু হয়—

(দ্বিজেন প্রস্থানোদ্যত)

দ্বিজেন আমার যা জানবার আছে তা জানতে পারলাম না !

দ্বিজেন—আমি জানতে পেরেছি, কিন্তু এ কথার উত্তর আমি দিতে পারবো না।

কাশী—তুমি জানতে পারনি দ্বিজেন। শুধু মৃত্যুর কথা আমি বলতে চাইনি। আমি শুনতে চেয়েছি আমার মৃত্যুর পরের কথা।—আমার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বা পারলৌকিক সমস্ত কাজ কে কোরবে দ্বিজেন ? তুমি কোরবে ত' ?……

(দ্বিজেনের প্রস্থান)

চলে গেল ! শুনতে চায় না !

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগমায়া—পাগল ছাড়া এ কথা আর কেউ শুনতে চাইবে না।

কাশী—এই যে তুমি উঠেছ ! খবর কি তাই বলো ?

যোগমায়া—তোমায় ডাকছে। একবার তার কাছে এসো।

কাশী—না, —আমার যাবার দরকার নেই।

যোগমায়া—আজও এ কথা তুমি বলতে পারলে ?

কাশী—আমি বলেই বললাম। আর কেউ হলে এ কথা বলতে পারতো না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে তোমার পরামর্শই শুনতো।

যোগমায়া—তোমার চক্ষুলজ্জাও কি নেই ?

কাশী—ছিল, কিন্তু যেতে বলেছে ; দিলীপের চোখের উপর চোখ রেখে চোখের লজ্জা ভেঙ্গে যেতে বলেছে। সত্যভাষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে তার জন্ম ! মিথ্যা, ছলনা আর চলবে না !……

যোগমায়া—থাক্ ও সব কথা। তোমার মাথার ঠিক্ নেই।

(প্রস্থানোদ্যত)

কাশী—হয়তো সে কথা সত্য যোগমায়া ! কিন্তু কেন, জানো ?

(যোগমায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল)

আমি আর পারছি না। তাই আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তার মুখের দিকে চাইলে আমার কষ্ট হয়। —মনে

পীড়াদায়ক। নিবেদিতার গান খানি থার্ড-ক্লাশ।

* * *

১৪ই জুলাই, ১৯৩৮, বৃহস্পতিবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ৫-৩০ থেকে ৬-৩০ পর্য্যন্ত শ্রীযুত ফণী গুপ্ত ও তাঁর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "মেঘ" নাটিকা অভিনীত হ'ল। লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ রচনায় সাহিত্য রসপুষ্ট। আশাকরি এইরকম শিক্ষামূলক নাটক আমরা প্রায়ই বেতারে শুনতে পাব। সঙ্গীত পরিচালক শ্রীরবীন্দ্র রায়ের সুরসংযোজনা সত্যিই প্রশংসনীয়। কুমারী কণ্ঠরাণী ঘোষের গান বেশ শ্রুতিমধুর। কুমারী রমা গুপ্তের অভিনয় মন্দ নয়। আর আর অভিনয় মোটামুটি ভালই।

হয় সে সব বুঝতে পেরেছে, শুধু আমার মুখের কথা শোনবার জন্ম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরে আছে।

যোগমায়া—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যে কথা সে ত্রিশ বৎসর শুনতে পায় নি, আজ তার সে কথা না শুনলেও চলবে। সুতরাং মিনতি করি, চুপ করে থাকো।

কাশী—কিন্তু তার দৃষ্টির টানে সত্যভাষণ উদগ্রীব হয়ে আছে। সত্যকার পরিচয় তাকে পেতেই হবে, আমাকে দিতেই হবে। পরিত্রাণের পথ নেই যোগমায়া!

যোগমায়া—কিন্তু কি তুমি পাবে সত্যকার পরিচয় তাকে জানিয়ে দিয়ে—তার হিসেব রেখেছ?

কাশী—কিছুই পাবনা। হয়তো সব আমার হারিয়ে যাবে। সব। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনের খাতাখানা পরিস্কার রেখে যেতে চাই। আর কিছু চাইনা।

যোগমায়া—তুমি কি দিলীপকে সব কথা বলে দিতে চাও?

(বলিয়া বিবর্ণ মুখে চাহিয়া রইলেন)

কাশী—সব কথা বলে দিতে চাই। সমাজকে আর ঠকিয়ে রাখতে চাইনা।

যোগমায়া—বেশ, বলে দিও।

(প্রস্থানোদ্যত)

কাশী—কিন্তু তুমি চলে যেতে পাবেনা। তোমায় বেঁচে থাকতে হবে।

যোগমায়া—দিলীপের অসতী মা হ'য়ে বেঁচে থাকবো? দিলীপ এসে আমায় জিজ্ঞাসা কোরবে "মা, এ সত্যি? আমি বলবো—"হ্যাঁ, এ সত্যি, তারপর আবার বেচেও থাকবো?

(এই বলিয়া যোগমায়া কঠিন দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া রহিল)

কাশী—মৃত্যু যদি কামনা করো, মৃত্যু আসতে বিলম্ব হবেনা। আহ্বান যদি করো, তোমার সঙ্গে আমিও সেই অজানা পুরীর মাঝখানে গিয়ে হাজির হতে পারি! —কিন্তু খাতাখানা পরিস্কার রেখে যেতে চাই যোগমায়া, আর কিছু চাইনা। আজ সংসারের লোকেরা, ছেলে মেয়েরা জানে আমি নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। নিরপেক্ষতা বলে কোন বস্তু আমার ভেতর নেই। তার জন্ম আমার না আছে দুঃখ, না আছে ক্ষোভ।—কিন্তু মানুষকে ঠকিয়ে আর আমি সমাজের ভেতর থাকতে চাইনা। তুমি যা কোরেছ, বা, আমি যা করেছি তা আমাদের ভেতরই নিবদ্ধ থাক্‌লে কথা ছিলনা; কিন্তু—

যোগমায়া—কিন্তু?

কাশী—কিন্তু যে রক্তপ্রবাহকে আমি অবৈধ বলে জানি, তাকে আমার বংশের ধারার সঙ্গে কি কোরে মিশিয়ে দিতে পারি? যে মিথ্যাকে আমি ইহলোকে স্বীকার কোরে নিলাম, পরলোকে তাকে স্বীকার করা যাবেনা। সেখান থেকে আমার চেয়ে থাকতে হবে দ্বিজেনের হাত দুটির দিকে! দিলীপ আমায় তখন পরিতৃপ্ত কোরতে পারবেনা যোগমায়া; পারবে শুধু ঐ দ্বিজেন!

যোগমায়া—এতো যদি বুঝেছিলে, তবে সেদিন কেন আমায় ক্ষমা কোরেছিলে যে দিন তোমার কাছে আমি প্রথম এলাম? সেদিন কেন তুমি আমায় লাঞ্ছিত কোরে ঘরের বাইরে বার কোরে দাওনি? স্নেহের আবরণ দিয়ে কেন তুমি আমার এই কলঙ্কের স্তূপ ঢেকে রেখে দিতে চাইলে?

কাশী—কলঙ্কের জন্ম এক নারীকে সমাজের বাইরে ছুড়ে ফেলে দিতে আমার মন চায়নি সে দিন। তা ছাড়া, যে কাহিনী তুমি আমায় কাছে সে রাত্রে উদ্‌ঘাটিত কোরেছিলে তাতে আমি ক্ষুব্ধ হ'তে পারিনি, বরং আমার বিস্ময় লেগেছিল তোমার অন্তরের নির্ম্মলতায়। যৌবনের মহিমায় আমি সেদিন তোমায় হয়তো অসতী বলেও ভাবতে পারিনি—আজও হয়তো ভাবিনা—কিন্তু পৃথিবীর অভিজ্ঞতা আমায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ কোরে এনেছে। আজ আর আমি সে কাশীশ্বর নই যোগমায়া! যে সাধুর সন্তানকে আজ এই ত্রিশ বৎসর—কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

(দিলীপের প্রবেশ)

যোগমায়া—দিলীপ! দিলীপ দাড়িয়ে!

(মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধির মত অবস্থান করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল)

কাশী—দিলীপ তুমি কতোক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আছো?

দিলীপ—যেখান থেকে আপনি দিলীপকে সব কথা বলে দিতে চেয়েছেন সেইখান থেকেই আমি আছি।

কাশী—না, না,—আমি কিছু বলতে চাইনি। সব মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা—

(প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

আগামী ছবির কথা

বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

প্রশ্নের জবাব নানাজন নানাপ্রকার দিবেন। তাহার মধ্য হইতে ঠিক জবাব কি হইবে, তাহা বাছিয়া লওয়া হয়ত আমাদের পক্ষে সহজ না হইতেও পারে। একদল হয়ত বলিবেন—বর্ত্তমান সভ্যতার মাঝে বাস করিতে হইলে আমাদের মনের সহজ প্রকাশ চলিবে না। সমাজ কি চায়, সভ্যতা কি চায়, লোক কি চায় এই সব বিষয় ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে। আর একদল বলিবেন যে সভ্যতা বা সমাজ যাহাই হউক—মানুষ নিজের সহজ প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার মতেই চলিবে। মনের ভাব প্রকাশে তাহার কোন বাধা মানিবার প্রয়োজন নাই। এই দুইএর মধ্যে কোন পথ সত্য, কোন পথ শ্রেয় তাহা বলা শক্ত, দুইদলের মনের মিল হওয়া আরো শক্ত। 'অধিকার' চিত্রেও ঠিক এই রকম একটি প্রশ্ন আছে। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া কেমন করিয়া কোন পথে যে তাহার সমাধান দেখাইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে সমস্যার সমাধান তিনি যেমন ভাবেই দেখান—তাহার কারণও তিনি আমাদের অবশ্যই দেখাইবেন, এ আশা আমরা করিতে পারি। আলোচ্য চিত্রে বর্ত্তমান সমাজের সম্পর্কে আরো নানাপ্রকার প্রশ্ন আছে—প্রশ্নের জবাবও আছে। ক্রমে ক্রমে আমরা সেই সব পাঠকমহোদয়গণের গোচরে আনিব।

* * *

'দেশের মাটি' ছবিখানি লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা চলিতেছে। সকলেই এই চিত্রে নূতন কিছু পাইবার, নূতন কিছু দেখিবার আশা করিয়া আছেন। তাঁহাদের এই আশা যে সার্থক হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। যে কাহিনী, যে তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া দেশের মাটির আখ্যানভাগ রচিত হইয়াছে, তাহা পরম মনোহর একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের দেশে বর্ত্তমান অন্নসমস্যা ক্রমশই ভীষণতর হইতেছে। এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে সম্ভব হইতে পারে, দেশের মাটি চিত্রে তাহারই সামান্য কিছু দেখানো হইবে। দেশে কর্ম্মশক্তির অভাব নাই, কাজ করিবার লোকেরও অভাব নাই, অভাব কেবল পথ দেখাইবার লোকের। এমন পথপ্রদর্শক আমাদের এখন প্রয়োজন, যাহারা সত্য পথই দেখাইবেন। দেশের দুঃখ মোচনের হয়ত নানা পথ, নানা পন্থা আছে, কিন্তু আমাদের তাহার মধ্য হইতে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রকৃষ্ট পথই আশ্রয় করিতে হইবে। দেশের মাটি চিত্রে এই ইঙ্গিত আছে। দেশের মাটি চিত্রখানি শীঘ্রই চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে। সুতরাং এই ছবির বিষয় বর্ত্তমানে অধিক বলার কোন প্রয়োজন নাই। এই চিত্রখানি তুলিতে নিউ থিয়েটার্স যে ভাবে তাহার সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছে, তাহাতে এই চিত্রের বাণী, ইহার আশার কথা, নবকর্ম্মপ্রেরণার ইঙ্গিত সকল দর্শকচিত্তে নবতর আনন্দ সঞ্চার করিবে—এ আশা আমাদের দুরাশা নহে। ইহা সার্থক হইবেই।

* * *

কণীবাবুর ষ্ট্রীট সিঙ্গার প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কণীবাবু বাহিরে কতকগুলি লোকেশন খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। এইবার এই সকল লোকেশনে কাজ হইবে। আলোচ্য ছবিতে সঙ্গীত-বাদ্যের দিকটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বে সুর-সম্পদে পূর্ণ এমন ছবি খুব বেশী হয় নাই। যে চিত্রের নায়ক সায়গল এবং নায়িকা কানন, সে চিত্র যে সঙ্গীতে কেমনতর হইবে, তাহা বোধ হয় আমাদের পাঠকগণকে বেশী বলিবার প্রয়োজন হইবে না। এই চিত্রের কাহিণীও অতি বিচিত্র, এবং তাহা পাঠকবর্গের অনেকেই জানেন। বর্ত্তমানের এই চিত্রের নায়ক-নায়িকার জীবনে বিচিত্র ঝড় উঠিয়াছে। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস, প্রেম এবং সন্দেহ এই সকল প্রণয়ীযুগলের মনে এক অতি বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা বাল্যকাল হইতে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে, আজ কেন সেই আশ্রয় বৃন্তে তাহাদের সংশয় জাগিয়াছে? বাহির জগতের ছোঁয়াচ লাগিয়া আজ তাহাদের অন্তরের এ-পরিবর্ত্তন কেন দেখা যাইতেছে? সায়গল ও কানন দুইজনেই এই বিচিত্র মানসিক অবস্থার রূপ চিত্রে যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গত সপ্তাহে এই দুইজন প্রখ্যাত শিল্পীর কয়েকটি সঙ্গীত শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এ সঙ্গীতের ভাষা নূতন, ভাব নূতন, সুর নূতন—ইহা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। মনে হইল রাইচাঁদ বড়াল যেন নিজের অন্তরে সঙ্গীত দেবতার নব-আবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন। সুর-শিল্পী হিসাবে রাইবাবুর অদ্বিতীয় স্থান এই চিত্রে আবার প্রমাণিত হইবেই।

নিউ থিয়েটার্সের "অধিকার" চিত্রে যমুনা, বড়ুয়া, মেনকা। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া।

পরিচালক

ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ত্রিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই শ্রাবণ ১৩৪৫, ২৮শে জুলাই ১৯৩৮

স্বরূপ ফুটিল

কর্পোরেশনের আগামী নির্ব্বাচন উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির উপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় সশস্ত্র নিরপেক্ষতার আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা প্রীত হইয়াছি যে কিরণবাবুর কষ্ট-সংরক্ষিত মুখোস সত্বর খসিয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত বিরোধিতাকে নিরপেক্ষতার আবরণে পোষণ করিয়া কিরণবাবু রাষ্ট্রপতিকে যে বিভ্রান্ত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন তাঁহার সেই সযত্ন-প্রসারিত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হইয়াছে দেখিয়া বাংলা কংগ্রেসের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই আশ্বস্ত হইবেন।

নিরপেক্ষতার অজুহাতে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যালের এ্যাসেসার পদটী লাভ করিয়া তাহার পর প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করিবার গোপন বাসনা কিরণবাবু মনের কোণে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিগত অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করার প্রস্তাবে কিরণবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ পরিহার করিয়া ফেলিলেন।

কিরণবাবুর তল্পিদাররূপে বহু চিহ্নিত ব্যক্তিই সুভাষচন্দ্রের উপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় নলিনী-বিধান-কিরণের "অন্তরঙ্গ" সংবাদপত্র "অমৃতবাজার", বিধানের কৃপা-পুষ্ট "ফরওয়ার্ড"ও বিধান-শিষ্য-প্রতিপালিত "যুগান্তর" সমস্বরে এই প্রস্তাবকে "অশোভন ও অসঙ্গত" বলিয়া প্রচার করিতে সুরু করিয়াছেন।

বাংলা কংগ্রেসে যে বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ডিক্টেটারী শাসনের উপযোগীতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। গণদেবতার নামে যখন ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতজনিত কলকোলাহল তাণ্ডবতায় পরিণত হয়, তখন সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আদর্শচ্যুত কংগ্রেসীকর্ম্মীবৃন্দের বিভিন্ন স্বার্থের ইন্ধন যোগাইতেছেন কংগ্রেস-বিরোধী বিত্তশালী ব্যক্তি বিশেষ ও তাঁহার স্নেহবদ্ধ ছদ্মবেশী কংগ্রেসী-নেতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ। গণতন্ত্রের আদর্শ যখন ভাগ্যান্বেষীর কবলে নিবদ্ধ তখন সেই আদর্শকে পরিপূর্ণ দীপ্তিতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিধর নেতৃত্বের কঠোর একনায়কত্ব। বাক্য-বিন্যাসের মোহমন্ত্রে বা চুক্তির বেড়াজালে বাংলা কংগ্রেসে গণতন্ত্রের আদর্শকে সন্নিবেশিত করিবার মোহনীয় চেষ্টা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে যে কিছু কালের জন্য চাপা দেওয়া স্বার্থ-দুষ্ট কলহ পুনঃ পুনঃ উগ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে বিগত কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতির মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্রের উপর অনুরূপ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও সুফল ফলে নাই। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, শরৎচন্দ্র সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই—মিলন-মোহ-মুগ্ধ

শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক বিচক্ষণতার ও দূরদৃষ্টির অভাবে যে সমস্ত ব্যক্তি মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা যে অদূরভবিষ্যতে তাঁহারই বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহা তিনি বুঝেন নাই। যাঁহাদের তিনি মনোনয়নের ছাপ দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেই যে ছদ্মবেশী বিধান-পন্থী বিদ্যমান ছিলেন তাহা তিনি তখনও বুঝিয়া বুঝেন নাই। তবে শরৎচন্দ্রের পক্ষে যাহা হয়ত অসম্ভব সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তাহা নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং শরৎচন্দ্রের ব্যর্থতার নজীরে সুভাষচন্দ্রের উপর ক্ষমতা অর্পণের জন্য কুণ্ঠাবোধ করা সমীচিন নহে।

সুভাষচন্দ্রের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে আমরা ভরসা রাখি তাহা তিনি সুচারুরূপে পালন করিতে সক্ষম হইবেন।

সাহিত্যের কষ্টি পাথর

অশনি

মুর্গী-মার্কা সাহিত্যিকদের কারসাজি

শনি—পাপগ্রহ। রবির সন্তান হইলেও সে রবি-বিদ্বেষী। পিতৃ-নিন্দায় তাহার অপার আনন্দ! শ্রীর সঙ্গে তাহার চির বিরোধ। শিবও শনির চক্ষু-শূল! মঙ্গলের রূপ সে সহিতে পারে না; তাই তাহার চক্ষে চির আবরণ! সুতরাং সাহিত্যের ঘরে—যেখানে সত্য, শিব ও সুন্দরের সমাবেশ—সেখানে যদি শনি দেখা দেয়, তবে সেটাকে "গুরু-চণ্ডাল-যোগ" বলিতে হইবে। এই যোগ সাহিত্যের পক্ষে সাংঘাতিক। সাহিত্য-মন্দিরে শনির পাপ-অনুচরেরা প্রথমে সূচ হইয়া ঢোকে, তার-পর ফাল্ হইয়া বাহির হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য বেশী দূর কাহাকেও যাইতে হইবে না। বাঙ্গলার সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-ক্ষেত্রের প্রতি একটু তাকাইয়া দেখিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ উভয় স্থানেই কয়েকটা সূচ ফাল হইবার জন্য ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে!

তবে ইহাদের মধ্যে সকলেই যে সমান ভাবে সতেজে ফুলিতেছে, তাহা নহে। বরং বলা যায়, কেহ কেহ কুপ-মণ্ডূকের ন্যায় ফুলিতে ফুলিতে ফাটিতে আরম্ভও করিয়াছে। ঢাকার নরসুন্দকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমাদের কথায় সায় দিবেন। তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই নরসুন্দরটি নিজেকে সত্য-সুন্দরের দাস বলিয়া যতই ঘোষণা করুক —ডাক ডাকিবার সময়ে তাহার মুর্গী-মূর্ত্তিই প্রকট হয়। তাহার এই কয় ছত্র "সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাহাদের স্থান নাই বলিলে হয়, যাহারা মূর্চ্ছিত শিবের বুকে উলঙ্গিনী কালীর মত, বাংলার এই আধুনিক বিদ্যা-বুদ্ধি, চরিত্র ও পৌরুষহীন পুরুষ-সমাজের বুকে নির্লজ্জভাবে নৃত্য করিতেছে, শরচ্চন্দ্র হইয়াছেন তাহাদের দরদী প্রাণ-সখা।"—(শনিবারের চিঠি)—যদি পাত্রী সাহেবেরা পড়েন, তাহা হইলে তাঁহারা শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে কি ভাবিবেন, জানি না; তবে এই লেখকের মধ্যে তাঁহারা বর্দ্ধমানের James Stewart যিনি হিন্দুর "দেব-দেবী বিষয়ক বিবরণ" লিখিয়া বহুদিন হইল মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই আত্মার প্রবল প্রেরণা দেখিতে পাইয়া যে পরম পুলকিত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর যাঁহারা বলেন—"নিবিড় আঁধারে মাগো চমকে অরূপ রাশি"—তাঁহারা ঐ কুৎসিত উপমা দেখিয়া লেখককে লজ্জা দিবার বা ঘৃণা করিবার মতন ঠিক ভাষা বোধ হয় খুঁজিয়া পাইবেন না। যাহা হউক, একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, এই অসত্য অসুন্দর ভাবের যত কিছু nonsense, তাহা এক মুর্গী-মার্কা "শনিবারের চিঠি" ছাড়া আর কোথাও এপর্য্যন্ত ছাপার অক্ষরে জাহির হয় নাই।

তবে ভবিষ্যতের কথা কিছুই বলা যায় না। কারণ, পার্শীবাগানের সেই উড়ে মালীই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এখন প্রধান মুরুব্বি! পরিষদে রামেন্দ্র-যতীন্দ্র নাই। সুরেশ-পাঁচকড়িও নাই। কাজেই পরিষদের সদরে যে আবর্জ্জনারাশি ছাপাইয়া এই গৌরব-গবেষক তাহার প্রভু-প্রবাসীর ও তাহার প্রাণ-সজনীর ছাপা-খানার প্রাণে যে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে, তাহাতে বাধা দিবে কে? কি গুণে যে ইহার "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" "সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত হইল, তাহা কে বলিবে? এই পুস্তকে বাঙ্গালার অভিনয়-পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনও কথা নাই, বাঙ্গালা নাটকের কোনও আলোচনা নাই, —থাকিবার মধ্যে আছে কেবল কতকগুলা ভুল সংবাদ ও তীব্র গিরিশ-বিদ্বেষ।

আগামী বারে এই গ্রন্থের পরিচয় আমরা দিব; তা' ছাড়া এই লেখকের ভাষার মধ্যে কত রকম যে মুন্সীয়ানা আছে, কত লেখকের ভাষা যে উঁকি মারিতেছে, তাহারও বিবরণ ক্রমে ক্রমে দিব। এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, বঙ্কিম-সাহিত্যও যে এই অপগণ্ডদের হাতে পড়িয়া নাস্তানাবুদ হইবার আয়োজন হইয়াছে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন না। যে ব্যক্তি "শনিবারের চিঠির" 'সত্যসুন্দর দাস', সেই ব্যক্তিই ইহাদের "দরদী প্রাণসখা"। সুতরাং শুনিতেছি, তাহারও লিখিত 'ভূমিকা' পরিষদ হইতে মুদ্রিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। ইহা অপেক্ষা বঙ্কিমের অসম্মান আর কি হইতে পারে? শনিবারের চিঠিতে এই লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের যেরূপ শ্রাদ্ধ করিয়াছে তাহা তাহার দাদা সুশীলের লেখাকেও টেক্কা দিতে পারে। এই জঘন্য রচনার পরিচয়ও আগামী সংখ্যার 'খেয়ালীতে' আমাদের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, বঙ্কিমের শততম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্কিম-সাহিত্য কি এই মুর্গী-মার্কা সাহিত্যিকদের কবলে পড়িয়া কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত হইবে? হীরেন্দ্রবাবু এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাকেই আমরা অনুরোধ করিতেছি, তিনি এই পাপ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, তাহার উপায় করুন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল। শনির পাপ-অনুচরেরা বঙ্গসাহিত্যের গণেশ-রূপী বিদ্যাসাগরের কি দুর্দ্দশা করিয়াছে, তাহর কথাও আলোচনার বিষয়। সে আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু সম্প্রতি। বঙ্কিম-সাহিত্যের জন্যই আমরা উদ্বিগ্ন বঙ্কিমের যাহারা ভাষা জানে না, ভাব বুঝে না, তাহারা যদি বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক হয়, তবে সেটা শুধু বঙ্কিমের দুর্ভাগ্য নয়, বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যেরও পরম দুর্ভাগ্য মনে করিতে হইবে।

* * *

সাহিত্য-সংসারে শনির কারসাজি ক্রমশঃই ধরা পড়িতেছে। নির্জ্জলা নীচতা কতদিন ঢাকা থাকে? ইহাদের আহাম্মুকি ও বাচালতা যাহারা এতদিন উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারও আর নীরব থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন না। যেখানে উপেক্ষা করার নাম পাপের প্রশ্রয় দেওয়া, সেখানে উপেক্ষা উদারতা নহে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগরের ন্যায় প্রবীন ব্যক্তি ইহাদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ইহাদের নীচতাটুকু বেশ ধরাইয়া দিয়াছেন। গত সপ্তাহের "আনন্দবাজার পত্রিকায়" তাঁহার যে সুলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মহাশয়,—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-তারিখ সম্পর্কে "আনন্দবাজারে" ৩রা জুলাই তারিখে প্রেরিত এবং ১২ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত আমার পত্রের উত্তরে ১৪ই জুলাই তারিখে শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রে আমার প্রতি সজনীবাবুর শ্লেষ এবং বক্রোক্তিগুলি বাদ দিয়া মোট বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, বঙ্কিমবাবুর জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে প্রচলিত ভুল তিনিই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমি তাঁহারই কৃতিত্ব আত্মসাৎ করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছি। এমন কি আমাকে উপলক্ষ করিয়া 'আনন্দবাজার' সম্পাদকের প্রতিও তিনি অকারণ বক্রোক্তি করিতে ছাড়েন নাই। এ বিষয়ে আমার একটু বক্তব্য আছে:—

(১) সজনীবাবু বলিতেছেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথম ৩রা জুলাই তারিখের চন্দননগরে বঙ্কিম স্মৃতি-সভায় এই ভুলের উল্লেখ করেন। আমার নিবেদন এই, আমি ১লা জুলাই তারিখে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশিত এক পত্রে এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মাত্র তাহাই নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোষ্ঠী হইতে প্রাপ্ত প্রকৃত জন্ম-তারিখও তাহাতে প্রকাশ করি। আশা করি, ইহার পর সজনীবাবু আশ্বস্ত হইতে পারিবেন যে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে কাহারও কৃতিত্ব আত্মসাৎ করি নাই।

(২) সজনীবাবু বলিতেছেন, "৬ই জুলাই আনন্দবাজারে আমিই সর্ব্ব-প্রথম এই বিষয় লিখি।" আমার নিবেদন এই, তাঁহার লিখিবার ৩ দিন পূর্ব্বে আমার পত্র আনন্দবাজারে প্রেরিত হইয়াছিল আমার সৌভাগ্যক্রমে লিখিবার তারিখটিও (৩-৭-৩৮) পত্রের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। সজনীবাবু তাহা লক্ষ্য করেন নাই; করিলে তাঁহাকে অকারণে মনোকষ্ট পাইতে হইত না।

(৩) নিজ-সম্পাদিত "শনিবারের চিঠির" ভুলের সাফাই করিবার জন্য সজনীবাবু বলিতেছেন, বঙ্কিমের জন্মতারিখের ভুল "বিগত ১০০ বৎসরের ভুল।" ইহা অসম্ভব কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে নিশ্চিতই কেহ তাঁহার জন্ম-তারিখ লইয়া ভুল করিতে সাহস করেন নাই। বিশেষতঃ তাঁহার কোষ্ঠী রহিয়াছে। ১৮৯৪ সালে তাঁহার মৃত্যুর পরে যে দিন হইতে অতিরিক্ত উৎসাহী গবেষকগণ এই কার্য্যে হাত দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই ভুলের সূত্রপাত। ইহা বড় জোর ২০।২৫ বৎসরের ভুল হইতে পারে। সজনীবাবু "সাহিত্য পরিষদে" বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক। "পরিষদের" প্রদর্শনীতে বঙ্কিমবাবুর কোষ্ঠী সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই নজরে পড়া উচিত ছিল। উহা যে অগ্রে আমারই নজরে পড়িয়াছে, ইহা নিশ্চিতই আমার অপরাধ নহে।"

কিন্তু উচ্চৈশ্রবা মহাশয় ভুলিয়া যাইতেছেন—অপরাধ তাঁহারই ষোলআনা, যেহেতু তিনি শনির কারসাজি এমন সুচারু-রূপে ধরাইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর "বঙ্গবাণী"-র স্থায় প্রাচীন ও নিরপেক্ষ পত্র অপর এক শনৈশ্চর সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহাও শুনিয়া রাখুন। গত সপ্তাহের "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন:—"ভাল জিনিষের আদর হইতে দেখিলে, কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু হয়ত আমাদের এ কথা বলা সর্ব্বাংশে ঠিক হইল না। কারণ, শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে 'বঙ্কিম-পরিচয়ে'র যে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া মনে হইল যে, ঐ সমালোচনা-লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ততঃ আনন্দ হয় নাই। পরন্তু তাঁহার লেখাটি গভীর উদ্দেশ্যমূলক বলিয়াই মনে হয়। তিনি মূল পুস্তকের কোনও গুণই দেখিতে পান নাই, কেবল পরিশিষ্টেরই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ-শেষে নিবিষ্ট পরিশিষ্টের কয়খানা পাতায় কোথায় কি তারিখের সামান্য ইতরবিশেষ আছে, তাহাই ইহার আলোচনার বিষয় হইয়াছে। অবশ্য আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি, তারিখ সম্বন্ধে দুই একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে বটে। বাকি ভুল, যাহা ব্রজেন্দ্রবাবু অতি উল্লাসের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্যই ভুল কিনা, তাহা এখনও বিচারসাপেক্ষ।

সমালোচক প্রথমেই লিখিয়াছেন—"বঙ্কিম-জন্ম শতবার্ষিক" (?) উপলক্ষে যে কয়েকটি স্থায়ী কাজের চেষ্টা হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ রচনাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ-চেষ্টা উল্লেখযোগ্য।" ব্রজেন্দ্রবাবু সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক কর্ম্মচারী কিনা, জানি না। তবে পরিষৎ কর্তৃক বঙ্কিমের সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশের সম্পাদনভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে, তিনিও তাঁহাদের মধ্যে একজন। অতএব তাঁহার সমালোচনার প্রারম্ভেই সাহিত্য-পরিষদের ঐ প্রচেষ্টার ঢক্কানিনাদ করা, তাঁহার আত্মপ্রশংসারই নামান্তর হইয়াছে।"

কিন্তু এক লজ্জা পরিহার করিয়া ত্রিভুবন-বিজয়ী হইবার স্পর্দ্ধা করা যাহাদের স্বভাব, "বঙ্গবাণী" তাহাদের কতটুকু লজ্জা দিতে পারেন। আমরা শুধু ভাবিতেছি এই অতিকায় নির্লজ্জতা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় সম্পাদিত "প্রবাসী"তে বাহির হইল কিরূপে? বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে ছোট করা এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রাসাদাৎ ব্রজেন্দ্র কর্তৃক ব্রজেন্দ্র-কীর্ত্তির ঢক্কানিনাদ করা—ইহা কি পাকা ব্যবসাদারের কাজ নহে? ভৃত্য কি মনিবের নিকট এতটুকু সহবৎ শিক্ষাও লাভ করেন নাই? আমাদের মনে হয় রামানন্দবাবু গভীর উদ্দেশ্য-মূলক তথা বিদ্বেষ-প্রসূত এই সমালোচনা প্রকাশের কথা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই; তাহা হইলে, কখনই তিনি এই অপকর্ম্মের ভাগী হইতেন না।

গোপন সাধ

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কবিভূষণ

ধূলি হয়ে রইব পড়ে' তোমার পথের মাঝে
দলে যেও চরণ তলে আঁধার মলিন সাঁঝে।
পেয়ে তোমার মধুর পরশ
হৃদয়ে মোর জাগবে হরষ
জীবন আমার সফল হবে আনন্দে ও লাজে:
আঁধারতলে মোদের গোপন-মিলন বাঁশী বাজে।

২

আমি হব তোমার হাতের পাগলকরা বাঁশী,
দিনের শেষে করবে পরশ সকল ব্যথা নাশি,
দুঃখ আমার রইবে দূরে
তোমার করুণ মিলন সুরে
তোমার হাতের মধুর পরশ বাধবে আমায় আসি,
আদর করে চুমবে আমায় হেসে প্রেমের হাসি।

চেম্বারলেন এবং মধ্য ইউরোপ

বলকানে বৃটিশ প্রভাব

সচী শীল

সম্প্রতি বলকান রাজ্যগুলিতে বৃটেন নিজের প্রভাব বাড়াবার খুব চেষ্টা করছে। টারকীকে এর মধ্যেই সে হাত করে ফেলেছে এবং একটা বড় রকমের Loan দিয়ে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করে নিয়েছে। রুমানিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ইংলণ্ডে এসে বৃটিশ কর্ত্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন—উদ্দেশ্য নাকি ঐ একই। এইভাবে টাকা দিয়ে যদি বলকান রাজ্যগুলোকে হাত করা যায় ত মন্দ কি? ফ্যাসিষ্টরা ত আর টাকা দিয়ে এদের বন্ধুত্ব কিনতে পারে না। উল্টে এদের অনেকেরই কাছে তারা ঋণী। মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের নেতারা ইংলণ্ডকে আর্থিক সাহায্যের জন্ত আবেদন জানিয়েছিলেন, এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ আবেদনকে একটা বিশিষ্ট সুযোগ হিসেবেই মনে করছেন।

Mr. Elwin Jones অনেকদিন আগে বলেছিলেন—(ইনিই Hitler's "Drive to the East" বইখানার গ্রন্থকার)—যে মধ্য ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে Magnet-এর মত টেনে নিচ্ছে Rome-Berlin axis—তার কারণ সেই রাজ্যগুলো যেমন Poland, Yugoslavia, Hungary ভেতরে ভেতরে democracy-কে মোটেই ভালবাসে না। অর্থাৎ ফ্রান্স-এর মত বড় Democracy-র সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে গেলে ঘরোয়া ব্যাপারে democratic movement-কে চেপে রাখা চলে না, তাই হিলটার-মুসোলিনীর দিকে Col. Beck-এর মত নেতারা সতৃষ্ণ নয়নে চাইছেন। ঘরে সব Rights and Liberties এই সবের জন্ত আন্দোলন লাগছে—এ বড় ভয়ের কথা। এই বছরে গোড়ার দিকে রুমানিয়াতেও Fascism পুরোপুরি প্রায় এসেছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই গোগা সাহেবকে রাজ্যের হাল ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

Austro-German Anschluss-এর পর যে একটা বিপরীত অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে—এটা সব International observerরাই এখন স্বীকার করবেন। এর আগে Rome-Berlin axis attract করছিল, এখন repel করতে আরম্ভ করেছে। ঐ সব রাজ্যগুলো ভেবেছিল—প্রবল-প্রতাপ-সম্পন্ন হিটলার-মুসোলিনীর ছায়াতলে থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখবে। কিন্তু তা হবার নয়। অষ্ট্রিয়া-ত রক্ষক হিসেবে ফ্যাসিষ্টদেরকেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু রক্ষকই যে ভক্ষক হবে দাঁড়াবে—এ কথাও সে জানে নি। আমি তাই একটি প্রবন্ধে শুশনিগ সাহেবকে দোষ দিয়ে বলেছিলুম:

"Driven by hatred of democracy at home, Schuschnigg made friends with Fascism abroad, and nestling between Berlin and Rome he at last found himself in the melting Pot."

Economic factor গুলো এখন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। মধ্য ইউরোপের State গুলি যে ইংরেজের শরণাপন্ন হয়েছে—এ তারই প্রমাণ। রুমানিয়ার সঙ্গে জার্ম্মানীর creditor-debtor সম্বন্ধ। জার্ম্মানী টাকা দিয়ে ধার শুধতে না পেরে শেষকালে কামান-বন্দুক দিয়ে পাঠিয়েছিল এবং রুমানিয়াকে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। এরকমও আর বেশীদিন চলতে পারে না। হিটলারও bankrupt, মুসোলিনীও তাই। এখন মুসোলিনী খুব চেষ্টা করছেন যাতে Anglo-Italian Pact খুব শীঘ্র implemented হয়, কারণ British Loan তার বিশেষ দরকার। Anschluss-এর Lesson-এর কথা ছেড়ে দিলেও এখন Economic consideration Pro-fascist Central European State গুলোকে বাধ্য করছে অর্থশালী Democracy-র দিকে তাকাতে। Mr. Vernon Bartlett "World Review" পত্রে একটি প্রবন্ধে বৃটিশের এই সুযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করে বলছেন:

"If Whitehall cares to play them, it still has most of the trump

cards in its hand. It may be slow in offering guns to the people, but it can offer butter, and it is still the man rather than the machine that matters. It may be bad form to boast of one's wealth, but a few millions handed out as credits to states in South-eastern Europe could be more effective than the expenditure of ten times the ammouent on tanks and guns and aeroplanes."

সত্যিই জার্মানীকে যদি এইভাবে diplomatically isolate করা যায় তাতে শান্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এই সঙ্গে এখন উচিত হচ্ছে Franco-Czecho-Soviet axisএ যোগদান করে system of collective securityতে একটা বড় রকমের British contribution করা। চেকোশ্লোভাকিয়াই হচ্ছে এখন ইউরোপের Central Problem. এর সুন্দরভাবে কোন solution না আনতে পারলে trouble brew করতে থাকবে। এই সমস্যাকে সম্প্রতি বৃটেন খুব badly handle করেছে। একথা আমি আগেই "খেয়ালী"তে বলেছি। Czech crisisএ বৃটেন যে diplomatic action নিয়েছিল, তা আলোচনা করে আমি Hindusthan Reviewর জুন সংখ্যায় বলেছিলুম:

"Why Britain intervened in Berlin and Prague? Was it a dictation from Paris? Was it to show that the present British Government was anxious for the safety of the only democratic Republic in Central Europe? No. What was at the bottom of London's strenuous diplomatic efforts during the crisis was a frantic desire to avert a war in which the London-Paris-Moscow Alliance was bound to be called into play. The alignment of these three powers might have spelled a disaster for Fascism and paved the way for Socialist Ascendency in Europe. This is a prospect from which Chamberlain and his main prop, the British Capitalists, would shrink back in terror!"

চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধে খুব সম্প্রতি Edgar P. Young সাহেবের একখানা বই বেড়িয়েছে; তার title হচ্ছে Keystone of Peace and Democracy. গত সোমবার ২৪শে জুলাই-এর অমৃতবাজার পত্রিকাতে তার Review পড়লাম। Epilogueএ Young সাহেব বলছেন:

"War was averted because of the firm stand and resolute action of the Czechoslovak Government which called the bluff of the Fascist International. It was because their plans had been frustrated, not because of the solicitude for Czechoslovakia that the British Cabinet met hurriedly during that critical week-end."

২৩শে জুন তারিখের খেয়ালীতে আমি যা বলেছি তার সঙ্গে এর খুব মিল রয়েছে। উক্ত সংখ্যায় আমি লিখেছি: "অবশ্য বৃটিশ মন্ত্রীরা কম চেষ্টা করেন নি যাতে ফ্রান্স এ নিয়ে না মাথা ঘামায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বার্লিন ও প্রেগে খুব জোর diplomatic effort চালালেন।" চেম্বারলেন সাহেবের plan ছিল চেকেদের isolate করে দেবার। কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। উপস্থিত তিনি দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপের যে State গুলোকে হাত করবার চেষ্টা করছেন তারা কেউ রাশিয়ার বন্ধু নয়। তবে কি তা'র উদ্দেশ্য ইউরোপের defensive system-এ রাশিয়াকে ঢুকতে না দেওয়া? এই চেষ্টাও কি Franco Soviet Pact-এর বিরুদ্ধে নিয়োজিত?

(বিলাসী)

স্ট্রীট সিঙ্গার

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওর দু' নম্বর ফ্লোরে বিরাট একটি বস্তীর সেট তৈরী করা হয়েছে। এই নিখুঁত সেটের ভেতর প্রবেশ করলে লোকের ভ্রম হয়, কলকাতার একটি সত্যিকার বস্তী বলে।

এই বস্তীর ভেতর 'ভলুয়া-মজুর' বাড়ী। নৃত্যে সঙ্গীতে, হাস্যে লাস্যে, অভিনয়ে বস্তী মুখরিত, উচ্ছলিত।

এখানে অভিনয় করছেন সায়গল, কানন, শৈলেন চৌধুরী, জগদীশ শেঠ, অমর মল্লিক, কাপুর প্রভৃতি।

ফণি মজুমদারের পরিচালনায় ও প্রবর্দ্ধক পি এন রায় কার্য্যতৎপরতায় ছবিখানি অতি দ্রুত সমাধার পথে এগোচ্ছে!

বড়দিদি

মল্লিক মশাইয়ের পরিচালনাধীনে 'বড়দিদি'-র কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

শ্রীমতী মলিনা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে কাজে যোগ দেবার পর পূর্ব্ববর্ত্তী সেটের খানিকটা অংশ আবার তোলা হয়েচে।

ব্রজরাজ বাবুর বাড়ীতে প্রমীলার গৃহ-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হ'য়ে, ধীরে ধীরে এই আপন ভোলা, এই অজমনস্ক লোকটি কেমন কোরে 'বড়দিদি' মাধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উপরের গৃহীত অংশে তারই খানিকটা আভাষ পাওয়া যায়।

এদিকে পাটনায় বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী দৃশ্যগুলিও তোলা আরম্ভ হ'য়েছে এবং এই সপ্তাহেই শেষ হ'বে।

সুরেন্দ্র নাথের পিতার ভূমিকায় চিত্রা-বতরণ কোরেছেন যশস্বী অভিনেতা শৈলেন চৌধুরী। সুরেন্দ্র নাথের বিমাতার ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন—শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী।

এ ছাড়া একই ছবিতে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায়—মলিনার সঙ্গে পাহাড়ীর যোগা-যোগ এই প্রথম। উভয়কেই মানিয়েছে চমৎকার এবং অভিনীত অংশের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা কোরেছেন।

দেশের মাটী

'দেশের মাটি'র সম্পাদনার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। যতদূর স্থির আছে তাতে মনে হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর চিত্রায় এ ছবির মুক্তি হ'বে। এ ছবির হিন্দী সংকরণ বোধহয় আগষ্ট মাসের মধ্যেই বাঙলার বাহিরে মুক্তিলাভ করবে।

অধিকার

এ ছবির উভয় সংকরণেই গেল বৃহস্পতিবার শেষ হয়ে গেছে। বিরাট dreamland-এর সেট-এর মধ্যে শেষ দৃশ্য সে দিন তোলা হ'ল, তা আমাদের বেশ ভালই লেগেছিল। প্রায় ছাব্বিশ জন মেয়ে ও ১০ জন পুরুষের একটি সম্মিলিত গান নিয়ে এই ছবির উদ্বোধন। সেই দৃশ্যটিই সেদিন তোলা হ'ল। এ ছাড়া এই দৃশ্যে মানিকবাবুরূপী একটী কলেজের ছাত্র বেশ চমৎকার অভিনয় করেছে।

এ ছাড়াও গত সপ্তাহে পঙ্কজ বাবুর 'এমন দিনে তারে বলা যায়' গানটি straight take করা হয়েছে এ ছবির বাঙলা সংস্করণের জন্য।

ছবি খানির উভয় সংস্করণই সেন্সার করা হয়েছে। যতদূর মনে হয় মুক্তিলাভ বিষয়ে এই ছবি দুখানি 'দেশেরমাটী' ও 'ধাত্রীমাতা'কে follow করবে।

গোরা

এই শনিবার থেকে চিত্রা'য় দেবদত্ত ফিল্মস-এর গোরা দেখান হ'বে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সম্বন্ধে বিশেষ করে লেখবার কিছুই নেই। 'গোরা' বাঙলার ঘরে ঘরে পরিচিত। এই পরিচিত কাহিনী নিয়েই পরিচালক নরেশ বাবু তাকে ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেছেন।

"গোরা" চিত্রে প্রতিমা দাশগুপ্তা

যিনি ভারতবর্ষের দেবতা
যাঁর মন্দির-দ্বার সকলের জন্য
হিন্দু মুসলমান জৈন খ্রীষ্টান
সকলের যিনি প্রণম্য
তাঁহারই উদ্দেশ্যে
উৎসর্গীকৃত
মহিমান্বিত চিত্র-কাব্য

চিত্রায়

শুভ
উ
দ্বো
ধ

৩০শে জুলাই, শনিবার

গোরা
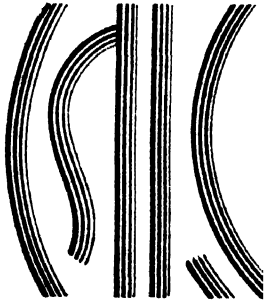
* কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের
কাহিনী

* দেবদত্ত ফিল্মসের
চিত্রসৃষ্টি

* শ্রীনরেশ মিত্রের
পরিচালনা

* চিত্র পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস লিঃ

E. P. S

চোখের বালি

এসোসিয়েটেড প্রোডিউসার্সের চিত্র-নিবেদন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক কাহিনী "চোখের বালি" আগামী শনিবার ৩০শে জুলাই 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তি-লাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর স্বাতন্ত্রতা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখিয়া কর্তৃপক্ষ যতদূর সম্ভব বিশ্বকবির এই অমর কাহিনীকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিখানির সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হইতেছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রের সঙ্গীত ও সুর সংযোজনা করিয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ অনাদি দস্তিদার। আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন সুরেন দাস। ছবিখানির পরিচালনা করিয়াছেন সতু সেন, শব্দানুলেখন করিয়াছেন মধু শীল এবং আলোক চিত্র-শিল্পী ননী সান্যাল। এতদ্ভিন্ন "চোখের বালি"-র আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই ছবিখানি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নর-নারী কর্তৃক অভিনীত হইয়াছে।

বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জ্জি
আশা—ইন্দিরা রায়
রাজলক্ষ্মী—শান্তিলতা ঘোষ
অন্নপূর্ণা—রমা ব্যানার্জ্জি
মহেন্দ্র—হরেন মুখার্জ্জি
বেহারী—ছবি বিশ্বাস
সাধুচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

অন্যান্য চরিত্রে—শিবকালী চ্যাটার্জ্জি, শরৎ সুর, অমিত্র গুহঠাকুরতা

বেকার নাশন

'বেকার নাশন'-এর 'ট্রেলর' 'উত্তরা'-র দেখানো হ'চ্ছে। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা ছবিখানি সম্বন্ধে আশান্বিত হ'য়ে উঠেছেন বোঝা গেল। তারা সমস্যা-হীন হাল্কা কাহিনীর চিত্র-রূপ দেখে কর্মক্লান্ত দিবসের অবসাদ দূর করতে চায়, তাই—'বেকার নাশন'-এর পরিচয়-চিত্র তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, এতে করে বলা যেতে পারে যে 'বেকার নাশন' জনসাধারণের মনে কিছুক্ষণ ধরে আনন্দ দিবে।

যখের ধন

প্রয়োগ শিল্পী হরি ভঞ্জর পরিচালনায় 'যখের ধন'-এর শুটিং দ্রুত গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দুটি ভাই-বোন—বিমল আর লেখা। অন্ন-চিন্তা নেই—স্নেহের কলহ এবং আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটায়—দেখলে অতি-বড় সুখী পরিবারেরও মনে হিংসার উদয় হয়। গত সপ্তাহে ছবির এই অংশটুকুর দৃশ্য গ্রহণ হ'য়েছে।

রূপবাণী

নিউ থিয়েটার্সের 'অভিজ্ঞান' রূপবাণীতে অষ্টম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। সামাজিক সমস্যা এবং অন্তর রহস্যের অপূর্ব্ব সংঘাত ও সংমিশ্রনের নাটকীয়তায় এই চিত্র কাহিনীটি যিনিই দেখিয়াছেন তাঁহাকেই অভিভূত হইতে হইয়াছে।

এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে মন্দার ফিল্মস কর্তৃক প্রযোজিত বাঙলা কার্টুন-চিত্র 'আকাশ পাতাল' দেখিয়া আপনারা অধিকতর কৌতুক বোধ করিবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ণ থিয়েটার

সামনের শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটার্সের 'বিদ্যাপতি' দেখান হ'বে। নিউ থিয়েটার্স কোম্পানী প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে এই ছবি তুলছেন। টাকার কথা ছেড়ে দিলেও এ বই-এর মধ্যে যেভাবে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ করা হয়েছে তা খুব কম বই এর মধ্যেই দেখা যায়।

এতে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী, কানন, দুর্গাদাস, অমর মল্লিক ছায়াদেবী প্রভৃতি।

আকাশ পাতাল

বাংলা কার্টুনের ইতিহাসে মন্দার ফিল্মের আকাশ পাতালকে হয়তো প্রথম বলা যায় না কিন্তু উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা যদি দেশবাসীর শুভেচ্ছা এবং উৎসাহ পান তবে তাঁরা আরো উন্নত এবং নিখুঁত জিনিষ আমাদের দিতে পারবেন। একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে কার্টুন চিত্রের কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। বাংলা ছবি উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে সত্য কিন্তু কার্টুনের দিকটায় আজ পর্য্যন্ত কেউ তেমনভাবে দৃষ্টি দেন নি—বোধহয় উপরোক্ত কারণে।

মন্দার ফিল্ম উপযুক্ত সময়েই তাঁদের সাধু প্রচেষ্টাকে সেই দিকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। দেশবাসী যদি নির্দ্দয় সমালোচকের চক্ষে ইংরাজী কার্টুনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার না করে পৃষ্ঠপোষকের দৃষ্টিতে এদের প্রথম উদ্যমের দোষ ক্রটীগুলি ক্ষমার চক্ষে দেখেন এবং উৎসাহ ও প্রেরণা দেন তবেই দেশের এই শিশুশিল্পটী অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে।

গোপাল কৃষ্ণ

প্রভাতের গোপাল কৃষ্ণ গেল শনিবার থেকে প্যারাডাইজ্ সিনেমায় দেখান আরম্ভ হয়েছে। বালক শ্রীকৃষ্ণের গো বৎসল তার উপর নির্ভর করেই এ ছবির কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। অভিনয়-এর দিক থেকে এই বালক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাটা রাম মারাথে তার সারল্যের ও মহিমার একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীতের দিকেও এই বালক-এর অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। এ ছাড়া শান্তা আপ্তের 'রাধা' ও পরশুরামের 'মনসুখ' অভিনয়ও সঙ্গীত-এর দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

এই ছবির শেষের দৃশ্যে যে ঝড় জলের Scene দেখান হয়েছে তাও চমৎকার। যদিও একটু বেশী ভাবেই দেখান হয়েছে তাহলেও Indian Screen-এ আজ পর্য্যন্ত খুব কমই দেখা গেছে এর মত।

বিবিধ

পত্রিকার প্রলাপ

বুধবার প্রাতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সাক্ষরিত এক "ক্ষম হে ক্ষম" পত্র তাঁহার বিহারী বন্ধুদের তৃপ্ত্যর্থে প্রকাশিত হইয়াছে। 'অমৃতবাজারের' ন্যায় প্রভাবশালী পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যে অভিমত পোষণ করার শক্তি নাই তাহা ব্যক্ত করাই বা কেন? কাশ্মির, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থানে মন্ত্রী বা সরকারী কর্ম্মচারীর অতিথিরূপে বিচরণ করিয়া বেড়াইলে সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করা যায় না ইহা কি বাগবাজারের ঘোষপরিবারবর্গের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারেন না? তুষারবাবুর "To my Behari friends" শীর্ষক পত্র প্রকাশে "পত্রিকা" কতদূর লোকচক্ষুতে হীন হইয়াছে তাহা কি তাঁহারা বুঝেন না?

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী

গত ৮ই শ্রাবণ (২৪ জুলাই) রবিবার সন্ধ্যায় ইটালী বাণী ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে বঙ্কিম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচিত সভাপতি ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ডক্টর কালিদাস নাগ সাময়িকভাবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহোদয় সুললিতকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গাহিবার পর একটি স্থানীয় ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রনয় সমাদ্দার প্রভৃতি বক্তৃগণ বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সময়ে সভাপতি মহাশয় আসিয়া পড়েন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ও ডক্টর কালিদাস নাগ মহোদয় বঙ্কিমের রসসৃষ্টি ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার শুদ্ধং অতীতে লিখিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বঙ্কিমের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সত্য; কিন্তু উহাতে 'ধান ভানিতে শিবের গীতও' প্রচুর ছিল। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত অক্রূর সরকার, শ্রীযুক্তা প্রতিভা সেন, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু কয়াল প্রভৃতি বহু সুধী ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশনি গুপ্ত

দশটী নিষেধ

পৃথিবীতে অনেক কিছুই আমরা পছন্দ করি না। অপরের অনেক অভ্যাসই আমাদের প্রতিনিয়ত বিরক্ত করে। তা' বলে জোর করতে পারি কি? ভার্জ্জিনিয়া ক্রস্ কিন্তু পারেন। সম্প্রতি ক্রস্ হলিউডের স্ত্রী-পুরুষের উপরে দশটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন:

(১) রাস্তা-ঘাটে স্ত্রীলোকের ধূমপান করা চলবে না।

(২) স্ত্রীলোকের বাহু জড়িয়ে ধরে পুরুষ পথ চলতে পারবে না।

এই দুটী শ্রীমতীর দুচক্ষের বিষ, বিশেষ করে শেষেরটী। শ্রীমতী বলেন, পুরুষ কি 'সজ্জবান ব্যক্তি' নাকি, যে খড়কুটোর মত স্ত্রীলোকের বাহু আশ্রয় করে বেচে থাকবে?.........তারপর:

(৩) হো হো করে দমকা-হাসি, যে হাসিতে লোকজনের অপ্রার্থিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা ত্যাগ করতে হবে।

(৪) ঢিলা পায়জামা পরে পথ চলা বন্ধ

(৫) প্রকাশ্যস্থানে দাঁড়িয়ে রূপসজ্জা করা অসভ্যতা, অভ্যাস ছাড়তে হবে।

(৬) শিশুবিষয়ক আলাপ আলোচনা শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এর ব্যতিক্রম ঘটলে, ভাবপ্রবণ স্ত্রীলোক সমাজে শুধু যে হাস্যাস্পদই হয়, তা না, অকাট মূর্খ সাব্যস্ত করা হয় তাকে।

বাকী চারটী বিশেষভাবে পুরুষদের জন্যে:

(৭) কতকগুলো পুরুষ দেখা যায়, তারা কেবল তাদের কেনা জিনিষের খরচ জাহির করেই মরলো,—'এটায় লেগেছে কুড়িটাকা' 'এটায় পঞ্চাশ'—এই শুধু তাদের বাঁধা বুলি। এ লোভ তারা সংবরণ করতে পারে না, কিন্তু অনতিবিলম্বে করা উচিত।

(৮) 'ঈর্ষা' রমনীর চোখে পুরুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে। সুতরাং—

(৯) গাড়ীতে উঠবার সময়ে অনেক পুরুষ স্ত্রীলোকদের সাহায্য করে না,—এবার থেকে করতে হবে।

(১০) উপসংহারে,—হলিউডের সুন্দরী মাত্রেই স্বার্থপর পুরুষকে ঘৃণা করে, অপরের জন্য তাদের দয়ামায়া, বিবেচনা থাকা উচিত। সৌজন্য প্রকাশ তাদের স্বভাবের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হওয়া চাই-ই-ই।

এ নিয়মগুলো সব ফলপ্রসু হলে শীগ্‌গির আর একটা মহাবিপ্লব ঘটবার সম্ভাবনা আছে, মনে হয়।

রূপসীর মেলা হলিউড

রূপসীর মেলা হলিউড! কত রং বেরংয়ের রূপসী মেয়ে, উচ্ছ্বসিত রূপতরঙ্গ দোল খেয়ে যায় যাদের দেহে, চকিত চঞ্চল বিদ্যুৎ যাদের আঁখিতে, কপোলে যাদের উষার লালিমা, স্বপনের অগ্নি শিখায় সে কি প্রবল আকর্ষণ মোহাবিষ্ট পতঙ্গদের।

কিন্তু হলিউডের অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রকর অলিভার মার্শ বলেন: এ রূপ, এ আকর্ষণ চিরদিন ছিলো না। পনেরো বছর আগে রমণীর রূপ এমন কিছু আলোড়নের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। স্ত্রীলোকের সজ্জা তখন ছিল অতি সাধারণ। বর্ত্তমান যুগের রূপসীরা রূপ অনুশীলন শিল্পকলায় যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তা সত্যই বিস্ময়কর।

আজ সাতাশ বছর ধরে মিঃ মার্শ হলিউডের আলোকচিত্রগ্রহণে রত আছেন; এ যাবৎ কোন সুন্দরীই প্রায় তার ক্যামেরার চোখ এড়াতে পারে নি, ব্লান্সি সুইট, ম্যাবেল নরম্যাণ্ড, লিলিয়ান গিশ, নরমা ট্যালমেজ, মেরিয়ন ডেভিস, জোয়ান ক্রফোর্ড জিনেট ম্যাকডোনাল্ড, মিরণা লয়,...কেউ বাদ যায় নি।

সাতাশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মিঃ অলিভার মার্শ এই মন্তব্য প্রকাশ করে গিয়েছেন। হলিউডের মেয়েরা আজকাল আরো বেশী সুন্দরী।

কিন্তু একটা কথা: অনুকরণ রমণীর রূপসাধনার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। জগতের যে কটা অসামান্য সৌন্দর্য্য আমরা দেখিতে পাই, তার প্রায় গুলিই একনিষ্ঠ রূপ সাধনায় দেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে ফুটিয়ে তোলার ফল।

তারকার স্ত্রী নির্ব্বাচন

কি মুস্কিল! এতগুলো সুন্দরীর ভিতরে একটাকেও পছন্দ হয় না? ...হলিউডের তারকা জেমস্ ষ্টুয়ার্ট খুঁজে খুঁজে হয়রান। ষ্টুয়ার্ট বলে, আজ তিন বছর ধরে ঘুরচি, কিন্তু সুবিধে হয় কই? হলিউডে বউ পছন্দ করা কি কঠিন কাজ রে বাবা!...

বল কি ষ্টুয়ার্ট? এত রাশি রাশি মনোমোহিনীর দল, ডানাকাটা পরীর মত ঝাঁকে ঝাঁকে বিশ্বের মন রাঙিয়ে দেয়, আর তোমার বেলাতেই যত—

এরও জবাব দিয়েছে ষ্টুয়ার্ট: মাথা গুলিয়ে যায় যে! এ ঝাঁকের কাকে রাখি, কাকে ছাড়ি।

ফ্রেডি বার্থলমিউ

হলিউডের আকাশের একটু অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র এই শিশু অভিনেতাটী। কিন্তু ব্যাপার যা দেখচি, তাতে আমার মনে হয় এ শিল্পকলা ছেড়ে ওর আইন পড়া উচিত ছিলো। ওর জীবন ভরে তো আইনের প্যাঁচই চললো, টানাহ্যাঁচড়ার অন্ত নেই ওকে নিয়ে। শুধু আদালত, আর আদালত! ...এবং একটার পর একটা আইনের লড়াই!...

ফ্রেডির আত্মীয়স্বজন সবাই ব্যস্ত ওকে আবেদারে এনে ওর উপার্জ্জনের টাকার ভাগ বসাতে।

বর্ত্তমান মোকদ্দমাটী ত্রিশ হাজার ডলারের দাবী, এনেছেন—ওর প্রতিনিধি মেসার্স মাইরন্ সেলজনিক এণ্ড কোং ফ্রেডির উপার্জ্জনের 'কমিশন' অর্থাৎ দালালী এটা মেট্রো গোল্ড্ইন মায়ারের সঙ্গে সাত বছরের এক চুক্তি সর্ত্তে টাকাটা নাকি ওদের প্রাপ্য।

খুচরো খবর

'ষ্ট্যাণ্ড ইন'রা আর এ নামে পরিচিত হতে চায় না, ওরা বলে, আমরা 'ফোকাস্ আর্টিষ্টস্।'

* * *

জিনজার রোজার্সের নতুন চিত্রসাথী, এরল ফ্লিন। ওরা একসঙ্গে নামছে 'ইউ কাণ্ট এসকেপ ফর এভার' ছবিতে।

* * *

গেল প্যাট্রিক আজ দু'বছর ধরে জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া আসা করচে। ...সুবিধে হলো কই? জ্যোতিষীমশাই ক্রমাগত তার বাঁধা গৎ আউড়ে চলেছেন, 'হবে! হবে!!'

শরৎ সাহিত্যে—মাধবী ও শান্তি

শরৎচন্দ্রের রচনার পরিচয় দিতে গিয়ে, বাঙলার একজন কৃতি সাহিত্যিক লিখেছেন : "শিশির-স্নাত প্রভাতের জলপদ্ম যেমন একটি একটি ক'রে আপন পল্লব-দল সূর্য্যের দিকে প্রসারিত ক'রে জেগে ওঠে, এক একখানি উপন্যাস লিখে শরৎচন্দ্র তেমনি আপন মনের মাধুর্য্য চারিদিকে বিকীর্ণ ক'রেছেন।"

সত্যই, এমনি সুন্দর তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি। তাঁর মত দৃষ্টি নিয়ে দেশের মানুষের পানে কেউই চায় নি। তাঁর মত দরদ নিয়ে কেউই এগিয়ে আসে নি। তাই এতকাল মনে হয় যেন মানুষ, মানুষকে চিনতে পারে নি। মানুষের তৈরী সাহিত্যের মত তাই কৃত্রিমতাই থেকে গিয়েছিল বেশী। সাহিত্য সত্যকার রূপ ধ'রে মানুষের চোখের সামনে ফুটে ওঠে নি।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকা নিত্যকার, চিরন্তন হাসি-কান্নার ধারায় স্নাত হ'য়েই সচে। তারা আমাদেরই মত বেদনা ও অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত হয়, আমাদেরই মত সুখ-দুঃখের কথা বলে, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে।

শান্তির ভূমিকায়—চন্দ্রাবতী

সত্য চিরদিনই সত্য, আর সেই জন্যই তার মত সকলে মানতে বাধ্য হয়। শরৎচন্দ্র সেই সত্যকে নিজের বুকের মধ্যে পেয়েছিলেন। তার সত্তাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি কোরতে পেরেছিলেন। তাই আজ বিশ্বমানবের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হয়েচে। তাঁদেরই কল্যাণের জন্য তিনি লেখনী ধারণ কোরেছিলেন। সমাজের চোখ রাঙানী তাঁকে এতটুকু দমাতে পারে নি।

এ সাহিত্যের সৃষ্টি সত্যের মধ্যে—বেদনার মধ্যে। সমাজের শাসনে নিপীড়িত নর-নারীর দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। সেই জন্যই অভয় সাহস ও শক্তি নিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

মাধবীর ভূমিকায়—মলিনা

এমনি বুকের দরদ দিয়ে আঁকা, তাঁর দুটি অপরূপ নারী চরিত্র—'বড়দিদি'-র মাধবী ও শান্তি।

বড়দিদি মাধবীর পরিচয় দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : "স্বর্গের কল্পতরু কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাহার কথা বলিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই ব্রজবাবুর সংসার-বর্ত্তী লোকগুলো একটি কল্পতরু পাইয়াছিল।
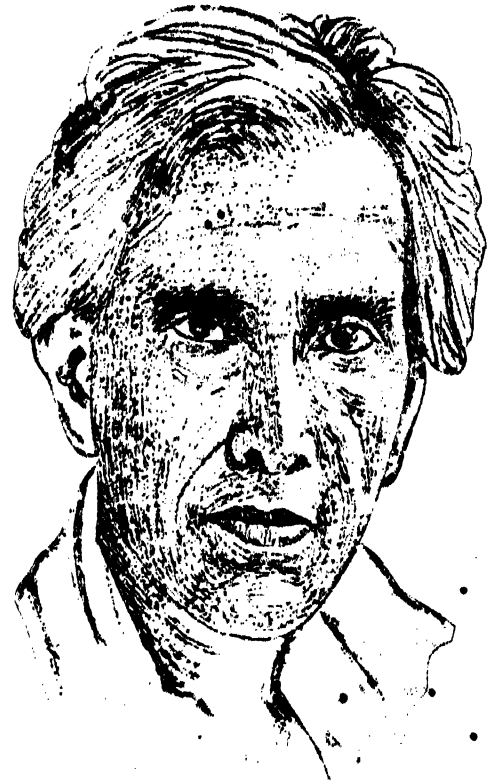
শরৎচন্দ্র

তলায় গিয়া হাত পাতিত, আর হাসি মুখে ফিরিয়া আসিত।"

পলাতক ধনীপুত্র সুরেন্দ্রনাথ নিঃস্ব ভিখারীর বেশে 'বড়দিদি'-র আশ্রয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে দিন তার বাইরের অভাব মিটেছিল, সে দিন সে বুঝতে পেরেছিল, বড়দিদি ছাড়া তার অন্তরের শূন্যতাও মিটবার নয়।

তারপর আর একদিন···বেলা পড়ে এসেচে। পা আর চলে না। যেন একবার শুতে পারলেই সে জন্মের মত ঘুমিয়ে পড়বে। তাই যেন অন্তিম শয্যা লাভের প্রতিজ্ঞায়, জীবনের মহা-বিশ্রামের আশায়, সুরেন্দ্রনাথ একদিন উন্মত্তের মত ছুটে চললো—সেই অজানার উদ্দেশ্যে—যেখানে ছিল তার বড়দিদি।

বড়দিদির কোলে মাথা রেখে, অনন্ত পথ যাত্রী সুরেন্দ্র নাথের শেষ কথা : "সে দিনের কথা মনে পড়ে যে দিন তুমি আমাকে

তাড়িয়ে দিয়েছিলে? আমি তাই এখন শোধ নিয়েছি, তোমাকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলাম কেমন এখন শোধ হ'ল ত?"

কেমন কোরে একজন তার দেনা-পাওনা চুকিয়ে বিদায় নিলে, এবং আর একজন তারই দাহন-জ্বালা বুকে নিয়ে এই নির্ম্মম ধরিত্রীর এক কোনে পড়ে রইল—সে কাহিনী আশা করি আজ আর ভেঙে না বোললেও চলবে।

সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিনী—শান্তি।

রক্তমাংসে গড়া আর একটি অপরূপ নারী চরিত্র!

শুধু 'মাধবী', এই নামটুকু সুরেন্দ্রনাথের কাছে যে তার ইষ্টদেবতার নামের মতই পরমকাম্য, পরমপবিত্র—শান্তি সে কথা বুঝতে পেরেছিল।

তার অন্তরে ঈর্ষ্যা ছিল না। ছিল তার স্বামীর অন্তরের বেদনা মুছিয়ে দেবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

"আমি আজীবন যাতনা পাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার কি কষ্ট যদি জানতে পারি—"

স্বামীকে জানবার, তার ব্যথাহত অন্তরে নিষেধের জন্যও শান্তির প্রলেপ দেবার এই যে মিনতি—এই যে দুর্নিবার আকাঙ্খা—এরি মধ্যে পাই 'শান্তি' চরিত্রের যথার্থ পরিচয়।

মরমী শরৎচন্দ্রের বুকের দরদ ঢেলে আঁকা সেই অপরূপ কাহিনীটিকে মুখর ছায়া-চিত্রাকারে সম্প্রতি রূপদান কোরছেন ভারতের শ্রেষ্ঠতম চিত্র প্রতিষ্ঠান—নিউ থিয়েটার্স। ছবিখানির পরিচালনা কোরছেন—অমর মল্লিক।

মাধবী ও শান্তি—এই দুটি চরিত্রে চিত্রাবতরণ কোরেছেন বাঙ্গলার জনপ্রিয় দুটি অভিনেত্রী—মলিনা ও চন্দ্রাবতী।

যাঁরা শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ চিত্রে মলিনার 'মৃণাল' এবং দেবদাসে—চন্দ্রাবতীর 'চন্দ্রমুখী' দেখেছেন তাঁরা নিশ্চিত স্বীকার কোরবেন, এই দুটি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী তাঁদের বুকের দরদ মিশিয়ে বড়দিদি-ছবির দুটি প্রধান নারী চরিত্রকে জীবন্ত কোরে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

আর একটি সু-খবর। শুনছি, আবহ সঙ্গীত এবং কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরশ দিয়ে এই চিত্রখানিকে আরও অধিক মনোহারী কোরে তুলবেন—নবীন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুর-শিল্পী—পঙ্কজ কুমার মল্লিক।

নিউ থিয়েটার্স-এর এই উদ্যম সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হোক্ ও ছায়া-চিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙলার অপরাজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের এই অপরূপ সৃষ্টি, আর একটি নতুন রূপ নিয়ে, তাঁর দেশবাসীর চিত্তে অক্ষয় হোয়ে থাক্ এই আমাদের কামনা।

মহিলা মহল

সম্পাদিকা—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

ইতি পূর্ব্বে "খেয়ালী"তে "মহিলা মহল" নাম দিয়ে মহিলাদের আলোচনা আন্দোলন ও লেখা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'ত। কিছুদিন ধরে নানা কারণে সেটা বন্ধ ছিল। উপযুক্ত আলোচনা পাওয়া যায় না, যে কিছু লেখা পাওয়া যায় সবই গতানুগতিক রচনা বলে প্রকাশ বন্ধ ছিল, একথা বললেও মিছে বলা হয় না। খেয়ালীর এটা অন্তরের খেয়াল যে সহরে মফঃস্বলে যে ভাবে নারী জাতির শিক্ষার জন্য চেষ্টা করা উচিত, তার জন্য শুধু পুরুষ নয় আমাদের জননী, ভগ্নীরাও তাহাদের যতটা সাধ্য শক্তি যেন নিয়োগ করেন। কলকাতা সহরের আনাচে কানাচে অলি গলিতেও দেখা যায়, একটা মেয়েদের পাঠশালা বা ছেলেদের ইস্কুল করে নিয়ে বসলেই কোথা থেকে যে মধুগন্ধ-লোলুপ ভৃঙ্গের মত ছেলে মেয়ের দল জোটে তা দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। অথচ তা দিয়ে বাঙ্গালীর স্ত্রীশিক্ষার প্রগতির বিচার করা চলে না। এমন অনেক পল্লীগ্রাম এখনও বাঙ্গালায় আছে যেখানে শত করা ২৫ জন স্ত্রী পুরুষ অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয় শিক্ষার অভাব যে কতবড় অভাব শুধু পেটের অন্ন আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র যোগাড় করাই যে পৃথিবীতে পুরুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এটা তাঁরা কল্পনাও করতে পারে না। কলকাতায় বিজলী পাখার তলে বসে সিনেমার গল্প করা কটা বাঙ্গালীর মেয়ের ভাগ্যে (?) নিত্য চলে, সেটা অনুমানসাপেক্ষ কিন্তু অন্নের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে এখনও শিক্ষা ও সংস্কারের যে কত বড় প্রয়োজন আমাদের অন্তঃপুরে আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। ২টা ৪টা প্রাইমারি স্কুলে বা হাইস্কুলে যে নিরন্ন নিঃস্ব কুশিক্ষা লোকবঞ্চিত পল্লীর প্রাণ রসের পুষ্টি হ'তে পারে না, সেটা এবার আমাদের নিজেদের দেখতে হ'বে। 'খেয়ালী'র নারী মহলে এই ভাবে আলোচনা করতে হ'বে যে, সুশিক্ষার জন্য, নারীর নৈতিক উন্নতির জন্য, দৈহিক অশান্তি নিবারণের জন্য কি উপায় কার্য্যকরী হবে। এ ভার শুধু পুরুষের ত নয়, এ কাজ ত নারীরই।

এই হিন্দু জাতি জগতে সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি তথাপি এখনও তাদের এমন দুর্দ্দশা

শ্রীনটনাথ

মেঘমুক্তি

গত বুধবার রঙমহলে'র নতুন নাটক "মেঘমুক্তি" দেখলাম। নাটকখানিকে অতি আধুনিক বলা যেতে পারে। চারটি ভাগে নাটকখানি বিভক্ত। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য বয়সে তরুণ হলেও তিনি নানাগুণের অধিকারী। শিশিরকুমার ইন্‌সটিটিউটের হ'য়ে তিনি ইতিপূর্ব্বে বহু নাটক রচনা কোরে সুনাম অর্জ্জন করেন এবং নাট্য-রসিকদের রসদান করেন। আলোচ্য নাটকখানি বছর দু'য়েক আগে 'খেয়ালী'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় গুণীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এতদিন পরে নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'তে দেখে আমরা বিশেষ খুশী হ'য়েছি।

"মেঘমুক্তি"-র গল্পাংশ হ'চ্ছে—ধনী যুবক প্রদ্যোৎ ও তাঁর স্ত্রী অনিমার ভেতর ভ্রমবশতঃ মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় এবং সেই মেঘ দিন দিন বিস্তারলাভ করে স্বপন রায়ের স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তজালে। এমন কী স্বপন প্রদ্যোতের ভগিনীসম গীতাকে নিয়ে অনেক

জহর গাঙ্গুলী

কুৎসিৎ কথা অনিমার কাছে লাগিয়ে প্রায় তাকে জয় কোরে ফেলেছিল। কিন্তু পরে সব ঘটনা ফাঁস হ'য়ে যাওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হ'ল। এই কাহিনীটির ভেতর যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান আছে এবং বেবী ছাড়া প্রত্যেক চরিত্রটিই বিভিন্ন পথে এগিয়ে চলেছে। বেবী চরিত্রের স্বার্থকতা নাটকের

উষা

ভেতর কোথায়ও খুঁজে পেলাম না। নাটক-খানির 'সিচুয়েশন' সৃষ্টিতেও নাট্যকারের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গীত রচনায়ও বিধায়কবাবুর পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকখানির পরিচালনা করেছেন যোগেশ চৌধুরী। এই কাজ তিনি স্বচ্ছভাবে সম্পাদন কোরেছেন বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে সকালে বিদ্যুতালোকিত ঘর দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত কোরেছেন। তা' ছাড়া এই দৃশ্যেই এক জায়গায় অনিমাকে বেবী বলছে—"বৌদি তোমার কি হয়েছে বলতে পারো? আমরাত এলাম আমাদের সঙ্গে ভালো করে কথা কইছো না?" অথচ সেই সময় অনিমা অনর্গল বকে যাচ্ছিল। এই রকম দোষত্রুটি আরও কয়েক জায়গায় আছে এবং এই বিষয় নিয়ে আমাদের নাট্য-কারের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে এবং আমরা শুনলাম দ্বিতীয় রাত্রির থেকে এই ত্রুটির আর পুনরাবৃত্তি হয় নি, সেইজন্য বিশদভাবে তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অভিনয়ে সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা কোরেছেন এবং রঙমহলের পূর্ব্ব সুনাম তাতে অক্ষুণ্ণই থেকেছে। জহর গাঙ্গুলীর বিজয় আমরা খুব উপভোগ কোরেছি এবং এই ধরণের ভূমিকায় তাঁর সুনামও

কেন? দিন দিন তারা হা অন্ন হা বস্ত্র বলে জগতের অন্য সব চিন্তা ভুলে যায় কেন? জীবন সংগ্রামে সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন কত বেশী, আমাদের সহানুভূতি সাহায্য পরামর্শ তাদের জীবনে কিরূপ কাজ করছে, আজ তাদের ভাল করে দেখিয়ে দিতে হ'বে। গৃহিনী সচিব সখী শুধু কথায় নয়, জীবনে আমরা নইলে যে তাদের সব মিছে, এটা তারা ভোলে নি। শিবহীন শক্তি যেমন অসার, তেমনি শক্তিহীনের ধর্ম্ম অর্থ কাম বর্গ কিছুই ত থাকে না! তাইত আজ তার দেবমন্দির ধ্বংস হ'চ্ছে জীবনে অকল্যাণের শেষ নাই গৃহ প্রায় নিরানন্দ; শৈশবে তাদের উৎসাহ নাই, যৌবনে তাদের কর্ম্মময় লক্ষ্য নাই, তারা যেন জ্যান্তে মরা। এ মরাকে জাগাবে নারী! এত আর কেউ পারবে না।

যথেষ্ট। কিন্তু তিনি এই ভূমিকায় অত্যধিক বাড়াবাড়ি করায় এবং প্রত্যেক অভিনেতৃর কথায় মাত্রায় স্বরচিত কথা বলে নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিয়েছেন। সন্তোষ সিংহের স্বপন তাঁর পক্ষে নতুন ধরণের চরিত্র হ'লেও তিনি এই 'চরিত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি। রতীন ব্যানার্জ্জির প্রদ্যোৎ নিন্দনীয় না হলেও আরও উন্নত ধরণের অভিনয় তাঁর কাছ থেকে আমরা আশা কোরেছিলাম। যোগেশ চৌধুরীর দাদু স্বাভাবিক হ'য়েছে। বেচু সিংহের প্রণব মন্দ নয়। স্ত্রী ভূমিকায় রাণীবালার গীতা এক কথায় চমৎকার। তাঁর তিনখানি গানও সত্যই তৃপ্তিকর। কিন্তু গান গাওয়ার

রাণীবালা

সময় তাঁর অত্যধিক অঙ্গভঙ্গি এই চরিত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ কোরেছে। সুহাসিনীর অনিমা চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করেনি, অভিনেত্রীর একঘেয়েমি ভাবব্যঞ্জনা ও আবৃত্তির জন্যে। এই চরিত্রটি আমাদের মনে হয়, পূর্ণ সাফল্যলাভ কোরতে পারে নি, অভিনেত্রী চরিত্রটি যথাযথভাবে গ্রহণ কোরতে পারেন নি বলে। পদ্মাবতীর অপর্ণা ছোটর ওপর রূপশ্রীমণ্ডিত হ'য়েছে। তাঁর গানখানিও শ্রুতিমধুর। 'ক্রয়েড্'-ভক্ত তরুণী 'বেবী'-র অংশে উমা দেবী যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার সদ্ব্যবহার কোরেছেন।

পদ্মাবতী

পাড়ার মেয়ে আরতির একখানা গান ও একখানা নাচের মধ্যে সাবিত্রী শেষের জিনিষটাতেই দর্শক আকৃষ্ট কোরতে সমর্থা হ'য়েছেন। কীর্ত্তন গানখানা তাকে দিয়ে না গাওয়ালেই ভাল হত।

এর সাজসজ্জা, ও দৃশ্যপট সত্যই প্রশংসনীয়। এমন সুন্দর দৃশ্য পরিকল্পনা এবং সেটের আসবাব পত্র আমরা ইতিপূর্ব্বে কোনও সামাজিক নাটকে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না এজন্য সুধাংশু চৌধুরী সকল প্রশংসার দাবী কোরতে পারেন। অনিমা ভিন্ন সাজসজ্জা যার যেরূপ হওয়া দরকার সেইরূপই হ'য়েছে। অণিমার সম্বন্ধে এইটুকু আমরা বলি—যে স্বামীকে সদাসর্ব্বদাই মনে কোরছে অন্য নারীতে আসক্ত এবং সেই ভাবনা তাকে দিনরাত অশান্তির আগুনে পোড়াচ্ছে এই অবস্থায় তার পক্ষে সৌখীন শাড়ী ও জামা পড়ে ঠমক দেখানো অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

"মেঘমুক্তি"-র সুর-সংযোজনা কোরেছেন তুলসী লাহিড়ী। এর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন—এককথায় গানের সুরগুলি হ'য়েছে চমৎকার। একখানি নৃত্যপরিকল্পনায়ও ললিত গোস্বামীর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা "মেঘমুক্তি" হয়েছে একখানি ঝরঝরে তকতকে সামাজিক নাটকাভিনয়—যা' দেখে সবাই-ই আনন্দ পাবেন প্রচুর পরিমাণে।
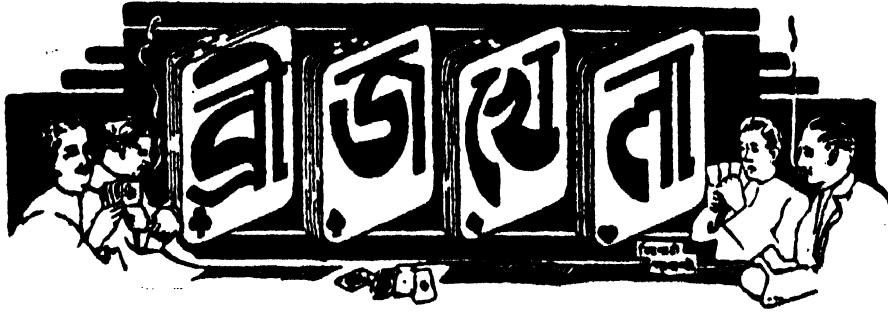
শ্রীদুর্ব্বাসা

নিষ্কাশন-কৌশল (Squeeze Play) অধিকাংশ ক্রীড়কের ধারণা নিষ্কাশন কৌশল কষ্টসাধ্য এবং অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে এই অহেতুক ভয় বিদূরিত হয় এবং এই কৌশল প্রয়োগ করা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। অধিকাংশ স্থলে নিষ্কাশন কৌশলের কার্য্য আরম্ভ হয় দশম পিট হইতে এবং এই পিটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কাশন একেবারে সম্ভবপর হয় না। তদুদ্দেশ্যে উভয়ের হাতের মধ্যে প্রবেশ করার মত তাস রেখে দিয়ে উক্ত অবস্থায় উপনীত হতে হবে। ফলে খেলা করা তখন পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠবে। নিম্নের হাতখানি দেখুন,

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, নয়।
হরতন—নয়, আটা, ×, ×।
রুহিতন—×, ×, ×
চিড়িতন—×, ×, ×

ইস্কাবন—গোলাম, আটা, ×, ×।
হরতন—বিবি, গোলাম, দশ ×।
রুহিতন—×, ×, ×,।
চিড়িতন—দশ, ছক্কা।

উ

ইস্কাবন—বিবি, দশ, ×, ×।
হরতন—×, ×, ×।
রুহিতন—×।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, × ×, ×

ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—টেক্কা, সাহেব।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, ছক্কা।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, আটা।

সাতটি ফেরাইএর ডাকে খেলা হচ্ছে। 'প' হরতনের বিবি খেলে প্রথমিক চাল দিবার পর ডাকদাতা দেখলেন যে তাঁদের উভয়ের হাতে মাত্র বারোটি পিট আছে। সুতরাং তেরটি পিট পেতে হলে নিষ্কাশন-কৌশলের সাহায্য নেওয়া দরকার। সাধারণতঃ নিষ্কাশন-কৌশল অবলম্বন করতে হলে দশম পিট অবধি পৌঁছানো প্রয়োজন। এখন দেখা যাক্ কিভাবে দশম পিট অবধি পৌঁছানো যায়। যা' হোক বিপক্ষদের হাতে চিড়িতনের ও হরতনের বিভাগ জেনে নেওয়া দরকার, কারণ হরতনে বড়

ইস্কাবন—সাহেব, আটা।
হরতন—নয়।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—×।

ইস্কাবন—গোলাম, ×
হরতন—বিবি।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—ছক্কা।

উ

ইস্কাবন—বিবি, দশ
হরতন—নাই।
রুহিতন—নাই।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম।

ইস্কাবন—×।
হরতন—নাই।
রুহিতন—×।
চিড়িতন—সাহেব, আটা।

তাস 'প'র হাতে আছে সেটি প্রথমিক চাল থেকেই জানা গেছে। এইবার দশম পিট পর্য্যন্ত পৌঁছাতে হলে প্রথমতঃ হরতনের টেক্কা, সাহেব, ইস্কাবনের টেক্কা ও চিড়িতনের টেক্কা খেলে নেওয়া দরকার। তারপর পর পর ছয়খানি রুহিতন খেলে গেলেই দশম পিট পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে। তারপরেই নিষ্কাশন-কৌশল আরম্ভ হবে। এরূপ সিদ্ধান্তের পর খেলা আরম্ভ করলে দশম পিটের বেলায় হাতের অবস্থা হল উপরোক্তরূপ।

এইবার রুহিতন খেলার পর 'প' চিড়িতনের ছক্কা, 'উ' চিড়িতনের ছোট একতাস দেওয়ায় 'পূ' ইস্কাবনের দশ দিতে বাধ্য হলেন। একাদশ পিটে 'দ' চিড়িতনের

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—ছাব্বিশ—

আগত রোগীগণ অপেক্ষা করিয়া হতাশ চিত্তে বাড়ী ফিরিল। কেহ অমলকে ডাকিয়া দুই চারিটী মিঠাকড়া কথা শুনাইয়া বিদায় লইল। দুই এক জন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বাটীর উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইল। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজিল তথাপি অরুণের দেখা নাই। গত কয়েকদিন হইতেই অমল ভাবিতেছিল সে অরুণকে স্পষ্টই বলিবে যে তাহার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। নচেৎ অচিরেই তাহার দুর্ণাম বাহির হইয়া পড়িবে ও সাধারণের চক্ষে অরুণ যদি একবার লম্পট ও হীন চরিত্রের চিকিৎসক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে জীবনে ব্যবসায় জমান তাহার পক্ষে দুষ্কর হইবে। বেলা বাড়িয়া গেল, বারটা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময় নিদ্রালস চোখে অরুণ গাড়ী হইতে নামিল এবং সম্মুখে অমলকে দেখিয়া প্রীতি নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন আছ?" রোগী-পত্র কি কেউ ছিল ভাই?

বিষণ্ণ মুখে অমল উত্তর দিল, "হ্যাঁ ছিল বৈ কি? সবাই চলে গেল; মানুষ তো তারা; রোগ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তারা আসে; বেলা এগারটা পর্য্যন্ত থেকে চলে গেল অন্য ডাক্তারদের কাছে।"

"তুমি তাদের কিছু বল্লে না ভাই?" অরুণ প্রশ্ন করিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিল।

অমল বলিল, "হ্যাঁ বলেছি বৈ কি? বলেছি যে মশায়, ডাক্তারবাবু শ্রীমন্দিরে গিয়েছেন। দেবীর আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ফিরতে পারবেন না তিনি। আপনারা কি আর কলকাতায় ডাক্তার খুঁজে পেলেন না যে এসেছেন এই চরিত্রহীন লম্পটের কাছে?"

অরুণের মাথার ভিতর একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেল। সে বলিল "তা বলবে বৈ কি! নইলে আর বন্ধু কি? অনেক উপকার করেছি তোমার এই তার প্রতিদান। নিজে যদি মস্ত বড় চরিত্রবান হতে তা হলে ওসব কথা বলা শোভা পেত তোমার।

উত্তরে অমল বলিল, "তবু আমায় বলতে হবে অরুণ, যে তোমার বন্ধু আর কি করে বেহয়াল হবে বল? তবে আমার অপরাধ তোমার চেয়ে কম কারণ, আমি অবিবাহিত কিন্তু তুমি, তুমি কি? যার প্রতিমার মত স্ত্রী রূপে গুণে পৃথিবীর যে কোন স্ত্রীলোকের চেয়ে ছোট নয় তার মনে শেলাঘাত করে কোন শ্রীমতীর চরণ বুকে করে রাত কাটাও বলতে পার? বলতে পার কত ভালবাসে সে তোমায়, যার মোহে পড়ে তোমার স্ত্রীর জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে বসেছ?"

অরুণ বলিল, "এ সব তোমার অনধিকার চর্চ্চা। আমি যাই করি না, তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই আমি।"

অরুণ চলিয়া যাইতে উপক্রম করিলে অমল বলিল, "শোন অরুণ, তুমি আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য কিনা সে কথা ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি কি অধঃপতন হচ্ছে তোমার। দিলীপ বাবুর আজ প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে অসুখ। বৌদি রোজই সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে যান। উপযুক্ত ডাক্তার জামাই একদিনও দেখতে যাবার সময় পেলে না। আজ সকালে তিনি এসে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত বসে ফিরে গেলেন। আচ্ছা, তুমিই বল কি ধারণা নিয়ে গেলেন তিনি তোমার সম্বন্ধে!"

"কি বল্লে? শ্বশুর মশায়—?—এ্যা কখন এসেছিলেন তিনি?"

"ভোর পাঁচটা—বরং আরও কিছু আগে; যে সময় লোকে বাইরে যায় না বুঝেছ?"

"শুভ্রা কি বলেছে তাঁকে?"

উত্তরে অমল বলিল, তা আমি কি করে বলবো? তবে আমার বোধ হচ্ছে বৌদি তোমার দোষ ঢাকার চেষ্টা করলেও তিনি বৌদির কোন কথাই বিশ্বাস করেন নি।"

অরুণ দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া পরুষকণ্ঠে শুভ্রাকে বলিল, "এদিকে এস।" শুভ্রা নিকটে আসিলে সে বলিল, "রোজ সন্ধ্যায় কোথায় যাওয়া হয় শুনি? কাল মিথ্যে কথা বলেছিলে আমায়, বাপকে দেখতে যাও তার অসুখের জন্যে। আমি বেশ জানতে পেরেছি যে তাঁর কোন অসুখই করে নি। আজ আবার সকাল বেলা বাপকে আনিয়ে তাঁকে বোঝান হচ্ছিল যে আমি রাতে বাড়ী থাকি না—কেমন?"

উত্তরে শুভ্রা বলিল, "বাবাকে আমি ডাকিনি—তিনি নিজেই এসেছিলেন।"

"নিজে এসেছিলেন?—কের মিথ্যে কথা?" অরুণের ক্রোধে সর্ব্বশরী ফুলিতেছিল, সে পুনরায় বলিল, তোর বা

সাহেব খেলায় 'প' ইস্কাবনের ছোট এক তাস দিতে বাধ্য হলেন, 'উ' হরতনের নয় ফেলে দিলেন। এখন 'উ'র ইস্কাবনের তাস দুখানি বড় হওয়ায় (১২) ও (১৩) নং পিট দুখানি আত্মসাৎ করলেন।

——

আমায় কি করবে শুনি, যে বাপকে ডেকে বোঝান হচ্ছিল আমি বাড়ী থাকিনা ?"

শুভ্রা নীরবই রহিল। অরুণ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তোর বাপকে বলিস যা খুসী করতে আমার বিরুদ্ধে। তিনি বড়লোক তো বড়লোকই আছেন। আমার বয়ে গেল তাতে।—কিন্তু তুই রোজ রাতে যাস্ কোথায় ? কার অভিসারে ?

শুভ্রা কোন উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে না দেখিয়া অরুণ বলিল, "দেখ আমি অন্ধ নই—আর বুদ্ধিও আমার লোপ পায়নি। আমি স্পষ্ট কথায় শুনতে চাই রোজ যাওয়া হয় কোথায় ?"

অরুণ তাহার সকল সংযম হারাইয়াছিল। তাহার কথার কোন বাঁধনই ছিল না—তাহার মনে হইতেছে অরুণের অবহেলার সুযোগ লইয়া শুভ্রা কোন প্রেমিক জুটাইয়া লইয়াছে যাহার মিলনাকাঙ্খায় শুভ্রা প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিন চার ঘণ্টা কাল বাহিরে থাকে। সে কল্পনা নেত্রে দেখিতে পাইল শুভ্রা যেন কোন তরুণ যুবকের কণ্ঠে বাহুলতা জড়াইয়া দিয়া তাহাকেই বলিতেছে—ওগো তোমাকেই আমি ভালবাসি।—তুমিই আমার সব।—অরুণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, ব্যাঘ্রের ন্যায় শুভ্রার উপরে ঝাপাইয়া পড়িল ও তাহার কেশ আকর্ষণ করিয়া তাহার গণ্ডে তিন চার বার সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "বল্ এখনও, কোথায় যাস্ নইলে—."

শুভ্রা বলিল, "নইলে মেরে ফেলবে এইতো—আমি বলবো না। এমনি করে বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার হাতে মরা ঢের ভাল।"

"বটে বলবি না ? মনে করেছিস্ আমায় লুকিয়ে তুই অভিসার চালাবি ওই সুন্দর মুখখানা নিয়ে। মেরে তোকে ফেলবো না। কিন্তু এই মুখখানাকে এমনি

করে দেব যা দেখলে সবাই তোকে ঘৃণা করবে।"

অরুণ উঠিয়া কক্ষদ্বার বন্ধ করিল ও সোণা বাধান একটা বেত লইয়া আসিয়া পুনরায় বলিল, "এখনও বল কোথায় যাস তুই—আর তোর ভালবাসার লোকের নাম।"

উত্তরে শুভ্রা বলিল, "তুমি চোখ থাকতে অন্ধ, কাণ থাকতেও বধির; তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দেবনা আমি।"

"তোর বাবা দেবে" বলিয়া অরুণ সেই বেত্রদ্বারা শুভ্রাকে অমানুষিকভাবে প্রহার করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও পাছে তাহার প্রাণপ্রিয় স্বামীর সম্বন্ধে কেহ নীচ ধারণা করে তাই শুভ্রা নীরবে সেই প্রহার সহ্য করিল। শেষে যখন আর সহ্য করিতে পারিল না তাহার সংজ্ঞা লোপ হইল সে ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

অরুণ ভাবিল যে শুভ্রা মরিয়া গিয়াছে। ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে শুভ্রার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলিয়া লইল ও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সংজ্ঞা ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

অনুশোচনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল যে শুভ্রার শুভ্র অঙ্গের বহুস্থানে রক্তাক্ত আঘাত চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

দুই-তিন ঘণ্টা পরে শুভ্রার জ্ঞান ফিরিল। সে উঠিয়া বসিল। অরুণের মনে হইল সন্দেহ যখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে তখন হয়তো রাগের মাথায় কোনদিন শুভ্রাকে খুনই করিয়া ফেলিবে। তার চেয়ে সে তাহাকে আজই পিত্রালয় পাঠাইয়া দিবে এবং ইহজীবনে তাহার সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না। সে শুভ্রাকে আদর করিয়াই এক কাপ চা খাওয়াইল এবং তাহার সহিত আসিবার আদেশ দিল। শুভ্রাকে লইয়া সে ভবানীপুরে দিলীপবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। শুভ্রা গাড়ী হইতে নামিবা মাত্রই সে সজোরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। শুভ্রা বুঝিল স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিলেন। সে ধীরে ধীরে পিত্রালয়ে প্রবেশ করিল। উপরে উঠিতেই দিলীপবাবু কন্যার নিকটে আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত চিহ্ন দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তোর এ দশা কে করলে মা?"

পিতার বুকে মুখ লুকাইয়া শুভ্রা উত্তর করিল, "এ আমার পতিভক্তির পুরস্কার বাবা।"

—সাতাশ—

রাইচরণকে হয়ত পাঠক পাঠিকা ভুলিতে পারেন নাই। হোটেল পরিবর্ত্তনের পর রাইচরণ নূতন হোটেলে আসিয়া পৌছিল। অত্যধিক সাহেবিয়ানা ও সভ্যতার বাঁধন তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন কাজ তাহাকে বড় করিতে হয় না। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহাকে বাতরোগ আক্রমণ করিল। অরুণ ও বর্ণার ব্যবহার সময় সময় তাহার চক্ষে অত্যন্ত নির্লজ্জ বোধ হইত। সে স্থির করিল জন মুখর আড়ম্বর পূর্ণ কলিকাতা হইতে সে তাহার শান্তিপূর্ণ অনাড়ম্বর কুটীর প্রান্তে ফিরিয়া যাইবে। তাহার মনে হইল এই বিশাল নগরীতে সে লোক বহু দেখিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া নাই—সকলেই যেন যন্ত্রচালিত—প্রাণহীন, তাহাদের নিজের সত্ত্বা বলিয়া কিছুই নাই। তাহারা কাজ করে, হাসে, কথা বলে তাহাও যেন ধার করা—নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। অরুণকে পাওয়ার পর বর্ণা হয়তো তাহাকে তাহার গলগ্রহ মনে করে—তাই সে তাহাকে কোন কাজই করিতে বলে না। কাজ না করিয়া মাসে মাসে বেতন লওয়াটা রাইচরণ পছন্দ করিতে পারিতেছিল না। সে দরিদ্র চাষী; সে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ চাহে; সে ভিক্ষাগ্রহণ কেন করিবে? রাইচরণ স্থির করিল সে ফিরিয়া যাইবে ও কার্য্যে ইস্তফা দিবার ইচ্ছায় অরুণের বাটী গেল। তথায় সে অমলকে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। অমল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় চিনতে পার রাইচরণ?"

নমস্কার করিয়া কর জোড়ে রাইচরণ বলিল, "সে কি কথা বাবু? তোমার অন্ন খেয়েছি—আর চিনতে পারবো না? তা তুমি এখানে যে বাবু? এতদিন ছিলে কোথায়?"

উত্তরে অমল বলিল, "সে অনেক কথা রাইচরণ, বাঁচবার আশা ছিল না আমার। বহু ভাগ্যে বেঁচে গিয়েছি। আজ দু'মাস হলো এখানেই রয়েছি।"

হাসিয়া রাইচরণ বলিল, "তা ডাক্তার-বাবুকে দ্যাবতাই বলিতে হবে বাবু, নইলে যে তার বৌ বার করে নিয়ে যায় তাকে আবার বাড়ীতে স্থান দেয়? আমরা ছোটলোক, বাবু, অত ক্ষ্যামা ঘেন্না মোদের আসে না।"

অমল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি বলছ রাইচরণ, কার বউ বার করলাম আমি?"

"কার আবার? যার বাড়ীতে বসে কথা বলছ তারই,—থাক্ সে কথা।—"

বাধা দিয়া অমল বলিল, "অরুণের বউকে বার করতে পারে এমন সাধ্য পৃথিবীর কোন পুরুষেরই নেই—তুমি তাঁকে দেখনি তাই ওই কথা বলতে পারলে তুমি। শয়তান স্বয়ং যদি সমস্ত শক্তি নিয়ে চেষ্টা করে তবুও তাঁর দেহে পাপের ছায়া স্পর্শ করতে পারবে না এমন স্ত্রীলোক তিনি। মানুষের বেশ ধরে তিনি এসেছেন এই পৃথিবীতে। তিনি মানুষ নন রাইচরণ।"

সাগ্রহে রাইচরণ বলিল, "আচ্ছা বাবু, তবে সত্যি করে বল আমায় বর্ণা কে?"
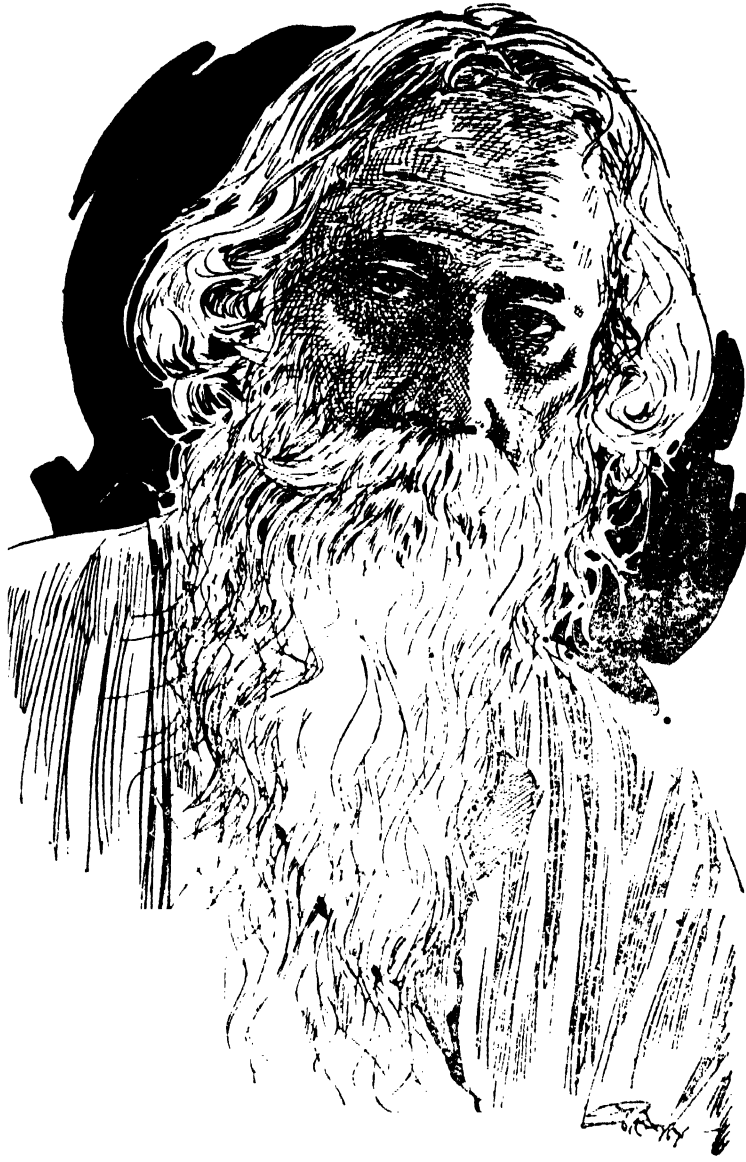
বি-পি মেহেরা
প্রযোজিত
এসোসিয়েটেড
প্রোডিউসার্সের
নিবেদন :
শ্রী
শুভ-উদ্বোধন :
৩০শে
জুলাই, শনিবার
দ্রুত সিট্ রিজার্ভ হইতেছে।
সঙ্গীত ও
সুর-সংযোজনা :
রবীন্দ্রনাথ
পরিচালনা :
সন্তু সেন
চিত্র-শিল্পী :
ননী সান্যাল
শব্দধর :
মধু শীল
সঙ্গীত শিক্ষক :
অনাদি দস্তিদার
আবহ সঙ্গীত :
সুরেন দাস
: ভূমিকায় :
সুপ্রভা মুখার্জ্জি
ইন্দিরা রায়
শান্তিলতা ঘোষ
রমা ব্যানার্জ্জি
হরেণ মুখার্জ্জি
ছবি বিশ্বাস
মনোরঞ্জন ভট্টাঃ
শিবকালী চ্যাটার্জ্জি
রবীন্দ্রনাথের
চোখের বালি
কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে বি-এ-এফ্ শব্দযন্ত্রে ত
E. P. S.
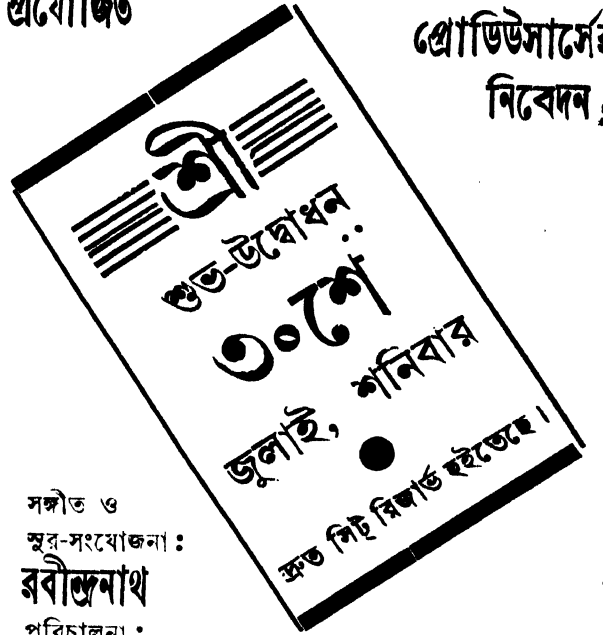
অমল বলিল, "সে আমার বা অরুণের কেউ নয়—সে এক কুড়িয়ে পাওয়া বামুনের মেয়ে।"

"তবে সে কারও স্ত্রী নয়?"

"না সে ছিল কুমারী--পিতৃমাতৃহীনা।"

"অরুণবাবুর বাড়ী সে এলো কি করে?—মিথ্যে বলোনি, দোহাই তোমার। তুমি তাকে কোথা থেকে টাটানগরে নিয়ে গিয়েছিলে?"

অমল কিছুমাত্র গোপন না করিয়া রাইচরণের নিকট সমস্ত কথাই বলিল—পরে বলিল, "বিশ্বাস না কর, অরুণের স্ত্রীকে দেখাতে পারি তোমাকে আমি।" সে রামলালকে ডাকিয়া বলিল বৌমার কাছে এই বুড়োকে একবার নিয়ে যেতে পার রামলাল?"

রামলাল জানাইল আজ তিন দিন হইল বৌমা বাপের বাড়ী গিয়াছেন। বৌমা কবে ফিরিবেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল উত্তরে প্রভু তাহাকে বলিয়াছেন যে তিনি আর ফিরিবেন না। রামলালের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল; সে অমলকে জানাইল সত্যই যদি তাহার 'মা' ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে সেও চাকরী ছাড়িয়া দিবে। লক্ষ্মীহীন এই বিশাল প্রাসাদে থাকা অপেক্ষা বনে বাস করাও সে শ্রেয়ঃ মনে করে।

অমল ও রাইচরণ একত্রে বলিয়া উঠিল, "সে কি বৌমা ফিরিবেন না কেন?" রাইচরণ বলিল, "হা ভগবান্, শেষে কি সতীলক্ষ্মীর চোখের জলের কারণ হলাম আমি? আমার জন্তেই যে অরুণবাবুর এই সর্বনাশ হয়েছে—আমি যে সেই ডাইনীর কাছে ডাক্তারবাবুকে ধরে নিয়ে গিয়েছি। আমার সর্বনাশ হবে, অমলবাবু, তার চোখের জলে জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার সব—হয়তো নির্বংশ হব।

অমল রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "তবে, তবে কি কণা এখন অরুণের কাছেই আছে! অরুণ তার খবর জানে কি রাইচরণ! সত্য বল সেই কি তবে অরুণের অধঃপতনের কারণ? সেই কি বৌদিদিকে গৃহছাড়া করেছে? বল রাইচরণ, তোমার পায়ে পড়ি কোথায় সে? তুমি জান নিশ্চয়—জান আমার প্রতি দয়া কর—অনুগ্রহ কর, বলে দাও সে কোথায়।"

রাইচরণ বলিল, "মাফ করবেন বাবু তা আমি বলতি পারবো না। আমারে বৌমার বাপের বাড়ীর ঠিকানা বলে দিন আমি সেথানে যাব, মার পায় ধরি ক্ষমা চাইব। রামলাল ঠিকানা বলিয়া দিল। উন্মাদের ন্যায় রাইচরণ ছুটিল ভবানীপুরের দিকে। অমল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল ও কিছুদূর যাইয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল ও বলিল "ঠিকানা না বললে যেতে পারবে না তুমি রাইচরণ।"

রাইচরণ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বাবু যদি আমার কণা মাকে দেখতে পাও তুমি কি করবে শুনি?"

অমল বলিল, "প্রথমে চেষ্টা করবো তাকে ফিরিয়ে আনতে সে যদি না আসতে চায় তাহলে খুন করবো—হ্যাঁ সত্যিই খুন করবো তাকে।"

রাইচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "সে তোমার সঙ্গে ফিরবেনি বাবু শেষ কালে খুনই হবে। তোমার কচি বয়েস সমস্ত বড় জীবন পড়ে রয়েছে তোমার সামনে। কেন মিছে খুনোখুনি করে ফাঁসি যাবে বলত? আমি আমার মাকে নিজ হাতে খুন করবো; বৌমার পথের কাঁটা আমিই সরিয়ে দেবো। বুড়ো বয়সে ফাঁসি কিছু যাবে আসবেনি আমার। তুমি বাড়ী যাও।" অমলকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই বৃদ্ধ ঊর্দ্ধশ্বাসে পুনরায় ছুটিতে আরম্ভ করিল। অমল হতাশচিত্তে বাটী ফিরিল।

(ক্রমশঃ)

ব্যথার-রূপ

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

গানে আমার দেবে ধরা এইত ছিল কথা
গানেতে তাই ভাষা পেল আমার প্রাণের ব্যথা।
সুরের সাথে সুর মেশাতে সাধ ছিল যে মনে
বাঁধব তোমায় আপন করে প্রেমের আলিঙ্গনে।
সাধ যা ছিল মিলিয়ে গেল, হোলোনা গান গাওয়া
প্রেম যা ছিল ফুরিয়ে গেল, জাগলো শুধু মায়া
ক্ষণেক পরে হৃদয়ে মোর—তার পরেতে হায়
হৃদয় আমার উঠলো বলে বিপুল বেদনায়।
সুখের আশে ঘুরে শেষে ক্লান্ত হিয়া নিয়ে
বিদায় যখন নেব আমি মিশবো ধূলোয় গিয়ে,
তার আগেতে তোমার কাছে এইটুকু চাই প্রিয়
মিশে যাবার ক্ষণেক আগে শেষ দেখাটি দিও।

নৃত্যের অভিনব জলসা

"জলজ নৃত্য"

একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে যে অপরূপ নৃত্যের সৃষ্টি হয়, আসছে ৭ই আগষ্ট প্রভাত সিনেমার রূপালী পর্দায় বেলা ১১ টায় চিত্রে তা সম্পূর্ণ দেখান হবে। এরূপ ধরণের চিত্র এই সর্ব্ব প্রথম এবং কর্তৃপক্ষের এ ব্যবস্থা রস-পিপাসু মাত্রেরই আনন্দ দান কর্ব্বে। প্রতীচ্য নৃত্য, প্রাচ্য নৃত্য, বহু নৃত্যই রসক মহলে সু-পরিচিত কিন্তু নৃত্যের অভিনবত্ব ও প্রসারতা বহুদূর-মুখী। লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত. শুধু ঐশ্বর্য্যের ন্যায় এ আমাদের ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু পুরাতন কিংবদন্তীর সঙ্গে বিজড়িত বহু নৃত্যেরই প্রচলন রয়েছে। এ সম্পর্কে "হাউ" নৃত্যের উল্লেখ উল্লিখিত উক্তিরই সমর্থন কর্ব্বে। তেমনি দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজেই এই "জলজ" নৃত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়।

মাদ্রাজের সু-প্রসিদ্ধ নর্ত্তক রাজাগোপালন সুদূর 'রঙ্গমঙ্গলম' গ্রামে কোনও একমন্দিরের নর্ত্তকী জলজকে দেখতে পান। "জলজের" নৃত্যে যে স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণা আসত, যে অদ্ভুত কলা-নৈপুণ্যের সৃষ্টি হত সাধারণ লোকের কাছে তা অপরিজ্ঞাতই ছিল। রাজা-গোপালনই তা সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কার করেন এবং জলজকে সঙ্গে নিয়ে এলেন সহরে। তিনি ভাবলেন জলজের সহায়তাই তিনি "ভারত নাট্য"কে পূর্ণভাবে সঞ্জীবিত কর্ত্তে সক্ষম হবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক এবং কার্য্যকালে তার বিপরীতই সচরাচর হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। জন সাধারণ রাজাগোপালনের কার্য্যে কোন সাধু উদ্দেশ্য দেখতে পেলেন না, অধিকন্তু এটাতে লাগল রাজাগোপালনের কার্য্য অতীব গর্হিত হয়েছে। রাজা গোপা-লনের স্ত্রী ললিতা এতে খুবই মনে আঘাত পেল। অবশেষে জলজ এসে ললিতার মনের চাঞ্চল্য দূর করে দিল—তাও তার ঐ স্বর্গীয় নৃত্যের প্রভাবে।

ছবিখানি "জলজ" প্রত্যেকেরই মনো-রঞ্জনে সমর্থ হবে—বিশেষ করে নয়ন-মুগ্ধকারী অভিনব নৃত্য দ্বারা ভারত নাট্যের এই আদি কল্পনা রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য।

সবিতা ও মতিলাল

প্রভাত সিনেমায় সাগর মুভিটোনের চিত্ত-চাঞ্চল্যকারী অভিনব চিত্র "৩০০ শত দিবস পর" কলকাতায় হিন্দি চিত্র জগতে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, যারা গত সপ্তাহে প্রভাত সিনেমায় বুকিং অফিসে উপস্থিত ছিলেন তারাই এ কথার প্রতিধ্বনি কোরবেন এবং একথা বলাই বাহুল্য যে ঘটনার অভিনবত্বে, অভিনয়ে, সঙ্গীত ও কৌতুকে ছবিখানি এককথায় হয়েছে চমৎকার। গল্পের প্লটে বিদেশী ছায়ার ভাব পরিস্ফুট থাকলেও তাকে সম্পূর্ণ দেশী আব-হাওয়াপোযোগী করা হয়েছে এবং পরিচালক মশাইর এ কৃতিত্ব কম নহে। হিন্দি ভাষা খুবই সহজ ও সরল করা হয়েছে। মোটের উপর বাঙ্গালী দর্শকদের কাছে ছবিখানা যথেষ্ট সমাদর পাবে।

ছবিখানার পরিচালনা করেছেন সর্ব্বোত্তম বাদামী। মিঃ বাদামীর নাম চিত্রামোদী মহলে খুবই পরিচিত এবং পরিচালনার কাজ তিনি যথেষ্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর্ত্তে পেরেছেন।

এতে অভিনয় করেছেন ছায়াচিত্র-জগতে সুপরিচিত অভিনেত্রী মিস্ সবিতা দেবী, মতিলাল, দিব্বু ও ইয়াকুব, ভারতের ছায়া চিত্র জগতে এদের প্রত্যেকেরই কোন পরিচয় দিয়ে হয় না; এবং প্রত্যেক নামেরই বক্স-অফিস মূল্য যথেষ্ট আছে।

আসছে শনিবার থেকে প্রভাত সিনেমায় তৃতীয় সপ্তাহে পড়বে এবং আশা করা যায় আরও কয়েক সপ্তাহ ছবিখানি এখানে খুব ভাল ভাবেই চলবে।

অভিনয়

শ্রীভারত লক্ষী পিকচার্সের অনবদ্য অবদান "অভিনয়" শীঘ্রই রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ কোরবে। অভিনয় নৈপুণ্যে ও ঘটনার মনোহারিত্বে "অভিনয়" অভিনয়-জগতে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি কর্ত্তে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। শ্রীমতী সাধনা বোস চিত্রজগতে অতি অল্প সময়েই প্রসিদ্ধি লাভ কর্ত্তে পেরেছেন এবং "আলিবাবা" চিত্রে তিনি যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তা চিত্রামোদী মাত্রেই অবগত আছেন। বর্ত্তমান চিত্রেও তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য মোটেই ম্লান হয়নি, বরঞ্চ তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তাছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, প্রীতি মজুমদার, প্রতিমা মুখার্জ্জী প্রভৃতি রয়েছেন।

মহিলাদের অর্থনৈতিক- স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বইখানা লিখিত এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত মধু বসু।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

বাদুমণির পরিচালনায় ছোটদের বৈঠকের বিশেষ উন্নতির আশাই আমরা করেছিলাম। ছোটদের বৈঠক পরিচালনার যোগ্যতা বাদুমণির আছে এ আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু আমাদের ক্রমেই এই বিভাগটি সম্বন্ধে আমরা নিরাশ হয়ে পড়ছি। নির্দ্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে চিঠি পড়া আর বাকী সময়ে একটা বক্তৃতা কিংবা একটা ছেলে ভুলানো নাটিকা (?)—এই যদি ছোটদের বৈঠকের প্রোগ্রাম হয় তা হলে তাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না।

* * *

বাণীকুমারের পরিচালনায় 'বেতার-বিচিত্রা' বিভাগের মধ্যে আমরা দিন দিন বৈচিত্র্যতার পরিচয় পাচ্ছি। এবারে কয়লা-খনির দৃশ্য সুচিত্রিত রসঘন। বাণীকুমার কয়লাখনির যে দৃশ্য বেতার মারফৎ আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। কুলিসর্দ্দারের কথাবার্ত্তার ঢং সাওতালি নাচ-গান মাদল আর কয়লাখনির আভ্যন্তরীন দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব্ব!—বেতারে এ একটি সৃষ্টি!—……।

* * *

শ্রীযুক্ত সমরেশ চৌধুরীর আধুনিক গান আমাদের খুবই ভালো লাগে। বেতারে সমরেশবাবু জনপ্রিয় শিল্পী, বেতার প্রোগ্রামে এর গান বেশী করে দেওয়া উচিত।

* * *

গত বৃহস্পতিবার ২১শে জুলাই সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্রবাবু শরৎ বাবু সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নূতন তথ্য আমাদের জানান নি। তবুও বেতারে শরৎবাবু সম্বন্ধে আলোচনা প্রশংসনীয়।

* * *

ছোটদের বৈঠকে গত ২৩শে জুলাই সুসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। রসসাহিত্যিক বিজ্ঞান আলোচনা করলেন কেতাবী সুরে। শিশুদের বোধগম্য বক্তৃতাটি মোটেই হয় নি।

পল্লীমঙ্গল আসরেরও আমরা প্রশংসা করার মতন বিশেষ কিছু খুঁজে পাই না। অবশ্য পল্লী-কৃষক সমস্যা নিয়ে আলোচনা—নাটিকার রূপান্তরে মাঝে মাঝে বেতারে হয়ে থাকে। কিন্তু কতকগুলি সমবেত কণ্ঠের বেসুরা কোলাহলে নাটিকার রসসৃষ্টিতে বাধা পড়ে। গানও যা হয় তারও কোন অর্থ কিংবা সামঞ্জস্য থাকে না। নৃপেনবাবুর কাছ থেকে আমরা এর থেকে অনেক উন্নত ধরণের প্রোগ্রাম-গঠনমূলক অনুষ্ঠান আশা করে থাকি।

* * *

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান যে তিমিরে সেই তিমিরেই। কর্ত্তৃপক্ষ এ আসর সম্বন্ধে একেবারেই নিশ্চেষ্ট এবং উদাসীন। দু'একটি নারী শিল্পীদের বক্তৃতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানই এ আসরে থাকে না।

* * *

গত রবিবার ২৪শে জুলাই প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে কুমারী বীণাপাণির দু'খানি হিন্দি গান ও বেতার অর্কেষ্ট্রার প্রভাতী সঙ্গীত মন্দ নয়। জটাধর পাইনের গান চলনসই। রবিবার প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান দিনে দিনে অবনতির স্তরে নেমে যাচ্ছে। স্পেক্‌টেটর ষ্টেজ এবং স্ক্রীন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। স্পেক্‌টেটরকে সুসমালোচক বলে আমরা জানি। তাঁর ষ্টেজ এবং স্ক্রীন সম্বন্ধে আলোচনাগুলিতে সমালোচকের দৃষ্টি থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 'চক্রধারী'র মত একখানি থার্ডক্লাশ নাটককে প্রশংসা করতে শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলুম। স্পেক্‌টেটর অবশেষে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' সাধারণ দর্শকদের উপযোগী বলে নিজের রসজ্ঞানের মর্য্যাদা আবার রক্ষা করে গেলেন। Climax, নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত অনেক অনেক বড় কথা—গালভরা বুলিই শুনলুম—কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষদর্শী জানি একটা শতাব্দী বর্ষ পূর্ব্বের যাত্রা সুলভ নাটক। তারই সঙ্গে নানা প্যাঁচ কসা হয়েছে, সহজে লোক ভোলানোর মনোবৃত্তি নিয়ে। স্পেক্‌টেটরের রসজ্ঞানের অতঃপর আমরা প্রশংসা করি।

প্রেসিডেন্সী কলেজ ম্যাগাজিন

রজত জয়ন্তী

গত শনিবার ২৩শে জুলাই সন্ধ্যা ৬॥০ টায় প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার-ল্যাবরেটরী গৃহে কলেজ-ম্যাগাজিনের রজত-জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন মহাশয়। এই উপলক্ষে কলেজ-ম্যাগাজিনের প্রথম সম্পাদক— স কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌, বি, এল্‌. বার-এ্যাট্-ল, এম্‌-এল, এ মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উৎসব-সভায় যে সকল বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও সুধীসজ্জনগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে— মিসেস্ বি, এম্‌, সেন, মিসেস্ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার কন্যাগণ, মিসেস্ পাহাড়ী সান্যাল, মিসেস্ সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার,— বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কলেজ ম্যাগাজিনের প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী), শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কলেজ-ম্যাগাজিনের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক), শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার (ম্যাগাজিনের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী), ডক্টর অময়প্রসাদ দাশগুপ্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিষ্টাণ্ট কন্‌ট্রোলার), বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ কলেজের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে কলেজের একটি ছাত্র "বন্দে-মাতরম্" গানে উৎসবের উদ্বোধন করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের এই অতি পুরাতন ভবনে কলেজের উৎসবে প্রকাশ্যভাবে "বন্দেমাতরম্" গান এই প্রথম। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের আকস্মিকতা এতই বিস্ময়কর ও প্রীতিজনক হইয়াছিল যে, গানটি খণ্ডিত-বিকৃত ভাবে বেসুরে-বেতালায় কোনওরূপে গীত হইলেও আমরা প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইহার পর অধ্যক্ষ সেন মহাশয় নূতন ছাত্রগণকে স্বাগত সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। তাহার পর কলেজ-ইউনিয়নের গতবৎসরের সম্পাদক শ্রীমান্ পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রমথবাবুর পুত্র) সরস ভাষায় প্রধান অতিথিকে আমন্ত্রণ করেন। শ্রীমান প্রতাপ সেন (কলেজ ম্যাগাজিনের বর্ত্তমান সম্পাদক) ম্যাগাজিনের রজত-জয়ন্তী সংখ্যা কিরূপ হইবে তাহার একটি ক্ষুদ্র বিবৃতি প্রদান করেন। তাহার পর প্রধান অতিথি প্রমথ বাবু আবেগপূর্ণ ভাষায় কলেজ ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, উহার ক্রমোন্নতি ও বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া ভবিষ্যতে সগৌরব সাফল্যের আশা প্রকাশ করেন। ইহার পর কলেজম্যাগাজিনের গতবর্ষের সম্পাদক শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র সিংহ ম্যাগাজিনের অর্থসমস্যা লইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর মৃদু হওয়ার জন্য তাহারই সতীর্থগণ তাঁহার প্রতি যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়া ছিল, তাহাতে যে কোনও শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের লজ্জিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ছাত্র হইয়া ছাত্রের প্রতি যে এরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে—ইহা আমাদের ছাত্রাবস্থায় কল্পনারও অতীত ছিল। তাহার-পর শ্রীমান প্রতাপচন্দ্র ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

অতঃপর শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিক, পাহাড়ী সান্যাল ও অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রীযুক্ত চমনলাল মিশ্র ও দক্ষিণারঞ্জন ঠাকুর রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত গান বাজনা চালাইয়া ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটু বক্তব্য আছে। কলেজের এইরূপ একটি উৎসবে কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকই (বিশেষ করিয়া হোমরা-চোম্‌রা অধ্যাপক-গণ) অনুপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী, ডক্টর কুদ্‌রত-ই-খোদা, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুশোভন চন্দ্র সরকার, সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, গুরুদাস ভড়, সদানন্দ ভাদুড়ী, গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন অধ্যাপক ব্যতীত অন্যের দর্শন মিলিল না। অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (যিনি কলেজ ম্যাগাজিনের উপরা-উপরি দুই বৎসর সম্পাদক ছিলেন)—তাঁহারও অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে এ সভায় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বোধ হয় এই সকল দূরদর্শী অধ্যাপকবৃন্দ ভাবিয়াছিলেন—একে-ত এ্যাসেম্ব্লীর একজন কংগ্রেসী সভ্য প্রধান অতিথি, তাহার উপর "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত (হউক উহা ন্যাজা-মুড়া বাদ)— অতএব, এহেন স্থল দূরে পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত! অন্যথায় একযোগে অধ্যাপক-বৃন্দের উৎসবে অসহযোগিতার রহস্য আর কি থাকিতে পারে?

সোস্যাল কমিটির সভ্য শ্রীমান্ গণেশ চন্দ্র বসু, অসিত মজুমদার ও জুলশ্রী ঘোষ উৎসবের সাফল্যের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

কাশীপুর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(দিলীপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ক্ষণকাল, পরে আপন মনে মর্ম্মভাঙ্গা সুরে বলিতে লাগিল)

আজ সব বুঝতে পারলাম! কুহেলিকা কেটে গেছে! চারিদিক পরিষ্কার!......

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—একি! তুমি এ ঘরে উঠে এসেছো কেন? একবারটি তন্দ্রা এসেছে অমনি একি কাণ্ড করে বসলে!

দিলীপ—সুনীলা, সব বুঝতে পেরেছি আজ। সব ধরা পড়ে গেছে। জানতে আর আমার বাকী নেই কিছু।

সুনীলা—কি হ'ল? কি বুঝতে পারলে? কি জানতে পারলে?

দিলীপ—ওরে নীলা! সে কথা বলতে গিয়ে আমার বুকের মাঝে আটকে যাচ্ছে। —আমি ভাষায় তাকে টেনে আনতে পারছি না!

সুনীলা—তবে থাক্, তোমায় বলতে হবে না। যা বলতে এত কষ্ট হয় তা আমি শুনতে চাই না!

দিলীপ—কিন্তু তোমায় না বলে আমি পারবো না। ওগো মর্ম্মজয়ী বন্ধু আমার! তুমি ছাড়া আজ আর আমার কেউ নেই, তোমাকে বলতেই হবে!

(এই বলিয়া দিলীপ নিকটস্থ একখানি কোচে প্রথমে বসিয়া পড়িল, পরে শুইয়া পড়িল)

সুনীলা—দিলীপ, দিলীপ—! একি, একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে গেল!......বেহারা, বেহারা—

(বেহারার প্রবেশ)

এই, ছোটবাবুকে শীগগীর ডেকে দে, শীগগীর।

(বেহারার প্রস্থান)

মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে ব্যাণ্ডেজ ও গেল ভিজে রক্তের চাপে। অথচ ঠোঁট দুটি ন'ড়ছে, কি যেন বলতে চাচ্ছে!—

(স্নেহ তরল কণ্ঠে) দিলীপ, দিলীপ, আমায় যে কি বলবে বললে? আমি তোমার কাছেই রয়েছি। কি বলতে চাইছো বলো? কথা বলো, কথা বলে দুঃখের ভার লাঘব কোরে নাও দিলীপ!—

—না, না, এ আমি কি করছি! রোগীকে বিরক্ত করব না, বিরক্ত করব না!...

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

দ্বিজেন—কি, কি হয়েছে সুনীলা?

সুনীলা—দ্বিজেন, কি হ'য়েছে দেখো। তুমি উঠে গেলে, আমার কেমন একটু তন্দ্রা এলো। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।—উঠে দেখি ঘরে নেই। এ ঘরে এসে দেখি পাথরের মূর্ত্তির মতো ঐ ক্লীনটার পাশে দাঁড়িয়ে!—আমি জিজ্ঞাসা ক'রতে ব'ললে "বুঝতে পেরেছি, সব বুঝতে পেরেছি!" বললুম, কি বুঝতে পেরেছ আমায় বলো? বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু ব'লতে পারলে না, এই কোচটার শুয়ে পড়লো।

দ্বিজেন—দাদা, দাদা—

সুনীলা—ডেকোনা। তুমি শীঘ্র ডাক্তারকে নিয়ে এসো। পাবেত তাকে এখন?

দ্বিজেন—পাবো।— (প্রস্থানোদ্যত)

সুনীলা—মা কি শুয়ে পড়েছেন? পার যদি তাঁকে একবার ডেকে দিয়ে যেও। এখুনি উঠে হয়তো মাকেই দেখতে চাইবে।

(দিলীপ সহসা কথা বলিয়া উঠিল)

—না, না, মাকে আমার চাই না। মাকে ডাক্তে হবে না!...

সুনীলা—এই যে কথা বলেছে!—মাকে ডাকবে না দিলীপ?

দিলীপ—না।

সুনীলা—তবে থাক্ দ্বিজেন। তুমি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।

দিলীপ—না কাউকে না। কাউকে ডাক্তে হবে না। দ্বিজেন, তুমি আমার জন্ত কিছু কোরবে না।

দ্বিজেন—(হাসিয়া) তোমার জন্ত কিছু ক'রছিনা, ভয় নেই; কিন্তু আমার জন্ত আমায় ক'রতেই হবে!

(প্রস্থান)

দিলীপ—দ্বিজেন ভেবেছে আমি ওর ভাই; তাই আমার জন্ত ডাক্তার আনাকে ও নিজের জন্ত ডাক্তার আনা ব'লে ভাবে! মূর্খ!

সুনীলা—সত্য কথাই ভেবেছে। আমি হ'লেও তাই ভাবতুম দিলীপ।

দিলীপ—সত্য কথা জানে না ব'লে তাই ভেবেছে। জান্‌লে ভাবতে পারতো—

(মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবেগ ভরে বলিতে লাগিল)

আমার কেউ নেই সুনীলা। আমার বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। এ বাড়ীতে আমার কেউ নেই সুনীলা! ছিল সব, এক নিমেষে সব চলে গেছে!

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—এই যে বাবা এখানে। ওগো বাবা, তুমি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হ'য়েছো! এই দেখ Amrita Bazar Patrika Extra-Ordinary Issue বার কোরে খবর দিচ্ছে: Dilip Kumar Elected President Of The Indian National Congress! —এই দেখো। (পত্রখানি মেলিয়া ধরিল)

সুনীলা—দেখি, দেখি,—

(পত্রিকা লইয়া পড়িতে লাগিল)

(বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—Telegram! Sir.

সুনীলা—Telegram! দেখি।

(বেহারা চলিয়া গেল; খাম খুলিয়া টেলিগ্রাম খানি পড়িয়া সুনীলা কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল)

Wardha! যা ভেবেছি ঠিক তাই! Wardha থেকে আসছে!—এই নাও পড়ো।

মনীষা—কংগ্রেসের টেলিগ্রাম তো?

সুনীলা—হ্যাঁ—

মনীষা—প্রেসিডেণ্টই হ'ল বটে?

সুনীলা—হাঁ। রে—

মনীষা—ও-হো হো!

(বলিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া ফেলিল)

—আমি বাবাকে বলে আসিগে—

(দ্রুত প্রস্থান)

সুনীলা—দিলীপ, কথা বলছো না যে?

(টেলিগ্রাম খানি হাতে করিয়া দিলীপ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, সুনীলার কথায় তাহার চমক্ ভাঙিল)

দিলীপ—কথা! কথা আমার চির-জীবনের জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল সুনীলা! আমার যে দুর্দ্দিনে জাতি আমার নেতৃত্ব করবার ভার দিয়ে আহ্বান জানালে, আমার আমি সে আহ্বানে সাড়া দিতে পারবো না। ঠিক যে দিন আমার মা মর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন কোরে আমার কাছ থেকে বহু দূর চলে গেল, সেই দিন এলো আমার দেশের মা—আমার ভারতবর্ষ—তাঁর শ্রেষ্ঠ সেবকের অধিকার দিয়ে আমার পূজা নিতে! যে দুর্ভাগা মায়ের উপর শ্রদ্ধা হারাল, সে হ'ল অশুচি, অস্পৃশ্য; সে হ'ল কৃপার পাত্র, সে হ'ল সমাজের একটা আবর্জ্জনা!—আমি সেই! দেশ মাতৃকার পূজার অঙ্গনে আমার স্থান নেই, আমায় তোমরা বিদায় দাও!

সুনীলা—এ তুমি কী বলছো দিলীপ?

দিলীপ—যা বলতে চাই তাই বলেছি! —ওরে নীলা! ওরে Comrade! তুই জানিস্ আমি কে? আমার কি গোত্র?

সুনীলা—জানি।

দিলীপ—জানিস না!—আমি জারজ!

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—

বাড়ীর সকলের ঘুম ভাল করিয়া ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই, সকালে জগুদাদা ওরফে যজ্ঞেশ্বর আসিয়া হাজির। বাহিরের ঘরে ছিল রামদীন, সে তখন তাহার প্রভাতি মহাদেব বব্বমার্কা কলিকায় অগ্নি সংযোগে সমাপ্ত করিয়া সবে মল্লিকের দেউড়ী হইতে নন্দীভৃঙ্গীকে বিদায় দিতেছিল, এমন সময়ে জগুদাদা আসিয়া বলিলেন: 'কিরে রামদীন? বাড়ীর সব ভাল তো?'

জগুদাদার গায়ে এক নামাবলী জড়ানো, এবং পরণে একখানা গরদ কাপড়। কপালে চন্দন ও সিন্দুরের ঘটা সূর্য্যাস্তকালীন পশ্চিম আকাশকেও হার মানাইয়াছে। জগুদার সেই মুর্ত্তি দেখিয়া রামদীন প্রথমে ভয় পাইয়া গিয়াছিল, বুঝি কৈলাস হইতে মহাদেব স্বয়ং তাহার নিকট গঞ্জিকার অর্ঘ চাহিতে আসিয়াছেন, কিন্তু যখন দেখিল সেরূপ কোনও প্রশ্ন মহাদেব করিল না, বরং মানুষের মত এই পৃথিবীর বিষয়ে কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, তখন রামদীন চোখ রগড়াইয়া বলিল: 'মা বাবু? ভ্যালা কাঁহা! খবর বহুত খারাপ!'

পেছন দিক হইতে বাড়ীর ভিতরকার বাঙ্গালী চাকরটা দুইহাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া বলিল: দণ্ডবৎ হই মামাবাবু! এত সকালে কোথা থেকে এলেন?'

'কে? কেদার?'

'আজ্ঞে করেন!'

'বাড়ীর সব ভাল?'

'ভাল? ও বাবা! কি সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল কাল,—তা আর আপনাকে কি বলবো?'

জগুদা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন: কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, কেদার?

—আপনি শুনচেন না? কাল যে বউ ঠাকরুণ গঙ্গালাভ করেছেন!

—সে কি কথা? বউ ঠাকরুণ?

—হ্যাঁ গো বাবু! আপনাদের দিদিমণি! আহা! বড় সত্য মানুষটিই ছিলেন! মুখ দিয়ে কখনও রা বাহির হইতেন না।'

জগুদা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন: সে কি কথা! আমাদের ললিতা দিদিমণি মারা গেছেন?

—হ্যাঁ গো বাবু! আমি কি আর মিথ্যা কথা কইচি! ঐ জিজ্ঞেস করুন না রামদীনকে! বাড়ীটাকে একেবারে চোখের জলে ভাসাইয়া গ্যাছেন!

—কি সর্ব্বনাশ! আমি ত কিছুই জানতে পারিনি! মা জেনেছেন? তিনি এসেছেন নাকি?'

—বউ ঠাকরুণের মা? না, না, তাঁমরাও আসেন নি। কেউ আসেন নি। মৃত্যুটা যে হঠাৎ হলেন কি না!

—হঠাৎ? কি হয়েছিল?

রামদীন এতক্ষণে কথা কহিল; সে বলিল: ভগ্‌বান্ বোলা, মাটিকো মুনিয়া হুয়া!

—মুনিয়া কি ব্যাধো রে?

কেদার বলিল: মুনিয়া টুনিয়া ওসব কিছু নয়। ওসব মেড়োদের কথা। বুকে সর্দ্দিকাশি বসেছিল! সান্নিপাত বিগার হয়েছিলেন।

—উঃ! তাহলে'ত বড় ভয়ানক কথা! মা খবর পেলেন কিনা, বুঝতে পারলুম না। কেদার? তুমি একবার সরজ দিদিমণিকে খবর দাও! কি ব্যাপার ঘটলো, আমি একবার জিজ্ঞেস করি।

—সরজ দিদিমণিকে? আমি একবার দেখি তাঁকে পাওয়া যায় কি না! তানারা আবার এত সকালে উঠছেন না। বাবু ওঠেন দেরীতে, তাই তানরাও উঠছেন দেরীতে!

বলিয়া কেদার সিঁড়ি বাহিয়া উপরে গেল। জগুদা বসিয়া রহিলেন। তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল, গৃহলক্ষ্মীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানাও হতশ্রী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহিরের ঘর খানাও যেন কিছু কিছু তাহার আভাষ দিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে কেদার আসিয়া জগুদাকে উপরে লইয়া গেল। তিনি কেদারের সঙ্গে যে ঘরটিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সে ঘরটি খুব সুসজ্জিত না হইলেও সুপরিষ্কৃত এবং আসবাবগুলি যথাস্থানে সুরক্ষিত। দেখিলেই মনে হয়, মানুষের পরিচ্ছন্নতার প্রকৃতি সেখানে পুরদস্তুর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শিল্পী এবং সতর্ক অঙ্গুলির সেখানে অভাব হয় নাই।

পরিষ্কার সুমার্জ্জিত মেঝের উপরে বসিয়া একটি রমণী চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া কাঁদিতেছে। জগুদা দেখিবামাত্র চিনিলেন, সে সরজ। জগুদা কিছু না বলিয়া সম্মুখের একটি কেদারায় উপবেশন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

Bastard! আমার মা—না, না,—আমি আর বলতে পারছি না, আমায় ক্ষমা কর।

(বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল; অনুসরণ করিল সুশীলা। নামিয়া আসিল তীব্র যবনিকা।)

(ক্রমশঃ)

প্যারামাউণ্টের ছবি "ট্রপিক হলিডে"তে
ডরথি ল্যামুর ও রে মিল্যাণ্ড

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৯৬৬

অষ্টম বর্ষ, একত্রিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে শ্রাবণ ১৩৪৫, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৩৮

রাষ্ট্রমঞ্চে শেষ অঙ্ক

বাংলার মন্ত্রী-মণ্ডল যে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াছেন তাহাতে হক্-নলিনী-নাজিমের "সুখী পরিবারের" নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের অনুকূলে বিপুল সমর্থকবৃন্দের সমাবেশে তাঁহারা অপ্রত্যাশিতভাবে শঙ্কিত হইয়াছেন। রাষ্ট্র-নাট্যের শেষ অঙ্কের অভিনয় হইবে আগামী সোমবার।

সোমবারের বল-পরিক্ষার জন্য উভয় পক্ষই বিশেষ তৎপর। হকাই মন্ত্রী-মণ্ডল প্রতিক্রিয়া-বাদিদের সহিত মিতালী করিয়া যেরূপভাবে মসনদে কায়েমী হইয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে পারে তাহা কয়েক মাস পূর্ব্বে কেহই ভাবিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরাগমনের পর হইতে বিরোধীদল যেরূপ অভাবনীয়রূপে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বিস্ময়েরই বিষয়। অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বর্ত্তমানে যে অন্ততঃ পক্ষে ১১০ জনও সমর্থক পাওয়া গিয়াছে তাহা বিরোধী-দলের সংযোগসাধক নেতা শরৎচন্দ্র ও হুইপ শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্তের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সাহেবের বাক্-চাতুর্য্য, নলিনীবাবুর আত্মশ্লাঘা ও অপরাপর কৌশলাবলী যে পতনোন্মুখ মন্ত্রী-মণ্ডলীকে রক্ষা করিতে পারিবে না তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত।

বিরোধী দলের শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া হক্ সাহেব বহু রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। তবে তিনি নলিনীবাবুর মায়া কাটাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহাকে বিরোধীদল হজম করিতে পারেন নাই। শেষ মুহূর্ত্তে হক্ সাহেব নলিনীবাবুকেও পরিত্যাগ করিয়া বিরোধীদলের নিকট আত্ম-সমর্পন করিলেও আমরা বিস্মিত হইব না কারণ সময় ও ঘটনা-উপযোগী রূপ, মত ও বেশ পরিবর্ত্তন হক্ সাহেবের পক্ষে যতটা সহজসম্ভব অন্যের পক্ষে তাহা নহে। সুতরাং শেষ মুহূর্ত্তে কোন নাটকীয় বিবৃতি সহ হক্ সাহেবের পক্ষে বিরোধীদলে যোগদান করা অসম্ভব নহে।

দশটী বিভিন্ন অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব দাখিল অভিনব হইলেও ইহার মধ্যে রাজনৈতিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা বিদ্যমান আছে। হক্ সাহেব ও নলিনী বাবুর সহিত অনেকের বহুবিধ যোগাযোগ ও বাধ্য-বাধকতা আছে সুতরাং অন্যান্য মন্ত্রীদের বিপক্ষে অধিকতর ভোট গৃহীত হওয়াই স্বাভাবিক। আর সংযুক্ত দায়িত্বের নীতি স্বীকৃত হইলে একজনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইলে সমগ্র মন্ত্রী-মণ্ডলের উপরই অনাস্থা জ্ঞাপিত হইল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

শেষ অঙ্কের যবনিকা পতনের পর পটোত্তলন হইলে বাংলার রাষ্ট্রমঞ্চে কোন মন্ত্রী-মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে তাহা এক্ষণে তুমুল গবেষণার বিষয় এবং বাংলার জনসাধারণ শেষ অঙ্কের বিতণ্ডার পরিণতি সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

নৌশের আলি সাহেব, মিঃ শ্যামসুদ্দিন, মিঃ তামিজুদ্দিন, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়, মিঃ পি, আর, ঠাকুর ও ডেপুটী মেয়র হেমচন্দ্র নস্করের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবার সম্ভাবনাই অধিক। রাষ্ট্র-মঞ্চে শেষ অঙ্কের অভিনয়ের পরিণতির সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদও বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্য নূতন ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ সম্বন্ধে কোন ঘোষণা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

(বিলাসী)

গোরা

দেবদত্ত ফিল্মসের নিবেদন

প্রযোজক—দেবদত্ত শীল

কথা ও কাহিনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচালনা—নরেশ মিত্র

সঙ্গীত পরিচালক—কাজী নজরুল ইসলাম

চিত্র-শিল্পী—যশোবন্ত ওমাশীকর

শব্দ-যন্ত্রী—সত্যেন দাসগুপ্ত

চিত্র-সম্পাদনা—ভোলানাথ আঢ্য

চিত্র-পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ

ভূমিকায়: গোরা—জীবন গাঙ্গুলী, সুচরিতা—রাণীবালা, ললিতা—প্রতিমা দাসগুপ্ত, লাবণ্য—রমলা, আনন্দময়ী—রাজলক্ষ্মী, হরিমোহিনী—দেববালা, বিনয়—মোহন ঘোষাল, হারাণ—নরেশ মিত্র, পরেশবাবু—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মহিম—রবি রায় প্রভৃতি।

প্রথম মুক্তি 'চিত্রা' শনিবার ৩০শে জুলাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাঙলা দেশের সকল ঘরেই পরিচিত। তাই যেদিন শুনলাম এই বইখানি দেবদত্ত ফিল্মস্ তোলবার ব্যবস্থা করেছেন, সেদিন একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলুম। কেননা এর আগে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা যা পেয়েছিলাম তা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। কিন্তু সেদিন গোরা দেখে আমাদের সে ধারণা অবশ্য কতকটা বদলেছে। এখন আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে 'গোরা' এই প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ছবি।

নরেশবাবু—'পানুবাবু'-র ভূমিকায়

পরিচালক মশাই যে ভাবে এই বইখানি পরিচালনা করেছেন তাতে তাঁকে ভালই বলা চলে যদি চিত্রনাট্য থেকে আরও কয়েকটা দৃশ্য বাদ দিয়ে এর মূল চরিত্রগুলিকে আরও ভালভাবে ফোটাতে পারতেন। একটা জিনিষ সম্বন্ধে তিনি যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অমার্জ্জনীয়। নর্ত্তকী অরুণার অর্দ্ধনগ্ন মাংসস্তূপ দেখাবার প্রলোভন সম্বরণ করতে না পেরে তিনি রবীন্দ্রনাথএর এই অমর সৃষ্টির উপর যে কশাঘাত করেছেন তা বাঙলা দেশের লোক কোন দিন বরদাস্ত করতে পারবে না।

ছবিখানার চিত্র-শিল্পের কাজ মোটামুটি ভালই হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি দৃশ্য বেশ ভালভাবেই তোলা হয়েছে।

প্রতিমা দাশগুপ্ত—'ললিতা'-র ভূমিকায়

চিত্র সম্পাদনা কার্য্য আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। আমাদের মনে হয় এখনও যদি এ ছবিতে কিছু addition, alteration করা হয় তাহ'লে এ ছবিখানা ভালই হয়ে দাঁড়াবে।

অভিনয়এর দিক থেকে প্রথমে মনে পড়ে প্রতিমার 'ললিতা'র কথা। ইনি ছায়া-চিত্র রাজ্যে যে চমৎকার নিজ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই আশাপ্রদ। এর পরেই স্বয়ং পরিচালক মশাই 'পানুবাবু' চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। আনন্দময়ী ও হরিমোহিনীর ভূমিকায় যথাক্রমে রাজলক্ষ্মী ও দেববালার অভিনয় চরিত্রপযোগী হয়েছে। সুচরিতার অংশে রাণীবালার গান ও অভিনয় সুন্দর। গোরার ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় মোটের উপর ভাল বলা চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আর বিশেষ করে কিছু বলবার দরকার নেই।

মোটকথা গোরা হয়েছে এমন একটী ছবি যার dialogue-গুলি চোখ বুজে শুনলেও মানুষ তৃপ্তি পাবে।

চোখের বালি

এসোসিয়েটেড্ প্রোডিউসার্সের নিবেদন

প্রযোজনা : বি, পি, মেহেরা

কথা, কাহিনী, সঙ্গীত ও সুর-সংযোজনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচালনা : সতু সেন

সঙ্গীত শিক্ষক : অনাদি দস্তিদার

আবহ সঙ্গীত : সুরেন দাস

চিত্র-শিল্পী : ননী সান্যাল

শব্দযন্ত্রী : মধু শীল

চিত্র-সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি

ভূমিকায় : বিনোদিনী—সুপ্রভা মুখার্জ্জি, আশা—ইন্দিরা রায়, রাজলক্ষ্মী—শান্তিলতা ঘোষ, অন্নপূর্ণা—রমা ব্যানার্জ্জি, মহেন্দ্র—হরেণ মুখার্জ্জি, বেহারী—ছবি বিশ্বাস, সাধুচরণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

প্রথম মুক্তি : 'শ্রী' শনিবার, ৩০শে জুলাই।

পরিবেশক : রীতেন এণ্ড কোং।

রবীন্দ্রনাথের "চোখের বালি"-র মত একখানা মনস্তত্বমূলক উপন্যাস যেদিন রূপালী পর্দ্দায় রূপান্তরিত হবে সেদিন আমাদের সন্দেহ হ'য়েছিল বঙ্গসাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদখানি হয়তো বিকৃত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ কোরবে, কিন্তু ছবি দেখে আমরা একবাক্যে স্বীকার কোরছি যে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেষ্ঠ কাহিনীটির মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। কবি মানসচক্ষে যে সকল চিত্র চিত্রণ কোরেছেন এবং গল্পটিকে যে ভাবে গ্রথিত কোরেছেন চিত্রনাট্যকার কোথায়ও সস্তা প্যাঁচ বস্তা বস্তা না ভরে সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সম্পাদন কোরেছেন। পরিচালনাও হ'য়েছে অতি উচ্চস্তরের। সতু সেন এ অবধি যতগুলি চিত্র পরিচালনা কোরেছেন—নিঃসংশয়ে এখানিকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে।

টেক্‌নিক্যাল বিভাগেরও কাজ "চোখের বালি"-র আশানুরূপ হ'য়েছে। বিশেষতঃ মধু শীলের শব্দযন্ত্রের কাজ অতুলনীয়। কিন্তু সে হিসাবে আলোকচিত্রের কাজে ননী সান্যাল আমাদের তৃপ্তি দিতে পারেন নি। রসায়নাগারাধ্যক্ষ হিসাবে কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জির কাজ আরও ভাল হওয়া উচিৎ ছিল। বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জির চিত্র-সম্পাদনা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

ছবিখানির সঙ্গীতাংশ হ'য়েছে বাঙলা ছবির এক অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের সুর-বৈশিষ্ট্যকে কিছুমাত্র বিকৃত না কোরে মধুর সুর-লহরীতে ছবির ভেতর যে মায়াজাল সৃষ্টি করা হ'য়েছে তা' সত্যই অপূর্ব্ব! এবং এজন্য আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের একমাত্র অধিকারী অনাদি দস্তিদারকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ছবিখানির আবহ সঙ্গীতও হ'য়েছে অনবদ্য এবং এজন্য সমস্ত গৌরবের দাবী কোরতে পারেন সুরেন দাস।

অভিনয়ের দিক থেকেও ছবিখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না কোরে পারি না। বিনোদিনীর ভূমিকায় সুপ্রভা মুখার্জ্জি যে অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা' বাঙলাদেশের যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর কথাবার্ত্তা চালচলন সত্যই অপূর্ব্ব। ইন্দিরা রায়ের আশা চলনসই—কিন্তু এই চরিত্রে তাঁকে মোটেই মানায়নি। শান্তিলতা ঘোষের রাজলক্ষ্মী ও রমা ব্যানার্জ্জির অন্নপূর্ণা চরিত্রানুযায়ী হ'য়েছে। পুরুষ ভূমিকার মধ্যে ছবি বিশ্বাসের বেহারী সত্যই অপূর্ব্ব হ'য়েছে। ছবিবাবুর মধ্যে যে এত শক্তি ছিল তা' এই ভূমিকাভিনয় দেখবার আগে আমাদের ধারণার অতীত ছিল। হরেণ মুখার্জ্জির মহেন্দ্রও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের সাধুচরণ যেরূপ হওয়া দরকার সেইরূপই হ'য়েছে। আর একটি অতি ক্ষুদ্র ভূমিকা সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সেটি হ'চ্ছে অত্রি গুহ ঠাকুরতার জগুভৃত্য। তাঁর সাজসজ্জা, কথাবার্ত্তার ভেতর শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়।

মোট কথা, "চোখের বালি" একখানি ছবি হ'য়েছে যা' দেখে সবাই পাবেন প্রচুর পরিমাণে আনন্দ।

স্ট্রীট সিঙ্গার

বস্তীর ভেতর আজ যে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি ঘোরা ফেরা কচ্ছেন তাঁকে চেনা সত্যিই শক্ত। সেদিন যাঁরা ষ্টুডিওতে সুটিং দেখতে এসেছিলেন তাঁদের সবাইয়ের এক প্রশ্ন ছিল, কে লোকটি? তাঁদের কারুকেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি। ষ্টুডিও আমাদের জানিয়েছেন লোকটির নাম অমর মল্লিক। বাংলার চলচ্চিত্রে অভিনয়ে এবং রূপ সজ্জায় তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে একথা সবাই স্বীকার করবে।

এই দিনেই দেখা গেল শৈলেন চৌধুরীকে। আজ তিনি তরুণ যুবক, সুবিখ্যাত অভিনেতা অমরনাথের ভূমিকায় অবতরণ করেছেন। বন্ধু ত্রিলোক নাথ অর্থাৎ অমর মল্লিকের হাত ধরে এসেছেন 'পাঁকে পদ্মফুল তুলতে'।

বন্ধুদ্বয়ের হাত যশ আছে, কী বলেন?

চাকরী পেয়েছে মঞ্জু মানে কানন। আনন্দ ভুলুধার আর তার মঞ্জুর। গান, গান, গান! নাচ আর গান। সাইগল গাইছে, কানন গাইছে। সুরে তানে লয়ে, মীড়ে মূর্চ্ছনায় সারা ঘর খানা যেন দোল খেয়ে

যাচ্ছে। হাঁফিয়ে উঠেছে মঞ্জু—তার মুখখানা লাল টকটকে—লাল সিঁদুরের মত লাল। কপোলের, কপালের আর কেশের ঘাম পিছলে পড়ছে তাঁর পাতলা রাঙা ঠোঁটে আর লাল ঘাঘরাতে।

মঞ্জু নাচছে—তার নিভাজ নিটোল মাংসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বেতবিন্দু বাহিরের বাতাসকে শীতল করছে। মঞ্জু নাচছে! মাটির দেওয়ালের ছবি দুলছে, জিনিষ পত্তর ভুঁয়ে লুটোপটি খাচ্ছে। ভুলুয়া গাইছে; 'ঝুমুর ঝুমুর নুপুর বাজে—ওই নুপুরে বন্দী আছি আমি আর আমার সারা ভুবন খানি।'

বড়দিদি

গত সপ্তাহে পরিচালক অমর মল্লিকের সেট্-এ উপস্থিত হ'তে পেরেছিলাম। মল্লিক মশাই তখন একটি বিশেষ দৃশ্যের পরিচালনায় ব্যস্ত।

ব্রজবাবুর বাড়ীতে—নায়ক সুরেন্দ্রনাথের পড়বার ঘর। টেবিলের উপর একরাশ বই। সব Higher Mathematics-এর।

সুরেন্দ্রনাথ আপন মনে আঁক ক'সে যায়। কোন দিকে তাকাবার তার অবসর নেই।

হঠাৎ কার যেন কণ্ঠস্বর তার কানে এল —'মাষ্টার বাবু, শুনছেন?'

বিস্মিত সুরেন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে 'নিমু'। ব্রজবাবুর বাড়ীর বহুকালের পুরোনো চাকর।

আবার নিমুর প্রশ্ন: "বড়দিদি বলচেন—"

"কি বলচেন?"

"ছোটদিদিকে পড়ান নি কেন?"

অন্যমনস্ক সুরেন্দ্রনাথ জবাব দেয়—ভাল লাগে না।"

উপরের দৃশ্যের শেষপর্য্যন্ত আমাদের দেখা হয় নি। শুনলুম এই লোকটিকে বড়দিদি শেষ পর্য্যন্ত বশে আনতে পারেন নি। ছোট বোন প্রমীলার মাষ্টারী করবার জন্যে তাঁকে রাখা হ'য়েচে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রাখবার তাঁর অবসর নাই। সে অম্লানবদনে জবাব দেয়—"আমার সময় হয় না।"

তার উত্তরে, বড়দিদির শেষ কথা যখন ভৃত্যের মারফতে সুরেনের কানে গেল—

"তবে এত দিন মিছে কথা বলে এ বাড়ীতে আছেন কেন?" —তখনই সুরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলে—'তাইত' বড় ভুল হ'য়েচে!"

শুনলুম নায়ক সুরেন্দ্রনাথের জীবনে, ব্রজবাবুর আশ্রয় ছাড়বার এই টুকুই ইতিহাস। সুরেন্দ্রনাথ চলে যাবার পর, বড়দিদির মনের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, তাহা আর একদিন জানাব।

সেদিন সুরেনের ভূমিকায় পাহাড়ীর রূপ-সজ্জা ও অভিনয় দেখে সত্যই মুগ্ধ হয়েচি। আর মুগ্ধ হ'য়েচি পরিচালক মল্লিক মশাইয়ের—সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে, হাসি-খুশীর মধ্য দিয়ে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার কৌশল দেখে।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে নিউ থিয়েটার্সের অনন্যসাধারণ সামাজিক-কথাচিত্র 'অভিজ্ঞান' নবম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। অত্যন্ত আধুনিক সমাজ সমস্যা ও হৃদয়ানুভূতির বিরোধ এবং ব্যাকুলতার অপূর্ব্ব চিত্র-কাহিনী যে কি ভাবে দর্শকবৃন্দকে আকৃষ্ট করিয়াছে তাহার পরিচয় রূপবাণীতে 'অভিজ্ঞান' চিত্রের এই নবম সপ্তাহ।

রূপবাণীতে আর একটি অভিনব ও বিশিষ্ট আকর্ষণ হইতেছে মন্দার ফিল্মসের বাঙলা কার্টুন চিত্র 'আকাশ-পাতাল।

আকাশ-পাতাল

'আকাশের পাখী ছিল গাছের ডালে—মাছেরা ছিল সুখে অতল জলে; কুক্ষণে মিলন হোলো আকাশপাতালে।" একটা মাছরাঙা পাখী ধরলে একটা মাছকে—কোনও প্রকারে মাছটা পাখীর ঠোঁট থেকে আপনাকে উদ্ধার করে হ্রদের জলে পোড়লো বটে—কিন্তু ল্যাজটা তার রয়ে গ্যালো পাখীর ঠোঁটে। মাছের রাজ্যে একটা হৈ হৈ রব পড়ে গ্যালো—পাতাল পুরীতে রাক্ষস এসেচে এবং তাদের এক-জনের ল্যাজ কেটে নিয়েচে। রাণী তখন নাচের মজলিসে বিশ্রামসুখ উপভোগ করচেন—মাছেরা সেই সময় সদরে গিয়ে এই দুর্ঘটনার কথা জানালে এবং প্রতি-বিধান প্রার্থনা করলে। রাণী ঘোষণা করলেন যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলে দুটী আসামী ধরা পড়লো—১ নম্বর একটা সাপ—অপরাধ তার একটী ছোট মাছকে গ্রাস করা, বিচারে হোলো তার প্রাণদণ্ড—চিংড়ী তার শুড়ের করাত দিয়ে তাকে দু'খান করে কেটে ফেললে—ছোট মাছটী জীবন্ত অবস্থাতেই বেরিয়ে এলো। ২ নম্বর ১টী পানকৌড়ী—দোষী কি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করার জন্য রাণীর হুকুম হোল ১টী ছোট মাছকে—পানকৌড়ীর পেটে গিয়ে দেখে আসতে সেখানে কিছু লুকানো আছে কিনা—মাছটী ফিরে এসে বললে কিছু নেই। বিচারের রায় হোল মুক্তি। একটা গ্যাসের বুদ্বুদ তৈরী করে পান-কৌড়ীকে তাতে পুরে দিয়ে উর্দ্ধমুখে ছেড়ে দেওয়া হোলো—জলের উপরে গিয়ে সেটা ফেটে গ্যালো—আকাশের পাখী আকাশের কোলে ফিরে গ্যালো! আকাশ পাতাল কার্টুন চিত্রের এই হ'ল গল্পাংশ।

পূর্ণ থিয়েটার

সামনের শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটার্সের বিদ্যাপতি ২য় সপ্তাহে পড়বে। গেল সপ্তাহে যে অদ্ভুত দর্শক সমাগম হয়েছিল তাথেকে মনে হয় যে, এ ছবি এখানে ৬৭ সপ্তাহ চলিবে।

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড এবং মধ্য প্রদেশের পরিস্থিতি

সচী শীল

ডাঃ খারে মহাকোশলের তিনজন মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে কতটা অন্যায় করেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই আমরা ওয়ার্কিং কমিটির কাজের দোষগুণ বিচার করতে পারবো।

মন্ত্রীদের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। Cabinet-এ যারা রয়েছে তাদের মধ্যে যদি Disharmony থাকে ত' প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে একত্ববোধকে basis করে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত করা। এতে হাই কমাণ্ড ছবির মধ্যে আসে কি করে? সে কি জোর করে প্রধান মন্ত্রীকে বলতে পারে—একতা রাখ, নইলে তুমি শুদ্ধ বিদায় হও। C. P.র ব্যাপারে যা ঘটেছে তা এর চেয়েও বেশী। মহাকোশলের মন্ত্রীত্রয়কে আবার গদিতে বসান হল, মারাঠী মন্ত্রীরা ছবির বাইরে চলে গেলেন, ডাঃ খারে হলেন—Condemned to roam in the wilderness.

গণতন্ত্র যেভাবে একটা প্রচণ্ড shock পেল কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হাতে তাতে মনে হয়, খুব শীঘ্রই দেশজুড়ে একটা বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হবে, যদি অবশ্য দেশ গণতন্ত্রকেই ভালবেসে থাকে।

কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার ওপর-ওয়ালা প্রথমতঃ Parliamentary Sub-Committee, তারও ওপর Working Committee. এরাই এতদিন প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর কাজ দেখছে এবং তার ওপর প্রভুগিরি করছে, Co-ordinating Body হিসেবে থাকার সার্থকতা Working Committeeর যে নেই তা আমি বলছি না। কিন্তু এই Co-ordination এবং broader senseএ supervision ছাড়া প্রাদেশিক আইন-সভা ও ক্যাবিনেটের ওপর অন্য কোন রকম কর্তৃত্ব চালাতে গেলে কুফল ফলবার যে বিশেষ সম্ভাবনা তার পরিচয় এখনই পাওয়া যাচ্ছে, এবং পরে এই পরিচয় বিশ্রীভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

হিটলার-মুসোলিনীর দিকে না তাকিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে যে সব ছোটখাট ডিক্টেটর গজিয়ে উঠছে তাদের ওপর তীব্র নজর রাখা দরকার। এইবারকার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ভারত কংগ্রেসের রাজনীতিতে একটা কু-অধ্যায়ের সৃষ্টি করলো।

ডাঃ খারে ওয়ার্কিং কমিটির কথা শুনে যে আবার resignation দিলেন—এই কথাটা gratefully মনে রাখা উচিত ছিল ওয়ার্কিং কমিটির। পদত্যাগ না করলে কে সরাতে পারতো প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে? আইন-সভার কংগ্রেস-সদস্যদের তাঁর ওপর Censure Motion আনতে রাজী করান একটা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। এবং জিদ বজায় রাখবার জন্যেও আর কমিটি ঐ সদস্যদের ওপর disciplinary action নিতে পারতো না। সেটা আরও অসম্ভব নয় কি? .*

মহাকোশল মন্ত্রীদের সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে হাই কমাণ্ডের নির্দেশ কেন নেওয়া হয়নি, এর উত্তরে ডাঃ খারে অনুশোচনা জানিয়েছিলেন, মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছিলেন এবং Assembly Congress Partyর নেতৃত্বও ত্যাগ করেছিলেন। এর পর আবার যদি তিনি নির্ব্বাচিত হতেন, তাহলে বোঝা যেত তিনি মেজরিটির confidence enjoy করেছেন সম্পূর্ণভাবে, এবং আবার নতুন করে মন্ত্রী সভা গঠন করলে আগের মত গণ্ডগোল থাকতো না, পুনরায় শান্তি ফিরে আসতো। ওয়ার্কিং কমিটি একটা unseemly ও ill-conceived resolution পাশ করে বললো—তাতে ডাঃ খারেকে অন্যায়ভাবে খর্ব্ব করা হয়েছে, স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের নির্দ্দোষ গভর্ণরকে বিশ্রীভাবে cowardly insult করা হয়েছে এবং হাই কমাণ্ডের সর্ব্বময় প্রভুত্ব অর্থাৎ ডিক্টেটরীগিরিকে বেশ করে consolidate করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন থেকে mailed fist দেখান হচ্ছে, যাতে দেশশুদ্ধ লোক ভড়কে গিয়ে হাই কমাণ্ডের decision ও directionকে কোনদিন না challenge করতে সাহস করে। Federation সম্বন্ধে compromise করবার তলে তলে যে চেষ্টা চলছে, সে চেষ্টা ব্যর্থ না হয়, এবং বল্লভভাই-ভুলাভাই-সত্যমূর্ত্তির political amibition কাজে প'রণত হওয়ার পথে না বাধা পায়, এইজন্য এখন থেকে হাইকমাণ্ডের শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করবার মতলবেই আজকের এই সব

“স্বামী”-স্ত্রী-উৎসব

গেল রবিবার “স্বামী-স্ত্রী”-র শততম রজনী উৎসব উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ থিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মচারীবৃন্দকে যথাযোগ্য উপহার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে সিলেটের ললিতকুমার দত্তের একটি প্রাচ্য-নৃত্য বিশেষ দর্শনীয় হ'য়েছিল। এই উৎসবে পৌরহিত্য করেন কংগ্রেস নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রঘুনাথ মল্লিক ও বিশ্বেশ্বর মল্লিক অতিথিগণকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।

কারসাজি। যা ঘটেছে তার এই রকম impressionই আমরা পেয়েছি।

মন্ত্রীদের মধ্যে একত্ববোধ হাই কমাণ্ড জোর করে জাগাতে পারে না। যদি পারতো তা হলে Panchmarhi Agreement টিকে যেত। তা ত আর হয় নি। ঐ Agreement এর পর থেকে অবস্থা আবার যা ছিল তাই হল। তা থেকেও উদ্ধত হাই কমাণ্ডের শিক্ষা হল না। মন্ত্রীসভা নিজের মনের মত করে গড়বার ভার ডাঃ খারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল; সব দিক দিয়ে তাতে ভাল হত। নিজের অস্তিত্ব সব জায়গায় জাহির করা চাই—এই Vanity হয়েছে সব গণ্ডগোলের মূল। এবং হাই কমাণ্ডের এই Vanity এখন বেড়েই চললো!

সুভাষবাবু নাকি বলেছেন যে Parliamentary Conventionকে বড় করে দেখতে গেলে চলবে না, তাতে আসল issue অর্থাৎ আমাদের Struggle for freedom বাধা পেতে পারে। এখন এই Struggleটা বড় আর সব ছোট এ কথা হয়ত সত্য হতে পারে কিন্তু, C. P.র ব্যাপারে ত আর এ সব বললে position clarify করা হবে না।

Struggle for freedom—এ কথার এখনকার মানে কংগ্রেস নির্দ্দেশিত parliamentary programme carry out করা। খারে সাহেব কি convention বজায় রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের constructive programme-এর কোন ক্ষতি করেছেন?

Harmonious cabinet গঠন করবার জন্যই ডাঃ খারে convention-এর ওপর জোর দিয়েছিলেন, কংগ্রেস-নির্দ্দেশিত programmeকে ব্যাহত করবার জন্য নয়। Struggle for freedom ঠিকই আছে, এবং এই Parliamentary convention-এর ওপর হাই কমাণ্ড কর্ত্তৃক outrage হওয়ার পর freedom movement-এর Tempo বেড়ে যায়নি—এটাও খুব সত্যি কথা।

Federation সম্বন্ধে আমাদের হাই কমাণ্ড শুধু বলেছে যে—মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি যাতে Haripura decision বদলাবার দরকার হতে পারে। অর্থাৎ পরে এমন কিছু ঘটতে পারে, লর্ড জেটল্যাণ্ড এমন একটা conciliatory attitude নিতে পারেন—যার ফলে Haripura decision বদলাবার বিশেষ দরকার হতে পারে! এখনও Open door policy! আদর্শের প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকতো তাহলে হাই কমাণ্ড বলতো হরিপুরার decision unalterable. সত্যমূর্ত্তির activity repudiate করতেও পারতো। কিন্তু হাই কমাণ্ডের সে আদর্শনিষ্ঠা কোথা?

শ্রীশনি গুপ্ত

াণীচিত্রে ভ্যালেন্টিনো

জগতের চিত্রবিলাসীদের অন্তরে অন্তরে াজও রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো অমর হয়ে াছেন। অতীতের সেই প্রিয়দর্শন যাদুকর ত্রনট; যুগান্তকারী প্রতিভার মোহিনী-য়ায় বিশ্ববাসীর হৃদয়ে যে দেবদুর্লভ াসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা কোনদিন লুপ্ত হবার নয়। তাই আজ নতুন কোনও প্রেমচিত্র দেখলেই মনে পড়ে যায় তার থা, অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেড়িয়ে আসে ্যালেন্টিনো! রুডলফ্ ভ্যালেন্টিনো!

রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর স্বল্পায়তন জীব-ার মধ্যে যে অপরূপ প্রেমমাধুর্য্য বিকাশলাভ রে উঠেছিলো, যে প্রণয়লীলার মধুময় রশ নটজীবনে একটী নবপর্য্যায়ের সৃষ্টি রেছিলো, সেই রূপরসপরিপুষ্ট অপূর্ব্ব ্রেম কাহিনীই আজ চিত্রজগতের একমাত্র ালোচ্য বিষয়।

সম্প্রতি আমেরিকায় ভ্যালেন্টিনোর ছায়া-ত্রগুলি অত্যধিক চাহিদা কর্তৃপক্ষকে শেষভাবে বিচলিত করে তুলেছে। রাস্তা টে হোটেল রেস্তোরায় আবার আরম্ভ য়েছে ভ্যালেন্টিনোর প্রশংসা গুঞ্জন!

তাই, কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, ভ্যালেন্টি নার জীবন কাহিনীর সেই অপূর্ব্ব রসমধুর র্য্যায়টি চিত্রে রূপান্তরিত করবেন।

রূপালী পর্দ্দার আত্মপ্রকাশ করে যারা সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাদের মধ্যে আর ারুর এ সৌভাগ্যলাভ করবার সুযোগ ঘটে নি। চিত্রনটের জীবন কাহিনী অবলম্বনে বাণীচিত্র এই প্রথম।

বার্থলমিউয়ের আবিষ্কার

ফ্রেডি মস্ত বড় কি একটা আবিষ্কার করেছে! কিন্তু বয়সে ছোট হলে হবে

বার্থলমিউ

কি, বুদ্ধি ওর ভারী; ব্যাপারটা ভাঙতে ও রাজী নয়—উঁহু—অতি নিকটতম আত্মীয়-কেও নয়। বলে: যতদিন না এটা পেটেণ্ট হয়, ততদিন টু শব্দ করছি নি।

ঘটনাটা অবশ্য এমন বিশেষ কিছু নয়। সম্প্রতি ও আর ওর পিসি হাওয়া খেতে গিয়েছিলো সাণ্টা বারবারা'র একটা ভাড়া বাড়ীতে। বাড়ী ফিরে এসে ফ্রেডির পিসি দেখেন, চাবীটা ভুলে ফেলে এসেছেন! ভ্যাবাচাকা খেয়ে বল্লেন: কি হবে ফ্রেডি?

ফ্রেডি মহা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো: কুছ পরোয়া নেই পিসি। আবার আবিষ্কারটা পরখ করে দেখবার

চার্লস বয়ার

এই একটা মহা সুযোগ। আজ বিকেলে, পেছনে জানালাতে একটা ছোট্ট ছিটকেনী বসিয়েছি আমি। এখন, যদি সেটা ঠিকমত কাজ করে, তা হলেই—ব্যস! বাড়ী ঢোকবার জন্যে আর তোমায় ভাবতে হবে না।......

তাড়াতাড়ি দুজনে গিয়ে উপস্থিত হলো বাড়ীর পেছনটাতে। ফ্রেডি তার গোপন প্যাঁচ কষতে আরম্ভ করলে। নানান্ রকম অদ্ভুত কারিকুরীতে অবশেষে খুললো জানলা। সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে একটা শব্দ আর কি একটা তরল জিনিষ ঢেলে পড়বার আওয়াজ—ভক্ ভক্ ভক্!......

পিসি মুখ বাড়িয়ে দেখেন, ঘরময় তেলে ভাসাভাসি। ফ্রেডির পোষাকগুলোর অবস্থা তেলে চপচপ—শোচনীয়!

ছিটকেনী বসাতে তেলের পিপেটার দরকার হয়েছিলো। কিন্তু কাজ শেষ হলে, সেটা সরাবার কথা আর মনে হয় নি। অতএব—

আবিষ্কারকের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, তেলসমুদ্র সাঁতরে মহা আনন্দে সে ঢুকলো ঘরে।

পিসি বললেন রেগে: ব্যাপার কি?

ও বললে হেসে: গোপনীয়!

হলিউডে ফরাসী অভিনেত্রী

রূপসী ফরাসী নটী দানিয়েল দারিয়ুর

নামছেন 'দি রেজ অব প্যারী' ছায়াচিত্রে। এই শ্রীমতীর প্রথম আমেরিকান ছবি। কিন্তু তাই বলে নিরাশ হবার কিছু নেই এতে; যারা শ্রীমতী দারিয়ু অভিনীত ফরাসী ছবিগুলি দেখেছেন, তারাই একবাক্যে স্বীকার করবেন: হাঁা রূপ বটে! প্রতিভা বটে!......

চার্লস বয়েরের ফরাসী ছবি 'মেয়ারলিঙ্গ' এর কথা শুনেছেন নিশ্চয়ই! 'মেয়ারলিঙ্গ'এ বয়ারের চিত্রসঙ্গিনী ছিলেন ফরাসী দেশের এই যৌবনোচ্ছল নিটোল চঞ্চলা রূপসী মাদামোয়াসেল দানিয়েল দারিয়ুর!

'দি রেজ অব প্যারী'তে ওর প্রেমিক সাজবে ডগ্লস ফেয়ার ব্যাঙ্কস (ছোট)।

ফ্রেডরিক মার্শ

ফ্রেডরিক মার্শ কে ও কি

ফ্রেডরিক মার্শ কে?......সাগর পারের একটী অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় প্রতিভা। কেমন? এই তো ওর নট-পরিচয়!!!

কিন্তু আজ যদি ওর এই 'ভুবনভোলান ক্ষমতাটুকু না থাকতো, যদি এই অভিনয় প্রচেষ্টা ওর হতো বিফল, তা হলে ফেডারিক

জিনজার রজার্স

মার্শের পরিচয় কি হতো জানেন?—ফ্রেডারিক বিকেল!......

না, না, হেঁয়ালী নয়, সত্যিই তাই। ওর প্রতিভা আজ ওর পরিচয়, তাই আজ ওর স্বকল্পিত নাম এতখানি ব্যাপকতা লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে। ফ্রেডরিক নিজেই বলে গেছে: আমার আসল নাম ফ্রেডরিক বিকেল। কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন ছিলো এত গোঁড়া যে থিয়েটারে ঢুকবার সময়ে সময়ে বাধ্য হয়ে আমাকে নাম পাল্টাতে হলো। একেবারে একটা নিরর্থক ছদ্ম নাম না নিয়ে, ঠিক করলাম, আমার মায়ের নামটুকু জুড়ে দেবো আমার নামের সঙ্গে।... আমার ফে্ডরিক এবং মায়ের মার্শায়, এই মিলে হলো ফ্রেডারিক মার্শার। তারপর দিলাম নেজুংটুকু ছেঁটে,—হলো, ফ্রেডারিক মার্শ!...কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল তেরটী অক্ষর লাগে ফে-ড-রি-ক মা-র্শ লিখতে। লক্ষণ অশুভ! তাই দিলাম আর একটা 'ই' ছেঁটে! এখন আমার নাম অতি সহজ সুবোধ্য বার অক্ষরের...ফ্রেডরিক মার্শ।

কি ভাবছেন?......'দি বুকানিয়ার'এর নায়ক অসম সাহসী বীরপুরুষ ফ্রেডরিক মার্শ। কুসংস্কারে হোঁচট খায় সেও!!......

সৌজন্য প্রকাশে বিপদ

সৌভাগ্যের বড়াই করে প্রায় সকলেই, নিজের ঐশ্বর্য্য সম্পদের কথা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে জানাতে সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু বিপদ কোন দিকে?

সম্প্রতি সাগরপারে এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছে। খ্যাতনামা একটী অভিনেত্রীর বুড়ী ঠাকুমা নাতনীর টাকার একখানা চমৎকার সাজান বাড়ী পেয়ে একেবারে

বিং ক্রসবী

আহ্লাদে ডগমগ। যে যেখানে ছিলো সকলকে এক একখানা করে লিখলেন চিঠি ওগো, আমার এ সুখ সৌভাগ্য তোমরা না এলে যে সব বৃথা যায় গো।...লিখে মনে মনে ভাবলেন, কে আর আসতে

বাবে দাত সমুদ্দুর তের নদী ডিঙিয়ে, তবু সকলে জানুক কথাটা।

কিন্তু ফল হলো ভারী মজার বান খানেকের মধ্যেই আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ী গেল ভরে। আর সবার কাছ থেকে থোকে থোকে চিঠি আসতে লাগলো: দুঃখু করো না, আমরা যাচ্ছি।

আতঙ্কে অভিভূত হয়ে বুড়ী বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিনকতক হোটেলে গিয়ে থাকিবার বন্দোবস্ত করছেন।

খুচরো খবর

জিঞ্জার রোজার্সে'র নতুন ছবি, 'দি ট্রেলার রোমান্স'। ওর নাচের তালে তালে রস সিঞ্চন করবে মেট্রো গোল্ড্‌উইন মেয়ারের জেমস্ ষ্টুয়ার্ট।

* * *

এডওয়ার্ড জি রবিন্সনের নতুন ছবিতে ওর পরিচয় হবে একটী ফুলের নামে, আর্কিড, 'ব্রাদার অর্কিড !!...

* * *

মহাসমারোহে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে 'দি এ্যাডভেঞ্চার অব রবিন হুড'—অতীত যুগের এক অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী ! ছবিখানা আগাগোড়া 'টেক্‌নিকলর'। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এরল ফ্লিন্, নায়িকা মেড মেরিয়নের ভূমিকায় অলিভিয়া ড হাভিল্যাণ্ড।

* * *

চিত্রজগতে নটনটীর জনপ্রিয়তার পরিমাপ আজকাল উক্ত তারকার ষ্ট্যাপ ছবির সংখ্যা। অর্থাৎ যার যে (নট বা নটী) যত প্রিয় সে তার তত ছবি সংগ্রহ করে রাখে। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, নিউজিল্যাণ্ডের একটী মেয়ে ছবি জমিয়েছে ৩,০৭৬ খানা, প্রত্যেকখানিই ওর অতি প্রিয় নট বিং ক্রসবির ছবি। কি বলবো একে ?...অতি অদ্ভুত তারকাপ্রীতি ?

বিবিধ

শুভ-বিবাহ

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার এটর্নী শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দের কন্যা শ্রীমতী অনিমা দের সহিত শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ এ-কে বসুর শুভ-বিবাহ কলেজ স্কোয়ার বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বসু, কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত. ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশ বসু ও কলিকাতা হাইকোর্টের বহু ব্যারিষ্টার, এটর্নী উপস্থিত ছিলেন। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

* * *

মেঘদূতের সাহায্যে সন্দেশ প্রেরণ যে কালিদাসের কালেই সম্ভব ছিল, তাহাই নয়। একালেও সে পদ্ধতি চলে এবং সার্থকও হয়। কারণ বন্ধুবর হরিপদ রায় তাঁহার প্রিয়ার নিকট এই বর্ষাগমে যে মেঘদূত পাঠাইয়াছিলেন, সে তাঁহার প্রিয়ার নিকট হইতে আহ্বান লইয়াই ফিরিয়াছিল। সেই আহ্বানে বন্ধুবর সাড়া দিতে গিয়াছিলেন গত ১৩ই শ্রাবণ। আমরাও সাথী ছিলাম। অবশ্য এক যাত্রায় পৃথক ফল হইল। তিনি পাইলেন প্রিয়া, আর আমরা পাইলাম সন্দেশ। দম্পতী শতং জীবতু।

* * *

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার শ্রীপ্রমথভূষণ দেবরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান পন্নগভূষণ দেবরায়ের পুত্র শ্রীমান্ পিনাকভূষণ দেবরায়ের সহিত ৪৭নং হালদার পাড়া রোড (কালীঘাট) নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপদ হালদার মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শোভনা দেবীর শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নব দম্পতির মঙ্গল কামনা করি।

* * *

গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার আলমপুর (বর্দ্ধমান) নিবাসী ৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর মহাশয়ের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত তারক মোহন সেন শর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মৃগেন্দ্রমোহন সেন শর্ম্মা বাবাজীবনের সহিত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুলেখা দেবীর শুভ পরিণয় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা নবদম্পতীর শুভকামনা করিতেছি।

স্মৃতি তর্পণ

গত ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ৪৭তম স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে রামমোহন লাইব্রেরি হলে সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক অমূল্য রায়কত, অধ্যাপক দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত গণপতি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণাবলী কীর্ত্তণ করেন। ছাত্রদের পক্ষ হইতে শ্রীশিশির বিশ্বাস, শ্রীরেবতী মোহন ঘোষাল, শ্রীআশুতোষ রায় চৌধুরী এবং শ্রীভবানী প্রসাদ সেন গুপ্ত স্ব স্ব রচিত রচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করার পর শ্রীসুজিত রায় চৌধুরী সুললিত কণ্ঠে গান গাহিয়া সমবেত সকলকে তৃপ্তি দেওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। উক্ত স্মৃতি সভায় বহু অধ্যাপক ও ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

শোক-সংবাদ

৺সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের শ্বশুর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার বাগাপুকুরস্থ বাটীতে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার চারি কন্যা বিদ্যমান।

ফিল্ম শিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতা

বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে সকল শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তন্মধ্যে ফিল্ম-শিল্পের স্থান যে বহু উচ্চে সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বেও এ শিল্পের বর্ত্তমান রূপ কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। ছায়া চিত্র জগতের এ অবস্থা একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে মানব মনের সাধারণ অবস্থার ক্রম-বিকাশ কেও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়।

কর্ম্মই মানব জীবনের প্রধান ও প্রথম কেন্দ্রস্থল। মানব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শুধু কাজ করিয়াই যাইবে। কারণ কর্ম্মেই তাহার মুক্তি, কর্ম্মেই তাহার প্রাণ এবং কর্ম্মেই তাহার আনন্দ, এক্ষণে কথা হইতেছে কর্ম্মের একঘেয়েমীত্বকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মের বহু রূপ সৃষ্টি হয় এবং কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহন করিবার নামই হইতেছে বিশ্রাম, অথবা একঘেয়েমী দূর করিবার উপাদান।

বস্তুতঃ বহু পুরাতন যুগ হইতেই এই উপাদান দেশাচার ভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এবং বর্ত্তমান যান্ত্রিক-সভ্যতার যুগেও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই উপাদান অর্থাৎ আনন্দ রস পরিবেশের নূতন উপাদান ছায়াচিত্র জগতেও ক্রমশঃ উন্নতি সাধন হইতেছে।

কিন্তু এই যে আনন্দ রস পরিবেশনের উপাদান তাহা যদি মানব মনকে দোলা না দেয়, যদি মানুষের রুচির প্রতিকূলে হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে মানুষ তৎক্ষণাৎ তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। কারণ তাহা হইলে দ্বিতীয়টি স্বল্পায়াসেই তাহার করতল গত হইবে। সুতরাং প্রত্যেক ফিল্ম-ব্যবসায়ী —প্রত্যেক ছায়াচিত্র নির্ম্মেতারই লক্ষ্য রাখিতে হইবে তাহার ছবি দর্শক গ্রহন করিবে কিনা অর্থাৎ আনন্দ রস পরিবেশনের উপাদান তাহার ছবিতে যথেষ্ট পরিমানে আছে কিনা। কর্ম্মের গুরুগম্ভীরত্বের সঙ্গে যেন রস সৃষ্টির উপাদানও গম্ভীর না হইয়া যায়। কারণ মানুষ কর্ম্মের আওতার বাহিরে গাম্ভীর্য্য মোটেই পছন্দ করে না।

উপরোক্ত এই বিষয়টির দিকে সুনিপুণ দৃষ্টি রাখিয়া সাগর মুভিটোন আনন্দ-রস পরিবেশনের যথেষ্ট উপাদান বজায় রাখিয়া "৩০০ শত দিন বাদ" নামক ছবিখানা তুলিয়াছেন। সঙ্গীতের মাধুর্য্যে অভিনয়-নৈপুণ্যে ও ঘটনার নূতনত্বে ছবিখানা হইয়াছে এক কথায় অপূর্ব্ব। এতে অভিনয় করিয়াছেন সবিতা দেবী, মতিলাল, বিব্বু ও ইয়াকুব। আগামী শনিবার ছবিখানা ৪র্থ সপ্তাহে পদার্পন করিবে। ছায়াচিত্র জগতের অভিনব সৃষ্টি নূতন অবদান যদি আপনি দেখিতে চান তাহা হইলে অবিলম্বে আপনি প্রভাত সিনেমায় "৩০০ শত দিন বাদ" নামক ছবিখানা দেখিয়া আসিবেন।

ইউরোপ অভিমুখে মিঃ সেন

কলিকাতার ছায়াচিত্র জগতে সুপরিচিত মিঃ বি সেন গত ২৬শে জুলাই বোম্বাই হইতে ইউরোপ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইটালী গমন করিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তিনি ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম "Dubbing" পদ্ধতিতে মুখরছবি তুলেন। কয়েকজন ইটালীয় ব্যবসায়ী তাঁহাকে ইটালীতে Dubbing পদ্ধতিতে ছবি তুলিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে মিঃ সেন ইটালীতে অবস্থান কালে মার্কিনী ইনষ্টিটিউটে "Television" সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবেন এবং তিনি মনে মনে আশা পোষণ করেন যে অদূর ভবিষ্যতে ফিল্ম-শিল্প ও Television-এর সমন্বয়ে এক নূতনতর শিল্পের সৃষ্টি হইবে। তিনি ইউরোপে dimension film, colour film ইত্যাদি ছায়াচিত্র শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা করিবেন।

মৃত্যুকালে তিনি প্রায় ৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি তাহার বহু আত্মীয়পরিবার-বর্গকে উইল করিয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

জলজ নৃত্য

আগামী ৭ই আগষ্ট প্রভাত সিনেমায় রূপোলী পর্দায় চিত্রে এই অভিনব নৃত্যের জলসা হইবে। দিনের পর দিন দক্ষিণ ভারতে এই নৃত্যের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে এবং এতাবৎ উহার সীমানা দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই স্বর্গীয় নৃত্যের উদ্ভব ছায়াচিত্রে তাহা গ্রথিত হওয়ায় আজ সকলের নিকটই তাহা উপভোগ্য। রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এই অভিনব নৃত্যের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবেন।

অতদ্ব্যতীত শুধু দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও গল্পের মনোহারিত্বে আপনি মোহিত হইবেন।

নিয়তির পরিহাস

শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অবসন্ন, বিবর্ণ প্রায় সন্ধ্যা তখন ধরণীর কোলে লুটিয়ে পড়ছে।

অলকা তখনও তেমনি ভাবে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্য পড়ে অনন্ত আকাশের পানে—কি স্বাধীন ঐ পাখী; আকাশের গায়ে ঐ একখানা কালো মেঘ—অসংখ্য তারকা—ওরা কত সুখী!

আর আমি—

ভাবনায় তার শুভ্র-ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো—অন্তরে বেদনা আঘাত দিল। ভাবে—সে যদি হ'তো একটি পাখী, উন্মুক্ত বাতাসে সে যেতো উড়ে। তাকে ধ'রতে পারতো না কেউ; রাত্রের অন্ধকারে পাখীবেশে দাঁড়াতো সমীরের সামনে। রূপকথার গল্পের মত পাখী থেকে হ'য়ে যেতো এক রাজকন্যা—দুজনা কথা কইতো অনেক—

ভালবাসার!

তারপর প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতো ঘরে; কি সুখে দিন যেতো। পৃথিবীতে সবেরই সম্ভব হয়, এটাও কি সম্ভব হয় না—!

পিছন থেকে কে চোখ টিপে ধ'রলো অলকার: অলকার বুঝতে বাকী রইলো না। এ স্পর্শ চিরকাল সে অনুভব ক'রে এসেছে! এ স্পর্শ কি ভোলবার!

হাত দুটো দুহাতে চেপে ধ'রে অলকা বললে—"ছিঃ, ছিঃ, তুমি কি—;"

জবাব আসে—"আমি—আমি সমীর। যে প্রত্যহ এমনি সময় গোপনে তোমার সঙ্গে একটু কথা কইতে ছুটে আসে,—তুমি যার প্রতীক্ষায় এমনি ভাবে জানালার কাছে বসে থাকো; যে তোমায় ভালোবাসে,—তুমি যাকে ভালোবাসো; যে তোমায় চায়,—তুমি যাকে চাও—।"

বাধাদিয়ে অলকা ব'ললে—"থাক্, তোমার পরিচয় আমি চাইনি—কিন্তু এমনি ভাবে দুজনকে কথা কইতে যদি কেউ দেখে তা হ'লে কি হবে বলোতো, চলো বাগানে যাই।"—"চলো।"

বসন্তের শীতল বাতাসে চারিদিক শীতল হ'য়ে উঠেছিল………।

অলকার উন্মুক্ত কেশরাশী নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে সমীর উদাস সুরে বলতে লাগলো।—"জানি না অলকা এ যন্ত্রণার অবসান কবে হবে,—জানি না কবে এ নিষ্ঠুর দিনগুলির অবসান হবে! তবে আমি শুধু এইটুকুই জানি,—আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কে যেন ঘন ঘন বলে অলকা, "মিছে, মিছে এ ভালবাসা, যন্ত্রণার অবসানে সুখ নেই, নিষ্ঠুর দিন-গুলির অবসানে সুখের দিনের আবির্ভাব হবে না"।

অলকাকে আরও টেনে নিয়ে সমীর আবার ব'ল্লে—"অলকা, আমার ভয় করে' আতঙ্কে সারা দেহ কেঁপে ওঠে; চোখে জল আসে। আমার জন্যে আমি ভাবি না অলকা—ভাবি শুধু তোমার জন্যে। আমি মরি দুঃখ নেই, কিন্তু—কিন্তু শেষে তোমার কি হবে অলকা?' তুমি আমায় ভালবাসো; সে ভালবাসা গভীর—পবিত্র। তবে কেমন ক'রে তুমি অন্যকে ভালবাসবে! কেমন ক'রে সে তোমার ভালবাসা পাবে! এখন-কার চেয়েও সে দিনগুলা কাটানো আরও কঠিন হ'য়ে উঠবে না কি অলকা? অলকা তুমি—!"

সমীরের মুখে হাত চাপা দিয়ে অলকা ব'ল্লে—"চুপ করো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। অমনকথা মুখে এনো না!"

হাত সরিয়ে দিয়ে সমীর বল্লে—"কিন্তু ব'লতে পারো অলকা, নিয়তি আমার কাণের কাছে এসে বার বার ঐ কথা বলে কেন?—'মিছে, মিছে এ ভালবাসা, যন্ত্রণার অবসানে সুখ নেই,—নিষ্ঠুর দিনগুলির অবসানে সুখের দিন আবির্ভাব হবে না!"

সমীরের হাতখানা জোরে চেপে ধ'রে অলকা বল্লে—"এ বুঝি সত্যের পূর্ব্বাভাষ, বুঝি দেবতার দৈববাণী। কিন্তু তুমি অমন অস্থির হয়োও না! দেবতার যদি তাই ইচ্ছা হয় তবে তাই হবে, তাঁর বিরুদ্ধে তো যাওয়া যাবে না!"

অলকাকে নাড়া দিয়ে সমীর বল্লে—"জানি, কিন্তু ব'লতে পারো, দেবতা এমন পাষাণ কেন? এমন নিষ্ঠুর কেন? এমনি ভালবাসার মধ্যে বিরহের বীভৎস প্রাচীর গেঁথে দেন কেন?—ভালবাসা কি তবে পাপ?"

মাথাটা সমীরের বুকের উপর এলিয়ে দিয়ে অলকা বল্লে—"ভালবাসা,—ভালবাসা পাপ কেন হবে, ভালবাসা পুণ্য সাধনার বস্তু; তুমি কি বলতে পারো প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রকৃত ভালবাসা দিতে পারে? —আমি জানি, পূর্ব্বজন্মের সাধনার দ্বারা পরজন্মে ভালবাসা পাওয়া যায়। সে সাধনা যদি সমাপ্ত হয় তবে ভালবাসা সফল হয়, কিন্তু সে অসমাপ্ত র'য়ে গেলে ভালবাসায় ফল পাওয়া যায় না!—পূর্ব্বজন্মে সাধনার ফলে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে পেয়েছি। যদি সে সাধনা অসমাপ্ত থাকে তবে এ ভালবাসা সফল হবে না, যদি সাধনা সমাপ্ত হ'য়ে থাকে তবে একদিন

তোমায় আমায় মিলন হবে; কিন্তু জানি না, সাধনা অসমাপ্ত না সমাপ্ত আছে।"

অলকার মাথাটাকে চেপে ধ'রে সমীর বল্লে—"আমার মনে হয় অলকা, সাধনা অসমাপ্ত আছে, তা না হ'লে দূর থেকে করুণ কান্না ভেসে আসে কেন আমার কানে! সে কান্না কেন এত পরিচিত! কেন এত বেদনা ভরা! যখনই তোমার মূর্ত্তী আমার মানস্ পটে গড়তে যাই, আঁকতে যাই,—তখনই বার বার ভেঙ্গে যাই কেন? বার বার মুছে যায় কেন? এইটাই কি দৈববাণী? যদি এ দৈববাণী সত্য হয়, তবে—তবে অলকা, এ ভালবাসার পরিণাম কি?"

অলকা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে করুণ স্বরে বল্লে—"এ ভালবাসা যদি সত্য হয়—পবিত্র হয়, যদি ঐ দৈববাণী সত্য হয় তবে একজনার বিরহে অন্যের এ নিষ্ঠুর পৃথিবী ত্যাগ করা উচিৎ। এর পরিণাম আমি শুধু এইটুকুই জানি।—"

সমীর ধীরে ধীরে বল্লে—"আমিও শুধু ঐটুকুই জানি অলকা।"

বসন্তের জোৎস্না মাখা বাতাসে তাদের দেহ শীতল ক'রে দিয়েছিল......, দূর থেকে ভেসে আসা কোন্ সুর তাদের প্রাণে গেঁথে দিয়েছিল এক নূতন সুর,—নিদ্রাদেবী পাতলা আঁচল বিছিয়ে দিয়েছিল তাদের চোখের উপর......

কতক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল সমীর জানে না।......অলকাকে নাড়া দিয়ে বল্লে—"অলকা, আজ আমি আসি, আমার একটু কাজ আছে।"

অলকা বাধা দিল না।

সমীর বিদায় নিল।

দু'দিন পরে—।

সেদিন যখন সেইখানেই দু'জনার আবার দেখা হ'লো, তখন কিন্তু সমীরকে পূর্ব্বের মত দেখায়নি। তার এমনি চেহারা দেখে অলকা ভয় পেলো। উৎকণ্ঠায় মন গেল ভরে। বুঝি কোন অসুখ করেছে। তাড়াতাড়ি অলকা ব'ল্লে—"তোমার এ বেশ কেন? কোন অসুখ করেনি তো?"

বিষাদ বিজড়িত স্বরে সমীর শুধু ব'ল্লে—"না।"

দুজনা খানিকক্ষণ নীরব রইলো। শেষে অলকা ব'ল্লে—"আমি তোমার কাছে কি দোষ ক'রেছি, যার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কইছো না?"

সমীর রুক্ষ চুলগুলো টান্তে টান্তে ব'ল্লে—"দোষ—দোষ তোমার একটুও নেই অলকা, দোষ শুধু আমার। আমাকে কেন তুমি ভালবাসলে! আমি অন্যের কাছে বিক্রিত জেনেও কেন তোমায় ভালবেসেছিলাম! তুমি আমায় ক্ষমা করো! এর প্রায়শ্চিত্ত কি তুমি আমায় ব'লে দাও!"

অলকা অবাক হ'য়ে বল্লে—"কি ব'ল্‌ছো তুমি?"

সমীর পাগলের মত ব'ল্লে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি ঠিক ব'লছি অলকা! বলো, বলো তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে?—তোমার এমনি গভীর ভালবাসা পেয়ে হয়তো আর একটি জীবন মধুময় হ'য়ে উঠতো কিন্তু আমি তা হ'তে দিইনি; আমারই জন্যে তোমার জীবন ব্যর্থ হ'য়ে গেল। এতেও তুমি কি ব'লতে চাও অলকা? অলকা—!

সমীরের কথায় বাধা দিয়ে অলকা ব'ল্লে—"তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?

সমীর তেমনি ভাবে ব'ল্লে—"পাগল—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি পাগলের মত হ'য়েছি বটে, কিন্তু বল অলকা তুমি আমায় ক্ষমা ক'রতে পারবে?"

সমীরের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়ে অলকা দৃঢ়স্বরে ব'ল্লে—"বাজে কথা রাখো! বলো কি হ'য়েছে তোমার।"

সে স্বরে সমীর ভয় পেলো; বললে—"আমার একটু ভাবতে সময় দাও!"

তেমনি ভাবে অলকা ব'ললে—"ভাববার সময় দেবোনা।"

নিজের হাত অলকার হাত থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় সমীর ব'ললে—""কালই আমায় যেতে হবে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে,—যুদ্ধে!"

—যুদ্ধে!—অলকার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন সরে গেল।—ব'ললে—"সত্যি বলছো তুমি যুদ্ধে যাবে?"

সমীর বল্লে—"হ্যাঁ অলকা সত্যি।"

অলকা কাতর স্বরে বল্লে—"না, না, তুমি যেতে পারবে না; তোমায় আমি যেতে দেবো না।"

সমীর দুঃখের সঙ্গে ব'ললে—"তা যদি সম্ভব হ'তো অলকা, তা হ'লে আমায় আর মনে করিয়ে দিতে হ'তো না ও কথা; কিন্তু এ জীবন যে অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত! আমার জীবনের উপর আমার তো কোন অধিকার নেই! যদি এ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি তবেই হবো আমি মুক্ত; তবে হবো আমি স্বাধীন। তখন আর কোন বাধা থাকবে না। দুজনা চলে যাবো বহুদূরে, কোন এক নদীর ধারে। যেখানে শুধু পাখী ছাড়া আর কারুরই চিহ্ন পাওয়া যাবে না। ঢেউ ব'য়ে যাবে—ব'য়ে যাবে বাতাস—তাদের সঙ্গে ব'য়ে যাবে আমাদের সুখের দিনগুলাও। নীল আকাশের তলে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দেবো আমাদের জীবন তরী। কোন কূলে গিয়ে ভিড়বে তা আমরা জানবো না—, জানবার প্রয়োজনও হবে না; কিন্তু মাঝে এসে যদি তরী ডোবে তবে ডুববো আমরা দুজনাই—কেমন?"

(ক্রমশঃ)

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—আঠাশ—

শুভ্রাকে বিদায় দিবার পর হইতেই অরুণের মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পৃথিবীকে রঙ্গীন চোখে দেখবার প্রথম বয়স হইতে সে শুভ্রাকেই ভালবাসিয়াছে—তাহাকেই গত চতুর্দ্দশ বর্ষ যাবৎ সে মনের মন্দিরে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহারই পূজা করিতেছিল। জীবনের আশা, আনন্দ, শান্তি, তৃপ্তি, যাহা কিছু সবই একদিন ছিল শুভ্রা তাহারই চোখে মূর্ত্তিমতী ঈশ্বরীর মত। এমন কত রাত্রি গিয়াছে, সে শুভ্রার হাস্যোজ্জ্বল পবিত্র মুখের দিকে তাকাইয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছে। যাহার মাথা ধরিলে অরুণের মাথা ঘুরিত, যাহার মুখ ম্লান দেখিলে অরুণের চক্ষে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া উঠিত, যাহার চক্ষে জল দেখিলে অরুণ আত্ম সংযম বিস্মৃত হইত সেই চির-আদরিণী শুভ্রা—তাহার হৃদয় রাজ্যের নিভৃত প্রতিমাকে সে আজ বিসর্জ্জন দিয়াছে। অরুণ ভাবে আর তবে তাহার বাঁচিয়া লাভ কি? কাহার জন্য দুর্ব্বহ সংসারের ব্যথা বোঝা বহন করা? তাহার মনে হইতেছিল তাহারই অবজ্ঞার ফলে, তাহারই অবিবেচনায়, তাহারই কামপরায়নতার অন্ধতায় সে তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তুটাকে স্বহস্তে সে বর্জ্জন করিয়াছে। তাহার এই পাতকের একমাত্র শাস্তি আত্মহত্যা। শুভ্রা রোজই সন্ধ্যায় বাহিরে যায়, কোথায় যায় সে তাহা বলিতে পারে না, হয়তো বলিবার মত কোন স্থানে সে যায় না—হয়তো কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত তাহার কোন কৈফিয়ৎই নাই।

তাহার অবজ্ঞার ফলে শুভ্রা হয়তো কোন তরুণকে ভাল বাসিয়াছে—হয়তো প্রত্যহ সন্ধ্যায় সে তাহার নবীন প্রেমিকেরই অভিসারে বাহির হয়। হায়, সে যে কোনও দিন স্বপ্নেও এ বিভীষিকার কল্পনা করে নাই। সে ভাবিল সেই দোষী তাহারই মুর্খতায় সে তাহার পতিপ্রাণা স্ত্রীর দেহ ও মনোরাজ্য হইতে বিতাড়িত। শুভ্রা যদি এইরূপ প্রতিশোধ লইতে পারে তবে সেও আত্মহত্যা করিয়া শুভ্রার উপর প্রতিশোধ লইবে। জীবন আজ তাহার মরুভূমি—শ্মশান, বিভীষিকা। সে গত তিন চারিদিন হইতে কণার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতেছিল। তাহার ধারণা হইয়াছে কণার জন্যই সে শুভ্রাকে হারাইল। তাহার জন্যই তাহার শুভ্রা অন্যে অনুরক্তা হইয়াছে। এই যাদুকরী মায়াবিনীই যত অনিষ্টের মূল। তাহারই প্ররোচনায় সে তাহার দেবতুল্য চরিত্রটাকে কণার পায়ে ডালি দিয়াছে। তাহার মিষ্টকথায় ভুলিয়া দিবারাত্রি সে তাহার কাছে যাপন করিয়া নিজের ও শুভ্রার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যত অনিষ্টের মূল ওই সর্ব্বনাশী কণা। অরুণ কণার বাটীতে আসিয়া কৌচের উপর হতাশভাবে বসিয়া পড়িল—কণা প্রতিদিনের মত নিকটে আসিয়া তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মুখটা অত শুকিয়ে গেছে কেন গো? কি হয়েছে? শরীর ভাল আছে তো? দিদি ভাল আছেন?"

অরুণ উঠিয়া দাড়াইল, কণা দুই হাতে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আদরের সুরে বলিল, "বল না লক্ষীটী, কি হয়েছে তোমার?"

অরুণ দুই হাতে তাহার হাত দুইটী ধরিয়া তাহার গলা বেষ্টনী খুলিয়া লইল ও সজোরে তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "দূর হয়ে যাও, সামনে থেকে আমার।"

কণা অরুণের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অরুণ হতাশভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল। কণা মাটীতে পড়িয়া আকাশ পাতাল কত কি ভাবিল পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া অরুণের মাথার কাছে দাড়াইয়া তাহার কুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া মাথার বিপর্য্যস্ত চুলগুলিকে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। কণার ব্যবহারে অরুণ বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে কণার চোখে এক বিন্দুও জল নাই।

অরুণ কণার হাত ধরিয়া তাহাকে নিকটে আনিল ও তাহার মাথাটা নিজের বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কণা, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

কণার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতে তাহার চোখে জল আসে নাই বটে কিন্তু এই আদরে তাহার সমস্ত অশ্রু চক্ষু বাহিয়া পড়িতে লাগিল। সে নিতান্ত অসহায়ের মত অরুণের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল।

অরুণ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দেখ কণা, শুভ্রা আর কাউকে ভালবেসেছে। রোজ সন্ধ্যায় সে কোথায় যায় সে বলতে পারে না আমি তাকে জন্মের মত বিদায় দিয়েছি। হায়, এমনি করে সে যে আমার অত্যাচারের প্রতিশোধ দেবে কে জানতো। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে সে—"

কণা বলিল, "না ও কথা বলো না, ও কথা শুনলেও পাপ হয়। দিদি তোমায় ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারে না। আমি জানি, দিদি তাঁর দেহ ও মনের প্রতি পরমাণু দিয়ে তোমায় ভালবাসতেন, আজও বাসেন। তুমি ভুল করেছ—তুমি তাঁকে চিনতে পার নি। দিদি কোথায় যান তা আমিও জানি না। তিনি বলেন নি তোমাকে, হয়ত তারও কারণ আছে। তুমি নিশ্চয় জেন তিনি সন্দেহের অতীত।"

সাগ্রহে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ ধারণার কারণ কি কণা?"

কণা বলিল, "আমি মেয়ে মানুষ, মেয়ে মানুষদের আমরা যত চিনতে পারবো, পুরুষ তোমরা, ততটা কোন দিনই বুঝতে বা চিনতে পারবে না। দিদি দেবী স্বর্গদূতী—তাঁকে বিদায় করে দিলে তুমি—এ কি সম্ভব?"

অরুণ ভাবিতে লাগিল, কণা যা বলিতেছে তাহাতে সত্যতা কতদূর আছে। কণা অরুণকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "রাগ করো না তুমি। হয়তো বহুজন্মের তপস্যার ফলে তোমার সেবার অধিকার পেয়েছিলাম আমি—গত এক বৎসর ধরে আমার অভিশপ্ত জীবনে যে সুখ পেয়েছি আমি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দিদি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না কিন্তু ভগবান জানেন আমি কোনদিন তার অনিষ্ট চিন্তা করিনি। পাছে তাঁর মনে কষ্ট হয় কতদিন তোমায় রাত কাটাতে বারণ করেছি, পায়ে ধরে মিনতি জানিয়েছি। দিদির মনে ব্যথা দিতে বা তাঁকে অনাদর করতে বারণ করেছি, কিন্তু কোন কথাই শোন নি তুমি। তুমি তাঁকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত করে শেষে একটা বদনাম দিয়ে কোথায় বিদেয় করে এসেছ তুমিই জান। আমি জানি আমি রাক্ষসী, শয়তানী, পিশাচী, আমার ছায়াস্পর্শে লোকের সর্ব্বনাশ হয়ে যায়—তা জেনে শুনেও আমি তোমাদের সর্ব্বনাশ করেছি—নিজের সর্ব্বনাশ করেছি। এর প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজ হাতে করবো। এই পৃথিবীতে আমার স্থান নেই। আমি তাই ঠিক করলাম যেখানে গেলে সকল জ্বালা জুড়োয় সেখানে গিয়ে আমার সকল জ্বালা জুড়োবো। মা গঙ্গার বিশাল বুকে অভাগী মেয়ের স্থান হবেই।" কণা আর বলিতে পারিল না, তাহার মুখে স্থির প্রতিজ্ঞার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

সে আবার বলিতে লাগিল, "আমার শেষ অনুরোধ দুটী আছে সে দুটো রাখতেই হবে তোমায়—দিদিকে ফিরিয়ে এনে তাঁর কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে বলো, "আমি তোমায় চেয়েছিলাম বটে কিন্তু তাঁকে অধিকারচ্যুত করে নয় তাঁর প্রসাদের শেষটুকু মাত্র। আর দ্বিতীয় অনুরোধ আজ রাত্রিতে ভক্ত যেমন দেবতায় পূজো করে তেমনি করে পূজো করবো তোমায় আমার জীবনের সবটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে।

কণা আর বলিতে পারিল না; সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অরুণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কত মিষ্ট কথা বলিল, কিন্তু কণার ক্রন্দন থামিল না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের ন্যায় কেবলই বলিতে লাগিল, "দিদি তুমি আমায় ক্ষমা না করলে পরলোকেও যে এমনি অভিশপ্ত জীবন বইতে হবে আমাকে।"

—ঊনত্রিংশ—

বেলা দুইটায় ক্লান্ত দেহ লইয়া অরুণ বাটী ফিরিল—তাহার দেহ ও মন উভয়ই তাহার সহিত বিদ্রোহ করিতেছে। তাহার মনে হইতেছে এই দেহটা হইতে যদি তাহার অন্তরাত্মা বাহির হইয়া যাইতে পারিত তাহা হইলে সে যেন কতকটা শান্তি পাইত। সে নিঃশব্দে আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাহিরের পোষাক না ছাড়িয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। সে দেখিল তাহার বাড়ীর সাজ সরঞ্জাম সকল বিষয়েই ত্রুটী রহিয়াছে। এতগুলি ভৃত্য থাকা সত্ত্বেও বাড়ীটাকে যেন লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া বোধ হইল। বিছানায় যে চাদর পাতা হইয়াছে তাহা অন্ততঃ পাঁচদিন পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক ছিল। বড় বড় আয়না-দেওয়া আলমারীর আয়নাগুলি তৈলাক্ত ও অপরিচ্ছন্ন। বুক সেলফের উপর প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি ধূলা জমিয়া রহিয়াছে, কাপড়-চোপড়গুলি আলনায় বিপর্য্যস্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। সে কোনরূপে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাথ রুমে গিয়া দেখিল সেখানে সাবান বা তোয়ালে কিছুই নাই। তেলের শিশিটা কাত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা হইতে মূল্যবান তৈল গড়াইয়া পড়িয়া সেলফের খানিকটা তৈলাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। বাং টবটী শূন্য; জলের সংস্পর্শরহিত। সে কোনরূপে একবাটী জল সংগ্রহ করিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিল। ভৃত্যদের তিরস্কার করি এবং পরে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখি উৎকলী পাচক মেঝের পড়িয়া পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। একটা বিড়াল মাছের ঝো হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া পরম সন্তো তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছে। কতকগুলি চড়াই পাখী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আহার্য্যগুলিকে ঘরময় ছড়াইয়া ফেলিতেছে গ্যাসের শুনান দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে একটু কল ঘুরাইবার অভাবে এতগুলি পয়স নষ্ট হইতেছে। সে ধমক দিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, "লজ্জা করেনা ভূতের ম ঘুমাতে?" সে উঠিয়া হাই তুলিয়া চ কচলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "খেতে দেব ি কর্ত্তা?" অরুণ রাগ করিয়া বলিল, "খা না আমি।"

"যে আজ্ঞে বাবু।"

অরুণ পুনরায় শয়নকক্ষে গিয়া শয্যা শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ অতীত হইল কো

আসিয়া তাহাকে আহারের জন্য একবারও অনুরোধ করিল না। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। সে স্থির করিল ঠাকুর ঘরে গিয়া জগদীশ্বরের ধ্যান করিয়া মনটাকে শান্ত করিবে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহার পিত্ত পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। চমৎকার মার্ব্বেলের মেঝে—তাহা কে গোময় দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া যতদূর সম্ভব অপরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে, একপাশে এক গাদা ফুল ও বিল্বপত্র জমিয়া তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। বিগ্রহের বেশ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অরুণের মনে হইল সে চক্ষুতে তিরস্কার ও অভিমানের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হায়, এতগুলি ভৃত্য সত্ত্বেও একজনের অভাবে তাহার সুবিশাল প্রাসাদ শ্মশানের মতই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

সে পুনরায় শয়নকক্ষে ফিরিল—ঘরের দ্বারটা রুদ্ধ করিয়া শুভ্রার ছবিখানি নামাইয়া লইয়া সে তাহা নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তৎপরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্রার্পিত মুখখানিতে সহস্র চুম্বনের ছাপ আঁকিয়া দিল। সেই চিত্রখানিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"দুষ্টু কোথাকার, আমার উপর অভিমান করা হয়েছে—তাই বুঝি আসবে না।—এসোনা। আমায় যত পার সাজা দাও। কিন্তু আর ক'দিন? এবার চলে যাব এই পৃথিবী ছেড়ে। যেমন দুষ্টু তুমি—তেমনি—অরুণের চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল—কয়েকফোটা অশ্রু ছবির মুখখানিকে সিক্ত করিয়া দিল।

অরুণ আপন মনে বলিতে লাগিল, "তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার সাহসও আমার নাই। পশুর অধিক ব্যবহার করেছি তোমার সঙ্গে। একটী কথা বলে প্রতিবাদ করোনি কোনদিন আমার সেই অমানুষিক অত্যাচারের। শুনো, আত্মহত্যা করলেও কি আমার ক্ষমা হবে না, আমাকে কি একটীবার, আবার—। সহসা তাহার পৃষ্ঠে কাহার দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ পাইয়া অরুণ বলিয়া উঠিল, "তবে কি তুমি ফিরে এসে শুভা—তোমার অভাগা স্বামীর কাছে?"

সে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল যাহার দীর্ঘশ্বাস তাহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল সে শুভ্রা নহে তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু অমল।

অরুণ দ্বারটা বন্ধ করিয়া খিল আটিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। অমল উপরে আসিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া অরুণের পশ্চাতে দাড়াইয়াছিল ও নীরবেই তাহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। অরুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

অরুণ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া প্রথমেই কথা কহিল—"কখন এসে ভাই?"

"যতক্ষণ তুমি এই ঘরে আছ ততক্ষণ। কিন্তু অরুণ, আজ আমি তোমায় দুটো অনুরোধ জানাতে চাই—আশাকরি, তুমি তা রাখবে। অমলের মিনতিতে শুধু অনুরোধ ছিলনা অরুণ তাহাতে আদেশের আভাষ পাইল।

অরুণ বলিল, "কি বল?"

"বৌদিদিকে ফিরিয়ে আন। তার মত স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করার মত পাপ আর কিছুতেই থাকতে পারে না। তুমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস আর প্রতিজ্ঞা কর জীবনে অপর কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখবে না।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া অরুণ বলিল,—'তারপর?

অমল বলিল, "জগদীশ্বর যেন তোমায় সুমতি দেন। আর এই অনুশোচনার আগুনে পুড়ে আমার মত তুমিও যেন মানুষ হতে পার তার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাও।"

অরুণ বলিল, "ভাল' তারপর?"

"তারপর, দ্বিতীয় মিনতি, কণার কাছে নিয়ে যেতে হবে আমায়।"

অরুণ কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা দিয়া অমল বলিল, "না অরুণ আমায় প্রতারণা করবার চেষ্টা করো না। আমি জানি সে আছে তোমারই কাছে তোমার রক্ষিতা হিসাবে।"

অরুণ বলিল, "তোমার অভিযোগ আমি অস্বীকার করব না অমল, কিন্তু সেখানে যাওয়া চলবে না তোমার। প্রথমতঃ আমি যদি বলি সে তোমায় ঘৃণা করে তা হলে মিথ্যে বলা হবে না। দ্বিতীয়তঃ সে আমায় সত্যিই ভালবাসে তার আমি কোন বিপদ আমি নিজে ডেকে আনতে পারি না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে অমল বলিল, "সে আমায় ঘৃণা করে করুক—আমি ঘৃণারই পাত্র—আমি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম তাতে আমি আশা করিনা যে সে আমায় ভালবাসবে বা ভক্তি করবে। পৃথিবীর সব মেয়েই তো বৌদিদি নয় অরুণ। আর তার বিপদের কথা বলছো আমি ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করছি আমার দ্বারা কোন বিপদই হবে না তার।"

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কেন দেখতে চাও তাকে?"

অমল বলিল, "আমি তাকে বুঝিয়ে দিতে চাই তার জন্যে কোথায় নেমে এসেছ তুমি আর তোমার সুখের সংসারে কত বড় আগুন লেগেছে। আমার বিশ্বাস আমি তাকে ফেরাতে পারবো। সে বৌদিদিকে ভালবাসতো অন্তর দিয়ে।"

অরুণ হাসিল ও বলিল, "বেশ, আজ সন্ধ্যায়ই তোমায় সেখানে নিয়ে যাব আমি—কিন্তু শপথের কথা ভুলোনা অমল।"

(ক্রমশঃ)

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লবঙ্গ তাহাকে দেখিয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। জগুদা তখন কথা কহিলেন বলিলেন : তাইতো! এতবড় একটা সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, এতো আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি! মাকে বুঝি কোনও খবর দেওয়া হয় নি?

লবঙ্গ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল : বোধহয় হয় নি! এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে যাবে, এতো বাবুও বুঝতে পারেন নি, আমিও বুঝতে পারি নি!

—এখন চিঠি লেখা হয়েছে?

—কই আর হলো? কে চিঠি দেবে?

—তুমিই না হয় একখানা লিখে দাও। দিতে ত হবেই!

—ভাবছি, আজ বিকেলে একখানা দেবো! কিন্তু কি ক'রে যে দেবো, তা জানি নি! তাঁকে এ সংবাদ কি ক'রে লিখে পাঠাবো?

—সত্যি কথা। বিশেষ তিনি যে রকম মেয়ে-অন্ত-প্রাণ ছিলেন। ললিতা বলতে অজ্ঞান হতেন। তবু দিতে হবে লবঙ্গ! বিপদের সময়ে অধীর হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। মানুষকে সব কর্ত্তব্যই করতে হয়, আপদ বিপদেরও মাঝখানে!

—তা জানি ঠাকুর্দ্দা। তবু হাত পা আসে না। মনে হয় যেন, কিসের জন্য কর্ব্বো। যার জন্যে করা, সেই তো চলে গিয়েছে। ঘরগুলো সব খাঁ খাঁ করছে। বাবু তো একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন। কাল সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজোন নি, বারাণ্ডায় পায়চারি করেছেন। তাঁকে শান্ত করা আমার পক্ষে এক বিষম দায় হ'য়ে উঠেছে!

—এখানে কি তাঁর আর কেউ নেই?

—কে আর আছে। মা নেই, খুড়ী নেই, জেঠী নেই,—আছে একটি ছোট ভাই। তা, সেও হয় সমস্ত দিন কলেজে, না হয় বাইরে বেড়াতে বেরোয়। সে সংসারের বড় বেশী ধার ধারে না। ঐ ঝি চাকর নিয়েই সংসার। তারা কি আর শোকেতাপে মনিবের কোনও কাজে লাগে? তারা, আম পাকলে মাছির মত ভ্যান্ ভ্যান্ কর্ত্তে পারে,—কিন্তু বর্ষার দিনে কাকেও খোঁজ পাওয়া যায় না!

—কোনও নিকট আত্মীয় কুটুম্বকে খবর দিয়ে নিয়ে এলেও হয়!

—কে দেবে? আমি ত আর ওদের কিছুই জানি নে। যিনি জানতেন, এবং নিজহাতে কর্ত্তেন, তিনি হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। কাজেই মাঝদরিয়ার নৌকো বন্ বন্ করে ঘুরপাক খাচ্ছে।

—তা হলে তো এখনই মাকে খবর দেওয়া উচিত। আমি না হয় আজই তাঁকে টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি।

—তাই না হয় করুন। না হ'লে বাবুর একটা মস্ত বিপদ্ হবার সম্ভাবনা। হয়তো মাথাটাই খারাপ হয়ে যেতে পারে। আমি একা,—আর তেমন নিকট সম্পর্কের লোক ত নেই,—

—তাতো বটেই! কি করবি বল্! এ বিপদে বাবুকে রক্ষে করবার জন্যে ভগবান্ হয়তো তোকেই জন্ম করে পাঠিয়েছেন। নইলে এমন সময়েই বা তুই এখানে আটকে পড়বি কেন?

—আপনি কি এখন দেশে ফিরবেন?

—হ্যাঁ, দেশেই ফিরবো। এসেছিলুম কলকাতায় একটা মকদ্দমার জন্যে, তাই ভাবলুম দিদিমণিকে একবার দেখে যাই! কিন্তু দিদিমণি যে এমন করে সকলকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা কে জানতো? আহা,—আর দুদিন আগে আসতুম যদি, তা হ'লে দেখাটাও হতো।

—দেশের খবর কি, জেঠামশায়? আমার বিষয়ে কোনও নালিশ মকদ্দমা করলেন নাকি?

—না, এখনও তো করিনি। তবে উকীল বাড়ী ঘুরচি। তোমাকে নিজে সই করে একখানি দরখাস্ত পেস্ কর্ত্তে হবে।

—তা যা কর্ত্তে হয় করবো। একটা ছিল্লে ত হওয়া চাই। যে আমাকে স্নেহ করে কোলে তুলে নিচ্ছিল, সে তো চলে গেল। এখন কি আঁকড়ে পড়ে থাকবো?

—তা হ'লে তোর মত আছে নালিশ করতে।

—কাজেই! আর না হয় একবার চেষ্টা দেখোনা, যদি তার বাড়ীতে একটু মাথা গুজতে দেয়!

—মাথা গুজতে দিলেই কি হবে! সেখানে তো আবার সতীন আছে!

—সে সতীনে বরং পার পাওয়া যায়, জেঠামশাই। কিন্তু বাইরে দেখতে পাচ্ছি, জগৎ শুদ্ধই আমার সতীন! সতীনের ঝাটা গায়ের রক্তটুকু শুধু বার করে, কিন্তু বাইরের ঝাটা জীবনের কোনও অংশটাকেই বাদ দেয় না। দুনিয়ার দেনা পাওনায় একেবারে দেউলে করে ছেড়ে দেয়।

—তবে উঠে পড়ে লেগে দেখি!

—হ্যাঁ, তাই দেখো! আর আমাকেও দেশে নিয়ে চলো না! এখানে একা

শ্রীদুর্ব্বাসা
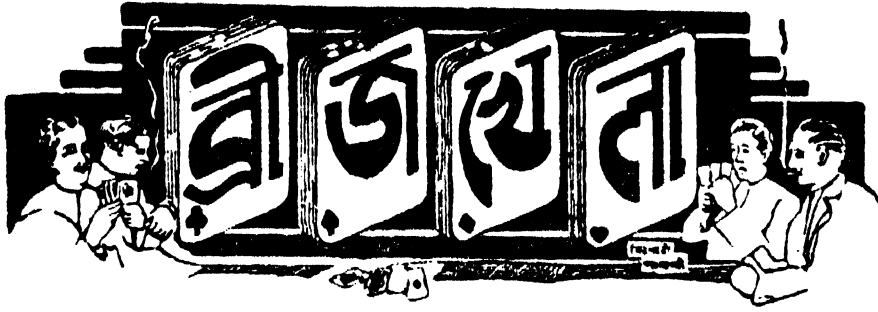
নিষ্কাশন কৌশল (Squoeze Play) অনেক সময় প্রতিপক্ষের হাতে একটি টেক্কা থাকা সত্ত্বেও সাতটির খেলা করা সম্ভব হয় যদি সেই রঙ খেলা না হয়। নিয়ের হাতটিতে সেইরূপ একটি ডাক হয়েছিল ও প্রতিপক্ষ ডবল দিয়েছিলেন। ডবলকারীর হাতে কোন টেক্কা আছে এ খবর তাঁর খেঁড়ী জানতে পারেননি বলে ডাকদার অনায়াসে খেলা করে নিতে পেরেছিলেন। হাতটি ছিল এইরূপ—

ইস্কাবন— ×, ×, ×, ×, ×।
হরতন—সাহেব, বিবি, ×।
রুহিতন— ×।
চিড়িতন—সাহেব, ×, ×, ×।

ইস্কাবন— ×।	ইস্কাবন—গোলাম, ×।
হরতন—গোলাম, ×।	হরতন—দশ, ×, ×, ×।
রুহিতন ×, ×, ×, ×, ×, ×।	রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, ×।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, ×, ×।	চিড়িতন—×, ×, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, ×, ×।
হরতন—টেক্কা, ×, ×, ×।
রুহিতন—সাহেব, ×।
চিড়িতন—টেক্কা, বিবি।

এই হাতটিতে সাতটি ইস্কাবনের ডাক হয়েছিল এবং বিপক্ষদল ডবল দিয়েছিলেন। তাঁর খেঁড়ী 'প' চিড়িতনের গোলাম খেলে প্রাথমিক চাল দিলেন। তাস খেলার পর ডাকদার দেখলেন যে তাঁদের উভয়ের হাতে মোট বারোটি পিট বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁর আর একটি পিটের দরকার। এখন একটি পিট বাড়াতে হলে নিষ্কাশন-কৌশলের প্রয়োগ করতে হবে। ডবল দেওয়ার দরুণ তিনি জানতে পেরেছেন যে রুহিতনের টেক্কাটি 'পূ'-র হাতে আছে। এখন 'পূ'-র হাতটিকে নিষ্কাশন করার প্রয়োজন, সুতরাং প্রথমে দশটি পিট কি ভাবে নেওয়া যায় সেইটি প্রথমে দেখতে হবে।

(১—৪) প্রথম পিটখানি চিড়ের টেক্কা দিয়ে নিয়ে রঙের টেক্কা সাহেব ও চিড়িতনের বিবি পিট নিলেন। এই পিটগুলি নেবার সময় তিনি দেখলেন যে 'প' রঙের খেলায় একখানি রুহিতন পাশালেন।

(৫—৭) তারপর হরতনের একটি ছোট তাস খেলে ডামির হাতে সাহেব দিয়ে পিট ধরে চিড়িতনের সাহেব খেলে ছোট চিড়িতন খেললেন ও তুরূপ করে নিজে সেই পিটখানি নিলেন।

এইরূপ করায় তিনি দেখলেন শেষ চিড়িতন খানিতে 'পূ' একখানি রুহিতন পাশালেন। এখন সাতটি পিট নেবার পর তিনি ইস্কাবনের বিবি ও ছোট আর একখানি রঙ খেলায় ডামির হাতে উঠলেন। এই দুইখানি পিটে 'প' ও 'পূ' উভয়েই দুইখানি রুহিতন দিলেন। এইবার দশম পিটে ডামির হাতে ছোট এক তাস রঙ খেলায় 'পূ' আপনা-আপনি নিষ্কাশিত হয়ে গেলেন, কারণ তাঁর হাতের বিভাগ এখন ধরা পড়ে গেছে। অতএব ডাকদার তাঁর ডাক অনুযায়ী সাতটি ইস্কাবনের খেলা করে নিয়ে গেলেন।

াকা কি ভাল দেখায়? সেখানে না য় যার কাছে থেকে, যা হয় করে চালাবো!

—না, না, গিন্নীদিদিকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ! তারপর, যা হয় হবে। তবড় আশ্রয়টা তুই একেবারে ছেড়ে দিস নে।

(ক্রমশঃ)

একগাছি মালা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

শুধু এক গাছি মালা, আর কিছু নহে—
তোমারে সঁপিব বলে গিয়ে ছিনু লয়ে,
গেথেছিনু নিশি দিন মিলনে, বিরহে,
সুখে, দুখে, ক্ষতি-লাভে, জয় পরাজয়ে।
পরাব তোমার গলে ভেবেছিনু মনে;
লুটাব চরণে তব মনে ছিল সাধ,
দিবস নিশার মধু-মিলনের ক্ষণে
সঁপিব কুসুম মালা লভিব প্রসাদ।
কিন্তু হায় একি দেখি, চারিদিক হতে
কত মণি মুক্তা মালা আসে উপহার।
তোমার চরণ তলে হরষে ঢালিতে
ভারে ভারে আসে কত পূজা উপাচার।
সামান্য এ মালা মোর বিষাদ মলিন।
ফিরায়ে লইয়া গেনু। সে যে তুচ্ছ, হীন।

[সোভিয়েট রাশিয়ার উন্নত রীতিনীতি আজ বিশ্বসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অথচ আমাদের দেশের মা বোনেদের মধ্যে কজনে সে দেশের নারী প্রগতি সম্বন্ধে অবগত আছেন, জানি না। এ সংখ্যায় কুমারী মায়াতরু লিখিত এই সুচিন্তিত প্রবন্ধটী তাদের যথেষ্ট নূতন তথ্যের সন্ধান দেবে, এই আমার বিশ্বাস। আগামী সংখ্যা থেকে যথারীতি আমাদের আলোচনা চলবে।

সম্পাঃ মঃ মঃ]

সোভিয়েট রাশিয়ার নারী-প্রগতি

লেখিকা—কুমারী মায়াতরু সিংহ

রাশিয়ায় সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার পূর্বে রাশিয়ার (প্রধাণতঃ পূর্ব-রাশিয়ার) নারীসমাজের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। নিরক্ষরতা—ধর্ম আর সামাজিক গোড়ামী প্রভৃতি নানান্ কারণে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিলো বিষময়।

সমাজে তাদের স্থান বা অধিকার কিছুই ছিলো না। সকল বিষয়ে তাদের পুরুষের প্রভুত্ব মেনে চল্‌তে হতো। পুরুষেরা সকল দিক থেকে নারী হতে শ্রেষ্ঠ আর স্বতন্ত্র জীব বলে' পরিগণিত হতো। সে দেশের নারীরা কিছুতেই ভাবতে পারতো না যে তারাও মানুষ,—পুরুষের মত তাদের স্বাধীন স্বত্বা আছে, সুখ-দুঃখ বোধ আছে।

সাধারণ গৃহস্থালীর কাজ থেকে কৃষিকার্য্য প্রভৃতি বহুবিধ কষ্টকর কাজ সে দেশের নারীদের সুসম্পন্ন কোরতে হতো! কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য্যের ব্যাপার হোচ্ছে এই—সকল প্রকারের উচ্চাঙ্গের কাজ ছিলো তাদের অধিকারের বাইরে!

তুর্কমেনিয়া, কসাকস্থান, বুরিয়াটো—মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি জায়গায় মেয়েরাই সকল প্রকারের কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন কোরতো। আট নয় বছরের বালিকা থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধা পর্য্যন্ত প্রত্যেক নারীকেই কৃষিভূমিতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো।

এ ছাড়া গো-পালন ইত্যাদি বহুবিধ শ্রমসাধ্য কাজের ভারও তাদের উপর অর্পিত ছিলো। অথচ সমাজে তাদের কোনো স্থান বা অধিকার ছিলো না। এমন কি তাদের শ্রমলব্ধ অর্থ বা দ্রব্যাদিও তারা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারতো না। সমাজ এতে তাদের বাধা দিতো। সমাজের বিধানানুযায়ী পুরুষেরাই ছিলো সমস্ত সম্পত্তি আর দ্রব্যাদির মালিক!

বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হতো। স্ত্রীলোকেরা শত কারণ সত্বেও স্বামী পরিত্যাগ করতে পারতো না। কিন্তু স্বামী প্রভুদের কারণে অকারণে স্ত্রী পরিত্যাগ করবার বাধা ছিলো না! ফলে অনেক সময় পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিতে হোতো। অন্যথায় নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় সংসার সমুদ্রে একা দাঁড়াতে হোতো।

রাশিয়ার পর্দাপ্রথাও ছিলো অত্যন্ত খারাপ। বাঙ্গালা দেশে পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকলেও রাশিয়ার পর্দাপ্রথার তুলনায় আমাদের দেশের পর্দাপ্রথার কোনো তুলনাই হয় না।

রাশিয়ার পর্দা দু'প্রকারের। একটার নাম 'চাদ্রা' অপরটির নাম 'পরান্দজা'। 'চাদ্রা' জিনিষটা প্রায় আমাদের দেশের (হিন্দুস্থানীদের) 'ওড়নার' মত আর 'পরান্দজা' কতকটা মুসলমান মহিলাদের ব্যবহৃত 'বোরখা'র মত।

তবে 'বোরখা'-র সঙ্গে 'পরান্দজা'-র পার্থক্য এই,—'বোরখা'র চোখের সামনে দুটো ছিদ্র থাকে কিন্তু 'পরান্দজা'-র সে দুটোও নেই। কাজেই এটা ব্যবহারে মেয়েদের অন্ধের মত অন্যের সাহায্য নিয়ে চল্‌তে হয়।

এই বিষময় পর্দাপ্রথার ফলে অল্প বয়সেই রাশিয়ার মেয়েদের সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে যেতো (যদিও বর্তমানে রাশিয়ার মেয়েরা দৈহিক আর মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতি-যোগিতায় বিজয়িনী তবু এরাই বছর কয়েক পূর্বে কেমন ছিলো তারই ছোট্ট আলোচনা এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য)।

এরপর এলো বিবাহ প্রথা। সেদেশে পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। মেয়েদের বিয়ে হতো ঠিক্ আট থেকে দশ বারো বছরের মধ্যে। এই বাল্য বিবাহের ফলে অকাল মাতৃত্ব প্রভৃতি কারণে স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সেই জড়াগ্রস্থ হয়ে পড়তো এবং অনেকে অকালে প্রাণ হারাতো।

সন্তানেরা প্রায়ই দুর্ব্বল হতো আর শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিলো না। সেদেশের নিয়ম ছিলো কোনো মেয়েকে বিয়ে কোরতে হোলে পাত্র পক্ষকে কন্যাপক্ষের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে হতো কন্যার পিতাকে।

ঠিক্ আমাদের দেশের পণপ্রথার বিপরীত।

আমাদের দেশে বলে বরপণ। ওদের দেশে বলা যেতে পারে কন্যাপণ! দু'য়ের ফল কিন্তু একই।

বাঙ্গালা দেশের কন্যার পিতা অর্থের অভাবে বৃদ্ধের সঙ্গে শিশুকন্যার বিয়ে দেয় আর রাশিয়ার কন্যার পিতা অর্থলোভে বুড়োর হাতে শিশুকন্যাকে সপে দিতো। সুতরাং অনেক সময়ে ষাট বছরের বৃদ্ধ শ্মশানে যাওয়ার পথে এক আট বছরের বালিকাকে বিবাহ করে বসতো! আবার অনেক সময়ে পুরুষেরা একদেশে কম টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করে অন্য দেশে গিয়ে সেই বিবাহিতা স্ত্রীকে বেশী টাকায় বিক্রয় করতো! সুন্দর লাভের ব্যবসা সন্দেহ নেই কিন্তু স্ত্রী যে এতে হ'ল তৈজসপত্রের সামিল!

এ গেলো সোভিয়েট রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়ন স্থাপিত হওয়ার পূর্ববর্তীকালে পূর্ব-রাশিয়ার অবস্থা! জারদের নিষ্ঠুর রাজত্বের অবসানের পর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সে দেশের নারী সমাজের উন্নতির জন্যে প্রবল চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন।

রাশিয়ার গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পেরেছে সমাজকে উন্নত করতে হোলে আর সমাজ-দেহকে সুস্থ রাখতে হোলে নারী সমাজের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে সর্ব্বাগ্রে।—তাই, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট দেশের উন্নতির জন্যে যে "Five Years Plan" (পাঁচ বছরের সংকল্প) গ্রহণ কোরেছিল, সে সংকল্পের গোড়ায় রোয়েছে এই নারীপ্রগতি।

সোভিয়েট ইউনিয়ন নারী আর পুরুষের সামনে "অধিকার" এই চিরন্তন সত্য ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথা, বহু বিবাহ—বাল্য বিবাহ প্রভৃতি নারী সমাজের অনিষ্টকর কুৎসিৎ প্রথাগুলোকে কঠোর আইন দিয়ে দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু শত কঠোর আইনের নিষ্পেষণে একদিন সমাজের সমস্ত দোষগুলো দূর করা সম্ভব নয়। তৎকালীন সমাজের লোকেরা এ বিষয়ে বাধা দিতে লাগলো—চারদিকে নবপ্রচারিত আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের ঝড় উঠলো।

সমাজের রক্ষণশীল চাষীরা ভাবলো—সরকার আইন দিয়ে ধর্ম আর সমাজের পবিত্র বন্ধন ভাঙতে চাইছেন! চারদিকে নবপ্রচারিত আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হলো। ফলে গভর্ণমেন্ট কুলোকে প্রচার কোরে—বলশেভিকেরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে! নারীর সতীত্ব বলে কোনো জিনিষ আর থাকবে না—ইত্যাদি—ইত্যাদি। সুতরাং পুরুষের ধারণা হয়—সত্যই বুঝি এতে সমাজের পবিত্র বন্ধন বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ সকল বাধার মধ্য দিয়ে নারী প্রগতির আন্দোলন ধীরে ধীরে সফলতা লাভ করতে লাগলো। রাশিয়ার মেয়েদের পক্ষে হঠাৎ পুরুষদের সঙ্গে একত্রে স্কুল-কলেজ, বা ক্লাবে যোগ দেয়া তখন নিতান্ত অসম্ভব।

একেতো, পুরুষদের ক্রমাগত বাধা তারপর আবার মেয়েদের নানা আশঙ্কা সুতরাং মেয়েদের জন্যে পৃথক স্কুল-কলেজ, ক্লাব প্রভৃতি খুলতে হলো।

নারীদের সর্ব্বপ্রথম ক্লাব হয় বাকুতে। নাম—'অল বৈরামভ ক্লাব।' সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে এটাই মেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্লাব। এর পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক নগরে এবং গ্রামে নারীদের ক্লাব স্থাপিত হয়েচে।

মেয়েদের শিক্ষার জন্যে "অজ্ঞতা নিবারণী" প্রতিষ্ঠান—ভ্রাম্যমান শিক্ষালয় প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গীত, ব্যায়াম, সন্তান-পালন, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়েই মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হয়।

এ প্রকারের প্রতিষ্ঠান সমূহ যাতে প্রত্যেক নগরে এবং গ্রামে স্থাপিত হয় সে দিকে প্রবল চেষ্টা চলেচে। বর্ত্তমানে কৃষক রমণীদের জন্যে একমাত্র পূর্ব্ব রাশিয়ার ১২০টি ক্লাব, ৩৮৫টি অজ্ঞতা নিবারণী প্রতিষ্টান (Red Corners), ১৮০টি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষালয় (Red Yurta) এবং পাঁচটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের সভ্য সংখ্যা প্রায় নব্বই হাজার! দিন্ দিন্ এসকল প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্চে সঙ্গে সঙ্গে সভ্য সংখ্যাও বাড়চে!

এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভ্রাম্যমান শিক্ষালয় আর ভ্রাম্যমান গাড়ীর কথা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ সকল ভ্রাম্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো নগরের সংস্পর্শ বর্জ্জিত গণ্ড গ্রামগুলোতে ঘুরে বেড়ায়।

প্রত্যেক ভ্রাম্যমান শিক্ষালয়েই একজন কোরে গ্রন্থাগারিক (Libraian), শিক্ষকতার ধাত্রী থাকে। তারা শিক্ষালয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গমন করে। একগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলো সেখেনকার মেয়েরা এসে লেখাপড়া শিক্ষা করে। তাদের বহু পত্রিকা পড়িয়ে শোনানো হয় আর সোভিয়েট সভা থেকে প্রবর্ত্তিত নতুন আইনগুলো তাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়।

অনেক সময়ে এ সকল ভ্রাম্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সহিত একজন করে বিচারক থাকেন। মেয়েরা কোন বিষয়ে অভিযোগ কোরলে তার তিনি উপযুক্ত বিচার করেন।

ফলে এই হলো যে, মেয়েরা ঘরে বোসেই সুবিচার পায়। ধাত্রীরা নারীদের সন্তান প্রসবের সাহায্য করে আর ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ইত্যাদির সাহায্যে স্বাস্থ্য, সন্তানপালন প্রভৃতি নারীদের জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করে।

এদের পূর্ব্ব পুরুষদের আমলে এ সকল প্রতিষ্ঠানকে বিষবৎ পরিত্যাগ করে থাকতো। কিন্তু এখন এরা এতো লোকপ্রিয় হয়ে উঠেচে যে, পুরুষেরাও অসুস্থ হলে এগুলো'র আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

দিন্ দিন্ রাশিয়ার পুরাতন প্রথাগুলো লোপ পেয়ে আসছে। সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক অবস্থারও বিস্তর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আজকাল বাকু, সমরখন্দ, বুখারা প্রভৃতি সহরগুলোর কর্কশ বুকের উপরে যোদের মতোন্ নরোম মেয়েদের পর্দাবিহীন ভাবে পথ চলতে দেখা যায়। যাঁরা Czar রাজত্বের আমলে সে দেশে গিয়েছেন বর্ত্তমানে তাঁরা এ দেখলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হবেন সন্দেহ নেই।

রাশিয়ার নারী প্রগতির মূলে রয়েছে সেদেশের নারী-রক্ষীদের অদম্য সাহস, অসাধারণ আত্মত্যাগ, অসীম বীরত্ব! প্রথম যেদিন সামান্য কয়েকজন নারী মিলিত হয়ে প্রবল জনতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে—'চাদ্রা' আর 'পরান্দজা' পুড়িয়ে পর্দাপ্রথার অবসানের সূত্রপাত করলো সেদিন তাদের কত যন্ত্রনা সহ্য কোরতে হয়ে ছিলো।

তাদের মধ্যে অনেককে নিষ্ঠুর ভাবে নিগৃহীত করা হয়। কেউ কেউ অন্ধ সমাজভক্তদের হাতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলো! কিন্তু আজ আর সে দিন নেই! রাস্তার বুক দিয়ে অসংখ্য নারী পর্দাছাড়া অবাধে হেটে যায়। যুবক-যুবতী কারুরই তা দৃষ্টিকটু মনে হয় না।

বর্ত্তমানে রাশিরার মেয়েরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে (Political field) যোগদান করছে! নির্ব্বাচনের সময়ে পুরুষদের চাইতে নারীরাই বেশী কর্ম্ম তৎপরতা দেখিয়ে থাকে। বহু মহিলা গ্রামের ইউনিয়নগুলোতে সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

গ্রামের সোভিয়েটগুলোর প্রধান পরিচালক গ্রামের সোভিয়েটের সভাপতি। তাই নারীদের সভানেত্রী পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় বেশ বোঝা যায়—সে দেশের মেয়েরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করছেন।

অথচ কয়েক বছর পূর্ব্বেও এই সকল গ্রামগুলোতে মেয়েদের কোনো অধিকার বিন্দুমাত্র ছিলো না। আজ গ্রাম্য সোভিয়েটগুলোতে সভানেত্রীর সংখ্যা প্রায় ৯২৪, বাসিকোরিয়াতে ১৪৪ জন। উজবেকিস্থানে ৩৮৯ জন। কাজাকে ২৩৩ জন। তাতার সাধারণ তন্ত্রে ১০৮ জন এবং ঝিথেস্থানে ৬০ জন। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

সামাজিক পুর্ণগঠনে আর নারীর স্বাধীন সত্বা প্রকাশে সাহয্যে করাতে আজ রাশিয়ার আমুল পরিবর্ত্তন হয়েচে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলো সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়েচে। দেশে শিল্প বানিজ্যের উন্নতি হোয়েচে দ্রুতগতিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে রাশিয়ার নারী সমাজ।

সকল নারীর আদর্শরূপে চিত্রাঙ্গদার মুখ থেকে যে বাণী সকল দেশের বরণীয় শ্রেষ্ঠ কবি অর্জ্জুনকে উদ্দেশ্য কোরে বলিয়েছেন, তার যতোটুকুন্ আমার অত্যন্ত ভালো লাগে (আপনারদের মতের সঙ্গে গরমিল হোতেও পারে!) সেটুকুন্ পুনঃ লিখে আজকের প্রবন্ধে সমাপ্তির সোনালী রেখা টেনে দেবো—

—দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই; অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। পার্শ্বে যদি রাখো
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।—

[চিত্রাঙ্গদা, শেষ দৃশ্য।

সাহিত্যের কষ্টি পাথর

অশনি

বাহা বাহা রে মোহিতলাল!

দ্বিজুরায় বাঁচিয়' থাকিতে স্বনামধন্য "নন্দলাল"-কে বাহবা দিয়া গাহিয়াছিলেন—"বাহা, বাহা রে নন্দলাল!" এখন যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিপাতনে সিদ্ধ ঢাকাই মাষ্টার মোহিতলালের "বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবন" নামক অদ্ভুত প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তগুলি পড়িয়া আর একবার নিশ্চয়ই গাহিয়া উঠিতেন—"বাহা, বাহা রে মোহিতলাল!" বাস্তবিক এই নন্দ-দুলাল মোহিতলাল বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-জীবনের যে কাহিনী রচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-জগতে একটি আবিষ্কারের তুল্য। বঙ্কিম চন্দ্রকে এতদিন সকলেই সত্য-শিব-সুন্দরের অদ্বিতীয় কবি ও ব্যাখ্যাতা বলিয়াই জানিতেন; কিন্তু মোহিতলাল সকলের সে ধারণা দূর করিয়াছেন। যাহা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এতদিন কেহই বলিতে সাহস করেন নাই বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, নিপাতনে সিদ্ধ মোহিতলাল তাহাই বলিয়াছেন ও তাহাই ভাবিয়াছেন। মোহিতলাল প্রতিপন্ন করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যাহা যৌনতান্ত্রিক, তাঁহার পন্থা ছিল "বীরাচারী তান্ত্রিকের পন্থা,—বোধকরি অনেকটা কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মত! অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!

*　*　*

মোহিতলালবাবু বোকা হইলে কি হয়, বুদ্ধিমান্ আছেন। তিনি ভাবিলেন তরুণরা বঙ্কিমচন্দ্রকে তেমন পছন্দ করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ পড়িলে তাহাদের মনে রিরংসার উদ্রেক হয় না, বরং রিরংসার আগুন কে যেন গঙ্গাজলে ঢালিয়া নিবাইয়া দেয়। অন্তরের অন্তরে একটা যেন "অস্বস্তিকর"—চিত্তশুদ্ধির আত্মপ্রসাদ আসে। বঙ্কিম-চন্দ্রের বিরুদ্ধে তরুণদের ইহাই নালিশ। এই শতবার্ষিকীর মুখে বঙ্কিমকে তরুণ-মহলে popularise করিতে হইবে। কেমন করিয়া করা যায়? তাঁহাকে যৌনতান্ত্রিক বলিয়া খাড়া করিলে তরুণরা এবং মোহিত-লালবাবুর মত অনেক "প্রচ্ছন্ন-সবুজ" বঙ্কিমচন্দ্রকে উপাস্য বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রকে একবার যৌনপন্থী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে আরও একটা কাজ হইবে—তরুণদের নিকট রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র কোথায় ভাসিয়া যাইবেন। রবীন্দ্রনাথ যে একবার মোহিতলালকে "অধ্যবসায়ী কবি" বলিয়া মোহিতলালের ললাটে অতি সুনিপুণ ও মর্মান্তিক ভাবে পঙ্কতিলক পরাইয়া দিয়াছিলেন, সে অন্তর্জ্জালারও অবসান হয়। অতএব মোহিতলাল কলম ধরিলেন এবং কলম ধরিয়া নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি প্রচার করিলেন:—

(১) অতি-অল্পবয়সে রচিত তাঁহার কবিতাগুলিতে যে একটি কল্পনা বা রস প্রেরণার উন্মেষ দেখা যায় তাহাও যৌন-আকর্ষণমূলক। ……নায়িকারূপিনী নারীর প্রতি এই যে আসক্তি, ইহাই তাঁহার জীবন-দর্শনের মূল সূত্ররূপে উপন্যাসগুলির সৃষ্টি-কল্পনায় অনুস্যূত হইয়া আছে।

(২) জীবনের বাস্তব নিয়তিকে মানুষের দেহাধিষ্ঠিত কামরূপেই তিনি তাঁহার দিব্যদৃষ্টির দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন;

তাহাকে তিনি ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিতে দেন নাই।

(৩) প্রেম ও রূপমোহ (পাছে পাঠকের ভ্রম হয়, এজন্য রূপমোহ ও যৌনপ্রবৃত্তি যে এক তাহা মোহিতলাল দয়া করিয়া পরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন) এই দুই পৃথক্ পিপাসা (প্রেম ও ইঁহার কাছে পিপাসা ;—"হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক্!") প্রায় একই প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া যে দ্বন্দ্ব-সংসারের সৃষ্টি করে, কবি বঙ্কিম তাহা হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারেন নাই। নগেন্দ্র দত্ত, গোবিন্দলাল……মনুষ্যধর্ম্ম পালন করিয়াছে —সে পরিণাম রোধ করিবার প্রবৃত্তিই তাহাদের স্রষ্টার চিত্তে নাই; বরং রসবিহ্বল কবি পরম আগ্রহে সে দৃশ্য উপভোগ করিয়াছেন। ……সেই রূপমোহ বা ইন্দ্রিয়লালসার মুখে বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের যে নিদারুণ পরিণাম, কবি তাহাকেই দীর্ঘ-নিশ্বাসের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছেন; এই পাপের স্বস্ত্যয়নকল্পে যত মন্ত্রই উচ্চারণ করুন—নিয়তির সেই ভীষণ-মধুর বিরাট গম্ভীর মূর্ত্তি হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারেন নাই। প্রেমই হউক, আর রূপ-মোহই হউক, ফল একই; প্রতাপের প্রেম ও গোবিন্দলালের রূপমোহ দুইয়েরই পরিণাম এক—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নাই!

(৪) যে প্রেম রূপজ নহে, তাহার গভীরতা স্বীকার করিলেও প্রেমকে সম্পূর্ণ রূপমোহমুক্ত-রূপে কল্পনা করিতে তাঁহার বাধিয়াছে; তাহার কারণ এ মোহ কবির নিজেরই প্রাণের মোহ।

(৫) বঙ্কিমচন্দ্র…এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে নিজের জন্মগত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই—রূপজ মোহকেই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক নাম দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছেন, ব্যাধির নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

(৬) দেহবর্জ্জিত আধ্যাত্মিক আদর্শকে তিনি কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই।

উপরি-উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি মাষ্টার মোহিতলাল উনপঞ্চাশটি উত্তম পুরুষ লাঞ্ছিত "আমি" ও "আমার" সর্ব্বনামপদের মারফতে, অবলীলা-ক্রমে, কলিযুগের দ্বিতীয় দাতাকর্ণের ন্যায়, বঙ্গীয় পাঠককে খয়রাৎ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তগুলির সহজ সরল ভাষ্য অংশ্য ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র একজন ঘোরতর যৌনপন্থী ছিলেন। যৌন প্রবৃত্তি তাঁহার জন্মগত সংস্কার ছিল। স্বরাজ আমাদের "জন্মগত দাবী" ইহাই এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি। যৌন প্রবৃত্তি যে বঙ্কিমের "জন্মগত সংস্কার" ছিল, তাহাও এতদিন পরে শুনিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র কামের দৃশ্য বেশ "তারাইয়া তারাইয়া" দেখিতে ভালবাসিতেন। কামকে বঙ্কিম দীর্ঘ নিশ্বাসের দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। যেমন দেবতা, তেমনই পূজার উপকরণ! প্রেমই হউক আর ইন্দ্রিয়লালসাই হউক—ফল একই—মৃত্যু ছাড়া আর পথ নাই। মোহিতলালের গুরু সুনীলকুমার ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। The paths of glory lead but to the grave—গ্রে সাহেবের সেই কবিতা মনে পড়িতেছে! রূপজমোহকেই অর্থাৎ যৌনপ্রবৃত্তিকেই বঙ্কিমচন্দ্র শোধন করিয়া প্রেমনামক পিপাসায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। মোহিতলাল-মল্লিনাথের এই ভাষ্য পড়িয়া রামমাণিক্যের কথা মনে পড়িতেছে। রামমাণিক্য ব্রাণ্ডির গেলাসের উপর মন্ত্র পড়িয়া "শোধন" করিয়া লইয়াছিল ইহাও দেখিতেছি তাহাই। বঙ্কিমের প্রতি আরোপিত এই যৌনবাদ রামমাণিক্য-সুলভ মোহিতলালেরই কীর্ত্তি, তাই নিমচাঁদ রামমাণিক্যকে যাহা বলিয়াছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়িবে—"ব্যাটা খাবে ত ব্রাণ্ডি, মন্ত্রের ধূম দেখ,—যে ব্যাটা গেলাস দে—," বাস্তবিক বঙ্কিম-চন্দ্রের উপর এই মনগড়া যৌনতান্ত্রিকতার আরোপ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে এরূপ অপমান আর কেহ কখনও করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। অথচ ইনিই নাকি বঙ্কিমসাহিত্য সম্পাদনের একজন স্বয়ংসিদ্ধ মোড়ল। বাঙ্গালা দেশের বঙ্কিমভক্তি যে শুধু বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত ও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—ইহাও তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অন্ততঃ স্বদেশী আন্দোলনের বাঙ্গালা বাঁচিয়া থাকিলেও বঙ্কিমের এতটা দুর্গতি হইতে পারিত না।

* * *

মোহিত লিখিত সু-সমাচারের উদ্ধৃত অংশগুলি এতই কাঁচা ও শূন্যগর্ভ যে, সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিম সাহিত্য যাঁহারা একটু যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে মোহিতলালের এই ফাঁকা আওয়াজ সহজেই ধরা পড়িবে। বঙ্গীয় পাঠকদের রস-বোধের উপর আমরা এখনও ততটা আস্থাহীন হই নাই যে ঐসকল অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় কথার অযৌক্তিকতা তাঁহাদিগকে বিচার করিয়া বুঝাইতে হইবে। তথাপি তাঁহাদের স্মৃতি-শক্তি জাগরিত করিবার জন্য ঐ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরের কথা তাঁহারই লেখা হইতেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

(১) "মনের অনেকগুলি ভাব আছে তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায় অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মবিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়।

স্বতঃ প্রস্তুত হই” অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা আধ্যাত্মিকতায় নহে। সুতরাং রূপভোগ-লালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। এই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদন-শরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।……সে কেবল রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর-প্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারে ইষ্টসাধন হইয়া থাকে এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী।…কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট ও সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়।…ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম-বিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্তপক্ষে স্ত্রী-পুরুষে ভালবাসা আমার বিবেচনায় এইরূপ।”

(২) “ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহে প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এসকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।”

(৩) “প্রীতিই সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহা-সঙ্গীত সহিত মনুষ্যহৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।”

(৪) সৌন্দর্য্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।”

সূর্য্যকে লণ্ঠন ধরিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই; তথাপি চক্ষুষ্মান্ পাঠক দেখিবেন আমরা উপরে যতটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই মোহিত-মাষ্টারের সকল তর্কেরই সমাধান আছে। অবশ্য, বঙ্কিম-কথিত “সৌন্দর্য্য-তৃষা”-কে মোহিতলাল “রূপজমোহ” বলেন কি না সেই রহস্যটুকুই আমাদের দেখিবার সাধ আছে!

* * *

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোহিতলালবাবু বোকা হইলেও বুদ্ধিমান্ বটেন। তাই তাঁহার অকস্মাৎ শৈবলিনী ও রোহিণীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তবেই ত বঙ্কিমের দেহবাদ-প্রতিষ্ঠার মূলে একটা গলদ থাকিয়া যায়। মনের জোর কমিয়া গেল, কিন্তু গলার জোর বৃদ্ধি পাইল। মোহিতলাল দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন—“প্রতিভার পরিণত অবস্থায়, বঙ্কিমচন্দ্রের রূপতান্ত্রিক সাধনায়, দুইবার আসন টলিতে দেখিয়াছি।** শৈবলিনী ও রোহিণীরূপে নারী তাঁহার হস্তে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কবি-মানসের একটি অসুস্থ উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে, সুস্থ কবিদৃষ্টির পরিচয় তাহাতে নাই। সব চেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, এই দুই-চরিত্রই তাহাদের দেহ-মনের উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠতার জন্য পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; তাহারা কেহই যে সাধারণ পাপী নয়—তাহারা যে more sinned against than sinning—সে ধারণার জন্য লেখক নিজেই দায়ী।… তাহাকেই এখানে শাস্ত্রকারদিগের মত পাপের মূল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।” ইহাকেই বলে “His Master's voice!” মোহিতলালের গুরু সুশীলকুমারও ঠিক অবিকল এই বাণী “শনি”-র একই সংখ্যায় প্রকাশিত “রোহিণী” নামক প্রবন্ধে প্রচারিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, মোহিতলাল ও সুশীলকুমার যেন পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একই কাগজে একই সময়ে এই দুইটী লেখা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। শাস্ত্রকারদিগের নাম ইঁহারা সহ্য করিতে পারেন না; কিন্তু সে যাহা

হউক, শৈবলিনীর সহিত যাঁহারা রোহিণীর নাম উল্লেখ করেন, তাঁহাদের রসবোধের পরিধি যে যৌনপ্রবৃত্তিমূলক গণ্ডীটির এক চুলও ওধারে নয়, তাহা বলাই অবশ্য বাহুল্য। শৈবলিনীর কথা স্বতন্ত্র. কিন্তু যে রোহিণী কামুকী ছাড়া আর কিছুই নয়, যে তাহার ক্ষুদ্র জীবনে হরলাল ও নিশাকর দাসকে মজাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং গোবিন্দলালকে মজাইয়াছে, যে কুল কামিনী হইয়া চুরি করিতেও সঙ্কুচিতা হয় নাই, যাহাকে হরলালের মত অপদার্থও বলিতে পারিয়াছে—"আমি যাই হই, কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র; যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না"—সেই রোহিণী তাহার "দেহমনের উৎকর্ষ ও বলিষ্ঠতার জন্য ইহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে"। হায় রে মোহিতলাল! "অসুস্থ উত্তেজনা" যে তোমার, কবিমানসের নয়, তাহা কি লিখিবার সময়ও টের পাও নাই?

* * *

কিন্তু হাজার হউক মোহিতলালের 'মন' হইলে, তাহাও ত "মন"—ছটাক ত আর নয়? তাই তিনি আত্ম-প্রতারণার কথাটা সহজেই ধরিয়া ফেলিয়াছেন এবং সামলাইয়া লইবার জন্য বলিয়াছেন "আমি ** বঙ্কিম-চন্দ্রের জীবনবাদের যে আদর্শ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে এক প্রকার দেহবাদেরই প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আমি এ যুগের সংস্কারবশে সে যুগের বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যপ্রেরণায় ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের ছায়া দেখিয়াছি। ইহার উত্তরে প্রথমত (?) ইহাই বলিব যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যেমন, তেমনই আমারও মনের কোণে, কোন তত্ত্বের বালাই নাই।" অর্থাৎ মোহিতলাল বলিতে চাহিতেছেন—"হে বঙ্কিম, তুম ভি একটা, হাম ভি একটা! ইহা তোমারও যেমন প্রতিভার পৌরুষ, আমারও তেমনি প্রতিভার পৌরুষ, অর্থাৎ 'ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্ব'!" বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এক নিশ্বাসে মোহিতলালের নাম মোহিত-লাল কর্তৃক উচ্চারণ, ইহার তুলনা বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্লভ। এই গগনচুম্বিনী স্পর্দ্ধার শাস্তি যে কি হওয়া উচিত, তাহা আমাদের ধারণায় আসিতেছে না, পাঠকগণ 'ভাবিয়া-চিন্তিয়া' মোহিতলালের প্রতিভার পৌরুষকে তাহা দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

কিন্তু বিস্তর কাদা-ঘাটা হইয়াছে, আর নয়। এইবার মোহিত মাষ্টারের 'ভরত-বাক্য' উদ্ধার করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। মোহিতলাল লিখিতেছেন—

"Here in the flesh, within the flesh, behind, swift in the blood and throbbing on the bone,

Here in the flesh, the never yet explored."—

"বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবন সম্বন্ধে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই।" অর্থাৎ—বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবনের চারিভিতে কেবল—"Flesh, Flesh, Flesh!" অতএব আমার কথাটি ফুরাইল,—আর কি বলিবার আছে? উপসংহারে এই 'Flesh'-এর ছড়াছড়ি দেখিয়া বঙ্কিমবর্ণিত জয়ন্তীর বেত্রাঘাত দৃশ্যে সেই কদাকার কসাইয়ের কথা কিন্তু আমাদের মনে পড়িয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে বিকটদর্শন চণ্ডালের হাত হইতেও বেত খসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেত উঁচু করিয়া এই কসাই জয়ন্তীকে বলিয়াছিল—"কাপ্‌ড়া উতার্—তোর গোশত (Flesh) টুক্‌রা টুক্‌রা করকে হাম্ দোকান্‌মে বেচেঙ্গে।" জয়ন্তী তখন বলিয়াছিলেন—"রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। …যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে সে যাহা ইচ্ছা করুক, তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই, আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করি না।" কিন্তু তথাপি এই কসাই জয়ন্তীর অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যতক্ষণ না মহারাণী নন্দার ইঙ্গিতে সহস্রদর্শক "মার! মার!" শব্দ করিয়া সেই কসাইয়ের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, ততক্ষণ সে ঐ "গোশ"-(Flesh)-এর কথা ভুলে নাই। মোহিতলালের উপসংহার দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হয় সেই কসাইয়ের প্রেতাত্মাটাই মোহিতলালের ঘাড়ে চাপিয়া তাঁহাকে ঐরূপ প্রবন্ধ এবং তাহার এইরূপ উপসংহার লিখাইয়াছে!

বঙ্গীয় নাট্যশালার পিণ্ড-পিণ্ডান্ত

'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' কে লিখিয়াছে?—প্রবাসী-ভৃত্য ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা ছাপা হইয়াছে কোথায়?—প্রবাসী প্রেসে। ছাপা ও কাগজ প্রভৃতির খরচ জোগাইয়াছে কে?—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্। সুতরাং কাহার মাথায় কাঁটাল

ভাজিয়া কে মজা লুটিল, আর কাহার পেট ভরিল, তাহা পাঠকেরা প্রথমেই বুঝিয়া রাখুন!

এইবারে এই পুস্তকে যে সব উৎকট গবেষণা ও বিকট বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় আছে, একে একে সেই সব কথাই পাঠকগণের অক্ষ গোচর করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—"যে যে-গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যায় বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে।"—বঙ্কিম বাবুর এই উক্তি পুরাতন হইলেও এখনও যে উহা কত সত্য, তাহা এই বহিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেই সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। গ্রন্থের প্রায় গোড়াতেই লেখক 'ক্যালকাটা গেজেট' হইতে এই ইংরেজী বিজ্ঞাপনটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন — Mr. Lebedeff, respectfully acknowledges the very distinguished patronage, the Ladies and Gentlemen of the Settlement Subscribers to his Second Bengally Play, honoured him with, begs leave to assure them, he has the most grateful sense of the very liberal support afforded him on this occasion, and intreats they will be pleased to accept his warmest thanks".—ইহা উদ্ধৃত করিয়াই ব্রজেনবাবু নিজের এই মন্তব্যটি জাহির করিতেছেন—"দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না।" এই মন্তব্যের মধ্যে যে মাসী-সুলভ মুরুব্বিয়ানা আছে, তাহা অবশ্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ঐ মন্তব্যের সহিত উপরি উদ্ধৃত ইংরেজী বিজ্ঞাপনের যোগ-সূত্র যদি কেহ খুঁজিতে যান, তাহা হইলে উহার মধ্যে লেখকের কেবল অজ্ঞতা-যোগ ছাড়া আর কিছু তিনি দেখিতে পাইবেন কি? ইংরেজী না জানিয়া ইংরেজী 'কোটেশ্যন' উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপর আন্দাজী টিপ্পনী করিতে গেলে যে তাহা কিরূপ হাস্যকর বিড়ম্বনায় পরিণত হয়, ব্রজেনবাবু নিজের কাজের দ্বারা তাহাই প্রমাণিত ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন!

ধন্য তাঁহার গবেষণা! এই পুস্তকের ১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"দি নিউ

এরিয়ান থিয়েটার সর্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অবতীর্ণ হন—১৮৭৫, ১৪ই আগষ্ট তারিখে। এই দিন দুর্গাদাস দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক গীতিনাট্যের অভিনয় হয়।" কিন্তু বাঙ্গালা নাটকের সামান্ত খবরও যাহারা রাখে, তাহারা জানে যে, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম দুর্গাদাস নহে। তাঁহার নাম—উপেন্দ্রনাথ দাস। আর 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' আদৌ গীতিনাট্য নহে। উহা নাটক। এ সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' পণ্ডিত প্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। 'সোমপ্রকাশে' লিখিত হইয়াছিল—উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ-সরোজিনী' বিদ্বৎ-সমাজে সমধিক সম্মান-লাভ করিয়াছে। আমরা জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ততোঽধিক সম্মানলাভ করিবে। রসই কাব্যের আত্মা। আমরা সচরাচর যে সকল বাঙ্গালা নাটক দেখিতে পাই, তাহাতে সে আত্মার সহিত প্রায় সাক্ষাৎ হয় না। 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে সেই আত্মার সম্পূর্ণ সদ্ভাব লক্ষিত হইল।... উপেন্দ্রনাথের প্রণীত নাটকের একটি বিশেষ-গুণ এই স্বগ্রন্থে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্যাদি রসের সমাবেশ করিয়া পাঠকগণকে বিশুদ্ধ আনন্দসুখে আনন্দিত করা তাঁহার নাটকরচনায় একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। তিনি নাটকরচনায় অনেকগুলি অভিপ্রেত বিষয়ের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।"

কিন্তু খোসা লইয়াই যাহাদের কারবার, শাঁসের খবর তাহারা দিতে গেলে নাটককে গীতিনাট্য' ও গীতিনাট্যকে যে উপন্যাস বলিবে, তাহা অবশ্য স্বাভাবিক। তবে পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতা লইয়া এই লেখক যেরূপ আকাশ-স্পর্শী স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 'আবুহোসেনের' পাগলা গারদেও দেখা যায় না। উপরি উক্ত দুই ছত্রের মধ্যে দুইটা 'Himalayan blunder' করিয়া লেখক পুনরায় এই পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—অনেকে ভ্রমক্রমে উপেন্দ্রনাথ দাসকে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের গ্রন্থকার বলিয়াছেন।"—ইহাকেই বলে পাগলা-ওস্তাদী। সত্যকে মিথ্যা বলিয়া ভ্রম-সংশোধনের এমন 'সায়েণ্টিফিক্' গবেষণা ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও কেহ দেখিয়াছেন কি?

কেলেঙ্কারী আরও অনেক আছে। এক সংখ্যার 'খেয়ালী'তে সে সব কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। এবারে তাই এই 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' নামক আবর্জ্জনাস্তূপ হইতে আর একটা বিট্‌কেল ও বিদ্ঘুটে বচন পাঠকদের শুনাইয়া এ প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করিতে চাই।

রসরাজ অমৃতলাল একবার বলিয়াছিলেন,—"বঙ্গদেশে নাটক নাগরিক, যাত্রা তাহার পরম পূজনীয় গ্রাম্য জ্ঞাতি—পূর্ব্বপুরুষ। আমি নাট্যব্যবসায়ী, যাত্রার তর্পণ না করিলে আমার অপরাধ হইবে।" কিন্তু গোবর-গবেষক ব্রজেনবাবু ভীষণ মুরুব্বিয়ানা করিয়া এই পুস্তকে বলিয়াছেন—"পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই।" —বলা বাহুল্য, এই উক্তির সমর্থন-হিসাবে লেখক একটিও কথা বলেন নাই। এক কথায় কয়তা মারিয়াছেন। ব্রজেন বাবুকে যদি কেহ বলেন যে, "আপনি সোনার বেনের বামুন হইয়া 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধি ব্যবহার করেন কি হিসাবে? বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সোনার বেনের বামুনের কি কোনও নাড়ীর যোগ আছে?" —তাহা হইলে ব্রজেন বাবু কি উত্তর দিবেন? এজন্য নিশ্চয়ই কুলুজী ঘাটিয়া উহার উত্তর তাঁহাকে যোগা-ইতে হইবে। এক্ষেত্রেও সেইরূপ বাঙ্গলা নাটকের সহিত যাত্রার কোন নাড়ীর যোগ কেন নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা তাঁহার উচিত ছিল। তবে যাত্রা ও বাঙ্গালা নাটকে তাঁহার নাড়ীজ্ঞান যেরূপ টন্‌টনে, তাহাতে "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" মন্ত্রই তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্। যিনি নাটককে 'অপেরা' বলেন, তিনিই যাত্রা ও বাঙ্গলা নাটকের নাড়ী টিপিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতার পরিচয় আর কি হইতে পারে? প্রবাদ আছে, 'হাতে কাজ না থাকিলে খুড়ার গঙ্গা-যাত্রা করে।' ব্রজেনবাবু শুধু যাত্রার গঙ্গা-যাত্রা নয় সেই সঙ্গে 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'রও গঙ্গা-যাত্রা করিয়াছেন।

বঙ্কিমিয়ানা বনাম হ্যাংলাপনা

দেখিতেছি ঔষধ ধরিয়াছে। গতপূর্ব্ব সপ্তাহের 'খেয়ালী' বাহির হইবার পরে শনির মুর্গীমার্কা যে কাগজখানা বাহির হইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিচয় আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি-কেই শনির শকারেরা কামড়াইবার ও আঁচড়াইবার চেষ্টায় ফিরিতেছে। সবে শ্রাবণমাস, সম্মুখে এখনও ভাদ্র ও আশ্বিন বাকি! সাধু পথচারীদের একটু সাবধানে থাকা ভাল।

ইহাদের "বঙ্কিমিয়ানা" নামক কালির আচড়কে কেহই অবশ্য "লেখা"-র সম্মান দিতে রাজী হইবেন না, তাহা জানি। এই কালির আচড়ের ভিতর দিয়া যে উৎকট হ্যাংলাপনা উঁকি মারিতেছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। তবে আমরা ভাইস্-চ্যানসেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একটা অনুরোধ করিতে পারি: বিশ্ববিদ্যালয়ের—ছাপাখানা বিভাগে একটা প্রুফরিডার বা কালি-মাখাইবার লোকের চাকরী কি ইহাদের

বক্ষে তিনি খালি করিতে পারেন না? তাঁহার পদলেহন করিবার জন্ত ইহারা যেরূপ আকুল-বিকুলি করিতেছে তাহাতে "বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজা" "রাগান্ধ" না হউন "দয়ান্ধ" হইতে পারেন না কি? আমরা শুনিয়াছি, উপরোক্ত দুইটী চাকরী করিবার যোগ্যতা ইহারা বহুদিনের—সাধনায় অর্জন করিয়াছে এবং এই দুইটী চাকরী খয়রাৎ করিলে "রাজা"কে কথনই তাহার জন্ত "পরে অনুতাপ" করিতে হইবে না।

ইহারা যে কতখানি "উচ্চশ্রেণী"র অপকৃষ্ট জীব তাহা তাহাদের কালির আচড়ের সামান্ত কয়েকটি নমুনা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নমুনা কয়েকটী এইরূপ:—

(ক) "মহাকবি" গিরিশচন্দ্র ঘোষ জীবনে উদারচরিত্র "মাইডিয়ার" লোক ছিলেন।

(খ) গিরিশিয়ানায় যখন দানীবাবু আপত্তি করেন নাই, আমরাও নীরব থাকিতে বাধ্য।

(গ) "সেক্সপীয়র চাচা"-র বচন-অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "fortune এর লোভে" "বঙ্কিম পরিচয়" প্রকাশ করিয়াছেন।

(ঘ) বঙ্কিমের "বয়েৎসংগ্রহে" বঙ্কিম-পরিচয়ের সম্পাদক "নলকূপমাত্র বসাইয়াছেন, পুকুর কাটেন নাই।"

(ঙ) কবিরাজ অমরেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবন মনোমোহিনী" (?) গানের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে "রবীন্দ্রনাথ ভারতমাতাকে কুলটা বলিয়াছেন।"

যাহারা স্বর্গগত মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শুধু কবিত্ব সম্বন্ধে নয়, চরিত্র সম্বন্ধেও কটাক্ষ করিয়া থাকে, তাহাদের রুচি সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। বঙ্কিমের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে যাহারা বঙ্কিমকে অবলম্বন করিয়া "পুকুর কাটিবার" বড়াই করিতেছে তাহারা বঙ্কিমের বয়েৎ সংগ্রহ" বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া বঙ্কিমকেও কটাক্ষ করিতে ছাড়ে নাই। অবশ্য এমন জীব অনেক আছে, যাহারা প্রয়োজন হইলে বাপ-কেও বাপান্ত করিতে পারে! ইতিপূর্ব্বে "বসুমতী" বঙ্কিম সাহিত্য যেরূপভাবে সম্পাদন করিয়াছেন, ইহারাও তাহাই করিতেছে। কিন্তু ইহারা হয় ত বলিবে—"আমরাই পুকুর কাটিবার একমাত্র উপযুক্ত জীব, 'বসুমতী' ডোবা কাটিয়াছে মাত্র।" দানীবাবুর পুত্র "খোকাবাবু" এখনও বাঁচিয়া আছেন, অতএব "গিরিশিয়ানায় যখন দানীবাবু আপত্তি করেন নাই এবং দানীবাবুর পুত্র খোকাবাবু আপত্তি করেন নাই, তখন আমরাও নীরব থাকিতে বাধ্য"—ইহা লিখিলেই analogyটা ঠিক সাগসই হইত এবং যুক্তির এই অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্যে আশ্বস্ত হইয়া কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। সেক্সপীয়রকে "চাচা" বলিয়া ইহারা মুর্গীমার্কা কাগজের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়াছে বটে, তবে সম্পর্কের মাত্রাটা একটু কম হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় "বঙ্কিম-শত-বার্ষিকীর flood-এর মুখেই tideকে" ধরিয়া "fortune"-এর লোভে কাজটা করুন আর নাই করুন, ইহারা যে tideকে চারিহাতে সাপ্টাইয়া ধরিয়াছে, তাহাকে আর সন্দেহ কি, নতুবা প্রিন্টার ও টাইপিষ্ট্ বঙ্কিম-সাহিত্যের সং-পাদক সাজিল কেমন করিয়া? আমরা জানি এবং সাহিত্যিকমাত্রেই জানেন অমেরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী"-র ঐরূপ অপব্যাখ্যা—করেন নাই। পরশ্রীকাতরতায়—অন্ধ হইয়া অনেকে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারও এতখানি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না।

অভিযান—লেখক শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম্‌, এ, বি-এল। খ্যাতনামা কেশব গুপ্ত কর্ত্তৃক ভূমিকা লিখিত পুস্তকখানি ১০৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য ৸৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ-গুপ্ত এণ্ড কোং রসারোড, ভবানীপুর। ১৯৩৮ সন।

পুস্তকখানি যদিও উপন্যাস আকারে লিখিত হইয়াছে মূলতঃ এখানিকে অপরাধ-তত্ত্বের আভাসমাত্র বলিলে অত্যুক্তি হবে না। সমাজে যেখানে যে কারণে পাপের ও অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে তাহার বিপক্ষে এরকম নিপুণ তুলিতে "অভিযান" বাহন করা উক্ত লেখকেরই সহজ-সাধ্য হইয়াছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের অত্যাচারের কথা ইতিপূর্ব্বে কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার দৃশ্য বিংশ-শতাব্দীর মাঝখানে যে কি রকম তাহা সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে। মেডিকেল কলেজের দৃশ্য, কলিকাতার বড় বড় রাস্তার দৃশ্য, আউট্রাম ঘাটের দৃশ্য, নগরের শ্রেষ্ঠ হোটেলের কথা প্রভৃতি ভবিষ্যতে ইতিহাসের কার্য্য করিবে।

দারিদ্র্য ও ব্যক্তিস্বভাব, অপরাধী ও তাহার প্রতি সমাজের লোকের কি রকম বিষদৃষ্টি যাহাতে পুনঃ সমাজিকরণ অসম্ভব, সমাজবহির্ভুক্ত শ্রেণীর প্রতি সমাজের বিরূপ ব্যবহার প্রভৃতি অতি কঠিন বিষয়ও চরিত্রের মধ্যে দিয়া লেখক যেরকম ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মনে হয় আধুনিক নভেলের মধ্যে এরকম শ্রেণীর বই খুবই বিরল।

রেবা চরিত্র আঁকিতে গিয়া লেখক যখন বিবাহ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তখন তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। একটী লাইনে—"দেখ আমাদেরর দেশে শিক আর পার্শিদের মধ্যে বেশ্যা ব'লে কিছু নেই। যদি এদের মধ্যে সম্ভব হয়, তা' হ'লে বাঙ্গলার বুকে কেন কালিমা থাকে। তোমরা একটা কিছু চেষ্টা করতে পার না।" আর এক যায়গায় লেখক গণিকাবৃত্তি যে পুরুষের সৃষ্টি এবং নারীকে বলিদিয়া নিজেদের খোরাকের ব্যবস্থা তাহারই আভাস দিয়াছেন। রেবা বলিতেছে "দাদা, বিবাহ যে মানবের মঙ্গলের জন্যে হ'য়েছে কি স্বার্থ-সিদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বল তো বিবাহের সঙ্গে আর গণিকাবৃত্তির সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? গণিকাবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীলোকে দেহ বিক্রয় ক'রে দেহাতীত সামগ্রী পেয়ে থাকে পুরুষের কাছে। আর নারী যখন উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় ঠিক সেই রকম একজন পুরুষের মনস্কামনা পূর্ণ কোরে, পরিবর্ত্তে খোরাক-পোষাক আরও না হয় গাড়ী ঘোড়া, মোটর ইত্যাদি ভোগ করার অবকাশ পায়। দুদিক থেকেই দেখ—নারীর আর্থিক নির্ভরতার পরিবর্ত্তে পুরুষের লালসা তৃপ্ত করাই একমাত্র কার্য্য।"

সমালোচনার শেষে প্রসিদ্ধ লেখক কেশব বাবুর ভুমিকায় লিখিত শেষ লাইনটী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—

"দেশের শিক্ষিত সমাজের ভাবধারাকে পুষ্ট করবে এই উপন্যাস—এ আমার বিশ্বাস।"

গান

কুমারী লাবণ্য মজুমদার

দেবতা হে! আমি হবনাক আর
পথহারা।
অস্তপারে ডুবলে সোনার রবি
সান্ধ্যারাণী আসবে যখন নামি,
দূর গগনে জ্বলবে গো তোমার
—নয়ন তারা।
আসবে যখন ঘোর অমানিশা
উদিবে নভে তোমার স্নিগ্ধ শিখা,
জলদ জালে আঁধার হলে ধরা
ঝরবে ধারা।
প্রিয়! কাজ কি আমার চেনা পথে
যে পথেই যাই মিলব তব সাথে,
তোমায় আমায় পরিচয়ের এই তো
চিরধারা।

খেয়ালী চিত্রপট

মতিমহল থিয়েটার্সের "বেকার নাশন" চিত্রে সুশীল রায় ও রাণীবালা। ছবিখানি ১৩ই আগষ্ট উত্তরায় প্রথম মুক্তিলাভ করিবে

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১. চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ). কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে শ্রাবণ ১৩৪৫. ১১ই আগষ্ট ১৯৩৮ } দ্বাত্রিংশ সংখ্যা

মন্ত্রী-মণ্ডলীর মুখরক্ষা

শেতাঙ্গদলের অনুগ্রহে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক্ সাহেবের মুখরক্ষা হইয়াছে। অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আলোচনার প্রসঙ্গে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যবস্থাপরিষদে তাঁহাদের ভারতীয় সমর্থকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং শেতাঙ্গদল কৃপা না করিলে তাঁহাদের মান রক্ষা হইত না। ক্লাইভষ্ট্রীটের বড়কর্ত্তাদের নায়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন তাহাতে কি ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল তাঁহাদেরও বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তবে কোন অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ তাঁহারা বর্ত্তমানে মন্ত্রীমণ্ডলকে সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করেন তাহা গুরুতর এবং তাঁহার মতে স্বরাষ্ট্রসচিব আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগ পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

"ইসলাম বিপন্নের" ধূয়া তুলিয়া বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল দেশে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে দেশের মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গত বুধবার অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যার পর কলিকাতার মত সুরক্ষিত সহরে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা "ইস্লাম-বিপন্নের" ধূয়ার পরিণতি।

সিন্ধু প্রদেশ হইতে সমাগত সভ্য সিদ্দিকি সাহেবকে কংগ্রেসদলের নামে যে অপবাদ রটনা করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেসীদলে কোন দিন সে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না। শরৎচন্দ্র অতীতে কোন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেন যে যতদিন তিনি কংগ্রেসীদলের অধিনায়ত্ব করিবেন ততদিন Bait, bluff briberyর প্রশ্রয় দিবেন না। সিদ্দিকি সাহেবের ক্ষমা প্রার্থনায় ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে যে শরৎচন্দ্রের অধিনায়কত্বে কংগ্রেসীদল দুর্নীতি-অবলম্বন করে নাই।

হক্-মন্ত্রি-মণ্ডলীর স্বজন-প্রীতি সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পঁচিশটী অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। মিঃ হক্ ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ কিভাবে স্বজনপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের আত্মীয়-

স্বজনকে চাকুরী দিয়াছেন তাহা সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মিঃ গ্রিফিথস্ ও মন্ত্রী-সভার অক্ষমতার বিশ্লেষণ করিয়া বিপক্ষে ভোট দেন। উপরি উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল ভারতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন।

জনসাধারণের দুর্দ্দশা লাঘব মানসে কংগ্রেসীদলের আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে কার্য্যসূচির উল্লেখ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। শরৎচন্দ্র স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে কংগ্রেসদল মন্ত্রীত্ব-লোভী নহে। যাহা হউক শরৎচন্দ্র ফজলুল হক সাহেব সম্বন্ধে যে সরল ও আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "মিঃ ফজলুল হকের দুঃখের দিনে আমি তাঁহার সাথী ছিলাম—কিন্তু তাঁহার সুখের দিনে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু আমি তাঁহাকে নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার উপরে আগেও যে আস্থা ছিল এখনও তাহাই আছে, একটুও পরিবর্ত্তন হয় নাই।" হক সাহেব কি এখনও সেই স্মৃতি-বিজড়িত সৌহার্দ্দ ফিরাইয়া আনিতে পারেন না? শরৎচন্দ্রের এই আবেগপূর্ণ আবেদন তিনি স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন কি?

ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফরাসীর পার্ট
যুদ্ধ সম্বন্ধে ফরাসীর জনমত

সচী শীল

ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী সম্প্রতি প্যারিস visit করতে গিয়েছিলেন। এর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এপ্রিল মাসের Anglo-French Talks-এর ফলে যে Agreement হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর Royal Seal দেওয়া। খুব বিরাট রকমের অভ্যর্থনা হয়েছিল এই রাজ-অতিথিদের, কিন্তু এই অভ্যর্থনার পেছনে ফ্রান্সের তীব্র আকাঙ্খা ছিল যে Europe এর এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডকে ফ্রান্স যেন সর্ব্বদা নিকট বন্ধুরূপে পায়। এই বন্ধুত্ব বজায় রাখবার আকুল স্পৃহাই অভ্যর্থনার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিল।

বাস্তবিকই লণ্ডনের কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্য ফ্রান্সের ব্যাকুলতার সীমা নেই। M. Bonnett যখন মে মাসে জেনেভায়, তখন কোথা থেকে—from nowhere? খবর এল যে জার্ম্মাণ বাহিনী ২১শে মে তারিখে চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করবে। বনেট সাহেব ত ভেবেই অস্থির। কী করা যায়? তখন স্পেনের সমস্যা মাথার ওপর ঝুলছিল, এবং চেম্বারলেন দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিল যে স্পেনের ব্যাপারে ফ্রান্সকে free hand গোছের কোন কিছু দিলে চলবে না। তিনি নাকি ভেবেছিলেন এতে মুসোলিনীকে ভয়ানক চটান হবে। মুসোলিনীর ত এক কথা—Gen. Franco must win. কাজেই চেম্বারলেন সাহেব ফরাসী পররাষ্ট্র সচিবকে সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে ফ্রান্সকে British plan এ মত দিতেই হবে, না হলে মুসোলিনীকে হাতে রাখা অসম্ভব হবে। চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করতে গেলে বৃটেনকে হাতে রাখতেই হবে, এবং মুসোলিনী অন্ততঃ যাতে Neutral থাকেন সে ব্যবস্থা করতে হবে—এইটাই ছিল তখন বনেট সাহেবের main concern তাই ফ্রান্স যখন স্পেন সম্বন্ধে League Council এর British sponsored decision এ মত দিল, তাতে ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্টের ওপর Left Press এর attack না হয়, সেই জন্য বনেট সাহেব করজোড়ে ৩৪ জন influential Press-menকে আহ্বান করে বলেছিলেন—এত বড় বিপদ সামনে; এখন বৃটিশকে হাতে রাখবার জন্য স্পেনের ব্যাপারে London-Paris accord বজায় রাখা দরকার।

Franco-Czech military Pact অনুযায়ী যদি সত্যই ফ্রান্সকে যুদ্ধে নামবার দরকার হয়, তাহলে ভেবে দেখতে হবে ফ্রান্স নিজে এই যুদ্ধের জন্য কতটা প্রস্তুত। মার্চ্চ মাসে অবশ্য প্যারিস লণ্ডনের পরামর্শ না নিয়েই চেকদের pledge of military support দিয়েছিল, কিন্তু তা থেকে ঠিক বোঝা যায় না সাহায্যের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্কল্প কতটা অটুট আছে। কারণ ২১।২২শে মে তারিখে যখন বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল, তখন ফ্রান্স টু শব্দটিও করেনি, pledge repeat করবার কোন আগ্রহই দেখায়নি। এইটাই হয়েছিল Anglo-French Agreement এর ফল। ফ্রান্স ভেতরে কতটা Sound? সব ফরাসীরা কি Democracyকে বাঁচাতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত? না, গতযুদ্ধের কথা স্মরণ করে এখনও যুদ্ধটাকে সবাই ভয় খাচ্ছে? এইটাই এখন আসল প্রশ্ন। এর উত্তর পাওয়া যায় Madame Genevieve Tabouis প্রণীত "Blackmail or War" বইখানা থেকে। Introductory Remarks এ Madame Tabouis বলেছেন:

"In France war is not feared, but hated. Public opinion takes the point of view that war, which may perhaps be inevitable, would involve the utter ruin of our civilisation. Hence what must be done at any cost is to gain time by favouring every possible concession. At all events, before taking the fatal step which would result in a ghastly conflict, the Government must convince the French people that every attempt had been made to avoid war. If, however, war should come there is not a Frenchman, whatever his political party may be, who would oppose a government which had made every effort to ward off the catastrophe. Once again the nation would rise as one man to defend French territory and French freedom."

এই কথাগুলো থেকে বেশ বোঝা যায় ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্টের এখন ঘরোয়া সমস্যাটা কি। "Every attempt had been made to avoid war"—এইটা বোঝাতে হবে ফরাসীদের, নাহলে হয়ত ঘরে গণ্ডগোল বাধবে। "Favouring every possible concession"—এইটাই যত ক্ষতি করছে এবং সমস্যাকে আরও ঘনিয়ে তুলছে। এইটা কি বোঝা দরকার নয় যে এই Concession-এর ফলে ফ্রান্সের অবস্থা কাহিল হয়ে যেতে পারে? বিরুদ্ধ পক্ষ ফ্রান্সের এই weak spot-টা ধরে ফেলেছে এবং সেই-টাকেই জোর exploit করছে। Black-mail করে, Bluff দেখিয়ে হিটলার-

মুসোলিনী নিজেদের জন্ত concession আদায় করছে এবং এই ভাবে Fascism-এর Strategic position consolidate করছে। এই থেকে ভীষণ বিপদ হবে এই যে, সত্যই যুদ্ধ যখন বাধবে—যা নাকি "inevitable"—তখন ফ্যাসিষ্টদের হারাবার Strategic advantage টুকু ইংরেজ-ফরাসী পাবে না। এই বিপদের উল্লেখ করে Madame Tabouis বলেছেন—

"Of-course, Italy and Germany are bluffing. The danger is, however, that sooner or later the successes scored by Rome and Berlin as a result of their black-mailing methods will encourage one or other of the dictators to gamble for the mastery of Europe by means of a stupendous war which, incidentally, would save him from his serious internal troubles."

Political foresight যদি থাকে তাহলে ফ্রান্সের আর মোটেই উচিত নয় policy of concession চালান। এর ফলে ইতিমধ্যে অবস্থা অনেক খারাপ হয়েছে। এখনও কিছু সময় আছে। স্পেনের Republican Government এখনও বেঁচে রয়েছে; যদিও Pyrenees border-এর খানিকটা Franco সাহেব অধিকার করে নিয়েছে। এখনও সময় রয়েছে চেকোস্লো-ভাকিয়াকে বাঁচাবার। Isolated হয়ে গেলে capitulate করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়, ভাল Czech Army থাকলে কি হবে! রাশিয়া একলা কখনো চেকদের সাহায্যে আসবে না; পথে অনেক বাধা। যুদ্ধ যেকালে বাধবেই, তখন যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হয়ে ফ্যাসিষ্টদের চোখ রাঙান দরকার। তাতে ফল খুব ভালই হবে। চেকদের Betrayal-এর আর একটা stage—Runciman Mission. চেম্বারলেন যা খুশী তাই আরম্ভ করেছে। গোপনে Anglo-German Air-Pact করবার মতলবও হয়েছে। ফরাসীরা কি চোখ বুজে এই সব দেখে যাবে?

—— •

(বিলাসী)

দেশের মাটি

দেশের মাটি চিত্রটী এখন মুক্তি প্রতিক্ষায়। আমরা যতদূর জানি তাতে মনে হয় যে নিউ থিয়েটার্সের এই নব নির্ম্মিত ছবিখানি ভারতবর্ষের চিত্ররাজ্যে এক অপূর্ব্ব সম্পদ হয়ে থাকবে।

আমরা এই ছবির 'ট্রেলার' পূর্ণ থিয়েটারে দেখেছি। ট্রেলার থেকে আমরা তিনটে জিনিষ সম্বন্ধে একটা সঠিক্ ধারণা করতে পেরেছি। তার প্রথমটী হচ্ছে এ ছবির শব্দ যন্ত্রের কাজ। এত নিখুঁত শব্দ গ্রহণ কোন বাঙলা ছবির ভাগ্যে বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয় হচ্ছে এর অপূর্ব্ব চিত্র-শিল্পের কাজ। আর তৃতীয়টী হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ। বাস্তবিক উমার মুখে পঙ্কজ বাবুর সুর দেওয়া যে গান আমরা শুনলাম তা ভোলবার নয়। ধন্ত পঙ্কজ বাবু। তোমার অপূর্ব্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছনার আবার হয়ত তুমি 'মুক্তি'র মতই বাঙলা দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

গত মঙ্গলবার 'দেশের মাটির হিন্দি সংস্করণ 'ধরতীমাতা'র সাতখানি কপি ভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সেন্টারে পাঠা[নো] হয়েছে। বোম্বাইএর কপিটা নিয়ে স্বয়[ং] সম্পাদক সুবোধ মিত্র মশা'ই নিজেই বি[...] এন, আরএর বম্বে মেইলএ রওনা হয়েছেন [...] আশাকরা যাচ্ছে সামনের শনিবার থেকে এ ছবিগুলি মুক্তিলাভ করবে।

বাঙলা সস্করণটী আশা করা যাচ্ছে আসছে ১৭ই সেপ্টেম্বর 'চিত্রায়' মুক্তিলা[ভ] করবে।

অধিকার

এ ছবির উভয় সংস্করণই শেষ হয়ে পড়ে আছে। এ ছবিখানি ঠিক্ দেশের মাটি পরেই 'চিত্রা'য় মুক্তিলাভ করবে।

ছবিখানা মাত্র চার মাসের মধ্যে শেষ করে পরিচালক মশাই তঁার প্রাইভে[ট] সেক্রেটারী মিস্ যমুনা গুপ্তাকে সঙ্গে নি[য়ে] বিদেশে রওনা হয়ে গেছেন। বিদেশে না[...] তাঁরা অনেক ষ্টুডিও ঘুরবেন ও অনে[ক] শিক্ষা করবেন।

বড়ুয়া সাহেব এই ছবি যে অল্প সময়ে[র] মধ্যে শেষ করেছেন তাতে সকলেই তা[কে] ধন্ত ধন্ত করছে। speed সম্বন্ধে সত্যিই এ[...] পরিচালকের সমকক্ষ কেউ নেই। কি[ন্তু] এই speed কে maintain করবার জ[ন্য] যাঁরা দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করে স[ব] কিছুরই ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের কথা কে[উ] ভাবে না। আমরা দুটী লোকের কথা জানি একজন হচ্ছে বন্ধুবর হুমা যার অমায়ি[ক] ব্যবহার ও অক্লান্ত পরিশ্রম সকলকেই শুস্তি[...]

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

প্রগতি চঞ্চল কথা-চিত্র

অ ভি ন য়

—শ্রেষ্ঠাংশে—

সাধনা বোস, প্রতিমা মুখার্জ্জী

অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

*

রূপবাণীতে

আগতপ্রায়

N. I. P.

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের

নবতম অর্ঘ্য

= খনা =

ছায়া দেবীর...

অভিনয় নৈপুণ্যের বিজয় বৈজয়ন্তী

খনা

আপনার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

নাম ভূমিকায়ঃ ছায়া দেবী

এক এ চার—চারে এক

পরিচালক:

শ্রীযুত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-পরিবেশক—

কপূরচাঁদ লিমিটেড

প্যারাডাইস বিল্ডিং, কলিকাতা

E. P. S.

করে দিয়েছে। আর একজন হচ্ছে শিল্পি তারক বসু। এর কথা না বলাই ভাল। ইনি হচ্ছেন নীরব কর্ম্মী। দিন নেই রাত নেই, বৃষ্টি নেই কেবল সেট্ই তৈরি করে চলেছেন। Modern setsএর পরিকল্পনা হয় বটে কিন্তু তাকে বাস্তবে পরিণত করতে কত যে পরিশ্রম করতে হয় তা হয়ত' সকলেই বোঝে না। আমরা জানি একদিনের কথা। সেদিনের হচ্ছে দোলযাত্রা। সারা ষ্টুডিওর কর্ম্মীরা শুধু কর্ম্মীরা কেন সারা বাঙলা দেশের লোকেরা ফাগের 'রঙে' মত্ত তখন এই শিল্পি তাঁর boss ছোটাইবাবুর সঙ্গে ষ্টুডিওর ফ্লোরে নিজের তুলি নিয়ে রত। অথচ একে কেউ চেনে না, জানে না। ঠিক্ যেন 'কাব্যের উপক্ষিতা।'

তিমিরবরণ

নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মশাই সম্প্রতি ছ'মাসের ছুটি নিয়ে সি, এ, পিতে যোগ দিয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে কোলকাতায় সি, এ, পি সম্প্রদায়ের যে অভিনয় ও নৃত্যলীলা হ'ল তাতে তিনি অর্কেষ্ট্রার ভার নিয়ে ছিলেন। এ ছাড়াও ঐ সম্প্রদায় শিগ্রই বাঙলা দেশে ও ভারতবর্ষের কয়েকটা বিশিষ্ট সহরে এদের নৃত্যাভিনয় দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। তিমিরবাবুও সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকবেন। আমরা তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

দেবকী বসু

পরিচালক দেবকীবাবু তাঁর "বিদের বাঁশীর" কাজ নিয়ে অনেক এগিয়ে চলেছেন। রোজই ভুনবর ষ্টুডিওতে তিনি তাঁর কাজ করে চলেছেন। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক রাইবাবু ও ছবির নায়িকা কাননবালা 'ষ্ট্রীট সীঙ্গার' বই থেকে একটু মুক্তি পেলেই কাজ সুরু হয়ে যাবে।

সাপুড়ে সর্দ্দার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের কাছে নায়িকা কানন মানুষ হয়েছিল ঠিক্ পুরুষ মানুষের মত। কারণ তাদের দলে মেয়ের স্থান ছিল না।

স্ত্রীলোককে পুরুষের মত হ'তে হ'বে এই হয়েছে কাননএর ভাবনা। তাই কানন উপস্থিত তার কর্ম্মরত দিনের মধ্যেও ঐ প্রকার বেশভূষা ও চালচলনের অভ্যাস নিয়ে যেতে রয়েছে। শ্রীমতীকে এই নবরূপে দেখবার আশায় আমরা উপস্থিত চুপ করে রইলাম।

ষ্ট্রীট সিঙ্গার

ষ্টুডিওর বাহিরে একটি বিরাট বস্তীর সেট গড়ে তোলা হয়েছে। এই বস্তীতেই একদিন ছিল ভুলুয়ার বাড়ী। পথের আস্তা-কুড়ের আবর্জ্জনার মত এখানকার লোকেরা, কোন এক অত্যাচারী দানব এদের গলা টিপে ধরে রেখেছে। জন্মাচ্ছে, মরছে, পচ্ছে আর দুনিয়া বিষাক্ত করে তুলছে। এই ক্লেদময় জঘন্য আবাসস্থলের আবেষ্টনের মধ্যে ভুলুয়ার কেটেছে একদিন নয় অনেকদিন। জীবনের অনেকগুলো পাতা এখানকার সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খার কথায় পূর্ণ। সেই ভুলুয়া, মজুর ভুলুয়া জীবনের আর এক অধ্যায়ে একদিন এলো ফিরে বস্তীতে। কেন এলো কি কারণে এলো কে বলবে! তার গত জীবনের চলে যাওয়া দিনগুলো সুখের? না আজ যাকে তুমি বলো সুখের, তাই তার সুখের আসন? শিল্পী ভুলুয়া সাধক ভুলুয়ার কাছে কোনটা সোনার সিংহাসন বলতে পারো?

বস্তীর মধ্যে অভিনয় করলেন সায়গল বিনয় গোস্বামী, ছুনী খাঁ, পূর্ণিমা প্রভৃতি। অপরূপ গান এরা গেয়েছেন।

কৃতি পরিচালক ফণি মজুমদার ও প্রোডাকশন্ চিফ প্রমোদ রায় যাতে ছবি-খানি এ মাসে শেষ হয় তার চেষ্টা করছেন।

হাজরা পিকচার্স

৪৮নং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে একটি সুবৃহৎ সুদৃশ্য বগানবাড়ীতে হাজরা পিক্চার্স লিমিটেডের ষ্টুডিও নির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে পূজার পূর্ব্বেই ছবির স্যুটিং আরম্ভ করিয়া বড়দিনের সময় দেখান যায় তাহার জন্য তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী এবং প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মীরা বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এই নবগঠিত ষ্টুডিওর যাহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রধান যন্ত্র-শিল্পী: মধু শীল, আলোক চিত্র-শিল্পী: বিভূতি লাহা, শব্দ-যন্ত্রী: যতীন দত্ত, রসায়নাগারাধ্যক্ষ: কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জ্জি, চিত্র-সম্পাদক: বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি, স্থির চিত্র-শিল্পী: সুবোধ দত্ত, আলোক সম্পাত-কারী: সুরেন চ্যাটার্জ্জি, প্রচার-শিল্পী ও সহকারী পরিচালক: বিশ্বাবন্ধু রায় চৌধুরী, সহকারী পরিচালক: কালিপদ রায়, শব্দ-যন্ত্রী: বিমল চাক্লাদার, চিত্র-শিল্পী: মণ্টু পাল

এই প্রসঙ্গে এই কথা এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে আলোক-চিত্র, রসায়নাগার ও শব্দ-যন্ত্র বিভাগ অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে গঠিত হইতেছে এবং এই ষ্টুডিওর শব্দগ্রহণ করা হইবে নূতন মডেলের ব্রিটিশ একাউষ্টিক সেটে। তিনকড়িবাবুর এই নূতন উদ্যম যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বাঙ্লা ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি সাধিত হয় আমরা সেই কামনা করি।

বেকার নাশন

আগামী শনিবার (১৩ই আগষ্ট) থেকে 'উত্তরা'-য় রাধা ফিল্মসের পরিচালনায় তোলা মতিমহল থিয়েটারের ঘটনাবহুল হাস্য-রসাত্মক চিত্র-কাহিনী 'বেকার নাশন' মুক্তি লাভ করবে। অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়ের জনপ্রিয় নাটক অবলম্বন ক'রে 'বেকার নাশন'-এর চিত্র-গাথা লেখা হয়েছে। ছবিখানির পরিচালনা ক'রেছেন প্রয়োগ-শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।...বর্ত্তমান ছবিখানির গল্পের সুরের সঙ্গে 'মানময়ী'র

অনেক মিল আছে। আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযতীন দাসের আলোক-চিত্র-গ্রহণ, শ্রীনৃপেন পাল এবং ভূপেন ঘোষের শব্দ-গ্রহণ এবং রাণীবালা, দেববালা, ছায়া, নরেশ মিত্র জহর গাঙ্গুলী, সুশীল রায় (এঃ), মৃণাল ঘোষ, মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু), তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির মত নট-নটীর অভিনয় যে কাহিনীর চরিত্রগুলির রূপে-রসে প্রাণবন্ত ক'রে তোলবার যে চেষ্টা করেছেন তাহা আশা করি সার্থকই হবে।

প্রফুল্ল রায়

পরিচালক প্রফুল্ল রায় সম্প্রতি ভারত-লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে তিন খানা ছবি তোলবার ভার পেয়েছেন এবং এই তিনখানা ছবির মধ্যে একটী ছবির উভয় সংস্করণ আর একটীর কেবল বাঙলা সংস্করণ। 'কলেজ কন্যা'ও পরিচালনা করবেন ইনি। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে চুক্তি শেষ হ'বার পর প্রফুল্লবাবুর এই নব নিয়োগে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অভিনয়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের ছবি 'অভিনয়' প্রায় শেষ হয়ে গেছে। গেল পরশু দিন 1st Class compartment-এর দৃশ্যটী তোলা হয়েছে। যতদূর ঠিক আছে ২০শে আগষ্ট 'রূপবাণী'তে এ ছবিখানি মুক্তি লাভ করবে।

ভ্যারাইটি ফিল্মস

উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্মকাল অত্যল্পকাল হইলেও এই প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য কর্ণধার নলিনীরঞ্জন বসুর সুনির্দ্দেশনায় ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। চিত্র সরবরাহ কার্য্যে নলিনীবাবুর দক্ষতা আজ চিত্রজগতে সুপরিচিত সেইজন্যই হরিপ্রিয় পাল তাঁহার পৌরাণিক চিত্র "হরিশ্চন্দ্র" পরিবেশনার ভার ভ্যারাইটি ফিল্মসের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই বৎসরের ভিতর এই প্রতিষ্ঠানটি দুইখানি বাঙলা চিত্র পরিবেশনার ভার পাইবেন। স্বাবলম্বী ও নিরহঙ্কারী নলিনী বাবুর আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

চিত্রা

সামনের শনিবার থেকে চিত্রায় দেবদত্ত ফিল্মস-এর 'গোরা'-তৃতীয় সপ্তাহে পড়বে। গত দুই সপ্তাহ ধরে 'গোরা' ছবিতে যে অদ্ভুত জনসমাগম হচ্ছে তাতে মনে হয় যে এ ছবি 'চিত্রায়' ছয়-সাত সপ্তাহ চললেও এর ভবিষ্যত খুবই আশাপ্রদ।

পূর্ণ থিয়েটার

বিদ্যাপতি তৃতীয় সপ্তাহে পড়বে। বিশপীর কবি বিদ্যাপতির জীবনী জানবার জন্যে আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে অপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় বাঙলা দেশ এখনও কবি বিদ্যাপতির প্রেমের ছন্দ নিজের বুকে করেই রেখেছে।

রূপবাণী

যাঁহারা অদ্যাবধি নিউ থিয়েটার্সের 'অভিজ্ঞান' চিত্রটি দেখেন নাই, অথবা আর একবার দেখিবার বাসনা আছে তাঁহারা যেন এই সপ্তাহে রূপবাণীতে আসিয়া ছবিটি দেখিয়া যান। অভিজ্ঞান রূপবাণীতে দশম ও শেষ সপ্তাহে পড়িল। 'আকাশ-পাতাল' নামে বাঙলা কার্টুন্ চিত্রটি এখনও এখানে দেখানো হইতেছে। এর পরেই এখানে 'অভিনয়' দেখান হ'বে।

১৮ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রূপবাণীতে সমস্তরাত্রিব্যাপী যে আয়োজন হইয়াছে তাহা সত্যই লোভনীয়।

প্রভাত সিনেমা

মিথ্যা জহর

আগামী শনিবার হইতে প্রভাত সিনেমার মিনার্ভা মুভিটোনের অনবদ্য সামাজিক চিত্র 'মিথ্যা জহর' দেখান হইবে। ছবিখানি চিত্র-জগতে যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিবে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই ছবিতে সোরাব মোদি ও নাসিম অভিনয় করেছেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষবাবু বোম্বেতে এই ছবিখানি দেখিয়া অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।

বিবিধ

কন্টিনেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক অফ এসিয়া

গত শনিবার কন্টিনেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক অফ এশিয়া-লিঃ এর হেড অফিসে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উপস্থিতির জন্য একটী Tea partyর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই partyতে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ভবানীপুর সমাজ

গত শনিবার, ২১শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ২৫-২, গিরিশ মুখার্জ্জি রোডে, ভবানীপুর 'সমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺উমানাথ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুতীথি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সভাপতি ছিলেন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ। সমাজের সভ্যগণ ৺দত্ত মহাশয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার পর ধীরেনবাবু একটি বক্তৃতা করেন। পরে সভা ভঙ্গ হয়।

"টেলিগ্রাফ ইনষ্টিট্যুট"

গত শুক্রবার, ২০শে শ্রাবণ সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে "টেলিগ্রাফ ইনষ্টিট্যুটের" সভ্যগণ পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক "অভিষেক" অভিনয় করেন।

অভিনয়ের পুরুষ ভূমিকাগুলোর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ে "চন্দনের" কথা—তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়। দশরথ, রাম, ভরত ও বশিষ্ঠের অভিনয়ও চলনসই কিন্তু জয়ন্ত, জাবালি ও গুহকের অভিনয় একেবারেই অচল।

স্ত্রী ভূমিকাগুলোর মধ্যে মন্থরার ও কৈকেয়ীর অভিনয় ভাল হয়েছিল। সীতার অভিনয় নিন্দনীয় নয়। উর্ম্মিলার অভিনয় দেখে আমাদের মনে হ'ল—পরিচালক মহাশয় "উর্ম্মিলাকে" নাটক হইতে বাদ দিলে ভাল করিতেন।

"গানের" কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—"বৈতালিকের" গান অতি সুন্দরভাবে বেসুরা হয়েছিল। চন্দনের গান শুনে আমরা কিছু আনন্দলাভ করিয়াছি।

ব্যর্থ প্রেম

হিল্লোল কুমার মিশ্রী-

আনমনে ঘুমিয়ে ছিনু—
প্রেমের বাগিচায়—
দোদুল দোলে লতা।
স্বপন মাঝে আপন হারা
কোন সুদূরে যায়—
বাস্তবের ওই ব্যথা!
চোদ্দ বছর বয়স যখন
সাতটী বছর আগে—
আঁখির কোনে নেশা—
ভালোবাসার পাইনি আভাস
দখিন বায়ুর ডাকে—
ফুলের গন্ধ মেশা!
তখন তুমি আপন হাতে
অস্ফুট সেই কলি—
ফুটিয়েছিলে জানি—
মোর হৃদয়ের প্রেমের পরাগ—
ভ্রমর সম ভুলি—
নিয়েছ বুকে টানি'!
পাগল করি' মরম আমার
আমাকে দিয়ে প্রিয়া—
খেলেছ কত খেলা!
দুলিয়ে দেছ জগত আমার
বুকের মাঝে নিয়া
সেই ছোট বেলা!
ঠোঁটেতে আমার একেছ' চুমু
বলেছ মোরে স্বামি—
কোমল বাহু দিয়ে—
বুকের মাঝে রাখিয়া মাথা
বলেছ ওগো আমি—
এখানে যেন মরি!
যৌবনের ওই গভীর ঘুমে
দীর্ঘ স্বপন খানি—
সাত বছরের নেশা—
জাগরণের কঠিন ঘায়ে—
মিলিয়ে গেল জানি—
গুড়িয়ে গেল আশা!
কেন কে জানে এক প্রভাতে
হঠাত জেগে দেখি
নাইকো তুমি পাশে—
পালিয়ে গেলে আমায় ছেড়ে
বাতাস মাঝে একি—
চুলের গন্ধ ভাসে!
বুকের মাঝে ঘনায় ব্যথা—
চক্ষু ভরে জলে—
শয়ন পানে চেয়ে—
তুমি যে নাই, আস্‌বেনা আর
বাতাস গেল বলে
কানন বীথি ছেয়ে!
অস্ফুট ওই কুঁড়ির বুকে
গন্ধ যতো ছিল—
নিয়েছ করে চুরী—
বুক ভরা মোর ভালোবাসা
আজকে আমায় দিল
বিষ মাখানো ছুরী।
নীরব আঁখি উদাস হয়ে
সুদূর পানে ধায়—
তোমার পিছে পিছে,—
নীরব ব্যথা সজীব হ'য়ে
আমার দিকে চায়—
বিশ্ব যে তাই মিছে!

জামাই

চট্টোপাধ্যায় ||

(এক)

ধীরেন ঘর-জামাই।

সেদিন সকালবেলা: বলি পুরুষ হয়েছিল কি করতে! আমার কাছে পয়সা চাইতে লজ্জা করে না? একটা আধলা যার রোজগার করবার মুরোদ্ নেই তার আবার বিয়ে করা কেন?—ঝাঝালো কণ্ঠে কথাগুলো বলে স্ত্রী সরমা প্রায় কেঁদেই ফেললো: আমারও যেমন পোড়া বরাত, পরেছি এমনি মিন্সের হাতে, কোথায় আমায় দু'পয়সা এনে দেবে—না, আমারি কাছে আসে হাত পাত্‌তে। মুখে আ—কান্নায় ও রাগে তার কথা বন্ধ হয়ে এলো।

মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে বাড়ীর গিন্নী—ওলো তোদের আবার সকালবেলাই কি হলো। নাঃ—আমি আর পারিনে বাপু। বস্‌নে বল্‌তে তিনি এগিয়ে এলেন ঘরের দিকে।

ধীরেন অনুপায় দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ীর বাইরে বেড়িয়ে গেল।

গিন্নি এলেন—কি, আরম্ভ করেছিস্ কি? খালি ঝগড়া, খালি ঝগড়া—লোকে শুনলেই বা বলবে কি বলতো। ছ্যা—ছ্যা—এক-মুহূর্ত্তও কি তোরা ঠিকভাবে থাকতে পারিস্ না।

সরমার মুখ ঝড়ের পূর্ব্বের প্রকৃতির মতো।

গিন্নি হাত নেড়ে বলে চলেছেন—আর জামাইও হয়েছে যেমন—হবে নাইবা কেন, কাজ কর্ম্ম তো নেই কিছু—শুধু বাইরে বাইরে আড্ডা দেওয়া আর ঘরে এসে তোর সঙ্গে ঝগড়া করা—কাজের মধ্যে তো দেখি এই—ছ্যা ছ্যা লোক হাসালি তোরা। বলি আজ আবার কি হয়েছিল? অতো চেচাচ্ছিলি কেন? কিলো কথার যে উত্তর দিচ্ছিস্ না বড়?

সরমা প্রস্তুত হয়েই ছিল:—উত্তর আর কি দে'বো। এর জন্ত দায়ী তো তোমরাই।

—দায়ী আমরা! তিনি যেন দশ হাত জলে নেবে গেলেন—সেকি তোরা করবি ঝগড়া আর আমরা হবো দায়ী!

—নিশ্চয়ই তোমরা দায়ী এর জন্যে। সরমা অল্প বয়সেই বুড়ি হয়েছে। আমায় এর চে' গঙ্গায় কেন ভাসিয়ে দিলে না—বিষ কেন খাওয়ালে না। সরমা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো: তা-ও যে আমার ভাল ছিল।

গিন্নির মুখে একটা ভয়ানক কঠিন উত্তর এসেছিল কিন্তু একমাত্র কন্যার কান্নায় কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ খেয়ে গেলেন, তার অবস্থা স্বাভাবিকতার চেয়েও সাত পরদা নেবে এলো। সেহ'ৎ অপরাধিনীর মতোই বলে উঠলেন—ওকি কথা মা—ওকি বলতে আছে। না—না ধীরেন একটু পাগ্‌লাটে ধরণের তাতো জানিই। আজ বুঝি আবার তবলার জন্যে বায়না ধরেছিল—একেবারে মাথা খারাপ তার। চোখ মুছে ফেল মা কাঁদতে আছে কি ইত্যাদি বলে তিনি মেয়েকে স্বান্তনা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

ধীরেন যদিও এই রকম বাণী শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছলো তবুও আজকের মত কান্নাকাটী হাঙ্গামা এতটা সে সত্যই আশা করেনি। শাশুড়ীর আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে এলো রাস্তায় এবং বেকারের একমাত্র বান্ধব চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

আজকে তার অপরাধ ঘুম থেকে উঠে সে স্ত্রীর কাছে দশ আনা পয়সা চেয়েছিল। আজ শনিবার, শুটুকে বলেছে যে আজ 'কুইক্ বয়' ঘোড়াটা উইন করবেই—তাই দশ আনা দিয়ে আজ তার সেই ঘোড়াটা ধরা চাই-ই। স্ত্রীর কাছে সে নিবেদন করলে: শুনছো?

—কি

—এই বলছিলাম কি যে.........আমার কালকে বিকেলে ভয়ানক পেট ব্যথা হয়েছিল তা ডাক্তারের কাছে গেছলাম সে বল্লে—দশ আনা লাগ্‌বে অসুধের দাম—তা তখন পয়সা হাতে ছিল না বলেই......আজ দাওনা, পয়সা কটা অসুধটা নিয়াসি।

—দ্যাখ। সরমা সব বোঝে। মিছে কথা বল না—কাল বিকেলে তোমার পেট ব্যথা হয়েছিল। কই এ পর্য্যন্ত ত কিছু বলোনি; রাত্তিরে আবার য-তা খেলেও। আর আজ সকাল অবধী রইলো তোমার পেট ব্যথা।

—মাইরী বলছি মিছে কথা নয়। ধীরেন থতোমতো খেয়ে বললে—সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু বলেছেন'—

—যে তোমার পেট ব্যথা। সরমা ক্ষেপে গেল। দ্যাখ ফের তুমি যদি মিছে কথা বল তো...'

—আ—হ্ বল্‌ছি মিছে কথা নয়। ধীরেন মিনতির স্বরে বললে মাইরী বলছি যে...

—নয় হলই তা বলে—সরমা আরম্ভ করলো। তারপর পূর্ব্বোক্ত চেচামেচি। শাশুড়ী আগমন, নিজের পলায়ন ইত্যাদি।

ধীরেনের যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সংসার বিষাক্ত বলে মনে হল। মেয়ে ছেলের কাছে এরকম

অপমান আর কদ্দিন সহ্য করা যায়। তার নিষ্প্রভ পুরুষত্বে আজ বড় ঘা লাগলো। না আর সে সহ্য করবে না এরকম অপমান, বিশেষত: মেয়ে ছেলের, তাও আবার নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে।

—কেবল বলে—'চাকরী কর' 'চাকরী কর'। আরে চাকরী কি আর মুখের কথা যে বললেই পাবে। তা চাকরী বা করতে যাবে কেন শুনি—শ্বশুরের তো এমন দুরবস্থা নয় যে জামাইর রোজগার না করলেই নয়। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা যার শুধু তেজারতিতেই খাটছে—তার একমাত্র জামাই চাকরী না করলে বুঝি স্ত্রী পুত্রের হাত ধরে একেবারে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে! হুঃ—কি কঞ্জুষ ঐ শ্বশুরটা, একটা পয়সা না যেন এক ফোঁটা গায়ের রক্ত।

ধীরেনের এসব একেবারেই ভাল লাগছিল না। ঐ তো মেয়ের রূপ টাকা দিলেও কেউ বিয়ে করতো না। উদ্ধার করে দিয়েছি কিনা—তাই আজ এ্যাতো তরফাণি। মনের ভেতর আজ অনেক কথাই ভেসে উঠতে লাগলো। এর একটা বিহিত সে করবেই এ রকমভাবে আর চলে না।

সেদিন কত করে বল্লে বিশেকে—দেনা ভাই তোদের অফিসে ঢুকিয়ে। ব্যাটা বলে কিনা—এক হাজার টাকা জমা দিতে হবে, তবে কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী।

আরে এক হাজার টাকাই যদি হাতে থাকবে তবে কি আর ঐ ছাইয়ের চাকরী সে করতে যাবে। তাহলে সে একটা সাইকেলের দোকান কিংবা চায়ের দোকান দিয়ে বসতো কিন্তু হাতে যে এক কানা কড়িও সম্বল নেই। শ্বশুর ইচ্ছে করলে কি আর পারে না? তা পারে কিন্তু সে তো দেবে না, ভাবে জামাই সব ফুঁকে দেবে।

সরমাকেও দোষ দেওয়া যায় না। এতোদিন তো সে দেয়েইছে কিছু কিছু ওর হাতখরচা কিন্তু সেদিন খুটকের জন্যই তো যতো ফ্যাসাদ হল। সে কিছুতেই খাবে না তবু খানা এক গেলাস। কিছু হবে না এতে। আজকের দিনে একটু খেতে হয়।

—না ভাই আমি খাবনা—মুখে ভারী গন্ধ থাকে। ধীরেন বলেছিল।

—আমি তার ব্যবস্থা করে দেবখন—ভয় কি।

নেহাৎ বন্ধুর উপরোধে ঢেঁকি গেলবার মতোই খেয়েছিল এক গেলাস। এতো করে মুসুর ডাল চিবিয়ে, জরদা দিয়ে পান খেয়েও বাড়ী ঢুকে সরমার কাছে ধরা পরে গেল।

—একি! তোমার মুখে গন্ধ কিসের। সরমা আৎকে উঠলো।

ধীরেনের বুকের ভেতর কোয়েটার ভূমিকম্প—গন্ধ! কই না গন্ধ—সত্যই বিশ্বাস করো ইত্যাদি আবোল তাবোল কি যে বলেছিল কিছুই মনে নেই।

চেতনা হয়েছিল সরমার ধাক্কায়—তুমি মদ্ খেয়েছ। আজ কাল এ্যাদ্দুর এগিয়েছো—এ্যা—তুমি—

ধীরেন ভীষণভাবে ঘাবড়ে গিয়ে সরমার হাত দুটো ধরে প্রথমে বলেছিল সত্যই খেয়েছি আমি, ইচ্ছে করে খাইনি। খাইয়ে দিয়েছে আমায় ঐ খু-খু-টুকে। তারপর প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বললে যা হয়ে গেছে ওদের যেন আর ব'লো না। জীবনে আমি ও জিনিষ কক্ষনো ছোঁব না। এই নাক্ মুল্‌ছি কাণ মুল্‌ছি।

সেই দিন থেকেই সমরা ওকে পয়সা দেয়না। বিশ্বাস করে না ওকে। নেহাৎ জলজ্যান্ত প্রমান না দিলে এক পয়সা ও বের ক'রে না।

সেই দিনের কথা মনে পরতেই আবার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে বড্ডো হতভাগা বলে মনে হলো। ইস্ স্ত্রীর কাছে নাক্ কান্ মুলতে হল। যে নাক কান মুলতে বলায় একদিন সে ইস্কুল থেকে লেখাপড়ায় খতম দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিল—তাই কিনা আজ একটা সামান্য মেয়েছেলের কাছে ছি-ছি ওর মনে হল নিজের স্ত্রীর কাছে বোধহয় এরকম অপমানিত ভূভারতে কোন লোক হয় নি।

ভাবতে ভাবতে চায়ের দোকানে কখন ঢকে পরেছে।

দলের সবাই-ই হাজীর। কেউ দোকানে বসবার যায়গা থাকতেও ফুটপাতে দাঁড়িয়ে-ই চা খাচ্ছে, কেউ বোধহয় ঘণ্টা দু'য়েক আগে চা খেয়ে সেই কোণে বসে ছোট একখানা বই নিয়ে দাগ কেটে চলেছে; মাঝে মাঝে হয়তো বা পাশের লোককে জিজ্ঞেস্ করছে—হ্যারে কেষ্টা লেস্‌লী ঘোড়াটা কেমনরে, উইনে না প্লেসে।

টেবিলের মাঝামাঝি কয়েকজনের ভেতর তুমুল তর্ক, সিনেমা অভিনেত্রী সমালোচনা নিয়ে। কেউবা খবরের কাগজের 'আইন আদালতের' পৃষ্ঠা খুলে মনোযোগ সহকারে পড়ছে।

ধীরেন এসে ঢুকলো।

—এই যে ম্যান দাও দিকিন্ পয়সা কটা। খুটুকে এককোনে বসে বই পড়ছিল ওকে দেখে বলে উঠলো।

—তোরাই ভাই আজ আমার টা দিয়ে দে।'—ধীরেনের মুখ ও আওয়াজ গম্ভীর।

—না বাবা। বিশে বল্লে। ওসব চলবে না—নগদা নগদি কারবার ধার কার চলবে নি। ফ্যালো দেখি চাঁদ ট্যাক্ থেকে।

—সত্যিই আমার কাছে নেই আজকে। ধীরেন বললে—আজ তোরা দিয়ে দে বললুম তো কালই দিয়ে যাব।

তাহলে বাবা হবে নি। বিশে গিয়ে আবার সস্থানে বসলো।

ধীরেন হাঁকলে—চা দিন একটু দে মশাই।

যে মশাই চা নিয়ে এলো :—পৌনে আট আনা হল আপনার, আর আমি ধার দিতে পারবো না।

চা বিস্বাদ হয়ে উঠলো ধীরেনের কাছে। সে চুপ করে রইলো। সুটকে ধীরেনের একটু বেশী অন্তরঙ্গ, কাছে এগিয়ে এলো—এমন ট্রীপটা মাটী কচ্ছো হে—শিওর উইন করবেই। দাও না থাকলে—

—নেই সত্যি বলছি

—না নেই বাবা। তোমার কাছে আবার পয়সা নেই।

—জানই তো ভাই চাকরী বাকরী করি না। বাড়ীতে আজ চেয়েও পেলাম না। হাতে থাকলে কি আর 'লস্' করি। দাও, একটা বিড়ি দাও।

দুজনেই বিড়ি ধরালো।

ধীরেনের বিয়ে হয়েছিল 'বাকদত্তা' হিসেবে। শাশুরী কবে নাইতে নাইতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন গঙ্গার ঘাটে ওর মা'র কাছে—দিদি তোমার ছেলের সঙ্গেই আমার মেয়ের বে' দ'বো। কিন্তু আসল কথাই এইটে নয়, সত্যি বল্‌তে কি সরমার রূপের বালাই নেই বললেই চলে। তাকে নিজেদের অবস্থানুযায়ী কেউ বিয়ে করতে তো রাজীই হ'তো না, হলেও বেশ মোটামুটী ঘুস্ নিয়ে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে ধীরেনের শ্বশুর একপয়সাতেই মরে বাঁচে তাই 'বাকদত্ত'-র উপর বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন তখন আর ভাববার অবসরই পেলেন না যে ধীরেনের তিনকুলে কেউ নেই। মা মারা যেতেই ধীরেন উঠলো এসে শ্বশুর গৃহে চিরস্থায়ী ভাবে। শ্বশুর ভাবলেন একটা লোকের খাওয়া খরচা আর এমন কী বেশী লাগবে। তবুও তিনি ভেবেছিলেন যে যদি জামাই রোজগার করে তাহলে তো কথাই নেই বাড়ী খরচাটাও তার উপর দিয়েই চলে যাবে। কিন্তু বেটাচ্ছেলে জামাই তো চাকরীর নামই করে না উলটে তার খরচা জোগাতে প্রাণান্ত। সামনাসামনি কিছু বলতে না পারলেও আকারে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন 'ওসব এখানে চলবে না বাপু'। ধীরেন নির্ব্বিকার ছিল এতোদিন কিন্তু আজকের ঘটনায় তার প্রাণে বড় লেগেছে।

দশ আনা পয়সার জন্ত এতো অপমান। এতোটাকা খাবে কে? দুটো নয় দশটা নয় একটা জামাই আর লোকটা এরকম করে। যেরকম বাপ সেরকম মেয়ে সেরকম মা, সবগুলোই সমান ধীরেন মনে মনে ভাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো তার বুক চিরে। হাতের পোড়া আধখানা বিড়ি ফেলে দিয়ে গুম্ হয়ে বসে রইলো।

—কি বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস যে বড়। সুটকে সমবেদনার সুরে জিজ্ঞেষ করলো—কি হল? পয়সা নেই বলে দুঃখু করচো? মাইরী আমার কাছেও নাই, থাকলে ঠিক দিয়ে দিতাম তোমার হয়ে। এতো পয়সাই গেল নেশা পত্রে উড়ে আর সামান্ত কয়েক আনা পয়সার জন্তে কি আমি পেছপা' হই। এই কালকে রাত্তিরে ভাই নেশায় একটু বেসামাল হয়ে পরেছিলাম—শালারা থানায় নিয়ে গেল। টাকা পাঁচেক গচ্চা দিয়ে এলাম। নাহলে কি আর ভাবনা কোরতাম রে ভাই।

'কেষ্ট বললে—চ' সুটকে একটু ফ্লাশ খেলিগে।

—চল্। সবাই উঠিল। ধীরেনও উঠলো ওদের সঙ্গে। যাবার সময় দে মশাই স্মরণ করিয়ে দিলো কাল আমার পয়সা ক'টা চাই ধীরেনবাবু?

—দুই—

ধীরেন বাড়ী এসে ঢুকলো বেলা দেড়-টায়। এক তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। সকাল বেলার ঝগড়া ক্রমে শ্বশুরের কানে উঠেছে। বাজে খরচার উপর তিনি ভয়ানক চটা, তাই তিনি রেগে গেছেন। এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে খুব এবং নিঃসন্দেহে প্রমান হয়েছে যে ধীরেন একটা প্রকাণ্ড রকমের কুষ্মাণ্ড. কিছু না বলতে বলতে যা-ইচ্ছে-তাই আরম্ভ করেছে। তাঁরা তাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হয়ে উঠলেন। বেকার বসে থাকলে এই অবস্থাই হয়। নাইবা রইলো তোর বিদ্যে—বিদ্যে ছাড়া কি আর লোকে রোজগার করে খাচ্ছে না? ঐতো পাকরাশী মশায়ের জামাই পেটে বোমা মারলে 'ক' বেড়োয়না সে পর্য্যন্ত আশি টাকা মাইনের চাকরী

করছে। আর তাদের জামাই হতভাগা বলে কিনা 'চাকরী অতো সহজ নয়'; 'লেখা পড়া না জান্‌লে পাওয়া অসম্ভব'। আরে মুর্খ বিদ্যেই যদি চাকরীর একমাত্র সম্বল হ'তো তাহলে আর এতো এম্. এ, বি, এ পাশকরে পৈ-পৈ করে ঘুড়ে বেড়াতো না। আজ আসুক একটা হেস্তনেস্থ করা দরকার। হোক না জামাই তা বলে তাকে পুজো করতে হবে নাকি? আমরা অকর্ম্মার ঢেঁকি! হুঃ। শ্বশুর রেগে গেছেন ভীষণ।

সরমা খুসী হয়েছে এ ঘটনায়, সত্যিই এতো বাড়াবাড়ি আর ভাল লাগছিল না। উঃ মদ অবধী ধরেছে। যদিও সে কথা বাপ-মার কানে তোলেনি কিন্তু দরকার হলে তুলবে বৈকি! এখনই এই, হাতে পয়সা-হলে হয়তো পড়ে মাতাল হয়ে সম্পত্তিকে সম্পত্তিই উড়িয়ে দেবে, তখন সে ছেলে-পেলে নিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? আসুক না আজ মজাটা টের পাবে খন।

একে সবাই রেগে আছেন তার উপর দেড়টার সময় সে বাড়ী ঢুকলো এসে। খানিকটা বা ভয়ে ভয়েই। এতো যে দেরী হয়ে যাবে সে ভাবে নাই। জুয়ার আড্ডায় বসলে কিছুই আর খেয়াল থাকে না। বাড়ী গেলে হয়ত......।

ধীরেনের মন্‌টা দমে গেল কিন্তু আবার রক্ত গরম হয়ে উঠলো: ভয়টা কিসের? স্ত্রীর কাছে ভয় হুঃ, এ্যাদ্দিন যা হয়েছে হয়েছে আর নয়। যতোই ভয় করা যায় ততোই ভয়। 'আরে বাবা যতোই হোক না, আমি ছাড়া তো গত্যন্তর নাই' ধীরেন নিজের মনে সাহস আনবার চেষ্টা করে ঘরে এসে ঢুকলো। সামনেই সরমা। মুখ দেখেই ওর সাহস অর্দ্ধেক উড়ে গেল। বুক ঢিব্ ঢিব্।

সরমা খাপ্ পেতেই ছিল—দ্রুত এগিয়ে এসে চীৎকার করে বললে—

কোন চুলো থেকে আসা হচ্ছে শুনি? সেখানে খাওয়া দাওয়া মিললো না?

ধীরেনের দেহে প্রাণ নেই। জোড় করে সাহস এনে গম্ভীর স্বরে বললে—কেন তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকী?

—নিশ্চয়ই দিতে হবে, একশোবার দিতে হবে। সরমা কাঁপতে লাগলো।

কতো বড় স্পর্দ্ধা! কক্ষনো না। যেখানে ইচ্ছে যাব, যেখানে ইচ্ছে আমার। আমি তোমার চাকর নই। খবরদার তুমি আ—গলা ভয়েই হোক আর রাগেই হোক শুকিয়ে গেল।

—কি! যেখানে ইচ্ছে যাবে। তাহলে সরমা বাইরের দিকে হাত দেখিয়ে তেমনি-ভাবেই বললে—তাহলে যাও সেইখানেই যাও। এ বাড়ীতে তোমার আর আসতে হবে না—যাও।

ধীরেনের কথা শুনে চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল।

—আচ্ছা যাচ্ছি সেইখানেই যাচ্ছি। এ ছাড়াও আমার থাক্‌বার অনেক যায়গাই আছে জেন? বলে ধীরেন ঠিক সেই অবস্থায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

দুঃখে ও রাগে তার চোখে জল এলো। ওখানে তো বলে এলো যায়গা আছে কিন্তু......হ্যা সুটকের কাছে যাওয়া যাক্। কেন সে এক লাথি মেরে বেরিয়ে এলো না সরমাকে। এখন তার মনে হল বাইরে এসে—কেন সে নিরবে সহ্য করে এলো এ অপমান। সরমাইতো জিতলো। সে নিজে তো হেরে বেরিয়ে এলো।

সুটকে সবে গঙ্গাস্নান করে চন্দনচর্চ্চিত কপালে হোটেলের দিকে চলেছে—পথেই ধীরেন কাঁদ কাঁদ অবস্থায়......।'

—কি—রে আবার ফিরে এলি যে—

ধীরেনের গলা কান্নায় জড়ানো কোন মতে শ্বশুরের নামে দোষটা চাপিয়ে কাহিনীটা বলে গেল। তারপর বললে—তুই যদি তোর সঙ্গে আমায় হোটেলে খেতে আর বাড়ীতে থাকতে না দিস তো আমি বিষ খেয়ে মরবো।

বেশীদিনকার কথা নয় একবার সুটকে ওর শ্বশুরের কাছে ধারের জন্ত গেছলো—তা—ধীরেনের শ্বশুর—৬০৲ টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে টাকায় ছয়পয়সা সুদে নগদ চল্লিশ টাকা দিয়েছিল। তারপর দিলে—একটু দেরী হয়ে গেছলো বলে বেটা কিনা নালিশ করে, সুটকের মালপত্তর ক্রোক্ দিতে এসেছিল। উঃ কি বদমাইস—তাই সুটকের রাগ ভীষণ শ্বশুরের উপরে। সে বল্লে—কিছু মনে করনা মাইরী, তোমার শ্বশুর ব্যাটা বড্ডো পাজী লোকটার অতো টাকা খাবে কে। মাইরী এ কি ব্যবহার বল দিকিনি। আমার অতো টাকা থাকলে দশ বিশটা লোককে নিয়ে সারা জীবন স্ফুর্ত্তি করিয়ে কাটাতে দিতুম।

তারপর কি খানিকটা আলাপ হ[illegible] চলতে চলতে তা সব অবশ্য শোনা গে[illegible] না। শুধু ধীরেনের অসহায় ও ভীত কণ্ঠ স্বর শোনা গেল—কিন্তু ভাই তা যদি ন[illegible] করে তবে?

—আরে বাবা বাছাধনকে করতেই হবে সুটকের উৎসাহ শোনা গেল। —ত[illegible] কিন্তু ঐ কথা রইল কেমন?

ধীরেন ঘাড় নাড়লো।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী

অরুণ রবির তরুণালোকের মত,
ফুটাও তুমি কমল যত,
তেমনি করে ফুটাও প্রভু, আমার প্রাণে,
জ্ঞানের কমল শত শত।

নিয়তির পরিহাস

শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অলকা তেমনি কাতর স্বরে বললে—"না, না, অতটার প্রয়োজন হবে না ; চলো আমরা পালিয়ে যাই কোন দূর দেশে।"

সমীর দুঃখের হাসি হেসে বল্লে—"তা সম্ভব হবে না! পালিয়ে আমরা কতদিন থাকবো! একদিন তো ধরা পড়তে হবে। আর শুধু জীবনের জন্তে এত বড় নীচ কাজ করবো?"

হতাশ হ'য়ে অলকা বললে—"তবে?"

সমীর বল্লে—"ভয় পেয়েও না অলকা, তুমি যদি অমন অস্থির হও তবে আমারও যে ভয় পায়! রাজপুতেরা যখন যুদ্ধে যাবার আগে এমনি ভাবে তাদের প্রিয় সঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আসতো, তখন সঙ্গিনী কি ক'রতো জানো? সে ভয় পেতো না! সে নিজের মনে গৌরব অনুভব ক'রতো। গর্ব্বের সঙ্গে বলতো—'তুমি বীর, যুদ্ধে যাও ; ভগবান করুণ যুদ্ধে জয় হ'ক।' তারপর ললাটে এঁকে দিতো বিজয়ের দীপ্ত রেখা। তারপর বীর যদি ফিরে আসতো, কোন এক শুভলগ্নে তাদের মিলন হ'তো। যদি বীর ফিরে না আসতো, সঙ্গিনী বেছে নিতো আপনার পথ। তাই বলি অলকা তুমি আমায় উৎসাহিত করো ; বলো—যেন আমি যুদ্ধ থেকে আবার ফিরে আসতে পারি।"

অলকা সমীরকে উৎসাহিত ক'রে বল্লে—"তবে তাই হ'ক, তুমি যুদ্ধে জয় লাভ করো, যুদ্ধ থেকে আবার ফিরে এসো ; ফিরে এলে.........।

পরদিন প্রভাতে সমীর বিদায় নিতে এসে বললে—"কি করবো নিয়তির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।"

মুখ দিয়ে কথা বেরুল না কারুরই, অশ্রু হ'লো তাদের বিদায় বাণী।

বিদায় নিল—ভবিষ্যৎ মিলনের কল্পনায়।

নিয়তি গেল পালিয়ে তাদের মধ্যে বিরহের তীব্র দাবানল জ্বালিয়ে দিয়ে।

একা পড়ে রইলো অলকা—অতীতের স্মৃতিটুকু বুকে নিয়ে।

দিন যায়—।

ক্রমে বছর কেটে যায়—।

আজও যুদ্ধের অবসান হ'লো না ; পৃথিবীর বহুস্থান ব্যাপী যুদ্ধ, শীঘ্র অবসান হওয়া বড় শক্ত। যুদ্ধের খবর পাওয়া যায় পত্রিকায়। হতা-হতের সংখ্যা দেখে অলকা কেঁপে ওঠে। যদি এর মধ্যে সমীর থাকে, তবে? অলকা আর ভাবতে পারে না,—অশ্রুর বাণ ডেকে ওঠে—।

একদিন শুনলে অলকা—সমীর একটি ছোট্ট সেনা দলের সেনাপতি হ'য়েছে।

অলকার মনে আনন্দ হ'লো—গর্ব্বও হ'লো ; কিন্তু তা প্রকাশ পেলো না!

একদিন একটা চিঠি এলো অলকার, সমীরের লেখা দুটো কথা—"অলকা আমি বেঁচে আছি ; শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবারও আশা করি। সাবধানে থেকো, কবে ফিরবো জানি না। —ভালবাসা নিও।"

এমন চিঠি দু'তিন বার এলো ; অলকা দিতে পারে না তার উত্তর, কারণ সমীরের অবস্থানের স্থিরতা নেই।

অলকা দুঃখ করে।—

একদিন প্রভাতেই যুদ্ধের অবসানের খবর প্রচারিত হ'লো। অলকার বড় আনন্দ হ'লো এবার ফিরে আসবে তার সমীর।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এলো সকলেই, কিন্তু এলোনা কেবল সমীর। সাতদিন কেটে গেল সমীর তবু এলো না। সে কি তবে নেই? অলকার পায়ের তলায় ভূমি কেঁপে উঠলো—।

এমন সময় চিঠি এলো—"অলকা আমি এখন পাটনার এক হাঁসপাতালে। যুদ্ধ থেকে বেঁচেছি। শত্রু আমায় মারতে পারেনি, কিন্তু নিয়তি আমায় মেরেছে। আমি আর বাঁচবো না। কি রোগ হ'য়েছে আমায় জানি না। আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। তবে তুমি যদি পারো তো একবার এসো ; কেমন করে আসবে জানি না! আর লিখতে পারি না, বড় কষ্ট হয়।"

অলকার বুক দুলে উঠলো ; ভেবে পায় না কি করবে। পাটনায় যাওয়া অলকার পক্ষে অসম্ভব।

তবুও ভাবে অলকা, এখন অসম্ভবকেও সম্ভব করতে হবে। অনেকবার সে পাটনায় গিয়েছিল কিছু কিছু মনে পড়ে।

পরদিন রাত্রের অন্ধকারে একলা বেরিয়ে পড়লো—সমীরের সাথে মিলবার আশায়।

গভীর প্রেমের তীব্র শক্তি তাকে পৌঁছেদিল পাটনায়। খোঁজ নিয়ে উপস্থিত হ'লো হাঁসপাতালে।

কিন্তু সেখানে সমীরের খোঁজ পেলো না ; বল্লে—"দু'দিন আগে চ'লে গেছে।"

—"দুদিন আগে!"

—"চ'লে গেছে!"

—"কিন্তু, কোথায় চ'লে গেছে?"

—কে-উ-জা-নে না।

আঘাত পেয়ে ফিরে এলো অলকা।

সহরের মধ্যে খুঁজে বেড়ায় সমীরকে।

কিন্তু তার দেখা সে পায় না।

সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার তখন ঘিরে ফেলেছে গঙ্গানদীর কোলগুলিকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবই চাঁদের নম্র আলোকে।

অলকা পাগলিনীর মত ছুটে ছুটে বেড়ায়। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা "অলকা" নামটি আঘাত দিল' অলকার কাণে।

অলকার বুক দুলে উঠলো; এ স্বর যে তার বড় পরিচিত!—বড় প্রিয়—বড় আদরের! কে ডাকে! সমীর! সমীর।

আবার সেই প্রিয় ডাক—"অলকা"!—আবার—আবার।

দূর থেকে নিয়তি অল্প হেসে অলকাকে পৌঁছেদিল সমীরের কাছে।

অলকা দেখলে ওর মুখ দিয়ে ঘন ঘন রক্ত উঠছে।—"তুমি,—তুমি এসেছো অলকা! এসো কাছে এসোত আরও কাছে এসো; তুমি কেমন ক'রে এলে আমার জানবার অবসর নেই অলকা। অলকা আমি আর—"

বাধা দিয়ে অলকা ব'ল্লে—"ওগো, আমার উপর তোমার এ অভিমান করবার মত দোষ তো আমি করিনি, তবে তুমি কেন এ অভিমান ক'রলে! আমি যে—".

কথা কেড়ে নিয়ে সমীর কাতর স্বরে ব'ল্লে—"অভিমান নয় অলকা—অভিমান নয়। এ কেবল নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তা যাক অলকা, তা যাক্ আর আমার সময় নেই। শুধু অলকা একবার বল—আমি মরে গেলে, তুমি—অলকা তুমি ঠিক আজকের মতই ভালবাসবে! এ জীবনে তোমায় আমায় মিলন হ'লো না। কেন হবে অলকা, কেন হবে? জানো না! পূর্ব্বজন্মে আমার সাধনা অসমাপ্ত র'য়ে গেছে। তা যাক্ অলকা—তা যাক্। সাধনার বাকীটুকু এ জীবনে সমাপ্ত ক'রে গেলাম; বলো—বলো অলকা পরজন্মে এমনি ভাবে তুমি আমায় ভালবাসবে!—তখন আর ভয় থাকবে না অলকা! মিলন হবে নিশ্চয়। —উঃ, কোমর থেকে খুলে নাও অলকা পিস্তলটা। পারোতো আমার নাম ক'রে থানায় জমা দিও; অলকা—অলকা তোমার হাত খানা দাও।

একটা দমকা হাওয়া ব'য়ে গেল তাদের ওপর দিয়ে। সমীরের শীতল হাতখানা লুটিয়ে প'ড়লো মাটিতে।

কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অলকা কাতর স্বরে ব'ল্লে শুধু একটি উত্তর পাবার আশায়—"ওগো, ঐ দেখো চাঁদ উঠছে। চলো সেই দেশে, যে দেশে পাখী ছাড়া আর কারুরই চিহ্ন পাওয়া যাবে না; যেখানে কেবল ব'য়ে যাবে নদী—, ব'য়ে যাবে বাতাস—, আর তাদের সঙ্গে ব'য়ে যাবে আমাদের সুখের দিনগুলা। নীল আকাশের তলে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দেবো আমাদের জীবন তরী; কিনারার কথা ভাববো না; যদি তরী ডুবে যায় মাঝে—" অলকা থেমে যায়। পাষাণ দেহটাকে নাড়া দিয়ে তেমনি কাতর স্বরে অলকা আবার ব'ললে—"ওগো, তুমি—তুমি চলে গেল আমায় ছেড়ে! একটু দাঁড়াও আমিও যাবো তোমার সঙ্গে! মনে পড়ে নিয়তির কথা? —সে বড় নিষ্ঠুর কিনা তাই সে মনে করে আমি তাকে ভয় ক'রবো; কিন্তু জানে না যে আমি মৃত্যুকে আর ভয় করি না। মৃত্যুর জন্যে আমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি!—কিন্তু তুমি দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও—!"

এক ঝলক্ তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে প'ড়লো অলকার গাল বেয়ে। সমীরের পাষাণ পায়ে এঁকে দিল একটি শিথিল চুম্বন রেখা—।

সমীরের কোমর থেকে খুলে নিল পিস্তলটা। নিমেষের মধ্যে পিস্তল গর্জ্জন ক'রে উঠলো। অলকার প্রাণহীন দেহখানা লুটিয়ে পড়লো সমীরের পাষাণ দেহটার উপর।

তখন একখণ্ড কালো মেঘ ঢেকে ফেলেছে চাঁদকে......। পিস্তলের শব্দ তখনও দিগন্ত ভেদ ক'রে ছুটে চলেছিল......। গভীর অন্ধকার তখন ধরণীর কোলে পা দিয়েছে......। কেউ ছিল না সেখানে......।

শুধু নিয়তি এক অট্টহাসি হেসে পালিয়ে গেল।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—ত্রিশ—
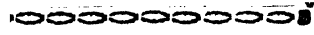
দ্বারবানদের চীৎকার ও হট্টগোলে দিলীপ বাবু, শুভ্রা ও সমর চকমিলান দালানের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমর চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই রামসিং, এতনা চুল্লত কেঁও মাফাতে হো? বাবু বুলাতে হেঁ, জলদী আও।

রামসিং তাহার বিশাল বপু ও গালপাট্টা দাড়ী লইয়া দালানের মধ্যে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল ও অর্দ্ধ হিন্দি অর্দ্ধ বাংলায় বলিল, "হামি কি করবে হুজুর, একঠো বুড়া আকে উপরমে যানে মাংলে—হামি বারণ করলে তা শুনলে না; বোলে দিদি-বাবুকা ছেলিয়া আছে।"

দিলীপবাবু বলিলেন, "ও বুড্ডা হ্যায় কাঁহা?"

রামসিং বলিল, হুজুর হামি বল্লে কি হামারা দিদিবাবুকী উমর চৌবিশসে জ্যাদা নেহি আর তুমহি শালা বুড্ডা আছে তো সেলিয়া কৈসে হোবে।"

শুভ্রা পিতাকে অনুরোধ করিল সে যেই হোক তাহাকে মা বলিয়া যখন পরিচয় দিয়াছে সে নিশ্চয়ই তাহার সহিত দেখা করিবে। দিলীপবাবু কন্যার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দ্বারবানকে আদেশ করিলেন—"এই বুড্ঢাকো উপরমে লে আও।" বাবুর আদেশ শুনিয়া রামসিং রাইচরণকে খাতির করিয়া বলিল—চলিয়ে জী উপরমে; আপকা নানা সাহাব বুলাতে হে। রাইচরণ তাহার সহিত উপরে উঠিল।

সমর ও শুভ্রা উভয়েই রাইচরণকে চিনিল। রাইচরণ সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া শুভ্রার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র শুভ্রা বলিল, "এসো বাবা রাইচরণ, ভাল আছ তো?"

রাইচরণ ভাবিল শুভ্রা সর্ব্বজ্ঞ, সে বিস্ময় বিমুগ্ধনেত্রে শুভ্রার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার নাম জানলে কি করে মা?"

শুভ্রা পুনরায় বলিল, "বাবুর শরীর ভাল তো? তোমাদের সেই রঘুনাথ খানসামাটার হাতে বাবু খেতে ভাল বাসতেন না রাইচরণ?

রাইচরণ আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাকে ম্যানেজার বাবু জবাব দিয়ে দিয়েছে মা। তার জন্তে ডাক্তার বাবু বড় চটেছেন মাঠান।

শুভ্রা বলিল, "তা কত খানসামা হোটেলে আসে যায়,—তা ছেলেটা বেশ ভাল ছিল কি বল রাইচরণ।

রাইচরণ বলিল, "কি জানি মাঠান ডাক্তারবাবুর তাকি বড় ভাল লেগেছিল সে চলি যাওয়ার পরে কণা মা নিজ হাতে কত রাধি দেয় কিন্তু বাবুর মনে ধরেনা। আজ কদিন ডাক্তারবাবু কণা মার সঙ্গে বড় বকাবকি করতিছে কণা মা কেবলই কাঁদে। আমি মনে করেছিনু যে সেই রঘুনাথ ছোড়াটার জন্তে বাবু রাগ করে। তারপর মা আজ গেনু তোমাদের বাড়ীতে ছুটী নেবার তরে। সেথায় গিয়ে শুনলাম তুমি নাকি বাড়ী যাবি না। মাগো যত দোষ সব তোমার এই বুড়ো ছেলের। আমি মনে করেছিনু যে কণা মা বুঝি ডাক্তার বাবুর বৌ, তাই তার অসুখে তোমার পায়ে ধরি আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে গিয়েছিনু সেই ডাইনী মেয়েটার কাছে। আজ অমল বাবু আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলে। আমার উপর দয়া করি ঘরে ফিরি চল মা। আমি তোমার পথের কাঁটা নিজহাতে সরায়ে দিব।"

দিলীপবাবু ও শুভ্রা একত্রে বলিয়া উঠিলেন, "সেকি কথা রাইচরণ?

রাইচরণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়াছিল, সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হ্যাঁ মা আমি নিজহাতে কণামাকে খুন করবো আর তা যদি না করি অমলবাবুর ছুরির ঘায়ে মরতে হবে তাকে। আজ দু'বছর যার কাছে রয়েছি আমি। তায়েই আমার মা—মেয়ে বলি ঠিক করি নিয়েছি—আর কারও ছুরির ঘায়ে মাকে মরতে দেবো আমি। তা দেখতে পারবনি আমি। সে তোমার সুখের বাসায় আগুন লাগিয়েছে; তার সাজা হওয়া উচিত। তাই আমি ঠিক করেছি তাকে মেরে নিজেও ফাঁসি যাব। তোমার পথের কাঁটা দূর করে আমরা মা বেটায় ওপরের রাজ্যিতে যেতে চাই।" বৃদ্ধ নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

দিলীপবাবু রাইচরণকে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, ওরকম কথা মনে করাও পাপ। প্রত্যেক মানুষ ভগবানের অংশ। তার প্রাণনাশের কল্পনাও মহাপাপ। শুভ্রা কদিনের জন্য আমার কাছে বেড়াতে আর জিরুতে এসেছে। অরুণের বাড়ীতে যাবে বৈকি ফিরে। তোমরা আশীর্ব্বাদ করো জন্মে জন্মে যেন ওই ঘরই করে সে।"

শুভ্রা বলিল—"তুমি ভেবনা রাইচরণ, আমি নিশ্চয়ই যাব সেখানে কয়েকদিন পরে। কিন্তু একটা কথার উত্তর দাও তো? তুমি বল্লে যে কণাকে মরতে হবে অমলের ছুড়িতে—কেন রাইচরণ অমল কি জানতে পেরেছে যে উনি আর কণা ঐ হোটেলে থাকেন?

রাইচরণ বলিল, না মা, আমার মনে হয় এখনও জানতি পারিনি তিনি। আজ অমলবাবু আমায় বল্‌ছিল কণা মার ঠিকানা বলে দিতে। তিনি জানতি পরাছেন যে মা আমার ডাক্তারবাবুর কাছেই আছেন।"

শুভ্রা বলিল "রাইচরণ তুমি আমায় মা বলেছ। মার কাছে ছেলে এলে তো মা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়না, তোমায় দিন কয়েক আমার এখানে আমার ছেলের মতই থাকতে হবে বাবা।"

রাইচরণ মাথা চুলকাইয়া বলিল, "কিন্তু মা রাত্রে কণা মাকে আগ্‌লাবে কে?"

উত্তরে শুভ্রা রাইচরণকে বুঝাইল সে যখন বাটী নাই বাবু রাত্রিতে হোটেলেই কাটাইবেন। রাইচরণ কয়েক দিনের জন্য দিলীপবাবুর বাটীতে থাকিতে সম্মত হইল।

অপর একখানি ঘরে প্রবেশ করিয়া সমর শুভ্রাকে বলিল, "দেখ দিদি, গোড়ায় ভেবেছিলাম যে ব্যাপারটায় মোটেই উত্তেজনা নেই। এখন দেখছি রোমান্স আর থি্‌লে ভরা; কেবল এডভেঞ্চারটাই বাকী।

হাসিয়া শুভ্রা বলিল, "আমি মরে গেলে এই ঘটনাটাকে নিয়ে তুই একটা বই লিখে ফেলিস সমু।"

সমর এই কথাটায় মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া বলিল, "না, তোর সঙ্গে আর কথা বলবোনা দিদি।"

সমরের ভাব দেখিয়া শুভ্রা বলিল, "না ভাই, রাগ করিস্‌না। তুই বাবাকে ডেকে আন্‌ আজকের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলি।"

দিলিপবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলে শুভ্রা ব্যাকুলভাবে বলিল, "আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে বাবা, সত্যই যদি অমল ওদের খোজ পায় তবে একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব নয়।

দিলিপবাবুও চিন্তিত হইয়া বলিলেন, "তাইত মা, একটা ভাবনার বিষয় হয়ে উঠলো। এসব ব্যাপারে ওরকম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।"

সমর বলিল, "মামাবাবু ট্রেনথেকে পড়ে অমলবাবুর আবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। একথা দিদিও জানে। জামাই বাবু ও কণাকে একত্র দেখলে তার আবার মাথা খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। বিকৃত-মস্তিস্ক লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস অমলবাবু যদি তাদের একত্র দেখতে পায় তাহলে যে দুজনের একজনকেও জীবিত রাখবেনা।"

শুভ্রা কাতর কণ্ঠে বলিল, "তবে কি হবে বাবা, তুমিও ত আমায় হোটেলে যেতে বারণ করে দিয়েছ। যদি এমনই একটা বিপদ এসে উপস্থিত হয়—সমু ছেলেমানুষ, সে কি ওকে বাঁচাতে পারবে। ওঁর যদি কিছু হয় একটা দিনও বাঁচবনা আমি।

সমর বলিল, "আমি ছেলেমানুষ? আমি কি চিরকালই ছেলেমানুষ থাকব নাকি দিদি। পরে নিজের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় বলিল, "দেখছিস আমার গোঁফদাড়ি উঠেছে। আমি বলে, একজন পাশকরা গ্রেজুয়েট। চিরকালই আমি ছেলেমানুষ থাকব? আমি মামার পায়ে হাতদিয়ে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি আমার চোখের সামনে কেউ অরুণবাবুর কোন ক্ষতি করতে পারবে না—আমার জীবন থাকতে নয়—" এই বলিয়া সমর মাতুলের পদস্পর্শ করিল।

দিলীপবাবু বলিলেন, "সমরের কথার উপর আমার বিশ্বাস আছে শুভ্রা, তুমি ভয় পেওনা। রাইচরণ যদি অমলকে ঠিকানা বলে না দেয় তা হলে আমলের পক্ষে ওদের সন্ধান পাওয়াও দুষ্কর।"

শুভ্রা বলিল, তা হলে আদর যত্নে ভুলিয়ে রাইচরণকে আটকে রাখতে হবে আমাদের।"

দিলীপবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" তৎপরে তিনজনে নিজ নিজ কক্ষে গিয়া ভ্রমণের বেশ পরিধান করিলেন। শুভ্রা পূর্ব্ববৎ ব্রীচেস, সার্ট, বুট প্রভৃতি পরিধান করিয়া কিশোররূপ ধারণ করিল। সন্ধ্যা সমাগমে তিনজনেই বাহির হইলেন। শুভ্রা ও সমর তাহাদের মোটর বাইকে আগে চলিল—দিলীপবাবু তাহার সানবীম গাড়ীতে তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন। হোটেলের দ্বারে উপস্থিত হইয়া শুভ্রা দিলীপবাবুর গাড়ীতে চলিয়া গেল। সমর গেল তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য পালন করিতে হোটেলের ম্যানেজারের কক্ষে।

গাড়ীতে বসিয়া পিতাপুত্রী কলিকাতার সন্ধ্যার শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুইদিকের রাজপথের বিদ্যুত বাতিগুলি জ্বলিয়া উঠিল—নবীন প্রেমিক, প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী, বৃদ্ধ ও পৌত্রগণপূর্ণ শত শত বিবিধ রংয়ের মোটর গাড়ী বিবিধ সুরের বাঁশী বাজাইয়া বিদ্যুতবেগে ছুটীতে লাগিল। সিনেমা গুলিতে নানাবর্ণের রঙীণ আলো জ্বলিয়া উঠিল। রেডিওতে কোন এক সুকণ্ঠির কণ্ঠস্বর ভাসিয়া উঠিল।

"বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত লোচনে
করোনা বিড়ম্বিত তারে।"

কয়েকজন কাগজের ফুলওয়ালা গাড়ীর নিকটে আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, ফুল নিবেন হুজুর—দশ পোয়সা দরজন।"

সম্মুখস্থ নিউ সিনেমায় লাউড স্পীকার হইতে উচ্চ কনসার্ট ধ্বনিতে বহুজাতীয় নাগরিক সেখানে ভিড় জমাইয়া ফেলিয়াছে। হ্যাপি বয়, ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম হকারগণ "আইসক্রীম হ্যাপি বয়—" ইত্যাদি নানাবিধ বিকৃত সুরের আওয়াজে কনসার্টের সুরের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতেছিল। প্রতি পাঁচ মিনিট টাং টাং শব্দ করিয়া যাত্রীপূর্ণ ট্রাম কারগুলি সদর্পে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে বহু রঙীণ বস্ত্র পরিহিতা বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গি তরুণী তরলমতি যুবকদের গাড়ী চাপা পড়িবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। কিয়ৎ দূরে সেলুনদের

দ্রব্য সহিত একটী দোকানে কয়েকজন হিন্দুস্থানী ঘণ্টা নাড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "লিয়ে যান বাবু ছে ছে আনা —ছে, ছে, আনা।"

শুভ্রার কোন দিকেই লক্ষ্য ছিল না সে এক মনে দেখিতেছিল অরুণ কোন গাড়ী হইতে হোটেলে আসিতেছে কিনা। এইরূপে রাত্রি ৮॥০টা বাজিল। দিলীপবাবুর বসিয়া থাকিতে থাকিতে বিরক্তি আসিতেছিল।

সহসা উভয়ে দেখিলেন যে অরুণ ও তাহার বন্ধু অমল একখানা বিরাট বিউক গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। অজ্ঞাতভয়ে দিলীপবাবু ও শুভ্রার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

শুভ্রা বলিল, "যে ভয় করেছিলাম তাই হোল। তোমার পায়ে পড়ি বাবা আমায় যেতে দাও হোটেলে। আমার মন বলছে ওর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। নিজের প্রাণ দিয়েও আজ ওকে বাচাতে হবে আমার।"

শুভ্রার ব্যাকুলতা দেখিয়া দিলীপবাবু বলিলেন "তুমি ক্ষান্ত হও মা, আমি নিজে যাচ্ছি। অরুণের কোন বিপদ হবে না। তুমি শান্ত হয়ে বসো গাড়ীতে। দিলীপবাবু হোটেলে প্রবেশ করিলেন। শুভ্রা সেই গাড়ীর মধ্যে বসিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিণীর ন্যায় আশঙ্কায় ও অভিমানে ফুলিতে লাগিল।

—একত্রিশ—

মানুষ যাহা মনে করে সব সময়েই তাহা সত্য হয় না। এই অনিত্য পৃথিবীতে মিথ্যার পশ্চাতে মানুষ ঘুরিতে থাকে। অবশেষে এমন একদিন আসে মানুষ যখন সত্যের সন্ধান পায় তখন তাহার দেহ হয়ত অশক্ত, মন হয়ত অবসন্ন। জরা-ব্যাধি তখন তাহার যৌবনকে গ্রাস করিয়াছে অথবা মনের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

কণা আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে অরুণকে ভালবাসিয়া সে কত বড় অন্যায় করিয়াছে সে যাহাকে গত একবৎসর জীবনে সবটুকু ভালবাসা দিয়া পূজা করিয়াছে যাহার চরণে তাহার জীবন যৌবন ইহকাল পরকাল সবই ডালি দিয়াছে সে মুখে তাহাকে যতই বলুকনা যে সে তাহার প্রণয়ের মর্য্যাদা রাখিতে জানে বস্তুতঃ সে তাহার প্রণয়ের সম্মান রাখিতে পারে নাই। সে হয়ত তাহার প্রণয়ের মর্য্যাদা রাখিবার মিথ্যা মোহে তাহার নিরপরাধিণী সতী স্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে তাহার জীবনের শান্তি-তরী বিষাদসাগরে ডুবিতে বসিয়াছে; জগতের জুয়াখেলায় অরুণ আজ সর্ব্বস্বান্ত—সর্ব্বহারা। কণা ভাবিল অরুণের এই শোচনীয় অবস্থা তাহারই জন্য হইয়াছে। সে নিজকে বাঁচাইবার জন্য দুইটী মহিমাময় জীবনকে মরণের পথে টানিয়া আনিয়াছে—তাহাদের জীবনে কণা আসিয়াছিল সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের মত, বন্যার মত, প্রলয়ের ভূমিকম্পের মত বিভীষিকাময়ী রূপ লইয়া।

কণার জীবনে উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে, আঘাতে কণা ঈশ্বরকে নিজের পরমবৈরী মনে করিত। বারংবার ইচ্ছা হইলেও সে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিত। আজ আর সে নিজকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে অশ্রুসিক্তনেত্রে করজোড়ে ভূমিতে বসিয়া পড়িল ও বলিতে লাগিল, "ওগো প্রভু, আমাদের দেহমনের অলক্ষ্যে কোন অজানা রাজ্যে বসে আছ তুমি, তা আমি জানি না—তুমি চিরনিদ্রিত কি চির-জাগ্রত তাও বুঝতে পারিনা। তোমার তৈরী এই শান্তিময়ী পৃথিবীতে আমায় তুমি সৃষ্টি করেছিলে চির অশান্তি ভোগ কর্ত্তে; তার জন্যে তোমায় দোষী করছিনা দেব।—যদি মানুষের মনের বেদনা বুঝবার ক্ষমতা থাকে, যদি তার ভাষা শুনবার কান ও প্রাণ থাকে তোমার—ওগো দয়াময়, ওগো অনাথের নাথ, ওগো ঈশ্বরের ঈশ্বর শুধু এইটুকু করো আমার জীবনের বিনিময়ে যাদের ভালবাসতাম আমি সব চেয়ে বেশী, তাদের হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়ে দিও—তাদের মিলন চিরন্তনী করো, তাদের তুমি সুখী করো।"

কণা আবার বহুক্ষণ কাঁদিল—কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল মেঝের উপরেই নিতান্ত অবসন্নভাবে। বৈকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সারাদিনের অনাহারে কণার দেহ দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল, তথাপি সে উঠিল—স্নান করিল—একটী চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরিধান করিয়া ললাটে একটী সুবৃহত সিন্দুর বিন্দু আঁকিয়া দিল। তৎপরে হোটেলের এক চাপরাসীকে ডাকাইয়া দুই টাকা তাহার হস্তে দিয়া ফুলের মালা ও ফুল আনিতে আদেশ করিল।

সে এইবার আলমারী হইতে তাহার মৃতভ্রাতার ছবিখানি বাহির করিয়া আপনার সমস্ত শক্তি দিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার অশ্রুর উৎস আজ আর কোন বাধাই মানিল না। সে সেই চিত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা, যাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পারতে না, আজ তাকে ভুলে কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ? একদিনও কি বুঝতে পারনা কি দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয় আমাকে?"

কণা কাঁদিতেছিল এমন সময় চাপরাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া ফুলের মালা ও বিবিধ রকমের ফুল রাখিয়া চলিয়া গেল। কণা তাহার ভ্রাতার ফটোটীকে বিবিধ পুষ্পে মনোরমভাবে সাজাইল ও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল পরলোকে সে যেন তাহার ভ্রাতার শ্রীচরণপ্রান্তে পৌছিতে পারে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম রেখাকে গ্রাস করিল। হোটেলের কক্ষগুলিতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বহু তরুণ-তরুণীর কণ্ঠস্বরে হোটেলের বিরাট সৌধ মুখরিত হইয়া উঠিল। হোটেলের ম্যানেজারের কক্ষে পুনঃ পুনঃ টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতে লাগিল—চাপরাসী ও বয়গণ খাদ্য-দ্রব্য ও রঙ্গীন পানীয় লইয়া ছুটোছুটি করিতে লাগিল। হোটেলের দ্বারে একটীর পর একটী মোটর আসিয়া থামিতে লাগিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেলের ডাইনিং টেবিলগুলি বিবিধ জাতির তরুণ-তরুণীতে পূর্ণ হইয়া গেল।

হোটেলের সকলেই ব্যস্ত—সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত—সমস্ত গৃহটী আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু কণা আপনার কক্ষের বাতিটী পর্য্যন্ত জ্বালিল না। সে সেই কক্ষের অন্ধকারে বসিয়া আপনার অভিশপ্ত জীবনের অতীত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। সে তাহার জীবনের যবনিকা নিজ হস্তেই আজ টানিয়া দিবে এ বিষয়ে সে তাহার চিত্ত স্থির করিয়াছে। অরুণ চলিয়া গেলে সে একাকিনী এই হোটেল ত্যাগ করিবে এবং গভীর রাত্রিতে ভাগীরথীর শীতল বক্ষে আশ্রয় গ্রহন করিবে এই তাহার কল্পনা।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজিলে কণা উঠিয়া বাতি জ্বালিল ও একটী কাগজে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সাহেবের নামে পত্র লিখিল—

"মাননীয় মহাশয়,

আমার জীবনে বিতৃষ্ণা ধরিয়াছে। এই জীবনের বিগত বিশ বৎসর আমি শুধু সাংসারিক আবর্ত্তনে পড়িয়া মৃতকল্প হইয়াছি তাই আজ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম। আমার মৃত্যুর জন্য কেহ দায়ী নহেন বা কোন বিষয়ে কাহারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। ইতি

তারিখ) কণা দেবী'
৮-১১-১৩৪০ রুম নং ৫২
......হোটেল"

আরও একখানি পত্র অরুণের নামে লিখিয়া অশ্রুজলে সে খামখানিকে সিক্ত করিয়া বন্ধ করিল। পুনরায় সে সুইচ টিপিয়া ঘরের আলোটী নিভাইয়া বাতায়নের পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইল। রাত্রি সাড়ে আটটায় অরুণ ও অমল তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরুণ বাহির হইতে ডাকিল, "রাইচরণ, রাইচরণ?" ভিতর হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অরুণ ডাকিল, "কণা" তথাপি কোন উত্তর নাই। অরুণ অমলকে বাহিরে থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিল। অরুণ দেখিল কণা প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বাতায়ন প্রান্তে দাড়াইয়া শুক্লা একাদশীর চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার জ্ঞান বা সংজ্ঞা আছে বলিয়া অরুণের মনে হইল না। সে তাহার নিকটে গিয়া স্কন্ধে দুইটী হাত রাখিল ও সপ্রেম কণ্ঠে ডাকিল, "কণা।" কণার চমক ভাঙ্গিল, সে অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া তাহার অবনত মস্তকটী অরুণের চরণপ্রান্তে নত করিয়া বসিয়া পড়িল। তৎপরে কহিল, "আমার জীবনের শেষ সাধ রাখতে হবে তোমায়, তুমি ঐখানে একটু বসো।" অরুণ উপবেশন করিলে কণা একরাশি ফুল আনিয়া অরুণের পদপ্রান্তে পূজারিনীর ন্যায় অঞ্জলি দিল। অতঃপর সে মালাটী হাতে লইয়া বলিল, "এই আমার জীবনের শেষ পূজা।" এমন সময়ে নিতান্ত পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল, "কণা।" কণা ফিরিয়া দেখিল মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাড়াইয়া রহিয়াছে তাহারই পূর্ব্ব প্রণয়ী অমল।

কণা বিস্ময়ে, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পদতল হইতে পৃথিবী যেন প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া চলিল। তাহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গেল—অমল কণার নিকটে আসিয়া কণাকে ধরিয়া ফেলিল বটে কিন্তু কণা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাহার পদতলে বসিয়া পড়িল।

অমল শান্ত ও সরলকণ্ঠে বলিল, "আমি জানি কণা আমার অত্যাচারে ও অবিচারে তুমি এতখানি নীচে নেমে এসেছ। তোমার এ পাপের জন্য দোষী তুমি নও—এর জন্যে দোষী আমি। আমার পাপের শাস্তি ভগবান আমায় দিয়াছেন কণা এবং গত কয় বৎসর ধরে আমি প্রায়শ্চিত্তই করছি। আজ আমি এসেছি তোমায় শাস্তি দিতে নয়, অভিযোগ জানাতে নয়, কঠোরতা দেখাতে নয়, আজ আমি তোমায় ফিরিয়ে নিতে চাই—আমার রক্ষিতা হিসাবে নয় আমার আশ্রিতা হিসাবে নয়—আমার জীবনের সঙ্গিনীরূপে, আমার সহধর্ম্মিনীরূপে—আমার ধর্ম্মপত্নীরূপে—আমারই বাড়ীতে আমারই মা বাবার চরণ-প্রান্তে—আমার সমাজে।"

কণা কিছুই বলিল না; তাহার মস্তকটী ঠিক অমলের দুই পায়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। অরুণ বুঝিল কণা অমলের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কণার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। অরুণের তাহা দেখিবার কি ভাবিবার মস্তিষ্ক ছিল না। সে সন্তর্পণে পিছু হাটিয়া হোটেলের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং উন্মাদের ন্যায় নীচে নামিয়া আসিয়া তাহার গাড়ীর সম্মুখে দাড়াইল ও সোফারকে নামিতে ইঙ্গিত করিল। সোফার গাড়ী হইতে নামিয়া আসিলে অরুণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল গাড়ীতে কয় গ্যালন পেট্রল আছে। সোফার তাহাকে জানাইল কমপক্ষে আট গ্যালন হইবে। অরুণ তাহাকে বাটী যাইবার আদেশ করিয়া স্বয়ং গাড়ীর ড্রাইভিং সীটে উঠিয়া বসিল ও সেল্‌ফ ষ্টার্টার টিপিয়া ধরিল।

শুভ্রা পিতার গাড়ীতে বসিয়া সকলই দেখিতেছিল। অরুণকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল অরুণের মানসিক অবস্থার বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সেও পিতার গাড়ী হইতে নামিয়া সমরের মোটর সাইকেলে উঠিয়া বসিল এবং অরুণের গাড়ীর পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করিল। শুভ্রা এই সময় একবারও কল্পনা করিতে পারে নাই এখনই তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বহুদূরের যাত্রী হইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বিদায়-স্মৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আজি প্রিয়া! সেদিনের কথা পড়ে ম'নে;
সে দিনের সে আসন্ন বিদায়ের ক্ষণে—
ডাগর ও আখি দুটি অশ্রু ছল ছল।
তোমার মুখের কথা কোথায় লুকাল
নাহি জানি; শুধু মোর বক্ষে মাথা রেখে,
"যেতে নাহি দিব," নয়নে নিষেধ এঁকে
জানালে আমায়। তোমার ও আঁখি দুটি,
আমারে নিঃশেষ কোরে নিতেছিল লুটি—
শুধু ক্ষণে ক্ষণে। গলায় দুলিতেছিল
ও বাহুর মালা। কি জানি কে কোরে দিল
কণ্ঠ রুদ্ধ মোর, বলিতে নারিনু কিছু,
ব'ক্ষে বেঁধে তোরে, নয়ন করিয়া নীচু
অশ্রু নিনু চাপি। আসিল বিদায় ক্ষণ;
বক্ষ উঠে দুলি, শুধু হু হু করে মন।
তোমারে যাইতে হবে ছাড়ি ওগো প্রিয়া
এই কথা স্মরি, উঠে হৃদি উদ্বেলিয়া।
তোমার বাহুর মালা ছিঁড়ে দিনু যবে—
পরাণ উঠিল মোর কাঁদি হাহারবে
শত শত বিরহীর আর্ত্তনাদ সম।
তবুও রহিনু চুপে, ওগো! অনুপম!
বিদায় চাহিতে হ'ল তবু হাসি মুখে।
তুমি প্রিয়া কেঁদে সারা, আমি ল'য়ে বুকে
তোর ওই অশ্রু ভরা রাঙা মুখখানি;
বলিনু স্বান্তনা ছলে, কেন কাঁদ রাণি!
আবার আসিব ফিরে, পুনঃ আলিঙ্গনে
বাঁধিব কোমল হিয়া নিবিড় বন্ধনে।

* * *

আজি প্রিয়া! কথা কও! চাহ মুখ ফিরে!
নিরবে ছাড়িয়া দিলে। আমি ধীরে ধীরে
বাহিরি আসিনু পথে। "নাহি দিব যেতে"
শুধু এই কথা কানে লাগিল বাজিতে!

রেকর্ড সমালোচন

—এডিসন—

ঝুমুরাঙ্গ—গান গীতি-কবিতায় দুর্ব্বোধ্যতা—সেনোলা ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সমালোচনা

আমরা আগষ্ট মাসে প্রকাশিত কয়েকখানি রেকর্ডের সমালোচনা প্রকাশিত করিলাম। কলম্বিয়া কোম্পানীর এবার চারখানি রেকর্ড সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই চারখানি ও সেনোলার দুইখানি রেকর্ড সমালোচিত হইল। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এ বিভাগ আমরা নিয়মিত চালাইবার চেষ্টা করিব। আশা করি সাধারণ পাঠকবর্গ ও গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় আমাদের এ বিভাগ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

কলম্বিয়া জি, ই,—২৪৭৫—এই রেকর্ডখানিতে নবাগত শিল্পী শ্রীপাঁচুগোপাল বসু আবহ-সঙ্গীত সহযোগে দুইখানি কাব্যসঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। গায়কের গলা আড়ষ্ট, রেকর্ডে প্রকাশের যোগ্য কি না সংশয় আছে,—গানের সুর বৈশিষ্ট্যহীন। একদিকে 'আসিলে কোন্ প্রভাতে মোর প্রাণে' গানখানির মাঝে 'তবু পেয়েছি বারতা'র পর তিনি যে তান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা তান পদবাচ্য তো নহেই, বরং হাস্যকর। অন্যদিকে 'চলিতে চলিতে পথে মরমে বাজে' গানখানিও শ্রুতিকটু।

কলম্বিয়া জি, ই,—২৪৭২:—শিল্পী শ্রীমতী মণিমালা সুউচ্চকণ্ঠে সহগামী সঙ্গীতের সহিত এই রেকর্ডখানিতে 'আমি জলের ছলে পরাণ-বন্ধু' ও 'আমার মন মানে না যে' এই প্রথম পঙক্তি বিশিষ্ট দুইখানি ঝুমুরাঙ্গ গান গাহিয়াছেন। সুরদাতা গোকুল মুখার্জ্জি ঝুমুর গানের উপর ভিত্তি করিয়া ঝুমুরাঙ্গ নামে যে সুরের জগাখিচুড়ী কলম্বিয়া কোম্পানীর তালিকায় বিতরণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রোতাসাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধ[া] হইয়াছে, কারণ মাত্র নগদ দুইটাকা চা[র] আনাতেই গ্রাম্য, নৃত্য প্রভৃতি সকল রক[ম] সুরের বৈচিত্র্য, ঘুঙুর, একতারা প্রভৃতি যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্র, জমজমাট সহগামী সঙ্গী[ত] ও ততোধিক ভয়ানক চীৎকার প্রাপ্তব্য। রেকর্ডটি থামিলে মনে হইবে শ্রোতা বাজা[র] হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। যাহ[া] হউক তাহার উপর শ্রীশ্রী৺রাধাকৃষ্ণের চির পরিচিত প্রেম-লীলাকে কেন্দ্র করিয়া গান[ ] রচিত হওয়ায় সকলরূপ রুচি-সম্পন্ন শ্রোতা[র] পক্ষে রেকর্ডটি পছন্দ হওয়াই তো উচিত[;] অন্যথা কোম্পানী আর কি করিতে পারেন!

কলম্বিয়া জি, ই,—২৪৭৩:—শ্রীহেম[ন্ত] কুমার মুখার্জ্জি 'দেবতা ফিরিয়া চাও' [ও] 'তোমারে চাহিয়া প্রিয়' এই আধুনিক গা[ন] দুইখানি এই রেকর্ডে পরিবেশন করিয়াছেন[।] গান দুইখানি সুর-বৈচিত্র্যহীন,—সুর-হী[ন] বলিলেও চলে, কারণ যেটুকু সুর পাওয়া গে[ল] সেটুকু যথার্থ সঙ্গীতের সুর বলিলে অন্যা[য়] হইবে। প্রথম গানখানির গোড়ার দি[কে] 'তোমার আশায়' এই স্থলে শিল্পীর ক[ণ্ঠ] শ্রোতার আশাভঙ্গ করিয়া সেই যে গাড়াই[তে] লাগিল তাহার বিরতি রেকর্ডে[র] পরিসমাপ্তিতে। অতঃপর গানের রচনা

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে হাসি-কান্নায় ভরা অপরূপ বাংলা বাণী-চিত্র——

প্রয়োগ-শিল্পী :

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র-শিল্পী :

যতীন দাস

শব্দ-যন্ত্রী :

নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ.

ভূমিকায় : রাণীবালা, দেববালা, ছায়া, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, সুনীল রায় (এঃ), মৃণাল ঘোষ, মন্মথ পাল (হাঁদুবাবু), কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে

১৩ই আগষ্ট উত্তরা-য় প্রথমারম্ভ

N. I. P.

কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল, কারণ আজকালকার বাঙলা গানের অর্থের তো কোন বালাই নাই, শুধু গুটিকতক মনোহারী লাগসৈ কথা সাজান হইলেই—ব্যাস,—ইঁহারও দ্বিতীয় গানখানিতে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মাঝের চার পঙক্তি—

"ভেবেছিনু তুমি ফুল
সহসা ভাঙ্গিল ভুল
মায়ার স্বপন তুমি
হল না তোমারে পাওয়া॥"

ইহার অসংলগ্নতায় আমাদের এই বলিতে হয় যে অর্থহীন প্রলাপ সকলের পছন্দ নাও হইতে পারে।

কলম্বিয়া জি, ই, ২৪৭৪ :—এই রেকর্ডে নবীনা গায়িকা কুমারী তরুণপ্রভা সিংহরায় 'এইতো আমার জয়' ও 'তোমার যাবার কালে' এই দুইখানি আধুনিক গান গাহিয়াছেন। গান দুইখানির সুর একঘেয়ে এবং আধুনিক গানের কোন মাধুর্য্যই কুমারী তরুণপ্রভার কণ্ঠে পাওয়া যায় নাই। তাহার উপর দ্বিতীয় গানের চার পঙ্ক্তি লক্ষ্য করুন,

"যেথা খেলে বনছায়া
আজো সেথা তব মায়া
ছলছল চাওয়া তব
বরষার জোছনায়।"

ইহার মধ্যে 'বরষার জোছনায়' পদার্থটি যে কি, তাহা বলা কঠিন। তবে আমাদের মনে হয় 'জোছনা' স্থলে কোন বিদ্যুৎবাচক শব্দ হইবে, তবে মিলের তাড়নায় অজ্ঞাত গীতিকার 'ক্ষণপ্রভায়' শব্দের গাম্ভীর্য্যে ও ছন্দপতনের আশঙ্কায় 'জোছনা'র শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহাই হউক অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক আধুনিক গান 'জোছনাতেই কাটিয়া যাইবে।

মেগোফোন কিউ, এন,—৩২২ :—শ্রীমতী নীলিমা ব্যানার্জ্জি (রাণীবালা) এই রেকর্ডে 'কত পূজা হ'ল সারা' এবং 'আমার দীপ নিভিল ঐ' এই দুইখানি আধুনিক গান বিতরণ করিয়াছেন। সুর-সংযোজনার দোষে গান দুইখানি শ্রুতিসুখকর হয় নাই। গান দুইখানির রচয়িতা খ্যাতনামা তরুণ গীতিকবি শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য কিন্তু অবশেষে তাঁহার রচনাও সাধারণ দোষে দুষ্ট হইয়া দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় গানখানির এক অংশ,

"সাধ ছিল মোর সন্ধ্যাতীরে
লতার মত রইবো ঘিরে,
এ সাধ কবে সফল হবে
তারি আশে রই।"

'সন্ধ্যাতীর' কোন স্থল যেখানে, অথবা কেন্ দ্রব্য যাহাকে 'লতার মত ঘিরে' থাকিবার প্রয়োজন হয় আমরা বুঝিতে পারি নাই।

মেগোফোন কিউ, এন,—৩২৩ :—তরুণ গায়ক শ্রীজটাধর পাইন এই রেকর্ডে দুইখানি শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়াছেন। একদিকে 'কালী মায়ের কালি দিয়ে' ও অন্যদিকে 'সবাই তোরে জবায় পূজে' রেকর্ড করা হইয়াছে। 'সবাই তোরে জবায় পূজে' গানখানি যেরূপ ওস্তাদীভাবে আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ হইল, ভেবেছিলাম শিল্পী বোধহয় উচ্চশ্রেণীর কিছু দান করিবেন; হায়, হায়, মনের আশা মনেই রহিয়া গেল, সেই গতানুগতিক ভাবেই একঘেয়ে গান চলিল। সুর-সংযোজক শ্রীসুরনাথ মজুমদারএর নামই রহিয়া গেল, নামের প্রভাব আর গানে বিস্তৃত হইল না।

গান

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আমি তোমারি গান গাইবে বন্ধু
তোমারি গান গাই।
আমার একতারাতে তোমার নামের
সুর মিলায়ে যাই॥
তোমার ভমরা কালো নয়ন দু'টি,
প্রাণ মুকুরে ওঠে ফুটি;
তোমার মধু পরশ সুধা,
আমার প্রাণে পাই॥
আমি তোমারি গান গাই॥
সূর্য্যি যখন অস্তাচলে,
ক্লান্ত হয়ে পড়ে ঢলে,
প্রাণের গাঙে গানের তরী
ভাসিয়ে দিয়ে যাই॥
আমি তোমারি গান গাই।

শ্রীশনি গুপ্ত

আবার নভারো

বহুদিন পরে আবার র‍্যমান নভারো! এবার ওর নতুন ছবি হবে, 'এ্যাজ ইউ আর'। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কোন নাম করা অভিনেত্রীকে নভারো আর ওর প্রণয়িণী সাজতে দেবে না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, নভারোর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় (!) করবার জন্যে হলিউডের প্রত্যেক খ্যাতনামা নটীই বিশেষভাবে লালায়িত। আমার মনে হয়, সেইটুকুই তারা জীবনের পরম সম্পদ ও সৌভাগ্য বলে মনে করে। কিন্তু নভারো অবলীলা-

র‍্যমান নোভারো

ক্রমে এই রূপসীদের সাকুনয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে—না, যাকে তাকে এ সুযোগ দিতে আর ও রাজি নয়।

এ সৌভাগ্য সুযোগ ঘটেছে ওদের তুলনায় একটি অখ্যাতনামা মেয়ের অদৃষ্টে। 'এ্যাজ ইউ আর'এ নভারোর নায়িকা হবে 'মার্গারেট ট্যালিসেট'। নাম শুনেছেন এর?···যশস্বী তারকা না হলেও শ্রীমতী ট্যালিসেট রূপালী পর্দ্দায় ইতিপূর্ব্বে দু একবার আত্মপ্রকাশ করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন ওকে 'এ ষ্টার ইজ বর্ণ' ছবিতে। তবে নায়িকার অংশাভিনয় ওর ভাগ্যে এই প্রথম।

অবশ্য, মেয়েটীর এ সৌভাগ্যের জন্যে অনেকখানি দায়ী সুপ্রসিদ্ধা তারকা ক্যারল লম্বার্ড। শ্রীমতী লম্বার্ডই মার্গারেট ট্যালিসেট'কে আবিষ্কার করেছিল—একটা টাইপ রাইটের পিছন থেকে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। নভারোর নতুন ছবিতে একটী উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণা হবে মেরিয়ন মার্শ।

হঠযোগী নভারো

সাগরপারে হুলুস্থূল কাণ্ড। র‍্যমান নভারো নাকি হঠযোগ অভ্যাস করছে। ইতি মধ্যেই চারদিকে কাণাকাণি সুরু হয়ে গিয়েছে: হঠযোগী নভারো! হঠযোগী নভারো !!···

প্রাণপণ মাথা নেড়েও নভারো গুজবটাকে উড়িয়ে দিতে পারে না। বেচারা বারবার বলে: না, না, আমি হঠযোগী নই;—হঠযোগের খানকতক বই পড়লেই হঠযোগী হওয়া যায় না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। যথাপূর্ব্বং তথা পরম্!···

অগত্যা নিরুপায় নভারো কাগজে এক বিবৃতি প্রকাশ করেছে: একদিন এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে মত প্রকাশ করলেন আমাকে যেন খুব স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন আজকাল আমি কি কি বই পড়াশুনো করছি। অন্য অন্য বইগুলির মধ্যে আমি হঠযোগ সম্বন্ধেও কতকগুলো বইয়ের নাম করেছিলাম। তাকে ভাল করে বুঝিয়েও দিয়েছিলাম যে, 'যোগ' মানে প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব-সাধনা, হঠযোগের বিষয় হলো নিজের মনকে সংযমী ও উন্নত করে তোলবার উপায় সমূহ। এর মধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্মের কোন কথাই নেই।

কিন্তু সেদিনকার এই কথাটাই যে আমার পক্ষে এতবড় দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো।

রজার্স ও ষ্টুয়ার্ট

উচ্ছ্বসিত যৌবনের লীলা তরঙ্গে দুলে দুলে চলে রূপসী জিঞ্জার রজার্স। 'রজার্স এ্যাষ্টেয়ার্স টিম' ভেঙ্গে যাওয়ায় ওর তত ক্ষতি হয় নি যতটা না এ্যাষ্টেয়ার্সের হয়েছে। বস্তুতঃ উক্ত টিমে রজার্স ও এ্যাষ্টেয়ার্সের সম্বন্ধ যে কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হবার তা' কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি; ওরা দুজনে দুজনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে

জিঞ্জার রোজার্স

জড়িত ছিল যে রজার্সকে মনে পড়লেই ভেসে উঠতো এ্যাস্টেয়ারের ছবি, আবার এ্যাস্টেয়ারকে ভাবলেই মনে পড়তো জিঞ্জার রজার্স। এদের একজনকে বাদ দিয়ে অন্য যে চিত্রজগতে টিকে থাকতে পারে এ ছিলো সকলের ধারণার অতীত। কিন্তু আজ এত বড় দুর্ঘটনায় (যদিও এটা অনেকদিনের কথা) রজার্স একটুও বিচলিত হয়নি, সেই চকিত চঞ্চল রূপসী তরুণী আজও তেমনি।

মার্লে ওবরণ

আজ জিঞ্জার রজার্স একাই দর্শকদের কাছে একটা অতি বড় বিশিষ্ট আকর্ষণ, ওর জনপ্রিয়তা আজ আর কাউকে গ্রাহ্য করে না।

রজার্সের নতুন নায়ক জেমস ষ্টুয়ার্ট। ওদের দুজনকে একত্রে দেখা যাবে 'ভিভিসস্ লেডী' নামক নবতম বাণী চিত্রে। নায়িকা জিঞ্জার রজার্স, নায়ক জেমস্ ষ্টুয়ার্ট। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ডগলস ফেয়ার ব্যাঙ্কস (ছোট)।

আজব বীমা

ইয়াট ক্লাবের সভ্য চারজন সম্প্রতি এক অদ্ভুত সর্ত্তে জীবন বীমা করেছে।

মরিন ও সুলিভ্যান

বীমার সর্ত্ত এই যে, আর্টিষ্টস এণ্ড মডেল এ্যাব্রড' ছবি শেষ হবার আগে যদি তাদের চারজনের যে কোনও একজনের মৃত্যু হয় বা সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, তবে অন্য তিনজনের প্রত্যেককে ৫০০০ পাউণ্ড বা প্রায় ৭৫০০০৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হবে।

কিম্বি কার্ণ (সর্দ্দার) বিলিম্যান, জর্জ্জ কেলী ও চার্লি এ্যাডলার—এই চারজন সভ্যই একবাক্যে বলেছে: আজ আট বছর আমরা একসঙ্গে আছি। আমাদের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য উপস্থিত হয়নি।

গ্রেটা গার্বো

বাণী চিত্রে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

স্যামুয়েল গোল্ডুইনের নবতম ছায়াচিত্র 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড'। ছবিখানা আগাগোড়া বিলাতের সুবিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিসের কীর্ত্তিকলাপে ভরা। গোল্ডুইন স্থির করেছেন, সুপ্রসিদ্ধ বাণীচিত্র 'ডার্ক এ্যাঞ্জেল'এর খ্যাতনামা তারকাত্রয় ফ্রেডরিক মার্শ, মার্লে ওবেরণ, হার্বার্ট মার্শালকে আলোচ্য ছবির তিনটী বিশিষ্ট অংশে নিযুক্ত করবেন। কল্পনা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা 'রোয়ান'এর ভূমিকায় অভিনয় করবেন ফ্রেডরিক মার্শ, ডিউক অব ওয়েলিংটন' রূপে হার্বার্ট মার্শাল, লেডী মেলবোর্ণরূপে মার্লে ওবেরণ।

খুচরো খবর

ছ হপ্তা পুরো বিশ্রামের পর মেরিয়ন ও' সুলিভান ফিরে আসছে জনি উইসমুলারের কাছে। পুরোদমে চলছে ওদের ছবির কাজ। টারজনকে আপনার মনে আছে তো?

* * *

রহস্যময়ী গার্বোর নূতন ছবি 'নিনোচ্কা'। শ্রীমতীকে দেখা যাবে রাশ্যার একজন দুর্দ্ধর্ষ কমিউনিষ্টরূপে।

* * *

গেলবারে একটী মেয়ের অদ্ভুত তারকা-প্রীতির কথা বলেছিলাম, এবারে আর একটী মেয়ের সন্ধান দিচ্ছি। ১৪৯৫ খানা ছবি ওর প্রিয় তারকা শার্লী টেম্পলের জমিয়েছে ও। অবশ্য এটী আগের মত তত চমকপ্রদ নয়, কিন্তু ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রশংসাধ্য নয় কি?

শনির 'বাণু' সজনী দাস

কথায় আছে—"কালে বাণুও পণ্ডিত হবে।"—কথা ফলিয়াছে। সেই ভবিষ্যৎ কাল' আজ আসিয়াছে! শনির 'বাণু' সজনী সত্যই 'পণ্ডিত' বনিয়াছে! মুর্গী-মূর্ত্তি মাথায় করিয়া আঁস্তাকুড় খুঁটিতে খুঁটিতে সহসা সে গোবেষণার মাঠে দেখা দিয়াছে! বিশ্বাস না হয়, ১৩৪৩ সালের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' প্রকাশিত তাহার বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান' নামক প্রবন্ধ সকলে পাঠ করুন! উহা পড়িলেই, আমাদের বিশ্বাস, ৺ঠাকুরদাস বাবুর লিখিত সেই—"চৌর্য্য-শিল্পে"র কথা অনেকের মনে পড়িবে!

* * *

শনির 'বাণু' সজনীবাবু 'পরিষৎ-পত্রিকা'র বুকে "বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধানে"র যে আবিষ্কার-কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া বিবৃত করিয়াছেন, তাহার এক-স্থানে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ২০এ মার্চ্চ তারিখের Calcutta-Chronicle'এ প্রকাশিত এই বাঙ্গালা-বিজ্ঞাপনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—"ইংরাজ এবং বাঙ্গালি লোকের লিখিবার কারণ এক বহি অতি শিঘ্র ছাপাখানায় তৈয়ার হইবেক সাহেবলোকে বাঙ্গালা কথা লিখিবেক এবং বাঙ্গালিলোকে ইংরাজি কথা লিখিবেক অত-এব সকল লোকের কেফাএত কারণ এই বহি তৈয়ার করা জাইতেছে জে জে লোকে চাহে তাহারা মেং আব্জন (Mr. Upjohn) সাহেবের ছাপাখানায় আসিয়া লইবেক ইতি সন ১৭৯২ ইংরাজী তারিখ ১৯ মার্চ্চ সন ১১৯৮ বাঙলা তারিখ ৯ চৈত্র।"—কিন্তু প্রায় চৌদ্দবৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ, ১৩২৯ সালের ভাদ্রমাসের 'নারায়ণ'-পত্রে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় "ইয়ং-বেঙ্গল ও বাঙ্গালা অনুবাদ-সাহিত্য" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহার মধ্যে অবিকল ঐ বিজ্ঞাপনটিকে সকলে দেখিতে পাইবেন। অথচ মজা এই যে, 'বাণুর লেখায় 'নারায়ণ' পত্রের নাম-গন্ধ নাই। পাছে লোকে তাহার এই 'আবিষ্কার'কে (?) আন্‌কোরা না বলে, এই ভয়েই বেচারা উহা চাপিয়া গিয়াছে! সুতরাং 'বাণু' পণ্ডিত হয় নাই, এ কথা কে বলিবে?

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়েও বড় এই 'আবিষ্কারে'র জন্ত পরিষদ্-মন্দিরে অনেক ঢাক-ঢোল অবশ্য বেজনেরা বাজাইয়াছে! বাজাইবারই কথা। কারণ, চৌর্য্য-শিল্পের ইহাও একটা অঙ্গ। ঢাক-ঢোলের আওয়াজে অনেক সময় 'নকল' চলিয়া যায়, 'আসল' চাপা পড়ে। ঠাকুর-দাস বাবু লিখিয়াছিলেন,—"চৌর্য্য-শিল্পের সৌন্দর্য্যের তারতম্য কার্য্য-কৌশলানুসারেই হয়, দ্রব্যভেদে নয়।......বেজা ডোম অপর লোকের বাগান ও বাড়ী হইতে ডাবটা-আমটা আর কলাটা-কচুটা, থালা-খানা-কাঁসিখানা চুরি করিয়া হাটে-বাজারে বেচে; কিছু কিছু পয়সা পায়; উদরে দু'টি অন্ন দেয়। আর ব্রজবাবু অপর লোকের লেখা হইতে ভাবটা আসটা আর প্রথাটা-কবিতাটা চুরি করিয়া হাটে-বাজারে বাহির করেন; খুব খানিক খ্যাতি পান। বেজা ডোম ও ব্রজবাবুতে বিভেদ কি? ডোম বেটায় ও বাবুটিতে কার্য্যগত বিভেদ কিছুই নাই। উভয়েই এক সম্প্রদায়স্থ শিল্পী।"—ঠাকুরদাসবাবু এই কথাগুলি কত-দিন আগে লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজ উহা কি কঠোর সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে!

* * *

এই অবসরে আর একজনের একটি পুরাণো কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বহুকাল পূর্ব্বে, গিরিশচন্দ্র এদেশের একশ্রেণীর সম্পাদক-উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন,—"ইঁহারা ভবঘুরে, যেখানে সেখানে যান। এদিক ওদিক দু'একটা ছোট-খাট সমাজে গিয়াও বসেন। জ্যাঠামীতে যাহাতে সম্পূর্ণ দীক্ষালাভ হয়, সেই সকল কার্য্য দিবা-রাত্রি করিতে থাকেন। ইঁহারা সকল পুস্তকেরই সমালোচক। ... ...ইঁহারা বালক বয়সে গোঁফ কামাইয়া ও মোটা চাদর লইয়া বিজ্ঞ সাজেন। প্রত্যক্ষে কুকুরের ন্যায় যাঁহাদের অনুবর্ত্তী হন, পরোক্ষে তাঁহাদের ঘৃণিত পত্রে ঐসকল মান্যগণ্য ব্যক্তির কুৎসা রচিত হইয়া বিক্রীত হয়। এই সকল অধমাত্মাদের প্রতি সমাজের লক্ষ্য পড়া উচিত। সম্পাদক বলিয়া তাহাদের আদর করিলে, আকাট মূর্খদের আদর করা হয়। তাহাদের কুকুর-প্রকৃতি বলিলে কুকুরকে গালি দেওয়া হয়।"—কথাগুলা 'বাসি' হইলেও এখন যেন আরও সত্য—আরও মিষ্ট লাগিতেছে। কারণ, এখন ঐ শ্রেণীর সম্পাদকেরা শুধু জীবিত মান্য-গণ্য ব্যক্তির কুৎসা রচনা করেন না—মান্য-গণ্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেও কলঙ্কের কালি ছিটাইয়া আরও নীচতার পরিচয় প্রদান করেন। ইহার প্রথম প্রমাণ—'অগ্রগতি'। দ্বিতীয় প্রমাণ—'অগ্রগতি'রই ভায়রা-ভাই 'শনিবারের চিঠি'। এই কাগজখানা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

রচনায় যে কেবল কদর্য্য ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহা নহে; সম্প্রতি মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধেও লিখিয়াছে—"গিরিশচন্দ্র ঘোষ জীবনে উদারচরিত্র 'মাই ডিয়ার' লোক ছিলেন; মৃত্যুর পরেও তিনি গিরিশ-পার্কের ভাস্কর হইতে আরম্ভ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ রায় পর্য্যন্ত বহু রসিক ও রসক্ষ্যাপাকে তাঁহাকে কিলাইয়া কাতুকুতু দিয়া রস জমাইবার অনুমতি দিয়াছেন।"—কি 'সূক্ষ্ম রসিকতা'! 'বাপু' এখন বাঁচিলে হয়! বঙ্কিমচন্দ্রের মামলা প্রসঙ্গে পুলিশকোর্টের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাস সেদিন বলিয়াছেন—বাঙ্গালাদেশে লেখার অপব্যবহার স্ত্রীলোকের বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও জঘন্য হইয়াছে।" কথাটা যে কত সত্য, তাহা শনির পাপ অনুচরদিগের পাপ লেখাগুলোই আজ সপ্রমাণ করিতেছে।

বেজেনবাবুর গোবর-গবেষণা

চালুনি বলেন—সূচ, তোমার অধোদেশে কেন ছিদ্র? যাহার গোবর-গবেষণার সর্ব্বাঙ্গে ছিদ্র, সে টানিয়া বুনিয়া পরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে গিয়া পদে-পদে নাকাল হয়। তারিখ বগলে করিয়া বিশল্যকরণী খুঁজিবার চেষ্টা করিলে, অথবা পুরাতন লাইব্রেরীর ধুলা ঘাটিতে ঘাটিতে বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগের পড়া হাতে-কলমে মক্স-করিবার সাধ্ চেষ্টা করিলে 'হতাশ-ঐতিহাসিক' মাত্রই হওয়া যায়, আর কিছুই হওয়া যায় না। আস্পাইলে কি হইবে বাছ, তাড়ে যে ভবানী! বেজেনবাবুর চালুনীত্বের পরিচয় 'কথক'-এর মুখেই শুনিয়া রাখুন। আমরা নিজে কিছু বলিব না, কিছুদিন পূর্ব্বে "কথক" পত্রিকা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

"একখানি বই হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। বইখানি 'রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস্' হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র চতুর্থ গ্রন্থ—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রচিত 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'।"

দেখিলাম, সম্পাদক-লিখিত 'ভূমিকা'য় 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী' সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়-কৃত 'গ্রন্থাবলী'র এই পরিচয় ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। ....ব্রজেনবাবু অত্যধিক বিদ্যা জাহির করিতে গিয়া নিজের অজ্ঞতাকে নিজেই ধরাইয়া দিয়াছেন। শূন্যগর্ভ কলসীর শব্দ কিছু বেশীই হইয়া থাকে।

মৃত্যুঞ্জয়-কৃত 'হিতোপদেশ'-সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"১৮০৮ সনে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকের সন্ধান আমি এখনও পাই নাই।"

তৎ-কৃত 'হিতোপদেশ' দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে একটি কথাও ব্রজেন্দ্রবাবু উল্লেখ করেন নাই; প্রথম সংস্করণ হইতে তিনি একেবারে তৃতীয় সংস্করণে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন! তাঁহার অবগতির জন্য বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় সংস্করণ (মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ') শ্রীরামপুরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তৎ-কৃত আর একটি সংস্করণ ('হিতোপদেশ') ১৭৪৫ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল; উহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৩৪৫।

দেখিলাম,—'বেদান্ত-চন্দ্রিকা'র মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় স্যার যদুনাথ সরকার ব্রজেন্দ্রনাথকে সেকালে প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের পরিচয়-সংগ্রহ-ক্ষেত্রে 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমী ও বিশেষজ্ঞ' বলিয়া যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা ছাপা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবু এই সার্টিফিকেটখানি কপালে জয়পত্র-স্বরূপ আঁটিয়া স্বার্থসিদ্ধির ফিকিরে থাকুন, অনেকে তাহা দেখিয়া বাহাবা দিবে, অনেকে হাসিবে।

'ভূমিকা'-য় মৃত্যুঞ্জয়-কৃত 'হিতোপদেশে'র পরিচয় দিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু পাদটীকায় (footnote) লিখিয়াছেন:—"১৮০৮ সনে আরও একখানি হিতোপদেশ" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অনুবাদক রামকিশোর তর্কচূড়ামণি।" কিন্তু তৎপূর্ব্বে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে যে একখানি 'হিতোপদেশ' শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, স্যর যদুনাথের "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমী ও বিশেষজ্ঞ" তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। এই 'হিতোপদেশ'খানির বঙ্গানুবাদক গোলোকনাথ পণ্ডিত। ইহার আখ্যা-পত্রটি এইরূপ:—

হিতোপদেশ। সংগ্রহ ভাষাতে। গোলোকনাথ শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০১। [পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৪৭]

এই পুস্তকখানির ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল '১৮০২' ছাপা আছে।

এই ত গেল হিতোপদেশ-সম্বন্ধে "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমী ও বিশেষজ্ঞ" ব্রজেন্দ্রবাবুর শ্রম ও বিশেষজ্ঞতার বহর! এইবার মৃত্যুঞ্জয়-কৃত 'বত্রিশ সিংহাসন' সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষজ্ঞতার নমুনা দেখুন। ব্রজেন্দ্রবাবু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বত্রিশ সিংহাসন'—প্রথম সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর 'শ্রীরামপুরে তৃতীয়বার ছাপা' (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) সংস্করণের নামও করিয়াছেন। কিন্তু মাঝে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। 'বত্রিশ সিংহাসনে'র দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যা-পত্র এই:—

বত্রিশ সিংহাসন। সংগ্রহ ভাষাতে মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৮। [পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮]

বত্রিশ সিংহাসন। সংগ্রহ ভাষাতে মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা-ক্রিয়তে। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল। ১৮০৮। (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮)

রাজাবলি।—ব্রজেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক উল্লিখিত সংস্করণগুলি ব্যতীত ইহার আর একটি সংস্করণ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল।

এত কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। চারিদিকে খুব ঢাক বাজাইয়া 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র সম্পাদন-বাহাদুরী ঘোষিত হইতেছে! এমন কি, বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি হইতে বজ্র-কণ্ঠ-নিঃসৃত ব্রজেন্দ্র-বিদ্যার জয়নাদ সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ও প্রবাসী-কার্য্যালয়ের ভিত্তি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়াছে! তাই "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রমী ও বিশেষজ্ঞ"র বাহাদুরটী একবার পরখ করিয়া লওয়া গেল।

'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, ভাল কথা। কিন্তু যোগ্যতর হস্তে ইহার সম্পাদন-ভার ন্যস্ত করা উচিত। পুরাতন পুস্তকের আলমারি ঘাটিলে এবং দপ্তরখানার পুরাতন চিঠি-পত্র নাড়া-চাড়া করিয়া দেখিলে অনেক মাল-মশলার সন্ধান পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু কেবল সেইগুলি যে কোনও উপায়ে হস্তগত করিতে পারিলেই প্রাচীন পুস্তকের সম্পাদন-কার্য্য বা ভূমিকা-রচনার যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে পুরাতন পুস্তকের দোকানদার ও রেকর্ডখানার চাপরাশী পর্য্যন্ত দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পুস্তকের সম্পাদন কার্য্য যোগ্যতার সহিত করিতে পারিত। কাহারও তদ্বীরকারী করিলে তিনি চক্ষু-লজ্জা'য় প্রশংসাপত্র দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। অযোগ্য ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতিদিন কত ছোট যে খোঁড়াইয়া বড় হইবার প্রচেষ্টায় উপহাসাস্পদ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাহারও ছোট আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইতেছে, কাহারও খ্যাঁদা-নাক মোটা হইতেছে, কাহারও কত কি ফুলিতেছে!

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—

ললিতা যাওয়ার পর হইতে বাড়ীর গৃহিনীপনাটা সমস্তই আসিয়া নামিল লবঙ্গর ঘাড়ের উপর। নীরদবাবু কিছুই দেখেন না, দেখিতে পারেনও না। ললিতাই সংসারের খুঁটিনাটি যা কিছু সবই করিত, এমন কোনও দিক অপূর্ণ রাখিত না, যেদিকটায় নীরদের বা আর কাহারও নজর দিবার কোনও প্রয়োজন হইত। আজ হঠাৎ সে আসন ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতেই যে একজন অনভ্যস্ত ব্যক্তি সেই আসনটিতে জুড়িয়া বসিবে, এরূপ আশা করা যায় না। বিশেষ গৃহিনীর আসনটি চিরকালই পৃথিবীর নারীজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত!

নীরদবাবুর সংসারে এমন কোনও আত্মীয় স্বজন আগে হইতে বর্ত্তমান ছিল না, যে ললিতার অবসরে গৃহিনীপনার ভার নিজ স্কন্ধে লইতে পারিত। শেষাশেষি লবঙ্গ আসিয়া কতকগুলি ফরমাইসের ভার নিজের ঘাড়ে লইয়াছিল! সে কাজগুলি লবঙ্গকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে নাই, কেননা নারী জাতির শোণিতগত অভ্যাসের গণ্ডির মধ্যে সেগুলি বর্ত্তমান ছিল। লবঙ্গ অলসও ছিল না, আভিজাত্যের দেমাক কখনও মনকে ঘোলাটে করিয়া রাখে নাই। কাজেই নীরদবাবুর ক্ষুদ্র সংসারের পোষাকী কার্য্যগুলি সে সম্পাদন করিত খুবই সানন্দ উৎসাহে, প্রকৃতিগত শালীনতায়।

ললিতার জীবদ্দশাতেই, লবঙ্গ এই বাড়ীর মধ্যে একটি ঘর বাছিয়া লইয়াছিল নিজের জন্ত।

সন্ধ্যাবেলা নীরদবাবু আসিয়া নিজের ঘরে বসিলেন এবং রামদীনকে দিয়া লবঙ্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। লবঙ্গ আসিলে বলিলেন: "লবঙ্গ? ললিতার অসুখে ত তুমি অনেক সেবাশুশ্রূষা করলে; আমার অসুখে কি কিছুই কর্ব্বে না?"

লবঙ্গ বলিল: "আপনার কি কোনও অসুখ করেছে?"

"করলেই বা কি কচ্ছি বলো! এখনতো ললিতা নেই যে তাকে এসে জানাবো, বা তার একটা বিহিত হবে?"

একথা শুনিয়া লবঙ্গ মনে মনে খুব দুঃখিত হইল কিনা বুঝা গেল না; তবে তাহার মুখের উপরে যে মেঘখানি অবিলম্বে ভাসিয়া উঠিল, সেখানিকে জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া সে বলিল: "কি হয়েছে বলুন, আমি তার ব্যবস্থা কচ্ছি!"

নীরদবাবু উদাসীনভাবে বলিলেন: "কি আর বলবো লবঙ্গ! ললিতা যাওয়া থেকেই আমার শরীরটা ভাল নয়! আজ আদালতে কাজ করতে করতে মাথাটা এমন ধরে উঠেছে, যে এখনও পর্য্যন্ত সামলাতে পাচ্ছি নে!"

লবঙ্গ বলিল: তা'হলে আজ আর নীচের বৈঠকখানায় যাবেন না! বিছানায় শুয়ে পড়ুন!

লবঙ্গ আলমারি খুলিয়া একটা গোলাপ জলের শিশি বাহির করিয়া নীরদবাবুর মাথায় ঢালিয়া দিল, এবং একখানি পাখা নিয়ে তাঁহার মাথায় হাওয়া করিতে

লাগিল। নীরদবাবু আপনার বিছানাতেই বসিয়া ছিলেন, এখন শুইয়া পড়িলেন। লবঙ্গ খাটের পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে লাগিল।

—"মাকে শুভ সংবাদটা লিখে পাঠিয়েছো, লবঙ্গ ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ! কাল একখানা চিঠি দিয়েছি!"

—তোমার জ্যাঠাকুর্দ্দা বলছিলেন, টেলিগ্রাম কর্ত্তে? হাঁ। দুর্ঘটনাটা বড়ই বেজায় রকমের আনন্দের সংবাদ কিনা, কাজেই টেলিগ্রাম না করলে চলবে কেন?

—তাঁর দোষ নেই! আপনার জন্যই আমাদের চিন্তা হয়ে পড়েছে!

—আমার জন্যে ?

—কাল সমস্ত রাততো আপনি ঘুমুননি! বারাণ্ডার পায়চারি ক'রে বেড়িয়েছেন! এ রকম করলে অসুখ বেড়ে যাবে।

—কে বললে লবঙ্গ, আমি কাল সমস্ত রাত্রি বারাণ্ডার পাইচারি ক'রে বেড়িয়েছি ?

—পায়ের শব্দ আমি সমস্ত রাত শুনতে পেয়েছি!

—শুনতে পেয়েছো, কিন্তু কোনও প্রতিকার ত করোনি লবঙ্গ! ললিতা হ'লে চুপ ক'রে থাকতো না! কিন্তু তুমি!

লবঙ্গ কোনও কথা কহিল না; কিন্তু তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল!

নীরদবাবু করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "লবঙ্গ, তোমার স্বামীর জন্তে মন কেমন করে না ?"

লবঙ্গ প্রথমটা কিছু উত্তর করিল না। এ প্রশ্নটির ভিতর হইতে যে বৃশ্চিকগুলি আসিয়া হঠাৎ তাহাকে দংশন করিয়া ফেলিল, তাহার জ্বালা প্রশমিত হইতে না হইতেই সে বলিয়া উঠিল: "আপনি ত জানেন, আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছেন।"

"—তিনি ত্যাগ কর্ত্তে পারেন! কিন্তু তুমি ত্যাগ করোনি ত লবঙ্গ! তোমার স্বামী তোমায় ত্যাগ করেছেন বলে, তুমি ত তাকে এখনও ভালবাসতে কসুর করো না!"

—দেখুন বাবু! ভালবাসা এক, আর কর্ত্তব্যপালন আর এক জিনিষ! সেটা শিক্ষা করতে হয়! ভালবাসাকে মানুষের শিক্ষা করতে হয় না। একটা হ'ল সযত্নে রক্ষা করা উদ্যানের ফুল,—আর একটা হ'ল স্বভাবজাত বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প! দুটোর মধ্যে প্রভেদ আছে বৈকি, বাবু!

—কিন্তু সে প্রভেদটা সকলে মানে কই—লবঙ্গ। ভগবান্ মানুষকে শাস্তি দেবার অধিকার রাখেন, তিনি শাস্তি দেবার আগে মানুষের মেরুদণ্ডটা পরীক্ষা করে দেখেন! যদি দেখেন মেরুদণ্ডটা ফুলের মত নরম, তখন তাঁর বেতটাকে করে তোলেন ছুরির মত তীক্ষ্ণ আর যদি দেখেন মেরুদণ্ডটা লোহার মত শক্ত, তখন শাস্তির বদলে স্বস্তিই তার ভাগ্যে ব্যবস্থা করে দেন! তোমরা যতো নরম হবে, লবঙ্গ—ঈশ্বর তত তোমাদের উপরে গরম হয়ে উঠবেন!

লবঙ্গ কথাগুলি পিপাসিতের মতই শুনিল, কিন্তু সমস্তা উদ্ভাবন করিতে পারিল না।

লবঙ্গ সহসা জিজ্ঞাসা করিয়া বাবু? তাঁর নামে কি নালিশ রুজু করে দিয়েছেন ?

—নালিশ? না এখনও করিনি। তবে তুমি যদি খুব আগ্রহ করো, তাহ'লে কর্ব্বো বৈকি!—উঃ! মাথাটা বড়ই যন্ত্রণা দিচ্ছে। লবঙ্গ! তোমার হাতখানা আমার কপালে একটু রাখো দেখি! হয়তো একটু ঠাণ্ডা হতে পারে!

লবঙ্গ তাহার কিশলয় নিন্দিত হাতখানি নীরদবাবুর কপালের উপরে রাখিল। নীরদবাবু আরামের সুরে বলিলেন: আঃ!

(ক্রমশঃ)

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ত্রয়োত্রিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২রা ভাদ্র ১৩৪৫, ১৮ই আগষ্ট ১৯৩৮

এ কার "বিধান" ?

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যানরূপে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র নাকি লাইসেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালের মারফতে অনুরোধ-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতির এই পন্থাবলম্বন সমীচিন হইয়াছে কিনা তাহা ডাঃ রায়ের ভবিষ্যত কার্য্যাবলী প্রমাণ করিবে কিন্তু ডাঃ রায়কে কর্পোরেশনে "অনুরোধ করিয়া" ফিরাইয়া আনিবার পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি তাঁহার নিকট হইতে আনুগত্যের অঙ্গীকার পাইয়াছেন কি ? আর পাইলেও সে অঙ্গীকার কতদূর রক্ষিত হইবে তাহাও ভাবিবার বিষয় !

ডাঃ বিধানচন্দ্রের জন্য তদ্বির প্রসঙ্গে দিল্লীর "রায়স্ উইকলি" বলিয়া ফেলিয়াছেন যে : He (Dr. Roy) has some influence with Mr. Nalini Ranjan Sarker. And if Mr. Nalini Ranjan Sarker could be weaned away from the Fazlul Huq Ministry, then that Ministry falls like a pack of cards. ...... If, therefore, the Congress is at all anxious to dethrone Mr. Fazlul Huq, then that party should cultivate Mr. Nalini Sarker and Mr. Bidhan Roy." নলিনী-বিধানের এই যে যোগাযোগের ইঙ্গিত "রায়স্ উইকলি" দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা বাংলার কংগ্রেসী মহলে সুবিদিত। সুতরাং নলিনীরঞ্জনকে বাদ দিয়া বিধানচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া কি কোন ফল পাওয়া যাইবে ? রাষ্ট্রপতি তাহা কি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন ? আর যদি রায়-রুণী প্যাক্টের প্রবর্ত্তক বিধানচন্দ্রকে পাংক্তেয় করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে নলিনীরঞ্জনকে গঙ্গোদকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ? অশোক শাস্ত্রী মশাই শাস্ত্রীয় মতে শুদ্ধি-কার্য্য সুসমাধা করিতে পারেন !!!

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাদের নিকট স্বমুখে স্বীকার করিয়াছিলেন যে My dear Raja শীর্ষক "জাল" চিঠিখানা নাকি ডাঃ বিধানচন্দ্রই তাঁহাকে দেন এবং বিধানচন্দ্রেরই অনুরোধক্রমে তিনি ঐ পত্রটী ব্যবহার করেন। উক্ত ব্যবহারের ফলভোগ অবশ্য তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল কিন্তু তদানীন্তন অটুট বন্ধু-পঙ্কের সৌহার্দ্দ্য বশতঃ শরৎচন্দ্র সেই চিঠির অপপ্রয়োগের কাহিনী অদ্যাবধি সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন নাই। যে বিধানচন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার সহিত বিজড়িত করিতে পক্ষান্তরে দায়ী তিনি যে বসু-ভ্রাতৃদ্বয়কে কতদূর সাহায্য করিবেন তাহা সন্দেহজনক। সহযোগী "অমৃতবাজার" অদ্যাপিও এই চিঠি লইয়া শরৎচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতেছেন কিন্তু শরৎচন্দ্র কি অপরের বিষ স্বীয় কণ্ঠে বহন করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন ?

রায়-রুণী প্যাক্টের সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বিদ্রূপভরে বলিয়াছিলেন যে শরৎচন্দ্র যেন "ভোলা মহেশ্বর—খপ করে জলেন ও দপ্ করে নেভেন"!!! শরৎচন্দ্র হয়ত আজ সে বিদ্রূপোক্তি ভুলিয়া গিয়াছেন !

রাষ্ট্রপতির কার্য্যের সমালোচনা আমরা করিতে চাই না—তবে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিবেদন করিতে চাই যে

যখন বিধানচন্দ্রও পরিশুদ্ধ হইলেন তখন নলিনী বাবুকে আর অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়া ফল কি ?—যেহেতু তিনি "Would be anxious to help the Congress if only he is approached in the right spirit সাধু !

নলিনী-বিধান-কিরণের অচ্ছেদ্য ও অদৃশ্য বন্ধন যখন বন্ধু-ভ্রাতৃদ্বয় ছিন্ন করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ তখন এই ত্রিমূর্ত্তির প্রভাব যে বাংলা কংগ্রেসে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নিশ্চিত। বিধানচন্দ্রের কর্পোরেশনে পুনঃ প্রবেশ তাহারই সূচনা করিতেছে। কিরণশঙ্কর এক বৎসরের জন্য সশস্ত্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছেন—অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কার্য্যকাল সমাপ্ত হইলেই কিরণবাবুর স্বরূপ প্রস্ফুটিত হইবে !! ইতিমধ্যে এ্যাসেসারী পদলাভ হইলে তিনি নিশ্চিন্তচিত্তে রাজনীতিক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিতে পারিবেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বিধানচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ আসিবে। আমরা সেই মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় রহিলাম।

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা

হিটলার কি যুদ্ধ বাধাবে ? মুসোলিনীর ডিপ্লমেসি এখন কোন দিকে?

সচী শীল

ইউরোপের Defensive Systemএ যে Combination of Powers এখন চেম্বারলেন গড়ে তুলতে উদ্যত, তাতে মনে হয় ইংরেজ-ফরাসীর শক্তি ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে মুসোলিনীর Imperialist ambitionকে feed করবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আকুল হয়ে উঠেছে। বুঝেসুঝেই যে এটা করছে তা হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু যা করছে তার ফলে মুসোলিনীরই সবদিক দিয়ে সুবিধে হয়ে যাচ্ছে।

চেম্বারলেনের Sinister driveএর উল্লেখ করে ২৮শে জুলাইএর "খেয়ালী"তে বলেছিলাম—"উপস্থিত তিনি দক্ষিণ ও মধ্য ইউরোপের যে State গুলোকে হাত করবার চেষ্টা করছেন তারা কেউ রাশিয়ার বন্ধু নয়। তবে কি তার উদ্দেশ্য ইউরোপের Defensive Systemএ রাশিয়াকে ঢুকতে না দেওয়া ? এই চেষ্টাও কি Franco-Soviet Pactএর বিরুদ্ধে নিয়োজিত ?"

চেম্বারলেনের উদ্দেশ্য এই রকম একটা System গড়ে তুলে ফ্রান্সকে দেখান যে—আর ভাবনা কি ? রাশিয়া ত এখন Superfluous. ফ্রান্সের অনেকের কাছে রাশিয়া undesirable হতে পারে কিন্তু এখনও superfluous নয়। ইংরেজ যদি দেখাতে পারে যে রাশিয়াকে আর দরকার নেই, তাহলে Franco-Soviet Pact অটুট থাকতে না পারাই সম্ভব। কিন্তু গণ্ডগোলত ঐখানে ! French General Staff বিশ্বাস করতে পারছে না যে রাশিয়াকে বাদ দিয়ে ফ্রান্স নিরাপদ থাকতে পারে। তারপর বাদ দিলেই চেকোস্লোভাকিয়ার অবস্থা এমন অসহায় হয়ে পড়বে যে, সে Capitulate করতে হয়ত বাধ্য হবে। Bohemiaর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য, চেক সৈন্যবাহিনী এবং ওখানকার Strategic position হাতে পেয়ে হিটলার এমন প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে পড়বে যে তখন তাকে দাবিয়ে রাখা শক্ত হবে। তখন ফসোলীর দাবীর পেছনে সেই বিরাট Military powerকে রেখে হিটলার ইংরেজ-ফরাসীর মাথার ওপর Monsterরূপে tower করবে। এ অবস্থাটা contemplate করতে চেম্বারলেনের কি রকম লাগছে ?

বৃটিশ সমর-সচিব Mr. Leslie Hore-Belisha সম্প্রতি বাধ্য হয়ে প্যারিসে ছুটেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল Franco-Czecho-Soviet axis ভেঙ্গে দেওয়া। চেম্বারলেনের উপদেশ অনুযায়ী প্রথমতঃ তিনি বলেছিলেন যে British military force এত শক্তিশালী যে Russiaর সঙ্গে সম্বন্ধ ফ্রান্সের আর না রাখলেও চলবে। তা ছাড়া Red Armyর দ্বারা কিই বা উপকার পাওয়া যাবে ?

এই argument complete করবার জন্য খুব শীঘ্রই হয়ত বৃটিশ ফরাসীকে বলবে—"দেখ, দক্ষিণ-মধ্য ইউরোপের রাজ্যগুলো আমাদের বন্ধু ; সবের ওপরে Anglo-Italian Pactএর ফলে স্বয়ং মুসোলিনী friendly hand extend করতে উদ্যত। আর ভাবনা কি !"

হিটলার যদি তাঁর power politicsএর মধ্য দিয়ে Franco-Soviet Pact ভাঙতে পারেন এবং চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাস করে নিয়ে সেই Pactকে চিরকালের জন্য অসম্ভব

করে দিতে পারেন, তাহলে রাশিয়া ইউরোপীয়ান রাজনীতির বাইরে হয়ে যাবে,—এবং এইটা হবে মুসোলিনীর পক্ষে সব চয়ে বেশী আনন্দের কথা। কেন? এতে হিটলারের জিতকে ছাপিয়ে চলে যাবে মুসোলিনীর জিত। আমার অন্য প্রবন্ধে Rome-Berlin axisএর আসল মর্ম বুঝিয়ে দিয়েছি। এই এ্যালায়েন্স যে মুসোলিনীর হাতে একটা Excellent political lever সে কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছি ইংরাজী এবং বাংলা প্রবন্ধে।

সেদিন দেখি বিখ্যাত Biographer Mr. Emil Ludwig একটা press-interviewএ বলেছেন—"One of the few optimistic points I see, is the unreality of the Rome-Berlin axis, inspite of all the humbug to cloud the issue. The Anschluss and its implications worry Italy more than Fascism cares to admit."

মিঃ লাডউইগের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে অবশ্যই একমত। এই রোম-বার্লিন আঁতাতের unrealityকে যদি postulate বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে এই basisএ ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কি রকম alignment of Powers হবে? London-Paris-Rome axis হিটলারকে বাধা দেবে নাকি? হিটলার কি ভেবে দেখেছেন কথাটা? হিটলার কি নিশ্চিন্ত চিত্তে সেইদিনের অপেক্ষা করছেন, যেদিন তিনি মুসোলিনীর কাছে হয়ে যাবেন—Just a sucked-up Orange?

রাশিয়াকে যতক্ষণ না একঘরে বা isolated করা যাচ্ছে, ততক্ষণ মুসোলিনীর স্বপ্ন বিশেষ করে ফ্রান্সের কাছে অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে না। তাই Isolation of Russia মুসোলিনীর কাছে হবে—The happiest event after the Anglo-Italian Pact.

মুসোলিনী সত্যিই হিটলারকে ভয় খান। Adriatic Sea পর্য্যন্ত হিটলার হাত বাড়াতে এলে মুসোলিনীর সেই ভয় আরও বেড়ে যাবে। আসল কথা মুসোলিনী হিটলারকে political lever হিসেবে পেতে চান, friendly neighbour হিসেবে নয়।

১৪ই মে তারিখে Genoaতে মুসোলিনী বক্তৃতাতে বলেছিলেন—"In the event of an ideological war, the authoritarian nations will solidly walk together." এর উদ্দেশ্য ইংরেজ-ফরাসীকে ভয় দেখান, এবং হিটলারের চোখে ধুলো দেওয়া। এর চেয়ে বড় Bluff আর হতে পারে না কি? হিটলার-মুসোলিনীর বন্ধুত্ব এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

মুসোলিনীর present political gameকে sum up করে আমি একটি প্রবন্ধে (Hindusthan Review—June) বলেছি—

"His objective is neither the appeasement of Hitler nor a victory for the Fascist International, but the consolidation of his own power and prestige and the consummation of Italian ascendency without actual recourse to arms. The next phase of his political manoeuvres will be in the direction of drawing freely upon the wealth and possessions which have made the British Empire what it is."

যদি মুসোলিনীর plan অনুযায়ী Spanish problem solved হয়ে যায়, যদি Franco-Soviet Pact ভেঙে গিয়ে London-Paris-Rome Alignment সম্ভব হয়, যদি রোম-বার্লিন axis ভাঙবার আগে Mediterranean ও Indian Ocean-এ মুসোলিনী নিজেকে Strategically সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারেন এবং যদি নূতন Trade Treaty ও Big British Loan দ্বারা ইটালীর crazy economic systemকে ঠিকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়, তবে পরবর্ত্তী জগত-যুদ্ধে Fascist Internationalএর মধ্যে মুসোলিনীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তিনি থাকবেন ইংলণ্ড-ফ্রান্সের পাশে, অর্থাৎ ১৯১৫ সালের Betrayal আবার ১৯৩৯ কিম্বা ১৯৪০ সালে repeated হবে, যদি অবশ্য যুদ্ধ বাধতে অত দেরী হয়।

কেন, হিটলারের Loyal Ally হিসেবে থাকলে এবং যুদ্ধের সময় Rome-Berlin Alliance অটুট রাখলে মুসোলিনীর ক্ষতি কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এখন যুদ্ধ বাধলে London-Paris-Moscow Alliance ফ্যাসিষ্টদের একেবারে নষ্ট করে দেবে, এবং রাশিয়া out of the picture হয়ে যাবার পর যুদ্ধ বাধলে ফ্যাসিষ্ট শক্তি ইংলণ্ড-ফ্রান্সকে পরাজিত করতে পারে। ঠিক এর পরেই হিটলারকে ঠেকিয়ে মুসোলিনীর পক্ষে মহাসমস্যা হয়ে পড়বে। জার্ম্মানীকে বড় Mediterranean Power করবার বাসনা হিটলারের মনে জাগবে। শুধু তাই কেন, সমস্ত ইউরোপের Master হবার ইচ্ছা হিটলারের মনকে চঞ্চল করে তুলবে। Fascist Victoryর পর "Sharing the Swag"-এর ব্যাপারে মুসোলিনীর বরাতে কি জুটবে বলা শক্ত। হয়ত power-mad হিটলার তখন aeroplone পাঠিয়ে দেবেন রোমে স্বস্তিক flag পুঁততে এবং ইটালীর আকাশে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিতে। আপনারা Pears' Soap-এর aerial advertisement দেখেছেন ত?

মুসোলিনীর এখন যে সব সমস্যা সেগুলি liquidated হয়ে গেলেই London-Paris-Rome Alliance তৈরী হয়ে যাবে as a bulwark against German aggression.

এ কথা অনেকদিন আগেও বলেছি। হিটলার যদি ভাল করে calculate করে দেখেন ত তিনি চেষ্টা করবেন যাতে মুসোলিনীর troubles prolonged হয়। Spanish issue still hanging fire, Anglo-Italian Pact not yet implemented—এ ত হিটলারের পক্ষে খুব আশার এবং আনন্দের কথা! Spain এখন largely an Italian Concern. Franco Victoryকে speed up করবার জন্য চেম্বারলেন-মুসোলিনীর যে ব্যগ্রতা, হিটলারের সে ব্যগ্রতা কই? হিটলার হয়ত ভাল করেই জানেন যে এইসব সমস্যার একবার সমাধান হলেই মুসোলিনীকে আর কাছে পাওয়া যাবে না। মধ্যইউরোপে প্রসার কিম্বা কলোনী ফেরতের সম্ভাবনা হিটলার যদি একেবারেই না দেখতে পান, তাহলে desperate হয়ে তিনি explode করবেন। Expansion কিম্বা Explosion—এ ছাড়া হিটলারের আর পথ নেই। মুসোলিনী যদি নিজের প্রধান সমস্যাগুলি সমাধানের কোন উপায় না দেখে desperate হয়ে পড়েন, তবেই যুদ্ধে Italo-German combination সম্ভব হবে। আমার Analysis অনুযায়ী মনে হচ্চে, trouble কাটবার আগেই কিম্বা তা আরও জটিল হলেই মুসোলিনীকে ধরে pitchforhead করে দেবেন হিটলার। আবার Far East-এ Sino-Jap war of attrition-এ জাপান যেরকম ক্রমশঃ কাবু হয়ে পড়ছে, তাতে মনে হচ্চে এক বছরের মধ্যেই জাপান চীনের হাতে crushed হয়ে যাবে—even without direct Soviet intervention.

এধারে যদি ইটালীকে হারায় এবং ওধারে যদি জাপানকে এইভাবে হারায় তবে বন্ধু বলতে জার্ম্মানীর আর কে রইল? তাই আমার খুব বিশ্বাস ইটালী হাতে থাকতে থাকতে এবং জাপান বেঁচে থাকতে থাকতে হিটলার প্রচণ্ড নিনাদে ফেটে পড়বেন। German Explosion must precede a break-up of Fascist International—এই কথাটাই ভাল করে মনে রাখতে হবে।

১৯৩৮ সালের এই আগষ্ট মাসে পৃথিবীর যে অবস্থা, সে অবস্থায় সবদিক বিচার করে হিটলার হয়ত আর সময় নষ্ট করবেন না। মুসোলিনী পিছনে গেলে মুস্কিল হবে। আবার এদিকে জাপান কাবু হয়ে গেলে রাশিয়ার শক্তি বেড়ে যাবে, চীনে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠিত হবে, বর্ত্তমান যুদ্ধজাত সংহত চীনের শক্তি ও প্রগতির ধারা Communist Channelএ বইতে থাকবে; শুধু তাই নয়, যুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে ঘরে বিপ্লব বাধবে। এ বিপ্লব Proletarian Revolution ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এশিয়ার অনেকটা রাশিয়ার আওতায় এসে পড়বে। জাপানী পরাজয়ের পরিণাম এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এইভাবে ভেবে দেখলে মনে হয় যুদ্ধের বুঝি আর দেরী নেই। Fascist axis of Tokio-Berlin-Rome বজায় থাকতে থাকতেই হিসেব মত জার্ম্মানী যুদ্ধ বাধাবে। সেইজন্য এই সময়টা ভয়ানক critical. যুদ্ধ যদি খুব শীঘ্র বাধে ত তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। হিটলারের terrific war preparationএর যে সব খবর কাগজে বেরিয়েছে ধরে আসছে তার Explanation এই প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যাবে। এই খবরগুলো হয়ত World war-এর prelude. কিন্তু আবার একটা জগত-যুদ্ধ হয়ে সভ্যতাকে নষ্ট করে দেবে? ভাবতেও ভয় হয়।

বিবিধ

অমরেশ-মীনা

"খেয়ালী"তে প্রকাশিত শ্রীলক্ষ্মী মিত্র রচিত "অমরেশ-মীনা" আনন্দ-পরিষদের মহলায় পড়িয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথমে "আনন্দ-পরিষদ" অমরেশ-মীণাকে পাদ-প্রদীপে উপস্থিত করিবেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী মিত্র স্বয়ং ইহাতে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় রঙ্গাবতরণ করিবেন।

ভবানীপুর সমাজ

গত মঙ্গলবার ২৪শে শ্রাবণ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' বা 'বৈরাগ-যোগী' নাটকখানা সমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয় নাই; বিল্বমঙ্গলের ভূমিকায় কটিকবাবু পূর্ব্বের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার গানগুলি শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। বণিক—রমেনবাবু ভালই; শ্রীমান বলাই এর সাধক, ও বিবেক রূপে গানগুলি ভাল। কিন্তু সাধকের রূপে কেষ্টবাবু ভণ্ডামি করিতে গিয়া কেবল হ্যাবলামি করিয়াছে মাত্র। ইহার পরে দুলালবাবুর পাগলিনী ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রী চরিত্র একেবারে অচল।

আমরা সমাজের নিকট ভবিষ্যতে উচ্চ ধরণের অভিনয় আশা করি।

দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগীতা

অর্চ্চনা পত্রিকা দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগীতায় প্রবন্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার এবং গল্প ও কবিতায় যথা-ক্রমে প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করিতেছে। প্রবন্ধটী ১,০০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। সমস্ত রচনা স্পষ্টাক্ষরে কাগজের

(বিলাসী)

নিউ থিয়েটার্স

"দেশের মাটী" চিত্রায় সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তায় মুক্তি পাবে বলে ঘোষিত হ'য়েছে।

* * *

নীতীন বসুর পরবর্ত্তী চিত্র "দি এনিমি" স্বাস্থ্যবিষয়ক কাহিনীর ওপর ভিত্তি কোরে গ্রথিত হ'য়েছে। এই ছবির নায়ক-নায়িকা সাইগাল ও লীলা দেশাই প্রত্যেক দৃশ্যে চমৎকার অভিনয় কোরছেন বলে প্রকাশ। নীতীনবাবু এবার যে বিষয় নিয়ে ছবি তুলছেন তা' সমাজ, সংস্কার ও আনন্দের দিক থেকে এক গরীয়ান্ চিত্র হবে বলেই আমরা আশা করি।

* * *

প্রমথেশ বড়ুয়ার "অধিকার" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কাহিনী অবলম্বনে ছবিখানা তৈরি হ'য়েছে বলে সাধারণের কাছে ছবিখানা আদৃত হবে বলেই মনে হয়।

* * *

অমর মল্লিকের "বড়দিদি"-র কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ী, চন্দ্রাবতী, মলিনা, নিভাননী, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি চরিত্রানুগত অভিনয় কোরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা কোরছেন।

* * *

এখানে অভিনয় করেছেন যোগেশ চট্টো, অহি সান্যাল, ব্রজ পাল প্রভৃতি।

সাইগল ও কাননের কয়েকখানি গানও এ সপ্তাহে গ্রহণ করা হোল। এদের দুজনের মধ্যে কে ভাল অভিনয় করছেন, গান গাইছেন এ কথা ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিই বলতে পারেন না। কাজেই আমরা ও আপনাদের জানাতে পাচ্ছি না।

"ধরত্রীমাতার" অপূর্ব্ব সাফল্য

মুক্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরত্রী-মাতা' (দেশের মাটির হিন্দি সংস্করণ) বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর ইত্যাদি স্থানে যে অপূর্ব্ব সমাদর লাভ কোরছে, তা ভারতীয় চিত্র মহলে সত্যই অভূতপূর্ব্ব। সকল শ্রেণীর দর্শক চিত্রখানিকে ভারতীয় চিত্র শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন বলে একবাক্যে স্বীকার কোরেছেন। সংবাদ পত্র মহলেও এই, বিচিত্র চিত্রখানি এক পরম আনন্দ ও বিস্ময়ের আন্দোলন তুলেছে।

"MY DEAR RAJA"

লুপ্ত চিঠির গুপ্ত রহস্য

My Dear Raja শীর্ষক যে "জাল" চিঠিখানির অপপ্রয়োগে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বিভ্রান্ত হইয়া মানহানির মামলায় পড়িয়াছিলেন ইহা কি সত্য যে ডাঃ বিধান রায়ই সেই চিঠিখানি শরৎচন্দ্রের হস্তে অর্পন করেন ?? শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অধুনা-লুপ্ত রত্ন-পঞ্চকের (Big Five) সৌহার্দ্দ্য বশতঃ সে কাহিনী অদ্যাপি প্রকাশ করেন নাই—ইহা কি শরৎচন্দ্র অস্বীকার করিতে পারেন ?? আমরা শরৎচন্দ্রকে এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য সাধারণের গোচরীভূত করিতে আহ্বান করিতেছি !

এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া প্রতিযোগিগণ তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা সহ রচনা ১১ই ভাদ্র ১৩৪৫ সাল, মধ্যে "অর্চ্চনা পত্রিকা" সম্পাদক ৩৮.এ বলরাম বসুঘাট রোড ভবানীপুর কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রেরিত রচনা ফিরৎ দেওয়া হইবে না।

রচনার বিষয়

১। প্রবন্ধ:—হিন্দু মুসলমান সমস্যা ও তাহার সমাধান। (১,০০০ শব্দের মধ্যে)

২। ছোট গল্প।

৩। কবিতা।

নিউথিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে নতুন যে ফ্লোরে পরিচালক ফণি মজুমদারের ছবি 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' সেট স্থাপন করা হয়েছে সে সেটটির নাম 'চার' নম্বর ফ্লোর।

একটি নিখুত রিহার্সাল রুম সেট তৈরি করা হয়েছে। নাচ-গান-অভিনয় আলোচনা কত কিছুই এখানে হয়ে গেল।

ধরত্রীমাতার এই সাফল্য নিউ থিয়েটার্সের এবং বাংলার গৌরব যে বৃদ্ধি করিল, তা নিশ্চয়ই বলা যায়।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

"অভিনয়" আগামী ২৭এ আগষ্ট "রূপবাণী"-তে মুক্তি পাবে। মধু-সাধনায় অভিনয় দেখবার জন্ত লোকে আগ্রহান্বিত হচ্ছে

উঠেছে। "অভিনয়" সম্বন্ধে আমরাও বিশেষ ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছি। "অভিনয়" ভাল হ'ক মধু-সাধনার কীর্ত্তি প্রচার হ'ক দেশে দেশে এই আমরা কামনা করি।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থিয়েটার্স

এই নামে একটি প্রতিষ্ঠান "পরিচয়" নামে একখানা ছবি তুলছেন বলে কাগজপত্রে প্রকাশিত হ'য়েছে। "পরিচয়ের" অভিনেতৃবর্গ ও পরিচালকের নামেরও ফিরিস্তি বেরিয়েছে দেখলাম—কিন্তু কোথায় ছবি তোলা হ'চ্ছে এবং এই ছবির টেক্‌নিশিয়ান কারা সে বিষয় কিছুই জানানো হয়নি কেন? কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয় অবিলম্বে আমাদের জানিয়ে সন্দেহ দূর কোর্‌বেন কি?

চিত্রা

আস্‌ছে শনিবার থেকে এই চিত্রগৃহে "গোরা" চতুর্থ হপ্তার পড়বে। ভীড় দেখে মনে হয়, ছবিখানা চল্‌ছে ভাল।

নিউ সিনেমা

এই শনিবার উক্ত চিত্রগৃহে "অভাগিন" ("অভিজ্ঞানে"র হিন্দি সংস্করণ) মুক্তিলাভ কোরবে।

রূপালী

এখানে ইউনাইটেড আর্টিষ্টের "হারিকেন" এই শনিবার থেকে তৃতীয় হপ্তায় পড়বে। "হারিকেন" সত্যই একখানা দেখবার মত ছবি—সে জন্ত ছবিখানা দেখবার জন্ত যেরূপ ভীড় হ'চ্ছে তা' সাধারণতঃ এদিককার কোনও বাঙলা ছবিতেও দেখা যায় না।

পূর্ণ থিয়েটার

"বিদ্যাপতি" এই শনিবার থেকে চতুর্থ হপ্তায় পড়ল। ছবিখানা সগৌরবেই চলছে এবং আরও কিছুদিন নিশ্চয়ই চলবে। এরূপ আশা করা যায়।

রূপবাণী

জন সাধারণের বিশেষ আগ্রহে নিউ থিয়েটার্সের হৃদয়স্পর্শী কথাচিত্র 'অভিজ্ঞান' এখানে আর এক সপ্তাহ রাখিতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হ'লেন। সত্যকার ভাল সামাজিক চিত্রের জনপ্রিয়তায় এমনিতর পরিচয় বিশেষ আনন্দের বিষয়। এখানে এই সঙ্গে মন্মার ফিল্মের আকাশ-পাতালও দেখানো হচ্ছে।

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

উক্ত রামদয়ালের প্রপৌত্র সাধারণ গৃহস্থ রামজয় সেনকে যদি দিল্লীশ্বরের অধীন করদ বা মিত্র রাজা বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে শরৎবাবুর পল্লী-সমাজের রমেশকে মহামহিম সম্রাট বা সাহানসা বাদশাহ বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিৎ। অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনখানেই রামজয় নামীয় কোন ব্যক্তিকে শুধু আমরা কেন স্বয়ং শ্রীহরিও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন না। সুতরাং ১৭৪৩ এবং ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁর সহিত তাঁহার (রামজয়ের) যে যুদ্ধ বসুমজুমদার মহাশয় ঘটাইয়াছেন, তাহা কতখানি অসত্য, মনগড়া ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা তাহা Stowart-এর ইতিহাসে প্রমাণিত হইবে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোসলার সেনাপতি ভাস্কর রাও বঙ্গ আক্রমন করেন এবং আলিবর্দির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। পর বৎসর (১৭৪৪) ভাস্কর রাও নিহত হন। বসুমজুমদার মহাশয় কিন্তু, বোধকরি অন্তরে আঘাত পাইয়া, তাঁহাকে অক্ষত অবস্থায় স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা মোটেই নহে:—"As the Mahratta chief advanced, Alyverdy Khan eagerly inquired, which was Baskar Raow; and on his being pointed out, cried out with a loud voice, 'Cutdown the infedel!' In an instant, the appointed band rushed on their victims; and Boskar Raow, with nineteen officers of rank, were slaughtered." (Stewart's History of Bengal.) ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দির সহিত কাহারও যুদ্ধের কথা পাওয়া যায় না। সে সময়ে তিনি মারাঠা ও আফগান্‌দের কবল হইতে দূরীভূত করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইতেছিলেন (ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস)। আলিবর্দির যে মারাঠাদিগের নিকট হইতে বঙ্গরক্ষা বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন, তাহার আভাষ-ও আমরা পাইতেছি—"Alyvardy Khan, the Subahdar of Bengal, who had saved Bengal from the attacks of the Mahrattas." (Ramesh Chandra Datta's History of Ancient and Modern India.)

বসুমজুমদার মহাশয় রামজয় সেনের জাহু কাহিনী বিবৃত করিতে করিতে তাঁহার প্রবন্ধের পাদটীকায় গোবরডাঙ্গা জমিদারী প্রতিষ্ঠাতা খেলারাম মুখোপাধ্যায়, সাতক্ষীরা জমিদার বংশের আদি বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী, তিতুমীর প্রভৃতিকে রামজয়ের প্রধান সেনাপতি বলিয়া দম্ভোক্তি করিয়াছেন—দেখিয়া আমাদের চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে। উহা তাঁহার চাঁদের রাতের রঙীন স্বপ্ন। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের এমন পোড়াকপাল

হয় নাই যে, তাঁহারা রামজয়ের চাকরী করিতে যাইবেন। (১) যশোহর জেলার সারষার শ্যামরাম মুখোপাধ্যায় কোন এক পারিবারিক ও সামাজিক দোষে নিজ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ইছাপুরে বাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র—জগন্নাথ ও খেলারাম। খেলারাম সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সৌভাগ্য-ক্রমে যশোহর কালেক্টারির সেরিস্তাদার হন এবং কালেক্টার সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গোবরডাঙ্গা তালুক, চিরুলিয়া ও মধুদিয়া পরগণা এবং ডিহি আড়পাড়া ইত্যাদি সম্পত্তি নীলাম খরিদ করেন, পরে বিখ্যাত দুলাল সরকারের নিকট হইতে রাজাদিয়া পরগণা পত্তনী লন খেলারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন দুর্দান্ত জমিদার ছিলেন; তিনিই সর্ব্বপ্রথম আসিয়া গোবরডাঙ্গায় বাস করেন। এই হইল গোবরডাঙ্গা জমিদারীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সাতক্ষীরা জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধেও তাই। খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামের চক্রবর্ত্তী বংশীয় বিষ্ণুরাম চক্রবর্ত্তী নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পরগণাগুলি বিক্রীত হইতেছিল, তখন বিষ্ণুরাম বুড়ন পরগণা নীলাম খরিদ করিয়া তদন্তর্গত সাতক্ষীরায় আসিয়া বাস করেন এবং রায়চৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি পরে ভালা, খাজুরা ইত্যাদি কয়েকটি সম্পত্তি অর্জন করেন। তাঁহার বংশীয়গণ এখনও সাতক্ষীরায় বাস করিতেছেন।

তারপর তিতুমীর। প্রামাণ্য ইতিহাস অনুযায়ী তিতুমীরের সময় হইতেছে লর্ড আক্‌ল্যাণ্ডের সময়ে, আর রামজয় সেনের সময় তাহার অনেক পর। তাহা ছাড়া তিতুমীরের জেহাদ কবে, কোথায় ও কাহার সহিত ঘটিয়াছিল, তাহা প্রামাণ্য ইতিহাসে আছে—পাঠকবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া

যে সামান্য ও সাধারণ গৃহস্থ রামজয় সেনকে বসুমজুমদার মহাশয় এত ঊর্দ্ধে তুলিয়াছেন, কোন লজ্জায় আবার হঠাৎ তাঁহাকে (রামজয়কে) ক্ষুদ্র করিতে পারেন? তাই বাধ্যতার ভিতরে আলিবর্দি খাঁকে দিয়া রামজয়ের সহিত সন্ধি ও বহুপরগণা শেষে প্রত্যর্পন করাইয়া লইয়া ছাড়িয়াছেন। আমরা তাঁহার দস্যুতায় লুণ্ঠন-সাম্পট্যে সাধুবাদ প্রদান না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না।

রামজয় সেনের পাঁচ পুত্র—রামনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, দেবনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, ও

কমলনারায়ণ। যশোর রাজবংশীয়দের পুরাতন Record-এ রামজয়ের এই পুত্র পঞ্চকের মধ্যে প্রেমনারায়ণ—নাম একজনের পাই। দেবনারায়ণ এই নাম পঞ্চপুত্রের কাহারো ছিল না বলিয়াই শুনিয়াছি। বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ মৎলবের বশবর্ত্তী হইয়া বোধকরি বসুমজুমদার মহাশয় প্রেম-নারায়ণকে দেবনারায়ণ নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন।

জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণের পুত্র ষষ্ঠীবর এবং চতুর্থ লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র দ্বিজবর। ষষ্ঠীবর সেনের যদুনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ দুই পুত্র। যদুনাথ সেনের ছয় পুত্র—প্রথম রমানাথ, দ্বিতীয় নলিনীনাথ, তৃতীয় সতীনাথ চতুর্থ শৈলেন্দ্রনাথ, পঞ্চম মনীন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ অমূল্য কুমার। বসুমজুমদার মহাশয় অভিনব (!) নীতিজ্ঞ এবং রসজ্ঞ ব্যক্তি বটেন। তাই অকুতোভয়ে যদুনাথ সেনের "পঞ্চমপুত্র" পুরাতন মনীন্দ্রনাথ সেনকে শ্রীশ্রী রাজা মনীন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর সাজাইয়া একেবারে জ্যেষ্ঠের আসনে বসাইয়া দিয়াছেন। "পঞ্চমপুত্র" মনীন্দ্র নাথকে জ্যেষ্ঠত্ব, রাজত্ব রাজস্ব না দিলে তাঁহার ইতিহাস অশ্রুধারায় প্রবাহিত হইত তাহা ভাবিবার বিষয় বটে! তিনি নিশ্চয় জানেন না যে, তাঁহার শ্রীশ্রী রাজা বাহাদুরের পরিবারবর্গ সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা তাঁহার অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অনেক অধিক এবং তাঁহার শ্রীশ্রী রাজা বাহাদুরের বাণী ও প্রকৃত ব্যাপার এই দুইয়ে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

যাহা হউক, উপসংহারে বসুমজুমদার মহাশয়ের শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুরের বংশের প্রকৃত ও যথার্থ ইতিহাস সংক্ষেপে লিপি-বদ্ধ করিয়া এবার প্রবন্ধ শেষ করিতেছে (বঙ্গেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য শ্রীশ্রীমহারাজ বসন্তরায়ের পুত্র রাজা শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর রায় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে যশোর-ধুমঘাটে সিংহাসনারোহণ করেন। নূর-নগরের অন্তর্গত কাটুনীয়ার সেন বংশের আদি পুরুষেরা তখন যশোর-ধুমঘাটেই বাস করিতেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ধুমঘাট অকস্মাৎ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠায় রাজা চন্দ্রশেখর সে স্থান ত্যাগ করিয়া থানা ২৪ পরগনার আঁধার-মাণিকের সন্নিকট রুদ্রপুরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত কাটুনীয়ার সেন গোষ্ঠির তদানীন্তন পুরুষ (রামদয়ালের পিতামহ) সেই সঙ্গে উঠিয়া আঁধারমাণিক অঞ্চলে বাস করেন। রাজা চন্দ্রশেখরের পৌত্র রাজা শ্যামসুন্দর রায় (ইনি সম্রাট ২য় আলমগীরের সময় দক্ষিণ বঙ্গের মনসব-দার নিযুক্ত হইয়া কতিপয় জমিদারী ও জায়গীর পাইয়াছিলেন) নানাপ্রকার অসুবিধা বোধকরায় ১১০২ বঙ্গাব্দে (১৬৯৬) যখন রুদ্রপুর পরিত্যাগ করিয়া নূরনগরের অন্তর্গত রামজীবনপুরে আসেন, তাঁহার সহিত তখন রামদয়াল সেন ও তদীয় নাবালক পুত্র রামশঙ্কর সেন আসিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

দেখা পেলাম শ্রাবণে

"এত দিন যে বসেছিলাম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলাম ভরা শ্রাবণে"

—উইলিয়াম্‌স লেনের হাস্য-লাস্য-মুখর ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Council of State) সদস্য মাননীয় মিঃ সুশীলকুমার রায় চৌধুরীর সৌরভ-শয্যার বাতায়ন-কক্ষ হইতে যে আনন্দ-ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতার আশে পাশে ভাসিয়া আসিতেছে তাহার প্রতিধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা বন্ধুবরকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। সুশীলকুমারের নব-পরিণীতা পত্নী শ্রীমতী হেনা দক্ষিণ কলিকাতায় সুপরিচিতা ক্রীড়া-নিপুণা বিদুষী মহিলা। তাঁহার দাম্পত্য-জীবন মধুময় হউক।

* * *

হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ কমিশনার ডাঃ বেণী দত্তের ভ্রাতা শিবপুরের সুপরিচিত কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত শ্রাবণের শেষে এক শুভ লগ্নে এক শিক্ষয়িত্রীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুদাসবাবুর এই যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণে নব বসন্তের উন্মেষে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি।

* * *

বাংলার কংগ্রেসী মহলে এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির বিলম্বিত পরিণয়োপলক্ষে আমাদের মনের কোণে আরও দুটী বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীর নাম উদয় হইতেছে—তাঁহারা হইতে-ছেন আমাদের বন্ধুবর 'ইমিউনিটি"র কর্ণধার ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত ও অধ্যাপক-প্রবর শ্রীরাজ কুমার চক্রবর্ত্তী। ক্যাপ্টেনের জীবনে যুগান্তর আসিলে শুধু আমরাই খুসী হইব না। ক্যাপ্টেন-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মচারীবৃন্দও কঠোর কর্ম্মকর্ত্তার নীরস হৃদয়ে সঞ্জীবিত শীতলতার প্রাদুর্ভাবে বহুলাংশে শান্তি পাইবে। 'ব্যাচিলরের' রস-হীন রক্ত-চক্ষুর পরিবর্ত্তে কল্যানীর শাসন-বদ্ধ প্রভুর দরদী হৃদয়ের পরিচয় লাভে তাঁহারাও যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন তাহাও আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি। সুশীলকুমার 'ব্যাচিলর'-সঙ্ঘের মায়া কাটাইবার পর এ আশা দুরাশা নহে !!!

ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী

বর্ত্তমানে দেশব্যাপী স্বাধীনতার যে আন্দোলন ক্রমশঃ সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে তন্মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জ্জনও অন্যতম। স্বাধীনতার আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলনকেও চালাইতে হইবে। তাই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইয়াছে ঐ সকল প্রদেশে ইতি মধ্যেই আইন দ্বারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন শুরু হইয়াছে।

আবহমান কাল হইতেই ভারতবর্ষ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত। তাহার শিক্ষা তাহার আদর্শ যে মহান্ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে শুধু সাম্যের ভাবই বজায় থাকিতে পারে। কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা চঞ্চলতা ভারতবর্ষের আদর্শ বিরুদ্ধ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণে ও লালসা নীতির আপাতঃ মধুর আস্বাদনে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ নৈতিক আদর্শের অবনতি ঘটিত থাকে। যে শুচিতার আবহাওয়া ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ছিল তাহা ক্রমশঃ পঙ্কিলতায় পূর্ণ হয়। এমন সময়ে ত্যাগমন্ত্রের ঋষি মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে নূতন প্রেরণা আনয়ন করেন। সে ত্যাগের মন্ত্রে ভারতবর্ষ লোক চক্ষে গরীয়ান ছিল, পুনরায় ভারতবাসিকে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি অগ্রসর হন। ভারতবর্ষও এই আহ্বানে সাড়া দেয়, এই আন্দোলনকে অব্যাহত রাখিয়া জাতীয়তার ভাব প্রসারকল্পে মিনার্ভা মুভিটোন মাদক দ্রব্য বর্জ্জন নীতিকে ভিত্তি করিয়া এক সুমধুর চিত্র নির্ম্মান করে। মাদক দ্রব্যের প্রভাবে মানব চরিত্রের কতদূর অবনতি ঘটিতে পারে, মানুষ তাহার মনুষ্যত্ব কী ভাবে হারাইয়া ফেলে তাহার পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া ছবিখানি তোলা হয়। ছবিখানির নাম "মিঠা জহর।"

"জহর কখনও মিঠা হইতে পারে না। কিন্তু আপাততঃ সুখের প্রলোভনে পড়িয়া মানুষ প্রথমে এই বিষকেই অমৃত জ্ঞানে পান করে। ফল হয় বিষময়।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলী ছবিখানি দেখিয়া ছবিখানির উচ্চ প্রশংসা করেন। সময়োপযোগী এই ছবিখানি তুলিয়া মিনার্ভা মুভিটোন যে স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়াছেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ছবিখানার পরিচালক সোরাবমোদীকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে এরূপ ছবির আরও প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং এরূপ ছবির প্রচলন যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনও ততই ফলপ্রসূ হইবে।

ছবিখানার পরিচালনা করিয়াছেন মিঃ সোরাব মোদী। বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় "খান বাহাদুর" ছবিখানা চিত্র জগতে চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। ছবিখানা দেখিতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ যথেষ্ট লোকের ভীড় হইত। উক্ত ছবির প্রযোজক মিঃ সোরাব মোদী এই ছবিতেও তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নাসিম, জাগীরদার, ইয়াচ, শিলা, শান্তা দত্ত, সাদাতালি প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গও এই ছবিতে অভিনয় করিয়াছেন।

ছবির গল্পাংশ খুবই সরল এবং শেষ পর্য্যন্ত কোথায়ও খেই হারাইয়া যায় নাই। ঘটনার সাবলীল গতি শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে অব্যাহত থাকায় বুঝিবার পক্ষে দর্শকদের কোনই বেগ পাইতে হয় না। নরেন একজন প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী, প্রকাণ্ড এক মিলের মালিক সে, গৃহে লক্ষী স্বরূপিনী স্ত্রী করুণা। এক কথায় সুখের সংসার, কিন্তু এই সংসারেও অবশেষে অশান্তি প্রবেশ করিল। ভগবতীচরণ নামক জনৈক ব্যক্তি পূর্ব্বে করুণার প্রণয়াকাঙ্খী ছিল। ব্যর্থ প্রেমের প্রতিশোধ লইবার মানসে সে নরেনের সংসারে প্রবেশ করে এবং নরেন ও করুণার বিশ্বাস ভাজন হইয়া তাহাদের চরম অনিষ্ট সাধন করে, কিন্তু ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী পর্দ্দার গায় নিপুনভাবে তাহাই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

শ্রীশনি গুপ্ত

পাঁচখানি ছবি

চিত্র নির্মাণে অর্থের ছিনিমিনি চলে হলিউডে, খবর রাখেন বোধহয়। একখানা ছায়াছবিকে যতপ্রকারে সম্ভব সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে ত্রুটি রাখেন না কর্তৃপক্ষ। ফলে জলের মত বয়ে চলে খরচের স্রোত। প্রযোজকের সন্তোষ উৎপাদন না করা পর্য্যন্ত আর তার বিরাম নেই। শিল্প-কলায়, অভিনয়ে, দৃশ্যসজ্জায়, রূপসজ্জায় পোষাক পরিচ্ছদে, তারপর, আলোক-চিত্র ও শব্দ-গ্রহণ কোন কিছুতেই একটু খুঁত থাকবার উপায় নেই। বিশেষজ্ঞরা ঠায় বসে আছেন যে যার বিভাগের পাহারায়। যে অংশটা মনঃপূত হচ্ছে তা করছেন 'ও, কে,' (অর্থাৎ ঠিক হ্যায়) আর যেটাতে মনে সাড়া জাগছে না, বলে উঠছেন 'চালাও রিটেক'। এই হলো ব্যাপার!

কিন্তু ব্রিটিশ ষ্টুডিয়োও হলিউডের কাছা-কাছি এগিয়েছে প্রায়। সম্প্রতি একটা সংবাদে প্রকাশ যে, এই বৎসরের মধ্যেই কয়েকখানি চিত্রগ্রহণে এরা খরচ করবেন ২০০০০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০০০০০০০ টাকা। কাণ্ডখানা কি একবার ভেবে দেখুন দেখি!

এই বিরাট অঙ্কের মধ্যে ৭৫০০০০ পাউণ্ড শুধু খরচ হবে পাঁচখানি ছবির জন্যে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ভুবনবিখ্যাত তারকা গ্রেসি ফিল্ডের নতুন অপেরা ছবি আরম্ভ হয়েছে, 'কিপ্ স্মাইলিং'। এর জন্যে খরচ হবে, এক লক্ষ পাউণ্ড বা পনেরো লক্ষ টাকা।

আর একখানি ছবি, গিলবার্ট ও সুলি-ভানের অপেরা, নাম 'দি মিকাডো'। এখানি আগাগোড়া 'টেকনিকলার'। সুতরাং এই বহুবর্ণরঞ্জিত ছবিখানার খরচও একটু বেশী, মাত্র দুলক্ষ পাউণ্ড।

তারপর ওদেরই আর একখানা ছবি 'ইয়োম্যান অব দি গার্ড।—একটু সস্তাই বলতে হবে, মাত্র দেড়লক্ষ পাউণ্ড।

বার্গনারের ছবি 'ষ্টোল্‌ন্ লাইফ'—এক লক্ষ পাউণ্ড।

সর্ব্বশেষে যুদ্ধজয়ীবীর নেলসনের চমকপ্রদ জীবনী অবলম্বনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ট্রাফাল-গারের যুদ্ধের রূপ ও বাণী মুখরিত চিত্র, সুপ্রসিদ্ধ তারকা লেস্‌লী হাওয়ার্ডের নবতম অবদান!—এতে ব্যয় হবে দু'লক্ষ পাউণ্ড।

জিনজার-জননীর প্রেম

স্ত্রীলোকের দ্বিবিবাহ আজগুবি নয় হলিউডে। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েরা এ সময়ে প্রতিষ্ঠাবান পাণিপ্রার্থী এড়িয়েই চলে থাকে, এই তো জানতাম। কিন্তু জিন্‌জার-জননী রজার্স এর একটী বিশেষ ব্যতিক্রম।

জিনজার-জননী শুনে অন্য কিছু ধারণা করে নেবেন না যেন। অটুট দেহসৌষ্ঠবে ও রূপের জোয়ারে ইনি যেন জিন্‌জার রজার্সের ভগ্নী! এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি জিন্‌জারকে দেখে যারা উল্লসিত হন, জিন্‌জার-জননীকে দেখে তাদের বিমুখ হতে হবে না।

মে ওয়েষ্ট

জিন্‌জার প্রসিদ্ধা হবার বহু পূর্বে থেকেই লেলা রজার্স সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে আছেন।

সম্প্রতি এর নামটী জড়িয়ে পড়েছে জে এজার হুভার নামক এক বিখ্যাত ভদ্রলোকের সঙ্গে।

ওরা দুজনেই কিন্তু প্রাণপণ মাথা নেড়ে গুজবটা অস্বীকার করবার চেষ্টায় আছেন।

বাদী মে ওয়েষ্ট

এককালে মে ওয়েষ্টকে নিয়ে কানাকানি ফুসফিসির অন্ত ছিল না। বিশ্বের মনরাজ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে ছিলো মে ওয়েষ্ট।

বর্ত্তমানে একটী বিচিত্র ঘটনায় আবার গুজব ও জটলার সূত্রপাত হয়েছে।

মার্ক লিণ্ডায়ের প্রতিনিধিরূপে এ্যাটর্ণী জে, এফ, রুবেন দশ লক্ষ ডলারের (ত্রিশ লক্ষ

গ্রেটা গার্বো

টাকার) দাবীতে শ্রীমতী ওয়েষ্টের বিরুদ্ধে একটী মোকদ্দমা রুজু করেছেন। মিঃ রনেন বলেন, 'দি ডান্ হিম রঙ্গ' ছায়াচিত্রের লভ্যাংশ হিসাবে এটা ওর মক্কেলের প্রাপ্য।

প্রত্যুত্তরে শ্রীমতী ওয়েষ্ট বলেন, আলোচ্য বাণী চিত্রের মোট চল্লিশ লক্ষ ডলারের লভ্যাংশ তার পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সে স্থলে তিনি পেয়েছেন মাত্র পঁচিশ হাজার ডলার। লিওয়ার এই অর্থের প্রাপ্য অংশ যথারীতি পেয়েছেন।

ক্যারল লম্বার্ড

টুকরো খবর

শ্রীমতী ক্লারা বো এখন দ্বিতীয় সন্তানের জননী। কিন্তু এতে তিনি সুখী নন, স্বামীকে টেলিফোন যোগে জানালেন: একটী মেয়ে হলেই হতো ভালো।

ক্লারার স্বামী মিঃ রেক্স বেল্ সানন্দে জানালেন, ছেলেই আমার ঘরের আলো।

* * *

শ্রীমতী ক্যারল লম্বার্ড ও ক্লার্ক গেবল দুজনে পরস্পরের বন্ধু। এ খবর আপনাদের অজানা নয়। সম্প্রতি লম্বার্ড তার বন্ধুর নূতন নামাকরণ করেছেন, 'প্যাপী'।

* * *

তারকামালার মধ্যমণি শ্রীমতী গ্রেটা গার্বো অভিনীত নবতম বাণীচিত্রে নায়ক সাজবে 'উইলিয়াম পাওয়েল'।
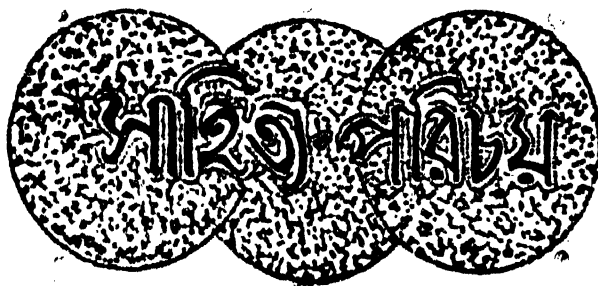
[জয়শ্রী]—মহিলাদিগের মাসিক পত্রিকা। মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। সম্পাদিকা—শ্রীলীলাবতী নাগ। বার্ষিক মূল্য সডাক ৫৲ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৵৹। ২২সি অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বহুদিন পূর্ব্বে বাংলার নারীকর্ম্মী সমাজের মুখপত্র হিসাবে "জয়শ্রী" ঢাকা হইতে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলাবতী নাগের সুষ্ঠু পরিচালনায় পত্রিকাখানি স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিচালিকাগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক মতবাদের জন্য রাজরোষে পতিত হ'ন এবং তাঁহাদের অধিকাংশই অন্তরীনাবদ্ধ হ'ন। বহুদিন পরে পরিচালিকাগণ সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বাংলার নারীকর্ম্মী সম্প্রদায়কে কর্ম্মোৎসাহে উদ্দীপ্ত করিতে এরূপ একখানি পত্রিকার প্রচার অবশ্য প্রয়োজনীয়। বিশ্ব রাজনীতি ধারার সহিত সংযোগ রাখিয়া স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে নারীকর্ম্মীদল "জয়শ্রী"-র পৃষ্ঠা হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্যলাভ করিতেন সুতরাং অদ্য মুক্তিপ্রাপ্তা নারী কর্ম্মীগণ যে আবার নবোৎসাহে "জয়শ্রী" পরিচালনা করিতেছেন তাহা বিশেষ আনন্দের কথা।

শ্রাবণ সংখ্যা "জয়শ্রী" আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দেশের নারী সমাজের চিন্তাধারা কোন দিকে ধাবিত হইতেছে বা তাঁহারা কোন দৃষ্টিকোণ হইতে দেশের ও দশের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন "জয়শ্রী"-র পৃষ্ঠায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য পত্রিকা-

খানির প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে ও সম্পাদকীয় নিবন্ধে যে দৃষ্টি ভঙ্গির আভাষ পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে বাংলার নারী সমাজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হয়। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বর্ত্তমানে বহু আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইয়াছে —সেগুলি দূর করবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিকার লেখনী সতেজ ও স্পষ্টভাবে চালিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ দেশমুখ কর্ত্তৃক আনীত হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমর্থন লাভ করিবে।

সম্পাদকীয় নিবন্ধে উক্ত প্রসঙ্গে নারী-সমাজের মতামত যেরূপ সাহসের সহিত ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হইলেও তরুণ সম্প্রদায়ের চিন্তা করিবার কিছু নেই। যুগে যুগে সামাজিক আচার ব্যবহারের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহা ব্যতীত হিন্দু সমাজে বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত ছিল।

পত্রিকাখানির ছাপা ও বাঁধাই সুরুচির পরিচায়ক। আমরা "জয়শ্রী"-র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—শ্রীসনাথ

গান

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চকোর চাঁদের পানে মেলেছে ডানা।
ওগো মেঘ, পথি-মাঝে দিওনা হানা॥
এখন বনের বুকে
মলয় খেলিছে সুখে,
হে নিঠুর, সে কথাও নাহিকি জানা?
আকাশের চাঁদে কেন চকোর-ছায়া
জান না কি? এযে প্রেম—মিলন-মায়া।
জগতের যে-বোঁটায়
যে-ফুল ফুটিতে চায়,
কেউ তা'রে কোন দিন কোরোনা মানা॥

রাত্রি এখন হোয়েছে গভীর

শ্রীসমীর ঘোষ

রাত্রি এখন হোয়েছে গভীর,
গভীর হোকনা তোমার ঘুম।
পৃথিবী এখন শান্ত ও স্থির,
ট্যাক্সিচলায় নেইকো ধুম।
ট্রামলাইনের চাকার দাগ যে
গড়িয়ে চলেনা রূপালি পাতে;
ঝলমলি হোয়ে বিজলী রাগ যে
আলো কোরে কালো দেয়না রাতে;
এখন শুধুই গভীর রাত্রি
তন্দ্রানামুক নয়নে তোর।
আমার কলম নিয়ে সে যাত্রী
আরবী অশ্ব ছুটবে জোর।

বাড়ছে রাত্রি টেবিলে আমার
জাগছে রজনীগন্ধা দল।
তোমার চুলেতে অজানা আঁধার
কোরছে আমারে কি চঞ্চল।
সিগারেটে আর নেইকো আগুন,
ঘরে কিকে হোল ধোঁয়ার জাল;
নীরবতা এলো ঘনিয়ে দ্বিগুণ—
বাইরে উড়ছে বাদুড় পাল।
আকাশে কইছে নীরব ভাষায়
আধেক হাসিয়া তারকা ম্লান:
মরেছে চন্দ্র নিরাশ আশায়,
গাইছে পৃথিবী সমাধি-গান।

কৃষ্ণচিক্কনী সূর্য্যালোকেতে
কয়লা দিয়েছে ছড়িয়ে আজ।
কৃষ্ণচূড়ার কোমল বুকেতে
দিয়েছে বাতাস হেনেছে বাজ।
এ সবে তোমার কোন কাজ নাই—
ঘুমাও এখন শান্ত মেয়ে;
সোনালী তন্দ্রা জেলে রোশনাই
নামুক চোখের পলক বেয়ে।
আমার কলম ছুটবে এখন;
উড়বে না হয় বোমারু যান:
হরিনীর মতো এরো নয়ন
ঘুমে ঢাকা থাক দুই নয়ন।
না হয় জ্যোৎস্না বাতায়ন পথে
ঘরে ঢুকে দিক দোলায়ে চুল;
নিশীথ মায়ার স্বপ্ন জগতে
ঘুমাও আমার ছোট্ট ফুল।
রাত্রি গভীর, সহর ঘুমাও
ঘুমাও আমার রাতের রাণী:
জঁগল পাখী সে তীক্ষ্ণ চুমায়
নাইবা জানালো প্রেমের বাণী।

পিচকালো পথে রিকসার গাড়ী
মাঝে মাঝে মৃদু ঘন্টি বাজে:
হলদে রঙেতে ঢাকা মোর বাড়ী—
কারখানা বুকে প্রেম কি সাজে?
তার চেয়ে বসে চুপচাপ আমি
কাগজ কলম সামনে নিয়ে;
সেইকের মতো নীল ঘুম নামি'
আসুক দুচোখে তোমার প্রিয়ে।
সাগর ফেণার শুভ্র বিছানা
তোমার শিথিল অঙ্গ ছুঁয়ে,
কল্পনা কতো জাগাবে অজানা
রেখায়িত কতো ভঙ্গী থুয়ে:
সাগরের জল কেটে যাওয়া কতো
জাহাজের মতো ডাকবে মোরে
কলম আমার হুইলের মতো
বাগিয়ে তাহারে ধরবো জোরে।
তারপর কতো সোনা ঢেউ আর
প্রবালপুঞ্জ পেরিয়ে যাবো
ঘরের দেয়ালে জমছে আঁধার
কখন তোমারে তেমনি পাবো।

সমালোচনার গলদ কোথায়?

মাননীয় "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় আমার এই সামান্য পত্রখানা ছাপাইলে বিশেষ বাধিত হ'ব। এতদিন ধরে দেখে আস্‌ছি যে, বাংলা দেশে ছবির সমালোচকের অভাব নেই; তাই একটা ছবি মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে কাগজের মারফৎ নানা রকম সমালোচনার বহর দেখা যায়, তাতে আজ পর্য্যন্ত ভাল মন নিয়ে কোন ছবিই দেখতে পারা যায়'না। ছবি দেখতে যাওয়া মানে কয়েক ঘণ্টা নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে সময় কাটিয়ে দেওয়া বইত নয়? তাতে যদি আগে থেকেই কাগজ পড়ে একটা খারাপ ভাব নিয়ে যাওয়া যায়, তা হ'লে বোধহয় শেষ পর্য্যন্ত সেই আমোদটা উপভোগ করতে পারা যায় না। প্রযোজক মহাশয়রা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ছবিখানিকে সব দিক দিয়ে ভাল করতে। কিন্তু অনেক সময় হয়ত অর্থাভাবেই হোক্ কিংবা সময়োপযোগী উপকরণের অভাবেই হোক্ তাঁরা ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর কোরতে পারেন না। তার জন্য বিদেশী কোনও ছবির সঙ্গে আমাদের ছবির তুলনা করা সব সময়ে উচিৎ নয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ওদের দেশের ছবির অবস্থা কি রকম ছিল? আর বর্ত্তমানেও যে উহাদের ছবি একেবারে নির্দ্দোষ হয় এমন কথা স্বীকার কোরতে পারি না। কারণ কয়েক খানা নাম করা ছবি যাহা সকলেই হয়ত দেখে থাকবেন এবং দেখে এত বেশী অন্ধ হয়ে পড়েছেন যে তার দোষ ত্রুটী একেবারেই চোখে পড়ে না। পড়লে যে প্রকার সমালোচনার বহর দেখা যায় তাতে ক'রে একটু আধটু এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়ত।

আমাদের সমালোচকরা শুধু বাংলা ছবির দোষ ত্রুটি নিয়াই ষোলআনা সময় ক্ষেপণ কোরে থাকেন। কিন্তু তাঁ'রা একবার ভেবেও দেখেন না যে, বাংলা ছবি কতদিনের। এই অল্পদিনের মধ্যেই এরা কতটা উন্নতি করেছেন। অথচ তার জন্য বাহাবা দিতে আজ পর্য্যন্ত কাকেও দেখলাম না। উপরন্তু যে সমস্ত ফিল্ম কোম্পানী একটু আধটু উন্নতির চেষ্টা করছেন তাঁদের পেছনে আমরা লেগে ছিদ্র খুঁজে খুঁজে নিরুৎসাহ করে দি'চ্ছ। সমালোচনা করবার সময় একবারও ভাবি না যে আমাদের শিক্ষা দীক্ষাই বা কতদিনের। এখনও আমাদের শিখবার যথেষ্ট রয়েছে। প্রথম প্রথম একটু-আধটু দোষ ত্রুটী থাকবেই। একবার ভেবে দেখুন দেখি ওদের এ পর্য্যন্ত আসতেই বা কত যুগ কেটে গেছে। আমাদেরও ওদের মত ফিল্ম শিল্পে সমান নিপুণতা অর্জ্জন করতে কিছু সময় লাগবে বৈকি। নিজেদের সৃষ্টি (Originate) করবার মত সময় এখনও যায় নি।

একবার ভেবে দেখুন দেখি যে যাদের দেশের এই জিনিষ বহু যুগ ধরে চলে আসছে, শিক্ষিত এবং বড় বড় মাথাওয়ালা প্রযোজক তাদেরই বা এরূপ মারাত্মক ভুল হয় কেন? আর সে সব ভুল আমাদের চোখেই বা পড়েনা কেন? বিদেশী ছবি কিনা, তাই ভুল ধরে কে?

স্যামুয়েল গোল্ডউইনের বিশেষ প্রশংসিত চিত্র "হারিকেন" অনেকেই হয়ত দেখেছেন। দক্ষিন মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবন কাহিনী অবলম্বন করে এই ছবির আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে। সে দেশের নর-নারীর ভূমিকায় "জন হল" ও "ডরোথী ল্যামুর" অভিনয় করেছেন। একদিকে সহজ সরল মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি ও অপর দিকে আইন ও শৃঙ্খলার মাঝে মানুষের কোমল বৃত্তির বিসর্জ্জন। এই পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ছবির মধ্যে ভালভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভীষণ ঝটিকার যে রুদ্রমূর্ত্তি ও তাণ্ডব লীলার দৃশ্য ছবিতে দেখান হ'য়েছে তা অতি চমৎকার। ছবিখানাও বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি প্রবল ঝটিকা ও তার আনুসঙ্গিক দৃশ্যাবলী দেখিয়ে আমাদের চোখে এম্‌নি তাক লাগিয়ে দিলে যে ৬০০ মাইল দূরথেকে সামান্য একখানা ডাঙ্গা ছোট নৌকা করে (অবশ্য চুরি করে নেবার সময় নৌকাখানা বেশ বড় এবং সুন্দরই ছিল) সমুদ্রের বক্ষদিয়ে আগত পলাতক আসামীর "নৈনীতাল আলু ভাতের মত মুখখানা" এবং Dinner—খাওয়া চেহারা কাহারও চোখে পড়ল না। আমার মনে হল যে ওদের দেশের লোকের হয়ত দাড়ি কিংবা গোঁফের বালাই নেই।

আর এদিকে বাংলা ছবিতে যদি স্নান করবার পরে কাপড় ও শরীর না সিক্ত হয় অথবা বাহুতে বসন্ত প্রতিষেধক টিকা লইয়া ইন্দ্রের শচী, কৃষ্ণের রাধা ইত্যাদি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (অবশ্য পরিচালকগণ এসব খুটি-নাটি একটু লক্ষ্যকরিলেই শুধরে নিতে পারেন) তবেই চারদিক থেকে সকলে হৈচৈ করে উঠেন। ১৮ বৎসরে রমেশবাবুর পরিবর্ত্তন বেশ হয়েছিল। কিন্তু রমা দেবীর কোন পরিবর্ত্তন না দেখানো খুবই দৃষ্টিকটু হয়েছিল। অতবড় একজন পরিচালকএর এই প্রকার ভুল ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু হারিকেন ছবির জেলের আসামীকে দেখে আমরা স্যামুয়েল গোল্ডউইনের সকলকেই

কথা করেছি। ঝড় দেখেই ঠাণ্ডা। হা হতভাগ্য বাংলার ডিরেক্টর বাহাদুরগণ।

* * *

পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারে অনেক সময় দেখা যায় যে একই ব্যক্তি একই পোষাকে একবার মুসলমানের টুপী পরে মোগল বাদশার দারবক্সী হয়, আবার পরের দৃশ্যে ঐ পোষাকেই মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে হয় রাজপুত সৈনিক। এর কারণ বোধ হয় বড় বড় ভূমিকার দিকে এত বেশী নজর রাখতে হয় যে ছোট ছোট ভূমিকার দিকে কাহারও খেয়ালই থাকে না। তেমনি দেখলাম ম্যারী ওয়ালেওস্কায় (Marie Walewaska) ভিতর Charles Boyerকে নেপোলিয়ানের সাজ সাজাতে গিয়ে তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী এক মন্ত্রী কিংবা যাই হোক যাহার মাথার চুল থেকে সমস্তই শুভ্র এবং চাসড়াও কুঁচকে গেছে তার অত বড় চওড়া ভ্রূ জোড়া কলপ দিয়ে একেবারে কুচ কুচে কাল ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। আবার পরের দৃশ্যে দেখলাম যে উহা শুভ্র হয়ে গেছে। মনে হলো চুলগুলো হয়ত এচোড়ে পেকেছিল তাই এতদিন ভ্রূ কাল ছিল। সময় হতেই হঠাৎ পেকে গেল। বলি এরা ত আর বাঙলা দেশের ডিরেক্টর নন্ যে, ইন্দ্রের স্ত্রীর হাতের টীকার সমালোচনায় ভয় পাবে।

নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে অনেক সময় অনেক কিছুই চোখে পড়ে। অনেকদিন আগের একখানা ছবি অনেকে হয়ত দেখে থাকবেন। নাম "KIKI"। ডগলাসের সহধর্ম্মিণী অভিনয় করেছেন। অত বড় একজন অভিনেতার স্ত্রী এবং নিজে একজন এত বড় অভিনেত্রী হয়েও কিনা একটি তিলকে (Mole) সপ্তর্ষী মণ্ডলের মত মুখের চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হয়রান করিয়ে শেষে এক যায়গায় এনে স্থির করে বসিয়ে দিলেন। এ সমস্ত বড় বড় কোম্পানীর বড় বড় প্রযোজকদের সমস্ত বছরের পরিশ্রমের ফল কিনা তাই আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারি না। আর বাংলার প্রযোজক এবং ফিল্ম কোম্পানির জন্ত আমরা রাখি শুধু উপহাসের টিট্‌কার ধ্বনি।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৫২।৩বি মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ঘর-জামাই

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তিন

সরমা রাগের মাথায় যে কি বলে গেল তা বুঝতেই নিজের খানিক্ষণ সময় কেটে গেল। এঘটনার সময় তার মা বাপ সামনে না থাকলেও আড়াল থেকে সব শুনেছেন এবং এতটা বাড়াবাড়ি জামাইর ভাল নয়। কিছু শিক্ষা হোক বলে এগিয়ে এসে মিটমাটের চেষ্টা তো করেনই নি বরং দূর থেকে সায় দিয়েছেন।

শ্বশুর গিন্নিকে বললেন—আমার কপালে যে এমন জামাই জুটবে একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—সবই বরাত। আমি একটা পয়সা খরচা করি না, রোজগার ছাড়া আর এ ব্যাটা কেবল তালে আছে খরচাই কোরবার। একটা আধলা রোজগার করবার ক্ষমতা নেই ওর। খবরদার তোমায় বলে রাখছি এবার আমার বাড়ীতে এলে বলবে রোজগার করতে শেখতো থাক নয় আমি তার ঝক্কি পোয়াতে পারবো না। এই পষ্ট কথা। যতো অনিষ্টের গোড়া তো তুমিই—হা হা তুমি। তোমার জন্যেই যত সব ইয়ে আমার বরাতে জোটে। ইত্যাদি।

—ওমা আমার দোষ কি। গিন্নী গালে হাত দিলেন। আমি ওর মাকে সব কথা দিয়েছিলাম এইতো। তা বাপু আমি কি জানতুম ছেলে এরকম হবে।

সরমা প্রথমে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। দিব্বি চান করে খেয়ে বেশ পরিপাটী করে দোক্তাসহ পান মুখে দিয়ে তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিলো ঘুমুবার চেষ্টায়।

ঘুম কিন্তু এলোনা। শত হলেও......। কাজটা সত্যি ভাল হয়নি। আর ভাল হয়নিইবা বলে কি করা, যে রকম হতে চলেছিল সেটা একবার খেয়াল আছে। তাই বলে নিজে স্ত্রী হয়ে এতটা...না: ভাল হয়নি ছি ছি দুপুর বেলা খেতে এসেছিল, এসময় যে মানুষ বেড়াল কুকুরকেও...ন: কি হলে। সরমা উঠে বসলো। এখন কোথায় গেল নিশ্চয় ঐ সব বদমাইস্ বন্ধুগুলোর কাছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে তিনটে বেজে গেছে। তাইতো? সরমা জানালায় কাছে এসে রাস্তার দিকে চাইল। জঞ্জালের গাড়ী বেড়িয়েছে। রাস্তায় জল দিয়েছে। একটি লোকও রাস্তায় নেই, ভয়ানক রোদ্দুর। ঐ মোড়ে কে আসছে না, সে-নিশ্চয়ই—না সে তো নয়? সরমার মন বেশ কি রকম হয়ে গেল। সে যদি কোথাও চলে যায়। ওমা কি সর্ব্বনাশ! তাহলে? সরমা ঘরের বাইরে এসে চাকরটাকে ঘুম থেকে তুললো—ওরে যা দিকিন্ একবার ঐ চায়ের দোকানে। খবর নিয়ে আসবি জামাইবাবু ওখানে আছেন কিনা কিংবা কোথায় গেছেন। যা শিগ্‌গির যা।

চাকর চলে গেল।

সরমা আবার নিজের ঘরে ফিরে এলো। ও কতো বলেছে দেখ যেখানে হয় একটা কিছু যোগাড় করে নাও, থাকলোই বা বাবার পয়সা তবুও তার ঘাড়ের উপরে বসে খাওয়া কি ঠিক। তা তখন কানে ও তোলেনি। আর কিইবা করবে, চাকরী তো আর রাস্তায় পড়ে নেই। ঐ তো পিসে মশায়ের ভাই বসে আছে আজ চার বছর তিন তিনটে পাশ দিয়ে। সরমার রাগ হল বাপমার ওপর ছটো নয়, দশটা নয় একটা জামাই—তার উপর কি রকম ব্যবহার—উঃ জনমে দেখিনি। ভগবান—সরমা হাত জোড় করে দেওয়ালে টাঙ্গান ক্যালেণ্ডারের কৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলো—হে ভগবান ওকে ভাল ভাবে বাড়ীতে ফিরিয়ে দিও ঠাকুর।

চাকর এসে বললে: না চায়ের দোকানে তো বাবু যায় নাই। সেখানকার এক বাবু বললে: দুপুর বেলা জামাইবাবু তাদের বলেছে যে 'চল্লুম ভাই এখান থেকে, কোথায় বলবো না, তবে বোধ হয় আর জীবনে ফিরবো না, বলে কোথায় চলে গেছেন তারা তা জানে না।

সরমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। তাহলে সে তো চলে গেছে। 'মাগো' বলে সে বিছানায় শুয়ে কেঁদে ফেললো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শাশুড়ীর মনটা এখন সত্যিই কেমন কেমন করছে। শ্বশুর অটল, বলে যাবে কোথায়, একমুঠোর যার বাইরে সংস্থান নেই—ফিরে তাকে আসতেই হবে। অতো ভাবনা চিন্তায় দরকার কি। বাছাধনকে ফিরে আসতে হবেই'।

রাত্রি বারোটা। মা মেয়ের পাশে বসে রয়েছেন গালে হাতদিয়ে। সত্যিই তো এসনা এখনো বড় ভাবনায় বিষয় হল। তিনি মনে মনে সমস্ত জাগ্রত দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন। কি হল বাছার। অনুতাপ এলো প্রথমে, পরে এলো হতাশা। শেষে রাগ মেয়ের উপর—

—তুইও যেমন হয়েছিস কি দরকার ছিল অতো কথা বলবার বুঝিয়ে বললেই হতো। তা নয় একেবারে তুমুল কাণ্ড করে ছাড়লি। হাড়ে হাড়ে জ্বালালি আমাকে তুই, এখন আমি কি করি।

সরমা অন্য সময় হলে হয়তো আরেকটা তুমুল কাণ্ড করে বসতো কিন্তু এখন তার মন ভয়ানক চিন্তাক্রান্ত। বুকের ভেতর যেন কেমন কেমন করছে। রাত্রি একটা। বাপ বাইরে বেড়িয়ে দেখলেন মা মেয়ে এখনো ঠায় বসে। ধীরেন তবে কি··· তারও মনটা কিরকম খারাপ হয়ে গেল। কোন দিন তো সে······।

সে রাত্রি কেটে গেল। কিন্তু ধীরেন ফিরে এলো না। সে যে নিরুদ্দেশ হয়েছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বেলা দশটায়ও যখন ফিরে এলোনা তখন সরমা আর থাকতে না পেরে বাপের কাছে গিয়ে বললে—এখন কি হবে বাবা। কোথায় গেল, কি হল একবার খোজ নাও।

খোজ আর কোথায় নেবে। কচি খোকাটীতো আর নয় যে থানায় খবর দেবে। চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করাতে তারা সবাই একবাক্যে অস্বীকার করলো।

বেশী রটানও ঠিক নয় পাছে লোক হাসে। পাছে ভিতরকার লজ্জাস্কর ব্যাপারগুলি লোকের কানে যায়। যতটা সম্ভব চুপি-চুপি চেষ্টা করা দরকার।

চুপি চুপি কিন্তু হল না। পাশের বাড়ীর সুরেশ উকীল যিনি বর্ত্তমানে মক্কেলাভাবে কুড়ি টাকার টিউশানির উপর নির্ভর করিয়া বেকার বাড়ী বসিয়া থাকেন ও পাড়ার যতো মন্দানন্দ খবর সংগ্রহান্তে সম্যক আলোচনা করে দিন গুজরান করেন, তিনি বর্ম্মাচুরুট মুখে করে এসে বল্লেন—ব্যাপার কি মিত্তির মশাই, জামাইটি শুনছি পালিয়ে গেছে।

আর হঁ্যা এই দেখুন না বিপদের উপর বিপদ। 'বিপদের উপর' কথাটা মিত্তির মশায়ের মুদ্রাদোষ; এই কালকে সকালে হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কোথায় যে চলে গেছে। মেয়ে, গিন্নি তো দেখুন কান্না জুড়ে দিয়েছে। মহা মুস্কিলেই পড়েছি।

ধোয়া ছেড়ে সুরেশ উকীল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বল্লেন—একেবারেই কি কিছু হয়নি? শুধু শুধুই লোকটা চলে গেল? না না ওটা কি আর কাজের কথা হল মিত্তির মশাই? আজকালকার ছেলেরা কিন্তু কথায় কথায় কি বলে আপনার সুইসাইড মানে আত্মহত্যা ক'রে বসে।

মিত্তির মশাইয়ের প্রাণটার ভেতর যেন ধপ করে বাতি নিবে গেল। আত্মহত্যা! সেকি, হ্যা, আচ্ছা; হ্যা হ্যা আমি যাহোর একটা ব্যবস্থা এক্ষুনিই করছি। তিনি যেন বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। শক্ত হলেও জামাই তো, তার উপরই নির্ভর করছে একমাত্র মেয়ের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ। কি করবেন প্রথমে মাথায় এলোনা। থানার দিকে শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বঙ্কিম সাহিত্যে প্রীতিবাদ

অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত অজ্ঞাতসারে কপালকুণ্ডলার একটি প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাই বঙ্কিম-সাহিত্যের মর্ম্মকথা। কাপালিক-পালিতা অরণ্যবিহারিণী কপালকুণ্ডলা গৃহিনী সাজিলেও অন্তরে যোগিনীই রহিলেন, প্রণয়িনী হইতে পারিলেন না,—ফুল হইয়া ফুটিলেও ফুটিবার সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। একদিন শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?" তাহার উত্তরে কপালকুণ্ডলা বলিলেন,—"লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?" ফুলের কি?—তাহা শ্যামাসুন্দরী বলিতে পারিলেন না। কমলাকান্ত হইলে বলিতেন,—"পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না, (লোকের সুখেই তাহার সুখ)।" ইহাই পুষ্পের ধর্ম্ম, এবং যাহা পুষ্পের ধর্ম্ম তাহা মানবজীবনেরও ধর্ম্ম, বিশ্বপ্রকৃতিরও ধর্ম্ম।

পুরাতন হইলেও একথা নূতন করিয়া প্রণিধান করিবার আবশ্যকতা আছে। বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে সেই শক্তি প্রীতির সহিত যুক্ত না হইলে কি ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে বর্ত্তমান ইউরোপ তাহার বীভৎস দৃষ্টান্ত। প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের অভাবেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিশাল হর্ম্ম্য টলমল করিতেছে, বলের বন্যায় দুর্ব্বলের অধিকার ভাসিয়া যাইতেছে, অত্যাচারীর হুঙ্কারে আর্ত্তের ক্রন্দন নিমগ্ন হইতেছে। মানুষ যে কখনও ইহা অপেক্ষা নিষ্ঠুর ছিল ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে ও মধ্য যুগে ধর্ম্মের অনুশাসন মানবমনের কুপ্রবৃত্তিগুলি অনেক পরিমাণে রোধ করিত। মধ্যযুগে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় ও ভারতবর্ষে বৈষ্ণব প্রভাবে যে প্রীতির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল তাহার নিদর্শন ইউরোপের ক্যাথিড্রাল ও বাঙ্গালার বৈষ্ণব গীতি-কাব্য। ধর্ম্মের সে বন্ধন এখন আর নাই। প্রেমের মন্দাকিনী আজ শুকাইয়া গিয়াছে, মানবের হৃদয় ঊষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং বাহ্যসম্পদের কুহকে মানুষ তাহার অন্তরের সুখ বিলাইয়া দিতে বসিয়াছে। মহাযুদ্ধের পর যে জাগতিক শক্তির আদর্শ লইয়া আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হয় তাহার মধ্যে প্রাণধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই বলিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারিল না। তাই বর্ত্তমানে জড়বাদী সভ্যতার লীলাভূমি ইউরোপের মনীষিগণ মনুষ্য সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সভ্যতার উপর ইউরোপের জড়বাদী সভ্যতা ক্রমশঃ যে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে তাহার লক্ষণগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বাঙ্গালীকে যে সতর্কবাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না, —"ইংরেজী শাসন, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 'মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির' উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজী সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি।......তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটু বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সব বেকল হইয়া যাইবে।" প্রশ্ন হইতে পারে, বিজ্ঞান যদি মানুষকে এমন করিয়া জড়বাদী করিয়া ফেলিতেছে, তবে কেন 'আনন্দমঠে' চিকিৎসক বিজ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সত্যানন্দকে অত উপদেশ দিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতীতি জন্মিয়া ছিল যে, ভারতবাসীকে উন্নতি করিতে হইলে, বিশ্বের দরবারে উচ্চ আসন পাইতে হইলে, বিজ্ঞানকে অবহেলা করিলে চলিবে না। প্রাচীন ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানের সমাদর ছিল, কিন্তু সে বিজ্ঞান মানবাত্মার গতি রোধ করিতে পারে নাই, পক্ষান্তরে ধর্ম্মের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত হইয়া তাহার পরিপুষ্টি করিয়াছিল যে পরবর্ত্তীকালে সেই বিজ্ঞানের বিলোপে প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মও লোপ পাইল। তাই 'আনন্দমঠে' এই ভারতীয় ঐতিহ্যের উল্লেখ করিয়া চিকিৎসক সত্যানন্দকে বলিতেছেন,—"ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।" বহিস্তত্ত্ব বা বিজ্ঞান কিরূপে মানবাত্মাকে ঈশ্বরমুখী করিতে সহায়তা করে এবং ঈশ্বরমুখী মানবাত্মা কিরূপে নিষ্কাম হইয়া "আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতিসাধন" ইত্যাদি ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 'অনুশীলন-তত্ত্বে' গুরুশিষ্যসংবাদে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই

প্রসঙ্গে গুরু বলিতেছেন,—"যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কামধর্ম্ম একত্র হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে।" সেইদিন মনুষ্য বিজ্ঞানের বলে বাহ্যসম্পদের অধিকারী হইয়া সেই বাহ্যসম্পদকে জীবনের কর্ম্ম-বেদীতে তাহার প্রীতি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিবে। নির্ব্বাণপন্থী বৌদ্ধধর্ম্ম এবং কর্ম্মহীন সন্ন্যাসের প্রভাবে ভারতীয় মনে বাহ্যসম্পদের প্রতি যে ঔদাসীন্য জন্মিয়াছিল তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয় নাই। তাই বাংলার নবযুগের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলদল-বিহারিণী কমলা'র প্রসাদ উপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে গীতাধর্ম্মসম্মত নিষ্কাম কর্ম্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই নিষ্কামধর্ম্মের অনুশীলনেই প্রীতির বিস্তার ও প্রীতির বিস্তারেই চিত্তের শুদ্ধি। সেই মনীষার ভাষায়,—"তাহা না হইলে ডোর-কৌপীন ধারণ করিয়া, সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিনাম করিয়া ফিরিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে, রাজসিংহাসনে হীরকমণ্ডিত হইয়া বসিয়াও যে রাজা জনৈক ভিক্ষুক প্রজার দুঃখ আপনার দুঃখের মত ভাবে তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। যে ঋষি বিশ্বামিত্রকে একটি গাভী দান করিতে পারিলেন না, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই।"

গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণে, অণুপরমাণুর নৃত্যকলরোলে প্রীতির যে "গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বপ্রকৃতির সেই মহাসংগীতের সহিত মানুষের হৃদয়তন্ত্রী যেদিন তাহার সুরযোজনা করিতে পারিবে, সেইদিন তাহার জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া সাফল্যে ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইবে। ইহাই উপনিষদের বাণী, ইহাই কমলাকান্তের বাণী এবং ইহাই আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে দাঁড়াইয়া,

বিশ্বপ্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মানুষ কখনও তাহার জীবন সার্থক করিতে পারে না। অতএব "অনুশীলন-তত্ত্বে" গুরু শিষ্যকে নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ জাগতিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই, যথাক্রমে আত্মপ্রীতি, দাম্পত্যপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতির "সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন" করিতে আদেশ করিয়াছেন।

আত্মরক্ষার্থে আত্মপ্রীতির প্রয়োজন থাকিলেও দাম্পত্যবন্ধনই পরপ্রীতির প্রথম সোপান। কপালকুণ্ডলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন,—কিন্তু প্রকৃতির দুহিতা হইয়াও প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না। বিবাহের পর একবৎসর অতীত হইল, তবু অন্তঃকরণমধ্যে নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত যে বিশাল তরঙ্গ আসিয়া কপালকুণ্ডলাকে গ্রাস করিল, সেই বিশাল তরঙ্গ যেন অবমানিতা প্রকৃতির সংহারিণী মূর্ত্তি। যৌবনে আত্মপ্রীতির আধিক্যবশতঃ কমলাকান্ত বিবাহ করিয়া সংসারী হন নাই, সুখীও হন নাই। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতার বেদনাই বিশ্বব্যাপী প্রীতির গভীর উৎস উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণতার আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল। কমলাকান্ত এই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসারসুখবঞ্চিতা ব্যথাতুরা দেবী চৌধুরাণী নিষ্কামধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেও যতদিন না সংসারী হইলেন ততদিন সুখী হইতে পারিলেন না। এই দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষ ও নারীর হৃদয়গত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে নিষ্কামধর্ম্ম পুরুষের প্রীতিকে গৃহের ক্ষুদ্র পরিসীমা হইতে মুক্ত করিয়া জীবনের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষণ করে, নারী গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে সেই নিষ্কামধর্ম্মে প্রেরণা দিয়া তাহার ও পুরুষের জীবন ধন্য করে। এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম—এবং এই ধর্ম্মই "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের সারকথা।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রীতিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নপ্রকার প্রীতির সামঞ্জস্য। "অনুশীলন তত্ত্বে" গুরু বলিতেছেন,—"ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি উভয়ের অনুশীলন ও সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।" এখানে গুরু ভারতবর্ষের কথা বলিলেও বাংলা দেশই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ। কমলাকান্ত স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা'। 'বন্দেমাতরম্'-সঙ্গীতে যে মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছে তাহা বাংলার 'সপ্তকোটি সন্তানের' আরাধ্যা মূর্ত্তি। ভারতের বিভিন্ন জাতির যে বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস এবং যে বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপর তাহাদের ও জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে, সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বদেশধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশমন্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ণ সাধন না করিয়া বাঙ্গালী তাহার প্রীতি সমগ্র ভারতবর্ষকে অর্পণ করিল, বঙ্গমাতার আসনে ভারতমাতাকে বসাইল। সামঞ্জস্যযুক্ত অনুশীলনের অভাবে, যে প্রীতি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন পুষ্ট করিতে পারিত তাহা বিশাল ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক পরিমাণে ভারতবর্ষের উন্নতি সাধন করিলেও বাঙ্গালী সে উন্নতির ফলভাগী হইতে পারে নাই। বাংলার জাতীয় জীবনে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দুর্ব্বলতা তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ হইয়াছে। যদি বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে ... করিয়া বাংলায় অশিক্ষিতের শিক্ষায়, অনুন্নতের উন্নতি সাধনে, পরপীড়িতের রক্ষায়, দেশের মেরুদণ্ড অবহেলিত পদদলিত কৃষক সম্প্রদায়ের দুঃখ ও দৈন্য নিবারণে এবং জাতীয় ঐক্যের সংস্থাপনে আরও যত্নবান হইত, তাহা হইলে সেই জাতীয় শক্তির ফলে বাঙ্গালীর ভারতপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতির পরিণাম আরও গৌরবময় হইতে পারিত।

যে বঙ্কিম বিশ্বপ্রীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালীকে স্বদেশধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার

চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জাতীয় প্রীতির মধ্যে তাহার জাতীয় শক্তির সন্ধান দিয়াছিলেন এবং সেই শক্তির পূর্ণতায় বাংলার ও বিশ্বের কল্যাণময়ী মূর্তি দেখিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে যে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি চরিত্রের উক্তি ব্যতীত আর কোথাও এই অভিযোগের ভিত্তি নাই এবং এই উক্তিগুলিও বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আয়েষার ন্যায় উদার, করুণ ও মধুর নারীচরিত্র যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,—'রাজসিংহে' যিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "হিন্দু হইলেই ভাল হয় না। মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না; অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না; ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপই আছে",—কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে যিনি বলিয়াছেন, "যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র··· আমি তাঁহাকে নমস্কার করি", সেই বঙ্কিমকে মুসলমানবিদ্বেষী বা পরধর্মবিদ্বেষী বলিলে তাঁহার আত্মার প্রতি অবিচার করা হইবে। হিন্দু বঙ্কিম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু অন্যধর্মের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার উদার প্রীতিবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই! *

* হুগলী জেলা বঙ্কিম শতবার্ষিক উৎসবে পঠিত।

সাহিত্যের কষ্টি পাথর

অশনি

সত্যসুন্দর দাসের মুরুব্বিয়ানা

সত্যসুন্দর দাস "সাহিত্যের স্টাইল" সম্বন্ধে তেষট্টী পৃষ্ঠা ব্যাপী এক প্রবন্ধ লিখিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের স্টাইল যে কি বস্তু তাহা তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারেন নাই। প্রবন্ধটি ইংরেজি গ্রন্থপাঠের অজীর্ণ বমন মাত্র। ইহাতে নাই কি? ইহাতে কাকুতি আছে, আকুতি আছে, রূপায়তন দেহ আছে, বাঙ্ময় দেহ আছে, ভাষার মিতাক্ষর গাঢ়তা আছে, কৃচ্ছ্রসম্ভব বিকলতা আছে, "অসম্বদ্ধ শব্দের চকমকি ঠুকিয়া ভাবের সরিষাফুল সৃষ্টি করা আছে, নাই কেবল 'সাহিত্যের স্টাইল'! স্টাইল সম্বন্ধে সেক্সপীয়র-বর্ণিত লীয়ারের আর্তনাদকে উপলক্ষ্য করিয়া সত্যসুন্দরবাবু কি বলিতেছেন প্রথমেই শুনিয়া রাখুন:—অসহ্য অকস্মাৎ বেদনার ভাষা নাই, তাই নির্ভাষাকেই কবি এখানে কাজে লাগাইয়াছেন। ইহাই স্টাইলের পরাকাষ্ঠা। স্টাইলেরও অনেক রূপ আছে বটে—কিন্তু যেখানে তাহার নির্দ্দেশ-যোগ্য লক্ষণ যত স্পষ্ট, সেখানেই তাঁরা খাঁটি স্টাইল হইতে ততদূরে।" অর্থাৎ লেখক যেখানে নির্ব্বাক্‌ হইয়া বসিয়া আছেন, কিছুই লিখিতেছেন না, সেখানেই লেখকের টেবিলে যে শাদা কাগজ রহিয়াছে তাহাতেই স্টাইলের পরাকাষ্ঠা ফুটিয়া উঠিতেছে। যেখানে লেখক যদিও বা লিখিলেন, তাহা হইলেও, তাঁহার লেখা যেখানে ধোয়াটে রকমের হইল, ততটা তাহাই স্টাইলের নিকটে আসিল। গাঁজা আর কাহাকে বলে? সত্যসুন্দর ভাষিত অপর একটি স্টাইলের সংজ্ঞাও শুনিয়া রাখা ভাল। "ভাব ও দেহের—বিম্ব ও প্রতিবিম্বের—মধ্যে যদি অংশত বা সমগ্রত কোনও অসামঞ্জস্য কোথাও না থাকে, তবে ভাষাগত যত কিছু উপাদানের সেই সামঞ্জস্য-কেই খাঁটি স্টাইল বলিতে হইবে।" কিছু বুঝিলেন কি? আমাদের মনে হয় স্টাইলের এই খাঁটিত্বে শুধু গন্ধই রহিয়াছে, যাহাতে ভদ্রলোকের বমনোদ্রেক করে মাত্র, বুঝিবার, বা ভাবিবার কিছুই নাই।

এইবার সত্যসুন্দরবাবু যে স্টাইলে সাহিত্যের স্টাইল" লিখিয়াছেন, তাহার একটু নমুনা 'নোট্‌' করিয়া রাখুন:—

(১) "গদ্যই আধুনিক জীবনের বিচিত্র রস-সংবেদনার অতি নিপুণ ও বৈচিত্র্যময় বাক্‌-ভঙ্গি হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই যেন কবি সরস্বতীর কামধেনু।"

(২) "ভাষার বাঁশীখানিকে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত হইতে হইবে—বিবৃতি, বিশ্লেষণ, পর্য্যবেক্ষণ, ধ্যান, আবেগ, আবেদন—সব হইতে সকল সুরই আদায় করিতে হইবে।"

(৩) "মানুষের মনের অসীম আকুতি (Imagination?") যেন এক কঠিন কালো মায়া-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া আছে, স্বপ্নকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি একমাত্র কাব্যেরই আছে; কাব্যই, শব্দের যাদুমন্ত্রে,

বন্দী ভাবরাজির সেই মায়াশৃঙ্খল মোচন করিতে পারে।"

আমরা আশুতোষ-সরস্বতী পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, "কবি-সরস্বতী" দেখিও নাই, শুনিও নাই। বশিষ্ঠ ঋষির ন্যায় "কবি-সরস্বতী"-র কামধেনু ছিল কিনা তাহাও বর্ণিত নাই। বোধ করি এই কামধেনুটি কবি সত্যসুন্দর দাসের গোয়ালে বাঁধা থাকিয়া সত্যসুন্দরের "ভাষার বাঁশীখানিকে" চিবাইয়া চিবাইয়া ছিদ্রযুক্ত করিয়াছে এবং সেই জন্যই, সেই ছিদ্রপথে কবি-মনের "অসীম আকূতি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে! স্বপ্নকে ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে যে একমাত্র কাব্য লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। এখন দেখিতেছি স্বপ্ন দেখাই, বিপদ্ হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! সত্যসুন্দর কি বাঁশীই বানাইলেন!

কিন্তু সত্যসুন্দরবাবু সাহিত্যের স্টাইল সম্বন্ধে আবোল তাবোল যাহাই কেন লিখুন না, আমাদের তাহাতে আপত্তি ছিল না কিন্তু ঐটুকু—বিদ্যা-বুদ্ধির পুঁজি লইয়া সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা শুধুই অমার্জ্জনীয় নয় গুরুতর শাস্তির যোগ্য। সত্যসুন্দর লিখিয়াছেন—"সেকালের সাহিত্য-রসিকের মনে স্টাইল জিনিষটার একটা ধারণা যে অজ্ঞাতসারেও বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারি। তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' সম্বন্ধে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—"তারাশঙ্করের ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুরতাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, বিস্মিত হইতাম--কিন্তু কখনও নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না।" লেখকের অভিপ্রায় বোধ হয় এই—কাদম্বরীর ভাষার শব্দগত মাধুর্য্য বা ধ্বনিচাতুর্য্য কাণে ভাল লাগিলেও চিত্ত স্পর্শ করে না, কেন যে, তাহা তিনি বুঝাইতে পারেন নাই।......পাকের দোষ কোথায় তাহা ধরিতে পারেন নাই...কথাটা বলিয়াও বলিতে পারেন নাই। আবার লেখক তাঁহার মনোমত উৎকৃষ্ট রচনার গুণ ব্যাখা করিয়াছেন এইরূপ—

'কিন্তু অন্নদা মঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদগুণ তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত।'—প্রাণে বাজিত,—লাগিত, —বসিয়া যাইত, —ব্যাখ্যা করিবার কি প্রাণান্ত চেষ্টা! ...ভাল লাগে না কেন তাহাও যেমন লেখক ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই, ভাল লাগে যে কেন বুঝাইতে গিয়া তেমনই যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক সাহিত্য-বিচারে অতিশয় তুচ্ছ।"

সত্যসুন্দরদাস-নামা বাল্যখিল্য লেখকের এই অকালপক্কতা ও মুরুব্বিয়ানার কি শাস্তি আপনারা দিতে চাহেন, তাহাই প্রথমে আমরা শুনিতে চাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কৃপাচার্য্যতুল্য অক্ষয়চন্দ্রের পাদুকা বহন করিতে পারিলে যাহার সাহিত্যিক জীবন ধন্য হইয়া যাইত, যে সত্যসুন্দর দাস এককালে অক্ষয়চন্দ্রের এক ছত্র সমালোচনা পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল, সেই সত্য-সুন্দর দাসের এই অসম্মানজনক উক্তি ও বাচালতা আপনারা কিসের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিবেন? যে প্রসঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া অক্ষয়চন্দ্র ঐ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, এই সত্য সুন্দর তাহার কোনও খবরই রাখেন না। অক্ষয় চন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার তাঁহার সম্পাদিত কাদম্বরীর ভূমিকায় অক্ষয়চন্দ্রের বিবৃতির যেটুকু অংশ তুলিয়াছেন, তাহাই সত্যসুন্দরের পুঁজি। অক্ষয় চন্দ্র সত্যসুন্দর বাবুর মত কোমর বাঁধিয়া তেবট্টিপৃষ্ঠা লম্বা "সাহিত্যের স্টাইল" বুঝাইতে গিয়া ঐ বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই। বালককালে তাঁহার পিতৃদেবের মুখে কাদম্বরী পাঠ শুনিয়া তাঁহার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, তাহাই তিনি "পিতা-পুত্র" নামক প্রবন্ধে প্রসঙ্গচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সত্যসুন্দর দাস অক্ষয় চন্দ্রের উদ্ধৃত লেখা যেখানে শেষ করিয়াছেন, তাহার পরেই অক্ষয়চন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেই এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সেই লেখাটুকু এই—"তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রসাদগুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও যে বেশ জানি সে কথা বলিয়া বুড়াবয়সে অধর্ম্ম সঞ্চয় নাই করিলাম।" ইহাই "সে কালের সাহিত্য-রসিক"-দের বিনয়; আর একালের "সাহিত্য-রসিক" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ত দেখিতেই পাইলেন! কতখানি মিথ্যা কতখানি লঘু-গুরু-ভেদাভেদ জ্ঞানের অভাব, কতখানি আহাম্মুকির পরিচয় উহাতে রহিয়াছে, তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

অক্ষয়চন্দ্র এ কালের রসিকদের ন্যায় গুরুজনের কান ধরিয়া টানেন নাই বটে, কিন্তু কাদম্বরী প্রভৃতির ভাষাকে উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত "পিতা-পুত্র" নামক নিবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—"সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও বয়স্থা কুলীনকন্যার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। শীঘ্র ভিন্নগোত্রা হউক, আপনার ঘর আপনি করিতে শিখুক, আপনার পথ আপনি দেখুক, এই প্রকার ইচ্ছা হইত।" কিন্তু সত্যসুন্দরের অজয়বাবু-লিখিত কাদম্বরীর ভূমিকাটুকু মাত্র বিদ্যা, তাই তিনি ফতোয়া ঝাড়িয়াছেন—পাকের কোথায় দোষ অক্ষয়চন্দ্র তাহা ধরিতে পারেন নাই।

অক্ষয়চন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—"তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পুস্তক

উপহার যেন, আবার নিগ্রহ করিয়া সমালোচনার দাবী করেন। নিগ্রহ কেন বলিতেছি, বলি। লেখাপড়া কিছু না শিখিয়া অনেকের লিখিবার বাসনা হয়। অনেক লেখা বুঝিতে পারা যায় না,—সমালোচনা একটা নিগ্রহ হইয়া ওঠে।" ঐ "তাঁহারা" এবং "অনেকের" মধ্যে বোধ করি সত্যসুন্দর বাবুও একজন ছিলেন, নতুবা এতদিন পরে অকস্মাৎ অক্ষয়চন্দ্রের প্রতি সত্যসুন্দরের—এতখানি অযথা আক্রোশ ফুটিয়া উঠিবে কেন ?

সত্যসুন্দর বাবু যে ভাষা ও যে বিচার-বিশ্লেষণী বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া "সাহিত্যের স্টাইল" শিখিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের দুইটি উক্তি আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। অক্ষয়চন্দ্রের দ্বিতীয় উক্তিটি—তাঁহার ঐ "পিতা-পুত্র" নামক নিবন্ধেই আছে। সত্যসুন্দর বাবু পুনর্ব্বার লেখনী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আচার্য্যের ঐ উক্তি দুইটি যদি স্মরণ করেন, তাহা হইলে তিনি উপকৃত হউন আর না হউন, বঙ্গীয় পাঠক যে তাঁহার ভাষার ও স্টাইলের অত্যাচার হইতে অনেকটা রক্ষা পাইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে। অক্ষয়চন্দ্রের উক্তি দুইটি এইরূপ :—

(১) "বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না। বঙ্গীয় শব্দ বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের অভ্যন্তরে একটি প্রাণপদার্থ আছে, সেইটি বাঙ্গালির মত হইলে তবে বাঙ্গালির উপযোগী ভাষা হয়।"

(২) "এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনাটমিক্যাল ডিসেক্‌শন্। অস্থি-মাংস-চর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্যগ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরী বাহির করিয়া, তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর আবার বোতলে পুরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমিত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি ; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল এক্‌জামিনার, রাসায়নিক পরীক্ষক—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া, অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ না কেন ইহার মধ্যে কি আছে ? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য-সেবা এইরূপ আর তখনকার সেই কাদম্বরী পাঠ যেন বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের আরতি। সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে তখন সাহিত্য-সেবা হইত। সাহিত্য-সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌গদ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্য-চর্চ্চা, সাহিত্য-পূজা। এখনকার মত ছুরি-কাঁচি-নরুণ লইয়া সাহিত্য-ভেদ, সাহিত্য বেধ, সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না। হায় ! আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি !!!" পাকের দোষ কোথায় তাহা ধরিবার জন্য, ডেপোমি করিবার পূর্ব্বে সত্যসুন্দরদাস নিজের ভিতরটা একবার খানাতল্লাসী করিয়া দেখুন না !

গান

শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য্য

আমার দেউলে নিভে গেল দীপ
আরতির ধূপ নাহিরে।
অন্তরে ছিল দেবতা আমার
আজিকে সে গেল বাহিরে।
অকারণ শুধু গাঁথি বসে মালা
প্রভাত সন্ধ্যা আরতির ডালা
মঙ্গল দীপ হল বৃথা জ্বালা
অন্তর ধন চাহিরে।
যন্ত্রের মোর ছিঁড়ে গেছে তার
আজিকে বেসুরো গাহিরে
অন্তরে মোর উঠেছে প্রলয়
তাণ্ডব আছে বাহিরে।
'খনে 'খনে শুধু বিজুলীর শিখা
বুক চিরে লিখে ব্যথিতের লিখা
মত্ত আকাশে পরায় সে টীকা
আমি থাকি শুধু চাহিরে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ঘর

দিলীপ ও সুনীলা।

সুনীলা—তুমি ভালো হ'য়ে গেছ, এখনও কেন মুখ ভার কোরে থাক আমায় বলবে ?

দিলীপ—ভালো ! ……দেহটা ভালো থাকলেই ভাবো মানুষ ভালো থাকতে পারে ?

সুনীলা—তা ভাবি না। কিন্তু—

দিলীপ—ঐ কিন্তু !—আমারও সকল চিন্তা, সকল প্রেরণা ঐ কিন্তু'র পাশে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সুনীলা। আমি ভাবি আর আমার মন কোন অতল তলে ডুবে যায় !…

সুনীলা—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু জন্মের জন্য কেউ দায়ী নয় দিলীপ, কর্ম্মের জন্য দায়ী। সুতরাং—

দিলীপ—জানি। আমার নিজের পক্ষে সে কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কর্ম্মের জন্য যে ব্যক্তি দায়ী সে হ'ল আমার মা,—এইটা আমি কোনমতে ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না বলেই আমার আজন্মের সাধনা আজ এমন কোরে ধ্বংস হ'য়ে গেল !

সুনীলা—তুমি যে বলতে সাধনা কখনও ধ্বংস হয় না ? বলতে না ?

দিলীপ—বলতাম। তখন জানতাম না সাধনার পথে এতো বড় বিপর্য্যয় কখনও ঘটতে পারে !

সুনীলা—তর্ক করচিনা, কিন্তু ভেবে দেখো এর চেয়ে কত বড় বিপদ, দুঃখ-দুর্ভোগ মানুষকে সহ্য করতে হয়। সহ্য কোরে আবার সেই পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝখানে গিয়েই দাঁড়াতে হয় !—ভেঙে পড়লে তার চলে না। তাকে পড়তে হয়, তাকে উঠতে হয় ; তাকে থামতে হয়, তাকে চলতে হয় !

দিলীপ—সব জানি ; কিন্তু সুনীলা, সাধনার পথে এর চেয়ে গুরুতর দুর্ভোগ আমি কল্পনা করতে পারি না ! —দেশভক্তি আমার কোথা থেকে আসে নীলা ? কোথা থেকে পেয়েছি স্বজাতি প্রীতির অমৃতধারা ? —পেয়েছি মাকে ভালোবেসে ! মায়ের সঙ্গে তুলনা আছে বলেই দেশকে আমরা বন্দনা করি তাই দেশের সন্তান আমার ভাই, আমার Comrade. সেই মা যদি হ'ল কলঙ্কিতা, সেই মা যদি হ'ল অশ্রদ্ধার পাত্রী, কি অজুহাতে আমি আবার দেশ-মাতৃকার সেবা করতে যাবো ? আমার কর্ম্মক্ষেত্র যে বিরাট ভূমিকম্পে ধরাতল হতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল সুনীলা ! —সেখানে দাঁড়াইব বা কি কোরে, চলবই বা কোথা ! (বলিয়া দিলীপ চুপ করিল, দেখা গেল তাহার চোখ দুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিয়াছে ; সুনীলা ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল)

সুনীলা—শান্ত হও দিলীপ, আর ও চিন্তায় নিজেকে অধীর কোরে তুলো না। সাধনা যদি ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে থাকে ত' যাক্। কর্ম্মক্ষেত্র যদি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়ে থাকে ত' যাক্। —আমরা আবার সব নূতন কোরে গড়ে তুলবো !

দিলীপ—(ম্লান হাসিয়া বলিল) আমরা

সুনীলা—হ্যাঁ আমরা ! —শুধু তুমি আর আমি।

দিলীপ—কিন্তু তোমায় মা তো আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে দেবে না নীলা। তোমাদের সকলকার কাছ থেকে আমি এখন বাইরে চলে গেছি। দূরে চলে গেছি।

সুনীলা—মা কি কোরবে জানি না। কিন্তু আমার কাছ থেকে তুমি বাইরে যেতে পার না দিলীপ। আমার মন থেকে—

(বলিয়াই সুনীলা সহসা থামিয়া গেল)

দিলীপ—বলো, থেমে যেয়ো না ; সবটা আমায় শুনতে দাও নীলা ! —ভারী মিষ্টি লাগছে আমার !

সুনীলা—সে থাকগে। সে আর এমন কি কথা। —কিন্তু আমরা দু'জনেই আবার নূতন কোরে সাধনা সুরু কোরবো তুমি দেখে নিও। সৃষ্টি কোরব নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে তোমার গৌরব-হানি হবে না।

দিলীপ—কিন্তু আমার নিজের কাছ থেকে আমি অব্যাহতি পাবো কি করে ? অগৌরবের যে গ্লানি আমার বুকের মাঝ-খানটাতে বহ্নিশিখার মত জলতে লাগলো, তার আমি কি কোরবো ? সে আগুণ নিভবে কি করে ? সে আগুণ নেবাবে কে ?

সুনীলা—আমি।

দিলীপ—তুমি ?

সুনীলা—হ্যাঁ আমি। আমি তোমার বুকের মাঝখানটিতে এমনি কোরে হাতবুলিয়ে দোব চিরকাল ধরে; যাহ তোমার থাকবে না, কখন ছিল বলেও জানতে পারবে না। —দেখছো ত' আমার হাত কী ঠাণ্ডা!

দিলীপ—হ্যাঁ ঠাণ্ডা। বুক আমার জুড়িয়ে গেল। কিন্তু ওগো আমার দুঃখ-জুড়ানো দরদী বন্ধু, নিজের কী সর্ব্বনাশ করছো একবার ভেবে দেখো।

সুনীলা—নিজের সর্ব্বনাশ আমি মোটেই করছি না। তোমার সংস্পর্শে যে আসে তার কখনও সর্ব্বনাশ হয় না। সর্ব্বনাশ তার কাছে মাথা নত ক'রে থাকে।

দিলীপ—(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া বলিল) আমি বুঝতে পারছি না। সব আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। আমায় বুঝিয়ে বলো সুনীলা!

সুনীলা—আমরা এখানে থাকবো না। আমরা চলে যাবো দূরে, সহরের বাইরে—যেখানে সভ্যতার বালাই নেই। —ছোট্ট পাতার ঘর করে আমরা থাকবো। সেখানে চোখের উপর আমাদের থাকবে উন্মুক্ত প্রান্তর, নীলিমায়-ভরা একখানি অসীম আকাশ আর তুমি আর আমি!—আমাদের কার্য্য হবে দরিদ্র গ্রামবাসীর সেবা—ভারতবর্ষের যারা প্রতীক! সেই হবে আমাদের নূতন ব্রত, আমাদের সাধনা।

দিলীপ—কিন্তু ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে তুমি আসবে আমার সঙ্গে দূর পল্লীতে পাতার ঘরে বাস করতে! —এ দুঃখ কেন তুমি বরণ কোরে নেবে নীলা।

সুনীলা—বাঃ! এ বুঝি আমার দুঃখ! কে বলেছে শুনি? তুমি তো সব জান! কিছুই জান না দেখছি!.........

(ক্রমশঃ)

রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—
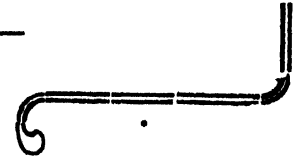
রেকর্ড বিচিত্রা—সেনোলার শিশু-রেকর্ড হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসের সমালোচনা।

এবারে আমরা আগষ্ট মাসের যে কয়-খানি এচ, এম্, ভি, রেকর্ড শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি তাহার সমালোচনা প্রকাশ করিলাম।

এচ, এম্, ভি,—পি ১১৮২৬:—রেকর্ড-আসরের সুপরিচিতা রবীন্দ্র-গীতি-গায়িকা শ্রীমতী কনক দাস এই রেকর্ডে দুইখানি পুরাতন রবীন্দ্র-গীতি গাহিয়াছেন। সহগামী সঙ্গীতের সহিত একপিঠে 'তিমির-দুয়ার খোলো' এবং অন্যপিঠে 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ' প্রথম গানখানি শিল্পী স্বীয় বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গাহিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। দ্বিতীয় গানখানি আমাদের ভাল লাগে নাই। গান দুই খানির সুর দিয়াছেন স্বয়ং কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ।

* * *

এচ, এম্, ভি,—এন ১১১১০:—কুমারী সাবিত্রীরাণী বসু (চামেলি) এই রেকর্ডে বাদ্যযন্ত্রাদির সহিত একদিকে 'বিদেশী তরী এল কোথা হতে' ও অন্যদিকে 'বন-মল্লিকা ফুটিবে যখন' এই দুইখানি কাব্য-গীতি রেকর্ড করিয়াছেন। কুমারীর গাহিবার ঢঙ ভাল, খোঁচ ও মীড়গুলি উপভোগ্য,—বিশেষতঃ প্রথম গানখানিতে ইহা বিশেষ সুপরিস্ফুট হইয়াছে। দুইখানি গানেই গায়িকার প্রযত্ন রেকর্ডের আসরে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে, তবে প্রথম গানখানি সুর-মাধুর্য্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে। গান দুইখানি রচনা করিয়াছেন—কাজী নজরুল ইস্‌লাম, সুর দিয়াছেন অন্ধ-গায়ক সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

* * *

এচ, এম্, ভি,—এন্ ১১১১১:—শিল্পী শ্রীমতী রেণু রায় (বসু) এই রেকর্ডে পিয়ানো ও অন্যান্য যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। একদিকে 'ঝরা বকুলে এসে কি ভুলে' ও অন্যদিকে 'বাদল-ধারার বাজল এবার' গান দুইখানি সুগীত হইয়াছে বলা চলে, তবে প্রথমখানি আপেক্ষিকভাবে মধুরতর।

* * *

এচ, এম্, ভি,—এন ১১১১৮:—এই রেকর্ডের বিচিত্র বর্ষা-সঙ্গীত দুইখানি এচ, এম্, ভি,এর তালিকায় বিশিষ্ট স্থান। এক দিকে বর্ষাকে বেদিয়া-বালিকারূপে কল্পনা করিয়া এবং অন্যদিকে বিজয়ী সেনারূপে বর্ণনা করিয়া কবি যে ঝঙ্কারময় ও ভাব-ব্যঞ্জক গীতি-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সুরদাতার নিপুণ তেজোপূর্ণ সুর-সংযোজনায় এবং গুরুগম্ভীর উদ্দীপনাপূর্ণ অর্কেষ্ট্রা সহযোগে এই রেকর্ড-বিচিত্রাটি শ্রোতাদিগের নবরস পরিবেশন করিয়াছে। গান দুইখানির রচয়িতা কাজী নজরুল ইস্‌লাম ও সুর-সংযোজক কমল দাশগুপ্ত। একদিকে রেবা সোম, অনিমা মুখোপাধ্যায় ও পদ্মরাণী চ্যাটার্জ্জী সম্মিলিত কণ্ঠে বেদিয়া-বালিকারূপী বর্ষার গান 'গগনে খেলায় সাপ বরষা-বেদিনী' ও অন্যদিকে গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অসিত মুখোপাধ্যায় এবং চিত্তরঞ্জন রায় বিজয়ী সেনার বেশী বর্ষার গান

বরষা-ঋতু এল, এল বিজয়ীর সাজে' এই গানখানি মিলিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন।

এচ, এম্, ভি,—এন ১৭১৭৩ :—'ফিরে চল, ফিরে চল—আপন ঘরে' নামধারী ব্যঙ্গ-নাটিকাটি এই একখানি রেকর্ডে গ্রামোফোন নাট্য-সমিতি কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। মেসের দোতালার ঘরের পূর্ব্ববঙ্গীয় বীরেন এবং মেসের তেতালার ঘরের কবি রমেন পাশের বাড়ীর মিস্ শেলী সেনের রূপমুগ্ধ ও সঙ্গীতমুগ্ধ। মিস্ শেলী সেন অভিজাত-বংশের সন্তান মিঃ দাশ গুপ্তের বাক্‌দত্তা। তবু মিস্ সেন্ ও মেসের দোতালা-তেতালা ঘরের মধ্যে চিঠি-পত্র চলিবার ফলে একদিন বেলা একটার সময় পূর্ব্ববঙ্গীয় বীরেন এবং কবি রমেন শেলির অপেক্ষায় নিরালা ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডার ধারে উপস্থিত। দুইজন দুইজনকে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে অনুনয়-বিনয় করিলেও কোন ফল হইল না দেখিয়া কিছুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধের পর অবশেষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এমন সময় মিঃ দাশগুপ্তএর সহিত মিস্ সেন তথায় উপস্থিত হওয়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিরতি হইলে মিস্ সেন মিঃ দাশ গুপ্তের সহিত তাঁহার বিবাহের সংবাদ সহ দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র দিলেন। এদিকে জগৎসিংহ এবং ওসমানের সন্ধি হইয়া গেল এবং তাঁহারা সমস্বরে 'ফিরে চল, ফিরে চল—আপন ঘরে" গাহিতে গাহিতে মেসে ফিরিয়া গেলেন। এই আখ্যানটিকে বিষয়বস্তু করিয়া নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। গল্পটির ভিতর হাস্যরসের সম্ভাবনা ছিল সুপ্রচুর, ততটা না জমিলেও মোটের উপর ব্যঙ্গ-নাটিকাটি উপভোগ্য হইয়াছে। কবি রমেনের বিনাইয়া বিনাইয়া

"ঐ তব এলো-খোঁপা ঐ তব প্যাঁচমারা শাড়ী

ভোলাইয়া দেয় মোর সব, কাঁদাইতে নাহি দেয় ছাড়ি।"

আবৃত্তি তবু ভালো, কিন্তু বীরেনের

"মৃত্যুভয় তাহাও কাহারে?
জাননা কি বাঙ্গাল বালক
মাতৃ-অঙ্ক হ'তে ছুটে যায়
মশকের সনে করিবারে মল্লরণ?"

কি ধরণের হিউমার লেখকই বলিতে পারেন।

* * *

সেনোলা—কিউ, এস, ৩২৪ :—এই রেকর্ডের একপিঠে 'ভাই-বোনের আড়ি,' অন্য পিঠে 'ভাই-বোনের ভাব' নামে ছেলেদের উপযোগী একখানি রেকর্ড প্রকাশ করা হইয়াছে। রেকর্ডের প্রথম খণ্ডটি ছেলেদের পক্ষে মোটেই মনোহারী হইবে না, কারণ ঘটনা সংগ্রথনে ও প্রকাশভঙ্গীতে কোনরূপ বৈচিত্র্যই নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে এক জায়গায় গল্পের বই পড়িবার সময় যে আবহ-সঙ্গীতের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা চমৎকার। এতদ্ব্যতীত রেকর্ডখানি বড় সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

রেকর্ড-সংক্রান্ত পাঠকবর্গের কোন প্রশ্ন থাকিলে বিভাগীয় সম্পাদক তাহার সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিবেন। এডিসন, C/o খেয়ালী এই ঠিকানায় আপনার প্রশ্ন প্রেরিতব্য।

স্বর্গদূতী

তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—বত্রিশ—

অরুণের গাড়ী বেহালার পুল পার হইয়া ডায়মণ্ড হারবারের পথ ধরিল। তাহার গাড়ীর বেগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। শুভ্রাও তাহার পশ্চাতে মোটর বাইকে অনুসরণ করিতেছে। অরুণের সুবৃহৎ শক্তিশালী সেলুন গাড়ী ষাট মাইল স্পীডে অবলীলাক্রমে চলিতে লাগিল কিন্তু শুভ্রার মোটর বাইকে ষাট মাইল স্পীডে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল—বায়ুর বেগে শুভ্রার মনে হইল এখনই যেন সে সুদূরে ছিটকাইয়া পড়িবে। পথের অবস্থাও ভাল নহে—উঁচু নীচু মেরামত শূন্য পথ। পার্শ্বে রেল লাইন—জনমানববিহীন লোকালয়শূন্য প্রান্তর দুইপাশে ধূ ধূ করিতেছে—সম্মুখের লক্ষ্য উদ্‌ভ্রান্ত স্বামীর উন্মত্ত অভিযান। বাঙ্গালীর মেয়ে হইলেও শুভ্রা অসীম সাহসে ও একান্ত আগ্রহে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই বায়ুবেগে তাহার মাথার পরচুলা উড়িয়া গেল। তাহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি বায়ুবেগে উড়িতে লাগিল। সে সময় চন্দ্রালোকে যদি কেহ শুভ্রাকে দেখিবার অবসর পাইত তাহা হইলে হয়ত মনে করিত সেই পুরাণ কথিত দক্ষবালা পতিপ্রাণা সতীরাণী আজ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিতেছে।

ঘনকৃষ্ণ কাল মেঘ ধীরে ধীরে একাদশীর চন্দ্রমাকে ছাইয়া ফেলিল ঘন ঘন বিদ্যুৎ সেই কৃষ্ণ মেঘ ভেদ করিয়া আকাশের বক্ষে ক্রীড়া করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া বজ্র পতনের কর্কশ নিনাদ সুপ্তিমগ্ন পল্লীবাসীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। পথিপার্শ্বের বিটপী-

শ্রেণীর মধ্যে মহা আলোড়ন উপস্থিত হইল। শঙ্কাকুল বিহগকুল প্রাণভয়ে বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া নানাবিধ শব্দ করিয়া আকাশে উঠিল। বায়ুতাড়িত ধূলিরাশি শুভ্রার বর বপুটাকে রক্তিমাভ করিয়া তুলিল। তথাপি অরুণ ও শুভ্রার গতির বিরাম নাই। এ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। ফল্‌তা পার হইবার পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। জলের ঝাপটায় শুভ্রার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল। নিতান্ত বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত হইলেও সে থামিল না। সে অরুণের গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল শঙ্কাহীনা, ক্লান্তিহীনা, অবসাদরহিতা সমুদ্র যাত্রী তরণীর মত। জল ঝড় দুর্য্যোগ অতিক্রম করিয়া উভয়েই ছুটিতেছে কাহার আশায় তাহা অরুণই জানে। আরও আধঘণ্টা অবিরাম গাড়ী চালাইয়া অরুণ ও শুভ্রা যখন ডায়মণ্ড হার-বারের বাঁধের নিকট উপস্থিত হইল তখন আকাশের মেঘরাশি অনেক সরিয়া গিয়াছে। সেই ছিন্ন মেঘের ফাঁক হইতে চন্দ্রমার হাসি ফুটিয়া উঠিল ঠিক যেন ছিন্ন নীলাম্বরী পরিহিতা সুন্দরী তরুণীর দেহাংশের মত। দূরে সীমাহীনা জাহ্নবীর লোহিত জলরাশির কল্লোল ধ্বনি উভয়ের কর্ণে দূরাগত বংশী-ধ্বনির ন্যায় প্রবেশ করিল। অরুণ সেই বাঁধের নিকট গাড়ী রাখিয়া নামিয়া পড়িল ও ধীরে ধীরে যে ভূমিখণ্ড গঙ্গাগর্ভের মধ্যে ডলফিনস্ নোজের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছে তাহার উপর দিয়া জাহ্নবীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

শুভ্রাও অদূরে আপনার বাইকখানি রাখিয়া লঘুপদে অরুণের অনুসরণ করিল। শুভ্রা দেখিল অরুণ তটভূমির একপার্শ্বে উদাসীর মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তৎপরে আপনার কোটটী খুলিয়া একটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া দিল এবং ঐ কোটের পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র বাহির করিয়া লইল। শুভ্রা বুঝিল উহা তাহার স্বামীর নিত্য সহায় আগ্নেয় অস্ত্র। সে ছায়ার ন্যায় অরুণের পশ্চাতে দাঁড়াইল—রুদ্ধ নিশ্বাসে—স্পন্দিত হৃদয়ে, ব্যাকুল চিত্তের সমস্ত শক্তি লইয়া।

সে শুনিল অরুণ আপন মনে বলিতেছে, "হায় নারী, তোমাদের কি ধাতুতে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন তা তিনিই জানেন। তোমাদের বাহিরের রূপে মুগ্ধ পুরুষের দল তোমাদের পায়ে তাদের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেয়। তারা একবারও ভাবেনা যে তোমাদের হৃদয়ে দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম, কিছুই নাই। যে শুভ্রাকে চিরদিন আমার মনের মন্দিরে পূজা করে এসেছি—চিরদিন যাকে এত বিশ্বাস করেছি ক'দিনের অযত্নে সেও যখন অন্যকে আত্মদান করতে পারে তখন কণার পক্ষে অমলের পায়ে আত্মসমর্পন করায় বিস্মিত হবার কিছুই নেই। আমি যেমন কামো-ন্মত্ত পশু, ভগবান আমাকে তেমনি সাজাই দিয়েছেন। তবে আর আমার বেঁচে থাকার লাভ কি? নিজ হস্তে আমার জীবনের সুখ, শান্তি, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সবই শুভ্রার সঙ্গে বিসর্জ্জন দিয়েছি। এই পৃথিবীতে বেচে থাকবার কোন সম্বল আমার নেই। আমি শুভ্রা ও কণা দুজনকে হারিয়েছি আমার বুদ্ধির দোষে আমার অবিবেচনার ফলে। এই পৃথিবীতে এসে কত আশা কত ইচ্ছাই ছিল আমার। আমার নিজ হাতে সে আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি। আমার আজ সবই অন্ধকার, তমসাচ্ছন্ন—আমার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কিছুই নেই—তবে—তবে কেন এই জীবনের ভার বহন করা?

অরুণ ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া আবার বলিল, শুভ্রা আমার, শুভ্রা জীবন মরণের আরাধ্যা দেবী আমার, কত নির্য্যাতনই না করেছি তোমার। আমার সন্দেহ সত্য কি মিথ্যা তা বুঝবার মত শক্তি আমার নেই। তবু মনে হয় তুমি পাপ করতে পার না; পাপের পথ তোমার ছায়া স্পর্শে রুদ্ধ হয়ে যায়—তুমি শুধু আমাকেই ভালবাস। ওগো দেবি! হতভাগ্য আমি, অতি নীচ আমি, পশু আমি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার শক্তিও আমার নেই। আজ বহুদূরে কোন অজানা দেশে যেতে বসেছি, কিন্তু তবু ইচ্ছে হয় শেষ মুহূর্ত্তে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নি। কণা গেছে তাতে দুঃখ নেই আমার, সে স্বেচ্ছায় নিজের পথ বেছে নিয়েছে, কিন্তু তুমি, তুমি তো শত অত্যাচার সহ্য করে আমায় অবলম্বন করেই ছিলে—আমার দেওয়া লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, প্রহার অবহেলা সবই নীরবে সহ্য করেছ। পিতার একমাত্র পুত্রী তুমি, লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারিনী, তবুও সর্ব্ব সুখ ত্যাগ করে আমার পদাঘাত সহ্য করবার জন্যে পড়েছিলে ক্রীতদাসীর মত। এমনই মোহান্ধ আমি তাও সহ্য করতে পারিনি। নিজ হাতে বিসর্জ্জন দিয়েছি তোমায়। ভগবান আজ সেই মহাপাতকের সাজা আমায় দিয়েছেন। আজ আর আমার আপনার বলবারও কেউ নাই। ওগো প্রিয়া, ওগো জন্মজন্মান্তরের সঙ্গিনী আমার, এই জনশূন্য প্রান্তরে, নীল আকাশের নীচে বসে, সম্মুখে তোমার অনু-তপ্ত স্বামী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত তোমার নিকট তার অন্তরের শেষ আবেদন জানাচ্ছে। হয়তো তুমি শুনতে পাচ্ছনা—হয়তো তুমি এখন সুপ্তিমগ্ন তবু আমার শেষ প্রার্থনা তুমি আমায় ক্ষমা করো। ওগো জগৎপিতা আমার মত পাতকীকে যদি কোন দিন ক্ষমা করতে পার, যদি দয়া করে কোন দিন আবার এই পৃথিবীতে পাঠাও আমায়, সেবারে যেন আমি কাম, ক্রোধশূন্য হয়ে আসি আর শুভ্রাকেই যেন পাই আমার জীবন সঙ্গিনী রূপে। এমনি করে যেন তাকে হারাতে না হয়।"

শুভ্রার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ও বিস্ময়ে কাঁপিতে-ছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া

শ্রীদুর্ব্বাসা

নিষ্কাশন-কৌশলের আর একটি উদাহরণ—আমেরিকার বিখ্যাত ব্রীজ-ক্রীড়ক Mr. Lightner-কে একবার একটি প্রতিযোগিতায় কয়েকটি খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মহাশয়, কয়খানি তাস খেলার পর তালো খেলোয়াড় বাকি লুকানো হাতের সব বড় তাসগুলি ঠিকমত বলে দিতে পারেন?" এই প্রশ্নে মিঃ লাইটনার প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলেন, তারপর তিনি বল্লেন কার্য্যটি অসম্ভব তবে কয়েকখানি তাস খেলা হলে পর হাতের বিভ'গ এবং কখনও কখনও বড় বড় তাসের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে।

বস্তুতঃপক্ষে প্রতিপক্ষের হাতের অবস্থা বলার মত হাত খুব কমই আসে, তবে চিন্তা করে দেখলে আংশিক ভাবে হাতের অবস্থা বুঝতে পারা যায় বা সকল রঙের বিভাগীয় বড় বড় তাস ধরবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নীচের হাতখানি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক এবং এই তাসে হাতের আংশিক অবস্থা অনায়াসে বলা যায় বা নিকাশন কৌশল প্রয়োগ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করে নেওয়া যেতে পারে। হাতটি এইরূপ,

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি।
হরতন—সাহেব, ×, ×,।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, ×
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, ×, ×।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম দশ, ×
×, ×।
হরতন—নয়, সাতা।
রুহিতন—×, ×, ×।
চিড়িতন—×, ×।

ইস্কাবন—×, ×।
হরতন—বিবি, গোলাম, ×, ×, ×
রুহিতন—বিবি, ×, ×, ×।
চিড়িতন—×, ×।

ইস্কাবন—×, ×, ×।
হরতন—টেক্কা, ×, ×।
রুহিতন—×, ×।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×, ×।

ডাক হয়েছিল এইরূপ,—

‘দ’	‘প’
একটি চিড়িতন	পাশ
দুইটি ফেরাই	পাশ
পাঁচটি চিড়িতন	পাশ
পাশ	পাশ
‘উ’	‘পূ’
দুইটি রুহিতন	পাশ
চারটি চিড়িতন	পাশ
ছয়টি চিড়িতন	পাশ

‘প’ ইস্কাবনের টেক্কা খেলে প্রাথমিক চাল দিয়ে ছোট একখানি ইস্কাবন খেললেন। ডামি সাহেব দিয়ে পিটখানি সংগ্রহ করলেন। এখন ডাকদার দেখলেন যে তাঁকে একটি হরতনের পিট বিপক্ষদলকে দিয়ে যেতে হবে, কিন্তু যদি রুহিতনের গোলাম ফিনাস করে পিট পাওয়া যায় তবে খেলা করা সম্ভব হবে। তাড়াতাড়ি ফিনাস করতে না গিয়ে ডাকদার প্রথমে ভাবতে লাগলেন বিপক্ষদের হাতের বিভাগ সম্বন্ধে কিছু টের পাওয়া যায় কি না। সুতরাং তিনি ডামির হাতে পিটটা নিয়েই একখানি ছোট রঙ খেলে সাহেব দিয়ে নিজের হাতে পিট নিলেন। অতঃপর তৃতীয় ইস্কাবনখানি

গিয়া অরুণকে বলে তোমার শুভ্রা চিরদিন তোমারই থাক্‌বে কিন্তু কিসের জন্ত সে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেছিল না শুভ্রা নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না।

অরুণ তাহার চিবুকের নিম্নে পিস্তলের মুখটী চাপিয়া ধরিল; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে পিস্তলের গুলি তাহার মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া যাইবে দেখিয়া শুভ্রা ত্বরিতপদে অরুণের উপর ঝাপাইয়া পড়িল ও চিবুক হইতে তাহার হাত ঠেলিয়া দিল।—সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের বক্ষ ভেদ করিয়া এক ঝলক ধূমায়মান অগ্নিশিখা বিকট নিনাদে উর্দ্ধে উঠিয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। অরুণের অসাড় দেহ টলিয়া পড়িল—আর শুভ্রা নিস্পন্দ স্বামীর মস্তকটী সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল—মধ্য রজনীর গভীর অন্ধকারে, বারিসিক্ত নদী সৈকতে আদর্শ সতী সাবিত্রীরই মত।

(ক্রমশঃ)

খেলে ডাক্তার হাতে রঙের বিবি তুরুপ করে পিট নিতে দেখা গেল, 'পূ' একখানি হরতন পাশালেন। তারপর আর একতাস রঙ খেলায় বিপক্ষদলের উভয় ক্রীড়কই রঙ দিয়ে গেলেন, তাহাতে বুঝা গেল 'প' ছয়খানি ইস্কাবন ও দুইখানি চিড়িতন পেয়েছেন—বাকি পাঁচখানি তাস মাত্র অজ্ঞাত রইল। এখন বাকি পাঁচখানি তাসের মধ্যে চারখানি রুহিতন হওয়া সাধারণতঃ অসম্ভব। যদি তিনখানি রুহিতন ও দুইখানি হরতন হয়, তাহলে নিস্কাশন করা সম্ভব হতে পারে; কিন্তু যদি তাঁর হাতে বিবি না হয়ে দুইখানি রুহিতন হয়, তাহলে খেলা করা অসম্ভব। কিন্তু যদি বিবি সমেত তাঁর তিনখানি রুহিতন থাকে, তাহলে তৃতীয়বারে তুরুপ করলেই বিবি পড়ে যায় এবং খেলা করবারও সুবিধা হয়। আবার যদি 'প'র হাতে চারখানি থাকে এবং 'পূ'র হাতে বিবিসমেত তিনখানি থাকে, তাহলেও তুরুপ করে খেলা করা সম্ভব হতে পারে। এই সব চিন্তা করার পর ডাক্তারের খেলায় আমূল পরিবর্তন হল। তিনি ডামির টেক্কা-সাহেব ও ছোট রুহিতন খেলে তুরুপ করে নিজের হাতে উঠলেন। বাকি রঙগুলি খেলার পর হাতের অবস্থা হল এইরূপ,—

হরতন—সাহেব, ছক্কা, ছুরি।
রুহিতন—গোলাম।
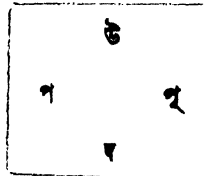
ইস্কাবন—আটা, ছক্কা।
হরতন—নয়, সাত্তা।

হরতন—বিবি, গোলাম, ছুরি।
রুহিতন—বিবি।

হরতন—টেক্কা, পাঞ্জা, চৌকা।
চিড়িতন—পাঞ্জা।

এইবার রঙের পঞ্জাখানি খেলায় 'উ' দিলেন হরতনের ছুরি, 'পূ'র অবস্থা হল সঙ্গীন, কারণ তিনি এখন যে তাসই পাশান্ না কেন আপনা হতেই খেলা হয়ে যাচ্ছে। যদি তিনি রুহিতনের বিবি পাশান ডামির রুহিতনের গোলাম বড় হচ্ছে, আর যদি তিনি হরতন পাশান্ তো ডাক্তারের তৃতীয় হরতন খানি বড় হয়ে পড়ছে। অতএব খেলা প্রতিরোধ করা একেবারে অসম্ভব।

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, লবঙ্গ কখন তাহার ঘরে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহার মনে নাই। খোলা জানালা দিয়া দক্ষিণের বাতাস আসিয়া তাহার মাথায় ব্যজন করিতেছিল। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ঘরের দরজায় কাহার কড়ানাড়ার শব্দে।

লবঙ্গ জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল: কে কড়া নাড়ে?

একটা চাপা গলায় উত্তর আসিল: আমি।

—কে,—বাবু? এত রাত্রে?

—তুমি একবার দরজা খোলো। আমার শরীরটা কেমন কচ্ছে!

লবঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠিয়া সংযত হয়ে মাথার উপর কাপড় খানিও একটু টানিয়া দিয়া দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল: শরীর কি কচ্ছে, বাবু?

—কি জানি, কেমন কচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি না। যতবার চোখ বুজুচ্ছি, ততবার ললিতা এসে চোখের ওপর হাজির হচ্ছে। এমন করে কি ঘুমোন যায়?

—চলুন, আমি যাচ্ছি। মাথায় পাখা করবোখন আপনি ঘুমুবেন।

নীরদবাবু আপনার ঘরের দিকে চলিলেন, তাঁহার পশ্চাতে যাইতে যাইতে লবঙ্গ বলিল: কাল থেকে রামদীনকে বলবো আপনার ঘরে শুয়ে থাকতে। এখন দিনকত আপনার একা একঘরে শুয়ে থাকা হবে না।

—রামদীন শুয়ে থাকবে আমার ঘরে। ঐ অসভ্য মেড়োটা। তার চেয়ে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের খাটালে গিয়ে শুয়ে থাকলে হয়।

—তবে না হয় কেদার শোবে।

—কেদার? ঐ পেঁয়াজরসুন-খেকো জানোয়ারটা? ও ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকলে, ঘরটা হয়ে দাঁড়াবে একটা রান্নাঘরিক

সেবরেটারি! কলিকাতার ড্রেন তার কাছে হার মেনে যাবে! না নবজ! আমাকে অত বড়ো শাস্তি তুমি দিও না!"

নীরদবাবু ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং নবজ পাখা লইয়া তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। কোথাও আর কোনও শব্দ ছিল না, শুধু একটা পেচক অসম্ভব কর্কশ স্বরে দূরের নারিকেল গাছ হইতে এক একবার শ্রুতিকটু শব্দ করিতেছিল।

নীরদবাবু বলে উঠলেন। নবজ! ললিতা কি এখনও এ ঘরে ঘুরে বেড়াচ্চে?

—অসম্ভব কিছুই নয়!

—ভালবাসা কি এমনই টানের জিনিষ, নবজ?

—কি জানি বাবু! ও খবর আমি কি ক'রে রাখবো?

এই প্রসঙ্গে নীরদবাবু একটি গল্প দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলে যেতে লাগলেন।

গল্প শুনিয়া নবজর গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল সে ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল: বাবু! এত রাত্রে আর ওসব গল্প করে কাজ নেই! গা ছম ছম্ করে। আপনি তার চেয়ে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

তোমার ভূতের গল্প শুনলে ভয় পায়?

—ভূতের ভয় আর কার নেই, বাবু?

—আমার নেই। ভূতের ভয় নেই বটে, কিন্তু—ললিতা চলে যাওয়ার পর থেকে, নিদ্রাও যেন আমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ভুলে দিয়েছে!

—কেন? নিদ্রা হয় না কেন, বাবু?

—চোখ যেমন বুজই, অমনি ললিতা ঠিক জীবন্ত মূর্ত্তি নিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়! এই কারণে আজ দশ দিন আমি মোটেই ঘুমোই নেই। আজ সন্ধ্যে বেলা প্রতিজ্ঞা করেছি, যা করে পারি ঘুমোবই; সেজন্যে, ডাক্তারের কাছ থেকে একটা ঘুমের ওষুধ চেয়ে নিয়ে খেয়েছি! কিন্তু তবু ঘুমুতে পাচ্ছিনে! মনে হচ্ছে, ঘরে যদি একজন কেউ থাকে, তাহ'লে হয়তো ঘুম হ'তে পারে! কেননা তাহলে হয়তো ললিতার ছায়ামূর্ত্তিটা সাহস করে চোখের সম্মুখে আসতে পার্বে না! কিন্তু কে আমার ঘরে থাকবে? তবে তুমি যদি দয়া করো, তাহলে আর কিছু হোক্ না হোক্—একটা মানুষ হয়তো বেঁচে যেতে পারে।

এই বলিয়া নীরদবাবু অতি দীননেত্রে নবজর দিকে তাকাইলেন। এই প্রার্থনাটা যদি নীরদবাবু ছাড়া আর কাহারও নিকট হইতে আসিত, তাহা হইলে নবজ হয়তো ইহা রক্ষা করিতে না পারিত। হয়তো কতকগুলো যুক্তিপূর্ণ সামাজিক কারণ দেখাইয়া ইহার অনৌচিত্য প্রমাণ করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু প্রার্থনাটা আসিল এমন লোকের নিকট হইতে, যাহাকে এখন এ অবস্থায় কোনও জিনিষই অদেয় বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারে না। প্রথমতঃ নীরদ বাবুর আশ্রয়েই সে আজকাল দিন কাটাইতেছে কাজেই আশ্রিতের কৃতজ্ঞতার দিক থেকে খানিকটা প্রতিদান অপরপক্ষ চাহিতেই পারে তো। দ্বিতীয়তঃ নীরদবাবু এখন আত্মীয় কুটুম্বহীন অবস্থায়, হঠাৎ বিপত্নীক হইয়া পড়িয়াছেন, মনুষ্যত্বের দিক থেকে উপকার করা এই সময় অবশ্য উচিত। এজন্য যদি সামান্য একটু আধটু সামাজিক সম্ভ্রম অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, সেটুকু নবজ দূরে ঠেলিয়া রাখবে না?

নীরদবাবু নবজর দিকে এমন কাতরভাবে তাকাইলেন, যে নবজ মনের মধ্যে এত তর্কবিচার করিয়া উঠিতে পারিল না। কতক কতক প্রশ্ন তাহার মনে বর্ষাকালের বিদ্যুতের মত চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু তখনই সেগুলি আবার মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। উত্তর মনে আসিয়া, কতক আসিল না। প্রশ্নোত্তরের টানাটানির মধ্যে যখন সে নিজেকে বড়ই বিপর্য্যস্ত ব'লিয়া মনে করিতেছিল, তখন নীরদবাবু আবার একবার অনুনয় করিয়া বলিলেন!

নবজ? অন্ততঃ আজকের রাত্রিটা তুমি আমার ঘরে ঘুমোও,—একটা দিন আমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করো!

বলিয়া, নীরদবাবু হঠাৎ খপ্ করিয়া তাহার হাত দুইখানা ধরিয়া বলিলেন। নবজ, এই অনুরোধের লজ্জায় যেন একেবারে মরিয়া গেল। সে বলিয়া বসিল: "আচ্ছা, আপনি ঘুমুন। আমি এখানে সমস্ত রাত ব'সে আপনাকে পাখা করবো'খুনি।"

বলিয়া সে পাখা লইয়া জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল। নীরদবাবুও নিশ্চিন্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাগর পারের সুন্দরী অভিনেত্রী
শ্রীমতী জেনেভা মিচেল

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, চত্বারিংশ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই ভাদ্র ১৩৪৫, ২৫শে আগষ্ট ১৯৩৮

বাক্যে ও কার্য্যে

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরীর বিবৃতি ও তাহার প্রত্যুত্তরে প্রমাণ হইয়াছে যে ভূতপূর্ব্ব মেয়র সনৎবাবুর নিজ বাড়ীতেও কর্পোরেশনের নিয়ম-নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই এবং নিয়ম-ভঙ্গের দোষে তিনিও দোষী। সনৎবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন-কল্পে বলিয়াছেন যে ঐরূপ নিয়মভঙ্গ কর্পোরেশন বহুক্ষেত্রে অনুমোদন করিয়াছেন। এইরূপ যুক্তি যেরূপ হাস্যোদ্দীপক তদ্রূপ দায়িত্বজ্ঞানবিহীন। স্বয়ং মেয়র বা প্রতিষ্ঠাবান কাউনসিলার যদি গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ে কর্পোরেশনের নিয়মাবলী পালন করিতে যত্নবান না হন তাহা হইলে Purity সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা বা গালভরা উচ্ছ্বাসের কোনই অর্থ নাই।

উড্ডীয়মান কাইলের উদ্ধারকারকের পক্ষে Building Department এ অনাচার নিবারণের উদ্যম যে stunt নহে তাহা প্রমাণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে যে সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে তাহা সংশোধন করা। Profession ও Practice অর্থাৎ বাক্যে ও কার্য্যে যেখানে এত তারতম্য সেখানে সংস্কারক শুধু বাক্যবীরেই পরিণত হন—সংস্কার-সাধন শুধু রোমাঞ্চকর বিবৃতি ও উড্ডীয়মান কাইলের অনুসরণ নহে !!!

উইলিয়াম্স লেনের যে বিধবার ১৯ হাজারের বাড়ী ৯ হাজার মূল্যে রায়চৌধুরী পরিবারের হুন্দা-ভুক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ বাস্তবিক সন্দেহজনক এবং সনৎবাবু হয়ত আইনতঃ এ বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত হইতে পারেন তবে ভ্রাতৃ-বৎসল সনৎবাবুর নৈতিক দায়িত্ব যে এ বিষয়ে কিছুই নাই তাহা জনসাধারণ সহজে বিশ্বাস করিবে না। যাঁহারা পৌর-প্রতিনিধি বিশেষতঃ যে সমস্ত প্রতিনিধি নৈতিক নিষ্ঠায় আস্থাবান বলিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আচরণ ও কার্য্যাবলী সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সুধীর কুমার রায় চৌধুরী প্রমুখ কাউনসিলারদের অবশ্য সনৎ বাবুর বিল্ডিং বিভাগের অনাচার নিবারণের প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন এবং আমরাও স্বীকার করি যে তাঁহার সে প্রচেষ্টা অধিকতর কার্য্যকরী হইত যদি তাঁহার নিজের বাড়ী বা ভ্রাতার বাড়ী সম্বন্ধে নিয়ম-ভঙ্গের দোষারোপ কেহ না করিতে পারিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটী অপ্রীতিকর উক্তির উল্লেখ করিয়া আমরা এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিব। সুধীরবাবুর পিতা কি করিয়াছিলেন বা না করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে বা সুধীরবাবুর কার্য্যাবলীর আলোচনায় একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। সুধীরবাবুর পিতাকে এই প্রসঙ্গে টানিয়া আনা

ইস্পের সিংহ-শিশু ও মেষশাবকের গল্পেরই অনুরূপ। সুধীরবাবুর পিতা সিটি আর্কিটেক্ট (City Architect) হিসাবে কি কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা সুধীরবাবুর কার্য্যাবলীর বিচারে বিবেচিত হইতে পারে না। শুধু কাউন্সিলার হিসাবে [এমন কি ব্যক্তিগত বা তাঁহার ব্যবসায়গত কোন কার্য্যের দোষ-গুণও সমালোচনার বাহিরে] তিনি কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছেন বা সমর্থন করিয়াছেন কি না তাহাই বিবেচ্য। তাঁহার বিরোধী কাউনসিলারবৃন্দ যদি তাঁহার কাউনসিলার হিসাবে কোন কার্য্যকলাপে এই রূপ দুর্নীতির সন্ধান দিতে পারেন তাহা হইলে তিনিও নিন্দার্হ হইবেন—তৎপূর্ব্বে নহে। পিতার কর্ম্মের ফলাফল পুত্রে অর্শায় না—রাজনীতিতে ইহা সর্ব্ববাদীস্বীকৃত নীতি।

স্বদেশচিন্তে সনৎবাবু আক্ষেপ করিয়াছেন যে সুধীরবাবু নাকি তাঁহার বিরোধিতা করিবার জন্য কতকগুলি রেকর্ডের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন! ইহাতে সুধীরবাবু কি দোষ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম—বরং ইহা সুধীরবাবুর উদ্যমেরই পরিচায়ক।

রায়চৌধুরী-যুগলের বিবৃতি প্রকাশে কলিকাতার করদাতাগণ ইহা বুঝিতে পারিল যে বাক্যবীর নিষ্ঠাবান বলিয়া পরিচিত বিশিষ্ট কাউনসিলারও স্বীয় প্রয়োজনবোধে বিল্ডিংকমিটির নিয়ম লঙ্ঘন করেন। পৌর-প্রতিনিধিরা যদি এই রূপ আদর্শ-চ্যুত হন তাহা হইলে দোষ দিব কাহাকে? আমাদের পৌর-প্রতিনিধিদের বাক্যে ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আসিবে কবে তাহা কে বলিবে?

(বিলাসী)

বেকার নাশন

চিত্র-নির্ম্মাতা : মতিমহল থিয়েটার্স

কাহিনী : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পরিচালনা : জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি

আলোকচিত্রী : যতীন দাস

শব্দধর : নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

সঙ্গীত : কুমার মিত্র

চরিত্র : রবি—সুশীল রায়, রেবা—রাণীবালা, মিঃ বোস—নরেশ মিত্র, মিঃ ঘোষ—জহর গাঙ্গুলী, জনার্দ্দন—মন্মথ পাল, নায়েব পত্নী—দেববালা, হাঁদারাম—কুমার মিত্র, পরিচারিকা—ছায়া।

চিত্র-পরিবেশক : মতিমহল থিয়েটার্স

প্রথম মুক্তি : 'উত্তরা' ১৩ই আগষ্ট '৩৮।

"বেকার নাশন" কোন শ্রেণীর ছবি হ'য়েছে এ প্রশ্ন যদি কেউ উত্থাপন করেন তা' হ'লে সে প্রশ্নের জবাব আমরা হঠাৎ দিতে পারব না। তবে "বেকার নাশন" দেখে প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা আমরা হেসেছি খুব এবং যাঁরাই দেখছেন তাঁরাও হাস্ছেন যে—একথা আমরা হলপ কোরে বল্তে পারি। সুতরাং হাসির ছবি তোলার উদ্দেশ্য য কর্ত্তৃপক্ষের আংশিকভাবে সিদ্ধ হ'য়েছে—একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

ছবিখানির গল্পাংশের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইতিপূর্ব্বে পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হ'য়েছে। 'স্লাপ ষ্টিক্ কমেডি' বল্তে যা বুঝায় গল্পটি ঠিক সেই শ্রেণীরই। গল্পের ভেতর নানা জায়গায় অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য আছে—এই ধরণের গল্পে অবশ্য তা' থাকা অশোভন কিছু নয়। গল্পটির নাম "বেকার নাশন" দেওয়ার মূল্য কতদূর তা' আমরা বল্তে পারি না—কিন্তু নিছক হাসি ছাড়া, বেকার বা অন্য কোনও সমস্যার সমাধান কাহিনীর ভেতর হয় নি।

পরিচালনা সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু বল্তে পারি—পরিচালক যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিখানি পরিচালনা কোরেছেন তা' কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্যলাভ কোরেছে। অর্থাৎ আগাগোড়া পর্দ্দার ওপর গল্পটি তিনি বলেছেন ভাল। টেকনিক দেখিয়ে পাঁচ রঙের ফুলঝুরি তৈরি কোরে দর্শকগণকে তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা না কোরে তিনি সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।

আলোকচিত্রের কাজ ভাল বল্তে আমাদের দ্বিধা নেই—কিন্তু যতীন দাসের সুনামানুযায়ী হয় নি। বিশেষতঃ আভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলি।

শব্দযন্ত্রের কাজ আমরা নিখুঁত বল্তে না পারলেও ভাল হ'য়েছে বল্তে পারি।

আবহ সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত ছবিখানির কোনও উৎকর্ষ সাধন কোর্তে পারে নি।

দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে আমাদের একটি অভিযোগ আছে। সেটি হ'চ্ছে, মেসের বাড়ীতে যে সব আস্বাব পত্র দেওয়া হ'য়েছে তা' নিতান্তই অস্বাভাবিক। সাজসজ্জায় ছায়ার পরিচারিকা ছাড়া আমাদের বল্বার কিছুই নেই। ছায়াকে যে নার্সের মত সাজানো হ'য়েছে তা' ইংরাজী-ঘেঁষা এমন কী এখানকার কোনও ইংরেজ পরিবারের পরিচারিকারা ব্যবহার করে কিনা তা' আমাদের জানা নেই!

ছবিখানির ওপর কাঁচির কসরৎ ঠিক-ভাবে না হওয়ায় স্থানে স্থানে ছবিখানি এক ঘেয়ে হ'য়ে পড়েছে।

অভিনয়ে নরেশ মিত্তিরের মিঃ বোস নিখুত হ'য়েছে। রাণীবালার রেবা, অভিনয়ের দিক থেকে উচ্চাঙ্গের হ'লেও আধুনিকা তরুণী হিসাবে তাঁকে আমরা গ্রহণ কোর্তে পারিনি। সুশীল রায়ের রবি মন্দ লাগল না। কিন্তু তিনি যখন মেয়ে সাজেন তাঁকে তখন মানায়নি মোটেই। হতাশ প্রেমিকরূপে জহর গাঙ্গুলী দর্শকদের মনে কোন রেখাপাতই কোর্তে পারেন নি। কুমার মিত্রের হাঁদারাম ভাড়ামির নামান্তর মাত্র। হাঁদুবাবুর জনার্দ্দন আগাগোড়া মঞ্চ-ঘেঁষা। দেববালার দ্বিতীয় পক্ষের নায়েব-পত্নী চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে। ছায়ার পরিচারিকা নির্জ্জীব, নিষ্পন্দ—দম্ দেওয়া কলের পুতুলের মত। এই মেয়েটি এ অবধি অনেকগুলো ছবিতেই অভিনয় কোর্লেন—কিন্তু এ অবধি কোন উন্নতিই কোর্তে পার্লেন না। মেসের সভ্যেরা সবাই নিজ নিজ ভূমিকায় কৃতিত্ব দেখাবার চেষ্টা কোরেছেন।

পরিশেষে আমাদের মনে হয় উপরি-উল্লিখিত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ছবিখানি সাধারণে সাদরে গ্রহণ কোর্তে কুণ্ঠিত হবে না—কারণ ছবিখানার ভেতর 'মাস্ এ্যাপীল' আছে যথেষ্ট।

'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' বা 'সাথী'

ষ্ট্রীট সিঙ্গার (যার বাঙলা নাম হয়েছে 'সাথী') ছবি তোলার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে ছবি তোলা এমন কি সম্পাদনার প্রথম দফার কাজের অনেক খানি এগিয়ে যাবে। পরিচালক ফণি মজুমদারকে এতদিন যাঁরা

শুধু উৎকৃষ্ট চিত্র-নাট্য লেখক বলে জানতেন, উপস্থিত তাঁরা তাঁকে কর্ত্তিৎকর্ম্মা বলেও জানলেন। এ বিষয়েও তিনি তাঁর গুরুদেব প্রমথেশ বড়ুয়ার উপযুক্ত শিষ্য। ছবি তোলার সময় 'সট' নেবার পূর্ব্বে সিগারেট পুড়িয়ে সিটিং করে ভাবতে বসার দরকার বড়ুয়া সাহেবের হয় না, ফণি মজুমদারেরও হয় না।

অক্লান্তকর্ম্মী প্রবোধ রায় কৃত নতুন ফ্লোরের স্যুটিং দেখতে সেদিন আমরা গিয়েছিলাম। নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর ষ্টুডিওর এই চার নম্বর ফ্লোরটি অন্যান্য ফ্লোর অপেক্ষা ছোট। এখানেই সেট পড়েছে ফণি মজুমদারের "ষ্ট্রীট সিঙ্গার" ছবির।

চার নম্বর ফ্লোরের সামনে বেজায় ভীড়। অভিনেতা অভিনেত্রীতে বোঝাই জন পচিশ তো বটেই। বড় থিয়েটারের বড় রিহার্সাল রুম; গিরীশ ঘোষ, অমৃতলাল বোসের ছবি পর্য্যন্ত বাদ যায়নি সেখান থেকে।

বাজনা বাজল। এক ঝাঁক মেয়ের দল নাচের মহড়া দিলে। ক্যামেরা ছবি নিলে কত রকম মেয়ের যারা এই থিয়েটার গুলোর রঙীন বাতির সামনে রাতের মোহে নিজেদের আরো রঙীন করে উদ্ঘাটিত করে—ভোতা মেয়ে, বোঁচা মেয়ে, দাঁতাল মেয়ে।

আর একটি দৃশ্য। কলগুঞ্জনরত রূপসী পরিবেষ্টিত ত্রিলোকনাথ অর্থাৎ অমর মল্লিক। সদা-যুবতীগণ-সঙ্গলোভী এই থিয়েটারের প্রোপ্রাইটর, হাঁফিয়ে উঠেছিলেন এতক্ষণ 'মঞ্জু' আসেনি বলে। এই থিয়েটারের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী 'মঞ্জু' যৌবনে যার রঙ ধরেছে সাড রঙের প্রথম রঙ—শরীরের শিরায় উপশিরায় কুসুমে কোরক আজও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। শাড়ীর ছায়ার ছায়ার এখনও প্রথম আলোকের মৃদু সৌরভ।

'মঞ্জু' এলো অপরাজিতার রঙ নেভড়ান একখানা শাড়ী জড়িয়ে, জরীর বাঁধনে বাঁধা লাল ব্লাউজের ভেতর নিজেকে দৃঢ় করে বেধে। ত্রিলোক কাছে এসে বল্লে: 'মাইরী, তুমি না এলে—তারপরের কথাটা আপনি যোগ করে নিন, ধরুন বিষ খেতুম, গলায় দড়ি দিতুম, জলে ডুবে মরতুম আরো কত কি এই ধরণের জীবেরা বলে থাকে। মঞ্জুর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, দৃষ্টি নত হোল কপালের চুলের ঢেউয়ের তলায় তলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলে। অমরচাঁদ ঘরে ঢুকে ডাকলে 'মঞ্জু'। ক্ল্যাপ ষ্টিক গিয়ে খট্ করে পড়ল।

আবার কলরব। বোকেন চট্টো থপ থপ করে ফ্লোরের বাহিরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করলেন। ছবিতে সেজেছেন আর্ট ডাইরেক্টর অর্থাৎ সব জান্তা মানে কিছু জানে না। ফ্লোরের ভেতর ঢুকেই বল্লেন: আপনারা সব বেরিয়ে আসুন আর্টিষ্ট নার্ভাস হয়ে পড়ছে। বাহিরে বেরিয়ে দেখি ফণি বাবুর একজন অ্যাসিষ্টেণ্ট তখন সিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম কে নার্ভাস হয়ে পড়ছে মল্লিক মশাই! কানন! শৈলেন চৌধুরী! না বহু উত্থান-উৎসব প্রত্যাগত বোকেন চট্টো!

পরিচালক ফণি মজুমদার এই সহকারীটির কাছে এসে বল্লেন বেশ ভাল হয়েছে কী বল! আমি ঠিক এই জিনিষটাই চাইছিলাম।

সন্ধ্যে হয়ে এলো, সেদিন আমরা ফিরে এলুম।

বড়দিদি

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'বড়দিদি' যে বাঙলায় কত প্রিয় বস্তু তা বোধহয় কাউকে আর জানাতে হ'বে না। এই সুন্দর জিনিষটাকে নিয়ে পরিচালক শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক যে অদ্ভুত পরিশ্রম করছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

গেল সপ্তাহে তিনি মাধবীর পিতা ব্রজরাজ লাহিড়ীর শয্যাগৃহের দৃশ্য তোলা শেষ করেছেন। ব্রজরাজ লাহিড়ীর ভূমিকায় হিন্দি সংস্করণে জগদীশ ও বাঙলা সংস্করণে যোগেশ চৌধুরী শোনা যাচ্ছে চমৎকার অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

পরিচালক মশাই তাঁর কাজের Speed যে ভাবে maintain করছেন তাতে মনে হয় আর মাসখানেকের মধ্যেই এ ছবি শেষ হয়ে যাবে। তাছাড়া অমরবাবুর অমায়িক ব্যবহারে তিনি artistsদের কাছ থেকেও বেশ ভাল ভাবেই কাজ আদায় করছেন।

বিষের বাঁশী

গেল জন্মাষ্টমীর দিনে পরিচালক দেবকী বসু মহাশয় তাঁর নূতন বই 'বিষের বাঁশী'র কাজের নব-উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করেছেন। উদ্বোধনএর দিনে এক নম্বর ষ্টুডিওতে মেগাফোন আর্টিষ্ট গিরীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটা হিন্দী গান 'টেক্' করা হয়েছে। এই ছবিখানা যদিও দু'নম্বর বাড়ীতে ছোটাই বাবুর তত্ত্বাবধানে তোলা হবে তবুও প্রথম দিনের কাজ এক নম্বর বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়েছিল। তার কারণ সঙ্গীত পরিচালক রাইবাবুর সুবিধার জন্য। কারণ তিনি এখনও তাঁর দলবল নিয়ে 'ষ্ট্রীট সীঙ্গার-এর কাজেই ব্যস্ত রয়েছেন।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
প্রগতি-চঞ্চল কথা-চিত্র

অভিনয়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের
অতি আধুনিক চিত্র নিবেদন

*

পরিচালক ঃ

মধু বোস

*

কাহিনী ঃ

মন্মথ রায়

শুভ-উদ্বোধন
শনিবার, ৩রা সেপ্টেম্বর
১৯৩৮

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

সাধনা বোস

অহীন্দ্র চৌধুরী

রূপবাণীতে

N. I. P.

এ ছবির ক্যামেরার কাজ করবেন ইউসুফ মুলজী আর শব্দ-যন্ত্রের কাজ করবেন অতুল চাটার্জ্জি। অভিনয়েতে নামবেন শ্রীমতী কানন, মেনকা, পাহাড়ী, রতীন বন্দ্যোঃ, মনোরঞ্জন ভট্টা, সত্য মুখুজ্জ্যে প্রভৃতি।

সম্প্রতি পরিচালক দেবকী বাবু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তিনি আরোগ্যলাভ করলেই আশা করা যায় সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই এ ছবির কাজ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যাবে। ষ্টুডিওর মধ্যেও সেট নির্ম্মাণ কার্য্য বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

জীবন মরণ

নীতিনবাবুর পরিচালনায় যে নতুন ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে তার নাম হয়েছে 'জীবন মরণ' (বাঙলা) ও 'দুষমণ' (হিন্দি)।

গেল হপ্তায় যে দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে তার মধ্যে একটা দৃশ্যে দেখা গেছে যে রুগ্ন সাইগাল ডাক্তারএর কাছ থেকে তাঁর নিজের রোগ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ কর্চ্ছে। অথচ রোগের ভীষণ পরিনামের কথা ভেবেও ডাক্তারের পক্ষে রুগীকে সঠিক্ সংবাদ দেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় কর্চ্ছেন বাঙলায় বন্ধুবর বিক্রম নাহার আর হিন্দিতে নাজাম।

নতুন উদ্যমের দিক থেকে সারা ভারতে নীতীন বাবুর সমকক্ষ কেউ নেই। 'দিদি'তে তিনি Industry, 'দেশের মাটি'তে Agriculture, আর 'জীবন মরণ'এ Health নিয়ে deal করে শিক্ষার দিক্ থেকে দেশের যে কত উন্নতি সাধন কর্চ্ছেন তা আর না বলাই ভাল।

অভিনয়

এ ছবিখানা যে সত্যিই কবে release হ'বে তা ঠিক বলা যায় না। তবে যতদূর শোনা যাচ্ছে ৩রা সেপ্টেম্বর 'রূপবাণী'তে হ'বে। প্রথম ঠিক ছিল ২০শে আগষ্ট তারপর ২৭শে আর এখন ঠিক হয়েছে ৩রা সেপ্টেম্বর। প্রযোজক মহাশয়রা এখনও বিজ্ঞাপনে জানাচ্ছেন "রূপবাণীতে মুক্তি প্রতিক্ষায়" আর 'রূপবাণী' কর্ত্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন ৩রা সেপ্টেম্বর।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এদের পরবর্ত্তী চিত্র 'কলেজ কন্যার' নূতন নাম রাখা হয়েছে "পরশমণি"। গত বৃহস্পতিবার জন্মাষ্টমীরদিন "পরশমণি"র মহরৎ খুব জাকজমকের সহিত ষ্টুডিওতে হয়ে গিয়েছে। "পরশমণি'র কাজ আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পরিচালক প্রফুল্ল রায় আরম্ভ কোরবেন। "পরশমণি"র কাহিনী লিখেছেন শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র, এবং কথা দিয়েছেন শচীন সেনগুপ্ত।

এ বইতে অভিনয় করবেন যাঁরা তাঁদের সব নাম এখনও পাইনি। তবে যতদূর জানি তাতে মনে হয় জ্যোৎস্না গুপ্তা, অরুণা, নলিনী দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় নামবেন। আর ছবির নায়কের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স এর কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধার চেয়েছেন। যদিও এখন পর্য্যন্ত কিছু ঠিক্ হয়নি তবে মনে হয় এরা দুর্গাবাবুকে হয়ত পাবেন।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থিয়েটার্স

এদের "পরিচয়" ছবি কোন ষ্টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে তা' আমাদের খবর দেওয়া হ'ল না কেন? কি দেদিনে ছবি তোলা হ'চ্ছে—কোন্ কোন্ টেক্‌নিশিয়ানরা কাজ কোর্‌ছেন? তাঁদের অভিজ্ঞতা কী? সব বিষয় আগামী হপ্তায় না জানালে—তাদের সম্বন্ধে অনেক খবর সাধারণকে জানাতে আমরা বাধ্য হব।

চিত্রা

গোরার দর্শকসমাগম এখন এখানে কমে নি। 'চিত্রা'র সংস্পর্শে এসে 'গোরা' যে এই অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা—আমরা আগে থেকেই জানতাম।

নিউ সিনেমা

মধ্য-কলিকাতা ও দক্ষিন কলিকাতার দর্শকদের সুবিধার জন্যে নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষ 'নিউ সিনেমা' চিত্রগৃহটী বাঙলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন একথা আমরা অনেকদিন আগেই পাঠক পাঠিকাদের জানিয়েছি। সম্প্রতি আমরা বিশস্ত-সূত্রে জানতে পেরেছি যে আসছে ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্র 'দেশের মাটি' চিত্রা ও এই চিত্রগৃহে একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করবে। মধ্য কলিকাতায় 'হিন্দি' চিত্রগৃহের অভাব নেই। এবার সেই জন্যেই মনে হয় হিন্দি ছবির দর্শকদের এই চিত্র গৃহটীর পরিবর্ত্তনে খুব বেশী অভাব পরিলক্ষিত হ'বে না। কিন্তু বাঙলা ছবির দর্শকদের যে কত বড় সুবিধা হ'বে তা সহজেই বোধগম্য। কর্ত্তৃপক্ষের এই কার্য্য আশা করি সকলেই সমর্থন করবেন।

পূর্ণ থিয়েটার

কবি সজিনী 'অনুরাধা' দক্ষিণ কলিকাতার এই জনপ্রিয় চিত্রগৃহটীর মারফৎ যে বাণী প্রচার করে চলেছেন তাতে করে প্রত্যেক গৃহেই মহা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে। অনুরাধা বলেছেন "ভালবাসা পাপ নয়" কেন নয় এই কথা শোনবার জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে 'অনুরাধা' কে আটকে রেখেছে। আরো ২-৩ সপ্তাহের আগে সে বেচারী ছুটী পাবে বলে মনে হয় না।

রূপবাণী

চিত্ররসিকদের বিশেষ অনুরোধে নিউ থিয়েটার্সের সমাজ-সমস্যামূলক এই কথাচিত্রটি রূপবাণীর কর্ত্তৃপক্ষ আর এক সপ্তাহ রাখিতে বাধ্য হইলেন।

আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের অভিনব ও অতি-আধুনিক চিত্রকথা 'অভিনয়' রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে। বহুদিন প্রত্যাশিত 'অভিনয়' চিত্রটি নানাদিক দিয়া বাঙলা ছায়াচিত্র-

বিবিধ

টসের চা

ভারতীয় 'চা'-এর মধ্যে টসের 'চা' স্বাদে ও গন্ধে সত্যই অতুলনীয়। আমরা এই কোম্পানীর 'চা' ব্যবহার করিয়া সত্যই অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। দেশীয় এই প্রতিষ্ঠানের আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

বিনোদ কোং

গত ১১ই তারিখে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বিনোদ কোম্পানী ১৩নং ডালহাউসি স্কোয়ারে একটী নূতন Show room-এর উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বিনোদ কোম্পানীর নাম কোলকাতার বাজারে সকলেই জানেন। এই কোম্পানী Drawing ও Surveying-এর যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কলিকাতার বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শিল্পের একটি গৌরবময় অবদানরূপে জনসাধারণকে পরিতুষ্ট করিবে ইহা আশা করা যায়।

আকাশ-পাতাল

মন্দার-ফিল্মসের আকাশ পাতাল রূপবাণীতে দেখানো হচ্ছে—আমরা ছবিখানি দেখে এসেছি শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক এমন সুন্দর রূপকথার একটি ঘটনাকে কার্টুন-চিত্রে রূপান্তরিত কোরে অনেকেরই ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। কার্টুনচিত্র আমাদের দেশে ২-১ খানা তোলা হয়েছে বটে কিন্তু সে গুলি মোটেই সফল হতে পারেনি। কিন্তু শ্রীযুক্ত মন্দার মল্লিক বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে একটি সত্যই সুন্দর কার্টুন ছবি তৈয়ারী করতে সক্ষম হয়েছেন। আলোকচিত্র, সম্পাদনা, আবহ সঙ্গীত ও শব্দ যন্ত্রের কাজ ভালই হয়েছে এর।

ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশন

ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েসনের দ্বাবিংশতম জলক্রীড়া ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হইবে। ২৭শে আগষ্ট ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় নাম দিবার শেষ দিন। জ্ঞাতব্য বিষয় সকল উক্ত এসোসিয়সনের সুইমিং সেক্রেটারী প্রবোধ চক্রবর্ত্তীর নিকট জানিতে পারিবেন।

খিদিরপুর সুইমিং ক্লাব

উক্ত ক্লাবের সপ্তম বার্ষিক জলক্রীড়া আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে, খিদিরপুর পদ্মপুকুর স্কোয়ারে সম্পন্ন হইবে। প্রতিযোগীতায় যোগদান করিবার শেষ তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর। কয়েকটী বিশেষ প্রতিযোগীতার Heats ও Final যথাক্রমে আগামী ৬ই, ৭ই ও ৮ই সেপ্টেম্বর হইবে। বিশেষ কিছু জানিবার থাকিলে, ক্লাবের Secretary শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী সরকার মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এস্‌সি আগামী সোমবার ১২ই ভাদ্র ১৩৪৫ তারিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে Diploma in Librarianship পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইবেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্, এস্‌সি পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভবানীপুর আশুতোষ কলেজে কয়েকবৎসর তিনি রসায়ণ শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণীত-পরীক্ষক ছিলেন। ইহার পর মাদ্রাজে গিয়া Library-training পরীক্ষা পাশ করিয়া আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হ'ন। ইনি Bengal Library Association-এর কোষাধ্যক্ষ ও Bengal Teachers' Training ক্লাসের অন্যতম অধ্যাপক। কলিকাতা ছোট আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি চতুর্থ পুত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বার এট-ল; এম্, এল্, এ; মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা।

আমরা কামনা করি ইঁহার যাত্রা জয়যুক্ত হউক।

নূতন চিত্রের নূতন দিক্

যে খবর পেলাম তাতে আমরা আনন্দিত হয়েছি—একথা স্বীকার কচ্ছি। 'দেশের মাটি' চিত্রখানি আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর চিত্রা এবং নিউ সিনেমায় একই সঙ্গে দেখানো আরম্ভ হবে। 'দেশের মাটি'র মত বড় ছবির যোগ্য-সম্মান দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করি।

নিউ সিনেমায় এতদিন হিন্দি ছবি দেখান হত। কিন্তু নিউ থিয়েটার্সের বাংলা ছবির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মধ্য কলিকাতার এই চিত্রগৃহটিকে বাংলা ছবিঘরে রূপান্তরিত করা হল। বিশেষ করে মধ্য কলিকাতার বাঙ্গালীদের পক্ষে এটি বড় কম আনন্দের কথা নয়। এবার থেকে এরা নিজেদের এলাকায় নূতন ছবির প্রথম রিলিজ দেখতে পাবেন।

'দেশের মাটি' ছবিখানির কথা পূর্ব্বে আমরা বহুবার বলেছি। ছবির মধ্যে কেবল হালকা আনন্দদানের দিন এখন আর নেই। দেশের চারদিকের যেমন অবস্থা, তাতে লোককে ভাল করে বাঁচবার পথ প্রথম দেখান দরকার।

মানুষের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে আনন্দের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু মানুষের মন যদি "কর্ম্ম" ক্লান্ত না হয়ে কেবল ক্লান্তই হয়, তাহলে ভাববার কথা হয়ে দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে আমাদের খানিকটা এই অবস্থা হয়েছে। দেশের কর্ম্মের অভাব অথচ কর্ম্মক্ষেত্রের যে অভাব আছে, তা নয়।

দেশের মাটি চিত্রখানি আজ আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরবার বাণী নিয়ে এসেছে। এই ছবিখানির কেহ যেন অসার আনন্দ দানের সামগ্রী বলে ভুল করবেন না। অলস আনন্দ যাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ছবি প্রস্তুত হয় নি।

দেশের গভীর দুঃখ দারিদ্র নিউ থিয়েটার্সের কর্ত্তৃপক্ষের মনের দুয়ারে আঘাত করেছে। একথা তাঁদের বার বার মনে হয়েছে, যে দেশের মাটিতে তাঁদের জন্ম, সেই দেশের মাটির ওপর তাঁদেরও মহান কর্ত্তব্য রয়েছে। মানুষকে কেবল নিছক আনন্দ দান করলেই সেই কর্ত্তব্য পালন করা হয় না।

"দেশের মাটি" ছবিতে যে কাহিনী আমরা পাব তা সত্যিই অতি বিচিত্র—কিন্তু যে আদর্শকে ভিত্তি করে কাহিনী গড়ে উঠেছে তার দিকেই আমাদের সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই ছবির আদর্শ এবং বাণী আমাদের জীবনের আজ সব চেয়ে বড় কথা।

সহরে হয়ত এর যথার্থ রূপ আমরা প্রথমে ধরতে পারব না, কিন্তু প্রথমে ধরতে না পারলেও ক্রমে 'দেশের মাটি' চিত্রের আদর্শ দেশের মাটি আমাদের দৃষ্টি এবং মন নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে। "দেশের মাটি" ছবিখানি দেখবার সময় দর্শক যেন তাঁর মনের দৃষ্টিও উন্মুক্ত রাখেন, এই অনুরোধ।

চোখের সামনে প্রতিদিন যে শত শত লোক অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের কথা মনে করে আমাদের এই ছবির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। "আমার দেশের মাটিতে যাদের জন্ম—তাদের সকল সুখ এবং দুঃখের ভাগ আমাকে নিতে হবে"—একথা মনে করবার সময় বোধহয় এখন হয়েছে। 'দেশের মাটি' চিত্রেও এই সত্যের ইঙ্গিত সকলেই পাবেন।

সকল দর্শককে গভীর দৃষ্টি দিয়ে 'দেশের মাটি' ছবিখানি দেখতে হবে। বর্ত্তমান চিত্র-ধারায় যে পরিবর্ত্তন সূচনা এই ছবির মধ্যে দিয়ে হ'চ্ছে, তা আমাদের দেশে নূতন হ'লেও—রাশিয়া, জার্ম্মানী, ইটালিতে নূতন নয়। ঐ দেশের লোকে বুঝেছে, কেবল আনন্দ দান করলেই চিত্রের সকল কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় না।

চিত্রকে মানুষের সেবার কাজে নিয়োগ করতেই হবে। ছবি এমন হবে যা দর্শকের মনকে দোলা দেবে। তাকে ভাবিয়ে তুলবে। তাকে নূতন কর্ম্মে অনুপ্রেরণা দেবে। "দেশের মাটি" চিত্রের এরই প্রচেষ্টা সকল দর্শকের চোখে পড়বে।

'দেশের মাটি' ছবি দেখে যদি হাজার জনের মধ্যে একজনেরও দেশের মাটির দিকে দৃষ্টি যায়—একজন লোকও যদি দেশের হিতে আত্ম নিয়োগ করে—চিত্র-নির্ম্মাতার সকল শ্রম সার্থক হবে বলে আমরা মনে করি।

তারার মালা

ঠাকুর শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্ম্মন

তারার মালা নয় কল্পনার খেলা,
মধু সিক্ত নহে বাণী
দুঃখ-দগ্ধ প্রাণ খানি,
শুষ্ক চক্ষে পথ চেয়ে কেটে যায় বেলা,
তারার মালা নয় কল্পনার খেলা।
আশায় ছলনা নাই (তায়)
পাবনা কি তারা তোমায়
উত্তরিতে সিন্ধু পথে জানি নাহি ভেলা!
তারার মালা নয় কল্পনার খেলা!
নীরব কর্কশ স্বরে,
কণ্ঠে কাতরতা ঝরে,
তারা হীন আকাশ দেখি বিশ্ব করি হেলা!
তারার মালা নয় কল্পনার খেলা।
নিরাশায় নহি ক্ষুণ্ণ,
আমার কামনা শূন্য,
প্রাণ হীন দেহ খানি মৃত্তিকার ঢেলা,
তারার মালা নয় কল্পনার খেলা!

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"

নর ও নারীর ভেতর যে ভালবাসার বাধন রহিয়াছে, সৃষ্টির গোড়া হইতেই তাহার জন্ম। মানব জন্মিয়াই ভালবাসিতে আরম্ভ করে। এই পৃথিবীর জল, হাওয়া এই পৃথিবীতে ভগবানের যা কিছু সৃষ্টি সবই তাহার ভাল লাগে, শিশুকালে মাতৃস্তন্যে তাহাকে জীবন ধারণ করিতে হয়, মায়ের সুনিপুণ হস্তের সেবায় সে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তারপর সে পায় আত্মীয় পরিজন, পিতা, ভ্রাতা, পত্নী,—সকলের ভালবাসা, সুতরাং দেখা যাইতেছে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা কিছুই সে করিতেছে সকলেরই মূলে রহিয়াছে ভালবাসা। নানা প্রকার ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে, অবস্থার বৈগুণ্যে এই ভালবাসা দেশ কাল ও পাত্র ভেদে নানারূপ ধারণ করে। যে ব্যক্তি রোজ মদ খায়, মাতলামি করে তাহার মূলে যে প্রেরণা রহিয়াছে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাও ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং এই বিশ্বজগৎ যে নীতিতে সর্ব্বদাই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহার একমাত্র সংজ্ঞা হইতেছে প্রেম বা ভালবাসা।

ভাল ও মন্দ সকলই ভগবানের সৃষ্টি। অন্ধকার থাকায় যেরূপ আলোর মহিমা প্রকাশ পায় তদ্রূপ মন্দ রহিয়াছে বলিয়াই ভাল বলিয়া যাহা বুঝায় তাহার সুফল মানুষ বুঝিতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহার প্রেরণা ও যাবতীয় সত্ত্বা এই ভালর দিকে সম্প্রিত করিতে প [illegible]

[illegible]

ভগবানের এই প্রেমের রাজ্যে স্বরূপ জন্মিয়াই ভালবাসিতে শিখিয়াছে। ফুলের [illegible] ধ্বনিতে সর্ব্বদাই সে ভগবানের, তাহার আরাধ্যা দেবীর মহিমা দেখিতে পায়। প্রেমেতে পাগল হইয়া সে "দেওয়ানা" হয় বটে কিন্তু তাহার গুরুদেবের স্নেহমিশ্রিত সতর্ক দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। অদৃষ্টের পরিহাসে স্বরূপ চৌর্য্যাপরাধে জেলে প্রেরিত হয়। জেল দারোগার বাগানে সে মালীর কাজ করে। কিন্তু ফুলের বাগানে সর্ব্বদাই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহার আরাধ্যা দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করে। কিন্তু কোথায় তাহার আরাধ্যা দেবী, ভক্তের এই নীরব পূজা গ্রহণ করিয়াই সে সন্তুষ্ট।

অবশেষে একদিন স্বরূপ তাহার দেবীর দেখা পায়, জেল দারোগার কন্যা শ্রীমতী দুর্গা। বলে স্বরূপ তুমি কি চাও, স্বরূপ বলে দেবী—কিন্তু, দুর্গা উত্তর দেয়, আমি ত দেবী নই, আমি যে, দুর্গা, স্বরূপ বলে দুর্গতি দেবীই, তুমিই আমার দেবী। দুর্গা যেন কী এক ভাবের মোহে নিজকে হারিয়ে [illegible] হয়। স্বরূপ আত্মহারা হইয়া বলে, "মো পিয়ারী, মেরে দুর্গা।"—দুইটি আকুল হিয়া মিলন হয়।

কিন্তু পাড়াময় রাষ্ট্র হয় দুর্গা বিধবা বিধবা!—দুর্গা নিজে নিজে বলে—কেন বিধবার হৃদয় বলে কি কোন জিনিষ নেই না, স্বরূপের এই প্রেম সে কিছুতেই অগ্রা[illegible] করিতে না—করিতে পারে না। [illegible] নিস্তব্ধ অন্ধকারে সকলের অলক্ষিতে দু[illegible] যে ফুল বনে স্বরূপের কুটির অবস্থিত তথ[illegible] যায় এবং স্বরূপকে বলে, স্বরূপ আমায় নি[illegible] চল। স্বরূপ ও বলে, চল দুর্গা আম[illegible] এখান থেকে চলে যাই। আমরা প্রেমের এক নূতন রাজ্য সৃষ্টি করব। কিন্তু দুর্গার পিতা অতর্কিতে পিছনে আসিয়া তাহাদের পলায়নে বাধা দেয় এবং স্বরূপকে প্রহারও ভৎর্সনা করে। অতঃপর অপর এক যুবকের সহিত তিনি দুর্গার বিবাহের আয়োজন করেন। এহেন সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হন এবং সকল সমস্যার সমাধান করেন। তিনি বলেন, দুর্গা ও স্বরূপ বিবাহিত। সাত বৎসর পূর্ব্বে এদের বিবাহ হয়। যে কারণে এই বিবাহ এতদিন অপ্রকাশ্য ছিল তাহা হইতেছে.........

পরিচালক কার্দ্দারের নাম চিত্র-জগতে আজ সকলের নিকটই সু-পরিচিত। উল্লিখিত আখ্যান ভাগকে কেন্দ্র করিয়া তিনি সুনিপুণ ভাবে "বাগ-বান" অর্থাৎ উদ্যান-মালির প্রেমকে চিত্রে রূপান্তরিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিমলাকুমারী, সিতারা, যমুনা, নজ্রেকার, আসরাফ্ খান প্রভৃতি রহিয়াছেন। ঘটনার অভিনবত্বে, অভিনয়ে ও সঙ্গীতে ছবিখানি এক কথায় হইয়াছে অপূর্ব্ব, বোম্বাইতে ছবিখানি এখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ দর্শকবৃন্দ কর্ত্তৃক আদৃত হইতেছে।

ছবিখানা শীঘ্রই প্রভাত সিনেমায় আসিতেছে।

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাখা টানিতে টানিতে কখন যে সরজ শ্রান্ত হইয়া সেই খানেই শুইয়া পড়িয়াছিল, এবং নিদ্রাদেবী কখন যে তার সুকোমল চক্ষু পল্লবের উপর আসন পাতিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে একেবারেই জানিতে পারে নাই। যখন উষার প্রথম আলোকচ্ছটায় তাহার নিদ্রা ভাঙিল, তখন সে লক্ষ্য করিল একখানি নিঃসঙ্ক হস্ত নিতান্ত আত্মীয়ের মতই তাহার কণ্ঠ আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং এই হস্তখানি যে পুরুষটির, তিনি অকাতরভাবে এখনও তাহার পার্শ্বেই নিদ্রিতা। এই হাতখানি তাহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া স্থানান্তরিত করিতে গেলেই, ইহার অধিকারী যে তখনই জাগিয়া উঠিবে, এবং সরজকে যে তাহার সম্মুখেই লজ্জার বিষম স্রোতে হাবুডুবু খাইতে হইবে ইহা বুঝিতে তরুণীর বাকি রহিল না। আপনার এই বিপত্তিপূর্ণ অবস্থার কথা বুঝিবামাত্রই হঠাৎ বারেকের জন্য সরজের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, দেহের সমস্ত বল যেন নিমেষের জন্য নিঃশেষ হইয়া গেল, বুকের স্পন্দন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পার্শ্বে ঘরের চারিদিক ঘুরিতে লাগিল, যে পালঙ্কের উপর সে শুইয়াছিল তাহা দুলিতে লাগিল, এবং তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ-সংসার অন্ধকার হইয়া গেল। সরজ তখন প্রথম অনুভব করিল, সে একান্তই অনাথা!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সরজ অতি ধীরে ধীরে যেমনই ঐ হাতখানি তাহার কণ্ঠ হইতে সরাইয়া দিবে, অমনই নীরদবাবু জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "আঃ! বেশ ঘুমুচ্ছিলুম! এটুকুও তোমার সহ্য হ'ল না সরজ? তুমি এত নিষ্ঠুর কবে থেকে হ'লে?"

সরজ আর কি বলিবে? বলিল: ঘুমুন না আপনি! আমি আসি! সকাল হয়ে গেছে, কাজকর্ম্ম করতে হবে তো?"

—তোমার কাছে কাজকর্ম্মটাই বড় হল? আমার ঘুমটা,—

"দিনের আলো এসেছে! এখন আর আপনার ঘুমের সুবিধা হবে না! আমি আসি!" বলিয়া সে জোর করিয়াই উঠিল; নীরদবাবুর কাতর চক্ষুর উপর সহানুভূতি করিল না। কি একটা কারণে তাহার মনটা অত্যন্তই ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া সেটা তখন ঘুরিতেছিল ভবিষ্যতের অলিতে গলিতে নিতান্তই গৃহ তাড়িতের মত!

সে উঠিয়া নীরদবাবুর দিকে পিছন ফিরিয়া, কোনও রকমে আপনার কাপড়-চোপড়গুলি ঠিক করিয়া লইল। অনভ্যস্ত পুরুষের নিকট তরুণীর বসন বিন্যাস করা যে কি যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সে এই প্রথম হাড়ে হাড়ে অনুভব করিল। তবু এই লজ্জাকর কাজটি তাহাকে করিতেই হইল, কোনও রকমে কাপড় ঠিক করিয়া, সে অগ্নিদগ্ধ জলন্ত কাঠখানির মত, ঘর হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত সকালটা ও দুপুরটা তাহার কি করিয়া যে কাটিল, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। বাবুর কাছে মুখ দেখাইতে তাহার যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। গত রাত্রে অজ্ঞাতে যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গিয়াছে, সেটা যে ভয়ানক লজ্জাকর ব্যাপার, এই ধারণাটা জোর করিয়া তাহার মনের মধ্যে অনবরত উঠিতে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া যে জীবনের উপর এই কালো দাগটা সে মুছিয়া ফেলিবে,—সেটা মুছিয়া ফেলা একান্ত দরকার কিনা,—এবং দরকার হইলে, কেমন করিয়া তাহা মুছিয়া যায়,—এই সকল ভাবনা লইয়াই তাহার সকালটা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হেমন্ত প্রভাতের মত, অত্যন্ত ভারি হইয়াই কাটিতে লাগিল।

বেলা দশটার সময়ে, বাবু যখন খাইতে আসিলেন, তখন সরজ আবার একবার বিপত্তিতে পড়িল। ইদানীং প্রত্যহ পাচক-ব্রাহ্মণের নিকট ভাত বাড়িয়া লইয়া, সে নিজেই দিয়া আসিত; কিন্তু আজ সেই নিত্য-আচরিত গৃহস্থালী সৌষ্ঠবটি করিতে তাহার আটকাইয়া যাইতে লাগিল। সে পাকঘরে গিয়া পাচককে বলিল: "ঠাকুর! আজ তুমি নিজে বাবুকে ভাত দিয়ে এসো! আমি একটু আটকে আছি!" ঠাকুর বলিল: "না, মাসিমা! আমি গেলে, বাবু বড় মুখ বেঁকান! আপনি যেমন রোজ যাচ্ছেন, তেমনই যান না!" সরজ ইহারও কি একটা উত্তর দিয়া কাটাইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে আবার ঘর হইতে বাবু চেঁচাইয়া বলিলেন: সরজ! আজ ভাত আনতে এত দেরি কচ্ছ কেন? বড় বেলা হয়ে গেছে যে!" তখন "সরজ নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, কোমরে আঁচল জড়াইয়া ভাতের থালা লইয়া বাবুর সম্মুখে গিয়া হাজির হইল।

মুখে অন্নের গ্রাস দিতে দিতে নীরদবাবু বলিলেন: "সরজ? আজ তুমি এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?"

পালিয়ে বেড়াবো কেন বাবু? আজ আমার একটু কাজ ছিল (গলাটা খুবই ধরা-ধরা)।

শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চার

সেইদিনই বিকেলে ছাদে মেনে গিন্নির সঙ্গে কথায় কথায় এ বাড়ীর গিন্নি বলবেন না ভেবেও বলে ফেললেন কথাটা। মেনে গিন্নির মাথায় হাত। ওমা সেকি! জামাই চলে গেছে, সেকি! কি হয়েছিল? কেন গেল, কখন গেল ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে করতে সব কথা বেড় করে নিলেন। তিনি বক্তৃতাছলে শোনালেন পুরুষ মানুষ ভয়ানক অভিমানি আরো যদি নিজের বউএর সঙ্গে কিছু হয়তো তাহলে সে যে-কোন বিপদ আনতে পারে। এইতো তার বাপের বাড়ী নাকি এক ঘটনা ঘটেছে। পাশের বাড়ীর এক নূতন জামাইকে তার স্ত্রী 'মুখপোড়া' বলায় নাকী সে ফাসী দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, আহা যোটে বিয়ের ছমাসের মধ্যে।

এ বাড়ীর গিন্নির শিরে আস্ত বজ্রাঘাত হল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁরা ধারণা করে রখেছিল যে ধীরেন পালিয়ে গেছে। মরার কথা.........ওমা, কি ভয়ানক, এ তো স্বপ্নেও মনে আসেনি। তিনি আর ছাদে থাকতে পারলেন না তাড়াতাড়ি নেবে এলেন নিচে।

বাড়ীর ঝি দিন দুই আগে কি এক বিশেষ কারণে তারকেশ্বরে গেছলো হ'ত্যা দিতে। না খেয়ে ওরকম ঠাণ্ডামেঝেয় শুয়ে থাকা নাকী তার কুষ্টিতে লেখেনি, তাই সে আজই রাগ করে চলে এসেছে।

সে বললে—উঃ দিদিমণি যা দেখে এনু, বাবাগো সে মনে করলেও গাটা আমার এখনো থরথরিয়ে কাঁপে। জান দিদিমণি হাবড়ার কাছে আসতেই, গাড়ীটা নড়ে উঠলো। আমার মনে সন্দেহ হয়েছে আগেই। গাড়ী তক্ষুনি থেমে গেল। দেখতে আর পানুমনি ভীড়ের জন্যে। শুনলুম যে একটা বেটাছেলে নাকী গাড়ীর তলায় ইচ্ছে করে ঝাপ দিয়ে পরেছিল। হাত-পা থেকে সাড়া দেহ এমন কাটা কাটা হয়ে গেছে যে তাকে আর চেনা যায় না, রক্তে, কি বলবো দিদিমণি মাঠে যেন পুকুর জমে গেল।

চারগুণ অতিরঞ্জন করে ঝি বলে চললো—কি পোড়া মিনসে জন্মে দেখিনি ওরকম। কেনরে বাপু অমন প্রাণটা খেযোতে হায়ালি। ঝি ধীরেনের পালাবার খবর জানতো না।

সরমার মনের অবস্থা একথা শুনে কিরকম হ'ল তা আমরা ঠিক জানিনা তবে মাথার অবস্থা খারাপ হয়ে উঠলো। বেলা সাড়ে-তিনটে রাত্রি সাড়েতিনটের পরিবর্ত্তিত হল। মনে হল নাগর দোলায় চেপে বসেছে সে।

সেদিনও গেল বর্দ্ধমানের বুক থেকে স'য়ে।

রাস্তায় সামনের পাল মশা'য় বললেন—দেখুন মিত্তির মশাই—দেরী করবেন না। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এ নিয়ে অবহেলা করা উচিৎ নয়। আশু চেষ্টা করুন। দিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন। ছবি টবি আছে তো? মিত্তির মশাই অকুলে কুল পেলো।—হ্যা ছবি তো আছেই।

—সেই ছবি দিয়ে আর জামাইএর চেহারার বিবরণ দিয়ে একখানা বিজ্ঞাপন দিন্। এ তো বড় ভাল কথা নয়, তিন তিনটে দিন ব'য়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত লাগেনা বিপদ ঘটতে—আর... ...। হ্যা পুরস্কারের কথা উল্লেখ ক'রে দেবেন। ধরুন জামাইএর যদি ফেরবার ইচ্ছে না থাকে তা হলে কেউ দেখতে পেলে অন্ততঃ পুরস্কারের লোভেও ধরে নিয়ে আসবে। বেশ একটু মোটা অঙ্ক দেবেন, বুঝলেন?

—কত দে'বো বলুন। এই দশ টাকা, কেমন? মিত্তির মশাই নিরীহের মতো জিজ্ঞেস করলেন।

—পাগল হয়েছেন মিত্তির মশাই, দশ-টাকা! দেখুন এসময়েও যদি মায়া করেন তো—তাহলে আর কিছু বলবার নাই। আরে মশাই পাঁচশো টাকা—পাঁচশো টাকা দিয়ে দিন। আপনার দেখছি জামাইর চে' টাকা বেশী হল।

পাঁচশো টাকা! হায় হায় মিত্তির মশাইকে এরচে' জামাই খুন করিয়া গেল

নীরদবাবু বলিলেন: কাজ তোমার আর হবে থাকে না? তুমি ত কাজেরই মানুষ! কাজ যদি একটা থাকে, তুমি হও দশটা!

সরজ ধরা-ধরা গলাটা আর একবার খঁকরানী দিয়া পরিষ্ক'র করিয়া লইয়া বলিল: "আপনার কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার কাণ ভোতা হয়ে গেছে! দিনকত কটা বন্ধ দেন!"

—তা দিতে পারি, যদি আর না পালিয়ে বেড়াও! সরজ পাকঘরের মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে বলিল: ঠাকুর! বাকি তরকারিগুলো তুমি দিয়ে এসো, আমার বড় মাথা ঘুরচে! বলিয়াই সে ব্যঞ্জনের থালাটা মেঝের উপর ঝন্ ঝন্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। ঠাকুর সহানুভূতির স্বরে বলিল: "মাথা ঘুরবে না! সমস্তদিন চরকির মত ঘুরে বেড়াবেন! একদণ্ড ত বিশ্রাম নেই!"

(ক্রমশঃ)

না কেন। ইস্ এতোগুলো টাকা অযথা অব্রাহ্মণে দিতে হবে। ভেবে আর কি করবেন পরেছেন যবনের হাতে।………

পরদিন দৈনিকে বেরুলো :—

—নিরুদ্দেশ।

—২০০৲ টাকা পুরস্কার—

আমার জামাতা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় গত ১৫ই বৈশাখ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। চেহারা সরু, লম্বা ও রং কালো। মাথায় বাবড়ী চুল। চোখে পাওয়ারহীন চশমা। ভুরুর উপরে কুকুরের কামড়ের একটী দাগ আছে। ধুম্রপানাসক্ত। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত বাবাজীবনকে নিম্ন ঠিকানায়……ইত্যাদি।

উপরে একখানা ছবি ছাপা হয়েছে—তা ঠিক মেয়েছেলের কি পুরুষের বোঝা যায় না—কালী একটু বেশী পড়েছে।

সবাই পড়লো। চায়ের দোকানের দে' মশাইও একখানা কাগজ নেন, তিনি পড়িয়া কপালে হাত দিলেন—তার পয়সা ক'আনা পাইবার আর আশা নাই।

নিরুদ্দেশ হবার পঞ্চম ও দৈনিকে বেরুবার তৃতীয় দিবসে সকালবেলা শ্বশুর সবে গদি ঘরে নেবে এসেছেন, মনে সেই এক চিন্তা, জামাইর চিন্তা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। চিন্তা শুধু দুশো টাকা যে জলে গেল।

সরমা তার মায়ের সঙ্গে এক গণৎকারের বাড়ী গেছিল গোনাতে। সে বলে দিয়েছে এক হয় ঈশান কোনে নয় নৈঋৎ কোনে ধীরেন গেছে, ফেরবার আশা নাকী নাই তবে কয়েক দিকের এক মাদুলী ধারণ করলে নাকী ফিরে আসতে বাধ্য হবে। তারাও এসে বাড়ী পৌঁছালো। চেহারা তাদের সত্যই খারাপ হয়ে গেছে চিন্তায়।

একখানা রিক্সা ক'রে ধীরেন এসে হাজির, সঙ্গে একটী লোক চেহারা ধীরেনবৎ—চৌদ্দ আনা দু'আনা. চুলছাঁটা। ধীরেন কিছুতেই নাববে না, সে লোকটী যেন এক প্রকার টেনেই বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল।

মিত্তির মশাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও মনে মনে দমে গেলেন টাকার দুঃখে। জামাইকে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। পাড়ার অনেকে এলো ভীড় জমাতে ও নানাবিধ মন্তব্য উচ্চারণ করতে।

গিন্নি ও সরমা আনন্দে কেঁদে ফেললো—কোথায় তুমি গেছলে বাবা—তোমার কি প্রাণে একটুও দয়া নাই।

সরমা কিছু অবশ্য বলতে পারলো না চুপ করে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলো। তার খুব শিক্ষা হয়েছে। ধীরেনের রাগ বোধ হল তখনও আছে। তাকে যেন জোর করেই বাড়ী নিয়ে আসা হয়েছে এই রকম ভাব। অন্দরে এক বিষাদে-হরিষ উপস্থিত হল।

নীচে দাঁড়িয়ে সহৃদয় ভদ্রলোকটী (?)। গোলমাল কিছুই হচ্ছে না দেখে সে মিত্তির মশাইকে বলতে বাধ্য হল—কই স্যার। আমার বিদেয় করে দিন্। টাকা কটা দিন্। উঃ কি ক'রে যে এনেছি সে আমিই জানি মশাই। ট্যাঙ্গরার খালে প্রায় ঝাপ দিচ্ছিল, আমি মশাই আসছিলাম কোলকাতার দিকে—ভাগ্যিস্ কাগজের বিজ্ঞাপনটা পড়েছিলাম ঠিক দেখলুম কপালে দাগ, অমনি ঝাপ দেবার আগেই খপ্ করে ধরে ফেললুম। আর যাবে কোথা বাছাধন, চেপে ধরলুম। কিছুতেই আসবে না, জোর করে নিয়েলুম। এই দেখুন স্যার কামড়ে দিয়েছে। বলে একটা যায়গা সে দেখাল বটে কিন্তু সেখানে চর্ম্মচক্ষে কোন দাগ দৃষ্ট হল না।

মিত্তির মশায়ের কানে কিন্তু এর একবর্ণও তখন প্রবেশ করছিল না। তিনি লোকটাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে অনুনয়ের স্বরে বললেন—বাবা—ছাপার ভুল হয়েছে, কুড়ি টাকা লিখেছিলাম একটা শূন্য ভুল ছেপেছে। তা বাপু কুড়ি টাকাওতো এখন হাতে নেই—এই দশটা টাকা এখন নাও। যা উপকার করেছ জীবনে তা ভুললো না। উপকারইতো বড় কথা তুমি মহৎলোক, উপকারতো তোমার কাছে বড় কথা, টাকা নয়।

আগন্তুকের মুখের ভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিবর্ত্তিত হল—সে কি স্যার! একি জুয়াচ্চুরী নাকী? দিয়ে দিন ঝপ করে, ভদ্রলোক আপনি কেন খামখা গোলমাল করছেন।

মাথায় হাত বুলিয়ে মিত্তির মশাই বললেন—না বাবা—রাগ ক'রো না সত্যি আর পারবো না। তোমার হাতে ধরছি—ঐ নিয়েই সন্তুষ্ট হও।

আগন্তুক রেগে উঠলো—দেখুন স্যার তবে নিয়ে আসুন আপনার জামাইকে আমি আবার ট্যাংরার খালে দিয়ে আসি। চালাকী নাকী?

অগত্যা দিতে তাকে হলই টাকাগুলি।

বিকেলে; দে মশাইয়ের 'চা-ষ্টল'।

ধীরেন বলছে সুটকের দিকে চেয়ে—দাও ভাই দেড়শোটী টাকা দাও দিকিন্—

—অ-হ, খুব যে বলছিল একশো টাকার বেশী দিতে পারবো না। আমাদের পূর্ব্বোক্ত আগন্তুক বললে—কম্ মেহেনত করতে হয়েছে আর তা ছাড়া এতদিন যে রাজারহালে হোটেলে খাওয়ালুম আর বুদ্ধি কে বাৎলে দিয়েছিলরে—

পালমশাই বললেন—আমার ভাগটাও দিয়ে দাও এখন

—ওটী হচ্ছেনা বাবা ধীরেন বললে—আমার জন্তেই তো হল। আবার কি ভাবিয়া বললে—আচ্ছা দে দে তাই দে।

স্বর্গদূতী

শ্রীমতী তরুলতা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তেত্রিশ—

আলো আঁধারের সন্ধিক্ষণে, প্রভাতী মীরণের মৃদুস্পর্শে অরুণের সংজ্ঞা ফিরিয়া াসিল। সে চক্ষু খুলিয়া বহুক্ষণ একদৃষ্টিতে ভ্রার মুখের দিকে চাহিল। শুভ্রার অঙ্গে ট দেখিয়া সে প্রথমে শুভ্রাকে বহু পরিচিত থচ অচেনা কোন কিশোর বলিয়া মনে রিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "কে তুমি বা করছ আমায়?" শুভ্রা হাসিল—মুক্তার ত সুন্দর দন্তরাজি দেখিয়া অরুণের শুভ্রাকেই নে পড়িল। সে পুনরায় বলিল, 'বলনা তুমি?' তুমি যে আমার বড় চেনা, ড় পরিচিত; অথচ আমি যার কথা বলচি াত পুরুষ নয়! শুভ্রা হাসিয়া বলিল মামিও পুরুষ নই। তুমি যাকে ভাবছো ামি সেই কিনা জানিনা, তবে আমি মামারই, তোমারই পরিত্যক্তা স্ত্রী শুভ্রা।'

অরুণ অশেষ আগ্রহে উঠিয়া বলিল ও লল "শুভ্রা, শুভ্রা, আমার শুভ্রা তুমি? মন করে এলে এখানে? তুমিই কি াম'য় মরতে দাওনি? সারারাত্রি তুমিই বসে আছ এই জনশূন্য স্থানে আমার থা কোলে নিয়ে?"

শুভ্রা বলিল, "হ্যাঁ স্বামী, একদিন তুমি নতে চেয়েছিলে কার অভিসারে রোজ াায় আমি বাইরে যাই। সেদিন তার র দিইনি আজ তার উত্তর দেবার সময় সছে। যার পিছু পিছু প্রতি সন্ধ্যায় ামি ছায়ার মত ঘুরে বেরিয়েছি সে আর কেউ নয় সে আমার স্বামী, আমার দেবতা আমার ইহকাল, পরকাল—সে তুমি।"

অরুণ বলিল "অথচ একটুও জানতে পারিনি আমি।"

"না, জানবার মত মনের অবস্থা ছিল না তোমার, ভেবে দেখ রঘুনাথ বলে কাউকে মনে পড়ে কি তোমার যে কতদিন হোটেলে তোমার খাবার সার্ভ করতো?"

অরুণ বলিল, আর বলো না শুভ্রা; সেই রঘুনাথকে দেখলে শুধু মনে পড়তো তোমায় অথচ তবু চিনতে পারিনি আমি। আর তোমার সঙ্গের লোকটা কে ছিল শুভ্রা?

শুভ্রা বলিল, "সে আমার ভাই নয়।"

অরুণ লজ্জিত হইল; সাগ্রহে সে শুভ্রাকে নিজের বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "অনেক ভাগ্যে পেয়েছিলাম তোমার শুভ্রা, আর অনেক পাপে হারাতে বসেছিলাম তোমায়। আমার মত ছন্নছাড়া বিপথগামী স্বামী জেনেও শত বিপদে আমায় রক্ষে করেছ তুমি। তুমি মানবী নও—তুমি শাপভ্রষ্টা দেবী স্বর্গদূতী।

শুভ্রা বলিল, চল এবার বাড়ী ফিরে যাই। এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এস আমরা জগদীশ্বর চরণে প্রার্থনা জানাই আর যেন আমরা পরস্পরকে ভুল না বুঝি, আর যেন আমরা বিচ্ছিন্ন না হই।

অরুণ ও শুভ্রা করজোড়ে জগদীশ্বরকে তাহাদের নবজীবন দানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া চির মিলনের প্রার্থনা জানাইল।

* * *

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই দিলীপবাবু ও সমর আসিয়া পৌঁছিলেন, দিলীপবাবু কন্যা ও জামাতাকে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অরুণ তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল।

দিলীপবাবু বলিলেন, "পৃথিবীর পিছল পথে চলতে চলতে পা অনেকেরই পিছলায় বাবা, তাতে তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই। আজ বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে তুমি যার স্বামী সে তোমার অযোগ্যা নয়। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা চিরসুখী হও—জীবনে যেন আর এমন দুর্দ্দিন না আসে।"

সমর নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "আপনি একদিন একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হুজুর, আজ সেইটা আমাকে যে দিতে হয়।"

অরুণ বলিল সে কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা তাহার মনে নাই।

"আজ্ঞে আপনি বলেছিলেন যে রঘুনাথকে আপনার বাড়ী পৌঁছে দিতে পারলে ১০০৲ টাকা পুরস্কার দেবেন। তা ঐ দেখুন রঘুনাথের বদলে রঘুনাথের প্রতিচ্ছবি—সীতার মত সতী শুভ্রা দিদিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন ভুললে চলবে কেন?"

অরুণ বলিল, "এর পুরস্কার 'একশ' টাকায় হয়না সমু। আমি চিরদিন তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবো'।"

দিলীপবাবু বলিলেন, "আর আমি থাকবো এবার থেকে আমার ভাগ্নেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমার মা বাপের কাছেই—দূরে রেখে আর বিপদ ঘটতে দেব না।"

অরুণ ও শুভ্রাকে নদীতীরেই রাখিয়া দিলীপবাবু ও সমর বেড়াইতে গেলেন। প্রভাতী সমীরণস্পর্শেই রাত্রি জাগরণ ক্লান্তি দূর হইল—তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে শুভ্রা ও অরুণকে অবসর দিয়া সরিয়া গেলেন।

অরুণ শুভ্রার আরক্তিম গণ্ডে সহস্র চুম্বন চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া বলিল "এই সম্মুখের ভাগীরথি ও তপনদেবকে সাক্ষী করে আজ

প্রতিজ্ঞা করলাম শুভ্রা, এ জীবনে আর কোন দিনই অন্য স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসবো না। তুমি শুধু আমার স্ত্রী বা সহধর্ম্মিনী নও; তুমি আমার বান্ধবী, আমার জীবনদাত্রী, রক্ষয়িত্রী।

শুভ্রা হাসিয়া বলিল, "ইংরাজীতে একটা কথা আছে "খালি জিনিষই বাজে বেশী"। আমার বিশ্বাস তোমার মনে স্থান না পেলেও পায়ে স্থান পাব আমি। আমি চিরদিন শুধু তোমার পদ সেবারই অধিকার চাই।"

অরুণ আরও কি বলিতে চাহিতেছিল। শুভ্রা বলিল, নাগো, তোমায় এখন আর কিছু বলতে দেবনা আমি। যা কিছু বলবার আমিই বলব।

হাসিয়া অরুণ বলিল, "তুমি তো বেশী কথা বলতে চাইতেনা শুভ্রা"

উত্তরে শুভ্রা বলিল, "এ যে আমার নূতন জীবন; আজ জীবন প্রভাতে একসঙ্গে কত কথাই না মনে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে আজ যা কিছু বলবার সবই একসঙ্গে বলে নি।"

অরুণ আগ্রহে বলিল, "বল শুভ্রা—তোমার কথা আমি এতদিন শুনতে পাইনি—আজ থেকে তোমার সকল কথাই রাখবো।"

শুভ্রা বলিল, "রাখবে, সত্যি রাখবে।"

উত্তরে অরুণ জানাইল যে তাহার অবাধ্যতা করিবে না।

শুভ্রা বলিল, "কণাকে বিয়ে করতে হবে তোমায়—তাকে আনতে হবে বাড়ীতে আমারই কাছে আমার ছোট বোন করে।"

অরুণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না শুভ্রা তা হতেই পারে না। আমি বুঝতে পেরেছি এতদিন সেই যাদুকরী আমায় শুধু অভিনয় করে ভুলিয়ে এসেছে। সে চিরকাল অমলকে ভালবাসতো আর আমাকে—"

শুভ্রা বাধা দিয়া বলিল, "দেখ রঘুনাথ সেজে যতদিন তোমার হোটেলে গিয়েছি ততদিনই আমি বাড়ী ফিরেছি এই ধারণা নিয়ে কণা সত্যিই তোমায় ভালবাসতো।"

অরুণ বলিল, "মানুষ নিজেকে দিয়ে অন্য মানুষকে ওজন করে থাকে এই পৃথিবীর নিয়ম। তুমি ভাল, তুমি সতী, তুমি আমায় ভালবাস প্রাণ দিয়ে তাই হয়তো মনে করতো সেও বুঝি তোমারই মত সাধবী, তোমারই মত মহিমাময়ী, তোমারই মত স্বর্গের জিনিষ।"

শুভ্রা বলিল, "স্বর্গের প্রাণী হবার সখ নেই, আমি শুধু মর্ত্ত্যেই থাকতে চাই মানবী হয়ে তোমার পায়ের তলায়। আমি যে তোমার স্ত্রী এই আমার সব চেয়ে বড় পরিচয়।"

অরুণ শুভ্রাকে বুকের উপর টানিয়া লইল। শুভ্রা অরুণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু অরুণ বুঝিল না। শুভ্রাকে শান্ত করিবার জন্য সে বলিল, "তুমি যদি এই রকম অন্যায় আবদার কর তাহলে আর বাড়ীই ফিরবো না আমি।"

অগত্যা শুভ্রা শান্ত হইল। হতভাগিনী কণার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শুভ্রার চোখে জল আসিতেছিল। সে বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিলনা একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে দুইটী পুরুষকে ভালবাসা কিরূপে সম্ভব।

মধ্যাহ্নে অরুণ ও শুভ্রা বাটী ফিরিল। বহুদিন পরে পরিত্যক্ত গৃহে গৃহলক্ষ্মীর আগমনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সময়ের ডিটেকটীভির পুরস্কার স্বরূপ অরুণ একটী পরমাসুন্দরী পাত্রীর সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিল ও সময়ের কর্ণমর্দ্দন করিয়া বলিল, "দেখ শালা, পঞ্চাশ টাকার জন্য লাফাচ্ছিলি এখন যে পুরস্কার দিচ্ছি তোকে তার দাম পাঁচ লাখটাকা।"

সময় দন্ত বিকশিত করিয়া বলিল, "তা হলে আমার দিদির দাম বিশ লাখ, বুঝলে ডাক্তার সাহেব?"

অরুণ এবার হার মানিল।

—চৌত্রিশ—

অমলকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই কণার মনে যুগপৎ ভয়, লজ্জা বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মনে হইল অমল যেরূপ কোপন-স্বভাব এখনই হয় তাহাকে নয়তো অরুণকে হত্যা করিবে। গত কয়েক দিন অরুণের ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল এবং এ কয়েকদিন যাবৎ নামমাত্র আহার করিত। তৎপরে সে যখন শুনিল যে অরুণ শুভ্রাকে ত্যাগ করিয়াছে তখন সে মৃত্যুবরণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। সারাদিন অনাহারের পর সে আজ যখন অরুণকে পাইল আবেগে তাহার মস্তক ঘুরিতেছিল তথাপি সে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া চির বিদায়ের পূর্ব্বে তাহার দেবতার পূজা করিতে চাহিয়াছিল এমন সময় অমল তাহাকে ডাকিল কণা!

কণার মনে হইল যে তাহাকে ডাকিতেছিল সে অমল নহে এ বুঝি সাক্ষাৎ শমন তাহাকে মৃত্যু ডাকের কঠোর আহ্বান জানাইতেছে। তাহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

অরুণের কি হইল অমলের তাহা দেখিবার অবকাশ ছিল না। সে কণার চৈতন্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেই ব্যস্ত রহিল।

ঘণ্টা তিনেক পরে কণার সংজ্ঞা ফিরিল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া বসিল—ব্যাকুল চিত্তে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—অমলকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই সে ছুটিয়া নামিয়া আসিল। অমলও তাহার পশ্চাতে চলিল। দুই একজন সুরাপায়ী মদের নেশায় কণাকে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া "কোন গগনের তারা তুমি কোন আকাশের চাঁদ" বলিয়া গানের সুরে তাহাকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কণা ছুটিল প্রকাণ্ড রাজপথে দারুণ দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া জাহ্নবীর পানে।

পথ জনশূন্য দুই চারিজন গৃহহীন ভিক্ষুক বিস্মিত নেত্রে কণা ও অমলের দিকে চাহিল মাত্র।

কণা ছুটিতেছে; তাহার বস্ত্রাঞ্চল মাটীতে লুটাইয়া কর্দ্দমাক্ত হইল—সর্ব্ব দেহ সিক্ত—সিক্ত বসনের ভিতর দিয়া সুগৌর যৌবনশ্রী পুলিশের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। তাহারা বিস্মিত আতঙ্কে চক্ষু বুজিল।

ভাগিরথীতীরে কণা ও অমল আসিয়া পৌঁছিল। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।

অমল কণার নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই কণা ঝাপাইয়া পড়িল উন্মাদিনী তরঙ্গিনীর উদ্বেল বক্ষে। বিদ্যুতালোকে কণার গৌর বাহুলতা একবার উপরে উঠিয়া জলমধ্যে বিলীন হইল। জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া "কে কোথায় আছ রক্ষা কর" বলিয়া অমলও সেই তরঙ্গে লাফাইয়া পড়িল।

তাহার মর্ম্মভেদী চীৎকারে জাগরিত হইয়া নিকটস্থ বোটের দুইজন মাল্লাও জলে লাফাইয়া পড়িল এবং অন্য একটী বোটের মাঝিরা উহাদের লক্ষ্য করিয়া বোট ছাড়িয়া দিল।

* * *

প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে অচৈতন্য কণাকে লইয়া শ্রান্ত দেহে কয়েকজন মাল্লা ও মাঝি সহ অমল মহীতোষবাবুর গৃহদ্বারে পৌছিল। জাগরিত হইয়া দ্বার খুলিয়া মহীতোষবাবু অমলকে সম্মুখে দেখিয়া আকুল আগ্রহে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন ও কণাকেও গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া মাঝি মাল্লাদের যথোচিত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। অচৈতন্য কণার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মহীতোষ ও অমল-জননী মুগ্ধ হইলেন এবং যাহাতে কণাকে বাঁচাইতে পারা যায় তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কমলবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অমলকে ফিরিয়া পাইয়া এতই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে অমলের জন্য তাহারা সকলই করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

বেলা দশটায় কণা চক্ষু মেলিল—কিন্তু তখন প্রবল জ্বরে সে আক্রান্ত। এতগুলি নরনারীর মধ্যে যে কেমন করিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। সে আকুল কণ্ঠে কেবলই বলিতে লাগিল, "ওগো দেবি, ওগো দিদি আমার; আমায় ক্ষমা কর। তাহার প্রলাপের অর্থ অন্য কেহ না বুঝিলেও অমল বুঝিল। সে অরুণের বাটী গিয়া শুভ্রার নিকট নিবেদন জানাইল যে শুভ্রা কণার নিকট না গেলে তাহাকে বাঁচান যাইবে না। অরুণকে বহু তর্কে শান্ত করিয়া শুভ্রা চলিল কণার সেবা করিতে। কয়েকদিন বিকারেই কণার কাটিল—কিন্তু শুভ্রা ও অন্যান্য সকলের যত্নে একাদশ দিনে কণার জ্ঞান ফিরিল। সে শুভ্রাকে দেখিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল ও বার বার তাহার নিকট কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। সে শুভ্রাকে আরও জানাইল যে সে আর বাঁচিতে চাহেনা; মৃত্যুই তাহার একমাত্র কাম্য। উত্তরে শুভ্রা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়ে থাকে বোন্। তোমার মত অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়লে হয়তো অন্য স্ত্রীলোকেও তোমার মতই করতো। পাপের সাজা অনুশোচনা। মা গঙ্গার পবিত্র জলে তোমার সকল মলিনতা ঘুচে গেছে। তুমি ভুলে যাও কণা যে তুমি সেই ভাগ্য বিড়ম্বিতা পিতৃ-মাতৃহীনা লাঞ্ছিতা নারী। আজ অমলের বাপ মা তোমায় কন্যারূপে, বধূরূপে ঘরে স্থান দিয়েছেন। আশীর্ব্বাদ করি তোমার জীবন শান্তিময় হোক।"

তৎপরে সে অমলকে ডাকিয়া কণার শীর্ণ হাতখানি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "সত্যই যদি এ জীবনে তোমার দাদা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান না পেয়ে থাকে তবে এই আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি আমি যেন তোমাদের এ মিলন চিরন্তনী হয়; অতীতের অন্ধকারাবৃত স্মৃতি মুছে গিয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রেমালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—তোমরা সুখী হও।"

শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে অমলের মস্তক শুভ্রার পায়ে লুটাইতে চাহিতেছিল; সে নতজানু হইয়া শুভ্রার পদতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বৌদি, তুমি মানুষ নও—তুমি স্বর্গদূতী।"

—সমাপ্ত—

স্বপ্ন-খেয়াল

শ্রীবিমুখ শর্ম্মা

(১)

রাত দুপুরে ঘুমের ঘোরে খোয়াব্ দেখি আনন্দে,
লীগের মুণ্ড লাগছে জোড়া কংগ্রেসের-ই কবন্ধে।
মিলছে যুগল হিন্দু-মুসল আর কারে বল্ ভয় তবে?
সারা ভারত মিল্ছে যে আজ ভারতমাতার জয় রবে!
ঘুমের ঘোরেই বেড়িয়ে পড়ি বিপুল প্রেমের উচ্ছ্বাসে,
নৃত্যপাগল হিন্দু-মুসল; কুশল গাহি উল্লাসে!
লম্বা দাড়ির সঙ্গে হেরি গুচ্ছ-টিকির গাঁটছড়া,
হম্‌কা নাচের হ্যাঁচ্‌কা টানে পরস্পরের হাত ছাড়া!
বদ্‌না-গাড়ুর 'বল্' চলে ঐ যুগ্মনলের বন্ধনে,
ঘোম্‌টা এবং বোরখা বহিন্ খেম্‌টা নাচে অঙ্গনে;
পেশোয়াজ্ ও শাড়ী জমায় ঝুমুর নাচের পাল্লা যে,—
সাম্‌লাবে কে তাণ্ডবে ঐ কৌপীন্ ও আল্‌খাল্লাকে?
গান্ধী-টুপির সঙ্গে লাফায় 'ফেজে'র মাথায় গোপুচ্ছ,
কংগ্রেস এবং লীগ্ পতাকা সবার উপর সু-উচ্চ!
হংস এবং মোরগ নাচে ঘরের চালের মট্‌কাতে,
রাম ও রহিম একযোগে ঐ শুভুক টানে সট্‌কাতে;
হিন্দু-মুসল কুশল গাহ, এক হলো আজ দুই মিশে,
নৃত্য-পাগল ছন্দ আমার উল্লাসে না পায় দিশে;
ড্যাডা ড্যাং ড্যাং ছ্যাডাং ড্যাডং ডঙ্কা বাজাও আনন্দে,—
লীগের মুণ্ড লাগছে জোড়া কংগ্রেসের-ই কবন্ধে!

(২)

নিগূঢ় প্রেমের নিগড় এ যে মৈত্রী-ভীষণ, অখণ্ড,
কংগ্রেস্ এবং লীগের বাঁধন, প্রতাপ কত প্রচণ্ড!
ভারতমাতা অভয় দানে বাংলা এবং পাঞ্জাবে,
অহিংসাতেই গোবংশে তার রক্ষা বুঝি সম্ভবে;
ঈদ্-বিজয়ার আলিঙ্গন ঐ রামছাগল আর দুম্বাতে,
পুরুতঠাকুর ঘণ্টা নাড়েন 'আখেরী-চাহার্-শুম্বা'তে।
মহরমের বাদ্যে নাচে চৈত্রী-গাজন-সন্ন্যাসী,
হোলির রঙে হল্লা তোলে দরবেশেরা ভিন্‌দেশী;
কোশাকুশি নিয়ে ঢোকেন মন্দিরে ঐ মৌলবী,
'জুম্মা'বারের 'আজান্' দিতে শর্ম্মা ভাজেন ভৈরবী।
এক বিছানায় খানায় বসে নিকষ-কুলীন, মৌলানা,
গোস্তরুটির দিস্তে দিয়ে কিস্তিমাতে নাই মানা;
মালসা-ভোগের মহড়া নিতে লুকিয়ে থাকেন মোল্লাজী,
ভাঙ্গা মাটির সান্‌কিতে ঐ ভাটপাড়া খায় ডিগবাজী!
সব ভেদাভেদ মিট্‌লো এবার মিলন গানে গুঞ্জরি,
মসজিদে ঐ বাউল বাজায় একতারা আর খঞ্জরি!
ঢাকঢোলে আজ নিবিড় শুধু নীরবতার স্তব্ধতা,
ভক্তগণের নাই আজি আর রক্তপণের লুব্ধতা;
সারাভারত মিললো আজি লীগ-কংগ্রেস্ সনন্দে,—
ড্যাং ড্যাডা ড্যাং ছ্যাডাং ড্যাডাং ডঙ্কা বাজাও আনন্দে।

( )

ডঙ্কাই আজ বাজাও এবং বাজাও জগঝম্পরে,
লীগ কংগ্রেস্ মিলন যেন জীবন-মরণ সংস্করে!
এক লাফে যান মক্কা কাশী, জাহ্নবী যান 'জম্‌জমে',
রেজাকরিম্ রাজকুমার হ'ন জামাইবাবুর সম্ভ্রমে;
বোরখা ফেঁড়ে ফয়জু বিবি হলেন ফুলী ময়রাণী,
কামাল্ পাশার আমলে ঘর সামাল্ বড় হায়রাণী!
অবাধগতি যুগপ্রগতি হিন্দু-মুসল সংযোগে,
'আজাদ্' ও 'আনন্দবাজার' পরস্পরের গা শোঁকে।
স্বরাজ-তরী ভাস্‌লো এবার প্রেম-দরিয়ার মাঝখানে,
জিন্নাজহর,—বদর্ বদর্—লহর তুলে দাঁড় হানে;
শক্ত হাতে পোক্ত মাঝি গান্ধীজী তার কর্ণধার,—
পাল তুলেছে সুভাষ নিজে, স্বরাজ-গতি দুর্নিবার!
হেল্‌ছে তরী, দুল্‌ছে তরী, চল্‌ছে তরী, টল্‌ছে না—
লর্ড-মহলের পাঁজির পাতায় পাঁতির নীতি ফল্‌ছে না।
লোষ্ট্রাঘাতেও রাষ্ট্রপতি ইষ্ট-নীতি-ভ্রষ্ট নয়,
মিষ্ট কথায় বৃষ্টি করেন, দৃষ্টি হেরেন ব্রহ্মময়।
হিন্দু-মুসল-কল্যাণে আজ কেউ তুলোনা নিন্দাবাদ—
ঐক্যতানে উঠুক শুধু "জিন্নাজহর জিন্দাবাদ!"
ড্যাড্‌ডা ড্যাডাং ছ্যাডাং ড্যাডাং ডঙ্কা বাজুক হুঙ্কারে,-
'খেয়ালী' এই স্বপ্ন-খেয়াল প্রচার করুক সংসারে।

শান্তি-নিকেতনে বঙ্কিম-অর্চ্চনা

গত সপ্তাহের সাহিত্য-সংসারের সেরা ংবাদ কবিবর রবীন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক শান্তি-নিকেতনে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতি-অর্চ্চনা। তিপূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশব্যাপী শততম ন্ম উৎসব উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কবিবর একটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন ভাবিয়া অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন! একদা বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কণ্ঠের মালা রবীন্দ্রনাথকে পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন :—এখন চন্দ্র অস্ত যাইতেছে, রবির উদয় হইতেছে, এ মালা এখন রবিরই প্রাপ্য। কবিবর পরিণত বয়সে বঙ্কিম-শতবার্ষিকীর উচ্চ অবসরে সেই পুণ্যস্মৃতির অর্চ্চনা কেমন করিয়া করেন, তাহা দেখিবার জন্য অনেকেরই লোভ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভগ্নস্বাস্থ্য ও বৃদ্ধবয়সের কথা স্মরণ করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, কবিবর এতদুপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যতটুকু বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশা ষোলআনা পূর্ণ না হইলেও ততটুকুই বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ এই প্রাণখোলা লেখাটুকুর ভিতর দিয়া আমরা যেন আমাদের সেই সত্যযুগের রবিবাবুকে ফিরিয়া পাইয়াছি। কবিবর সতেজ, সরল, স্পষ্ট ভাষায় যেটুকু বলিয়াছেন, তাহাও সম্প্রতি আর কেহই বলিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত সত্য-ভাষণের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু রহিয়াছে তাহাও বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-কর্ত্তৃক বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী সম্পাদনের প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ সভা সমিতিতে বঙ্কিমকে লইয়া যে নির্লজ্জ ব্যবসাদারী চলিতেছে তাহা অবশ্যই কবিবর লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সকল বাক্সর্ব্বস্ব অনুষ্ঠানে বঙ্কিম সম্বন্ধে যে সকল অকালপক্কতার ওস্তাদি ফুটিয়া উঠিতেছে এবং বঙ্কিমকে Certificate দিবার যে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ও বাচালতা দিন দিন প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বঙ্কিমের জন্য তোমরা যে শোক করছ, তার কি সবটা খাটে? তোমরা তাঁর মহত্বের কি টের পেয়েছো? হয়তো তাঁর গভীর পুস্তকগুলি কিছুই পড়নি। কোনোটাই ভাল করে পড়েছ কি না সন্দেহ। যে পরিপ্রেক্ষার (Perspective) মধ্যে তাঁকে বোঝা যেতে পারতো, তাতো এখন দুর্ল্লভ। তোমরা তাঁকে ঠিক করে বুঝবে কেমন করে? ......নহিলে স্মৃতিসভার যত কিছু আয়োজন ও সমারোহ সবই দুঃসহ বিড়ম্বনা। তাতে তাঁর শুদ্ধবুদ্ধি আত্মা তাঁর চিন্ময় লোক হতে প্রতিদিন পীড়িতই হবে।" ইহার তুল্য খাঁটি সত্য মর্ম্মান্তিক কথা আর নাই। আমাদের শনির "বাণু" সজনী, হতাশ ঐতিহাসিক ব্রজেন, নিপাতনে সিদ্ধ মোহিত মাষ্টার, এবং প্রেমচাঁদ সুশীল-কুমার হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য রামা, শ্যামা, শকুরা প্রতিদিন বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে যে রাশি রাশি রাবিশ-বাণী উদ্গারিত করিতেছেন, তাহাতে বঙ্কিমের—"শুদ্ধবুদ্ধ আত্মা তাঁর চিন্ময় লোক হতে প্রতিদিন পীড়িতই" যে হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইঁহারা কেহই যে বঙ্কিমের গভীর পুস্তকগুলি কিছুই পড়েন নাই এবং ভাল করিয়া কোন গ্রন্থখানিই পড়েন নাই, তাহা ত ইঁহাদের লেখা পড়িলেই বুঝা যায়। যে Perspective-এর মধ্যে বঙ্কিম-চন্দ্রকে বুঝা যাইতে পারিত তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র কবিবরেরই আছে; কিন্তু আমাদের ভাগ্যবশে এখন তিনি রোগশীর্ণ ও জরাজীর্ণ। তাঁহার নিকট সেই বিরাট perspectiveএর ব্যাখ্যা শুনিবার আশা আমাদের এখন দুরাশা মাত্র। সেই জন্যই কবিবর প্রথমেই আমাদের বলিয়া রাখিয়াছেন—"আজ আর নূতন করে কি বল্‌বো? তাঁর মৃত্যুর পরেই ১৮৯৪ সালের (ব্রজেনবাবু দেখিবেন, রবিবাবু তারিখ না দিয়া তাঁহাকে কেমন ফাঁকি দিয়া গেলেন! সালটা ঠিক হইয়াছে ত?) প্রথম স্মৃতিসভায় আমার সব কথা নিঃশেষে বলেছি। তখন অন্তর সদ্য আঘাতের ব্যথায় ভরা ছিল। এখন সেই সব কথা সহজে কি আর আস্‌বে?" তথাপি কবিবর বঙ্কিম-স্মৃতি-অর্চ্চনার প্রসঙ্গে এখনও যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহাও এই "মরুভূমির" মধ্যে আমাদের শুষ্ককণ্ঠে ও পিপাসার্ত্ত কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিয়াছে। সেই কথাগুলির কিয়দংশ আর একবার এইখানে স্মরণ করিয়া কবিবরকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি :—

"সেই শুদ্ধ মহান্ সাধক ছিলেন হিমালয়ের মহাশিখরের মত নিঃসঙ্গ গম্ভীর। কেউ তাঁর কাছে ঘেস্‌তে পারতেন না। * *

তিনি ঋজু, অল্পবাক্, দুরারাধ্য, শুদ্ধ সাধক। তিনি সাধকই বটেন। তাঁর সাধনালব্ধ যে চিন্ময় আধারটি তিনি দিয়ে গেলেন, তাহাই ক্রমে বাঙালীর নব ইতিহাস সৃজনের মূল কাব্য হোলো। * * * * কি ভাষা নিয়ে বঙ্কিম আরম্ভ করলেন, আর কি করে রেখে গেলেন।.........তাঁর সময়কার রুচি ও দৃষ্টি তাঁর লেখার কোথাও ধরা পড়ে না। তিনি (Pioneer) যাত্রীদলের অগ্রদূত। নূতন পন্থা রচনায় সৃজনের দুঃসহ দুঃখ তাঁর। তাঁর দুঃখ তোমরা এখন বুঝবে কি করে? বাংলা ভাষাকে তিনি এমন করে রেখে গেলেন যে তাহা সর্ব্ব-সাধনা ও ঐশ্বর্য্যের আধার হোতে পারে। নিজে সে সব ঐশ্বর্য্য আহরণ করে তাতে রেখে দেখালেন যে বাংলা কি অপূর্ব্ব আধার হয়েছে।.........নানাদেশের ও কালের সম্পদ্ তাতে তিনি সঞ্চয় করে দেখালেন। ভরসা পেয়ে অন্যেরাও তাতে তাঁদের অর্ঘ্য রাখতে সুরু করলেন। যে ভাষা অবজ্ঞার আবর্জ্জনায় আঁস্তাকুড় ছিল, তা হোলো শ্রদ্ধাবান যজমানের অর্ঘ্যের আধার পবিত্র যজ্ঞভূমি। এত বড় দান আর নাই। আমরা নিজেরা সারাজীবনের সকল সঞ্চয় তাতে রাখতে পেয়েছি বলে, জানি কি অসামান্য অধিকার ও সম্পদ্ তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর প্রসাদেই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সকল স্থান কাল হতে সকল সম্পদ্ আহরণ করে ও অন্তরের সব চিন্ময় ভাণ্ডার উজাড় করে তাতে রাখতে পেয়েছি।"

অসামান্য প্রতিভার প্রতি অসামান্য প্রতিভার এমন ভক্তি-শ্রদ্ধাঞ্জলিপূর্ণ অন্তরের নিবেদন আমরা ইদানীং আর দেখি নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবিষ্যৎ

পর্দ্দার অন্তরালে যে সকল লীলা চলিতেছে, তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ভবিষ্যৎ জগঝম্পাট্ বলিয়াই মনে হইতেছে। সদ্যঃ-প্রকাশিত সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকার অভিনব সংখ্যাখানি দেখিলেই সেই পর্দ্দা-লীলার আমেজ পাওয়া যায়। ইহার বিজ্ঞাপনের পাতা হইতে শেষপর্য্যন্ত ব্রজেন-সজনীর নামাবলি দিয়া মোড়া। এই পত্রিকার পত্রিকাধ্যক্ষ ব্রজেনবাবু, এই পত্রিকা ছাপা হইয়াছে ব্রজেনবাবুর কার্য্যালয় তথা ব্রজেনবাবুর মনিবের কার্য্যালয় প্রবাসী-প্রেস হইতে, এই পত্রিকায় ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর গুণ-গরিমা ঘটা করিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে (অবশ্য বিনামূল্যে কি না জানা নাই), এই পত্রিকায় লিখিয়াছেন গবেষক ব্রজেন বাবু এবং তস্য প্রাণসজনী সজনীকান্ত—ইঁহারা দুইজনেই পত্রিকার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সজনীকান্তের রঞ্জন পাব্লিসিং হাউসের বিজ্ঞাপনও ইহাতে আছে এবং ইনি বঙ্গীয়-সহিত্যপরিষদের নাম-করা গ্রন্থাধ্যক্ষও বটেন। ব্রজেনবাবু তাঁহার লেখায় সজনীকান্তকে কেয়াবাৎ করিয়াছেন এবং সজনীকান্ত তাঁহার গবেষণা-মূলক লেখায় ব্রজেনদাদাকে কেয়াবাৎ করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয় ইঁহাদের দুইজনের এক প্রাণ, এক মন, এক ধন, এক মন, এক দেহ। অবশ্য এই পত্রিকায় এই দুই মহাত্মার অবদানের কথা এবার আর তুলিব না। যে সজনীকান্ত অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস সাতছত্রে শেষ করিয়া পূর্ণোল্লাসে লিখিয়াছেন—"সুতরাং অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিতান্ত হাঁটি-হাঁটি-পা-পা অবস্থার ইতিহাস", সেই সজনীকান্তের গবেষণার "হাঁটি-হাঁটি-পা-পা" এর মূল্য কেহই দিতে ভুল করিবেন না। এই যুগলাত্মার লেখা দুইটিতে যে তারিখ ও facts এর ভুল আছে, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা পরে দেখাইব। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। আমরা শুধু ভাবিতেছি—সেই রামেন্দ্র-হরপ্রসাদ অধ্যুষিত সাহিত্যপরিষদ্, আর এখনকার এই ব্রজেন-সজনী-কিল্‌কিলান্বিত সাহিত্যপরিষদ্। বয়োধর্ম্মে হীরেন্দ্রবাবুর সেই দাপট আর নাই। সাহিত্যপরিষদ্ যেন ক্রমশঃই বে-ওয়ারিশ মাল হইয়া পড়িতেছে এবং সুবিধা বুঝিয়া ব্রজেন-সজনী—"এই-বেলা নে ঘর ছেয়ে"—নীতি অবলম্বন করিতেছে। ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে, তাহাতে হীরেন্দ্রবাবুর অবর্ত্তমানে সাহিত্য-পরিষদের কপালে ব্রজেন প্রেসিডেণ্ট এবং সজনী Vice, জগঝম্প করিতেছে বলিয়াই মনে হইতেছে!

রাজমালা রচনা গরজ

(ঐতিহাসিক প্রতিবাদ)

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রামদয়াল রাজা শ্যামসুন্দরের নিকট বাসভূমি চাক্রাণ পান। রামজীবনপুরে আসিবার কিছু পরে রামদয়ালের কাল হয়। রামশঙ্কর সেন, তৎপুত্র রামজনার্দ্দন সেন এবং তদীয় পৌত্র রামজয় সেন—তিন পুরুষ এই রামজীবনপুরে বাস করেন। রামজীবনপুরের একাংশকে নেটোর বেড় বলে। আজিও সেই নাম সেই অংশে এবং জমিদারী কাগজপত্রে চলিতেছে। রামজীবনপুর ব্যতীত নেটোর বেড়ের পৃথক অস্তিত্ব কিছু নাই। বসুমজুমদার মহাশয় নেটোর বেড়কে নাটুরগড় করিয়া বনেদী চাল চালিয়াছেন মাত্র। তৎপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজা শ্রীশ্রীবসন্ত রায়ের ৮ম পুরুষ অধস্তন রাজা জয়নারায়ণ রায় কাটুনীয়ায় বাস পরিবর্ত্তন করিলে অনুগত বৃদ্ধ রামজয় সেনও তদনুগমন করিয়াছিলেন। কাটুনীয়া আসিয়া রামজয় ও তদীয় গোষ্ঠি বাসার্থে পূর্ব্বৎ জমি চাকরাণ পান। তাঁহার (রামজয়ের) পুত্র রামনারায়ণ ও পৌত্র যষ্ঠীবর সেন উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ ছিলেন। তাঁহাদের মুদীখানার দোকান ও নৌকায় ছোট কারবার ছিল।

গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে Settlement এর সময় ভুঁইকোড় শ্রীশ্রীরাজা মনোন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পিতামহ সম্পর্কীয় দ্বিজবর সেন (রামজয়ের পৌত্র) যশোর রাজবংশীয় রাজা জয়নারায়ণের পৌত্র (মহারাজ বসন্ত রায়ের ১০ম পুরুষ অধস্তন) খুলনা জেলার অন্তঃপাতী নূবনগরের খ্যাতনামা দানশীল প্রবীন জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহোদয়ের নিকট ভবিষ্যতে বহু সরিকী যশোর রাজবংশীয়েরা যাহাতে কিছু করিতে না পারেন, তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া লইবার জন্য সানুনয় নিবেদন জানান। মহানুভব মহাপ্রাণ রাজা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় দ্বিজবর সেনের কাতর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ৪ একর ৯১ শতক বাসভূমি 'চাকরাণ' শব্দের পরিবর্তে 'মহাত্রাণ' শব্দ বসাইয়া Settlement Record করান। এখনো সেই জমিতে সেনেরা বাস করিতেছেন।

সাধারণ গৃহস্থ রামজয় সেন (যিনি বসুমজুমদার মহাশয়ের দিগজার শেষ স্বাধীন নৃপতি) যে "১৮৫৬" খৃষ্টাব্দে যশোর রাজবংশীয়দের আশ্রয়েই কাটুনীয়ায় জীবিত ছিলেন—যশোর রাজবংশীয়দের 'পুরাতন দপ্তর আজো তাহার জীবন্ত ও সগর্ব্ব সাক্ষ্য দিতেছে। পরম শ্রদ্ধেয় রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় আজিও জীবিত। তাঁহার নিকট সন্ধান লইলে সকল সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত হইবে। যষ্ঠীবর সেন সম্বন্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ তিনি—স্বয়ং।

রামজয় সেনের প্রপৌত্র যদুনাথের ছয় পুত্রের মধ্যে প্রথমটি দেশেই থাকেন, দ্বিতীয় মৃত, তৃতীয় পূর্ব্বে কম্পাউণ্ডারী করিতেন—স্বভাবদোষে বিতাড়িত হইয়াছেন, চতুর্থ ও কনিষ্ঠ অপারিণামদর্শী চঞ্চল-চিত্ত অনেক কিছু করিয়া বর্ত্তমানে দরজীর ব্যবসায় করিতেছেন এবং "পঞ্চম" মনীন্দ্র নাথ (পাগলা মনে নামে খ্যাত) সেন (যিনি বসুমজুমদার মহাশয়ের স্বহস্তনির্ম্মিত অতি আধুনিক ভুইকোড় শ্রীশ্রীরাজা বাহাদুর) পূর্ব্বে বহুদিন ভ্যাগাবাণ্ডাইজিম প্রচার করিয়া শেষে Photographerই হইয়াছিলেন; এক্ষণে পৈটিক কারণে নানাপ্রকার প্রসাধন দ্রব্যের Canvassing করিতেছেন। প্রবন্ধ লেখকের চক্ষু স্বয়ং তাহা দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে! মনীন্দ্র নাথ সেন অবিবাহিত। তিনি অতি কষ্টে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, নিজকে বিদ্যাদেবীর গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শিশুবেলা হইতে তাঁহার মাথায় দোষ আছে—তাহা পরিচিতমাত্রেই জানেন।

যাঁহারা চিরদিন পুরুষানুক্রমে শুধু "সেন" উপাধি বহন করিয়া যশোর রাজবংশীয়দের আশ্রয়ে নূরনগর অঞ্চলে বসতি করিয়া আসিতেছেন; রাজা ও রাজবংশ বসাইয়া সেই সেন গোষ্টিকে ময়ূর-পুচ্ছ দিয়া পক্ষী বিশেষকে ময়ূর সাজাইবার মত এক উৎকট লালসা সহসা বসুমজুমদার মহাশয়ের উদয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার একমাত্র কারণ—তিনি উক্ত মনীন্দ্র নাথ সেনের একান্ত অনুগৃহীত। বসুমজুমদার মহাশয় শিখিয়া রাখুন যে, কথা এবং কাজে যাহারা কোনদিন মিল রাখিতে পারে না তাহারা লোকসমাজে মিথ্যাশ্রয়ী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

আমাদের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে রাজানুরাগী বসুমজুমদার মহাশয়ের প্রবন্ধ ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতে পারিল না; তজ্জন্য তাঁহার অনুশোচনা বা অন্ধক্রোধের কিছুই নাই। আমরা তাঁহার ইতিহাসে বেপরোয়া ব্যভিচারের কর্কশ প্রতিবাদ করিয়াছি মাত্র। ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে সমগ্র সমাজও প্রতিবিধানে অগ্রসর হইবে—ইহা পরম সত্য।

—:(শেষ):—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ঘর

দিলীপ ও সুনীলা

দিলীপ—(সুনীলার মুখের উপর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, ক্ষণকাল পরে বলিল) সত্যি কিছু জানিনা সুনীলা! আমি জানতুম তুমি কাশীশ্বর বাবুর বড়ো ছেলে দিলীপকে ভালোবাসো। তার জন্য তুমি সব করতে পার। জানতাম না তোমার এ নুতন পরিচয়। জানতাম না—এক গোত্রহীন জারজ-পুত্রের জন্য তুমি—

সুনীলা—জানি, জানি; তুমি কি বলবে তা জানি কিন্তু থাক, আর কথা কয়োনা। তুমি বড়ো বেশী কথা কইছো আজ।

দিলীপ—হাঁ, খুব বেশী? কি কর্ব্ব চুপ কোরে থাকতে পারছি না। —তুমি রাগ করোনা, এতে আমার অসুখ করবে না।

সুনীলা—হাঁ, আমি রাগ কোরব। তুমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পাবে না। অনেক রাত হল।

দিলীপ—আর একটা কথা!

সুনীলা—বলো, কী?

দিলীপ—তুমি আমায় একলা ছেড়ে দিতে পার না? নাই বা তুমি আমার সঙ্গে এলে। আমি আমার দুঃখের বোঝা নিয়ে দূর পল্লীতে গিয়ে বাস কোরব একলা; তুমি এখান থেকে আমার অসমাপ্ত কাজের ভার নাও। —পারবে না?

সুনীলা—না, সে হবে না।

দিলীপ—কেন হবে না?

সুনীলা—সে অনেক কথা। সে এখন বলতে পারবো না। তুমি ঘুমোও। আর জেগে থাকলে কাল সকালে আবার তোমার মাথা ঘুরতে থাকবে, বুক ধড়ফড় ক'রবে।

দিলীপ—কিন্তু ঘুম আমার আসে না। চোখ বুজলেই দুঃস্বপ্ন!

সুনীলা—গাইবো একটা গান, চুপি চুপি কালকের মত? গান শুনলেই তোমার ঘুম আসবে।

দিলীপ—কিন্তু কালকের গান ছিল বড়ো করুণ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের ভেতর কতো কেঁদেছি। করুণ গান আমি শুনবো না। কাঁদতে আর পারি না।

সুনীলা—(তরল হাস্যে) কি স্বপ্ন দেখছিলে?

দিলীপ—দেখছিলাম আমার মা আমার কাছে হাত জোড় কোরে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি—

(দিলীপের গলার স্বর সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল)

সুনীলা—থাক্, করুণ গান আমি আর গাইবো না। অকরুণ গানই গাইছি, শোন। —চোখ বোজ, পাশ ফিরে শোও, বালিশের উপর হাতটা তুলে দাও। (দিলীপ শিশুর মত সুনীলার আদেশ পালন করিল) —হয়েছে। (বলিয়া উজ্জ্বল আলোটা নিভাইয়া ঘরের সবুজ আলো জালিয়া দিয়া মিঠে সুরে গান ধরিল)

"কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা?
আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল
তোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগালো
ঐ চাহনি তুফান তোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন মাধুরীর কমল কানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের পরে।
তোমার হাসির আভাষ লেগে
বিশ্ব দোলন দোলায় বেগে
উঠলো জেগে আমার গানের
হিল্লোলিনী কলরোলা॥"

(গান শেষে সুনীলা দিলীপের পানে চাহিয়া দেখিল—সে নিদ্রামগ্ন হইয়াছে)

সুনীলা—দিলীপ? না ঘুমিয়ে পড়েছে —(বলিয়া ধীরপদে তাহার মাথার কাছে আসিয়া অতি সন্তর্পনে তাহার মস্তকে কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল)

সুনীলা—তোমায় ছেড়ে দোব! তুমি একলা চলে যাবে, আর আমি এখানে তোমার অসমাপ্ত কাজের ভার নিয়ে থাকবো। —আমি পারবো না তা। —কেন, শুনবে, পারবো না? ...আরে দূর, আমিও কি শেষে পাগল হ'লাম! কি সব বকে যাচ্ছি আপন মনে! —থাক্, আমি চট্ কোরে

কাজগুলো সেরে আসি গে। বেশ ঘুমুচ্ছে, থাক্।

(প্রস্থান করিল সুনীলা)

(দিলীপ ঘুমাইতে লাগিল। প্রবেশ করিল যোগমায়া। তিনি অপলক নেত্রে দিলীপের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন)

যোগমায়া—দিলীপ! ওরে আমার দিলীপ।

(দিলীপ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া শুইল ইতিমধ্যে; মনে হইল যোগমায়ার আহ্বান তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে জাগরণের উপর টানিয়া আনিতেছে। যোগমায়া আবার ডাকিলেন; এবং অবশেষে দিলীপের গায়ে মৃদু আঘাত করিয়া ডাকিতেই দিলীপ স্বপ্নের ঘোরে বলিয়া উঠিল—'মা! মা! মা!'··· সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুম ছুটিয়া গেল; সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া যোগমায়ার দিকে চাহিয়া রহিল মুহূর্ত্তকাল অবাক হইয়া; পরে বলিল)

দিলীপ—মা! তুমি! ···স্বপ্ন নয়, সত্য তুমি।

যোগমায়া—হ্যাঁ দিলীপ, আমি। —ওরে আমি মরে যাচ্ছি। অন্তর আমার জ্বলে গেল, আমায় বাঁচা দিলীপ। সে দিন থেকে কাউকে আমি মুখ দেখাইনি, তবু আমি শান্তি পাইনি দিলীপ। তোর কাছ থেকে ক্ষমা না পেলে আমি শান্তি পাবো না। —আমায় বাঁচা দিলীপ।

দিলীপ—মা, আমি নিজে বেঁচে নেই—তোমায় কি করে বাঁচাবো! আমারও মৃত্যু হয়ে গেছে সেই দিন থেকে!—সাধনা গেছে, গৌরব গেছে, জীবনের মন্ত্র ভুলে গেছি! যা আছে তা শুধু মানিকের এক স্মৃতি আর এই দেহটা!

(ক্রমশঃ)

বিয়ের রাতে

ডাঃ সৌরেন্দ্র মোহন সরকার

তিন্ তিন্ বার ম্যাট্রিক ফেল ক'রে সুবিমল মুষড়িয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ একদিন সংবাদ পত্রে নজরে পড়লো, কে একজন সতেরো বার বিফল মনোরথ হ'য়ে চল্লিশ বছর বয়সে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হ'য়ে অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাই দেখে সেও প্রাণপণ চেষ্টায় চতুর্থবারে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলো।

একে তাহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলনা, তদুপরি তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ-পাতীত্ব দেখিয়া উদ্যম নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সে বুঝিয়াছিল পরীক্ষকগণ পর্য্যন্ত অবিচারক; নতুবা এক-আধ-বার নয়, তিন তিন বার বিফল হ'বার কথা তার নয়।

যাই হোক তাকে রোজগারের চেষ্টা করতে হ'লো। চাক্‌রী—! চাকরী—! চাক্‌রী! কিন্তু কোথায় চাক্‌রী। সে চাকরী চায়, কিন্তু চাকরী তাকে চায় না। সংবাদপত্রে একদিন লক্ষ্য পড়লো—'জর্জ্জ টেলিগ্রাফ' হ'তে পাশ করলে, রেলের চাক্‌রী অনিবার্য্য। কোন রকমে টেলিগ্রাফটাও সে পাশ করলো, কিন্তু "অনিবার্য্য চাক্‌রী"—তার ভাগ্যে দুঃসাধ্য হ'ল, কাজেই 'প্রাইভেট টিউশনি' করেই দিন কাটছিলো—এবং 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে'র 'ওয়াণ্টেড' কলম দেখে মাঝে মাঝে এক একটা আবেদন পত্রও স্থানীয় ডাক বাক্সের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা চলছিলো; কিন্তু কোনটাই লাগছিল না।

সুবিমল একদিন বসে বসে ভাবছে, পোষ্টাফিসের পিওনগুলোও কি তার সঙ্গে শত্রুতা করছে, ঠিক সেই দিনই একখানা

সুবিমল তাহার জীবনের একঘেয়েমীর কথা ভাবিতে ভাবিতে ভাঙা চেয়ারখানায় ব'সে, টেবিলটার 'পা' দুটো চাপিয়ে দিয়ে একটা বিড়ি টানিতেছিল, হঠাৎ সে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠলো, বিড়িটা কখন যে তার কোলের উপর প'ড়ে, খানিকটা কাপড় পু'ড়ে, গায়ের চাদরা পোড়বার উপক্রম করছিলো, তা সে টেরই পায় নি।

তাড়াতাড়ি উঠে কাপড়-চোপড় সামলাতে ব্যস্ত, এমন সময়ে একখানা 'ট্রলী' তার ষ্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ালো, আরোহী তাহাদের লাইনের 'ইন্‌স্পেক্টার' সাহেব। প্রথমে সে দিকে তার লক্ষ্যই হয় নাই, 'ইন্‌স্পেক্টার' সাহেব, সুবিমলের ব্যস্তভাব দেখে একটু ইতস্তত ক'রে গম্ভীরকণ্ঠে একজন কুলীকে যখন আদেশ কল্লেন "টিকিট বাবুকে ডাকো", তখন সুবিমলের লক্ষ্য পড়িল সে দিকে।

বলা বাহুল্য, যুপকাষ্ঠ সন্নিহিত, খড়্গ-উত্তোলন-কারী-ঘাতকের সন্নিকটে দেবমূর্ত্তির সম্মুখস্থ, নিরীহ ছাগ-শিশুর মতই সুবিমল কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার 'দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তার' সামনে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টার সাহেব তাহাকে বিশেষ কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। 'ফ্লাগ' ষ্টেশন, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে একখানি ঘর, এই ঘরেই তোলা উনুনে রান্নাবান্না করিয়া খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া থাকিতে হয়,. কারণ রাত্রে এখানে থাকা নিরাপদ নহে, এই কয়েকটী সংবাদ গ্রহণ করিয়াই তিনি বিদায় লইলেন।

'ম্যাকলিয়ড' কোম্পানীর ছাপ মারা চিঠি তার হাতে পড়লো—পড়ে দেখলে কুড়ি টাকা মাইনের "জেনারেল ম্যাসিষ্টেন্টের" একটী পোষ্ট তাকে দেওয়া হ'য়েছে। বিনা বাক্য ব্যয়ে সে কর্ম্মে যোগদান করলো।

বছর খানেক ধ'রে একটা বড় ষ্টেশনে কাজ কর্ম্ম শেখার পর সম্প্রতি তাকে 'বুকিং ক্লার্ক' করা হয়েছে একটা ফ্লাগ ষ্টেশনে। পদোন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু মাইনে তাই-ই আছে "ম্যাসিষ্টেন্ট ষ্টেশন মাষ্টারশিপ" পরীক্ষাটা পাস করতে পারলে, একটা ষ্টেশনের চার্জ্জ পাওয়া গেলে, মাইনে ত্রিশটাকা হতো আর বাইরের রোজগারও কিছু হ'তো। কিন্তু সেটা তার পক্ষে অসম্ভব, কিছুতেই একজামিন কোস্টার 'ডু' এক 'প্যারা'ও তার মাথায় ঢুকছিলো না, সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

তবে একটা সুবিধা, সে তখনও অবিবাহিত। দেশে, তাহার দাদা ও বিধবা মাতা ছাড়া আর কেহই ছিলেন না। নিজের খরচের জন্য কিছু রাখিয়া তাহাকে সবই সংসারে দিতে হইত। কাজের মধ্যে সকালে উঠে, ক্যাস্ বাঁধা, গোটাকতক টিকিট বিক্রয়, ট্রেন এলে পাশ করান, খাতা পত্র সারা, তার মধ্যে ছুটো রান্না, খাওয়া, নিকটস্থ গ্রামে গিয়া রাত্রি কাটানো, আবার পরদিন ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি। এই সব কথা যখন সেদিন সে ভাবছিলো, সেই দিনই ইনস্পেক্টার সাহেবের শুভাগমন হ'বে, তা সে জানতো না। নূতন ইন্স্পেক্টার এসেছে, বড় 'ষ্ট্রিক্ট' এই কথা সে শুনেছে কিন্তু একদিনও তার মুখের কথা শোনে নাই। আজ ইন্স্পেক্টারের সঙ্গে কথা ক'য়ে সে বুঝলে তিনি মন্দ লোক নন্।

(দুই)

সিক্স আপ্ ট্রেনখানা ধীরে ধীরে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। 'ম্যাকলিয়ড' কোম্পানীর জংসন্ ষ্টেশন্। ম্যাসিষ্টেন্ট সুবিমল 'ইউনিফর্ম্ম' দেওয়া কোটটী গায়ে চড়াইয়া গেটের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কত রঙ বেরঙের যাত্রী ট্রেন হইতে নামিতেছে, কেহ তাহার হাতে 'টিকিট' গুঁজিয়া দিয়া যাইতেছে, কেহ 'টিকিট নিন্ মশাই' বলিয়া টিকিট দিতেছে, কেহ বা টিকিট না দিয়াই চলিতেছে। সু-বিমলের যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। প্রথম শ্রেণীর কামরায় এক কিশোরী ও তাহার সঙ্গিনী এক প্রৌঢ়া, দরজার সম্মুখে ঝুঁকিয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছিল যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছে। সুবিমলের অন্যমনস্কতার কারণ, সে তাহার চঞ্চল দৃষ্টিকে কোন মতে ফিরাইতে পারিতেছিল না। তাহার লুব্ধ নয়ন ঐ কিশোরীর দিকেই আবদ্ধ ছিল। কাহাকেও না পাইয়া যখন কিশোরী ও প্রৌঢ়া ধীরে ধীরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, তখন সুবিমল কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল।

ক্যাশ্ মিলাইতে তাহাকে সেদিন বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিছুতেই তাহার মনসংযোগ হইতেছিল না, কিশোরীর হাব-ভাব, ষ্টাইল, আধুনিক ধরণের পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিতা মন্থর গমন তাহার চোখের সামনে ভাসিতেছিল। ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া তাহার ভুল দেখাইয়া দিলে সে বিশেষ লজ্জিত হইল। একটা কথা বলিতে ভুল হইয়াছে, ইনস্পেক্টার সাহেবের সুনজরে পড়িয়া, সুবিমল বড় ষ্টেশনে স্থান পাইয়াছে।

বাস্তবিকই সুবিমল ইনস্পেক্টার সাহেবের সুনজরে পড়িয়াছিল। ইন্স্পেক্টারকে সাহেব বলিলেও তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন। তাঁর, স্ত্রী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন। ব্রত, পূজা, উপবাস, কিছুই তিনি বাদ দিতেন না। একদিন সুবিমলের ডাক্ পড়িল। ইনস্পেক্টার বাবুর স্ত্রী তাহাকে বলিলেন "বাবা এখানে ব্রাহ্মণের ছেলে আর কেউ নাই, শুনলাম তুমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার যখন কোন দরকার হবে, তখন যেন তোমার সাহায্য পাই। আমার মাঝে মাঝে এমন সব জিনিষের আবশ্যক হয়, যাহা বামুন ছাড়া আনানো হয় না।" সুবিমল সসম্ভ্রমে তাঁহার কথায় সম্মতি দিয়া চলিয়া আসিতেছিল হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল ইনস্পেক্টার বাবুর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া একজন কিশোরীর উপরে, সে বাহিরে আসিয়া সম্মুখের জানালা দিয়া পুনরায় সেই তরুণীকে দেখিতে পাইল, তাহার মনে হইল এই তরুণীই সেদিন সিক্স আপ্ ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় থাকিয়া, তাহার মনের গতিকে চঞ্চল করিয়াছিল। এই তরুণী কি ইনস্পেক্টার বাবুর মেয়ে! নানা রকম ভাবিতে ভাবিতে সে বাসায় আসিয়া পৌঁছাইল।

সেদিন সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। সকালের—ট্রেনখানা বিদায় দিয়া ষ্টেশনের বাইরের বেঞ্চটার উপরে শুইয়া পড়িল। মাষ্টার মশাই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে সুবিমল তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে? ওকি তোমার মুখ চোখের অবস্থা এমন কেন?"

সুবিমল কোন জবাব দিল না। তাহার অন্তরে যে কী ভষণ ঝড় উঠিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামী ছাড়া কে জানিবে! অপরিচিতা এক তরুণীকে দেখিয়া অবধি তাহার মানসিক অবস্থা কি হইয়াছে, তাহা নিজেই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, আবার পূর্ব্বদিন ইন্‌স্পেক্টার বাবুর বাসায় সেই অপরিচিতা পুনরায় তাহার দৃষ্টি পথে পড়িয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে; কোন রূপেই মনকে দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিতেছে না। সত্যই সুবিমলের মুখের দিকে চাহিলে মনে হইত সে যেন সর্ব্বদাই কি চিন্তা করিতেছে।

কোনদিন ইনস্পেক্টার বাবুর বড় ছেলে 'অমল' কোনদিন বাড়ীর চাকর—'হারু'. সুবিমলকে অন্দরে ডাকিয়া লইয়া যাইত। 'অমলে'র বয়স ৮।১০ বৎসরের বেশী নয়, তাহার কাছে সমস্ত সংবাদ সুবিমল গ্রহণ করিয়াছে। অমলের দুই দিদি, চা'র ভাই—বড়দিদির বিবাহ হয়েছে, ছোট দিদি মামার বাড়ী থাকিয়া পড়াশুনা করিত, কয়েক দিন হইল এখানে আসিয়াছে, শীঘ্রই তার বিয়ে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা।

সুবিমল 'অমল'দের বাড়ীর যেন একজন হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ ত পাইতই, তাহা ছাড়া সহর দেখা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যই তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে হইত না। সুবিমল এক একদিন স্বপ্নে দেখিত, 'ইনস্পেক্টার' তনয়া 'বকু'রাণীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে ভাবিত অসম্ভব কি সম্ভব হয়? এই ভাবিয়া দুরাশাকে মন হইতে দূর করিয়া দিত।—

সেদিন 'বিদ্যাবাণী'তে 'সাণ্ড ইন ডেজার্ট' অর্থাৎ মরুভূমিতে প্রেম নামে একখানা বই দেখানো হইতেছিল, মেয়েদের আসনে অসম্ভব ভীড় হওয়ায় 'বকুরাণী' ও তাহার মাকে অগত্যা পুরুষদের আসনে বসিতে
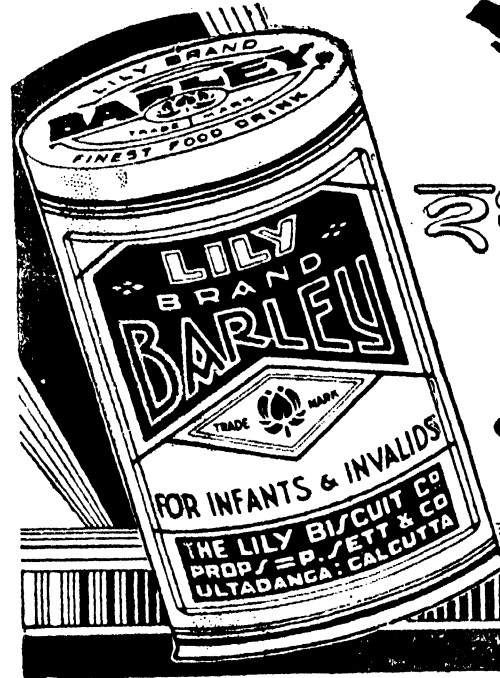
হইয়াছিল। সুবিমল ও অমল একপাশে বসিয়াছিল। 'বকুরাণী' মধ্যে মধ্যে নানারূপ প্রশ্নে সুবিমলকে বিব্রত করিতেছিল, সেও একান্ত আগ্রহের সহিত তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর ও প্রত্যেক দৃশ্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছিল।

পর্দ্দায় দেখানো হইতেছিল, ধনী কন্যা কিরূপে দরিদ্র যুবকের গলায় স্বেচ্ছায় বরমাল্য দিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইল। পিতার অগাধ সম্পত্তি, বহু ধনী পুত্রের অযাচিত প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া পর্ণ কুটিরকেই রাজান্তঃপুর বিবেচনা করিল, সেখানটায় সুবিমল যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল, বকুরাণীর কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে সে ভুলিয়া গেল। বকুরাণী, তাহার তন্ময়তা দেখিয়া বলিল "কি দেখছেন আপনি, ওর ভেতরে নতুনত্ব কি আছে? হিন্দুর পুরাণে অমন কত শত পাবেন, সাবিত্রীর কথা কি জানেন না?"

সুবিমল অপ্রতিভ হইল, হাঁ-না করিয়া সারিয়া দিল, সে জানিত যে বকুরাণী তাহার মাতুলালয়ে থাকিয়া মধ্য ইংরাজি স্কুল হইতে উত্তীর্ণা হইয়াছে, এখন বুঝিল তাহার মায়ের নিকট ধর্ম্ম পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া কাহিনীও অনেক শিখিয়াছে।

এমন দিন গিয়াছে, বকুরাণীর মা বায়োস্কোপে যাইতে পারেন নাই, অগত্যা সুবিমলকে বকুরাণী ও অমলকে সিনেমা দেখাইয়া আনিতে হইয়াছে, পঞ্চবিংশতি বর্ষ যুবক, ষোড়শী তরুণীর সহিত কত বিষয়ে কত আলাপন করিয়াছে, কিন্তু কোন দিনই সুবিমল তাহার অন্তরের বাসনা প্রকাশ করে নাই, বা বকুরাণীও এমন ভাব প্রকাশ করে নাই, যাহাতে সুবিমল বুঝিতে পারে যে সে তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোঝা যাইত যে বকুরাণী ক্রমশঃ সুবিমলের অনুরাগী হইয়া উঠিতেছিল, আর, এটা নিশ্চয় যে যুবক-যুবতীর অবাধ মেলা মেশার ফলে, পরস্পর, পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হওয়াই স্বাভাবিক।

সুবিমলের সৌভাগ্যে তাহাদের ষ্টেকের কয়েকজন খলস্বভাব কর্ম্মচারীর চোখ জ্বালা করিত, তাহারা সর্ব্বদাই তাহার ছিদ্রানুসন্ধান করিত; কিন্তু ইনস্পেক্টার বাবুর সুনজর থাকাতে কেহই কিছুই করিতে পারে নাই; এই সময়ে তাহারা সুবিমলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, ইনস্পেক্টার বাবুর কাণেও সে সংবাদ পৌছিল, পাছে তাহার কন্যা একজন 'বুকিং ক্লার্ক'কে আত্মদান করে, সেই ভয়ে তিনি সুবিমলকে স্থানান্তরিত করিলেন।

নূতন স্থানে আসিয়া সুবিমলের প্রথম প্রথম বিশেষ অসুবিধা হইত, তাহা ছাড়া 'বকুরাণী'র চিন্তা অহরহ তাহার পিপর্য্যস্ত মনকে কিছুতেই বাগে আনিতে পারিতেছিল না। এখন তাহার নূতন চিন্তা—বকুরাণী তাহাকে ভালবাসে কি না। এ সংবাদ কে তাহাকে দিবে? মাত্র এই কথাটী শুনিতে পাইলেই সে কৃতার্থ হইবে। তাহার অন্য কোন বাসনা নাই।

অনেকদিন ছেলের কোন সংবাদ না পাইয়া একদিন সুবিমলের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবিমল বদলী হইয়াছে সে সংবাদ তিনি জানিতেন না; সুবিমলের স্থানে যে কার্য্য করিতেছে অর্থাৎ নূতন য়্যাসিষ্টেন্টের বাসায় উঠিয়া তিনি সকল সংবাদ শুনিলেন, নূতন য়্যাসিষ্টেন্ট 'হিমাংশু' তাঁহার দূর সম্পর্কীয় ভাই-পো। হিমাংশুর স্ত্রীর নিকট তিনি আরও শুনিলেন যে, বকুরাণীর মনের উপর সুবিমলের ছাপ পড়িয়াছে, এ কথা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন, কারণ বকুরাণী তাহার নিকটে মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসে, কারণে, অকারণে তাহার কাছে সুবিমলের নাম করিয়া তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন।

সুবিমলের মা বুঝিলেন, তাতে কি আসে যায়, অসম্ভব কি সম্ভব হয়? যাই হোক ছেলের শীঘ্র বিবাহ না দিলে উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া সেই দিনই তিনি ছেলের কর্ম্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। স্নেহময়ী মা পুত্রের মুখ দেখিয়াই সব বুঝিলেন। সেই দিনই তিনি গোপনে তাহার জামাতা 'চন্দ্র'বাবুকে লিখিলেন যে তুমি সুবিমলের জন্য যে মেয়েটী ঠিক করিয়াছ, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ফেল, আমি সুবিমলকে লইয়া শীঘ্রই দেশে যাইতেছি।"

সুবিমল ছুটী পাইল না বলিয়া মায়ের সহিত দেশে যাওয়া হইল না। ক্রমশঃ তাহার মনের প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিতেছে, অতীতের কথা সে ভুলিতে বসিয়াছে। নানা বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য্য তাহাকে দুশ্চিন্তা হইতে নিস্কৃতি দিয়াছে।

সিনেমায় যাওয়া তার একটা বাতিক ছিল, অবশ্য নূতন কর্ম্মস্থান হ'তে সহরে সিনেমা দেখতে যেতে হ'লে লুকিয়ে যেতে হ'তো, অবশ্য যেদিন ট্রেনের 'গার্ড' বা 'চেকার' তাহার পক্ষের লোক থাকিত। একদিন 'হিমাংশু'র স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো—সঙ্গে 'বকুরাণী'। উভয়ে আবার উভয়কে দেখিল। রূপান্তরিত হইয়া এ সংবাদও প্রকাশ হইয়া গেল।

(চার)

'চন্দ্র'বাবু ই, আই, আর ষ্টোর ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করেন। সুবিমলের জন্য তিনি একটী সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া সুবিমলের মাকে পত্র দেন, কিন্তু সুবিমলের তখন বিবাহে বিশেষ আপত্তি ছিল, বা নিজে মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছিল। পুনরায় মায়ের অনুরোধে, তিনি সুবিমলকে পাত্রী দেখিবার জন্য লিখিলেন। সুবিমলও একদিন ছুটী লইয়া 'পাত্রী' পছন্দ করিয়া আসিল।

পাত্রীর বাবা নাই, মা আছেন, মামার বাড়ীতে মানুষ; মামা ই, আই, আরের 'ক্রু' গিরি করেন। দেশের বাড়ীতে বিবাহ হইবে। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, আগামী মাসেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

কিছুদিন পরে সুবিমল সংবাদ পাইল, বকুরাণীর বিবাহ স্থির হইয়াছে। কোন অবসর প্রাপ্ত সাবজজের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ পাকাপাকি হইয়াছে। ইন্‌সপেক্টারবাবু অনেক টাকা খরচ করিয়া কন্যার বিবাহ দিতেছেন। প্রথম কন্যার বিবাহ একজন গ্রাজুয়েটের সহিত দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতা বাবাজীবন আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীর ভরণ পোষণের কোন উপায় করিতে পারিল না, স্ত্রীকে পিত্রালয়েই অধিকাংশ কাল রাখিত, এবং নিজেও মধ্যে মধ্যে শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করিত। এবারে বেশী খরচ করিয়া বিবাহ দিবার উদ্দেশ্য, যাহাতে কন্যা-জামাতা আবার তাহার গলগ্রহ না হয়, তিনি বুঝিয়াছিলেন, সস্তায় বিবাহ দিলে কন্যা ও জামাতা তাহার সুদ সমেত এমনিভাবে আদায় করিয়া লইবে।

বকুরাণীর মায়ের ইচ্ছা, ধনীর সন্তানকে হাজার হাজার টাকা যৌতুক দিয়া বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা, শিক্ষিত, ভদ্রবংশীয়, গৃহস্থ ঘরের ছেলে দেখিয়া দেওয়া হাজার গুণে ভাল, ধনীপুত্রেরা প্রায়ই অহঙ্কারী, বিলাসী ইত্যাদি হইয়া থাকে। বকুরাণীর দিদি মনোরমা ভাবিত বড়ঘরে বিবাহ হইলে 'বকুরাণী' তাহাদের পর হইয়া যাইবে। সুবিমল একদিন একখানা বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইল; প্রথমে সে মনে করিয়াছিল, টাকের কোন বন্ধুর বিয়ে, পড়িয়া সে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল—চিঠিতে লেখা ছিল—

শ্রীশ্রী৺প্রজাপতয়ে নমঃ

সবিনয় নিবেদনমিদং—আগামী মাসের শুভ ২৯শে শুক্রবার তারিখে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতি বকুরাণীর বিবাহ—বাহাদুরপুর নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সাবজজের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নিরঞ্জন কুমারের সহিত সম্পন্ন হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সুবিমল আর পড়িল না। চিঠির নীচে হস্তাক্ষরে লেখা আছে—সুবিমল তুমি অবশ্য বিয়ের রাতে উপস্থিত হইবে। আমার দেশের বাড়ীতেই 'বকু'র বিবাহ হইবে, সেখানে লোকাভাব, 'শান্তি' 'প্রীতি' ও তুমি এই থাকিলে সকল কর্ম্ম সুসমাধা হইবে। বলা বাহুল্য পাত্র-পক্ষের আমাদের দেশেই বাড়ী। আমি শীঘ্রই ছুটী লইতেছি। তোমরা অবশ্য অবশ্য তথায় উপস্থিত হইবে।

সুবিমলের বিবাহের দিন ২৯শে মাঘ স্থির হইয়াছে সে মনে করিয়াছিল, 'বকুরাণী'র বিবাহে একটু খাটিয়া দিয়া আসিবে, কিন্তু তাহারও বিবাহ ঐদিন। তাহার মনের আশা মনেই থাকিয়া গেল।

যথা সময়ে 'পৌষ' চলিয়া গেল, 'মাঘ' আসিল, আর ৭দিন বাকী আছে। ইনস্পেক্টার বাবু সপরিবারে একেবারে এক মাসের ছুটী লইয়া দেশে গিয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার কোন্ পল্লীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহা কেহও জানিত না।

সুবিমলও ১০ দিনের ছুটী পাইল। বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে সে বাড়ী পৌছিল। তাহাদের গ্রাম হইতে বারো ক্রোশ রাস্তা তাহাকে যাইতে হইবে বিবাহ করিতে। ঐ রাস্তা ২ ক্রোশ গো-গাড়ীতে, ৮ ক্রোশ ট্রেনে, এক ক্রোশ জলপথে, বাকী এক ক্রোশ, হয় পাল্কী কিম্বা পুনরায় গো-গাড়ী। শুনিল পাত্রীর মামার দেশের বাড়ী ঐ বিদঘুটে জায়গায়। এ যেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হ'য়ে—'রাজকন্যা'র দেশে যাত্রা।

যত কষ্টই হোক, বিবাহ তাহাকে করিতে হইবে। দূরের রাস্তা বলিয়া ভোর বেলাতেই, নাপিত, পুরোহিত, বর-কর্ত্তা 'চন্দ্র' বাবু ও জনকতক বর-যাত্রীসহ গো-যানে সুবিমলকে ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইতে হইল। রাস্তা বিশেষ সুবিধা ছিল না বলিয়া ষ্টেশনে পৌছিতে তাহাদের ৪ ঘন্টা লাগিল। বেলা ১০টার ট্রেনে মার্টিন কোম্পানির একটা ছোট রেলের একটা ছোট ষ্টেশন। ট্রেন আসিয়া পড়িল, তাহারা ইচ্ছা করিয়াছিল পথিমধ্যে কোন স্থানে রন্ধন করিয়া বিবাহের অনুযাত্রীদিগকে খাওইয়া লইবে। যাহা হোক মার্কা মারা রেলগাড়ী অভিনব গতিতে তাহাদের ষ্টেশনে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

বরের আসনে সুবিমল বসিয়া আছে, বিবাহ আসর নানা রকমে বেশ সরগরম হইয়াছে, আশে পাশে, 'বর-যাত্রী', কন্যাযাত্রীর দল বসিয়া আসে, ছেলে মেয়েরা 'বর' দেখিতে আসিতেছে; গান বাজনাও এক ধারে চলিতেছে। এমন সময়ে কিসের একটা, হৈ-চৈ উঠিল, যে যে দিকে পারিল, ছুটিল, কেহ বলিল, কোথাও আগুন লাগিয়াছে, কেহ বলিল ও পাড়ায় 'ডাকাত' পড়িয়াছে, যাহার যাহা মনে আসে সে তাহাই বলিতে লাগিল।

চন্দ্রবাবু ভীষন চীৎকার করিতে করিতে হাজির হইলেন "তোলো পাত্র, বিয়ে এ বাড়ীতে দেবো না, যারা এত ছোটলোক তাদের বাড়ীতে কাজ করবো না"—একজন মাতব্বর গোছের লোক আসিয়া বলিল "রাগ করবেন না মশাই"। চন্দ্রবাবু অধিকতর চীৎকার সহকারে বলিলেন, "বলেন কি মশাই বরযাত্রীদের মাথায় ঝাটা মারবে, আর আমি চুপ করে থাকবো।" নিকটস্থ একজন লোক বলিল "হলো কি মশাই, অত চেঁচাচ্ছেন কেন? ব্যাপারটাই খুলে বলুন না ছাই।" বরযাত্রীদলের এখনও খাওয়া হয় নাই, আর কন্যাযাত্রীর দল সব খেতে বসেছে, এটা কি বর যাত্রীদের

অপমান নয় ?" এই বলিয়া চন্দ্রবাবু সাঙ্গ-পাঙ্গোদিগকে উঠিতে বলিলেন।

কন্যাকর্ত্তা আসিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া চন্দ্রবাবুকে নিরস্ত হইতে বলিলেন, "রাত্রি ১০ টায় লগ্ন, তাই কয়েকজন 'ডিস্‌পেপসিয়া'-গ্রস্থ কন্যাযাত্রীকে একটু সকালে সকালে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে 'এতে যদি কোন দোষ হ'য়ে থাকে, আমাকে মার্জ্জনা করুন।"

বাহির হইতে পাড়ার কয়েকজন ছোকরা চন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "ভারি বিয়ে তার 'দু পা'য়ে আলতা"। আর যায় কোথা—'দু' চার কথায়—পাত্রীপক্ষের লোকও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, প্রথমে মুখোমুখী কথা কাটা-কাটি, শেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। গ্রামটীতে দলাদলি আছে বোঝা গেল—কয়েকজন বিপক্ষ দলের লোক গোপনে 'চন্দ্রবাবু'কে বলিল "কুচ-পরোয়া নাই, ও পাড়ায় মেয়ে আছে চলুন এখুনি বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।"

চন্দ্রবাবু ভীষণ একগুঁয়ে লোক, তিনি 'পাত্র' উঠাইয়া লইয়া চলিলেন, কয়েকজন মুরুব্বি বলিল—বিয়ের রাতে কত কথা হয় ও সব ধরতে নেই,—এ রাত্রিতে বর-যাত্রীরা লাট-সাহেবের বাড়া, পান থেকে চুণ খসলে বিয়ের রা'তে হুলুস্থুল কাণ্ড বাধায়, হাজার আয়োজন কর—ব্যাটারা নিন্দে করেছে বলে। অথচ তারা কোন কালে সে সব জিনিষ দেখেই নাই। কে কার কথা শোনে, সুবিমলকে সদল বলে উঠিতে হইল। সে ভাবিল তাহার ভাগ্যে বিয়ের রা'তেও গোলযোগ। চন্দ্রবাবু দল্ বল্ সহ ওপাড়ার দিকে রওনা হইলেন। একজন যুবক বর-যাত্রীদের খাবার জন্ত বিবাহ বাড়ীতে নজর রাখিতেছিল তাহাকে ধরিয়া আনিয়া সুবিমলের স্থান পূরণ করা হইল।

সুবিমলের দল, ওপাড়ায় পৌছাইলে, কয়েকজন লোক আসিয়া চন্দ্রবাবুকে সুবিমলের কুল-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, পরিচয় শুনিয়াই তারা সোৎসাহে বলিয়া উঠিল "এই পাত্র আমাদের ঠিক পাল্টী ঘর। পাত্রও সুদর্শন—লেখা-পড়ায় নেহাৎ মুর্খ নয়। ইহাদের মধ্যে একজন চন্দ্রবাবুর হাত দুটী ধরিয়া বলিল "অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সঙ্গে চলুন—লগ্ন সন্নিকট, আমার উপরেই সব ভার আছে ব্যাপারটি শুনুন ;—"পাশের গাঁয়েই আমাদের বাড়ী ঐ গাঁয়ে আজ 'দুটী' বিয়ে ছিল দুটী বিয়েতেই গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। একটী এক দরিদ্র কৃষকের মেয়ের, অন্যটী ৺রামচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাত্নী। কৃষকের মেয়ের, বরপক্ষ আসিয়া কন্যাপক্ষের সঙ্গে সামান্য খুঁটী নাটী হ'ওয়ায়, তারা পাত্র তুলে নিয়ে অন্য পাড়ার একজন অতি দরিদ্রের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াছে। এবং ঐ মেয়েটীর ও পাড়ারই একজন যুবককে ঘুমন্ত অবস্থায় উঠাইয়া আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। কোন রকমে 'হিন্দুয়াণী' রক্ষা হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের মেয়েটীর পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে বিবাহ ঠিক হয়েছিল, সেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে দুঃসংবাদ এসেছে, পাত্রটী হঠাৎ মৃগী-রোগা-ক্রান্ত হ'য়েছে। মেয়ের বাবা আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা, তিনি বিদেশে চাকুরী করেন, পাত্র পক্ষের অনুরোধে দেশে এসে বিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন, এখন পস্তাচ্ছেন, মেয়ের মা-বাপ গতিক দেখে শয্যাশায়ী হয়েছেন। তাকে এদেশের লোক বড় কেউ চেনে না, মেয়ের ঠাকুর্দ্দাকে এ দেশের লোক খুব চিনতো। এখন এই লগ্নেই মেয়ের বিয়ে না দিলে সমাজে আমরা ঘৃণিত হ'য়ে থাকবো, আমাদের জাতি-কুল সব নষ্ট হবে। এখন দেখছি এই 'পাত্র' হ'লেই আমাদের সব রক্ষা পাবে। এখন অনুগ্রহ ক'রে সম্মতি দিয়ে আমার ভাবনা দূর করুন।"

চন্দ্রবাবু রাজী হইলেন। নূতন 'বর'কে লইয়া একেবারে ছাঁদনা তলায় আনা হইল। সেখানে অসম্ভব ভীড়, সকলেই 'পাত্র' দেখিতে আসিয়াছে। ভীড়ের জন্য কেহ 'বর'কে দেখিতে পাইতেছে না, তাই একটা গোলমালের সৃষ্টি হইতেছে। কন্যাপক্ষীয় কয়েক জন গোলমাল নিবারণ করিয়া যাহাতে সকলে বর দেখিতে পায় সেই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। জনতাকে বসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শুভলগ্ন সন্নিকট হইল—পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ হইতে লাগিল। শুভ-দৃষ্টির সময় সবিস্ময়ে সুবিমল দেখিল—একি! এ যে—বকুরাণী!

পরক্ষণেই সম্মুখে দৃষ্টি পড়াতে—"শান্তি রাম" ও 'পটাই' বলিয়া উঠিল—একি! সুবিমল যে ;—কি জানি কেন--সুবিমলের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"বিয়ের রাতে" উপস্থিত থাকতে সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় কি ?... ... ..." এয়োগণের উলুধ্বনি, কুমারীগণের শঙ্খধ্বনি ও নহবতের মধুর রাগনীতে আর কিছু শোনা গেল না।

রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—

নিউ থিয়েটার্সে'র রেকর্ড—গীতি-কবিতায় Imagism (?)—মেগাফোনের গাঁয়েলী গান।

নিয়ে আমরা মেগাফোন কোম্পানীর পাঁচখানি রেকর্ডের ও হিন্দুস্থান কোম্পানীর একখানির সমালোচনা প্রকাশ করিলাম।

মেগাফোন—জে, এন, জি, ৫২৮৬—সাফল্যমণ্ডিত চিত্রতারকা শ্রীমতী মলিনা এই রেকর্ডে অভিজ্ঞান বাণীচিত্রের 'রূপ-কথারই রাজা এসে' ও 'ছিল সাথী মোর প্রভাতের ফুল' এই দুইখানি গান পরিবেশন করিয়াছেন। সুর-বৈচিত্র্যে ও আবহ-সঙ্গীতে প্রথম গানখানি হইয়াছে অনবদ্য; দ্বিতীয়খানি অর্কেষ্ট্রা-প্রধান, এমন কি সমগ্র পিঠটি অর্কেষ্ট্রা নামে চালানেই হয়তো সঙ্গত। ১৫টি বাক্যে রচিত ক্ষীণকায় গানখানি মোটেই জমিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে নিউ থিয়েটার্সে'র বৈচিত্র্যপূর্ণ গুরুগম্ভীর অর্কেষ্ট্রা বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

* * *

মেগাফোন—জে, এন, জি, ৫২৮৭—এই রেকর্ডে শিল্পী শ্রীসুনীল কৃষ্ণ দাস তাঁহার জরাট কণ্ঠে সহগামী সঙ্গীতের সহিত একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ভজনগান 'বৃন্দাবন-ঘন-আনন্দ-মূরতি' ও অন্যদিকে কীর্ত্তনগান 'তনু-দেহটিরে পুষ্প করিয়া পূজা করিব' রেকর্ড করিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠ সাধনার শ্রেণীর এবং তিনি সরলভাবেই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর রেকর্ডটি মন্দ নহে।

মেগাফোন—জে, এন, জি, ৫২৮৮—শিল্পী কুমারী অমীয়া শেঠ (এ্যামেচার) বেশ লাগসৈ ধর্ত্তাই সঙ্গীতের ও সহগামী সঙ্গীতের সহিত 'আজি তোমায় আমায় খেলবো লুকোচুরী!' ও 'গোপনে মনের কোণে' এই দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুইখানি গাওয়া নেহাৎ মন্দ নহে, তবে আবার সেই আধুনিক গানের গতানুগতিক দুর্ব্বোধ্যতা আসিয়া জুটিয়াছে। 'আজি তোমায় আমায় খেলবো লুকোচুরি' এই Mystic গানখানি রচনা করিতে গিয়া গীতকবি অবশেষে এতই নাকাল হইয়া পড়িয়াছেন যে সাধিয়া দুর্য্যোগ আনয়ন করিলেন। অবশ্য 'বাদল-ধারা' 'দাদুরী' প্রভৃতি বাছা বাছা কথা জোড়াতাড়া দিয়া সমিল আধুনিক গান খাড়া হইল কিন্তু Mysticism এতই ঘনাইয়া উঠিল যে, অর্থ অনর্থ ঘটাইয়া বসিল।

"(আহা) ছোটে কেন ঐ ভ্রষ্টতারা
অন্ধকারে লক্ষ্যহারা
আর রে নিশায় বাদল-ধারা
ঝিঁঝি ও দাদুরী॥"

'ভ্রষ্টতারা লক্ষ্যহারা' হইয়া 'অন্ধকারেই বা কেন ছোটে' এবং 'নিশায় বাদল-ধারা, ঝিঁঝি ও দাদুরী'কেই বা কেন ডাকিব (শুধুই কি মিলের জন্য?) তাহা গানের প্রধান অংশ হইতে জানিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। স্থানাভাবে এই শেষ চার পঙক্তি ব্যতীত অন্যান্য কলিগুলি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা গেল না।

* * *

মেগাফোন—জে, এন, জি ৫২৮৯—এই রেকর্ডে শিল্পী অনন্তবালা বৈষ্ণবী একতারার সহিত দুইখানি ভাটিয়ালী গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে নিমাই-সন্ন্যাসের 'নিমাই দাঁড়ারে, দাঁড়ারে নিমাই' ও অন্যদিকে 'যশোদে মা তোর কৃষ্ণধন দে' গীত হইয়াছে। রেকর্ডখানি বাড়ী আনিয়া একদিন বৈকালে প্রথম গানটি বাজানো শেষ করিয়া দেখি পাড়ার লোক-জনে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবে বৈঠকখানা সরগরম হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই কোমরে গামছা বাঁধিয়া সহানুভূতিপূর্ণ মুখে আমার অপেক্ষা করিতেছে। নিমাই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার পর নিমাইএর স্নেহময়ী

মাতা বিলাপ করিয়া এই গানখানি গাহিতেছেন,—এই বিষয়-বস্তু করিয়া গানখানি রচিত। বাঙলার পুত্রশোকাতুরা জননীর 'মরা-কান্না' যেইরূপ হৃদয়-বিদারক হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ 'মরাকান্নার' উপর ভিত্তি করিয়া গানখানি গীত;—সুতরাং অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া গানটির এতাদৃশ বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা দর্শনে প্রাণ স্বতঃই নৃত্য করিয়া উঠিল। ভাবিলাম রেকর্ডটি কিনিবই কিনিব, কিন্তু পাছে 'দুষ্ট রাখালের গল্প'র মত প্রতিবাসীরা বার বার ঠকে, এই কারণে সেই সঙ্কল্প হইতে বিবৃত হইতে বাধ্য হইলাম। রেকর্ড-পুস্তিকায় দেখা গেল, লেখা হইয়াছে 'তাঁর (শিল্পীর) কণ্ঠে শুনতে পাবেন'—ইহা আমরা তখনই বুঝতে সক্ষম হইব, যখন অনুভব করিব দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট পল্লীমায়ের হাহাকার-আর্ত্তনাদ। অপর গানখানি ততোধিক না হইলেও গতানুগতিক বৈশিষ্ট্য-হীন ভাবেই গীত হইয়াছে।

* * *

মেগাফোন—জে, এন, জি ৫২৯০—গাঁয়েলী নাম দিয়া অপ্রকাশিতনামা শিল্পী কর্ত্তৃক গীত হইয়া 'মেগাফোন ভ্যারাইটিজ'এর রেকর্ডখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইম্‌পষ্টার বা ধূমকেতু বাণীচিত্রে ঢোল, কাঁসি ও সানাই সহযোগে শ্রীরঞ্জিত রায় কর্ত্তৃক যে জারি গান দুইটি গীত হইয়াছিল এবং পরে যাহা এচ, এম, ভি, কর্ত্তৃক রেকর্ড করা হইয়াছে, সেই ধরণের সঙ্গীতাদি আরোপ করিয়া এই গান দুইটি তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গান দুইটির সহিত ঢোল বাজাইয়াছেন বিখ্যাত বাদক শ্রীপবনচন্দ্র বিশ্বাস। রেকর্ডখানি মন্দ নহে।

হিন্দুস্থান—এচ্ ১১৬৩৫—শ্রীমতী সুশীলা সেন (মণিপুরী) এই রেকর্ডে দুইখানি ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করিয়াছেন। একদিকে অজয় ভট্টাচার্য্যের 'চাঁদ যখন মুখ লুকাবে' ও অন্য পিঠে 'তোমার বন্ধু না আইল' গীত হইয়াছে। শ্রীমতীর গলা পরিষ্কার ও মিষ্ট কিন্তু অত্যধিক দরদেহ সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে মনে হয় তিনি এখনই বুঝিবা কাঁদিয়া ফেলিবেন। তাঁহার কণ্ঠ এই দোষ হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ রেকর্ডগুলি যে ভাল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঝ-দরিয়ায় এই রেকর্ডের—কথা ও সুরের তরণী ডুবাইয়াছেন শ্রীতরণী গোস্বামী। তিনি দ্বিতীয় গানখানির রচয়িতা এবং দুইটি গানেরই সুরসংযোজনা করিয়াছেন। প্রথম গানখানির সুরে বিশেষরূপে বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং দ্বিতীয় গানখানির রচনায় তিনি একটু নূতনত্বের আমদানী করিয়াছেন। সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্যে কাব্যে ও কবিতায় Imagism ও Cubism নামে কবিতার নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু গীতি কবিতায় অদ্যাবধি তাহা হয় নাই। সুতরাং গীতি কবিতায় Imagism (?) এর প্রচলন করিয়া গোস্বামী মহাশয় নূতনরূপ গুরুগিরি করিলেন। আমরা গানটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গানটি হুবহু এইরূপ,

"আমার বন্ধু না আইল
না আইল আমার বন্ধু,
আস্‌ব বলে না আইল
আসিত না জানি
কোন্ বিধি সৃজিল এত নির্দ্দয় বন্ধু।
বন্ধু যদি না আইল
এই মালা বিফল হইল
কার লাগি গাঁথিব মালা
মালা হইল বিষম জ্বালা
গাঁথা মালা বাসি হইল
বন্ধুর মনে এই কি ছিল
অতি সাধের গাঁথা মালা
যমুনায় ভাসায়ে দিব॥"

রাতে

"সনেট"

কুমারী শিবানী বিশী

বর্ষারাতে আনমনে বিছানাতে আছি;
কোথা থেকে কেতকীর গন্ধ আসে ভাসি।
নিস্তব্ধ নিঝুম পুরী তার মাঝে একা
প্রতিক্ষাতে আছি, সখী পাব কিগো দেখা?
মৃণালের লতা প্রায় তব ওই দেহ
দাদুরী ধ্বনিতে সাজে দাঁড়াবে কী কেহ।
তন্দ্রা ভরা স্বপ্ন ধরা মম আঁখি পাশে
ছলনা ও লুকোচুরী খেলিবার আসে।
ভাবিতে ভাবিতে আঁখি ঢুলে এলো ঘুমে—
দেখিনু স্বপন এক, গেলে তুমি চুমে;
আমার নয়ন দু'টী চকোরের প্রায়—
জেগে উঠে দেখিলাম কেহ নাই হায়।
কেবল খণ্ডিত জ্যোৎস্না ছিন্ন মেঘ ফাঁকে
পড়ি' মম সর্ব্ব দেহে আলপনা আঁকে॥

—:০:—

খেয়ালী চিত্রপট

নিউ থিয়েটার্সের "বড়দিদি" চিত্রে চন্দ্রা, পাহাড়ী ও মলিনা যথাক্রমে শান্তি, সুরেন্দ্র ও বড়দির ভূমিকায়—ছবিখানির পরিচালক শ্রীযুত অমর মল্লিক।

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ভাদ্র ১৩৪৫, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

দুরাশা

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন অনুসারে বঙ্গীয় ছাত্র-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সদ্যমুক্ত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ সিপিং Shipping Supdt. পদের জন্য সার্ভিস কমিটি কর্ত্তৃক মনোনীত হন। সার্ভিস কমিটির এই মনোনয়ন কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় পেশ হওয়ার পূর্ব্বেই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় অল্ডারম্যানরূপে কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন। বিধানবাবু কর্পোরেশনে আসিলে কংগ্রেসী দলের শৃঙ্খলা যে বিশৃঙ্খলায় পর্য্যবসিত হইবে এই আশঙ্কা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশঙ্কা যে এত শীঘ্র সত্য হইবে তাহা আমরাও ভাবি নাই। প্রবেশ করিয়াই তাঁহার নাকি মনে হইয়াছে যে অবিনাশ বাবুর মনোনয়ন সমীচিন হয় নাই এবং অবিনাশ বাবুর পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও ঐ পদে নিয়োগ তিনি সমর্থন করেন। তদনুযায়ী কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেনের প্রস্তাব ক্রমে অবিনাশ বাবুর নিয়োগ প্রস্তাব সার্ভিস কমিটিতে পুর্ণবিবেচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। স্থগিত-রাখা অবশ্য ধামা-চাপারই শোভনীয় সংস্করণ। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী অবিনাশ বাবুকে "স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে" (Dropped from the sky) দেখিয়া পুলকিত হন নাই বটে তবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ বিনয়বাবু কংগ্রেস-বিপক্ষীয় সুতরাং এইরূপ নিয়োগ-প্রসঙ্গে তাঁহার মত-স্বাতন্ত্র্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অবিনাশবাবুকে রাষ্ট্রপতি-অনুমোদিত পদ হইতে সরাইবার সম্বন্ধে কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলপতি কে—সুভাষচন্দ্র না বিধানচন্দ্র—এই প্রশ্নই স্বতঃই জাগরিত হইতেছে? বিদায়ী সুপারিণ্টে-ণ্ডেণ্ট নাকি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন কিন্তু উক্ত পদানুযায়ী তাঁহার বিশেষ কোন বিদ্যা ছিল কিনা জানা নাই। বিধানবাবু নাকি অবিনাশবাবুকে আশ্বাস দিয়াছেন যে তাঁহাকে অন্যত্র বসান হইবে সুতরাং তিনি যেন এই পদের জন্য আর তদ্বিরী না করেন। হয়ত বিধান বাবুর বন্দোবস্ত অনুযায়ী অবিনাশবাবুর আর্থিক ক্ষতি কিছু হইবে না তবে এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নের উদয় হয় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কর্পোরেশনের কংগ্রেস দলপতি কে?

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী কর্পোরেশন সাব্-কমিটির সম্পাদক। সম্প্রতি তিনি 'এ্যাডভ্যান্স' পত্রিকার সম্পাদকের পদে বৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের অধিনায়কত্বে যে খণ্ড-দল বাংলা কংগ্রেসে প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র 'এ্যাডভ্যান্স' নাকি তাঁহাদেরই মুখপত্র হইয়াছে। সাংবাদিক হিসাবে সত্যবাবু যশস্বী ও তেজস্বী সুতরাং তাঁহার সম্পাদনায় 'এ্যাড্ভান্স'-পত্রিকা যে বাংলার রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবে তাহা সুনিশ্চিত। কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-সচীব শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ সত্যবাবুর ভবানীপুরের বাসা বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সত্যবাবু কর্পোরেশনের সাব্-কমিটির সম্পাদক সুতরাং শৈলেনবাবুর সত্যবাবুর বাড়ীতে গমনাগমন তাঁহার (শৈলেনবাবুর) কর্পোরেশনে পুনঃপ্রবেশের প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে হয়।

কর্পোরেশনে স্ব স্ব দলপুষ্টির জন্য যে প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে তাহা বাংলা কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের পক্ষে আদৌ শোভনীয় নহে। খণ্ডদলগত প্রখরতা ঈষৎ খর্ব্ব করিলে খণ্ডদলপতিদের গৌরব বৃদ্ধিই হইবে—তাঁহারা একটু আদানপ্রদানের (Give And Take) উদারতা দেখাইলে বহু দ্বন্দ্বের ও মনোমালিন্যের অবসান হয়। কিন্তু সে আশা কি দুরাশা নহে??

বাঙ্গালীর কাপড়ের মিল ও বাঙ্গালী

বাণিজ্য-বিশারদ

"What Bengal thinks to day, rest of India thinks to morrow".

যে সময় এই গর্ব্ব বাণীতে ভারতের আকাশ বাতাস ধ্বনিত হত—যে সময়ের বাঙ্গালীর কৃত কার্য্যের ফলে এই মহান বাণীর জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল, বর্ত্তমান সময়ে সে বাঙ্গলা, সে বাঙ্গালী যে মৃত অতীতের গরিমা যে কাহিনীতে পর্য্যবসিত হয়েছে এমন অভিযোগেও বর্ত্তমানের বাঙ্গালী বিরক্ত নয়। আজ বাঙ্গালা ভারতের সকল প্রদেশের পশ্চাতে পড়েছে। আজ বাঙ্গালীর সে প্রতিভা নাই, উদ্যম নাই, উৎসাহ নাই সে সাহসও নাই। আজ বাঙ্গালী অন্নাভাবে কাতর। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে কৃতবিদ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনী মুক্ত হয়ে বাইরে এসে দেখছে তাদের সম্মুখে ঘন তমসাবৃত ভবিষ্যত। সামান্য বিশ ত্রিশ টাকার গোলামির জন্য অফিসে অফিসে বিফল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন যে বাঙ্গালী রাজনীতি ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের গুরু স্থানীয় ছিল, সেই বাঙ্গালী আজ আপনাকে ভুলে ইতর দলাদলির মোহে ভারতের উপহাসের বস্তু হয়ে পড়েছে। আজ বাঙ্গালীর অধঃপতন এত স্পষ্ট যে তার নিজের নিকট ও নিজের অকর্ম্মণ্যতা এতটুকু অস্পষ্ট নয়। মানসিক দৈন্য এমন গভীর খাদে নেমেছে যে একান্ত নিঃসহায়ের মত পর মুখাপেক্ষী হয়ে চেয়ে থাকা ভিন্ন কোন সামর্থ নাই। জীবন সংগ্রামের প্রত্যেক স্তরে আজ বাঙ্গালী পরাজিত। একদিন যে বাঙ্গালা চরিত্র বলে দৃঢ়তায় সমগ্র জগতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়ে ছিল, আজ বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের নিকট তা কল্পনাতীত কাহিনীর মত। মনে হয় কোন গুরুতর অমার্জ্জনীয় অপরাধের দরুন বিধাতার

অভিশাপ আজ বাঙলার শিরে পতিত হয়েছে। তাই বাঙালী ভুলেছে আপনাকে, ভুলেছে তার সর্ব্বস্ব, তার অতুলনীয় চরিত্র জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ঔদারতা সব ভুলে সে অসাড় চিত্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নইলে ১৯০৫ সালে যে বাঙালী স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতে জীবন পণ করেছিল, সেই বাঙলায় বর্ত্তমানে যে ১২।১৩টি বাঙালীর কাপড়ের মিল্ স্থাপিত হয়েছে মনে হয় তার খবরটুকু পর্য্যন্ত জানে না। কারণ প্রতি বছর বাঙলায় প্রায় ৩৫ কোটী টাকার কাপড় চোপর আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে যে ১২।১৩টি কাপড়ের মিলে বর্ত্তমানে কাজ চলেছে তাদের কাপড় উৎপন্নের সমষ্টিগত পরিমান মাত্র এক কোটী টাকার মত। আর ঐ মাত্র এক কোটী টাকা মূল্যের কাপড়ও বাজারে, বিক্রয় হয় না। বিক্রয় না হবার দুটী কারণের মধ্যে প্রথম কারণ আজ বাঙ্গলার শোচনীয় অধঃপতন। আমরা জানি বাঙলার একমাত্র গর্ব্বের সর্ব্ব বৃহৎ বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটীর সুদক্ষ ম্যানেজার Textile magnet—শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদচন্দ্র সোম বি, এ, মহাশয় বাঙলার মিল মালিকগণের সঙ্গে এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে আলাপ আলোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে, বাঙলা মিলের কাপড় বোম্বে, মাদ্রাস্ ও অন্যান্য স্থানের মিলের কাপড়ের তুলনায় বেশী টেক্‌সই, এবং দামেও সস্তা।

তবেই এর অপেক্ষা লজ্জার বস্তু আর কি থাকিতে পারে, আমরা বাঙ্গালীকেই তাই জিজ্ঞাসা করছি? যে বাঙলায় বছরে ৩৫ কোটী টাকা মূল্যের কাপড় আবশ্যক হয়, সেই বাঙলায় ১২।১৩টি বাঙালীর মিলের সর্ব্ব সাকুল্যে উৎপন্নের পরিমান মাত্র এক কোটী টাকা মূল্যের কাপড়ও বিক্রয় হয় না। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিদারুন পরিহাস আর কি হতে পারে আমরা জানি না।

দ্বিতীয় কারণ, বর্ত্তমানে কাপড়ের বাজার অবাঙালীর হাতে। তারা তাদের খুসী মত মিল সমূহের ভাগ্য গড়ছে, ভাঙছে। বাঙলার বাজারে—আমেদাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাস্, কানপুর প্রভৃতি প্রদেশের (জাপানি ও বিলাতি ত' আছেই) মিল সমূহের উৎপন্ন কাপড়কে চালিয়ে বাঙলাকে অনুগ্রহ করবার মত যেটুকু ঔদারতা তাদের মনে জমে, সে টুকুই বাঙালী মিল্‌ওয়ালাদের ভাগ্যে জোটে। তাই বাঙ্গলার মিলের এক কোটী টাকার মূল্যের কাপরও বিক্রয় হয় না। ফলে দিন দিন ঐ ১২।১৩টি মিলের দশ অবস্থা উপস্থিত হচ্ছে।

পাহাড়ে এক জাতীয় সর্প যেমন চক্ষু দিয়ে হরিণকে সম্মোহিত করে, আর বেচারা হরিণ তার সর্ব্বশক্তি দিয়েও সে আকর্ষণ মুক্ত হতে না পেরে, পা' পা কোরে সর্পের মুখবিবরে আত্মসমর্পন করে, এও তেম্‌নি। ঐ বারো তেরোটি বাঙালীর কাপড়ের মিল্ দিন দিন হরিণের মত সর্ব্বশক্তি হারাতে হারাতে অবাঙ্গালীর হাতের মুঠার মধ্যে চলেছে। আর একটি বাঙালী মিলের ভাগ্য ইতিমধ্যে সত্য সত্যই হরিণের ভাগ্যে পর্য্যবসিত হয়েছে।

কিন্তু এই বিপদের কি প্রতীকার নাই (?) আছে। বাঙ্গলার নর-নারী যদি একবাক্যে বলেন যে, আমরা বাঙ্গালী মিলের কাপড় ছাড়া আর কিছু পরবো না, তা হলে আগামী এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলায় আরও ৩০০টি মিলের আবশ্যকহয়ে পড়বে।

ফলে হাজার হাজার যুবকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, বাঙ্গলার ৩৫ কোটী টাকা বাঙ্গালীর ঘরেই থাকে। অথচ তার জন্য বাঙ্গালীকে কোনও ত্যাগ স্বীকার বা ক্ষতির দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হয় না। মাত্র বাঙ্গালীর পণ করবে "আমরা বাঙালী পরিচালিত বাঙ্গলা মিলের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় স্পর্শ করব না।" আজ বাঙালী যদি এটুকুও বলতে না পারে, আজ বাঙালী যদি এটুকুও বুঝতে না পারে, তাহলে কি সত্যই আক্ষেপ করা যায় না, যে বাঙালীর শিরে বিধাতার নিদারুণ অভিশাপ পড়েছে! বাঙালী মরবে, বাঙালী অধঃপাতে যাবে, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। সামনে এমন দিন আসছে যে, এ বাঙালী জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া হবে ভার। এরা জানে সব, বুঝে সব কিন্তু তবু এরা কেমন যেন বোকা। নিজের বুঝ বুঝতে এরা ভয়ে শিউরে উঠে, ভাল, দাদা "বুঝবে দুদিন পরে"। এ সর্ম্মার কথা বাণী হলে বেশ মিষ্ট হবে।

কেহ যদি বলেন, আমরা প্রাদেশীকতা প্রচার করছি তা হলে, তাঁরা আমাদের প্রতি অবিচার করবেন। আজ বাঙলার ছেলেমেয়ে নরনারী অন্নাভাবে মৃত প্রায়, দারিদ্র্যে কাপুরুষ, দুশ্চিন্তায় চরিত্রহীন হয়ে পড়েছে, তাদের যদি কেউ বাঁচতে বলে, তাদের ক্ষুধার অন্নের সন্ধান যদি কেউ করতে চায় আর সে জন্য যদি বলে প্রথমে বাঙালীকে বাঁচতে হবে, পরে প্রদেশ, জাতি, স্বদেশ ও পৃথিবী। আর সেই প্রচেষ্টাকে কেহ যদি প্রাদেশীকতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন, তাহলে নিতান্ত দুঃখের সহিত বলতে হবে, তিনি বাঙলার শত্রু, বাঙালীর শত্রু, সমাজের শত্রু, দেশদ্রোহী। প্রথমে বাঙালী পেটপুরে খেতে পাক্ তবেই তার মুখে হাসি ফুটবে, তার সব হারিয়ে যাওয়া রত্ন যথা চরিত্র, মেধা, ঔদারতা, পাণ্ডিত্য আবার শতগুণে ফিরে আসবে। বাঙালী আবার তথা জগতের সম্মুখে মাথা তুলে দাড়াতে সক্ষম হবে। তখন আবার দিকে দিকে ধ্বনিত হবে। "What Bengal thinks to day, rest of India thinks tomorrow."

বাঙালী! তুমি শুধু বলো, তুমি একবার প্রতিজ্ঞা করো যে, তুমি বাঙালী মিলের তৈরী

শ্রীনটনাথ

শ্রীযুক্ত যশোদা ঘোষের প্রযোজনায় সুবিখ্যাত ক্যালকাটা থিয়েটার্স নাট্য নিকেতন রঙ্গমঞ্চ ছাড়িয়া চিৎপুর রোডস্থ রঙ্গমহল নাট্যমঞ্চে উপস্থিত অভিনয় করিতেছে। কিছুদিন আগে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন নাটক উত্তরা'র অভিনয়-এর উদ্বোধন হয়েছে। সুবিখ্যত লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত এই নাটকখানি রচনা করেছেন।

'উত্তরা' নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের সকলেই পরিচিত। মহাভারতের মধ্য থেকে অভিমন্যু ও উত্তরার কাহিনীর উপরই এর ভিত্তি। তাছাড়া এই নাটকটির আখ্যান ভাগ যে কৃতিত্বের সঙ্গে তৈরি করে দর্শকদের সামনে লেখক ধরে দিয়েছেন তাতে বাস্তবিকই তাঁর রুচিজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাঙলা নাট্য জগতের কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই প্রতিষ্ঠানে যোগদিয়ে এই নাটকখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। বহু দিন পরে শ্রীমতী প্রভার অভিনয় আমরা দেখলাম। বাঙলার এই শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা দ্রৌপদীর ভূমিকায় যে অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা একমাত্র তাঁর মত অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। জীবন মুখোপাধ্যায় এর ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ এর ভূমিকায় অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। এর পরেই মনে হয় নাম ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)র অভিনয় এর কথা। দেবীদাস বন্দোপাধ্যায় এর অভিমন্যু স্থান স্থানে উচ্চাঙ্গের হলেও সব যায়গায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় কলা প্রদর্শন করতে পারেন নি। অর্জ্জুনের ভূমিকায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘটোৎকচের ভূমিকায় গণেশ গোস্বামীর, দুর্যোধনের ভূমিকায় সন্তোষ দাস ও কৃষ্ণের ভূমিকায় সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী চমৎকার অভিনয় করেছেন। ভীমের বেশে পশুপতি সামন্তর অভিনয় আমাদের তৃপ্ত করতে পারেনি।

দৃশ্যপটগুলি খুবই ভাল হয়েছে। মোটকথা এই নাট্যগৃহে সেদিন আমরা যে অপূর্ব্ব জনসমাগম দেখেছিলাম তাথেকে বেশ বোঝাযায় যে ভাল নাটক হ'লে তার দাম দর্শকরা দিতে জানেন।

কাপড় ছাড়া, অন্য কাপড় স্পর্শ করবো না, তাহলে ঐ গলে বেরিয়ে যাওয়া ৩৫ কোটী টাকার মালিক হবে, তোমার অর্দ্ধেক ক্ষুধা শান্ত হবে। "বন্দে মাতরম"।

—:০:—

নারী ধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত হেমেন মজুমদারের পরিচালনায় মিনার্ভা থিয়েটারে 'নারী ধর্ম্ম' অভিনয় চলেছে। বইখানা লিখেছেন শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যকার নানা বিষয় বস্তুর মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীর সতীত্বের মূল্য পদমর্য্যাদায় বা সামাজিক অবস্থায় কোন তফাৎ আছে কিনা? এই নাটকের মধ্যে তিনি তিনটী নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনটী নারীরই সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। কিন্তু তাদের সকলের কাছেই সতীত্বের মর্য্যাদা ছিল সমান।

অভিনয় এর মধ্যে প্রথমে মনে পড়ে কাশ্মীরার ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুবালা (সুধ) এর অভিনয়। সারা নাটকখানি শ্রীমতী হাস্যে লাস্যে ও নৃত্যে মুখর করে তুলে রেখেছে। শ্রীমতী তপতী দত্তের 'দীপ্তি' অভিনয় আমাদের ভালই লেগেছে। শ্রীমতীর ভবিষ্যত ভালই বলে মনে হয়। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দুর্দ্দমনের বেশে ফণী গাঙ্গুলী, উন্মাদ রাজকুমার রূপে উৎপল সেন, অপরস্তর ভূমিকায় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, রাজারূপী ভূমেন রায় এর অভিনয় বেশ ভাল লেগেছে। শ্রীকান্তের ভূমিকায় প্রভাত সিংহ মহাশয় সবসময়েই বেশ একটা সংযত ভাব বজায় রেখে নিজ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পেরেছেন।

এই বইখানার সুর সংযোজনা করেছেন স্বনামধন্য নট শ্রীযুক্ত র'ঞ্জত রায়। তাঁর কার্য্য তিনি বেশ প্রশংসনীয় ভাবেই সম্পন্ন করেছেন। দৃশ্যপট পরিকল্পনা ভালই হয়েছে।

চক্রধারী

পুরাতন মিনার্ভা সম্প্রদায় সম্প্রতি 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে যে বইখানি অভিনয় করছেন তার নাম হচ্ছে 'চক্রধারী' এই বইখানির প্রযোজনা কার্য্য করেছেন শ্রীযুক্ত কালী প্রসাদ ঘোষ। আর বইখানা লিখেছেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র গুপ্ত।

দস্যু সম্বর এর কাহিনী নিয়েই এই নাটকের রচনা। নাট্যকার বেশ চমৎকার ভাবেই একে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের সামনে ধরে দিতে পেরেছেন।

৩রা সেপ্টেম্বর
শনিবার
রূপবাণী
ফোনঃ বি, বি, ৩৪১৩
অগ্রিম সিট রিজার্ভ করুন
শুভ-উদ্বোধন
শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
আধুনিক সমাজ-চিত্রকাহিনী
অভিনয়
অভিনয়
শ্রেষ্ঠাংশেঃ সাধনা বসু
অহীন্দ্র, ধীরাজ, প্রতিমা প্রভৃতি
N. I. P.

অভিনয় এর দিক থেকে আমরা ব্যক্তি-বিশেষের ওপর কোনরকম কৃতিত্ব দিতে রাজি নই। তবে একথা জোর করেই বলা যায় এই সম্প্রদায়ের যে চমৎকার 'team work' আছে তা উপস্থিত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই নেই। আর সেই 'team work'এর জন্যেই এদের সব বই successful হয়।

নন্দরূপে শরৎবাবু তাঁরা পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বসুন্ধরার বেশে যশস্বীনী অভিনেত্রী নীভাননীর অভিনয় সত্যিই এ বই-এর একটী আকর্ষনীয় বস্তু। প্রদ্যুম্নের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় আমাদের মোটেই ভাল লাগেনি। হাসির খোরাকের জন্যে এ বইএর মধ্যে গোপাল ভট্টাচার্য্য ও মুকুল জ্যোতির দ্বারা যে 'বশীকরণ' বিদ্যার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে হাসির খোরাক থাকলেও—সুরুচির খোরাক নেই। অভিনয়এর দিক্ থেকে চমৎকার অভিনয় করেছেন গোপাল বাবু।

এছাড়াও এই বইএর নৃত্যের দিক থেকে কয়েকটী আকর্ষনীয় বস্তু আছে। প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পি মহারাজা বসু এই নাটকে একটী একক ও দ্বৈত নৃত্যকলা দেখিয়েছেন। তাঁর দুইটী নৃত্যই ভাল হয়েছে। শ্রীমতী রেনুকার নাচও বেশ ভাল লাগল আমাদের।

পটল বাবুর পরিকল্পনার 'চক্রধারীর' দৃশ্যপট মিনার্ভা সম্প্রদায়ের নামোপযোগী হয়েছে।

আমরা এই নাট্যখানির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশনি গুপ্ত

ক্যারোল লম্বার্ডের প্রচার-পিপাসা

পাবলিসিটী বা প্রচার কার্য্য ছায়াচিত্রের প্রাণ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। চিত্র সাফল্যের ভিত্তি—পাব্লিসিটীর জাকজমক। চিত্র সংশ্লিষ্ট শিল্পী মাত্রেই যে সুনাম প্রচারের জন্য বিশেষ লালায়িত হয়ে থাকেন, তা' বলা বাহুল্য

সম্প্রতি শ্রীমতী ক্যারোল লম্বার্ড স্বয়ং প্রচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়ে এক নূতন অধ্যায়ের সুচনা করেছেন। ওর অনন্য প্রতিভা অভিনব প্রচার পদ্ধতির নব নব

ক্যারল লম্বার্ড

পরিকল্পনার রেখাপাত করে চলেছে। তাই, মৃদু গুঞ্জন আলোড়নে আজ সমগ্র হলিউড চঞ্চল!

প্রচারের অদম্য পিপাসা শ্রীমতীকে অনেকদিন আগেই পেয়ে বসেছিল। এদিক দিয়ে প্রচার বিভাগের পরিচালকদের সঙ্গে তার ছিল একটী অবিচ্ছেদ্য মধুর সম্বন্ধ। স্বকীয় প্রচার কার্য্যে নানাভাবে তিনি এদের প্রাণপণ সাহায্য করে এসেছেন এবং প্রচার ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার মায়া ত্যাগ করে এ'টী নবযুগ প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন। হলিউডে প্রচারকার্য্যের অপূর্ব্ব মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের মতে অনেকখানি প্রশংসাই শ্রীমতী লম্বার্ডের প্রাপ্য।

সম্প্রতি শ্রীমতী সেলজনিক্ 'ইন্টারন্যাশানাল নিউজ বুরো' নামক সংবাদ প্রতিষ্ঠান নামে স্বাধীনভাবে একটী অফিস খুলে বসেছেন। ইতিমধ্যেই, একটী টাইপরাইটার চারটে টেলীফোন দুজন সেক্রেটারী এবং একজন অফিস বেয়ারা এসে গেছে।

পুরোদমে কাজ চলবে বলেই মনে হয়।

নবরূপে কে ফ্রান্সিস

রূপসী অভিনেত্রী চিত্রাবরণ করছেন নবরূপে 'দি যুওমেন আর লাইক হ্যাট' নামক রসমধুর বাণীচিত্রে। বিবাহিত জীবনের একটী কৌতুকময় হাস্যরস সঞ্জীবিত সরস পর্য্যায় এই ছায়া ছবিখানির অন্যতম বিষয়বস্তু। শ্রীমতীর অন্যান্য ছবির মত এতে জাকজমকের তত ঘটা নেই, শুধু আছে দর্শকমাত্রকেই আনন্দের রসসাগরে নাকানি চোবানি খাইয়ে তার অন্তরস্পর্শ করতে পারে। এমন একটী সহজ সুন্দর গল্প। প্রকাশ, স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয়কালে

শ্রীমতী ক্র্যাঙ্কিন যে গর্ব্বিতা রমণীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চরিত্র চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সত্যই অপূর্ব্ব! স্বামীর ভূমিকায় প্যাট্ ও ব্রায়েনও চমৎকার অভিনয় করছেন।

কে ফ্রান্সিস

বিজ্ঞাপন ব্যবসায় স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে স্ত্রীকে শেষে কি করে তার কাছে হার স্বীকার করতে হলো—তাই ছবিখানার মূল কাহিনী।

কে আগে বাবা হবে !!…

ডিক পাওয়েল আর এ্যালেন জেঙ্কিনস্ দুজনে তুমুল তর্ক—কে আগে বাবা হবে? ডিক্ না এ্যালেন, কে?…দুজনের প্রত্যেকেই প্রথম সৌভাগ্যের দাবী করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিতভাবে তর্কের পরিসমাপ্তি ঘটলো, কারণ গলার জোরে তো আর এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। 'ফলেন পরিচীয়তে' বলে ভাগ্যের হাতে ফলাফল সঁপে দিল দুজনে। তবে, কথা রইলো যে আগে বাবা হবে অর্থাৎ যার সন্তান আগে জন্ম গ্রহণ করবে, বাজীতে তার হবে জয়।

—তথাস্তু!……কিন্তু জিত হলো এ্যালেনের। ডিকের সন্তান ভূমিষ্ট হবার এক সপ্তাহ আগেই এ্যালেন জেঙ্কিনস্ সে সৌভাগ্য অর্জ্জন করলে। নাম হলো 'স্যান্ডি'। এক সপ্তাহ পরে ডিক পাওয়েলের স্ত্রী জোয়ান ব্লণ্ডেলেরও একটী পুত্র জন্ম নিল। ডিক্

জন ব্লন্‌ডেল

আদর করে তার নামকরণ করলে 'এলেন পাওয়েল'।

কিন্তু এত কাণ্ডের পর একটী সত্যি কথা শুনুন চুপিচুপি; যে ছেলেটী আছে সেটী ডিকের নয়, ওর জন্মের জন্তে দায়ী জর্জ্জ বার্ণেস—শ্রীমতীর প্রথম স্বামী।

পিকফোর্ডের উইল

চিত্রজগতের স্বনামধন্যা তারকা শ্রীমতী মেরী পিকফোর্ড 'দি মোশন্ পিকচার রিলিফ ফাণ্ড'এর নিকট এই মর্ম্মে একটী বিবরণ প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার উইলে চলচ্চিত্রজগতের অতিবৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্যদের জন্তে একখানা সাজান বাড়ীর সত্ত্বাধিকার দান করেছেন।

শ্রীমতীর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধীকারী ওর ভগ্নী স্বর্গীয় পিকফোর্ডের কন্যা কুমারী পিকফোর্ড; সুতরাং ছায়াচিত্র জগতের দুঃস্থ শিল্পীদের উদ্দেশ্যে পিকফোর্ডের বিরাট সম্পত্তির আরও কিয়দংশ ব্যয়িত হবে, আশা করা যায়।

খুচরো খবর

মার্লিন ডিয়েট্রিচ্ পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটু বাতিকগ্রস্থ বলে তার বেশ একটু কুখ্যাতি আছে, কিন্তু তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে রোণাল্ড কোলম্যান। সে বলে প্যারামাউন্টের পরিচ্ছদ বিভাগের তারপ্রাপ্ত মেয়েগুলো: কোলম্যানকে খুশী করা দায়!

* * *

'ভিভাসিয়স' লেডী'তে জিঞ্জার রজার ওর চিত্রসাথী জেমস ষ্টুয়ার্টের অপরূপ অভিনয় প্রতিভার কথা বলতে বলতে প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে।…হুঃ…ব্যাপারটী বেশ সন্দেহজনক যে!!…

* * *

চার্লি চ্যাপলিনের একটী নতুন আবিষ্কার ১৮ বছরের ভরা যৌবনে ঢল ঢল তন্বী রূপসী ডরোথী কমিঙ্গোর।

* * *

'সুয়েজ' ছবিতে এম্প্রেস ইউজিনির ভূমিকায় শ্রীমতী লরেটা ইয়ঙ্গ যে পোষাকগুলির সুখস্পর্শ অনুভব করেছেন তার দাম:—৭৬০০ পাউণ্ড বা ১১৪০০০ টাকা।

* * *

মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার 'দি লাইফ অব মাদাম কুরী'র চিত্রসত্ত্ব ক্রয় করেছেন।…

মীর্ণা লয়

সম্ভবতঃ শ্রীমতী আইরিন ডিউনের ভাগ্যে চলেছে নাম ভূমিকা।

* * *

সম্প্রতি আমেরিকার একটী সংবাদপত্রের উদ্যোগে হলিউডের নটনটীদের জনপ্রিয়তা বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দর্শকদের কাছ থেকে ভোট আহ্বান করা হয়। ভোটে শ্রেষ্ঠা জনপ্রিয়া অভিনেত্রী নির্ব্বাচিত হন রূপসী তারকা শ্রীমতী মির্ণালয়।

(বিলাসী)

ষ্ট্রীট সিঙ্গার (সাথী)

জীবনের চলার পথে আমরা চলেছি কত জন কত পথে। লক্ষ লক্ষ চলার পথে এই যাত্রীবাহিনী চলেছে কত দুঃখ কত কষ্ট বরণ করে—কত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। 'ষ্ট্রীট-সিঙ্গার'এর ভুলুয়া ও মঞ্জু, এরাও দুঃখময়, কণ্টকপূর্ণ পথে রক্তাক্ত পদে জীবনের চরম আনন্দ জয়ের আশায় আমাদের মত এই পথেরই যাত্রী। তারা নাচে গায়—দুনিয়ার সমগ্র মানবকে আনন্দ বিলোতে বিলোতে তাদের কল্পলোকের পথ দিয়ে ছুটে চলে।

এই রকম একটি গল্পকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে সারা ভারতকে উপহার দেবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছেন নিউ থিয়েটার্স—যারা ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ষ্টুডিও। এই ছবির হিরো-হিরোয়িণ সেজেছেন সাইগল ও কানন—ভারতের চলচ্চিত্র সঙ্গীত রাজ্যে যাদের স্থান অতি উচ্চে।

এইরূপ টিম এর পূর্ব্বে আর হয়নি। এই ছবিতেই নেমেছেন শৈলেন চৌধুরী, অমর মল্লিক, জগদীশ শেঠি, বিক্রম কাপুর।

এই চলচ্চিত্রখানির সুরের রাজ্যে অপরূপ মায়া জাল বিস্তার করেছেন রাইচাঁদ বড়াল।

ছবিখানি পরিচালনা করেছেন ফণি মজুমদার। পি এন রায়ের নিজ তত্ত্বাবধানে ছবিখানি উঠছে।

ষ্টুডিও জানিয়েছেন দিলীপ গুপ্ত অতি উচ্চ শ্রেণীর ছবি তুলছেন। লোকেন বসু সাউণ্ডের কাজ এত ভাল এর পূর্ব্বে নাকি করেন নি।

একদিনের স্যুটিংএর খবর আমরা এখানে দিচ্ছি। খবরটা বজবজের প্রত্যক্ষদর্শী একজন দর্শকের নিকট হতে পাওয়া। 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার'এর ইউনিট গিয়েছিল স্যুটিং করতে বজবজের গঙ্গায়! পরিচালক অপেক্ষা করছিলেন জোয়ারের আশায়। গঙ্গায় তখন ভাটা। জল গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাঝ গঙ্গায়। হঠাৎ এলো বান। এই ইউনিটের প্রায় সমস্ত লোকগুলি তখন নেমে গিয়েছিলেন গঙ্গার মাঝখানে—ভাটার জলের কাছে। পাড়ের ওপর প্রায় শ পাঁচেক লোক অতি দূর গ্রাম হতে যাঁরা সাইগল কাননকে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা চেঁচাতে সুরু করলেন বান আসছে বান আসছে।

লক্ষ লক্ষ সাপের ফণা তুলে মাইলের পর মাইল ধরে ঢেউ ছুটে আসতে লাগল। চীৎকার গোলমাল 'পালাও পালাও', 'উঠে এসো উঠে এসো' চতুর্দ্দিকে হৈ চৈ রব। উত্তাল তরঙ্গময় ভীষণা গঙ্গা। নৌকাগুলি মোচার খোলার মত ভাসতে সুরু করল। ভীষণ জলের আওয়াজ—বন্যার গোঁ গোঁ শব্দে ভীষণ তরঙ্গাঘাতে সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। ভাসল কানন ভাসল ভুলুয়া। ষ্ট্রীট সিঙ্গারের সমস্ত ইউনিট বিরাট স্তুপের মত ঢেউয়ের ওপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। চতুর্দ্দিকে চিৎকার 'বাঁচাও বাঁচাও।' কে বাঁচায়—কাকে বাচায়। জল জল জল আর জল।

পরিচালক ফণি মজুমদার খপ করে কাননের হাত ধরে ফেল্লেন। ঢেউয়ের মুখে ভেসে যাওয়া কানন রক্ষা পেল। সমস্ত দলটা লোকেশন থেকে অতি দূরে গঙ্গার ধারে একটা গাছের গোড়ায় আটকাল।

কানন ডাঙ্গায় উঠে তখনও হাসছে। খিল খিল হেসে বল্লে: বেশতো ভেসে যেতাম অতি দূরে কোন গ্রামে তারপর আবার কোলকাতা ফিরতাম সত্যিকার 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' হয়ে। সাইগল বল্লে: সেই ছিল ভাল। সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার লোকেন বসু বল্লেন—'বন্যা আমার প্রথম ছবি আমার তোলা আছে; দাঁড়ান এইবার আমাদের মাটির স্পর্শ পাওয়া ছবিটি গ্রহণ করি।

এর পরেও ফণি মজুমদার সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ছবি তোলার কাজ চালিয়ে ছিলেন।

দেশের মাটি

'দেশের মাটি'র হিন্দি সংস্করণ বাঙলার বাহিরে খুব ভালভাবেই চলছে। নূতন আদর্শ মানুষ সামনে দেখতে চায়। তাই এ ছবিতে যে নূতন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা সকলকেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছে।

বাঙলা সংস্করণ আসছে ১৭ই সেপ্টেম্বর নিউসিনেমা ও চিত্রায় একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করবে।

বড়দিদি

গেল সপ্তায় ডাইরেক্টর অমর মল্লিক তাঁর নতুন সেট্ নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করতে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজ মল্লিক কয়েকটী হিন্দি ও বাঙলা গানএর টেক্ নিয়েছেন।

জীবন মরণ

নীতীন বাবু পরিচালিত 'জীবন মরণ' বা দুষমন'এর কাজ বেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

গেল সপ্তায় 'ক্লিনিক'এর সেট্ কার্য্য শেষ হয়ে গেছে।

বিষের বাঁশী

ডাইরেক্টর দেবকী বসু মহাশয় তাঁর বইয়ের মহলা পুরোদমে চালিয়েছেন। ২১ দিনের মধ্যেই সুটিং আরম্ভ হয়ে যাবে। ছোটাই বাবু তাঁর দুইজন সহকারী সুধা ও মামার দ্বারা প্রথম সুটিংএর যাবতীয় ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেছেন।

শ্রীভারত লক্ষ্মী

আমরা গতবারে জানিয়েছিলাম যে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের হয়ে 'পরশমনি' বই-এ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার জন্ত নিউ থিয়েটার্স এর কর্তৃপক্ষ কাছে 'Loan' এর ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে। সম্প্রতি আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানলাম যে দুর্গাবাবুর ছুটি মঞ্জুর হয়েছে এবং ভারত লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর এক বছরের চুক্তি হয়েছে।

জনকনন্দিনী

রাধা ফিল্মের উক্ত বইএর সুটিং কার্য্য বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে।

গেল সপ্তায় যে দৃশ্যটী তোলা হ'ল তাতে দেখা যায় যে রাজপ্রাসাদে জনকরাজা কর্তৃক 'শিবধনু' গ্রহণ। এখানে তুলসী চক্রবর্ত্তীকে রাজা জনক, দেববালাকে রাণী, মনোরঞ্জন ভট্টাকে পরশুরাম, সাবিত্রীকে সীতারূপে দেখা গেল।

নরনারায়ণ

ডাইরেক্টর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছবির পরবর্ত্তী দৃশ্যের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এখানে দেখা যাবে রাণী জাম্ববতী আর তাঁর সখী জয়ন্তীর সঙ্গে সত্যভামা মিলন। এই তিনটী চরিত্রে অভিনয় করছে রেণুকা রায়, রাণীবালা ও শীলা হালদার।

যখের ধন

ডাইরেক্টর হরি ভঞ্জ তাঁর 'যখের ধন'কে আগলে নিয়ে চলেছে। সেদিন তিনি 'বাঙ্গলো' দৃশ্যের কাজ শেষ করলেন। এই দৃশ্যে ভিলিয়ান্ করালী তার দলবলসহ তিনজন নিঃস্রত ব্যক্তি বিমল, কুমার ও রেখার ওপর আক্রমণ করে। করালীর ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী আর বিমল, কুমার ও রেখারূপে দেখা যাবে যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী, সুশীলা রায় ও শীলা হালদারকে।

বেকার নাশন

মতিমহল থিয়েটার্সের হাস্যরসাত্মক ছবি 'বেকার নাশন' উত্তরা চিত্রগৃহে বেশ ভালই দর্শক সমাগম করছে।

ক্যালকাটা সিনেটোন নিউজ

এই নামে একটি নূতন চিত্র-প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। "মাটির মায়া" নামে ছোট একটি গীতিনাট্য তোলা হচ্ছে—সহকারী পরিচালক কুমার সেন আগামী সপ্তাহের আউটডোর লোকেসন নিয়ে বড় ব্যস্ত আছেন। চিত্র গ্রহণ কোরছেন তরুণ চিত্র-শিল্পী অজিত সেন। শব্দযন্ত্রের কাজ কোরছেন—সন্তোষ হাজরা।

চিত্রা

আসছে শনিবার থেকে 'গোরা' এখানে ষষ্ঠ সপ্তাহে পড়বে। 'গোরা'র দর্শকসমাগম এখন বেশ ভালভাবেই চলছে।

পূর্ণ থিয়েটার

বিদ্যাপতি পঞ্চম সপ্তাহেও বেশ আসর সরগরম করে রেখেছে।

আসছে ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে এখানে নিউ থিয়েটার্সের সামাজিক চিত্র 'অভিজ্ঞান' দেখান হ'বে বলে আশা করা যায়।

নিউ সিনেমা

সামনের শনিবার থেকে এখানে 'চাবুক-ওয়ালী' দেখান হ'বে। এতে অভিনয় করেছে আজুরী, সিরাজ, সুলতান আলাম, রমিলা, কমলাবাঈ প্রভৃতি।

রূপবাণী

শ্রীমতী সাধনা বসু নৃত্যে, গীতে অভিনয়ে শুধু অসাধারণ কুশলতার পরিচয় দেন নাই; তিনি বাঙলাদেশের ছায়াচিত্রজগতে একটী ব্যক্তিত্ব।

সুসাহিত্যিক মন্মথ রায় রচিত 'অভিনয়' আধুনিক সমাজের হৃদয়ানুভূতির বিশিষ্ট বিশ্লেষণ। এমনি একটি কাহিনীই শ্রীমতী সাধনার প্রতিভার যোগ্যতর বিকাশ-ক্ষেত্র। শিল্পী সমাবেশে এই কথাচিত্রটি বিশেষ-ভাবে একটি আকর্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায়, তুলসী লাহিড়ী, বিভূতি গাঙ্গুলী প্রভৃতি শিল্পী সমাবেশে চিত্রটি যে অভিনয়ের দিক দিয়া বিশেষ উপভোগ্য হইবে তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। 'অভিনয়' চিত্রটি-র প্রযোজনায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। 'অভিনয়' রূপবাণীতে যে বিশেষ চঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে তাহা বলা বাহুল্য।

বিবিধ

কলিকাতা সঙ্গীত প্রতিযোগিতা
তৃতীয় বর্ষ—১৯৩৮

আগামী শুভ-মহালয়া দিবসে উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা এবং সম্মিলনীর আসর হইবে। উক্ত দিবসে বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা উক্ত আসরে সঙ্গীতের ভার লইয়াছেন। কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, সাংবাদিকগণ, এবং কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নৃত্য-শিল্পী উক্ত আসরে উপস্থিত থাকিবেন

সঙ্গীত সম্মিলনী

আগামী শনিবার ৩রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক সভার অধিবেশন হইবে।

বিষয়:—(১) স্মৃতি বার্ষিকী সভা

(ক) ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) ৺অতুল প্রসাদ সেন বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদ্বারা পরলোকগত মহাপুরুষদের রচিত সঙ্গীত চর্চ্চা।

(২) যন্ত্র সঙ্গীত

দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগিতা

৩৮,এ, বলরাম বসু ঘাট রোডস্থ অর্চ্চনা পত্রিকার কর্ম্মকর্তৃবৃন্দ, দ্বিতীয় বার্ষিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিযোগিতার রচনা প্রেরণের সময় ১১ই ভাদ্র হইতে ২০শে ভাদ্র ১৩৪৫ সাল পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

রচনার বিষয়:—

(১) হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও তাহার সমাধান। (১০০০ শব্দের মধ্যে)

(২) ছোট গল্প।

(৩) কবিতা।

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

প্রথম পর্য্যায়

অজয় যদি জানতো কাব্যজগতের সাথে বাস্তব জগতের এতখানি পার্থক্য—তা'হ'লে ওর কাব্যস্পৃহা বাস্তবের উত্তাপে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যেত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর কোথায়? মানব-মনের রহস্য অনন্ত। সে রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা সহজ সাধ্য নয়। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের কন্দরে কন্দরে অলক্ষ্যে কত ফুল ফোটে, সবার অলক্ষ্যেই তা আবার ঝরে পড়ে। সন্ধান তার ক'জনই বা রাখে?

অজয় ছিল সত্যিকারের কবি—অন্তরে ও বাহিরে। কলেজে থাকতেই, প্রফেসর যখন বুঝিয়ে যেতেন অঙ্ক—বাইনোমিয়াল থিওরেমের কূট বিবর্ত্তন, বোর্ডের গায়; ও তখন তা'থেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতো কবিতার রাইম। সোজা সোজা লাইনগুলো সাজানো পর পর বোর্ডের গায়। বাংলা ভাষার অক্ষর ও গুলো না হ'য়ে—হলোই বা অঙ্ক শাস্ত্রের নিরর্থক সংখ্যার শ্রেণী। তবুও একটা প্রতিপাদ্য জিনিষকে নিয়ে লাইনের পর লাইন সাজিয়ে সমাধানের পথে এগিয়ে আনা। কবিতার উদ্দেশ্যও তো একই। কতকগুলো কবিতা হয় মিষ্টিক ধরণের—লোকে বলে ভাব-সম্পদে ঠাসা। অঙ্কগুলোও তাই। ক'জন ছেলের কাছে ওর আসল অর্থ ধরা পড়ে? হ্যাঁ সবই কবিতা। অঙ্কশাস্ত্রও কবিতা, রাস্তা দিয়ে ঝন্ ঝন্ করে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী চলে তাতে বাজে কবিতার রাইম। আদালতে পেয়াদা আসামী ডাকে—'বানোয়ারীলাল হাজির হায়?' সেখানেও কবিতার ছন্দ। রাস্তা দিয়ে চলে অগণিত মানুষ, প্রতিজনের পদক্ষেপে বাজে কবিতার নাচন তাল। মানুষ হাসে, মানুষ কাঁদে তাতেও কবিতার রূপ।

কলেজ থেকে বেরিয়ে ও নিল আশ্রয় ওর ছোট্ট ঘরটাতে যেখানে আলো প্রবেশ করে সংকুচিত হ'য়ে। ও বলতো—'আমার অন্তরের আলোকই যথেষ্ট। আর অন্ধকার না থাকলে আলোর বিকাশ লাভ ঘটে না পূর্ণভাবে, তাতো জানিস্ অমিত'।

কলেজে থাকতেই বেরুত ওর লেখা মাসিকে, সাপ্তাহিকে। কলেজের যে কোন ফাংশানে তাই ওকে দিয়ে পড়ানো হতোই কিছু না কিছু। সরস্বতী পুজোর চিঠির খসড়া থেকে যায় ম্যাগাজিনের সম্পাদনা পর্যান্ত ওকেই দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হতো।

* * *

চাকরী নিয়ে বিদেশে গেছি চলে। খবর ওর বিশেষ কিছুই পাই না, সে আজ অনেক দিনের কথা। আর রাখবারও যে বিশেষ চেষ্টা ছিল তাও বলতে পারি না। তবুও ওকে আমার বেশ ভালই লাগতো। তাই মাঝে মাঝে ওর কথা ভাবি। ওর জীবনের বহমান প্রতিটী দিন হয়তো স্বপনের রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে। কল্পনার কত কথাই আমি ভেবে যেতাম যখন পড়তাম ওর লেখা মাসিকের পাতায়।

'প্রচিত্রা' তখন রেখেছে মাসিকের বাজার গরম করে। বড় বড় লোকের লেখায় ঠাসা। তারই পাতায় মাঝে মাঝে ওর লেখা পড়ে যেটি কথা কবিতা অনন্ত। জগতের কোণে কোণে, গ্রহ তারকায়, সাগরজলে দোল খায় কবিতা সুন্দরী। সারা দুনিয়াটাই কবিতা—ইন্-এ নাটুশেল।

তাই বলছিলাম অজয় ছিল সত্যিকারের কবি—প্রাণ। দুনিয়ায় আর সব কিছু, ওর কাছে লুপ্ত। দরিদ্রের কুটীরে কুটীরে, রাস্তার অন্ধকারময় কোণে কোণে, মানুষের সঞ্চিত আশা যেখানে হাহাকার করে লুটিয়ে পড়ে, যেখানে চলতো ওর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ। কমল-বিলাসী কবি ও নয়। ছন্দে ছন্দে ঝরে পড়ে আগুণের ঝলক, লাইনে লাইনে কেঁদে ওঠে রুদ্ধ বেদনার গুমরানি।

বাপের ওর খুব বেশী পয়সা ছিল না—তবু পরিত্যাক্ত সংসার তাঁর চলে যেত সহজেই। আড়ম্বরের আধিক্যবিহীন স্বচ্ছ জীবন যাত্রা। ও ভাবতো নাইবা থাকলো ওর মোটর গাড়ী, ব্যাঙ্কের মোটা অঙ্ক। বাইরের সম্পদটাই কি সব? দেশের মাঝে অগণিত লোক ক্ষুধার জ্বালায় চিবায় গাছের পাতা, তাদের পেটের খাবার কেড়ে নিয়েছে কে? শতজন দরিদ্রের অন্নে ভাগ বসিয়ে তবে না একজন বড়লোক ইমারৎ গাড়ে, মোটর হাঁকায় ওদের বুকের পাঁজরে পাঁজরে? আর এও তো ঠিক যে বাইরের এই সম্পদ—তাকে তো খরচ করে শূন্য অঙ্কে টেনে আনা যায়। হ্যাঁ ওত পড়েছে সেই কোন্ ছোটকালে—'অর্থই যত অনর্থের মূল'। সত্যই কি তা নয়?

অন্তরের সম্পদই তো আসল। তাকে কেউ ম্রিয়মান করতে পারে না। খরচ করলে বেড়েই চলে; নিঃশেষ হয়ে যাবার ঠিক উল্টো। ছেঁড়া কাপড় হয়তো ওর দৈন্যকে চাপা দিতে পারে না—লোকে হাসে। কিন্তু ওরা কি সন্ধান রাখে অন্তর-সম্পদের। সেখানে যে নিত্য নতুন ভাবের খেলা। কত অর্ঘ্য এসে পড়ে ওর এই মলিন চরণে, অর্থাৎ ওর অন্তর্সম্পদের চরণে। দুনিয়ার সারা লোক ওরদিকে তাকিয়ে থাকে। ও লিখছে বা ও লিখবে তাতেই না কত লোক বড় লোক হবে; বাড়িয়ে তুলবে জমার অঙ্ক? তাতেই না দেশ-বিদেশের লোক চিনবে বাঙালীকে। রবীঠাকুর খানিকটা এগিয়ে দিয়েছেন দেশকে। বাঙ্লাকে, তার বাঙালীকে জগতের সামনে দাঁড় করিয়েছেন—তার মুখে কাব্যের ফোকাস ফেলে। ও তাকে দীপালোকের মালায় সাজাবে। কাব্যলোকের, সাহিত্য-লোকের গেটপাশ দিয়ে তাকে নিয়ে বসাবে জগৎসভার মাঝখানে।

* * *
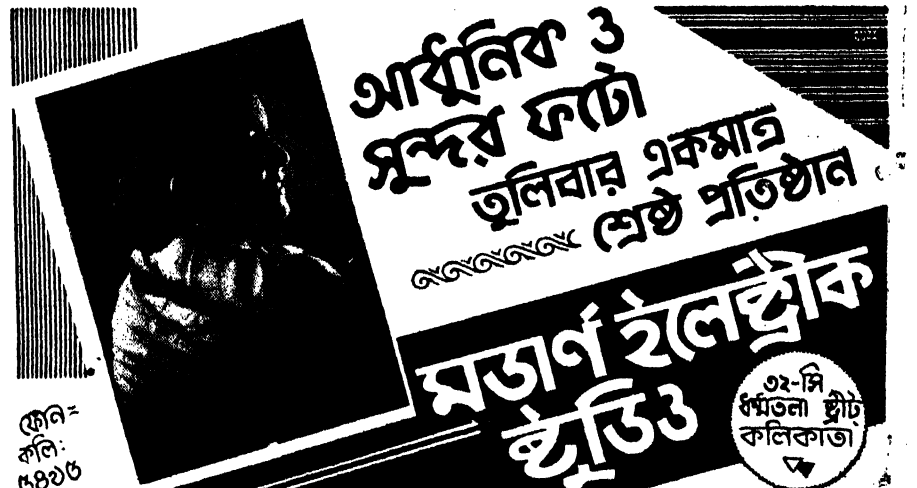
কলেজ থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি। একই সহরে বাস, আর একই কলেজের সহপাঠি, তার ওপর আমি ছিলাম বিশেষ করে ওর সমঝদার। আমি ছিলাম ওর বাল্যবন্ধু, বিশেষ বন্ধুও বটে। সেই সূত্রেই ওর গোড়ার ইতিহাসটা ছিল আমার জানা। কে জানে হয়তো একদিন একটা হিসাব করা হবে—কতজন প্রতিভার অপমৃত্যু হ'য়েছে। লেখা হবে তাদের জীবন কাহিনী—পথিককে সাবধান করতে সেই কারণটা দেখিয়ে, যে কারণে তাদের প্রতিভা করেছে আত্মহত্যা। সেদিন হয়তো আমার এ লেখা লাভ করবে খানিকটা সার্থকতা।

বিদেশেই অনুভব করতাম গর্ব। পাঁচজনকে ডেকে দেখাতাম—দেখতো এ লেখাটা কেমন? প্লটের কায়দা আছে না? বর্ণনার মাধুর্য্য অপরূপ। ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে জীবন্ত ছবি। কেমন তাই না? জানো লেখাটা কার? তোদের প্রিয় লেখক গো। অজয় বোস। আমারই ক্লাশ-মেট বলে নিজেই একটু গম্ভীর হয়ে চেয়ে থাকতাম সবার মুখের দিকে।

সুচিত্রা বরাবরই কিনতাম। প্রতি-সংখ্যাতেই আশা করতাম ওর লেখা। কিন্তু তাকি সম্ভব? না তা ভালো? রবিঠাকুরই একঘেয়ে হয়ে গেল পাঠকের কাছে প্রতিসংখ্যাতে লিখে লিখে। ও যখন যা কিছুই লিখতো তাই জীবন্ত হয়ে ধরা দিত পাঠকের কাছে। কখনও বা কাঁদাতো ও ওর পাঠককে আবার কখনও হাসির মাঝে শিখিয়ে দিত দেশের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান।

সুচিত্রার গ্রাহক আমি তাই নিয়মিত। কিন্তু কিছুদিন অজয় বোসের নাম সুচিত্রার পাতা থেকে মারলো ডুব। ভাবলাম—আজকাল হয়েছে এক ফ্যাসান ছদ্ম নামে লেখা। ও হয়তো ধরেছে সেই রাস্তা। ওই যে 'ধৃতরাষ্ট্র' বলে লেখক সেই হয়তো অজয় নামটাকে রেখেছে লুকিয়ে। কিম্বা 'কাশ-ফুল' ইত্যাদিরা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী, অন্ততঃ নামের বাহাদুরীতে। অমূল্য, গদাধর, অজয়—এসব আর ক'জনের সাধারণতঃ মনে থাকে? নাঃ, অজয় বোসের বুদ্ধি পেকেছে। --আবার ভাবি—তাইতো—নীলিমা বোস তো অজয় বোস নয়? ভগবানই জানেন। প্রিয়ার নামকে হয়তো অমর করে রাখবার চেষ্টা!

* * *

কেটে গ্যাছে বছর কয়েক। একঘেয়ে জীবনে আসে বিরক্তি। তাই তার স্বাদ বদলিয়ে নেবার জন্যে ছুটীর দরখাস্ত। এলাম ফিরে বাংলা মায়ের শ্যামল কোলে, একেবারে কলকাতার বুকে—যেখানে শ্যামলিমার লেশ মাত্র নেই। জীবন্ত মোট-ঘাট নিয়ে উঠলাম ভবানীপুরে, মানে ভর করলাম শ্বশুর মহাশয়ের স্কন্ধে।

সেদিন পুরানো সুচিত্রা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল অজয়ের কথা। তার ওপর সেই যে এদের বাড়ী এসে ঢুকেছি আর বিশেষ কোথাও বেরুনোও হয়নি। এরাই বা মনে করবে কি? ভাবলাম অজয়ের সাথে একবার দেখা করে এলে মন্দ কি হয়। উদীয়মান একজন সাহিত্যিক—যার সাথে আলাপ করবার জন্য কত লোক হয়তো লালায়িত; আর আমি কি না এতদিনের বন্ধুত্বকে ভুলতেই চলেছি!

সেইদিন বিকেল বেলাতেই বেরুলাম অজয়ের বাড়ীর দিকে পুরাতণ বন্ধুত্বকে ঝালিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবিলাম—কি জানি সেখানে সে আছে তো? যাইহ'ক একবার খোঁজ করে আসা যাক্। তবুও মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে যে—চেষ্টার ত্রুটী নেই; সিদ্ধির ভার ভগবানের হাতে।

মাণিকতলার এক অপ্রশস্ত রাস্তা। ২৮নং ই না ছিল অজয়দের বাড়ী? চিনতে পারবো তো ওদের বাড়ীটা? এতদিনে কত পরিবর্ত্তন হয়ে গ্যাছে হয়তো বাড়ীটার। হয়তো বাড়ীটাকে ভেঙেফেলে সেখানে মাথা খাড়া করে আছে হালফ্যাসানের চকচকে আর্কিটেকচার। হ্যাঁ তাওতো বটে, বালিগঞ্জেও সেদিন যে অদ্ভুত বাড়ীটা দেখলাম, সেই যে নাম 'কাব্য-কুঞ্জ' না কি, সেইটাই তো অজয়ের বাড়ী নয়? সকলেরই দৃষ্টি আজকাল ওই পাড়াটার দিকে—যেটা ছিল এই কিছুকাল আগেও একটা পোড়া মাঠ। ওই পাড়াটার কথা ভাবলে অসিৎ আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এই সেদিনও ও দেখে গেছে ওর পূর্ব্বাবস্থা। আলাদিনের প্রদীপের শক্তিতে ও যেন রাত্রেই বদলে গেছে। যাইহ'ক বাড়ীটা সম্বন্ধে একবার খোঁজ নিলেই হোত। অনর্থক হয়তো এত দূর আসা আর ভোগান্তি।

হ্যাঁ এই তো আটাশ নম্বর। বাড়ীটা এখনও আছে দেখ'ছ। কিন্তু অজয়ের বদলে ওর ভাড়াটিয়া দেবে না তো তাড়া?

অজয়! অজয়বাবু!

ডাকবো নাকি 'কাশ-ফুল' বলে? অথবা 'ধৃতরাষ্ট্র'? উঁহু নীলিমা দেবীই হয়তো বা হবে। কি জানি কি ব্যাপার। তার চেয়ে অজয় বলেই ডাকা যাক্।

(ক্রমশঃ)

শনি-জীবনীর খসড়া

বর্ত্তমান শ্রাবণের সংখ্যায় শনির "বাণু" লিখিয়াছে—"হয়তো কবিতার যুগ শেষ হইয়াছে, কিন্তু "শনিবারের চিঠি"র পাঠকেরা সে কথা মানেন না। তাঁহারা বলেন—এককালে 'শনিবারের চিঠি'র—বিশেষত্বই ছিল কবিতা; ঐতিহাসিক গবেষণায় তাহার অপমৃত্যু আমরাই সাধ করিয়া ঘটাইতেছি।" 'শনিবারের চিঠি'র খোকাটির বয়স এখন দশ-বর্ষ দশ-মাস। এই খোকাটি যখন মাস আষ্টেকের ছিল, তৎকালে প্রকাশিত "মহাকাল" পত্র ইহার "বিশেষত্ব" সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া রাখা ভাল। খোকা এখন ঐতিহাসিক গোবেষণায় ব্যস্ত, কিন্তু তখন কিসে ছুনহর ছিলেন, কবিতায় না অন্য কিছুতে, এবং যদি কবিতাই হয়, তা হইলেও বা সে কেমন কবিতা, তাহা সর্ব্বকালদর্শী "মহাকালের" পক্ষপাতশূন্য জবানীতেই শুনিয়া রাখা ভাল। এই জবানীর মারফৎ শনি-জীবনীর যে খসড়া খাড়া হইয়া উঠিবে, তাহাতে শুধুই শনিগ্রহ নয়, শনি-চক্রের অনেক গ্রহ-উপগ্রহকেই পাঠক চিনিয়া রাখিতে পারিবেন। ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে "মহাকাল" শনি-জীবনীর বক্ষ্যমান পরিচয় দিয়াছিলেন :

(১) "কয়েকদিন আগে স্থানীয় পুলিশ প্রবাসী অফিসে খানাতল্লাস ক'রে মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করেছিল। 'শনিবারের চিঠি' নামক একখানি ইতর কাগজ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-পরিচালিত প্রবাসী প্রেস থেকে ছাপা হয় এবং সেই ছাপাখানার যিনি মুদ্রাকর তিনিই সেই ইতর কাগজখানির সম্পাদনা করেন। সেই কাগজটিতে একাধিক অশ্লীল বীভৎস ও নগ্ন-কামচিত্র-সম্বলিত লেখা ছাপা হ'য়ে থাকে। সেই অশ্লীল সাহিত্য প্রচারের জন্যই রামানন্দবাবুর কর্ম্মচারী তথা প্রবাসী প্রেসের মুদ্রাকর গ্রেপ্তার হ'ন। তিনি পরে অবশ্য জামিনে খালাস পান। আমাদের এই লেখার সময় পর্য্যন্ত মামলার নিষ্পত্তি হয় নি।

যে রামানন্দবাবু অশ্লীলতার ভয়ে 'শুক্রবার' পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন না, তাঁরই প্রেস থেকে মাসের পর মাস এই রকম একখানি কাগজ প্রকাশিত হয় (সে কাগজের লেখা এত জঘন্য ও জনসাধারণের পক্ষে এত অহিতকর যে পুলিশ পর্য্যন্ত সম্পাদককে গ্রেপ্তার করিতে বাধ্য হয়)—এ অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়।"

(২) "অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি শনিবারের চিঠির যে অগ্ন্যুৎপাত তারও পশ্চাতে বহু ব্যক্তিগত কারণ নিহিত আছে। একটা মোটা কথা এই,—সজনী দাসের খাজে ভাবহীন ছন্দহীন কবিতা কল্লোল-পত্রিকা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, সেই থেকেই শ্রীমতী সজনী কল্লোলের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে আছেন।"

(৩) "শ্রীযু[illegible] সজনীদাসের পত্র কেন "কল্লোল" [illegible] বহিষ্কৃত হয়েছিল, "বঙ্গলক্ষ্মী"[illegible] তাঁর "ব্যর্থতা" শীর্ষক কবিতা থেকেই তা বোঝা যায়।

তিনি নিজের সাহিত্যিক অবস্থাটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

'কূলে ভিড়িবার নাহি আর মোর আশা,
তল মিলিবার রয়েছি অপেক্ষায়।'

তা আমরা জানি বলেই তাঁর পরকাল ভেবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি লিখেছেন—'ডুবিব কখন তাহার আশায় আছি।' আমরা বলতে পারি, বেশী দেরি নেই। কবিতাটিতে তাঁর কবি হবার ব্যর্থতাটি ভারি করুণ লাগে। তাঁর এই বেদনায় মন গ'লে যায়। তার চেয়ে ভাল লাগে তাঁর উন্মাদ উলঙ্গ রূপ—শনিবারের চিঠিতে। যেন এক উলঙ্গ পাগল সায়েন্স কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে লাঠি ঘোরাচ্ছে, তাঁর দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই, 'প্রবাসী'র কুকুর থেকে সুরু করে রামানন্দবাবুর দিকে পর্য্যন্ত লাঠি হাঁকাচ্ছে। সজনীবাবুর এই রূপটিই আমাদের ভালো লাগে।"

(৪) "তারপর শনিবারের চিঠি যখন খিস্তি সুরু করবে তখন ঠেলা বুঝবে। মেয়ে পুরুষ কাউকে রেয়াত করে না বাবা—চালাকি নয়। রামানন্দবাবু খাইয়ে গোপা একটি ডজন খেঁকি ঝাঁসু পুষেছেন জানো?"

(৫) "কাব্যে ও জীবনে অসত্য ও অসুন্দরের সাধনা ক'রেও সত্যসুন্দরের নামে যে নিজের নীচতা ও গ্লানি লুকিয়ে রেখেছে সেই মোহিতলাল কবিযশঃপ্রার্থী শ্রীসুশীল কুমার দে নামধের এক অধ্যাপকের বুকের বন্ধু। তাঁরই Patronage এ তিনি ঢাকায় চাকরি পেয়েছেন—মাণিকতলা থেকে নীল-ক্ষেতে এক Ceylonese লাফ মেরে। ....তাই তিনি সত্যসুন্দর দাসের ছদ্মনামে সুশীলকুমারের চোরাই রচনার কেরা কিরতি প্রশংসা করে ফেলেছেন।

এই না হ'লে বন্ধুত্ব। দু'জনে পরামর্শ ক'রে পরস্পরের বিজ্ঞাপন দেবার কি অদ্ভুত মনীষা!.........নইলে সুশীল ছাপলেন মোহিতের অশ্লীল কবিতার প্রশংসা, আর মোহিত ছাপলেন সুশীলের চোরাই মালের স্তুতি! অনুরূপা দেবী এই সুশীল মোহিতকে গোড়ার দিকে একটু নুন্ খাইয়ে দেন নি কেন?"

(৬) "জনৈক অধ্যাপক শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় শনিবারের চিঠির দলের একজন। তিনি ঐ ইতর কাগজখানির প্রচারের জন্য মাসে মাসে চাঁদা দিয়া থাকেন,—এই কথা শনিবারের চিঠির সম্পাদকই আমাদের জানিয়েছিলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারতীয় মাতৃভাষার প্রধান না হ'লেও সব চেয়ে ক্ষমতাপন্ন অধ্যাপক। সুনীতি বাবু ঠিক তাঁর অধীনস্থ না হ'লেও তাঁর চেয়ে নিম্নপদারূঢ়। শুনে থাকি এমন অবস্থায় নাকি ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও আক্রোশ জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাপারটা ভালো জানি না, তবে ইঙ্গিতটা চোখে ভারি স্পষ্ট ঠেকে।"

এবার শনি-জীবনীর খসড়ার এই পর্য্যন্ত। "মহাকাল"-এর উদ্ধৃত লেখার উপর আমাদের টীকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন। সমসাময়িক পত্রের বিবরণ শনির ব্রজবাবু বেদবাক্য বলিয়া মানেন। আমরা শুধু অশেষ সত্যসন্ধ ব্রজনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, "মহাকাল" পত্রখানি তাঁহার সঙ্কলিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাসে"এ স্থান পাইয়াছে ত?

সত্য-সুন্দরী সস্তা দাওয়াই

আপনারা কেন বৃথা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যভাবন্ধনের জন্তে উপায় উদ্ভাবন করিতে এত মাথা কুটাকুটি করিতেছেন? সত্যসুন্দর দাস সস্তায় যে দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার খবর রাখিয়াছেন কি? তিনি শনির শ্রাবণ সংখ্যায় "বাংলা না হিন্দুস্থানী?" নামক প্রবন্ধে যে অব্যর্থ দাওয়াই বাত্লাইয়াছেন তাহা একবার প্রয়োগ করিয়া দেখুন না? সত্যসুন্দর প্রবন্ধের কি grand peroration করিয়'ছেন দেখুন—"অতএব বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে,......ইহার একমাত্র উপায়, সর্ব্বপ্রথমে নিজের ঘর ভাল করিয়া মেরামত করা। দেশের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালীত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে—হিন্দু বাঙ্গালীকে ও মুসলমান বাঙ্গালীকে এক ভাগ্যসূত্রে একতাবদ্ধ হইতে হইবে। আমার মনে হয়, মুক্ত প্রাণ ও মুক্ত মন লইয়া অগ্রসর হইলে এ কার্য্য দুরূহ হইবে না।" হায়! হায়! এমন সহজ দাওয়াই আমাদের হাতের কাছে ছিল, শুধু বাস্তির অভাবে এতদিন খাওয়া হয় নাই! সত্যসুন্দর দাস নিশ্চয়ই জাতিতে বৈদ্য, নতুবা এমন নাড়ীজ্ঞান তাঁহার জন্মিল কোথা হইতে। দেখিলেন ত, একেবারে যথাস্থানে টিপিয়া ধরিয়াছে! চাই শুধু একটু "মুক্তপ্রাণ", আর একটু "মুক্তমণ"—এই দুইটি বস্তু, ডুমুরের ফুলের রস অনুপানসহযোগে ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিলেই হিন্দু-মুসলমানের একতাবন্ধন দৃঢ় হইবে, "ঘর ভাল করিয়া মেরামত করা" হইবে এবং বর্ষার দিনে ঘরের ভিতর আর বৃষ্টির জল টোপাইবে না। এই "মুক্ত প্রাণ" আর "মুক্ত মণ"-এর দামও বেশী নয়,—রমণার মাঠে পয়সায় পাঁচ জোড়া করিয়া বিক্রয় হইতেছে, পয়সা দিলেই বাঙ্গালীর জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া সত্যসুন্দর দাস ঢাকা হইতে লাখে লাখে ভি:পি:তে পাঠাইয়া দিবেন! সুভাষ বসু, শরৎ বসু, যে 'মুক্ত প্রাণ' ও 'মুক্ত মনে'র জন্য সারা দেশ চুড়িয়া হায়রাণ হইলেন, তাহা যে সত্যসুন্দরের কলমের খোঁচায় এতকাল পরে আত্মপ্রকাশ করিবে, কে জানিত? সত্যসুন্দর বলিয়াছেন—"বাংলাদেশের জলমাটির এমন একটি বিশিষ্ট গুণ আছে যে, হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক—প্রাণ সকলেরই এক......শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের সাড়া মিলিবেই।" বাঙ্গলাদেশের জলমাটির বিশিষ্ট গুণে, প্রাণ যে সকলেরই এক হইয়া যায়, তাহা ত সিরাজদ্দৌল্লা মীরজাফরের আমল হইতেই অদ্যাবধি দেখা যাইতেছে। তবে বাঙ্গালা দেশের জলমাটির অন্য বিশিষ্ট গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, এই জলমাটির গুণে এ দেশে যে অখণ্ড Idiotএর সৃষ্টি দ্রুতবেগে সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা ত চাক্ষুষই দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের একতা-বন্ধনের দাওয়াই বাৎলাইয়া সত্যসুন্দর পর নিশ্বাস-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—উভয়ের অধীনতা পাশ কাটিয়া বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইবে। প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের একতাবন্ধনের উপদেশ, পর-মুহূর্ত্তেই মুসলিম লীগের অধীনতা পাশ কাটাইবার যুক্তি—কেমন চমৎকার consistency! তাহার উপর আবার আস্ফালন কত! "আমার একথা শুনিয়া আজ সকলে চমকিত হইবেন জানি, কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে, যখন লোকে এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, বাঙ্গালী একদিন ইহা অবিশ্বাস করিয়াছিল।" অর্থাৎ সত্যসুন্দর যে চমকপ্রদ বুলি ঝাড়িলেন, তাহা অদ্যাপি "ন ভূতো, ন ভবিষ্যতি!" কিন্তু লোকে আর কিছু নয়, এই ভাবিয়া বিস্মিত হইবে, সত্যসুন্দর ছাপার অক্ষরে এমন "গবেটি-রাবিশ" বাহির করিলেন কিরূপে?

ভারতে নারীত্বের আদর্শ সাবিত্রী

শ্রীসাধনা সেনগুপ্তা

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবন যাত্রার প্রণালী, রুচি এবং সামাজিক রীতির ও নীতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু যে আদর্শ, প্রেম, নিষ্ঠা, ত্যাগ, পবিত্রতা ও মহানুভবতা প্রভৃতি দুর্লভ ও বিশ্বময়ী গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার পরিবর্ত্তন কোন কালেই হয় না, যুগে যুগে সে আদর্শকে মানুষ পূজা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে নারীত্বের আদর্শ এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এত গৌরবময়। সাবিত্রীর চরিত্রে আমরা এই আদর্শেরই পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হই, চিত্ত আমাদের ভক্তিভরে অবনমিত হইয়া পড়ে। এই আদর্শ বুঝিতে হইলে সাবিত্রীর উপাখ্যানভাগটী সংক্ষেপে বলিয়া নেওয়া প্রয়োজন।

পুরাকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে ধর্ম্মাত্মা, ন্যায়বান ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা ছিলেন। নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া বিপুল রাজ্যের অধিপতি হইয়াও তিনি অত্যন্ত মনোকষ্টে দিন যাপন করিতেন।

তারপর রাজা সন্তান লাভের আশায় মুনি-ঋষিদের উপদেশে কুলদেবী সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে আঠার বৎসরব্যাপী যজ্ঞ করিলেন। আঠার বৎসর পূর্ণ হইলে সাবিত্রী দেবী সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই অনুগ্রহে শীঘ্রই আপনার একটী তেজস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে।"

যথাসময়ে রাজার অতি রূপবতী ও সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিল। সাবিত্রী দেবীর কৃপায় এই কন্যা জন্মিল বলিয়া রাজা রাজকুমারীর নাম রাখিলেন সাবিত্রী। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যা কালক্রমে যৌবনে পদার্পন করিলেন।

স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় রাজকন্যাকে দেখিয়া লোকেরা "ইনি দেবকন্যা আসিয়াছেন" এইরূপ বলিতে লাগিল। সাবিত্রীর তেজে অভিভূত হইয়া কোন রাজপুত্রই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাজা দেবিরূপিণী স্বীয় কন্যাকে এমতাবস্থায় দেখিয়া অতিমাত্রায় দুঃখিত হইলেন। পরে রাজা বলিলেন, "সাবিত্রী, তোমার সম্প্রদান-কাল সমুপস্থিত তথাপি তোমার উপযুক্ত পাত্র মিলিতেছে না, সুতরাং তুমি নিজেই উপযুক্ত পতির অন্বেষণ কর। তুমি যাহাকে মনোনীত করিবে, আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহার হস্তেই তোমাকে সম্প্রদান করিব।" এইরূপ আদেশ দিয়া রাজা স্বামী মনোনয়ন উদ্দেশ্যে সাবিত্রীর যাত্রা করিবার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। সাবিত্রীও পিতার অভিপ্রায়ক্রমে স্বর্ণময়-রথে আরোহণ করিয়া বিবিধ স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং রাজর্ষিগণের মনোহর তপোবন সকল দর্শন করিয়া স্বামী মনোনয়নপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সেই দিন দেবর্ষি নারদ মহারাজ অশ্বপতির সভামধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সাবিত্রী উপস্থিত হইলে তাঁহার উজ্জ্বলস্নিগ্ধপ্রভায় সভাগৃহখানি আলোকিত হইয়া উঠিল। নারদ তাঁহার বিবাহ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিলে অশ্বপতি বলিলেন, "এই উদ্দেশ্যেই উহাকে আমি পাঠাইয়াছিলাম এবং এইমাত্র সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। সেই বিষয়ে উহার নিকট হইতেই আমরা এখন শ্রবণ করি।" সাবিত্রী পিতার আদেশে বলিলেন, "শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে অতি ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন। তিনি পরে অন্ধ হইয়া যাওয়াতে এবং পুত্র বালক ছিল বলিয়া শত্রুগণ কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য ও বিতাড়িত হইয়া পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। তাঁহার এই পুত্রের নাম সত্যবান। আমি তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।" নারদ বলিলেন, "সত্যবান যদিও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের ন্যায় বীর, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল, যযাতির ন্যায় উদার স্বভাব, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন এবং অশ্বিনী কুমারদের ন্যায় রূপবান তথাপি সাবিত্রী তাঁহার অজ্ঞাতসারেই নিজের অনিষ্টসাধন করিয়াছেন, কারণ সত্যবান অত্যন্ত স্বল্পায়ু। আর এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে কালগ্রস্ত হইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া অশ্বপতি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং অপর কোনও সজ্জনকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য কন্যাকে অনুরোধ করিলেন কিন্তু যে সাবিত্রী প্রাণান্তেও পিতার অসন্তুষ্টির কারণ হইতেন না, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সতীধর্ম্মের মোহনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি পিতা ব্যথিত হইবেন জানিয়াও একান্ত বিনয় ও দৃঢ়তার সহিত বলিলেন :—

"সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥
দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপিবা
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম ॥"

অথবা

"সম্প্রদান কেবলমাত্র একবারই হইয়া থাকে, সত্যবান অল্পায়ুই হউন আর দীর্ঘায়ুই হউন, গুণহীনই হউন কিংবা গুণবানই হউন, আমি তাঁহাকে দেহমনপ্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া একান্তভাবে পতিত্বে বরণ করিয়াছি,

অতএব পত্যান্তর গ্রহণ বা মনোনয়ন করিতে আমি পারিব না।" নারদ সাবিত্রীর এই অপূর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইয়া এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন।

রাজাও কন্যার অভিপ্রায়ানুযায়ী পবিত্র আশ্রমে রাজর্ষি দ্যুমৎ সেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহের অনুমতির প্রার্থনা করিলেন। দ্যুমৎসেন প্রথমে বলিলেন, "রাজনন্দিনী আশ্রমবাসে অনভিজ্ঞা সুতরাং কিরূপে ইহা সম্পন্ন হইবে?" পরে অশ্বপতির কথায় তুষ্ট হইয়া তিনি এই বিবাহে অনুমতি দিলেন। সেই দিনই মুনি ঋষি ও বনবাসীদের মধ্যেই সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহকার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল।

সাবিত্রী আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত সেবা শুশ্রূষা এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা শ্বশ্রূসেবা, শ্বশুর এবং সত্যবানকে সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

এইরূপে একবৎসর অতীত হইয়া সত্যবানের মৃত্যুদিন সমাগত হইল। সাবিত্রী অনুক্ষণ নারদের সেই ভীষণ বাক্য স্মরণ করিতেন। স্বামীর মৃত্যু দিবসের চারিদিন পূর্ব্বে তিনি ত্রিরাত্রিব্রত আরম্ভ করিলেন। এই ব্রতানুযায়ী তিনরাত্রি উপর্য্যুপরি সাবিত্রীকে অনাহারে থাকিতে হইবে। এইরূপে সত্যবানের মৃত্যু দিন আসিয়া পড়িল। তখন সকলেই তাঁহাকে ব্রত উদযাপনের সময় অতিবাহিত হইয়াছে দেখিয়া আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সাবিত্রী কোমলবাক্যে তাঁহাদের বুঝাইয়া দিলেন যে রাত্রিতে আহারই তাঁহার সঙ্কল্প। এমন সময়ে সাবিত্রী দেখিলেন যে স্কন্ধে কুঠার লইয়া সত্যবান বনে যাইতেছেন। সাবিত্রী শ্বশুর শাশুড়ী এবং স্বামীর অনুমতি লইয়া সত্যবানের সহিত সেই দিন ফল ও কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনে গেলেন। তাঁহারা নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরিবেষ্টিত বর্ণশ্রেণি ও পর্ব্বতমালা দেখিতে দেখিতে ক্রমে বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ পরিশ্রম জনিত সত্যবান তাঁহার মস্তকে তীব্র বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। সাবিত্রী বুঝিলেন, সত্যবানের শেষ সময় উপস্থিত। মুহূর্ত্তকাল পরে সাবিত্রী দেখিলেন যে রক্তবস্ত্র পরিহিত পাশধারী এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষমূর্ত্তি সত্যবানকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সাবিত্রী তখন সেই অপরিচিত আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে দেবতা বলিয়াই বুঝিতেছি আপনি কে এবং কেনই বা এখানে আসিয়াছেন?" আগন্তুক পুরুষ বলিলেন, "তুমি পতিব্রতা বিশেষতঃ তপস্বিনী তাই তোমার সহিত আলাপ করিতেছি। তুমি আমাকে যম বলিয়া অবগত হও। সত্যবানের আয়ু শেষ হইয়াছে, সে পরম ধার্ম্মিক ও সত্যানুরাগী তাই আমি নিজেই ইহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

দেখিতে দেখিতে সত্যবানের স্থূলদেহ প্রাণশূন্য, অপ্রিয়দর্শন ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। যম সত্যবানের আত্মাকে বন্ধন করিয়া লইয়া চলিলেন। সাবিত্রী শোকে মুহ্যমান না হইয়া দৃঢ়চিত্তে যমের অনুগমন করিলেন। সাবিত্রী যমকে বলিলেন, "সাধুরা গার্হস্থ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া থাকেন, আমিও ধর্ম্মানুরাগী সুতরাং স্বামীর অনুগমন করিতেছি।"

"ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং ন ভর্তৃহীনাকৃতা ব্যবসামি জীবিতুম্।"

অর্থাৎ—

"পতি ব্যতীত আমি সুখ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি স্বর্গ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি প্রিয়বস্তু চাহিনা এবং পতি ব্যতীত আমি বাঁচিতেই পারিব না।"

এই কথায় যম সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে বর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সাবিত্রীর প্রার্থনা ক্রমে যমরাজ সাবিত্রীর অন্ধ শ্বশুরকে পুনর্দৃষ্টি প্রদান করিলেন। সাবিত্রী আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যম তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। যম সজ্জন বলিয়া সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিবেন না বলিয়া জানাইলেন। যম সাবিত্রীর ধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করিয়া এতদূর প্রীত হইলেন যে ক্রমে তিনি দ্যুমৎসেনের হৃতরাজ্য-প্রাপ্তি ও পুত্রহীন অশ্বপতির শত পুত্র লাভ হওয়ার জন্য সাবিত্রীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু সত্যবানকে পুনর্জ্জিবীত করিবার প্রার্থনা তিনি কোন ক্রমেই পূর্ণ করিতে প্রস্তুত না হওয়ায়, সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে তাঁহার শত পুত্র লাভ এবং সত্যবানের চারিশত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হওয়ার প্রার্থনা জানাইয়া প্রকারান্তরে সত্যবানের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির উপায় করিলেন। যম তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

সাবিত্রী সত্যবানের মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্যবানকে নিদ্রোত্থিতের ন্যায় দেখিলেন। সাবিত্রী বুঝিলেন যে বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই অংশে সাবিত্রী নিজ তেজ বলে যে অপূর্ব্ব অলৌকিক কীর্ত্তি সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা হইতে সতীর মহিমা যে কত শক্তি সম্পন্ন, কত উজ্জ্বল, সতীর তেজ যে কত মহান্ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

অনন্তর তাঁহারা গভীর রাত্রিতে মাতা-পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত ঘটনা সবিশেষ বিবৃত করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রত্যেক প্রার্থনাই যথাযথোভাবে

পূর্ণ হইয়াছে। সাবিত্রী ও সত্যবান দ্যুমৎসেনের সহিত নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন এবং সত্যবান যুবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ইহাই হইল মূল উপাখ্যান। সাবিত্রী চরিত্রের বৈচিত্র্য ও আদর্শ সম্বন্ধে আমি দু একটী কথা বলিব। কোমলতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়, সতীত্ব, পাতিব্রত্য, সেবা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতাই আদর্শ নারী চরিত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা।

পুরাকালের সতীচরিত্র যেমন—সীতা, পার্ব্বতী, শকুন্তলা, শৈব্যা, দময়ন্তী ও চিন্তা অপেক্ষা সাবিত্রী শ্রেষ্ঠা। আদর্শ চরিত্রের গুণাবলী ইঁহাদের কাহারো চরিত্রে একাধারে সন্নিবেশিত ছিল না। সীতা নম্রতা, পতিপরায়ণতা ও স্নেহশীলতার চরম আদর্শ, কিন্তু তিনি সাবিত্রীর মত কর্ম্মশীলা নহেন। সীতা রামচন্দ্রকে সর্ব্বদা চক্ষে দেখিতে পারিবেন এবং সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিবেন বলিয়াই বনগামিনী হইয়াছিলেন। পার্ব্বতী পতিকে মুগ্ধ করিবার জন্য মদন ভস্মের কারণ হইয়াছিলেন। শৈব্যা শত কষ্ট সহ্য করিয়াও শেষকালে অসহিষ্ণু হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। দময়ন্তী ও চিন্তা কঠোর সাধনা করিয়াও পতিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সাবিত্রী চরিত্রে এইসব অসম্ভব একটীও নাই। শকুন্তলার মত তিনি স্নেহাধিক্যে জগত বিস্মৃত হন নাই, শৈব্যার মত আত্মবিস্মৃত হন নাই, সীতার মত অকারণে লক্ষ্মণকে বৃথা ভৎর্সনা করেন নাই। পার্ব্বতীর ন্যায়ও কৃত্রিম উপায়ে স্বামীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কর্ম্মকুশলতা, বুদ্ধিপ্রখরতা, বাক্যকৌশল, বিপদে সহিষ্ণুতা প্রভৃতি উত্তম গুণের সমন্বয় কেবলমাত্র এক সাবিত্রী চরিত্রেই অলঙ্কৃত করিয়াছে।

সাবিত্রীর মানসিক বলের অসাধারণ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। সাবিত্রী জানেন সত্যবান এক বৎসরের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। সাবিত্রী নিজের নিয়তি ও অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। সাধনায় কি অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন হয় না? লোকে বলে অদৃষ্ট কখনো বিনষ্ট হয় না। বিধাতার লিখন ফিরে না। ধর্ম্মে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাসিনী সাবিত্রী তথাপি অদম্য বীরত্বে অপূর্ব্ব সাহসে এই অপরাজেয় অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সাধনা করিতে লাগিলেন। এই কারণে তিনি যে বনবাসী হইলেন তাহা নহে। তিনি বনে থাকিয়াও গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যকেও অবহেলা করেন নাই। অনুক্ষণ সত্যবানের পরিণাম চিন্তা এবং কাহারো নিকট প্রকাশ না করিবার সহিষ্ণুতা আমাদের বিচিত্ররূপে আকৃষ্ট করে।

বিবাহের পূর্ব্বেই সাবিত্রী জানিলেন সত্যবান স্বল্পায়ু কিন্তু মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি শোকের মর্ম্মন্তুদ প্রহার, বিকশিত যৌবনের প্রথম সোপানেই আসন্ন বৈধব্যের বিভৎসতা বা সুদীর্ঘ ভোগ লালসার উত্তপ্ত প্রলোভন মদ্ররাজ দুহিতার চিত্ত কাঁপাইল না—তাঁহার হৃদয় দুয়ারে আঘাত করিল না। সাবিত্রীর স্বর্গীয় ও অলৌকিক প্রেমধারা অমৃতসিন্ধুমুখী, তাই বিপর্যায়ের নিনাদ সেথায় শব্দহীন, কাম সেথায় পরাজিত, মৃত্যুর সেথায় মৃত্যু। স্বর্গীয় প্রেমের এই অনবদ্য সাধনা দেহের ভিতর দিয়া আত্মার এই অলৌকিক উপাসনা, ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া এই অতিন্দ্রিয়ের পূজা ও মৃত্যু বিনাশবক্ষে এই মহামৃত্যুঞ্জয়ের প্রণব ধ্বনি সাবিত্রী চরিত্রকে উজ্জলময় করিয়াছে। ভারতকৃষ্টি ও সাধনার এই উজ্জল রত্ন, সতীধর্ম্মের এই অনন্ত প্রতিমা এই মূর্ত্তিমতি পতিব্রতা, সমগ্র প্রাচ্য জগতের তথা মহামানবের সভ্যতা ও সাধনাকে উজ্জল করিয়াছে, সার্থক করিয়াছে, ধন্য করিয়াছে।

যে প্রেম আসন্ন মৃত্যুদ্বারেও একনিষ্ঠ ও নির্ভীক, ব্রত, উপবাস এবং তপস্যায় যাহার পুষ্টি, যাহা ভোগলালসাবর্জ্জিত, বাঞ্ছিতের ইষ্টই যাহার উপাসনা, যাহা মৃত্যুঞ্জয়ী কল্যাণময় তাহাই সাবিত্রীর আদর্শ। "সাবিত্রীর পূর্ব্বরাগ পিতৃ আদেশ নিয়ন্ত্রিত, সংযম, কঠিন ধর্ম্মমূলক; ইহা ভারতকল্পিত দাম্পত্য স্বর্গের অম্লান পারিজাত পুষ্প—বিদেশীয় আইভিলতার ফুল নহে।" বাঞ্ছিতের কল্যানময়ী, সংযমময়ী ও তপোমার্জ্জিত প্রেমের এই অপূর্ব্ব কাহিনী আমাদের নিয়া যায়—তুচ্ছ সংসারের অনেক উপরে, ভোগী জীবনের অনেক উর্দ্ধে, এক অতীন্দ্রিয় লোকে এক অলৌকিক জগতে এবং স্বর্গীয় প্রেমের লীলা নিকেতনে। যে শিক্ষা; যে দীক্ষা লইয়া সাবিত্রী জগতে আসিয়াছিলেন, আমরা আজ সেই শিক্ষা ও সেই দীক্ষাতেই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিতেছি। *

---

* রেডিওতে কথিত।
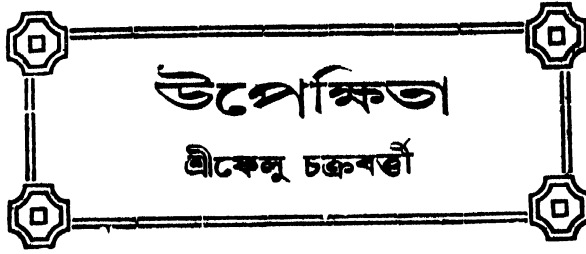
"ইষ্টার্ণ পাব্লিশিং ব্যুরোর" অর্দ্ধেক অংশীদার স্বরূপ মিঃ রে আজ বিপুল অর্থের অধিকারী। জীবনের প্রথম অবস্থায় খবরের কাগজের হকারের কার্য্য থেকে সুরু ক'রে ছোট খাটো সওদাগরি অফিসের কেরানীগিরি ও বায়স্কোপ থিয়েটারের টিকিট কালেক্টারী ইত্যাদি করবার পরও যখন কোন মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘ'টল না তখন ১৯১৭ সালে বাঙ্গালী পল্টনের তালিকায় নাম ভুক্ত ক'রে চলে যান তিনি মেসোপটেমিয়ায়। পল্টনের কার্য্যে বেশ সাহসিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একটু নজরে পড়েন এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ যুদ্ধাবসানে কলিকাতায় ফিরে এসে ই, আই, রেল অফিসে একটী উচ্চপদস্থ চাকুরী প্রাপ্ত হন। কিন্তু সে পুরস্কার, তিরস্কারে পরিণত হওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাতে অব্যাহতি দিয়ে কিছুদিন বেকার দলভুক্ত থাকবার পর অবশেষে তাঁর এক মাড়োয়ারী বন্ধু মিঃ অনন্তরাম ঘুড়ঘুড়ওয়ালার আর্থিক সাহায্যে এই 'পাবলিশিং ব্যুরো' স্থাপিত করেন এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পাবলিশিং কর্য্যে সুনাম অর্জ্জন করে কলিকাতার ধনী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অতীত সুক্ষবিচারী, খিটখিটে, রুক্ষ-স্বভাবসম্পন্ন মিঃ রে জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে অনুকম্পার ছায়া পর্য্যন্ত হৃদয় থেকে অপসারিত ক'রে আজ এই 'পাবলিশিং ব্যুরো'র সর্ব্বময় কর্ত্তা বলেই তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট তিনি 'বড়সাহেব' নামে খ্যাত। এডিটর, সব-এডিটর, কেশিয়ার, হেড্ক্লার্ক প্রভৃতি অন্যূন ৩০ জন কর্ম্মচারী তাঁর অধীনে কার্য্য করেন তা ছাড়া বহুসংখ্যক কর্ম্মসম্পাদনের পারিশ্রমিক প্রাপ্ত প্রতিনিধি ও মৌলিক গ্রন্থকার প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিযুক্ত করেছেন তিনি। মিঃ রে তাঁর কক্ষ বেছে নিয়েছেন তাঁর একাউন্ট অফিসের গায়েই। উচ্চ গ্রীবাবেষ্টনীবাহ সার্ট, আল্পাকা কোট, ব্রাউন অক্সফোর্ড জুতা ও সাদা প্যান্টালুন—এক কথায় ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধাণ ক'রে তিনি এই গুরুত্ব বিশিষ্ট অফিসের চেয়ার অলঙ্কৃত ক'রে বসে থাকেন। আর তাঁরই কামরার দরজার বাহিরে বসে থাকেন এক জন চাপরাসী তাঁর Calling bell এর অপেক্ষায়। প্রত্যহ অফিসের সর্ব্বপ্রথম কাজ ছিল তার অফিসের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা। এই হিসাব পরীক্ষার সময় অফিসের কেরানীবৃন্দের মধ্যে প্রায় প্রত্যেককেই কালীমন্ত্র জপ ক'রতে হোত চাকরী যাবার ভয়ে।

অফিসের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি রবিবারে 'পাবলিশিং ব্যুরো' বন্ধ থাকে সুতরাং সমস্ত সপ্তাহটী অন্যত্র বাস করে প্রায় সকল কর্ম্মচারীই শনিবার সন্ধ্যায় নিজ নিজ বাড়ী প্রত্যাগমন করে। তাদের এই বাড়ী যাওয়াটা মিঃ রে মোটেই পছন্দ করেন না, তাই প্রতি শনিবারেই তাঁর মেজাজটা রুক্ষ হয়ে থাকে।

এমনি এক শনিবারের কথা—তিনি যে অন্তরে অন্তরে বেশ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন তা তাঁর ললাটের কুঞ্চিত রেখাগুলির দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল। হঠাৎ ক্যাস বই পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে তিনি গর্জ্জন ক'রে উঠলেন "কি! ২০০৲ শত টাকা? আমরা এখানে দানছত্র ক'রতে বসিনি—যত বড় উঁচুদরের লেখকই হউক না কেন, মিঃ রে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও এক সঙ্গে ৫০৲ টাকার বেশী দেয় নি, তা জান?"—

একাউন্টেন্ট বাবু বিনীতভাবে জবাব দিলেন "কিন্তু স্যার সেদিন আপনি নিজেই বলেছিলেন যে উপন্যাসখানি ভালভাবে যখন পাঠকেরা অনুমোদন করেছে এবং আমাদের ও বেশ দু-পয়সা আসছে, তখন একে আপনি ২০০৲ টাকা দেবেন"—

মিঃ রে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করে উঠলেন "এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার যে তুমি আমার কথার প্রতিবাদ কর—তখন বলেছিলাম বলেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নেই। এখনি fresh account প্রস্তুতকরে নিয়ে এস।" আর কোন কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র বুঝিয়া একটী সম্মানসূচক অভিবাদন করিয়া চলে গেল একাউন্টেন্ট নিজের জায়গায়।

সিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া মিঃ রে অস্পষ্ট বাক্যে বিরক্ত প্রকাশ ক'রে বল্লেন "অফিসের whole staff change ক'রতে হবে নইলে এ ব্যবসাও বন্ধ ক'রতে হবে, দেখছি।" ঠিক সেই সময় চাপরাসীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একখানি কার্ড বড়সাহেবের হাতে দিল।

"সুলেখা দেবী" কার্ডখানি পাঠ করে নাকটা সিট্কে বল্লেন "ডাক ভিতরে"। সঙ্গে সঙ্গে একটী উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণা ছিপ্ ছিপে সুন্দর আকৃতি মহিলা তথায় উপস্থিত হইল।

মিঃ রে এই মহিলাটীর দর্শন মাত্রে কেমন একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং তার মুখখানি ভাল ক'রে পরিদর্শন করবার জন্য দেহখানি একটু হেলিয়ে নাক হইতে চসমাটী নামিয়ে মনে মনে ব'ল্লেন "কি অদ্ভুত

সাদৃশ্য" তারপর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আপনার কি প্রয়োজন ?"

মহিলাটী ঘাড়টা ঈষৎ বক্র ক'রে বল্লে "আমার উপন্যাস খানির জন্য স্যার"—

অজ্ঞতার ভান করিয়া মিঃ রে বল্লেন "আপনার উপন্যাস ? কি উপন্যাস ?"—

"উপেক্ষিতা স্যার"—হ্যাঁ মিঃ রে, আপনি আপনার পত্রে আমাকে জানিয়েছেন যে উপন্যাসখানি আমাকে প্রভূত অর্থ পাইয়ে দেবে" সহাস্যবদনে কথা কয়টী সুলেখা খুব তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লে।

"Oh ! I see, এতক্ষণে আমার স্মরণ হচ্ছে। দেখুন, আমরা হাজার হাজার উপন্যাস পাবলিস্ করছি—সব কথা স্মরণ রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। হ্যাঁ, যদিও আমি বইখানি পড়িনি, তথাপি আমার এডিটর, সব এডিটরের মুখে শুনেছি যে বইখানি উচ্চাঙ্গের আর আমাদের পাঠকেরা বইখানি বেশ অনুমোদন করেছে। একাউণ্টেণ্ট বাবু !"—

একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সুলেখা বলিল "আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ মিঃ রে। যদি আপনি আমাকে উৎসাহিত করেন, খান্‌কতক ঐরূপ উচ্চাঙ্গের উপন্যাস আপনাকে দিতে পারি"—বলা বাহুল্য একাউণ্টেণ্ট সর্ব্ব সময়েই আড়ি পাতিয়া তাহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল—সুতরাং ডাকবা-মাত্র একখানি ৫০৲ টাকার চেক্ আনিয়া বড় সাহেবের হাতে দিল। বড়সাহেব দস্তখত করিয়া সুলেখাকে দিয়ে বল্লেন "এই আপনার টাকা। চেক্‌টা পাওয়ার একটা রসিদ দিন। আপনার ভাবনা কি মিস্ সুলেখা—এবার থেকে আপনি বেশ দুপয়সা করতে পারবেন—যখন ব'ল্‌ছেন ওরকম উপন্যাস আপনার stockএ আছে"—

বিস্ময়পূর্ণ লোচনে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল "বলেন কি মিঃ রে, মাত্র ৫০৲ টাকা ?"—

গম্ভীর ভাবে মিঃ রে উত্তর দিলেন "আপনি আমাদের previous record দেখতে পারেন—কোন নূতন লেখককে আমরা ৫০৲ টাকার বেশী দেই না।"

"কিন্তু আপনি আপনার পত্রে আমাকে কিছু মোটা রকমের দেবেন বলেছিলেন এবং ইহাও জানিয়ে ছিলেন যে আজ পর্য্যন্ত আপনার "Bureau"তে যে সমস্ত উপন্যাস এসেছে তার প্রত্যেকটার অপেক্ষা আমার উপন্যাসখানি প্রাঞ্জল, রোমাঞ্চকর ও মুগ্ধকর"

"আমি তা জানি, মিস সুলেখা—কিন্তু কি করব বলুন, আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে ত আমরা যেতে পারি না—আমাকে মাপ করবেন"—

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুলেখার মুখ, চোখ ও কান দুটো রক্তাক্ত হয়ে উঠল, আর তার পাতলা টুকটুকে ঠোঁটদু'খানা ঈষৎ কাঁপতে লাগল। কম্পিত স্বরে একটু উচ্চ গলায় সে বল্লে "মিঃ রে, আমি যখন কলেজের magazine এ লিখতাম তখন লেখক বোলে আমার বিশেষ একটু সুনাম হয়েছিল—আমি মনের কোনেও স্থান দিতে পারি নি যে তোমার মত একজন Publishera দয়ার প্রার্থী হতে হবে আমার। কিন্তু কেবল আমার চির দুঃখীনি, পরিত্যাক্তা, উপেক্ষিতা, অনাদৃতা জননীকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবার অভিপ্রায় তোমার দ্বারে একরকম বলতে কি ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে দাঁড়াতে হয়েছে আমার।" কথাগুলো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখার আরক্তিম গণ্ডদুটী অশ্রুবারিতে সিক্ত হয়ে গেল।

কঠোর হৃদয় হলেও সুলেখার এই কথাগুলো মিঃ রে এর মাথাটা কেমন গোলমাল করে দিলে—উদ্বিগ্ন চিত্তে তাহার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে নিম্নতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি "আপনার উপেক্ষিতা, পরিত্যাক্তা অনাদৃতা জননী? তার মানে?"—

নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে চোখ দুটী কাপড়ের খোঁট দিয়ে মুছে সুলেখা জবাব দিলে "হ্যাঁ! আমার উপেক্ষিতা অনাদৃতা জননী। আমাদের দেশে ওরকম পরিত্যাক্তা উপেক্ষিতা, অনাদৃতা নারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে, তাই তাঁদের কারণ অবলম্বন করে আমি উপন্যাস খানি লিখেছি এই উদ্দেশ্যে, যাতে তারা নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নারীজাতির সম্মান অক্ষুন্ন রেখে এই সকল জঘন্য মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত দাম্ভিক স্বামী জাতীর একটা শাস্তি বিধান করতে পারে"—

প্রশস্ত ললাটখানি স্বেদ বিন্দুতে ভরে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে কপালের পার্শ্ববর্ত্তী শিরা দুটী বেশ উন্নত হয়ে উঠল। সুলেখার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মিঃ রে তাকে হাত নেড়ে তাঁর সম্মুখের চেয়ারে ব'সতে ইঙ্গিত করলেন এবং শুষ্ক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন "কি এমন হয়েছে আপনাদের জীবনে মিস্ সুলেখা যার জন্য আপনি এই উপন্যাস লিখতে বাধ্য হয়েছেন—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে খুলে ব'লতে আপনার বাধা আছে?"—

সুলেখা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল "সে এক নিদারুণ মর্ম্মভেদী কাহিনী মিঃ রে। সেই হতভাগ্য রমনী আমার মা—সংসারের প্রথম ধাপে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবন দুর্বহ হয়ে ওঠে। স্বামীর নির্দ্দয় আচরণ তাঁর জীবন তিলে তিলে ক্ষয় ক'রতে থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর মৃত্যু কামনা ক'রতেন। কিন্তু কোথায় তিনি? ব্যথিতের ক্রন্দন যদি বলবামাত্র তাঁর কর্ণে পৌঁছাত তা'হলে এ সংসার এত দুঃখময় হোত না। আমার মাতার যখন বিবাহের প্রস্তাব হয় তখন আমার পিতা এ বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানিয়েছিলেন, কিন্তু আমার পিতামহের অর্থ-পিপাসা বাধ্য করেছিলো তাঁকে এ বিবাহে রাজী হওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটী দিনের জন্যও তিনি আমার মাকে স্নেহের চক্ষে দেখতে পারলেন না। আমি ভূমিষ্ঠ হবার পর আমার মা মনে করেছিলেন যে এইবার বুঝি মেঘ কেটে যাবে কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনা গেল যে আমার বাবা গৃহ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন—দেশে আর ফিরে আসবেন না।" বলিতে বলিতে সুলেখার কণ্ঠস্বর একরকম বন্ধ হয়ে এল এবং সে একটু পানীয় জল খাইলে। তারপর গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে একটু পরেই বল্তে সুরু ক'রলে "আমার মায়ের এই দুরবস্থার সুযোগ পেয়ে তাঁর শ্বশুড়বাড়ীর সকলে তাঁকে নানাভাবে নির্য্যাতীত ক'রতে সুরু

করলে। অনন্যোপায় হয়ে তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর পিতার আশ্রয়ে এলেন। সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আমার মাতামহ কোনরকমে শিক্ষকের কার্য্য ক'রে বেতনের সামান্য কয়েকটী টাকায় দুবেলা অন্নের সংস্থান করতেন। পল্লীগ্রামে প্রায় সকলেরই কিছু না কিছু জমী জায়গা থাকে, কিন্তু মাতামহের আমার কিছুই ছিল না—কারণ সমস্ত বিক্রয় ক'রে কন্যার বিবাহের পণের টাকা সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। তিনি তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা করে-ছিলেন আমার পিতাকে খুঁজে বার ক'রবার, কিন্তু কোন ফল হয় নি। পরে শুনা গেল তিনি যুদ্ধে গেছেন। কেউবা বল্লে মারা গেছেন, কেউবা বল্লে হয়ত সেই দেশের কোন এক অঞ্চলে আছেন—এসব কথা. আমি মায়ের কাছেই শুনেছি"—

তারপর আমার জীবনের কথা—শুনলাম ছেলেবেলা থেকে আমার লেখাপড়ায় বেশ বেশ প্রবল ইচ্ছা দেখে মাতামহ আমাকে গাঁয়ের স্কুলে free pupil হিসাবে ভর্ত্তি করে দেন এবং গাঁয়ের দয়ালু লোকের সাহায্যে আমি ম্যা ট্রিকুলেশন পাশ করি। সৌভাগ্যক্রমে আমি ম্যা ট্রিক পরীক্ষায় একটী বৃত্তি পাই এবং তাহারই বলে আমি কলেজে ভর্ত্তি হই। এইভাবে দুঃখের সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে আমি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক তারপরই আমার মাতামহ ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে চলে যান এবং আমার মাও রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন। গ্রাসাচ্ছাদন ও মায়ের চিকিৎসার অন্ত উপায় না দেখে আমি গাঁয়ের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হই কিন্তু তাও বেশীদিন রইল না--গাঁয়ের স্কুলটী উঠে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমার চাকরীটী চলে গেল। ইহার কিছুদিন পরে আমি একটী বহু দূরবর্ত্তী স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর চাকরী পাই কিন্তু মাকে ওরূপ অবস্থায় নিরাশ্রয়ে রেখে যাওয়া কিম্বা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব বলে আমি সে চাকরী গ্রহণ করিতে সক্ষম হই নি। তাঁর চিকিৎসার টাকা সংগ্রহের আর কোন দ্বিতীয় উপায় না দেখে আমি উপন্যাস লিখতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তারও ত এই পুরস্কার"—

বাম হস্তের কুনুইটা টেবিলের উপর ন্যস্ত করে তাঁর মস্তকটী বাম হস্তের তালুতে রেখে মিঃ রে কিছুক্ষণ নিস্তব্দ থেকে ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন "আপনার মা এখন কোথায় এবং তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?"—

"হ্যাঁ—আমারই একটী ছাত্রী দয়া ক'রে তার বহির্বাটীর একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছে আমাদের জন্য—ভাড়া কিছুই দিতে হয় না—সেই ঘরে তিনি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন"—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সুলেখার চোখের জল উষ্ণ প্রস্রবণের মত অবিশ্রান্ত ধারায় উথলে উঠল। উত্তেজিত স্বরে মিঃ রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "আপনার নরাধম পিতার নাম আমায় ব'ল্‌তে পারেন"—

অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুলেখা উত্তর দিলে "বাবু প্রতুলকুমার রায়"—"কে"? উদ্‌ভ্রান্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে মিঃ রায় তাঁর চেয়ার থেকে উঠে দুই এক পদ অগ্রসর হবামাত্র মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। সুলেখা ভয়ে চীৎকার করে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরের আফিসের বাবুরা ছুটে এল। সুলেখা মিঃ রায়ের মাথাটা তার কোলের উপর তুলে নিয়ে তাদের মধ্যে একজনকে ডাক্তার ডাক্‌তে বলে দিলে। ডাক্তার আসবার কিছুক্ষণ পরে মিঃ রায় তাঁর সংজ্ঞা ফিরে পেলেন এবং নিজেকে সুলেখার কোলের মধ্যে দেখে আনন্দাশ্রু-পূর্ণ লোচনে মানসিক উচ্ছাসে চেঁচিয়ে বল্লেন "ওরে আমার অনাদৃতা, ওরে আমার পরিত্যক্তা কন্যা—তুই তোর অনাদৃতা মায়ের কাছে আমাকে নিয়ে চল—ওরে তোরা আমার অতীত শয়তানী ভুলে গিয়ে আমায় ক্ষমা কর ওরে তোরাই এই Publishing Bureauর অর্দ্ধেক অধিকারিনী—"

এই দৃশ্যে সুলেখা কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। অপলোক দৃষ্টিতে অস্ফুট কণ্ঠে শুধু একবার বল্লে "এ্যা একি সত্য তুমিই আমার সে পিতা যে আমার মাকে পথের ভিখারিনী করেছিল"—

বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে তার গণ্ডদুটী ধ'রে মিঃ রায় স্নেহ বিচলিত কণ্ঠে বল্লেন "ক্ষমা কর্, ক্ষমা কর সুলেখা—নিয়ে চল্ তোর মায়ের কাছে—তাকে বাঁচাতেই হবে। শেষের কটা দিন তোর চিরদুঃখীনি মায়ের দুঃখ ঘুচিয়ে তাকে যত্ন ক'রে, আদর ক'রে, স্বামীর কর্ত্তব্য ক'রে আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে। আমি কতদিন তোদের জন্য কেঁদেছি কতদিন তোদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেছি, কতদিন তোদের পাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি--যখনই চেষ্টা করেছি, কে যেন আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে চলে গেছে, গাঁয়ের কাছাকাছি গিয়েও রাতারাতি ফিরে চলে এসেছি। সুলেখা! আমার মত যারা তাদের স্ত্রীকে, কন্যাকে, পুত্রকে এই ভাবে অনাদর করে, ত্যাগ করে, উপেক্ষা করে তাদের চোখ ফুটিয়ে দেবে তোর ওই 'উপেক্ষিতা'—

প্রতুল রায় তারপর সুলেখাকে সঙ্গে করে চলে গেলেন তার উপেক্ষিতা, অনাদৃতা, মরনোন্মুখ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। মরণ পথের যাত্রী মিসেস্ রায় তখন কিন্তু জীবনের এত শেষ সীমান্তে এসে পড়েছিলেন যে রক্তহীন ওষ্ঠের ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ব্যতীত এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত, ঈশ্বর প্রেরিত

‘ফুল-পরী’ শিশু-নাট্য—‘ইসলামের জয়’—পাইওনিয়রের কীর্ত্তন—মুস্কিল-আসানের গান

হিন্দুস্থান—এচ্ ৬৩৬ :—এই রেকর্ডে শ্রীমতী পারুলবালা একদিকে ‘সজনীরে হেলো পরায়ে খোঁপায়’ ও অন্যদিকে ‘(লো সখি) পরান বঁধুয়া আমার’ এই দুইখানি নৃত্য সঙ্গীতে যথারীতি নৃত্য-বাদির আধ-আধ স্বরে যথোপযুক্ত সহগামী-সঙ্গীতের সহিত রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুইটিতে নূতনত্ব কিছুই নাই, পুরাতন নৃত্যসঙ্গীতের ঢঙেই সাধারণ-ভাবে গান দুইটি গাত হইয়াছে। দ্বিতীয় গানখানির ধর্তাই সঙ্গীত-টুকু ভাল কিন্তু পরে সুরটি একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে।

* * *

হিন্দুস্থান—এচ ৬৩৭ :—সুকবি বন্দে আলি মিয়া এ্যাণ্ড পার্টি কর্তৃক ‘ইসলামের জয়’ নামক একটি ইসলামী নাটিকা এই একখানি রেকর্ডে অভিনীত হইয়াছে। ইহার রচনা ও পরিচালনা করিয়াছেন বন্দে আলি মিয়া, সুর-সংযোজনা করিয়াছেন শ্রীদুর্গা সেন, গীতাংশটুকু গীত হইয়াছে শ্রীমতী পারুল ও মোহনলাল কর্তৃক। অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম অপ্রকাশিত। রাজার দুহিতা মর্জ্জিনা পবিত্র ইহুদীকুলে জন্মলাভ করিয়া পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম্ম ইহুদী ধর্ম্মে বিদ্রোহিনী হইয়া উঠিলেন। তিনি খোদা আর রসুলের নাম উচ্চারণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, পিতার শত নিষেধ ও শাস্তি-ভয় প্রদর্শন সত্বেও কোরাণের অমৃতময় বাণী শিরে বহন করিয়া সত্যপথে চলিতে ভীতা হইতেন না। অবশেষে সনাতন ধর্ম্মী পিতা কন্যাকে স্বপথে চালিত করিতে না পারায় মন্ত্রীর পরামর্শে একটি বাহুমূল্য আঙটি কন্যার নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। অতঃপর আঙটিটি অজ্ঞাতসারে নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল এবং স্থির হইল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে ঐ আঙটিটি ফিরিয়া চাহিলে যদি পাওয়া না যায়, তবে এই কারণ দেখাইয়া স্বধর্ম্ম বিদ্রোহিনী কন্যাকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু দেখা গেল নিমন্ত্রিতদিগের জন্য আনীত মৎস্যের উদরে ঐ অঙ্গুরীয় খোদার পরম ভক্ত তাঁহার কন্যা ফিরাইয়া পাইয়াছেন। অবশেষে কন্যার নিকট সকলে পবিত্র ইসলামি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই আখ্যানভাগের উপর রেকর্ডখানি রচিত। আশ্চর্য্যের বিষয় লেখক মহাশয়ের পুস্তিকায় প্রকাশিত রচনার সহিত অভিনীত সংলাপের আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—পরস্পরের সহিত অর্দ্ধেকেরও মিল নাই। ইহার অর্থ লেখক মহাশয়ই জানেন, আর হিন্দুস্থান কোম্পানীই জানেন এই সরল আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়াও লেখক মহাশয় আদপেই লিপি-কুশলতার পরিচয় দেন নাই। মর্জ্জিনার অংশ সুঅভিনীত হইয়াছে বলা চলে। সম্মিলিত কণ্ঠে শেষের গানটি সুবিধাজনক নহে।

* * *

হিন্দুস্থান—এচ ৬৩৮ :—এই একখানি রেকর্ডে শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত ‘ফুল-পরী’ শিশু-নাট্য অভিনীত হইয়াছে। ইহার সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। এই নাটিকার গল্প শিশু-কল্পনার বিশেষ উপযোগী। রাত্রে ফুল-পরীরা ফুল-বনে খেলা করিতে নামে, খোকার সাধ হয় সেও তাঁহাদের নিকট হইতে একটি পাখনা ধার করিয়া কতদূর উড়িয়া আসে ও তাঁহাদের সহিত খেলা করে। এই নাটিকার ভিতর চারটি কণ্ঠ-সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৪র্থ সঙ্গীতটী ফুলপরী ঘুরি মোরা ফুর্-ফুর্ ফুর্’ গানখানি সুরে ও সহগামী সঙ্গীতে বিশেষ চমৎকার। অন্য গানগুলি আশানুরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিশুদিগের মনো-হারী হইবে না। মোটের উপর রেকর্ডখানি মন্দ নহে।

* * *

রিগ্যাল—আর, এল, ১০০৯ :—জুলাই মাস হইতে কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী রিগ্যাল রেকর্ড নামে আরও কতগুলি রেকর্ড প্রকাশ করিতেছেন। ইহার দাম

পুনর্মিলনের আনন্দোচ্ছাস প্রকাশ করবার আর কোন শক্তি তাঁর ছিল না—এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ সংসারের সমস্ত মায়া কাটাইয়ে স্বামীর কোলের উপর মাথা রেখে চলে গেলেন সেখান থেকে এক রহস্যময় অজ্ঞেয় রাজ্যে।

—:০:—

সস্তা করা হইয়াছে,—প্রত্যেকখানি ১৷৷০ টাকা দাম। এই মাসে তাঁহাদের দ্বিতীয় নিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। এই রেকর্ডে রিগ্যাল ভ্যারাইটিজ নামে ইসলামী রেকর্ড প্রকাশ করা হইয়াছে। একতারা সহযোগে একপিঠে মাণিকপীরের গান ও অন্যদিকে মুস্কিল আসানের গান যথারীতি সাধারণভাবে রেকর্ড করা হইয়াছে।

* * *

রিগ্যাল—আর, এল, ১০০৪ :—শিল্পী শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র দেব একদিকে 'চম্পাবতীর দেশে যাব' ও অন্যদিকে 'কাজ নাই আমার এ ছার জীবনে' এই পল্লীসঙ্গীত দুইখানি এই রেকর্ডে পরিবেশন করিয়াছেন। গান দুইখানিই বিশেষত্ব বর্জ্জিত সাধারণভাবে গীত হইয়াছে।

* * *

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬২ :—এই রেকর্ডে শ্রীমতী শৈল দেবী (কুমিল্লা) শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষকতায় 'বঁধুর বিরহ হয়েছে অসহ' এবং 'সখি দেখ্ দেখ্ চেয়ে দেখ গো' এই কীর্ত্তন-গান দুইখানি গাহিয়াছেন। শ্রীমতীর কণ্ঠ সুমিষ্ট এবং আখর-সমেত কীর্ত্তন দুইটি সুন্দরভাবেই গীত হইয়াছে। এই রেকর্ডখানি ভাল রেকর্ড-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে।

*

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৪ :—শিল্পী কুমারী নিবেদিতা সেন এই রেকর্ডের একদিকে 'নিঠুর দেবতা মম' ও অন্যদিকে 'আঘাত যখন হানো বুকে' এই ভক্তিমূলক গান দুইখানি সহগামী সঙ্গীতের সহযোগিতায় রেকর্ড করিয়াছেন। প্রথম গানখানির ধরতাই সঙ্গীত ভালো কিন্তু পরে সুর-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটায় শ্রুতিসুখকর নহে। দ্বিতীয়খানি একেবারে সরলভাবে গীত হইয়াছে।

* * *

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৫ :—এই রেকর্ডে শিল্পী শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত পঙ্কজী-রেকর্ডের আবহ-সঙ্গীতের অনুরূপ আবহ-সঙ্গীতের সহিত দুইখানি আধুনিক গান পঙ্কজী-ধরণে রেকর্ড করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। আবহ-সঙ্গীতের সহিত 'সন্ধ্যা রাতে তুমি কুল-বালিকা' গানখানি গায়ক স্ত্রী-সুলভ ঢঙে যে ভাবে গাহিয়াছেন (?), বরং আবৃত্তি করিয়াছেন বলিলেই ভালো হয়,—তাহা শ্রুতিকটু। দ্বিতীয় গান 'আমি যে গান রচিয়া ছিনু' তাহাও তথৈবচ।

* * *

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৬ :—শিল্পী শ্রীহিমাংশুভূষণ রায় এই রেকর্ডে দুইখানি গ্রাম্য গান রেকর্ড করিয়াছেন; একদিকে 'ঐ দূর সায়রের পানে নদী' ও অন্যদিকে 'আমি এই খানেতেই থাকি' এই দুইখানি গান একতারা সহযোগে সাধারণ ভাবে গীত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্টতা বা বিচিত্রতার আভাস মিলিবে না।

* * *

পাইওনিয়র—এন কিউ ৬৭ :—শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসের নেতৃত্বে এই রেকর্ডে দুইটি অর্কেষ্ট্রা পরিবেশন করা হইয়াছে। একদিকে ঋষি বঙ্কিমের জাতীয়-সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' স্বদেশ-মন্ত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্গত মহামান্য সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ বাহাদুরের শুভ রজতোৎসবে গীত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধবয়সের অভিনব স্বদেশ-ভক্তিমূলক গান 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা' গানের সুর লইয়া ও অন্যদিকে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সমস্বরে • তিনবার উচ্চারণ করিবার পর 'হও ধরমেতে বীর, হও ধরমেতে বীর' এই স্বদেশ ভক্তিমূলক গানের সুরের কাঠামো লইয়া ইংরাজী সুরে অর্কেষ্ট্রা বাজানো হইয়াছে। নানাবিধ যন্ত্র-সহযোগে অর্কেষ্ট্রা দুইটি বেশ গুরুগম্ভীর করা হইয়াছে এবং ইহাতে বৈচিত্র্যও আনয়ণ করা হইয়াছে, বিশেষতঃ Saxophone এর ব্যবহারে ইহার সুর-বৈচিত্র্য বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীদুর্ব্বাসা
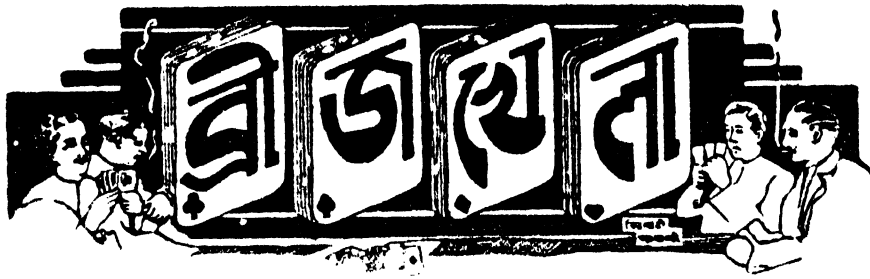
ডাকের পর ডামির হাতে যদি কোন রঙের একক তাস (singleton) দেখেন, তাহলে সাধারণ ব্রীজক্রীড়ক সেই রঙটি আগে খেলে নিয়ে নিজের হাতের সেই রঙের বাকি তাসগুলি তুরূপ করে নেবার জন্য এতই আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন যে অন্য বিষয়ে চিন্তা করবার তাঁর আর অবসর থাকে না; ফলে তিনি এতই অধৈর্য্য হয়ে পড়েন যে অবশেষে ডাক অনুযায়ী খেলা করতে তিনি অসমর্থ হন। তখন তিনি তাসের বিভাগ সম্বন্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে আত্মতুষ্টি সাধন করেন, অথচ খেলার শেষে একবার ভেবে দেখেন না যে খেলার গলদ কোথায়? নিম্নের হাতটি সম্প্রতি কোন এক প্রতিযোগিতায় পড়েছিল, উভয়-পক্ষ একইরূপ ভুল করে খেলা করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। অবশেষে তাসের বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করে সকলেই নিরস্ত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে একজন আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন চারটি হরতনের ডাকে হাতটিকে কিভাবে খেলতে হবে। নিম্ন-লিখিতরূপ হাত এসেছিল; উভয় পক্ষ ভালনারেবল।

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—গোলাম, আটা, ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, আটা, ছক্কা, চৌকা, তিরি।
চিড়িতন—নয়, দুরি।

ইস্কাবন—টেক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, সাতা, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, দুরি।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, তিরি।

এই হাতে ডাক হয়েছিল,

'দ'	'প'
একটি হরতন	একটি ইস্কাবন
পাশ	পাশ
'উ'	'পূ'
চারটি হরতন	পাশ

'প' ইস্কাবনের সাহেব খেলে প্রাথমিক চাল দিয়েছেন, আপনি এখন কি খেলবেন?

এই পিটটি ইস্কাবনের টেক্কা দিয়ে ধরে প্রথমে হরতনের টেক্কা খেলতে হবে এবং তারপর রঙের বিভাগটি কেমন আছে দেখতে হবে, কারণ এটি ধরতে না পারলে খেলা করা একেবারেই অসম্ভব হবে। সাধারণতঃ এইরূপ হাতে বিপক্ষদের হাতে ৪-১ ভাবে রঙ আসে, ইহা ঠিক কি না সঠিক জেনে নিয়ে তবেই তুরূপ করতে অগ্রসর হতে হবে। রঙের টেক্কার খেলায় উভয় ক্রীড়কই রঙ দিলেন, তবে 'পূ'র হাত থেকে নয় পড়ায় বুঝতে পারা গেল যে সম্ভবতঃ তাঁর হাতে একখানি বা দুইখানি তাস আছে। এই ধারণার বশে যদি হরতনের সাহেব খেলা যায়, আর 'পূ' যদি পাশ দেন, তাহলে খেসারৎ অনিবার্য্য। সেইজন্য এই সব ক্ষেত্রে ছোট রঙ খেলাই যুক্তিযুক্ত, আবার যদি সেই রঙের পিট 'পূ' নিয়ে নেন তাহলেও ডাকদারের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় না। 'প' ও 'পূ' সর্ব্ব-সমেত মাত্র তিনটি পিট পাচ্ছেন, একটি হরতনের ও দুইটি চিড়িতনের। এখন ধরুণ যদি 'পূ'র হাতে রঙ না থাকে তাহলে 'উ' ঐ পিটটি নিয়ে আর একখানি রঙ খেলে নিয়ে বরাবর রুহিতন খেলে যাবেন। এই ভাবের খেলায় বিপক্ষদলের দুই-তিন খানির বেশী পিট হবে না। সকল ক্ষেত্রেই যে তুরূপ করে পিট নিতে হবে এমন কোন কথা নেই,—অনেক ক্ষেত্রে আবার তুরূপ করার ভয় দেখিয়ে নিজ হাতের অন্য কোন রঙ দাঁড়া করার দরকার হয়। চারজনের হাত ছিল এইরূপ,

ইস্কাবন—গোলাম।
হরতন—গোলাম, আটা, ছক্কা, পঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, আটা, ছক্কা, চৌকা, তিরি।
চিড়িতন—নয়, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, দশ, সাতা, ছক্কা।
হরতন—বিবি, দশ, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, পঞ্জা, চৌকা।

ইস্কাবন—নয়, আটা, চৌকা তিরি।
হরতন—নয়।
রুহিতন—দশ, নয়, পঞ্জা।
চিড়িতন—সাহেব, বিবি, আটা, সাতা, ছক্কা।

ইস্কাবন—টেক্কা, পঞ্জা, দুরি,।
হরতন—টেক্কা, সাহেব, সাতা, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, দুরি।
চিড়িতন—গোলাম, দশ, তিরি।

অভিনব চিত্র সৃষ্টি
অতুলনীয় শিল্পী সমাবেশ
অকল্পিত গল্প-রচনা
সুনিপুণ পরিচালনায়
আসিতেছে
নীতিন বসুর পরিচালনা—পঙ্কজ মল্লিকের সুর সংযোজনায়
দেশের মাটি
ভূমিকায়: উমা, চন্দ্রা, দুর্গাদাস, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র ও সায়গল
চিত্রায়
নিউ থিয়েটার্সের নবতম অবদান
পরিবেশনা
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন
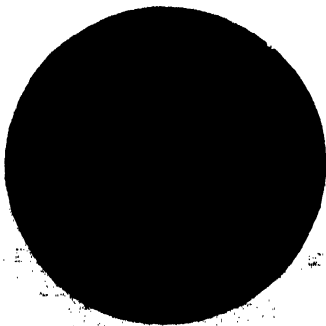
কলিকাতা মহানগরীতে "মহাগীত"

আসর—প্রভাত সিনেমা

উদীয়মান বৈজ্ঞানিক প্রশান্ত তাঁহার অধ্যাপকের ল্যাবরেটরীতে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সর্ব্বদাই গতায়াত করে এবং একদিন আবিষ্কার করে, এই পৃথিবীতে যে মহাশূন্য পরিব্যপ্ত তাহাতে যে কোন বাণীই হউক না কেন, তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই বজায় থাকে। তাহার লোপ কখনও হয় না। প্রশান্তের এই আবিষ্কারে সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ অবাক বিস্ময়ে এই আবিষ্কারের ফলাফল আলোচনা করিতে থাকে। অতঃপর বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী এক বিশিষ্ট সভায় প্রশান্তকে তাহার এই আবিষ্কারের জন্য অভিনন্দিত করিয়া একটি পদক প্রদান করিয়া বলে যে, তাহারা প্রশান্তর নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করে, প্রশান্ত যেন কখনও তাহা বিস্মৃত না হয় এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্তর পক্ষে 'নোবেল' প্রাইজ পাওয়াও কষ্টকর হইবে না।

প্রবীন অধ্যাপক তাঁহার প্রিয় ছাত্র প্রশান্তর এই আবিষ্কারে খুবই উৎসাহিত হন এবং প্রশান্তর নিকট প্রস্তাব করেন যে তিনি তাঁহার মেয়ে অরুণাকে প্রশান্তর সঙ্গেই বিবাহ দিবেন। কিন্তু প্রশান্ত ধীর স্বরে বলে যে, সে এই বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার পিতা এক বালিকার সঙ্গে তাহার বিবাহের নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন এবং প্রশান্তও তাহাকে ভালবাসে, সুতরাং এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। ইহাতে প্রবীন অধ্যাপক খুবই রাগান্বিত হন এবং ক্রোধে প্রশান্তকে তাঁহার বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এবং বলেন যে, অতঃপর তিনি প্রশান্তকে কোন প্রকারেই কোন সাহায্য করিবেন না।

প্রশান্তর জীবনে সে এক দুর্দ্দিন। নিরাশ হৃদয়ে যখন সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে তখন তাহার প্রেম-পাত্রী মায়ার এক দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা আসিয়া খবর দেয় যে, গ্রামের লোকেরা বলপূর্ব্বক মায়ার বিবাহ অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে দিতেছে। সুতরাং এ বিবাহ পণ্ড করিতে হইলে প্রশান্তর অবিলম্বে গ্রামে যাওয়া দরকার। প্রশান্তও তখনই গ্রামে উপস্থিত হয় এবং স্বীয় মাতা ও ভগ্নীর অগোচরে মায়াকে বিবাহ করে। প্রশান্ত ও মায়া পরস্পর পরস্পরের বুকে আশ্রয় লয়।

প্রশান্তর মাতা ও ভগ্নী প্রশান্তর মোটেই খুসী নয়। কেননা সে অধ্যাপকের মেয়েকে বিবাহ না করিয়া যথেষ্ট মূঢ়ের ন্যায় কাজ করিয়াছে। মায়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রশান্ত মায়াকে বিবাহ করিয়াছে, মায়াও ভাল মেয়ে নয়। সর্ব্বদাই এইরূপ কুবাক্য প্রশান্তকে সহ্য করিতে হয়, তদুপরি বেকার জীবনের তিক্ততা তাহার জীবনকে আরও অসহ্য করিয়া তোলে। কিন্তু এই মরুভূমির মাঝেও মায়া ওয়েসিসের ন্যায় তাহার হৃদয়ে অবস্থিত। তাই সে কোন প্রকারে এই দুর্ব্বহ জীবন বহিয়া চলিয়াছে।

জীবনের একটানা স্রোতে প্রশান্ত ও মায়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এই চরম দুর্দ্দিনে তাহারা সুখী। কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরকে অন্তর দিয়াই ভালবাসে।

অবশেষে মায়ার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা রতনের চেষ্টায় প্রশান্তর থিয়েটারে চাকরী হয়। অভিনয়ে তাহার নাম শীঘ্রই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়। কিন্তু থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী বলে, প্রশান্ত, তুমি কেন আমায় ভালবাস না —এই "কেন"র উত্তরে প্রশান্তকে পুনরায় চাকরী ছাড়িতে হয়। আকাশে মেঘ পুনরায় ঘনাইয়া আসে। মায়াকে নিয়া প্রশান্ত মায়ার মায়ের নিকট যায়। মায়াকে তথায় রাখিয়া প্রশান্ত চাকরী করিবে, এই ছিল প্রশান্তর সংকল্প।

কাজের উমেদারীতে প্রশান্ত যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন একদিন কোন এক ধনী তনয়ার মোটরে সে আঘাত পায়। তরুণী আহতকে মোটরে করিয়া নিজ বাড়ীতে নিয়া যায়। তথায় তরুণীর পিতা বলেন, অরুণা, এ তুই কাকে নিয়ে এসেছিস! এ যে প্রশান্ত।

অরুণার সেবা ও যত্নে প্রশান্ত ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে। এইখান হইতেই প্রশান্তর জীবনের গতি নাটকীয়ভাবে ঘটিতে থাকে। প্রশান্ত ও মায়ার জীবনে যে একটা স্রোত চলিতেছিল অরুণা এসে তাহাতে বাধা প্রদান করে। এবং এর পরিণতি কি, দেখিতে হইলে আপনি নিশ্চয়ই একবার প্রভাত সিনেমায় আসিবেন। মনে রাখিবেন রূপালি পর্দ্দায় কখনও এরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মানব চরিত্রের অপূর্ব্ব বিকাশ আর কখনও প্রদর্শিত হয় নাই।

চারিটি হাত দেখে যদিও জানা যায় যে প্রতিপক্ষের হাতে চারিটি ইস্কাবনের খেলা আছে কিন্তু ভালনারেবল অবস্থায় 'উ'র একেবারে চারিটি হরতন ডাকের প্রত্যুত্তরে 'পূ'র পক্ষে চারিটি ইস্কাবনে ডাক দেওয়া ভয়ানক শক্ত।

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নীরদবাবু আদালতে বাহির হইয়া যাওয়ার পর, লবঙ্গ তাড়াতাড়ি উঠিল, তাহার ঘরে যাইয়া খিল লাগাইল। একটা ছেঁড়া কুশাসন মেঝেতে পাতিয়া বসিয়া কুলুঙ্গি হইতে কোশাকুশি নামাইয়া, একখানি গরদ কাপড় পরিয়া সে আহ্নিক করিতে বসিল। প্রত্যহ যতখানি আহ্নিক করে, ততটা সারিয়া সে পুনরায় গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতে লাগিল : "হে বিশ্বনাথ! আমাকে পথ বলিয়া দাও! আমি আজ নিতান্তই বিপদে পড়িয়াছি ইত্যাদি!" বলিয়া কত প্রার্থনাই করিল লবঙ্গ। সমস্ত মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সে আজ অন্য কোনও কাজই করিল না, কেবল নিজের ঘরে বসিয়া, দ্বারে খিল লাগাইয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল।

অপরাহ্নে রামদীন আসিয়া ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল।

"মাসিমা! মাসিমা।"

—"আঃ! ভাল জ্বালাতন! একদণ্ড যে সুস্থির হয়ে নিজের ভালমন্দ'র সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবো, তার যো নেই!" উচ্চৈস্বরে বলিল : কে তুমি?

—আজ্ঞে, আমি রামদীন!

—কি চাও?

—দরজা খুলুন! বাবু এই জিনিষটা পাঠিয়েছেন রেখে দিন!

—কি জিনিষ!

—আপনি দরজা খুলে দেখুন না!

লবঙ্গ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, রামদীন একটা বড় ফুলের তোড়া লইয়া দাঁড়াইয়া। লবঙ্গর হাতে তাহা তুলিয়া দিয়া সে বলিল : বাবু এইঠো একঠো মিটিং মে পাইয়েছেন, —আপনি তাঁর ঘরের টেবিলে রাখিয়ে দিন!

—কেন, তুমি সে কাজটা পারো না?

—পার্ব্বনা কেনো? বাবু বললো, আপনা দিতে! তাই হামি আপনা দিচ্ছে!

—আচ্ছা, তুমিই গিয়ে এটা বাবুর টেবিলে রেখে এসো!

রামদীন একটু চটিয়া গিয়া বলিল : দেন, দেন! হাম্‌হি রাখ দেগা! কই মেহন্নতকা কাম নেহি হ্যায়! বলিয়া লবঙ্গর হাত হইতে ফুলের তোড়াটি লইয়া সেই-ই টেবিলের উপর এক ফুলদানিতে রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর বাবু বাড়ী আসিলেন, কিন্তু লবঙ্গ তাঁহার নিকট গেল না। বেহারাকে দিয়া চা এবং জলখাবার পাঠাইয়া দিল।

নীচের বৈঠকখানায় প্রত্যহ যে সান্ধ্য মজলিশটি বসে, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য বাবু নীচে নামিয়া গেলেন, লবঙ্গ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ঠাকুর আসিয়া রন্ধনের অনেক খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া গেল, ঝি আসিয়া অনেক তার নিজের দরকারি ও গৃহস্থের দরকারি জিজ্ঞাসা করিল, চাকর আসিয়া কখনও পান, কখনও গোলাপজলের শিশি চাহিয়া লইয়া গেল, কিন্তু এসকলের মধ্যে লবঙ্গ আপনাকে অবিচলিত রাখিয়া দিল। তবু বুকটা চিং চিং করে,—যেন কাহার পদশব্দে চমকাইয়া উঠে। ঘর ছাড়িয়া ছাদে আসিয়া লবঙ্গ দেখে, অনন্ত নীল আকাশে কত কোটি কোটি নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, তাহাদের কেহই নিষ্প্রভ নহে, লবঙ্গর মত উদ্বেগ বিধুর নহে। সকলেই বেশ স্বচ্ছ, পবিত্র, স্বাধীন।

রাত্রি দশটা বাজিলে বাবু উপরে আসিলেন। তাঁর খাওয়ার সময়ে লবঙ্গ কাছে গেল না। পাচক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিবেশন করিল। বাহিরের বারাণ্ডায় আঁচাইয়া বাবু যখন পুনরায় ঘরে ঢুকিলেন, তখন লবঙ্গ বসিয়া তাহার নিজের ঘরে। রামদীন হঠাৎ আসিয়া বলিল : বাবু আপনাকে ডাকছেন!

সাহস করিয়া লবঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল! কেন রে?

ওহি হাম্ ক্যায়সে জানেগা?

লবঙ্গর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল; কিন্তু তবু যন্ত্রচালিতের মত সে নীরদবাবুর ডাকে তাঁহার শোবার ঘরে গিয়া হাজির হইল।

—আমায় ডাকছেন?

—হাঁ! মাইনের টাকা ক'টা সিন্দুকে রেখে দাওতো!

অনুজ্ঞাটা খুবই নির্দ্দোষ! কিন্তু তবু লবঙ্গ অনুভব করিতে লাগিল,—একটু একটু করিয়া যাদুকর তাহাকে আবার যাদুমন্ত্রে আবদ্ধ করিয়া আনিতেছে!

যাহা হউক, খুব স্থিরতার সহিত লবঙ্গ কোট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিল। তুলিবার সময়ে বাবু বলিলেন : খান দশেক নোট বার ক'রে

একমাত্র সাগর মুভিটোনেই "মহাগীত" ছবিতে ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অবশ্য সুরেন্দ্র, কৃষ্ণকুমারী, গুলজার, বুধো এডভানী, কমলা ও মায়া ব্যানার্জ্জি এতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

তোমার কাছে রেখে যাও! সংসার খরচ ত আছে!

ইহার প্রতিবাদ করে কি একটা কথা লবঙ্গ বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। কে যেন তাহার গলাটা টিপিয়া ধরিয়া আছে।

ব্যাপারটা সহজে মিটাইবার জন্য সে দশখানা নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল, সিন্দুকে চাবি বন্ধ করিয়া চাবির গোছাটা নীরদবাবুকে দিতে আসিল।

নীরদবাবু চাবির গোছা লইতে গিয়া, হঠাৎ খপ করিয়া লবঙ্গর হাত ধরিয়া বসিলেন। লবঙ্গ চমকাইয়া উঠিল, কিন্তু কোনও আপত্তি করিয়া উঠিতে পারিল না। নীরদবাবু স্নেহসিক্ত স্বরে বলিলেন! লবঙ্গ? আমি কি তোমার এতই পর?

লবঙ্গ লজ্জায় মুখখানি নত করিল। কিন্তু কোনও উত্তর করিতে পারিল না। তাহার দুই কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল।

লবঙ্গ কথার কোনও উত্তর দিতে পারে না, অথচ প্রতিবাদের একটা উগ্র আবেগ তাহার মনোমধ্যে তরঙ্গ তুলিতেছিল। নীরদবাবু লবঙ্গকে টানিয়া তাহার কপোলে আপনার মানসিক আকাঙ্খার একটি কালিমাময় চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

সমস্ত অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা ধরিয়া যে দৃঢ় সঙ্কল্পটা লবঙ্গ মনে মনে আঁটিয়াছিল, তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল! কোথা দিয়া যে কি হইয়া গেল, লবঙ্গ কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। প্রতিবাদ করিতে গেলে যে টুকু ভাষার দরকার, বা যেটুকু শারীরিক শক্তির আবশ্যক হইয়া পড়ে, সে ভাষা বা সেটুকু দৈহিক শক্তিরও তাহার অপ্রতুল ঘটিল। তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারেই অবশ হইয়া পড়িল. নীরদবাবুকে সে এমনই একটা শ্রদ্ধার উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছিল, যে, তাহার যে কোনও কাজের বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার কথা কওয়া বা দৈহিক কোনও বাধা দেওয়া লবঙ্গর পক্ষে সাধারণতঃ একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাহার উপরে আজ হঠাৎ এই আক্রমনে লবঙ্গ একেবারেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)
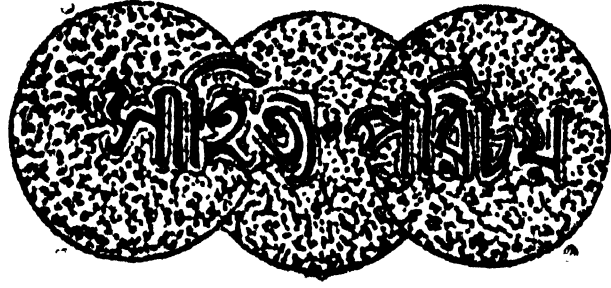
ভবিতব্য—শ্রীঅনন্ত কুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত। দীপালী প্রেসে মুদ্রিত, ছাপা বেশ সুন্দর, বাঁধাইও সুদৃশ্য। ১২৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মূল্য এক টাকা।

"ভবিতব্য" উপন্যাসখানি দীপালীর ৪র্থ বর্ষ ২৯শ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এখানা পুস্তকাকারে প্রকাশ লাভ কোরেছে। লেখক সাহিত্য জগতে নবাগত হ'লেও তাঁহার লেখার ধরণ বেশ সুন্দর। বিশেষ বড় বড় শব্দ প্রয়োগ না করে, জাকজমক না দেখিয়ে নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় নায়ক ও নায়িকার যে রূপ বর্ণনা করেছেন তাহা সত্যই প্রনিধান যোগ্য।

বইখানার বিষয়ে এই বলা যায় যে, পাঠকবর্গকে এখানার মনস্তত্ব অনুধাবন করতে বিশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হবে না। "ভবিতব্য" পড়িয়া আমরা বেশ খুসী হইয়াছি। আমরা এই নবাগতের মঙ্গল কামনা করি।

—শ্রীভট্ট

"মায়া-মুক্তি":—ব্রহ্মচারী শিবু ভাই প্রণীত উপন্যাস "মায়া-মুক্তি"। এই উপন্যাসখানি তত্বজ্ঞানপূর্ণ। ইহা নামে মাত্র উপন্যাস। শিবুভাই দক্ষিণেশ্বর আদ্যা-পীঠের ৺অন্নদা ঠাকুরের মঠের একজন তরুণ ব্রহ্মচারী ও ৺অন্নদা ঠাকুরেরই একজন ভক্ত শিষ্য। সুতরাং ৺অন্নদা ঠাকুরের "স্বপ্ন-জীবনী"র প্রভাব এই পুস্তকখানির উপর কতখানি যে বাড়িয়াছে—তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। উপন্যাসখানি পাঠ করিলে "বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু—তর্কে বহু দূর" এই উক্তির কথা মনে পড়ে। ব্রহ্মচারী শিবুভাই সহজ সরল ভাষায় নায়ক মৃণালের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ধর্মভাবের সাহায্যে। দুশ্চরিত্র মৃণাল ধীরে ধীরে কেমন বদলে গেল তার স্ত্রী মায়ার প্রভাবে, সেই ছবিই তিনি এঁকেছেন। স্ত্রীকে সে ভালবাসতো; কিন্তু সে ভালবাসায় ছিল একটা মাদকতা। মায়ার মৃত্যুতে মৃণালের ভালবাসা আরও এগিয়ে গেল; শেষে সে প্রেম বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হ'লো। এই প্রেমেই তাকে সেই বিশ্বনিয়ন্তার পানে, অনন্তের পানে পৌছে দিলো। মৃণাল মায়ার ভালবাসার ভেতর দিয়েই পেলো তার গুরুকে ও তার ভগবানকে।

উপন্যাসখানি সুনীতি, ধর্ম্ম ও উচ্চভাবে পূর্ণ। এই পুস্তকখানি সকল বয়সের লোকেরই পড়বার উপযোগী।

—শ্রীভট্ট

খেয়ালী চিত্রপট

নিউ থিয়েটার্স-এর "বড়দিদি" ছবিতে
পাহাড়ী, মলিনা ও [illegible] অমর মল্লিক
এ ছবির পরিচালক।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২২শে ভাদ্র ১৩৪৫, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ } ছত্রিশ সংখ্যা

দিল্লীতে

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ অধিবেশন হইবে। মধ্য-প্রদেশের মন্ত্রী সঙ্কটকে কেন্দ্র করিয়া যে জটিলতম পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে দিল্লীর অধিবেশনে তাহার মীমাংসা হইবে। ডাঃ খারের উপর যে ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে তাহা প্রায় সকল প্রদেশের প্রবুদ্ধ জনমতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভেই প্রকাশ। বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্র প্রদেশ একবাক্যে ডাঃ খারের সমর্থন করিতেছেন। বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে আশ্রিত-বৎসল মহাত্মাজীও ডাঃ খারের প্রসঙ্গে তাঁহার মহামানবীয় উদার্য্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের জিদ বজায় রাখিতে গিয়া মহাত্মাজীকেও নিরপেক্ষতার উচ্চ আদর্শ হইতে পতিত হইতে হইয়াছে।

বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজাগোপালাচারিকে অবলম্বন করিয়া যে ত্রিমূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সর্ব্বগ্রাসী বিবরে সমগ্র কংগ্রেস বিলুপ্ত হইয়াছে—আদর্শচ্যুত হইয়াছে—লক্ষ-ভ্রষ্টও হইতে চলিয়াছে! ইতিমধ্যেই বল্লভভাইয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ বশতঃ নারিম্যানের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী, আদর্শবাদী, নির্ভীক কংগ্রেস-নেতাকে বোম্বাইয়ে অজ্ঞাতবাস করিতে হইতেছে—অখ্যাতনামা ও সদ্য-সংগৃহীত খের সাহেব প্রধান মন্ত্রীত্বের গদীতে বসিয়া বল্লভভাইয়ের ইঙ্গিত-মাফিক রাজ্য-শাসন করিতেছেন। বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্নেহ-পুষ্ট মিঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন তাহা কি জাতীয়তার পরিপোষক না কংগ্রেসী আদর্শের মূর্ত্ত বিকাশ? বিহারে যে নীতি কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বের আওতায় অনুসৃত হইতেছে বাংলায় যদি সেই নীতি অনুসৃত হয় তাহা হইলে শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস জালানের ন্যায় অ-বাঙ্গালী ব্যক্তিবর্গের বাংলাদেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বে 'সার্টিফিকেট' গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার কংগ্রেসীদল বাংলায় সেইরূপ প্রতিশোধমূলক নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিবেন কি? অতঃপর মান্দ্রাজের তথ্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, মহাত্মাজীর বৈবাহিক শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়ার হিন্দী-বিরোধী আন্দোলন-কারী-

দের বিরুদ্ধে সংশোধিত ফৌজদারী আইন আরোপ করিয়া সরাসরি কারাপ্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া আন্দোলন বন্ধ করিয়া স্বীয় মসনদ অটল রাখিতে বদ্ধপরিকর। কংগ্রেসী বীর রাজাজীকে যদি ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে Criminal Law Amendment Actএর ধারাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ও মত-স্বাতন্ত্র্যের মৃদু-স্ফুরণে যদি এতদূর উগ্র হইতে হয় তাহা হইলে বাংলায় হক-মন্ত্রীমণ্ডলীকে দোষ দেওয়া যায় কিরূপে? কোন কংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী যে নীতি অনুসরণ করিলে দোষী বলিয়া বিবেচিত হন না অকংগ্রেসী প্রধান মন্ত্রী সেই বা অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিলেই তাঁহার মুণ্ডপাত করিতে হইবে—আমরা এইরূপ বৈষম্য কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারি না। "If Madras cannot be governed without the Criminal Law Amendment Act, the Congress must bring in a chastened mood to discuss changes!" শুনিতে কটু হইলেও এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে যে সত্য আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা কেহ কি অস্বীকার করিতে পারিবেন?

নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে বল্লভভাই-রাজেন্দ্রপ্রসাদ-রাজাজীর ষড়যন্ত্রের অন্তরালে যে আদর্শচ্যুতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার কঠোর বিশ্লেষণ করিয়া যদি এই ত্রিমূর্ত্তিকে সংযত না করা হয় তাহা হইলে কংগ্রেস জনগণের শ্রদ্ধা হারাইবে এবং ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িবে। বামপন্থী-নেতৃবর্গ, নারিম্যান-পক্ষীয় সভ্যবৃন্দ, মহারাষ্ট্রের ও বাংলার সভ্যগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিরোধিতা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে জয়ী হওয়া বিশেষ দুঃসাধ্য নহে।

শোক সংবাদ

বাগনানের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ননিলাল মিত্র গত ২রা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। বাগনানের স্কুল-গৃহ নির্ম্মানকল্পে তিনি নিষ্কর জমি দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোক-গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

আই, বি, এম, এ পরিচালিত সুকুমার মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা বুধবার ৩১শে আগষ্ট অপরাহ্ণে বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব ও সাউথ সুবারবন স্কুল (মেন) এই দুই দলের মধ্যে হইয়াছিল। খেলাটি আই, বি, এম, এ গ্রাউণ্ডে (হরিশ পার্ক) হইয়াছিল। স্কটিশচার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ ক্যামেরন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মিসেস ক্যামেরন পুরস্কার বিতরণ করেন। খেলায় বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব ৪-৩ গোলে জয়লাভ করে।

খেলা শেষে ক্লাবের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীনির্ম্মল মুখোপাধ্যায়, এম, এ, প্রতিদ্বন্দী দলকে ও বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে জলযোগে পরিতৃপ্ত করেন।

'রঙমহলে' শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের "অভিজ্ঞান"

সৌখীন নাট্যদলের ভেতর শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের সুনাম আজ সর্ব্বজনখ্যাত। গেল মঙ্গলবার এই দলটি 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অভিজ্ঞান" মঞ্চস্থ করেন। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন "মেঘ-মুক্তি"-র তরুণ নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, নাট্যরচনায় এবারও তাঁর সুনাম অটুট আছে। এই দলটি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যশিক্ষক অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর শিক্ষাধীনে এত বড় একটি জটিল নাটক যে ভালভাবে অভিনয় কোরে সকলের সন্তুষ্টিসাধন কোরেছেন—এ কম গৌরবের কথা নয়! মূল ভূমিকাগুলি সবই প্রায় সুঅভিনীত হ'য়েছে। অপ্রধান চরিত্রগুলির প্রতি আরও দৃষ্টি রাখা উচিৎ ছিল।

টসের চা

বর্ত্তমানে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের ফলে এদেশে প্রস্তুত জিনিষের চাহিদা যদিও যথেষ্ট বাড়িয়াছে কিন্তু এতদিন উন্নত ধরণের চা বিদেশী চা-ব্যবসায়ী দ্বারা ভারতের মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন নর-নারীর অভাব পূরণ করিত—আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন বাংলাদেশে ভারতীয় মূলধনে পরি-চালিত প্রসিদ্ধ চা-ব্যবসায়ী এ, টস্ এণ্ড সন্স শুধু বাংলাদেশের নয় সারা ভারতের এই অভাব বিমোচন করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটী বাংলার নিজস্ব ও আধুনিক উন্নত প্রণালীতে অভিজ্ঞ কর্ম্মীবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। কলিকাতায় ইহাদের ৫।৬টী শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। টসের চায়ের চাহিদা ও বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া মনে হয় যে অল্প সময়ের মধ্যে ইহা ভারতের বাজারে সর্ব্বত্র উত্তরোত্তর লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করিবে। পরিচালকবর্গের মধ্যে স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষের দূরদর্শিতা ও ব্যবসায়বুদ্ধি ও অদম্য কর্ম্মশক্তি (এ, টস্ এণ্ড সন্সের) এই কোম্পানীর উন্নতির মূলে নিহিত। আমরা এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘজীবন ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

রচনা প্রতিযোগীতা

'মৈত্রী বাসর' নামক কলিকাতার এক খ্যাতনামা তরুণ সঙ্ঘ 'অতীত ও বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজে নারী'—এই বিষয়ে একটি 'নিখিল বঙ্গ রচনা প্রতিযোগীতা' আহ্বান করিতেছেন। বাংলার নবীন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রয়াসী মাত্রেই এই প্রতিযোগীতায় যোগ দান করিতে পারেন।

রচনা বিচার করিবার ভার লইয়াছেন:—(১) অধ্যাপক মন্মথ মোহন বসু (২) অধ্যাপক অনাথনাথ বসু (৩) কবি বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় ও (৪) শ্রীইন্দিরা দেবী।

বিচারে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধীকারীদিগকে যথাক্রমে ১০, ৭, ও ৫, নগদ বা উক্ত মূল্যের তিনটী পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে।

(১) প্রতিযোগীতার প্রবেশ মূল্য বাবদ চার আনার ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হইবে।

(২) ফুলিস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া দশ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

(৩) পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাগুলির সর্ব্বসত্ত্ব সমিতির থাকিবে।

প্রতিযোগীতার শেষ তারিখ: ৩০শে সেপ্টেম্বর '৩৮। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা:—

১৩/১ নাথের বাগান ষ্ট্রীট। কলিকাতা। সাধারণ সম্পাদক 'মৈত্রী বাসর'।

ত্রুটী স্বীকার

গত সংখ্যার খেয়ালীতে শ্রীসাধনা সেনগুপ্তা লিখিত রেডিওতে কথিত বা পঠিত "ভারতে নারীত্বের আদর্শ—সাবিত্রী", যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়েছে সেটা "অল ইণ্ডিয়া রেডিওর" সৌজন্যে যে কথাটী ভ্রমবশতঃ গত সংখ্যায় স্থান পায়নি।

(খিলাসী)

সাধনার এ' অভিনয় অভিনয় নয়!
সাধনা-লব্ধ মধুর প্লাবন!!

চিত্র-নির্ম্মাতা: শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

কাহিনী: মন্মথ রায়

পরিচালনা: মধু বোস

শব্দযন্ত্রী: চার্লস ক্রীড্

চিত্র-শিল্পী: বিভূতি দাস

আলোক নিয়ন্ত্রী: গীতা ঘোষ

গীতিকার: হেমন্ত গুপ্ত

সুর-শিল্পী: হিমাংশু দত্ত

চিত্র-সম্পাদক: শ্যাম দাস

শিল্প-নির্দ্দেশক: সুধাংশু চৌধুরী

নৃত্য-পরিকল্পনা: সাধনা বসু

চরিত্রে: মনীষা—সাধনা বসু, পীতাম্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী, হীরক—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রতনগড়ের রাজা—বিভূতি গাঙ্গুলী, রম্ভা—প্রতিমা মুখার্জ্জি, অজয়—প্রীতি মজুমদার, থিয়েটারের ম্যানেজার—তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশক: এম্পায়ার টকি ডিস্ট্রিবিউটার্স।

প্রথম মুক্তি: 'রূপবাণী', ৩রা সেপ্টেম্বর '৩৮

দু'বছর ধরে তোলা লক্ষাধিক মুদ্রার ছবি—সাধনার নাচ, গান আর অভিনয়—তার স্বামী মধু বোসের পরিচালনা এবং শ্রীভারতলক্ষ্মীর কলাকুশলী যন্ত্রীদের বহুযত্নে তোলা "অভিনয়" দেখবার জন্যে যেন আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমরা কেন? চিত্রানুরাগী যাঁরা সবাই যে এতদিন ধরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরছিলেন 'রূপবাণী'-তে কয়দিনের দারুণ ভীড় তা প্রমাণ কোরেছে। সত্যি কথা বলতে কী ছবিখানা যে উচ্চশ্রেণীর হবে—এ সম্বন্ধে আমরা একেবারে Biased হ'য়ে পড়েছিলাম, একথা বলতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই। অকৃপণ হস্তে যিনি কেবলমাত্র বাঙলা সংস্করণ একখানি ছবি তুলবার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা বিনা দ্বিধায় ব্যয় কোরেছেন—কেবলমাত্র এই বিশ্বাসে যে তাঁর ষ্টুডিও থেকে এমন একখানি ছবি বেরুবে যা' দেখে লোকে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যাবে। উদার প্রযোজক
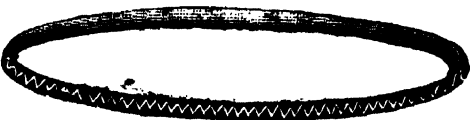
অভিনব চিত্র স্মৃষ্টি
অতুলনীয় শিল্পী সমাবেশ
অকল্পিত গল্প-রচনা
সুনিপুণ পরিচালনায়
শুভ-উদ্বোধন
শনিবার
১৭ই সেপ্টেম্বর
দেশের মাটি
নীতীন বসুর পরিচালনা—পঙ্কজ মল্লিকের সুর সংযোজনায়
ভূমিকায় ঃ উমা, চন্দ্রা, দুর্গাদাস, অমর মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র ও সায়গল
চিত্রায়
ও
নিউ সিনেমায়
নিউ থিয়েটার্সের
নবতম অবদান
ঃ পরিবেশনা ঃ
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন
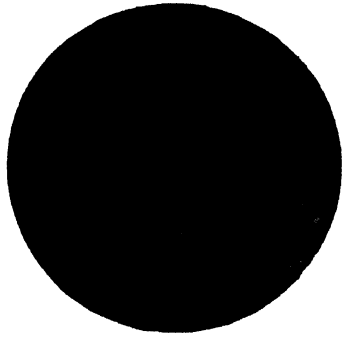
বাবুলাল চোথানির রঙীন স্বপ্ন বহুলাংশে সফল হয়েছে। অভিনয় A1 ছবি হয়েছে। তবে নীতীন বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া এবং দেবকী বসুর ছবির সঙ্গে এই ছবির স্থান নিঃসঙ্কোচে দিতে পারি। আমাদের এই মন্তব্যে এই উল্লিখিত তিনজন পরিচালক ছাড়া যে কয়জন আজ সুনামের সোপালি আলোর পথে এগিয়ে চলেছেন তারা হয়তো বল্‌তে পারেন—ওরূপ সুযোগ ও সুবিধা পেলে আমরা ওর চেয়ে ভাল ছবি তুল্‌তে পারি। তাঁদের এ কথা অবশ্য ভাববার আছে! "অভিনয়ে"র দোষ-গুণ বিচারের পূর্ব্বে এর গল্পটি সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

কিষণগড়ের তরুণ জমিদার হীরক রায় একদিন কোল্‌কাতা থেকে রেস্ খেলে ট্রেণে ফিরছে জমিদারীতে। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে এসে 'জাগ্রত ভারতে'র বিশেষ সংখ্যায় সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার-প্রাপ্তা 'মিস্ বেঙ্গল'—মনীষা চৌধুরীর ছবি দেখে সে বুঝতে পারলে মেয়েটি তার পরিচিত। বন্ধুবান্ধবদের একথা বল্‌তে তারা তাকে ঠাট্টা কোর্‌তে লাগল। তখন সে বন্ধুদের কাছে বাজী ধর্‌ল—চেনা ত' দূরের কথা মনীষাকে বিয়ে কোরে এর সত্যতা সবায়ের কাছে সে সপ্রমাণ কোর্‌বে।

মনীষা পাটনার পীতাম্বর চৌধুরীর মেয়ে। সকালবেলা বুড়ো পীতাম্বর নাটকের খসড়া কোর্‌ছিলেন আর বিদেয় কোর্‌ছিলেন ঘটক ও দালালের দলকে। এমন সময় হীরক এসে সেখানে পৌঁছল। হীরক ছিল পীতাম্বরের ছাত্র সেইজন্য তাকে চিন্‌তে বৃদ্ধের বেশী বেগ পেতে হ'ল না। এই সময়ে মনীষাও সেখানে এসে হাজির হ'ল—সেদিনের কিশোরী মনীষার সর্ব্বাঙ্গে আজ যৌবন জোয়ারে উচ্ছল। হীরক সে রূপ দেখে মুগ্ধ হ'ল—আর মনীষার জীবনেও এল নব বসন্ত।

তারপর একদিন প্রজাপতির বাঁধনে ওরা দু'জনে পড়ে পরস্পরের কাছে বাঁধা। কিন্তু বিয়ের পর নারীজীবনের যা কাম্য তা' সে পেল না স্বামীর কাছে—তাই তাকে কোরে তুল্‌ল ব্যথিত। হীরকের মনীষার ওপর এই হতাদরের যে কোনও কারণ ছিল না এমন নয়। ঘটনা এখানে খুলে বলাই দরকার। কিষণগড়ের রাজকন্যা রত্নার সঙ্গে অনেকদিন আগে হীরকের সম্প্রীতি হয়। কিন্তু রত্না তারপর বিলেত যাওয়ায় এবং রত্না সম্বন্ধে দু'একটি কুৎসিৎ কথা শোনায় হীরকের মন তার ওপর বিরূপ হ'য়ে ওঠে এবং প্রতিশোধ নেবার জন্যই বাজী রেখে সে মনীষাকে বিয়ে করে। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর রত্না-হীরকের পূর্ব্ব প্রেম প্রগাঢ় হ'য়ে ওঠে এবং একদিন রত্নাকে নিজ বাড়ীতে এনে মনীষাকে যখন দস্তুরমত অপমান কোর্‌ল তখন মনীষা এ হতাদর সহ্য কোর্‌তে না পেরে গৃহত্যাগ কোরে পাটনায় রওনা হ'ল বাপের কাছে। কিন্তু বাপের কাছে সে ফির্‌তে পারল না। কারণ, মনীষা মরেছে, এ দুঃখও পীতাম্বরবাবু সইতে পারবেন, কিন্তু স্বামী ত্যাগ কোরেছে এ তাঁর পক্ষে অসহ্য। তাই মনীষা না মরেও মর্‌ল। তার আত্মহত্যার খবর সংবাদপত্র মারফৎ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই শোক সহ্য কোর্‌তে না পেরে বৃদ্ধ পীতাম্বর অন্ধ হ'য়ে গেলেন।

এদিকে মনীষা থিয়েটারে যোগদান কোর্‌লেন অভিনেত্রীরূপে দেবী ইন্দ্রাণী নাম নিয়ে। "কচ ও দেবযানী" নাটকে তার অভিনয় দেখে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হ'ল। এমন সময় হীরক একদিন কাগজে দেবী ইন্দ্রাণীর ছবি দেখে বুঝল—এই ইন্দ্রাণীই মনীষা। সে ছুটল কোল্‌কাতায়। কিন্তু কিছুতেই মনীষা তাকে আমল দেয় না। অবশেষে থিয়েটারের ম্যানেজারকে বহু টাকা দিয়ে সে বাসব রায় নাম নিয়ে পীতাম্বরবাবু লিখিত "শকুন্তলা" নাটকে দুষ্মন্তর ভূমিকা পেল। বাসব রায়ের দুষ্মন্ত আর দেবী ইন্দ্রাণীর শকুন্তলার প্রশংসায় কোলকাতা সহর মুখরিত হ'ল। কিন্তু তাদের এ অভিনয় আর ভাল লাগে না। তাই তারা দু'জনে থিয়েটার ছেড়ে কিষণগড়ে তাদের সেই পরিচিত গৃহে ফিরে যাবে স্থির কোর্‌ল।

সেদিন "শকুন্তলা" নাটকের শেষ অভিনয় রজনী। মনীষা তার বাপকে থিয়েটারে এনেছে—ইচ্ছে, অভিনয় শেষে স্বামীর হাত ধরে পিতাকে প্রণাম কোরে বলবে—সে মরেনি।

শেষ দৃশ্য হ'য়ে গেল। হীরক ও মনীষা তাড়াতাড়ি রঙ মুছে প্রস্তুত হ'তে লাগল পীতাম্বরকে নিয়ে কিষণগড়ে যাবার জন্যে। এমন সময় রত্না সেখানে এসে মনীষাকে বলল—ধন, ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রাণী একজন অভিনেত্রীর যা কাম্য সে যা চায় দেবে—শুধু হীরককে সে ছেড়ে দিক। মনীষা ঘৃণা করে চলে যাচ্ছিল কিন্তু সে শুন্‌ল রত্না সন্তানসম্ভবা এবং হীরক ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই, তখন শোকে দুঃখে অভিমানে তার পিতা যে গাড়িতে তাদের জন্য বাইরে অপেক্ষা কোর্‌ছিলেন সেখানে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল—গাড়ী দ্রুতগতিতে চক্ষের বাইরে চলে গেল। হীরক কত ডাক্‌ল কিন্তু কেউ ফিরেও তাকাল না।

গল্পটি বেশ নতুন ধরণের এবং এর ভেতর বেশ বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু চিত্রনাট্য রচনার অক্ষমতাহেতু গল্পটি প্রথম দিকে জমে ওঠবার সুযোগ পায়নি। প্রথমার্দ্ধে পুরো দেড়ঘণ্টা ছবি দেখবার পর কাহিনী যে কতটুকু অগ্রসর হ'ল তা' আমরা বুঝলাম না। এই অর্দ্ধে নায়ক-নায়িকাকে প্রতিষ্ঠিত কোরতেই চিত্রনাট্যকার হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে অবশ্য ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে গল্পটি বেশ জমে উঠেছিল এবং ঘটনার গতিও বেশ স্বচ্ছন্দ্যগতিতে এগিয়ে চল্‌ছিল কিন্তু শেষের একই ব্যাপারের বারবার অবতারণায় 'টেম্পো' একটু শ্লথ হ'য়ে পড়েছিল। গল্পের পরিসমাপ্তি আমাদের মনে হয় সাধারণের মনে বিশেষ কোনও রেখাপাত কোরবে না। গল্প সম্বন্ধে একটি অভিযোগ আছে আমাদের। গল্পের শেষে রত্নার মুখ দিয়ে বলানো হ'য়েছে 'সন্তান-সম্ভবা'। চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে সবাইকে আনন্দ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৎশিক্ষা দেওয়াই উচিৎ বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু একটি কুমারীর মুখ দিয়ে ঐ কথা বলিয়ে দুর্নীতি প্রচার কোরে পরিচালক হয়তো আগতদিনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার কোরতে পারেন কিন্তু সাধারণে ও জিনিষটা বরদাস্ত কোরতে পারবে কিনা সন্দেহ! বিলাতী নর-নারীর অর্দ্ধনগ্ন নৃত্য দেখিয়ে আসর গরম করবার চেষ্টা অশেষ নিন্দনীয় ও বিজাতীয় ভাব-পূর্ণ—তবে পরিচালকের থিয়েটারের দৃশ্যগুলি পরিচালনা আমরা প্রশংসা করি।

"অভিনয়ে"র আলোকচিত্রের কাজ অতি উচ্চাঙ্গের হ'য়েছে। পরিস্ফুটনাগারের কাজেও নিন্দা করবার কিছু নেই। শব্দযন্ত্রের কাজও প্রশংসার যোগ্য। দৃশ্যপট এই ছবির এক আকর্ষণীয় বস্তু। এত চমৎকার জাকজমকপূর্ণ দৃশ্যপট কোন দেশীয় ছবিতে আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এত ভাল দৃশ্যসজ্জা হ'লেও সেটগুলির ভেতর Distinction এর অভাব হেতু আমরা কখন কোথায় এসে পড়লাম তা' প্রণিধান করা হ'য়ে পড়ে শক্ত! তা' ছাড়া অহেতুক এত সেট্ দেখানো আমাদের বাহুল্য বলেই মনে হয়। সাজ-সজ্জা ভালই হ'য়েছে—হীরককে মাঝে মাঝে ওরূপ সংকোচ পরিয়ে মাড়োয়ারি সাজানোর অর্থ বুঝলাম না। ছবিখানির সম্পাদনায় ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে অনেক। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ছবিখানির ওপর যদি কাঁচি চালানো যায় তা' হ'লে মনে হয় গল্পটির গতি অধিকতর সহজ ও সরল হবে। ছবিখানির সঙ্গীতাংশ অতি সাধারণ—প্রশংসা করবার মত কিছু নেই। গান রচনা প্রশংসনীয়।

নৃত্যকুশলা সাধনা

সাবলীল অভিনয় করে নৃত্যকুশলা সাধনা 'অভিনয়কে' সাফল্য-মণ্ডিত করেছেন—কোন কোন দৃশ্যে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলতে ইচ্ছে করে—সাধনার এ' অভিনয় অভিনয় নয়—সাধনা-লব্ধ মধুর প্লাবন !!! তাঁর এই অনিন্দ্যনীয় অভিনয়ের জন্যে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে সাধনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—তাঁর সাধনা সার্থক হউক। ১৯৩৮ সালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী-রূপে সাধনা আজ ভারতের চলচ্চিত্রাকাশে ভাস্বর! কন্যাগত-প্রাণ বৃদ্ধ পীতাম্বরের ভূমিকায় অহীন্দ্রের অভিনয় মনোমুগ্ধকর। এরপরই একটি ক্ষুদ্র হাস্যচটুল ভূমিকায় তুলসী লাহিড়ী অভিনয় গুণে সকলের দৃষ্টিপথে আকৃষ্ট হ'য়েছেন। হীরক রায় রূপে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য খুব উচ্চাঙ্গের অভিনয় না কোরলেও তাঁর অভিনয় চলনসই হ'য়েছে বলা যেতে পারে। তাঁর মুখে গান ভাল লাগল না। প্রীতি মজুমদারের অজয় মল্লিক আশানুরূপ হয়নি। ৺ললিত মিত্রের কুঞ্জবাবু নিজ গুণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। বিভূতি গাঙ্গুলীর রতনগড়ের রাজা মন্দ নয়। প্রতিমা মুখার্জ্জির রম্ভা অচলের নীচে যদি কিছু থাকে—তবে তাই। এর চেহারা ও গলার স্বর চিত্রের পক্ষে একেবারে প্রতিকূল। অন্যান্য ভূমিকাগুলি চলনসই।

ষ্ট্রীট-সিঙ্গার

শুটিং দ্রুত সমাধার পথে এগোচ্ছে। এ কদিন প্রথম দিকে কায হোল সহরের একটি নামকরা থিয়েটারের সামনে। ষ্টুডিওর মধ্যে তৈরী এ সেটটা বোঝাই যাচ্ছিল না যে এটি সত্যিকার থিয়েটার নয়। রাস্তা, লোক-জন, মোটর গাড়ী, রিকস্, বাস সবে মিলে দৃশ্যটিকে এমন একটি অখণ্ড রূপ দিয়েছে যে অনুকরণ বলে মনেই হয় না।

অভিনয় করলেন এই সেটে সায়গল, অমর মল্লিক, কানন, জগদীশ শেঠি, বিক্রম কাপুর, নরেশ বোস, অহি সান্ন্যাল, খগেন পাঠক, কেষ্টো দাস প্রভৃতি।

আর একটি সেটে কায হোল। এটি 'ব্রড কাষ্টিং ষ্টেশন'। সায়গল গান করলেন। সায়গলের অপরূপ কণ্ঠ মাধুর্য্য সুরে তানে লয়ে ভাবে মূর্চ্ছনায় সেটের অপর সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। দেখা গেল কারোর কারোর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে। চলচ্চিত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক অভিনেতা সায়গল গাইছে 'এ গান তোমার শেষ করে দাও.........', কোন দর্শক আছে যার ভাল লাগবে না?

সু-অভিনেতা ভানু বাড়ুজ্জ্যে এই সেটের ওপর সুঅভিনয় করে সবায়ের মনে রেখাপাত করলেন।

বড়দিদি

সুরেন্দ্রনাথকে আমরা শেষ দেখেছিলাম জমিদার ব্রজবাবুর বাড়ীতে। বিমাতার উপর অভিমান কোরে সে এখানে আশ্রয় পেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিল বড়দিদি 'মাধবী'র অপরিমিত যত্ন ও স্নেহের পরশ। একদিন আবার সেই বড়দিদির কথাতেই ভুল বুঝে, নিদারুণ অভিমানে, সে আবার পথের বার হোল।

যখন জানতে পারলেন সুরেন্দ্রনাথ নেই, তার সব কিছুই ঘরে পড়ে আছে, নেই কেবল
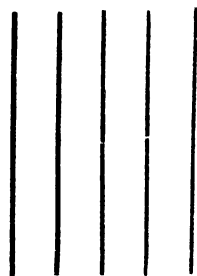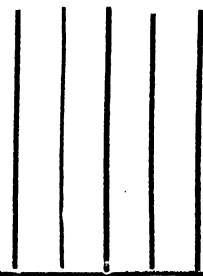
সেই ঘরের মালিকটি, তখন মাধবীর অন্তর বেদনায় কাতর হোয়ে পড়লো।

চেষ্টার ত্রুটি নেই। সারা শহর তোলপাড় কোরেও সে পলাতকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

বেচারী মাধবী! ঘর-গৃহস্থালীর কোন কাজে তার সুখ নেই। অন্তরের অবরুদ্ধ বেদনা বাহিরে প্রকাশ হয় না, কিন্তু মন তার ভেঙে পড়ে।

দোতালার বারান্দায়, পথের পানে উদাস দৃষ্টি মেলে মাধবী তাকিয়ে আছে। জনপথে কতলোকের আনাগোনা, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নেই।

অন্দর থেকে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসে এক বৈষ্ণব ভিখারীর মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন গান। সচকিত মাধবীর বিক্ষুব্ধ অন্তর সেই গানের কথায় যেন আবার নতুন কোরে ভেঙে পড়ে—

"সখি গো, রাধা রাধা সুরে
কাঁদিল বাঁশরী"—

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ গোপন কোরতে না পেরে, মাধবী তার নির্জ্জন কক্ষে আবার ফিরে যায়।

গত হপ্তায়, একনম্বর ষ্টুডিওতে এই দৃশ্যটি তোলা হোল, সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজবাবুর নির্দ্দেশনায়। বৈষ্ণব-ভিখারীর রূপে, তাঁর অমৃত-কণ্ঠের সুধা বর্ষণ কোরলেন সুকণ্ঠ গায়ক বিজয় গোস্বামী।

পরিচালক মল্লিকমশাইয়ের মুখে দেখলুম আবার সেই পুরোনো হাসি। দন্তশূলের ধাক্কা সামলে মল্লিকমশাই সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়ে উঠেছেন। 'বড়দিদি' ছবির পরবর্ত্তী অংশের কাজ শীঘ্রই সুরু হ'বে।

দু'নম্বর ষ্টুডিও

দেবকী বাবুর নতুন ছবি। তার 'শুভ মহরত' গত জন্মাষ্টমীর দিন সুসম্পন্ন হোয়েছে। গত কাল থেকে পুরোদস্তুর চিত্র-গ্রহণ পর্ব্ব সুরু হোল।

চন্দ্রাবতী, সায়গল এবং ইন্দু মুখার্জ্জি—নিউথিয়েটার্সের 'দেশের মাটি' চিত্রে। পরিচালনা: নীতীন বসু। ১৭ই সেপ্টেম্বর হইতে চিত্রা এবং নিউ সিনেমায় দেখান হইবে।

এই ছবির নামকরণ এখনও সুমীমাংসিত হয় নি। আপাততঃ আমরা 'বিষের বাঁশী' নামেই অভিহিত করছি।

আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের বাইরেও মানুষের বসতি আছে। সেখানে আমা'দের মতই মানুষ বাস করে। বাহ্যতঃ তাদের জীবন-যাত্রার প্রণালীতে তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকপাতে উজ্জ্বল হোয়ে না উঠলেও—তার মধ্যে ধরা পড়ে একটা সহজ, শান্ত ও মধুর সাচ্ছন্দ্য। বিবেক-বুদ্ধি, কর্ত্তব্য-বোধ স্নেহধর্ম্ম এবং অন্তরের ঐশ্বর্য্যে তারা কারু চেয়ে খাটো নয়।

এদেরই বিচিত্র-জীবন অবলম্বন কোরে গোড়ে উঠেছে আলোচ্য চিত্রের নাট্যাংশ। জীবনের সহজ শৃঙ্খলা ভেঙে চুরে কেমন কোরে সেখানে বিপ্লবের সৃষ্টি হোল, অন্তরের সহজাত সুপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হোয়ে এলো। ঘৃণা, ঈর্ষা, অভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রনা, মোহ ও রূপতৃষ্ণার কাছে আত্ম-নিবেদন কোরে, কেমন কোরে সে সচ্ছন্দ-জীবনের সহজ-প্রবাহে আবর্ত্তের সৃষ্টি হোল—তারই চিত্তচমকপ্রদ, সম্পূর্ণ অভিনব এক বিচিত্র কাহিনীর অবলম্বন কোরে এই চিত্রখানি রূপে-রসে সঞ্জীবিত হোয়ে উঠবে।

এ সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর, পরে আপনাদের বিস্তৃত ভাবে জানাতে পারবো আশা করচি।

এ সপ্তাহে, ২ নম্বর ষ্টুডিওর একটি সেট-এ ছবির উদ্বোধন-পর্ব্ব সুরু হোল। পরিকল্পনা ও গঠন-মাধুর্য্যে সেটটি সত্যই অভিনব। পাহাড়ের উপর—বিচিত্র 'মনসা বন'।

কর্ম্ম-সচীব যতীন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যবস্থাপনায় এবং দেবকী বাবুর পরিচালনায়, নিউ থিয়েটার্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও টেক্‌নিশিয়ানদের সহযোগে—এই সর্ব্বরসপুষ্ট বিচিত্র কাহিনীটি যে তার বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রেখে, একটি নব-তর মাধুর্য্য নিয়ে, ছবির পর্দ্দায় ফুটে উঠবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু!

দেশের মাটি

আসছে ১৭ই তারিখ থেকে চিত্রায় ও নিউ সিনেমায় নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্র "দেশের মাটি" ছবিখানা মুক্তিলাভ করবে। হিন্দি সংস্করণএর মতই যে এ ছবিখানাও জনপ্রিয়তা লাভ করবে সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহই নেই। আমরা এর মুক্তি লাভের আশায় রইলুম।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে এখানে নিউ থিয়েটার্সের ছবি 'অভিজ্ঞান' দেখান হ'বে। এই ছবির মধ্যে যে সব বিষয়-বস্তু নিয়ে deal করা হয়েছে তা আজকালকার দিনে বাস্তবিকই ভাববার বিষয়।

এই ছবিতে অভিনয় করছে নলিনা, জীবন, শৈলেন চৌধুরী, মেনকা, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২৯শে ভাদ্র তারিখে খেয়ালীর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হইবে না। ইহার পরবর্ত্তী সংখ্যাই পূজা সংখ্যা—মহালয়ার দিন বাহির হইবে। সঃ খেঃ

প্রেম নহে শুধু ফুলহার

জেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ মোহনলালের চিত্তে কোন প্রকার সুখই নাই। ধনে, মানে, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে মিঃ মোহনলাল সমাজের এক জন শীর্ষ স্থানীয় কিন্তু হৃদয় তাহার অন্ধকার। সংসারের কোন প্রকার উৎসবেই যোগদানের অধিকার তাহার নাই। হৃদয়ে যাহার শান্তি নাই, বাহ্যিক আনন্দ উৎসবে যোগদান তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ আর কিছুই নহে, তাহার আদরের একমাত্র কন্যা দুর্গা বাল্য বিধবা। অতি শৈশবে খুব ঘটা করিয়াই তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর হইতেই জামাতার কোন খোঁজই পাওয়া যাইতেছে না। কেহ বলে সে জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, কেহ বলে কোন সাধু হয়ত জামাতা স্বরূপকে চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে। কারণ তাহার গোপন তন্ত্র মন্ত্রের সে হইবে প্রধান সহায়।

দুর্গা শিশুকাল হইতেই ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা। এই পঙ্কিলতা পূর্ণ পৃথিবীর কোন আবর্জ্জনাই তাহার গভীর মনে কোনই দাগ কাটিতে পারে না। কোন প্রকার সাজ সজ্জা বিলাসিতায় তাহার মন মোটেই চঞ্চল হয় না। সে ভাবে এ মর জগতে একমাত্র অবিনশ্বর হইতেছে স্বর্গীয় প্রেম। প্রেমই মানবকে চিরকাল অমর করিয়া রাখে।

দুর্গার সহচরী শান্তার কিন্তু এসব মোটেই ভাল লাগে না, "হেঁসে নাও দু'দিন বইত নয়" ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। তাই সে তাহার প্রিয় সখীর এই উদাসীন ভা'ব সহ্য করিতে পারে না। জোর করিয়া সে তাহার সখীকে আনন্দ উৎসবে লইয়া যায় এবং একদিন হোলী উৎসবেও সে তাহার প্রিয় সখীকে নিয়া যায়।

আগ্রা নগরীর একপ্রান্তে থাকে এক সাধু। সর্ব্বদাই সে ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন। পার্থিব কোন প্রকার সুখ তাহার কাম্য নহে। ভগবানের সঙ্গে চির-বিলীয়মান হওয়াই তাহার একমাত্র আকাঙ্খা।

সাধুর শিষ্য স্বরূপ প্রেমের পূজারী। প্রেমের জয়গান সর্ব্বদাই তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। কিন্তু সাধু দেখেন তাহার প্রিয় শিষ্য ক্রমশঃ এই প্রেমের জয়গানে পার্থিব জগতের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তাই তিনি শিষ্যকে সাবধান করিয়া বলেন,—এই পৃথিবী নশ্বর, যাহা দেখিতেছি, শ্রবণ করিতেছি একদিন সকলই তাহার লোপ পাইবে। পৃথিবীর অস্তিত্ব ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং সর্ব্বদাই ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই মানবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।"

কিন্তু স্বরূপ বলে,—গুরুদেব সবই বুঝি, কিন্তু প্রেমত স্বর্গীয় জিনিষ। স্বর্গীয় প্রেমে কী অপরাধ থাকিতে পারে। তখন সাধু বলে স্বরূপ, মন তোমার খুবই চঞ্চল, তুমি কয়েকদিনের জন্য বাহিরে যাও। জন্মাষ্টমীর মেলায় বিরাট উৎসব হয়। বহু স্থান হইতে বহুলোক তথায় এই উৎসব উপলক্ষে জমায়েৎ হয়, তুমিও তথায় যাও। হয়ত বা মনে শান্তি পাইবে।

ডাঃ হংসরাজ শান্তার পিতা বৈষয়িক কর্ম্মে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তথাপি কাজ কর্ম্মের অবসরে তাহার নিরুদ্দিষ্ট একমাত্র পুত্রের মুখ মাঝে মাঝে তাহার চিত্তকে দোলা দেয় এবং গতানুগতিক কার্য্যধারাকে ওলট-পালোট করিয়া দেয়।

পরিচালক মিঃ কার্দ্দার উপরোক্ত চরিত্র গুলিকে তাহার অনবদ্য ছবি "বাগবানে" অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিমলা কুমারি, সিতারা, আসরফ খাঁন, কে, এন, মিঃ নজ্রেকার ইয়াল মিন, নাজির প্রভৃতি রয়েছেন।

ছবিখানা বোম্বাইতে বর্ত্তমানে দেখান হইতেছে এবং তথায় ৯ম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। প্রভাত সিনেমায় ছবিখানা আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করিবে।

নাট্যশালার ইতিহাসে ব্রজলীলা

গত সাত সপ্তাহ ধরিয়া 'খেয়ালী' কাগজে মুর্গী-মার্কা লেখক কয়টার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকটিত হইতেছে। এই মূর্ত্তি প্রকটনে পাঠক-সাধারণ যে এত বেশী উল্লসিত হইবেন, পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল না। এই সম্পর্কে চারিদিক হইতে যে সব আনন্দ-সূচক চিঠি আসিতেছে, তাহাদের সার-সঙ্কলন করিলে দেখা যায়, প্রায় পনেরো আনা পত্রই এই কথা বলিতেছে—'ভাষা-জননীর পবিত্র মন্দির অস্পৃশ্য মোরগ-বিবরণে কলুষিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার অত্যাবশ্যক। 'খেয়ালী'-তে 'অশনি'র যে খেলা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আশা হয়, মাতৃমন্দির হইতে শনির পাপ-অনুচরেরা শীঘ্রই বিতাড়িত হইবে।'

আমরা এই সকল পত্রের উত্তরস্বরূপ আমাদের সহৃদয় পাঠকগণকে এখানে জানাইয়া রাখিতেছি যে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন,—আশাভঙ্গের মনস্তাপ তাঁহাদিগকে পাইতে হইবে না! মেকীর মুখের মুখোস খুলিয়া দেওয়াই 'খেয়ালী'র জীবনের প্রধান কাজ। সাহিত্য বা রাজনীতি, যে কোনও ক্ষেত্রেই হউক—ধাপ্পাবাজির জোরে যাহারা মাথা তুলিতে চায়, তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হউক, ইহাই 'খেয়ালী'র চির কামনা। সুতরাং দুঃ-(শীল+নীতি)-পালিত শনির পাপ সেবকেরা 'সাহিত্যের কষ্টিপাথরে' যে ভাবে ঘর্ষিত হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহার অন্যথা হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। 'নীলবর্ণ শৃগাল' যতদিন না ধরা পড়িয়াছিল, ততদিন মজা মারিয়াছিল বটে; কিন্তু পরিণামে যে ভাবে সে মরিয়াছিল, তাহা করুণ রসেরই উদ্দীপক। পরিষদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইয়া ইহারাও আজ অনেক অজ্ঞের নিকট হইতে আদর ও পুরস্কার আদায় করিতেছে বটে; কিন্তু ইহাদের পরিণাম 'নীলবর্ণ শৃগালে'র পরিণামের চেয়েও ভয়ঙ্কর! যেদিন দেশের লোক বুঝিবে যে, সাহিত্য-পরিষদকে একদল চ্যাংড়া আত্ম-অভ্যুদয়ের সোপান করিয়া এবং পরিষৎ-পত্রিকাতে তাহারা নিজেদের প্রশংসা-প্রচারের জয়ঢাক বাজাইয়া মজা লুটিতেছে; সেই দিনই তাহাদের সাহিত্যিক 'কোঁকর-কোঁ' একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

বাস্তবিক, বলিতেও লজ্জা হয় যে, যে কাগজে একদিন রামেন্দ্রসুন্দর, রজনী গুপ্ত প্রভৃতি সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন, সেই কাগজের আজ 'অধ্যক্ষ' হইয়াছেন—শনির বাবুর 'ব্রজনদাদা'। দাদার জন্যে ভায়া যে কিরূপ দিশেহারা—কিরূপ বেতাল-ক্ষ্যাপা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় এই পত্রিকায় "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" নামক 'রাবিশে'র মধ্যেই জল্ জল্ করিতেছে! 'বিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যে ১০।১২ খানি পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য' বলিয়া শনিকান্ত সজনীকান্ত তাহাদের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র নাম নাই বটে কিন্তু তাঁহার 'ব্রজনদাদা'র 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' নামক পচা পুস্তকখানা সাদরে উল্লিখিত হইয়াছে। ভায়া দাদার প্রেম-মদিরা পানে যেরূপ টলমল, তাহাতে ঐ তালিকার মধ্যে ব্রজেন বাবুর বিজয়-পতাকা 'বেগম সমরু'র নামটা থাকিলেও আমরা অবশ্য বিস্মিত হইতাম না। অনধিকার-চর্চ্চায় এইরূপ আহাম্মকের নির্লজ্জতাই শোভা পায়। 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' (?) যে সব ভয়ানক ভুল ও কেলেঙ্কারী আছে, তাহার কতক পরিচয় ইতিপূর্ব্বে এই 'খেয়ালী'তেই আমরা দিয়াছি। পাঠকগণের মনে আনন্দ দিবার জন্য এবারেও কিছু দিতেছি।

এই গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় আছে—"লেবেডেফের নাট্যশালার কথা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বাংলায় প্রকাশ করেন (রঙ্গমঞ্চ, আশ্বিন কার্ত্তিক, ১৩১৭)। তাহার পর শ্রীযুত অমরেন্দ্র নাথ রায় 'বাসন্তী'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮) ও শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'নাচঘর' পত্রে (১৩৩১, ১৩ই অগ্রহায়ণ) এই নাট্যশালা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।" কিন্তু উড্ডীয়মান ঐতিহাসিক ব্রজেন বাবুর এই 'গবেষণা'র মধ্যে যেমন একটা প্রকাণ্ড ভুল আছে, তেমনই সত্য-গোপনেরও একটা কুৎসিত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কথা—লেবেডেফের নাট্যশালা সম্বন্ধে ব্যোমকেশ বাবু সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হয়। কারণ, 'রঙ্গমঞ্চ' নামক মাসিকপত্র জন্মগ্রহণের অনেক পূর্ব্বে 'বিশ্বকোষে'র 'রঙ্গালয়'-শীর্ষক রচনার মধ্যে লেবেডেফের নাট্যশালা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল—"কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এই সময়ে

ডোমটুলীতে ইংরাজদিগের যে নূতন নাট্যশালা স্থাপিত হয়, তাহাতে এই বিদ্যাসুন্দর ইংরাজীতে গীত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়।···গবর্ণর জেনারেলের আদেশ অনুসারে মিষ্টার লেবেডেফের ডোমটুলীস্থ নূতন নাট্যশালায় "ছদ্মবেশী" নামক নূতন ইংরাজী নাটক শীঘ্রই খোলা হইবে। বহু আদৃত কবি ভারতচন্দ্রের কবিতা সুরে বাঁধা হইয়াছে। ইহা যে বিদ্যাসুন্দর—অন্নদামঙ্গল নহে, তাহা প্রমাণ ভিন্নও বুঝা যায়। তাহা সম্ভবতঃ Ballad হিসাবে গীত হইয়াছিল। ইহা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।" সুতরাং ব্যোমকেশ বাবু 'সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় লেবেডেফের নাট্যশালার কথা বলিয়াছিলেন, ইহা মূর্খ ব্যতীত আর কেহ বলিবে না। 'বিশ্বকোষে'র ন্যায় দেশবিশ্রুত গ্রন্থকে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে'র আলোচনা করিতে যায়, তাহাকে 'মূর্খ' ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

শুধু মূর্খতা নয়, মূর্খতার সঙ্গে সঙ্গে সত্য-গোপনের একটা চালাকি বা নীচতাও ঐ কয় ছত্রের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে দেখা যায়। মনে রাখিতে হইবে, লেবেডেফের নাট্যশালা সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষ' সর্ব্বপ্রথম সংবাদ প্রদান করিলেও, ঐ সংবাদ মধ্যে যে সব কথা আছে, তাহা ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ। 'রঙ্গমঞ্চ' কাগজে ব্যোমকেশ বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাও ঐ 'বিশ্বকোষে'র ভ্রমপূর্ণ উক্তিই কিছু বিস্তারিতভাবে পুনরুক্তি মাত্র। লেবেডেফ যে 'Disguise' নামক ইংরাজী নাটকের বাঙ্গলা অনুবাদ করাইয়া তাহারই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, একথা 'বিশ্বকোষ' বা ব্যোমকেশ বাবুর লেখার মধ্যে নাই; সুতরাং এক্ষেত্রে যদুর জীব ব্রজেন বন্দ্যো 'বিশ্বকোষে'র পরিবর্ত্তে ব্যোমকেশ বাবুর নামোল্লেখ করিয়া যে পাপ করিয়াছেন, তাহার চেয়ে গুরুতর পাপ হইতেছে—ভুল জানিয়াও ভুলকে গোপন করিবার চেষ্টা। ব্যোমকেশ বাবুর ভুল-ভ্রান্তির কথা ব্রজেন বাবু ইচ্ছা করিয়াই চাপা দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা, ইহারাই আবার ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক আলোচনার বড়াই করে! থাকমণি থাকিলে বলিত যে, এমন বৈজ্ঞানিক গোবেষণার মাথায় "খ্যাংরা মারি, খ্যাংরা মারি!"

বাস্তবিক, খ্যাংরা মারিবারই কথা। এই বহিখানাতে যে কত রকম বেকুবি ও বেয়াদপির পরিচয় আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আর একটা কেলেঙ্কারির কথা বলিতেছি। ইহার ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা অনুবাদ—'আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী'ই প্রথম বাংলা নাটক। ইহা ১৮২২ সনে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়মে একখণ্ড 'আত্মতত্ত্ব-কৌমুদী' আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃতানুসারী এবং পূর্ণমাত্রায় পণ্ডিতী বাংলা।" —ইহাকেই বলে দিব্য দৃষ্টি। 'প্রবাসী'র প্রুফ দেখিতে দেখিতে যে কুৎকুতে চক্ষু দুইটি ব্রিটিশ মিউজিয়মের আলমারি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যস্থিত পুস্তকের ভাষা পর্য্যন্ত দেখিয়া লয়—সে চক্ষুর্দ্বয়ের তারিফ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে "যতদূর জানা গিয়াছে" বলিয়া লেখক মুরুব্বিয়ানা সহ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মূল্য এক কাণা কড়িও নহে। কারণ, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে Monckton সাহেব 'Tempest' নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়া, ১৬৩৪ শকাব্দে প্রেমদাস যে 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে'র বঙ্গানুবাদ করেন, একথা বোধ হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন।

কিন্তু ব্রজ-বিদ্যার বাহাদুরী এই যে, ঐ সকল অতি জানা কথাও না জানিয়া পাগলার মতন যাহা ইচ্ছা তাহা সে বকিয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য মুর্গী-মার্কা লেখকদের একটা বড় রকম বৈশিষ্ট্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে বিষয়ে ইহারা সব চেয়ে বেশী অনভিজ্ঞ, সেই বিষয় লইয়াই ইহারা সব চেয়ে বেশী ওস্তাদী করে। ইহাকেই বলে পাণ্ডিত্য-পাগলামি! এই পাগলামিতে শনির "বাপু" সজনী বড়, কি তাহার 'বেজন দাদা' বড়, কিংবা তাহাদের সাহিত্যাচার্য্য সত্যসুন্দর বড়, তাহা অবশ্য নির্ণয় করা কঠিন।

পাণ্ডিত্য-পাগলামির আর একটা নমুনা এখানে দিতেছি—পাঠকেরা তাহা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচিবেন। এই পুস্তকের ৯৩ পৃষ্ঠায় 'বেগম সমরু'র ব্রজেন বাবু লিখিয়াছেন—"আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগে আবার 'গীতাভিনয়' নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরণের এক প্রকার অভিনয় এদেশে দেখা দিয়াছিল।" —কি ভয়ানক জানা-শুনা। পেঁচোর পিসীমা পেঁচোর সম্বন্ধে বলিত—"আমার পাঁচুর কি কম বুদ্ধি! এই সবে মাত্র ষোল বছরে পা' দিয়েছে, এরই মধ্যে বাছা আমার পথ চিনে পাঠশালায় যায়, আবার পথ চিনে বাড়ী ফিরে আসে! আমাকে 'পিছিমা' 'পিছিমা' বলে ডাকে! আমি আবাগী যে ওর পিসীমা হই, তাও বাছা আমার জানে। —ও কি বাঁচবে!" —পেঁচোর পিসীমা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এই বুড়ো খোকা ব্রজ বন্দ্যোর বুদ্ধি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া যাইত। যে বুদ্ধি যাত্রা ও গীতাভিনয়কে এক জিনিষ মনে না করিয়া দুইটা স্বতন্ত্র প্রকারের অভিনয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে বুদ্ধি পেঁচোর বুদ্ধির বাবা! থাকমণি থাকিলে আবার বলিত—'এই বুদ্ধির মাথায় খ্যাংরা মারি!'

এই গোবর-গবেষকের আর একটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। ইনি প্রায়ই পরের প্রমাণকে 'অনুমান' ও নিজের 'হনুমানকে'

প্রমাণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহাও এই জাতীয় লেখকদের ‘বিজ্ঞান-সম্মত’ আলোচনার একটা অঙ্গ-বিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘জাতিবৈর” বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনা কিনা, এই বিষয়] লইয়া শনির চিঠিতে ইনি গোময়পূর্ণ মস্তককে সন্দেহের দোলায় দুলাইয়া ‘অনুমানের’ পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। অথচ এই অপাঠ্য বহিখানার মধ্যে যে সকল লেখা ‘বিবিধার্থসংগ্রহ’ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল লেখা ইনি নিঃসঙ্কোচে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। ঐ সকল লেখা যে রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন, এ কথা ব্রজেন বন্দ্যো কেমন করিয়া জানিবেন? একাধারে এমন বেকুবি ও বেয়াদপি আর কোথাও কেহ দেখিয়াছেন কি? প্রকৃত ইতিহাস বলে, ঐ সকল রচনার অধিকাংশই কালী-প্রসন্ন সিংহের লেখনীপ্রসূত। কিন্তু ইতিহাস কাহাকে বলে, তাহা যাহারা জানে না, তাহারা এ সব কথা কেমন করিয়া বুঝিবে?

বাস্তবিক, ‘বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস’ লিখিতে বসিয়া যে ব্যক্তি গিরিশচন্দ্রের গুণপনা ও কৃতিত্বের কথা বাদ দিয়া কেবল-মাত্র কতকগুলা মন-গড়া কথার উপর নির্ভর করিয়া গিরিশচন্দ্রের নিন্দা-প্রচারের চেষ্টা করে, তাহাকে তিরস্কার করিবার বা লজ্জা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। বিখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার “রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর” নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—“গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন;

আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage.—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোন দিন ছিল না। ইহা এক প্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল! যে অমৃত-পানে বাঙ্গলার নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃত পক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাঙ্গালা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।" —কিন্তু পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত এই ঘৃণিত পুস্তকে গিরিশচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। পরিষদের পক্ষে ইহা একটা ঘোরতর কলঙ্কের কথা। শুনিতে পাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রদের পাঠ্য হিসাবে এই আবর্জ্জনাও নাকি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে তবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেও অপযশের কথা বলিতে হইবে। ইহা পড়িয়া ছেলেরা কতকগুলো সাংঘাতিক ভুল শিখিবে মাত্র। এই পুস্তক সম্বন্ধে এক কথায় বলিতে গেলে মাইকেলের ভাষায় বলিতে হয়—

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—আরেঃ! অজয় না?

—হ্যাঁ তাইতো আমারও মনে হচ্ছে—

—কেমন আছিস? তোর কল্পনা দেবী?

—বারে! কখন এলি? কই জ্ঞানাস্নি তো যে কলকাতায় ফিরেছিস্।

—মুখ বদলাতে এমনি চলে এলাম ভাই—

—কোথায় উঠেছিস্?

—ডাঃ ব্যানার্জ্জীর বাড়ী—লিলির বাবা—ভবানীপুরে।

—কি করছিস, সেই চাকরীই?—

—হ্যাঁ প্রমোশন পেয়েছি। আটশো অবধি গ্রেড্। বিগিন্ করেছে সাড়ে তিন শোয়। আর তুই?

—আচ্ছা বলছি চল। ভালোই হলো। আমি ভেবেছিলাম নিজেই একবার যাবো তোর সাথে দেখা করতে—

—আমার সঙ্গে?—

—হ্যাঁরে প্রয়োজন ছিল —

—আমার সাথে সাহিত্যিক মানুষের প্রয়োজন? কাগজের সম্পাদক তো আমি নই বা পাবলিশারও নয়।—

—তা জানি। আর সেই জন্যেই—

—কেন বল দেখি?—

—আছে প্রয়োজন। পরে বলা যাবে—

—কি নাম নিয়েছিস্ আজকাল? ধৃতরাষ্ট্র?—না লৌহভীম, যে চূর্ণ হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে।

—তার মানে?—

—চল না বলছি—। সময় হবে তো?

—সময়ের অসদ্ভাবও তো দেখছি না—

—তবে চলে আয়, ঘরটায় গিয়ে বলা যাক। তারপর বলা যাবে লৌহভীম চূর্ণ হওয়ার গল্প।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

পূব দিক্‌কার কোণে এক নাতি অন্ধকারময় ঘর। ঘরের মধ্যে একটা ছোট্ট খাট, তার ওপর একটা গদী দেওয়া বিছানা। বেশ পরিষ্কারই আছে। ঝালর দেওয়া মশারিটা বাড়িয়েছে ওর শোভা। ওধারে একটা মাঝারি গোছের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তার ওপর সাজানো—দোয়াতদানি, পেন-ষ্ট্যাণ্ড আর বিস্তর কাগজ পত্র—হয়তো ওর কবিত্বের সাক্ষী ওরা। টেবিলে বসানো একটা লাইট গ্রীণ-শেডের টেব্‌ল্ ল্যাম্প, আর একটা পোর্টেবল টাইপ রাইটার।

বাইরে থেকে ঘরটাকে যা মনে হয়—এ ঠিক তা নয়। এরও আছে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বা সম্পদ। অন্ততঃ তারই পরিচয় দিচ্ছে এর আসবাবপত্র। ঘরের ওর শ্রী ফিরেছে। অঙ্গে অঙ্গে ঝরে পড়ে মার্জ্জিত রুচির পরিচয়।

ছোট্ট একটা ছেলে ওর ফরমায়েস খাটে। বাড়ীর ভিতরের খবর ঠিক জানি না।

তাইতো ওর বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করাও হয়নি! কি মনে করবে ও কি জানি।

হ্যাঁরে অজয়—মা কেমন আছেনরে?

—ভালই আছেন। তবে চিরস্থায়ী বাত ধরেছে।

—আর সকলে?—

আবার কে?

—কেন—কবি-প্রিয়া।

—মারা গ্যাছেন—

—বিয়ে করলি কবেরে? আর মারাই বা গেলেন কতদিন?

—কালের হিসেব রাখিনে।

—তার অর্থ?—

বাচ্চা চাকরটাকে এক চড়া হাঁক দিয়ে ও চা আনতে হুকুম করলে। তারপর চেয়ারটা টেনে নিয়ে এগিয়ে এল আমার আরো সন্নিকটে।

ওর ঘরটার চতুর্দিকে একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে নিলাম। তাতে আশ্বস্তই হলাম এই ভেবে যে হয়তো সরস্বতী দেবী মা লক্ষ্মীর সাথে ঠিক বিবাদটা বাধাননি। লক্ষ্মী দেবী আজকাল বাসা বেঁধেছেন ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে। কাব্যলক্ষ্মী হয়তো অজয়ের নামে লক্ষ্মীকে জমা দিয়ে এসেছে ব্যাঙ্কের খাতায়। সব জিনিষই কি আর বোঝা যায় বাইরে থেকে? অজয়ের পানে তাকিয়ে বল্লাম

—তোর কাব্যলক্ষ্মীর টেষ্ট আছে দেখছি অজয়।

অজয় বললে—তাই নাকি? তবে টেষ্ট থাকলেই কি আর সব জিনিষের সমাধান করা যায়? ঘরের এই শ্রী, যার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তুই টেষ্টের কথা তুললি—তা কাব্যলক্ষ্মীর কৃপাতে নাও তো হতে পারে? হয়তো বা এর পেছনে আছে অন্য প্রেরণা। বাইরে থেকে অনেক জিনিষকেই ভরাট দেখায়, অন্ততঃ সুন্দর তাতো জানিস? আবার তার অন্তরের অর্থাৎ সারবস্তুর, তার মানে আমি এই বলছি যে বাস্তব জগতে মানুষকে যা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, পথ চলতে হয় প্রয়োজন, ভাব-জগতের কথা হচ্ছেই না, সেই দিক থেকে দেখলে অনেক জিনিষই অসারত্বের পর্য্যায়ে পড়ে যায়।

যেমন দেখনা আমার এক কাকা। ছোট বেলা থেকে সখ উকীল হবেন। আরম্ভ করলেন পড়াশুনো, গরীব সংসারের স্বচ্ছলতায় ভাটা পড়িয়ে। ম্যাট্রিক দেবার পরই অবস্থা দাঁড়ালো আরো সঙীন। যেমন নৌকো ছাড়তেই দেখা গেল তলা-ফুটো। উঠছে নিরাশার জল। বিরাট নদী পার হওয়া যাবে কি করে? সন্ধান চলতে লাগলো আত্মরক্ষার উপায়ের। জল সেচবার ছোট্ট একটা পাত্র, তাও ভগ্ন প্রবণ। তাতে করে মনকেই দেওয়া চলতে পারে সান্ত্বনা। আসল কাজটা থেকে যায় ফাঁকিতে।

কাকা চলে এলেন কলকাতায়, নিঃসম্বল অবস্থা। এক বড়লোকের বাড়ীতে বাজার করে দিয়ে, সংসার খরচের হিসেব রেখে আর রাত্রে গোটা চারেক ছেলে-মেয়েকে পড়িয়ে, ভর্ত্তি হলেন কলেজে। ভাবলেন বুঝি এতেই উৎরে যাবেন। কিন্তু ওধারে নিজের বেলা জমতে লাগলো ফাঁকি। দ্বিতীয় বার্ষিক ওৎরালেন তাই কোন প্রকারে। আশা গেল বেড়ে। অন্ধকার মুখব্যাদান করলো আরও বেশী। কিন্তু উপায় তো চাই। ধরলেন এক কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে জানালেন ইচ্ছা ও সামর্থ্য। মন নরম হলো, বিদ্যোৎসাহী মানুষ কি না তাই। বাড়ীতে চিঠি লেখবার পয়সাও জোটে না। রোগে শুশ্রূষা করে নিজের শরীরে ঢোকালেন রোগ। শরীর ভেঙ্গে পড়তে চায়। তবু ছাড়লেন না আশা। এখনও মাঝ নদী। ঢেউ উঠেছে কিছু কিছু। সর্ব্বক্ষণই তরী ডুববার ভয়। জোর করে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন আশে পাশের লোককে। করুণার আলোয় আবছায়া দেখা দিল। কাটলো অন্ধকারের ঘন কুহেলি। কোন রকমে পথ দেখে চলা যায় হয়তো। পাশ করলেন বি, এ। ল'ক্লাশ, ট্যুশান, আর নিজের রান্না করে প্রথমবার করলেন ফেল। দ্বিতীয় বারে বেরিয়ে এসে নতুন করে দুনিয়া অন্ধকার দেখলেন। ভাগ্য তাঁর হয়তো ছিল সুপ্রসন্ন। পেলেন সরকারের ডাক বিভাগে চাকরী দেড়শো টাকায়। কিছুদিন পরে গেলেন দিল্লী বদলী হয়ে, যখন কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে মোগলাই দেশে গেল। মাইনে বাড়লো। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মনের মাঝে বেঁধে খোঁচা। আচার্য্য রায়ের প্রবন্ধ বাধায় দ্বন্দ্ব। দিলেন ছেড়ে চাকরী—উদ্দেশ্য ল'পাশ করা আর ছেলে বেলাকার টেষ্টকে দিতে হবে সার্থকতা। সামনে ভাসে আশু মুখুজ্যে, রাসবিহারীর উদ্দীপনা। গায়ে চড়ালেন তাই কালো স্যুট, আর আশ্রয় করলেন বটতলা। কাটলো কয়েক বৎসর। দেখলেন কল্পবৃক্ষ তার বন্ধ্যা। চাকরী জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে মফঃস্বল সহরে একটা বাড়ী করে, বাড়িয়ে চলেছেন তাই ভাড়াটিয়া ঘর। প্র্যাকটিশ সাথে সাথে চলে। কালো কোটের পিঠটা আসে ছিঁড়ে। নিজের ছেলেই তাই তাকায় মুখের দিকে। লক্ষ্যের, যাকে বলো তোমরা এম্-অব্-লাইফ, বিশেষ টেষ্ট, তার দাঁড়ি পাল্লায় অপর দিকের শূন্য পাত্র শূন্যে দোল খায়। দুঃখের বোঝা বেড়েই চলে। এইতো তোমার টেষ্ট? টেষ্ট্ থাকলেই যে টসে জিতবে তার কোন মানেই নেই। বাঃ বিশেষ টেষ্ট থাকাই বিপদজনক। জগৎটাই যে বিদ্ঘুত-কিমাকার।

চা এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটো প্লেট। অজয়ের মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। একটা স্বাদালু গন্ধ আসছে চায়ের ধোঁয়ার সাথে মিশিয়ে। তপনদেব ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলে তোলবার ব্যবস্থা করেছেন। কাজ মিটিলো বলে। পাতলা অন্ধকারে আরো বেশী পাতলা ছায়া ফেলেছে টেবিলটার নীচে। ভালো করে না দেখলে বোঝাই যায় না। এমনি অলক্ষিতেই ও গ্রাস করবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে মানুষ হয়তো তখন ভুলেই যাবে ওরা

—ছায়ার-মায়া—

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এ ছায়া না হয়ে মানবীর ছায়া, এ যে স্বরগের দেবীর ছায়া,
ছায়া দেখে তারে ভুলিতে পারিনা, ভক্তিতে মোর আনত কায়া ;
এখনো যে আমি দেখিনি তাহারে
শুনি নাই গান সে বীণার তারে
তবুও পরাণ ছুটিয়া চলেছে ধরিতে তাহার অজানা মায়া,
প্রণমি তাহার অলখ-চরণে, সে যে স্বরগের দেবীর ছায়া।

২

অশরীরি ছায়া সে ত নহে কভু, তার ত নহেরে পাষাণ হিয়া
প্রাণহীন দেহ করে সে সজীব নূতন ভাবের প্রেরণা দিয়া :
সেত নহে দাসী, সে যে মহারাণী,
ধরণীর বুকে সে যে বীণাপাণি
স্বরগ ছাড়িয়া এসেছে হেথায় নব নব-সুর-ঝঙ্কার নিয়া ;
এ ছায়া নহেরে পাষাণের ছায়া, করুণায় ভরা একটী হিয়া,

অতিথি সেবার মহান ধর্ম্ম হয়েছেরে তার জীবন-ব্রত
আপনার সুখ অবহেলা করি পরের কারণে সদাই রত ;
বুকভরা তার কি যে মহাস্নেহ
দিব্য জ্যোতিতে ভরা তার দেহ
স্বার্থ-বিহীন সেবা-উৎসবে ভক্ত তাহার জুটেছে শত,
অতিথি-সেবার মহৎ প্রয়াস তার জীবনের পরমব্রত।

৪

নয়নে তাহারে দেখি নাই কভু, দেখেছি তাহারে হৃদয়ভরে,
দূর থেকে তার হৃদয়ের ছায়া হৃদয়ে ধরেছি যতন করে ;
দরশন তাঁর মেলে কভু যদি
জানাব আমার প্রাণের আকুতি
বলিব তাহারে "মোরে বেঁধে রাখ তোমার স্নেহের অটুট ডোরে",
ছায়ার মায়ায় পাগল করেছে, করেছে আজিকে উদাসী মোরে।

আলোর মানুষ ছিল এক কালে। নিজের অতীত মর্য্যাদা বজায় রাখতে তখন চলবে কৃত্রিম চেষ্টা যার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সদাই জাগে ভয়। বলে—প্রকৃতিকে করেছি জয়। পুরাণো কালের জমীদার বাড়ীর মতো হয়তো আধখানা রঙ করতেই শক্তি হবে শেষ। জগতে ইলেকট্রীক্ বাল্‌ব কিন্তু তবুও পড়বে অন্ধকার-ছায়া ভেতরে ভেতরে।

বর্ত্তমানটাই সত্যি। অতীতটা মিথ্যে। পণ্ডিতরা বলেন মিথ্যা এ জীবন, মানে মরণশীল এ জীবন। স্থায়িত্ব এরও নেই। অতীত অর্থাৎ যা মরে গেছে তা মিথ্যে। মরা অতীত মানেই মিথ্যা অতীত। তাই মরা অতীতকে নিয়ে আলোচনা মানেই মিথ্যাকে নিয়ে জাল বোনা। তা থেকে যা'কিছু জাগুক না কেন—গন্ধ বল, রঙ বল, স্মৃতি বল—সবই অর্থহীন, অচল। সুগন্ধের বদলে দুর্গন্ধ বেরুবার সম্ভাবনাই সেখানে বেশী। অতীত নিয়ে যারা গৌরব করে তারা বুঝতে চায় না এই পরিবর্ত্তনশীল, মরণশীল জগৎটার ধারা। কাদার ভেতর বাস করে তারা দেখে মর্ম্মর প্রাসাদ রচনার স্বপ্ন। তাই উদ্ধার তাদের কোন কালেই হয় না। বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে অতীতটাকে আঁকড়ে ধরা যে মরণেরই সামিল। জীবনের জগতে বাস করে মরণ পারে তাকিয়ে থাকা তাতে জাগে না কল্যাণ। বর্ত্তমানের আগুণ জাগাবে জ্বালা, বেঁধাবে কাঁটা তবে না মনের ঘোড়া ছুট মারবার চেষ্টা করবে। অতীত আস্ফালনের দড়ি না কাটলে পা তার পঙ্গু হয়েই থাকবে। অতীত এনে করবে গ্রাস। জাতটাই যাবে অতীতের কবলে। বর্ত্তমানকে ফাঁকি দেবার এই যে চেষ্টা বা গৌরব বোধ এতে আছে মরণের বিষ ; অলক্ষিতে চলে তার ক্রিয়া। নিষ্কর্ম্ম কলের কুলি সে হয়তো বাঁচবে, কিন্তু সন্দেহ জাগবে পণ্ডিতের বেলায়। স্রোতহীন নদীর জল পরিষ্কার হলে কি হবে ? তলায় যে জমছে বালির চর, যা একদিন তার অস্তিত্বকে দেবে বিলুপ্ত করে। ওর চেয়ে ক্ষুদ্র পঙ্কিল নির্ঝরিণী ভালো, যার স্রোতের কাছে পাথরগুলো দিচ্ছে জায়গা ছেড়ে। আঘাতে আঘাতে জল উঠছে ফেনিয়ে। তবুও ওর প্রাণে শক্তির অভাব নেই। রচনা করে চলতে পারে নিজের পথ নিজে। দেখনা ছোট্ট জাত জাপানের দিকে। বিশ্ব শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সে পারে প্রয়োজন হলে। হয়'তো সে যাবে জগতের বুক থেকে মিলিয়ে। তবুও সে ক্ষতি মানবে না। গড়ে উঠবে নতুন জাত। প্রাণশক্তিকে বলি দেবার

বদলে দেবে দেহটাকে বলি। তবু স্বাধীন জাপান চাইবে না পরের পা চাটতে।

সংস্কার ও শাস্ত্রের ঝুরো বলিতে ঠাসা আমাদের সমাজ বা সমাজের মস্তিষ্ক কালের গতিকে রাখতে চায় ঠেকিয়ে। তাই বাধে দ্বন্দ্ব নতুন ও পুরাতনে। নতুনের সংস্পর্শে এসে যে পুরাতনও যাচ্ছে রূপান্তরিত হয়ে, তা এরা সন্ধান রাখেন না। শুধু দিনে দিনে নিজের অলক্ষ্যে জাগছে চোরা বালি।

অজয় কাপ শেষ করে সোজা হয়ে বসলো। সিগারেট কেসের হোয়াইট্‌ বিউটী এক এক করে দেহ দান করেছে। অ্যাশট্রের ছাইএর বোঝা হলো ভারী। আর বাদ বাকীটা গেছে ধোঁয়া হয়ে উড়ে, যেন মানুষের যৌবন।

জিজ্ঞাসা করলাম—কই কি বলবি যে বলছিলি। অজয় বললে—হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করছিলি না কাব্যলক্ষ্মীর দয়ার কথা? বলছিলাম না নাম নিয়েছি লৌহ ভীম? তবে চূর্ণ হয়েছে আমারই কাব্য-লক্ষ্মী—আমাকেও বলতে পারিস্। সেই কথাই বলতে চাইছিলাম। তবে ধৈর্য্য ধরতে হবে বন্ধু। লিলি লিলি দেবী থাকবেন না তো পথ চেয়ে? অধৈর্য্যের জোয়ার ভাঙবে না যে একাগ্রতার বাঁধ?

—পুরানো হয়ে গ্যাছে অজয়, জমেছে একঘেয়েমীর আবিলতা।

—এরই মধ্যে? ব্যবহারের এ নিয়ম বন্ধু, অন্ততঃ মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাই বলেন। সব কিছু উদ্‌ঘাটন করে ধরলেই ঔৎসুক্য যায় কমে। তাই অনুসন্ধানের বাঁধনে, সামান্য কিছু অজানার আড়াল দিয়ে চির-নবীনত্বকে রাখতে হয় বেঁধে। ভালবাসা সেখানেই বাসা বেঁধে থাকতে পারে চিরকাল যেখানে সবখানি রহস্য পড়েনি ধরা। যাক্ এখন আরম্ভ করি আমার কথা। তার আগে একট গল্প বলি শোন।

(ক্রমশঃ)
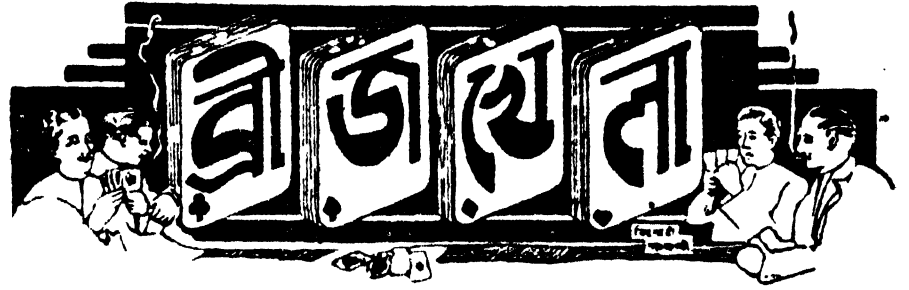
শ্রীদুর্ব্বাসা

মিঃ ব্ল্যাকউডের চার বা পাঁচটি ফেরাইএর ডাকঃ—

মিঃ কালবার্টসনের আবিষ্কৃত চার বা পাঁচটি ফেরাইএর ডাক ব্রীজজগতে যেমন একটি খেলার অভিনব পন্থার সৃষ্টি করিয়াছিল তেমন মিঃ ব্ল্যাকউডএর পন্থানুযায়ী চার বা পাঁচটি ফেরাইএর ডাক বর্ত্তমানে ব্রীজ খেলার সাধারণ চাল অনেকাংশে পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই ডাক ব্যবহার করিবার প্রণালী অতীব সহজ। এই ডাক যখন ইচ্ছা দেওয়া চলে যদি উভয় খেঁড়ীর মধ্যে যে রঙে খেলা হবে সেটি মিলে থাকে। মিঃ কালবার্টসনের নিয়মানুযায়ী চারটি বা পাঁচটি ফেরাইএর ডাক দিতে গেলে হাতে দুইটি টেক্কা ও নিজেদের কথিত কোন রঙে সাহেব থাকা চাই; কিন্তু Mr. Blackwood এর নিয়মে নিজেদের মধ্যে তুরুপ রঙে মিলে গেলেই যে কোন সময়ে এই ডাক দিতে পারেন। তার উত্তরে তাঁর খেঁড়ী তাঁর হাতের টেক্কার খবর দিতে বাধ্য হবেন। মনে করুন আপনি চারটি ফেরাইএর ডাক দিয়েছেন, তাহলে তার উত্তরে খেঁড়ী নিম্নলিখিতরূপ জবাব দিতে পারেন।

(১) পাঁচখানি চিড়িতন,—যদি তাঁর হাতে কোন টেক্কা না থাকে।

(২) পাঁচখানি রুহিতন,—যদি তাঁর হাতে একখানি টেক্কা থাকে।

(৩) পাঁচখানি হরতন,—যদি তাঁর হাতে দুইখানি টেক্কা থাকে।

(৪) পাঁচখানি ইস্কাবন,—যদি তাঁর হাতে তিনখানি টেক্কা থাকে।

(৫) পাঁচখানি ফেরাই,—যদি তাঁর হাতে চারখানি টেক্কা থাকে।

এখন ডাকদার নিজের ইচ্ছামত ডাকটি পাঁচখানিতে 'Sign off' করতে পারেন, অথবা ছয়খানি ডাকতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি এই জবাব শুনা সত্ত্বেও আবার অগ্রসর হতে রাজি হন তো সাহেব কয়খানি আছে জানিবার জন্য পাঁচটি ফেরাইএ ডাক দিতে পারেন। পুনরায় এই ডাকের উত্তরে খেঁড়ী পূর্ব্ববৎ উত্তর দিতে পারেন। তিনি ডাকতে পারেন—

(১) ছয়খানি চিড়িতন,—যদি তাঁর হাতে কোন সাহেব না থাকে।

(২) ছয়খানি রুহিতন,—যদি তাঁর হাতে একখানি সাহেব থাকে।

(৩) ছয়খানি হরতন,—যদি তাঁর হাতে দুইখানি সাহেব থাকে।

(৪) ছয়খানি ইস্কাবন,—যদি তাঁর হাতে তিনখানি সাহেব থাকে।

(৫) ছয়খানি ফেরাই,—যদি তাঁর হাতে চারখানি সাহেবই থাকে।

এমন অনেক সময় দেখা যায় যে হাতে চারখানি টেক্কা বর্ত্তমান, অথচ যদি সাহেবের খবর পাওয়া যায় তো বড় স্লাম বা ছোট স্লাম করা সহজ হয়ে পড়ে, সুতরাং এইরূপ ডাকের দ্বারা সাহেবগুলি জানা গেলে ডাকদারের হাতে ছোট স্লাম আছে কি বড় স্লাম আছে তা' অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মনিকার মনে পড়লো আজকে অতনুর আসবার কথা। দুই চোখ রগড়ে নিয়ে দুটো হাই তুলে একটুখানি আড়মোড়া দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসলো। শিয়রের ধারে টেবিলের ওপর অতনুর চিঠিটা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, মনিকা সেটা পঞ্চাশবার পড়ে দেখলো। তারপর আলনা থেকে তোয়ালে, শাড়ী আর ব্লাউস হাতে করে নিয়ে চলে গেলো বাথরুমের দিকে।

নিচেরকার ঘরে চায়ের টেবিলে পেয়ালা আর পিরিচের ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে; মনিকার মা কৌশল্যা দেবী নিশ্চয় চা-খাবারের আয়োজন করছেন, আর বালক ভৃত্য ছোট্টু সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ফরমাস খাটছে। ওদিকে মথুর ঠাকুর বোধকরি রান্নাঘরে লুচি ভাজছে, মনিকার বাথরুমে থেকে থেকে ভেসে আসছে টাটকা ঘিয়ের অপরূপ উগ্র গন্ধ। মনিকার বাবা বিলাসবাবু বোধকরি তাঁর আট বছরের মেয়ে, হাসিকে নিয়ে এখনো বাগানে বেড়াচ্ছেন, এটা তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। কৌশল্যা দেবীর চায়ের আয়োজন হয়ে গেলেই ছোট্টু গিয়ে তাঁকে খবর দেয়।

মনিকা বাথরুমের কাজ শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নরম ভিজে চুলগুলির ভেতর চিরুণী চালিয়ে ঠিক করে নিলো। গায়ে খয়েরী রঙের একটা শাড়ী আর বুকে টকটকে লাল রঙের ব্লাউস। কাল বিকেলের দিকে সখ করে চোখে কাজল দেওয়া হয়েছিলো, তার আবছা আভাষ এখনো রয়েছে চোখের পাতায়, মনিকা মুখে স্নো মাখাতে লাগলো।

আজ চার বছর বাদে অতনু এখানে আসছে। সুদীর্ঘ চার বছর; এরি মধ্যে না-জানি কতোখানি বদলে গেছে সে— এবং তার চোখের কাছে মনিকাও। ছেলেবেলা থেকে প্রায় এক সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে দু'-জনে: পাশাপাশি ছিলো তাদের বাড়ী। গরমের দিনে দুপুরে বাগানে গাছের ছায়ায় বসে কাঁচা আম খাওয়া আর বর্ষার দিনে জলে ভেজার অদ্ভুত আনন্দ সব এখনো অস্পষ্ট মনে পড়ে। কৈশোর আর প্রথম যৌবনের সন্ধিক্ষণে দু'টি ছেলে আর মেয়ের দুরন্ত অনাবৃত উল্লাস। একমাত্র মনিকা-দি ছাড়া তখন আর কেই-বা ছিলো অতনুর। এখন সেই অতনুই হয়েতো অনেক বন্ধু-বান্ধব পেয়ে গেছে, নতুন আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসছে সে।

অতনুর ম্যাট্রিক দেওয়ার আর দু'বছর বাকী এমনি সময়ে তার বাবা অকস্মাৎ এখান থেকে বদলি হয়ে গেলেন। সঙ্গে যেতে হল পরিবারের সবাইকে,—অতনুও। বিচ্ছেদটা এতো আকস্মিক যে ছাদে গিয়ে চিলিকোঠায় বসে মনিকাদির গলা জড়িয়ে ধরে নিতান্ত ছোট্ট শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠেছিলো অতনু। মনিকাদির কোনো প্রবোধই তখন তার মন মানতে চায়নি, ছলোছলো চোখে জানিয়েছিলো, মনিকাদিকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না, অন্যত্র গিয়ে সে নিশ্চিত মরে যাবে।

কিন্তু…যাক সে মরেনি। মনিকা স্তিমিত হাসি হাসলো, এখন সে কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, মস্ত দিগগজ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়। নতুন, সম্পূর্ণ নতুন।…

প্রসাধন শেষ করে মনিকা গিয়ে হাজির হল চায়ের টেবিলে। বিলাস বাবু, কৌশল্যা দেবী, হাসি…সবাই ইতিমধ্যে আসন দখল করে' বোধকরি তারই জন্যে অপেক্ষমান,—কিছু না বলে মনিকা সন্তর্পনে বসে পড়লো নিজের জায়গায়।

আর দেড় ঘণ্টা বাদে অতনুর ট্রেন এসে পৌঁছাবে এখানকার প্লাটফর্মে। শুধু ছোট্টু কিংবা মথুরকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করার কোনো মানে হয় না, মনিকা ভাবতে লাগলো, সে নিজেও যাবে কিনা।

একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে মনিকা কিন্তু পীড়িত হ'ল: তার বাবা আর মা অতনুর আগমন সম্বন্ধে কেন যেন বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। মনিকা খুব কম করেও চার-পাঁচবার তাঁদের জানিয়ে দিয়েছে যে অতনু আজ এখানে এসে পড়বে; তবু কেন যে তাঁরা তৎপ্রতি এতো নির্বিকার আর উদাসীন হয়ে রয়েছেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনিকা আঘাত পেলো হৃদয়ে: চায়ের টেবিল—যেখানে যেকোন বাজে বিষয় নিয়ে, যে-কোন বাজে কথাবার্ত্তা হওয়া সম্ভবপর, সেখানেও কিনা আজ অতনুকে কেন্দ্র ক'রে একটা সাধারণ আলোচনা পর্য্যন্ত উঠলো না। বরঞ্চ গতানুগতিক কথাবার্ত্তাও অন্যান্য দিনের চেয়ে কমই হ'ল; খাওয়া শেষ করে অত্যন্ত ব্যস্ততা দেখিয়ে বিলাসবাবু চলে গেলেন বাইরের ঘরে আর কৌশল্যা দেবী রান্নাঘরে। মনে-মনে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ ক'রে শাদা মুখে মনিকা তাকিয়ে রইলো: হাসিও কথা যেন সরে পড়েছে; বাইরে তার সমবয়সীদের দু'একজন অপেক্ষা ক'রছে বোধ হয়।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে মনিকা ভাবতে লাগলো তার বাবা-মা'র এরকম অদ্ভুত

ব্যবহারের কারণ কী। অতনু এই বাড়ীতে আসবে একথা গতকাল বিকালে জানবার পর থেকেই তাঁরা যেন গম্ভীর হ'য়ে অন্যরকম হ'য়ে পড়েছেন। কিন্তু কেন? ...অতনুর বাবার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে আবার কী মনোমালিন্য ঘটেছে? অথবা অতনু নিজেই কী কোনোকালে তাঁর প্রতি অশিষ্ট আচরণ দেখিয়েছে?...মাথামুণ্ডু মনিকা কিছুই ভেবে পেলো না। একবার ভাবলে, ব্যাপার কী মা-কে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা যাক্; আবার ভাবলে, না থাক। ব্যাপার যা-ই হোক্ শিগগিরই জানা যাবে। আগে থেকেই এই নিয়ে অনাবশ্যক হৈ-চৈ হট্টগোল ক'রবার প্রয়োজন নেই।

শেষ পর্য্যন্ত ছোট্টু একা-ই ষ্টেশনে গেলো। আর মনিকা একটা মাসিক পত্র টেনে নিয়ে মনোযোগ দেবার চেষ্টা ক'রলো। কিন্তু বৃথা সাধনা। বাড়ীর সামনেকার রাস্তায় এক-একটা গাড়ীর শব্দ হয় আর অমনি বই ফেলে উঠে, সে গিয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়ায় জানালার ধারে। অনেক ঘোড়ার গাড়ীই গলিপথ দিয়ে আসা-যাওয়া করে, অতনুরটা আর আসে না: ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে ফিরে এসে মাটী থেকে মনিকা আবার বইটে তুলে নেয়।

বাবা আর মা-র ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়ে মনিকা ভাবলে, মথুরকে ষ্টেশনে পাঠাবে কিনা; সে যেন অতনুকে নিষেধ করে এ-বাড়ীতে এসে উঠতে। মিছেমিছি অপমান সইতে সে কেন এখানে আসবে। কিন্তু এই-সুদীর্ঘ চার বছর বাদে অতনু এখানে আসছে—সারাটা পথ ট্রেনে আর ষ্টিমারে হয়তো ভাবতে-ভাবতে এসেছে যে তার মনিকা-দিকে গিয়ে সে কী রকম দেখবে; কী নিয়ে প্রথম আলাপ ক'রবে; কী ভাবে আলাপ ক'রবে। এখন এই কল্পনার চাকায় ...কি ক'রে নির্ম্মম আঘাত দেওয়া যায়! নির্ম্মম আঘাত; অতনু নিশ্চয় শক্ পাবে, সুখের সমস্ত উৎসাহ নিভে আসবে নিমেষে। এতোদিন পরে এ ধরণের আমন্ত্রণ অতনুর প্রত্যাশিত নয়, সেই মুহূর্ত্তে অতনু হিম হয়ে যাবে; চোখের সামনে নেমে আসবে মনিকাদির উদ্ভাসিত দেহ নয়, অমানিশার অন্ধকার।

কী যে ক'রবে ভেবে না পেয়ে নিস্তব্ধ ঘরে মনিকা স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রইলো।

ওদিকে গাড়ীটাকে বিদেয় করে দিয়ে অতনু ততক্ষণে বিলাসবাবুর বাড়ীর বাগান অতিক্রম ক'রে অন্দরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কেউ তার জন্যে বাইরে অপেক্ষা ক'রছে না; ধারে-কাছে কোনো লোকজন নেই, অতনু একটু বিস্মিত হ'ল। তবু এ বাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্র সবই চেনা,—সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে বরাবর মনিকাদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেজানো দরজা একটুখানি ঠেলা দিয়ে ফাঁক ক'রে দেখলে, দরজার দিকে পেছন ফিরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মনিকাদি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' রয়েছে; বসবার ভঙ্গীটা চমৎকার—অতনু চোরের মতো পা টিপে-টিপে এগিয়ে এলো, তারপর হঠাৎ তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্যে প্রায় ঝাপিয়ে পড়লো মনিকা-দির দেহের ওপর।

মনিকা অতিমাত্রায় চমকে উঠলো। দুটো বলিষ্ঠ হাত ততক্ষণে তাকে মনের আবেগে জড়িয়ে ধরেছে—কতোদিন বাদে দেখা! কিন্তু এই আলিঙ্গন তো অতীতের কিশোর অতনুর অভ্যস্ত আলিঙ্গন নয়, কথাটা মনে হতেই মনিকা অনাস্বাদিত উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো, এ যেন কোনো অপরিচিত পুরুষের কঠিন পরশ—মনিকা মুহূর্ত্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো; ঈষৎ হাঁপাতেও লাগলো যেন।

'মনিকা-দি' স্মিতমুখে অতনু বললে: 'আমাকে চিনতে পারছো না?'

বাস্তবিক চিনতে পারছে না যেন; মনিকার মনে হ'তে লাগলো, এ যেন তার কিশোর সহচর অতনু নয়, অন্য কেউ তাকে ছলনা ক'রতে এসেছে এ বাড়ীতে। এ-কী অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন: এই চার বছরের ভেতর অতনু বয়সের অনুপাতে অপ্রত্যাশিত রকম বড়ো হ'য়ে উঠেছে; আগে পাতলা ছিপছিপে দেহের গড়ণ ছিলো এবং এখনো সেরকমই আছে বটে কিন্তু লম্বায় সে মনিকাকে কাঁধের কাছে ফেলেছে। গায়ে ইণ্ডিয়ান সিল্কের পাঞ্জাবী; মাথায় একরাশ

অগোছাল চুল; চোখ দুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল—মনিকা অভিভূত হ'য়ে গেলো।

'মনিকা-দি!' অতনু আবার বললে: 'আমাকে চিনতে পারছো না?'

অতীত দিনের তুলনায় বর্ত্তমানের ব্যবধান যতো বড়োই হ'ক, এখন এই মুহূর্ত্তে বোকার মতো চুপ ক'রে বসে' থেকে সত্যি কোনো লাভ নেই,—মনিকা চেষ্টা ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রে নিলো। তারপর হাসি-হাসি মুখে তাকালো অতনুর দিকে।

'একেবারে বদলে গেছো—' মনিকা বললে: 'গলার আওয়াজ না শুনে তোমাকে চেনে কার সাধ্যি। আমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হ'য়েছে? না আগেই আমার এখানে ছুটে এসেছো?' অতনু না টের পায় এরকমভাবে ব্যবধান বাঁচিয়ে মনিকা একটু দূরে সরে' বসলো।

'আগে তোমার কাছেই ছুটে এসেছি—' অতনু বললে: 'এখন চলো, দেখি, কোথায় তাঁরা রয়েছেন। হাসিটাই বা গেছে কোথায়? কতো বড়ো হয়েছে সে?

বিলাসবাবু আর কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে অতনুর কয়েকটা খুচরো কথাবার্তা হ'ল। অতনুর বাড়ীর সবাই কেমন আছেন; অতনু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কোনো সবজেক্টে লেটার পেয়েছিলো কিনা; (পায়নি: ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছিলো এই পর্য্যন্ত।) ইনটারমিডিয়েট পাশ ক'রে অতনু কি আরো পড়বে না অন্য কোনো লাইনে যাবে, অতনু এখন যে সহরে থাকে সে সহর এ সহর থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে ভালো কি কোন্ কোন্ বিষয়ে খারাপ; কোন্ কারণে অতনুর আশানুযায়ী স্বাস্থ্য-উন্নতি এখনো ঘটেনি—ইত্যাদি।

একটা প্রশ্ন তাঁরা ক'রতে গিয়েও থেমে গেলেন। সেটা এই যে অতনু এই বাড়ীতে কতোদিন থাকবে বলে' ঠিক ক'রেছে, এবং অতনু যে এখানে এসেছে সেটা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যেই, না অন্য কোনো প্রয়োজন আছে। অতনুর অভিভাবকেরা জানেন কিনা যে অতনু এখানে এসেছে। অতনু কলেজ হোষ্টেলে থাকে।

প্রশ্নবর্ষণ স্থগিত হ'লে ছাড়া পেয়ে মনিকার সঙ্গে অতনু আবার ওপরের সেই নিভৃত কক্ষে চলে' এলো: বাড়ীর সমস্ত ঘরের ভেতর এই ঘরটাই বোধকরি সবচেয়ে ভালো। এখান থেকে বাগানটা চমৎকার চোখে পড়ে, দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া চলাচল করে।

'বাড়ীময় একটা গম্ভীর আবহাওয়া দেখছি—' একটু ইতস্তত: ক'রে অতনু বললে: 'আগে তো এরকম ছিলো না, মস্ত পরিবর্ত্তন এসে গেছে—কী বলো'?

'কিন্তু কারণটা ভারী চমৎকার—' হাসবার চেষ্টা ক'রে মনিকা বললে: 'বছরের বিবর্ত্তনে আমাদের দু'জনেরই বয়স বেড়ে গেছে, কৈশোরের চঞ্চলতা আর নেই, সারল্যের পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্য মনকে আচ্ছন্ন করেছে। অর্থাৎ আমরা নিজেরাই গম্ভীর হ'য়ে পড়েছি, অতএব পৃথিবীর সব কিছুই এখন থেকে আমাদের কাছে গম্ভীর ঠেকবে।'

কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে বোধকরি সংশয় নেই। অতনু ভাববার চেষ্টা করলো এরকম মতবাদ তার পরিচিত কোনো কবির কবিতায় সে ইতিপূর্ব্বে পেয়েছে কিনা? প্রিয় কবি ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থকে মনে পড়লো যিনি শিশুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফিলজফার বলেছেন।

'আচ্ছা মনিকাদি—' অতনু বললে: 'চার বছর ধ'রে আমাদের তো কোনো মুখোমুখি সাক্ষাৎ নেই, কিন্তু আমার চিঠি-গুলি তো তুমি নিয়মিত পেয়েছো, তাতে কি কোনো পরিবর্ত্তন ধরা পড়েছে? চিঠির ভেতর দিয়ে মানসিক পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করা নিশ্চয় অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমার কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছো নাকি?'

'সামান্য কিছু আভাস পাওয়া গেছে বটে—অনেক চেষ্টা করে মনিকা বললে: 'কিন্তু যে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে কীই বা বলবার আছে মানুষের!'

এই প্রসঙ্গে অতনুর লিখিত একটা চিঠির অংশবিশেষ তার মানসনেত্রে ভেসে উঠলো, লাইন কয়েকটি এই রকম: মনিকাদি এখানে তোমার মত সুন্দর, তোমার চেয়ে বেশী সুন্দর আর তোমার চেয়ে কুৎসিত এরকম অনেক মেয়েকেই প্রতিনিয়ত দেখে থাকি। ইচ্ছা করলে তাদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ করতে পারি, সে সুযোগও রয়েছে। কিন্তু পাছে তাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশায় তোমাকে ভুলে যাই এজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকি। আমার মনে তোমার জন্যে যে আসন এবং একমাত্র আসন নির্দ্দিষ্ট রয়েছে সেটা অন্য কেউ কোনোদিন অধিকার করে বসবে এ আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।······

এই কয়েকটি লাইন মনিকা অনেকবার পড়েছে, এতোবার পড়েছে, যে তার প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে। সে মনে-মনে ভারী খুসী হয়েছিলো অতনুর উদারতা দেখে,

মুগ্ধ হয়েছিলো, অথচ বিনিময়ে কীই বা দেবার আছে অতনুকে।

মনিকা নিজে পড়াশোনা বেশীদূর করেনি ইস্কুল-জীবনে সে মধ্যমাত্রী গোছের ছাত্রীদের চেয়েও অনেক খারাপ: অতএব কোনো গতিকে সেকেণ্ড কেলাসে উঠে উপরি-উপরি দু'বার বছর নষ্ট করে আর সে অগ্রসর হয়নি। বাড়ীতে ফিরে এলো। কিন্তু অতনু নিজে তার মনিকাদি সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান। নাই বা হল চলতি গতানুগতিক বিদ্যালয়ের পড়া—বিদেশ থেকে অতনু বিভিন্ন বাছাইকরা বাংলা গল্প প্রবন্ধ উপন্যাসের বই পাঠাতে লাগলো মনিকাকে: এতোদিনে এক আলমারী প্রায় ভরে গেছে। এই যে এতো-এতো বই, মনিকা বিশেষ করতো, তার মতো তুচ্ছ মেয়ের জ্ঞানের বিস্তৃতির পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট: মনিকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো।

'তুমি আমার জন্যে যতোটুকু করছো—' অতনুর চোখের ওপর চোখ রেখে মনিকা না বলে থাকতে পারলো না: 'তার জন্যে আমি খুব কৃতজ্ঞ, অনু!'

'এসব তো কিছুই নয়—' ঘাড় নেড়ে অতনু বললে: 'তুমি খামকা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে যাবে কেন? তুমি তো জাননা তোমার জন্যে আমি কতোদূর কী করতে পারি। আমার অন্তরে তুমি ছাড়া যে আর কেউ-ই নেই, মনিকাদি!'

মনিকা চুপ করে রইলো।

'সমগ্র পৃথিবীটা একদিকে—' মনের আবেগে অতনু বলে যেতে লাগলো: 'আর, আমি তুমি অন্যদিকে। যদি তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমার হাতে হাত রাখো, সংসারের সবকিছু বাধাবিপত্তি সইতে পারবো আমি। এটা জেনো, তোমার কাছে এসে যে শান্তি পেতে পারি সেরকম পৃথিবীর আর কোথাও পাবো না। তাইতো তোমাকে এতো কাছে পেতে ইচ্ছে করে।'

'কাছে পেতে ইচ্ছে করে—' মনিকা কৌতুকভরা কণ্ঠে বললে: 'আমাকে চিরকাল তোমার কাছে রাখবার উপায় আছে নাকি কোনো? এতো যে আবদার করছো, কিছুদিন পরে আমি অন্যত্র চলে গেলে তখন কী করবে?'

'তার মানে?' অতনু উদগ্রীব হয়ে উঠলো: তুমি আবার অন্যত্র কোথায় যেতে চাও?' একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে বললে: 'বিয়ের কথা বলছো?'

'ধরো যদি তাই হয়—' মনিকা হাসবার চেষ্টা করলে: 'চিরটা কাল বাবা-মার ঘরে বসে রইবো এমন তো কোনো কথা নেই! বিয়ের পর স্বামীর ঘরে চলে গেলে তখন আমার দর্শন পাওয়া হয়তো কঠিন হয়ে উঠতে পারে।'

'কিন্তু সত্যি কি তুমি বিয়ে করবে?' অতনু মুহূর্তে মুষড়ে পড়লো যেন।

'করলে কি খুব বেশী অন্যায় করা হবে?' মনিকা টেনে টেনে হাসতে লাগলো।

'আমি কিন্তু আজীবন চিরকুমার রইবো—' ঈষৎ বিষাদমিশ্রিত সুরে অতনু বলতে লাগলো: 'আচ্ছা, মনিকাদি, আমি যদি আজীবন বিয়ে না করে থাকতে পারি, তুমিও কি সেরকমভাবে থাকতে পারো না?'

দুপুরের আগে খাবারের ঘরে আবার সকলের দেখা পাওয়া গেলো। খেতে বসে বিলাস বাবু আর কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে অতনুর আরো কিছু আলাপ হ'লো। অতনুদের ওখানে এখন কী রকম গরম পড়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় কিনা, মশার উৎপাত কী রকম—এখানে অনেকদিন পরে এসে অতনু কোনো রকম বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে কিনা, পুরাতন বন্ধুদের কারুর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক কিনা, ঠাকুরের রান্না কী রকম লাগছে···এই সব।

দুপুরে সূর্য্য যেন অনন্ত অগ্নিকুণ্ড; বাতাসে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছিটাতে থাকে ক্রমাগতঃ যে যার ঘরে দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে শুয়ে থাকতে পারলে বাঁচে—ঠাণ্ডা মনোরম মেঝের ওপর। অতনুকেও থাকবার জন্যে একটা ছোট্ট ঘর ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে: ঘরের গরমে ভালো লাগে না; অতনু ঘর ছেড়ে চলে আসে মনিকার কাছে।

মনিকা খুশী হয়। বলে: 'দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস বুঝি নেই?'

'তোমারও তো তাই দেখছি—'অতনু একটা চেয়ারে বসে পড়ে।

মনিকা আড় চোখে অতনুকে দেখে নেয়। স্বভাব আর ব্যবহারের দিক থেকে বিবেচনা ক'রলে পরস্পরের যে খানিকটা মিল আছে এমন নয়। সম্ভবতঃ এটা ছেলেবেলাকার সুখদুঃখ-বিচারণার প্রতিক্রিয়া; অসম্ভব নয়, দু'-জনেরই ঘুম হয় না দুপুরে।

'তুমি আগের থেকে অনেক বেশী সুন্দর হ'য়েছো মনিকা-দি—' অতনু হঠাৎ বলতে আরম্ভ ক'রলো: 'বেশ মানান সই মোটা সোটাও হ'য়েছো দেখছি।'

অতএব অতনুকে আর ছেলেবেলাকার অতনু বলে' ভুল ক'রবার উপায় নেই। আজকের অতনু মনিকার চোখে যেন সম্পূর্ণ নতুন কোনো মূর্ত্তি ধরে' এসেছে: কথায় তার বিদ্যুত আর ভাব-এ তার বন্যা; মুখেচোখে প্রথম যৌবনের স্বর্ণপ্রভা দীপ্তি; বলসঞ্চারিত বলিষ্ঠ বাহুযুগে বিশুদ্ধ রক্তের তপ্ততা।

'হোষ্টেলে বসে' পরীক্ষাসঙ্কুল একঘেয়ে জীবন যাত্রার ফাঁকে প্রায়ই তো তোমাকে মনে পড়ে—' অতনু বলে' চলেছিলো: 'আর ভাবি, হে ঈশ্বর, কবে মনিকা-দির সঙ্গে দেখা হবে। এক-একবার ভাবি কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে দেই; মনিকা-দিকে সঙ্গে ক'রে পালিয়ে যাই এমন জায়গায়

যেখানে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না ; দু'জনে মনের আনন্দে ছোট্ট ঘরে থাকবো সেখানে।'

অতনুর চোখে মনিকাও বুঝি আর আগেকার পুরোপুরি মনিকা-দি নয়। এই তো এক মুহূর্ত্তে এই ঘরে বসে' পরিণত বয়সের প্রেরণায় নিটোল স্বাস্থ্য আর রূপলাবণ্যের কমনীয়তায় মনিকাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। আজকের মনিকায় আর সেদিনের উচ্ছ্বাস নেই: আজকের মনিকা অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত সাবধানী—কিন্তু অনাস্বাদিত অনুভূতির দুরন্ত আবেগকে সে লুকোবে কোথায়?

'এই কবিতাটি পড়ে শোনাও তো—' কথোপোকথনের মোড় ফেরাবার জন্যে হাতের বইটা মনিকা অতনুর দিকে এগিয়ে দিলো: 'দেখি কেমন পড়তে পারো!'

দ্বিরুক্তি না ক'রে অতনু পড়তে লাগলো:

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিব না মোরা, প্রিয়ে,
ভাগ্যের পায়ে দুর্ব্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

(ক্রমশঃ)

নূতনের সূচনা

অনেক কথাই শুনেছেন—"দেশের মাটি" সম্বন্ধে। তাই এই ছবির মুক্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আর বেশী কিছু বলবার দরকার আছে বলে মনে করি না। তবে সেদিন হঠাৎ ভাগ্য ক্রমে ছবিখানি একবার দেখলাম বলে এর বিষয় নতুন দু-একটি কথা আপনাদের বলা মাত্র।

* * *

পূর্ব্বে মনে করেছিলাম ছবিখানি চাষ আবাদ নিয়েই আগাগোড়া তৈরী হয়েছে, কিন্তু ছবি দেখে আমাদের সে ধারণা বদলে গেল। এই ছবির মধ্যে যে চমৎকার একটি কাহিনী রয়েছে, তা সত্যই অনবদ্য। এ এমন সুন্দর একটি কাহিনী যা চিত্রে আমরা পূর্ব্বে বিশেষ পাই নি।

* * *

এই কাহিনীর মধ্যে মানুষের মনের বিবিধ প্রকার ভাবাবেগের খেলা এমন ভাবে দেখান হয়েছে, যা সত্যিই অনন্য সাধারণ বলে মনে করি। কেবল নাচগান আর বিলাস দৃশ্যের অবতারণা করে দর্শক চিত্ত মাৎ করবার কোন চেষ্টা এই ছবিতে নেই। ছবিটিকে দেখে এই কথাই আমার বারবার মনে হচ্ছে যে—হ্যাঁ-এতদিনে এমন একটি ছবি আসছে যা এক পরিবারের সকল বয়সের সকলে একসঙ্গে বসে দেখে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

* * *

"দেশের মাটি" চিত্রে এমন কোন ঘটনা, কথাবার্ত্তা, বা ইঙ্গিত নেই যাতে কেউ কোন প্রকার আপত্তি নিতে পারবেন। আমরা খুব মন দিয়ে ছবিখানি দেখেছি, তাতে আমরা অন্ততঃ এমন কোন কিছু পাই নি যাতে আপত্তি করতে পারি।

* * *

এই ছবির কাহিনীর মধ্যে আমাদের দেশের গ্রামকে এবং গ্রামের নানা ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যে সকল গ্রাম্য চরিত্র আমরা ছবিতে দেখতে পাব—তাদের অনেকেই হয়ত খুব পরিচিত বলে মনে হবে। গ্রামের সুখ দুঃখের কথা যাদের মনে জাগে তাঁরা এই সব ব্যাপার চিত্র-কাহিনীতে দেখে নিশ্চয়ই খুশী হবেন এবং গ্রামের দুরবস্থার কথা মনে করে হয়ত কিছু দুঃখও পেতে পারেন।

* *

ছবিতে দর্শককে দুঃখ দেওয়া চিত্র-নির্ম্মাতার উদ্দেশ্য নয়। "দেশের মাটি" চিত্র দেখে অনেকের মনে দুঃখ হলেও এর ফল অন্যদিক দিয়ে ভাল হবে। কারণ দুঃখ পাবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মনে একথা জাগা স্বাভাবিক যে কি করে দেশের এবং গ্রামের দুঃখ দূর করা যেতে পারে।

* * *

আপনারা জানেন বাংলাদেশের গ্রামে শিক্ষা বা সভ্যতার আলোক খুব বেশী প্রবেশ করে নি। ছবি দেখেও তাই প্রথমে আমাদের মনে হয়। কিন্তু ছবি দেখে একথাও আপনারা জানতে পারবেন যে—গ্রামের লোকদের মধ্যে শিক্ষা তেমন না থাকলেও তাদের নতুন কিছু শিখবার আগ্রহ আপনার চেয়ে কম নয়। ঠিকমত শেখাতে পারলে তারা দেশের জন্য সব কিছুই করতে পারে।

* * *

সত্যি কথা বলতে কি পূর্ব্বে দেশের এত রকম সমস্যার কথা আর কোন ছবিতে আমরা বোধহয় দেখিনি। 'সমস্যার কথা' বললাম এই জন্যে যে চিত্রের চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তার মধ্যে দর্শক অনেক কিছুই শুনতে পাবেন এবং যা শুনে তাঁদের মনে নানা প্রকার চিন্তাও আসতে পারে।

* * *

দেশের চাষ-আবাদ বিষয়ে যে সকল কথা ছবিতে বলা এবং দেখান হয়েছে, তাও বিশেষ করে ভাববার বিষয়। বিদেশে আজ চাষের কাজে বৈজ্ঞানিক কলকব্জার ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। তাতে চাষীদের লোকসান কিছুই হয় নি। প্রথমে আপত্তি বা সন্দেহ হলেও পরে চাষীরা কলকব্জার সাহায্য চাষের সকল কাজে আনন্দের সঙ্গেই নিয়েছে। আমাদেরও হয়ত অচিরেই তা করতে হবে।

* * *

মোটের ওপর "দেশের মাটি" চিত্রে সব কিছুই এক অতি বিচিত্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে বলা বা দেখান হচ্ছে। কাহিনীকে রাখা হয়েছে প্রধান—আনন্দদান প্রচেষ্টা রয়েছে মুখ্য, তার সঙ্গে গৌণভাবে বহু কিছু দেশহিতকর ব্যাপার এই ছবিতে পাবেন। এবং একথাও বলা দরকার যে আপনারা এই ছবিকে সামান্য জিনিষ বলে নিলে নিজের প্রতি অবিচার করবেন।

* * *

আগামী শনিবার ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে চিত্রা এবং নিউ সিনেমায় এই ছবিখানি আপনারা দেখতে পাবেন। তখন দেখবেন, আমরা যা বলছি তা ঠিক কি না।

বৈচিত্র্যের পাদমূলে কৃষ্ণচন্দ্র দে—'নটীর পূজার' গানের কৌতুককর দুরবস্থা রঞ্জিত রায়ের হাসির গান

এবার আমরা সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হিজ মাষ্টারস ভয়েসের সমালোচনা প্রকাশ করিলাম। হিজ মাষ্টার ভয়েসের রেকর্ড পুস্তিকাখানি এবার পূর্ব্বাপেক্ষা বেশ সুদৃশ্য হইয়াছে, প্রত্যেক রেকর্ডের পরিচিতির সহিত যে ছোট ছোট চিত্রগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহাতে পুস্তিকাখানির বহুলাংশে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। রেকর্ড রসিকদের নিকট পুস্তিকাখানি বিশেষভাবে আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রী৺শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই অর্থাৎ এই মাসের শেষে এই কোম্পানীর অক্টোবর মাসের রেকর্ডগুলি বাজারে উপস্থাপিত করা হইবে। এত রকমের রেকর্ড এ মাসে প্রকাশ করা হইয়াছে যে বিভিন্নরুচি সম্পন্ন শ্রোতৃসাধারণের প্রত্যেকেই এ মাসের তালিকায় নিজ নিজ মনোমত রেকর্ড পাইবেন।

* * *

এই পূজার প্রধান খবর ট্রেডাস বুরোর কে, বি, ক্লাবের পরিচালনায় হাস্যরসিক গীতশিল্পী শ্রীনারদা গুপ্তের সম্পাদনায় 'সুরশ্রী' নামে একখানি রেকর্ড-প্রধান মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। অদ্যাবধি চলচ্চিত্র বিষয়ক, বেতার বিষয়ক ও অন্যান্য বিষয়ে নানাবিধ সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু রেকর্ড সংক্রান্ত পত্র এই প্রথম। 'সুরশ্রী' যে রেকর্ড রসিক এক সম্প্রদায়ের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা আশা করা যায়।

* * *

হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস পি ১১৮২৮ :—
এই রেকর্ডে বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে শৈলেন রায় রচিত এক-পিঠে 'আবার নতুন করে জল আসে রে' ও অন্যপিঠে '(আমার) ভাঙা এ ঘর উজল করে' এই দুইখানি নূতন আমদানী গীতি-কাব্য পরিবেশন করিয়াছেন। কৃষ্ণবাবুর গান সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, তবে নিম্নলিখিত বিষয়ে আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যাহা এই থালিকায় (disc) রেকর্ড করা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহাকে গীতি-কাব্য বলিয়া চালানো হইয়াছে,—তাহার বিশেষত্ব এই। প্রথম গানখানির আট পঙক্তি গাহিবার পর 'সেদিন ছিল আমার হাতে……ফুটেছে কমল!' এই সাত কলি কৃষ্ণবাবু ক্রন্দনের সুরে আবৃত্তি করিলেন, আবার শেষ চার কলি গাহিতে আরম্ভ করিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডেও তদ্রূপ পাঁচ পঙক্তি গাহিবার পর

"দিনগুলি সব ভালোই কাটে
সুখের সোয়াদে;
যখন তখন জড়িয়ে গলা সোহাগে
বাঁধে।

বুকের 'পরে এলিয়ে পড়ে'
মুখখানি দি' চুমোর ভরে',
হেসে বলি: 'পিঞ্জরা আমি,
তুমি পরাণ-পাখী!'
সে হেসে কয়: '………'"

এই সাত লাইন পূর্ব্ববৎ ক্রন্দনের সুরে আবৃত্তি করিয়া হঠাৎ

"......তুমি যে ফুল,
(তোমায়) খোঁপায় বেঁধে রাখি।"

সুর ধরিয়া গাহিয়া উঠিলেন ; অতঃপর আবার আট লাইন পূর্ব্বোক্তরূপ আবৃত্তি করিয়া শেষের দুই কলি গাহিয়া রেকর্ড শেষ করিলেন। এই হইল নূতন আমদানী গীতি-কাব্য। আবৃত্তিতে কতকাংশে সুরের প্রয়োজন হয় তাহা সকলেই জানেন এবং আবৃত্তি যে গীত অপেক্ষা যথেষ্ট নিম্নস্তরের তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। গীতি-কাব্যের আশ্রয়ে গান এবং আবৃত্তির জগা-খিচুড়ি একটু বৈচিত্র্য বটে এবং বৈচিত্র্যের নামে ইহাও যদি সাধারণের গলধঃকরণ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সাধারণের রুচি ভীষণভাবে নিম্নাভিমুখী হইতে চলিয়াছে। কৃষ্ণবাবু যে বৈচিত্র্যের পাদমূলে রেকর্ড আসরের এতদিনের সুনাম বলিদান দিবেন তাহার জন্ম কালই যে সর্ব্বতোভাবে দায়ী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গান এবং আবৃত্তির সংমিশ্রণ এই গীতি-কাব্য রেকর্ডের সহিত কৃষ্ণবাবুর নাম জড়িত বলিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

* * *

এন ১৭১৮২ এচ এম্ ভি :—সুপরিচিতা গায়িকা কুমারী যুথিকা রায় (রেণু) খোল, খঞ্জনী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায় 'যদি যমুনার জলে ফুল' ও 'মন-বৃন্দাবনে রাস-মঞ্চে' এই দুইখানি শ্রীকৃষ্ণের ভজনগান রেকর্ড করিয়াছেন। পূর্ব্বের তীব্রতা হ্রাস-প্রাপ্তির দরুণ কুমারীর কণ্ঠ ইদানীং আরও ভালো হইয়াছে। গান দুইটি সুগীত হইয়াছে বলা চলে।

* * *

এন্ ১৭১৮৩ এচ এম্ ভি :—রেকর্ড আসরের সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীমৃণাল কান্তি ঘোষ এই রেকর্ডে 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে' ও 'ওরে সর্ব্বনাশী মেখে এলি' নজরুল-রচিত এই দুইখানি শ্যামা-সঙ্গীত রেকর্ড করিয়াছেন। খোল-খঞ্জনী প্রভৃতি সহগামী সঙ্গীতের সহিত সুকণ্ঠ-শিল্পীর সরল-প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে।

* * *

এন্ ১৭১৮৬ এচ এম্ ভি :—এই রেকর্ডে কুমারী রেবা সোমের দুইখানি গীতি-চিত্র 'ওগো তেপান্তরের রাজকুমার' ও 'রাঙা মাটীর দেশে বনের ছায়ে' পরিবেশন করা হইয়াছে। দুইটী গানই বৈচিত্র্যপূর্ণ সুশ্রাব্য অর্কেষ্ট্রার সহিত অধিকাংশ ইংরাজী সুরে গীত হইয়াছে। আপেক্ষিকভাবে প্রথম গানখানির সুর শ্রোতাকে দ্রুত মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টির ধর্ত্তাই সঙ্গীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * *

এন্ ১৭১৮৪ এচ এম্ ভি :—জসীম উদ্দীনএর রচনা ও সুর-সংযোজনায় আব্বাস উদ্দীন এই রেকর্ডে 'আমায় এত রাতে কেনে' ও 'আমার গলার হার খুলে নে' এই দুইখানি ভাটিয়ালী গান একতারা প্রভৃতি যথাযোগ্য বাদ্যযন্ত্রাদি সহযোগে নিজস্ব ধারা অনুযায়ী রেকর্ড করিয়াছেন। ইহাতে অভিনবত্ব বা বৈশিষ্টের আভাস মিলিবে না।

* * *

এন্ ১৭১৯৩ এচ এম্ ভি :—রেকর্ডের আসরে নবাগতা আগ্রার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র তালুকদারের কন্যা কুমারী দীপালি তালুকদার এই রেকর্ড মারফৎ দুইটি খেয়াল গান পরিবেশন করিয়াছেন। 'রুমঝুম্ ঝুমঝুন্ নূপুর বোলে' একদিকে এই নট-বেহাগ ও অন্যদিকে 'মেঘ-মেদুর বরষায় কোথা তুমি' এই 'জয়জয়ন্তী—তেতালা'টি রেকর্ড করা হইয়াছে। ইনি নাকি ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ভ্রাতা ওস্তাদ তসুদ্দক হোসেন সাহেবের নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষা করিয়াছেন এবং ভারত-বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের বিশিষ্টা ছাত্রী। যাহা হউক গান দুইখানি সুগীত হইয়াছে এবং জয়জয়ন্তী খানি আমাদের বিশেষ-ভাল লাগিয়াছে।

* * *

এন ১৭১৮৫ এচ এম্ ভি :—শ্রীমতী পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায় এই রেকর্ডে আড়বাঁশী একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের সহগামীত্বের সহিত একদিকে 'নিশির নিশুতি যেন' ও অন্যদিকে 'ও বন্ধু! দেখলে তোমায় বুকের মাঝে' এই দুইখানি কাজী নজরুল লিখিত গ্রাম্য গান রেকর্ড করিয়াছেন। শ্রীমতীর সুমিষ্ট কণ্ঠের গুণে গান দুইখানি শ্রুতিমধুর হইয়াছে! গ্রাম্য গানের একঘেয়ে ঢঙ এই রেকর্ডে নাই।

* * *

এন ১৭১৯২ এচ এম্ ভি :—এক সময়ের রেকর্ড-জগতের শ্রেষ্ঠ-গায়ক কে, মল্লিক যাহার 'ছাড়িয়ে সংসার কোথা চলি যাও' গানটি অদ্যাবধি সাধারণ্যে সমাদৃত, তিনি বহুদিন পরে নজরুল লিখিত দুইখানি আমদানী গান সতেজ কণ্ঠে রেকর্ড করিয়াছেন। একদিকে 'বর্ষ গেল, আশ্বিন এল', ও অন্যদিকে 'তোর মেয়ে যদি থাকত উমা' রেকর্ড করা হইয়াছে। আগমনীর গান, দেহতত্বের গান প্রভৃতি type গানে এখনও কে, মল্লিক যে পুরাতন নহেন তাহা এই রেকর্ড হইতে সম্যকরূপেই উপলব্ধি করা যাইবে।

* * *

এন ১৭১৯১ এচ এম্ ভি :—শ্রীমতী সুধীরা ও ইন্দিরা সেনগুপ্তা উপযুক্ত আ[illegible] সঙ্গীতের সহিত সম্মিলিতভাবে এই রেক[illegible] দুইখানি শ্রীকৃষ্ণের ভজনগান গাহিয়াছেন। Base part গুলিতে পুরুষ-কণ্ঠের সম্মিলনে ও সুর মহিমায় প্রথম গানখানি সুন্দর হইয়াছে। দ্বিতীয় গানখানি সুবিধাজনক হয় নাই।

* * *

এন্ ১৭১৯৪ এচ্ এম্ ভি :—এ মাসের রেকর্ড-ত লিকায় শ্রীরঞ্জিত রায়ের হাসির গানের রেকর্ডখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুইটি গানেরই কথা ও সুর যোগাইয়াছেন নজরুল ইস্‌লাম। একদিকে 'কলির কেষ্ট'এর কার্টুন-চিত্র অঙ্কন করিয়া 'ওহে শ্যামো হে শ্যামো, নামো হে নামো' গানখানি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজার প্রসিদ্ধ গান 'আমার ক্ষম হে ক্ষম, নমো হে নম' গানখানির সুরের কাঠামো লইয়া শিল্পী এমন কৌতুককরভাবে শ্রোতার নিকট উপস্থিত করিয়াছেন যে মূল গানখানি যিনি শুনিয়াছেন তিনি কোন ক্রমেই হাস্য-সংবরণ করিতে পারিবেন না। মূল গানটিতে মধ্যে মধ্যে যে 'আ আ আ আ আ আ' করিয়া তান দেওয়া হয় সেটির যে কৌতুককর দুরবস্থা শিল্পী করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়। পুস্তিকায় বা রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের মূল গানের ঋণ স্বীকার করা হয় নাই। অন্যদিকে শ্রীধীরেন দাসের বক্তৃতার পর ইংরাজী সুরে সুমধুর অর্কেষ্ট্রা বাজানোর সহিত আধুনিক নৃত্য-সাধনার ব্যঙ্গচিত্র অর্থবিহীন 'সাম্ পম্ সাম্ পম্' হাস্যরসাত্মক গানখানি শ্রোতৃ-বর্গকে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিবে। অর্থের দিক দিয়া ধরিলে গানখানিকে nursery rhymeএর পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং সেদিকেও প্রথম গানখানি মোটেই উন্নত নয় কিন্তু রঞ্জিত রায়ের representation অতি চমৎকার হইয়াছে।

* * *

এন ১৭১৮৮ এচ এম্ ভি :—এই রেকর্ডে বিচিত্র বাজনার সহিত মণিবর্দ্ধনের নৃত্য-ছন্দ,—একদিকে রূপকুমার নৃত্য বা ফুলের জাগরণ ও অন্যদিকে দেবদাসী-নৃত্য, রেকর্ড করা হইয়াছে। ইহার সহিত রঞ্জিত রায়ের পরিচালনায় যে অর্কেষ্ট্রা বাজানো হইয়াছে তাহা চমৎকার। রেকর্ডখানি সবিশেষ শ্রুতিসুখকর।

* * *

এন্ ১৭১৮৭ এচ এম্ ভি :—বেতার-বৈঠকের সুপরিচিত বাদক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার একদিকে 'কোন সগনে জনম নিলাম' এই ঝুমুর গানখানির সুর লইয়া ও অন্যদিকে কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্তৃক গীত 'আমি চন্দন হইয়া শীতল পরশে' এই কীর্ত্তন গান খানির সুর লইয়া ক্লারিওনেটএ সুরের অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতের সহিতই স্ব স্ব যথোপযুক্ত আনুসঙ্গিক যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র
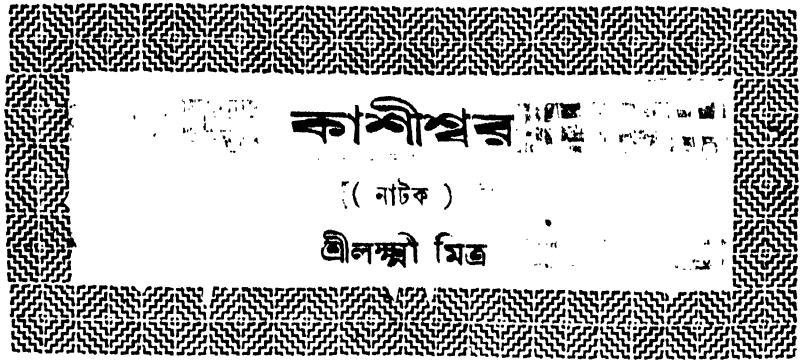
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তৃতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য—ঘর

দিলীপ ও যোগমায়া

যোগমায়া—ওরে আমি জানি, সব জানি। কিন্তু মাকেও তো ফেলে দিতে পারবিনি বাবা! তোকে পেটে ধরে আমি কলঙ্ক পেয়েছি বটে, কিন্তু কলঙ্কিতা তুই আমায় বলতে পারবিনি; মর্য্যাদাহীন অসত্য বলে তুই আমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবিনি দিলীপ :—অবাক্ হয়ে যাসনে, আমি এমন কিছু সজ্ঞানে কোরিনি দিলীপ যাতে কোরে কারুর মাথা হেঁট হয়। তা যদি হোত তা হলে দ্বিজেনের বাবা আমায় এতোদিন ধরে রাণীর গৌরব দিতে পারতো না :—তা নয় দিলীপ, তা নয়!

দিলীপ—কৈফিয়ৎ আমি চাইনা। কৈফিয়ৎ দিওনা।

যোগমায়া—শুনবিনি তুই?

দিলীপ—না।

(বলিয়া মুখ ফিরাইল)

যোগমায়া—কেন শুনবিনি? কেন আমি জ্বলে পুড়ে মরবো? কেন তুই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবি তাহলে?

দিলীপ—কেন!......

(অবাক হইয়া যোগমায়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল মুহূর্ত্তকাল)

তুমি জানো 'মা' কথার পরিচয় কি? জানো কেন ঐ একটি শব্দ সারা পৃথিবীর মানব মনের জীবন মরণের দোল? জানো তুমি?

যোগমায়া—জানি।

দিলীপ—জান না।—গর্ভধারিনী মানে মা নয়। জান না তুমি :—

(ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল)

প্রতিবিন্দু যার পবিত্রতা সেই হচ্ছে মা। দেবত্ব যাকে আশ্রয় কোরে মহিমান্বিত সেই হচ্ছে মা।

(সহসা উত্তেজিত হইয়া বলিল)

তুমি আমার এই কল্পনায় আঘাত করেছ। আমার ধ্যানের মাকে তুমি হত্যা কোরেছ। —তোমার আমি কোন কৈফিয়ৎ শুনতে চাইনা।

(সুনীলার প্রবেশ)

সুনীলা—দিলীপ !—ও জ্যাঠাইমা !—কিন্তু এতো গোলমাল কেন ? তোমার ঘুম ভাঙলোই বা কি কোরে ?…একি, খুব যে ঘেমেছ দেখছি !—না, আর একটিও কথা নয়। তুমি এখুনি শুয়ে পড়বে।—আর জ্যাঠাইমা, তুমি আর সময় পেলে না ? এই রাত্রে তুমি এলে ঐ রোগীর ঘুম ভাঙিয়ে কথা কইতে ! এখন চলো দিকিনি, শোবে চলো।—ওর সঙ্গে আর দেখা কোরোনা। ওকে তাহলে আর বাঁচাতে পারবে না।

যোগমায়া—না মা, দেখা কোরব না। এই শেষ। ওকে বলতে চাইলাম, ও শুনলে না। ভেবেছিলাম ওর কাছে বিচার পাবো, কিন্তু বিচারক আমার মুখ ফিরিয়ে রইলেন ! এইবার আমার শাস্তি নেবার পালা।… বেশ, তাই হবে দিলীপ, তাই হবে। শাস্তিই আমি নোব

(বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন)

জানিস্ মা, ও ভেবেছে ওর মা একটা চরিত্রহীনা ইতর মেয়ে ! ভেবেছে—না, সে থাক। সে আমি বলব না।

(প্রস্থান)

সুনীলা—একবারটি গেছি অমনি এক কাণ্ড হয়ে গেল। জ্যাঠাইমারও দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে যাক্—এখন কি তুমি একটুখানি হরলিক্ খাবে, না এমনি আবার শুয়ে পড়বে ?

(দিলীপ সুনীলার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল) কথা কইছো না যে ? ওসব চিন্তা মন থেকে দূর কোরে দাও দিলীপ। শান্ত হও, স্থির হও।

(বলিয়া দিলীপের হাতখানি ধরিল ও হাসিয়া বলিল)

কি, আমার মুখের দিকে অমন চেয়ে রইলে কেন বলতো ?—আমায় দেখতে বুঝি খুব ভালো ?

(দিলীপ কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া রহিল, দেখা গেল তাহার চোখ দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে) ওমা তুমি কাঁদছো ! কি হল আবার ?…

দিলীপ—আমার মা ! সুনীলা, আমার মা !

সুনীলা—কি তোমার মা ?

দিলীপ—না কিছু না। আমি সামলে নিয়েছি। ঠিক আছে। আলোটা নিবিয়ে দাও। একটুখানি আমায় একলা থাকতে দাও।

সুনীলা—দিচ্ছি আলো নিবিয়ে। কিন্তু একলা থাকতে তোমায় আমি আর দোব না।

(বলিয়া সুনীলা ঘর অন্ধকার করিয়া দিল)

দিলীপ—আচ্ছা দিও না।

সুনীলা—এইবার একটুকু ঘুমিয়ে নাও। রাত আর কতটুকুই বা রইল।

দিলীপ—নো'ব। কিন্তু আলোটা জ্বেলে দাও। অন্ধকার সহ্য কোরতে পারছি না। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠছে আলোর কমল—আমার ভুলে-যাওয়া অতীতের দিনগুলি ! জ্বালো, জ্বালো, আলো জ্বালো ; আমি সহ্য কোরতে পারছি না অন্ধকার !…

(সুনীলা আলো জ্বালিয়া দিল)

সুনীলা—কি রকম হচ্ছে বলতো ?

দিলীপ—কিছুই হয়নি। শুধু মনে পড়ে। আর কিছু না।

—মনে পড়ে আমি ঐ মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেললে মা কখনও সহ্য কোরতে পারতো না। আমায় না খাইয়ে মা নিজে খাসতে পারতো না। আর আজ আমার সামনে কি অভিনয় অনুষ্ঠিত হোয়ে গেল তুমি স্বচক্ষে দেখতে পেলে। মা কাঁদতে লাগলো, হাতজোড় কোরে ক্ষমা চাইলে, আর আমি পাথরের মূর্ত্তির মতো ব'সে রইলাম !

সুনীলা—মাকে ডাকবো দিলীপ ?

দিলীপ—(তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল) না, না, ওরে না। ও আমার মা নয়। আমার মা মরে গিয়েছে। —কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে ?

(মনীষার প্রবেশ)

মনীষা—আমি।—মা কোথায় জানো ?

দিলীপ—মা !

সুনীলা—ঘরে নেই ?

মনীষা—না। জ্ঞানদা বললে মা দাদার ঘরের দিকে এসেছিল সে দেখেছে। তারপর আর কিছু সে জানেনা। আমি সমস্ত বাড়ী খুঁজে দেখেছি, কোথাও পাচ্ছি না।

সুনীলা—শীগগীর দ্বিজেনকে তুলে দেগে। সবাইকে চারদিক্ খুঁজে দেখতে বল্। শীগগীর যা, দেরী করিসনি।

(মনীষার প্রস্থান)

(মুহূর্ত্তকাল দুইজনে স্তব্ধ বসিয়া রহিল ; পরে সহসা দিলীপ বলিয়া উঠিল)

দিলীপ—সুনীলা, তুমিও যাও।

সুনীলা—থাক, ওরাই পারবে। আমার যাওয়ার দরকার হবেনা বোধ হয়।

দিলীপ—না, না, ওরা পারবেনা। তুমি যাও। তুমি যাও। তুমি না হ'লে হবেনা।

সুনীলা—কিন্তু—

দিলীপ—কোন ভয় নেই সুনীলা। আমার কোন ক্ষতি হবেনা।—তুমি যাও।

(সুনীলার প্রস্থান)

এক মিনিট স্তব্ধ থাকিয়া দিলীপ বলিল)

মা ফিরে এসো ! অভিমানিনী মা আমার ! তুমি ফিরে এসো !

(ক্রমশঃ)

মেট্রোগোল্ডউইনের
কয়েকটি
জনপ্রিয় তারকা।
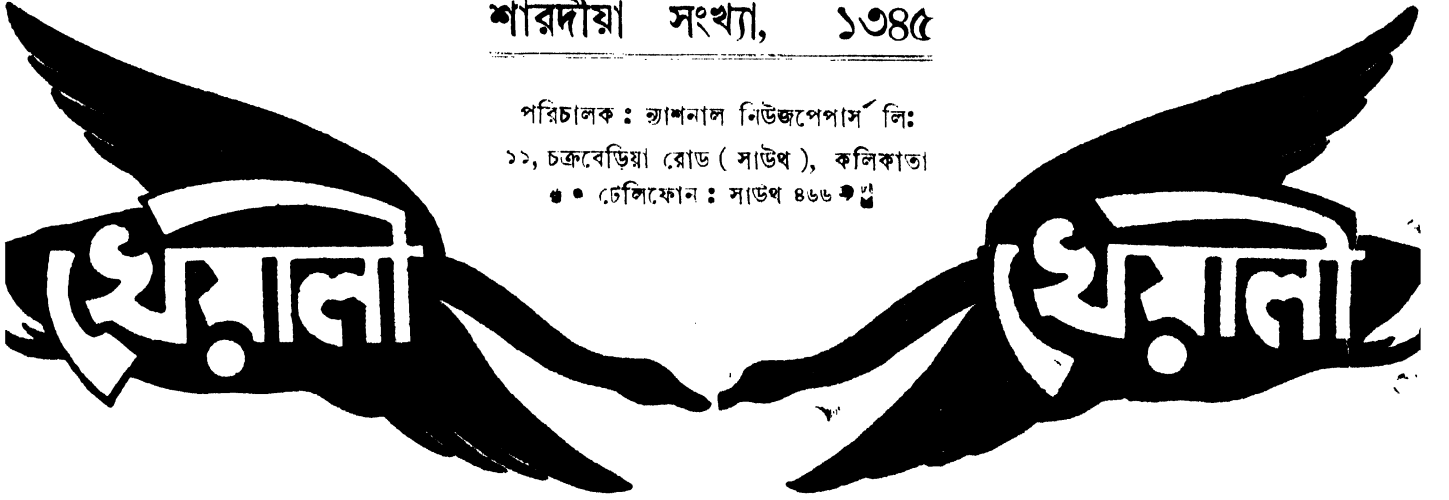
মূল্য চার আনা Price -/4/-

মফঃস্বলে পাঁচ আনা Mofussil /-5/-

খেয়ালী

হে অজ্ঞাত চরম খেয়ালী,
অসামান্য হে আশ্চর্য্য পরম খেয়ালী !
তোমার নিখিল সৃষ্টি সামান্য এ মানুষের কাছে
অনাদি কালের হ'য়ে আছে—
অনন্ত রহস্যাবৃত দুর্জ্ঞেয় হেঁয়ালী !

*　　　*　　　*

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বিশাল ও আকাশের বুকে
সবিস্ময়ে নেহারিছে ঝুকে
কীর্ত্তি তব
নিত্য অভিনব,
তোমারি ইচ্ছায় নির্ব্বিচারে
সৌরলোকে ভ্রমে বারে বারে
সুনির্দ্দিষ্ট পথে প্রতিদিন
শ্রান্তি ক্লান্তি হীন !

*　　　*　　　*

নিত্য তব সঙ্গ লভি প্রকৃতির রঙ্গভূমিময়
নাহি জানি তবু পরিচয়,
হে চির অপরিচিত অদৃশ্য মায়াবী
অবাক বিস্ময়ে শুধু ভাবি
কালের প্রবাহ চলে অবিরাম কোন লক্ষ্যে ছুটি' ?

অসংখ্যের মাঝে কভু নাহি মেলে হেন কোনো দু'টি
সমতুল্য যারা পরস্পর ;
ওগো স্থষ্টিধর !
লোকে লোকে এ কি তব মায়া !
বিরাট এ বিশ্বে হেরি চারিদিকে নব নব ছায়া
অরণ্য পর্ব্বতে আবর্ত্তন
অসীম সমূদ্র মাঝে ক্ষণে ক্ষণে তাণ্ডব নর্ত্তন
ঋতুরঙ্গে অপূর্ব্ব বিকাশ
হেরি স্বপ্রকাশ !

* * *

জরা মৃত্যু রোগ শোক দিয়ে
ধ্বংসের কঙ্কাল মূর্ত্তি নিয়ে
একি তব নিষ্ঠুর কৌতুক ?
এ খেয়ালে কী যে পাও সুখ
কী আনন্দ লভ নাহি জানি,
আজ যারে তোলো সিংহাসনে করো রাজরাণী
কাল পুনঃ ভিক্ষুকের বেশে পথপ্রান্তে ছেড়ে দাও আনি !

* * *

রাখাল সাম্রাজ্য লভে,
তোমারি খেয়ালে ভবে,
রাজপুত্র বরি' নেয় প্রবজ্যা সন্ন্যাস।
আনন্দ উৎসব মাঝে অকস্মাৎ তোলো শোকোচ্ছ্বাস
শিশুরে হরিয়া লও মা'য়ের স্নেহের অঙ্ক হ'তে,
ফিরিতেছে পথে
অনাথ আতুর কত শত—
তোমারই খেয়াল খুশী মত !

* *

হে নির্ম্মম, রূঢ় খেয়ালিয়া !
দয়িতের বক্ষ হ'তে ছিন্ন কর কণ্ঠলগ্নাপ্রিয়া !
তরুণী হারায় তার হৃদয় বিভব ;
তোমারি ইচ্ছায় ঘটে সব
অসম্ভব নানা অঘটন !
নিত্য নব জীবন মরণ
ফুল ফোটা ফুল ঝরে পড়া—
ক্ষণে ক্ষণে কত ভাঙা-গড়া,
হাসি অশ্রু মেশা এই ভুবনের মনের দেয়ালি
তোমারি খেয়ালে চলে জানি জানি হে মহা খেয়ালী।

——শ্রীনরেন দেব

চিন্ময়ী চণ্ডিকা

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

উপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, শাক্তাগমে তিনিই চিন্ময়ী মহাদেবী চণ্ডিকা। উপনিষদে বর্ণিত ব্রহ্মের যেমন দুইটি রূপ—(১) পর (অর্থাৎ নির্গুণ নিরাকার পরম-ব্রহ্ম) ও (২) অপর (অর্থাৎ সগুণ সাকার ঈশ্বর)—শ্রীশ্রী৺মার্কণ্ডেয় চণ্ডীসপ্তশতীতেও সেইরূপ জগন্মাতা চণ্ডিকার ত্রিগুণাত্মিকা মূর্তি ও গুণাতীত স্বরূপের উল্লেখ আছে। তবে দেবী স্বরূপতঃ চিন্ময়ী হইলেও চণ্ডীতে গুণাতীত ভাবের উপর ততদূর জোর দেওয়া হয় নাই; কারণ এই অখণ্ড নির্গুণ নিরাকার স্বরূপের ধারণা করা দেহাভিমানী সাধকের পক্ষে বড়ই কঠিন। তাই সাধকগণের হিতার্থ মহাদেবীর সগুণ ও সাকার রূপকল্পনাই চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে সমধিকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সগুণাবস্থায় দেবী ত্রিগুণাত্মিকা জগন্মাতা—সমগ্র জগতের প্রকৃতি স্বরূপা। কিন্তু শুধু এই "প্রকৃতি" শব্দটি শুনিয়াই ইঁহাকে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বোধ করিলে বড় ভুল হইবে। এস্থলে "প্রকৃতি"-শব্দের পারিভাষিক বা রূঢ়ার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্যুৎপত্তিগত যৌগিক অর্থ গ্রহণীয়। "প্রকৃতি" বলিতে বুঝিতে হইবে—উপাদান কারণ (material cause)। অবশ্য সাঙ্খ্যের প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। জগদ্রূপে তাঁহার স্বতঃ-পরিণামও ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ—সাঙ্খ্যের মতেও প্রকৃতি জগতের স্বতন্ত্র উপাদান কারণ। আবার এই পরিণাম সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের প্রচ্যুতি কদাচ ঘটে না। পরিণামিনী হইয়াও তিনি নিত্যা। এই সকল বিষয়ে চণ্ডিকাদেবীর সহিত সাঙ্খ্যের প্রকৃতির কিছু কিছু মিল আছে সত্য; কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও বহু। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি জড়রূপা, জগন্মাতা চণ্ডিকা চিন্ময়ী। সপ্তশতী স্পষ্টই বলিয়াছেন—তিনি চিতিরূপে (চৈতন্যমাত্রস্বরূপে) সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আবার দেবীকে 'মায়া', 'মহামায়া', 'যোগমায়া', 'বিষ্ণুমায়া' প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের মায়া বা অবিদ্যার স্বরূপ হইতে চণ্ডিকাস্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন মায়া বা অবিদ্যা অচেতন ও ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও সর্বাংশে সাঙ্খ্যের প্রকৃতিরও তুল্য নহে। প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তসম্মত; কিন্তু শাঙ্কর-বেদান্তে জগৎকারণ সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্রভাবে জগদাকারে পরিণাম স্বীকার করা হয় না। তাহা ছাড়া প্রকৃতি নিত্যা—অনাদি ও অনন্ত; পক্ষান্তরে মায়া অনাদি হইলেও অনন্ত নহেন সান্ত। মায়ার নাশে সর্বমুক্তি; কিন্তু প্রকৃতির ধ্বংস নাই। মায়া পূর্বে ছিলেন, এখনও আছেন; কিন্তু তাহা বলিয়া যে চিরদিন থাকিবেনই—এমন কথা অদ্বৈতবাদিগণ বলেন না। তাঁহাদের মতে—এমন একদিন আসিবেই আসিবে যেদিন মায়ার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটিবেই ঘটিবে। কিন্তু সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি নিত্যা। প্রকৃতি ও মায়ার বিভেদ এই খানেই। অন্যান্য অংশে প্রকৃতি ও মায়ার কথঞ্চিৎ সাম্য আছে; তাই সাঙ্খ্যের প্রকৃতি বা বেদান্তের মায়াকে শাক্তের জগন্মাতা চণ্ডিকার সহিত তুলনা করা সম্ভবে না। বরং চণ্ডিকার সগুণরূপের সহিত উপনিষদের অপরব্রহ্ম বা মায়াশবল ঈশ্বর অথবা শৈবতন্ত্রের সশক্তিক পরমেশ্বরের তুলনা করা চলে।

আদি সৃষ্টির পূর্বে চণ্ডিকাদেবী ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় অব্যক্ত ছিলেন। প্রথম কল্পারম্ভে তিনি গুণময়ী হইয়া প্রথম অভিব্যক্ত হইলেন মহালক্ষ্মীস্বরূপে। তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া তিনি মহাশূন্যকে নিজ তেজোরাশিতে পূর্ণ করিলেন। এই মহালক্ষ্মী দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা—কনকাভরণে ভূষিত-দেহা। তাঁহার মস্তকে নাগ (ব্রহ্মার চিহ্ন), লিঙ্গ (রুদ্রচিহ্ন) ও যোনি (বিষ্ণুচিহ্ন)। তাঁহার করচতুষ্টয়ে—দাড়িম্বফল, গদা, চর্মফলক ও পানপাত্র। এই মহালক্ষ্মী দেবীই চণ্ডিকার আদ্যা প্রকৃতি।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মহালক্ষ্মী দেখিলেন, কোথাও কোন জীব নাই। তখন তাঁহার গুণত্রয় হইতে তমোগুণের সারাংশগ্রহণে তিনি একটি অভিনবমূর্তি সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার দেহবর্ণ মর্দ্দিত-অঞ্জনসন্নিভ উজ্জ্বল গাঢ়নীল। নয়নগুলি অতিবিশাল ও বিস্ফারিত। বদনবিবর দংষ্ট্রাকরাল। কটীদেশ ক্ষীণ। শিরোদেশ মুণ্ডমালা-বিভূষিত। বক্ষঃস্থলে কবন্ধহার প্রলম্বিত। ভুজচতুষ্টয়ে খড়গ, চর্ম, ছিন্নমুণ্ড ও খর্পর বিরাজিত। ইনিই চণ্ডিকাদেবীর দ্বিতীয়া প্রকৃতি মহাকালী।

মহাকালীর আবির্ভাবের পর দেবী ত্রিগুণময়ী মহালক্ষ্মী নিজ অতি শুদ্ধ সত্ত্বগুণদ্বারা আর একটি মূর্তির প্রকাশ

করিলেন। শরতের রাকাশশি-কৌমুদীর ন্যায় ইঁহার দেহকান্তি; হস্তচতুষ্টয়ে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক বিরাজমান। ইনিই চণ্ডিকাদেবীর তৃতীয়া প্রকৃতি মহাসরস্বতী।

এইরূপে মহাকালী ও মহাসরস্বতীর আবির্ভাবের পর ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীতে রজোগুণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ত্রিগুণ-সমষ্টিরূপা মহালক্ষ্মী তখন ব্যষ্টিভাবে কেবল রজোগুণাশ্রয়ে বিরাজমানা রহিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তামসী মহাকালীই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী – বিষ্ণুমায়া বা যোগমায়া। মধুকৈটভ বিনাশের নিমিত্ত বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা ইঁহারই স্তুতি করিয়াছিলেন। তখন তিনি কজ্জলোজ্জ্বল-বর্ণা, দশাননযুতা, দশভুজা ও দশপাদাব্জ-শোভিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মুখে তিনটি করিয়া বিশাল আয়ত নয়ন। বদনসমূহ করালদংষ্ট্রাবলীর প্রভায় ভয়ঙ্কর হইলেও রূপলাবণ্যে তিনি লোকললাম-ভূতা। তাঁহার দশভুজে—খড়গ, বাণ, গদা, শূল, চক্র, শঙ্খ, ভুশুণ্ডী, পরিঘ, ধনুঃ ও গলদ্রক্ত ছিন্নমুণ্ড। এই নীলাশ্মদ্যুতি মহাকালিকা ৺সপ্তশতীচণ্ডীর প্রথমচরিতের (মধুকৈটভবধমাহাত্ম্যের) অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

যে অমিতদ্যুতি মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবী দেববৃন্দের তেজঃসারসমষ্টি হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে কথিত হইয়াছে, তিনিই ত্রিগুণা মহালক্ষ্মীর অপরা মূর্ত্তি। তাঁহার বদনমণ্ডল ও কুচযুগ শ্বেতাভ। হস্তসমূহ, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় নীলবর্ণ। কটিদেশ ও পাদপল্লবদ্বয় রক্তবর্ণ। তাঁহার পরিধানে সুচিত্র রমণীয় বস্ত্রযুগল। অঙ্গে বিচিত্র ভূষণরাজি ও সুগন্ধি অনুলেপন। গলদেশে অম্লানকুসুমমালিকা। সুধাপানে বদনকমল আরক্তিম। যুদ্ধকালে ইনি কভু সহস্রভুজা, কভু শতভুজা, কভু অষ্টাদশভুজা, কভু ষোড়শভুজা আবার কভু বা দশভুজা। অষ্টাদশভুজারূপে তিনি (দক্ষিণ হস্তের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে ও বামের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে) যথাক্রমে—অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি, কুলিশ, গদা, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম, চাপ পানপাত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। এই পদ্মাসনা, প্রগল্‌ভা, মহিষমর্দ্দিনী দেবীই ৺চণ্ডীর মধ্যমচরিতের (মহিষাসুর-বধ-মাহাত্ম্যের) অধিদেবতা।

আর যিনি গৌরীর দেহকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দানব-দলন করিয়াছিলেন, সেই কৌষিকী দেবীই সত্ত্বগুণাশ্রয়া মহাসরস্বতীর অপরা প্রভৃতি। ইনি অষ্টভুজা—বাণ-মুসল-শূল-চক্র-শঙ্খ-ঘণ্টা-হল-কার্ম্মুকধারিণী। শরতের সিতাংশুপ্রভা এই দেবীই ৺চণ্ডীসপ্তশতীর উত্তমচরিতের (শুম্ভনিশুম্ভ-বধ-মাহাত্ম্যের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নির্গুণা চণ্ডিকা দেবীর সগুণমূর্ত্তিত্রয়ের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দিদি
বিদ্যাপতি
দেবদাস
ভাগ্যচক্র
চণ্ডীদাস
মীরাবাঈ
দেশের মাটি
ছিঁড়ে ফেল মায়া ডোর,
আবরণ খুলনার
ভেঙে ফেল কারাগার
এ ধরার দেহভার।
আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সেই দিন এসেছে ফিরে, যেদিন আমাদের মাটিকে আবার মা বলে ডাকতে হবে, এই মাকে ভালবাসতে হবে, এই মাটির মা হবে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, অবলম্বন—
বাংলার গৌরব নিউ থিয়েটার্স চিত্রে সেই দেশের মাটির কথা আপনাদের জানাবেন— এর গৌণ উদ্দেশ্য আনন্দ বিতরণ হলেও, মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ ও জাতিগঠন।
আমাদের অনুগ্রাহকবর্গ, পৃষ্ঠপোষক এবং সকলকেই বিশ্বজননীর আগমনী আমরা জানাই।
সকলের আশীর্বাদ যেন আমাদের কর্মজীবন মধুময় করে।
অরোরাফিল্মস্
নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড
অবতার — চিত্রে ছায়ার
পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন
১২৫ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
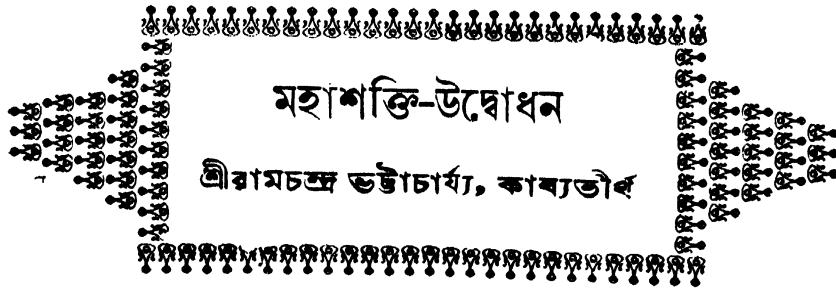
মহাশক্তি-উদ্বোধন

শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্যতীর্থ

"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়"—সন্তানের মঙ্গল কিসে হয়, সন্তান কিসে সুখী হয়, মায়ের সর্ব্বদা এই চিন্তা। তাই মা জগদম্বা সংবৎসরের স্নিগ্ধ মধুর প্রাতঃকাল – এই শরৎকালে, সন্তান-সন্ততির উৎসব-আনন্দ, উৎসাহ-উদ্যোগ, ধর্ম্ম মঙ্গলের জন্য এই ধরাধামে প্রকাশ ক'রেছেন স্বীয় মহাশক্তি। তাই জগজ্জননী আপামর সাধারণ সকলকেই অধিকার দিয়েছেন এই বর্ষ—প্রভাত — মহোৎসবে। তথাকথিত অনুন্নত জাতিও বঞ্চিত হয়নি তাঁর এই উৎসবাধিকারে। প্রবৃত্তিভেদে উৎসবের প্রকারভেদ আছে বটে, কিন্তু উৎসব নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে সকলেরই জন্য। 'সংবৎসরের সুপ্রসন্ন প্রাতঃকাল ধর্ম্মে, কর্ম্মে, উৎসবে আনন্দে কেটে গেলে, শক্তির উপাসনা ক'রলে, সারা বছর ভাল যাবে', সন্তান-বৎসলা মঙ্গলময়ী মায়ের মনে বুঝি এই ভাব!

আয়, আয় মা! দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! দুর্গতিনাশিনি! দুর্গে! মা ভিন্ন আমাদের যে গতি নাই মা! আমাদের গর্ব্ব ক'র্‌বার জিনিষ মা, আমাদের গৌরবের সামগ্রী মা, আমাদের উৎসবের মূল মা, আমাদের সঞ্জীবতার হেতু মা। তবে কেন আমরা নির্জ্জীব? কেন আমরা বীরত্ব-বর্জ্জিত? কেন আমরা সকল রকমে হতাশ? হায় ত্রিনয়নে! দয়া ক'রে একটি বার চেয়ে দেখ্ মা। তোর হতভাগ্য ছেলেদের হাসি আছে—বিষাদের অশ্রু আছে—বিলাসের উৎসব আছে—নিরানন্দ দেহ আছে—আলস্যবিজড়িত প্রাণ আছে—ম্রিয়মাণ! আয় মা মহাশক্তিরূপিণি সর্ব্ব-দুঃখনাশিনি সিংহবাহিনি! আমরা পরিতৃপ্ত হই তোর সংহারিণী অথচ মধুর হাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখে, চিরচরিতার্থ হই তোর পদ-পঙ্কজে ভক্তি-অশ্রুমাখা কুসুমাঞ্জলিদানে, পূর্ণমনোরথ হই তোর মহাশক্তিপূর্ণ বরাভয় লাভে।

তাই ডাকি—একবার আয় মা! শিবদে! শিবরাণি! আমরা তোর পূজা করি। আহা! ঐ অদূরে বর্ত্তমান আমাদের সেই মহাশক্তি উদ্বোধনের শুভবাসর। ঐ সন্নিকটে উপস্থিত আমাদের সেই শারদীয়া মহাপূজার মঙ্গলময় মুহূর্ত্ত। এস, এস ভক্ত ভাই সব! আমরা মেতে যাই ঐ শারদ মহোৎসবের শুভ অনুষ্ঠানে, আমরা ডুবে যাই ঐ মাতৃপূজার সুগভীর মহানদীতে, আমরা ধন্য হই মায়ের ষোলকলায় পূর্ণ ঢল ঢল রূপ দেখে। বন্ধুগণ! এ পূজা একলার নয়—সকলের, এ পূজা ধনীর নয়—দীনের, এ পূজা হাসিবার নয়—কাঁদিবার, এ পূজা জড়ের নয়—কর্ম্মীর, এ পূজা সামান্য পূজা নয়—মহাপূজা! এ পূজার অন্য অর্ঘ্য নাই, অন্য বলি নাই, অন্য মন্ত্র নাই অন্য কামনা নাই। এ পূজার অর্ঘ্য—প্রেমাশ্রু, এ পূজার বলি—আত্মবলি, এ পূজার মন্ত্র—বন্দেমাতরম্, এ পূজার কামনা—মুক্তি।

"শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে!।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবী নারায়ণি! নমোঽস্তুতে॥"
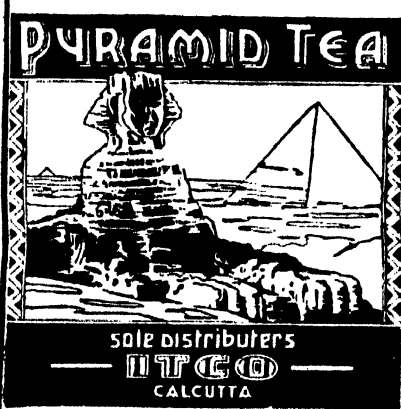
বাঙলা সাহিত্যে রমন্যাসের অভ্যুত্থান

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনিশের শতকে ইংলণ্ডের সাহিত্যের, আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইউরোপের মনের সঙ্গে স্পর্শ, বাঙলা সাহিত্যের পথে জীয়ন-কাঠির মত হ'ল—বাঙলা সাহিত্য নোতুন প্রাণ পেয়ে সম্পূর্ণ রকম নোতুন এক যুগে প্রবেশ ক'রলে। আঠারোর শতকের মাঝামাঝি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের মৃত্যু হয়—পুরাতন যুগের বাঙলা সাহিত্যের একটি চরম বিকাশ ভারতচন্দ্রের কাব্যে হ'য়ে যায়। তাঁর পূর্ব্বে ষোলোর আর সতেরোর শতকে, বৈষ্ণব সাহিত্যের—মহাজন-পদে আর চরিত-সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের আর এক মহনীয় বিকাশ হ'য়ে গিয়েছিল। ষোলোর আর সতেরোর শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য, আর ঐ দুই শতকে রচিত মুকুন্দরাম কবি-কঙ্কনের চণ্ডী, বংশীদাসের পদ্মপুরাণ প্রভৃতি খান কয়েক বই; আর আঠারোর শতকে রামপ্রসাদের পদ, আর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য, এই গুলিকেই অবলম্বন ক'রে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এদিকে, বাঙালী সাহিত্য বিষয়ে তার গুণপনা দেখায়। আঠারোর শতকের প্রথমার্দ্ধেই ভারতচন্দ্রের যুগ শেষ হ'য়ে গেল। তার পরে বাঙলা সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে গেঁয়ো হ'য়ে প'ড়ল। হরগৌরীলীলা, রামলীলা, রাধাকৃষ্ণলীলা, আর অন্য পুরাণ কথা আর দেবতা বাদ নিয়ে ছড়া পাচালী যাত্রাগানে বাঙলা সাহিত্য পর্য্যবসিত হ'ল। এই ছড়া পাঁচালীর যুগের জের ইংরেজ প্রভাবের প্রতিষ্ঠার পরেও চ'লেছিল; এবং এই ধরণের গ্রাম্যসাহিত্যে বা লোকসাহিত্যে দাশরথি রায়ের মত একজন প্রতিভাশালী কবি (যাঁর মৃত্যু হ'য়েছিল ১৮৫৭ সালে বঙ্কিমের সাহিত্যিক অভ্যুদয়ের কিছু আগে) বাঙলা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত ক'রেছিলেন॥

বাঙলা সাহিত্য ১৯এর শতকের গোড়ায় যে অবস্থায় পৌঁচেছিল তাতে অতি প্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা ক'রে অদ্ভুত রস যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সত্যকার রসানুভূতি, রমন্যাস বা রোমান্সের ভাব ছিল না ব'ললেই হয়। 'রোমান্স' বল্‌লে আমরা বুঝি, বাইরের বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে এক অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় আনন্দ বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুভূতি; মানব-মানবীর সাধারণ সম্বন্ধের মধ্যেও, তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেও এই আনন্দবস্তুকে অনুভব করা,—আর এই সম্বন্ধ আর এই জীবনকে বর্ণনা করবার সময়ে, তার আভ্যন্তর আনন্দবস্তু বা রস-বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা। বাহ্যপ্রকৃতি এবং সাধারণ জীবন ছাড়া, সুদূর অতীত, যার সম্বন্ধে আমরা পুরো খবর জানি না, যা আমাদের কতকটা জানার আলো-আঁধারীতে আবছা-আবছা ভাবেই থাকে কিন্তু আমাদের কল্পনার রঙে রঙীন হ'য়ে দেখা দেয়, তাকে নিয়েও রোমান্স বা রমন্যাস নাড়াচাড়া ক'রতে, তার মধ্যেও শাশ্বত রসবস্তুর সন্ধান ক'রতে ভালোবাসে। এই অ-দৃষ্ট অ-শ্রুত অনির্ব্বচনীয় রসবস্তুর সন্ধানে রোমান্স কতকটা বেপরওয়া হ'য়ে কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়, কিন্তু উদ্ভট বা বিকট, রস বর্জ্জিত বা অপ্রিয় ভাবের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়িত ক'রতে চায় না। রোমান্সের মধ্যে, ক্লাসিক অর্থাৎ রীতি অনুসারী বিচারপন্থী সংযত সাহিত্যের যুক্তি নিয়ন্ত্রিত আত্মসমাহিত ভাব ততটা থাকে না, যতটা থাকে আত্মভোলা অকারণ অযৌক্তিক কল্পনার আবেগ আর উচ্ছ্বাস। এখন, অষ্টাদশ শতকের শেষে আর উনবিংশ শতকের গোড়ায়, যে দু'পাঁচজন যথার্থ সাহিত্য রসিক পণ্ডিত বাঙলা দেশে প্রাচীন সংস্কৃত, মহাকাব্য, কাব্য, গদ্যকাব্য, আর খণ্ডকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, কাদম্বরী, মেঘদূত প্রভৃতি প'ড়তেন তাঁরা ভারতের অবিনশ্বর 'ক্লাসিক' সাহিত্যের রস কিছুটা অনুভব ক'রতে পারতেন, কিন্তু রোমান্স-এর দৃষ্টিতে তাঁরা দেখতে শেখেন নি। প্রাচীন জগতের কথা বা গল্পের মধ্যে প্রাচীন জগতের জীবনের মধ্যে আমাদের কল্পিত জগৎকে আমরা নিয়ে গিয়ে খুসী হয়, আর এইভাবে আমাদের রোমান্স যাহা অনেকটা তৃপ্ত হয়; কিন্তু সেটা ক'রতে গেলে, একটা ঐতিহাসিক বোধ থাকা চাই। কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক বোধ কতকটা ছিল আকবরের আমলে। আকবর বাদশাহের সভার হিন্দু চিত্রকরেরা যেভাবে ফরাসীতে অনূদিত মহাভারতের ছবি এঁকেছিলেন তা থেকে এটা বেশ বোঝা যায়, তারপরে সে প্রকার ঐতিহাসিক বোধ ভারত থেকে লুপ্ত হয়, ইউরোপের ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আবার সেই বোধ আমরা এখন ফিরিয়ে পাচ্ছি।

উনিশের শতকের মাঝামাঝি ইংরেজী সাহিত্য প'ড়ে, এই ঐতিহাসিক বোধ আর তার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক আর প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে রোমান্সের অনুভূতি বাঙালী লাভ ক'রলে। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ক'লকাতায় বাঙালী যুবকদের ইংরিজী সাহিত্য পড়াতেন, তার সংস্পর্শে এসে এবিষয়ে বাঙালী ছেলেদের অনেকে খুব সচেতন হ'য়ে পড়ে। রিচার্ডসন সাহেব গত শতকের চারের কোঠায় Poetical Selections ব'লে কতকগুলি ইংরেজী সাহিত্যের চয়নিকা প্রকাশ করেন, তার একখানিতে ধারাবাহিক ভাবে ইউরোপের সাহিত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রোমান্স-কাব্য থেকে চয়ন ক'রে দেওয়া আছে। এই রকম বইয়ের দ্বারাও বাঙালীর চিত্ত উদ্বুদ্ধ হ'তে অনেকটা সাহায্য পেয়েছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবৎকাল ১৮২৩ থেকে ১৮৭৩, আর রঙ্গলাল বাঁড়ুজ্জে, জীবৎকাল ১৮২৭ থেকে ১৮৮৭—বাঙলা সাহিত্যে এই অভিনব রোমান্সের ধারা প্রবর্ত্তন ক'রতে এরা দুজনেই হ'য়েছিলেন অগ্রণী, এক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্র নাথের অগ্রদূত ছিলেন এরাই। ইংরেজী সাহিত্যের, ইউরোপীয় সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, তারাশঙ্কর কবিরত্ন, এরা উত্তরামচরিত, শকুন্তলা নাটক, মহাভারত, কাদম্বরী প্রভৃতি একাধারে রোমান্সের ও ক্লাসিসিজম্‌এর খনি প্রাচীন সংস্কৃত বই বাঙলায় অনুবাদ ক'রে বা অনুসরণ ক'রে বাঙলা সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা বোধের দ্বারা প্রণোদিত রোমান্সের আবহাওয়া বহাতে অনেকটা সাহায্য ক'রেছিলেন। এদের বই বা লেখা বার হতে বাঙালী সোজা প্রাচীন সংস্কৃত যুগের জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রতে সমর্থ হ'ল। ভারতচন্দ্র, কাশীরামদাস, কৃত্তিবাস, দাশুরায়ের চোখে আর প্রাচীন পুরাণকথা তাকে দেখতে হোলো না।

আর একটি জিনিষ এসে বাঙলা দেশে রোমান্সের এক নবীন উৎস খুলে দিলে, সেটী হ'চ্চে কর্ণেল জেম্‌স্ টডের লেখা ইংরাজী 'রাজস্থান' গ্রন্থ আর তার বাঙলা অনুবাদ। রাজপুতানায় রাজপুতদের মধ্যে টডসাহেব অনেকদিন ছিলেন, তিনি রাজপুতজাতকে মনে প্রাণে ভালোবাসতেন। ১৮২৯ সালে লণ্ডন থেকে তিনি তাঁর Annals and antiquities of Rajasthan নাম দিয়ে সুপরিচিত মহাগ্রন্থ বার করেন। এই বই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর কাছে সম্পূর্ণ নূতন একটি জগতের খবর দিলে—এদেশে মহাভারত রামায়ণের পাশে টডের রাজস্থানও নিজের স্থান করে নিলে। রাজপুতনার হিন্দু বীর আর বীরাঙ্গনাদের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা, রামায়ণ মহাভারতের প্রাচীন হিন্দু জগতের একটা মধ্য যুগের জের-স্বরূপ রাজপুত রাজাদের জগৎ, বাঙালীর চিত্তকে জয় করে নিলে। আধুনিক বাঙলা কাব্য, নাটক আর উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা অংশ এই রাজস্থান গ্রন্থের প্রভাবের ফল। দেশাত্ম-বোধ, স্বাজাত্য আর ত্যাগের বাণী আর সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধ—এই জিনিষগুলি বাঙালীর মনের রোমান্সকে উদ্ভাসিত ক'রে দিলে, 'রাজস্থানের' চর্চ্চার ফলে।

রাজপুত জগতের খবর কাব্যে প্রথম দিলেন রঙ্গলাল, তাঁর 'পদ্মিনী', 'কর্ম্মদেবী' আর 'সুরসুন্দরী' কাব্যত্রয়ে; মধুসূদন দিলেন নাটকে তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে, আর বঙ্কিম দিলেন উপন্যাসে—তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনীতে', 'রাজসিংহে' আর অন্য বইয়ে। পদ্যে রচিত কাব্য আর গদ্য-কাব্য বা উপন্যাস, এই দুইয়ের প্রকৃতি কোনও কোনও বিষয়ে এক। রমন্যাসের প্রস্তাবক উপন্যাসিক বঙ্কিমের যথার্থ অগ্রগামী পথিক এবং সহযোগী হ'চ্ছেন কবি রঙ্গলাল। কেবল রাজপুত জগতের প্রভাব রঙ্গলালের উপরে প'ড়েছিল, তা নয় তিনি 'কুমার-সম্ভব' অনুবাদ করেছিলেন আর উড়িষ্যার ইতিহাসের একটা মনোহর রোমান্টিক কাহিনী (কাঞ্চীকাবেরী) তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরভাবে বাঙ্গালায় গ্রথিত করেন। রঙ্গলাল ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের রোমান্টিক অভ্যুত্থানের বিশেষভাবে সচেতন পুরোহিত।

বঙ্কিমের প্রথম বই "দুর্গেশনন্দিনী" এমন কিছু বিরাট বই বা বড় বই না হ'লেও এই বই-ই বাঙলা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত ক'রলে। রাজপুত, পাঠান, মোগল আর বাঙালী—অতীতের তিনশ' বছরের বিস্মৃতি ভেদ ক'রে, যে যুগের সঙ্গে আমরা নাড়ীর টান অনুভব করি সেই যুগ বাঙালী পাঠককে নিয়ে গেল, আর হাতে ধ'রে তাকে সেই যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ, স্নেহ, প্রেম, ধর্ম্ম, আদর্শ, বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্ঘাত-মিলন, মানুষের প্রতিযোগিতা, প্রতিশোধ, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি নানা বৃত্তির খেলা আমাদের কল্পনা-রঙ্গীন অস্ত্র ধ্বনি মুখরিত মধ্যযুগের জীবনের পটভূমিকার সামনে দেখিয়ে দিলে—বিস্ময়ে পুলকে বাঙালী যেন নোতুন চোখ পেলে। উত্তর-কালে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক রোমান্স লিখনে আরও উন্নতি করিয়াছিলেন। আর এক হিসাবে রাজসিংহ তাঁর চরম ঐতিহাসিক রমন্যাস। কতরকমের মানুষে রাজসিংহের রঙ্গমঞ্চ ভরতি, আর কত বৈশিষ্ট্যময় তাদের ক্রিয়া কলাপ। সপ্তদশ-শতকের মোগল সাম্রাজ্য তার হরেক রকমের লোকজন নিয়ে যেন বঙ্কিমের যাদুকরের দণ্ডের প্রভাবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে

এসে জড়ো হ'য়েছে। বঙ্কিম এর পরে বাঙালীর ঘরোয়া-জীবন অবলম্বন ক'রে তাঁর রমন্যাসের অবতারণা করেন। এখানেও তাঁহর কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই বই, বাঙলার জীবনের ভিতর আর বাহির এই দুইকেই যেন আলোকিত ক'রে দিয়েছে। বাঙলাদেশে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিককে বেশ খুঁটিয়ে দেখতে হয় কি ক'রে তা' বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ, আর কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাচার নক্‌শা'য়। ঘাসের ফুলের সৌন্দর্য্য আছে—আমরা তা দেখি না; যিনি দেখেন, আর আমাদের দেখাতে পারেন, তিনিই সত্যস্রষ্টা, তিনিই ভাবনেতা, তিনিই কবি। ১৮৫০—১৮৬০ সালের দিকের কলকাতার জীবন যাত্রা প্রণালী, কলকাতার সমাজ এদুটো সব বিষয়ে সুন্দর বা সৌষ্ঠবময় ছিল না; কিন্তু এ দু'টোকে খুটিয়ে দেখেছিলেন, আর দেখে তাঁর ভালোও লেগেছিল, কালীপ্রসন্ন সিংহ; তাই তাঁর "হুতোম" বাঙলা সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে, কারণ পথ চল্‌তি সাধারণ ব্যাপারে তিনি রসের সন্ধান পেয়েছিলেন, সে রস তিনি নিজে আস্বাদন ক'রেছিলেন, আমাদেরও আস্বাদন করিয়েছেন। বঙ্কিমও সেই রকম বাঙালীর ঘরোয়া জীবনেও যে রস-বস্তুর অভাব হয়নি, তা আমাদের অভিজ্ঞতা গোচর করিয়ে দিয়েছেন। এইখানেই তার রোমান্স বা রমন্যাস স্রষ্টা হিসাবে কৃতিত্ব তাঁহার অমরতা।

বঙ্কিম চিন্তা-শীলতার পরিচয় দিয়েছেন, ভাবুকতার রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নানা উপন্যাসে আর প্রবন্ধে। তাঁর কমলাকান্তের কোনও কোনও প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় রোমান্স ধারার অফুরন্ত উৎস হ'য়ে থাকবে। কিন্তু রোমান্সের লক্ষণ আর তার সাহিত্যিক প্রকাশ বিচার ক'রলে, বঙ্কিমের তাবৎ লেখার মধ্যে তাঁর 'কপাল কুণ্ডলা'কে সব চেয়ে প্রথম স্থান দিতে হয়। এরকম অদ্ভুত সুন্দর বই বাঙলা সাহিত্যে আর নেই, অন্য সাহিত্যেও দুর্লভ। বাঙালীর ঘরোয়া জীবন, তিন শ' বছর আগেকার বাঙালীর সমাজ; বাঙালীর ধর্ম্ম জীবনের সৌকুমার্য্য আর স্নিগ্ধতা, ভয়াবহতা আর ভীষণতা, অনবলোকিত জগতের সঙ্গে পরিদৃশ্যমান জগতের এক অচ্ছেদ্য রহস্যময় যোগ,—এই সব বিষয় 'কপাল কুণ্ডলা'য় দৃশ্যের পর দৃশ্যে আমাদের সামনে তিনি উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। প্রথম কয় অধ্যায়ে সমুদ্র, সমুদ্রতটের বনানী, আর বালিয়াড়ী, কাপালিক কপাল-কুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ এসবে যে রোমান্সের সৃষ্টি করে, তা কখনও পাঠকের মন থেকে মুছে যাবার নয়। বইয়ের পরিসমাপ্তির ও বছরের করুণ-ভীষণ ট্রাজেডীর উপযুক্ত—নদীতীরে শ্মশান ভূমির জলে ধ্বসে গিয়ে নায়ক নায়িকাকে যেন তাদের অপেক্ষাতেই র'য়েছে এমন লোকান্তরে নিয়ে গেল। এই পার্থিব আর অপার্থিব মিশ্র রহস্য লোকের মধ্যে, মোতি-বিবির চরিত্র এবং তার মধ্যে নানাপ্রকারের দ্বন্দ্ব এক অতি সূক্ষ্মতার সৃষ্টি ক'রেছে। বইটার ভিতর নানা বর্ণনায় আর প্রসঙ্গে সুন্দর সুন্দর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির আর রমন্যাস-উদ্বোধনের শক্তির পরিচয় আছে যে, সে সব কথা নিয়ে আজকে আর আলোচনা সম্ভব হবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবিকই উনিশের শতকের বাঙালী সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন, আর এই রমন্যাস বিন্যাসেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ।

রহস্যময় শরৎচন্দ্রের লেখায় বাস্তব ও কল্পনার স্থান

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার পূজোর সময় তাঁর সাম্‌তার বাড়ীতে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন একলা কাটাবার অবসর ঘটেছিল। বিপুল বর্ষা নেবেছে: রূপনারাণ ফুলে ফেঁপে টল্‌ টল্‌ ক'রছে। দিনগুলোর ঝাপ্‌সা আলোতে আলস্য করার সত্যিই সুবর্ণ সুযোগ।

বর্ষার মজা এই যে, বন্ধু-বান্ধবরা ভিড় করে না। শরতের পক্ষে সেটাই ছিল, যেন একটা বড় স্বস্তি। আমারও সময় ছিল না,—তাঁর লাইব্রেরীতে কত বিচিত্র বই—একটার পর একটা শেষ ক'রছি। সমস্ত দিনে কেউ কারুর সঙ্গে প্রায় কথা কইবার ফুরসৎ পাইনে।

সন্ধ্যে বেলায় সেদিন, আমরা তাঁর দোতালার বিস্তৃত বারান্দায় ব'সে দিনে কি সব করা গেল তারই একটা মোটামুটি হিসেব করছি।

নীচে শব্দ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে গোপাল এসে খবর দিলে: একজন বাবু, দেখা ক'রতে চান······

কে বাবু রে গোপাল?

চিনি নে।

ডেকে নিয়ে আয়······

বাবুটি এলেন, বল্লেন, কি হচ্চে ব'সে ব'সে?

শরৎ কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইলেন। তার মানে, মনে-মনে মোটেই খুশী হ'তে পারেন নি। কিন্তু লোকটি অত সহজে দমার পাত্র নন্‌,—বল্লেন: শুন্‌লাম এসেছেন, অনেকদিন দেখা হয়নি··· কেমন আছেন?

ভালো নেই, দেহ মন ক্রমেই অচল হ'য়ে আস্‌ছে; এসব বার্দ্ধক্যের পূর্ণ লক্ষণ, আর কি!

লোকটি একচোট হেসে নিয়ে বল্লেন একটা ভারি মজার প্লট পেয়েছি···আপনার কাজে লাগতে পারে মনে ক'রে এলুম··· বলি?

বল। ব'লে শরৎ নিশ্চেষ্টভাবে—তামাক টান্‌তে লাগলেন।

লোকটি অনর্গল প্লট ব'লে গেলেন। শেষ হ'লে বল্লেন: এর সবটাই সত্যি,—একটুও বানান নয়। কেমন লাগল?

বেশ।

কাজে লাগবে?

দেখি, আজকাল লিখতে মন যায় না।

কথা যখন আর কিছুতেই জমেনা তখন তিনি উঠ্‌লেন—ক'দিন আছেন? জিজ্ঞেস ক'রলেন।

কালই বোধ হয় চ'লে যাব।

লোকটি বল্লেন, কাল নারিট যাবো—তা' হ'লে এবার আর দেখা হবে না। ফের কবে আস্‌চেন?

তার ঠিক নেই।

অগত্যা বাবুটি চ'লে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করার পর, শরৎ বল্লেন, এই প্লট নিয়ে তুমি এক-খানা বই লিখে ফেল।

বল্লুম: আমি শুনিনি·········কি ওর মাথামুণ্ডু প্লট·········

শরৎ বল্লেন: আমিও শুনিনি········· গল্পের প্লটের অভাবেই যেন লেখা হয় না। ·········এরা যে কি মনে করে আমাকে! ·········আবার বল্লে সবটাই সত্যি, বানানো নয় একটুও।·········ওদের এখনও সাহিত্য যে কি বস্তু—তারই জ্ঞান হয়নি। অত সোজা হ'লে আর ভাবনা ছিল না।

আবার খানিকটা নিস্তব্ধে কাটল।

শরৎ বল্লেন: কি জানি, প্লট নিয়ে, আর বাস্তব নিয়ে কিছু লেখা যে যায় তা' আমি মনেই ক'রতে পারিনে। আর যারাই এই নিয়ে লেখে তাদের লেখা ব্যর্থ হয়ই হয়।

বল্লুম, প্লটের কথা ছেড়েদি, কিন্তু তোমার ঐ কথা: সাহিত্য যে বাস্তব নয়, এটা বোঝা খুব শক্ত, মনে হয় তোমার কোথায় যেন ফ্যালাসি আছে।

শরৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বল্লেন, কোথাও ফ্যালাসি নেই, তোমাকে নিশ্চয় ক'রে ব'লচি।·········দেখ, বাস্তব জিনিষের বিশেষ কোন আপীল নেই মনের উপর, যদিইবা থাকেত সেটা সাময়িক, ক্ষণিক। লোকে ওটাকে তেমন মন দিয়ে নেয় না পর্য্যন্ত, কত আস্‌চে যাচ্চে, কটা কথা মনে থাকে? আর মানুষে গ্রাহ্যই কি করে? মানুষ, আসল হচ্চে মানুষ—যে নিত্য দিন, এই পৃথিবীতে ঘটনা গ'ড়ে তোলার মালিক। ধর ইতিহাসের কথাই। আকবর একজন মানুষের মত মানুষ—বিরাট্‌ বৈচিত্র্য তাঁর চরিত্রে। তাঁর চরিত্র যদি খুব ভাল ক'রে ষ্টাডি করা যায় তো দেখতে পাওয়া যাবে যে, ওঁর রাজত্বের ঘটনাগুলো যেন ঐ চরিত্রের নেসেসারি কন্‌ক্লুশন। ও ছাড়া, আর কিছুই ঘটতে পারে না। চরিত্রই বাস্তব;

—ওটিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে ঘটনার সমাবেশ এমন ক'রে করতে হবে যে, ঐটেই সত্যি হ'য়ে ফোটে। দেখ, মিলিয়ে দুজনকে, ধর ঔরঙজেব—ওঁর চরিত্রের বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে—সমস্ত ইতিহাসের ঘটনাই গেল ব'দলে। শিবাজীর সঙ্গে—আকবর হ'লে এমন ব্যবহার করতেন নিশ্চয়ই, যাতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের আয়ু হয়ত বেশ বেড়েই যেত।

বল্লুম, আরো পরিষ্কার ক'রে বল, আমাদের জানা লোক নিয়ে—ও দুজনই ত, ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

বেশ, ধর আমরা আমাদের ললিতকে নিয়ে একটা বই লিখচি। ললিতকে কেন আমাদের ভালো লাগে,—কি কি তার গুণ; কোথায় তার দোষ; কিসের জন্যে তার চরিত্র বাস্তব থেকে সাহিত্যে আস্‌তে পারে না, সেইটে আমাদের ষ্টাডি ক'রতে হবে: তারপর, তার যে সব গুণগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেগুলো এমন পরিস্থিতির মধ্যে আনতে হবে যে, সে-গুলো উজ্জ্বল আর মধুর হ'য়ে উঠে। ধর, ললিতের একটা গুণ, সে বড় পরোপকারী। এখন, সেইটেকে দু'তিন দিক দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তার বন্ধু মহেন্দ্র এক সময় তার খুব ক্ষতি ক'রেছে; কিন্তু আজ মহেন্দ্র ভারি বিপন্ন—মহেন্দ্র এসে ললিতকে ধ'রেছে—বাস্তব—ললিত হয়ত' মহেন্দ্রকে তাড়িয়ে দিতে পারে কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ললিত তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে ক্ষমা ক'রে বুকে তুলে নেবে। এইখানে বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যের তফাৎ—এইখানে কল্পনার এলিমেণ্ট এসে প'ড়ল। সাহিত্যকে আমি এমনি ক'রে বুঝি—সাহিত্য বাস্তব আর আদর্শের মাঝামাঝি পথ দিয়ে যায়। একদিন আমাদের সাহিত্যে আদর্শ মানুষের চিত্র অনেক আঁকা হ'য়েছিল কিন্তু সে সব নিছক কল্পনার জিনিষ ব'লে লোকে নেয় নি। আবার অবাস্তব থেকে কল্পনা দিয়ে বাস্তব আঁকতে গেলেও ঠিক হবে না। আর তা' মানুষ কিছুতেই পছন্দ করে না। বহু লেখা আজও তা' ছাড়া অন্য কিছু হচ্চেনা। তাই সে ফটোর মত বাস্তবের নিখুত ছবি তা' মনকে তেমন ক'রে টানেনা আর হ'লেও আর চাহিদাও নেই।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী সামাজিক চিত্র "অধিকারে" মেনকা ও পাহাড়ী সান্যাল। ছবিখানি পরিচালনা কোরেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

একটা যেন নদী, আর একটা ক্যানেল —তাদের পার্থক্য, প্রভেদ থাক্‌বেই। একটা কাগজের ফুল আর সত্যিকার ফুলের তফাৎ আছেই আছে। বাস্তব নৈলে সাহিত্য হ'তে পারে না; কিন্তু সে বাস্তবকে দেখার চোখ থাকা চাই, মন থাকা চাই,—সেই চরিত্রকে কঠিন সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলে না—তাতে তোমার মনের রস দিতে হবে, অনুভূতি দিতে হবে—আজকাল দরদ কথাটা বেশ চলচে এই সম্পর্কে। ·· কি চুপ ক'রে রইলে যে?

বল্লুম, হজম করছি, কথাগুলো। বুঝিত সব কিন্তু লেখার সময় সরস্বতীর কৃপা না হ'য়ে, হয় গণেশের।

তার মানে ধৈর্য্যের অভাব; কিন্তু আর একটি বিবেচনার অভাব হয় অনেকের। আর সেটি খুব বড় কথা, জন প্রিয়তার দিক দিয়ে।

কি সেটি? জিজ্ঞেস ক'রলুম।

শরৎ বল্লেন: অধিকারী বিচার। এটি বঙ্কিম বাবুর ছিল চৎমকার, আমি ওঁর কাছ থেকে ওটি শিখেছি। ওঁর গোটা কয় চরিত্র নিয়ে অনেকে অনেক কঠিন আর বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রেছে; কিন্তু আমি জানি যে, বঙ্কিম বাবু ওটি ভুল ক'রে করেন নি, একেবারে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ওটি ক'রে গেছেন, এই উদ্দেশ্যে।

কি রকম?

কার জন্যে লিখছি বই? সেটাও খেয়াল রাখতে হয় হুসিয়ার লেখকের। রাজার কাজ যেমন প্রজা-রঞ্জন তেমনি লেখকের কর্ত্তব্য হচ্ছে পাঠকের মন রসে ভিজিয়ে তোলা।

পাঠককে আরম্ভে ক্ষেপিয়ে দিলে তোমার সত্য ভাষণটা হয়ত নিখুঁত হ'তে পারে কিন্তু সেই ভাষণের উদ্দেশ্যটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'য়ে যায়। পাঠকের রুচি, সংস্কার, তার জ্ঞান এবং বোধকে অতিক্রম ক'রে গেলে কিছুতেই চলবে না, এ তোমায় বরাবর বলে আস্‌চি। এর একস্‌পেরিমেণ্ট আমি দু-একখানা বইয়ে ক'রে দেখেচি। তার ফলে দেখেছি সেগুলো লেখার দিক দিয়ে ব্যর্থ হ'য়েছে। পাঠকের মনকে আঘাত ক'রে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। আমার যদি নিছক সত্যের প্রচার করা কাজ হয়ত—কোন সমাজের কি ধর্ম্মের প্রচারক হিসেবে তা আমি ক'রে বেড়াতে পারি; কিন্তু রস-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ক'রতে গেলে রস মেতে যায়, গেঁজে উঠে!·········

শরৎ একটুখানি চুপ ক'রে বল্লেন: তুমি ভেবে দেখ শেষ-প্রশ্নের যা শেষ হয়েছে—তাই নিয়ে কি রকম হৈ চৈ! কিন্তু আমি ওর কোন শেষ করিনি। কোন বিলিতি ব'য়ে ওর যা' শেষ হওয়া উচিত—তা ক'রে দিলে ও-দেশের লোক হয়ত খুশী হ'ত; কিন্তু এদেশের সে অবস্থার দেরি আছে।······

ঠিক এ' কথাই খাটে কিরণময়ী সম্পর্কে—কিরণময়ীকে আমি কোথাও ছোট কি দুর্ব্বল করিনি; কিন্তু ঐ রকম ক'রে শেষ না করলে, চরিত্রহীন নিজের প্রতিষ্ঠায় আজ দাঁড়াতে পারত না। চিন্তায় আচারে, ব্যবহারে পরিবর্ত্তন আস্‌বে; কিন্তু ততটুকুই আস্‌বে যা দেশের লোকে—অর্থাৎ পাঠকেরা আনন্দের সঙ্গেই নিতে পারবে।

বল্লুম: তাহ'লে কল্পনার কোন স্থান থাক্‌বে না; কথা সাহিত্যের রস-রচনায়?

চিরকালই আছে, আর থাক্‌বেও,—আদর্শ ত চিরদিনই কল্পনার বস্তু, নয় কি? বলেছি ত' সাহিত্যের পথ—আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে দিয়ে রস-সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে চ'লবে। কিন্তু বাস্তব যদি সাহিত্য হ'ত ত কল্পনার স্থান থাকৃত না তাতে। বাস্তব কিছুতেই সাহিত্য হ'তে পারে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শরৎচন্দ্র বাস্তবকে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে কি রকমে ব্যবহার করতেন। সেখানে বাস্তবের প্রাধান্য নেই। তাকে ভেঙ্গে চুরে তিনি নিজের গঠনের কাজের উপযোগী ক'রে নিতেন। তাতে সুসঙ্গত কল্পনার রস দিয়ে এমন কিছু দাঁড় করিয়া দিতেন—যাতে বাস্তবের স্থূলত্বের রূঢ় কর্কশতা চ'লে গিয়ে কল্পনার রসমাধুর্য্যে সত্য সুন্দর এং কল্যাণের সমাবেশ হ'য়ে সাহিত্যের চিরন্তনতার বদলে পাঠকের মনে নিবিড় আনন্দে পুরিপ্লুত হ'য়ে উঠত।

কল্পনার রসান এমন অপূর্ব্ব কৌশলের সঙ্গে তিনি ব্যবহার ক'রতেন যে, সেই সৃষ্টির মধ্যে কৃত্রিমতার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

পাঠকের মনোরঞ্জনের প্রয়াস সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠতে পারে যে, তিনি হয়ত আর্টের উচ্চ আদর্শকে ক্ষুণ্ণই ক'রেছেন। সে কথা স্পষ্ট কণ্ঠে স্বীকার, একের বেশীবার করার তাঁর সাহস ছিল। তিনি আর্ট ফর আর্টস্ সেক—একেবারেই মান্‌তেন না তিনি বিশ্বাস ক'র্‌তেন যে, রস-সৃষ্টির ভিতর সমাজ, জ্ঞান, নীতি এবং ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে!

—

ওয়াইল্ড ক্লাব

শ্রীমন্মথ রায়

রাত্রি ১০টা বাজল।

মিসেস মাধুরী বানার্জি ডিনার খেয়ে ড্রইং রুমে এসে দাঁড়ালেন—তার চোখে মুখে একটা যন্ত্রণা ফুটে উঠচে। পেছনে পেছনে এল 'বয়', তার ট্রেতে গরম জল, তুলো, আয়োডিন প্রভৃতি প্রাথমিক সাহায্যের সরঞ্জাম।

মিসেস বানার্জি॥ উঃ গেলাম! গলায় আমার কি হল! ('বয়' তার 'ট্রে' নিয়ে এগিয়ে এল) কি এনেছিস? আয়োডিন? ইডিয়ট? কি হ'ল আমি বুঝলাম না আর তুই নিয়ে এলি আয়োডিন! সব কাজেই তোমার এমনি বাড়াবাড়ি! নিশ্চয়ই গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছে। এ বাবুর্চ্চি দিয়ে আমার চলবে না—মাছে নিশ্চয়ই কাঁটা ছিল... দেখে দেয়নি। ফাইন্—আমি তাকে এক টাকা ফাইন করলাম। উঃ......গলাটা আমার গেল! গরমজল...দাও দেখি একটু গরম জল—(বয়ের ট্রে থেকে গরমজল নিয়ে মুখে দিয়েই ফেলে দিলেন) পুড়িয়ে দিয়েছে—গলাটা আমার পুড়িয়ে দিয়েছে—এত গরম জল কখনো খেতে দেয়! ফাইন! তোমাকে আমি দুটাকা ফাইন করলাম!

বয়॥ বারো টাকা মাইনে, এ দুটাকা নিয়ে পনর টাকা ফাইন দাঁড়াল এ মাসে! তিন টাকা কি ফিরিয়ে দিতে হবে হুজুর?

মিসেস বানার্জি॥ কি সাহস! কি দুর্জ্জয় সাহস তোমার! আমার মুখের ওপর কথা! ঐ গরম জল তোমাকে খেতে হবে—এখনি খেতে হবে—খাও—খাও নইলে আসছে মাসের মাইনে থেকে ঐ তিন টাকা কাটা যাবে—(বয় অবলীলাক্রমে সমস্ত গরম জলটাই খেয়ে ফেলল। তা দেখে, সবিস্ময়ে)—খেয়ে ফেললে! সবটা খেয়ে ফেললে। এটা শুধু আমাকে জব্দ করতে! আমি যে গরম জল মুখে দিতে পারলাম না—তুমি আমার 'বয়' হয়ে···সেই গরমজল—

বয়॥ আপনি হুকুম করলেন—তাইতো আমি—

মিসেস বানার্জি॥···তোমার জিভ পুড়ে যাওয়া উচিত ছিল। দেখলে না আমি মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম? একটা এটিকেট নেই! আমি যা পারলাম না—তুমি তা—

বয়॥ আমার জিভ্ পুড়ে গেছে!

মিসেস বানার্জি॥ There you are! পুড়ে গেছে?

বয়॥ হাঁ হুজুর।

মিসেস বানার্জি॥ খুব পুড়ে গেছে?

বয়॥ হাঁ হুজুর।

মিসেস বানার্জি॥ যন্ত্রণার কোন লক্ষণ দেখছি না তো?

বয়॥ চেপে আছি—ভয়ে চেপে আছি।

মিসেস বানার্জি॥ That's good. যাও, গিয়ে আয়োডিন দাও—এখনি সেরে যাবে।

বয়॥ তা যাবে। আয়োডিন আনতেই হুজুরের গলার ব্যথা সেরে গেছে।

মিসেস বানার্জি॥ সেরে গেছে! রাসকেল! ভাগো—ভাগো হিয়াসে! (বয়ের পলায়ন) উঃ গেলাম! গলায় কি কাঁটাই ফুটল, না আর কিছু! মনে হচ্ছে গলাটা চিরে গেছে! উঃ (ফোন করলেন)। হ্যালো, পি-কে ওয়ান টু থ্রি!......... ওঃ গেলাম! প্রাণ গেল! ইজ দ্যাট্ Wild club? ওখানে মিষ্টার বানার্জি আছেন? ছিলেন! কারসঙ্গে ছিলেন বলুন দেখি! মিসেস ব্যানার্জি! আপনার মাথা খারাপ হয়েছে। মিসেস ব্যানার্জি তো আমি! গলার ব্যথায় মারা যাচ্ছি! তবু

N. I. P.

বলছেন মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে ছিলেন? কি? মিসেস সুধা ব্যানার্জি! মাই গড! আপনাদের ক্লাবটি কি হয়ে দাঁড়িয়েছে বলুন তো Wild club! যা খুশী তাই হচ্ছে, না! মিসেস সুধা বানার্জির স্বামীও তো ওখানে ছিলেন? কি? ছিলেন না? দেখুন—শুনছেন? আপনাদের এই ক্লাবটি ভেঙ্গে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে। দেবেন না? দেন কি না আমি দেখছি। সুধা বানার্জির স্বামী তো একটি আছেন। তাকে আমি সঙ্গে পাব। এমনি অনেক স্বামী—অনেক স্ত্রী আমি পাব। দল-বল নিয়ে আমি যাচ্ছি একদিন আপনাদের ওখানে—দেখে নেব সুধা বানার্জিকে—দেখে নেব আপনাকে—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—রাস্কেল! ছেড়ে দিয়েছে!

[মিষ্টার বানার্জির প্রবেশ।]

মিঃ বানার্জি॥ হ্যালো মাধুরী! হাউ-ডু ইউ-ডু?

মিসেস্ বানার্জি॥ [গর্জ্জে উঠলেন] গলার ব্যথায় আমি মারা যাচ্ছি—আর তুমি কিনা সুধা বানার্জির সঙ্গে—

মিঃ বানার্জি॥ গলার ব্যথা! ও! তাই গলাটা তোমার শাঁখের মতো বাজছে!

মিসেস্ বানার্জি॥ সাট্ আপ্। উঃ, আঃ গলায় আমার কাঁটা ফুটেচে···আর আর তুমি কি না—

মিঃ বানার্জি॥ কাঁটা ফুটেচে—

মিসেস বানার্জি॥ আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। গলার ব্যথায় আমি মারা যাচ্ছি—আর তুমি কিনা Wild clubএ—সুধা বানার্জির সঙ্গে—

মিঃ বানার্জি॥ সুধা বানার্জি নয়—

মিসেস বানার্জি॥ লায়ার! মিথ্যা কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? ভাবছো আমি কিছু জানি না?

মিঃ বানার্জি॥ শোনো মাধু—

মিসেস বানার্জি॥ [গর্জ্জে উঠে] যা শোনবার তা আমি শুনেছি। আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, শুনব না। এই গলার ব্যথাতেই আমি মরব। গলায় যে কি হল বুঝতে পাচ্ছি না। [কাস্তে লাগলেন—] ওঃ আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! ডাক্তার বোস্ এর কি আক্কেল—আধঘণ্টা হয়ে গেল কল্ দিয়েছি—এখনো এলেন না! আজকাল সব হয়েছে সমান! যেমন হয়েছে বাবুর্চ্চি তেমনি হয়েছে আয়া—তেমনি হয়েছে 'বয়' তেমনি হয়েছে হাজব্যাণ্ড তেমনি হয়েছে ডাক্তার!

[ডাঃ বোসের প্রবেশ]

ডাঃ বোস॥ গুড্-ইভিনিং মিসেস বানার্জি! গুড-ইভিনিং মিষ্টার বানার্জি! আমি প্রায় দশমিনিট হল আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে আছি—পেসেণ্টকে অবজার্ভ করছিলাম। আমি দেখছি পেসেণ্টকে না জানতে দিয়ে যা জানা যায়—যা দেখা যায়, রোগনির্ণয়ের পক্ষে সেটা অধিকতর মূল্যবান। আপনার গলাটা বোধ হয় চিরে গেছে।·········
[কাছে গিয়ে—] হাঁ করুন দেখি—
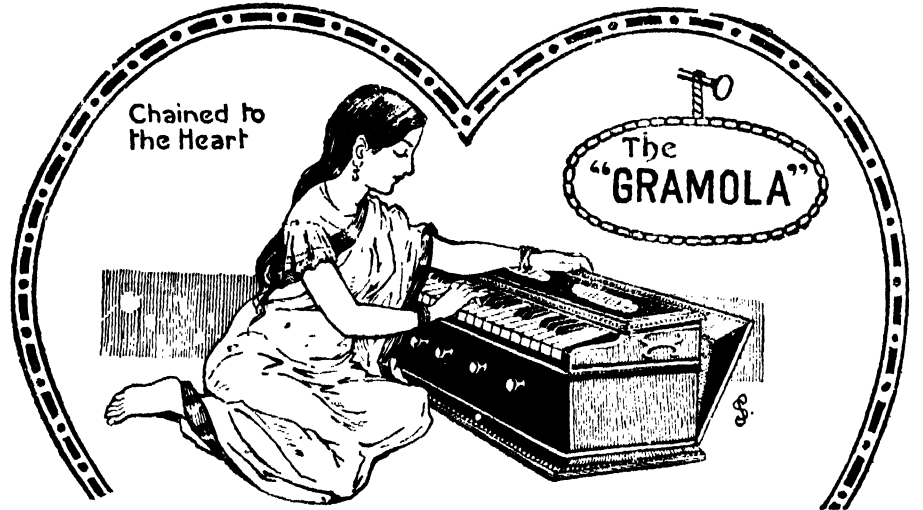
মিসেস বানার্জি ॥ [হা না করে, আতঙ্কে] চিরে গেছে! গলা চিরে গেছে!

মিঃ বানার্জি ॥ যাবে না! রাতদিন যা চেঁচাও!

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জিকে] তুমি থামো। আমার সম্বন্ধে তুমি কোন কথা কইবে না। [ডাক্তারকে] গলা আমার চিরে গেছে?

ডাঃ বোস ॥ [খুব গম্ভীর হয়ে] যদি গিয়ে থাকে তাহলে মুস্কিলে পড়তে হবে। আসুন। হাঁ করুন [ডাক্তার পকেট থেকে যন্ত্রপাতি বের করে দেখলেন। খুব সিরিয়াস-লি] সিরিয়াস!

মিসেস বানার্জি ॥ [আতঙ্কে ঢোক গিললেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ সিরিয়াস!

মিসেস বানার্জি ॥ [মিঃ বানার্জিকে] তুমি থামো। তুমি কোন কথা কইবে না।......[ডাক্তারকে] কি হবে ডাঃ বোস?

ডাঃ বোস ॥ বেশী কথা বলে বলে এই দাঁড়িয়েছে। আজ বোধ হয় খুব চেঁচিয়েছেন?

মিঃ বানার্জি ॥ শুধু আজ কেন—

মিসেস বানার্জি ॥ [মিষ্টার বানার্জিকে] তুমি কোন কথা কইবে না! ওয়াইল্ড! ভ্যাগাবণ্ড!

ডাঃ বোস ॥ [মিসেস বানার্জিকে] কিন্তু আপনিও আর কথা কইবেন না। না—একটি কথাও আর নয়। গলা চিরে গেছে—রক্ত বেরুচ্ছে মনে হচ্ছে।

মিসেস বানার্জি ॥ রক্ত বেরুচ্ছে! বলেন কি!

মিষ্টার বানার্জি ॥ গলার ঝাজটাও তাই একটু কমেছে!

মিসেস বানার্জি ॥ সাট্ আপ! কথা বলেছ কি আজ রসাতল করব!

মিঃ বানার্জি ॥ না—না, কমেনি।

ডাঃ বোস ॥ শুনুন মিসেস বানার্জি। গলাকে আজ আপনার **absolute rest** দিতে হবে। কথা কয়েছেন কি গলা দিয়ে রক্ত ছুটবে। গলার ভেতরকার কোমল

পর্দ্দাটী একেবারে ছিড়ে গেছে! কথা কইলেই ওখানে ঘা হবে, পুঁজ হবে, শেষটায় পোকা পড়বে!

মিসেস বানার্জ্জি॥ [অকাতরে] ডাঃ বোস!

ডাঃ বোস॥ না, আর ডাক্তার বোস্‌ও নয়। গলাকে স—ম্পূ—র্ণ বি—শ্রা—ম দিতে হবে।

মিসেস বানার্জ্জি॥ কতক্ষণ?

ডাঃ বোস॥ না—না—আর কোন কথা নয়। যা জিজ্ঞেস করবেন—লিখে দিন।

মিসেস বানার্জ্জি॥ মাই গড!

ডাঃ বোস॥ না না—মাই গডও নয়। মুখে আর একটি কথাও নয়, সব লিখে—

মিঃ বানার্জ্জি॥ [ছুটে গিয়ে মিসেস বানার্জ্জির সামনে রাইটিং প্যাড এবং পেন রাখলেন।]

ডাঃ বোস॥ [বুঝলেন মিসেস ব্যানার্জ্জি এতে চটে গিয়ে এখনি মিষ্টার বানার্জ্জিকে বকতে যাবেন তাই আগে থেকেই—] না-না, কোন কথা নয় মিসেস বানার্জ্জি। কথা কয়েছেন কি গলা দিয়ে রক্ত ছুটবে। আপনার গলার ভেতরকার কোমল পর্দ্দাটা কথা কইলেই ফুটো হয়ে যাবে—তখন রক্ত ছুটবে—ঘা হবে—পুঁজ হবে—পুঁজ হলেই পোকা—কিন্তু তার চেয়েও ভীষণ আপনার বাক্‌শক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে! Complete loss of speech! আমি গিয়ে অষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। রেষ্ট—এবসোলিউট রেষ্ট! মিষ্টার বানার্জ্জি! আপনি পাশেই থাকবেন—খুব লক্ষ্য রাখবেন একটি কথাও যেন উনি না বলেন এমনকি উঃ আঃ এসবও না!

মিষ্টার বানার্জ্জি॥ আপনি চলে গেলেই উনি—

মিসেস বানার্জ্জি॥ [মিঃ বানার্জ্জির প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত—কিন্তু এবার আর কোন কথা নয়।]

ডাঃ বোস॥ মুখ বেঁধে দেবেন। যদি কথা বলেন মুখ বেঁধে দেবেন। রোগীকে বাঁচাতে হবে তো!

মিঃ বানার্জি ॥ [কলিংবেল টিপিলেন।]

[পূর্ব্বোক্ত বয়ের প্রবেশ]

মিঃ বানার্জি ॥ তোরা আজ সবাই আমার পাশে পাশে থাকবি। আজ রাত্রে কেউ তোরা ঘুমুবি নে। বুঝলি?

বয় ॥ [পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা কইল না।]

মিঃ ব্যানার্জি ॥ কথা কইছিস না যে?

বয় ॥ [মিসেস বানার্জির দিকে একবার তাকিয়ে—] জিভ পুড়ে গেছে!

মিঃ বানার্জি ॥ কি খেয়েছিলি?

বয় ॥ গরম জল।

মিঃ বানার্জি ॥ কেন?

বয় ॥ [মিসেস বানার্জিকে দেখিয়ে] হুজুর জোর করে খাইয়ে দিয়েছেন।

মিসেস বানার্জি ॥ [চটে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—]

মিঃ বানার্জি ॥ [তা বুঝতে পেরে]—না—না, কোন কথা নয়। [বয়কে] যা ডাক্তারের সঙ্গে চলে যা—অষুধ নিয়ে আয়—

ডাঃ বোস ॥ তাহলে চললাম। মিসেস বানার্জি! আপনি ভাববেন না। আমার কথামত চললে হয়ত ভালো হবেন—অপারেসন বোধ হয় দরকার নাও হতে পারে!

মিসেস বানার্জি ॥ [হতাশাময় দৃষ্টিপাত। ডাঃ বোসের প্রস্থান। প্রস্থান কালে ডাঃ বোসের এবং ডাঃ বানার্জির ইঙ্গিতপূর্ণ সস্মিত দৃষ্টি বিনিময়।]

বয় ॥ তাহলে বাবুর্চি, খানসামা, আরদালি, ঝাড়ুদার, মেথর সবাইকে পাঠিয়ে দেব হুজুর?

মিঃ বানার্জি ॥ হ্যাঁ—পাঠিয়ে দে...... বারান্দায় বসে থাকবে।

[বয়ের প্রস্থান, প্রস্থানকালে তাহার চোখে-মুখে কৌতুক ফুটে উঠল।]

মিঃ বানার্জি ॥ এইবার মাধুরী, তোমায় বলছি—ওয়াইল্ড ক্লাবে আমার সঙ্গে কে ছিল।

মিসেস বানার্জি ॥ [সরোষে হাত তুলে কথা বলতে মানা করলেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ না না তোমার শুনতেই হবে। চিরটা-কাল তোমারই কথা কেবল শুনে এসেছি। আজ এই একটা রাত যখন কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি—

মিসেস বানার্জি ॥ সাট্—[কিন্তু 'আপ' আর বলা হল না। নিজেই বুঝতে পারলেন কথা বলা উচিত হবে না...এবং বুঝেই তখনি নিজের হাতে মুখ চেপে ধরে বসে পড়লেন।]

মিঃ বানার্জি ॥ আবার কথা বলতে যাচ্ছিলে! তাহলে দেখছি মুখ তোমার বেঁধেই দিতে হচ্ছে—বয়!.. আচ্ছা, এবার থাক্। হ্যাঁ, কি বলছিলাম! হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি বলছিলে সুধা বানার্জির সঙ্গে আমি ওয়াইল্ড ক্লাবে আজ ডিনার খেয়েছি। তা নয়। প্রথমতঃ সুধা বানার্জি নয়। প্রেমলতা বানার্জি। দ্বিতীয়তঃ প্রেমলতা বানার্জির সঙ্গে ডিনার খাই নি, আমরা নেচেছি এবং গেয়েছি—কি গান... শুনবে?

মিসেস বানার্জি ॥ [অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে রোষ প্রদর্শন করছিলেন।]

[দ্বারের বাইরে খানসামারা এসে দাঁড়াল।]

মিঃ বানার্জি ॥ এই যে তোমরা সবাই এসেছ! বারান্দায় বসে থাক। মেম সাহেবকে নার্স করতে হবে। আমি ডাকলে আসবে।...হ্যাঁ, মাধুরী, এইবার এইবার শোন—গানটি শোন—

"হেসে নাও দুদিন বৈতো নয়।"

[গান সুরু করলেন। শেষে নৃত্য। মিসেস বানার্জি নিরুপায় হয়ে দুকানে হাত দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেন।]

[—যবনিকা—]

রূপের ধ্যানে তোমায় দেখি

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন

রূপের ধ্যানে তোমায় দেখি
প্রাণ-জুড়ানো রূপময়!
তোমার ধ্যানে সুখে থাকি
সব-ভুলানো সুখময়!
ওই শ্যামলে দেখি তোমায়!
ওই আকাশে তোমার শোভায়!
বাতাস বহে মৃদু মৃদু
হাত-বুলানো শুভময়!
তোমার ধ্যানে সুখে থাকি
সব ভুলানো সুখময়!
পত্রে পুষ্পে তোমার হাসি!
পাখীর গানে সুধার রাশি!
কর্ম্মে জ্ঞানে সুরে তানে
প্রাণ-কুড়ানো সুখময়!
নাহি বিভেদ, নাহি ক খেদ
মান-গুড়ানো দুখ ভয়!

—:০:—

সরমা পিক্‌চার্সের
নবতম নিবেদন
মায়ামৃগ
প্রযোজনা - গণেশরঞ্জন
পরিচালনা - কালীভূষন
কথা ও গান - সুশীল ঘোষ
সুর - গিরীন্ চক্রবর্ত্তী
ভূমিকায়
কমলা, মমতা,
সরযূ, নটরাজ
ইন্দ্রনাথ ও ললিত
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
"যমুনা পুলিনে ভিখারিনী" অবলম্বনে
Bimol Ghosh

মেঘ ও রৌদ্র

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
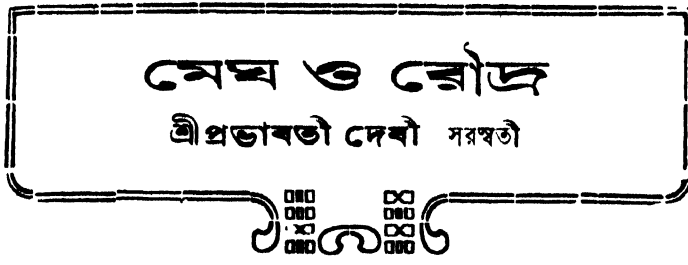
সকালেও আকাশ ছিল বেশ পরিষ্কার; সেই আকাশে যে হঠাৎ এমন গাঢ়ভাবে প্রকাণ্ড বড় মেঘখানা এসে দাঁড়াবে তা নারাণ আশাই করেনি।

বৃষ্টি আসবে—

পাখীরা আকাশে উড়ছিল—মেঘের ভাব দেখে সবাই আশ্রয়ের আশায় নেমে এলো ধরণীর বুকে, আশ্রয়ও মিললো গাছের পাতার মধ্যে।

খোঁড়া নারাণ বসেছিল পথের ধারে, লাঠি গাছটা যদিও তার পাশেই পড়েছিল, তবু তাকে সম্পূর্ণভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্ভরতা তাতে ছিল না। মুখ্যতঃ কোনও মানুষের দরকার, লাঠিটা গৌণ কারণ হতে পারে।

দেখতে দেখতে পথ হয়ে গেল জনশূন্য—দুই একখানা গাড়ি ছাড়া মানুষ বড় একটা দেখা যায় না।

নারাণ এদিক ওদিক চাইলে—তার চেনা মুখ দেখা যায় না কে তাকে কোন আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। একান্ত অসহায়ভাবে সামনের লাঠি গাছটা আঁকড়ে ধরে সে বসে রইলো।

সামনের বাড়ীটার ছাদে একটী মেয়েকে দেখা গেল; কাপড় তুলতে এসেছে। ভোর বেলায় কখন স্নান করে কাপড়খানা শুকাতে দিয়ে গিয়েছিল, আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় সেখানা তুলতে এসেছে।

এই মেয়েটীর মুখখানার 'পরে দৃষ্টি পড়তে খোঁড়া নারাণ চমকে উঠলো।

ঠিক সেই মুখ—

আশ্চর্য্য, মানুষের মত মানুষ থাকে? মন তার জিজ্ঞাসা করে—সেই নয় তো?

কিন্তু না, সে নয়—।

বায়স্কোপের ছবির মত রেখার কথা তার মনে হয়।

একদিন নারাণের পা খোঁড়া ছিল না,—তোমার আমার মতই সে সমান দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতো—দৌড়াতো। সে ছিল সম্পূর্ণ একটী মানুষ, আধখানা পা কেটে তা বাদ দিতে হবে, তারপর রাস্তায় বসে লোকের করুণা উদ্রেক করতে বিনিয়ে বিনিয়ে নিজের দুঃখ কাহিনী বলতে হবে, ভিক্ষা নিতে হবে, সেদিন সে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

রেখা ছিল ধনী কন্যা, তাদেরই বাড়ীতে নারাণের মা কাজ করতো। রেখার মায়ের সহচরী অর্থাৎ দাসী—যতদূর সম্ভব খোসামোদ করে দেশের মেয়ে নারাণের মা রেখার মার কাছে এইটুকু অনুগ্রহ লাভ করেছিল। বলা যেতে পারে কাজই বা তাকে এমন কি করতে হতো? না করতে হতো বাসন মাজা, জল তোলা, না করতে হতো রান্নাবান্না—যা সাধারণ দাসী শ্রেণীর মেয়েরা করে থাকে। নারাণের মা তাদের চেয়ে উন্নততর কাজ করতো,—রেখার মার কাছে কাছে সর্ব্বদা তাকে থাকতে হতো, তাঁর সব ফাই-ফরমাস তামিল করতে হতো।

রেখার মা মনে করতেন তাকে অনেক কিছু সুখ সুবিধা দেওয়া হয়েছে, হয়তো হয়েছেও তাই, তবু নারাণের মা মনে করতো সে দাসী ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা তারও অধম। দাসীর সে স্বাধীনতা আছে যাতে সে কাজ ছেড়ে অন্যের বাড়ী কাজ করতে যেতে পারে, কিন্তু ভদ্রকন্যা রেখার মার সাহায্য তাকে সে স্বাধীনতা দেয়নি।

ঠিক এমনই ভাবে মানুষ নারাণ, দাসী-পুত্রের সম্মান ছিল না—মর্য্যাদা ছিল না, সকলের হুকুম মানতে সে ছিল বাধ্য। তবু এরই মধ্যে সে যে কেমন করে প্রভু

কন্যা রেখাকে ভালোবেসে ফেললে, তাই বলাই মুস্কিল।

সে বুঝতে পারেনি এ তার অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সে শুধু জানতো এ কথা প্রকাশ হলে কেবল তারই নয়, তার মারও বিপদ ঘটবে। তারা এখান হতে তাড়িত হলে দুনিয়ায় কোথায়ও তাদের আশ্রয় জুটবে না।

কিন্তু একটা কথা এই—ভালবাসা গোপন করে রাখা চলে না, অন্ততঃ পক্ষে তার মত লোক গোপন রাখতে পারে না।

নারাণ যে কোন ভালো জিনিস পেলে আর কাউকে না দিয়ে সেটা রেখাকে দিয়েই তৃপ্তি পায়, এটা কে জানে কেমন করে সবারই চোখে পড়ে গেল। রেখা পর্য্যন্ত তা বুঝতে পেরেছিল এবং ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল।

সেই দিনই রাত্রে নারাণ যখন বাগান হতে সদ্য ফোটা রজনীগন্ধার তোড়া গেঁথে, ভক্ত যেমন দেবীর মন্দিরে অর্ঘ্য নিয়ে আসে, তেমনই ভাবে রেখার ঘরে টেব্‌লের উপর সাজিয়ে রেখে বিছানায় ঘুমন্ত রেখার পানে মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে বার হয়ে আসছিল সেই সময় তার সামনে দাঁড়ালেন রেখার পিতা তিনি একা নন, সঙ্গে তাঁর চাকর দ্বারোয়ান সব।

নারাণ কিছুতেই বলে বুঝাতে পারেনি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সে কেবল ফুল দিতে এসেছিল।

সে কি প্রহার—

নারাণ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। তাকে রক্ষা করতে এসে তার মাকেও কম আঘাত সইতে হয় নি। তারপরে তাদের স্থান নিতে হল পথে, জীবিকা হল ভিক্ষা—।

এক বৎসর পরে তার মা হাঁসপাতালে মারা গেছে।

নারাণের একটী মাত্র আশ্রয় ছিল মায়ের কোল, সে আশ্রয়ও গেছে। নিজের জন্য নারাণ কোন দিনই ভাবে নি। মা থাকতে যেটুকু বাঁধন ছিল, তাও কেটে গেল।

জীবিকার্জ্জনের জন্য সে না করেছে কি—দুনিয়ার যত খারাপ কাজ মন্দ কাজ সবই করেছে—।

যথেষ্ট অর্থ তার হাতে এসেছে, বাবুয়ানাও করেছে, সুখ বা শান্তি কোন দিন পেয়েছে বলে নারাণ আজ মনে করতে পারে না।

সে একদিন সন্ধ্যাবেলার কথা—সেদিন ছিল একদিনকার মত বৃষ্টি ধোওয়া সন্ধ্যা—তার স্মৃতি নারাণের মনে জেগে উঠে, জগতের 'পরে তার বিতৃষ্ণা এনে দিয়েছিল—।

সে সন্ধ্যায় হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল ফুটনোন্মুখ একরাশি রজনীগন্ধা ফুল --।

নিজেকে ভুলে সে মদ খেয়েছিল প্রচুর, এত বেশী খেয়েছিল যাতে সে মোটে দাঁড়াতে পারছিল না—তবু সে টলতে টলতে চলছিল পথ বেয়ে—

একটা গানের একটা লাইন ছিল তার মুখে—

পেয়ে মানিক হারিয়েছি মা—
আমি অতি লক্ষীছাড়া।

"এই এই—রোখো—রোখো—" বলতে বলতে একখানা মোটর এসে পড়েছিল তার উপরে—

সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো মোটরের মধ্যে একটী মেয়ে, সে রেখা। যে লোকটী মোটর চালাচ্ছিল, তারই পাশে সে বসেছিল—।

একটা গলির মুখ, আলোও সেখানে বেশী ছিল না, লোক জনও কম—।

"রেখা—"

আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটী তার পানে চেয়েছিল, সে চাহনীটিই শেষ। লোকজন এসে পড়বার আগেই মোটর খানা নিমেষে গলির পথে অন্তর্হিত হয়েছিল।

একখানা পা তার কেটে বাদ দিতে হয়েছে।

জীবনে সে বেঁচেছে, কিন্তু সে একেবারে অকর্ম্মণ্য, বিরাট বোঝা শুধু বইছে।

আকাশের মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিল দমকা হাওয়ার স্পর্শ লেগে—

ছেঁড়া মেঘের ফাঁক হতে এক ঝলক রৌদ্র আচমকা হাসির মত ধরার বুকে ছড়িয়ে পড়লো।

সামনের বাড়ীটার বারাণ্ডায় টবে রজনীগন্ধা গাছে ফুলগুলো বাতাসে দোলন খাচ্ছিল। তার পানে চেয়ে চেয়ে নারাণের চোখ জ্বালা করতে লাগল। তবু আজও সে ভালোবাসে—সেই মেয়েটীকে—সেই নিষ্ঠুর মেয়েটীকে।

সে সুখী হয়েছে তা নারাণ জানে—বিবাহিতা জীবন যাপন করছে তাও সে জানে। হয়তো হঠাৎ আবার কোনদিন তার সঙ্গে এই পথের ধারেই দেখা হয়ে যাবে, সেই ক্ষণটীর আশা সে করে।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা চলছে—মেয়েটী ছাদ হতে কাপড় তুলে নিয়ে চলে গেছে।

নারাণ স্বপ্ন দেখছে রজনীগন্ধার, সে যেন এক গোছা রজনীগন্ধা এনে দিয়েছে, রেখা একটু হেসে ফুলগুলো নিয়ে মাথায় পরছে।

যেন

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিদায় বেলায়
অকথিত সব রহে যায়।
শুধু রেখো মনে
কত ব্যথা দূরে মরে ঘুরে—
ফোটে যেন বিরহেরি সুরে
সে ব্যথা গোপনে
আগামী চাঁদের মধু-স্বপনে।

তখন ভুলোনা প্রিয় তাহারে
বিনতি জানায় যেথা আড়ালে।
মিনতি-মলিন দিঠি ভরে'
স্মৃতির সুবাস যেন ঝরে।
থেকে থেকে স্তব্ধ দুপুর
ভরে যেন অন্তরপুর—
ছলছল ভরা নদীতে
আনে যেন তারি ব্যথা চিতে—
তব চোখে পড়ি' ম্লান রবি
আঁকে যেন তারি মুখছবি।
তখন সাজিয়ো তুমি চম্পক বসনে,
প্রসাধন কোরো তারি গন্ধিত স্মরণে।

উপরে : নিউ থিয়েটার্সের "অধিকার" চিত্রে মেনকা, যমুনা ও পাহাড়ী সান্যাল। ছবিখানি মুক্তি প্রতীক্ষায়।

দক্ষিণে : ফণি মজুমদার পরিচালিত "সাথী" চিত্রে সাইগাল, কানন প্রভৃতি।
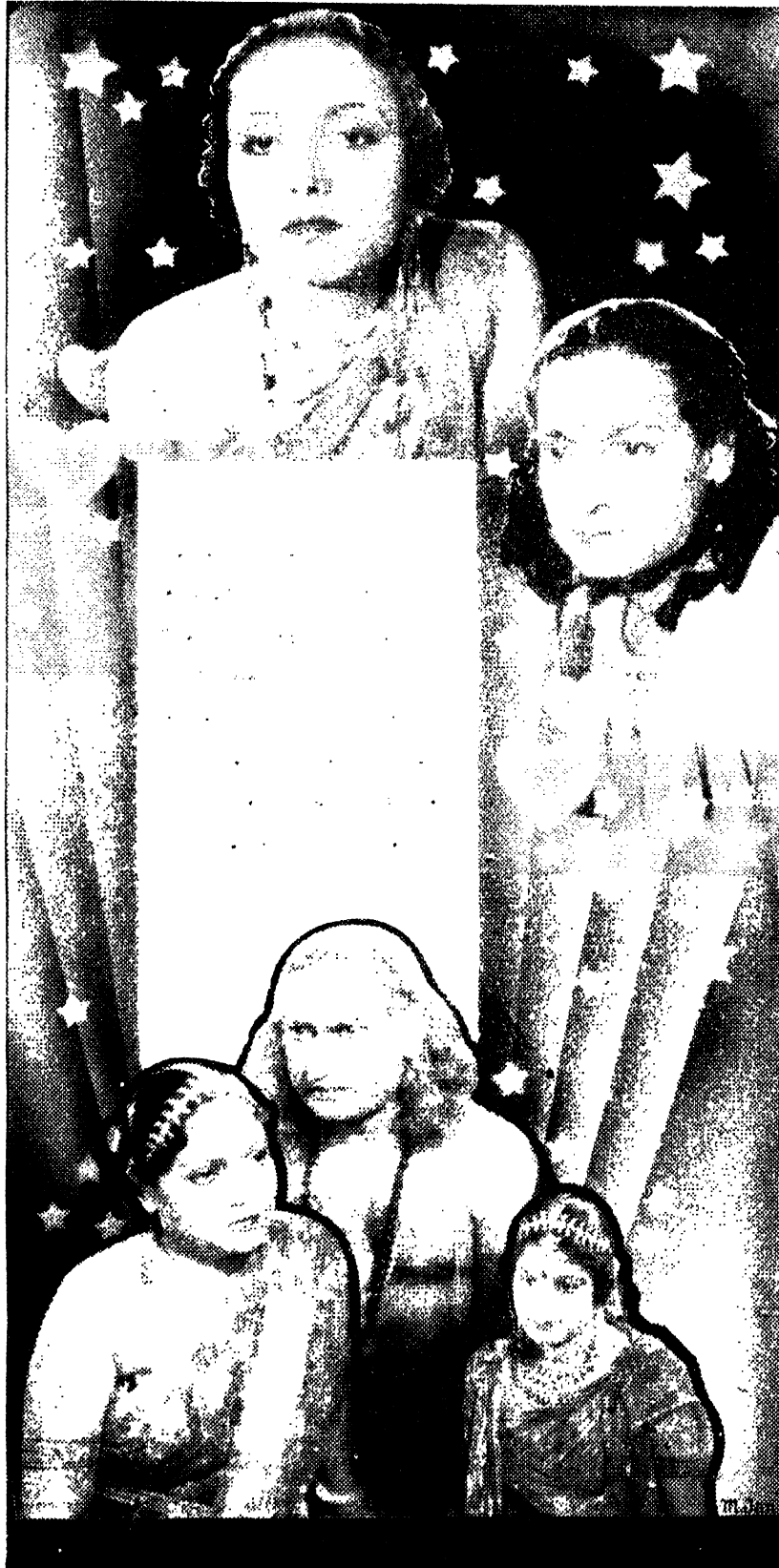
প্রয়োগ-শিল্পী : ফণী বর্ম্মা

*

চিত্র-শিল্পী : প্রবোধ দাস

*

শব্দ-যন্ত্রী :

নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

*

ভূমিকায় : সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, মৃণাল ঘোষ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস লিঃ

কলিকাতা

মতিমহল থিয়েটার লিমিটেডের
রোমাঞ্চকর বাংলা কথা-চিত্র

যখের ধন

ইষ্টইন্ডিয়া পিকচার্সের ষ্টুডিওয় গৃহীত

প্রয়োগ-শিল্পী : হরি ভঞ্জ ঃ ঃ চিত্র-শিল্পী : যতীন দাস

শব্দ-যন্ত্রী : গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবনী চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী : হেমেন রায়

ভূমিকায় : শীলা হালদার, সুহাসিনী, অহীন্দ্র চৌধুরী, সুশীল রায়, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্সের পরবর্ত্তী আকর্ষণ, পৌরাণিক কথা-চিত্র—

দ্রৌপদী

প্রয়োগ-শিল্পী এবং প্রধান অভিনেতা ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী

Layout By N. I. P.

নির্ব্বিঘ্ন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার

কিছু ভালো লাগেনাকো, পড়াশোনা, নাওয়া, খাওয়া, শোওয়া ;
সুরহীন জীবনবীণার তারগুলো
বাজে নাকো তেমন মধুরে।
'টকি' শুনি সপ্তাহে ৩ দিন ;
মাঝে মাঝে 'লেকে' যাই, নিয়মিত ফুঁকি সিগারেট ;
তবুও লাগে না ভালো ; কোথা আলো, দীপ্ত, অচপল,
প্রাণের বিজন গেহে কল্যাণের অমৃতপ্রদীপ !
অগণ্য প্রদীপজ্বালা রূঢ় এই মহানগরীর
গূঢ় অন্ধকার মাঝে অন্ধ হ'লো অন্তরের আঁখি।
অলঙ্কৃত শবাধার কলিকাতা, নিরুদ্ধনিশ্বাস
বিগলিত শবের কবর ; মোরা তা'য় কৃমীকীট
আবরিয়া ক্লিষ্টতনু লজ্জাহীন আদ্ধির জামায়,
দেঁতো হাসি মুখে আনি' কহি বাণী রবীন্দ্রনাথের।

*　　　　•　　　　•

শতকরা পঁচাত্তর কোনোরূপে হবে রাখিতেই,
কাজেই কলেজে যাই, ক্লাসে বসি, শুনি শকুন্তলা
মিশরের মমি সম শুষ্কদেহ, লুপ্ত প্রাণরস,
প্রফেসর উচ্চারিছে শ্লোক,
যৌবনের করুণ কাহিনী !
কখনো বা শুনি 'মনু', বৃদ্ধ ভারতের
পূতি গন্ধ আলস্যের অজস্র বিকায়,
যুগান্ত সঞ্চিত বর্ব্বরতা।
'কনক আসনে বসি দশানন বলী'
কাঁদে নিত্য বাংলা ক্লাসে, নাহি জানি, হায়,
কবে যে সে ক্ষান্ত হ'বে।
কবিবেশ মছি বোস ইংরাজির ক্লাশে
করে নিত্য কাব্য-ব্যবচ্ছেদ।
কভু প্রভঞ্জন ভাষী মৃদুহাসি দত্ত মহাশয়
পন্থ হতে পন্থান্তরে লম্ফ দেন নয়ন-রঞ্জন।
Ladyগণ সনাতন আদর্শের পথে
নতমুখী, নীরব ভাষিণী।
মোরা যেন কেহই আসিনি এ কলেজে,
এহেন মনের ভাব।
বন্ধুগণ কেহ কবি, কেহ সাধু, পাগলাটে কেহ,
কারো প্রাণে আদিরস তুলেছে তুফান,
নির্জ্জন প্রান্তরে ব্যান্জো বাজান।

*　　　　•　　　　•

এখনো তো মনে পড়ে শান্ত এ হৃদয়ে
কোমল তরঙ্গ তুলি' স্বর্গের বাতাস
গাহিত কী অমল সঙ্গীত !
পবিত্রতা, শুভ নিরমল
অসংশয় স্নেহময় মন
কোথায় মিলাল ধীরে।
এখনো পড়িছে মনে কী শুভ প্রভাতে
নবীন সূর্য্যের আলো কৈশোরের স্নিগ্ধ নীলিমায়
অরুণিল অকস্মাৎ। মনের গহন বনতলে
সুপ্ত ছিল যে সঙ্গীত, কমকর পরশে তাহার
জাগিল সে মধুর গৌরবে।
আলোকে সঁপিল সুর, শব্দেরে করিল দীপ্তিময়,
গীতার দানিল ছন্দ, অপূর্ব্ব করিল সামান্যেরে
সুদূরের মোহ সঞ্চারিয়া।

*　　　　•　　　　•

সে মোহ কাটিয়া গেছে ; যতদূরে আঁখি মোর ধায়,
হেরি শুধু প্রাণহীন বাস্তবের বিমূঢ় কঙ্কাল।
কী লভেছি তা'র ফলে ! কোন্ ধন দিয়াছে সে জ্ঞান
সুবঙ্কিম দেহযষ্টি তিক্ত মন অশান্ত, চঞ্চল,
আঁধারের গ্রাস হতে নিবু-নিবু প্রদীপশিখার
নিত্য শঙ্কা, ব্যর্থ নিবারণ !

*　　　　•　　　　•

হে প্রকাশ ! হে মোর ঈশ্বর !
হানো তব অগ্নিখড়্গ, টুটুক এ কালো আবরণ,
বিষণ্ণ, বৈচিত্র্যহীন ! জীবনের অকাল সন্ধ্যায়
আবার তোমাতে জাগি পরিপূর্ণ মেলিয়া নয়ন,
নিশীথ-প্রসুপ্ত পাখী জাগে যথা প্রদীপ্ত উষায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম

Where Angels fear to tread!

অশনি

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। কাজেই ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা, তাহাই ফলিতেছে। শনির দলের কেহবা রোহিণীকে উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে আর্টিষ্ট ছিলেন না, তাহাই ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়া ফেলিয়াছেন, কেহ বঙ্কিমকে ডাহা যৌনতান্ত্রিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেহ "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের ব্যক্তিগত রুচি ও বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে, ইঁহাদের মনে যে দিন-দিন নবনব তত্ত্ব গজাইয়া উঠিতেছে, তাহাই ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অবলীলা ক্রমে আরোপ করিয়া অসহায় বঙ্গীয় পাঠককে নূতন কথা শুনাইবার জাঁক করিতেছেন। বাস্তবিক, ইঁহাদের নবনব-উন্মেষশালিনী দুষ্ট বুদ্ধি দেখিয়া হাসি পায়। ভাদ্রের সংখ্যা শনির কাগজখানাতে কি কারণে জানি না, এবার আর মোহিতলাল-সত্যসুন্দর-সুশীলকুমারের দেখা পাওয়া গেল না। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস পড়িতে না পড়িতেই—"একস্ত দুঃখস্ত না যাবদন্তং"—স্বয়ং সম্পাদক সজনীকান্তকে শনির 'মুখপাত' রক্ষা করিতে মরিয়া ভাবে রঙ্গস্থলে দেখা গেল। সজনীকান্তেরও নবনব রূপ, নবনব ভাব; কখনও দেখি, খিস্তিভাব, কখনও কপিভাব, কখনও বা বাণুভাব। এবার দেখিতেছি, পাদ্রীভাব। তা, শ্রীরামপুরের স্থান-মাহাত্ম্যে শনির বাছনির মিশনারি—ভাবটা খুলিয়াছে ভাল।

রসরাজ অমৃতলাল একবার লিখিয়াছিলেন—

কুঁচো চিঙ্গড়ির সেজো দাদা তারও
একটাকা সের,
তার উপরে মেছোর মেয়ের আছে
দাঁড়ীর ফের!

সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে যে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদিত হইয়া বাহির হইবে বলিয়া প্রকাশ, সজনীকান্ত হইতেছেন সেই অনুষ্ঠানের সেজো কর্ত্তা। বর্ত্তমান সাহিত্য-মেছোহাটের মেছুনীরা দাঁড়ী পাল্লার ফের কসিয়া ইতিমধ্যেই কুঁচো চিঙ্গড়ীর সেজো দাদাকে টাকা-টাকা সেরে দাঁড় করাইয়াছে। সেই দর যাহাতে পোক্ত থাকে, বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্পাদনের 'সেজো কর্ত্তামি' যাহাতে অযোগ্যপাত্রে ন্যস্ত বলিয়া লোকে না মনে করে, সেই জন্যই ইন্দুকান্ত সজনী শেওড়াফুলি হইতে আরম্ভ করিয়া গোবরডাঙ্গা পর্য্যন্ত বঙ্কিম শতবার্ষিকী সভার সভাপতি হইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর নব-নব আলেয়া-পাত করিতেছেন। কর্ম্মী ও ত্যাগী পুরুষের এইরূপ "পাত" সাহিত্য-মেছোহাটায় দুর্ল্লভ—মেছুনীদেরও ঈর্ষ্যার বস্তু! শ্রীরামপুরের বঙ্কিম শতবার্ষিকী সভায় সভাপতি সজনী দাস অমিতবিক্রমে বাহ্বাস্ফোট করিয়া শ্রীরামপুরবাসীদের "থ" বানাইয়া দিয়াছেন এবং যাহাতে কলিকাতা ও অন্যান্য জেলার লোকেরাও সেই বাহ্বাস্ফোটের বীররস হইতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য পর পর দুইবার, 'আনন্দবাজার' ও 'শনিবারের চিঠি'তে, সেই বীররসের পরিবেশন করিতে কৃপণতা করেন নাই। কান্তদাস বলিয়াছেন—"অথচ কুত্রাপি দেবতত্ত্ববিষয়ে বঙ্কিমের এই লেখাগুলির উল্লেখ দেখিনা কেন? • • • অথচ এটি একটি বৃহৎ গ্রন্থ, বিষয়ের গুরুত্বের দিক দিয়া বোধহয় বঙ্কিম-রচিত বৃহত্তম গ্রন্থ। আমি আজ বঙ্কিমের শেষ জীবনের এই বিলুপ্ত কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় দিয়া বিস্মৃতি পুরাতনকে নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিতেছি; • • 'হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতত্ত্বে'র সন্ধানও দিতেছি।" কান্তদাসের ভাবটা এই—"তোমরা, ত এ খবর জানিতে না বাবা, হুঁ হুঁ, দেখিতেছ ত, আমি কেমন কেলেবর হইয়াছি!" কিন্তু আসল কথাটা এই যে, কান্তদাস সজনীবাবু তাঁহার গোবেষক বাণুলীলার অন্ত লীলায় সেকালের বঙ্কিম আমলের "প্রচার" পত্রের সন্ধান পাইয়াছেন এবং তাহাও বেশী নয়, চারিখণ্ড "প্রচার"এর প্রথম খণ্ডখানি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সভাপতির অভিভাষণের পোনর আনায় মাছি মারা কেরাণী-বৃত্তির কণ্ডুয়ন করিয়াছেন। ইহাতেই আস্ফা কত? যে কেহ "প্রচার" পত্রের প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সামান্য কয়খানি পাতা পড়িয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, শনির বাণু পণ্ডিতের কেরামতি কতটুকু। বঙ্কিমের ঐ লেখাগুলি আদৌ বৃহত্তম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু সে পরিচয় আমরা পরে দিতেছি। তাহার পূর্ব্বে বাণুপণ্ডিত তাঁহার কেরামতির ভনিতা করিতে গিয়া নিজের মৌলিক বিদ্যা যেরূপ মাঠময় করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় গোড়াতেই দিয়া রাখা ভাল।

বাণু-পণ্ডিতের গৌরচন্দ্রিকা:—"যে চারিজন মহাতাপসের প্রতিভায় এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে • • • আমরা তাঁহাদের

কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিয়া ধন্য হইতেছি। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন এবং বঙ্কিমের আবির্ভাব ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত থাকিত। • • বঙ্কিমচন্দ্র • • এই কারণে এই রত্নচতুষ্টয়ের • মধ্যমণি। বরফ ও বাষ্পের মাঝখানে তিনিই তরল প্রাণধারা। খনির তিমির গর্ভে যে কঠিন হীরকদ্যুতি আমাদিগকে প্রতিহত করে এবং অনন্ত আকাশলোকে যে অদৃশ্য আলোকের আমরা নাগাল পাই না, একাধারে তরল এবং সংহত করিয়া সেই কঠিন এবং বায়বীয়কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার অবশ্য প্রয়োজনীয় সূর্য্যালোক-রূপে দিশাহীন মানব সমাজে বিকীর্ণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে ধরিতে পাই, ছুঁইতে পাই বলিয়াই বেশী ভালবাসি। এবং ভালবাসি বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বিচারে আমাদের ভুল হয়।" এখন দেখা যাক—আমরা মাত্র ঐ কয়েকটি অমূল্য ছত্র হইতে কতগুলি অমূল্য নূতন কথা শিখিলাম :—

(১) মহাতাপসদের এতদিন ধরিয়া তপস্যার কথা শোনা যাইত—এখন দেখা যাইতেছে, তাহা ভুল কথা। মহাতাপসদের "প্রতিভা" থাকে এবং বোধ করি সে "প্রতিভা" বাণু-পণ্ডিতের মস্তিষ্কের মত মস্তিষ্কে জটা বাঁধিয়া বাসা করিয়া থাকে।

(২) বিদ্যাসাগর মধুসূদন ছিলেন "বরফ" এবং রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন "বাষ্প"—ইহাদের মাঝখানে বঙ্কিম ছিলেন "তরল প্রাণধারা।" বাস্তবিক, এই উপমার দাপটে কবি কালিদাস পর্য্যন্ত ঘাবড়াইয়া যাইবেন! কি বরফ জলময়া উপমা! আমরা ত এতদিন বিদ্যাসাগর-মধুসূদনকে আগুন বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু বাণুদাস ইহাদের একবারে "বরফ" বানাইয়া ছাড়িলেন! "কুলপী বরফ" করিলে আরও ভাল হইত নাকি?

(৩) "হীরকদ্যুতি" অত্যন্ত "কঠিন" বস্তু এবং আকাশলোকের আলোক অদৃশ্য হইলেও বায়বীয় পদার্থ—টুসকি দিলেই বাষ্পের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ছেঁদা হইয়া টস্ টস্ করিয়া ঝরিতে থাকে!

(৪) কঠিন হীরকদ্যুতি ও বায়বীয় আলোক একাধারে তরল এবং সংহত করিলেই "সূর্য্যালোক" প্রস্তুত হয়,—ঢেঁকি দিয়া চূর্ণ করিলে, বোধ করি সস্তায় বস্তা বস্তা মিলেতে পারে!

(৫) যাহাকে ধরিতে পাই এবং ছুঁইতে পাই তাহাকেই বেশী ভালবাসিতে হইবে। চোর ডাকাত বাটপাড়দের খবরদার কেহ ধরিবেন না এবং ধরিলেও ছুঁইবেন না—বেশী ভালবাসিয়া শেষে কি ধনে-প্রাণে মারা যাইবেন!

(৬) ভালবাসিলেই বিচারে ভুল হইবে। অতএব সাবধান, কাহাকেও ভালবাসিবেন না—মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সকলকেই ঘৃণা করিবেন, তাহা হইলে আর তাহাদের সম্বন্ধে ভুল হইবে না। শ্রীরামপুরবাসীদের দেখিতেছি অসাম ধৈর্য্য অথবা দুরন্ত আতিথেয়তা! নতুবা এমন "রাবিশ" তাঁহারা বরদাস্ত করিলেন কি রূপে? সভাপতির লম্বকর্ণের নাগাল কি তাঁহাদের আয়ত্বের বাহিরে ছিল?

বাণু-পণ্ডিতের প্রবন্ধের বিষয় "বঙ্কিম চন্দ্রের ধর্ম্ম"। অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় লেখা ছাড়া আর যাহা কিছু বাকি রহিল তাহাই প্রকারান্তরে অধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে, বাণুদাসের প্রবন্ধের আকার বড় হয় কেমন করিয়া? তাই, বাণু-পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অসম্মানসূচক প্রলাপ বাক্যগুলি লিখিতে লাগিলেন এবং পাছে বঙ্কিমের প্রতি অভক্তি জনসমাজে ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে, মাঝে মাঝে মিঠাবুলির বুঁদ ছাড়িতে লাগিলেন :—

(১) "আমরা কখনও তাঁহাকে (বঙ্কিমচন্দ্রকে) রূপলালসায় দগ্ধ হইয়া উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে দেখিতে পাই"·········

(২) "দেশ-মাতৃকার চরণে সমর্পিত-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রেরও মধ্যে মধ্যে দেখা পাই"—

(৩) "নবকুমার হইতে কমলাকান্ত পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপ বাঙালী-পাঠকসমাজে পরিচিত—তিনি আমাদের শিশু-মনের গল্পশোনার অশেষ আগ্রহ কতকটা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া।"

(৪) "'বঙ্গদর্শনে'র যুগে মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে নাই, তিনি তখনও শিক্ষানবিশী করিতে ছিলেন।"

ঐরূপ আরও অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য বাণু-পণ্ডিতের ক্ষুদে লেখাটার ভিতর বিস্তর আছে। সে সকল সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। তাহার প্রয়োজনও নাই। আমরা শুধু ইহাই মাত্র বলিতে চাই যে, যে পণ্ডিত, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মধ্যে দেশ-মাতৃকার চরণে সমর্পিত-প্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রকে "মধ্যে মধ্যে" দেখিতে পান, প্রতি ছত্রে দেখিতে পান না এবং যিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের দপ্তর লিখিয়া শিশুমনকে গল্প শোনাইবার "বিষ্ণুশর্ম্মা" মাত্র বলিয়া চিনিয়াছেন, তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের "জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে নাই"! 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর'! যে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের যুগে সমগ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে একছত্র প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন, তথা নব্য-বাঙ্গালার জন্মদাতা বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন, যে বঙ্গদর্শনের অসামান্য আধিপত্যের কথা রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই সে-দিন স্বয়ং নিষ্ঠা-পূর্ব্বক কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাণুদাসের ঐ উক্তি যে কতদূর হাস্যকর তাহা বলিবার প্রয়োজন আছে কি?? বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এই শ্রেণীর জীবদের উপর বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদনের ভার দিয়া কি মহাপাপ করিয়াছেন, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন কি?

ইহার পর, বাণু-পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমজীবনে উপন্যাস ও সাহিত্য লিখিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। "উপন্যাসের শর্করাবরণে তাঁহার সাধনালব্ধ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছিল না, ইহা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন"। "সীতারাম উপন্যাস প্রকাশে "তাঁহার যথেষ্ট সঙ্কোচ ছিল"। "উপন্যাসপ্রিয় সাহিত্যরসিক পাঠকগণের" কাছে তাই নাকি তিনি "জবাবদিহি" করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। "এই সময়ে অকস্মাৎ একটা হতাশা অনুভব করিয়া

ছিলেন। এই সময়ের কথায় তিনি বলিয়াছেন—

আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন।' আমার জীবনের কতক বড়-শিক্ষাপ্রদ·········আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্ম্মে আমার মতিগতি অতি-আশ্চর্য্য রকমের। [সাধনা, শ্রাবণ ১৮৯৪]" বাণু-পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের "হতাশা" কেমন 'সাধনা' হইতে 'কোট্' করিয়া অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন. দেখিলেন ত ? 'সাধনার' কোটেশন-টুকুর ভিতরে 'হতাশা'র কোনও লক্ষণই ত আমরা দেখিলাম না এবং আশা করি বাণুদাস ভিন্ন অন্য কেহই তাহা দেখিতে পাইবেন না। এইরূপ তালকাণাভাবে রবীন্দ্রনাথের একটি কোর্টেশন তুলিয়া প্রবন্ধের অন্য একস্থানে বানু-পণ্ডিত ল্যাজে-গোবরে হইয়াছেন। "সীতারাম" উপন্যাস-প্রকাশে তাঁহার কোন সঙ্কোচই ছিল না। প্রচারের প্রথম খণ্ডে ৩৬২ পৃষ্ঠায় ইহার প্রমাণ আছে,—"স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। "সীতারাম" বন্ধ হওয়ায় অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে "সীতারাম" পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।" "প্রচারের" যে খণ্ডখানি লইয়া সজনীকান্ত এত "নপড়-চপড়" করিয়াছেন, উহাতেই ঐ কথাগুলি লিপিবদ্ধ আছে। কৈ, উপন্যাস-প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও "পবিত্র অনুতাপের" চিহ্নও-ত উহাতে দেখা গেল না। অথচ প্রচারের ঐ খণ্ডতেই সজনীবাবু কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত (?) বঙ্কিমচন্দ্রের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখাগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ লেখাগুলি আদৌ বৃহত্তম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। উহা প্রচারের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে সজনীবাবু কৃত নির্ঘণ্ট এবং প্রচারের প্রথমখণ্ডের স্চী পাশাপাশি তুলিয়া দিতেছি। পাঠক সহজেই সকল কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন এবং সজনীবাবুর বিদ্যা ও বাহাদুরীর অবশ্যই তারিফ করিবেন:—

সজনীবাবু কৃত "হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতত্ত্ব" গ্রন্থের নির্ঘণ্ট।

১। হিন্দুধর্ম্ম, ২। বেদ, ৩। বেদ, ৪। বেদের দেবতা, ৫। ইন্দ্র, ৬। কেন্ পথে যাইতেছি, ৭। বরুণাদি, ৮। সবিতা ও গায়ত্রী, ৯। বৈদিক দেবতা, ১০। দেবতত্ত্ব, ১১। দ্যাবা পৃথিবী, ১২। চৈতন্যবাদ, ১৩। উপাসনা, ১৪। হিন্দু কি জড়োপাসক? ১৫। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা, ১৬। বেদের ঈশ্বরবাদ, ১৭। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই।

প্রচার, ১২৯১, প্রথম খণ্ডের স্চী।

বেদ:—

বেদ
বেদের দেবতা
ইন্দ্র
কোনপথে যাইতেছি
বরুণাদি
সবিতা ও গায়ত্রী
বৈদিক দেবতা
দেবতত্ত্ব
দ্যাবা পৃথিবী
চৈতন্যবাদ
উপাসনা
হিন্দুধর্ম্ম
হিন্দু কি জড়োপাসক?

সজনীকান্তবাবু "প্রচারের" স্চী কপি করিতে গিয়াও মাছি-মারা কেরাণীর কাজ করিয়াছেন। প্রচারের স্চীর Sub-heading "বেদ"-এর নীচে 'বেদ' ইতি-প্রবন্ধের নির্দ্দেশ আছে। কান্তবাবু তাঁহার নির্ঘণ্টে সেইজন্য (২) ও (৩) সংখ্যক বিভাগে দুইবার "বেদ" লিখিয়া গোবেষণার "গোবেড়ন" করিয়াছেন। মোট অধ্যায়ের বিভাগ ১৬ হইবে, ১৭ নয়। সজনীবাবু-কৃত বিভাগের শেষ তিনটি নিবন্ধ "প্রচারে'র দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। "বেদ" নামে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ 'প্রচারের' দ্বিতীয় খণ্ডে, ২২০ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছিল। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নহে। এই প্রবন্ধের শেষে লেখক "হিন্দু" এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত বেদ সম্বন্ধীয় লেখাগুলিরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ তীব্র প্রতিবাদ। বস্তুতঃ, এই লেখাটি 'প্রচারে' প্রকাশিত হইবার পর, বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখা এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন। ইহাও সজনীবাবু কর্ত্তৃক পরে উত্থাপিত "বিস্ময়কর প্রশ্নের" একটি উত্তর।

সজনীকান্তের লিখিত প্রবন্ধে (শনিবারের চিঠির ৬৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) বঙ্কিমবাবুর যতগুলি লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে প্রচারের উপরোক্ত প্রথম খণ্ডের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে আছে:—

১৮৮-১৮৯ পৃষ্ঠা (ধর্ম্ম এবং সাহিত্য), ২১ ২২ পৃষ্ঠা (হিন্দুধর্ম্ম), ১০৭ পৃষ্ঠা (বেদ), ২০১-২০৩ পৃষ্ঠা (কোন পথে যাইতেছি), ৩৬৬ পৃষ্ঠা (দ্যাবি পৃথিবী), ৩৭৫-৩৮০ পৃষ্ঠা (চৈতন্যবাদ)। শনিবারের চিঠির ৬৭৮ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৬৭৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যেটুকু 'কোটেশন' আছে, তাহা প্রচারের দ্বিতীয় খণ্ড ৭৪-৭৯ ও ২৭৮ পৃষ্ঠা হইতে আহরিত।

পাঠক এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, শনির বাণু-পণ্ডিত তাঁহার বহু ঢক্কা-নিনাদিত
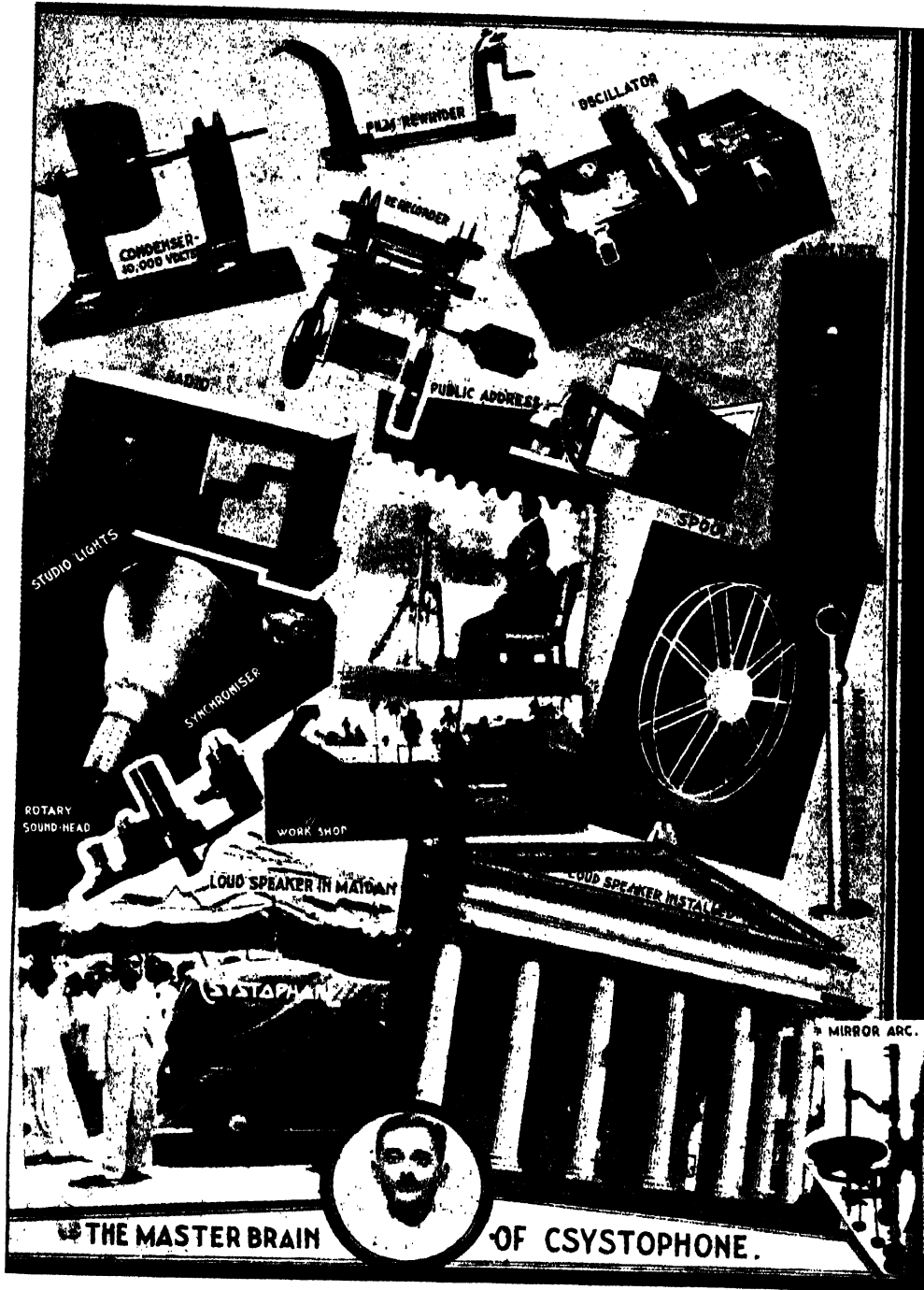
গোবেষণার inspiration কোথা হইতে draw করিয়াছেন। আহা! বেচারী এই Discovery-র "আনন্দে অধীর হইয়া সভাপতির কর্ত্তব্য সঠিক পালন করিতে" পারে নাই! কিন্তু বেচারী হইলে কি হয়, বাণুদাসের ন্যাকামি ষোলআনা। "প্রচার" হইতে Discovery জনসমাজে পুনঃ প্রচার করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন, অথচ সোজাসুজি সে কথা প্রবন্ধের কুত্রাপি স্বীকার করিলেন না। ইহা না হইলে, গোবেষণা! সজনীকান্ত এইবার প্রশ্ন তুলিয়াছেন, বঙ্কিমের ঐ দেবতত্ত্ববিষয়ক লেখাগুলি বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হইল কেন? ঐ লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল না কেন? "এই বিস্ময়কর প্রশ্নের সমাধান" তিনি কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। চেষ্টা করিলে, পাইতেন বৈকি, কিন্তু সে-কথা আমরা আজ এখানে বলিব না। ঐ সকল লেখা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল বৈ কি, কিন্তু "কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত" আমরা সহজে দেখাইতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু সে যাহা হউক, সজনীকান্ত তাঁহার অসীম মেধা বলে ঐ "বিস্ময়কর প্রশ্নের" সমাধানও করিয়া ফেলিয়াছেন। 'যে মনোবৃত্তি লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বেদ ও বেদোক্ত দেবতাদের * * * সাংঘাতিক বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে নাকি তৎকালীন 'ধার্ম্মিকেরা' বিমুখ হইয়াছিলেন। "বঙ্কিমচন্দ্র সত্য কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সত্যকে প্রচলিত হিন্দুসমাজ ভয় করে"—ইহাই সজনীকান্তের সমাধান। কিন্তু "প্রচলিত হিন্দুসমাজ" ভয় করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় পুরুষসিংহ ভয় পাইবেন কেন? অন্যে যাহাই ভাবুক, তিনি যাহা সমীচীন বলিয়া বুঝিতেন, তাহা কাহারও মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজে যাহা ভুল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা অবশ্যই পুনঃ প্রচার করিতেন না। তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র" ধর্ম্মগ্রন্থ-হিসাবে ধার্ম্মিকদের মনঃপূত হয় নাই, তথাপি উহা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন কেন? 'সাম্য' পুস্তিকাখানির সিদ্ধান্ত যখনই তিনি আগাগোড়া ভুল বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখনই তিনি লিখিয়াছিলেন—"এক্ষণে সেই "সাম্য" শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি।" দেবতত্ত্ব বিষয়ক ঐ লেখা গুলির পর 'প্রচার' আরও দুই বৎসর বাহির হইয়াছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রও আরও সাত আট বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার আরব্ধ দেবতত্ত্ববিষয়ক প্রস্তাবের শেষ করিলেন না কেন, বা তৎসম্বন্ধে একছত্রও আর লিখিলেন না কেন? আমাদের বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্র যে কারণে "দেবী চৌধুরাণী"র স্বয়ং ইংরেজি অনুবাদ করিয়াও, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের অনুরোধ সত্ত্বেও, উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই, ইহাও সেই একই কারণ সঞ্জাত। তিনি বলিয়াছিলেন—দেবী চৌধুরাণীর ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইলে, সাহেবরা হিন্দুর বহুবিবাহের খুঁৎ ধরিয়াই মাতামাতি করিবে, অন্য সার-কথা কিছুই বুঝিবে না। শুধুই খোসা লইয়া টানাটানি করিবে। তিনি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে সজনী-জাতীয় পাঠক ও লেখকদের মনোবৃত্তি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেই লিখিয়াছেন—"আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরিত মনে করি না"—অমনই সজনীকান্ত লাফাইয়া উঠিয়াছেন! এইত তাঁহাদের মত প্রচ্ছন্ন অবুঝ-সবুজদের মুখরোচক কথাই বটে! কিন্তু ইহার পরই, বঙ্কিমচন্দ্র ফুটনোটে যে কথাটি বলিয়াছেন, তাহা সজনী বাবু বোধ করি চালাকি করিয়াই চাপিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়াছেন—"যাঁহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।" কিন্তু সে কথা কে শোনে? তাই, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দেবতত্ত্ব বিষয়ক লেখাগুলির গভীর মর্ম্মকথা কেহই বুঝিবে না, শুধুই খোসা লইয়া টানাটানি করিবে। সেইজন্যই তিনি উহাদের পুনঃপ্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে পরে আর একটি কথাও কহেন নাই।

এতদ্ব্যতীত, আর একটি কারণ এই যে, দেবতত্ত্ব ও বেদ-বিষয়ক লেখাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—"হিন্দু" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়া জনৈক লেখক "বেদ" সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির সারবত্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নিজের উপনীত সিদ্ধান্তের ভুলগুলি ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি ঐ লেখকের লেখার কোনও প্রতিবাদ আর করেন নাই। বিশেষতঃ, মত পরিবর্ত্তন হইলে বা নিজের ভুল বুঝিতে পারিলে, বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বের লেখা আর গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেন না, অথবা নূতন করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে এই কথা খাটে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র", ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত "বিবিধ সমালোচনা" নামক গ্রন্থে স্থান পাইলেও, পরে প্রকাশিত বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পায় নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত "কৃষ্ণচরিত্র" এই উভয়ের মধ্যে যে আলো ও অন্ধকারের মত ছিল—প্রভেদ ছিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাগুক্ত দেবতত্ত্ব ও বেদবিষয়ক প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মৃত্যুর অল্প কয়েকমাস পূর্ব্বে লিখিত Vedic Literature নামক দুইটি ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই Vedic Literature গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে, পূর্ব্বোক্ত দেবতত্ত্ব ও বেদবিষয়ক সন্দর্ভগুলি স্বতঃই বাতিল হইয়া যাইবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি আর ঐ লেখাগুলি সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই, বা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন নাই। ইহাই বাণুদাস-কর্ত্তৃক উত্থাপিত "বিস্ময়কর প্রশ্নের" প্রকৃত সমাধান। এই প্রসঙ্গে—"বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ডের" ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের উপরোক্ত মতবাদেরই প্রতিধ্বনি দেখা যায়। সেই লেখাটুকু এই:—"সকলগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্যও নহে। যাহা এ পর্য্যন্ত পুনর্মুদ্রিত হয় নাই, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটিমাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না।" আশা করি, ইহার পর বাণুদাস-উত্থাপিত কুতর্কের কথা আর উঠিতেই পারে না। অতঃপর সজনী কান্ত যে লিখিয়াছেন, "ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে"—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের "শেষ কথা", ইহা মোটেই সত্য নহে। উহা বঙ্কিম-চন্দ্রের কথাই নহে। উহা গীতার ৯।২৩

শ্লোকের বঙ্কিমবাবুকৃত অনুবাদ। উহা "হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই"—"প্রচারের" ২৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ ছত্র। সেই প্রবন্ধের মূলটুকু পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থে আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—"এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম্।
গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধি-পূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।" উহাও অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রকৃত অনুবাদ। গীতার ঐ শ্লোকে "ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই"—ঠিক এমন কথা বলিতেছে না। সে যাহা হউক, পাঠক এতক্ষণে বাগ্দাসের বিদ্যাবুদ্ধি চালাকির বিস্তৃত পরিচয় পাইলেন, আশা করি। আমরা এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তৎকালীন প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্বের এই কথাগুলিও এস্থলে স্মরণ করিতেছি।

"এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্যচক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ কি চৈতন্য, তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, কি কোন মনুষ্য প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।"

কিন্তু সজনীবাবুরা সে কথা শুনিবেন বা বুঝিবেন কেন? "Fools rush in where Angels fear to tread!" তাই শ্রীরামপুরে গিয়া পাদরী সাজিয়া শ্রীরাম-পুরকে "ছিঃ রামপুর" বানাইয়া "বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

এই শতছিদ্র প্রবন্ধ লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, তবে একটা কথা সজনীকান্তকে বলিয়া দেওয়া ভাল যে, "প্রচার" ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে বাহির হইয়াছিল বটে কিন্তু "ঐ মাসেই প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "নবজীবন" তাহার সহায় হয় নাই। "নবজীবন" ১২৯১ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনশ্চ, সজনীবাবু লিখিয়াছেন, "১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিম-সঞ্জীব-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" একবারেই বন্ধ হইয়া গেল।" এই "বঙ্কিম সঞ্জীব"-সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" কি বস্তু? বঙ্কিমবাবু, সঞ্জীববাবু কি কখনও বঙ্গদর্শনের যুগ্মসম্পাদক ছিলেন? তাহা যদি না থাকেন, তবে কি উহা সজনীবাবুর অজ্ঞতা, না ভাষার জড়তা? কি জানি, বঙ্কিমের কপালে আরও কত কি আছে! আমরা এই ক্ষুদ্র ভুলগুলির উল্লেখ করিতাম না, কিন্তু ইঁহারা পরের বেলায়, তারিখ অন্যান্য সামান্য ত্রুটি দেখিলেই "মহাভারত অশুদ্ধ" হইল বলিয়া মনে করেন। কাজেই ঐ ভুলগুলি দেখিয়া কবি কৃত্তিবাস কীর্ত্তিত "অঙ্গদ রায়বারের" কথা আমাদের মনে পড়িয়া গেল—

"আপ্ত ছিদ্র না জানিস্ পরকে দিস্ খোঁটা,
বারে বারে কথা ক'স্ মর্ রে অধম ব্যাটা।"

দোঁহারে দোঁহে বাসি ভালো

শ্রীমতী রুচিরা দেবী

আমরা দুইজনে দোঁহারে শুধু ভালোবেসে,
দোঁহার বুকে দুহু একদা মিলেছিনু এসে।
সেদিন ধরণীর সকল রূপে রসে মোহে
আমরা যেন শুধু নূতন অধিকারী দোঁহে!
তাহার পরে দিন কেটেছে কত সুখে দুখে,
বিরহ মিলনের মধুর লীলা, মুখে মুখে,
কখন পেয়েছিনু কেবল অমৃতের ধারা,
কভুবা নিরজনে নয়ন জলে দোঁহে-সারা!
কখনো চলে গেছি কত যে দূরতম দেশে,
তবুও দুইজনে মিলেছি শুধু ভালোবেসে।

এখন মিটে গেছে প্রথম জীবনের ক্ষুধা,
সবুজ ধরণীর শ্যামল সেই রূপসুধা,
আজিও ফুল ফোটে, আজিও পাখী ডাকে বনে,
শুধু সে দোঁহাকার মিলন কোথা মনে মনে?
দুজনে কাছাকাছি, তবুও নেশা নাহি লাগে,
দখিন বাতাসের বৃথাই অধীরতা জাগে
ফাগুন আসে দেখি, কখন চলে যায় ফিরে;
চাঁদের বান ডাকে সুদূর আকাশের তীরে,
কেবল মায়াজালে এখন রচে নাকো আলো,
তবুও দুইজনে দোঁহারে শুধু বাসি ভালো॥

সমুদ্র-দেবতা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

হে উন্মাদ সমুদ্র দেবতা
তব বক্ষে কল্লোলিত সুগম্ভীর ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদ,
তুলিয়া তরঙ্গ বাহু কী যন্ত্রণা করে নিবেদন
উর্দ্ধ আকাশের পানে আন্দোলিয়া বিপ্লবের ধ্বজা!
কি তোমার হারায়েছে? কা'রা তব শত্রু এ জগতে?
কোন্ মহা বিচ্ছেদের স্মৃতি—
আবর্ত্তিয়া ফেনপুঞ্জ নিরন্তর করিছে হুঙ্কার
একান্ত প্রয়াস লয়ে লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের লাগি'?
বার বার ওগো সিন্ধু, ভঙ্গুর এ পৃথিবীর বুকে
কঙ্কর বালুকাময় উচ্ছবেলা ভূমে—
উন্মত্ত আছাড়ে যেন কহিতেছ দুঃসহ ক্রন্দনে
'দাও দাও ফিরে দাও জীবনের সর্ব্বস্ব আমার!'

অসীম অনন্ত ক্ষুব্ধ বেদনা তোমার
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ঝড়ে মর্ম্মভেদী তুলি হাহাকার,
নির্ম্মম দৈত্যের মত চাহে যেন নখরে ছিঁড়িতে
আকাশের ছন্দে গাঁথা গ্রহ সূর্য্য তারকার মালা।
উৎকট প্রার্থনা তব উৎকট কামনা
পূর্ণ কেহ করিল না শুনিল না নিষ্ফল ক্রন্দন
ফিরায়ে দিলনা কেহ মহৈশ্বর্য্য হারানো রতন।

মোরা ধরিত্রীর শিশু সামুদ্রিক দুঃখে ম্রিয়মান,
কালের ডম্বরু শুনি নিরাশায় বক্ষ স্পন্দমান
বালুকা বেলায় তোমার ও নীল বক্ষপানে—
চেয়ে থাকি বিস্মিত বিহ্বল;
নীরবে বুঝেছি মোরা কী গভীর বেদনা তোমার—
কি তোমার হারায়েছে কা'রা তব শত্রু এ জগতে
কেন এ গর্জ্জন রোল, ফেনোচ্ছ্বাস উত্তুঙ্গ লহরী,
দুরন্ত বিক্ষোভ কেন? বিশ্বধ্বংসী রুদ্র মূর্ত্তি ধরি'
বুঝেছি বুঝেছি আজ হে বিপ্লবী, মহাপারাবার!
মনে পড়ে রত্নাকর অতীতের—জ্বলন্ত কাহিনী,
তোমার অরাতি বৃন্দ হীন চেতা তস্কর বাহিনী,
দুরন্ত তেত্রিশ কোটি অদিতির স্বার্থান্ধ সন্তান,
বৈকুণ্ঠের ধূর্ত্তরাজ বিষ্ণু সহ করি অভিযান,
একদা আদিম প্রাতে অতিহীন চক্রান্ত করিয়া,
মূর্খ যতো দৈত্যগণে লুব্ধ করি অমৃত প্রদানে,
মন্দর মন্থন দণ্ডে অনন্ত নাগের রজ্জু বাঁধি
ঘুমন্ত তোমারে বন্দী করি'—
অতর্কিতে আক্রমন করেছিল ঐশ্বর্য্য তোমার।
দেবাসুর সম্মিলিত মহাশক্তি বলে—
কী বীভৎস অত্যাচারে করেছিল তোমারে মন্থন,
দুশ্চরিত্র দস্যু সম হৃত করি সর্ব্বস্ব তোমার।

তাহাদের পাপ নাই, তাহারা যে স্বর্গের দেবতা,
সময় সুযোগ বুঝে বিপক্ষের বক্ষে দেয় ব্যথা,
হীন স্বেচ্ছাচারে মত্ত অহঙ্কার ললাটের টীকা
মৃত্যু নাই, জরা নাই, স্বর্গলোকে পরস্ব-জীবিকা।
যেখানে যা কিছু আছে—সুন্দর মহত,
বহুমূল্য লোভনীয় সৃজনের যা কিছু সম্পদ
ধূর্ত্ত তস্করের মত হরিয়াছে নির্ব্বিকার মনে
মহাসভা বৈকুণ্ঠের কূটতম রাজনীতি বলে।

দেবতার স্বর্গধামে দেখিয়াছি ওগো পয়োনিধি,
দেখেছি দেখেছি সেথা তব প্রেয়সীরে…
সুন্দরী ইন্দিরা নিত্য তোমা' হারা ভাসে অশ্রুনীরে
বিষ্ণু পদতলে বসি' দীর্ঘশ্বাস ফেলিছে বন্দিনী,
ক্রুর সর্পদল সেথা চারিদিকে সতর্ক প্রহরী।
স্বর্গলোকে শুনিয়াছি বিলাসের রঙ্গমঞ্চ পরে
অসহায় উর্ব্বশীর ছন্দোবদ্ধ নূপুর নিক্কণ,
কামান্ধ দেবতা অঙ্কে দেখিয়াছি অপমান তা'র।
দূরে কাঁদে কলানিধি সুধাহারা মহাশূণ্য মনে
কক্ষপথে বন্দী সম আদিত্যের নিত্য ব্যঙ্গ সহি',
উচ্চৈশ্রবা, ঐরাবত শৃঙ্খলিত দাসত্ব জর্জ্জর।
হে জলধি, তব কণ্ঠে একদিন যে অমূল্যমণি

ত্রিলোকের চিত্তহরি' বিচ্ছুরিত কী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ
বিষ্ণুকণ্ঠে দ্যুতিহারা আজি সেই কৌস্তুভ রতন।
আজি তব রাজবৈদ্য ধন্বন্তরী কাঁদে অমরায়,
পারিজাত পুষ্পদল গন্ধহারা নন্দন কাননে
সুরভির দর দর ঝরে অশ্রুধারা।
তাই বুঝি এত ক্ষোভ, এত দুঃখ অন্তরে তোমার?
নির্লজ্জ দেবতাবৃন্দ সর্ব্বনাশ করিয়াছে তব
হরিয়াছে গৃহলক্ষ্মী হরিয়াছে বিপুল সম্পদ,
সাগর-শকুন দল তাই করে কর্কশ চিৎকার
সামুদ্রিক শ্মশানের রক্তাক্ত আকাশে।

তোমার বঞ্চিত হিয়া যে বিপ্লব করিছে ঘোষণা
উন্মাদ তরঙ্গ বাহু নিরন্তর হানি' বক্ষোদেশে,
ভীম ঝঞ্ঝা তুফান তুলিয়া—
ছুটিছে উদ্দাম বেগে বাধা বন্ধ হারা
অভিশপ্ত স্বর্গপুরী চূর্ণিবারে রেণু রেণু করি'।

ভীমকান্ত হে ভৈরব সর্ব্বহারা ওগো অম্বুরাজ
বহ্নিময় প্রতিহিংসা প্রজ্জ্বলন্ত দেখিয়াছি আজ
দেবদ্রোহি ভয়ঙ্কর তব মর্ম্মতলে;
তরঙ্গে তরঙ্গে তব অগ্নিময় বিপ্লবের ধ্বজা

আহ্বান করিছে যেন ঘৃণাভরে প্রতিদ্বন্দ্বীগণে—
—ঊর্দ্ধে বাহু আস্ফালিয়া।
সভয়ে লুকায় মুখ দূর স্বর্গে কলঙ্কীর দল,
বিশ্বের শাসক বৃন্দ ঊর্দ্ধে আজ হৃতচিত্ত বল,
শুনেছে শুনেছে তা'রা হে বীরেন্দ্র তোমার গর্জ্জন
প্রতিধ্বনি ফিরে এল তস্করেরা দেয় নাই সাড়া
স্বর্গের তোরণ দ্বারে ঢাকিয়াছে কলঙ্কের মেঘ।
বিলাস ব্যসন ভূমি নন্দন কানন—
তব অভিশাপে আজ জ্বলে পুড়ে হ'ল ছারখার,
ইন্দ্রের সে শক্তি নাই বীরবেশে বজ্র ধরিবার
বিদ্যুৎ করেছে সেথা বিদ্রোহ ঘোষণা।
স্বর্গের পাষাণ ভিত্তি চূর্ণীকৃত হয়—
উল্কাপিণ্ড খসি' পড়ে শূণ্যে অসহায়
নীহারিকা সৃষ্টিমেঘ ছিন্ন ভিন্ন দিকে দিকে ধায়।

স্তম্ভিত মানবশিশু শশঙ্কিত বিস্ময় বিহ্বল,
বালুময় উপকূলে শুনিতেছি অশান্ত চঞ্চল,

সম্মুখে উদ্দামগতি, মহাক্রুদ্ধ তরঙ্গবাহিনী
লুপ্ত রত্ন উদ্ধারিতে অট্টহাস্যে করে অভিযান।

প্রতিহিংসা পরায়ণ হে উন্মাদ সমুদ্র দেবতা
শুনাও জগত জনে অমৃতের উদ্ধার বারতা!
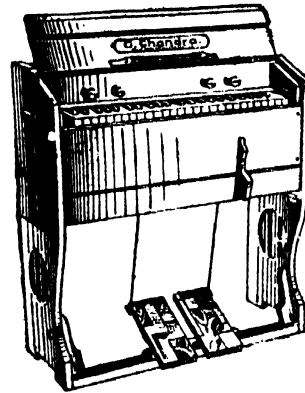
কলেজে মানবশক্তির অপব্যয়

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

"লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।"

আজকের দিনে এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। শিশুও করে না। লেখাপড়া শিখে কিছুই হয় না, বাংলার যুব-সম্প্রদায় এ কথাই আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, 'লেখাপড়া' বলতে এখানে ইস্কুল কলেজের পড়াশুনোই বুঝছি, পরীক্ষায় পাশ, ডিগ্রি অর্জ্জন। ডিগ্রি অর্জ্জনটাই সত্যিকারের বিদ্যালাভ কিনা, বাংলার হাজার হাজার বি-এ, এম-এ পাশ করা ছেলেদের (এবং মেয়েদের) মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা ক'জন পেয়েছে, সে প্রশ্ন আলাদা, যদিও আমার আজকের আলোচনার বিষয়ের একেবারে বহির্ভূত নয়।

সুবিধার জন্য আপাততঃ ধ'রে নেয়া যাক যে শিক্ষা আর কলেজের লেখাপড়া একই বস্তু। আজকের দিনে এই শিক্ষার কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নেই। ছেলে-মেয়েরা তা জানে, তাদের বাপ-মারাও তা জানেন, তাদের শিক্ষকরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও জানেন এ কথা। 'শিক্ষিত' যুবকদের মধ্যে বেশির ভাগই বেকার, কি বীমার দালাল, কি নগণ্য কেরাণী, কি সামান্য ইস্কুল মাষ্টার। শিক্ষিত লোকের রোজগারের রাস্তা ভয়াবহরকম সংকীর্ণ। এ কথা প্রমান করা বোধহয় খুব শক্ত নয় যে, একজন ভালো দরজি কি মিস্ত্রির রোজগার গড়-পড়তা শিক্ষিত বাঙালি যুবকের চাইতে বেশি তো বটেই, তা ছাড়া কাজটাও তাদের ঢের বেশি সম্মানের। হাতের কাজ শিখলেই যে এই কৃষিপ্রধান দেশে তার মূল্য সব সময় পাওয়া যাবে তা নয়, তবু হাতের কাজের প্রতি আমাদের মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর অবজ্ঞা এই বিষম নিষ্পেষণেও দূর হচ্ছে না সেটা আশ্চর্য্য। বি-এ পাশ ক'রে পঁচিশ টাকার কেরাণী হ'য়ে আমরা প্রাণপণে আমাদের ভদ্রতা রক্ষা করি।

লেখাপড়া শিখে কিছু হয় না এই চৈতন্যোদয়ের ফলে কলেজে বিদ্যার্থীর সংখ্যা কিছু কি কমেছে? কমেনি, বরং দিন-দিনই প্রচণ্ডবেগে বাড়ছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতিবারই গতবারের রেকর্ড ভাঙছে; জুলাই মাসে বন্যাজলের মতো ছাত্র দলে দলে সমস্ত কলেজ-বাড়ি উপচে পড়ছে। যত ব্যর্থতা, যত হতাশা, ছাত্রের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ঠিক তারই উল্টো হারে। পাশ ক'রে কিছুই হবে না, এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে যতই, ততই দলে দলে ছাত্র এসে ভিড় করছে সহরের কলেজে দূর দুরান্তর থেকে।

কেন এমন হচ্ছে,

কারণটা অবশ্য সুষ্ঠু। আর কিছু করবার নেই। ষোলো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে যত মধ্যবিত্ত ছেলে-মেয়ে, কিছুই করবার নেই তাদের জীবনে। আমাদের দেশে এখন পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বি-এ এম-এ পাশ করা ছাড়া আর যে সব রাস্তা খোলা আছে তা অতি সংকীর্ণ, এবং মিস্ত্রি-মজুরের সমক্ষেত্রে মধ্যবিত্তশ্রেণী এখনো নামতে পারছে না, কি নামতে গেলে সেখানেও প্রতিযোগিতায় টেকবার আশা নেই। যে কোনো মানুষের পক্ষে নিষ্কর্মা হ'য়ে থাকবার মতো শরীর মনের এত বড়ো লজ্জাকর ব্যর্থতা আর নেই; এবং সে অবস্থা অনিবার্য্যরূপেই একদিন আসবে প্রত্যেক ছেলেই তা জানে। সেই দিনকে যত দূরে ঠেলে রাখা যায়, সকলেরই তা-ই চেষ্টা সেই জন্যেই বি-এর আর এম-এ, এবং এম-এর পর ল; বাপ মরীয়া হয়ে খরচ জুগিয়ে যান। ছেলেরা বেশির ভাগ বেকার ও সেই কারণে বিবাহে অক্ষম; মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, তাই অগত্যা তাহারাও কলেজে যাচ্ছে।

এতো গেলো সহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা। এদিকে কৃষকদের দুর্দ্দশার ফলে গ্রামের ভূমিনির্ভর শ্রেণীর অনেক ছেলে আজকাল কলেজে পড়তে আসছে। মাটির উপর আর তাদের ভরসা নেই, ইংরিজি শিখে পেটে-ভাতে অন্ততঃ থাকতে পারবে এমন দুরাশা আছে। কলকাতার বেসর-কারি কলেজগুলিতে এরা ভিড় করে। বিনে-মাইনেতে বা আধা মাইনেতে ভর্ত্তি হয়। অতি কষ্টে পড়া চালায়। অতি কষ্টে পাশ করে—কি করে না। এদের মধ্যে সহুরে ছেলের চাইতে পড়াশুনা সম্বন্ধে সততা বেশি দেখা যায়, কেননা এদের তবু কিছু আশা আছে। তবে সে আশা কোন রকমে বেঁচে থাকবার আশা মাত্র; সহুরে ছেলের চাইতে অনেক খারাপভাবে থেকে

অভ্যস্ত বলেই সেই বেঁচে থাকার প্রহসনও তাদের মনে আশার সঞ্চার করে।

মোটের উপর, তা'হলে, পড়াশুনো করতে কোনো ছেলে কি মেয়েই বোধ হয় কলেজে আসে না। বেশির ভাগ আসে সময় কাটাতে; কেউ কেউ আসে হাল কি জাল ছেড়ে ইংরিজি শিখে পাটকলে চটকলে কেরাণী হ'তে। অবশ্য বেশীর ভাগ ছেলেরই তার চাইতে খুব বেশি জোটে না। যে অল্প দু'চারজন ভালো কাজ পায়, তারা বেশিরভাগ তা পায় দৈব কারণেই। ভালো কাজ পাবার জন্যে ভালো পাশ করা, কি একেবারেই পাশ করা অপরিহার্য্য নয়, ছাত্ররা সকলেই তা জানে। সরকারি প্রতিযোগিক পরীক্ষার ফলে প্রতি বছর যে কটি ছেলের সংস্থান হয় তাহাদের সংখ্যা অবশ্য আঙুলে গোনা যায়, সুতরাং তারা এই আলোচনার বহির্ভূত।

একথা নিশ্চয়ই সত্য যে কোনো কাজের আর্থিক মূল্য সামান্য, তার প্রতি মানুষ বেশিদিন একাগ্রভাবে মন দিতে পারে না। শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই কথা। যে শিক্ষা স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় মানুষের মতো বাঁচবার সংস্থানও না দেয়, তার সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অনুরাগ আশা করা উন্মত্ততা। বিশুদ্ধ শিক্ষা, বিশুদ্ধ শিল্প, কি বিশুদ্ধ জ্ঞান—বিজ্ঞানের মতোই অলীক কল্পনা। শিক্ষিত ব্যক্তি, কি শিল্পী, কি পণ্ডিত নিশ্চয়ই মানুষের মতো জীবন দাবি করতে পারেন, এবং সেই জীবন থেকে বঞ্চিত হ'লে শিল্প, কি জ্ঞান—বিজ্ঞান অবশ্যই তাঁদের কাছে অনেকটা মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। 'আমাদের কাজ তোমাদের লেখাপড়া শেখানো, চাকরি জোটানো নয়'; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ একথা বলতে পারেন বটে, কিন্তু কথাটায় একটা ভয়ঙ্কর গলদ আছে। এ শিক্ষার জোরে অন্ন-সংস্থানও হবে না এ কথা ছেলেরা যখন জানে, তখন শিক্ষাতে তারা কিছুতেই মন দেয় না, তার ফলে লেখা-পড়া কিছুই শেখে না—অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বাংলা দেশের গড়পড়তা বি-এ পাশ ছেলে প্রকৃত অর্থে যে প্রায় অশিক্ষিত তা যে কোনো পরীক্ষক কি চাকরি দেনে-ওলা জানেন সে ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, ইংরেজি জানে না, বাংলা জানে না—সিনেমা অভিনেত্রীদের নাম ও জীবন চরিত ছাড়া বিশেষ কিছুই জানে না।

এতই যদি এরা অশিক্ষিত, এরা পাশ করে কেমন ক'রে? করে এই কারণে যে আমাদের পরীক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অত্যন্তই নিচু। হাজার হাজার ডিগ্রিধারীতে দেশ ছেয়ে গেছে। একটা নিষ্ঠুর পরিহাস যে যে-দেশে (অর্থাৎ বাংলাদেশে) শতকরা ন'জন লোক নাম সই করতে পারে সে দেশেই সহরের অলিতে গলিতে ডিগ্রিওয়ালার ছড়াছড়ি! এতবেশি আছে বলে আজকাল চাকরি দেনে-ওলারা যে কোনো তুচ্ছ কাজের জন্য বি-এ পাশ চাচ্ছেন ও পাচ্ছেন। কলকাতায় দুজন বি-এ পাশ ট্রাম-কণ্ডাক্টার আছে শুনলুম। ট্রাম-কণ্ডক্টারের কাজ অনেক কেরাণী কি মাষ্টারের কাজের চেয়ে ভাল মনে করি, কিন্তু তার জন্যে বি-এ পাশ করবার কোনো দরকার করে না। অন্যান্য পেশীর ভাগ কাজ সম্বন্ধেই সেই কথা। যে সব কাজ ইংরিজি অক্ষরে লিখতে পারলে কি মিশ্রযোগ পর্য্যন্ত পাটিগণিত জানলেই করা যায়, তার জন্যে এতগুলো সময় ও অর্থের অপব্যয় কেন?

এইভাবে আমরা এখন এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছি, পাশ করলে 'কিছু হবে না, আবার পাশ না করলে কিছু-লাভ হবে না; সুতরাং পাশই করো। ছেলেরা ও মেয়েরা তাই প্রাণপণে পাশ করছে। পাশ করাই হ'লো কলেজের এই লেখাপড়ার সাধনা ও সিদ্ধি, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। প্রতি জুলাই মাসে কলেজ স্কোয়ারে নোটের জোয়ার ডাকে, ছেলে গোগ্রাসে নোট গেলে, পরীক্ষার হলে বমি ক'রে দিয়ে চ'লে আসে। পাঠ্য বই খুব কম ছেলেই পড়ে। বাংলা দেশের এক মফঃস্বলের কলেজের ৪০টি ছেলে ইংরিজি অনার্স পড়ছে, অনার্স কিংলিয়র পাঠ্য, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র দু'জনের কিংলিয়র বইটি আছে, এমন শোনা গেছে। অধ্যাপকরা ক্লাশে যা বলেন তাও শোনবার দরকার করে না; নোটে, সব আছে। অধ্যাপকের কাজ পাশের দালালিতে এসে ঠেকেছে। পাশের তুকতাক বলে দেবার জন্যেই তাঁরা আছেন। সত্যি বলতে তারা না থাকলে কলেজের ঠাট বজায় থাকে না ব'লেই তাঁরা আছেন আর কোনো কারণ নেই। পরীক্ষার একশোখানা খাতা দেখলে একশোখানাতেই এক প্রশ্নের একই উত্তর পাওয়া যায়। ছেলেরা পরস্পরের খাতাটোকেনি, একই নোট মুখস্থ করেছে। মনুষ্যধর্ম্ম ও শিক্ষাধর্ম্মের দিক থেকে এদের কাউকেই এক নম্বর দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বর্ত্তমান আইন অনুসারে কিছু নম্বর দিতেই হয়। এই ভাবে এরা পাশ করে।

আমাদের কলেজগুলোতে; তাই, বহু মানবশক্তির অজস্র ও অপরিমিত অপব্যয়। হাজার হাজার ছেলে কিছু না শিখে বেরিয়ে এসে বেকার বন্যায় মিশে যাচ্ছে; শিক্ষকদের যাঁর যেটুকু দেবার আছে কোনদিনও দিতে পারবেন না জেনে কাজটার উপরই

অশ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে। তাঁরা উপলব্ধি করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, তাঁদের কিছু করবার নেই, কিছু শেখাবার নেই—কেন না শিখতে কেউ ইচ্ছুক নয়, যেহেতু শিখে কোনো লাভ নেই। বরং খেলাধূলোয় ভালো হ'তে পারলে তার বাজার দর অনেক কড়া। এই কারণে শিক্ষকরা একেবারেই ব্যর্থ বোধ করেন, অথচ এ-কথাও ঠিক যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে রুচিতে দেশের অনেক ভালো লোক এই শিক্ষক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাঁদের সঙ্গে ভালো রকম ব্যবহার করতে পারলে যথেষ্ট সামাজিক কল্যাণ হয়। কিন্তু তার উপায় নেই। এদিকে যে হাজার হাজার ছেলে নোট গিলছে, আর ফুটবলের মাঠে চেঁচাচ্ছে; আর সিনেমার ঘর ভর্ত্তি করে তুলছে—তাদের সমস্ত শক্তি শুধু যে তখনকার মত ব্যর্থ হ'লো তা নয়, সারা জীবনের মতোই তারা পঙ্গু অক্ষম ও নির্বোধ হ'য়ে রইলো। অথচ এদের বেশির ভাগেরই সাধারণ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিলো; মানুষের মতো বাঁচবার আশা থাকলে হয়তো এরা লেখাপড়া কিছু শিখতো; আর মানুষের মত জীবন পেলে মোটের উপর এরা দেশের সম্পদই হত, ঋণ হত না।

ছাত্রের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই এই বিরাট অপব্যয়ের হার বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব্বেই বলেছি এত ছাত্র পড়তে পারছে বেসরকারী কলেজগুলোর জন্যেই। এখানে বেসরকারি মানেই বৃত্তিহীন। বৃত্তিহীন কলেজ আজকাল সভ্যজগতে এক ভারত-বর্ষেই আছে। পৃথিবীর অন্য সব দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্রেই হয় সরকারি খরচে চলে, নয় চলে ক্রোড়পতিদের বিপুল দানে। ছাত্ররা যে মাইনে দেবে তারই উপর নির্ভর করতে হ'লে ছাত্র সংখ্যার সীমা টানা সম্ভব নয়। এবং ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট রকম পরিমিত করতে না পারলে কোনো-রকম শিক্ষাই সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কথা আগেই বলেছি যে শিক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য পাশ করা ও পাশ করানো।

প্রত্যেক কলেজে মাত্র তিনশো করে ছেলে নিতে হ'লে দেশে আরো পঞ্চাশটা অন্ততঃ কলেজ করতে হয়, এবং সে টাকা আসবে কোথেকে? তবে কি আমি উচ্চ শিক্ষা কমিয়ে দেবার পক্ষপাতী? এতো দেখাই যাচ্ছে যে, যে শিক্ষা আমরা পাচ্ছি ও দিচ্ছি তা উচ্চশিক্ষা নয়, কোনো শিক্ষাই নয়। সুতরাং কমিয়ে দিলেই বা দোষ কী? দশ হাজার ছেলেকে অশিক্ষিত করবার চাইতে তার দশমাংশকে সুশিক্ষিত করা ঢের বেশি লাভের কথা। তাছাড়া,

এওতো সত্য যে, যে-রকমের কাজ পরবর্ত্তী জীবনে তারা করবে, তাতে উচ্চশিক্ষার কোনো দরকারই করে না। বি-এ পাশের সংখ্যা কমলেই চাকরির বাজারে বি-এ পাশের চাহিদা কমবে এবং পাশ করা ছেলেরা হয়তো তাদের উপযুক্ত কাজই পাবে।

একথা অবশ্য না বললেও চলে যে, কি মেয়ে, কি পুরুষ, দেশের সমস্ত লোকেরই লেখাপড়া জানা দরকার। যে দেশে শতকরা ৯১ জন নিরক্ষর, উচ্চশিক্ষা সে দেশে আসলে কোনো সমস্যাই নয়। সাধারণ লেখাপড়া নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে যেটুকু দরকার, তা প্রত্যেক লোককে শেখাতে পারলে, তারপর উচ্চশিক্ষা অত্যন্ত দুর্লভ হ'লেও কিছু এসে যায় না। কেননা সত্যি যেটা উচ্চশিক্ষা, সেটা সব মানুষের জন্য নয়। খুব কম লোকেরই সত্যি সত্যি উচ্চ শিক্ষিত হ'বার ক্ষমতা থাকে। আর সেটা যাঁদের থাকে কি অন্ততঃ যাঁদের স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানলিপ্সা থাকে, তাঁরা একবার লিখতে পড়তে শিখলে নিজেরাই নিজেদের শিক্ষিত করতে পারেন, কলেজের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এক হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীর যত মণীষী, পণ্ডিত ও গুণী সকলেই স্বশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে থাকলেও আসল শিক্ষা নিজেরাই নিজেদের দিয়েছেন। না প'ড়ে থাকলেও এসে যায় না; ইউরোপের বহু কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিকের কথা জানি যাঁ'রা কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন নি—কেননা সে দেশে উচ্চশিক্ষা বহু ব্যয় সাপেক্ষ ও মণীষীরা বেশির ভাগই দরিদ্র সন্তান। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য আবশ্যক ও বিনামূল্যে করতে পারলে অনেক সমস্যারই সমাধান হ'য়ে যায়। তখন উচ্চশিক্ষা হবে, প্রকৃতই জ্ঞান-সন্ধানী ও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের জন্য, এবং তা'হলে সেটা হবে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা। যদি আর্থিক কারণে কোনো যোগ্য ছেলে কলেজে পড়তে না পারে, তা' হ'লে শেষ পর্য্যন্ত তার কিছু ক্ষতি হবে না, সে কথা এই মাত্র বলেছি। যে সব ছেলেমেয়ের বিশেষ কোনো দিকে বিশেষ রকম ঝোঁক ও ক্ষমতা থাকে, উচ্চশিক্ষা শুধু তাদের জন্য হওয়া উচিত, কেননা উচ্চশিক্ষায় লাভবান হতে তারাই শুধু পারে। উচ্চশিক্ষিত হওয়া মানেই বিশেষজ্ঞ হওয়া, এবং বিশেষজ্ঞ সব দেশে সব সময়েই অল্প লোকই হয়েন। সাধারণ লোকের শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের পরেই বিশেষ কোনো কর্ম্মপদ্ধতির দিকে যাওয়া ভালো, যাঁরা শিল্প কি বিজ্ঞান কি বিশেষ কোনো বিদ্যার চর্চাতেই জীবন কাটাবেন, তাঁরা বাদ দিয়ে আর কোনো লোকেরই ম্যাট্রিকুলেশনের বেশি পাশ করবার কোন দরকার নেই (অবশ্য আমাদের ম্যাট্রিকুলেশন এখনকার চাইতে ঢের শক্ত ও ব্যাপক হওয়া দরকার)। এই ব্যবস্থার আর একটা ফল হবে এই যে, সাধারণ লোকও পাশ করবার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হ'য় নিজের ইচ্ছায় অনেক বেশি পড়বে ও শিখবে।
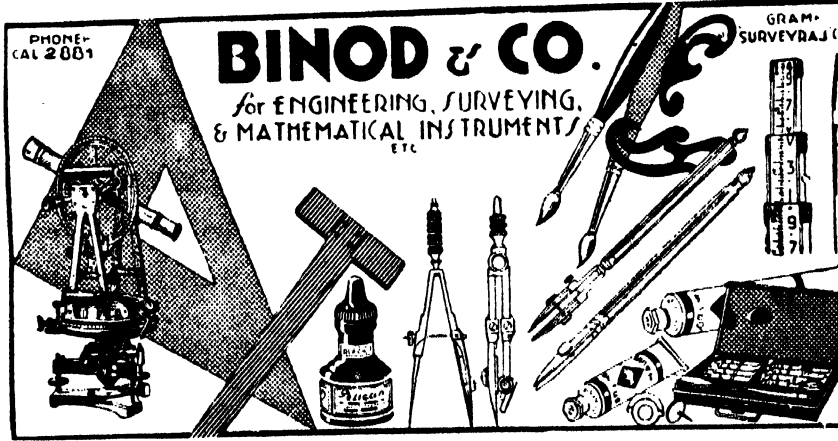
প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যিক ও বিনামূল্যে কথা বলা যত সোজা, কাজে সেটি হওয়া তত সোজা নয়, তা আমি জানি। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতিই হচ্ছে আমাদের দেশের প্রধান শিক্ষার সমস্যা। আমি এখানে শুধু সমস্যাগুলোর উল্লেখ করলুম, কী ক'রে তাদের সমাধান হ'তে পারে, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সমাধান নিশ্চয়ই দুরূহ, এবং হয়তো শুধু আমূল সমাজ-শোধনের ফলেই সম্ভব।

রেডিওতে কথিত।

খেয়ালী

শারদীয়া

সংখ্যা

*

মতিমহল থিয়েটার্সের পৌরাণিক চিত্র "একলব্য"-র একটি দৃশ্যে রেণুকা ও জহর গাঙ্গুলী। জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি ছবিখানি পরিচালনা কোর্‌ছেন।
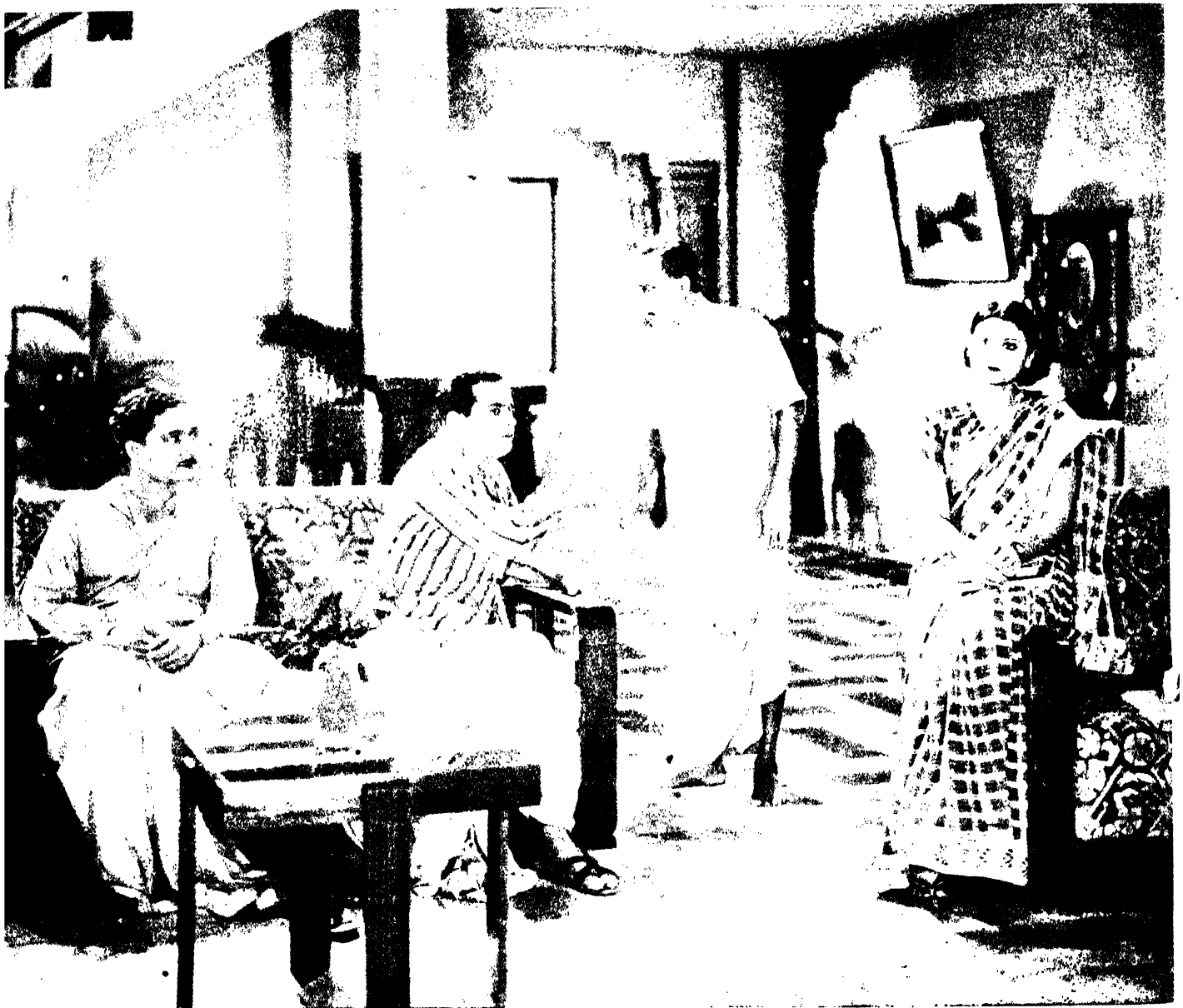
মতিমহল থিয়েটার্সের রোমাঞ্চকর কথা-চিত্র "যখের ধনে" সুশীল রায়, জহর গাঙ্গুলী, কুমার মিত্র ও শীলা হালদার। ছবিখানির পরিচালক হরি ভঞ্জ।

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের

অনবদ্য কথা-চিত্র

খনা

প্রাচীন ভারতের এক মহীমময়ী নারীর অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী

খনা

প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য সংস্কৃতি ও সাধনার চিত্তাকর্ষক পরিচয়

নাম ভূমিকায়

ছায়া দেবী

শ্রেষ্ঠাংশে

অহীন্দ্র চৌধুরী

কথা-শিল্পীঃ

মন্মথ নাথ রায় এম-এ, বি-এল

পরিচালক ঃ

জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জী

অন্যান্য ভূমিকায় : দেববালা, সুশীল রায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণা, ধীরেন মুখোপাধ্যায়, সমর ঘোষ, মনোরমা, কালী ঘোষ, জোৎস্না মিত্র ও আঙ্গুর।

বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

যতীশদা আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ো ছিলেন, কলেজেও আমার চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে পড়তেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং তাঁর বিয়ে উপলক্ষ্যে যতীশদা যখন আমায় নিমন্ত্রণ ক'রলেন তখন আমি সম্মত হ'লুম তা রাখতে কিন্তু বিস্মিতও হ'লুম।

আমরা পাটনা থেকে ট্রেনে উঠলুম। যতীশদার আত্মীয়-স্বজনরা মজঃফরপুরে থাকেন, তাঁরা সেখান থেকে যাবেন বিয়ের দিন। আমরা যেদিন ট্রেনে উঠলুম, বিবাহ তার পরের পরদিন। ট্রেনে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকও সে কামরায় ছিলেন। তিনি আমাকে জিগ্‌গেস করলেন, কোথায় যাবে। "খড়দহ"-বল্‌তে, তিনি বল্‌লেন আমরাও সেখানে যাচ্ছি। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, খড়দহে কি প্রয়োজনে যাওয়া হ'চ্ছে? আমি জানালুম যে একটা বিবাহের উৎসবে যোগ দিতে। যতীশদা লেমনেড খেতে না পান কিন্‌তে গেছলেন, এসে প'ড়লেন, ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময়। গাড়ীতে উঠে ব'ল্‌লেন, বাবা, ইনি আমার বন্ধু পুলিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সঙ্গেই যাবেন আর থাকবেন। তখন বুঝলুম যে ভদ্রলোকটী যতীশদার পিতা। তিনি ব'ল্‌লেন, বড়ো ভালো হ'লো বাবা, যতীশের আর কোনো বন্ধু সঙ্গে যেতে পারলে না, তুমি আসাতে খুব খুসী হ'লুম। একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদের সাহচর্য্য যতীশের অনেক কাজে আসবে। ভদ্রলোক আমাকে যতীশদার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই ঠাওরালেন কেননা আর কেউ না এলেও, আমি এসেছি। কিন্তু তিনি যে অজ্ঞাত খাঁটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেটা তখনও বুঝিনি।

পরের দিন সকালে খড়দহে পৌঁছলুম। ষ্টেশান থেকে ছক্কড় ভাড়া ক'রে আমাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট আবাসের অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের ষ্টেশানে নিতে আসবেন কথা ছিল, কিন্তু আসেন নি. মনঃক্ষোভের সূত্রপাত।

গাড়ী আমাদের বাসার দিকে যাচ্ছিল এমন সময় পথের মাঝে একব্যক্তি চীৎকার ক'রে একটা বাড়ীর কাছে আমাদের গাড়ী থামিয়ে তার মাথায় কুশাসন, ডেকচি কড়া প্রভৃতি চাপিয়ে দিলেন। যতীশদার বাবা শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে এবং যতীশদা এই ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করলেন না। যে বাড়ীতে আমাদের গাড়ী থামানো হ'য়েছিল, সেটা যতীশদার ভাবী শ্বশুর বাড়ী আর যিনি থামিয়েছিলেন তিনি ভাবী বধুর দাদামশায়।

দাদামশায়কে আমিও গোড়া থেকে 'দাদামশায়' বল্‌তে লাগলুম - বেশ মজার লোক তিনি। বাসায় পৌঁছে হাতমুখ ধুয়ে প্রচুর জলযোগ করা গেল। যতীশদার ভাবী শ্বশুরের তখন পর্য্যন্ত দেখা নেই। মধ্যাহ্নে স্নানাহার সেরে আমি কল্‌কাতা যাবার জন্যে উন্মুখ হ'লুম। বল্‌লুম, কাল রাতে বিয়ের আগেই আসবো, কল্‌কাতার এত কাছে যখন এসেছি, জনকয়েক বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করে আসি। যতীশদাও আমার সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি হ'তে লাগলেন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যত শ্বশ্রূগৃহের আপত্তি হোলো। ব্রজবাবু আমাকে ব'ল্‌লেন, বাবা পুলিন, তুমি ক'লকাতায় যেও না কারণ তুমি গেলে যতীশ যাবেই। আজ বাদে কাল তার বিয়ে, তাকে ছেড়ে দিতে এখানে কেউ সম্মত হ'চ্ছেন না।

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হোলো আমরা ক'ল্‌কাতায় যাবো কিন্তু রাত নটার মধ্যে কোনো ট্রেনে ফিরবো—ব্রজবাবুও বারাসাত যাবেন ব'ল্‌লেন তাঁর কতিপয় কুটুম্বকে নেমন্তন্ন করতে এবং রাত এগারোটা নাগাদ ফিরবেন জানালেন। আমরা সকলেই অনুরোধ ক'রলুম ঐ দুই সময়ে ষ্টেশানে যেন আমাদের জন্যে ঘোড়ার গাড়ী থাকে। শ্রাবণমাস, তায় ষ্টেশান থেকে আমাদের খড়দহের বাসা প্রায় দুমাইল, কাজেই এই সতর্কতা। ক'নের বাপের তখন পর্য্যন্ত দেখা মেলেনি। চিন্তোত্তেজনার প্রথম অঙ্ক।

রাত নটায় যখন কল্‌কাতা থেকে ফিরে খড়দহ ষ্টেশানে নাম্‌লুম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি প'ড়ছে। ষ্টেশানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলুম কিন্তু বৃষ্টি থাম্‌লো না। খবর নিয়ে জানলুম আমাদের জন্যে কোনো গাড়ী নেই। যতীশদা ভয়ানক রুষ্ট হ'লেন। যাই হোক, পদব্রজে যখন যেতেই হবে তখন ষ্টেশান থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম।

বর্ষাকাল, ছাতা আমাদের দুজনের সঙ্গেই ছিল। রাস্তায় কোনো গাছতলায় এক খানা ঘোড়ার গাড়ী দেখলুম কিন্তু তার গাড়োয়ান মদে একেবারে চুরচুরে। ভাড়া যাবার কথা ব'লতে, সে যা জবাব দিলে, তা ছাপার অক্ষরে লেখা যায় না।

রাত দশটা নাগাদ আমরা ও বারোটা নাগাদ ব্রজবাবুর বাসায় সুসিক্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন। তাঁর জন্যেও গাড়ী ছিল না। ক্রোধের দ্বিতীয় অঙ্ক। যতীশদা গেলেন ভয়ানক চটে, তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না তার জন্যে। ব'ল্লেন এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে ক'রবো না। আমি ব'ললুম, মেয়েটির কি হবে? প্রত্যুত্তর হ'লো, তোমার খুসী হয় তুমি বিয়ে করো। আমি ব'ললুম, যতীশদা, আমি মেয়েটিকে দেখে ফেলেছি বার দুই তিন। অতি শান্ত স্বভাব ব'লে মনে হোলো আমি যে রকম ছটফটে মানুষ, আমার সঙ্গে ওকে মানাবে না মোটেই। আমার বৌ হবে অত্যন্ত চঞ্চল, হৈ হৈ ক'রবে খুব। অনেকের মহড়া একা নিতে পারবে—

যতীশদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে ব'ললেন, অর্থাৎ সে হবে বীরদর্পের মেয়ে। উত্তর ক'রলুম, হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের ভাষা নারীর প্রতি প্রয়োগ ক'রে ব'লছি যে, আমি "বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন"। সে কথা থাক, কিন্তু যতীশদা তুমি চরম কিছু একটা কোরোনা। যতীশদা কিছুতেই নরম হ'তে চাইলেন না। ব'ললেন, এরা আগাগোড়া আমাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা ক'রেছে, কোনোমতেই এবাড়ীর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না।

রাত বারোটায় কান্তিবাবুর দেখা পাওয়া গেল। বেচারা কোনো পাটকলে চাকরী করেন, সেখানে দারুণ একটা হাঙ্গামার সম্ভাবনা ছিল বলে তিনি আটকে ছিলেন, আসতে পারেন নি তাঁকে সব কথা বললুম। তিনি ব্রজবাবুর শরণাপন্ন হ'লেন, কিন্তু বরকর্ত্তা জানালেন যে তিনি তাঁর ছেলেকে ভালো ক'রেই চেনেন, তার ইচ্ছে না থাকলে, বিয়ে করবার জন্যে জেদ তিনি ক'রবেন না। দাদামশায়, বাড়ীর মেয়েরা সকলের কানেই পৌছল যতীশদার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা। মেয়েরা লাগলে কাঁদতে, পুরুষরা ব'সলেন মাথায় হাত দিয়ে।

তারপর আমাকে তাদের দিক থেকে কাতর মিনতি করা হোলো, যেমন ক'রে হোক এ বিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার ক'রতে। কনের মা সাশ্রু-নয়নে আমাকে ব'ললেন, বাবা তুমি আমার সন্তানের মতো, আমার মর্য্যাদা রক্ষা করো। কান্তি বাবু, দাদামশায় সকলেরই ঐ কথা।

যতীশদা আমাকে বলেছিলেন, আবার যদি তাঁকে বিয়ে করবার কথা বলি তো তিনি সোজা বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন। সমস্ত পরিবারের কাতরতা দেখে, তা সত্ত্বেও আমি তাঁকে আর একবার দ্রব করবার চেষ্টা কোর্‌লুম। মাধবিকার দিক থেকে কথা কইতে, অনেক কষ্টে তিনি অবশেষে বিয়েতে সম্মত হ'লেন কিন্তু এক সর্ত্তে। সেটি হ'চ্ছে এই, যে, সম্প্রদানের সময়, পাঁচজন ভদ্রলোকের সাম্‌নে তাঁর শ্বশুরকে বেশ কড়া কড়া দু'চার্‌টে কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

শুভ সম্বাদটা সকলকে দিতে, আমার প্রতি তাঁদের প্রশস্তি উচ্চারিত হ'লো শতকণ্ঠে। আমার খাতির অসম্ভব রকমের বেড়ে গেল। মাধবিকাকে আমি বৌদি এখন থেকেই ব'ল্‌তে আরম্ভ করেছি। প্রকাশ করা বাহুল্য যে মাধবিকা যতীশদার হবু স্ত্রীর নাম। সেদিন রাত দুটো পর্য্যন্ত এই সব কাণ্ড-কারখানায় কেটে গেল—কাজেই পরের অর্থাৎ বিয়েরদিন সকালে সাতটার আগে আমার ঘুম ভাঙলো না। দাদামশায় এসে ব'ললেন ভায়া মুখহাত ধুয়ে ফেলে একটু চা-টা খাও। আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে দাদামশায়কে ব'ল্‌লুম 'টা'-র আর দরকার নেই একটু চা যদি আনিয়ে দেন তো ভালো হয়। তিনি বল্‌লেন, তোমার এখানে সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার, তুমি অত কুন্ঠিত হ'য়ে কথা ব'ল্‌ছো কেন, আর তোমাকে আবার চা আনিয়ে দিতে হবে কেন? সোজা ভিতরে চ'লে যাও, তোমার সঙ্গে অন্তপুরিকারা সকলেইতো কথা ক'য়েছেন, সামনেও বেরিয়েছেন, বলোগে "আমার চা কই"? আমি ইতস্তত: ক'রছি দেখে ব'ল্‌লেন অন্ততঃ অন্দরমহলের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে 'খুকী' ব'লে ডাক্‌তে পারবে তো? সে এলে তাকে প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা ব'লো, তোমার আর কিছু ভাবতে হবে না। তা-তে আমি রাজি হ'লুম, ছ-সাত বছরের একটি মেয়েকে ডেকে চা চাইতে নিশ্চয় সঙ্কুচিত হবো না। খুকীর আর তার চেয়ে কত বেশী বয়েস হবে!

কিন্তু ঐ নামের সাড়া-স্বরূপ একটি বছর পনেরোর মেয়ে এলো। আমি সলজ্জ ভাবে ব'ল্‌লুম, খুকীকে একবার ডেকে দেবেন? সে খুব খানিকটা হাস্‌লে, তার পর ব'ল্‌লে, পুলিনদা আমারই ডাক নাম 'খুকী', আমার ভালো নাম কুসুমিকা। অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী, ঐ নাম তারই সার্থক—সে যেন জীবন্ত পারিজাত পুষ্প। আর কি সপ্রতিভ! কাল রাতে হয়তো আমাকে দেখেছে কিন্তু আমি তাকে নজর করিনি, কথাতো তার সঙ্গে কই-ই-নি। অথচ একেবারে কত যেন আপনার, পুলিন-দা! এসো চা আর খাবার দেওয়া হ'য়েছে যে তোমার। আমি 'আপনি' ব'ল্‌ছিনা ব'লে রাগ কোরোনা যেন, ওরকম পরের মতো সম্বোধন আমি কাউকে ক'রতে পরিনা।

তারপর আমাদের খুব ভাব হ'য়ে গেল এক সঙ্গে কাজ ক'রে। আসর সাজানো থেকে সব গোছ-গাছ করার ভার দাদা-মশায় ও কান্তিবাবু আমাদের উপর দিলেন। রাতে মেয়ে পুরুষেদের পরিবেশন করার কাজটা নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হ'লো আমাদের দুজনেরই সম্মিলিত নৈপুণ্যে। পান-সাজা প্রভৃতি অনুরূপ কাজ কুসুমিকা একাই করলে। অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতা ঐ মেয়েটির। মা (যতীশদার ভাবী শাশুড়ীকে মা ব'ল্‌ছি) আমাদের দুজনকে অনেক আশীর্ব্বাদ করলেন। সকলের মুখেই আমার সুখ্যাতি। কেবল যতীশদার স্বগ্রামের আত্মীয়রা আমার উপর খুসী ছিলেন না। তাঁরা ভাবলেন, ভালোরে ভালো, আমাদের কেউ তেমন খবরও নেয়না অথচ এ কোথাকার কে এসে এ বাড়ীতে বেশ জমিয়ে নিয়েছে দেখছি।

কান্তিবাবুকে ব'লে রেখেছিলুম সম্প্রদান স্থলে আপনাকে আমি এই এই বল্‌বো যতীশদার সর্ত্তানুসারে, আর আপনি এই এই ব'ল্‌বেন। অতএব আমি পাঁচজন

ভদ্রলোকের সাম্‌নে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌লুম, আপনি যে রূঢ় আচরণ করেছেন তা'তে আমাদের উচিত বর ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমার শেখানোমতো যতীশদার শ্বশুরমশায় ব'ল্‌লেন, আমি তার জন্যে মাথা নীচু ক'রে ক্ষমা চাইছি ইত্যাদি। সবগোল গেল চুকে। যতীশদা ব'লে রেখেছিলেন বাসরঘর থেকে কোনো ছুতো ক'রে তাঁকে বাইরে আনতে, নয়তো সারারাত তাঁকে ঘুমুতে দেবেনা কেউ। আমি তদনুযায়ী ঘণ্টাখানেক পরে তাঁকে ডাকতে গেলুম। কিন্তু মেয়েরা সবাই বললেন এই একটা রাত তাঁদের, এতে হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত। যতীশদা বাইরে একবারটি আসতে, তাঁকে সে কথা জানালুম। তিনি স্বভাবতঃই অল্পভাষী, শুধু ব'ল্‌লেন 'তা বটে'। বুঝলুম বৌদিকে দেখবার ফলে তাঁর ঘুমোবার প্রবৃত্তিটা অন্তর্হিত হ'য়েছে। কুসুমিকার মতো না হ'লেও, বৌদি শ্রীমতী এবং লাবণ্যময়ী।

বধূ-বর যাবার সময় এলো। যে যতীশদা শ্বশুর বাড়ীর সকলের উপর ক্রোধযুক্ত হয়েছিলেন, দেখলুম যে তিনি কান্তিবাবু আর দাদামশায়ের সঙ্গে কি একটা গভীর আলোচনায় যথেষ্ট সময় অতিবাহিত ক'রছেন। ওঁদের ঘনিষ্ঠতা দেখে সত্যিই খুসী হ'লুম। যেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে আমরা ফির্‌বো, সেই দিন মধ্যাহ্নভোজনের পর যতীশদা ব'ল্‌লেন, পুলিন, তোমার মস্ত অনুরোধ আমি রেখেছি, আমারও একটা বিশেষ অনুরোধ তোমায় রাখতে হবে। আমি অবাক্ হলুম। যতীশদা এত কথা এক সঙ্গে প্রায়ই বলেন না। কি অনুরোধ জান্‌তে চাইলুম। তখন তিনি ব'ললেন, এ বাড়ীর সকলের একান্ত কামনা তুমি কুসুমিকাকে বিয়ে করো। আমার শালী দেখতে খারাপ নয়, তোমার অযোগ্যাও নয়।

আমি প্রথমটা কিছু ব'ল্‌তে পার্‌লুম না, ভাবলুম আমার মনের কথা কোন্ বিধাতা যতীশদা ও আর সবাইকে জানালেন? পরে ব'ল্‌লুম, যতীশদা সেদিন আর নেই যে, একজন শিক্ষিতা কিশোরীর ঘাড়ে জোর ক'রে কাউকে চাপিয়ে দেবে। কুসুমিকা যদি আমাকে বিয়ে ক'র্‌তে না চায়? যতীশদা জানালেন মেয়েদের মধ্যে এ সম্বন্ধে বহু আলাপ হ'য়েছে এবং তাঁরা বুঝেছেন যে কুসুমিকা তোমাকে স্বামীত্বে বরণ ক'র্‌তে উন্মুখ। অনেক কথা কাটা-কাটির পর, ব'ল্‌লুম, আচ্ছা রাজি আছি কিন্তু তোমার মতো একটি সর্ত্ত করছি এই যে, কুসুমিকা নিজে আমাকে সে কথা বল্‌বে। যতীশদা বোঝালেন, যে কোনো কিশোরী অমন প্রস্তাব আপনা হ'তে ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবে। আমি জবাব দিলুম, তবে আমার সম্ভব হবে না তাকে গ্রহণ করা। কুসুমিকাকে আমরা কেউ ঠিক চিন্‌তে পারিনি।

অপরাহ্ণে কুসুমিকা আমাকে ভিতরের কোনো ঘরে ডেকে নিয়ে গেল চা ও খাবার খেতে। সে ঘরে আর কেউ ছিল না। আমি ব'ল্‌লুম, কুসুমিকা, আজ চ'লে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমার কি একটুও মন কেমন ক'র্‌বে না? সে 'না' বল্‌তে বিস্মিত হ'লুম। আমার ভাব দেখে, অতঃপর সে নিজেই ব'ল্‌লে, আমি-ও যে তোমার সঙ্গে যাবো, মা, বাবা, দিদি, দাদামশায় সবাইকে ব'লেছি।

তা তো' হয় না কুসুমিকা, এমন ভাবে কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে তোমাকে তাঁরা যেতে দেবেন কেন?

মেয়ে মানুষ যদি পুরুষ মানুষের সঙ্গে যেতে না-ই পারে, তবে যতীশবাবুর সঙ্গে দিদি যাচ্ছেন কি করে?

কী বুদ্ধি! স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে।

তা-হলে দিনকতক পরেও তো অন্ততঃ যাবো।

তোমার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না। কেন আমি কি তোমার বৌ হবার যোগ্য নই? আমাকে গ্রহণ তুমি ক'র্‌তে কি পারবে না?

কুসুমিকা, এমন সৌভাগ্য হ'লে বর্ত্তে যাবো। আমি শুধু ভাবছিলুম, আমার মতো লোক কি? –

কুসুমিকা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, দম্পতীর কলহটা বিয়ের আগে থেকেই চ'ল্‌বে নাকি!

'কুসুমিকা' ব'লে পুনরায় ডাক্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে বৌদি এসে ঢুকলেন। তিনি যে আড়ি পেতেছিলেন, টের পাইনি। বললেন, পরস্পরের বিনয় প্রকাশের পালাটা আপাততঃ রেখে, দুজনে এস ঘরের বাইরে। এই মঙ্গলবার্ত্তা সকলকে দি-ই আর তোমাদের নিয়ে আমরা একটু আমোদ আহ্লাদ করি।

আমরা দুজনেই বৌদির অনুসরণ ক'রলুম। বৌদি যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে কি বলে ডাকবে—ঠাকুরপো না জামাইবাবু?

আমি ব'ল্‌লুম, যতীশদার বাড়ীতে, ঠাকুরপো আর এ বাড়ীতে, জামাইবাবু।
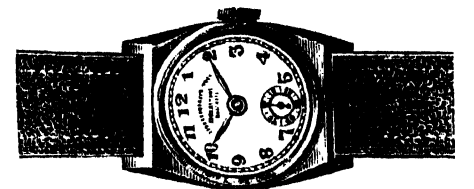
বিশ্বপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বোধ হয় দ্বিজেন্দ্র-লালের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া এতাবৎকাল আর কেহ সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েন নাই। একাধারে নাট্যকার, কবি, সাহিত্যে হাসির, বিদ্রূপের, কশাঘাতের রাজা, সুরকার (composer) দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার অল্পায়ু জীবনে ও কঠোর দাসত্বের মধ্যে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে রস পরিবেশন করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা অবলীলাক্রমে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় বিশ্বপ্রেমিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলাল বড় কবি ছিলেন, মন্দ্র কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন যে কাব্যের নয় রসকে এক আসরে পরিবেশন করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন কবি সাহসী হয়েন নাই। তিনি বঙ্গভাষায় এক নূতন শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা তাহার গতিশক্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ব্যতাত বোধহয় অতি অল্প কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বন্ধুবর্গ ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুযোগ অভিযোগ করা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য লেখেন নাই। তিনি বলিতেন "যে দেশে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি জন্মেছেন সে দেশে আর কবির প্রয়োজন নেই—নাটকে একেবারে লোক নেই আর যারা কবি তাঁরা বড় নাটককে Seriously নেন্ না—আমি সেই দিকে চেষ্টা করি—বঙ্গ সাহিত্য, নাট্যমন্দির সমৃদ্ধ হবে।" দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ বিচার সমর্থন করা সম্ভব, কারণ নাট্যমন্দির ও সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হইয়াছে সে বিষয় এখন সন্দেহ করার উপায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হইয়াছে ১৯১৩ সালে এবং ১৯৩৮ সালেও যদি লক্ষ্য করা যায় "সাজাহান" বা "চন্দ্রগুপ্ত" বিশেষ সমারোহে আজও অভিনীত হইতেছে ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রতিভাশালী নট একই ভূমিকা যথা "সাজাহান" বা "চাণক্য" বা ঔরংজেব বিভিন্নভাবে অভিনয় করিয়া নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন যেরূপ Shakespeareএর Hamlet বা Lear বিখ্যাত অভিনেতা Irving বা Tree অভিনয় করিয়া বিলাতে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তখন সমালোচককে স্বীকার করিতে হইবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক আজও সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ উভয়কেই সমৃদ্ধ করিয়াছে।

সত্য বটে যে আজকাল অধ্যাপক সমালোচকের লেখায় বা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রকাশিত বঙ্গভাষা ইতিহাসে হয়তো দ্বিজেন্দ্রলালের নাম উল্লেখ করা ব্যতীত কোন সমালোচনা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সমালোচকের বা আধুনিক লেখকের বিরাট ঔদাসীন্য থাকা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি আজও জীবিত আছে ও জীবিত থাকিবে। তথাকথিত বঙ্গভাষার ইতিহাস হয়তো বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইবে—কি হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীর মধ্যে এবং প্রত্যেক রচনার মধ্যে পৌরুষ বর্ত্তমান। তাহা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে "আমরা মানুষ নহি, মেষ"—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে যেরূপ স্বদেশ-প্রেম ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মধ্যেও তাহাই দৃষ্ট হয়। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-কারের উত্তরাধিকার সাহিত্যের মধ্যে কাহারও থাকে তো দ্বিজেন্দ্রলালেরই তাহা পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান (বিশেষতঃ সঙ্গীতে, সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমে ও কাব্যে বা সাহিত্যে নীতি বিষয়ে)।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম যুগের নাটক রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস দেশকে স্বদেশ-প্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যে হিন্দু মুসলমান লইয়া আজ সারা ভারতে বিরাট সাম্প্রদায়িকতার ঝড় প্রবাহিত, সেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যাহাতে ঐক্য স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা দুর্গাদাস নাটকে লক্ষিত হয়। হিন্দু মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছিল না—রাণাপ্রতাপে মেহেরউন্নিসা, দৌলৎউন্নিসা, দুর্গাদাসে রাজিয়ার চরিত্র নারীর পূত পবিত্র মহিমান্বিত শিখরে মণ্ডিত। এদিকে রাণা-প্রতাপের চরিত্র আদর্শ চরিত্র হইলেও সম্রাট আকবরও যে মহৎ ছিলেন তাহা কবি সুন্দর ভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া রাণাপ্রতাপের ভাই হইয়া; শক্ত সিংহ বিদ্বেষ বশে যে মেবারের সর্ব্বনাশ করিলেন তাহাও দ্বিজেন্দ্রলাল দেখাইতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। দুর্গাদাসে দুর্গাদাস আদর্শ চরিত্র হইলেও দিলীর খাঁ ও কাশিমের চরিত্র দুর্গাদাস অপেক্ষা কোন

অংশে নিকৃষ্ট নহে। ঔরংজেবের চরিত্র চিত্রনে দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময়ে ইতিহাসকে উপেক্ষা করিয়া ঔরংজেবের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সে শ্রদ্ধা সমর সিংহের মুখে দুর্গাদাস নাটকে প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল উপরোক্ত নাটকে স্বদেশপ্রেমকে সঞ্জীবিত করিলেও তাঁহার বিশ্বপ্রেমের উপর প্রথম হইতেই আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে রবীন্দ্র নাথের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখি। রাণা-প্রতাপে যোশী তাঁহার স্বামী কবি পৃথ্বিরাজকে বলিতেছেন "এমন কাব্য লেখো, যা প'ড়ে ভাই ভাইয়ের জন্য কাঁদে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্য কাঁদে। এমন কবিতা লেখো যার গভীর সঙ্গীত বিরাট বন্যার মতন আর্য্যাবর্ত্ত ছেয়ে প'ড়ে।" রাণাপ্রতাপের কন্যা ইরা রাণাপ্রতাপকে বলিতেছেন "না বাবা পৃথিবীই একদিন স্বর্গ হবে। যে দিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ করবে, সে দিন অসীম অনন্ত প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে প'ড়বে, সে দিন স্বার্থ-ত্যাগেই স্বার্থ লাভ হবে"। অন্যত্র ইরাই বলিয়াছেন "সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হ'ন, হোন—তাঁকেও যেতে হবে! চিতোর তাঁর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু মনুষ্যত্ব-টুকু সঙ্গে যেতো। আমার দেশ। আমার নিয়ে দিবারাত্র এ ভাবনা—এ দ্বন্দ্ব কেন মা? পৃথিবীতে "আমার" কি আছে বাবা?" এ বাণীই পশ্চাৎ মেবার পতনে "গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ"—এই মহাসঙ্গীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দেশ-হিতৈষণা এই বিশ্ব-প্রেম এই মনুষ্যত্ব—দ্বিজেন্দ্রলালই বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে প্রথমে যোজনা ও পরিস্ফুট করিয়া বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্য মন্দিরে অপ্রত্যাশিতরূপে অতি উচ্চে স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়া চিরতরে বঙ্গবাসীর নিকট নমস্ত হইয়া আছেন।

মেবারপতন নাটকের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্র-লাল লিখিয়াছেন "মদ্রচিত অন্যান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটী পার্থক্য লক্ষিত হইবে। আমার অন্যান্য নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পাষাণীতে আমি আদর্শ ব্রাহ্মণ চরিত্র, রাণা-প্রতাপ সিংহে আদর্শ ক্ষত্রিয় চরিত্র, দুর্গাদাসে আদর্শ পুরুষ চরিত্র এবং সীতাতে আদর্শ নারী চরিত্র লইয়া বসিয়াছিলাম! আবার তারাবাঈ ও নুরজাহান ইত্যাদিতে আমি বাস্তব মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন সে নাটক-গুলিতে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই নাটকে আমি একটী মহানীতি

লইয়া বসিয়াছি।—সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিন চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য-প্রেম, জাতীয়-প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তি রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্ত্তিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। আমি হইতে যতদূর প্রেমকে ব্যপ্ত করা যায় ততই সে ঈশ্বরের কাছে যায়। ঈশ্বরে লীন হইলে সে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। সে ঐশ প্রেম এখানে দেখান হয় নাই, নাটকান্তরে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল" —বস্তুতঃ "কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ" গানটী শুদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের কেন জগতের জাতীয় সাহিত্যের একখানি অবিনশ্বর স্বর্গীয় সঙ্গীত—সর্ব্বজাতির অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।

বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নবযুগের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। কি হাসির গান, কি ব্যঙ্গ কবিতা। কি প্রহসন, কি নাট্য-কাব্য, কি নাটক—সাহিতের যে যে বিভাগে দ্বিজেন্দ্রলালের অতুল প্রতিভা স্ফুরিত হইয়াছে—সর্ব্বত্রই তিনি তাঁহার বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র বজায় রাখিয়াছেন। সর্ব্বত্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্ত্তক, সর্ব্বত্র তিনি স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিভা গিরিনদীর ন্যায় স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে আপনার পথ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব অভ্রভেদী। ভাবের প্লাবনে সে বিরাট ব্যক্তিত্ব ভাসিয়া যায় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের দোষ ক্রটী গুণ সমস্তই তাঁহার এই বিশিষ্টতা হইতে উদ্ভূত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার সামান্যই আলোচিত হইয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিত কালে তাঁহার অনেক সাহিত্যিক অধ্যাপক বন্ধু আসিয়া নাটকের অভিনয় দেখিয়া অনেক মতামত প্রকাশ করিতেন। বিখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ইংরাজী সাহিত্যের দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিলেও চাণক্য বা সাজাহানকে মহানাট্যকার Shakespeare এর যে কোন শ্রেষ্ট সৃষ্টির সহিত তুলনা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে স্বকীয় নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সমালোচক ছিলেন—তিনি বলিয়াছিলেন সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত নাটক চিরদিন আদর পাইবে, আর পাষাণী, মেবারপতন ও নুরজাহান দেশ অগ্রসর হইলে আশাতীত আদর পাইবে। সাজাহান চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কবির ভবিষদবাণী আজও অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়াছে—দেশ অগ্রসর কবে হইবে এখনও বোঝা কঠিন। যখন দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বাংলার লোককে সচেতন করিতে আজও দ্বিজেন্দ্রলালের বাণীরই পুনরুক্তি করিতেছেন—

"তোদের মধ্যে ভণ্ড যে,
তাহারে দূর করিয়া দে
সবার বাড়া শত্রু সে,
আবার তোরা মানুষ হ"
(মেবার পতন)

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী বহুপূর্ব্বে হিন্দী, গুজরাটী, উর্দ্দু, মালাসালাম তেলেগু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

মানুষ হওয়া ব্যতীত জাতি স্বদেশকে ভালবাসিতে পারে না বিশ্বপ্রেমের মহিমায় নিজেকে মহিমান্বিত কল্পনা করিতে পারে না—। দ্বিজেন্দ্রলাল কত বড় কবি, কি কত বড় সমালোচক, কি কতো বড় নাট্যকার তাহা বিবেচনা করিবার সময় এখনও বোধ হয় আগত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহিমায় আজ দেশ সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন ও কবি আজও বর্ত্তমান। দ্বিজেন্দ্রলাল আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল দার্শনিক কবি বঙ্গের অদ্বিতীয় নাট্যকার হইলেও সর্ব্বোপরি তিনি ছিলেন যুগ প্রবর্ত্তক, সংস্কারক ও নীতি-প্রচারক—ঋষি টলষ্টয়, রোঁমা রোলার ও Bernard Shaw র ন্যায়। একাধারে বিরাট পাণ্ডিত্য ও অসামান্য কবি প্রতিভার এইরূপ সম্মিলন সাহিত্য জগতে বিরল। তিনি কি নাটক, কি প্রহসন, কি ব্যঙ্গ বা হাসির কবিতাতে বাঙ্গালী যাহাতে সত্যিকারের মানুষ হইয়া দেশকে, জাতিকে, সমগ্র বিশ্বকে ভালবাসে তাহাই প্রচার করিয়াছেন। বিখ্যাত সমালোচক Morley সাহেব Carlyle সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে অনায়াসে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

Morley said, "Carlyle was not only one of the foremost literary figures of his own time, which is comparatively a small thing, but one of the greatest moral forces for all time"

শঙ্খ

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ

সমুদ্রতল কথা কহে ওগো, তোমার বক্ষপুটে,
তাই বাজো বুঝি গম্ভীর-রবে-সাগর গাহিয়া উঠে!
শুভ্র শুভ্রতা তোমার অঙ্ক—
উঠে এলে তাই ছাড়িয়া পঙ্ক,
ওগো সাগরিকা, সাগর ত্যজিয়া নগরের কোলে এলে-
আমরা তোমায় করিব বরণ, হৃদয়ের শিখা জ্বেলে!

যত কুমারীর রক্ত-অধরে এলে চুম্বন লোভে
তুমি যে সাগরী, তাই তো তোমাতে কোমলতা নাহি শোভে!
দেব দেউলে বা তুলসীতলায়,
তব আবাহনে যে শুভ ঘনায়—
গভীর না হ'লে সে কি যেতে পারে দেবতার পদতলে!
সে ধ্বনি কভু কি ঠাঁই পেত তবে শ্রীচরণ শতদলে!

বিবাহ বাসরে তব ইঙ্গিতে শুচিতা সূচিত হ'ল—
দম্পতী বুকে তব শুভধ্বনি চিরদিন পাকা হ'ল।
নব জীবনের হে সেতুবন্ধ,
সুরাসুর-নর-বীরের বন্দ্য—
যুগে যুগে থাকি মনিবন্ধনে, নারীকে শ্রীমতী রাখো—
শক্তিরূপিণী রমনীর তুমি সিঁদুর বজায় রাখো!

দ্বাপরে একদা পাঞ্চজন্য ঘুচাইল অবসাদ,
ক্লৈব্য প্রাপ্ত অর্জ্জুন-কানে ধ্বনিলে রণ-নিনাদ।
বিশ্বপিতার গীতার গীতালি!
বীর্য্যের সাথে তোমার মিতালি—
মহাভারতের দেবতা পার্থ, বীর হ'ল তব হাঁকে
পার্থ সারথি সার কথা ক'ন তোমার ঠোঁটের ফাঁকে!

সব শুভ আর শুভ্রতা নিয়ে এইবার তুমি এসে,
রমণীর কর শোভি দেখা দাও—পাঞ্চজন্য বেশে।
হাঁতে শাঁখা থাক, মুখে থাক শাঁখ
বীর বিক্রমে দাও তুমি ডাক—
রমণী-মন্ত্রে হউক বিজয়ী, সব নর দেশে দেশে—
রমণী-শঙ্খ-ধ্বনিতে দাঁড়াক পতাকার তলে এসে!

বাঁশীতে আজ তুল্‌বো আমি সুর

বন্দে আলী মিয়া

পদ্মানদীর পাড়ির 'পরে ঘন কাশের বন
ওপাশে তার সবুজ চর—দূর হতে যে টানে আমার মন।
রাখাল ছেলের সঙ্গে আমি যাবো চলে সেথায় নদীর চরে
পায়রা চড়াই ঝাঁক বাঁধিয়া বিহান বেলা হোথায় এসে পড়ে;
তাদের পায়ের দাগ রয়েছে পদ্মাচরের সকল বালুময়
নদীর পাড়ে হেথায় হোথা নানান্ রঙা পালক পড়ে রয়।
তাই কুড়ায়ে গুজবো কাণে—মাথায় লবো—লবো দু'হাত ভরি
কাশের ফুল ছড়িয়ে দেবো পূব বাতাসে সারা সকাল ধরি।

রাখাল ছেলের সঙ্গে যাবো পদ্মানদীর চরে
বিহান বেলা জলের 'পরে সোণালি রোদ ঝিলি মিলি করে।
দেখবো আমি চেয়ে কেবল ঢেউ ভাঙিয়া পড়বে কিনারায়
পাল তুলিয়া নৌকাগুলো দখিন দেশে উজান বেয়ে যায়,
রাজহাঁসেরা এলিয়ে পাখা যায় যেন সে হয় গো আমার মনে
আজকে আমার সাধ হয় যে নায়ে চড়ে যাবো ওদের সনে—
ওই ও পারে কাজল রেখা—দূরের চেয়ে আরো দূরের গাঁ
কোথায় যে সে যাবো চলে কত না দূর নাইকো ঠিকানা।

পদ্মাচরে কাটিয়ে দেবো সারাটি দিন আজ
রাখাল ছেলের সাথে আমার কতো রকম থাকবে কতো কাজ।
হাত ধরিয়া কিনার দিয়ে বেড়াবো আজ সারা বিহান বেলা
শামুক ঝিণুক কুড়িয়ে এনে গাছের ছায়ে করবো দু'জন খেলা।
পুবালীবায় ঝাপটা সাথে ক্ষণেক ক্ষণে আসবে চরের বালি
দুপুর বেলা রোদের আঁচে চারদিকেতে ঝাঁ ঝাঁ করবে খালি।
রাখাল ছেলে রইবে বসি—বাঁশীর মুখে তুলবো আমি সুর
ভাটিয়ালী জারির গানে ভরিয়ে দেবো আজের দুপুর।

ভাটির বেলা গাঙের ঘাটে গামছা দু'জন নিয়া
চিংড়ি বেলে কিনার থেকে ধরবো খালি চিতে চাবান দিয়া।
মাছরাঙারা মাছের আশায় থাক্‌বে বসে উঁচু পাড়ির দোপে
গাঙচিলেরা মাথার 'পরে উড়বে খালি ক্ষুদে পোনার লোভে—
দিনের আলো আসবে নিভে—সিঁদুর গুলে যাবে নদীর জল
পাড়ির 'পরে আছাড়িয়া গানের সুরে করবে ছলাৎছল।
সাঁঝ না হতে মোষের পিঠে বসে দু'জন আসবো ফিরে গাঁয়—
পদ্মানদীর চরের লাগি পরাণ আমার করবে রে হায় হায়।

বাসনা

[নক্সা]

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

থীসিস্ কেহ লেখে; কেহ লেখে না, শুধু জীবনে প্রতিপালন করে। প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক একটি থীসিস্ থাকে, যাহাকে আমরা লোক-ভাষায় বলি গোঁড়ামি। অথচ তার জীবনে একটি বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য আছে, অন্তরে একটি মতবাদ আছে—যাহা সে নীরবে কাজের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলে। যাহারা মতবাদ লইয়া গবেষণা করে, কোলাহল করে, তারাই বই লেখে, ডক্টর হয়। আর যাহারা বই লেখে না, অথচ থীসিস্ লইয়া জীবন যাপন করে, তাহারা নিরুপাধি সামান্য গৃহস্থ। যেমন আমাদের সুজিৎ বাবু।

সুজিৎ বাবুর যখন বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর, তখনই তাঁর পাঁচ পুত্র, এক কন্যা। এই প্রবল বংশবৃদ্ধির মূলে কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক থীসিস্। থীসিসের প্রথম কথা—জন্মশাসনের আন্দোলনে কুঠারাঘাত। দ্বিতীয় কথা—যাহারা মাতা হইতে অনিচ্ছুক সেই সব নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিরোধ। তৃতীয় কথা—পৃথিবীতে আবার মাতৃতন্ত্র…অর্থাৎ মেট্রিয়ার্ক্যাল্ সমাজের প্রবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইয়াছে, এই প্রগতির গতিরোধ করিয়া, চাই পুনরায় পিতৃতন্ত্র অর্থাৎ পেট্রিয়ার্ক্যাল সমাজের প্রবর্ত্তন। পিতৃতন্ত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা হইলে ফ্যাসিজ্‌ম্ আসিবে, সোশ্যালিজ্‌ম্ পাত্তা পাইবে না।

তাই সুজিৎ বাবু একজন পুরা দস্তুর পিতা বা পেট্রিয়ার্ক। তাঁর পুত্রদের কেহ তাঁকে আড়ালে বলে হিট্‌লার, কেহ বলে মুসোলিনি, কেহ বলে গান্ধী, তাঁর শিষ্য-গণের কেহ তাঁকে বলে অবতার, কেহ বলে ডেভিল্। আর তাঁর কন্যা কুমারী বাসনা বলে, "বাবা যেন কী, একটি আস্ত ইয়ে, মানে একটি মিষ্ট্রি (রহস্য)—ঠিক মিষ্ট্রি নয়—একটি করুণার পাত্র। আহা বেচারী বাবা! মা মারা যাওয়ার পর থেকে অম্বিধারা খাপ্‌ছাড়া হ'য়ে গেছেন।"

কুমারী বাসনার মা মারা গিয়াছে প্রায় ছ' বছর আগে। মায়ের কলেরা হইয়াছিল, কিন্তু বাবা ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দেন নাই, গৃহদেবতার নির্ম্মাল্য তুলসীপাতা বাঁটিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সুজিৎ বাবু বস্তু-তন্ত্রবাদা—সংসারে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভাগীরথীকে পুনরায় নামাইয়া আনিবেন, এই ছিল পণ। কুমারী বাসনার তখন বয়স সবে দশ বছর। তবুও আজ সে-সব কথা বেশ মনে পড়ে। সে মা বলিয়া কাঁদিয়া-ছিল, কিন্তু বাবা ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন—"কান্না-টা মেয়েদের একটা অভ্যাস, দুর্ব্বলতা প্রকাশের প্রণালী মাত্র। তোর ও সাজে না বাসনা, ঐ জন্যেই ত তোকে আমি পুরুষের পোষাক পরাব আজ থেকে। তোর মা সতালক্ষ্মী, তাই সন্তান ও স্বামা রেখে মরেছে। ফের যদি তুই কাঁদবি ত তোকে তুলে আছাড় মারবো; আমি ইমোশন্ ভালোবাসি না।"

সেদিন থেকে বাসনা পুরুষের বেশে থাকে, ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে, সম্প্রতি বডিস্-এর ওপর সার্ট ও কোট পরিতে সুরু করিয়াছে। সে গ্যার্ল-ইস্কুলে যায় না, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্য পড়ে।

আজ বাসনা সেই সব কথা ভাবিতেছে। সামনের চেয়ারে বসিয়া মাষ্টার উমাপতি বাবু "মানব-বিবাহের ইতিহাস" পড়িতে-ছেন। সহসা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কুমারী বাসনা, তুমি কি বিয়ে করবে না? কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী সকলেরই বিয়ে হয়, কেবল মানুষ-ই দু' একজন অবিবাহিত থাকতে চায়, ওটা আদৌ ভাল নয়।"

উমাপতি কোন নূতন বই পড়িলে, দু' একটা কথা অম্বিধারা অবান্তর বলিয়া ফেলেন, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়া বলেন না বোধহয়।

কুমারী বাসনা চমকিয়া উঠিয়া এক দৃষ্টিতে মাষ্টারের পানে চাহিয়া রহিল। এরূপ ধৃষ্ট প্রশ্ন তাহাকে মাষ্টার কোনদিন করিবে, সে ভাবে নাই। একে বিয়ের কথা, তার ওপর আর কীটপতঙ্গের বিয়ের সহিত তাহার বিয়ের কথা! প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত এবং নিশ্চয়ই অপমানকর। মাষ্টারের কী স্পর্দ্ধা!

বাসনার ক্রুদ্ধ বক্ষ কোটের নীচে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে স্ফীত রোষ ভাঙ্গিয়া ফাটিয়া বিস্ফুরিত হইয়া গেল। মাষ্টারের মাথায় আসিয়া পড়িল ধাঁ করিয়া এক প্রচণ্ড পেলব ঘুষি। মুট্ করিয়া চুরমার হইল দু'গাছি সোনালি কাচের রেশমি চুড়ি। আর সোনার চুড়ি একগাছা বাঁকিয়া তোবড়াইয়া কাটিয়া বসিল কোমল হাতের কব্জিতে। দু'ফোঁটা রক্ত গড়াইয়া ছোট্ট দুটি চুনীর মতো দুলিতে লাগিল।

বাসনার চোখের সামনে সেই ক্ষুদ্র দুটি রক্ত বিন্দু ক্রমে বৃহৎ হইয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শোণিত সিন্ধুর ফেনার মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। "উঃ! মা গো!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া সে টেবিলে মাথা রাখিয়া এলাইয়া পড়ে।

উমাপতিবাবু ঘুষিটার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একেবারে থতমত ভাব। চটিয়া উঠিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বিদ্যুৎ বেগে বাহিরে যাইবার আর অবকাশ পাইলেন না। "কী হলো!" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া বাসনার মাথাটি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া শুধাইলেন,—"হাতে লেগেছে বুঝি?" তারপর নিজের রুমাল দিয়া রক্ত মুছিয়া দিলেন। হাত-পাখা দিয়া শিষ্যার মাথায় বাতাস করিতে লাগিলেন। ধীরে বলিতে লাগিলেন, "ছিঃ! কুমারী বাসনা! আমি ভেবেছিলাম তুমি জোয়ান্ অব আর্ক-এর মতো বীর, দেশের মুক্তির জন্যে একদিন যুদ্ধ করবে। কিন্তু তোমার দ্বারা তা হবে না দেখছি।"

বাসনা করুণ কণ্ঠে উত্তর করিল—"আমার দ্বারা শুধু বিয়ে করাই হবে এই বুঝি আপনার ধারণা। আপনি বড় ফাজিল হচ্ছেন দিন দিন। যান! যদি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যেতুম, তাহলে কী করতেন আপনি, শুনি।"

কিন্তু শোনা আর হইল না। ঢং করিয়া আরতির ঘণ্টা পড়িল—পিত্রারতির ঘণ্টা। অমনি সৈনিকের ন্যায় হুসিয়ার (য়্যাটেন্‌শন্) ভাবে দাঁড়াইয়া বাসনা পিতার আরতি করিতে ছুটিয়া গেল।

প্রত্যহ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার পর সুজিৎ বাবুর আরতি হয়। তিনি নিজে একটি দারুনির্ম্মিত সিংহাসনে বসেন। ভার্য্যাভাবে বাড়ীর প্রাচীনা ঝি কুন্দ একখানি চামর লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া ব্যজন করে। আর ভৃত্য দাশরথি কাঁসর বাজায় এবং পুত্রগণ তখন ঘণ্টাধ্বনির সহিত পঞ্চ-প্রদীপ ঘুরাইয়া পিতার আরতি করিতে থাকে। কন্যা পঞ্চম সুরে স্তোত্রগান পূর্ব্বক পিতৃ-বন্দনা করিয়া সমস্ত পল্লীতে একটি সুপবিত্র ধর্ম্মভাবের অনুভূতি-স্পন্দন বিকম্পিত করিয়া তোলে।

সুজিৎ বাবুর মতে পারিবারিক শান্তির জন্য চাই পিতার সভারিন্‌টি অর্থাৎ অদ্বৈত প্রভুত্ব, এবং তার জন্যে চাই ডিভাইন্ পেট্রিয়ার্কশিপ অথবা ভাগবত পিতৃত্ব। তাই এই পিতৃ-পূজার পদ্ধতি তাঁর গৃহে গত ছয় বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এই আরতি-কালে পুত্র-কন্যা কাহারো অনুপস্থিত হইবার জো নাই, হইলে পরদিন আর তাহার গৃহে স্থান নাই।

প্রথম তিন পুত্র এই ভাবেই গৃহ ছাড়িয়াছে। লোকে বলে তাহারা চাকুরী করিতে স্থানান্তরে গিয়াছে, কিন্তু সুজিৎবাবু বলেন তিনি তাহাদের যাইতে বাধ্য করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা পিতৃশাসন

মানিতে একদিন দ্বিধাবোধ করিয়াছিল। বড় কঠোর তাঁর শাসন।

কুমারী বাসনা আসিয়া পিতার পাদ-বন্দনা পূর্ব্বক শঙ্খ-দীপ লইয়া আরতি আরম্ভ করিল। কারণ বর্ত্তমানে গৃহে সে-ই বয়সে বড়। তার ছোট দুটি ভাই নীলু ও কালু স্তবপাঠ করিতে লাগিল।

রুটিন্-মাফিক আধঘণ্টা আরতি চলে। তারপর প্রসাদ বিতরণ।

একখানি প্লেটে কিছু ফল-মিষ্টি নিয়া কুমারী বাসনা লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে। বলে,—স্যর কিছু জল খান। আমাকে ক্ষমা করুন। ঘুঁষির কথাটা ভুলে যান, তাহলে আর এক কাপ চা দেবো।

উমাপতিবাবু ঘুঁষির কথা প্রায় ভুলিয়া-ছিলেন। তিনি অন্যমনস্কভাবে ভাবিতে-ছিলেন. বাসনার সেই নারী-সুলভ এলাইয়া পড়ার ছবিটি। সেই তার মাথাটি তুলিয়া ধরা। তিনি তখনো মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া টেবিলটি মুছিতেছিলেন, পাছে কোথাও রক্তের ছিটা লাগিয়া থাকে। তিনি বাক্য ব্যয় না করিয়া জলযোগে নিযুক্ত হইলেন।

বাসনা এযাবৎ যে-প্রশ্ন কখনো করে নাই, আজ হঠাৎ তাহাই বলিয়া ফেলিল,—স্যর আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী? উমাপতি গম্ভীর স্বরেই বলিলেন,—আমার স্ত্রী নেই।

—সে কি? আপনি বিয়ে করেন নি?

—না।

—বাবা যে বলেন, আপনি বিবাহিত, সচ্চরিত্র সংসারী লোক!

—তোমার বাবাকে আমি মিছে কথা বলেছিলুম, নইলে এ টিউশন্ পেতুম না। টাকা রোজগাড়ের জন্যে মিথ্যে কথা বলা আমি পাপ মনে করি না।

—এখন যদি বাবা আপনাকে তাড়িয়ে দেন?

—তুমি তাড়াবে না, এই আমার বিশ্বাস।

হুঁ!

পরক্ষণেই বাসনা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

(২)

নীলুর বয়স বারো কালুর দশ। দুজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিতেছিল। নীলু বলে,—দ্যাখ কালু মাইরি সেদিন দেখিছি, মাষ্টার মশায় দিদির মাথা টিপে দিচ্ছেলেন, মাথায় হাওয়া করছিলেন। কালু বলে—দিদি আজ বাবার বাক্স খুলে মায়ের সব কাপড়-জামা বার ক'রে নিয়েছে বলেছে আর সে পুরুষ মানুষ সাজবে না. মেয়ে মানুষ হবে।

কথা শেষ না হতেই ঘরে বাসনার প্রবেশ। পরণে লালপাড় সাদা সাড়ী, গায়ে সেমিজ। ভাল করিয়া পরিতে পারে নাই. কোনমতে জড়াইয়া সরাইয়া লম্বা আঁচলখানি কোমরে বাঁধিয়াছে।

ঘরে ঢুকিয়াই বাসনা বলে,—ওরে নীলু-কালু, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। বাবা গেছেন ব্যাংকে টাকা তুলতে আমিও বেরিয়ে যাচ্ছি মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে বিয়ের পোষাক কিনতে। বাবা এলে বলিস্।

নীলু হাততালি দিয়া উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া বলে,—তা ভাই দিদি বেশ মজা হবে। ওবাড়ীর যূথিকাদি'র সেদিন বিয়ে হ'লো. তেম্নি ধুমধাম হবে ত! টোপর মাথায় জামাইবাবু আসবেন……

কালু বলে,—অনেক লোকজন, সার সার ইলেক্ট্রিক্ আলো, শাখ আর উলু—বড়-দা, মেজ দা. সেজ-দা আসবেন···

বাসনা ভ্রাতার কথা থামাইয়া বলে,—যাঃ সে সব কিছু হবে না। মাষ্টার মশাই বলেছেন, তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে আসবেন সন্ধ্যেবেলার—শুধু মালা বদল···

বাকী কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, আবার কথা ঘুরাইয়া বাসনা বলে,—আর এক কাজ করবি দ্যাখ. বাবার সব সিগারেটগুলো বারান্দায় জড়ো করে রেখেছি, আগুন ধরিয়ে দিয়ে খুব হাওয়া করবি, যেন সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

নীলু শুধায়, কেন দিদি?

বাসনা মৃদু হাসিয়া বলে,—জানিস্‌নে বুঝি! মাষ্টার মশাই বলেছেন, সিগারেট খাওয়া দেখলেই তাঁর যুদ্ধের সময় কামানের নলে আগুন জ্বালার কথা মনে পড়ে। বলেন, সিগারেট খাওয়া না ছাড়লে কামানের স্মৃতি মুছবে না, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ ঘুচবে না। বেশ ভালো কথা, না?

ভালো মন্দের অত বিচার নীলু-কালুর নাই। তাহারা তৎক্ষণাৎ দিয়াশালাইয়ের অনুসন্ধানে ছুটিয়া যায়। বাসনাও বাহির হইয়া পড়ে।

সুজিৎবাবু যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন ঝি চাকর সব নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। বাড়ী ধূমে আচ্ছন্ন, আর নীলু-কালু বারান্দায় দাঁড়াইয়া বেদম কাসিতেছে, এবং কাঠির খোচা দিয়া দিয়া বাক্স সমেত এক এক রাশি সিগারেটের অগ্নি সংস্কার করিতেছে।

সুজিৎবাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া হাঁকিলেন,—ওকি হচ্ছে রে?

পলাইবার শক্তি আর নাই। নীলু-কালু মুখ চূণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সুজিৎবাবু অগ্রসর হইয়া অভিনিবেশ সহকারে তাকাইয়া উপলব্ধি করিলেন, কী পুড়িতেছে। পরক্ষণেই দুই পুত্রের দুই গালে দুইটি চড় মারিয়া দুই হাতে তাহাদের কাণ ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিয়া ঘরের মেঝেয় প্রবল ধাক্কায় ফেলিয়া দিলেন। ছেলে দুইটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। অতঃপর

সুজিৎবাবু গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, হারামজাদা ছেলে সব, এ আবার কি রকম খেলা হচ্ছে? পোড়াবার আর জিনিষ পাওনি? এই শূয়ার দাশরথি......শালার কুম্ভকর্ণের ঘুমের কিছু বলেছে।...

নীলু গোঁঙাইতে গোঁঙাইতে বলে,—দিদি যে বল্লে, ওতে যুদ্ধ থামবে......

সুজিৎবাবুর কণ্ঠে বজ্র বিস্ফোরণ হইল,—কী বল্লে? কে বল্লে? বাসনা? কোথায় সে হতভাগী?

"এই যে বাবা, আমি।" বলিয়া বাসনা সামনে আসিয়া দাঁড়ায়!

সুজিৎবাবু যেন প্রেত দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বাসনার অপরূপ সজ্জা। পরণে পাহাড় পেড়ে সাগর-রঙ-এর সাড়ী, গায়ে আকাশ-রঙের জামা, পায়ে দূর্বা রঙের স্যাণ্ডেল্, আর মাথায় পাকাধানের সোণালি রঙের ভেল্ (ওড়না)। কুমারী বাসনার পিছনে মাষ্টার উমাপতি। তাঁর পরণে ঢিলা পায়জামা ও হাতকাটা সার্টের ওপর কোট—পুরা দস্তুর প্রোলিটারিয়েট (শ্রমিক) পোষাক।

সুজিৎবাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রোরুদ্যমান পুত্রদ্বয় সহসা থামিয়া গেল।

মাষ্টার উমাপতি বলিলেন,—দেখুন সুজিৎবাবু, এই আপনার কন্যা বাসনা—পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আজ আমি একে সাজিয়েছি। এই যে পোষাক—এতে পার্ফেক্‌শান্ অব্ ম্যাচ্ (পরিপূর্ণ সুষমা)—এ মূর্ত্তিতে আছে শান্তি ও সৌন্দর্য্য, শ্রী ও সারল্য। এতে ওয়ার্ নেই, বিরোধ নেই। আপনি স্বভাবের (নেচার) বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন—তাই নারীকে দিয়েছিলেন পুরুষের বেশ, তার হৃদয়ের কোমলতায় আনতে চেয়েছিলেন পাথরের কঠোরতা। কিন্তু এই তিন বৎসর ধ'রে আমি এর শিক্ষক। মানুষের যা কিছু শেখা দরকার আমি একে শিখিয়েছি, এবং নূতন কিছু শিখিয়েছি। শিখিয়েছি, শুধু পুরুষের স্তোত্র-গান করবার জন্যেই নারীর সৃষ্টি হয়নি। সন্তান প্রসব ক'রে শিশুর সঙ্গে সঙ্গে আতুর ব্যক্তি হ'য়ে থাকাই তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য বিরাট্। নারী একাধারে কৃষির দেবতা সীতা, চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা। নারী-চরিত্র বাল্মীকি-কাব্য ও চাণক্য-নীতির একত্র সমাবেশ। আমার মতে ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্তের অথবা মৌর্য্যবংশের উত্থান মানে, দাসী পুত্র নামচ্ছলে জন-সাধারণের উত্থান—চন্দ্রগুপ্ত প্রোলিটারিয়েটের প্রতীক। তাই আজ আপনার পতন, কুমারী বাসনার উত্থান। সে আমার প্রেয়সী, সহচরা। শুধু আমার সহচরী নয়, এ দেশের বিপুল জনশক্তির সহচরী। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি অবিবাহিত, আজ আমাদের বিয়ে......

নীলু কালু আনন্দে হাত তালি দিয়া উঠিল। সাগ্রহে বলে,—বাঃ দিদিকে বেশ বউ-বউ মানিয়েছে! না বাবা?

সুজিৎবাবু হুঙ্কার করিলেন। চোপ্ রাও।

(৩)

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। ক্ষুদ্র গৃহ অপরিচিত অপরিচ্ছন্ন অসংখ্য জনসমাগমে গম্ গম্ করে। বড় ঘরের বারান্দায় সেই কাঠের সিংহাসন তৃণগুল্মে সাজাইয়া তাহার উপর উমাপতি ও বাসনাকে বসানো হইয়াছে। তিনজন হিন্দুস্থানী পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক তাহাদের মালাবদল করিয়া দিল। একজনে একটা রামশিঙ্গা (bugle) বাজাইল। কয়েকটি শ্রমিক-বালক গান গাহিল—

"উড্ডিন কর রক্ত-পতাকা
ভক্তেরা আজি সবে।
নারী ও নরের নূতন বিবাহে
গাহ গান ভৈরবে॥"

ইত্যাদি

নিলু-কালু বারান্দার এক কোণে নীরবে দাঁড়াইয়া সব ব্যাপার দেখিতেছিল। এই জন-কোলাহলের মধ্যে তাহারা নিজেদের অস্ফুট শিশু-মনকে খাপ খাওয়াইতে পারে নাই।

সুজিৎবাবু আপনার শয়ন ঘরে বসিয়া এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা দৈব নির্দ্দেশ পাইবার চেষ্টা। কিন্তু কিছুই পাইলেন না। মাষ্টারটা জুয়াচুরি করিয়াছে, তাহাকে পুলিশে দেওয়া উচিত কিনা? কন্যা সাবালিকা, স্বমতে স্বামী সংগ্রহ করিতেছে, মোকদ্দমা টিকিবে না। অগত্যা পাঁজি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

ঝি কুন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিতে গিয়াছিল, তিনি আসিলেন। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, আজ বিবাহের লগ্ন নাই। তবে.........

—আর তবে-টবে নয়। ভট্চায্, যেমন ক'রে হোক একটা কুশণ্ডিকা অন্ততঃ সেরে দিয়ে যাও, মেয়েটার কপালে সিঁদুর ত উঠুক, নইলে.........

সুজিৎবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, আর ভাবিতে পারিলেন না।

ওদিকে কোলাহল ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। অবশেষে উমাপতি ও বাসনা লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। নীলু-কালু বিছানায় বসিয়া তখনো দিদির বধূবেশ দেখিতেছে। উমাপতি বলিলেন, —আজ আমি একটা রেল-অফিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছি, তাই এই Coup de' etat (দাবার কিস্তি) দিলাম। তোমাকে আমি আমার সকল থিওরি-ই শিখিয়েছি, এইবার কাজে নামতে হবে, কালই আমি ট্রেড্-য়ুনিয়নের মেম্বর হবো। তোমার আমার মিলনের একটা মহৎ সিগ্নিফিক্যান্স (তাৎপর্য্য) আছে।

এ যেন পৃথিবীর একটা নবীন জন্ম,—যেন প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নূতন মহাদেশের আবির্ভাব,—যেন—

বাসনা বলিল,—যেন মেরু প্রদেশে অরোরা বোরিয়লিস্—বলিয়া সে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠে।

বাহিরে ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন,—মা বাসনা, একবার আসতে হবে যে, কুশণ্ডিকা-টা সেরে নেওয়াই ভালো, নইলে বে-আইনী হবে।

উমাপতি আপত্তির ভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিল। বাসনা তাহার আঙ্গুলে চাপ দিয়া বলিল,—নাও, ওঠো, আর কেলেঙ্কারি করতে হবে না।

উভয়ে আসিয়া পাশের ঘরে পিঁড়িতে বসে। ভট্টাচার্য্য যজ্ঞ করিয়া মন্ত্র পড়িয়া কুশণ্ডিকা সারিয়া দেন। বাসনার কপালে সিঁদুরের লাল টকটকে দাগটা ঝক্ ঝক্ করিয়া ওঠে,—রাত্রিশেষের শুকতারকার মতো।

সুজিৎবাবু বলিলেন, বাসনা—আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি তবে যাই, তোরা যা হয় কর।

আপনকক্ষে ফিরিয়া দেখেন ঝি কুন্দ ঘুমন্ত নীলু-কালুকে টানিয়া আনিয়া শোয়াইয়া দিতেছে, বোধ হয় তাহাদের খাওয়া হয় নাই।

বাসনা-কে আজ দেখিতে মন্দ মানায় নাই। সুজিৎবাবুর মনে সহসা একটি বহুদিনের বিস্মৃত মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে,—বাসনার মায়ের বয়স তখন অতখানিই হইবে।

আর তাঁহার এ-গৃহে থাকা চলে না। কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। নীলু কালুকে সঙ্গে লইবেন কিনা ভাবিবার কথা। নিজের স্যুট্-কেস্টা টানিয়া গুছাইতে বসিয়া গেলেন।

উমাপতি তখন বলিতেছিল,—ভাখো বাসু,—তোমাকে কিন্তু সভায় বক্তৃতা দিতে হবে।

বাসনা বলে,—ইস্! আমি তোমার ভাড়াটে বক্তা নাকি! ওসব জংলিদের সভায় যাচ্ছে কে? এখনো বাবাকে বলা হয় নি যে, তুমি ঘর জামাই হয়ে থাকবে এখানে।

উমাপতি বলে,—না।

বাসনা বলে,—তোমার ঘাড় থাকবে—জানো আজ থেকে নারীতন্ত্র (মেট্রিয়ার্ক্যাল্) সমাজের পত্তন।

সুজিৎবাবুর গোছানো শেষ হয় নাই। বাসনা আসিয়া বলে,—বাবা ও কি করছেন। এখনো ঘুমোন নি যে বড়। আপনার জামাই কিন্তু এখানেই থাকবে, ওর ঘর বাড়ী নেই, একটা চাক্‌রি পেয়েছে শুধু।

সুজিৎবাবু নির্লিপ্তভাবে বলেন,—আমি কাল চলে যাবো বাসনা। নীলু-কালুকেও সঙ্গে নে যাবো ঠিক করেছি।

বাসনা ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—ধ্যেৎ। তাই আবার যায় নাকি। তাহলে আমি এ বিয়ে নাকচ ক'রে দেবো, বাবা। খবরদার ও কাজ করো না। তুমি শোও আমি ঘরে তালা মেরে দিচ্ছি।

সে সত্যই পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিল। তখন রাত্রি প্রায় ১১টা। ফিরিয়া দেখে উমাপতি মনোবিজ্ঞানের বই খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছে। সে বইখানা ছুড়িয়া বারান্দায় ফেলিয়া দিয়া বলে—কাল আমার আরও পাঁচখানা সাড়ী চাই, পাঁচটা ব্লাউস্, একটা ক্রীম, পাওডার, সাবান, আর······

উমাপতি বিরক্ত হইয়া বলে, হু! তোমরা সীতাও নও, ক্লিওপেট্রাও নও,—শকুন্তলাও নও, বেহুলাও নও···

—আমরা কিছুই নই, শুধু তোমাদের ঘাড়ে চাপি, ভূত! বাবার পেট্রিয়ার্কশিপ ভেঙ্গেছি, এইবার তোমার সোস্যালিজম্-এর মুণ্ডুটায় আমার ঘোম্‌টা-খানা জড়াতে পার্লেই হয়। বলিয়া বাসনা তার সোনালি ওড়নাখানি উমাপতির মাথায় ফেলিয়া তাহাকে কানা করিয়া দিয়া···কি যেন করিতে যাইবে···

এমন সময় বাহিরে (উঁকি-রত) কুন্দ ঝি হাসি চাপিতে চাপিতে গলায় বিষম লাগিয়া কাসিয়া ফেলিল।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী আধুনিক সামাজিক চিত্র "অধিকারে" মেনকা, যমুনা ও প্রমথেশ বড়ুয়া। ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোর্বে।

= খেয়ালী =

ডায়েরীর পাতা থেকে

(য়ুরোপের Impresario)

শ্রীহরেন ঘোষ

২২শে এপ্রিল সকালের দিকে মুশি ও অস্ত্রিকের অফিসে এলাম। Niceএর সবচেয়ে বড় থিয়েটার প্যালে ডি Mediteranianএর তিনি ম্যানেজার। বেঁটে খাটো লোকটী অসীম উৎসাহী, ব্যবহারে আমরা যাকে মাটীর মানুষ বলি। আমার জন্য এ ফরাসী ভদ্রলোক যা করেছেন, জীবনে ভোলা যায় না। আমি বলেছিলুম তাঁকে—আমাদের Impresario G. Kuged, Vienna annexationএর গোলমালে আটকে পড়েছেন এবং আমরা না পাচ্ছি পূর্ব্বেকার হিসেব মত শো দিতে, না পাচ্ছি কোন নূতন লোকের সঙ্গে ব্যবস্থা করতে।

বিপদ বুঝে মুশিও অস্ত্রিক প্যারীতে (Paris) সবচেয়ে যিনি বড় Impresario Arnold Meckel—তাঁর Bureauতে ফোন কল্লেন; একবার নয়, দু' দুবার এবং বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে ও আমাদের দলের বৈশিষ্ট্যতা সম্বন্ধে বুঝিয়ে বল্লেন—এবং অনুরোধ কল্লেন, তিনি যদি আমাদের দলের সমস্ত য়ুরোপ আমেরিকার ভার নেন। কিছুক্ষণ কথা কইবার পর মুশিও অস্ত্রিক "ত্রে বিঁয়া" বলে চীৎকার করে উঠলেন এবং ফোন ছেড়ে আমাকে বল্লেন, Meckel Agency will take you up and do the needful - you better go to Paris right now and see them—" বলে তিনি তখুনি তাঁর stenoকে একখানি চিঠি dictate কল্লেন এবং দু' মিনিটের ভিতর চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "কাল কি পরশু নিশ্চয়ই Paris গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা কইবেন, এই আমার অনুরোধ", আরও বল্লেন, Niceএ আমাদের থিয়েটারে সেরাইকেল্লার নাচে কি পরিমাণ লোক হয়েছে, সাংবাদিকরা কি রকম প্রশংসা করেছেন, পোষাক পরিচ্ছদ আপনাদের কত উচ্চাঙ্গের এবং বিশিষ্ট মুখোস নৃত্যের চাহিদা কতখানি বাড়তে পারে এদেশে, এ বিষয়েও আমি Meckel Agencyকে বলে দিয়েছি। এরপর তুমি যদি তোমার Newspaper cutting Bookটা নিয়ে ওঁদের সঙ্গে কথা কও—কাজ হয়ে যাবে, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।"

ধন্যবাদ দিয়ে চিঠিখানি নিয়ে চলে আসি এবং রাত্রের ট্রেণে অনেক অসুবিধা করেও Paris যাত্রা করি– সাথে যান কুমার বিজয় প্রতাপ ও কুমার হিমাংশু কুমার। ট্রেণে ভীড় ছিল, শোবার ঘরেও (Sleeping Car) স্থান ছিল না খালি। সুতরাং খানিকটা বসে, পাশের লোক নেমে গেলে খানিকটা পা ছড়িয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া গেল কোন রকমে। কুমার বিজয়প্রতাপ আয়েসী লোক ওঁর ভাল ঘুম হ'ল না—সকালে উঠে বুঝলুম রাত্রের journeyতে ওঁর বিশেষ কষ্টই হয়েছে। তাছাড়া রাত্রের দিকে ঠাণ্ডা পড়েছিল, সাথে মাত্র একটী করে ওভারকোট, তাই দিয়ে যতটা ঢাকা যায় তা করা গেছলো—কিন্তু ওদেশের শীত, অল্পবিস্তর ছোট খাটো ফাঁক দিয়েও যে পরিমাণ ঠাণ্ডা সরবরাহ হয়—সে বেশ কষ্টকর ব্যাপার।

Stationএ নেমে দেখা গেল interview এর সময় বেশী নেই। হোটেলে ওঠার সঙ্কল্প ত্যাগ করে আমরা সবাই সোজা Arnold Meckelএর Bureauতে যাব বলে Taxiতে উঠলুম। ফরাসী দেশে, ফরাসী লোকেদের সঙ্গে ভাষা না জানার দরুণ বুঝাতে কোন অসুবিধা হলোনা কারণ মুশিও আস্ত্রিকের চিঠির খামখানা Taxi Driverকে দেখাতেই সে বুঝতে পাল্লে, কোথায় যেতে হবে।

প্রকাণ্ড বড় প্রাসাদ। সেখানে এসে গাড়ী থামল। Diver বাড়ীর নম্বর দেখিয়ে বল্লে, এই হচ্ছে ২৫২নং বাড়ী—ভিতরে গেলেই পাবে—তোমরা যাকে চাও।

তখনও খানিকটা সময় ছিল। কুমার সাহেব বল্লেন, একটা restaurantএ গিয়ে কিছু খেয়ে নিলে ভাল হ'ত। আমরাও রাজী। Restaurantএ খাসা মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা। তৎক্ষণাৎ হাত ব্যাগটা খুলে, কাপড় জামা ছেড়ে, রাত্রিজাগরণের ও ট্রেণে চলার ছাপটা মুখ থেকে সরিয়ে ফেলা হ'ল এবং কিছু খেয়ে ফিরে আসা গেল।

সা—পি থিয়েটার—ফটকের ভিতরে এসেই পড়লুম আমরা সুবৃহৎ একটী লবীতে। তার চারিদিকে ছোট ছোট ঘরে, নানালোকের বিভিন্ন অফিস। এক জায়গায় Meckel Bureau বলে আঙুল দেখান আছে, সেখানে গিয়েই, দেখি বাঁ দিকে সিঁড়ি—পাশেই Lift. প্যারীর বহু বাড়ীতে Automatic Lift আছে—নিজেই ওঠানামার জন্যে Switch use করতে হয়। গোলমাল ভেবে আমরা সিড়িদিয়ে উঠে দ্বিতলে আসতেই—গন্তব্য স্থানের সন্ধান পেলুম।

সামান্য একটা দরজার পাশেই লেখা—A. Meckel's Bureau. দরজায় নক্ কল্লাম। কে একজন ভেতর থেকে বলে উঠল, "আন্ট্রে"। তিনজনেই ভিতরে গেলাম। সাধারণ ঘর—চারিদিকে দেয়ালে ঝুলছে কয়েকটা ভাল Poster—কয়েকখানি সুশ্রী সুদর্শন ছবি স্তূপাকার করে পড়ে আছে কোণের দিকে ছাপা কাগজের তাড়া। এক দিকটায় দুটো Table, Office ঘরের মত সাজান। একটীতে বসে একটী অল্পবয়সী সুন্দরী—আর একটীতে বসে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মুখ তুলে প্রশ্ন কল্লেন কি চাই? চিঠি আছে বলে বার করে দিলাম। উঠে এসে চিঠিখানা নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বলে—কোনের একটী স্প্রিং এর দরজা খুলে ভিতরকার ঘরে গেলেন এবং ফিরে এসে আমাদের অপেক্ষা করতে বল্লেন।

ঘরে এমন কোন Extra Chair ছিল না যাতে আমরা সবাই বসতে পারি বা কুমার সাহেবকে বসাই। একবার ড্রয়ার, একবার Book case, একবার Souvenir Shelfএর দিকে দেখছি, এমন সময় ডাক এল—আমরা ভিতরে গেলাম।

আরো সাধারণ ঘর—কয়েকখানি বিশিষ্ট আর্টিষ্টের ছবি দেয়ালে টাঙান Secretariate Tableএর সামনেই বসেছিলেন, দাঁড়িয়ে উঠলেন একজন সুস্থকায় রাশিয়ান ভদ্রলোক, চশমাটা বাঁ হাতে নামিয়ে, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিতে আমি এগিয়ে গিয়ে করমর্দ্দন কল্লুম (কারণ চিঠিটাতে আমারই কথা লেখা ছিল) পরে কুমার সাহেব এবং তার পর হিমাংশুবাবু। ঘরে তিনখানি extra chair—আমরা বসলাম তাতে। পথের ধারে জানলার নীচে টেবিলে কিছু কাগজ-পত্র, বিবিধ মাসিকপত্রিকা, থিয়েটারের প্লান, কয়েকখানা ফটো, ২।৪ রকমের Souvenir তাতে রয়েছে।

দু'এক কথায় বুঝলাম ভদ্রলোক ইংরেজী বোঝেন কম, ফরাসী জানেন, আমরা তেমনি ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা জানিনে বল্লেই হয়।—তবুও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইতালিয়ন-ফরাসী ও তার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার ঠ্যাকা দিয়ে, আমার হাতের Newspaper cuttingএর বইটা ছিল, দিলুম, ও সেই সঙ্গে ছবির Album খানাও।

দু'তিন মিনিট পর প্রশ্ন কল্লেন আমাকে দেখিয়ে, You—Shanker—India.?

আমি প্রসন্ন হয়ে বল্লুম, "হ্যাঁ"

বিদেশী বুঝলেন আমার কথা। তারপর উঠে এক এক করে শান্তিনিকেতনের জন্য যে All India Tour arrange করেছি, শঙ্করের জন্য সেই প্রথম থেকে (অর্থাৎ ১৯২৯) ১৯৩৫ পর্য্যন্ত যা যা করেছি, গুরু লাম্বুদ্রিদল, বালা সরস্বতী, এনাক্ষী রমা রাও প্রভৃতির ছবি ও সংবাদ পত্রের তালিকা এক এক করে সব দেখালাম এবং সেই সঙ্গে কবির দেওয়া পত্রখানি ও ভারতীয় নানা সংবাদ পত্রের বিভিন্ন মতামতগুলি অল্প-বিস্তর বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করাতে ভদ্রলোক এইটুকু বুঝলেন যে আমি হয়ত বা এই লাইনের একটু important লোকই হব এবং আমারই হাতের সেরাইকেল্লারদল য়ুরোপে প্রথম এলেও, এদের ভিতর অভিনবত্ব কিছু থাকতে পারে। অভয় দিলেন—সেরাই-কেল্লা দলকে তিনি নেবেন। ইতিমধ্যে একজন ইংরাজী জানা ভদ্রলোক এলেন এবং কথাবার্ত্তার সুবিধা হ'ল।

এইবার রুষদেশবাসী ব্যবসার কথা পাড়লেন এবং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর বন্ধুর মারফৎ:—

"আমরা বড় Expensive Impresario. তবে আমরা হচ্ছি Best. যদি নাম ও ইজ্জৎকে বড় করিতে চাও—অর্থের ব্যবস্থা করে আমাদের কাছে এসো—অর্থের টানাটানি থাকলে—নাম বলে দিচ্ছি ৩।৪ জনের—তাদের কাছে যাও—তারাও ভাল Impresario." এই বলে কটী নাম কল্লেন।

কুমারসাহেব উত্তর দিলেন, "আমরা ভাল Impresario দ্বারাই Placed হতে চাই—কত পয়সার আবশ্যক হবে শুনতে পেলে ভাল হ'ত।"

অত্যন্ত কম হেসে চিন্তান্বিত ভাবে রুশ-ভাষায় যা বল্লেন—অপর ব্যক্তি তার তর্জ্জমা করে দিলেন, "আমাদের হাত দিয়ে প্যারীতে প্রথম শো'এ placed হতে হলে এবং য়ুরোপের জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা করিতে হলে, এক লক্ষ Franc খরচ কর্ত্তে হবে। যদি এ টাকা তোমাদের থাকে—কাল দুপুরে এস—কথা কইব।"

বিদেশীর এই গম্ভীর কথায় মাথা আমাদের ভারী হয়ে উঠল—বলে কি! একলক্ষ ফ্রাঙ্ক খরচ করে এদের কাছে আসতে হবে। য়ুরোপ আসতে—ভারতবর্ষ থেকে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরুতে তখন পর্য্যন্ত আমাদের খরচ হয়েছিল প্রায় ৩৫,০০০৲ টাকা। সে কথা বল্লুম তাঁকে, যে একটা দল নিয়ে ৩৫,০০০৲ টাকা খরচ করে তোমার দেশে এসেছি, এখন আবার একলক্ষ ফ্রাঙ্ক তোমাকে দিতে হবে সেলামী—তবে তুমি আমাদের স্পর্শ করবে?

কলম নামিয়ে রেখে, চোখ থেকে চশমা সরিয়ে—একটু হেসে ভদ্রলোক বল্লেন, "তোমরা নবাগত, জান না। উদয়শঙ্কর কত বড় আর্টিষ্ট, আর তাঁর এখানে এত নাম—তাঁর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিলাম জানো?"

ব্যাপার বেগতিক দেখে কুমারসাহেব বল্লেন, "আমরা Niceএ যাচ্ছি—কালকে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। তা'ছাড়া আমাদের দেশে তার করে জানতে হবে, এতটাকা সেলামী দিয়ে এ-কাজে নামা, আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে কি না—কারণ আমাদের Principal ভারতেই আছেন।"

"বেশ, তার করে শুভ-জবাব পেলে আমাদের খবর দেবেন"—এই বলে Good Bye কল্লেন। এবং আবার কি ভেবে বল্লেন, কি কি বাবদ একলক্ষ ফ্রাঙ্ক চাইছি, তার একটা খসড়া হিসেব নিয়ে যান আপনারা। মাত্র প্যারীতে শো'এর ব্যবস্থা করতে হলে;—

১। ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক - লাগবে অফিসের খরচ

২। ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক—Publicity and Propaganda.

৩। ১৫,০০০ ঐ—বুকলেট, সুভেনীর

৪। ১০,০০০ ঐ—তিন রাতের হল ভাড়া

৫। ৫,০০০ ঐ—Leaflets.

৬। ১০,০০০ ঐ—Poster.

৭। ১০,০০০ ঐ—হাতে রাখব, যদি দরকার হয়। তোমাদের কাছে টাকা না থাকে—কোনদিন…। এই টাকা আমাদের অফিসে জমা দিলে কাজে হাত দেব এবং তোমাদের জন্য কাগজওয়ালাদের সঙ্গে কথা কইব। অবশ্য ধরে নিচ্ছি, তোমাদের দেশের সংবাদ-পত্র তোমাদের নাচ সম্বন্ধে যখন এত ভাল লিখেছে এবং হরেন ঘোষের সঙ্গে যখন এসেছ—তখন তোমাদের দলটা ভাল এবং শিল্পীরা গুণী।"

"এই টাকা জমা দেওয়া ছাড়া আমাদের সঙ্গে Contract সই করতে হবে যে আগামি দুবছরের মধ্যে অন্য কোন Impresarioর কাছে তোমরা যাবে না, গেলেও আমরা তোমাদের সমস্ত আয়ের ওপর অর্থাৎ এই দুবছরের যে Takings হবে তার ওপর ২০% করে কমিশন নেব।"

ভদ্রলোকদের এত মিষ্টি কথা শুনে আমি বলতে বাধ্য হলাম, "আপনারা কি নেবেন তা পরিস্কার বুঝতে পেরেছি, এখন আমরা কি পাব, সেটা বুঝিয়ে দেবেন একটু?"

"গ্যারান্টি বলে কোন কিছু লিখে দেব না নিশ্চয়, তবে আমরা চেষ্টা কল্লে টাকার জন্য ভাবনা থাকবে না তোমাদের। শো'টা যদি এ দেশের লোকের মনের মত হয়।"

আমি বল্লুম, "গ্যারান্টি দরকার হবে না দেবার, তবে যাতে গোটা ২০ engagement মাসে হয়, তার ব্যবস্থা করে দিতে পার্বেন?

বুদ্ধিমান Impresario মুচকে হাসলেন আমার কথায়, তারপর বল্লেন, "তুমিও বিচক্ষণ লোক, এ কাজ করেছও অনেক, তুমি হলে কি এরকম ধারা গ্যারান্টি একটা দিতে পার্ত্তে? না দেওয়া উচিত হত?"

আমি বল্লুম, "কতগুলো শো হবে তাও জানব না—কত টাকা পাব তারও ঠিক নেই অথচ ঘরের টাকা অতগুলো এনে তোমাদের হাতে দেব—এটা কি ঠিক ব্যবসার কথা হ'ল-একটু Give and Takeএর নমুনা থাকলে ভাল হ'ত না?"

বিদেশী দুজনই তখন বুঝতে পাল্লেন যে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ঘড়ি দেখেই জবাব দিলেন যে, কাজ আছে—উঠতে হবে"…।

Arnold Meckel Bureauর through দিয়ে কোন নূতন artistকে সাধারণের কাছে পৌছতে হলে—যে টাকা তাঁরা চেয়েছেন তার কমে কাজ হওয়া অসম্ভব। দরদস্তুর কর্ত্তে হলে—অন্য Impresarioর নামত দিয়েই দিয়েছেন।

ফরাসী দেশে রাশিয়ান ব্যবসার ধরণটা মনের মত হয়নি বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা যা কল্লেন এবং আর্টিষ্টের দল যা দেখালেন তাতে এই জ্ঞান হয়েছে যে Impresario হয়ে বাঁচতে হলে—ওই রকম ব্যবসাই তাঁদের বাঁচবার পক্ষে একমাত্র উপায়। এইখানে বলা আবশ্যক যে Arnold Meckel Agency, সেরাই-কেল্লার জন্য যে propaganda ও publicity—Londonএর মত যায়গায় করেছে—বেশ কিছুদিন লাগবে ওদেশের লোকের তা ভুলতে।

বাংলা ছবির গলদ কোথায়

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া

আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করবার আগেই আপনাদের একটা কথা বলে নিতে চাই। কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ আমার ওপর ভার পড়েছে—দেশী ছবির দোষের কথা বলতে—বিশেষ ক'রে পরিচালনার দিক দিয়ে। আর পরিচালনার ভুল সব বলতে যাওয়া মানে নিজের ভুলগুলো বলা—কোথায় আপনাদের কাছ থেকে আমাদের ভুল ত্রুটীর কথা শুনবো, না উলটে আমাকেই আমাদের ভুল সব দেখিয়ে দিতে হবে।—কি মুস্কিলে পড়েছি বলুন ত?

তাছাড়া ভুলের কথাই যদি তোলেন—তা'হ'লে ভুলের ত' আর অন্ত নেই। একে নতুন industry—এখনও আমাদের লোকের cinema গঠনটা আয়ত্ব করতে অনেক বাকী। ছবি কর্ত্তে গিয়ে সাপ গড়ছি কি ব্যাং গড়ছি তা বোঝাই মুস্কিল—হ্যাঁ—সত্যি—হলপ করে আমি বল্‌তে পারি যে আমাদের এই পরিচালকদের মধ্যে খুব কমই আছেন যিনি ছবি তৈরি করবার সময় জোর গলায় বলতে পারেন যে এছবি চলবেই। বিশ্বাস হচ্ছে না ত? এই দেখুন—আমাদের কোথাও যেন একটা মস্ত ভুল আছে যার জন্যে আমরা ছবি release না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝতে পারি না যে, সে ছবি দর্শকদের মনোমত হবে কি না? এই হচ্ছে ১ নং গলদ আর এ ভুল কেন হয় জানেন?—জানেন না—এই ভুলের কারণ হচ্ছে দর্শকদের—মানে আপনাদের পছন্দ অপছন্দ জানবার অভাব। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই আপনাদের—

এই ধরুন, এক বাটী ডাল রাঁধতে হবে—আমি হয়ত খুব ঝাল খাই—তাই তাতে প্রায়—এই—ধরুণ গোটা পনেরো লঙ্কা—হু?—দাঁড়ান ভুল বললুম বুঝি—এক বাটী ডাল রাধতে কটা লঙ্কা দিতে হবে—আমি—আমি কটা বলেছি?—পনেরোটা—সে, থাক্‌গে—না; ডাল রাধা আমার কাজ নয়—কাজেই এতে ভুল বললেও আপনারা কিছু বল্‌তে পারবেন না। সে যাক্—কি বলছিলাম—ওঃ—হ্যাঁ—ধরুন আমার যা ধারণা সেই নিয়ে যদি আমি ডাল রাধতে বসি—তা' হ'লে আপনাদের খাওয়া যা হবে বুঝতে পাচ্ছেন ত'? আমাকে দেখতে হবে যে আপনাদের কি পছন্দ সেইটে ভাল করে আগে বুঝতে হবে। সেই মত রান্না কর্ত্তে পারলে তবে ত' আপনাদের ভাল লাগবে। এই আপনাদের পছন্দ—অপছন্দ—এইটে সারাক্ষণ মনে রেখে যদি আমরা ছবি তৈরি করি তা' হ'লেই সেই ছবি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারে। এই পছন্দ-অপছন্দ আপনাদের—এটাও আবার ঘন ঘন বদলে যায় তা জানেন ত'—হ্যাঁ বদলান—সেই কখন, কিরকম, আপনাদের মানসিক অবস্থা সেইটেরও খোঁজ রাখতে হয়। এইটে আমরা সবসময় পেরে উঠি না—এইটে আমাদের প্রথম নম্বর ভুল—বা দোষ—যাই বলুন॥

দিশী ছবিতে আরও একটা ভুল যা প্রায়ই সবাই বলেন যে আছে—সেটা হচ্ছে-গল্প বলবার ক্ষমতার অভাব।—মানে গল্প জমাবার অভাব। জানেন ত? আপনাদের অনেকেই আছেন—যাঁরা একটা গল্প গুছিয়ে বলতে পারেন না—গল্প বলতে আরম্ভ করলেই আর সবাই পালাই পালাই করতে থাকে না—না—আপনাকে বলছি না—আপনি জানেন নিশ্চয়ই কারণ আপনিও বলে থাকেন—"উঃ—ঐ লোকটা কি বকে!"—সেই—সেই—তেমনি—একটা ভাল গল্পও খারাপ পরিচালনায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে লোকে পালাতে পারলে বাঁচে।—

মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা—

"এক যে ছিল রাজা—"এই ব'লে ঠাকু'মা গল্প বলতে সুরু করলেন আর অমনি নাতি-নাতনীরদল এসে জুটলো—তাদের চোখের সামনে তারপর—'পক্ষীরাজ ঘোড়া'—"স্বপনদেশের রাজকুমারী"—কত সব ভেসে আসে। ঠাকুমা গল্প বলতে জানে—নাতি-নাতনীরা নিথর হ'য়ে গল্প শোনে।—ঠাকুমা যদি আরম্ভ কর্ত্ত—"ওহে পৌত্র-পৌত্রীগণ—এইবার তোমরা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর আমি তোমাদের কাছে গল্প বলিব—" —ওঃ—এতক্ষণ দেখতেন ঘরখালি—সব পালিয়েছে।—গল্প জমাবার কায়দা জান্‌তে হয়।

ছবির পরিচালনাও ঠিক তাই—ভাল ক'রে জমিয়ে গল্প বলা—। এরও একটা ধারা আছে। আজে বাজে বকলে যেমন গল্প জমে না—তেমনি ছবিতে অনাবশ্যক কতকগুলো জিনিষের সৃষ্টি করলে সে ছবি ভাল লাগেনা।—ছবিতে অবান্তর জিনিষের স্থান একেবারেই-নেই।—থাকবে কি করে? ধরুণ দুই বন্ধু—একজনার ভালর জন্যে তার বন্ধু শেষে প্রাণ দেবেন—এই হচ্ছে—ধরুণ—গল্পের পরিণতি। তাতে ধরুন একটা ঘটনা আছে যে—বন্ধু না জেনে একটা বিপদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—। এখন এই অবস্থায় আমি যদি বলতে বসি যে বন্ধু ছেলেবেলা ভালকরে লেখাপড়া করেনি—কাজেই তার

বুদ্ধি কম—কাজেই সে বুঝতে পারছে না —তার সুমুখে বিপদ। আর তাই প্রমাণ কর্ত্তে গিয়ে ছেলেবেলার সব ঘটনা দেখাতে আরম্ভ করি তাহ'লে আপনারা কি বলবেন? বলবেন—"দূর ছাই! ওর যে বুদ্ধিকম তা' ত' জানি—এমন বিপদে পড়লে কি হবে তাই দেখাও—তানা—ছেলেবেলার কাহিনী বলতে আরম্ভ করলে—।" ফলে—আপনার বিরক্ত এলো। এই রকম বহু অবান্তরতা আমাদের ছবিতে থেকে যায়। তাতে অযথা ছবির দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়—।

এই অযথা দৈর্ঘ্য নিয়ে কত যে আলোচনা হয় তা আপনাদের কি বল্‌বো। অনেকে বলেন যে আমাদের দর্শকদের বুদ্ধি কম তাঁরা বোকা—সামান্য জিনিষ বুঝতে তাদের অনেক দেরী হয়—এই দেখুন চটে গেলেন ত? দাঁড়ান ভাল ক'রে জিনিষটা বুঝুন তারপর রাগ করবেন। আর আপনাকেত বলা হচ্ছে না যে আপনার বুদ্ধি কম। সে যাক্ মোটকথা অনেকের মত যে চার আনার' দর্শক যাঁরা, যাঁদের পয়সায় সবচেয়ে বেশী আয় আসে-তাদের বোঝবার জন্যে ভাল করে—অনেক বেশী করে বুঝিয়ে সব বলতে হয়। ফলে হয় কি জানেন? যাঁরা এই ধারণা নিয়ে 'অ আ ক খ' থেকে বোঝাতে আরম্ভ করেন তাঁদের ছবির দৈর্ঘ্য বেশী হয়ে যায়। লোকের ভাল লাগে না। এই যে ঠিক কতকটা বললে বা দেখালে সর্ব্বসাধারণ ছবির গল্পটা বুঝে চলতে পারবে এইটে ঠিক করাই সব চেয়ে শক্ত কাজ। আর এইটের ভুলই আমাদের সব চেয়ে বেশী হয়। আচ্ছা—এই বার একটী বাংলা ছবিতে গিয়ে দেখবেন যে তা থেকে কতটা কেটে বাদ দিলেও ক্ষতি হয় না—নিজেরাই মিলিয়ে নেবেন—কি বলেন?

দেখুন আমার উদাহরণ দেবার উপায় নেই—বলবার উপায় নেই যে ঐ ছবিতে ঐ জিনিষটা খারাপ। জানেন ত? আমরা বড় আত্মাভিমানী। আমাদের দোষ শুনতে খারাপ লাগে—সহ্য হয় না। আপনাদের যে ছবি থেকে উদাহরণ দেবো তার উপায় নেই। তা যদি থাক্‌তো তাহ'লে অনেক দোষ দেখিয়ে দিতাম। যদি বলেন—যে তোমার ছবির দোষগুলো দেখিয়ে বল না কেন—তা'হলে আমি বলি যে সত্যি কথা বলতে কি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। নিজে যদি বুঝতেই পারতাম তা হ'লে সে সব ভুল কি করতাম।

হ্যাঁ—আরও একটা দোষ মনে পড়ে গেলো। সেটা হচ্ছে নতুনত্বের অভাব। একটা জিনিষের অনেক দিক থাকে তার একটা নতুন দিক দেখাবার অভাব। এই ধরুণ চাঁদ ওঠে—আমাদের বাড়ীতে কটা বড় বড় গাছ আছে। ছাত ছাড়িয়ে উঠেছে—চাঁদ এমনি শূন্য আকাশেও ওঠে আবার একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখি যে গাছের পাতার ফাকে ফাঁকে চাঁদ ওঠে! ফাঁকা আকাশে চাঁদ তার চেয়ে পাতার ফাঁকে চাঁদ দেখার মধ্যে আনন্দ বেশী আসে—তাই না—এই যে একটু সরে দেখা সেই চাঁদ দেখলাম—তবে পাতার ফাঁকে ফাঁকে একটু সরে দাঁড়িয়ে এই সরিয়ে দাঁড় করানো এইটেই হচ্ছে পরিচালকের প্রধান কাজ। এই ভালভাবে একটা জিনিষকে দেখানো এরও অভাব আমাদের অনেক আছে।

বিলেতে থাকতে একজন খুব বড় পরিচালকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি বলেছিলেন যে সব জিনিষরই একটা সৌন্দর্য্য আছে—তবে সেটা দেখতে এবং দেখাতে জানতে হয়।—সেইখানেই পরিচালনার ভালমন্দ। সংসারের সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপার থেকেও এমন সব জিনিষ খুজে বার ক'রে ছবিতে দেখান যায় যে হঠাৎ কারও নজরে পড়ে না। অনেক বাড়ী থেকে স্ত্রীকন্যা ছেড়ে লোকে চাকরী কর্ত্তে যায় তবে 'যেতে নাহি দিব" এক রবীন্দ্রনাথই লিখতে পেরেছেন।

আচ্ছা আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি প্রায় হয়ে এসেছে না? আমি পারছি না ত—বক্তৃতা জমাতে? আমি জানি আপনারা খুব চটে যাচ্ছেন কিন্তু কি করবো বলুন—আমায় আর কিছুক্ষণ বকতে হবে। তবে খালি দোষগুলো আর বলবো না—কারণ কতকগুলো দোষ যা পরিচালকদের ওপর এসে পড়ে তার জন্যে পরিচালকরা সব সময়ে দায়ী নন্ তা জানেন ত? একটা ছবি করতে হলে কত রকম অসুবিধে আর কষ্টের মাঝখান দিয়ে অনেক সময়ে কাজ করতে হয় তা আপনারা ধারণা করতে পারেন না। পরিচালকদের অনেকে সেই সব অসুবিধের ভেতর পড়ে নিজেদের ইচ্ছে বা ক্ষমতা থাকলেও কিছু করে উঠ্‌তে পারেন না।—এর চেয়ে বেশী বল্‌লে আমাকে উদাহরণ দিতে হয়—আর তা আমি কেন দিতে পারছি না—তা ত' বুঝতেই পারেন।

হ্যাঁ—শেষ করবার আগে আপনাদের একটী ফর্দ্দ শোনাই দাঁড়ান, মানে—পরিচালকদের কি কি গুণ থাকা দরকার, তার ফর্দ্দ। তাহলেই বুঝবেন যে পরিচালকদের দোষ কতখানি।

প্রথম নম্বর:—তিনি হবেন মনবিজ্ঞানের পণ্ডিত। তাঁর লেখাপড়া খুব ভালভাবে জানা থাক্‌বে। Philosophy, Literature, Psycology এই তিনটেতে তিনি হবেন পণ্ডিত।

২য় :—তাঁর সঙ্গীত শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে।

৩য় :—তিনি ভাল ক্যামেরাম্যান হবেন কারণ ছবি তুলতে না জানলে তার ফলাফল বুঝবেন কি ক'রে?

৪র্থ—সাউণ্ড মানে শব্দ তোলার যে যন্ত্র আছে তাঁর সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে, তা না হ'লে তিনি Scenario ঠিক ক'রে লিখবেন কি করে!

৫ম—আর্টের সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে।

৬ষ্ঠ—দেশের জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে—হ্যাঁ দেখুন মোটকথা প্রায় সবই তাঁর জানতে হবে—দু'একটী জিনিষ বাদে এখন বুঝতেই তো পার্চ্ছেন যে পরিচালকদের দোষ কত সহজেই আসতে পারে। আপনারা হয়ত ভাববেন যে আমি পরিচালক ব'লে তাঁদের হয়ে দোহাই দিচ্ছি—মোটেই না। সত্যি এই সব জানলে তবে ভরসা ক'রে বলা যায় যে, আমি একজন বড় গোছের পরিচালক যে আমার ছবি সবাই পছন্দ করবে।

আজ দোষ-ত্রুটিই বলে গেলাম, দোষ ত' কারও ভাল লাগে না—তাই আপনাদেরও ভাল লাগেনি নিশ্চয়ই। আবার যদি সুযোগ হয়—

আধুনিক শবরীর প্রতীক্ষা

মন্টুরাণী ঘোষ বি-এ

লেখিকা

কৈশোর কুসুমকলি মুকুলিত যবে,
বসন্তে ডাকিয়া আনে কোকিলের র'বে
সেই সে সেদিন হ'তে অতি সযতনে
সাজানু নিজেরে কত নানা আভরণে
স্বপনের মায়া ঘেরা কোন আঙ্গিনায়
সমর্পিতে কারে আজি রহি প্রতীক্ষায়—

দিন বাহি রাত্রি বাহি বর্ষ গেল চলি
ধীরে ধীরে বিকশিত যৌবনের কলি
আশার স্বপনে রহি 'শবরী'র মত,
বাঙ্গলার 'আধুনিকা' 'টয়লেটে' রত;
প্রজাপতি আপিসেতে দিতে নিজে ডালি
সাজায়ে রেখেছি দেহ নৈবদ্যের থালি।
'লিপষ্টিক' আর 'রুজে' আঁকিয়াছে রেখা
রিমলেশ চশমাতে তবে যায় দেখা
শিথিল কবরীখানি আবেশিয়া লোটে
কবিয়ানা উচ্ছ্বাসে আলোড়িয়া ওঠে—
ক্ষীণ তনু তরঙ্গিয়া ছন্দেরি তালে
স্বপনেরি জাল বুনি হেদুয়ারি কূলে।

* * *

ভালেতে পড়িতে গেনু ডিগ্রীর ফোঁটা
সময় বহিল তাতে যৌবনের গোটা
প্রবেশিকা দিয়েছিনু বসন্তের বায়ে,
তরুণ অরুণ প্রাতে শ্যামলিমা ছায়ে;
বি-এ, এম্-এ, আর যত সবে গেল চলি
নিবেদিয়া ভারতীরে যৌবনের থালি
আসিলনা কেহ কভু আঙ্গিনার দ্বারে
আধুনিক যুগের এই শবরীর তরে
সাজান জীবনডালা বিফলে শুকায়
আশার স্বপন মায়া সকলি মিলায়।

* * *

আই-সি-এস্, বি-সি-এস্; ভেবেছিনু যাহা
আজ দেখি সবি মিছে সব ফাঁকা মায়া
নিঠুর কঠোর অতি নব ধরাধাম,
'শবরী'রে উদ্ধারিতে নাহি কোন 'রাম';
কেরানীর কুল এবে তাও গেল সরি
ডিগ্রীর ঘটা হেরি ত্রাহি ডাক ছাড়ি—
হায় হায় শেষে কি গো এই ছিল ভালে
অনাদরে ঝরি বুঝি টাকুরের কোলে।

ছায়ার প্রগতি

লীলা দেশাই

ছায়ার মায়া কাটিয়ে তোলা যে কি কষ্টকর, বিশেষ আজকালকার দিনে, তা আর বলবার নয়। চলচ্চিত্র, তারপরে সবাক-চিত্র এদেশে এসে হানা দিল, এসে অতি সহজেই এদেশের লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেললো। এই প্রভাব আজকাল এমন স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, বায়স্কোপ দেখাটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যার পর আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের মনেই যেন একটা চঞ্চলতার তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়ে যায়—"আজকে একটা বায়স্কোপ দেখে এলে হয় না?" মাতব্বর প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের একটু ভেবেচিন্তে বেরুতে হয়—হয়তো সেইদিন সকালেই তাঁরা তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কাছে বায়স্কোপ দেখার বিরুদ্ধে খুব বড় রকমের এক লেকচার্ দিয়েছেন। কলেজের ছাত্রদের এ বালাই নেই—পকেটে পয়সা থাকলেই হ'ল। সমস্ত দিন তুমুল আলোচনার ফলে কে কোথায় যাবে তা আগেই স্থির হয়ে আছে, সন্ধ্যার পর শুধু পকেটে কিছু পয়সা নিয়ে বেরিয়ে পড়া, তারপর বায়স্কোপে গিয়ে টিকিট কিনে ভেতরে গিয়ে বসে প্রসন্নমনে একটি সিগারেট ধরান। মহিলা ছাত্রীদের মধ্যেও এরকম আলোচনার অন্ত নেই, তবে এই ক্ষেত্রে আলোচনার ভাগটাই বেশী। যাই হোক, এইভাবে সবাকচিত্রের প্রায় সমস্ত রসটুকু নিংড়ে নেবার সুযোগ শুধু বৃদ্ধ, প্রৌঢ় এবং যুবকেরাই পেয়ে থাকেন, বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারাও এর একটু ভাগ পান, অবশিষ্ট যা থাকে, সেটুকুই শুধু বালক-বালিকাদের কপালে জোটে। এই অবস্থায় তাদের মনের ভাব অনুমান করা কিছুই শক্ত নয়—তাদের মুখের ভাবটা কি রকম হয়, সেটা ধারণা করে নেবার ভার পাঠকদের উপরই রইল।

লেখিকা

এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ কি? অনেকগুলি কারণের মধ্যে এর প্রবল একটি কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে Educational film অথবা বালক-বালিকাদের উপযোগী filmএর একান্ত অভাব। যে সমস্ত গল্প আমাদের দেশের film-producerরা করেন তার অধিকাংশই সামাজিক গল্প, সেগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখাবার আদৌ উপযোগী নয়। কাজেই, ছেলেমেয়েদের যদি বায়স্কোপ দেখাতে হয়, তবে ইংরাজি ছবি ছাড়া আর তাদের দেখাবার মত কিছু নেই, ধরুন যেমন্ চার্লি চ্যাপলিনের কোন হাস্যোদ্দীপক ছবি অথবা হ্যারল্ড লয়েড, অথবা বাষ্টার কিটন্ ইত্যাদির। এই সমস্ত বই দেখে যেমন ছেলে মেয়েরা আনন্দ পায়, তেমনি বড়রাও দেখে দুদণ্ড হেসে বাঁচেন, দুদণ্ড সংসারের দুঃসহ নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পান। কিন্তু এ বিষয়ে একটি মুস্কিল হচ্ছে এই যে—বেচারী ছেলেমেয়েরা অনেক জায়গায় এই সব ইংরাজী ছবির কথাগুলো বুঝতে পারে না।

বিলেত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এই সব বিষয়ে খুব উন্নত। তারা filmএর Commercial Valueটা কমায় নি, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই filmএর educational valueটা বাড়িয়ে তুলেছে—তারা তাদের filmএর মধ্যে এই দুটি জিনিষের সামঞ্জস্য রেখে তাদের film industryটাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে; কিন্তু আমাদের দেশে এই জিনিষটার এখনও একান্ত অভাব। আমাদের দেশের film industry অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে; techniqueএর দিক দিয়ে আমাদের দেশের বইগুলি অনেকাংশে অনেক বিদেশী বইয়ের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে সত্যি, কিন্তু তবুও বল্‌তে হবে যে সর্ব্বাঙ্গীন্ পূর্ণতা আমাদের এখনও আসেনি—অবশ্যি তার যথেষ্ট কারণ আছে, এটা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমাদের দেশে film industry অন্যান্য দেশের অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের স্বীকার করতে হবে—আমাদের দেশের film industry অতীতে অতি দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, বর্ত্তমানেও হচ্ছে, এবং আশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও এর এই দ্রুত গতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বাংলা ফিল্‌ম সম্বন্ধে দু'চারটি কথা

ইন্দিরা রায়

আজ্‌কে অতি সহজেই এই প্রশ্নটা করা চলতে পারে, ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েরা ফিল্‌মে যোগ দেবে কিনা ?

ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়েদের ফিল্‌মে যোগ দেওয়ার পথে অন্তরায়ের অন্ত নেই আর, না যোগ দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তিরও অন্ত নেই। প্রথমেই কথা আসে, আমাদের এই রক্ষণশীল (conservative) দেশে সেটা সম্ভব কিনা ?

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, এটা কিছুতেই সম্ভব হত না—আর পঞ্চাশ বছর আগে। কিন্তু আজ সে রক্ষণশীলতার বাঁধ ভেঙ্গেছে এবং ক্রমশই ভাঙ্গছে। যখন ভাঙ্গন ধরেছে তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়ুক। যাকে আমরা এতদিন চাপাচুপি দিয়ে রেখেছিলুম তারই reaction আজ দেখা দিচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে আগেকার সমাজ ব্যবস্থার ওপর আমরা খুশী হতে পারিনি, গলদ তার মধ্যে ছিল আর সেই গুলোই আমাদের এখনকারকালের সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী করে তুলেছে। আমি বলব, যা ভাঙ্গছে তাকে ভাঙ্গতে দেওয়া হোক্—ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে যাক আবার গড়ে উঠুক নতুন করে—আমরা backward হ'ব না—time spiritকে বজায় রেখে আমাদের চলতেই হবে।

তারপর কথা আসে—ভদ্রঘরের মেয়েরা এটাকে তাদের profession করে নিতে পারে কিনা ? Profession আমি বলতে চাই এই কারণে যে, শুধু খেয়াল বা সখ বলে কোন artকে নিলে—সেটা শুধু সেই আর্টের সঙ্গে flirt করাই হয়—সেটার আর উন্নতি হয় না, তার perfection তো দূরের কথা।

কিন্তু কেন ভদ্রঘরের মেয়েরা এটাকে তাদের Profession করে নেবে না—এর যথাযথ শিক্ষা তাদের নিতে হবে—এর জন্যে তাদের রীতিমত সংযমী হতে হবে, এককথায় এটাকে তাদের একটা আর্ট বলে গ্রহণ করতে হবে। তবে তার মধ্যেও একটা কথা আসে যে, ভদ্রঘরের মেয়েদের ছবিতে অনেক ভূমিকায়, অনেক দৃশ্যে আমাদের জনসমাজ মেনে নিতে চাইবে না সেটা তাদের এতদিনের সংস্কারে বাঁধবে। কিন্তু সংস্কারটা চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল—আজ যেটা তাদের বিসদৃশ ঠেকছে সেটা আর কিছুদিন বাদে লাগবে না। যারা প্রথমে এই সংস্কারে ঘা দেবে—তাদের হয়তো একটু সহ্য করতে হবে। কিন্তু সেটুকু সহ্য তাদের করতেই হবে এটা চিরন্তন—ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এর দৃষ্টান্তের অভাব হবে না; যারা আসবে তাদের এটাকে art বলে গ্রহণ করতে হবে—এটাকে তাদের Profession করে নিতে হবে। আর্টের Sakeএ তাদের এটুকু সহ্য করতেই হবে—মনে তাদের সেটুকু উদারতা থাকা দরকার, সেটুকু মনের বল থাকা দরকার।

তারপর আর একটা প্রশ্ন আসে যে, এই ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানগুলো ভদ্রঘরের মেয়েদের উপযোগী কিনা—সেখানে তারা ভদ্রব্যবহার পাবে কিনা ?

আমাদের দেশের এই ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানগুলি, সত্যি কথা বলতে গেলে, এখনও যথেষ্ট ভদ্র নয়। এখন এগুলো অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষিত কর্ত্তৃপক্ষের হাতে রয়েছে—তারাই এগুলোকে চালায়, তত্ত্বাবধানের ভার তাদের ওপর। কাজেই অনেকক্ষেত্রে এই ফিল্‌ম প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ থেকে ভদ্রব্যবহার পাওয়া যায় না। সেগুলোর দিকে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। আর সে সতর্কতার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষদের জানানো দরকার যে, যথেষ্ট ভদ্র হতে না পারলে—লোকসান তাদেরই। কেননা এমন একটা দিন এসেছে, যে, এখন জনসাধারণ আর কোন চরিত্রের অর্থহীন অভিনয় দেখতে চায় না। যারা অশিক্ষিত, তাদের পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, কোন চরিত্র বোঝা, কাজেই সবক্ষেত্রেই তাদের অভিনয় সেই এক—চরিত্র ফুটে ওঠে না অভিনয় অর্থহীন হয়ে পড়ে—দর্শকের সংখ্যাও কমতে থাকে, দর্শকেরা ক্রমেই বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে—দেশী ছবির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছোটে বিদেশী ছবি দেখতে। কিন্তু এটা খুবই সত্যিকথা যে, আমাদের দেশীছবি যদি নিখুঁত হয় সবদিক থেকে, তাহলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই দেশী ছবির মধ্যে বিদেশী ভাষা—বিদেশী আচার পদ্ধতির চেয়ে দেশীছবিই বেশী পছন্দ করবে। তারা এর মধ্যে যেন নিজেদের দেখতে পাবে বিভিন্ন রূপে—নানা অবস্থায়। এই থেকে ক্রমে জনসাধারণের শিক্ষা লাভ হবে, অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারবে। আজকাল প্রায় অন্যসব দেশেই নাটক এবং ফিল্‌মকে জনসাধারণের শিক্ষার বাহন করে নিয়েছে। তারা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ছবি দেখিয়ে এবং অভিনয় করে দেশের অবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছে—তাতে শিক্ষার বেশ বিস্তার হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের সাড়া

পড়ে গেছে। তবে এ জিনিষ আমাদের দেশেই বা সম্ভব হবে না কেন।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আজকাল প্রায় সকলেই বুঝতে পারে যে আমাদের নিয়ে একটা মস্ত সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকার প্রতি মেয়েটীকে যথেষ্ট শিক্ষিত করতেই হবে—যে কোন উপায়েই হোক—আর সেই শিক্ষার পরিণতি—তাদের সৎপাত্রস্থ করা। কিন্তু আজকাল এমন অনেক মেয়ে দেখা যায় —যাদের বিয়ের বয়েস সত্যিই চলে গেছে। তাদের অবস্থা কি। তাদের জীবনটা, তাদেরই চোখের ওপর ব্যর্থ হতে চলেছে—আশা-ভরসা করবার মত কোন সম্বলই তাদের হয়তো থাকে না—তবুও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারওপর তাদের অনেককেই সংসার প্রতিপালন করতে হয়। হয়তো তাদের মধ্যে কেউ হচ্ছে শিক্ষয়িত্রী—আর কেউ হচ্ছে নার্স। কিন্তু তাতেও তাদের সকলকে উপজীবিকা দিতে পারছে না। নিরাশমনে দুঃস্থ অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনটা একটা মস্ত অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি বলি, তারা অনায়াসে ফিল্মে যোগ দিতে পারে—সৎউপায়ে জীবিকা-অর্জ্জন তাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। অন্তত তারা দুঃস্থতার হাত থেকে 'নিজেকে বাঁচিয়ে—স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

(কৌতুক-নাটিকা)

[গুরুদেব শিষ্যবাড়ী এসেছেন; সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য হারানিধি। গৃহিনী আস্‌বার সময় মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছেন, হারানিধিকে চোখের আড়াল কোরো না, ও থাক্‌লে তোমায় কুটো গাছটি ভেঙেও দু'খান করতে হ'বে না।

মাঘের সকাল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা। গুরুদেব খুব ভোরে উঠে ডাক্‌লেন:]

গুরুদেব॥ ওরে হারানিধি—ওঠ—ওঠ…

[হারানিধির কোন জবাব পাওয়া গেল না। সে পাশ ফিরে শুয়ে আবার নাক ডাকাতে লাগলো]

গুরুদেব

ব্যাটা ঘুম থেকে উঠতে চাইবে না! আর গিন্নি বলে দিলে কিনা, ও সঙ্গে থাক্‌লে কুটোগাছটিও ভেঙে দু'খান করতে হ'বে না! ভালো আপদে পড়া গেছে দেখছি! ওরে ও নবাব পুত্তুর—

[হারানিধির নাকের ডাক, আবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করলে]

গুরুদেব

নাঃ খামোখা ওর সঙ্গে চ্যাঁচামেচি করে সকাল বেলাটা নষ্ট করতে পারি নে! যাই পুকুর ঘাট থেকে আগে আহ্নিকটা সেরে আসি—জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং…

[আবৃত্তি করতে করতে প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে হারানিধি লেপের তলা থেকে নাকের ডগাটা বের করলে]

হারানিধি

বাবা! যা ঠাণ্ডা! এর ভেতর বেরুলে নির্ঘাৎ নিমুনিয়া! কথায় বলে, মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে! [গুণ গুণ করে গান]

ভজ মন লেপের তলায় জয়রামে…
কন্‌কণে শীতে মারবে ছোবল্ বাইরে যাবা
কোন্ কামে!

আজ গুরুজীর থাক্‌লে কৃপা
লেপের তলায় নিদ্রা দিবা—
খাও খিচুরী গরমা-গরম যদি রে ভাই
শীত থামে!

[বাইরে গুরুদেবের আবৃত্তি শোনা গেল—প্রণতস্মি দিবাকরম্। সঙ্গে সঙ্গে হারানিধি নাকটা লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিলে। গুরুদেবের প্রবেশ]

গুরুদেব

অ্যা! তুই এখনো উঠিসনি। আমি ভাবলাম, বুঝি সাজা তামাক পুড়ে যাচ্ছে। ওরে ও হারানিধি—ও আমার বাপের ঠাকুর—

[গা মোড়ামুড়ি দিলে যেন এই মাত্র ওর ঘুম ভাঙলো]

হারানিধি

[প্রথমে একটা হাই তুল্‌লো তারপর গোটা কয়েক তুড়ি দিয়ে]

দা ঠাকুর ডাক্‌ছ?

গুরুদেব

আজ্ঞে, ডাকছি না—মিনতি কচ্ছি—একবার দয়া করে উঠবে বাপধন—?

হারানিধি

কি বল্‌ব দা ঠাকুর, শরীরে যেন আর

কিছু নেই। কাল সারারাত পা কট্ কট্, মাথা ঝন্ ঝন্, দাঁত কড়মড়, বুক ধড়ফড়... গোটা রাত্তিরে দু' চোখের পাতা এক করতে পারিনি! এই ভোর বেলায় একটু ঘুমিয়ে ছিলুম — তোমার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল!

গুরুদেব

[সভয়ে] তাইত' রে। বলিস্ কি! তুই যে আমাকে ভয় লাগিয়ে দিলি!

হারানিধি

না—না, তুমি কিছু ভেবোনি দা ঠাকুর; উনুনটায় আগে আগুন দিয়ে ফেলো, তারপর যা করবার আমি করবো'খন!

গুরুদেব

[বিমর্ষ ভাবে] আচ্ছা, না হয় তাই করি—।

[উনুনে আগুন দিতে বস্‌লেন]

উঃ! ধোঁয়ায় চোখ দুটো একেবারে গেল!

[লেপের তলায় চাপা হাসি শোনা গেল]

গুরুদেব

ওকি রে হারানিধি···? ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌ছিস্ বুঝি?

হারানিধি

হাস্‌ছি আর কোথায় দা' ঠাকুর, কাল রাত থেকে ত' শুধু বিষমই খাচ্ছি—

গুরুদেব

যাক! কোনো রকমে ত' উনুন ধরানো হ'ল—এইবার বাসন গুলো—[হঠাৎ] একিরে হারানিধি তুই করেছিস কি?

হারানিধি

কি দা'ঠাকুর?

গুরুদেব

কাল রাত্তিরে যে খেয়েছিলাম সে এঁটো বাসনগুলো পর্য্যন্ত মাজিস্ নি?

হারানিধি

কি করবো দা'ঠাকুর, দেহটা সত্যি ভালো নেই! এ-বেলা তুমিই কোনো রকমে ধুয়ে নাও—ও-বেলা আর তোমায় কিছু দেখতে হ'বে না!

গুরুদেব

তাইত রে! তুই যে আমায় বড্ড ফ্যাসাদে ফেল্লি!

হারানিধি

[কাঁদ কাঁদ ভাবে] আমাতে কি আর আমি আছি দা'ঠাকুর! তোমায় নিজে হাতে কাজ করতে দেখছি আর আমার বুকের ভেতরটা পুড়ে কয়লা হয়ে যাচ্ছে।

গুরুদেব

পরবিই-নে যখন—যাই ঘাট থেকে বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসি—; বিদেশে বিভুঁয়ে এসে বড় মুস্কিলে পড়া গেল। গিন্নির কথা শুনেই যত অনাচ্ছিষ্টি হ'ল

[যেতে যেতে ফিরে]

দেখ, কোনো রকমে মশলাটা পিষে দে—আমি বাসন ধুয়ে এলুম বলে—

[প্রস্থান]

[হারানিধি মুখ বের করে]

হারানিধি

হ্যাঁ! বয়ে গেছে আমার মশলা পিষতে! রইলুম আমি এই মটকা মেরে পড়ে! যে কণকণে জল, মশলা বাটতে গেলে হাত শুদ্ধু জমে বরফ হয়ে যাবে।

[বাসন মেজে গুরুদেব এসে ঘরে ঢুকলেন]

গুরুদেব

এ কি রে! তুই এখনো লেপের তলায়! মশলা বাটা হ'বে কখন?

হারানিধি

উঠতেই ত' গিয়েছিলাম দা' ঠাকুর! কিন্তু পা' দুটোতে একেবারে জোর নেই। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। হাড়ে-হাড়ে সে কী ঝন্‌ঝনানি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হয়ত শব্দ শুন্‌তে পেতে!

গুরুদেব

[রাগিয়া] নাঃ, তুই আমায় একেবারে রাস্তায় বসিয়ে দিলি? মশলা না হলে আর কিই-বা রান্না হ'বে! দি ডালে-চালে চড়িয়ে—যে শীত খিচুরিটা খেতে ভালোই লাগ্‌বে—

[লেপের ভেতর হাসি শোনা গেল]

গুরুদেব

আবার হাস্‌ছিস্ হতভাগা?

হারানিধি

কৈ আর হাস্‌ছি দা'ঠাকুর! হাস্‌বার কি আর ক্ষমতা আছে! এত' শুধু খাবি খাচ্ছি!

গুরুদেব

এসেছি—শিষ্যবাড়ী কোথায় আরাম করে দু'দিন একটু খাবো দাবো না—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! চোখ গেল ধোঁয়ায়, ঠাণ্ডা কনকনে জলে বাসন মাজতে গিয়ে হাড়ে-হাড়ে কাঁপুনি! এখন আবার রান্না কি পদের হবে কে জানে! যাক্! খিচুড়িটা বেশ তাড়াতাড়িই নেমে গেছে—

[লেপ সরিয়ে হারানিধি উঁকি মেরে দেখলে]

—ওরে তোর ত' বড্ড অসুখ—তুই কি খিচুড়ি খাবি?

হারানিধি

[তড়াক করে উঠে বসে] দা'ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ—দেবতা! সেই ব্রাহ্মণের বাক্যি' বেদবাক্যি—একথা নাকি শাস্ত্রেই লেখা আছে। বেদবাক্যি আর কত লঙ্ঘন করবেন দেবতা! দাও চারটি খিচুড়ি, পেসাদ খেয়ে জীবন ধন্য করি—

—যবনিকা—

কিছুই হয়ত' না

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বি এন আর-এর একটি ছোট্ট ষ্টেশন—জগৎপুর।

সন্ধ্যা একটি ছেলেকে কোলে করিয়া আর একটি ছেলের হাত ধরিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে, দুধারের দুজন কুলী মাথায় মোট লইয়া, তাহাদের মনে ব্যস্ততার লেশ নাই, নিত্য কত যাত্রীকে পার করিতেছে, কিন্তু সুধীর যেমনি ভাবিতেছে, তেমনি সন্ধ্যা! এই নীচু প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে অন্ধকারে ছেলেপুলে লইয়া কি করিয়া নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে গাড়ীতে চড়া যাইবে! তাছাড়া, পুরী-এক্সপ্রেসের ভিড়, থামিবে মাত্র এক আধ মিনিট! ধাক্কাধাক্কি অপমান, গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়!

এক চক্ষু দৈত্যের মত সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলো ফেলিয়া কালো ইঞ্জিন গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসে, যন্ত্রদানবের প্রতীক। ভাবিবার সময় নাই, দেখিবার সময় নাই, সাম্নের থার্ড ক্লাস গাড়ীর দরজা তাড়াতাড়ি সুধীর খুলিয়া ফেলিল। 'আরে বাবু আরে' চীৎকারের মধ্যেই পোঁটলা পুঁটলীগুলা ঠেলিয়া দিয়া সন্ধ্যাকে চড়াইয়া দিল।

অসংখ্য যাত্রী দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যা উঠিতে উঠিতে বলে, কোথায় ঢুকব? লোক যে!

ঠেলে ঢোক, ট্রেণ ছেড়ে দিলে ব'লে—সুধীর স্ত্রীকে একরকম ঠেলিয়াই দেয়।

তোরঙ্গ এবং স্যুট্‌কেশ, বিছানা ও জলের কুজো কুলীরা পায়ের কাছে আগাইয়া দেয়, পয়সা দিতে দিতেই ট্রেণ ছাড়ে।

হাঁফ ছাড়িয়া সুধীর ফিরিয়া দেখে হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও উড়িয়ায় কামরা ভর্ত্তি। বাঙালী মহিলা দেখিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছে মাত্র, জায়গা ছাড়িয়া দিবার লক্ষণই নাই। ইহাদের চেয়ে বাঙালী ফাজিল ছোকরাগুলাও ভালো! সন্ধ্যাত' গিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রায় একজনের বুকের কাছে, উপায়ই বা কি?

কেহ সঙ্গীতলহরী তুলিয়াছে, অশ্লীল কিনা কে জানে, তাহাদের ভাইব্রাদাররা ত হাসিয়াই অস্থির! সারারাত এমনি দাঁড়াইয়া যাইতে হইলে হইয়াছে, আর কি? হাওড়ায় পৌঁছিয়া আবার শিয়ালদা হইতে গোয়ালন্দ, সেখান হইতে নারায়ণগঞ্জ, সেখান হইতে ঢাকা। ঢাকা হইতে আবার নৌকা, তবে তাহাদের দেশ! পথের কষ্টের শেষ নাই! সন্ধ্যার কিন্তু সত্যি কান্না পাইতেছিল, কুমারী অবস্থায় ধনী পিতার দুলালী সেকেণ্ড ক্লাস ছাড়া কখনো চড়ে নাই, তাও রিজার্ভড। সে রামও নাই অযোধ্যাও নাই, আজ দরিদ্র স্বামীর সঙ্গে পথ ভ্রমণের কষ্ট তাই সাধারণ মেয়ের চেয়ে বেশী করিয়াই লাগিতেছে। ইহাদের সঙ্গে কখনো কি সে গিয়াছে, কর্পোরেশনের কুলী, ধাঙড়, দর্জ্জি, ধোপা ও মিলহাওসের সঙ্গে? তাহার বামে ও পশ্চাতে একেবারে গা ঘেঁসিয়া যারা দাঁড়াইয়া আছে, হয়ত কাহাদের ড্রাইভার ও চাপরাশী, বিড়িওলা কিম্বা রিক্সওলা, যা খুসি হইতে পারে, কিন্তু গায়ের গন্ধ যে অসহ্য।

সুধীর তাহাকে বিছানার উপর বসাইবার ব্যবস্থা করিল, গরমে ঘামে ক্লান্তিতে ও অপমানে শিক্ষিত দম্পতির কি বিশ্রী লাগিতে লাগিল, বলিবার নয়। কে বলিবে এই মেয়েটিই একদিন সগৌরবে কলেজে পড়িয়াছে, এবং সুধীর ফার্ষ্ট-ক্লাস-ফার্ষ্ট সকল পরীক্ষায়? দারিদ্র্য ছাড়া আরত' তাহাদের কোনো অপরাধ নাই।

একটি ছোট ষ্টেশনে টিকিট চেকার উঠিল। সন্ধ্যা চিনিল তাহাদেরই কলেজের সতীর্থ অনিমেষ। অনিমেষের সঙ্গেই তার বিবাহ হইবার কথা ছিল কিন্তু সন্ধ্যার বাবা পশ্চিমবঙ্গের সহিত কারবার করিতে চাহেন নাই, বঙ্গজে বঙ্গজেই ভালো এই তাঁর ধারণা। অতি সহজেই বিবাহের কথা ভাঙিয়া যায়।

অনিমেষ সন্ধ্যার অসুবিধা এক পলকেই বুঝিয়া লইল, গুঁতা দিয়া আরামে শায়িত যাত্রীদলকে উঠাইয়া তাহার স্থান করিয়া দিল। বেশী পরিশ্রম করিতে হইল না, এক্সপ্রেসের টিকিট কামরার প্রায় তিনভাগ লোক কেনে নাই, প্যাসেঞ্জারের টিকিট লইয়াই উঠিয়াছে, তাছাড়া বিনামাশুলের বেয়ারিং যাত্রীও ছিল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী খালি করিয়া দিতেই একটুও দেরী হইল না। বাঙালীর অসম্মানের প্রতিশোধে দুএকটা লোককে দুচারটা চড়চাপড়ও বসাইয়া দিল।

এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে কত বড় উপকার যে করিল সে কথা সন্ধ্যার মত কেহই বোঝে নাই হয়ত অনিমেষও না। বিপুল কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টিকে লক্ষ্য না করিয়া সে ওধারের বেঞ্চে গিয়া নিঃশব্দে সিগারেট টানিতে লাগিল।

সারারাত অনিমেষ জাগিয়া পাহারা দিল, এ গাড়ীতে যেন কেহ না ওঠে। সারারাত সন্ধ্যা ও সুধীর এবং তাহাদের ছোট ছেলেদের আরামে ঘুমাইতে দিয়া নিজের ক্লান্ত চোখ দুটিকে কষ্ট দিয়া যখন দেখিল পূর্ব্বদিগন্তে ঊষার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন সে নামিয়া অন্য গাড়ীতে চলিয়া গেল।

কিছুই হয়ত না, কিন্তু এই ছোট উপকারটি বৃহৎ হইয়া সন্ধ্যার জীবনে স্মরণীয় হইবার মত।

অমর মল্লিক পরিচালিত নিউ থিয়েটার্সের সমাজ চিত্রে "বড়দিদি"-র ১টি বিশিষ্ট চরিত্রে মলিনা ও ছবি। ছবিখানি দ্রুত সমাপ্তির পথে।
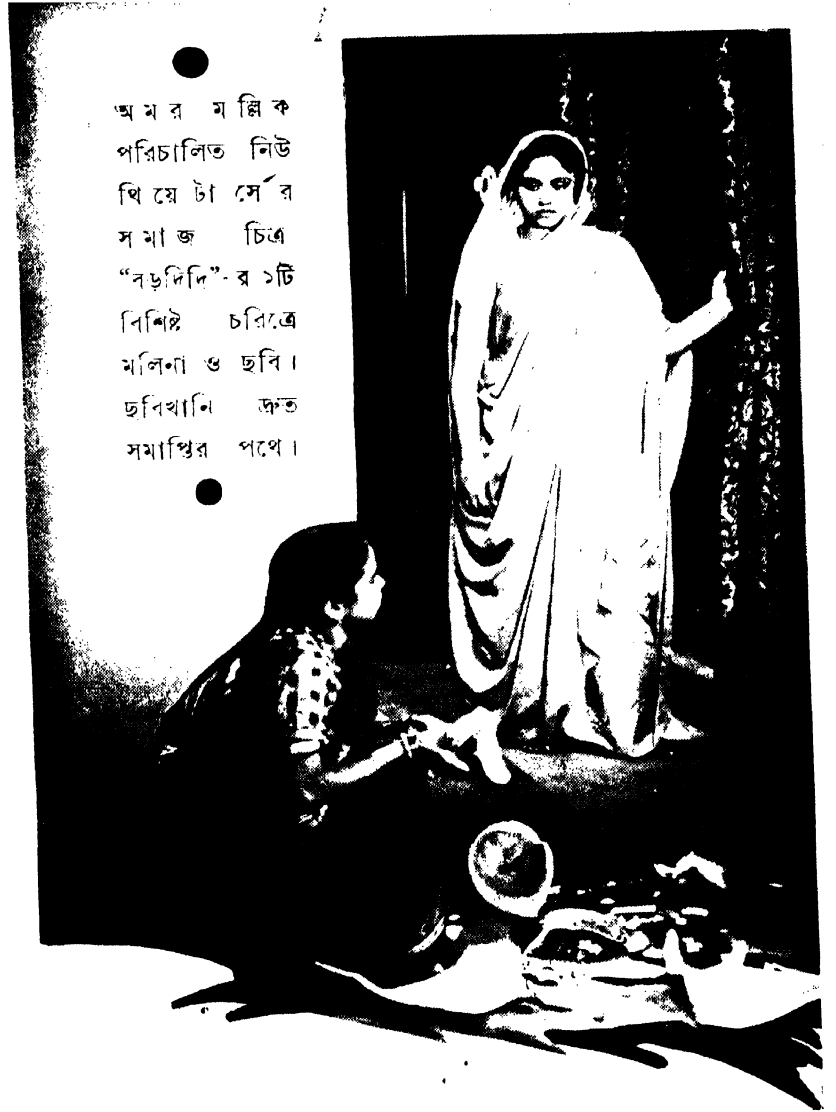
সিষ্টোফোন ষ্টুডিওর "কল্পনা" চিত্রে কান্তি ব্যানার্জি ও কল্পনা।

80, CORNWALLIS STREET
HATIBAGAN MARKET
CALCUTTA PHONE No BB 2649.

কাপড় — ব্যানারম্যান এণ্ড কোং — পোষাক

৮০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হাতিবাগান মার্কেট, ফোন: বি.বি. ২৬৪৯

N. I. P.
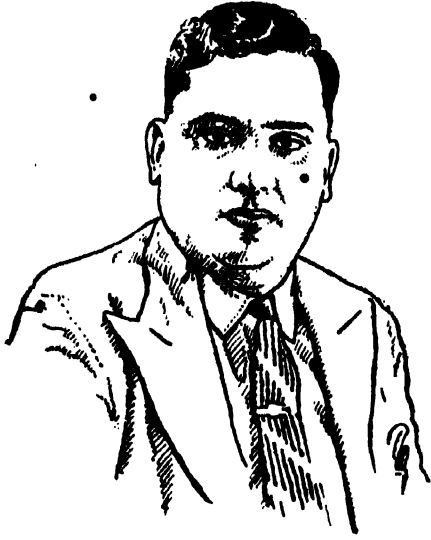
টলিউড় ট্রিপ্

(শেষ-কিস্তি)

: লেখক :
শ্রীসুধীরেন্দ্র
সান্যাল

একই পথে আনা-গোনা বরষে বরষে ; চেয়েছিনু লভিতে বিদায়—
এই মায়া মরীচিকা, সব ফাঁকি, সব ফাঁকা—তারি লাগি বৃথা হায় হায়!
জীবনের খালি পাতা, লোকসানে সার গাঁথা, আজও কী হয়নি ভরপুর—
সহসা শুনিয়া বাঁশী, বারেক ফিরিয়া আসি—চড়ুকের পিঠ সুড়সুড়্!
শূন্য সে থলি খুলি', সাদরে দিলাম তুলি, যাহা কিছু ছিল অবশেষ—
শেষ বিদায়ের ক্ষণে, চাহি সকলের প্রীতি—টলিউডে ট্রিপ করি শেষ

*

হাসি হাসি মুখ গুলি, মনে পড়ে শুধু খালি, মনে পড়ে অতীতের কথা,
সে ত' কিছু মিছে নয় যাহা কিছু রয় সয়, তারি মাঝে পেয়েচি বারতা
বিলাসীর Tollywood-এ, লভিতে সে হরিলুটে, পেতে ধরে সবে করপুট—
দেউলে ধনীর দল, ফেলিতে চোখের জল, সার্থক করে—Follywood!
তারি মাঝে আছে গাঁথা, অতি-মানবের কথা, শুধিবারে শিল্পের ঋণ—
তারি লাগি মাথা ব্যথা, তাহারি বুকের খুনে মৃত্তিকা হয়েচে রঙীন্!
পটে আঁকা ছায়া-ছবি, মিলায় পটের বুকে, অগণিত মানবের মেলা
তারি মাঝে দেখি চেয়ে, জীবনের খেলা-ঘরে, খেয়ালীর ভাঙ্গা-গড়া খেলা!

সাধনা বোস

হিসাব-নিকাশ থাক, আজ শুধু চলা যাক এখনও সে পথ বহু বাকী
সহসা দেখিনু চেয়ে, রাধার কানন ছেয়ে, আঁধারেতে জ্বলিছে জোনাকী!
বেকারের চিত্ত হরি, শেষের সে দিন স্মরি', করুণায় দিল যে পরশ
বুড়োর বদনে হাসি, টলিউড ফ্যালে চসি', ফলাইল কাঁকুড় সরস!
মেলেনি যখের ধন, তারি তরে প্রাণপণ,, রেখো মান নর-নারায়ণ
ভবঘুরে ঘুরে-ফিরে, সেই পথে আসে ফিরে, পায় বর—বেকার-নাশন্!

হাঁটু জলে ভাসে শীলা, কেন এত হেলা-ফেলা, কেবা রাখে মানিনীর মান—
হাসি মুখে নাই হাসি, যে রাণীরে ভালবাসি, সহসা সে ভুলিয়াছে গান!

মেনকা

কানন

লীলা হালদার

চন্দ্রাবতী

পথ পাশে দেখি ভিটে, মধু-হীন কালো-পিঠে, মন্থনে উঠেছে গরল,
জানিনা কাহার দোষে, মন কাঁদে আপশোষে, চোখে আজ আসে শুধু জল!
অবাঙালী বাঁধে বাসা, উড়ো-কলে আনে 'আশা', তারি তরে মন উচাটন্
মধুর-পরশ লভি' সরস হয়েচে নাকী, টলিউডে—'করপোরেশন্'!

•

অদূরে মাঠের পরে, অসুর কাঁদিয়া মরে, তারি আজো ভেসে আসে রেশ
খেমকা ও মতিচুরে, লড়া-লড়ি ঘুরে ফিরে, লাঠালাঠি হয় নাই শেষ!
লালে লাল বাবুলাল, হয় নাই আজো ঘালু, সিদ্ধি সে লভে সাধনায়,
ভাঙ্গা চাকে আছে মধু, তারি লাগি আজও শুধু, নেচে-কুঁদে-হেসে দিন যায়!

উমা

•

এত নহে অভিনয়, জীবনে এমনি হয়, কাজ শেষে যত না চতুর—
দিয়েছে বিদেশে পাড়ি, অপরূপ কারিকুরি, ধনে-প্রাণে বেচারী ফতুর!
তিমিরে ছেয়েছে ধরা, একী শুধু বেঁচে মরা—ফুরায়েছে জীবনের মধু
প্রেমের সাধনা শুধু বুঝিয়াছে সেইজন—যে তাহার পরাণের বঁধু।

•

চলিতে চলিতে দূরে, দেখিনু সহসা চেয়ে, আজও সেই বিজয়-কেতন
উড়িতেছে বায়ুভরে—দাঁড়াইয়া উচ্চ শিরে—বাঙালীর শিল্প-নিকেতন!
সেই চেনা মুখগুলি, সোহাগে-আদরে ভরি, কাছে ডাকে মোরে হাত ছানি'
মায়ার পরশ দিয়ে ভুলায় ছায়ার কায়া, আমি শুধু এইটুকু জানি।
শুধু তাহাদেরি সাথে কাটিয়াছে কতদিন, কত নিশি হইয়াছে ভোর
জানি তাহা আজীবন আঁকা রবে হৃদি পটে, মুছিবেনা সেই স্মৃতি মোর!

•

দেশের নরের কথা, দেশের নারীর ব্যথা, দেশের মাটির সাথে মিশে—
শরতের নীলাকাশে তাহারি বোধন শুনি, সোনালী ধানের শিষে শিষে!
'অশোক' পেয়েছে বুঝি উমার পরশ যেন, কাঁদিছে 'অরুণা' মনো-দুখে
মেঘের আড়ালে তাই বেদনা ঘনায় ধীরে, মানিনীর চারু চাঁদ-মুখে!

মলিনা

রাণী
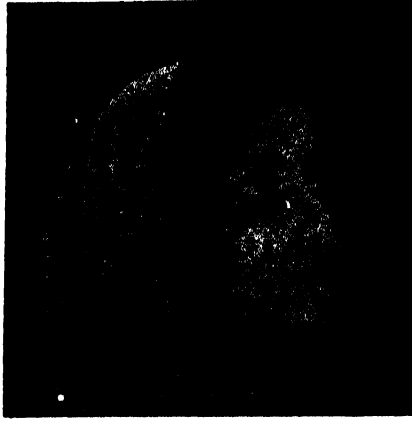
মঞ্জু-কাননে হেরি মিলিয়াছে চখা-চখী, মণি-হারা ফণী কাৎরায়
লীলা কমলের কাঁটা চলিতে বিঁধেছে বুকে—'দুষমণ' করে হায়, হায়!
জ্যোৎস্না নিশীথে কোন পদ্মার বালুচরে, পথিকের শুনি পদধ্বনী
বাঁধিতে পারেনি হায় পলাতক মনোচরে. মাধবী কাটায় দিন গণি।
দেবতা দিয়েছে ফাঁকি, পথ আর কত বাঁকি—তবু ফিরে চায়
পড়ে আছে ধূলি-তলে, কে পরিবে আজ গলে—মলিন-মালায়!
সার্থক রচনার অমর-কাহিনী সেই. শুভ্র-পটের বুকে আঁকি—
সার্থক শিল্পীর শিল্প-সাধনা বুঝি শোনাতে সবারে আছে বাঁকি।

•

ফিরিবার আছে তাড়া, আর কেন হেলা-ফেলা, বেলা বুঝি যায়,
যেটুকু পেয়েচি ঢের, তাহারি চলিছে জের—বিদায়, বিদায়!

রেণুকা রায়

ফিরিবার পথে ধীরে, আনওয়ার 'শা'র পীরে, করি কুর্নিশ্
ছেলে-বুড়ো দলে দলে, জানি না কাহারে ঘিরে, জোরে দেয় শিস্!
এত নহে উপবন, গভীর 'মনসা-বন', আশে পাশে পাহাড়ের রাশি,
চলেচে বেদের দল, জানে এরা ছলবল, কানে পশে—সাপুড়ের বাঁশী!
মন্ত্র-সাধনা আর সিদ্ধির তুকতাক্—কাজ নাই, পৈত্রিক প্রাণ
দেবকীর ছলা কলা, বলিতে কাঁপিছে গলা—দিই পিঠটান্!
মনসা-বনের পাশে, যেন আজো চোখে ভাসে—'স্বপন প্রাসাদ'
রাজার কুমার তারে, গোড়েছিল বাহু-বলে—ভুলি অবসাদ!
কোন অধিকারে 'রাধা' দিয়েছিল প্রেমে বাধা, আজো তারি রেশ—
'স্বপন-প্রাসাদ' মাঝে, সে প্রেমের স্মৃতি রাজে, জানে 'নিখিলেশ'।
যে নারী রূপের মোহে প্রেমের পরশ দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—
সাত-সাগরের পারে তাহারি তুফান উঠে—হৃদি যমুনায়!

জ্যোৎস্না গুপ্তা

কুচো কাচা কাজ নাই, অনেক ঝামেলা তাই. সংক্ষেপে আজ করি শেষ
জ্যোৎস্না নিশীথে ভাসে, শান্তি সে বারো মাসে, দেখি তারি মিলনের রেশ
রাণী লছম'র ব্যথা, ভুলি নাই তারও কথা, সে নারীরে স্মরি—
মায়ার পরশ দিয়ে, ছায়ার মাধুরী মোরে রাখিয়াছে ধরি!

•

শরতের অবসানে চাহি যে শুনিতে কানে, বারেক সে হেমন্তের গান—
আত্ম-প্রচারের লাগি কামনা করি না বন্ধু, প্রতিভার হেন অপমান!
আজো যারে ভালবাসি, আমার ঢাকের কাঠি দিনু তারি হাতে—
বিদায়, বিদায় আজ, সকলের সাথে ভাই, শারদ-প্রভাতে।

ছায়াছবি-পরিচিতি

বিলাসী

বাঙ্‌লার ক্রমবর্দ্ধমান "ছায়াছবির পরিচিতি লিখ্‌তে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে নিউ থিয়েটার্সের কথা। এই অত্যল্পকালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি ছায়াছবির দরবারে আজ মহান্‌ আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাঙ্‌লা তথা ভারতের অন্যান্য ষ্টুডিওগুলিরও কাজে আজ যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

নীতীন বোস

নিউ থিয়েটার্সের 'চিত্রা'য় সদ্যমুক্ত "দেশের মাটী" চিত্র সারা ভারতের চিত্রামোদীদের প্রাণে এক নতুন স্পন্দন স্ফুরিত কোরেছে। আনন্দের ভেতর দিয়ে বাঙালার কৃষিশিল্পের এক মহোত্তর আদর্শ এই চিত্রে প্রতিফলিত কোরে নীতীন বসু সকলের কাছে নিজের ও নিউ থিয়েটার্সের বৈশিষ্ট্য প্রচার কোরেছেন। শুধু কাহিনীর চমৎকারিত্বে নয়—একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবির যে সকল গুণ থাকে "দেশের মাটী" সেই সেই গুণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা বের কর্‌বার ইচ্ছা রইল।

নীতীন বসু এর মধ্যেই "জীবন-মরণ" নামে স্বাস্থ্য বিষয়ক একখানি ছবির কাজ প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে এনেছেন। ছবিখানি হয়তো বড়দিনের আগেই মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকবে। নীতীন বসু আজ যে আদর্শ নিয়ে ছবি তুলতে সুরু কোরেছেন, সে আদর্শ সকলেরই অনুকরণযোগ্য।

প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "অধিকার" চিত্র মুক্তি প্রতিক্ষায় রয়েছে। "মুক্তি"-র পরে আস্‌ছে "অধিকার"—চিত্রামোদীরা সেইজন্য উৎসুক হ'য়ে রয়েছে "অধিকারে"র আগমন প্রতীক্ষায়। "অধিকারে" আমরা একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া উচ্চশিক্ষিতা তরুণীকে দেখতে পাব একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। নাম তার—চিত্রলেখা দেবী।

প্রমথেশ বড়ুয়া

ফণি মজুমদারের পরিচালনায় "ষ্ট্রীট্‌ সিঙ্গার" বা "সাথী"-র চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির পথে। ছবিখানি যে খুব ভাল হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা এখন থেকেই কোর্‌ছি। কারণ, ফণিবাবুকে আমরা চিনি, তার কাজের পরিচয় আমরা পেয়েছি; তাঁর গুণের প্রশংসা আমরা কোরেছি।

অমর মল্লিকের "বড়দিদি" চিত্রখানিও প্রায় শেষের পথে এগিয়ে চলেছে। এই চিত্রে মল্লিক মশাই যে ভাবে চরিত্র বণ্টন কোরেছেন তা' সত্যই প্রশংসার্হ। নিউ থিয়েটার্সের জন্মকাল থেকে এতাবধি সিনেমা শিল্পের সেবা কোরে মল্লিক মশাই
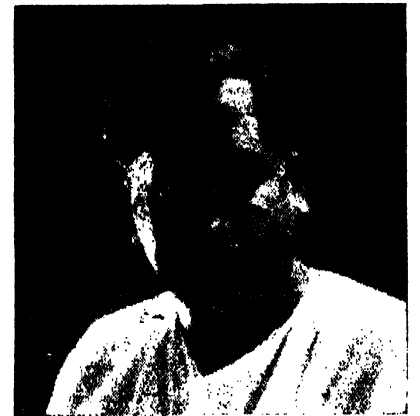
অমর মল্লিক

যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন এবং তিনি একজন গুণী শিল্পীরূপে যে ভাবে চিত্রামোদীদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছেন সেই হিসাবে আজ পরিচালকের পদে উন্নীত হ'য়ে তিনি নিউ থিয়েটার্সের ও

নিজের সুনাম রাখবেন—একথা আজ নিঃসংশয়ে আমরা বলতে পারি।

দেবকী বসু দু'নম্বর ষ্টুডিওতে মৈমনসিং গীতিকা থেকে গৃহীত "বিষের বাঁশী" নামে ছবি তুলছেন ছবিখানি নাচগান ও নতুন ধরণের কাহিনীতে যা'তে দর্শকমন আনন্দে আপ্লুত কোরতে পারে তার জন্য এই

দেবকী বোস

প্রতিষ্ঠানের বহুগুণী কর্ম্মকর্ত্তা যতীন মিত্র ও দেবকী বসু যুগ্মভাবে চেষ্টা কোরছেন। এই যোগাযোগে "বিষের বাঁশী" যে অমৃত মন্থন কোরবে একথা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত ছবিগুলির কাজ শেষ হ'লেই শোনা যাচ্ছে, হেমচন্দ্র ও দীনেশ দাশ ছবি তোলায় ব্যাপৃত হবেন। ইতিমধ্যে এরা চিত্রনাট্য ও ভূমিকা বণ্টন কার্য্য শেষ কোরে রাখবেন।

* * *

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সে'র "অভিনয়" 'রূপবাণী'তে সগৌরবে চলছে। ছবিখানি এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম আরও বৃদ্ধি কোরেছে। "অভিনয়" সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমাদের মতামত ব্যক্ত কোরেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মধু বোস

এদের পরবর্ত্তী ছবি তোলা হ'চ্ছে "পরশমণি"—প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায়। ছবিখানির গল্প রচনা কোরেছেন শক্তিমান নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। এই ছবির ভূমিকালিপিতে আছেন, দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জি, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রভৃতি কলাকুশলী অভিনেতৃবৃন্দ।

শোনা যাচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠান রঙমহলের মূল অভিনেতৃ সঙ্ঘ নিয়ে শীঘ্রই শচীন্দ্র-নাথের সাফল্য মণ্ডিত "স্বামী-স্ত্রী" পর্দ্দায় রূপান্তরিত কোরবেন।

* * *

রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক চিত্র "জনক নন্দিনী" ফণি বর্ম্মার তত্ত্বাবধানে প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

ফণি বর্ম্মা
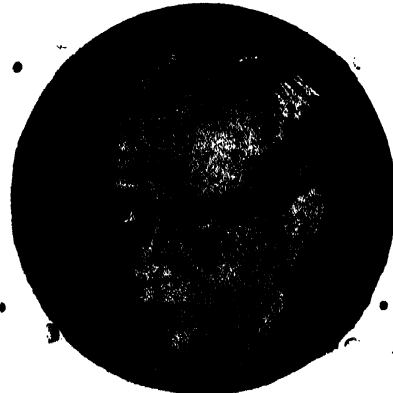
জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি আর একখানি পৌরাণিক ছবি "নর-নারায়ণে"-র শূটিং প্রায় শেষ কোরে এনেছেন।

মতিমহল থিয়েটার্সে'র সামাজিক ছবি "যখের ধন" হরি ভঞ্জের পরিচালনায় কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা যায়। ছবিখানি রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি পরিচালিত ধর্ম্মমূলক চিত্র "একলব্য" মুক্তি প্রতীক্ষায়।

আপাততঃ এই ষ্টুডিওতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পৌরাণিক চিত্র "দ্রৌপদী"-র কাজ অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

* * *

ফিল্ম কর্পোরেশনের হিন্দি ছবি "আশা" বহুদিন ধরে তোলা হ'চ্ছে কিন্তু এখনও শেষ হবার নাম নেই। এই ছবিতে নিউ থিয়েটার্সে'র কমলেশকুমারী নায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

* * *

বি এল্ খেমকা সংগঠিত দ্বিতীয় ছবি "খনা" পূজোর পূর্ব্বেই "শ্রী" চিত্রগ্রহে মুক্তিলাভ কোরবে। মিঃ খেমকার দুর্দ্দমনীয় সাহস ও ঐকান্তিকতা আজ পর্য্যন্ত তাঁকে কোন বিষয়ে পরাজিত কোরতে পারেনি। সেইজন্যেই মনে হয়, "খনা" তাকে জয়মাল্যে ভূষিত কোরবে।

শোনা যাচ্ছে ইনি শীঘ্রই নিজস্ব ষ্টুডিও তৈরি কোরে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" তোলার ব্যবস্থা কোরবেন।

* * *

কালী ফিল্মস্ বহুদিন যাবৎ নিজেদের কোনও ছবি তোলেন নি। তবে এই ষ্টুডিওতে আপাততঃ তামিল ও গবর্ণ-মেণ্টের ছবি তোলা হ'চ্ছে। শোনা যাচ্ছে,

এই মাসেই কালী ফিল্মস্ লিমিটেড কোম্পানী হ'বে এবং পূজোর পর থেকে "শ্রীকৃষ্ণ" নামে একখানি পৌরাণিক ছবি তুলবেন। 'প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর এই অভ্যুত্থানে বাঙ্গালীমাত্রই খুসী।

* * *

দেবদত্ত ষ্টুডিওতে আপাততঃ কোন ছবিই তোলা হ'চ্ছে না। তবে পূজোর পর থেকে এই ষ্টুডিওতে নূতনভাবে কাজ আরম্ভ হবে।

* * *

ব্যারাকপুরে রামগতি হাজরা ও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে হাজরা পিক্‌চাস লিমিটেড্ নামে যে নূতন ষ্টুডিও তৈরি হ'য়েছে সে সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত। কারণ, এখানে যাঁরা যোগদান কোরেছেন তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি। এদের শুটিং পূজোর পর থেকেই সুরু হবে।

ম্যাডান কোম্পানীতে চারু রায়ের পরিচালনায় ইন্দ্র মুভীটোনের "পথিকে"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো

* * *

সিষ্টোফোন ল্যাবরেটরী পি, ঘাণ্ডেলের পরিচালনায় ও অজিত সেনের সহযোগিতায় "কল্পনা" নামে একখানি ছোট ছবির কাজ শেষ হয়েছে।

* * *

অরোরা ষ্টুডিওতে সরমা পিকচার্সের "মায়ামৃগ" শেষ হ'য়ে এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়।

* * *

এ ছাড়া অন্যান্য দু'একখানা ছবি তোলার কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে এখন কিছু খবর দেওয়া আমরা যুক্তি সঙ্গত মনে করি না।

বঙ্কিম-বন্দনা

শ্রীসুবোধ রায়

মায়ের প্রতিমা গড়িলে আপন হাতে,
পূজার মন্ত্র রচিয়া ভাষায় নব
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি' দিলে তুমি তাতে;
তাই নিয়ে মোরা করি পূজা-উৎসব।
বাণী যে তোমার অমৃত সঞ্জীবনী
বিস্মৃতি নাশি' দিল নব জাগরণী,
আঁধার রজনী অবসানে তাই হেথা
জাগিল উষার আনন্দ-কলরব।
গহন গভীর বনের বুকের মাঝে
এক হাতে তুমি রচিলে বিশাল পথ,
আর হাতে তুমি নব-আভরণ-সাজে
সাজায়ে চালালে ভাষার বিজয়-রথ।
সে-রথ আজিকে বিপুল গর্ব্বে চলে
দেশ দেশান্তে আপন শক্তিবলে,
আশীষ তোমার অসীম যাত্রাপথে
আনিছে সেথায় সারথি নিত্য-নব।
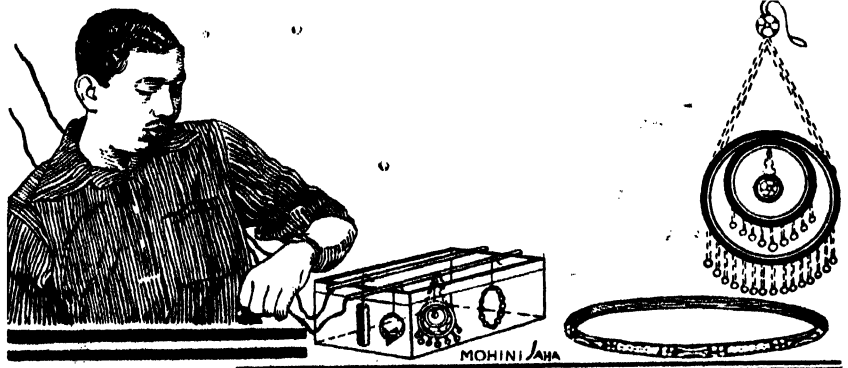
বিবাহ ও প্রেম

শ্রীপদ্মা বসু

বিবাহ মানব সমাজের একটী অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। দুজন নর-নারী এই বিবাহ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া দুজনের একান্ত কাছে থাকবার, সুখেদুঃখে সঙ্গী হবার, আপদেবিপদে সহানুভূতি করবার জন্য মিলিত হয় ও সমাজ সে মিলন অনুমোদন করে। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী নিজেদের মধ্যে নীড় বাঁধে ও বৃহৎ সংসার সৃজন করে। প্রেম বিবাহের একটী অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তাই যে সংসারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রেম থাকে না—সে সংসার হয়ে উঠে ব্যর্থ। যেখানে সন্তান জন্মে, বেড়ে উঠে—সেখানে যদি প্রেমের আধিপত্য না থাকে, সেখানে যদি স্বার্থের হানাহানি থাকে, তবে তা সন্তান-জননের পক্ষে প্রতিকূল না হ'লেও সন্তানপালনের পক্ষে হয়। যে শিশুর মা-বাপের মধ্যে নেই সদ্ভাব, নেই একের সুখ সুবিধার জন্য অন্যের সুখ সুবিধা বিলিয়ে দেবার স্বতঃপ্রণোদিত চেষ্টা, সে শিশুর মানসিক বৃত্তিগুলি অকালেই বাস্তবের কঠোরতার আঁচে ম্লান হ'য়ে শুকিয়ে যায়—পারে না সে বড় হয়ে নিজের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শুকিয়ে-যাওয়া হৃদয়-মুকুলটীকে শোভায়, সৌগন্ধ্যে একটী প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত করতে।

আর বিবাহ যে দুজন নরনারীকে নির্দ্দেশ দিল এক হ'য়ে সংসার পাতবার—তারাই বা কি করে সক্ষম হবে এক ছাতের নীচে দিনের পর দিন কাটাবার, এক অন্ন, এক শয্যা ভাগ করে নেবার—যদি না মিশে থাকে প্রেম তাদের সব কাজে সব চিন্তায়? যদি পরস্পর বিলিয়ে দিতে না পারল নিজেদের পরস্পরের কাছে প্রেমে, যদি একে অন্যের হাত থেকে নিজের স্বার্থটুকু রক্ষায় সব সময় সযত্ন থাকল, তবে গড়বে তারা কি? বাঁচবে তারা কি দিয়ে? মরণের পর কি অক্ষয় সম্পদ তারা রেখে যাবে তাদের বংশধরদের জন্য? তাই প্রেম বিবাহের একটী অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। তাই প্রেমহীন বিবাহ—বিবাহই নয়।

বিবাহের মধ্যে আবদ্ধ হ'বার জন্য সামাজিক পরিচয়ের পর পরস্পরের মধ্যে প্রেম যাচাই করবার উদ্দেশ্যে সভ্য দেশ সমূহে court-ship বা মন-জানাজানি, মন-দেওয়া নেওয়ার পালা সুরু হয়। যখন একজন আর একজনকে হৃদয় দিয়ে চিনে নেয়, তার আশেপাশের, তার সংসারের ব্যাপার বৃত্তান্ত জেনে নেয়—তখন তারা বিবাহ পদ্ধতির ভিতর দিয়া নিজেদের জীবনের সাথী করে নেয়। কিন্তু এই যে মন-জানাজানির কাল, এ সময় কি মানুষ—যাকে সে প্রিয়তম বলে বরণ করতে চলেছে তার সম্মুখে, আপনাকে, নিজের স্বরূপ মূর্ত্তিতে, সত্যপরিচয়ে, উদ্‌ঘাটিত করতে পারে সব সময়? যদি পারতো, তবে প্রেমের বিবাহের পরেও আসতো না এত বিবাহ বিচ্ছেদের হুড়াহুড়ি, আইন-প্রণেতাদের করতে হ'তো না নিত্য নূতন করে বিবাহ বন্ধন থেকে নরনারীকে মুক্তি দেবার জন্য নূতন আইনের প্রণয়ন।

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অভিজাত ঘরের বিবাহ প্রায়ই অনুষ্ঠিত হ'তো স্বয়ম্বর সভায়, কন্যার বরের কণ্ঠে স্বেচ্ছায় মাল্যদানের পর। স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করার সাথে সাথেই কন্যা বরের জন্য অন্তরে কিছু প্রেম অনুভব করতো না। সেখানে কন্যার অন্তরে কাজ করত প্রধানতঃ বরের রূপ—যা সে স্বচক্ষে দেখত—love at first sight (আমাদের একালেও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়) আর শুনতো সে তার সহচরীর কাছ থেকে বরের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন প্রতিপত্তির কথা।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সমাজ যে বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে, তা' হচ্ছে, পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ দু'জনারাই, পরস্পরের কৌলীন্য রূপ, স্বাস্থ্য, বিত্ত, সম্পদ পরিমাপ করে, পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দেন—এ জীবনে চিরদিনের জন্য—মরণের পরেও বিবাহ-বন্ধন স্বীকার করে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর মত, মানব জীবনের একটী অপরিহার্য্য সংস্কার। পাত্র ও পাত্রীপক্ষ সামাজিক রীতি হিসাবে আরও নজর রাখেন, বিবাহের পণের উপর। এই বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর মতামত নেওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকেরা প্রয়োজন বোধ করেন না—এমন কি চাক্ষুষ দেখাও অনেক জায়গায় হয় না—একেবারে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানের সময় শুভ-দৃষ্টির মধ্য দিয়া চারিচক্ষের মিলন হয়। কাজেই এই বিবাহ কতকক্ষেত্রে নরনারীর পক্ষে শুভ হ'লেও নরনারীর মননশক্তি, আদর্শবাদ রূপতৃষ্ণা যৌন আকর্ষণ, পূর্ব্বানুরাগ যে কোনও একটী বা একাধিক কারণে হয়ে উঠে নিরানন্দের। ব্যর্থতায় ভরে উঠে স্বামী স্ত্রীর মন, ভারাক্রান্ত মনের বিষময় প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় তাদের

নিজের সংসারে, সন্তান-সন্ততির জীবনে। তবে এই বিবাহের পর সাধারণতঃ স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে দুজনে মিলিত হয় এবং তাদের মনে সংস্কাররূপে দেখা দেয় প্রেম। জীবনের কণ্টকাকীর্ণ স্বাধীন প্রেমের পথে চলাফেরা করার চেয়ে ধ্রুব প্রেমের সুশীতল ছায়ায় আরাম-প্রিয় মানব-মন আশ্রয় পায়—তাই এই বিবাহের সমাদর।

সকল দেশ সকল যুগে একনিষ্ঠ প্রেমকে সব চেয়ে বড় সম্মান দিয়েছে। একসঙ্গে একই সময়ে একজন পারে না একাধিক জনকে বা একবার কাকেও ভালবেসে অপর কাকেও সমান ভাবে ভালবাসতে—এই ছিল আমাদের ধারণা। কিন্তু আজ-কাল কত ক্ষেত্রেই দেখতে পাই একই মানুষের জীবনে একাধিক জনের আবির্ভাব যাকে অপ্রাকৃত বা অগভীর বলে কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন প্রেমকে মাপতে হয় সময়ের দীর্ঘতা দিয়ে নয়, অনুভূতির গভীরতা দিয়ে। তাই এক সময়ে যাকে দেখি একজনের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রেমের মহিমায় কিছুদিন পরে দেখি, তার সে হৃদয়ে আর কোনই অধিকার নেই—সেখানে এসেছে এক নবাগত অতিথি। এই অনুভূতির গভীরতা থাকে বলেই তখনকার মত সুখ বা দুঃখ অতি গভীরভাবে মনের উপর রেখাপাত করলেও চিরদিনের জন্য দাগ ফেলে যায় না।

একাধিক নিষ্ঠার ধারণা হয়ত পূর্ব্বে ছিল—তবে তার প্রচলন ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে—পুরুষের স্ত্রীবিয়োগের বা ত্যাগের পর বিবাহের বা স্ত্রী বর্ত্তমানে বহুবিবাহের মধ্য দিয়া। একাধিক বিবাহের বা বহু বিবাহের যে চলন ছিল সেটা যে প্রথম থেকেই উদ্ভূত হ'তো—একথা মেনে না নিয়েও বলা যেতে পারে, অপর বিবাহের মত এখানে প্রেম আসতো বিবাহের অঙ্গাঙ্গী সংস্কাররূপে। স্ত্রীবিয়োগে বা স্ত্রীত্যাগে পুরুষের যে বিবাহের অধিকার জন্মে তা বহুবিবাহের মত নিন্দনীয় না হ'লেও (কারণ সেখানে বিবাহ-অনুষ্ঠানের অপর সংস্কৃত নিষ্ঠার কথা আছে) একনিষ্ঠ প্রেমের ব্যতিক্রম। বিধবা বিবাহ বা অপর ক্ষেত্রে নারীর দ্বি-বিবাহ সময়ে সময়ে কোন সমাজ মেনে নিলেও সাধারণের চক্ষে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না, শুধু প্রেমের একনিষ্ঠার অভাবের জন্য নয়, নানারূপ সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার জন্য ও সর্ব্বোপরি সমাজে নারীর নিকৃষ্ট আসন নির্দ্দেশের জন্য।

বহু-বিবাহ ছিল তখনকার দিনে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটী

উপায় মাত্র। স্ত্রীলোক তখন একটা সচল সম্পত্তি মাত্র ছিল। পুরুষের বহুবিবাহ কখনো ঘটতো ধনের আতিশয্যে, কখনো বংশের কৌলীন্যে, কখনো বা শক্তির প্রাচুর্য্যে। ধন, বংশমর্য্যাদা বা সাহসিকতা. যার মূল্যেই কেন না ক্রীতা হউক, নারীর ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শন, স্বামীসঙ্গ-সুখলাভ হয়ত কালে ভদ্রে ঘটতো। ক্রমে মানুষ যখন সভ্যতার আলোকে এই নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করল, তখন থেকে আরম্ভ হ'লো একনিষ্ঠতার জয়গান। তখন সমাজের সব স্তরেই দেখা দিল প্রেমে একনিষ্ঠার সম্মান, সম্ভ্রম এবং মর্য্যাদা। এমনি করে আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বহু-বিবাহ বিদায় নিল। এখনো দু'এক-ক্ষেত্রে পুরুষকে এক স্ত্রী বর্ত্তমানে একাধিক বিবাহ করতে দেখা গেলেও, সে পুরুষ সমাজে অসম্মানের পাত্র বিবেচিত হয়—মাথা তুলে অন্য সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারে না—এক রকম সামাজিক অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু আদিম কাল থেকে মানুষের মনে যে বহুবল্লভ-বৃত্তি আছে, মানব-সভ্যতা তাকে ঘুম পাড়াতে চাইলেও সব সময়ে সে ঘুমিয়ে থাকে কি? হ'তে পারে, প্রেমের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠা আদর্শ হিসাবে মহান, কিন্তু সব সময় পারে না মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে। তাই প্রেমকে আমাদের বিচার করতে হ'বে সময়ের স্থায়ীত্ব দিয়ে নয় অনুভূতির গভীরত্ব দিয়ে। মানুষের জীবনে বাস্তবে যখন দেখা দিচ্ছে একাধিকের আধিপত্য, তখন কি হ'বে চোখ বুজে থেকে, তাকে না দেখার ভাণ করে?

অমুকের প্রতি অমুকের প্রেম খাঁটী কি না একে বিচার করতে হ'বে—অমুক অমুককে চিরজীবন দিয়ে ভাল বেসেছিল কি না এ দিয়ে নয়—যতটুকু ভালো বেসেছিল ততটুকুর মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা ছিল কিনা, ফাঁক ছিল কিনা তাই দিয়ে। যদি কৃত্রিমতা না থাকে, তবে যতক্ষণ স্থায়ীই হোক না কেন তার মূল্য ত' বড় কম নয়। ফুল এক-রাতের জন্যই ফোটে, আকাশে ইন্দ্রধনু অল্পকালের জন্যই রঙের মায়াজাল বোনে—সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত কল্লান্তকাল স্থায়ী নয়. কিন্তু সে জন্য ত' উপভোগের পাত্র অপূর্ণ থাকে না। ঠিক এমনিই মানুষের প্রেম। প্রেম যখন মানুষের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে নিজেকে সে বলি দেয় না। উর্ণনাভ যেমন আপনার শরীর থেকে সৃষ্টি করে আপনার জাল—মানুষ তেমনি নিজের মনের রঙ ফলিয়ে তার প্রেমাস্পদকে করে নেয় সুন্দর, মহান।
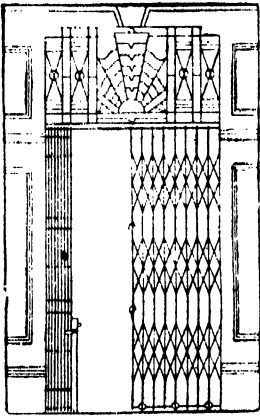
কিছুদিন চলে পূজা, আরতি—তারপর নদীর মতন আবার মানুষের মন যখন অন্যপথ ধরে তখন—

"একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জ্জন।"

যে মানুষ পারে ভালবেসে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে, তার অনুভূতির গভীরতায়—সে কোনদিন ক্লান্ত হয় না পরাস্ত হয় না জীবন-যুদ্ধে। তাই "শেষ প্রশ্নে'র কমল ভেঙে পড়েনি যখন শিবনাথ তার জীবনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছিল। তাই সে পেরেছিল নূতন করে সংসার সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখতে অজিতকে কেন্দ্র করে। দুই বিভিন্ন সময়ে যে দুইজন পুরুষ তার জীবন ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের প্রেমের পসরা নিয়ে—তাদের দুজনকেই সে বরণ করেছিল সমান আগ্রহভরে—একজনের স্মৃতি অন্যজনকে বরণ করার পথে তাকে বাধার নিগড় পড়িয়ে দেয় নি।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রেম কোন রীতিনীতির দোহাই মানে না—সে আপনার বেগে আপনি চলে, আপনার প্রাণশক্তিতে আপনি ভরপুর। বিবাহ, প্রেমের ব্যাপারে একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ হ'তে পারে কিন্তু বিবাহে বাঁধা পড়লেই যে মানুষের মন সেই একই জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকবে বাকী সবটুকু কালের জন্য এমন কথা কে হলফ করে বলতে পারে? এবং একই জায়গায় বাঁধা না পড়ার দরুণ দোষ দিতে গেলে দোষ দিতে হয় মানুষকে নয়, মানুষের স্রষ্টাকে যিনি তাঁর অপরূপ সৃজন লীলায় সৃষ্টি করেছেন মানুষের মন যা নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা চায় জীবনের যাত্রাপথে, যা নিয়মের মধ্যে অনিয়ম আনে—যা তৈরী জিনিষ ধ্বংস করে আনন্দ পায়—আবার ধ্বংসের মধ্যে রোপণ করে সৃষ্টির বীজ।

তাই বিবাহে একনিষ্ঠ প্রেম অপরিহার্য্য হ'লেও প্রেমের রাজ্যে একনিষ্ঠার ব্যতিক্রম আছে। আর সেই কারণে প্রেমের একাধিক নিষ্ঠা স্বৈরাচার নয়। মানব জীবনের এক প্রাণবন্ত গতির স্বাভাবিক শক্তিতে সেই ব্যতিক্রম ঘটে—মানব-মনের বহুধারা ব্যক্তিত্বের একটা রূপ। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেমের বহুনিষ্ঠাকে স্বীকার করে নিতে গেলে বিবাহ-সংস্কারে বাধে—নানা ছোটবড় অসুবিধা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। তাই অধিকাংশ সমাজ বিবাহিত জীবনে নিষ্ঠার অভাবকে স্বৈরাচার বলে প্রচার করে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। সবচেয়ে সভ্য মানবমন কিছু উদার ভাব নিয়ে সেই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দিয়েছেন। তবু বিবাহের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে পড়েছে কারণ একনিষ্ঠ প্রেমের উপর ভিত্তি করে বিবাহ অনুষ্ঠানকে সুদৃঢ় করা হয়েছে বলে। প্রেমের বহুধারা স্বীকার করে আজ সত্যই ভাববার সময় এসেছে—ভবিষ্যতে প্রেম বিবাহের অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠা বলে গণ্য হ'বে কি না। কারণ বিবাহের পূর্ব্বরাগে প্রেম হেতু বিবাহিত জীবনে প্রেমের বিস্তার, বিবাহ-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত প্রেম সবই মানব জীবনের আদর্শ-বাদের সহিত বাস্তবতার শুধু আপোষনামা। তাই ভয় হয় মানব মন থেকে সংস্কারের ভীতি বা প্রীতি কমে গেলে, বিবাহিত জীবনে একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ স্থায়ী হবে কি না। আজ স্বীকার করবার সময় এসেছে, প্রেম স্বভাবজ, বিবাহ সংস্কারজ; দুয়ের মিলন কাম্য হ'লেও বিরোধ অসম্ভব নয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

ইম্পিরিয়াল টী

'চা' এর মধ্যে এদের 'পিরামিড' চা এবারকার শারদীয়ার একটী শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। খেতেও ভাল আর সঙ্গে সঙ্গে দামেও সস্তা।

পাদুকা শিল্প প্রতিষ্ঠান

দক্ষিণ কলিকাতায় 'বাঙ্গালা'র এই প্রতিষ্ঠান আজ কাহারও কাছে অপরিচিত নয়। গ্রাহকদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়।

সিন্টোফোন লেবরেটারী

এরা সম্প্রতি 'কেলী' নামক প্রোজেক্টর এর distribution right পেয়েছেন। চিত্র শিল্পের silent যুগ থেকেই এই 'প্রোজেক্টর' চলে আসছে।

ব্যানারমান এণ্ড কোং

এখানে ফ্যান্সি সিল্ক ও মিলের শাড়ী অতি অল্পলাভে বিক্রয় হয়। পোষাক পরিচ্ছদের জন্য এরা খুবই পরিচিত।

ন্যাশনাল রোল্ড গোল্ড সিণ্ডিকেট

রোল্ড গোল্ড সোনার গহনা আজকাল বাজারে খুবই চলছে। ১০ নং কলেজ ষ্ট্রীটের—এই প্রতিষ্ঠানএর জিনিষগুলি চিরস্থায়ী।

টসের চা

'চা' খেয়ে আরাম পেতে হ'লে এদের চা খাওয়াই উচিত। খেয়ে বেশ তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়।

---:o:---

সাহিত্যে নবযুগ

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

নবযুগের আগমনী-গীতি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সুরু হয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে উন্নতির ফলে মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আজ নূতন ভাবে চখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে তার নূতন রূপ আজ সাহিত্যের পাতায়ও ফুটে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়ে সে আজ হতে চলেছে মানব জীবনের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক। সে আজ বস্তুধর্ম্মী।

অনেকে বলেন ব্যবহারিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ট যোগাযোগের ফলে সাহিত্য হবে সমস্যামূলক আপেক্ষিক। কিন্তু কোন সমস্যাই চিরস্থায়ী নয়। আজ যা উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে হয়ত কাল তা থাকবে না। কাজেই সমস্যামূলক সাহিত্যও শাশ্বত মর্য্যাদা লাভ করবে না। কোন একটা বিশেষ সময়ের বিশিষ্ট সুখ-দুঃখের ছাপ সাহিত্যের গায়ে আঁকা হয়ে যাবে। সময় চলে গেলে সে ছাপ আর পাঠকের মন হরণ করবে না। তখন সে সাহিত্য ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত হবে। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সাধকদিগকে সে অতীতের সমাজ ব্যবস্থার উপকরণ যোগাবে। কিন্তু রস সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য তা নয়। কর্ম্মনিরত পুরুষ যখন সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যা-বেলা শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ক্ষণস্থায়ী কত অবান্তর চিন্তা তার মনের আকাশে রঙীন পাখীর মত এসে দেখা দেয়। তাদের সঙ্গে তার দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের কোন সম্বন্ধ নেই। না থাকলেও তারা বড় মিষ্ট। এবং সেই জন্যেই তাদের ধরে রাখবার চেষ্টা হয়েছে যুগে যুগে। এই সাহিত্য সর্ব্বকালের এবং সকল দেশের ঐতিহাসিক পরিবেশকে অতিক্রম করে সার্ব্বজনীন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে। এই সাহিত্যে যে রূপ ফুটে উঠেছে অনেকের মতে তাহাই সাহিত্যের বিশ্বরূপ, সেই সাহিত্য কালজয়ী। সমগ্রভাবে সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন "প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন রোমের সভ্যতা গেছে অতীতে বিলীন হয়ে। যখন বেঁচে ছিল তখন বিস্তর ছিল তাদের বৈষয়িকতার দ্বন্দ্ব, প্রয়োজনগুলি ছিল নিবিড়, নিরেট গুরুভার, প্রবল উদ্বেগ প্রবল উদ্দাম ছিল তাদের বেষ্টন করে, আজ তার কোন চিহ্ন নেই। কেবল এমন সব সামগ্রী আজও আছে যাদের ভার ছিল না, বস্তু ছিল না, দায় ছিল না। মানুষের ব্যক্তি-স্বরূপের যে পরিচয় চিরকালের দৃষ্টিপাত সয়, পাথরের রেখায় শব্দের ভাষায় তারি সম্বর্দ্ধনাকে স্থায়ী রূপ ও অসীম মূল্য দিয়ে রেখে গেছে।...... আমি নিশ্চিৎ জানি যে সময়ে শকুন্তলা রচিত হয়েছিল, তার গুরুত্ব তখনকার দিনে অতি উদ্বেগ রূপে ছিল, কিন্তু সে সমস্তর আজ চিহ্ন মাত্র নেই, আছে শকুন্তলা।"

কালের বিবর্ত্তণে মানুষ আজ এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যখন এযুক্তি তার মনে আর বল সঞ্চার করতে পারছে না। তার চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অসামাজিক মনোবৃত্তি নিয়ে রচিত সাহিত্য এখন তার কাছে হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা সামাজিক জীব। সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখের পরিপূর্ণ রূপ তাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু ফুটিয়ে তোলা নয়, দুঃখের মূল কারণগুলি সত্যের দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধান ও তার দূরীকরণের পথ-নির্দ্দেশও করতে হবে। সেই সাহিত্য হবে বস্তু-ধর্ম্মী এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কৃষক মাঠে মাঠে লাঙ্গল চাষলো, তারপর দুপুরবেলা বাড়ী

গিয়ে শুনলো তেলের অভাবে রান্না হচ্ছে না। বিশ্রাম করবে কি, তেলের যোগাড়ে কেটে গেল ঘণ্টাখানেক, তারপর খেতে বসলো মোটা মোটা রাঙা রাঙা ভাত। অমনি জমিদারের পাইক এলো ডাকতে। সেখান থেকে ফিরে দেখলো গুরুদেব এসেছেন বাড়ীতে। প্রণামী একটি টাকা এবং যদি দু'একদিন থাকেন তাঁর আদর অভ্যর্থনার জন্য অর্থের দরকার। কাজেই তাকে যেতে হল মহাজনের বাড়ী। মহাজন টাকা দিতে রাজী এই সর্তে যে, যে কয় মন পাট তার হবে তাঁর কাছে বিক্রী করতে হবে তাঁরই খুসীমত দরে। নিরুপায় কৃষক সেই সর্তে রাজী হয়ে টাকা নিয়ে এলো। এই ঘটনার মধ্যে আছে যে দারিদ্র, দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার তাঁর হাত থেকে মুক্তিলাভের তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে হবে সাহিত্যকে। গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে প্রগতিমূলক সাহিত্য। মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। মানুষকে চলতে দিতে হবে স্বাধীনভাবে আত্ম-বিকাশের পথে। ধর্ম্ম সমাজ কিছুই তার চলার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করবে না। বুঝিয়ে দিতে হবে ধর্ম্ম বা সমাজ বেঁচে আছে মানুষকে আশ্রয় করেই। মানুষ না থাকলে ধর্ম্মও থাকতো না সমাজও থাকতো না কাজেই তারা কোন দিক দিয়েই মানুষকে ছোট করবে না, মানুষের ঘাড়ে চেপে বসবে না। বরং মানুষই তাদের স্কন্ধে বসে তাদের সাহায্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করবে। এই উন্নতিতে সাহায্য করবে সাহিত্য। এবং সেই জন্যেই মানুষের কর্ম্ম জীবনের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ তাকে রাখতে হবে। তার সুখ-দুঃখের মূল-কারণগুলির সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। বিজ্ঞানের অভিযান মানুষের বুদ্ধির অভিযান। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মকে জেনে তাকে করায়ত্ত করেছে। ফলে নূতন সভ্যতা নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সমাজও আপনার নিয়মে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। সে নিয়মকে বিজ্ঞানের সাহায্যে জেনে যদি মানুষ সমাজকে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে তবে অতি অল্প সময়ে অনেক কাজ হতে পারে। এই রূপান্তরের কাজে সাহিত্যের দান হবে অমূল্য। জন সাধারণের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় ঘটলে সাহিত্য কখনও সামাজিক জীবনের সমষ্টিগত আবেগের চিত্র হবে না, সাহিত্য হবে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের বাস্তব চিত্র। বস্তুতঃ সাহিত্য কোন ব্যক্তির খেয়ালের সৃষ্টি

শারদীয়া সংখ্যার লেখক-লেখিকাগণের প্রতি

"খেয়ালী"র শারদীয়া সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ ও বিলম্বে প্রাপ্তি হেতু বহু বিশিষ্ট লেখক ও লেখিকার লেখা পত্রস্থ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী মিত্র, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, হরেন মুখার্জ্জি, কুমুদেশ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক ও শ্রীযুক্ত অনিল ভট্টাচার্য্যের নিকট আমরা আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের প্রবন্ধ "খেয়ালী"র বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। "খেয়ালী"র প্রতি স্ব স্ব দরদ ও সহানুভূতি বশতঃ তাঁহারা আমাদের এই অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন। সঃ খেঃ

প্রেমিক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রেমের মতন প্রেম জানে যে
সে জানে গো তোমার রীতি—
বিরাট প্রেমিক! আমার কাছে
নেই লুকানো প্রীতির নীতি।
মেঘমহলে তোমার মায়া
দোলায় আলো, নাচায় ছায়া,
কালো ধূলোয় ফুল ছড়িয়ে
রঙিন করে বনের বীথি।

* * *

আকাশ যখন ডাকে ধরায়
শুনি তোমার সূর্য্য-ভাষা,
মাটি যখন আকাশকে চায়,
পায় যে চাঁদের ভালোবাসা।
বিশ্বপ্রেমের মহোৎসবে
জীর্ণ জীবন নতুন হবে
মানুষ হবে অসীমতার
নিত্য নবীন সসীম গীতি।

নয়। সমগ্র সমাজের সমষ্টিগত সুখ দুঃখের অনুভূতির প্রকাশ। সমাজ সম্পর্কিত সুখ-দুঃখ ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ের বেদনা বোধের পাত্র পূর্ণ করে বলেই সাহিত্য-রস সকলের আস্বাদনীয় হয়। সাহিত্য রস আস্বাদন করে সকলে আনন্দ পায়। সাহিত্যের মূল সমাজের সুখ দুঃখের অনুভূতির মধ্যে নিহিত। কিন্তু সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতির মূলগত পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন বস্তুধর্ম্মী ও ব্যবহারিক। কাজেই সাহিত্য কখনও অবাস্তব কল্পলোকে বাস করতে পারে না।

ইহাই এই নবযুগের ধরণা। এবং এ ধারণা সত্য।

আলেয়া

শ্রীসমর মিত্র

বায়োস্কোপ আরম্ভ হয়েছে এইমাত্র; 'ট্রেলারের' ছবিগুলি দেখাচ্ছে তখন লোক-গুলি, 'comming attraction'এর দিকে চেয়ে আছে; কেউ বা নাক সিঁটকে বল্‌ছে, দূর এই কী বই হয়েছে?—কেউ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ভাবছে 'আর্ট জ্ঞান নেই এদের মোটেও'—আবার আর একজন নিজের বাবরী চুলে হাত বুলিয়ে ভাবছে, 'পরচুল প'রে কী আর ফিতে ছবিতে নামা যায়?'

সুকান্ত ঢুকলো সেই সময়, যখন একজন 'হিরো' 'হিরোইনকে'......যাক্ সুকান্ত ঢুকলো। বাইরের আলো হ'তে এসে, ওর চোখে সৃষ্টি হল ধোঁয়া আর অন্ধকার,... অন্ধকার আর ধোঁয়া। 'টর্চ্চধারী' একজন, ভীষণ দ্রুতভাবে এগিয়ে বুক ফুলিয়ে চ'লে গেল; তার টর্চ্চের আলো, সুকান্তকে পথ দেখিয়ে দিল। হুঁ, একটা বিরক্তির স্বর ওর কানে এল, 'আঃ! কী যে......ইত্যাদি' যাই হোক সুকান্ত, সীটের দিকে এগিয়ে গেল, সকলের হাঁটুর স্পর্শে, নিজে ত সচকিত হ'য়ে উঠলই, এমন কী যাদের সঙ্গে এই সংঘাত হল, তারাও মনে, মনে, যথেষ্ট বিরক্ত হল, তা সুকান্ত বেশ বুঝতে পার্লে...কিন্তু উপায় কী?

তারপর আরম্ভ হল বই। বাংলা ছবি... আরম্ভ হতেই ন্যাকামীপূর্ণ অভিনয়, আর যেখানে সেখানে গানের আবির্ভাব হল; সুকান্ত বাংলা ছবির মোটেই ভক্ত নয়, আজও এসেছে হঠাৎ, আরও শুনেছে বইটা নাকি খুব ভাল হয়েছে হাতী মার্কা ছবির চেয়েও। কিন্তু প্রথমেই তার মন গেল বিগড়ে, সে একটা বিশ্রী অসোয়াস্তি অনুভব কর্ল, এমন কী তার ঘুম পেতে লাগল।

সুকান্ত এতক্ষণ কোনদিকে চায়নি; কিন্তু, না, আর চুপ করে বসে থাকা যায় না, কারণ ডানদিক থেকে একটা নরম হাতের ছোঁয়াচ অনুভব কর্লে এবং বেশ বুঝতে পার্লে, যে এ হাত সরাতে গিয়ে হঠাৎ, হাতে হাত লেগে যাওয়া নয়, এ, ইচ্ছে ক'রে হাত ধরা, দস্তুরমত হাত নিয়ে খেলা করা। সুকান্ত, বাঁ হাতে, নিজের হাতের ঘাম মুছে নিল; রূপালী পর্দ্দায়, তখন কী যে ছবি পড়ছে, আর তারা কী বলছে, ওর কাণে কিছু যাচ্ছে না; শুধু একটী কোমল হাতের মধ্যে নিজের হাতখানি ছেড়ে দিয়ে বসে রইল। একটু পরে, সুকান্ত দেখলে; তরুণী সুন্দরী, অবিশ্যি সল্লালোকে, লোকে ও দেখলে, হ্যাঁ সুন্দর বটে কিন্তু এত—!

এবার তরুণী ওর দিকে চাইল,...সুকান্ত দেখলে ওর চোখদুটী আরও.. আরও সুন্দর, বিবাহিতা কীনা, কিছু বোঝা গেল না, অন্ধকার কিনা!...

সুকান্ত দেখলে ওর পাশের সীটে লোক নেই, খালি, 'ওঃ! তাই এত সাহস! একলা এসেছে ছবিঘরে 'রোম্যান্স' কর্ত্তে! সুকান্ত ভাবলে, যদিও তার খুব ভাল লাগছিল, এই চুরী ক'রে ভালবাসা মধুর লাগছিল এই চুলের গন্ধে, নেবুফুলের আমেজ, শরীরের উষ্ণতা, গভীর নিশ্বাস, কিন্তু তবু—ও ভাবলে, বাঙ্গালী মেয়ের অবাধ প্রেম, মুক্তপাখীর মত প্রেম, অনেকটা বর্ষার সময় রোদের মত বিশ্রী...।

সুকান্ত, ওর হাতে অল্প চাপ দিয়ে নিজে হাত ছাড়িয়ে নিল। কতক্ষণ পরে সুকান্তর মনে হ'ল, তার বাহুতে কার একখানি নরম ছোঁয়াচ; সুকান্তর মাথার রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল…ওঃ সেই নরম হাত! ও আর থাকতে পার্লে না, ও বুঝতে পার্লে না কী কর্বে? সমস্ত ভালবাসায় তরুণীর হাত চেপে ধর্ল, তরুণী ওর দিকে চেয়ে চমৎকার করে হাসল।

সুকান্ত ওর মাথাটা হেলিয়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট ক'রে বল্‌ল, 'তোমার নাম কী'? ও, একেবারে 'তুমি' বলে প্রশ্ন কর্ল, কারণ পরিচয় ত ওদের আগেই হ'য়ে গ্যাছে; তাই;…তাছাড়া সময়ের সল্পতা ভেবেও, ও আর 'আপনি'—'তুমি' নিয়ে মিথ্যে কথার জাল বুণে দেরী কর্ত্তে চাইল না তাই ও সোজাসুজি বল্‌লে, 'তোমার নাম কী'?

মেয়েটী উত্তর দিলে না, কথা বল্‌লে না কিছু, কেবল একটু হাসল।

'বল্‌বে না বুঝি'? সুকান্ত বল্‌লে; মেয়েটী কোন উত্তর দিলে না অথচ সুকান্তর হাতে জোরে চাপ দিল।

ওদের সামনে, 'নমস্কার' বা 'Good night'এর 'শ্লাইডখানা' ভেসে উঠ্‌লো; সুকান্ত তাড়াতাড়ি মেয়েটীর গাল হ'তে হাত সরিয়ে নিল; নিজের সিঙ্কের নরম 'ইভনিং-ইন-প্যারিস' মাখানো রুমালখানায় তার এই ভালবাসার স্মৃতিগুলো মুছে ফেলবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল—তখন আলো জ্বলেছে। সকলের মুখে একটা শেষ হওয়ার তৃপ্তি।

যাক্, তখন, অনেকলোক বাইরে চ'লে গ্যাছে। সুকান্তর সাথী ওর দিকে চেয়ে হাসল……পরিপূর্ণ তৃপ্তির হাসি, চমৎকার লাগল সুকান্তর। দু'জনেই বাইরে এল। সুকান্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত, তার সঙ্গে এগিয়ে চল্ল; অন্ধকারে সুকান্ত ওর সাজের দিকে কোন লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এখন দেখল, 'টুয়েনটিএথ্ সেঞ্চুরির' আগুন ওর গায়ে দীপ্তিমান।

সুকান্ত ছাড়া,…সকলেই ওর ভাগ্যকে হিংসা কর্ত্তে সুরু করেছে। গর্ব্বে সুকান্তর মন ভরে উঠেছে; কিন্তু সুকান্ত বাইরে এসে ভাবলে, কথা বলা শোভা পায়না, অথচ তার পরিচয়……, সুকান্ত দেখলে কী একটা লম্বা, অথচ নীচু গাড়ী এসে দাঁড়ালো, তরুণী এগিয়ে গেল, চাঁপার মত আঙ্গুলগুলো দিয়ে গাড়ীর 'হ্যাণ্ডেল' ঘুরিয়ে দিলে, হাতে হীরে 'মারকুইস' আংটীটা ঝক্, ঝক্ করে উঠল।

সুকান্ত গাড়ীর ভেতর উঠবে কিনা ভাবছিল, আর একবার মেয়েটীর দিকে চাইল, সেই সল্লান্ধকারে সুকান্ত স্পষ্ট দেখলে, তরুণীর ছোট চিবুকটী বুকের কাছে নুয়ে এল, ডাকবার ভঙ্গিমাটুকু সুন্দর……

সুকান্ত উঠে ওর পাশে বসল; গাড়ী ছুটে চল্‌ল আলোর সারির মাঝে সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে। মেয়েটী এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলেনি, অথচ সুকান্তর কেমন ভয় কর্ত্তে লাগল; ও সম্মোহিতের মত ওর সঙ্গে কোথায় ছুটে চ'লেছে কে জানে? এলো-মেলো চিন্তা এসে ওর মনকে তোলপাড় কর্ত্তে লাগল, হঠাৎ 'চাংওয়ার' সামনে গাড়ী থামাল, সুকান্তরি মনে হল, ও বিস্ময়ে ফেটে পড়বে। কিছু বলবার আগে তরুণী দরজা খুলে নেমে পরেছে, সুকান্ত সেই খোলা দরজা দিয়ে, রাস্তায় নেমে এল; সুকান্ত ভাবল, রাস্তায় নেমে এক ছুটে বাড়ী পালিয়ে যাবে, কিন্তু তরুণী হঠাৎ ওর হাত ধর্লে, ওকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে গেল। দুজনে ছোট্ট একটা কেবিনে ঢুকলো, তখন তরুণী হাত ছেড়ে দিয়েছে।

সুকান্ত আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে কিছু বলবার আগেই একটী 'বয়' এসে দুটো কাঁচের গ্লাস, আর এক বোতল 'শেরি' দিয়ে গেল; কেষে আনতে বলেছে…! রঙ্গীণ শেরির জল, সুকান্তকে পাগল করে তুল্'ল। ও বল্‌লে, তরুণীকে হঠাৎ জড়িয়ে ধ'রে, 'বল তোমার নাম কী, বল, বল।

তরুণী ওকে ছাড়িয়া দিল না সরে দাঁড়াল না, কেবল অল্প হাসল; সুকান্তর নেশায় লাগল রঙ্গন আমেজ, ও যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললে ও তরুণীর গোলাপী গালে চুমু খেলে। এইবারে মেয়েটী হাসল না, ওর গালে ঠাস্ করে একটি চড় বসিয়ে দিলে।… সুকান্তর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল…চোখ চেয়ে দেখে ওর সীটে ও বসে আছে, দুজন 'ওয়েটার' তার কাছে দাঁড়িয়ে আর একটি মোটা মত ভদ্রলোক, বোধহয় বায়স্কোপের ম্যানেজারই হবে। তিনি একটু হেসে বল্‌লেন, 'কী মশায়, কেমন লাগল?'

সুকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, চমৎকার, কিন্তু………'

—[সমাপ্ত]

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজাবকাশে আমাদের আফিস দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকিবে। আমাদের পরবর্ত্তী সংখ্যা আগামী ১৩ই অক্টোবর হইতে আবার যথারীতি বাহির হইবে। পূজার এই আনন্দ অবকাশ সকলেরই মধুময় হউক—এই ভগবানের কাছে আমাদের একান্ত কামনা। সঃ খেঃ

খেয়ালী চিত্রপট

মেট্রো গোল্ডুইন্ মায়ারের তম্বী তারকা এ্যান্ মরিশ। ব্যাড্‌মিণ্টন খেল্‌তে আর সাঁতার কাট্‌তে মেয়েটি খুব ভালবাসে।•
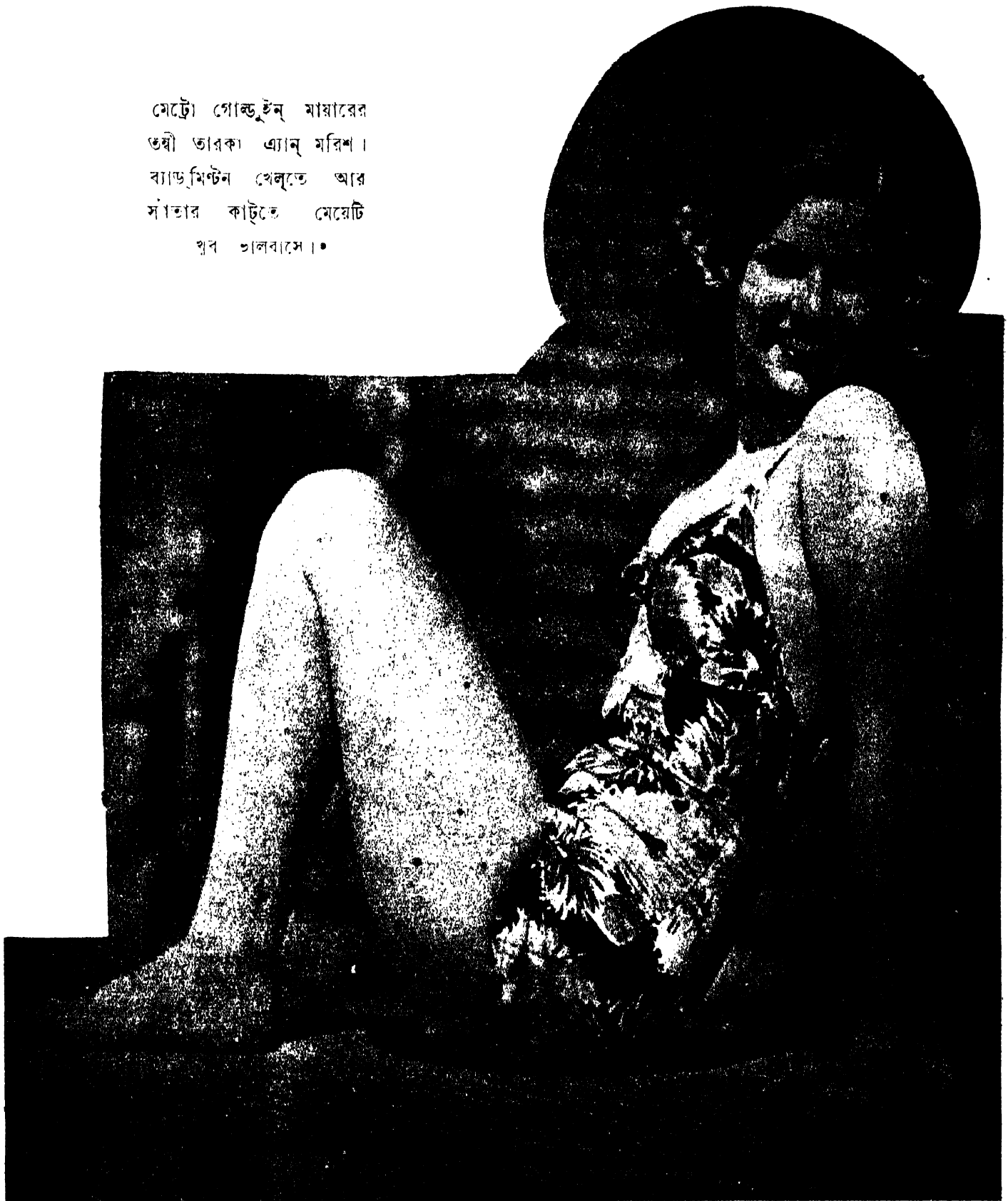
পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে আশ্বিন ১৩৪৫, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩৮ } অষ্টত্রিংশ সংখ্যা

দশম বার্ষিক পরিকল্পনা

শারদীয়া অবকাশের প্রারম্ভে দিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বামপন্থীগণ যে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ এম্, এন্ রায়, শ্রীযুক্ত নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবর্গ দক্ষিণপন্থী নেতৃবর্গের কার্য্যাবলীর ও কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর অনুসৃত কর্ম্মপন্থার যে তীব্র সমালোচনা করেন তাহা শ্রুতিমধুর না হইলেও বিশ্লেষণযোগ্য। তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি বিশেষ গুরুতর। মন্ত্রীমণ্ডলীর অভিযোগ খণ্ডনে ও নিরাকরণে তৎপর হওয়া উচিত।

উক্ত অধিবেশনে ডাঃ খারের বিরুদ্ধে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বিশেষ হ্রাস হওয়ারই সম্ভাবনা। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইতে হইবে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হইবে—তৎপূর্ব্বে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীদের শান্ত করা প্রয়োজন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনের সময় হইতেই আগামী কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন তাহা লইয়া গবেষণা সুরু হইয়াছে। ওয়াকিবহাল মহলে প্রকাশ, যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বা সর্দ্দার প্যাটেল ইঁহাদের মধ্যেই একজন সভাপতি হইবেন। প্রগতিপন্থী, মহারাষ্ট্র ও মহাত্মাজী স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের পুন নির্ব্বাচনই সমর্থন করেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনের পরেই সুভাষচন্দ্র যে দশম বার্ষিক শিল্প সংগঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলালকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী ও এমন কি অকংগ্রেস প্রদেশের মন্ত্রীগণও এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য একযোগে কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতির এই বিরাট সঙ্কল্প সফল হউক ইহা আমরা কামনা করি।

(বিলাসী)

"দেশের মাটি"

বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিবেদন
নিউ থিয়েটার্স কর্ত্তৃক প্রস্তুত
চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও আলোকচিত্রে } নীতীন বসু
শব্দধর : মুকুল বসু
সঙ্গীত পরিচালক : পঙ্কজ মল্লিক
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : সুবোধ গাঙ্গুলী
চিত্র সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র
চরিত্রে : অজয়—দুর্গাদাস, অশোক—সাইগল, শশধর—ইন্দু মুখার্জ্জি, যদু চক্রবর্ত্তী—অমর মল্লিক, গৌরী—উমা, অরুণা—চন্দ্রাবতী। অন্যান্য ভূমিকায়—কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভানু ব্যানার্জ্জি, পঙ্কজ মল্লিক, শ্যাম লাহা, অহী সান্যাল ইত্যাদি।

চিত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন।

প্রথম মুক্তি : 'চিত্রা' ও 'নিউ সিনেমা'

সিনেমা শিল্পের ভেতর দিয়ে দেশের যদি প্রকৃত উপকার সাধন করবার এ অবধি কেউ চেষ্টা কোরে থাকেন তা' হ'লে সর্ব্বাগ্রেই আমাদের নীতীন বসুর নাম কোর্‌তে হয়। তিনি যে ধরণের ছবি তোলেন, তা' শুধু নিছক আনন্দের জন্য নয়—তার মূলে থাকে একটা মহৎ উদ্দেশ্য এবং চলচ্চিত্রে তাই নতুন রূপ, নতুন জ্ঞানে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে, দেশের লোকের চিন্তাশক্তির দ্বারে এসে ধাক্কা দিয়ে তাদের কোরে তোলে সচেতন। আমাদের সোনার বাঙলা যার ধূলিকণা একদিন ছিল স্বর্ণ কণা, আজ সভ্যতার মোহজালে সেই কুবেরের ভাণ্ডার পল্লীকে পদদলিত কোরে তার বুকের ওপর দিয়ে রক্তাক্ত শকট চালিয়ে পল্লীকে শ্মশানভূমিতে পরিণত কোরে লোকে উদরান্ন সংগ্রহের জন্য দলে দলে আস্‌ছে সহরে। কিন্তু পল্লীমায়ের করুণ আর্ত্তনাদে অভিশাপরূপে সহরের বুকে ছড়িয়ে পড়ে এই সব মোহগ্রস্থ

লোকদের জীবনে যে কী হাহাকার তুলছে তা' ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন।

জাতির এই জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে "দেশের মাটি" যে আদর্শ নিয়ে আজ দেশবাসীর সামনে সমুপস্থিত হ'য়েছে এবং কৃষিশিল্প ভিন্ন ভারতের সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য্য এবং আমাদের মত একটি অধঃপতিত জাতির উত্থান অসম্ভব এই মহদ্বাণী প্রচার কোরে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার মিঃ বি, এন, সরকার দেশের জাতীয় জীবনে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা কোরেছেন তা' সত্যই প্রশংসার্হ।

"দেশের মাটি" ছবিটি খুব ঘটনাবহুল নয়। এরূপ প্রচার-চিত্রে অবশ্য ঘটনার প্রাচুর্য্য অবান্তর বলেই পরিচালক হয়তো সাধারণকে খুসী করবার চেষ্টা না কোরে নিজের দৃষ্টিশক্তি ও রসানুভূতির সাহায্য নিয়েই গল্পগঠন কোরেছেন। গল্পটি হ'চ্ছে সংক্ষেপে এই—

অজয় ও অশোক ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অজয়ের ভগ্নি অরুণার সঙ্গে অশোকের অবাধ মেলামেশা ছিল—যার ফলে অশোক-অরুণার মধ্যে যে প্রেমের পূর্ব্বরাগ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে এবং ভবিষ্যতে এরা দু'জনে যে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে এ ধারণাই সবার ছিল। ঠিক হ'লো অজয় ও অশোক বিলেত থেকে ফিরে এলেই এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হবে। বিলেত যাবার সব ঠিকঠাক অজয় অশোকের জন্যে টিকিট কিনেছে—নিজের যেরূপ জিনিষ-পত্তর কিনেছে অশোকের জন্যেও ঠিক সেই সব জিনিষ কিনে যাবার জন্য একেবারে প্রস্তুত—এমন সময় অশোক বল্লে সে বিলেত যাবে না—পল্লীগ্রামে গিয়ে কৃষিশিল্পের উন্নতি সাধন কোরবে।

অশোক তার আর তিনজন বন্ধুকে নিয়ে পাড়াগাঁয়ে গেল। সেখানকার মোড়ল যদু চক্রবর্ত্তীর কাছে চাষের জন্য জমি ভিক্ষা কোরল—কিন্তু সেখান থেকে তারা কেবল অবমানিত ও তিরস্কৃত হ'ল। অবশেষে সেই গ্রামেরই এক অন্ধ বৃদ্ধ ও তার কন্যা গৌরীর আনুকূল্যে এবং অরুণার অর্থ সাহায্যে সমস্ত পল্লীতে নব জীবনের স্পন্দন অনুভূত হ'ল। গ্রামের সরলতা অশোককে এমনভাবে জড়িয়ে ফেল্‌লো যে বন্ধু-ভগ্নি অরুণার অপরিমিত প্রেমও তার কাছে স্বাদহীন বলে মনে হল তাই সে তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিল সরলা গ্রাম্যবালিকা গৌরীকে।

এই ছোট্ট কাহিনীটিকে চিত্রনাট্যে অতি সুসংবদ্ধভাবে গ্রথিত করার ফলে দর্শকমন দস্তুরমত সারাক্ষণ উত্তেজিত কোরে রাখে। অবশ্য অনেকে বলবেন গল্পটির ভেতর বিশেষ কিছু নেই। একথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি যে, এ ধরণের ছবিতে ঘটনার প্রাচুর্য্য বা হাল্কা রসের সৃষ্টি করে দর্শকমন ভোলাবার চেষ্টা করা সমীচীন ও রসানুভূতির পরিচায়ক নয়। এ ছবির মূল উদ্দেশ্য আনন্দের ভেতর দিয়ে লোকের জ্ঞানোন্মেষের সাহায্য করা।

"দেশের মাটি"-র পরিচালনায় নীতীন বসু তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দেশবাসীর প্রাণে নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছেন। একমাত্র পল্লীগ্রামের আবহাওয়ার সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত না থাকায় সেখানকার মেয়েপুরুষদের আচার ব্যবহার, সাজসজ্জা নিখুঁতভাবে রূপায়িত কোরতে পারেন নি। এ ছাড়া পরিচালনা সম্বন্ধে অভিযোগ করবার আমাদের আর কিছু নেই।

ছবিখানির আলোকচিত্রের কাজ হ'য়েছে অতুলনীয়—বিশেষতঃ ঝড় জলের দৃশ্যটি। এই বিভাগে নীতীন বসু যে আজও অপরাজেয়, "দেশের মাটী"র ছবি তা' প্রমাণ কোরেছেন। মুকুল বসুর শব্দ-গ্রহণ পূর্ব্ববৎ অনিন্দনীয় হ'য়েছে। রসায়নাগারের কাজের সম্বন্ধে দোষ দেখাবার কিছু নেই। পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতের কাছে আবহ সঙ্গীত যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। কারুশিল্পের কাজ বেশ কলা সম্মত হ'য়েছে। সাজ-সজ্জা যথোপযুক্ত হ'য়েছে। সম্পাদনায় পল্লীগ্রামের দৃশ্যগুলির স্থানে স্থানে অবান্তরতা দৃষ্ট হয়—এছাড়া সম্পাদনা ভালই বলতে হবে।

"দেশের মাটি"-র অভিনয়াংশ হ'য়েছে অভূতপূর্ব্ব। সরলা গ্রাম্য বালিকা গৌরীর ভূমিকায় উমা ও সহুরে আত্মভোলা যুবতী অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয় "দেশের মাটি"-র প্রাণ সঞ্চারে বহুল পরিমাণে সাহায্য কোরেছে। কিন্তু একথা স্বীকার কোরতে দ্বিধা নেই যে, কুমারী-রূপে এদের দু'জনকেই একটু বেমানান দেখাচ্ছিল। পুরুষ ভূমিকায় দুর্গাদাসের অজয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নায়ক সাইগাল অবাঙ্গালী হ'য়ে পড়ায় তার ভাষার জড়তা এবং ভাষা সাম্‌লাতে গিয়ে ভাবের দৈন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। কঠিন ও কোমল বিভিন্ন রসের বিভিন্ন রূপে Typical পাড়াগাঁয়ের মোড়লরূপে মল্লিকমশাই পূর্ব্ববৎ নিজের ব্যক্তিত্বকে পর্দ্দায় সুপ্রকাশ কোরেছেন। দরদী হৃদয়ের অমৃতধারা সিঞ্চিত হ'য়েছে কৃষ্ণচন্দ্রের অভিনয়ে। ইন্দু মুখার্জ্জির শশধর হাস্যরসের ফল্গুধারায় দর্শকমন আপ্লুত কোরেছে। তাঁর অভিনয় "দেশের মাটি"-র একটি বিশিষ্ট সম্পদ। অশোকের তিনটি বন্ধু ভানু ব্যানার্জ্জি, পঙ্কজ মল্লিক ও শ্যাম লাহার অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অহি সান্যালের ষষ্ঠীচরণ উপভোগ্য।

"দেশের মাটি-"তে গান গেয়েছেন উমা, সায়গাল, কৃষ্ণচন্দ্র ও পঙ্কজ। এদের

সকলেরই গান পর্দ্দার ওপর এক সুরজালের সৃষ্টি—কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্তকর।

মোট কথা, "দেশের মাটি" এই নব জাগরণের দিনে দেশের মনে নব-উন্মেষণা সৃষ্টি কোরে ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতির সহায়তা কোর্‌বে—একথা বলাই বাহুল্য।

সাপুড়ে

পূজোর বন্ধের পর আবার পুরোদমে এই ছবির কাজ সুরু হয়েচে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বিষের-বাঁশী নামে এই ছবিখানির বিবৃতি প্রকাশ কোরেচি। ইতিমধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ ছবিখানির নামকরণ পাকাপাকি ভাবে স্থির কোরেছেন। বাঙলায় সাপুড়ে' এবং হিন্দিতে 'সপেরা' নামে এই ছবিখানি পর্দ্দার গায়ে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

পূজোর বন্ধের মধ্যে এই ইউনিটের কর্ম্মসচীব ছোটাইবাবু এবং পরিচালক দেবকীবাবু গিরিধি অঞ্চল ঘুরে এসেছেন—'লোকেশান্' নির্ব্বাচন করবার জন্যে।

ইতিমধ্যে দু'নম্বর ষ্টুডিওর মধ্যে আর একটি চমৎকার সেট তৈরী হ'য়েচে। সাপুড়েদের ওস্তাদ জহর (মনোরঞ্জন) এবং ছবির নায়িকা কাননকে একত্রে এই সেটে অভিনয় কোরতে দেখা যাবে। সম্প্রতি পরিচালক দেবকীবাবু একটু অসুস্থ। তিনি সেরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলা সুরু হবে।

বড়দিদি

এই চিত্রে মধ্য বয়সী প্রমীলার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে পরিচালক অমর মল্লিক মহাশয় দুটি মেয়েকে নির্ব্বাচিত কোরেছেন। মেয়ে দুটির নাম সাবিত্রী ও শ্রীমতী গুলাব। 'যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দী সংস্করণে নাম্‌বে।

ছবির অর্দ্ধেকের বেশী শেষ হয়েচে এবং যে যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে মল্লিক মহাশয় এবং তাঁর কর্ম্মীসঙ্ঘ কাজ কোরেছেন তাতে মনে হয় ছবিখানি সর্ব্বসাধারণের অন্তরে আনন্দ পরিবেশন কোরতে পারবেন।

ভূষমণ

ভূষমণ-এর কাজ উপস্থিত বন্ধ আছে। পরিচালক নীতীনবাবু উপস্থিত অসুস্থ হয়ে পড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে।

সাথী

সাথী (বাঙলা) ও ষ্ট্রীট সিঙ্গার (হিন্দি)র উভয় সংস্করণই শেষ হয়ে গেছে। যতদূর ঠিক হয়ে আছে তাতে মনে হয় আসছে ৫ই নবেম্বর নিউসিনেমায় 'সাথী' প্রথম মুক্তি লাভ করবে।

এদিকে পরিচালক ফণী মজুমদার সম্পাদনা কার্য্য থেকে রেহাই পেলেই তাঁর পরবর্ত্তী ছবির কাজ সুরু করে দেবেন। উপস্থিত এ ছবিখানির কেবলমাত্র হিন্দি সংস্করণই তোলা হ'বে। ছবিখানি হবে "কপাল কুণ্ডলা"র হিন্দী সংস্করণ।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চাস

প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় এদের "পরশমণি"র শূটিং চলেছে। দুর্গাদাস ধীরাজ, ছায়া, রাণী, জ্যোৎস্না, সন্তোষ সিংহ প্রভৃতির সহযোগে "পরশমণি" আশানুরূপ সাফল্যলাভ কোর্‌বে বলেই মনে হয়।

দেবদত্ত ফিল্মস

শোনা যাচ্ছে, আসছে মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ নতুনভাবে সুরু হবে এবং এবার এখানে পৌরাণিক কাহিনী "শর্ম্মিষ্ঠা" চিত্রান্তরিত হবে। "শর্ম্মিষ্ঠা"-র কাহিনী ভাল ভালভাবে তুলতে পারলে জয় অবশ্যম্ভাব।

কালী ফিল্মস

এদের সম্বন্ধে সঠিক খবর এখনও পর্য্যন্ত আমরা অবগত না হলেও শীঘ্রই যে একটা ব্যবস্থা হবে—এ খবর ঠিক। দু'খানা বই নিয়ে এরা নাড়াচাড়া কোর্‌ছেন।—"শ্রীকৃষ্ণ" আর "রামপ্রসাদ।" কালী ফিল্মসের উত্থান আজ বাঙ্গালী মাত্রেরই কাম্য।

রাধা ফিল্মস

এদের নূতন পৌরাণিক চিত্রালেখ্য (চিত্র+আলেখ্য, বিজ্ঞাপনের একখানি বৃহৎ ব্লক থেকে সঙ্কলিত। প্রচার সম্পাদককে জিজ্ঞাসা কোরতে পরি কী চিত্র' মানে কী? আর 'আলেখ্য' মানেই বা কী?) প্রায় শেষ হ'য়ে এল। শোনা যাচ্ছে, ছবিখানি নাকি 'শ্রী'-তে মুক্তি পাবে।

* * *

আর একখানি পৌরাণিক ছবি "নর নারায়ণে"র শূটিং চলেছে।

মতিমহল থিয়েটাস

এদের পরবর্ত্তী রোমাঞ্চকর কাহিনী হেমেন রায় লিখিত "যখের ধন" ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে প্রায় শেষের পথে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির শিল্পী সংযোগ মন্দ হয়নি তবে "যখের ধনে"-র সন্ধান হরিভঞ্জ কোন পথে দেবেন—ছায়ায় না কায়ায় তা বলা শক্ত!

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া পিক্‌চাস

অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় পৌরাণিক ছবি "দ্রৌপদী"র শূটিং মন্থরগতিতে চলছে।

পূর্ণ থিয়েটাস

এই সপ্তাহই 'অভিজ্ঞান'এর শেষ সপ্তাহ। আসছে শনিবার ১৫ই তারিখ থেকে এখানে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' দেখান সুরু হ'বে।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী প্রিকচার্সের অভিনব সামাজিক কথাচিত্র 'অভিনয়' এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। 'অভিনয়' যে বাঙলা ছায়াচিত্র-

শ্রীনটনাথ

"সমাজ"

জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত নূতন সামাজিক নাটক। নাট্য নিকেতনে গত শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর থেকে অভিনীত হ'চ্ছে। অনেকদিন যাবৎ এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক আমরা মঞ্চে অভিনীত হ'তে দেখিনি। যেখানে প্রবোধ গুহ ও সতু সেনের মত গুণী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সেখানে যে কি বিবেচনায় এই নাটকখানি অভিনীত হবার পাশপোর্ট পেল তা' আমাদের ধারণার অগম্য। তিন ঘণ্টা নাটকখানি অভিনীত হয়। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আড়াই ঘণ্টা নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাত বা চরিত্র পরিপুষ্টি কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। নাটক যেখান থেকে সুরু হয় ঘটনার গতি এই আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী সেখানেই নিশ্চল-ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঘটনার মূল প্রতিপাদ্যও অবাস্তর ও অবাস্তব। একখানি নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক নিয়ে এর বেশী আলোচনা আমরা কোর্‌তে চাই না। এবিষয়ে মুদ্রিত পুস্তক হস্তগত হ'লে আমাদের সাহিত্য সম্পাদক তাঁর নিজ বিভাগে নিশ্চয়ই মতামত ব্যক্ত কোর্‌বেন।

নাটকখানি প্রযোজনায় কর্তৃপক্ষ নমঃ নমঃ কোরে মঞ্চস্থ কোরেছেন এবং সেজন্য তাঁদের ব্যবসায় বুদ্ধির প্রশংসা করা যায়। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও সতু সেন নাটকখানি পরিচালনায় নিজ বৈশিষ্ট্যের ছাপ সর্ব্বত্রই সুপরিস্ফুট কোরেছেন।

"সমাজে"-র ভেতর গীতাংশ নেই বল্‌লেই হয়। যে তিনখানি গান আছে তা' মনে হয় জোর কোরে গাওয়ানো হ'য়েছে—তা' যদি হয় তবে কর্ণপীড়া দেবার কিছুমাত্র দরকার ছিল না।

নাটকখানির অভিনয়ে প্রত্যেকটি অভিনেতাই যথাসম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করবার চেষ্টা কোরেছেন। সেজন্য অভিনয়াংশ নাটকখানির উল্লেখযোগ্য। ছবি বিশ্বাস মঞ্চে প্রথম যোগদান কোরে জমিদার ধর্ম্মদাসের মত একটি সুকঠিন ভূমিকায় সুসংযত অভিনয় কোরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন। প্রথম দিকটা তাঁর অভিনয় খুবই স্বাভাবিক হ'য়েছে। কিন্তু শেষের দিকে সমাজ আর মনের দ্বন্দ্ব এইভাব সুস্পষ্ট হবার অবকাশ পায়নি। এর জন্য অবশ্য তাঁকে দোষী করা যায় না, এই চরিত্রটি তাঁর বয়সের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায় এই অসুবিধা হ'চ্ছিল। যা হ'ক তিনি সুচেহারার অধিকারী—মঞ্চে তাঁর সুনাম অবশ্যম্ভাবী। নায়িকা লতিকার ভূমিকায় চারুবালার মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় অন্তরকে স্পর্শ কোর্‌লেও ভাবব্যঞ্জনার এক-ঘেয়েমির দরুণ চরিত্রটি পূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি। অধীরের ভূমিকায় অমল ব্যানার্জ্জির অভিনয় বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে। সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলীর মহীম চলনসই। ফিরোজাবালার মাধবীও তাই. তবে গান অচল। পশুপতি সামন্তের পুলিশ কর্ম্মচারী অনুল্লেখ্য। গাঁয়ের একটি বৃদ্ধের ভূমিকায় যিনি নেমেছিলেন তিনি প্রচুর হাসিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করবার কিছু নেই।

——

শিল্পের একটি বিশিষ্ট দান সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কাহিনীর অভিনবত্বে ও নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের চমৎকার গতিভঙ্গীতে, অত্যন্ত স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ে, অতুলনীয় দৃশ্যসজ্জায় এবং শ্রীমতী সাধনা বসু ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অপূর্ব্ব চরিত্র অভিব্যক্তিতে যে রসসৃষ্টি হইয়াছে তাহা বাঙলা ছায়াচিত্রে সত্যই দুর্লভ ও অবিস্মরণীয়। 'অভিনয়' রূপবাণী চিত্রগৃহে আরও বহুদিন ধরিয়া যদি প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

—:০:—

প্রিয়ার উদ্দেশে

প্রিয়া মোর,

আজি এই দূর দেশে প্রবাস যাপিতে এসে
তোমারেই পড়িতেছে মনে।
শুধু হাসি শুধু গান তবু মোর মন প্রাণ
তোমাকেই খুঁজিতেছে এসে ॥
দিন আসে যায় দিন তবু মোর চিন্তাহীন
অবসর নাহি হয় কভু।
ব্যোমপথে বলাকায় দূর বন বীথিকায়
তোমারেই হেরি আমি শুধু ॥
প্রভাময় দিনকর নিশীথ রাত্রির পর
যখন উদিত হন্ হেসে।
সেইক্ষণে মনে জাগে প্রিয়া মোর ভালবেসে
দাঁড়ায়েছে কাছে এসে হেসে ॥

তামসী রাত্রির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ রহস্যময়
সে মূরতি নাহি রয় আর।
কনক কিরীট পরি দশদিক ঝলমলি
সম্মুখে আসিলে আরবার ॥
কল্পনা তুলিকা দিয়ে এই ছবি একে নিয়ে
অবসাদ্ গ্রস্ত চিত্ত মোর।
অসহ্য পুলক ভরে নৃত্য করে বারে বারে
কভু তাহে না হয় কাতর ॥
বল বল প্রিয়া মোর একি শুধু স্বপ্ন ঘোর
মুছে যাবে কঠোর আঘাতে?
হৃদয় মন্থন করি যাহা কিছু লিখি আমি
নাহি প্রবেশিবে অন্তরেতে?
পরাণের হাহাকার শুধু হবে ব্যর্থতার
জ্বালাময় তীব্র পরিহাস।
ধরা নাহি দিবে কভু দাঁড়ায়ে দেখিবে শুধু
মর্ম্মছেঁড়া মোর দীর্ঘশ্বাস ॥

উদ্বেলিত হৃদয়েতে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে
হৃদয় চাহিছে আজি মম।
এ রাগিনী রচি আজি তব তরে শুধু সখি
লয়ে তব স্মৃতি অনুপম ॥

শ্রীমনোজ কুমার বসু

মধুপুর
মহাসপ্তমী—

[বাগবাজারের প্রবচন-প্রসিদ্ধ মণ্ডলীর মধ্যেও যে কবিত্বের উন্মেষ হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। গঞ্জিকা-ধূম্রায়িত নভোমণ্ডল হইতে বহুদূরে মধুপুরের পূজাপ্রবাসে শ্রীমান্ মনোজ কুমারের প্রিয়ার উদ্দেশে এই উচ্ছ্বাস হয়ত বর্ত্তমানে "পত্রিকা"র বিজ্ঞাপনের চাপে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে, তবুও আমরা তাঁহার এই ক্ষণ-স্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস তাঁহার সহকর্ম্মীবৃন্দের হস্তে অর্পণ করিলাম—বিচার ভার তাঁহাদের উপরেই !!! স: খে:]

প্রভাত সিনেমা

বাগবান

জেনারেল ফিল্মের অমর চিত্র-কথা "বাগবান" আগামী শনিবার থেকে প্রভাত সিনেমায় ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পড়বে। দর্শকের ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানির জনপ্রিয়তা এখন পর্য্যন্তও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি এবং আরও কিছুদিন ছবিখানি প্রভাত সিনেমায় চল্‌লে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হব না।

উত্তর ভারতের জনপ্রিয় লেখিকা শ্রীযুক্তা আনসারি এই ছবিখানির চিত্র নাট্য লিখেছেন। মুসলমান মহিলা হইয়াও লেখিকা হিন্দু সমাজের যে সকল জটিল প্রশ্ন তুলেছেন তাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। বেগম্ আনসারির এই প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, এবং যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী (কংগ্রেস) পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু প্রভৃতি বহিখানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এতদ্ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু সংবাদপত্রেও এই গল্পের যথেষ্ট অনুকুল সমালোচনা করা হয়েছে।

বাল্য-বিবাহের ফল কিরূপ বিষময় হয় এবং হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ যুক্তি-যুক্ত কিনা,—এই সকল কঠিন সমস্যা সমূহের সুমীমাংসার অবতারণা এই বহিতে উত্থাপিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দর্শকের মনকে ভাবিত করিবার যথেষ্ট খোরাক এতে রয়েছে।

কিন্তু এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন একটানা চল্‌তে থাকে তখন তারই ফাঁকে ফাকে হাল্কা রসের উপাদানও যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। জটিল প্রশ্নে মন যখন ভারাক্রান্ত হতে থাকে তখন মাঝে মাঝে এরূপ হাল্কা রসের খোরাক থাকায় ছবিখানাতে কোথাও এক ঘেয়েমী নেই। যেন শরতের মেঘ ও রৌদ্রের অপরূপ সংমিশ্রণ।

চিত্র-জগতে বিমলাকুমারী ও নন্দ্রেকারের পরিচয় বাহুল্য মাত্র। সুন্দর আননের অধিকারী বিমলা কুমারী ইতিমধ্যেই "বাগী সিপাই" "তক্‌দীর কা তীর" প্রভৃতিতে অভিনয় করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। "বাগবান" ছবিখানাতেও নায়িকা দুর্গার ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন অপূর্ব্ব। তদুপরি তার সুললিত কণ্ঠস্বরে আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হবেন।

"অমর জ্যোতি" খ্যাত মিঃ নন্দ্রেকার এ ছবিতেও নায়ক স্বরূপের ভূমিকায় তার পূর্ণ গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাছাড়া সিতারা, ইয়াসমিন, আসরফ খাঁন, নাজির প্রভৃতিও বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন।

ছবিখানা পরিচালনা করেছেন মিঃ এ, আর, কার্দ্দার।

"জেলর"

প্রভাত সিনেমার পরবর্ত্তী আকর্ষণ হচ্ছে মিনার্ভা মুভিটোনের অতুলনীয় চিত্র সৃষ্টি "জেলর"। পরিচালক সোরাব মোদী ছবিখানার পরিচালনা ও শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন এবং বিভিন্ন ভূমিকায় লাস্যময়ী লীলা চিৎনীস্, শীলা, তারাপুর প্রভৃতি রয়েছেন।

গল্পের অভিনবত্বে এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ছবিখানা এক কথায় হয়েছে অপূর্ব্ব। চিত্রজগতে ছবিখানা এক যুগান্তর আনয়ন করেছে।

যুবক সঙ্ঘ

খিদিরপুর ২৫ ওয়ার্ডের যুবক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এ বছর প্রথম সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন করা নিতান্ত ছেলেখেলা নয়। কিন্তু আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে খিদিরপুরের যুব সম্প্রদায় যে বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে এই পূজার কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। যে কয়েকজন অক্লান্ত কর্ম্মী এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গোপীমোহন দাদা ও শ্রীমতী উমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাদর সম্ভাষণ

আমরা গ্রাহক, গ্রাহিকা, শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবর্গ সকলের নিকট আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

সম্পাদক—"খেয়ালী"

উক্ত অনুষ্ঠানের পর গেল শনিবার দিন পূজামণ্ডপে শ্রীগুরু বালিকা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত 'মীরাবাঈ' নাটক অভিনীত হয়। শ্রীগুরু বালিকা সঙ্ঘের বালিকা অভিনেত্রীদের বয়স ১০ বৎসরএর বেশী কাহারও নয় এবং সম্প্রদায়টীও সৌখিন ভদ্রকন্যাদের দ্বারা গঠিত। এত কম বয়স্কা বালিকাদের দ্বারা এ প্রকার গীতিবহুল নাটিকার অভিনয় যে সম্ভব তা ইহার পূর্ব্বে আমাদের ধারণার অতীত

শিশুদের সর্দ্দি কাশি

কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অধ্যাপক ডাঃ জন পাওয়েল বলিয়াছিলেন যে জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে স্বাস্থ্যকায় শিশুর উপর। পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ভারতবর্ষের মতন আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। ইহা খুব সত্য যে, সাধারণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে জাতির উপর। ওয়ালিংটনে পাবলিক হোম এসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে কয়েকজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপে পূর্ণসুস্থকায় সবল কেবলমাত্র রাশিয়ায় দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে রাসিয়ায় পরিভ্রমন করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, ঐ দেশে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক কথা children first.

আমাদের অভিশপ্ত দেশে প্রতি বৎসর হাজার হাজার অকাল শিশুমৃত্যু দেশের ও জাতির জনসম্পদ হ্রাস করাইয়া দিতেছে। জাতীয় সম্পদ জন শক্তির উপর নির্ভর করে ইহা বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিশেষ ভাবে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরই যখন ইউরোপে পুরুষ সংখ্যা অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইল তখন শয্যাগত শিশুর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে, সুখ সাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ইহা সব দেশেই ধ্রুব সত্য যে শিশুগুলি জাতীয় পুনঃ গঠনের কেন্দ্রস্থল।

ফুস্‌ফুস্‌ ও শ্বাস-প্রশ্বাস রোগের যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে "সিরোলিন রচি" সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। ইউরোপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহচিকিৎসার জন্য অন্ততঃ এক বোতল করিয়া সিরোলিন রচি স্থান লাভ করিয়াছে। এবং যে সমস্ত জননী তাঁহাদের রুগ্ন সন্তান সন্ততিদিগকে সিরোলিন রচি সেবন করাইয়াছেন তাঁহারাই ইহার গুণ ও উপকারীতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন।

(জনৈক চিকিৎসক)

ছিল। কুমারী অরুণীমা (৯ বৎসর) মীরার ভূমিকায় ২৫ খানা গীত সহকারে যে অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছে তাতে আমরা বিস্মিত না হ'য়ে থাকতে পারিনি। অন্যান্য কয়েকটী ভূমিকায় যারা অভিনয় করেছে তাদের মধ্যে কল্যানি, বাণী, প্রতিমা, অনিমা, নীলিমা, পূর্ণিমা, মীরা, ফ্লোরা, রাধারাণি, দুর্গা, কিরণ, জসবতী, উষারাণী, সুকৃক্তি, গৌরি, সরোজিনী, অনিমা, মঙ্গলা, অলকা, শোভারাণী, ডোরা, সুষমা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে আমরা এই সম্প্রদায়ের কর্ণধার মোহিতবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের সার্থকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁর এই প্রচেষ্টা আরও উন্নতি লাভ করুক এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

নিষ্ফল!

কুমারী মলয় গুপ্ত

মোর আশার প্রদীপখানি
জ্বলিবে না জানি!
নিভিয়াছে সে মরমে মরি'
বোশেখীর দুরন্ত ঝড়ে,
তারে জেলেছিনু গো অন্তরে মম,
কহেছিনু গোপন বাণী;
(সে) মোর আশার প্রদীপখানি!
দিনের আলো, গগন পারে
বিদায় মাগি' গিয়াছে চলে;
প্রদীপখানি না বলি' আমারে
নিভিয়াছে কোন্ লগনে—
সে আর জ্বলিবে না জানি—
মোর আশার প্রদীপখানি!
তা'রে জেলেছিনু কত যতনে,
নিভৃত হৃদয় মন্দিরে
কত স্বপনের স্মৃতি বিজড়িত
তন্দ্রাতুর আঁখি দু'টি মোর
চেয়েছিল অনিমেষ নয়নে—
তবু না জানি কেমনে
দিল সে আমারে ফাঁকি
মসীর তুলিকা টানি।
মোর আশার প্রদীপ খানি!

শ্রীশনি গুপ্ত

বহুরূপী নরমা

নরমা শিয়ারার! নরমা শিয়ারার!! ... রূপালী পর্দার ঝিলিমিলির মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য! অতুলনীয় শান্ত সৌম্য মুখশ্রী, কোমল স্থির অথচ উজ্জ্বল রস ঢল ঢল দেহকান্তি! শিল্প জগতের একটী অনিন্দ্যসুন্দর 'ব্যতিক্রম' রূপসা অভিনেত্রী নরমা শিয়ারার!

কিন্তু শুধু ঐ কমনীয় লাবণ্যললিত রূপই নয়, গুণও শ্রীমতীর অসামান্য। তাই আজ নরমা ভুবনপ্রসিদ্ধা, তাই ওর অভিনীত একখানি ছায়াচিত্র বিশ্বচিত্রবিলাসীর পরম কাম্য ধন।

শ্রীমতীর ভুবনবিজয়ী প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত নয় এমন লোক বিরল। ওর অপরূপ অভিনয় আপনাকেও মুগ্ধ বিস্মিত করেছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কি,—শ্রীমতার বহুমুখী প্রতিভা? যে শ্রেণীর যে কোনও চিত্রই হোক্—সাফল্য ওর অবশ্যম্ভাবী। কি করুণরসাশ্রিত, কি হাস্যরসাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার চরিত্র পরিস্ফুটনেই অসাধারণ এই শ্রীমতী এবং সেই স্ফুটমান চরিত্রচিত্রণে বৈচিত্র্যপ্রদর্শনেও তুলনা নেই ওর।

আপনাদের স্মরণ আছে, শ্রীমতা নরমা শিয়ারার 'মেরী এ্যান্টয়নেট্' বাণী চিত্রে নায়িকার অংশ গ্রহণ করেছেন। সেই প্রেম সুবাসিত আবহাওয়ার মোহ ত্যাগ করে আজ উনি এসে দাঁড়িয়েছেন সম্পূর্ণ বিরোধীভাবসম্পন্ন এক কৌতুক চিত্রের ভূমিকায় ক্যামেরার ঈগল চোখের সামনে। পাশে তাঁর জনপ্রিয় নট ক্লার্ক গেবল্।

ষ্টুডিওর এই মনোরম দৃশ্য অতীতের আর একটা দিনে এমনি আর এক দৃশ্যের মধুর স্মৃতি জাগিয়ে তোলে মনে। ক্লার্ককে হলিউডের তারকা রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে ছবি সেই 'ফ্রি সোল' এর একটী সেট। সেদিনও নরমা ও ক্লার্ক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সামনে ছিল তাদের পরিচালক ক্লেরারেন্স ব্রাউন। আর আজও ব্রাউন তেমনি দাঁড়িয়ে এ ছবিখানার নাম 'ইডিয়টস্ ডিলাইট'।

পুরাতনের দাবী

পুরাতনের দাবী চলেছে দর্শক সমাজে। দিকে দিকে সাড়া জেগেছে 'পুরোণো ছবি দেখাও' 'পুরোণো ছবি দেখাও'। জগতের চিত্র-ইতিহাসে এমন কয়েকখানি যুগান্তরকারী সুন্দর ছায়াচিত্রের দর্শন পাওয়া গিয়েছে, যা আমরণ কাল মানুষের স্মৃতি ফুলে পূজা পেয়ে আসবার উপযুক্ত।

কিন্তু মানুষ শুধু স্মৃতি নিয়েই সন্তুষ্ট নহে, ওদের বারবার দেখবার কামনা রাখে তারা। কিম্বা হয়তো স্মরণের কোণে পুরাতনের যে অংশটুকু কালপ্রবাহে ম্লান হতে চলেছে সেটুকুর উপর আবার মোহন তুলিকা বুলিয়ে নিতে চায়। তাই তারা বলে: দেখাও 'শেখ' দেখাও সন্ অব দি শেখ'—দেখাও 'কিড' পুণর্মুক্তি দাও।

চিত্রবিলাসী দর্শকদের এই নুতন দাবী কর্তৃপক্ষদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। এদের মতে—চিত্রশিল্প-কলা আজ অতদূর উন্নতি লাভ করেছে যে উক্ত ছবিগুলোকে মুক্তি দেওয়া আর এখন যুক্তি সঙ্গত হবে না। এই নুতন নুতন চমকপ্রদ টেকনিকের যুগে পুরাতনের পূর্ণমুক্তি হয়তো শুধু হাস্যকর অসাফল্যে পর্য্যবেশিত হবে। কিন্তু দর্শকেরা এ যুক্তি মানতে চায় না। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষও বিবেচনা করে দেখলেন, যে, দর্শকদের এ দাবী নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয়। সুতরাং তারা বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই পুরাতন জনপ্রিয় ছবিগুলির পুনর্মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। 'শেখ' ও 'সন অবদি শেখ' ছবিদুটীতে প্রসিদ্ধ চিত্র-নট রুডল্‌ফ্ ভ্যালেন্টিনোর অপরূপ প্রণয় প্রতিভায় আপনাদের আবার নূতন করে মুগ্ধ করবে নিশ্চয়ই। কল্পলোকের অধীশ্বর ভুবনমোহন ভ্যালেন্টিনোর সুমধুর প্রণয়-লীলা ওর সেই প্রেম কি করে নারীর উপরে প্রভাব বিস্তার করে তাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে নিতো—তার চাক্ষুষ প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সমূহ আপনাকে বিস্মিত করবে।··· ···বস্তুতঃ ভ্যালিন্টিনোর রূপ পরিচয় পিপাসাই এই পূর্ণমুক্তি কামনার একমাত্র কারণ। কিন্তু 'কিড' এর বিষয়ে চার্লি সকলকে হতাশ করেছে। আপনাদের হয়তো মনে আছে—এই 'কিড' ছবিই জ্যাকিকুগানকে চিত্ররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। এই-ই কুগানের প্রথম ছবি। কিন্তু দর্শকদের দাবী মেটাতে চার্লি চ্যাপলিন বিশেষ নারাজ।

হ্যারল্ড লয়েডের মনোভাব কিন্তু অন্য রূপ। পুরাতন কমেডিগুলোর চিত্রসত্ব কিনেছে সে, তবে সেগুলো নিয়ে কি করবে জানা নেই। পুণরায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে, সম্ভব।

কিন্তু কথা হলো এই, যে আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নিত্য নব অভিলাষী দর্শকদের এই সব ছবিগুলো ভাল লাগবে কি না !!

ক্লার্কের নাসিকা

মির্ণালয় ও ক্লার্ক গেবলের ছবি 'টু হট টু হ্যাণ্ডল' এর একটী দৃশ্যে সংবাদ পত্র সেবী আলোকচিত্রকরের ভূমিকায় ক্লার্ক ঘুরিয়ে চলেছে ক্যামেরা।

মির্ণালয়

টিক্ টিক্ টিক্—টিক্ টিক্ সশব্দে ঘোরে নিউজরিল ক্যামেরা।.........

বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলে বিরাট গাড়ী খানা।

ছাদের উপরে ক্লার্ক এক দৃষ্টে নিরীক্ষণরত। অদূরে মির্ণার এরোপ্লেন এই বুঝি যায় যায়—এই বুঝি গুড়ো হয়!!...

চার্লি চ্যাপলিন

অকস্মাৎ এক বিরাট চিৎকার শোনা যায়, দুহাতে নাকটা ধরে বসে পড়ল ক্লার্ক গেবল্।

অভিনয়ের ভীষণ উত্তেজনায় ক্যামেরা-মান মহাশয় নাকটা চেপে ধরেছিলেন ঘুর্ণায়মান চাকাখানার গায়ে—আর তারই ফলে নাসিকার খানিকটা চামড়া গেছে উড়ে। আয়নার দিকে তাকিয়ে ক্লার্ক দেখে, নাকটা লাল-লাল ভারী লাল। সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ যন্ত্রণার জ্বালাময় অনুভূতি।

হ্যাঁ, ক্লার্কের মেয়ে-ভক্তদের চিন্তার বা উদ্বেগের কারণ নেই। এমন বিশেষ কিছুই নয়—শুধু খানিকটা চামড়া ও, সারতে আর কদিন ?

কি বলছেন ? দুঃখু হয় ?... ...তবু তো নাকটা আস্তই আছে দাদা!

অদ্ভুত উপহার

সাগরপারে কোন্ রূপসীর গুণমুগ্ধ আপনি ? এযাবৎ কোনও উপহার পাঠিয়েছেন কি তাকে ? কি ?......ছবি ? ফটো ?......চিঠি ?......দুষ্প্রাপ্য জিনিষ কোনো ?......রত্ন, মণি, মাণিক্য ?...... অপনার স্বহস্তে রোপিত গাছের লাল নীল ফুল ?......অভিনন্দন কিছু ?......

বলি, ব্যাপার কি ? তবে, কি চকোলেট ? না, বড় একটী ডল্ ? না, একটা লালটক্‌টকে ঝুমুর ?......

বুঝেচি, আপনি স্বীকার করতে চান না। কিন্তু এতে লজ্জাটা কিসের ?...এমন

ক্লার্ক গেবল

উপহার তো ওরা হামেসা পাচ্ছে; আর তা একটা নয় দুটো নয়,—ঝুড়ি ঝুড়ি। দোষটা কিসে ?

এইতো সেদিন আপনাদের অতি পরিচিতা ছায়ানটী জোয়ান ক্রফোর্ড একটা বড় পার্শেল উপহার পেয়েছেন। পার্শেলটা এসেছিল ডাকে, ভারী অদ্ভুত আর বিচিত্র কতগুলি উপহার ছিল তার মধ্যে। জোয়ান তো খোলামাত্র একেবারে হতভম্ভ।
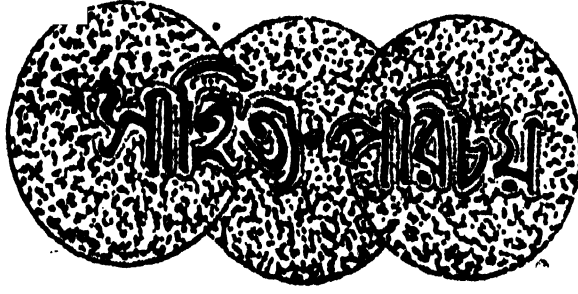
২৪শে এপ্রিল চুপ!—সুকুমার দে সরকার প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমণিমোহন ঘোষ। ঘোষ এণ্ড গুপ্ত, ৩।১ রসা রোড ভবানীপুর কলিকাতা—ডবলক্রাউন ১৬ পেজী – ৯৮ পৃষ্ঠা। বোর্ড বাঁধাই, মূল্য বার আনা।

বর্ত্তমানে উপন্যাসের মধ্য দিয়া মনস্তত্ত্বের নামে যৌনতত্ত্বের বিশ্লেষণ বাঙলা সাহিত্যে ক্রমশঃ একঘেয়ে হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক উপন্যাস লিখিবার প্রচেষ্টা যে বাঙলা কথাসাহিত্যে একটি নূতন দিকের সন্ধান দিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর এই হিসাবে আমরা আলোচ্য গ্রন্থখানিকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিতেছি।

পাশ্চাত্যে এই ধরণের বৈজ্ঞানিক উপন্যাস কথাসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জুল্-ভার্ণের বিজ্ঞানমূলক উপন্যাসগুলি সমগ্র পৃথিবীর পাঠকবর্গের চিত্ত জয় করিয়াছিল। আজিও এচ্-জি-ওয়েল্‌সের বিজ্ঞান ও কল্পনার বিমিশ্র চিত্রগুলি সাধারণের অতি প্রিয়। এই সকল কল্পনাবিলাসী কথাসাহিত্যিকগণ বৈজ্ঞানিক রাজ্যে তাঁহাদিগের অনন্ত প্রসারিণী চিন্তাধারাকে উদ্দামগতিতে অনুপ্রবেশ করিতে দিয়া অনেক সময় যে সকল অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের নিকট নিছক খেয়াল বা উদ্ভট কল্পনা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-ঔপন্যাসিকের এইরূপ কোন কোন অসম্ভব স্বপ্নও বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে। জুল ভার্ণের কল্পিত ডুবো জাহাজ 'নটিলাস্' বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে রূঢ় বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার চন্দ্রলোকে গমনের পদ্ধতিও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের নিকট আর উপহাসের বিষয় নহে—উহা লইয়া প্রচুর গবেষণা চলিতেছে। জানি না, ওয়েল্‌সের কাল্পনিক "অদৃশ্য মানব" কোনদিন কোন বিজ্ঞানবিদের গবেষণাগারে আত্মপ্রকাশ করিবে কিনা।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে যে এ্যালকেমি বা "কিমিয়া বিদ্যা"র তত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইয়াছে সেই গুপ্তবিদ্যার সাধনা মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সবিশেষ প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য জগৎ সে যুগে সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল কিনা, ইতিহাস সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলে না। কিন্তু প্রাচীন ভারত যে এ বিষয়ের রহস্যভেদে সমর্থ হইয়াছিল তাহা ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের রসগ্রন্থগুলিতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও এ সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর আজিও এই কিমিয়াবিদ্যা সম্প্রদায়ক্রমে নাগাসন্ন্যাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে অতি অল্প ব্যক্তিই এ প্রক্রিয়া সাধনের প্রকৃত অধিকারী। লোভী ও ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হইয়া পারদক্রিয়া আরম্ভ করিলে নানারূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হয় বলিয়া যাঁহারা এ বিদ্যা জানেন, তাঁহারাও কদাচিৎ সাহসে ভর করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ভারতীয় প্রক্রিয়া পাশ্চাত্য প্রক্রিয়া অপেক্ষা বহুলাংশে আড়ম্বরহীন ও অভ্রান্ত, কিন্তু তুলনায় বহু কঠিন। আর

এ প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া উপন্যাস রচনা করিলেও পাঠক সমাজের নিকট হইতে "গঞ্জিকাসেবীর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা" প্রভৃতি অম্লমধুর প্রশংসা লাভেরই যথেষ্ট সম্ভাবনা। বর্ত্তমান গ্রন্থকার এদিক্ ছাড়িয়া পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে বাঙলাদেশের পল্লীতে নিভৃতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহার গ্রন্থখানিতে যে বিজ্ঞানসম্মত গুরুত্বের ছাপ পড়িয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। বস্তুতঃ পাশ্চাত্ত্যে এইরূপ নিভৃত গবেষণাগারেই নিকৃষ্ট ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা চলিয়াছে। আর সে চেষ্টা যে আংশিক সফলতা লাভও করে নাই, তাহাও বলা চলে না। তবে পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইলেও গ্রন্থকারের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"এত বেশী এনার্জ্জি খরচ হয় যে দরে পোষায় না।" এ সম্বন্ধে গবেষণা ভবিষ্যতে আরও চলিবে ইহা স্থির। হয়ত এমন দিনও আসিবে যেদিন দুই হাজার টাকা বাজার দরের স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে কুড়ি টাকাও খরচ পড়িবে না। সেদিন পৃথিবীতে আর্থিক অবস্থা উন্নত কি অবনত হইবে, স্বর্ণের অলঙ্কার মাতৃজাতির আর এরূপ প্রিয় থাকিবে কিনা—সে সম্বন্ধে আলোচনা-গবেষণার প্রসঙ্গ ইহা নহে। কি উপায়ে নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়, তাহার যে ব্যাখ্যা গ্রন্থকার দিয়াছেন, তাহা মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মত ও অতি সরলভাবে লিখিত। তবে নিতান্ত বালক বা বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাও যে সকল পাঠকের নাই—তাঁহাদিগের নিকট হয়ত ঐ স্থানটি একটু কঠিন ও নীরস বোধ হইতে পারে। পড়িতে বসিয়া বইখানি যেন বড় শীঘ্র শেষ হইয়া গেল মনে হয়। গ্রন্থখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহার গল্পাংশের মৌলিকতা। কিমিয়াতত্ত্বটি পাশ্চাত্ত্যের অনুসরণে গৃহীত হইলেও উহার সহগামী কাহিনীটি গ্রন্থকারেরই নিজস্ব। গল্পের মৌলিকতা ও কাহিনী-প্রকাশের ভঙ্গিমা শুধু বালক বা শিশু মনের খোরাক জোগাইবে না, বয়োবৃদ্ধদেরও আনন্দদান করিবে।

গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সাবলীল। অতি দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয়ও এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট হইয়াছে। সুন্দর পাইকা অক্ষরে, ফেদার ওয়েট এ্যান্টিক কাগজে মনোরম ছাপা। গ্রন্থমধ্যে তিনখানি চিত্র আছে। ঝক্‌ঝকে বাঁধাই। প্রচ্ছদপটে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে বিস্ফোরণের দৃশ্যের পরিকল্পনাটি গ্রন্থোপযোগী হইয়াছে। আর গ্রন্থের নামটিও গল্পের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। আমরা এ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—প্রিয়দর্শী

গান

শ্রীনির্ম্মল সুর

সে কথা মনে কি আছে,
বলেছিলে মোর কাছে—
বঞ্চিত-হিয়া-রঞ্জিত-করা বাঞ্ছিত প্রেম দিয়া,
সিঞ্চিত করি রাখিবে আমার দীনচিত ভীরু হিয়া॥
আজ কি পড়িবে মনে,
সেই সে মিলন ক্ষণে—
বাহু মাঝে মোর তনুরে বাঁধিয়া কয়েছিলে কোন বাণী—
জানি গো বন্ধু জানি
চির-সঞ্চিত রহিবে এ প্রেম ওগো মোর মরমিয়া॥
আজ, ডুবেছে সে চাঁদ যে চাঁদ আছিল উৎসব রাতি ভরি,
কণ্ঠ জড়ায়ে যে ফুল দুলেছে সে বুঝি গিয়াছে ঝরি।
(আজ) সরে গেছে বারি জাগিয়াছে চর,
পূর্ণিমা শেষে কোথা নিশাকর
বিনা মেঘে তাই বারি ঝরঝর
কুহেলিরে পরশিয়া॥

পৃথিবীর পুত্র—লেখক: পরিমল চট্টোপাধ্যায়। সুনীতি প্রেস হইতে বিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নেই।

মেয়েদের আধুনিক প্রগতিকে কটাক্ষ কোরে লেখক এই পুস্তকখানিকে একখানি নক্সারূপে রূপায়িত কোরেছেন। লেখকের ভাষার ভেতর কোথাও জড়তা নেই এবং রচনার পারম্পর্য্য ও পরিপুষ্টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সম্ভবতঃ পরিমলবাবুর ইহাই প্রথম রচনা—তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোরছি ভবিষ্যতে তিনি যদি ছোট গল্প লেখার চেষ্টা করেন তা' হ'লে তার প্রশংসা পাবেন অনেক গুণগ্রাহীর কাছ থেকে। আলোচ্য নক্সাখানিকে তিনি "পৃথিবীর পুত্র" নামে অভিহিত কোরলেন কেন তা' ঠিক বোঝা গেল না। বইখানির ছাপা আরও ভাল হওয়া উচিৎ ছিল।

—মল্লিনাথ

—:০:—

ত্যাবর্ত্তন

(গল্প)

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা অতনু সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়ে চলেছে; আর বিস্ময়-বিমুগ্ধা মনিকা এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তার সুকুমার মুখের পানে। বাস্তবিক, মনিকার কেবলি মনে হ'তে লাগলো, তার অতি কাছে নীল সোফাটাতে যে উপবিষ্ট রয়েছে সে যেন আশৈশব সহচর অতনু নয়, অন্য কোন অপরিচিত পুরুষ। আর এই পুরুষকেই যেন সে চিরকাল উপলব্ধি করে এসেছে নিদ্রা আর জাগরণে, স্বপ্ন আর চিন্তায়, এরি জন্যে যেন এতো কাল ধরে অপেক্ষা করে এসেছে আগ্রহে আর আশঙ্কায়। এই পুরুষই তার সব অথচ এই পুরুষ অতনু নয়! মনিকা মনে মনে বললে, হে ঈশ্বর, এই পুরুষ যেন অতনু না হয়।

'যদি তুমি কিছু না মনে কর—' নিজের জামার পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে সামান্য ইতস্ততঃ করে অতনু বললে 'যদি অনুমতি দাওতো একটা সিগারেট খেতে পারি!'

'সিগারেট?' মনিকা প্রায় চমকে উঠলো 'সিগারেট ধরেছো নাকি?'

'সে কেলেঙ্কারীর কথা আর জিজ্ঞেস করো না। খাবো একটা সিগ্রেট? এখানে আসা অবধি একটাও খাইনি, অভ্যাস হ'য়ে পড়ায় না খেলে খারাপ লাগে।'

অভ্যাস পাকা হ'য়ে গেছে তাহ'লে—কী বলো?'

'বোধকরি তাই হবে।' দেশলাইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠুকতে ঠুকতে অতনু বললে 'এই ঘরে এখন হঠাৎ কেউ এসে পড়বার আশঙ্কা নেই তো?'

'সম্ভবত নয়। এই ভর দুপুরে যে-যার ঘরে শুয়ে নিদ্রামগ্ন।'

সিগারেট ধরিয়ে জানালার দিকে মুখ করে অতনু টানতে লাগলো। আর মনিকা হাতের খোলা বইটাতে মনযোগ দেবার চেষ্টা করলো। সিগারেটের ধোঁয়ায় অতনু আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখচোখ: সিগারেটের তীব্র সুরভিতে সমস্ত ঘরটা যেন কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভরে গেছে, ...স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস টানতে গিয়ে মনিকার বুকেও এসে যেন লাগছে এই ধোঁয়ার আস্বাদ। একটা অপূর্ব্ব মাদকতায় চোখদুটো আবেশে ঘুমে ভরে আসে।

'কিছুই আর ভালো লাগছে না।' অতনু হঠাৎ কথা বলতে সুরু ক'রলে: ছেলেবেলার জীবনটাকে আবার যদি ফিরে পেতাম! বর্ত্তমানের বিক্ষোভের চেয়ে অনেক ভালো ছিলো সেদিনের সারল্য। বাস্তবিক কিছুই আর তেমন ক'রে ভালো লাগছে না এখন'

মনিকা উত্তর দিলে না। তার চোখ দুটো এতক্ষণে ঘুমে জড়িয়ে এসেছে।

'এক-এক সময় ভাবি', অতনু বলে' যেতে লাগলো: 'গতানুগতিকার বিরুদ্ধে মানুষ কি কোনো কালেই বিদ্রোহী হ'তে পারে না? দুর্ব্বিসহ হ'য়ে পড়েছে আজকের এই রুটিন বাধা একঘেয়ে জীবন যাত্রা: ক্ষণিক সভ্যতার চাপে মানুষ নাস্তিক জীবন-যাত্রা যাপন ক'রছে আর কলের কারখানায় তেল জুগোতে মরছে হাজার-হাজার নিরন্ন মানুষ। সাম্রাজ্যবাদীর পীড়নে আর দুর্ব্বল জাতির আর্ত্তনাদে নিরন্তর আলোড়িত হ'চ্ছে অন্দর আর আকাশ—এইরূপ শোকাবহ দুর্গতির হাত থেকে নরনারায়ণের সত্যি কি কোনো মুক্তি নেই; সত্যি কি আর কোনো ভিন্নতর উপায় নেই বাঁচবার?'

মনিকা একটু নড়ে উঠলো মাত্র। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।

'তাই তো মাঝে-মাঝে ভাবি, কী হ'লে এই ঘুনেধরা সমাজ আর সভ্যতা নিয়ে। এর চেয়ে ঢের ভালো বনে গিয়ে বাস করা, সত্যি মনিকা-দি, তুমি যদি আমার থাকো, বনে যেতেও আমার আপত্তি নেই।'

এতো উদ্দীপনা বুঝি মাঠে মারা গেলো। অতনুর হঠাৎ খেয়াল হ'ল চোখ বুজে রীতিমতো ঘুমোচ্ছে মনিকা। আস্তে-আস্তে সে ইজিচেয়ারে শায়িতা নিদ্রিতা মনিকার খুব কাছে সরে' এলো। নিচু গলায় ডাকলে: 'মনিকা-দি!'

মনিকার কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না।

'বেশ তো মানুষ!' মনিকার মুখের কাছে মুখ এনে অতনু আবার বললে: 'আমি এতো বকে মরছি আর তুমি নির্ব্বিবাদে নিদ্রা যাচ্ছো। ভারী অন্যায় কিন্তু!'

মনিকা তথাপি নিদ্রার ভাণ ক'রে পড়ে' রইলো।

অতনু তার একহাত আলগোছে নিজের হাতের ভেতর তুলে নিলো। নরম মসৃণ রক্তগুপ্ত আঙুলগুলি নিয়ে খেলা ক'রতে

ক'রতে বললে: 'কৈ বললে না, তুমি আমার সঙ্গে বনে যাবে কিনা। আচ্ছা, তোমার বয়স কতো মনিকা-দি?'

বয়স কতো! মনিকা ধরফর ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো।

'ছেলেবেলা তো আমি-ই ছোট ছিলাম—' বিস্ময় বিস্ফারিতা মনিকার হাতের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে হাসতে-হাসতে অতনু বললে: 'এখন বড়ো হ'য়ে কিছু বুঝতে পারছি নে!'

বিকেলবেলা চায়ের টেবিলে আর একবার বিলাসবাবু আর কৌশল্যা দেবীর সঙ্গে দেখা হ'ল অতনুর। মনিকা তখন বাথরুমে প্রাত্যহিক বৈকালিক স্নান ক'রতে গেছে। বিলাসবাবু আর অতনু পাশাপাশি বসে' চা-খাবার খেতে লাগলো।

'হাসি কোথায়?' অতনু কৌশল্যা দেবীর দিকে তাকালো: 'তাকে দেখছি না যে?'

'ছোটু ওকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছে।' কৌশল্যা দেবী বললেন।

অতনু আর কিছু জিজ্ঞেস ক'রলো না।

'এখন তোমাকে একটা কথা বলি—' বিলাসবাবু গোড়া থেকেই বোধকরি এই কথাগুলি বলবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন: 'তুমি মনিকাকে প্রতি মাসে যে বইগুলি পাঠাও সেগুলি আর পাঠিয়ো না।'

অতনু হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা পিরিচের ওপর নামিয়ে রাখলো।

'মিছেমিছি টাকা নষ্ট করে লাভ কী বলো—' বিলাসবাবু আবার বললেন 'মেয়েটাতো আর সত্যি বই-টই পড়াশোনা করে না!'

'ওদিকে আলমারীটাতো একেবারে ভর্ত্তি হ'য়ে উঠেছে—' কৌশল্যা দেবী স্বামীর কথায় যোগ দিলেন 'মনিকা চলে গেলে এসব দেখবেই বা কে?'

চলে গেলে মানে বিয়ে হয়ে অন্য ঘরে গেলে ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট নয়।

'আর তুমি অন্যখান থেকে মনিকার কাছে যে সমস্ত চিঠিপত্র লেখ—' এবার বিলাসবাবু বললেন 'সেগুলিও ক্রমশঃ কমিয়ে আনা দরকার নানা কারণেই।'

'চিঠিপত্রও লিখতে পারবে না?' অতনু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

'লিখতে পারবো না কেন!' কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বিলাসবাবু বললেন 'কিন্তু আমরা তো মরে যাইনি, এখানকার খবরাখবর নেয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, আমাদের কাছে লিখলেই তো পার। আমার কাছে কিংবা আমার স্ত্রীর কাছে।'

অতনু এই মুহূর্ত্তে কী যে বলবে ভেবে পেলো না।

'একি, খাবার খাচ্ছো না যে?' কৌশল্যা দেবী বললেন 'আর একটু চা দেবো?'

অতনু মাথা নাড়লো। সিঙাড়ার এক টুকরা ভেঙে মুখে দিলো।

'এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।' বিলাসবাবুর বক্তব্য বোধকরি এখনো শেষ হয়নি 'সংসারে আরো ঢের ভাবনার জিনিষ পড়ে রয়েছে। সে যাই হোক, আমার কথাগুলি স্মরণ থাকবে তো অতনু?'

অতনু ঘাড় নেড়ে জানালো যে থাকবে।

'তোমাকে আরেকটা সন্দেশ দেবো?' স্বামীকে উদ্দেশ্য করে কৌশল্যা দেবী বললেন 'কচুরীটা বুঝি ভালো হয় নি?'

উত্তরে যা বলবার প্রয়োজন বিলাসবাবু বললেন।

খাবার ঘর থেকে বের' হ'য়ে এসে অতনু চিন্তিত মনে মনিকার ঘরের দিকে এগিয়ে চললো। ঘনায়মান সন্ধ্যার সোণালী আলো তখন পশ্চিম দিগন্ত রাঙিয়ে রেখেছে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মনিকা একাগ্রচিত্তে প্রসাধনে নিমগ্না ছিলো। সে স্নান সেরে এইমাত্র বাথরুমের বার' হ'য়ে এসেছে: কালো-কালো নরম ফুলকো চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো, সমগ্র নিটোল দেহ ঝক্‌ঝকে, ঝল্‌মলে।

একরাশ অগোছালো কালো চুলের ওপর চিরুণী চালিয়ে নিয়ে তাদের বিন্যস্ত ক'রে যখন সে গায়ের রক্তবর্ণ তকতকে ব্লাউস্‌টা দেহের ওপর ভালো ক'রে এঁটে নিচ্ছে, এমনি সময়ে সামনের আয়নায় কার চকিত ছায়া দেখে তাকে থামতে হ'ল নিতান্ত আনমনে অতনু এই ঘরে ঢুকে পড়েছিলো, মনিকাদিকে প্রসাধনরতা দেখে একটু বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই মনিকা ঠিক ততোধিক তাড়াতাড়ি কথা বলে উঠলো।

'চলে যাচ্ছো কেন—'মনিকার গলার আওয়াজ শোনা গেলো 'এদিকে এসো অনু!' তারপর নিজেকে বিন্যস্ত করে নিয়ে বললে 'খবর কী?'

অতনু এসে নীল সোফাটাতে বসে পড়লো।

'আমার দেরী হয়ে গেছে—' ফেস পাউডরের ডিবা নামিয়ে রেখে মনিকা ক্রিমের কৌটটা তুলে নেয় 'যে অসহ্য গরম। ভালো করে স্নানটা সেরে নিতে দেরী হয়ে গেলো; তাই সময়মতো চায়ের টেবিলে যেতে পারলুম না।'

'তুমি কোথাও বেরুবে নাকি?' অতনু একটা ছোট্ট প্রশ্ন করলে।

আমাকে সে রকম লাগছে নাকি? মনিকা বললে 'বেরুতে তো পারি কিন্তু বেড়াবার জায়গা কোথায়? মাঝে মাঝে পাশের বাড়'র আমার সমবয়সী নববিবাহিতা ও নবাগতা মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে

যাই এই পর্য্যন্ত। এছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে পারি, তাইতো মাঝে মাঝে ভারী ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।'

অতনু চুপ ক'রে রইলো।

'কিন্তু তুমি এখন একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসবে না?' মনিকা এগিয়ে এসে অতনুকে স্পর্শ ক'রলো: 'এখানকার পুরানো লোকজনদের সঙ্গে দেখা ক'রবে না?'

'কার সঙ্গে আবার দেখা ক'রবো?' অতনু বিড়-বিড় ক'রলো: 'এই সহরে তোমরা ছাড়া আর কাদের বাড়ী-ই বা আছে যেখানে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে খুসী হ'তে পারি?'

মনিকা ভাবতে লাগলো।

'তার চেয়ে চলো না, তোমাকে সঙ্গে ক'রে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। যাবে?'

'কোথায় যেতে চাও?'

'চলো না যেখানে হয়। নদীর ধারে? অথবা সিনেমায়?'

'সিনেমায়! তুমি খুব সিনেমা দেখ বুঝি?'

মাঝে-মাঝে দেখি। সময়টা একরকম ভাবে কাটাতে হবে তো?'

একটা মস্ত পরিবর্ত্তন, মনিকা ভাবতে লাগলো, এই চার বছরে অতনুর মধ্যে এতোটা পরিবর্ত্তন সত্যি সে আশা করেনি। অতনু এখন সিগারেট খায়; সিনেমা দেখে; দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার বিষয় নিয়ে পলিটিক্যাল তর্ক করে। আর এই অতনুই আজ ভোরের দিকে দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন ক'রেছিলো তাকে একথা মনে হতেই কিসের একটা আরক্তিম সম্মোহে সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। মা-বাবা যে কন্যার প্রতি উদাসীন নন তার একটা কারণ সে এইমাত্র উপলব্ধি ক'রলো।

একটা পরিবর্ত্তন এবং এতোটা পরিবর্ত্তন যে রীতিমতো চোখে ঠেকে; একটা বিস্ময়কর বিপ্লব বলে' মনে হয়। এখনকার অতনুর সঙ্গে আগেরকার অতনুর অনেক তফাৎ; তবু কেন যেন মনিকা নিজেকে নিরস্ত ক'রতে পারে না; কিসের যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ক্রমাগত তাকে ঠেলে দিতে থাকে অতনুর দিকে। মনিকা ঘাবড়ে গেলো; মনিকা ভারী বিপন্ন মনে ক'রতে লাগলো নিজেকে; কোথায় সেই অতনু যার ভেতর সে এককালে দেখেছিলো অপাপবিদ্ধ শিশুর অপার সারল্য?

সিনেমায় যাবে?' অতনু আবার জিজ্ঞেস ক'রলে: 'না আপত্তি আছে কোনো?'

'আমার নিজের হয়তো কোনো আপত্তি নেই—' একটু ইতস্ততঃ ক'রে মনিকা বললে: 'কিন্তু খুব সম্ভব বাবা-মা রাজী হবেন না। বাবা তো প্রায়ই বলেন, বায়োস্কোপ দেখার বিলাসিতাকে তিনি কোনো কালেই প্রশ্রয় দিতে পারবেন না!'

'বিলাসিতা!' কথাটা অতনুর গলায় আঁটকে গেলো যেন: 'আর তুমি যে এই স্নো-পাউডার, ক্রিম আর রুজ ব্যবহার ক'রছো—এইসব?'

'এটা অবশ্য স্বতন্ত্র—' হাসবার চেষ্টা করে মনিকা বললে: 'তাঁদের মেয়েকে নিখুঁত হতে হবে তো? নইলে ভবিষ্যতে পরের হাতে দিতে বেগ পেতে হবে!'

'অতিরিক্ত বিনয় দেখাচ্ছো?' অতনু বললে: 'তোমার মতো চমৎকার মেয়ের পাউডার ঘসে' নিখুঁত হবার কোনো দরকার দেখি না। এটা বাড়াবাড়ি!'

'বাড়াবাড়ি নয়। তোমার চোখে যাকে ভালো লাগে, অন্যের চোখে তাকে কুৎসিতও তো দেখাতে পারে। তুমি একজনের ভেতর যে গুণগুলি আবিষ্কার করো তাকে পছন্দ কর অন্যের চোখে সে-গুণগুলি হয়তো নাও ঠেকতে পারে।'

'কিন্তু এটা অন্তরের কথা। বাইরের রূপটাকে তো আর কেউ অস্বীকার ক'রতে পারে না। তার জন্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকারও প্রয়োজন নেই বোধকরি।'

মনিকা চুপ ক'রে রইলো।

'তোমার এখন যে বয়স—' অতনুর গলা আবেগে গম্ভীর হ'য়ে এলো: 'এর চেয়ে ভালো বয়স আর মেয়েমানুষের হ'তে পারে না। এই বয়সে নিতান্ত কুৎসিত মেয়েমানুষকেও সাময়িক ভাবে সুন্দর দেখায়। কিন্তু তুমি তো আর কুৎসিত নও: তুমি রূপলাবণ্যবতী; তুমি স্বাস্থ্যবতী; এখন এই তো তোমার বাইরের শ্রেষ্ঠ পরিচয়!'

'হ'য়েছে, হ'য়েছে!' মনিকা অকস্মাৎ মুখর হ'য়ে উঠলো: 'ওদিকে আমার এখনো চা খাওয়া হ'য়ে উঠেনি সে-খেয়াল আছে? বক্তৃতা বন্ধ ক'রে চুপচাপ কোনো বই-টই উল্টোতে থাকো; আমি ততক্ষণে খাবারঘর থেকে ঘুরে আসি।'

'হারটা গলায় দেবে না?' অতনু বলে' উঠলো: 'টেবিলের উপর যে পড়ে' রইলো!'

'হারের জয়েনটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে—' মনিকা বললে: 'না দেখে কিছুতেই আর লাগানো যাচ্ছে না। কারিগরের কাছে পাঠিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।'

আমি দেখতে পারি?' টেবিলের ওপর থেকে হারছড়া তুলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত পরীক্ষা করে অতনু বললে 'আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়াও মনিকাদি!'

নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মতো মনিকা আদেশ পালন করে। সোনার হারের সরু গ্রন্থিটা আটকানো বাস্তবিক কষ্টকর. সূক্ষ্ম চেষ্টা করতে গিয়ে অতনু প্রায় ঘেমে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট অনুভব করে

মনিকাদির মনোরম মরাল গ্রীবাটি কোন সময়ে আলগোছে তার কাঁধের ওপর লতিয়ে পড়েছে। আকাঙ্খিত অনভ্যস্ত মৃদু চাপ, একটু জোর করেই অতনু আস্তে আস্তে তাকে সরিয়ে দেয়।

হারটা আর লাগনো হয় না, বাস্তবিক কারিগরের কাছে পাঠানো দরকার। কিছু না বলে মনিকা অতনুর হাত থেকে সেটা তুলে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দেয়। তারপর চলে যায় ঘর ছেড়ে। আর অতনু হাতের কাছে টেবিলের ওপর থেকে 'মহুয়া' বইটা নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকে। হঠাৎ এক জায়গায় তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়:

ফিরাবে তুমি মুখ
ভেবেছো মনে আমারে দিবে দুখ?
আমি কি করি ভয়?
জীবন দিয়ে তোমারে, প্রিয়ে, করিব আমি জয়।

বিঘ্ন-ভাঙ্গা যৌবনের ভার,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলি-ঘাতে হবে না নিষ্ফল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মনিকা ফিরে এসে দেখলে, অতনু কবিতার বইটা হাতে করে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে, নতশিরে কী সব ভাবছে যেন। ঘর অন্ধকার, বাইরের আকাশে ঘোলাটে চাঁদ উঠেছে, তার খানিকটে আলো ক্রমে পড়েছে জানালা গলিয়ে ঘরের মেঝেয়, ঘরময় অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

'সিনেমা দেখা বা নদীর ধারে বেড়ানো ঘটে উঠলো না বলে মন খারাপ হয়ে গেলো নাকি?' মনিকা এসে পেছন থেকে অতনুকে স্পর্শ করলো; 'চেয়ে দেখ বাইরে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। এখন বাগানে বেড়াতে যাবে?'

বাগানে নানা রঙের অনেক রকম ফুল; অনেক রকম ফুলের গন্ধে ঘরের ভেতরটা সুরভিত। এতো গন্ধ যে স্পর্শের মতো লাগে, সিগারেট খেয়ে এই গন্ধ নষ্ট করে দিতে কষ্ট হয়।

'চুপ করে রইলে যে?' মনিকা স্পর্শকে নিবিড়তর করলো, 'বাগানে যাবে না?'

'কিছুই ভালো লাগছে না—' হাত বাড়িয়ে হঠাৎ মনিকাকে আকর্ষণ করে অতি কাছে টেনে এনে উত্তেজিত দুর্ব্বল গলায় অতনু বললে 'কী উপায় হবে মনিকাদি?'

কিসের উপায়? মনিকা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকালো অতনুর দিকে।

'সত্যি কি তুমি বিয়ে করবে? আমার মতো না বিয়ে করে থাকতে পারবে না?

বাগানে একটা বেঞ্চি পড়েছিলো। দু'জনে এসে সেটার ওপর বসে পড়লো। 'শরীরটা ভারী খারাপ লাগছে—' বলতে বলতে অতনু মনিকার কোলে মাথা দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো অসুখ-টসুখ আবার হবে না-তো?'

মনিকা নিঃশব্দে অতনুর মাথার উস্কো-খুস্কো চুলের ভেতর আঙুল চালনা করতে লাগলো। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, গাছের ডালাপালা আর পাতাগুলি দুলে উঠছে, অতনুর চোখ দুটো আরামে ঘুমে বুজে এলো।

'মনিকাদি! অতনু আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলো।

'কী? মনিকার আঙুল চালনা দ্রুততর হয়ে উঠলো।

'না, থাক।' অতনু পাশ ফিরে শয়ন করলো। তার একটা হাত মনিকার কটিদেশে জড়িয়ে গেছে; কিন্তু অতনু স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস টানতে লাগলো।

'সঙ্কোচ করো না—' মনিকা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে 'বলো, কী বলতে চাও।'

'এমন বিশেষ কিছু নয়। আমার ডায়রীর খাতাটা বুক পকেটে নেই। বোধহয় বাগানে আসবার পথে কোথাও পড়ে গেছে। দয়া করে খুঁজে দেখবে কি?'

মনিকার আঙুল চালনা থেমে গেলো। অতনুর মাথাটা সরিয়ে দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। তাড়াতাড়ি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত বাদেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হয়ে অতনুও ছুটে চললো মনিকা যেদিকে গেছে সেইদিকে। অন্ধকারে (কেননা চাঁদ কিছুক্ষণ ধরে' মেঘের আড়ালে অস্ত গেছে;) কিছু ঠাহর ক'রতে না পেরে কোনো বড়ো ইট বা পাথরে ধাক্কা লেগে মনিকা নিশ্চয় মাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে' গেছে।

ব্যাপারটা সত্যি তাই। এবং আঘাতটাও বোধকরি নিতান্ত অল্প নয়। দুটো হাত দিয়ে পা চেপে ধরে' মনিকা রীতিমতো কাঁপছিলো। অতনু গিয়ে তাড়াতাড়ি বসে' পড়লো তার কাছে। পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে একটা কাঠি ধরিয়ে বললে: 'কোথায় আঘাত লেগেছে দেখি?'

দুটো জায়গায় লেগেছে: হাতের কব্জিতে আর হাঁটুর খানিকটে নিচে। ক্ষিপ্রহাতে নিজের রুমাল ছিঁড়ে অতনু বেধে দিলো এই দুটো আঘাতলাগা স্থানে; পায়ের দুটো আঙুল ছিড়ে গিয়েও রীতিমতো রক্তপাত হ'চ্ছে।

'হাঁটতে তো আর কিছুতেই পারবে না—' অতনু বললে: 'চলো ঘরে ফিরে যাই। আমি তোমাকে কোলে ক'রে নিয়ে যাবো?'

'পাগল!' মনিকা ম্লান হাসি হাসলো: 'তুমি পারবে না।'

আরেকটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে অতনু এইবার ভালো ক'রে তাকালো মনিকার দিকে: মনিকার ছলছলো চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল; মাটীর কোথাও হয়তো ভিজে নরম ছিলো; পড়ে যাওয়ায় মনিকার ধবধবে বাহুতে কাঁদা লেগেছে; মনিকার ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসির অপূর্ব্ব মাদকতা।

'দেখি তোমাকে তোমার ঘর পর্য্যন্ত বয়ে' নিতে পারি কিনা—' অতনু পাঁজা-কোলো অবস্থায় মনিকাকে সাপটে ধরলো নিজের বুকের উপর। তারপর চলতে আরম্ভ ক'রলো কিন্তু—উঃ! মনিকা দির শরীরটে কী অসম্ভব রকম ভারী! অতনুর পা দুটো টলতে লাগলো। হয়তো এখনই পড়ে' যাবে।

'বলেছি তো পারবে না।' মনিকা বললে: 'আমাকে নামিয়ে দাও।'

মনিকা-দিকে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিয়ে অতনু হাঁপাতে লাগলো। তার কয়েক মিনিট পর অতনুর ঘাড়ে ভর ক'রে এক হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে' অতিকষ্টে হাঁটতে-হাঁটতে মনিকা এসে পৌঁছালো নিজের ঘরে: একটা সোফায় ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো।

'তোমার জন্যে—' করুণ সুরে মনিকা বললে: 'এই দুর্ভোগ ভুগতে হ'ল আমাকে!'

সুইস টিপে অতনু আলো জ্বালালো। দেশী বিলেতী, ছোট-বড়ো, নানারকম বিচিত্র ও বিদেশী আসবাবে আর ইলেক্‌ট্রিক বাতীর উজ্জ্বল আলোকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটা রৌদ্রফলকিত স্ফটিকের মতো ঝলমল ক'রতে লাগলো। বাইরের বাগানে রজনীগন্ধা, রক্তাশোক, হেনা প্রভৃতি ফুল থরে থরে ফুটে রয়েছে; সুগন্ধে ভেতরটা সুরভিত। সমগ্র বাড়ীর ভেতর—উন্মুক্ত বায়ু, চাঁদ আর আকাশ—এসব দিক থেকে বিবেচনা ক'রলে, মনিকা-দির এই শোবার ঘরটাই বোধকরি সবচেয়ে লোভনীয়।

'এই নাও তোমার ডায়েরী—' মনিকা বুকের ব্লাউজের অভ্যন্তর থেকে সন্তর্পনে ডায়েরী খাতাটা টেনে বের' ক'রে এগিয়ে দিলো: এরি জন্যেই তো যতো কাণ্ড!'

সেটা গ্রহণ ক'রে অতনু জানালার ধারে সরে গেলো: বাইরের চাঁদছোঁয়া অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগলো নিজ মনে মনে।

বাইরে বারান্দায় দেয়ালের বড়ো ঘড়িটাতে ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজলো। ঘড়ির শব্দ কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্যে স্তব্ধতা আর অন্ধকারকে আলোড়িত ক'রলো। তারপর আবার সব চুপচাপ: বাগানের অন্ধকারে কয়েকটা জোনাকী উড়ে বেড়াচ্ছে।

রাত্রির খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে নটা বাজলো। মনিকা এসে শুয়ে পড়লো নিজের বিছানায়: অপার আলস্যে নিজেকে প্রসারিত ক'রে দিলে। অসহ্য ক্লান্তিতে তার দুই চোখ ভরে' হয়তো এখনই ঘুম নেমে আসবে; ছোট্ট একটি নরম অপরূপ ঘুম।

'তুমি তো পাশের ঘরেই শোবে—' চোখ বুজে জানালার ধারে দণ্ডায়মান চিন্তিত অতনুকে উদ্দেশ ক'রে মনিকা বললে: 'রাত্তিরে যদি কোনো দরকার হয় তো আমার সাহায্য প্রার্থনা ক'রো। এখন পাশের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম ক'রতে পারো।

অতনু একপ্রকার তৈরীই ছিলো। ঘরের কোন থেকে নিজের সুটকেশটা তুলে হাতে নিয়ে মনিকাকে সচকিত ক'রে হঠাৎ বললে, ট্রেন ছাড়বার আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকী আছে. আমি তাহ'লে আসি মনিকাদি!'

মনিকা ধড়ফর ক'রে বিছানায় উঠে বসলো, 'কোথায় চলেছো?'

'বাবা-মার কাছে যাচ্ছি, ইষ্টারের এই ছুটিটা তো সেখানেই কাটাবার কথা ছিলো।' অতনু বারান্দায় এসে সিড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো।

'কিন্তু আজকে না গেলেই কি চলতো না?' মনিকা পেছন পেছন ছুটে এলো।

'কী করবো উপায় নেই। অমনিই অনেক দেরী হ'য়ে গেছে।'

মনিকা আবার ছুটে এলো নিজের ঘরে। তাড়াতাড়ি বাগানের দিককার জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ালো। বিপুল উত্তেজনার মাঝে সমস্ত শারীরিক বেদনা সে ভুলে গেছে।

অতনু ততক্ষণে বাগানের ছোট্ট রাস্তাটা পার হ'য়ে প্রকাশ্য পথে নেমে পড়েছে। প্রায় চীৎকার করে বললে; 'আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা করে গেলে না?'

'কোনো দরকার নেই। তুমি তাঁদের বুঝিয়ে বলো সব কথা।'

'কিন্তু যদি কারণ জিজ্ঞেস করে?' মনিকার কণ্ঠস্বর চাপা কান্না আর বিক্ষোভে ভেঙে পড়লো, 'কী কৈফিয়ৎ দেবো তাঁদের?'

'যতোটুকু জানা আছে ব'লো—' অপস্রীয়মান অতনু অনেক দূর থেকে শেষ বারের মতো প্রায় চীৎকার ক'রে বললে: 'কিন্তু সত্যি কথা বলতে কোনো ভয় পেয়ো না যেন!' শেষের কয়েকটি কথা রাত্রির অন্ধকার আর স্তব্ধতায় প্রধ্বনিত হ'ল।

অতনু চলে' যেতেই মনিকা ছুটে এসে ভেঙে পড়লো। নিতান্ত ছোট্ট অসহায় দুর্ব্বল শিশুর মতো বালিসে মুখ গুজে ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে লাগলো: তারপর হয়তো কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

অতনু বিলাসবাবুকে কথা দিয়েছে। নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হবে

— শেষ —

যবনিকা

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

রবিবারের সমস্ত দিনটাই আজ মাটি!

সপ্তাহের আর বাকী ছয়টি দিনের অক্লান্ত এবং অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তি বিনোদনের বহু আকাঙ্খিত এই রবিবার!

উত্তর কলিকাতার সমস্ত সিনেমার দরজায় হত্যা দিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শেষকালে ঠিক করলাম আজকের সন্ধ্যায় গঙ্গার শোভা দেখেই বাড়ী ফেরা যাক

মন অত্যন্ত ক্লান্ত,শরীর অবসাদ ক্লিষ্ট, চিত্ত অশান্ত সিনেমার টিকিট না পাওয়ায়। ওদিকে শ্রাবণ আকাশেও ঘনিয়ে এসেছে মেঘের মেলা, এখুনি হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই নাম্‌বে বর্ষণ ধারা।—

সামনের তের নম্বর বাসখানাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম গন্তব্যস্থল আউটরাম ঘাট!—

বিশাল জল রাশির মধ্যে অশান্ত মনকে যদি খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। আকাশের কালো ঘন মেঘের অন্তরাল হতে নেমে আসছে টিপ টিপ বর্ষণ ধারা।

বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে বাস গেল থেমে একটি তরুণীর বাম করের তাচ্ছিল্য একটি অঙ্গুলি হেলনে।

বাসের সমস্ত যাত্রীর লুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে উঠলো একটি তরুণী

ময়ূর পঙ্খী রংএর বিচিত্র বর্ণ সমন্বিত শাড়ীর অঞ্চল ভাগ পাদুকা যুগল স্পর্শ করেছে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, দেহের মাঝে যৌবনের চঞ্চল ছন্দ, মেয়েটি প্রথম দৃষ্টিতেই সকলের অনুরাগ আকর্ষণ করলে।—

পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে এক লহমায় মেয়েটির অঙ্গ সজ্জা দেখে নিলুম—কিন্তু মুখের দিকে তাকাবার পূর্ব্বেই সে আমার পিছনের লেডিস্ সিট্‌টায় বসে পড়লো।

মুখের পানে তাকাবার অবকাশ না পেলেও অনুমানে বোঝা গেল মেয়েটি সুন্দরী, বিশেষ করে তার সাজ সজ্জায়—দেহ ভঙ্গিমায় বিশেষ একটি ছন্দ আছে।

বাসের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া গেল। খুক্ খুক্ কাশির শব্দ-স্মিত আলাপনের হাসির তরঙ্গ- সাহেবী কায়দায় ইংরাজী উচ্চারণ বাসের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়াকে নিমেষেই বিচিত্রতর করে তুল্‌লে।

আমি আনাড়ী তবুও একটা সিগারেট ধরিয়ে বসলাম।

চলন্ত বাসের দ্রুততর গতি নির্গত সিগরেটের ধোঁওয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে উর্দ্ধ গতিতে পিছনের পানে উড়ে উড়ে চলেছে যেন শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ!

পিছনের সিটের মেয়েটির কণ্ঠে খুক্ খুক্ শব্দ শোনা গেল।

ভারী অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম ছিঃ ছিঃ কী অভদ্রোচিত ব্যবহার আমার! মেয়েটি ভাবছে কি!

সিগরেটের তীব্র গন্ধে এই কাশির উৎপত্তি, ভাবলাম মেয়েটির নিকট নিজের কৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

নিরুপায়ের মতন অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি তখুনি ফেলে দিলাম।

সিগ্‌রেটের ধোঁওয়া খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে, মেয়েটির কণ্ঠে আবার শোনা গেল খুক্ খুক্ কাশির শব্দ!—

এ্যাসপ্লানেড ঘুরে ড্যালহাউসি স্কোয়ারে পৌছাতে বিস্মিত নেত্রে দেখলাম আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে সহযাত্রিণী তরুণী কখন না জানি নেমে গেছে সমস্ত বাসটাই প্রায় খালি।

নিমেষই আমার চাঞ্চল্য শিথিল হয়ে এলো। পূর্ব্বের ক্লান্ত সমস্ত দেহমনে পরিব্যপ্ত হয়ে উঠলো। আসন্ন মনে বাস থেকে নেমে পড়লুম।

আউট্‌রাম ঘাটের জেটির একটি কোনে বহুক্ষণ ছিলাম বসে গঙ্গার বিস্তৃত বক্ষের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শ্রাবণ আকাশের প্রদোষের মেঘভারও ফিকে হয়ে এসে চাঁদের আলো ফুটে বেরুচ্ছে। ওদিকে গঙ্গার বুকে জাহাজের মাল খালাস হচ্ছে—ট্রেনের শব্দ।

দিবসের চিন্তা সিনেমা না যাওয়ার দুঃখ মন থেকে গেছে মুছে। নিবিষ্ট চিত্তে উপভোগ করছিলুম কাব্যমধুর ভাব ঐশ্বর্য্যে ভরা পরম এক মুহূর্ত্তকে।

কিন্তু সে মুহূর্ত্ত সে তপমৌন ভাব গেল ভেঙে। অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম 'খুক্ খুক্' কাশির শব্দে।

বাসের সেই পরিচিত সুর যেন!

উৎসুক দৃষ্টি ফেরাতেই দেখি ময়ূর পঙ্খী সেই শাড়ী ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে সেই তরুণী। কিন্তু এবারে আর একাকিনী নয় মেয়েটির সঙ্গে দেখলুম সাহেবী পোষাক পরিহিত একটি তরুণ যুবক।

—আপনার সিগ্‌রেটের গন্ধটি ভারী strong ডক্টর মিটার! আমি কড়া সিগ্‌রেটের ধোঁওয়া stand করতে পারিনে মেয়েটি বল্‌লে।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে আমি চম্‌কিত হয়ে উঠলাম এ স্বর যেন পরিচিত।

—কিন্তু আজকের রাতটা কি charming বিশেষতঃ এখানকার environ

ment! এর পাশে মনে করুন আমাদের Hospitalএর দৃশ্য মৃত্যুর বিভীষিকা আর রোগের যন্ত্রণা! সঙ্গের পুরুষটি বলে উঠলো।

মেয়েটি ঠিক এতক্ষণে আমারই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইলেক্‌ট্রিকের আলোতে মেয়েটির মুখ স্পষ্টভাবেই এবার দেখা গেল। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় ঘটুতেই একসঙ্গে যেন দুজনেই চম্‌কে উঠলাম। মেয়েটির মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি নিমেষেই যেন মলিন পাংশু বর্ণ আকার ধারণ করলে। এই সময়ে দুজনের পক্ষেই অত্যন্ত অস্বস্তিকর একেবারেই অনাকাঙ্খিত সাক্ষাৎ।

তবুও মেয়েটিই প্রথমে এই বিশ্রী আবহাওয়া কে বদলে দিলে।

বেশ সপ্রতিভ ভাবে সে আমাকে বল্‌লে আরে প্রেমেন দা যে তুমি এখানে? বেড়াতে?

বিস্ময়ের পূর্ণমাত্রা আমি তখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মনের ভেতর তখনও চলেছে সন্দেহের দোলা। পারুল!—পারুলের একী ভীষণ পরিবর্ত্তন! আমি শুধু ছোট্ট করে একটি উত্তর দিলাম—হ্যাঁ।

পারুল তখন নিজেকে বেশ সামলে নিয়েছে। বল্‌লে—তুমি এখন কোথায় আছ? ওঃ কতদিন বাদে দেখা—দেশে টেশে আর যাওয়া আসা কর না কি—দেশের সব খবর কী?

এক সঙ্গে সে অনেকগুলি কথাই বলে চল্‌লো, আমি তার কথার নাগাল ধরে উঠতে পারলাম না। আমাদের গ্রামের পাশের বাড়ীর সেই গ্রাম্য বালিকা, অতীতের সেই পারুল!

পারুল বল্‌লে—আমি এখন এক মাড়ওয়ারী হাসপাতালে নার্সের কাজ করছি। বাবা-মা সব এখানেই আছেন। চোরবাগানে বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। একদিন যেওনা আমাদের বাড়ী।

সঙ্গের সাহেবী বেশধারী তার সাথীটির প্রতি লক্ষ্য করে এবারে সে বল্‌লে—Excuse me Dr. Mitter! প্রেমেনদা আমাদের গ্রাম্য আত্মীয়। এসো প্রেমেনদা তোমার সঙ্গে ডক্টর মিটারের আলাপ করিয়ে দিই আমাদের Hospitalএর R. M. O. আমার বন্ধু গত বছরে বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন ছুরি-কাঁচি-ডিসেক্‌সনের টেবিল নিয়ে কারবার করলেও ডক্টর মিটার এক রকম কবি! তোমার সঙ্গে জম্‌বে ভালো।

প্রেমেনদা আমাদের একজন সুকবি—ডক্টর মিটার আমাকে অভিবাদন জানালেন আমিও প্রতি নমস্কার জানা্লুম। ভারী অস্বস্তিকর মুহূর্ত্ত!

ডক্টর মিটার এবং আমি উভয়েই বাণী হারিয়ে ফেলেছি। ভদ্রতা বজায় রাখতে দুএকটি কথার বিনিময় ছাড়া উভয়ের আর কোন কিছুই নেই।

পারুল কিন্তু বেশ সপ্রতিভতার সহিত এই বিশ্রী পরিস্থিতিটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তার কণ্ঠে অজস্র প্রশ্নবান—বাড়ীর খবর কী। রাসে এতক্ষণ উভয়ে একসঙ্গে এসেছি—কিন্তু কী আশ্চর্য্য কেউই কাউকে চিনতে পারি নি, কবে আমি তাদের বাড়ী যাচ্ছি; এমনি বহু প্রশ্নই সে অনর্গল করে চলেছে।

আলাপ আলোচনার মাঝে সে মোটেই অপ্রস্তুত ভাবের আভাষ পর্য্যন্ত দিতে নারাজ।

কথায় বার্ত্তায় সঙ্কোচ এবং জড়তা অনেকটা গেল কমে।

আউটরাম ঘাটের এদিকটায় বেশ নির্জ্জন ছিল। জেটির'পর আমরা তিনজনে বসে—চাঁদের আলো এখন বেশ পরিস্ফুট! মন্দ লাগছিল না, বিশেষতঃ পারুলের মতন একটি মেয়ের সাহচর্য্যে! ডক্টর মিটার এবং আমি দুজনেই খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলুম এতক্ষণে।

মধ্যে মধ্যে গঙ্গার ছোটখাটো ঢেউ লেগে জেটিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

ওপরের বারাণ্ডায় রেস্তোরাঁ থেকে ভেসে আসছে সাহেব মেমদের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর আর বিলিতি গানের গুঞ্জনধ্বনি! সান্ধ্য ভ্রমণকারীদের সংখ্যাও কমে আসছে-নিশীথিনীর সাথে সাথে!

ডক্টর মিটার বল্‌লেন, প্রেমেন বাবু আপনার স্বরচিত একটা কবিতা যদি শোনান—দিনরাতই আমাকে কাটাতে হয় নিষ্ঠুরতার মাঝে। কার্য্যলক্ষ্মী সভয়ে আমাদের এড়িয়ে চলেন।

পারুলও জেদ ধরলে তার সেই পূর্ব্বের প্রিয় কবিতাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটা শোনাবার জন্যে।

কবিতা? কী আশ্চর্য্য! আমার কবিতার কথা এখনও তোমার মনে আছে পারুল! আমি কিন্তু সত্যি সে সব একেবারেই ভুলে গেছি। সে আজ কতদিন আগের কথা আজ বছর পাঁচেক মোটে আর সাহিত্যের জন্যে লেখনী ধরিনি।

বিমর্ষভাবে কথাগুলি আমি উচ্চারণ করলুম বুকের ভেতর থেকে বহুদিনের পুঞ্জিভূত বেদনা যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চায়।

—ডক্টর মিটার ক্ষমা করবেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার অনুরোধ রাখতে পারলুম না—

পারুল বললে, কেন? হঠাৎ এ বৈরাগ্যের কারণ, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছো! কারুর প্রেমে পড়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে নাকি? কিন্তু আমরা সাধারণতো জানি যে আঘাতের বেদনাতেই কবিতার উৎস খুলে যায়!

আমি হেসে উত্তর দিলাম না, ব্যর্থ প্রেমের আঘাতের কড়া এ বেদনা ব্যাঙ্কের ডেবিট্ ক্রেডিট্ আর ব্যালেন্সিং মনের সমস্ত রসকে নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। অঙ্ক লক্ষীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে গিয়ে কাব্যলক্ষীকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

পারুল সবিস্ময়ে বল্‌লে বলো কী তোমার মতন লোক করছে ব্যাঙ্কে চাকরি? একে চাকরি তারপর আবার ব্যাঙ্ক!—

আমি বললাম এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে? একেই বলে না ভাগ্যচক্র। তুমি করছো Hospitalএ নার্সের কাজ আর আমি ব্যাঙ্কে চাকরি!—

—আচ্ছা ব্যাঙ্কে চাকরি করলে কী আর কবিতা লেখা যায় না? লেজারেও তোমার প্রসাদের কাব্য অক্ষুণ্ণ ছিল।— স্মিত হাসি হেসে ডক্টর মিটার বল্‌লেন।

সে হিসাবের খাতা ছিল জমিদারের— আর জমিদারের অন্তর ছিল সরল। বড় বড় 'ফিগারের' ক্যালকুলেশন কাব্যের কথা মনে আসতে দেয় না ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও আমরা দেখি যোগের স্বপ্ন!

পরিপূর্ণ হাসির তরঙ্গে আমরা তিন জনেই কেঁপে উঠলুম।

—রাত অনেক হয়ে গেল—হাসপাতালে আজ আবার নাইট ডিউটি।—হাতের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে পারুল বল্‌লে ন'টা পাঁচ মিনিট এগারটায় ডিউটি, প্রেমেন দা এবার চলি তবে, তুমি কবে আমাদের বাড়ী যাচ্ছো বলো? হ্যাঁ ভালো কথা যাবার দিন কাকীমাকে আর বৌদিকে অতি অবশ্যি নিয়ে যাবে।

বৌদি! বৌদি তাহলে অর্ডার দিতে হয় বলো।

তেমনি উচ্ছ্বসিত হাসির সুরে পারুল বল্‌লে হরি, হরি তুমি বুঝি এখনো বিয়ে করো নি। চাকরি করছো এখনও বিয়ে করো নি। চাকরি করছো, এখনও বিয়ে করলে না!

আমি বল্‌লুম ওইটেই কেবল এখন বাকী আছে। বিয়ে করা এবং একাদশটি সন্তানের জনক হয়ে মানব জীবনের চরিতার্থ সাধন করা!—

আমার কথায় ডক্টর মিটার এবং পারুল হেসে উঠলো।

ডক্টর মিটার আমাকে সম্বোধন করে বল্‌লেন—আপনি ভারী রসিক লোক—আপনার সঙ্গে আলাপ করে প্রকৃতই খুসি হলুম প্রেমেন বাবু। আজ রেহাই পেলেন—এর পর কিন্তু কবিতা শোনানোর নিমন্ত্রণ রইলো। একদিন দয়া করে Hospitalএ আমার কোয়াটারে পায়ের ধুলো দেবেন। আমিও ব্যাচিলার লোক, যে কাজ আমাদের করতে হয় তাতে সরসতার কোন নাম গন্ধই নেই। আপনাদের মতন লোকের শুভাগমনে মাঝে মাঝে তবু মনের খানিকটা ঐশ্বর্য্যের খোরাক পাওয়া যায়।

পারুল গম্ভীর হয়ে বল্‌লে—ডক্টর মিটারের নাম বিনয় কুমার হওয়া উচিত ছিল। অতি মাত্রায় বিনয় প্রকাশ করেছেন।

উচ্ছ্বসিত হাসি, এবং পরস্পর অভিবাদনের পর ডক্টর মিটার এবং পারুল বিদায় গ্রহণ করলে।

গঙ্গার বুকে প্রশান্ত নীরবতা! জাহাজের মাল নামানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে—ক্রেনের ঘর্ঘর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। নৌকার মাঝিদের কোলাহলও আর নেই। ভ্রমণকারীর ভীড় এখন খুবই কমে এসেছে। বারান্দার ওপরে সাহেব মেমদের কলরবও মন্দীভূত। পরিষ্কার আকাশে শুভ্র ধবল চাঁদের পরিপূর্ণ শোভা সম্ভার আর গঙ্গার মৃদু কম্পিত বক্ষে তার প্রতিবিম্ব। অসংখ্য তারকার দীপ্তি শোভা মনের মাঝে রেখে যায় গভীর একটি ভাবের আবেশ।

পারুল চলে গেলে খানিকক্ষণ গঙ্গার বিস্তৃত গভীর জল রাশির পানে তাকিয়ে রইলুম।

কিন্তু কখন না জানি অলক্ষিতে আবার পারুলের কথা মনের পাতায় সজাগ হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য্য—অত্যন্ত আশ্চর্য্য—পারুলের একী অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন।

আট বছর পূর্ব্বের অশিক্ষিত অমার্জ্জিত সেই গ্রাম্য কিশোরী—আজ তার কী বিচিত্র প্রকাশ!

ভ্যানিটি ব্যাগ আর রিষ্ট ওয়াচ হাতে মুখে কায়দা দোরস্ত ইংরাজী বুলি চোখে মুখে অঙ্গাভরণে সহুরে ইঙ্গ বঙ্গ ভাবভঙ্গি!

সমাজ এবং সংসার একটি কোমল গ্রাম্য কিশোরী বক্ষে যে নিষ্ঠুর বঞ্চনা এবং বেদনার তীব্র কষাঘাত জেনেছিল তারই কী প্রতিক্রিয়া!, সে আজ তার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সংস্কার অন্ধ মন আমার তাতে বিষণ্ণ হয় কেন?

ডক্টর মিটার চমৎকার সদালাপী শিক্ষিত ভদ্রলোক—পারুলের বন্ধু!

পারুল আজ আর সে গ্রাম্য সমাজের রক্তচক্ষুর কোন অনুশাসনকেই মানে না। কিন্তু আট বছর আগের সে পারুল!

আমার কাছেই এসেছে সে কত সঙ্কুচিত চিত্তে—কত চক্ষুর গোপনতার মাঝে।

কলেজের জীবনে কাব্যের ছোঁয়া মনের মাঝে রঙ ধরিয়েছিল—আমার তখনকার প্রিয় সঙ্গিনী এই পারুল।

কতদিন তারই কত উচ্ছ্বাসের বন্যা আগ্রহের আতিশয্যে আমার কবিতার খাতা পরিপ্লাবিত হয়ে গিয়েছিল ছন্দের বন্যায়।

পারুল বলতো, কী সুন্দর কবিতা লেখ তুমি প্রেমেনদা আচ্ছা, যাক্ কবি তারা পৃথিবীর সব কিছুকেই যারা সুন্দর দেখে না?

পারুলের সে কথা আজও বেশ স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে।

যেদিন পারুলের বিয়ে হয় সেদিনের কথা। চক্ষু কোটরগত গাল চড়ানে বিশ্রী লোকটাকে দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন যেন অশ্রদ্ধা জাগে।

সেই পারুলের স্বামী জেনে ভারী রাগ হয়েছিল।

এরই অনতিকাল পরে যেদিন আবার শুনলুম পারুলের শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক চিরদিনের তরে ঘুচে গেছে. সেদিনের বেদনা আজও মনের মধ্যে জাগ্রত।

পারুলের স্বামী অপর একটি কন্যাকুলকে উদ্ধার করেছে পারুলের বেহায়া এবং অসংযত ব্যবহারের জন্যে।

পারুলকে ফিরে আসতে হোল আবার তার দরিদ্র পিতৃগৃহে অশেষবিধ লাঞ্ছনা আর দুর্ভাগ্যের বোঝাকে মাথায় নিয়ে।

দরিদ্রের সংসারে সুন্দরী বয়স্থা কন্যা থাকা মহাপাপ। পারুলের দিকে বহু লুব্ধ দৃষ্টিই বর্ষিত হতে লাগলো। পল্লীগ্রামে দরিদ্র মাতাপিতার বিদ্রোহের কিংবা বাধা দেবার কোন স্পর্দ্ধাই নেই।

গ্রামে এ নিয়ে চতুর্দ্দিকেই কুৎসা এবং নিন্দার বান পারুলের পরই যত কিছু অত্যাচার। বেহায়া মেয়ে, দোষ সমস্ত তো তারই!

গ্রামের সঙ্গে বহুদিনই সম্পর্ক আমার ছিন্ন ছিল।

পারুলের কথা যেন জীবনের কোলাহলে দূরে গিয়েছিল।

বহুদিন বাদে গ্রামে আবার পদার্পণ করায় পারুলের কথা মনে পড়ে গেল।

শুনলুম, তারা সমগ্র পরিবার দেশের মায়া পরিত্যাগ করে কলকাতায় কোন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে চলে গেছে।

গ্রামে পারুলকে নিয়ে অনেক কিছু রটেছিল তাকে কেন্দ্র করে অনেক কুৎসার জঞ্জাল সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারই প্রতিকার নিরুপায় দরিদ্র সংসারটিকে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে।

সেই পারুলের সঙ্গেই আজ আবার দেখা।

বাসের সহযাত্রিনী, আউটরাম ঘাটের সঙ্গিনী, আজকের পারুল আর সেদিনের পারুলে কতখানি তফাৎ।

সেই গ্রাম্য কন্যা দরিদ্র সংসারের কণ্টক এবং বোঝা আজকের সংসারের প্রতিপালিকা দরিদ্র পিতামাতার পরম আশ্রয়-স্থল

বেশ ভূষায় কথায় বার্ত্তায় ভাবে-ভঙ্গিতে আজকের পারুল চমক্ জাগায়।

সেই সরল কুণ্ঠিত লজ্জারুণ কোমল গ্রাম্য কিশোরীর মুখ খানিতে টয়লেটের উগ্রতা, কথায়-বার্ত্তায় সহুরে সভ্যতা।

বাসের একাকিনী পারুলের নিংসঙ্গতার অভাব পূরণেই ডক্টর মিটারের হয়ত বা আবির্ভাব আউট্রাম ঘাটে।

কিন্তু ডক্টর মিটারের সঙ্গে তার এই অসঙ্কোচ মেলামেশা সেদিনের পারুলের কোন পরিচিতিই দান করে না। সে পারুলের সঙ্গে আজকের পারুলের কোন মিলই যেন নেই।

তার এ পরিবর্ত্তনে মনে আজ বিস্ময় জাগে।

ডক্টর মিটারের সাথে একটি বিবাহিতা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর অসঙ্কোচ বাধাহীন মেলামেশা সংস্কার ক্লিষ্টমনে দ্বিধা জাগায়।

মনটি কেমন যেন হয়ে ওঠে, পারুলকে যেন আজ এ ভাবে দেখতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

কিন্তু তার মতন অসহায়া মেয়ের জীবন সমস্যার প্রতিকারই বা কী?

সে প্রশ্ন মনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল অকস্মাৎ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির স্পর্শে। চমকিত হয়ে উঠে পড়লাম।

আকাশের চাঁদ গাঢ় মেঘের অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে। গঙ্গার বুকে নিস্তরঙ্গ বিষণ্ণতা।

সঙ্গে ছাতা নেই। কাল আবার অফিসের গুরুতর পরিশ্রম।

দ্রুততর গতিতে পা বাড়িয়ে দিলুম হাইকোর্টের ট্রামের দিকে।

পারুলের ছায়া মন থেকে কিন্তু এখনও অপসৃত হয় নি।
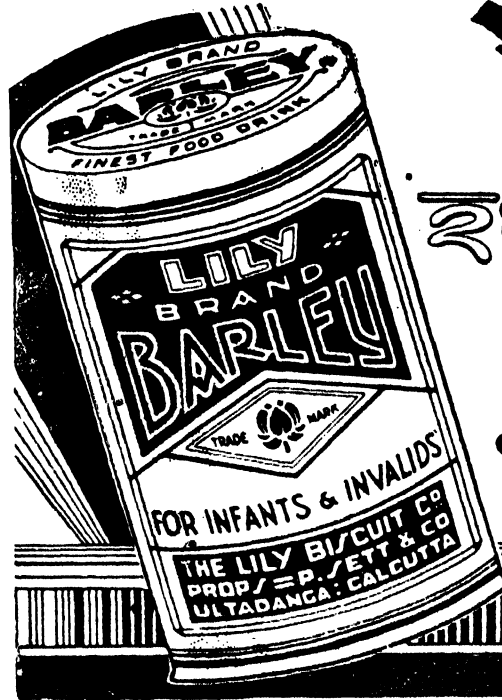
প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পর্য্যায়

ধরে নেওয়া যাক তার নাম চপল কুমার। ডিঙিয়েছে কলেজের তিনটে ধাপ, তবুও ঘোচেনি কল্পনার কুয়াশা। দারিদ্র্য আর বাস্তবতা তাগিদ দেয়, কল্পনার জাল ছিন্ন করতে. কিন্তু মন মানে না। কলম চলে। কাগজে কাগজে বেরয় তার নিদর্শন। পাঠকরা কিনে পড়ে, লেখকরা মজুরী পায় না। সম্পাদক বা কাগজের সত্বাধিকারীরা লেখক মেরে খায়, তাই লেখকের জমার ঘর শূণ্য।

দিন যায়। জমে চলে ভাবের ফেনিল জল। তলা দেখা যায় না। খালি বুদ্বুদ আর আবর্ত্ত। ওর তলায় মাটী না চোরা-বালি ভালো করে বোঝা যায় না। বুঝবার চেষ্টাও যে আছে তাও বলা চলে না ঠিক। তবু আশা জাগে পূর্ব্বাকাশে হয়তো বা জাগবে আলোর রেখা। পুবের অন্ধকার ঘরের কোণটা হয়তো একদিন উঠবে হেসে। জীবনের পথ ও পাথেয়কে হয়তো একদিন চেনা যাবে। রাতের সাধনা হয়তো দিনের কামনাকে দিতে পারবে না ফাঁকি।

চপলের ঘুম ভাঙলো একটু দেরীতে। রাত্রের স্বপ্ন বুঝি চোখ ছাড়তে চায় না। বিদেশ ঘুরে ও চলেছে কোন সুদূরে।

কর্ম্মব্যস্ত মহানগরী। দৈহিক স্বাস্থ্যের নিয়ম মানতে গেলে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যকে দিতে হয় বলি—এই হচ্ছে ওর ধারণা। স্বপ্ন যদি সত্যি হতো।—ও ভাবে। ওর মন ততক্ষণে গিয়ে পোঁছেচে জার্ম্মেনীতে। সেখান থেকে একবার ইটালীটা ঘুরে যাবে কিনা তাই ভাবছে।

"বাবু"—বাচ্চা চাকরটা সত্যিই হয়ে উঠেছে কাণ্ডজ্ঞানহীন। ওকে দিয়ে আর চললো না। এত সকালে·········নাঃ উঠতে হলো। চা আর খট্‌খটে টোষ্ট। চপল পাশ ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চায়ের কাপে যে দেয়নি চুমুক, বাঁহাতের কনুইটার ওপর ঈষৎ ভরদিয়ে যে ধরিয়ে নেয়নি ভিজে ঠোঁট দুটোর মাঝে শ্বেতাঙ্গী সিগারেট, সে জাবনের আরাম উপভোগ করেনি বল্‌লেই চলে। সবটাই তার রয়ে গেছে বাকী। রবিঠাকুর ধরণে ও কথা কয়টা মনের ভেতর দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল। নাঃ 'চা'টা গেছে ঠাণ্ডা হয়ে। অন্তত: বিছানার শুয়ে এই উত্তাপের কিছুই সহ্য করা যায় না। বাচ্চাটাকে সে আবার ডাকে। সে কাছে এলে মোটা একটা কিল তার দিকে উচিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে—ভয় নেই মারবো না। কিন্তু মারতে ভয়ানক ইচ্ছে করছে আমার, শীঘির ছুটে পালা, গিয়ে এক কাপ গরম চা নিয়ে আয়। না থাকে তো মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে······। বুঝলি? কি বুঝলি? পয়সা নিয়ে, বুঝি আমি তোমাকে ট্যাকে গুঁজতে বলেছি? বক্‌শিস্? কিসের বল দেখি? ঠাণ্ডা চা যেহেতু এনে দিয়ে আমার সকালের আরামটা দিলে খেয়ে? হতভাগা দাঁড়িয়ে আছিস্ এখনও? আর দেরী করলে যে······নাঃ তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। পাজী দেরী করলে যে দুকাপের অর্ডার দিয়ে দেব তা জানিস না? আর হ্যা—কিছু বুদ্ধি নেই তোমার হতভাগ্য মুর্খ্য কোথাকার। বলছিলুম কি, সিগারেটও তো নিয়ে আসবি? না কি শুধু চায়ের পয়সাই চেয়ে নিবি মার কাছ থেকে? তা বলে বুঝি তোকে আমি বলছি সিগারেটের নাম করে চাইতে? বলবি ওই একটা জিনিষ আনতে হবে, বুঝলি? আর এক কাজ করিস? সিগারেট আর চুরুট মিশিয়ে নিয়ে আসবি কেমন? ঢুকলো কানে? তাবলে যেন পয়সায় দুটো-ওয়ালা গোল্ডফ্লেক্ নিয়ে বস না।

চাকরকে চা আনতে দিয়ে চপল চাদরটা পায়ের ওপর টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। ওর মনে তখন এক প্রশস্ত প্রশান্তি। মনটা যেন ভয়ানক আল্‌গা গোছের।

বাইরে কাদের ডাক শুনে ও ধড়মড় করে উঠে বসলো। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলে অভাবনীয় ব্যাপার। মোটরে এসেছেন কয়েক ভদ্রলোক। চিনতে না পেরে ও অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো ওঁদের পানে।

নমস্কার! এইটাই চপলবাবুর বাড়ী?

—নমস্কার! আজ্ঞে হ্যাঁ, এইটেই বটে। কাকে চান আপনারা?

—চপলবাবুর সাথে দেখা করবার উদ্দেশ্যই ছিল। আছেন কি তিনি বাড়ী?

চপল ভেবে পেলে না তার সাথে এই সব বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে! ও গেল খানিকটা নার্ভাস হয়ে, বল্‌লে—হ্যা আছেন তিনি বাড়ী। আসুন বসবেন ভেতরে।

ভদ্রলোকগুলি নেমে এলেন গাড়ী থেকে। ওকে অনুসরণ করে এসে হাজির হলেন ওরই ঘরে। ওদের ঘরে বসিয়ে ও কি করবে না ভেবে পেয়ে খানিকটা বাইরে থেকে পাইচারী করে এল। ফের ঘরের ভেতর এসে মশারীটা না তুলেই বসে পড়লো খাটের ওপর।

এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—কই চপল বাবুকে খবর দিয়েছেন ?

—এই যে—বলে ও খানিকটা নড়ে চড়ে বসলো।

—বাঃ আপনি তো বেশ লোক মশাই। আপনাকে বললাম চপলবাবুকে একটু ডেকে দিতে, আর আপনি কিনা বেশ গুছিয়ে বসলেন আবার! চপলবাবু কে হন্ আপনার ?

—আজ্ঞে……এই হন……মানে কেউ না।

—কেউ না ? তবে আপনি তাঁর বাড়ীতে এমনিই থাকেন বুঝি ?

অপর একজন বল্লেন—তা নাও হতে পারে মৃণাল বাবু। উনি কোন বন্ধুও তো হতে পারেন। হয়তো এসেছেন দুদিন বেড়াতে। তাই বাড়ীর কাউকে চেনেন না। কেমন আমি ঠিক বলেছি কিনা বলুন ? আপনি চপলবাবুর কোন বন্ধুতো ?

চপল ক্রমশঃ নার্ভাস হয়ে পড়তে লাগলো। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বল্লো—আজ্ঞে বোধ হয় তাই।

মৃণালবাবু ওর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বোধ হয় তাই মানে ? আপনি বুঝি তাঁর দেশের লোক ?

—আজ্ঞে তা……বলে ও উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় ওর দাদা ঢুকলেন ঘরে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ফিট্‌ফাট্ মানুষ। চাকরী করেন এক সওদাগরী অফিসে। ওর দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভদ্রলোকরা উঠে দাঁড়ালেন। বল্লেন—এই যে নমস্কার। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। একে তাই ডেকে দিতে বলছিলাম আপনাকে।

ওর দাদা প্রতি নমস্কার করে চিনলেন না কাউকেই।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আমাকে ডাকছিলেন ? কি প্রয়োজন আপনাদের বলুন। আপনাদের কাউকে চিনি বলেতো মনে হচ্ছে না।

—কি করে আর চিনবেন বলুন। আপনাকে কিন্তু আমরা খুবই চিনি। শুধু আমরা কেন, দেশের অনেক লোকই চেনে, কিন্তু পরিচয় করবার সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলুন ? আপনি তো বিশেষ কোথাও বেরুন না, তাই আমরা নিজের গরজেই এসেছি। পর্ব্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই যেতে হয় পর্ব্বতের কাছে, বুঝলেন, না—বলে মৃণালবাবু একটু হেসে উঠলেন।

চপল ওধারে উঠে পড়েছে। পাশ কাটিয়ে ও ততক্ষণ এগিয়েছে দরজার দিকে।

মৃণালবাবু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা উনি আপনার কে হন বলুন তো ? দেশের কোন পরিচিত লোক, না ? ওর দাদা বললেন—তা হতে যাবেন কেন ? ওতো আমার ছোট ভাই।

মৃণালবাবু একটু বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করে বললেন—ভাই ? তবে যে উনি বল্লেন—দেশের লোক ! ওঁর মাথা একটু ক্র্যাক্ আছে না ?

ওর দাদা হেসে বল্লেন—ও হতভাগা অমনি পাগল। কি যে বলে বা করে কিছুই খেয়াল থাকে না।

(ক্রমশঃ)

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সেদিন কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে আদালতের ছুটি ছিল। নীরদবাবু অলস-ভাবেই গৃহের মধ্যে মধ্যাহ্ন কাটাইতে-ছিলেন।

নীরদবাবুর শোবার ঘরের সমস্ত জানালাগুলিই বন্ধ, গৃহের মেঝেয় একটি শীতল পাটি বিছাইয়া তিনি দিবানিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া আছেন। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া কিছুতেই তিনি শান্তি পাইতেছিলেন না। অবশেষে রামদীনকে দিয়া লবঙ্গকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

লবঙ্গ আসিলে বলিলেন: রবিবাবুর সেই কবিতার বইখানা আনোনা লবঙ্গ! তুমি একটু সুর ক'রে পড়ো, আমি শুনি!"

—সে বইতো আমার নয়!

—কার বই?

—নিরাপদ ঠাকুরপোর! আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি!

—তবে যা হয় একখানা বই নিয়ে এসে পড়ো। তোমার মুখে পত্ত বড় সুন্দর শোনায়!

লবঙ্গর ভ্রূযুগল অল্প একটু নড়িয়া উঠিল। সে বলিল: আমার কাছে এখন আর কোনও কবিতার বই নেই!

নীরদবাবু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন: মিথ্যাবাদী! এই কাল দেখলুম, কি একখানা বই সুর ক'রে পড়চো!

—সে রামায়ণ! সে আপনার ভাল লাগবে না!

—খুব ভাল লাগবে! তুমি নিয়ে এসো দেখি!

লবঙ্গ বই আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল: বলুন, কোন্ খানটা পড়বো?

—পড়োনা, যেখানটায় তোমার বেশ লাগে।

লবঙ্গ যেখানে বসিয়া পাঠ করিতেছিল, নীরদবাবু আস্তে আস্তে গোড়ালির উপর ভর দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। লবঙ্গ যখন পাঠে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। যখন তাহার সীতা বনবাসে গিয়া রামের জন্য হা-হুতাশ করিতেছেন ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বাল্মীকির আশ্রমস্থল প্রকম্পিত করিতেছেন, —তখন নীরদবাবু সহসা লবঙ্গর কোলের উপর তাহার মাথাটা ঝুলাইয়া দিয়া সটান হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

—একটা বালিশ এনে দেবো, তাতে মাথা রেখে শোবেন?

বালিশ ত পেয়েছি! তবে বালিশের অধিকারী জাত যাবার ভয়ে না সরিয়ে নেয়!

—জাত কি আর আছে? সেতো আগেই খোয়া গেছে!

—গেছে না কি? তবে আর কি? সে উৎপাতটা যখন একেবারেই গেছে, তখন আরামটাকে আর ছাড়ি কেন? আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুই, তুমি আতিথ্যস্বরূপ আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। পাকা চুলগুলির উপরেও তোমার হিংস্র নখগুলিকে লাগিয়ে দিতে পারো!

—রামায়ণ পড়া শুনবেন না?

—না লবঙ্গ! আমার এখনও সে বয়স আসে নাই! ওটা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখে দাও!

লবঙ্গ রাগ করিয়া রামায়ণ বন্ধ করিল; এবং নেহাত অনিচ্ছাস্বত্বে নীরদবাবুর মাথার উপর তাহার চম্পকাঙ্গুলি চালাইতে চালাইতে বলিল আপনার মাথায় আর পাকাচুল নেই!

—যে গুলো ছিল, তোমার আঙ্গুলের কলপে সেগুলিও বোধ হয় কাঁচা হয়ে গেলো!

—আচ্ছা, আমাদের দুজনকে এমন ভাবে দেখলে লোকে কি বলবে বলুন দেখি!

—লোকে বলবে এই মেয়েমানুষটি অত্যন্ত সেবাপরায়ণা! একজন অনাথ পুরুষকে আপনার মনপ্রাণ দিয়া সেবা করার পুণ্য অর্জ্জন কচ্ছে! এমন নিঃস্বার্থ মেয়েম মুষের স্থান সমাজের খুবই উচ্চে!

লবঙ্গ একথা শুনিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সে নিঃশ্বাসটি যেন বলিতে বলিতে বাহির হইল, সমাজের যে স্থানে তুমি ইহাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সে স্থানটিকে তুমি হাজারবার উচ্চ বলিলেও, সেটি নরকেরও নিম্নতর প্রদেশে, তাহার চেয়ে নীচে সমাজের আর বোধ হয় কোনও স্থান নেই! লবঙ্গর দীর্ঘনিঃশ্বাস এই আন্তরিক প্রতীতিরই প্রতীক মাত্র! তবু লবঙ্গ কোনও প্রতিবাদ করিল না! যন্ত্রচালিতের মত নীরদবাবুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে লবঙ্গ চমকিয়া উঠিল। আনত চক্ষু উপর দিকে তুলিয়া দেখে, ঘরের দ্বার হঠাৎ উন্মুক্ত —এবং যাঁহার মূর্ত্তি সেই দরজায় আত্মপ্রকাশ করিল, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং—

ঘরের মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও লবঙ্গ অধিক চমকিত হইত না, লজ্জা ও সম্ভ্রমের একটা বিষম ঝড় তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি নীরদ বাবুর মাথাটা ঠক্ করিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া, গাত্রের বসন সংযত করিতে করিতে, একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। সর্ব্বাঙ্গে এমন একটা অপ্রস্তুতের ভাব ফুটিয়া উঠিল সে দাঁড়াইয়া উঠিয়াও আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিল না। দ্বারে দাঁড়াইয়া একেবারে খোদ জগত্তারিণী! মূর্ত্তিটা যদি তিনি না হইয়া একটা উন্মুক্ত বাঘও হইত, তাহা হইলেও লবঙ্গ অধিক আশঙ্কিত হইত না। এতদিনের পর দেখা! তবু যে লবঙ্গ গিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিবে, সেটুকুও সে ভুলিয়া গেল। যে নারী তাহার জননীর চেয়ে অধিক স্নেহপরায়ণা ছিলেন, যাঁহাকে সে দেবতার চেয়ে অধিক ভক্তি করিত, এতদিনের পর তাঁহাকে দেখিয়াও সে আনন্দে ছুটিয়া গেল না. কুশল সম্বাদ অবধি জিজ্ঞাসা করিল না।

জগত্তারিণী কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইলেন না, কোনও কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে পশ্চাৎ ফিরিয়া তিনি আবার অপসৃতা হইলেন।

লবঙ্গ কি করিবে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; অবশার মত সেই খানে বসিয়া পড়িল। নীরদবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন: —উঃ! এমন লেগেছে! আচ্ছা লবঙ্গ তুমি মাঝে মাঝে এমন নিষ্ঠুর হও কেন বল দেখি?

—চুপ! মা এসেছিলেন!

—মা? কোন্ মা?

—যে মা কাশীতে ছিলেন, তিনি হঠাৎ—

লবঙ্গ আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। তাহার গলা শুকাইয়া কাঠের মত হইয়া গিয়াছিল।

রামদীন হঠাৎ দ্বারের নিকটে আসিয়া বলিল: "বাবু? মায়ি আসিয়া!"

নীরদবাবুর আর কোনও সন্দেহ রহিল না যে, তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী কাশী হইতে ফিরিয়াছেন। লবঙ্গর মুখ যে ছাইএর মত সাদা হইয়া গিয়াছে, এতক্ষণে তিনি তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। রামদীনকে বলিলেন: যাও! মায়িকে বলো, হামারা থোড়া দের্ হোগা!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

লবঙ্গ কিছুতেই মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারিল না। দ্বারের কাছে তাঁহাকে দেখা অবধি সে তাঁহার নিকট হইতে একেবারে বিশক্রোশ তফাতে গিয়া পড়িয়াছে।

সে নীরদবাবুর ঘর হইতে, বারান্দার দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিল। দুপুর কাটিল, বিকালও কাটিল, সন্ধ্যার সময়ে এক ঝি আসিয়া লবঙ্গকে দ্বার খুলিতে অনুরোধ করিল। অনুরোধ রাখিবেনা রাখিবেনা করিয়া শেষে কড়ানাড়ার উৎপাতে দ্বার খুলিল। ঝি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল: "মা আপনাকে ডাকেন।"

এ কথার মধ্যে যে কান্নার কথা কি আছে তাহা সেই জানে, কিন্তু লবঙ্গ হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। অঞ্চল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে ঘরের বাহির হইয়া মার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল।

যখন দেখা হইল, তখন ঢিব করিয়া একটা প্রণাম করিয়া সে মায়ের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা চ'ক্ষের জলও মায়ের পায়ে ঢালিয়া দিল।

জগত্তারিণীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি কন্যার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখের জলের সঙ্গে খানিকটা লড়াই করিয়া তিনি বলিলেন:

"আমাকে সময় থাকতে খবর দিতে পারিস্ নি?" লবঙ্গ বলিল: "দিদি যে এমন কাণ্ড ক'রে চলে যাবে, তা কি আমরা বুঝতে পার্লুম? আগেরদিন সন্ধ্যা-বেলায়ও আমরা জানি দিদি ভাল হয়ে উঠবে।"

—ডাক্তার কিছু বুঝতে পারলে না?

—যখন বুঝতে পারল, তখন আর বেশী সময় নেই! একরকম গ্যাসের ব্যবস্থা কর্লে, সেই গ্যাসটাই আরও যেন প্রাণবায়ুটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল!

—গ্যাসের দোষ নয় লবঙ্গ, দোষ আমার কপালের। অদৃষ্ট যখন মন্দ হয়, তখন ওষুধও বিষ হয়ে দাঁড়ায়!

তাহার পর দুইজনে পালা করিয়া পরলোকগত ললিতার বহুবিধ সদ্গুণের কথা স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে চয়ন করিয়া পরস্পর পরস্পরের কাছে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, ঝি চাকরও মাঝে মাঝে তাহাতে তাহাদের অংশ দান করিতে লাগিল। কিন্তু জগত্তারিণী শোকে আত্মহারা হইবার মানুষ নন, তাঁহার মেরুদণ্ড সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের চেয়ে অনেক কঠিন। পূজা-

আহ্নিক, বার ব্রত, একাদশী-অমাবস্যার উপবাস, একাহ ইত্যাদি করিয়াই তিনি অতিরিক্ত রকমের মজবুত হইয়া উঠিয়াছেন। শ্মশানের ধোঁয়ায় বা সংসারের ধূলিকাদায় তাঁহাকে শীঘ্র অন্ধ করিতে পারে না। কাজেই কথা শেষ করিবার আগে তিনি হঠাৎ লবঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন!

—তা সে যা হবার হয়ে গেল, আমার কপাল পুড়ে গেল! এখন তুমি কি করবে, তাই বলো!

—আপনি যা বলবেন, তাই কর্ব্বো!

—হাঁ, তা তো কর্ত্তেই হবে! না হ'লে কি আর তোমাকে ছেড়ে কথা কইবো! এখানে এসে যা দেখলুম, তাতে ত বড়—

লবঙ্গর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

— তুমি একটা সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এসেছো, এখন আবার আর একটা সংসারে আগুন ধরাবার মত করে তুলেচো। তোমার ভাবগতিক বড় ভাল দেখচি নে, আমাকে নজর রাখতে হবে!

মা'র নিকট হইতে এই ভর্ৎসনার তীব্রতায়, লবঙ্গ একেবারে কাঁদিয়া ফেলিবার মত হইয়া উঠিল। জগত্তারিণী তখন ঝি চাকরদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন: তোরা এখানে কি কচ্চিস! যে যার সব নিজের কাজে যা না! বাড়ীর গিন্নি নেই তো, ঝি-চাকরগুলো যেন রাস্তার ষাঁড় হয়ে দাঁড়িয়েছে!

তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করিতে পারে, এমন শক্তি কোনও ঝি-চাকরেরই ছিল না! কাজেই সকলেই আস্তে আস্তে অন্যদিকে সরিয়া গেল। জগত্তারিণী লবঙ্গকে একা পাইয়া বলিলেন:

মনের এটুকু জোর নেই যে নিজের দেহটাকে শুচি ক'রে রাখতে পারো? মানুষ কি কুকুর বেড়ালের মত, যে আর একজন তু করলেই অমনি তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়বে? তবে ভগবান মানুষকে পশুর ওপর করে সৃষ্টি করেছেন কেন? সে যদি নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে দমন কর্ত্তে না পারে, তবে সে বুদ্ধির বড়াই করে কেন? সমাজের মধ্যে বাস করে কেন, জঙ্গলে গিয়ে বাস করুক না? তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, ভদ্রভাবে চলবে—অসভ্যতা করো না! আজ আমি তোমার ব্যাপার দেখে, মনে বড় কষ্ট পেয়েছি। ললিতার জন্যে আমার যত না কষ্ট হয়েছে, তোমার আচরণ দেখে তার দ্বিগুণ যাতনা বুকের মধ্যে বিঁধেছে। তোমার স্বামী তোমাকে ত্যাগ করেছেন কিন্তু তা ব'লে ভেবো না, তোমার ধর্ম্মও তোমাকে ত্যাগ করেছেন! তুমি পতি-সেবার পুণ্য হয়তো না অর্জ্জন করতে পারো, কিন্তু সতীত্বের নারী ধর্ম্মকে অপব্যয় ক'রে নিজে দেউলে হয়ে বসে থাকবে কেন? তোমার শিবের মন্দির শূন্য বলে কি সেখানে একটা বাঁদর এনে বসিয়ে দেবে?

কথাগুলো যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লবঙ্গর কানে আসিতে লাগিল। সেগুলির উষ্ণতায় শুধু যে তার কান জ্বলিয়া যাইতেছিল এমন নহে, তাহার হৃদয়ও অনেকটাই দগ্ধ হইতেছিল। তথাপি নিরুত্তর হইয়া সে সব শুনিল এবং লজ্জায়, ক্ষোভে ও অনুশোচনায় যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইতে লাগিল।

অনেক কথাই জগৎতারিণী বলিয়া গেলেন, তাহার মধ্যে উপদেশের কথাই অনেক। শেষকালে বলিলেন:

এখানে তোমার থাকা হবে না লবঙ্গ! আমি শীঘ্রই তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দিচ্চি!

লবঙ্গ অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম কথা কহিল; বলিল: বন্দোবস্ত আর কি কর্ব্বে মা? আমি যেমন কাশীতে তোমার কাছে ছিলুম, তেমনই থাকবো!

জগৎতারিণী যেন তাহাতে অসম্মতা। তিনি নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন: তা আর হয় না। আমি যখন নিজে স্বচক্ষে দেখেছি, তখন আর তোমাকে আমার রান্নার ভার দিতে পারি নে! আমি কায়েতের ঘরের বিধবা মানুষ, আমার রান্না-বান্না খুব খাঁটি লোক দিয়েই করাতে হবে।

(ক্রমশঃ)

নিউ থিয়েটাসের "বড়দিদি" চিত্রে শান্তি ও সুরেন্দ্রের ভূমিকায়—চন্দ্রা ও পাহাড়ী—পরিচালনা—শ্রীঅমর মল্লিক।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৩রা কার্ত্তিক ১৩৪৫, ২০শে অক্টোবর ১৯৩৮ } উনচত্বারিংশ সংখ্যা

মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে……

'মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে চরিত্রহীনের স্থান নাই' :—কারান্তরাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাংলার এক বিশিষ্ট নেতা যে আদর্শ-পূত বাণী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন বাস্তবতার মুকুরে অবলোকন করিয়া বিষাদ-ক্লিন্ন চিত্তে তাঁহার সেই স্মরণীয় উক্তিকে কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় : মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে চরিত্রবানের স্থান নাই !!!

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী-সঙ্কটের বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর বিষয়ের আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্বীকার করিতেই হয় যে উক্ত প্রদেশে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই আদর্শচ্যুত হইয়াছেন। মধ্য-প্রদেশের সাময়িক পত্রাদিতে যে সমস্ত বিষয় বেশ স্পষ্টভাবে আলোচিত হইতেছে তাহা বাংলায় অদ্যাবধি অপ্রকাশ্যই রহিয়া গিয়াছে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে অবশ্য সেই সমস্ত অনাচার ও দুর্নীতির অর্দ্ধ-স্ফুট প্রতিধ্বনি ভিক্টেটারী ভঙ্গিমায় কঠোর হস্তে নিষ্পেষিত হইয়াছে! ইহা সাময়িক প্রতিষেধক হইলেও রোগের বীজাণু বিনাশের প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। যে সমস্ত অনাচার ও দুর্নীতির আভাষ পাওয়া গিয়াছে হয়ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে তাহার আলোচনা সমীচিন নহে কিন্তু কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের (High Command) এ বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়।

মধ্যপ্রদেশে ইহা স্পষ্টই আলোচিত হইতেছে যে, কোন এক মন্ত্রীর দপ্তর হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সম্বলিত এক ফাইল উধাও হইয়া যায়। অবশেষে সি, আই, ডির দ্বারা অনুসন্ধানের ফলে উক্ত ফাইল নাকি এক বার-বণিতার বিলাস-কক্ষ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে!!! এই অনুসন্ধান ও উদ্ধার-পর্ব্ব যেরূপ চাঞ্চল্যকর তদ্রূপ শোচনীয়। অবশ্য সর্দ্দার বল্লভভাই

প্যাটেলের আনুকুল্যে এই সব গ্লানিকর বিষয় ধামাচাপাই পড়িয়াছে। মধ্যপ্রদেশের মাতৃপূজার পবিত্র অঙ্গনে চরিত্রহীনেরই স্থান অটুট রহিল—সর্দ্দারজী প্রভৃতির পক্ষপুটের স্নেহচ্ছায়ায়!!

মধ্যপ্রদেশের এই গ্লানিকর বিষয় শুধু একমাত্র ঘটনা নহে—কংগ্রেসের প্রধান শিবির এলাহাবাদে এক রূপসী বাঙ্গালী তন্বীকে কেন্দ্র করিয়া যে মধু-গুঞ্জন চলিতেছে তাহাতে যে মধু-চক্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে এমন কি, কোন কোন স্বনাম-প্রসিদ্ধ-সোস্যালিষ্ট নেতাও আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

বোম্বাইয়ে বিশাল হর্ম্ম্য-বাসী বাক্য-বিলাসী সমাজতন্ত্রী নেতাদের ও জনপ্রিয় দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আচরণ শুধু সন্দেহজনক নহে—রুচি-বিগর্হিতও বটে। নৈতিক আদর্শের এই স্খলন হয়ত স্বাভাবিক। মানব দেহমনের যে দুর্ব্বলতা সাধারণ মানবে মার্জ্জনীয় বা উপেক্ষণীয়—যাঁহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে শীর্ষস্থানে উপবিষ্ট বা নেতৃত্বপ্রয়াসী তাঁহাদের পক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয়। বাংলার নেতার তেজোদ্দীপ্ত উক্তির পরিহাস করিয়া সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট কর্ম্মীবৃন্দের আচরণে ক্ষোভ-মিশ্রিত প্রতিধ্বনি প্রবাহিত হইতেছে: মাতৃপূজার পবিত্র-অঙ্গনে চরিত্রবানের স্থান নাই!! হয়ত বর্ত্তমান যুগের ইহাই অপ্রতিরুদ্ধগতি! বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রেও কি বাংলার নেতা তাঁহার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাহাও নহে। আদর্শ আজ রূঢ় বাস্তবতার সঙ্ঘাতে বিনষ্টপ্রায়!!

বাংলা ফিল্ম শিল্প আজ শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। প্রথম কয়েক বৎসর আমাদের সব চাইতে বড় কর্ত্তব্য ছিল এই নবজাত শিশু শিল্পটীকে বাঁচাইয়া রাখা। সেই জন্য কোন প্রকার সমালোচনাই আদরে গৃহীত হইত না। প্রয়োগ শিল্পীরা মনে করিতেন তাঁহাদের এই নতুন উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করাই সমালোচকের কাজ।

কিন্তু এই কয়েক বৎসরে বাংলা ফিল্ম শিল্পে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ নিউ থিয়েটার্সের বিপুল উদ্যমে ব্যবসাটি এমন একটী স্থানে উপনীত হইয়াছে এখন সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য হইল তাহাকে যথাযথ সমালোচনা করিয়া ত্রুটি হইতে মুক্ত করা।

কয়েকটী বিষয়ে বাংলা ছায়া-ছবি অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তার টেকনিক্যাল উন্নতি প্রত্যেকেই মানিয়া লইবেন। শ্রীযুক্ত নীতীন বসু, বিমল রায় চিত্রগ্রহণ কার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শব্দধররূপে মধুশীল ও মুকুল বাবুর কার্য্য আজ বিদেশী শব্দশিল্পিদের সঙ্গে সমতুল্য। এই সমস্ত অবিসংবাদিত সত্যগুলি মানিয়া লইলেও, বাংলা ছায়াছবি যে এখনও সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইতে পারে নাই. তাহা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের ছায়াছবি লইয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে ছবির প্রথম হইতে শেষ কাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত দায়িত্বই একা নিজের স্কন্ধে বহন করিতে সক্ষম; তাঁহাদের এই ধারণাকে শুদ্ধমাত্র ত্রুটি বলিলেও ত্রুটি করা হয়। ইহার ফলে কয়েকটী বাংলা ছবি একেবারে Unbalanced এবং abortive হইয়াছে। একজনই পরিচালক, নায়ক ও চিত্রনাট্যকারের কার্য্য করিতে চান। ইহাতে কোন কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই শ্রেণীর বহুমুখী প্রতিভা সম্পন্ন গুণী বোধ করি বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ বাক্য "যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না" স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন! বিদেশী ফিল্ম শিল্পে এবম্বিধ ব্যাপার খুবই কম। একই ফিল্মে কেহ কখনও তত দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। কদাচিৎ কোনও অভিনেতা, ডাইরেক্টারের কাজ করেন এবং যথাযোগ্যভাবে তা সম্পন্ন করেন। লায়োনেল ব্যারীমুরকে আমরা দু'রকম ভাবেই দেখিয়াছি। কেবল মাত্র চার্লি চ্যাপলিন শুধু ইহার মধ্যে পড়েন না। কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, চার্লি চ্যাপলিন একজনই আছেন—

বাংলা ছায়াছবি যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ষ্টেজ ও ফিল্ম টেকনিকের মধ্যে যে বিশিষ্ট একটি পার্থক্য আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। নিউ থিয়েটার্সের পরিচালক-বৃন্দ এই ত্রুটি হইতে কিয়ৎ পরিমানে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু নিউ থিয়েটার্স বাদ দিয়া অন্য যে সমস্ত ফিল্ম কোম্পানী আছে, তাহার কয়েকটি পরিচালকের মধ্যে এই ত্রুটি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের যেরূপ প্রভেদ, মঞ্চ ও ছায়াছবির ভিতর সেইরূপ প্রভেদ আছে। চিত্রনাট্য উপন্যাসের মত ধীরে ধীরে পরিনতির দিকে যায়। মঞ্চের রূপ চিত্রনাট্যে চলে না।

বাংলা ছায়াছবিতে আর একটি অভাব—আমরা দর্শকেরা প্রায়ই অনুভব করি। ভাল অভিনেত্রী সংখ্যায় ভাল অভিনেতার চাইতে বেশী। আকৃতি, বাচনিক ভঙ্গি এবং অভিনয় করিবার ক্ষমতা একসঙ্গে একজনার মধ্যে পাওয়া যায় না। যদি চেহারা ভাল হয়, তবে তাঁরা অভিনয় করিতে পারেন না; যদি অভিনয় করিবার ক্ষমতা থাকে—তিনি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী নন। দু'একটি ফিল্ম কোম্পানী এই অসুবিধা ও বাধা হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য একটি বিশিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা গল্প নির্ব্বাচন ও চিত্রনাট্য রচনা এমন ভাবে করেন যাহাতে তাহাদের দলের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কোন প্রকার গোলমালে না পড়েন। হয়ত তাদের প্রধান অভিনেতা খুব ভাল গাইতে পারেন, সেই জন্য এমন ভাবে চিত্রনাট্য রচনা করতে হয় যে তাতে কেবল স্থানে, অস্থানে গানের ছড়াছড়ি থাকিবে। অভিনয় করিবার কোন প্রয়োজনই হইবে না। এইরূপ জোড়াতালি দিয়া চিত্রগ্রহণ করিলে ভূমিকা নির্ব্বাচন অনেক সময়েই হাস্যাস্পদ হয়। সম্প্রতি কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্রে

যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন তাঁহারা একেবারেই Misfit হইয়াছেন।

অধুনা কয়েকটী ভদ্রমহিলা আমাদের ছায়াছবিতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হিসাবেই ফিল্ম শিল্পকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দু'একজনার সত্যিকার ক্ষমতা, ও প্রতিভা আছে। শ্রীমতী লীলা দেশাই, সাধনা বসু, সুপ্রভা মুখার্জ্জি, ইন্দিরা রায়ের নাম এই প্রসঙ্গে সবারই মনে উদিত হইবে। তবে ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করাই ছায়াছবিতে সাফল্যের কারণ হয় না। শ্রীমতী শীলা হালদারের অভিনয় দেখিয়া এ কথার সত্য আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করি। আর একটী অভিনেত্রী আমাদের বিশেষ হতাশ করিয়াছেন।

বাংলা ছায়াছবি সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য করলাম, আশা করি আমাদের প্রযোজকগণ ইহা অন্যভাবে গ্রহণ করিবেন না। আমরা জানি, যে কয়টি ত্রুটির উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে সত্যি সহজেই মুক্ত হইতে পারা যায়। বাংলা ফিল্ম যদি যথাযোগ্য ভাবে পরিচালিত হয় তবে শীঘ্রই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে পরিচিত হইতে পারে। আমরা আশা করি আমাদের এই মন্তব্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে॥

প্রভাত সিনেমা

"বাগবান"

পরিচালক কার্দ্দারের অতুলনীয় ছবি "বাগবান" প্রভাত সিনেমায় ৭ম সপ্তাহে পদার্পন করল। এবং এর জন-প্রিয়তা তুলনায় প্রথম সপ্তাহের চেয়ে এখনও কিছু-মাত্র হ্রাস পায়নি। যে কোন হিন্দি ছবির পক্ষে ইহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই।

হিন্দু সমাজের এমন এক জটিল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এর গল্পাংশ রচিত যে, ছবিখানা যত বারই দেখা হউক না কেন পুনরায় ছবিখানা দেখিতে কোন প্রকার অরুচিই দর্শকের আসে না। সামাজিক ছবি এরূপ নিখুঁত এর পূর্ব্বে খুব কমই হয়েছে বলতে হবে।

বাল্য বিবাহের কী শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে এবং হিন্দু বিধবাদের পুন-র্বিবাহ যুক্তি-যুক্ত কিনা ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নই ছবিতে রহিয়াছে। দুর্গার বিবাহ হয় অতি শৈশবেই কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে শৈশবেই তাকে বিধবা হইতে হয়। পিতামাতা এ ঘটনায় মুহ্যমান হলেও কন্যার নিকট কিছুই প্রকাশ করলেন না। অধিকন্তু তাঁরা তাদের আদরের দুলালীকে কুমারীর ন্যায়ই রাখলেন। পরে দুর্গা যখন তাদেরই বাগানের মালী স্বরূপকে ভালবেসে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চায় তখন এক জটিল অবস্থার উদ্ভব হয়। এই ঘটনাচক্রে দুর্গা, তার প্রেমাস্পদ স্বরূপ কী লাঞ্ছনা সমাজের কাছ থেকে পায় তার করুণ কাহিনী দর্শক মাত্রেরই প্রাণে এক সাড়া আনবে।

বিমলা কুমারী, নজ্রেকার, আসরফ খান, নাজীর, সিতারা ও ইয়াসমিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পরিচালনা করেছেন এ, আর, কার্দ্দার। ছবিখানা চিত্রামোদী মাত্রেরই দেখা উচিত।

'প্রেম অন্ধ'

প্রভাতের পরবর্ত্তী আকর্ষণ—মিনার্ভার অমর-অবদান "জেলারে" আপনি স্পষ্টই বুঝতে পারবেন "প্রেম অন্ধ"। তার কোন ভেদাভেদ, উচ্চ-নীচ কিছুই বিচার নেই। অ-সুন্দরও প্রেমের স্পর্শে হয়ে উঠে সুন্দর, গরীয়ান।

জেলার দলীপ কড়া মেজাজের লোক। নিয়মানুবর্ত্তিতাই হচ্ছে তার সকল কাজের লক্ষ্য। সৃষ্টি রসাতলে গেলেও তার এ নিয়ম এক চুলও নড়চড় হবার জো নেই। কিন্তু দলীপ তাঁর স্ত্রী কানবালকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সেখানে সে সম্পূর্ণ 'নূতন' ধরণের মানুষ।

কানবাল তার স্বামীকে ভালবাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু যখনই সে দেখতে পায় তার স্বামী কুৎসিৎ। তার মুখে ক্ষতের এক বিকট চিহ্ন তখন তার সমগ্র মন স্বামীর বিরুদ্ধে বিষিয়ে যায়। তাই একদিন এক গভীর নিশিথে সে তার স্বামীর ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। পিছনে পড়ে রইল তার সংসার, তার একমাত্র আদরিণী কন্যা কৃষ্ণা।

এই ঘটনায় জেলার দলীপের হৃদয়ে কী ঝড় এসেছিল। ঘটনা-সূত্রে কানবাল

(বিলাসী)

সাথী

পরিচালক ফণি মজুমদার 'সাথী বা ষ্ট্রীট সিঙ্গার' ছবি তোলার কাষ শেষ করেছেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই সারা ভারতের আগ্রহান্বিত চিত্রামোদীদের এই ছবির ট্রেলার উপহার দেওয়া হবে।

বাংলার তথা সারা ভারতের চলচ্চিত্রে এইরূপ অপরূপ টিম আর হয় নি। চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক গায়িকা এই একটি মাত্র ছবিতেই প্রথম অবতরণ করেছেন। সাইগলের মধুমাখা কণ্ঠস্বর কোন দর্শকের ভাল না লাগে ?

সেই গাইবে হারমোনিয়াম নিয়ে পথে পথে তার মঞ্জুকে নিয়ে এ ছবিতেই, কে না দেখতে চায় ?

মঞ্জু সেজেছে শ্রীমতী কানন। যে গ্ল্যামার ক্র্যাফোর্ডকে ঘিরে আছে, কাননেরও আজ সেই গ্ল্যামার। হাস্যে, লাস্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, ভাবে মূর্চ্ছনায় অঙ্গের অনবদ্য আবেদনে সারা ছবিখানিকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। ষ্টুডিওর মতে এ একটি নতুন ধরণের ছবি এবং কানন ছাড়া এমন অভিনয় আর কারোর দ্বারা সম্ভব হোত না।

এই ছবিতেই দুইটি বিভিন্ন ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে ছবির গৌরব বর্দ্ধন করেছেন প্রথিতযশা নট অমর মল্লিক ও শৈলেন চৌধুরী। হিন্দীতে আছেন বিক্রম কাপুর ও জগদীশ শেঠি।

প্রবর্দ্ধক প্রমোদ রায় বহু যত্নে এই নতুন ধরণের গল্পটিকে পর্দ্দায় রূপান্তরিত করতে সম্ভব করেছেন।

ও তাহার প্রণয়ী ডাক্তারকে কী ভাবে বিচার জন্য পুনরায় জেলারের কাছে টেনে নিয়ে এল এবং জেলার তার কি শাস্তি বিধান কল্লে—আপনি তা সত্বরই প্রভাতের রূপোলী পর্দ্দায় দেখতে পাবেন।

শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন সোরাব-মোদী ও লীলা চিৎনিশ। পরিচালনা করেছেন সোরাবমোদী।

অধিকার

এ ছবিখানির হিন্দি সংস্করণ এই সপ্তাহের মধ্যেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে মুক্তিলাভ করবে। বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনা তদুপরি তিমির বরণের সাহায্যার্থে পঙ্কজ ও পাহাড়ীর সঙ্গীত লহরী যে এ ছবির কত বড় সম্পদ তা দর্শকমাত্রেই অল্পদিনেই বুঝতে পারবেন। এর বাঙলা সংস্করণ ডিসেম্বর মাসে 'চিত্রা'য় মুক্তিলাভ করবে।

বড়দিদি

আর একটি মধুর চরিত্র—'বড়দিদি'-র মনোরমা। এটিও কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি।

বড়দিদি মাধবীর সমবয়সীদের মধ্যে—মনোরমাই তার সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী। মাধবী সে কথা গোপন কোরতে চায়, মনোরমার কাছে তা সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিধবা মাধবীর জীবনে সে কথা চিরদিন অস্ফুট থেকে যেত—যে বেদনার কথা, যে লজ্জার কথা, মাধবী প্রাণ থাকতে অপরকে জানাতে পারত না—সখী মনোরমার কাছে তা পরিস্ফুট হোয়েছিল। 'মনোরমা' চরিত্র-সৃষ্টির এই খানেই সার্থকতা।

সমবেদনাকাতর এবং অতিশয় স্নেহ প্রবল এই অপূর্ব্ব নারী চরিত্রটির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে পরিচালক মল্লিক মহাশয় এমন একটি মেয়েকে নির্ব্বাচিত কোরেছেন—যাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

এই মেয়েটি—শ্রীমতী মেনকা। ইনিই তাঁর অপূর্ব্ব প্রাণ ঢালা অভিনয়ে, 'মুক্তি' চিত্রে আপনাদের হৃদয় হরণ কোরেছিল। আশাকরি 'মনোরমা'র ভূমিকায় এই শক্তিমতী অভিনেত্রী আপনাদের খুসী কোরতে পারবে।

এ সপ্তাহে ছবিতোলা সুরু হয়েছে আর একটি সুগঠিত সেট-এ। এইখানে মাধবী কাশীতে এসে পৌছুবার পর কাশীর বাড়ীতে তার শয়ন প্রকোষ্ঠে মাধবীর সাথে মনোরমার দেখা হয়। সেই মিলনের ফলে মাধবীর অন্তরের কথা মনোরমার কাছে ধরা পড়ে।

"সাপুড়ে"

সাপুড়েদের কাহিনী নিয়ে এদের ছ'নম্বর ষ্টুডিওতে যেন ভেল্কী বাজী সুরু হয়েচে। যে দিকেই তাকাই দেখি অদ্ভুত সাজে, রকমারী পোষাকে, বেদের দল।

বুকে হাত রেখে ষ্টুডিওর মধ্যে যাই। জানি না কোন ফাঁকে, কোন ঝোপ-জঙ্গলের পাশ থেকে হঠাৎ ফোঁশ কোরে ওঠে!

এতদিনপর দেবকী বাবুর সাধ হয়েচে—কেউটে সাপ নিয়ে খেলা কোরতে।

কর্ম্মসচীব ছোটাইবাবু করিৎকর্ম্মা লোক। তাঁর মুখে এক কথা—সাবধানের মার নেই। তাই তিনি ষ্টুডিওর মধ্যেই ছোট্ট একটি 'ক্লিনিক' বসিয়েছেন। দেখলুম নানা রকম যন্ত্রপাতি, নানা জাতের ওষুধ সার-সার আলমারীতে সাজানো। শুনলুম—সব গুলোই সর্পদংশনের প্রতিষেধক।

এখন ভগবান করুন এই ক্লিনিকের শরণাপন্ন কাউকেও না হোতে হয়!

এই জাতীয় ছবি তোলায় বিপদের সম্ভাবনা আছে অনেকখানি। যাঁরা আপনাদের আনন্দ দেবার জন্যে সেই বিপদকে বরণ কোরে নিয়েছেন তাঁদের সাহসের প্রশংসা কোরতে আমরা বাধ্য।

সাপুড়েদের বস্তী এবং আরণ্য জীবনের আবহাওয়া যা'তে যথারীতি এই চিত্রে বজায় থাকে' তার জন্যে দৃশ্যপটাদি গঠনে, শিল্পীদের যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার কোরতে হচ্ছে। কর্ম্মসচীব ছোটাইবাবুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারক বসু যে সেট্ ইত্যাদি গঠন কোরছেন তাতে তাঁর কাজে যথেষ্ট রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ছবি তুলছেন ইউসুফ মুলজী এবং অতি-আধুনিক R. C. A Ultra Violet শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রে সুবিখ্যাত শব্দ-যন্ত্রী অতুল চট্টোপাধ্যায় শব্দানুলেখন কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ কোরেছেন।

নায়িকার ভূমিকায় স্বনামধন্যা অভিনেত্রী কাননকে মানিয়েচে চমৎকার। ছুটির মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তনের ফলে শ্রীমতী কাননের শারিরীক উন্নতিও হয়েচে যথেষ্ট।

ছদ্মবেশ

পরিচালক নীতীন বসু সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করে আবার তার ছবির কাজে পুরোদমে লেগে পড়েছেন। ভারতবর্ষের চিত্র শিল্পের উন্নতির মাপকাটী একমাত্র নীতীনবাবুর ছবিতেই পরিলক্ষিত হয়। তিনি যে সব Technical qualities-এর উন্নতি আজ পর্য্যন্ত ছবির মধ্যে দিয়ে দেখাতে পেরেছেন—তা বোধ হয় কোন বিলেতি ছবির চেয়ে কম নয়। তিনি এই ছবিতে যে সব আর্টিষ্ট নিয়ে কাজে নেমেছেন তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলবার নেই। লীলা দেশাই, নাজাম, সাইগাল, নিমো, জগদীশ, পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি সকলেরই অভিনয়-প্রতিভা সর্ব্বজনবিদিত।

পরশমণি

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষ্মীর ছবি পরশমণির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রফুল্লবাবুর উপর আমাদের আস্থা আছে সুতরাং আমরা নিশ্চয়ই করে বলতে পারি যে এ ছবি ভালই হ'বে। এ ছাড়াও এ ছবির আর্ট ডিরেকশনএর ভার নিয়েছেন শিল্পী সুধাংশু চৌধুরী। বন্ধুবর সুধাংশু চৌধুরীর সম্বন্ধে অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রোয়জন। সম্প্রতি তাঁর সেট্ পরি-কল্পন র অভিনব ব্যাপার অনেকেই 'অভিনয়' চিত্রে দেখেছেন।

এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের মধ্যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, অরুণা দাস, সুলেখা চাটার্জ্জি, ধীরাজ ভট্টা, তুলসী লাহিড়ী, রবী রায়, সন্তোষ, সিংহ, কৃষ্ণধন মুখুজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আর একটী বিশিষ্ট নায়িকার ভূমিকায় এই প্রতিষ্ঠান প্রথমে ছায়া দেবীকে মেট্রোপলিটান পিকচার্সের কাছ থেকে loan নিয়ে কাজ করবেন বলে ঠিক্ করেছিলেন কিন্তু সম্প্রতি আমরা জানতে পেরেছি যে কোন বিশেষ কারণে এ proposal কার্য্যকরি হয়নি। উপস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তের সঙ্গে এই চরিত্রটীর জন্যে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন

দেশের মাটি

সামনের শনিবার থেকে 'দেশের মাটি' ৬ষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করবে। একাধারে দুইটী চিত্রগৃহে এরূপ দর্শকসমাগম একমাত্র নিউ থিয়েটার্সের ছবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। চিত্রা ও নিউ সিনেমায় এই জনসমাগম 'দেশের মাটি'র জনপ্রিয়তার পরিচয় দিচ্ছে।

ঝড়ের যাত্রী

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস কোম্পানী সমর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে ঝড়ের যাত্রী' তোলবার ব্যবস্থা করেছেন। যতদূর শোনা যাচ্ছে এই মাসের শেষে সুটিং আরম্ভ হ'বে। এতে অভিনয় করবে নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতি।

পূর্ণ থিয়েটার

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এই চিত্রগৃহে এই শনিবার থেকে ২য় সপ্তাহে পড়বে। প্রথম সপ্তাহে দক্ষিণ কলিকাতার এই জনপ্রিয় চিত্রগৃহে যে অপূর্ব্ব জনসমাগম আমরা দেখেছি তাতে মনে হয় এছবির ভবিষ্যৎ ভালই। নিখুঁত চরিত্রাভিনয়ে পরিচালক নরেশ বাবু নিজে আর শ্রীমতী প্রতিমা দাসগুপ্ত যে অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা সকলের প্রশংসার যোগ্য।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'অভিনয়' সত্যই একটি উচ্চাঙ্গের কথাচিত্র হইয়াছে। অত্যন্ত আধুনিক এই চিত্রকাহিনীটিতে নানা রসের এমন নিপুণ পরিবেশনা হইয়াছে যে, যিনিই ছবিখানি দেখিয়াছেন তাঁহাকে সত্যই অভিভূত হইতে হইয়াছে। রূপবাণীতে এই চিত্রটি শনিবার হইতে অষ্টম সপ্তাহে পদার্পণ ক'রবে।

শোক সংবাদ

পণ্ডিত দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের আকস্মিক তিরোধানে বাঙলার "মার্গ" সঙ্গীতের যে ক্ষতি হইল, তাহা যথার্থই অপূরণীয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন বর্ত্তমান বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী মৃদঙ্গী। গত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধন কালে বারাণসীর স্বনামধন্য ধ্রুপদাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের ধ্রুপদ গানের সহিত সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্ল্লভচন্দ্রের মৃদঙ্গবাদ্য শ্রবণের সৌভাগ্য যাঁহারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তৎকালে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এরূপ মণিকাঞ্চন-যোগ সংসারে অতি অল্পই ঘটিয়া থাকে।

মৃদঙ্গাচার্য্য পণ্ডিত দুর্ল্লভচন্দ্র যে কেবল সঙ্গীতজ্ঞই ছিলেন তাহা নহে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে সংস্কৃত-শাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল ও তিনি একজন আচারপূত, নিষ্ঠাবান্, দশকর্ম্ম-বিশারদ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি নিত্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিতেন। এইরূপ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান বাঙলায় দুই চার জনের অধিক আছেন কি না সন্দেহ।

পণ্ডিত দুর্ল্লভচন্দ্র প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। এই পরিণত বয়সেও তাঁহার যন্ত্র-সাধনার বিরাম ছিল না। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার ও সঙ্গীত-রসিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহোদয়ের বাসভবনে একটি সঙ্গীতের আসরে মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতে করিতে তিনি সন্ন্যাসরোগগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তাঁহার সে মূর্চ্ছা আর ভঙ্গ হয় নাই। আমরা তাঁহার সাধনপূত আত্মার পারত্রিক শান্তি কামনা করি।

বর্ত্তিকা সঙ্ঘ

গত শনিবার ২৮শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'বর্ত্তিকা' সঙ্ঘের উদ্যোগে হস্তলিখিত "বর্ত্তিকা" পত্রিকার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্ঘের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিবৃতি প্রদান করার পর বর্ত্তিকাসঙ্ঘের সভ্যগণ, "নরেন্দ্র গীতিমন্দিরে"র সভ্যবৃন্দের সহযোগিতায় নানারূপ সঙ্গীত, প্রাচ্যনৃত্যকলা, আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত দর্শকগণের মনোরঞ্জন করেন। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত অশোক নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমরা নবোদ্বোধিত বর্ত্তিকা পত্রিকার দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।

কালিয়া সংবাদ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও যশোহর জিলার কালিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় শতাধিক গৃহ মায়ের বন্দনা উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুখের বিষয়, ভীষণ বন্যার প্রকোপও গ্রামবাসীর পূজার আনন্দকে বিশেষ কমাইতে পারে নাই। আশ্রয়হীন ও অন্নবস্ত্রহীন হইয়াও তাহারা হাসিমুখে মাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছে।

গ্রামের এবার একটী বিশেষ দুঃসংবাদ স্বনামধন্য জনপ্রিয় নীরব কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যু। ইহার মৃত্যু সমগ্র কালিয়া গ্রামে একটী নিরানন্দের ছায়া বিস্তার করিয়াছে। পূজার আনন্দের মধ্যেও সতীশবাবুর স্মৃতি গ্রামবাসীর চিত্তকে বিয়োগ ব্যথাতুর করিয়া তুলিয়াছে।

অন্যান্য বারের মত ৺পূজা উপলক্ষে এবার গ্রামে যাত্রা থিয়েটারের তত সমারোহ দেখা যায় নাই।

গ্রামের প্রায় সকল অবস্থাপন্ন বাটী হইতেই বন্যাপীড়িত দুস্থ দরিদ্রদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করা হইয়াছে। ছোটকালিয়ার "নূতন বাটী" এবং বড় কালিয়ার "মুন্সেফ বাটী"র নাম ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত রিলিফ ফণ্ডে প্রায় সহস্রাধিক মুদ্রা জমা আছে। গভর্ণমেণ্ট হইতেও যৎসামান্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

নির্ঝরিণী সাহিত্য সংসদ :—

আগামী ৬ই কার্ত্তিক রবিবার ৫টার সময় আমাদের সংসদের তৃতীয় অধিবেশন ৫০ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটে (কালীঘাট হাই স্কুল) অনুষ্ঠিত হইবে। সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট।

দুর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ২৯শে আশ্বিন রবিবার সুধীর দাস মহাশয়ের ৭৬ নং ল্যানসডাউন রোডস্থিত ভবনে দুর্ব্বার সঙ্ঘের দশম অধিবেশন সুকবি বিমলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। সম্পাদক কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পাঠান্তে দীনেন্দু

দাস সম্পাদিত 'শ্রীর' (হস্তলিখিত পত্রিকা) উদ্বোধন কবিতা 'শ্রী' দিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ এবং সুরেশ সরকারের 'সেদিন শ্রাবণ রাতে' (কবিতা), নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গা' (কবিতা), হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'ছোট গল্প' (গল্প) আর সমীর ঘোষের 'বাংলা সাহিত্যের একখানি বই, গৃহদাহ' (প্রবন্ধ) দিয়া সমাপ্ত হয়। সভায় প্রাচীন সাহিত্যের সহিত আধুনিক সাহিত্যের বিরোধ কি এবং কোথায়, তাহা লইয়া বিশেষ আলোচনায় সুধাংশু সেনগুপ্ত, সন্তোষ ঘোষ, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জগত দাশ প্রভৃতি যোগদান করেন। পরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়।

বহিরগাছি পল্লী-মঙ্গল পাঠাগার

গত ১৮ই আশ্বিন বুধবার বৈকাল ৫॥০ ঘটিকার সময় ঠাকুর বাড়ী মন্দির প্রাঙ্গনে পল্লী মঙ্গল পাঠাগারের নবম বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন ও বঙ্কিম শত বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। নবম বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলনীতে পৌরহিত্য করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বঙ্কিম শত বার্ষিকী উৎসবে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কবি শ্রীযুক্ত বিজয়লাল তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে ও ওজস্বিনী ভাষায় আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি-এস্‌সি ও শ্রীমান কমলকুমার ভট্টাচার্য্য বঙ্কিম সাহিত্যে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠের পর রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, কালনা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির ও ভদ্র মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল।

সহকারী ডিরেক্টরের পদে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেসের সহিত সংযুক্ত শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্, বি, ই, বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টার অফ্ পাবলিক ইন্‌ফরমেশান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তিনি কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। হীরেণবাবু উৎসাহী ও তরুণ সাংবাদিক। আমরা তাঁহার নবতম কর্ম্মজীবনের সাফল্য কামনা করিতেছি।

N. I. P.

রেকর্ড সঙ্গীতের প্রসারতার কারণ

শ্রীঅমিয়মাধব সেনগুপ্ত

'গ্রামোফোন রেকর্ড' আজ আর সুদূর পল্লীগ্রামেও নতুন কথা নয় কারণ প্রায় সব পল্লীতেই রেকর্ড-সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায়। ভারতের কয়েকটি মহানগরীর কথা ছেড়ে দিলে আর সব জেলা বা গ্রামের লোকের কাছে রেকর্ড-সঙ্গীতই একমাত্র অবসর বিনোদনের বস্তু বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। অভিনয়ের পালা-রেকর্ড, গান-বাজনার রেকর্ড, কৌতুক-কথার রেকর্ড প্রভৃতি নানাপ্রকার রেকর্ড বাজারে প্রকাশিত হচ্ছে এবং রুচি অনুযায়ী ক্রেতাগণ এই সব রেকর্ড সংগ্রহ করেন।

* * *

রেকর্ড সঙ্গীতের প্রসারতার দিকে দেখতে গেলে প্রথমেই দেখা যাবে যে, দেশীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠানগুলির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'মেগাফোন' ও 'হিন্দুস্থান' রেকর্ডই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে রেকর্ড সঙ্গীত আজ এত জনপ্রিয় হয়েছে। এই দুটি বাঙালা প্রতিষ্ঠান ছাড়া 'সেনোলা' রেকর্ডও বাঙালার অন্যতম প্রতিষ্ঠান এবং এদের রেকর্ডও বাজারে নিয়মিত বার হয়।

* * *

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ক্ল্যাসিক্যাল গান বা ঐ জাতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন সুরের রকম-ফের করে শিল্পীদের গান রেকর্ড করা হ'তো। অবশ্য এখনও এই প্রকার গান রেকর্ডিংএর একটা বিশেষ বিভাগে গৃহীত হয় সত্য কিন্তু সঙ্গীত-রসিক ব্যতীত পল্লীবাসী জনসাধারণের কাছে এ শ্রেণীর সঙ্গীত ততটা আনন্দদায়ক হয় না। যখন একই শ্রেণীর সঙ্গীত পরিবেশিত হ'তো তখন বিভিন্ন রুচির শ্রোতৃসাধারণের এই সব রেকর্ড কেনা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

* * *

দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিশেষ করে 'মেগাফোন কোম্পানী' লোক-সঙ্গীতের প্রসারতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। বাঙলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রকারের লোক-সঙ্গীত ভিন্ন ভিন্ন ঢঙে গীত হ'য়ে থাকে। এই সব পল্লীগীতি মার্জ্জিত কণ্ঠের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ালে সম্পূর্ন রস পরিবেশিত হয় না। কাঁচা কণ্ঠের কমনীয়তা ও সুরের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য সহরের শাণিত-কণ্ঠের গায়ক গায়িকা দ্বারা সম্যক প্রস্ফুটিত হয় না।

* * *

পল্লীসঙ্গীতের বিশিষ্ট শিল্পীদের সংগ্রহ করা দুরূপ ব্যাপার। মেগাফোন কোম্পানী বহু চেষ্টায় অনন্তবালা বৈষ্ণবা (বরিশাল), পরেশ দেব (কুমিল্লা), নিরঞ্জন সুত্রধর (চান্দুরা) স্বরূপ দাস ও কামিনী বৈষ্ণবী (মৈমনসিংহ), নবানদাস বাবাজী ও নন্দরাণী (ঢাকা), মাতাপদাস ও ললিতা (ফরিদপুর) প্রভৃাত শিল্পীদের সংগ্রহ করে লোক-সঙ্গীতের রেকর্ড করেন। ইঁহাদের গীত গানে পল্লীসঙ্গীতের যথাযথ রূপ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো এবং প্রাদেশিকতার টেক্‌নিক্ সম্পূর্ণ বজায় রইলো। পল্লীবাসীগণ নিজেদের প্রিয় ও আবাল্য-শ্রুত গানের রেকর্ড সানন্দেই গ্রহন করলেন ও ইহার দ্বারা রেকর্ডের প্রসারতা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'লো।

* * *

ফিল্ম-রেকর্ডের চাহিদা বৃদ্ধিও রেকর্ডের প্রসারতার আর একটা মূল কারণ। সবাক চিত্র যতই জনপ্রিয় হচ্ছে ফিল্ম-সঙ্গীতের রেকর্ডও তত বেশী বিক্রয় হচ্ছে। অবশ্য সব ফিল্মের গানই যে চলে তার কোন মানে নেই। এমন অনেক ফিল্ম আছে যার গান রেকর্ডে অচল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। দেখা গেছে যে রেকর্ডের জনপ্রিয় শিল্পী যদি কোন নবগঠিত ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের নতুন ছবিতে গান করেন আর সেই গান যদি রেকর্ডে প্রকাশিত হয় তা'হলে বাণীচিত্রটির জনপ্রিয়তার অভাবের দরুণ সেই ফিল্ম গান বিশেষ কিছুই কাটে না; এমন কি সেই শিল্পীর নিজস্ব গান অপেক্ষা ফিল্ম-গান অনেক কম বিক্রীত হয়।

* * *

ফিল্ম-সঙ্গীতের রেকর্ড বিক্রয়ের দিক থেকে নিউ থিয়েটার্সের ফিল্ম-গানগুলি আজ সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছে। এদের ফিল্মের গান সঙ্গীত-রসিক ও চিত্রামোদী উভয়ের কাছেই সমান আদরণীয়। এ দিক দিয়ে নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড-জগতে একটা যুগান্তর

শ্রীলীলাময় বসু

বেশীদিনের কথা নয়। প্রায় আট-দশ মাস আগে এক পাঁজি-মেলানো দিনে শঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে শান্তি যখন পরের সংসারে গিয়ে প্রবেশ করে তখন তার চোদ্দ বৎসর উত্তীর্ণ হয় নি।

তারপর যা হয়ে থাকে। সিঁদুর প'রে বেরিয়েছিল, সিঁদুর মুছে ঢুকলো। পাড়ার প্রবীনারা এসে সরু-সরু দু'খানি হাত হ'তে নোয়া ও শাঁখা খুলে দিয়ে, থান কাপড় পরিয়ে তাকে তপস্বিনীর বেশে সাজিয়ে দিলে। আর এ-ও উপদেশ দিয়ে গেল,—বিধবাদের সংযমের পথে চলতে হয়।

কন্যার এই নিদারুণ পরিবর্ত্তনে শোকাহত গিরিশ মিত্র মুষড়ে পড়লেন। এই আকস্মিক আঘাতে তিনি শয্যাগত হলেন। বিধবা কন্যাকে সর্ব্বদা নিজের চোখের সামনে দেখে দেখে তিনি আরো ভেঙে পড়লেন। এই নিয়ে ছ'মাস। শেষে একদিন অর্থের জীর্ণ বাক্সটী যখন তার আসন্ন শূন্যতার কথা জানিয়ে দিলে, সে দিন মিত্রমশাই তার পৈত্রিক বাড়ীখানা বেচে দিয়ে গ্রামের মধ্যেই এক কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

তারপর উপর্য্যুপরি আরো পাঁচ মাস নগ্ন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে হঠাৎ একদিন মিত্রমশাই পরপারের দিকে পা বাড়ালেন।

শান্তি তখন আবিষ্কার করলে এই গৃহখানি আর সামান্য কিছু আসবাব-পত্র ছাড়া সে এই সংসারে একাকা। আত্মীয় স্বজন দু-পাঁচ জন ছিল বটে কিন্তু দুর্দ্দিনে তাদের কারো দেখা মিললো না।

পেটের চিন্তা বড় চিন্তা। তাই কারো বা গরুর জাবটা কেটে দিয়ে, কারো বা কুটনো কুটে অন্নের সংস্থান করে। ঘুঁটে বেচে ও সুপারি কেটে দু'-চার পয়সা হয়। আরো এমনি অনেক কিছু।

দিন রয় না। এমনি করে কিছুদিন কেটে গেল। আর হাতে যা কিছু ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। উপায়ন্তর না দেখে বাধ্য হয়ে শান্তিকে গ্রামের জমিদার বাড়ীতে অল্প বেতনে রাঁধুনীর বৃত্তি নিতে হলো।

সময়ের ব্যবধান বেড়ে যাওয়াতে শান্তির মুখে দু-চার গরস্ সুখহান ভাত নিয়মিত ভাবে উঠতে লাগলো। এর জন্যে ঈশ্বরকে সে অশেষ ধন্যবাদ দেয় ও।

তার যৌবন এখনো উত্তর্ণ হয় নি বলা যায়। রাঁধুনী বৃত্তি পাবার পর থেকে সে যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলো তার যৌবন-শ্রী এখনো ম্লান হয়ে যায় নি। বেশভূষায় এখন সে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছে, প্রসাধন ও অঙ্গরাগে এখন সে যথেষ্ট সময় খরচ করে।

একটা অস্বস্তিকর ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল সেদিন থেকে, যেদিন শান্তির রূপ-যৌবন তার সমস্ত শরীরে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু একদিন জমিদার পুত্র বিজনের সঙ্গে খোলাখুলি হাঁসি ঠাট্টার পর থেকে কিছু লজ্জাকর গূঢ় ব্যাপার জমিদার গৃহিনীর বোধগম্য হলো। সুতরাং এরূপ মানসিক অবস্থা নিয়ে জমিদার গৃহিনী শান্তিকে ডেকে বললে: দেখ শান্তি, রূপ দেখাতে হয় বাজারে, গেরস্তের ঘরে নয়?

দিন যায়। ক্রমে তাদের মেলামেশার ওপর একটা সন্দেহের ছায়া এসে পড়লো। শেষে সত্যি সত্যিই তারা একদিন অধিক-রাত্রে গ্রামের শিরোমনি পণ্ডিতের কাছে ধরা পড়ে গেল।

সেদিন বাড়ী ফিরে শান্তির কী কান্না? তার মাতৃত্বের আকাঙ্খা কী এতই লজ্জাকর। হৃদয় বিদ্রোহে আরো গর্জ্জে ওঠে।

গ্রামে সোর গোল পড়ে গেল। শেষে কী না জমিদারের ছেলে ছিঃ? জমিদার বাড়ী থেকে শান্তির কাজ গেল।

এ সংসারে কালস্রোত কারুর জন্যে অচল হয় না। শান্তির কাজ যাওয়ার পর থেকে তিন মাস কেটে গেছে। তবে গত কয়েক মাস ধরে বিজয় তাকে মাস-হারা কিছু দিয়ে এসেছে। আগে লোকে প্রায় তাকে দেখে থাকতো—তবে শরীরটা কৃশকায় হয়ে গেছে, যেন অসুস্থ বলে মনে হয়।

সেদিন রাত্রে গ্রামপথে বিজয়ের সঙ্গে শান্তির দেখা।

শান্তি বললে: কী আশ্চর্য্য? আমায় দেখে অমন ভয় খেয়ে গেল কেন?

বিজয় বললে: ভয় তোমাকে নয় তোমার ভবিষ্যতকে। সামাজিক শাসন যে তোমায় হত্যা করতে চায়।

এনেছেন। ভারতে এমন সঙ্গীত রসিক ও চিত্রামোদা অতি অল্পই আছেন যাঁদের রেকর্ড-সংগ্রহের মধ্যে 'নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড' বা 'নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ড' একখানিও নাই। ফিল্ম রেকর্ডের এই প্রসারতার মূলে আছে নিউ থিয়েটার্সের ছবির অসম্ভব জনপ্রিয়তা, এদের টেকনিশিয়ানদের সর্ব্বমুখী উন্নতি ও সঙ্গীত পরিচালকের জনপ্রিয় সুরের নব নব সৃষ্টি।

—:০:—

—সে বিচার কী তোমার ওপর ?

—না। সে শাসন আমাকেও ভয় দেখাতে ছাড়বে না !

—ব্যাপারটা আদালত অব্দি গড়ালে তোমারি ভয় বেশী। কিন্তু ভয় নেই আমি তোমার বিরুদ্ধে যাবো না।

বিজয় আলোচনার মোড় ঘোরালো। বললে : কেমন আছো শান্তি ?

—বেশ ভালই আছি ? চলি, এই রাত্রে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখতে পেলে—আবার অন্য বিপদ ঘটতে পারে ? বলে শান্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শান্তির খোরাকি বন্দোবস্ত ব্যাপারটা কী করে জানাজানি হয়ে যায়। ঘরে ঘরে পড়ে যায় ঢি ঢি। জমিদার গৃহিনী লজ্জায় পুত্রের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। এমনি একা থেকে থেকে পুত্রের সঙ্গে এখন তার কোন সম্বন্ধ নেই। ব্যাপারটা পঞ্চায়েৎ অব্দি গড়ায়। বিচারে শান্তিই দোষী হয়ে দাঁড়ালো। গ্রামের কর্ত্তারা এই মত জাহির করেন : আমাদের বউ-বেটা নিয়ে ঘর করতে হয়, আজই মেয়েটাকে গ্রামছাড়া করতে হবে।

পরদিন পরানের মা এসে খবর দিলে শান্তি ঘরে নেই। সেই আজকাল একটু শান্তির দেখাশোনা করে। গতরাত্রের বর্ষণ এখনো শেষ হয় নি।

পাড়ার অনেকেই জোট পাকালো মন্দিরের কাছে। সকলের চোখে ওই এক জিজ্ঞাসা এই ঝড় বৃষ্টিতে মেয়েটা গেল কোথায় ? অনেক সৎ অসৎ আলোচনার পর তারা এই মত জাহির করলে—গেল ভালই হয়েছে, আপদ গেল। তারপর সকলেই যখন ফেরবার উপক্রম করছে, তখন গ্রামের উপেন চাষী এসে খবর দিলে—নদীর ধারে শান্তি বনের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার পাশে একটী মৃত শিশু ! ছেলেটী কিন্তু ঠিক আমাদের বাবুর মত দেখতে হয়েছিল।

এমন সময়ে সমস্ত গ্রাম কম্পিত করে একটা মেঘ ভীষণভাবে গর্জ্জে উঠলো।

পুরাতনের পরিবর্ত্তন

(আলোচনা)

শ্রীরেণুকা সেনগুপ্তা

পুডিংএর কথা

আমি পুডিং—এদেশে আগন্তুক। ইংরেজ সভ্যতার উপকরণের সঙ্গে অজানাভাবে এসে পড়েছি। এখানে এসে বহুকাল বাবুর্চ্চিখানার বাইরে যাবার সুযোগ পাই নি। ক্রমে বাঙ্গালীপাড়ায় একটু আধটু করে যেতে শিখলাম, কিন্তু পরিচয়টা অনেকদিন পর্য্যন্ত পুরুষদের মধ্যেই নিবদ্ধ রয়ে গেল। তখন মনে হ'তো—বোধহয় বাঙ্গালীমেয়েরা সুখাদ্যের আদর জানেন না। কিন্তু ক্রমে সে ধারণা আমার বদলে গেল। দেখতে লাগলেম—মেয়েরা ঘটা করে পুডিং তৈরীর মহড়া আরম্ভ করে দিয়েছেন। উঃ কী দুর্দ্দশাটাই-না তখন ভোগ করেছি। বাটির মুখে থালা চাপা দিয়ে বুকে পিঠে জ্বলন্ত কয়লা ঠেঁসে আমাকে অর্দ্ধদগ্ধ করে ফেলতেন।

সন্দেশবাবু -যা এতক্ষণ বল্লেন,—তাত আপনারা শুনলেন ! মনে করেছিলেম চুপ করেই থাকবো, কিন্তু শাস্ত্রে একটী কথা আছে—"মৌনং সম্মতি লক্ষণম্"—আমি যদি মৌন থাকি—তা হলে আপনারা সকলেই সন্দেশকে সমর্থন করবেন আর আমার উপরই সমস্ত দোষ চাপাবেন তাই বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। তার সঙ্গে সঙ্গে সব জিনিষেরই পরিবর্ত্তন হয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি ইউরোপ থেকে এদেশে এসেছি। এতে সন্দেশের রাগ করবার কোন কারণই নেই। তিনিও অনেক কথাই বল্লেন কিন্তু আমার বিশ্বাস—ভারতীয়েরা এত মুর্খ নন যে বিনা বিচারে আমাকে তাঁদের খাদ্যতালিকা হ'তে নির্ব্বাসিত করবেন। সন্দেশের ভারতের সর্ব্বত্র আদর একথা ঠিক, কিন্তু আমার আদর পৃথিবীব্যাপী অর্থাৎ International. পৃথিবীর মানচিত্র খুলে দেখুন যে সর্ব্বত্র ইউরোপের প্রভাব রয়েছে। ইউরোপের প্রভাব যেখানে, আমার প্রভাবও সেখানে। আমাকে ছাড়লে ডিনার (Dinner) অসমাপ্ত হয়।

আপনারা স্যার আশুতোষের গর্ব্ব করেন, আর ভাবেন যে গণ্ডায় গণ্ডায় সন্দেশ খেয়েই তিনি তাঁর অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি লাভ করেছিলেন। আপনারা ত জানেন না যে কত লোক এ সন্দেশ খেয়েই নশ্বরকান্তি লাভ করে—অকালে যমলোকে গিয়েছেন। আর সন্দেশ খেয়েই যদি স্যার আশুতোষ হওয়া যেত তবে ভারতে স্যার আশুতোষের মত লোকের কি অভাব হ'তো ?

আর একটা কথা, সন্দেশের ভক্ত হিসাবে একমাত্র স্যার আশুতোষের নামই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু পুডিংএর ভক্ত—জগতের প্রথিত-নামা কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার এবং আরো কত লোক। শুনেছি মহামতি গেটের নাকি পুডিং না হলেই চলতো না। সেক্সপীয়র, মিলটন, শেলী কিটস্, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কে না পুডিং খেয়ে-

ছেন? অবশ্য পুডিং সম্বন্ধে তাঁরা কোন কবিতা রচনা করে যাননি, এই থেকে আপনারা মনে করতে পারেন না যে তাঁরা পুডিং ভালবাসতেন না। রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরুন—তিনি নাকি দই খেতে ভালবাসতেন, কিন্তু দই সম্বন্ধে কবিতা লিখে কি তিনি "নোবেল" প্রাইজ পেয়েছেন? বঙ্কিমবাবু গঙ্গার ইলিশ, কচি পাঁঠার ঝোল ভালবাসতেন। তাঁর সমস্ত লেখা ঘেটে কোথাও তাঁর প্রিয় মৎস্যের-বর্ণনা পেলাম না। অতি প্রিয় পদার্থের ও অতি প্রিয়-জনের বর্ণনা কবিগণ কখনো করেন না। যেমন বার্ণাডস্ কদাপি তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি।

বন্ধুটী বলেছেন—তাঁর জন্য অনেকে বাড়ী করেছে সম্বাদ পেয়েছে কাজেই তিনি শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা মশাই—আপনারাতো সবাই জানেন সেই ডিলিঞ্জারকে—ওই যে সেই অ্যাট্‌লান্টিকের ওপারের সেই 'পাব্লিক এনিমি' নং ১—পরিচিত ত সে সবারই কাছে—তাই বলে কি সে শ্রেষ্ঠ? সন্দেশও যদি সে রকম শ্রেষ্ঠতার দাবি করেন, তবে আমি আপত্তি করবো না।

শুনেছি এদেশের মেয়েদের কেউ কেউ অপবিত্র বলে আমাকে ছোঁন না কিন্তু আমার ও আমার জ্ঞাতি ভাইদের ছোঁয়াচ পেয়েই আজকে এদের অনেকে বাইরে বেরিয়ে জগতের আলো দেখছেন। বেরিয়ে যে ঠকেননি তার প্রমাণ পাবেন যদি কোনদিন অফিস ফেরতা বা কলেজ থেকে বেরুবার কিছুক্ষণ পর চৌরঙ্গির ওধারটায় একটু বেড়িয়ে—আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলার বা তারও একটু পর ধীরে অতি ধীরে চলে যান কাগজওয়ালাদের ঐ বড় বাড়ীটার পাশ দিয়ে—যেখানটায় অনেক গাড়ী, অনেক শাড়ী আর রঙের মেলা। ঢুকবেন না যেন—শুধু দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখবেন ফেল ফেল করে। আব ভাববেন এরা কি সত্যিই ঠকেছে—আমাকে চেয়ে আর পেয়ে?

সন্দেশবাবুর আর একটী নালিশ এই যে, আমার সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের অজীর্ণতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে দোষটাই কি আমার? নিজেদের শ্রম-বিমুখতার জন্যে ভারতীয়েরা যদি নিজেদের ক্ষমতাশক্তি হারিয়ে ফেলেন, সে দোষ কি আমার? তাই বলি ভারতীয়েরা যদি পরিশ্রম করতে শেখেন তা হলে দেখবেন যে আমার সংস্পর্শে এসে তাঁরাও স্বাস্থ্যবাদীদের মত স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান হতে পারবেন।

আমার বন্ধু আরো বল্লেন যে আর্য্য সভ্যতার প্রথম থেকেই নাকি তিনি অবস্থান করছেন—তিনি অনাদি অনন্তকালব্যাপী অবস্থান করবেন। কিন্তু আমি ঠিক বলছি যে একবার যাঁরা তাঁদের রসনাগ্রে আমার মধুর স্পর্শ অনুভব করেছেন—তাঁদের কাছ থেকে সন্দেশবাবুর চিরদিনের মত বিদায় নিতে হবে। কথায় বলে the taste of pudding lies in the eating অর্থাৎ খেলেই পুডিংয়ের স্বাদ বোঝা যায়। আজ থেকে আপনারা আমার আদর করুন—অচিরেই বুঝবেন যে আমি বৃথা আস্ফালন করছি না।
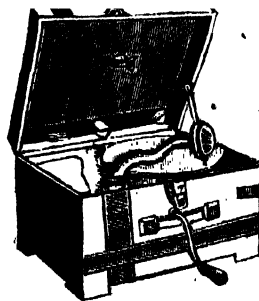
তবু প্রাচীন পন্থীগণ আমার নিন্দা করেন। কিন্তু যিনি আমার যত নিন্দাই করুন আমি কিন্তু নিন্দনীয় আদৌ নই। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অনুকরণের কথা বলছেন। প্রত্যেক জাতিই উন্নতিশীল জাতির অনুকরণ করে থাকে। তার জন্য এদেশীয়েরা যে ওদেশের অনুকরণ করবে এটা ত স্বাভাবিক।

আমি বলি আমি অতুলনীয় আমি শ্রেয়ঃ আমি প্রেয়। আমার নিন্দা করা অতি গর্হিত অপরাধ কারণ আমি এখন সর্ব্বজন-প্রিয়, সর্ব্বদেশ প্রচলিত। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রসার অবশ্যম্ভাবী। আমি ওদেশে তো ধ্বজা উড়িয়েছি, এদেশেও ওড়াব—আমার সে গতি রুধবে কে? নমস্কার!

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে

অসুস্থ

শরীর

সুস্থ ও সবল

করিতে

সিরোলিন

'রচি'

অদ্বিতীয়

ইহা সর্দ্দি, কাসি এবং যক্ষ্মার

প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অভিনয় ও অভিনয় নয়

পার্থ রায়

মমতাজের সঙ্গে সেদিন হঠাৎ দেখা বোটানিক্যাল গার্ডেনে। চুপ করে বসেছিল সে অ্যাসফল্টের রাস্তার ধারে, একটি গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের ওপর সবুজ বেঞ্চে। তার ডাইনে-বাঁয়ে প্রচণ্ড রোদে ঘেমে-ওঠা পথ দূরে গিয়ে বেঁকের মুখে হারিয়ে গিয়েছে। সেদিন বোটানিক্সে আমিও এই পথের যাত্রী। হারিয়ে যাওয়া একটি বেঁকের মুখ থেকেই আমি বেরিয়েছিলুম গঙ্গার ধারে পৌছব বলে। দারুণ রোদ, নিদারুণ গরম। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝিম্ ঝিম করছে। তেষ্টায় বুকখানা শুকিয়ে গিয়েছে। একটু ঠাণ্ডা বাতাস, একটু ছায়া, একটু আরাম আমাকে পেতেই হবে, ওই তো ওই দিকে গঙ্গার ধার ওই দিকেই যাওয়া যাক!

সামনেই প্রকাণ্ড একখানা রোলস্ রয়েস।

তারই অদূরে বসে মমতাজ। মোমের মমতাজ। গরমে গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে মোম ঝরে পড়ছে। তার গোলাপী গালে দুটি চূর্ণ অলক নিষ্ঠুর নিদাঘে মূর্চ্ছা গেছে। মমতাজের হলদে সাড়ী সূর্য্যের আলো পড়ে সোনালী। তার ফ্রিল দেওয়া কালো সিল্কের জামা অলস নিদ্রালু। মাথার ফুল শুকনো।

ফ্যাসানের রাণীর ফুল চাই সব সময়েই—প্রদীপ্ত দুপুরেও।

মমতাজকে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই নি। আশ্চর্য্য হয়ে যাবার কথাও নয়। মমতাজ যে বেড়াতে ভালবাসে এটা আমি জানি; তবে সে আজ একা এটাই কেমন লাগল।

আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম সে ডাকলে: শুনুন। আমি কাছে গেলুম। তারপর মমতাজ কী বলবে! কী বলতে পারে! চোখের চেনা লোককে তার মত মেয়ের অকারণে কী বলার থাকতে পারে! তবু সবাই এমন সময়ে এমন অবস্থায় যা বলে সে তাই বল্লে: বড্ড গরম না? দেখেছেন একটু হাওয়া নেই। গায়ের সব রক্ত জল হয়ে গেল। আমি বল্লাম: হু। ব্যস তারপর চুপচাপ। আমার সর্ব্বাঙ্গে অস্বোয়াস্তি আঁকড়ে ধরেছে। বোধকরি তারও। একখানা আদ্দিকালের হলদে ফোর্ড হর্ণ দিতে দিতে ছুটে চলে গেল। সে আর বসে থাকতে পারল না। তার গায়ে জড়ান সবুজ স্কার্ফটা খুলে ফেলে দিলে। মাথার ফুলগুলি খুলতে খুলতে বল্লে: কী বিশ্রী দেখাচ্ছে আমায় এখন এগুলো মাথায় দিয়ে।—আমি নিখিলেশ সেন অন্তরে অন্তরে পুরোপুরি নীতিবাগিশ। আমার সমস্ত নীতি চূর্ণ হয়ে গেল। আমার দুর্ব্বলতা বুঝি ধরা পড়ল মমতাজের কাছে। আমি বলে ফেল্লুম: বেশ দেখাচ্ছে, ঠিক সাজাহানের মমতাজের মত। সে তার রহস্যময় তন্দ্রালু চোখ দুটি একবার আমার পানে সোজা তুলে দিলে। তার লিপষ্টিক-মাখা পাতলা ঠোঁটে এক চির হাসি খেলে গেল। প্রিয়তমা মমতাজের জন্ম হোল। তার নাম রাখলুম মমতাজ।

মমতাজকে ঠিক কবে প্রথম দেখি এ হিসেব আমি রাখিনি। একই সরাই-খানার আমরা দুইটি অতিথি। পান্থশালার অল্পকালের আশ্রয়ভোগী যাত্রীদের মত মমতাজ এতদিন আমার মনে কোন রেখা টানতে পারেনি। শুধু যখন তাকে দেখেছি ভাল লেগেছে। আর ইরাণী ঠোঁট, তার আরেবী চোখ, তার রুজমাখা কাশ্মীরী গাল, তার কাজল-কাল চুল সরাই খানার লাল নীল সবুজ রঙের বাতির সামনে আমাকে বাদশার রঙমহলে টেনে নিয়ে যেত। আমি চেয়ে থাকতুম আর কল্পনায় কাব্য গড়তুম—মানুষের নয় রূপের। সাকীর দল পেয়ালা ভরে সিরাজী ঢালত। যাত্রী দল পাত্রভরা সুধা পান করত। বাজনা বাজত ঝমঝম। এ সাকীদের পরণে থাকত স্কার্ট। একটা কেয়ারী করা ফুলের বাগানের সব কটা রঙ গলা জড়াজড়ি করত এদের পরণের পোষাকে। তাদের গাল থেকে আঙুর রস ঝরত আর চোখ থেকে তীর ছুটত সোজা আর সিধে। কত প্রেম রোজ জন্ম নিত, কত চুমুর সমাধি হোত সরাইখানার দেওয়ালের ওপরে! গভীর রাতে যখন নিজের ঘরে ফিরে আসতুম তখন মমতাজের কোন খবর আমি রাখতুম না। আমার মনের রঙে তখন আমি রাজা। আমার সুখ ছিল আমার নিজের সুখ আমার দুঃখ ছিল আমার নিজের দুঃখ।

তারপর এলো বোটানিক্স—এলো মমতাজ!

মমতাজের নাম একটা নিশ্চয়ই আছে। সে নামের খোঁজ আমি রাখি না। আমার অন্তরের অন্ধকার কবর ভুমি হতে যে নাম একদিন সহসা উঠে এলো সেটা দিয়েই তাকে আমার নিজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছি।

মমতাজ জিজ্ঞাসা করলে: আপনার বাড়ী কোথায়?—হয়ত মানে, কোন সহর হতে আসছ তুমি? কোথাকার অধিবাসী তুমি? কোথায় তোমার দেশ?—আশ্চর্য্য! এক সরাইয়ের লোক আমি অথচ সে নাকি জানে না কোথায় আমি থাকি! আমার দক্ষিণ দিকের জানালা হতে তার ঘর দেখা যায়। আমি সবুজ পর্দার ভেতরে সবুজ আলো জ্বলতে গভীর রাত পর্যান্ত কতদিন দেখেছি। কত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় অনাত্মীয় আসে তার সঙ্গে দেখা করতে—গল্প করে গান গায়। গোলমাল এসে পঁহুছয় আমার ঘরে—আমার কাজের ব্যাঘাত করে, আর সে আমায় চেনে না। আমি তাকে জানতুম সে নাকি কোথাকার রাণী। মমতাজ প্রশ্ন করলে: মেয়েরা হেসে খেলে মাঠে ঘাটে ছুটে বেড়ায় এটা আপনি পছন্দ করেন।—আশ্চর্য্য! জগতের কোন কাব্যে কোন সাহিত্যে কোন নায়িকা এমন অসংলগ্ন প্রশ্ন করেছে। তারপর কাটল অনেকক্ষণ। দুজনে চুপ-চাপ। অকারণে বসে থাকা আমার ভাল লাগে না। আমি অ্যাশফল্টের রাস্তার ওপর ছোট্ট করে কাঁকড় দিয়ে আখর টানতে সুরু করলুম। তারপর তাকে পা দিয়ে মুছে দিলুম। মমতাজ চেঁচিয়ে উঠল: আপনি যা লেখেন তা অমন করে পা দিয়ে মুছে দেন কেন?—আমার বুকটা ছনাৎ করে উঠল! এত তার দরদ! কেন? কিসের জন্যে? মমতাজ বল্লে: আপনি বুঝি কবিতা ভালবাসেন।—মমতাজের প্রশ্ন অদ্ভুত প্রশ্ন। অঙ্ক কষে জিজ্ঞাসা করছে আমি কী চাই আর কী না চাই। তারপর হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে: চলুন গঙ্গার ধারে বেরিয়ে আসি।

হেটে যাবেন কেন? গাড়ীতে চলুন। আপনার গাড়ীতো রয়েছে। এত রোদে হাটবেন? আমি বল্লাম।

মমতাজ তাড়াতাড়ি কথাটা চেপে দিয়ে বল্লে: না না হেঁটেই চলুন, হাঁটতে আমি পাইনা, তাই হাঁটতে ভালবাসি।

ফুলরাণী আমার মমতাজ আমার অন্তরের অন্ধকার কবর ভূমিতে প্রথম সূর্য্যের স্পর্শ ছোয়ালে। বাড়ীতে এসে ডায়রীর খাতায় লিখলুম—মরমী মমতাজ তোমায় সেলাম।

(২)

পরের দিন প্রভাত হোল। সরাইখানার ঘরে আর একটা রাত আমার কাটল প্রায় জাগরণে। বার বার প্রশ্ন এলো কেন? কেন? কেন সে আমার খবর নিতে চাইলে? আমি তো দিতে চাইনি। সে রাণী রাজার সোনার পালঙ্কে টাকার বিছানায় শুয়ে থাকবে? আমায় তার কিসের প্রয়োজন? আমার মনের একি অবস্থা! যে মন শুধু আপন মন নিয়ে থাকতে চায় তার এ বিকার কেন? রাত তিনটে—আমি আঁৎকে উঠলাম, আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: আমার এ ক্ষতি আমি কিছুতেই হতে দেব না।

তারপর এই সকাল। মমতাজের সঙ্গে দেখা হোল সরাইখানার স্পাইর‍্যাল সিড়িতে তার সারা গায়ে জড়ান একখানা আশমানি জর্জ্জেট। স্ফীতকরা বুকে একটা সিল্কের লাল ব্লাউজ। মাথায় গোলাপী কারচিফ। কাঁধের ওপর ফেলা সেই সবুজ স্কার্ফ। আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না, মুখ দিয়ে বেরুল: কি বিশ্রী দেখাচ্ছে আপনাকে—কী পুঁটলির মত পোষাক পরেন।

মমতাজ চোখ বড় করে বল্লে: খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে, না? আচ্ছা আমি স্কার্ফ খুলে ফেলছি।—মমতাজ বুঝেছিল কী আমি চাইছি। সে পোষাক বদলালো।

মমতাজ বল্লে: কাল থেকে ভারী বিশ্রী লাগছে।—আমার প্রাণের পরতে পরতে একটা ঢেউ খেলে গেলো। কিসের? আনন্দ না বেদনার? আমারও যে কাল রাতে ঘুম হয় নি। মমতাজকে বল্লুম: জানেন কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি, কি ভাল লাগছিল না। অনেক রাত পর্য্যন্ত বই পড়েছি তারপর বিছানায় জেগে কাটিয়েছি অনেকক্ষণ—প্রায় সকাল পর্য্যন্ত।—মমতাজের মুখ খুসীতে ভরে উঠল। বল্লে: একটু বেরুচ্ছি, সারাদিন থাকব না। কারুকে দেখতে পাবো না। ভারী খারাপ লাগছে।—একি, মমতাজের হোল কি? আমাকে—হ্যাঁ আমাকে দেখতে পাবে না বলে তার কষ্ট হবে! আমি ছাড়া মমতাজ আর কাকে দেখতে চাইতে পারে! আমি মানে নিখিলেশ আরও খানিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হোল।

মমতাজ হুস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তার বড় চোখে ক্লান্ত চাহনি এনে মরাল চরণে সিড়ি দিয়ে নামতে সুরু করলে।

(৩)

সারাদিন কাটল মমতাজের কথা ভেবে। আজ আমার সব কাযেই ভুল। মণি-ব্যাগটা, জামার বোতামটা, সিগারেটের প্যাকেটটা সবায়েরই যেন পাখা গজিয়েছে। মমতাজ আমার প্রিয়, তার ভাবনা আমার কাছে আমার নিশ্বাসের মত। তবু মমতাজের দেহটাকে নিয়ে মনোবিলাস আমি করিনি। সারাদিন এই কথা বলে ভগবানকে ডেকেছি। মমতাজ যেন আমার মত সব কাযে ভুল না করে। তার

ভুল ধরা পড়লে তার যে ভয়ানক ক্ষতি হবে তার পাচ জনের কাছে। তার ক্ষতি আমি সইব কেমন করে। মমতাজকে আমি কাছে পেতে চাই না, তাকে দূরে রেখেও আমার শান্তি নেই। মমতাজ! মমতাজ! আমার জীবনে ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত আলোকময়, তাকে আমি আমার সব কাযের আড়ালে কেমন করে রেখে দি।

সন্ধ্যেবেলা মমতাজ এসে উপস্থিত হোল, আমি তখন আমাদের পান্থশালার টেনিস লনে একখানা ডেক চেয়ারে শুয়ে। কাছে এসে মুখ ভার করে বল্লে: বেশ আছেন আপনি। বেশ শান্তিতে কাটাচ্ছেন। আপনার ওপর আমার যা রাগ হয়।

মমতাজের রাগ হয়েছে, কেন?—কেন? তার কথার ওপর আর একটু চড়িয়ে বল্লুম: রাগটা বুঝি আপনার একারই আছে আমার নেই।

মমতাজ সুর নাবিয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে বলে: কেন?

আমি বল্লাম: আপনিই বলুন কেন?

তার মুখখানা খুসীতে ভরে উঠল।

যে ছাপ হল্যাণ্ডের দুধের বালতি মাথায় মেয়ের মুখে—মমতাজের মুখেও আজ সেই ছাপ। তার চোখ থেকে একখানা শানানো ছুরী সাঁ করে এসে আমার চোখে বিঁধল।

(৪)

পরের দিন সকালে। মমতাজ উঠেছে আমার চেয়েও সকালে। লনে গিয়ে শুয়ে আছে আমারই ডেক চেয়ারে। সে পরেছে একখানি চাঁপা রঙের সিল্ক সাড়ী, গায়ে তার টকটকে রক্তের মত লাল সিল্কের জামা। দূর থেকে দেখি, সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বল্লুম: কী, আপনি যে মালবিকার মত তাকিয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের সে গান জানেন তো—'মালবিকা অনিমেষে চেয়েছিল পথের দিকে—' সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ম্লান হাসি হাসল। বল্লে: কাল সারা রাত ঘুমোয় নি, জেগে বই পড়েছি।—বই পড়েছ তুমি মমতাজ! একি, আমার সব অভ্যাস তুমি কেড়ে নিচ্ছ। আমার বই পড়া, যেখানে তোমাকে আমি ভুলে থাকতে চাই সেখানেও তুমি। আমি আর পারি না! আমার মাথা ঘুরছে! জোর দিয়ে বলে উঠলাম: দেখি আপনার ভ্যানিটি ব্যাগটা। উ: এত বড় ব্যাগটা! এটাকে নিয়ে আপনি. কী করেন বলুন তো। মমতাজ আমার কথার ওপর আরও জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা—' সারা রাত্রি ধরেই কি মমতাজ কবিতা পড়েছে! ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে পশমের সুতোর বল একটা বার করে নিয়ে, এমনিই অকারণে দেখতে লাগলাম। মমতাজ বল্লে: নিন ওটা।

আমি বল্লুম: এ নিয়ে কি করব?

মমতাজ হাত থেকে সুতোর বলটা কেড়ে নিয়ে জোরে আমারই কোলে রেখে, ভ্যানিটি ব্যাগটা নিজের কোলের ওপর রেখে বল্লে: রাখতে হয় রাখুন, না হয় টান মেরে ফেলে দিন। আমার এই সামান্য বোঝা টুকু আপনি বইতে পারেন না।

মমতাজ কেন আমায় এত জড়িয়ে ফেলেছে।

আমার পকেটে ছিল পেন্সিল, তাড়াতাড়ি সেটা বার করে দিলাম মমতাজের হাতে। ধ্বংশ পথের যাত্রী আমরা। আমার প্রতিদিন তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাওয়া রক্ত বিন্দু এর মুখ থেকেই ঝরেছে। জীবনের অনেক কথা অনেক হিসাব নিকাশ আমার এই পেন্সিলটাই জানে সেটাই মমতাজের হাতে সঁপে দিলাম। মমতাজ তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে সেটা পুরে ফেল্লে।

(৫)

আর একটা দিনের প্রভাত। আকাশ মেঘলা। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার ঘরের জানলায়। হু হু করে বাতাস আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা রেবার ধার থেকে এসে লাগছে আমার মুখে চোখের ওপর। আমার অন্তরের বাতাসও আজ হু হু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবছি দাঁড়িয়ে মমতাজকে গিয়ে বলব—'তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে ফেল।' তোমার ভার আর আমার মন বইতে পাচ্ছে না। আমি ক্লান্ত অবসাদগ্রস্থ সৈনিক। আমায় শান্তি দাও।

মমতাজের প্রকাণ্ড রোলস্ খানা এসে দাঁড়াল সরাইখানার দরজায়। খানসামার দল একে একে সুটকেস, বিছানা, বেতের বাক্স তুলতে লাগলো। মমতাজ চলে যাবে? যাক না! —কেন যাবে? আমাকে তো বল্লে না মমতাজের ঘরের দিকে তাকালুম! তার ভেতরে কয়েকটা লোকের নড়ানড়ি। কিসের তাড়া? তবে কি সত্যিই মমতাজ চলে যাবে? মমতাজ চলে যাবে আর আমায় জানাবে না। আমার চোখে জল এলো—না, না, মমতাজকে ছেড়ে কিছুতেই আমি থাকতে পারবো না। তাকে না দেখে আমি বাঁচবো কি করে! আমার মনের নীতি আমায় ঠেলা দিলে। আমি নিখিলেশ সেন, আমি এত দুর্ব্বল। কিন্তু মমতাজ আমি তো কিছু চাইনি। আমার চোখের সামনে তুমি থাকবে এতেই তো আমার পৃথিবী রঙীন!

গাড়ীর কাছে ও কে? ওই কি মমতাজ? হ্যাঁ মমতাজই তো! আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না। ছুটলুম নীচে। কাছে গিয়ে বল্লুম: একি? আপনি এ পোষাকে কেন? —তার পরণে পেশ-ওয়াজ পায়জামা, ওড়না, হীরের কলার, হীরের নাকছাবি, হীরে হীরে হীরে—সর্ব্বাঙ্গ হীয়ে দিয়ে মোড়া। উঃ কি বিশ্রী দেখতে লাগছে ওকে। গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠছে। বল্লাম: আপনি এ পোষাক পরেছেন কেন?

মমতাজ হাতের ছোট্ট রঙীন সিল্কের রুমালটা গাড়ীর সিটের ওপর ফেলে বল্লে: পোষাকটা কি খারাপ।

আমি বল্লাম: না—তবে কেমন বাইজী বাইজী ভাব।

—এই তো আমার পোষাক।

হেসে বল্লুম: তার মানে? আপনি বাইজী নাকি?

—হ্যাঁ।

—কি বলছেন? আপনি বাইজী?

—বিশ্বাস হচ্ছে না? আমি বাইজী।

—আপনি বাইজী! আমার মুখের ওপর কে সপাং সপাং করে চাবুক চালাতে লাগল। আমি নীতি বাগিশ নিখিলেশ আমার প্রেম আমার কাব্য আমার দুনিয়ার সুখ দুঃখ এক বাইজীকে নিয়ে।

বল্লুম: কৈ আপনি এ কথাতো এর আগে কোনদিন জানান নি।

—জানাবার আবার কি আছে!

—কোথায় যাচ্ছেন?

—ঠিক নেই।

—কবে আসবেন?

—ঠিক নেই

—সবাই ছেড়ে দিলেন?

—হ্যাঁ।

মমতাজ গাড়ীর ভেতর থেকে একটা 'ক্র্যাভেন এ' সিগারেটের টিন বার করে নিজে একটা ধরালে আমার হাতে একটা দিলে। আমার ফুলরাণী আমার অন্তরের আগ্রার মমতাজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

একটা ভয়ানক গরম বাস্পে আমার সারা বুকখানা ভরে গিয়েছে।

মমতাজ চাকরকে জিজ্ঞাসা করলে; সব তোলা হয়েছে।

আরো কাছে গিয়ে বল্লুম: আপনি সত্যিই আর ফিরবেন না?

—না।

—আর আমাদের দেখা হবে না—

—বোধ হয় না—

—আমার কথা আপনার মনে থাকবে?

—কি করে বলব।

ইচ্ছে হোল বলি, তুমি আমারই সামনে আমারই মুখের ওপর একথা বলছ কি করে? বল্লুম: আপনি আমার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

মমতাজ বল্লে: হ্যাঁ অভিনয়ই করেছি। অভিনয় করাই তো আমাদের ব্যবসা—আমাদের পেশা।

—তবে আমার সঙ্গে আপনি অভিনয় করলেন কেন? আমি তো কিছুই চাইনি।

—কিছু চাননি বলেই তো করলুম। যারা কিছু চায় তাদের সঙ্গে অভিনয় করি না, চাওয়ার মূল্য দি।

আমার চোখের জল ফেটে পড়বে বুঝি। আমার মমতাজ হারিয়ে গেছে। আমি উগ্র হয়ে উঠলাম। চেঁচিয়ে বল্লুম: দাও আমার পেন্সিল, ফিরিয়ে দাও। আমার জীবনের অনেক খবর ও জানে ওকে তুমি নিতে পারবে না।

—পেন্সিল নেই। হারিয়ে গেছে। কোথায় ফেলেছি মনে নেই।

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। বল্লুম: আমার জন্যে তুমি রাত জেগেছ—আমারই জন্যে কবিতা পড়েছ—আমারই জন্যে তোমার কটা দিন খারাপ গেছে এটাও তোমার অভিনয়।

—হ্যা অভিনয়! তুমি আমাকে যে কথাগুলো শুনিয়েছ, আমি ঠিক সেই কথা গুলোই তোমাকে শুনিয়েছি।

আমার পায়ের তলায় মাটি ফাঁক হয়ে যেতে লাগল। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার অন্তর আর্ত্তনাদ করে উঠল—নিষ্ঠুর, আমি তোমার কী করেছি। তুমি আমায় ঠকালে কেন? আমার সুখের সোনার দিনগুলির ওপর কেন অমন করে কালি ছিটিয়ে দিলে!

মমতাজ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্লে: চল্লুম—Good bye

জোরে গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল, ভিজে রাস্তার ওপর একটা মোটা গাড়ীর দাগ দিয়ে। আমার হাতে তখনও মমতাজের দেওয়া সেই 'ক্র্যাভেন এ' সিগারেট টা। ফেলে দিতে পারলুম না। ধরিয়ে নিয়ে একটা টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল আমিও অভিনয় করেছি। আমাদের জীবনে এমনি করেই তো অসংখ্য জিনিষ সৃষ্টি করি আবার তাকে এমনি করে পা দিয়ে মুছে ফেলি।
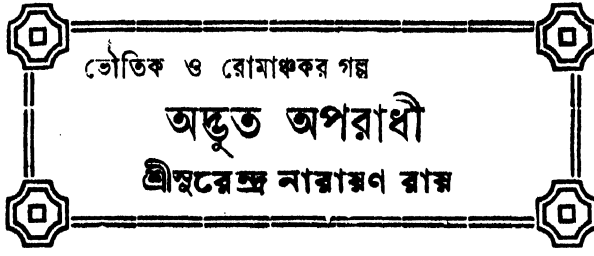
রাত্রি দশটা। কাজের ঝামেলা অনেক কমে গিয়েছে। সমস্ত দিনের শ্রম ক্লান্ত অবশ দেহ আর বইছে না। জোড়াবাগান থানার প্রবীণ ইনস্‌পেক্টার মিঃ চক্রবর্ত্তী কাজ সারিয়া উঠিবার উদ্যগ করিতেছেন, এমন সময় একজন শীর্ণকায় দীর্ঘাকৃতি পুরুষ আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্ত্তী মনে মনে বিরক্ত হইয়া লোকটীর মুখের দিকে চাইলেন। এত রোগা লোক সচরাচর দেখা যায় না। রোগা বলে আরও কিরকম দেখাচ্ছিল। গায়ের রং বেশ ফরসা, তবে রোদপোড়া গোছের—ফরসা চোখের ন'চে কে যেন খানিকটা কাল কালীর পোঁচ দিয়ে দিয়েছে। বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর হবে। চক্রবর্ত্তী বলিলেন, আপনার প্রয়োজন? ভদ্রলোক বলিল, আমি খুনী! ধরা দিতে এসেছি, অমাকে গ্রেপ্তার করুন। চক্রবর্ত্তী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ, খুন করেছেন? কখন? কাকে? ভদ্রলোক বলিল, হ্যাঁ খুন করেছি বন্ধুকে, বিশ বছর আগে সন্ধ্যার সময় ঝড় জলের মধ্যে পদ্মা নদীর ধারে। চক্রবর্ত্তী বিরক্ত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন বিশ বছর আগে পদ্মার ধারে খুন করেছেন আর আজ এসেছেন বেঙ্গল পুলিশের এলাকা ছেড়ে জোড়াবাগান থানায় রাত্রি দশটার সময় ধরা দিতে। মহাশয়ের মাথায় কি একটু ছিট্ আছে? আর এই ত চেহারা। হাঁটতে টলে পড়ছেন আর একটা জলজ্যান্ত লোককে খুন করে এলেন? আগন্তুক বলিল—হাঁ···হাঁ খুন করলুম। তবে চেহারাটা ঠিক এতটা খারাপ ছিল না, আর আপনি এখনও যা মনে করছেন তা, নয়; এই শরীরেই যথেষ্ট বল আছে বলিয়াই ভদ্রলোক মুহূর্ত্ত মধ্যে চক্রবর্ত্তীকে চেয়ার শুদ্ধ শূন্যে তুলিয়া ধরিল। চক্রবর্ত্তী ভয়ে আরষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। কোন রূপে চেয়ারের হাতল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, চেয়ারখানি যথাস্থানে নামাইয়া রাখিয়া ভদ্রলোক বলিল, এইবার তো বলের পরিচয় পেলেন?

চক্রবর্ত্তী লম্বা, চওড়া স্থুলাকায় পুরুষ, ওজন ৩ মণের কম নয়, প্রৌঢ়ত্বে একটু থলু থলে ভাব আসিয়াছে। ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখিয়া থানার সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল ভদ্রলোক বলিল, আমি খুন করতে পারি বিশ্বাস হ'ল তো? এইবার আমায় গ্রেপ্তার করুন। ভদ্রলোকের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া চক্রবর্ত্তী ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। বলিলেন ঐ চেয়ারটায় বসুন, আগাগোড়া ঘটনা না শুনলে কিছুই বুঝতে পারছি নি।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া বলিল—তবে শুনুন। থানার সকলেই সাগ্রহে ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিতে লাগিল—।

আমার বাড়ী পদ্মার ধারে কোন বিশিষ্ট এক গ্রামে। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। ভূসম্পত্তি যথেষ্ট আছে, এম, এও পাশ করেছিলাম।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ব্রজকিশোর। তারা আমাদেরই জাতি। অবস্থা ভাল। আমরা এক সঙ্গেই এম, এ পাশ করেছিলাম।

গ্রামের মধ্যে ললিতা ছিল সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে—আমাদেরই পাল্টা ঘর। আমার সঙ্গে তার বিবাহের কথা চলছিল। কিন্তু তার বাবার ধরণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি আমার চেয়ে ব্রজকে বেশী পছন্দ করতেন।

ললিতারও একটু বেশী টান ব্রজর ওপরই দেখা যেত। ললিতা তার শিক্ষিত বাপের কাছে লেখাপড়া একরকম ভালই শিখেছিলো। ললিতার বাপ কণ্ট্রাক্টারী করে বেশ মোটা কিছু গুছিয়ে নিয়ে কারবার তুলে দিয়ে গ্রামে এসে বসেছিলেন।

তখন না বুঝি, এখন বুঝেছি, চেহারার দিক দিয়েও বটে আর মনুষ্যত্বের দিক দিয়েও বটে ব্রজ আমার চেয়ে ঢের উচু ছিল। পিতৃ ধনে আমিই অবশ্য বড় ছিলুম। ললিতার পিতার নির্ব্বাচন ভুল না হলেও, আমার কিন্তু তা অসহ্য হয়ে উঠল।

নারীর প্রেমে বন্ধুত্ব নেই, মনুষ্যত্বও নেই, আছে শুধু স্বার্থ। সে দিন আপনি সুযোগ এসে উপস্থিত হল। পাপ পাহাড়ের উৎরায়ের পথ—চড়ায়ের নয়। নেবে যাওয়া সোজা, পাপের সুযোগ সহজেই আসে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল।

আমি পদ্মার ধার দিয়ে যাচ্ছিলুম। তখন ভাদ্র মাস। পদ্মার কি উদ্দাম গতি, ভীষণ খরস্রোতা! একুল ওকুল দেখা যায় না। শুধু জল। পাড়টা খুব উচু, তাতে ভাঙ্গন ধরেছে। প্রায় বিশ হাত নিচে জল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, দেখি ব্রজ কোথা হতে ছিপ হাতে করে

আসছে। তার মাছ ধরা বাতিক ছিল। আমায় দেখে বল্লে আর অন্ধকারে কোথায় যাবি ভাই; ঐ দেখ, মেঘ করে আসছে এখুনি প্রবল ঝড় হবে।

সত্য সত্যিই ভয়ানক ঝড় উঠে বৃষ্টি এল। ফাকা পদ্মার পারে দাঁড়ান যায় না। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যেন পদ্মার মধ্যে ফেলতে চায়। দুজনে পাশাপশি পদ্মার পাড় দিয়ে গ্রামের পথে ছুটতে লাগলুম। ব্রজ পদ্মার ধারের দিকে ছিল। হঠাৎ আমার কি মনে হল, আমি ঝড়ে তার দেহের ওপর পড়ে যাবার ভান ক'রে তার গায়ের ওপর সজোরে ধাক্কা দিলাম।

আমার গায়ের জোরের ত পরিচয় পেয়েছেন? ব্রজ টাল সামলাতে পারলেনা সে একটা করুণ আর্ত্তনাদ করে পদ্মার খাড়া পাড়ের বিশ হাত নীচের জলে পড়ে গেল।

পদ্মায় কি ভীষণ তুফান! বোধহয় দশ হাত উচু এক একটা ঢেউ উঠে গর্জ্জন করে পড়ছিল। মানুষ কোন ছার! সে ঝড়ে ষ্টিমার পড়লেও বাঁচেনা! আমি একবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চাইলাম। ঢেউয়ের উপর ঢেউ আছড়ে পড়ে একটা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। আর কিছুই দেখা যায় । শুধু ব্রজর সেই আর্ত্তধ্বনি যেন সমস্ত পদ্মাটা জুড়ে ঢেউয়ের তালে তালে ঝড়ের গর্জ্জনের মধ্যে হা হা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কি করুণ! কি মর্ম্মান্তিক! আমি মাতালের মত টলতে টলতে বাড়ী গিয়ে ভিজে কাপড়েই বিছানায় শুয়ে পড়লুম। তখনও ব্রজর সেই স্বর, আমাকে ঘিরে আকুলি ব্যাকুলি করে বেড়াচ্ছিল।

যেন বলছিল ওরে খল! ওরে ক্রূর! ওরে মিত্রদ্রোহী! ইহকালেও ফাকি দেওয়া যায় না রে!
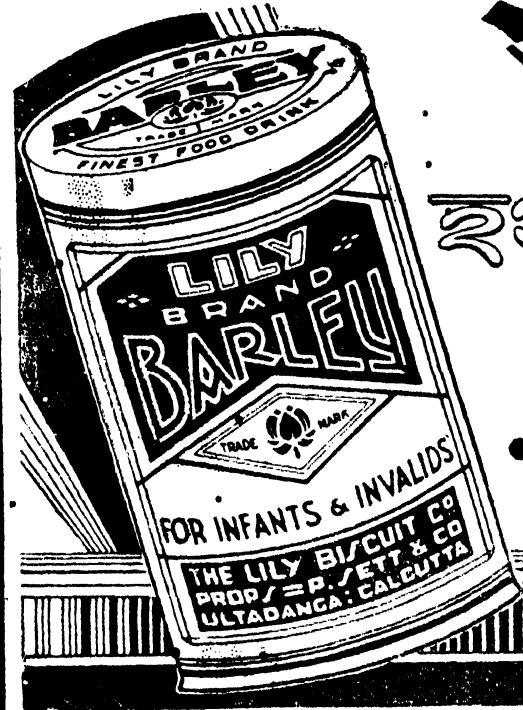
পরকাল পরে পরেই আছে। সেই রাত্রেই ব্রজর সন্ধানে তাদের বাড়ী থেকে লোক এসেছিলো। আমি ঘর থেকেই বললেম, কই! ব্রজ তো আজ এ দিকে আসেনি। কত বড় মিথ্যা! কত বড় প্রবঞ্চনা! গলার স্বর যেন আটকে আসছিল।

নানারূপ বীভৎস স্বপ্নে ভঁয়ে আতঙ্কে সমস্ত রাত তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে কেটে গেল। মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস আট্‌কে যাচ্ছিল কে যেন বুক চেপে ধরছিল। ছুটে বারাণ্ডায় বেরিয়ে পড়ে—তবে যেন দম্ ছাড়তে পারলুম। কি ভয়ানক যন্ত্রনা! ক্লান্তি-হরা, শান্তিময়ী নিদ্রা সেও পাপীর তাপ সহ্য করতে পারে না।

পরদিন গ্রামে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল, ব্রজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ছিপটা পদ্মার পাড়ে প'ড়ে রয়েছে। সকলেই অনুমান কর্ল্লে ঝড়ে পাড় ভেঙে সে পদ্মায় পড়ে গিয়েছে। ব্রজর আর কোনও সন্ধানই হ'ল না।

১ বৎসর পরে বাবা ললিতার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা স্থির করলেন।

ব্রজর মৃত্যুর পর থেকেই ললিতা কেমন হ'য়ে গিয়েছিলো। সে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের ফুল বাগানের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তো সে যেন কি দেখতে পাচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাস করলে হাসে—প্রকাশ করে কিছু বলে না। তার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে যেতে লাগল।

তার আর সে লাবণ্য, সে শ্রী নাই।

ললিতার পিতা বহু চিকিৎসা করালেন, ফল বিশেষ কিছু হ'ল না। সমাজে বাস করতে গেলে মেয়ে আইবুড়ো রাখা চলে না; কাজেই বিবাহের চেষ্টা তাঁকে করতেই হ'লো।

ভাবলেন—মেয়ের বয়েস হয়েছে বিয়ে না হওয়ার জন্যই বোধহয় এই সব ব্যাধির সৃষ্টি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনও সেই রকম মত দিলেন, সকলেই বল্‌তে লাগলেন মেয়ে বড় হয়েছে—বিয়ে হলেই সব শুধ্‌রে যাবে, শরীরও ভাল হবে।

বিবাহের কথা শুনেই ললিতা চম্‌কে উঠল্।

একদিন সন্ধ্যার সময় তার পিতা একটি বারাণ্ডায় বসেছিলেন—সেখানে স্বপ্নাবিষ্টের মত ললিতা গিয়ে বল্‌লে, আমার ত বিয়ে হ'য়ে গেছে, বাবা! সে তো রোজ আসে, রোজ আমার সঙ্গে কথা কয়! আবার বিয়ে দেবে এ তোমরা কি বলছ? হিন্দুর মেয়ের আবার ক'বার বিয়ে হয়?

বিস্মিত হ'য়ে ললিতার পিতা বললেন—কে, আসে? কে, তোমার সঙ্গে কথা কয়? মাথা নীচু করে লজ্জিতা ললিতা বল্লে কেন তোমার জামাই—যার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলে—।

চম্‌কে উঠে তার পিতা বল্‌লেন কে? ব্রজ—? ললিতা ঈষৎ হেসে বললে, সবই জান যখন বাবা, তখন আর নূতন ক'রে বের সম্বন্ধ করছো কেন? ললিতা সেখান থেকে চলে গেল।

ললিতার পিতা গভীর চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজন শুনে বললেন ও কিছু নয়, ও এক রকম হিষ্টিরিয়া। মেয়েটা ভেবে ভেবে ঐ রকম হ'য়ে পড়েছে। দেরী করো না শীঘ্র বিয়ে দাও। স্বামীর ঘরে গেলেই ওসব সেরে যাবে। অনেক ভেবে এক রকম নিরুপায় হয়েই তিনি আমার সঙ্গে ললিতার বিবাহ দিলেন।

বিয়ের দিন কি বিভ্রাট! সাতপাক ঘোরান হচ্ছে। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে। চারিদিকে লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আলোক-মালায় স্থানটী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আমি যেমন গ'ড়ে মালাটী হাতে নিয়ে ললিতার গলায় পরিয়ে দিতে যাব, কে যেন আমার হাত মুচড়ে মালাটা কেড়ে নিয়ে, ললিতার গলায় পরিয়ে দিলে।

ললিতা এতক্ষণ মুখ নীচু করেই ছিল। বারবার করে সকলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে ললিতাকে শুভ দৃষ্টি করতে বল্‌লে। কিন্তু সে কিছুতেই ঘাড় তুললো না। মালা গলায় দিতেই সে মুখ তুলে চেয়েই একটু হাসলো, যেন এইবার তার সত্যিকার শুভদৃষ্টি যেন তাদের চির মিলন ঘটিয়ে দিলে। মিলন কার সঙ্গে? কার সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হ'ল? বুকখানা তার আনন্দে ভরে গেল, যেন আনন্দের আতিশয্যে সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ঢলে পড়ল। তাড়াতাড়ি পাশের লোকেরা তাকে ধরে ফেললে নইলে সে পাঁড়ে থেকেই পড়ে যেত।

ধরাধরি করে বাসরে নিয়ে গি[illegible] চোখে মুখে জল দিতে তার জ্ঞান হ'ল সে চকিত দৃষ্টিতে ঘরের চারদিক চে[illegible] কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

লোকে তো দেখলো আমার সঙ্গে বি[illegible] হ'ল। আমি কিন্তু দেখলুম সব ফাঁকি-শুভলগ্নে মিলন গ্রন্থির শুভ্র নির্ম্মল পবি[illegible] পুষ্পমাল্য বন্ধনে আর একজন তাকে বেঁ[illegible] ফেল্‌লো। আমি যেমন পর—নিঃসম্পর্ক দূরের লোক দূরেই রয়ে গেলাম।

বুঝলুম—সে যার তারই রইল। জীবনে মরণে ইহকালে পরকালে তারই থাক্‌বে।

আমি লুব্ধ আকিঞ্চণ, আত্মপ্রতারণা নিয়ে চিরদিনই জল্‌বো। কেবল সেই সরল নির্ম্মল কুসুমকোরক আমার পাপের তাপে অকালে তিলেতিলে শুকিয়ে খসে পড়্‌বে। এই আমার লালসার দুর্নিবার পরিণাম।

এ বিবাহে সবচেয়ে আনন্দিত হবার কথা আমার; কিন্তু ব্রজর সঙ্গে সঙ্গে আমার যে আনন্দ চলে গিয়েছিলো বাসরে ফুলের গন্ধে গানের সুরের মধ্যে ব্রজর সেই স্বর তেমনি সকরুণ সুরে ভেসে এসে আলোকমালাকে যেন ম্লান ক'রে তুল্‌ছিল।

আমি সলজ্জ ললিতাকে মনের এ বীভৎসতা ভোলবার জন্যে আলিঙ্গন করতে গেলাম। ললিতা শিইরে উঠে দূরে সরে গিয়ে বললে—না, না তুমি আমায় ছুঁয়ো না। দেখছো না, ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি বিস্মিত হ'য়ে চারিদিকে চেয়ে বললুম কই, কে? ললিতা বল্‌লে দেখতে পাচ্ছ না? তোমার বন্ধু। তখনই কে যেন অদৃশ্য হস্তে আমাকে ঠেলে দিলে। আমি বিছানার ওপর ঢলে পড়লুম। ললিতা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে আমি স্পষ্ট দেখলুম ব্রজ তাকে আলিঙ্গন করে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে। সে অস্ফুট হাসি কি তীব্র কি ভীষণ! আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেলুম।

ভোরের কোকিল ডেকে উঠল, আমি চমকে চেয়ে দেখলুম ললিতা সেই ঘরের খালি মেঝেয় শুয়ে আছে।

যদি কখনও মোহে গত কথা ভুলে ললিতার কাছে যাই, কে যেন ঠেলে কিছুই দেখতে পাই না, কোনও শব্দ পাই না। কোনও অদৃশ্য শক্তি আমাদের মিলিত হ'তে দেয় না। তৃষ্ণাতুর প্রাণ, সম্মুখে সুশীতল বারি—পান করবার অধিকার নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে তৃষ্ণার দাহে সমস্ত দেহ জ্বলে পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছে, এ যেন হা-জল হা-জল ক'রে বারিধির বক্ষে ভেসেও এক ফোঁটা জলের জন্যে মরণ বরণ করা। তবুও মরণে তার একটা সার্থকতা আছে আমার জীবন মরণহীন জরা-হীন। প্রতীচ্যের অভিশপ্ত ইহুদার মত ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে জীবন ধারণ করা, যুগের পর যুগ বেঁচে থাকা—এ যে কি ভয়াবহ, বাইরের লোকে কল্পনা করতে পারবে না।

ললিতা এল সংসার করতে লাগল, লোকে জান্‌ল ললিতা আমার স্ত্রী কিন্তু কিন্তু ললিতা কার? কে তার যথার্থ প্রভু? কে তার অধিকারী? খেতে বসি কোনো অদৃশ্য হস্ত তার অর্দ্ধেক গুলো তুলে নেয় আধ পেটা খেয়ে বেঁচে আছি, তবু মৃত্যু নেই।

এইভাবে বৎসর কেটে গেল। এই অদৃশ্য শাসনের বিরাম নেই। ললিতার মুখে হাসি নেই, আমার মুখে হাসি নেই। কে যেন অলক্ষ্যে হেসে বলে কেমন! ললিতাকে বিয়ে কর। পরকাল পরের কথা, ইহকালেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলুম। তাই ইহকালেই পাপে এত ভয়।

অসহ্য, অসহ্য—! ঠিক তেমনি ভাদ্রের বরষা, তেমনি খরস্রোত, তেমনি ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য—ঝাঁপিয়ে পড়লেম পদ্মায় ডুবে মরতে। কে যেন কোমল শয্যায় শুইয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল দূরে চড়ায় গিয়ে তুলে দিলো, এক ফোঁটা জলও পেটে গেল না একটু শ্রান্তিও এলনা। আত্মহত্যাকারী আত্মাদের কত কাতর হ'য়ে ডাকতে লাগলুম। শুনেছি যে আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের নাকি তারা সহায় হয়। এ মিত্রদ্রোহী হত-ভাগ্যকে ঘৃণা করে তারাও দূরে সরে রইল। সরু লাফ লাইন দড়ী মোম দিয়ে ঘষে পালিস করে গোয়াল ঘরের উঁচু আড়ায় টাঙিয়ে ফাঁস করে ঝুলে পড়লুম। কোথায় শূন্য পায়ের নীচে শূন্যে তক্তা বিছিয়ে কে যেন দাঁড় করিয়ে রাখলে, ফাঁস এক চুলও সরলো না।

একটিন কেরোসিন তেলে ৩।৪ খানি কাপড় চুবিয়ে গায়ে জড়িয়ে দেশলাই জ্বাললুম। একবার দপ্‌ করে জ্বলেই নিভে যায়। তিনটে দেশলাই খরচ হল—দেহ ত দূরের কথা-কাপড়েও একটু পোড়া দাগ লাগলো না। রেগে ধারাল ক্ষুর নিয়ে গলায় চেপে বসালুম। যেন গলায় মোটা কাঠি ঘসছি, দাগ পর্য্যন্ত হল না। সাংঘাতিক বিষ খেলুম—যেন নীচে আর নামে না। অনশন সুরু করলুম, কোন কষ্ট নেই। ২৫ দিন পরেও দেখি যেমন সবল সুস্থ তেমনিই আছি। নৈরাশ্যে হেঁসে উঠলুম, আমি মৃত্যুজয়ী মৃত্যুঞ্জয়।

এমন সময় ললিতার অসুখ করল। সে একদিন বললে দুঃখ কোরনা - যাঁর জিনিষ তাঁর কাছেই যাচ্ছি। ঐ দেখনা তোমার বন্ধু বিয়ের জোড় প'রে টোপর মাথায় দিয়ে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আজ আমাদের সত্যি বিয়ে— ললিতা উৎফুল্ল হয়ে হেসে উঠল। হাসি-টুকু তার মুখ থেকে মিলুতে না মিলতেই চোখ দুটো তার বুজে এলো। আর সে চাইলে না। সব শেষ হয়ে গেল।

মাঝে বাপ মা মারা গেলেন। আমি জেলায় ম্যাজিষ্টেটের কাছে গিয়ে হলপ করে ব্রজকে খুন করেছি স্বীকার করলুম। কিন্তু বাইরে খুন প্রমাণ হল না। পাগল বলে ম্যাজিষ্টেট কাটগড়া থেকে নামিয়ে দিলে। কিন্তু সত্যি আমি পাগল নই, বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করুন, এই দেখুন মৃত্যুও আমাকে ভয় করে. বলিতে বলিতে
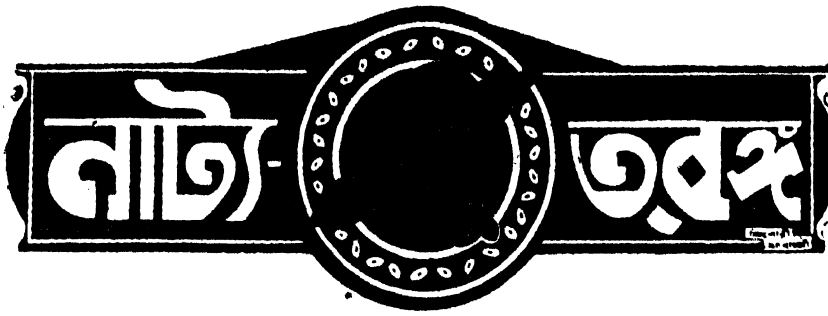
শ্রীনটনাথ

সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অভিনয়

৺শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের সভ্যবৃন্দ প্রতি বৎসরই প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাদির অভিনয় করিয়া থাকেন। এ বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। মাননীয় নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের নেতৃত্বে গত ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ভবনে পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে মাননীয় বিচারপতি রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, পাইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত গিরিজা-কিশোর ঘোষ, শ্রীযুক্ত গৌরীকিশোর ঘোষ, রায় বাহাদুর মন্মিনাথ রায় প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক স্বর্গত পণ্ডিত প্রবর কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহোদয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। তৈলচিত্রখানি তর্কবাগীশ মহাশয়ের মধ্যবয়সের প্রতিকৃতি হওয়ায় অনেকের পক্ষে চিত্র দর্শনে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছিল। পরিষৎ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পরিণত বয়সের একখানি প্রতিকৃতি স্থাপন করা।

সভা সমাপ্তির 'পর নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী জর্জ্জরোৎসব অনুষ্ঠানের পর পরিষদের সদস্যগণ ক্ষেমীশ্বরের "চণ্ডকৌশিক" অভিনয় করেন। বিশ্বামিত্র, হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা, বিদূষক ও বনেচরের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কামাখ্যা-চরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত শিরোমণি মহাশয়গণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বনেচরের ভূমিকা দর্শনে প্রীত হইয়া ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় পণ্ডিত যামিনীকান্ত শিরোমণিকে একখানি পদক দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। শৈব্যার সখী চারুমতীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কমল মিত্রের রূপসজ্জা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সে তুলনায় শৈব্যার রূপসজ্জা একটু ম্লান দেখাইতেছিল। রোহিতাশ্বের ভূমিকায় যে ছেলেটিকে নামান হইয়াছিল তাহার অভিনয়ও জড়তাশূন্য হওয়ায় আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

রাত্রি প্রায় ১২টায় 'চণ্ডকৌশিকে'র অভিনয় সমাপ্তির পর 'হাস্যচূড়ামণি' নামে একখানি প্রহসন অভিনীত হয়। কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় উহা দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটে নাই।

আমরা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

এবার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রীযুত রবিন্ সরকারের "মৃগব্যাধ" নৃত্য। প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা রবিন্ সরকারের এই নৃত্যটির সমালোচনা আমরা পূর্ব্বে একাধিকবার করিয়াছি। নৃত্য ও তাহার অনুগামী সঙ্গীত সুন্দর হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত অভিনয়ের গান কয়খানিই সুগীত হইয়াছিল। এজন্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। পাপপুরুষের রূপসজ্জা প্রশংসনীয় হইলেও অভিনয়ে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না।

ভদ্রলোক জুতা খুলিয়া চলন্ত ইলেকট্রিক ফ্যানের রেগুলেটারের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দিল। সকলে আতঙ্কে হা হা করিয়া উঠিল……। ভদ্রলোক নীরব, স্থির, কোন যন্ত্রনা নেই। হাসিয়া বলিল দেখলেন ত, আমি মৃত্যুঞ্জয়ী কিনা? দোহাই আপনাদের যদি সরকারী ফাঁসিতে ঝুললে আমার মৃত্যু হয় করুন, করুন তাই করুন। অতি কাতর ব্যকুল ভাবে সে ইনেস্পেক্টরের মুখের দিকে চাইল। তারপর হতাশে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে থানা থেকে বেরিয়ে গেল। থানার সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। ইনসপেক্টর চক্রবর্ত্তী পুলিশের কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত অপরাধী তিনি কখনও দেখেন নি।—

—[শেষ]—

রাজবন্দী

শ্রীসমীর ঘোষ

আকাশের দিকে তাকাও বন্ধু গভীর হোয়েছে রাত
কালো শকুনির পাখার পালকে আকাশ মেখেছে কালি;
কোথাও নেইকো আলোর চিহ্ন—কিন্তু উল্কাপাত
আমার বুকেতে একদা দিয়েছে প্রলয় আগুন জ্বালি'!

এই ক্ষীণ বুকে আগুনের জ্বালা! বিদ্রূপে ওঠো হেসে,
সত্যি তো ভাই বড় ক্ষীণ এই বুকের অস্থি কটি,
যক্ষ্মার বীজ আশ্রয় নিলো, দুর্ব্বল খালি কেশে,
কারার প্রাচ'রে মাথা ঠুকে ঠুকে গেছি খালি পিছু হটি'।

রাত্রি গভীর কয়েদী ঘুমায় সারাদিন ঘানি টেনে
দূরে শুধু চলে সমুদ্র জলে জোয়ার ভাটার খেলা,
মাঝে মাঝে ছেঁড়ে রাতের আঁধার শাস্ত্রীরা রোদ হেনে
—আমারো চোখেতে আঁধার ছিড়েছে চোখের জলের মেলা!

আমার চোখের জল নয় এতো—বুঝো'না বন্ধু ভুল,
আমার মায়ের, বোনের, ভায়ের বেদনার শৃঙ্খল
মাঝে মাঝে করে স্নায়ুমণ্ডলী যন্ত্রণা সমাকুল—
হদিস পাইনা রাজবন্দীর চোখে আসে কেন জল!

রাজার বন্দী!…চম্‌কে উঠলে তরাসে বন্ধু তুমি!
বিদায় নিচ্ছো—নাও ভাই নাও পথ গেছে ওই সোজা।
আমি যে কিন্তু ভালোবাসিয়াছি পথ গড়া ওই ভূমি—
কারার প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরি কোথা সেই পথ খোজা।

সোজা কথা বলি, দিন গুণে গুণে হোয়েছি ক্লান্ত ভারী
সূর্য্য চন্দ্র করে আসা যাওয়া রাখি না হিসাব আর,
মাটির কনিকা অঝোরে কাঁদিছে করুণ শব্দ তারি
মনে করে দেয় দুপুর রাত্রে অনেক অত্যাচার।

থাক ভাই থাক অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনী শুনে
তোমার চোখেতে জল আসবে সে দেখতে চাই না।আমি,
শিশু হোয়ে আছো তোমরা বন্ধু আকাশের তারা গুণে—
আমি দেখিয়াছি সে আকাশে গেছে শকুনির ডানা থামি'!

বুকের ব্যথাটা উঠিয়াছে জেগে, কাশিটাও আজ বেশি,
তবুও বন্ধু দিনের প্রহর হুকুম তামিলে গ্যাছে—
চোখ জ্বালা করে জীবনটা হায় হোয়ে এলো শেষাশেষি
—সোনালী ধানের মরায়ে প্রেতের নৃত্য কি থামিয়াছে?

পাশবিক সেই শক্তিমত্ত দস্যুর নীতি আজো.
বিশ্বেরে করি' নিঃস্ব রিক্ত শাসন করিছে দেশ,
আকাশে উড়িয়ে বোমারু বিমান কোথাও কি দেখিয়াছো
শাসনের নামে শোষণ এমন—চেয়ে আছো অনিমেষ!

থাক তবে থাক পুরানো কাহিনী চিরকাল ওতো হয়!
সবল সে করে দুর্ব্বল বুকে চিরদিন পদাঘাত,
বুকেতে আগুন পুষে মরা সেও দুর্ব্বল পরিচয়
—কি জানি ব্যাকুল করে কেন আজ এ অমানিশার রাত!

আকাশের দিকে তাকাও বন্ধু নেইকো আলোর কণা,
সে দিন রাতেও ঢেকেছিল সারা পৃথিবীরে কুহেলিকা,
ভাই বোন কাঁদে কাঁদুক তাহারা নেই কোন সান্ত্বনা—
নিজে হাতে আমি সে দিন পরেছি আগুণের জয় টিকা।

তারপর—থাক সে সব কাহিনী, কেটেছে বছর কুড়ি—
ক্ষীণ বুকে আজ যক্ষ্মার বীজ—শাস্ত্রীরা হাকে রোদ
—বুকের অস্থি কাঁপে থরো থরো, রক্ত গিয়েছে পুড়ি'
—পৃথিবীর সাথে সব জানা শোনা হোয়ে গেছে শোধবোধ!

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ—

দিন চার পাঁচ বাদে নীরদ বাবুর বাটীতে জগুদা আসিয়া দেখা দিল। জগৎতারিণীর সহিত দেখা হইলে জগুদা প্রথম ললিতার জন্য খুব শোকপ্রকাশ করিতে লাগিল। বৃদ্ধের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িল, এবং বালকের মত তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, লবঙ্গর বিষয়ে কথা উঠিল।

—কই জগুদা? লবঙ্গর জন্যে তোমরাত কিছুই করলে না?

—আপনি ভার দিয়ে গেলেন জামাই বাবুর উপরেই প্রধানতঃ! আমাকে ত শুধু তাঁর তাঁবেদার রেখে গেলেন।

—জামাই বাবুও কিছু করেন নি, তুমিও কিছু করোনি। কেন করবে? তোমাদের নিজের ঘাড়ে ত কোনও চাপ লাগছে না; এযে আমার উপকার করা কিনা, কাজেই—

—আর লজ্জা দেবেন না দিদি! আমি আপনার পা ছুয়ে দিব্বি করছি, এবারে একটা কিছু করে দেবোই। এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি খোরাকির জন্যে নালিশ করে দিচ্ছি।

খোরাকির টাকা হাতে করে কোথায় থাকবে বল দেখি! একটা জায়গায়, মাথাগুজে থাকতে হবে!

জগুদা খপ করিয়া বলিলেন: কেন আপনার কাছে!

—আমি আর সংসারের কোনও কিছুতে নিজেকে জড়াতে চাইনে! একটা সমর্থ মেয়ে মানুষ কাছে রাখা বড় জ্বালা।

জগুদা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন: কি জানেন দিদি, বাঁধন জিনিষটা এমন যে, যার ওপর এটা এসে পড়ে তার ইচ্ছের ওপর এটা নির্ভর করে না,—নির্ভর করে যে বাঁধছে তারই ভাগ্যলিপির ওপর।

জগৎতারিণী উত্তরে বলিলেন: কিন্তু বাঁধন নেবার শক্তিটুকুও যে আমি হারিয়ে ফেলেছি জগুদা!

কথা আর না বাড়াইয়া জগুদা বলিয়া বসিলেন: যাক্! আমায় তাহলে কি করতে হবে, সেইটে বলুন।

জগৎতারিণী বলিলেন: আমি বলি, তুমি কোনও ফিকিরে লবঙ্গকে তার শ্বশুর বাড়ীতে বাহাল করবার চেষ্টা করো।

লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন: ওরে বাবা। তার' চেয়ে বলোনা দিদি, সুন্দর বনের একটা মানুষখেকো বাঘকে তোমার কাছে ধরে এনে দিতে।

কিন্তু জগৎতারিণী হাল না ছাড়িয়া বলিলেন: অমন করে লাফিয়ে উঠলে চলবে না জগুদা! জানি কাজটা খুবই শক্ত। কিন্তু এটাও জানি যে তুমি চেষ্টা করলে হয়তো এ কাজটা ঘটেও যেতে পারে।

জগুদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল: মোটেই না, মোটেই না দিদি!

জগৎতারিণী একথাতেও না দমিয়া বলিলেন: জগতে অসাধ্য বলে কোনও কাজ আছে জগুদা? দুর্ভিক্ষের সময়েও যখন তুমি খাজনা আদায় করতে, তখন কি একটা অসাধ্য কাজ সাধ্য করে তোলো নি?

- একাজ কিন্তু তার চেয়ে অসাধ্য।

—আচ্ছা অসাধ্য না হয় হলো। কিন্তু তা'বলে চেষ্টা করতে দোষ কি। আমি তোমায় একটা ফিকির বলে দিচ্ছি। তুমি সেই রাস্তা দিয়ে চলে দেখ দেখি।

জগুদা জিজ্ঞাসু নেত্রে জগৎতারিণীর দিকে চাহিলেন।

– তুমি জামাইকে বলো লবঙ্গকে ঘরে রাখবার জন্যে আমি তাকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে খোরাকি ধরে দেবো। জামাইটার শুনেছি হাঁড়ির সংস্থান তেমন নেই। তার ওপর তার দাদা ইস্তফা দিয়ে সরে পড়েছে। গেলো মাসে কলেরায় সেও নাকি মারা পড়েছে। এখন সমস্ত সংসারের ভার জামাইয়ের ঘাড়ের উপর। এ সময়ে তার টাকার খাক্তি খুব। এই সময় একবার চেষ্টা করে দেখো, হয়তো সফল হতে পারবে

জগৎতারিণীর কথা শুনিয়া জগুদা বিস্মিত হইয়া গেল।—বলেন কি? মাসে মাসে কুড়িটাকা ক'রে দেবেন? নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করার জন্যে?

কি করি বলো? মেয়েটার ত একটা গতি করা চাই।

—কিন্তু মেয়েটা তো আপনার নিজের নয়! আপনার দূর সম্পর্কে জ্ঞাতির মেয়ে! পাড়া-প্রতিবাসা! এই তো?

মেয়েটা যে আমায় মা বলে ডাকে জগুদা? সে ডাকের কি কোনও মূল্য নেই? পেটে ধরলেই কি আপনার হয়? তা না হ'লে কি হয় না? সে যে তার নিজের মাকে ভুলে, আমাকে তার শূন্য স্থানে বসিয়ে আজ কত বছর আমার স্নেহের দ্বারেই হাত পেতে বসে আছে, চোখের জলে তার হাত ভরিয়ে দিয়ে তাকে ফেরত দেবো কেমন করে?

দিদি! তোমার অন্তঃকরণটা খুব বড় জানতাম। কিন্তু তুমি যে তোমার জননী স্নেহে সমস্ত পল্লীটাকে আচ্ছাদন করে ফেলেছো, পল্লী ও মাঝখানে যে এতটুকু ফাঁক আর থাকতে দাওনি,—এ দেখে আমি যতটা বিস্মিত হচ্ছি, তার চেয়ে বেশী প্রশংসায় অস্থির হয়েচি। লবঙ্গ আর জন্মে অনেক পুণ্য করে এসেছিল তাই এজন্মে তোমার মত মা কে পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। আমিও ধন্য যে আমার মুখ তোমাকে দিদি সম্বোধন করে চিরকাল তীর্থজলে স্নান করে এসেছে। তবে আর তোমাকে বারণ কর্ব্বোনা! একটু পদধূলি দাও,—দেখি, সেই পায়ের জোরে তোমার কাজ হাঁসিল করে আসতে পারি কিনা!

জগৎ তারিণী জগুদার কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র!

(ক্রমশঃ)

সম্পাদকের দপ্তর

মাননীয় 'খেয়ালী' সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার কাগজের এক কোণে আমার এই সামান্য পত্রখানা স্থান পেলে বিশেষ বাধিত হ'ব।

গত ১লা ভাদ্দর 'খেয়ালী'তে শ্রীমনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "সমালোচনার গলদ কোথায়" প্রবন্ধটী পড়লাম। তিনি লিখেছেন "আমাদের দেশের যে কোনও ছবি পর্দায় বা'র হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক্ থেকে কাগজের মারফতে যে প্রকার সমালোচনার বহর দেখা যায়, তাতে ক'রে ভাল ভাব কিম্বা মন নিয়ে কোন দিনই কোন ছবি দেখতে যে'তে পারি নাই।"·········

ছবি দেখতে যাওয়া যে কয়েক ঘণ্টা আমোদ প্রমোদে সময় কাটান ইহা সত্য; তবে যে জিনিষটীর যেখানে যাহা দেখান আবশ্যক তা যদি ঠিক সেই প্রকারের না হ'লো,—আর তাই নিয়ে যদি সমালোচকেরা মাথা ঘামান তবে সে দোষটা সমালোচককে দেওয়া ঠিক নয়। তাঁদের কর্ত্তব্য শুধু ভাল মন্দ বিচার করে' লোক সমক্ষে আসল জিনিষটী প্রকাশ করা। আমাদের মনে হয় এই সব ব্যাপারে সমালোচনটাই সব চেয়ে বেশী দরকার। আর সমালোচনা হয় ব'লেই আমাদের দেশের (আমাদের দেশেরই বা কেন, অন্যান্য দেশেরও) ছবির এতটা উন্নতি ক'রতে পেরেছে। সমালোচনার দোষ ত্রুটী দেখে' প্রযোজক মহাশয়েরা পরবর্ত্তী ছবির দোষ ত্রুটি শুধরে, নিতে পারেন এবং পূর্ব্বের ছবির চেয়ে পরের ছবিখানা যা'তে ভাল হয় সেই চেষ্টা করবার সুযোগ পান। তাই সমস্ত ব্যাপারেই সমালোচনাটাই সবচেয়ে বেশী দরকার তা বোধহয় কেহই অস্বীকার করেন না আমার বিশ্বাস যে নির্ভুল সমালোচনাই আমাদের দেশের ছবিকে আরও বেশী করে' উন্নতি পথে টেনে নিয়ে যা'বে। আমার নমস্কার গ্রহণ করুণ। ইতি

কুমারী রমা বসু (Miss Roma Basu)
৫৩ খাজে দেওয়ান রোড, ঢাকা।

—:o:—

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর
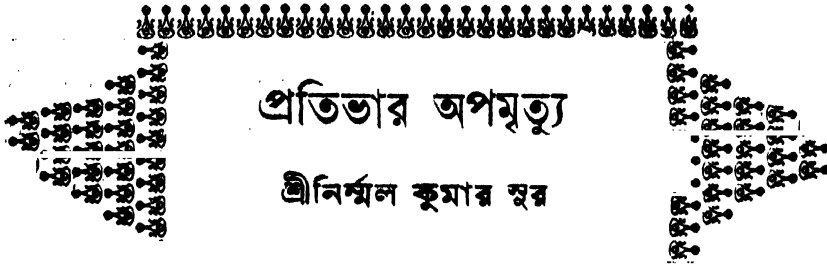
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) ।

এই ঘরের মধ্যে থাকে সারা দিনরাত বন্ধ হয়ে। মা এত বকেন, বলেন—হতভাগা ছেলে বাইরে একবার কোথাও ঘেড়িয়ে আয়তো, দেখি। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রাতদিন বসে আছে বই পত্তর আর কাগজ কলম নিয়ে।

মৃণালবাবু ঈষৎ চোখটা তুলে বলেন—কোন্ ইয়ারে পড়ে? সেকেণ্ড ইয়ারে বুঝি? তবে একটু বয়স বেশী হয়ে গ্যাছে। যাক্ লেখাপড়ায় মন থাকা ভাল। আর দুটো বছর বাদে বি-এটা দিলে আর কেউ নাক্ সিঁটকাবে না।

—ওর দাদা বলেন—কলেজে কোথায়, কলেজের গোড়ায় ও অনেকদিন নমস্কার করেছে।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মৃণালবাবু বলেন—ও! চাড্ডি রাবিশ নভেল বুঝি? তারপর একটু বেশ এয়ার নিয়ে বলেন—আর দোষই বা কি বলুন। বাজারে যে সব নভেল বেরুচ্ছে ছেলেগুলোর মাথাটা একেবারে খাওয়া হয়ে যাচ্ছে। সেই এক ঘেয়ে প্রেমের কাঁদুনি আর ন্যাকামো। আপনিই মাত্র নিয়েছেন অন্য রাস্তা। আপনার লেখা পড়লে বুঝতে পারি দেশে হয়তো ভালো কিছু আবার বেরুবে শরৎ-বাবুর পরে। সত্যিই আপনার ধারা দেশে নতুন স্রোত আসবে। তাইতো এসেছি আপনার সাথে [illegible] আলাপ করে [illegible] হতে, আর আমাদের [illegible]কেও [illegible] করতে।

ওর দাদা এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যে ওঁরা চপলের কথাই বলছে তাই উনি জিজ্ঞাসা করলেন—কার কথা বলছেন আপনারা?

—দেখুন, বিনয় আপনাদের ভূষণ। তবুও আবেগকে চেপে রাখা যায় না, যেখানে সত্যসত্যই থাকে শ্রদ্ধা বা ভাল-বাসা। নিজের প্রশংসা একেবারে সামনা সামনি শুনতে বোধহয় কেউই পছন্দ করেন না। তবুও সত্যি যা তাই বলেছি, দোষ করে থাকি তো ক্ষমা করবেন।

ওর দাদা মনে মনে হেসে বল্লেন—দেখুন আপনারা গোড়াতেই করেছেন ভুল—আর মধ্যিখানে এসে পড়ে আমিও করেছিলাম ভুল। এখন বুঝতে পেরেছি ভুলটা,—তাই আপনাদেরও উদ্ধার করতে চাই।

—বলুন। আমাদের তথা সারা দেশের ভুল শোধরাবার ভার যে আপনাদের হাতে দিয়েই পাঠিয়েছেন ভগবান।

—ঠিক তাই নয়, ওর দাদা বল্লেন। ব্যাপারটা ক্রমশঃ হয়ে উঠছে জটীল, শেষ-কালে আপনারাও জিভ কাটবেন আর আমাকেও অপদস্থ হতে হবে।

—সেকি? কি বলছেন আপনি? মৃণালবাবু বললেন।

—বলছি কি—আপনারা যার কথা বলছেন, যা [illegible] দেখা করতে এসেছেন তার [illegible] চপল বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনার সাথে…

—দাঁড়ান, অত শীঘ্গিরই চিনে ফেলবেন না চপল বন্ধুকে।

—তার মানে?

—তার মানে এই যে—যে এতক্ষণ বসেছিল আপনাদের সামনে, অর্থাৎ যাকে বল্লেন ক্র্যাক্ড্, মানে যিনি আমার দেশের লোক বলছিলেন, হোয়াট্ ইজ্ সেকেণ্ড ইয়ার ষ্টুডেণ্ট করে দিয়েছিলেন যাকে—তিনিই চপলবাবু—অর্থাৎ যার আসনে আমাকে বে-আইনী করে বসিয়ে করছিলেন সুখ্যাতি। আমি নয়।

মৃণালবাবু ও তাঁর দলটী বিস্ময়ে চোখ দুটোকে কপালে ঠেকাবার চেষ্টা করে বললেন—এ্যা বলেন কি ?

ওর দাদা বল্লেন—অর্থাৎ ছি, ছি কি লজ্জার বা দুঃখের কথা, অথবা তিনি কি ভাববেন, এই তো ? নির্ভয় থাকতে পারেন ওর এসব কোন কালেই খেয়াল থাকে না। লোকজন দেখলে নার্ভাস হয়ে পড়ে তাই কি উত্তর দেওয়া উচিত ঠিক করতে না পেরে একটা যা তা বলে বসে। একবার ভেবেও দেখে না ওর উক্তির কি অর্থ হতে পারে। একটু হুস্ যদি ওর থাকতো তাহলে তো আমার খাটনি অনেক যেত কমে।

মৃণালবাবু বললেন (ওঁর দল তখন চুপ করে আছে)—দেখুন তো কি ভুলই করে বসলাম। প্রথমে ওঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা চপলবাবুর বাড়ীতো ? উনি—হ্যা বলে ভেতরে নিয়ে এসে বসালেন। তখন ওঁর পরিচয় পেলাম না বলে মনে করলাম—চপলবাবুর বাড়ী খুঁজছি নিশ্চয়ই চপলবাবুকেই দরকার এ কথা উনি বুঝবেন।

অত সোজাসুজি যদি ও বুঝতে শিখতো তাহলে ভাবনাই ছিল না। চপলবাবুর বাড়ী জিজ্ঞাসা করেছেন ও চপলবাবুর ঘরেই এনে বসিয়েছে। ওখানেই ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে।

—বাঃ জিজ্ঞাসা করলাম যে—চপলবাবু আপনার কে হন—উনি বললেন প্রথমে কেউ না, তারপর বললেন বন্ধু তারপর দেশের লোক।

—ওকে আপনারা যেমন জিজ্ঞাসা করেছেন ও সোজাসুজি তারই উত্তর দিয়ে হাঁফ ছাড়তে চেয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা করতেন—আপনার নামই চপলবাবু ? তাহলে ও কাঁচু মাচু হয়ে দাঁড়াতো হাত জোড় করে—যেন 'চপল' এই নাম ধরে ও ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে তা থেকেই আপনারা বুঝে নিতে পারতেন। আপনারা ঘুরে গ্যাছেন, ওর নার্ভাসনেস্ আপনাদের ঘুরিয়েছে। যাক্ দোষ কারুরই নেই। আপনারা বসুন ; আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি বলে ওর দাদা বেরিয়ে গেলেন।

মৃণালবাবুদের অবস্থা তখন ঠিক স্বাভাবিক নয়, কি ভাবে কথা বলে ওর প্রতি এই তাচ্ছিল্য দেখানোর অপরাধ স্খালন করবে সেই কথাই ওঁরা আলোচনা করতে লাগলেন।

চপল তৎক্ষণে দরজার সামনে এসে হাজির—চায়ের পেয়ালা শুদ্ধ চাকরটাকে নিয়ে। টিপয়টা এগিয়ে দিয়ে বল্লে:—একটু চা খান। মা পাঠিয়ে দিলেন। আর এই সিগারেটগুলো। হ্যা এগুলো মা পাঠিয়ে দেননি। মিথ্যা কথা বল্লে মা শুনতে পেলে আমাকে ভয়ানক বকবে। বলে ও নিজের যায়গায় আবার এসে বসলো।

মৃণালবাবুর দল তৎক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাতজোড় করে বলে চল্লেন—দেখুন, ভয়ানক ভুল গোড়াতেই করে ফেলেছি। তার জন্য ক্ষমা করবেন। ইংরাজীতে বল্লেন—ভুল করাই মানুষের স্বভাব'। ছি, ছি কি লজ্জার কথা বলুন দেখি। আপনাকে খুঁজতে এসে আপনাকেই দিলাম ঘর থেকে তাড়িয়ে, আপনারই ঘর থেকে!! একটু বুঝতে পারিনি আপনিই উদীয়মান কবি সাহিত্যিক চপল বসু। মনে করেছিলাম আমাদের দেশের সকল কবি মায় কালকের সরস্বতী পূজোর গান লেখা কবিগুলো পর্য্যন্ত যেভাবে থাকেন বা চলেন অর্থাৎ লবঙ্গ লতিকাভাবে, চপল বসু এতখানি নাম করে নিশ্চয়ই তাদের জাত ছাড়া হবেন না। কবিদের গায় সার্ট কোট উঠতে দেখিনি, আলখাল্লা গোছের পাঞ্জাবীর ভেতর শীর্ণ শরীর গলিয়ে, 'গলায় জড়িয়ে চলেন চাদর। মনে হয় বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসবে। যেন ফ্রিল দেওয়া মোটা বালিশের খোলের ভেতর ঢোকান হয়েছে সরু বালিশ, সামঞ্জস্য নেই। আপনাকে তাই যখন দেখলাম—ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর একটা ময়লা কোট চাপিয়ে বেরিয়ে
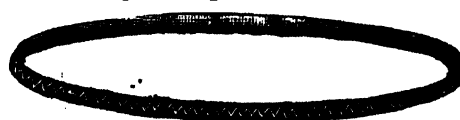
এসেছেন, তখন আমাদের মনের সাধারণ কবিগুলোর ছবির সাথে মিললো না। ওখানেও করলাম ভুল। ধারণাই করতে পারিনি আপনিই তিনি যাঁর বিষয় আমরা মনে মনে কত কল্পনাই করে এসেছি। অপরাধ আছে চপলবাবু—ক্ষমাও তার আছে, বিশেষ করে আপনার মত দরদী লোকের কাছে।

চপল আবার নার্ভাস হয়ে যেতে লাগলো। ওর দাদার কথা মনে করে ও একটু শক্ত হতে চেষ্টা করে বললে—দেখুন ওসব কিছুই না, মানে, অর্থাৎ আমারও কেমন ভুল হয়ে গেল। তাইতো নিজে এতখানি লজ্জায় পড়ে গেলাম।

মৃণালবাবুরা ভেবেই পেলেন না—ওর লজ্জার কারণ কি থাকতে পারে। নিজেদের লজ্জার কথা ভেবেই ওরা তখন প্রায় ঘেমে উঠেছিলেন। তাই চপলের মুখ থেকে ওর কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন—যেতে দিন। যা হবার তাতো হয়েই গেছে। এরকম লজ্জায় আমি কোনদিন পড়িনি। যাক্ সে কথা এখন আপনার কাছে যে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি—তার আর্জিই পেশ করি। তারপর পকেট থেকে একটা রঙীন কার্ড বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আমাদের 'মিলনী' হচ্ছে একটা ছোটখাট সাহিত্য সমিতি। আপনাদেরই লেখা নিয়ে করি আলোচনা। আজ তার পূর্ণিমা সম্মেলনে সকল সভ্য ও সভ্যাই আপনার দর্শন প্রার্থী। ধন্য হব আমরা আর হবে আমাদের মিলনী—আপনাদের পায়ের ধুলো পেলে। যেতে আপনাকে হবেই—এতগুলো আপনার গুণগ্রাহীকে বঞ্চিত করতে পারবেন না কোন প্রকারেই। সন্ধ্যায় তৈরী হয়ে থাকবেন, আমিই নিয়ে যাবো আপনাকে, আবার পৌছে দিয়ে যাবো।

চপল এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিল ওঁদের কথা। সাহিত্য সমিতিতে গিয়ে ও কি করবে ভেবেই পেলে না। তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে বললে—দেখুন······

মৃণাল ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—দেখুন টেখুন নেই এর ভেতর। যেতে আপনাকে হবেই, ছাড়তে আপনাকে পারি না কিছুতেই। শরীর অসুস্থ থাকলে, আপনার উপস্থিতিই আমাদের উৎসাহ দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তাতেই আমরা ধন্য হব। কোন কষ্টই আপনার হতে দেব না।

চপল হেসে বল্লে—আমি তা বলছি না। আমি বলছিলাম কি যে আমি গিয়ে করবো কি। বক্তা আমি নই, সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানও আমার অল্প পরিসর। তাই যতটা আশা আপনারা করেছেন আমার কাছ থেকে, ততটা না পেয়ে নিরাশ হবেন। মনে যা আসে লিখে চলি, কলমের মুখে কি যে ছাই পাশ বেরয় তা নিজেই খেয়াল রাখি না। মনের কথা মুখে বার করবার চেষ্টা হয় ব্যর্থ। আপনার 'মিলনীর' পূর্ণিমা-সম্মেলনীতে গিয়ে হয়তো বড় জোর কাঠের পুতুলের মত থাকবো বসে।

(ক্রমশঃ)

গান

সুবোধ কুমার ব্যানার্জ্জি (বালি)

স্বপনে জাগিছে শিয়রে আমার কাহার আনন খানি
মরমে পশিছে মরম-কাঁদান-বেদনা-মাখান বাণী॥
ত্রিলোকের ব্যথা মনের ভুবনে,
বসায়েছে মেলা স্বপন-কাননে,
নয়ন আমার সহিছে বেদনা এসগো হারাণ-রাণী॥
কোকিল কাঁদিছে বসন্ত-লগনে,
হারাণ-প্রিয়ার স্মৃতি আবরণে,
ঝরিছে তেমনি
ভোলা আঁখি-মণি
আকাশের চাঁদ আকাশের বুকে জানি॥

খেয়ালী চিত্রপট

নিউ থিয়েটার্সের আগতপ্রায় কথা-চিত্র "সাথী"-র দুইটী বিশিষ্ট দৃশ্য। ছবিখানা পরিচালনা করেছেন তরুণ পরিচালক শ্রীযুত ফণি মজুমদার।

পরিচালক: ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]
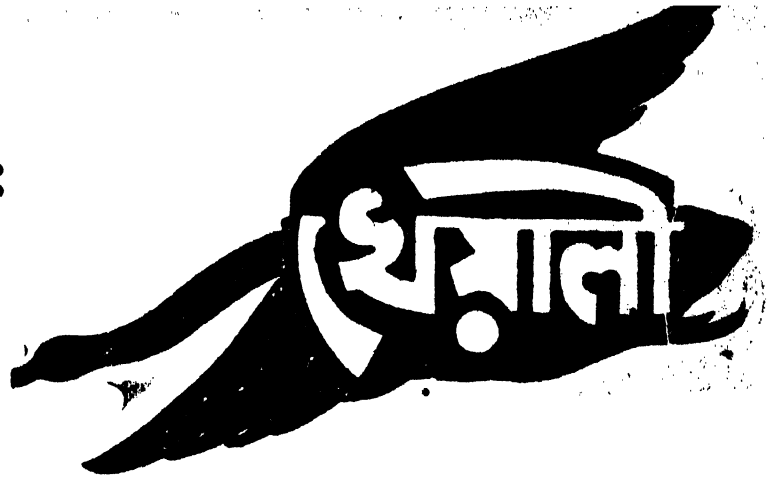
অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই কার্ত্তিক ১৩৪৫, ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৮ } চত্বারিংশ সংখ্যা

মধু চক্রে

গত সংখ্যার 'খেয়ালী'তে কংগ্রেসনেতৃবর্গ ও কংগ্রেস মন্ত্রীদের মধ্যে যে দুর্নীতি পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার ইঙ্গিত করিয়া কষাঘাত করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের সাময়িক পত্রাদি বিশ্লেষণ করিলে নিরপেক্ষব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে গতায়ু মন্ত্রীসভার মধ্যে কাহারও কাহারও নৈতিক চরিত্র সন্দেহাতত ছিলনা তৎব্যতীত জনৈক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পুত্র-বৎসল্যের আবরণে পক্ষ-পাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। প্রকাশ যে মন্ত্রীবরের পুত্রকে এক জিলার সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর একটী অভিযোগও গুরুতর। একজন মন্ত্রী যে মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহা তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য অভিযোগের দরুণ সরকার কর্ত্তৃক সেই মিউনি-সিপ্যালিটীর ক্ষমতা অপহরণ করা হইয়াছে। গভীর পরিতাপের বিষয় সর্দ্দার বল্লভভাইয়ের বাৎসল্য হেতু এই সমস্ত অভিযোগের কোন নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হইল না—অধিকন্তু ধামাচাপাই পড়িল। ডিসিপ্লিনের জাঁতাকলে পড়িয়া ডাঃ মুঞ্জে নিষ্পিষ্ট হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে কি কংগ্রেসের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে? ডাঃ মুঞ্জের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে একটী অভিযোগ বাস্তবিকই হাস্যকর ও চমকপ্রদ। জনৈক মন্ত্রীর বিভাগীয় 'ফাইল' অদৃশ্য হইলে ডাঃ মুঞ্জে নাকি মন্ত্রীবরের বিরুদ্ধে সি, আই, ডি নিযুক্ত করেন। ইহাতেই কংগ্রেসের বড় কর্ত্তার দল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশ্য সি, আই, ডির অনুসন্ধানের ফলে উক্ত ফাইল বার-বণিতার কক্ষ হইতে পাওয়া গিয়াছে!!

শুধু পাঁচ শত টাকা বেতন গ্রহণ করিলেই কংগ্রেসী আদর্শ গৌরান্বিত হয় না। বরং অল্প বেতন ধার্য্য করায় অন্য ভাবের দুর্নীতি অধিকতর ভাবে দেখা দিয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইতিমধ্যেই সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে অচিরেই কংগ্রেসী মন্ত্রীবর্গের মধ্যে অনেকেই আদর্শচ্যুত, ঘৃণিত ব্যক্তির পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবেন। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

বিহার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধেও যে সমস্ত দুর্নীতির দোষারোপের আভাষ আমাদের কর্ণ-গোচর হইয়াছে ঘনিষ্টভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহা পত্রস্থ করিব।

নিয়মতান্ত্রিক মধুচক্রে অলিকুল শুধু আকৃষ্ট নয়, আবদ্ধও হইয়া পড়িয়াছেন!!!
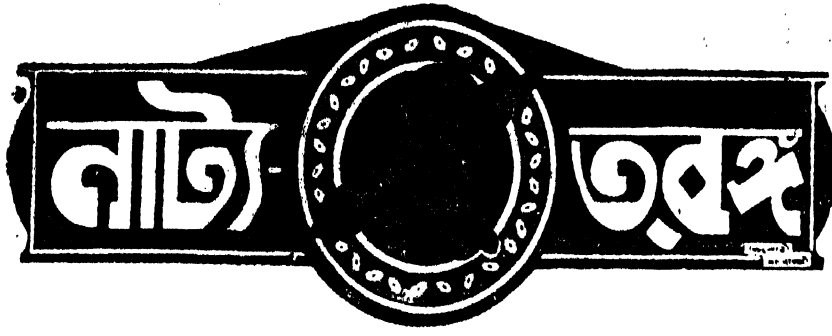
শ্রীনটনাথ

"বাংলার বোমা"

গেল মহাষ্টমীর দিন থেকে 'ষ্টার থিয়েটারে' অভিনীত হচ্ছে। "বাংলার বোমা" - গোয়েন্দা নাটক। ঘটনাটি সংক্ষেপে হচ্ছে - স্বদেশীর নামের দোহাই দিয়ে এক দল শিক্ষিত যুবক 'অগ্নিচক্র' নামে একটি দল গড়ে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে চুরি, ডাকাতি ও নরহত্যা কোরে দেশের মধ্যে দস্তুরমত আতঙ্ক সৃষ্টি কোরেছিলো। এই দলের নেতা ছিল অশনি ও তার সহকারী ছিল করালী এবং সহকারিণী ছিল তড়িতা। অশনিকে তড়িতা ভালবাসতো; কিন্তু অশনি তার কার্য্যসিদ্ধির কলরূপেই তড়িতার সঙ্গে যখন যেরূপ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত সেইরূপই কোরত। তড়িতা মনে জ্ঞানে জানতো অশনি তাকেই ভালবাসে - কিন্তু যেদিন আত্মরক্ষার জন্য ফাঁকি দিয়ে সে পুলিশ ইন্‌সপেক্টরের কন্যাকে বিয়ে কোরে উধাও হল, সেদিন থেকেই তড়িতার মন সন্দেহ দোলায় দুলে উঠল কিন্তু অশনি লীলাকে নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই গ্রহণ কোরেছে—এরূপ স্তোকবাক্যে তাকে ভোলাবার চেষ্টা কোর্‌ল। কারণ, তার এই বিরাট দুষ্কৃতির নায়িকা হচ্ছে তড়িতা সে ভিন্ন তার এই অভিযান যে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়বে এ তার ভাল কোরেই জানা ছিল। এদিকে যখন অশনির দলবল ধরা পড়ল তখন সে লীলাকে নিয়ে বরাহনগরে এক গুপ্ত আড্ডায় গিয়ে উঠল। কিন্তু সেখানে থাকাও নিরাপদ নয় মনে কোরে অশনি গ্রামে তার এক ধনী মামার শরণাপন্ন হবে ঠিক কোরল। পনের বছর পূর্ব্বে নিজের স্বভাবের দোষে সে এই মামার বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়। যাবার সব

ঠিকঠাক—এমন সময় সেখানে তড়িতা এসে উপস্থিত হ'ল এবং সে অশনিকে ভয় দেখালে—আশে পাশেই পুলিশরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সে যদি লীলাকে পরিত্যাগ না করে তা হলে এখুনি সে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। অগত্যা নিরুপায় হ'য়ে অশনি সেই বাড়ীর এক সুরঙ্গের ভেতর লীলাকে নিক্ষেপ কোর্‌ল—এমন সময় পুলিশ ইন্‌সপেক্টার সেখানে আসতে তড়িতা ত্বরিৎগতিতে তাকে লক্ষ্য কোরে গুলি মেরেই অশনিকে নিয়ে অঞ্জনাগ্রামে পালালো। এখানে এসে তারা স্বামী স্ত্রীরূপে পরিচিত হ'ল এবং তার মামার কাছে সে এ কয় বছর জাপানে ছিল—এবং সেখানেই তড়িতাকে সে বিয়ে করে—এরূপ কত কী মিথ্যা কথা বল্‌ল। তারপর অশনি ভাবল এরূপভাবে পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। তাই সে ঠিক করলো তড়িতার সাহায্যে মামার হাজার পনের টাকা হাতিয়ে সে তড়িতাকে ফাঁকি দিয়ে লীলাকে নিয়ে একেবারে ক্যালিফোর্ণিয়ায় পাড়ি দেবে। সেজন্য সে বরাহনগরে সেই অন্ধকূপ থেকে লীলাকে উদ্ধার কোর্‌তে গেল কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল লীলার বাপ পুলিশ ইন্‌সপেক্টর লীলাকে সেখান থেকে সবেমাত্র উদ্ধার কোরেছে। অশনি এখানেও পুলিশের চোখের ধূলো দিয়ে লীলাকে নিয়ে একেবারে অঞ্জনাগ্রামে পৌঁছুল এবং কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে সেখানেই লুকিয়ে রাখল। তারপর অশনি তড়িতার চায়ে বিষ দিল—এমন সময় পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার কোর্‌ল। তার মামা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে বল্‌ল যে, অশনি তার ভাগ্নে, সে গ্রামের জমিদার কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার অশ্রুসংবরণ কোরে হেসে বললেন যে, সে তার জামাই। এদিকে তড়িতা বিষের জ্বালায় উন্মত্তা হয়ে অশনির ওপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ইন্‌সপেক্টরের দিকে চেয়ে চেঁচাতে লাগল। তখন অশনি বল্‌লে লীলাকেই তার নিজের হাতে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তড়িতা চক্ষের নিমেষে পিস্তল বার কোরে চরম প্রতিশোধ নিয়ে তার অচল দেহ অশনির মৃতদেহের ওপর এলিয়ে দিল।

নাটকখানি কার লেখা তা' আমরা জানি না। যাঁরই লেখা হোক্, এ বিষয় যে তাঁর হাত একেবারে কাঁচা একথা সত্য। নাটকের 'সিচুয়েশান্' বা ঘটনা সংস্থাপন এত এলোমেলো যে রস দানা বাঁধবার সুযোগ কোথাও পাইনি। নাটকখানির সংলাপ ও ভাষা এত কমজুরি যে চরিত্রগুলির সাফল্য তার জন্য বিশেষভাবে ব্যহত কোরেছে। নাট্যকার নাটকান্তর্গত প্রত্যেকটি চরিত্র পরিপুষ্টিতে এত অক্ষমতা প্রকাশ কোরেছেন যে যার জন্য নাটকখানি কারও মনে রেখাপাত কোরতে পারে না। তা' ছাড়া "বাংলার বোমা" অবান্তর, অবাস্তব ও অসংলগ্ন কাহিনীর ওপর ভিত্তি কোরে গড়ে তোলার জন্য নাটকের সার্থকতা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে।

পৌরাণিক নাটক অভিনয়ে 'ষ্টার' সম্প্রদায়ের যে একটি নিজস্ব খ্যাতি আছে সামাজিক নাটকাভিনয়ে তারা সে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। ভুবন গাঙ্গুলীর অশনি ও লাইটের তড়িতা আমাদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছে। লাইটের শেষ দৃশ্যের বাচন ও ভাবাভিব্যক্তি চমকপ্রদ। তার গানও মন্দ লাগল না। শরৎ চ্যাটার্জ্জির ইন্‌সপেকটারে দেখাবার বিশেষ কিছু না থাকলেও তিনি প্রশংসনীয়ভাবে অভিনয় কোরেছেন। লীলার ভূমিকায় যে মেয়েটি নেমেছে সে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তোতা পাখীর মত ভূমিকাটি আউড়েছে মাত্র। অর্দ্ধোন্মাদ ক্রিমিনোলজিষ্টের ভূমিকায় বঙ্কিম দত্তের অভিনয় ভাঁড়ামির নামান্তর মাত্র। তার স্ত্রী চপলারূপে কমলা যাত্রা দলের পৌরাণিক ছবির মত সুরেলা অভিনয় কোরে দর্শকগণকে রীতিমত উদ্ব্যস্ত কোরে তুলেছিল। ক্রিমিনোলজিষ্টের ভৃত্যরূপে গগন চ্যাটার্জ্জি সবাইকে হাসিয়েছে খুব। ভাবণ ও তার স্বরূপে যাঁরা নেমেছিলেন তারা দুজনেই অচল। প্রফুল্ল দাসের বাসুদেব মন্দের ভাল। জয়নারায়ণ মুখার্জ্জির রূপসজ্জা ও অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখ্য।

নাটকখানির মঞ্চসজ্জায় বিশেষ কিছু দেখাবার না থাকলেও সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চযাদুকর পরেশ বসু তার ভেতরই মঞ্চসজ্জায় একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরেছেন। গানের সুরের ভেতর প্রশংসা করবার কিছু নেই।

নাট্যনিকেতন

এদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ হবে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত "মীরকাশিম"। মীরকাশিমের ভূমিকায় সম্ভবতঃ আত্মপ্রকাশ কোর্‌বেন নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। সতু সেন নাটকখানি পরিচালনা কোর্‌বেন। "সিরাজদ্দৌলা"র মত "মীরকাশিম"ও সাফল্যমণ্ডিত হবে আশা করা যায়।

রঙমহল

কাজী নজরুল ইস্‌লাম লিখিত "মধুমালা" নামে একখানা নাচগানের নাটক বীরেন ভদ্রের পরিচালনায় শীঘ্রই এখানে মঞ্চস্থ হবে। বীরেনবাবু একজন গুণী ব্যক্তি—বহুদিন পরে তিনি আবার নাট্যপরিচালনায় যোগ দিয়েছেন শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম।

--:o:--

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—লবঙ্গ?

—লবঙ্গকে ভুলে যান। সে আর আপনার কথার জবাব দেবে না।

—তার জিহ্বা না দিতে পারে,—কিন্তু তার প্রাণ দেবে।

—তার প্রাণ কি আছে কি? অনাথার কি প্রাণ থাকে?

—তবে অনাথার কি থাকে? শুধু ছেঁড়া কাপড়? না!

'তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় নাই। লবঙ্গ নীরদবাবুকে চা দিতে আসিয়াছিল। সেই অবসরে নীরদ তাহার অনাগত আশঙ্কার কথা পাড়িয়া বসিল।

— শুনলুম তুমি কালই শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে?

— হাঁ, এসেছিলুম জুয়ারের জলের কুটো-টির মত, আবার চললুম ভাঁটার টানে কোন্ দুর্দ্দশাসাগরের তরঙ্গাকুল জলরাশির মধ্যে মিশতে। অনাথারা এই রকম করেই তাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে!

—এ কাণ্ডটা ত বাঁধাচ্ছেন মা? তুমি আপত্তি কর্লেনা কেন?

—আপত্তি? হিন্দুর ঘরের মেয়ের কি আপত্তি কর্ব্বার অধিকার আছে? স্বামী চায় না তবু সেই ভেজানো অনাদরের দ্বার ঠেলে হিন্দুনারীকে তার মন্ত্র-শুদ্ধ গৃহস্থালীর মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে হবে, নইলে চোখ রাঙাবে সমাজ,—চোখ রাঙাবে দু-হাজার বছর আগেকার মুনি-ঋষিরা! অতীত ও বর্ত্তমান এমনকি অনাগত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলেই রক্তবর্ণ মুখ নিয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন কর্ত্তে থাকবে!

লবঙ্গর কথায় নীরদবাবু এমন একটা অকপট অনুকম্পা অনুভব করিলেন, যে তিনি উচ্ছ্বাসের সুরে বলিয়া উঠিলেন: সত্যি কথা! যারা ভারতবর্ষের চিরন্তন সভ্যতার কথা উচ্চকণ্ঠে গাইতে থাকে,—যারা সমাজকে পরহিতের প্রতীক ব'লে, গৌরব-পূর্ণ আখ্যায় মণ্ডিত করে তাকে উপাসনা কর্ত্তে থাকে, ঠিক তারাই তোমাদের মত নির্য্যাতিতা নারীদিগকে অত্যাচারের দিকে আরও এগিয়ে দেয়। মানুষ কেন এই সব রমণীদের ওপর অত্যাচার করে? মানুষ কি পশু?

লবঙ্গ এত দুঃখেও থাকিতে পারিল না, নীরদবাবুর উচ্ছ্বাস শুনিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। লবঙ্গ হাসিতে হাসিতেই বলিল: বাবু! সমাজের নেতাদের আপনি যে তীব্রভাষায় গালাগালি দিলেন, এতে নিশ্চয়ই তারা বাসায় গিয়ে মরে থাকবে! এবং আমারও কাল আর বোধহয় শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না! ওঃ! আপনার গালাগালির কি ভয়ানক জোর!

এ উপহাসে নীরদবাবু চঞ্চল হইলেন না, বরং আরও গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে নারী সৌন্দর্য্যের যে অভিনব বিকাশ প্রকটিত হইতে ছিল, তাহারই মনোমুগ্ধকর উন্মাদনায় মত্ত হইয়া বলিলেন: লবঙ্গ? কারুর বাগানে যদি একটি গোলাপফুল ফোটে, কে এমন নিষ্ঠুর আছে, তাকে পদদলিত করে?

—কার বাগানে আবার গোলাপফুল ফুটলো, রায় মশায়?

—কারুর বাগানেই নয়! ধরো সমাজের মাঝে।

—সমাজের মাঝে গোলাপফুল ফুটলে আর কেউ রক্ষক না থাকলে পাড়ার ছোড়া-রাই আগে তাকে তুলে নিয়ে, কামিজের বোতামের গর্ত্তে বসিয়ে দেবে! দশজনে তাকে শুকবে, দশজনে তাকে চট্‌কাবে! আর আপনার মত যারা গম্ভীর লোক, তারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাদের ওপর হিংসা করবে, আর নিজের হাত কামড়াবে!

— কিন্তু সমাজ শাস্তি দেবে ওই ছোড়া-দেরও নয়, আমাদেরও নয়,—শাস্তি দেবে ঐ গোলাপফুলকে!

—তাতো দেবেই! গোলাপের যে বাধা দেবার শক্তি নেই!

—কিন্তু সমাজের ত বিচারশক্তি আছে। সমাজের নেতারা সে শক্তির সুব্যবহার করে না কেন?

— সেটা তাদের অভ্যাস নেই! আপনার মত তারা রোজ এজলাসে বসে ত বিচার করে না। আর আপনার মতো দশ আলমারি আইনের বইও তারা পড়ে'না!

— লবঙ্গ? আমি তোমায় সমাজের হাত থেকে রক্ষে কর্ত্তে পারি, যদি তুমি—

— আর কাজ নেই মশায় আমাকে রক্ষে করে! আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনি কেন আমার জন্যে এই বিপদের মাঝে পা দেবেন! তারচেয়ে আমায় ছেড়ে দিন!

'—না, না, লবঙ্গ! তুমি সেখানে যেও না! তুমি এই খানেই থাকো। আমার বাড়ীতে থাকলে কেউ তোমায় থাতলাতে পার্ব্বে না!

—থাতলানোর সীমাটা এমন এক জায়গায় এসে হাজির হতে পারে, সেখানে

আপনার শক্তি নিতান্তই দুর্ব্বল, নিতান্তই নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে! আপনি তো খবর রাখেন না, এর মধ্যে কি কাণ্ড আপনার বাড়ীতেই হয়ে গেছে!" মা এখানে আসা অবধি আমার হাতের রান্না খাচ্চেন না! তিনি ত উড়ে বামুনের রান্না খাবেন না! কাজেই নিজের হাত পুড়িয়ে রেধে খাচ্ছেন! অথচ কাশীতে আমিই তাঁকে রোজ রেধে দিতুম। মার কাছে এ অপমান আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে! না বাবু আমায় ছেড়ে দিন আমি শ্বশুর বাড়ই যাবো!

নীরদ লবঙ্গর এই অপমানের কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল। তাহার শ্বশ্রমাতা ঠাকুরাণী যে লবঙ্গকে এমন করিয়া প্রচ্ছন্ন শাস্তি দিবেন, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। মনটা বড়ই দমিয়া গেল।

ঘরের বাহির হইতে ঝি লবঙ্গকে ডাকিয়া বলিল: মাসিমা! দিদিমা আপনাকে ডাকচেন!

যাই বলিয়া লবঙ্গ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নারদবাবু খানিকটা চিন্তার বোঝা লইয়া সেখানে একাকী বসিয়া রহিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্জিকালিখিত একটা শুভদিনে জগুদা আসিয়া লবঙ্গকে তাহার শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেল।

যাইবার সময়ে জগৎতারিণী লবঙ্গকে অনেক সদুপদেশ ও গুটিকয়েক টাকা দান করিয়াছিলেন। টাকগুলি সে অঞ্চলে বাঁধিয়া লইল, আর উপদেশগুলি পাঠশালার ছাত্রের মত অখণ্ড ধৈর্য্যে কান পাতিয়া গ্রহণ করিল।

সেদিন অপরাহ্ণে ছোট কর্ত্তা বিরিঞ্চি চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে। বাহিরে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে; আকাশে মেঘের দল কাল হইয়া কি কাণ্ড বাঁধাইবে বলিয়া তোড়জোড় করিতেছে। গ্রাম্য পথে লোকজনের কোনও খবর নাই। বিরিঞ্চি অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল; মুহুর্মুহুঃ তাম্রকূট সেবনে তাহার উৎসাহ অটল থাকিতে চাহিতেছিল না। এমন সময়ে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সঙ্গে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠনাবৃত তরুণীকে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত।

"এই নাও জামাইবাবু! তোমার গৃহিনীকে পৌছে দিলাম।"

"আসুন, আসুন! উপরে আসুন!"

"তবু ভাল! তোমার মুখে আসুন কথাটা শুনতে পেলুম! রাস্তায় ভাবতে ভাবতে আসছিলুম যে, হয়তো তোমার এখানে আতিথ্যের বিনামূল্যের উপাদান গুলোও পেতে পার্ব্বো না! নাঃ! এ রকম আশঙ্কাটা একেবারেই অমূলক দেখছি।"

বলিতে বলিতে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তরুণীকে সঙ্গে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে গৃহের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। বিরিঞ্চি অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন না বটে, কিন্তু একটু পা নাড়া দিয়া জানাইয়া দিলেন যে তিনিও অপ্রস্তুত নহেন।

তরুণী গৃহমধ্যে আসিয়া হঠাৎ ঠক্ করিয়া একটা প্রণাম করিল, বিরিঞ্চির পায়ে। বিরিঞ্চি বলিয়া উঠিল: থাক, থাক্! তুমি একেবারে বাড়ীর মধ্যে যাও!

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বলিলেন: হাঁ যাও! একেবারে তোমার ভাগের হাঁড়ি কুড়ি গুলো দখল ক'রে বসো।

বিরিঞ্চি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল: খোরাকির টাকাটা'—

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন: টাকা এনেছি বৈকি! সেজন্য তুমি চিন্তিত হয়ে মনকে কষ্ট দিও না, এই নাও।

বিরিঞ্চি কথার কোনও জবাব না দিয়া; আগন্তুক ভদ্রলোকটি যে দশখানা দশ টাকার নোট তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন, তাহাই হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া, এক এক করিয়া গণিতে লাগিল।

—কেমন মিলেছে?

—হাঁ মিলেছে। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের কথার কি নড়চড় হয়।

—না। নড়চড় যা হবার, তা আপনার বেলায়ই হয়ে গেছে। যাও দিদি, তোমার ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানের ভেতরে যাও। দেখগে তোমার অদৃষ্টে বিধাতা কেমন সব সাজিয়ে রেখেছে।

লবঙ্গ উঠিয়া, বিরিঞ্চির দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া, ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে জগুদাকে বলিয়া "তাকে বলবেন, আমার অপরাধ যেন তিনি মাপ করেন!"

জগুদা বলিল: তোমার চাইবার আগেই তিনি তোমার সব অপরাধ মাপ করেছেন।

লবঙ্গ চলিয়া গেলে, বিরিঞ্চি নোট কয়খানা তাহার কাপড়ের টেঁকে গুঁজিল; এবং তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার পর নিশ্চিত হইয়া জগুদার দিকে তাকাইয়া বলিল: আপনি কি এখনই ফিরবেন নাকি? জগুদা উত্তর দিল: তা, বস্‌তে না বল্‌লে কাজেই ধূলাপায়ে বিদায় হতে হবে! আর বসলেই তো তোমার পয়সা খরচ।

বিরিঞ্চি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল: আমি সেজন্য বলছিলাম না,—তবে কিনা আজ বড় দুর্য্যোগ. আপনি হয়তো বসতে নাও চাইতে পারেন।

জগুদা বলিলেন: দুর্যোগটা তা'হলে তোমার আতিথেয়তার দিক থেকে খুব সুবিধাকর ব্যাপার বলো? এই বৃষ্টি বাদলায় পাকা চুলগুলো মাথায় ক'রে ভিজতে ভিজতে ফিরলে, আমাকে আর দ্বিতীয়বার খোরাকির টাকা পৌঁছে দিতে এখানে আসতে হবে না। সেটা তোমারই লোকসান, বাবাজী!

(ক্রমশঃ)

মানুষ

আশালতা সিংহ রায়

সৃষ্টি তোমার দুনিয়ার বুকে কবে?
আদি অনন্ত নিত্য নূতন করে'—
সৃষ্টি তুমিই করেছ মানবে শুধু;
নানা মত বাদে ভূষিত যে চিরতরে।

মানব-তুমিই ভগবানে দিলে রূপ—
তুমিই রচিলে তোমার সৃষ্টি কথা,
তুমিই দানিলে মরু ভূমি বুকে বারি—
অনুভূতি তব বেদ-দর্শনে গাঁথা।

দুঃখ ব্যথা, গরল কালোর পাশে—
তুমিই দিয়েছ সুধা-আলো সুখে ব্যাখ্যা।
তোমার অভাবে তুমিই স্বভাব দানি—
সরল-কুটীলে সমভাবে দিলে আখ্যা।

যাহা কিছু আজ সৃষ্টি তত্ত্ব মাঝে
দুঃজ্ঞেয় নয় তোমার কাছে ও' কিছু
শিল্পী স্রষ্টা হে মহামানব তুমি—
তুমিই ছুটী'ল চিরন্তরে তার পিছু!

(বিলাসী)

সাপুড়ে:

পরিচালক দেবকী বসু হঠাৎ অসুস্থ হোয়ে পরায় গত সপ্তাহে ছবি তোলার কাজ বিশেষ অগ্রসর হোতে পারে নি।

এ সপ্তাহ থেকে আবার কাজ আরম্ভ হোয়েচে।

সাপুড়ে-সর্দ্দার জহরকে আজ বিশেষ চিন্তিত দেখা যাচ্ছে। তার শান্তিময় জীবনে কোথায় যেন বিপ্লবের সুত্রপাত হোয়েচে। সাক্‌রেদদের দল বিশেষ কোরে তার প্রতিদ্বন্দ্বী — আক্রোশটাই যেন তার উপর বেশী।

সত্যই কী নিমিষের ভুলে আজ জহরের সুনাম ও প্রতিপত্তি, সব কিছু নিশ্চিহ্ন হোয়ে যাবে?

যে শপথ ও প্রতিশ্রুতির উপর সর্দ্দারের আসন প্রতিষ্ঠিত তা থেকে পদস্খলন ঘট্‌লে সে আসনের মায়া পরিত্যাগ কোরতে হ'বে। জহর সে সম্বন্ধে নির্ব্বাকার নয়। তবু তার পদস্খলন হোয়েছিল এবং তার জন্যে জহরের লাঞ্ছনার সমা ছিল না।

এই নাটকের উপরের দৃশ্যে সর্দ্দার-জীবনে বিপ্লবের কারণটুকু পরিস্ফুট হবে। সর্দ্দারের ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন সুবিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ কোরেছেন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কানন দেবী।

বড়দিদি:

ছবিতোলার কাজে যে আন্তরিকতা ও স্পর্দ্ধের প্রয়োজন পরিচালক অমর মল্লিক মশাই তার পরিচয় দিচ্ছেন।

এই ইউনিটের কর্ম্মীগণও হ'য়েচে যেন মল্লিক মশাই অন্ত প্রাণ! যেমন পরিচালককে সুখী করবার দিকে এদের দৃষ্টি আছে, তেমনি আছে মল্লিকমশাইয়ের প্রথম ছবিখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কোরে গঠন কোরে তুলতে।

মনোরমা বেশিনী মেনকাকে দেখলুম সেদিন একখানি গান গাইছেন। গান খানি গেয়ে শোনাচ্ছেন তার প্রিয় সখী মাধবীকে:—"সই, কেবা শোনাইল শ্যাম নাম" ...

কিন্তু এই শ্যাম নামের অন্তরালে যে বিদ্রুপটুকু প্রচ্ছন্ন রোয়েছিল, বিধবা মাধবীর অন্তরে গিয়ে তা' আঘাত কোরেছিল গভীর ভাবেই।

হাসি ও বেদনার মধ্যদিয়ে, মনোরমা ও মাধবী চরিত্রের দুটি দিক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য নিয়ে চিত্রিত হয়েছে। বাঙলাদেশের ভাব প্রবণ নর-নারীর অন্তরে এই শ্রেণীর দৃশ্য যে বিশেষ ভাবে রেখাপাত কোরবে, একথা আজ নি:সন্দেহে বলা যায়।

মনোরমা ও মাধবীর ভূমিকায় মেনকা ও মলিনা অতি অপূর্ব্ব অভিনয় কোরছেন।

"অচিন প্রিয়া"

প্রায় বছর তিনেক আগেকার ডি, জি-র তোলা ছবি 'অচিন প্রিয়া' সামনের শনিবার থেকে "নিউ সিনেমায়" দেখান হ'বে। এই তিন রীলার হাস্যোদ্দীপক ছবিখানি কর্ত্তৃপক্ষ এতদিন নানা কারণে রিলিজ করতে পারেন নি! উপস্থিত তাঁরা তিন সপ্তাহের জন্য ছবিখানি এখানে রিলিজ করবার ব্যবস্থা করে দর্শকদের নতুন ছবি দেখবার সৌভাগ্য দান করলেন। তিন রীলের ছবি নিয়ে একটা full length প্রোগ্রাম হয় না, সেই কারণেই "অচিন প্রিয়ার" সঙ্গে প্রতি সপ্তাহেই দু'খানি করে নিজেদের অন্যান্য ছবি দেখাবারও ব্যবস্থা করেছেন। অনেকেরই হয়ত' নানা কারণে ঐ সব ছবিগুলির মধ্যে কোন না কোন একটা দেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি; উপস্থিত তাঁদের পক্ষে এই সুযোগে ছবিগুলি দেখা হয়ে যেতে পারে।

'অচিন প্রিয়া'র cast value বাঙলা দেশের কোন ছবির সঙ্গেই তুলনা হয় না। এতে নেমেছেন—পাহাড়ী, চন্দ্রা, অমর মল্লিক, ডি, জি; ছায়া আরতি, কিশোর, তিমিরবরণ, পশুপতি, খগেন পাঠক প্রভৃতি।

সামনের ২৯শে থেকে ১লা নভেম্বর পর্য্যন্ত "অচিন প্রিয়া"র সঙ্গে দেখান হ'বে 'দেবদাস' আর ২রা নভেম্বর থেকে ৪টা অবধি হ'বে 'ভাগ্যচক্র'।

দেশের মাটি

'দেশের মাটি' নিউ সিনেমায় বন্ধ হ'লেও 'চিত্রায়' এখনও নিয়মিত ভাবেই চলবে। চিত্রায় এখন যেভাবে দর্শক-সমাগম হচ্ছে তাতে মনে হয় 'বড়দিন' পর্য্যন্ত এ ছবি ভাল ভাবেই চলবে। তবে কর্ত্তৃপক্ষ যদি তার আগে অন্য ছবি দেখাবার জন্যে এ ছবি তুলে নেন সে অবশ্য আলাদা কথা।

সাথী

"সাথী" (বাঙলা) ও "স্ট্রীট সিঙ্গার" (হিন্দী) দুইয়ের সম্পাদনা কার্য্যই প্রায়

মন্মথ রায় রচিত বহু প্রশংসিত
কাহিনী অবলম্বনে—
বাণী-চিত্রকারে গ্রথিত

বি-এল-খেমকার প্রযোজনায়
মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর নিবেদন

শীঘ্রই আপনাদের প্রিয় চিত্রগৃহ

উত্তরায়

মুক্তিলাভ করিবে।

একজন সিংহলের রাজকন্যা অপর জন সাগর-জলে ভেসে আসা অজ্ঞাত-কুলশীল এক যুবা। খনা ও মিহির। সিংহলের সাগর-সৈকতে যে নাটকের সুরু উজ্জয়িনীতে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভায় তাহারই পরিণতি। একদিকে প্রেম, অন্যদিকে অমঙ্গলের আশঙ্কা। পরিণামে কী ঘটিল আপনি কল্পনা করিতে পারেন কী?

ভূমিকায় :—

ছায়া দেবী
অহীন্দ্র চৌধুরী
দেববালা
সুশীল রায়
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুণা
ধীরেন মুখোপাধ্যায়
সমর ঘোষ
মনোরমা
জ্যোৎস্না গুপ্তা, আঙ্গুরবালা।

চিত্র-পরিবেশক—
কাপুরচাঁদ লিমিটেড
প্যারাডাইস বিল্ডিং—কলিকাতা

পরিচালক :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ হয়ে এসেছে। পরিচালক ফণীবাবু তাঁর একমাত্র সহকারী কার্ত্তিক চট্টোকে নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাতে মনে হয় আর এক সপ্তাহের মধ্যেই এর সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।

'সাথী' আসছে ১৯শে নভেম্বর থেকে নিউ সিনেমায় দেখান হ'বে। কিন্তু এর হিন্দি সংস্করণ হয়ত নবম্বরের প্রথম সপ্তাহেই বাঙলার বাহিরে রিলিজ হয়ে যাবে।

'সাথী'র ট্রেলার উপস্থিত চিত্রায় ও নিউ সিনেমায় দেখান হচ্ছে।

অধিকার

অধিকারএর হিন্দি সংস্করণ গেল শুক্রবার থেকে বোম্বাই নগরীতে রিলিজ হয়ে গেছে। সেখান থেকে যতদূর খবর এসেছে তাতে জানা যায় যে নিউ থিয়েটাসে'র পূর্ব্বতন তিনখানা ছবির চেয়ে এ ছবি দর্শক সমাজে যথেষ্টভাবে জনপ্রিয় হয়েছে।

অধিকারএর বাঙলা সংস্করণ ডিসেম্বর মাসে চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে বলে স্থির হয়ে আছে।

দুষ্মণ

দুষ্মণএর কাজ পরিচালক নীতীন বাবু আবার দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। হিরো সাইগাল ও হিরোয়িন লীলা দেশাই (গীতা) দুজনেই পরস্পর আন্তরিকভাবেই প্রেমে আবদ্ধ। কিন্তু গীতার পিতামাতা রুগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহাদের কন্যার বিবাহ দেওয়ার একেবারে অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় গীতার দ্বারাই বা কতদূর সম্ভব? এই নিয়ে এখন পরিচালক মশাই বিশেষ ব্যস্ত রয়েছেন।

কপালকুণ্ডলা

পরিচালক ফণী মজুমদার তাঁর 'সাথী'র কাজ থেকে একটু রেহাই পেলেই 'কপাল কুণ্ডলা'র (হিন্দি) কাজে হাত দেবেন। যতদূর মনে হয় সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি কাজে হাত দিতে পারবেন। এই ছবিতে নামবেন নবকুমারএর ভূমিকায় নাজাম, কাপালীকএর ভূমিকায় জগদীশ, মতিবিবির ভূমিকায় কমলেশ কুমারী। তবে কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় কাকে দেখা যাবে তা এখনও ঠিক হয়নি।

পরশমণি

পরশমণির কাজ প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় বেশ এগিয়ে চলেছে। ষ্টুডিওর 'ফ্লোর' মাদ্রাজী ছবির জন্যে মাঝে মাঝে আটকে যাওয়াতে প্রফুল্লবাবু ছবির কাজের speed ঠিক রাখতে পারছেন না।

খনা

আসছে মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্রী' চিত্র-গৃহে খনার উদ্বোধন হ'বার কথা। সেই কারণেই এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা ও আর্টিষ্টরা গেল সপ্তায় 'ভিজেগাপটাম' বন্দরে কতগুলি সামুদ্রিক দৃশ্য তোলার জন্যে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু ছবির নায়িকা শ্রীমতী ছায়া দেবী হঠাৎ সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের সদলবলে ফিরে আসতে হয়েছে।

এদিকে বাজারে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে যে 'খনা' ছবি ছোট হয়ে পড়ায় এর সঙ্গে নাকি ডি, জি.র পরিচালনায় একখানি ছোট কমিক ছবি তুলে 'খনা'র উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হ'বে।

পূর্ণতে গোরা

আগামী শনিবার গোরা তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিবে। কবি-গুরুর উপন্যাস অবলম্বনে দেবদত্ত ফিল্মস্ 'গোরা'কে চিত্রে রূপান্তরিত করায় যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। তাই আজ তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিয়াও গোরার জন-সমাগমের বিরাম নাই। মনে হয় 'গোরা' এখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তাহার আগ্রহান্বিত দর্শকবৃন্দের পরিতুষ্টি সাধনে কৃতকার্য্য হইবে। যাঁহারা এখনও গোরা দেখেন নি তাঁহারা যেন তাঁহাদের মনের তৃপ্তি মিটাইতে গোরা দেখার সুযোগ হারাইবেন না—।

রূপবাণী

এই শনিবার হইতে শ্রীভারতলক্ষ্মীর আধুনিক সমাজ চিত্র 'অভিনয়' রূপবাণীতে নবম সপ্তাহে পদার্পণ করিল। জনসাধারণ 'অভিনয়' চিত্রটি বার বার দেখিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন। দর্শকবৃন্দের এই উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া মনে হইতেছে ছবিখানি রূপবাণীতে আরও কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে।

গৃহিণী ও গৃহ

"বড়দিদি"র সহকারী পরিচালক ও মল্লিক মশাইয়ের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ শ্রীমান্ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পত্নী লাভে ভাগ্য-বান। 'স্ত্রী'-ভাগ্যে ধন'— এই সনাতন প্রবচন তাঁহার পক্ষে প্রযুজ্য। বালিগঞ্জে জামির লেনে যে শান্তি-কুঞ্জের ভিত্তি স্থাপনা সম্প্রতি হয়েচে তা সহ-গৃহিণী গৃহ নির্ম্মাণের সংকল্পেরই পূর্ব্বাভাষ। সহকারীর গৃহিণীও আছে, গৃহও হ'লো; কিন্তু স্বয়ং পরিচালক মশাইয়ের গৃহ আছে কিন্তু গৃহিণী নাই!! মল্লিক মশাই আর কতকাল উন্মার্গগামী হবেন?

সোনার টোপর মাথায় দিয়ে

'সোনার টোপর মাথায় দিয়ে টলিউড থেকে বেরুল টিয়ে'—টাইটেল কার্ডের প্রোজ্জ্বল শিখায় এই কটা কথা ভেসে

মার্কিন রাজ্যে নিম্নতম বেতন আইন

শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় এম এ বি-এল

মার্কিন রাজ্যে নিম্নতম বেতন স্থির করিয়া দিবার জন্য কিছুদিন ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলে এখন কয়েকটী আইনও পাশ করা হইয়াছে। উক্ত আইন গুলির দ্বারা যে ভাবে বেতন স্থির হইবে তাহার একটা মূল ভিত্তি বা প্রিন্সিপল্ ঠিক করা আছে, যেমন ধরুন "ফেয়ার-ওয়েজ টাইপ" বা উপযুক্ত বেতন হিসাব, "লিভিং ওয়েজ টাইপ" বা জীবন ধারণ সাপেক্ষ বেতন হিসাব অথবা "ফ্ল্যাট-রেট টাইপ" বা সাধারণের সমান বেতন হিসাব। তন্মধ্যে দশটী আইন "ফেয়ার ওয়েজ" শ্রেণীর। সেই আইনগুলি যেখানে যেখানে প্রচলিত হইয়াছে সেখানে উহাদিগকে কিছুদিন যাবৎ অনুস্তাবাচক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তৎপরে বিচারালয়ের দ্বারা বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলিত হইবে। আটটী আইন "লিভিং ওয়েজ" শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। তাহারা যে যে স্থলে প্রচলিত হইল সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। শেষে চারটী আইন প্রচারিত হইয়াছে "ফ্ল্যাট-রেট" শ্রেণীভুক্ত। ইহার দ্বারা এক রকমের মাহিনা সকলের জন্যই স্থির হইয়াছে পারিশ্রমিকে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

কি উপায়ে আইন প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনুসন্ধান করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা কার্য্যকরী বলিয়া মনে হয়।

সাধারণতঃ "ওয়েজ বোর্ড" বা মাহিনা নির্দ্ধারক ব্যক্তি-সঙ্ঘ একটী গঠন করা হয়। তাহাতে প্রভুদের নির্ব্বাচক ব্যক্তি এবং বেতনভোগীদের নির্ব্বাচক ব্যক্তি উভয়েই নিযুক্ত হন এবং জনসাধারণ হইতেও দু-একজন মাতব্বরকে সঙ্গে নেওয়া হয়। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় নিম্নতম মাহিনার হার কি ভাবে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক তাহা স্থির করা হয়। তৎপরে তাহারা একটা খসড়া লিখিয়া "কমিসন" অথবা বরাবরের নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীর এজেন্সিকে অনুমোদন করিয়া পাঠান। উক্ত এজেন্সি সাময়িকী বোর্ডের মতামত গ্রাহ্যও করিতে পারেন নাও পারেন। আইনগুলির সত্বসমূহ সাধারণের জন্য প্রচারিত করার ব্যবস্থা দেখা যায়, কেবলমাত্র দু একস্থলে তাহাদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। চারটী দেশের আইনে কোন পার্থক্য নাই, যেমন—ক্যালিফর্নিয়া, কোলোরাডো, অরি, আর উইসকনসিনা দুটি ষ্টেটে কৃষি-মজুর এবং গৃহের ভৃত্য এদের বাদ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগকে আইন-অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় নাই। তিনটী ষ্টেটে উপরিউক্ত মজুর শ্রেণীকে তো ধরাই হয় নাই উপরন্তু আরও কয়েক শ্রেণীর মজুরকে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে। যেমন প্রথম ষ্টেটে—হোটেলের কর্ম্মচারীকে, দ্বিতীয় ষ্টেটে দাতব্য বা ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের কর্ম্মচারী, তৃতীয়টীতে রোল-কর্ম্মচারী অথবা অন্য যে কোন কর্ম্মচারীকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে কেবল এটর্নি-জেনারেল অনুমোদন সাপেক্ষ। দ্বাদশটী ষ্টেটে স্ত্রী মজুর এবং শিশুমজুর মাত্রকেই আইন-অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বাকী আর সকলকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। শিশুমজুর বলিতে ২১ বৎসরের নিম্নে সকলকেই ধরা হইবে। কলাম্বিয়াতে কিন্তু শিশু মজুর বলিতে বোঝায় ১৮ বৎসরের নিম্নে। ক্যালিফার্ণিয়াতে শিশু মজুর বলিলে স্ত্রী লোক হইলে ২১ বৎসরের নিম্নে এবং পুরুষ হইলে ১৮ বৎসর অবধি সকলকেই ধরা হইবে।

কেবল স্ত্রী-মজুরের নিম্নতম বেতনহার নির্দ্ধারণের ফলাফল

ম্যাসাচুসেটস্ এবং ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে বহুদিন যাবৎ স্ত্রীমজুরদের নিম্নতম বেতনহার স্থির করা আছে। ম্যাসাচুসেটসে ১৯১২ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক হিসাবে উক্ত আইন প্রচলিত ছিল না। ক্যালিফর্ণিয়াতেও পুরাতন বেতন হার আইন প্রস্তুত হইবার পরও অনেক দিন ধরিয়া বিনা সংশোধনে চালিত ছিল। অন্যান্য স্থলে অল্পদিন হইল ঐরূপ আইনের সৃষ্টি হইয়াছে।

অক্টোবর মাসে ১৯৩৭ সনে "উইমেন্‌স্ বুরো" একটী ছোট পত্রিকা বাহির হয়। তাহাতে অনেক তথ্য নিহিত ছিল। উহাতে বেশ বোঝা যায় যে, যে সকল ক্ষেত্রে নিম্নতম বেতন হার নিয়োগ করার জন্য অনুসন্ধান করা হইয়াছিল সে সকল ক্ষেত্রে মাহিনার হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভিন্ন কার্য্যের তালিকা পরীক্ষা করিলেও বোঝা যাইবে যে নিম্নতম হার যাহা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক বেতন স্ত্রীমজুরেরা পাইয়া আসিয়াছে।

আরও দেখা যায় যে স্ত্রী-মজুরদের নিম্নতম বেতনের হার নির্দ্ধারণ হেতু তাহাদের স্থলে পুরুষ মজুরের আমদানী হয় নাই। কারণ মেয়ে মজুর এবং পুরুষ মজুর উভয়কেই এক শ্রেণীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় না। ধোবার কারখানায় হঠাৎ প্রকাশ হইল যে স্ত্রী মজুরের সংখ্যা কম্‌তি হইয়া যাইতেছে। তাহাতে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, যে কারণে সংখ্যা ন্যূন হইতেছে তাহা হইল "টেকনিক্যাল" বা যন্ত্রপাতি বিষয়ক, নিম্নতম বেতন হার হইয়াছে বলিয়া কমিয়া যায় নাই। বরং নিউইয়র্কে দেখা যায় সাধারণ ভাবে স্ত্রী মজুরদের কর্ম্ম সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

"উইমেনস্ বুরোর" সহযোগীতায় "ফেডারেল ডিপার্টমেণ্ট অব লেবর" অনেকগুলি সভা আহ্বান করিয়া নিম্নতম বেতনহার সম্বন্ধে আলোচনা করে। ১৯৩৭ সনে অক্টোবর মাসে সপ্তম অধিবেশন হয়। ইহাতে সারা দেশে যাহাতে এক-রকমের আইন এবং এক রকমের বেতন হার প্রচলিত হয় তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। "উইমেন্‌স বুরো" দুইটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছে যাহাতে উক্ত মন্তব্য অনুসারে কার্য্য ঠিক হয় তাহার তত্ত্বাবধানে এবং উপায় অবলম্বন করার নিমিত্ত ফেডারেল গভমেণ্ট এবং ষ্টেটের মধ্যে শ্রমিক আইন প্রচলিত করার জন্য একতা সূত্রে বন্ধন হওয়ায় এবং পরস্পরের সহানুভবতার জন্য অনেক প্রকার কৌশলেও আইন প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে সমস্ত দেশটা জুড়ে নিম্নতম বেতনহার এবং উচ্চতম পরিশ্রমের সময় নির্দ্ধারণ হেতু আইন প্রস্তুত করা হইয়াছে। উক্ত আইন পুরুষ ও স্ত্রী মজুর নির্ব্বিশেষে নিয়োজিত হইবে। ইতিমধ্যে যে সকল দেশে আইন গঠন হয় নাই তাহাদের হাত হইতে আইন প্রচলিত দেশকে বাঁচাইবার জন্য অনেক উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং তাহা-দিগকে অন্যায় বিরুদ্ধতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ফেডারাল গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছে।

ভারতবর্ষে স্ত্রী মজুরের অদৃষ্টাকাশ চির-দিনই বোধ হয় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে। পুরুষ মজুরদের আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষার চেষ্টা এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অভাব যেমন প্রকট হইয়াছে স্ত্রী মজুরদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানাও তেমনি অসম্ভব হইয়াছে। মার্কিণের মত পুঁজিপাতির দেশেও শ্রমিক সুখের আলো দেখতে পায় আর ভারত দরিদ্রের দেশ হ'য়ে তার শান্তিটুকু পাবার চেষ্টায় বিরত। কর্ম্মের অভাবই মানুষ—গড়ার পথের কাঁটা এবং তার অপেক্ষা অধিক বাধা অক্ষম কর্ত্তীর হাতে কর্ম্মের প্রচেষ্টা।

জাগ্রত স্বপ্ন

স্বর্গীয়া নিপুণিকা দেবী

কত সুগভীর নিশীথে আমার হিয়ার দুয়ারে আসিয়া,
কাহার আনন্দ-মধুর মুরতি দাঁড়ায় ঈষৎ হাসিয়া!
বুঝি কত তার মৃদু করাঘাত ভাসিয়া গিয়াছে পবনে,
ঘুম ঘোরে ছিনু হ'য়ে অচেতন, পশেনিকো কিছু শ্রবণে!
অভিমানে ভরা নীরব নিঃশ্বাস মিলায়ে গিয়াছে গগণে,
কত আদরের আকুল আহ্বান কাঁদিয়া ফিরেছে সঘনে!
ঘুম ভাঙা আঁখি না মেলিতে মোর মানস মুকুরে হেরি।

স্নেহমাখা কার করুণ মু'খানি আঁখিতে অমিয়া ভরি!
অমনি উঠিয়া উদাস নয়নে জাগি প্রভাতের তরে,
হেরিতে সে মুখ উতলা পরাণ আকুল পিয়াসা ভরে!
কত না গভীর আনন্দ উচ্ছ্বাস উথলে নয়ন-পলকে,
দেখি যবে সেই প্রীতি-ভরা ছবি প্রভাতে সোনালি আলোকে
ভাব-রসহীন ভাষাহীন কত রচিয়া প্রীতির অর্ঘ্য।
বিমল প্রভাতে বারেকের তরে লভি যেন চির স্বর্গ!

বিবিধ

নির্ঝরিণী সাহিত্য সংসদ

গত ৬ই কার্ত্তিক রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় ৫০নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটে (কালিঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে) উক্ত সংসদের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট্ মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অন্ধগায়ক শ্রীবিভূতি চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর শ্রীঅমল ঘোষাল, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'পার্থ' নামক কবিতাটি আবৃত্তি করেন। সম্পাদক কর্ত্তৃক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করা হইলে পর শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু একদিক নামক একটি সনেট ও শ্রীদীনেন্দু সুন্দর দাস "স্মরণে" নামক একটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীদুর্গাপদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি পঠিত-কবিতাগুলির সমালোচনা করেন। অতঃপর শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক-"বাংলা পদ্য-সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর" নামক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত ও শ্রীদুর্গাপদ কাব্যতীর্থ প্রভৃতির দ্বারা তাহা সমালোচিত হয়। ইহার পর সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর জল যোগান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়। সভায় হস্তলিখিত 'নির্ঝরিণী' পত্রিকা প্রদর্শিত হয়।

বৈদ্যনাথধাম-রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বৈদ্যনাথ ধাম কুণ্ডা রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার ত্রিকালীন পূজা ও উৎসব হইবে। এতৎ উপলক্ষে একটী মেলা বসিয়া থাকে ও বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হইয়া থাকে। মাতার পূজা ও উৎসবে ৪।৫ দিন দরিদ্র নারায়ণের সেবা বিশেষ-ভাবে হইয়া থাকে। এবৎসরও ১৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে ১৯শে কার্ত্তিক শনিবার পর্য্যন্ত বিশেষভাবে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইতেছে। চণ্ডীর গান, ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা নাম সংকীর্ত্তন, যাত্রা, বায়স্কোপ, বাজী ম্যাজিক, সাওতালী নাচ, লাঠী খেলা, ঝুমুর ইত্যাদি যেমন হয় তাহারও ত্রুটী হইবে না। দেওঘর ষ্টেশন হইতে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধা উদ্দেশ্যে মোটর লরীর ব্যবস্থা হইতেছে। ইতি মধ্যেই বহু লোক সমাগম হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এই মাতৃ পূজা ও সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

বালীগঞ্জ ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন

গত ১৬ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় বালীগঞ্জ ইয়ং মেন্স এসোসিয়েশনের উৎসব ও সাহিত্য শাখা সমিতির উদ্যোগে একটী প্রীতি-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য শাখার রচনা প্রতিযোগীতায়, কুমারী শান্তি বসু ও গল্প প্রতিযোগীতায় কুমারী শৈলসুতা বিশ্বাস একটী করিয়া রৌপ্য পদক পান। কুমারী শুক্তিধারা মুখার্জ্জী, কুমারী প্রীতিধারা মুখার্জ্জী ও কুমারী বাণা রায় চৌধুরীর নৃত্য। এবং জগবন্ধু মুখার্জ্জী, কুমারী সন্ধ্যাদত্ত, কুমারী গৌরী মিত্র ও সুপ্রীতি মজুমদারের বন্দেমাতরম সঙ্গীত, কুমারী রেণুকা ঘোষের খেয়াল গান এবং নির্ম্মল পালের আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র মহিলাগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আর, এ, পি

'রিফর্ম্ড্ আর্ট প্লেয়ার্স' নামে একটি নূতন নাট্য প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষিতা ভদ্র মহিলা সমন্বয়ে সংগঠিত। এরা একখানি ছবিও তুলবেন।— এখন চলেছে আর্টিষ্ট সংগ্রহ ও নির্ব্বাচনের পালা। এঁদের উদ্দেশ্য, জন সাধারণ দর্শক-বৃন্দের চোখের সামনে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটা কিছু তুলে ধরা। মঞ্চ ও পর্দ্দা দু'বিভাগেই পরিচালকের পদে নিয়োজিত হয়েছেন জন-প্রিয় তরুণ অভিনেতা শ্রীসুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়; সম্পাদকের পদে—সুনিপুণ ব্যবসায়ী মিঃ জে, সি, ভট্টাচার্য্য। এঁদের প্রথম প্রচেষ্টা 'ঝর্ণাধারা' ও "রূপ শিক্ষা" কলিকাতার কোন বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে দেখা যাবে।

অসুস্থ
শরীর
সুস্থ ও সবল

করিতে

SIROLIN
সিরোলিন
'রচি'
অদ্বিতীয়
ইহা সর্দ্দি, কাসি এবং যক্ষ্মার
প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ব্যায়াম ও ছাত্রছাত্রী সমাজ

শ্রীউমেশ মল্লিক
(ব্যায়াম শিক্ষক)
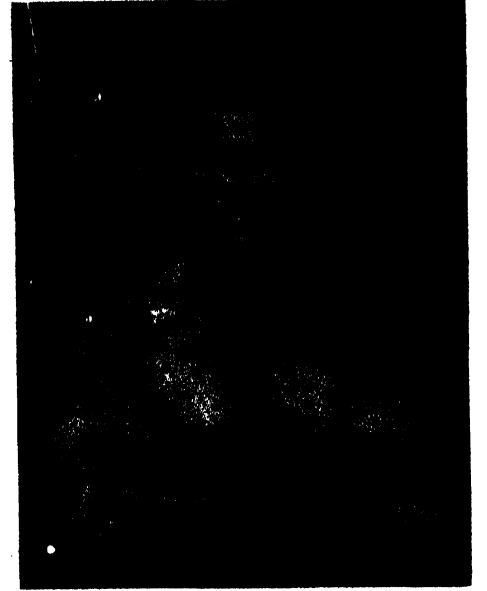
এই জাতীয় দুর্দ্দিনে জীবন যাত্রার পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়ের উন্নত স্বাস্থ্যের যে কত প্রয়োজন তাহা জনসাধারণ মাত্রই সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। ছাত্রছাত্রী সমাজের উপর জাতির ভবিষ্যত মুখ্যতঃ নির্ভর করে। অতএব এ সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উপর জনসাধারণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যে দেশের ছাত্রছাত্রী সমাজ অনুন্নত, স্বাস্থ্যহীন সে দেশ, সে জাতি এই জনবহুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত। চিরকালেই এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রী সমাজ উন্নত জাতির হৃদয় আকাশে অস্পষ্টভাবে জাগরুক হইয়া থাকে। ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়ের উন্নত স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নতির পথের পরিচয়ক। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যেরূপ দেশনায়কের বড়ই প্রয়োজন হয় উন্নত স্বাস্থ্য সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীগণের প্রয়োজন তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ছাত্রছাত্রীগণকে উন্নত, স্বাস্থ্যবান, শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে হইলে এ সম্প্রদায়ের ব্যায়াম চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিবার সহায়তা করা যুক্তি সঙ্গত। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রী-গণের ভগ্নস্বাস্থ্য জাতির দুর্দ্দিন এবং অধঃ পতনের পরিচয় দিয়া থাকে। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ব্যায়াম চর্চ্চায় শিক্ষাব্রতী ছাত্রকে অতি অল্পদিনই ধৈর্য্য সহকারে ব্যায়ামে অনুরক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ নানাবিধ।

অনেকে অবস্থার প্রতিকূলে পড়িয়া ব্যায়াম চর্চ্চায় বিরত হন। অনেকেই অতি অল্পদিনে স্বীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিতে না পাইয়া ব্যায়ামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেন। কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট অংশ শেষ করাকে মুখ্য এবং স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা গৌণ পর্য্যায়ভুক্ত করেন। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, দেশে ব্যায়াম চর্চ্চায় বিশে-ষজ্ঞের (exponent of physical culture) অনটনে সামান্য পরামর্শের অভাবে ছাত্রগণ এ বিষয়ে দিন দিন উদাসীন হইয়া পড়েন। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সহপাঠী ছাত্র'দের অবস্থা অতীব সঙ্গীন বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের মধ্যে শতকরা সকলেরই স্বাস্থ্য আশাপ্রদ নহে। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে স্বাস্থ্যবতী শক্তিসম্পন্না ছাত্রীর অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধ হইতেছে। তাঁহাদের স্বাস্থ্য জাতীয় উন্নতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই ছাত্রী সমাজের উপর জাতির শক্তি, সাহস, বলবীর্য্য বহুল পরিমানে নির্ভর করে।

ছাত্রীদিগের নিকট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিবার কথা উত্থাপন করিলে সৌন্দর্য্যহীন হইবার আশঙ্কায় এ সম্প্রদায় ব্যায়ামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না। ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে সৌন্দর্য্যহানীর আশঙ্কা আছে—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার পক্ষপাতীত্ব করিয়া শরীর চর্চ্চার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা অত্যন্ত গর্হিত। যাঁহারা এই মতের পোষকতা করেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে, স্ত্রীজাতির মাংসপেশীর আকার দীর্ঘায়ত এবং সূক্ষ্ম হওয়ার তাঁহাদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকার ব্যায়ামই সৌন্দর্য্যহানী করিবার সহায়তা করিতে পারে না—অধিকন্তু তাঁহাদিগকে লাবণ্য-ময়ী করিয়া তুলে। কারণ কোন ব্যায়াম-কারীছাত্রীকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে তাহার মাংসপেশীগুলি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিটোল, কমনীয়তা এবং কোমলতায় পরিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে developed হওয়ায় তাঁহার আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। ছাত্রীগণকে ব্যায়াম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করিবার জন্য। ছাত্রীদের ব্যায়াম করিবার উদ্দেশ্য ছাত্রদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই জন্যে ছাত্রীদের ব্যায়াম করিতে বলিলে যেন কেহ মনে না করেন যে, ব্যায়াম করিলে

শ্রীউমেশ মল্লিক

ছাত্রীদের মাংসপেশী সমূহ স্ফীত হইয়া দেহ পুরুষাকৃতি হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশের ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই স্থূলাঙ্গী হওয়ায় তাঁহাদের সৌন্দর্য্যহীনা করিয়া তুলে। যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের দেহে মেদ জন্মাইতে না পারে সে বিষয়ে এ সম্প্রদায়ের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাক দেহে মেদ জন্মাইবার কারণ কি? এবং দেহে মেদ বা চর্ব্বি কিরূপে জমা হয়

দেহে Adipose tissue নামে এক প্রকার tissue আছে। বাহিরে এই tissue গুলিকে সূক্ষ্ম দানাদার দেখায় ইহা বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত। এই প্রত্যেক খণ্ডে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড আছে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে আবার ধমনী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা এবং চর্ব্বিকোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল নালী পরস্পর এরিয়েলের তন্তর দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। সংযোগে তন্তর সেল্ হইতে চর্ব্বিকোষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ fat সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন। যাঁহাদের দেহে অতিরিক্ত চর্ব্বি জমে তাঁহারা যেন অতিরিক্ত চর্ব্বি জাতীয় আহার না করিয়া শরীর চর্চ্চার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। অতিরিক্ত আহার করা কখনও উচিৎ নহে। এইরূপ আহার করা উত্তম স্বাস্থ্যের ফলপ্রদ নহে। অনেকে স্বল্পাহারে শরীরকে মেদ জন্মাইবার সম্ভবনা হইতে রক্ষা করিতে চাহেন। তাঁহাদের মতে সল্পাহারে দেহ ভাল থাকে। এ ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেহ ক্ষয় ও পুরণের সমষ্টি বিশেষ। মানুষ নিস্তেজভাবে চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলেও প্রায় ২৫,৯২০ বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে। নিঃশ্বাস গ্রহণ এবং ত্যাগেও মানুষের দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রত্যহই এবং প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের দেহের কিছুনা কিছু ক্ষয় হইয়া থাকে। এই ক্ষয়তি অংশের পূরণের জন্য আমাদের আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা সমীচিন। সকলেই অবগত আছেন যে খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ হইতেই শরীরের ক্ষয়তি অংশের পূরণ হইয়া শরীরে শক্তির সঞ্চার হয়।

আমাদের খাদ্য দ্রব্য প্রধাণতঃ দুইভাগে বিভক্ত:— (১) আমিষ জাতীয়। (২) নিরামিষ জাতীয়। আমিষ জাতীয় খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ ও পুষ্টি-সাধন হয় এবং নিরামিষ খাদ্যে আমাদের শক্তি লাভ হয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে আমাদের খাদ্যদ্রব্যে ছয় প্রকার যৌগিক পদার্থ আছে, যথা ১। ছানা জাতীয় ২। শ্বেতসার জাতীয়, ৩। স্নেহ জাতীয় ৪। খনিজ পদার্থ, ৫। জলীয়, ৬। খাদ্যপ্রাণ।

সকল প্রকার খাদ্যে উপরোক্ত উপাদান-গুলি পাওয়া যায় কিন্তু বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ বিশেষ উপাদানের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

জার্ম্মান পণ্ডিত ভোয়াট বলেন যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিলে তাঁহার প্রত্যহ ১৩৩ গ্রাম প্রাচীন (ছানা জাতীয় উপাদান), ৯৫ গ্রাম তৈলাক্ত পদার্থ ও ৪৩৭ গ্রাম শ্বেতসার জাতীয় উপাদান গ্রহন করা কর্ত্তব্য। যিনি অনুরূপ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন না তাঁহার প্রত্যহ ১০৯ গ্রাম বা প্রায় আধপোয়া ছানা জাতীয় একছটাক তৈলাক্ত পদার্থ এবং ৪৮৫ গ্রাম শ্বেতসার জাতীয় উপাদান গ্রহন করা যুক্তি সঙ্গত।

কোন পদার্থে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান থাকিলেই যে শরীরের পক্ষে তাহা উপযোগী তাহা নহে। সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যাহাতে এই সমস্ত উপাদান সহজে পরিপাক হইয়া দেহ গঠনের সহায়ক হয়। যাঁহাদের পরিপাক-যন্ত্র দুর্ব্বল তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যাহা হউক ফলকথা এই যে সুস্থ ব্যক্তির যে খাদ্য ভাল বোধ হয় এবং যাহা আহার করিলে মনে কোন গ্লানি বোধ হয় না এইরূপ আহার করাই বিধেয়। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে শরীর রক্ষার উপাদান আছে কিনা এ বিষয়েও দৃষ্টি রাখা সঙ্গত।

ছাত্র ও বন্ধুগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্যায়াম করিবার পূর্ব্ব হইতে ডিম, ছানা, পেস্তা বাদাম প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। তাঁহাদের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে ব্যায়াম করিলে বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য গ্রহন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ভ্রান্ত ধারণার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। গুরুপাক খাদ্য (পেস্তা বাদাম, মনেক্কা) গ্রহন না করিয়া অনেকে অমানুষিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া বহু সহপাঠিকে এ বিষয়ে মতামত দিতে হয় এবং হইতেছে। আহার ব্যতাত ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হইলে আমাদের বহু বিষয়ে সতর্ক অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। শ্বাসক্রিয়া, স্নান, একাগ্রতা, নিদ্রা প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সমীচিন। ইহাতে শরীরের যে অশেষ উন্নতি হইয়া থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। ছাত্রদিগের জন্যে ব্যায়াম নির্দ্দেশ করা কঠিন। তাঁহাদের এইরূপ ব্যায়ামের নির্দ্দেশ দিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অথচ অটুট স্বাস্থ্য লাভ হইতে থাকে। এই সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রীদিগের নিমিত্ত সহজসাধ্য ব্যায়াম নির্ব্বাচন করা উচিত।

ছাত্রীদিগের সন্তরণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সন্তরণ সহজসাধ্য অতি স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়াম। মহিলাদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্ত্তব্য। ছাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই টেনিস্, ভলিবল, প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। বিদেশীয় ছাত্রীগণকে ফুটবল, হকি, অশ্বারোহণ প্রভৃতিতে লিপ্ত দেখা যায়। কিন্তু অশ্বারোহণ, ফুটবল বা হকি খেলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম বলিয়া গৃহীত হয় না। কারণ ইহাতে Violent exercise হইয়া থাকায় বিশ্রাম গ্রহণ করিবার সময় অবসাদ আসে। ছাত্রীগণের প্রত্যেকের Breathing exercise গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। Breathing exercise বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়ামের অংশ বিশেষ।

ছাত্রগণও ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলিয়া থাকেন। ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম হয় না বলিয়াই তাঁহারা উন্নত স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন না।

এক্ষণে ব্যায়াম এবং খেলাধূলোর পার্থক্যের কথা আসিয়া পড়ে। অনেকেরই এই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে খেলাধূলা এবং ব্যায়ামের উদ্দেশ্য একই। তাঁহারা মনে করেন যে Sports and Exerciseএ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন হয় বলিয়া মাংসপেশীগুলির একই ভাবে উন্নতি হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিলে একাগ্রতা বলে অতি সহজেই সমুদয় মাংসপেশীতে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং ব্যায়াম জনিত কোন অবসাদ আসে না। খেলাধূলায় অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হয় এবং উত্তেজিত হইয়া বেশী দৌড়াদৌড়ি করায় বিশ্রাম করিবার সময় ক্লান্তি বোধ হয়। ব্যায়ামের সাহায্যে যে শক্তি ও শ্রম করিবার ক্ষমতা সঞ্চিত হইয়া থাকে Sportsএ তাহা ব্যয়িত হয়। খেলাধূলায় মাংশপেশী সঞ্চালিত হয় বটে তবে নির্দ্দিষ্ট মাংশপেশী গুলির উপর মনঃসংযোগের অভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

তবে ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে Sportsএ শরীর চর্চ্চা হিসাবে মূল্য একেবারেই নাই। খেলাধূলায় মানসিক স্ফূর্ত্তি আসে এবং খেলোয়াড়গণ খেলাধূলা করিয়া কর্ম্মঠ হইয়া উঠেন। ব্যায়াম করিতে হইলে মানসিক স্ফূর্ত্তির বিশেষ প্রয়োজন কারণ ব্যায়াম করিবার সময় মানসিক কোন চঞ্চলতা থাকিলে একাগ্রতাসহকারে ব্যায়াম করা যায় না। ব্যায়াম করিতে হইলে একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। একাগ্রতা সহকারে ব্যায়াম না করিলে ফললাভে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

অধুনা বাঙ্গলা দেশে ক্রমে ক্রমে ব্যায়াম করিবার স্পৃহা জাগরিত হইতেছে। এই নব জাগরণের দিনে সমগ্র দেশবাসী ছাত্রছাত্রী সমাজের প্রতি অপলক নেত্রে চাহিয়া আছেন। এই নিরন্ন অসহায় জাতিকে জগতের অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে উন্নত স্বাস্থ্যের প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম অনুভূত হইবে। বৈদেশিকগণের মনের ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উন্নত স্বাস্থ্যবান শক্তি সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীকে দেহেমনে উন্নত হইতে হইবে। যাহাতে, ছাত্রছাত্রী সমাজ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাঁহারা সহযোগিতা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত না হন সে বিষয়ে জনসাধারণের পক্ষপাতিত্ব করিতে হইবে, স্বাস্থ্যের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দিতে হইবে। দেশ নায়কগণের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের ছাত্রছাত্রী সমাজও বৈদেশিকগণের ন্যায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারিবেন না ইহা কেহ মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারিবেন না। স্বাস্থ্যই সম্পদ এই প্রবচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ছাত্রছাত্রী সমাজ যদি জীবন যাত্রার পথে আগুয়ান হইতে পারেন তাহা হইলে এই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অধঃপতিত জাতির মুক্তির দিন অতি সন্নিকটে।

রেকর্ড সমালোচনা

—এডিসন—

আধুনিক গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত—গোপাল ভাঁড়ের "মোসায়েব নির্ব্বাচন" — ভারতবাণী রেকর্ড।

পূজার সময় হিন্দুস্থান কোম্পানীর প্রকাশিত রেকর্ডগুলির মধ্যে নিম্নে আমরা কয়েকখানির সমালোচনা প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে আমরা নিয়মিতভাবে রেকর্ড সমালোচনার প্রয়াস পাইব। সহৃদয় পাঠকবর্গের ও বিভিন্ন কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা-দিগের সহায়তায় ও সহানুভূতিতে আমাদের সমালোচনা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রশংসা-নিন্দাবাদের উর্দ্ধে স্থায়িত্বলাভ করিলেই আমাদের লেখা সার্থক হয়।

* * *

এচ ৬৪১ হিন্দুস্থান :—শ্রীমতী গোপালী-বালা, শ্রীমতী পারুলবালা, প্রেমকুমার ও মোহনলাল এই রেকর্ডখানিতে মাদল, বেণু ও অন্যান্য আবহ সঙ্গীতের সহিত সাঁওতালী নৃত্যের সুরে দুইখানি গান গাহিয়াছেন। একপিঠে 'সখি চল, পানিয়া ভরণে জলে' ও অপর পিঠে 'এলে কে পরদেশী বাজিয়ে বাঁশী' গীত হইয়াছে। গান দুইখানি শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

* * *

এচ ৬৪২ হিন্দুস্থান :—এই রেকর্ডে শ্রীঅনুপম ঘটক, শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী, কুমারী প্রতিভা সেন ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ আগমনী বিষয়ক দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। পুরুষ কণ্ঠের সহিত নারী কণ্ঠ এই রেকর্ডে সুন্দরভাবে মিলিয়াছে। খোল খঞ্জনীর সহিত 'শিউলিঝরা অঙ্গনপথে' সুশ্রাব্য এবং অন্যদিকে 'আজি শরৎ চাঁদের তিথিতে' গানখানি অপেক্ষিকভাবে মধুরতর।

* * *

এচ ১১৬৪৩ হিন্দুস্থান :—শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বি-এল ও তাঁহার দলবল "মোসায়েব নির্ব্বাচন" নামে একটি হাস্য-রসাত্মক নাটিকা অভিনয় করিয়াছেন। রেকর্ডের প্রারম্ভেই বেতার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বাণীকুমার রচিত ও বিখ্যাত গায়ক পঙ্কজ কুমার মল্লিক কর্তৃক গীত 'নমো নমো নমো হে রুদ্র সন্ন্যাসী' গানের লালিকা 'থামো থামো থামো হে ক্ষুদ্র রাক্ষসী' এই চরণ গীত হইতেই আমরা নূতন রসাস্বাদনের নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া ছিলাম, কিন্তু মোসায়েব সম্বন্ধে গোপাল ভাড়ের অতি-পুরাতন বহুজ্ঞাত গল্পটিকে লইয়া ননী দাশগুপ্ত এম্-এ মহাশয় এত সাধারণ ভাবে নাট্যরূপ দিলেন যে হাস্যরস নেহাৎ কাষ্ঠ-হাসিতে পর্য্যবসিত হইল। তাঁহার উপর দ্বিতীয় মোসায়েব 'প্রলয় পালধি' বাঙলা শব্দ মাড়োয়ারী-সুলভ উচ্চারণ করিয়া এবং অদ্ভূত intonation এর সহিত যে হাস্য-রস পরিবেশনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মোটেই হাস্যরসের অনুকূল নহে। ৪র্থ মোসায়েব সবজান্তা সমাদ্দারের ভূমিকায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ভাল হইয়াছে।

* * *

এচ ৬৪৮ হিন্দুস্থান :—কুমারী কণিকা মুখোপাধ্যায় এই রেকর্ডে দুইখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত রবীন্দ্র-সুরে গাহিয়াছেন। একদিকে 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে' ও অন্যদিকে 'না না, ডাকব না, ডাকব না' গাওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রের সুরে রাবীন্দ্রিক-গান অনেকেই গাহিয়া থাকেন, কিন্তু যথার্থ রাবীন্দ্রিক গান অল্পই শ্রুত হয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সহিত আধুনিক গানের অনেকাংশে মিল বর্ত্তমান সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও আধুনিক সুরবিশিষ্ট গানের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা অসম্ভব। নিছক রবীন্দ্র সঙ্গীত শ্রীমতী কনক দাস, শ্রীমতী সতী দেবী, স্বর্গত: হরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির কণ্ঠে যেরূপে রূপ পায় বা পাইত সেরূপ সকল কণ্ঠে শুনা যায় না। শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কতগুলি গান রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যে গাহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আবার তাঁহার নিজস্ব ঢঙে গানগুলি অপরূপে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। আবার আধুনিক ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সীমা-রেখা নির্দ্দেশ করাও দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক বর্ত্তমান রেকর্ডে শিল্পী গান দুইখানি আধুনিক ভাবেই গাহিয়া ফেলিয়াছেন। কুমারীর কণ্ঠ পরিস্কার এবং সহগামী সঙ্গীতের সহিত সরলভাবেই গান দুইখানি গীত হইয়াছে 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে' গানখানি আপেক্ষিকভাবে ভাল।

* * *

এচ ৬৪৯ হিন্দুস্থান :—শিল্পী শ্রীসত্যরঞ্জন চৌধুরী সহগামী সঙ্গীতের সহিত 'আমারে ভুলিয়া যাবে জানি' ও 'রজনীর শেষে দেখেছি'—এই আধুনিক গান দুইখানি এই রেকর্ডে পরিবেশন করিয়াছেন। সরলভাবে এবং নির্দ্দোষভাবে গান দুইখানি গীত হইয়াছে। বৈচিত্র্যের নিমিত্ত দ্বিতীয়

গানখানির মধ্যে ইংরাজী সুর যোজনা করা হইয়াছে। সাধারণতঃ ৭৮ গতিবেগে রেকর্ড বাজানো হইয়া থাকে, কিন্তু এই রেকর্ড খানিকে ৮০ গতিবেগে বাজাইতে হইবে এইটুকু বৈশিষ্ট্য শ্রোতৃবর্গের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

* * *

এচ ৬৪৪ হিন্দুস্থান:—শ্রীজ্ঞান ঘোষের রচনায় ও পরিচালনায় "বাণী সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক এই রেকর্ডের একদিকে তিলোক কামোদ ও অন্যদিকে পিলুতে অর্কেষ্ট্রা বাজানো হইয়াছে। বাদন মনোরম, বিশেষতঃ পিলুর দিকে সুর-সংগ্রথন ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি সুশ্রাব্য।

* * *

এচ্ ৬৪৫ ভারত-বাণী:—এই ভারত-বাণী রেকর্ডে শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র '(আজি) বিদায় বেলায় মিনতি তোমায়' ও অন্যদিকে 'আজি পড়ে গো মনে—' এই দুইখানি আধুনিক গান রেকর্ড করিয়াছেন। গান দুইখানিতে আর কিছু দোষ নাই, তবে বিরহমূলক প্রেম সঙ্গীতে বাস্তবতার আবহাওয়া অর্জ্জন করিবার জন্য কিনা জানি না, কণ্ঠে যে কারুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বোধ হয় রেকর্ড তুলিবার কালে ভয়ে ভয়ে গাওয়া হইয়াছিল বলিয়াই হইয়াছে;—তবে শিল্পীর ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই।

—:o:—

শরৎ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

মিসেস মাধবীলতা দাশ

বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে শরৎবাবুর দান যে শুধু অমূল্য তাই নয় অপূর্ব্ব ও অচিন্ত্য। যাদুকর ভেল্কি দেখায়, আমরা দেখে আনন্দ পাই কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ভেল্কির সব কিছুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বার কর্ত্তে যাই সেই মুহূর্ত্তেই করি ভুল, ভেল্কি দেখে যে আনন্দ পাই, তা' যায় অন্তর্হিত হয়ে। শরৎ সাহিত্যের অবদান আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে; এর রস উপলব্ধির, অনুভূতির। একে বিশ্লেষণ কর্ত্তে গেলে হয়তো বা আমরা কর্ব্ব অন্যায়, কারণ প্রথমতঃ বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে হৃদয়কে বিচার করা যায় কিনা এবং বুদ্ধি বড় কি হৃদয় বড় এ সমস্যা পৃথিবীর আদিম সভ্যতার যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত শুধু সমস্যা হয়েই রয়েছে, সমাধানের পন্থা খুঁজে পাওয়া যায়নি, দ্বিতীয়তঃ বিচার করার ক্ষমতা তারই থাকে যার আছে সংস্কার বিহীন মনের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও বিচার বুদ্ধি। সব সমাজের সব সংস্কারের বাইরে না গেলে শরৎ সাহিত্যকে বিচার করা চলে না, বিশ্লেষণ করা চলে না, আর বিশ্লেষণ না কর্লে তার বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জিভূত বেদনার সাথে যার নেই সম্যক পরিচয়, যার নেই মানব-মনের গোপনতম অনুভূতি উপলব্ধির অভিজ্ঞতা, তার শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার প্রয়াস বৃথা নয় অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

শরৎ সাহিত্য আলোচনা করার আগে জেনে রাখার প্রয়োজন ভারতবর্ষকে, তার ভাবধারাকে, তার সংস্কারকে, তার সমাজকে, সমাজের ব্যষ্টিকে।

কবে কোন আদিযুগে মানুষ এই ভারতের মাটীতে ব্যষ্টির কল্যাণ কামনায় সভ্যতার প্রথম সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে গড়ে তুলেছিল তার সমাজকে, সে আজ বিস্মৃত প্রায়। সেদিনকার মানুষ কল্পনাও করেনি যে সেদিনকার প্রয়োজনে-গড়া সামাজিক অনুশাসন কালের কবলে মরিচা মণ্ডিত হয়ে আজ বহুশত বর্ষ পরে সংস্কারে রূপান্তরিত হয়ে তারই ভবিষ্যৎ বংশধরের জীবনকে করে তুলবে দুঃখময়। গৃহ নির্ম্মানের দিন সে ভাবেনি যে, একদিন এই ধ'রে ধ'রে গড়ে-তোলা বৃহৎ সৌধমালা জর্ণ হয়ে পড়ে যাবে তারই সন্তান-সন্ততির মাথায় বিরাট বোঝা হয়ে, সৃষ্টি কর্ব্বে নানা অনর্থের।

যুগায়ত সঞ্চিত সংস্কার আজ মানুষের জীবনকে করে তুলেছে দুর্ব্বহ। গৃহকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস আজ মানুষের আনন্দকে করেছে বিষাক্ত, সমাজে চলেছে নরবলি। মানুষের জন্য গড়া হয়েছিল সমাজকে, সমাজের জন্য মানুষকে নয়। সেদিনকার প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ অনুশাসন আজকের দুনিয়ার কোন কাজে লাগতে পারে না। পদে পদে সে ছন্দপতন ঘটাচ্ছে, দুনিয়ার অগ্রগতির পথে সে আজ বাধা সৃষ্টি কর্চ্ছে। আজ তাই প্রয়োজন হয়েছে তাকে ঢেলে সাজার, প্রয়োজন হয়েছে তাঁকে ঝালিয়ে নেওয়ার।

সাহিত্যের কাজ মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তাকে আত্ম-সচেতন করে তোলা, যা কিছু অন্যায় তার তীব্র প্রতিবাদ করা, যা কিছু সুন্দর তাকে মধুর করে সমাজের

ও ব্যষ্টির কাছে পরিবেশন করা। শরৎ-সাহিত্যে এর কোনটীরই অভাব নেই। তাঁর মোহন তুলিপাতে সমাজের যে ছবিকে তিনি ফুটিয়েছেন তাকে এক কথায় বলা চলে অপূর্ব্ব।

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে যে একটা আত্মভোলা মহা-মহেশ্বর রূপ আছে তা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রই প্রথম কথাসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে অঙ্কিত করেন বিন্দুর ছেলের যাদব, চন্দ্রনাথের কৈলাশ খুড়ো ও 'বামুনের মেয়ের' প্রিয়নাথের চরিত্র সৃষ্টি করে। মহেশ্বরের আর একটী ধ্যানী ও মৌনী রূপ দেখি আমরা বিপ্রদাসে ও মাইমে।

ধনী-কন্যা বিন্দু এলো যাদবের সংসারে রূপ ও ধনের প্রাচুর্য্য নিয়ে, আনলো নাকো শুধু ধনগর্ব্ব। বড়-জাকে সে ভক্তি কর্ত্ত, শ্রদ্ধা কর্ত্ত, ভালবাসত মায়ের চেয়েও বেশী করে, কালের আবর্ত্তনে ঘটনার প্রবাহে সংসার হল ভিন্ন। শরীর অসুস্থ। জায়ে জায়ে চলেছে মান-অভিমানের পালা। কথা বন্ধ। তবু মায়ের অনুরোধের উত্তরে সে বল্লে—"না, মা, তা হয় না। যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ সেখানেই থাক, সেই সব। আর যাই করি মা তাঁকে না বলে বাড়ী ছেড়ে যেতে পার্ব্ব না।" অভিমানিনী ধনার দুলালি সে, তবু মাতৃতুল্য বড়-জায়ের প্রতি ভক্তি যে কত বেশী ছিল তা তার এই ভক্তি থেকেই বোঝা যায়। ভারতবর্ষের হিন্দু ঘরের গৃহস্থ কুলবধূদের চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর সাহিত্যেও কোথাও এর তুলনা মেলে না, একমাত্র শরৎ সাহিত্যেই এর সুন্দর স্ফুরণ লাভ ঘটেছে। অভিমানে তিলে-তিলে সে নিজেকে ক্ষয় কর্ত্তে লাগল, যমে-মানুষে টানাটানি তবুও ঔষধ সে খাবে না, মা. বাপ, স্বামী কারও অনুরোধেই না। এ যে তার মুহূর্ত্তের

অসতর্কতায় ঘটা স্বকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। এমন সময় পিতৃতুল্য স্নেহময় মৌনী বড় ভাসুর এসে বল্লেন—"আর একদিন যখন এতোটুকুটী ছিলে মা, তখন আমি এসে আমার সংসারের মা-লক্ষ্মীটিকে নিয়ে গিয়েছিলাম, আবার আসতে হবে ভাবিনি; জানতো মা আমি মিথ্যে কথা বলিনি।" ওষুধ তাকে খেতেই হ'ল। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের, সত্য-ভাষণের এ অপূর্ব্ব প্রকাশ ভঙ্গী শুধু শরৎ সাহিত্যেই সম্ভব।

তারপর আসে শরৎ সাহিত্যের অপূর্ব্ব অবদান' নরনারীর ভালবাসার মাঝে দেশাচারের, সমাজের ললিত বিধিব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে নরবলির বিরাট আয়োজনের ছবি। এমন প্রাণস্পর্শী করে ব্যথাকে রূপ বোধহয় আর কোন সাহিত্যিকই দিতে পারেন নি। পথ নির্দ্দেশেও নির্দ্দিষ্ট হল, না পথ, শুধু ধূমায়িত হল সংস্কারের অত্যাচারের ব্যথা। হেম ও গুণী। দুটী সবুজ প্রাণে জাগল ভালবাসা, সৃষ্টি হল ব্যথার, সম্ভব হল আত্মাহুতি যজ্ঞের। ব্রাহ্ম গুণী ভালবাসল হেমকে, হেমও ভালবাসল গুণীকে! সমাজ, দেশাচার দিল বাধা, গড়ে তুলল প্রাচীর, জীবনের মাধুর্য্য হল নষ্ট, গতি হল ব্যহত। ভালবাসার আছে কতকগুলো চাওয়া; এই চাওয়া যদি পাওয়ায় না হয় রূপান্তরিত তাহলে জাগে অভিমান, মানুষ ভুলে যায় হিতাহিত জ্ঞান, হারিয়ে ফেলে শান্ত বিচার বুদ্ধি। তাই যে দিন বিধবা হেম গুণীকে কর্ত্তে চাইলে গুরু বরণ সে দিন সে তাকে দিল ফিরিয়ে। এই ফিরিয়ে দেওয়ার মূলে ছিল অভিমান, এ অভিমান ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে সমাজের বিরুদ্ধে সংস্কারের বিরুদ্ধে করে বিপ্লব, কোথাও বা সৃষ্টি করে আত্মাহুতি যজ্ঞের। হেম ভুল বুঝল, সামনে যা পেল তাকেই ধরল আঁকড়ে। প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠান লোকাচারই হল বড়। কিন্তু মনের কোন থেকে পারল না দূরে সরিয়ে দিতে তার ভালবাসার বস্তুটীকে। তাই তাকে ছুটে আসতে হল, সুবকিছুকে উপেক্ষা করে ঐ লোকটীর রোগভোগের কথা শুনে। কিন্তু সে তখন নিসম্বল এ নীলাম্বতলে, শুধু সেবা কর্ত্তে দেওয়ার অধিকারটুকু ছাড়া দেবার কিছু ছিল না তার; নেওয়ারও না।

তারপর দেবদাস, সমাজের প্রতিষ্ঠাপন্ন মহাসম্ভ্রান্ত জমীদারের ছেলে দেবদাস গেল পাঠশালায় পড়তে, পড়ায় তার মন লাগে না, পাখীর ছানা পেরে বেড়ানো আর পুকুরে মাছ ধরা প্রভৃতি তার নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি। এসব কাজে তার যোগ্য সহচরী পাশের বাড়ীর মেয়ে পার্ব্বতী। দুটী কিশোর কিশোরীর সখ্যতা বয়সের সাথে সাথে ভাললাগা থেকে ভালবাসায় হল পরিণত। তাদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করল দেবদাসের পিতার সামাজিক সম্ভ্রম। পার্ব্বতী বিশ্বাস কর্ত্ত দেবদাসের পৌরুষে, তাই সমর্পিতপ্রাণা পার্ব্বতী এগিয়ে গেল এক নিশুতি রাত্রে দেবদাসের কাছে আত্ম নিবেদন কর্ত্তে। দেবদাসের অন্তরে তখন চলেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। বাইরের আত্ম-সম্ভ্রমের সঙ্গে মনের আত্ম-সম্মানের বেধেছে ঠোকাঠুকী। কর্ত্তব্য নির্ণয় কর্ত্তে তার দেরী হল সে পারল না, সেই দিনই তার অন্তরের দেবীকে বরণ কর্ত্তে। অভিমানী পার্ব্বতী তার ন্যায্য চাওয়াকে ব্যর্থ হতে দেখে রুখে উঠল, তীব্র অভিমানে হারিয়ে গেল বিচার বুদ্ধি, ফলে আরম্ভ হল দুটী তরুণ তরুণীর জীবনাহুতি যজ্ঞের। এক বৃদ্ধ ধনীর সাথে হল পার্ব্বতীর বিবাহ, সেখানে পার্ব্বতী শুধু সুগৃহিনী, বুড়ো চক্রবর্ত্তী মশাইও এর বেশী কিছু চাইলেন না। সমাজ নির্ম্মম হাতে ছিঁড়ে দিল দুটী প্রাণীর মিলনের সুত্রকে কিন্তু মুছে দিতে পারল না তার অন্তর থেকে তার দেবদাকে। পারুর জীবনকে আচ্ছন্ন করে রইল দেবদাসের চিন্তা, গঙ্গাজলে ফুটে উঠল প্রিয়তমের ছবি। হয়তো কখনও প্রয়োজনে তার দেবদার কাছ থেকে ডাক্ আসতে পারে সেবা করার, এই আশাটুকু নিয়ে সে রইল বেঁচে; জীবনের চলার পথে ঐ টুকুই তার সম্বল।

ওদিকে দেবদাস শক্তি হারা শিবের মত ধ্বংস লীলায় উঠল মেতে। যে সামাজিক মর্য্যাদা, যে আত্ম-সম্ভ্রমের জন্য সে পার্ব্বতীকে হারিয়েছিল সেই মর্য্যাদকে দিল ধূলোয় মিশিয়ে! সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে করলে প্রতিবাদ তিলে তিলে জীবনাহুতি দিয়ে। দুটী তরুণ-হিয়ার এই যে মর্ম্মন্তুদ পরিণতি এর জন্যে দায়ী কে? এমন আর একটী প্রশ্ন রয়েছে এই যে tragedy এ কার? দেবদাসের না পার্ব্বতীর? যে তার সমস্ত আশা ভরসা নিয়ে চলে গেল পরপারে—তার, না যে রইল এপারের সমস্ত ব্যথা ও বেদনায় মুহ্যমান হয়ে তার? Tragedy পার্ব্বতীর। যে ক্ষীণ আশাটুকু তার জীবনদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছিল দেবদাসের মৃত্যুর সাথে সাথে সে আশাটুকুও হল বিলুপ্ত, রইল শুধু যুগায়ত সঞ্চিত সংস্কারের দেওয়া পুঞ্জীভূত বেদনা। ব্যথা ও বেদনার ছবির মধ্যে দিয়েই শরৎ সাহিত্যের ক্রম বিকাশ।

সাবিত্রী, রমা, গৌরী, পার্ব্বতী ও সন্ধ্যা যে অত্যাচারের প্রতিবাদ কর্ত্তে পারলে না, মুখ বুজে সহ্য করলে পণ না পেয়ে, সরযূ ও বিলাসীও হয়তো তাই কর্ত্ত যদি না পেত চন্দ্রনাথ ও মৃত্যুঞ্জয়ের সাহচর্য্য। সমাজের এইসব নোংরামীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লড়াই কর্ত্তে সাহিত্যাসরে প্রথম আবির্ভূত হল কিরণময়ী তারপর এলো কমল।

নারী চরিত্রের এই Evolution এর দিক অঙ্কন শরৎ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিরণময়ী আর কমলকে বোঝার আগে যদি রমা, গৌরী, পার্ব্বতী, সন্ধ্যা এবং কালীতারাকে না বুঝি তাহলে কিরণময়ী ও কমল আমাদের সংস্কারাচ্ছন্ন মনে ও সংশয়ী চোখে বিকৃত হয়ে দেখা দেবে, ব্যর্থ হয়ে যাবে ওদের সাহিত্যের আসরে আবির্ভাব, ব্যর্থ হবে কথাশিল্পীর প্রাণপাত পরিশ্রম।

কিরণময়ীর স্বামী লোকচক্ষুতেই স্বামী ছিলেন, কিন্তু আসলে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল অধ্যাপক আর শিষ্যার। তার স্বামীকে সে অন্তরের নিভৃত কন্দরে কর্ত্তে ভক্তি কিন্তু পারেনি ভালবাসতে। ভালবাসার জন্য চাই কতকগুলো উপকরণ, চাই কতকগুলো আচার ব্যবহার যেগুলোর একান্ত অভাব ছিল তার স্বামীর মধ্যে। দাম্পত্য জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় দিক তিনি লক্ষ্য করার সুযোগই পাননি তাঁর পঠন ও অধ্যাপনায় মেতে।

ভালবাসার ক্ষুধা, দাম্পত্য জীবনের বুভুক্ষা তাই কিরণময়ীর রয়ে গেল অপূর্ণ। ভালবাসা শুধু দেহগত নয়; সূক্ষ্মে ও স্থূলে মিলে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশে এর সৃষ্টি হয়। মানব-মনের এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি, এক অপূর্ব্ব সম্পদ। শাশুড়ীর অত্যাচারের পীড়নে অনঙ্গ ডাক্তারকে সে আগিয়ে আসতে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তাতে ভালবাসার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হল না তাই তার মগ্নচৈতন্যস্থ ভালবাসার ও ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খা রয়ে গেল অননুভূতপূর্ব্ব পরম লোভনীয়, একটা অনুভূতির মত। সতীশের কাছে শুনল উপেনের দাম্পত্য জীবনের কথা। মনের কোনে নিজের কামনা উঠল জেগে কিন্তু তখনও উপলক্ষ্য হল না কোন ব্যক্তি। স্বামীর শেষাবস্থায় আঁকড়ে ধর্ত্তে গেল মুমূর্ষুকে। ফল হল না—স্বামী তার বাঁচলেন না। তারপর কথাপ্রসঙ্গে সতীশ একদিন বলে বসল—"সংসারের দুটী লোককে আমি দেবতার মত ভক্তি করি, উপেনদাকে আর তোমাকে, একজনকে মনে করলেই আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখি।" কথার প্রতিধ্বনি দোলা দিল হিয়ার কিনারে; সম্ভব হল উত্তাল তরঙ্গমালার। ভালবাসার আকাঙ্খা তীব্র হয়ে দেখা দিল, উপেন হল তার পাত্র। তারপরই সামাজিক অনুশাসনের মূর্ত্ত প্রতীক উপেন তার ভালবাসার বিনিময়ে দিল শুধু উপেক্ষা ও ঘৃণা, অন্তরের প্রস্ফুটিত কুসুম কোরকটীকে কর্লে পদদলিত, ফলে পদাহতা ফনিনীর মত কিরণময়ী উঠল গর্জ্জে, দিবাকরকে উপলক্ষ্য করে উপেনের গৃহের সুখকে দিল নষ্ট করে প্রতিশোধ স্পৃহায়। কিন্তু তাই বলে জলাঞ্জলি দিল না বা অপমান করল না তার নিজের ভালবাসার। দিবাকরকে সে ছোট ভাইয়ের মতই স্নেহ কর্ত্ত অনুকম্পা কর্ত্ত শেষ পর্য্যন্তও। তীব্র অভিমানে ও অপমানে দিবাকর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়ে সে আঘাত কর্ত্তে চাইলে তাকেই যে সংস্কারের মোহে গার্হস্থ্যাশ্রমের গৃহকেই করেছিল বড় এবং গৃহের কাছে মানুষকে করেছিল অস্বীকার, যাকে সে নিজেই ভালবাসত অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে। ভালবাসার উদগ্র কামনাই শেষে যে রমণীর একদিন রূপেরও সীমা ছিল না জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধিরও অন্ত ছিল না, সেই কিরণময়ীর চেতন অবচেতন ও মগ্নচেতন চৈতন্যকে দিল ঘুলিয়ে। নারীর মগ্নচৈতন্যে থাকে নীড় বাঁধার আগ্রহ, থাকে দাম্পত্য জীবনের ক্ষুধা। এ আকাঙ্খার তৃপ্তি ঘটেনি কিরণময়ীর জীবনে তাই উন্মাদ অবস্থায়ও তাকে দেখি গিলটীর গহনা পরে প্রিয়তমের রোগ মুক্তির জন্য কালীঘাটের চরণামৃত ও প্রসাদী নির্ম্মাল্য বয়ে বেড়াতে। অন্তঃশীলার বহিঃপ্রকাশে যে নির্ম্মম সত্যের হল উদঘাটন, যে সমস্যার হল সৃষ্টি তারই সমাধান কর্ত্তে কমলকে আসতে হল সাহিত্যাসরে।

কিরণময়ী যা পারেনি, কমল সেই অসমাপ্ত কাজকে রূপ দিল এক অভিনব পন্থায়। সত্যকে সে জগতের সম্মুখে টেনে আনল তার সুশৃঙ্খল মতবাদের মত দিয়ে। নর ও নারীর জীবন যাত্রার পথে সংযম তার পথচলার লক্ষ্য নয়, পাথেয় মাত্র, এ সত্যকে কমল তার নিজের জীবনে বরণ করে নিল। আজকের সত্যকে যে কালকেও সত্য হতে হবে বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে বিধাতা এমন কোন বিধি দেন নি। এ বিধি দুর্ব্বলের, জীর্ণের, নিমজ্জিত-প্রায় ব্যক্তির, এ আঁকড়ে ধরে থাকার প্রয়াস যৌবনের মানুষের, সবল মানুষের ধর্ম্ম নয়। তাই কমলকে দেখি গতির বেগে আনন্দ পেতে। পেছিয়ে পড়ে থাকতে সে ঘৃণা করে; সংস্কারকে সে তার ত্রি-সীমানায় ঘেঁসতে দেয় না। বুদ্ধি দিয়ে সে বিচার করে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে তাই তার আনন্দও কষ্টি পাথরে-ঘসা সোনার মত; তার মধ্যে খাদ নেই, খেদও নেই।

সত্য প্রচার শরৎ সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সত্যকে অকুণ্ঠভাবে প্রচার করার জন্য বহু নিন্দা, বহু গালিগালাজ তাকে খেতে হয়েছে, তবু তাঁর লেখনীকে কুণ্ঠিত করা যায় নি। বর্ত্তমান সমাজকে, সমাজের সংস্কারকে তিনি বারে বারে করেছেন আঘাত, কিন্তু অকারণে নয়। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন তাই মানুষের জন্য গড়া সমাজ, বিধি, মানুষের ওপরই অত্যাচার

কর্ব্বে এ তিনি সহ্য কর্ত্তে পারতেন না। সমাজের শাসনদণ্ড ধনী পুরুষের হাতে, সে তার ইচ্ছামত নারীকে করেছে পতিতা, হয়তো সে কারণে তারও সঙ্গে সঙ্গে হওয়া উচিত ছিল সমাজ পতিত। সতীশ উপেনের স্নেহের পাত্র অথচ সে যাকে ভালবাসে সেই সাবিত্রীকে দেখেই উপেন নাক সিঁটকে ফিরিয়ে দিল সুরবালা ও দিবাকরকে এবং নিজেও গেল নেমে সতীশের বাসা বাড়ীর সিঁড়ি থেকে। হিরু নাপিত বা তার মনিব কোনদিনই হল না সমাজচ্যুত অথচ কালীতারাকে ভোগ কর্ত্তে হলো সারাজীবন পরের নাচাশয়তার জন্য। গোলক জমীদার জ্ঞানদার কর্ল্লে সর্ব্বনাশ অথচ সেই হল সমাজপতি আর তার পাপের বোঝাকে বহন কর্ত্তে জ্ঞানদাকে যেতে হল নির্ব্বাসনে। এই সাবিত্রীর মধ্যে কিসের দৈন্য আছে যার জন্য সে সমাজের কাছে পতিতা, কোন অপরাধে জ্ঞানদা হল পতিতা, কি পাপ করেছিল কালীতারা যার জন্য সমাজ তাকে পতিতা করেছে, শরৎ সাহিত্যে আজ এই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে প্রত্যেক শিক্ষাভিমানীর হৃদয়ের দুয়ারে। যাঁরা শরৎ সাহিত্যকে বিলাসের সাহিত্য বলেন তাঁরা কি এ প্রশ্নের সমাধান করেছেন কোন দিন? চন্দ্রমুখীর মধ্যেও কি ছিল না ভালবাসা, ছিল না নারীর নারী-সুলভ কোমল বৃত্তি ও অনুভূতি? রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও কি ছিল না মাতৃত্ব, পরদুঃখ কাতরতা, সহৃদয়তা ভালবাসা ও সংযম? পতিতা নারীর মধ্যেও মহার্ঘ্য-মণির মত উজ্জ্বল রত্ন থাকে, তারাও মানুষ, তারাও গৃহস্থের কুলবধূদের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, একথা শরৎবাবু তাঁর আজীবন সাধনার মধ্য দিয়ে প্রচার করেছেন। পৃথিবীর সাহিত্যে ঐ বৈশিষ্ট্যর সম্মান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। বিরাজ-বৌ এর মত সতি-শিরোমনিকেও মুহূর্ত্তের ভ্রমে পঙ্কিল মাখতে হয়েছে। তাই বলে মুহূর্ত্তের ভ্রমকে তার স্বরূপ বলা চলে না।

শরৎ সাহিত্যের আর একটী অভিনয়-রূপ তাঁর গৃহদাহ, sudden psychology র ওপরে বইখানা লেখা, সুরেশের চরিত্র-সৃষ্টি সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অভিনয় সৃষ্টি। উদার আত্মভোলা এই লোকটী ঠিক সাধারণের মতই দোষেগুণে ভরা মানুষ। প্রচুর অর্থ ও বিত্ত অথচ অহঙ্কার নেই একটুও। বন্ধুপ্রীতি; পরের দুঃখে সব ভুলে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়া, লক্ষ বর্ষ আগেকার আদিম পুরুষের মত অন্তরের প্রিয় ললনাকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া এবং, ভগবানে অচল অটল অবিশ্বাস সুরেশের চরিত্রকে করেছে সুন্দর সহজ সরল। এত বড় বিশ্বাসী নাস্তিকের সন্ধান বাংলা সাহিত্যে আর একটীও মেলে না যে মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ভগবানকে ডাকতে অনুরোধ কর্লে মুখ বিকৃত করে বলে—ও "আমার ভাল লাগে না।" ভগবানকে ডাকে মানুষ তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত-গুলিতে অথচ কত শক্তি থাকলে ও কত নিষ্কলুষ হলে ভগবানকে মানুষ এম্নি করে উপেক্ষা কর্ত্তে পারে বলা শক্ত।

"জন ক্রিষ্টোফার" লিখে ওদেশের লোক নোবেল প্রাইজ পেতে পারে অথচ শ্রীকান্ত লিখে এ হতভাগ্য দেশের লেখক পাঠকদের কাছ থেকে একটু ধৈর্য্যের আশাও কর্ত্তে পারেন না সমস্ত বইখানা পড়ার জন্য। শ্রীকান্তকে নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক জায়গায় হয়েছে কিন্তু এর সম্বন্ধে একটী কথা কেউ কোনদিন কোথাও বলেননি। সেইটীই আমার এখানকার শেষ বক্তব্য।

শ্রীকান্ত বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। তার সংসারে নেই কোন আকর্ষণ, সমাজের ধার ধারে না, কোন কর্ত্তব্যেরও ভার তাকে বইতে হয় না। জীবন প্রভাতে একটী মেয়েকে সে ভালবাসল নাম তার রাজলক্ষ্মী। ঘটনা বৈচিত্রে রাজলক্ষ্মী করল কুলত্যাগ সমাজের ভয় তারও রইল না, সমস্ত ফাঁড়াকে সে কাটিয়ে উঠল, কিন্তু কাটাতে পারল না তার যুগায়ত সংস্কার। বহু বছর অদর্শনের পর হঠাৎ পরস্পরের দেখা হয়ে গেল। কৈশোরে উভয়ে উভয়কে ভালবাসত সে স্মৃতি উঠল জেগে, নুতন করে আবার আকাঙ্খা জাগল মিলনের। নানান্ভাবে, নানান্ অভিব্যক্তি প্রকাশ হল তাদের অন্তরের বাসনা কিন্তু মিলন হলনা তাদের দুজনের। মুক্ত পুরুষ শ্রীকান্তও পারল না সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে অথচ ভালবাসাকে পাপও বলতে পারল না। ভূতের ভয় না থাকলেই মানুষের মন থেকে সংস্কারকে দূর করা যায় না; তার জন্য প্রয়োজন যে সাধনার সে সাধনা আর যারই থাকুক শ্রীকান্ত বা রাজলক্ষ্মীর ছিল না, তা বলে শ্রীকান্ত জিতেন্দ্রিয় ছিল না। মানব মনের গোপন তথ্যটুকু এমন করে পরিবেশন কর্ত্তে পারা বড় সহজসাধ্য নয়।

অনেকে বলেন শরৎ সাহিত্য চিরন্তন সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না, বিশ্বসাহিত্যে চিরন্তন সাহিত্য বলে কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই; তবে এটুকু বলতে পারি কালের মাপ কাঠিতে আনন্দ উৎসের বিচার চলে না, এবং তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, "টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তীও লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।"*

---

* কৃষ্ণনগর কলেজের পাঠ-চক্রের সভায় লেখিকা কর্ত্তৃক পঠিত।

শ্রীদুর্ব্বাসা
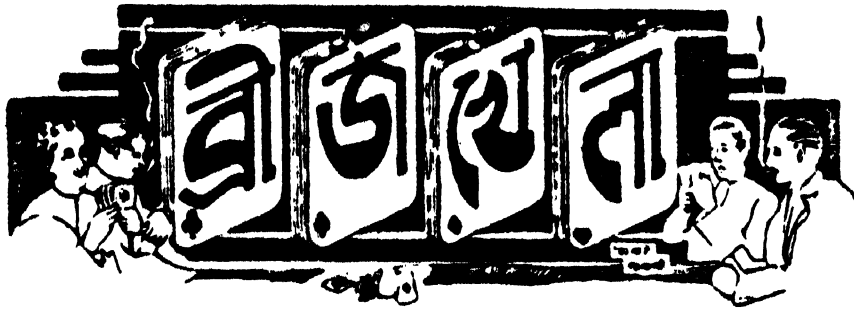
ডাকের কয়েকটি সমস্যা ঃ—

কণ্ট্রাক্ট ব্রীজে ডাক দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত। ডাক দেওয়ার উপর খেলার জয়-পরাজয় অনেকাংশেই নির্ভর করে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে নিম্নে আমরা ডাকের কয়েকটি সমস্যা প্রকাশ করলাম।

(১) আপনি দক্ষিণে বসেছেন এবং আপনার হাতে আছে,— ইস্কাবন—সাহেব গোলাম, দশ, সাতা, পঞ্জা, দুরি; হরতন—তিরি; রুহিতন—দশ, নয়, দুরি; চিড়িতন—টেক্কা, সাতা, ছক্কা।

ডাক হয়েছে,

'উ'	'দ'
একটি রুহিতন	একটি ইস্কাবন
একটি ফেরাই	?

আপনি এখন কি ডাকবেন?

আপনার ডাকা উচিত তিনটী ইস্কাবন। আপনার খেঁড়ীর প্রারম্ভিক ডাকের পর যখন তিনি একটি ফেরাইএ ডাক দিয়েছেন, তখনই বোঝা যাচ্ছে হাতটি অন্ততঃ কতকাংশে মিলেছে; সুতরাং দুইটি ইস্কাবনে ডাক দেওয়ার পক্ষে আপনার হাত বেশ শক্তিশালী। যেহেতু আপনার হাতে ভাল ছয় তাসওয়ালা রঙ বর্ত্তমান, তার উপর একটি টেক্কা রয়েছে, আবার যখন খেঁড়ীর প্রথম রঙের সঙ্গে মিলেছে, তখন মোটেই তিনটির ডাক দিতে ভাববার দরকার নেই।

(২) ডাক হয়েছে,

'উ'	'দ'
দুইটি ইস্কাবন	?

আপনি 'দ'; আপনার হাতে আছে ইস্কাবন—গোলাম, আটা, তিরি; হরতন—সাহেব, গোলাম, পঞ্জা, তিরি; রুহিতন—বিবি, দশ, ছয়; চিড়িতন—আটা, পঞ্জা।

আপনি এখন কি ডাকবেন?

আপনার পক্ষে তিনটি হরতনেই ডাক দেওয়া উচিত। আপনার হাতে ১+ অনারের পিট রয়েছে, তার উপর পাঁচ তাসওয়ালা মুখ্য রঙ বর্ত্তমান, সুতরাং আপনি অনায়াসে ডাকতে পারেন।

(৩) ডাক হয়েছে,

'উ'	'দ'
একটি হরতন	দুইটি চিড়িতন
দুইটি ইস্কাবন	?

আপনি দক্ষিণে বসেছেন, আর আপনার হাতে আছে ইস্কাবন—বিবি, পঞ্জা, চৌকা; হরতন—ছক্কা, তিরি; রুহিতন-ছক্কা; চিড়িতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, আটা, পঞ্জা, তিরি। আপনি এখন কি ডাক দেবেন?

চারটি চিড়িতনে ডাক দেওয়াই সঙ্গত হবে। এক টেক্কা ছাড়া আপনার সাত তাস সমেত নিরেট রঙ হাতে রয়েছে, আর অন্য দুটি রঙে আপনার খেঁড়ী ডাক দিয়ে গেছেন, সুতরাং অনারের পিট বিনাও আপনি ডাক দিয়ে যেতে পারেন। তিনটি চিড়িতনে ডাক দিলে 'Sign-off' bid বা নিষেধাত্মক ডাকের মত শোনাবে, এবং যেহেতু আপনার হাতে রুহিতনে মাত্র একক তাস তিনটি ফেরাইএর ডাক চেপে দিয়ে গেলে ক্ষতি হবে না। এদিকে পাঁচটি চিড়িতনের ডাকে লাফ দিয়ে গেলে শ্লাম আবাহনকারী ডাক হয়ে যাবে। আপনার খেঁড়ী শক্তিশালী রঙ প্রদর্শন করলে আপনি গেম করে নিতে পারেন।

(৪) ডাক হয়েছে,

'উ'	'দ'
দুইটি ফেরাই	?

আপনি দক্ষিণে বসেছেন। আপনার হাতে আছে, ইস্কাবন—বিবি, পাঞ্জা, চৌকা; হরতন তিরি, দুরি; রুহিতন—বিবি, গোলাম, ছক্কা চৌকা, দুরি; চিড়িতন—নয়, সাতা, চৌকা। এখন আপনি ডাকবেন কি না?

তিনটি ফেরাইএ আপনার ডাক দেওয়া উচিত। খেঁড়ীর প্রারম্ভিক দুইটি ফেরাই ডাকের প্রত্যুত্তরে এই হাতে পাশ দেওয়া চলে না। এতদ্ব্যতীত পাঁচ তাস সমেত গৌণ রঙেও ডাকা নিরর্থক, কারণ তাস

বিভাগের খ্যাঁজ সুসম এবং শ্লামের আশাও সুদূর পরাহত।

টেলিগ্রাফ ইনস্টিট্যুটের প্রতিযোগিতাঃ—বিগত ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই অক্টোবর এই চারদিন ব্যাপী ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত টেলিগ্রাফ ইনষ্টিট্যুটের প্রতিযোগিতাগুলি পরিসমাপ্তি লাভ করে। এবারে এদের উদ্যোগে যথারীতি অকসন সিঙ্গলস্ প্রতিযোগিতা ও ডুপ্লিকেট কন্ট্রাক্ট ব্রীজের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি-

টেলিগ্রাফ ইনষ্টিট্যুটের সম্পাদক
শ্রীঅনিল মিত্র

যোগিতাগুলির শেষাংশের খেলা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয় এবং ক্লাবের কর্ম্মকর্তাগণের সুপরিচালনায় প্রতিযোগিতাগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ফাইন্যালের কয়দিন কর্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়নে ও তদ্বিরে অতিথিদিগের ভূরিভোজনের প্রতিযোগিতাও নেহাৎ সাধারণ স্তরের হয় নাই। ক্লাবের সেক্রেটারী করিৎকর্ম্মা অনিল মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিশেষ করে হরেন ঘোষ ও কৃষ্ণ সেনের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর
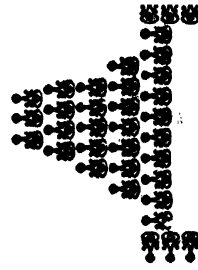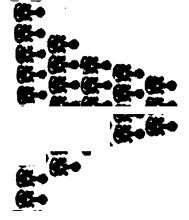
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মুখদিয়ে কোন কথাই বেরুবে না—শত-চেষ্টা করলেও। তাতে আমারও অবস্থা দাঁড়াবে সঙীন, আর আপনারাও নিরাশ হয়ে করবেন অশ্রদ্ধা।

—কি যে বলেন! যার লেখার ওপর আমাদের এতখানি শ্রদ্ধা—সেই মানুষটী-কেই করবো অশ্রদ্ধা! তাঁকে বাড়ী থেকে জোর করে নিয়ে গিয়ে!!

—তাই হয় সাধারণতঃ। মানুষ যখন মনে মনে গ'ড়ে চলে স্বপ্নসৌধ তখন খেয়াল রাখে না তাদের কল্পনাগুলো কতদূর। তারপর বাস্তবে যখন দেখে—যে বাস্তব কল্পনার অর্দ্ধেক রাস্তাও পৌঁছাতে পারলো না, তখন তাদের মন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণা, মনে মনে জাগে তখন অশ্রদ্ধার ভাব। তাতে মানুষের কোন দোষই নেই। স্বভাবই মানুষের এই রকম। তাই আমাকে না টানতেই বলি আপনাদের। আপনার মিলনীর সভ্যবৃন্দ হয়তো বা নিরাশ হবেন শেষ পর্য্যন্ত।

নিরাশ কক্ষোণই হবে না কেউ। আপনার উপস্থিতিই আশা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট। কুমারী মীরা দেবী কর'বেন আবৃত্তি, আপনারই কবিতা—'সুরদাস'। আপনি উপস্থিত থাকলে উনি পাবেন যথেষ্ট প্রেরণা। শিক্ষিতা মেয়ে, বলেনও অতি-চমৎকার। আপনারই লেখা অপরের মুখে কেমন রূপ পায় তাতো আপনার দেখা উচিত। তা হবে না চপলবাবু, নিয়ে আপনাকে যাবোই···অন্ততঃ মীরা দেবীর আগ্রহকে সার্থকতা দেবার জন্যে। তাহলে উঠি—আমরা সন্ধ্যার সময় এসে আপনাকে নিয়ে যাবো। দয়া করে থাকবেন বাড়ী। নিরাশ হয়ে ফিরতে না হয়।

এমন সময় চাকরটা এসে খবর দিলে—মা ডাকছেন। চপল 'এক্ষুনি আসছি' বলে উঠে গেল। ওঁরা রইলেন বসে।

ওর মা বল্লেন—হ্যাঁরে চপল—তোর কি কাণ্ডজ্ঞান কোন কালেই হবে না?

—বাঃ! আমি আবার কি করলাম!

—কিছু করনা বলেই তো যত বিপদ। কিছু করতে শিখলে তো বাঁচতাম।

চপল ভেবে পেলে না ও কি অন্যায় করে বসলো ইতিমধ্যে! মাকে বল্‌লে—অন্যায় করেছি কি কিছু?

—নিশ্চয়ই করেছিস্। মান সম্মান ডোবাবি নাকি তুই আমাদের?

ও হাঁ করে মার পানে চেয়ে বল্‌লে—আমি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তুই। মুখ্যু কোথাকার, এতগুলো ভদ্রলোকের ছেলে যে সেই থেকে বসে আছেন তোর বাড়ীতে—তা তোর খেয়ালই নেই?

ও হতভম্ব হয়ে বললে—বারে আমি কি করবো তার? ওঁরা এলেন কেন? যাচ্ছি এখুনি—চলে যেতে বলছি।

ওর মা চোখদুটো বিস্তৃত করে বল্‌লেন—দেখ ছেলের বুদ্ধি! আমি বুঝি ওঁদের তাড়িয়ে দিতে বল্লাম তোকে?

—তবে কি বলছো?

—বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। কিছু যদি বুদ্ধি থাকে তোর। গাধা কোথাকার।

ও একবার নিজের দিকে তাকিয়ে নিয়ে নিরতিশয় বিস্ময়ে মায়ের মুখের পানে চেয়ে রইলো।

ওর মা হেসে উঠে বল্লেন—তুই একটা প্রকাণ্ড গাধা। মানুষের মত দেহ হলে কি হবে, বুদ্ধি গাধার চেয়ে নিকৃষ্ট। একটা লেজ যে ভগবান কেন তোকে দেননি, ভেবেই পাই না।

চপল আরো চিন্তিত হয়ে বল্লে—তাহলে ল্যাজ আর কাপড় একসঙ্গে সামলাতাম কি করে?

—অদৃশ্য ল্যাজ তোর নিশ্চয়ই একটা আছে, লোকে দেখতে পায় না, তা নইলে এতগুলো ছেলে সেই কখন থেকে বসে আছে আর তুই একটু জল খাবারও তাদের জন্যে এনে দিলি না?

—ও এতক্ষণে যেন বাঁচলো। বল্লে—বেশতো আমি কি জানি তার?

ওর মা বল্লেন—তা জানবে কেন—খালি জান চা আর কাগজ কলম। এখন যা দেখি ওঁরা বসে আছেন একলা। উঠতে দিবিনা এক্ষুণি, বুঝলি? আমি জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ক'জন আছে বল দেখি?

ও হাতগুণে বললে—পাঁচ জন আর একজন ছয়।

—আর একজন কে? পেটুক মহারাজ তুমি?

ও ততক্ষণে সরে পড়েছে। ঘরে ঢুকে ও সবাইএর দিকে চেয়ে বললে—দেখুন, আপনাদের এক্ষুণি উঠে যেতে মা মানা করলেন।

ওঁরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠলেন—কেন? বড় দেরী হয়ে গ্যাছে যে, মাকে বলবেন আর একদিন আসবো। আর আপনার সাথে দেখা করতে তো আসতেই হবে। বলে ওরা উঠতে চাইলেন।

ও মুস্কিলে পড়লো। বল্লে—তাহলে একটু দাঁড়ান মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

ওঁরা এই অদ্ভুত লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

• • •

ইতিমধ্যে চা আর জলখাবার নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকলো। পাঁচটা প্লেট মার্বেল টপ গোল টেবিলটায় সাজিয়ে দিয়ে বল্লে আপনারা খান ততক্ষণ, আমি একটু আসছি এক্ষুণি।

ও সটান মার কাছে গিয়ে হাজির হলো। মার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লে—কই?

—কি কইরে! সবই তো পাঠিয়ে দিয়েছি।—

—ঘোড়ার ডিম দিয়েছ। আমার প্লেট কই?

—ও রাক্কুসে ছেলে; তাই এসেছিস্ ছুটে?—

—বারে! সেই সকাল থেকে আমি খেয়েছি নাকি কিছু?

—খাসনি? চা বিস্কুট কে খেলে?

—সেত কখন হজম হয়ে গ্যাছে।

—নে, নে, পেটুক কোথাকার, প্লেটটা নিয়ে ঐ ঘরে গিয়েই খেগে যা।

ও চলে আসে ওর ঘরে। ওদের খাওয়া তখন হয়ে গ্যাছে। ওকে দেখেই ওরা উঠে দাঁড়ালেন। নমস্কার করে বল্লেন—আজ আসি তাহলে। সন্ধ্যায় কিন্তু থাকা চাইই।

—আচ্ছা বলে চপল ওদের এগিয়ে দিতে চল্লো।

—সন্ধ্যায় আসবো কিন্তু ঠিকই—

—আসতে আপনাদের হবে না, আমি নিজেই যাবো। কার্ডে ঠিকানাটা লেখা আছে তো?

—'হ্যাঁ আছে। তাহলে, আসবেন নিশ্চয়ই' বলে ওরা চলে গেলেন।

— চতুর্থ পর্য্যায়—

মৃণালবাবুরা চলে যেতে ও ঘরে ফিরে বিছানায় উঠে একটু পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। ওর চোখের সম্মুখে তখন ভাসছে মৃণালবাবুর চেহারাটা। মোটাসোটা চেহারা স্বাস্থ্যের আধিক্যের পরিচায়ক। রঙটা বিশেষ ফরসা নয়। মেজে ঘষে পালিশ করা হয়েছে। অদ্ভুত জমকালো সাজ পোষাক। ফিন্‌ফিনে জরি পেড়ে ধুতির ওপর বত্তুয়া ককের সিল্কের সার্ট। রঙীন জুতো মেসাই কুঁচো চামড়ার জাল বোনা। হাতে গোটা তিনেক আংটী, সবকটাই বোধহয় হীরে, মুক্তোর হবে। নাকের ওপর রিমলেশ্ চশমা। ছোট্ট সোণার হাত ঘড়িটা বাঁকা করে হাতে বাঁধা। চলেন ও বলেন বেঁকে বেঁকে। ওর ভারী মজা লাগে এই অদ্ভুত লোকগুলোকে দেখতে। ও ভাবে—কি জানি হয়তো বা প্রকাণ্ড একজন কেউ কেটা হবে। বাইরে থেকে তো অন্ততঃ তাই হওয়া উচিত বলে মনে হয়। হয়তো বা কোন কলেজের নতুন প্রফেসর। বিজ্ঞের জাহাজ। মরুকগে যাক—যে আছে বড় লোক সেই আছে ওর কি? ও পাশ ফিরে শোয়।

আবার ভাবনা আসে চোরা জল স্রোতের মত। তাইতো কি বলা যাবে ওদের ওখানে গিয়ে। নাঃ মনের স্বাস্থ্য বা স্বাচ্ছন্দ্য করলো ওরা নষ্ট। আবার ভাবে কি বলতে হবে বা পড়তে হবে না, লিখে নিয়ে গিয়ে পড়তে ও পারবে না। ও অভ্যাস যেন বিশ্রী অশোভন।

বড় বড় অনেক রথীই করে থাকেন, তবুও ও নিজে তা পারবে না। সাহিত্যিকের মন সর্ব্বদা বহমান ও খেয়ালানুসারী। কাগজের পাতায় তাকে বিশেষ ভাবে বেঁধে নিয়ে যাওয়াতে ঘৃণা জাগে। চপল ঠিক করে ফেলে—ওর মনে যা আসবে ও তাই বলবে। সীমানির্দ্দিষ্ট ভাবকে ও সহ্য করতে পারবে না—না কোন মতেই না। কিন্তু কি সে বলবে? সাধারণ লোকে যে ভাবে বক্তৃতা দিয়ে যায়?—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবৃন্দ···? এঃ ওর নাক সিঁটকে ওঠে। যাক্ সেখানে গিয়েই ঠিক করে ফেলা যাবে। আগে থাকতে ভেবে, অনর্থক মনকে চটকে শক্ত করা।

চপল উঠে দাঁড়ায়। নিঃশেষিত পেয়ালা-গুলির দিকে আর একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফেলে, একটা চুরুট ধরিয়ে নেয়। নাঃ সিগারেটের চেয়ে চুরুটের আভিজাত্য আছে, মাদকতাও বেশী। বনেদী বংশের মেয়ের মত একটা বিশেষত্ব। লোককে ফিরে তাকাতেই হয়। হাল্কা হাওয়ার হাল্কা প্রজাপতি নয়। অল্প টানেই পাখা পড়ে না খসে, সৌন্দর্য্য যায় না মিলিয়ে। ময়ূরের মিহি রব নেই তবু তার দিকে লোকে চায়। পাখা তার খসিয়ে দেয় নতুন করে গজাবে বলে। আবার নতুন করে বাড়ে তার মর্য্যাদা। তাইতো চপল মাঝে মাঝে ধরায় চুরুট সিগারেটের বদলে—ক্ষণস্থায়ী যার মোহ। বয়স তার খুব বেশী নয়—তাই যেন কেমন একটু অশোভন দেখায়—বাইশ বছরের কবির বত্রিশ বছরের প্রিয়ার মত।

ভাবতে ভাবতে চপল রাস্তায় নেমে আসে। অগণিত জনস্রোত। ও যেন দিশা হারিয়ে ফেলে। ওর প্রাণের মধ্যে এক নতুন আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—স্থির জল থেকে বহমান জলে এসে মাছের যা আনন্দ। ও যেন মুক্তি পেয়েছে বদ্ধ কারা কক্ষ থেকে। বাস্তবিক বাইরে কত বিচিত্র জীবন, অভিনব চঞ্চলতা ও চোখ মেলে চায়নি। সুন্দর পৃথিবী ওর কাছে আরো সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে আজ। রহস্য এর অনেক চির-যৌবনা শ্যামা ধরণী। অনন্তকাল ধরে কত বিচিত্র খেলাই এর বুকের ওপর খেলা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় ও শুধু ঘুরে বেড়ায় আপন খেয়ালের বশে। মন ওর যেন আজ অনেকদিন বাদে পেয়েছে ছাড়া।

চপল ফিরে আসে ওর নিজের ঘরটাতে—অনেকখানি ঘুরে। বেলা তখন বেজে গেছে প্রায় একটা। ঘরে ঢুকে ও ডেক্ চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে।

পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মা ঘরে ঢুকে দেখেন ও চোখ বুজে পড়ে আছে। খাওয়া দাওয়া এখনও হয়নি, স্নানও নয়। কাছে এসে বলেন হতভাগা ছেলে এতক্ষণ ছিলি কোথায়? খেতে দেতে হবে? না তাও গেছ ভুলে?

ও ধড়মড় করে উঠে বসে। বাস্তবিক এখনও ওর খাওয়া হয়নি, স্নানও নয়। মাও হয়তো বসে আছেন না খেয়ে, ওর প্রতীক্ষায়। অপরাধীর মত ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। ওর মা জিজ্ঞাসা করেন—কোথায় গিয়েছিলি রে?

—এই একটু ঘুরে এলাম মা—

—এই দুপুরে আবার কি দরকার পড়েছিল শুনি—

—এমনিই গেলুম, মা। বড় ভালো লাগছিল বেড়াতে—

—শোন কথা একবার। সময় আর উনি পেলেন না বেড়াতে বেরুলেন দুপুর বেলা। তোর কি সবই উল্টো?

ও অপরাধীর মত বলে—আর কক্ষনো যাবো না কেমন?

দুপুরে কি মানুষ বেড়ায় রে? বলি, সকালে উঠে একটু বেড়িয়ে আয়, তাতো শুনবি না। দুপুর রোদ্দুরে মুখখানা কি হয়েছে একবার দেখতো আয়নায়। নে—শীগ্‌গির স্নান করে নিয়ে, দুটো খেয়ে নে।

ও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। স্নান সেরে নিয়ে ও রান্না ঘরে চলে এসে বল্লে—ভাত দিয়েছো?

ওর মা ওর দিকে তাকিয়ে বলেন—গায়ের জলটা একটু মুছতেও তো হয় বাপু। ওই রকম জলশুদ্ধ থাকলে, যদি শেষকালে অসুখ করে তো দেখবে কে? আমি তো বাপু একলা মানুষ। বৌদি তোমার বাপের বাড়ী আদর খাচ্ছেন। —তারপর উঠে এসে নিজের আঁচল দিয়েই ওর গা মাথা মুছিয়ে দেন। ওকে খেতে দিয়ে নিজে বসেন পাশে।

চপল জিজ্ঞাসা করে—তোমার খাওয়া হয়ে গ্যাছে? ওর মা বলেন—শোন কথা, উনি রইলেন বাইরে আর আমি নিলাম খেয়ে! তাকি খেতে আছেরে। ছেলের খাওয়া না হলে মার কি খেতে মন চায়, না খিদেই পায়? ও অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বলে—আমি যদি আজ না ফিরতাম, তাহলেও খেতে না?

—তাকি হয়রে পাগলা ছেলে। তুই বাইরে থাকলে অনাহারে, আমি কি খেতে বসতে পারি! খাওয়ার চাইতে খাওয়ানোতে মেয়েদের আনন্দ বেশী সে কথা তুই জানিস না? বাইরে কোথায় কি ভাবে তুই রইলি তাই ভেবেই কুল পেতুম না, আবার খাওয়া।

আচ্ছা আমি যদি একেবারেই না আসতাম আর?

ও কথা বলতে নেই বাবা, আমার মনে তাতে ব্যথা লাগে।

চপল ভারী লজ্জায় পরে। হাতের ভাত ওর মুখে ওঠে না। ও যেন ভারী অন্যায় করে ফেলেছে।

ওর মা ওর অবস্থা উপলব্ধি করে কথার মোড় ফেরাবার জন্য বলেন—যাক্ ও কথা। খাওয়া বন্ধ করলি কেন? তুই দিন দিন আরো ছেলেমানুষ হয়ে পড়ছিস্ চপল। খেতে বসলে হা করে ভাবতে থাকবি. চান করতে বললে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বি। এমনি করে ক'দিন চলবে বল দেখি? কাজ কর্ম্ম একটা কিছু করবি না চিরকালটা দাদার ঘাড় দিয়েই চালাবি? সত্যি বলছি চপল, একটা কাজ কর্ম্ম জোগাড় করবার চেষ্টা কর। এমনি করে আর কত দিন চলবে? কলসীর জল গড়াতে গড়াতে তাও ফুরিয়ে যায়। আজ যদি তোর দাদার চাকরী যায় তাহলে কি করে চলবে বল দেখি? ব্যাঙ্কের যা সামান্য টাকা আছে তাই ভেঙে খাবি তো?

চপল স্থির হয়ে শোনে। সত্যিই তো, এ ও কি করছে? সৎনাম হয়তো যথেষ্ট পেতে পারে। অভ্যর্থনা হয়তো ওকে অনেকেই করবে কিন্তু তা দিয়ে কি সংসার চলে? তা দিয়ে কি মার দুঃখ ঘোচান যায়? ও ভাবে, ভেবে কূল কিনারা পায় না। ভাবতেই ও শুধু শিখেছে আর কিছুই শেখেনি। আজকাল মাসিক কাগজে লেখা দিয়ে কিছু কিছু ও পায়, কিন্তু তাতে ওর নিজের খরচই হয়তো চলে না। দাদার আশ্রয়ে ও নিশ্চিন্তে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে, কোন ভাবনাই নেই। কিন্তু সত্যিই তো মার কথা—এমনি করে চিরদিন কি চলবে? ওর গত বছরের উপন্যাসটা পাবলিসারদের দিয়ে যা পেয়েছিল তাতে করে ও কিনেছে চাড্ডি বই । এমন কিই বা টাকা, বইটার সব সত্ত্ব পাবলিশাররাই দিয়েছে মেরে। ও চাইতে পারে না, দয়া করে যা পাঠায় তাই যথা লাভ বলে মেনে নেয়। কিন্তু টাকাগুলো দিয়ে বই না কিনে আর শেলফটা না কিনে যদি টাকাটা ওর মার হাতে দিত তাহলে মা কত খুসীই না হতো—ও ভাবে। প্রথম বইটা ওর কাটতি হয়নি বেশী নতুন লেখক বলে। দ্বিতীয় বইটাও বিশেষ কিছু লাভ দিলে না। একটু যা কিছু পেয়েছে ও তৃতীয় বইটাতে কিন্তু এত সংস্করণ বইটার হলো আর টাকা দেবার বেলা ওরা এত মোলায়েম করে কথা বলে কেন ও ভেবেই পায় না। যাক এই বইটার কপি-রাইট ও নিজেই রাখবে। মাকে কিছু টাকা এবার দেবেই ও ঠিক করে রাখে।

না খেয়েই ও উঠে পড়ে। ওর মা বলেন—কিরে উঠে পড়লি যে! দুধটা খাবে কে? কাজের কথা বলুম আর ছেলের খাওয়া হলো না। তোকে নিয়ে আর পারা যায় না বাবা। গরীবের ঘরে কেন যে জন্মেছিলি তাই ভেবে পাই না। বড়লোকের ঘরে জন্মালে সারা দেশের লোক হয়তো তোকে চিনতো। কি করবো বল, সাধে কি আর ওই সব কথা তোকে বলি, না বলতে ইচ্ছে করে? গরীবের কিছুই সহ্য হয় না চপল। তা নইলে তোকে বলি কাজের চেষ্টা দেখতে। লক্ষী-বাবা—ওসব পরে ভাবিস 'খন। এখন পেটটা ভরে দুটো খেয়ে নে, দেখে স্বস্তি পাই। তোর মত ছেলেকে চাকরী করতে পাঠিয়েও কি আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো? কোথায় কোনদিন কি বিপদ বাধিয়ে আসবি তাই ভেবে পাই না। রাস্তায় চলতে চলতে হয়তো ট্রামের নীচেই কোন দিন পড়বি তার ঠিক নেই। ওকি চলে যাচ্ছিস যে? দুধটাই না হয় শুধু খেয়ে যা।

—'পেটে জায়গা থাকলে তো খাবো মা এই ছাখনা পেট'—বলে ও জামা তুলে ধরে।

ওর মা বলেন—তা হ'ক দুধটুকু খুব হবে। না হয় একটু সন্দেশ দিচ্ছি তাহলে তো হবে?

(ক্রমশঃ)
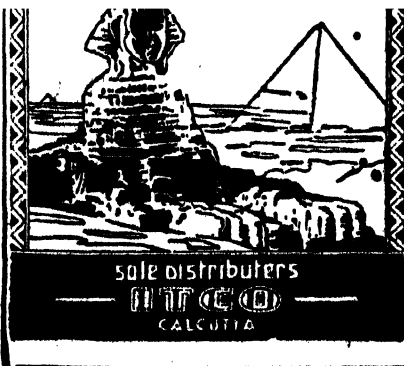
প্রভাত সিনেমা

বাগবান

ছায়াচিত্র জগতে বিমলা কুমারর নাম খুবই সু-পরিচিত। এ পর্য্যন্ত যে কয়খানা ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন তার প্রত্যেক খানাই দর্শকবৃন্দ আনন্দ সহকারে গ্রহন করেছে। এই সুন্দরী অভিনেত্রীর সূক্ষ্ম অভিনয় নৈপুণ্য চিত্রামোদী মাত্রকেই মুগ্ধ করে। "কিন্তু শ্রীমতীর অভিনয় নৈপুণ্যের চরম বিকাশ লাভ করেছে পরিচালক কার্দ্দারের অতুলনীয় ছবি "বাগবানে"। যাঁরা এ পর্য্যন্ত ছবিখানা দেখেছেন সকলেই একথা স্বীকার কর্ব্বেন।

জেনারেল ফিল্মের অমর অবদান "বাগবানে" বিমলাকুমারী নায়িকা দুর্গার অংশে অবতীর্ণা হয়েছেন। নায়কের ভূমিকায় নজ্রেকার অভিনয় করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় সিতারা, ইয়াসমিন আসরফখান, নাজির প্রভৃতি রয়েছে।

উত্তর ভারতের জনপ্রিয় লেখক বেগম আনসারী বাগবানের গল্পাংশ লিখেছেন। হিন্দু সমাজের বহু সমস্যার উল্লেখ এই ছবিতে করা হয়েছে।

জেলারের একমাত্র মেয়ে দুর্গা বাল-বিধবা। কিন্তু এ সংবাদ দুর্গার কাছে অজ্ঞাত রাখা হয়। স্বরূপ জেলের কয়েদী। জেলারের বাগানে, কাজ করার ভার স্বরূপেরই উপর দেওয়া হয়। দুর্গা স্বরূপকে ভালবাসে, স্বরূপও দুর্গাকে ভালবাসে। কিন্তু সমাজের শাসন তাদের এ মিলনে হল প্রধান অন্তরায়। কিন্তু ভাগ্যসূত্র তাদের একই সূত্রে গেঁথে দেয়।

ছবিখানার গোড়াথেকে শেষ পর্য্যন্ত tempo মোটেই ব্যহত হয়নি। এবং খুবই সহজ হিন্দি থাকাতে বাঙ্গালী দর্শকদের বুঝিতে মোটেই কষ্ট হয় না। ছবিখানা প্রভাত সিনেমায় আট সপ্তাহ ধরে দেখান হচ্ছে কিন্তু দর্শকের ভীড় এখনও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।

জেলর

মিনার্ভার অতুলনীয় চিত্রসৃষ্টি "জেলর" প্রভাত সিনেমার পরবর্ত্তী আকর্ষণ হবে। ছবিখানা বোম্বেতে মুক্তিলাভ করার পর যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তাতে বলা যেতে পারে যে কলিকাতাতেও ছবিখানা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হবে।

মিঃ সোরাব মোদী পরিচালক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। এই ছবিখানা তিনি পরিচালনা করেছেন এবং নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

জেলর দিলীপ সব সময়ই ঘড়ির কাটার ন্যায় কাজ করে থাকেন। তার কাছে শৃঙ্খলার এক চুলও এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। কিন্তু তিনি তার সুন্দরী স্ত্রী কানবালকে ও একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। কীসে স্ত্রী ও কন্যার তুষ্টি সাধন হবে সর্ব্বদাই তিনি এ চিন্তা করেন। স্ত্রী কানবাল কিন্তু স্বামীকে সম্পূর্ণ ভালবাসতে পারে নাই। তার একমাত্র কারণ দিলীপের মুখশ্রী মোটেই সুন্দর নয়। একটা তীব্র উপেক্ষার ভাব সর্ব্বদাই তার মনে জাগরুক থাকত।

একদিন দিলীপের অসুখ হলে তারই প্রিয়বন্ধু ডাক্তার রমেশকে ডাকা হয়। রমেশ রুগীকে দেখতে এসে রুগীর স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়।

ধীরে ধীরে দিলীপ সেরে উঠে। কিন্তু কী একটা সন্দেহের কালো ছায়া সর্ব্বদাই তার মনে উকি ঝুকি দিতে থাকে। এমন ধারা ত পূর্ব্বে ছিল না। ডাক্তার রমেশের ঘন ঘন আগমন দিলীপের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

অবশেষে একদিন ঝড় উঠিল। তার চরম পরিণতি আপনারা শীঘ্রই প্রভাত সিনেমার রূপোলী পর্দায় দেখতে পাবেন।

নায়িকার অংশে লীলা চিৎনিশ অভিনয় করেছেন। তাছাড়া শীলা, ইরাচ তারাপুর, সাদিকালী, শরিফা প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে।

"জেলরে"র গান ছবিখানার এক অপূর্ব্ব সম্পদ হয়েছে।

এম্পায়ার টকী

স্থান পরিবর্ত্তন

চিত্র-পরিবেশক এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটরসের নূতন ঠিকানা অতঃপর হইবে **ই, টি, ভি বিল্ডিং।**

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের "একলব্য" চিত্রের একটি দৃশ্যে রেণুকা রায় ও জহর গাঙ্গুলী। শীঘ্রই এই চিত্রখানি 'শ্রী' চিত্রগৃহে মুক্তি পাবে।

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই কার্ত্তিক ১৩৪৫, ৩রা নবেম্বর ১৯৩৮

ভাওয়াল-বিজয়ী বীর-শ্রেষ্ঠ !

ভাওয়াল-বিজয়ী "হিন্দু"-বীর শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় হিন্দু সভার সভাপতিরূপে বাংলায় এক অভিনব হিন্দু রাজত্বের স্বপ্ন দেখিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দশ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে—সৈন্যদিগের দক্ষিণ হস্তে লেখনীর শাণিত আয়ুধ আর বাম হস্তে মেমোরিয়ালের পাণ্ডুলিপি দুর্ভেদ্য বর্ম্মরূপে শোভমান !

বিজয়চন্দ্র হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় বিভোর থাকুন তাহাতে কোন হিন্দুরই আপত্তি থাকতে পারেনা কিন্তু আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন হিন্দু মাত্রেরই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার অধিকার আছে—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—বিশেষ, যেখানে ভিক্ষার বস্তু রাজ্য।

অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দিবে যে স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠার ধূয়া তুলিবার প্রচেষ্টা বিজয়চন্দ্রের এই নূতন নহে। একদিন জয়চন্দ্র যে পথ অবলম্বনে দেশবাসীর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্বার্থ সংরক্ষণে অগ্রসর হইয়াছিলেন আজ বিজয়চন্দ্র সেই পথেরই পথিক হইয়াছেন ! এই কৌশল পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যদি দেশবাসী ঠেকিয়া না শেখে তাহা হইলে ইতিহাসের শোচনীয় পুণরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব হইবে না।

বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুসভার নেতৃবৃন্দ আবেদন নিবেদন রূপ ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বনে আস্থাবান নহেন তাই অন্যান্য নির্ভীক নেতৃত্বের প্রচেষ্টায় ভারতের নিজস্ব সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে: এই সকল বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ প্রদেশে হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ও সংরক্ষণের জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে বিদেশী শাসকের দ্বারস্থ হওয়াকে লজ্জাকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে মুঞ্জে বা সাভারকারের নেতৃত্বে যে সপ্রতিষ্ঠ দৃপ্ত গতিভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই বাংলার হিন্দুনায়ক—মন্য বিজয়চন্দ্রের লঘু-চঞ্চল নেতৃত্বের অভিনয়ে তাহার একান্ত অভাব। যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও উদ্দ্যমতা স্বীয় মত প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য্য বিজয়চন্দ্রের সে গভীরতা, সে একতানতা কি? ব্যবহারাজীবের অধুনা স্বর্ণ-প্রসূ ব্যবসায়ের অন্তরালে ক্ষণিকের অবসর লাভে নিছক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বাংলার কংগ্রেসনেতা শরৎচন্দ্রের প্রতি সময়ে অসময়ে কটুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণে নির্ব্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি বিদূরিত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে হিন্দুর অধিকার বা স্বার্থ পরিপূর্ণ মর্য্যাদার সহিত সংরক্ষিত হয় না। মুষ্টিমেয় মুসলমানের বিরোধিতায় আতঙ্কিত হইয়া বর্দ্ধমানের মত হিন্দু-বহুল সহরের রাজপথের ধূলিতে হিন্দুদেবপ্রতিমা অসহায়ভাবে বিলুণ্ঠিত করিয়া যাহারা কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মহানগরীর নিরাপদ পারিপার্শ্বিকতার আবরণে আত্মরক্ষাকারী সেই সকল হিন্দুত্বাভিমানী পৃষ্ঠভঙ্গবর্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা-কল্পে অসার আস্ফালন ও বাগ্-জাল বিন্যাস উপহাস ও অনুকম্পারই উদ্রেক করে !
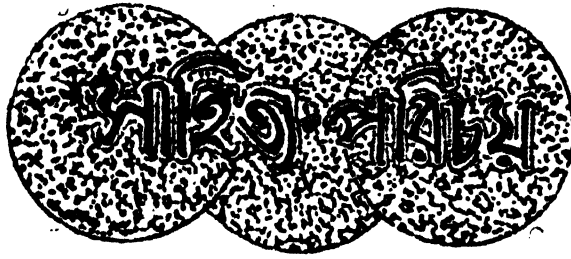
ইণ্ডিয়ান ষ্টেজ (ইংরাজীতে লিখিত, দুই খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত)—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি, এল—প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক জোহান ভ্যান সানেন কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ—প্রথম খণ্ড—১৯৩৪—পৃষ্ঠা ৪+৭+৩+৩১৩+৬—মূল্য (ভারতে) ৫৲ টাকা—(বিদেশে) আট শিলিঙ। দ্বিতীয় খণ্ড—১৯৩৮—পৃষ্ঠা ৩+২৮৮+৮ মূল্য (ভারতে) ৫৲ টাকা (বিদেশে) দশ শিলিঙ। মেট্রোপলিটান পাবলিশিং হাউস হইতে প্রথম খণ্ড ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত।

স্বর্গত দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ও জীবন-চরিত লেখক দেশসেবক হিসাবে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাস গুপ্তের নাম বাঙলার শিক্ষিত সমাজে অজ্ঞাত নহে। কিন্তু দেশসেবক হেমেন্দ্রনাথের একটি সাহিত্যিক দিকও আছে। হেমেন্দ্রবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গিরিশচন্দ্র" সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়াছেন ও তাঁহার বক্তৃতা-মালা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিতও হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি "গিরিশপ্রতিভা" নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বাঙলাভাষায় রচনা করিয়াছেন, ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দানীবাবুর স্থান সম্বন্ধেও একখানি চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্য ও বাঙলার নাট্যশালা সম্বন্ধে হেমেন্দ্রবাবু দীর্ঘদিন অটুট অধ্যবসায় সহকারে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন ইংরেজী ও বাঙলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আর এই সকল প্রবন্ধ রচনা কালে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের সহিত তাঁহাকে বহুবার তর্ক-বিতর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ করিতে আমরা দেখিয়াছি। আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার গবেষণায়

উদ্যম ও সত্যানুসন্ধিৎসা। তাঁহার সেই সুচিরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফল কিয়দংশে এই দুইখণ্ড গ্রন্থে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

হেমেন্দ্রবাবুর উদ্যম ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত হেমেন্দ্রবাবুর সাক্ষাতের যোগাযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হেমেন্দ্রবাবু "গিরিশ-প্রতিভার" ন্যায় একখানি সুবিরাট তথ্যপূর্ণ গ্রন্থরচনায় পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। স্বর্গত রসরাজ অমৃতলাল বসু, গিরিশচন্দ্রের পিতৃষ্বস্রীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু (বর্ত্তমান ইনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "গিরিশ বক্তৃতা" প্রদান করিয়াছেন—ও অধুনা জীবিত নাট্যসমালোচকগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন), গিরিশচন্দ্রের নিত্য সহচর ও জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের সঙ্গী শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণের সহিত আলোচনা দ্বারা, গিরিশচন্দ্রের দ্বারা শিক্ষিত স্বনামধন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব তাঁহার কলাকৌশলের জ্ঞান আহরণ দ্বারা, প্রাচীন সংবাদপত্র সমূহে তৎকালে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত সমালোচনা সংগ্রহ দ্বারা, ও পরিশেষে গিরিশচন্দ্র রচিত প্রবন্ধ ও নাটকাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও স্বয়ং অভিনয়দ্বারা (বলা বাহুল্য, হেমেন্দ্রবাবু স্বয়ং একজন উচ্চ শ্রেণীর অভিনেতা; তাঁহার বহু সামাজিক নাটকের ভূমিকাভিনয় আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি)—তিনি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল অভিনবতথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক বঙ্গীয় নাট্যরসিক পাঠক সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। পরোক্ষ-জ্ঞানের সাহায্যেও যে ধারাবাহিক অখণ্ড ইতিহাস রচিত হইতে পারে, হেমেন্দ্রবাবুর প্রচেষ্টাই তাহার অন্যতম নিদর্শন।

'ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেজ' গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে হেমেন্দ্রবাবু ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন যুগে নাট্যোৎপত্তির উপাখ্যান হইতে তাঁহার গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা করিয়াছেন। ভরতনাট্যশাস্ত্রে ব্রহ্মার দ্বারা চতুর্ব্বেদ সারসম্ভূত নাট্যবেদের প্রথম প্রচার ও জর্জ্জরোৎসবের বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ, ভরতমুনি কর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকট নাট্যবেদ শিক্ষান্তে ভরতনাট্যশাস্ত্রপ্রণয়ন, আদি অভিনেতা শত ভরতপুত্র ও আদি অভিনেত্রী অপ্সরোগণের দ্বারা প্রথম নাট্যাভিনয় প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর বিবরণ প্রদানের পর তিনি প্রাচীন ভারতীয় নাট্যরচনার একটি পূর্ব্বাপর ধারাবাহিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্ত, ব্রাহ্মণভাগের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। উপনিষদের নানারূপ নাটকীয় সংলাপ প্রভৃতি প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে নাটকীয়তার প্রভাব কতটুকু আছে তাহার আলোচনা ইহাতে আছে। পরবর্ত্তী যুগে পৌরাণিক রচনা মধ্যে পাণিনীর ব্যাকরণে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, বৌদ্ধ জাতক ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থ মধ্যে, প্রাচীন শিলালিপি, মন্দির-স্তম্ভ-গোপুর—পর্ব্বতগুহা প্রভৃতির গাত্রে উৎকীর্ণ নরনারী মূর্ত্তির ভাবভঙ্গীতে ভারতীয় নাট্যরচনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কতটুকু ইঙ্গিত মিলে তাহার বহু কৌতূহলকর বিবরণে হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের প্রথমাংশ পরিপূর্ণ। কোন কোন দৃশ্যকাব্যে বর্ণিত "যবনী" প্রতিহারী চরিত্র, ও প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গপীঠের অপরিহার্য্য অঙ্গ "যবনিকা" প্রভৃতি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে গ্রীক (যবন-আইয়োনিয়ান্ = ব্যাক্ট্রীয় গ্রীক) প্রভাবের পক্ষপাতী গবেষকবৃন্দের মতের সমালোচনাও হেমেন্দ্রবাবু করিয়াছেন। তাহার পর অশ্বঘোষ-ভাস শূদ্রক-কালিদাস- চন্দ্র- ভবভূতি শ্রীহর্ষ-ভট্টনারায়ণ-বিশাখদত্ত- ক্ষেমীশ্বর-রাজশেখর কৃষ্ণমিত্র প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত নাট্যকারগণের নাট্যরচনার একটি পূর্ব্বাপর ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পর্ব্বতগুহা মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের অদ্যাপি বিদ্যমান ভগ্নাবশেষ, শিলাগাত্রে খোদিত সংস্কৃত নাট্যরচনার নমুনা প্রভৃতি সাধারণের অজ্ঞাত বহু তথ্য ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের নটগণের স্থান কোথায় ছিল—তাহার সম্বন্ধেও অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার পর প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় (বিশেষ করিয়া সংস্কৃত-প্রাকৃত) নাট্যরচনা কিরূপে ও কি কারণে অবনতির পথে অগ্রসর হইল, তাহার সম্বন্ধেও আলোচনা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছিবার পর রসাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার সহৃদয় পার্ষদগণের আবির্ভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে সাময়িক রসপুষ্টির পুনরাভাস দেখা দিয়াছিল তাহাও বিবৃত হইয়াছে। ইহার পরই বাঙলার নিজস্ব বিশিষ্ট অভিনয় পদ্ধতি বা যাত্রার যুগ। ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রভৃতি খাঁটি যাত্রা ওয়ালাদিগের বিস্তৃত পরিচয়, যাত্রার ক্রমাবনতি, যাত্রা ও থিয়েটারের মিশ্রণ, কবিগান, হাফ-আখড়াই, পাঁচালী, কীর্ত্তন, কথকতা প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন প্রকার কাব্যামৃতরসাস্বাদন করিবার ব্যবহারিক পদ্ধতির ইতিহাসও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। আনুষঙ্গিকরূপে নেপাল,

আসাম ও মণিপুরে বাঙলা দৃশ্যকাব্যের প্রসার সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমখণ্ডের প্রথমাংশ এই স্থলে প্রায় ১৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাঙলার থিয়েটারী যুগের কথা। বাঙলায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে থিয়েটার স্থাপনের মূলে নানা জাতীয় ইউরোপীয় বণিক্‌গণের কতদূর প্রভাব ছিল, গ্রন্থকার তাহা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। প্লে-হাউস্‌, কলিকাতা থিয়েটার, লণ্ডন ট্যাভার্ণ, মিসেস্‌ ব্রিষ্টোর থিয়েটার প্রভৃতির কাহিনী বাঙলা থিয়েটারের ভিত্তিমূলে ইউরোপীয়-গণের আদর্শ প্রতিষ্ঠারই কাহিনী। তারপর আসিলেন প্রসিদ্ধ রুস পর্য্যটক হেরাসিম লেবেডেফ। এতকাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গই অভিনয় দ্বারা বাঙলার দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু লেবেডেফ সে গড্ডালিকা প্রবাহে পতিত হইলেন না। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙালী পণ্ডিত গোলক নাথ দাসের সাহায্যে বাঙালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া, পাশ্চাত্য দৃশ্যকাব্যের বাঙলা অনুবাদ করাইয়া, ও বাঙালী দর্শক সমাজে তাহার অভিনয়ের দ্বারা বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে লেবেডেফ যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার বাদানুবাদপূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ হেমেন্দ্রবাবু সুকৌশলে প্রদান করিয়াছেন। লেবেডেফের থিয়েটার—পার্টি ভাঙ্গিয়া যাইবার পরেও ইউরোপীয় থিয়েটারের যুগ আরও কিছুদিন চলিয়াছিল। এই সকল থিয়েটারের মধ্যে চৌরঙ্গী থিয়েটার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্‌ হেমন্‌ উইলসন্‌ ও সুবিখ্যাত শেক্‌স্‌পীয়ার অধ্যাপক ক্যাপ্টেন ডি, এল্‌ রিচার্ডসনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও ইহারই আদর্শে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের ভিত্তিপত্তন। কিন্তু এ সকল থিয়েটারেও প্রাচ্য নাটকাদি ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়া অভিনীত হইত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি বাঙালী থিয়েটার হইতেছে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারে স্থাপিত নবীনচন্দ্র বসুর নিজস্ব থিয়েটার। এই থিয়েটারেও পেশাদার বাঙালী অভিনেত্রীগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনা যায় যে এই থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করিয়াই নবীনবাবু সর্ব্বস্বান্ত হ'ন। নবীন বাবুর থিয়েটার লোপ পাইবার পরও সা-সুচি থিয়েটার প্রভৃতিতে ইংরাজী অভিনয় কিছুদিন চলে। তাহার পর ক্রমশঃ দেশবাসিগণের রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী অভিনয়ের ধারা বিলুপ্ত হইয়া যায়। হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের

প্রথম খণ্ডে বঙ্গীয় নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাসের এই অধ্যায় পর্য্যন্ত সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে এই ইতিহাসের ধারাই সুরক্ষিত হইয়াছে। তৎকালীন কলিকাতার ধনী নাট্যরসিকগণের প্রচেষ্টায় বাঙলা থিয়েটারের প্রথম যুগ কিরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া কাটিয়াছিল দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাইকপাড়া ও বেলগাছিয়ার সিংহোপাধিধারী ভূম্যধিকারিগণ, শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার দের বংশীয়গণ, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশ বাঙলা থিয়েটার প্রবর্ত্তনের মূলে কতদূর সহায়তা করিয়াছিলেন, সে সকল বিচিত্র বিবরণ হেমেন্দ্রবাবু বহু পরিশ্রমে নানাস্থান হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের ধুরন্ধরগণও যে তৎকালে নীতির দোহাই দিয়া নবরূপ নব প্রবর্ত্তিত এক নাট্যকলার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ান নাই তাহার পরিচয়ও ইহাতে আছে। আর আছে—প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণে"র রচনা ও অভিনয়ের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদক পাদ্রী লঙ্ সাহেবের কারাবরণ ও নীলদর্পণ নাটকের প্রভাবে ধীরে ধীরে নীলকর সাহেবদিগের অন্তর্ধান প্রভৃতির কাহিনীও দ্বিতীয় খণ্ডের বিশিষ্ট আকর্ষণ। ইহা ব্যতীত গ্রন্থকার "ন্যাশন্যাল থিয়েটারের" উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাস অতি সাবধানে ও সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। অবশেষে "গজদানন্দ" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" অভিনয়ের নিমিত্ত গ্রন্থকার উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ও ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "ড্রামেটিক পারফরম্যান্সেস্ এ্যাক্ট" পাশ হওয়ার চিত্তাকর্ষক কাহিনী দিয়া বর্ত্তমান খণ্ডটির সমাপ্তি করা হইয়াছে।

এই খণ্ডেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চের জনক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার, নাট্যাচার্য্য নাট্যশালাধ্যক্ষ ও অপরূপ রূপদক্ষ নট স্বর্গত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বঙ্গ রঙ্গশালায় প্রথমাবির্ভাবের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে নিমে' দত্তের ভূমিকায় তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ—

"মদমত্ত পদ টলে নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে
প্রথম দেখিল বঙ্গ নব নট গুরু তার।"

এই দুই খণ্ড গ্রন্থে হেমেন্দ্রবাবু যেরূপ ধৈর্য্য, পরিশ্রম, তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের বিচার বিতর্ক গুলিতে (যথা—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থ সমালোচনায়) হেমেন্দ্রবাবু বিশেষ সুক্ষ্মদৃষ্টিও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের তিনটি অভিযোগ আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার সঙ্কলন প্রায় নিখুঁৎ হইলেও ভাষা বিশেষ সরস হয় নাই। বোধ হয় ভাষা অপেক্ষা ঘটনার উপর অধিক মনোযোগ দানই ইহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার transliteration পদ্ধতি বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে না। আর ইহা ছাড়া ছাপার ভুলও গ্রন্থমধ্যে নিহাত অল্প নাই। তৃতীয়তঃ, তাঁহার গ্রন্থের একটি বিস্তৃত Index of proper names নাই। দ্বিতীয় খণ্ডে এরূপ একটি নামসূচী দেওয়া হইলেও উহা সম্পূর্ণ নহে। আর প্রথম খণ্ডে ত উহার একান্ত অভাব। এই ত্রুটিগুলি পরিবর্জ্জিত হইলেই গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত সন্দেহ নাই। গ্রন্থমধ্যে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য চিত্রও আছে। আমরা তৃতীয় খণ্ডের আশায় রহিলাম। আশা হয়, গ্রন্থ দুইখানিই দেশবিদেশের পাঠক সমাজে সাগ্রহে পঠিত হইবে।

"প্রিয়দর্শী"

মনস্তত্ত্ব ও নবতম শিল্পকলার চাতুর্য্যে ছায়াচিত্র জগতে যুগান্তর আনয়ন করবে

═ পথিক ═

═ পথিক ═

মানব মনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব
সমাজের শাসন বড়
কি প্রেমের অনুশাসন বড়
তারই চিত্ররূপ

═ পথিক ═

তরুণী রেবার জীবনে-জীবন ও অবনী দুজনই এসেছিল প্রেমের মালা হাতে করে, একজন তার উদ্বেল প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাকে অভিভূত করেছিল—আর অন্যের ছিল নির্লিপ্ত ভালবাসা—কাকে সে বরণ করবে ?

ঃ পরিচালনা ঃ

চারু রায়

N. I. P.

(বিলাসী)

বড়দিদি :

শ্রীমান্ পাহাড়ী ভায়াকে আমরা জানি একজন সু-গায়ক, সু-অভিনেতা এবং বন্ধু হিসাবে। কিন্তু তিনি যে একজন পাকা ঘোড়সোয়ার এ খবরটা অনেকেরই জানা নেই।

বড়দিদির আশ্রয় ছেড়ে যাবার পর নায়ক সুরেন্দ্রনাথের জীবনে শান্তি ছিল না।

দিন কেটে যায়...বেচারী সুরেন জানে না তার বড়দিদি কোথায়। এমন দিনে, নিতান্ত দৈবাৎ সে খবর পেল তারই কর্ম্মচারীর অত্যাচারে বড়দিদির ভিটে-মাটি আজ নিলামে উঠেচে।

হায়! সুরেন আজ জমিদার···বিপুল বিত্তের অধিকারী; আর বড়দিদি—পথের ভিখারিনী!

যে মুহূর্ত্তে সুরেন জানতে পারলে বড়দিদি মাধবী তারই জমিদারীর এলাকাধ'নের প্রজা এবং তারই কর্ম্মচারীর চক্রান্তে আজ তার বড়দিদির এহেন দুর্দ্দশা—সেই মুহূর্ত্তে সুরেন্দ্রনাথ তার কর্ত্তব্য স্থির কোরেছিল। সে কাল-বিলম্ব না কোরে দ্রুতগামী অশ্বে জিন চড়িয়ে বড়দিদির শ্বশুরালয়ের অভিমুখে তড়িৎগতিতে বেরিয়ে পড়ে।

উপরের এই দৃশ্যটি শহরের সন্নিকটে একটি নির্দ্দিষ্ট লোকেশানে সম্প্রতি তোলা হ'য়েচে। এই দৃশ্যটি গ্রহণে অশ্বারোহী হিসাবে পাহাড়ী সান্যাল যথেষ্ট সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিচালক অমর মল্লিক এবং তাঁর কর্ম্মীসঙ্ঘও এই দৃশ্য গ্রহণে বিশেষ কষ্টসহ্য কোরেছেন। সুখের বিষয় তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েচে।

সাপুড়ে :

দেবকী বাবু একেবারে শয্যাশায়ী হোয়ে পড়ায়, গত সপ্তাহেও এই ছবির কাজ বিশেষ অগ্রসর হ'তে পারে নি। তিনি সুস্থ হ'বা মাত্রই চিত্র-গ্রহণ সুরু হ'বে। ইতিমধ্যে সুর-শিল্পী রাই বড়াল তার দল-বল নিয়ে দু'নম্বর ষ্টুডিওতে সঙ্গীতাংশের মহলা সুরু কোরেছেন।

রাইবাবুর মহলার খানিকটা অংশ শুনে আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েচে এবারে সাপুড়ে ছবিতে তিনি সুর-সংযোজনার মধ্যে কিছু নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারবেন। তাঁর পরিপক্ক সুরজ্ঞান এবং পরিকল্পনার অভিনবত্বে কণ্ঠসঙ্গীত এবং আবহ-সঙ্গীতের মাধুর্য্য যে অত্যন্ত হৃদয়হীনেরও অন্তর স্পর্শ কোরবে, এর পরিচয় পেয়ে আমরা বিশেষ আশান্বিত হ'য়েচি।

কপালকুণ্ডলা (হিন্দি) :

ফণী মজুমদারের "সাথী" শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষ আবার তাঁকে জুড়ে দিলেন হিন্দি "কপালকুণ্ডলার" গঠন কার্য্যে।

শ্রীমান ফণী ভায়ারও কর্ম্মশক্তির তারিফ কোরতে আমরা বাধ্য। "সাথী" শেষ হ'বার আগে থেকেই তিনি "কপালকুণ্ডলার" চিত্র-নাট্য রচনায় মন দিয়েছিলেন। এত সত্বরতায় সঙ্গে কাজ শেষ হ'য়েচে যে অনেকে ভাবতেই পারেন না এই মাসের মধ্যেই "কপালকুণ্ডলার" চিত্র গঠন আরম্ভ হ'তে পারবে। কিন্তু সত্যই সে অঘটন ঘটে গেল।

গত শুক্রবার নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় এবং অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীদের উপস্থিতিতে, ফণীবাবুর নতুন ছবি হিন্দি "কপালকুণ্ডলার" 'শুভ-মহরত' সুসম্পন্ন হ'য়েচে। সকলের শুভেচ্ছা নত মস্তকে গ্রহণ কোরে কর্ম্মযোগী ফণী মজুমদার কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন। আরব্ধ কার্য্যে আমরাও তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের মাঝে, পথের ধারের সেই বিখ্যাত সরাইখানার কথাটি আপনারা একবার স্মরণ করুন!

সেই সরাইখানায় কপালকুণ্ডলার সঙ্গে মতিবিবির সাক্ষাৎ ঘটে এবং সেই সাক্ষাতের ফলাফল আপনারা পরে জানতে পারবেন।

আপাততঃ শুনে সুখী হবেন, কপাল-কুণ্ডলার ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন সুন্দরী অভিনেত্রী লীলা দেশাই। এই চিত্রের আর তিনটি প্রধান ভূমিকা এইভাবে নির্ব্বাচিত হয়েচে তা আমরা গত সংখ্যায় জানায়েছি।

মতিবিবি······শ্রীমতী কমলেশ কুমারী
নবকুমার······নাজাম
কাপালিক......জগদীশ

'সাথী'

'সাথী'র সম্পাদনা কার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এসেচে। হিন্দি সংস্করণের প্রায় ১৩ রীল 'প্রিণ্ট'ও হয়ে গেছে। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ 'ঈদ' পর্ব্বে হিন্দি সংস্করণটী বাঙলার বাহিরে প্রায় বার যায়গায় 'রিলিজ' হ'বে। বাংলা সংস্করণটী আসছে ১৯শে নভেম্বর নিউ সিনেমায় মুক্তি লাভ করবে।

'দুষ্মন'

দুষ্মণএর কাজ বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিচালক নীতীনবাবু এবার আরও বেশী করে 'Technique' এর দিকে নজর দিয়েছেন।

পরিচালক হেমচন্দ্র

পরিচালক হেমচন্দ্র তাঁর পরবর্ত্তী ছবির 'সিনারিও' শেষ করে ফেলেছেন। ঐ ছবিখানার গল্পাংশ হচ্ছে রঞ্জিত (টুলু) সেনের লেখা। পরিচালক মহাশয় সেই গল্পের ওপর base করে এই চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন। অবশ্য এ কাজে বিনয় চাটুজ্যে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ছবিখানার চরিত্রলিপি যদিও এখন ঠিক হয়নি তবে যতদূর আশা হয় তাতে মনে হয় পাহাড়ী ও পঙ্কজের মধ্যে একজন 'হিরো' আর কানন ও লীলা দেশাই এর মধ্যে একজন 'হিরোয়িন' হ'বে।

'বড়দিদি'র কাজ শেষ হলেই এই বই-এর কাজ আরম্ভ হ'বে বলেই উপস্থিত স্থির হয়ে আছে।

জনক নন্দিনী

রাধার 'জনকনন্দিনী' প্রায় শেষ হয়ে এলো। অভিনয় শেষ হ'লেই 'রূপবাণী'তে ঐ ছবি দেখান হবে।

এ ছবির ভূমিকালিপি হ'চ্ছে এই রকম: সীতা—সাবিত্রী, রাণী—দেববালা, ধরিত্রী-মাতা—রাজলক্ষ্মী, ব্রাহ্মণী—ছায়া, অহল্যা—উমাতারা, বিশ্বামিত্র—অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম,—মনোরঞ্জন ভট্টা, দশরথ—রবী রায়, রাবণ—জহর গাঙ্গুলী, বৈতালিক—মৃণাল ঘোষ, জনক—তুলসী চক্রবর্ত্তী, গৌতম—জয়নারায়ণ, রাম—সুশীল রায়, প্রভৃতি।

একলব্য

ওরিয়েন্টাল ফিনেটোনের ছবি 'একলব্য'র কয়েকটী বিশিষ্ট দৃশ্য গেল হপ্তায় তোলা হয়ে গেলো। ছবিখানা আসছে ১৯শে নভেম্বর থেকে 'শ্রী' চিত্রগৃহে দেখান হ'বে। এতে অভিনয় করেছে জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, অমল বন্দ্যো, প্রভৃতি।

খনা

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়এর পরিচালনায় 'খনা' এক রকম শেষ হয়ে গেছে। 'উত্তরা' চিত্রগৃহে এ ছবিখানি মুক্তি প্রতিক্ষায় রয়েছে।

এই ছবির সঙ্গে ডি, জির পরিচালনায় একখানি ছোট হাস্যরসাত্মক ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে তা আমরা আগেই জানিয়েছি। ছবিখানির নাম হয়েছে 'অভিসারিকা'

পথিক

ইন্দ্র মুভীটোন নামে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে, এঁদের প্রথম ছবি—পথিকের চিত্রগ্রহণ ম্যাডান ষ্টুডিওতে খুব জোরভাবে এগিয়ে চলেছে। এতে অভিনয় করছেন—লীলা হালদার, রমলা,

চন্দ্রিকা মনোরমা, রাজলক্ষ্মী, সুহাসিনী, ধীরাজ, ভোলা, সত্য প্রভৃতি।

আমরা আশা করি চারু রায়ের পরিচালনায় ছবিখানির মধ্যে অনেক কিছু নূতনত্ব থাক্‌বে।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের অভিনব সমাজ চিত্র 'অভিনয়' এই সপ্তাহ হইতে রূপবাণীতে দশম সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

চিত্রা

এই শনিবার থেকে 'চিত্রা'য় 'দেশের মাটি' অষ্টম সপ্তাহে পড়বে। 'দেশের মাটি'র মতন এমন একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি যে চিত্রায় আরও কয়েক সপ্তাহ ধরে চল্‌বে তা আশা করা অসমীচিন হ'বে না।

পূর্ণ থিয়েটার

এই শনিবার ৫ই নভেম্বর 'গোরা' এই চিত্রগৃহে চতুর্থ সপ্তাহে পড়বে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' দর্শক সমাজে যে কত প্রিয় তা গত দু' সপ্তাহের জনসমাগম থেকে বোঝা যায়।

নিউ সিনেমা

'নিউ সিনেমায়' ১৯৩৫ সালের তোলা ছবি 'অচিন-প্রিয়া' আমরা দেখে বাস্তবিকই যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। এই ছোট তিন রিলের বই খানা মানুষকে যথেষ্ট ভাবে হাসাতে পেরেছে। অভিনয়ের মধ্যে অমর মল্লিকের কবিরাজ ও তুয়ার জমিদার সত্যই উপভোগ্য হয়েছে।

এই শনিবার ৫ই নভেম্বর থেকে ৮ই পর্য্যন্ত 'অচিনপ্রিয়া'র সঙ্গে 'দিদি' আর ৯ই থেকে ১১ই অবধি 'মীরাবাই' দেখান হ'বে।

কোন পথে?

কুমুদেশ সেন

বুভুক্ষা ও যৌন লিপ্সা নরনারীর জীবনে দুইটী কেন্দ্র। মানুষকে বাঁচতে হলে যেমন তার চাই খাদ্য, তেমনি নরনারীর যৌন সম্বন্ধ, অন্ততঃ বংশ রক্ষার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শুধু যে বংশরক্ষার তাগিদই একমাত্র নয়, তা বোধহয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা বাহুল্যমাত্র।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য দুয়েরই প্রয়োজন। যৌবন যখন স্বাভাবিকতা পায়না, তখন তার বিকৃতরূপ জীবনকে কলঙ্কিত করে, লাঞ্ছিত করে। মানুষ যখন খেতে না পায়, তখন অসৎ উপায়ে কিম্বা আরোও কুটিলভাবে তার ক্ষুধার রসদ জোগাড় করবার চেষ্টা করে। সুস্থ ও স্বাভাবিক ও uninhibited জীবন যাপনের জন্য যা নিতান্ত গৌণ এবং তার অভাবে যে সমস্যা দেখা দেয়, সে শুধু ব্যক্তিগত নয়—তা সামাজিক। এই সমস্যা যে সত্যিকারের ও ব্যাপক, তার প্রমাণ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য Karl Marx এবং Frued :

দু'রকমভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। এই দুইটী সমাধানের রূপই 'Negative'। প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে এই দুইটী সমাধানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনেক কথারই আর্ষ প্রয়োগ হয়েছে এবং হতে পারে। তাঁদের মতে, বুভুক্ষা ও যৌন সম্বন্ধ অগৌণ। যৌন জীবনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা একেবারে অস্বীকার করেননি—কিন্তু বংশ রক্ষাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য—'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। ব্যবহারিক জীবনে এই কথার সত্যতা মেনে নেওয়া দুরূহ। মানুষ ও পশুর মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে মানুষ যৌন জীবনকে আরোও উর্দ্ধস্তরে পৌছিয়ে দিয়েছে,—নার'কে কামনা করবার মধ্যে তার আরোও অনেক সুপ্ত আকাঙ্খা আছে। সাহিত্যে ও শিল্পে আমরা নরনারীর যৌন লিপ্সার অতিন্দ্রিয় রূপ দেখতে পাই। আর একটী সমাধান নারীকে মানুষের জীবন থেকে কেন্দ্রচ্যুত করবার পরামর্শ দান করে। "নারী নরকের দ্বার"—যারা এমতে আস্থা রাখেন, তাদের জীবনে নারীর প্রয়োজন শুধু পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য। এই ধারণা ছিল পূর্ব্বে বর্ব্বরদের। তারা যুদ্ধ করত লুণ্ঠন করবার জন্য। তারা নগর জয় করে ঘরে ঘরে আগুণ লাগাত, আর মেয়েদের করত কামনার সামগ্রী। আজকের অনেক ধনী ব্যক্তির মধ্যে এই প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাদের ধনোপার্জ্জনের একমাত্র অনুপ্রেরণা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য। তারা শুধু টাকার বলে অন্যের স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নিকে প্রলুব্ধ করে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করে।

অতএব এই দুটী সমাধান আজকের জীবনে নিরর্থক। আত্মসংযমের বুলি আওড়ান সোজা কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তাকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা শুধু যৌবনকে ব্যঙ্গ করা। দেশ যদি রোগা সন্ন্যাসীতে ভরে যায়···তবে ক্ষত্রিয় বীর্য্যের নিতান্ত অভাব হবে।

সুতরাং গোড়াতেই ধরে নেওয়া যাক্—নরনারীর জীবনে প্রয়োজন অন্নের এবং সুস্থ ভাবে যৌনপ্রবৃত্তি তৃপ্ত করা।

দেশের শতকরা নব্বুই জন লোক অনেকটা পশুর মত কোনরকমে আহার জোগাড় করছে। তাদের যৌন জীবনও অনেকটা আদিম যুগের। তাদের ছেলেরা না পায় খেতে না পায় পরতে। আমাদের মধ্যবিত্তরা মাসে মাসে, গরীব হয়ে আসছে। তাদের ঘরে এই সমস্যা দুটী ব্যাপক। যারা একান্ত গরীব, তাদের একমাত্র রক্ষাকবচ তাদের অসহায় অজ্ঞানতা। কিন্তু মধ্যবিত্ত ঘরে আজ পৌঁচেছে শিক্ষার আলোক। এই জগতের লোকেরা অনুভব করে তাদের অভাব এবং প্রতিকার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। কোনরকমে একটা কেরানীগিরি জুটিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ ক'রে ভেবে নেয় দু'টী সমস্যাই সমাধান হয়েছে। শিক্ষা পেলেও, শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে তারা তাদের জীবনে প্রয়োগ কর্ত্তে চায় না। এদের ছেলেপিলের সংখ্যাও সবচেয়ে বেশী এবং মনে হয় "Population increases at geomecal progrression and income increases at arithmetical rate"...... তাই সমস্যা আরোও জটিল ভাবে দেখা যায় এই শ্রেণীতেই। মধ্যবিত্ত ঘরে সেজন্য সবচেয়ে বেশী মূর্খতা, ভণ্ডামী এবং পারিবারিক অশান্তি।

সমস্যা সমাধান হতে পারে শুধু জীবন ও নবলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। আমাদের পথকে মসৃণ কর্ত্তে পারে শুধু বিজ্ঞান ও তার কার্য্যকরী প্রণালী। নারী সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদও বদলানো আবশ্যক। ভাবী যুগের নতুন সমাজে নারীর স্থান পুরুষের সমকক্ষ হবে, এই আশা ব্যর্থ হবে না, মনে করি। দাস ও প্রভুর সম্পর্ক কখনও মধুর হয় না! সম-পদস্থ নরনারীর মধ্যে যাকে সত্যিকারের বন্ধন—যে বন্ধনের মধ্যে ফাঁক থাকতে পারে, কিন্তু ফাঁকি থাকে না। কোন্ পথে আমাদের জীবনের সমস্যা সমাধান হবে তার প্রতীক্ষায় আমরা রইলাম।

বিবিধ

গোল্ড কাপ

Theta Beta Club Gold cup প্রতিযোগিতার (Duplicate Contract Bridge) চতুর্থ অধিবেশন এই মাসের মাঝামাঝি আরম্ভ হইবে। হায়দ্রাবাদ, বোম্বে, বিহার প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ হইতে দল আসিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। কলিকাতার বিভিন্ন দল সমূহের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু প্রথম দুই বৎসর হায়দ্রাবাদ Phœnix Club বিজয়ী হন। গত বৎসর বিমান মিত্রের অধিনায়কত্বে Theta Beta Club বিজয়ী হইয়া কলিকাতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। মুরারী বসু, শম্ভু মিত্র ও সুবিমল মিত্র এই দলে ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভাল খেলিয়াছিলেন। গত বৎসর Mr. J. E. Borrellএর নেতৃত্বে Cosmo Club ফাইন্যালে পরাজিত হন। Mrs Ashmead খেলাতে যথেষ্ট নিপুণতা দেখান ও সকলের প্রশংসা ভাজন হন। এ বৎসরও তাঁহাদের দুটী দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছেন। কলিকাতার দল সমূহের আগ্রহ দেখা যায় কিন্তু সুবিধা বিশেষ করিতে পারেন না। কি করিলে তাঁহাদের খেলার উন্নতি ও কি ভাবে খেলা উচিত এসব বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। 'সব জান্তা' ভাবটা এ খেলায় থাকা উচিত নহে। আর যেন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে তাঁহারা উদ্যত না হন। তাঁরা যেন তাঁদের Bid ও খেলায় এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

শুনা যায় Theta Beta Clubএর তিনটী দল এ বৎসর যোগদান করিবেন। জনরব কমল ঘোষের দল হইবে কিনা এখনও ঠিক হয় নাই। আশাকরি তিনি যেন আমাদের এ বাৎসরিক আমোদ হইতে বঞ্চিত না করেন।

এ বৎসর Gold Cupএর বৈঠক ক্লাবের সভাপতি কুমার অমিয় নারায়ণ সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটী ১নং মহারাণী হেমন্ত কুমারী ষ্ট্রীটে বসিবে। আমরা আশা করি প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতার শ্রীবৃদ্ধি হউক ও যেন খেলার উন্নতি করে এবং সকলের মধ্যে একতার সৃষ্টি আনে। Mr. J. E Borrellএর ভাষায় বলিতে পারি তাস খেলায় "Body line bowling" নাই।

প্রতিযোগিতার প্রবেশের শেষ দিন ৯ই নভেম্বর। সবিশেষ বিবরণের জন্য ১ নং ন্যায়রত্ন লেনে সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কার্মাটার গৌর প্রতিষ্ঠান

কারমাটার গৌর প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সাঁওতাল পরগণার কারমাটারে শ্রীশ্রী৺কালীপূজা ও নবগৌর বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজা উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণের সেবা ও বস্ত্র বিতরণের সুবন্দোবস্ত হইয়া ছিল। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোং লিঃ ড্রামাটিক ইউনিয়ন "চন্দ্রগুপ্ত" ও "গয়াতীর্থ" অভিনয় করিয়া সমগ্র কারমাটার বাসীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ সিংহ, রায় বাহাদুর কেশবলাল রায় চৌধুরী, রায় সাহেব অন্নদা মিত্র, ডাঃ সুধীর কুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু এডভোকেট, ডাঃ শিবচন্দ্র বসু, ডাঃ নিতাই চাঁদ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ তিনকড়ি ঘোষের উদ্যোগে ও স্থানীয় জমীদার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে উৎসব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

সার্ব্বজনীন কার্ত্তিকপূজা

আগামী ৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ২নং ওয়ার্ডে বেনিয়াটোলার সাঝের মজলিসের উদ্যোগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সার্ব্বজনীন কার্ত্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হইবে।

সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও উপস্থিতি এবং সভ্যগণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

শ্রীঅজিত দে

রাত্রি তখন গভীর।

ঘরের ভিতর হইতে খুট্ খুট্ ক'রে খিল্ খোলার শব্দ হইতেই গুটিকতক ক্ষুদ্র নিশাচর জীবের ক্ষিপ্র পলায়নের খস্ খস্ আওয়াজে নিঝুম রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন একটু নড়িয়া উঠিল। সরস্বতী খিল খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া একটু চাপা গলায় বলিয়া উঠিল—আশু খুড়ো, এখনও যে রাত অনেকগো। আশুখুড়ো বিড়ি টানিতে টানিতে বলিলেন—সতী আজ আমায় একটু তাড়াতাড়িই যেতে হবে রে, ভোর বেলাই আবার পাড়ার পাঁচজন বাড়িতে এসে জুটবে কিনা,—আজকে যে ঘোষবিবির বিচার হবে। সতী ঘরের কোনে মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়া গায়ের কাপড় গুছাইয়া আশু খুড়োর চটিজোড়া দরজার বাহিরে রাখিয়া দিল। প্রদীপের স্বল্প আলোকে আশু খুড়োর পরিপক্ক মুখের কিয়দংশ দেখা গেল। চোখজোড়া যেন বিশ্বের পুঞ্জীভূত রহস্য-ভারে ছোট হইয়া আসিয়াছে—হয়ত' শীঘ্রই একদিন বুজিয়া যাইবে আর খুলিবে না। সতী বলিল—হ্যাঁ গো খুড়ো, ঘোষেদের ঐ মেয়েটির ওপর তোমরাত' খুব উঠে পড়ে লেগেছে—কিন্তু ওর দোষটি যে কি তাত' তোমরা খুলে বল না। খুড়োমশাই খক্ খক্ করিয়া কাসিয়া বলিলেন, ওরে ঐ বিবির কথা ছেড়ে দে। সোমত্ত মেয়ে তুই, তায় বিধবা; তুই যাবি এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় মাষ্টারণীগিরি করতে, সকালসন্ধ্যা মেয়ে পড়াতে। মালতীর কি এটা উচিত হচ্ছে! তুই-ই বলনা সতী? সরস্বতী কোন কথা কহিল না।

প্রদীপের আলোয় খুড়োমশায়ের মুখখানি একবার দেখিয়া লইয়া মুচকি একটু হাসিল মাত্র। খুড়োমশাইও যেন সেই হাসির প্রত্যুত্তরে ঠোঁট উল্টিয়ে নিমীলিত চক্ষু আরও একটু টিপিয়া নিমীলন করিলেন। এই ভাবে কথা কহিতে কহিতে খুড়োমশায়ের হঠাৎ যেন সাড় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন - ওরে সতী বাইরে যে আলো বেরিয়ে গেলো, এই দেখ'! এবার বোধহয় আমিও বিপদে পড়লুম রে! সতী তৎক্ষণাৎ উত্তরে কহিল—খুড়ো; তোমার আর ভয় কি বল—তুমি তিন তিন খানা গ্রামের পঞ্চায়েতদের মাথা, তোমার আবার ভয়!

খুড়ো ঘরের বাহিরে আসিয়া চটিজোড়াটি পরতে পরতে বলিলেন সতী, বড় মিষ্টি কথা কইতে পারিস তুই, ঐ জন্যেইত এখানে এলে আমার আর গা তুলতে ইচ্ছে হয় না। সতী একটু হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, তোমার যা কথা! তারপর খুড়োর হাতদুটি ধরিয়া বলিল—খুড়ো যে শাস্তিই তোমরা ওকে দাও, একেবারে গ্রাম ছাড়া করে দিও না; মালতী বড় গরীব কোন রকমে মাষ্টারনীগিরি করে মেয়ে পড়িয়ে দুটি পেটে খায়; আর তা ছাড়া ও সত্যিই খুব ভালো মেয়ে।

আশুখুড়ো সোহাগভরে সতীর চিবুকটি ধরিয়া—বলিলেন আচ্ছাগো আচ্ছা—এখন তবে আমি চলি, পথে কারুর সঙ্গে আবার দেখা না হোলেই বাঁচি; যে রকম আলো বেরিয়ে পড়েছে! এই বলিতে বলিতে খুড়ো পা টিপিয়া টিপিয়া অত্যন্ত সন্তর্পনে উঠন পার হইয়া চলিয়া গেলেন।

এইখানে সরস্বতী অর্থাৎ সতীর একটু ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন। সরস্বতীর মা দুই বছরের মেয়ে রেখে মারা যান। বৃদ্ধ বাপ তাকে অতি দুঃখ কষ্টের মধ্যেই লালন পালন করেন। বৃদ্ধ বয়সের ঐ একমাত্র মেয়ের জন্য হরিহর বাবু যখন পাত্র খুঁজিতে লাগিলেন তখন গরীবের মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি তা হাড়ে হাড়েই বুঝিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় গ্রামের মাতব্বর আশু বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দাবা খেলিতে খেলিতে বহু দুঃখেরই কথাবার্ত্তা তাঁর চলিত। বলিতেন, দেখো আশু, মেয়েটার ও' আর কোন পাত্রই জুটলো না—তা তোমরা বাপু যাহোক একটা দেখে শুনে দিও। তুমি ব্রাহ্মণ, সজ্জন, বিবাহ না করে গ্রামের পাঁচ জনের ভালো মন্দ দেখে জীবনটা তুমিও প্রায় সাধু সন্ন্যেসীদের মতই কাটিয়ে দিলে। আশুখুড়ো তখুনি বলিতেন—হরিহরদা তুমি কিছু ভেবো না—সরস্বতীকে যদি কেউ না বিয়ে করে তো আমি নিজে ওকে বিয়ে করব, এই বলিয়া এক প্রস্ত উচ্চরোলে হাসিয়া লইতেন। সরস্বতীর বয়স তখন প্রায় পনেরো বৎসর, কাছে থাকিলে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া সে সরিয়া যাইত। সরস্বতীর বিবাহ অবশ্য হইয়াছিল—কিন্তু হরিহর বাবু তা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আশুখুড়োর চেষ্টায় পাঁচ ছ'খানি গ্রাম দূরে এক ভদ্রলোক দ্বিতীয় পক্ষে সরস্বতীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহ করিয়াছিলেন নিজের জন্য নয়; দশ'বারো বৎসরের দুটি ছেলেকে দেখাশুনার জন্যই তাঁর এই বিবাহ। ভদ্রলোকের কিছু জমিজমা ছিল—এবং সরস্বতীকে ঐ বয়সে দেখিতেও মন্দ ছিল না, অতএব একটি পয়সা না লইয়া তিনি যখন সরস্বতীকে বিবাহ করিলেন তখন প্রতি গ্রামেগ্রামেই সাড়া পড়িয়া গেলো; সকলেই বলিতে লাগিল—আহা হরিহর বাবুর জামাই অতি

ভদ্রলোক—একটি পয়সা নেয়নি। বুড়োর বরাৎ খারাপ তাই মেয়েটার বিয়ে দেখে শান্তিতে যেতে পারল না। কিন্তু সে ভদ্রলোকও বছর আষ্টেক পরে চোখ বুজলেন। সরস্বতীর কোলে তখন একটি ছয় বৎসরের শিশু সন্তান, বিধবার ঐ একমাত্র অবলম্বন। সরস্বতী সতাত পুত্রদের সহিত শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুতেই একত্র থাকিতে পারিল না, সেই ছেলেরা তাহাদের মামার প্ররোচনায় সৎমায়ের সহিত জায়গা-জমি লইয়া মামলা জুড়িয়া দিল। আশুখুড়ো তখন সরস্বতীকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজেই মামলার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সরস্বতীও কিছু অংশ সম্পত্তি পাইল। সেইথেকে আশুখুড়োই সরস্বতীর সমস্ত দেখা শুনা করিতেন।

আশুখুড়ো চলিয়া যাইবার পর সতী দাওয়ায় বসিয়া তাহার এই পূর্ব স্মৃতিটুকুই মনে মনে চিন্তা করিতেছিল। সহসা তার নিজেরই অজ্ঞাতে দুই চোখ দিয়া দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এইতেই তাহার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে নিজের জীবনের প্রতি তার ধিক্কার আসিল। সে সন্তানের জননী। কলিকাতার এক আশ্রমে আশুখুড়ো তাকে রাখার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সরস্বতীর মনে পড়িল প্রথমে সে ছেলেকে কলিকাতার আশ্রমে রাখিতে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু আশুখুড়ো কি জানি কি কারণে যেন জোর করিয়াই ছেলেকে লইয়া কলিকাতায় রাখিয়া আসিয়াছে। সন্তান ক্রমশঃ বড় হইতেছে। উপযুক্ত বয়সে সে যখন আসিবে অথবা কলিকাতায় থাকিয়া মায়ের খবর লইবে তখন সে কি ভাবিবে। সরস্বতী এই কথা চিন্তা করিতেই শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে—রাত্রে আশুখুড়ো আসিলে সে তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিতে বলিবে। কোন ভদ্রগৃহস্থের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করিতেও সে রাজী আছে, কিন্তু এদেশে আর সে কখনও থাকিবে না!

এদিকে খুড়োমহাশয় প্রভাত হইবার পূর্বেই লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাতঃকৃত্য এবং পূজা আহ্নিকাদি সারিয়া সদরে আসিতে বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়া গেলো। ইতিমধ্যেই মালতীর বিচারের জন্য গ্রামের পঞ্চায়েতগোষ্ঠী এবং বিশিষ্ট শিক্ষিত লোকদের উপস্থিতিতে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সদর পরিপূর্ণ। বিড়ি এবং তামাকের শ্রাদ্ধ হইতেছে। শিখাধারী কাব্যতীর্থ ও ন্যায়-রত্নগণ জালা জালা নস্য টিপিয়া নাসিকারন্ধ্র একেবারে প্রায় বুজাইয়া আনিয়াছেন। খুড়োমহাশয় তসরের কাপড় পরিয়া গাত্রে একটি শতছিদ্র নামাবলী জড়াইয়া, গলায় কণ্ঠী এবং নাসিকায় কৃষ্ণকলি আঁকিয়া একজোড়া খড়মের সাহায্যে নিজ আগমন ঘোষণা করিয়া মুখে 'রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ' বলিতে বলিতে সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। সভাস্থলে সেই 'রাধে গোবিন্দে'র প্রতিধ্বনি করিয়া কেহ বা বিড়ী লুকাইয়া আসুন আসুন বলিল, কেহ বা নলচের আড়ালে দৃষ্টি রাখিয়া 'জয় রাধে' বলিতে বলিতে ধূমোদ্গারণ করিল। গ্রামে আশু খুড়োর পরই ন্যায়রত্নমহাশয়ের প্রতিষ্ঠা। তিনি নাকে একটিপ নস্য লইয়া গৃহের এক কোনে দৃষ্টি রাখিয়া বামাচরণ' বলিয়া চীৎকার করিলেন। এই ডাকে যে যুবকটি দাঁড়াইয়া উঠিল তাহার বয়স অনুমান আটাশ উনত্রিশ বলিয়া বোধ হয়। বলিষ্ঠ দেহের ওপর তাহার মুখশ্রীর এমন একটি দিপ্তী রহিয়াছে যে তাহাকে দেখিলেই কোন সম্ভ্রান্ত ধনী বংশের সন্তান বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয় না এবং সে যে শিক্ষিত সে কথাও তার চোখের দৃষ্টি হইতেই বোঝা যায়। ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার নামই বামাচরণ?

সে উত্তর করিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় 'রাধে গোবিন্দ' বলিয়া নিমীলীত চক্ষু হইয়া অলক্ষ্যে অধিষ্ঠিত যেন কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আপনি কি মালতীর সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হুঁ, মালতীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?

বামাচরণ অতি নরম সুরে বলিল—তার সাথে আমার সম্বন্ধ জেনে আপনাদের বিশেষ কিছুই লাভ হবে না—তার চেয়ে মালতীর ওপর কি দণ্ডাদেশ হয়, আপনারা দয়া করে আমাকে শুধু সেই কথাটাই জানিয়ে দিন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন—তা' মালতীকে যে আমরা এখানে আসতে বলেছিলাম, সে এলো না কেন?

বামাচরণ এবার একটু কঠিন হইয়া উত্তর করিল—মালতী এখানে আসতে পারবে না—তার প্রতি যা দণ্ডাদেশ হয় আমিই তা' মাথা পেতে নেব—আপনারা বলুন।

গৃহের এক কোনে একটি অশীতিপর বৃদ্ধ অহিফেন্ প্রভাবে মুহ্যমান ছিলেন, বামাচরণের এই উত্তর শুনিয়া গলার স্বর দ্বিগুণ চড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—শুনেছো হে বাঁড়ুয্যে—বিবিসায়েবের আজ লজ্জা হোয়েছে!

এই কথা শুনিয়া বামাচরণ জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বৃদ্ধের দিকে রক্ত চক্ষু মেলিয়া হয়ত' কিছু একটা কাণ্ড বাধাইবার উপক্রম করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সদরের দিকে চোখ পড়িতেই সে দেখিল মালতী এই দিকেই আসিতেছে।

এই সভায় গ্রামের যুবসঙ্ঘের প্রতিনিধি স্বরূপ জনকয়েক বলিষ্ঠ যুবক ছিল, তাহারা মালতী সভায় পৌছিবা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল; বৃদ্ধেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলেন এসো মা এসো।

হঠাৎ যুবসঙ্ঘের একটি যুবক বলিয়া উঠিল—আশুখুড়ো, যে স্ত্রীলোকের অপরাধ বিচারে আপনারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন তাঁকে মা বলতে আপনাদের মর্য্যাদার হানি হচ্ছে না?

মালতী একবার মাত্র সেই উদ্ধত যুবকের দিকে তাকাইবা মাত্র যুবক চক্ষু নত করিয়া মালতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতী তাহার কাঁধে হাত দিয়া নরম সুরে বলিল—সুবিমল তুই চুপকর্ ভাই।

মালতীর এই কথায় সুবিমলের বলিষ্ঠ দেহে এবং দৃষ্টিতে যেন কিসের একটি বোঝা নামিয়া আসিল। সেই বোঝার ভারে সে তার ব্যক্তিত্ব যেন ইচ্ছা করিয়াই ধূলার সহিত মিলাইয়াছিল। সুবিমলের এই পরিবর্ত্তন সভাস্থ কোন সভ্যেরই দৃষ্টি এড়াইল না, বিশেষ করিয়া যুবসঙ্ঘের প্রত্যেকেই মালতীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় দৃষ্টি নত করিল।

এই অল্পক্ষণের মধ্যে একটি চঞ্চল ঝড় বহিয়া গেল, যাহার ফলে ঘরের আব-হাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সেখানকার নিস্তব্ধতা যেন অধিকতর গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন বাঁড়ুয্যে মহাশয়। যুবসঙ্ঘের প্রতি একবার তাকাইয়া একটু ভৎর্সনা মিশ্রিত স্বরে বলিলেন মালতী, গ্রামের প্রায় সকলেই তোমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হোয়ে উঠেছেন এবং বামাচরণবাবুর সঙ্গে তোমার একত্র বাস সে সন্দেহের রহস্য আরও গভীর করে তুলেছে। ওপাশ হইতে ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কথার সুর টানিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আর অসৎচরিত্র স্ত্রী-পুরুষকে আমরাত' আর গ্রামের মধ্যে থাকতে দিতে পারি না—তাতে সমাজ যে রসাতলে যাবে, গ্রামের যে অমঙ্গল হবে। মালতী এই কথার কোন প্রতিবাদ করিল না। বামাচরণবাবু লাফাইয়া উঠিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন—তার কোন প্রমান আপনারা······

কিন্তু বামাচরণের কথা শেষ হইতে পাইল না। মালতী বামাচরণকে থামাইয়া বলিতে লাগিল—বাঁড়ুয্যে মশায়, আপনারা বলুন কি শাস্তি আমাকে নিতে হবে, আমি প্রস্তুত আছি।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় এদিক ওদিক তাকাইয়া ন্যায়রত্নকে বলিলেন—বল'না হে কি বিধান তোমরা করবে। ন্যায়রত্ন সেই জাতীয় ব্রাহ্মণ যাঁহারা অপরের সম্বন্ধে অপ্রিয় কথা বেশ সদর্পেই উচ্চারণ করিতে পারেন। তিনি বলিলেন—তোমাকে কাল সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বেই এ গ্রাম থেকে চলে যেতে হবে।

বামাচরণ রাগে ফুলিতেছিল সে আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—মালতী একলা নয়; আমিও তার সঙ্গেই যাব'—তবে আপনাদের চরিত্র সম্বন্ধে···

এবারও মালতী তাহার কথা শেষ করিতে দিল না। শাড়ীর একটি প্রান্তে একবার চোখদুটি মুছিয়া সে বলিল—না আমি একলাই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। যুবসঙ্ঘ মালতীর এই কথায় অত্যন্ত উত্তে-জিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহাদের প্রতি তাকাইয়া মালতী পুনরায় বলিল—আপনারা এই বিচারের জন্য এতটুকু দুঃখ করবেন না। তবে এর পর থেকে গ্রামের যেন কোন নিরপরাধিনীকে এরা ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে না পারেন আপনারা আজ থেকে শুধু সেই চেষ্টাটুকুই করুন। কথার শেষ দিকে মালতীর কণ্ঠস্বর ধরিয়া আসিয়াছিল। এই কথা বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেলো—পিছনে পিছনে বামাচরণ বাবুও বিমর্ষ পদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন। সভাস্থ সকলেই তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া যতক্ষণ দেখা যায় দেখিল; প্রতিজনের মুখেই যেন একটা বিস্ময়ের ভাব। যাহারা এই মেয়েটির চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়াছিল তাহারা মালতীর দৃঢ়চিত্ত এবং সংযম লক্ষ্য করিয়া স্তম্ভিত হইল, মনে মনে তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়াও পারিল না। বিচারের সভা ভঙ্গ হইল, বাঁড়ুয্যে মহাশয়, ন্যায়রত্ন; কাব্যতীর্থদের প্রতি গর্ব্বভরে একবার তাকাইয়া 'রাধে গোবিন্দ' বলিতে বলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বামাচরণ বলিল, 'মালতী তুমি বড় ভুল করলে, তোমার সঙ্গে আমারও যাওয়া উচিত ছিল—এই পশুর দেশে আমার আর এক মিনিটও থাকতে ইচ্ছে করে না। মালতী বামাচরণের দিকে তাকাইয়া বলিল—তুমি কিছু দিন এখানে থেকে সুবিমলদের সঙ্ঘটিকে একটু মানুষ করে তোল। মনে আছে ত' আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিন আমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বামাচরণ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—বেশ তাই' হবে—কিন্তু তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে ত'?

মালতী ততোধিক আবেগের সুরে বলিল—তোমার জন্য আমি কি এতদিন অপেক্ষা করেই ছিলাম না?

সারা পথ এইরূপ কথোপকথনে অতিক্রম করিয়া তাহারা যখন গৃহে পৌছিল তখন রৌদ্রের তেজ ভীষণ বাড়িয়াছে,

গ্রীষ্মের দুপুর নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছে। গৃহে যাইতেই মালতীর চোখ পড়িল, অদূরে দাওয়ার ওপর উপবিষ্ট সরস্বতীর দিকে। মালতী আগাইয়া আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ওমা, এখানে বসে আছ সতী, কতক্ষণ এসেছ ভাই, চল ঘরে চল।

সরস্বতী বলিল—আমি তোমার জন্যেই বসে আছি। আশুখুড়ো তোমাদের কি শাস্তি দিলেন সেই কথাটাই আগে আমায় বলতো ?

মালতী হাসিতে হাসিতে বলিল—আমি চরিত্রহীন কিনা, তাই কাল ভোরের আগেই এ গ্রাম ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। সরস্বতী একমুহূর্ত্তের জন্য কঠিন হইয়া গেলো। দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়া শুধু বলিল—ঠিক ঐ শাস্তিই দিয়েছেন! মালতী হাসিয়া কোন কথা না বলিয়া তাহাকে প্রায় ঠেলিয়াই ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মালতী এবং সরস্বতী সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসতে আসতে মালতী বলিল—সরস্বতী, বোন, চল একবার ওঁর কাছে কথাটা জানিয়ে আসি। ওঁর মতটাও একবার নেওয়া উচিত। সরস্বতী বলিল—চলো, কিন্তু উনি যদি না বলেন আমি সে কথা শুনবো না।

মালতী একটু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা সে না'কে 'হ্যাঁ' করার ভার আমি নিলুম। মালতী বামাচরণ বাবুর কাছে গিয়া সরস্বতীর সমস্ত কথাই বলিয়া তাঁহার মতা-মত লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল সরস্বতী তখন উদ্বেগ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাই মালতী, উনি কি বল্লেন? মালতী সরস্বতীর চিচুকটি ধরিয়া সস্নেহে একটু নাড়া দিয়া বলিল—সে কথা তোমার না ভাবলেও

চলবে; তাহলে কখন আসছ' ভাই? ইত্যাদি কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে মালতী সরস্বতীকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিল—তখন দেখিল বামাচরণবাবু বোধহয় তার সহিত কথা কহিবার জন্যই বাইরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মালতী আসিতেই বামাচরণ গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—মালতী কাজটা কিন্তু খুব ভালো হলো না; অন্য কিছুর জন্যে আমি ভাবি না; তবে ঐ সদাশয় সাধুসন্ন্যেসী গোছের লোকটি বোধহয় মনের দুঃখে এবার বনেই চলে যাবেন। মালতী সেই কৌতুক আরো একটু ঘন করিয়া তুলিবার ইচ্ছায় ঈষৎ হাসিয়া বলিল আর তুমি কোথায় যাবে, যুবসঙ্ঘের আশ্রম খুলবে?

বামাচরণ ও মালতী সরস্বতীর সম্বন্ধে পাঁচজনের অভিমত এতদিন যা শুনিয়াছিল তাহার সহিত এইমাত্র জ্ঞাত সত্যতার তুলনা করিয়া দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল—মানুষের সত্য পরিচয়টি এ জগতে কতই না দুর্লভ। যাহারা তাহাকে পরম পরিচিত আপনার জন বলিয়া চিনে তাহারা হয়ত কিছুমাত্র বুঝিবে না যে ঐ নারীর জীবনে কি ভীষণ একটি বিষাদময় জীবনের যবনিকা পাত হইল। সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য একটি নারী তাহার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইল না ঠিক সেই অপবাদের যন্ত্রণা এড়াইবার জন্য অপর একটি নারী বর্ত্তমানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া অনির্দ্দিষ্টের পথেই পা বাড়াইল। অথচ সব চেয়ে বিস্ময় হইল এই যে ইহাদের জীবনে যাহারা ঝড়-তুফানের আন্দোলন জুড়িয়া দেওয়ার জন্য সত্যই অপরাধী তাহারাই লাভ করিল সাধু-সন্ন্যাসীর আখ্যা, সংসারে তাহারা পরম শ্রদ্ধায় পূজা পাইল, মানুষ তাহাদের দুয়ারে পৌঁছাইল নীরব বশ্যতার অঞ্জলি।

পরদিন প্রত্যুষের বহু পূর্ব্বেই বামাচরণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের উত্তর কোণে মালতীর ঘর, সেই ঘরের বন্ধ দুয়ারের কাছে একটি বিড়াল 'ম্যাও ম্যাও' করিতেছে সে লক্ষ্য করিল। অতি প্রত্যুষে মালতীর দুয়ারে উপস্থিত হওয়া এই বিড়ালটির নিত্য কর্ম্ম। মালতী প্রত্যহ রাত্রে দুধ খাইত; তাহার কিয়দংশ রাখিয়া সে প্রত্যহ প্রভাতে এই বিড়ালটিকে দিত। আজ কিন্তু দুয়ার বন্ধ দেখিয়া বিড়ালটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া 'ম্যাও ম্যাও' করিতেছিল। বিড়ালটির জন্য বামাচরণের দুঃখ হইল। সে নিজেই ঘর খুলিয়া দেখিতে গেলো যদি কিছু পায়। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল গতরাত্রে মালতী দুধ খায় নাই, দুধের বাটি যেমনটি রাখা হইয়াছিল তেমনি ভাবেই ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। দুধের বাটিটি বাহিরে আনিয়া রামচরণ বিড়ালটির সামনে ধরিয়া দিল। বিড়ালটি স্বোৎসাহে দ্বিগুণ আনন্দে তাহা নিঃশেষ করিতে লাগিল। বামাচরণ দূরে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিল এবং ভাবিতেছিল একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে বিড়ালটির স্বরে এবং চোখের দৃষ্টিতে ছিল দুঃখের ব্যঞ্জনা, কিন্তু একবাটি দুধ ভক্ষনের পর সে পরম পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বামাচরণের মুখ দিয়া তাহার অজ্ঞাতেই দুটি কথা বাহির হইয়া আসিল—'হায়রে, মানুষ যদি তোর মতই স্মৃতিহীন হোতে পারত!' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বামাচরণের চমক ভাঙ্গিল। নিজের অজ্ঞাতে চোখে হাত পড়িতেই সে কোঁচার কাপড় তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। এদিকে আশুখুড়ো অতি ব্যস্তভাবে যেন পাগলের মত হইয়া বামাচরণের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই দিকেই আসিতেছিলেন।

বামাচরণ যেন একটু বিস্মিত হইয়া অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বাঁড়ুয্যে মশায় এই প্রত্যুষে আপনি এখানে? আশুখুড়ো হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—হ্যাঁ বাবা হ্যা, তা মালতা কি চলে গেছে এরি মধ্যে? বামাচরণ আশুখুড়োকে এদিক ওদিক তাকাইতে দেখিয়াই বুঝিয়াছিল কাহার খোঁজে তিনি আসিয়াছেন। বামাচরণ বলিল—আশু-খুড়ো একটু দাঁড়ান। এই বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়াই আবার তখুনি বাহির হইয়া আসিল। আশুখুড়োর হাতে একগোছা চাবি দিয়া বামাচরণ বলিল—বাঁড়ুয্যে মশায়, সরস্বতী আপনাকে এই চাবিগুলি দিয়ে গেছে, আর বলে গেছে, কলকাতার আশ্রম থেকে তার ছেলেকে যেন কখনও আর এই গ্রামে আনা না হয়, সে যদি মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করে তবে বলবেন, তার মা মারা গেছে। প্রভাতের আবছায়া আঁধার তখন ফরসা হইয়া গিয়াছে, রাত্রির কালিমা ধুইয়া মুছিয়া নবীন প্রত্যুষের শুভ্রতায় দিগন্ত প্লাবিত হইয়াছে কিন্তু বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মুখের ঘন-বিষাদময় ঘোর কালিমা এই সংবাদে যেন আরও গভীরভাবে ঘনাইয়া উঠিল। তিনি যেন আর কিছুই চোখে দেখিতে পান না, পায়ের নীচের মাটি যেন ক্রমশই সরিয়া যাইতে লাগিল। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন—বামাচরণ, এখানে একটু বসব' বাবা, এই বলিয়া তিনি দাওয়ার একপ্রান্তে আসিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।
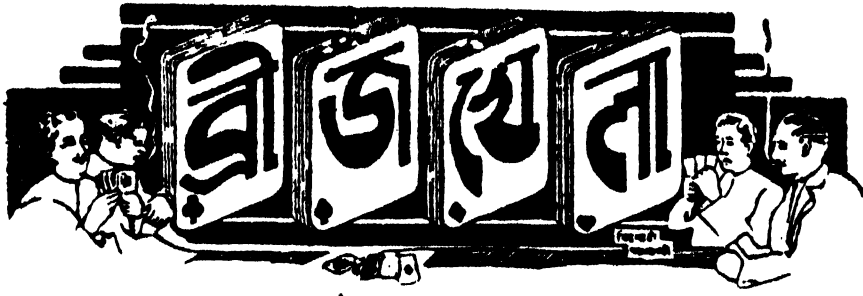
শ্রীদুর্ব্বাসা

ডাকের কয়েকটি সমস্যা ঃ— এবারেও ডাকের আরও কয়েকটি সমস্যা প্রদত্ত হইল। আপনি উত্তরে বসেছেন। আপনার হাতে আছে ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, পঞ্জা; হরতন—সাতা, ছক্কা, তিরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, চৌকা; চিড়িতন—টেক্কা, দশ, সাতা, ছক্কা।

ডাক হয়েছে

'উ'	'দ'
একটি চিড়িতন	একটি ইস্কাবন
?	

আপনি এখন কি ডাক দেবেন? এই হাতে অবশ্য প্রারম্ভিক একটি ফেরাইএর ডাক দেওয়া চল্‌ত, কিন্তু হরতন রঙে দুর্ব্বলতার দরুণই ইনি চিড়িতনে ডাক দেওয়া ঠিক্ করেছেন। যা' হোক্ উপস্থিত দুইটি ইস্কাবনে ডাক দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ফেরাইএর ধাঁচের তাস থাকলেও নিম্নলিখিত কারণের জন্য এই মাঝামাঝি ডাক দেওয়া হল। মাত্র চারখানি অনারের পিট নিয়ে তার ওপর একটি রঙে পিট আটকাবার তাসের অনুপস্থিতি হেতু দুইটি ফেরাইএ ডাক দেওয়ার পক্ষে হাতখানি নিতান্ত দুর্ব্বল; অথচ একটি ফেরাইএ ডাক দেওয়ার পক্ষে হাতটি শক্তিশালী। সুতরাং দুইটি ইস্কাবনে ডাক দিলেই ঠিক হয়, আর খেঁড়ীরও তাতে সাহস আসে।

(২) ডাক চলেছে নিম্নলিখিতরূপ,

'উ'	'পূ'
একটি ইস্কাবন	দুইটি হরতন
?	
'দ'	'প'
তিনটি চিড়িতন	পাশ

আপনি উত্তরে বসেছেন; আপনার হাতে আছে, ইস্কাবন—টেক্কা, সাতা, ছক্কা, চৌকা, দুরি; হরতন—গোলাম, তিরি রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, পঞ্জা; চিড়িতন—আটা, সাতা, ছক্কা।

আপনি এখন কিসে ডাক দেবেন?

তিনটি ইস্কাবনে এখন ডাক দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ। সকল ক্রীড়কের পক্ষেই ইহা ভীতিপ্রদ অবস্থা। অথচ এক্ষেত্রে একেবারেই পাশ দেওয়া চলবে না। নূতন রঙে আপনার খেঁড়ী যখন তিনটির ডাক দিয়েছেন তখনই বুঝতে হবে যে ইহা one-over-one takeout কিংবা two-over-one takeout ডাকের মতই আবাহনকারী ডাক। তা'ছাড়া এক ইস্কাবনে এ হাতের দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান কিন্তু এ হাতে কোন ডাকযোগ্য রঙও অনুপস্থিত। আবার আপনার হাতেও অন্য কোন রঙ না থাকায় ইস্কাবনেই আপনাকে পুনরায় ডাক দিতে হবে। যেহেতু হরতনে পিট আটকাবার কোন তাস নেই, তিনটি ফেরাইএও ডাক দেওয়া অসম্ভব।

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—'বলছি যায়গা নেই তবুও তুমি বলবে সন্দেশ দিচ্ছি'—বলে ও এগিয়ে আসে। ওর মা হেসে দুটো সন্দেশ ওর দুধের বাটীতে দিয়ে, বাটীটা তুলে ধরেন ওর মুখের কাছে।

খাওয়া শেষ করে ও আঁচাতে চলে যায়। ঘরে ঢুকে ক্যাম্প-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরায়।

ওর মা ওঘর থেকে চেঁচিয়ে বলেন—চপল এক্ষুণি কাগজ কলম নিয়ে বসিস্ নে যেন। শরীর খারাপ হবে। খেয়ে দেয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে তবে অন্য কাজ করতে হয়।

'আচ্ছা তাই'—বলে ও আবার এলিয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ বাদে চোখে নেমে আসে নিদ্রা। ও ঘুমিয়ে পড়ে চেয়ারটাতেই।

পঞ্চম পর্য্যায়

ঘুম যখন ওর ভাঙলো তখন বেশ বিকেল হয়ে গেছে। বাড়ীর গাছগুলোর মাথায় ঈষৎ লালচে ধরণের রোদ্দুর পড়েছে। ওর ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে সন্ধ্যার ছায়া। ও তাড়াতাড়ি উঠে বসে। ওর সারা দেহে তখন অদ্ভুত এক জড়তা। হঠাৎ ওর মনে পড়লো ওকে যেতে হবে সুদূর ভাবানীপুরে, সাহিত্য-সমিতির পূর্ণিমা সম্মেলনে মৃণালবাবু বার বার অনুরোধ করে গেছেন; না গেলে ভালো দেখায় না। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসে ও বসলো ওর টেবিলে; মনে মনে ভাবতে সুরু করলে ও কি বলবে। নতুন একটা বলতে হবে নিশ্চয়ই। গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করে চলতে ওর ভালো লাগে না। হ্যাঁ ঠিক করে ফেলেছে। গোর্কীর সাহিত্য প্রতিভাকে নিয়ে আলোচনা করে ও দেখাবে যে—মুষ্টিমেয় লোকের জন্যে সাহিত্য নয়। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে পরিচয় করে যে সাহিত্য পা বাড়াতে পারলো না, তাব মরণ সুনিশ্চিৎ। দেশের মুষ্টিমেয় য়্যারিষ্টোক্র্যাটদের জীবন প্রণালী ও সমস্যাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে সত্যিকার দেশের মানুষ যারা তাদের দিকেই নজর দেওয়া উচিত। লক্ষ লক্ষ কলের কুলি বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে তিলে তিলে বিলিয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য, কোটী কোটী কৃষক রৌদ্র-জলে ভিজে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে আমাদের বিলাসের সামগ্রী, পেটের অন্ন যুগিয়ে চলেছে—তাদের কথা কেউ লেখে না। কেউ বোঝে না তাদের ব্যথা; তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ ধরে না কলম। এখানেই দেশের সাহিত্যের আত্মহত্যা। দেশের সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটী লোককে বাদ দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ লোকের কথা নিয়ে মাতা-মাতি করা, এতে আছে মরণের বিষ। দরিদ্র চাষার কুটীরে যখন অন্নের হাহাকার ওঠে, দুমুঠো খেতে না পেয়ে যখন স্বামী খুন করে স্ত্রীকে মনের স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে, অথবা একই সাথে সপরিবারে লাগায় গলায় ফাঁসি—তাদের দুঃখের কাহিনী কেউ শোনে না বুঝতেও চায় না। বিরাট দেশ, যা একবার জাগলে সারা দুনিয়াকে দিতে পারে রসাতলে, তারা পড়ে আছে অন্ধ সংস্কার আর অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে। দেশের সাহিত্য যদি তাদের দিকে না তাকালো, তারা যদি বুঝতে না শিখলো নিজের দেশের অবস্থা, তা'হলে সাহিত্যের কিই বা প্রয়োজন? চপল নিজেই আত্মহারা হয়ে পড়ে। ওর মনে পড়ে ও একবার খবরের কাগজে পড়েছিল এক দরিদ্র কৃষক অন্নসংস্থানের কোন উপায় না দেখে—নিজের দু'টো ছেলেকে আছড়ে মেরে ফেলে, তারপর স্ত্রীর গলা কাটারি দিয়ে কেটে নিজে গলায় কাপড় লাগিয়ে আড়ায় ঝুলে সকল দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সে কথা মনে হলে ওর এখনও চোখ ফেটে জল আসে। শস্যশ্যামলা বাঙলা জননীর সন্তানদের একি অবস্থা! এর জন্য দায়ী কে? দায়ী কি দেশের উচ্চ শ্রেণীরা নয়? শিক্ষার আলো পেয়ে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে ওদের দিক থেকে। গ্রামের দুরবস্থার মধ্যে যারা দিনের পর দিন কাটিয়ে বরণ করে নিলে নিজের মৃত্যুকে, তাদের কথা কেউ শুধালে না। চপল এই সব ভাবতে ভাবতে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

পূর্ণিমা-সম্মেলনে মিলন বাসর। নেহাত তরুণ-তরুণীদের কাণ্ড। ওতো তারুণ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। চপল নিজের বক্তব্যের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দেয়। প্রতি কথা ওর বেরিয়ে আসে অন্তর থেকে। দেশের দুঃস্থ আত্মা যেন আজ আশ্রয় নিয়েছে ওর অন্তরের মধ্যে। তারই বাণী যেন বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে। ও ভুলেই যায় ও এসেছে মধ্যসমাজের আনন্দ সম্মেলনে, যারা কোন কালেই বুঝতে চায় না গরীবদের অবস্থা। ওর ভেতরের

ভাব যেন স্রোতের মত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—ও তাকে চেপে রাখতে পারে না।

বক্তব্য শেষ করে ও যখন থামলো তখন সারা ঘরটায় বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। ও নিজেই হাপিয়ে পড়েছিল উত্তেজনার মুখে—তাই তাড়াতাড়ি চেয়ার আশ্রয় করে বসে পড়ে। সকলেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে লজ্জা এসে ওর সারা মনকে আশ্রয় করে। ও এমনি করে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল ভেবে নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগলো।

বৈঠক শেষে ও উঠে দাঁড়ায়। সঙ্কুচিত হ'য়ে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। মৃণাল বাবু এসে ওকে নিয়ে চলে অন্য ঘরে ওদের লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখাতে। ও লজ্জিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। কতকটা এগিয়েই বলে—থাকুগে মৃণালবাবু, আর একদিন এসে দেখে যাবো আপনাদের সব কিছু। এসব দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে। তবে, তবে আজকে শরীরটা আমার কেমন জানি খারাপ লাগছে। আমি চলি। আর এক দিন নিশ্চয়ই আসবো নিজেই।

মৃণালবাবু বলেন—সে কি? এরই মধ্যে যাবেন? একটু কিছু না খাইয়ে তো আপনাকে কিছুতেই ছাড়তে পারি না। লাইব্রেরী না হয় অন্য দিন দেখবেন, চলুন কিছু জলযোগ করবেন। পরিশ্রম তো কম হয়নি? কি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা! সত্যিই আপনি যেদিকটা দেখালেন সেদিকটা সাধারণ লেখক শ্রেণী দেখাতে চায় না। তাতেই না দেশের এই অবনতি।

চপল আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ও মনে করে, ওরা বুঝি ওর এই ভাব-বিহ্বলতা দেখে ওকে বিদ্রূপ করছে।

—আজ আমায় ক্ষমা করুণ মৃনালবাবু বলে ও সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সেকি? তা কি হতে পারে? আপনার বাড়াতে সেদিন অত খেয়ে এলাম, আর আজ আপনাকে আমাদের ভেতর পেয়ে এমনি ছেড়ে দেব? তাকি সম্ভব?

অগত্যা চপলকে কিছু খেয়েই যেতে হয়। মোটের ওপর এখানকার আবহাওয়া ওর যেন মোটেই ভাল লাগছিল না।

আচ্ছা নমস্কার—বলে রাস্তার দিকে পা বাড়ায়।

• • • •

খানিকটা রাস্তা ও হেটেই চলবে। বাইরের খোলা আবহাওয়ার মধ্যে এসে ও যেন প্রাণ ফিরে পায়। বাঃ হাঁটতে ওর বেশ লাগছে। এমনি ভাবে হেঁটেই ও চলবে যতদূর পারে; তারপর বাস ধরবে। মৃনালবাবু মোটরে পৌছে দেবার কথা বলেছিলেন, সে কথা স্বীকার না করে ও ভালই করছে। কি হবে ওদের করুণার বোঝা বাড়িয়ে। পৌছে দিয়ে এসে হয়তো মোটরের পেট্রল মেপে দেখবে। তার চেয়ে এমনি করে হেটে যেতে ওর বেশ লাগছে। পূর্ণিমা রাত। রজত শুভ্র আলো ছড়িয়ে পড়েছে বাড়ীগুলোর ছাদে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বনগুলো যেন স্নান করছে কৌমুদীধারায়। ওই দূরে আরম্ভ হয়েছে লোকের আর আলোর ভিড়। জ্যোৎস্না গ্যাছে ওখানে মরে। নৈসর্গিক সুখকে মানুষ ওখানে করেছে হত্যা।···ওর বড় ভাল লাগছে আজকার এই চাঁদের আলো। ও আরো আস্তে আস্তে পা চালায়।

—'নমস্কার'—

চপল পিছন ফিরে চায়। দেখে এক মেয়ে, তাই ও আবার পা চালায়। হয়তো বা আর কাউকেই জানিয়েছে নমস্কার। ফিরে তাকানোই ওর অন্যায় হয়েছে ও ভাবে।

—চপলবাবু—

তাইতো! ওকেই যে ডাকে। ও পিছন ফিরে দেখে সেই মেয়েটাই। 'আমাকে বলছেন?'—বলে ও দাঁড়িয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ আপনাকেই তো জানালাম নমস্কার—চপল খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, তারপর বলে—আমাকে?—আজ্ঞে তা···নমস্কার। কিছু প্রয়োজন ছিল কি?

—আপনার সাথে পরিচয় করে খুসী হতে চাই। আমি আপনার লেখার একজন বিশেষ অনুরক্তা। সুন্দর আপনার ধারা' নতুন কিছু শোনাবার ক্ষমতা আপনার আছে। আপনার··

—আমার?—

—তাইতো। মানে চপল বসুর। আপনিই তো চপল বসু? সেক্রেটারী মৃণালবাবু যে আপনার সেই পরিচয়ই দিলেন। কেমন আপনিই না? মাসিকের সাপ্তাহিকের পাতায় পড়ি আপনার লেখা, দেখি আপনার নাম। মানুষটীকে দেখিনি চিনিনি কোনদিন। আজ শুনলাম আপনার প্রাণ-ঢালা বক্তৃতা। এতখানি আন্তরিকতা না থাকলে কি কেউ কোন ভাল জিনিষ সৃষ্টি করতে পারে?

—তা আমি···

—হ্যাঁ, আপনিই। উদীয়মান গণ-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত চপল বসু মহাশয়, যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন, মানে এই মুহূর্ত্তে কথা বলছি অর্থাৎ আলাপ করছি

তাঁর সাথে অর্থাৎ চপলবাবুর সাথে i. e. আপনার সাথে আমার মিস্ মীরা সেনের একটু প্রয়োজন আছে। তাই যেচে আলাপ করবার এতখানি স্পৃহা। জানেন তো মেয়েরা ভয়ানক স্বার্থপর হয়?

—ও, হয় নাকি?—

—আপনি তো তা জানতেন না এই তো? অর্থাৎ আপনি থাকেন আপনার নিজের ভাবের মধ্যে ডুবে, ওসব দিকে তাকাবার অবসর আপনার নেই। কিন্তু সাহিত্যিক আপনি, মেয়েদের দিকে চোখ না রাখলে, কি সৃষ্টি করবেন? আর যদি কিছু করেনই তবে তা হবে নিছক কল্পনা, মানে নিরর্থক অর্থাৎ জগতের বেশীর ভাগ মানুষের ওপর করা হবে অবিচার। জানেন তো জগতে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই বেশী?

—তাই নাকি?—চপল বিস্মিত চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়।

—বাঃ আপনি যেন তা জানেন না। আমি বড় বেশী বক্‌ছি নয়?

—তাইতো মনে হচ্ছে।—চপল বলে।

—তার মানে?—

—তার মানে এই যে—উপস্থিত এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সব শুদ্ধ যতগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার শতকরা পঁচানব্বইটা আপনার মুখনিঃসৃত।

—বাঃ আপনি তো বেশ মানুষ! দিব্যি সত্যকথা বলার সৎসাহসটাও দেখিয়ে দিলেন অমনি? সত্যি কথাও বলতে নেই যদি তা অপ্রিয় হয় তা বুঝি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

চপল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। মীরা তাকিয়ে থাকে ওর বিস্মিত চোখের দিকে।

—কই একবারে চুপ করলেন যে? কথা বলুন।

—কি বলবো?

—আমাকেই বুঝি তা শিখিয়ে দিতে হবে? বাঃ—কই বলুন।

—আমি? আপনিই যে কি প্রয়োজনের কথা বলবেন বল্লেন।

—হ্যাঁ সে কথা বলছি আস্তে আস্তে—

—কই আমার তো কিছু বলবার ছিল না—

—তা জানি। কিন্তু আলাপ করতেও কি দোষ?

চপল সচকিত হয়ে ওঠে। বলে—হ্যা, এই যে বলছি। এই কি যে বলবো বলবো মনে করছিলুম···। হয়েছে—, আপনার নাম বুঝি শ্রীমতী মীরা সেন?

—না, আমার নাম কুমারী মীরা সেন।

—তার মানে আপনি এখনও স্বাধীন, এই তো?

—পুরোপুরি নয়. মা, দাদা আছেন।

—তা আপনি বুঝি বেথুনে······ না না ইউনিভার্সিটীতে পড়েন?

—হলো না—

—তবে?

—ছেড়ে দিয়েছি গত বৎসর থেকে ও সব হাঙ্গামা। এখন একটু পড়্‌বার চেষ্টা করছি আপনাদের কাছে—অর্থাৎ সাহিত্য চর্চ্চার পাগলামী ঢুকেছে। তাতে কাটে সময় আর মনের ভারও বলতে হবে বৈকি। কিন্তু থাক আর না। আপনার অনেকখানি মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করেছি। চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

একটা ট্যাক্সী ডেকে ও উঠে পড়ে। ভেতরে বসে ডাকে আসুন।

—কি হবে ট্যাক্সীতে? এইতো বাস ধরলেই চলে যেতে পারবো।

—তা হোক, আসুন। চপল ভাবে—তাইতো, কি করা যায়; শেষে উঠেই পড়ে।

মীরা ড্রাইভারকে বলে দেয়—এই, মাণিকতলা চলো।

(ক্রমশঃ)

—:০:—

সাঁওতালী গান

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সইলো সই—
আজ নিশীথে ফুল খেলিতে
বন্ধু এল কৈ।
ফুল গুঁজিনু মাথায় খোঁপায়,
ফুলের নূপুর প'রনু দু'পায়;
ফুলের বসন ফুলের ভূষণ
শুধুই প'রে রই।
যালো সখি যালো সখি যা—
সেই মনোচোর বন্ধুরে মোর
এনে দেখা।
আজ মহুয়া মদের রঙীন্ নেশায়—
তার পরাণে মোর পরাণে
সুধা মিশাই।
ওলো সে যে আমার আমি যে তার
মনের মানুষ হই।

দেহতত্ত্বের গানে যন্ত্রসঙ্গীতের আড়ম্বর —উপযুক্ত কৌতুক-নাট্যের অভাব— উত্তরা দেবীর আগমনী-গান

নিম্নে আমরা কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের রেকর্ডগুলির সমালোচনা প্রকাশ করিলাম।

G. E. 2479 কলম্বিয়া :—এই রেকর্ডে শিল্পী শ্রীমতী চিত্রলেখা গাঙ্গুলী সহগামী সঙ্গীতের সহযোগিতায় দুইখানি ভক্তিমূলক গান রেকর্ড করিয়াছেন। গায়িকার গীতভঙ্গী মন্দ নহে, কিন্তু অনেকস্থলে গানের বাণী যথোচিতভাবে উচ্চারিত হয় নাই। একদিকে 'প্রভু! বন্দী হয়েছ আমার হিয়ায়' ও অন্যদিকে 'আমার লাগিয়া তুমি হলে যোগী' গীত হইয়াছে।

* * *

G. E. 2481 কলম্বিয়া :—শ্রীমতী রাধারাণী এই রেকর্ডে খোল প্রভৃতি যথাযোগ্য বাদ্যযন্ত্রাদির সহিত দুইখানি কীর্ত্তনগান গাহিয়াছেন। শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য রচিত আধুনিক কীর্ত্তনগান 'বঁধু তুমি যে নিলাজ অতি' ও 'আজি মাধব এসো মাধবী-তলে', গায়িকার কণ্ঠে মোটেই সুপরিস্ফুট হয় নাই।

* * *

G. E. 2476 কলম্বিয়া :—রেকর্ড-আসরের সুপরিচিতা গায়িকা কুমারী ভারতী মজুমদার এই রেকর্ডে দুইখানি ভাটিয়ালী গান পরিবেশন করিয়াছেন। একপিঠে 'বন্ধু! তোমার বদল বাঁশীটি দাও' ও অন্যপিঠে 'ময়ূরপঙ্খী নায়ের মাঝিরে' যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগে ভালই হইয়াছে। তবে একটি বিষয়ে আমাদের ধাধা লাগে,—ইনি কি সেই বাসন্তী বিদ্যাবীথির ভূতপূর্ব্ব গায়িকা কুমারী ভারতী মজুমদার নহেন? গত বৎসরে উত্তর কলিকাতার সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান নীলু বাবাজীবনের সহিত যাঁহার শুভ-পরিণয় উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম! অথচ তাহার পর এই এক বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি-পাঁচখানি রেকর্ড কুমারী ভারতী মজুমদারের নামে বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কি বুঝিতে হইবে যে তাঁহার কুমারী-জীবনে এত গান রেকর্ড করা আছে যে তাহাতে সারা জীবনই চলিয়া যাইবে? অথবা যেমন বাঙলার জনৈক নটের নাম কুমার মিত্র, এই গায়িকার নামও তদ্রূপ কুমারী ভারতী মজুমদার!

* * *

G. E. 2483 কলম্বিয়া :—কলম্বিয়ার শ্রেষ্ঠা গায়িকা শ্রীমতী উত্তরা দেবী মৃদু আবহ-সঙ্গীতের সহিত এই রেকর্ডের একদিকে একখানি আগমনী গান ও অপর দিকে একখানি বিজয়া-বিষয়ক গান গাহিয়াছেন। বিজয়া-বিষয়ক 'দাঁড়াও নবমী নিশি' গানখানি প্রধানতঃ ভৈরবীতে গাওয়া হইয়াছে কিন্তু মধ্যে কীর্ত্তনের সুর মিশ্রিত করা হইয়াছে। গায়িকার উদাত্ত মধুর কণ্ঠে বিজয়ার গানখানি শ্রুতি সুখকর হইয়াছে। সমগ্র অংশটিকে ভৈরবীতে গাহিলেই এই শিল্পীর কণ্ঠে ইহা অধিকতর মধুর হইত, আগমনী গানখানিও উপভোগ্য হইয়াছে।

* * *

G. E. 2482 কলম্বিয়া :—শ্রীআশুতোষ মল্লিক আড়ম্বরপূর্ণ যন্ত্র-সঙ্গীতের সহিত এই রেকর্ডে দুইখানি দেহতত্ত্বের গান গাহিয়াছেন। বেশ ইংরাজী সুরের ভঙ্গীতে যখন বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল এবং শিল্পী যখন 'বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে শ্মশানঘাটে যাচ্ছ চলে' এই দেহতত্ত্বের গান আরম্ভ করিলেন, তখন যে কি এক অপূর্ব্ব রসানুভূতি লাভ করিলাম তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিব না। স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক কল্পিত 'মদের সঙ্গে হরি নাম' কথাটিই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহার রসোপলব্ধি করিতে পারি নাই, এক্ষণে কলম্বিয়া কোম্পানীর দয়ায় সে রস কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম। অপর পিঠে 'দোকানী ভাই দোকান সার না' ঐ একই ধরণের সহগামী সঙ্গীতের সহিতই গাওয়া হইয়াছে।

* * *

G. E. 2478 কলম্বিয়া :—শ্রীক্ষিতীশ বসুর রচনা ও পরিচালনায় কলম্বিয়া ভ্যারাইটিজ এই রেকর্ডে 'লেক দি গ্রেট্' নামক একখানি কৌতুক নাট্য পরিবেশন করিয়াছেন। গল্পটির সারাংশ এই,—একদিন দুই তরুণী মিস্ লেক ও মিস্ লেক জুনিয়ার-এর সহিত মিঃ ইডেন গার্ডেনএর সাক্ষাৎ হইল। যথারীতি পরিচয় হইবার পর ক্রুদ্ধ মিঃ ইডেন গার্ডেন তাঁহার চিরবৈরী লেক-ভগ্নীদ্বয়কে সম্মুখে পাইয়া বেশ কড়া কড়া দুই-চারিটি কথা শুনাইয়া দিলেন, আর এদিকে কিরূপ দুর্ব্বার হাস্য-রস নিঃসারিত হইল দেখুন।

মিঃ ইডেন গার্ডেন—"• • • •
তোদের কাছে যায় যত ডাক্তার
নার্শ লয়ে সাথে টেক্‌সিতে চড়িয়া,
কেহ বা প্রেমিক যায়
প্রেমিকারে সাথে লয়ে, হাসে কাঁদে
তোদের শোনায়ে নাকি সুরে
চিবিয়ে চিবিয়ে গায় অর্থশূন্য গান।
তারপর হয়ত বা
হস্ত পদ শৃঙ্খলিত করি
ঝাপাইয়া পড়ে বক্ষেতে তোদের।
এমনি কত যে যুবক যুবতী সধবা বিধবা
বিসর্জ্জিল প্রাণ কে রাখে হিসাব।"

ভাব, ভাষা, ছন্দ লক্ষ্য করিবার বস্তু। পরে

মিস্ লেক—"ইডেন গার্ডেন • • •
তোর সম্মুখে হয় কত ঘৃণিত ব্যাপার
তোর কাছে যায় যত ট্যাস্, মারওয়াড়ী,
উড়ে, শিখ, পাঞ্জাবী কামাইয়া দাড়ী
যত ভণ্ড বসে গিয়া ঝোপ-ঝাপ পাশে।"

কি অপূর্ব্ব হাস্যরস! তাহার পর আরও চমকপ্রদ ব্যাপার আছে। এই বাদানুবাদের পর 'বৃদ্ধ ইডেন গার্ডেন রমণী হস্তে খাইল প্যাণ্ডেলের বাড়ি'। অতঃপর ইডেন গার্ডেনের দলবল মিঃ কার্জ্জন পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও মিস্ লেকের সঙ্গিনী মিস্ হেদোয়া প্রভৃতি দলবল লইয়া কুচকাওয়াজ করিতে করিতে হাজির। কিন্তু যুদ্ধ বাধে, এমন সময় ইডেন গার্ডেন ও লেকএর জন্মদাতা কলিকাতা কর্পোরেশন আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। সমগ্র নাটিকাখানিতে কাঁচা হাতের লেখার ছাপ,—যেমনই ভাষার দারিদ্র্য তেমনই ছন্দের বৈষম্য। বস্তুতঃপক্ষে ইহাকে তৃতীয় শ্রেণীর নাটিকার পর্য্যায়ভুক্ত করাও চলে না। রেকর্ডের দুই দিকের কোন অংশ বিশেষই শ্রোতার অন্তঃকরণে হাস্যরসের উদ্রেক করিবে না, এমন কি সদাহাস্যমুখ ব্যক্তি এই নাটিকা হইতে হাস্যরস নিষ্কাশন করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। পূর্ব্ববঙ্গীয় উচ্চারণে মিঃ ইডেন গার্ডেনএর ভূমিকা অভিনীত হওয়ায় অভিনয় সবিশেষ কর্ণ-পীড়াদায়ক হইয়াছে। আমরা এইরূপ নিম্ন স্তরের রেকর্ড বাজারে উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। অধুনা রেকর্ডের আসরে উপযুক্ত কৌতুক নাট্যের অভাব সবিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং কি কারণে যে মাসের পর মাস এই শ্রেণীর রেকর্ড সাধারণ্যে প্রকাশ লাভ করে তাহা কর্ত্তৃপক্ষই অবগত আছেন। এ বিষয়ে বারান্তরে আমরা আলোচনা করিব।
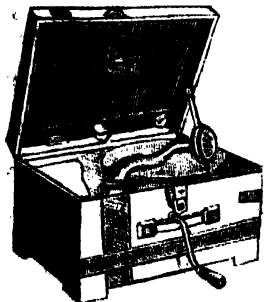
জন্মদিন

হিল্লোলকুমার মিশ্রী

জন্মদিনে লিখতে ব'সে
ভাষা নাহি পাই
সমুখেতে চাই!
দিগ্‌বলয়ের রেখার পানে—
আকাশ যেথা মাটীর কাণে—
ব্যাকুল প্রাণের গোপন কথা
বলছে নিশি দিন—
ঝঙ্কারিছে সদাই যেথা
নীরব সুরের বীণ্!
দিগন্তের ওই তরুর সারি
কালো রেখার মতো—
প্রিয়ার আঁখির কাজল পারা
আপন মাঝেই আত্মহারা
রঙীন স্বপন আঁকছে বুকে—
উল্লাসেতে কতো!
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
অস্ত রবি আঁকতে থাকে
বড়ল নদীর বুকের মাঝে
আলো ছায়ার দোলা—
বাত্যাক্ষুব্ধ বীচি মালায়
যেন আবীর গোলা!
আবার আঁখি ফিরাই দূরে
অতীতের পানে—
জন্ম যখন নিলাম এসে
এই ধরাতে মধুর হেসে
এমনি এক ভাদ্র শেষে
কোন স্বপনের টানে!
সেদিনোতো এমনি ছিল
আকাশ মাটীর খেলা—
সেদিনোতো এমনি ছিল
আলো ছায়ার দোলা!
ভরা নদীর পাড়ে পাড়ে
শুভ্র কাশের ঝাড়ে ঝাড়ে

আর্দ্র সমীর ভাদ্র শেষের
পরশ দিয়ে যেতো—
সেদিন ছিল, আজকে কিন্তু
যায়নি চলে সেতো !
দিগন্তের ও ভুরুর টানে
এসেছিনু ধরার পানে
আজ আবার সেই টানেতেই
যৌবনের মাঝে—
পৌঁছে গেনু ধীরে ধীরে
ভাদ্র শেষের সাঁঝে।

রবীন্দ্রকাব্য ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শ্রীসত্য নারায়ণ লাহিড়ী

সুসভ্য পাশ্চাত্য থেকে ধার করা আধুনিক শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনকে যে কিভাবে পঙ্গু করে রেখেছে সে সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কয়েকটী কবিতায় সুন্দরভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই সমস্ত কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব, সুন্দর ও সতেজ প্রকাশভঙ্গী, অপূর্ব্ব পদ-বিন্যাস ও ললিতমাধুর্য্য জাতীয় সম্পদ হিসাবে কাব্যে চিরকাল অম্লান রহিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে খুব বেশী দিন প্রচলিত হয় নাই; কিন্তু এত অল্প-কালের মধ্যে জাতীয় জীবনের উপর ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রভাবের পরিণাম চিন্তায়, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই শঙ্কিত হোয়েছেন। যেভাবে এত অল্পকালের মধ্যে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, শিক্ষায়, সভ্যতায় একটা আমূল পরিবর্ত্তন এসেছে, যেভাবে আধুনিক শিক্ষা ভারতের মত বিশাল একটা জাতকে অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে দুর্ব্বার অলঙ্ঘনীয় গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে তাতে শঙ্কা হয় এমনভাবে এ মিথ্যার পিছনে মানুষ কতদিন ছুটতে পারে; এ মোহ যখন ভাঙ্গবে, মিথ্যা যখন ধরা পড়বে তখন তার আঘাত সে সইতে পারবে কিনা ?

'Plain living and high thinking' এইটাই ছিল ভারতের শিক্ষার চরম এবং পরম আদর্শ। এই আদর্শকে সামনে রেখেই তাদের আরম্ভ হোত শিক্ষার হাতেখড়ি। বাহ্য আড়ম্বরের চেয়ে, আত্মার ও হৃদয়ের উন্নতিতেই তাঁদের ছিল অনুরাগ; শান্ত সরল অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রায় তাঁরা ছিলেন অভ্যস্থ।

তাই রবিবাবু বলিয়াছেন—

"কোরো না কারো না লজ্জা
হে ভারতবাসী, শক্তিমদমত্ত ঐ বনিকবিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শান্ত উত্তরীয়খানি করিতে বহন।"

বাহিরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে দরিদ্র কিন্তু অন্তরে, সে ধনী আধ্যাত্মিক সম্পদে তার হৃদয় পরিপূর্ণ।

"দারিদ্র্যের যে একটা কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠায় যে গভীর শান্তি এবং বৈরাগ্যে যে উদার গাম্ভীর্য্য" এইটাই ভারতের নিজস্ব ও বলিষ্ঠ। ভারতের বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিরা পার্থিব সম্পদে দীন ছিলেন বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পদে তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী। তাই কবি বলিয়াছেন,

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন তাই আমাদের দিও
পরের সজ্জা ফেলিয়া পড়ি তোমারই
উত্তরীয়।"

তাঁরা জীর্ণ বল্কল পরিধানে, সামান্য একটী উত্তরীয়ে দেহ আবৃত করে যে সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ ছিলেন, সে জীবন যাত্রার মধ্যে বাহ্য আড়ম্বরের আধিক্য এতটুকু ছিল না, কিন্তু এই তুচ্ছ বহি রাবণের অন্তরালে তাঁদের অন্তরে যে অমূল্য

—বেকার নাশন শব্দ বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো—

BEKARNASHAN CROSSWORD COMPETITION BUREAU

বাঙ্গলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা—নং ১।

১১৩বি, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ পুরস্কার ৫০০৲ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৩০০৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০৲ তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম :—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে। অন্য ঘরগুলি যথা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৮ বাংলা ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

পাশাপাশি (**Across**)

১। এ জীবন দুঃসহ।
৩। দেশ।
৪। অনেকের ধারণা এ ভগবানের প্রতীক।
৫। এ সরল নয়।
৭। বিপদে যে এ কাজ করে হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পিতা।
৮। মদন যার পতি।
৯। স্ত্রীলোকের বিশেষ প্রিয়।
১২। বোলতার এ বিষাক্ত।
১৩। মহাদেব।
১৫। এ থাকলে সে ভীতু।
১৬। উল্টালে মীমাংসা কঠিন।
১৭। ঠিক করে সাজালে এর জোর না থাকলে ভাল উকিল হওয়া শক্ত।
২০। কর।
২১। বলরাম।
২২। ইন্দ্র এ-পাণি বলা হয়।
২৫। এ বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
২৭। এ আহার অকর্ত্তব্য।
২৮। দুর্য্যোধনের মাতুলালয়।
২৯। ভঙ্গুর নয়।
৩১। উল্টালে গ্রীষ্মকালে এ আরামদায়ক।
৩২। এর বুদ্ধি যে নেয় সে চালাক নয়।
৩৩। ঠিক করে সাজালে এর দায়িত্ব বহন করিতে হয়।

—এইখানে কাটুন—

বেকার নাশন শব্দ-বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো

নভেম্বর সংখ্যা ১৯৩৮। কুপন নং............

১ বে	কা	২ র	■	৩ বি		ত	■	৪	জা
	■	৫	৬ প		■	■	৭	ক্ষা	■
৮ র		■		■	৯ অ		ম্	■	১০ বি
■	■	১১ বি		১২ অ		■	১৩	ম্র	ক
১৪		১৫	য়	■	১৬ র্ক		■	■	
১৭ য়া	১৮	ন	■	১৯ আ	■		২০		■
■	ল	■	২১ ব		■	২২ ব		■	২৩
২৪ ত	■	২৫ ত		■	২৬ তা	■	বাঁ		ম
২৭	চা	■	২৮ গাঁ			■	২৯	টা	■
৩০ ন		■	■	৩১	ন	■	৩৩		ত্র

—এইখানে কাটুন— —এইখানে কাটুন—

প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম ....

ঠিকানা...

লোকেল রসিদ নং·· ....তারিখ.............

মনিঅর্ডার নং.........পোষ্টেল অর্ডার নং.........

—এইখানে কাটুন—

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

উপর হইতে নীচে (**Down**)

১। এর দাম নাই।
২। কাচ।
৩। এ দুশ্চরিত্র।
৪। গালা।
৬। ভাগ্য।
৯। অষ্টপদ পোকা বিশেষ।
১০। এ হলে মাথায় অনেকেই ঔষধ ব্যবহার করেন।
১১। এ নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল হয়।
১৪। এ হৃদয়ের বৃত্তি।
১৮। একে অনেক কষ্ট পেতে হইয়াছে।
১৯। একে অমৃত ফল বলা হয়।
২০। বলবান।
২১। অসতী।
২৩। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।
২৪। অন্ধকারকে বিনাশ করে।
২৬। সূর্য্যের চাইতেও বড়।
৩০। এর স্থান মাথায়।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ।০ আনা।০ কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিনখানা সমাধানের মূল্য ॥০ আনা। লেখা কাটা বলা এবং পেন্সিলে লেখা চলিবে না। মণিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া রাখিবেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অন্যথায় অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া নম্বরানুযায়ী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাপ্তাহিক খেয়ালীতে ম্যানেজারের নির্ভুল সমাধান প্রকাশিত হইবে।

[illegible] ছাপা হয়।

সম্পদ নিহিত ছিল, সেটা তাদের বহিরাবণের সমস্ত তুচ্ছতাকে ঢেকে ফেলেছিলো।

ভারতের বৈশিষ্ট্য ত্যাগে, সেবায়, পরার্থে, জীবনদানে। অন্যান্য দেশে যখন হিংসার দাবানল জ্বলে উঠেছে, অস্ত্রের ঝনঝনানি ও রক্তের স্রোতে সমস্ত দেশ কলুষিত হোতে বসেছে ভারতই তখন প্রথম প্রচারকরেছে অহিংসার মন্ত্র, পরকে আপন করে নেবার মন্ত্র। একমাত্র ভারতের নৃপতিই প্রজার হিতের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে দুঃখ ও রুচ্ছতাকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন, একমাত্র ভারতের কর্ম্মীই সর্ব্বলোকের হিতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, একমাত্র এখানকার সেবকই নিজের জীবন তুচ্ছ বিসর্জ্জন দিয়ে নিস্বার্থ সেবাকার্য্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছেন।

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড, সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্রবেশ।"

আধুনিক শিক্ষায় আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সম্পূর্ণ পরের ছাঁচে আমরা আমাদের জীবনকে গড়ে তুলছি। এ শিক্ষায় এখন আছে আমাদের দুটী দিক, এক বাহিরের দিক ও ভিতরের দিক। বাহিরের দিকে কথাবার্ত্তায় আমরা যতদূর সম্ভব মোলায়েম কিন্তু ভিতরের দিকে আমাদের স্বার্থটী সব সময় সজাগ হোয়ে আছে। যেই সেখানে গিয়ে আঘাত লাগে অমনি আমাদের বাহিরের খোলস খসে আমাদের সত্য মূর্ত্তিটী বর্ব্বর চেহারাটী আলোর মত স্পষ্ট হোয়ে ওঠে। বাহিরে আমরা ভদ্র ভিতরে আমরা নীচ, বাহিরে আদব কায়দায় আমরা দুরুস্ত, ব্যবহারে আমরা ভদ্র, অন্তরে আমরা হিংস্র স্বার্থের কাছে বাঘের চেয়েও নিষ্ঠুর।

এই কৃত্রিমতা আজকাল সভ্যতার একমাত্র মাপকাঠি। যে জাত যত বেশী কৃত্রিম, বাহিরের আদবকায়দায় যত বেশী দুরস্ত সেই জাত তত বেশী সভ্য। সেই আদর্শের ছায়া ভারতে এসে পড়েছে, তার সর্ব্বগ্রাসী ছায়া ভারতকে গ্রাস করে ফেলেছে, সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে তার আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে।

আধুনিক যুগ যন্ত্রের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। দানবীয় যন্ত্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে পিষ্ট হচ্ছে লক্ষাধিক নরনারী বিজ্ঞানের অভিযান প্রকৃতির বিরুদ্ধে। দু'দিন আগে যেখানে প্রকৃতি তার সুন্দর রূপটী নিয়ে আমাদের চারিদিকে তার বাসাটী বেঁধেছিলো, দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্তমাঠের চারিপাশে গাছপালায় সজ্জিত হোয়ে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত আলোছায়ার স্পর্শে যে নিত্য নূতন নূতন রূপে তার সৌন্দর্য্যটীকে প্রকটিত করে তুলে সেইখানে হয়ত আজ দেখা যাবে নিষ্ঠুর দানবীয় যন্ত্রটী বাসা বেঁধেছে। তাই আজ আমাদের দৃষ্টি সুউচ্চ অট্টালিকায় প্রতিহত হোয়ে ফিরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেদনা ও আক্ষেপের রুদ্ধ একটী আবেগ ক্রমশঃ উপর দিকে ঠেলে আসে। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
লহ যত লৌহ, লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন, পণ্যচ্ছায়ারাশি

গ্লানিহীন দিনগুলি—সেই সন্ধ্যাম্লান
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান
নীরব ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন
মগ্ন হোয়ে আত্ম মাঝে নিত্য
আলোচন মহাতত্বগুলি।

প্রকৃতির ক্রোড়ে যে অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রাটী ছিল সেটী আজ লুপ্ত হোতে বসেছে। প্রকৃতি দেবী আজ নির্ব্বাসিত। তাই আজ যতদূর দৃষ্টি যায়, আশেপাশে চারিদিকে কেবল দেখা যায় বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান, নিষ্ঠুর তাণ্ডব উল্লাসের এক একটা বিকট গর্জ্জনে সে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলেছে, সুন্দর সরল জীবন যাত্রার আদর্শকে ব্যহত করেছে সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমতাকে ডেকে এনেছে।

এই যন্ত্র যে আজ ভারতের কত বড় শত্রু সে কথা আজ কে-না বুঝেছে। ভারতের শক্তি, স্বাস্থ্য, ধন, সম্পত্তি এ সমস্তই হনন করেছে এ যন্ত্র। ভারতের পূর্ব্ব ইতিহাস কোনদিন সাক্ষ্য দেবে না যে ভারতে কোনদিন অন্নাভাব ঘটেছে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে লোক মারা গেছে। কিন্তু আজ লক্ষ্য লক্ষ্য অনাহারী ভারতবাসীর ক্ষিণ ক্রন্দনের রোলে আকাশ বাতাস মুখরিত। অন্নের অভাবে, খাদ্যের অভাবে যৌবনেই তারা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে, এবং অসময়ে কাতারে কাতারে মারা যাচ্ছে। এই রকম করে একটা জাত তিলেতিলে পলে-পলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধুমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্নঅংশভাগ
কলহ সংশয়
সহেনা সহেনা আর জীবনের খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

আধুনিক কালের জীবনযাত্রার একটা স্পষ্ট ছবি। কলহ বিবাদ ও সংশয়ের কণ্টকাজালে আমাদের জীবন ক্ষত বিক্ষত স্বার্থ ও হিংসার পরস্পর হানাহানিতে আমরা অবসন্ন ও দুর্ব্বল।

যে ভারতের বৈশিষ্ট্য সর্ব্বমানবকে প্রীতি ও ভালবাসায় অভিষিক্ত করে আপন করে নেওয়া, যেখানে সমস্ত বিরোধের মাঝে ঐক্যস্থাপনই' ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য সেখানে তার পাশে আজকালকার আদর্শ কত হীন কত দুর্ব্বল। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমতা বাহ্যাড়ম্বর যত বেড়ে চলেছে ততই আমাদের মোহও বেড়ে চলেছে। অন্য সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে অন্ধের মত পরের বিরুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য আমরা ব্যাকুল। অন্যের থেকে আজ আমরা পৃথক হোতে চাই। কিন্তু এটা মোহ মিথ্যা মাত্র। কিন্তু অন্তরাত্মা এ সঙ্কীর্ণতাকে মেনে নিতে চায় না, এ মিথ্যা অভিনয়ে সে সারা দেয় না। স্বাধীন বন্ধন অসহিষ্ণু অন্তরাত্মা চারিদিক থেকে বন্ধনের বেড়াজালে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠে। আত্মার আনন্দ স্বাধীনতায়, বন্ধন মুক্তিতায়। উন্মুক্ত আকাশ বাতাসও প্রকৃতির মাঝেই সে পায় মুক্তি, বিশ্বমানবের প্রীতির মিলনক্ষেত্রেই তার মুক্তি, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মাঝেই তার মুক্তি। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষের মুক্তিকামী অন্তরাত্মা বিজ্ঞান ও যন্ত্রের অবরোধে অপমানিত, পরস্পর হিংসা ও স্বার্থ বিদ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ। কোথাও রাষ্ট্রের চাপে কোথাও বা সমাজের চাপে সে পিষ্ট সঙ্কুচিত। তাকে যেন বায়ুলেশহীন অর্গল বদ্ধ ঘরে ফেলে রাখা হোয়েছে। ঐ বায়ুর অভাবে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম, ও বাহিরে উন্মুক্ত আকাশ প্রান্তরে সে পাগল হোয়ে উঠেছে। তাই রবিবাবু প্রত্যেক মানুষের অন্তরের কথাটীকে নিম্নলিখিত কবিতায় মূর্ত্ত করে তুলেছেন।

হে বিধাতা,
নিঃসঙ্কোচে মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে, উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।
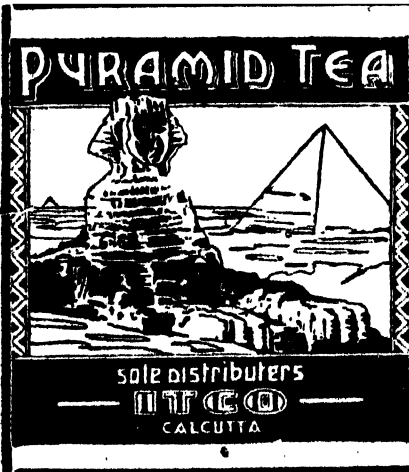
খেয়ালী চিত্রপট

মেয়েটীকে সকলেই জানেন, গুণের পরিচয়ও এর পেয়েছেন—এবার দেখা যাবে একে নূতন চরিত্রে নূতনরূপে—নিউ থিয়েটার্সের "সাথী" চিত্রে মঞ্জু চরিত্রে। মেয়েটী শ্রীমতী কানন অভিনব ভাব মূর্চ্ছনায় দৃশ্যমানা। "সাথী" চিত্রখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে। ছবিখানার পরিচালক শ্রীযুত ফণি মজুমদার।

পরিচালক ঃ ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৪শে কার্ত্তিক ১৩৪৫, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৮ } ৪২শ সংখ্যা

নূতন এ্যাসেসার

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইব্যুনালের এ্যাসেসার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পাঠক-বর্গের হয়ত স্মরণ আছে যে এই পদের জন্য অন্যতম প্রার্থী ছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়। বাংলার কংগ্রেসী মহলে কিরণবাবুর প্রভাব সর্ব্বজনবিদিত। বিধানবাবুর খণ্ডদলের সহিত কিরণবাবুর যোগাযোগ অপ্রকাশ্য নাই। কিরণবাবুর ষড়যন্ত্র-কামী প্রবৃত্তি তাঁহাকে বাংলা কংগ্রেসে যে স্থান দিয়াছে তাহা হইতে তাঁহাকে বিদূরিত করিতে না পারিলে বাংলা কংগ্রেসে ঐক্য বা শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে না। কিরণবাবুর বুদ্ধির প্রখরতার সহিত যদি অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশ হয় তাহা হইলে তিনি যে বাংলা কংগ্রেসে কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিগত এ্যাসেমব্লী নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উদারতার ও সহৃদয়তার সুযোগ লইয়া বহু কষ্টে নির্ব্বাচিত হইয়াও তিনি বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের আনুগত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। বর্ত্তমান অর্থ-সচিবের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্প্রীতি আছে, ডাঃ বিধানচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে যোগাযোগ বিদ্যমান তাহাতে তাঁহার পক্ষে হয়ত বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য স্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব।

বিগত আঠার বৎসরের কংগ্রেসী ইতিহাস অনুসরণ করিলে ইহা সহজ ও সরল সত্য রূপে প্রতিভাত হয় যে বাংলার সমস্ত দলাদলির অলক্ষ্যে ইন্ধন যোগাইতে বা প্রত্যক্ষভাবে দলাদলি পরিচালনা করিতে কিরণবাবু যেরূপ নিষ্ঠা ও পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

প্রথমেই যখন কিরণবাবু এ্যাসেসার পদের জন্য তদ্বির শুরু করেন তখনই আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বসু-ভ্রাতৃদ্বয়কে সজাগ করিয়া দিয়াছিলাম কারণ কিরণবাবু উক্তপদ পাইলে দলাদলি পরিপোষণে যে সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন তাহাতে তিনি অপরাজেয় হইয়া উঠিবেন। সুতরাং তাঁহাকে উক্ত পদে মনোনীত করিলে বিধান-নলিনী-স্নেহাশ্রিত কংগ্রেসী উপদলই শক্তিশালী হইয়া উঠিত। যাহা হউক আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি যে বসু-ভ্রাতৃদ্বয় কিরণবাবুর মনোনয়ন সমর্থন করেন নাই এবং তাহারই ফলে কিরণবাবু শেষ মুহূর্ত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বুধবারের সাধারণ অধিবেশনে অমরেন্দ্র বাবু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

(বিলাসী)

সাপুড়ে

দু'নম্বর ষ্টুডিওর কর্ম্মসচীব ছোটাইবাবু ধীরে ধীরে ছবিখানাকে বেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দেবকীবাবু অনেকটা ভাল হলেও এখনও কার্য্যক্ষম হন নি। তাঁকে প্রথমতঃ সুস্থ করা আর দ্বিতীয়তঃ এই ছবির জন্য বহু পরিশ্রমে, বিপুল অর্থ ব্যয়ে, ছোটাইবাবুকে একগাদা নানা জাতের বিষাক্ত সাপ সংগ্রহ কোরতে হোয়েছিল। এই সাপের গুষ্টিকে ছবি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে, জিইয়ে রাখা। স্বর্গের অশ্বিনীকুমারের কাজ থেকে দেবাদিদেব নীলকণ্ঠের কাজ দুইই তাঁকে করতে হচ্ছে।

বর্ষার জোলো-হাওয়ায় যে সাপগুলিকে যেরূপ সজীব অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছিল, শীতের আরম্ভে দেখা যাচ্ছে তারা যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়চে!

তবু ভরসা এই অনেক দিন থেকে যিনি অনেক জীবের মরণ-বাঁচনের মুষ্টিযোগ বাতলে চিত্র-জগতে চরক ও চাণক্যের সম্মান পেয়েছেন—এই সাপগুলিকে সজীব ও টাটকা অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত জিইয়ে রাখতে, এবারেও যে তাঁর অব্যর্থ মুক্তিযোগ বৃথা যাবে না—এটা অনেকরই বিশ্বাস।

যে মঞ্চের সুরুতেই সাপ, তার শেষ পরিণতি কোথায়—কে জানে!

বড়দিদি

এই চিত্রের পরিচালক, আমাদের দাদুদাদা মল্লিক মশাই আবার এ সপ্তাহে সদলবলে রওনা হয়েছেন, শহরের বাইরে একটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবার জন্য।

নদীবক্ষে নৌকোর উপরএ সেই মর্ম্ম-বিদারক শেষ মিলন।

সর্ব্বহারা সুরেন্দ্রনাথ সারাপথ পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে শেষে এই নদীবক্ষে জীবন সর্ব্বস্ব স্নেহময়ী বড়দিদির সন্ধান পায়। এ মিলন ঠিক প্রতাপ শৈবলিনীর হয় নি তথাপি যার জীবন প্রদীপের অবশিষ্ট তেলটুকু আজ নিয়তির বিধানে নিঃশেষ হয়ে এসেচে, ক্ষণিকের এ মিলন তাকে কতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারে?

সাথী (হিন্দি স্ট্রীট সিঙ্গার)

বাংলার চিত্রামোদীগণ এই নূতন ছবি দেখবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। সুখের বিষয় তাঁদের আর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। বাংলা ভাষায় নৃত্যগীত পূর্ণ এই "সাথী" নিউ থিয়েটার্সে এর বাংলা চিত্রগৃহে রূপান্তরিত নিউ সিনেমায় শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

'সাথীর' নানা আকর্ষণীয় বিষয়ের কথা পূর্ব্বেই প্রচারিত হয়েছে। সঙ্গীত সংলাপের অপূর্ব্ব সংমিশ্রনে এই প্রেম মধুর ও চিত্তাকর্ষক ছবি দর্শকের মন হতে শীঘ্র মুছে যাবে না এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

দুষমন (হিন্দি)

গীতার মা ও গীতার নমস্তা অন্য একজন (দেববালা ও মনোরমা) গীতার (লীলা দেশাই) জন্য একটী যুবককে সুপাত্র

"বড়দিদি" চিত্রে মলিনা ও ছবি

নির্ব্বাপিত
আজ হৃদয়ের যত কিছু
আশা, আকাঙ্খা, প্রশ্ন
ও সংঘাত........
অপমৃত্যু হইয়াছে মনের

অভিনয়

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের

অভিনয়

১১শ সপ্তাহ

হৃদয়ের এই বেদনাবিমথিত
রহস্যের অভিনব
বাণীচিত্র ....

রূপবাণী ফোন: বি, বি, ৩৪১৩

N.I.P.

পূর্ণ থিয়েটার

২নং রসা রোড ফোন: সাউথ ৩৪

শনিবার ১২ই নভেম্বর হইতে ৮ম সপ্তাহ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

গোরা

দেবদত্ত ফিল্মসের নবতম কথা-চিত্র

শ্রেষ্ঠাংশে: রাণীবালা, প্রতিমা দাস গুপ্তা, নরেশ মিত্র, জীবন গাঙ্গুলী, মোহন ঘোষাল ইত্যাদি।

সুকবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষের
নূতন কাব্যগ্রন্থ

জীবন ও রাত্রি

বাহির হইয়াছে, মূল্য এক টাকা
প্রকাশক:—
নালান্দা ইউনিভার্সিটি প্রেস
২৪।এ মোহিনী মোহন রোড, কলিকাতা।

বিবেচনায় বিবাহের প্রস্তাব করলেন। তাঁদের এ নব আগন্তুকের প্রতি পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট কারণও ছিল। এ নবীন যুবকের স্বাস্থ্য ছিল, সম্পদ ছিল, সে নিজেও একজন চিকিৎসক।

শাস্ত্রে বলে, "কন্যা যাচয়তে রূপং, পিতা বিত্তাং মাতা ধনং" কাজেই এ বিবাহের কোন বাধাই নাই কিন্তু পিতাই কর্ত্তা মাতার মতে বিবাহ হয় না। গীতার পিতা (নিমো) যে প্রকৃতির লোক তাতে শেষে কি হয় বলা যায় না।

পরিচালক নীতীনবাবু এখানে সত্যই ড্রামার সৃষ্টি করিতে ছাড়িবেন না।

কপালকুণ্ডলা (হিন্দি)

পরিচালক ফণী মজুমদার বাঙ্গলার সাহিত্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কন্যা কপালকুণ্ডলার হিন্দিরূপদানে ব্যস্ত। জানিনা বঙ্কিমচন্দ্রের এই চির নূতন ও চির মধুর আখ্যায়িকা বাংলার ভাবুক প্রাণকে যে ভাবে উদ্বেলিত করেছিল—কাটখোট্টা আবহাওয়ায় তার কি অবস্থা হবে। তবে ফণীবাবু যে ভাবে পশ্চিমের দিকে নজর দিয়ে চলেছেন তাতে মনে হয় যে একেবারে নিরাশ হতে হবে না। শুষ্ক তরুও মঞ্জুরিত হতে পারে।

গত সপ্তাহে পান্থশালায় নব কুমার ও মতিবিবির দৃশ্য তোলা হয়েছে। আমাদের পাঠকের কাছে এ দৃশ্য নূতন নয়। গ্রামোফোন কোম্পানীর কল্যাণে সকলের কাছেই সুপরিচিত এ দৃশ্য।

নবকুমারের ভূমিকায় নাজাম, মতিবিবির ভূমিকায় কমলেশ আর কপালকুণ্ডলার ভূমিকায় হাস্তলাস্তময়ী লীলা দেশাইকে দেখা যাবে; তবে শেষ পর্য্যন্ত শেষোক্ত শ্রীমতী তাল সামলাতে পারবেন ত?

প্রাইমা ফিল্মস

এরা সাহস করে অবাঙ্গালী প্রতিযোগিতা তুচ্ছ করে হিন্দি ছবির পরিবেশন আরম্ভ করেছেন। এঁরা হংস পিক্‌চার্সের "জ্বালা" ও নটরাজ পিকচার্সের "সাথীর" পরিবেশন ভার পেয়েছেন। জ্বালায়—প্রভাতের চন্দ্র মোহন ও সুন্দরী রত্নপ্রভা প্রধান অংশে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। জ্বালার আখ্যান ভাগ মধুর মহারাষ্ট্রীয় গাম্ভীর্য্য কারুনৈপুণ্য, সাজ-সজ্জা ও সমারোহে পরিপূর্ণ। জ্বালা শীঘ্রই গণেশ টকিতে মুক্তিলাভ ক'রবে বলে শোনা যাচ্ছে।

পথিক

এখন কোন গৃহপ্রাঙ্গণ বা স্নিগ্ধ-বটচ্ছায়ায় সুপ্তিমগ্ন তা আমরা সন্ধান করে খুজে পাইনি। তবে শুনলুম পরিচালক চারু রায় আগামী সপ্তাহে বাকী দৃশ্য কয়টি তোলবার জন্য বাইরে যাচ্ছেন। পথিকের নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য্য আর নায়িকা শ্রীমতী শীলা হালদার। চিত্রশিল্পী একজন বাঙ্গালী—নাম অজয় কর।

রাধাফিল্ম কোম্পানী

পরিচালক ফণী বর্ম্মা জনকনন্দিনীর কাজ খুব দ্রুত শেষ করছেন। দু সপ্তাহের মধ্যেই ছবিখানি শেষ হ'বে ব'লে আশা করা যায়। পরিচালক মশায় ছবির অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। রাধা ফিল্মএর পৌরাণিক ছবির এরূপ নাম আছে তা সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স

হরিভঞ্জ মহাশয় ষ্টুডিওর বাকী দৃশ্য শেষ করে বহিদৃশ্য তোলবার জন্য পার্ব্বত্য প্রদেশে যাবেন তার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

চিত্রা

আজ থেকে "দেশের মাটি" নবম সপ্তাহে পড়ল। আমাদের দেশের দৈনন্দিন অবস্থা ও উন্নতির উপায়ের দিকে এ চিত্র জন-সাধারণের ও সংবাদ পত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি। সাধারণ চলচ্চিত্রের ধারা হ'তে "দেশের মাটি"র প্রয়োগ নৈপুণ্য ও বিষয় বস্তু বিভিন্ন ও উন্নত ধরণের এজন্য শীঘ্র শীঘ্র দর্শকের মন থেকে এ চিত্র উঠে যাবেনা ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

নিউ সিনেমা

'নিউ থিয়েটার্সের নূতন বাঙলা চিত্র-গৃহরূপে রূপান্তরিত নিউ সিনেমায় আগামী ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত বাঙলা 'চণ্ডীদাস' ও 'মাসতুতো ভাই' দেখান হবে। তার পর দুদিন 'মায়া' ও 'মাসতুতো ভাই' দেখান হবে।

রূপবাণী

ভাল ছবি, বাঙলা দেশের দর্শক সাধারণের কাছে যে কি বিপুলভাবে সমাদৃত হ'তে পারে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের আধুনিক সমাজ-চিত্র 'অভিনয়' তাহার শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। এই শনিবার হইতে 'অভিনয়' রূপবাণীতে একাদশ সপ্তাহে পদার্পণ করিবে। ছবিটি আপনারা যত বারই দেখুন না কেন, আপনাদের কাছে পুরানো হইবে না।

পূর্ণ থিয়েটার

দেবদত্ত ফিল্মসের 'গোরা' এখনও যে ভাবে দর্শক টেনে আনছে তাতে আরও কিছুদিন তা চলবে বলে মনে হয়।

"পাপকে ঘৃণা করিও পাপীকে নয়"

"পাপীকে ঘৃণা করিও না—কিন্তু পাপকে ঘৃণা করিও"—সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গ-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অমর উপন্যাসে এ কথাই বলে গেছেন। ক্ষণিকের মোহে কিম্বা এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে যদি পদস্খালন হয় তাহলে সারা জীবন তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে—নিজকে শোধরাবার কোন সুযোগই তাকে দেওয়া হবে না, এ নীতির বিরুদ্ধে ক্রমশঃই আন্দোলন চলছে। কিন্তু সমাজের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ যাঁরা এখনও অন্ধ গোঁড়ামির দোহাই দিয়ে প্রতি পদে পদে কাজ করে থাকেন, তারা এই আন্দোলনে চমকে উঠছেন, বুঝি সমগ্র বিশ্বই রসাতলে যাবে। তাদের কাছে সৃষ্টির ধ্বংস আসন্ন প্রায়।

আনন্দ পিক্‌চার্সের প্রথম অবদান "পিঙ্গলা" চিত্রে এইরূপ এক কাহিনীকে ভিত্তি করেই এক বারবণিতার করুণ প্রেম চিত্রিত করা হয়েছে।

পিঙ্গলা বার-বণিতার মেয়ে,—তাই সমাজে তার কোন ঠাঁই নেই। সমাজের কঠোর হস্ত সর্ব্বদাই অঙ্গুলী উত্তোলন করে আছে, "তুমি অস্পৃশ্যা"। সমাজে তোমার কোন স্থান নেই। তোমার অপরাধ তুমি বারাঙ্গনার মেয়ে। পিঙ্গলা অতশত বোঝে না যে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী প্রভেদ। কিন্তু পিঙ্গলার মা পিঙ্গলাকে বাধ্য করে দেহ বিক্রী ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে। এক ধনীও এসে জোটে, পিঙ্গলার মাতার হস্তে অনেক টাকা দেয় ও পরিবর্ত্তে পিঙ্গলাকে চায়। পিঙ্গলা এতে বাধা দেয়, বলে সে এ ঘৃণ্য পাপ ব্যবসায়ে কখনও লিপ্ত হবেনা। পিঙ্গলার প্রেমের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তা দেখতে হলে আপনি নিশ্চই আসছে ১২ই নভেম্বর শনিবার প্রভাত সিনেমায় আসবেন। ঘটনার বৈচিত্রে; অভিনয়ের উৎকর্ষতায় ও সঙ্গীতে "পিঙ্গলা" আনন্দ পিক্‌চার্সের এক উৎকৃষ্ট অবদান।

ইন্দিরা ওয়াদকার

খ্যাতনামা গ্রামোফোন রেকর্ড গায়িকা ইন্দিরা ওয়াদকারের নাম সকলেই জানেন। বিশেষতঃ যার ঘরে গ্রামোফোন রয়েছে তিনিই ইন্দিরা ওয়াদকারের গানের রেকর্ডের সঙ্গে সু-পরিচিত।

আনন্দ পিক্‌চার্সের অতুলনীয় অবদান পিঙ্গলার নায়িকারূপে এই শ্রেষ্ঠ গ্রামোফোন গায়িকা আত্ম প্রকাশ কোরবেন। সুতরাং একই সঙ্গে ইন্দিরা ওয়াদকারের সঙ্গীত ও অভিনয় উপভোগ কর্ব্বার এই স্বর্ণ সুযোগ, চিত্রামোদীগণ কখনও হারাবেন না। তাছাড়া, এই ছবিখানায় এমন সব বহু সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়েছে যে তা আপনার মনকে ছবি দেখবার পরও বেশ ভাবিত রাখবে। সঙ্গে হাল্কা রসের উপাদানও এতে যথেষ্ট রয়েছে।

গান

শম্ভুদাস রায়চৌধুরী

প্রিয় আমার বুকে তোমার আসন পাতা,
দূর সুদূরের গান শুনেছি
হৃদয়ে তার তাল শুনেছি
ভীরু আমার কোমল বুকে নীরব আকুলতা।

অন্ধকারে ঘরের দ্বারে থাকি'
তোমায় প্রিয় স্মরণে মোর রাখি
আবেশে মোর তোমায় স্মরি' জাগে
বুকে ব্যথা।

উদয় তোমার নীল সবুজের শাড়ী
দিগন্তেতে রক্ত লেখায় পাড়ি
ঘরের মায়ায় হাতছানি দেয় আনে
ব্যাকুলতা।

পরশ তোমার এখনও মোর দেহে
গুপ্ত আছে মনের প্রতি গেহে
বাহিরে তার প্রকাশ নাহি কেউ তো
জানে না তা।

শ্যামাপূজা

বিগত ৫ই কার্ত্তিক শনিবার ৺ঈশ্বরচন্দ্র নান মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺নিস্তারিণী মাতার দীপান্বিতা পূজা ২৬ নং বেথুন রোডে মহা ধুমধামের সহিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে সহরের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ঐদিন সন্ধ্যায় মায়ের মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপান্নালাল নান এবং প্রকাশচন্দ্র নান ও রবীনদত্ত, অতিথিদের আদর অভ্যর্থনায় ও ভুরীভোজনে বিশেষ ভাবে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পরদিন শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউ অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্তৃক শ্রীদুর্গা পালা অভিনয় খুব ভালই হোয়েছিল।

দীপান্বিতা উৎসব

"গত ৩০শে অক্টোবর রবিবার ৯৯নং বকুলবাগান রোডস্থ ভবনে উপেন্দ্র নন্দী পরিচালিত হস্তলিখিত "শ্রী" পত্রিকার দীপান্বিতা উৎসব সুকবি শ্রীযুত রামেন্দু দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় সুকবি হেমচন্দ্র বাগচি মহাশয় "শ্রী"র কর্ম্মীদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বক্তৃতা দেন। তৎপর যুগ্মসম্পাদক শ্রীদীনেন্দু দাস বি-এ, সমীর ঘোষ, সমর সরকার, লক্ষ্মী ঘোষ, দ্বিজেন্দু দাস, অমিয় ব্যানার্জি ও ধর্ম্মদাস মিত্র বিবিধ বিষয়ে কবিতা পাঠ করেন। সুসাহিত্যিক সুধীরঞ্জন মুখার্জি ও সুশীল দাশগুপ্ত গল্প এবং উপেন্দ্র নন্দী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণ ও আলোচনার পর জলযোগান্তে সভার কার্য্য শেষ হয়।"

পরলোকে ডাক্তার নীরোদচন্দ্র ঘোষ

ইনি প্রাইমা ফিল্মসের অন্যতম প্রধান কর্ম্মসচীব শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের পিতা। গত রবিবার প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় ১৩।এ অভয় গুহ রোডস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে তরুণ সাহিত্যিক

গত পূর্ব্ব রবিবার রাত্রে ১০টার সময় বাঙ্গলা দেশের তরুণ সাহিত্যিক শ্রীনরেশচরণ মল্লিক মহাশয় ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ছিল। ছোট বড় বহু স্বনাম খ্যাত পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতির কামনা করি।

প্রভাতী সঙ্ঘের বিজ্ঞপ্তি

বিহার প্রবাসী বাঙালী সমাজের মুখপত্র "বেহার হেরাল্ডের"র সম্পাদক ও পাটনার সাহিত্য প্রতিষ্ঠান "প্রভাতী সংঘের" পরিচালক শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার জানাইতেছেন—

গত বৎসর পাটনায় প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রভাতীসঙ্ঘ একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবৎসরও এই বার্ষিকী প্রকাশিত হইবে। শ্রীবিমল রায় 'পত্রিকাটির সম্পাদন ভার গ্রহন করিয়াছেন। প্রঃ বঃ সঃ সম্মেলনের গৌহাটী অধিবেশনে যে সকল প্রতিনিধি যোগদান করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে এই পত্রিকার এক একখণ্ড উপহার দেওয়া হইবে।

জলসা

গত ২৯শে অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ টার সময়, কালীঘাট বাদল খাঁ মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্যোগে ১৩৩নং কালীঘাট রোডে শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গ ভুষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি জলসার আয়োজন হয়েছিল।

নামকরা কেউ না থাকলেও তাঁদের এই অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। অন্ধ গায়ক শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের "বন্দে-মাতরম্" সঙ্গীত; কুমারী শেফালিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতিকা দে (৭বৎসর) এবং শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়ের "খেয়াল"; শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিখিলেশ্বর গাঙ্গুলীর "ঠুংরী"; কুমারী কমল কুমারী নাগের 'আধুনিক বাংলা গান'; শ্রীবিভূতি ভূষণ দেব রায়ের বেহালা বাদন এবং শ্রীপরিতোষ মুখোপাধ্যায়ের তবলা-সঙ্গ বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

আমরা বাদল খাঁ মেমোরিয়াল ক্লাবের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

N. I. P.

পূর্ব পরিচয়

সাধারণতঃ আমরা যে রকম ছবি দেখি, তাতে আর মন ওঠে না। কাজেই নতুন রকমের কিছু সব সময় দর্শক মাত্রেই চায়। "সাথী" নামে যে ছবিখানি আসছে, তাতে বাঙ্গালী দর্শকের মন নতুনত্বের সন্ধান পাবে এ আশা আমরা করি। সাথীর পরিচালক ফণী মজুমদার দর্শক-মনের খোঁজ খবর রাখেন এবং কখন কোন দিকে এর পরিবর্ত্তন হয় তাও তিনি জানেন বলে মনে হয়।

এর প্রথম প্রমান পাই আমরা সাথীর ভূমিকা নির্ব্বাচনে। সাথীর প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন কানন এবং সায়গল। ছায়াচিত্রে এদের একসঙ্গে এই প্রথম অবতরণ। ফণীবাবু জানেন যে বাংলার— শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের দর্শক-মহল এই দুজন প্রখ্যাত শিল্পীকে এক সঙ্গে দেখবার আশা বহুদিন থেকে করে আসছেন। দর্শক মহলের এই আশা সাথী চিত্র পূর্ণ করবে। কানন এবং সায়গল ছাড়া আর যে সকল শিল্পী সাথীতে আছেন, তাঁরাও সকলে বিখ্যাত। অমর মল্লিক, শৈলেন চৌধুরী, বোকেন চট্টো, অহি সান্যাল, ভানু ইত্যাদি সকলেই বাংলার সিনেমা জগতে নামকরা লোক।

ফণীবাবু সাথী চিত্র নির্ম্মানে ঠিক চিরাচরিত পথ অনুসরণ করেন নি। তিনি নতুন ধরণে লিখেছেন গল্প এবং নতুন ধরণেই তা চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন।

সাথীর কাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা আমরা দেখতে পাব— যা দর্শক চিত্তে আনন্দ দান করার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র নানা ভাবের উদ্রেকও করবে। মানুষের মনে প্রেমের জন্ম এবং তার পরিণতি কোন পথে—কি ভাবে হয়, সাথী চিত্রে তাহার অপরূপ প্রকাশ দর্শকগণ দেখতে পাবেন।

এই ছবিতে কানন এবং সায়গলের অনেকগুলি গান আছে কাননের নাচও এতে দর্শক পাবেন। আমাদের মনে হয় এদের এই নাচ গান দেখতেই দর্শক হয়ত বারবার নিউ সিনেমায় আসবেন। সাথী ছবিকে সকল দিক থেকে পরম আনন্দময় করবার সকল চেষ্টাই করা হয়েছে, এবং নিউ থিয়েটার্স এর জন্যে কোন কার্পণ্যই করেননি।

বাংলার দর্শক নিউ থিয়েটার্সের ছবিকে যে যে কারণে সমাদর করে থাকেন, সাথী চিত্রে তার সবই পাবেন—এবং এও হতে পারে, যতখানি আশা আমরা দিচ্ছি, তার চেয়ে বেশীও অনেক কিছু পেতে পারেন। সাথীর মুক্তি আসন্নপ্রায়।

দেবদাসী

(শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী)

নৃত্য-বিলাসে অঙ্গে তোমার জাগে, একি মাধুরিমা!
দেবদাসী, তব রূপের সাগরে হারাই আমারি সীমা।
কাঁচুলী-বন্ধ উন্নত-পীনে ছন্দ নাচিছে অলসে,
নিতম্ব-ঘিরি' স্বর্ণ-মেখলা আরতির দীপে ঝলসে।
অগুরু গন্ধ মন্দির করে মাতাল তাহার বাসে,
ধূপের ধোঁয়ায় স্বর্গ লোকের বিদেহীরা বুঝি ভাসে।
চন্দন-ফোঁটা আননে তোমার, চোখে মাখা কালো অঞ্জন,
স্বপ্ন-মদির দৃষ্টিরে দিয়ে হের জানি কোন জন
আমি যে পথিক সুদূর বিদেশী, মন্দির মাঝ হতে
তোমার নুপুর-নিক্কণ আজি পশিলো শ্রবণ পথে।
বিভোল উদাসী চাহিনু যেমন তোমার নয়ন পানে,
অতীন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধ-পরশ কোথা জানি মোরে টানে।

শিল্পে জাতীয়তাবোধ

সত্যেন রায়চৌধুরী

শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বা তা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেকেই অনেকবার নানারূপ বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। ঐ কথাটী সকলেরই মনে রাখা উচিৎ যে, কোন দেশের বা জাতির উন্নতি নির্ণয় করা হয় তা'র শিল্প ও সাহিত্য থেকে। বৌদ্ধযুগে কি ছিল, মিশরদেশটী পূর্ব্বকালে কিরূপ ছিল; আজ তাদের সভ্যতার পরিচয় পাচ্ছি তার শিল্প ও সাহিত্য দেখে। আজ সে যুগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার চিন্তাধারা সমস্তই বুঝতে পাচ্ছি তার সেই সময়কার শিল্প ও সাহিত্য দেখে।

অসীমের রূপকে সমীমে এনে দেখিয়ে দেওয়া যেমন আর্ট তেমনি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারার বা ধর্ম্মক্ষেত্রের মধ্য হতে যে সত্য ও সুন্দর গতি চল্‌ছে তাকে প্রকাশ করাও তেমনি আর্ট। এই আর্টকে দুই পর্য্যায়ে ফেলছি—কাল্পনিক (Idealistic) ও বাস্তবীয় (Realistic)। কাল্পনিকের ভেতর ফেলছি সেই গুলিকে যা বাস্তবে আমরা দেখতে পাইনে, কল্পনার মধ্যদিয়ে অবাস্তবীয় যা দেখতে পাই বা অনুভব কোর্‌তে পারি। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের মাননীয় অধ্যক্ষ অসিত বাবুর একখানা ছবির কথা উল্লেখ কোর্‌ছি—ছবিখানার নাম "রহস্যময় প্রকৃতি"। ছবিখানির বর্ণনা হচ্ছে—বিচিত্র মেঘের মধ্যে একটী মেয়ের লীলায়িত ভঙ্গি। প্রকৃতিটা যে রহস্যময়ী সেইটাই প্রকাশ কোরছেন শিল্পী এইখানে। মেঘটা হুবহু মেঘের মত হয়েছে কি না, মেয়েটীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিকতা (anatomy) ঠিকমত হয়েছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দেন নি। এখানে দৃষ্টি দিয়েছেন শিল্পী তাঁর চিন্তাধারাটীর উপর। শিল্পী যদি চিন্তাধারাকে প্রাধান্য না দিয়ে উপকরণের অনুকরণের দিকে লক্ষ্য দিতেন তা'হলে আসল বিষয় বস্তুটী নষ্ট হোয়ে যেত।

শিল্পী যে কোন বিষয়ে দেখাতে চান না কেন, তাঁর প্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে বিষয় বস্তুটীর বিশিষ্টতার উপর। শিল্পী আঁক্‌ছেন একটী কৃষক দম্পতীর বিষয়, তখন তাঁকে যেতে হবে কৃষক সমাজের মধ্যে, মিশতে হবে তাদের সাথে ঠিক তাদের মত হোয়ে, দেখতে হবে তাদের হালচাল। মনের ভেতর একে নিতে হবে তাদের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটী; তারপর একে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে ঠিক তাদেরই মত কোরে তাদেরই বিষয় বস্তুটী। তা নয় একটী সুন্দর ছেলেকে সাজিয়ে কোরলাম কৃষক, আর একটী স্কুল কলেজের মেয়েকে কোমরে কাপড় জড়িয়ে বানিয়ে দিলাম কৃষক দম্পতী। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজকাল আমাদের দেশের অনেক মাসিকে স্থান পেয়ে থাকে এইরূপ অনেক ছবি যাকে কোনদিক হ'তে আর্টের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। তেমনি হয়েছে এই দেশীয় অনেক সিনেমায়। অনেক চরিত্র বা দৃশ্য দেখতে পাই যা'র সাথে বাস্তব বা সত্যের কোন সংস্রব নাই। প্রাণহীন জীব যেমন এগুলিও যেন তেমনি। ছবি আঁকা যেমন সাধনার জিনিষ, ছবি নির্ব্বাচন করা তেমনি। ছবি আঁকা বা নির্ব্বাচন করা শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় হয় না। যাঁর এ বিষয়ে বহুদর্শী অভিজ্ঞতা আছে, সেই সেটা গড়বে বা নির্ব্বাচন কোরবে, সেইটাই হবে সত্য, সেইটাই প্রাণে লাগবে সকলের। অজেয় কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের

জীবনী হ'তে আমরা সেইটাই প্রমাণ পাই। একদিন শরৎবাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনার বইতে যে সব চরিত্র স্থান পায়, এর মধ্যে কি কোন সত্য আছে?" তিনি দুটী কথায় তা' বেশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—"দেখ! আমার জীবনের পথে মিশ্‌তে হয়েছে অনেক লোকের সাথে অনেক রূপে, তার মধ্যে আমি যা পেয়েছি সেইটাই প্রকাশ কোরবার চেষ্টা করি"।

মূর্ত্তি-চিত্র-শিল্পের (Portrait painting) পটভূমীর (Back ground) বিষয় বস্তু নির্ব্বাচনে বেশীর ভাগ শিল্পীদের ঔদাসীন্য দেখতে পাই। ইংরাজিতে একটী কথা আছে "পটভূমী মূর্ত্তি-চিত্রের প্রাণ"। সে কথাটী আমরা কোন সময়ে চিন্তা করি না। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখতে পাই মূর্ত্তি-চিত্রের পটভূমীতে বই, টেবিল, চেয়ার, পর্দ্দা, কার্পেট; এগুলি থাকাই যেন নিয়ম। হয়ত এমন একটী লোকের ছবি যার সাথে বই বা লেখাপড়ার বিশেষ সংস্রব ছিল না অথচ তাঁর পাশে টেবিলে আঁকা রয়েছে গাদা গাদা বই, দোয়াত কলম ইত্যাদি। এই ছবিখানি তাঁদের বংশের চিরকালের একটী স্মৃতি হয়ে রইল। এদিকে তাঁর প্রপৌত্রেরা তাদের বাপ ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনছে যে তিনি লেখাপড়া বিশেষ করেন নাই; কোষাকুষি নিয়েই পূজাহ্নিকে সময় কাটিয়ে দিতেন। পরক্ষণেই সেই ছবি দেখেই ভাবছে "না"! এত সে লোক নয়! এ যে সাহিত্যিক। না হয় এর এমন কোন কাজ ছিল যাতে লেখাপড়া নিয়ে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হত। আমরা অনেক মূর্ত্তি চিত্র দেখতে পাই যার সাথে তার প্রকৃতির বা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের কোনই সংস্রব থাকে না। এই মিল না থাকায় চিত্রখানি যে কতটা অসত্য ও অশোভন হয় তা সহজেই অনুমান কোরতে পারা যায়।

চিত্রশিল্পে জাতীয় বৈশিষ্ট্যতা আর একটী বিশেষ লক্ষ্য কোরবার বিষয়। প্রত্যেক দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের মধ্যে এই বিশেষত্বটুকু রেখে গিয়েছেন। তাঁদের কল্পনা হয়ত বিশ্বজনীন, কিন্তু সেই কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলতে যে সব উপকরণ বা অনুকরণের প্রয়োজন হয়েছে সেটা তাঁদেরই সমসাময়িক এবং তাদেরই দেশীয়। র‍্যাফেল যে বিশ্ববিখ্যাত "মাতৃমূর্ত্তি" এঁকে গিয়েছিল সেই মাতৃমূর্ত্তির কল্পনাটী অবশ্য বিশ্বজনীন কিন্তু সেই বিশেষ মা ও ছেলে সেই দেশীয় ও সেই সময়কার তা আমরা দেখলেই বুঝতে পারি। এই ছবিখানিতে চিন্তাধারার প্রসারতার শক্তি যেমন পাচ্ছি তেমনি সেই সময়কার হালচাল, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমাদের এই দেশীয় অধিকাংশ শিল্পীদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নাই। শিল্পীর কল্পনাকে প্রকাশ কোরতে তাঁর নিজ দেশীয় অনুকরণে বা উপকরণে যত সুন্দর ও স্বাভাবিক হবে, অন্য দেশীয় বা কল্পনার উপকরণ দিলে তেমন সুন্দর হবে না। বাঙ্গালীর হাতে বাঙ্গলার সুখ-দুঃখ যত সুন্দররূপে প্রকাশ পাবে অন্য দেশেরটা তত সুন্দর হতে পারে না। কারণ এটা সে তার নিজস্ব। এই নিজস্ব জিনিষটা প্রকাশ করা আরও বিশেষ করে উচিৎ এই জন্যে, কারণ আজ তাঁরা যে সৃষ্টি কোরছেন পরে সেটাই হবে এই দেশেরই গৌরব স্মৃতি ও ইতিহাস। তাই দেখে এখন বিচার করবে এখনকার ধারা। বাঙ্গালার হাতের জিনিষ বাংলারই হওয়া উচিৎ, সেটা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে এটা বাংলারই সৃষ্টি। বাস্তবীয় (Realistic) ছবিগুলির বিষয়বস্তু বর্ত্তমান যুগের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি অবলম্বন কোরে সৃষ্টি কোরলে ভাল হয়। এই যুগের পর যে যুগ আসবে তারা এই ছবি দেখেই বুঝতে পারবে এখনকার গতি। এই ছবিগুলিও হবে তখনকার ইতিহাস। বাংলার শিল্পীদের সব সময় মনে রাখা উচিৎ যে আমি বাঙ্গালী আমি যা সৃষ্টি কোরছি তা এই বাংলারই গৌরবস্মৃতিস্বরূপ হয়ে থাকবে চিরকাল।
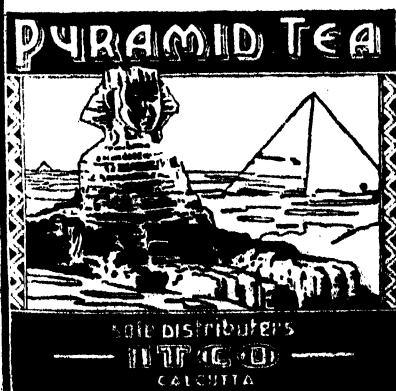
—:০:—

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—**শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্ত্তী**

[অনেকদিন ধরেই আমার সাহিত্য জগতে নামবার সাধ ছিল, আজ তা পূরণ হলো। কিন্তু আমি আমার নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু না করবো, তারচেয়ে আমাকে কর্ত্তে হবে একটী বৃহৎ কাজ, জানিনা কতটা সফলকাম হবো। তবে আমার মা, বোনদের কাছে আমার আশা রইল, যেন তাঁদের সমবেত-সহানুভূতির অংশ আমার কাজের সাথে মাখান থাকে, আমার আশা তবে সাফল্যমণ্ডিত হবে ও এই জন্য আমি চিরদিন আপনাদের কাছে থাকবো ঋণি—জানিনা এই ঋণের জন্য আপনাদের আমি কতটা আনন্দ দিতে পারবো। কাজের কথা বলা যাক— আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা থাকবে কি করে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পার্ব্বো ও আমাদের দ্বারা দেশের ও দশের কি উপকার সাধিত হতে পারে। বিশ্ব মানবের চক্ষে আমরা কি ভাবে থাকবো, বিশ্বের দরবারে আমাদের দাবী কতটা ও জাতীর মুক্তির সংগ্রামে আমাদের প্রয়োজন কতটা—এই আদর্শ নিয়েই আমাদের আলোচনা চলবে বরাবর ও তাতে আপনাদের সাহায্যও একান্ত প্রার্থনীয় ইতি—সম্পাদিকা: মঃ মঃ]

অনেক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে দেখতে পাওয়া যায়, মহিলা প্রসঙ্গকে হোটেলখানা করা হয়েছে। যেন এদেশের মা বোনেরা বিলেতি আদপ কায়দায় গা ঢেলে দিয়ে এই রান্না করা জিনিষটী বিভ্রমের খাচায় পুরে রেখেছেন—আর তাঁর উদ্ধার করা হচ্ছে, কি করে, না, চপ, কাটলেট্ ইত্যাদি বিদেশীয় লোভনীয় সামগ্রীর পাক প্রণালী সংকলন। এতে হয়কি, আর হবে কি?

আমি অবশ্য কোন প্রতিবাদ এর কর্ত্তে চাইনা, তবে এই জিনিষটী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মত মুখস্ত না করে, বাড়ীর বয়স্থাদের নির্দ্দেশনায় হাতে কলমে প্রতি দিন চেষ্টা করে দেখা উচিৎ নয় কি—কোন খারাপ কথা বলতে চাইনা, তবে অনেকেই জানেন যাদের হাক ডাক বেশী তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনার হয়তো "বেগুন ভাজতে হাত পুড়ে"—এইত অবস্থা। আপনারা অনেকে হয়তো মনে করছেন বা করতে পারেন আমি গায়ে পড়ে ঝগড়া কচ্ছি, ছিঃ, তা করবো না। আর যদি পারেন সে ভেবে আমায় ক্ষমা না করলে আপনাদের একটা মহাপাপ হবে নিশ্চয় জানবেন। যাক্ ঝাজে বলে আমার উদ্দেশ্য ও সময়টা এভাবে নষ্ট করতে চাই না। আমার উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে আমাদের দেশের যেরূপ পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতের যে দিনগুলিকে আমাদের সামলাতে হবে তার দরুণ আমাদের এখন থেকেই সতর্ক থাকতে হবে ও তাঁর প্রতিকারকল্পে আমাদের এখন থেকে কঠোর বৃতে ব্রতী হতে হবে। আমাদের ভাবতে হবে, বুঝতে হবে, আমরাই এই বৃহৎ জাতীর মেরুদণ্ড স্বরূপ। দেশের ও দশের ভাল মন্দই আমাদের ভাল মন্দ। আমাদের শিক্ষাই এই জাতীর বুদ্ধি, আমাদের আদর্শতাই এই জাতীর মুক্তির পাথেয়, আমাদের কার্য্যকুশলতা ও সহায়তাই এই জাতীর বলবীর্য্য—ভাবতে হবে আমরাই এক একটী অগ্নিকণা আর এই বৃহৎ বিশ্বটা একটা অগ্নিকুণ্ড। এ জাতীর সুখ দুঃখের ভার আমাদেরই সইতে হবে। এই দেশের বীর সন্তানদের পিছনে আমরা থাকব অভয়ারূপে। এদের মুক্তির পথ দেখাবার ভার আমাদেরই। এদের পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবার ভার আমাদেরই। আমাদেরই হতে হবে অগ্রণী। যে দেশের নারীজাতি শ্রমশীলা পারদর্শিনী ও কর্ম্মে সদা জাগ্রতা সে দেশের সুখও সদা জাগ্রত। কিন্তু তাবলে আমাদের ভাই ও সন্তানদের সংগ্রাম থেকে পরাজীত হয়ে ফিরে আসতে দেখলে শুধু অঞ্চলে চক্ষু মুছলেই হবেনা, এদের দিতে হবে এমন ধারা মন্ত্রনা যাতে করে এরা বিজয়ীর গৌরব মালা পরে আমাদের মধ্যে ফিরে আসে।

সে দিন আর আমাদের নাই। বিদেশী সাজ সজ্জায় নিমগ্ন থাকলে চলবে না আমাদের সাজতে হবে আজ নূতন সাজে। যাতে বিশ্ব সাহিত্যের প্রতি পংক্তিতে ভারত রমনীর গৌরব গাথায় ভরতি থাকে। জাগ— জাগ—এই আমার কামনা।— যাক্— এই সংখ্যায় এইখানেই যবনিকা টেনে দিলাম। পরবর্ত্তী সংখ্যা থেকে আমাদের কিভাবে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা কর্ব্বো। আপনাদের মতামত ও সহানুভূতি চাওয়া রইলো।

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া লবঙ্গ দেখিল, একটি শ্যামাঙ্গী স্থূলকায়া যুবতী দরদালানের সম্মুখের ঘরে বসিয়া, সম্মুখে আরসি খুলিয়া কেশ বিন্যাস করাইতেছে। একটা প্রৌঢ়া রমনী পশ্চাৎদিকে হাঁটু গাড়িয়া নানা অঙ্গভঙ্গিতে তাহার চুলের রাশি বাঁধিয়া দিতেছে। লবঙ্গ দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিল, এই শ্যামাঙ্গী যুবতীই তাহার সপত্নী এবং পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী রমনী কোনও দাসী হইবে। লবঙ্গকে দেখিয়া শ্যামাঙ্গী বক্রকটাক্ষে জিজ্ঞাসা করিল : তুমি কে গা ?

লবঙ্গ বলিল : আমায় চিনবে না। আমিও তোমার মত এ বাড়ীর একজন অংশীদার !

শ্যামাঙ্গী ঘৃণাসূচক ভ্রূভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : তার মানে ?

লবঙ্গ বলিল : মানে খুব সহজ। তোমার আগে, তোমার কর্ত্তা আর একটি বিয়ে করেছিলেন, জান ?

—হ্যাঁ, শুনেছি বটে।

—আমিই সেই।

শ্যামাঙ্গী লবঙ্গকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুখ বেঁকাইয়া বলিল : তা, এখানে কেন ?

লবঙ্গ প্রত্যুত্তরে বলিল : তুমি যে জোরে এখানে এসেছো, আমিও সেই জোরে এখানে এসেছি।

শ্যামাঙ্গী অবহেলাভরে বলিল : ওঃ ! সেই জোর !

লবঙ্গ উত্তর করিল : হ্যাঁ, জোরটা যতটা কম ভাবছো, ওটা কম নয়। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কাজেই মানুষের সমাজে বয়সের পার্থক্যের যে মূল্য আছে, সে মূল্যের আমি অপমান কর্ব্বো না, এ অঙ্গীকারটা তোমায় দিতে পারি।

—তুমি ত সতীন ! সতীন নাকি আবার ভাল হয় ?

—ভাল হয় না এইটেই দেখে এসেছো, এবং শুনে এসেছো ! কিন্তু ভাল যে হতে পারে, এটুকু কেন ধারণা কর্ত্তে পারো না ?

—ভালই যদি হবে, তবে যেখানে ছিলে, সেখানে ছেড়ে এখানে এলে কেন ? সেইখানে থাকাইতো সব দিক দিয়ে ভাল হতো !

—আমার ভাল হতো বটে ! কিন্তু আমার নামের বড় ক্ষতি হতো।

পশ্চাদ্‌বর্ত্তিনী যে রমনীটি কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত ছিল সে এতক্ষণে কথা কহিল : স্বগতভাবেই যেন বলিল, নাম বেরোতে বড় বাঁকি আছে কিনা। আমরাও সব শুনেছি।

এই গায়েপড়া অসভ্য রমনীটির মুখে এত বড় উচ্চকথা শুনিয়া রাগে লবঙ্গর সমস্ত শরীর কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু স্থানকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া লবঙ্গ অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে মনের উত্তেজনা মনোমধ্যেই দমন করিল, এবং অতি শান্ত ভাবে বলিল : দেখো বাছা ! কারুর বিষয় ভাল করে না জেনে, তার নিন্দা করো না। এটা আর কেউ সহুক, ভগবান সয় না। ভগবানকে মানো তো ? না, তাও মানো না ! তাঁর নামেও কুৎসা রটিয়ে বেড়াও।

লবঙ্গর এই শান্ত উপদেশপূর্ণ বাক্যে সে একটু দমিয়া গেল। সে নম্রস্বরে বলিল : আমি আর কি জানি বলুন। পাঁচজনে বলে, তাই আমিও বললুম।

লবঙ্গ আবার বলিল : আমি যদি বলি, পাঁচজনে বলে তুমি বাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে লুকিয়ে মুরগি খাও, তাহলেই সে কথাটা সত্যি হবে ?

মুরগীর নাম শুনিবামাত্রই ঝি তাহার পার্শ্বে থুৎকার ফেলিয়া বলিয়া উঠিল : মাগো ! আমি মুরগী খাই কিগো ? ওমা কি ঘেন্না। তুমি-আপনি এমন কথাটা আমায় বললে ?

লবঙ্গ বলিল : তা'হলেই বোঝো, পরকে বিনা দোষে নিন্দে করলে কত বড় অন্যায় হয়।

ঝগড়াটা প্রায় মিটমাট হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু শ্যামাঙ্গী প্রভুপত্নীর বাধায় তাহা হইতে পারিল না। তিনি হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন : আমি আরও চার পাঁচ জায়গায় শুনেছি তুমি কলকাতায় কোন্ বাবুর বাড়ীতে,—

—বাবুর বাড়ীতে কি ? বলো, কথাটা শেষ করো !

সে কথা কি আবার মুখে আনা যায় না কি ? আমরা পাঁচ জায়গায় শুনি, তাই বলুচি !

লবঙ্গ ধৈর্য্য সামলাইতে না পারিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল : কোন কথাটা কোথায় গিয়া কতদূরে দাঁড়ায়, চিরকাল পল্লীগ্রামে প্রতিপালিতা হইয়া ইহা তাহার অজানা ছিল না। দেখ ছোট গিন্নি ! আজ ভগবান তোমার দয়া করেছেন, তাই তুমি আমাকে নিঃসহায় পেয়ে যা তা বলে নিচ্ছ ! কিন্তু মনে রেখো, কোনও

মিথ্যা কথা জনরবের জোরও টেকে না, কিম্বা বক্তার উচ্চস্থানের জোরেও বাহাল হয়ে যায় না।

ছোট-গিন্নি তর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিল: মিথ্যে বলা? কে বলে একথা মিথ্যে ওই দত্তদের বাড়ী চলতো, আমি ভজিয়ে দেই।

—তারা কি করে জানলে।

—তা কি করে জানবো! কোনও রকমে জেনেছে, বোধহয়।

লবঙ্গ তখনও ঠাণ্ডা থাকিয়া বলিল: ছোট গিন্নি। এই 'বোধহয়'এর ওপর একেবারেই নির্ভর করো না। এগুলো একেবারেই রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া। এগুলোর না আছে কোনও কুলুজি, না আছে কোনও সম্ভ্রম। এগুলোকে বিশ্বাস করলে, শুধু যে সব সময় পরকে গালি দেবার' সুবিধা পাবে তা নয়, নিজেকেও অনেক সময় সেই গালির ভেতরে জড়িয়ে পড়তে হবে।

—পাঁচজনে যখন তোমার নামে এমন করে বলে, তখন গেরস্থ ভদ্রলোকের বাড়ী তুমি থাকবে কেমন করে?

—আমার কথা ভেবো না, ছোট গিন্নি। আমি দুদিনেই আবার সব উল্‌টে দেবো। ওসব শোনা কথা বইতো নয়?

—যতটা রটে, তার খানিকটা ত বটে। তুমি বললেই লোকে বিশ্বাস কর্বে কেন?

—লোকের সঙ্গে আমার যাহ'ক একটা বোঝা পড়া হবে এখন। সে ভেবে তুমি আর তোমার কচি মাথা পাকা করে তুলো না। তার চেয়ে বরং চুলটা বেঁধে নাও। আমি পুকুরঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে আসি।

—তুমি কি সত্যি সত্যিই এখানে থাকতে এসেছো নাকি? ওমা। কি ঘেন্না। বউমানুষ কি আবার যেচে শ্বশুর বাড়ী আসে নাকি?

—আচ্ছা ঘেন্নাটা না হয় হজম করলুম। ঘেন্না জিনিষটা মানুষের কাছে নতুন নয়, পৃথিবী ঘেন্নাতেই ভরা। সেইগুলোই মানুষের জমিকে উর্ব্বর করে। তুমি এখন একটু ঠাণ্ডা হও দেখি, তোমার নিজের ঘরের কোণে ঐ দুর্গন্ধটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না।

লবঙ্গ আর কিছু না বলিয়া তাহার পুঁটলি হইতে একখানা গামছা বাহির করিয়া পুকুরঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। যাইবার সময়ে বলিয়া গেল: ছোট-গিন্নি, আমার ওপর রাগ আছে বলে, আমার বাক্স তোরঙ্গ পুঁটলিটার ওপর তোমার রাগ ফলিও না। ওগুলো নেহাৎই নির্দ্দোষ!

(ক্রমশ:)

তখন আসিও

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

এখনো আমার মনের বনেতে
জাগিয়া বহ্নি-শিখা—
ক্ষমা চাহিব না বরণ করেছি
কপালে যে ব্যথা লিখা!!
তুমি যে আগুন সেতো জানা আছে
আমিও অগ্নি কণা।
আমার 'গরব'তুলিয়া ধরিব,
তুলিব যখন ফণা—
বেদনা আমার কাঁদিয়া হবে গো
তোমারী অনুরাগী,—
তখন আসিও প্রিয়!
তোমার বাঁশীর সুরে সে আমার-
'গর্ব্ব ছিনা'য়ে নিও!!······
এলিয়ে যখন পড়িবে আমার
জীবনে সান্ধ্য-ছায়া,
মুদিয়া যখন আসিবে নয়ন—
ওপারে টানিবে মায়া—
আমার "আমিরে"—হারায়ে ফেলিব
দেহেরো' উর্দ্ধে জাগি'—
তখন আসিও প্রিয়!
আমার ক্লান্ত অতনু তনুতে
দু'বাহু বাড়ায়ে দিয়ো!!······

স্বপ্ন ও বাস্তব

(গল্প)

কল্যাণকুমার সোম
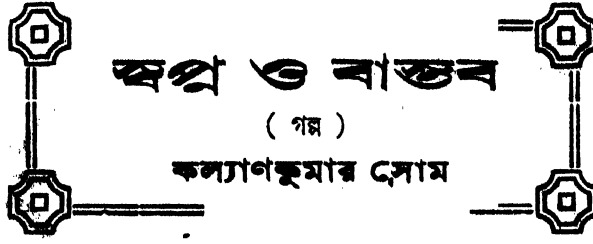
সুপ্রিয় কবি; ইদানীং সে কবি হিসেবে খুব খ্যাতি লাভ করেচে। কবিতা লিখে সে রাত্রি-বেলায়; যখন ঘুমিয়ে পড়ে সারা পৃথিবী, যখন নীরব হ'য়ে যায় জগতের সব কল-কোলাহল আর সারা জগত জুড়ে নেমে আসে একটা সুগভীর প্রশান্তি,—তখনই সুপ্রিয় লিখতে বসে। এমনি নীরব, মৌন-আবেষ্টনীর মাঝেই ওর কবিতার প্রেরণা আসে: জগতের যতো ছন্দ, কল্পনা আর গান—সব ভির ক'রে আসে ওর মনে। সে তন্ময় হ'য়ে লিখতে আরম্ভ করে; তার ঝর্ণা-কলমটা ছুটে' চলে কাগজের ওপর দিয়ে বিজয়ী বীরের মতো।

আজ-ও সুপ্রিয় লিখতে বসেচে এমনি আবেষ্টনীর মাঝে। বাতির উপর নীল শেড্‌টা টেনে দিয়েচে। টেবলের সামনের দিকের জান্‌লাটা খোলা; সে জান্‌লার ভেতর দিয়ে ভেসে আসচে নানারকম ফুলের মৃদু-মধুর গন্ধ। বাইরে জ্যোৎস্না: সারা পৃথিবীর উপর উপচে' পড়চে জ্যোৎস্নার আলো। এই চন্দ্রিল নিঃশব্দ-তার মাঝে বসে' লিখতে সুপ্রিয়র খুব ভালো লাগে।

পাশের বাড়ীর ওই পূবের ঘর হ'তে ভেসে আসচে কা'র সুললিত গানের সুর। সুপ্রিয় চিনতে পারলো এই সুর। নীলা গাইচে গান। নীলা! নীলা!—কী সুকোমল, কী শ্রুতি-মধুর নাম! নীলা সুপ্রিয়র বন্ধু সুদর্শনের কতো অন্তরঙ্গ ছিলো। নীলা সুতনু, অনুপম তার সৌন্দর্য্য। নীলার সাথে কথা কইতে সুদর্শন এতো আনন্দ পেতো! নীলা যখন সুদর্শনের সাথে কথা কইতো, তখন ওর সুবঙ্কিম ভ্রূ-যুগল, হাসিমাখা অধরপুট আর নয়নে কালো দুটি তারা নেচে উঠতো। সুদর্শনের হৃদয়-বীণায় বেজে উঠতো বিচিত্র সুর।

আজ সুপ্রিয়র মনে পড়লো তার বন্ধু—অতিপ্রিয় বন্ধু সুদর্শনের কথা।

ক'দিন আগে একটা কাজে সুপ্রিয় শিলচর গিয়েছিলো। বিকেল বেলা রাস্তা দিয়ে চলেচে; অজস্র লোকের ভীড়ের মাঝে একজন লোক হঠাৎ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো: এক খানি চেনা-চেনা মুখ, ওই সামনের রাস্তা ধরে চলেচে! গালে ওর লম্বা লম্বা দাড়ি জমেচে, অনেকদিন কামায়নি। গায়ের জামায় অজস্র তালি লাগানো; পায়ের জুতোটা ছেড়া।··· সুপ্রিয় চিনতে পারলো লোকটিকে। সে দৌড়ে' ওর কাছে গিয়ে ডাকলো: সুদর্শন!

সুদর্শন ফিরে তাকালো। সুপ্রিয়র পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো; তারপর ব'লে উঠলো: সুপ্রিয়?

সুপ্রিয় আবেগে বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরলো।

সুদর্শনের সাথে সুপ্রিয়র প্রায় সাত-আট বছর পর দেখা হোলো। এই সুদীর্ঘ সময়ের অবকাশে সুদর্শনের স্মৃতি সুপ্রিয়র মনের আকাশে অনেকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে আসছিলো। অতীতের স্মৃতি, অনেক হারিয়ে-যাওয়া কথা একমুহূর্ত্তে ভেসে উঠলো সুপ্রিয়র চোকের সামনে।···ছেলে-বেলা হ'তেই সুপ্রিয়র সাথে সুদর্শনের বন্ধুত্ব ছিলো। তাদের কৈশোর ছিলো কল্পনার রঙে রঙীন, স্বপ্নময়। নতুন যৌবনের বিশুভ্র-আলো রাঙিয়ে দিয়েছিলো তাদের জীবনকে অনুপম দ্যুতিতে। তারা তাদের সামনে দেখতে পেতো সুন্দর, নিঃসীম জীবন; যে-জীবনে আছে আলো, আছে মাধুর্য্য, আছে সৌন্দর্য্য: যে জীবন রহস্যে ঘেরা, যে—জীবনের গণ্ডিতে দুঃখের শীতল হাওয়া দোল খায়না। দু'বন্ধুই ছিলো কবি-প্রকৃতির। প্রভাতে পূবাকাশের অরুণোদয়, সন্ধ্যার রক্তিম আলোয় ঝল্‌মল্ পৃথিবী, সন্ধ্যাতারার মৌন-সংগীত, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর অনাবিল শুভ্রতা ওদের মনে জাগাতো আনন্দের সুর: এই বিস্ময়-পুলক মুগ্ধতার মাঝে ওরা ভুলে' যেতো আপনাকে, নাম-না-জানা এক অপূর্ব্ব আনন্দের শিহরণ জেগে উঠতো ওদের মনে। সুদর্শণ ছিলো একটু বেশি ভাব-প্রবণ। প্রকৃতির লীলা-চঞ্চল রূপে বিমুগ্ধ হ'য়ে সে লিখতো সুন্দর কবিতা। সুদর্শণ বাস্তবতার কোনো বেদনা সহ্য করতে পারতো না: এমনি কোমল ছিলো ওর মন। সে জগত জুড়ে' খুঁজে বেড়াতো অনাবিল আনন্দ। ওর সৌন্দর্য্য পিপাসু অন্তর ঘুরে' বেড়াতো আনন্দের সন্ধানে,—যে আনন্দ হ'বে ওর জীবনের পাথেয়।···

—কেমন আছিস্ সুপ্রিয়?—সুদর্শণ শুধালো: কী ভাবচিস্ ভাই!

সুপ্রিয়র চিন্তার ফিল্‌ম্ মাঝ-পথেই গেলো ছিঁড়ে। সুদর্শণের এই অবস্থা দেখে' বিষাদে ভ'রে উঠলো সুপ্রিয়র অন্তর। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুপ্রিয় বললো: আমি ভালোই আছি ভাই! তোর খবর কী বলতো! কী করচিস্, আজকাল?

—কী করচি আজকাল!—সুদর্শণ হাসবার চেষ্টা করলো। বৃথা চেষ্টা; তার মুখের উপর হাসির করটি ক্ষীণ-রেখা ভেসে

উঠে' মুহূর্তেই মিলিয়ে গেলো: বিশেষ কিছুই করচিনে। আর, কেমন আছি তা' তোর না-জানাই ভালো, বন্ধু!

—তোর কথা আমাকে-ও বলবিনে, দর্শণ? সুপ্রিয়র গলা ভারী হ'য়ে এলো।

ততোক্ষণে ওরা একটা পার্কের পাশে এসে পড়েচে। সুদর্শণ খানিকটে ভেবে বললো: আচ্ছা, শোন্ তবে!...

—চল্ ঐ পার্কে গিয়ে বসি।—সুপ্রিয় বললো।

দু'বন্ধু পার্কের একটা বেঞ্চের উপর বসলো। সুদর্শণ ব'লে চললো তার জীবনের বেদনা-ভরা ইতিহাস্। সুপ্রিয় বুঝতে পারলো, সুদর্শণের বুকের ভেতর কল্লোল তুলেচে ব্যথার একটা অবরুদ্ধ বন্যা।

—তোর বোধ হয় মনে আছে সুপ্রিয়,—সুদর্শণ বলতে লাগলো: বি, এ, পাশ করবার আগেই আমাকে কলেজ ছাড়তে হ'য়েছিলো; হঠাৎ বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বাড়ি চ'লে গেলাম। বাবার যা' আয় ছিলো, তা' দিয়ে তিনি বেশ জমি-জমা করেছিলেন; তা'তে খুব স্বচ্ছন্দেই আমাদের দিন চলে যেতো। আমি বাবার মৃত্যুর আগে টাকা-পয়সা সম্বন্ধে তাই কোনই চিন্তা করিনি। কিন্তু বাড়ি এসে শুনতে পেলুম, বাবা অনেক টাকা ঋণ করে-ছিলেন; এবং তা' শোধ করা হয়নি। আমি বাবার সব ঋণ শোধ ক'রে দিলুম; তখন আমাদের রইলো শুধু ভিটে-টা এবং সামান্য কিছু ক্ষেতের জমি। এ-সব থাকলেও আমি কোনোমতে চালিয়ে নিতে পারতুম।—এই পর্য্যন্ত ব'লে সুদর্শণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামলো। তারপর আবার বলতে লাগলো: কিন্তু তা' হোলো না। গ্রামের জমিদারের নায়েব হরিশ চৌধুরী ক'দিন ধরে অযাচিত ভাবে আমায় খুব সহানুভূতি দেখা'তে লাগলেন।

শেষে একদিন তিনি নিজের অভিপ্রায়টা ব'লে ফেললেন: তিনি আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। তুই তো জানতিস্ সুপ্রিয়, আমার একটা প্রতিজ্ঞা ছিলো যে, যতোদিন পর্য্যন্ত আমি উপার্জ্জনশীল না হই, ততোদিন পর্য্যন্ত বিয়ে করবো না। তাই আমি হরিশবাবুর অনুরোধ রাখতে পারলুম না। তিনি আমাকে অনেক টাকা দিতে চাইলেন; কিন্তু আমি রাজী হলুম না। শেষে তিনি খুব রেগে গেলেন, এবং আমায় শাসিয়ে দিলেন: বটে! খুব স্পর্দ্ধা হ'য়েচে তো! আচ্ছা, আমি তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দেবো!

তারপর তিনি আমার নামে জমি-জমা নিয়ে মিথ্যে মোকদ্দমা রুজু করলেন; মিথ্যে সাক্ষী জোটালেন। ছেলেবেলা হ'তেই আমি শহরে ছিলুম; গ্রামের লোকদের সাথে বিশেষ পরিচয় ছিলো না। আর পরিচয় থাকলেই বা কী লাভ? সবাই যাবে নায়েবের পক্ষে; তিনি টাকার জোরে এবং ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্বপক্ষে টেনে নিলেন। আর তাই, আমাকে দাঁড়া'তে হোলো রাস্তায়। মহাবিপদে পড়লুম; মা এবং ছোট ভাই-বোনদের কী শেষে না খাইয়ে মারবো! অবিশ্যি, অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছেই সাহায্য চাইতে পারতুম; কিন্তু চাইলুম না।...শেষে অনেক চেষ্টা ক'রে এখানের একটা অপিসে সামান্য বেতনে একটা কেরাণীর কাজ পেয়েচি।

সুদর্শন থামলো। তার করুণ চাহনিতে তার প্রতি অঙ্গে যেন ফুটে' উঠেচে বেদনার আভাস।

—তারপর?—অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে শুধালো সুপ্রিয়।

—তারপর?—সুদর্শন জবাব দিলো: তারপর আর বলবার কিছুই নেই ভাই! এই তো আছি!

সুদর্শনের বুকের ভেতর হ'তে বেরিয়ে এলো একটি দীর্ঘশ্বাস।

সুদর্শনের বেদনা-ভরা কাহিনীতে সুপ্রিয়র হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো ব্যথায় টন্-টন্ ক'রে উঠলো। এই কী সেই সুদর্শন? সুদর্শন যে ছিলো ভাব-বিলাসী কবি: তার ছিলো ছন্দের পথ, কাব্যের পথ, সঙ্গীতের পথ! নব-যৌবনের মদির হাওয়ায় সে অনুভব করতো স্বপ্নময় রোমাঞ্চ। কল্পনার তৃতীয়-নয়ন দিয়ে সে করতো অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। ওর দেহের সেই কমনীয়তা হারিয়ে গেচে; সেই রক্তিমাভ কপোল আর নেই: মাংসল জায়গায় ভেসে উঠেচে ক'খানা রুক্ষ হাড়ের চিহ্ন। সুদর্শনের চোকের সেই অপূর্ব্ব দীপ্তি নিষ্প্রভ হ'য়ে গেচে! কোথায় সেই সুশ্রী, প্রতিভাসমুজ্জ্বল যুবক? সে কি আর বেঁচে নেই?...

• • •

বিষাদের রিক্ততায় ভ'রে উঠলো সুপ্রিয়র সারা অন্তর।

গান

শ্রীমাণিক চট্টোপাধ্যায়

তোমার মুখের ঘোমটাখানি
বন্ধু আজি খোলো,
'আমার মনের নীরব বীণা
মুখর ক'রে তোলো।
পলাশ বনে রঙ লেগেছে
মৌমাছি'রা তাই মেতেছে
বকুল শাখে দোলনা'তে
(আজ) আমার সাথে দোলে
যে দুখ্ তুমি সইলে প্রিয়
আজকে তারে ভোলো
তোমার মনের গোপন কথা
আমায় তুমি ব'লো।
ফাল্গুণ যায় চৈত্র আসে
বন যে কাঁদে দীর্ঘশ্বাসে
আমার মনের স্বপ্নটুকু—
সফল ক'রে তোলো।

—

পাশের বাড়িতে নীলার গান তখন শেষ কলিতে এসে পৌছেচে:
'দু'খের রাতে নিখিল ধরা, যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।'

সুপ্রিয়র চোকে নেমেচে অশ্রুর উচ্ছল-বন্যা। অশ্রুতে ঝাপসা হ'য়ে এলো ওর দু'চোক।

সুপ্রিয়র আজ কিছুই লিখা হোলো না।

—

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে। চপল যেন এক নতুন জগতে এসে পৌঁছেচে। অপরিচিতা তরুণীর সাথে, একই গাড়ীতে, একই আসনে ও এই প্রথম চলেছে। জীবনে ট্যাক্সিতেই উঠেছে ও খুব কম, গুণে বলতে পারে ক'বার। দোতলা বাসের মাথায় উঠে সামনের বেঞ্চে বসে চেয়ে থাকা রাস্তার দিকে ওর একটা বিলাস। ওর সীটের পাশে কোন কোন দিন কোন অপরিচিতাও হয়তো উঠে থাকবে, কিন্তু সেদিকে ও একেবারে অন্ধ। সারা দেশের লজ্জা যেন ওর ঘাড়ে এসে আশ্রয় করে। সোজা চোখ রেখে ও চুপ করে চেয়ে থাকে সামনের দিকে, আড়ষ্ট হয়ে। তারপর টিকিটের মেয়াদ ফুরুতে না ফুরুতেই; গন্তব্যের অনেকখানি আগে নেমে পড়ে। দোকানে কাপড় কিনতে গিয়ে মেয়ে খরিদ্দার দেখলে ও পালিয়ে আসে চুপি চুপি, পাছে ওকে কেউ দেখে ফেলে। এই ওর স্বভাব।

মীরার পাশে বসে ও নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করে দেখতে চায়—এই ওর ভালো লাগছে কিনা। ও নিজের প্রশ্নের ভেতর ডুবে যায়, অন্যের সান্নিধ্য ভুলে।

—এই রোকো থোড়া।— ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তার ধারে। চপল তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে যায়।

মীরা ওকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলে—ওকি উঠছেন যে। এতো মৌলালীর মোড় বসুন একটু; আমি একটা জিনিষ নিয়ে আসি এদের দোকান থেকে।

ও নেমে যায়। চপল তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। নাঃ ওর চোখটাও হয়ে উঠেছে আজ অবাধ্য। কিছুতেই ও তাকাবেনা, ও ঘাড় নীচু করে বসে থাকে।

—মীরা ফিরে আসে অল্পক্ষণের মধ্যেই। ওর দিকে তাকিয়ে বলে—কি ভাবছেন ?

—কই না তো—

—আপনার সময়ের বড় অপব্যবহার করছি—নয় ?

—আমি কি তাই বলেছি ?

—সব জিনিষই কি আর মুখের কথায় বুঝতে হয় ?

—কই ! আমি তো বেশ আছি।

—দেখে তাতো মনে হচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক স্বাভাবিক নন। বিরক্তির ছায়া পড়েছে আপনার মুখে।

—তা কেন ? আপনার সাথে আলাপ করে বরং খুসীই হয়েছি।

সত্যি ? ধন্য হলাম। ভায়নক কষ্ট দিলাম আপনাকে—নয় ?

—কি যে বলেন। আমি তো তা বলিনি একবারও। মনেই হয়নি কোন কষ্টের কথা।

মীরা চোখ বুজিয়ে নিয়ে বলে—আঃ বাঁচলাম।

আঁচলটাকে গুটিয়ে নিয়ে ও চপলের সামনে দিয়ে এসে ওর পাশে বসে পড়ে, মধ্যে একটুখানি ফাঁক রেখে। সঙ্কোচ তো আছে। ভদ্রতাকেও তো বাদ দেওয়া যায় না।

ওর গা থেকে ছড়িয়ে পড়ে দোকান থেকে সদ্য কেনা দামী সেন্টের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ ওর সখ চেপেছে।

গাড়ী এসে মাণিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চপল তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। নমস্কার করেই ও সোজা চলতে আরম্ভ করে। ওর যেন কি ভুল হয়ে যাচ্ছে সর্ব্বদাই—ও ভেবেই পায় না। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—আপনার ঠিকানাটা।

—'তবু ভাল'—মীরা বলে। এরই মধ্যে সম্পর্ক চোকানর ব্যবস্থা করেছেন যে—

—বাঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে। ভুল করাইতো মানুষের স্বভাব।

—তা বটে, বিশেষ করে আপনাদের মত গুণীলোকদের স্বভাব। কিন্তু দয়া করে মনে রাখবেন ঠিকানাটা। আর না হয় লিখেই দিচ্ছি। দেখবেন যেন ভুল করে ওটাও রাস্তায় ফেলে যাবেন না। আপনার বাড়ীর নম্বরটা তো ২৮ নং ? আমার খুব মনে থাকবে। আমাদের সেক্রেটারী মৃণাল বাবুর কাছেই জানতে পেরেছিলাম ওটা, আর এখনও পর্য্যন্ত ভুলিনি তাও দেখছি। হ্যাঁ আমাদের ফোন নাম্বারটাও রেখে গেলাম ওই সঙ্গে। দুপুরের দিকে বাড়ীই থাকি ছুটীর দিনে। প্রয়োজন হলেই ডাকবো বিরক্তি বোধ করলেও রেহাই দেব না। আর নিজেই এসে যদি হানা দিই আপনার বাড়ী—চটে যাবেন তো ?

চপলের চোখের সামনে ওর মার মূর্ত্তি ভেসে ওঠে। এই মাকে জিজ্ঞাসা না করে ও কোন কাজই করতে পারে না। মাকে ও যতদূর জানে তাতে মুখে

তিনি কোনদিন মানা করবেন না। কিন্তু মনে মনে কি ভাববেন তা তিনিই জানেন। দুনিয়ায় একমাত্র মাকেই ও চেনে—তাই কোন কথাই মার কাছে গোপন রাখে না। ও ভাবে মা কি এই ধরণের মেয়েদের পছন্দ করবেন ?

আর একটু সময় কেটে যায় নিঃশব্দে।

মীরা আবার জিজ্ঞাসা করে কই বল্লেন না চটে যাবেন কিনা ?

ও বলে—মানুষের বাড়ী মানুষ গেলে কি কেউ কোনকালে চটতে পারে ?

—পারে বইকি চপলবাবু, কিন্তু আপনি বিরক্ত হলেন কিনা তাই বলুন।

—তা কেন হব। বরং খুসীই হব।

—তাহ'লে অভয় দিলেন ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আচ্ছা নমস্কার—বলে চপল পা বাড়ায়। হঠাৎ আবার ফিরে বলে (ওর বুদ্ধি যেন ফিরে এসেছে) —ভারী কষ্ট দেওয়া হলো আপনাকে, এতদূর টেনে এনে। কিছু মনে করবেন না।

মীরা বলে—কষ্ট তো বরং আমিই দিলাম আপনাকে। ও কথাটা তো আমারই বলা উচিত ছিল।

—তা কি করে হয় ? বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত আনলাম টেনে আপনাকে, ফিরতে আপনার কত রাত হয়ে যাবে, দেখুন দেখি। বাড়ীতে হয়তো আপনার মা আপনাকে কত বকবেন (ও নিজের মার সাথে মিলিয়ে বলে)

—একটু বকুনি না হয় খেলামই, কিন্তু আজ যা লাভ করলাম, তার সন্ধান তো তিনি রাখবেন না।

—লাভ ?—

—হ্যাঁ তাইতো। আপনার সাথে ঘনিষ্ঠতা, সেকি কম লাভ ?

—আচ্ছা আমিও তো সে কথা বলতে পারি ?

—তা কেমন করে পারেন ? আপনার দর্শনটাই কাম্য সকলের কাছে, আমার কাছেও, কিন্তু আমার জন্যে আর কে ভিড় জমায় বলুন ?

—জমায় না ? নিশ্চয়ই জমায়। কতজন হয়তো চায় আপনার দর্শন।

আপনি চান ?

—আমার কথা ছেড়েই দিন। হয়তো চাই, হয়তো চাই না।

—বাঃ, আপনার কথার যে কোন মানেই হয় না।

—তা হবে; কিন্তু সত্যিই অনেক রাত হলো, বাড়ী যান বলে চপল পা চালাতে সুরু করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা

ডাকদার হয়ে দুটি হাত খেলানো আর প্রতিরোধকারী হয়ে সেই খেলাটিকে নষ্ট করা যদিও মূলতঃ এক,—তবু অধিকাংশ সময়ে প্রতিরোধকারীকে অত্যধিক পরিমানে মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয়। ডাকদার তাস ফেলা থেকেই দেখতে পান যে তাঁর খেলা কতদূর যেতে পারে বা তাঁর ডাকানুযায়ী খেলা করা সম্ভব হতে পারে কি না। কিন্তু প্রতিরোধকারীকে এই বিষয়ে চিন্তার দ্বারা, ডাকের দ্বারা আর ডাকদারের খেলার কৌশলের দ্বারা ধরে নিতে হয়। অধিকাংশ সময়ে প্রতিরোধকারীর অসাবধান খেলার দরুণ ডাকদার খেলা করে নেন। এইজন্য প্রথম থেকেই প্রতিরোধকারীকে ডাকদারের খেলার চালনাটি বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা দরকার। নিম্নের খেলাটি দেখলে অনায়াসে আপনারা বুঝতে পারবেন যে প্রতিরোধকারী কিরূপ চিন্তা করে ডাকদারের খেলাটি নষ্ট করলেন,

ইস্কাবন—দশ, পঞ্জা।
হরতন—টেকা, সাহেব, তিরি।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, পঞ্জা, দুরি
চিড়িতন—দশ, পঞ্জা।

ইস্কাবন—টেকা, সাহেব, নয়, আটা।
হরতন—বিবি, আটা, ছক্কা, পঞ্জা।
রুহিতন—দশ, ×।
চিড়িতন—বিবি, চৌকা, দুরি।

ডাক হয়েছিল,

'উ'	'পূ'
একটি রুহিতন	পাশ
দুইটি রুহিতন	পাশ
তিনটি ফেরাই	পাশ
'দ'	'প'
একটি ইস্কাবন	পাশ
দুইটি ফেরাই	পাশ
পাশ	পাশ

'প' হরতনের গোলাম খেলায় ডাকদার সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে ইস্কাবনের দশ

খেললেন। পিটখানি টেক্কা দিয়ে মেরে নিয়ে রুহিতনের দশ খেলায় 'প' ও 'উ' দুইজনেই দুইখানি রুহিতন দিলেন। এইবার 'পূ' দেখলেন যে 'দ'র হাতে নিশ্চয়ই আর একখানি রুহিতন আছে, নতুবা তিনি ইহার উপর টেক্কা মেরে পিট নিয়ে রুহিতনের বিবি খেল্তেন। কিন্তু যে হেতু তিনি তা' করেন নি, নিশ্চয় তাঁর হাতে হরতনেরও বিবি আছে; যদি তা' না থাক্ত তবে হরতনের ভয়ে তাঁকে রুহিতনটি দাঁড় করিয়ে যে কটা পিট পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হত। পূর্ব্বোক্তরূপ না খেলার দরুণ দেখুন কতটা খবর পাওয়া গেল। এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'দ'র ইস্কাবনেও ফিনাস্ নেওয়া উচিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা' উচিত নয়। কারণ তাঁর মোট পিট হয়ে যাচ্ছে রুহিতনের পাঁচখানি, হরতনের তিনখানি ও ইস্কাবনের দুইখানি,—সর্ব্বসমেত দশখানি পিট, অতএব ইস্কাবনের ফিনাস নেওয়া অতীব মূর্খতা। এইবার 'পূ' দেখতে পেলেন যে, যে ভাবে খেলা যাচ্ছে তাতে ফেয়াইএর খেলা করা অতীব সহজসাধ্য। আবার ডাকদারের খেলার ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ইস্কাবনেও তাঁর হাতে পিট ধর্বার একখানি তাস আছে, তা না হলে এত তাড়াতাড়ি তিনি রুহিতনের ফিনাস নিতে যেতে পারতেন না। সুতরাং এখন একমাত্র চিড়িতনের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, আর যখন 'পূ'র হাতে চিড়িতনের টেক্কা সাহেব বর্ত্তমান। অতএব রুহিতনের সাহেব দিয়ে পিট ধরেই চিড়িতনের ছোট একতাস খেলাই যুক্তিযুক্ত, কারণ ডাকদারের হাতে যদি চিড়িতনের বিবি থাকে তো তাঁর পক্ষে মারা বড়ই শক্ত হবে। এইরূপ চিন্তা করে 'পূ' ছোট একতাস চিড়িতন খেল্লেন এবং অতি সহজেই ডাকদারের খেলাটি নষ্ট করে দিলেন। অথচ এইরূপ ভেবে-চিন্তে না খেল্লে ডাকদার অনায়াসে খেলা করে নিয়ে যেতেন। অন্য দুজনের হাত—

প

ইস্কাবন—×, ×, ×, ×।
হরতন—গোলাম, দশ, ×, ×।
রুহিতন—পঞ্জা।
চিড়িতন—গোলাম, নয়, সাতা, তিরি।

উ

প পূ

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, ×।
হরতন—×, ×।
রুহিতন—সাহেব, সাতা, চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ×, ×।

লক্ষ্ণৌয়ে কয়েকদিন

বি, কে, চট্টোপাধ্যায়

চঞ্চল, অনিল আর তার বোন সুগৌরী। বহুদিন পরে এদের দেখা ট্রেইনের ইণ্টারের ছোট্ট কামরায়। ট্রেইনের সশব্দ গতি আর দুই বন্ধুর অতীত দিনের টুকুরো গল্পের মধ্যে সুগৌরী হঠাৎ বলে উঠলো, "লক্ষ্ণৌ কেমন দেখলে চঞ্চলদা?' সজীব ভাষণে চঞ্চল সুগৌরীকে বললে, "কী দেখলাম জান গৌরা? দেখলাম ইতিহাসের পিছনে সত্য অতীত। তোমরা সবাই ইতিহাসে পড়েছ, অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদাৎ খাঁ। কিন্তু আমি কি দেখলাম জান? দেখলাম এর অতীত ইতিহাস যা তোমাদের ইতিহাসে নেই। তুমি হয়তো হাসবে যদি আমি বলি লক্ষ্ণৌ নগরার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণ। তখন এর নাম ছিল লক্ষ্মণপুর। এখন যেখানে মচ্ছিভবন অবস্থিত, সেখানেই ছিল লক্ষ্মণপুরের অবস্থিতি। আর লক্ষ্ণৌ নাম যে লক্ষ্মণপুর হতে উৎপন্ন তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারছ।"

তারপর দেখলাম মোগল সভ্যতা। মোগল যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পিদিগের বিস্ময়কর নৈপুণ্য। তাদের তৈরী এমামবাড়ী সুবৃহৎ ও গৌরবময়, আর তার মধ্যে চির নিদ্রায় শায়িত আসাফউদ্দৌল্লা। তার সমাধির কাছে একটী আধার স্থাপনা করা হয়েছে। আশা দর্শকগণ কৃপা করে যা দেবে তা দিয়ে হবে সমাধির সংস্কার আর আলোক দানের ব্যবস্থা। জান গৌরী, তখন আমার মনে কি হলো? যার শৌর্য্যে লক্ষ্ণৌ গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, যার তর্জ্জনীয় হেলনে রাজকোষাগার নিঃশেষিত হত, তার সমাধির পাশে বাতি দেবার জন্য একটী পয়সাও সংগ্রহ করিতে হয়, চমৎকার না?

তরপর দেখলাম লক্ষ্ণৌয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ 'করহৎবক্স'। পুলকে আমার মন পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই যেন সঙ্কুচিত করে দিল আমার মন, প্রতি দেয়ালটী অশ্রুতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে জানিয়ে দিলে আমরা সাদাৎ আলির কীর্ত্তি, যে বিক্রয় করেছিল তার পিতৃ পিতামহের সম্পত্তি পরশক্তির জন্য। জানিয়ে দিলে আমরা সেই জীবের সৃষ্টি, যে বিসর্জ্জন দিয়েছিল নিজ মনুষ্যত্ব, দেশের স্বাধীনতা, জাতির শ্রেষ্ঠ অধিকার ...... তারপর আর কিছুই দেখা যায়নি। সেখান থেকে ফিরে এলাম নিজের বাসায়। মাথার ভিতর কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলাম। প্রথমে ভেবেছিলুম কিছুক্ষণের ভিতর সুস্থ হব কিন্তু সেটা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগলো। অসহ্য যাতনা, অব্যক্ত

বেদনা, কি করি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। শেষে এক বন্ধুর উপদেশ মত রচির একটী 'সারিডন' ট্যাবলেট্ সেবনে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ফল হ'ল। আমি জীবনে এ কথা কখনও ভুলতে পারিবো না 'সারিডন' ট্যাবলেট অসময়ে আমার যা উপকারে লেগেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিবার পর সুগৌরী ধীরে ধীরে বললে "তোমার অসমাপ্ত কাহিনী শেষ করছি চঞ্চলদা। গাজীউদ্দিন হায়দার লক্ষ্ণৌএ প্রথম রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং ওয়াজিদ আলি খাঁ পঞ্চম বা শেষ রাজা। লক্ষ্ণৌর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় কৈশরবাগ ওয়াজিদ আলি খার তৈরী। জান চঞ্চলদা কৈশরবাগ কি দিয়ে তৈরী? লোকে বলে, আশী লক্ষ টাকা দিয়ে, কিন্তু আমি দেখেছি কি দিয়ে, জান? আর্ত্তের হৃদয় শোনিত দিয়ে আর নির্য্যাতিত বেগমদের অশ্রুর বন্যায়। তাই তার মধ্যে গিয়ে আমরা এখনও পাই যেন কার সব-শীতল স্পর্শ, অনুভব করি অশ্রুময় দীর্ঘশ্বাস আর নীরব অভিশাপ"।

চলচ্চিত্র ও ইহার প্রচার কার্য্য!

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একথা সবাই আজ একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, চলচ্চিত্র আজকের যুগে একটা দেশের প্রধান মুখপাত্র। চলচ্চিত্রের মধ্য হ'তে নানা দেশ সম্বন্ধে 'নানান বিষয়ে জ্ঞাতব্য এবং শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আমরা জানতে পারি। কোন দেশের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি অনেক কিছুই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে' একটা দেশকে বিশ্বসমক্ষে পরিচিত করে দেয় এবং এ হিসেবে চলচ্চিত্রের দান অপূরণীয়। তাই আজ সাহিত্যের পরই চলচ্চিত্রের স্থান।

একটা দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতার প্রত ক এই চলচ্চিত্র শিল্প পৃথিবী ময় শিক্ষা, জ্ঞান এবং সর্ব্বোপরি আনন্দ বিতরণ করে মানুষের একটা অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করেছে। মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান চলচ্চিত্রদ্বারা পৃথিবীর মানুষের যে কতটা উপকার সাধিত হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। অন্য কিছু ছেড়ে ব্যবসার দিক দিয়ে ধরতে গেলেও একটা দেশের কোটী কোটী টাকা এই শিল্পের পিছনে খাটছে। তাই নানারূপ বিবিধ কারণে এই শিল্পের প্রসারতা এক একটা দেশের নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতির দিক দিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের দরিদ্র বাংলাদেশেও কয়েক কোটী টাকা এই শিল্পের জন্য খাটছে এবং অনেক লোক এর থেকে কিছু রোজগার করে খাচ্ছে।

বাংলার বহুজন-সমাদৃত চলচ্চিত্র-শিল্পটীকে অবনতির হাত থেকে বাচাতে হলে এবং এর ভবিষ্যত উন্নতি দেখতে গেলে এর আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের অনেক কিছুর উপর আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এই উন্নতিশীল শিল্পটীর ভবিষ্যৎ যে-সব জিনিষের উপর নির্ভর করছে, প্রচার কার্য্য বা Publicity তাহাদের মধ্যে অন্যতম। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি এবং প্রসারতা ব জনপ্রিয়তা (Popularity)র উপর জার্ণালিষ্ট, প্রচার-শিল্পী (Publicity officer) এবং সমালোচকের (Film-critic) দান যে কত বড় তা অস্বীকার করবার আর আজ উপায় নেই। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে যেমন যথার্থ সমালোচক বা প্রকৃত ফিল্ম-জার্ণালিষ্টের অভাব তেমনি আবার এদেশের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা ছবি ও এ শিল্পের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। প্রচার বিভাগীয় কার্য্যের উন্নতি

এবং জার্ণালিষ্ট ও ফিল্মক্রিটিকের সহানুভূতি ব্যতীরেকে এর ভবিষ্যত উজ্জ্বল হোতে পারে না—কোনও দেশে তা পারে নি। আমেরিকার তথা সমগ্র জগতের কেন্দ্র 'হলিউড' যে চলচ্চিত্র শিল্পের স্বর্ণপুরী হোতে পেরেছে সে সুধু তাদের প্রচার-শিল্পীদের গুণেই। এ বিষয়ে আমরা যে কত পিছনে এবং কত অন্ধকারে বাস করছি তা একমাত্র আমাদের এই চিত্র-শিল্প ব্যবসায় প্রচার কার্য্যের দিকে একটু অনিসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারবো। আমেরিকার প্রচার বিভাগের জার্ণালিষ্টরা জানেন কী করে একটা প্রতিষ্ঠান, তাহার ছবি. তাহার পরিচালক ও শিল্পীদের সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত করতে হয় এবং কেমন করেই বা তাদের সুনাম দেশ বিদেশে ছড়িয়ে দিতে হয়। আর এর জন্য ওরা অনেক সময় যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। একমাত্র Publicityর জোরেই আমেরিকার চলচ্চিত্র-শিল্প সমগ্র পৃথিবীময় এক চেটিয়া ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই শিল্পের বহুল উন্নতি করতে পেরেছে।

বাংলার এই শিল্পের প্রসারতা, জনপ্রিয়তা এবং উন্নতি বিধান করতে হলে আমাদের প্রচার বিভাগের উন্নতি করতে হবে—প্রচার কার্য্যের উপর জোর দিতে হবে। অনেক সিনেমা-জার্ণাল সৃষ্টি করে দিকে দিকে এশিল্পের বিষয়ে অনেক কিছু জানিয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ত্তে হবে। আমাদের আর্টিষ্ট, পরিচালক এবং ছবি প্রভৃতি সম্বন্ধে নিত্য নতুন অদ্ভুত ও বিচিত্র সংবাদ প্রচার করে সকলকে এদিকে আকৃষ্ট করতে হবে—এর দর্শক সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে হবে। যে সব অদ্ভুত প্রণালীতে আমেরিকার প্রচারকেরা তাদের নতুন আর্টিষ্টদের পৃথিবীময় পরিচিত করিয়ে তাদের ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন আমাদেরও সেরূপ করতে হবে। এখানে আমেরিকার Publicityর একটা বিচিত্র ঘটনা না বলে পারলুম না।

Broadway musicএর একরূপ আবিষ্কারক আমেরিকার বিখ্যাত প্রডিউসার ফ্লোরেন্স জিগফিল্ড (Florence Zigfield) যখন Continental actress বিখ্যাত এ্যানা হেল্ড (Anna Held)কে তার রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে প্রথম অবতীর্ণ করান তখন প্রথমে জনসাধারণের দৃষ্টি তার উপর আকৃষ্ট হোল না। দর্শকরা তাকে গ্রহণ করলে না। অত বড় নামকরা বিখ্যাত আর্টিষ্টের উপর দর্শক সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল না—কেহই তার গুণ বা তার ঐ ভুবনমোহিনী রূপের আদর করলে না দেখে যেমন তিনি দুঃখিত হলেন তেমনি আশ্চর্য্যও হলেন। এত বড় Continental fameএর আর্টিষ্ট এনে তিনি লোকসান খাবেন এ তার অসহ্য হোল—হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি একটা বুদ্ধি আট্‌লেন মনে মনে। আর তার পর দিন আমেরিকা বাসী জনসাধারণ সংবাদ-পত্র খুলে একটা সংবাদের উপর নজর পড়ায় চমকে উঠলো। সেই আশ্চর্য্য খবর আমেরিকার ছোট বড় সব কাগজেই বেরিয়ে গেছে এবং সংবাদটীর অভিনবত্ব কল্পনা করে সবাই বিস্ময়ে মুগ্ধ হোল। সংবাদটী হয়েছে যে ফ্লোরেন্স জিগফিল্ড অসামান্যা রূপসী সেই নবাগতা আনা হেল্ডকে স্নান করাবার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ২০ গ্যালন করে দুধ পাঠান। শুনুন কী অদ্ভুত সংবাদ! ২০ গ্যালন দুধ—আর তাতে স্নান করে রূপসী আনাহেল্ড। বুঝুন তা হলে তার রূপের বহর। আর তার পর থেকেই রোজ সন্ধ্যায় যে অভাবনীয় ভীড় সেই জিগফিল্ড রঙ্গালয়ের সম্মুখে দেখা যেত তাহা কল্পনাও করা যাবে না। এবং আনা হেল্ডকে দেখবার জন্য তার এত fan (ভক্ত) বেড়ে গেল যে তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নে ও চিঠিতে অতীষ্ঠ হয়ে একদিন আনা হেল্ড Zigfieldকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি ঐরূপ মিথ্যে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। জিগফিল্ড, সমস্ত প্রয়োজকদের উপাস্য—জিগফিল্ড নির্ব্বিকারে উত্তর করলেন যে. উহা ছাড়া, তার আর কোন উপায় ছিল না। Mobকে আকৃষ্ট করতে হলে ঐরূপ অদ্ভুত প্রচার কার্য্যের একান্ত প্রয়োজন।

তাহা হলে দেখুন প্রচার কার্য্যের জন্য অনেক সময় মিথ্যে হলেও অনেক সব অদ্ভুত এবং অসম্ভব কথা প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হয়। আমাদের দেশের প্রডিউসারেরা ইহা একবারও ভেবে দেখেন না যে প্রচার কার্য্য দ্বারা আর্টিষ্টদের ভক্ত তৈরী করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে। হলিউডের প্রডিউসারেরা এক একটী নতুন আর্টিষ্ট খুজে বের করবার সাথে সাথে তাদের সম্বন্ধে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত তথ্য প্রকাশ করে ও তাদের চিত্তাকর্ষক ছবি দিয়ে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ছবি বেরুবার বহু পূর্ব্বেই তার যেরূপ প্রচার কার্য্য সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে তা ভাবলেও আশ্চর্য্য হোতে হয়। কিন্তু আমরা আমাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কথা পৃথিবীময় প্রচার করা তো দূরের কথা বাংলা দেশের মধ্যেই ভালরূপে systematically প্রচার করতে পারিনে। অবশ্য আমাদের অনেকেরই সিনেমা পাবলিসিটী সম্বন্ধে ধারণা বা জ্ঞান. খুবই কম—শিক্ষাও অল্প। সিনেমা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ধারণা

ভাল সাহিত্যিক হলেই তিনি সিনেমা ক্রিটিক বা ভাল প্রচারশিল্পী হোতে পারবেন। এবং এই ভুলেই প্রচার কার্য্যের দোষে আমাদের অনেক ছবিই ভাল হোলেও মার খায়, অনেক শিল্পীই গুণ থাকা সত্ত্বেও যথার্থ নাম কিনতে পারেন না—অনেক প্রতিষ্ঠান পটল তুলতে বাধ্য হন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনেকেরই এদিকে দৃষ্টি পড়ছে না বলে যেমনি আশ্চর্য্য হোতে হয় তেমনি এই শিল্পের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হোয়ে উঠতে হয়। পাবলিসিটীর মধ্য দিয়ে ওদের দেশের প্রচার শিল্পীরা তাদের এক একটী প্রতিষ্ঠানের আর্টিষ্টদের সম্বন্ধে নিত্য নতুন অদ্ভুত এবং অভিনব সংবাদ রটিয়ে পৃথিবীময় তাদের ভক্ত সংখ্যা সৃষ্টি করেন। এমন অনেক ছবি আছে যা একমাত্র আর্টিষ্টদের নামের জোরেই প্রচুর Box-office দেয়। আর আমাদের আর্টিষ্ট সম্বন্ধে নিত্য নতুন অভিনব কথা শোনা তো দূরের কথা, অতি সাধারণ কথাও তাদের বিষয় আমরা জানতে পাইনে অনেক সময়। নতুন শিল্পী আবিষ্কার করাতো আমাদের দেশে একরূপ হয়ই না, তা নিয়ে দুঃখ করে আর কী হবে! কিন্তু যে সব শিল্পী আছেন তাদেরও সামান্য 'Publicity' দিয়ে দর্শক সাধারণের মধ্যে পরিচিত করাতে এবং তাদের ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে আমরা হয়তো লজ্জা অনুভব করি—নয়তো প্রয়োজন মনে করি নে। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে, আমাদের সব কাগজগুলোই (কী সাধারণ সংবাদ পত্র বা কী সিনেমা-জার্ণাল) বিদেশী প্রতিষ্ঠানদের ছবি এবং সংবাদ দ্বারা পুষ্ট থাকে—। আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্রের কথা খুবই অল্প স্থান মধ্যে আমরা পেয়ে থাকি। ইহা আমাদের চলচ্চিত্রের প্রচার কার্য্যের কী লজ্জাকর অবস্থার কথাই না মনে করিয়ে দেয়।

অতএব আজ বাংলার প্রত্যেক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানকে অবনতির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে তাদের প্রচার বিভাগের কার্য্যের উপর খুব সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে সর্ব্বপ্রথমে। একমাত্র নিউথিয়েটার্স'ই আমাদের দেশে ছবির যা কিছু পাবলিসিটী দিয়ে থাকেন, অবশ্য এর জন্য তারা ভারতময় সুনাম অর্জ্জন করতে পেরেছেন। নিউথিয়েটার্সের শিল্পী, তাদের পরিচালক, তাদের ছবির কথা তাই আজ সবার মুখে মুখে! এজন্য এন্, টীর (N. T.) সুযোগ্য প্রযোজক মিঃ বি, এন্, সরকার জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ! তাই অবিলম্বে বাংলার সকল চিত্র-প্রতিষ্ঠানেরই একযোগে খুব জোরের সঙ্গে প্রচারকার্য্য চালাতে হবে।

আরেকটী জিনিষ যা আমাদের এই ক্রুটীপূর্ণ Publicityর মধ্যে ঢুকতে দেখা গিয়েছে—তা হয়েছে এর পক্ষপাত দুষ্টতা; কোন শিল্পী বা কোন প্রতিষ্ঠানকে অহেতুক দাবিয়ে রেখে অপরকে প্রধান্য দেওয়া। এই দুর্নীতিমূলক কার্য্য যাহাতে ইহার মধ্যে প্রবেশ না করে সে দিকে লক্ষ্য রখেতে হবে। যাহাতে একদল যথার্থ শিক্ষিত লোকদ্বারা প্রচার কার্য্যের প্রকৃত উন্নতি হয় তাই দেখতে হবে।

পরিশেষে আমি আমাদের দেশের ফিল্ম-জার্ণালিষ্টদের কাছে দু'টী কথা জানাতে চাই যে একমাত্র তারাই তাদের সহানুভুতি, সমালোচনা ও পাবলিসিটী দ্বারা বাংলার ক্রম-বর্দ্ধমান এই শিশু-শিল্পটীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তাদের বিশ্বসমক্ষে পরিচিত করে বাংলার চলচ্চিত্রের সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। আমাদের দেশের এই শিল্পের বর্ত্তমানে ক্রুটী অনেক কিন্তু জার্ণালিষ্টরা যদি স্বার্থান্বেষী হয়ে ছিদ্রান্বেষীর মত কাজ না করে একে আদরণীয় ও গ্রহনীয় করে তোলেন তাহলে এ শিল্পের যে কতটা উপকার হবে তা বলে শেষ করা যাবে না।

বাংলার উত্তরোত্তর উন্নতিশীল এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেক বৈদেশিক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের চক্রান্তে পড়ে স্বার্থের লোভে যে সব জার্ণালিষ্ট বা ফিল্ম-জার্ণাল আমাদের এই দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে তারা দেশের বড় শত্রু—জার্ণালিষ্ট নামের অযোগ্য! তাদের অসত্য-অসুস্থ এবং অন্যায় সমালোচনা দ্বারা তারা বাংলার একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কতটা যে ক্ষতি করেন তা কা একবারও ভেবে দেখেন? প্রকৃত সমালোচকের দান যেমন অপূরণীয় তেমনি স্বার্থান্বেষী সহানুভূতিহীন সমালোচনাও এ শিল্পের পক্ষে বহু ক্ষতিকর এ কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। তাই প্রচারকার্য্যের সহায়তার জন্য একশ্রেণীর প্রকৃত সমালোচক গড়ে তুলতে হবে।

আমার মতে তাই একদল শিক্ষিত লোক নিয়ে অবশ্য প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে যাঁ'দের একটুও ধারণা বা জ্ঞান আছে—প্রচার কার্য্যের জন্য বাংলার সকল প্রতিষ্ঠান একযোগ হয়ে একটা Central Cine Publicity Baurue গড়ে তুলতে হবে। সমস্ত ফিল্ম প্রতিষ্ঠান একত্র হয়ে যেমন সম্প্রতি Bengal Motion Pictures' Association গড়ে তুলেছেন, প্রচার কার্য্যের জন্যও তেমনি একটা কিছু সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য সেই Association-এর মধ্যেই এই Publicity department বা প্রচার বিভাগ থাকতে পারে কিনা এটা ভেবে দেখা উচিত। তা হলে এর অনেক সুবিধাই হবে আমার মনে হয়। সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যে উহা

—বেকার নাশন শব্দ বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো—

BEKARNASHAN CROSS WORD COMPETITION BUREAU

বাঙ্গলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা—নং ১।

১১৩বি, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ পুরস্কার ৫০০৲ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৩০০৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০৲ তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম ঃ—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে। অন্ধ ঘরগুলি যথা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৮ বাংলা ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

পাশাপাশি (**Across**)

১। এ জীবন দুঃসহ।
৩। দেশ।
৪। অনেকের ধারণা এ ভগবানের প্রতীক।
৫। এ সরল নয়।
৭। বিপদে যে এ কাজ করে হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পিতা।
৮। মদন যার পতি।
৯। স্ত্রালোকের বিশেষ প্রিয়।
১২। বোলতার এ বিষাক্ত।
১৩। মহাদেব।
১৫। এ থাকলে সে ভীতু।
১৬। উল্টালে মামাংসা কঠিন।
১৭। ঠিক করে সাজালে এর জোর না থাকলে ভাল উকিল হওয়া শক্ত।
২০। কর।
২১। বলরাম।
২২। ইন্দ্র এ-পাণি বলা হয়।
২৫। এ বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
২৭। এ আহার অকর্ত্তব্য।
২৮। দুর্য্যোধনের মাতুলালয়।
২৯। অভগ্ন নয়।
৩১। উল্টালে গ্রীষ্মকালে এ আরামদায়ক।
৩২। এর বুদ্ধি যে নেয় সে চালাক নয়।
৩৩। ঠিক করে সাজালে এর দায়িত্ব বহন করিতে হয়।

—এইখানে কাটুন—

বেকার নাশন শব্দ-বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো

নভেম্বর সংখ্যা ১৯৩৮। কূপন নং............

১ বে	কা	২ র	■	৩ বি		ত	■	৪	জা
	■	৫	৬ প		■	■	৭	ক্ষা	■
৮ র		■		■	৯ অ		ম্	■	১০ বি
■	■	১১ বি	■	১২ অ		■	১৩	ম্ন	ক
১৪	■	১৫	য়	■	১৬ ক্ষ		■	■	
১৭ য়া	১৮	ব	■	১৯ আ	■	■	২০		■
■	ল	■	২১ কা		■	২২ ব		■	২৩
২৪ ত	■	২৫ ত		■	২৬ তা	■	বাঁ	■	র্ম
২৭	চা	■	২৮ গাঁ			■	২৯	৩০ টা	■
৩১ ন		■	■	৩২	কা	■	৩৩		ত্র

প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম..

ঠিকানা...... ....

লোকেল রসিদ নং... ....তারিখ..........................

মনিঅর্ডার নং..........পোষ্টেল অর্ডার নং...........

—এইখানে কাটুন—

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

উপর হইতে নীচে (**Down**)

১। এর দাম নাই।
২। কাচ।
৩। এ দুশ্চরিত্র।
৪। গালা।
৬। ভাগ্য।
৯। অষ্টপদ পোকা বিশেষ।
১০। এ হলে মাথায় অনেকেই ঔষধ ব্যবহার করেন।
১১। এ নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল হয়।
১৪। এ হৃদয়ের বৃত্তি।
১৮। একে অনেক কষ্ট পেতে হইয়াছে।
১৯। একে অমৃত ফল বলা হয়।
২০। বলবান।
২১। অসতী।
২৩। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।
২৪। অন্ধকারকে বিনাশ করে।
২৬। সূর্য্যের চাইতেও বড়।
৩০। এর স্থান মাথায়।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ।০ আনা। কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিনখানা সমাধানের মূল্য ৷৷০ আনা। লেখা কাটা ঘসা এবং পেন্সিলে লেখা চলিবে না। মণিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া রাখিবেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অন্যথায় অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া নম্বরানুযায়ী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাপ্তাহিক খেয়ালীতে ম্যানেজারের নির্ভুল সমাধান প্রকাশিত হইবে। বিস্তারিত নিয়মাবলী ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে পাঠান হয়।

পরিচালিত হয়ে পৃথিবীময় যাহাতে বাংলার এই শিল্পটীর বিষয় নানান সংবাদ সরবরাহ করা যায় এবং যাহাতে সকল স্থানেই বাংলা ছবির ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা যায় তাহা এই পাবলিসিটী বিভাগ করবেন। আশাকরি এইরূপ ভাবে কার্য্য করলে আমাদের ছবির প্রচার কার্য্য দেশে এবং বিদেশে খুব সুন্দর ভাবে এবং Scientifically পরিচালিত হতে পারবে এবং আমাদের চিত্র প্রতিষ্ঠানেরও বহুল উন্নতি সাধিত হোতে পারবে।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

আমাদের দেশে বেতারের লাইসেন্স সংখ্যা নাকি আশাপ্রদরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ দিনে দিনে নিরাশাপ্রদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামে বহু পরিবর্ত্তন অধুনা দেখা যাচ্ছে কিন্তু শ্রোতাদের অভিযোগ দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে যেগুলি ভালো অনুষ্ঠান ছিল সেগুলিকে বাদ দিয়ে যত বাজে জিনিষ দিয়ে সেই স্থান পূর্ণ করা হচ্ছে। মাঝে আমরা বেতার প্রোগ্রামে কিছুটা আশার আলো দেখেছিলাম কিন্তু আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

* * *

বেতার অভিনয় নিয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা করেছি। আমরা বার বার বলে এসেছি ষ্টেজের চর্ব্বিত চর্ব্বণ, বস্তাপচা পুরাতন নাটকগুলির অভিনয়, যাত্রার চীৎকার বেতারে অচল। ষ্টেজের অভিনয় আর বেতার অভিনয়ে খানিকটা পার্থক্য রাখতে হবে। শুধু কণ্ঠ দ্বারা শ্রোতাদের নাটকীয় রস পরিবেশন সত্যিই বিশেষ শ্রমসাধ্য। আমরা বেতার অভিনয়ে চাই কিছুটা নূতনত্ব, বৈচিত্র্য। বেতার অভিনয় শ্রোতাদের বিশেষ করে মহিলা শ্রোতাদের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান। কর্ত্তৃপক্ষ নূতনত্ব দেখালেন সময় সংক্ষেপ করে ভালো অভিনেতাদের বাদ দিয়ে বাজে নাটিকার আমদানি করে।—অভিনয় এবং নাটকীয় উপাদান ঠিক রসবান হতে সময় লাগে—নাটকের ঘাত প্রতিঘাত, সিচুয়েশন, চরিত্র সৃষ্টি এইগুলি নাটকের প্রাণ। এখন যে নাটকগুলি অভিনীত হচ্ছে তাতে প্রকৃত নাটকত্ব মোটেই থাকে না। সময় সংক্ষেপ করায় শ্রোতাদের মহলে অত্যন্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ বিভাগে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছি।

* * *

বেতারে বিচিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এখন প্রোগ্রাম থেকে বাইরের সম্প্রদায়ের বিচিত্র অনুষ্ঠান তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ আকর্ষণীয় নূতন ধরণের 'ফিচার প্রোগ্রাম' বেতারে পাওয়া যেত সেগুলি বাদ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাই না। শনি মণ্ডল, বিদূষক মণ্ডলী, বাসন্তী বিদ্যাবীথি, অনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের সম্প্রদায়, লীলাদেবীর সম্প্রদায় প্রভৃতির বিচিত্র, অনুষ্ঠানগুলি জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ছিল এইসব সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানে সাহিত্য রস বৈচিত্র্য পাওয়া যেত। এখন শুধু বেতার বিচিত্রা অত্যন্ত একঘেয়ে লাগে। মধ্যে মধ্যে বাণীকুমার রচিত দু' একটি অনুষ্ঠানে তবু একটু সাহিত্য রসের পরিচিতি থাকে।

যদি কোনদিন প্রোগ্রামে দেখা যায় ভালো অনুষ্ঠান সূচি—অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আর কার্য্যে পরিণত হয়ে উঠতে পারে না। "চিন্তদোলা" বেতার বিচিত্রায় পঙ্কজ মল্লিক, কানন দেবী, কে, এল, সাইগল, উমা দেবী প্রভৃতির নাম দেখা গেল—কার্য্যকালে তাঁদের কারুর উপস্থিতি ঘটে উঠলো না। দেওয়া হোল তাঁদের কণ্ঠ সঙ্গীত গ্রামোফন যোগে। শ্রোতারা বহু আগ্রহ নিয়ে অবশেষে নিরাশ হয়েছেন আমরা জানি না পূর্ব্ব থেকেই এইসব আর্টিষ্টের গ্রামোফনই সংযোজনা করবেন কর্ত্তৃপক্ষের এইরকম অভিপ্রায় ছিল কিনা কিন্তু তাহলেও প্রোগ্রামে তার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এ যেন ছেলে ভোলানোর মতনই শ্রোতাদের বঞ্চনা করা হয়েছে।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান একেবারে অনুল্লেখযোগ্য। এই অনুষ্ঠানটির কোন গুরুত্বই বেতারে এখন আর নেই। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বেও এ অনুষ্ঠানে আমরা মহিলা-শিক্ষাপ্রদ আনন্দ দায়ক বহু উন্নত ধরণের প্রোগ্রাম পেয়েছি। সময় সংক্ষেপ করা—সংবাদ ঘোষণা, মাঝে মাঝে দু'একটি বক্তৃতা, নবাগতের আসর আর গ্রামোফন রেকর্ড এই দিয়ে শুধু জোড়া তাড়া দিয়ে রাখা

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দু'একটা কথা

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই ইতিমধ্যে বলা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। সুতরাং নুতন করে আমার যা বলবার থাকতে পারে তা নেহাৎ পুরাতন ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে আনন্দ পরিষদ্ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল সে দিক দিয়ে হয়তো সত্যি কিছু বলা যেতে পারে। কিন্তু সে বলার হয়তো কোন মূল্য নেই।—

তার জীবনী লেখক হয়তো তার থেকে কোন মশলাই খুঁজে পাবেন না।

শরৎচন্দ্রকে বৃহৎ ভাবে উপলব্ধি করবার পক্ষে তা হয়তো বা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

তবু কিন্তু তাঁর ছোট ছোট মন্তব্যগুলি আমার কাছে অপূর্ব্ব হয়ে আছে। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে।

হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটির জন্যে মহিলা সমাজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধা।

* * *

রেডিওর লাইসেন্স বৃদ্ধিতে প্রোগ্রাম সংস্কার এমনই হচ্ছে যে অশ্রাব্য। রেডিও কর্ত্তৃপক্ষের এ উদাসীনতার সংস্কার চাই শুধু কয়েকটি নামকরা আর্টিষ্টের নাম প্রোগ্রামে দিলে কিংবা তাঁদের অনুষ্ঠিত প্রোগ্রাম হলেই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করা যায় না।— বহু শ্রোতার অভিযোগে, অনুরোধে এবং আদেশে আমাদের এ বিভাগের আলোচনা আবার নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হবে। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে আমরা চাই জনসাধারণের সহযোগিতা এবং প্রীতি।

তিনি বলতেন, ওহে, লেখো যদি, লেখার আনন্দে লিখবে। নাইবা রাখলে হিসাব পরের অধ্যায়ে তোমায় কি বলতে হবে।—

আমি তাঁর কথা সাগ্রহে শুনতাম।

তিনি বলতেন—আমি লিখি লেখার আনন্দে। একটার পর একটা যেন অবশ্যম্ভাবী ছন্দে এসে পড়ে। এমন কি সময় সময় কোন কোন উপন্যাসের শেষ অংশটাই আগে লিখে ফেলেছি। যেমন চরিত্রহীন। আমি জিজ্ঞাসা করতাম— আপনি লিখতে বসে কাটাকুটি করতেন?

নিশ্চয়ই। এক একটা কথা একেবারে ওজন করে বসাতাম। যতক্ষণ না মনে ধরতো আমি ছাড়তাম না। ঐ রকম একটা কথা চরিত্রহীনে ব্যবহার করেছি অনেক ভেবে; একদিন দেখি সুনীতি (ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়) এসে হাজির ঠিক ঐ কথাটা নিয়ে আলোচনা করতে।

আমি একদিন বল্লাম—Mathematical Mistake কিন্তু আপনার বইএ বেশ পাওয়া যায়।

মানে?

মানে একজায়গায় তিন খানা ভাঙ্গা ঘরের বিষয় বলে অপর জায়গায় যোগ করে দেখালেন চার খানা ঘর! তিনি হেসে বলতেন,—বলেছি নাকি হে এই রকম?—

ও আর কি হবে; ওসব ধোরো না।

আমি তো অঙ্কে ভুল করি—আমার চেয়েও যিনি বড়ো তিনি একেবারে সম্বন্ধ ওলোট পালোট করে ফেলেন। তিনি একবার এক জনকে 'মাসি' বলে, পরের পরিচ্ছেদে তাকে পিসি বলে চালিয়েছেন।

* * *

একদিন আমরা হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে হেঁটে আসছি—শরৎচন্দ্র আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা বল্লেন—ওহে, তুমি খদ্দর পর না?

আমি চুপ করে রইলাম।

আশ্চর্য্য, তিনি আর কোনও মন্তব্যই প্রকাশ করলেন না। শুধু খানিকটা রাস্তা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, তিনি আমায় স্তব্ধ ভাষায় তিরস্কার করলেন।

আমাদের চরিত্রহীন অভিনয় সম্পর্কে কথা ছিল এক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রয়ালটি বাবদ দু'শ টাকা দিতে হবে।

টাকাটা আদায় করে দিতে দেরী হয়েছিল সেজন্য আমরা গাফিলি করে তাঁর কাছে যেয়েও উঠতে পারি নি। শেষে যেদিন গেলাম সেদিন তিনি বেশ রাগ করলেন। ইতিমধ্যে হয়তো পাবলিক থিয়েটারের উপরও তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন অর্থঘটিত ব্যাপার নিয়ে।

তিনি বল্লেন,—তোমরা শেষে এলে তাহলে। আমি হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম।

'কেন বলুন তো?'

"কারণ তোমরা সব যে থিয়েটারের লোক। থিয়েটারের লোককে আমি—"

কিন্তু সে কথা যাক্।

একদিন হাওড়া ষ্টেশনে ঘুরছি, সহসা দেখি শরৎবাবু আমায় ডাকছেন—

"কোথাও যাবে নাকি হে লক্ষ্মী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কাশ্মীর যাবো; তাই ব্যবস্থা করতে এসেছি ষ্টেশনে।"

"কাশ্মীর! কাশ্মীর যাচ্ছ কেন?"

বিনয় সহকারে বললাম—"দৃশ্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে।

"কাশ্মীর উপভোগ করবার মত কি আছে জানিনা বাপু। তুমি বাঙলা দেশের সব জায়গায় ঘুরেছ?"

"আজ্ঞে না।"

তিনি প্রদীপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন—সৌন্দর্য্য যদি দেখতে চাও বাঙলা দেশ ঘুরে এসো। এ শোভা তুমি কাশ্মীরেও পাবে না। বাঙলা ছাড়া সুন্দর দেশ ভারতে নেই। বাঙলা দেশ দেখগে আগে।

সেদিনের কথা আজও মনে আছে। কি জোরের সঙ্গেই না তিনি কথাগুলো বলেছিলেন।

• • •

আমাদের পরিষদে শরৎচন্দ্র এসেছেন। ধুমধাম চলছে। যাবার সময় তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমরা ট্যাক্সিভাড়াটা পকেট থেকে বার করে তাঁর সামনে ধরলুম। তিনি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি হে?

বললাম—ট্যাক্সিভাড়া—।

তিনি এক মিনিট স্তব্ধ থেকে বললেন—তোমরা আমায় কি ভাবো বলত? কি দুঃখে তোমাদের কাছ থেকে ট্যাক্সি ভাড়া নিতে যাবো? এ পয়সাটুকু খরচ করবার ক্ষমতা আমার নেই এ বিশ্বাস তোমাদের কি ক'রে হোলো?

সরিয়ে নিলাম হাত। লজ্জায় মাথা এলো নুয়ে। কিন্তু ভাবতে লাগলাম—লোকটি অদ্ভুত বটে।

• • •

একদিন আমাদের কি খেয়াল হোলো শরৎবাবুকে অনুরোধ করে বললাম—"আপনি আমাদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ অভিনয়ে—কৈলাশ-খুড়োর অংশটা অভিনয় করুন।"

কথাটা শুনে তিনি প্রথমে হাসতে লাগলেন;—পরে বললেন, "তোমরা বুঝি ভাবো আমি ওসব পারি না?—পারিছে পারি। আমি সব পারি। আমিও তোমাদের মত বয়সে করিনি এমন কাজই নেই। থিয়েটার, যাত্রা, বাঁশীবাজান, সাপ-ধরা, মাছধরা—সব আমার হ'য়ে গেছে।

এ ছাড়াও এমন সব কথা অবলীলাক্রমে তিনি আমাদের বললেন যার উল্লেখ করবার প্রয়োজন মনে করছিনা।—

• • •

একদিন আমাদের পরিষদের তারকের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেছি। তারকের বিয়ে। ভীষ্মদেব—তারকের ভাগ্নে—আসর জমিয়ে হিন্দুস্থানী গান করছেন; সঙ্গীত চলছে।—বলা বাহুল্য ভীষ্ম গাইছিল ভালোই।—তার গান শেষ হ'লে শরৎচন্দ্র বললেন—"ওহে নিধুর টপ্পা গাইতে পারো? বা অন্য কোন পুরানো বাঙলা গান?" ভীষ্ম অবশ্য পারল না গাইতে তাঁর অনুরোধ মত—। শরৎচন্দ্র চুপ করেই রইলেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম তিনি কি কথা বলতে চেয়েও বলতে পারলেন না।—

তখন তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ চলছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি দপ করে জ্বলে উঠলেন—

"ওসব বাঙলা দেশে চলবে না তুমি দেখে নিও। বাঙালীর মুখে ওরা ইয়ে করে দিয়ে যাবে,—আর সে যে চুপ করে থাকবে তা ভেবোনা। যারা ছাতু খায়, তারা ও কাজ পারবে। পারবেনা বাঙালী। আঘাত করলেই সে প্রতিঘাত করবে। এই তার বৈশিষ্ট্য। পড়ে পড়ে মার সে খেতে পারবে না"!

রাধা ফিল্মসের "জনকনন্দিনী"-র একটী দৃশ্যে, অহীন্দ্র, জয়নারায়ণ, সুশীল ও উমাতারা। ছবিখানা শীঘ্রই রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে।

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৮

মিলনের পথে

আসামে কংগ্রেস-কোয়ালিশানী মন্ত্রীমণ্ডলী স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বাংলায় অনুরূপ কংগ্রেস-প্রজা সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনে তৎপর হইয়াছেন। রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং আশাতীতভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন যে এই মাসের শেষ ভাগেই নব মন্ত্রীমণ্ডল কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। যে দূরদৃষ্টি লইয়া রাষ্ট্রপতি এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহা সফল হইলে রাষ্ট্রপতি অসাধ্য সাধন করিলেন বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী হক্ সাহেব ও অর্থসচিব নলিনীবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা প্রায় একরূপ ঠিক হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই নলিনীবাবু পদত্যাগ করিবেন—পদত্যাগ কালে নলিনীবাবু এক বিবৃতি প্রদান করিবেন। নলিনীবাবুর পর হক্ সাহেবও পদত্যাগ করিবেন—তাহা হইলেই বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর পতনের পরই মৌলভী ফজলুল হককে প্রধান মন্ত্রী করিয়া যে সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইবে তাহাতে থাকিবেন :—

প্রধান মন্ত্রী—মৌলভী ফজলুল হক্

কংগ্রেস—ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়
শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়
শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার
শ্রীসন্তোষ কুমার বসু

প্রজা—মৌলভী তামিজুদ্দিন খাঁ
মৌলভী শামসুদ্দিন আহাম্মদ
মৌলভী নৌশের আলি
মিঃ হুমায়ুন কবির

অনুন্নত সম্প্রদায়—শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র নস্কর
মিঃ পি. এন্. ঠাকুর

মন্ত্রী-মণ্ডলীর বেতন ৫০০ টাকাই নির্দ্ধারিত হইবে। যদি মন্ত্রী-বিশেষের ব্যক্তিগত প্রয়োজন হয়, কোন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী তাহা দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুতরাং নব-গঠিত মন্ত্রীমণ্ডল নিশ্চিন্ত চিত্তে কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন।

এক বিবৃতি প্রদান করিয়া নলিনীবাবু পদত্যাগ করিলেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি নাকি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা উঠাইয়া লইবেন। পাঠকবর্গের হয়ত স্মরণ আছে যে, ইতিপূর্ব্বেই অন্যান্য অনেক কংগ্রেস কর্ম্মী ও নেতার বিরুদ্ধে অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত করা হইয়াছে। নলিনীবাবুর বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অপসারিত হইলে তাঁহাকে সম্মিলিত মন্ত্রী-মণ্ডলীর অর্থসচিবের পদে মনোণীত করিতে কোন বাধাই থকিবে না।

ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারী মুরহেড সাহেব ভারত পরিভ্রমণের অছিলায় কোহাটের প্রান্তে মহাত্মাজীর সহিত নিভৃতে আলাপ করিয়া গিয়াছেন। এই আলাপ নিছক সৌজন্য-প্রদর্শন নহে—ইহারই অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনা নিহিত রহিয়াছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রাখিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন সুতরাং যুক্ত-রাষ্ট্রের বর্ত্তমানে পরিকল্পিত কাঠামোর কিঞ্চিৎ রদবদল করিয়া কংগ্রেসের মনস্তুষ্টি করা হইবে—ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। কংগ্রেস যদি পরিবর্ত্তিত যুক্ত-রাষ্ট্রে যোগদান করিবার সঙ্কল্প করেন তাহা হইলে সর্দ্দার প্যাটেল ও রাষ্ট্রপতির অভিমত এই যে নলিনীবাবুকে বাংলার অর্থ-সচিবের পদ হইতে সরাইয়া যুক্ত-রাষ্ট্রের অর্থসচিবের পদে বসানই সমীচিন। এই অভিমত কার্য্যে পরিণত হইলে

নলিনীবাবুর পরিবর্ত্তে. মিঃ খৈতান বাংলার অর্থ-সচিব হইবেন। বৃহত্তর রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নলিনীবাবুর পদোন্নতিতে আপত্তি না থাকিলেও একজন অ-বাঙ্গালীকে বাংলার অর্থসচিবের পদে বসান আমরা সমর্থন করিতে পারিনা। এইরূপ কোয়ালিশনী সিদ্ধান্তের বার্ত্তা বহন করিয়া রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে শীঘ্রই সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নলিনীবাবু বোম্বাই যাত্রা করিবেন।

কেহ কেহ বলিতেছেন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পরিকল্পনা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবগত নহেন এবং তাঁহাদের বিনা অনুমোদনেই এইরূপ সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইয়াছে। তবে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ, যদি এইরূপ সম্মিলিত মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের আদেশ দেন ত তাঁহারা ইহা অনুমোদন না করিলেও শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য নব-গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলকেই সমর্থন করিবেন।

যাহা হউক এই মাসের মধ্যেই হক-মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন ও কংগ্রেস-প্রজা-সম্মিলিত মন্ত্রীগঠন অবশ্যম্ভাবী। রায় হরেন্দ্র চৌধুরী পদত্যাগ করিয়া বিধানবাবুকে এ্যাসেমব্লিতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিবেন। আর হয়ত নব-মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বাংলা ও আসামের কংগ্রেসী এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত হইবেন। এক কথায় বাংলার রাজনীতি এক ঘোরতর বিপ্লবময় পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে। যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সহিত রাষ্ট্রপতি এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন তাহা সফল হইলে বাংলার বক্ষ হইতে প্রতিক্রিয়া-পন্থী মন্ত্রীমণ্ডল বিলুপ্ত হইয়া বাংলায় নব আশা আকাঙ্খার উদয় হইবে। রাষ্ট্রপতির উদ্যম সফল হউক - ইহা আমরা আন্তরিক ভাবে কামনা করি।

শনৈশ্চরের বিচিত্র লীলা

আশ্বিনের শনির চিঠি খবর দিয়াছে—“বর্ত্তমান সংখ্যায় শনিবারের চিঠির দশম বর্ষ পূর্ণ হইল।” ইহা সাহিত্য-সমাজের পক্ষে একটা সুসংবাদ বটে। কারণ, জ্যোতিষ-বচনে আছে—শনির দশ বৎসর দশা-ভোগ কাল। সুতরাং কুক্কুট-মার্কা কদাচারী লেখক কয়টার কুদৃষ্টি বা কুস্পর্শ বাঙ্গালার সাহিত্য ক্ষেত্রকে যে আর কলুষিত করিতে পারিবে না, এমন আশা করা যায়। নীলবর্ণ শৃগালদলের স্বরূপ যখন ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন ‘শেষের সে ভয়ঙ্কর দিন’ যে তাহাদের নিকটবর্ত্তী, একথা কে না মনে করিবে? অন্ধকার অঞ্চলে এ ছুমনি চেহারা ঢাকা পড়িবার নহে। বঙ্গ বিশ্রীর অভিনয় আবার সকলে দেখিতে পাইবেন।

• •

রাঁচিতে বসিয়া ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো যে জাবর কাটিয়াছিলেন, তাহাও আনন্দবাজারের বুকে বাহার দিয়া বাহির হইয়াছে! ১৩৩৯ সালের ‘সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা’য় বৃহৎ ঐতিহাসিক ব্রজেনবাবু ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—“বাংলায় ইহাই বোধহয় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।” কিন্তু তাঁহার এই ‘বোধ হয়’ তাঁহার রাঁচির ‘বাণী’তে বিলীন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার বাণু ভায়া তাঁহার বাক্যকে বেদ-বাক্য বলিয়া শনির পত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই বোধ হয় আস্কারা পাইয়া ব্রজেনবাবু নিঃসঙ্কোচে এবারে বলিয়াছেন—“১৮৫১ সনের শেষার্দ্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালায় ইহাই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র।”—কিন্তু একথা আদৌ সত্য নহে। ব্রজেন বন্দ্যোঃ যদি শুধু পুস্তকের মলাট দেখিয়া ওস্তাদী না করিতেন, তাহা হইলে তিনিও জানিতে পারিতেন যে, ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ প্রকাশের পূর্ব্বে—১৮৫০ সনে ‘সত্যার্ণব’ নামে যে মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কাগজখানিই বঙ্গভাষার প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। শনির বাহনেরা শুনিয়া খুসী হইবেন যে, ব্রজেনবাবুর বাক্য সম্প্রতি ‘বাণী’তে পরিণত হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের উক্তি যখন কাগজে কাগজে ‘বাণী’ বলিয়া প্রকাশিত হয়, তখন ব্রজেন বন্দ্যোই বা নিজ উক্তিকে ব্রজ-বাণী না বলিবে কেন? আশাকরি, শীঘ্রই সকলে বাণুর বাণী, নরসুন্দরের বাণী প্রভৃতি দেখিতে পাইয়া নয়ন সার্থক করিবেন। ইহাকেই বলে—ব্যাঙাচি-বিড়ম্বনা!

যতীন ভট্টাচার্য্য ‘Griffith Prize’ পাইয়া শনি সম্প্রদায়ের বুকে সত্যই শেলাঘাত করিয়াছেন! শনি-বাহন ব্রজেন বন্দ্যো যে কাগজে কাজ করেন, সেই মডার্ণ রিভিউ' যদিও যতীনের এই পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলিয়াছে,—

It is understood that it is for the first time that a comprehensive, systematic and scientific attempt has been made by Mr. Bhattacharjee to trace the growth and development of the Bengali lexicon from the year 1743, i. e. several years even before the battle of Plassey. Mr. Bhattacharjee has been able to refer in his original thesis to as many as 150 different volumes of Bengali lexicon between 1743 and 1867.

Mr. Bhattacharjee has dealt with indices of words given in different volumes, their philological treatment, the un-published manuscripts of eight different lexicographers and their lives. The last chapter of the thesis deals with the development of the Bengali language since 1830 and an attempt has been made to demonstrate how the Bengali language was used as the court language of the province. Mr. Bhattacharjee also refers to the pioneering attempts made by Rev. Long, that immortal missionery litterateur, who made the cause of the province his own and also states papers in this direction.

কিন্তু আর কাহারও কৃতিত্ব-কথা শনি-সম্প্রদায়ের সহ্য হয় কি? তাই ঈর্ষানলে পুড়িতে পুড়িতে আশ্বিনের শনির চিঠি পাগলার মতন লিখিয়াছে—“ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কৌশলী লোক, তাহা তাঁহার রাজ্যাবসানের পর গ্রিফিথ পুরস্কার ঘোষণার দ্বারা প্রমাণিত হইল। সংবাদপত্রে দেখিলাম, পুরস্কৃত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের গুণের

মধ্যে তাঁহার ন্যূনাধিক চারি হাজার পুস্তক সংগ্রহের উল্লেখ আছে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুধাংশু চট্টোপাধ্যায় আজ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক চারি হাজার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।"—অথচ শনির বাপু সজনী দাস যখন বহুজনবিদিত একখানা বাঙ্গালা অভিধানের কথা তুলিয়া পরিষদে আস্ফালন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গরা আবিষ্কারের দোহাই দিয়া আন্দোলনের তুফান তুলিয়াছিল! আর আজ যতীন ভট্টাচার্য্যের এই কৃতিত্বকে—প্রাচীন বাঙ্গালা অভিধানের ইতিহাস-রচনাকে উপেক্ষার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ইহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদকেও অকারণে আক্রমণ করিয়াছে। নীচতার এমন কদর্য্য নিদর্শন ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও কেহ দেখিয়াছেন কি? যাহারা স্রোত বুঝিয়া সায় দেয়, নৌকা দেখিয়া নেমাজ পড়ে, ধরণ দেখিয়া ধামা ধরে এবং গণ্ডি দিয়া গালি পাড়ে, তাঁহাদের এ হীন কৌশলের তুলনা আছে কি?

* * *

"বিস্মরণী"-কবি মোহিতলাল মজুমদারের সুশীল-সজনী একজোড়া দিগগজ কবি-বন্ধু থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিজেই নিজের "পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে" কবিতা লিখিয়া অমর হইতে হইল, ইহা বড়ই আফশোষের কথা। অবশ্য—গোঁফ উঠিবার বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই মোহিতলালের মৌলিক হইবার সখ—তাই তিনি একদা নিজের বিয়ের কবিতা নিজেই লিখিয়া এবং তাহাই অকুতোভয়ে ছাপাইয়া বরযাত্রীমহলে বিলি করিয়াছিলেন। ২৮শে আশ্বিন ১২৯৫—শনি-পঞ্জিকার একটি লোহিতাক্ষর দিবস, কারণ এই দিবসেই মোহিতলালের "আত্ম-বিহঙ্গ" দয়া করিয়া "পাখা মেলিয়াছিল"! সাদা বাঙলায়—"আত্ম-বিহঙ্গ"-কে "প্রাণের পাখী" বলা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়—"ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী"····· ইত্যাদি ভণিতা দিয়া জন্মদিনের কবিতাটি আরম্ভ করিলে আরও শ্রুতিসুখকর হইত। মোহিতবাবু আমাদের কথাটি ভাবিয়া দেখিবেন এবং অগ্রহায়ণের শনিবারের চিঠিতে উক্ত ভণিতা দিয়া আর একটি কবিতা লিখিয়া আমাদের উপরোধ রক্ষা করিবেন।

* * *

মোহিতলাল লিখিয়াছেন—

"ব্যথা নাই কোথা, ক্ষোভ নাই মোর
—গড়েছি বুকের ভুষা,
কাল-ফণী-শিরে আছিল যে মণি তাহাই
মাজিয়া নিয়া।"

আমরা ত পড়িয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছি। মোহিতলালের যে একাধারে "অধ্যবসায়ী" কবি, দুঃসাহসী সাপুড়ে, এবং অদ্ভুত মণিকার তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। কাল্-কেউটের মাথা হইতে মণি ছিনাইয়া লইয়া, তাহাই মাজিয়া ঘসিয়া, তিনি বুকের যে ভুষা বানাইলেন, তাহা একবার দেখিতে ইচ্ছা করে। মোহিতলালের ঔদার্য্যের ওর নাই, তাহা আমরা জানি বলিয়াই তাঁহার এই বুকের ভুষাটিকে—অভাগা বাঙ্গালীদের নামে উইল করিয়া যাইতে অনুরোধ করি। ঐ ভুষা মাখিয়া, শ্রীবিষ্ণুঃ, ঐ ভুষার ছোঁয়াচ লাগিয়া, বাঙ্গালী যদি মানুষ হয় তাহা হইলে কবি মোহিতলালের দুরন্ত সাপুড়েগিরি সার্থক হইবে!

* * *

"তোমার কাননে যে ফুল ঝরিল আমার
প্রাণের ঝড়ে,
রচি নাই মোর ফুলশেজ তায়—
ভরেছি পূজার থালা।"

এতক্ষণে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল। মোহিতলালের প্রাণের ঝড়ো হাওয়ায় যে ফুল ঝরিয়াছে সেই ঝরা ফুলে পূজার থালা ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহাতেই এত গুরুচণ্ডালী ভাষা, এত নিপাতন প্রয়োগ, এত আড়ষ্ট অর্থহীন শব্দ চয়ন। ঝড়ে পড়া ঝরা ফুলে দেব-সেবা হয় না, অপদেবতার সেবায় তাই জীবনটাও ছন্নছাড়া হইয়া গিয়াছে!

* * *

"সব শেষে আর রহিবেনা কিছু বাহির ভুবনে
মোর,
জন্মতিথি যে মিলাইয়া আসে মৃত্যুতিথির
সনে
তখনো বক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
থামিবে না জানি যতখন মুখে তারকারা
চেয়ে রবে।"

সবশেষে কবি মোহিতলালের মত ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ মহাপুরুষেরও যে অবশিষ্ট কিছু রহিবে না—ইহা অবশ্যই নূতন কথা। তবে আশার কথা এই যে, তারকা থাকিতে মোহিতলালের বক্ষের কম্পন থামিবে না অর্থাৎ রাত্রিকালে যতক্ষণ আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়া রহিবে ততক্ষণ মোহিতলালের মৃত্যু হইবে না। বাসিমড়া না হওয়া বহু পুণ্যের কথা এবং ইহাতে কবির আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গও আশ্বস্ত হইবেন!

বাস্তবিক এমন রাবিশ, যে কাগজের মুখপাত রক্ষা করে, সে কাগজের স্থান কোথায়, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

"পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে"র পর শনিবারের চিঠির দ্বিতীয় প্রবন্ধ "বাঙালা ও সংস্কৃত"। লেখকের নাম নাই, কাজেই প্রচলিত রীতি অনুসারে এবং লেখাটির শেষভাগে, "এবার আমাকে চুমু খেতে দাও, অনেকক্ষণ ধরে খেতে দাও, অনেক করে খেতে

দাও” ইত্যাদি উদ্ধৃতাংশের জৌলুষে ইহা মণিমুক্তার ডুবারি সজনী সম্পাদকের লেখা বলিয়া অনেকের অনুমান হইতে পারে। কিন্তু লিখন-ভঙ্গীর গুরু-চণ্ডালী যোগ দেখিয়া মনে হয় এ লেখাটিও শ্রীমোহিতলালের। লেখক অভিযোগ করিয়াছেন—“এককালে বিদ্যার গৌরব ছিল, এখন আছে অবিদ্যার বা বিদ্যা-হীনতার গৌরব।” কিন্তু লেখক এই তথ্যটি নিজের লেখার মধ্যেই বেশ সপ্রতিভভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাঁহার লেখা পড়িলেই, সে কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে “অবিদ্যা” আর “বিদ্যাহীনতা” যে একার্থবোধক তাহা আমাদের জানা ছিল না, বরং এককালে লোকে “অবিদ্যা” রাখিয়া গৌরব করিত শোনা যায়। সে যাহা হউক, লেখক দুইটি বিষয়ে বড় খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন—

(১) “বাঙ্গালা দেশের দুইটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত জ্ঞানের কোন ব্যবস্থাই নাই। তাহার একটির বাঙ্গালা বিভাগের কর্ণধার শ্রীখোল বাজাইয়া কীর্ত্তন গাহিয়া আসর জমাইয়া রাখিয়াছেন ; .....”

(২) “ইহা-ত অর্ব্বাচীনদের অসার প্রলাপ ; কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন অতি-আধুনিক হইয়া লেখেন—

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে
পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা !

এবং একদিন রুদ্র বৈশাখের ‘ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল’-এর বর্ণনা করিয়া এখন সেই বৈশাখের অতি আধুনিক চিত্র আঁকেন—

সমস্ত আকাশটা ঢেকে উঠল যেন কেশর-
ফোলা সিংহ
তার ল্যাজের ঝাপটে ডাল-পালা আলুথালু
করে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে—

তখন বলিতে হইবে যে, বাঙালা ভাষা সরস্বতীর ‘উবুড়’ হইয়া পড়িবার আর বেশি দেরি নাই।”

লেখকের উদ্ধৃতাংশ দুইটির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কিছুই বলিবার নাই কিন্তু আমরা শুধু ভাবিতেছি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথা। রায় বাহাদুরকে শনিবারের চিঠি “খোলন্দাজ” বলিয়া বরাবর সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকে এবং উপরোক্ত এক নম্বর খোঁচাটির অর্থও বেশ পরিস্ফুট। তথাপি রায়বাহাদুর শনৈশ্চরদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে এবং শনির কাগজে লেখা দিতে ঘৃণা বোধ করেন না। রায় বাহাদুরের এই আত্মসম্মান-জ্ঞান-বর্জ্জিত মনস্তত্ত্ব আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তিনি কেন ইহাদের এখনও ‘নাই’ দেন, ইহাই আশ্চর্য্য। আর বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথকে শনিবারের চিঠি-ত যখন তখন বর্ব্বরোচিত ভব্যতালেশশূন্য ভাষায় বক্রোক্তি করিয়া থাকে। অথচ সজনী-সংপাদিত সদ্যপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যহীন “অলকা” পত্রিকা খানায় রবীন্দ্রনাথের “মুক্তির উপায়” নাটক ছাপা হইয়াছে দেখা গেল এবং শ্রীমতী সুনীতি-বৃন্দের দূতী-গিরির আশ্রয় করিয়া সজনীকান্তকে শান্তিনিকেতনে হানা দিতেও দেখা যাইতেছে। ইহা কি রবীন্দ্রনাথের অহেতুকী আশ্রিত-বাৎসল্য অথবা বিশ্বকবির বুড়াবয়সে চন্দন-বিষ্ঠায় সমজ্ঞান লাভ ? ইহাদের না হয় লজ্জা নাই কিন্তু আমাদের সেকালের সেই রবীন্দ্রনাথের এতটা অধঃপতন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। হায় ব্রহ্মবান্ধব ! তুমি শুধু “চার-অধ্যায়ের” ভূমিকা লিখিবার সময় রবীন্দ্র নাথের কাণে কাণে তোমার নিজের অধঃপতনের কথাই বলিয়া গিয়াছিলে, স্বচক্ষে আর কিছুই কি দেখিয়া যাও নাই ?

—
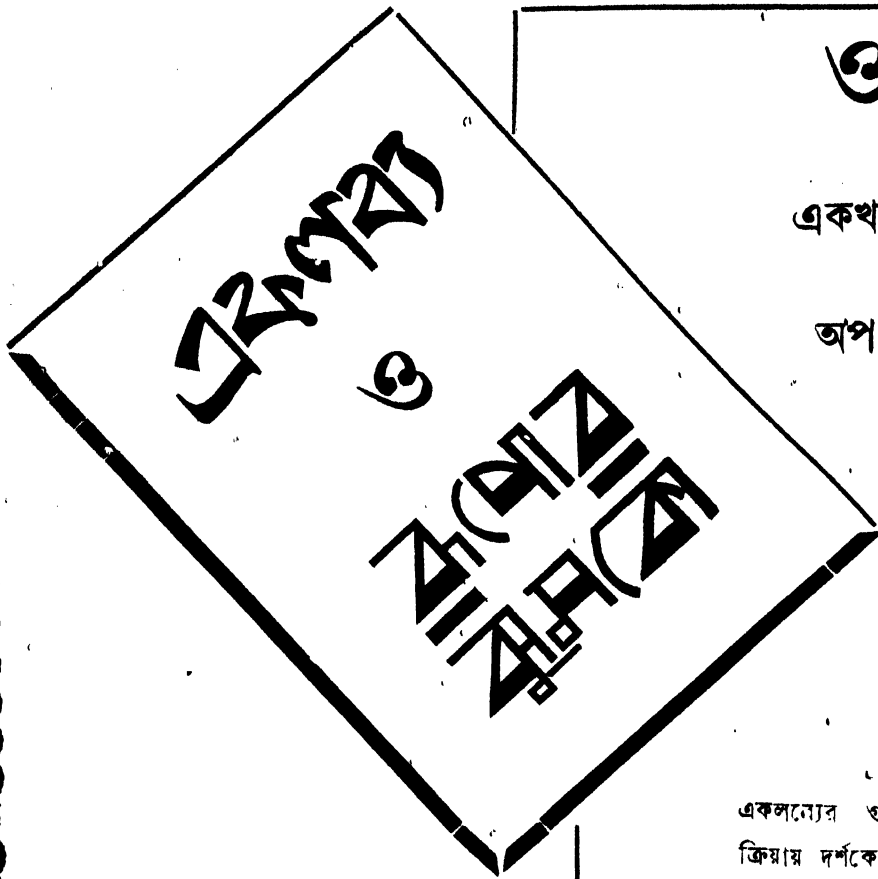
ও, কে, এ'র
নব অবদান
একখানি অতি প্রাচীন
পৌরাণিক
অপরখানি অতি আধুনিক
সামাজিক
...এই দুই বিভিন্ন রসের দুইটী কাহিনী একই সময়, একই চিত্রগৃহে দেখিতে পাওয়া যাইবে...
একলব্যের গুরুভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শনের প্রতি-ক্রিয়ায় দর্শকের মন যখন জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে, তখনই হারাণ ঝুমকোর সরস অন্বেষণে জলভারাক্রান্ত মনে আনন্দের বিদ্যুৎ চমক দেখা দিয়া নির্ম্মল জলকণার ন্যায় দর্শকের মনে বিমল হাস্যকণা ফুটাইয়া তুলিবে......................
প্রযোজক :
পান্নালাল পাঠক
পরিচালক :
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভ-উদ্বোধন
শনিবার
১৯শে নভেম্বর
N.I.P.

('বিলাসী)
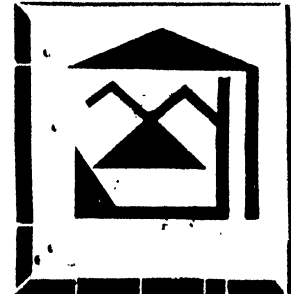
'উত্তরা'য় খনা ও অভিসারিকা

গত শনিবার 'উত্তরা'য়, শ্রীযুক্ত বি এল খেমকার প্রযোজনাধীনে গঠিত 'খনা' ও 'অভিসারিকা' ছবি দুটির উদ্বোধন সুসম্পন্ন হ'য়েচে। ঐ দিন প্রাতে কর্ত্তৃপক্ষ চৌরঙ্গী প্লাজা সিনেমায় এই ছবির বিশেষ 'প্রেস-প্রদর্শনী'র ব্যবস্থা কোরেছিলেন এবং এই উপলক্ষে সাংবাদিকেরা ছবি দেখার পর শ্রীযুক্ত খেমকার মধুর আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হ'য়ে সকলেই খুসী মনে বাড়ী ফিরেছিলেন।

জনশ্রুতির উপর নির্ভর কোরে নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় যেমন 'খনা'র আখ্যান-ভাগ রচনা কোরেছিলেন, তেমনি জনশ্রুতির উপর নির্ভর কোরেই আমরা বোলতে পারি, এই ছবির গঠনের গোড়া থেকে প্রকাশের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি আগাগোড়া হৃদয় বিদারক 'ট্রাজিডি'।

পর্দ্দার উপর যে ট্রাজিডি, তার পরিচয় ছবিতেই প্রকাশমান কিন্তু পর্দ্দার অন্তরালে যে হৃদয় বিদারক অপ্রকাশ্য অভিনয় সংঘটিত হ'য়েচে, সেই নাটকের অভিনেতা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, এবং অভিনেত্রী ছায়া দেবী আর তার দর্শক—বি-এল-খেমকা এবং তাঁর কর্ম্মসচীব উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

সুখের কথা, সেই অপ্রকাশ্য ট্রাজিডির যবনিকা আজ বি-এল-খেমকার নিতান্ত বরাত জোরেই পড়লো। সেই যবনিকা ফলবার জন্ত যিনি অকুত-সাহসে, নিঃস্বার্থ ভাবে, অবৈতনিক ষ্টেজ-ম্যানেজার রূপে, মুমূর্ষকালে খেমকা বাবুর মান রক্ষা কোরতে পেরেছেন—তিনি হ'চ্ছেন আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। এই সম্পর্কে বাবুলালজীর সহযোগীতা প্রশংসনীয়।

যে রহস্য—'খনা' দেবীর পর্দ্দারগায়ে প্রকাশমান জীবন রহস্যের চেয়েও মর্ম্মান্তিক ও গভীর—সে রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করবার সুযোগ ও সময় এখনও আসে নি। তাই বর্ত্তমানে এর বেশী আর আপনাদের জানাতে পারলুম না।

এখন পর্দ্দার উপরের মূল ছবিখানির বিচার করা যাক।

সিংহল-রাজকন্যা খনার এক অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকের সঙ্গে প্রেম, পিতৃপরিচয় লাভে উন্মত্ত প্রায়, সেই যুবকের সঙ্গে উজ্জয়িনীর উদ্দেশে খনার অভিযান এবং উজ্জয়িনীতে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নব-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন, জ্যোতিষার্ণব বরাহের সহিত মিলন ও সেই মিলনের ফলে খনা ও তাহার স্বামী মিহিরের ভাগ্যাকাশে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন সূচিত হয়—তাহারই উত্থান-পতনের কাহিনী এই চিত্র-নাট্য রূপ পরিগ্রহ কোরেচে।

কালোপযোগী দৃশ্য-পট, সাজ-পোষাক এবং আবহাওয়ার মধ্যদিয়ে, নানা রূপ রসের সংঘাতে, ছবিখানি উপভোগ্য হয়েছে। নাটকের রস আংশিক ভাবে দানা বাঁধলেও, তা' বাঙলার নর-নারীর চিত্তকে হৃদয়স্পর্শী অভিনয় এবং সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের আকর্ষণে আকৃষ্ট কোরবে।

বরাহ বেশী অহীন্দ্র চৌধুরীর এবং নাম ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া দেবীর অভিনয় হ'য়েছে উপভোগ্য।

'মদনিকা'র ভূমিকায় শ্রীমতী অরুণাকে মানিয়েচে সত্যি চমৎকার। কিন্তু চেহারাটির মত অভিনয় অতখানি মিষ্টি হয় নি।

'মিহিরের' ভূমিকায় সুশীল রায়ের অভিনয় চলনসই কিন্তু অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কামান্দক নিতান্তই প্রাণহীন বোলে মনে হোল।

অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করবার মত বিশেষ কিছুই নেই।

'খনা'র সুন্দর গানগুলি রচনার জন্ত লেখক নীহারবিন্দু সেন গুপ্তের প্রশংসা করি। অধিকাংশ গানেরই সুর বেশ 'লাগ সৈ' হ'য়েচে, এর জন্যে প্রশংসা অবশ্য সুর শিল্পী ধীরেন দাসের প্রাপ্য। মোটকথা ছবিখানির সাফল্যের অন্যতম কারণ এর চমৎকার সম্পাদনা।

'খনা'র সঙ্গে প্রদর্শিত, পাঁচ রীলের হাসির ছবি—ধীরেন গাঙ্গুলীর 'অভিসারিকা' অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক হাসির খোরাক জুগিয়েচে।

স্বনামধন্য 'ডি-জি' সেজেছিলেন এক উৎকট রোমান্স-বাতিকগ্রস্ত ঘর-জামাই। তার প্রণয়ের অগ্নিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন বন্ধু সুহাস। অবশ্য সে আগুণ নিভিয়েছিলেন, ফায়ার-ব্রিগেড্ রূপিনী শ্রীমতী লীলা (সাবিত্রী)।

টাইপ হিসাবে—'ডি-জি'র প্রণয়-পাগল ঘরজামাই, 'জ্যান্ত পিনাল কোড' শাশুড়ীর ভূমিকায় শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, এবং বিপত্তারণ ভৃত্য রূপে আশু বোষের অভিনয়

আমাদের ভাল লেগেচে। বিকাশের লীলা-সঙ্গিনী রূপে শ্রীমতী সাবিত্রীর ভাবাভিব্যক্তি ও অভিনয়ও হয়েচে তৃতীয় শ্রেণীর।

সূক্ষ্ম সমালোচনার মাপ-কাঠিতে এই শ্রেণীর হাল্কা প্রহসনের জাত-বিচার না কোরে আজ শুধু এইটুকুই বোলতে চাই যে ছবিখানি একেবারে আমাদের নিরাশ করে নি।

বড়দিদি

'বড়দিদি' কাহিনীর মধ্যে, নৃত্য-গীত-পটিয়সী, যুবতী বাঈজী 'এলোকেশী'—এমন একটি চরিত্র, যার কথা এতদিন আমরা উল্লেখ না কোরলেও, উপেক্ষা কোরতে পারি না।

কুশলী কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটির অবতারণা কোরেছিলেন, নায়ক সুরেন্দ্র-নাথের চরিত্রের দৃঢ়তা, এবং আর একটি নারীর প্রতি তার অবিচলিত নিষ্ঠা, শেষ পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন করবার জন্য। নানা ঘটনার সংঘাতে, নানা বিরোধের মধ্য দিয়ে কি ভাবে মূল চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, শরৎচন্দ্র সে কৌশল বেশ ভালই জানতেন। বস্তুতঃ নর-নারীর হৃদয় রহস্যের এতখানি সন্ধান জানতেন বোলেই, কাল্পনিক হ'লেও তাঁর সৃষ্টি চরিত্রগুলি, প্রাণ-রসে সমুজ্জ্বল হোয়ে ওঠে।

বাঈজী এলোকেশীর সান্নিধ্যে, সুরেন্দ্র-নাথের আন্তরিক নিষ্ঠার অগ্নিপরীক্ষা, পরিচালক অমরবাবু শুনচি শীঘ্রই গ্রহণ কোরবেন। হাব ভাব ও কটাক্ষাদির সহ-যোগে নাচ-গানের মুষ্টিযোগ যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্যে পঙ্কজবাবুর মহলা-মন্দিরে, 'শ্রীমতী এলোকেশী' চেষ্টার ত্রুটি কোরছেন না।

এই ভূমিকায় আপনারা এমন একটি চৌখোশ অভিনেত্রীকে দেখতে পাবেন, যিনি সত্যকারের এলোকেশীর আদর্শকে যে কোন দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ কোরবেন না—এর পরিচয় আমরা বাইরের লোক হ'লেও, কিঞ্চিৎ পেয়েচি।

পঙ্কজবাবু ও অমরবাবুর জয় হোক। এখন বেচারী সুরেনকে অল্পেতেই রেহাই দিলে আমরা বাঁচি!

সাপুড়ে

দু'নম্বরে আবার সাপুড়ে দলের ভেল্কী বাজী এ হপ্তা থেকে সুরু হোল।

'ঘণ্টা বুড়ো'-র সাক্রেদী কোরে, কর্ম্ম-সচীব ছোটাইবাবু ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ তুক্‌তাক্ আয়ত্ব কোরে থাকবেন। অন্ততঃ দেবকী বাবুকে তিনি আংশিক ভাবেও চাঙ্গা কোরে তুলতে পেরেছেন দেখে
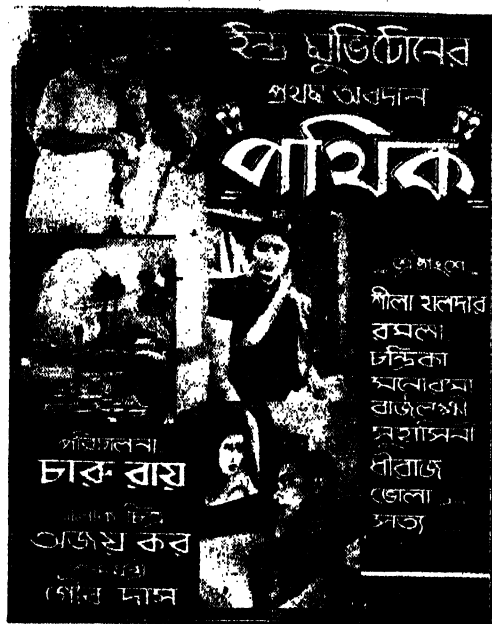
In my life both Nanda & Reba are equally true. I shall have to pay the price of what happens at their meeting "I shall have to shoulder the whole responsibility." That youth wanted to evade truth in this way but did it succeed?

P A T H I K

Direction:
CHARU ROY

Indra Movitone's
Maiden Hit

PATHIK

It is based on psychology & the latest technique and is expected to herald a revolution in Bengal's film world.

For booking apply to:—

CHANDANMULL INDRAKUMAR

3, Synagouge Street, Calcutta

PHONE B. B. 497

N. I. P.

আমাদের আশা হচ্ছে—এ বিরাট সর্প-যজ্ঞের প্রথমারম্ভ নির্ব্বিঘ্নেই কেটে যাবে।

কথায় বলে—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে!

বেদেদের পাণ্ডা দেবকীবাবু নিশ্চিত দিন রাত শুনচেন—ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ, আর তার সঙ্গে এমন একটি মেয়ের ফোঁস্ ফোশানী—যে নাকী পুরুষের বেশে, বেদেদের দলে ঢুকে একদিন অকস্মাৎ নিতান্ত নিয়তির নির্দ্দেশেই অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। কে সেই দুঃসাহসিনী মেয়ে, কেমন কোরেই বা সে বেদেদের দলে ঢুকলো—সে খবর আপনাদের আর একদিন জানাব। আপাততঃ জেনে রাখুন, মেয়েটির নাম—'চন্দন'।

দেবকীবাবু ও ছোটাইবাবু অনেক কিছুই দেখছি আজকাল লুকিয়ে রাখতে চান। তবু, আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি। 'বেদে পল্লী'-র গোপন খবর ইতিমধ্যেই আমাদের হস্তগত হ'য়েচে। আপনারা ক্রমশঃ জানতে পারবেন।

ফণী মজুমদার

পরিচালক ফণী মজুমদার ভায়ার যে হালফিল্ পরোপকার বৃত্তি বেড়ে চলেচে—সে বিষয়ে সংশয় মাত্র নেই।

পথে পথে ঘুরে বেড়াতো এক জোড়া ভবঘুরে—মঞ্জু ও ভুলুয়া। মজুমদার মশাই তাদের একেবারে সহরে এনে, ডায়মণ্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের হাতে তুলে দিলেন।

আজ আবার দেখছি, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের পথে ছোটখাটো একটা ডাকাতি হ'য়ে গেল। সেই অবু-স্থল' থেকে, পাল্কী সমেত এক যোড়া সুন্দরী যুবতীকে এনে তুললেন, পথের ধারে এক সরাইখানায়। কিন্তু তাদের দেখা শোনার ভার দিলেন এমন একটি জীবের উপর, যিনি না ওসমান্, না জগৎ সিংহ।

ফণী ভায়া এতও জানেন?

অধিকার ও সাথী

নিউ থিয়েটার্সের এ দুটি নূতন ছবির বাংলা সংস্করণ বাংলার চিত্রামোদিগণের আর ধৈর্য্যচ্যুতি করবে না। অধিকার ২৪শে নভেম্বর শনিবার চিত্রায় মুক্তিলাভ ক'রবে। 'সাথী' পরিবেশকের (কপুরচাঁদ) কাছ থেকে বেশী দূরে যেতে চায় না তাই নিউ সিনেমায় শীঘ্রই মুক্তি লাভ ক'রবে। অধিকারের নায়ক ও পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া এ ছবিতে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন আর তার প্রিয় শিষ্য ফণী মজুমদার 'সাথীর' পরিচালনায় দর্শকদের মনোমত 'প্যাঁচ' বেশ দিয়েছেন। সত্যিকারের গুরুর মত

কুমার প্রমথেশ শিল্পের সাফল্যের জন্য উদ্‌গ্রীব ও কতকটা নিশ্চিন্ত। 'শিষ্যাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্' শাস্ত্রের এ উদার নীতি কুমার বড়ুয়া লঙ্ঘন করেন নি তাই লোকে যাকে Box office star বলে সেই কাননবালাকে তিনি নিজের ছবিতে নায়িকার অংশ না দিয়ে, সায়গলকে গানের জন্য নিজের ছবিতে না নিয়ে সবই ফণীবাবুর ছবির জন্য রেখে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। তবে পরাজয় ইচ্ছা ক'রলেও দ্রোণের মত যোদ্ধা অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হয় নি। এ মধুর ছায়া চিত্রকলার দ্বন্দ্ব দেখবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি।

ষ্টাণ্ডার্ড পিকচাস

এই নামে একটি লিমিটেড কোম্পানীর তোর-যোড় চলছে। টালিগঞ্জে খালের ধারে বড় জমিও নাকি নেওয়া হয়েছে। কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে ২১ জন গুণীও নাকি আছেন। যাক যত হয় ততই আনন্দের—The more the merrier। তবে কতগুলি বোবা ও পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে তাদের হিসেব নিলে ভাল হ'ত।

দেবদত্ত ফিল্মস

স্বয়ং দেবদত্তবাবু নাকি 'শর্ম্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে ব্যস্ত। এত দেবকন্যা থাকতে হঠাৎ দৈত্য কন্যার ওপর নজর পড়ল কেন? যাক্-এর আরোও খবর পরে জানাব।

প্রাইমা ফিল্মস. লিঃ

গত সপ্তাহে এরা বোম্বাইএর হিন্দি ছবির পরিবেশন. সত্ত্ব নিচ্ছেন বলে খবর দিয়েছি। জালা শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। দ্বিতীয় ছবি 'সাথী'র নায়িকা শ্রীমতী দুর্গাবাই খোটে আর নায়ক মোবারক। এ ছাড়া আরও তিনখানা ভাল ছবি নেওয়ার কথাবার্ত্তাও পাকা হ'য়ে গিয়েছে।

পথিক

পুরাতন ম্যাডান ষ্টুডিও বা টলিউড ষ্টুডিওতে ইন্দ্র মুভিটোনের প্রথম ছবি 'পথিক' প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। পরিচালক চারু রায় শেষের দু-একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

পূর্ণ থিয়েটার

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী নিঃসৃত 'গোরা' বিগত পাচ সপ্তাহ ধরে পূর্ণ থিয়েটারে দক্ষিণ কলিকাতার চিত্রামোদি-গণকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। এই শনিবার ১৯শে নভেম্বর তারিখ হ'তে গোরা ষষ্ঠ সপ্তাহে প'ড়বে। যারা এখনও দেখেননি তারা এ সুযোগ ছাড়বেন না আশাকরি। এর পর আস্‌ছে 'আলিবাবা' (শ্রেষ্ঠাংশে সাধনা বোস) ও নিউ থিয়েটার্সে'র হাস্যরসাত্মক ছবি "অচিন প্রিয়া"।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সে'র 'অভিনয়' ভালই চলছে যদিও অনেক দিন হয়ে গেল এর উদ্বোধন হয়েছে। এর পর রাধা ফিল্মসের পৌরাণিক ও চিরনূতন রামায়ণী গাথা—জনক নন্দিনী।

খনা

উত্তরা চিত্রগৃহে মেট্রোপোলিটন পিক্‌চার্সে'র 'খনা' এই শনিবার থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে প'ড়ল।

হাজরা পিকচার্স

এদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নানা লোকে নানা কথা বলে। দাদার-ও গলা শোনা যাচ্ছে না। শীত-কাল গলায় শ্লেষ্মা হয়ত বসেছে। আহা ব্যাচারি রামগতি! ফুলরাও ফুলিয়ে দিলে না।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস্‌এর পৌরাণিক চিত্র একলব্য ও তৎসহ অতি আধুনিক চিত্র রূপোর ঝুমকো শ্রী চিত্রগৃহে ১৯শে নভেম্বর হইতে দেখান হইবে। ছবি দুইখানির প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত পান্নালাল পাঠক। অসীম ধৈর্য্য সহকারে শ্রীযুক্ত পাঠক উক্ত চিত্রপ্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাঁরই অমানুষিক চেষ্টা ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আজ "একলব্য" ও "রূপোর ঝুমকো" সাধারণে আত্মপ্রকাশ করিল।

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পর্য্যায়

বাড়ী ফিরে চপল আস্তে আস্তে এসে প্রবেশ করে ওর ছোট্ট ঘরটাতে। ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে জিনিষ পত্রগুলো। বিছানাটা ওর অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। মশারীর একটা কোনের দড়ি গ্যাছে ছিঁড়ে। বিছানার ওপরই ওটা লোটাচ্ছে। সামনের বড় আয়নাটা দেয়ালে টাঙানো। ওটায় ধরেছে ময়লা। জামা কাপড়গুলো এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে, কোনটা চেয়ারের গায়ে, কোনটা স্যুটকেসের ওপর আর কোনটা বিছানার ওপরেই। বই আর খাতা পত্রগুলো টেবিলের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ছড়ানো, রাশিকৃত জঞ্জালের মত। টিপয়টাতে শূন্য পেয়ালা এখনও পড়ে। জলের গেলাসটা মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। না, ও নিজে ভারী অলস মানুষ—ওভাবে কি অপরিস্কারই না হয়ে আছে ওর ঘরটা। এঃ কাগজ পত্রগুলো গোছানই হয়নি। ওর কবিতার খাতাটা পড়ে আছে টেবিলের নীচে। তাইতো! যে কবিতাটা ও ফেয়ার করে রাখলো 'সুচিত্রায়' পাঠাবার জন্য, সেটাই বা গেল কোথায়? নাঃ যাক্‌গে সব চুলোয়। ও আর পারে না। বাড়ীর কেউই নজর দেয় না ওর ঘরটার দিকে। এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? 'এ যেন গরুর গোয়াল, চতুর্দ্দিকে ঘাস, বিচালী ছড়ানো। এর চেয়ে রাস্তার ঐ ডাষ্টবিনটা পরিস্কার। ও চেঁচিয়ে ডাকে—মা।

কোন উত্তরই আসে না। ও ফের ডাকে, ফের।

মা আসেন। বলেন—কিরে চেঁচাচ্ছিস কেন? কি হলো তোর আবার?

ও ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে ঐ বিছানার ওপরেই জুতো জামা শুদ্ধ।

ওর মা ফের জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্‌ছিলি কেন?

ও লাফিয়ে উঠে বলে—কেন আবার। আমার ঘরটা কি দেখতে নেই কোনকালে? এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? আমার পায়জামাটা গেল কোথায়? এ কাপড়টা ছাড়তে তো হবে। আমার স্লিপারটাই বা কোথায় ডুব মারলো? দেখতো কি মুস্কিল। একটা মানুষ যদি আমার ঘরে আসে তাহলে আমায় কি ভাববে বলতো? ভাববে একটা জানোয়ার থাকে আস্তাবলের মধ্যে। না, তোমরা ভয়ানক ইয়ে··· ঝিটাকেও তো একবার পাঠিয়ে দিতে পার। ঝাঁটাটাও দিতে পারে, না তারও দরকার নেই। দেখতো টেবিলটা কি হয়েছে। এই দেখ, খাতাটা কোথায় পড়ে রয়েছে। এমনি করে আর কাঁহাতক পারি বল। না বললে যেন কিছুই করতে নেই। আমি যদি বোবা হতাম, তাহলে কি হতো? আঁস্তাকুড়ের ভেতর ফেলে রাখতে তো? আমি যেন একটা ভাড়াটে, পড়ে আছি একধারে; তিন কুলে কেউ নেই যার।

—মা হাসেন। বলেন—হতভাগা ছেলে এরই জন্যে এত চেঁচামেচি? আমি তো মনে করলুম বুঝি বা ডাকাত পড়েছে তাই চপলকুমার সাবধান করে দিচ্ছেন বাড়ীর লোকজনকে। সকাল বেলা আমি নিজে তোর ঘর গুছিয়ে দিয়ে গেলাম না? এরই মধ্যে এমনি করে তুলেছ তা কি করে জানবো? জিনিষপত্র গুছিয়ে ব্যবহার করতে তো কোনকালেই শিখবে না। আমি একা কাঁহাতক সামলাবো?

—ওর রাগ বেড়ে যায়। বলে হুঃ ভারী গুছিয়েছ, ছাই করেছ। আজ সকালে কখন এলে তুমি আমার ঘরে? তোমারই মনে নেই। সেই কবে একবার গুছিয়ে দিয়েছিলে তার ঠিক নেই!

বলিস্ কিরে? কবে মানে আজ সকালেই তো গুছিয়ে পরিস্কার করে দিয়ে গেলাম। কি ভুলোরে তুই! তাইতো বলি বউ নিয়ে আয়, সব ঠিক থাকবে দেখিস্। তাতো শুনবি না। বিয়ের নাম শুনলে—ছেলে যেন লাফিয়ে ওঠেন। বই আর কালি কলম নিয়েই পড়ে আছেন রাতদিন। ওসব ছাই পাঁশ দিয়ে কি হবে শুনি?

—কি সব ছাই পাঁশ? বই আর কালিকলম? আর তোমার ওই বউ আর বিয়ের কথাই হারেমুক্তো; বিয়ে করলে খাওয়াব কি শুনি?

—কেন দুনিয়ার লোক যা খাওয়াচ্ছে। পুরুষ মানুষ না তুই?

তা না হয় হলুমই। কিন্তু তাই বলে পাশে শুয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে একটা মানুষকে খাওয়ানোর কি দরকার?

কিন্তু বাপু একলাটি খেটে খেটে জীবনটা আমার যাবার দাখিল হলো যে! সেদিকে খেয়াল কি তোর কোনদিনই হবে না।

—বারে, ঝিটা কি করে তবে? খালি বুঝি কাজে ফাঁকি দেয়? দাঁড়াও কাল সকালেই ওকে বকে দিচ্ছি আচ্ছা করে।

সত্যিই তোমার শরীরটা তো খারাপই হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। আচ্ছা মা, ঝিটা কখন আসে বলো তো? তখন আমাকে একটীবার ডেকে দিও, দেখ কি ভাবে ধমকে দিতে হয়।

নে, খুব হয়েছে। ওঠ দেখি এখন। জামা জুতো ছাড়বি? না; ওই পরেই রাত কাটাবি? পায়জামাটা ওই খাটের নীচে পড়ে রয়েছে। চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখলেই তো পারিস।

চপল তাড়াতাড়ি উঠে জামা কাপড় নেয় তারপর নিজের টেবিলে এসে বসে। ওর মা ততক্ষণে কাপড় জামাগুলো গুছিয়ে, বিছানাটা ঝেড়ে ঠিক করে দিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলে যান—খেয়ে নিবি আয়। বেশী রাত্তির পর্য্যন্ত বসে থাকতে পারি না।

চপল খেতে চলে যায়। খেয়ে ফিরে এসে ও আবার টেবিল আশ্রয় করে বসে। ও লিখবে আজ কবিতা। ওর ইচ্ছা তাই লেখে। কিন্তু কি লিখবে?

ও কলম চালিয়ে চলে। পাতার পর পাতা শেষ করে ওর দৃষ্টি ফিরে আসে গোড়ার লাইনের দিকে। সুরু থেকে পড়ে যায়। একি লিখেছে ও! এরূপ ধারার কবিতা ও তো এর আগে কখনোই লেখেনি। ওর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে—দেশের অতীত ইতিহাসের গৌরব-পূর্ণ কাহিনী; দীন দুঃখী যারা, দুবেলা যারা দুমুঠো খেতে পাবার জন্য করে যায় নিজের রক্তবিন্দু তিলে তিলে দান, তাদের কথা, আর বড় জোর অপরূপ রহস্যময়ী প্রকৃতি দেবীর মাধুর্য্য বর্ণনা। ভাব বিলাসী কবিদের দলের মানুষ ও নয়,—যারা একটী কথাকেই নানারকমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে চলে। দেশের এই সব কর্ম্মবিলাসী কবিদের ও করে ঘৃণা। ওর মতে এরা দেশের প্রাণ-শক্তিকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ওরা ক্ষমারও অযোগ্য। রাশিয়ার গোর্কীকে ও করে পুজো। ওদের দেশেও ভাববিলাসী কবি আছে, কিন্তু তারা এদের মত নয়। তাদের সব লেখার ভেতরই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এদের কবিতা তো কবিতা নয়—কাঁদুনি। এদের গল্প লেখা, উপন্যাস রচনা তো নয়, সব ন্যাকামী। ও ভাবে আমাদের দেশে একজনও কি জন্মাবে না গোর্কী, রোমারোলা, হুইটম্যান, বার্ণার্ডশ, লারমন্টভ হুগো; অথবা হাকসলি, ব্যালজ্যাক, ইবসন, টুরগেনিভ, ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থ, শেলী, বাইরন? না, কত নাম ও করবে? দেশটার প্রাণশক্তির অভাব এতেই প্রমানিত হয়। এরা ভোগ করতেও জানে না ত্যাগ করতেও না। খালি নাকে কান্না - তার নাম সাহিত্য? রবি ঠাকুর জন্মালো, কিন্তু বেচারা একা কতদিকেই বা সামলাবে? গান লিখবে না গান গাইবে, কবিতার ছন্দ মেলাবে না আবৃত্তি করবে, নাটক রচনা করবে না নিজেই ষ্টেজে নামবে! ভ্রমন কাহিনী থেকে আরম্ভ করে ন্যায় ছেলে ভুলোনো ছড়া পর্য্যন্ত ওই একটা লোকই বজায় রাখলে। শরৎবাবু যাও বা নামলেন দেশের সমাজ সমস্যা নিয়ে, হিন্দু শাস্ত্রের কূপমণ্ডুকতা নিয়ে, লিখলেনও মন্দ নয়; কিন্তু আসল গোড়ামীগুলোকেই দিয়ে গেলেন প্রশ্রয়। আর হ্যাঁ এক দেবদাস লিখেই খেলেন তিনি দেশের মাথা। বই পড়ে আর না হয় পর্দ্দার গায় ছবি দেখে, কতকগুলো ছেলে গেল একেবারে উৎসন্নে, যারা হয়তো মানুষ হতে পারতো ভাল শিক্ষা পেলে। দেশের অনেকগুলো শিক্ষিত তাজা যুবক সাজলো নকল দেবদাস। কেউবা ভালো মদের অভাবে টাসলে কান্‌ট্রী লিকর, কেউ বা খেলে সায়নাইড আবার কেউ কেউ বিশ্রী বাড়ীগুলোর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলে। এক 'দেবদাস'ই অনেকগুলো বিশ্রী জিনিষের প্রবর্ত্তন করে গেল। দেবদাস মরলো—মরলো যদি পুরুষ মানুষের মত মরতো, তাহলেও দেশ একটা কিছু শিখতে পেত। রস সৃষ্টি হয় না তাহলে? কিন্তু দেশের যা প্রয়োজন তাই তো দেওয়া উচিত সাহিত্যের ভেতর দিয়ে?

নিজের লেখা লাইনগুলোর দিকে চেয়ে ও ভাবে—কিন্তু চপল বোস তোমার কলম থেকে আজ একি বেরুলো? নাঃ এ লেখা ও ছিঁড়ে ফেলবে। দেশকে ফাঁকি ও দিতে পারবে না। কিন্তু মনকে তুমি ফাঁকি দেবে কি করে চপলকুমার?—ও নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। ও ভেবে ঠিক করতে পারে না। এর চেয়ে খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে কাজ দেখবে বলে ও গিয়ে শুয়ে পরে। কিন্তু ঘুম আসে কই? ওর মনটা যেন আজ খালি পাগলামী করছে। ও ঘুমুতে পারে না, উঠে পড়ে। খানিকটা পায়চারি করতে থাকে আস্তে আস্তে, যেন পাশের ঘরের লোক না জাগে। ধীরে ধীরে ও আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কাচের ওপরে দেখা যায় ওর মুখটা খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট। তাইতো ওকে আজ বাস্তবিকই দেখাচ্ছে সুন্দর। ওর মুখের শ্রী ফিরে গেছে। আয়নার সামনে আরও একটু এগিয়ে আসে।

ও ভাবে মেয়েটার কথা। মীরা নাম না? বাস্তবিক মিষ্টি নামটা। বেচারী আমার একজন ভক্ত; আমার চেহারার নয়, আমার লেখার। বেশ চেহারাটা ওর। ও একটু খানিতেই দেখে নিয়েছে—। বেশ চটপটে। কথার স্রোত ওকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হ্যাঁ প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে ও হাসতেও; কোন জড়তা নেই। নাঃ মেয়েটার সরল সাহস আছে

সোজাসুজি কথা বলবার। ঘুরিয়ে কথা বলবার ন্যাকামো নেই। ওর প্রতি কথাটা যেন প্রাণশক্তির রসে সঞ্জীবিত।

চপল ফিরে আসে আয়নার সামনে থেকে। এসব কি ভাবছে ও! এতো ওর স্বভাব ধর্ম্ম নয়! আভিজাত্যের গ্যাস-পোড়া এই সব বেলুন জাতীয় মানুষদের ও কোন কালেই পছন্দ করতো না। মেয়ে-দেরও না—পুরুষদেরও না। ও জানে—ওরা চায় শুধু নিজের ঔজ্জ্বল্যকে জাহির করতে। ওরা লোকের সাথে পরিচয় করে অতি সন্তর্পনে, পাছে ওদের আভিজাত্যে আঘাত লাগে। সাধারণ লোকের সাথে ওরা কথা কয় না, আভিজাত্যের খোলস পাছে খ'সে পড়ে বলে। ওরা গ্যাসপোড়া বেলুন জাতীয় জীব। অন্তর বিষ-বাষ্পে ভরা, কখন যে উড়ে যাবে তার ঠিক নেই। সমান জমিতে নেই ওঁদের স্থান। চপল ওদের ভয় করে। ওঁদের সাথে মিশতে ওর কোন কালেই প্রবৃত্তি হয়নি, নিজেকে এটিকেটের টানে আড়ষ্ট করে বেঁধে ও চলতে পারে না বলে। ওর নিজের জীবন ছন্নছাড়া, যেন মুক্ত বাতাস, যেখান সেখান দিয়ে বয়ে চলে, বাধা পেলে রাস্তা বদলায়, আবহ কমে না। যখন যে খেয়াল চাপে ও তখন তাই করে। চায়ের সাথে চেয়ে নেয় আলু ভাজা, একটা পায়জামা পরেই হয়তো বা দোকান থেকে জিনিষ কিনে আনে, পাঞ্জাবীর উপরই কখন কখন সোয়েটার চাপিয়ে ঠাণ্ডা কমায়। এই ওর স্বভাব।...

মীরা যদি সেই দলের হয়? তাহলে? তাহলে আর কি?, কি সম্পর্কই বা মীরার সাথে? একদিনের মাত্র আলাপ বইতো নয়! তাতে ওর ভাববারই বা কি আছে? হলেই বা আভিজাত শ্রেণীর মানুষ, জাহির করতে এসেছে নিজের সম্পদ। চপল জোরে জোরে পা চালাতে সুরু করে। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠে। পাশের ঘরে আরো মানুষ ঘুমুচ্ছে। সন্তর্পনে স্লিপার জোড়াকে ঠেলে দেয় খাটের তলায়। খালি পায়ে আর আওয়াজ আসে না 'চপল ভাবে হ্যাঁ তাহলে ও-ও দেখাতে পারবে মীরা কতখানি ভুল করেছে। সাধারণ ছেলেদের মত গায়েপড়া মানুষ ও নয়, কোন মেয়ে হেসে কথা বললে যারা নিজেদের ধন্য মনে করে। না, ওর মাথা ব্যথাই বা কেন এত? সামান্য একটা মেয়ে, এমন কত মেয়েই তো চলে গেছে ওর সামনে দিয়ে, কোন দিন কারুর কথা ও ভেবেছে কি? সাহিত্যিকদের—বিশেষ করে তরুণ যারা, একটু নাম যারা করেছে, তাদের সাথে এমনি কত মেয়েই তো আসে সেধে আলাপ জমাতে। তা নিয়ে ভাবলে কি আর চলে? ও বুঝতে পারে ওদের কেউ আসে নিজে জৌলুশ দেখাতে—সাধ নিজের বর্ণনা ফুটবে কাগজের পাতায়; আবার কেউ আসে নিজের যা তাই লেখাকে সুখ্যাতি করিয়ে নিতে। এতে আর মাথা ঘামাবার কি আছে? এই মীরা হয়তো তাদেরই একজন। 'ওর সাথে দেখা হলে চপল ঠিক বলে দেবে ওর মুখের ওপর—তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি হালকা হাওয়ার রঙীন প্রজাপতি, গাছে গাছে ঘুরে বেড়াও নিজের রূপ দেখিয়ে। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার ভেতরকার উদ্দেশ্য। কিংবা হয়তো চাও আমাকে, অর্থাৎ শ্রীমান চপলকুমারকে খানিকটা উত্তপ্ত করে দেখতে, গরম কড়ায় দেওয়া ধানের মত নাচতে পারি কি না। কেমন এই না তোমার উদ্দেশ্য? কি গো মীরা দেবী উত্তর দাও! কিন্তু তুমি ভুল করেছ পথিক অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই পথ, যে পথ ধরে তুমি পা বাড়াতে চাইছো—সেখানে তোমার হয়েছে ভুল—দিক নিরূপণের বেলায়। কারণ তোমার জানা উচিত ছিল (যদি তুমি বাস্তবিক দক্ষ পথিক হয়ে থাক) যে চপল বোসের মন সেই ধরণের নয়, যারা আলোতেই যায় গলে, একতাল কাদার মত, যা খুসী তাই বানানো চলতে পারে। চপল বোসকে গলানো অত সহজ নয়। ক্যালসিয়াম অর্থাৎ চুণকে গলাতে গেলে কেমন হয়, যদি অবশ্য চুণকে গলাবার মত যথেষ্ট জল তোমার থেকে থাকে, চপল বোসকে গলাতে গেলেও পড়বে একই অবস্থায়। ওর অন্তর বাহির সবই সাদা, ঠিক চুণের মত, কিন্তু আছে অন্তর্নিহিত উত্তাপ। জলের ভিতর নির্ব্বিঘ্নে ওকে গলানো যায় না। ও কেটে পড়বে তাহলে আগুণকে উদ্গীরণ করতে করতে যা সামলাতে গিয়ে হয়তো বা তোমারই হাত পুড়বে। তাকে দিয়ে বানানো যাবে না যথাইচ্ছা পুতুল, যাকে নিয়ে খেলা করা চলে। সাবধান মীরা সেন এখনও পথ বদলাও। (ক্রমশঃ)

সন্দেশের কথা

আমি সন্দেশ—আশা, উদ্যম, আনন্দ ও উৎসাহের জীবন্ত ছবি। ময়রার দোকানে বা আপনার খাবার রেকাবে দেখলে আপনার যে শিশুটী হামাগুড়ি ছেড়ে সদ্য হাঁটতে শিখেছে সেও আমাকে চিনতে পারবে। শুধু তাই নয়—নিজের অজ্ঞাতসারে আমার নামটীও উচ্চারণ করে ফেলবে। কিন্তু আপনাদের চোখের অড়াল থেকে আজ আমাকে চলতে হচ্চে বলেই নিজের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আপনারা বিদ্রূপ করবেন জানি—বলবেন সন্দেশও চেঁচিয়ে নিজের পরিচয় জানাচ্ছে এটা অবশ্যই আমার দুর্ভাগ্য কারণ আমাকেও নিজের কথা শোনাতে হচ্ছে।

জানি—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আমার আদর। সমস্ত শুভকার্য্যে আমাকে না হলে চলে না—আমার নাম শুনলে আবালবৃদ্ধবণিতার জিভেয় জল আসে—মনে স্ফুর্ত্তি হয়। আমি সদানন্দ—যখনি দুঃখে থাকুন একবার আমার নাম করবেন, দেখবেন দুঃখ কোথায় চলে গেছে। আমি চিরন্তন—আর্য্যসভ্যতার আদি যুগ থেকে আমি সকল সময়েই সুখী, দুঃখী, ধনী, দরিদ্র, আমির ও মুসাফির সকলের কাছেই আদর পেয়েছি। এখন নব্য-ভারতীয় সাহেবদের কাছে আমার আর স্থান নেই।—আমার নাকি দিন গিয়েছে। বর্ত্তমানে আমার এক প্রতিদ্বন্দী জুটেছে—তিনি হলেন পুডিং—, স্বজাতিও নয়—স্বদেশাও নয় তারই নাকি আজকাল জয়-জয়কার। কিন্তু পুডিং কি আমার কাছে দাঁড়াতে পারে? আমি শরীরে শক্তি—মগজে বুদ্ধি ও হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি দেই। এমন কি পশ্চিমের—খাদ্যতত্ত্ববিদগণও আমার মধ্যে যথেষ্ট প্রোটীন আছে সুখ্যাতি করছেন। বাংলা তথা ভারতের সুধীশ্রেষ্ঠ স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি ভীমনাগের দোকান থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় জলযোগ কর্ত্তেন। তাই বলি—তিনি হয়েছিলেন Royal Bengal Tiger.

আর পুডিং—যারা বিলিতি ধরণে হাসে, ফরাসি ধরণে কাশে ও পিতৃপুরুষের হুক্কা ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে ভালবাসে—তারাই পুডিং খেয়ে উদরপীড়া করে, বাড়ীর সকলকে খিটখিটে মেজাজ দেখিয়ে, চাকর বাকরের প্লীহা চমকিয়ে দেন। তখন ডাক্তারেরা ব্যবস্থা করেন পুডিং ছেড়ে আমারই আশ্রয় নেবার জন্যে। আমি চির উদার—আমায় একদিন উপেক্ষা করেছে বলে—আমি অজীর্ণ রোগীকে বিমুখ করিনে—সাদরে আশ্রয়ই দেই।

শুনেছি—হাঁসের বা মুরগীর ডিম পুডিং তৈরীর একটী শ্রেষ্ঠ উপাদান। আমাদের এই গরম দেশে এই আবহাওয়ার মধ্যে ডিমের শত উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও মোটেই তা গ্রহণ করা উচিত নয়। আর নস্য ও সিগারেটের গুণে যার ঘ্রাণ শক্তি এখনো নষ্ট হয়ে যায় নি—তিনিই অনুভব কর্ত্তে পারবেন যে পুডিং থেকে কেমন যেন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ বেরোয়। পুডিং তৈরী অবশ্য অনেক রকমে হতে পারে। তার সাধারণ উপাদানগুলোর সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক্। ঘন দুধ—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমতে এর মত অপকারী জিনিষ বোধহয় আর নেই। তারপর ডিম—লোকমুখে শুনি আধাসিদ্ধ ডিমের মত স্বাস্থ্যপ্রদ পদার্থ আর নেই। কিন্তু পুডিংএর ডিম সম্পূর্ণ সিদ্ধ—ঘন দুধের সঙ্গে মিশে হজমের পক্ষে ভয়ানক কঠিন হয়। তারপর চিনি ও ফল—উভয়েই ভাল জিনিষ। কিন্তু কঠিন পদার্থের সঙ্গে মিশে বোধহয়—বোধহয় কেন,—নিশ্চয়ই হজম করা দুরূহ ব্যাপার। আর পাঁউরুটী, তাও ত ময়দারই রূপান্তরিত বিষ! তাই বলি—যারা আমার মত অখণ্ডমণ্ডলাকার—শুদ্ধ—স্নিগ্ধ শুভ্র, অপাপবিদ্ধ, সুঘ্রাণযুক্ত সন্দেশকে ছেড়ে, এই বিদেশাগত পুডিং এর ভক্ত হয়—তাদের গতি কি হবে, একবার ভেবে দেখুন। আমি অভিশাপ দিচ্ছি না—আমি কেবল আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর দোষ দেখাচ্ছি মাত্র।

আজো যাঁরা আমায় 'Old Fool' বলে পরিত্যাগ করেন নি তাঁরা জানেন যে, আমার অনুগ্রহে খাবার দোকানের নাম বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কিরূপ পরিচিত। আমার অনুরাগে এই কলিকাতা সহরে কত দরিদ্র যশ ও অর্থের অধিকারী হয়েছে, এই সহরের কত অট্টালিকা, আমারই দান। আমাকে ছাড়লে, দেবদাসীর অর্চ্চনারও অঙ্গহানি হয়। আকণ্ঠ ভোজন করেও যদি কেহ—আমার সেবা করতে চান—তবে দেখবেন যে—উদরস্থিত লুচি, পোলাও মাংস এরা আমার জন্যে একটু স্থান করে দেবেই—কেননা তারা ভাল ভাবেই আমাকে জানে এবং যথেষ্ট সম্মানও করে।

আমিষাসী ও নিরামিষাসী, উভয়ের কাছেই আমার সমান আদর। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে, দেখবেন যে, আমার শুভাগমন হয় সর্ব্বশেষে, কেন না সবাই জানে যে নিমন্ত্রিতগণ আমার জন্ত অপেক্ষা করবেনই। যদি প্রথমেই আমার দর্শন মিলে, তা হ'লে লুচি, পোলাও, মাংস এদের কেউ চাইবে না। শুদ্ধাচারিণী হিন্দু বিধবারা যারা পুডিংকে স্পর্শ কর্ত্তেও অশুচি মনে করেন,—তারাও সাদরে আমায় স্থান দেবেন। তাইত বলি আমার জায়গা অধিকার করবার জন্য পুডিংএর এই যে বৃথা চেষ্টা, এ কিছুতেই সফল হবে না।

কেহ কেহ বলেন—আমার নাকি দিন গিয়েছে। আমি তা স্বীকার করিনে। এখন নব্য নব্যাদের যুগ। এখন দেশের উল্টে গেছে হাওয়া,—কিন্তু আমি তো আর বদলাই নি? আমি সেই ছানার সন্দেশই বটে। আমাকে পাবার জন্যও সবাই ব্যস্ত। তবে নূতন হাওয়ায়, আমার সে মহিমা গেল কোথায়? কত দুষ্টকে আমি দমন করেছি, আর পুডিং—? তাকেও করবো। পুডিংই আসুক আর যেই আসুক এদেশে, কিন্তু সন্দেশই রাজত্ব করবে চিরকাল। ভুলবেন না এদেশে আমি চিরকাল মন রেখেছি, জন রেখেছি ও সবার মান রেখেছি। এখনও রাখবো।

কথায় আছে:—

"কোথায় লাগে বা কুর্ম্মা কাবাব,
কোথায় পুডিং কালিয়া
না খেতেই যায় ভরিয়ে উদর
সন্দেশ থাকে পড়িয়া।"

কোন ময়রার দোকানে যে আমার, পূর্ব্বপুরুষের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, তা আমি অবগত নই। কিন্তু ছানাকে স্থায়ীভাবে অবিকৃত রাখবার যদি কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তা হ'লে বাঙ্গালী জাতির কর্ত্তব্য সেই বিকারহীন,—ছানায় মর্ম্মরে, সেই চিরস্মরণীয় অজ্ঞাত ময়রার স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করে রাখা। সন্দেশ বাঙ্গালার অপরাজেয় সৃষ্টি,—ভারতের গৌরব মিষ্টান্ন জগতের অপূর্ব্ব অবদান।

—:০:—

কবি মধুসূদনের জীবনী ও কর্ম্মধারা

মাণিকলাল চ্যাটার্জ্জী

আজ আমি এখানে যে মনস্বীর স্মৃতি-বাসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে এসেছি, তিনি ৬৫ বছর আগে ধরাধাম ত্যাগ করে অমৃত লোকের পথে মহা প্রয়াণ করেছেন।

মধুসূদনকে লাভ করে বাংলা ভাষা ও বাঙলা দেশ গৌরবান্বিত হয়েছে। খিদিরপুর নিবাসীগণ তাঁকে আর বঙ্গের অন্য দুজন খ্যাতনামা কবিকে লাভ করে ধন্য হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন কবি হেমচন্দ্র ও অন্যজন কবি রঙ্গলাল। এদের মত মধুসূদনের জীবনেরও কিছু অংশ এই খিদিরপুরেই অতিবাহিত হয়েছিল।

১৪৪ বছর আগে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী শনিবার যশোর জেলার অন্তর্গত 'সাগরদাঁড়ি' গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্নেহময়ী মা'র স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় আর সৌভাগ্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে মধুসূদন জীবনের প্রথম তেরটি মধুময় বছর তাঁর জন্মভূমিতেই কাটিয়েছিলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ-সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয়। ছেলে বেলায় তিনি তাঁর মা জাহ্নবী দেবীর কাছে কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ, চণ্ডী প্রভৃতি পড়তেন। এই জিনিষটা তাঁকে তাঁর কবি প্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠবার পথে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল আর ভবিষ্যত জীবনেও তাঁর কাব্য রচনা'কে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছিল।

তের বছর বয়সে ১৮৩৭ খৃঃ মধুসূদন তাঁর মার সঙ্গে কলকাতায় চলে এসে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হলেন, তাঁর বাবা রাজনারায়ণ দত্ত মশায় তখন কলকাতায় ওকালতী করতেন। খিদিরপুরে তাঁর একটা বাড়ী ছিল। মধুসূদন এই সময়ে তাঁর বাবার সঙ্গে যে বাড়ীতে বাস করেছিলেন-খিদিরপুর গার্ডেন রীচ রোডে সে বাড়ী আজও বর্ত্তমান রয়েছে।

হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সকল পরীক্ষায় তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে লাগলেন। এইখানে পড়বার সময় মধুসূদন গৌরদাস বসাক রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে তাঁর নিজ সহপাঠি রূপে পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে, অতি নিম্ন শ্রেণী থেকেই তিনি ইংরাজীতে সুললিত কবিতা আর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। এই কলেজের অধ্যাপক কবি Captain Richardson সাহেব তাঁকে এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এই সময়ে মধুসূদনের আদর্শ ছিলেন Lord Byron. এইকালে তিনি যে সব কবিতা রচনা করেছিলেন তা তার পক্ষে যথেষ্ট গৌরব আর প্রতিভার পরিচায়ক।

কলেজে পড়বার সময় তাঁর আচার ব্যবহারে উৎকট সাহেবীয়ানা প্রকাশ পেতে

লাগল। তার কারণ সেই সময়ে ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে এইটাই একটা ফ্যাসান দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। শেষকালে ১৮৪৩ খৃঃ ১৯ বছর বয়সে মধুসূদন গোপনে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন। অতি অল্প বয়স থেকে তিনি ইংলণ্ডে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। খৃষ্টান হলে পরে যদি তাঁর ইংলণ্ড যাওয়ার পক্ষে সুবিধা হয় এই জন্যই তিনি ধর্ম্ম ত্যাগ করেন।

এই ঘটনার পর তিনি বছর পাঁচেক শিবপুরে Missionaryদের Bishop's Collegeএ ছিলেন আর সেই সময়ে তিনি Greek, Latin, German, French, Italian, Hebrew, প্রভৃতি বিদেশী ভাষা আর Tamil, Telegu, Hindusthani, Persian, Sanskrit প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

১৮৪৮ সালে ২৪ বছর বয়সে মধুসূদন ভাগ্যান্বেষণে মাদ্রাজ যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটি ইংরাজী স্কুলে মাষ্টারী আর সংবাদ পত্রে লেখা আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাহলেও তিনি সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়লেন না। এদিকে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সময় তিনি Captain Lady "রিজিয়া" ও অন্যান্য ইংরাজী কাব্য রচনা করেছিলেন। মাদ্রাজে তাঁর প্রথম বিবাহের বিচ্ছেদ হলে তিনি Henrietta নামে একটী ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই সময় থেকে তাঁদের মধ্যে যে মধুর দাম্পত্য সম্বন্ধ গড়ে উঠল সেটা তাঁদের জীবনের শেষ দিনটি অবধি অমলিন ছিল।

মাদ্রাজে থাকবার সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, কিন্তু তাহলেও তিনি সুলেখক বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর Captain Lady পাঠ

করে Bengal Educational Councilএর Secy. মহামতি বেথুন সাহেব তাঁকে ইংরাজী ভাষায় লেখা ছেড়ে বাঙলা ভাষায় লিখতে অনুরোধ করেন। মান্দ্রাজে থাকবার শেষের দিকে মধুসূদন Spectator নামে একটা ইংরাজী সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও সেখানকার Presidency Collegeএর অধ্যাপক ছিলেন।

৮ বছর মান্দ্রাজে থাকবার পর তিনি ১৮৫৬ সালে যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন তাঁর পিতা ও মাতা দুজনেই মৃত। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি নিজেকে বাঙলা কাব্য রচনা ও ভাষা সংস্কারে নিয়োজিত করলেন এবং Hindu Patriot প্রভৃতি নানা সংবাদ পত্রে লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়াতে Police Courtএর interpreterএর কাজ নিতে তিনি বাধ্য হলেন।

সেই সময়ে বাঙলা ভাষায় অভিনয় করার মত সুরুচিপূর্ণ নাটক ছিল না। কবি, পাঁচালী, যাত্রা, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি নিম্ন শ্রেণীর আমোদ প্রমোদ প্রচলিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি অনেকে তখন বেলগাছিয়া নাট্যশালা নামে একটা স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপন করলেন। তাঁদের অনুরোধে এখানে অভিনীত হবার জন্য মধুসূদন প্রথমে শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ এবং পরে শর্ম্মিষ্ঠা আর পদ্মাবতী নামে দুটি নাটক রচনা করেন। এগুলি সেখানে অনেকদিন ধরে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

এই সময়ে তিনি বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করে "তিলোত্তমা সম্ভব" কাব্য রচনা করেন। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোয়া" ও 'একেই কি বলে সভ্যতা" নামে মধুসূদনের দুটি প্রহসন এর পরে রচিত হয়। এগুলিই বাঙলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রহসন।

মধুসূদনের ৩৭ বছর বয়সে ১৮৬১ খৃঃ 'মেঘনাথ বধ কাব্য' রচনার পর "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" ও "বীরাঙ্গনা কাব্য" আর "কৃষ্ণ কুমারী নাটক" রচিত হয়। এ সময়ে তিনি St. James Lane এ থাকতেন। খিদিরপুর মনসাতলা লেন এবাড়ীর কিছু অংশ এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

১৯৬২ খৃঃ ৩৮ বছর বয়সে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য London যাত্রা করে সেখানকার Gray's June এ ভর্ত্তি হলেন। এর কিছু কাল পরে তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, মধুসূদন তাঁদের সঙ্গে France এর অন্তর্গত ভার্ষাই চলে গেলেন তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে। এই সময়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিলো। যদি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সময়ে প্রচুর পরিমাণে টাকা দিয়ে সাহায্য না করতেন তবে ভবিষ্যতে তাঁর অবস্থা যে কতদূর খারাপ হয়ে পড়ত তা বলা যায় না।

Europeএ থাকবার সময় তিনি ইংরাজীতে সীতা ও সুভদ্রা কাব্যের কিছু অংশ রচনা করেছিলেন। এরপর ৯৮টি স্বরচিত Sonnet নিয়ে 'চতুর্দ্দশপদী' কবিতাবলী নামে একটা সনেট কবিতা সংগ্রহ রচনা করেন। মধুসূদনই বাঙলা সাহিত্যে প্রথম লেখার প্রবর্ত্তন করলেন। এই বইটি রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সমাপ্তি ঘটল।

১৮৬৭ খৃঃ ৪৩ বছর বয়সে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে High Courtএ প্রাকটিস্ করতে সুরু করলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে তিনি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। মধুসূদনের চিত্ত ছিল কবিজনোচিত, আইন ব্যবসায়ীর উপযুক্ত নয়। 'হেক্টর বধ কাব্য', 'নীতিমূলক কবিতাবলী' আর 'মায়া কানন' এই সময়েরই রচনা।

শেষ জীবনে তিনি আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও শারীরিক অসুস্থতায় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলেন, আর খুব ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে অল্পদিনের জন্য তিনি পঞ্চ কোটের রাজার Legal adviser হন তারপর কিছুদিনের জন্য উত্তরপাড়া লাইব্রেরীতে বাস করেন।

১৮৭৩ খৃঃ ২৯শে জুন রবিবার বেলা ২টার সময়—Henrietta'র মৃত্যুর তিন দিন পরে Alipore Presidency General Hospital-এ মধুসূদন তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কবিযশপ্রার্থী মধুসূদন আপনার ভাগ্যান্বেষণ করতে গিয়ে যে জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়েছিলেন মৃত্যু এসে তার শান্তিময় হাত বুলিয়ে দিয়ে সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটলো। বাঙলার শ্রেষ্ঠতম কবিদের একজন যে এভাবে নিঃসম্বল অবস্থায় সাধারণ হাসপাতালে দেহত্যাগ করলেন তা আমাদের মহা কলঙ্কের বিষয়।

মধুসূদন ছিলেন অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন ও প্রতিভাবান কবি। আপনার অমর লেখনী ধারণ করে তিনি বাঙলা ভাষায় অমিত্রাক্ষছন্দের ও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রবর্ত্তন করে যান। অভিনয়োপযোগী ও বিয়োগান্ত বাঙলা নাটক তিনিই প্রথম লিখেছিলেন, তাঁর সাহিত্য রচনা দ্বারা বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এ ঋণ আমরা কখনই শোধ করতে পারব' না।

মধুসূদনের রচনার ভিতর কোমলতা ও কঠোরতার একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়—বীরাঙ্গনা কাব্যই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য সকলের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠতম। আর তাঁর প্রতিভা বিকাশের উর্দ্ধতন সীমারেখা।

তিনি ছিলেন বিরহী কবি। মধুসূদন তাঁর আত্মীয়, বন্ধু, ধর্ম্ম, সমাজ আর তাঁর নিজের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অভিমানের যে দুস্তর সাগর রচনা করেছিলেন তা তিনি নিজে কখনও পার হয়ে যেতে পারেন নি। এই জন্য তিনি বিরহিনী শ্রীরাধিকার কাহিনী অবলম্বন করে বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে মধুময় ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেছিলেন।

তাঁর নিজের জীবন-টা যে পরিশেষে দুঃখময় হবেই, তা তিনি অনেক আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই দৈত্যরাজ রাবণের বিষাদ-মলিন চরিত্র'কে আপনার কাব্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দিয়েছিলেন। মধুসূদন ছিলেন স্বাধীনতার উপাসক। তাই স্বাধীন চেতস্ রাবণকে তিনি অত্যাচার ও দুঃখ জর্জ্জরিত বাঙ্গালী জাতীর ও ভগ্ন-হৃদয় মধুসূদনের প্রতীক-রূপে চিত্রিত করেছিলেন। এই জন্য মেঘনাদ বধ কাব্যে আমরা প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই।

তার নিজের জীবন যে করুণ রসে উছলিত হয়ে উঠেছিল সেই করুণ রসের পরিবেশন করেছিল তার কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

বাইরে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করলেও তিনি অন্তরে ছিলেন একজন খাঁটি হিন্দু।

তার স্বদেশ প্রীতিও উল্লেখযোগ্য। মান্দ্রাজ ও ইউরোপ প্রবাসের সময় মধুসূদন তাঁর জন্মভূমি ছায়াশীতল সাগরদাঁড়ী গ্রাম ও মধুছন্দা কপোতাক্ষ নদকে কখনও ভুলতে পারেন নি।

তিনি ছিলেন নবীনের উপাসক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-কে তিনি আপনার প্রতিভার দ্বারা মিলনের সূত্রে বেঁধে গেছেন। তিনি গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করে যে নূতুন পথ অবলম্বন করেছিলেন তা বাঙলা ভাষাকে গতিশীল আর প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।

শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রতিভাশালী সাহিত্যিকেরা এক সময়ে যা রচনা করে যান যুগে যুগে সেটা সাহিত্য রসিকদের অনুপ্রাণিত করে থাকে। দীর্ঘ এক শতাব্দীরও আগে মধু-কবি যে কাব্য রচনা করে গেছেন তা আজও আমাদের চিত্তকে রসধারায় অভিষিক্ত করেছে—আর ভবিষ্যতে আমাদের বংশধরদের যে রসের সন্ধান দেবে তার তুলনা নেই।

মধুসূদনের আশা সফল হয়েছে। মধু-চক্র রচনা করে গৌড়জন আজ আনন্দে তার কাব্য-সুধা পান করছে—ভবিষ্যতেও করবে।

যৌবনে ভিন্ন পথে চালিত হয়ে মধুসূদনের দুঃখক্লিষ্ট আত্মা লোকোচিত শান্তি লাভ করতে পারে নি। তাঁরই উদ্দেশ্যে আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করে আর তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করে আজ এই সভাতল থেকে বিদায় নিলাম।

ওঁ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

---

* ২৭শে জুন বেতারে পঠিত।

প্রতিষেধক

(গল্প)

শ্রীফেলু চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা সহরে যে কোন সামান্য কারণে যখন পথে লোক জমায়েত হয়ে যায়, তখন ট্রাম গাড়ী থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে লোক ছুটে এসে স্পর্শকে যে ঘিরে ফেলবে, এ আর বেশী কথা কি। ব্যাপারটা ঘটে একখানি ত্রিতল বাড়ীর সম্মুখে। অন্যূন ২৫।৩০ জন তার চতুর্দ্দিকে এসে দাঁড়ায়—কেউ বা সহানুভূতি জানায়, কেউ বা তার কেশ গুচ্ছ রাস্তার কাদায় মাখামাখি দেখে মুখ টিপে হাসে, কেউ বা টিপ্পনী দিয়ে বলে "যাদের অভ্যেস নেই, তাদের অমন গোড়ালী উঁচু জুতো না পরলেই হয়।" স্পর্শের জখমটা কিন্তু যে অতি সামান্য নয়, তা তার মুখ চোখের ভাব ও কাতরানী দেখে বেশ প্রতীয়মান হয়—তার আঘাতটা একটু বেশী লাগে তার বাম পায়ের গুল্ফ সন্ধিতে। বয়স্থা বালিকা বলেই বোধ হয় কেউ সাহস করে না তাকে স্পর্শ করতে। ত্রিতলের শয়নকক্ষ হতে মণি কিন্তু ব্যাপারটা দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাড়াতাড়ি নেমে এসে ভিড় ঠেলে, বালিকার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে "এ কি, আপনি উঠতে পার্চ্ছেন না, ankle টা dislocate হয়নি ত, দেখি, আমার মনে হয় আপনার হাসপাতালে যাওয়া উচিত, কি বলেন?" বালিকাটি মুখটা বিকৃত করে বলে, "আমার অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে, উঠতে পার্চ্ছি না, যাতে ভাল হয় তাই করুণ"—বিলম্ব না করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে তাকে তুলে নিয়ে চলে যায় মণি বেলগেছিয়া হাঁসপাতালে। ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়ে, ঔষধপত্র সঙ্গে নিয়ে সহগমন করে মণি বরাবর তাদের বাড়ী পর্য্যন্ত বালিকার রক্ষকরূপে। বাড়ীটা কিন্তু একটা ছোট্ট গলির মধ্যে অবস্থিত থাকায় সদর রাস্তার উপরই ট্যাক্সিখানা থামাতে হয় তাকে। উপায়ন্তর না দেখে গাড়ী থেকে নেমে, ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে মণি, একরকম ব'লতে কি, কোলে করেই স্পর্শকে অতি কষ্টে তাদের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে আসে। অচেনা এক যুবকের সঙ্গে স্পর্শের ঐ ভাবে আসাটা পাড়ার অনেক লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মণিকে এর জন্য জবাবদিহী করতে হয়।

অপরিচিত হলেও এই মনোরম স্পর্শ তাদের অজ্ঞাতসারে উভয়ের মনের মধ্যেই ভালবাসার প্রবর্ত্তনা সঞ্চারিত করে। অনতি সুন্দরী, অনূঢ়া বালিকা স্বপনেও ধারণা ক'রতে পারে নি, যে তার এই ভাবাবেগপ্রবণ বয়সকালে ওরূপ একজন উন্নতচিত্ত, সুপুরুষ মহান হৃদয় যুবক তার সংস্পর্শে আসতে পারে।

মণির এই সমবেদনা ও অনুকম্পা স্পর্শের পিতামাতার অন্তর এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, তারা তাকে নিজের ছেলের মতই গণ্য করে। এবং তাদেরই কাতর অনুনয় বিনয়ের প্রেরণায় মণিকে যখন তখন তাদের বাড়ী যাতায়াত করতে হয়। এই অবধি অসঙ্কোচ মেলামেশার ফলে মণি ও স্পর্শের মধ্যে এমন একটা অজানা আসক্তি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে যে, একের এক দিনের অদর্শন, অপরের নিকট অসহনীয় হ'য়ে পড়ে। যদিও স্পর্শের মনে হয় যে মণিকে জীবন সঙ্গীরূপে পেলে তার নিজের জীবন ধন্য হবে, সে জানে মণিকে ও 'ভাবে আশা করা তার পক্ষে একটা অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। মণি কিন্তু একরকম স্থির ক'রেই রাখে যে তাদের এই মিলন পথের যদি কেউ কণ্টক হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে দাঁড়াবে তার পিতার অসঙ্গত অত্যধিক দাবী যা মণি বি, এস-সি পাশ করবার পরই তিনি বাড়ীর সকলকেই জানিয়ে রেখেছেন।

মণির অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমেন্দ্র ব্যতীত তাদের এই ব্যাপারটা সকলের কাছেই অজ্ঞাত থাকে। সমাজের কর্ম্মী হিসাবে হেমেন্দ্র মণির পিতার অন্যায় উৎপীড়ন মোটেই সমর্থন ক'রতে না পেরে স্পর্শ ও মণির পবিত্র বন্ধনকার্য্য সমাধার জন্য এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করে। তেজারতি কারবার ও কতকগুলি ভাড়াটে বাড়ীর আয় থেকে ব্যাঙ্কে জমার কসমটা বৃদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে মণির পিতা ধনপ্রিয় বাবুর ধনলিপ্সা উত্তরোত্তর বেড়েই চলে এবং হেমেন যখন স্পর্শের সঙ্গে মণির বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়, তিনি বলেন "সব দিক দিয়ে যখন মিল আছে এ বিবাহে, আমি রাজী আছি, যদি কন্যাপক্ষ দুটী হাজার টাকা পণস্বরূপ দিতে স্বীকৃত হয়।"

(২)

সে দিন সন্ধ্যায় তাদের ক্লাবে এক নৈশ-আহারের আয়োজন করা হয়। সমস্ত কার্য্য শেষ হ'তে মধ্য রাত্রি অতীত হয়ে পড়ে। মাঘের কম্পজনক শৈত্য রজনী। নিশীথের নির্জ্জনতার মাঝে নিদ্রিত

রাজপথে বেড়িয়ে পড়ে মণি তার ওভার-কোটের বোতাম ক'টা লাগিয়ে দিয়ে। দ্রুতপদবিক্ষেপে রাজপথ অতিক্রম ক'রে যখন সে তার বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হয় তখন রাত্র আন্দাজ ২টা হবে। চাকরটা তখন বাহিরের ঘরে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। বাবুর ডাকে ধড়্মড় ক'রে ঘুম থেকে উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে বলে "হেমেন বাবু আপনার কাছে আন্দাজ রাত ৯ টার সময় এসেছিলেন, আধঘণ্টা-টাক বসে থাকবার পরও যখন আপনি এলেন না, তখন তিনি বড়বাবুর সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা ক'য়ে চলে গেলেন আর আমায় বলে গেলেন কাল সকালে তাঁর কাছে আপনাকে পাঠিয়ে দিতে"।

আগ্রহপূর্ণ লোচনে মণি জিজ্ঞাসা করে "তার সঙ্গে আর কেউ ছিল"?

"না বাবু, তিনি একলা এসেছিলেন"। কথাগুলো শুনে মণি একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ে এবং কিছু না ব'লে শয়নকক্ষে গিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর বোতামটা টিপে দিয়ে জামা কাপড় ছেড়ে পরদিন প্রভাতের অপেক্ষায় আরাম কেদারার উপর শরীর-টাকে হেলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। বাড়ীর মধ্যে তখন একটা শান্তিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ ক'রতে থাকে। সবাই সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত. কেবল আমেরিকান ঘড়ীটা ডিং ডং শব্দে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন ক'রতে থাকে। চিন্তাস্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে রজনীর অবশিষ্ট কয়েকটী ঘণ্টার জন্য মণি নিদ্রাদেবীর কথা একেবারে ভুলেই যায়। চিন্তা—হেমেনের অত রাত্রে আসার তাৎপর্য্য, চিন্তা—স্পর্শের কোমল মুখশ্রী, চিন্তা,—তার পিতার অত্যধিক দাবী, যা সংগ্রহ করা স্পর্শের পিতার পক্ষে অসম্ভব। সবগুলো একত্র হ'য়ে তার মনের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রামের সৃষ্টি করে। স্নায়ুমণ্ডলকে দমন ক'রবার উপায়ন্তর না দেখে ধূমপানের মাত্রাটা মণি অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ক'রে দেয় এবং এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট্ শেষ ক'রে ফেলে। সারাটী রজনী এই ভাবে অনিদ্রায় কাটিয়ে অতি প্রত্যুষে সকলের জাগবার বহু পূর্ব্বে হাত মুখ ধুয়ে চলে যায় মণি হেমেনের বাড়ী।

সাহিত্য সেবার জন্য স্বভাবতঃই হেমেন প্রত্যুষে উঠে থাকে—সুতরাং মণি গিয়ে দেখে হেমেন টেবিলের উপর কাগজপত্র বিছিয়ে সাহিত্য দেবীর সঙ্গে মসগুল্ হয়ে আলাপ সুরু করে দিয়েছে। মণিকে দেখে হেমেন্দ্র হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলে "এই যে আমার নায়ক, স্মরণ মাত্রেই উদয় হয়েছ। তোমার অভাবে আমার নক্সা সম্পূর্ণ হচ্ছে না যে"—হেমেন্দ্র দু' পেয়ালা চা পাঠাতে হুকুম করে মণিকে তার সম্মুখে বসিয়ে বলে "আচ্ছা মণি, তোদের মিলনপথের ব্যবধানটা আমি যদি সরিয়ে দিতে পারি, তাহলে কি পুরস্কার তুই আমায় দিতে পারিস্"—

মণি আগ্রহের সহিত মৃদু হেসে বলে "হেমেন! তোকে অদেয় আমার কি আছে, বল্‌ত"?

"আচ্ছা, তা হলে তোর স্বর্গীয় মায়ের নামে শপথ কর্, যে এ বিবাহ সম্পাদনের জন্য আমার উপদেশ অনুযায়ী তুই কাজ করবি"।

"সর্ব্বান্তকরণে, হেমেন সর্ব্বান্তকরণে—তুই বোধহয় জানিস্, যে এ বিবাহ যদি না হয়, তাহলে আমাদের দুজনার জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে"—আবেগ-প্রবণে মণি কথাগুলো বলে ফেলে এবং পরক্ষণেই একটু লজ্জিত হয়ে মাথাটা নামায়।

"শোন্!—কালরাত্রে আমি স্পর্শের বাবা বিনয়বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কই। তারপর তোর বাড়ী যাই। তোর বাবা ২০০০৲ টাকা নগদ ও তাছাড়া অন্যান্য আনুসঙ্গিক চেয়েছেন। বলা বাহুল্য বিনয় বাবুর মত একজন গৃহস্থের পক্ষে অত টাকা জোগাড় করা একেবারে অসম্ভব! অথচ ঐ গুলি সব না দিলে আমি ত তোমাদের বিবাহের কোন আশা দেখি না। সর্ব্ব-সমেত ২৮০০৲ টাকা যদি সংগ্রহ করতে পার, তবেই এ বিবাহ হতে পারে। আমি তোমার বাবার সঙ্গে একরকম পাকাপাকি করে এসেছি। আর টাকার জোগাড় হলে বিনয় বাবুর ত কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। বিনয় বাবুকে আমি বলেছি, আপনি ভাবেন না আমরা

—বেকার নাশন শব্দ বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো—

BEKARNASHAN CROSS WORD COMPETITION BUREAU

বাঙ্গলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা—নং ১।

১১৩বি; প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫০০৲ পুরস্কার ৫০০৲ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার ৩০০৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ১৫০৲ তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম ঃ—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে। অন্য ঘরগুলি যথা নিয়মে থাকিবে।

প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৮

বাংলা ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues পাশাপাশি (**Across**)

১। এ জীবন দুঃসহ।
৩। দেশ।
৪। অনেকের ধারণা এ ভগবানের প্রতীক।
৫। এ সরল নয়।
৭। বিপদে যে এ কাজ করে হিন্দুশাস্ত্র মতে সে পিতা।
৮। মদন যার পতি।
৯। স্ত্রীলোকের বিশেষ প্রিয়।
১২। বোলতার এ বিষাক্ত।
১৩। মহাদেব।
১৫। এ থাকলে সে ভীতু।
১৬। উল্টালে মীমাংসা কঠিন।
১৭। ঠিক করে সাজালে এর জোর না থাকলে ভাল উকিল হওয়া শক্ত।
২০। কর।
২১। বলরাম।
২২। ইন্দ্র এ-পাণি বলা হয়।
২৫। এ বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়।
২৭। এ আহার অকর্ত্তব্য।
২৮। দুর্য্যোধনের মাতুলালয়।
২৯। অভগ্ন নয়।
৩১। উল্টালে গ্রীষ্মকালে এ আরামদায়ক।
৩২। এর বুদ্ধি যে নেয় সে চালাক নয়।
৩৩। ঠিক করে সাজালে এর দায়িত্ব বহন করিতে হয়।

—এইখানে কাটুন—

বেকার নাশন শব্দ-বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো

নভেম্বর সংখ্যা ১৯৩৮। কুপন নং

১ বে	কা	২ র	■	৩ বি		ত	■	৪	জা
	■	৫	৬ প		■	■	৭	ক্ষা	■
৮ র		■		■	৯ অ		ম্	■	১০ বি
■	■	১১ বি	■	১২ অ		■	১৩	ম্ন	ক
১৪	■	১৫	য়	■	১৬ র্ক		■	■	
১৭ য়া	১৮	ব	■	১৯ আ	■	■	২০		■
■	ল	■	২১ ব		■	২২ ব		■	২৩
২৪ ত	■	২৫ ত		■	২৬ তা	■	বাঁ	■	র্ম
২৭	চা	■	২৮ গাঁ			■	২৯	৩০ টাঁ	■
৩১ ন		■	■	৩২	কা	■	৩৩		ত্র

প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম ....

ঠিকানা..

লোকেল রসিদ নং·· ....তারিখ..................

মনিঅর্ডার নং.........পোষ্টেল অর্ডার নং.........

—এইখানে কাটুন—

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues উপর হইতে নীচে (**Down**)

১। এঁর দাম নাই।
২। কাচ।
৩। এ দুশ্চরিত্র।
৪। গালা।
৬। ভাগ্য।
৯। অষ্টপদ পোকা বিশেষ।
১০। এ হলে মাথায় অনেকেই ঔষধ ব্যবহার করেন।
১১। এ নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল হয়।
১৪। এ হৃদয়ের বৃত্তি।
১৮। একে অনেক কষ্ট পেতে হইয়াছে।
১৯। একে অমৃত ফল বলা হয়।
২০। বলবান।
২১। অসত্য।
২৩। এ নিয়ে দ্বন্দ লেগেই আছে।
২৪। অন্ধকারকে বিনাশ করে।
২৬। সূর্য্যের চাইতেও বড়।
৩০। এর স্থান মাথায়।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ।০ আনা। কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিনখানা সমাধানের মূল্য ॥০ আনা। লেখা কাটা ঘসা এবং পেন্সিলে লেখা চলিবে না। মণিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া রাখিবেন। ২৮শে নভেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অন্যথায় অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া নম্বরানুযায়ী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাপ্তাহিক খেয়ালীতে ম্যানেজারের নির্ভুল সমাধান প্রকাশিত হইবে বিস্তারিত নিয়মাবলী ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে পাঠান হয়।

পরলোকে প্রবীণ সাহিত্যসাধক দেবেন্দ্রনাথ বসু

(স্মৃতি চিত্র)

বাগ্‌দেবীর একনিষ্ঠ সাধক, ধর্ম্মপ্রাণ, মনীষী দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আর ইহ-জগতে নাই! কিঞ্চিন্ন্যূন অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি তাঁহার সাধনোচিত দিব্যধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। প্রায় গত বিশ বৎসর ধরিয়া তিনি অজীর্ণ ঘটিত দুশ্চিকিৎস্য রোগ ভোগ করিতেছিলেন ও মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পদদ্বয় অচল হইয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া তুলিয়াছিল। এই অবস্থায় মৃত্যুর প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে নিদারুণ বমন রোগে আক্রান্ত হইয়া, গত চন্দ্রগ্রহণ চূড়ামণি যোগের রাত্রিতে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। দুই দিন এই ভাবে কাটাইয়া গতপূর্ব্ব বুধবার (৯ই নভেম্বর) অপরাহ্ণ ৪-২৮ মিনিটের সময় তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রবাবুর জীবন কথা বড়ই বিচিত্র। সাধারণের নিকট তিনি "ব্যাঙ বাবু" নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। বাগবাজার বসু-পাড়ার বিখ্যাত বসুবংশে তাহার জন্ম। তাঁহার পিতা ৺ গোপীনাথ বসু মহাশয় উচ্চশ্রেণীর রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। আর স্বর্গত নট-নাট্যাচার্য্য-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও দেবেন্দ্রবাবু ছিলেন মামাত পিসতুত ভ্রাতা। দেবেন্দ্রনাথ নটগুরুর নিকটে বাল্যেই সাহিত্যসাধনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনা চলিত অতি সঙ্গোপনে। যৌবনে গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার, দেবেন্দ্রবাবুও তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে উক্ত রঙ্গমঞ্চের কর্ম্মপরিচালনায় সুদীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের রচনার এতদূর অনুরাগী ছিলেন, ও দেবেন্দ্রবাবুর নাট্যচিত্র বা সঙ্গীত রচনা শক্তির উপর তাঁহার এরূপ আস্থা ছিল যে কোন কোন সময় তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকা হেতু স্বয়ং রচনার অবসর না পাইলে দেবেন্দ্রবাবুকেই উক্ত রচনা কার্য্য সমাধা করিতে আদেশ দিতেন। এইরূপে দেবেন্দ্রবাবুর রচিত কোন কোন সঙ্গীত বা নাট্য রচনা গিরিশচন্দ্রের কোন কোন গ্রন্থে স্থান পাইয়া নটগুরুর নিজস্ব রচনা বলিয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে অবশ্য গিরিশচন্দ্রের কোনই অগৌরব হয় নাই; পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতি গিরিশচন্দ্রের রচনাধারার সহিত কতদূর সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল—তাহাই মাত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। এই জন্য গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত হইবার পর তাহার সর্ব্বশেষ অসমাপ্ত গার্হস্থ্য নাটক "গৃহলক্ষ্মী" পূর্ণাঙ্গ করিবার ভার দেবেন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত হইয়াছিল; আর এ গুরুতর দায়িত্বভার দেবেন্দ্র বাবু কিরূপ কৃতিত্বের সহিত বহন করিয়া ছিলেন, বাঙলার নাট্যামোদী জনসাধারণই এ-তাবৎকাল তাহার সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ বসু

মিনার্ভা থিয়েটারের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাশিমবাজারে গমন করেন। কাশিমবাজারের ভূতপূর্ব্ব প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় দেবেন্দ্রবাবুর সহপাঠী ও শৈশব সুহৃদ্ ছিলেন। মহারাজার সেক্রেটারী রূপে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর তিনি রাজদরবার হইতে পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। আর এই সময় হইতেই তাহার সাহিত্যিক-জীবন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন নীরবকর্ম্মী। তিনি কখনও কোন সভা-সমিতিতে প্রকাশ্যে যোগদান করিতেন না। যথার্থ রসসৃষ্টি ব্যতীত অন্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক অথবা অনুবাদ-সৃষ্টিকর প্রবন্ধাদি রচনার ধার দিয়াও চলিতেন না। আত্মপ্রচারের সর্ব্ব-বিধ পন্থা হইতে তিনি আপনাকে সাবধানে

দূরে রাখিতেন। এইজন্য এ যুগের তরুণ সাহিত্যিকগণের অনেকে হয়ত দেবেন্দ্রনাথের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যবয়সের সাহিত্যসেবী, রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যকার, অভিনেতা বা শিল্পী এমন অতি অল্পই ছিলেন বা আছেন যিনি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আসিয়া তাঁহার সহিত নানারূপ আলোচনা না করিতেন। এই সকল গুণিজন সম্মেলনে দেবেন্দ্রবাবুর গৃহ তৎকালে প্রায় প্রতিনিয়তই রীতিমত সরগরম থাকিত। স্বর্গত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, স্বর্গত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত জলধর সেন (ইনি দেবেন্দ্রবাবু অপেক্ষা কয়েক মাসের বয়োজ্যেষ্ঠ), শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, স্বর্গত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, স্বর্গত স্বামী অখণ্ডানন্দ, অধ্যাপক আশুতোষ মিত্র, অধ্যাপক বিপিনবিহারী সেন, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, স্বর্গত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বহুবার তাঁহার গৃহে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছে।

দেবেন্দ্রবাবু বহু অখ্যাত কবিযশঃপ্রার্থীকে প্রবন্ধ উপন্যাস কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেন। এ বিষয়ে তিনি এরূপ উদার ও মুক্তহস্ত ছিলেন যে, তাঁহার স্বনামে প্রচারিত গ্রন্থসমূহ অপেক্ষা পরের নামে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অল্প হইবে না। তাঁহার রচিত গ্রন্থ নিজ নামে প্রকাশ করিয়া আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যাও বর্ত্তমানে নিতান্ত অল্প নহে।

পরিণত জীবনে তিনি বহু নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় প্রথমেই কিশোর তনয় ও বিবাহযোগ্যা দুহিতার অকালবিয়োগ বেদনা, তারপর সন্তানশোকতাপিতা পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণীর লোকান্তর, উপার্জ্জন-ক্ষম উপযুক্ত যুবক পুত্রের অতর্কিত মৃত্যু। সুদিনে-দুর্দ্দিনে অনন্যনির্ভর, শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আত্মজ হইতেও প্রীতিভাজন ভাগিনেয়ের পরলোক, ও সর্ব্বশেষে নিরতিশয় স্নেহপাত্রী ভ্রাতুষ্পৌত্রীর শোচনীয় মৃত্যুতে বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ জরজর হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকল প্রবল শোক ও দীর্ঘব্যাপী দুরারোগ্য রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য দেবেন্দ্রবাবু অন্তরে তাঁহার ইষ্ট পরমহংসদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন; আর তাঁহার বাহিরের অবলম্বন ছিল বাণীর চরণসরোজ। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি এই দুইটি আশ্রয়ের কোনটি হইতেই বিচ্যুত হন নাই—ইহাই পরম সান্ত্বনা। জীবদ্দশায় তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ কৃপালাভে ধন্য হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালেও তাঁহারই চিত্রপটের চরণপ্রান্তে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া সজ্ঞানে ইষ্টনাম শ্রবণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি যে জীবনে পরম শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্বভাবতঃ শান্ত সৌম্য সহাস বদন যিনি বারেকের তরেও দেখিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সুকঠিন রোগও ক্রমবিবর্দ্ধমান জরার আক্রমণ, মর্ম্মভেদী শোক, গুণরাশিনাশী নিদারুণ অর্থাভাব—কিছুই ক্ষণিকের তরেও তাঁহার সদা প্রফুল্ল বদনের স্নিগ্ধ কান্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই। সে উন্নত প্রশস্ত ললাট কোনদিনই দুশ্চিন্তার কুটিলরেখাপাতে কলুষিত হয় নাই—আয়ত বিশাল সমুজ্জল নয়নদ্বয়ে প্রতিভার দীপ্তি চির অনির্ব্বাণ ছিল। সেদিন মৃত্যুর পরেও অর্দ্ধস্তিমিত নয়নদ্বার দিয়া সেই প্রশান্ত জ্যোতিই মৃদুভাবে বিচ্ছুরিত হইতেছিল, মৃত্যুর কঠিন হিম-

শীতল স্পর্শেও উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেবেন্দ্রবাবুকে এই অতি পরিণত বয়সে "গিরিশ লেক্‌চারার" নিযুক্ত করিয়া পর্য্যাপ্ত বিচারশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রবাবু যখন একদিকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও নিদারুণ অর্থাভাবে বিভ্রান্তপ্রায়—ওদিকে একমাত্র পৌত্রী চক্ষুর সমক্ষে 'মুমূর্ষু'—সেই সময় তাঁহার উপর এই গুরুভার আসিয়া পড়িল। অথচ গিরিশচন্দ্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাহেতু তিনি এ আহ্বান উপেক্ষাও করিতে পারিলেন না। তখন তিনি উঠিয়া বসিতে পারেন না। চিৎ হইয়া শুইয়া পেটের উপর বালিস রাখিয়া তাহার উপর খাতা পাতিয়া কোনরূপে ধীরে ধীরে স্বহস্তে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপর তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি মুখে বলিয়া যাইবেন আর অন্যে তাহা লিখিয়া লইবে—ইহা কদাচ তাঁহার মনঃপূত হইত না। গত সেপ্টেম্বরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের উপযোগী করিয়া দুইটি বক্তৃতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—এবং যথানিয়মে উহা পঠিতও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেবেন্দ্রবাবুর নিজের মোটেই মনঃপূত হয় নাই। গ্রন্থাকারে ছাপিতে দিবার জন্য পঠিত প্রবন্ধ দুইটিকে তিনি পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। এমন সময় সহসা মহাকালের অনুপেক্ষণীয় আহ্বান আসিল। কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। আশা করি, তাঁহার অসমাপ্ত প্রবন্ধখানাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অচিরে প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান "শ্রীকৃষ্ণ" চম্পূকাব্য। বাঙলায় চম্পূরচনায় এই প্রথম নিদর্শন। পঞ্চশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবিরাট গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে "ক্ল্যাসিক" রচনার শ্রেণীভুক্ত হইবার অধিকারী। সর্ব্ববিধ ভাব-রস-স্ফুর্ত্তিতে, ছন্দে-গানে চরিত্র চিত্রণে, অপরূপ ভাষাচ্ছটায় ও ভক্তিমাধুরী স্ফুরণে যেন উহা সেই চিরকিশোর শ্যামসুন্দর নন্দনন্দনের মধুর মুরলীতানের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকমল, বঙ্কিমচন্দ্র ও (প্রাচীন সাহিত্য রচয়িতা) রবীন্দ্রনাথের রচনা ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শনই ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে না।

দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনার অন্যান্য ফল স্বরূপে—বাসিফুল, বরমাল্য, চঞ্চরীকা, ওথেলো ও এনটনী-ক্লিওপাট্রার অনুবাদ, সীমন্তিনী, গোপালের মা, কুহকী, বেজায় আওয়াজ, পরমহংসদেব ও স্বামী সারদানন্দ, শকুন্তলায় নাট্যকলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরস ও করুণ ছোট গল্প রচনায়, ভৌতিক কাহিনীর রোমাঞ্চকর বর্ণনায়, নির্ম্মল শিশুসাহিত্য সংগঠনে, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক চিত্রের মনোরম উপন্যাসে, নাটকীয় ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনায় ও নির্দ্দোষ ভাবশুদ্ধ কবিতা বন্ধনে তাহার অনন্য সাধারণ অধিকার ছিল। তাহার এরূপ ভাবান্তর রচনা যে এ যাবৎকাল কত বাঙলা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার কয়েকটি নাট্যরচনা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ও বেতারের আসরে ভূয়সী প্রশংসার সহিত বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

ব্যবহারিক জীবনে দেবেন্দ্রবাবুর ন্যায় সদালাপী, পরিহাস-রসিক, সহৃদয়, অমায়িক ভদ্রলোক অতিঅল্পই দেখা যাইত। কখন কোন কারণে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তিনি কোন ব্যক্তির অন্তরে আঘাত দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে "তাহার মৃত্যুতে সেকাল ও একাল দুইযুগের সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সংযোগ-স্বর্ণসেতু ভাঙ্গিয়া পড়িল"।

দেবেন্দ্রনাথের জীবন আদর্শ সাহিত্য-সাধকের জীবন। তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু অন্যতম আদর্শ বিলোপ হেতু বাঙলা সাহিত্যজগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, তাহার জন্য বাঙলার সাহিত্য সেবী মাত্রেরই অশ্রুপুষ্পাঞ্জলিদানে তাহার স্মৃতির অর্চ্চনা করা উচিত। প্রার্থনা করি—তাহার দীর্ঘসাধনপূত নিষ্কলুষ আত্মা শান্তিময় লোক হইতে আমাদিগকে গন্তব্য পথ প্রদর্শন করুক। শান্তিঃ। শান্তিঃ॥ শান্তিঃ॥।

গান

শ্যামসুন্দরী

দিনের আলো ঘুমিয়ে ঝরে পড়ে সাঁঝের বুকে
মধুর হাসি গভীর সুখে ফোটে তারার মুখে।

* * *

কয় সে কথা চাঁদের সনে
মুক্তা ঝরে আঁধার বনে;
শিউলি-চোখে অশ্রু ঝরে কোন্ সে
গোপন সুখে॥

* * *

জোছনা ধারা মগ্ন রহে নীরব নিঝুম রাতে,
শুকতারা তার বিদায় লেখা আঁকে
কমল পাতে।

* * *

চাঁদের আলো তারার মালা
শিউলি হাসি ভুবন আলা
শিশির সনে অরুণ আলোয় ঝরে
উষার বুকে॥

—:•:—

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টসের "একলব্য" চিত্রের একটি দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলী, রেণুকা রায় ও আরো অনেকে। ছবিখানি

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৮

ভবানীপুর ক্লাব

কলিকাতার ক্রীড়া জগতে যে সমস্ত ক্লাব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে ভবানীপুর ক্লাব তাহার অন্যতম। ভবানীপুর ইম্পিরিয়াল ও ভবানীপুর স্পোর্টিং সম্মিলিত হইয়া ভবানীপুর ক্লাবে পরিণত হইবার পর হইতেই যিনি অকুণ্ঠ অর্থব্যয়ে ও অননুকরণীয় প্রযত্নে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন এই মাসের প্রথমে সেই শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মিত্রের আকস্মিক পদত্যাগে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের উদয় হইয়াছে। প্রকাশ যে উপদলগত ষড়যন্ত্রে উত্যক্ত হইয়া নলিনীবাবু পদত্যাগ করিবার পর তাঁহার বিরোধীদল মিঃ বি, এন, সরকারকে সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত করেন। অবশ্য অদ্যাবধি মিঃ সরকার ঐ পদগ্রহণে সম্মতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে ঐ পদগ্রহণ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষ নিউ থিয়েটার্সের আপিস চষিয়া ফেলিতেছেন। বাংলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠতম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসাবে মিঃ সরকারের অবসর অতি বিরল। তাঁহার পক্ষে ভবানীপুর ক্লাবের দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য সময় দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়—তিনি কোন বিষয়েই দৃষ্টি দিতে পারিবেন না মনে করা অসমীচিন নয়। তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণে সম্মত করার গুপ্ত অভিসন্ধি এই যে তাঁহার নামের অন্তরালে কতিপয় ব্যক্তি ভবানীপুর ক্লাবের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন। আর মিঃ সরকারের অর্থ-স্বাচ্ছল্যের প্রতিও যে তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি আছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। মিঃ সরকার অর্থ-সাহায্য করিয়া ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন—ইহাতে সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁহার ন্যায় নির্ব্বিরোধী সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে খণ্ডদলীয় চক্রান্তকারীদের শিখণ্ডীরূপে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে—বিশেষতঃ যখন তাঁহার অবসর এত অল্প এবং তাঁহার পক্ষে ক্লাবের কোন বিষয়েই দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হইবে না। আমরা আশাকরি মিঃ সরকার বিভ্রান্ত হইয়া এই পদ গ্রহণ করিয়া চক্রান্তকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হইবেন না।

ভবানীপুর ক্লাবের প্রাণ-স্বরূপ নলিনীবাবুর বিরুদ্ধে যে খণ্ডদল গজাইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও ক্লাব-পরিচালনার শক্তি আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ধূমাগ্নি যাহা কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই নলিনীবাবুর সহৃদয়তার সুযোগ লইয়া আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে বর্ত্তমান অবস্থায় মিঃ বি, সি, ঘোষও সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির সহযোগিতা বিচ্যুত হইয়া ভবানীপুর ক্লাব অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে কিনা তাহাও ঘোর সন্দেহের বিষয়।

কলিকাতার বিশেষতঃ ভবানীপুরের ক্রীড়ামোদীগণের আশু কর্ত্তব্য এই যে, এই জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটীকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করা। বারান্তরে আমরা ভবানীপুর ক্লাবের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া সকলের দৃষ্টি আরও বিশদভাবে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে আমরা আশা করিতে পারি কি যে, বিবদমান দলদুটীর মধ্যে এক সন্তোষজনক মীমাংসা সংসাধিত হইবে? মিঃ সরকার স্বয়ং এ বিষয়ে অবহিত হইলে এক সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন নহে।
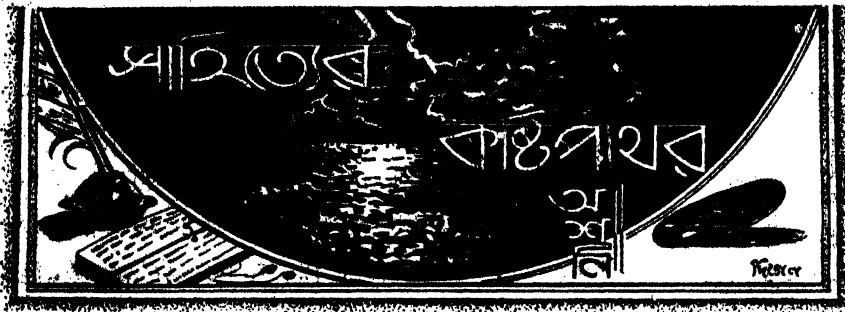
এই বিভীষণটি কে?

বৈশাখ ১৩৩৬ সালের "মহাকাল" পত্র এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন :—"মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণে বিভীষণকে অমর ক'রে রেখে গেছেন একথা বোধহয় কাউকে নূতন ক'রে বলে দিতে হবে না। তাই আমাদের দেশে যুগে যুগে বিভীষণ প্রকট হ'য়ে উঠেছেন। এই সেদিনও মির্জ্জাফর জন্মে গেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি একটি মির্জ্জাফর লুকিয়ে আছেন, আপনারা বোধহয় জানেন না। এই লোকটির একটু পরিচয় নিচে দিলাম।"

"ইনি প্রথমে ৭৫৲ কি ১০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর কলেজে চাকরী নেন। তারপর আশুবাবুর বাড়ীতে বছর খানেক ধর্ণা দেবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চাকরী পান। চতুর লোক! —রমা প্রসাদ মুখুয্যে এবং প্রমথ বাঁড়ুয্যের হাতে পায়ে ধ'রে একটু একটু করে আশুতোষের নেক নজরে পড়বার সুযোগ ক'রে নেন। তারপর স্যার আশুতোষ রমাপ্রসাদ এবং প্রমথবাবুর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তি আদায় ক'রে বিলাত যাত্রা করেন, এবং সেখান থেকে ফিরে স্যার আশুতোষের কৃপায় এবং রমাপ্রসাদবাবু, প্রমথবাবু প্রভৃতির চেষ্টায় দিব্যি হোমরা চোমরা [illegible] হোয়ে ওঠেন। তখন আর পায় কে? —রমাপ্রসাদবাবু প্রমথ বাবু প্রভৃতিকে চিনতেই পারেন না এমনি ভাবটা। শুধু তাই নয়—রমাপ্রসাদ বাবু এবং প্রমথবাবুর চাকরী খাবার জন্যে এই মহানুভবটি যে কি প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন তার ইতিহাস এত দীর্ঘ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তা দিয়ে একটি মহাকাব্য রচনা হ'তে পারে। মহাকবি বাল্মীকি আজ বেঁচে থাকলে এই অপূর্ব্ব জীবটিকেও বোধহয় অমর ক'রে রেখে দিয়ে যেতেন। তবে ভরসা এইটুকু যে রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত এবং হয়ত বা শেষ বয়সে একটা মহাকাব্য রচনা ক'রে দয়া ক'রে এই বিনীত সুনীতিরও মহাত্মাটিকে অমর করে রেখে দিয়ে যাবেন।"

কানাঘুষায় শোনা যায়, এই লোকটির জন্মদাতা জনকও নাকি বন্ধু মহলে তাঁহার এই স্বনামধন্য রত্নটির জন্য দুঃখ করিয়া থাকেন। অবশ্য পিতা এবং পুত্রের "চালা ও চুলা" বহুদিন হইতেই ভিন্ন—একজন থাকেন সহরের উত্তরে একজন থাকেন দক্ষিণে। তথাপি এত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও এই বিভিষণটিকে এখনও অনেকেই খোলাখুলি ধরিতে পারিতেছেন না। বোধকরি ইনি, একাধারে বিভিষণ ও মেঘনাথ এবং তাহার উপর ছায়া স্বন্দের ন্যায় ছায়ায় কায়া ঢাকিয়া থাকেন। তাই একটু বিলম্ব হইতেছে।

• • •

মুদ্রাকর-প্রমাদ :—

সজনীকান্ত যে এককালে উদরান্নের জন্য "প্রবাসী" পত্রিকার মুদ্রাকর ছিলেন তাহা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছেন না। প্রবাসীর বৃদ্ধ সম্পাদককে যখন তখন কামড়াইবার চেষ্টার দ্বারা সেই মুদ্রাকর-প্রমাদ প্রতিপদে প্রকট হইয়া পড়িতেছে। শরৎচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে শনির দলের নিকট হইতে উপেক্ষা ও অবজ্ঞাই লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইহারা শরৎচন্দ্রের হইয়া ওকালতির দানসাগর করিতেছে। চারু বন্দোপাধ্যায়ের উপর মুদ্রাকর জীবন হইতেই শনির দৃষ্টি। কাজেই যেই চারু বন্দ্যো "শরৎস্মৃতি" প্রবাসীতে ছাপাইয়াছেন, আর যায় কোথায়? মুখস্থ শরৎ ভক্তির মুখোস পরিয়া ভূতপূর্ব্ব প্রবাসীর মুদ্রাকর চারু বন্দ্যো রামানন্দ এবং তস্য পুত্রদের প্রতি পুরাতন ঝাল ঝাড়িয়াছেন এবং শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন কাহিনীর অংশ বিশেষ যাহাতে আরও একবার লোকলোচনে পতিত হইয়া শরৎ তর্পণ ভাল করিয়া সম্পন্ন হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। কার্ত্তিকের শনির চিঠি লিখিয়াছে "প্রবাসী পত্রিকার চিত্রদ্বারা অথবা প্রবাসী আপিসে গুণী সমাবেশের দ্বারা 'গ্র্যাপশটে'র প্রত্যক্ষ demonstration দেখাইতে পারিলে অনেক বেশী সুবিধা হইত। শরৎচন্দ্র জীবনে আরও যাহা যাহা করিয়াছেন তাহার সচিত্র বর্ণনা দিবার লোভ প্রবাসী বহুকষ্টে সম্বরণ করিয়াছেন, মনে হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের পুত্রেরা সৌভাগ্যক্রমে বড় হইয়া 'গ্র্যাপশট' প্রলোভনের ঊর্দ্ধে গিয়াছেন কিন্তু প্রবাসীর পাঠকদের সকলের সে সৌভাগ্য হয় নাই।" ইহাতে শরৎ-ভক্তির মুখোস পরিয়া যে [illegible] শরৎ [illegible] -চিত্রের [illegible] হইয়াছে তাহার নিকট শরৎ [illegible]

"সচিত্র বর্ণনা"ও লজ্জায় মরিয়া যাইত সন্দেহ নাই। ইহারা চারুচন্দ্রের "শরৎ-স্মৃতি"কে "শরৎচন্দ্রের পক্ষে পোষাকুকুরের চুম্বন" তুল্য "মারাত্মক" বলিয়া সংশিক্ষা ও সুরুচির পরিচয় দিয়াছে কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের আঁস্তাকুড়ে প্রভুভক্তটি যে অবাধে দাঁত খিচাইতেছে তাহাও ত ভুলিবার কথা নহে। শরৎ সংগৃহীত এবং দৈবদুর্ব্বিপাকে নষ্ট হাজার পতিতার জীবন কাহিনী "প্রবাসী প্রেসে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত নিশ্চয়ই" না, কারণ এখনও শনিরঞ্জন প্রেস বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং হাজার হৌক রামানন্দবাবু পূর্ব্বের ভৃত্যবাৎসল্য ভুলিতে পারিতেন না। ইংরাজীতে 'মুদ্রাকর প্রমাদ'কে যে Printers' Devil" বলে তাহার যথার্থ এতদিনে উপলব্ধি হইতেছে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাচি ফেরৎ শনির অন্যতম স্যাঙাৎ এখনও নির্ব্বিবাদে মন যোগাইয়া প্রবাসী আফিসে চাকরী করিতেছে!

ভেঁড়ার শিং ও হীরা

বঙ্কিম শত বার্ষিকীর জের এখনও চলিতেছে, তথাপি ইহার মধ্যেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক বহু ঢক্কা নিনাদিত বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পাদনের আওয়াজ ঢ্যাবঢেবে হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যাইতেছে। যাঁহারা এককালীন টাকা জমা দিয়া এই সিরিজের গ্রাহক হইয়াছেন. তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। দুই চারিখানি পুস্তক কোন রকমে এযাবৎ কাল বাহির হইয়াছে বলিয়া জনরব কিন্তু কাগজে কাগজে সেই বিজ্ঞাপন হল্লোড় সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।" ইহা কি তাহাই? পরিষদের হীরেন্দ্রবাবু কি বলেন? ব্রজেন্দ্র-সজনী সম্পাদিত "বঙ্কিম জীবনের [illegible] কি হইল? এই [illegible] কাগজ খানাতে বহুদিন [illegible] নাই। এদিকে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ [illegible] মহাশয় শচীশ চট্টোঃর নিকট হইতে বঙ্কিম জীবনী সম্পর্কিত সমস্ত [illegible] হস্তগত করিয়াছেন এবং তিনি ঐ সকল মাল মসলা ভবিষ্যতে ব্যবহার করিবেন, তিনিই আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন বলিয়া সংবাদ পত্রে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবু নাকি ঐ সকল মাল মসলা অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সুবৃহৎ জীবনী পুস্তক রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। পরিষদ মন্দিরে বা শনির তাঁবুতে বঙ্কিম-সাহিত্য প্রকাশের পূর্ব্বেকার সেই অর্থপূর্ণ উদ্দপনার অভাব অনেককেই শঙ্কা ও চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। একটু ঘোমটা খুলিলে ভাল হয় না কি?

(বিলাসী)

রূপোর ঝুমকো

প্রযোজক—ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস।

কাহিনী—গোবিন্দ ব্যানার্জ্জি

পরিচালনা—জ্যোতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র শিল্পী - বীরেন দে

শব্দযন্ত্রী—এন্, পাল, এম এস-সি ও বি, ঘোষ, এম-এস-সি

সুর-শিল্পী—সত্যেন দাস

চরিত্র - ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কার্ত্তিক দে, ফণী বিদ্যাবিনোদ, সত্য মুখার্জ্জি, নীলু রায়, কমলা, পারুল ইত্যাদি—

প্রথম মুক্তি—শ্রী, ১৯শে নভেম্বর।

পরিবেশক—মতিমহল থিয়েটার্স লিঃ

ওরিয়েণ্টাল্ কিনেটোন আর্টসের এইই প্রথম ছবি। সকল রকমে হাস্যরসাত্মক ক'রবার প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু এক মন্মথের ভূমিকা ছাড়া কোথায়ও সে উদ্যম সফল হ'তে পেরেছে বলে আমাদের মনে হয় না। ছবিটি পুরোপুরি লম্বা নয়, মাত্র ৭৮ রীল তাও অনেক জায়গায় আমাদের অবান্তর ও সস্তা প্যাচের পায়তাড়া বলে মনে হচ্ছিল। বেশীরভাগ দোষই আমাদের মনে হয় গল্প রচয়িতার জন্য, তারপর "কথাশিল্পী"র জন্য। গল্পের গতি অনেক জায়গায় খাপ-ছাড়া। এমন শূন্য মরুভূমে প্রাসাদ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় এরূপ হ'য়েই থাকে, আখ্যানভাগ একেবারে কাচা হাতের পরিচয় দিচ্ছে, সামান্য রূপোর ঝুমকোর জন্য এক কাব্য-বাতিকগ্রস্ত মন্মথ-জর্জ্জরিত নায়কের সমাবেশ আজিকালকার যুগে বরদাস্ত করা অনেকের পক্ষে শক্ত। ঝুমকো নিয়ে এত কাণ্ড করাও ঐরূপই বেমানান হয়েছে, কথাবার্ত্তাও তেমন উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিল না। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ছবিই করেছেন কিন্তু এ-বয়সে, এক বাল-খিল্য কথা ও কাহিনী নিয়ে স্বেচ্ছায় নাস্তানাবুদ হবেন আমরা আশা করিনি—তবে এক বলতে পারেন অভাবের তাড়নায়। অবশ্য সে বিষয় আমাদের ব'লবার কিছু নেই।

নায়ক ধীরাজ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলেছি একটা বেখাপ্পা বিদঘুটে চরিত্র তাতে রসসৃষ্টি অসম্ভব। নায়িকা বা নায়িকাদ্বয় কোন রূপ চলনসই। নীলু রায় চেহারার জোরে চলতে চাইছিলেন কিন্তু এখনও অভিনয় বহুদূরে। ফণী বিদ্যাবিনোদ অর্থহীন অভিনয় ক'রেছেন। সত্য মুখার্জ্জির খানিকটা কৌতুকময় অভিনয় ছাড়া অন্যান্য অংশ আমাদের মনে রেখাপাত ক'রতে পারে নি।

সঙ্গীতাংশ মন্দ-নার পর্য্যায়ে তবে গায়িকারা তেমন কিছু সুবিধে করতে পারেন নি। শব্দানুলেখন ভালই। দৃশ্যসজ্জা মোটের ওপর ভাল। আলোকচিত্র মাঝা-মাঝি একরকম হয়েছিল কিন্তু প্রথম কপিতে ২।১ রীলে রসায়নাগারের কাজ খারাপ হওয়ায় আলোক চিত্র খারাপ দেখাচ্ছিল তবে শুনলাম পরে নূতন কপি দিয়ে সে দোষ সেরে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদনা তেমন সুবিধের হয় নি। ২।১টা বড় গোছের ভুলও চোখে পড়ল্। ছবি খানায় যেরূপ অর্থব্যয় হ'য়েছে বলে শোনা যায় তাতে বোধ হয় একখানা ভাল full length ছবি হ'ত। যাক এর সঙ্গে একখানা ছোট ও ছোটর মধ্যে যতদূত সম্ভব সুন্দর পৌরাণিক ছবি একলব্য জুড়ে দিয়ে দুরকম দর্শককে পরিতৃপ্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

একলব্য

প্রযোজক ও নির্ম্মাতা—ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের পক্ষ হতে শ্রীযুক্ত পান্নালাল পাঠক।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোক চিত্রশিল্পী - বীরেন দে

শব্দশিল্পী—অবনী চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরশিল্পী—ধীরেন দাস

নৃত্যশিল্পী—কুমার মিত্র

দৃশ্য সজ্জা—বটকৃষ্ণ সেন

উদ্বোধন—'শ্রী' চিত্রগৃহে ১৯শে নভেম্বর শনিবার।

কুশীলবগণ—একলব্যের ভূমিকায়—জহর গাঙ্গুলী, দ্রোণ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্জ্জুন—ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য। বিপাশা—রেণুকা রায় প্রভৃতি।

এই পৌরাণিক আখ্যানটি সমস্ত ডাল-পালা বাদ দিয়ে ৫।৬ রীলে দেখান হয়েছে। তবে গল্প সরল হয়েছে অনেক স্থান বেশ উপভোগ্য হয়েছে কিন্তু ছোট করতে গিয়ে অনেকটা পাতাহীন নেহাৎ ছোট শিমুলগাছের মত দেখাচ্ছিল। তবুও বাচন-ভঙ্গী, দৃশ্য-সজ্জা, সাধারণ অভিনয় বিশেষতঃ রেণুকার অভিনয়, ব্যাধনৃত্য প্রভৃতি নানা উপভোগ্য উপাদান থাকায় ছবিখানি রূপোর ঝুমকোর চেয়ে উপভোগ্য হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়। পরিচালকের নিপুণ ও কোমল স্পর্শের আভাষ দুই এক জায়গায় পেয়েছি।

অভিনয়ে কঠোর প্রকৃতি অর্জ্জুন গত চিত্ত দ্রোণের অভিনয় খুব ভাল না ফুটলেও মন্দ হয় নি। একলব্যও পৌরাণিক ছবি হিসেবে মন্দ হয় নি। শ্রীমতী রেণুকে আমরা এই প্রথম গান গাইতে শুনলাম, চেষ্টা করলে আরও উন্নতি করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ব্যাধ নৃত্যগুলি বেশ জমিয়েছে এজন্য নৃত্যশিল্পী কুমার মিত্র প্রসংশা পেতে পারেন।

আলোক চিত্র পরিস্কার, ঝর ঝরে। শব্দগ্রহন স্পষ্ট হলেও back ground voice আছে, সম্পাদনা মন্দ নয়।

সাপুড়ে

দু' নম্বর ষ্টুডিওতে দেবকীবাবু ও ছোটাই বাবুর সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পর্ব্ব নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হ'য়েচে। শুনচি পুরুষ-

"বড়দিদি" চিত্রে মলিনা, ছবি, নিভাননী ও নির্ম্মল ব্যানার্জ্জি।

বেশী 'চন্দনা'-কে নিয়ে ওস্তাদ জহর কিঞ্চিৎ বিভ্রাটে পড়েচে। ওস্তাদ নিজেই জানে, স্ত্রী লোকের সংস্পর্শে এলে তাদের প্রতি শ্রুতি থেকে পদস্খলন ঘটে এবং তার পরিণামে কোন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই নাকি সাপুড়ের শাস্ত্রে লেখা নেই। এখন এই ফ্যাসাদ থেকে ওস্তাদজী রক্ষা পেলেই বাঁচি!

ওস্তাদ ও চন্দনাকে নিয়ে আজকাল আবার শুনচি বেদে-পল্লীতে নানা কথা রটতে সুরু হয়েচে। শেষকালে শ্রীমতী চন্দনার ছদ্মবেশের জুরি-জুরি ফাঁস হ'য়ে গেল না কী?

কে জানে বেচারী ওস্তাদের অদৃষ্টে কী আছে?

আজকাল সুন্দরী কানন দেবীর সঙ্গে মঞ্চ ও চিত্র-জগতের Confirmed মহর্ষি নামে পরিচিত, সুবিখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মশাইকে হামেশাই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। শুনচি নাকি সর্প-যজ্ঞের এরা দুজনাই মূল অধিনায়ক ও অধিনায়িকা।

কর্ম্মকর্ত্তা ছোটাইবাবুর সঙ্গে কোট-প্যাণ্টুন আর দেবকী বাবুর গলা থেকে কান পর্য্যন্ত কমফার্টার জড়ানো। ওদিকে আবার শুনি রাইচাঁদের কথায় কথায় মান অভিমান!

কর্ম্মকর্ত্তা মশাই একা ক'দিক সামলাবেন?

বড়দিদি

আজকাল পরিচালক অমর মল্লিক মশাইয়ের মন দেখচি কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত। শুনলাম নাকী টলিউডের মমতা সাময়িক ভাবে কাটিয়ে গত হপ্তায় ইনি সদলবলে

ব্যারাকপুর অঞ্চল তোলপাড় কোরে তুলেছিলেন।

মস্ত ভাবনায় পড়েছেন মল্লিক মশাই, বেচারী পাহাড়ীকে নিয়ে। মোসাহেবের দল চায়, এই গোবেচারা রাঘব-বোয়াল জমিদার বাবুটির মাথায়, সুযোগ বুঝে কিঞ্চিৎ হাত বুলিয়ে নেবেন।

কিন্তু 'বাঘ' ছেড়ে মল্লিক মশাই সময় মত খবর পেয়ে ব্যারাকপুরের বাগান বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতীকে।

তনুজম—ইনিই 'শান্তি'; জমিদার সুরেনের সহধর্ম্মিনী। সেই বাগান বাড়ীতে যে প্রহসনের সূচনা হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমতী শান্তির আবির্ভাবে তার কী মর্ম্মান্তিক পরিণাম ঘটে সে কাহিনী আপনাদের আর একদিন জানাব। আপাততঃ শুধু শুনে রাখুন - শ্রীমতী শান্তি তার স্বামীকে সুস্থ দেহে, সুস্থ মনে জুড়ী গাড়ী চড়িয়ে মোসাহেব ও বাইজীর কবল থেকে বাড়ী ফিরিয়ে এনেচে।

শান্তির হাতের 'নোয়া' আর সিঁথের সিঁদুর শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাক। মল্লিক মশাইয়ের মুষ্টিযোগ বিফলে যাবে না।

কপালকুণ্ডলা

ত্বরিৎকর্ম্মা-প্রথিতযশা পরিচালক ফণি মজুমদার অপরূপ চিত্রনাট্য গঠন করে সদলবলে তাঁর পুরাণ ইউনিট নিয়েই 'কপালকুণ্ডলা'র হিন্দী সংস্করণ চিত্রগঠন কার্য্যে হাত দিয়েছেন। তাঁর মত সুবিখ্যাত চিত্রনাট্য লেখকের পরিচালনায় ভারতবর্ষ আর একখানি সৌন্দর্য্যসম্ভারে উদ্ভাসিত চিত্র দেখতে পাবেন এ আশা যে কোন চিত্রামোদীই করতে পারেন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের কয়েকটি অভিনয় কলাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠালব্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রী এই ছবিতেই অভিনয় করে ছবির গৌরব বর্দ্ধন করছেন। সুপুরুষ, চলচ্চিত্রের সৌন্দর্য্যের আইডল নাজাম সেজেছেন নবকুমার আর সুন্দরী শ্রীমতী লীলা দেশাই, সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল-রূপে রূপসী—রাশীকৃত আগুলফ লম্বিত কুঞ্চিত কেশভার মস্তকে, জেনেট গেনরের আয়ত চক্ষুর নিষ্পাপ দৃষ্টিতে অসাধারণ কায়িক কারুশিল্পের যৌবন-শ্রীতে, অভিনয়ের বর্ণনাতীত বাচন ভঙ্গিমাতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কন্যা কপালকুণ্ডলার রূপ পরিগ্রহণ করেই এ ছবিতেই অবতরণ করেছেন। সুপরিচিতা প্রদীপ্ত ভঙ্গিমার অধিকারিণী শ্রীমতী কমলেশকুমারী সেজেছেন মতিবিবি। এই ছবিতেই একটি বিশিষ্ট চরিত্রে বাঙলার চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক পঙ্কজ মল্লিক নামবেন। এ ছাড়াও বহু নাম করা অভিনেতা অভিনেত্রীদের এতেই দেখা যাবে।

সঙ্গীত পরিচালনাও করছেন পঙ্কজ মল্লিক। তাঁর সুরের অপূর্ব্ব মায়াজাল ভারতের যে কোন চলচ্চিত্রের দর্শক জানে।
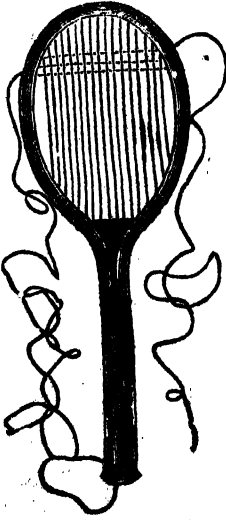
সেদিন সুটিং দেখতে আমরা গিছলাম। নিউ থিয়েটার্স দু-নম্বর ফ্লোরে একটি ছোট সেটে 'কপালকুণ্ডলা'র সুটিং চলছিল। অক্লান্তকর্ম্মী প্রবর্দ্ধক প্রমোদ রায় অতি যত্নে এই সরাইখানার নিখুঁত সেটটি তৈরী করেছেন। সদ্য বিবাহিত নব-দম্পতী সপ্তগ্রামে যাবার পথে এই সরাইতেই প্রথম আশ্রয় নিয়েছেন। একটি নিষ্পাপ সরল হৃদয়া বনের মেয়ের জীবনে প্রথম পুরুষের সঙ্গে একটি প্রেমের দৃশ্য তোলা হচ্ছিল। সেটের উপর এ দৃশ্য এত চমৎকার যে বর্ণনায় লেখা যায় না। এ যেন অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রেমের অভিনয় নয়। সুটিং দেখে ফ্লোরের বাহিরে এসে আমরা তারিফ করলুম ব্যাচিলার ফণিবাবুকে যিনি এ দৃশ্যের পরিকল্পনা করেছেন।

আর সুশিক্ষিতা লীলা দেশাই—বোধ হয় তাঁর দ্বারাই এ দৃশ্যে এমন করে অভিনয় করা সম্ভব হয়।

সাথী

আগামী ৩রা ডিসেম্বর শনিবার "সাথী" নিউ সিনেমা ও চিত্রায় এক যোগে মুক্তিলাভ ক'রবে। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি 'সাথী' পরিচালক ফণী মজুমদারের সৃষ্ট নূতন ঐশ্বর্য্য। গানের-ত কথাই নেই

কারণ সায়গল ও শ্রীমতী কাননবালা—এ দুজনের অসামান্য সঙ্গীত নৈপুণ্য অকৃপণ কণ্ঠে তারা ঢেলে দিয়েছেন—এমন কি যে যে রকম গান চায় তার ব্যবস্থা পুরোপুরি আছে। নাচেও তাই। অভিনয়ে সায়গল, কানন, শৈলেন চৌধুরী, অমর মল্লিক, ভানু, বোকেন প্রত্যেকেই নিজের নিজের বৈশিষ্ট ও উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।

অধিকার

আগামী বড়দিনে ২৪শে ডিসেম্বর 'অধিকার' চিত্রায় মুক্তিলাভ ক'রবে। 'অধিকার' অপরাজেয় পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার নবতম চিত্র। কুমার বড়ুয়া ছাড়াও শ্রীমতী মেনকা, শ্রীমতী চিত্রলেখা, পাহাড়ী, পঙ্কজ মল্লিক, ইন্দু মুখার্জ্জি ও শৈলেন চৌধুরী অভিনয় করেছেন। গল্প আধুনিক কলা-কুশলী কুমার বড়ুয়ার নিপুণ তুলিকাস্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে নিশ্চয়।

দুশমন (হিন্দি)

গত সপ্তাহে একটি রেডিও ষ্টুডিওর দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। জগদীশ শেঠী ষ্টেসন ডিরেক্টরের অভিনয়ে বেশ কঠোর ভাব দেখিয়েছেন। সায়গলের মত গায়ককেও তিনি পাত্তা দেননি। শেষে কিন্তু গুণেরই জয় হ'ল। নিরাশ প্রেমিক হ'লেও এ গায়কের সুমধুর কণ্ঠস্বর বৃথা যায় নি, ষ্টেশন ডিরেক্টরের ন্যায় কঠিন প্রাণকেও নরম ক'রেছিল।

যখের ধন

শ্রীযুক্ত হরি ভঞ্জের পরিচালনায় যখের ধনের কাজ এগিয়ে চলেছে। শ্রীমতী লীলা হালদারের গান অনেক তালিম দিয়ে আশাতিরিক্ত সুন্দরভাবে তোলা হ'য়েছে। নভেম্বর মাসের মধ্যে ভিতরের সমস্ত দৃশ্য হ'য়ে যাবে তারপর বাহিরের দৃশ্য তোলবার জন্য তারা আশায় থাকেন। ছবিখানা এখন ইষ্ট ইন্ডিয়া ষ্টুডিওতে তোলা হ'চ্ছে। খ্যাতনামা আলোকচিত্র-শিল্পী যতীন দাস এ ছবি তুলছেন। এ ছবির যাকিছু যোগাড়যন্ত্র সব রাধা ফিল্ম কোম্পানীই করছেন।

চিত্রায় 'দেশের মাটি'

আগামী শনিবার থেকে চিত্রায় "দেশের মাটির" ১১শ ও শেষ সপ্তাহ আরম্ভ হ'ল। এ নূতন ধরনের দেশ-কল্যাণকর ছবি ভারতে এই নূতন। যাঁরা এখন পর্য্যন্ত দেখেননি তাঁরা এবার দেখতে ভুলবেন না।

নিউ সিনেমায় "বিদ্যাপতি"

আগামী শনিবার থেকে নিউ সিনেমায় বাংলা বিদ্যাপতি দেখান হবে। অনেকেরই মতে বিদ্যাপতি চির নূতন, শ্রীমতী কাননবালার অনুরাধার ভূমিকার অভিনয় বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক।

রূপবাণী

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের আধুনিক সমাজ-চিত্র 'অভিনয়' এই শনিবার হইতে রূপবাণীতে ত্রয়োদশ সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

বাঙলা ছায়াচিত্রজগতে যে অভিনবত্ব ও সম্পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছে তাহা ইতি-পূর্ব্বে কোন ছবিতে যেমন লক্ষ্য করা যায় নাই, নিকট ভবিষ্যতেও এমন একটি উৎকৃষ্ট বাঙলা ছবি দেখিতে পাইবার সম্ভাবনাও অত্যন্ত অল্প। সুতরাং 'অভিনয়' চিত্রের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্যই অস্বাভাবিক নয়।

উত্তরায় 'খনা' ও 'অভিসারিকা'

শনিবার হইতে মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর "খনা" এবং "অভিসারিকা" তৃতীয় সপ্তাহে পড়বে। ছবি দু'খানি যে বিপুলভাবে দর্শক আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়, উহা বহুদিন ধরিয়া "উত্তরায়" আসর জমাইয়া রাখিবে আমাদের বিশ্বাস ও আশা।

'খনা'র সহিত প্রদর্শিত, পাঁচ-রীলের হাসির ছবি 'অভিসারিকা' অন্ততঃ এক-ঘণ্টাকাল, আপনাদের বিপুল হাস্য-রসে ডুবাইয়া রাখিবে। এই রস-মধুর অফুরন্তহাসি হাস্যরসাবতার ধীরেন গাঙ্গুলীর আর একটি স্মরণীয় দৃষ্টি।

জেলার

গত মঙ্গলবার প্রভাত সিনেমার কর্ত্তৃপক্ষ জেলার এর 'প্রেস শো'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছবিখানা দেখে আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। তবে ছবির বিষয়ে সম্যক সমালোচনা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। তবে এই কথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, সোরাব মোদীর পরিচালনা ও তাঁর অভিনয় সত্যই খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছে। আর লীলা চিৎনিস, লীলা প্রভৃতির অভিনয়ও বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

জ্বালা

চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী সমন্বিত 'জ্বালা' ১০ই ডিসেম্বর গনেশ টকি হাউসে মুক্তি লাভ করবে। প্রভাতের চন্দ্রমোহন, বিনায়ক ও সুন্দরী অভিনেত্রী রত্নপ্রভাকে এ চিত্রে দেখা যাবে। এ হিন্দি ছবির পরিবেশক—প্রাইমা ফিল্মস লিঃ।

বি বি ধ

এনায়েৎ খাঁ সাহেব

বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতারিয়া প্রফেসার এনায়েৎ খাঁ সাহেব গত ১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃতুকালে তাঁহার বয়স্ পঞ্চাশও পূর্ণ হয় নাই।

খাঁ সাহেব এবার এলাহাবাদে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে গত ৬ই নভেম্বর রবিবার কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করেন। ৭ই তারিখে তিনি এলাহাবাদ পৌছেন ও ৮ই মঙ্গলবার সকালে সম্মেলনে তাঁহার বাজনা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাতেও তাহার বাজাইবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় বাজাইতে পারেন নাই। ঐ রাত্রেই তিনি অধিক অসুস্থ হইয়া উঠেন ও বুধবার সকালে তাঁহার রক্তবমন হইতে থাকে। তখন ভীত হইয়া সকলে তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। বৃহস্পতিবার রাত্রে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌছান ও শেষ রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁ সাহেব ইন্দোর দরবারের বিখ্যাত সেতারিয়া স্বর্গীয় ইনদাদ খাঁ-র জ্যেষ্ঠ পুত্র। এটোয়া মণিপুরীতে তাহার জন্ম হয়। তিনি সাহারাণপুরে যে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। গত কয়েকবৎসর যাবৎ তিনি গৌরীপুরের দরবারে সেতারীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে তাঁহার তুল্য গুণী সেতারিয়া আর দ্বিতীয় ছিল না। এইরূপ গুণী ব্যক্তির অকালে তিরোধানে বাঙলার তথা ভারতের যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। মৃদঙ্গাচার্য্য দুর্লভচন্দ্রের পরলোক গমনের পর একমাস না যাইতে যাইতে খাঁ সাহেবের ন্যায় অসাধারণ গুণী ব্যক্তির এই তিরোধান যেরূপ গভীর বিস্ময়ের সেইরূপ নিদারুণ দুঃখেরই উদ্রেক করে। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

কিশোর সঙ্ঘ

গত ৫ই নভেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যার পর ১৮ নং পাইকপাড়া রো (বেলগাছিয়া) স্থিত "যদুনাথ নিকেতনের" উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেতৃত্বে "কিশোর সঙ্ঘে"র প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়—মিলিটারী একাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অচ্যুত-কুমার দত্ত মহাশয় উৎসবটিকে প্রাণবান্ করিতে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শ্রীপদ মুখোপাধ্যায় একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর কিশোর সঙ্ঘের বালক বালিকাগণ নানাবিধ নৃত্য-গীত ও সর্ব্বশেষে একটি ক্ষুদ্র নাট্যচিত্রের অভিনয় করিয়া সমবেত সামাজিকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মিলিটারী একাউন্টস্ বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। পরিশেষে সঙ্ঘের অন্যতম সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর রাত্রি দশটার পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব

১৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার হইতে বৈদ্যনাথধাম কুণ্ডা রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রী কুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা উৎসব ও দরিদ্র নারায়ণের সেবা মহা সমারোহে সুচারুরূপে সমাধা হইয়া গিয়াছে। পর্ব্বত পরিবেষ্টিত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ কুণ্ডা গ্রামখানি অকস্মাৎ বহু জনসমাগমে ও নাচ গান গণেশ অপেরা পার্টীর যাত্রা, বায়স্কোপ, পুষ্প, পতাকা ও আলোক মালায় সুশোভিত হইয়া সৌন্দর্য্যে মুখরিত হইয়াছিল। দলে দলে সাঁওতাল মহানন্দে নাচ, গান দেখিয়া মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। ইহাদের মুখের অকলঙ্ক হাসি ও আনন্দ উল্লাস আশ্রমবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। দরিদ্র নারায়ণের সেবার এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। আশ্রমের সেবায়েত শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আশ্রমের সভ্যগণের যথাবিহিত সম্মান ও আদর আপ্যায়ন অভ্যাগত জনসাধারণের সকলকেই বিমোহিত করিয়াছিল। হরিবাবুর আদর আপ্যায়ন ও যত্নের কথা এবং বিদেশে বাঙ্গালীর এই মাতৃপূজার কথা বহুদিন আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিবে। আশ্রমের উন্নতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। এই উৎসব উপলক্ষে হরিবাবুর অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়াছে।

ছায়া-চিত্রের সম্পাদক ও সমালোচক

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালী ফিল্মস্)

হ্যালো !

এই যে কি খবর ?

আর খবর ? আপনাদের নিয়ে বিশেষ বিপদে পড়েছি। কাল আপনাদের যে ছবি মুক্তিলাভ করেছে, সে ছবির সমালোচনা লিখতে হবে, কি যে লিখব ভেবেই পাই না।

কেন ? আপনার কেমন লাগলো ?

সত্যি কথা বলতে কি, আমার মোটেই ভাল লাগেনি। দেশী ছবি খারাপ, একথা লিখতে আমার ইচ্ছা করে না, কিন্তু বাধ্য হয়ে লিখতে হয়। কি করবো বলুন, যখন সমালোচক হয়েছি, তখন সত্য কথাই লিখব।

হ্যাঁ ; সত্য কথাই লেখা উচিত। অপ্রিয় সত্যও লিখবেন, তাতে আমাদের উপকার হবে, কিন্তু সত্যের পোষাক পরিয়ে মিথ্যা কথা লিখবেন না। আচ্ছা বলুন তো আমাদের ছবি আপনার ভাল লাগেনি কেন ?

আপনাদের ছবি শুধু নয়, এ দেশের প্রায় সব ছবিতেই গলদ আছে। কোথায় গলদ, কেন গলদ কিছুই বুঝতে পারি না। দেখুন তো ও দেশের একখানা ছবি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ওদের দেশের চতুর্থ শ্রেণীর ছবির সঙ্গে এদেশের সবচেয়ে একখানা ভাল ছবিরও তুলনা হয় না।

সেই পুরানো কথা। ও দেশের ছবি। আপনারা সমালোচক, আপনারা সবজান্তা, কিন্তু এ কথাটা বোধহয় আপনারা জানেন না বিদেশী শিল্পীদের চেয়ে এ দেশের শিল্পীদের কলাজ্ঞান কোন অংশে কম নয়।

তা' হলে আপনাদের ছবি ভাল হয় না কেন ?

আমাদের অবস্থাটা কি রকম জানেন ? "ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।" এ দেশের ছবি খারাপ, ও দেশের ছবি অপূর্ব্ব শুধু এ কথাটাই আপনারা জানেন, তাই আপনারা বলেন এ দেশের শিল্পীরা কোন কাজের নয়। তাদের culture নেই, idea নেই।

আপনাদের ছবি তা'হলে খারাপ হয় কেন ? এই ছবিখানা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর হ'ল কেন ?

এই ছবিখানা তৃতীয় শ্রেণীর হ'লো কেন ? সে অনেক কথা—আর জানেন সেই অনেক কথাই এখন বলা উচিত—তা না হলে এ দেশের ছায়া চিত্রের কোন উন্নতি হবে না। প্রথমে, মনে করুন একটা ষ্টুডিও একখানা ছবি তুলবে লাভের জন্য ; আর্টের জন্য নয়। তখন 'producer'এর ভাবতে হবে কোন রকম বই তোলা উচিত। সাধারণ লোকেরা যাঁরা দর্শক তারা কি বই চায়—অথবা বই শেষ হওয়ার সময়ে, ছ'মাস পরে তারা কি বই চাইবে, বই ঠিক করবার পূর্ব্বে, প্রযোজকের জানা উচিত, ভাবা উচিত, সাধারণের মনোগতভাব। কিন্তু অনেক প্রোডিউসার তা ভাবে না। কেননা এ কাজের জন্য লোক চাই, ভাল লেখক চাই, কিন্তু প্রোডিউসার মনে করেন তাদের দাবী অনেক বেশী।...

যাঁই হোক, কোন বিখ্যাত বা অখ্যাত লেখকের বই ঠিক হ'লো। চিত্রনাট্য লেখার সময় পরিচালক প্রযোজকের মুখের দিকে চেয়ে লেখেন। কারণ প্রযোজক প্রায়ই বলেন "ও দৃশ্যটা কেটে দাও, বেশী দূর লোকেশন্ রে'খ না"। এই রকম ভাবে চিত্রনাট্য লেখা হল। এখন অভিনেতা অভিনেত্রী চাই। অনেক ষ্টুডিওতেই মাইনে করা অভিনেতৃ থাকে না। অভিনেতৃদের সঙ্গে চুক্তি হলো তারা দিনের বেলা কাজ করবে, রাত্রে পারবে না, কারণ রাত্রে তাদের থিয়েটার। তার উপর আবার অন্য ষ্টুডিওতে যে দিন কাজ থাকবে সে দিন আর কাজ করতে পারবে না—আরও কত কী।

সে সব জানি কিন্তু আপনারা, যারা টেক্‌নিশিয়ান আছেন তাদের কাজ ভাল হয় না কেন ?

টেকনিশিয়ানদের কথা যদি বলেন তা হলে যাঁরা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁদের সেই সেই বিভাগের কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আমি, আমার কাজের কথা—অর্থাৎ চিত্র-সম্পাদনার কথা বলতে পারি। আমাদের দেশে ছবি শেষ না হ'তেই ছবির মালিক যখন ছবির মুক্তির দিন ধার্য্য করেন তখনও চার পাঁচটা দৃশ্য বাকী। তার মধ্যে আবার হয়তো দু'টি বহির্দৃশ্য আছে। আপনারা তো জানেন আমাদের বহির্দৃশ্য

ছবি তুলতে গিয়ে কি কষ্ট হয়। লোকেশনে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছি—কখন রোদ উঠবে তবে শট্ নেওয়া হবে। হয়তো দু'তিন দিন রোদের একটুও রেখা নাই। কাজ বন্ধ। যদি বা একটু রোদ উঠলো, মালিক বলে উঠলেন "এই রোদ উঠেছে, চট্ পট্ শটটা নিয়ে নাও"। পরিচালক চক্ষুলজ্জার খাতিরে শটটি নিয়ে নিলেন, কিন্তু ফল যে কী হ'ল তা সহজেই অনুমেয়।

তারপর পরিস্ফুটনাগার থেকে develope হয়ে সেই ছবি Editor এর কাছে এলো। Editor তখন থেকে রাতদিন কাজ করতে লাগলো, কারণ তার Editing finish হলে আবার Laboratoryতে যাবে। সেখানে গিয়ে তার final print হবে। কাজে কাজেই দুদিনের মধ্যে Editor এর Editing finish করতে হবে তা না হলে Laboratory incharge সময় মত ছবি finish করে দিতে পারবেনা; সে আবার সেই সঙ্গে Editorকে তাগাদা দিতে লাগলো। কাজে কাজেই Editor আর Edit করবার সময় পেলে না, কেটে কেটে জুড়ে দিল। Editorকে তখন যদি Edit করতে হয় তাহলে অন্ততঃ তাকে ৭ দিন সময় দিতে হবে। কারণ তাকে সমস্ত ছবি scene এর পর scene join করে project করে দেখে নিতে হবে। কোথাও Monotony হয়েছে কিনা, Scene এর পর Scene এর Link আছে কিনা continuety আছে কিনা, গল্পের climax কে আরও ভালভাবে নিতে গেলে কি কি Shot এবং কোন কোন Artist এর Shot নিতে হবে। বা কোন কোন Scene কাটতে হবে। তারপর final edit করে Laboratoryতে Reel by Reel দিয়ে দিতে হবে।

যখন Editor সময় পেলনা, তখন যা দেওয়া হয়েছে তাই দেওয়া ছাড়া তার আর অন্য উপায় নেই, তাই কেটে কেটে জুড়ে Reel by Reel করে Laboratoryতে দিয়ে দিল। Laboratory incharge মাত্র ১ দিন সময় পেলো—সে একদিনের মধ্যে Light number দিয়ে print করবে না Develope করবে? সে তখন তাড়াতাড়ি যা হয় করে ছবি finish করে দিল। তারপর বুঝতে পাচ্ছেন তো কি করে সে ছবি ভাল হবে। সে ছবি যখন দেখবেন তখন অপরকে কিছু বলবেন না—বলবেন ওটা deparment কে—সে Camera, Editing ও Loboratory. Editor এর হয়তো তখনও রেহাই নাই—সে তখন House-এ কাঁচী হাতে করে বসে আছে, ছবি যেখানে মনে হচ্ছে একটু খারাপ লাগছে—Audience হৈ হৈ কচ্ছে, তক্ষুনি Editor সে যায়গায় কাঁচি চালাচ্ছে। তাতে Link থাকুক বা না থাকুক, কারণ এর আগে সে সমস্ত ছবি দেখবার সৌভাগ্য পায় নাই, কাজে কাজেই Houseএ বসে প্রথম দুদিন সে এই রকম ভাবে ছবি কাটলো।

তারপর পরের copyতে সে final edit করলো এবং Laboratory incharge তখন তাকে ভাল ভাবে print করলো। তা হ'লে দেখা যায় যে 'releasing copy' হচ্ছে rough copy এবং সেই copyটাই সকলে দেখে গেল এবং আমরা আপনাদের কাছ থেকে খেলুম গালাগালি—companyর হ'লো বদনাম।

এতো গেল তাড়াতাড়ির জন্য। আরও অনেক difficulty আছে যাতে আমাদের কোন হাত নাই। প্রথমটা পয়সা, ২য়টা হচ্ছে কার্য্যোপযোগী জিনিষ পত্র। এইজন্য আমাদের ভাল ছবি তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নাই।

আর একটা কথা মনে রাখবেন—আমাদের একটা 'department'র কাজ যদি খারাপ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক department তার জন্য "suffer" করবে, কারণ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ আছে।

আচ্ছা তা হলে আজ আমি আসি, কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।
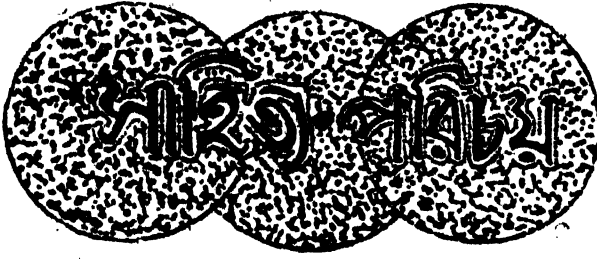
অভিযান—শ্রীলীলাময় দে বিরচিত এবং ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হোতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

অভিযান কবিতার বই। আজকাল কবিতার বই (আধুনিক প্রকাশিত) পড়তে ভয় হয়। বড়বড় মতবাদ আর দুর্ব্বোধ্যতা হোয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতার বিশেষত্ব। কবিতার যে শিল্পকলা, শান্ত সমাহিত প্রবাহের ধারায় বহে চলে সেটা আজকালকার আধুনিকতার মোহে গেছে মুছে। বড় বড় কথা আর অদ্ভুত অবচেতন মনের ক্ষণিক ভাবালুতা নিয়ে নাকি গড়ে উঠছে আধুনিক কবিতা আর সেই রকম আধুনিক বাংলা কবিতা নাকি বিশ্বসাহিত্যে হবে বাংলার এক নতুন দান।

সে যাই হোক; কবি লীলাময়ের অভিযান পড়তে বসে আধুনিকতার কোন রকম প্যাঁচ খুঁজে পাই নি। অর্থাৎ শাব্দিক আর দুর্ব্বোধ্য হোয়ে কবি নিজেকে আধুনিক বলে জাহির করবার চেষ্টা করেন নি। তিনি পুরাতন পন্থী। তাঁর কবিতার প্রকাশভঙ্গী হোচ্ছে মোটের ওপর রাবেন্দ্রীক। মোটের ওপর বললুম এই জন্যে যে, রবীন্দ্রোত্তর কোন কোন কবিরও প্রভাব তাঁর কবিতায় এসে পড়েছে। এক কথায় বলা যায় 'অভিযানে'র প্রকাশভঙ্গী কোন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কবির প্রকাশ ভঙ্গীর রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কোথাও বা না করতে পারায় কবিতা পঙ্গু হোয়ে পড়েছে। তা ছাড়া, ছন্দের দুর্ব্বলতা, ভাষার ওপর বেদখল থাকাতে মনে হয় কবির সাধনা বড় অল্প; আরো কিছুদিন কবিতাগুলি খাতার পাতাতে থাকাই ছিল ভাল। এমন সুন্দর কাগজে, এমন সুন্দর ভাবে ছেপে, বাঁধাই করে এদের বাইরে টেনে না আনলেই ভালো হোত।

তবে এটা ঠিক, কবির যে কবি-হৃদয় আর কবিত্ব শক্তি আছে তা অস্বীকার করা যায় না, যখনই মাঝে মাঝে এমন লাইনগুলি পাই—

ওগো জীবনের সই

চল ধীরে অতি ধীরে—

নিতি রাঙা ফুল ফুটিছে মনের কুঞ্জবনে
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে প্রেম অলি মধু গুঞ্জরণে
রূপ রস মোহ প্রলোভন দিয়ে রাখো রাখো
তারে ঘিরে।

অথবা,

পরাণে খসিবে শত শত কণা ব্যর্থতার
ওষ্ঠে জ্বলিবে বিষচুম্বন রিক্ততার।

এই রকম ভাবের যে লাইনগুলি, 'ওগো জীবনের সই', 'ওগো সন্ধ্যা ওগো সন্ধ্যা', 'আমার প্রেম তোমার প্রেম', 'হে মোর তাপসী প্রিয়া', 'আমার কবিতা', প্রভৃতি কবিতায় ছড়ানো রয়েছে, তাতে মনে হয় কবির ভেতরে দরদ আছে, সাধনা থাকলে কবি একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন নিশ্চয়ই।

শেষ কালে একটা কথা আবার বলছি, ছাপা ও বাঁধানো সুন্দর। তবে বোধহয় প্রুফ দেখার দোষেই অনেক মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে, সেগুলো না থাকলেই সুখী হতুম।

শ্রীস খ।

প্রতিষেধক

(গল্প)

শ্রীফেলু চক্রবর্ত্তী
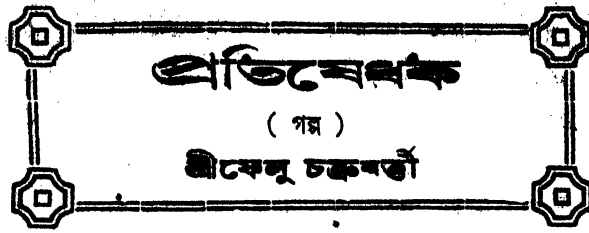
(গত সংখ্যার পর থেকে)

টাকা জোগাড় করবই করব। সুতরাং আমি চাই আজ হতে তোমার চিন্তা হবে কেবল ঐ টাকা সংগ্রহ করবার উপায় উদ্ভাবন"।—

"আমি কি করে এত টাকা সংগ্রহ করতে পারি, হেমেন" ?

"তুমি পার না, তুমি একজন ধনীলোকের পুত্র, তুমি পার না ?" হেমেন তারপর একখানা কাগজে লেখা একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার হাতে দিয়ে, চোখদুটো তার দিকেই ন্যস্ত করে রাখে তার মন্তব্য শোনবার আকাঙ্খায়।

লেখাটা পড়ে মণি টেবিলটা চাপড়ে বলে ওঠে বাঃ, চমৎকার, সুন্দর, প্রশংসনীয়। হেমেন তুই যদি কোন ফিলিম্ কোম্পানীর ডিরেক্টার হতিস্ তাহ'লে তাদের আর প্লটের অভাব প'ড়ত না। এই ঠিক হয়েছে। যেমন বুনো ওল্, তেমনি বাগা তেঁতুল।" তারপর হেমেন তাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলে "দেখ, যেন টাকাটা অন্ততঃ শুভদিনের দু তিন দিন আগেই সংগ্রহ হয় কারণ বিনয় বাবুকে আবার অনেক কিছু কিনতে হবে, বুঝলে—কিন্তু, খুব সাবধানে—"

"নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তাহ'লে প্রস্তাবনার এইখানেই শেষ হোক্, আমি উঠি।" এক চুমুকে চা-টা শেষ ক'রে আশার সমুদ্র অন্তরে চেপে ধরে মণি বেড়িয়ে পড়ে সে স্থান থেকে।

৩

নির্দ্ধারিত দিবসে বিবাহোৎসবের নিদর্শন স্বরূপ উভয় গৃহ হতেই নহবতের শ্রুতিমধুর মিলিত ধ্বনি উত্থিত হয়ে স্পর্শ ও মণির বিবাহবার্ত্তা ঘোষণা ক'রতে থাকে এবং সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই ধনবাবু ও হেমেনের কর্ত্তৃত্বাধীনে বর ও বরযাত্রী শোভাযাত্রা ক'রে উপস্থিত হয় কন্যাপক্ষের গৃহ প্রাঙ্গনে। বিনয়বাবু ও তাঁর আত্মীয় বর্গ গলবস্ত্র হ'য়ে তাদের সংবর্দ্ধনা করে ও যথারীতি ভোজনের ব্যবস্থা করেন। তারপর শুভলগ্নে একটী সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়ে যায় এবং বর-কণে উভয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হেমেনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কক্ষটী বৈবাহিক উপঢৌকনে পরিপূর্ণ ও পণের টাকা একখানি রূপার থালার উপর সজ্জিত দেখে ধনবাবুর মুখে আর হাসি ধরে না এবং আনন্দের আতিশয্যে তিনি মুহুর্মুহু তামাকু সেবন ক'রতে থাকেন এবং হেমেনকে ডেকে বলেন "কুটুম যা করে দিয়েছ বাবাজী, খাসা, খাসা, অতি সজ্জন। পরদিন অপরাহ্নে বর ও বরপক্ষ কণেকে সঙ্গে ক'রে নিজের বাড়ী প্রত্যাগমন করে।

তারপর দিন পনের পরের কথা। সে দিন রবিবার। সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখা যায় এবং অল্পক্ষণ পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে সকলকেই বাধ্য করে বাড়ীতে আটক থাকতে। মধ্যাহ্নে বৃষ্টি থেমে যায় বটে কিন্তু বায়ুর স্রোত শরীরের উপর যেন কশাঘাত ক'রতে থাকে।

বিবাহের খরচপত্র মিলিয়ে বাকী টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবার মানসে খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর ধনবাবু পুত্রের বিবাহের হিসাব নিকাশ ক'রতে বসেন কিন্তু পর ক্ষনেই বজ্রাহতের মত চীৎকার ক'রে ওঠেন। তাঁর চীৎকারে চারিদিক থেকে লোক জমায়েত হয় এবং সকলেই ব্যাপারটা জানবার জন্য উৎসুক হ'য়ে পড়ে। তিনি তখন হস্ত দস্তের মত একবার লোহার সিন্দুক, একবার ক্যাস বাক্স, একবার হিসাবের খাতা হাতড়াতে থাকেন। সঠিক খবরটা না বুঝতে পেরে তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করে "কি হয়েছে ধনবাবু, আপনি অমন ক'রছেন কেন।" কম্পিত স্বরে ধনবাবু চীৎকার ক'রে বলেন "সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার বুকে ছুরি মেরেছে রে বাবা, বুকে ছুরি মেরেছে। নিশ্চয়ই এটা সেই অনাথ বেটার কাজ, বেটা সেদিন আমাকে শাসিয়ে গিয়েছিল বেশ একটু জানিয়ে দেবে। ওঃ, আমায় উত্তম মধ্যম জানিয়ে দিলে। ২৮০০৲ টাকা তহবিল থেকে চুরি, এর চেয়ে সত্যই সে যদি আমার বুকে ছুরি মেরে দিত, আমি যন্ত্রণা থেকে নিশ্চিন্ত হতাম। আচ্ছা, আমিও অল্পে ছাড়ছি না, বেটাকে জেলে দিয়ে তবে জলগ্রহণ ক'রব। এই, মণিকে ডেকে আন আর থানা থেকে দারোগা বাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।" হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি মাথায় হাত দিয়ে থপ ক'রে বসে পড়েন এবং তাঁর পাশে বসে সমবেত পাড়ার লোকগুলি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মত তাঁকে উত্তেজিত ক'রতে থাকে। এই অনাথটী তাঁর একজন ভাড়াটে। এর বিরুদ্ধে তিনি ঘড় ভাড়া, মোকর্দ্দমার খরচা ও উচ্ছেদ বাবত সর্ব্ব-সমেত ১১৫৲ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হন। অনাথ নাকি তার বাড়ীর অসুখের জন্য নিয়মিতভাবে ভাড়া দিতে অসমর্থ হয়।

ধনপ্রিয়বাবু ডিক্রীর টাকা আদায় ক'রে তাকে উচ্ছেদ ক'রবার অভিপ্রায়ে ডিক্রী জারী ক'রে তার তৈজস পত্র ক্রোক ক'রতে অভিলাষী হয়েন। উপায়ন্তর না দেখে অনাথ একদিন ধনবাবুর কাছে এসে তার দুঃখের আরজী পেশ করে, কিন্তু ধনবাবুর পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে একটা আঁচর পর্য্যন্ত কাটতে সমর্থ হয় না। তার এই কাহিনী কিন্তু মণির কোমল অন্তর অনায়াসেই আকৃষ্ট করে এবং দয়াপরবশ হয়ে সে পিতাকে অনুরোধ ক'রে বলে "বাবা, ওর এই বিপদের সময় ওকে উচ্ছেদ করে পথে বসান যুক্তিসঙ্গত হবে না বাবা, ওর মরনোন্মুখ মাকে নিয়ে ও কোথায় যাবে। আমি বলি, ওর মা ভাল হবার পর যা হয় কোরো।" ধনবাবুর অন্তকরণ কিন্তু এত অনুভূতিশূন্য নির্ম্মম যে একটা অবজ্ঞা সূচক মুখভঙ্গীর দ্বারা অনায়াসেই তিনি পুত্রের এই কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করতে দ্বিধাবোধ করেন না। অনাথ কিন্তু এই প্রাণহীন বৃদ্ধের বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাকে শাসিয়ে যায় "যদি আপনি আমার মরনোন্মুখ মাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন, তাহলে স্থির জানবেন ধনবাবু, আপনাকেও আমি অল্পে ছাড়ছি না, বেশ একটু জানিয়ে দোব"—বলা বাহুল্য ভীরু স্বভাব ধনপ্রিয় বাবু অনাথের এই ভীতি প্রদর্শক উক্তি উত্তোলিত খড়্গের ন্যায় গণ্য করেন এবং উহা তাঁর মনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা হয়ে জাগরুক থাকে। তারপর এই চুরি, সুতরাং তাঁর পক্ষে অনাথকে সন্দেহ করা স্বাভাবিক বলা চলতে পারে। তাই দারোগা বাবু আসবার পর তিনি অনাথকেই এই চুরির সঙ্গে জড়িত করেন। তাঁকে সমর্থন করে একজন প্রতিবাসী বলে "হ্যাঁ, আমি তাকে সে দিন রাত্রে ১০টা আন্দাজের সময় মুখে একখানা কাপড় ঢাকা দিয়ে এই বাড়া থেকে বেরুতে দেখেছি।" আর একজন বলে "দেখছেন না তার পর থেকেই তার পোষাক পরিচ্ছদের বহরটা কিরূপ বেড়ে গেছে?" ধনবাবুর কথার উপর নির্ভর করে ও সাক্ষীদের কথা শুনে দারোগা বাবু যখন তাঁর সহকারীকে নিযুক্ত করেন অনাথকে গ্রেপ্তারের জন্য অনাথ তখন তার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের জন্য শ্মশানে। দারোগা বাবু উপায়ন্তর না দেখে পরদিন প্রাতে তাকে ধনবাবুর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। অনাথের শত উক্তি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সে কিছুতেই তাদের বুঝাতে পারে না যে সে এই চুরির কিছুই জানে না।

৪

নাটকের এই শেষ অঙ্ক ধনপ্রিয় বাবুর গৃহ প্রাঙ্গণে অভিনীত হওয়ার সংবাদ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে ইহা হেমেনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং সে তখনই বেড়িয়ে পড়ে মণিকে খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্যে। মণি তখন তার নব পরিনীতা বধূ ও তার সঙ্গীনীদের নিয়ে বিনয়বাবুর দ্বিতল কক্ষে হর্ষোচ্ছ্বাসে নিমগ্ন। হেমেনের হঠাৎ তথায় গমন কিন্তু তার ক্রমিকতা ভঙ্গ করে দেয় এবং হেমেনকে ওরূপ অবস্থায় দেখে মণি একটু বিস্মিতও হয়ে পড়ে এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে নীচের তলায় নেমে এসে জিজ্ঞাসা করে "কি খবর হেমেন তুমি হাঁপাচ্ছ কেন? কি হয়েছে, তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে।" আশে পাশে লোক থাকায়, হেমেন মণিকে একটু অন্তরালে ডেকে ব্যাপারটা খুলে বলে এবং তখনই তার সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে অনুরোধ করে। অবিলম্বে ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি তাদের জানিয়ে বেড়িয়ে পড়ে মণি হেমেনের সঙ্গে একখানা ট্যাক্সি ডেকে। সদর দরজায় প্রবেশ করবামাত্র অনাথ হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মণির পা দুটো জড়িয়ে গদগদ কণ্ঠে বলে "মণিদা, আমি গরীব, পথের ভিখারী বললেও হয়, কিন্তু আমি চোর নহি। সেই যে সেদিন আপনার সম্মুখে ওঁকে দু একটা কথা বলেছিলাম, তার ফলে আজ উনি আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এই চুরির সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছেন—কিন্তু মণিদা, আমি আমার স্বর্গীয়া মায়ের নামে শপথ করে বলছি, আমি এ চুরির সম্বন্ধে কিছুই জানি না"—

অনাথের কাতরোক্তিতে মণির নয়ন দুটী অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে এবং তার হাত দুটো ধরে তাকে তুলে নিয়ে সে বলে "আমি তা জানি, অনাথ। দারোগা বাবু! ও নির্দ্দোষ, ওকে ছেড়ে দিন।" তারপর তার পিতার দিকে ফিরে সে পুনরায় বলে "বাবা! ক্ষমা করবেন, এ চুরি আমিই করেছি। আমাকে শাস্তি দিন। গভীর রাত্রে যখন আপনি অঘোরে ঘুমচ্ছিলেন তখন আমি আপনার বালিশের তলা থেকে

অসুস্থ
শরীর
সুস্থ ও সবল

করিতে

'রাচি'

অদ্বিতীয়
ইহা সর্দি, কাসি এবং যক্ষ্মার
প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

লোহার সিন্দুকের চাবি নিয়ে ২৮০০৲ টাকা চুরি করি, কারণ চুরি না করা ভিন্ন অন্ত উপায় আমার ছিল না"—মণির এই উক্তিতে সকলেই ধারণা করে অনাথকে বাঁচাবার উদ্দেশ্য নিয়েই মণি নিজের স্কন্ধে চুরির অপরাধ চাপাচ্ছে এবং কেহই তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু মণি যখন সমস্ত ঘটনার সঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত বিনয় বাবুর কাতর প্রার্থনার কথা জানায় যাহা রক্ষা করতে গিয়ে তাকে এই চুরি করতে হয়, তখন সকলে অবাক হয়ে যায়। সে বলে "আমার বাবা এ বিবাহে সম্মতি দেন এবং সেই সঙ্গে ২৮০০৲ টাকা পণ স্বরূপ দাবী করেন। কিন্তু আমি এই সামাজিক অন্যায়টাকে আন্তরিক ঘৃণা করি। এবং যখন দেখি যে ঐ টাকাটাই একমাত্র এ বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অন্য কোন দিক থেকে টাকা পাবার কোন আশা নেই তখন আমি ওঁর টাকা চুরি করে ওঁকেই দিয়েছি। দারোগাবাবু আমি এর জন্য জেলে যেতে প্রস্তুত, বাঁধুন।" বলিয়া হাত দুটো বাড়িয়ে দেয়।

অনাথকে ছেড়ে দিয়ে যখন দারোগা বাবু মণির হাতে হাতকড়া লাগাতে যায়, তখন ধনবাবুর মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবীটা তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং কাঁপতে কাঁপতে তিনি বাধা দিয়ে বলেন "না, না, না, দারোগা বাবু, তা হতে পারে না। আমি আমার আঁধার ঘরের মাণিককে জেলে দিতে পারি না। আমারই দোষ, দারোগাবাবু, আমি তখন বুঝতে পারি নি যে অর্থ পিপাসাই সমস্ত অনর্থের মূল। ওই আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। ওর নিজের টাকা ও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। দারোগাবাবু আমি এ মোকর্দ্দমা চালাতে চাই না।"

ব্যাপারটা বেশ ভাল ভাবে উপলব্ধি ক'রে দারোগা বাবু মন্তব্য প্রকাশ ক'রে বলেন "ধনবাবু, আপনার লেজে পা পড়েছে বলেই আজ ওই অভাগা অনাথটা বেঁচে গেল, তা না হ'লে ওর অবস্থা কি হ'ত বুঝতে পারছেন কি? তবে আপনার ছেলের প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না—চমৎকার প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করেছিলো—এটাতে অনেকেরই চোখ ফুটিয়ে দেবে—বিশেষ করে আপনার মত যারা পণের টাকা পাবার জন্য অন্ধ হয়ে থাকে। প্রকৃত ভালবাসা ঠেকিয়ে রাখা মানুষের সাধ্যাতীত—সেটা আপনার জানা উচিত ছিল"—

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দারোগা বাবু, আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রকৃত ভালবাসা একটা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ—তার স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাকে শত বাধা দিয়েও আটকান যায় না। তার ফল আমি হাতে হাতে পেলাম। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে অযথা হায়রাণ করার জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন—"

পিতা পুত্রের আলিঙ্গনের সঙ্গে ব্যাপারটা সেইখানেই নিষ্পত্তি করে দিয়ে দারোগা বাবু ও আর আর সকলে হাসতে হাসতে সে স্থান থেকে প্রস্থান করে।

—:০:—

সমাধি

বীণা দেবী

বন্ধু আমার
একই সাথে জেগেছিলাম দুজনে
প্রথম উষার উদয় তখন
প্রভাত পাখীর কুজনে,
বইল প্রথম ভোরের হাওয়া
শিউলি ফুলের গন্ধ ছাওয়া
ভাসিয়েছিলাম জীবনখানি
নবীন আশার উজানে।
এখন যেগো ঘনিয়ে আসে
দিনের শেষ লগ্ন
জানিনা কোন স্বপন ধ্যানে
হলে তুমি মগ্ন
একলা আমি বসে কাঁদি
সামনে নামে গভীর আঁধি
নাইক আলো নাইক আশা
ব্যথায় হৃদি ভগ্ন।

—:০:—

আত্মসংযম বনাম স্বেচ্ছাচার

মালবিকা রায়

"খেয়ালী"তে 'কোন পথে' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়ে মনে হল সব বিষয়ে লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারছি না—তাই আজ দু'একটা কথা বলতে চাই।

লেখক একস্থানে লিখেছেন "আত্মসংযমের বুলি আওড়ান সোজা, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে তাকে 'প্রতিফলিত করবার চেষ্টা যৌবনকে শুধু ব্যঙ্গ করা।"

এখানে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সংযম এবং নিবৃত্তি দুটো এক নয়। নিবৃত্তি যে আমাদের Summum bonum of life নয় সেটা আমরা জানি--Rigorism বা 'যৌনলিপ্সা দমন আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ভিত্তি হতে পারে না। সংযম বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত—এ আমাদের বাসনা লিপ্সার পরিসমাপ্তি কামনা করে না। সংযমের মধ্যে আছে Reasonable পরিতৃপ্তি।

তারপর বহুসন্তান সমস্যা। প্রত্যেক কাজেই ভাল মন্দ দুটো দিক যেমন আছে তখন বহু সন্তানের ভালোর দিকটাই বা আমরা কেন অগ্রাহ্য করি? চীন জাপান যুদ্ধের কথাই ধরা যাক্। সমগ্র পৃথিবীতে চীনের মত জনবল কোন জাতির নেই—এই যুদ্ধে জাপানের ও চীনের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছে—ক্ষতিগ্রস্ত জাপান কম হয়নি—কারণ তার লোক সংখ্যা চীনের তুলনায় অতি ন্যূন। চীন যে জয় সম্বন্ধে এখনও নিরাশ হয়নি তার বহু কারণের মধ্যে জনবল অন্যতম। তাই ব'লে সমূখ সমরের কল্পনায় জনবল বাড়াবার অজুহাতে যৌন লিপ্সা সাধন নিতান্তই বোকামী।

গরীবের ঘরে সন্তান বেশী একথা কেউ অস্বীকার করতে সাহস করি না। কিন্তু গরীবের মধ্যে কৃষকশ্রেণীর বহু সন্তান হওয়া বোধহয় তেমন দোষণীয় নয়, তার কারণ—বৈজ্ঞানিক প্রথায় জন্মশাসন তাদের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ এমন কি হয়ত তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য নয়—প্রত্যেক চাষী যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় পারদর্শী হ'য়ে পড়ে তবে 'দেশের মাটির' আদর্শ নিয়ে ভদ্রঘরের কয়জন চাষীর কাজে নামবেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ।

মধ্যবিত্তরা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করুন—তাতে আপত্তি করি না তাঁদের অশান্তির বেশীর ভাগ কারণ বহু সন্তান। A. P, G. P-র যুক্তি অকাট্য।

আমি আত্মসংযমকেই বৈজ্ঞানিক সংযমের চাইতে উচ্চতর স্থান দেই। পুরাণে বিশ্বামিত্র মুনির বারবার অপ্সরা দ্বারা পরীক্ষিত হবার আর কোন অর্থই থাকতে পারে না, আত্মসংযমকে উচ্চতম স্থান দেওয়া ছাড়া।

এই আত্মসংযম শুধু পুরুষের দিক থেকেই দরকার নয়—নারীরও এটা অতি প্রয়োজন। আদিমকাল থেকে দেখে এসেছি নারীই ক'রেছে পুরুষকে প্রলুব্ধ। নারীর প্রলুব্ধ ক'রবার বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে—ফলে তারা হয়ে পড়েছে সংযমের অভাবে উচ্ছৃঙ্খল। আত্মসংযমের রক্ষণাবেক্ষণে নিজেদের সমর্পণ না করে যৌবনের মাদকতায় লিপ্ত থেকে দেশের যে সর্বনাশ ডেকে আনছে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষকে সম্পূর্ণ দোষী ক'রব না—এরজন্য দায়ী নারীর আত্মমর্যাদা জ্ঞানের অভাবই বেশী।

আত্মসংযম যৌবনকে ব্যঙ্গ করেনা করে সম্মান। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চাই আত্মসংযম—পুরুষ যেন পরস্ত্রী, বন্ধুভগিনি
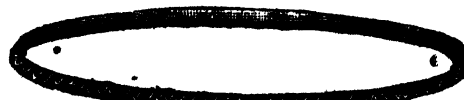
মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্ত্তী

গত পূর্ব্ব সংখ্যায় আমাদের আলোচনা কোন ধারায় চলবে তার একটু আভাসমাত্র দিয়েছি। কোনও কাজে অগ্রসর হতে হলে চাই উদ্যম, সাহস, সৎশিক্ষা ও সংযম। আজ বাঙ্গালীর জীবনে, তথাকথিত বাংলার নারীজীবনে এমন একটা দিন এসে গেছে, যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হোয়েছে আমাদের পারিবারিক জীবনে গঠনমূলক কার্য্য করবার উদ্যম থাকা। এই গঠন-মূলক কার্য্য হবে শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য নিয়ে। আমাদের সন্তান সন্ততি, আমাদের আশাভরসার স্থল ছেলেমেয়েরা সৎশিক্ষা মানে যে শিক্ষা তাদের দেশ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সমাজের ভালমন্দ সম্বন্ধে, সাহিত্য সম্বন্ধে, সাহিত্যের মূল সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে সেই শিক্ষা, সেই সৎশিক্ষা যাতে পায়, করতে হবে তার বন্দোবস্ত এবং সেই বন্দোবস্ত যেন আমাদেরই হাত দিয়ে হয়।

এই শিক্ষার বন্দোবস্তের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ল। আজ সেই কথাটা নিয়েই আলোচনা করবো। কথাটা হোচ্ছে আমাদের মা, বোনেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। আজকাল যাঁরা প্রবীণ এবং প্রৌঢ় তাঁদের সকলকেই আমি দুঃখ প্রকাশ করতে দেখেছি আধুনিক মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। শুধু প্রবীন এবং প্রৌঢ় নয়, প্রবীণা এবং প্রৌঢ়ারাও এইরূপ আলোচনা করে থাকেন। তাঁদের এই অভিযোগ আমরা আজকাল বুড়ো কি বুড়ীর ভীমরতি বলে যে হেসে উড়িয়ে দেবো তার কোন উপায় দেখছি না; বরং ধীরে ধীরে আমাদের এই অভিযোগ স্বীকার করে নিতে হয় যখন কলকাতা শহরে সাড়ে পাঁচটার পরও মেয়েদের স্কুলের ছুটির বাসে ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত ছাত্রীর দল যেতে দেখতে পাই অথবা মফঃস্বল শহরে বা পল্লীগ্রামে বাড়ীর কর্ত্তারা কারোর জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে ফিরে এসে সেই সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, এই সরু হাত—তখন আমাদের কর্ত্তাদের কথায় প্রতিবাদ করবার কোন উপায় থাকে না।

সে কথা যাক্। মোটের ওপর এই সত্য কথা মানতে আজ আমরা বাধ্য যে বাংলার মেয়েদের স্বাস্থ্য আজ অবনতির পথে ধাপের পর ধাপ নেমে চলেছে। এখন কথা হোচ্ছে এই স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় কি? আর আমাদের স্বাস্থ্য কেন এই অবনতির পথে নেমে এসেছে?

প্রথম প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার আগে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে গুটিকত কথা বলে নেওয়া যাক। বাংলা তথা পৃথিবীর সভ্যতা আজ সহরে প্রতিপালিত হোচ্ছে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সহরে প্রতিপালিত হোলেও সে সব দেশের খুব বেশী ক্ষতি করতে পারে নি, যতটা ক্ষতি করেছে ভারতবর্ষের তথা বাংলার। কারণ অন্যান্য প্রদেশ-বাসী অপেক্ষা যে ভারতে বাঙ্গালী অধিক পরিমাণে চাকুরীজীবী তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার জগতের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী, চলতি কথায় যাদের গৃহস্থ ভদ্রলোক বলা হয় তারাই বরাবর চাকুরীজীবী হোয়েছে, হচ্ছে ও হবে। জগতের ইতিহাসে ও সভ্যতায় নতুন চিন্তার ধারা, নতুন সৃষ্টির বিপ্লব সকল কিছু হোচ্ছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যদি জাতির মেরুদণ্ড বলা যায়, তাহোলে কিছু বেশী বাড়িয়ে বলা হবে না। বাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা, মেরুদণ্ড আজকাল সহরবাসী ও চাকুরীজীবী হোয়ে গেছে। কেন হোয়েছে একথা আর একদিন আলোচনা করা যাবে। আজ শুধু দেখতে পাই এরা সহরবাসী হোয়ে এদের গেরস্থালী সহরে তুলে এনেছে। তারপরে সহরের বিলাসিতায় পড়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য কেন যে অবনতির পথে নেমে এসেছে ও দিনে দিনে আরও আসছে, মাত্র একটি কথায় তা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

মানুষের শরীর একটা যন্ত্র। এই যন্ত্র ততক্ষণ ঠিক ভাবে কাজ দেবে, যতক্ষণ

প্রবৃত্তিকে প্রলুব্ধ না করে, আর নারী যেন আত্মমর্য্যাদা হারিয়ে নিজেদের পুরুষের খেলার সামগ্রী না করে—। Sadismএর পক্ষপাতিত্ব নারী না করুক এই কামনা।—

• কুমুদেশ সেন লিখিত 'কোনপথে' প্রবন্ধটীর প্রতিবাদ।

একে ঘড়ির মত দেওয়া হবে দম আর তেল। আমাদেরও প্রয়োজন হোচ্ছে যন্ত্র ঠিক রাখতে শারীরিক পরিশ্রম। এই পরিশ্রম যে সাধারণ মেয়ে বা বৌ ঝিয়ে কতটুকুন করেন তা এখানেই প্রমাণ হোয়ে যাবে উপস্থিত কথায়। পাড়াগাঁয়ে দেখতে পাওয়া যায় বৌ ঝিয়েরা পুকুরে নেমে গিয়ে অন্ততঃ বার তেরটা সিড়ির ধাপ ভেঙ্গে জল নিয়ে উঠে। আর এটা যে একটা ব্যায়াম বিশেষ তা জল আনবার সময় মনে না পড়লেও কার্য্যতঃ শরীর চর্চ্চায় গিয়ে পড়ে। এই জল আনাটা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ছোট মেয়ে থেকে আরম্ভ করে বয়স্থা মেয়ে, সকলকেই করতে হয়। কিন্তু সহরে, বিশেষ করে যেখানে জলের কল আছে, সেই সব বায়গায় কলতলা থেকে রান্নাঘরে জল তুলে আনে সাধারণত ঝি চাকর না হয় বাড়ীর গিন্নী, গৃহস্থালী সম্বন্ধে যার গরজ বেশী! মেয়েরা সেই সময় বসে বসে সচিত্র মাসিক বা সাপ্তাহিক নিদেনপক্ষে স্কুলের পড়া করে। কাজেই পরে দেখতে পাওয়া যায় একমুঠো আন্দাজ ভাতের বেশী ভাত হইলেই মেয়েদের মার উপরে রাগ বেড়ে যায়। এইতো সহরের মেয়েদের অবস্থা। এরা দিবে জাতিকে সাহস, শক্তি ও প্রেরণা। এরা হবে বীরপ্রসূতা।

এই কথাগুলো বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে কেন বলছি বলে যদি প্রশ্ন করেন, তবে আমার উত্তর হোচ্ছে এই যে মেয়েদের আজ একান্ত দরকার হোচ্ছে ব্যায়াম করার। অনেকের কথাটা ভালো লাগলো না; মেয়েদের আবার পুরুষদের মত হাত 'পা ছোড়াছুড়ির দরকার কি? কিন্তু দরকার যে ক্রমশঃ হোয়ে পড়ছে তা আমার মা বোনেদের চেহারার দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একটা দিন গেছে যে দিন কারোর কাছে মানে সাধারণের কাছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ভালো বলে বোধ হয়নি। আজ আবার আর একটা দিন এসেছে যখন মেয়েদের ব্যায়াম হোয়ে পড়েছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ যা অনেকের কাছেই ভালো লাগবে না। এই ব্যায়াম পদ্ধতি কি রকম হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি যে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে ব্যায়াম পদ্ধতি (মেয়েদের সম্বন্ধে) যা বেরুচ্ছে তা অথবা নৃপেন্দ্রকুমার বসুর "যৌবনের যাদুপুরী"র ব্যায়ামপ্রণালী সহজেই অনুকরনীয়।

এইবার আমাদের প্রথম প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। কথাটা হোচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় কি? উত্তর এইখানে আমার হাতে যেটুকুন সময় ও স্থান আছে তার মধ্যে দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবুও মোটামুটি কথায় আমি কিছুমাত্র আভাস দিয়ে যাচ্ছি। এই মতটা যেটা আমি এইখানে দেব সেটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মত তবে আপনাদের মতও জানাবেন। এবং উপযুক্ত মনে হোলে তা নিয়েও আমরা ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করব। হ্যাঁ, বলছিলুম সাধারণ গুটিকতক নিয়ম পালন করলেই বোধহয় আমাদের স্বাস্থ্য অবনতির পথে ধাপের পর ধাপ থেকে নামবার হাত থেকে নিস্তার পায়। সেই নিয়মকটি আমাদের খাদ্যাখাদ্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিচার করে চলার উপরে নির্ভর করছে। এ সংখ্যায় এখানে শেষ করলাম। আগামী সংখ্যায় খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার ও তাদের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু বলবার আশা রহিল।
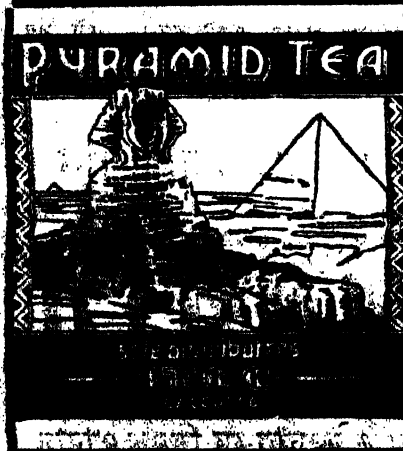
রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান-সূচীর প্রধান অভাব—সাধারণ রুচি অনুযায়ী পঠিত হয় না। সাধারণতঃ কতটুকু শ্রোতাদের আনন্দ দান করতে পারে শিক্ষার দিক থেকে কতটুকু রস পরিবেশন করলে সাধারণ তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে তেমন করে এগুলি ভাবা হয় না; কিংবা এ বিষয়ে চিন্তা করলেও প্রোগ্রাম কর্ত্তারা কার্য্যে পরিণত করতে সক্ষম হন না।

• • • •

শ্রোতারা কি চায়? অসংখ্য অগণিত শ্রোতার মনরাজ্য পরিদর্শন করা সত্যিই দুঃসাধ্য! তবে যা ভালো—যা সুন্দর তা সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রায় ভালো এবং আনন্দদায়ক! বিশাল জনসজ্যের মনস্তুষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন বৈচিত্র্য। মানুষের মন বৈচিত্র্যঃ প্রিয়। বেতার প্রোগ্রাম কর্ত্তারা আনন্দ-দানের এই সাধারণ নিয়ম এবং মাপ-কাঠি মেনে চল্‌লেই অনেকটা সফলতা অর্জ্জন করতে পারেন। এক যন্ত্র-সঙ্গীত কিংবা কণ্ঠ সঙ্গীত দীর্ঘ সময় ব্যাপি অনুষ্ঠিত হলে সাধারণের পক্ষে তার রস গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। বেতার প্রোগ্রামে এই এক ঘেয়েমী ভাব অত্যন্ত বেশী।

• • •

বেকার গ্রামোফন রেকর্ড বাজানো দিন দিন সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। আর্টিষ্ট অনুপস্থিতির অভাব রেকর্ডে পূরণ—দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে রেকর্ড বাজানো এবং সময় সময় অপরাপর অনুষ্ঠানেও রেকর্ড দেওয়া—বেতারে এই রেকর্ডের প্রাদুর্ভাব অসহ্য বিরক্তিকর। অধিকাংশই যতরাজ্যের রাবিশ রেকর্ড দিয়ে শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদনের সার্থকতা কি?

* * *

আর্টিষ্ট অনুপস্থিতি এবং অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এর প্রতিকার বিধানের জন্যে কিছু রিজার্ভ আর্টিষ্ট রাখলে খানিকটা বোধহয় রেকর্ডের স্মরণাপন্ন দায় হতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

* * *

বক্তৃতা বিভাগের কিছু উন্নতি সংসাধিত হচ্ছে। বেতারে এটা একটি অত্যন্ত গুরু এবং প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু রাজ্যের সংবাদ জ্ঞাপনের সংখ্যা বাড়িয়ে বক্তৃতার সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্য আমরা বুঝি না। এমন কথা আমরা অবশ্যই বলি না যে, সংবাদ জ্ঞাপনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তবে জাতি গঠনমূলক শিক্ষাপ্রদ রস-সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যপ্রদ বক্তৃতার প্রয়োজন বেতারে খুবই অধিক। বক্তৃতা বিভাগের অনুষ্ঠানসূচিতে একই জিনিষের অধিক সংস্করণ দেখি এবং বিভিন্ন রুচি সম্প্রদায় অনুযায়ী হয় না। বক্তৃতায় বৈচিত্র্যও কম। শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা চল্‌লো কিংবা ক্রিকক্রীড়ার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেনতো তার চর্ব্বিত চর্ব্বনের জের চল্‌লো বহুদিন ধরে। এতে Suspense থাকে না।

দিনের শেষে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দিনের শেষে আসবে যখন
নিবিড় অন্ধকার,
কেমন করে বাইব আমার
জীর্ণ তরী আর।
মিশবে আলোক দিগন্তরে
সাঁঝের প্রদীপ জ্বল্‌বে ঘরে
আমি শুধুই ঢেউয়ের 'পরে
দুল্‌ব অনিবার।
ভোর থেকে মোর যাত্রা সুরু
নিরুদ্দেশের পারে,
ফুরায় না পথ দিক্‌সীমাহীন
বিশাল পারাবারে;
পথশ্রমে ক্লান্ত আমি
ডাকছি তোমায় জীবন-স্বামী
বাজাও আমার হৃদয়-বীণায়
আশ্বাস-ঝঙ্কার।

—:০:—

বেতারে শিল্পী উপেক্ষা এবং অনাদরের কোন প্রতিকারই দেখা যাচ্ছে না। বহু শিল্পীর অভিযোগ এবিষয়ে। শিল্পীদের প্রতি অত্যন্ত অভদ্র জনোচিত উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়। বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তারা কেউ কেউ নিজেদের 'কেষ্ট-বিষ্টু' মনে করেন। এই ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিকার চাই। সাধারণের অনুষ্ঠানে সাধারণের দাবীকে অভদ্রভাবে উপেক্ষা করার অধিকার আছে কিনা এ সম্বন্ধে তাঁদের ভেবে দেখা উচিত। যোগ্য-অযোগ্যের বিচার অবশ্যই করতে হবে—কিন্তু সাধারণ সৌজন্যের অভাব কেন হবে? আমরা এবিষয়ে ষ্টেশন ডাইরেক্টর মিঃ ষ্টেপলটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবিষয়ে অভিযোগমূলক অনেক পত্রাদি শিল্পীদের তরফ হতে আমাদের কাছে আসে।

কাশীপ্রভু

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

বারান্দা

রামগতি ও পরেশ উকিল

রামগতি—চুপ চুপ, একবারে চুপ। কথা কইলেই সর্ব্বনাশ। —কি বিপদ!

পরেশ ইঙ্গিতে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারখানা কি?

রামগতি ফিস ফিস করিয়া বলিল—গুরুতর ব্যাপার রে বাবা, গুরুতর ব্যাপার। কর্ত্তা একেবারে মুখখানা বিরাট থমথমে কোরে ছুটোছুটি কোরছে, হুঙ্কার দিচ্ছে। তাই বলি চুপ চুপ—একেবারে চুপ।

পরেশ—কিন্তু আমাকে যে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি যে তাহলে গেছি!

রামগতি—সবাই গেছিরে বাবা, সবাই গেছি। থাকবো না কেউ। এ বাড়ী থেকে অন্নজল উঠলো।—কি বিপদ!

পরেশ—আসল ব্যাপারখানা আমায় খুলে বলতে পারেন সরকার মশাই? বুঝে নি নিজেদের অবস্থাটা?

রামগতি—হায়রে উকিল!—ওকালতিই কোরুলে, আসল ব্যাপারখানা বুঝলে না বাবা!—কি বিপদ!

পরেশ—দোহাই সরকার মশাই আর ভণিতা কোরবেন না। ব'লতে হয় বলুন, না হয়তো থাক্।

রামগতি—(গলা খাটো করিয়া) ওরে বাবা, মা-ঠাকরুণ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছেন কাল রাত্তির থেকে। বাড়ী তাই ওলোট্‌ পালোট। দরোয়ানটা খেয়েছে চড়, চাকর খেয়েছে রদ্দা। বাপরে বাপ!

পরেশ—মা-ঠাকরুণ নিরুদ্দেশ! কেন, কি দুঃখে?

রামগতি—কি দুঃখে?—সে কর্ত্তা জানে, ছেলে জানে; আর জানে বাড়ীর ঝিয়েরা। তুমি আমি কি জানবো বলো?

পরেশ—সত্যি আপনি জানেন না?

রামগতি—ঐ তো আমার দোষ উকিল। সব্বাই জানতে পারে, পারি না শুধু আমি। এ ব্যাপারেও জানলে সবাই, জানলুমনা শুধু আমি। থাক্‌গে বাবা, বড়ো কথায় মাথা দিয়ে মাথা খোয়াতে চাই না।

(কাশীশ্বরের প্রবেশ)

কাশী—সবাই জানলে, তুমি শুধু জানলে না রামগতি?

রামগতি—আজ্ঞে—

কাশী—বুঝতে পেরেছি, আর কথা কোয়োনা।—তুমিও জাননা পরেশ?

পরেশ—আজ্ঞে—

কাশী—সেই এক কথা 'আজ্ঞে'! ওরে মুর্খের দল, কী দুঃখে ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছাড়া হ'য়ে গেল তা ব'লতে গিয়েও বাক্য রুদ্ধ হ'ল! (পরেশ ও রামগতি হতবাক হইয়া চাহিয়া রহিল)—কিন্তু দুঃখ কি তা জানো রামগতি? জানো পরেশ?

পরেশ ও রামগতি পরস্পরের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

—পরেশ ভয়ে ভয়ে বলিল:—না Sir জানি না।

কাশী—Sir! ওরে আমায় সম্মান দেখাচ্ছে!—ভাবছে আমি ওর তোষামোদে ভুলে গিয়ে ওকে ছেড়ে দোব। কিন্তু ছাড়বোনা পরেশ ছাড়বো না তোমায়। উইল কোরে দিয়ে তুমিই সকলকে ক্ষেপিয়েছ। তোমায় ছাড়বো না।

(বলিয়া পরেশের হাত চাপিয়া ধরিল)

মণীষার প্রবেশ—

মণীষা—বাবা, ভেতরে এসো।

কাশী—(পরেশের হাত ছাড়িয়া দিল) দ্বিজেন ফিরেছে-রে? তোদের মায়ের কোন সংবাদ পেলি?

মণীষা—তুমি আগে ভেতরে এসো, পরে সব বলবো।

কাশী—ভেতরে কে আছে? কার জন্য যাবো?

মণীষা—নেই থাক্ কেউ, তবু তুমি আসবে।

(বলিয়া কাশীশ্বরকে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল)

পরেশ—একি মূর্ত্তি! একি কণ্ঠস্বর!

রামগতি—আরও কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্ম্মভোগ ক'রবে উকিল? সরে পড়ো। বিছানা পত্তর সব বেঁধে ছেঁদে নিয়ে সরে পড়ো।

পরেশ—সরে প'ড়তে হয় আপনি সরে প্রড়ুন সরকার মশাই। আমার থাকতে হ'ল। আমায় না যেতে ব'ললে আমি যেতে পারবো না।

রামগতি—ওরে বাপু, জাত যাবে। ধর্ম্ম যাবে। শেষে চুণোগলির দালালি ক'রতে হবে!

পরেশ—তার মানে ?

রামগতি—গিন্নী কেন বাড়ী থেকে পালিয়েছে তা জানো ? খবর রাখো কিছু ?

পরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল—না জানি না।

রামগতি—(অতি সন্তর্পনে চুপি চুপি বলিল) অধঃপাতে গেছলেন। কর্ত্তার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে উনি অধঃপাতে গেছলেন। বুঝেছ ?

পরেশ তীব্রকণ্ঠে বলিল—কি ? কি ব'ললেন ?......

রামগতি—হ্যাঁ, হ্যাঁ—যা ব'লেছি তাই। ধরা প'ড়েছে এখন। লোক জানাজানি হ'য়ে গেছে। সাক্ষী-সাবুদ সব হাজির।

পরেশ রামগতিকে প্রবল এক ঝাঁকানি দিয়া বলিল—আপনি এতো বড়ো কথা ব'লতে সাহস করেন ?

(দ্বিজেনের প্রবেশ)

রামগতি—আমি ব'লছি না। আরে রাম রাম—ঐ ঝিগুলো জল্পনা ক'রছিল। কি বিপদ ! থাক বাবা, তুমি এইখানেই থাক ; বড়োলোকের তেল দাওগে।—আমি দেশে চ'ললুম। (প্রস্থান)

পরেশ—এই যে ছোটবাবু—। কি খবর বলুন তো ?

দ্বিজেন—খবর ভালো নয়, বলিয়া স্তব্ধ রহিল ক্ষণকাল ; পরে জিজ্ঞাসা করিল : রামগতি কি ব'লছিল ?

পরেশ—সে থাক্। সে অশ্রাব্য।

দ্বিজেন—আমায় বুঝি ব'লবেন না ?

পরেশ—আপনি জিজ্ঞাসা ক'রলেই বলতে হবে। কিন্তু মিনতি ক'রছি জিজ্ঞাসা কোরবেন না।

দ্বিজেন—বুঝতে পেরেছি। থাক তবে। (ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত)

পরেশ—মায়ের খবর কি বলুন ?

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চপল আবার কখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে ও নিজেই চমকে ওঠে। একি! লাল হ'য়ে উঠেছে যে, ওর সারা মুখখানা! ওভাবে—ও ক্ষেপে গেল নাকি! কি আবোল তাবোল ও ভেবে চলেছে। মীরা সে ধরণের মেয়ে নাও তো হতে পারে। হয়তো বা অতি সাধারণ ঘরেরই মেয়ে লেখাপড়া শিখে একটু পলিশ্‌ড্‌ হয়েছে। হয়তো বা সত্যিকারের প্রয়োজনই কিছু ওর আছে। কিন্তু কি প্রয়োজনই বা থাকতে পারে চপল বোসের সাথে মীরা সেনের? কবিতা 'অথবা গল্প লেখার সখকে রূপ দেওয়া ছাপার অক্ষরে? এ প্রয়োজন মেটার সাথে সাথে, সখ নিবৃত্তি লাভ করলে, হয়তো এই পরিচয়ের সূত্র যাবে ছিন্ন হয়ে। সত্যি সে-ই ভালো—ওভাবে। আয়নার মাঝে ওর চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে আসে। লাফিয়ে সরিয়ে আনে ও দেহটাকে। কি আশ্চর্য্য ও সব কি ভাবছে? কেনই বা ভাবছে! সামান্য পরিচয় পাতলা জলের মত, একটু কাৎ করলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে। নাঃ চপল বোসের মাথার ঠিক নেই আজ এই জন্যেই তো ও লোকজনের ভিড়ের মাঝে যেতে চায় না।......

পা দু'টোকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে ও বিছানার ধারে। তারপর ঝপ করে শুয়ে, আলো নিভিয়ে দেয়। যাক্ বাঁচা গেছে। ওর মাথায় নিশ্চয়ই ভূত চেপেছিল; ও ঘুমুবে এইবার নিশ্চয়ই।

বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে ও চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকে। বাঃ ঘুমও যেন ওর সাথে রাগারাগি করে চলে গেছে, আর এদেশ মাড়াবে না। ও মনে মনে এক-দুই গুণতে আরম্ভ করে। কিন্তু মনটা অবাধ্যের মত খালি চলে যায় অন্যদিকে। অন্ধকারের মধ্যে ও মেলে ধরে চোখ দু'টোকে। খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্নার যেটুকু আলো এসে পৌঁছেছে, মশারীর ভিতর দিয়ে তাকে দেখা যায় আবছায়াময়। খানিকক্ষণ ও তার দিকে তাকিয়ে থাকে নিবদ্ধদৃষ্টি। ও আবার চোখ বোজে। বোজা চোখের সামনে ভেসে ওঠে—কত কি ছবি। সাহিত্য সভা, বলবার জন্য ওর উঠে দাঁড়ানো, কথার জাল বুনে চলা, সবই যেন ওর কাছে এখন অপরূপ মনে হচ্ছে। বাঃ, ও ত বেশ বলতে পারে! বেশ গুছিয়ে, জোরের সাথে যুক্তির দ্বারা ও প্রমাণ করেছে ওর বক্তব্যকে। কোথাও একটু ফাঁক নেই। যুক্তি তর্কের নীরেট গাঁথুনি দিয়ে ও গেঁথে গেছে ওর বক্তব্যকে।......

নমস্কার............আপনার লেখার আমি একজন......চলুন না একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সমস্ত ঘটনাগুলো বায়োস্কোপের ছবির মত। অন্ধকারের কালো পর্দ্দার ওপর ওর মনের মেসিন থেকে যেন লাইট ফোকাস করা হয়েছে। অভিনয় করা চিত্রকে দেখানো হচ্ছে পর্দ্দার গায়। সেখানে দর্শকমাত্র ও নিজে, মেসিনম্যানও, আবার অভিনেতাও।

কি নামছেন যে! এটা যে মৌলালির মোড়। বসুন একটু...আমি এক্ষুণি আসছি।...ওর নাকে ভেসে আসে সেন্টের মৃদু গন্ধ। যাবার সময় মীরার আঁচলটা ঠেকে গিয়েছিল ওর হাঁটুর সাথে, সে সময় ও খেয়ালই করেনি, মন ছিল সংস্কারের জালে বদ্ধ। রাতের অন্ধকারে জাগছে তার মৃদু পরশ।...

...'ফোন নাম্বারটাও রেখে গেলাম ওই সাথে'...ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ছোট-খাট বাংলা প্যাটার্ণের বাড়ী, রাস্তার দিকে মুখ করা। গেট দিয়ে ঢুকতে লাল কাঁকর মাড়িয়ে যেতে হয়। পাশের ফুলগাছ গুলো মাথা উঁচু করে ডিঙি মারবার চেষ্টা করে। ফুল-গুলো হেলে দুলে যেন কথা কয়। বলে

দ্বিজেন থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—মা? নাঃ, সে খবর ভালো নয় পরেশবাবু।

পরেশ—খুজে পেলেন না?

দ্বিজেন—খুজে পেয়েছি, কিন্তু মা আর বেঁচে নেই!......

পরেশ—বেঁচে নেই!

দ্বিজেন—ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না। তাহার দুই চোখে অশ্রু ঘনাইয়া আসিয়াছে।

—দূরে জানলা হইতে মনীষা ডাকিল: মেজদা, খবর?

দ্বিজেন হাত নাড়িয়া কি বলিল বোঝা গেল না, কিন্তু মনীষার অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি ঝলকে ঝলকে ভাসিয়া আসিতে বিলম্ব হইল না।

পরেশ দ্বিজেনের হাত ধরিয়া বলিল:

—আসুন, ভেতরে চলুন।

(প্রস্থান)

ক্রমশঃ

—যাচ্ছো কোথায়? আমাদের সংসার গুলোকে একবার দেখে যাও। ওই দেখ —আইভি দেবী, নিজের বিছানা বিছিয়ে শুয়ে আছেন পরম আনন্দে গেটের ওপর। ওখান থেকে উনি নিত্য নতুন লোকের সাথে আলাপ করছেন। ওই দেখুন—মিসেস্ ম্যাগ্নোলিয়া। চারটীতে মেলে এখানে বসবাস করছেন। তবে আছেন তফাতে তফাতে। নীরবতা পছন্দ করেন কিনা তাই। সন্তান সন্ততি ওঁদের কমই কিন্তু বড় সুন্দর রূপ গুণ। লোকে আদর করে কাছে ডাকে। ওখানে ওই যে সারি বেঁধে রোগা রোগা মেয়েগুলি দাঁড়িয়ে আছে—কেউ রয়েছেন লজ্জায় মাথা গুজে, কেউ বা ঈষৎ হেসে, কেউ আবার অবাক হয়ে চেয়ে; ওরা ভারী ভাল মানুষ। চিনলেন কি? দিনের বেলায় লজ্জায় এক-গলা ঘোমটা দিয়ে থাকেন, রাত্রে খোলেন ঘোমটা। মুখের মিষ্টি গন্ধে করেন পথিককে পর্য্যন্ত পাগল। ওঁরা বঙ্গের বধু, বুকভরা মধু। কোন সাজ গোছের আড়ম্বর নেই, নিতান্ত সাদা-সিধা মানুষ নাম রজনীগন্ধা। এদিকে চেয়ে দেখুন—মিস্ প্যান্সি চেয়ে আছেন আপনার দিকে—কৌতুহলী দৃষ্টি। ভায়লেট রঙের গাউন পরেছেন। বিদেশী মানুষ, তাই হঠাৎ কেউ এদের চিনতে পারে না।...বেলা দেবী ওধারে হাঁসছেন আপনাকে দেখে, নতুন মানুষ দেখেছেন কিনা তাই। মিস্ 'ওলিও' ওধারে আছেন। নিজের গুণে সকলকেই মুগ্ধ করেন। ওই মাচাটার ওপর মিস্ 'ইনিথি্না' আরাম করছেন। আর ওদের পরিচয় তো আপনি জানেনই। মোগল আমল থেকে এদেশে বসবাস করেছেন। গুণী লোক তাই আমাদের রাণী করে রেখেছি। মনে থাকবে আমাদের সবাইকে? মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন আমাদের অভাব অনটন যদি কিছু থাকে। লজ্জায় বড় একটা কথা বলিতে পারি না আমরা মনিবের সাথে। বারান্দা দিয়ে উঠে যান আরো নতুন মানুষকে দেখতে পাবেন। নামগুলো আগে থাকতে বলে দিই। চিনে নিয়ে আলাপ করে যাবেন। ওখানে থাকেন সিঁড়ি বেয়ে পর পর আসন পেতে যথা ক্রমে—পিচেটিয়া, চাইনিজ পাম্, ডালিয়া, এ্যারিকা, ইউকেরিস, লিলি।

ফুলকুমারীদের পরিচর্য্যা নিয়ে চপল সোজা ঢুকে পড়ে ভেতরে। ঝক্ ঝকে তক্ তকে বাড়ী। বেশী আড়ম্বর নেই। সামনেই ড্রইং রুমটায় খান তিনেক টেবিল, বিভিন্ন রকমের; তাদের ঘিরে নানা রকমের চেয়ার, ধার সাথে যে খাপ খায়। দেয়ালের গায়ে কতগুলো ছবি. এদেশী নয় নিশ্চয়ই। বাঃ "এটা যে হেমেন মজুমদারের। বাঙালী স্থান পেয়েছে দেখছি।. এ ছবিগুলোর শিল্পীর নাম নেই—বাজারে কেনা কি? তাহলেও মন্দ নয়, এদেশী ছবিই বোধ হচ্ছে। ফটোগুলো কার? আত্মীয় বন্ধুদের হবে হয়তো মীরার বাবার বড় অয়েল পেন্টিংটা সামনেই। বাঃ বুদ্ধের মূর্ত্তিটাতো বেশ চমৎকার। নাঃ এদের বেশ ভালো রুচি আছে। ভেড়ার মূর্ত্তি যে রাখেনি এই যথেষ্ট।......লাইটগুলোর শেড ওর পছন্দ হয় না; ও ভালোবাসে একেবারে সাদা। ড্রইং রুমটা থেকে চপল পূর্ব্ব-দিককার ঘরে ঢোকে। এটা ষ্টাডী, মীরার নিশ্চয়ই। বাঃ অনেক বই, রিভল্‌ভিং বুক কেসে সাজানো আছে পরপর। মাঝখানে ছোট গোছের একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। খোলা র‍্যাকটায় সাজানো বাঁধান মাসিক পত্রিকার গাদা। বেঁটে গোছের চওড়া আলমারীটা থেকে উকি মারছে—বাইরন, টেনিসন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী। হুইটম্যান, সুইন্‌বার্ণও আছে দেখছি। কীট্‌স্ হুইটএধার, ওধারে কাউপার। ওগুলো কি পেঙ্গুইন বুক সিরিজ? এভরিম্যান্‌স্ লাইব্রেরীর অনেক বই ওধারে সাজান। ল্যাম্বের বইগুলো কে পড়ে মীরা? ও! এই বইটা যে ও আর একবার পড়তে চেয়েছিল, থাউসেণ্ড বেষ্টষ্টোরী। ষ্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচারের ছবির বইটাও আছে দেখছি। আহাঃ! এদের এডিসন্ সেক্সপীয়র কিনলো কেন? ভারী ছোট ছোট লেখা, চোখ ঠিকরে যায়। মোঁপাসার সব কটা ভলিউমই রয়েছে, হামসুন, হুগো. গোর্কী এদেরও আনা হয়েছে। 'বার্নার্ডশ' কেনে নি? নাঃ এই যে নিচের থাকে রয়েছে। বাঃ রবীন্দ্রনাথ, শরৎবাবুর সব বইকটাই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। বাঙালীর মান তবুও এরাই কর্তকটা রেখেছেন। মীরার হিউমারের টেষ্টও আছে দেখছি। বাংলার মধ্যে পরশুরাম, কেদারবাবুকে কিনেছে, রবীন মৈত্রেয়কেও সাথে সাথে। ...নাক দিয়ে ওর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। অগাধ বই দেখলে ও নিজেকে ভুলে যায়। নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজে নিজেই চমকে উঠে ও ভাবলো —উঃ কল্পনায় ও কতদুর গিয়ে পৌঁছেছিল। কোথায় বা মীরাদের বাড়ী আর কোথায় বা বই-এর আলমারী! মীরাদের বাড়ী ঠিক ওরকম ধরণের-নাও হতে পারে; হয়তো ঠিক্ই উলটো। নিজের মনে মনে যে সব জিনিষ ও ভালবাসে, কল্পনাবলে সেই সব জিনিষই ও দেখে চলেছে। ওর মাথাটা টিপ্ টিপ্ করে। রাত এতক্ষণে ভোরের সীমানার দিকে পা বাড়িয়েছে। হয়তো এক্ষুণি ও শুনতে পাবে বাসের হর্ণ, নয়তো রিকসর ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ। কি বিশ্রী লাগছে ওর শরীরটা।

সারারাতটাই ও কাটিয়ে দিলে যত সব বাজে কল্পনা করে! কেন এই সামান্য একটা মেয়ের জন্য ও ভাববে এতক্ষণ? নিজের মনের ওপর ওর নিজেরই ঘৃণা জন্মায়। শত ধিক্কার দেয় তাকে। ও ভাবে—চপল বোস, তুমিও এত দুর্ব্বল আর ভাবপ্রবণ? কি সব অলীক কল্পনা করে চলেছ তুমি? তুমিই না এককালে মেয়েদের সঙ্গকে পরিহার করে চলতে? তুমিই না আজকালের মেয়ে বর্ণনা প্রধান উপন্যাস গুলোকে বিষচক্ষে দেখতে? আর আজ? আজ সারা রাত্রি ধরে তুমিই যে সেই সব উপন্যাসের বাস্তব অভিনয় করে চললে মনে মনে! চপল নিজকে চিরে চিরে বিচার করে দেখতে লাগলো। বাড়ীর ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বেজে গেল এক, দুই, তিন, চার। ও উঠে দাঁড়াল। বাইরে থেকে মুখ, হাত, পা ধুয়ে, খানিকটা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগালে কানদুটোয়, ঘাড়ে। তারপর ফিরে এল নিজের ঘরে। উঃ, এতক্ষণে তার কি তৃষ্ণাই পেয়েছিল। তৃষ্ণার জলটুকু, যা সে রোজ রাত্রে শোবার আগে খেয়ে শোয়; তাও খেতে গিয়েছিল ভুলে। এমনিই তার মতি-বিভ্রম! গ্লাসের ঢাকনাটী খুলে পুরো গ্লাসের জলটা দিলে গলার মধ্যে চালিয়ে। তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে বসলো গিয়ে ক্যাম্প-চেয়ারটায়। চুরুট টানতে টানতেই ও চেয়ারটার কোলেই এলিয়ে পড়লো।

ক্রমশঃ

শ্রীদুর্ব্বাসা
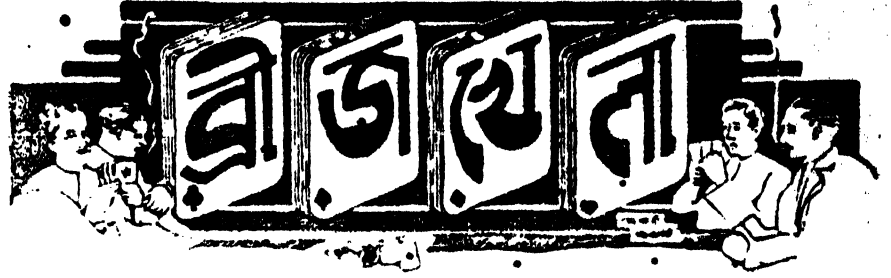
সাম্ভাবিক আংশিক পয়েন্ট— আংশিক পয়েন্টের (Part score) ডাকের বিষয় অনেক ক্রীড়কেরই সম্যক্, এমন কি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানেরও অভাব দৃষ্ট হয়। আসল কথা এই যে, এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের অভাবই অনেকাংশে দায়ী। আংশিক-পয়েন্ট থাকার দরুণ কত ক্রীড়ক যে খেলা নষ্ট করেন তার ইয়ত্তা নেই, অথচ কুফল দেখেও অনেকে 'ঠেকে শিখতে' পারেন না। সুতরাং আমরা আংশিক-পয়েন্ট থাকার বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

২০ বা ৩০ পয়েন্ট প্রাপ্তিকে আংশিক পয়েন্ট না বলাই ভালো। যদি ক্রীড়ক কখনো একটির ডাকে কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ খেলেন তো তাঁর ভুলে যাওয়াই উচিত, অন্ততঃ তখনকার মত, যে আংশিক-পয়েন্ট তাঁদের মোটেই নেই। পয়ের দানে যদি আপনি তিনটি ইস্কাবন, দুইটি ফেরাই বা চারটি চিড়িতন পর্য্যন্ত ডাক দেন, তো তখন আপনি মনে করতে পারেন যে আগের বারের কিছু পয়েন্ট আছে এবং সাধারণতঃ গেম-পয়েন্ট অবধি না উঠলেও চলবে,—কেন না এই একটু কম ডাকেই ১০০ পয়েন্টে পৌছান যাবে। এটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, গেম-পয়েন্টের কাছাকাছি না যাওয়া পর্য্যন্ত আগের দানের আংশিক-পয়েন্টের কথা নিয়ে ভাবা কুফলপ্রদ। যদি আপনি পূর্ব্বোক্ত পরামর্শে না চলেন তো তার ফলে কখন না কখন আপনাকে নিম্নলিখিত অবস্থায় পড়তে হবে।

(১) আংশিক-পয়েন্ট আছে বলে আপনি হয়তো কায়ক্লেশে প্রারম্ভিক ডাক দিলেন।

(২) আপনার আংশিক-পয়েন্ট আছে বলে তার ওপর আপনার খেঁড়ী কায়ক্লেশে আপনার প্রারম্ভিক ডাককে বজায় রাখতে ডাক দিলেন।

(৩) পুনরায় আপনি উত্তরে ডাক দিয়ে গেলেন, আপনার আংশিক-পয়েন্ট আছে বলে।

(৪) আপনার খেঁড়ী আবার ডাক দিলেন, কেন না গেমের জন্য আর একটি ডাক বাড়ানো দরকার, কারণ পূর্ব্বেই আপনার আংশিক-পয়েন্ট রয়েছে।

(৫) এবং আরও মজা এই যে, এই অবস্থায় আপনার প্রতিরোধকারী ডবল দিলেন; যে হেতু আপনার আংশিক-পয়েন্ট রয়েছে এবং তার ওপর আপনারা গেম করবার জন্য তিনটি হরতনে ডাক দিয়ে গেছেন, তখন ডবল কার্য্যকরী হলেও খেলা হচ্ছে আর না হলেও খেলা হচ্ছে; সুতরাং ডবল দিয়ে দেখাই উচিত।

(৬) সাধারণ অবস্থায় হয়তো সে হাতে সাতটি পিট নিয়ে খেলা করতে আপনি দস্তুরমত ভয় পেতেন, কিন্তু এখন আপনি নয়টি পিট নিতে স্বীকৃত হলেন। ফলে

আপনাকে চারটি পিটের জন্ত খেঁসারৎ দিতে হল। অতএব ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তো ১০০ পয়েন্টের খেঁসারতেই শিক্ষা শেষ নচেৎ হয়তো আরও বেশী।

আংশিক-পয়েন্টের ভূত:— আংশিক-পয়েন্টের ভূত ঘাড়ে চাপলে যে কি অবস্থা হয় তা নিম্নলিখিত খেলাটির বিবৃতি পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন। আর প্রতিদিন প্রত্যেক জায়গায়ই এই ধরণের ঘটনা ঘটে আসছে।

'দ' তাস-বণ্টন করেছেন। কোন দলই ভাল্‌নারেবল নয়। 'উ-দ' দলের আংশিক পয়েন্ট আছে ৩০।

ইস্কাবন—আটা, ছক্কা, পঞ্জা।
হরতন—গোলাম, সাতা।
রুহিতন—দশ, সাতা, চৌকা, দুরি।
চিড়িতন—সাহেব, আটা, ছক্কা, তিরি।

প		পূ
ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, নয়।	উ	ইস্কাবন—সাহেব, দশ, সাতা, চৌকা।
হরতন—টেক্কা, নয়, পঞ্জা, দুরি।	প পূ	হরতন—বিবি, তিরি।
রুহিতন—সাহেব, নয়, পঞ্জা।	দ	রুহিতন—গোলাম, আটা, তিরি।
চিড়িতন—দশ, সাতা, চৌকা।		চিড়িতন—টেক্কা, গোলাম, পঞ্জা, দুরি।

ইস্কাবন—গোলাম, তিরি, দুরি।
হরতন—সাহেব, দশ, আটা, ছক্কা, চৌকা।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, ছক্কা।
চিড়িতন—বিবি, নয়।

ডাক হয়েছিল নিম্নরূপ,

'দ'	'প'
একটি হরতন	পাশ
দুইটি হরতন	পাশ
পাশ	ডবল
পাশ।	

'উ'	'পূ'
একটি ফেরাই	পাশ
তিনটি হরতন	পাশ
পাশ	পাশ

৩০ পয়েন্ট যদি আংশিক গেম করা না থাকত তো খুব সম্ভবতঃ 'দ' ডাক দিতেন না। যেহেতু আংশিক পয়েন্ট থাকলে প্রারম্ভিক ডাক আধা-বাধ্যকারী হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে, সেই হেতু 'উ' একটি ফেরাই ডাকে ডাকটি বাড়িয়ে গেলেন। 'দ'র হাতে পুনর্ব্বার ডাক দেবার মত কিছুই ছিল না; কিন্তু একটুখানি এগুলে যদি ডাক বজায় থাকে, তার জন্ত একটি ফেরাইএর ডাক ছেড়ে দিতে দ'এর মনঃপূত হল না। যে হেতু তাঁর হাত দুইটি ফেরাইএ ডাক দেবার পক্ষে ভয়ানক দুর্ব্বল, তিনি অগত্যা গোড়ায় কায়ক্লেশে যে রঙে ডাক দিয়েছিলেন, সেই রঙেই পুনর্ব্বার ডাক দিলেন। 'উ' দেখলেন মাথা যখন গলানো হয়েছে তবে একটি ডাকের জন্ত গেম নষ্ট করে লাভ কি, অতএব ঝুলে পড়া যাক্‌' গোছের তিনটি হরতনে ডাক দিলেন। 'প' সাধারণ অবস্থায় হয় তো তিনটি হরতনে ডাক দিতেন না, কিন্তু যে হেতু বিপক্ষ দলের আংশিক পয়েন্ট রয়েছে ডবল বিফল হলেও গেম হবে, কার্য্যকরী হলেও গেম হবে, তবে ডবল দিয়ে 'এস্‌পার ওস্‌পার' যা হয় একটা হয়ে যাক। মোটের ওপর তাঁর ('প'র) খুব আশা আছে যে অন্ততঃ চারখানি পিট পাওয়া যাবে, সুতরাং বিপক্ষ দলের অধিক পিট পাবার সম্ভাবনা নেই।

'প' চিড়িতনের দশে প্রাথমিক চাল দিলেন। ডামি ও 'পূ' ছোট তাস দিয়ে গেলেন, আর 'দ' চিড়ের বিবিতে পিট ধর্‌লেন। 'দ' একতাস ছোট হরতনে চাল দিলেন, আর ডামি সাতা দিয়ে 'ফিনাস' করলেন, কারণ ডবল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেছে যে প'র হাতে হরতনের নয় থাকাই সম্ভব। 'পূ' হরতনের বিবিতে পিট ধরে ইস্কাবন খেল্‌লেন। 'প' ইস্কাবনের বিবিতে পিটখানা ধরেই ইস্কাবনের টেক্কায় পিট নিলেন, হরতনের টেক্কার পিট নিলেন। তারপর তিনি ইস্কাবন খেল্‌লেন। 'পূ' ইস্কাবনের সাহেবের পিট নিয়ে ইস্কাবনের দশ পেড়ে খেল্‌লেন। 'দ' সুবুদ্ধি করে ইস্কাবনের দশে তুরুপ করার পরিবর্ত্তে একখানি চিড়িতন পাশিয়ে গেলেন। কিন্তু প'ও কৌশলী খেলোয়াড়। তিনি 'পূ'র ইস্কাবনের দশের পিটের ওপরই তুরুপ করে শেষ রঙখানি খেলে 'দ'এর হাতে পিট দিলেন। পাছে 'পূ' পূর্ব্বোক্ত পিটখানি ধরে রুহিতন খেলে বসেন এই ভয়েই 'প এই ধরণের খেল্‌তে বাধ্য হলেন। এখন 'দ'কে বাধ্য হয়ে নিজের দিক থেকে রুহিতন খেল্‌তে হল, যার ফলে রুহিতনে বিপক্ষদল দুখানি পিট আদায় কর্‌লেন। সুতরাং ডাকদার পাঁচটি পিট পেলেন এবং তাঁকে খেসারৎ দিতে হল ১০০ পয়েন্ট।

ডাকার ফলে 'উ-দ' দলকে খেসারৎ দিতে হল বটে, আমরা কিন্তু এর থেকে চমৎকার শিক্ষা আহরণ কর্‌লাম। যখন আংশিক পয়েন্ট থাক্‌বে তখন যেন আমরা প্রারম্ভিক ডাকের প্রত্যুত্তরে মোহাবিষ্ট হয়ে ডাক দিয়ে না যাই; আর যদি ডাক দিতেই হয়, তো অনার-বিশিষ্ট রঙেই ডাক দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। এ পরামর্শের অন্যথাচরণে আংশিক-পয়েন্টের ভূত তার প্রাপ্য আদায় করবেই।

—

খেয়ালী চিত্রপট

নিউ থিয়েটাসের "সাথী" চিত্রের একটি দৃশ্যে—শ্রীমতী কানন। ছবিখানা ৩রা ডিসেম্বর হইতে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ ক'রবে। ছবিখানা পরিচালনা করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত ফণী মজুমদার।

"সাথী" চিত্রে শ্রীমতী কানন।

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৮

বাংলার মন্ত্রী-সমস্যা

গত পূর্ব্ব সংখ্যার 'খেয়ালীতে' বাংলার সম্মিলিত মন্ত্রী-মণ্ডল গঠন সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহারই অব্যবহিত পরে মিঃ শ্যামসুদ্দিন ও মিঃ তামিজুদ্দিনের মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অনেকেই আমাদের প্রদত্ত বিবরণকে কাল্পনিক বলিয়া ব্যঙ্গ ও উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা পুণরায় ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের সংবাদ মোটেই ভিত্তিহীন নহে এবং রাষ্ট্রপতি পাঞ্জাব পরিভ্রমণের প্রাক্কালে সমস্তই স্থির করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান অর্থসচিবের সহিত যে মিলনের আভাষ আমরা দিয়াছিলাম তাহাতে কেহ কেহ ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে রাজনীতি স্থিতিশীল পদার্থ নহে সুতরাং ইহাতে বিচলিত বা ব্যথিত হইবার কিছুই নাই। আর স্বয়ং রাষ্ট্রপতি যখন এই মিলনের প্রবর্ত্তক তখন বৃহত্তর আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ-করে এই মিলন সমর্থনযোগ্য। স্থিরীকৃত হইয়াছে যে নলিনীবাবু যে দিন অর্থসচিবের পদ পরিত্যাগ করিবেন সেই দিন অপরাহ্নেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অপসারণ করিবেন। আমাদের রাজনীতিতে অভিজ্ঞ সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে ইতিমধ্যে নলিনীবাবু ও শরৎ বাবুরও মিলন হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর 'রঞ্জনী'র কক্ষে শরৎবাবু নলিনীবাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়াছেন। বর্ত্তমান অর্থসচিবের সহিত কংগ্রেসের মিলনের শেষ ও প্রবল অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসী-কোয়ালিশনী মন্ত্রী-সভা যে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর তাহা সহজেই অনুমেয়।

১২ই ডিসেম্বর ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির যে সভা হইবে তাহাতে বাংলার কংগ্রেসী কোয়ালিশনী মন্ত্রী-সভা গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হইবে এবং তাহার পরেই নলিনীবাবু পদত্যাগ করিয়া বসু-ভাতৃদ্বয়ের সহিত একত্রে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনে তৎপর হইবেন। নলিনীবাবু ওয়ার্দ্ধায়ও যাইতে পারেন।

লাহোরে রাষ্ট্রপতি স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে বাংলায় বর্ত্তমান প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীমণ্ডলের আয়ু শেষ হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের পতন হইলে তিনি বিস্মিত হইবেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে একজন মুসলমানকে প্রধান মন্ত্রী করিয়া বাংলার কংগ্রেসী কোয়ালিশনী মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবে। সেই মুসলমান ভাগ্যবানটী কে—মিঃ ফজলুল হক না অধ্যাপক আবদুল বারি? রাষ্ট্রপতির এই স্পষ্ট ঘোষণার পর যাঁহারা আমাদের প্রকাশিত সংবাদকে অলীক বলিয়া উপহাস করিয়া শরাঘাত করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন আশা করি।

বাংলা সরকার একটী 'কমার্শিয়াল মিউজিয়াম' গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীকে এই মিউজিয়মের কর্ত্তার পদে বসান স্থিরীকৃত হইয়াছে। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ ও বর্ত্তমান

অর্থসচিবের অনুমোদন অনুযায়ী প্রস্তাবটী কয়েক সপ্তাহ ধামাচাপা রহিবে। কংগ্রেস কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে জ্ঞানাঞ্জনবাবুর উক্তপদ গ্রহণে সঙ্কোচ থাকিবে না এবং কংগ্রেস-পরিচালিত কর্পোরেশনেরও অনুমতি দিতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। আমরা জ্ঞানাঞ্জনবাবুর এই ভাগ্যোদয়ে বিশেষ প্রীত: তিনি যোগ্য ব্যক্তি: তাঁহার সুপরিচালনায় বাংলায় যে মিউজিয়াম গড়িয়া উঠিবে তাহাতে বাংলার স্বদেশজাত শিল্প-প্রচারের অশেষ সহায়তা হইবে। জ্ঞানবাবুর সহিত তাঁহার অন্যান্য অনুচরেরাও বাংলা সরকারের মিউজিয়ামে যোগদান করিবেন। বাহুল্যবোধে কর্পোরেশন নিজস্ব মিউজিয়ম উঠাইয়া দিবেন।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাইব্যুনালের এ্যাসেসার নিয়োগের সময় কিরণবাবুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিবৃত্ত করিবার সময় রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে বাংলার অন্যতম মন্ত্রী-পদ যখন তাঁহার করতলগত তখন তাঁহার পক্ষে এই নিম্নতর পদের আকাঙ্খা করা শোভন নহে। রাষ্ট্রপতি কিরণবাবুকে বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১৯২০ সালের প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ১৯৩৮ বা ১৯৩৯ সালে বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রী পদে আসীন হইলে রাজনীতির চমকপ্রদ বিবর্ত্তনেরই সূচনা করিবে।

বর্ত্তমান অর্থসচিব রাজপথের ভ্রাম্যমান যুবকরূপে জীবন-যাত্রা সুরু করিয়া চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলির মধ্য দিয়া ও প্রতিকূল শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া বাংলার রাজনীতিতে যে অপরিহার্য্য শক্তি-শালী ও কৌশলী পুরুষে পরিণত হইয়াছেন শরৎচন্দ্রের সহিত মিলনে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। রাজনীতি পরমহংসদেবের বা স্বামীজির আদর্শে পরিচালিত হইতে পারে না—Bait, Bluff ও Briberyর প্রয়োজন আছে!!!
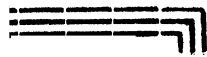
চৌর্য্য শিল্পের মাহাত্ম্য

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সন্ন্যাসীর চিঠি"র একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—"কালকোটাকে ইংরেজরা কালকাটা (Calcutta) বলে, আর আমরা একটু শুদ্ধ কোরে বলি কলিকাতা। কলিকাতা কথাটা "না সাপ না বেঙ।" কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কি অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি! শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি এই 'না সাপ না বেঙ' কলিকাতা কথাটাকে তাঁহার মন-গড়া বিজ্ঞানসম্মত ভাষা-তত্ত্বের যন্ত্রে চোলাই করিয়া দেখাইয়াছেন যে—"কলিকাতা একটি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ।" 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"ইহার অর্থ, 'কলি' বা কলিচুণের জন্য 'কাতা' বা শামুক-পোড়া। সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন 'সুতানুটী' নাম, তেমনি কলির বা চুণের ও কলি-চুণের জন্য শামুকের আড়ত এবং চুণের কারখানা হইতে 'কলিকাতা' নাম।"—ইহা পড়িয়া আমাদের সেই বুঝোন মোড়লের গল্প মনে পড়িতেছে। একদা বুঝোন মোড়লের গ্রামের এক রাস্তা দিয়া রাত্রে এক হাতী চলিয়া গিয়াছিল। সকালে উঠিয়া গ্রামবাসীরা পথে হাতীর পায়ের দাগ দেখিয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে বুঝোন মোড়ল আসিয়া তাহাদিগকে পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল—

"চোর এসেছিল কাল রাতে,
নিয়ে গেছে ঢেকি এই পথে,
গুতাতে—গুতাতে—গুতাতে।"

কথাটা তখনই জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। গ্রামের সকলে বুঝোন মোড়লের বুদ্ধির 'ধন্যি ধন্যি' করিতে লাগিল। সুনীতিবাবুও কলিকাতা-নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে গিয়া যেরূপ বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বুঝোন মোড়লের মুখও মলিন হইয়া যাইতে পারে। শনি-সম্প্রদায় সুনীতিবাবুর এই কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য পরিষদ-গৃহে একটি সভা করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলে ভাল হয়!

* * *

হরেকেষ্ট! হরেকেষ্ট!!

ফাঁকি দিয়া কোনও বড় কাজ হয় না, এ কথা সত্য। কিন্তু ফাঁকি দিয়া অনেক ছোটকে অনেক সময়ে বড় হইতে দেখা যায়। এই বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য ক্ষেত্রে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত এত বেশী যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তবে সব ছোটই যে একরকম ফাঁকিবাজির পক্ষ ধরিয়া 'বড়' হইয়া থাকে, তাহা নহে। ফাঁকিবাজির রূপ অনন্ত। ইহার সেবকও অনন্ত। কোনও কোনও সেবক সুবিধা বুঝিয়া সময়মত বড়দের পায়ে কামড়ও দেয়, আবার তেলও মাখায়। শনি-সম্প্রদায়-সেবিত অনেকে বাস্তবিক বড়ই, একথা বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে চৌর্য্য-শিল্পই বোধ করি বড় হইবার সব চেয়ে বড় উপায়। আমরা জানি, চৌর্য্য-শিল্পে হাত পাকাইয়া অনেক ছোটই ক্রমে পণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্য-রত্ন প্রভৃতি হইয়াছে। চৌর্য্য-শিল্পের মাহাত্ম্যে আজ অনেকেই সাহিত্যের সিংহাসনে চড়িয়া বসিতেছে!

* * *

অহো, সেই হরেকৃষ্ণ!—অনেকের বোধ হয় এখনও মনে আছে, কুমার মহিমা-নিরঞ্জনের 'বীরভূমি-বিবরণ' বগলে করিয়া বেচারা কত লেখক ও সমালোচকের দ্বারে দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়াইত! সেই হরেকৃষ্ণ আজ পণ্ডিত হইয়াছে—কত গবেষণা করিতেছে—চণ্ডীদাসকে লইয়া কত গণ্ডগোল পাকাইতেছে! তাহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাকে আমরা নগেন্দ্রবাবুর 'বিশ্বকোষে' হরেকৃষ্ণ-লিখিত 'অভিরাম গোস্বামী' শীর্ষক রচনাটি এবং সেই সঙ্গে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট কর্ত্তৃক লিখিত ও ১৩৩১ সনে মুদ্রিত "শ্রীশ্রীদ্বাদশ গোপাল" গ্রন্থের "শ্রীঅভিরাম গোস্বামী" নামে প্রবন্ধটি মিলাইয়া পড়িতে অনুরোধ করি। পড়িয়া হরেকৃষ্ণবাবুর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে যদি তাঁহার মনে কিছু উদিত হয়, তবে তাহা আমাদের জানাইবেন। আমরা তাহা 'খেয়ালী'তে সাদরে মুদ্রিত করিব।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্ত্তী

গত সংখ্যায় কথা ছিল আগামী সংখ্যায় অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যায় আমাদের আলোচনার কেন্দ্র হবে সাধারণের খাদ্য কি হওয়া উচিত? সমস্যা বড় জটিল এবং এর প্রশ্নোত্তরের জন্য যে স্থান আমাদের পাওয়ার প্রয়োজন, তার চাইতে অনেক কম স্থান আমাকে দিয়েছেন সম্পাদক মহাশয়। কাজেই এই সংখ্যায় অনেকটা নমো নমো করে সারতে হবে বলে মনে হোচ্ছে। তবে এটা ঠিক আপনাদের সহানুভূতি আর সুদৃষ্টি আমার ওপর থাকলে—আমরা অনেকখানি স্থান সম্পাদক মহাশয়ের কাছ থেকে আদায় করতে পারব।

সে কথা যাক। উপস্থিত দেখতে হবে আমরা আজ কোথায় আর কি কি জিনিষকে আমাদের খাদ্য বলে গ্রহণ করেছি? প্রথম প্রশ্নের উত্তর গত সংখ্যায় দিয়েছি: আমরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা এসে বসবাস স্থাপন করেছি সহরে, সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছি পল্লীগ্রামের সঙ্গে। আচ্ছা, এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অনেকেরই অনেক মত দেওয়া হবে বটে কিন্তু সেই মতের মধ্য থেকে আমাদের নিরূপণ করতে হবে কোনটা আজ চলছে। অর্থাৎ আমরা আজ কি খাদ্য গ্রহণ করছি শরীর সবল রাখতে! সহরের কোন মা বোনকে একথা জিজ্ঞেস করলে সে নিশ্চয় আমাকে পাগল ভাববে। সত্যি সহরের আবার খাদ্যের অভাব কি?—তবে তার প্রায় সবই যে কুখাদ্য তাতেই বা সন্দেহ কিসের? সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায় সকালে উঠে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে প্রথমেই (অনেক জায়গায় মুখ না ধুয়ে!) এক পেয়ালা চা খাওয়া হোল। তারপর একটু বেলা হোলে, মানে কর্ত্তারা বেরিয়ে গেলে ছেলেমেয়েদের দিয়ে সামনের উৎকলদেশীয় তেলেভাজা দোকানের মালিকের কাছ থেকে কিছু গরম অথবা ঠাণ্ডা যাই হোক আনান হোল, তাই খেয়ে কিছু জল পানের পর অম্বলের ঢেকুর উঠতে লাগল—ভাত তরিতরকারী ইত্যাদি দু এক গ্রাস খাওয়া হোলোতো খুব হোল, তা না হোলে ঝি চাকরেরা নিয়ে গেল বাসায়। প্রায় সন্ধ্যার সময় কাপড় কাচার পর, চুল বাঁধা হোলে আবার চা আর তার সঙ্গে বড় জোর ঘি-য়ে ভাজা (বেশী জায়গাই ভেজিটেবেল ঘি) খান তিন চার কচুরী কি সিঙ্গাড়া! তারপর সেই অম্বলের সাক্ষাৎলাভ, কেউ সোডা খেলেন, কারোর আবার কোন পেটেন্ট ওষুধ মজুত আছে।

হয়তো অনেকে ভাববেন এসব কথা বলবার স্বার্থকতা কি? এর স্বার্থকতা যে কি তা যেভাবে ইচ্ছে ভেবে দেখতে পারেন—তবে আমার বলবার উদ্দেশ্য হোচ্ছে—খাদ্যের দ্বারা আমাদের শুধু যে জীবন রক্ষা হয় তা নয়, আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, সুখ, স্বচ্ছন্দ জাতির আশা ভরসা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত জীবন সবই নির্ভর করে—তাকে আমরা যে কি রকম অবহেলা করছি তারই আলোচনা করবার জন্যে উপরোক্ত কথাগুলি বলতে হোল। মাত্র পচিশ বছর আগে যারা কলকাতায় বাস করে গেছেন, তাদের স্বাস্থ্য আর আজকের বাসিন্দার স্বাস্থ্যের কোনরূপ তুলনা কেন চলে না তার কারণ কি? —এ বিষয়ে আমার বলা কথা না শুনে নিজেরা একটু প্রত্যক্ষ করলে ভাল হয় বলে আমার বিশ্বাস, কারণ কথা শুনে সেটাকে কার্য্যে প্রতিফলিত করার চেয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করে কাজে লাগালে তার ফল অনেক বেশী হবে। তার সময় কই এই ত' সংসারের সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দেওয়া ভাল নয় কি—এতে পরিশ্রমই বা কি? থাক—আমি আবার আমার আলোচনার বিষয় বস্তুর বাইরে না চলে যাই সেই ভয় হয়। নিজেদের স্বাস্থ্য, যাতে করে নিজেরাই হব সুখী সে বিষয়ে যদি একটু সময় নষ্ট করা যায় সংসারের কাজ বজায় রেখে তাতে ক্ষতি কি। কর্ম্ম প্রবণতা না যোগালে কাজে মন বসবে কেন। হ্যা কি বলছিলাম—পঁচিশ বৎসর আগেকার মা বোনেদের স্বাস্থ্য আর এখনকার মা বোনেদের স্বাস্থ্যের এত ব্যতিক্রম কেন, তার কারণ তারা জানতো আমরা এখন থেকে যদি নিজেরা শক্ত ও সবল না হই, ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান সন্ততিগণ হবে……এ কথা ভাবে কজন। পয়সা ফেললাম, খাবার এল খেলাম। ভাল জিনিষ এল ভাল, না এল ভাল। যে দোকানদার পয়সা পেল শরীর হয়তো তার বেশ শক্ত, আর যাঁরা তার দোকানের খাবার খেল, তাঁরা কেউ বা……অবান্তর কথা বলাও বিধি নিষিদ্ধ—কথা সত্য বলবে, অপ্রিয় সত্যকথা বলবেনা, কিন্তু অপ্রিয় সত্য না বলার অভ্যাসে আমরাও যেমন কেমন হয়ে গেছি। চোরকে যদি চোর বলা যায় তবে অপ্রিয় সত্য বলা হলো বলে কি সে চোর তার

ব্যবসায় চিরকাল সমান তালে পা ফেলে চলবে। এ কি রকম কথা—কোনও চিররুগ্ন ব্যক্তিকে যদি বলা হয়—আপনার ভিতরে অনেক রোগ আছে—সেজন্য কি সে আমায় গালি দেবে, না সে তার রোগ সারাবার ব্যবস্থা করবে না। যে যা ভাল বুঝবে, করবে—এইত হয়েছে আজকালকার ধর্ম্মই বলুন আর কানুনই বলুন। আবার কোথায় এলুম—কি মুস্কিল। সেই পুরানো কথায় আবার ফিরতে হলো, তা না হলো লোকে বলবে—গেল ধান বাণ্‌তে, গেয়ে এল শিবের গীত। ভাল কথা। পচিশ বৎসর আগেকার মা বোনেদের স্বাস্থ্যের কথা ধরুন।

সকালে তাদের কিছু খাওয়া ঘটে উঠত না। দশটার পর কর্ত্তারা সব অফিসে চলে গেলে—বেশীরভাগ স্থলে মুড়িমুড়কী, সন্দেশ (বাড়ীতে তৈয়ারী) ছিল জল খাবার। ইতিমধ্যে বাড়ীর কর্ত্তারা বেরিয়ে গেলে পর মেছুনী এসে হাজির হোত মাছ নিয়ে। আর কর্ত্তারা বেরিয়ে যাবার পর এই আলাদা মাছ কেনা হোত। তার পর রান্নার পালা আর এক পর্ব্ব হোত। ভাত খাওয়া শেষ হোত মাছ, সামান্য তরিতরকারী আর দুধ-গুড় দিয়ে। বিকেলে জলখাবারের কোন হাঙ্গামা ছিল না আর চায়ের নামও বোধ হয় অর্দ্ধেক লোক শোনে নি।

তখনকার খাবার আর এখনকার খাবারের তুলনা করলে দেখা যায়, মাছ আর দুধ খাওয়া আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং চা দিয়েই বোধ হয় সে স্থল পূরণ করতে লেগেছি। অবশ্য এটাও ঠিক যে আধুনিক বাঙ্গালীর খাদ্য বলে যদিও ডাক্তারেরা এরকম তালিকা দিয়েছেন:—প্রাতে কিঞ্চিৎ মুড়ি, নারিকেল এবং অঙ্কুরিত ছোলা ভিজান।

মধ্যাহ্নে ভাত দেড় পোয়া; ডাল, মৎস্য ও মাংস সর্ব্বসমেত আধ পোয়া; শাকসবজী আধ পোয়া; ঘৃত, তৈল, লবন ও মসলাদি প্রত্যেকটির আধ ছটাক করিয়া।

বৈকালে দুগ্ধ আধ পোয়া এবং কিঞ্চিৎ সুপক্ক ফল ও মিষ্টান্ন।

রাত্রে মধ্যাহ্নের অনুরূপ (ভাতের পরিবর্ত্তে তিন ছটাক ময়দা বা আটার রুটি খাওয়া যাইতে পারে)।

তবুও এই তালিকানুযায়ী কাজ করা যে আমাদের বর্ত্তমানে আর্থিক অবস্থায় অসম্ভব তা স্বীকার করতে বোধহয় কেউ দ্বিধা বোধ করবেন না অবশ্য যাঁরা মধ্যবিত্ত গেরস্থ। কাজেই এই ডাক্তারী মত বজায় রেখে কতদূর আমরা সুখাদ্য গ্রহণ করতে পারি তার একটা তালিকা (অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতানুযায়ী) আগামী সংখ্যায় দেব। আপনাদের যদি কিছু সেই তালিকার সম্বন্ধে বলবার থাকে তো জানাবেন সে সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা করা হবে ও আপনাদের যদি কোন ব্যক্তিগত মত প্রকাশের ইচ্ছা থাকে তা' জানাবেন।

(বিলাসী)

সাথী

'সাথী'—যে ছবির হিন্দি সংস্করণের নাম 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' তা ভারতবর্ষের বহু স্থানে মুক্তি পেয়েছে। সমস্ত স্থান হতেই আমরা ছবির প্রভূত সফলতার খবর পেয়েছি। সে সব জায়গায় দর্শকগণের মুখে মুখে কানন সায়গলের গান শোনা যাচ্ছে। গল্পের নূতনত্বে, চরিত্র মাধুর্য্যে প্রয়োগ চাতুর্য্যে 'ষ্ট্রীট-সিঙ্গার' প্রত্যেক দর্শককেই চমৎকৃত করেছে। কানন সায়গলের গান ও রাইচাঁদ বড়ালের এমন মিউজিক পূর্ব্বে আর নাকি তারা শোনে নি।

এই ছবিই-এরই বাংলা সংস্করণ 'সাথী' মুক্তি পাবে চিত্রায় ও নিউ সিনেমায় আগামী ৩রা ডিসেম্বর। গ্ল্যামার কুইন, সৌন্দর্য্যের ফুলরাণী কানন—ক্লারা বো'র আবেদনে, মে ওয়েষ্টের মুগ্ধ করা ভঙ্গিমায়, গ্রেস মুরের, উদাত্ত কণ্ঠস্বরে, জোয়ান ক্র্যাফোর্ডের অভিনয়ে, জিনজার রোজার্সের নৃত্য ছন্দে ছায়াচিত্র 'সাথী'র সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে রেখেছে। ভারতের চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক সায়গল বাংলায় এত ভাল গান আর নাকি গায়নি।' অমর মল্লিক ও শৈলেন চৌধুরী এই ছবিতেই অভিনয় করেছেন।

'সাথী'র গল্প সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। একটি পথের ছেলে ও একটি পথের মেয়ের জীবনের ইতিহাস। কেমন করে ধাপে ধাপে তারা উঠল—পায়ে পায়ে তারা পথের প্রত্যেক ধূলিকণাটাকে চিনল—আর কোথায় গিয়ে পৌছল এরই কথা নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও অতি সরস করে শোনাবার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে কোন উৎকট বিভীষিকাময় নাটক নেই, কাল্পনিক উগ্র ও হিংস্র চরিত্র নেই, রোমান্সের নাম দিয়ে রামধনু দেখানো কিম্বা বুকেতে কেয়ার কাঁটা বেঁধানো, কিছুই নেই। আছে একটি সহজ সরল গল্প, কয়েকটি সত্যিকার নিখুঁত চরিত্র, ও আমাদের জীবনের প্রতিদিনকার নাটক।

কৃতি পরিচালক ফণি মজুমদার উক্তরূপ চিত্রই ভারতবর্ষকে উপহার দিয়েছেন ও এইবার বাংলা দেশকে দেবেন।

অধিকার (বাংলা)

হিন্দি অধিকার বাংলার বাইরে এখন ভাল ভাবেই চলছে আর সকলের প্রশংসাও পেয়েছে। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বাংলা 'সাথী' চিত্রায় তিন সপ্তাহ চলবার পর বাংলা অধিকারকে অধিকার দেবে বলে শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ বড়দিনের আসরে চিত্রায় নবমুক্ত 'অধিকার' আর নিউ সিনেমায় ৩ সপ্তাহের পুরণো বাংলা সাথী চলবে।

দুশমন (হিন্দি)

রেডিও ষ্টেসনের দৃশ্য এখনও তোলা হচ্ছে। অসময়ে এসেও মোহন (সায়গল) মধুর সঙ্গীতে সকলকে ঠাণ্ডা ক'রতে পার্চ্ছে। কেউ কেউ বলে এতে নাকি একটু সঙ্গীত সাধক প্রভৃতির আত্মচরিতের আভাস আছে।

শ্রীমতী লীলা বড় এক নাচ গানের আসরের মহলা দিচ্ছেন অবশ্য শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায়।

বড়দিদি

মাধবীর প্রিয়-সখী মনোরমার কথা আপনারা জানেন। শুধু সমবয়সী বোলেই নয়, নিজের চরিত্র মাধুর্য্যে সে ছিল সত্যি বিধবা মাধবীর সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী।

পশ্চিমের কাছাকাছি একটি সহরে, সুদৃশ্য একটি বাঙলোতে বাস করে মনোরমা ও তার স্বামী।

কথায় বলে—'যেমন দেবা, তেমনি দেবী!'

মতামত গ্রহণ তাঁদের উপদেশ গ্রহণ বহুবিধ প্রচেষ্টাই দেখি। অতিরিক্ত আলোচনা হলে বেতার প্রোগ্রামে কয়েকটি নাম করা শিল্পীর নাম দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অনুপস্থিতিতে রেকর্ড বাজে। কয়েকটি নাম করা শিল্পী প্রোগ্রামে থাকলেই শুধু প্রোগ্রাম ভালো হয় না। ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক এর কি প্রতিকার করছেন?

—

উত্তরায়

প্রশংসা-মুখরিত

৪র্থ

সপ্তাহে

বর্ষ-শেষের

অবিস্মরণীয়

নিবেদন—

খনা

অশ্রু-জলের স্মৃতি-তর্পণ

শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া

মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নবতম চিত্র-কথা

= অভিসারিকা =

হাস্য-রসের অনাবিল প্রবাহ!

শ্রেষ্ঠাংশে : ধীরেন গাঙ্গুলী ও সাবিত্রী

* * * *

আনন্দবাজার : —"অহীন্দ্র চৌধুরী বরাহের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সমগ্র ছবিখানিকে রূপে, রসে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন নায়িকা খনার ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া।"

Advance :—"The story has been well developed and beautifully presented against the well conceived spectacular scenes which give it an authentic atmosphere."

খেয়ালী :—"কালোপযোগী দৃশ্যপট, সাজপোষাক এবং আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে, নানারূপরসের সংঘাতে ছবিখানি উপভোগ্য হয়েছে।"

Dipali :—"The story has been very neatly told on the screen and the climaxes of the picture have been ably handled"

বাঙলা :—"অনেক প্রতিষ্ঠানের অনেক ছবির চেয়ে দর্শনোপভোগ্য হইয়াছে এবং প্রচুর দর্শক আকর্ষণ করিতেছে।"

দীপালী :—"আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলার দর্শকবৃন্দ "খনা" দেখিয়া সন্তোষলাভ করিবেন।"

অগ্রদূত :—"মেট্রোপলিটানের শিল্পীবৃন্দ সিনেমার শিল্প-সজ্জরূপে ঢালাই করিয়া ইহাকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন।"

সচিত্র শিশির :—"বরাহের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়ও হয়েচে তেমনি কিংবা ততোধিক উল্লেখ যোগ্য। শেষ কয়টি দৃশ্যে তিনি অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন।"

Hindusthan Standard :—"Khana would not fail to draw good houses at Uttara for some time to come for its brilliant settings and well-decorated exteriors"

বাতায়ন :—"নিছক আমোদ প্রমোদ হিসাবে ছবিখানি আমাদের সত্যই আশাতীত খুসী করতে পেরেছে। রসসৃষ্টির দিক থেকে খনার কাহিনীটি বেশ সার্থক হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের মনকে আকৃষ্ট করবার প্রচুর উপকরণ এর মধ্যে আছে এবং এই কারণেই এর সাফল্য সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।"

Varieties :—"Good acting and soothing music would draw the crowd. Most of the songs have been soothingly tuned up."

মনোরমা ও তার স্বামী—দুটিতে যেন মানিক-জোড়! মান-অভিমান ও হাস্য কোলাহলের ছোঁয়াচ লেগে এদের দাম্পত্য জীবন নিত্য মুখর হোয়ে আছে।

এই দুটি রস-মধুর ভূমিকার উপযোগী আর্টিষ্ট নির্ব্বাচনে পরিচালক মল্লিক মশাই সত্যিকারের রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

মনোরমা—মেনকা এবং তার স্বামী—ভানু বাঁড়ুয্যে!

সম্প্রতি এই দুটি মাণিক-জোড়ে পশ্চিমের বাঙলোটি সরগরম কোরে তুলেছেন।

দিন এমনি যায়......

হঠাৎ মাধবীর একখানা চিঠি এসে পড়লো মনোরমার কাছে। চিঠির অংশ-বিশেষ নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুরু হোল বাক্‌-বিতণ্ডা। দেখতে দেখতে চায়ের পেয়ালায় উঠলো ঝঞ্ঝা।

সত্যাই মনে আজ এই প্রশ্নই ওঠে—কী এমন কথা মাধবী চিঠিতে লিখেছিল, যার জন্যে মনোরমা ও তার স্বামীর মধ্যে ছোট্ট একটি প্রহসনের অভিনয় হোয়ে গেল?

এর জবাবে, মল্লিক মশাই আমাদের জানিয়েছেন, বড়দিদি ছবির এই অংশটুকু যখন পর্দ্দার গায়ে প্রতিফলিত হবে, তখুনি এ রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন কোরতে আপনারা পারবেন।

অতএব, ধৈর্য্যধারণ করাই বিধেয়।

সাপুড়ে

পরিচালক দেবকীবাবু, বেচারা বেদে-বেদিনীদের নিয়ে অনেক খেলাই খেললেন। হালে আবার সুরু হ'বার উপক্রম হ'য়েচে এক নতুন খেলা—দিল্‌-খোলাদের আড্ডায়।

এতকাল ধরে অনেকরকম আড্ডার নাম আমরা শুনে এসেচি। কিন্তু হালের আমদানী—এই 'দিল্‌খোলাদের ডেরা'—একদম নতুন!

বড় বড় গাছের উপর ডালপালার মাঝে লতা-পাতার কুটির। গাছের আশেপাশে ও নীচে—নানা-জাতের 'ঘর-বাড়ী'। লতা গুল্মে আচ্ছাদিত সারা স্থানটির মধ্যে বেশ একটা সহজ শান্ত শ্রী আছে—যা' লোকালয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, গাধা ও ঘোড়া থেকে আরম্ভ কোরে নানাজাতের গৃহপালিত জীব-জন্তুও এই ডেরাটির আশে পাশে স্থান পেয়েচে।

সাপুড়ে সর্দ্দারের সাকরেদের দল, এই মিলন কেন্দ্রে এসে বিশ্রাম সুখ লাভ করে।

এরাই 'দিল্‌খোলা'! নীল আকাশের বুকে এক ঝাঁক মুক্ত-স্বাধীন পাখীর মত সচ্ছন্দগতি!

এই দলটি গঠন কোরতে পরিচালক দেবকীবাবু এবং কর্ম্মসচীব ছোটাইবাবুকে শুনলুম বিশেষ বেগ পেতে হ'য়েচে।

এই দলে আছেন একদল বিখ্যাত নাচিয়ে এবং একদল কৌতুকাভিনয়ে পারদর্শী তুখোড় অভিনেতা।

এদের নামের তালিকা এই:

নৃত্য-শিল্পী: মণি বর্দ্ধন, ইন্দ্র বোস, ব্রজবাসী, ব্রজ পাল, খেমচাঁদ এবং রতনলাল।

কৌতুকাভিনেতা: হরিদাস বন্দ্যোঃ (গ্রামোফোন), আলাউদ্দিন সরকার (মেগাফোন) এবং আগা খাঁ (করিন্থিয়ান)।

কপালকুণ্ডলা

পৃথিবী অন্ধকারময়ী। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত মিলিত হবার জন্য অতি দ্রুত পদ বিক্ষেপে পথ চলেছেন। অতি দুর হতে শৃগালের চিৎকার, ঝিঁঝিঁর ডাক অন্ধকারের অপরিচিত প্রাণীগণের কণ্ঠের আওয়াজ। নবকুমারকে প্রতি মুহূর্ত্তেই উন্মনা করে দিচ্ছে। এক চিন্তা ভিন্ন পথের কোন চিন্তাই মনে স্থান নিচ্ছে না। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁর চরণ স্পর্শ হোল। পদভরে সে বস্তু খড় মড় করে ভেঙ্গে গেল। নবকুমার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, পুনর্ব্বার পদচারনা করলেন পুনরায় ঐরূপ হোল। অন্ধকারে পদস্পৃষ্ট বস্তুতে হস্ত স্পর্শে জানলেন এটি একটি তক্তাভাঙ্গা।

তারপরের খবর 'কপালকুণ্ডলা' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন। এটি একটি ভগ্ন শিবিকা, তবে কপালকুণ্ডলার নয় মতিবিবির। নবকুমারের পরিচয় হোল বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়তর বন্ধনযুক্ত সুন্দরী, ঈষদ্দীর্ঘাঙ্গী, বর্ষাকালে বনবিটপীলতার ন্যায় শোভাময়ী মতিবিবির। মতিবিবি উদ্ধার পেলেন।

এই দৃশ্যই সেদিন পরিচালক ফণি মজুমদার অতি বিচক্ষণতার সহিত পরিচালনা করলেন। ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্ত অতি যত্ন সহকারে এ ছবি তুললেন।

জনক নন্দিনী

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর রামায়নী গাথা অবলম্বনে এই নূতন ছবি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নদীতীরের দৃশ্যগুলি ভাল ভাবেই নেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে

পৌরাণিক ছবির প্রযোজনা করে রাধা ফিল্ম বাংলার চলচ্চিত্র জগতে আজ যে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে—জনম-দুঃখিনী জানকী এবং শ্রীরামচন্দ্রের যৌবনের সৌর্য্য-বীর্য্য-ভরা প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে চিত্রিত এই

সে গৌরব শতগুণ বাড়িয়ে তুলবে

মাঝির (ধীরেন দাস) কাঠের নৌকা সোনার হয়ে গেছে। মাঝি ও তার স্ত্রীর (গীতা) পারিবারিক ছোট খাট দ্বন্দ্বের কৌতুকপূর্ণ রস পরিবেশনে পরিচালক ফণী বর্ম্মা বেশ দৃষ্টি দিয়েছেন। এখন বিশ্বামিত্রের (অহীন্দ্র চৌধুরী) যজ্ঞের ও তাড়কা বধের দৃশ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে।

যখের ধন

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া পিকচার্সের যখের ধনের কাজ আস্তে আস্তে এগুচ্ছে।

পরশমণি

শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'পরশমণি' পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের নেতৃত্বে তোলা হ'চ্ছে। প্রধান অংশে শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী জ্যোৎস্নাকে দেখা যাবে।

"খনা"

"উত্তরা" চিত্র গৃহে এই শনিবার হইতে মেট্রোপলিটান পিকচার্স-এর "খনা" ও হাসির ছবি "অভিসারিকা"—চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিল।

সামাজিক বা অপরাপর ছবির বিষয়-বস্তুর তুলনায় খনা-চিত্রের বিষয়-বস্তুর যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে খনা দেবীর অলৌকিক জীবনী ও সাধনার কথা ও তাঁহার অপেক্ষা অলৌকিক আত্ম-বলিদানের কাহিনী, এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে বাঙলার নর-নারী মাত্রেই তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ না করিয়া পারে না।

অহীন্দ্র চৌধুরীর সাবলীল ভাবাভিব্যক্তি ও অভিনয় এবং শ্রীমতী ছায়া দেবীর অভিনয় ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া নাটকের বাণী মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং অপরাপর বিষয়-বস্তুর তুলনায়, এই চিত্রের আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হইবার নহে।

পূর্ণ থিয়েটার

আসছে শনিবার থেকে পূর্ণ থিয়েটারে 'দেশের মাটি' চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে।

সিনেমা শিল্পের ভেতর দিয়ে দেশের যদি প্রকৃত উপকার সাধন করবার এ অবধি কেউ চেষ্টা ক'রে থাকেন তা' একমাত্র নিউ থিয়েটার্স'এর পক্ষ হ'তে নীতীন বসু। তিনি যে ধরণের ছবি তোলেন, তা শুধু নিছক আনন্দের জন্য নয়—তার মূলে থাকে একটা মহৎ উদ্দেশ্য এবং চলচ্চিত্রে তাই নূতন রূপ, নূতন জ্ঞানে মূর্ত্ত হয়ে উঠে, দেশের লোকের চিন্তা শক্তির দ্বারে এসে ধাক্কা দিয়ে তাদের ক'রে তোলে সচেতন। পল্লীমায়ের কোল ছেড়ে সহরের মোহগ্রস্থ লোকদের জীবনে যে কী হাহা-কার তুলছে তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন।

বিবিধ

শোক সভা

৮৪নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে গোপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে সাহিত্য সেবক সমিতির উদ্যোগে এক শোক সভা হয়। "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, সহপাঠি 'এবং সাহিত্য-সেবক সমিতির সহ-কর্ম্মী হিসাবে গোপেনবাবুর সঙ্গে মিশিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে প্রধান উপাদান ছিল ভদ্রতা, অমায়িকতা এবং সত্যনিষ্ঠা। গোপেনবাবু একজন বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং সাহিত্যালোচনায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য সেবক সমিতির অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়া গোপেন বাবুর

গোপেন্দ্রনাথ মিত্র

চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া গোপালবাবু বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বক্তা সমবেত সভ্যবৃন্দের নিকট গোপেনবাবুর আকস্মিক মৃত্যুর করুণ কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনা করিলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিচলিত হন।

সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গোপেন্দ্রনাথের কর্ম্মনিষ্ঠা ও পরের জন্য সহানুভূতির প্রশংসা করেন।

সভায় শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, অদিতেন্দ্রনাথ মিত্র, বিশু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কে, পি, রায়, বীরেন্দ্রলাল ধর, নারায়ণদাস ভট্টাচার্য্য, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রলাল রায়, সম্মোহন মুখোপাধ্যায়, শিশু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

'দেশের মাটি'-র' অভিনয়াংশ ও সঙ্গীতাংশ হয়েছে অভূতপূর্ব্ব। সরলা গ্রাম্য বালিকা গৌরির ভূমিকায় উমা ও সহুরে আত্মভোলা যুবতী অরুণার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয়, "দেশের মাটি"-র প্রাণ সঞ্চারে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছেন। গান গেয়েছেন এ ছবিতে উমা, সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র ও পঙ্কজ। এদের সকলেরই গান পর্দ্দার ওপর এক সুরজালের সৃষ্টি, কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্তকর।

—:০:—

'মেঘমুক্তি'র সুবর্ণ-জয়ন্তী

গত রবিবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত 'মেঘমুক্তি'র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মধু বসু, শ্রীমতী সাধনা বসু শ্রীমতী প্রতিমা মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

'দেহ—যমুনা', নামে 'মেঘমুক্তি' 'খেয়ালী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিধায়ক বাবু উদীয়মান লেখক হিসাবে বহুদিন হইতে আমাদের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার রচিত এই নাটকের সাফল্যে আমরা প্রীত এবং তাঁহাকে আমরা সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার লেখনী অক্ষয় হউক।

ভাইবোন-প্রীতিসম্মিলনী

সেদিন সন্ধ্যায়—মানে ৮ই অঘ্রাণ বিষ্যুৎ-বারের বারবেলাটি আমাদের চমৎকার কেটেছে একটি চমৎকার আসরে। ব্যাপারটি

হচ্ছে কবি প্রভাতকিরণ বসুর সম্পাদিত শিশুমাসিক "ভাইবোনে"র। সভাপতি ছিলেন পণ্ডিতবর অশোকনাথ শাস্ত্রী এম-এ, পি-আর-এস্। উপলক্ষ্য ছিল পদক ও পুরস্কার বিতরণ, কিন্তু লক্ষ্য ছিল অনেকগুলি তরুণ গায়ক-গায়িকা ও কলাবিদ্‌দের উৎসাহ দেওয়া। সভাপতি মশায় অভিভাষণে বলেন :—"ভাইবোনের কাকাবাবু এবং আমাদের দাদামশায় অর্থাৎ প্রভাতদা আজ যে রস পরিবেশনের আয়োজন করেছেন তা আমাদের পক্ষে উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু ছেলেদের মন আর বড়দের মন এক নয় সেটা বোঝা গেল খেয়াল গানের সময় তাদের কলকাকলীতে, আর হরবোলার ডাকের সময় নিস্তব্ধতায়। তাদের উপযোগী রসপরিশনের দায়ীত্ব বড় কম নয়, সে ভার ভাইবোনের মারফৎ ভালোভাবেই বহন করছেন তাঁর সম্পাদক।" আমরাও অবশ্য এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু ধৈর্য্য বলতে হয়, সভাপতির দেড়-হাজার লোকের ভিড়ে রাত সাড়ে দশটা অবধি বিস্তৃত প্রোগ্রামে মনঃসংযোগ করা—সেও ত' শিশুসাহিত্যের দায়ীত্বের মতন কঠিন। আমাদের খট্‌কা লেগেছে এইখানে যে যে-শাস্ত্রী মশায় 'নৃত্যে'র ভীষণ বিপক্ষে তিনিই সেদিনকার নৃত্যগুলি বেশ হৃষ্টমনেই উপভোগ করছিলেন এবং সে সম্বন্ধে উৎসাহসূচক বাণী ও বিবরণ করলেন কি ব'লে।

'স্থানাভাবে বহুলোককে ফিরতে হয়েছে, বহু সম্মানিত অতিথিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকতে হয়েছে এবং কষ্টসুহকারে উপবিষ্ট থাকবার দুঃখ বোধ করতে হয়েছে—এটা ভাইবোনের জনপ্রিয়তা ও প্রচারের নিদর্শন হ'লে—কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের অনুরোধ ভবিষ্যতে এবারকার মতন বার বার ত্রুটি স্বীকারে কর্ত্তব্য শেষ না ক'রে বৃহত্তর হল-এ যেন আসরের ব্যবস্থা করেন। ভাইবোনের গ্রাহকগ্রাহিকারা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাতে বাইরে থেকে শিল্পী আন্‌বার প্রয়োজনই হবে না—আমাদের ধারণা। সম্পাদক গোপনে কিছু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করলেও আমরা খুসি হব। আর যশোলিপ্সু দের বালসুলভ চাপল্যকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর অপূর্ব্ব আবৃত্তি থেকেও তিনি যেন আমাদের বঞ্চিত না করেন। আমরা কামনা করি বন্ধুবর প্রভাতকিরণের খ্যাতি যেমন সুদূরবিস্তৃত,—তেমনি প্রচারিত হোক্ ভাইবোন পত্রিকা দেশের শিশুজগতের দিকে দিকে।

বিঃ দ্রঃ—বেকার নাশন শব্দ বিন্যাসের ১নং প্রতিযোগীতার ফলাফল অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না। আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে জানান যাইতেছে। ম্যাঃ বেঃ নাঃ

মিলন

শুক্রবার ১৮ই নভেম্বর রাত্রে বাংলার অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বাংলার কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়কে তাঁহার 'রজনী'-গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। শ্রীযুক্ত বসু সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। বসু-সরকারের এই মিলন বাংলায় কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে।

নিবেদন

অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়

যুগে যুগে তুমি এস গো প্রিয়া
আমার দুখের রাগিণীতে,
থেকো তুমি কাছে হিয়ার মাঝে,
আমার মধুর যামিনীতে।

নব বসন্তে, কোকিলের সাথে,
গেয়ো গো তোমার গান,
অরুণ আলোকে অরুণ প্রভাতে
ধরিও তোমার তান।

নিকষ কালোর শতধা মাঝারে
নিভৃতে আমারে ঢেকে,
সবার আড়ালে অন্তরে তুমি
নিয়োগো আমারে ডেকে।

অসীমের মাঝে তুমি যে সসীম
আস্‌ছি তাইত কাছে,
তুমি যে বাঁধিবে অসীমের সাথে
তাইত রয়েছি পাশে।

—:o:—

শরৎচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধ ও মধুর জ্যোৎস্না বাঙ্গালার সাহিত্যগগনে যে মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তুলনা দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এত অল্প সময়ে রচনার কৃতিত্বে, এমন আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠা অতি অল্প-সাহিত্যিকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তিনি তাহার পূর্ণ প্রতিভা লইয়া যে দিন সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, সে দিন বঙ্গবাসী বিস্ময়ে চক্ষু মুছিয়া দেখিল—এ তো সাহিত্যগগনের ক্ষুদ্র তারকা নয়, ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক নয়, এ যে একেবারে পূর্ণচন্দ্র! সেই দিনই সাহিত্য আসরে তাঁহার একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

আজ শরৎচন্দ্র বঙ্গের আকাশ হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার জীবন রহস্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। বাল্যে ও যৌবনে তিনি সকলের অলক্ষে অনাদৃত, অখ্যাত ও ভবঘুরে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বৈচিত্র্যময় জীবন এখনও রহস্যে আবৃত। তিনি বাল্য ও কৈশোর ভাগলপুরে অতিবাহিত করেন। সেই স্থানেই মাতুলালয়ে তাঁহার সাহিত্যানুরাগ সূচিত হয়। তাহার পর তিনি কিছুদিন মজঃফরপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানকার জমিদার মহাদেব প্রসাদ সাহুর সহিত তিনি কিছু দিন বাস করেন। তিনিই শরৎচন্দ্রের অমর লেখনী-প্রসূত শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের 'কুমার বাহাদুর'। শ্মশানের বিখ্যাত চিত্রে তিনি মজঃফরপুরের শ্মশানের যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।

[... ইন্দ্রনাথের] প্রাণবন্ত চরিত্র তাঁহার এক অপূর্ব সৃষ্টি। আর্ত, দুঃখী ও নিপীড়িতের একান্ত দরদী বন্ধু এই ইন্দ্রনাথ ছিলেন দুষ্কৃতের ও অত্যাচারীর নিপীড়ক। ধর্মে ছিল তার পরম বিশ্বাস। দুঃসাহসিক কার্য্যে ছিল তার প্রাণের স্ফূর্তি। এই অনবদ্য চরিত্র তাঁহার সৃষ্ট নরনারীর মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া 'ইন্দ্রনাথের' সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার কার্য্যাবলী ঠিক ইন্দ্রনাথেরই অনুরূপ। বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তাঁহার নাম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ওরফে রাজু-দা। তিনি ভাগলপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার রামরতন মজুমদারের পুত্র ও সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ মজুমদারের সহোদর।

শরৎচন্দ্রের মাতামহের পিতা রামধন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হালিসহর হইতে আসিয়া ভাগলপুরে বসবাস করেন। গঙ্গার উপরেই তাঁহার বাড়ী।

ভাগলপুরে বাঙ্গালী টোলায় দুর্গাচরণ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে শরৎচন্দ্র ১৮৮৭ সালে একাদশ বর্ষ বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে তিনি কিছুদিন দেশে ফিরিয়া যান এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তেজনারান জুবিলী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বিখ্যাত অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুল শান্তিপুর নিবাসী হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল, তখন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৪ সালে তিনি প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ মাতুল মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহার সহপাঠী।

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী। রাজুদার আর এক সহোদর শ্রীমণীন্দ্রনাথ মজুমদার শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। রাজুদা ছিলেন তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। রাজুদা ৪২ বৎসর পূর্বে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক গৃহত্যাগ করেন। শুনা যায় তিনি ডেরাডুনে আছেন।

কিছুদিন পূর্বে মণীন্দ্রনাথের গৃহে বসিয়া শরৎচন্দ্র ও রাজুদার বাল্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় মণীন্দ্রনাথ তাঁহার জানালার ভিতর দিয়া গঙ্গার উপরেই অদূরে এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, "শরৎ গিয়াছেন, রাজুদা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কত কাহিনীই-না এই বৃক্ষটীর সহিত জড়িত আছে। বৃক্ষটী এখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইহারই নীচে রাজুদার একখানি ছোট ডিঙ্গী বাঁধা থাকিত। আর গাছের একটী ডালের উপর রাজুদা মাদুর দিয়া একটা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই খানেই তিনি বাস করিতেন। একটী দেবতার মূর্তিও তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

সেই গৃহখানি ছিল ঠিক জলের উপরেই। একটি বাঁশ লাগাইয়া জলের

উপর দিয়া সেখানে যাইতে হইত। রাজেন্দ্রনাথ বলিতেন যাহারা পুণ্যাত্মা তাহারাই কেবল সেই গৃহে যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র ও মণীন্দ্রনাথ কেবল সেখানে যাইতে পারিতেন। কারণ তাঁহারা এত উত্তম সাঁতার জানিতেন, যে তাঁহারা জানিতেন যে জলের মধ্যে পড়িয়া গেলেও তাঁহারা ডুবিবেন্ না।

রাজেন্দ্রনাথ সেই ঘরের মধ্যে একটী হাড়ীতে একটী কেউটে সাপ পুষিয়া ছিলেন। একটী ফুটা করিয়া হাড়ীর মধ্যে সাপকে দুধ খাইতে দিতেন। একদিন তাহার ভ্রাতা ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়া দূর হইতে হাড়ীটী ভাঙ্গিয়া সাপটী তাড়াইয়া দেন।

গঙ্গার উপরেই তাঁহাদের বাড়ী, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের ঠিক পূর্ব্বদিকে। সেখান হইতে অর্দ্ধমাইল উত্তরে জেলেরা গঙ্গার এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত মহাজাল পাতিয়া মাছ ধরিত। সেখানে গঙ্গার প্রবল স্রোত।

একদিন সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রনাথ, মনীন্দ্রনাথ ও ভুতোকে ডিঙ্গী লইয়া সেই স্থান হইতে মৎস আহরণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার হুকুম অমান্য করিবার সাহস কাহারও ছিল না। তাঁহারা সেখানে গিয়া দেখেন ভীষণ স্রোতের বিপক্ষে বড় বড় মাছ লাফাইয়া পড়িতেছে। এক একটীর ওজন আধমন ত্রিশ সের। দুই তিনটী মৎস্য তাঁহারা অতি কষ্টে নৌকায় তুলিলেন,—তাহাদের লেজের তাড়নায় তাঁহাদের শরীর লাল হইয়া উঠিল। তাহাদের আস্ফালনে ক্ষুদ্র ডিঙ্গী ডুবিবার উপক্রম। শব্দ শুনিতে পাইয়া ধীবরগণ একখানি নৌকা করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাঁহারাও দ্রুতবেগে নৌকা চালনা করিতে লাগলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীবরেরা তাঁহাদের নৌকা ধরিবার উপক্রম করিল। তখন তাঁহারা নৌকা ডাঙ্গায় বাঁধিয়া মৎস্য ফেলিয়া পলাইয়া আসিলেন। এই কাহিনী শুনিয়া রাজুদা 'কাপুরুষ' বলিয়া তাঁহাদিগকে দুই চড় বসাইয়া দিলেন।

পরদিন রাত্রে রাজেন্দ্রনাথ নিজে মৎস্য আহরণে চলিলেন। শরৎচন্দ্র ও মনীন্দ্রনাথও সঙ্গে চলিলেন। পূর্ব্বদিনের সন্ধান পাইয়া ধীবরগণ অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ ছিল। মৎস্যের শব্দে তাহারা দুই তিন খানি নৌকা লইয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ধীবরগণের নৌকা যখন নিকটবর্ত্তী হইল তখন রাজেন্দ্রনাথ বৈঠা তাহাদের নৌকার গায় লাগাইয়া সজোরে ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গী তাহাতে অনেকদূর আগাইয়া গেল। এইরূপে নৌকা যখন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে আসিয়া পৌছিল তাঁহারা তিনজনে দ্রুতপদে মৎস্য লইয়া গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। ধীবরগণ রাজেন্দ্রনাথ ও মনীন্দ্রনাথের পিতা রামরতন বাবুর নিকট নালিশ করিল। তিনি পুত্রগণকে তিরস্কার করিয়া ধীবরগণকে একটী টাকা দিলেন। তখন মৎস্যের সের দুই আনা। তাহারা টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

যে বন্য শূকর ও সর্প্প সঙ্কুল ঝোপঝাড় বন মধ্যে ইন্দ্রনাথ স্রোতবেগ অতিক্রম করিয়া ডিঙ্গী লইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি ধীবরগণের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার জন্য প্রবেশ করিতেন, তাহা একান্ত কাল্পনিক নহে। তাহা ছিল এই অশ্বত্থ বৃক্ষের আধমাইল দক্ষিণে।

এতাদৃশ বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় মৎস্য আহরণের কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই মৎস্য সংগ্রহের অন্তরে ছিল রাজেন্দ্র নাথের বালসুলভ চপলতা ও দুঃসাহসিক কর্ম্ম প্রবৃত্তি।

শরৎচন্দ্র ভাল ফুটবল খেলিতে পারিতেন, তিনি ফরওয়ার্ড লাইনে খেলিতেন। একদিন সন্ধ্যায় সদলে মাঠ হইতে ফিরিতেছেন, রাজেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও সঙ্গে আছেন। শরৎচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—কে কতদূর পা উঠাইতে পারে? সকলেই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন, কেবল রাজেন্দ্রনাথ নীরব রহিলেন।

একটু অগ্রসর হইয়া রাজেন্দ্রনাথ চৌমাথার মোড়ে দীর্ঘকায় একজন হিন্দুস্থানী মিলিটারী পুলিশ পাহারা দিতেছিল দেখিলেন। রাজেন্দ্রনাথ পা উচু করিয়া তাহার টিকিতে লাগাইলেন। সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। পুলিশটী ইহার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রনাথ তাহার সম্মুখে গিয়া ক্রুদ্ধ বানরের ন্যায় বার দুই "কোয়াচ কোয়াচ" শব্দ করিয়া নিজের চোখ দুটি উল্টাইয়া বিস্ফারিত ও শাদা করিয়া ফেলিলেন। কাল চোখের তারকা একেবারে দেখা গেল না। তৎপরে তাঁহরা সকলে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পুলিশও পশ্চাদ্ধাবন করিল। নিকটবর্ত্তী থানা হইতে আরও দুইজন তাহার সহিত যোগ দিয়া "পাক্ড়ো পাক্ড়ো" শব্দে ছুটিতে লাগিল। একটা ঘোড়ার সহিস সম্মুখ হইতে পথরোধ করিয়া দাড়াইল। তাহার ছিল এক বিশাল ভুড়ি। রাজেন্দ্র নাথের ফুটবলে অভ্যস্থ পদ সবেগে তাহার ভুড়ির উপর পড়িল। সহিস চীৎকার করিয়া গড়াইতে গড়াইতে একেবারে ড্রেনে গিয়া পড়িল। তখন সকলে যে গভীর ও দুর্ভেদ্য অরণ্য মধ্যে ইন্দ্রনাথ একাকী দ্বিপ্রহর রাত্রে মধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে নৌকা ভ্রমনে যাইত সেই অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর

কাহারও সেখানে প্রবেশ করিবার সাহস ছিল না।

এখন সে অরণ্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সেখানে বহু অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। মিশনারী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন মাঠই সেই অরণ্যের অধিকস্থান অধিকার করিয়াছে।

তাঁহাদের একটী অভিনয়ের দল ছিল। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই দলের শিক্ষক। শরৎচন্দ্র স্ত্রী ভুমিকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করিতেন। একবার এমন মধুর ও প্রাণ মাতান স্বরে "হরি বোল" বলিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া মহিলা দর্শকগণ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র বাঁশী বাজান শিখিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজেন্দ্র নাথের এক সহোদর শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার তাঁহার মাথায় গাট্টা মারিয়া বলিতেন, "তুই বাঁশী বাজিয়ে গলা নষ্ট কচ্চিস্, আমাদের ফিমেল পার্ট করবে কে ?"

রাজেন্দ্রনাথের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণচন্দ্র একবার মেদিনীপুর গিয়া মল্লিকদের বাড়ী হইতে গঞ্জিকা সেবনে পারদর্শী হইয়া আসিলেন। আসিয়া রাজুদাকে এই উপাদেয় ধুমপানের আনন্দ কিরূপে উপভোগ করিতে হয় তাহা শিখাইলেন। তখন দলের সকলেই এই কার্য্যে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পরে এই দলটী চরসেও উন্নীত হইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের মেজমামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় একটু গম্ভীর ও কঠোর প্রকৃতির লোক। তিনি শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বে কঠোর প্রকৃতি মেজদার মাষ্টারির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তাঁহারই চিত্র। বিপ্রদাস বাবু পাটনায় থাকেন।

রাজেন্দ্রনাথ ছিলেন অতি নিপুণ শিল্পী। তিনি নিজ হস্তে শরৎচন্দ্রকে একটী দোয়াতদানী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি মাতুল সুরেন্দ্র নাথের বৈঠকখানা ঘরে রহিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের হৃদয় ছিল অতি কোমল ও স্নেহপ্রবণ। বন্ধুবান্ধবগণের সহিত গল্প করিবার সময় তিনি বন্ধুর একখানি হাত নিজহস্তে লইয়া সারাক্ষণ দুই হাত দিয়া টিপিতেন। গল্প শেষে যখন আসর ভাঙ্গিত, তখন মনে হইত শরৎ তাঁহাদের পরম দরদী বন্ধু—আপন হইতে আপনার। তাঁহার ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে ন্যাড়া বলিয়া ডাকিতেন।

মাতুলালয়ের পশ্চাতে একটী কুটিরে শরৎচন্দ্র এক সাহিত্য সভার সৃষ্টি করেন। তাহার নাম ছিল Little Room Association. ইহা সপ্তাহে একদিন করিয়া বসিত। Sandes ground এ সপ্তাহে আর একদিন করিয়া সাহিত্য সভা বসিত। কবিতা ও গল্প সেখানে পঠিত হইত। মনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি উত্তম সমালোচনা করিতে পারিতেন।

শ্রীবিভুতি ভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর পিতা নফর ভট্ট তখন ভাগলপুরে সাবজজ ছিলেন। বিভুতিবাবু এই সাহিত্য সভায় যোগদান করিতেন। নিরুপমা দেবীও এই সভায় গল্প ও কবিতা পাঠাতেন। শরৎচন্দ্র একটী গল্প পাঠ করিয়া বলিতেন—ইহা অমুকের লেখা। আমি কি এমন সুন্দর গল্প লিখিতে পারি! এই ভাগলপুরের সাহিত্য সভায় তাহার সাহিত্য জীবনের অঙ্কুরোদ্গম হয়।

তেজনারান জুবিলী কলেজের হোষ্টেলের একটী কক্ষে বসিয়া শরৎচন্দ্র এফ, এ টেষ্ট পরীক্ষা দিতেছেন। গড়গড়ায় ধূমপান চলিতেছে। পরিধেয় বস্ত্র হাটুর উপর অনেকদূর উঠিয়াছে। নির্জ্জন গৃহে বসিয়া পুস্তক খুলিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া ধীরে সুস্থে পরীক্ষার খাতায় নকল করিতেছেন।

সম্মুখের ঘরে শ্রীউপীলা সান্যাল, মণীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রনাথ মজুমদার পরীক্ষা দিতেছেন। উপীলা সান্যালের একটু পা নাড়াইবার অভ্যাস ছিল। অভ্যাস বশে পা নাড়াইতে গিয়া হাঁটুর উপরস্থিত গ্যানোর ফিজিক্স খানি সশব্দে মেজের উপর পড়িয়া গেল। স্কুলের অধ্যাপক সারদাচরণ ভট্টাচার্য্য গার্ড দিতেছিলেন। তিনি পুস্তক দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

"What's that?" সান্যাল মহাশয় বলিলেন—"কপি ক্যার!"

"Why are you Copying?"

"না করে কচ্চি কি? আমি ত' কি কচ্চি স্যার—ও ঘরে গিয়ে দেখুন ল্যাড়া কি কচ্চে।"

সারদাবাবু শরৎচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইলেন।

সেই চাসিজনকে warning দেওয়া হইল। শ্রীউদীলা সান্যাল এখন গয়ার উকীল।

শরৎচন্দ্র পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে মনের বেদনায় ভাগলপুর ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই। কয়েকদিন পূর্বে ভিনোলিয়া সাবানের একটী বাঁধান মেমের চিত্র মাতুল সুরেন্দ্রনাথকে দিয়া একখানি অভিধান লইয়া যান। চিত্রখানি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের বৈঠকখানা গৃহে এখনও সযত্নে লম্বিত আছে।

দেবদাস, কাশীনাথ, অনুপমা প্রভৃতি গল্প শরৎচন্দ্র ভাগলপুর অবস্থান কালে রচনা করেন।

তাহার ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ স্বামী বেদানন্দ যখন দেহত্যাগ করেন সেই সময় ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর হইয়া তিনি ভাগলপুরে কিছু দিন অবস্থান করেন। ভাগলপুর হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাটীতে শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব রচনা সমাপ্ত করেন। ভ্রাতার চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। পথের দাবীর কিছু অংশও ভাগলপুরে রচিত।

ইন্দ্রনাথের দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছি। বাহুল্য ভয়ে আর অধিক দিব না। আর একটী মাত্র দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একদিন পাড়ারই এক যুবক একটি কন্যার কান হইতে দুইটী মাকড়ী চুরি করে। কেহই তাহাকে স্বীকার করাইতে অথবা তাহার নিকট হইতে মাকড়ী বাহির করিতে পারিল না। রাজেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার শুনিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনিতে একজন অনুচর প্রেরণ করিলেন। রাজেন্দ্রনাথের আহ্বান উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা ভাগলপুরে কাহারও ছিল না। যুবকটি আসিয়া দোষ অস্বীকার করিল। রাজেন্দ্রনাথ অশ্বত্থবৃক্ষের ডালের উপর বসিয়া ছিলেন। সেখান হইতেই আদেশ করিলেন—"ঘি ঘস।"

যুবককে দুইজন দুইদিকে ধরিল এবং একজন তাহার ঘাড়ে ঘি রগড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয় আজ্ঞা হইল—"গঙ্গা জল দে।"

ঘাড়ে গঙ্গা জল দেওয়া হইলে রাজেন্দ্র নাথ বলিলেন, "হাড়িকাঠ নিয়ে আয়।"

এতক্ষণ যুবক নীরব ছিল। এইবার কি আজ্ঞা হইবে তাহা অনুমান করিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"নিইচি।"

হুকুম হইল—"দে বের করে।"

চোর তখন যে স্বর্ণকারের নিকট মাকড়ী দুইটি দুই টাকায় বিক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম বলিল। তখন সহজেই মাকড়ী দুইটি উদ্ধার হইল।

রাজেন্দ্রনাথের ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রামনাম করিলে যে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করিতে পারে না ইহা তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন।

ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া শরৎচন্দ্র মজঃফরপুরে আগমন করিলেন। এইবার তাঁহার অজ্ঞাত ও ভবঘুরে জীবন আরম্ভ হইল। এখানকার জমিদার মহাদেব প্রসাদ সাহুর নিকট কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। এই কুমার বাহাদুরকে তিনি সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব বর্ণনা ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার মজঃফরপুরের শ্মশানে নিশীথ অভিযানে। সেই অমানিশার প্রেত কাহিনী রুদ্ধনিশ্বাসে পড়িতে হয়।

শরৎচন্দ্র ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে শেষবার ভাগলপুর গমন করেন। গত ১লা নবেম্বর শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর প্রকাশচন্দ্র ভাগলপুরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে দাদার অসুস্থতার কথা জানাইয়া তিনি যে কাহারও কথা শুনেন না এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে সামলাইতে পারিবেন না এই কথা লিখিয়া তাঁহাকে শরৎচন্দ্রের নিকট আহ্বান করেন। সুরেন্দ্রনাথ তদনুসারে ৩রা নবেম্বর শরৎচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।

২রা মাঘ রবিবার বাংলার সাহিত্য গগনের পূর্ণচন্দ্র চিরতরে অস্তমিত হইল।

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ **শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য** এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দিন কয়েক পরে, একদিন বৈকালের দিকে ছোটগিন্নি বিরিঞ্চির কোন কথার উত্তরে বসিয়া উঠিল ঝগড়ার কারণ যে তুমি করে তুলচো! কেন তুমি ওকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দিলে ?

স্বামী বলিলেন : আমার ত আর দশটা বাড়ী নেই যে, আলাদা বাড়ীতে রাখবো! তুমি একটু শান্ত হয়ে থাকলেই ত সব দিক রক্ষে হয়! আর ও যদি গুণ করে থাকে, তুমি ভাগ করে নাও। তোমাদের সঙ্গে ত শুধু গুণ-ভাগেরই সম্পর্ক।

অত হেঁয়ালি আমি বুঝিনে! আমি ওকে বাড়ীতে থাকতে দেবো না। আমায় তুমি বিয়ে করেছিলে কি এই যন্ত্রণা দেবার জন্যে ?

—তোমায় বিয়ে যে কেন করেছিলাম সে কথা বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে শক্ত। লোকে বিয়ে করে কেন ?—

—থাক তা, তুমি এখন কি বলচো? ঐ সতীনের ঘর কি করতে হবে ?

—সতীনের ঘর করবে কেন? স্বামীর ঘর কর্ব্বে।

—তুমি যে জোর করে তাকে আমার ঘরে ঢোকাচ্ছো ?

—তোমার উপরে জোর কর্ত্তে পারি কি ছোটগিন্নি? তোমার ওপর জোর কর্লে এখনি আমায় পশুহিংসা নিবারিণী সভা থেকে ধরে নিয়ে যাবে! তাহলে তুমিও বিরহে কষ্ট পাবে, আমিও ঘরোয়া ঝগড়ার হাত থেকে কিছুকালের জন্য ছুটি পাবো। সেটা কি তোমার পক্ষেই ভাল হবে ?

স্বামীর কথা শুনিয়া লবঙ্গ বুঝিল, স্বামীটি কথাবার্ত্তায় খুবই রসিক। কিন্তু এত রসিকের অন্তরটা কেন যে তাহার প্রতি এতদিন এত নিষ্ঠুর ছিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু এই রসিকতার ফল ছোট গিন্নির উপরে যাহা হইল, তাহা স্বামীর পক্ষেও অনুকূল নহে, লবঙ্গর পক্ষেও নহে। ছোট গিন্নি হঠাৎ উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল। স্বামীর বলিবার ভঙ্গিতে যে উপহাসটুকু প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, সেইটুকুই ছোট গিন্নিকে খোঁচা দিয়া অশ্রুর নির্ঝর বহাইয়া দিল।

কান্না শুনিয়া লবঙ্গ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বলিল : ছোট বউ! চুপ করো, ভাই! আমি কিছুদিন পরেই চলে যাবো। তুমি আর মরাকান্না কেঁদ না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে ছোট গিন্নি বলিল সত্যি বলচো? না আমায় ভুলাবার জন্য বলচো!

লবঙ্গ তখন স্বামীর দিকে ফিরিয়া বলিল : বলগো, আমি সত্যি বলছি না, মিথ্যে বলছি? স্বামী বলিলেন : ও সত্যি বলছে গো, সত্যি বলছে তুমি চুপ করো।

তখনকার মত বিপ্লব থামিল।

রাত্রে বিরিঞ্চি আহারে বসিয়াছে, ছোটগিন্নি পরিবেশন করিতেছে, লবঙ্গ কোথা হইতে একখানা ভাঙ্গা পাখা লইয়া আসিয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। সে চুপ করিয়া খাইতে লাগিল।

লবঙ্গ বলিল : বলি হ্যাঁগা, বিয়েতো করেছিলে,—সে কথাটাতো ঠিক। তবে এত দিনের ভেতর কি একবারও নাম কর্ত্তে নেই ?

বিরিঞ্চি মুখ তুলিয়া বলিল : নাম করাতো তোমারাই ঘুচিয়েছ। তোমাদের যা দেবার কথা ছিল, কিছুই দিলে না কাজেই—

—ধরে নিলুম তোমার কথাটাই সত্যি! কিন্তু তবু এটাও তো তোমাদের বোঝা উচিত যে, মা বিধবা মানুষ কোথা থেকে সে তোমাদের দাবী মেটাবে।

তা হলে বিয়ে দেওয়া কেন? সমান সমান ঘরে দিলেই হয়।

—ও! সে একটা ভুল হয়ে গেছে বটে! কিন্তু সে দোষ বা ভুল হয়েছে ত মা'র। তার জন্যে আমায় শাস্তি কেন ?

—উত্তরাধিকার সূত্রে।

—আমি ত কিছুই উত্তরাধিকার করিনি, একটি কাণাকড়িও না। শুধু দোষটির বেলায়ই আমার ঘাড়ে চাপান হ'ল ?

বিরিঞ্চি ইহার জবাব দিল : পৃথিবীতে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে কি শুধুই আমিই চাপাচ্ছি? কুলীনের ঘরে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। যথেষ্ট পাওনা দাওনা না হলে বউ ত্যাগ করা বাঙ্গালীর ঘরে নতুন নয়! তোমার মা দেওয়া থোওয়া ভাল করে করেন নি, কাজেই তোমার ভাগ্যে যে এমনটা ঘটবে, সেটা কিছু নতুন নয়, খুবই স্বাভাবিক।

লবঙ্গ বলিল : তাহ'লে এ স্বামীর ঘর করা নয়, হোটেলে থাকা।

বিরিঞ্চি খুব দার্শনিকের মতই আওড়াইল : পৃথিবীতে কোন্ জিনিষটা হোটেলের মত নয়? পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ, সন্তান লালনপালন সবই কি দোকানদারি নয়, বড়বৌ? বাঁ-হাতে মূল্য না দিলে,

ডানহাতে কোন্ জিনিষটা পাওয়া যায়? তবে আগে আর পাছে।

লবঙ্গ চমকিত হইয়া ভ্রূযুগল কপালের উপরে তুলিল, এবং অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল: বলো কি? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু এই-টুকু? শুধু দেনা পাওনার সম্পর্ক? শুধু ঝি ও মনিবের সম্পর্ক? আর কিছুই নয়! আমি-ত জানতাম আরও বেশী? আমি-ত জানতাম, পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই সকলের চেয়ে পবিত্রতম!

হাঁ! এম্‌নি কতকগুলো আখ্যা না দিলে, বাঁধনটার দড়ি শক্ত হয় কই? আর শক্ত না হলেই বা ছেলেপিলে প্রতিপালন হয় কি করে? বাপ যদি দড়ি ছিঁড়ে পালায়, তাহ'লে ছেলে-পুলে মানুষ হবার যোগাড় করে কে?

—তাহ'লে বলছো এই গ্রন্থিটুকু অটুট কর্‌বার জন্যেই ঋষিরা একে পবিত্র সম্বন্ধ বলে শাস্ত্রে লিখেছে?

বিরিঞ্চি খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া বলিল: ধর্ম্ম-টর্ম্ম সব উদরগত, উদর পরিপুরণই প্রধান ধর্ম্ম। তুমি কি বলতে চাও, ডাকাতরা সব অধার্ম্মিক? কখনও না। তারা নিজের উদরের জন্য ঐ বৃত্তি অবলম্বন করেছে। শাস্ত্রে বলে, স্ব-বৃত্তি সাধনই প্রধান ধর্ম্ম।

লবঙ্গ ত শুনিয়া অবাক্!

সে খপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: তা হলে তুমি বলতে চাও, আমি আমার উদর পূরণের জন্যে যে কোনও নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন করি না কেন, তাতে আমার কোনও পাপ হবে না?

—কিছু না! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যে কোনও পাপই হবে না, এটা আমি জোর করে বলতে পারি।

—তবে সমাজ এত রাগারাগি করে কেন?

—সমাজ করতে পারে, কেননা তাতে সমাজের স্বার্থে ঘা পড়ে।

লবঙ্গ পাখা থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল: তাহলে তুমি বলচো মানুষ যে কোনও উপায়ে তার পেটের জ্বালা নিবারণ কর্ত্তে পারে?

—নিশ্চয়ই।

—যদি চুরি ক'রে করে?

—কোনও দোষ নাই, যদি না ধরা পড়ে।

—মেয়ে মানুষ যদি হয়?

—সেও যে কোনও উপায়ে তার পেটের জ্বালা নিবারণ করতে পারে। পুরুষ মানুষ যেমন ক'রে করে, সেও তেমনি ভাবে পারে।

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের দেশে গ'ড়ব সোপান
তোমায় এবার ধ'রতে প্রিয়।
চোখের জলে ভাসিয়ে তরী
বেয়ে যাব পরশ দিও॥
স্বপ্ন-মায়ার পুষ্প-বনে,
হেসে গেছ আড়্-নয়নে,
স্বপন ভেঙে জাগব না আর
নয়ন কোনে বাঁধব প্রিয়॥
তোমার চোখে কাজল হ'য়ে
দুলে যাব আঁখির পাতায়,
তোমার গানের সুরটি সেজে
বাজব তোমার অন্তরে হায়;
তোমার নামের ঐ দেউলে,
প্রদীপ হ'য়ে উঠব জ্বলে,
নীল গগনে বাঁধব বাসা
সে যে তোমার উত্তরীয়॥

—:০:—

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার মুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পর্য্যায়

পরের দিন চপল যখন ঘুম থেকে উঠলো, তখন বেশ বেলা হয়ে গ্যাছে। ভোরের দিকে কখন ও নিজেই গিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়, তা ওর নিজেরই মনে নেই। সোনালি সূর্য্যের লালিমা কেটে গিয়ে ঝরেছে তাতে রূপোর রঙ। চোখ মুছে তাড়াতাড়ি ও নেমে এল বিছানা থেকে, এসে ধপাস্ করে বসে পড়লো ক্যাম্প চেয়ারটাতে—। ওখানে বসতেই ওর মনে পড়ে গেল গত রাত্রির কথা। রাত্রির অন্ধকারে যা ওকে মোহাবিষ্ট করে তুলেছিল, দিনের আলোকে তার চিহ্ন গেছে মুছে। ওর নিজেরই হাসি পাচ্ছে কালকের ওর নিজের কথা ভেবে। কি চঞ্চলই না ও হয়ে উঠেছিল কাল রাতে। কর্ম্মচঞ্চল কলিকাতার কর্ম্মধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সবাই যে কর্ম্মব্যস্ত তারই নিদর্শন ভেসে আসছে। ওর মন এখন সম্পূর্ণ সরল ও নিরাসক্ত। ও ঠিক আগের চপল বোস যার সাথে দুনিয়ার কোন মানুষের বিশেষ অন্তরঙ্গতা নেই। নিজের ঘরের মধ্যে বসে বসেই ও সারা দুনিয়াকে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কেউ ওকে কোনদিন খোঁজে পায় না। সারা দেশের লোকের জীবনমরণ যার কলম থেকে বেরোয়, তাদের কেহই জানে না ওকে। ও ইচ্ছে করেই ধরা দেয়নি। কত মেয়ে সেধে ওর বাড়ী এসে আলাপ করে গেছে, দেখিয়ে গেছে গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতার অভিনয়। কাগজে টুকে দিয়ে গেছে নিজেদের নাম অথচ পরমুহূর্ত্তেই ও গেছে সব ভুলে। ঠিকানা লেখা কাগজ উড়ে গেছে রাস্তায় না হয় জঞ্জালের গাদায়। কিছুদিন বাদে দেখা হলে দীপ্তিকণাকে আহ্বান করেছে প্রীতিলতা বলে, আর প্রীতিকে কল্যাণী মজুমদার বলে। মিসেস্কে ডেকেছে মিস্ বলে আর মিস্কে মিসেস্ বলে। মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করে নি। কেউ কেউ মনে ভেবেছে ওয়াইল্ড, আর কেউ বলেছে গেঁইয়া, কোন কাজের নয়'। প্রীতিলতার মত মেয়েরা বন্ধুদের কাছে বলেছে—কোল্ড আর ইম্পোটেন্ট। শ্যামলী রায় আলোচনা করেছে—ও দেউলে, বাঁধা পড়েছে ওর সমস্ত কিছুই অন্যের কাছে, যার রূপের সিন্দুকে চোখা চোখা প্রেমের-বুলির তালা দেওয়া লুকানো আছে ওর পৌরুষের দলিলটা। কড়া পাওনাদার, আদায় করে নিতে জানে নিজের পাওনা গণ্ডা, তাই মহাজনী খাতায় নাম লিখিয়ে রেখেছে ওকে চিরকালের জন্য বাঁধা। প্রীতি সন্দেহ করে কল্যাণীকে, কল্যাণী হিংসায় জ্বলে মরে দীপ্তিকে দেখে। চপল 'এ সবের কোন খোঁজই রাখে না, রাখবার মত মনের গড়ন ওর নয়। ও ডুবে থাকে নিজের ভেতর নিজে।

চেয়ারের ভিতর ও একবার পাশ ফিরে নেয়। সারা দেহে ওর ক্লান্তি আর জড়তা। চোখের তলায় পড়েছে কালির দাগ। সারা দেহটায় ওর ব্যথা লাগছে। শরীরটা যেন একবারে ভেঙে পড়তে চায়, কাঁচের পুতুলের মত—ভিতরে ভিতরে যেটা গেছে শত টুকরা হয়ে, ওপর থেকে রাখা হয়েছে বেমালুম জোড়া দিয়ে।

মা এসে ঢুকলেন। ছেলের চেহারা দেখে তাঁর সন্দেহ জাগলো। জিজ্ঞাসা করলেন কিরে! অমন করে বসে আছিস্ যে?

—এমনি আর কি—চপল মিটমিট করে চেয়ে বলে।

—অত শুকনো দেখাচ্ছে যে তোকে? অসুখ করেনি তো?

—কেন, বেশ আছি তো—কপালে হাত ঠেকিয়ে ও উত্তর দেয়। সত্যি ওর জ্বর হলো নাকি? মুখে বলে—এইতো কপাল বেশ ঠাণ্ডা। কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভাল ঘুম হয় নি কিনা তাই।

ওর মা মশারী তুলতে তুলতে বলেন কি স্বপ্ন রে? ও বলে—উঃ মাগো? সেকি বিশ্রী স্বপ্ন তোমায় আর কি বলবো। কি প্রকাণ্ড ভূত, ইয়া লম্বা লম্বা হাত পা, বুঝলে মা চোখগুলো দিয়ে আগুণ বেরুচ্ছে, সেই ভূতটা নামলো একটা ট্যাক্সী করে, প্রকাণ্ড একটা কার, অত লম্বা লম্বা হাত পা তার ভেতর কি আর ধরে? রাস্তায় নেমে আরও বড় হয়ে গেল…

ওর মা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন নে নে হয়েছে তোর ভূতের গল্প, নিজে যেমন তুই একটা আস্ত ভূত। ওঠ—মুখ হাত পা ধুয়ে চা খেয়ে নে।

ও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। মাকে মিথ্যা কথা বলে—ওর মনে খোঁচা বেঁধে। এই সুরু হলো নাকি লুকোচুরী? পেষ্ট আর ব্রাশ হাতে করে ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় বলে—চা-টা আমারই ঘরে পাঠিয়ে দাও মা, আমি

এক্ষুণি আসছি।—মার সামনে যেতেই যেন ওর ভয় করছে।

মুখধুয়ে ও ফিরে আসে শীগ্রই। পা ওর চলতে চায় না। শরীরটা ওর যেন জলভরা গ্লাস, নড়া-চড়া করতে গেলেই চলকে পড়ে যেতে চায়। তার চেয়ে তাকে এক যায়গায় বসিয়ে রাখাই ভাল। চায়ের কাপটা হাতে ক'রে ও আবার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় এসে এলিয়ে পড়ে। ছোট টিপয়টা আগেই এনেছে সরিয়ে চেয়ারটার ধারে, তার ওপর চুরুটের পকেট ব্যাগটা আর দেশলাই, পাশে চায়ের পেয়ালা। চায়ে আর চুরুটে টান দিয়ে ও খানিকটা তাজা হয়ে ওঠে। গতরাত্রের ভূতের স্বপ্ন (?) ওর মন থেকে গেছে প্রায় মিলিয়ে। চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে চুরুটটা মুখে দিয়ে ও আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, হেয়ার ব্রাশ-টা হাতে ক'রে। ওর নিজেরই এমন হাসি পাচ্ছে, নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে। মাথায় ব্রাশ করে ও টেবিলে এসে বসে, চেয়ারটা টেনে। কাগজ পত্রগুলো কিছু কিছু অগোছাল হয়েছিল, সেগুলোকে ও নিজেই গুছিয়ে ফেলে। তারপর র‍্যাক থেকে একটা বই পেড়ে চোখ দুটোকে মেলে ধরে তার পাতায়। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা চলে যায় ইটালির এক নিভৃততম কোণে।

খানিকক্ষণ সময় কেটে যায়। ওর কাছে বাহ্যজগৎ লুপ্ত। মা এসে খবর দিয়ে যান—চপল তোকে বাইরে কে একজন ডাকছে দেখে আয়।

ও ভাল ক'রে শুনতে পায় না। মা ফের বলেন—কই শুনতে পেলি আমার কথা?

—হুঁ বলে চপল পাতা উল্টে চলে। ওর মা ফের বলেন—কই উঠলি নে?

—কি?—

হুঁস হলো এতক্ষণে?

হু হলো, যাও বিরক্ত করো না।

—বিরক্ত-তো আমি তোকে নিত্যই করছি। নাও এখন দয়াকরে একবার উঠে বাইরে দেখবে?

—কেন? উঃ কি জ্বালাতনই যে তোমরা কর।

মা হাসেন, বলেন—কিযে বাপু রাতদিন রাত-দিন বই নিয়ে পড়ে থাকিস বুঝতে পারি না। কাজ কর্ম্ম নেই, কিছু নেই, পড়ে পড়ে উনি রাজ্য জয় করবেন। এখন বাইরে গিয়ে একবার দেখে আয় কে ডাকছে।

অন্যমনস্ক ভাবে ও বলে—কে বল দেখি?

তা আমি কি করে জানবো? ওর মা ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলেন।

—সত্যিই ডাকছে? আর কাউকে নয় তো? বইএর ওপর চোখ রেখেই ও বলে চলে।

ওর মা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলেন—চপলবাবু আপনারই নাম তো?

ও হেসে ফেলে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—কে ডাকছে নামটা জিজ্ঞাসা করলে না কেন? মাটী করলে দেখছি সব। সেই প্রীতি না যূথী সেই মেয়েটা নয় তো? তাহলেই খেয়েছে; আজ সব গয়া। মার দিকে তাকিয়ে ও বলে আচ্ছা মা, ওরা জ্বালাতন করতে কেন আসে বলতো? না এলেই তো পারে। তুমি মানা করে দিতে পার না? এই বার এলে বলে দিও বাড়ীতে নেই, কেমন? আর নাহয় আমাকে একটু খবর দিও চুপি চুপি আমি পাশের ঘরে চুপ করে শুয়ে থাকবো, টেরও পাবে না। কেমন?

ওর মা হেসে ফেলেন। ওরা কেন যে আসে তা তিনি বোঝেন, আর সেইজন্য একটু গৌরবও বোধ করেন মনে মনে। কত বড় বড় লোকের মেয়েরা তাঁর চপলকে এতখানি শ্রদ্ধা করে, একটু প্রীতিলাভ করবার জন্য লালায়িত হয় একি কম গৌরবের কথা?

চপল বাইরে এসে দেখে মৃণালবাবু এসে হাজির। মৃণাল মুখুজ্যে, আদব কায়দা আর ফ্যাসানে ফোলান পুরুষ। নিজের টু-সীটারে টহল দিয়ে বেড়ান সারা কলকাতা সহর। জমার খাতায় মোটা অঙ্ক, নিত্য চলে সুদ কষা, তারই জোরে মিলনীর সেক্রেটারীত্ব।

এই যে চপলবাবু—সুইট্ মর্নিং।

—গুড্-মর্নিং বলে চপল হাত তোলে।

মৃণালবাবু কার থেকে নেমে আসেন। ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলেন—এক কাপ চা না খেয়ে আজকেও যাচ্ছি না।

চপল লজ্জিত ভাবে বলে—হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই খাবেন। বাইরে থেকে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে ডাকে—মা! তারপর নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পেরে বলে—চলুন, ভেতরে বসবেন চলুন। নিজের ঘরটাতে মৃণালবাবুকে পৌঁছে দিয়ে ও নিজে বেরিয়ে আসে। বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ও ভাবে—কি মুস্কিলই হলো। এমন বইটা মাঠে মারা গেল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও ভেবে চলে কত কি কথা। ও ভুলেই যায় ঘরে একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছে।

মা এসে বলেন—কিরে এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস্ একলা? ছেলেটা চলে গেছে?

ওর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে ওর মার ওপর। বলে হ্যাঁ গেছে না আর কিছু? তুমি কেন বলে দিলে না যে আমি বাড়ী নেই?

তুই কি আমাকে মিথ্যা কথা বলাতে চাস্ নাকি বুড়ো বয়সে?

চপল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বলে—বাঃ আমি তাই বলছি নাকি?

—তবে কি বলছিস্ তুই? ঘরে থাকতেও বলে দেব বাড়ী নেই? সেটা মিথ্যা কথা হবে না?

মাথা চুলকে ও বলে—তাইতো! কিন্তু আমি কি করতে এসেছিলুম বল দেখি? ভুলে গেলুম যে।

—তা আমি কি করে জানবো। ভদ্রলোকের ছেলেকে ঘরের ভেতর একলা বসিয়ে রেখে উনি আছেন এখানে চোরের মত দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে মনে; মৃণালবাবু বল্লেন চা খাওয়াতে।

ওর মা বলেন—এতক্ষণে মনে হলো? যাও তুমি ঘরে গিয়ে ততক্ষণ একটু গল্প করগে; আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি চা।

চপল ফিরে আসে নিজের ঘরে। মৃণালকে দেখে বলে (গল্প করতে হবে বলে)—বসে আছেন একলা?

—তাইতো দেখছি। কি করা যায় বলুন? আপনার তো আর ফিরবার নামই নেই। কি আর করি বসে বসে তাই দেখছিলাম আপনার কাগজ পত্র বিনা অনুমতিতেই তা আপনি শুধু 'সুচিত্রা'তেই লেখেন বুঝি? 'ভারতে' লেখেন না কেন?

কি জানি কাগজটা আমার ভালো লাগে না। ওর চেয়ে 'অপ্রবাসী' কাগজটা বরং ভালো। সেখানে মাঝে মাঝে পাঠাই লেখা যদিও সম্পাদক মশাইএর নাতি-নাতনীর লেখাতেই ওটা চালানো হচ্ছে। ভালো লোকও মাঝে মাঝে লেখে। আর কিই বা সামর্থ্য বলুন? সামান্য আইডিয়া ও অভিজ্ঞতা, ভাল জিনিষ সৃষ্টি করবো কোথা থেকে? পড়তে পেলাম কই? পড়াশুনো না থাকলে কি আর বড় জিনিষ সম্বন্ধে ধারণা করা চলে? ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী পর্য্যন্ত পৌঁছাতেই

অর্দ্ধেক শক্তি ক্ষয়ে যায়, উৎসাহ ওখানেই যায় নিভে, অনেকখানি সময়ও।

—কি যে বাজে বলছেন, তার নেই ঠিক। বাংলা সাহিত্যে আপনি যা দেবার চেষ্টা করছেন, তার দামতো নেহাৎ কম নয়। বরং দুঃখের কথা এই যে, দেশের লোক এখনও আপনাদের মত লেখককে উৎসাহিত করবার পথে পেছিয়ে পড়ে আছে। সাহিত্যকে এরা বড় বড় বাড়ী, মোটর, সাড়ী, আর ফুলের বাগানের ভেতরেই বন্ধ করে রেখেছে। শরৎবাবু তাকে টেনে আনলেন মধ্যবিত্তের বাড়ী, আর আপনি চেষ্টা করছেন তাকে চালাঘর, পচা পুকুর আর কুলি বস্তিতে টেনে আনতে যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক বাস করে, যাদের নিয়েই দেশ। এই জন্যেই তো বলেছিলাম আপনি আমাদের গৌরব। জানেন তো সকালের সূর্য্যের দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় সারা দিনটাই কেমন যাবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার প্রথম পদক্ষেপেই তা বুঝতে পারা যায়।

—নাঃ এইবার আপনি অতিশয়োক্তি করছেন। মনে যা আসে, বলতে যা ভাল লাগে, কলমের মুখে তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করি; তার যে এত ব্যথা হতে পারে তাতো জানতুম না। আমার মনে হয় কি জানেন? পাঠকের ভাব-বিলাসী মন হয়তো এ লেখাকে আদর করবে না। তার ওপর যাদের জীবন কথা লিখতে চাই, তারা নিজেরাই যে নিরক্ষর। পড়বে কারা? ট্যাকও যে তাদের খালি। অতএব এ বই কিনবে কে? এই বই তো আর উপহার দেওয়া চলে না বন্ধু বান্ধবীকে? মাসে চার আনা পয়সা খরচ করে লাইব্রেরীতে ঢোকবারও যে তাদের সামর্থ্য নেই। সেই পয়সায় ছেলের একটা পেণি কেনা যায়—শীতাতপ থেকে দেহকে বাঁচাবার জন্য। দেশের এত বড় লোক আছে, এত লোক এত দান করে, ধর্ম্মশালা, মঠ, রাস্তা করে দেয়; আমার মনে হয় ওসব ভস্মে ঘি ঢালা। শিক্ষা পেলে রাস্তা ওরা নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারে, ধর্ম্মশালার প্রয়োজন হয় না কুয়ার জলও আপনি পরিস্কার হয়ে যায়। গরীবের বা মানুষের আসল উপকার করবার ইচ্ছা কারুরই নেই। জমকালো একটা কিছু করে অমর হ'য়ে থাকার বাসনা। কিন্তু তাদের ধর্ম্মশালার ইটে যে লাগবে নোনা, টিউব ওয়েলের মুখে জমবে কাদা, হাসপাতালের ছুরি কাঁচিতে ধরবে জং। ওর চেয়ে যদি পয়সাগুলো খরচ হতো ফ্রী স্কুল লাইব্রেরীর পেছনে তাহলে আসল উপকার করা হতো মানুষের, চিনতে পারতো প্রত্যেক অন্তর্নিহিত শক্তিকে, আর তাঁদের নামও অক্ষয় হয়ে থাকতো জাতির ইতিহাসের পাতায়।

(ক্রমশঃ)

যুদ্ধ

শ্রীসমীর ঘোষ

উন্মাদ হোয়ে বৈশাখী বায় আসে,
গাছের ডালেতে উন্মাদ দোলা দেয়;
সন্ধ্যা আকাশে বিদ্রূপ করি' হাসে,
উল্কার আলো ধূলিতে নিভায়ে নেয়।
বদ্ধ চক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানি;
রুদ্ধ বুকের রক্তে প্রলয় আনি,
সুপ্ত সন্ধ্যা-সুপ্ত নয়কো মানি'
প্রচণ্ডতায় সঙ্গী করিয়া দেয়।
সন্ধ্যা আকাশে বিদ্রূপ করি' হাসে,
উল্কার আলো ধূলিতে নিভায়ে নেয়॥

জঙ্গল ছেড়ে শ্বাপদ উঠিলো জেগে;
অমারাত্রির নিঃশ্বাস হীন বনে
শব্দ বিহীন পাদচার তার বেগে,
প্রেতেরে ফিরিলো লালসা কুটিল রণে।
চক্ষু তাহার লাভার জ্যোতিতে জ্বলে,
বিদ্যুৎবাহি শোণিত বুকের তলে,
কাপিল বুকের আশঙ্কা পলে পলে,
ব্যঙ্গ করিয়া উঠিছে স্তব্ধ বনে।
শব্দবিহীন পাদচার তার বেগে
প্রেতেরে ফিরিলো লালসা কুটিল রণে॥

অরণ্য বুকে অনেক হোয়েছে রাত,
প্রমত্ত বায়ে ঝরেছে অনেক পাতা;
আকাশের বুকে হোয়েছে উল্কাপাত
তুঙ্গ বৃক্ষ আনত করেছে মাথা।
জড়তা ভাজিয়া নিষাদ জুড়েছে তীর,
আরণ্যকের লক্ষ্য ফুরিছে শির—
বিকট নীরব মৃত প্রায় পৃথিবীর,
বক্ষে ঝরাতে বাড়তি একটি পাতা।
আকাশের বুকে হোয়েছে উল্কাপাত,
তুঙ্গ বৃক্ষ আনত করেছে মাথা॥

ছিঁড়ে গেল বুঝি ইথারে যবনিকা;
কান পেতে শোনো অশরীরি ক্রন্দন:
উষ্ণ করিবে মৃত্যুর জয়টিকা
পরাতে শায়ক মুক্তক বন্ধন।
আকাশের বুকে অনেক হয়েছে রাতি,
প্রলয় আগুন দম্ভে জ্বালেনি বাতি;
বৈশাখী বায় আবার উঠিলো মাতি,
—শোনো উলঙ্গ অশরীরি ক্রন্দন!
উষ্ণ রুধিরে মৃত্যুর জয়টিকা
পরাতে শায়ক মুক্তক বন্ধন॥
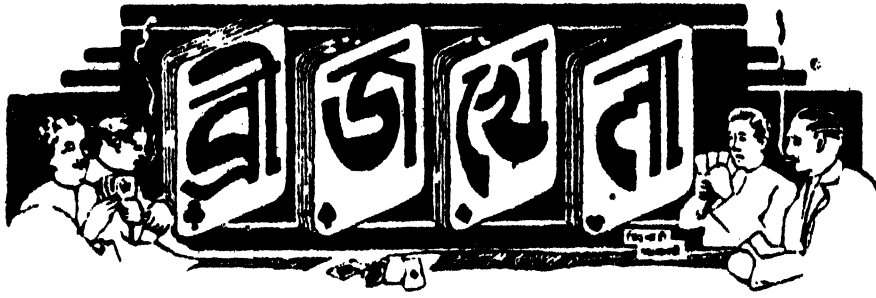
তাসের টেবিলে কলরব :— বিগত রবিবার ২০শে নভেম্বর থেকে খিটা বিটা ক্লাবের উদ্যোগে নিখিল-ভারত 'গোল্ড কাপ' প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে। যদিও এবার প্রতিযোগিতার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দারাবাদের দল এবৎসর যোগ দিতে পারেন নি, তবু অন্যান্য প্রদেশের ক্লাবসমূহ যোগদান করায় প্রতি-যোগিতার নিখিল-ভারত আখ্যা ক্ষুণ্ণ হয় নি। এখনও বাইরের কোনদল খেল-বার সুযোগ পাননি বটে, কলিকাতার ও তার উপকণ্ঠের দলসমূহ আসর সরগরম করছেন। কিন্তু প্রতিযোগিতার নামের শ্রেষ্ঠতা ও গাম্ভীর্য্য বজায় রখার মত কোন দলই খেলা দেখাতে পারেন নি। যে সব দল আজ অবধি ক্রীড়া-প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের কারও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলে মনে হয় না। তবে যদি তাঁরা এ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত খেলার ধরণ তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ নয় বলে প্রতিপন্ন করেন, অথবা আরও উন্নতি করতে পারেন তো আলাদা কথা। ভুল প্রত্যেকেরই হয় এবং হওয়াও স্বাভাবিক; কিন্তু খেলতে বসে খেঁড়ী শক্তিব্যঞ্জক ডাক দিলেন, আর আমি না শুনেই পাশ দিলাম,—সে ভুল ভুলই নয় তাকে খেলার অপরাধই বলা সঙ্গত। আর এ প্রতিযোগিতায় দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দিনই এই প্রকারের কোন না কোন ভুল কেউ না কেউ করে বসছেন; কোন সময়ে Revoke, কোনটা বা Out of turn bid, আর কোনটা না শুনে ডাক দেওয়া,—বাস্তবিক পক্ষে এ প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে এই গুলির কোনটিকে ভুল বলা চলে না, বলা উচিত অপরাধ। তারপর আর একটি দোষ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে তা' এই যে প্রতিযোগীরা খেলার পরই খেলানো হাতটি নিয়ে বিশেষ করে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁরা একথা ভুলে যান যে পরবর্ত্তী হাতটি তাঁদের এই তর্কের গরমে ডাকা এবং খেলানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। টেবিলে বসে তাঁরা যদি কথা বন্ধ করেন, তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক হাতই তাঁরা আপেক্ষিকভাবে যথেষ্ট ভালভাবে খেলতে সমর্থ হবেন। কারণ বিশেষ ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী হাতের খেলা বিশ্লেষণ না করার দরুণ নিজের ভুল দেখে মন খারাপ করে বসবেন না এবং অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে খেলে যেতে পারবেন ও শান্তিভঙ্গ না করে পূর্ব্বোক্ত অপরাধ থেকে বেঁচে যাবেন। যে কোন কাজেই ব্যাপৃত থাকা যাক্ না কেন সেটিকে সাধনা বলে গ্রহণ করাই বিধেয়, অন্যথা কৃতকার্য্য হওয়া সুদূর পরাহত। তাই প্রত্যেক ক্রীড়ক এবং ক্রীড়ামোদীদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন এ খেলাকে 'তাসা কর্ম্মনাশা' বলে উপেক্ষা না করে ইহাকে সাধনার গণ্ডীভুক্ত করেন, তাহলে এর সুফল সুনিশ্চিত। যদি একান্ত হাত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন তো হাতটি লিখে রেখে দিয়ে খেলা শেষ হবার পর তা নিয়ে তর্ক করা যুক্তিযুক্ত। যথাসময়ে হাতের সমালোচনা করলে খেলারও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় এবং অপরেরও বিরাগ ভাজন হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।
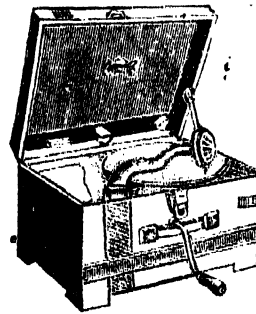
কাশীশ্বর

(নাটক)

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র
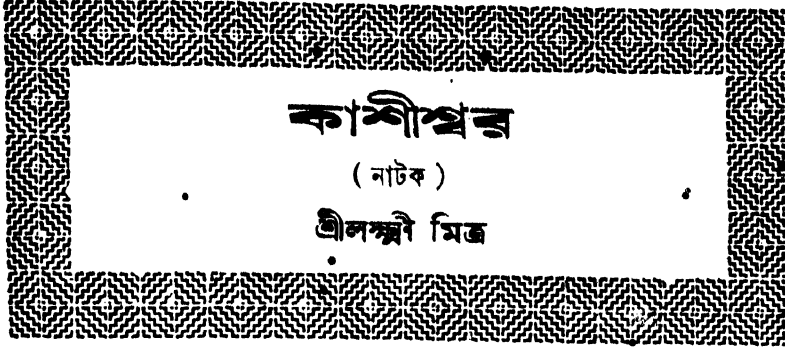
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঘর)

—অজয়, রহমৎ, দিলীপ ও সুনীলা—

অজয়—আজকের দিনে আমার আর কিছু বলা উচিৎ নয় কিন্তু একটা মস্তবড়ো Career নষ্ট হ'য়ে গেল! এইটাই আমাদের সব চেয়ে বড়ো লোকসান। যাক্, কি আর করা যাবে!—

(সকলেই চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল)

রহমৎ আমি তা হ'লে উঠি এবার।

সুনীলা—হ্যাঁ আপনি আসুন। বাড়ী গিয়ে আপনাকে হয়তো আবার আপনাদের নিয়মকানুন পালন কোরতে হবে।

রহমৎ—না, সে সব কিছু করতে হবে না।

অজয়—তুমি ঘাটে গেছলে না কি হে?

রহমৎ—হ্যাঁ—

সুনীলা—শুধু ঘাটে নয়, উনি 'কাঁধ'ও দিয়েছিলেন।

অজয়—মুসলমান হয়ে হিন্দুর—

রহমৎ—ভারী আশ্চর্য্য অজয়বাবু—সত্যি। আমি রাজী হইনি প্রথমে। কিন্তু দিলীপ ছাড়লে না। বল্লে আমার মাকে তুমি যদি বহন কোরে না নিয়ে যেতে পারো, তবে তুমি আমার কিসের ভাই। হিন্দু মুসলমানের মিলন কি শুধু রাজনীতি, ক্ষেত্রে? সমাজের গণ্ডীর ভেতর কি তার কোন স্থান থাকবে না?

অজয়—বুঝেছি। কিন্তু ধর্ম্ম দুটো যে আলাদা? একটা যে একটির একেবারে পরিপন্থী?

রহমৎ—আমরা সবাই তাই জানি অজয়বাবু, কিন্তু দিলীপ জানে আলাদা সে যাক্—আজকের দিনে আর না।

অজয়—আর কেউ আপত্তি কোরলে না? ওর বাবা, ভাই, বোন, বা অন্য আত্মীয়রা?

রহমৎ—করলে বই কি! সবাই সাধ্যমত আপত্তি করলে। একঘরে হবার ভয়ও কেউ কেউ দেখালে, কিন্তু ফল কিছু হল না।

অজয়—ভারী আশ্চর্য্য!

রহমৎ—ভারী আশ্চর্য্য। আমিও তাই বলি। কিন্তু স্রষ্টা যারা তারা অসাধারণ লোক অজয়বাবু! সাধারণ পথ তাদের নয়; সাধারণের জন্য পথ তারা সৃষ্টি করে। সে পথে প্রথমে হয়তো লোক চলতে চাইবে না; হয়তো বেধে যাবে কলহ, রেষারেষি, তুমুল আন্দোলন—কিন্তু সেই হবে পথ।

(প্রস্থান)

অজয়—(অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল) অন্যদিন হলে এর মুখের মত জবাব দিতাম। আজকের দিনে আর বাক্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার রুচি নেই। সে যাক্—আমিও তাহলে উঠি।

সুনীলা—আসুন!

অজয়—একটা কথা—তুমি তাহ'লে কংগ্রেস থেকে বিদায় নিলে এ কথা একেবারে ঠিক?

(দিলীপ ম্লান হাসি হাসিল)

Excuse me—আমি একথা জিজ্ঞাসা করছি তার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রেসিডেণ্ট হবার জন্য তাহলে অন্য লোক ঠিক করতে হবে। ওয়ার্দ্ধায় টেলিগ্রামও করতে হবে।—বিস্তর সব কাজ পড়ে রয়েছে।

দিলীপ—হ্যাঁ, একথা ঠিক অজয়।

অজয়—I am very glad to hear this. (অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বলিল) I mean I am very sorry—চল্লাম।

(প্রস্থান)

(কাশীশ্বর, দ্বিজেন ও মনীষা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া এক একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিল। —অল্প স্তব্ধ থাকিয়া কাশীশ্বর কথা কহিল)

কাশী—যাক্, সব শেষ হয়ে গেল। মৃত্যু সবাইয়ের হয়, কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়ীচাপা পড়ে হাসপাতালে মৃত্যু—সাধারণ ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েদের বড় একটা হয় না। সে দিক দিয়ে এ একটা Unique ঘটনা।

(দিলীপ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই কাশীশ্বর তীক্ষ্ণ অথচ মর্ম্মন্তুদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল) না না দিলীপ তুমি উঠবে না। তোমরা কেউ উঠে যাবে না। সবাই থাকো।

(দিলীপ বসিয়া পড়িল)

অনেক কথা সব আমার বলবার রয়েছে। তোমাদের তা শুনতে হবে, বিচার কোরতে হবে। উঠে গেলে চলবে না।

সুনীলা—আজকের দিনটা থাক না জ্যাঠামশাই?

কাশী—(প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল) না, না, আজই তোমাদের সে সব শুনতে হবে।

বলিয়া কাশীশ্বর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীর ও দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তোমরা সবাই শুনেছ দিলীপ আমার সন্তান নয়। সবাই তোমরা শুনেছ। তথাপি আমি দিলীপকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতাম ; কারণ, দিলীপ মহৎ, দিলীপ উদার।—তোমরা বলবে আমি কেন তবে উইল কোরে দিলীপকে আমার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত কোরতে চেয়েছিলাম! আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি এই হচ্ছে তোমাদের সকলকার জীবন্ত প্রশ্ন! —হ্যাঁ আমি স্বীকার করছি এইটাই আমার জীবনের মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল। মস্ত ভুল দিলীপ।—আজ সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল!

দিলীপ—(অশ্রুসজল চোখে) যে আপনার সন্তান নয় তাকে যদি আপনি আপনার বিষয় থেকে অব্যাহতি দেন, ভুল যে কোথায় তা তো আমি বুঝতে পারি না।

কাশী—বলেছ ঠিক। কিন্তু যাকে আমি সব দিতে পেরেছিলাম, নিজের পুত্র বলে যাকে পৃথিবীতে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করিনি, তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত কোরতে গেলাম তার জন্মদাতার উপর এক ভীষণ প্রতিশোধ নিতে—এ আমার ভুল নয় তুমি বলো? কাশীশ্বর বসুর পক্ষে এ একটা অপমৃত্যু নয় তুমি বলো? যে কাশীশ্বর একদিন এক আর্ত্ত নারীর সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্য জীবনের এক স্মরণীয় দিনে—না সে থাক্! সে বলব না।—কিন্তু তুমি দিলীপ, তোমার মায়ের যে অপরাধ আমি ক্ষমা কোরতে পেরেছিলাম, তুমি তা পার নি। আমি তাকে যে গৌরব যে সম্মান দিয়েছিলাম, তুমি তাকে সেই পরিমান অগৌরবের মাঝে ফেলে দিয়ে হত্যা করেছ।

মণীষা—বাবা, তুমি থামো। আমরা আর সহ্য কোরতে পারছি না। আজকের দিনে আমাদের শুধু চুপ কোরে ভাবতে দাও। আর আমরা কিছু শুনতে চাই না। (কাঁদিতে লাগিল)

কাশী—আমার কথা শেষ হ'লেই থেমে যাবো। ব'লতে হবে না। তারপর তোদের সঙ্গে চুপ কোরে ভাবতে থাকবো। কিন্তু কথা আমায় শেষ ক'র্তে হবে। শেষ না কোরে পারবো না।—তোরা ভাবতে থাকবি তোদের মা ছিল কলঙ্কিতা—এ আমি সহ্য কোরতে পারবো না। তাই আমায় সব কথা ব'লতে হবে, কথা শেষ না কোরে পারবো না।

মনীষা—তোমার কথাই যথেষ্ট। তুমি মা'কে সতীর আসন দিয়ে এসেছ এই যথেষ্ট।—আমরা আর কিছু শুনতে চাই না, জান্তে চাই না।

(প্রস্থান)

কাশী—দিলীপ, তুইও কাঁদছিস্! না, কাঁদিস্ নি। ওরে, সে ছিল অকলঙ্ক! মনে এতটুকু তার পাপ ছিল না। কোন মহিয়সী নারীর কাছে সে ছোট ছিল না। সবাইকে সে ভালবাস্তো, শ্রদ্ধা ক'রতো। তার সেই নির্ম্মলতার সুযোগ নিয়ে যে দুরাত্মা সাধু তার সর্ব্বনাশ সাধন কোরতে পারলে—না থাক্ সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই।—(মুহূর্ত্তস্তব্ধ) —ধর্ম্মের আবরণের ভেতরও শয়তানের বাসা—সে বেচারী বুঝতে পারে নি। তাই তার এত দুর্ভোগ।—কিন্তু সে মৃত্যু দিয়ে তার এই কলঙ্কটুকুর অবসান কোরতে চেয়েছিল।—শুধু তোর মায়ায় সে পারে নি!...প্রথম যে দিন সে এই বাড়ীর বৌ হ'য়ে আমার কাছে এলো, সেই দিনই সে বিনাদ্বিধায় তার সমস্ত অন্তরটুকু আমার কাছে উদ্ঘাটিত কোরে দিলে। সে দিনের সেই উদ্দাম মিলন রজনীতে সে কী আকুলতা দিলীপ! তুই কল্পনা কোর্তে পারবি নি। আমায় ব'ললে—"ওগো স্বামী, এই কলঙ্কিত দেহ নিয়ে আর যা হয় কোরতে পারবো, কিন্তু দেবতার পূজা কোরতে পারবো না। সজ্ঞানে যদিও কোন পাপ করিনি কিন্তু পাপের ছাপ আমি এড়াতে পারিনি। আমায় তুমি ত্যাগ করো।" কিন্তু আমি তা পারলাম

না, দিলীপ। যে আমার পায়ে আছড়ে পড়লো, আমি তাকে রাণীর আসন দিয়ে তুলে ধরলাম। তার প্রিয় সন্তানকে নিজের ব'লে আত্মপ্রসন্ন লাভ করলাম। সবই করলাম, কিন্তু প্রতিহিংসাবৃত্তিকে জয় কোরতে পারলাম না। তাই হ'লো উইলের উদ্ভব। তাই হ'লো আজ কালীশ্বরের পরাজয়!

দ্বিজেন—ঐ উইল আজ আমি পুড়িয়ে ফেল্‌বো। (প্রস্থান)

সুনীলা—জ্যাঠামশাই, যা হয়ে গেছে তা যেতে দিন। তার জন্য আর দুঃখ কোরে লাভ কি! এখন যাতে তাঁর শান্তি হয় আমরা সেই প্রার্থনাই করি আসুন।

কালী—ঠিক ব'লেছ মা। কিন্তু আমি প্রার্থনা কোরলে হবে না। তুমি প্রার্থনা কোরলে হবে না। দ্বিজেন বা মনীষা প্রার্থনা ক'রলেও হবে না। তার আত্মার শান্তি দিলীপের হাতে!—

ওকে বল, ওকে বল মা প্রার্থনা কোরতে!

(প্রস্থান)

(দিলীপ ও সুনীলা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল ক্ষণকাল: প্রবেশ করিল বেহারা)

সুনীলা—বেহারা কি বলছে শোনো।

দিলীপ—কি রে?

বেহারা—কংগ্রেস থেকে লোক এসেছে।

দিলীপ—কি চান তিনি?

বেহারা—তিনি আপনার কাছ থেকে একটা কাগজে সই করিয়ে নিতে চান যে, আপনি প্রেসিডেণ্ট থাকতে চান না।

দিলীপ—ও! —কিন্তু আমি মত বদলেছি রে। আমি প্রেসিডেণ্ট থাকবো। আমি আবার দেশের কাজ করবো। —তুমি তাকে বলগে।

বেহারা—Thank you sir, thank you.

(বেহারার প্রস্থান)

দিলীপ—সুনীলা, আজ আবার নূতন কোরে শপথ করো—(বলিয়া সুনীলার দিকে হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিল)

সুনীলা—শপথ করলুম দিলীপ—(বলিয়া দিলীপের হাতখানি চাপিয়া ধরিল)

—যবনিকা—

বাংলার মানুষ ও চলচ্চিত্র

কুমারী এলোকেশী গুপ্তা

মানুষের জীবনের তিনটী অধ্যায়—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমানে মানুষ বলতে পারে তার অতীতের কাহিনী, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তা' জোর করে বলতে পারে না। তবুও বর্ত্তমানে মানুষ কল্পনা করে ভবিষ্যতের। যাতে ভবিষ্যতে সে অপরের সামনে তার কীর্ত্তি দীপ্ত করে ধরতে পারে। আবার সেই কল্পনা যখন ব্যর্থ হয়, তখন তার মনে জাগে অতীতের কথা—"যদি সে কাজটা ও ভাবে কল্পনা না করে অন্যভাবে ক'রত—তাহলে হয়ত সে কৃতকার্য্য হতে পারত।" কিন্তু তা'তে তার অতীত কীর্ত্তির কোন সুফল হয় না—হয় বর্ত্তমান কার্য্যকারিতায় ভবিষ্যতের আশা-পথের কিঞ্চিৎ আলোর সন্ধান,—অর্থাৎ "অভিজ্ঞতা।"

ভবিষ্যতের কল্পনাকে মূর্ত্ত করার "অভিজ্ঞতা" সঞ্চয়ের জন্য মানুষকে সাহায্য নিতে হয়—প্রথমতঃ—"লিখন পঠন" (Theory) পরে তৎসম্বন্ধে "আলোচনা" ও "গবেষণা"। গবেষণা ব্যাতিরেকে মানুষ কখনও তার কাল্পনিক বস্তুর স্বত্ব উপভোগ করতে পারে না। কল্পনা শক্তি বা আকাঙ্খা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে জগতে যেমন নানা শ্রেণীর মানুষ পরিলক্ষিত হয়, তেমন তাদের কল্পনা বা আকাঙ্খার ধারাও নানারূপে প্রবাহিত হয়। কেউ চায় তার জীবনটাকে ব্যবসা বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে, কেউ চায় বৈজ্ঞানিক তত্ব অর্জ্জন করতে আবার কেউ বা চায় নিজের কল্পনার বাস্তবতা ভাবে, ভাষায় বা রূপে অপরের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে,—ইত্যাদি নানারূপ আকাঙ্খার অনুপ্রেরণা এসে জাগে মানুষের মনে, এবং সেই আকাঙ্খার অনুপ্রেরণাতেই মানুষ এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের পথে তার কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করবার জন্য। তা'তে তার প্রয়োজন হয় "অর্থ এবং সামর্থ্যের" সমন্বয়।

আমাদের দেশে অর্থাৎ "বাংলায়" অর্থ এবং সামর্থ্যের সমন্বয় খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। যাঁদের অর্থ আছে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই কোন তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার স্পৃহা বা সামর্থ্যের অভাব। তাঁরা তাঁদের ধনগর্ব্বেই গর্ব্বিত থাকেন। তাঁরা ভাবেন না যে ঐ অর্থে তাঁদের নিজের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এবং দশের কর্ম্মময় জীবনের কোনও একটা তিমিরাচ্ছন্ন নূতন পথ আবিষ্কৃত হতে পারে—এবং সেই নব আবিস্কৃত পথে হয়ত ভবিষ্যতে তাঁদের প্রভূত অর্থাগম হ'তে পারে। তাদের আদর্শের উপর ভিত্তি স্থাপন করে ভবিষ্যতে অপরে হয়ত সেই আদর্শকে আরও প্রাণময় করে জগতের সামনে ধরতে পারে। কিন্তু তাঁরা সে সম্বন্ধে কোন গবেষণা করেন

না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখতে পাই অনেক অর্থ সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের কাম্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় যথেচ্ছাচারিতা। কোন কিছু সৃষ্টির কল্পনা বা আকাঙ্খা তাদের অন্তরের দ্বারে আঘাত করে না। তারা চায় না কোন মহৎ উদ্দেশ্যের সাধনায় নিজেদের অন্তরকে ক্লিষ্ট করে জগতের সৃষ্টির মহত্বকে উপলব্ধি করতে—তারা চায় শুধু অপরের শক্তি সামর্থ্যের উপর দিয়ে নিজেদের ভোগের লিপ্সা পূর্ণ করতে। তাতে তাদের জীবনটা হয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন এবং সেজন্য জগতে তাদের কীর্ত্তির কোন ভিত্তিই স্থাপিত হয় না।"

"সামর্থ্য বা স্পৃহা যাদের আছে তাদের মধ্যে আবার হয়ত অর্থের অভাব এসে দাঁড়ায়। অনেক সময় জীবনের আনুষঙ্গিক চিন্তা বলবতী হয়ে তাদের উদ্দেশ্য চিন্তার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে। কিন্তু এ সত্বেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্পৃহা সত্যই যার অন্তরের নিবিষ্ট কোণে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে, সাধনায় সে তার প্রসার করে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হতে না পারলেও কৃতিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। আর একাগ্রতাহীন সাধকের জীবনের উপর দিয়ে শুধু ঝঞ্ঝাই বয়ে যায়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তার হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন কোন অর্থ-সম্পন্ন ব্যক্তির অন্তরে স্পৃহা জাগে অপরের শিল্প-বাণিজ্যের কৃতিত্বে সফলতায় অর্থ সমাগম দেখে নিজে সেই শিল্প-বাণিজ্য করতে। কিন্তু সেই বিশিষ্ট শিল্পের সাফল্যের পথ সম্বন্ধে কোনরূপ গবেষণা না করে তাঁরা এগিয়ে চলে শুধু তার অর্থ-সমাগমের আশায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়ে। ফলে লাভ হয় অর্থ-সমাগমের পরিবর্ত্তে অযথা অর্থব্যয়। কারণ যে জিনিষের উপর যার নিজের কোনও অভিজ্ঞতা থাকে না, সে জিনিষ নিয়ে অপরকে বিচার করার ক্ষমতাও তার থাকে না। এজন্য তারা এক-শ্রেণীর লোক দ্বারা প্রতারিত হয়—যারা কখনও কোনরূপ আলোচনা বা গবেষণার ধার ধারে নাই অথচ অনভিজ্ঞতা সত্বেও বাহ্যিক আড়ম্বরের দ্বারা অপরের কাছে নিজেদের সর্ব্বজ্ঞ বলে প্রচার করে। এরূপ লোকের কাছ হতে কোনদিন কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেজন্য এদের সহযোগীতায় তাদেরও ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

মানুষের আদর্শই মানুষকে জগতের মধ্যে বড় করে। এবং সেই আদর্শকেই অনুসরণ করে ভবিষ্যতে মানুষ তার জীবন যাত্রার পথে তাকে আরও বড় করে জগতের সামনে ধরবার চেষ্টা করে।

আমাদের নবাগত শিল্প বাণিজ্য চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির উপর লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, তাদেরও গতি আমাদের দেশের মানুষের জীবনের গতির সঙ্গে সমান ভাবেই পা ফেলে চলেছে। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ছোট বড় প্রায় পনেরটী চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মাত্র দু'একটি,—নিশ্চয়ই একমাত্র শুধু তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে। এবং সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাদের একনিষ্ঠ হয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা এবং গবেষণা করতে হয়েছে। একের কৃতকর্ম্মের সফলতা সত্বেও অপর প্রতিষ্ঠান গুলি তার আদর্শের সম্যক উপলব্ধি করতে পারছে না, তার কারণ তাদের মধ্যে আকাঙ্খা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সামর্থ্য এবং একাগ্রতার অভাব।

সুতরাং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করতে গেলে, আগে প্রয়োজন দেশের মানুষের সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে যত্নবান হওয়া। কারণ স্রষ্টার আদর্শেই সৃষ্টির মহত্ব।

'রাম ও সীতা'র ভূমিকায় রাধার "জনক-নন্দিনী" চিত্রে সুশীল রায় ও সাবিত্রী। চিত্রখানি শীঘ্রই রূপবাণী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

পরিচালক
ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা
টেলিফোন সাউথ ৪৬৬

অষ্টম বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৮

ওয়ার্দ্ধায়

পাঞ্জাব ও সিন্ধু পরিভ্রমণ করিয়া রাষ্ট্রপতি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন এবং 'খেয়ালী' সাধারণের নিকট প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন। ওয়ার্কিং কমিটির আগামী অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। বাংলায় কংগ্রেসী কোয়ালিশনী মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে। আশা করা যায় প্রস্তাবটী গৃহীত হইবে। ওয়ার্দ্ধায় অধিবেশনের পরই বাংলায় মন্ত্রীমণ্ডলের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন প্রক্রিয়া প্রবলভাবে সুরু হইবে। সিন্ধু প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে প্রধান মন্ত্রীর সহিত রাষ্ট্রপতির যে সমস্ত আলাপ আলোচনা হইয়াছে তাহা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করা হইবে এবং ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশনেই সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রী-সমস্যার সুনিশ্চিত ভাবে সমাধান হইবে।

মন্ত্রী-সমস্যা ব্যতীত দুইটী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওয়ার্কিং কমিটির সম্মুখে সমুপস্থিত করা হইবে। কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ-পন্থী ও বাম-পন্থীদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষিত হইবে কি না সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল। মুসোলিনী ও হিট্‌লারের ন্যায় বাধ্য শীর না হইলেও সর্দ্দার প্যাটেল বামপন্থী-দলনে যেরূপ তৎপর হইয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। দিল্লীর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর মহাত্মাজী বাম-পন্থীদের অক্রমণ করিয়া যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে বাম-পন্থী কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দ বিশেষ ক্ষুব্ধ ও ক্ষুন্ন হইয়াছে।

অতঃপর রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিত জহরলাল মহাত্মাজীর নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কংগ্রেসের অভিমত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে দাবী করিবেন বলিয়া প্রকাশ। রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিতজী পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিলেও তলে তলে মিঃ ভুলাভাই দেশাই, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি দক্ষিণ-পন্থী নেতৃবর্গ একটা রফা করিয়া সংশোধিত ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ্যে বিরোধিতার বিক্রম ও অন্তরালে গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা—এই দুই পরস্পর বিরোধী নীতির অবসান করিতে রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিতজী দৃঢ়-সঙ্কল্প।

ওয়ার্দ্ধার আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনেই যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে কংগ্রেসের নীতি ঘোষিত হইলে সমগ্র ভারতের রাজনীতি তদনুযায়ী পরিচালিত হইবে। অপর পক্ষে বাংলার পতনোন্মুখ মন্ত্রীমণ্ডল উদ্‌গ্রীবচিত্তে ওয়ার্দ্ধার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের কার্য্যকালের আসন্ন পরিসমাপ্তির দিন গুণিতেছেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে রাষ্ট্রপতি দৃঢ়-চিত্তে স্বীয় মত ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মহাত্মাজীকে পত্র লিখিয়াছেন। পণ্ডিতজীও রাষ্ট্রপতির সহিত একমত। রাষ্ট্রপতি ও পণ্ডিতজীর সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দক্ষিণ-পন্থী নেতৃবর্গ সংযত হইলে কংগ্রেসের পক্ষে যে মঙ্গল ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পবিত্র ক্রন্দন !

শনির চিঠি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভাবিয়াছে ও কাঁদিয়াছে। বাছা রে ! শনি লিখিয়াছে—"আমরা ভাবিতেছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। যতদিন ইঁহারা Examining Body মাত্র ছিলেন, ততদিন ধর্ম্ম কোনও ক্রমে আপনাকে বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্তাবক ও গুষ্টি প্রতিপালন করিবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন হইতে প্রি এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েটি পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন ও প্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছেন, সেদিন হইতে ভদ্রতার মুখোস পর্য্যন্ত খসিয়া গিয়াছে.......দেশের যাহারা ভবিষ্যৎ, তাহাদিগকে বঞ্চনা এবং ভুল শিক্ষার দ্বারা পীড়ন করিবার অপরাধে অপরাধীর শাস্তি তো হইতেছেই না, ধরাইয়া দিলে প্রমোশন হইতেছে। ইহাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের—'সীলে' Advancement of Learning পরিবৃত পদ্মান্তর্গত শ্রীচিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া হা-হুতাশের অন্ত নাই ! The Indian Stage যাহাই হউক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই Stage ভয়াবহ।" অনেকেই ইহা পড়িয়া মনে করিবেন, ইহা কোনও মুসলমান ভদ্রলোকের লেখা, কারণ এই প্রকারের কথা কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলার মন্ত্রী সভায় কোন মুসলমান সভ্য কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছিল এবং তাহার মুখের মত উত্তরও প্রদত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু নামে পরিচিত শনির দল যে এতদিন পরে এই উক্তি করিবে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু স্বার্থ ও হিংসা অতি পাজী জিনিষ, ইহারা না করাইতে পারে এমন কাজ নেই। সে যাহা হউক ইহাদের এতখানি কসরতের মূল্য মিলিতেছে না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। "ধরাইয়া দিলে প্রমোশন হইতেছে !" This is the most unkindest cut of all ! অন্তরের নিগূঢ় ব্যথা কি সুনিপুণ ভাষায় ব্যথিয়ে উঠিয়াছে ! কিন্তু বাছারা যাহা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না তাহা সম্ভবতঃ এই। বিশ্ববিদ্যালয় শনির দল হইতে একজন যোগ্য প্রুফরিডার ও একজন যোগ্য প্রিণ্টার সংগ্রহ করুন—তাহা হইলে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পাঠ্যপুস্তক সকল তারিখের ভুল-শূন্য অবস্থায় ছাপা হইয়া বাহির হইতে পারিবে। যোগ্য প্রুফরিডার প্রুফ দেখিবার সময় তারিখের ভুল ইত্যাদি নির্ভুল করিয়া দিবে এবং প্রিণ্টার তাহা সযত্নে ছাপাইবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহাদের অবস্থা আরও ফিরাইতে চাহেন, তাহা হইলে ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো: বিরচিত 'বেগমসমরু', 'কেল্লাফতে' প্রভৃতি গ্রন্থরাজি এবং সজনীকান্ত দাস প্রণীত 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'মধু ও হুল' প্রভৃতি বহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা ভুক্ত করুন। ইহা করিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সীলে' Advancement of Learning পরিবৃত পদ্মান্তর্গত শ্রীচিহ্ন মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া হা-হুতাশ করিতে হইবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের Stage ভয়াবহ না হইয়া অ-ভয়াবহ হইবেই ! কিন্তু ইহা যে হইবার নহে, তাহা ইহাদের প্রকাশিত কবিতাতেই প্রকাশ হইয়াছে

> "কুঞ্জ বাবাজীর সাধ চিৎ হয়ে শুইবেন তিনি,
> সীসার বাসনা গূঢ় ট্যাকশালে হইবেন গিনি।
> হয়েছে সম্ভব সবি মৎস্যরাজ্যে মৃত্তিকার গুণে
> গালে না শোভিয়া, চিত্র হইতেছে কালি আর চুণে।"

কুঞ্জ বাবাজী যখন এত জানিয়াও ন্যাকা সাজেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে এত পবিত্র ক্রন্দন কেন? কিন্তু কিছুতেই ইহাদের আফশোষ ও গায়ের জ্বালা মিটিতেছে না। কোনও সাপ্তাহিক লিখিয়াছে যে বাঙ্গলা দেশে যাহারা সাহিত্য রচনা করে, তাহারা হয় কেরাণী, নয় উকিল, নয় জার্ণালিষ্ট ইত্যাদি। শনি ইহার উপর টিপ্পনী করিয়াছে "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও লেকচারার এবং চোর ও গাঁটকাটা বাদ পড়িয়াছে।" বাছারা কেমন অন্তর্য্যামী তাহা দেখিবার বিষয় বটে। ভস্মলোচন দর্পণ অন্তে নিজের মুখ নিজে দেখিয়া বেঘোরে মারা গেল। ইহারাও নিজেরা নিজেদের কলমের খোঁচায় ধরা দিতেছে !

প্রশস্তি ?

"আনন্দবাজার পত্রিকা" এ কি করিলেন ? শ্রীসজনীকান্ত সম্পাদিত "অলকা"

মাসিক পত্রিকাখানার দ্বিতীয় সংখ্যার প্রশস্তি কীর্ত্তন করিতে গিয়া এমন বেফাঁস কথা লিখিয়া বসিলেন কেন? "কিন্তু শেষের দিকে ধীরতা ও যুক্তি অপেক্ষা উন্মা একটু প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।" একেই ত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত "বঙ্কিম পরিচয়ের একাধিকবার সমালোচনা বাহির করিয়া আনন্দবাজার শনির দলকে ক্ষেপাইয়াছেন, তাহার উপর আবার "অলকা"র ভিতর উষ্মার প্রাবল্য দেখিলেন? শনির দল যে স্বার্থ-হিংসা-কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ বিবর্জ্জিত হইয়া, শুধুই Art for Art Sake ভাবাপন্ন হইয়া, দেশের ও দশের, সাহিত্যের ও সাহিত্য পরিষদের নির্জ্জলা কল্যাণের জন্ত কলম ধরিয়াছেন, তাহা কি আনন্দবাজারের অবিদিত? যদিই অবিদিত থাকে, তাহা হইলে অগ্রহায়ণের শনির চিঠিখানার "আনন্দবাজারে"র প্রশস্তিটুকু পড়িয়া দেখিবেন।

নাচনচন্দ্রের দাদু

সপ্তকপারবর্ত্তী সাধারণ ব্যক্তির যে মতিভ্রম ঘটে তাহা সর্ব্বজন-বিদিত কিন্তু আমরা জানিতাম সপ্তক-পারবর্ত্তী অসাধারণ কবি অন্ততঃ সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত। এখন দেখিতেছি আমরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী। কবি প্রতিভা স্বর্গ হইতে অনেক দিন বিদায় লইয়াছিল, এখন দেখিতেছি স্বয়ং কবিরও স্বর্গ হইতে পতন হইল। ভূতপূর্ব্ব রবি-বিদ্বেষী শনির ঝুলিতে কবি, অকস্মাৎ ধূলিস্মাৎ হইয়াছেন। ইহাকেই বলে দুর্দ্দৈব! নাচনচন্দ্রদের কাকলীপর্ব্ব বিশবছর পরে নহে, ইতিমধ্যেই প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু দাদুর কাকলী পর্ব্বের ভাষাতত্ত্ব তথা দাদুর মনস্তত্ত্বও সুখবোধ্য নহে, ইহাও বলা আবশুক বৈকি।

স্যার যদুনাথের লাঙ্গুল-ইতিহাস

১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছিলেন—"আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে; সে বাঙ্গালী নয়।" কিন্তু প্রায় ৫৮ বৎসর পরে অর্থাৎ, এই ১৩৪৫ সালের 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় 'বাঙ্গালী' যদুনাথ অর্থাৎ স্তর যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—"আমার মনে হয়, মুসলমান জগৎ ভারতকে যে দানগুলি দিয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিহাস-সাহিত্য একটি প্রধান। এটি ভারতের পক্ষে অপূর্ব্ব। আমরা দম্ভ করিয়া বলি, হিন্দু-যুগে কি ইতিহাস ছিল না? আমাদের পুরাণই ইতিহাস, রামায়ণ মহাভারতও ইতিহাস, হর্ষচরিত, বিক্রমাঙ্কচরিত, রাম-চরিত এই ত ইতিহাস। এই যুক্তির উত্তর আমাদের একজন বিখ্যাত লেখক রহস্যের আকারে কিন্তু সত্যসত্যই দিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হনুমানের লেজ দু-হাজার ফুট লম্বা যে গ্রন্থে লেখা, তাহা পুরাণ। আর যদি ঐ লেজটা ঘর্ষণ কর্ত্তন করিয়া তিন ফুটে নামান যায়, তবে তাহা ইতিহাস হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি যদুনাথের এই লাঙ্গুলযুক্ত উত্তর শুনিয়া কি বলিতেন, জানি না। তবে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধেরই আর একস্থানে তিনি বলিয়া গিয়াছেন "সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়া-ছিল, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।"

মুসলমান-প্রধান মন্ত্রীমণ্ডল-পরিচালিত বর্ত্তমান বঙ্গদেশে স্তর যদুনাথ মুসলমান-লিখিত ইতিহাসের প্রতি যেরূপ প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাসের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া-ছেন, তাহা সত্য না হইলেও যুগধর্ম্মের যে উপযোগী; একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে আমরা দম্ভ করিয়াই বলিব, যে দেশে কহ্লন-রচিত "রাজ-তরঙ্গিণী"র অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান, সে 'দেশ ইতিহাস সাহিত্যে'র জন্য 'মুসলমান-জগতের কখনই মোসাহেবী করিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া, আরও একটি ভাবিবার ও বলিবার কথা আছে। স্তর যদুনাথ যে ইতিহাস-সাহিত্যের গুণ-গানে গদগদ হইয়া এদেশের রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রেণীর ইতিহাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র।" কোথা হইতে তাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলে ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, একদল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল, পর্ত্তুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ, সকল মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে

রঞ্জিত পরিবর্ত্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে, যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়'—এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই—কেবল যাহারা কাটাকাটি-খুনাখুনি করিয়াছে, তাহারাই আছে। তখনকার দুর্দ্দিনেও এই কাটাকাটি খুনাখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্ব্ব প্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জ্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না,—সেদিনও সেই ধুলি-সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধুলিজালই তাহার চক্ষে আর সমস্তই গ্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধুলির কথা—ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছু মাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জ্জন মুখর বাত্যাবর্ত্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু বিদেশ যখন ছিল, দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্য, তুকারাম, ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লী এবং আগ্রা ছিল, তাহা নহে—কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল।......ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জ্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রুথ চাইলডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারী তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সঙ্গতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই, সেখানে আবার হিষ্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যান এবং না পাইলে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।" বলিতে হইবে কি, স্যার যদুনাথও আজ ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে গিয়া মনের ক্ষোভে হনুমানের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছেন।

(বিলাসী)

সাথী

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স

কাহিনী ও পরিচালনা—ফণী মজুমদার

সঙ্গীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল

চিত্র-শিল্পী—দিলীপ গুপ্ত, সুধীশ ঘটক

শব্দ-যন্ত্রী—লোকেন বসু

রসায়নাগারাধ্যক্ষ—সুবোধ গাঙ্গুলী

চিত্র-সম্পাদনা—কালী রাহা

কথা—মণী দত্ত

গান—অজয় ভট্টাচার্য্য

ভূমিকায়— সায়গল—ভুলুয়া, কানন—মঞ্জু, অমর মল্লিক—ত্রিলোক নাথ, শৈলেন চৌধুরী—অমরচাঁদ, সুবীর—ছোট ভুলুয়া, রেখা—ছোট মঞ্জু, ইহা ছাড়া অহী সান্ন্যাল, বোকেন চট্টো, ভানু বানার্জ্জী, ব্রজ পাল, সত্য মুখার্জ্জী, বিনয় গোস্বামী, শৈলেন পাল, পূর্ণিমা, ছয়া প্রভৃতি আরো অনেকে।

প্রথম মুক্তি—চিত্রা ও নিউ সিনেমা, শনিবার ৩রা ডিসেম্বর।

'সাথী'র কাহিনী সহজ ও সরল এবং ঘটনাবহুল। এতে আছে কয়েকটি স্বাভাবিক ও সাধারণ চরিত্র। ছবির হিরো ভুলুয়া, ছোট বয়সে ছিল দুষ্টু। চিক থিয়েটারের অভিনেতা, বড় হয়ে হলো সঙ্গীতের সাধক, লোকজনের সঙ্গে না মিশতে পাওয়ার দরুণ অল্পভাষী, অশিক্ষায় সে অন্ধবিশ্বাসী ও অভিমানী। মঞ্জু, ছেলে বয়সে ছিল অনাথ-আশ্রমে, পরে হল পথের মেয়ে। ভুলুয়ার সঙ্গে গান গেয়ে পয়সা নিয়েই যার বয়সের অনেকখানি কেটেছে, বড় হয়ে যখন প্রচুর পয়সা, নাম ও যশ পেলো, ভুলে গেলো পুরাণো দিনের কথা। অমরচাঁদ—শিক্ষিত, সৌখীন, ধনী ও চরিত্র-হীন থিয়েটারের অভিনেতা, মঞ্জুর সংস্পর্শে এসে তার চরিত্র বদলালো, সে হোলো silent lover. ত্রিলোক নাথ—থিয়েটারের লম্পট প্রোপ্রাইটর। পৃথিবীতে যা সে ভোগ করতে পায় না তারই নিন্দে করে ও সুবিধে পেলে নীতির লেকচার দিয়ে দেয়। এ ছাড়াও বহু ছোট চরিত্র আছে যাদের খুব বেশী আমাদের চোখের সামনে অনেক সময়ে দেখতে পাই। এরা সবাই সারা ছবিখানিতে হাসির উপাদান জুগিয়ে এসেছেন।

ছবিটির প্রধান বস্তু গান। কানন সায়গলের দ্বৈত-সঙ্গীত সুন্দর। চিত্রের গতি—কাননের নাচ পর্য্যন্ত কোথাও বাধে না। শেষের দিক ডায়লগে ভারাক্রান্ত ও প্রথম অংশের তুলনায় মন্থর। কাল-বৈশাখীর ঝড় আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল। ত্রিলোককে মাঝে রেখে ড্রামার দ্বন্দ্ব যদি আরো বাড়তো তাহলে নাটকের বোধ করি কোন ত্রুটীই দেখা যেতো না। ছবিটি হিরোয়িন প্রধান। পরিচালক ফণী মজুমদার চিত্র-নাট্য লেখার চেয়েও পরিচালনায় বেশী ক্ষমতা, এই চিত্রে দেখাতে পেরেছেন। তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি মধুর হয়েছে। পরিচালকের কৃতিত্বে চিত্রের কোন স্থান অস্বাভাবিক ও আড়ষ্ট বলে মনে হয় না। ছবি-খানিতে হাল্কা রসের সমাবেশ হলেও কোন জায়গায়ই রসানুভূতির ব্যাঘাত ঘটায় না। অতি সুসংবদ্ধভাবে দৃশ্যাবলী গ্রথিত করার ফলে ছবিখানি পীড়াদায়ক হয় নাই। গল্পের কাহিনী সরল হলেও মৌলিক। গল্প লেখকের এইখানেই কৃতিত্ব। ভুলুয়ার মুখের ডায়লগে কিছু দোষ থাকলেও অশিক্ষিত ভুলুয়ার মুখে এর চেয়েও ভালো ডায়লগ না দেওয়ার পক্ষে লেখকের একটা যুক্তি হয়ত আছে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বিভিন্ন ধরণের ডায়লগ দিয়ে লেখক ক্ষমতারই পরিচয় দিয়েছেন। অজয় ভট্টাচার্য্যের গানের কথা ভালো। এ ছবির মিউজিক একটি সম্পদ।

পথের অনাথ বেয়াদপ বকাটে ছেলে হঠাৎ একদিন দেখা পেল তারই মত সমদুঃখী অনাথা মেয়ে মঞ্জুর। শীতের

কনকনে ঠাণ্ডা রাত্তে বোটের বুকে ছুটি ঘুমিয়ে পড়া শিশু ভেসে গেল জীবনের কোন অচেনা হাটে।

ছোট্ট ভুলুয়া বুকে আশা নিয়ে তার মঞ্জুকে নাচ আর গান শিখিয়ে, পথে পথে গান গেয়ে রোজগার করে আবার তারা ফিরল একদিন বড় সাধের ক'লকাতায়। তখন তারা বড় হয়েছে। এক বস্তীতে তারা বাসা বাঁধল। দিনের পর দিন নিরাশ হোল ভুলুয়া। থিয়েটারে চাকরী তার কোথাও মিলল না। তাই আবার গান গেয়ে পয়সা রোজগারের আশায় বেরুল রাস্তায়। থিয়েটারের বড় একটর ও ম্যানেজার একদিন এদের গান শুনে আর মঞ্জুর রূপ দেখে থিয়েটারের লম্পট মালিক ত্রিলোকনাথকে 'গোবুরে পদ্মফুল' দেখাতে নিয়ে এলেন বস্তীতে। মঞ্জুর থিয়েটারে চাকুরী হোল। ভুলুয়ার হোল না। তবু সে বেজায় খুসী, তারই মানুষ করা মঞ্জুর চাকরী হয়েছে বলে।

দিন যায়, মাস যায় মঞ্জুর নাম ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বস্তীর খোলার ঘর থেকে ক্রমে মঞ্জু উঠল প্রাসাদে। থিয়েটার আর নামের নেশায় মঞ্জু হোল মাতাল। সারা সহরময় কেবল মঞ্জু মঞ্জু আর মঞ্জু! সে আজ ভদ্দর লোক! গরীবকে ভাবে ছোটলোক। অমরচাঁদ তাকে ঘিরে থাকে। সে আজ আর মাতাল নয়। মঞ্জুকে ভালবাসে। ত্রিলোকের সহ্য হয় না। ভুলুয়ার কাছে নানান কথা বলে। স্বল্পভাষী ভুলুয়া নিজের অভিমান নিজের কাছেই রেখে দেয়। মঞ্জু ভুলুয়াকে অপমান করল ভুলুয়ার নিজের চেয়ে ও প্রিয় গানখানাকে ভুল সুরে গেয়ে। ভুলুয়া বুঝলে কলকাতার বিজলী-বাতীর চোখ ঝলসানো আলোর মধ্যে তার মঞ্জু হারিয়ে গেছে। তারপর কাল বৈশাখীর ঝড় একদিন কেটে গেল। ভুলুয়া তার সাথী মঞ্জুকে পায়ে চলা পথে ফিরে পেলে।

ছবির এই হচ্ছে মূল কাহিনী।

ও শেষ চমৎকার। পথের সাধারণ ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাংলা দেশে এই প্রথম গল্প চলচ্চিত্রে উঠেছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রী সবাই এতে ভাল অভিনয় করেছেন। কারুর অভিনয়ই খারাপ বলে মনে হয় নি। প্রথমেই নাম করা যায় শ্রীমতী কাননের। মঞ্জুর ভূমিকায় তিনি অভিনয়ে অনবদ্য, সঙ্গীতে সুষ্ঠু, নৃত্যে ছবির সবখানিই ছেয়ে রেখেছেন।

সায়গলকে এতদিন পরে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও বাংলা ছবিতে সত্যিকার চরিত্রে নামিয়েছেন। কোন জায়গায়ই তাঁকে মনে হয় না যে তিনি 'ষ্ট্রীট সিঙ্গার' নন। তাঁর গান এখনও আমাদের কাণে লেগে রয়েছে নিখুঁত হয়েছে তার অভিনয়। অমরচাঁদের ভূমিকায় নেমেছেন শৈলেন চৌধুরী। তাঁর অভিনয় মন্দ নয়। তাঁর 'সাইলেন্ট লাভা:রর' ভূমিকাটী দর্শকের মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। এর পরই আসে ত্রিলোকনাথের নাম। অমরবাবু এই ভূমিকাটিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। শক্তিমান অভিনেতা যে সব চরিত্রেই সফলতার সহিত অভিনয় করতে পারেন তার পরিচয়ই তিনি দিয়েছেন। নরেশ বোসের 'কবি', অহি সান্যালের 'সঙ্গীত শিক্ষক' ও বোকেন চট্টোর 'নবু'র অংশ আমাদের ভাল লেগেছে। ছোট 'ভুলুয়া'র অংশে সুবীরের গান ও অভিনয় ভালই। 'মধু'র ভূমিকায় পরেশ নামে ছেলেটিও বেশ ভাল করেছে। এ ছাড়াও ছোট ভূমিকায় সত্য মুখার্জ্জী, কেষ্ট দাস ও খগেন পাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য। বিনয় গোস্বামী ও পূর্ণিমার গান ভাল হয়েছে।

ক্যামেরার কাজ উচ্চাঙ্গের না হলেও প্রশংসনীয়। দিলীপ গুপ্ত স্বাধীনভাবে এই প্রথম কাজ করলেন। পরের ছবিতে তিনি অধিক পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন এ আশা আমরা রাখি। সাউণ্ডের কাযে লোকেন বসু তাঁর পূর্ব্বেকার ছবি অপেক্ষা এতে ভালই করেছেন। সাজ-সজ্জা ও সেট-সেটিং অনিন্দনীয় হয়েছে।

চিত্রখানিতে দর্শকগণকে আনন্দ দেবার জন্য প্রচুর উপাদান পরিবেশন করা হয়েছে বলেই ইহা বহুদিন ধরে অপ্রতিহতগতিতে চলবে—এ আশা আমরা নিঃসন্দেহে করতে পারি।

রায় বাহাদুর কারনানী

ম্যাডান ষ্টুডিওর সর্ব্বময় কর্ত্তা রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল কারনানী বড়ই অসুস্থ শুনিয়া আমরা বড়ই চিন্তিত হইলাম। জগদীশ্বর তাঁকে নিরাময় করুন এই প্রার্থনা।

পথিক

ইন্দ্র মুভিটোনের 'পথিক' উত্তরায় মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে। পরিচালক চারু রায় তাঁর কাজ শেষ ক'রেছেন।

যখের ধন

শ্রীমতী সুহাসিনীর অসুস্থতার জন্য শ্রীমতী শিশুবালাকে নেওয়া হয়েছে এজন্য কাজ একটু পিছিয়ে পড়ল।

"জনক-নন্দিনী" চিত্রে মৃণাল ঘোষ

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীর দ্রৌপদী এই প্রতিষ্ঠানেই তোলার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরনারায়ণও চলবে।

জনক নন্দিনী

অবশিষ্ট দৃশ্যগুলি মায় তাড়কাবধ তোলা হ'য়েছে। ছবিখানি এখন সম্পাদনাগারে। রাধা ফিল্মসের এই রামায়ণী-চিত্র শীঘ্রই রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে।

পরশমনি

পরিচালক প্রফুল্ল রায় পরশমনি নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছেন।

চিত্রা ও নিউ সিনেমা

নিউ থিয়েটাসের নূতন ছবি 'সাথী' মহাসমারোহে এই উভয় চিত্রগৃহে চলছে। নূতন ধরণের গল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যগীতের ছড়াছড়িতে ছবিখানা সকল শ্রেণীর দর্শকের নিকট প্রিয় হয়েছে। কানন ও সায়গল এ ছবিতে খুব খ্যাতি অর্জন ক'রেছে। এছাড়া শৈলেন চৌধুরী, অমর মল্লিক, বোকেন, ভানু প্রভৃতির সমাবেশ ও অভিনয় খুবই উপভোগ্য হ'য়েছে। পরিচালক ফণি মজুমদার সমস্ত উপাদান এমন ভাবে নিয়োগ করেছেন তাতে ছবির উৎকর্ষতা বেড়েছে। সঙ্গীত পরিচালক রাই বাবুর ত কথাই নেই তিনি চিত্রের উপযোগী বাছাই বাছাই সুরগুলি দিয়েছেন। কাননবালা ও সায়গলের গান অতি মনোরম হয়েছে। ছবিখানি আজ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল।

পূর্ণ থিয়েটার

নিউ থিয়েটাসের "দেশের মাটি" আজ থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পন করল। দক্ষিণ কলিকাতায় ছবিখানি বেশ জনপ্রিয় হ'য়েছে।

রূপবাণী

'অভিনয়' এখনও চলছে। অভিনয়ের পর জনকনন্দিনী আসবে।

ফিল্ম কর্পোরেশন

শ্রীমান টুলু সেন 'দি রাইজ' নামের ছবিখানা নাকি আরম্ভ করেছেন। কিন্তু প্রচার শিল্পী নীরব কেন?

দেবদত্ত ফিল্মস

শোনা যায় অন্য এক চিত্র প্রতিষ্ঠান এ ষ্টুডিও ভাড়া নিয়ে চালাবেন তাঁর ব্যবস্থা হচ্ছে।

কালী ফিল্মস

নূতন আয়োজন এখনও কার্য্যকরী হয় নি, শীঘ্র হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বেকার-নাশন শব্দ-বিন্যাস প্রতিযোগিতা ব্যুরো

১১৩বি, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট (ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সন্নিকট), কলিকাতা।

বাঙ্গলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগীতা নং ২

৩০০৲ পুরস্কার **বড় দিন স্পেশাল সংখ্যা** **৩০০৲ পুরস্কার**

প্রথম পুরস্কার ১৫০৲ ২য় পুরস্কার ১০০৲ তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲ টাকা

শব্দ গঠন করিবার নিয়ম :—প্রত্যেক সাদা ঘরে একটি মাত্র অক্ষর বসিবে, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণকে একটি অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হইবে, অঙ্ক ঘরগুলি যথা নিয়মে থাকিবে।
প্রতিযোগিতার সমাধান পাঠাইবার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮
বাং ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সাল।

শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)
পাশাপাশি (Across)

১। আসক্তির নাশেই এর উদ্ভব।
৩। মাসের নাম। ৫। বাতিক।
৬। মড়ক
৭। সবুরে '—' ফলে এইরূপ প্রবাদ।
৮। মহাভারতে কর্ণের এর জন্যই প্রসিদ্ধি বেশী।
৯। উল্টালে ভারতের স্থান বিশেষ।
১০। মাংস ব্যবসায়ী।
১২। উৎসবে নিমন্ত্রিতেরা এ সম্ভাষণ পান।
১৩। জীবন।
১৫। চতুর্ব্বর্গের অন্যতম
১৬। সুন্দরী।
১৮। ধারাল অস্ত্র বিশেষ।
২০। এর অঙ্কনে অপেক্ষাকৃত দক্ষতার প্রয়োজন।
২২। ছিন্ন বস্ত্রাংশ।
২৪। এ যুগে ক্রমশঃই এ বিরল হচ্ছে।
২৫। রাজশক্তির এ নীতি জনমত চিরকালই অপছন্দ করিবে।
২৬। এর আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়।
২৮। ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ।
২৯। এ নীরস নয়।
৩০। ঠিক করে সাজালে "মালাকার" পাবেন।

········ ······এইখানে কাটুন··········

বাঙ্গলা শব্দ-গঠন প্রতিযোগিতা নং ২

কুপন নং
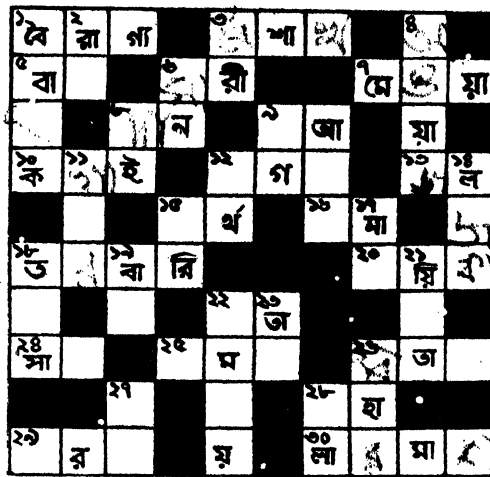
প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও আইনতঃ বাধ্য হইবে স্বীকার করিয়া এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিলাম।

নাম·····································

ঠিকানা·································

লোকেল রসিদ নং········ তারিখ ·······

মনি অর্ডার নং·························

পোষ্টেল অর্ডার নং

···············এইখানে কাটুন···············

উপর হইতে নিচে (Down)
শব্দ সন্ধান সূত্র (Clues)

১। বেয়াই।
২। এর "—" ভঞ্জন করতে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে।
৩। সম্ভব হলে এর শেষ রাখা অসমীচীন।
৪। এ সাধারণতঃ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
৬। আজকাল অনেকেই এ হানি হলেও গায়ে মাখে না। ৮। ধাত্রী।
৯। এর বশীভূত হয়ে লোকে কত সাংঘাতিক কাজই না করে। ১১। শরীর সম্বন্ধীয়।
১২। এ ত্যাগ করতে পারে এমন লোক বিরল।
১৪। উল্টালে আঁখির অঞ্জন।
১৫। শত্রু।
১৭। অসৎ কার্য্যে যে এ না শুনে তাহার অমঙ্গলই বাঞ্ছনীয়।
১৮। নদী বিশেষ।
১৯। বিধাতা এ হলে মানুষ কি করবে!
২১। স্ত্রী (ঠিক করে সাজালে)।
২২। ঠিক করে সাজালে আরোগ্য লাভ করিবেন। ২৩। সঙ্গীতের অঙ্গ।
২৬। বাঙ্গলার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ।
২৭। এ মেটাবার জন্যে অনেকে পয়সা খরচ করে থাকেন।
২৮। উল্টালে তিব্বতে যেতে হবে।

প্রতি সমাধানের প্রবেশ মূল্য ।০ আনা কিন্তু একই ব্যক্তির একত্রে তিন খানা সমাধানের মূল্য ॥০ আনা। লেখা কাটা ঘসা এবং পেন্সিলে লেখা চলিবে না। মণিঅর্ডার রসিদ সমাধানের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। রসিদ নম্বর নিজে টুকিয়া রাখিবেন। ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রি ৭টার মধ্যে মফঃস্বল কুপন পৌছান চাই। অন্যথায় অগ্রাহ্য হইবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কুপনে অথবা নিজে অবিকল ছক আঁকিয়া নম্বরানুযায়ী শব্দ বসাইয়া দিলেও সমাধান গ্রাহ্য হইবে। একাধিক সমাধান হইলে ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে। ১৮ই ডিসেম্বরের পর এক সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক আনন্দবাজারে ম্যানেজারের নির্ভুল সমাধান প্রকাশিত হইবে। বিস্তারিত নিয়মাবলী ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে পাঠান হয়।

বেকার নাশন শব্দ বিন্যাস প্রতিযোগীতা ব্যুরো

১১৩বি প্রিন্সেপ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১নং প্রতিযোগীতার পুরস্কার-প্রাপকদের তালিকা

১নং প্রতিযোগীতার নির্ভুল সমাধান

নিম্নলিখিত ৬ জন নির্ভুল সমাধানে ৫০৲ টাকা হিসাবে প্রথম পুরস্কার পাইবেন।

১। মিনা রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ২। শ্রীযুক্ত ফণী ভুষণ মজুমদার, ১২বি, নর্থরেঞ্জ কলিকাতা। ৩। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সেন, ৩৩নং নিউপার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সাহা, পোঃ গ্রাম, হাস্নাবাদ জিঃ ঢাকা। ৫। মাং আব্দুল মত লিব, সাং কল্যাণপুর পোঃ পুটিজুরী জিঃ শ্রীহট্ট। ৬। শ্রীযুক্ত বিধুলাল নাগ ৯-১ ক্রীক লেন কলিকাতা।

নিম্নলিখিত ১৫ জন এক ভুলে ১০৲ টাকা হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার পাইবেন।

১। কাদম্বিনী রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ২। অতুল চন্দ্র ঘোষ, ১০২-১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সিটি কলেজ, কলিকাতা। ৩। শ্রীশিবরাণী রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ৪। শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, ২১০-এ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৫। শ্রীসোমনাথ রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ৬। এন, এন, মল্লিক, হাসামদিয়া ফরিদপুর ৭। শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস কবিরাজ C-o ঢাকা ঔষধালয় লিঃ বহুবাজার কলিকাতা। ৮। মিঃ আকবর হোসেন, 20, Halwell Lane. Calcutta. ৯। Miss Sunila Ghosh C-o Pulin Behari Ghosh. P O. Khurda, Puri ১০। ভোলা নাথ সেন C-o এন, বি, এণ্ড এম, ইনস. কোং লিঃ, কলিকাতা। ১১। Duli Chand Roy. Auditor, Naogaon, Rajshahi. ১২। Krishna Kumar Roy, Teacher, Jalsuka, Sylet. ১৩। শ্রীগিরিজা নাথ রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা দিনাজপুর। ১৪। শ্রীপ্রফুল্লবালা রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায়, কালীতলা দিনাজপুর। ১৫। শ্রীরাধা নাথ রায় C-o বাবু অনাদি নাথ রায় কালীতলা, দিনাজপুর।

নিম্নলিখিত ৭৪ জন দুই ভুলে ॥৵১৫হিঃ তৃতীয় পুরস্কার পাইবেন

১। শ্রীরেণুকা দেবী চৌধুরাণী, আটআনি-রাজ, মুক্তাগাছা, মৈমনসিং। ২। শ্রীধীরেন্দ্র কুমার ঘোষ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়, চুনাপুকুর লেন, কলিকাতা। ৪। M. G. Mahiuddin C-o Fazaluddin Ahmed Tampat Rangpore. ৫। J. C. Nandy, College Street, Calcutta ৬। শ্রীজগদীশ চন্দ্র চৌধুরী, কালীতলা, দিনাজপুর। ৭। শ্রীভোলানাথ মৈত্র, সেরপুর বগুরা। ৮। প্রভা দেবী C-o শ্রীদক্ষিণাপদ গাঙ্গুলী, মুর্শিদাবাদ। ৯। শ্রীমতী ফুতুরাণী দেবী C-o শ্রীদক্ষিণাপদ গাঙ্গুলী, মুর্শিদাবাদ। ১০। শ্রীমাধবী রায় C-o অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১১। শ্রীঅঞ্জলি রায় C-o অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১২। শ্রীবিশ্বনাথ রায় C-o অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১৩। শ্রীমণিকান্ত রায় C-o অনাদি নাথ রায়, কালীতলা, দিনাজপুর। ১৪। শ্রীসবিতাবালা ঠাকুর টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫। শ্রীশ্রীচরণ বসাক, নওগা হাইস্কুল রাজসাহী ১৬। শ্রীনিতাইপদ সাহা, স্টার হাউস, বোটানিকেল গার্ডেন, হাওড়া। ১৭। শ্রীসুধীর চন্দ্র বসু, বৌবাজার কলিকাতা। ১৮। শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯। শ্রীকানাইলাল মান্না, নর্থ ব্রিটিশ মার্কেনটাইল কোং লিঃ কলিকাতা। ২০। শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় কুষ্টিয়াবাজার, নদিয়া। ২১। শ্রীকালিপদ ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। ২২। শ্রীনলিনীবালা দেবী, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। ২৩। শ্রীমদনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪। শ্রীঅনিমা চৌধুরী, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা ২৫। রায় সুখেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পদ্মপুকুর এলগিন রোড কলিকাতা। ২৬। শ্রীকালিপদ গঙ্গোপাধ্যায় শোভাবাজার ষ্ট্রীট, হাটখোলা কলিকাতা। ২৭। শ্রীদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, অন্নদা নিয়োগী লেন বাগবাজার কলিকাতা। ২৮। শ্রীমতী সুনিলাবালা নন্দী, মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা। ২৯। শ্রীমতী লিলি সেন, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। ৩০। শ্রীগঙ্গাধর ঘোষ, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৩১। জামালুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, মাদারবাড়ী চট্টগ্রাম। ৩২। শ্রীবৈদ্য নাথ দত্ত, আশুতোষ মুখার্জ্জি লেন, সালকিয়া হাওড়া। ৩৩। শ্রীপাচুগোপাল সাহা, কৃষ্ণদাস পাল লেন কলিকাতা। ৩৪। শ্রীরামদাস সেনগুপ্ত, Preventive Dept. Customs House. ৩৫। শ্রীলাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্তা, গোকুল মিত্র লেন কলিকাতা। ৩৬। শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী, কেশব সেন ষ্ট্রীট কলিঃ। ৩৭। শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত (Councillor Cal. Corporation), বাবুরাম শীল লেন কলিঃ। ৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড কলিকাতা। ৩৯। শ্রীমতী বিনোদিনী রায়, C-o কৃষ্ণকুমার রায়; টিচার জলসুকা, সিলেট। ৪০। শ্রীমতী কল্যাণী রায় C-o কৃষ্ণকুমার রায়; টিচার জলসুকা, সিলেট। ৪১। শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, চক্রধা, পাঁচপাইকা, ঢাকা। ৪২। ভবানীশঙ্কর বসাক, চিলমারী এইচ ই স্কুল রংপুর। ৪৩। শ্রীসুরেশচন্দ্র পণ্ডিত, বৈলর, ধানিখোলা, মৈমনসিং। ৪৪। ডাঃ বি, সি, মজুমদার H. M. D. সিলিগুড়ি দার্জ্জিলিং। ৪৫। মহম্মদ এম্, রহমান C-o B C. Majumder H M D P.O. Siliguri Darjeeling ৪৬। সৈয়দ নয়া মিঞা, খোলাহাটী, গাইবান্ধা রংপুর। ৪৭। শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া ২৪ পরগণা। ৪৮। শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, নর্থ গেণ্ডারিয়া

ফরিদাবাদ ঢাকা। ৪৯। শ্রীসুবোধকুমার চৌধুরী শান্তি নিকেতন ফরিদপুর। ৫০। শ্রীবিথী সেন, কল্যান কুটীর, পাবনা। ৫১। শ্রীঅমরনাথ রায় C-o অনাদি নাথ রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫২। শ্রীঅশোকনাথ রায় C-o অনাদি নাথ রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৩। শ্রীসন্ধ্যারাণী রায় C-o অনাদিনাথ রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৪। শ্রীপ্রশান্ত রায় C-o অনাদিনাথ রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৫। শ্রীমীরা রায় C-o অনাদিনাথ রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৬। শ্রীসতীনাথ রায় C-o অনাদিনাথ রায়, কালিতলা দিনাজপুর। ৫৭। শ্রীগীতা C-o N. N. Mitra, লাবান আসাম। ৫৮। Mr. S. K. Ghose, Office of Inspector of schools, Dacca. ৫৯। শ্রীচিন্তাহরণ দে সরকার, আড়াই হাজার ঢাকা। ৬০। শ্রীপবিত্রহরি মুখোপাধ্যায়, কালিচরণ শেঠ লেন, ২৪ পরগণা। ৬১। শ্রীঅনঙ্গমোহন আচার্য্য, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৬২। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, আনন্দমোহন দাস লেন ফরাসগঞ্জ ঢাকা। ৬৩। শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ, কৃষ্ণরাম বোস ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৬৪। শ্রীমনমোহন দে শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা। ৬৫। শ্রীগৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মদন দত্ত লেন, কলিকাতা। ৬৬। এ এইচ, এম, সাহাবুদ্দিন, বৈলর, ধানিখোলা, মৈমনসিং। ৬৭। শ্রীতেজেন্দ্রচন্দ্র দাস রায়, আড়াই হাজার ঢাকা। ৬৮। জুসাম্মত সামছুন নেহার C o খাজা আবদুলকাদের রংপুর। ৬৯। শ্রীরাধাবল্লভ পোদ্দার বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৭০। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কলেজ ষ্ট্রীট কলিঃ। ৭১। শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, রূপচাঁদ মুখার্জ্জী লেন ভবানীপুর, কলিকাতা। ৭২। শ্রীজগৎচন্দ্র বসু, কণ্টাই মেদিনীপুর। ৭৩। শ্রীখগেন্দ্রমোহন কুণ্ডু সেরপুর বগুড়া। ৭৪। কুমারী ছবিরাণী কুণ্ডু সেরপুর বগুড়া।

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর সুরু হইবে এবং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে ১৭ই ডিসেম্বর। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলনের প্রাণ-স্বরূপ পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রসিক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন গত বৎসর পিছাইয়া গিয়াছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভূপেন্দ্রবাবুর অকুণ্ঠ অর্থব্যয়ে ও আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। আমরা আশা করি এ বৎসরও সঙ্গীত-সম্মেলন ও প্রতিযোগিতা পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

মিডল্যাণ্ড ক্রিকেট ক্লাব

খিদিরপুর অঞ্চলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই নামে একটী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। খেলার দিক দিয়ে এরা এযাবৎ সর্ব্বত্রই সুনাম পেয়ে এসেছে। গত ২৬শে নভেম্বর ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৮।৩৯ সালের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচন স্থির হয়েছে। খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের জনপ্রিয় সভাপতি শ্রীযুত বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৮।৩৯ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং যথাক্রমে শ্রীযুক্ত অসিত কুমার বসু ও শ্রীযুক্ত হীরেন বিহারী মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ও অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোশিয়েশনের নূতন সভাপতি

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোশিয়েসনের সভাপতি মিঃ ডবলিউ, আর ইলিয়ট বিদায় গ্রহণ করায় সেই স্থলে মিঃ জে, এম, দত্ত উক্ত পদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি তাছাড়া ইতিপূর্ব্বে কোনও বাঙ্গালী এই পদে নির্ব্বাচিত হন নাই। ১৯১৯ সালে তিনি শেয়ার মার্কেটে যোগদান করেন এবং ১৯২৪ সালে ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তদবধি অসহযোগ আন্দোলন কালের কয়েক বৎসরকাল ব্যতীত প্রতি বৎসরই তিনি কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন। ব্যবসায়ী মহলে মিঃ দত্ত বিশেষ জনপ্রিয় এবং সকলেই তাহাকে তাঁহার সততা ও উচ্চাদর্শের জন্য বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। আমরা তাহার নব কর্ম্মময় জীবনে মঙ্গল কামনা করিতেছি।

শোক সংবাদ

গৌহাটী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চুণীলাল দে তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৩৪ পদ্মপুকুর রোডে গত ২৮শে নবেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র কয়েকদিন রোগ ভোগের পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গত ১৮৯৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে

এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। কয়েক বৎসর অধ্যাপকরূপে কার্য্য করার পর গত ১৯০১ সালে তিনি গোহাটী কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ণ-শাস্ত্রে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসএ উন্নীত হন। গৌহাটী কুটন কলেজের সিনিয়র অধ্যাপকরূপে কার্য্য করার সময় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নিরভিমানী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি অকাতরে সাহায্য করিতেন।

চৌরঙ্গী টেরেস মিউজিক ক্লাব

গত রবিবার ইংরাজী ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় রায় বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪নং গোখেল রোডস্থিত বাসভবনে উক্ত ক্লাবের ষষ্ঠ মাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রো: সুনীল বসু, সুবল দাশগুপ্ত, নুটু মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও বিমল ভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীগণ এই আসরে যোগদান করিয়াছিলেন। এই ক্লাবের সহিত প্রো: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কুমার শচীন দেববর্ম্মন, মণ্টু বাবু ও রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীগণ সংশ্লিষ্ট আছেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীতের প্রসার উদ্দেশে ভবানীপুরস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এই ক্লাবটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এই ক্লাবের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

দুর্ব্বার সঙ্ঘ

গত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার সুধীর দাস মহাশয়ের ভবনে সঙ্ঘের একাদশ অধিবেশন সুকবি শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। সভায় সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়-এর 'অপরূপ অপরাহ্ণ' ও সন্তোষ ঘোষের 'যযাতি' গল্প পাঠ করা হয়। গল্প দুইটি মনোজ্ঞ হইয়াছিল। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মায়াবী প্রভৃতি কবিতা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি কোন দিকে হওয়া উচিত তাহা লইয়া গভীর এবং বিশেষভাবে আলোচনা হয়। আলোচনায় যোগদান করেন সুশীল জানা, জগৎদাস, সমীর ঘোষ প্রভৃতি। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু সেনগুপ্ত, ফাল্গুনী রায় প্রভৃতি অনেকে। সর্বশেষে সভাপতির 'কাব্যে প্রেম' নামক অভিভাষণটি সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করে।

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডা: শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তা কেমন করে হবে? যাঁরা আপনাদের দেহ বিক্রয় করে দেহের ঋণ পরিশোধ করে, এতবড় গর্হিত কর্ম্ম করেও কি তারা নিষ্পাপ?

আমি ত বলি তারা নিষ্পাপ। তারা হয়তো সমাজের বিরুদ্ধে পাপ কর্ত্তে পারে। কিন্তু—

উ:! এত বড়ো কথা কে বলতে পারে? তুমি যে সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এত বড় কথা বলচো, এতে আমার আশ্চর্য্য লাগচে।

আশ্চর্য্য লাগবারই কথা! কেননা তুমি এতে অভ্যস্ত নও। বাল্যাবধি তোমার যে সংস্কার আছে, সেইটেই তোমার চেনা রাস্তা। এ ছাড়া যে কোনও রাস্তা তোমার সুমুখে পড়লেই অপরিচয়ের আশঙ্কায় তুমি সেটাকে ত্যাগ করবে। এটা মানুষের মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

তাহলে তোমার মতে, পেটের জ্বালায় দেহ বিক্রি করা পাপ নয়?

তার যদি অন্য রাস্তা খোলা না থাকে, এ রাস্তায় আসার জন্যে, তাকে পাপী বলা আমার বিবেক বুদ্ধিতে বাঁধে।

(অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ)

দেখ নতুন গিন্নি! তুমি বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছ, অমন কর্লে দুর্দিনে বাড়ী থেকে তাড়াবো—হাঁড়িতে যায়গা দিয়েছি, সেটুকুও কেড়ে নেবো।

হাঁড়ি কি শুধু তোমার একার, যে কেড়ে নেবে?

বেশী বাড়াবাড়ি করো না নতুন গিন্নি! তাহলে ঐ মুড়ো খ্যাংরা দেখচো, ওটির সদ্ব্যবহার আমায় কর্ত্তে হবে।

হঠাৎ ঝগড়াস্থলে বিরিঞ্চি আসিয়া বলিয়া উঠিল—বড় বৌ? এ মাসে যে তোমার খোরাকি এল না?

তাহ'লে কি হোটেলে আর খেতে পাব না?

তাইতো ভাবচি। কায়েত গিন্নি কি ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছেন?

না, না ফাঁকি তিনি দিতে পারেন? এ যে তাঁর পিতৃমাতৃ দায়! শেষকালে কি বাপপিতামহকে অনন্ত নরকে পাঠাবেন?

তিনি যখন কথা দিয়েছেন, তখন সেটা না পালন করা মানেই মহাপাপ। তাতে বাপপিতামহ নরকস্থ হতে পারে বৈকি!

কিন্তু যে নিজের স্ত্রীকে নিজের ব্যয়ে ভরণপোষণ করে না,—তার বোধহয় নরকে যাবার কোনও সম্ভব নেই! যে দাতা, তারই যাবার কথা!

নরকে যাবার কথা কার, তানিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে চাই না! তবে একথা ঠিক, খোরাকি না এলে, এ বাড়ীতে তোমার আসন টলমল করবে!

এ ছেঁড়া আসন টলমল করার চেয়ে একেবারেই যাওয়া ভাল। আমায় স্পষ্ট করেই বলে দাওনা, "আমার বাড়ী থেকে চলে যাও,—আমি আর খেতে দিতে পারবো না!'

কি জানো বড় বৌ? তোমাদের দুজনের কোঁদল আর আমি সহ্য কর্ত্তে পারছিনে। অবিশ্যি বুঝতে পারি, ছোট বউ বেশী গায়ে পড়ে ঝগড়া করে! কিন্তু কি কর্ব্বো বলো, তাকে আমি শাসন কর্ত্তে পারি নে! তুমিও যে কারণে তাকে ভয় করো, আমিও তাকে ঠিক সেই কারণে ভয় করি। তোমার ওপর আমার দয়া থাকলেও আমার ওপর দয়া কর্ব্বার যে কেউ নেই! এই সেদিন যে ছোট বউ তোমার সঙ্গে কোঁদল ক'রে, কোঁদল মেটাতে এলো আমার পিঠের ওপর, তখনতো ত্রিভুবনে এমন কাকেও দেখলাম না, যে এই কুলীন ব্রাহ্মণকে রক্তারক্তির হাতথেকে উদ্ধার করে। তুমি নিজেও ত নিজের পথ দেখলে! আমি বেচারি মাঝখানে পড়ে বেশ খানিকটা অমৃত-বর্ষণ খেয়ে নিলুম!

আমার পালান ছাড়া উপায় ছিল না। তোমার আদুরে বউ যে মূর্ত্তি নিয়ে তেড়ে এসেছিল, সে মূর্ত্তি দেখলে পুলিশের লোকরাও আতঙ্কে পালিয়ে যেতো, আমিত কোন্ ছার?

লবঙ্গর কথা শুনিয়া বিরিঞ্চি একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনেক কষ্টে বলিল: সেই জন্যেইতো বলছি বড়বউ যদি নশ্বর দেহটার ওপর কোনও রকম মায়া পড়ে থাকে, তাহ'লে এইবেলা "শত হস্তেন বাজিনাং" ক'রে কোথায়ও সরে পড়ো, নইলে কেন এই নির্দ্দোষ স্বামীটিকে খুনী আসামী ক'রে আদালতের কাটগড়ায় পুরবে? তাতে তোমার খোরাক-পোষাকের কোনও সুবিধে হবে না,—

তুমি তোমার নিজের বউকে শাসন কর্ত্তে পার্ব্বে না?

শাসন? শাসন আগে অনেক করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু নিজে সুদশুদ্ধ সেটা ফিরিয়ে পেয়েছি। লবঙ্গ, পৃথিবীতে কতকগুলি জাতি আছে, যাদের শাসন কর্ত্তে গেলে নিজেই তার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়! এই জাতির মধ্যে প্রধান এবং অগ্রণী হচ্ছে দোজ-পক্ষের বউ! এই সকল জাতিদিগের উপর শাসনের কথা ভাবতে গেলে, শোষণ এসে পড়ে মনের মধ্যে! বড় জটিল প্রশ্ন, লবঙ্গ! কোনও মুনি-ঋষিরাও এই কঠোর সাংখ্য সূত্রটির সমস্যা ভঞ্জন করে যেতে পারেন নি।

(ক্রমশঃ)

উল্কা

(নাটক)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র।

জগদীশ - দার্শনিক পণ্ডিত, নলিনী—জনৈক ধনীর পুত্র, রমেন্দ্র—জগদীশের বন্ধু পুত্র, হেমেন্দ্র—সংবাদপত্র সেবী, মিঃ গ্যানিশ—সিনেমা ডাইরেক্টর, নটবর—নলিনীর পার্শ্বচর, ব্রজেন্দ্র—কেরাণী, বিরজা—সিনেমা অভিনেতা, মিঃ মিত্র—সিনেমা আর্টিষ্ট, আর্টিষ্টগণ, পথিক, উদাসী ইত্যাদি।

উল্কা—জগদীশের কন্যা, ইন্দ্রা—হেমেন্দ্রের ভগ্নী, তরলা—সিনেমা অভিনেত্রী, চঞ্চলা—নটবরের স্ত্রী, ভবতারিণী—ব্রজেন্দ্রের স্ত্রী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

["জগদীশ" বাবুর ড্রয়িং রুম। জগদীশ বাবু বসিয়া কি সব লিখিতেছেন। টেবিলের চতুর্দ্দিকে, বই ছড়ান। বাহিরে জল ঝড়ের প্রবল দাপাদাপি। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জ্জন, বিদ্যুতের চকিত রেখা।]

জগ—তাইত! জল ঝড় দেখছি ক্রমশই বেড়ে চললো! অথচ ৭টায় মিটিং। ওরে, কে আছিস—জানলাটা বন্ধ করে দে—আর বুলাকে পাঠিয়ে দে।

[বয়ের প্রবেশ]

বয়—বাবু—বাবু

জগ—এঁ্যা—কি—?

বয়—দিদিমনিত বাড়ীতে নেই।

জগ—বাড়ীতে নেই? কই আমিত তা জানতে পারলাম না। তাইত' এই জল ঝড়—বিপদেও ত' পড়তে পারে! নাঃ তোরা দেখছি আমায় কোন কথা জানতেই দিবিনে। তাইত কোথায় বা তাকে খুঁজি—অথচ ৭টায় আবার একটা মিটিং—কিন্তু বেরুই বা কি করে! নাঃ—

[নলিনীর প্রবেশ]

জগ—এই যে বাবা নলিনী—খুব ভিজে গেছো বোধ হয়?

নলিনী—আজ্ঞে না—আমি ত মোটরেই আসছি।

জগ—ও তাওত বটে, আমি জানতেই পারিনি। কিন্তু এধারে আমার বড়ই ভাবনা হ'য়ে উঠল। বুলা গ্যাছে বেড়াতে এখনও ফেরেনি, এই ঝড় জল—বিপদ হবার সম্ভাবনাও বড় কম নয়।

নলিনী আপনি যদি বিপদ টেনে আনে—কে কি করতে পারে বলুন?

জগ—বিপদ! কি বিপদ নলিনী? আমায় বেশ করে বুঝিয়ে বলত বাবা। আমিত কিছুই জানতে পারিনি। তাইত মনটা আরও অস্থির হ'য়ে উঠল।

নলিনী—উপস্থিত হয়ত বিপদ হয়নি কিন্তু হ'তে কতক্ষণ?

জগ—তাত বটেই। বিপদ যে কোথা দিয়ে আসে কিছুই জানতে পারা যায় না। কিন্তু কার সম্বন্ধে বলছ বলত নলিনী?

নলিনী—আপনাকে কতদিনই বলেছি বুলাকে যখন তখন যার-তার সঙ্গে বেড়াতে বারণ করে দেবেন। আর কেন যে বলি, তাও হয়ত আপনি জানেন।

জগ—তা হয়ত জানতেও পারি—কিন্তু, কটা বাজল দেখত?

নলিনী—ছটা কুড়ি—

জগ—ছটা কুড়ি! তাইত ৭টায় একটা মিটিং অথচ বুলা এখনও এল না—নাঃ।

নলিনী—এখন ব্যস্ত হ'য়ে কি করবেন বলুন?

জগ—না ব্যস্ত হয়নি, তবে কিনা বৃষ্টিটা যেন—থামল না?

নলিনী—একটু থেমেছে।

জগ—তাহলে তোমাকে একটু বসতে হবে নলিনী। আমি একবার দেখি ওরে—ছাতাটা, নাঃ থাক—

নলিনী—এই জল-ঝড়ে কোথায় খুঁজবেন বলুনত?

জগ—তাও বটে! কিন্তু ভাবনাটাও ত বড় কম নয়। তা যাক্—তুমি বস আমি না হয় একবার—

নলিনী—এই দুর্য্যোগে আপনাকে একলা ছেড়ে দিতে আমি কিছুতেই পারব না। চলুন আমিও যাচ্ছি।

জগ—যাবে? তা বেশ চল - কিন্তু বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম—

[নলিনী ও জগদীশের প্রস্থান]

[একটু পরেই ভিজা কাপড়ে রমেন্দ্র ও উল্কা প্রবেশ করিল।]

উল্কা—আপনি বেশ লোক ত, অত বড় বিপদ থেকে আমায় রক্ষা করলেন—অথচ তার বিনিময়ে এতটুকু যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব—সে পথও বন্ধ করে দিতে চান? না তা হবে না—আপনাকে একটু বসতেই হবে।

রমেন্দ্র—আমি আর এমন কি কাজ করেছি বলুন যার জন্য আপনি এতটা উতলা হ'য়ে পড়ছেন?

উল্কা—কি করেছেন! আজ যদি আপনি সেই Spotএ না এসে পড়তেন, হয়ত সেই অসভ্য লোকগুলোর কাছে অনেকখানি লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হ'ত।

রমেন্দ্র—তা হয়ত হত। কিন্তু রাগ করবেন না—সেই রকমই একটা কিছু আপনার হওয়া উচিত ছিল।

উল্কা—উচিত ছিল! বেশ যা বলবার হয় বলুন—প্রতিবাদ আমি করতে চাই না। কারণ আপনি আমার উপকারী—আপনার অসম্মান আমি কখনই করব না—করতে পারি না। মুখোমুখী ঝগড়া করলেও না।

রমেন্দ্র—ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ থাকবেন, ওতে স্বাস্থ্যের তরফে ক্ষতি হতে পারে।

উল্কা—আপনি তাহলে একটু বসুন আমি পাঁচমিনিটের মধ্যেই আসছি। চলে যাবেন না যেন। বলুন যাবেন না?

রমেন্দ্র—বেশ! কিন্তু এত আগ্রহ করে আটকে না রাখলেও পারতেন।

উল্কা—না—তা হবে না—আমি এলাম বলে। [প্রস্থান]

[রমেন্দ্র একখানি মাসিক পত্রিকা টানিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহিরে শোনা গেল নলিনীর কণ্ঠস্বর]

"ওরে, কে আছিস—বুলা এসেছে? বুলা—

[নলিনীর প্রবেশ]

নলিনী—আপনি কাকে চান?

রমেন্দ্র—ঠিক যে কাকে চাই বলা কঠিন।

নলিনী—বলা কঠিন! strange! আপনি বোধ হয় মিঃ রায়কে চান? তিনি বাড়ী নেই, মিটিংএ গেছেন ফিরতে বিলম্ব হবে।

রমেন্দ্র—মাফ্ করবেন—মিঃ রায় যে কে আমি চিনি না। তবে যিনি আমায় অপেক্ষা করতে বসে গ্যাছেন হয়ত তিনি এখনই এসে পড়বেন তাঁর কাছেই সব জানতে পারবেন।

নলিনী—ও তাহলে এ বাড়ীর সঙ্গে আপনার কোন পরিচয়ই নেই?

রমেন্দ্র—না, আপনার মন খারাপ করবার কোন কারণ নেই।

নলিনী—তার মানে? আপনার মনোভাবটা কি শুনি?

রমেন্দ্র—দেখুন, অকারণে ঝগড়া করা আমি পছন্দ করি না। হয় আপনি স্থির হ'য়ে বসুন না হয় বাড়ীর ভেতর গিয়ে আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করুন।

নলিনী—আপনি বুঝি ভদ্রতা কাকে বলে তাও জানেন না?

রমেন্দ্র—জানি, কিন্তু ঠিক আপনার মত শিখে উঠতে পারিনি।

নলিনী—খুব সাবধান হ'য়ে কথা বলবেন—

[ঠিক এই সময়ে প্রবেশ করিল উল্কা খাবারের থালা লইয়া, নলিনী আরক্তনেত্রে একবার দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল—]

উল্কা—আপনাকে অনেকখানি কষ্ট দিলাম।

[খাবারের থালা রাখিতে গিয়া নলিনীকে দেখিয়া বলিল]

উল্কা—একি! নলিনীদা! কতক্ষণ এসেছো? বাড়ী এসে শুনলাম তোমরা আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছো। বাবা কোথায় গেলেন নলিনীদা?

নলিনী—মিটিংএ কিন্তু তোমার অতিথি সৎকারটা একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিলেই ভাল হয়। [উত্থান]

রমেন্দ্র—কিন্তু—সৎকারের ব্যবস্থাটা অল্প নয় দেখছি আর সেটা সারতে একটু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। অতএব এতক্ষণ যেমন ধৈর্য্য ধরে ছিলেন আরও কিছুক্ষণ আপনাকে থাকতে হবে দেখছি। রাগ আপনার বেড়েই যাবে। কিন্তু এগুলোর সদ্ব্যবহার না ক'রে মিস্ রায়কে ক্ষুণ্ণ করতে চাই না কি বলেন?

উল্কা—নিশ্চয়ই। বসনা নলিনীদা। এর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই বোধ হয়? উনি, যে উপকার আজ আমার করেছেন—

নলিনী—তাত দেখতেই পাচ্ছি—নইলে আর বাড়ী পর্য্যন্ত ধরে এনেছো আলাপ করবার জন্যে—

উল্কা—ছিঃ ছিঃ কি বলছ নলিনীদা—আচ্ছা তুমি এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছো কেন বলত?

নলিনী Excuse me বুলা—অসভ্য লোকের অসভ্য আচরণ আমি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারি না।

উল্কা তুমি কাকে mean করে বলছ?

রমেন্দ্র—আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে। যাই হোক ওঁর উত্তেজিত হবার কারণ পরেই না হয় জিজ্ঞাসা করবেন। এখন অনুমতি করুণ এগুলোর সদ্ব্যবহার করি কারণ আপনিও না খাইয়ে ছাড়বেন না—আর আমারও না খেয়ে যাওয়া উচিত নয়।

[রমেন্দ্র খাইতে লাগিল]

রমেন্দ্র—[নলিনীর প্রতি] আপনি মনে কিছু করবেন না। দশ পনের মিনিট বাদেই অপরিচিতের মত চলে যাব। পরিচিত হ'তে হয়ত আসবও না। আপনি যেমন এদের আত্মীয় আছেন—তেমনিই থাকবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই।

উল্কা—অপরিচিতের মত চলে যাবেন মানে? তা হবে না আজ থেকে আপনাকে পরম আত্মীয় বলেই মেনে চলব।

রমেন্দ্র—কিন্তু ঘরোয়া যুদ্ধ বেঁধে যাবে মিস্ রায়।

নলিনী—এরকম বাজে কথায় আমি সময় কাটাতে পারব না বুলা—তা আমি বলে দিচ্ছি।

উল্কা—বেশত নলিনীদা তোমার যদি বিশেষ কাজ থাকে আটকে রাখতে চাই না।

নলিনী—বেশ তাহলে আমি চল্লুম—

[কিছু দূরে গিয়া আবার ফিরিল]

নলিনী—কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে কোন একটা বিষয়ে কথা না কয়ে যেতে পাচ্ছি না।

উল্কা—কিন্তু বাবাত এখন নাই অতএব কথাটা উপস্থিত বন্ধ রাখতেই হবে। আর সেটা বোধহয় আমাকে বলবে না—না?

নলিনী—না—

উল্কা—বেশ বাবা এলে তাঁকেই বোলো।

নলিনী—তার জন্যে দেখছি আমায় অপেক্ষা করতেই হবে।

[নলিনী বসিল]

রমেন্দ্র—আপনারা যুদ্ধটা দেখছি এখন থেকেই আরম্ভ করলেন। কিন্তু জানি, আমি চলে গেলেই সব মিটে যাবে। আচ্ছা আমি তাহলে উঠি মিস্ রায়—নমস্কার। আপনি যে মুখ ফিরিয়েই রইলেন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আপনি দিলেন না—যাই হোক ভবিষ্যতে সুযোগ আসতেও পারে—আচ্ছা নমস্কার—

[প্রস্থানোদ্যত]

উল্কা—একটা কথা—

রমেন্দ্র—বলুন—

উল্কা—আবার কবে আপনাকে expect করতে পারি?

রমেন্দ্র—Expect করা বৃথা মিস্ রায়। আমি একটা প্রকাণ্ড ভবঘুরে—। এক জায়গায় থাকবার স্থিরতাও নেই, আবার ঠিক একটা জায়গাও নেই।

নলিনী—সেটা আপনাকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

রমেন্দ্র—পারবেন বৈকি আপনি একজন জহুরী—জহরী চিনবেন না—

উল্কা—আচ্ছা নলিনীদা—কেন মিছে ঝগড়া করছ বলত?

নলিনী—আমি ঝগড়া - করছি?

উল্কা—বারে, ঝগড়া নয়! আচ্ছা আপনি বলুনত?

রমেন্দ্র—যাক্ আপনাদের গোপন কথা গোপনেই থাক্, মিস্ রায়। আমি চল্লাম।

[প্রস্থান]

উল্কা—সত্যি বলছি নলিনীদা তুমি ভারী লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর—। একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছেন তাঁকে একটু না হয় Receive করেছি, তাতে তোমার এত রাগ হল কেন বলত? তাছাড়া—

নলিনী—থাক্-থাক্। ওকে তুমি চেন? যাকে আজ এত Support করছ?

উল্কা—না চিনলেও এইটুকু জানি নলিনীদা—তিনি আমার কত উপকারী—যে অপমানের হাত থেকে উনি আজ বাঁচিয়েছেন, সত্যি বলছি, নলিনীদা, রাগ কোরনা - হয়ত তুমি কোনদিনই পারতে না।

নলিনী—ও-মাতালটা দেখছি অনেক খানিই জয় করে গেছে। তা না হলে তাকে Support করতে, এত অছিলার আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'ত না।

উল্কা—অছিলা! তার মানে? ছিঃ কি বলছ?

নলিনী—যাও-যাও মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করে, নিজেকে সাফাই রাখবার চেষ্টা কোরোনা।

উল্কা—মিথ্যা, আমি বলিনা। আর সাফাই রাখবার চেষ্টারও প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তুমি একটা ভুল ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে, নিজেকে শুধু অতিষ্ঠই করে তুলছ।

নলিনী—আমি নিজেকে অতিষ্ঠ করে তুলেছি?

উল্কা - তা-নয়—?

নলিনী—না-না-তা নয়। তোমার অবাধ গতি—শুধু আমার চোখে নয়—অনেকের চোখেই ধরা পড়ে গ্যাছে।

উল্কা—তার মানে?

নলিনী—নিজে বুঝে ছাখ, তাছাড়া তোমার ভালর জন্যেই বলি—আর এটাও তোমার জানা উচিত যে আমার কাছে তোমরা—

উল্কা—ঋণী এইত? অস্বীকার কোনদিনই করিনি আর তা করবও না—

নলিনী—হুঁ-তাইত দেখছি—

[এমন সময়ে জগদীশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

"ওরে কে আছিস—বুলা এসেছে?"

[জগদীশের প্রবেশ]

জগ—এই যে মা বুলা, কোথায় গেছলি বলত? আমি ব্যস্ত হয়েই পড়েছিলাম। ভাগ্যে নলিনী তখন এসে পড়ল, যাক্—তাহলে তোমরা কথা কও আমি একবার চট্ করে জামাটা ছেড়ে আসি—

নলিনী—একটু দাঁড়িয়ে গেলে ভাল হত মিঃ রায়, আমার একটা বিশেষ কথা বলবার ছিল। বেশীক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না। মাত্র পাঁচ মিনিট।

জগ—সেকি কথা নলিনী, তোমার কথা শুনব না—মা বুলা—জামাটা—আচ্ছা থাক তুমি না হয় আমার জন্য একটু চা এইখানেই নিয়ে আসতে বল, হ্যাঁ, নলিনীর জন্যেও বোলো।

নলিনী—না থাক আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওঁর হয়ত কষ্ট হতে পারে তাছাড়া আমিত আর উপকারী বন্ধু নই।

উল্কা—উপকারী যে নন সে কথা কোনদিন অস্বীকার করিনি—সে ভদ্রতা আমার আছে।

নলিনী—তা জানি ভদ্রতা তোমার অসীম। তাই বোধ হয় একটা মাতালের পক্ষ নিয়ে আমাকে অপমান ক'রে ভদ্রতার চরম পরিচয় দিতে ছাড়োনি।

জগ—মাতাল! সে আবার কি নলিনী? আমিত কিছুই বুঝতে পারছি না, মা বুলা। এ বাড়ীতে মাতাল ঢুকেছিল? মা বুলা, আমার লাঠিগাছটা—আচ্ছা থাক—আমি না হয় কোন্ করেই দিচ্ছি।

[টেলিফোনের দিকে অগ্রসর]

নলিনী—থাক্-থাক্ আপনি কি কচ্ছেন? এখন ফোন্ করে কি কর্ব্বেন? সেত চলে গেছে।

জগ—তাই বল। মাতালের এত বড় সাহস হবে যে এখানে বসে থাকবে। আমিও তাই ভাবছিলাম। যাক তাহলে ব্যস্ত হবার কিছুই নেই দেখছি। কিন্তু ব্যাপারটাত কিছুই জানতে পারলাম না নলিনী।

নলিনী—আপনার বুলাকেই জিজ্ঞাসা করুণ না।

জগ—কি আশ্চর্য্য—তোমাদের কি যে হল আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

উল্কা—কি করে জানবেন বাবা, যারা টাকা ধার দিয়ে মর্য্যাদাকে কিনে রাখবার আশা রাখে, তাদের কথা চিরদিনই অবোধ্য। আমি যদি জানতুম বাবা, কিছুতেই আপনাকে ওর কাছ থেকে একটা টাকা ধার করতে দিতাম না। আমাদের অক্ষমতার advantage নিয়েই না এতটা প্রভুত্ব করছেন।

জগ—আহাহা থামনা বুলা। কি যে হল আমি কিছুই জানতে পারলাম না। নলিনী, বাবা তুমিই না হয় বুঝিয়ে বলত, মানে তোমাদের মধ্যে এতটা গরমিল কিসে যে হল—কই বুলা যা না মা একটু চা না হয়—

উল্কা—চা একটু পরে হলেও চলবে বাবা। কিন্তু আপনি যে কি বলতে চান আমি শুনে তারপর যেতে চাই।

জগ—বলবার কি আছে মা। নলিনীর কাছে—মানে ওত আমাদের সবই জানে। কই যা না মা—চা-টা নিয়ে এসেই না হয়—সব কথা শুনিস না, নলিনীত আর এখনই চলে যাচ্ছে না।

উল্কা—লজ্জা জিনিসটাকে যারা বড় ব'লে মানে বাবা, তারা হয়ত এরপর থাকতে পারত না, কিন্তু লোভী যারা তারা কোন লজ্জাকেই ভয় খায়না কিনা—

[প্রস্থান]

জগ—কি আশ্চর্য্য তোমাদের কি যে হল কিছুই জানতে পারলাম না।

নলিনী—কিছুই হয়নি মিঃ রায়—। তবে আমি আপনাদের যথেষ্টই মঙ্গল কামনা করি। শুধু ভালর জন্যই বুলাকে বলেছি যে, যার তার সঙ্গে না মেশাই ভাল।

জগ—নিশ্চয়ই, একশবার বলবে। তা-ছাড়া আমিত তোমাকে বলেই রেখেছি নলিনী, যে বুলার ভাল মন্দের বিষয় তুমিই দেখবে—তাছাড়া আমারও খুব বিশ্বাস যে তোমার চেয়ে এতটা ভাল হয়ত কেউই দেখবে না।

নলিনী—ঠিক তাই মিঃ রায়। আপনিত মিটিংএ গেলেন আমি আরও দুচার জায়গা খুঁজে এখানে ফিরে এসে দেখি, কে একজন বসে আছে—অবশ্য বুলাই তাকে ডেকে এনেছিল। আমি তাকে চিনি, সে একজন নামজাদা মাতাল।

জগ—বল কি নলিনী! মাতাল! এখানে এসে বসেছিল? অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না।

নলিনী—আপনি কি করে জানবেন, সেত আপনার আসবার পূর্ব্বেই চলে গেছে।

জগ—চলে গেছে তাহলে ভাবনার কিছুই নেই—কি বল?

নলিনী—ভাবনা নেই! আপনি কি বলেন মিঃ রায়?

জগ—ভাবনার আছে তাত আমি জানতে পারলাম না।

নলিনী—আপনিত দেখছি কিছুই জানতে পারছেন না। কিন্তু জানেন সেই রাস্কেলটাই হল আমাদের মতদ্বৈধের কারণ।

জগ—কেন বলত?

নলিনী—সেই লোকটা কেন এখানে এল জিজ্ঞাসা করতে বুলা বিদ্রূপ করেই বললে "আমার উপকারী বন্ধু আত্মীয়"।

জগ—আত্মীয়? আমাদের আত্মীয়! তা হবে কিন্তু বাড়ীতে এল অথচ আমি জানতে পারলাম না।

নলিনী—নাঃ আপনি কোন কথাই দেখছি serious ভাবে নিচ্ছেন না। আত্মীয় আপনাদের মোটেই নয় বরং শত্রু বললেও চলে—

জগ—শত্রু! বল কি নলিনী—তাহলেত তাকে কোন মতেই আসতে দিতে পারা যায় না। তুমি নিশ্চয়ই বারণ করে দিয়েছো?

নলিনী—বারণ করতে গিয়েইত ঝগড়ার উৎপত্তি। আমি যে বুলার মঙ্গল কামনা করি এটা নিশ্চয় অস্বীকার করেন না। অথচ বুলা সেই scoundrel-টাকে support করে আমাকে অপমান করতে একটুও দ্বিধা করলে না। অবশ্য বুলাকে একটু দাবিয়ে দেবার জন্য আমি একটু Rough হয়ে পড়েছিলাম সেটা যেন সত্যি বলে মনে করবেন না।

জগ—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কি বুঝিনা বাবা নলিনী যে, তুমি বুলাকে—কতটা—এই যে মা—

[উল্কার প্রবেশ—দুইজনকে চা দিল]

জগ—বাঃ এরই মধ্যে চা তৈরী! যাই বল নলিনী বুলাকে কাজে কেউ হঠাতে পারবে না।

নলিনী—শুধু কাজে নয়—মিঃ রায় কথাতেও—

জগ—হাঃ হাঃ হাঃ, এবার কিন্তু মা তোকে—নলিনী সত্যি সত্যিই ঠকিয়ে দিয়েছে। কারণ তোমার প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই দেখছি।

অসুস্থ
শরীর
সুস্থ ও সবল
করিতে
SIROLIN
ROCHE

অদ্বিতীয়

উল্কা—যারা নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা বলতেও কুণ্ঠিত হয়না তাদের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে আমি চাই না।

জগ—আমি আজ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না কেন যে তুমি এতটা বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলে। অথচ নলিনীর মত এত বড় উপকারী বন্ধুকে—কেন যে তুমি—

[টেলিফোন বাজিল—উল্কা ধরিল]

উল্কা—Hallo, আজ্ঞে হ্যাঁ-P. K. 2857 আজ্ঞে হ্যাঁ আছেন। ও আপনাদের মিটিং বুঝি আজ? কটায়? ৯॥টায়, আচ্ছা আমি বলছি—হ্যাঁ বাবা, আপনাদের না Theosophical Societyর মিটিং ছিল?

জগ—কি আশ্চর্য্য! আমি ওটার সম্বন্ধে একেবারেই ভুলে গেছি মা। ওঁরা নিশ্চয়ই আমার অপেক্ষাতেই আছেন? তুমি বলে দাও মা আমি এখুনি ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

উল্কা—Hello, বাবা এখুনি যাচ্ছেন, আজ্ঞে না বেশী দেরী হবে না—আচ্ছা নমস্কার—

[টেলিফোন রাখিল]

জগ—তাহলে বাবা নলিনী আমাকে একটু উঠতেই হচ্ছে। 'আমার চাদরটা-তাহলে মা বুলা—তোমরা বস-আমার আসতে হয়ত দেরিও হতে পারে। এ মিটিংটার কথা একেবারেই জানতে পারিনি।

[প্রস্থান]

[উল্কা মুখ ফিরাইয়া একখানি বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। নলিনী কাছে আসিয়া ডাকিল।

নলিনী—বুলা—

উল্কা—কি—!

নলিনী—আমার সঙ্গে কথা কওয়াটাকি বন্ধ করে দেবে?

বুলা—উচিত।

নলিনী—কিন্তু রাগ তোমার চেয়ে আমারই বেশী হওয়া স্বাভাবিক। কারণ কড়া কথা তুমিই আমাকে বেশী বলেছো।

উল্কা—হ'তে পারে। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদে sweet words আশা করা বৃথা।

নলিনী—কিন্তু কেন তুমি রাগ কর বুলা। আমি যে এতে কতটা ব্যথা পাই তা কি বুঝতে পার না?

উল্কা—দ্যাখ নলিনীদা, তুমি আমাকে কি ভাব বলতে পারি না। 'জানতেও ইচ্ছা নেই। কিন্তু অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি যে, তুমি যেন একটা অসম্ভব কিছু পাবার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করতেও ছাড়ছ না।

নলিনী—যদি কিছুর আশাই করে থাকি সত্যিই কি সেটা অসম্ভব?

উল্কা—সে সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

নলিনী—কিন্তু বুলা, তুমি কি জাননা আমার অন্তরের ব্যথা। তোমাকে পাবার আশায় আমি যে উন্মুখ হ'য়ে বসে আছি, তাকি বোঝ না?

[হাত ধরিল – উল্কা হাত ছাড়াইয়া লইল]

উল্কা—দ্যাখ নলিনীদা টাকা ধার দিয়েছো—উপকার করেছো 'তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ কিন্তু মর্য্যাদা আমার নিজস্ব জিনিস তার ওপর কোন দাবী করবার চেষ্টা না করলেই ভাল হয়।

[মুখ ঘুরাইয়া সোফায় বসিল]

নলিনী—ও তাই নাকি! আচ্ছা দেখে নেবো দাবী আছে কিনা—

[প্রস্থান]

ক্রমশঃ

কে তুমি পথিক

শ্রীরথীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কে তুমি আজ ওগো পথিক
মৌন ভাবে থেকে,
চলার ভাষা পথের পরে
যাচ্ছ এঁকে এঁকে!
চলার ভাষায় কি যে কহ
তুমিই যে তা জান,
মুখে তোমার নাইক' ভাষা
এত' তুমি মান।
বাতাস চলে হেঁকে হেঁকে
তুমি স্তব্ধভাবে থেকে
যাচ্ছ চলে কোথায় পথিক
অসীম যাত্রা সম।
যাবে যাও বারেক থেমে
আমার দ্বারে দৃষ্টি হেনে
চরণ ধূলে ভ'রিয়ে দে, যাও
অন্তর খানি মম।
তোমার তরে মনের কোণে
দরদ দাগে যে,
যতই ভাবি ডাকব' নাক
থাকতে পারি নে।
কোন সীমাতে বিজয় যাত্রা
থামবে তোমার কহ?
এই কথাটাই হৃদয় বীণে
বাজছে অহরহ'।
মন যে আমার থামছে নাক,
ডাক তোমার সাথে ডাক;
যাচ্ছ তুমি যেথায়, সেথা
নাও মোরে ডেকে।
যাবার পথে যেও ধীরে
মাঝে মাঝে চেও গো ফিরে
ব্যথায় কাতর হ'লে পরে
চরণ রেখ বুকে।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামে বাংলা আধুনিক সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কীর্ত্তন, বাউল, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত কমে আসছে। বাংলা প্রোগ্রাম দিনে দিনে সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। বাঙ্গালী শ্রোতা অর্থপুষ্ট অথচ বাঙ্গালী শ্রোতাদের 'পর এ অবিচার সমর্থনযোগ্য নয়। পূর্ব্বে দ্বিপ্রহরে ভালো সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান হোত· এখন তা একেবারেই বন্ধ। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে খবরের ভীড়, হিন্দুস্থানী প্রোগ্রাম প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত।

ভারতীয় প্রোগ্রামের প্রতিটি বিভাগেরই অনুষ্ঠান সূচির অধঃপতন ঘটছে। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে-তে শুধু অগতিরগতি রেকর্ড আর দু একটা বক্তৃতা। বিদ্যার্থী মণ্ডলে বক্তৃতা অতি গতানুগতিক পন্থা। ছোটদের বৈঠকে দাদুমনি তবু ছেলে-ভুলানো দু'একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। পল্লীমঙ্গল আসর, গ্রামোফন রেকর্ড, দিন-পঞ্জী, আর রাশিকৃত বেসুরো কণ্ঠের অভিনয় ধরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা রূপ বিরক্তি-কর রসহীন চীৎকার। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে অধিকাংশ বাজে গান আর বাজনা আর একঘেয়ে বেতার-বিচিত্রা। কোন বৈচিত্র্য নেই, নূতন দিকের কোন পরিচিতি নেই। সুবোধ শ্রোতারা সেট বন্ধ করে দেন? আর এ-আই-আর প্লেয়ার্সের অভিনয়—ও সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো!

কর্ত্তৃপক্ষের প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে এ অক্ষমতা শৈথিল্য আর খাম খেয়ালী ভাব আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি।—এর কারণ অতি অপ্রিয় সত্যের বহু ইঙ্গিতই আমরা দিয়েছি। যোগ্যের সমাদর সুবিচার বেতারের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় পরিচালকরা করেন না। রসবোধেরও বিশেষ পরিচয় পাই না প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণে।

আমাদের জনৈক বিশিষ্টা পাঠিকা ও বেতার গ্রাহিকা দু'টি বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। "আসাম ও মণি-পুরের নাগা"দের সম্বন্ধে আলোচনা করে-ছিলেন জীতেন্দ্র কুমার নাথ। বক্তার ভাষাজ্ঞানই নেই। গুরুচণ্ডালী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন? এবং নাগা সম্বন্ধে নূতন তথ্য কিছুই জানান নি।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে আর একজন গোপেশ্বর পাল "অনুশীলনের জন্য মনো-বিজ্ঞানের সহজ সন্ধান" সম্বন্ধে পণ্ডিতি চালে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। আপনারা শুনুন বলে আরম্ভ হতে মনে হয়েছিল মহিলা আসরের সর্ব্বজন জ্ঞাতব্য কিছু বিষয় বস্তু। "তোমরা ল্যাখাপড়া"—তাতে বুঝলুম বিদ্যার্থী মণ্ডলের জন্যেই।—অতি প্রাচীন পুঁথিগত উপদেশ, লেখাপড়া করে যে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে সুলভ উপদেশ। বক্তার বোঝা উচিত বাংলার ছাত্র সমাজ আজকের যুগে অতখানি পেছিয়ে আর কেউ-ই নেই। আমাদের বক্তব্য বেতারে এমনি ধরণের বক্তৃতাই চলে।

অথচ শ্রোতাদের ভোলাবার প্রচেষ্টার অন্ত নেই রেডিও কর্ত্তৃপক্ষের তাঁদের মতামত গ্রহণ তাঁদের উপদেশ গ্রহণ বহুবিধ প্রচেষ্টাই দেখি। অতিরিক্ত আলোচনা হলে বেতার প্রোগ্রামে কয়েকটি নাম করা শিল্পীর নাম দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অনুপস্থিতিতে রেকর্ড বাজে। কয়েকটি নাম করা শিল্পী প্রোগ্রামে থাকলেই শুধু প্রোগ্রাম ভালো হয় না। ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক এর কি প্রতিকার করছেন?
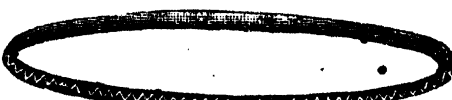
"গল্প" বনাম "টেক্‌নিক"

শ্রীঅমর মল্লিক (এন-টি)

আমি ছায়ালোকের বাসিন্দা··· আজ তাই আপনাদের কাছে ছায়া-ছবির দু-চার কথাই বলতে এসেছি।

আজকাল জগতের সব যায়গাতেই ছায়াছবি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসেছে। কেউ কেউ বলেন, ফিল্ম আনন্দের একটি শ্রেষ্ঠ পশরা—আবার ওদিকে আর এক দল লোক বলেন যে, আর্টের চরম নিদর্শন হচ্ছে সিনেমা! এই দু' দলের মধ্যে কোন মতটা যে সত্য, সেটার মীমাংসা করতে চাই না তবে যে কথাটা নিয়ে আজ আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ফিল্মে কোন জিনিষটার প্রয়োজন বেশী—গল্প না তার তোলবার কায়দা?

ফিল্ম-শিল্প আজ আর সেই শৈশবাবস্থায় নেই—এখন তার সম্বন্ধে জন-সাধারণ রীতিমত মাথা ঘামাতে সুরু করেছে। ছবি নির্ম্মাতারা আর উদাসীন হয়ে বসে নেই। তাঁরাও রীতিমত হুঁসিয়ার হয়ে উঠেছেন। তাঁরা আজকাল ভাবতে সুরু করেছেন—লোকে ছবির পর্দ্দায় কি জিনিষ দেখতে চায় —আর কি জিনিষ চায় না! যদি কোন একখানি ছবি বাজারে ভালভাবে না চলে অমনি ছবির কর্ম্মকর্ত্তারা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে যান—কেন এ ছবি চলচে না ··কোথায়· তার গলদ্ এবং লোকে কি চায়···"ষ্টার" অভিনেতা অভিনেত্রী, ভাল টেক্‌নিশিয়ান—পাকা ডাইরেক্‌শন্—কিংবা ভাল গল্প!

আজ কথাটা সত্যিই বিবেচনা করে দেখবার দিন এসেছে। দেখা গেছে—অনেক সময় ভাল ফটোগ্রাফী, সাউণ্ড, সেটিংস্, এবং অভিনয় থাকা সত্ত্বেও ছবি লোকে পছন্দ করে নাই। তার কারণ কি? একটু ভেবে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, লোক আজকাল মাত্র এই সব "টেকনিক্যাল—প্যাঁচের" মোহে ভোলে না—তারা চায় আরো কিছু বেশী—তারা চায় গল্প!

এও দেখা গেছে যে পাকা ডাইরেক্‌টারের ভালো পরিচালনা সত্ত্বেও লোকে ছবি পছন্দ করে নাই—তারই বা কারণ কি?

কারণ আর কিছু নয়—আমার মনে হয় আসলে লোকে চায় ভাল গল্প—তারপর ডাইরেক্‌শান, অভিনয়, ফটোগ্রাফী, সাউণ্ড, সেটিংস্ ইত্যাদি। ছায়া-ছবির মূল বস্তু হচ্ছে কাহিনী এবং কাহিনীটিকে ভাল করে গুছিয়ে বলার জন্যেই দরকার পরিচালকের, চিত্র-নাট্যকারের এবং সেটা রূপালী-পর্দ্দায় পরিণত করবার জন্য দরকার ভাল টেক্‌নিশিয়ানদের আর আর্টিষ্টদের। সুতরাং দর্শকরা ছবি-ঘরে এসেই প্রথমে খোজে কাহিনী অর্থাৎ গল্প। যদি তারা দেখে যে ছবিতে ভাল কাহিনীর অভাব তখন আর তাদের টেক্‌নিক্যাল মার প্যাঁচের মোহে ভুলিয়ে রাখা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না।

ছায়া ছবির প্রথম আমলে টেক্‌নিক্যাল্ কায়দায় তারা হয় তো গল্প নিয়ে এতটা মাথা ঘামাতো না—কিন্তু আজকাল মেকি জিনিষে দর্শক সাধারণকে আর ধাপ্পা দেওয়া সম্ভবপর নয়। সেই জন্যে প্রায়ই দেখতে পাই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভালো টেক্‌নিশিয়ানদের সাহায্যে তোলা ছবিও শুধু একমাত্র ভাল গল্পের অভাবে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। এ সম্বন্ধে হলিউডের প্রায় প্রত্যেক বড় বড় পরিচালকদেরও তাই মত। তাঁরা বলেন—ছবির প্রথম জিনিষই হচ্ছে ভালো গল্প এবং সেই গল্পকে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা—প্রযোজকদের এ বিষয় দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের অনুগ্রাহক বর্গের বিশেষ অনুরোধে আমরা নিয়মিত ভাবে রেকর্ড-সমালোচনা আরম্ভ করিলাম। বর্ত্তমানে বাংলা দেশের বিখ্যাত যে কয়টি রেকর্ড কোম্পানী আছে তাঁহাদের মাসিক প্রকাশিত রেকর্ডগুলির নির্ভিক ও গঠন-মূলক সমালোচনা এ বিভাগের বিষয় বস্তু হইবে। ইহাতে রেকর্ড-ক্রেতা ও রেকর্ড কোম্পানী উভয়েই সমানভাবে উপকৃত হইবেন।

* * * *

আমরা প্রথমেই বাংলার স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মেগাফোন কোম্পানীর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত রেকর্ডগুলির সমালোচনা করিব। মেগাফোন কোম্পনী এ মাসে সর্ব্ব সমেত ১০ খানি বাংলা রেকর্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে দু'খানি নিউ থিয়েটার্স মেগাফোন রেকর্ড ও দু'খানি "আত্মহত্যা" পালার রেকর্ড। বাকী ৬ খানি একক সঙ্গীতের রেকর্ড।

* * * *

JNG. 5311 এই রেকর্ডে শ্রীযুত ভবানী চরণ দাস দু'খানি ভজন গান গাহিয়াছেন। গায়কের কণ্ঠ শ্রোতৃমহলে সুপরিচিত। গান গুলির রচনা মন্দ নয়। মোটের উপর গান দুটি নিন্দনীয় হয় নাই।

* * *

JNG. 5312 নুর উদ্দীন আমেদ সাহেব দু'খানি ভাটিয়ালী গান রেকর্ড করিয়াছেন। ইসলামী গান গাহিয়া গায়ক মুসলমান শ্রোতৃবর্গের নিকট জনপ্রিয় হইয়াছেন। উদাত্ত ও মধুর কণ্ঠে গীত ভাটিয়ালী গান দুটি এ-শ্রেণীর গান যাঁহারা পছন্দ করেন তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

* * *

JNG. 5313 মিস্ ফুল্লনলিনী দু'খানি আধুনিক গান গাহিয়াছেন এই রেকর্ডে। গায়িকার কণ্ঠস্বর জোরালো। গান রচনা করেছেন অজয় ভট্টাচার্য্য। আবহ-সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতে সম্পূর্ণ মিল না হইলেও মোটামুটি গান দুটি সাধারণ শ্রোতাকে খুসী করিতে পারিবে।

* * *

JNG. 5314 অনন্তবালা বৈষ্ণবীর দু'খানি পল্লীগীতি এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গায়িকার কণ্ঠস্বর ও গাহিবার প্রণালী এই শ্রেণীর গানের সম্পূর্ণ উপযোগী। পল্লীগ্রামের শ্রোতাগণ রেকর্ডখানি শুনিয়া যে খুসী হইবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

* * *

JNG. 5315 শ্রীমতী সুষমা দে এই রেকর্ডে পল্লীকবি জসীম উদ্দীন রচিত দু'খানি ভাটিয়ালী গান গাহিয়াছেন। গায়িকার কণ্ঠের সহিত কলিকাতার সঙ্গীতামোদী মাত্রেই পরিচিত। শিক্ষিত ও মার্জ্জিত কণ্ঠে ভাটিয়ালী গানের যতটা রূপ প্রকাশ করা সম্ভব এই রেকর্ডে তাহার ত্রুটি হয় নাই।

* * * *

JNG. 5316 অনন্তবালা দু'খানি ইস্‌লামী গান পল্লীসঙ্গীতের ঢঙে এই রেকর্ডে গাহিয়াছেন। গান রচনা করিয়াছেন মহম্মদ সুলতান বি-এস-সি। অনন্তবালা হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শ্রোতার নিকট সমান ভাবে আদৃত হইয়াছেন। গান দু'খানি পল্লীবাসী মুসলমান শ্রোতাগণ সাদরে গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

* * * *

JNG. 5310 নিউ থিয়েটার্সের নবতম বাণীচিত্র 'সাথী'র দু'খানি সর্ব্ব জন-প্রিয় গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান গাহিয়াছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র-তারকা শ্রীমতী কানন দেবী। "সোনার হরিণ আয় রে আয়" ও "তোমারে হারাতে পারি না যে প্রিয়" গান দুটি সবদিক দিয়া চমৎকার হইয়াছে।

* * * *

JNG. 5319 'সাথী' বাণীচিত্রের আর দু'খানি জনপ্রিয় গান এই রেকর্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। গান দুটি "রাখাল রাজা রে"

ও "পায়ে চলার পথের কথা"। গান গাহিয়াছেন শ্রীমতী কানন দেবী। যাঁহারা ছবি দেখিবেন তাঁহাদের এই রেকর্ড খানি শুনিতেও সংগ্রহ করিতে হইবেই।

* * *

JNG. 5317 to JNG. 5318 এই দু'খানি রেকর্ডে প্রণব রায় রচিত "আত্মহত্যা" কৌতুক নাটিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন মিসেস সুপ্রভা মুখার্জ্জি, মিস্ ইলা ব্যানার্জ্জি, নবেন্দু সুন্দর ব্যানার্জ্জি, চারু প্রকাশ ঘোষ ও প্রণব রায়। এই সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় সাধারণ অভিনয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কলিকাতাবাসী শ্রোতাগণ নাটিকাটি শুনিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন।

* * *

নিউ থিয়েটার্স হিন্দুস্থান রেকর্ডে দরদী ও মরমী সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত সুখেন্দু গোস্বামী এম্-এর আধুনিক গান দুখানি 'কে গো বাজালে বাঁশরী' এবং 'তোমার আকাশে'— (রেকর্ড নং H 665) সঙ্গীত জগতে এক বিশিষ্ট অবদান। শ্রীযুত গোস্বামী তাঁর নিজস্ব ঢং-এ ও তানমালায় যে সুর এবং কাব্য আবহাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সত্যিই অপূর্ব্ব।—সুখেনবাবু সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র।

—

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঠিকই বলেছেন; কিন্তু মুস্কিল কি জানেন? মুস্কিল হচ্ছে এইখানে যে, গভর্ণমেণ্ট যদি এসব না দেখে তাহলে কোন চেষ্টাই ফলবতী হয়ে ওঠে না! রাজশক্তি যদি পেছিয়ে পড়ে থাকে এই দিক দিয়ে, তাহলে শাসিত জাতিও যে পেছিয়ে থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি। এই বিরাট দেশের বিরাট অশিক্ষা দূর করতে এক রাষ্ট্রই পারে।

আপনার কথা ঠিক মানতে পারলাম না। জগতের অন্যান্য দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পড়ুন তাদের ইতিহাস, দেখবেন ব্যাপারটা ঠিক উল্টোই। দেশের শাসক সম্প্রদায় এদিকে নজর দেবার অবসর কোন কালেই পাবেন না। তাঁরা এসেছেন শাসন করতে, দেশকে উদ্ধার করতে নয়। তবু ইংরাজ রাজত্ব অনেকখানি করেছে তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত নিন্দা না করে। আলোর রাস্তা তো তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন—দেশের লোক যদি নিজেরা এগুবার চেষ্টা না করে তবে দোষ কি তাঁদের। দেশের শতকরা সাত আট জনকে তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন; তারা শেখাতে পারে অপরকে। বাদবাকী বিরানব্বই জনকে শেখাতে কদিন লাগে যদি এই শিক্ষিত কজন চেষ্টা করে? বড় জোর দশ বৎসর লাগে দেশকে শিক্ষিত করে তুলতে। অথচ আমরা, যারা শিক্ষিত বলে গর্ব্ব করি, তারাই রইলুম সব থেকে মোহাচ্ছন্ন হয়ে। আজ দেখুন সাহিত্যের নামে যা চলেছে দেশের কাছে তার দাম কতটুকু! যে সব বই তরুণ মস্তিস্ক ছেলেদের সামনে ধরে দেওয়া হচ্ছে তাদের সামনে যারা দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল, সেগুলো তাদের করে তুলছে আরো মোহাচ্ছন্ন। এর জন্য দায়ী কে? সরকার না দেশের মানুষ? শিশু সাহিত্য আমাদের দেশে জন্মালোই না। ছেলেদের সাহিত্য বলে যা চালানো হলো তাতে ছেলেরা আরও ভীতু হয়ে পড়লো ভুতের গাঁজাখুরী গল্প পড়ে। কর্ম্মাবসানের পর বয়স্ক লোকেরা যে সব বই নিয়ে বসলেন তাতে বাড়িয়ে তোলা হলো ধর্ম্মের নামে কুপমণ্ডুকতা আর উপন্যাস শেখালো ভাবালুতা। বাস্তব জগতের সংগ্রাম থেকে তারা আশ্রয় নিলে স্বপ্ন-সৌধ রচনার ভিতর। বাস্তব ছেড়ে কল্পনাকে আশ্রয় করে জীবনের দায়িত্বকে, মনুষ্যত্বের দাবীকে দিলে তারা ধুলায় লুটিয়ে। মেয়েগুলোও যারা কিছু কিছু লেখাপড়া শিখলো—তারা চাইলো ফিকে হাওয়ায় ডানা মেলে বেড়াতে। আসল সাহিত্যের ক্ষমতা অসীম। হাজারো জন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে মরলেও যে ফল ফলে না, সাহিত্যিকের কলমের একটা টানে তার সমাধান হয়ে যায়। রাশিয়া পেছিয়ে পড়তো আরো অনেক বৎসর যদি না জন্মাতো গোর্কীর মত সাহিত্যিক। সেখানকার শিক্ষিতেরা বুঝেছিলেন যে

কথা, তাই তাঁরা যত্নে ত্রুটী করেননি দেশকে আগে শিক্ষিত করে তুলতে। আচ্ছা আপনিই বলুন—রবিঠাকুরের মত প্রতিভাই বা কি দিয়েছে দেশকে—এক কাব্য ছাড়া।

কিছু বলতে আরম্ভ করলে চপল জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মনে হয় ওর অন্তরের রুদ্ধ ভাবের কাঁটা মীটারের শেষ রেখায় এসে পৌঁচেছে। ধরে রাখবার উপায় নেই। নাহলে এক্ষুনি ফেটে পড়বে। মৃণাল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে ওর বলার ভঙ্গী গুলোকে দেখে যাচ্ছিল।

ওর ছোট বোনটা দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকলো আর ওর মা প্লেটে লুচি আর রসো গোল্লা নিয়ে দাড়িয়ে রইলেন বাইরে। চপল উঠে গিয়ে মার হাত থেকে নিয়ে এল প্লেট দুটো; মৃণালের সামনে ছোট টিপয়টা এগিয়ে এনে রেখে দিলে তার ওপর দুটোই।

মৃদু আপত্তি জানিয়ে মৃণাল হাত বাড়িয়ে দিলে প্লেটের দিকে, আর চায়ের কাপে ছোট্ট একটা সিপ দিয়ে বল্লে—আপনার কাল্চার আছে দেখছি চপলবাবু, সত্যিকারের কালচার বলতে যাকে বোঝায়। ঠিক খেয়ালের বশেই আপনি লেখেন না বা পড়েন না তা বুঝতে পারি। দেশের বেশীর ভাগ সাহিত্যিকদের সাথে আপনার ঠিক মেলে না। আপনার রাস্তাটা গেছে খানিকটা অন্য দিক দিয়ে। বিচারে, যুক্তির এসিডে ফেলে আপনি প্রত্যেক জিনিষকে নেন যাচাই করে। সত্যি করে আজ মনে হচ্ছে দেশ আপনার মত লোকই চায় অন্ততঃ প্রয়োজন তার, যারা শুধু কল্পনার গুলি গলধঃকরণ করে ঝিমোবে না নেশায় আর অবাস্তব স্বপ্ন-কুহেলি রচনা করে চলবে না কাগজের পাতায়; যারা

আইডিয়ার ষ্টিমুলেণ্ট দিয়ে দেশের প্রাণশক্তিকে তুলবে উজ্জীবিত করে। কথাগুলো বলে মৃণাল খরদৃষ্টিতে তাকাল চপলের দিকে। দেখল চপল চেয়ে আছে ওরই দিকে, কিন্তু মনটা তার বিহার করছে অন্য রাজ্যে। মৃণাল তাই ডাকলো একটু জোর দিয়ে—চপলবাবু! চপল চমকে উঠে বললে—হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন।

—কি ঠিকই বলুলুম? আমি বলছিলাম যে আপনিই—

—না, না আপনি ভুল বলেছেন। আমি সামান্যলোক, কিই বা করতে পারি বলুন। বিরাট অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটা প্রদীপ নিয়ে এগুবার চেষ্টা করছি মাত্র; কিন্তু ভয় জাগে প্রতি মুহূর্তেই যে নিজেই বুঝি বা কখন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাব। অন্ধকার দূর করবার মত প্রতিভার আলো নেই, তাই জাগে সন্দেহ আলো-আঁধারী সৃষ্টি করে মানুষকে আরো বিপদে না ফেলি। তখন একূলও যাবে ওকূলও যাবে। লোকে হয়তো দিশা হারিয়ে ফেলবে আবছায়ার মাঝে, আমার নিজের অক্ষমতার পরিচয়ে। আপনারা ভাগ্যবান্ পুরুষ, অর্থবানও। ইচ্ছে করলেই আপনারা পারেন দেখতে অনেক কিছুই, দেখাতেও। আর আমাদের? প্রদীপের সলতে পুড়িয়ে ক্ষণিক আলো জ্বালাবার চেষ্টা। হয়তো নিজে ওকে যেতেই হবে তেলের অভাবে।

—অর্থই সব কিছু নয় চপলবাবু। অর্থ দিয়েই অন্তসম্পদের অর্থ করা যায় না। তার ওপরও আর একটা জিনিষ আছে যার নাম প্রতিভা। প্রতিভাকে বাড়াবার ক্ষমতা অর্থের নেই, কুমারীর মরণ-কাঠিও তার হাতে অবিদ্যমান। প্রতিভা নিজেই আলো, নিজের পথ নিজেই সন্ধান করে চলতে পারে। অভাব সবাইকে বশীভূত করতে পারে কিন্তু প্রতিভাকে নয়।

ঠিক তাই কি? প্রতিভার অপমৃত্যুও-তো হয়। আর দেখা যায় অভাবের ফাঁসি কাঠেই তার মরণ-বেদী রচিত। প্রতিভার উজ্জীবক রস হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য, আর সেই রসকে বাষ্প করে উড়িয়ে দেয় অভাবের আগুন, বিফলতার আগুনও বলতে পারেন। অভাব মানেই অসফলতা—পরাজয়।

মৃণালের চায়ের কাপ শূন্য দেহে আশ্রয় নিলে যথাস্থানে। সোনার কেস থেকে সিগারেট বার করে চপলের দিকে এগিয়ে দিলে খোলা কেসটা।

মৃণালের আর ভালো লাগছে না এসব শুকনো আলোচনা। নিজেকে জাহির করবার, নিজের চিন্তাশক্তির পরিচয় দেবার জন্যই ও প্রবৃত্ত হয়েছিল এই সব আলোচনায়।

মৃণাল কথার মোড় ফেরালে। একটু নড়ে-চড়ে বসে বলুলে—মিস্ মীরার সাথে কাল আলাপ হলো আপনার?

চপল খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলুলে—হাঁ খানিকটা হলো বইকি। বেশ চমৎকার মেয়ে, নয়?

মৃণাল হেসে বলুলে—কি মনে হয় আপনার?

—আমার আর কি মনে হবে? ভালো যদি নাই হয়, তবে খারাপ হ'বে নিশ্চয়ই। কি বলেন?

খারাপ হবে নিশ্চয়ই? কেন এওতো হতে পারে যে ভালোও হলো না, মন্দও হলো না; তার মানে মাঝামাঝি, সাধারণ ঘরের মেয়েরা যেমন হয়। যাকে বলে সাধারণ।

অর্থাৎ বোধ্য এই তো বলতে চাইছেন? আপনার কথাই ঠিক; আমি ভুল করেছি। আগা আর গোড়া নিয়েই আগা-গোড়া নয়। মাঝখানটাও আছে। সেটা আমারই ভুল। যেমন ভোলেন আমাদের দেশের ছোট খাট নেতারা। পিকেটিং কর, জেলে যাও, প্রাণ দাও আর নইলে এ রাস্তা থেকে একেবারে বিদায় নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না লাগাও। দেশের নাম মুখে এন না। এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে আরও কিছু আছে যাকে অবলম্বন করে প্রান্তদুটী টিকে আছে সে খেয়াল নেই এদের। মাঝকে বাদ দিলে যে আগা থাকতে পারে না, গোড়াও হয় প্রাণহীন সে কথা এরা ভুলেই যান। হ্যাঁ কী বলছিলেন, মীরার কথা? ও একটু থমকে যায়, ভাবে কি প্রয়োজন মেয়েকে নিয়ে আলোচনাকে খুঁচিয়ে তোলার? কিন্তু ভেতর থেকে কে যেন ওকে ঠেলা দিতে থাকে। তাই ও বলে কি করে বুঝবো বলুন সামান্য পরিচয়ে? সে কথা বরং আপনিই বলতে পারেন।

তার মানে মীরার কথা ও খানিকটা শুনতে চায়; ঔৎসুক্য ভিতরে ভিতরে উকি মারছে।

মৃণাল বলে—তাত ঠিক। এক দিনেই কি করে বুঝবেন বলুন। ও কাল আপনার সাথে আলাপ করতে চাইছিল কিনা। আপনার লেখা বা কথাগুলো ওকে মুভ্ড্ করেছে। ও বলে—আপনি সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র।

এ ধারণা ওর কি করে হলো?

আপনার লেখা পড়ে ও বক্তৃতা শুনে বোধহয়। চপল মনে মনে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, বলে—কি আশ্চর্য্য! বক্তৃতা আবার আমি দিলুম কোথায়?

মৃণাল হেসে বলে—তা আপনিই জানেন।

বেলা এধারে বেড়ে উঠেছে অনেকখানি। মৃণাল তাই উঠে পড়লো। চপলের সাথে হ্যাণ্ডসেক্ করে বললে—গুড্-বাই! উইশ ইউ এভরি সাক্সেস্। আমাদের মিলনী আপনার মিলনকাঙ্খী।

করে থাকবে চিরকাল। দেখবেন মাঝে মাঝে বিরহ তার দূর করবার চেষ্টা করবেন।

চপল ওকে বাইরে এগিয়ে দিতে চললো। নমস্কার করে বললে—আসবেন মাঝে মাঝে, গল্প করা যাবে।

মৃণালের মোটর তখন অন্তর্বাষ্পে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

* * *

ভিতরে ফিরে এসে ও আবার বসে পড়লো টেবিলে। বইখানা মুড়ে গেছে, আর তারই ওপর চায়ের কাপ বসানো। নিজেই কখন ও বসিয়ে রেখেছে খেয়াল নেই। কাপটাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে ও বইটাকে তুলে নিলে মুছবার জন্য। আহা কি বিশ্রীই হয়ে গেছে মলাটটা। বইটাকে আদর করে বললে—লক্ষ্মী সোনা রাগ ক'র না। তোমার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছি অজান্তে কলঙ্কের ছাপ, সে শুধু বাইরে। তোমার অন্তর সম্পদ কোন কালে ম্রিয়মান করতে পারবে না কেউ কোন কালেই না, হাজার কালির ছাপ লাগাবার চেষ্টা করলেও। সেখানে তুমি চির-উজ্জ্বল। বইটাকে নামিয়ে রেখে ও কাগজ পত্র গুলো ঠিক করে রাখতে লাগলো। হঠাৎ ওর চোখ পড়লো একটুকরো কাগজের ওপর। কাল রাত্রে বাড়ী ফিরে, কখন এই টুকরো কাগজটার ওপর কালির এই রেখাগুলো ও টেনে গেছে তা ওর নিজেরই মনে হচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য চপল লিখে রেখেছে মীরা সেনের নাম বারবার? ও ভেবেই পায় না, এ কি ক'রে সম্ভব হ'লো। সারা কাগজটাময় ওই কটা অক্ষরই লিখে গেছে। নাঃ, ওর বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটেছিল কাল। হঠাৎ ওর মুখখানা শুকিয়ে গেল। তা'হলে মৃণাল বাবুও তো দেখেছে—এই কীর্ত্তি! এঃ কি ভাববে দেখতো! মহা মুস্কিলেই ওকে ফেলেছে ওই সামান্য একটা মেয়ে। কেনই বা গেল ও তার সাথে আলাপ করতে। সামান্য দু'চারটে কথা বলে তো দিতে পারতো বিদায়। তাহলে তো আজকে ওর এই অসম্মান হতো না। তাই কি মৃণালবাবু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলো মীরার কথা! 'মীরাকে আপনার, কেমন লাগে?' —ছাই লাগে। কত মেয়েকে দিলে ও স্বেচ্ছায় বিদায়, আর সামান্য মীরা সেন। কিই বা আছে তার ভেতরে, মুগ্ধ হবার মত! মাত্র একদিনের আলাপ বইতো নয়!

ও শক্ত হয়ে বসে।

নিশ্চয়ই প্রীতি মজুমদারের মত মীরা সেনকেও ও দেখিয়ে দেবে কঠিন উপেক্ষা। 'কিন্তু', ও ভাবে, 'প্রীতি মজুমদার বা কল্যাণীর মত মীরা সেন হ্যাংলা নাও তো হতে পারে!' তাহলে? উপেক্ষা দেখাবে ও কাকে? ওর মনে যেন ধাক্কা লাগে। নাঃ, ওর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

মৃণাল বাবু নিশ্চয়ই দেখেছে, আর তাই জিজ্ঞাসা করেছে ও কথা। ঠিক তাই-ই হবে। না,তাই বা হবে কেন? —ও ভাবে। না দেখে থাকতেও তো পারে—সামান্য একটা টুকরো কাগজ। কাগজটা ছিল যে বইটার নীচে। বইটা তো নাড়ায়নি, লেখার খাতাটাই নিয়েছে টেনে। সেটা তো ওই ওখানেই রয়েছে পড়ে। ঠিকই পায়নি তাহলে দেখতে—ও নিজের মনকে প্রবোধ দেয়। মীরা চেয়েছিল আলাপ করতে তাই হয়তো সাধারণ এই প্রসঙ্গ উঠানো। আর মৃণাল বাবুরই হয়তো আছে একটু দুর্ব্বলতা মীরা সেন সম্বন্ধে। তাওতো হতে পারে? পক্ষান্তরে যাচাই করে নিচ্ছিলেন হয়তো ভালবাসার নিধির কদর।

চপল খানিকটা আশ্বস্ত হয়। টেবিল থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে, শত খণ্ড করে জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়।

(ক্রমশঃ)

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্ত্তী

গত সংখ্যায় আমাদের কথা ছিল যে, আসছে সংখ্যায় অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যায় আমাদের আর্থিক সমস্তার দিকে যথাসাধ্য নজর রেখে এমন একটা খাদ্য তালিকা প্রকাশ করা হবে (অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে) যাতে আমাদের এই আধুনিক ক্ষয়মুখ স্বাস্থ্য শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় সাহায্য করবে। অবশ্য আমার মনে হয়, অনেকে হয়তো আমার কথা বিশ্বাস নাও করতে পারেন। কারণ—আমি কোথাকার কে, আপনাদের খাদ্য তালিকা নির্ণয় করতে চলেছি—আপনারা আমার কথার বাধ্য কিনা? আমাদের এত অধঃপতন কেন? তার মুখ্য কারণ, যদি বিশ্বাস করেন, তবে বলি এর একমাত্র কারণ, আমরা আজ নিজেরাই হয়েছি—কথায় বলে "মোড়ল", যাহা সাধারণতঃ চক্ষে পড়ে। কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে কি এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা সংসারের কোন বাধাই মানবেনা। অবশ্য যে বাধা যোগাবে তাদের শক্তি, যে বাধা আনবে তাদের চলার পথে প্রেরণা, যে বাধা তাদের শিক্ষা দিবে সংস্কার ও লোকাচার মানতে। যদি কেহ সংস্কারের বাহিরে গিয়ে থাকেন বা যাবার পথ খুজে বেড়াচ্ছেন অথবা কেউ পা ফেলেছেন, তাদের আমার বলার কিছুই নেই—কেননা তারা স্বাধীন বলে তাদের গৌরব বজায় রাখবেন। মেয়ে মানুষের স্বাধীনতা যে কোন কালে ছিল না, বর্ত্তমানে নেই ও ভবিষ্যতে আসবেনা—সে কথায় কেউ কান দেন কি? তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে—এই স্ত্রী জাতির শক্তি, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, শাসন, সংস্কার ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ার সাহায্য না নিয়ে কোন দিন কোন জাতির মুক্তি ঘটে নাই, ঘটবে না। কিন্তু আমরাই যদি আমাদের কর্ত্তব্য ভুলে যাই, আমরাই যদি হই দেশের অমঙ্গল তবে জাতির মঙ্গল স্বপ্নেও ভাবা কঠিন। আজকালকার মা-বোনেদের সংস্কারই বলুন, আর লোকাচারই বলুন—এরা রেস্তরায় বসে নানান ধরণের জিনিষ খেয়ে আসেন—কিন্তু এটার পক্ষপাতিত্ব কজনে করেন আর কজনে করেন না, তার হিসাব বোধহয় কেহই রাখেন না, আমার যতদূর বিশ্বাস। আমার কথার প্রতিবাদ করে হয়তো কেহ বা বলতে পারেন, আমাদের পোষায় তাই খাই। তখন অতি বড় তার্কিককেও চুপ থাকতে হয়। কেন না, যে জন মুখ বুজে থাকে তার শত্রু খুবই কম। সুতরাং বেশী দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে, (অবশ্য ভালর জন্যেই) নিজে মন্দের ভাগী কেন হই। যাক্ সে সব, এখন আমি যা আপনাদের জানাবো বলেছিলাম তাহা পর পর বলছি।

১। প্রথমতঃ আমাদের সকাল বেলার চা পানটা বন্ধ করা।

সকালের শুধু চা অথবা পাউরুটি বিস্কুটের সঙ্গে চা পানে আমাদের শরীরের অবস্থা যার মতে যাহাই হোক না কেন, আমি নিজে দেখেছি খিদে একদম মরে যায়। যে মেয়ে সকালে চা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, দশটার সময় তার খিদের জ্বালায় সে অস্থির হোয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, যারা সকালে নিয়মিত চা না খান, তাদের শরীর যে চা-পায়ীদের চাইতে লাবণ্যসম্পন্ন তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। চা পান বন্ধ করে আমার মতে সে স্থলে সম্ভবপর হোলে দুধ এবং না হোলে কিছু জলখাবার যেমন লাল বা
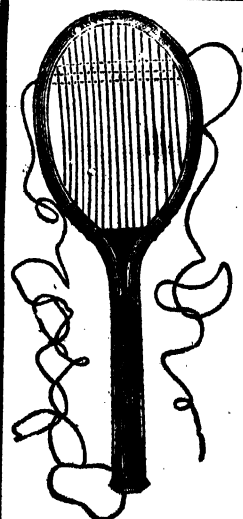
সাদা আটার পরোটা বা রুটি আখের গুড় বা পাটালী দিয়ে বা অন্য কিছু মিষ্টির সঙ্গে জলযোগ করা। অবশ্য এইখানে আমি এও বলছি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় যে ডাক্তারী তালিকায় প্রাতঃকালের খাদ্য দেওয়া ছিল তাও আমাদের সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অনুকরণযোগ্য হওয়া অসম্ভব নয়, যথা—কিঞ্চিৎ মুড়ি. নারিকেল এবং অঙ্কুরিত ছোলা ভিজান। এইখানে আর একটা কথাও বলতে হবে। অনেকেরই সকালে চা পান না নেশায়, না অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে; তারা ভাবেন এই নেশার নাগপাশ কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমার মনে হয় এদের এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি: প্রায় পনের বছরের চা পানের অভ্যাস থেকে একজন লোক নিস্তার পেয়েছেন চায়ের জায়গায় সকালে মাত্র এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে। এই ব্যক্তি নিজে বলেন, সকালে গলাটা শুকিয়ে থাকে কিনা তাই চায়ের কাপে জল নিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে নিতে আর চা খেলুম না বলে কোন আপশোষ থাকে না। এইবার আমাদের গৃহস্থের দিক থেকে চা পান বন্ধ করলে এবং সেস্থলে সামান্য দুধ বা অন্য জল খাবারের বন্দোবস্তে কি খরচ দাঁড়াবে দেখা যাক। আমি দেখেছি চার কাপ চা আর তার সঙ্গে পাউরুটি বা খান চারেক করে বিস্কুট খরচ হোলে মাসিক খুব কমপক্ষে পনের টাকার কমে নিস্তার পাওয়া যায় না। অথচ সেই টাকাতে যে অনায়াসে সকালের অন্য কিছু জল খাবার (যা যা উপরে বলে গেছি) আমরা খেতে পারি তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কাজেই সকালের এই চা পান বন্ধ করলে আমার মনে হয় আর্থিক দিক দিয়ে না হোক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে আমরা অধিকতর লাভবান হোতে পারবো।

২। দুপুরে আমরা যে ডাল ভাত খাই তাই যথেষ্ট। তবে এটাও ঠিক শুধু আলু পটল বা বেগুন কপি না খেয়ে কিছু কিছু শাকপাতা আর যে সময়ের যা, যেমন শীতের সময়ে মূলো, গাজর, শালগম, ওলকপি, কড়াইশুটি ইত্যাদি খাওয়া উচিত। আর এই জিনিষগুলি যাতে পুরোমাত্রায় সিদ্ধ হয়, তার ওপরেও নজর রাখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আর ডালের মধ্যে মুগ, অড়হর, মুসুর এইগুলো বেশী করে খাওয়া উচিত। ঝোলের পরিমাণটা কম করাই উচিত। আর সাধারণ তরকারীতে মশলার পরিমাণ. বিশেষ করে লঙ্কার ঝালের পরিমাণ যথা সম্ভব কম করাই উচিত।

৩। বিকেলে, যারা অনেক বেলায় খান এই সময়ে তারা চা ছাড়া অন্য কিছু খান না। কারণ বেলায় খাওয়ার দরুণ তারা সন্ধ্যার আগে কাপড় কাচেন না। কিন্তু আমার মতে এই সন্ধ্যের পর কাপড় কেচে চা খাওয়ার মতন শরীরের অপকারী কাজ খুব কম আছে। কারণ দিনের আলোয় কাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয় আর গা-য়ে জল বসতে পায় না। কিন্তু সন্ধ্যের পর কাপড় কাঁচায় প্রথমতঃ কাপড় রাত্রে ভালো করে শুকোয় না আর দ্বিতীয়তঃ হোচ্ছে গায়ে জল বসে শ্লেষ্মা সর্দ্দি ইত্যাদি হোয়ে মাথা-ধরা ইত্যাদি হয়। সন্ধ্যের আগে কাপড় কেচে চা না খেয়ে সামান্য পরিমাণে হালুয়া বা অন্য কোন রকম খাবার যদি আমরা বাড়ীতে তৈয়ারী করে খাই. তা হোলে আর কিছু হোক না হোক স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ভাল হবে তাতে কোন সংশয় নাই। আর বিকেলবেলা যথাসাধ্য আমাদের কিছু ফলমূল খাওয়া উচিত। এই ফলমূল খাওয়াটা আমাদের বাংলা দেশের মত ফলপ্রসূ দেশে মোটেই অসম্ভব বা ব্যয় সাধ্য নয়। সামান্য কলা শশা থেকে আরম্ভ করে সময়ের ফল হিসেবে জাম, জামরুল, আম, আনারস ইত্যাদি আমরা অনায়াসে খেতে পারি।

৪। রাত্রিতে ভাত বন্ধ করে রুটি খাওয়াই উচিত। যদিও আমরা "ভেতো বাঙালী", তবুও আজকালকার কলে ছাটা চালে যে কিছু সারবান পদার্থ থাকে না বা পাওয়া যায় না, তা অভিজ্ঞ ডাক্তারেরা বলে আসছেন ও মনে হয় যতদিন এই সমস্যার কোনও অনুকূল ব্যবস্থা না হয় ততদিন বলে থাকবেন। আর এই রুটি খেতে হলে আমার মনে হয় সাদা আটার চেয়ে লাল আটাই বেশী উপকারী হবে।

৫। এইবার আমি এমন একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি যার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নাই—তা হচ্ছে দুধ ও মাছ। এই দুটী ব্যয় বহুল ও সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে প্রতিদিন এর পেছনে পয়সা খরচ করা সহজ ব্যাপার নয়। এই বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করবো। আপনাদের মতামত জানালে বাধিত হব।

কথা-চিত্রের ভূমিকাগুলিকে রূপ দিয়েছেন সাবিত্রী, দেববালা, ছায়া, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, রবি রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, সুশীল রায়, মৃণাল ঘোষ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জানকী ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

জীবিত অবস্থায় মরা

সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই মানুষ যখন প্রকৃতির ক্রোড়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন রোগ বলিয়া কোন শত্রু যে এ জগতে আছে, তাহা তাহাদের জানা ছিল না। প্রকৃতি-মাতা নিজে সকলের লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন, তাহাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রাকৃতির আবেষ্টন হইতে পুরাতনকে বহুদূরে রাখিয়া বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম আবর্ত্তনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। অস্বাভাবিক জীবন ধারণের ফলে নানা প্রকার রোগবীজাণু শরীরে প্রবেশের সুযোগ পাইল। মানুষ বহু-পূর্ব্বাবস্থা ভুলিয়া গিয়া বিভিন্ন সঙ্কটা-কীর্ণ পথে চলিতে চলিতে অধুনা শীর্ণঅবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এখন দেখা যায় তাহাদের দেহে শক্তি নাই, শরীরে বল নাই, চক্ষুতে সে দীপ্তি নাই, প্রাণে সে অদম্য স্ফূর্ত্তি নাই, কাজ-কর্ম্মে তেমন স্পৃহা নাই, মাংশপেশী শিথিল, স্নায়ু দুর্ব্বল, রক্ত দূষিত। প্রত্যেক বেদনা-যুক্ত পদক্ষেপে সে প্রাণভরা জীবনীশক্তির অভাব অনুভূত হয়। বাতে পঙ্গু, না হয় কটি বেদনায় সঙ্কুচিত, আর না হয় মাথা বা দন্তের অসহ্য বেদনায় আড়ষ্ট। এ ভাবে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বহু নরনারী, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর কষ্টভোগ করিতেছেন। ইহাতে দেহের অপরিসীম কষ্টতো আছেই তদ্ব্যতীত মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিও ঘটে। আধুনিক যুগে এ সমস্ত কষ্টকর অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রচি কোম্পানীর বহুবৎসর গবেষণার পর নিরাপদ অথচ কার্য্যকরী বেদনা নাশক **সারিডন** আবিষ্কার করিয়া মানবের বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। **সারিডন** হৃদপিণ্ডের কোন অনিষ্ট করে না, এজন্য সকলেই ইহা নিরাপদে সেবন করিতে পারেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞচিকিৎসক-গণ প্রত্যহ বহু বেদনাপীড়িত রোগীকে ইহার ব্যবস্থা দিতেছেন। আমি বহু রোগীকে বেদনার জন্য ইহা ব্যবস্থা দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

জনৈক চিকিৎসক

ব্যথার-শান্ত্বনা

শ্রীতড়িৎকুমার ঘোষ

আমারি বুকের যতো কথা ছিল
সকলিতো তোমা' জানানো হয়েছে,…তবে-
সুদূরের ঘোলা আঁড়াল টানিয়া
চকিতা হরিণী!…কতদিন্ আর…রবে!
বাধনে তোমায় চাহিনিতো কভু
করিতে মলিন্ প্রিয়া—
চেয়েছি অদূরে হেরিতে তোমারে
সলাজ—কামনা নিয়া;
ভীতা কেন তবে? ওইখানে বসো,
ওই ও' বকুল-ছায়ে,
কুঞ্জের মম শুধু দুটী ফুল্
ঝরুক্ তোমারি গায়ে;—
তারপরে হায় যেথা যেতে চাও
যাইও চলিয়া………
বাধা নাহি আর দিব,
—"আমার ফুলের পরশ নিয়েছ"—
এই উপহার—
অঞ্জলী ভরে নিব;
বিদায়েরি' মেঘ আমার আকাশে
তারপরে ধীরে ঝঞ্ঝা তুলিবে যবে,—
নয়ন-বাদলে বাধিয়া,—বলিব—
"শান্ত্বনা" মোর! বল চিরদিন্ রবে!!
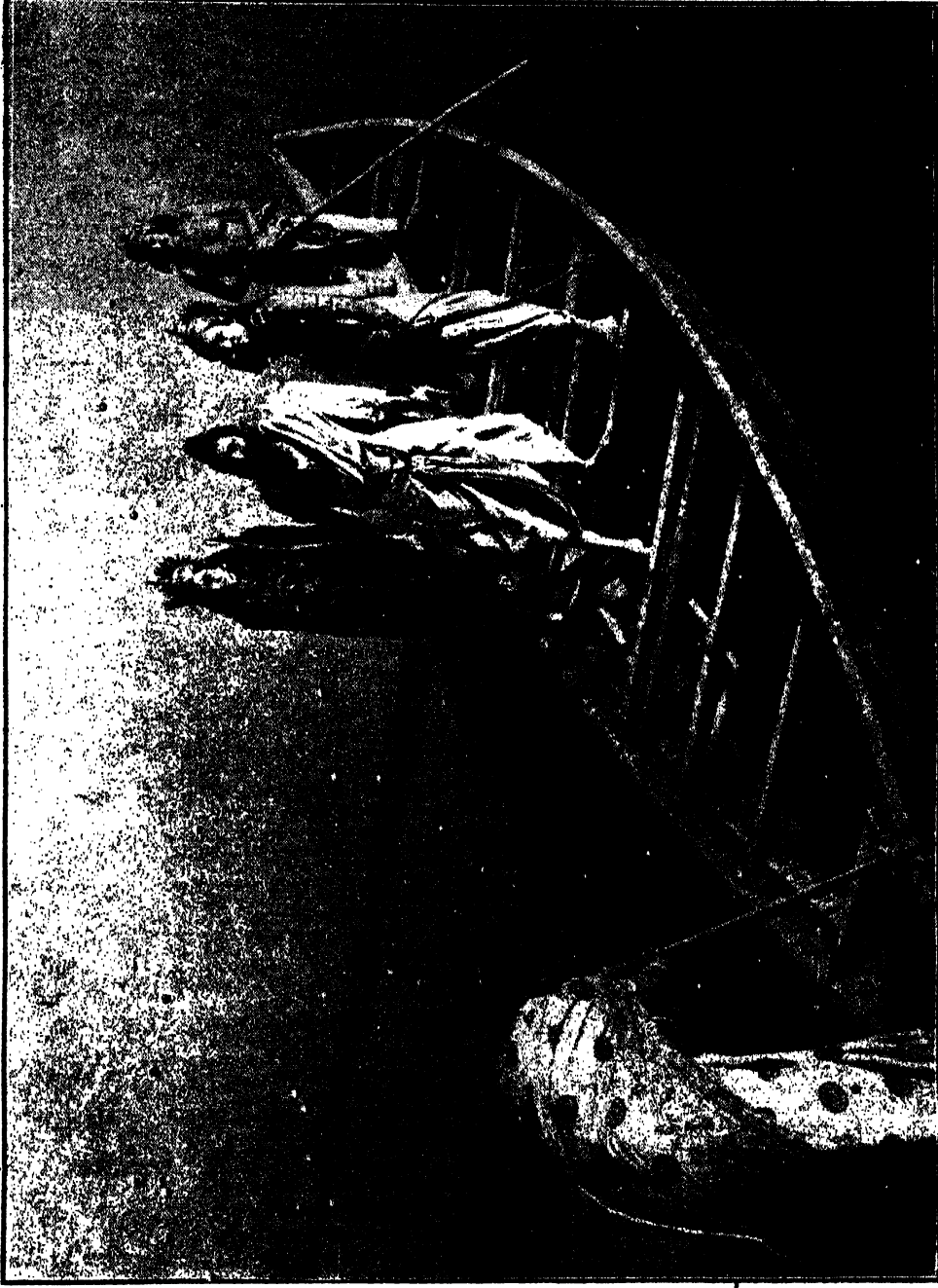
রাধা ফিল্মসের ভক্তি-মূলক বাণী-চিত্র; "জনক-নন্দিনী"-র একটী দৃশ্যে সীতা দেবী, সুশীল রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী ও পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী। ছবিখানা শীঘ্রই রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে।

পরিচালক : ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা

[ফোন—সাউথ ৪৬৬]

অষ্টম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ } ৪৭শ সংখ্যা

খেয়ালী-পোলাও ও আজাদী কোর্ম্মার সংমিশ্রণে নবাবী খানা

গত ৬ই ডিসেম্বরের 'খেয়ালীর পোলাও' শিরোনামায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া মুস্‌লিম বঙ্গের একমাত্র মুখপত্র "আজাদ" বাংলার পতনোন্মুখ মন্ত্রীমণ্ডলের অর্থ-সচীব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বসুভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলনের বিশ্লেষণ-ছলে একাধারে বিদ্রূপ ও ক্রন্দন করিয়াছেন—তবে "খেয়ালী"তে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই! "খেয়ালী"র প্রধান পরিচালক বসু-ভ্রাতৃদ্বয়ের আত্মীয় কিনা সে প্রসঙ্গ অবান্তর হইলেও সহযোগী সেই আত্মীয়তার মশলা সংযোগে "খেয়ালী-পোলাও" রন্ধন করিয়া মুস্‌লিম-বঙ্গে পরিবেশন করিয়াছেন।

শরৎবাবুর সহিত নলিনীবাবুর মিলনের সংবাদ অতর্কিত হইলেও শঙ্কার কোন কারণ নাই, কারণ তাঁহারা বাংলা কংগ্রেসের রক্ত-পঙ্কের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বহু বৎসর একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। দেশের বৃহত্তর কল্যাণকল্পে এখন যদি তাঁহারা সাময়িক বিরোধ ভুলিয়া গিয়া একযোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হন তাহাতে বিস্মিত হইবার কী আছে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রাজনীতি স্থিতিশীল পদার্থ নহে। শরৎ-নলিনীর মিলন-সংবাদ সত্য ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া সহযোগী "আজাদ" গবেষণা করিয়াছেন যে রঞ্জনী-গৃহে নিমন্ত্রণ স্বেচ্ছাকৃত বা আকাঙ্খিত? আর 'শরৎ-নলিনীর এই মিলন নাকি শরৎচন্দ্রের আত্ম-সমর্পণ! রাজনীতিতে Strategy বা কূটনীতি বলিয়া একটা বস্তু আছে, সে জ্ঞান কি বৃদ্ধ মৌলানা সাহেবের নাই? আধ্যাত্মিকতা, স্নেহপ্রবণতা ও মধ্যযুগীয় সত্যাসত্যের আদর্শ শরৎ-চরিত্রের বিশিষ্ট দুর্ব্বলতা—সেই দুর্ব্বলতার রন্ধ্রপথে বাংলা কংগ্রেসে যে শনি প্রবেশ করিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। Bait, Bluff ও Briberyর প্রয়োজন রাজনীতিতে কত বেশী তাহা বোধ হয় সহযোগী 'আজাদ' নিজেই স্বীকার করিবেন—কারণ এই বিষয়ে তাঁহার 'অধুনা-লব্ধ জ্ঞান আমাদের অপেক্ষা কম নহে।

বহু-নিন্দিত ও বহু-ধিকৃত নলিনীবাবুকে বাংলার রাজনীতিতে "অপরিহার্য্য শক্তিশালী ও কৌশলী" ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করায় সহযোগী 'আজাদ' আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। সত্য কি তাহা নহে—ইহা না হইলে তাঁহাকে গোষ্ঠি-ছিন্ন হইতে দেখিয়া সহযোগী 'আজাদ' আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছেন কেন আর অপর পক্ষে কংগ্রেস-

কর্ত্তৃপক্ষও বা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন কেন? আর নলিনীবাবুকে কিরূপ প্রতিকূল ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া রাজনীতিক জীবন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে হইয়াছে তাহা সহযোগী 'আজাদ' অপেক্ষা আমরা অধিক সংবাদ জানি। সুতরাং তাঁহাকে অশেষ ভাগ্যবান ও অপরিহার্য্য কৌশলী ও শক্তিশালী পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও বঙ্গাধীপ শরৎচন্দ্র যদি তাঁহাকে অপরিহার্য্য জ্ঞানে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তখন 'অন্যে পরে কা কথা'?

বাংলার সংবাদপত্র মহলে যখন কেহই সংমিশ্রিত কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করিতে সক্ষম হন নাই তখন "খেয়ালী"ই সর্ব্বপ্রথমে এই সংবাদ লোক-লোচনের গোচর করিলে অনেকেই ইহাকে বিদ্বেষ-প্রসূত, অলীক প্রভৃতি আপ্যায়নে আমাদিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন—আমাদের সেই শুভানুধ্যায়ীরা আজ নিরব কেন? শরৎ-নলিনীর মিলন-বার্ত্তা "খেয়ালী"তেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এবং তৎপরেই সহযোগী "আজাদ" 'গেল রাজ্য গেল মান' রব তুলিয়া 'খেয়ালী-পোলাও' বিতরণ করিয়াছেন!

লাহোরে রাষ্ট্রপতি যাহা অর্দ্ধস্ফুটভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন ওয়ার্দ্ধায় তিনি তাহা স্পষ্টভাবে ও নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন: বাংলার মন্ত্রীর পতন হইবেই! সাধু সংবাদ!! অতঃপর বৃদ্ধ মৌলানা সাহেবকে অসহযোগ আন্দোলন বা তৎপূর্ব্বকার যুগের বক্তৃতা ও রচনাগুলিকে পালিশ করিয়া সময়োপযোগী করিয়া লইতে দেখিলেও বিস্মিত হইব না!! আমরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলাম!

মোহিতলালের চুম্বন বিলাস

সত্য ও সুন্দরের সেবক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার—অগ্রহায়ণের শনির চিঠিতে কবিতা লিখিয়া পঞ্চাশপার মনের আকুতি ও কাকুতি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুনিতেছি, আগামী বড়দিনের সময় রমনার মাঠে যে চুম্বন-জয়ন্তীর আসর বসিবে, তাহাতে এই কবিতাটি চুম্বনের উদ্বোধন হিসাবে পঠিত হইবে। শ্রীকবি লিখিয়াছেন:

"তা' ব'লে ভেবো না, কম ক'রে চাই
আমার পূর্ণ-সুখ—
চুমাটি বাড়ায়ে থেমে যাব আমি তখনি
অর্দ্ধ পথে!
আমি শুধু চাই, তেমন সময়ে ফিরাবে না
বটে মুখ,
বলিবে তবুও—"আহা ও কি কর? হবে
না সে কোন মতে!"

কবি মোহিতলাল বুড়াবয়সে দুর্জ্জয় 'বাসনা' ধরিয়াছেন। শুনিয়াছি বুড়া বয়সে মনের কামনার সহিত দেহের কামনা সমানভাবে বাজি জিতিবার জন্যে দৌড়াইতে পারে না, এবং এই জন্যই বোধ করি শ্রীকবি কার্ত্তিকের শনির চিঠিতে তাঁহার "পঞ্চাশত্তম জন্মদিনের" কবিতায় হতাশ হইয়া লিখিয়াছিলেন—

"সেইদিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল
গোধূলি বেলা;
দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর
রাতে!"

'প্রথম-প্রহর' রাতে দেউল-দুয়ার বন্ধ হইলে এই কবি-নেউলের "চুমাটি বাড়ায়ে" যে কি অবস্থা হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের বেপথু হইতেছে। তথাপি "পূর্ণসুখ", "অর্দ্ধপথে" "হবে না সে কোন মতে"-র "সে" কথাটি আরও করুণ রসাত্মক করিয়া পরিস্ফুট করিতে পারিলে কবি মানসীর হয়ত দয়া হইতে পারে। অতএব শ্রীকবি হতাশ হইবেন না, দুই নম্বর কবিতা লিখিয়া কথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলুন।

'হত্যা'-দান ও প্রত্যাদেশ

একদা শনি-বাহনেরা সরস্বতী মন্দিরে 'হত্যা' দিয়াছিল। দিনের পর দিন 'হত্যা' দেওয়া চলিতে লাগিল কিন্তু তথাপি মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কৃপা পরবশ হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। শনি-বাহনেরা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষে দেবীর প্রত্যাদেশ বাণী ধ্বনিত হইল "রে শনি-বাহনগণ, তোমরা আমার পবিত্র মন্দির কলুষিত করিও না, দূরে অপসরণ কর। আমার এই শুভ্রবরণ সুশুভ্র আসন, তোমাদের মলিনতা পঙ্কিল অসিত বর্ণ সহ্য করিতে পারিতেছে না। তোমাদের স্থূল নাসা, ক্ষুদ্র চক্ষু, রুক্ষ স্বভাব, কর্কশ কণ্ঠ ও কুৎসিত প্রকৃতি আমার সবিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের অন্তরের চিত্র অধিকতর ভয়াবহ। তোমরা পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, অযথা পর ছিদ্রান্বেষী, গুরুলঘুজ্ঞান বিবর্জ্জিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন, কুটীল ও কোপন স্বভাব। তোমাদের বিদ্যার পরিধি আমার অজ্ঞাত নহে, তথাপি তোমরা গর্দ্দভের ন্যায় সেই বিদ্যা স্কন্ধে লইয়া মাঠময় করিয়া বেড়াইতেছ। চীনাবাজারে ইংরাজি বিদ্যা সুমাপ্ত করিয়া তোমরা আমার প্রিয় পুত্রগণের ইংরাজি লেখার ভুল ধরিতে অতি মাত্রায় নিপুণ হইয়া উঠিয়াছ—তোমাদের লজ্জা থাকিলে অন্ততঃ তোমাদের ইংরেজি ভাষা জ্ঞানের বড়াইটুকু করিতে না। তোমরা আমার প্রিয় অধ্যাপক-গণকে অতি ইতর ভাষায় গালাগালি দিয়া থাক। আর কেহ ইতিহাস চর্চ্চা করিবে, আর কেহ আমার যথার্থ সেবা করিয়া ধন্য হইবে, তাহা তোমরা সহ্য করিতে পার না। সাহিত্য সেবায় কেহ অপরের সুখ্যাতি করিবে ইহা তোমাদের কর্ণশূল। অতএব রে শনির দুষ্ট অনুচরগণ, দুষ্টা সরস্বতী নামে আমার যে অবিদ্যামূর্ত্তি আছে, তোমরা তাহারই উপাসনা করিয়া দিন দিন মোহগ্রস্ত হইতে থাক—আমার মন্দির আর অপবিত্র করিও না।" প্রত্যাদেশ বাণী নীরব হইলে শনিবাহনেরা গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া মন্দির মধ্য হইতে ম্লানমুখে নিষ্ক্রান্ত হইল। সহসা দুষ্টা সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বৎসগণ, তোমরা আমাকে অবহেলা করিয়া এ মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহিতেছ কেন? বহুকাল ধরিয়া আমি যে তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছি, তাহার কি এই প্রতিদান? বহু গ্রন্থাগারে তোমাদের স্থূল হস্তাবলেপের দ্বারা সরস্বতীর অবমাননা করিতে কে তোমাদের শিখাইল? দুই-পয়সার কুচাচিঙড়ী বাজার হাতে করিয়া বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের বাড়ী বাড়ী যখন তোমরা 'পেটিলি' করিয়া

বেড়াইতে, তখন তোমাদের স্কন্ধে কে ভর করিয়াছিল ? বহুলোকের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সাধনা আত্মসাৎ করিবার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী কে তোমাদের শিখাইয়া দিয়াছে ? তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমরা এই মন্দিরের উপাধ্যক্ষকে এবং এই মন্দিরের বরপুত্রগণকে আরও সজোরে গালাগালি দিতে থাক। ইহাতেই তোমরা বড় হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তোমাদের করিয়া খাইতে না হয়, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব।" তদবধি শনিবাহনেরা আত্মসম্বিৎ পূর্ণলাভ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে ছষ্টা সরস্বতীর উপদেশবাণী সফল করিতেছে।

জারজ সন্তানের কাহিনী

অগ্রহায়ণের শনির কাগজখানায় "বাংলা রঙ্গমঞ্চ" নামক প্রবন্ধে জনৈক বি-নামা লেখক লিখিয়াছে—"বাংলা থিয়েটার যাত্রা-গীতির জারজ সন্তান ; যাত্রা ও সার্কাসের সঙ্গমে এর উৎপত্তি ; ভদ্র সমাজে নাম ভাড়াইয়া নাট্যশিল্প নামে এ পরিচয় দিয়া থাকে। বাংলা নাট্যশিল্পের (সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যার অভিনয় হইয়া থাকে) আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক পিতৃ পরিচয় অত্যন্ত উগ্রভাবে স্পষ্ট।" "বাংলা নাট্যশিল্পের" পিতৃ পরিচয় যাহাই হউক, উদ্ধৃত লেখাটির "সঙ্গম"-সিক্ত ভাষার ভিতর দিয়া লেখকের আকৃতি ও প্রকৃতির যে পরিচয় উঁকি মারিতেছে, তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে। ইহার পরেই, লেখক পুনশ্চ লিখিয়াছেন—"কলিকাতা সহরে এখন বড় জোর ছুইটি মাত্র থিয়েটার চলিতে পারে। একটিতে যাত্রা-গীতির জারজ সন্তান নাটক চলিবে।" কিন্তু শনি জগতের একমাত্র পরমাণিক "চটি বই" (এই অদ্ভুত বিশেষণটি শনি-জগতেরই দান), যাহার পাতা না উল্টাইলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় কোনও গবেষণামূলক লেখাই সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাতে যে উহার উল্টা কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ বিড়ম্বিত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" নামক "চটি বই" খানির নবম পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।" শনির দলের বি-নামা লেখক শনির দলের অন্যতম নামী লেখকের মূল্যবান গবেষণা যে এতদিন পরে এমন করিয়া উল্টাইয়া দিবেন, তাহা কে জানিত ? কিন্তু আমাদের পক্ষে "এক ভস্ম, এক ছার, দোষ গুণ ক'বকার ?" "বাংলা রঙ্গমঞ্চে"র বি-নামা লেখকটির বাঙ্গলা থিয়েটার দর্শনের দৌড় বোধ করি ভাদুড়ী কোম্পানীর থিয়েটার দেখা হইতে আরম্ভ করিয়া "স্বামী-ইস্ত্রি", "বাংলার বোমা" প্রভৃতি ভাল ভাল আধুনিক নাটকের অভিনয় দর্শন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি কাল হইতে 'প্রাক্ ভাদুড়ীযুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা থিয়েটারের ইতিহাস ইহার কাছে অজ্ঞাত। এখনকার তরুণদের দেখিয়া যদি কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালীর আকৃতি ও প্রকৃতির পরিচয় পাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার এইরূপ দৃষ্টি-বিপর্য্যয় অনিবার্য্য। এই শ্রেণীর লেখকদের কাছে মহাকবি গিরিশচন্দ্র "আধা ভাড়, আধা ভক্ত" নামে পরিচিত। কাজেই বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের জন্মদাতা পিতা গিরিশচন্দ্রের নাম "বাংলা রঙ্গমঞ্চে"র বিনামা লেখকের লেখায় স্থান পাইবে কেন ? ইহারা Prince of Denmarkকে বাদ দিয়া Hamlet দেখিয়াই খুসী। ইহাদের কাছে, গিরিশচন্দ্রের নাট্য প্রতিভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই আমরা লজ্জা বোধ করি ; অতএব সে বিষয়ে নিরস্ত রহিলাম। আর, বিশ্বকোষ অবলম্বন করিয়া যে বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের উদ্ভব, তাহার সম্বন্ধেও এতকাল পরে নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। গিরিশ-বিদ্বেষ যে রচনার "অষ্টেপৃষ্টে" মাখানো রহিয়াছে, সে রচনা বঙ্গীয় নাট্যানুরাগীর পক্ষে অস্পৃশ্য বস্তু। এই গিরিশ-বিদ্বেষের মূল উৎস কোথায় এবং কি কারণ-সঞ্জাত তাহাও কাহারও অবিদিত নহে। শুধু একটি মাত্র কথা ইহাদের বলা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দু স্মৃতিসভায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যখন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশ্বকোষের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছিলেন এবং যাহার উত্তরে apology করিয়া স্বয়ং বিশ্বকোষকার পরবর্ত্তী সংস্করণে ভ্রান্ত গিরিশ-বিদ্বেষের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং যে ঘটনার বহু সাক্ষী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সে ঘটনার উল্লেখ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত তথা বিশ্বকোষ অবলম্বিত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে" দেখিতে পাই না কেন ? অবশ্য ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ-র তখন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে 'নাবালক' অবস্থা মাত্র এবং বোধকরি তখন তিনি সাহিত্য পরিষদের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইবারও অধিকার পান নাই। তাহা হইলেও স্বয়ং স্বয়ম্ভুর ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ এবং inspired ভাবে যখন তিনি সত্য ইতিহাস রচনার আস্থা করিয়া থাকেন, তখন ঐরূপ একটা জলন্ত সত্য ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা জাগ্রত হইল না কেন ? হায় রে ইতিহাস ! এবং সেই ইতিহাস রচনার জন্য ইহাদের বাহ্বাস্ফোটের আর অন্ত নাই ! কিন্তু আমরা শুধু ভাবিতেছি জারজ সন্তানের ইতিহাস রচনার জন্য এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা এতটা মাথার গোবর খরচ করিতেছেন কেন ?

(বিলাসী)

বড়দিদি

সুরেনের সাধ্বী-স্ত্রী 'শান্তি'-র অন্তরে সুখ নেই।

তার স্বামী আজ চারদিন বাড়ী ছাড়া শান্তি খবর পেয়েচে, ইয়ার-বন্ধুদের প্ররোচনায় সুরেন আজ বাগান-বাড়ীতে আবদ্ধ। এদিকে তার কুচক্রী ম্যানেজার মথুরবাবু দিচ্ছেন ইন্ধন। স্বামীর কাছে শান্তি লোক পাঠাতে কসুর করেনি। কিন্তু মথুরবাবুর চক্রান্তে কোন খবরই সুরেনের কাণ পর্য্যন্ত পৌঁচুচ্ছে না

মনের দুর্ণিবার বেদনা নিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত এই অবস্থার প্রতিকারের আশায়, শান্তি তার অন্তঃপুর ছেড়ে নিজেই কাচারী বাড়ীতে নেমে এলো। তখন আর হিতাহিত বিবেচনা করবার মত মনের অবস্থা তার নয়।

উপরের এই দৃশ্যটি এই সপ্তাহে মল্লিক মশাই তুলছেন। ম্যানেজার মথুরবাবুর সঙ্গে শান্তির বোঝা-পড়া এবং তার শেষ পরিণতি কী ঘটলো, আপনারা যথাসময়ে ছবির পর্দ্দায় তার পরিচয় পাবেন। আপাততঃ আমরা এই পর্য্যন্ত বোলতে পারি—শান্তির ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী এবং জমিদারের কুচক্রী ম্যানেজার মথুরবাবুর ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় কোরছেন।

উপরের কাচারী-বাড়ীর দৃশ্যে আর দুটি জনপ্রিয় শিল্পীকে দুটি বিশিষ্ট টাইপ-ভূমিকায় দেখতে পাবেন। এদের দুজনকেই আপনারা বিশেষভাবে চেনেন—অহী সান্যাল এবং সত্য মুখোপাধ্যায়

সাপুড়ে

এঁদের দু'নম্বর ষ্টুডিওতে, ছবির মত নয়নাভিরাম একটি সেটে, সুন্দর অভিনয় কোরছেন—শ্রীমতী কানন। এর সঙ্গে আছেন সাপুড়েদের ওস্তাদ মনোরঞ্জন বাবু।

মুক্তোর মত জলের ধারা বইচে আজ কাননের চোখে।

সবাই শুধোয়—কেন? কিসের এর বেদনা?

সাপুড়েদের বস্তীতে মানুষ হ'য়েচে এই মেয়েটি। তাদের সুখ-দুঃখের নিত্য-সঙ্গী। এতদিন পর কী এমন ঘটনা ঘটলো—কে দিল তার ফুলের মত কোমল অন্তরে বেদনা?

কানন সেদিন এই দৃশ্যটির অভিনয়কালে অন্তরের উচ্ছ্বাসে এতখানি অধীর হোয়ে পড়েছিল যে তার চোখের জল, সেটের উপর উপস্থিত সকলেরই অন্তর স্পর্শ না কোরে পারেনি। এমনি চমৎকার, এমনি প্রাণস্পর্শী, এমনি স্বাভাবিক তার অভিনয়! আর কাননের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে, তেমনি প্রাণস্পর্শী অভিনয় কোরছেন সুবিখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

ধন্য দেবকী বাবুর অভিনয়-শিক্ষা আর ধন্য এদের সাধনা।

দুষমন (হিন্দি)

গত সপ্তাহে রঙ্গ-মঞ্চ দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। এ দৃশ্যের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়ই শ্রীমতী লীলা দেশাইএর নৃত্য ও সায়গলের গান, দুই-ই বেশ উপভোগ্য হয়েছে—শুধু উপভোগ্য নয়, নাটকীয় ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়ে এ দৃশ্যের যথেষ্ট স্বার্থকতা আছে। পরিচালক নীতীন বোস ছবির কাজ অনেকটা শেষ ক'রে এনেছেন।

কপালকুণ্ডলা (হিন্দি)

পরিচালক ফণী মজুমদার কপালকুণ্ডলার উপযোগী বহিদৃশ্য দেখতে ব্যস্ত।

কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া

তিনি এখন তাঁর পরবর্ত্তী চিত্র 'রজত-জয়ন্তী' তোলবার যোগাড় কর্চ্ছেন। আগামী মাসের মাঝামাঝি ছবি তোলা আরম্ভ হবে। প্রথম কেবল বাংলায় তোলা হবে আর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি মুক্তি লাভ ক'রবে বলে শোনা যাচ্ছে। ভূমিকা আর অন্যান্য বিষয় শীঘ্রই জানান হ'বে।

সাথী

আজ থেকে বাংলা 'সাথী' চিত্রা ও নিউ সিনেমা এই উভয় চিত্রগৃহে তৃতীয় সপ্তাহে প'ড়ল। আশ্রয় হীন সহায় হীন একটি ছেলে আর একটি ছোট মেয়ে কেমন ক'রে 'সংসার সমুদ্রে সহস্র প্রতিকুল ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সুখ-দুঃখের মধ্যদিয়ে নিজেদের চালিয়েছে, পরস্পরের সহযোগিতা ও ভালবাসার আশ্রয় করে কেমন এক বিচিত্র আবহাওয়ায় এক অভিনব জীবনের সৃষ্টি করেছে—এগুলি অবলম্বন করেই সাথী এক সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক নৃত্য-গীতময় ছায়াছবির উদ্ভব হয়েছে। দর্শকেরা ছবি দেখে বেরিয়েই এক সমস্যায় পড়েন কে বেশী প্রশংসার যোগ্য? গান কার ভাল—কানন না সায়গল? 'সাথী' প্রয়োগশিল্পী ফণী মজুমদারের প্রথম ছবি কিন্তু তাহলেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ও যশের গৌরব মুকুটের যথার্থ অধিকারী হ'য়েছেন, চিত্রনাট্য

ও গল্পের গতি নিয়ন্ত্রণে তিনি সকলকে মুগ্ধ ক'রেছেন। মঞ্জু (কানন) ও ভুলুয়া (সায়গল) সকলের মনেই রেখা পাত ক'রবে। আশাকরি যারা এখনও ছবিটি দেখেন নি তারা এই সপ্তাহেই দেখবেন ও দেখে পরিতৃপ্ত হবেন।

প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ

বোম্বাইএর হিন্দি ছবি 'জ্বালা' ও 'সাথী'র পূর্ব্ব ভারতের পরিবেশন স্বত্ব এরা পেয়েছেন এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই দিয়েছি। 'জ্বালা' শনিবার ১০ই ডিসেম্বর থেকে গনেশ টকি হাউসে চলছে এ সংবাদও পূর্ব্বে দিয়েছি। এখন শোনা গেল এরা বোম্বাইএর খ্যাতনামা পুরাতন প্রতিষ্ঠান সরোজ ফিল্মসের 'রাইফেল গার্ল', 'মুরাদ' ও 'মস্তানা' এই তিনখানি ছবির পরিবেশন স্বত্বও পেয়েছেন। অবাঙ্গালীর বাঙ্গালায় চিত্র-পরিবেশনের দুর্গে প্রাইমার ন্যায় নিছক বাঙ্গালীর প্রবেশ প্রশংসনীয় ও শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই। কবে দুর্গ প্রাকারের একাধারে তাঁদের বিজয় বৈজয়ন্তী দেখতে পাব এই আশায় আমরা উদগ্রীব হ'য়ে রইলাম।

জনকনন্দিনী

মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অন্যান্য মুনিগণ তাড়কাপুত্র মারীচের অত্যাচারে যজ্ঞ করতে পারেন না—যখনই তাঁরা যজ্ঞব্রতী হন, তখনই মারীচ বহু অনুচর সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটায়। অন্য উপায় না দেখে বিশ্বামিত্র যজ্ঞ-রক্ষার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে রাজা দশরথের কাছ থেকে নিয়ে এলেন। যথারীতি যজ্ঞ আরম্ভ করা হল এবং যথাপূর্ব মারীচও তার দলবল সমেত আকাশ পথে ধেয়ে এলো। মেঘের আড়ালে অবস্থিত রাক্ষসদলের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধ চলল।......'জনক-নন্দিনী' কথা চিত্রের উপরোক্ত অধ্যায়ের চিত্র গ্রহণ এ সপ্তাহে শেষ হ'য়েছে। 'প্রভাস মিলন' ছবির যুদ্ধ দৃশ্য দেখে যাঁরা মুগ্ধ-বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরা শুনে হয়তো আনন্দিত হ'বেন যে "জনক-নন্দিনী" ছবির এই যুদ্ধ দৃশ্য "প্রভাস মিলন" ছবির যুদ্ধ দৃশ্য-পরিচালনা করার গৌরবকে ম্লান ক'রে তুলবে। আগামী সপ্তাহে ছবিখানা শেষ হ'য়ে যাবে।

যখের ধন

মতিমহল থিয়েটার্সের রোমাঞ্চকর বাংলা কথা-চিত্র "যখের ধন-"এর (হেমেন রায়-এর সর্ব্বজন আদৃত উপন্যাসের চিত্রানুবাদ) চিত্র-গ্রহণ পূর্ণ উদ্যমে চ'লেছে। বর্ত্তমানে প্রয়োগ-শিল্পী হরিভঞ্জ রূপনাথ গুহার পথে করালীর অভিযান দৃশ্য তুলতে ব্যস্ত। দৃশ্যটির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় ক'চ্ছেন শ্রীমতী শিশুবালা, অহীন চৌধুরী, রবি রায় প্রভৃতি।

কালী ফিল্মস্

এই প্রতিষ্ঠানের কাজ আবার আরম্ভ হ'ল। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্তে"র প্রাথমিক শূটিং মহাসমারোহে গেল বুধবার সমাধা হ'য়েছে। প্রকাশ যে, এই চিত্রে শিশিরকুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, কঙ্কাবতী, রাণীবালা, উষা দেবী, সাবিত্রী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে আত্মপ্রকাশ কোরবেন। এ ছাড়া শ্রীভারত লক্ষ্মীর সৌজন্যে দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে হয়তো নাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন। ছবি খানির শিল্পনির্দ্দেশনা কোরবেন সুধাংশু চৌধুরী।

এই সঙ্গেই জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের পরিচালনায় আর একখানি ধর্ম্মমূলক ছবির কাজও আরম্ভ হবার কথা হ'চ্ছে। গাঙ্গুলী মশাই তাঁর পুরণো কর্ম্মচারীবৃন্দকে আবার যথারীতি কাজ করবার জন্য আহ্বান কোরে সদাশয়তার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের পুনরুত্থানে সত্যই আজ আনন্দিত।

"খেয়ালী" "বর্ণ-বন্ধ" প্রতিযোগিতা

"খেয়ালী"র আগামী নববর্ষ সংখ্যা হইতে একটি নূতন আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে। নানারূপ নব-নব আকারে অক্ষর সাজাইয়া **"বর্ণ-বন্ধ"** সমস্যার সমাধানের দ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গের চিত্ত ও বিত্ত যাহাতে সমভাবে সমুন্নতি লাভ করে—সেই দিকেই আমরা অতঃপর সচেষ্ট থাকিব। নববর্ষ সংখ্যায় "বর্ণ-বন্ধ" প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী সহ প্রথম সমস্যা প্রকাশিত হইবে।

উত্তরায় খনা

বাঙলার দর্শক মহলে 'খনা' চিত্রের অসামান্য সাফল্যের কথা বোধ করি আর নূতন করিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই। হাজার হাজার দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিয়া 'উত্তরা' চিত্র-গৃহে এই শনিবার হইতে 'খনা' ও 'অভিসারিকা' ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পন করিল।

N. I. P.

সমালোচক ও দর্শক মহলে, 'খনা' যে ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে এবং গত পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া 'উত্তরায়' জনতা আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে এই চিত্রের সাফল্য সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহা ছাড়া মফঃস্বলের বহু সহরে ছবিখানি প্রদর্শিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্রই বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সত্যই সবান্ধবে ও সপরিবারে দেখিবার মত 'খনা' একখানি স্মরণীয় চিত্র।

পূর্ণ থিয়েটার

আজ থেকে 'দেশের মাটি' ৩য় সপ্তাহে প'ড়ল। রসগ্রাহী দক্ষিণ কলিকাতার দর্শকের নিকট দেশের মাটি বেশ প্রিয় হয়েছে। দক্ষিণ কলিকাতায় বড়দিনের বাজার পূর্ণ থিয়েটারই গরম রাখবে ব'লে মনে হয়।

রূপবাণী

'অভিনয়' এখনও বেশ চলছে। অভিনয়ের পরই রাধা ফিল্মের "জনক নন্দিনী" দেখান হবে—তারিখ এখনও ঠিক হয় নি।

আগামী ২২শে ডিসেম্বর খেয়ালীর কোন সংখ্যা বাহির হইবে না। এর পরবর্ত্তী সংখ্যাই হচ্ছে খেয়ালীর নবম বার্ষিক সংখ্যা, ৩০শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হইবে।

খেঃ সঃ

শূন্যপাতা (পত্রিকা)

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা আর্ট পেপারে পরিস্কার ছাপা। স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ও ছাত্রদের মুখপত্র। প্রকাশক ও সম্পাদক শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র রায়।

এরা সকলেই তরুণ কাজেই এদের উদ্যম ও প্রচেষ্টায় যে এরকম ভাল একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত। সকল লেখাই যে অত্যুৎকৃষ্ট হয়েছে একথা বলা চলে না। কিন্তু এই কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আন্তরিক চেষ্টা দ্বারা যতদূর সম্ভবপর, ততদূর ভাল এদের সব লেখাগুলি হয়েছে। লেখাগুলির মধ্যে যেটী সর্ব্বাগ্রে প্রশংসা পাবার যোগ্য তা হচ্ছে সম্পাদক মহাশয়ের রবীন্দ্রনাথের বলাকার সমালোচনা। সমালোচনাটী বেশ উচ্চ শ্রেণীর হয়েছে এবং তুলনায় সব লেখাগুলিকেই ভাবধারায় ও মুন্সীয়ানায় অতিক্রম করেছে। এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা উচ্চধারণা পোষণ করি। অরুণিমা ঘোষ এর কবিতাটী মন্দ নয়।

এদের এই নব প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি এবং এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কেদার নাথ ব্যানার্জ্জি গোল্ড মেডেল

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীপ্রভাত কুমার বসু বি-এলকে উক্ত মেডেল প্রদান করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের শ্রেষ্ঠ আইন ছাত্র হিসাবে এই পদক প্রভাত বসু লাভ করিয়াছেন। আমরা এই উৎসাহী যুবকের ক্রমোন্নতি আশা করি।

বেনিয়াটোলা ক্লাব

গত শনিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ (ইং ১০ই ডিসেম্বর) বেনিয়াটোলা ক্লাবের বাৎসরিক প্রীতিভোজ স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের দমদমস্থিত উদ্যান বাটীতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত বিভূতি দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুধীর ব্যানার্জ্জির সুললিত গান এবং শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ রায়ের তবলা সমাগত সভ্য এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ মুগ্ধ এবং আনন্দ দান করে। অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে স্যার হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্র, ডাক্তার নিতাই চাঁদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জি, মেজর পি, কে, গুপ্ত; শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ পাল, শ্রীযুক্ত পশুপতি ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত শৈল কর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া ক্লাবের সভ্যগণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সাধারণ সম্পাদক মিঃ এ, এন, খান অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি আপ্যায়নে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

এন্টি-টিউবার কিউলসিস ফণ্ড

কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঠিক উত্তরের ময়দানে অটোমোবাইল এসোসিয়েসন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে হিজ ম্যাজেষ্টি দী কি এম্পারাস এন্টি টিউবার-কিউলসিস্ ফণ্ডের সহযোগিতা কল্পে ১৮ই

ডিসেম্বর রবিবার এক বিরাট প্রমোদ উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশ বাইশ হাজার দর্শকের জন্য বিবিধ আসন এবং আমোদ প্রমোদের যে আয়োজন হইয়াছে, তাহার আর তুলনা নাই। টিকিট বেচিয়া যত টাকা পাওয়া যাইবে সে সব টাকা ভারতেশ্বরের এন্টি-টিউবারকিউলসিস্ ফণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

এ উৎসব আমোদ লীলা চার অঙ্কে বিভক্ত। যাঁহাদের প্রাইভেট মটর গাড়ী আছে, ফুলের বিচিত্র সজ্জাভূষণে গাড়ী সাজাইয়া, গাড়ীর মূর্ত্তিকে হংস ময়ূর, সারস, জাহাজ, দুর্গ, পুরী যে কোন দিব্য ও ছদ্ম মূর্ত্তিতে রচিয়া রঙ্গাঙ্গনে আনিবেন। এ জন্য কোনরূপ প্রবেশিকা ফী দিতে হইবে না। যাঁহাদের গাড়ীর সজ্জাভূষণ বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহারা নগদ টাকা পুরস্কার পাইবেন। প্রথম অঙ্কে আরো দুটি প্রমোদ বিভ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশের অতীত গরিমা মহিমা, মাধুরী শৌর্য্য কাব্য পুরাণের কাহিনী সচল ও নিশ্চল মূর্ত্তিতে দেখানো হইবে। তারপর ব্যবসায়ীরা দেখাইবেন তাঁহাদের বিবিধ পণ্য সম্ভারের প্রচার বিজ্ঞাপনীতে রকমারী কারুকলা। সব কয়টি অনুষ্ঠানই প্রতিযোগিতামূলক এবং সকল ব্যাপারেই পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখান যাবে মোটর জিমখানা। এ পর্ব্বে যেমন বিস্ময় বিভ্রম তেমনি কৌতুকের অন্ত থাকিবে না। মোটর চালনাকালে মোটরে দুজন মাত্র থাকিবেন—যিনি মোটর চালাইবেন তিনি এবং তাহার এক মহিলা বান্ধবী। মোটর চালাইতে চালাইতে সঙ্কেত মাত্র মোটর থামাইয়া নামিয়া ময়দানে রক্ষিত চেয়ার অধিকার করা; মহিলা সঙ্গিনীর প্রসারিত হাতে চামচে ধরা ডিমটিকে অক্ষত অটুট রাখিয়া মোটর দৌড় সমাপন। চলন্ত মোটর হইতে ডার্ট বা কাঁটা তীর ছুড়িয়া টার্গেট বিদ্ধ করা, এমনি বহু ক্রীড়া কৌশল দেখান হইবে। এগুলিতেও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। প্রমোদ অনুষ্ঠানগুলিকে সুরঝঙ্কৃত রাখিবে মিলিটারী ব্যাণ্ড তারপর সন্ধ্যা সমাগমে ফ্লাড লাইটে সারা ময়দান আলোয় আলো করা হইবে এবং সে আলোয় কলিকাতার পুলিশ বাহিনী রোমাঞ্চকর বিবিধ ব্যায়াম বিন্যাস লীলা দেখাইবেন। এ খেলার শেষে আতস বাজীর ব্যবস্থা আছে। আতস বাজীতে নূতনত্বের সমাবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আয়োজন যেমন বিরাট এবং বহু বিচিত্র তেমন দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান কল্পে রঙ্গাঙ্গনে যথাযোগ্য ভোজ্য, পানীয় বিক্রয় সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ এতটুকু ত্রুটী রাখেন নাই। সর্ব্ব শ্রেণীর দর্শকের সহযোগিতা লাভের জন্য আসনের মূল্য দশ টাকা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। আশা করি আমোদ প্রমোদ উপভোগের সঙ্গে আর্ত্ত আতুর যক্ষ্মা রোগীদের সেবা পরিচর্য্যা এবং স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা কল্পে সাধারণে এ অনুষ্ঠানটীকে সর্ব্বাংশে সার্থক করিয়া তুলিতে কুণ্ঠিত থাকিবেন না।

শোক সংবাদ

গত ২৫শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় তাহার ২৭নং মহিম হালদার ষ্ট্রীটস্থ বাস ভবনে দেহ ত্যাগ করেছেন। তিনি কালীঘাট মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি এবং কালীঘাট লাইব্রেরীর কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।

তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া তাঁহার কালীঘাটস্থ বাস ভবনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ৫ই ডিসেম্বর তারিখে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইয়া তাঁর মৃত আত্মার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন।

মহিলা মহল

বিভাগীয় সম্পাদিকা—শ্রীমতী সাধনা চক্রবর্ত্তী

গত সপ্তাহের কথা শেষ করেছিলুম, এইবারে মাছ ও দুধের কথা আলোচনা করবো এই আভাস দিয়ে। কিন্তু এইবারে স্থানাভাবে শুধু মাছ নিয়েই আলোচনা করবো। কিন্তু, সত্যি কথা আপনাদের বলতে কি, কি যে বলবো তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না। শরীর শক্ত রাখতে মাছের প্রয়োজনীয়তা কতটা এটা ঠিক ঠিক বলা শক্ত। তবে কারোর কারোর মতে মাছ অপরিহার্য্য, আবার কারোর মতে তেমনই পরিহার্য্য। কিন্তু সমস্যার সমাধান এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, হবে বলেও মনে হয় না। আজকাল প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে গৃহস্থের পোষ্যরা যে কত পরিমানে মাছ প্রত্যহ পায় তা আপনাদের কারোর অজানা নেই। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে ডাক্তারের আদর্শ খাদ্য তালিকায় যে মাছ মাংস খাওয়ার কথা ডাক্তার বলেছেন তার পরিমান হোচ্ছে সকালে আধ পোয়া আর রাত্রিতে আধ পোয়া: অর্থাৎ দুবেলায় এক পোয়া। কিন্তু আজকালকার সহরবাসী চাকুরে অনেক বাঙ্গালীর ঘরে দিনে এক পোয়া টাটকা মাছ আসা হয়েছে কষ্টকর। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে যদি আমি বিমুখ হই তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে দুষতে পারবেন না। তবে আপনারা বলতে পারেন: কেন আমরা আজ মাছ পাই না, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা কি আপনি করতে পারেন না? তাহলে আমাকে কিছু বলতে হবে দেখছি।

আজকাল কোলকাতার বাজারে উপযুক্ত পয়সা দিয়েও যে মনের মত টাটকা মাছ পাওয়া যায় না, তা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। কেন পাই না? এই কেনর উত্তর দেওয়া কিছু মাত্র শক্ত বা সমস্যার বিষয় নয়। যে কারণে আজ বাংলার পল্লীসমূহে ম্যালেরিয়ার বিষে তিলে তিলে শত শত জীবন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, যে কারণে আজ বাংলার কৃষক-কুল প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত ঠিক সেই কারণে আজ বাংলার হাটে বা বাজারে উপযুক্ত পরিমানে মাছ পাওয়া যায় না। বাংলার নদ-নদী সমূহ ক্রমশঃ মরে যাচ্ছে। এই মরা নদ-নদী হোতে যদি আমরা আগের মতন মাছ বিনা আয়াসে পাবো বলে আশা করি, তাহলে যে আমাদের সে আশা পূর্ণ হবে না, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে? যাহারা কোলকাতার বাজারে নিয়মিত ভাবে বাজার করেন, তাদের অনেকেরই মুখে শুনতে পাই, অমুক মাছ আর আজকাল দেখতে পাই না; বা অনেকেই বলেন অমুক মাছ আজকাল বরফে চালান আসে! তার কারণও যে বাংলার নদ-নদী ও জলাশয়ের দুরবস্থা থেকে উৎপন্ন হোয়েছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। অনেকে বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন গত দুই বৎসর যাবৎ কোলকাতায় মাছের চালান আর আগের মত হোচ্ছে না। এর কারণ নির্ণয় করবার জন্তে বাংলা গভর্ণমেণ্ট এক বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেন ও বিশেষজ্ঞের তদন্তের ফলাফলানুযায়ী জানতে পারেন যে আগেকার মত সমুদ্র হোতে বর্ষাকালে ইলিশের বাচ্চা উঠে আসচে না। কেন উঠে না? সে তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন উপস্থিত আমি জানতে চাই, এই ইলিশ মাছের অভাব কিভাবে পূরণ করা যায়? আর সেই জন্তে বাংলা সরকার বা বাংলার মৎস্য ব্যবসায়ীরা কি করেছেন? মাঝে শুনেছিলুম পুকুরে নাকি ইলিশের চাষ করে এই অভাবের প্রতিকার করা হবে। কিন্তু শোনা কথা দেখছি গুজবেই পরিণত হোয়ে গেল।

আজকে এই যে মাছের অভাব সম্বন্ধে শুধু যে বাংলা সরকার বা বাংলার মৎস্য ব্যবসায়ীরা সচেতন হোয়ে উঠছে না, তা নয়, বাংলার দেশ-নেতারাও এ সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য করছেন না। যারা আজ বাংলার গঠনমূলক কার্য্য চালাতে বদ্ধপরিকর, তারা আজ যে কেন এই মাছের অভাব সম্বন্ধে কোন কথা তুলছেন না, তা হয়তো অনেকের মনে না লাগতে পারে কিন্তু আমার কাছে যে বিস্ময়ের বস্তু তাতে কিছু আমার সন্দেহ নেই।

আজ শতকরা বোধ হয় পয়ষট্টি জন বাঙালী যুবকের এবং যুবতীর চোখে চশমা! কারণ? যে কোন ডাক্তারকে বা বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করবেন—তারা উত্তর দেবেন উপযুক্ত ফসফরাস অভাবে এই দৃষ্টিক্ষীণতার উৎপত্তি। এই অধুনা খাদ্যে দুর্লভ পদার্থটির বাসস্থান হোচ্ছে ছোট টাটকা মাছের মাথায় এবং চোখে। কিন্তু বাঙালী গৃহস্থের সামান্য আয়ে উপযুক্ত পরিমাণে মাছ ছেলে মেয়েদের খাওয়ানো যে কি কঠিন কাজ তা বলে আর কোন দুঃখকে নতুনভাবে অনুভব করতে চাই না। তাই বলছিলুম আজ যারা দেশের গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তারা যাতে আজ বাঙলার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল, সেই বাঙালী

ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত পরিমাণে মাছ পায় তার বন্দোবস্ত করুন। আমার এই কথা শুধু কাগজে কলমে না থেকে যদি কোন গঠনমূলক কর্ম্মীর মনের ভিতরে থাকতে পায় তাহোলো আমি যে শুধু নিজেকে ধন্য মনে করবো তাই নয়, আমার আসরের মা-বোনদের তরফ থেকেও তাঁকে ধন্যবাদ দেবো।

কিন্তু মাছ খেলেই যে আজকালকার বিলাসী পরিবারের খুব কাজে আসবে, তাতো মনে হয় না। সহরে এমন বোনেদের দেখা যায় যে, তারা অনেকে সাধ করে চশমা পড়েন, কিন্তু পরিণাম সম্বন্ধে কোনই খেয়াল তারা করে না। নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি আমরা উদাসীন হই তবে দোষ কি মাছের? আর মাছ খেলেই যে, সব সময় উপকার পাব তাতো নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় না, তার কারণ যারা মাছ মাংস খায়না তারা কি আমাদের চেয়ে দুর্ব্বল? না তাদের শরীরের আকৃতি আমাদের চেয়ে লিক্-লিকে, সিপ্-সিপে। ঝগড়া বিবাদ দেওয়া যাক ছেড়ে, আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে বাঙ্গালীর যখন বাংলার জল-বায়ুর সঙ্গে গোড়া থেকেই মাছটা সয়ে আসছে তখন একে বাদ দেওয়া ঠিক নয়। তবে এর একটা পরিমান ঠিক হওয়া দরকার। অবশ্য ডাক্তারী মতে খেতে হলে মাসে এক দিন ঠিক পেট পুরে খাওয়া যাবে। কিন্তু তারা শুধু বিধানই দিয়ে যাচ্ছেন, গৃহস্থের অবস্থার দিকে তাদের নজর খুব কম—আবার এই মাছকেই কেন্দ্র করে তারাই অনেক স্থলে বেশ রামায়ণ, মহাভারত শুনিয়ে দিচ্ছেন। মানুষের ভাবের অন্ত নেই—কখনোও ঢোরা আবার কখনোও গক্ষুরো।

তবে আমার মতে সপ্তাহে তিন দিন করে মাছ (অবশ্য টাটকা—বারে একবার হউক তাতে ক্ষতি নাই) ও বাকী কয়দিন নিরামিষ খাওয়াই বেশ ফলপ্রদ ও সুখকর। তবে.........। এইবার এইখানেই শেষ করলাম। আগামী বারে দুধের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আশা রহিল।

—:০:—

রুদ্ধধারা

(সামাজিক উপন্যাস)

ডাঃ শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য এম-বি, এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লবঙ্গ মুখ বেঁকাইয়া বলিল: তবে আর তুমি পুরুষ মানুষ কি?

বিরিঞ্চি বলিল: লবঙ্গ? পৃথিবীতে পুরুষমানুষ আর মেয়েমানুষের তফাত এ পর্য্যন্ত কিছু বুঝতে পারলুম না। দৈহিক বলে বলো, মানসিক শক্তিতে বলো,—যুদ্ধ বিদ্যায় বলো আর পঠিত বিদ্যায় বলো – চুরি ডাকাতিতে বলো, আর ধর্ম্ম কার্য্যে বলো,—রাজনীতিতে বলো, আর অর্থ-নীতিতে বলো – কোন বিষয়েই নারী যে পুরুষের চেয়ে কম যায়, এতো আমি বুঝতে পারলুম না। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে দেখেছি, জাহাঙ্গীরকে শাসন করতো নুরজাহান! এই সেদিনও মহারাণী ভিক্টোরিয়া—ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি লোককে এবং নিজের দেশের কোটি কোটি লোককে উদার রাজনীতির দ্বারা শাসন করে গেছেন! মহাবীর সেনাপতি অ্যান্টোনিও, ক্লিওপেট্রার অঙ্গুলি হেলনে দক্ষিণে বা বামে চলতো ফিরতো। আর কতো উদাহরণ দেবো? আমি যে পুরুষমানুষ হয়ে কেন তোমার সপত্নীকে শাসন কর্ত্তে পাচ্ছিনা, বরং সেই সম্মার্জ্জনী-হস্তা বীর নারীই কি ক'রে আমার নাকে দড়ি দিয়ে তার কাজ করিয়ে নিচ্ছে, এর দার্শনিক তত্ত্ব আমার চেয়ে ইতিহাসেই বেশী জানিয়ে দেয়! সত্য চিরকালই সত্য, আমি বুঝোতে পারি আর না পারি! লবঙ্গ! কোনও আশা নেই। আমার দ্বারা নারী শাসন পৃথিবীর অনেক অসম্ভব ব্যাপারের মধ্যে আরও একটি!

লবঙ্গ শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া বলিল: তাহলে কি আমার শ্বশুর বাড়ীতে আমার একটু স্থান হবে না?

হবে না কেন? ভীষ্মের শরশয্যা! ভীষ্মের মত দৈহিক শক্তি নিয়ে প্রতিজ্ঞায় অটল হয়ে, তুমিও যদি শত শত বাণের ওপর ছেঁড়া কাঁথা পেতে শুয়ে থাকতে পারো থাকো! তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই! কিন্তু এই ভীষণ অগ্নি-পরিক্ষায় দিন কাটিয়ে তোমার কি উন্নতি হবে, আমি তো বুঝতে পাচ্ছিনে!

তা হ'লে তুমি একরকম জবাবই দিলে!

এ অক্ষমতার জবাব লবঙ্গ! এতে পাপ নেই।

কিন্তু প্রথম যখন তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তখনতো ছোট বউ ছিল না।

তখন ছোট বউ ছিল না, তাঁর ভাসুর ছিলেন। গুরুনিন্দা করতে নাই, কিন্তু তিনিই—

জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ! আমার আর কোনও দিকেই নিস্তার নেই।

মাঝখানে এই তরুপল্লবহীন বেলাভূমি! এখানে ঢেউএর ঝাপটাও যত বেশী, বালির তাতও তত বেশী! ডাঙ্গা থেকে বাঘও আসছে; জল থেকে কুমীরও এসে শরীর তাতাচ্ছে!

লবঙ্গ একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল: তোমাদের দোষ নেই, দোষ আমার কপালের।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্বশুর বাড়ীতে আসা অবধি লবঙ্গর দিনগুলি কাটিতেছিল শ্রাবণের নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণকাতর শ্রান্ত দিবসগুলির মত। এক দিনও সূর্য্যের মুখ সে দেখিল না, নিরন্তর মেঘের গর্জ্জনে ও বিদ্যুতের বিষম বিস্ফুরণে সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সপত্নীর গালিবর্ষণ অনবরতই চলিত, দম লইবারও অবকাশ ছিল না। আগে আগে স্বামী নীরবে থাকিতেন, এখন তিনিও মুখ ধরিয়াছেন।

সে যখন বড় জ্বালাতন হইয়া উঠিত, তখন পাড়ার ঘোষেদের বাড়ার বিধবা বড় বউএর কাছে গিয়া খানিকটা শ্রান্তি লাভ করিত। এই বউটি ছিল তাহার সমবয়সী। বিয়ে হইবার পর লবঙ্গ যখন প্রথম ঘর করিতে আসে, তখন হইতেই ইহার সহিত তাহার সৌখ্য। সাধারণতঃ সম্পদের দিনে যে সখী থাকে, বিপদের দিনে বিমুখী হয়। কিন্তু ঘোষেদের এই বিধবা বউটি সংসারের এই সাধারণ নিয়মকে এই উল্টাইয়া দিয়াছে। বহুদিনের পুরাতন প্রণয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মুখ ফেরায় নাই।

"আর সহ্য হয় না! তুই আমায় এক গাছা দড়ি কিনে দে! আমি গলায় বেঁধে কড়ি কাঠে ঝুলি!"

কেদার তো একগাছা দড়ি নিয়ে এসেছিল, সেইটা নিলিনে কেন?

সেটা নিলে গলায় বাঁধা চলতো বটে কিন্তু কড়িকাঠে ঝোলা হ'ত না। দড়িটা এত শক্ত নয়! তা হ'লে আর মরতুম কি করে?

আবার ওর চেয়েও বেশী ক'রে মরতে চাস্ না কি? মেয়ে মানুষ কি ওর চেয়ে বেশী মরে?

মেয়ে মানুষ কি করে বল্লতে পারিনে ভাই! তবে আমার মরণ ওতে হবে না! আমার মরণ হবে এই গোভাগাড়ে! তোর ঠাকুরপোর যে গোয়াল আছে, সেই গোয়ালে জাবনা খেতে খেতে গলায় বিচালি আটকে আমি মর্ব্বো!

তবু ভাল; স্বামীর ভিটেয় ম'রে স্বর্গে যাবি!

স্বর্গে যাবার কথা এখন তুই রাখ ভাই! এক্ষনইতো যম দড়ি নিয়ে ধরতে আসিনি, কাজেই কোথায় যাবো, সে জন্যে আমার আপাততঃ কোনও ভাবনা নেই। যদ্দিন না যাচ্ছি, তদ্দিন কোথায় থাকি বল। এই মাত্র ত সতীনের কাছে মিষ্টি মিষ্টি অনেক-গুলো বাঁটা খেয়ে এলুম। স্বামী দেবতা, তাঁর নিন্দা কর্ত্তে নাই,—কিন্তু তিনিওতো ধর্ম্ম-পত্নীকে রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচালেন না। ঝাঁটা খেয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর সাতপাকের গুরু-ঠাকুরের ভিটেয় ফিরবো না। কিন্তু কোথায় যাই? পোড়া পেটটাতো আছে, সেটাতো কথা শোনে না।

লবঙ্গর শ্রোতা তখন কোমরে কাপড় জড়াইয়া উনানের উপর বসান ডালের বোক্‌নোতে কাটি দিতেছিল; লবঙ্গর কথা গুলি শুনিতে শুনিতেই তাহার হাতের কাজ চালাইয়া যাইতেছিল। এখন মুখ তুলিয়া বলিল:

যেমন ভাগ্য ক'রে এসেছিলি, তেমনি ত ফলভোগ হবে! আরজন্মে বোধ হয় তুই স্বামীকে খেতে দিস্‌নি,—এজন্মে তাই বিধাতা তোর ওপরে শোধ দিচ্ছে। আহা, কত দুঃখই তুই পেলি বোন! এসব দেখে শুনে মনে হয়, মানুষের পূর্ব্বজন্ম আছে!

পূর্ব্বজন্ম হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, মানুষ চেষ্টা কল্লে আর জন্মের প্রতিশোধ গুলো এজন্মে বিফল ক'রে না দিতে পারে। আমরা চেষ্টা করি না, তাই হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভুগে মরি!

(ক্রমশঃ)
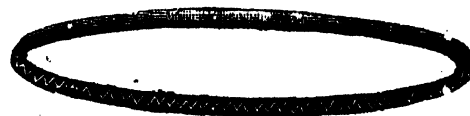
সুদূরের যাত্রী

(গল্প)

শ্রীসুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পূজার ছুটী। সংবাদপত্র অফিসে কাজ করি ছুটী একরূপ নেই বল্লেই চলে। গেল দু বছর যেতে পারিনি তাই এবার ছদিন ছুটীর মধ্যেই একবার দেশ থেকে ঘুরে আসতে হবে।

দু বছর পর দেশে যাচ্ছি কাজেই এটা সেটা করে জিনিষ পত্তর নেহাৎ কম হয়নি। ঘড়ি দেখে বেড়িয়ে পড়লাম একটু আগেই সম্ভব হলে স্পেসাল ট্রেণেই যাব শুধু কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বাড়ী যাওয়া যাবে। শিয়ালদহ পৌছে টিকিট কিনতে যাব হঠাৎ মনে হ'ল চাবিটা দেয়ালের গায় রেখে এসেছি। কি মুস্কিল, আবার এতটা পথ যেতে হবে। বিরক্ত মনে এদিক ওদিক দেখছি—যদি জানাশুনা কারুর কাছে এগুলি রেখে যাওয়া যায়, এমনি সময় পিছন হ'তে কে যেন ডাকলে, "পরিতোষবাবু যে, ভাল আছেন? কোথায় চলেছেন? দেশে নিশ্চয়।"

আলাপ করার মত ইচ্ছা বা আকাঙ্খা মোটেই ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে "হু" বলিয়া অন্য দিকে তাকালাম। যুবকটী তাহাতে মোটেই বিচলিত না হয়ে আরও কাছে এসে বল্লে, "আমিও ভাবছিলাম একবার দেশ থেকে ঘুরে আসবো কিন্তু তা আর হল না। কালকের জাহাজেই আমেরিকা চলেছি।" আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল। কোথায় চাবি হারিয়ে ট্রেন ফেল হতে বসেছি আর এ কিনা—ছেলেটীর মুখের দিকে চোখ পড়তেই আর কিছু বলা হ'ল না। সন্তোষকে প্রায়ই আমাদের অফিসে দেখতাম কিন্তু চেহারা যেন একটু কৃশ হয়েছে। কাল পাড়ের ধুতির উপর লংক্লথের পাঞ্জাবী গায়, পায় একজোড়া কাল পামসু। গায়ের রং খুবই সুন্দর—চেহারার দিক চাইলেই বেশ স্মার্ট বলে মনে হয়। ব'ললাম, "পূজার সময় বাড়ী না গিয়ে একেবারে ভারতবর্ষ ছেড়ে আমেরিকা চলেছ যে?" ব্যথিত কণ্ঠে ও উত্তর দিলে, "বাড়ী? না বাড়ী যাওয়া হবে না। একবার ভাবছিলুম বহুদূরে চলেছি যখন একবার মাকে প্রণামটা করে আসবো—সংসারে আর ত কোন বন্ধন নেই—কিন্তু তাও হ'ল না দুরাদৃষ্ট।" একটী দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই বল্লে, "একটা সুযোগ যখন পেলাম, হাত ছাড়া করি কেন? সাহেব কালকেই যাচ্ছে কিনা তাই আর দেরী করার উপায় নেই।"

ছেলেটীর ব্যথা কাতর মুখখানি দেখে বাস্তবিকই দুঃখ হ'ল। বুঝতে পারলাম, এমনি একটা কিছু হয়েছে যার জন্য সে বাড়ী যেতে চায় না, ভারতবর্ষ ছেড়ে ও দূরে চলেছে। ছেলেটী চুপ করে কি যেন ভাবছিলো, একটু পরেই উঠে বল্লে, "আপনি বসুন আমি আসছি"। ছেলেটী চলে গেল আমি সেইদিকে চেয়ে রইলাম।

অন্যমনস্ক ভাবেই একটী বিড়ির জন্যে পকেটে হাত দিয়েছি—শব্দ পেলাম চাবির—দেখলাম পৈতার সঙ্গেই আছে। আঃ মিছামিছি স্পেসাল ট্রেনটা মিস্ করলাম। যাহা হোক ছেলেটীর জন্য কিছুক্ষণ বসে রইলাম কিন্তু সে আর ফিরলে না। ট্রেনেরও সময় হয়েছে—তাই তাড়াতাড়ি কুলীর মাথায় লগেজ তুলে দিয়ে চলেছি হঠাৎ দেখলাম একখানা খাম পড়ে আছে ভিতরে কি আছে দেখবার অবসর নেই, দরকারী কিছু হবে মনে করে পকেটে রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেনে উঠলাম।

বাড়ী গিয়ে গোলমালের মধ্যে আর কাউকেই মনে পড়ল না। ট্রেনে আসতেই গা বেদনা হয়ে গেছে, তারপর বাড়ীতে পূজোর গোলমালে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। মা বৃদ্ধা, সংসারের ভার গৃহিনীর উপর, কাজেই এটা সেটা ছেলে রাখা প্রভৃতি তাঁরও দু'য়েকটা ফরমাইজ খাটতে হয়। যৌবনের সেই রঙ্গীন স্বপ্ন দেখা বহুদিন হয় বন্ধ হয়ে গেছে। আগের কথা মনে উঠলেই ভাবি যত সব ছেলে মানুষী।

পূজা হয়ে গেল। ত্রয়োদশীর দিন অর্থাৎ কালকেই আবার কর্ম্মমুখর জনাকীর্ণ নগরীর বুকে ফিরে যেতে হবে। সকাল বেলাটা ৺বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতেই কেটে গেল। বৈকালেও দু'একটা জায়গায় যেতে হবে। ভাবলাম ঐ সময় একটু বেড়িয়ে আসা যাবে। বাড়ী এসে অবধি আর এক মিনিটও কোথায় দাঁড়াতে পারিনি। সুটকেশ খুলে বোতাম সুট বের করতেই সেই খামখানির উপর চোখ পড়ল। সঙ্গে করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেলা তখনও একটু আছে তাই সোজা পথে না গিয়ে মাঠের পথ ধরেই চললাম। এরূপ খোলা ও নির্জ্জন স্থান বহুদিন পাইনি মনটা সত্যিই তৃপ্তিতে ভরে গেল। মনে পড়ল কবি দ্বিজেন্দ্র নাথের সেই গান "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা—।"

এইবার খামখানি বের করলাম। একটু কৌতুহলী হয়েই চিঠিটা দেখছি :

পদ্মপুকুর, কলিকাতা
১০ই আশ্বিন।

সবিতা

সবগুলি চিঠিই তোমার পেয়েছি। জবাব কোনদিন দেইনি আজও দিতাম না যদি না রাণুর সম্বন্ধে অতগুলি কৌতুহলী প্রশ্ন করতে। আগেই বলছি, নারীর দুঃখ শুধু নারীর অন্তর দিয়েই বোঝা যায়। সেই দিক দিয়ে তুমি তাকে দেখ তাহলে বুঝবে তোমরা তাকে ভুল বুঝেছ।

তুমি জান, রাণু আসার বহু পূর্ব্ব থেকেই রতন বাবুদের সঙ্গে আমাদের ভাব। শুধু গ্রামবাসী বলেই নয় পুরুষানুক্রমে একটী মধুর সম্বন্ধ তাঁদের ও আমাদের দুই সংসারকে একত্রিত করে রেখেছে। অনেক ঝঞ্ঝা এর উপর দিয়ে গেছে তবু সমানেই চলছিল। সত্যি কথা বলতে কি—ছেলেবেলা থেকেই রতনদাকে বড় ভাইয়ের মত ভালবেসে এসেছি। আজও যে তাকে ভালবাসিনা তা নয়, তবে দুজনার মাঝে যে প্রাচীর তিনি তুলে দিয়েছেন তা ডিঙ্গিয়ে যাবার মত ইচ্ছা বা আকাঙ্খা আর নেই। কোন দিন হবে কিনা তাও জানি না। কেন যে এই প্রাচীর হ'ল সেই কথাই তোমাকে আজ বলবো।

রেঙ্গুনে গিয়ে অবধি মনটা খুবই খারাপ ছিল তাই অধিকাংশ সময় বেঙ্গলী ক্লাবে কাটিয়ে দিতুম। হঠাৎ একদিন সেইখানেই রতনদার সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে বিদেশে রতনদাকে পেয়ে খুবই আনন্দ হ'ল। প্রায় ছুটীতেই তাঁদের ওখানে যেতাম। একসঙ্গে খাওয়া, বেড়ান, থিয়েটার, টকী সবই হতো। দেশের বাড়ীতে ঐরূপ হতো। সবাই ঈর্ষা করে বলতো "ভারীতো সম্পর্ক—তা আবার অত মাখামাখি কেন?" চুপ করে শুধু শুনতাম।

কিছুদিন পরে পেলাম রতনদার এক চিঠি কলকাতা থেকে লেখা। তাতে জানলাম রতনদা আবার বিয়ে করছেন। যেতে আমাকে বিশেষ করেই রতনদা লিখেছিলেন কিন্তু রতনদার মতন প্রকৃতির লোক এই বয়সে বিশেষতঃ বৌদি যখন সুস্থ ও সবল দেহেই আছেন তখন কেন যে আবার এই সখ বুঝতে পারলাম না। মনটা ভাল লাগলো না—নাইবা হ'ল বৌদির ছেলে মেয়ে কি হয় তাতে, তাই বলে আর একজনের পানীপীড়ন—এই বয়সে। যাহাহোক এজন্য ইচ্ছে করেই এ বিবাহে যাইনি।

বিয়ের পরে দুই স্ত্রী নিয়ে রতনদা ফিরে এলেন রেঙ্গুনে। সত্যি বলছি মনটা একেবারে দমে গেল যখন শুনলাম রতনদার নূতন বৌ-এর বয়স মাত্র বছর চৌদ্দ হবে, চেহারা শুকনো, রং কালো একগলা ঘোমটা দিয়ে নাকি দাঁড়ায়। রতনদার নূতন দেখার যে আগ্রহ ছিল তা একেবারে নিরানন্দে ডুবে গেল। রূপ বা গুণের কোন সমালোচনা করতে চাই না কিন্তু ভাববার রতনদার হ'ল কি। দেখে শুনে শেষে এই আপ-টু-ডেট্ নিয়ে এসেছেন। রাগ করোনা ভাই, আজ যদি অসাবধানতা বশতঃ দু'একটা কথা বেরিয়ে পড়ে সেটা সয়ে নিও।

মাস দুয়েক পরে একদিন সত্যিই গিয়ে হাজির হলুম রতনদার নূতন বৌ দেখতে। সামনের ঘরটায়ই ছিল, হঠাৎ ঢুকেই সে মুখখানা চোখে পড়ল, স্তম্ভিত হ'য়ে সেইদিকে চেয়ে রইলাম। বুকের উপর সজোরে যেন কে আঘাত করলে। অজ্ঞাতেই মুখ থেকে বেরুল, "রাণু তুমি!" চির পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে ও চমকে উঠলো, বল্লে "সরোজদা" তখনি বেরিয়ে পড়লাম। অর্দ্ধভগ্নস্বরে রাণু পেছন হতে ডেকে বল্লে, "আমার সঙ্গে দেখা না করে রেঙ্গুন ছেড়ে যেওনা সরোজদা।" বোধহয় আমার মনের অবস্থা ও বুঝে নিয়েছিল। রাণু! সেই রাণু! সর্ব্বাপেক্ষা ভালবেসেও যাকে ভুলবো মনে করে কলকাতা ছেড়ে সুদূর রেঙ্গুনে এসে আশ্রয় নিয়েছি—জানিনা কোন নিগুঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান তাকেই দিনরাত চোখের সামনে দেখাবেন বলে পাঠিয়েছেন।

* * *

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শৈশবেই মা মারা যাওয়ায় রাণুর বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে কর্লেন। তারপর যা হয় তাই। সংসারের সমস্ত কাজ একলা করেও কারুর মন পেলে না, পেলে নির্য্যাতন। গরীবের ঘরের কুৎসীতা মেয়ে—হবারই কথা। পাশের বাড়ীটায় থাকতাম—আপন মনে বসে এস্রাজ বাজাতাম। সবাই বলতো এস্রাজে আমার চমৎকার হাত। ও দাঁড়িয়ে আমার বাজনা শুনতো। একদিন আলাপ হ'লো। ওর দুঃখে আমার ব্যথা লাগতো। সহানুভূতি অজ্ঞাতেই একদিন ভালবাসায় পরিণত হ'ল। ও বল্লে, "না-তা হতে পারে না; আমার রূপ নাই গুণও নাই, তোমার রূপ গুণ দুই-ই আছে—আমি তোমার অযোগ্যা। আমার দুঃখ দেখে আজ দয়া করে আশ্রয় দিতে চাহিলেও পরে আর তোমার ভাল লাগবে না।" ওর বাবার খুবই ইচ্ছা ছিল, ও কিছুতেই রাজী হল না। একদিন ও স্পষ্টই আমাকে বল্লে, "তুমি আর এখানে এসো না। আমি আর হয়ত নিজেকে বেঁধে রাখতে পারবো না। আমার জীবন তুমিই হয়ত অশান্তিময় করে তুলবে।" আমি কিছু বলবার আগেই ও বল্লে, "আমরা গরীব আমি কালো—না না তা কিছুতেই হয় না।"

বড় ব্যথা পেলাম ওর কথায়। সেই দিনই রেঙ্গুনের টিকিট কেটে জাহাজে উঠলাম। যাকে ভালবাসি তাকে কোন অবস্থায়ই দুঃখ দেওয়া যায় না।

রেঙ্গুন ছেড়ে না গেলেও তখন রতনদার ওখানে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। ভাবলাম ভালই হ'ল, এবার দু'জনার চেষ্টায় যদি রতনদাকে পথে আনতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে গিয়ে যে খবর নিতাম তাহা বড়ই মর্ম্মান্তিক। দুর্দ্দান্ত মাতাল ও লম্পট বলে রতনদাকে সবাই ঘৃণা করতো, রাণু তা সইতে পারতো না। কত বোঝাত, কত অনুরোধ করতো কিন্তু কোন ফল হত না। মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগলো বাড়ী ফিরতে কখন রাত দুটো কখন তিনটা হয়ে যেত। বৌদির সয়ে গেছে, দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তো, বেচারী রাণু সমস্ত রাত জেগে বসে থাকতো। যদিবা কোন দিন ঘুমিয়ে পড়তো সেদিন আর রক্ষা থাকতো না। এমনি করে একলা শুয়ে রাতের পর রাত কেঁদে কাটাত।

রাণুকে যে ভাবে পেতে চেয়েছিলেন রতনদা, রাণুর নারীত্ব সে ভাবে ধরা দিতে চাইল না। মাতালকে ভালবাসা যায়, সপত্নীকেও সহ্য করা চলে কিন্তু গণিকার পায় উৎসর্গীকৃত যে দেহ তাকে নিয়ে অভিনয় করা অসাধ্য। এইবার আরম্ভ হ'ল নির্য্যাতন। রাণুর চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত করতেও রতনদা বাকী রাখেন নি। সহ্য করতে না পেরে রাণু এক একদিন অজ্ঞান হ'য়ে যেত। একদিন স্পষ্টই রতনদাকে বল্লাম, "রতনদা এখনও যদি আপনি নিজেকে না সামলান পরিণামে আপনাকে অনুতাপ ভোগ করতে হবে।" রতনদা চুপ করে রইলেন।

সেদিনও ছুটী উপলক্ষ্যে রতনদার ওখানে গেছি, শুয়ে শুয়ে রতনদার কথাই ভাবছি এমনি সময় রাণু এসে পাশে বসল। আমি বল্লাম, "কিছু বলবে?" রাণু একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইল পরে আস্তে আস্তে বল্ল, "মুহূর্ত্তের ভুল সমস্ত জীবনের অনুতাপ দিয়ে ঢাকা যায় না—সে কথা জানি, তাই আজ ক্ষমা চেয়ে তোমার আর অপমান করতে চাই না। শুধু এইটুকু তোমাকে জানাতে চাই তোমাকে ব্যথা দিয়ে অবধি নিজে এতটুকু শান্তি পাইনি। যদিও একথা তোমায় জানিয়ে আজ কোন লাভ নেই তবুও আমাকে আজ বলতে হবে। অদৃষ্ট বলে মেনে নিয়ে এই অমানুষের পায় নিজকে বিলিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই পারছি না। তাই আজও ওর সকল দাবী পূরণ কর্ত্তে পারিনি।" আমি চমকে উঠলাম, ও স্থির ভাবেই বল্লে, "তোমার কাছে আমার অপরাধের অন্ত নাই কিন্তু কত বড় ব্যথা বুকে চেপে রেখে যে অপরাধ করেছি তাহা শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন। তবু আমি জানি তুমি-ছাড়া আপনার বলতে আমার কেউ নেই সরোজদা"। এইবার সত্যিই ওর চোখে জল এল, একটু ইতস্তত করে বল্লে, "আজ কি পারনা আমাকে একটু আশ্রয় দিতে?" আবার আমার মুখের দিকে চাইল—কি বুঝল জানি না, পরক্ষণেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে, "নাঃ, আমি অত স্বার্থপর নই—তোমার সুন্দর জীবনটা এভাবে নষ্ট করতে পারি না"—বলেই ও উঠে দাঁড়াল স্তব্ধ হয়েই এতক্ষণ ওর কথা শুনছিলাম হঠাৎ কি খেয়াল হল, তার হাতদুটো চেপে ধরে বল্লাম, "রাণু, যাবে তুমি আমার কাছে?" আমার দিক চেয়ে শান্ত ভাবেই ও বল্লে, "বিশ্বাস হচ্ছে না, সেদিন নিতে চেয়েছিলে আমি যাইনি কিন্তু আজ তুমি নিতে না চাইলেও আমি নিজে তোমার কাছে যাব।"

সজোরে রাণুর হাতদুটো চেপে ধরতেই ও এলিয়ে পড়ল আমার গায়। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল—সব ভুলে গেলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে অসহায় শিশুর মত বুকের উপর তুলে নিয়ে তার সুন্দর মুখখানি অজস্র চুম্বনে আরও সুন্দর করে দিলাম। অসহ্য সুখে রাণু আমার বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে রইল—পরমুহূর্ত্তেই একটা অব্যক্ত লজ্জায় শিউড়ে উঠে তাকে নাবিয়ে রেখে মাতালের মত টলতে টলতে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম।

• • •

তিন মাস পরের কথা। কি একটা কাজে ওধারে গিয়েছিলাম। রাত দুটোর সময় রতনদা টলতে টলতে ঘরে ঢুকলেন। আমার চোখে ঘুম আসছিল না—অনেক কিছুই ভাবছিলাম। রতনদা এসেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে সুরু কর্লেন। বৌদিকে একটা লাঠি নিয়ে ছুটে যেতেই টাল সামলাতে পারলেন না—রাণু গিয়ে ধরল। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বল্লাম, "কি হচ্ছে এসব রতনদা? সবাই কি মনে কর্চ্ছে বলুন তো?"

আমার কথায় যেন আগুনে ঘি পড়ল। রতনদা এ সুযোগ ছাড়লেন না। অসভ্যের মত যা মুখে আসে বলতে লাগলেন। বল্লেন, "আমি কি বুঝিনে কিছু, তুমিই এই ছুড়িটার মাথা খেয়েছ, নইলে ওর সাধ্য কি আমার কথা শুনে না। আমার যা খুসি আমি করবো কি অধিকার আছে তোমার বলতে।"

রাগে সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। বলতে ইচ্ছা হল, "কি অধিকার আছে একবার রাণুকে জিজ্ঞাসা করুন"। ভাবলাম আজকেই বুঝিয়ে দেই—প্রেমের দেউলে যেখানে একে অন্যের কাছে আত্মসমর্পণ

করে সেখানে অধিকার আপনি জন্মে" বলেই চাইলাম রাণুর দিকে—সেখানেও ঝড় বইছিল কিন্তু চমকে উঠলাম তার সেই চাহনী দেখে—হয়ত: এ কলঙ্ক সে সইতে পারবে না। তাহলে সত্যিই কি আমার কোন অধিকার নেই? আইন বিরুদ্ধ—সমাজ বিরুদ্ধ—তাঁরা ঠিক করে দিয়েছে রাণু আমার কেউ নয় রাণু রতনদার?

তখনই সেখান থেকে চলে আসি। রাণুকে শুধু বল্লাম, "এই আমাদের শেষ দেখা—পারতো আমাকে ভুলে যেও"। রাণুর চোখ দিয়ে তখন টপ্ টপ্ করে জল পড়ছিল।

বল্‌তে পার সবিতা, কি মূল্য আছে এই মুখ না ফোটা গভীর প্রেমের—সে প্রেম সমস্ত জগতের সামনে দাঁড়িয়ে সুভদ্রার মত নিজের অধিকার দাবী কর্‌তে পারে না শুধু কেঁদে কেঁদে সমস্ত কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেয়।

মনে পড়ল রাণুর গানের দুটা লাইন:

"দুঃখ দিতে দুঃখ পেতেই
তোমার কাছে আমার আসা,
চোখের জলে নিবিড় হোক্ এ
অভিসপ্ত ভালবাসা"॥

বেশ তাই হবে।

পরদিনই কল্‌কাতা ফিরে আসি। তারপর আর কোন খবরই তাদের রাখি না। একদিন একদিন করে প্রায় বছর গড়াতে চল্লো, হৃদয়ের সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করে তাকে ভুলতে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রতি বারেই তার মধ্যে নিজের সমস্ত সত্বাকে হারিয়ে ফেলে তাকে নিয়েই বসে খেলা করি। এখন বুঝতে পেরেছি তাকে ভুলে থাকা অসম্ভব। দুজনে বেঁচে থাক্‌বো—কাছে থাক্‌বো—অথচ দুজনের মধ্যে থাকবে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। এযে কত বড় ব্যথা কেউ তা বুঝবে না—তাই আজ তোমাদের কাছ হতে বহুদূরে চলে যেতে চাই।

ইহকালে আর রাণুকে পাব না বলে আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে আমি নীরবে পড়ে আছি। অতীতকে আমি ভুলিনি—ভুলতে পারি না। অতীত যবনিকার উপর ভাব্ তুলবার প্রত্যেক আঁচরটী জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, তবে সে বড় বিষাদের চিত্র। ভালবাসার মন্দিরে জীবনের ডালি নিয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে নিতান্ত সরল পূজারীর বেশে একদিন গিয়েছিলাম কিন্তু মন্দিরের দেবী আমার আমাকে গলিত কুষ্ঠগ্রস্থ রোগীর মত দূর করে দিল। তবু সে পূজারী মন্দির পার্শ্বেই পড়ে আছে। তার সামর্থ্য নেই যে আবার সেই পূজার ডালি সাজিয়ে দুরারোহ সোপান আরোহন করে সে মন্দিরে পূজার জন্য উপস্থিত হয়। বার বার আঘাতে মেরুদণ্ড আমার ভেঙ্গে গেছে। ভালবাসার গভীরতা রূপের মাপকাঠিতে নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সে তার অতল তলে চিরদিনের মত ডুবে গেল। ভালবাস্‌বার কি স্নেহ করবার লোকের অভাব ছিল—তবু কেন তাকে আক্‌ড়ে ধরেছিলাম। আজ চিরদিন মস্তক অবনত করে চল্‌বো অথচ সঙ্গীহীন, নিরাশ্রয়।

আশ্চর্য্য তোমাদের এই নারী জাতটা, সবিতা, কেউ কোনদিন চিন্‌তে পারেনি আর কেউ পারবে বলে মনেও হয় না।

রাণু আমাকে ভুলে গেছে—ভালই। তাকে সুখী দেখে যাওয়াই এ জীবনের চরম সুখের। শুধু তার ভালর জন্যই আজ তার কাছ হতে দূরে যেতে চাই এতে কারুর দুঃখিত বা আনন্দিত হবার কিছু নেই।

গান

আধুনিক

নীরেন মুখোপাধ্যায়

মোর—সন্ধ্যারাতের ফুল-বাসরে তোমার নিমন্ত্রণ।
বঁধু তোমার নিমন্ত্রণ॥
তোমার তরেই গেঁথেছি আজ ফুলের আভরণ॥
যা' কিছু মোর ছিল আশা—
তোমার শুধু ভালবাসা—
তোমার সাথে মধুর রাতে প্রেমের আলাপন॥
যে বারতা হয়নি বলা—আছে গো প্রাণ জুড়ে
যে অনলে চিরজীবন—হৃদয় আছে পুড়ে
আমার হৃদয় গেল পুড়ে।
আজিকে সব থরে থরে
প্রেমের পূজায় দিব ধরে—থরে থরে
চরণ ধুলো ধুইয়ে দেবে—সজল দু'নয়ন
আমার সজল দু'নয়ন॥

অসুস্থ
শরীর
সুস্থ ও সবল
করিতে
SIROLIN

আজও তাকে তেমনি ভালবাসি যদিও বেশ বুঝতে পারছি—এই ভালবাসাই দিন দিন আমাকে মরণের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দেশে থাকলে হয়ত নিজের অলক্ষ্যে কোন অদৃশ্য মহাশক্তি তারা কাছে টেনে নিয়ে আবার সব ওলট পালট করে দেবে তাই আজ সুদূরের যাত্রী।

সবিতা, প্রতাপপুরে যদি যাও, মাকে বলো ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে যাবার সৌভাগ্য হল না। অনেক দিন ধরে তাঁর মাতৃ-হৃদয়ে যে বাসনা পোষণ করেছিলেন, এ জীবনে তা আর পূর্ণ হবার উপায় নেই। আমি তাঁর নিতান্ত অযোগ্য সন্তান মনে করে যেন ক্ষমা করেন।

এ চিঠি যখন তোমার হাতে গিয়ে পহুছিবে, আমি তখন তোমাদের কাছ হতে বহু-যোজন দূরে সাগরের বুকে ভেসে বেড়াব। তোমরা যখন সন্ধ্যার সময় চণ্ডী মণ্ডপের বারান্দায় বসে হাত যোড় করে মায়ের আরতি দেখবে, আমি তখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখবো ঐ সূর্য্য অস্ত গেল। বিজয়ার দিন সাহেবের সঙ্গেই হ্যাণ্ডসেক করবো।

ফিরে আর আসবো কিনা জানি না। মায়ের কাছে এই প্রার্থনাই ক'রো এ ছন্ন-ছাড়া জীবনে এই যেন শেষ যাত্রা হয়।

ইতি—

সরোজদা।

কখন যে চিঠি খানা পড়া হয়ে গেছে তা মনে নেই। চোখে তখনও ঝাপসা দেখছি। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে যখন দাঁড়িয়েছি ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন মাথার উপর।

—শেষ—

উল্কা

(নাটক)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ।

জনৈক পথিক গাহিয়া চলিয়া গেল

ওগো দরদী—
দরদ দিয়ো,
চলার পথে,
ছায়ার মত,
পিছনে যেয়ো।
ব্যথার মালা
গলে যে দোলে;
নেবে কে তুলে,
এস গো তুমি—
পরশ দিয়ো॥

কাজল চোখে
সজল ধারা;
নাই কিনারা,
ওগো মরমী,
মুছায়ে নিয়ো।
বুকের মাঝে
বাঁশীর তানে,
এস গো গানে;
পরাণ প্রিয়া
কাছে দাঁড়ায়ো॥

দৃশ্য

জগদীশের ড্রয়িং রুম।

[উল্কা বসিয়া জামা সেলাই করিতেছিল জগদীশের প্রবেশ]

জগ—এই যে মা—তোর কি হয়েছে বলত? মানে ক'দিন ধরেই দেখছি—যেন তোর মনটা ভাল নেই। তাছাড়া নলিনীও যে কেন তার আসা যাওয়া বন্ধ করলে, তাও জানতে পারলাম না।

উল্কা—না জানাই ভাল বাবা। তাঁর এখানে শুভাগমন যত কম হয় ততই মঙ্গল।

জগ—মঙ্গল! আমিত কথাটা—ঠিক বুঝে উঠেতে পারলাম না। কি হয়েছে বলত মা?

উল্কা—আমাদের দুর্ভাগ্য বাবা—যে ওঁর কাছে টাকা ঋণ করতে হয়েছে, আর সেইটার advantage নিয়েই না—যাক্গে বাবা, সে সমস্ত কথা আপনার না শোনাই ভাল।

জগ—তাইত মা, আমিত কিছুই জানতে পারলাম না। তবে এটা বলব মা, নলিনী আমাদের—

উল্কা—উপকার করেছে, এইত বলছেন বাবা। কে অস্বীকার করেছে। এবং তার জন্যে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছি, আর সেইটাই হচ্ছে তার এত বেড়ে ওঠার কারণ আজ বুঝেছি বাবা, দোষ তার নয়—দোষ আমারি।

জগ তাইত মা, এওত একটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়াল। অথচ—নলিনী—মানে—তাইত—আমিত ভারি মুস্কিলেই পড়লাম।

উল্কা—আপনার ভয় নেই বাবা, দেনা যতদিন না শোধ হচ্ছে সব সহ্য করে যাব। তবে যেটা অসহ্য সেটা কোন মানুষই সহ্য কর্ত্তে পারে না, আমিও পারব না। এতে ভবিষ্যতে আমাদের ভাগ্যে যা থাকে হবে।

জগ—তাইত মা, বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম। কি যে হল কিছুই জানতে পারলাম না। [প্রস্থান]

উল্কা—দেনা যে মানুষকে এত হীন করে দেয় আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। যাক like করিন', বা করতে প্যারি না তাকেও আজ মেনে চলতে হয়। [রমেন্দ্রের প্রবেশ] একি! আসুন—আসুন। সত্যি বলছি আপনি যে আসবেন, আশাই করিনি। বসুন—

রমেন্দ্র—তা বসছি—তবে আমার আসাটা আপনার পক্ষে বিপজ্জনক তা জেনেও আসতে বাধ্য হলুম।

উল্কা—কেন বলুন ত ?

রমেন্দ্র—সেদিন যাবার সময়, হয়ত একখানা খাতা এইখানেই ফেলে গেছলাম। আপনি পেয়েছেন ?

উল্কা—হয়ত পেয়েছি, কিন্তু ফিরিয়েই যে দিতে হবে, এমনত কোন কথা নেই।

রমেন্দ্র—সেটা আপনার ইচ্ছা—তবে সেখানা রেখে আপনার কোনই লাভ হবে না।

উল্কা—লোকসানও ত হবে না।

রমেন্দ্র—ও—তাহলে দেবেন না ?

উল্কা—যদি বলি না—

রমেন্দ্র—না বলেন—চাই না।

উল্কা—আপনার রাগ হচ্ছে—না ?

রমেন্দ্র—রাগ—নাঃ। আচ্ছা তাহলে উঠি—নমস্কার।

উল্কা—কিন্তু যাওয়া ত আপনার হ'তে পারে না।

রমেন্দ্র—তার মানে ?

উল্কা—আমিত আপনাকে যেতে বলিনি।

রমেন্দ্র—যেতে বলেননি বলেই থাকতে হবে ?

উল্কা—সেটা অবশ্য আপনার ইচ্ছা। কিন্তু খাতাখানা নেবেন না ?

রমেন্দ্র—আপনিত ফিরিয়ে দিতে চান না।

উল্কা—বারে—আমি ফিরিয়ে দিতে চাই না—না আপনি ফিরিয়ে নিতে চান না !

রমেন্দ্র—আমিত চেয়েছিলাম—

উল্কা—চাইলেই কি সব জিনিষ পাওয়া যায় ? বলুন না ?

রমেন্দ্র—দেখুন আপনি যে কি বলতে চান ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না।

উল্কা—পারছেন না ? আচ্ছা যদি কখনও সুবিধে হয় বুঝিয়ে দোবো। একটু বসুন আপনার খাতাখানা নিয়ে আসি। না নিয়ে বোধহয় যাবেন না—না ?

[রমেন্দ্র একবার চাহিল মাত্র কিছু বলিল না]

[উল্কার প্রস্থান, খাতা লইয়া পুনঃ প্রবেশ]

উল্কা—এই নিন আপনার খাতা এটা বোধহয় শীঘ্রই publish করবেন ?

রমেন্দ্র—ইচ্ছা আছে।

উল্কা—সত্যি বলছি আমার যতটুকু বিদ্যে অবশ্য অতি সামান্য তাতেই বইখানা পড়ে মনে হয় অনেকদিন এমন সুন্দর লেখা পড়িনি।

রমেন্দ্র—লেখা সুন্দর কিনা জানি না তবে যে কোন একটা বিষয় নিয়ে লেখা আমার খেয়াল। আর বিদ্যার কথা যদি বলেন বিদ্যা আর কতটুকু অর্জ্জন করতে পেরেছি।

উল্কা—এটা আপনার অতি বিনয় মিঃ গাঙ্গুলী। আপনি যে কত বড় বিদ্বান তার প্রমাণ আপনার নামের সঙ্গে জড়ান বিলিতি খেতাবটা।

রমেন্দ্র—শুধু খেতাব নিয়েই বিদ্যার ওজন হয় না মিস্ রায়। যাকগে সে কথা! এখন চলি, আপনার অনেকখানি দেরী করিয়ে দিলাম মনে যেন কিছু করবেন না।

উল্কা—ধরুন যদি মনে কিছু করি আপনি কি তার কোন প্রতীকার করবেন ?

রমেন্দ্র—আমি আর কি প্রতীকার করতে পারি বলুন ?

উল্কা—পারেন না ? আচ্ছা না থাক—

রমেন্দ্র—তবে থাক। চললুম মিস রায়, নমস্কার—

উল্কা—নমস্কার—

[রমেন্দ্র চলিয়া গেল উল্কা কতক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল পরে বসিতে যাইতেছিল—]

[নলিনী প্রবেশ করিল]

নলিনী—এতক্ষণ গোপনীয় কথা হচ্ছিল
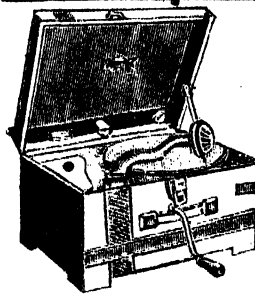
তাই বাধা দিতে আসিনি, পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিলাম। তা উপকারী বন্ধুটা চলে গেলেন, না আবার এখনি আসবেন বলে গেলেন ?

উল্কা—দরকার হ'লে আসবেন বৈকি।

নলিনী—ও—তা খাতা নেবার ছল করে ত দেখা করতে এলেন আরও কিছু ভুল করে ফেলে যান নি ত?

উল্কা—ফেলে গিয়ে থাকেন মনে পড়লে আবার আসবেন।

নলিনী—বটে! ভদ্রতার খাতিরে আবার আসবার জন্তে অনুরোধ করনি ?

উল্কা—করেছি—

নলিনী—তোমার ভালর জন্যই বলে দিচ্ছি উল্কা ঐ vagabondটার সঙ্গে মেলা মেশা কোরো না। আর এতে তোমার বাবাও বিরক্ত হন।

উল্কা—বাবা বিরক্ত হলে, আমাকে নিজেই বলবেন। তাঁর মুখ্‌ছি হ'য়ে নাইবা তুমি এত পরিশ্রম করলে।

নলিনী—আমার কর্ত্তব্য তোমার যাতে ভাল হয় সেই সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা আর তোমার বাবার কাছেও আমি সেই রকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

উল্কা—এ রকম ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ত ভাল নয়।

নলিনী—তুমি বোধহয় আমাকে ঠাট্টা করছ ?

উল্কা—এতটুকু বুদ্ধি থাকলে, বুঝতে কষ্ট হতো না।

নলিনী—বটে আমি নির্ব্বোধ এই না—

উল্কা—আমার মুখ থেকে নাইবা শুনলে।

নলিনী—আচ্ছা আমিও দেখে নেবো এত দর্প কোথায় থাকে। তোমার কত আত্মীয় উপকারী আছে তাও দেখে নোবো।

[প্রস্থান]

[উল্কা নীরবে বসিয়া রহিল]

প্রথমাঙ্ক শেষ।

(ক্রমশঃ)

প্রতিভার অপমৃত্যু

শ্রীনির্ম্মল কুমার সুর

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টম পর্য্যায়

মীরা সেনের বাপ যামিনীমোহন ছিলেন সরকারের গোয়েন্দা বিভাগে একজন নাম করা লোক। বুদ্ধি ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ আর তারই জোরে প্রমোশন পেয়ে স্থিতিলাভ করলেন এমন এক আসনে যেখানকার দায়িত্ব ও সম্মান তাঁকে পূর্ব্বের অবস্থা ভুলিয়ে দিলে। সরকারের নির্দ্দেশে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হতো সারা দেশময়, আর তারই সুযোগে বিস্তর পয়সাও ঘুরে ঘুরে তাঁর পকেটে এসে হাজির হতো। এই বিভাগেরই এক কাজের ভার নিয়ে যখন তিনি একবার এগিয়ে চলেছেন পশ্চিমের দেশে দেশে, তখন বাড়ী থেকে সংবাদ পেলেন তাঁর গৃহে আর একজন নতুন অতিথি এসেছে। তিন পুত্রের পর কন্যারত্ন লাভ করে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কম নয়। শারীরিক অসুস্থতার নজির দেখিয়ে সুদূর পাঞ্জাব থেকে তিনি ফিরে এলেন বাংলা দেশে, তাঁর নিজের বাড়ীতে। বন্ধুদের ডেকে খাইয়ে দিলেন এক প্রীতিভোজে, কন্যার জন্ম উপলক্ষ্য করে। মনে মনে কত কল্পনাই তাঁর জাগল, মেয়েকে গড়ে তোলবার আদর্শ নিয়ে।

মেয়ে যখন মাত্র এক বৎসর বয়সের সীমা ছাড়াল তখন থেকেই তিনি তাকে কিনে দিতে লাগলেন নানা ছবির বই, যেগুলো ও প্রতি সপ্তাহে গড়ে দুখানা করে ছিঁড়তে আরম্ভ করলো। কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে গিয়েও তিনি ভুললেন না মেয়ের কথা; সেখান থেকেও তাই আসতে লাগলো নিয়মিত ভাবে বইএর পার্শেল। নিজের ছোট্ট লাইব্রেরীটাতে বাড়িয়ে নিলেন আরো একটা আলমারী আর তার ভিতর বোঝাই করতে লাগলেন দেশ বিদেশের ছোটদের বই এখন থেকেই। ওর ভাইগুলো ওর প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখে অবাক্ হয়ে পড়লো। সকলের ছোট হলেও বাড়ীর সকলের ওপরেই ও তাই চালাতে লাগলো আপন খেয়াল খুসীর কর্ত্তৃত্ব।

ওর বয়েস যখন ছয় কি সাত, তখন ওর বাবা একবার ফিরলেন বিদেশ থেকে শরীর খারাপ করে। ডাক্তার, বদ্যির আড়ম্বর একটু বেশীই চলতে লাগলেও, গোড়া আলুগা গাছের মত ওঁর শরীর ক্রমশঃ নীচুদিকেই নামতে লাগলো। সরকারের কাছে ছুটীর মেয়াদ বাড়াবার দরখাস্ত করে উনি রওনা হলেন আবার পশ্চিমের এক স্বাস্থ্যকর জায়গায়—স্বাস্থ্যোন্নতির আশা বুকে ধরে। সেখানে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করে অস্থায়ীভাবে পাতলেন নিজের সংসার। কিন্তু স্বাস্থ্য তার ফিরলো না, বরং খারাপই হয়ে চললো ক্রমশঃ। বিদেশের বাসা উঠিয়ে কিছুদিন বাদে, তাই তিনি ফিরে এলেন আবার নিজের বাড়ী, বাংলার বুকে। সেখানে কিছুদিন বাদেই তিনি দেহত্যাগ করলেন, সংসারের সকল ভার বড় ছেলেটীর

স্কন্ধে চাপিয়ে। মীরার বয়স তখন মাত্র নয় বৎসর। সেই থেকে ও মায়ের কাছেই দাদার তত্ত্বাবধানেই মানুষ হতে লাগলো।

এমনিভাবে কেটে গেল কয়েকবৎসর, অকিঞ্চিৎকর যার ইতিহাস। ম্যাট্রিক পাশ করে ও ঢুকলো কলেজে। ওর বাবার ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন্যে ওর বড়দাদা চেষ্টার ত্রুটী করলেন না। ওকালতীতে পশার জমিয়ে ওর দাদা বাড়িয়ে চললেন ওর লাইব্রেরীর আয়তন।

বি, এ, পাশ করবার পর ওর দাদা ওকে আরো এগুতে বল্লেন; ও কিন্তু বেঁকে বসলো এই বলে—বেশী লেখাপড়া আর কোন কাজেই বা লাগবে দাদা। তুমি ভেব না; একটা জীবন আমি এদিয়েই চালিয়ে নিতে পারবো।

ওর দাদা আপত্তি জানালেন কিন্তু কাজের হলো না; ইউনিভার্সিটীকে সেলাম করে ও নিলে লাইব্রেরীর আশ্রয়।

এর মধ্যে ওদের সংসারের ভিতর ঘটে গেল আর একটা বিপর্য্যয়। ওর ছোটদা গেলেন মারা, আর মেজদা চাকরী নিয়ে কলকাতা ছাড়লেন।

• • •

সংসারের মধ্যে মাত্র তিনজন। ও, ওর মা আর বড়দা। সংসারের সকল স্নেহ এসে আশ্রয় করলো ওরই ওপর।

ওর বড়দা বিয়ে না করে ভালবাসলেন বোনটীকে; যাকে তিনি ভরিয়ে তুলতে চাইলেন সব দিক দিয়েই নিজের সন্তানের মত।

একদিন ওকে কাছে ডেকে বল্লেন—মানুষের জীবন মরণের কথা বলা যায় না মীরা। তোর ছোটদার মত আমিও হয়তো কোনদিন সাড়া দিয়ে বসবো পরপারের ডাকে। বড় হয়েছিস্ তুই,
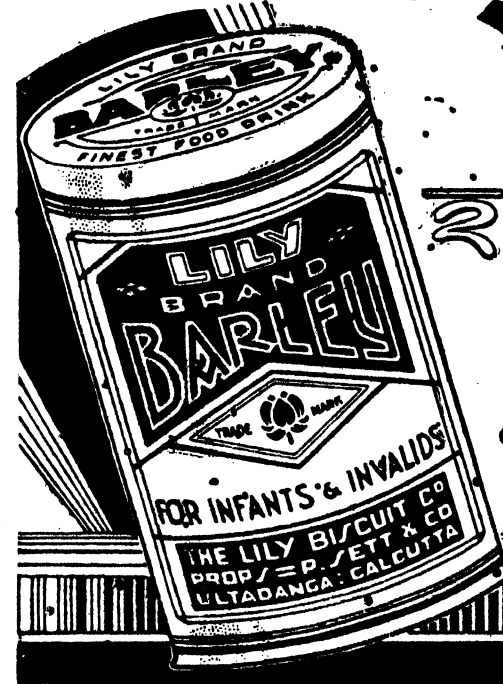
লেখা পড়াও যা শিখেছিস তাও খুব সাধারণ নয় তা জানি, কিন্তু তবু তুই মেয়েমানুষ। বাস্তব জগতের সাথে তাল রেখে চলতে পাবি পদে পদে বাধা। তাই আমার ইচ্ছা পথে চলবার পাথেয় যাতে তোর অভাব না হয় তার ব্যবস্থা করে যাবো।

—তুমি কি বলতে চাইছো দাদা?

—আমি এই বলতে চাইছিনা যে আমি তোকে সংসারী করিয়ে দিতে চাই। নিজেকে বোঝবার এবং বুঝে পা বাড়াবার মত বয়স ও বুদ্ধি তোর দুটোই হয়েছে। তোর স্বাধীন মনে শিকল দিতে গিয়ে তাকে বিড়ম্বিত করবার চেষ্টা কোন কালেই করবো না। নিজের মনমত পথে পা বাড়িয়েও যে তুই নিজের সম্মানকে বজায় রাখতে পারবি সে বিশ্বাস আমার আছে।

মীরা উৎসুক নেত্রে ওর দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি তোকে এই বলতে চাইছিলাম যে—বাবা দিয়ে গেছেন তোর সমস্ত ভার আমার ওপর। কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভুল থেকে যায়-তাই সদাই জাগে ভয়। বাবা মরে যাবার সময় বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারেন নি আমাদের, এক শিক্ষা ছাড়া। ভিতরে ভিতরে তিনি চালিয়ে এসেছেন অনেক দুঃস্থ সংসার, আর কেউ সে কথা না জানলেও আমি সে খোঁজ জানি; আর সেই জন্য তাঁকে খাটতে হয়েছে বিস্তর যার ফলে দেহ তাঁর টিকলো না। তবু রাস্তায় তিনি বসিয়ে যান নি আমাদের। যা কিছু তিনি রেখে গেছেন তাতে একটা সংসার খুব চলে যেতে পারে। আমার কথা ভাববার আর প্রয়োজন নেই। আমি যা রোজগার করি তাতে মাকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে যেতে পারবো। তোর মেজদার কথা তো আলাদাই—সাহেব মানুষ সে—কি করছে না করছে সন্ধান দেবার প্রয়োজন মনে করে না। বাবার ফেলে যাওয়া বিত্ত, যা কিছু এতদিন আছে আমার নামে ব্যাঙ্কে, সেটা বদলে তাই তোর নামে করে দিতে চাই—এই হচ্ছে আমার বলবার কথা। মানুষের মন পেণ্ডুলামের মত সর্ব্বদাই খাচ্ছে দোল; কোন স্থিরতাই তার নেই তাতো জানিস্ মীরা!

মীরার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোন কথাই বেরয় না। তারপর রুদ্ধ গলায় বলে—তার মানে তুমি চাও আমাকে পর করে দিতে!

ভুল বুঝিস না মীরা! আমি যে ঠিক তা চাই না তা তুই জানিস। আমি চাই তোকে আরো আপন করে নিতে।

এই বুঝি তোমার আপন করে নেওয়া? ও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

ওর দাদা ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন—কাঁদিস নে মীরা, কাঁদবার মত এ থেকে কি পেলি? তোর বুদ্ধি এখনও পাতলা, তাই ঠিক বুঝতে পারবি না,—কেন আমি এই ব্যবস্থা করতে চাই। পাথেয় না থাকলে পথ চলা যায় না তা তো জানিস্—সেটা যখন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মর্য্যাদা তোর আমি বাড়িয়েই দিতে চাই তোর স্বাধীন মনের পিছনে শক্তি দিয়ে। আমার কাছে তুই আসবি মাথা উঁচু করেই, স্নেহের ডালি বহন করে; মাথা নীচু করে আশ্রিতার মত নয়।

ওসব আমি বুঝতে চাই না দাদা, ও বলে—হয়তো চেষ্টা করেও বুঝতে পারবো না। বাবার সঞ্চিত বিত্তটুকু মার স্বাচ্ছন্দ্যের পিছনে ব্যয়িত হলেই আমি আরো খুসী হব, অথবা বাবার স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করতেও তো পার! আমাদের স্নেহের সম্বন্ধ যেন কোন কালে ক্ষুণ্ণ না হয় এইতো বলতে চাও তুমি? আর সেই জন্যেই আমিও সঙ্কল্প করেছি—তোমার বা বাবার দেওয়া ও শক্তি আমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কাজে ব্যয়িত হতে দেব না। যথেষ্টই তোমরা আমাকে দিয়েছ—তারই জন্যে চিরটীকাল আমার মাথা থাকবে তোমাদের পায়ে শ্রদ্ধায় নীচু হয়ে। আরো বোঝা চাপিয়ে তুমি তাকে একেবারে মাটীতে মিশিয়ে দিতে চেও না। আমি তো কোনকালেই আমার ব্যবহারের বৈলক্ষণ্য দেখাইনি; তবে কেন তুমি চাইছো আমাকে পর করে দিতে।

এর মানে পর করে দেওয়া?

তা নয়তো, কি? ও জোর দিয়ে বলে। অনর্থক অর্থের খোঁচা তুমি রাখতে চাও আমাদের মধ্যে খাড়া করে। আমি যে সে খোঁচা সহ্য করতে পারবো না সে কথা তুমি একবারও ভাবলে না কেন? তুমি তো নিজেই বললে—মাথা নীচু করে যাতে আসতে না হয়; তাই আমিও ঠিক করেছি কাজ নেব। বসে বসে করবোই বা কি? দরখাস্ত ইতিমধ্যেই আমি কয়েক জায়গায় করেছি। তুমি ভেবনা দাদা চালিয়ে আমি ঠিকই নিতে পারবো। যে পথে আমি বাস্তবিকই সুখী হব সে পথে তোমাদের আশীর্ব্বাদ যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে।

ওর দাদা ব্যথিতস্বরে বললেন—যা ভালো বুঝিস্ কর বোন। আমার বিচার বুদ্ধির কাছে তোর আত্ম চেতনাকে খাটো করতে চাই না।

সেই থেকে মীরা ভর্ত্তি হলো একটা স্কুলে, তখন ওর বয়স মাত্র কুড়ি কি একুশ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্ব্বাসা
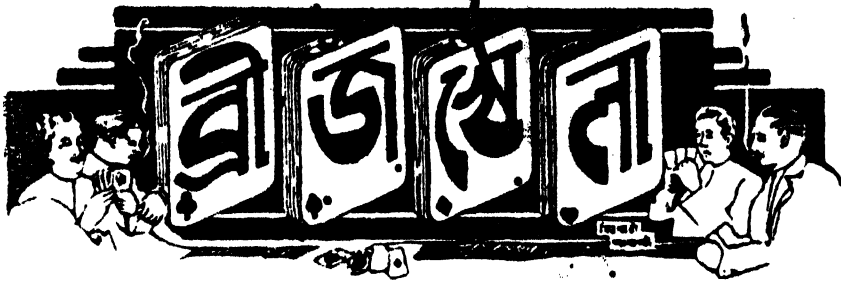
প্রতিযোগিতার একটি হাত—

নিম্নে প্রতিযোগিতার একটি হাত প্রকাশ করা গেল।

ইস্কাবন—টেক্কা, দুরি।
হরতন—টেক্কা, বিবি, দশ, সাতা, ছক্কা।
রুহিতন—গোলাম, দশ।
চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, দশ, ছক্কা।

ইস্কাবন—গোলাম, নয়, ছক্কা।
হরতন—গোলাম, দুরি।
রুহিতন—বিবি, নয়, পঞ্জা, দুরি।
চিড়িতন—বিবি, গোলাম, চৌকা, তিরি।
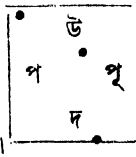
ইস্কাবন—বিবি, আটা, পঞ্জা, তিরি।
হরতন—সাহেব, চৌকা, তিরি।
রুহিতন—সাহেব, আটা, চৌকা।
চিড়িতন—নয়, সাতা, দুরি।

ইস্কাবন—সাহেব, দশ, সাতা, ছক্কা।
হরতন—নয়, সাতা, পঞ্জা।
রুহিতন—টেক্কা, সাতা, ছক্কা, তিরি।
চিড়িতন—আটা, পঞ্জা।

উক্ত হাতে ডাক হয়েছিল,

'দ'	'প'
একটি ফেরাই	পাশ
পাশ	পাশ

'উ'	'পূ'
একটি হরতন	পাশ
তিনটি ফেরাই	পাশ

'প' চিড়িতনের তিরি পেড়ে খেলায় ডামি ছক্কা দিলেন, 'পূ' নয় দিয়ে পিটখানি নিলেন। এরপর তিনি ইস্কাবনের তিনি পেড়ে খেললেন; সকলেই ছোট তাস দিলে পর ডামি টেক্কা দিয়ে পিটখানি ধরে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ছোট একতাস হরতন খেললেন। সকলেই ছোট তাস দিয়ে গেলেন এবং 'প' হরতনের গোলাম দিয়ে পিট ধরলেন। অতঃপর চিড়িতনের চৌকা খেলে তিনি চাল দিলেন। ডামি সাহেব দিয়ে পিট নিয়ে হরতনের টেক্কা খেললেন। তারপর ছোট একতাস হরতনের খেলায় 'পূ' হরতনের সাহেব দিয়ে পিট নিলেন। তারপর তিনি ইস্কাবনের পঞ্জা খেলায় ডাকদার ছেড়ে দিলেন, 'প' গোলাম দিয়ে পিট ধরলেন। এরপর তিনি রুহিতনের তিরি খেললেন। 'পূ' এ পিটে সাহেব দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডাকদার টেক্কা দিয়ে পিট না নিয়ে ছেড়ে দিলেন। 'পূ' পিটখানি ধরে আবার রুহিতন খেললেন।

হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস রেকর্ডস
ডিসেম্বর ১৯৩৮

P. 11829. শ্রেণী শিল্পী অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এই রেকর্ডে দু'খানি কীর্ত্তন গান গেয়েছেন। কীর্ত্তনের বিষয় 'নৌকা-বিলাস' এবং এই বিষয়ের ১ম ও ২য় খণ্ড রেকর্ডের দু'দিকে গীত হয়েছে। অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় গায়ক। কিন্তু ইদানীং তাঁর গানে তেমন সম্মোহনী আবেদন পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর পূর্ব্ব প্রকাশিত কীর্ত্তনের রেকর্ডগুলি যেন ইহাপেক্ষা অনেক ভাল।

* * *

N. 17227. জনপ্রিয় শিল্পী মৃণাল-কান্তি ঘোষ কবি নজরুল রচিত দু'খানি শ্যামা-সঙ্গীত রেকর্ড করেছেন। সাধারণ শ্রোতার পক্ষে রচনার ভাব হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের ভাষা যত প্রাঞ্জল ও অনাড়ম্বর হয় ততই অধিক হৃদয়গ্রাহী হবার সম্ভাবনা। গায়কের গাহিবার প্রণালী বদলানো প্রয়োজন। আমাদের মনে হয় এর পূর্ব্ব-প্রকাশিত "বল রে জবা" গানটি যেন এ রেকর্ড অপেক্ষা শতগুণে মধুর।

* * *

N. 17223. মিস্ আঙ্গুরবালা এই রেকর্ডে দু'খানি পল্লীগীতি গেয়েছেন। গায়িকার কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এক সময় একে অত্যন্ত জনপ্রিয় করেছিল। বর্ত্তমানে এর কণ্ঠের মাধুর্য্য অনেকখানি কমে গেলেও মার্জ্জিত ও সুরেলা কণ্ঠের আবেদন সব সময়েই সঙ্গীত পিপাসুর মনে আঘাত দেয়। মার্জ্জিত ও শিক্ষিত কণ্ঠে পল্লী-সঙ্গীত যতদূর রূপ পেতে পারে তা এই গান দুটিতে পেয়েছে।

* * *

N. 17228. কবি নজরুল রচিত দু'খানি ধ্রুপদ গান শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখার্জ্জি এই রেকর্ডে গেয়েছেন। উচ্চাঙ্গের গানের আসরের যাঁরা নিয়মিত শ্রোতা তাঁরা গায়কের কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত। রেকর্ডে এই শ্রেণীর গানের চাহিদা কতদূর আমাদের জানা নেই। বৈচিত্র্য হিসাবে কোন কোন শ্রোতা রেকর্ডখানি সংগ্রহ করতেও পারেন।

N. 17224. শ্রীমতী পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায় দু'খানি আধুনিক গান রেকর্ড করেছেন। গায়িকার কণ্ঠস্বর সুরেলা ও বৈশিষ্ট্যহীন। গানের কথা সাধারণ শ্রোতার বোধগম্য নয়। শিক্ষিত ও মার্জ্জিত রুচির মুষ্টিমেয় শ্রোতার জন্তে বোধহয় রেকর্ডখানি পরিবেশিত হয়েছে।

* * *

N. 17233. পল্লী সঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক আব্বাস উদ্দীন সাহেব দু'খানি গ্রাম্যগীতি এই রেকর্ডে গেয়েছেন। গানের কথা, সুর ও গাওয়া অনাড়ম্বর হওয়ায় গান দুটির সার্ব্বজনীন আবেদন আছে। আমাদের মনে হয় রেকর্ডখানি বাংলা দেশে জনপ্রিয় হবে।

* * *

N. 17225. শ্রীমতী কমলা পাট্টাদার দু'খানি কীর্ত্তন গান এই রেকর্ডে গেয়েছেন। পদাবলী কীর্ত্তন সব সময়েই আনন্দ-দায়ক। গায়িকার গাইবার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে উন্নতির আশা আছে।

* * *

N. 17226 কুমারী রেণুকা রায় দু'খানি বাংলা গান রেকর্ড করেছেন। গান শুনে মনে হয় গায়িকা কিছু সঙ্গীত চর্চ্চা করেছেন। ঠুংরী শ্রেণীর গান হয়েছে এ দুটি। কিন্তু ঠুংরী গান গেয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে হলে কণ্ঠের যে সাধনা প্রয়োজন তা এঁর কণ্ঠে নেই। গায়িকার নব-প্রচেষ্টা যে একেবারে বিফল হয় নি সে কথা বলা চলে।

ডাকদার পুনরায় ছেড়ে দেওয়ায় 'প' বিবি দিয়ে পিটটি নিয়ে শেষ রুহিতন খানিও খেলে দিলেন। এইবার খেলায় ডাকদার রুহিতনের টেক্কা, সাতা ও ইস্কাবনের সাহেবে পিট নিয়ে তিনটি পিট পেলেন। যা হোক আমরা তারপর শুনলাম এই তিনটি জিতে প্রতিযোগীদলটী নাকি দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠেছে।

গত রবিবার থেকে থিটা-বিটা ক্লাবের পরিচালনায় Pair contract খেলা আরম্ভ হয়েছে। আসছে বারে তাঁদের খেলা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

রেডিও প্রসঙ্গ

সত্যভাষী

পূর্ব্বের তুলনায় কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান লিপির বহু অবনতি ঘটেছে। কিন্তু কেন?—এ প্রশ্নের সহজ উত্তর—গুণগ্রাহিতার অভাব। বেতারের লাইসেন্স সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে অথচ অনুষ্ঠান সূচির উন্নতি না হয়ে অবনতি ঘটছে। বেতারে শ্রোতারা কি চায়—বেতার কর্তৃপক্ষ তা জানবার চেষ্টা করে থাকেন ইদানিং। বেতার শ্রোতাদের অভাব-অভিযোগ লিপির প্রত্যুত্তর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসে—বেতার শ্রোতাদের অভিমত এবং গঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করা হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কার্য্যকালে কোন প্রতিকারই দেখা যায় না!

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান লিপির যখন সংস্কার সাধন করা হয় তখন ভালো ভালো জনপ্রিয় অনুষ্ঠান গুলিকে বাদ দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত কয়েকটি বিচিত্র অনুষ্ঠান সত্যিই প্রশংসনীয় এবং নূতন রসতথ্যপূর্ণ ছিল—অনুষ্ঠান লিপি সংস্কারে এইটেই বাদ দেওয়া হোল।

এবারে বেতার বিচিত্রায় "অতীতের স্মৃতি" এবং "অন্ধ সুরদাস" আমাদের ভালো লেগেছে। সাহিত্য রসপূর্ণ সঙ্গীতানুষ্ঠান শ্রোতাদের প্রিয়।

গত রবিবারের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে সতীদেবীর রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠানে রত্নেশ্বর বাবুর কীর্ত্তন বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। বেতারে রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান আশানুযায়ী হয় না।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠান তথা মহিলা-মজলিস সম্পর্কে শ্রীযুক্তা উমা দেবীর একখানি অনুযোগ পত্র আমরা প্রকাশিত করলাম। বেতার কর্তৃপক্ষের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত "খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত বেতার আলোচনা আমরা বেতার গ্রাহক এবং শ্রোতা নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া থাকি। 'মহিলা-মজলিস' সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পত্রিকায় ইহা লইয়া আলোচনা করিবেন।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী মণ্ডলের, ছোটদের আসরের, পল্লীমঙ্গলের প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব আছে কিন্তু বিশেষ করিয়া মহিলা সম্প্রদায়ের দিক লইয়া কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামান না। মহিলা-মজলিশ বর্তমানে সপ্তাহে কয়েকটি দিন 'নারীদের মনোবিজ্ঞান'—'প্রতিযোগিতার আসর' কাপড়ে রং করা, রূপ, ঘরসংসারের খুটিনাটি দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করা হ'ল। আর 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলো' আছে গ্রামোফন রেকর্ড।

মধ্যে মহিলা মজলিশের অনেক উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভালো বক্তৃতা—ভালো সঙ্গীতানুষ্ঠান, নারী প্রসঙ্গ লইয়া ধারাবাহিক আলোচনা, ধর্ম্ম প্রসঙ্গ, সাহিত্য প্রসঙ্গ সঙ্গীত সহযোগে বিভিন্ন প্রসঙ্গাদি সাড়ে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসর ছিল। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবৎ অকস্মাৎ কেন এ সব উঠিয়া গেল, সময় সংক্ষিপ্ত করা হইল, মহিলাদের আসরের এ অবনতি ঘটিল আমাদের নিকট তাহা আজও অজ্ঞাত।

কলিকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ আশা করি আবার মহিলা-মজলিশের পূর্ব্বপ্রথা প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা-ভাজন হইবেন।

ইতি—বিনীতা
শ্রীউমা দেবী

শ্রীমতী দুর্গা দেবী কোন পথে?

(প্রাপ্ত পত্র)

শ্রীবিভূতি ভূষণ ঘোষ

সম্প্রতি সঞ্জীবনী পত্রিকায় "শ্রীমতী দুর্গা দেবী কোন্ পথে" প্রবন্ধটি পড়িলে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি স্পষ্টই দৃষ্টিতে পড়ে।

(১) কে একজন শ্রী—নামে ৭ই শ্রাবণের দেশ পত্রিকায় লিখিলেন,—পরম ভাগবত ভগবান্দাস বাবাজী গৌর দাসীর কাণে মন্ত্র দিয়া দিলেন। তাই তিনি ছিলেন গৌরাঙ্গ ভক্ত। দুই সপ্তাহের মাথায় ২১শে শ্রাবণ এই কথার প্রতিবাদ দেখা গেল "দেশ" পত্রিকায়। প্রতিবাদী আটজন এক ভাষায় একই ভাবে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—শ্রীরামকৃষ্ণই গৌর দাসীর দীক্ষা গুরু ছিলেন—অন্য কেহ নহেন।

(২) শ্রী—দমিলেন না। গত ৮ই ভাদ্রের "যুগান্তর" পত্রিকায় এমন এক প্রতিবাদ বাহির করিলেন, যাহার পরে গৌর দাসীর বা সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরী মাতার পক্ষ হইতে আর কোন প্রতিবাদ বাহির না হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু হাওয়া হঠাৎ উলটা দিকে বহিল।

(৩) দেখা গেল, গত ২৯শে ভাদ্রের "যুগান্তর" পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ও গত ৩১শে ভাদ্রের "বসুমতী" পত্রিকায় সুসাহিত্যিক শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ বসু স্বাক্ষরিত দুইখানি বিবৃতি ২১শে শ্রাবণের "দেশ" পত্রিকায় তাঁহাদের স্বাক্ষর সহায়ে যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে উভয়ে সাধারণকে জানাইতেছেন,—

(ক) গৌর দাসীর পালিতা কন্যা সারদেশ্বরী আশ্রমের সম্পাদিকা শ্রীমতী দুর্গা দেবী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া "দেশ" পত্রিকার কথা চাপা দিয়া, অন্যরূপ ভাবে বুঝাইয়া যে লেখা দেবেনবাবুর নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই লেখা না পড়িয়া মাত্র দেবেন্দ্রবাবুর দস্তখত দেখিয়াই হাঁপানী রোগ-আক্রান্ত মনীন্দ্র বাবু নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন।

(খ) দেবেন্দ্রবাবু নিজ প্রতিবাদে বলেন,—তাঁহার লেখা ও "দেশ" পত্রিকার প্রতিবাদের ভাষা এক নহে। এই জন্য তিনি শ্রীমতী দুর্গা দেবীকে তাঁহার সেই লেখা সাধারণে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।

(গ) মনীন্দ্রবাবু বলেন,—"দেশ" পত্রিকার প্রতিবাদের ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহা তিনি লিখেন নাই। গৌর দাসীর মৃত্যুর সময়ে তিনি পাটনায় ছিলেন। এমত অবস্থায় গৌর দাসী মৃত্যুর দিন কি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি জানেন না।

(৪) শ্রীমতী দুর্গা দেবী শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রবাবু ও মনীন্দ্রবাবুর বিবৃতির আঘাত বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিলেন। তিনি ... পর্য্যন্ত ভরসা করিয়া দেবেন্দ্র বাবুর সেই লেখা কোন সংবাদ পত্রে ... করেন নাই। অথবা মনীন্দ্রবাবুর বিবৃতির কোন প্রতিবাদ প্রকাশ করিতে ... নাই। এ ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে শ্রীমতী দুর্গা দেবীর সহিত মনীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা ইহার মধ্যে যখন অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাই, তখন শ্রীমতীর নীরব থাকার অর্থ হইল না ত স্বীকার করিয়া লওয়া। প্রকা... তাহা হইলেও শ্রীমতীও সহজ পাত্রী নহেন তিনি গত ১লা আশ্বিনের "যুগান্তর

[পত্রি]কায় "সঞ্জীবনী"র ভাষায় শ্রীযুত সুরেন্দ্র-[নাথ] সেনকে শিখণ্ডীরূপে পুরোভাগে [রাখি]য়া শ্রী---র প্রতিবাদের উত্তরের [প্রত্যু]ত্তর দিলেন। সেই উত্তরের ভাষা যেমন নিন্দনীয় তেমন তার যুক্তিগুলিও অশোভনীয়।

(৫) ঝড়ের পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন নিস্তব্ধ হইয়া যায়, শিখণ্ডীরূপী সুরেন্দ্র সেনের লেখার পরে প্রায় দেড় মাস সংবাদ পত্র এ প্রসঙ্গে একেবারে নিস্তব্ধ দেখা গেল।

(৬) ইহার পরে গত ১৯শে কার্ত্তিক ঢাকা হইতে প্রকাশিত "সোনার বাংলা" [প]ত্রিকায় মণীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুকে আক্রমণ করিয়া—অজ্ঞাত কুলশীল দিগেন্দ্র [লা]ল সরকার এমন এক অনাহুত প্রতিবাদ বাহির করিলেন, যাহাকে শ্রীমতীর পক্ষে সাফাই গাওনা বলিলে অন্যায় হইবে না। দিগেন্দ্রলাল সরকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা একমাত্র বলিতে পারেন স্বয়ং শ্রীমতী। কারণ তাঁহারই সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল মণীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুর—দিগেন্দ্রলাল সরকারের সহিত নহে।

(৭) সুতরাং বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না যে—শ্রীমতী দুর্গা দেবী সব্য-সাচীর ভূমিকায় নামিয়া প্রথমে সুরেন্দ্র সেনকে পুরোভাগে রাখিয়া আঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন শ্রী—কে। এইবার দিগেন্দ্র সরকারকে শিখণ্ডীর ভূমিকায় আসরে নামাইয়া আঘাত করিতেছেন—শ্রদ্ধেয় মণীন্দ্রবাবু ও দেবেন্দ্রবাবুকে।

(৮) কিন্তু সংবাদ পত্রের নিস্তব্ধ ভাব আর বেশী দিন রহিল না। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় শ্রী— সুদীর্ঘ নয় কলমে যে ঝড় তুলিলেন—তাহা এতদিনের নিস্তব্ধতাকে ভুলে আসলে পোষাইয়া লইল। শিক্ষিত সমাজ শ্রীমতী দুর্গা দেবীর প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলেন, এই প্রকৃতির মহিলার উপরে যখন পরম ভগবত ভগবান্ দাস বাবাজীর প্রধানা মন্ত্র শিষ্যা পূজ্যা গৌরদাসী প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রমের ভার রহিয়াছে, তখন তাহার ভবিষ্যৎ সন্দিহান।

(৯) শিক্ষিত সমাজ তখনও ভাল করিয়া ব্যাপারটা যে কি হইল, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অথচ ৮ই অগ্রহায়ণ সাপ্তাহিক "অবতার" প্রকাশ করিল,—"মায়ের মন্দিরে জোড়া পাঁটা।" বুঝিতে বিলম্ব হইল—এ আবার কোথাকার সংবাদ! কিন্তু ভাবিতে আর হইল না। ৯ই অগ্রহায়ণ তারিখের "বাঙলা" নামে অপর এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় যখন বাহির হইল, "ভালোয় ভালোয় তাড়াও, হুলো কুলোর বাতাস দিয়ে—" ও "দুর্গাদেবী কোন্ পথে" তখন কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মায়ের মন্দির অর্থ ভগবান্ দাস বাবাজীর মন্ত্র শিষ্যা গৌরদাসী প্রতিষ্ঠিত সারদেশ্বরী আশ্রম ও জোড়া পাঁটা হইল,—শ্রীমান অমলকুমার গাঙ্গুলী ও সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত নামে দুই জন যুবক যাঁহারা নিয়ত সারদেশ্বরী আশ্রমে বসবাস করেন, দু'বেলা আহার করেন ও রাত্রে আশ্রমেই নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন।

তবুও যদি কেহ অনুমান করেন যে আমরা কষ্ট সাধ্য কল্পনা বলে অমল ও সত্যেনকে বুঝাইতে সাধারণকে উৎসাহিত করিতেছি, তাহা হইলে তিনিও ভুল বুঝিবেন। কারণ—

(১০) "অবতার" পত্রিকায় এই রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, "পরম ভগবত ভগবান্ দাস বাবাজীর প্রধানা মন্ত্র শিষ্যা গৌরদাসী (গৌরীমা "সারদেশ্বরী আশ্রমের" প্রতি-ষ্ঠাত্রী) আজ পরলোকে। ** কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় ** শ্রীযুত অমলাকান্ত গাঙ্গুলী ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নামক দুই যুবক 'সারদেশ্বরী আশ্রমের' ভিতরে কয়েক বৎসর ধরিয়া বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা এই আশ্রমে দুই বেলা আহার করেন এবং রাত্রি যাপনও করেন। এই ব্যাপার লইয়া আশ্রমের প্রতিবেশী-মণ্ডলে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে।

সারদেশ্বরী আশ্রমের বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতী দুর্গাদেবীই আশ্রমের "প্রধানা।" সুতরাং অমল ও সত্যেন যে সারদেশ্বরী আশ্রমে থাকেন, তাহা যে শ্রীমতীর জ্ঞাতসারেই সম্ভব হইয়াছে, এইরূপ যদি কাণাঘুষা উঠে তাহা কি অন্যায় বলা যায়?

দিও

আশালতা সিংহরায়

মোর জীবনের যত আরাধনা
আর যত কিছু প্রিয়—
ছুটে যদি চ'লে তোমার বলিয়া
আপন করিয়া নিও।
বাহিরে চলিছে যত লেনা-দেনা
যা কিছু মন্দ-ভালো
সুন্দর তব পরশের রাগে
করে' নিও সব আলো,-
মানুষের হাটে বন্ধু বলিয়া
যাদের দিয়েছি যাহা
অবহেলে চলে গ্যাছে দূরে সরি
নাই কেহ—কিছু নাই!

এই পুকুরের পশ্চিম পার

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এই পুকুরের পশ্চিমপার আমি বড় ভালবাসি,
কাজে ও অকাজে, দিবসে দুপুরে বারে বারে তাই আসি।
ভালবাসি এর কস্তুরি পানা, মলিন ঘোলাটে জল,
ভালবাসি এর প্রতি লতাপাতা শুভ্র শাপলা দল।
ভালবাসি এর জঙ্গল ভরা আধারের কারাগার,
ভালবাসি এর ভাঙ্গা প্রাচীরের ক্ষুদ্র ইটের সার
পশ্চিম পারে চেয়ে থাকি, শুধু আঁখি ভরে আসে জলে,
এই দিকে তাই কতবার আসি কত না কাজের ছলে।
প্রথম দিনের সুমধুর স্মৃতি বুকে ওঠে শুধু ভাসি,
এই পুকুরের পশ্চিম পার তাই বড় ভালবাসি।
প্রথম দিনের সে শুভ লগন মনে পড়িতেছে আজ,
এসেছিনু এই পুকুরের পারে করিতে কি যেন কাজ;
সহসা ওপারে দেখিনু চাহিয়া সেই সোনামুখ খানি,
অজানা আলোকে ভরিল আমার আঁধার হৃদয়খানি।
আনমনে তারে দেখিতে দেখিতে আর সবই যাই ভুলি',
সহসা সে চাহে মোর মুখ পানে শুভ্র নয়ন তুলি'।
দূরে মাঠে মাঠে বাজিয়া উঠিল গৃহে ফিরিবার বাঁশী,
পুরবীর সেই করুণ রাগিণী মোর প্রাণে লাগে আসি'।

তার পর হায়! কতটী সন্ধ্যা কাটায়েছি এই ঘাটে,
এমনি মধুর প্রেমের স্বর্গে কত রাত মোর কাটে।
মোক্ষ আমার নামিয়া এসেছে এই পুকুরের ধারে,
হেথায় আমার কমলে-কামিনী দেখা দেয় বারে বারে
এই আশা ভরা পূজার বেদীতে, আজ মনে পড়ে সব
হেথায় আমার দেবতার পূজা আরতির উৎসব।
গয়া তীর্থ এই ঠাঁই মোর, এই মোর বারানসী
এই পুকুরের ধারে বসে' তাই বড্ডই ভালবাসি।
এ পারের এই সিঁড়িতে দাঁড়ায়ে ভাবি শুধু এর কথা
শয়নে স্বপনে শুধু মনে হয় ওপারের দুখ-ব্যথা।
শূন্য এঘাটে বসিয়া একাকী কত ভাবি মনে মনে,
কেমনে হইবে মধুর মিলন প্রেমের প্রতিমা সনে।
কতজনে মোরে কত কথা কয়, হেথায় আসার লাগি
ওপারের তরে সঁপেছি জীবন, সাজিয়াছি বৈরাগী।
প্রাণ যদি মোর যায় সেও ভাল গয়াতীর্থের নীরে,
তাহার লাগিয়া দিতে পারি এই ক্ষুদ্র বক্ষ-চিরে।
কলঙ্কময় জীবন আমার কাটাব হেথায় আসি,
দীঘিটাকে তবু পারিনা ছাড়িতে বড়ই ভালবাসি।